২২শ বর্ষ—প্রথম খণ্ড

(১৩৫০ সাল—বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত)

সম্পাদক

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেশ

শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই,' ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'।"

'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা অনেকেই অনেক রকমে করেছেন, কিন্তু কবির নিজেরটী কতই না সহজ ও সুন্দর। 'সংসার আমাদের জীবনের সমস্ত কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু আমাদিগকে তো গ্রহণ করে না। আমার চিরজীবনের ফসল যখন সংসারের নৌকায় বোঝাই করিয়া দিই তখন মনে এ আশা থাকে যে, আমারও ঐ সঙ্গে স্থান হইবে কিন্তু সংসার আমাদিগকেই দুই দিনেই ভুলিয়া যায়।...আমরা আগুন জ্বালাইয়া রাঁধি, যাহারা আগুন আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাদিগকে কে জানে? যাহারা চাষ আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের নামই বা কোথায়? যাহারা যুগে যুগে নানারূপে মানুষকেই গড়িয়া তুলিতেছে তাহাদের কাজ আমাদের মধ্যে অমর হইয়া আছে, কিন্তু তাহারা নাম ধাম সুখ দুঃখ লইয়া কোন্ বিস্মৃতির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে অথচ প্রত্যেকেই সংসারকে বলিয়াছিল 'আমার সমস্ত লও, তোমার জন্যই আমি খাটিতেছি, তোমাকে দিয়াই আমার সুখ, আমার সমস্তই লও কিন্তু আমাকেও ঠেলিও না, আমাকে ভুলিও না—আমার কাজের মধ্যে চিহ্নটুকু যত্ন করিয়া রাখিয়া দিও।' কিন্তু এত স্থান কোথায়?"

এই যে কর্ত্তাকে স্মরণ না করে তাঁর কীর্ত্তিকে গ্রহণ করার প্রয়াস তা-ই কবির মনকে ব্যথিত করে তুলেছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর চেয়েও নিষ্ঠুর ব্যথা মানুষের হৃদয় রক্তাক্ত করে দেয়। বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই, কীর্ত্তি থেকে কর্ত্তাকে নির্ব্বাসিত করা হচ্ছে—যাঁরা দেশসেবার প্রেরণায় মৌলিক কিছু গড়ে তুলেছেন,—আপন সৃষ্টির মধ্যেও তাঁদের ঠাঁই দিতে অনেকে যেন কুণ্ঠা বোধ কচ্ছেন। একটা দৃষ্টান্তের কথা বলি।

বাংলাদেশের ঢাকা জেলাটি চিরকালই বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এমন বাঙ্গালী খুব কমই আছেন, যিনি না জানেন যে ঢাকার তৈরী মস্‌লিনের মত সূক্ষ্ম কাপড় পৃথিবীর কোন দেশই আজ পর্য্যন্ত তৈরী করতে পারেনি। কিন্তু পরাধীনতার আশীর্ব্বাদে যথাকালে এই শিল্পের মৃত্যু হয়েছিল। সে কাহিনী হয়ত এতদিনে অতীত ইতিহাস বলে গণ্য হ'ত যদি না সেখানে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু ঢাকেশ্বরী কটন মিলের প্রতিষ্ঠা ক'রে ঢাকায় বস্ত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন করতেন। সে আজ ২২ বছর আগেকার কথা। সেদিন নারায়ণগঞ্জ সহরের অদূরে যেখানে দস্যু-তস্করের আবাসভূমি ঘন বন ছিল আজ সেখানে গড়ে উঠেছে ভারতের দু'টি বৃহত্তম কাপড়ের কল—ঢাকেশ্বরীর ১ নং ও ২ নং মিল; স্থানটিতে এখন সৎ ও কর্ম্মচঞ্চল লোকের ঘন বসতি। মিল দুটিতে ১,৩০০ তাঁত ও ৫৩,০০০ টাকু দিবারাত্র চলছে আর তাতে ৮,০০০ দক্ষ বাঙ্গালী কর্ম্মী দিনরাত ২৪ ঘণ্টা কাজ করে উৎপাদন করছে বোম্বাই, আমেদাবাদের সমতুল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্র-সম্ভার বৎসরে ১ কোটী টাকা মূল্যেরও অধিক। সূর্য্যবাবু মিলের ক্রেতা, কর্ম্মী বা অংশীদার—কাউকেই ভোলেন না, সত্যই তিনি বলতে পারেন—"তোমাদের জন্যই আমি খাটিতেছি।" ক্রেতাদের তিনি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর কাপড় অল্পতর মূল্যে দিচ্ছেন; এই ত গত পূজার সময়ই বাংলার দুর্গত অবস্থা দেখে তিনি স্বেচ্ছায় ঢাকেশ্বরীর কাপড়ের দাম এমন কমিয়ে দিলেন যে, অন্য কোন মিল তার কাছাকাছিও যেতে পারল না। যুদ্ধের দরুণ জীবন ধারণের প্রাথমিক সামগ্রীগুলি দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কর্ম্মীদের জন্য উপযুক্ত বোনাসের ব্যবস্থা করেছেন এবং ১২৲ মণ মূল্যে চাল যোগাচ্ছেন। ঢাকেশ্বরীর ২২,০০০ বাঙ্গালী অংশীদারদের জন্য লভ্যাংশও শতকরা দশ টাকা থেকে সাড়ে বার টাকায় বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু কীর্ত্তি থেকে কর্ত্তাকে নির্ব্বাসিত করার যে কথা বলছিলাম। ঢাকেশ্বরী মিল যে সূর্য্যবাবুর জীবনের ফসল—এটা যে তাঁর যৌবনের স্বপ্নের বাস্তব পরিণতি—এটাকে যে তিনি তিল তিল করে আপন বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে তুলেছেন, একথা কয়েকজন স্বার্থান্ধ ব্যক্তি বুঝবেন না। তাদের কাছে সূর্য্যবাবুর অবদান কিছু নয়, তার মস্তিষ্কের বা পরিশ্রমের কোন দাম নেই, ঢাকেশ্বরীর বর্ত্তমান সুদৃঢ় অবস্থার জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকার প্রশ্ন অবান্তর—শুধু মিলের কর্ত্তৃত্বটুকু তাদের হাতে এলেই হ'ল। তা সে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করবার বা চালনা করবার ক্ষমতা, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তাদের থাকুক আর নাই থাকুক। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তাঁরা সূর্য্যবাবু ও তাঁর সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধে অহরহ মামলা, মোকর্দ্দমা করেই চলেছেন, আর মিথ্যা প্রচারেরও বিরাম নেই।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বুঝবেন যে, এতে করে ঢাকেশ্বরী মিলের যতটা ক্ষতি হয় তার সামান্য অংশও সূর্য্যবাবুর হয় না। মিলটি বাংলার জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ্। এটির কোন প্রকার ক্ষতি যে একটা মস্ত বড় জাতীয় দুর্দ্দৈব সেটা বলাই বাহুল্য। বাংলার জনসাধারণ সূর্য্যবাবু ও তাঁর সহকর্ম্মীদের ২২ বছর ধরে জানেন, তাঁরা এক এক ক'রে ২টি মিল গড়ে তুলেছেন এবং তাদের দিন দিন অধিকতর উন্নত ক'রে তুলছেন। যুদ্ধ থেমে গেলে যখন যন্ত্রপাতি আনান সম্ভব হ'বে, তখন যে তাঁরা ৩নং মিল গড়তে প্রবৃত্ত হ'বেন না সেটাও শপথ ক'রে বলা যায় না। এই সব কি সূর্য্যবাবুর কর্ম্মশক্তি নিঃশেষিত হবার লক্ষণ? তবে আমরা পরিচিত, অভিজ্ঞ লোককে বাদ দিয়ে অপরিচিত, অনভিজ্ঞ লোকদের পক্ষ নেব কেন?

শ্রীশ্রীযোগব্রহ্মবিদ্যা

বৃহৎ পুস্তক ২০ খণ্ড মূল্য ১৬৲। আনন্দমালিকা ১৭ খানা ২৸০। জ্ঞানমালিকা ২০ খানা ক্ষুদ্র পুস্তক ১৲। জ্যোতিষ বিজ্ঞান (রাশি ও নক্ষত্রের চিত্র সহ) ১৷০; আর্য্যভাব গীতা বড় বই ১৷০।

উপরোক্ত নূতন ধরণের ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া আত্মা, ঈশ্বর ও অদৃশ্য লোকের সন্ধান লাভ করতঃ জীবনকে ধন্য জ্ঞান ও সংসারে বহুবিধ কল্যাণ লাভ করিবেন; যোগের ও সাধনার রহস্য বিদিত হইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—কাশীধাম, গোধুলিয়া, দাস কোং। কলিকাতা, মহেশ লাইব্রেরী, গুরুদাস লাইব্রেরী, ভারত সাহিত্য ভবন। পাবনা, যোগব্রহ্মবিদ্যাশ্রম।

ডাক্তার পালের ভীম বটিকা

সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, রতিশক্তিহীনতা, বাত, বেদনা, অনিদ্রা, বহুমূত্র বা ডায়েবেটিস ইত্যাদি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবে আরোগ্য হয়। **ভীম বটিকা** বলকারক, রক্তপরিষ্কারক ও শুক্রবর্দ্ধক। এক শিশি ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। ১৫ দিবসের ঔষধ মূল্য প্রতি শিশি ২৸০ দুই টাকা আট আনা।

প্রাপ্তিস্থান:—১। এম্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং—৮০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২। ও, এন্, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স—১৬৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ১৯ নং লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩। যমুনাদাস এণ্ড কোং, চাঁদনী চক, দিল্লী। ৪। কিং মেডিকেল হল, ২৫ নং আমিনাবাদ পার্ক, লক্ষ্ণৌ।

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড
ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস—কুমিল্লা

কলিকাতা অফিস:—২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট

শাখা ও এজেন্সী অফিস

কুমিল্লা কোর্ট, শিলচর, সিলেট, শিলং, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, তিনসুকিয়া, জোড়হাট, ছাতক, রাঁচী, বালীগঞ্জ, আসানসোল, বর্দ্ধমান, খুলনা

এজেন্সী

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ

বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, কানপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, ডিব্রুগড়, জলপাইগুড়ি, বরিশাল, ঝালকাঠি, কটক প্রভৃতি এবং ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্রে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর—মিঃ বি, কে, দত্ত।

প্রাচীন ভারত

পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব ৩য় খণ্ড

সচিত্র মূল্য ২৲

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মতে ১৪০০ খৃঃ পূঃ ও হিন্দুশাস্ত্র মতে ৫৫০৮ খৃঃ পূঃতে আর্য্যগণ ভারতে আসিয়াছে। এই ৪১৯৮ বৎসর কোথায় আর্য্যগণ কি করিয়াছে পাশ্চাত্যগণ বলিতে পারিবে না। ইহাতে পাইবেন। ৬৭৭৭ খৃঃ পূঃ—১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিক তারিখযুক্ত এরূপ ইতিহাস ইংরাজী কি বঙ্গভাষায় নাই। নূতন। নকল নহে। আসাম শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় ৮ কপি লইয়াছেন। কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে ও রাজসাহীতে রিসার্চ্চ হাউসে আমার নিকট পাইবেন। **শ্রীবিনোদবিহারী রায় বেদরত্ন।**

ফ্যান্সি লিভার রিষ্ট ওয়াচ (ক্যামেরা উপহার)

প্রতি ঘড়ির সহিত ১টী পেন ফ্রি ও ডাক মাশুল ফ্রি মজবুত লিভার মেসিন ফ্যান্সি সেপ সঠিক সময়-রক্ষক গ্যারাণ্টি ১২ বৎসর ৬ খানি জুয়েলযুক্ত ক্রমিয়ম কেশ রিষ্ট ওয়াচ মূল্য ১৩৲ সুপারীয়ার ১৫৲ লেডিস্ সাইজ ১৮৲ বেষ্ট ২০৲ রোল্ড গোল্ড প্লেটেড ৮ খানি জুয়েলযুক্ত ২১৲ বেষ্ট কোয়ালিটী ২২৲ লেডিস্ সাইজ ২২৷০, রেক্টাঙ্গুলার সেপ ২৪৲ স্পেশাল মূল্য ৩৪৲ পকেট ওয়াচ মূল্য ১২৲ সুপিরিয়ার মূল্য ১৪৲ স্পেশাল মূল্য ১৬৲ পকেট প্রেস ২নং ১৷০ ৩নং ২৷০ ডাকমাশুল ।৵০ আনা। **কলিকাতা ক্লক কোং (লেকসম ৫৯০)** পোঃ বক্স নং ১২২০৩, কলিকাতা।

A HUNDRED WAYS OF KISSING GIRLS

OR HISTORY OF THE KISS

Cloth Bound Book By Will Rossiter. An entirely New Book on these subjects. A real Novelty Entertaining and Instructive. FREE with every Order is included 15 handsome half-tone reproductions from photographs taken from life, illustrating different ways of kissing. SPECIAL in addition to the above we will include a phototype of "The Girl Who Has Never Been Kissed," which alone is worth ten times the Price of all. Our Price Re. 1/15 only. By V.P.P. As. 7 extra. Cloth Bound.

GENERAL SUPPLIES COMPANY, (Agents)
B. M. M- Rd. C/o P. O. Box 167, Karachi, India.

মায়ের স্বপ্ন

২২শ বর্ষ] ১৩৫০ সালের বৈশাখ হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [১ম সংখ্যা

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

বিষয়ানুক্রমিক সূচী

লেখকগণের নামানুক্রমিক রচনা-সূচী

চিত্রসূচী- বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

চিত্রসূচী—বিষয়ানুক্রমিক

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক সূচী

শিল্পিগণের নামানুক্রমিক চিত্র-সূচী

২২শ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৫০ | ১ম সংখ্যা

সন্ধি

কড়া ঝড়-বৃষ্টির পর পৃথিবীর বুকে যেমন স্তব্ধতা দেখা যায়···যে-স্তব্ধতায় মনে হয়, ঝড়-বৃষ্টির বিপর্য্যয়ের মধ্যে বুকের কতখানি ঝরিয়া গেল, কতটুকু বা রহিল, পৃথিবী যেন দেখিয়া বুঝিয়া লইতেছে,—ঘরের মধ্যে ঠিক তেমনি স্তব্ধতা !

স্বামী অনিল। স্ত্রী মায়া। একটু আগে দু'জনে খুব-খানিক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে ! কত তীব্র বচনের শরক্ষেপে দু'পক্ষের কেহ মমতা-ভরে কাহাকেও এতটুকু ছাড়িয়া দেয় নাই ! এখন যুদ্ধশেষে সুগভীর শ্রান্তি-ভারে দু'জনেই নির্ব্বাক্‌। খোলা জানলা দিয়া চাঁদ ভয়ে-ভয়ে ঘরের মধ্যে মলিন জ্যোৎস্নার দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে আসিয়াছে, দু'জনের বুক কতখানি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেছে !

অনিল চাহিয়াছিল ঘরের কোণে—টুলের উপর সদ্য-আনা টেবল-ক্লথের প্যাকেটটার পানে ! মায়া চাহিয়াছিল খোলা জানলা দিয়া বাহিরে আকাশের দিকে···দু'জনের মনের মধ্যে কত-কি ছত্রাকার হইয়া আছে !

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনিল প্রথমে কহিল। বলিল,—শুনচো ?

মায়া চাহিল অনিলের পানে।

ঘরে আলো জ্বলিতেছে। সে-আলোয় অনিল দেখিল, মায়ার দু'চোখ অপরাধের গ্লানিতে ভরিয়া মলিন ! অনিল মায়ার কাছে সরিয়া আসিল। মায়ার একখানি হাত নিজের হাতে লইয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল,—আমায় মাপ করো মায়া ! যা-যা বলেছি, ভুলে যেয়ো। মনে রেখো না।

মায়ার চোখের পিছনে একরাশ অশ্রু কখন আসিয়া স্তম্ভিত দাঁড়াইয়াছিল, মায়া জানে না। এখন অনিলের কথায় দু'চোখ ঠেলিয়া সে-অশ্রু একেবারে হু-হু করিয়া ঝরিয়া পড়িল। মায়া নিজেকে খাড়া রাখিতে পারিল না···ভাঙ্গিয়া গলিয়া অনিলের বুকে মুখ গুঁজিয়া বলিল,—আমারই অন্যায়, তুমি আমাকে মাপ করো।

অনিল বলিল—না, না মায়া···অন্যায় আমার। তুমি···মানে, সারা দিন খেটে-খুটে পাঁচটা কাজে মন আমার যেন মরে থাকে। বুদ্ধি লোপ পায় !···তোমাকে যা বলেছি, তা রাগের মুখে···সে শুধু মুখের কথা···মনের কথা নয়।

মায়া মুখ তুলিল না; অনিলের বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল—আমার দোষ ! আমার সুখের জন্য কি না তুমি করচো, অথচ আমি তোমাকে কি-কথাই না বলি !

অনিল বলিল—যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ হবে না। আমি জানি, তুমি আমায় যে-সব কথা বলেছো, সেগুলো তোমার মনের কথা নয় !···তা এখন শোনো যা বলি···মুখ তোলো···শোনো···

মায়া মুখ তুলিল। বলিল,—বলো···

অনিল বলিল—চোখের জল মোছো।

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া মায়া চাহিয়া রহিল অনিলের পানে।

অনিল বলিল—দু'জনে সন্ধি করি, এসো।

বলিয়া মায়ার দুই হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া অনিল বলিল,—সন্ধি হলো···সব ঝগড়ার শেষ ! এসো, দু'জনে দু'জনের হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করি, এখন থেকে অন্ততঃপক্ষে ছত্রিশ ঘণ্টা আমাদের ঝগড়া হবে না···আমি যদি দোষ করি, তুমি সয়ে থাকবে ! তুমি যদি দোষ করো, আমি সয়ে থাকবো !···

মায়া বলিল—আচ্ছা···

অনিল বলিল—আচ্ছা নয়···মুখের কথায় দু'জনে এ-প্রতিজ্ঞা করবো

তাহাই হইল। মন্ত্রের মতো দু'জনে মুখের বাক্যে উচ্চারণ করিল—এই রাত্রি আটটা বারো মিনিটে প্রতিজ্ঞা করছি, এখন থেকে অন্ততঃপক্ষে ছত্রিশ ঘণ্টা আমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হবে না। তুমি যদি দোষ করো, নিঃশব্দে আমি তা সয়ে থাকবো ! আর আমি যদি দোষ করি, নিঃশব্দে তুমি তা সয়ে থাকবে !

প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের মন বলিল, জলের লিখন আর তোমাদের প্রতিজ্ঞা ! হায় রে, এমন প্রতিজ্ঞা তো দিনে ছত্রিশ বার করিয়েছ !

সাত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। দু'জনে দু'জনকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না···একের উপর অপরের নির্ভর কতখানি! তবু কি যে হয়···

অতি-তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া প্রথমে দেখা দেয় ছোট এতটুকু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ! তার পর সেই স্ফুলিঙ্গ বড় হইয়া যেন এত-বড় পৃথিবী-খানাকেই পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে, এমনি প্রখর তেজে বাড়িয়া বিস্তার লাভ করে! সে-আগুনে এক জন জলে না,—জলে দু'জনেই। সে জ্বালার যাতনা নিবাইতে অনিল যেমন মায়াকে চায়, মায়ার মনের জ্বালাও তেমনি অনিলকে না পাইলে বিরাম মানে না!

রাগ পড়িলে অনিল বলে,—এমন করে বাঁচা যায় না মায়া! কুকুর-বেড়ালের মতো এমনি খেয়োখেয়ি! আমি যখন রাগ করি, কেন একটু চুপ করে তুমি থাকো না তখন? তাহলে তো আর···

মায়া বোঝে। নিশ্বাস ফেলিয়া জবাব দেয়,—আমি জ্ঞানপাপী গো! কেমন আমার বদ স্বভাব!

দু'জনে বসিয়া ভাব করে। সন্ধি হয়। পরের দিন অনিল গিয়া সিনেমায় শীট রিজার্ভ করিয়া আসে—দু'জনের জন্য; রান্নার বই দেখিয়া সারাদিন খাটিয়া মায়া তৈয়ারী করে নূতন দু'-চার রকম খাবার, অনিল যে-সব খাবার ভালোবাসে!

দু'জনে প্রাণপণে চেষ্টা করে, ঝগড়া নয়, কটু কথা নয়! স্বামি-স্ত্রী···পর নয়···জ্ঞাতি নয়···কুটুম নয়! তাছাড়া···

ঐ যে পাশের বস্তীতে মোটর-ড্রাইভার বলরাম···মদ খাইয়া বাড়ী ফিরিয়া কি তর্জ্জন-গর্জ্জন না সুরু করে! স্ত্রীটাও তেমনি···সমানে স্বামীর সঙ্গে লড়াই চালায়! শেষে বলরাম স্ত্রীকে মারে লাথি জুতো··· যা পায় সামনে, তাই দিয়া। স্ত্রী সে দিন বলরামের একটা কাণ কামড়াইয়া প্রায় ছিঁড়িয়া দিয়াছিল! পুলিশ-কেস হইবার জো! তারাই···পাড়ার পাঁচ জনে মিলিয়া শাসাইয়া দিয়াছে,—ফের যদি এমন গুণ্ডামি করো বলরাম, পুলিশ ডাকিয়া শায়েস্তা করিয়া দিব। এ বস্তী তোমাকে ছাড়িতে হইবে!

ধিক্কারে অনিলের মন ভরিয়া ওঠে! সে ভাবে, লেখাপড়া শিখিয়াছে, সভ্যতা-কালচারের গর্ব্ব করে···তার সঙ্গে ঐ গুণ্ডা মাতাল বলরামের তফাৎ কোন্‌খানে!

স্বামি-স্ত্রী···পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে! বৈশাখের এক শুভ-লগ্নে বিবাহ···ফুলশয্যার রাত্রেই দু'জনে দু'জনকে কি ভয়ঙ্কর ভাবে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল! পেন্সন লইয়া কোথায় দূর-বিদেশে পড়িয়া আছেন মায়ার বাবা চিন্তামণি বাবু···মায়া তাঁর একটিমাত্র সন্তান। মা মারা গিয়াছেন বিবাহের পূর্ব্বে···বিবাহের পর মায়া সেই যে অনিলের সংসারে আসিয়া ঢুকিয়াছে, বাপের কাছে যাইবার নামটি করে না! কখনো না! বাপ কত বার লিখিয়াছেন, দু'দিন আসিয়া আমার কাছে থাকিয়া যা, মায়া! অনিলও বলিয়াছে,—সত্যি মায়া, বছরে একটিবার করে এক হপ্তা অন্ততঃ তাঁর কাছে গিয়ে··· অভিমান-ভরা দৃষ্টিতে মায়া স্বামীর কথায় জবাব দিয়াছে,—আমি তোমার আপদ···না? আমাকে দূর করে দিতে পারলে তোমার গায়ে হাওয়া লাগে, বুঝেছি!

অপ্রতিভ হইয়া অনিল বলে,—তা নয়! বাপ···তুমি ছাড়া তাঁর আর কে আছে, বলো?

মায়া বলে—বেশ, তুমিও চলো আমার সঙ্গে···দু'দিন আপিসে ছুটী নাও।

এবং তাহাই হইতেছে। বড় দিনের সময়, পূজার সময়··· ছুটীছাটায় দু'-চার দিনের জন্য মায়াকে লইয়া অনিল যায় চিন্তামণি বাবুর কাছে। চিন্তামণি বাবুও মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া যান।

চিন্তামণি বাবু বলেন মায়াকে—আসা তোর সাধ্য নয়, বুঝি মা! তিনিও···(অর্থাৎ মায়ার মা) দশ-বছর বয়সে বিয়ে হয়ে সেই যে আমার কাছে এসেছিলেন, কখনো আর বাপের বাড়ীর মুখো হননি!···সাঁইত্রিশ বৎসর দু'জনে পাশাপাশি কাটিয়েছেন··· তিনি বলতেন, আমি না থাকলে তোমার ভারী কষ্ট হবে, সে ভাবনায় এক দণ্ড সেখানে আমার স্বস্তি মিলবে না!

শুনিয়া সলজ্জ হাস্যে মায়া বলে—তুমি জানো না বাবা, তোমার জামাইটি কেমন! ছেলেমানুষের বেহদ্দ! নাইতে যাবার সময় মাথায় তেল মাখতে হয়, এ কথা মনে করিয়া না দিলে চলে না! ঝোলের আগে ডাল খেতে হয়, এ কথাও আমায় রোজ মনে করিয়ে দিতে হয়। তা ছাড়া কোথায় থাকে জামা, কোথায় জুতো! এক দিন জানো বাবা, কি হয়েছিল? আমার খুব জ্বর··· যাকে বলে জ্বরে বেহুঁশ। আর উনি কি না সুটটুট পরে চটিজুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন! মধু চাকর এসে আমাকে বললে! শুনে তাকে তখনি পাঠাই ওঁর খোঁজে। ডাকতে এলেন। জুতোর কথা বলতে তোমার জামাই হেসে কি জবাব দিলে, জানো? বললে, রোজ সুট পরবার সময় মোজা-জামা হাতে তুমি এগিয়ে দাও··· অভ্যাস হয়ে গেছে···নিজের হাতে কিছু নিই না কি না···

হাসিয়া চিন্তামণি বাবু বলিলেন—তুই ওকে আয়েসী করে ফেলেছিস মায়া। এতটা করিস্ নে!

বাপের এ কথায় মায়া কতখানি লজ্জা পাইয়াছিল! অনিলের এ-নিঃসহায়তা, তার উপর এমন নির্ভর···দেখিয়া মায়ার মনে সুখের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না! অনিলের গৃহ···অনিলের সংসার বলিয়া কিছু নাই! সে-গৃহে, সে সংসারে মায়া যা করে···মায়াই সব! অথচ কেন যে তুচ্ছ কারণে দু'জনের মনে মনে ঠুকিয়া এমন ভাবে আগুন জ্বলে! মন তো নয়, যেন দু'খানা চকমকি পাথর!

এই সেদিন রবিবার···

বাহিরের ঘরের জন্য সখ করিয়া অনিল কিনিয়া আনিয়াছিল একজোড়া পর্দ্দা···কোন্ সাহেবের বাড়ী তেমনি পর্দ্দা দেখিয়া ভালো লাগিয়াছিল, তাই! পর্দ্দা দেখিয়া মায়া বলিয়া বসিল,—মাগো, কি পছন্দ! ক্রমে সেই পছন্দ আর পর্দ্দা লইয়া কণ্ঠ উঠিল চড়া পর্দ্দায় এবং দু'জনে দু'জনকে "ডাউন্" করিতে একেবারে রণ-মূর্ত্তি! তার পর অনিল না খাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং কাঁদিয়া-কাটিয়া মায়া কি কাণ্ডটাই না করিল!

আর এক দিন···অনিল নিউ মার্কেট হইতে একখানা জর্জ্জেট শাড়ী কিনিয়া আনিয়া হাজির! ভাবিয়াছিল, মায়া খুব খুশী হইবে! তা না, শাড়ী দেখিয়া মায়া যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল! বলিল,—সব তাতে কর্ত্তামি করো কেন বলো তো! আটপৌরে শাড়ী নেই, সব ছিঁড়ে গেছে···বলে-বলে মুখে আমার পোকা পড়ে গেল···এক জোড়া আটপৌরে শাড়ী কিনে আনলে লজ্জা রক্ষা হয়,

তা নয়, হুম করে আনা হলো জর্জ্জেট শাড়ী! ভারী বড়-মানুষ হয়েছো, না? অনিল অমনি না খাইয়া বিছানায় গিয়া ঢুকিল···মায়া সাধ করিয়া মাংস রাঁধিয়াছিল, সেগুলা চাকর-বামুনকে ধরিয়া দিয়া রাত-উপবাসী রহিল!

প্রতিদিনের ইতিহাস খুলিলে তার প্রতি পৃষ্ঠায় এমনি ছোট-বড় কলহ-বিবাদের পরিচয় মিলিবে। ওঠা-বসা চলা-ফেরা—সব ব্যাপারেই যেন মেঘে-মেঘে লাগিয়া বজ্র-বিদ্যুতের চমক! অথচ···

মনে মনে দু'জনে প্রতিদিন পণ করিয়াছে,—না, আর রাগ নয়। যা বলে, সহিয়া থাকিব! কিন্তু তা হয় না। কে যেন অভিশাপ দিয়াছে···সেই অভিশাপে দু'জনের সুখের-লাগিয়া-বাঁধা ঘর অনলে পুড়িতেছে।

বন্ধুদের কাছে অনিল বলে—মায়া আছে, তাই রক্ষা! নাহলে আমার মতো লক্ষ্মীছাড়ার কি দশা যে হতো! এমন স্ত্রী কারো হয় না!···সে দিন মেয়ে-মজলিশে জিতু হালদারের স্ত্রী শশিমুখী··· সদ্য-গড়ানো চুড়ি দেখাইতে সকলে বলিল—একালে কি আর ও ফ্যাশনের চুড়ি কেউ পরে শশি! কম নয় তো পনেরো ভরির চুড়ি! এত সোনা নষ্ট করলি! শশিমুখী বলিল—ওঁর সখ···কিছু বলবার জো আছে! বাব্বাঃ! বলেন, তুমি স্ত্রী···স্বামী যা দেবে, হাসি-মুখে নেবে! না নাও, চুড়ি ফিরিয়ে দাও···দরকার নেই তোমার নতুন চুড়ি পরে!

এ কথায় মায়া সগর্ব্বে জবাব দিয়াছিল—সে-সম্বন্ধে ভাই, উনি··· আমি যা করবো! শুধু কি গহনা গড়ানো? সব বিষয়ে···আমি যা করি।

হায় রে, এত নির্ভর, এমন গভীর প্রেম···তবু রাগ করিয়া কত বার অনিল বলিয়াছে,—চললুম···আজ আর আমি বাড়ী ফিরবো না!

অবশ্য অফিসের ছুটীর পরে আবার যথাসময়ে ঠিক বাড়ী ফিরিয়া আসে! তাও শুধু-হাতে নয়, মায়ার জন্য কিছু-না-কিছু উপহার লইয়া! মায়াও জোর-গলায় কত বার বলিয়াছে—আজ তোমার আপদ বিদায় হবে···ভয় নেই। দুপুরের ট্রেণে মধুকে নিয়ে বাবার কাছে চলে যাবো। সত্যি, ভেবেছো আমার চাল নেই? চুলো নেই? আছে। চাল আছে, চুলোও আছে!

এ কথা বলিলেও বাড়ী ছাড়িয়া মায়ার নড়িবার এতটুকু লক্ষণ কোন দিন দেখা যায় নাই···বিকালে চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া অনিলের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে!

দু'জনে দু'জনকে চিনিয়া ফেলিয়াছে! মুখে যত আস্ফালন করুক, এ বাড়ী ছাড়িয়া দু'জনের কোথাও আর গতি নাই, দু'জনেই তা জানে!

পরের দিনের কথা। কাল সেই দু'জনে হাতে-হাত রাখিয়া পণ করিয়াছে···

সন্ধ্যার পর। দোতলার ঘরে বসিয়া মায়া টেবল-ক্লথে ফুল-পাতা তৈয়ারী করিতেছে···মনে পড়িতেছিল ও-বাড়ীর কালোর মায়ের কথা। কালোর মা বলে, সাত-সাত বছর কাটলো···ছেলে-মেয়ে হলো না! আনিয়ে দেবো বৌমা, জনার্দ্দনের মাদুলি? একেবারে অব্যর্থ!···ছেলে-মেয়ে না হলে কি বাড়ী মানায়?

ভাবিতেছিল, কিসের দুঃখ? ছেলে-মেয়ে নাই, সে জন্য কোনো অভাব, কোনো অভিযোগ তো মনের কোণে উঁকি দেয় না! সুখের সংসার! দু'জনের ভালোবাসা দিয়া গড়া সংসার! এ সংসারের স্বপ্নও সে দেখে নাই কোনো দিন!

অনিল বসিয়া অফিসের মোটা ফাইল খুলিয়াছে। রাজ্যের অঙ্ক কাঁদিয়া পাতার পর পাতায় হিসাব মিলাইতেছে। সিগারেট পুড়িয়া গেল···দেশলাই জ্বালিয়া আর-একটা সিগারেট ধরাইল।

দেশলাই জ্বালার শব্দে মায়া ফিরিয়া চাহিল। দেখে, কোনো দিকে না চাহিয়া দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটা অনিল ছুড়িয়া দিল এমন যে সেটা গিয়া পড়িল খাটের উপরকার সজ্জিত বিছানায়!

মায়া খ্যাঁক্ করিয়া উঠিল,—এ স্বভাব কখনো কি ছাড়বে না? ছাই ফেলবার ট্রে দিয়েছি, তাতে সিগারেটের ছাই ঝাড়ো, পোড়া কাঠি ফ্যালো, তা নয়···একেবারে বিছানার উপর! বিছানা ঠিক করে রেখেছি ঝেড়ে-ঝুড়ে···ভেবেছো, দাসী-বাঁদী আছে···খেতে-পরতে দিচ্ছি···সে কেন, তার বাবা করবে আবার বিছানা ঠিক!

হিসাবে জট পাকাইয়াছিল···সে-জটে পড়িয়া মাথা পর্য্যন্ত টনটন্ করিতেছিল···মেজাজ ছিল যেন বারুদের মতো···সেই মেজাজের উপর মায়ার কথা আসিয়া লাগিল যেন দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি! বারুদে আগুন লাগিল! অনিল গর্জ্জন তুলিল—তোমাকে বলিনি-তো বিছানা করো, সিগারেটের ছাই ঝাড়ো! চাকর রয়েছে···সে করবে এ সব কাজ।

মায়া বলিল—চাকরকে দিয়ে এ কাজ আমি করাবো না···লক্ষ বার তোমায় বলেছি সে কথা! চাকরের কথা তোলা, ও শুধু ছুতো! তার চেয়ে স্পষ্ট বলো না, আমি পুরুষ মানুষ···রোজগার করছি··· আমার বাড়ী···আমি বাড়ীর কর্ত্তা···আর কারো সুখ-সুবিধা আমি দেখবো না···দেখতে পারবো না! বলে, হুঁঃ, স্বভাব কি মানুষ ছাড়তে পারে!

এ-কথায় অনিল প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যদি চুপ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আর লঙ্কায় আগুন লাগে না! কিন্তু তার জো কি! বরাতের ভোগ···অদৃশ্য কার সেই অভিশাপ আছে যে!

অনিল ফোঁশ করিয়া উঠিল—আমারই স্বভাব শুধু বদ, না? নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলো···বুঝলে!

মায়ার চোখে ভ্রূকুটি-কুটিল রেখা! মায়া বলিল—তার মানে? কি মন্দ স্বভাবটা আমার দেখেছো, শুনি?

অনিল বলিল—হুঁঃ, আমার আর কাজ নেই তো! আমি এখন তার ফিরিস্তি দিতে বসি।

—না, তোমাকে বলতেই হবে! পারো যদি দেখিয়ে দিতে, গুণে তোমার কাছে দশ জুতো খাবো।

নিরুপায়ে অনিল খাতায় মনোনিবেশ করিতেছিল! পারিল না মায়া ছাড়িল না! আগাইয়া আসিয়া খাতা টানিয়া সরাইয়া দিয়া মায়া বলিল—বলতেই হবে! যে না বলবে, তার অতি-বড় গুরুর দিব্যি!

দিব্যি! অনিল চাহিল মায়ার পানে···বুকের মধ্যে বিজয়ী বীরের আস্ফালন যেন প্রচণ্ড বেগে রুখিয়া উঠিল! অনিল বলিল—এই যে, তুমি যে-সব কথা বলো! ঐ অতি-বড় গুরুর দিব্যি দিচ্ছ··· তাছাড়া বাপ তুললে! বললে, গুণে দশ ঘা জুতো খাবে! তোমার মুখে এ-সব কথা···শুনলে লোকে কি বলবে?

মায়া বলিল—বলবে, আমি ছোট লোক!

—ঐ তো দোষ! সব সময়ে তুমি উল্টো বুঝবে!

মায়া বলিল—কি করবো, বলো! মুখ্যু মেয়ে-মানুষ···তোমার মতো বি-এ, এম-এ পাশ করিনি তো!

—পাশের কথা হচ্ছে না, মায়া···

তার পর প্যাণ্ডেমোনিয়াম! মায়া টিপ-টিপ করিয়া মেঝেয় মাথা ঠুকিতে লাগিল, খাতা ফেলিয়া অনিল তাকে ধরিল!

বৃথা! মায়ার মুখে তুবড়ি ফুটিতেছে, অনিলের মুখে পটকা···

এবং এই অগ্নিচক্রের মধ্যে চির দিন যেমন হয়···দুই লম্ফে ঘর ছাড়িয়া অনিল সহসা পথে ছুটিল···মায়া পড়িল মেঝেয় লুটাইয়া!

সে রাত্রে দু'জনে দেখা হইল না। অনিল শুইল বাহিরের ঘরে··· মায়া একা দোতলার ঘরে খালি মেঝেয়···

পরের দিন সকালেও দু'জনে কথা নাই। কলে চলিয়াছে সংসারের কাজ! এবং যন্ত্র-চালিতের মতো আহারাদি সারিয়া অনিল গেল অফিস—মায়া নিঃশব্দে আহার সারিয়া ঘরে আসিয়া একখানা নভেল খুলিয়া বসিল।

নভেলের পাতায় মন নাই। মন কালিকার রণক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে পোড়া ছাইয়ের রাশি মাড়াইয়া!

বিশ্রী লাগিতেছিল···

মনে হইতেছিল, অমন ভাবে পণ-গ্রহণ···হাতে হাত রাখিয়া··· কিন্তু উনিই প্রথমে পণ করিয়াছিলেন···

ভাবিল, ইহ-জন্মটা এমনি চুলোচুলি করিয়াই কাটিবে?

বেলা প্রায় পাঁচটা···চাকর আসিল। তার হাতে টেলিগ্রাম।

বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। অনিলের নামে টেলিগ্রাম। সহি দিয়া টেলিগ্রাম লইল। মনে দারুণ কৌতূহল! কে টেলিগ্রাম করিল? বাবা নয় তো? এ-চিন্তায় বুকখানা যেন দশ হাত নামিয়া গেল!

খাম ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম পড়িল।

তাই। যা ভাবিয়াছিল···বাবার টেলিগ্রাম! সেখানকার ডাক্তার-বাবু টেলিগ্রাম করিয়াছেন অনিলের নামে। জরুরি টেলিগ্রাম—

—চিন্তামণি বাবুর সাংঘাতিক অসুখ। শীঘ্র আসিবেন।—

দুশ্চিন্তার ভয়ে মায়া এতটুকু!

বেলা এখন পাঁচটা! অনিল আসিবে সেই সাতটায়···দু'ঘণ্টা দেরী। এ দু'ঘণ্টায় সেখানে ওদিকে কে জানে···

পাশের বাড়ীতে ছুটিল। সে বাড়ীতে টেলিফোন আছে। অফিসে টেলিফোন্ করিয়া দিল।

অনিল বলিল,—এখনি যাচ্ছি।

অনিল আসিল। দু'চোখে জল···মায়া বলিল—কি হবে? নিশ্চয় খুব বেশী অসুখ! হয়তো সব শেষ হয়ে এসেছে। না হলে টেলিগ্রাম তো কখনো আসেনি বাবার কাছ থেকে! ওগো···

অনিল একটা নিশ্বাস ফেলিল। বলিল—তা নয়! একা আছেন! আমরা ছাড়া তাঁকে দেখবার আর কে আছে? তাই টেলিগ্রাম করিয়েছেন! কাল বেলা দশটার ট্রেণে দু'জনেই যাবো। আজ ট্রেণ থাকলে আজই যেতুম।

মায়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—বাবা বাঁচবেন তো?

—আঃ, কি বকচো মায়া! অসুখ মানুষের হয় না?

—কিন্তু বাবার বয়স হয়েছে যে! তা ছাড়া গেল-বারে আ সময় বাবার চোখে জল দেখে এসেছি। কখনো তা দেখি বাবা বললেন, আবার কবে দেখা হবে, মা! হবে, ছি, হবে কেন এমন কথা···?

অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কথা বাধিয়া গেল।

অনিল বলিল,—কেঁদো না মায়া। অসুখ যদি বেশী হয়, নিয়ে আসবো এখানে আমাদের কাছে। ভালো করে চিকিৎসা ক ···নিশ্চয় সেরে উঠবেন।

মায়া থাকিতে পারিল না···মনের মধ্যে যেন ঝড় বহিতে একেবারে ভাঙ্গিয়া অনিলের পায়ের উপরে পড়িল, বলিল,—আম তুমি ক্ষমা করো···তোমাকে আমি বড় মন্দ কথা বলি···ঝগড়া ···মহাপাতক করি। সেই পাপেই···

দু'হাত ধরিয়া মায়াকে তুলিয়া সস্নেহে অনিল বলিল— পাগলের মতো বকছো!···ওঠো মায়া। এখন থেকে সব গু ঠিক করো! কিছু কেনবার আছে···মানে, কমলালেবু, আ আপেল, বেদানা···হরলিক্স···ওভালটিন···আমি যাই, আজই কি রাখি। তুমি সব গোছগাছ করো। একটা রাত্রি! নিরুপায়! কালীকে ডাকো···নারায়ণকে প্রার্থনা জানাও···

ডাক্তার বলিলেন, রোগ কঠিন···নিউমোনিয়া। এই ···শরীরে কি-বা আছে···কিসের জোরে যুঝিবেন!

গভীর রাত্রি। প্রদীপের ক্ষীণ আলো। বিছানায় পড়ি আছেন চিন্তামণি বাবু···মূর্চ্ছিতের মতো। মাথার শিয়রে বসি মায়া। পাশের ঘরে অনিল ঘুমাইতেছে। অনিল যাইতে চা নাই···মায়া তাকে পাঠাইয়াছে জোর করিয়া। সর্ত্ত হইয়াছে, রা দু'টা পর্য্যন্ত মায়া জাগিবে রোগীর শিয়রে···তার পর দু'টা হই ভোর পর্য্যন্ত জাগিবে অনিল!

মায়া ভাবিতেছিল,···অনেক কথা! অতীত দিনের কথা· যখন ছোট ছিল···মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন! মায়ের কত আদ যত্ন—তবু মায়ের কাছে মায়ার অনেক উপরে ছিল বাপের আসন মনে পড়িল, সে বার মামার বাড়ীতে মামার ছেলের অন্নপ্রাশন· চিন্তামণি বাবুর ছুটী মিলিল না বলিয়া তিনি যাইবেন না, তাই নিমন্ত্রণে যান নাই। মায়া গিয়াছিল মামার সঙ্গে মামার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে!···মায়ের ঐ ব্রোমাইড ছবি···প্রদীপের আলো পড়িয়াছে ছবির উপর···দেওয়ালে এমন জায়গায় ও-ছবি টাঙানো ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিবামাত্র ছবির উপর বাপের দৃষ্টি পড়ে সব-আগে মনে পড়িল, বাবাকে একবার মায়া বলিয়াছিল, ও-ছবি ও-দেওয়াল থেকে নামিয়ে যদি এদিককার দেওয়ালে রাখি, বাবা? ও-দেওয়ালে তেমন আলো পড়ে না! বাবা জবাব দিয়াছিলেন, না রে, ঐখানেই থাকুক। বেঁচে থেকে নিজে তিনি ঐ দেওয়ালে ও-ছবি টাঙ্গিয়ে গেছেন···তাঁর হাতের স্পর্শ ওতে আছে···ও-ছবি নাড়া চলে না, মা।

কথার শেষের দিকে বাবার কণ্ঠ আবেগে বিজড়িত হইয়াছিল···মায়ার মনে পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, মায়ের সঙ্গে বাবার কখনো কথা

কাটাকাটি হয় নাই···কখনো না···ছোট-বড় কোনো ব্যাপারে নয়! মা আগে কোনো কথা বলিলে বাবা তাহা মানিয়া লইতেন। আবার বাবা যদি নিজে হইতে কোনো প্রস্তাব করিতেন, মা তাহাতে 'হুঁ' বলিয়া সায় দিতেন! বরাবর···বেশ মনে আছে! সেই···

ঘুমের ঘোরে চিন্তামণি ডাকিলেন,—মক্ষি···

মায়া চমকিয়া উঠিল···মক্ষি! মায়ের নাম ছিল মোক্ষদা-সুন্দরী। বাবা ডাকিতেন, মক্ষি! বুঝিল, বাবা স্বপ্ন দেখিতেছেন!

চিন্তামণি বলিলেন,—আরো কত দিন একা ফেলে রাখবে, মক্ষি? এখানকার কোনো কাজ তো আমার বাকী নেই। মায়ার বিয়ে হয়ে গেছে···মনের মতো ঘর-বর পেয়েছে সে। দু'জনে কত ভাব। আমাদের যেমন ছিল! কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পাবে না। চিন্তামণি চুপ করিলেন।

মায়া ডাকিল—বাবা···

সে ডাকে চিন্তামণির নিদ্রাচ্ছন্ন-ভাব কাটিয়া গেল···চিন্তামণি বলিলেন,—কে?

—আমি, বাবা···তোমার মায়া।

বাপের রোগশীর্ণ হাতখানি মায়া নিজের হাতে চাপিয়া ধরিল,—আবেগ-ভরে বলিল,—ঘুমোও বাবা···

—ও! তুই এসেছিস! মনে হচ্ছিল, তাই। কখন এলি?

—সন্ধ্যার পর।···তুমি ঘুমোচ্ছিলে, তাই ডাকিনি।

—অনিল?

—এসেছে। ও-ঘরে ঘুমোচ্ছে। কিছুতে ঘুমোতে যেতে চায় না···জোর করে পাঠিয়েছি।

—হুঁ···

মেয়ের হাতে বাপের হাত···দু'জনের কাহারো মুখে কথা নাই··· অনেকক্ষণ!

মায়া বলিল,—এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখি, গা তোমার পুড়ে যাচ্ছে। এখন গা তত গরম নয় তো! এখন কেমন আছো বাবা?

চিন্তামণি বলিলেন,—ভালো নয় মা! বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

—কি কষ্ট হচ্ছে? কোথায় কষ্ট হচ্ছে?

—ভিতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। বুকে খুব ব্যথা।

মায়ার দু' চোখের সামনে যেন মলিন ছায়া···কালো কালো ছায়া! ছায়ার পর ছায়া সরিয়া চলিয়াছে!

মায়া বলিল,—উনি বলছিলেন, ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কথা কয়ে—তিনি যদি অমত না করেন,—কালই তোমাকে আমাদের ওখানে নিয়ে যাবেন। সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছেন। তাছাড়া এ বয়সে তোমাকে একলা এত দূরে উনি ফেলে রাখতে চান্ না।

চিন্তামণি বলিলেন,—এখান থেকে আমায় টেনে নিয়ে যাস্‌নে তোরা। এইখান থেকেই তিনি বিদায় নিয়ে গেছেন···এই ঘর থেকে···মনে নেই? চিন্তামণি নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—তোদের দু'জনকে দেখে যাচ্ছি, সুখে আছিস···মনে-মনে মিল···এর উপর আমার আর চাইবার কিছু নেই তো মা···এ দেখে যাওয়া মা-বাপের অনেক সৌভাগ্য!

জ্বর নরম পড়িয়াছে! মেয়ে-জামাইকে দেখিয়া চিন্তামণির বুকের মধ্যে প্রাণ যেন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে!

অনিল বলিল—আমাদের যে উপায় নেই এখানে এসে থাকি, আপনাকে দেখি। অথচ এখানে আপনাকে একা রেখে আমরাও সেখানে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না।

চিন্তামণি বলিলেন—না বাবা, আমাকে ধরে টানাটানি করো না ···এখান থেকেই আমি একেবারে ছুটী নিয়ে যেতে চাই।

চিন্তামণিকে কলিকাতায় আনা গেল না। তিনি আসিলেন না।···অগত্যা অনিলকে ফিরিয়া গিয়া অফিসের সঙ্গে বুঝাপড়া করিয়া ছুটীর মেয়াদ বাড়াইয়া আসিতে হইল।

বাপের পাশ ছাড়িয়া মায়া নিমেষের জন্য নড়ে না! মনে পড়ে মায়ের কথা। ছেলেবেলায় দেখিয়াছে, একটু অসুখেই বাবা কতখানি কাতর হইয়া পড়িতেন এবং মা তখন সংসার ছাড়িয়া, তাকে ছাড়িয়া, সব ছাড়িয়া নিজেকে কি ভাবে চিন্তামণির সেবা-পরিচর্য্যায় ডুবাইয়া দিতেন।

থাকিয়া থাকিয়া চিন্তামণির ঘোর আসে। তখন কোথায় থাকে অনিল, কোথায় বা মায়া! মৃতা পত্নীকে ডাকিয়া তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়া কত কথাই কন্! মায়া কাঁদিয়া অনিলকে বলে,—বাবা আমার সঙ্গে কথা কচ্ছেন না কেন? ফরমাশ করছেন, এটা-ওটা বলছেন···পাশ ফিরিয়ে দিতে বলছেন, বিছানা ঠিক করে দিতে বলেছেন, কিন্তু আমায় ডেকে কিছু বলেন না! ডাকছেন শুধু মাকে!

কাঠ হইয়া অনিল শোনে। ভাবে, তরুণ বন্ধু শিবচরণের স্ত্রী-বিয়োগের দুঃখে বিগলিত হইয়া অনিল বলিয়াছিল,—সামনে দীর্ঘ-জীবন···কি লইয়া শিবু বাঁচিবে? সদ্য-বিধবা ভাগিনেয়ীর কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু এই বৃদ্ধ···সাঁইত্রিশ বছর ধরিয়া যাঁর সঙ্গে বাস···যাঁর চিন্তায়-বাক্যে নিজের চিন্তা-বাক্য সব বিজড়িত ছিল···সেই সাঁইত্রিশ বৎসরের সঙ্গিনীকে হারাইয়া তাঁর দুঃখ কত গভীর! সাঁইত্রিশ বছরের প্রতি দিন প্রতি নিমেষের কত শত স্মৃতি···

ডাক্তারের কাছে কাঁদিয়া মায়া বলে,—বাবা আমায় ডাকছেন না কেন? আমি ডাকলে মুখের পানে চেয়ে দেখছেন, কিন্তু বাবা ডাকছেন শুধু মাকে!

ডাক্তার বলিলেন,—জ্ঞান তো নেই···আচ্ছন্ন ভাব! আর ঐ এক চিন্তায় উনি বিভোর হয়ে আছেন!

—তবে কি বাঁচবেন না?

- বলা শক্ত।

চিন্তামণি বাঁচিলেন না। অনিল-মায়াকে সামনে রাখিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিলেন। অন্তিম-নিদ্রার পূর্ব্বক্ষণেও মৃত্ত কম্পিত অধরে অস্ফুট আহ্বান—চলো মক্ষি···

কঠিন কর্ত্তব্য। জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। এখানে কোথায় থাকিবে! কেনই বা!

জিনিষপত্র গুছাইতে গিয়া মায়া দেখে মায়ের শত স্মৃতি···সেই মাথার কাঁটা, চুলের ফিতা, সিঁদুরের কৌটা···মায়ের হাতের তৈয়ারী কত দিন-আগেকার সাজা শুকনো পান, ভাজা মশলা···সমস্ত জিনিষ বাবা কি চমৎকার করিয়াই না সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন! সে মেয়ে···সে তো এ-সবের দাম বোঝে নাই!

বাপের লেখা একখানা ডায়েরির খাতা···পাতা উল্টাইতে লাগিল।

মাকে সম্বোধন করিয়া বাবা পাতায়-পাতায় প্রতিদিন চিঠি লিখিয়াছেন। একখানা চিঠিতে নিজের নাম দেখিয়া মায়া না পড়িয়া থাকিতে পারিল না!

চিন্তামণি লিখিয়াছেন···এই সে-দিন···মৃত্যুর ঠিক দেড়-মাস আগে। লিখিয়াছেন—

মনে অভিমান হয় বৈ কি মক্ষি! মায়াকে এত করিয়া বলি, ওরে আমার কি সাধ হয় না, দু'দিন তুই আমার কাছে আসিয়া থাকিস্? সে আসে না! কত ছল করে, কত ছুতা তোলে! তাই ভাবি, পরের ঘরে গিয়া মেয়ে বাপকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকে! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তোমার কথা। তোমাকে বলিতাম, বাপের বাড়ী যাও না···তাঁরা ভাবেন, আমি বুঝি বন্দী করিয়া রাখিয়াছি! তুমি বলিতে, তা নয়। বাপের বাড়ীতে যে-মেয়ে যাইতে চায় না স্বামীর পাশ ছাড়িয়া—সে-মেয়ের মা-বাপ তাহাতে দুঃখ পায় না—অনেকখানি সুখ পায়···গর্ব্ব বোধ করে। সে কথা মনে পড়িলে মনের অভিমান কাটিয়া যায়! সত্যি মক্ষি, মান-অভিমান হইলেও মেয়েরা অনেক সময় বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। তোমার মায়া তাও কখনো আসিল না! তাহা হইতেই বুঝি, দু'জনে মনে-মনে কতখানি মিল! ওরা না আসুক আমার কাছে—আশীর্ব্বাদ করি, এমনি সুখে ওদের দিন কাটুক! এ-সুখ দেখিয়া আমি যেন তোমার কাছে যাইতে পারি!

কিন্তু তুমি কেমন করিয়া আছো মক্ষি, আমাকে এত দিন একা ফেলিয়া? প্রত্যহ মনে করি, আজ তোমার ডাক আসিবে! কিন্তু প্রত্যহই নিরাশ হই···

আর পড়া গেল না! অশ্রুর ঘন বাষ্পে দু'চোখের হইয়া আসিল। ডায়েরি হাতে মায়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল

অনিল আসিয়া ডাকিল,—মায়া···

চোখ তুলিয়া মায়া অনিলের পানে চাহিতে পারিল না।

অনিল বলিল,—কাঁদছো! কাঁদবার দিন পড়ে আছে, তবু এর মধ্যে শক্ত হতে হবে।···ওদিকে কদ্দুর হলো? আজ ট্রেণেই যেতে হবে যে!

মায়ার কি মনে হইল, মায়া একেবারে অনিলের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। বলিল,—ওগো···

—কি করছো মায়া! ছি! পায়ে কেন?

মায়া বলিল—কখনো তোমাকে আর কটু কথা বলবো না তুমি আমায় একটি আশীর্ব্বাদ করো শুধু···

বিস্ময়ে অনিল অবাক্! কহিল—এর মানে?

মায়া বলিল—তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করো, আমার মা ভাগ্যবতী যেন আমি হতে পারি। আমার জন্য আমার মা যে বসে কোনো দিন লজ্জা না পান!

অনিলের দু'চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত! সেই বিস্ফারিত দৃষ্টি মায়ার মুখে নিবদ্ধ!

মায়া বলিল—এই সব দেখছি আর মনে হচ্ছে, সংসার বসে এতটুকু ধৈর্য্য থাকে না যে পরস্পরের মন বুঝবো! যে নিয়েই আমার সব···অথচ সেই তোমাকে কটু কথায় জ করি! এবার থেকে আমি খুব ভালো হবো, সত্যি! তুমি যা তাতে কোনো কথা কইবো না···কখ্খনো না! ভালোবাসা বাবা-মা···তাঁরা সেকেলে লোক···জানতেন, আমরা ভালোবাসতে না···শুধু নিজেদের অহঙ্কার নিয়েই মরি!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপা

প্রত্যাসন্ন

তোমার হৃদয়-কুঞ্জে আচম্বিতে এক দিন হেসে
খুঁজিব সঞ্চিত মধু ঢল-ঢল ষোড়শী-বালার—
চিনিতে পারিবে তব ওই দু'টি আঁখি-সুকুমার
সে দিন কি সুগভীর মূর্চ্ছনায় মোরে ভালোবেসে?
অথবা ব্যাকুল হবে অতর্কিত ঈক্ষণ-আশ্লেষে?
কখনো দেখেছো তুমি স্বপ্নভ্রান্তি প্রথম উষার
অর্দ্ধনিশা প্রলম্বিত ঝিল্লীভরা জ্যোৎস্না-আঁধিয়ার?
তাহলে আমারে ভেবো প্রত্যাসন্ন অতন্দ্রর বেশে!

শান্ত পায়ে টিপি-টিপি আসি তব সুন্দর ভবনে
হেরিব গাঁথিছ মালা একাকিনী নিকুঞ্জ-বিতানে,
মঞ্জীর ছন্দিয়া কভু বিলসিবে প্রিয়হারা গানে
লয়ে বীণা সপ্তস্বরা—অর্দ্ধস্ফুট সোণার স্বপনে,
হয়তো দেখিব গিয়া মূর্চ্ছাতুর বিরহ-শয়নে!
জানি এ অলীক-ভ্রান্তি,—তবু রতি মগ্ন আমি ধ্যানে!

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

গ্রন্থাগার

হেথা আসি' মিলিয়াছে সর্ব্ব দেশ-কাল, হাতে হাত ধরি;
সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে মনে মনে হেথা অবাধ সম্ভোগ।
জাতি, ধর্ম্ম বর্ণ—সবে আলিঙ্গিত হেথা, ভেদ পরিহরি';
মৃতামৃতে, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যে, শত্রু-মিত্রে হেথা নাহি বিপ্রয়োগ।
ত্যাগী, ভোগী, উচ্চ-নীচ রহে একাসনে প্রেমে মগ্ন চিত;
'শাস্ত্র', 'নীতি' 'মার্গ', 'বাদ',—নির্বিরোধে আশ্লিষ্ট সকল।
স্তব্ধ রূপায়িত হেথা মসীকৃষ্ণ বেণী অনাদি অতীত;
সর্ব্ব ভুবনের লীলা রহে হেথা মূর্ত্ত অচঞ্চল।

অতীতের কর-যুগ বর্ত্তমান হেথা করিয়া ধারণ,—
ডাকে, ওই ভবিষ্যেরে সাধিবারে আসি' ত্রিবেণী-সঙ্গম।
দেশে-দেশে কণ্ঠে-কণ্ঠে পুণ্যতীর্থে হেথা সৌভ্রাত্র-মিলন;
এক ধামে সম্মিলিত জগতের যত জ্ঞান-বিহঙ্গম,—
মৈত্রীভাবে পরস্পরে আলিঙ্গন হেথা সম্পন্ন সবার—
অপূর্ব্ব মিলনকেন্দ্র! বিশ্বমাঝে হেন নাহি কোথা আর!

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চৌধুরী

জাপান

'-সাত বৎসর আগেকার কথা। এমন বর্ব্বরের মতো হিংসায় াতিয়া নরমেধ-যজ্ঞের কল্পনাও জাপান বোধ হয় তখন করে নাই! শিক্ষা-সংস্কৃতির অনুশীলনে জাপানের অখণ্ড অনুরাগ, শিল্প-বাণিজ্যে াপানীর অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া কে তখন ভাবিয়াছিল, াহিরে শিক্ষা-সভ্যতার পালিশ্ থাকিলেও জাপানের বুকে দানবের ান! সেই তখনকাব কথা বলিতেছি। জন্ প্যাট্রিক নামে

ক জন মার্কিণ সুধী তখন জাপানে গিয়াছিলেন—জাপানের াকস্মিক অভ্যুদয় দেখিয়া জাপানের পরিচয় লইতে। সে পরিচয় নি সন্দর্ভ-ছন্দে গাঁথিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। *

জন প্যাট্রিক প্রথমে গিয়া য়োকোহামায় নামেন। য়োকো-মাকে তিনি দেখেন, পাশ্চাত্য ছাঁদে গড়া যেন নূতন সহর! বাড়ী সব আধুনিক ছাঁদের; পথে রিকশর সংখ্যা খুব অল্প : তরুণ জাপানীরা সব মোটরে চড়িতেছে! তাছাড়া বাইসিকলের সংখ্যা নাই!

য়োকোহামা হইতে জাপানের তুঙ্গতম পর্ব্বত ফুজিশান্ দেখা যায় —ফুজিশানের শিখর ১২৩৯৫ ফুট উঁচু। জাপানে আসিলে ফুজিশানে চড়িবার লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। চড়িবার ব্যবস্থা আছে। ফুজিশানে চড়িতে হইলে ট্রেণে করিয়া আসিয়া গোতেম্বায় নামিতে হয়। মোটা লাঠির আশ্রয় ব্যতিরেকে ফুজিশানে চড়া সম্ভব নয়। পাহাড়ের বুক হইতে দূরে ওশিমা আগ্নেয়গিরি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই ওশিমার অগ্নি-গহ্বরে প্রাণাহুতি দেওয়া—জাপানীদের কাছে মহাপুণ্য! এ অগ্নিগিরিতে ঝাঁপ দিয়া যে মৃত্যু বরণ করে, স্বর্গে তার স্থান একেবারে রিজার্ভ থাকে!

গ্রীষ্মকালে ফুজিশান্ পাহাড় যেন সহর হইয়া ওঠে! এ পাহাড়ে প্রায় কুড়িটি মন্দির আছে; এবং পুণ্য-কামী শিন্তো-মতাবলম্বীরা দলে দলে এই পাহাড়ে তীর্থ করিতে আসে। পাহাড়ে বারোটি যাত্রি-নিবাস আছে—যাত্রীর ভিড়ে সেগুলিতে তখন আর তিল-ধারণের স্থান থাকে না!

য়োকোহামার উত্তরে এবং অদূরে কামাকুরা গ্রাম। এখানে অমিত বুদ্ধের বিরাট্ মূর্ত্তি আছে। সাত শত বৎসর পূর্ব্বে পুরু ব্রোঞ্জ-প্লেট দিয়া মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মূর্ত্তির নির্ম্মাণ শেষ হইলে মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া বিরাট্ মন্দির গড়িয়া মূর্ত্তিটিকে সেই মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ ঝড়ে মন্দির ভাঙ্গিয়া যায়। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ-মধ্যে মূর্ত্তিটি অটুট ছিল—তার পর ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রের বন্যায় মন্দিরের সে ধ্বংসাবশেষ ভাসিয়া যায়। তখন হইতে মূর্ত্তিটির মাথায় আর কোনো আচ্ছাদন রচিত হয় নাই! ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত হিম-রৌদ্র মাথায় বহিয়া মুক্ত আকাশ-তলে মূর্ত্তিটি বিরাজ করিতেছে। মূর্ত্তির চরণদেশে যাত্রীরা সহজে যাহাতে পৌঁছিতে পারে, সে জন্য সোপানশ্রেণী গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বুদ্ধ-মূর্ত্তির-মাথায় কার্ণিশের মত যে রূপার বন্ধনী (boss) আছে, সেটির ব্যাস প্রায় এক ফুট।

য়োকোহামা হইতে টোকিয়ো—ট্রেণে আধ ঘণ্টার পথ। আট মিনিট অন্তর ট্রেণ ছাড়িতেছে। ট্রেণে থার্ড ক্লাশ কামরা অসংখ্য—থার্ড ক্লাশের আসন নীল রঙের গদি মোড়া, সব সময়েই ভিড়ে ঠাশা থাকে। সেকণ্ড ক্লাশে সবুজ রঙের গদি। থার্ড ক্লাশের সঙ্গে এই টুকুই যা তথাৎ! তাছাড়া সেকণ্ড ক্লাশ কামরা প্রায় খালি থাকে। যখন সম্রাট্ ট্রেণে চড়েন, তখন ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরা আঁটা হয়।

* জাপান সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ১৩৪১ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা সিক বসুমতী'তে "না-জানা জাপান" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

জাপানের হাউস-বোট

ছিড়িয়া গেলে সেলাই করা। লেখক লিখিতেছেন—দাসীরা চলে ঘড়ির কাঁটার মত! এতটুকু ব্যতিক্রম দেখি নাই। সন্ধ্যার সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিত, আমার স্নানের জল তৈয়ারী। স্নান করিতে যাইতাম। কাঠের বা মাটার ট্যাঙ্কে গরম জল সুরক্ষিত—এত গরম যে, বিদেশীয়েরা সে গরম সহিতে পারে না। জাপানীরা কিন্তু পারে। এ জলে গা ডুবাইয়া বসিয়া তারা স্নান করে। আ এই জলে গামছা ডুবাইয়া গা রগড়াইয়া তার পর আর একখ শুষ্ক গামছায় গা মুছিতাম! জাপানে টার্কিস তোয়ালে দেখি না স্নানের জন্য সূতিবোনা ওয়াশ-ক্লথ বা গামছার প্রচলন। স্না সময় লজ্জা রক্ষা করার দিকে কাহারো দৃষ্টি থাকিতে প

পর্ব্ব-উৎসবে মিছিল—সামনে পুরোহিত

চাষের কাজে

লোহিত স্তম্ভ—মিয়াজিমা

আইয়াশু মন্দির—নিক্কো

অমিত-বুদ্ধমূর্ত্তি—কামাকুরা
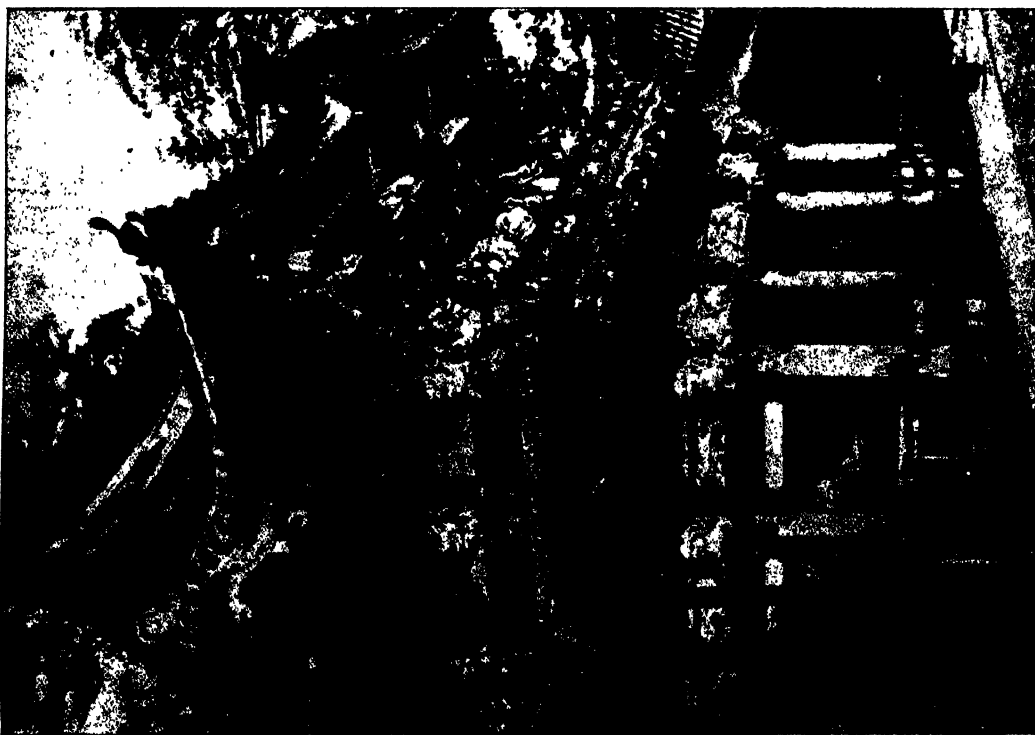
মাছের খাঁচা

বাল্‌তি চাপা দিয়া অক্টোপাশের ছানা ধরা

না; এক কামরায় গা খুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে অকুণ্ঠিত ভাবে স্নান করে। এক জন ইংরেজ যে লিখিয়া গিয়াছেন—Privacy is not much observed in Japan—this word is difficult to translate—সে কথা খুব সত্য। নিক্কোয় একটি বিশাল হ্রদ আছে—চুজেন্জি। এ হ্রদের দৃশ্য-মাধুরী স্বর্গীয়! ৩৩০ ফট উঁচু গিরি-মুখ হইতে অজস্রধারে জল পড়িতেছে। সে জলধারার উপ

আশাকুশা মন্দির-প্রাঙ্গণে পায়রাদের দানা খাওয়ানো

কিশো নদী—(জাপানের 'রাইন্')—এ নদীতে ষ্টীমার চলে না

সূর্য্যকিরণ পড়িলে মনে হয়, যেন রূপালি সূতার ঝালর দুলিতেছে! শীতের সময় এ জল জমিয়া নানা রঙে রঙীন তুষার-কণিকায় স্ফটিক রচনা করে।

নিক্কো হইতে লেখক ইয়োজো নোমুরায় গিয়াছিলেন ট্রেণে চড়িয়া। হোটেল হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পথ দু'ধারে লাল রঙের অজস্র ক্রিপটোমেরিয়া ফুলে রাঙা হইয়া আছে! ছোট ছোট নদী—তীরে ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে, তাদের মায়েরা নদীর জলে কাপড় কাচিতেছে; নদীর ধারেই চা তৈয়ারী হইতেছে; পাত্রে ভাত ফুটিতেছে—ঘরকর্ণার কাজ বাহিরেই সকলেই সারিয়া লয়!

এখানে ছোট একটি মিল আছে। এ-মিলে লোহার চিহ্ন নাই! কাঠ, পাথর এবং চামড়া দিয়াই মিলের যন্ত্রপাতি কলকব্জা তৈয়ারী।

ইংরেজী ভাষাকে জাপানীরা একেবারে যেন নিজের করিয়া লইয়াছে। সাইনবোর্ড লেবেল ডাকটিকেট সিগারেটের বাক্স—এ সব জিনিষের উপর নাম-ধাম ইংরেজী অক্ষরে ছাপা। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষা অবশ্য-পাঠ্য-তালিকাভুক্ত এবং জাপানী কুলি-মজুরের দলও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা কহিয়া কাজ চালাইতে চমৎকার পটুতা লাভ করিয়াছে।

পথে একটি গাম দেখিলাম। নাম সেনদাই। এ গ্রামে প্রায় এক লক্ষ নব্বই হাজার লোকের বাস। এই সেনদাই হইতে এক দিন ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে রাজদূত হাশেকুরা রকুয়েমন্ রাজকার্য্য-ব্যপদেশে রোমে গিয়াছিলেন। সেনদাইয়ের কাছে দেবদারু-কুঞ্জসেবিত মাৎসুইমা দ্বীপপুঞ্জ—ছোট বড় বহু দ্বীপ লইয়া গঠিত। একটি দ্বীপে বহু বৎসরের প্রাচীন একটি বৌদ্ধ-মন্দির আছে।

এ দ্বীপে জলের কোলে অসংখ্য শাম্পান বা নৌকা। পাল তুলিয়া বাতাসের মুখে ছাড়িয়া দিলেই হইল, এ নৌকা তীরের বেগে ছোটে। মাৎসুশিমার গায়ে ইশিনোমাকি উপসাগর—মাছ ধরিবার মস্ত ঘাঁটা। ইশিনোমাকির জল তেমন গভীর নয়! বুকে

এ গাছের তক্তা খুব মজবুত

শৈবালদামের মধ্যে নানা জাতের মাছ খেলা করিতেছে দেখা যায়, নৌকা হইতে হাত বাড়াইয়া সে-মাছ ধরা চলে—জলে এত মাছ!

তীরে বড় বড় খাঁচা সজ্জিত আছে। ধীবরদের খাঁচা। মাছ

ধরিয়া এই খাঁচায় তারা সে মাছ রাখে; তার পর সব মাছ বাজারে চালান যায়।

জাপানে অক্টোপাশের মাংসের খুব আদর! তার স্বাদ না কি মধুর! অক্টোপাশের ছানা ধরিয়া তার মাংস খায়। এ মাংস রাজভোগ! ধরিবার কৌশল অপরূপ। বাল্‌তির তলায় কাচ লাগাইয়া সেই বালতি চাপা দিয়া জাপানী ধীবরের দল অক্টোপাশের ছানা ধরে।

লেখক লিখিতেছেন—জাপানে রেলোয়ে-লাইনের পত্তন হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। খেলার ছোটখাট লাইন

দীর্ঘপুচ্ছ মোরগ

আনিয়া ইংরেজ পূর্ত্তশিল্পী বেরি সম্রাটের প্রাসাদের চারি দিকে লাইন পাতেন। সে-লাইনে খেলার ট্রেন চলিত। দেখিয়া সম্রাট্ বিমুগ্ধ হইয়া তখনি রেল-পথ নির্ম্মাণের আদেশ দেন।

এখন জাপানের অঙ্গ ভেদ করিয়া শিরা-উপশিরার মত অজস্র রেলোয়ে-লাইন বিস্তৃত। পাঁচ-মিনিট, সাত-মিনিট, আট-মিনিট অন্তর ট্রেন ছাড়িতেছে। ট্রেনের ভাড়াও খুব সস্তা। জাপানীরা বেড়াইতে খুব ভালোবাসে। সময় পাইলেই টিকিট কিনিয়া ট্রেনে চড়িয়া যতখানি পারে, বেড়াইয়া আসে।

আওমোরির কাছে তামাকের সমৃদ্ধ চাষ-আবাদ। এ-তামাকের চাষ গবর্ণমেণ্টের খাশে আছে। আইন এমন কঠিন যে, তামাকের

স্তুয়-বীনের পিণ্ড
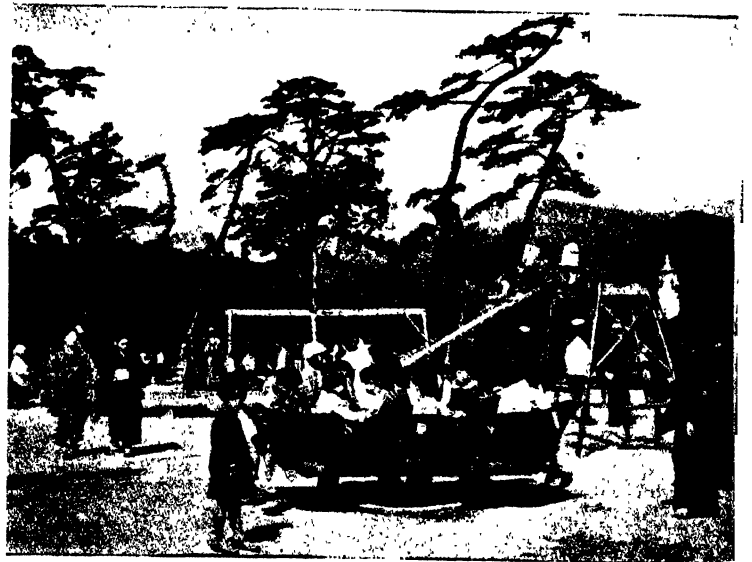
ছোটদের খেলার পার্ক

একটি পাতা কেহ ছিঁড়িতে পারে না! চাষারা চাষের তামাকের পাতা লইবে, সে উপায় নাই! চাষের তামাক পুরাপুরি গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগে বুঝাইয়া জমা দিতে হয়—সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্ধারিত হারে দাম মেলে। নিজের হাতে চাষ করিলেও চাষাকে তামাক পাতা কিনিয়া তবে তার স্বাদ লইতে হয়!

আওমোরিকে বলে হোক্কাইদোর তোরণ! হোক্কাইদো জাপানের

আলাস্কা ! সমস্ত জাহাজী-চালানী জিনিষ সুমারু অন্তরীপ হইয়া প্রথমে আসে এই হোক্কাইদোয়। সমুদ্র পার হইতে হয় রাত্রে। দিনে পার হইবার ব্যবস্থা নাই। এ জন্য জাহাজ-ঘাটে বিরাট্ ওয়েটিং-রুম আছে এবং সে ওয়েটিং-রুমে যাত্রীর ভিড়ও জমে বিরাট্ রকম।

লেখক লিখিতেছেন,—জাহাজের জন্য আসিয়া ওয়েটিং-রুমে বিশ্রামের জন্য আমি স্থান পাইলাম না! বাহিরে পায়চারি করিতেছি, এমন সময়ে এক সুদর্শনা জাপানী-তরুণী আমাকে তাঁর আসন ছাড়িয়া দিলেন। ইংরেজী ভাষায় পরিচয়ের আদান-প্রদান হইল। আমি আমেরিকান্—শুনিয়া তরুণী বেশ গম্ভীর ভাবেই আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—আমেরিকায় গেলে আমেরিকান্ স্বামী পাইব—বিবাহ করিতে? আমেরিকান্ স্বামীদের দরদ, মমতা, প্রীতি, স্নেহের বহু কথা তিনি বইয়ে পড়িয়াছেন, সে কথা বলিলেন। বলিলেন, স্বামীর আদরে-সোহাগে মার্কিণ মেয়েরা স্বর্গসুখ উপভোগ করে, তাই তাঁর বাসনা, আমেরিকান্‌কে বিবাহ করিবেন!

সে রাত্রে বোটের মাদুর-পাতা মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইলাম। অত ভিড়ে কষ্ট হয় নাই। তার কারণ, জাপানীরা সাধারণতঃ বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। গায়ে ও জামা কাপড়ে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না!

অন্তরীপ পার হইয়া প্রথমে আসিলাম স্যাপোরায়। এক জন বন্ধুর দেখা মিলিল। তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। বন্ধুটি কৃতবিদ্য। প্রায় বলিতেন, আমেরিকার প্রধান গৌরব তার বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি। বন্ধু বলিলেন,—আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া আছি। আমাদের অনেক শিক্ষার দরকার। তবে এ কথাও ঠিক, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জাপান বুদ্ধি ও কর্মশক্তির জোরে পৃথিবীর অন্য শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে একাসনে বসিবে।

স্যাপোরার পরেই সারি সারি অসংখ্য গ্রাম। গ্রামগুলির মধ্যে সিরায়োই বেশ সমৃদ্ধ! সিরায়োই গ্রামে দীর্ঘশ্মশ্রু বহু বৃদ্ধের বাস। ইহারা প্রাচীন আইনু-বংশীয়। এ-জাতির বিবাহিতা রমণীরা দুই ঠোঁটে চিত্রবিচিত্র নক্সা আঁকেন। এ নক্সা

নমস্কার

খাবারের দোকান—ওসাকা

স্কুলের জিম্‌নাশিয়াম্
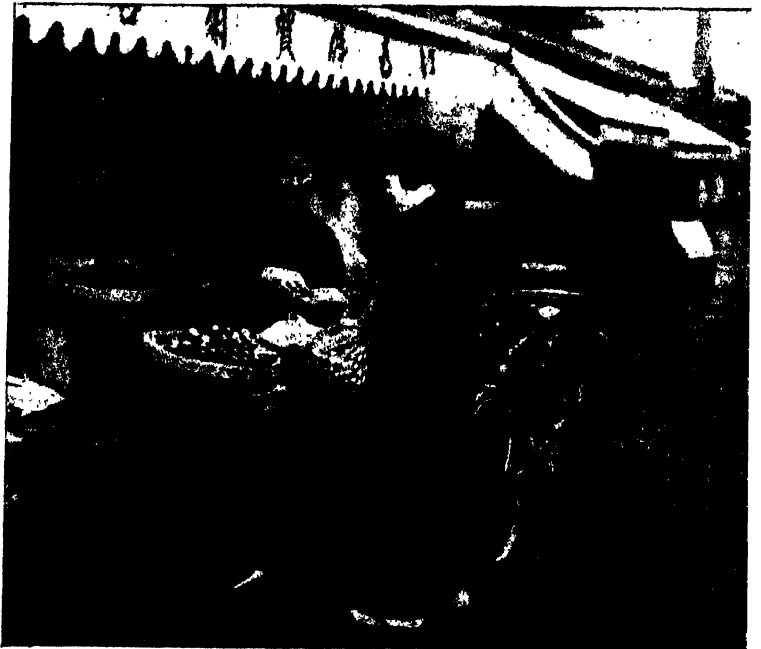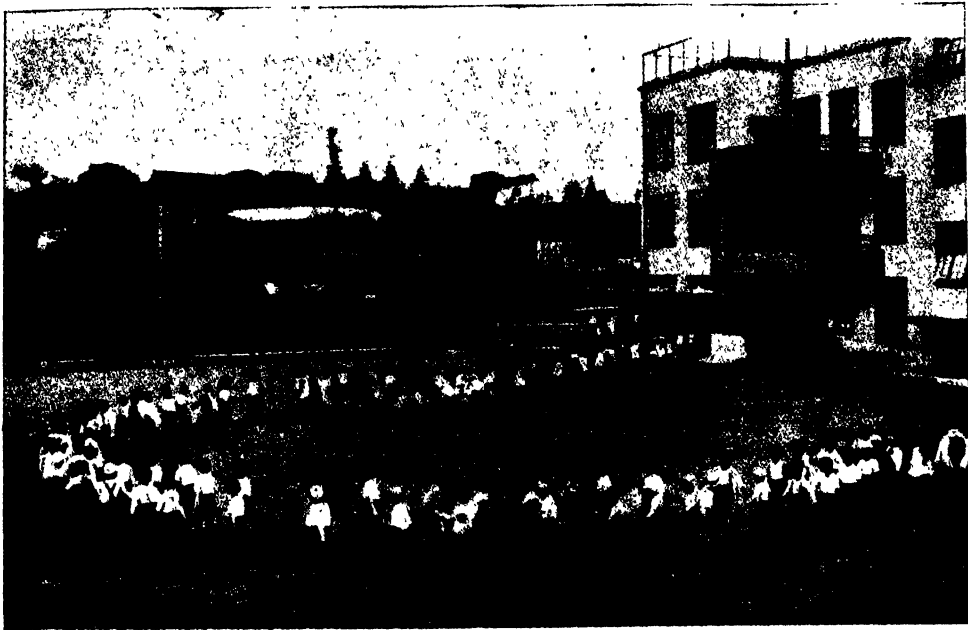
এয়োতির চিহ্ন। সিবায়োইয়েব অদূরে ওনুমা হ্রদ। এই হ্রদের অদূরে কোমাগাটাকে আগ্নেয়-গিরি—মাথায় ৩৭১০ ফুট উঁচু। এ আগ্নেয়-গিরি হইতে প্রায়ই অগ্নি-স্রাব হয়। এক বার এই গিরির অগ্নিবর্ষণে সতেরো মাইল দূরবর্ত্তী হাকোডেট সহর প্রায় ধ্বংস হইতে বসিয়াছিল। হঠাৎ ঝড়ো বাতাস উঠিয়া সহর রক্ষা করিল। সে-বাতাসে গিরি-নিঃসৃত অগ্নিকণাগুলি বিপরীত দিকে উড়িয়া উচিয়ুরা উপসাগরে গিয়া পড়ে।

জাপানের পাহাড়গুলি রুক্ষ অগ্নিশুষ্ক! সে জন্য এ সব পাহাড়ের অধিকাংশই চাষ-বাসের অযোগ্য। কোমাগাটাকে পূর্ব্বে আরো উঁচু ছিল! বহু বৎসর পূর্ব্বে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মাথার উপরকার

কলা-ভবনের শিক্ষা

এক-তৃতীয়াংশ ফাটিয়া বহুদূর সাগর-জলে গিয়া পড়ে।

কোমাগাটাকের কোলে রাস্প্‌বেরির অজস্র কুঞ্জ—ফলে ভরিয়া আছে।

আওমোরি হইতে আকিতা পর্য্যন্ত সমুদ্রের ধারে-ধারে জাপানী গ্রাম ও ঘর-বাড়ীর চেহারার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিবার মত। সহরের বাড়ী-ঘরে পাকা ছাদ, ছাদে অগ্নি-নিবারক টালি। গ্রামে সব বাড়ী খড়ে ছাওয়া। সমুদ্রের ধারে যে-সব ঘর-বাড়ী, সেগুলি বেশ মজবুত ভাবে তৈয়ারী করা হয়। বন্যায় সেগুলি সহজে ভাসে না বা নষ্ট হয় না।

নিগাতায় লোক-জন বোটে বাস করে।

লেখক লিখিতেছেন—জাপানী গ্রামগুলির মোহ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল! কোনো গ্রাম না দেখিয়া ছাড়ি নাই! নাওয়েৎসু, তোয়ামা, কানাজাওয়া, ফুকুই প্রভৃতি গ্রামগুলি রেলোয়ে-লাইনের গায়ে গায়ে অবস্থিত! সবগুলিতেই ষ্টেশন আছে। ট্রেণ-যাত্রীর জন্য প্রতি ষ্টেশনে সব সময়েই ভাত-তরকারী কিনিতে পাওয়া যায়। মাইজুরু হইতে লোকাল ট্রেণে চড়িয়া আমানো-হাশিদেতে আসিলাম। এ সহরটি স্বর্গের সেতু। এই সেতু দিয়াই না কি ভগবানের পুত্র আসিয়া সম্রাট্‌-রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন! সরু একখণ্ড জমি সোজা গিয়া মিশিয়াছে জাপান-সাগরের বুকে—এই জমিটুকুই সেতু-গর্ব্বে ধন্য হইয়াছে।

হোন্‌শুর ওপারে মিয়াজিমা দ্বীপ। এখানে জলের বুকে লাল রঙের বহু স্তম্ভ আছে। জাপানে এইরূপ স্তম্ভ দেখিলে বুঝিতে হইবে, নিকটে মন্দির আছে। মিয়াজিমায় এই স্তম্ভের গায়ে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স আরিশুগাওয়া তারুহিতো মন্দিরের সম্বন্ধে স্বহস্তে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। লেখা-লাইনগুলি লম্বে ৭৩ ফুট।

মিয়াজিমায় অসংখ্য হরিণ। তারা ভয়-ডর জানে না; পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাদের উৎপাতে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফলমূল রক্ষা করা দায়।

আইনু জাতি—শিরায়োই

ঠ্যালা-গাড়ীর পশরা

মিয়াজিমা দুর্গ সুরক্ষিত। এখানে শ্বেত-পাথরের বিরাট্‌ একটি অশ্ব-মূর্ত্তি আছে। লোকে বহু কষ্ট করিয়া ফসলের অর্ঘ্য আনিয়া এই মূর্ত্তির পায়ে পূজা নিবেদন করে। এ মূর্ত্তির পূজা করিলে অজস্রা কাটিয়া শস্য-সম্পদে ভূমি ভরিয়া ওঠে!

লেখক লিখিতেছেন—সমুদ্রের তীরে নানা রঙের কাঁকড়া দেখিলাম—মাছরাঙা পাখীর দলও দেখিলাম, মহানন্দে মাছ ধরিতেছে।
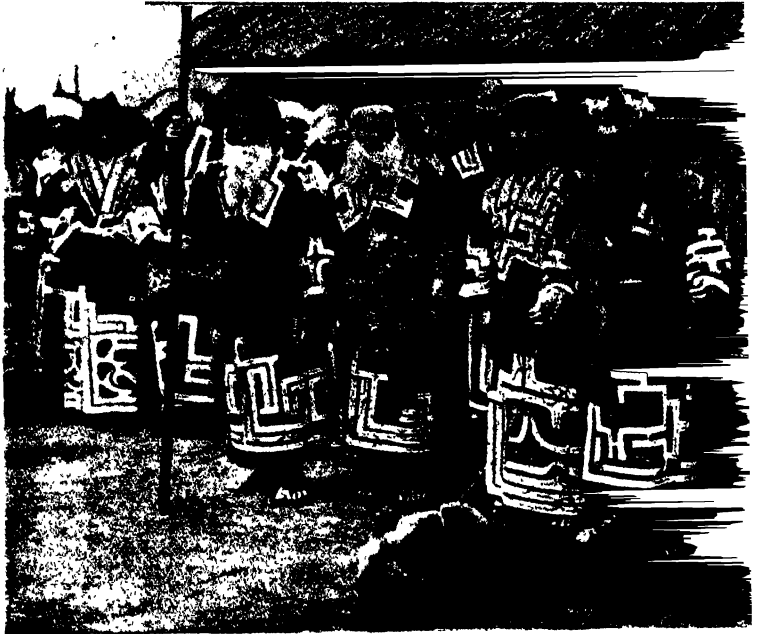
মোজির কাছে শিমোনোয়েসৃকি—দু'জায়গার মধ্যে সরু এ খালের ব্যবধান। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানগুলি এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত যে, শিমোনোয়েসৃকিকে অনেকে বলেন, প্রাচ্য জগৎ জিব্রালটার! শিমোনোয়েসৃকি হইতে এক রাত্রির পাড়ির প চোশেন্‌ বা প্রাচীন কোরিয়া। মাকুতিকুয়োর সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যাপ শিমোনোয়েসৃকি এবং চোশেন—এদিক্‌কার দু'টি প্রধানতম কেন্দ্র।

জাপানে প্রজার সঙ্গে রাজার অন্যতম সর্ত, প্রয়োজন ঘটিলে ফৌজদলে যোগ দিয়া প্রজাদের লড়াই করিতে হইবে ; না করিলে জমি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইবে।

জাপানে এক-জাতের বীন্ জন্মায়, সে বীনের মোটা মোটা পিণ্ড তৈয়ারী করিয়া জমির সারের কাজে তাহা ব্যবহার করা হয়। সারের কাজে এ কেক না কি অব্যর্থ! কেক-গুলি দেখায় যেন গরুর গাড়ীর চাকা!

জাপানে আবর্জ্জনা বলিয়া কোনো বস্তু ফেলিয়া দেওয়া হয় না। অতি তুচ্ছ বলিয়া জাপানে কোনো সামগ্রী নাই। আব-র্জ্জনাকেও জাপানীরা নানা কাজে লাগাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় বহু সামগ্রী তৈয়ারী করে—করিয়া বেচে ; বেচিয়া পয়সা রোজগার করে। জাপানীর বুদ্ধি ও শ্রমশক্তির তুলনা নাই। তার উপর যে কাজ তারা করে, তাহাতে প্রাণ-মন সঁপিয়া দেয়। এই আন্তরিকতার গুণেই এত অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পে-বাণিজ্যে জাপান সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে!

তোকিয়ো-সীমান্ত : এখানে পাশপোর্ট দেখা হয়

জাপানে কল-কারখানার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িলেও জাপানীর হাত এখনো আলস্যে বিজড়িত হয় নাই। ধানের চাষে এখনো সাবেকী প্রথায় হাত দিয়া বোনা ও ঝাড়া-মাপার কাজ চলিতেছে। রৌদ্রে বৃষ্টিতে কাজে কাহারো কামাই দেখা যায় না। রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য চাষা-চাষীরা গায়ে খড়ের তৈয়ারী জামা, মাথায় খড়ের টুপি আঁটিয়া ক্ষেতে অবিরাম কাজ করে।

পথে যে-সব ফিরিওয়ালার দেখা মেলে, তারা ঠেলাগাড়ীতে খাবার্-দাবার হইতে সুরু করিয়া রুজ, ক্রীম, জুতার পালিশ, হাতপাখা, খেলনা—সর্ব্ববিধ দ্রব্যের পশরা লইয়া বাহির হয়। গাড়ীর মাথায় আচ্ছাদন আছে : কাজেই রৌদ্র-বৃষ্টিতে তাদের কাজ বন্ধ থাকে না।

পাকা রাস্তা—হোনশু

জাপান দেখিয়া একটা কথা মনে হয়, জাপান যেন স্বপ্নের দেশ! গন্ধের দেশ! ফুলের দেশ! উৎসবের দেশ! এত রকমের ফুল ফোটে যে, তার আর সংখ্যা নাই! ঋতু-ভেদে গ্রামে-গ্রামে সহরে-সহরে নানা উৎসবের সাড়া পড়ে ; মেলা বসে : নৃত্য-গীতে পূজার্চ্চনায় লোকে যেন মাতিয়া ওঠে।

বসন্তে ফুলের হাসি যখন দিকে-দিকে বিকশিত হইয়া ওঠে, তখন উৎসব-আনন্দ একেবারে সীমাহীন হয়। মন্দিরের ছাঁদে কাগজের অসংখ্য ছোট ছোট মন্দির তৈয়ারী করিয়া ছেলেমেয়েরা সে সব কাগজের মন্দির পুষ্পভারে ভূষিত করে ; করিয়া দেবমন্দিরে লইয়া যায়—মিছিল করিয়া। মন্দিরে ধুমধামে পূজার্ঘ্য নিবেদিত হয়। প্রতি দলের সঙ্গে এক জন করিয়া শিন্তো পুরোহিত থাকেন।

শিল্প-বিজ্ঞানে অসাধারণ পটুতা লাভ করিলেও জাপান তার ধর্ম্ম-বিশ্বাস এতটুকু ত্যাগ করে নাই! সে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দরুণ দেশের নামে তারা বর্ব্বর নৃশংস হইতে এতটুকু কুণ্ঠাও বোধ করে না। এ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য স্নেহ মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিতেও তাদের বাধে না! এমন অমানুষিক বৈশিষ্ট্য বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোনো জাতের মানব-চরিত্রে দেখা যায় না!

সাহিত্যদর্পণে বিবৃত হইয়াছে—ভয়ানক-রসের স্থায়িভাব ভয়, কাল অধিদেবতা, স্ত্রী-নীচ-প্রকৃতি প্রভৃতি উহার নায়ক বা পাত্র, বর্ণ কৃষ্ণ। যাহা হইতে ভীতি উৎপন্ন হয়, তাহাই উহার আলম্বন। আলম্বনের ঘোরতর চেষ্টাসমূহ উদ্দীপন। বৈবর্ণ্য-গদগদ-প্রলয়-স্বেদ-রোমাঞ্চ-কম্প-দিগবলোকন প্রভৃতি অনুভাব। জুগুপ্সা-আবেগ-সম্মোহ-সন্ত্রাস-গ্লানি-দীনতা-শঙ্কা-অপস্মার-সম্ভ্রান্তি-মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারী (১)।

নীচ-পাত্রে উৎপন্ন ভয়ানক-রসের প্রসিদ্ধ উদাহরণ শ্রীহর্ষের রত্নাবলীতে দৃষ্ট হয়—'মনুষ্য-নামের অযোগ্য নপুংসক রাজপুর-চারী ভৃত্যগণ বানর-ভয়ে লজ্জা ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে—বামনাকৃতি ভৃত্যটি ভয়ে কঞ্চুকীর কঞ্চুকের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়াছে'—ইত্যাদি। স্ত্রীলোকে উৎপন্ন ভয়ানক-রস, যথা—'ইন্দ্রের বজ্র স্মরণে দৈত্য-স্ত্রীগণের গর্ভপাত হইয়া থাকে', ইত্যাদি। বালক-পাত্রে ভয়ানক, যথা—'ঘোর মেঘ-ধ্বনি শ্রবণে ব্রজ-বালকগণ কম্পিত কলেবরে ও বিকৃত কণ্ঠে মাতার অঙ্কে লুকাইত'—ইত্যাদি (২)।

দশরূপকে ধনঞ্জয় বলিয়াছেন—বিকৃত-স্বর-বিশিষ্ট প্রাণিগণ হইতে উৎপাদিত ভয়-ভাবই ভয়ানক-রস। ইহার ব্যাখ্যায় ধনিক বলিয়াছেন—রৌদ্র-শব্দ শ্রবণে বা রৌদ্র-প্রকৃতি প্রাণীর দর্শনে ভয়-স্থায়িভাব-সমুৎপন্ন রসই ভয়ানক। সর্ব্বাঙ্গ-বেপথু, স্বেদ, শোষ, বৈবর্ণ্য, বৈচিত্ত্য (চিত্তের অস্থিরত্ব) ইহার অনুভাব। দৈন্য-সম্ভ্রম-সম্মোহ-ত্রাসাদি ব্যভিচারী (৩)।

ভাবপ্রকাশনে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ভয়-স্থায়িভাব ভয়ানক-রসের উপাদান-হেতু। ভয় চিত্তের চলন। যাহা হইতে স্বয়ং ভয় পায় বা অপরকে ভয় পাওয়ান যায়, তাহাই ভয় বা ত্রাস (৪)।

শঙ্কা-নির্ব্বেদ-চিন্তা-জাড্য-গ্লানি-দীনতা-আবেগ-মদ-উন্মাদ-বিষাদ-ব্যাধি-চিন্তা-মোহ-অপস্মৃতি-(অপস্মার)-ত্রাস-আলস্য, মধ্যে মধ্যে স্তম্ভ-কম্প, রোমাঞ্চ-স্বেদ-বেপথু-বৈবর্ণ্য-মরণ-ত্রাস-গদগদ প্রভৃতি ভয়ানকে ব্যভিচারী। মহারণ্যে প্রবিষ্ট, মহাসংগ্রামকারী, গুরু ও রাজার নিকট অপরাধিগণ ভয়ানকের আলম্বন বিভাব।

ভয়ানকের উদ্দীপন বিভাবগুলির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'বিকৃত'। যে বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-স্পৃষ্ট হইলে বিকৃতি উৎপাদন করে, সেইগুলিকে 'বিকৃত' ভাব বলা হয় (৫)। এই সকল বিকৃত বিভাব যখন স্বযোগ্য সহকারি ভাবগুলির সহিত নাট্যকর্ম্মে (অভিনয়ে) সমাশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবে (ভয়ে) অবস্থান করে, তখন প্রেক্ষকগণের মন চিন্তাবস্থায় উপনীত ও তমঃ-সত্ত্ব-দ্বারা অন্বিত হইয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থাপন্ন মনের যে বিকার, তাহাই ভয়ানক-রস (৬)। ইহাই বাসুকি-মত।

নারদমতে বাহ্য-বিষয়াশ্রিত সত্ত্ববুদ্ধি-বিহীন তমোন্বিত মন হইতে ভয়ানকের উৎপত্তি (৭)। বাসুকি-মতে সত্ত্বের সূক্ষ্মরূপে অন্বয় স্বীকৃত হয়, নারদমতে তাহা হয় না—ইহাই মাত্র বিশেষ।

ভয়ানক-পদের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—'ভী' ধাতু ভয়-বাচক। 'ভয়' শব্দের অর্থ চলন। কর্ম্ম-বিশেষ-দ্বারা যখন কেহ স্বয়ং চলিত হয় (অর্থাৎ—কোন ভাববিশেষ-হেতু যখন কেহ চঞ্চল হইয়া উঠে), অথবা যখন ঐরূপ ভাব-বিশেষ-দ্বারা অপরকে চালিত করা হয়, তখন বলা হয়—অমুক ভয় পাইয়াছে অথবা অমুক অমুককে ভয় দেখাইতেছে। এই কারণেই বলা হয়, ভয় চলনাত্মক। কোন প্রাণীর ভয় বা আক্রোশ বশে উৎপন্ন রসই ভয়ানক (৮)।

ভয়ানক-রসের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—ব্রহ্ম-সভায় ভরতগণ-কর্ত্তৃক শম্ভুর কল্লান্ত-কর্ম্মের (প্রলয়-কালীন সংহার-লীলার) অনুকরণ নিপুণ ভাবে অভিনীত হইতে দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উত্তর মুখ হইতে ভারতী বৃত্তি ও তদুৎপন্ন বীভৎস-রসের আবির্ভাব ঘটে। এই বীভৎস হইতে আবার ভয়ানক

---

(১) বৈবর্ণ্য-স্বেদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব হইলেও সাধারণতঃ সাত্ত্বিকভাবগুলি অনুভাবমধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জুগুপ্সা—ইহা বীভৎসের স্থায়িভাব। এক রসের স্থায়ী অন্য রসে ব্যভিচারী হইতে পারে। সম্ভ্রান্তি—উন্মাদ (রামতর্কবাগীশ)।

(২) নীচ-পাত্রের দৃষ্টান্ত—"নষ্টং বর্ষবরৈর্ম্মনুষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপামন্তঃকঞ্চুকিকঞ্চুকস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ" ইত্যাদি (রত্নাবলী)। স্ত্রী-পাত্র—"ইদং মঘোনঃ কুলিশং ধারাসন্নিহিতাননম্। স্মরণং যস্য দৈত্যস্ত্রীগর্ভপাতায় কল্পতে"॥ (রাম-তর্কবাগীশ-টীকা)। বালক-পাত্র—"ঘোরমম্ভোধরধ্বানং নিশম্য ব্রজবালকাঃ। মাতুরঙ্কে ব্যলীয়ন্ত সকম্পবিকৃতস্বরাঃ"॥ (রাম-তর্কবাগীশ-টীকা)।

(৩) বিকৃতস্বরসত্ত্বাদের্ভয়ভাবো ভয়ানকঃ। সর্ব্বাঙ্গবেপথু-স্বেদশোষবৈচিত্ত্যলক্ষণঃ। দৈন্যসম্ভ্রমসম্মোহত্রাসাদিস্তৎসহোদরঃ"। দশরূপক (৪।৮০)

(৪) "ভয়ং চিত্তস্য চলনং তচ্চ প্রাহুরনেকধা। বিভেতি ভাপয়ত্যন্যান্ ত্রাসাদিভয়মুচ্যতে"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ পৃঃ ৩৫-৩৬।

(৫) "ভয়ানকস্য বিকৃতা বীভৎসস্য চ নিন্দিতাঃ।... বিষয়াস্ত্বিন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃষ্টা বিকৃতিং জনয়ন্তি যে। তে ভাবা বিকৃতাঃ খ্যাতা ভয়ানকবিভাবকাঃ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৪—৫।

(৬) "যদা তু বিকৃতা ভাবা স্বোচিতৈঃ সহকারিভিঃ। স্থায়িন্যভিনয়োপেতা বর্ত্তন্তে নাট্যকর্ম্মণি। তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং চিন্তাবস্থং তমোহন্বয়ি। সত্ত্বান্বিতং চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। ভয়ানকরসাখ্যাং তু লভতে রস্যতে চ তৈঃ"।—ভাব প্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৫। চিন্তাবস্থ—মনের চিন্তাবস্থা—স্মরণাত্মিকা বৃত্তি। চিত্তের কার্য্য স্মরণ।

(৭) "সত্ত্ববুদ্ধিবিহীনাত্তু মনসস্তমসান্বিতাৎ। বাহ্যাদেব সমুৎপন্নো ভয়ানক ইতীরিতঃ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৮।

(৮) "ঞিভী ভয় ইতি প্রায়ো ধাতুঃ স্যাদ্ভয়বাচকঃ। চলনং ভয়শব্দার্থ ইতি বিদ্বদ্ভিরুচ্যতে। বিভেতি ভায়য়ত্যন্যান্ কর্ম্মণেতি যথাক্রমম্। কশ্চিচ্চলতি কস্মাচ্চিদ্ভাবাদ্ধেতুনৈব হেতুনা॥ চাল্যতে চ যতস্তস্মাদ্ ভয়ং তু চলনাত্মকম্। ভয়েনাক্রোশতো জন্তোর্জায়তে স ভয়ানকঃ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, ৫৯—৫০।

রসের উৎপত্তি। দগ্ধ অসুরগণের অস্থি পরিধানপূর্ব্বক ভৈরব যখন অসুরগণের শ্মশানে অধিষ্ঠান করতঃ উক্ত অসুর-দেহ-ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারই অনুচর প্রমথ-ভূত-সঙ্ঘও তাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া ভয়-বিমূঢ়-ভাবে তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। এই কারণেই বলা হয়, বীভৎস হইতে ভয়ানকের জন্ম (৯)।

ভয়ানকের বিভাবাদি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, ইহাতে ভয়-ভাব স্থায়ী। এই ভয় দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও কৃতক (কৃত্রিম) (১০)। বিকটাকার (বিকৃতাকার) প্রাণিগণের দর্শন বা বিকৃত স্বর শ্রবণ, শূন্য অরণ্যাদিতে গমন, সংগ্রামাদিতে প্রবেশ, গুরু-রাজা প্রভৃতির নিকট অপরাধ প্রভৃতি হেতু দ্বারা ইহার উৎপত্তি। অর্থাৎ—ঐগুলিই ইহার বিভাব। ইহার অনুভাবগুলি বাঙ্-মনঃ-কায়-ভেদে ত্রিবিধ। উক্তানুক্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা, দিঙ্‌মোহ প্রভৃতি ইহার অনুভাব।

বাঙ্-মনঃ-কায়ভেদে ভয়ানক ত্রিবিধ। উহাদিগের মধ্যে মানস ভয়ানক স্বাভাবিক আর আঙ্গিক কৃত্রিম। দিঙ্‌মোহ, কান্দিশীকত্ব মুহুর্ম্মুহুঃ সহায়ান্বেষণ, পার্শ্ববীক্ষণ, পাণি-পাদ-কম্পন, অঙ্গুলি-দংশন, অভয়-যাচন, দন্ত-দংশন—এইগুলি দ্বারা আঙ্গিক ভয়ানক অভিনেয়। উরুস্তম্ভ, হৃৎকম্প, স্বেদ, চঞ্চল-তারকাযুক্ত দৃষ্টি, শুষ্ক ওষ্ঠ, মুখশোষ, গদ্গদ বাক্য, বিবর্ণতা, বিষয়বোধের অভাব, উক্তানুক্তের অনভিজ্ঞতা (কি বলিল না বলিল—বুঝিতে না পারা) এইগুলি দ্বারা স্বাভাবিক মানস ভয়ানক-রসের অস্তিত্ব সূচিত হইয়া থাকে (১১)।

ভয়ানকের অধিদেবতা কাল। বিকৃতাকারতা, বিকৃতরূপতা—ভয়ানকের অধিষ্ঠান। সংহারকালে কালদেবের ঐরূপ বিকৃতি আসে বলিয়াই তিনি ভয়ানকের অধিদেবতা।

বর্ণ ভয়ানকের কৃষ্ণ—কালদেবের গাত্রবর্ণ সদৃশ। আর অন্ধকারই সর্ব্ববিধ ভয়ের উৎস। এ কারণেও অন্ধকারের কৃষ্ণবর্ণই ভয়ানকের বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শারদাতনয়ের ভয়ানক-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশে মম্মটভট্ট ভয়ানক-রসের দৃষ্টান্ত-রূপে মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটক হইতে বিখ্যাত একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়াছেন—

অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে অনুসরণকারী রথের উপর মুহুর্ম্মুহুঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে মৃগটি লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক অগ্রসর হইতেছে। শরপতন-ভয়ে তাহার দেহের শেষার্দ্ধ সঙ্কুচিত—মনে হইতেছে যেন উহা পূর্ব্বকায়ে প্রবেশ করিয়াছে। দারুণ শ্রমে মুখব্যাদান করিয়াই দৌড়িতেছে—ফলে মুখভ্রষ্ট অর্দ্ধভুক্ত দর্ভ-কবলে তাহার পথ আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অত্যুগ্র লম্ফ-প্রদানের ফলে তাহার গতি আকাশেই অধিক—পৃথিবীতে অল্প—অর্থাৎ—মাটিতে তাহার পা যেন প্রায় পড়িতেছেই না—আকাশমার্গেই যেন ছুটিয়া চলিয়াছে।

এস্থলে রথ বা রথারূঢ় রাজা দুষ্মন্ত ভয়-স্থায়িভাবের আলম্বন। শরপতনের ভয়ে দৌড়িতেছে বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ ভয় তাহা হইতে নহে। এই কারণে শব্দবাচ্যতা দোষ ঘটে নাই। শরপাতনের ভয় ও রথের অনুসরণ উদ্দীপন, গ্রীবাভঙ্গ-পলায়ন প্রভৃতি অনুভাব। শঙ্কা-ত্রাস-শ্রমাদি ব্যভিচারী (১২)।

গোবিন্দ ঠক্কুর প্রদীপে বলিয়াছেন—রৌদ্র-শক্তি-দ্বারা জনিত অন্তরের বৈক্লব্য-দায়ক * চিত্তবৃত্তি-বিশেষ ভয়। তৎপ্রকৃতিক ভয়ানক (১৩)।

* রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র-কৃত নাট্যদর্পণে উক্ত হইয়াছে—পতাকা-কীর্ত্তি-রৌদ্র-আজি-শূন্য-তস্কর-দোষ প্রভৃতি হইতে জাত ভয়ানক-রস। স্তম্ভ-রোমাঞ্চ-কম্পন প্রভৃতি দ্বারা উহা অভিনেয়। পতাকা—রণস্থলে উড্ডীয়মান শত্রুর বিজয়-পতাকা ভয়ের কারণ। প্রতিপক্ষের কীর্ত্তিও প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তরে ভয় জন্মাইয়া থাকে। রৌদ্র—ভীষণাকৃতি ও বিকৃতস্বর পিশাচ উলূক প্রভৃতি। আজি (যুদ্ধ)—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শস্ত্রাঘাত। ইহা হইতে বধ-বন্ধন প্রভৃতিরও সংগ্রহ করিতে হইবে। শূন্য—নির্জ্জন গেহ-অরণ্য প্রভৃতি। দোষ—গুরু-নৃপতি প্রভৃতির প্রতি কৃত অপরাধ। এই সকল বিভাব দৃষ্ট-শ্রুত বা চিন্তিত হইলেও ইহাদিগের নিকট হইতে ভয়-স্থায়ী ভয়ানক রস জন্মে। স্তম্ভ—গাত্রাদির চলনাভাব। কম্পন—হস্ত-পদাদির বেপথু। এই দুইটি হইতেই গাত্র-মুখ-দৃষ্টি-বিকার, গলশোষ, বৈবর্ণ্য, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অনুভাবগুলি সংগৃহীত হইয়া থাকে। শঙ্কা-মোহ-দৈন্য-আবেগ-চপলতা

---

(৯) "যদাভিনীতং কল্পান্তকর্ম্ম শম্ভোর্নটৈস্তদা। ভারতীবৃত্তিতো জজ্ঞে বীভৎসশ্চোত্তরাননাৎ"।—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৫৭। ভারতীবৃত্তি—পুরুষ-প্রধান, নটাশ্রিত বাগ্‌ব্যাপার। "দগ্ধানামাদিদেবানামস্থীন্যামুচ্য ভৈরবে। তচ্ছ্মশানমধিষ্ঠায় তদ্ভস্মালিপ্য নৃত্যতি। প্রমথা ভূতসঙ্ঘাস্তমবেক্ষ্য ভ্রান্তচেতসঃ। তমেব শরণং জগ্মুর্যতো ভয়বিমোহিতাঃ। তস্মাদ্ভয়ানকো জাতো বীভৎসাদিতি গণ্যতে"।—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৫৮।

(১০) "ভয়ানকো ভয়স্থায়ী স্বভাবকৃতকাত্মকঃ"—ভাব প্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৩। স্বভাবকৃতকাত্মক—ইহার অর্থ ইহার স্বরূপ—স্বাভাবিক ও কৃতক। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—স্বাভাবিক ভয়ানক-রস রজস্তমঃ-প্রকৃতিক নীচ জনে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে, উত্তম সাত্ত্বিক-প্রকৃতিক জনের দ্বারা কৃত্রিম ভয়ানক-রসের অভিনয় মাত্র প্রদর্শিত হয়। শারদাতনয়ের মতে মানস ভয়ানক স্বাভাবিক আর আঙ্গিক কৃতক।

(১১) "ভয়ানকঃ সবীভৎসস্ত্রিধা বাক্‌কায়মানসৈঃ। স্বাভাবিকো মানসঃ স্যাদাঙ্গিকঃ কৃতকো ভবেৎ"।—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৪। কান্দিশীক—পলায়নপর।

(১২) গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্। দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি"।—শাকু ১।

"রথাম্নুপাত্বা ভয়ং স্থায়িভাবো ন শরপতনভয়াদিতি ন তস্য শব্দবাচ্যতা দোষঃ। পশ্চাদ্‌গচ্ছৎস্যন্দনো রাজা বালম্বনম্। শরপতনভয়মনুসরণং চোদ্দীপনম্। গ্রীবাভঙ্গপলায়নাদয়োঽনুভাবাঃ। শঙ্কাত্রাসশ্রমাদয়ো ব্যভিচারিণঃ"—নাগোজীকৃত উদ্দ্যোত।

(১৩) "রৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্যদং ভয়ম্। তৎকৃতিকো ভয়ানকঃ"।—প্রদীপ; "চিত্তবৈক্লব্যদং—তজ্জনকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ"—উদ্দ্যোত।

ত্রাস-অপস্মার-মরণ প্রভৃতি ব্যভিচারী। আর স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চ-বেপথু-স্বরভেদ-বৈবর্ণ্যাদি সাত্ত্বিক ভাবও সংগ্রহযোগ্য।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণব-সুধাকরে বলিয়াছেন—ভয় স্থায়িভাব স্বোচিত বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব-সংযোগে সদস্যগণের আস্বাদনীয় হইলে ভয়ানক-রসে পরিণত হয়। সন্ত্রাস-মরণ-চাপল-আবেগ-দীনতা-বিষাদ-মোহ-অপস্মার-শঙ্কা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। মুখশোষাদি ইহার বিকার (অনুভাব)। অশ্রু ব্যতীত অপর সকল সাত্ত্বিক ভাবই ইহাতে প্রযোজ্য।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে কথিত হইয়াছে—উগ্র ও প্রচণ্ড সঙ্ঘাত (সম্বাধ), রাক্ষস-প্রেতাদির দর্শন, শূন্যাগার-মহারণ্য-বধ-বন্ধন-বীক্ষণ, ত্রাস ও আয়াস জনিত উদ্বেগ, শিবা-পেচকাদির ধ্বনি প্রভৃতি বিভাব হইতে স্ত্রীলোক ও নীচগণের ভয়ানক-রস জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ ও অক্ষির ভেদ, সঙ্কোচ প্রভৃতি, তালু-কণ্ঠ-শোষ, হৃৎ-পাণি-চরণ-কম্প, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহা প্রদর্শনীয়। বৈবর্ণ্য-দৈন্য—আলস্য—ত্রাস-অপস্মার-মৃত্যু—বেপথু-স্বেদ-রোমাঞ্চ—স্বরভেদ-আবেগ-শঙ্কা প্রভৃতি ভাব ব্যভিচারী।

ভয়ানক-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

অতঃপর বীভৎস-রস। ভয়ানকের যে যে বিভাব উক্ত হইয়াছে, বীভৎসের বিভাবগুলির সহিত তাহাদিগের সাম্যের কিছু সম্ভাবনা থাকায় ভয়ানকের অব্যবহিত পরেই বীভৎসের স্থান কথিত হইয়াছে। ইহাই আচার্য্য অভিনবগুপ্তপাদের অভিমত (১৪)।

মহর্ষি বলিতেছেন—বীভৎস-রস জুগুপ্সা-স্থায়িভাবাত্মক। ইহা অহৃদ্য অপ্রশস্ত অপ্রিয় অচোক্ষ্য অনিষ্ট বিষয়-সমূহের শ্রবণ বা দর্শন, ও তজ্জনিত উদ্বেগ বা তত্তৎ বস্তুর পরিকীর্ত্তন প্রভৃতি বিভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে (১৫)। সর্ব্বাঙ্গ-সংহার, মুখাদির বিকূণন, উল্লেখন, নিষ্ঠীবন, উদ্বেজন প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য (১৬)। অপস্মার-উদ্বেগ-আবেগ-মোহ-ব্যাধি-মরণ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি আর্য্যা-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অনভিমত বস্তু দর্শনে, গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দের দোষহেতু ও বহু উদ্বেজন-বশতঃ বীভৎস-রস সমুদ্ভূত হইয়া থাকে (১৭)।

মুখ-নেত্র-বিকূণন, নাসা-প্রচ্ছাদন, অবনমিত মুখমণ্ডল, অব্যক্ত পাদপতন প্রভৃতি দ্বারা সম্যগ্‌রূপে ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য (১৮)।

নাট্যশাস্ত্রের বীভৎস-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে;

সাহিত্যদর্পণে কথিত হইয়াছে—জুগুপ্সা-স্থায়িভাবাত্মক বীভৎস-রস নীলবর্ণ, মহাকালাধিদৈবত; দুর্গন্ধ মাংস-রক্ত-মেদ প্রভৃতি ইহার আলম্বন; ঐ সকল পদার্থে কৃমিসঞ্চার প্রভৃতি উদ্দীপন; নিষ্ঠীবন আস্যবলন (মুখসংবরণ), নেত্র-সঙ্কোচন প্রভৃতি অনুভাব; মোহ-অপস্মার-আবেগ-ব্যাধি-মরণ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

ভট্টনারায়ণ-কবি-রচিত বেণীসংহারে রাক্ষস-রাক্ষসীর দৃশ্যটি এই বীভৎস-রসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দশরূপকে ও তাহার অবলোকে বিবৃত হইয়াছে—কৃমি-পূতিগন্ধি বমথু-বহুল রুধির-তন্ত্র-বসা-কীকস-(অস্থি)-মাংস প্রভৃতি বিভাব হইতে উদ্ভূত বীভৎস-রসের স্থায়িভাব কেবল জুগুপ্সা। বিভাবাদি দ্বারা এই জুগুপ্সারই পরিপোষণ হইয়া বীভৎস উদ্রিক্ত হয়। ইহা অত্যন্ত উদ্বেগকর (উদ্বেগী) ও ক্ষোভের জনক (ক্ষোভণ)। এই বিবরণে নূতনত্ব কিছু নাই। কিন্তু ইহার পর ধনঞ্জয়-ধনিক একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। সাধারণতঃ, উদ্বেগজনক অশুচি পদার্থই যে বীভৎস-রসের জনক হইবে—এরূপ নিয়ম নাই। যাহা সাধারণ লোকের নিকট অতি রমণীয়—শৃঙ্গারের উদ্রেক-হেতু সেই রম্য রমণী-শরীরও বৈরাগ্যবশতঃ ঘৃণাজনক ও অশুদ্ধ প্রতীয়মান হইয়া বীভৎস-রসের জনক হইতে পারে। ইহাকে শান্ত-রসও বলা চলে না। কারণ, প্রথমতঃ এই সকল বিভাব দর্শনে জুগুপ্সাগ্রস্ত হইয়া বিরক্ত ব্যক্তি

---

(১৪) "…তদনন্তরং ভয়ানকঃ। তদ্বিভাবসাধারণ্যসম্ভাবনাত্ততো বীভৎসঃ"।—অভিনব-ভারতী, বরোদা সং, নাট্যশাস্ত্র, প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৬৯।

(১৫) মূলে আছে—"স চাহৃদ্যা (প্রশস্তা) প্রিয়াচোক্ষ্যানিষ্টা-শ্রবণদর্শনোদ্বেজন[পরি]কীর্ত্তনাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে"। অহৃদ্য—কাহারও কোন বস্তু স্বভাবতঃ হৃদয়ের অপ্রিয়; যথা—দ্বিজগণের লশুন। অপ্রিয়—ধাতু প্রভৃতির দোষবশতঃ; যথা—শ্লেষ্মা রোগে পীড়িতের নিকট দুগ্ধ। অচোক্ষ—অশুচি, অপরিষ্কৃত; চোক্ষ—পরিষ্কৃত, পবিত্র শুচি, সাধু, চতুর, দক্ষ, প্রীতিকর ইত্যাদি; অভিনব অর্থ করিয়াছেন—'অচোক্ষ' স্বরূপে দুষ্ট না হইলেও মলাদি-দ্বারা উপহত। অনিষ্ট—দিবারাত্রি উপভোগের ফলে যাহার প্রতি ভোগেচ্ছা স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়াছে। পাঠান্তর—"চাহৃদ্যাপ্রশস্তাপ্রিয়াবে(পে)ক্ষানিষ্টশ্রবণ-দর্শন…" Dr. Mukherjee এই পাঠ গ্রহণ করিয়া ভাবান্তর দিয়াছেন—"**It arises from the excitants of unpleasant unlovely and disagreeable sights and the hearing vision or description of undesirable things.**"

(১৬) সর্ব্বাঙ্গ-সংহার—পিণ্ডীকরণ, গুটাইয়া আনা; "drawing in of the whole body" (M). "বিকূণন—সঙ্কোচন; অভিনব বলিয়াছেন—মুখ (অর্থাৎ—তদবয়বগুলির) সঙ্কোচন; contortion (M); a side glance, a leer (Apte)। উল্লেখন—উল্লাঘ (অভিনব); উল্লাঘ অর্থে—নীরোগ, রোগমুক্ত, চতুর, দক্ষ, পবিত্র, সুখী তুষ্ট বা কৃষ্ণবর্ণ—"উল্লাঘো নিপুণে হৃষ্টে শুচিনীরোগয়োরপি"—হৈমঃ। উল্লেখন—রেখাঙ্কিত করা, marking out by lines (Apte) অথবা বমন vomitting (Apte); এই শেষোক্ত অর্থটিই বড় ভাল লাগে; "furrowing of the face" (M). নিষ্ঠীবন—কফ-নিরসন (অভি), থুথু ফেলা। উদ্বেজন—গাত্রোদ্ধূনন (অভি); উদ্ধূনন—কম্পন, agitation (M). উদ্বেজন—উদ্বেগ অথবা গাত্রকম্পন।

(১৭) অনভিমত বস্তু দর্শন—এ স্থলে রূপের (আকৃতির) দোষ সূচিত হইতেছে। পরে, গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দের দোষও কথিত হইয়াছে। গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ এই পঞ্চ বিষয়ের দোষ থাকিলে উহারা উদ্বেগজনক হইয়া বীভৎস-রসের উৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে।

(১৮) নাসা-প্রচ্ছাদন—দুর্গন্ধবহুল বস্তুর ঘ্রাণে নাসা আচ্ছাদন করা হয়। অব্যক্ত পাদ-পতন—প্রতিঘাত-বশতঃ অব্যক্ত। অস্থি-কঙ্কাল-সমাকুল শ্মশানাদিতে সঞ্চরণকালে পাদক্ষেপ কখনও দীর্ঘ কখনও বা হ্রস্ব হইয়া থাকে—ইহাই অব্যক্ত পাদপতন (অভি)।

বৈরাগ্য লাভ করে—তদনন্তর শান্তি। নাসাবক্ত্র-বিকূণনাদি অনুভাব। আবেগ-আর্ত্তি-শঙ্কা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব (১৯)।

শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে বলিতেছেন—জুগুপ্সা-স্থায়িভাব হইতে বীভৎস উৎপন্ন হয়। নিন্দাত্মক চিত্তসঙ্কোচই জুগুপ্সা। উহার রসে পরিণাম-প্রকার দ্বিবিধ। সকল ইন্দ্রিয়ার্থের (অর্থাৎ বিষয়ের) গর্হা বা নিন্দাই জুগুপ্সা (২০)।

মোহ-অপস্মার-উন্মাদ—বিষাদ-ভয়-চাপল-আবেগ-জাড্য-দৈন্য-মতি-গ্লানি-শ্রম ও এক প্রলয় ব্যতীত স্তম্ভ প্রভৃতি সাতটি সাত্ত্বিক ভাব—এই গুলি বীভৎসের পুষ্টিকর ব্যভিচারি-ভাব। নিন্দিতাকৃতি ও নিন্দিতবেশ নিন্দিতাচার, নিন্দাবাদযুক্ত ও নিন্দিতরোগযুক্ত পিশাচাদি বীভৎসের আলম্বন বিভাব।

বীভৎসের উদ্দীপন-বিভাবগুলির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'নিন্দিত'। যে সকল ভাব অক্ষিকে সহসা নিমীলিত করাইয়া দেয় ও যাহাদিগের জন্য কোন স্পৃহা জন্মে না—সেই সকল ভাবই 'নিন্দিত' নামে খ্যাত। উহারা বীভৎস-রসের পরিপোষক (২১)। এই সকল নিন্দিত বিভাব যখন স্বযোগ্য সহকারি-ভাবগুলির সহিত অভিনয়াশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবে (জুগুপ্সাতে) অবস্থান করে, তখন প্রেক্ষক-গণের মন বুদ্ধ্যবস্থাপন্ন, অথচ সত্ত্বগুণযুক্ত (ইহাতে তখন রজস্তমো-যোগের প্রাবল্য থাকে না,) ও চিন্ময়ী অবস্থায় বর্ত্তমানে থাকে। ঐরূপ দশাগ্রস্ত অন্তঃকরণের যে বিকার, তাহাই বীভৎস-রস(২২)।—ইহা বাসুকি-মত।

নারদ-মতে—বাহ্য-বিষয়াশ্রিত মন যখন চিন্তাবস্থ ও তমঃসত্ত্বযুক্ত, তখনই তাহা হইতে বীভৎস-রসের উদ্রেক হয়। অতএব, দেখা যাই-তেছে যে, নারদ-মতে যাহা বীভৎস, বাসুকি-মতে তাহা ভয়ানক (২৩)।

বীভৎস-রস উৎপত্তির ইতিহাস পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সভায় ভরতগণ-কর্ত্তৃক শম্ভুর প্রলয়কালীন সংহারক্রিয়ার সুনিপুণ অভিনয় দর্শনে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উত্তরমুখ হইতে ভারতী বৃত্তি ও তৎসঞ্জাত বীভৎস-রসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। [এই প্রসঙ্গে (১) সংখ্যক ফুটনোট দ্রষ্টব্য]।

বীভৎসের বিভাবাদি-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, ইহাতে জুগুপ্সা স্থায়ী—জুগুপ্সাত্মক। ইহা দ্বিধা বিভক্ত—(১) ক্ষোভাত্মক ও (২) উদ্বেগাত্মক। ক্ষোভাত্মক বীভৎস রুধির-অন্ত্রাদি দর্শন ও স্পর্শনে জন্মে। আর উদ্বেগাত্মক বীভৎস কৃমি-বমন-পূতি-বিষ্ঠাদি হইতে জাত (২৪)। অ এব রুধির-অন্ত্র-কৃমি-বমনাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব। নাসাপ্রচ্ছাদনাদি অনুভাব। দ্বেষ-গ্লানি-ভয়-মোহ-ক্রোধ-নিদ্রা-ভ্রম-মতি প্রভৃতি ব্যভিচারী।

পূর্ব্বেই বলা হইল যে, বীভৎস দ্বিবিধ—(১) রুধিরাদি-ক্ষোভ-জাত ও (২) বিষ্ঠাদি-উদ্বেগ-সঞ্জাত। আবার বলা হইয়াছে যে, ভয়ানকের ন্যায় বীভৎসের ত্রিবিধ ভেদ—(১) বাচিক, (২) কায়িক ও (৩) মানস। রুধিরাদি দৃষ্ট হইলে মন চঞ্চল—ক্ষুব্ধ হয়। অতএব ক্ষোভণ বীভৎসই মানস। এই মানস বীভৎসের উদ্রেকে ভয় পায়, ম্লান হয়, বিদ্বেষ প্রকাশ করে, মুহুর্ম্মুহুঃ মোহগ্রস্ত হয় ও প্রবোধ প্রাপ্ত হয় (মূর্চ্ছা-ভঙ্গে আশ্বস্ত হয়), ক্রন্দন করে, পলায়ন করে, বিষণ্ণ হয়, নিন্দা করে, দয়া প্রকাশ করে, ভ্রমণ করে, ত্রাস পায়, তূষ্ণী (মৌন) অবলম্বন করে, গোপন করে। এই সকল কারণে ক্ষোভজ বীভৎসকে মানস বলা হয়। পক্ষান্তরে, উদ্বেগজ বীভৎস আঙ্গিক। বস্ত্রের অবকুণ্ঠন (কাপড় গুটাইয়া লওয়া), নাসাচ্ছাদন, নেত্রকুঞ্চন (সঙ্কোচন), অস্পষ্ট পাদ পতন (খুব সাবধানে অশুচি দ্রব্য বাছিয়া অনিয়মিত ভাবে পা ফেলা), বক্ত্রের অপবর্ত্তন (মুখ ফেরান), পাদাগ্রে ভর দিয়া দ্রুত গমন, মুহুর্ম্মুহুঃ নিষ্ঠীবন-ত্যাগ—উদ্বেগজ আঙ্গিক বীভৎস এইরূপে অভিনেয় (২৫)।

বীভৎসের অধিদেবতা মহাকাল। মহাকাল প্রলয়কালে রক্তাপ্লুত-দেহে বিরাজ করেন। রক্ত বীভৎসের অধিষ্ঠান বা আলম্বন। অতএব, বীভৎসের অধিষ্ঠান মহাকাল।

বীভৎসের বর্ণ নীল। কারণ, বমন-কালে যে পিত্ত উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে, তাহার বর্ণ নীল। এই কারণে বীভৎসকে নীলবর্ণ বলা হয়।

শারদাতনয়ের বীভৎস-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে মহাকবি ভবভূতির মালতীমাধব প্রকরণ হইতে শ্মশান-বর্ণনার একটি শ্লোক বীভৎসের দৃষ্টান্তরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক পিশাচ একটি শবদেহের মাংস কর্ত্তন-পূর্ব্বক

---

(১৯) "বীভৎসঃ কৃমিপূতিগন্ধিবমথুপ্রায়ৈর্জুগুপ্সৈকভূরুদ্বেগী রুধিরান্ত্রকীকসবসামাংসাদিভিঃ ক্ষোভণঃ। বৈরাগ্যাজ্জঘনস্তনাদিষু ঘৃণাশুদ্ধোঽনুভাবৈর্বৃতো নাসাবক্ত্রবিকূণনাদিভিরিহাবেগার্ত্তিশঙ্কাদয়ঃ॥" অত্যন্তাহৃদ্যৈঃ কৃমিপূতিগন্ধিপ্রায়বিভাবৈকভূতো জুগুপ্সাস্থায়িভাব-পরিপোষণলক্ষণ উদ্বেগী বীভৎসঃ।···রুধিরান্ত্রবসামাংসাদিবিভাবঃ ক্ষোভণো বীভৎসঃ।···রম্যেষ্বপি রমণীজঘনস্তনাদিষু বৈরাগ্যাদ্ ঘৃণা শুদ্ধো বীভৎসঃ।···ন চায়ং শান্ত এব বিরক্তো যতো বীভৎসমানো বিরজ্যতে"।—দশরূপকাবলোক (৪।৭৩)।

(২০) "নিন্দাত্মা চিত্তসঙ্কোচো জুগুপ্সেত্যভিধীয়তে। দ্বিধা বিভজ্যতে সাপি পরিণামে রসাত্মনা"॥—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৩৫। "সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থগর্হৈব জুগুপ্সেত্যভিধীয়তে"—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৩৬।

(২১) ······বীভৎসস্য চ নিন্দিতাঃ।···অক্ষীণি দ্রাঙ্ নিমীলন্তি যেভ্যো ন স্পৃহয়ন্তি চ। তে ভাবা নিন্দিতাখ্যাঃ স্যুর্বীভৎসোল্লাস-কারকাঃ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৪-৫।

(২২) "নিন্দিতা যে বিভাবাঃ স্যুঃ স্বৈতরৈঃ সহকারিভিঃ। যদা স্থায়িনি বর্ত্তন্তে তৈস্তৈরভিনয়ৈঃ সহ। তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং বুদ্ধ্যবস্থমসত্ত্বযুক্। চিন্ময়ী চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। স বীভৎসরসাখ্যাং তু লভতে রস্যতে চ তৈঃ"॥—ভাবপ্রঃ, ২য় অধি, পৃঃ, ৪৫। বুদ্ধ্যবস্থা—নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি 'বুদ্ধি'।

(২৩) "চিন্তাবস্থা তু মনসো বাহ্যার্থালম্বনাত্মনঃ। তমঃসত্ত্ব-যুতাজ্জাতো বীভৎস ইতি কথ্যতে"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭-৪৮। এই প্রসঙ্গে (৬) ও (৭) সংখ্যক ফুটনোট আলোচনীয়।

(২৪) "বীভৎসঃ স্যাজ্জুগুপ্সাত্মা ক্ষোভোদ্বেগবিভাগভাক্। ক্ষোভাত্মা রুধিরান্ত্রাদিদর্শনস্পর্শনাদিজঃ। উদ্বেগাত্মা কৃমিচ্ছর্দ্দিপূতিবিষ্ঠাদিজো ভবেৎ"।—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৩।

(২৫) "রুধিরাদিষু দৃষ্টেষু মনঃ ক্ষুভ্যতি চঞ্চলম্। অতো হি মানসঃ সদ্ভির্বীভৎসঃ ক্ষোভণঃ স্মৃতঃ। যত্ততো মানসঃ ক্ষোভজন্মা বীভৎস উচ্যতে। উদ্বেগজো যো বীভৎসঃ স ত্বাঙ্গিক উদাহৃতঃ"॥ ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৭।

ভোজন করিতেছে—ইহাই শ্লোকটির মূল বর্ণনীয় বিষয়। নাগোজী উদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—এ স্থলে পিশাচ অথবা শবদেহ—এই দুইটির যে কোনটিকে আলম্বন বলা যায়। তাহার মাংস কর্ত্তন ও ভোজন উদ্দীপন। দ্রষ্টার নাসা-কুঞ্চন, বদন-বিধুনন, নিষ্ঠীবন-ত্যাগ প্রভৃতি অনুভাব। উদ্বেগাদি সঞ্চারী।

গোবিন্দ ঠক্কুর টীকায় (প্রদীপে) বলিয়াছেন—বিষয়সমূহের দোষাধিক্য-দর্শনে গর্হণাই (অর্থাৎ—নাসাবদন-সঙ্কোচাদি-জনক চিত্তবৃত্তিবিশেষই) জুগুপ্সা। তৎপ্রকৃতিক বীভৎস (২৬)।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নাট্যদর্পণে বলিয়াছেন—জুগুপ্সনীয় রূপাদি দর্শন, পরশ্লাঘা শ্রবণ প্রভৃতি হইতে সমুদ্ভূত বীভৎস-রস। নিষ্ঠেব-উদ্বেগ-নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা ইহা অভিনেয়।

জুগুপ্সনীয় রূপ—মালিন্য-দুর্গন্ধিত্ব-কর্কশত্বাদি হেতু অমনোজ্ঞ রূপ। 'রূপ' বলিতে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—এই পঞ্চ বিষয়ই বুঝিতে হইবে। পরশ্লাঘা—'পর' অর্থে বিপক্ষ; তাহার 'শ্লাঘা' বা স্তুতি। শত্রুর স্তুতিতে বিশেষরূপে জুগুপ্সার উদ্রেক হইয়া থাকে। উক্ত বিভাবগুলি দৃষ্ট বা শ্রুত হইলে তাহা হইতে জুগুপ্সা-স্থায়ী বীভৎস-রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্ঠেব—কফ নিরসন। উদ্বেগ—গাত্রধূনন। নিন্দা—দোষোদ্‌ঘটন। এই তিনটি হইতে গাত্র সঙ্কোচন-মুখবিকূণন-নাসা-কর্ণ-প্রচ্ছাদন-হৃল্লেখ প্রভৃতি অনুভাবও সূচিত হইতেছে। ব্যাধি-মোহ-অপস্মার-আবেগ-মরণাদি উহার ব্যভিচারী।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণব-সুধাকরে বলিয়াছেন—জুগুপ্সা স্থায়ী ভাব স্বযোগ্য বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব-সংযোগে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া বীভৎস-রসে পরিণত হইয়া থাকে। গ্লানি-শ্রম-উন্মাদ-মোহ-অপস্মার-দীনতা-বিষাদ-চাপল-আবেগ-জাড্য প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। স্বেদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ও নাসা-প্রচ্ছাদনাদি ইহার বিকার বা অনুভাব।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে নূতন কথা কিছুই নাই। জুগুপ্সা যাহার স্থায়িভাব সেই বীভৎস বীর-সংশ্রিত (২৭)। বিকৃত উৎপূতি মাংসভক্ষক (রাক্ষস-পিশাচাদির) দর্শন-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ও দুর্গন্ধাদি-বিশিষ্ট বস্তুরূপ বিভাব হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ-সঙ্কোচ-নিষ্ঠীবন-ত্যাগ-আস্য-বিকূঞ্চন-নাসা-প্রচ্ছাদন-অব্যক্ত-পাদপাত-অক্ষিকূণন-হৃল্লেখ-উদ্বেজন প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহা অভিনেয়। অপস্মার-মোহ-মরণ-ব্যাধি-আবেগ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী ভাব।

বীভৎস-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইল।

অতঃপর অদ্ভুত-রস। বীররসে যাহা প্রথমে আক্ষিপ্ত (অর্থাৎ সূচিত—উপক্ষিপ্ত) হইয়াছে, তাহারই চরম পরিণাম অদ্ভুত। বীর-রস বীজ, অদ্ভুত ফল। এই কারণে বলা হইয়াছে—সর্ব্বশেষে অদ্ভুত-রসের স্থান। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল (২৮)।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২৬) "জুগুপ্সা গর্হণার্থানাং দোষমাহাত্ম্যদর্শনাৎ। তৎপ্রকৃতিকো বীভৎসঃ"।—প্রদীপ। "দোষমাহাত্ম্যম্। দোষাধিক্যম্। গর্হণা। নাসাবদনসঙ্কোচাদিজনকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ"।—উদ্দ্যোত।

(২৭) "জুগুপ্সাস্থায়িভাবো যো বীভৎসো বীরসংশ্রয়ঃ"। সাগরনন্দী, নাটকলক্ষণরত্নকোষ (পৃঃ ১১৪১)। হৃল্লেখ—হৃদয়ের ব্যথা, হৃৎপীড়া, heart-ache (Apte). উদ্বেজন—উদ্বেগ, গাত্রকম্প।

(২৮) "যদ্বীরেণাক্ষিপ্তং বীরস্য পর্য্যন্তেঽদ্ভুতঃ ফলমিত্যনন্তরং তদুপাদানং, তথা চ বক্ষ্যতে 'পর্য্যন্তে কর্ত্তব্যো নিত্যং রসোঽদ্ভুত' ইতি"—অভিনবভারতী, নাট্যশাস্ত্র, বরোদা সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯১। "'সর্ব্বত্রান্তেঽদ্ভুত' ইত্যুক্তম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩০।

কাল-বৈশাখী

উড়াইয়া জটা কাল-বৈশাখী
আসিতেছে মহাকাল!
ডমরু বাজিছে, চারি দিকে তাই
মৃত্যুর কঙ্কাল।
রুদ্রাণী নাচে তাথৈ তাথৈ;
বরাভয় ক'রে ডাকিছে মাভৈঃ;
অট্ট-অট্ট খল-খল হাসি
জ্বলিছে অনল-জাল;
ঐ আসিতেছে কাল-বৈশাখী
মৃত্যুর মহাকাল!

শ্যামের অধরে মুরলী বাজে না—
আজি সে চক্রধারী!
দুন্দুভি বাজে মহা-প্রলয়ের
গাণ্ডীব টঙ্কারি!
চারি দিকে শুধু জ্বলিছে অনল,
বজ্র-নিনাদে ধরা টলমল!
বাঁশী ছেড়ে তাই প্রলয়ের অসি
ধরিয়াছে শ্রীমুরারি!
প্রলয়ের বেশে কাল-বৈশাখী
রুদ্র অনল তারি।

গৌরী মায়ের কণ্ঠে কেমন
দুলিছে মুণ্ডমালা!
ত্রিনয়নে জ্বলে ধ্বক্-ধ্বক্-ধ্বক্
আগুনের শিখা-জ্বালা!
নয়নেতে নাই স্নেহ-নির্ঝর;
বহিতেছে মহা-প্রলয়ের ঝড়;
সম্বর মা গো মূরতি ভীষণ
নেত্রে বহ্নি ঢালা!
সৃষ্টির সুখে উঠুক নাচিয়া
কিশোর নন্দলালা!

শ্রীনকুলেশ্বর পাল (বি, এল)।

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

৪

নামের শ্লিপ পাঠাইবার অনেকক্ষণ পরে মিষ্টার গোস্বামীর ঘরে রমেশের ডাক পড়িল।

সুবৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবলের উপর রাশীকৃত কাগজ-পত্র ভাঁজে-ভাঁজে রক্ষিত—কতকগুলা খোলা ; পাশে ঘোরা-শেলফে মোটা-মোটা আইনের বই। মিষ্টার গোস্বামী নিবিষ্ট মনে মকর্দ্দমার ব্রীফ্ পড়িতেছিলেন। ব্রীফে এমন তন্ময় যে ডান হাতের কাছেই পাইপ পড়িয়া আছে, তুলিবার খেয়াল নাই!

রমেশ ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার নূতন জুতার মস্-মস্ শব্দে ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, রমেশের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই! বোধ হয় জানেন না, জুতার এ-আওয়াজ ফ্যাশন-দুরস্ত নয়! তাই কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া মিষ্টার গোস্বামীর টেবলের অপর প্রান্তে চেয়ার টানিয়া রমেশ তাহাতে বসিলেন।

মিষ্টার গোস্বামী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, "আপনি কি চান?" 'আপনি' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টাইপ-করা ব্রীফের কাগজগুলার উপর চশমা-পরা চক্ষু-যুগলের দৃষ্টি আবার আঁটিয়া গেল।

রমেশ একটু থতমত খাইলেন। এমন সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া—তাঁহার পক্ষে কেমন কঠিন হইল! এ ধরণের প্রশ্নের জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই মনের মধ্যে যা কিছু গড়িয়া-পিটিয়া উৎফুল্ল চিত্তে এ ঘরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, বাতাসের মুখে এলো-সূতার মত জট পাকাইয়া সে-সবের খেই হারাইলেন।

এক দিন যাহার সঙ্গে গভীর ভালোবাসা থাকে—কিশোর-চিত্তের অমল ভালোবাসা, স্বার্থ-কলুষহীন নিবিড় প্রীতি—দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সময়-স্রোতের ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে অকস্মাৎ কোথায় যে তাহা মাটী চাপা পড়িয়া সমাহিত হয়, তাহার উপর নূতন নূতন কত সৌধ গড়িয়া ওঠে, তাহার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকে না! কিন্তু সেই ধ্বংস-স্তূপ যদি ভূগর্ভের আশ্রয় হইতে মাথা তুলিয়া অকস্মাৎ নিজের দাবী জানায়, তখন সে মস্ত হেঁয়ালি হইয়া ওঠে!

সত্যপ্রসাদের মুখ দিয়া এমন প্রশ্ন বাহির হইবে, রমেশের তাহা কল্পনার অতীত ছিল! কিন্তু ইহা লইয়া দোষারোপ করিতে গেলে অবিচার করা হয়। সমসাময়িকদের মধ্য হইতে যে উঁচু হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, চারি পাশের দৃষ্টি গিয়া নিবদ্ধ হয় সেই উন্নত শিরে। কিন্তু তাহাদের পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত কচিৎ-দৃষ্ট মুখগুলাকে চলার পথে সব সময়ে মনে থাকে না। কালের ধর্ম্মই বিশিষ্টকে বুকে ধারণ করিয়া রাখা—তথাপি মনস্তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণের দিক্‌টা কেহ সহজে মাড়ায় না। তাই মানুষ প্রথমেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, এটা দাম্ভিকার তাচ্ছল্য!

কুণ্ঠিত স্বরে রমেশ কহিলেন, "আমি হরিপাল থেকে আসছি।"

"হরিপাল! ও! হুঁ, জানা জায়গা বটে! তা আপনি কি করেন?" কথাগুলা অবশ্য গোস্বামী-সাহেব মুখ না তুলিয়াই কহিলেন।

মুখ নীচু করিয়া রমেশ উত্তর দিল, "ওখানকার স্কুলের আমি হেড মাষ্টার।"

আবার সেই নীরবতা। মিষ্টার গোস্বামী কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। সে জমাট-কঠিন স্তব্ধতা রমেশের আত্মমর্য্যাদার উপর যেন রূঢ় আঘাতের মত ভয়ঙ্কর হইয়া বাজিল! নিজেকে এমন ছোট করিয়া ফেলিবার কি প্রয়োজন তাঁহার ছিল? এ দুর্ম্মতি তাঁহার কেন হইল! যে-মানুষ তাঁহাকে এমন করিয়া ভুলিয়া গিয়াছে, বন্ধু বলিয়া সেই ধন-মর্য্যাদাশীল ব্যক্তির পরিচয় ধরিয়া কেন তিনি নিজের সম্ভ্রম-বুদ্ধির অমন প্রয়াস পাইলেন? নিজের কাছেও হাস্যাস্পদ হইলেন। কঠিন ধিক্কারে দুঃসহ আত্মগ্লানিতে রমেশের আহত অন্তর বেদনায় টন্-টন্ করিয়া উঠিল।

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন কহিলেন, "আমি তা হলে আসি।"

কাগজের উপর তেমনি দৃষ্টি রাখিয়াই গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—"কৈ, প্রয়োজনের কথা, দেখা করার উদ্দেশ্য—কিছুই তো বললেন না আপনি!"

রমেশ বুঝিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে! সাক্ষাতের কৈফিয়ৎ একটা দিতে হয়! ব্যারিষ্টার-সাহেবরা দামী সময় অযথা ব্যয় করেন না!

পরিত্যক্ত আসনে রমেশ আবার বসিলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর কহিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, আপনি আমাকে চিন্‌তে পারবেন!"

"চিন্‌তে পারবো!" মিষ্টার গোস্বামী তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া বিস্মিত চোখের সন্ধানী দৃষ্টিতে রমেশের পানে মুহূর্ত্ত-কাল চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। পরিচয় বলুন তো!"

তীব্রতর অপমানে রমেশের কর্ণমূল হইতে ললাট পর্য্যন্ত জ্বলন্ত লোহার মত আরক্ত হইয়া উঠিল!

গম্ভীর কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "মাপ করবেন, এসে আপনাকে ডিস্টার্ব করলুম!"

গোস্বামী-সাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তা হোক, কিন্তু আপনি যে বললেন, চিন্‌তে পারবেন! পরিচয় দিন তো!"

রমেশের মুখ দিয়া ফশ্ করিয়া কথা বাহির হইল। "আমার মনে হয়, সে কথা আর উত্থাপন না করাই ভালো।"

মিষ্টার গোস্বামী সবিস্ময়ে কহিলেন, "সে কি! অথচ এসে অনেকক্ষণ বসে আছেন! দেখা করতে আসার প্রয়োজন বলুন।"

রমেশের মনে যেন আগুনের জ্বালা! তিনি বলিলেন, "এই অপেক্ষা করা ভুল হয়েছিল। চলে যাওয়াই আমার উচিত ছিল।" রমেশ থামিলেন। ইচ্ছা করিয়া না হইলেও আত্মসম্ভ্রমের ক্ষুণ্ণতা অজ্ঞাতে কণ্ঠকে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কণ্ঠের এ বিকৃত সুর নিজের কাণে বিশ্রী লাগিল! নিক্ষিপ্ত শরকে ফিরানো যায় না। তাই যত দূর সাধ্য, কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া রমেশ কহিলেন, "নমস্কার, তবে আসি।" কথাটা বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিষ্টার গোস্বামী বিস্ময়ে অবাক্! জীবনে অনেক রকমের মানুষ দেখিয়াছেন! ভাবিলেন, হয়তো কোনো প্রত্যাশা লইয়া ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন! তার পর প্রত্যাশার কথা বলিতে বোধ হয় দ্বিধা জাগিয়াছে! কিন্তু হরিপালের নাম করিলেন! তাঁহার বাল্যকালের শত স্মৃতি-ঘেরা হরিপাল!

তাই তিনি বলিলেন, "আপনি হরিপালের কথা বলছিলেন যে !"

রমেশের মনে হইল, একটা তীব্র শ্লেষে গোস্বামীকে বিঁধিবেন। তিনি বলিলেন, "হরিপালের কথা মনে আছে ?"

মিষ্টার গোস্বামী বলিলেন, "বিলক্ষণ ! সেখানে আমার মামার বাড়ী। কত বার সেখানে গেছি—তখন অবশ্য মা বেঁচে ছিলেন। ছোট-বেলার কথা।"

রমেশের মুখে যেন মুক্ত বাতায়ন-পথের আলো আসিয়া পড়িল ! ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া তিনি কহিলেন, "হরিপালে একটা মস্ত পোড়ো বাড়ীর কথা আপনার মনে আছে ? কবিরাজদের বাড়ী ?"

প্রসন্ন হাস্যে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "নিশ্চয় আছে। আচ্ছা, প্রমাণ দিচ্ছি ! একটি বউ সেখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। আহা, বউটি ভারী ভালো ছিল,—কত কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা আম খেতে দিত আমাদের।"

"রমেশের মনের মেঘ লঘু হইয়া স্বচ্ছ হইল। তিনি কহিলেন, "আর সেই বাড়ীর পাশের মাঠে বকুল গাছ—কোকিলের ছানা ?"

ছেলে-বেলাকার স্মৃতির দোলায় ব্যারিষ্টার-সাহেবের গম্ভীর মুখ হাসির জ্যোৎস্নায় যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"নিশ্চয় মনে আছে। আচ্ছা, আপনি হরিপালে থাকেন, সেই বকুল গাছটার খবর কিছু জানেন ?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন, "সে বছর পুরী গেছলুম। সেখানে একটা মঠ আছে। সে মঠে বকুল গাছ দেখিয়ে সেখানকার পাণ্ডারা বললে, এইখানে বসে মহাপ্রভু মালা জপ করতেন, প্রণাম করুন। পাণ্ডার কথায় প্রণামী-সমেত প্রণামটা বকুল গাছকে নিবেদন করলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল হরিপালে আমাদের বকুল গাছের তলায় আড্ডার কথা।"

পূর্ণিমার চাঁদের উপর হইতে খণ্ড মেঘ সরিয়া দশ দিক্ যেন আলোর প্লাবনে ভরিয়া গেল !

রমেশের ম্লান মুখ নিমেষে দীপ্ত হইয়া উঠিল। উল্লসিত অন্তরে তিনি কহিলেন, "গাছটার সঙ্গে আপনার আর কিছু মনে পড়ছে না ?" ঔৎসুক্যভরা দুই চোখের দৃষ্টি ব্যারিষ্টার-সাহেবের গুম্ফহীন মুখের উপর রমেশ মেলিয়া ধরিলেন।

গোস্বামী-সাহেব হাসিলেন। ঝর্ণার জলে সূর্য্য-কিরণ লাগিয়া যেমন দ্যুতি বিকিরণ করে, তেমনি অনাবিল আনন্দ-দীপ্তিতে তাঁহার মুখ ঝলমল করিয়া উঠিল। বলিলেন, "নিশ্চয় পড়ছে ! কত কথা।" বলিয়া তিনি একটু থামিলেন। বোধ করি, এই নীরবতার মধ্য দিয়া স্মৃতির গহনে চকিতের জন্য এক বার চাহিয়া লইলেন। সেখানকার বিস্মৃত, অবিস্মৃত, মলিন, দীপ্ত ছোট-বড় সংখ্যাতীত ছবি !

বলিলেন, "আচ্ছা এক জনের খবর দিতে পারেন ? তার নাম বল্টু ! ভালো নামটা মনে পড়ছে না ! তার সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। মামার বাড়ীর দেশে সে ছিল আমার প্রধান সঙ্গী। যেমন চমৎকার গান গাইত, তেমনি নাচতো ! যাত্রার দলে রাণী সাজতো। কি চমৎকার ! সে ছিল আমার আদর্শ ! আপনি চেনেন তাঁকে ?"

ঈষৎ হাসিয়া রমেশ কহিল, "চিনি"।

"ও ! এবার বুঝেছি। সে আপনাকে পাঠিয়েছে ? হ্যাঁ, তা সে এখন কি করছে ?"

"ইস্কুলের হেড-মাষ্টারী।" রমেশের চোখে-মুখে হাসির বিদ্যুৎ-রশ্মি !

মিষ্টার গোস্বামী কহিলেন, "আপনি—মানে, তুমিই বল্টু ! আ রে ! চেনার জো কি, বলো ! এমন দাড়ি-গোঁফের সখ হলো কোথা থেকে ? সে দুধে-আলতা রং তামা মেরে গেছে !"

আনন্দের হাসিতে বল্টুর ওষ্ঠাধর ভরিয়া উঠিল। কৈশোরের বন্ধুকে গোস্বামী-সাহেব অবহেলা করেন নাই ! এই উপলব্ধিই রাত্রি-শেষে আকাশের রাঙা ঊষার মত মনের সব অভিমান-কুণ্ঠা-উষ্মাকে ধুইয়া অন্তরকে স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল করিয়া দিল।

৫

রমেশের দিকে চেয়ার ঘুরাইয়া গোস্বামী-সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন। কহিলেন, "তার পর বল্টু, হঠাৎ এত দিন পরে আবির্ভাব ! আচ্ছা, আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল কবে ? তখন বোধ হয় আমি ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠেছি—বয়স আমার চৌদ্দ,—সেই ফিরে এসেই মা মারা গেলেন।" গোস্বামী-সাহেবের মুখে বেদনার ছায়া পড়িল।

প্রশান্ত স্বরে রমেশ কহিলেন, "আমার বয়স তখন পনেরো, মনে আছে, আমি এণ্ট্রান্সে স্কলার্সিপ পেয়েছি ! তোমার মামাবাবু তোমার কাছে কত সুখ্যাতি করলেন ! তার পর সেই বকুল-তলাতে নাচ শেখা ! তুমি পারতে না ! সুরেন অধিকারী—"

গোস্বামী-সাহেব সবেগে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "খুব মনে আছে। ছেলেমেয়েরা এখন সব নাচ শিখছে। মিসেস্ গোস্বামী 'নৃত্যশালা' স্কুল খুলেছেন—নাচে তাঁর ভারি ঝোঁক ! কিন্তু আমি তো দেখি শুনি,—মনে মনে হাসি। সে কালের কথা ভাবি। এক দিন তোমার সঙ্গে নাচছিলুম, মা এসে পড়লেন। উঃ, কি বকুনী ! সে কি দুর্গতি ! শেষে মার অবধি খেলুম। আচ্ছা বল্ট সেই সুরেশ, না, সুরেন অধিকারী,—তার যাত্রার দল আছে তো ? মিত্তির-পাড়ার সেই আখড়া ?"

"না ! সে সব কোথায় ভেঙ্গে-চুরে নিঃশেষ হয়ে গেছে খুঁজলে এখন তার কঙ্কালও পাবে না ভাই ! সেই হরিপদ গাঙ্গুলী—সে এখন কোথায় একটা গানের ইস্কুলে বুঝি চাকরী নিয়েছে। দেশের পাট মুছে দেছে। সে সুরেন অধিকারীও মরেছে। তার দলবলও শেষ !" রমেশের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইল। রমেশ কহিলেন,—"আর ভাই, দেশের লোক এখন খেতে পায় না ! দু'বেলা দু'টো অন্নের সংস্থান করবে, না, আমোদ-প্রমোদ করবে ?"

"তা সত্যি !" বলিয়া গোস্বামী-সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। এবং এই স্বল্প নীরবতার ফাঁক পাইয়া মনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল ক্ষণেকের জন্য অসংখ্য স্মৃতি। সে-সব স্মৃতির কোন রেখা মস্তিষ্কের কোন কোণে আঁকা আছে কি না, ব্যারিষ্টার সাহেবের মনে সংশয় ছিল।

তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, বিমনা ভাব লক্ষ্য করিয়া রমেশ কহিলেন, "ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, দুর্ভিক্ষ—বছর-বছর একটা-না-একটা—সেকালের বর্গীর আক্রমণের চেয়েও দুর্দ্দান্ত হয়ে মানুষকে নাস্তানাবুদ করছে। এদের তাড়াবার কোন রাস্তাই খোলা নেই। এই আমি একটা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার—কত ছেলে আমার হাত দিয়ে পার হচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কীর্ত্তিমান্ না হয়েছে, এমন নয়। এক জন শুনেছি, মস্ত বৈজ্ঞানিক। সাগর-পার পর্য্যন্ত খ্যাতি

ছড়িয়ে এসেছে। কিন্তু দেশকে এরা বর্জ্জন করেছে। সাত পুরুষের বাস্তু-ভিটা সংস্কারের অভাবে পড়ে ভূমিসাৎ হচ্ছে। শোবার ঘরে বট-অশথের জঙ্গল। কে দেখবে? সে ছাতি কোথা? সে ছাতি কার আছে? এমনি করেই আমরা আমাদের শ্রী-সম্পদ্ হারাচ্ছি!"

ঈষৎ শুষ্ক হাস্যে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তোমার অভিযোগ মিথ্যে নয় বল্টু! কিন্তু দোষী কি এক-পক্ষই? গ্রাম কি এখনো সে গোঁড়ামি ত্যাগ করেছে? সেই যে অজরামর অচলায়তন, তার সংস্কার কে? বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে তার সঙ্গে হাতাহাতি না করে কেউ যদি চলে আসে, সে তো সনাতনকে সম্মান দিয়েই এসেছে!"

অল্প উত্তেজিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন, "তোমার কথা অযথার্থ না হলেও যুক্তি বলে নানা চলে না। আপনার জন মন্দ বলেই পরিত্যাজ্য হবে, এ যে ঘোর স্বার্থপরের কথা! আমি যাদের মধ্য দিয়ে এসেছি, আমার বড় হবার মূলে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে যেমন করে যে ভাবেই হোক না কেন, তাদের অল্প-বিস্তর চেষ্টা বা সাহায্য ছিল তো! সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে নিজেকে কেউ গড়ে তুলতে পাবে না। অনুকূল কোথাও কিছু ছিল বই কি! ভালো বীজ হলেও সার-মাটা না পেলে জল না পেলে খোরাক সে পাবে কোথা বাচবার জন্য? বিচার তার পরে—কিন্তু থাক্, তোমার অনেকখানি সময় নষ্ট করছি!"

গোস্বামী সাহেব ঘড়ির দিকে চাহিলেন। মৃদু হাস্যে কহিলেন, "আর এক দিন এ সব আলোচনা হবে। এখন তোমার কাজের কথা বলো!" বলিয়াই তিনি কহিলেন, "সুরেন অধিকারীর কথা থেকে আর একটা কথা মনে পড়ছে।"

রমেশ কহিলেন, "কি কথা?"

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "আজকাল এখানে একটা কীর্ত্তনের রেওয়াজ উঠেছে! যেন মহাপ্রভুর রিফর্ম যুগ! বড় বড় ঘরে খোলের আওয়াজ হচ্ছে! কিন্তু সে বছর ম্যাসেম্ব্লির ফেরৎ দিল্লী থেকে বৃন্দাবনে গেছলুম। সুরেন অধিকারীর "মাথুর" পালা আমার মনে ছিল। হ্যাঁ, গান শুনলুম বটে সাধকের কণ্ঠে! সে সুর দেহকেই শুধু রোমাঞ্চিত করে তোলেনি—মনে হচ্ছিল, অধ্যাত্ম-রাজ্যের এক সূক্ষ্ম অনুভূতি-লোকে নিঃশব্দে যেন টেনে নিয়ে চলেছে! সেই যে কবি বলেছেন, 'সুরের হাওয়ায় জগৎ গেল ছেয়ে'—তা যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি হলো!"

রমেশের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। হাসিয়া তিনি কহিলেন, "রক্তের ধারায় যে বীজ রয়েছে, তুমি তা তাড়াবে কি করে? অনুকূল আবহাওয়া পেলেই সে সবল হয়ে মাথা চাড়া দেয়। তোমার দিদিমা, দাদামশাই তো শেষ জীবনটা শ্রীবৃন্দাবনেই কাটিয়ে গেছেন।"

মাথা নাড়িয়া গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "যা বলেছো। আজ অনেক দিন পরে সেই পুরানো দিনগুলোকে যেন দেখতে পাচ্ছি। দিদিমা ঠাকুর-ঘরে তাঁর গোপাল-গোপীবল্লভকে প্রণাম কচ্ছেন! ওই পাথরের ঠাকুরকে প্রণাম করে কি আনন্দই তিনি পেতেন! আবস্ত গোপাল আমি লুব্ধ নেত্রে সেই পাথরের রেকাবীর মাখন-সন্দেশগুলোর দিকে চেয়ে আছি! দিদিমাকে খুশী করতে পাথরের মেঝেয় দুম্-দুম্ করে মাথা ঠুকে প্রণাম কচ্ছি! যাক, অনেকখানি সময় ধরে রাখলুম বাজে কথায়! এবারে বলো—"

"বলি" বলিয়া রমেশ থামিলেন।

সত্যপ্রসাদ রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন। স্নিগ্ধ হাস্যে কহিলেন, "কি এত ভাবছিস্ বল্টু, আমি সেই সত্য রে—কোকিলের বাচ্ছার জন্য তোর কম খোসামোদ করেছি! ইস্কুলের টীমে নাম-করা ফুটবল-প্লেয়ার, অথচ গাছে চড়তে জানতুম না!"

রমেশ দীপ্ত-মুখে কহিলেন, "সেই সব ভেবেই তো আগে এখানে এলুম। মেয়েটাকে কলেজে দিলুম কি না!"

বিস্মিত কণ্ঠে গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তোর মেয়ে?"

"হ্যাঁ। রত্না। কুড়ি টাকা করে স্কলারশিপ পেয়েছে। সারা জীবন শুধু পরের ছেলেই পিটে পিটে পড়িয়ে এলুম! একটা সাধ তো!" রমেশের কণ্ঠে যেন জবাবদিহির সুর!

গোস্বামী-সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "ভেরী গুড গার্ল! কুড়ি টাকা! বলিস্ কি বল্টু! আমার ছেলেদের সকলে ভালো বলে—তারাও যে পায়নি—শুধু ঐ ফার্স্ট ডিভিসন আর লেটার! বেশ করেছিস্ কলেজে দিয়ে!"

কন্যা-গর্ব্বে রমেশের বুকখানা ভাদ্রের নদীর মত স্ফীত হইয়া উঠিল। রমেশ কহিলেন, "হোষ্টেলে রাখলুম। কিন্তু আমার তো আসবার বড় একটা সুবিধা হবে না! এখানকার অভিভাবক বলে তোমার নামটা দিলুম! ওকে একা রেখে যাচ্ছি। মনটা—মানে, কখনো তো—"

সব কথা রমেশ বলিতে পারিলেন না। গোস্বামী-সাহেব কথার মাঝখানেই খুশী কণ্ঠে বলিলেন, "ড্যাট্স্ রাইট! খোঁজ-তল্লাস নেবো বই কি—নিশ্চয় নেবো। মিসেস্ গোস্বামীকেও বলে দেবো। এখন তিনি বাড়ী নেই। না হলে তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতুম।"

রমেশ উত্তর করিলেন, "অন্য সময় হবে'খন। রত্না চমৎকার গান গায়। তার গান মিসেস্ গোস্বামীর নিশ্চয় ভালো লাগবে।"

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তাই না কি? মিসেস্ গোস্বামী তো তা হলে লুফে নেবেন। হ্যাঁ বল্টু, একটা কথা"—বলিয়া তিনি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার এক ছেলে ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে এসেছে! একটি ব্যারিষ্টার। পরিচয় দিয়ে রাখলুম। বাল্যবন্ধু, অথচ ছেলে-মেয়েদের পরিচয় আমরা জানি না, লজ্জার কথা!"

রমেশ হাসিলেন, "নিশ্চয়।"

৬

উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যে ইন্দ্রপুরীর কথা রত্না পড়িত, ভোজবাজির মত তাহাই যেন অকস্মাৎ চোখের উপর সুপরিস্ফুট হইয়া তাহাকে একেবারে দিশাহারা বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে!

আড়ম্বরহীন সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্তা আঠারো বছরের এই তরুণীর কাছে গোস্বামি-ভবনের ঐশ্বর্য্য-বিভব শুধু কুবের-সম্পদ্ বলিয়াই মনে হয় নাই, ইহার মোহ দুর্বার শক্তিতে অনুক্ষণ তাহাকে টানিতেছে! রত্নার মনে হয়, মানব-জীবনের সকল সার্থকতা সব আনন্দ যেন সেখানে নিবিড় হইয়া আছে!

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রত্না দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। ইহার মধ্যে অনেক বার সে গোস্বামি-ভবনে যাতায়াত করিয়াছে। প্রথম ক্ষেপে গোস্বামী সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছিলেন; তার পর তিনি আসিতেন না, বার-কয়েক মিসেস্

গোস্বামী আসিয়াছিলেন। এখন রত্নাকে গোস্বামি-গৃহে লইয়া যাইবার ভার পড়িয়াছে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্যারিষ্টার অনিল গোস্বামীর উপর।

মুসলমানদের পর্ব্ব উপলক্ষে কলেজ ক'দিন বন্ধ থাকিবে! সেদিন শনিবার! রত্না উৎসুক চিত্তে প্রত্যাশিত নেত্রে গোস্বামি-ভবনের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কল্পনা চাটার্জ্জি আসিয়া রত্নার পাশে দাঁড়াইল। ইচ্ছা করিয়াই সে রত্নার সন্ধানে আসিয়াছিল। রত্নার তন্ময় মূর্ত্তির পানে চাহিয়া ব্যঙ্গের প্রলোভন সে সম্বরণ করিতে পারিল না, কহিল, "এই যে, ব্রজবিলাসিনী রাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্!"

রত্না চমকিত হইল। কাঁচুমাচু মুখে অপ্রতিভ কণ্ঠে রত্না কহিল, "কি রকমের ঠাট্টা কল্পনা!"

হাসিয়া কল্পনা কহিল, "এ ঠাট্টা নয়! সত্যি কথা বলছি। গোঁসাই-সাহেবের বাড়ী তোর কাছে যেন বৈকুণ্ঠ-পুরী!"

"কেন? আমি কি করেছি?" রত্নার স্বর আহতের মত!

"কি না করেছিস, সেইটেই বরং বল্ রত্না! আমি একা নই,—হোষ্টেলের সব মেয়েরাই এই কথা বলে।"

রত্নার বিস্ময় এবার রোষে পরিণত হইল। গায়ে পড়িয়া কল্পনার বন্ধুত্ব করার মাঝে প্রচ্ছন্ন টিট্‌কারী থাকে—রত্না তাহা জানে বলিয়াই কল্পনাকে সে সর্ব্বদা এড়াইয়া চলে! কিন্তু দুষ্ট গ্রহের প্রভাব যেমন নানা উপায়ে ক্ষীণ করা গেলেও মুছিয়া ফেলা যায় না, রত্নার নিরীহতার মর্ম্মভেদ করিয়াও কল্পনার বিদ্রূপগুলা তেমনি তাহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে!

বিরক্ত কণ্ঠে রত্না কহিল, "তাঁদের ধন্যবাদ! আমার জন্য এতখানি ব্যাকুল! আমি যাই আমার আপনার লোকের বাড়ী—"

"তা যা না,—কে তোকে বারণ করছে? আর বারণ করলে তুই শুনবিই বা কেন? ঝর্ণা কিছু মন্দ বলেনি!"

ঝাঁজিয়া রত্না উত্তর দিল, "তার ভালো কথা শোনবার আমার কোনো দরকার নেই।"

"ইস্, একেবারে মেশিন গান্! তা তোর গোঁসাই-বাড়ী তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না! এত মার-মুখী কেন! কর্‌গে যা না যাই সেখানে তোর রাস-বিলাস!"

লজ্জায় রত্নার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। ঈষৎ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে কহিল, "আমি বুঝি। আমার হিংসেয় সকলে—"

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নীহার আসিয়া উপস্থিত হইল, কহিল, "তোদের কিসের ঝগড়া হচ্ছে?"

মুখ বাঁকাইয়া কল্পনা কহিল, "ঝগড়া নয়, ভাই! আমরা তো অমন আ-দেখ্‌লা নই যে কিছু দেখলেই ভীরমি যাবো! আমার বাবা—বলে—"

রত্না কোন উত্তর না দিয়া কল্পনার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দুম্-দুম্ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।

নীহার কহিল, "কি হলো রে রত্নার?"

ঠোঁট বাঁকাইয়া কল্পনা কহিল, "হার ম্যাজেষ্টি! কি মেজাজ! আমি ঠাট্টা করেছিলুম গোস্বামীদের বাড়ী নিয়ে, তাই চোখ-মুখ রাঙিয়ে কি তড়পানি!"

নীহার হাসিল। কহিল, "ওঃ এই! দুষ্মন্তর ভাবনায় শকুন্তলা আত্মভোলা হয়েছিল,—আমিও অনেকক্ষণ থেকে দেখেছি। কিন্তু ঋষি দুর্ব্বাসা হয়ে তুই আসবি, তা জানতুম না!"

কৃত্রিম ক্রোধে কল্পনা কিল তুলিল! কহিল, "দূর, আমি দুর্ব্বাসা হবো কেন? তেমনি দাড়ি আমার? নাঃ, তোরা রত্নার রূপের সুখ্যাতি করে করে ওকে মাথায় তুলেছিস! অজ পাড়াগেঁয়ে—এলো যখন, কি করে শাড়ী পরতো! মা গো, মনে হলে এখনো হাসি পায়!"

প্রতিবাদ করিয়া নীহার কহিল, "আমি কক্ষণো মাথায় তুলি না! প্রিন্সিপ্যাল ওকে একটু ভালোবাসে, তাই! কিন্তু সত্যি বলছি, আমার মাসিমার দেওরের মেয়ে ওর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর!"

"ঢের—ঢের সুন্দর অনেক আছে। নিজেকে উনি ভাবেন, ক্লিওপেট্রা!"

শিখা আসিয়া দাঁড়াইল! কহিল, "কি রে, তোদের কিসের কমিটী বসেছে?"

কল্পনা কহিল, "রত্নার রূপের দেমাকের কথা হচ্ছে।"

শিখা কহিল, কিন্তু ভাই, পাড়াগেঁয়ে অমন মোদ্দা কখনো দেখা যায় না! ঐ যা গোবর-গাদায় পদ্ম! তাতে কি এসে যায়—আমাদের মত য়্যারিষ্টক্রেট্ ফ্যামিলির মেয়ে তো ও নয়!"

কল্পনা কহিল, "নিশ্চয় নয়! আমার বাবা স্যার। আমরা যে ওর সঙ্গে মিশি, বন্ধুত্ব করি—"

নীহার মুন্সেফের মেয়ে। সে কহিল, "ও-কথা থাক্। রত্না আগে কিন্তু খুব ভালোমানুষ ছিল—সাত চড়ে মুখে রা বেরুতো না!"

কল্পনা কহিল, "আহা, তখন যে একটা গেঁয়ো মেয়ে ছিল। এখন 'পিয়ার্স' না হলে চলে না! দিশী স্নো মাখে না,—ওর সমস্ত ফ্রেঞ্চ টয়লেট্! দেখেছিস?"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শিখা কহিল, "তা সব দেখতে পাই বৈ কি! রূপ থাকলে রূপোর অভাব থাকে না।"

নীহার কহিল, "আচ্ছা, মিসেস্ গোস্বামী ওর মাসিমা হলো কি করে?"

শিখা কহিল, "তাঁর কি রকম বোন-ঝী। ওর বাবার বন্ধু!"

ব্যঙ্গের হাস্যে কল্পনা কহিল, "ওরে বাবা, তাতেই এত! একটা ঠাট্টা অবধি সইতে পারেন না! ফোঁস্ করে ওঠেন!"

বারান্দায় দাঁড়াইয়া কল্পনার দল যখন এমনি জটলা পাকাইতেছিল, বাগানের এক প্রান্তে রত্না তখন মাধবীলতার মঞ্জরীগুলাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

ঝর্ণা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল, কহিল, "রত্নাবলীর কি হচ্ছে?"

ঝর্ণার দিকে একবার চোখ তুলিয়া রত্না আনত মুখে গাছটা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

ঝর্ণা কাছে আসিল। রত্নার চিবুক তুলিয়া কহিল, "ও কি, কাঁদছিস্!"

"দেখ্ না ভাই, কল্পনা আমাকে কি রকম যা-তা বললে আমি গোস্বামীদের বাড়ী যাই বলে! বাবা তো ওঁকেই আমার গার্জেন করে গেছেন।"

"কি তাতে দোষ হয়েছে? তোমার বাবার তিনি বিশেষ বন্ধু! কল্পনার কথা ছেড়ে দে। ও বড়-লোকের মেয়ে। বাপ জজ বলে কাউকে ও গ্রাহ্য করে না।"

মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া রত্না কহিল, "ও বললে, তুমিও না কি আমার নামে কি সব বলেছো !"

"আমি ?" ঝর্ণা হাসিল। কহিল, "না, না। ওদের সে দিন কথা হচ্ছিল. আমি বলেছিলুম, রত্না নিজেকে ডিঙ্গিয়ে চলছে !"

"ডিঙ্গিয়ে চলছি কি রকম ?" রত্না ঝর্ণার পানে চাহিল।

একটা লোহার বেঞ্চে রত্নাকে লইয়া ঝর্ণা বসিল। কহিল, "হ্যাঁ রত্না। নিজের দিকে চেয়ে নিজেকে একটু দেখিস্। আচ্ছা, আমিই দেখিয়ে দিচ্ছি, তোর টুথব্রাস থেকে সেণ্ট পর্য্যন্ত কোন্‌টা দামী জিনিষ নয়, বল্ তো ? তাই আমি বলেছি, রত্নাকে যেন বড়মানুষী নেশাতে পেয়েছে !"

রত্না নীরব হইয়া রহিল,—উত্তর খুঁজিয়া পাইল না বলিয়া নয়, সুস্পষ্ট সত্য উক্তির মধ্যে এমন শক্তি নিহিত থাকে, যাহাকে সহসা অস্বীকার করা যায় না ! সঙ্কোচে মন বিমূঢ় হইয়া পড়ে।

ঝর্ণা রত্নার সেই ফ্যাল্-ফ্যাল্ দৃষ্টির পানে চাহিয়া কহিল, "সে যাক্ রত্না ! প্রিন্সিপ্যাল্ সে দিন বললেন, রত্না একটা জিনিয়াস গার্ল ! আমি কিন্তু বলছি—যত গোল বাধাতে সংসারে মজবুত এই জিনিয়সের দল ! কারণ, পাঁচ জনের চলা রাস্তাটাই তারা গুলিয়ে ফেলে।"

রত্না আড়ষ্টের মত বসিয়া রহিল ! কিন্তু অধিকক্ষণ এমন অপরাধীর মত সঙ্কুচিত থাকিতে হইল না ! মুক্তি দিলেন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। তিনি আসিয়া রত্নাকে কহিলেন, "রত্না, গোস্বামী-সাহেবের ওখান থেকে তোমায় নিতে এসেছেন ! প্রিন্সিপ্যালস্-রুমে তিনি আছেন।"

চাঁদের উপর হইতে খণ্ড মেঘখানা নিমেষে সরিয়া গেল। পুলকদীপ্ত মুখে রত্না বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্ল স্বরে রত্না কহিল, "আসি ভাই !"

"এসো রত্না।"

বাগানের মোড় ঘুরিয়া বারান্দার সিঁড়িতে পা দিতেই রত্না দেখিল, কল্পনার দল তখনও গুলতান্ করিয়া একটা মুখরোচক আলোচনায় মাতিয়া রহিয়াছে ! কাণে কিছু না শুনিলেও রত্না নিঃসংশয়ে অনুমান করিল, তাহারই সমালোচনা হইতেছে। নিষ্ফল আক্রোশে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া স্বস্থানে যাইতে তাহাদের নিকটবর্তী হইতেই কাণে শুনিল, জ্যোৎস্না কহিতেছে, "তা ভাই যাই বলিস্, রত্নার বরাত বটে ! কত বড়লোক—"

সুষমা কহিল, "থাম্ থাম্, বড়লোক। তুইও রত্নার মত মূর্চ্ছা যাবি—না, দিনে তারা গুণ্‌বি !"

থতমত খাইয়া জ্যোৎস্না কহিল, "না, তা বলিনি ! মিষ্টার গোস্বামী কিন্তু খুব সুপুরুষ ! সে দিন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে কথা বলছিল, আমি ভেবেছিলুম, কোন সাহেব না কি !"

কল্পনা কহিল, "তবে আর কি ! যাও বরমাল্য নিয়ে রত্নার আগে ছোটো ! বাবা, হ্যাংলা বটে তোরা !"

শান্তি কহিল, "চুপ !"

সকলে সচকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল,—গম্ভীর পদবিক্ষেপে রত্না তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় তাহার মুখ গম্ভীর।

রত্না কয়েক পা অগ্রসর হইতেই সহাধ্যায়িনীদের উচ্চ হাস্যরোল বোমা-ফাটার শব্দের মত রত্নার কর্ণে প্রবেশ করিল ! এব আহত চিত্তের ব্যর্থ আক্রোশ কান্নার মত গুমরিয়া বুকের মধ্যে মাথা কুটিতে লাগিল।

৭

অনিল মোটরের দরজা খুলিয়া দিতেই রত্না উঠিয়া গাড়ীতে বসিল। পাশে বসিল অনিল। গাড়ী ছুটিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া অনিল কহিল, "আজ এত গম্ভীর যে !"

রত্না কোন উত্তর দিল না। পাশে পথের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

সহাস্যে অনিল কহিল, "কি হলো ? মুখ ফিরিয়ে বসে আছো যে !"

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব মিলিল না। রত্না মুখ ফিরিয়া চাহিলও না ! যেমন ছিল, তেমনি রহিল।

আশ্চর্য্য হইয়া অনিল হাত বাড়াইয়া রত্নার মুখ নিজের দিকে ফিরাইতেই তাহার কৃষ্ণ-তারকা-শোভিত শ্বেত পলাশ হইতে শিশির-বিন্দু ঝরিয়া পড়িল। যে অশ্রু এতক্ষণ নয়ন-পল্লবে সঞ্চিত ছিল, সমস্ত শক্তি দিয়া রত্না যে-অশ্রুকে ঠেলিয়া রাখিতেছিল, সে অশ্রু আর নিজেকে সম্বৃত রাখিতে পারিল না—ঝরিয়া পড়িল।

সাশ্চর্য্য স্বরে অনিল কহিল, "এ কি রত্না, তুমি কাঁদচো !" ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সাগ্রহে সে রত্নার চোখের জল মুছাইয়া দিল। অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, "কেন ? কি হয়েছে তোমার ? কাঁদচ কেন ?"

রত্না নীরব।

সে রত্নার হাত ধরিল। মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিল, "আমায় বলবে না, কি হয়েছে ? বলো লক্ষ্মীটি !"

তবু রত্নার মুখে কথা নাই। অনিলের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাতখানা কিন্তু টানিয়া লইল না।

অনিল কহিল, "বুঝেছি। বাড়ীর জন্য মন কেমন করছে !"

এবার রত্নার মুখে কথা ফুটিল। এ অপবাদ যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণের জন্য ধরা-গলাতেই সে কহিল, "আমি তো ছেলেমানুষ খুকী নই যে, বাড়ীর জন্য বসে বসে কাঁদবো !"

পরিহাসের সুরে অনিল কহিল, "না, তুমি একেবারে আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ী ! বয়স তোমার সাতাশ হাজার কুড়ি !"

অনিলের কথা বলার ভঙ্গীতে কান্নার মধ্যেও রত্না হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "আপনি খালি ঠাট্টা করেন !"

হাসিতে হাসিতে অনিল কহিল, "হুঁ, আমি খালি ঠাট্টা করি—আর তুমি কেঁদে হাট বসাও ! কি হয়েছে, বলো তো ? এত কান্না-কাটি কিসের ?"

রত্না চুপ করিয়া রহিল। অভিমানি-চিত্তের যে-দুঃখ তাল পাকাইয়া অশ্রুর আকারে ঝরিতেছিল, তাহা কোন মতেই অন্যের কাছে প্রকাশ করা চলে না।

তরুণীর লজ্জা-রক্তিম মুখের উপর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কৌতুক-জড়িত কণ্ঠে অনিল প্রশ্ন করিল, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে বুঝি বকুনী খেয়েছ ?"

মাথা নাড়িয়া সবেগে প্রতিবাদে রত্না কহিল, "না। মিস্ গুহ আমাকে কিছু বলেননি।"

"বলেননি ! বলো কি ? তিনি তো আমায় দেখেই মুখখানা ভীমরুলের চাকের মত করেছিলেন। নেহাৎ প্রিন্সিপ্যালের আদেশ।"

"কিন্তু তিনি আমায় কোন কিছুই বলেননি !"

"তবে কে তোমায় কি বলেছে ? কি হয়েছে বলবে না রত্না ? কেন তুমি কাঁদচ ?" অনিলের কণ্ঠে এমন জিদ, এতখানি আগ্রহ যে, তাহাকে উপেক্ষা করা যায় না। পরিপূর্ণ নেত্রে অনিল রত্নার মুখের পানে চাহিল।

সে-দৃষ্টির সহিত রত্নার দৃষ্টি মিলিবামাত্র রত্নার অশ্রুধৌত স্বগৌর কপোলের উপর যেন দু'টি রক্ত-গোলাপ ফুটিল।

লজ্জিত কণ্ঠে রত্না কহিল, "না, আমায় কেউ কিছু বলেনি।"

রত্নার সেই অপরূপ সুন্দর মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনিল কহিল, "তবে কাঁদছিলে কেন ?"

রত্না মুখ নত করিল। জড়িত কণ্ঠে কহিল, "আপনারা আমাকে স্নেহ করেন, যত্ন করেন, তাই কলেজের মেয়েরা—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া অনিল হাসিয়া উঠিল। কহিল, "ও, বুঝেছি। আমরা ভালোবাসি বলে তোমায় ঠাট্টা করে ? তাই তোমার অভিমান হয়েছে ! আচ্ছা, আজই মাকে গিয়ে এ কথা বলবো।" অনিলের স্বরে দুষ্টামি মাখানো।

রত্না অনিলের হাত চাপিয়া ধরিল। "না, না, মাসিমাকে আপনি এ-কথা বলতে পাবেন না।"

"বেশ। বলবো না। কিন্তু তুমি সর্ত্ত করো।"

"কি সর্ত্ত, বলুন ?" রত্না চোখ তুলিয়া চাহিল।

"তুমি আমায় 'আপনি' বলে কথা কইতে পাবে না। 'তুমি' বলতে হবে।"

"বা রে, আমি কি বলবো—আপনাকে ?"

"আবার 'আপনাকে' ! বেশ, বাড়ী চলো, কথা ফাঁশ করে দেবো। বাড়ীতে আজ আবার এক জন নতুন লোক এসেছে।"

সাগ্রহে রত্না জিজ্ঞাসা করিল, "কে নতুন লোক ?"

"বলবো না যতক্ষণ না আমায় 'তুমি' বলবে। আর সেই নতুন লোকটির সামনে কি বলবো, জানো ?"

সবিস্ময়ে রত্না কহিল, "কি ?"

"তুমি কি রকম করে কলেজের মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমানুষের মত কাঁদছিলে ! কি রকম কাঁদুনে তুমি !"

"না কক্ষনো না।"

"কিন্তু কেঁদেছ তো ! সেই আমার মস্ত প্রমাণ। সবাই ভাববে, রত্না কচি খুকী ! সেই নতুন লোকটিও বলবে, একে একটা চুষি, ঝুমঝুমি কিনে দিতে হবে—কলেজে পড়তে আসাই এর বিড়ম্বনা—এর এখন দেশে ফিরে যাওয়া উচিত; তার পর ডাগর হয়ে কান্না থামলে কলেজে পড়তে আসবে।"

অনিল হাসিতে লাগিল।

রত্না মনে মনে আহত হইল। ছেলেমানুষের মত রাগিয়া উঠিয়া সে কহিল, "না, আপনি এমন সব কথা কক্ষনো বলতে পাবেন না !"

"কেন পাবো না ? তুমি আমায় ঘুষ দেবে না ?"

"কি ঘুষ দেবো ?" সরল কণ্ঠে রত্না চাহিল।

"তুমি আমায় 'তুমি' বলবে—বলো ! বেশ, বলবে না তো ? আমিও বাড়ী গিয়ে আমার যা মনে আসে বলবো।"

"না, না, দোহাই আপনার ! বলছি—'তোমার'—হয়েছে তো ?"

"হয়েছে ! চলো, আজ সিনেমায় যাই।"

"সিনেমা !"

"হ্যাঁ। দোষ কি ? তুমি আমায় আনন্দ দিয়েছ, আমিও তোমায় আনন্দ দেবো।"

"আনন্দ !" রত্নার মুখ প্রদীপ্ত হইল।

মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে অনিল কহিল, "আজ তোমার 'আপনি' বিসর্জ্জন হলো !"

রত্না কহিল, "আপনার যত সৃষ্টিছাড়া কথা !"

কৃত্রিম বকুনীর স্বরে অনিল কহিল, "আবার আপনার !"

"না, না, 'তোমার' ! কিন্তু দেখুন—"

"না, দেখবো না ! এই মুখ ফেরালুম !"

অনিল মুখ ফিরাইল।

রত্না হাসিল। কহিল, "ইস্, রাগ হলো ? কিন্তু বায়োস্কোপে যে যাবো, মাসিমা মত দেবেন ?"

তখনই মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া অনিল কহিল, "মার কাছে কৌশলে মত আদায় করার ভার আমার।"

"কি কৌশল করবেন 'আপনি'—না, না, তুমি ? শুনি।"

"মা'র শুদ্ধু টিকিট কিনবো। কিন্তু আজ শনিবার, মা তার নাচের স্কুলের জন্য যেতে পাবে না। অথচ তোমায় 'না' বলতে পারবে না !"

তার পর ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া অনিল আবার বলিল, "মা তোমায় অত ভালোবাসে কেন, জানো ?"

"কেন ?"

"আমাদের বোন ছিল,—মা তাকে নিজের হাতে গড়ছিল। সে নেই বলে—"

রত্নার আয়ত চোখের পিছনে বাষ্প-ভার ! রত্না কহিল, "কৈ, তাঁর নাম তো শুনি না !"

"মার সামনে আমরা কেউ কখনো তার নাম করতে পারি না। মা বড্ড কাতর হয়ে পড়ে। তার পরই তো মা নাচের স্কুল করলে। ওই সব নিয়ে ভুলে থাকে।"

"ও !" বলিয়া রত্না চুপ করিল।

মিসেস্ গোস্বামী দু'জনকে দেখিয়া কহিলেন, "তোমরা এতক্ষণে ফিরলে ! আমি বেড়াতে যেতে পাইনি ! রত্নার সঙ্গে অমিয়র আলাপ করিয়ে দেবো বলেছি, কাজেই বেরুতে পাইনি।"

সপ্রতিভ কণ্ঠে অনিল কহিল, "রত্নার বড্ড মাথা ধরেছিল। তাই মাঠে দু'টো চক্র দিলুম !"

মিসেস্ গোস্বামীর অসন্তোষ কাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "মাথা ধরেছিল—খুব রাত জেগে পড়ছো, বুঝি ? না, না,—শরীরকে যত্ন করবে। স্বাস্থ্য আগে, তার পরে যা হয়। এসো রত্না, আমার বড় ছেলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। অনিল যেমন তোমার ভাই, সেও তেমনি।"

ড্রয়িং-রুমে পুত্রের সহিত মিষ্টার গোস্বামী কথা কহিতেছিলেন। রত্না প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে আনত হইল।

গোস্বামী-সাহেব সস্নেহে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—"থাক্ মা, হয়েছে। বেশ ভালো আছো?"

মাথা নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া রত্না জানাইল, সে ভালো আছে।

নিজের পাশের আসনখানা দেখাইয়া তিনি কহিলেন, "বসো মা! কে আনতে গেছলো তোমাকে? অনিল?"

মৃদু স্বরে রত্না উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

মিসেস্ গোস্বামী ঘরে আসিলেন। তাঁর পিছনে আসিল অনিল। মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "রত্নার আসতে দেরী হচ্ছিল দেখে ভারী ব্যস্ত হচ্ছিলুম। অনিল তাকে নিয়ে মাঠে গেছলো! রত্নার বড্ড মাথা ধরেছিল।"

সহাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন, "বেশ করেছিল। রত্না ছেলেমানুষ! তেমন কিছু দেখতে পায় না! ওর বয়সের ছেলেমেয়েরা কত দেখে-শুনে বেড়ায়। হ্যাঁ রত্না, আমি তোমার প্রিন্সিপ্যালকে লিখেছি, এক্মাসের ছুটিটা তুমি এইখানে কাটাবে, বল্টুকেও তাই লিখেছি।"

রত্নার মুখ আনন্দে ঝল্মল্ করিয়া উঠিল। সস্মিত স্বরে সে কহিল, "বেশ হবে মেসোমশায়।"

মিসেস্ গোস্বামী নির্ব্বাক্! জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "অমিয়র সঙ্গে বুঝি এখনও রত্নার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি?"

গোস্বামী সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "না, ও আমার সঙ্গেই কথা কইছিল। অমিয়, এটি আমার ছেলেবেলার বন্ধু বল্টু—তার মেয়ে রত্না! রত্নাকে তোমরা বোনের মত দেখবে। রত্না, অনিল যেমন তোমার ভাই হয়, অমিয়ও তেমনি ভাই। তার উপর ও আবার হাকিম।"

গোস্বামী সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

তার পর কহিলেন, "রত্না খুব ভালো মেয়ে! ম্যাট্রিকে কুড়ি টাকা 'স্কলারশিপ' পেয়েছে! আই-এতেও পাবে, সে আশা আমরা রাখি।"

অমিয় এতক্ষণে পদোচিত গাম্ভীর্য্য লইয়াই কথা কহিতেছিল। তেমনই অনাসক্ত কণ্ঠেই কহিল, "ভেরী ইন্‌টেলিজেন্ট গার্ল!"

"শুধু ইন্‌টেলিজেন্ট নয়—ও একটা জিনিয়াস্! তোমার মাকে জিজ্ঞেসা করো, এই অতি অল্প দিনে কি রকম নাচতে শিখেছে ও।"

মিসেস্ গোস্বামী সায় দিয়া কহিলেন, "তা সত্যি। আমার ইস্কুলের কোনো মেয়ে রত্নার মত নাচতে পারে না। রত্নাকে যেমন হাতে ধরে শেখাই, তাদেরও তেমনি করি তো!"

গোস্বামী-সাহেব প্রদীপ্ত মুখে কহিলেন, "হবে না? কার মেয়ে রত্না! বল্টু কি রকম ভালো নাচতো! তবে শোনো, হাটে হাঁড়ি ভাঙি রত্না, তোমার বাবাকে গিয়ে বলো, তুমি নারদের মত দাড়ি রেখে এখন নিজেকে যতই ভারিক্কি বলে পরিচয় দাও না কেন, মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি, তুমি কি রকম লক্ষ্মী ছেলে ছিলে!" বলিয়া গোস্বামী-সাহেব আনন্দের সুরে হাসিয়া উঠিলেন।

তার পর কহিলেন, "সে ভারী মজার কাহিনী। মামার বাড়ীতে রাধামাধবের রাসে খুব ধুমধাম হতো। যাত্রা হবে। 'অর্জ্জুন-উর্ব্বশী'র পালা। হঠাৎ উর্ব্বশী বেচারার হলো ম্যালেরিয়া জ্বর। একদম বেহুঁস! কিন্তু তা বলে যাত্রা তো বন্ধ থাকবে না! বল্টু তখন লুকিয়ে সুরেন অধিকারীর সাকরেদী করে, তার নাচের মহল আমরা বটতলাতে দেখতে যাই। সুরেন অধিকারী বল্টুকে বললে,—তুমি মুখ রাখো বল্টু, আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি পারবে! বল্টু প্রথমে ভয় পাচ্ছিল। সুরেন অধিকারীর জিদে শেষে উর্ব্বশী সাজতে রাজী হলো। বল্টুর বাবা এসেছেন নিমন্ত্রণে। আসরে বসে তন্ময় হয়ে তিনি যাত্রা শুনছেন—দেখছেন। মুগ্ধ হয়ে উর্ব্বশীর নাচের তারিফ কচ্ছেন! হরিপদ গাঙ্গুলী বেহালা বাজাচ্ছে আর মুখ টিপে টিপে হাসছে। মামাবাবুর ওপাশে বসে আমিও যাত্রা দেখছি। বল্টুর বাবা বুঝতেই পাচ্ছেন না, ওড়না-উড়ানী বেণী-দুলুনী উর্ব্বশীটি তাঁর বল্টু! হঠাৎ এক সময়ে আমি বলে ফেলেছি—মামাবাবু, সুরেন অধিকারী বল্টুকে কেমন নাচতে শিখিয়েছে, দেখছেন! বল্টুর বাবা চমকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে নাচতে শিখিয়েছে? আমি তখন অত বুঝিনি, বললুম,—বল্টুকে! বাস, যে নাচে ভদ্রলোক অমন মসগুল হয়েছিলেন, এক নিমেষে তা চুরমার। ইন্দ্রের সভার কোন অনুশাসন না মেনে দেবরাজকে গ্রাহ্য না করে তখনি তিনি ছুটলেন স্বর্গের সেরা নর্ত্তকীকে জুতোপেটা করতে! সে কি হৈ-হৈ হাঁ-হাঁ হট্টগোল! মামাবাবু খপ করে তাঁর পাঞ্জাবী টেনে ধরলেন! পাঞ্জাবীর আধখানা মামাবাবুর হাতে রেখে ভদ্রলোক সংহার-মূর্ত্তি ধরলেন! ভদ্রলোক ভীষণ রাগী! উর্ব্বশী কিন্তু অর্জ্জুনের হাতের তলা দিয়ে ততক্ষণে দে চম্পট"! গোস্বামী-সাহেব হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস্ গোস্বামীও হাসিতেছিলেন। কহিলেন, "এমনি করেই আমাদের দেশের কলাবিদ্যাকে আমরা নষ্ট করছি। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সকলেই মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

"তোমার বার্থ-ডেতে আমি অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর অভিনয় করাবো। রত্না সাজবে উর্ব্বশী।"

সকলের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "তার পর রত্নাকে কি তার বাপের মত দুর্দ্দশা ভোগ করাতে চাও?"

অনিল কহিল, "তা কেন? রমেশ বাবুর কাছ থেকে আমরা অনুমতি চেয়ে নেবো।"

অমিয় কহিল, "ছুটীটা তা হলে মন্দ কাটে না!"

গোস্বামী-সাহেব কহিলেন, "উত্তম প্রস্তাব।"

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, "শুধু উত্তম প্রস্তাব করলেই চলবে না! তুমি সাজবে দেবরাজ, আর তোমার বন্ধু হবেন ভরত মুনি!"

গোস্বামী-সাহেব আর এক বার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "চমৎকার হবে!"

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

পতি-সংশোধনী সমিতি

[গল্প]

এবার পৌষ মাসে তেমন শীত পড়ে নাই ; সারা মাঘ মাসটা মাঝে-মাঝে ঝড়-বৃষ্টিতে কাটিয়াছে। তাই ফাল্গুনের শেষের দিকেও বেশ একটু শীত রহিয়াছে। দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর অচিন্ত্য বাবু বৈঠকখানা-ঘরে র‍্যাগ মুড়ি দিয়া এক-ঘুম ঘুমাইবার পর যখন চোখ চাহিলেন, দেখিলেন, ঘড়িতে প্রায় তিনটা বাজে। বাহিরে জোলো-ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। র‍্যাগখানাকে ভালো করিয়া গায়ে জড়াইয়া তিনি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। তবে আর ঘুমাইলেন না, শুইয়া শুইয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন—

ঋতুর এবার ওলট-পালট অবস্থা স্থুরু হলো। কি একখানা বইয়ে যে লিখেচে,—আসচে ভাদ্র মাসে কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ পড়বে, তার আগে অনেক রকম অঘটন ঘটবে, হয়তো এ-ও তারি একটা। মেদিনীপুরের বন্যা, উড়িষ্যার ঝড়, হালসীবাগানের অগ্নি-কাণ্ড, এ সবই হয়তো ঐ অঘটনের সামিল। তার ওপর জগৎ-জোড়া যুদ্ধ তো চলছেই। লোকটার গণনা হয়তো ঠিক। কলির যে শেষ, তার আর সন্দেহ নেই। রমানাথের কাণ্ডটা এক বার দেখ। চাইতে-না-চাইতে পঁচিশটে টাকা দিলুম—নইলে তার ইনসিওর বাতিল হয়ে যায়! বললে, পরশু মাইনে পাবো, পেয়েই আপনার টাকাটা দিয়ে দেবো। তা পরশুর জায়গায় আজ সাত মাস হয়ে গেল, কিছুতেই আর টাকাটা আদায় করতে পারলুম না! চাইতে গেলে উল্টে মহা বিরক্ত! নাঃ, কলির যে শেষ, তার আর কোন ভুল নেই!

ভাবতে-ভাবিতে অচিন্ত্য বাবুর একটু তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রার মাঝে তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—গভীর রাত; বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া তিনি 'কল্কিপুরাণ' পড়িতেছেন, এমন সময় একটা শব্দ শুনিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দেখেন, প্রকাণ্ড একটা ভাল্লুক! অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁর দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে। ভয়ে তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিতেই ভাল্লুক কহিল—'ভয় নেই, আমি সত্যযুগের ভাল্লুক, নিরামিষ ছাড়া আহার করি না।' অতঃপর জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, যেখানে ভাল্লুক দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে আর ভাল্লুক নাই, আছে রমানাথের ভূত দাঁড়াইয়া! তাহার হাতে টাকা-ভরা একটা থলি! তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া রমানাথের ভূত বলিতে লাগিল—"আঁমি মোঁরে গেঁছি। বঁউটা ইঁন্‌সিঁওরেঁর চাঁর হাঁজাঁর টাঁকা পেঁয়েছিঁলো, কেঁড়ে এঁনেছি। তোঁমাঁর পঁচিশটা টাঁকা দিঁতে এঁসেছি। আঁমি তঁআঁর মাঁনুষ নঁই—ভূঁত! সুঁতরাং আঁমায় তোঁমাঁর আঁর ভঁয়ের কাঁরণ নেঁই! নাঁও, এঁসো, তোঁমার টাঁকা নাঁও।"

আঁৎকাইয়া উঠিয়া তিনি জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। বাহির হইতে তখন রমানাথের ভূত জানালায় ধাক্কা দিতে লাগিল। সেই ধাক্কায় অচিন্ত্য বাবুর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তবু জানালার ধাক্কা থামিল না। বিরক্ত হইয়া অচিন্ত্য বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কে হে?"

"আজ্ঞে, আমি।"

"আমি কে?"

"আজ্ঞে, আপনি ত অচিন্ত্য বাবু?"

"আরে ভালো মুস্কিল!—তুমি কে?" বলিয়া অচিন্ত্য বাবু শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং জানালা খুলিয়া দেখেন, 'বাসন্তিকা বস্ত্রালয়'-এর সরকার, হাতে তাহার একটা 'বিল'। লোকটি কহিল—"মা সেদিন দু'জোড়া শাড়ী এনেছিলেন। এই বিলটা,—৩৪।/১০। টাকাটা দেবেন কি?"

"দেবো। আঁকৃষি আছে তোমার কাছে?"

"আজ্ঞে—আঁকৃষি! কি বলচেন?"

"এই আমার উঠোনের গাছে ফলেছে; টাকাটা পাড়তে হবে কি না—তাই আঁকৃষি চাই।"

লোকটি ভ্যাবা-চাকা খাইয়া এক-দৃষ্টে অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "চেয়ে থাকলে কি হবে! যিনি কাপড় এনেচেন, তিনিই টাকা দেবেন। দাঁড়াও, তাঁকে ডেকে দি। নিমাই! অ নিমাই!"

"আইজ্ঞা!" বলিয়া নিমাই আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "তোমার মাকে একবার ডেকে দাও দেখি, আইজ্ঞা।"

"আইজ্ঞা, তিনি তো ঘরকে নাই। আপনি ঘুমালে পর তিনি…"

"কোথায় গেছেন?"

"আইজ্ঞা, বাসকুপ দেখবারে…"

"ওহে, কোথায় গেলে? অ চৌত্রিশ সাড়ে-ন' আনা!"

"কি বলচেন বাবু?" বলিয়া লোকটি পুনরায় আসিয়া জানালার ধারে মুখ বাড়াইল।

অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "ওহে, ফিরে যেতে হলো। তিনি ঘরে নেই, বাসকুপ দেখতে গেছেন।"

লোকটি বিস্মিত এবং বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক মূর্ত্তি—পিঠে ও হাতে বোঁচকা-বুচকি ঝুলাইয়া দেখা দিল। লোকটা লেস্-ফিতা-ওলা। সে কিছু বলিবার আগেই অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "মক্কেল গর হাজির, ফিরতে হবে।"

"আজ্ঞে, মা-ঠাকরুণ বলেছিলেন, চওড়া সাটিনের ফিতের কথা…"

"আহা-হা, বলচি যে মক্কেল গর-হাজির, যাও।"

"বাবু, খুব ভালো সাবান আছে। দামে সুবিধে হবে। এক বার দেখবেন কি?"

"না।"

"উপন্যাস বই-টই কিছু চাই না বাবু?"

একটু বিস্মিত হইয়া অচিন্ত্য বাবু কহিলেন, "লেস্-ফিতে-সাবানের সঙ্গে উপন্যাসও রাখো না কি?"

"আজ্ঞে, মা-ঠাকরুণরা চান কি না। দেখাবো বাবু দু'-একখানা?" বলিয়া গাঁটরি খুলিতে খুলিতে বলিল—'প্রণয়ের ক্ষিদে' নিন বাবু একখানা। এ-রকম কেতাব আর জন্মায়নি। 'বসন্তের কোকিল' নিতেও পারেন। খুব ভালো বই। 'প্রথম প্রিয়া'…"

"চাই না, চাই না। আর বকিও না বাবা। তোমার 'প্রথম প্রিয়া' 'শেষের প্রিয়া' কিছুই দরকার নেই। সরে পড়।"

লেস্-ফিতা-ওলা তাহার বোঁচকা লইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীমান্ নিমাইচন্দ্র তখনও তাহার মিশ কালো রংয়ের 'ছিটে বেড়া'র গায়ে কোঁচার কাপড়খানা জড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অচিন্ত্য বাবু ঘড়ির দিকে এক বার দেখিয়া লইয়া কহিলেন—"নিমাই চন্দোর!"

"আইজ্ঞা বাবু।"

"এক কাপ চা তৈরী করতে পারবে ধন?"

"আ—ই—জ্ঞা……"

"আইজ্ঞার বহর দেখে বুঝতে পেরেচি। যা বেটা, ওই ঠাকুরকে বল গিয়ে—এক কাপ চা করে আনতে।"

নিমাই চলিয়া গেল।

"মায়-জি!"

"তুমি আবার কে বাবা?"

"ছিট্-কাপ্‌ড়াওয়ালা বাবু-সাব! মায়জি ওহি রোজ বোলা থা……"

"ও রোজ বোলা থা, কিন্তু আজ বোজ বোলতা যে, তোম হিঁয়া আউর মত্ আও। ছিট্-উট্ আউর নেহি লেগা।"

"কেঁও বাবুজি, কুছ কসুর হুয়া?"

"তোমরা মাইজি বিধবা হুয়া। ছিট্-ফিট্‌কা আব দরকার নেহি হোগা। যাও, ভাগো।"

ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া ছিটওয়ালা খানিকক্ষণ অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং তার পর এক-পা এক-পা করিয়া চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-সাতের মধ্যেই ঠাকুর এক-কাপ চা লইয়া হাজির হইল এবং অচিন্ত্য বাবুও পাঁচ-সাত মিনিট ধরিয়া তাহা তোয়াজের সহিত পান করিয়া ডাকিলেন—"নিমাই!"

নিমাই আসিলে কহিলেন—"সিগারেটের বাক্সটা—আইজ্ঞা! আর, ম্যাচ-বাক্সটা—আইজ্ঞা।"

প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গোটা চার-পাঁচ সিগারেট ধ্বংস করিয়া অচিন্ত্য বাবু উঠিলেন এবং নিকটবর্ত্তী পার্কে গিয়া একখানি বেঞ্চের উপর বসিলেন। খানিক পরে ঐ পাড়ারই দেবেশ বাবু আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়া কহিলেন—"অচিন্ত্য বাবুকে রোজই মনে মনে চিন্তা করি, কিন্তু দর্শন আর ভাগ্যে মেলে না। আছেন কেমন বলুন?"

গম্ভীর বদনে অচিন্ত্য বাবু কহিলেন—"কেমন অনেক দূরে, আছিই কি না সন্দেহ!"

"ব্যাপার তাই বটে। ৩১ টাকা দিয়ে দু'মণ চাল কিনলুম মশাই। আচ্ছা, আটা কত করে কিনছেন আপনি?"

"আটা? বলতে পারি না। তবে আটা নামে এক রকম সাদা গুঁড়ো চোদ্দ আনা করে সের আনে, দেখেচি।"

"উঃ! কি হবে বলুন তো?"

"বিশেষ কিছুই নয়। যে জিনিষটা অত্যন্ত সত্য সেইটেই হবে, অর্থাৎ যাকে বলে, মৃত্যু!"—অচিন্ত্য বাবুর গম্ভীর বদন অধিকতর গম্ভীর হইল।

হঠাৎ দেবেশ বাবু অদূরে কাহাকে দেখিতে পাইয়া ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া সেই দিকে চলিয়া গেলেন। অচিন্ত্য বাবু একাকী বসিয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজ নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সুরবালার অর্থাৎ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে রাগ তাঁহার মনে একটু একটু করিয়া সঞ্চিত হইতেছিল, এখন তাহা চরমে উঠিল। তিনি বাড়ী ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, সুরবালা আরাম-কেদারায় বসিয়া চা খাইতেছে, হাতে একখানা 'গবমিল'-এর গানের বই।

অচিন্ত্য বাবু পাশের চেয়ারখানায় বসিয়া কহিলেন—"তোমার আজ অনেক মক্কেলের আমদানী হয়েছিল। বাসন্তিকা বস্ত্রালয়, ছিটের কাপড়ওলা, লেস-ফিতে-ওলা। তার পর বেড়াতে বেরুচ্চি, এমন সময় 'হ্যাপি বয়' এসে হাজির। বলে, গিন্নীমা প্রায়ই কেনেন, আজ আসতে বলে দিয়েচেন। আমি তাকে বায়োস্কোপে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম,—গিয়েছিল?"

চায়ের শূন্য বাটিটা মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া সুরবালা কহিল—"পাঠিয়ে যখন দিয়েছিলে, তখন নিশ্চয়ই গিয়েছিল বই কি।"

"কিন্তু তোমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে যে।"

"হুকুম হোক্।"

"হুকুম নয়কো, ভিক্ষা! ভিক্ষা-এই যে, বর্ত্তমানের এই দুর্দ্দিন যত দিন থাকবে, তত দিন আমার ঘাড় থেকে নেমে তোমার পিত্রালয়ে গিয়ে ভর করতে হবে।"

"তার মানে?"

"তার মানে—'তাহার' সংস্কৃততে—'তস্য', আর ইংরেজীতে—'হিজ্ বা 'হার'।"

"রসের হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথাটা বললেই ভালো হয়।"

"আসল কথা হচ্চে, দেড়শো টাকা পাই পেন্সন, আর খরচ মাসে তিনশো। তার ভেতর বেশীর ভাগই তোমার বাজে-খরচ! সুতরাং……"

"সুতরাং কি করতে বলো?"

"ঐ সব বাজে-খরচ আর কিছুতেই চলবে না! বায়োস্কোপ দেখা, ঐ রং-বেরংএর শাড়ী, ব্লাউশ, ঐ সব লেস-ফিতে, ঐ 'হ্যাপি-বয়'—এ সব আর এই আন্-হ্যাপি দিনে চলবে না। চাল কিনতে হচ্চে কুড়ি টাকা মণ! কয়লা, তেল, আটা, তরি-তরকারী সব পাঁচ গুণ সাত গুণ দাম বেশী! সুতরাং এ সময়ে আর……"

একটু শ্লেষ-মেশানো স্বরে সুরবালা কহিল—"তা সংসার চালাতে যদি অক্ষম হয়েই থাকো, আমাকে দাদার ওখানেই দিয়ে এসো। একটু বললে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত তুমিও ওখানে পেতে পারবে। সিঁড়ির নীচে চোরকুঠুরীর ঘর আছে। সেখানাও বোধ হয় বলে-কয়ে তোমার শোবার জন্য করে দিতে পারবো।"

মুখখানা কথঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া অচিন্ত্য বাবু কহিলেন—"বটে! অপার দয়া তোমার! তবে দাদার সংসারে গিয়ে আবির্ভাব হলে আমার ভয় হয়, সে-বেচারার সংসারটিও ছারখার যাবে!"

বিষম বিরক্তির সহিত সুরবালা কহিল—"যেমন তোমার সংসার গিয়েচে?"

"না গেলেও যাবার লক্ষণ দেখা দিয়েচে। তোমার ও-সব নবাবী-চাল আর চলবে না। কিছুতেই চলবে না।"

"স্ত্রীকে যদি খেতে-পরতে দিতে না পারবে তো বিয়ে করেছিলে কেন?"

"খাওয়া-পরা মানে তো নবাবী করা নয়। নবাবী আর চলবে

না !" বলিয়া অচিন্ত্য বাবু চোখ দিয়া সুরবালার প্রতি যেন এক ঝলক আগুন ছিট্‌কাইয়া দিলেন।

তেমনি আগুন ছিটাইয়া সুরবালাও লাফাইয়া উঠিল—"আলবৎ চলবে।"

তার পরই তুমুল কাণ্ড। প্রথমে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বচসা, তার পর বাদাবাদি তরজা। শেষে তুবড়ি জ্বলিয়া, হাউই উড়িয়া, বোম্ ফাটিয়া সারা বাড়ী ধূমে ধূমাচ্ছন্ন! সুরবালার অনাহারে শয়ন এবং অচিন্ত্য বাবুর দ্বিগুণ আহারের পর বৈঠকখানায় রাত্রি-যাপন।

* * *

পরদিন প্রভাতে চা-পানের পর সুরবালা সাজগোজ করিয়া বাহির হইয়া গেল। নিমাই উঠানের কলতলায় বাসন মাজিতেছিল, মনে মনে কহিল—আজ সকাল থেকেই মা'র বাসরূপ্! অচিন্ত্য বাবু আন্দাজ করিলেন, বোধ হয় শ্যামবাজারে দাদার ওখানেই যাইতেছে! সুরবালা কিন্তু ও-পাড়ায়, অর্থাৎ যতীন দাস রোডে তার বন্ধু মীনাক্ষীর বাড়ী গেল। মীনাক্ষী তখন 'গরমিল'-এর স্বরলিপির বই দেখিয়া গান তুলিতেছিল—

'সেই আমি আর সেই তুমি
সেই কুসুমিত বন-ভূমি।'

ঘরে প্রবেশ করিয়াই সুরবালা কহিল, "সেই তুমি—সেই আমি ঠিক আছি বটে, কিন্তু সেই কুসুমিত বনভূমি আর নেই! বনভূমি শুকিয়ে আসছে।" বলিয়া সুরবালা মেঝেয়-পাতা কার্পেটের উপর মীনাক্ষীর পাশে আসিয়া বসিল।

অতঃপর দুই জনের বহুক্ষণ ধরিয়া বহু কথা আলোচনা এবং বহু শলা-পরামর্শ হইবার পর মীনাক্ষী কহিল—"খুব দরকার। এতে আমার খুব মত আর উৎসাহ সুরোদি। এ রকম না হলে ওঁরা শায়েস্তা হবেন না। ওঁরা বেটা-ছেলে বলে মনে ভাবেন, ওঁরাই সব, আমরা কিছুই নই!"

"তা হলে—তোর মত তো?"

"খুব—খুব। কিন্তু আর দেরী করো না।"

ব্যাপারটা এই যে—ইঁহারা স্ত্রীরা, স্বামীদের অত্যাচার অবিচার দূরীকরণ-মানসে একটা সমিতি গঠন করিবেন এবং রেজোলিউশন পাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহা প্রচার করিবেন।

মীনাক্ষী জিজ্ঞাসা করিল—"বিজলী সেনের কাছে গিয়েছিলে?"

"কোথাও এখনও যাইনি। তোর কাছেই প্রথম এলুম। দেখ্ না, সাত দিনের মধ্যেই আমি 'সমিতি' বসিয়ে ফেলবো।"

"কি নাম হবে বলো তো?"

"নাম? নাম হবে—নাম হবে—নাম হবে—'স্বামি-সংশোধনী সমিতি'। সোজা নামই ভালো।"

একটু ভাবিয়া লইয়া মীনাক্ষী বলিল—'না দিদি, স্বামী নয়। কথাটা 'পতি' দিতে হবে। কেন না, শাস্ত্রীয় কথাটা যখন—'পতি পরম গুরু', 'পতিই সতীর গতি', তখন ও নাম না হয়ে·········"

"কি নাম হবে বল্।"

"পতি-সংশোধনী সমিতি।"

হাসিয়া সুরবালা কহিল—"বেশ। তাই।"

* * *

এক সপ্তাহের মধ্যে বাইশ জন সভ্যার একত্র সংযোগে ও ঐকান্তিক আগ্রহে পতি-সংশোধনী সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবে গৃহের অভাবে এখনও ইহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যালয় স্থাপিত হয় নাই। পতিদের অনুপস্থিতির সুযোগে সভ্যাদিগের কাহারো-না-কাহারো গৃহেই সমিতির বৈঠক বসে এবং কার্য্যপন্থা বিষয়ে আলোচনা-পরামর্শ হয়। সে দিন চাঁদিমা দত্তের গৃহে বৈকালিক বৈঠকে ইহাই স্থির হইয়াছে যে, এই হপ্তার মধ্যেই একখানি ঘর ঠিক এবং সমিতির সাইন-বোর্ড ঝুলাইয়া যথারীতি কাজ-কর্ম্ম সুরু করিয়া দিতে হইবে।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সুরবালা মীনাক্ষীকে সঙ্গে লইয়া ঘর খুঁজিতে বাহির হইল। সদানন্দ রোডে একখানি ঘরের দেওয়ালে 'টু লেট্' ঝুলিতেছে দেখিয়া মীনাক্ষী দরজার কড়া নাড়িল। সঙ্গে-সঙ্গেই খোলা গা, গলায় পৈতা, ভুঁড়িওলা এক ভদ্রলোক হুঁকা-হাতে তামাক টানিতে টানিতে বাহিরে আসিয়া কহিল—"কাকে চান্?"

সুরবালা কহিল—"রাস্তার ধারের এ ঘরখানা ভাড়া দেওয়া হবে কি?"

"হবে।"

"ভাড়া কত?"

"ঘরটা আগে দেখুন একবার, তার পর ভাড়ার কথা হবে।"

ঘর দেখা হইল। বেশ বড় ঘর। দেওয়ালের গায়ে কাচ-দেওয়া দু'টো দেয়াল-আলমারী আছে। মীনাক্ষী বলিল—"বেশ হবে সুরোদি। আমাদের সমিতির খাতা-পত্তর, কাগজ-টাগজ রাখবার বেশ সুবিধে হবে।"

ভুঁড়ি-ওলা ভদ্রলোক কহিল—"আপনাদের কিসের সমিতি?"

"পতি-সংশোধনী সমিতি।"

তার পর সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া ভদ্রলোক কহিল—"মাপ করবেন, আপনাদের এ রকম সমিতির জন্য ঘর ভাড়া দিতে পারবো না।" ভদ্রলোক আর সেখানে দাঁড়াইল না; তামাক খাইতে খাইতে ভিতরে চলিয়া গেল।

অতঃপর প্রতাপাদিত্য রোড, রাণী-ভবানী রোড ঘুরিয়া দু'জনে সর্দ্দার শঙ্কর রোডে আসিয়া একখানা ভালো ঘরের সন্ধান পাইল। ভাড়া ১৬৲ টাকা। ঘরখানা খুব প্রশস্ত। বাড়ীওলা কহিলেন—"মাঝে একটা পার্টিসন যদি দিয়ে নেন্ তো দু'টো বেড্‌রুম চল্‌তে পারে। আপনাদের ছোট ছেলেমেয়ে ক'জন?"

"আমরা এখানে থাকবো না কেউ, অফিস হবে।"

"সে হলে ভালোই হবে। কোন হাঙ্গামা নেই। কিসের অফিস আপনাদের? সেলাইয়ের কলের?"

"না। আমাদের পতি-সংশোধনী সমিতি।"

"পতি-সংশোধনী সমিতি! পতিদের সংশোধন······দেখুন, আমার এখানে ওটা সুবিধে হবে না। আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করুন।"

কয়েক পা ফিরিয়া আসিয়া মীনাক্ষী কহিল—"সুরোদি, তিল-তিল্ করে ব্যাপারটা কোথায় উঠেছে, দেখচো তো?"

"খুব দেখেচি। তবে না এত দিন পরে আর সহ্য করতে না পেরে এই কাজে নামলুম! কি সাংঘাতিক স্বার্থপর এই পুরুষ জাতটা, একবার ভাব্ দেখি। স্ত্রীকে মুখে এরা যেটুকু ভালোবাসা

দখায়, জানবি সেটা ওদের নিজেদের স্বার্থে। স্ত্রীর জন্ম স্ত্রীকে ভালোবাসে, এ রকম স্বামী……

"স্বামী বলো না সুরোদি—পতি বলো। স্বামী বল্লেই যেন মনে হয়, আমাদের স্বত্ব-স্বামিত্ব সব ওঁদেরই দখলে!……এই যে একটা 'টু লেট্' ঝুলছে। একবার দেখ না।"

দরজার কড়া নাড়িতেই একটি সধবা প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঘোমটা দিয়া দরজা ঈষৎ ফাঁক করিল এবং আগন্তুক দুই জন স্ত্রীলোক দেখিয়া সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কহিল—"কি চান আপনারা?"

যা তাঁরা চান, তা বলাতে স্ত্রীলোকটি কহিলেন—"পতি সং…… কি বল্লেন আপনারা? থিয়েটারের দল কি আপনাদের? আপনারা নিজেরা বাস করবেন না?"

মীনাক্ষী কহিল—"থিয়েটারের দল নয়। আমাদের হলো— সমিতি! আমরা রাত-দিন কেউ এখানে থাকবো না, খালি দুপুর বেলাটায় ঘণ্টা দু'তিন করে আমাদের সমিতির কাজকর্ম্ম……"

অতঃপর সুরবালাই পরিষ্কার ভাবে এবং খুব সোজা করিয়া ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে পর স্ত্রীলোকটি একটু বিস্ময় ও ভয়ের সহিত কহিল—"আপনারা কাল সকালে একবার আসবেন। বাড়ীর পুরুষ-মানুষরা এখন আফিস গেছেন। আমি বলে রাখবো, আপনারা কাল সকালে একবার এসে দেখা করবেন।"

স্ত্রীলোকটি আর অপেক্ষা না করিয়া ভয়ে ভয়ে দরজায় ভালো করিয়া খিল লাগাইয়া চলিয়া গেল।

মীনাক্ষী বলিল—"সুরোদি, এ-ও লক্ষণ ভাল বলে মনে হচ্চে না।"

"আমারও তাই মনে হয়। তবুও কাল সকালে এসে খবরটা জেনে যেতে হবে।"

পরদিন প্রাতঃকালেই সুরবালা মীনাক্ষীকে সঙ্গে করিয়া সদার শঙ্কর রোডের সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া ভিতর হইতে একটি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসরের ভদ্রলোক বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"ঘর-ভাড়ার জন্য কাল আপনারাই এসেছিলেন?"

সুরবালা কহিল—"হ্যাঁ।"

"আপনাদের কিসের সমিতি বলুন তো?"

সুরবালা সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিলে, ভদ্রলোকটি কহিলেন— "বটে! দেখছি মস্ত বড় কাজে আপনারা হাত দিয়েচেন।"

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে যেন অসন্তোষের একটা ঢেউ ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। ভদ্রলোক কহিলেন—"এ দিকে আপনাদের ঘর পাওয়া শক্ত! একটা ঠিকানা বলে দি, আপনারা যান, যেখানে ঘর পেতে পারেন, এই—পার্ক ষ্ট্রীট্ দিয়ে বরাবর পূব-মুখে ঢুকে পশ্চিম দিকে পাবেন একটা প্রকাণ্ড তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তাকে ডাইনে রেখে বাঁয়ে চলে গেলেই দক্ষিণ দিকে পাবেন একটা কচু-ক্ষেত। ঐ কচু-ক্ষেতের পশ্চিমে রশি চার-পাঁচ গেলেই দেখবেন ক'খানা বড় বড় ঘর…"

সুরবালা কহিল—"ওঃ, সে তো আমরা জানি। সেটা একটা গাধার খোঁয়াড়। সেখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেও দেখচি তার পথ-ঘাটের কথা সবই আপনার মনে আছে!" বলিয়া মীনাক্ষীর হাতটা জোর করিয়া ধরিয়া সুরবালা হন্-হন্ করিয়া চলিয়া আসিল।

মীনাক্ষী বলিল—"সুরোদি, অভদ্রলোকটাকে বেশ ভালো করে দু'টো কথা শুনিয়ে দিয়ে এলে হতো। ভদ্র-ঘরের ঝি-বৌদের এমনি ভাবে……বলে আসবো, সুরোদি?"

"বৃথা, মীনা, বৃথা। ও বলবে এখন, ভদ্রঘরের ঝি-বৌয়েরা কি এমনি করে পথে বেরিয়ে……বুঝলি না? এদের দু'কথা শুনিয়ে কিছু হবে না, একেবারে ঢেলে সাজবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জন্যই তো এই স্বামী সং……"

"আবার স্বামী! স্বামীতেই তোমাকে পেয়ে বসেছে, সুরোদি, তোমার দ্বারা আমাদের সমিতি চলবে না। এ দিকে কোথা যাবে?"

"আয় না, রাজা বসন্ত রায় রোডটাও একবার ঘুরে যাই।"

শুধু রাজা বসন্ত রায় রোড নয়, পরাশর রোড, সাদার্ণ এভেনিউ, রাণী ভবানী রোড, শ্রীমোহন লেন প্রভৃতি ঘুরিয়াও যখন সমিতির জন্য কোন ঘর পাওয়া গেল না, তখন বেলা প্রায় এগারোটা। সুরবালা বলিল—"চ, এ-বেলা আর নয়। তবে ঘর আমি যেমন করে হোক যোগাড় করবোই।"

* * *

"এত দাম দিয়ে এত ভাল শাড়ী আনবার কি দরকার ছিল?"

"তুমি পরবে, লতা।"

"ব্লাউশ তো আমার অনেকগুলো রয়েচে—আবার এত ছিট্ নিয়ে এলে!"

"তা হোক্। তোমাকে সাজাবার জন্য, তোমার সুখের জন্যই তো আমার পয়সা। নাও, ক্লাপি বয়টা খেয়ে ফেল, ওটা যে গলে যাচ্চে!"

"নাঃ—ও আনলে কেন? তুমি খাও, আমি কিছুতেই খাবো না।"

"খেতেই হবে। তুমি যে ভালোবাস।"

বৈঠকখানা-ঘরের ভিতর দিকের দালানে বসিয়া স্বামী তরুবর দত্ত ও স্ত্রী শ্রীমতী লতিকারাণীর কথা হইতেছিল।

লতিকা কহিল—"এই দুর্ম্মূল্যের দিনে তুমি এত বাজে খরচ করতেও পারো! কাল নীলাদের বাড়ী বেড়াতে গেছলুম। নীলার মামী বুঝি নীলার মামাকে এক-বাক্স সাবান আনতে বলেছিল, তাইতে নীলার মামার কি কাণ্ড! নীলার মামীকে তেড়ে মারতে এলো। বলে, 'এই দুর্দ্দিনে সাবান! দিন কতক পরে যে ভাত-ই আর জুটবে না।' নীলার মামী ভয়ে আর লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল!"

তরুবর কহিল—"অত্যাচার! ঘোর অত্যাচার! আমাদের জাতের এই স্বামীগুলো—তাদের স্ত্রীদের ওপর কি অত্যাচারই না করে! তারা এত নিষ্ঠুর, এত স্বার্থপর যে, তা আর বলবার নয়। এই স্ত্রীজাতি সংসার-মরুভূমিতে সুশীতল বারি-স্বরূপ, এরা না থাকলে প্রভুদের……কে?"

বাহির হইতে নারী-কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল—"আপনাদের কোন্ ঘর ভাড়া দেওয়া হবে?"

তরুবর তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিতেই সুরবালা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তরুবর একখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া কহিল—"বসুন, বসুন।"

"আপনারা ক'খানা ঘর ভাড়া দেবেন?"

"একখানা। এই ঘরেরই ও-পাশের ঘরখানা। একখানা ঘরে

কি আপনাদের চলবে? শুধু স্বামি-স্ত্রী আর দু'-একটি ছেলে-মেয়ে হলে……"

"বসবাসের জন্য নয়। আমাদের সমিতির অফিস করবো। রাস্তার দিকের একটা জানালা খুলে যদি একটা দরজা……"

"সমিতি! কিসের সমিতি?"

"পতি-সংশোধনী সমিতি।"

"একটা অনুরোধ করতে পারি কি? এক কাপ চা……ইনি আমার স্ত্রী। মনে করুন, ওঁরই অনুরোধ……"

"তা আমার আপত্তি নেই! চা তো খেয়েই থাকি।"

তরুবর হৃষ্ট চিত্তে উঠিয়া গিয়া লতিকাকে মৃদু স্বরে কি বলিতেই লতিকা ভিতরে চলিয়া গেল এবং মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে একটা রেকাবীতে কিছু জলখাবার ও এক-কাপ চা লইয়া আসিল।

ইতিপূর্ব্বেই সুরবালা তরুবরকে তাহাদের সমিতি-গঠনের কারণ এবং উদ্দেশ্য বলিয়াছিল। তরুবর কহিল—"ঘর তো আপনাদের দেবোই! ভাড়া যা ইচ্ছে তাই দেবেন। না দিলেও অসন্তুষ্ট হব না। আপনারা যে-কাজে নামচেন, এটা খুব হওয়া উচিত। এ কাজে আমার ষোল আনা সহানুভূতি আছে। আমার দ্বারা এতে আপনাদের যতটা সম্ভব সাহায্য হবার, তা হবে জানবেন। স্ত্রী হলো সংসারে শান্তির নির্ঝরিণী! সেই স্ত্রীর ওপর স্বামীরা যে কি অমানুষিক……"

প্রফুল্ল চিত্তে সুরবালা জলখাবার ও চায়ের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিল।

পরদিনই শ্রীযুক্ত তরুবর দত্তর ঘরে 'পতি-সংশোধনী সমিতি'র কার্য্যালয় স্থাপিত হইল। পূর্ব্বেই কয়েকখানি চেয়ার, একখানা টেবিল, একটা আলমারী, কাগজ-পত্র, দোয়াত-কলম প্রভৃতি কেনা হইয়াছিল; ঐগুলি আনাইয়া অফিস সাজানো হইল। একখানা নাতিবৃহৎ সাইন-বোর্ডও লেখানো হইয়াছিল, উহাও সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

তৎপরদিন দ্বিপ্রহরেই অসীম আনন্দ ও উৎসাহের মধ্যে সমিতির উদ্বোধন হইয়া কার্য্য সুরু হইল। বাইশ জন সভ্যার একমতানুসারে সুরবালাই সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং বিজলী সেন সেক্রেটারী মনোনীত হইল। উদ্বোধন-বক্তৃতায় সুরবালা কহিল—"নর-নারী লইয়াই জগৎ। এই সর্ব্বসুখের আধার পৃথিবী কেবলমাত্র নরের বা কেবলমাত্র নারীর নহে। উভয়েরই সমানাধিকার। এই বিশাল বিশ্বের সর্ব্বদেশেই দেখিবেন, উভয়ের এই সমানাধিকার শুধুই অব্যাহত রাখা হয় নাই; দেখিবেন, সর্ব্বদেশেই নারীর মান, মর্য্যাদা, আদর কত বেশী! কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নারীরা কিরূপ লাঞ্ছিতা, কিরূপ অনাদৃতা, কিরূপ neglected—অর্থাৎ কি-না তাচ্ছিল্যকৃতা, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। নারীর প্রতি দেশব্যাপী এই দুর্ব্যবহারের প্রতিকার-মানসে আজ আমরা……" —ইত্যাদি।

চাঁদিমা দত্ত উঠিয়া প্রস্তাব করিল—"আমি প্রস্তাব করি, স্ত্রীর প্রতি স্বামীদের আচার-ব্যবহার সংশোধন-উদ্দেশে আমাদের এই সমিতির নাম হউক—'পতি-সংশোধনী সমিতি'।"

মীনাক্ষী টপ্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"শ্রীযুক্তা চাঁদিমা দত্তর প্রস্তাবের মধ্যে একটি কথার প্রতিবাদ করি। তাঁহার কথাগুলির মধ্যে 'স্বামীদের' এই কথাটির বদলে 'পতিদের' এই কথাটি ব্যবহার করা হউক।"

তখন সুদীপা সরকার দাঁড়াইয়া উঠিল এবং চাঁদিমা দত্তর সংশোধিত প্রস্তাবটি সমর্থন করিল।

অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীমতীদিগের যত্নে এবং উৎসাহে সমিতির শ্রী পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সভ্যা-সংখ্যা বাইশ হইতে সাড়ে সাতান্নয় আসিয়া পড়িল। কুহেলিকা চ্যাটার্জী নামে এক জন সভ্যাকে ঠিক পুরা পত্নী বলা যায় না; যেহেতু, তিনি স-পত্নী, তাঁহার সতীন আছে এবং সেই সতীন অত্যন্ত স্বামিগতপ্রাণা। সেই হেতু তিনি সভ্যাশ্রেণীভুক্তা হন নাই। সুতরাং শ্রীমতী কুহেলিকা চ্যাটার্জীকে অর্দ্ধ-সভ্যা ধরা যাইতে পারে এবং এই কারণেই সভ্যার সংখ্যা সাড়ে সাতান্ন।

প্রত্যহই দ্বিপ্রহরে সমিতি বসে; কেবল রবিবারে বন্ধ থাকে। পথিকেরা সাইনবোর্ডখানা দেখিয়া সচকিতে দাঁড়াইয়া পড়ে। ইহা লইয়া পাড়ায় পাড়ায় গৃহে গৃহে বেশ একটু আন্দোলন-আলোচনা চলিতে লাগিল।

লতিকার যদিও সভ্যা-শ্রেণীভুক্ত হইবার কোন আবশ্যক বা কারণ নাই, যেহেতু, স্বামী তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং প্রেমশীল, তথাপি সমিতির প্রতি তাহাদের পতি-পত্নীর অগাধ সহানুভূতি। তরুবর লতিকাকে বলিল—"তুমিও ওদের এক জন সভ্য হলে পারতে।"

লতিকা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল—"আমি অসভ্যাই থাকি।"

তার পর গুন্ গুন্ করিয়া সুরের সঙ্গে গাহিল—

"তুমি তরু, আমি লতা,
আমার বলো কিসের ব্যথা!"

—আনন্দে, গর্ব্বে ও আত্মপ্রসাদে তরুবরের হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

* * * *

ঠং ঠং।

সমিতির ক্লকটায় দু'টা বাজিল এবং তখনি সমিতির কাজ আরম্ভ হইল।

রেবা সমাদ্দার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"আজ আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

সুরবালা কহিল—"বলুন!"

"দেখুন, পুরুষরা কত দূর আমাদের……"

চঞ্চলা চৌধুরী কথাটায় বাধাদান করিয়া কহিল—"পুরুষ বললে ব্যাকরণগত একটু দোষ হয়ে পড়ে। আমাদের লক্ষ্য—সমস্ত পুরুষ-জাতি নয়, আমাদের লক্ষ্য শুধু পতিরা।"

প্রেসিডেণ্ট হিসাবে সুরবালা বলিল, "উনি যে পুরুষদের কথা বলছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা কারো না কারো পতি ছিলেন। আপনি বলে যান।"

রেবা সমাদ্দার বলিয়া যাইতে লাগিল—"পুরুষরা আমাদের কি পরিমাণে হেয় জ্ঞান করে আসচে, একবার ভেবে দেখুন। এমন আমাদের হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য শাস্ত্রের মধ্যে পর্য্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছে—'পথে নারী বিবর্জ্জিতা!'—'স্ত্রী-বুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী'

ইত্যাদি। আমাদের বিরুদ্ধে ঘরোয়া প্রবাদ সৃষ্টি হ'তেও বাকী থাকেনি—

'বনের সাপ বনে থাকে,
ঘরের সাপ নারী।
দুধ-কলা দে পুষবে তবু—
ছোবল্ খাবে তারি।

ইংরেজদের বাইবেলে পর্য্যন্ত মানব জাতির দুঃখের জন্ম নারীকে অর্থাৎ ঈভ্‌কে দায়ী করা হয়েচে!—এর একটা বিহিত করা কর্ত্তব্য।"

নীহার গাঙ্গুলী কহিল—"আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এ প্রস্তাবের সমর্থন করচি। এ বিষয়ে জোর প্রবন্ধ লিখে সংবাদপত্রে এবং মাসিকপত্রে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।"

এই সময়ে ফিস্-ফিস্ করিয়া শ্রীমতী স্বস্তিকা সোম সুরবালাকে কহিল—"আমাদের দুঃখের আর পার নেই। দেখুন, আমার পতি হচ্চেন এক জন কবি। চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি কবিতার মধ্যে মশ্‌গুল্ হয়ে আছেন; জ্যান্ত কবিতার দিকে একবারও ফিরে তাকান না। লেখবার সময় কাছে গেলে মুখ-টুখ সিঁটকে দূর-দূর করে তেড়ে আসেন।"

সুরবালা সমবেদনার স্বরে কহিল—"কবিতা আর বনিতা দুই-ই সমশ্রেণীর আরাধনার বস্তু! এ হলো শাস্ত্রীয় বচন। তবে এটা হলো কলিকাল কি না, সুতরাং উল্টো বিচার হবে। আপনি বিনা আরাধনাতে যদি কাছে যান, দূর-দূর করে পতি তো তেড়ে আসবেই। আপনি কি বলেন?" বলিয়া সুরবালা তাহার এ-পাশের সভ্যাটির দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—"ওঁকে তো শুধু তেড়ে আসেন, আমাকে মারেন!"

সবিস্ময়ে সুরবালা কহিল—"মারেন!"

"মারেনই তো। সে দিন বই পড়তে-পড়তে হাতের বইখানাই ছুড়ে মারলেন।"

"অপরাধ?"

"অপরাধ, একটু বায়োস্কোপ দেখবার সখ আছে! তা আমার দু'-এক জন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখতে যাই। তাতে কি অপরাধ, তা এই সাত বছরেও বুঝে উঠতে পারলুম না। সে দিন মিষ্টার মুখার্জ্জির সঙ্গে 'গোপন প্রেম' দেখতে গিয়েছিলুম! বাড়ী ফিরে আসতেই……"

বাধা দিয়া ও-ধারের একটি সভ্যা—শ্রীমতী বন্দিনী নন্দী—বলিয়া উঠিলেন, "আরে, আপনি তো বন্ধুদের সঙ্গে বায়োস্কোপ্ দেখতে যান! আমি কোথাও যাই না, দিন-রাতই ঘরের কোণে পড়ে থাকি……"

মৃদু হাস্যের সহিত সুরবালা কহিল—"সে তো আপনার নামেতেই প্রকাশ! তা, কি বলছিলেন বলুন।"

"বলছিলুম যে, দিনরাতই ঘরের কোণে বন্দিনী হয়ে আছি। আর উনি রোজ সন্ধ্যা না হতেই সেজে-গুজে সেণ্ট্ মেখে ঘড়ি-ছড়ি নিয়ে পাণ চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে যান আর ফেরেন রাত একটা-দু'টোয়। কোনো দিন বা ফেরেনই না! তাই আর থাকতে না পেরে সে দিন মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করতে গেলুম—"

"তাতে কি জবাব দিলেন?"

"মুখের জবাব কিছু পেলুম না! পেলুম তাঁর ছড়ির জবাব—পিঠের ওপর!"

রাগে আর দুঃখে সকলেরই মুখের ভাব কি-এক-রকম হইয়া গেল।

এই সময়ে সভ্যা হইবার ইচ্ছায় তিন জন নবাগতা প্রবেশ করিল। সেক্রেটারী বিজলী সেন তাহাদের নাম-ধাম আদি রেজেষ্ট্রীভুক্ত করিতে বসিল।

"আপনার নাম?"

"মৌমাছি মিত্র।"

"ঠিকানা?"

"৩।২, ফুলবাগান এভেনিউ।"

"আপনার নাম?"

"নিশীথিনী গুপ্ত।"

"আপনার পতির পেশা?"

"পেশা?—দিনরাত আমায় গালাগালি। এখন চাকরী নেই, পেন্সন নিয়েছেন। যত দিন চাকরী ছিল, দুপুর-বেলাটা তবু একটু রেহাই পেতুম! এখন চব্বিশ ঘণ্টাই আমার সঙ্গে লেগে আছেন।"

সকলের মিশ্র চাপা হাসিকে ঠেলিয়া মীনাক্ষীর উচ্চ হাসিতে ঘরখানা ভরিয়া উঠিল।

"আপনার নাম কি ভাই?"

"অভাগিনী ব্যানার্জ্জী।"

"পতির নাম?"

"ফালীফরণ ব্যানার্জ্জী।"

ফের একটা চাপা হাসির রোল উঠিল। সুরবালা কহিল, "বুঝলুম, আপনার পতির নাম 'কালী' উচ্চারণ করবেন না বলে 'ফালী'—কিন্তু 'চরণে'র বদলে 'ফরণ' কেন?"

"ওটা যে আবার আমার শ্বশুরের নাম।"

মৃদু হাস্যে সুরবালা কহিল—"আপনি এত আইন-সঙ্গত হিসেবে চলেও পতির কাছ থেকে নিশ্চয়ই অবিচার পাচ্ছেন। আপনার ভাগ্যে আর নামে যথার্থ ই মিল হয়ে গেছে।"

অতঃপর বিজলী সেন খাতার উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া কহিলেন—"আর কেউ নতুন সভ্যা নেই তো?"

"আমি আছি"—বলিয়া বিমর্ষ মুখে লতিকা ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রথমটায় সকলে মনে করিয়াছিল, স্বামি-ভাগ্যে ভাগ্যবতী লতিকার ইহা রহস্য মাত্র! কিন্তু তাহার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ের সহিত সকলে ইহা সত্য বলিয়া স্থির করিল।

লতিকা সুরবালার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরের বারান্দার এক কোণে লইয়া গেল। সেখানে একখানা বেঞ্চ পাতা ছিল, দুই জনে তাহাতে বসিল। লতিকা কহিল—"দিদি, আপনাদের ধারণাই ঠিক। স্বামীরা যে এত স্বার্থপর, এদের ভালোবাসা যে খালি মুখের ভালোবাসা, তার মধ্যে যে কোন আন্তরিকতা নেই, এত দিন পরে আমি তা বুঝলুম।"

"কি হয়েচে বলুন তো?"

"আমি জানতুম, অন্ততঃ আমার স্বামী আমাকে খুবই ভালোবাসেন! কিন্তু আজ তাঁর আসল রূপ বের হয়ে পড়েচে।" বলিয়া লতিকা নীরবে মুখ নীচু করিয়া রহিল। সকল কথা তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না, আবার না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছে

না! অবশেষে সুরবালার পীড়াপীড়িতে সব কথা খুলিয়া বলিল। যাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

লতিকার পিতা এক জন পয়সাওয়ালা কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। লতিকা তাঁহার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল বলিয়া মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি লতিকাকে ২১ হাজার টাকা দিয়া যান। টাকাটা লতিকার নামে ব্যাঙ্কে জমা ছিল। সে আজ তের বৎসরের কথা। লতিকার তখন সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। তরুবর সেই ২১ হাজারের মধ্যে এই কয় বৎসরে ১৫ হাজার টাকা লতিকার দ্বারা ব্যাঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া সংসার-খরচে চালাইয়াছে। এদিকে লতিকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাংসারিক অবস্থা বর্ত্তমানে কোন কারণে হঠাৎ হীন হওয়ায় কোন একটা ব্যাপারে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং সে বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য গোপনে সে ভগিনীর শরণাপন্ন হয়। লতিকাও গোপনে তাহাকে ঐ ছয় হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার টাকা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। গত কাল সে তাহার দাদার বাড়ী গিয়া তাহার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কাজটা গোপন না থাকিয়া কালই তরুবর কি করিয়া তাহা জানিতে পারে এবং লতিকা সন্ধ্যার পর এ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ দিয়া সে যে কাণ্ড বাধায়, তাহা ইতর শ্রেণীর মধ্যেও দেখা যায় না!

সমস্ত শুনিয়া সুরবালা কহিল—"তা হলে বিষম রেগেছেন?"

"সাংঘাতিক।"

"তা'হলে বলুন, ১৩ বৎসরের পোষা বেড়াল এক দিনেই বুনো বাঘে পরিণত!"

"ঠিক তাই।" সকাল-সকাল খেয়ে ব্যাঙ্কে গেছেন, পাকা খবরটা জানবার জন্য। এসেই আবার কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাবেন! কি ভয়ানক স্বার্থপর বলুন তো! স্বামী জাতটাই দেখচি বর্ণচোরা! কখন যে কি······"

"দেখুন, কে-একজন লেখক ছিলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে এত ভালোবাসতেন যে, সম্রাট্ সাজাহানও বোধ হয় মমতাজকে অমন ভালোবাসতে পারেননি। তাঁর সেই স্ত্রী মারা গেলে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাঁর সমস্ত চোখের জল দিয়ে একখানা বই লিখলেন। তার পর কি হলো বলুন দেখি?"

"সন্ন্যাসী হলেন বোধ হয়!"

একটু হাসিয়া সুরবালা কহিল—"না। আবার বিয়ে তিনি করলেন।—বুঝতে পারলেন না? স্বামীরা নিজের আনন্দের ঝুলি ভরাবার জন্যই স্ত্রীকে ভালোবাসে। স্ত্রীকে ভালবেসে তাঁরা নিজেরা সুখী হন। স্ত্রীর জন্য স্ত্রীকে ভালোবাসেন না।"

"যাই হোক, আজ থেকে দিদি, আমিও আপনাদের সমিতির সভ্যা হবো। আমার নামটাও আপনাদের খাতায় লিখে নিন।"

"চলুন। আজ শনিবার, সমিতি এখনি বন্ধ হবে।"

"কাল রবিবার বন্ধ থাকবে?"

"নিশ্চয়।"

তখন দুই জনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

সে রাত্রে তরুবর আর গৃহে ফিরিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লতিকা অনাহারে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তার 'ব্ল্যাক্-আউটে'র সঙ্গে তাহার মনের 'ব্ল্যাক্ আউট' মিশিয়া একাকার হইল। রাত প্রায় একটা পর্য্যন্ত এই ভাবে থাকিয়া লতিকা শয়ন করিল।

পরদিন বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় তরুবর যেন ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অবস্থায় গৃহে ফিরিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় ভীষণ ক্রোধ-ব্যঞ্জক, দৃষ্টি জ্বালাময়। সঙ্গে তাহার মামাতো ভাই পরেশনাথ। নিষ্কর্ম্মা পরেশনাথ পূর্ব্বে তরুবরেরই অন্ন ধ্বংস করিত, আর চায়ের দোকানে-দোকানে আড্ডা জমাইত। লতিকা তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। অনেক চেষ্টায় তাহাকে সে এ বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছিল। আজ তরুবর তাহাকে লইয়াই গৃহে ফিরিল। আসিয়াই হাতের ছাতাটা টান মারিয়া একধারে ফেলিল, জুতো-জোড়া বারান্দার কোণে ছুড়িয়া দিল। দালানের দড়িতে লতিকার একখানা ভালো শাড়ী শুকাইতেছিল, ফড়-ফড় করিয়া সেখানে ছিঁড়িয়া তাহারি একটা ফালি দিয়া মুখের ঘাম মুছিল; তার পর পরেশনাথের উদ্দেশে কহিল—"পরেশ, খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস। লে আও মুরগী, পেঁয়াজ, আদা য়্যাণ্ড এট্‌সেটরা।"

বলিয়া তাহার হাতে একখানা পাঁচ টাকার নোট দিয়া সারা বাড়ীময় বীরদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বেলা প্রায় একটার সময় দু'জনের খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস ভোজন হইয়া গেলে তরুবর বলিল—"এইবার 'পতি-সংশোধনী সমিতি'র শ্রাদ্ধ করতে হবে। আয় পরেশ।"

অতঃপর সমিতি-ঘরের তালা ভাঙ্গা হইল এবং আলমারী, র‍্যাক, টেবিল, কাগজ-পত্র ইত্যাদি সব তচ্-নচ্ করা হইল।

পরেশ কহিল—"এ সব নষ্ট না করে আসুন না দাদা, এইখানে আমরা একটা সমিতি বসাই। ঠাট্-বাট্ সব তৈরী।"

"ঠিক বলেছিস পরেশ! আমরা এখানে 'স্ত্রী-সংশোধনী সমিতি' বসাবো। আজ থেকেই বসাবো। স্ত্রীদের একেবারে জব্দ করতে হবে।"

এই সময় এক জন আগন্তুক জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই ঘরেই কি 'পতি সং···"

পরেশ কহিল—"এখন আর পতি-সং নয়, এখন স্ত্রী-সং।"

তরুবর ভদ্রলোকটিকে সাদরে আহ্বান করিয়া ভিতরে আনিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এঁদের কর্ত্তা হলেন কে?"

"কর্ত্তা নয়—কর্ত্রী। তাঁর নাম হলো শ্রীমতী সুরবালা দাসী। চেনেন না কি?

"বিশেষ ভাবে। চোখে সোণার চশমা আছে তো? বাঁ চোখের ভুরুর পাশে একটা তিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

একটু হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"তিনি এই অধমেরই অর্দ্ধাঙ্গিনী।"

"তাই না কি?"

তখন প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া তরুবর ও অচিন্ত্য বাবুর মধ্যে বহু কথা, বহু আলোচনা, বহু পরামর্শ হইল। উভয়ের আনন্দ আর ধরে না!

অচিন্ত্য বাবু আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে কহিলেন—"তা' হলে শুভ কাজে বিলম্ব উচিত নয়। আসুন, আজ থেকেই আমাদের

'স্ত্রী-সংশোধনী' সুরু করা যাক্! ঐ সব খাতা-পত্রেই কাজ চলবে। আজ হলো রবিবার, ওঁরা আজ আর আসবেন না। কাল এসেই দেখবেন যে……"

"কিন্তু সাইনবোর্ডখানা বদ্‌লাতে হবে যে।"

পরেশ কহিল—"তার জন্য আর ভাবনা কি! আমার চেনা লোক আছে। এখনি তাকে আমি ডেকে আনচি।"

পরেশ তখনই বাহির হইয়া গেল এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রং, তুলি প্রভৃতি সমেত সাইন্‌বোর্ডওলাকে ধরিয়া আনিল।

বোর্ডখানা দেখিয়া সে বলিল—"আজ আর কি করে হয়! ওটা খুলে নামাতে হবে, তার পর পোঁচ্‌ড়া টেনে নতুন একটা জমি করে নিয়ে শুকোতে হবে; তার পর তার ওপর লিখতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি করলেও দু'টো দিনের কমে হবে না, বাবু।"

মহা মুস্কিল!

সকলেরই মন খারাপ হইয়া গেল। তরুবর বলিল—"তাই তো, কি করা যায়! তেরস্পর্শ-যোগে আজকেই কাজ সুরু করতে পারলে বড় ভালো হতো।"

হঠাৎ অচিন্ত্য বাবু লাফাইয়া উঠিলেন—"আজকেই হবে, এক্ষুনি হবে। দেখ বাপু, এক কাজ করো। তোমায় বোর্ড নামাতে হবে না, জমিও করতে হবে না, নতুন করে কিছু লিখতেও হবে না। তুমি শুধু আমাদের জুতোর 'হীল'-য়ে একটা পেরেক ঠুকে দাও।"

লোকটা অবাক্ হইয়া অচিন্ত্য বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"বুঝতে পারলে না? সব যেমন আছে, তেমনি থাকবে। শুধু—'পতি'র 'ত'য়ের নীচে একটা 'ন' জুড়ে দাও, আর 'ি'-কারে একটা পোচ্‌ড়া দিয়ে 'ত্ন'য়ের পাশে একটা 'ী' বসিয়ে দাও। তা'হলেই কাম ফতে! একেবারে 'পত্নী-সংশোধনী সমিতি'। ও স্ত্রী আর পত্নী একই কথা। বুঝলে না?"

সাফল্যের আনন্দে তখন তরুবর ও অচিন্ত্য বাবু ঘরের বাতাসকে তোলপাড় করিয়া একটা বিকট কোলাহল তুলিল।

তৎক্ষণাৎ একটা মই আসিয়া পড়িল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই 'পতি-সংশোধনী সমিতি' 'পত্নী-সংশোধনী সমিতি'তে পরিণত হইয়া জল্ জল্ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'পত্নী-সংশোধনী'র উদ্বোধন-কার্য্য চলিল। তার পর অচিন্ত্য বাবুর দিকে চাহিয়া সহাস্যে এবং জোড় হাতে তরুবর কহিল—"একটি সবিনয় নিবেদন!"

"অনুমতি করুন।"

"আজকের শুভদিনে এইখানে একটু ভোজনের আয়োজন……"

তেমনি হাসিতে হাসিতে অচিন্ত্য বাবু কহিলেন—"কোন আপত্তি নেই।"

তৎক্ষণাৎ পরেশকে বাজারে ছুটিতে হইল। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল—"এ-বেলা তা হলে কি হবে, বলুন?"

"ও-বেলা হয়েচে খিচুড়ী য়্যাণ্ড মাংস, সুতরাং এ-বেলা চোক-পোলাও ধ্বংস। যাও, জোগাড় করে ফেল।"

পরদিন প্রাতে পথিকেরা সমিতির নূতন সাইনবোর্ড দেখিয়া সচকিতে দাঁড়াইয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে এক জন বলিল—"এ নিশ্চয়ই ভুতুড়ে কাণ্ড! রাতারাতি ভূতে আমদানী হয়েচে!"

দেখিতে দেখিতে এ-পাড়া হইতে, ও-পাড়া হইতে, সে-পাড়া হইতে বহু ভদ্রলোক আসিতে আরম্ভ করিল এবং দেখিতে দেখিতে বহু পতি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া গেল।

'পতি-সংশোধনী'র নূতন সভ্যা তিন জন—মৌমাছি, নিশীথিনী ও অভাগিনী—তাহাদের নূতন উৎসাহের জন্য সে দিন বেলা একটার পূর্ব্বেই সমিতিতে যোগদান করিবার জন্য আসিয়া দেখে, তাহাদের সাইনবোর্ডস্থ 'পতি' বোর্ড ত্যাগ করতঃ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দলবদ্ধ হইয়াছে এবং সকলে মিলিয়া বিষম হট্টগোল সুরু করিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া তিন জনে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া অদূরবর্ত্তী এক বকুলতলার ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। কিছু পরে আরও পাঁচ-সাত জন সভ্যা আসিল। তাহাদের সঙ্গে আসিল মীনাক্ষী। তা'দেরও গিয়া বকুলতলায় আশ্রয় লইতে হইল। তাহার পর আসিল সুরবালা। সুরবালা আসিয়া দেখিল, ঘরের সম্মুখে ভীড় জমিয়াছে এবং ভিতরে মহা হট্টগোল! সেই হট্টগোলের মধ্যে অচিন্ত্য বাবু উচ্চ গলায় বলিতেছেন—"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' —এই কথাটাকে আমাদের গ্রন্থ থেকে একেবারে বাদ দিতে হবে, আর গভর্ণমেণ্টের কাছে 'ডেপুটেশান্' পাঠিয়ে অনুরোধ করতে হবে যে, যেহেতু, পত্নীদের পতিনিন্দা ছাড়া আর দ্বিতীয় কাজ নেই, সেহেতু, উঁহাদের 'এ-আর-পি'তে নিযুক্ত করা হোক্।"

একবার ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সাইনবোর্ডখানার দিকে চাহিয়া সুরবালাও বকুলতলায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে তাহার বুকের মধ্য হইতে একটা সুগভীর নিশ্বাস বাহির হইয়া বকুলতলার বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল।

মীনাক্ষী কহিল—"সুরোদি, এই ভীষণ অত্যাচার সামনে দেখেও নেহাৎ অবলারই মত এই বকুলতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে?"

"কি করবো?"

"কি করবে! এখনো ভয়ে-ভয়ে থাকা? আজ বাদে কাল যখন 'ডিভোর্স য়্যাক্ট' পাশ হতে যাচ্ছে, তখনো তুমি…"

"পারবে তোমরা?" উৎসাহিত হইয়া সুরবালা কহিল—"পারবে তোমরা, ওই ভূত-প্রেতের দলকে গলাধাক্কা দিয়ে সমিতি-ঘর থেকে দূর করে দিতে পারবে?"

সকলে সমস্বরে বলিল—"পারবো, নিশ্চয় পারবো।"

তখন অপূর্ব্ব ভঙ্গী এবং বীরত্বের সঙ্গে সকলে সমিতি-ঘরের দিকে ধাবমান হইল।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন জৈন সমাজে নারীর স্থান

আমি পূর্ব্ব-প্রবন্ধে 'বৌদ্ধ সমাজে নারীর স্থান' সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিয়াছি। এবার জৈন সমাজে নারীর কথা বলিব। জৈন এবং বৌদ্ধ উভয় সমাজই হিন্দু সমাজের আত্মজ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর রাজা পরীক্ষিতের এবং রাজা জনমেজয়ের কথা কিছু জানা যায়। তাহার পরই ভারতের ইতিহাস তিমিরাবগুণ্ঠিত। জনমেজয়ের পর হইতে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের দশা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে অনুমানে মনে হয়, ঐ সময় হিন্দুধর্ম্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব কথঞ্চিৎ ম্লান হইয়া প্রায়শঃ আড়ম্বর-বহুল নাস্তিক অনুষ্ঠানে পূর্ণ হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের রক্ষক ঋষি-তপস্বীদিগের তিরোধান ঘটিয়াছিল। সেই সময় কলির প্রবেশ হয়, পুরাণে এ কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাণহীন ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ কতকগুলি মহাপুরুষ হিন্দুধর্ম্মমতের সহিত কতকটা ভিন্নমত হইয়া নূতন ধর্ম্মমত প্রচার করেন। তন্মধ্যে জৈন এবং বৌদ্ধ-মতই প্রধান। বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিবার কিছু পূর্ব্বে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের আবির্ভাব হইয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন, পার্শ্বনাথ খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি জৈনদিগের ২৩ম তীর্থঙ্কর বা জীন। ইঁহার পরেই জৈনধর্ম্মে চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বা জীবন মহাবীরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইনি বৈশালী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মগধের রাজা বিম্বিসারের সহিত তাঁহার কুটুম্বিতা ছিল। ইনি পার্শ্বনাথের অনেক মত সমর্থন করেন। পার্শ্বনাথের কতকগুলি শিষ্য ইঁহার মত গ্রহণ করেন। কিন্তু কি পার্শ্বনাথ, কি মহাবীর, কেহই জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন না। জৈনধর্ম্মের আদি তীর্থঙ্করের নাম ঋষভ বা বৃষভ। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতির পুত্র ছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, জৈনধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন। কারণ, কোন স্মরণাতীত যুগে ঋষভের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা এখন আর নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই নাই। বৌদ্ধ-জাতক প্রভৃতির ন্যায় জৈনদিগের পুরাণ অধিক নাই। কাজেই, ঋষভ বা বৃষভ ওরফে আদিনাথের সময় হইতে পার্শ্বনাথের আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত জৈন-ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইঁহাদের অঙ্গ, উপাঙ্গ, প্রকীর্ণক, ছেদসূত্র, মূলসূত্র ও সূত্র প্রভৃতি কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ বিদ্যমান। উহা অর্দ্ধ-মাগধী ভাষায় লিখিত।

প্রাচীন জৈনরা পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তবে ইঁহারা আত্মিক শক্তি স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে সকল বস্তুই সচেতন। ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া ইঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন হিন্দুদিগের গার্হস্থ্য জীবন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ হইয়াছে। কারণ, ভগবানে বিশ্বাস মানুষের জীবনধারাকে যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, ভগবানে অবিশ্বাস ঠিক সে ভাবে মানব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'প্রাচীন জৈন সমাজে নারীর স্থান' সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহা হিন্দু সমাজে নারীর স্থান হইতে কিছু ভিন্নরূপ ছিল। জৈন সমাজে যে সকল কাহিনী দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, রাজমহিষীরা রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। তবে তাঁহারা যবনিকার অন্তরালে থাকিতেন। এখন দেখা যায় যে, জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী মাড়োয়ারী মহিলারা প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইয়া থাকেন। তবে তাঁহারা সর্ব্বথা মস্তক অনাবৃত করিয়া মারহাট্টা মহিলাদিগের ন্যায় বাহির হন না। মস্তক অনেকটা অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া তবে পথে বাহির হন। দোহদ বা গর্ভধারণ কালে নারীদিগের মনে যে বাসনার উদয় হইত, প্রাচীন যুগের জৈন স্বামী তাহা যথাসাধ্য পূর্ণ করিতেন। জৈনদিগের উপপাঠিকা গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে, যাহাতে ঐ সময়ে নারীদিগের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য স্বামী কত দূর স্বাধীনতা দিতেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শালাটবী নামক দস্যুগ্রামের অধিপতি বিজয়ের মহিষীর নাম ছিল স্কন্দশ্রী। গর্ভধারণ কালে স্কন্দশ্রীর সাধ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সমস্ত সহচরী, সখী ও আত্মীয়-কুটুম্ব নারীর সহিত সৈনিক এবং সেনানী পুরুষদিগের ন্যায় পোষাক ও সাজসজ্জা করিয়া সমস্ত শালাটবী নগরী পরিক্রমণ করিবেন। রাজা বিজয় রাণীর সেই বাসনার কথা জানিতে পারিয়া তিনি সে বিষয়ে রাণীকে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে রাণী তাঁহার সখী, সহচরী, দাসী এবং আত্মীয়া কুটুম্বিনীদিগকে লইয়া পুরুষ-যোদ্ধাদিগের ন্যায় সামরিক বেশ পরিধানপূর্ব্বক সামরিক বাদ্যভাণ্ড লইয়া সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন (উপ, ৪১)। স্ত্রীর সাধ পূরণের জন্য কোন হিন্দু গৃহস্থ বা রাজা এত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ কাহিনী কুত্রাপি পাওয়া যায় না। জৈন নারীরা পুরুষ-রক্ষকশূন্য হইয়াও বাটীর বাহিরে দূরে গমন করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত জৈন-পুরাণগ্রন্থে পাওয়া যায়। পলাসপুর গ্রামে এক কুম্ভকার বাস করিত। তাহার নাম সদ্দালপুত্র। তাহার স্ত্রী অগ্নিমিত্রা একটি মাত্র দাসীকে সঙ্গে লইয়া বহু দূরস্থ মহাবীরের নিকট গো-শকটে করিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা কোনরূপ ভয় করিতেন না। প্রাচীন জৈনদিগের মধ্যে রাজা-রাজড়াদিগের অন্তঃপুর ছিল। সেই অন্তঃপুরে বহু কুব্জপৃষ্ঠ, খর্ব্বাকার, বিকৃতাকার ও কদাকার নারী এবং নানা জাতীয় বিদেশী নারী থাকিত। যুদ্ধে যাহাদিগকে রাজা বন্দিনী করিতেন, তাহারাই অন্তঃপুরে স্থান পাইত বলিয়া মনে হয়। দাস-দাসীরা প্রায় কদাকার হইত এ সকল কথার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জিত থাকিতে পারে। সাধারণ লোকের গৃহে অন্তঃপুরে কদাকার বা কুব্জ দাসদাসী থাকিত বলিয়া মনে হয় না।

জৈনদিগের মধ্যে আর একটা বিশেষ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখন তাহা ঐ সমাজে প্রচলিত আছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। কোন মড়ঞ্চে পোয়াতির ছেলে হইলে সেই ছেলেকে প্রসূতি বাড়ীর আঁস্তাকুড়ে বা জঞ্জাল-স্তূপে ফেলিয়া দিয়া আবার তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতেন। টিপাকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, বাণিজ গ্রামের শ্রেষ্ঠী বিজয়মিত্রের পত্নী সুভদ্রার সন্তান হইয়া বাঁচিত না। একবার তাঁহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি উহাকে গোপনে জঞ্জাল-স্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে তাহাকে তথা হইতে কুড়াইয়া লইয়া আসিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া লালনপালন করিতে থাকিলেন। পূর্ব্বে হিন্দু-সমাজেও কেহ কেহ এইরূপ করিতেন। ইহার কারণ, লোকের বিশ্বাস, ঐরূপ করিলে আর তাহাকে যমে ছুঁইবে না। সাহঞ্জনী গ্রামের বণিক্ সুভদ্রের পত্নী সুভদ্রার সন্তান হইলে মরিয়া যাইত। কিছুতেই বাঁচিত না। একবার তাহার একটি পুত্র জন্মিলে তিনি এবং তাঁহার স্বামী উভয়ে সেই পুত্রকে একটি

মালবাহী শকটের নিম্নে নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। এখন কেহ ঐরূপ করে কি না, জানি না। তবে নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে কেহ কেহ ঐরূপ করিতেও পারে। উহাদের বিশ্বাস এই যে, শকটের নিম্নে পড়িলে শিশুর মৃত্যু হইবেই, তবে তথায় ফেলিয়া দিলে তাহার সে রিষ্টি কাটিয়া যাইবে। অধুনা আমাদের দেশে যেমন মৃতবৎসা প্রসূতির সন্তান হইলে তাহার নাম নিসি, নিসিন্দী, গুয়ে প্রভৃতি রাখে, প্রাচীন জৈন-সমাজেও মৃতবৎসা প্রসূতির ঐরূপ নাম রাখা হইত। মৃতবৎসা প্রসূতির পুত্রদিগের নাম এখনও কুড়নে, কুড়ানী, বেচা, কেনা, হারাণে প্রভৃতিও রাখা হয়। প্রাচীন কালেও তাহা হইত। জৈন গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারা যায়। হিন্দু সমাজেও এইরূপ এখনও আছে।

বিবাহ

বিবাহ ব্যাপারে প্রাচীন জৈন সমাজের প্রথা হিন্দু সমাজের প্রথা হইতে কিছু স্বতন্ত্র লক্ষিত হয়। আবার অনেক বিষয়ে হিন্দু সমাজের সহিত উহা একই প্রকারের ছিল। হিন্দু সমাজের ন্যায় জৈন সমাজে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ একই দিনে বহু কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। সাধারণ গৃহস্থরাও একাধিক বিবাহ করিতেন। বাঙ্গালায় কুলীনের সন্তানগণ যেমন কিছু দিন পূর্ব্বে বহুবিবাহ করিতেন, জৈন সমাজে গৃহস্থগণ সেইরূপ কেহ কেহ অধিক সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। রাজগৃহের মহাশ্বগ নামক এক জন বণিকের তেরটি গৃহিণী ছিল। ইনি মহাবীরের নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন বলিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাবীরের নিকট ইনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ইনি আর অধিক বিবাহ করিবেন না। ইহাতে মনে হয়, মহাবীর অধিক বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বহু বিবাহের যুগে সপত্নী-বিদ্বেষ যে অতিশয় প্রবল ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজগৃহের মহাশ্বগ নামক শ্রেষ্ঠীর তেরটি পত্নী ছিল, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাঁহার প্রধানা পত্নীর নাম ছিল রেবতী। একদা নিশীথে নিদ্রাভঙ্গের পর রেবতী চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার দ্বাদশটি সপত্নীর জন্য দাম্পত্য সুখ সম্পূর্ণ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। ক্রমে তিনি ছয় জন সপত্নীকে অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ছয় জনকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা হইতে সপত্নী-কলহ ও বিদ্বেষ কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা বুঝা যায়।

বিবাহ সম্বন্ধে জৈনগ্রন্থে কতকগুলি বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণিত আছে। চম্পা নগরে এক বৈশ্য বাস করিতেন, তাঁহার এক কন্যা ছিল, তাহার নাম সুকুমারিকা। একদা ঐ নগরের জিনদত্ত নামক আর এক জন ধনাঢ্য বৈশ্য রাজপথ দিয়া গমনকালে সুকুমারিকাকে তাহাদের বাড়ীর ছাদে খেলা করিতে দেখিতে পাইলেন। জিনদত্ত সুকুমারিকার সৌন্দর্য্য দর্শনে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র সাগরের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করেন। সুকুমারিকার পিতা কহিলেন, তিনি তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, সুতরাং তাহাকে পরগৃহে পাঠাইবেন না। তবে যদি সাগর তাঁহার গৃহে আসিয়া গৃহ-জামাতারূপে বাস করেন, তাহা হইলে তিনি জিনদত্তের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত আছেন। জিনদত্ত গৃহে আসিয়া তাহার পুত্র সাগরকে সকল কথা বলিলেন। সাগর 'মৌন সম্মতি' দিল, নির্দ্দিষ্ট দিনে উভয়ের বিবাহ হইল। বরযাত্রিগণ ভোজনান্তে যে যাহার গৃহে গমন করিল। সাগর বাসরঘরে গমন করিল। কিন্তু সুকুমারিকার সন্নিহিত হইলে তাহার বোধ হইয়াছিল, তাহার গাত্রমাংস যেন ক্ষুর দ্বারা কর্ত্তিত হইতেছে। সে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকিল। কিন্তু ক্ষণপরে বধূ নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সাগর গৃহের অন্য স্থানে গিয়া শয়ন করিল। তাহার পর নিদ্রাভঙ্গে সুকুমারিকা দেখিল, তাহার পতি তাহার নিকটে নাই। সে সেই শয্যা হইতে উঠিয়া পতি যেখানে শুইয়াছিল, সেইখানে তাহার পার্শ্বে যাইয়া শয়ন করিল। আবার বধূর সান্নিধ্যহেতু বরের গাত্রে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। একটু পরে সুকুমারিকা নিদ্রিত হইয়া পড়িলে সাগর সেই বাসরগৃহ হইতে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে যখন কন্যার জননী তাঁহার দাসীদিগকে কন্যার এবং জামাতার মুখ-প্রক্ষালনের দ্রব্যাদি দিয়া আসিতে বলিলেন, তখন দাসীরা আসিয়া দেখিল, জামাতা তথা হইতে পলায়ন করিয়াছে, কন্যা বিষণ্ণ মনে একাকিনী তথায় বসিয়া আছে। কন্যার পিতাকে সেই কথা জ্ঞাপন করা হইল। তিনি উহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ এবং বিক্ষুব্ধ হইয়া জিনদত্তের গৃহে গমন করিয়া জামাতার এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। জিনদত্ত পুত্রকে সেই কথা বলিলে সাগর সমস্ত কথা বলিয়া বলিল যে, সে প্রাণান্তেও আর শ্বশুর-গৃহে যাইবে না। জিনদত্ত তাঁহার বৈবাহিককে সেই কথা জ্ঞাপন করিলেন। তখন কন্যার পিতা লজ্জিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কন্যাকে কহিলেন যে, অতঃপর তিনি তাহার জন্য এমন একটি পাত্র দেখিবেন যে, পাত্র তাঁহার কন্যাকে ভালবাসিবে। কিছু দিন পরে কন্যার পিতা একটি ভিখারীকে ধরিয়া আনিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। ভিখারীও কন্যার সন্নিহিত হইলে গাত্রে ঐরূপ তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া বাসর-ঘর হইতেই প্রাণভয়ে চম্পট দিল। তখন কন্যার পিতা হতাশ হইয়া কন্যাকে রন্ধনশালার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিলেন। সুকুমারিকা তখন রন্ধনশালার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। পরে তিনি এক জন মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ পাইয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। *

এই বিবরণ অনেকের নিকট অপ্রাকৃত মনে হইতে পারে। কিন্তু আমি কিছুকাল পূর্ব্বে এক মার্কিণী সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, কোন কোন নারীর দেহে এরূপ বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে যে, কেহ তাহার সন্নিহিত হইলে তাহার দেহে যেন সূচ ফুটাইবার মত জ্বালা ধরে। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই ঘটনার অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে. বিবাহ হইলে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কন্যার জৈন সমাজে পুনরায় বিবাহ দেওয়া যাইত। নতুবা সুকুমারিকার পিতা তাহার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিলেন কি করিয়া? ইহাতে অনুমান হয়, প্রাচীন জৈন সমাজে বহুবিবাহের মত বিধবা-বিবাহও প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিধবা-বিবাহের ব্যাপার অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বহু-বিবাহ প্রচলিত থাকায় সংসারে অনেক কলহ, বিবাদ এবং অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিত, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে রাজা-রাজড়ারা সেই জন্য বহুবিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার ফলে অনেক স্থলে অনেক অতি নৃশংস হত্যাকাণ্ডও অনুষ্ঠিত হইত। বিপাকশ্রুত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের রাজা সিংহসেনের পাঁচ শত মহিষী ছিল। কিন্তু তন্মধ্যে তিনি শ্যামা নাম্নী মহিষীকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং অন্য রাণীদিগের কোন সংবাদই লইতেন না। ঐ সকল রাণীর জননীরা যখন তাঁহাদের কন্যার এই দুঃখের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং যে কোন উপায়ে শ্যামাকে হত্যা করিবেন

* জ্ঞাতাধর্ম্ম কথা।

বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। শ্যামা সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া রাজা সিংহসেনকে সে কথা জানাইলেন। রাজা অবিলম্বে ইহার প্রতিকার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ইহার পর তিনি নগরের বাহিরে একটি পর্ব্বতাকার সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সৌধে অনেক দাহ্য পদার্থ ছিল। পরে তিনি তাঁহার সকল শ্বশ্রূমাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই সৌধে আনয়ন করেন এবং কয়েক দিন ধরিয়া তথায় তাঁহাদিগকে ভূরিভোজন করাইতে থাকেন। কিছু দিন পরে একদা গভীর রজনীযোগে রাজা জনকয়েক অনুচর লইয়া যাইয়া সেই সৌধের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলেন। অগ্নি দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং রাজার সমস্ত শাশুড়ীগুলিই তাহার মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। বিপাকশ্রুত গ্রন্থে এই কাহিনী বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। অবশ্য এরূপ নৃশংস অত্যাচার অতি অল্পই অনুষ্ঠিত হইত। পাষণ্ড সকল সমাজেই আছে, অহিংসা ধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ জৈন সমাজে এরূপ হত্যাকারী পাষণ্ড অল্পই ছিল এবং আছে; তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কোন সমাজ যে একেবারে পাষণ্ড-বর্জ্জিত হইবে, তাহা মনে করা বিষম ভুল।

একান্নবর্ত্তী পরিবার

জৈন সমাজে ঠিক একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রচলিত ছিল না। বিবাহের পর অনেক হিন্দুও পৃথগ্‌ভাবে বাস করিতেন। আবার কেহ কেহ একান্নবর্ত্তী থাকিতেন। এ বিষয়ে হিন্দু সমাজের সহিত জৈন সমাজের বিশেষ মিল ছিল। জৈনদিগের 'জ্ঞাতাধর্ম্ম কথা'য় বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন কালে চম্পা নগরে তিন ব্রাহ্মণ-ভ্রাতার বাস ছিল। তাঁহারা সকলেই সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা একান্নভুক্ত ছিলেন না। তাঁহাদের তিন জনের স্ত্রীর নাম ছিল যথাক্রমে নাগশ্রী, ভূতশ্রী, আর যক্ষশ্রী। একদা তিন ভ্রাতা কথাপ্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এখন যখন তাঁহাদের কোন অভাবই নাই, তখন তাঁহারা সস্ত্রীক পালাক্রমে এক এক জনের বাড়ীতে সকলে ভোজন করিবেন। তাঁহারা তাহাই করিতে থাকিলেন। এক বার নাগশ্রীর পালা পড়িলে নাগশ্রী বহু ব্যঞ্জনের মধ্যে একটি ব্যঞ্জন অনেক ঘৃত, তৈল এবং মশলা দিয়া রন্ধন করিলেন। রন্ধনের পর তিনি স্বয়ং তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য দেখিলেন, উহা অত্যন্ত বিস্বাদ হইয়াছে। ভ্রাতাদিগের উপহাস-শঙ্কায় তিনি তাহা সরাইয়া রাখিয়া আবার নূতন করিয়া উহা রন্ধন করেন। সকলে খাইয়া চলিয়া গেল। কয়েক দিন পরে ধর্ম্মরুচি নামক জনৈক যতী ভিক্ষার্থ নাগশ্রীর গৃহে আসিয়াছিলেন। নাগশ্রীর তখন সেই পর্য্যুসিত ব্যঞ্জনের কথা মনে পড়িল। তিনি তাহা ধর্ম্মরুচিকে দিলেন। ধর্ম্মরুচি উহা তাঁহার মঠাধ্যক্ষকে দেখাইলেন। মঠাধ্যক্ষ কহিলেন, উহা অভক্ষ্য, উহা ফেলিয়া দাও। ধর্ম্মরুচি উহা বাহিরে ফেলিয়া দিতে যাইয়া দেখিলেন যে, কয়েকটি পিপীলিকা উহা ভোজন করিয়া মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মরুচি ভাবিলেন যে, তিনি যদি উহা ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে অনেক পিপীলিকা এবং মক্ষিকা উহা খাইয়া মরিবে। অতএব তিনি স্বয়ং উহা ভোজন করিলেন। ভোজনমাত্র তিনি সেইখানে মরিয়া পড়িয়া রহিলেন। সেই কথা ক্রমে প্রকাশ পাইল। ভ্রাতা তিন জন সেই কথা শুনিয়া নাগশ্রীকে প্রহারপূর্ব্বক বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ-ভ্রাতৃত্রয় জৈনদিগের ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নাগশ্রী এবং যক্ষশ্রী নাম দেখিয়াই অনুমিত হয়। ভিক্ষাদান ব্যাপারে এইরূপ অপরাধ অমার্জ্জনীয় ছিল।

ধনাঢ্য সমাজে বেশ্যার আদর ছিল। বণিজ গ্রামের বেশ্যা কামধ্বজাকে সহস্র মুদ্রা দিলে পাওয়া যাইত। সে রাজার ন্যায় মস্তকে ছত্র ধরিত এবং বাহির হইলে তাহাকে চামর দ্বারা বীজন করা হইত। সে নানা বিদ্যায় নিপুণা ছিল। উজ্ঝটিক নামক জনৈক বণিক্-পুত্র কামধ্বজার প্রণয়ী ছিল: কিন্তু বণিজ গ্রামের রাজা মিত্রের মহিষী শ্রী অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতে রাজা উজ্ঝটিককে কামধ্বজার গৃহ হইতে বিতাড়িত করেন। উজ্ঝটিক গোপনে কামধ্বজার নিকট গমন করিতেন। রাজা উভয়কে এক সঙ্গে ধরিয়া ফেলেন এবং উজ্ঝটিকের প্রাণসংহার করেন। এইরূপ অনেক কাহিনীই জৈন-পুরাণে পাওয়া যায়।

ইহা ভিন্ন যুবকগণ বেশ্যালয়ে গোষ্ঠী (club) স্থাপন করিয়া তথায় সম্মিলিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। রাজা এই সকল গোষ্ঠী গঠনে অনুমতি দিতেন। ইহাতে যুবকদিগের অভিভাবক বা আত্মীয়গণ আপত্তি করিতে পারিতেন না। এই সকল গোষ্ঠীর অতি সুন্দর নামকরণ করা হইত। তৎকালীন হিন্দু সমাজেও এইরূপ গোষ্ঠী ছিল। বাৎসায়ন তাঁহার কামসূত্রে এইরূপ গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন (কামসূত্র ১।৪।৮)। মদ্যপানও সে কালে সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। জৈন-গ্রন্থে অনেক প্রকার মদ্যের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মদ্যপান হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভারতে যে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এবং মহাবীর উহা অনেক সংশোধন করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজ বা জৈন সমাজে তাহার প্রভাব পতিত হইয়াছিল।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই সময়ে প্রাচীন গ্রীসে ঠিক এইরূপ দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীসে এইরূপ বারনারীর গৃহেই বিদ্বজ্জন-সমাজের সমাবেশ হইত। ফ্রিইনে (Pheryne) নামক বারবনিতার মূর্ত্তি দেখিয়াই প্রাক্-সাইটেলস 'ভিনাস' দেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিয়াছিলেন। এই বারবনিতাকে এথেন্সের যুবকদিগের চরিত্রহানি করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইলে,—ইনি ইহার দেহের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। গ্লাইসেরা নাম্নী ফুলওয়ালীর সৌন্দর্য্য-কাহিনী গ্রীসের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। পেরিক্লিসের প্রণয়িনী এস্‌পেসিয়ার গৃহে এথেন্সের বিদ্বজ্জন-সমাজের সকলেই সমবেত হইয়া অনেক গভীর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। সক্রেটিসও ঐ এস্‌পেসিয়ার গৃহস্থ-গোষ্ঠীর প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন না। প্রকাশ, এস্‌পেসিয়াই পেরিক্লিসকে বাগ্মিতা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এস্‌পেসিয়ার গৃহস্থিত গোষ্ঠীতে এথেন্সের বড় বড় চিত্রকর, কবি, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক সমবেত হইতেন। লিয়নটিয়াম নাম্নী বেশ্যা এপিকিউরাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাময়ী শিষ্যা ছিল, তাঁহার গৃহেও বহু প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের সমাবেশ হইত। স্মির্ণার প্যাসাথিয়াসের কথাও ইতিহাস-বিশ্রুত। ইনি লুসিয়াস ভেরাসের উপপত্নী ছিলেন। গ্রীক্ লেখক লুসিয়ান ইহার অনেক পরে আবির্ভূত হইলেও ইঁহার সৌন্দর্য্য, মনীষা, উদারতা, এমন কি, ইঁহার শ্লীলতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ভারতের কামধ্বজা, সুদর্শনা, দেবদত্তা, লক্ষহীরা প্রভৃতির প্রভাব যে সাহিত্যিক-সমাজে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং তাহাদের গৃহে যে বহু বিদ্বানের সমাবেশ হইত, ইহা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় নহে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

কথাশিল্পীর হত্যারহস্য

[উপন্যাস]

প্রথম পল্লব

সহোদর-যুগল

জন ও ডেভিড গারসাইড সহোদর ভ্রাতা হইলেও উভয়ের স্বভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ডেভিড ভয়ঙ্কর মাতাল, তাহার স্বভাব সংশোধনের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না; তথাপি 'সন' নামক দৈনিক পত্রিকায় তাহার চাকরী দীর্ঘকাল হইতেই চলিতেছিল; কারণ, সে যতই মাতাল হউক, লণ্ডনের অপরাধি-সমাজের বিবিধ অপকার্য্যের নিখুঁত সংবাদ প্রকাশে আর কোন সাংবাদিকের সেরূপ দক্ষতা ছিল না।

ডেভিড জনের সহিত দেখা করিবার জন্য 'বুল' নামক প্রসিদ্ধ ভোজনাগারে (chop-house) উপস্থিত হইয়াছিল। জন ডেভিডকে যথেষ্ট স্নেহ করিলেও মাতলামির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, ডেভিড কিছু টাকা ধার কবিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু ডেভিড জনের সম্মুখে বসিয়া উৎসাহভরে পুনঃ পুনঃ মদ্যপান করিতে থাকিলেও টাকার কথা বলিল না।

জন সংবাদপত্রের সেবায় কর্ম্মজীবন আরম্ভ করিলেও সাত বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই ব্যবসায়ে সাফল্য-লাভের জন্য দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিলেও ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই; আদালতে তাঁহার পসার হয় নাই।

ডেভিড আর এক 'গ্লাস মদ এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "জন আজ রাত্রে আমি কি উদ্দেশ্যে তোমাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি, তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিতে পার নাই, এখন তোমাকে সেই কথাই বলিতেছি শোন। তুমি বোধ হয় জান না, লণ্ডনের দস্যু-তস্করদলের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিক ভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সেজন্য আমার পদোন্নতি হওয়ায় আমি এখন বার্ষিক বার শত পাউণ্ড বেতন পাইতেছি। সংবাদপত্রের সেবায় মাসিক এক শত পাউণ্ড বেতন পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি 'সন' পত্রিকায় আমার সেই সকল প্রবন্ধের কোনটি কি কোন দিন পাঠ করিয়াছ?"

জন বলিলেন, "হাঁ ডেভিড, ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার ধারণা, এ সম্বন্ধে ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পূর্ব্বে কোন দিন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই।"

ডেভিড উৎসাহভরে বলিল, "ধন্যবাদ জন! ঐ সকল প্রবন্ধের কোন কোনটি আমার নিজেরও ভাল লাগিয়াছিল। আমার বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি; কারণ, আমি—কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই, তুমি কি কোন দিন প্রেমে পড়িয়াছ? নারী-প্রেমের মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছ কি?"

ডেভিড এ কথা সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেও জন এই প্রশ্নে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন; কারণ, তিনি ওলিভিয়া ডেন নাম্নী যুবতীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি ওলিভিয়ার নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলে ওলিভিয়া তাঁহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিয়াছিল, "দুঃখের সহিত তোমাকে বলিতে হইতেছে—তোমার প্রেমের স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে জানিয়া রাখ, আমাদের পরস্পরের সদ্ভাবের কখন অভাব হইবে না। আশা করি, আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ।"

ওলিভিয়ার এই কথা জন কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই, এবং দুই-এক বার ভিন্ন এই দীর্ঘকালে তাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎও হয় নাই; কিন্তু ওলিভিয়ার প্রতি তাঁহার প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল।

ডেভিডের কথা শুনিয়া জন বিরক্তিভরে আসন হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন; ডেভিড মাতাল হইয়া তাঁহার অপমানের উদ্দেশ্যে ঐ কথা বলিয়াছিল, একপ মনে করা যে তাঁহার ভ্রম, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু ডেভিড তাঁহাকে এই প্রকার বিচলিত দেখিয়া বলিল, "জন, আমার কথায় তুমি কি রাগ করিলে? তুমি কখন প্রেমে পড়িয়াছ কি না, এ কথা তোমাকে বিশেষ কোন কারণেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি! আমার কথা শুনিয়া বোধ হয়, আমাকে পাগল মনে করিয়াছ! বস্তুতঃ, আমার মত নরাধম কাহারও প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করিবে, ইহা কি সত্যই অনধিকার-চর্চ্চা নহে? কিন্তু কথা এই যে, একটি তরুণীর সহিত সংপ্রতি আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় পৃথিবী আমার পক্ষে স্বর্গে পরিণত হইয়াছে।"

জন বলিলেন, "তাহা হইলে এখন তুমি কি করিবে?"

ডেভিড বলিল, "না, না, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি তাহাকে বিবাহ করিব না; কারণ, আমার প্রেম সেরূপ স্বার্থ-কলুষিত নহে। আমার জন্য তাহাকেও কোনরূপ ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে সে শান্তিতে কাল যাপন করিতে পারে, এ জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। সে ভবিষ্যতে যে ফ্ল্যাটে বাস করিবে, তাহা তাহার নিজস্ব হইবে, কেহই তাহাকে তাহাতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, এবং আমি যে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিব, তাহা তাহারই জন্য রাখিয়া দিব, যেন দুর্দ্দিনে তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে না হয়।"

ডেভিডের কথা শুনিয়া জন সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কারণ, এই উচ্ছৃঙ্খল মাতালের মুখ হইতে এরূপ বাণী প্রকাশ হইতে পারে—ইহা তিনি কোন দিন ধারণা করিতে পারেন নাই।

অতঃপর ডেভিড্ কোন্ প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে, জন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যদি ডেভিড তাঁহার নিকট কিছু টাকা ধার চাহিয়া বসে—তাহা হইলে তিনি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না, কারণ, তখন তাঁহার হাতে টাকা ছিল না।

জন মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমি এখন চলিলাম ডেভিড!"

আরও কিছু কথা আছে। মাস-খানেকের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, এ জন্য—"

ডেভিডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটি দীর্ঘ-দেহ, গম্ভীর-প্রকৃতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়স প্রায় ষাট্ বৎসর বলিয়া ধারণা হয়।

তাঁহাকে দেখিয়া ডেভিড জনকে নিম্ন-স্বরে বলিল, "বিচারপতি মিঃ স্বার্থডেলকে দেখিতেছি যে!"

এই বিখ্যাত জজের নাম শুনিয়া জন গারসাইড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী প্রবীণ বিচারক তাঁহার সুপরিচিত; কারণ, অনেক হত্যাকাণ্ডের খ্যাতনামা আসামিগণের অপরাধের বিচারভার তাঁহারই হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। লণ্ডনের ব্যবহারাজীবগণের ধারণা ছিল—বিচারপতি স্বার্থডেল নানা কৌশলে আড়ম্বরপূর্ণ জটিল মামলাগুলির বিচার-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইত। তিনি নরহত্যার জন্য অভিযুক্ত আসামিগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন; বস্তুতঃ, তাহাদিগকে চরম দণ্ডদানের জন্য তাঁহার আগ্রহের সীমা ছিল না। এ জন্য তিনি 'দণ্ডানুরাগী বিচারক' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

ডেভিড জনকে বলিল, "তোমাকে বোধ হয় উহারই হাতে পড়িতে হইবে। তুমি কোন খুনের মামলায় উহার এজলাসে বিচার-প্রার্থী হইলে তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সেই মামলা চালাইতে হইবে। যে সকল কৌশুলী উহার এজলাসে মামলা আরম্ভ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতে না পারেন, তাঁহাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকে না।"

ডেভিডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আর এক জন ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন। তিনি ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গারসাইড, অবিলম্বেই তোমাকে আফিসে উপস্থিত হইতে হইবে; এ জন্য তোমাকে তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে আসিলাম। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেন্টন হঠাৎ নিহত হইয়াছেন, জনরব—তাঁহার সেক্রেটারীই তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। তাঁহার এই সেক্রেটারী একটি তরুণী—তাহার নাম ওলিভিয়া ডেন। মর্টন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে 'সন'এর সম্পাদককে এই সংবাদ জানাইয়াছেন; তাঁহারই আদেশ তোমাকে শুনাইলাম।"

জন গারসাইড এই সংবাদে বিচলিত হইয়া আগন্তুককে ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ কি বলিতেছ? যে তরুণীর কথা বলিলে—তাহার নাম কি সত্যই ওলিভিয়া ডেন?

নবাগত সাংবাদিক ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই সংবাদ শুনিয়া জনের এরূপ ব্যাকুল হইবার কারণ কি? উনি কি তোমার বন্ধু, ডেভিড?"

ডেভিড বলিল, "হাঁ, আমার ভাই।—জন, ওলিভিয়ার সঙ্গে সত্যই কি তোমার বেশ একটু মাখামাখি হয় নাই? তোমাদের ঘনিষ্ঠতার কথাই আমার মনে পড়িতেছে!"

সাংবাদিক এবার ব্যস্ত ভাবে ডেভিডকে বলিলেন, "এ সকল খোসগল্প বন্ধ রাখিয়া শীঘ্র আফিসে চল। বুড়া বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

ডেভিড আর কোন কথা না বলিয়া সাংবাদিকের সঙ্গে 'সন্' নামক সংবাদপত্রের আফিসে চলিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া 'সনের' বৃদ্ধ সম্পাদক হেক্টর ওয়ারবর্টনকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখিলেন। সম্পাদক ডেভিডকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "যে সময় আফিসে তোমার উপস্থিত থাকা দরকার, সেই সময় এখানে তোমার দেখা পাই না, ইহার কারণ কি? এ জন্য আমি অত্যন্ত—"

ডেভিড তাঁহার কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মর্টন ফোনে আপনাকে সংবাদ দিয়াছে?"

সম্পাদক তাঁহার ডেস্কের উপর হইতে এক টুক্‌রা কাগজ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া রাখিয়াছি! আজ রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ট্রেন্টনের উপন্যাসের প্রকাশক কার্সন এণ্ড ম্যালরি কোম্পানীর অংশীদার ম্যালরি ট্রেন্টনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; কারণ, ট্রেন্টন তাঁহাদিগকে একখানি নূতন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠাইতে অত্যন্ত বিলম্ব করায় তাহার কারণ জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল! ট্রেন্টন যে কক্ষে বাস করিতেন, সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। ম্যালরির সাড়া পাইয়া একটি যুবতী দ্বার খুলিয়া দিল; এই যুবতীর নাম ওলিভিয়া ডেন,—সে ট্রেন্টনের সেক্রেটারী। ম্যালরি ওলিভিয়াকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিলেন। ম্যালরি কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ট্রেন্টনের সঙ্গে সেখানে দেখা করিতে যাইতেন; এ জন্য ওলিভিয়া তাঁহাকে চিনিত। ওলিভিয়া তখন এতই বিহ্বল হইয়াছিল যে, সে তাঁহাকে যে সকল কথা বলিল, তাহা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন—অর্থহীন। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে না পারায় ম্যালরি ট্রেন্টনের বাস-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল! ট্রেন্টন পায়জামা ও গাউন মাত্র পরিয়া মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন; একখান ভুজালি তাঁহার বক্ষঃস্থলে আমূল প্রোথিত! দেহ নিস্পন্দ, প্রাণহীন।

ম্যালরি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া টেলিফোনে পুলিশকে এই সংবাদ জানাইলেন। পুলিশ সেখানে উপস্থিত হইয়া ওলিভিয়ার নিকট প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করিলে ওলিভিয়ার হঠাৎ মূর্চ্ছা হইল, সে কোন কথাই বলিতে পারিল না।

ডেভিড জিজ্ঞাসা করিল, "ওলিভিয়াকেই অপরাধিনী বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ কি?"

সম্পাদক বলিলেন, "মর্টনের এইরূপই ধারণা; আমরা তাহার কথায় নির্ভর করিতে পারি। যাহা হউক, এখন আমাদের সেই ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়া প্রকৃত ঘটনা জানিবার চেষ্টা করাই উচিত। যদি তুমি আমাকে এই দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে আমি এই মাত্র বলিতে পারি—ট্রেন্টন এই যুবতীকে কুপথগামিনী করিয়া অবশেষে তাহার সংস্রব অসহ্য হওয়ায় তাহাকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। ওলিভিয়া তাহার ব্যবহারে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাহার প্রণয়ীকে প্রতিফল দানের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান! ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই।"

ডেভিড বলিল, "সেই যুবতী এখন কোথায়?"

সম্পাদক বলিলেন, জেরা করিবার জন্য তাহাকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। মর্টন শেষ পর্য্যন্ত সকলই জানিতে পারিবে

এখন তুমি এই হত্যা-কাহিনী আমাদের দৈনিকে প্রকাশের জন্ম লিখিয়া দাও।

ডেভিড বুঝিতে পারিল—ট্রেন্‌টনের হত্যা-কাহিনী 'সন' পত্রিকার পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে। কথা-শিল্পী পিটার ট্রেন্‌টনের বয়স আটত্রিশ বৎসর হইলেও তিনি উপন্যাস-রচনায় যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ ঔপন্যাসিকগণের কল্পনাতীত! অতি অল্পসংখ্যক উপন্যাস-লেখক এরূপ অল্প বয়সে এই প্রকার যশস্বী হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ ঔপন্যাসিক হইলেও তাঁহার নৈতিক চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল না; সকলেই বলিত, তাঁহার সুপরিচিত কোন রূপবতী নারীই তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত না। ডেভিড গারসাইড সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিল, তিন বৎসরের মধ্যে দুইটি পত্নী পিটার ট্রেন্‌টনের সহিত বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি আর বিবাহ না করিয়া একটির পর একটি এই ভাবে অনেকগুলি যুবতীকে তাঁহার সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে দুই জন অঙ্গীকার-ভঙ্গের দাবীতে (for breach of promise) তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ আদায় করিয়াছিল।

ট্রেন্‌টনের বাস-কক্ষে তদন্ত করিতে করিতে ডেভিড অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিল, তাহার মনে হইল—এই হত্যাকাণ্ড তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ, তাহার ভ্রাতা জন হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তা যুবতীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, এই সংবাদ তাহার অজ্ঞাত ছিল না। তাহার ধারণা হইয়াছিল—জন ওলিভিয়া ডেনকে তাঁহার পাণিগ্রহণের জন্ম অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। এই জন্মই ওলিভিয়ার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ শুনিয়া জন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন; তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়াছিল।

৭০৯ নং কাজ্জন ষ্ট্রীটস্থ ফ্ল্যাট হইতে পিটার ট্রেন্‌টনের দেহ স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই ডেভিড গারসাইড সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। এক জন পুলিশম্যান সেই ফ্ল্যাটের বহির্দ্বারে পাহারায় নিযুক্ত ছিল; গারসাইড তাহাকে পুলিশের অনুমতি-পত্র প্রদর্শন করায় ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার কোন অসুবিধা হয় নাই।

ডেভিড ট্রেন্‌টনের ফ্ল্যাটে এক জন ডিটেক্টিভ্-সার্জ্জেণ্টকে দেখিতে পাইল,—তাহার নাম মরফি। তাহার সহিত ডেভিডের পরিচয় ছিল। ডেভিড মরফিকে ট্রেন্‌টনের গুপ্ত-হত্যা সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত ধারণার কথা জিজ্ঞাসা করিলে মরফি দৃঢ় স্বরে বলিল, "প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নাই। ট্রেন্‌টন গ্রন্থকার ছিল, সে নভেল লিখিত; কিন্তু তাহার স্বভাব-চরিত্র কিরূপ ছিল—তাহা বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নহে; কোন রূপবতী তরুণী তাহার নজরে লাগিলে সে বেচারার পরিত্রাণ লাভ করা কঠিন হইত। ওলিভিয়ার বয়স অল্প, এবং সে রূপবতী। তাহাকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া ট্রেন্‌টন যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু ছুঁড়িকে সহজে রাজি করিতে পারে নাই। কাল তাহাদের ভয়ঙ্কর কলহ হইয়াছিল; চাকরদের কেহ কেহ তাহা শুনিয়াছিল। ছুঁড়িটা রাগ সামলাইতে না পারিয়া ট্রেনটনকে ভয় দেখাইয়াছিল। আজ রাত্রে ট্রেনটনের দুই জন চাকর কাজ শেষ করিয়া ফ্ল্যাট ত্যাগ করিলে ওলিভিয়া সুযোগ বুঝিয়া ট্রেন-টনের সঙ্গে দেখা করে এবং আর এক দফা ঝগড়া সুরু করে। কিন্তু সে আত্মসমর্থনের জন্ম বলে, সেই সময় সে খবরের কাগজ কিনিতে বাহিরে গিয়াছিল; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া দেখে, ট্রেনটন ছোরার আঘাতে নিহত হইয়াছে! তাহার এই জবাব শুনিয়া কি মনে হয়?"

ডেভিড বলিল, "ছোরাখানা কোথা হইতে আসিল?"

মরফি বলিল, "সেখানি ইটালিয়ান ভূজালি। ট্রেনটন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু ট্রেনটন কোথায় উহা রাখিয়াছিল, ওলিভিয়া তাহা জানিত। অধিকাংশ সময় উহা তাহার লিখিবার টেবিলের দেরাজের ভিতর থাকিত। ঐ সেই টেবিল।"

মরফি সেই কক্ষের বাতায়ন-প্রান্তে সংস্থাপিত টেবিলের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল। তাহার পর ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল, "ওলিভিয়ার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই—এ কথা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি।"

ডেভিড সেই কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলে মরফি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ?'

ডেভিড ফিরিয়া-দাঁড়াইয়া বলিল, "এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আমি একটি বৃহৎ গল্প লিখিব স্থির করিয়াছি। 'সনে'ই তাহা প্রকাশিত হইবে। এ জন্ম এখন আমার কিছুকাল চিন্তা করিবার প্রয়োজন!"

ডেভিড নিহত ব্যক্তির শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে মরফি বলিল, "ঐ কক্ষের কোন জিনিস স্পর্শ করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছি।"

ডেভিড তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া প্রায় কুড়ি মিনিট সেই কক্ষ পরীক্ষা করিয়া সেই ফ্ল্যাট ত্যাগ করিল।

সেই সময়ে বিচারপতি হোরেসিও স্বার্থডেলের আহার প্রায় শেষ হইয়াছিল; এক জন পরিচারক তাঁহার জন্ম পনীর আনিলে তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্ম তাঁহার আগ্রহ হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ধারের টেবিলে. যিনি খাইতে বসিয়াছিলেন, তিনি কি 'সন্' পত্রিকায় আসামীদের অপরাধের বিবরণ 'রিপোর্ট' করেন না?"

জজ সাহেব তাহাকে ডাকিয়া কথা বলিয়াছেন, তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সে সোৎসাহে বলিল, "হাঁ হুজুর, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমি উহাদের কথা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছিলাম। মিঃ গারসাইডকে অফিসে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটা জম্‌কাল গল্প লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। শুনিলাম, মে-ফেয়ারে মিঃ ট্রেন্‌টন নামক এক জন ভদ্রলোককে খুন করা হইয়াছে; সেই গল্পই তিনি লিখিবেন। সেই ভদ্রলোকটি না কি কেতাব লিখিয়া খাইতেন।"

বিচারপতি বলিলেন, "এ সব নোংরা কাজ! তা' আর কোন কথা শুনিয়াছ?"

ভৃত্য বলিল, "তা আবার শুনি নাই হুজুর! কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার। অন্য এক জন রিপোর্টারের সঙ্গে মিঃ গারসাইডের কথা হইতেছিল তাহাও শুনিয়াছি। সেই রিপোর্টার বলিতেছিলেন—পুলিশের বিশ্বাস, ট্রেন্‌টনের সেক্রেটারীই তাহাকে খুন করিয়াছে। একটি তরুণী—মিস্ ওলিভিয়া ডেন তাহার সেক্রেটারী ছিল।"

বিচারপতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "উইল্‌কিন্স, তুমি বড়ই অদ্ভুত কথা বলিলে! আশা করি, এই তরুণীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।"

* * * *

বিচারপতি স্বার্থডেল নৈশ ভোজন শেষ করিয়া তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আশা হইল, এই প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের হত্যাকাণ্ডের বিচার-ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলে বিচার-কার্য্যে খ্যাতি লাভ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার-ফল জানিবার জন্য জনসমাজের আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষিত হয়, বিচারপতি স্বার্থডেলকে সেই সকল মামলার বিচার করিতে দেখা যাইত। এই রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ডের বিচারভার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল।

পরদিন প্রভাতে এই মামলা-প্রসঙ্গে চতুর্দ্দিকে আন্দোলন আরম্ভ হইল। 'সন' পত্রিকায় এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইল। ডেভিড গারসাইড 'সন' পত্রিকায় তিন স্তম্ভব্যাপী এক প্রবন্ধে এই মামলার আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সেই প্রবন্ধের উপসংহারে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—

"এই মামলার ঘটনাচক্র অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ; কিন্তু এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেনটনের হত্যাকাণ্ডের জটিল রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে যে সকল ঘটনার বিবরণ পাঠকসমাজ জানিতে পারিবেন, সেরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ ঘটনাবলী বর্ত্তমান কালের কোন রহস্যোপন্যাসে প্রকাশিত হয় নাই।"

দ্বিতীয় পল্লব

বৌ-ষ্ট্রীটের কারাকক্ষে

বৌ-ষ্ট্রীট-কারাগারের স্থূলকায়া প্রবীণা ওয়ার্ডেস (wardress) হত্যাপরাধে অভিযুক্ত মিস্ ওলিভিয়া ডেনের কারাপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া কোমল স্বরে বলিল, "একটি ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন বাছা!"

এ কথা শুনিয়া ওলিভিয়া চমকিয়া উঠিল। কোন্ ভদ্রলোক সেই কারাকক্ষে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন? তিনি কি কোন সংবাদপত্রের রিপোর্টার? সেই দিন প্রভাতে বহু ভদ্রলোক তাহাকে দেখিবার জন্য পুলিশ-আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সকলেই গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিম্ন স্বরে নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সকল অপ্রীতিকর মন্তব্য শুনিয়া ওলিভিয়ার মন ক্ষোভ ও বিরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তখনই তাহার আশা হইল—কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশের রিপোর্টারগণকে হলওয়ে কারাগারে আসিয়া তাহার জেরা করিতে অনুমতি দিবেন না।

কিন্তু আগন্তুক ওলিভিয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সে বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ করিল।

আগন্তুক জন গারসাইড!—তিনি প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে তাহার নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিলে সে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিল। তাহার পক্ষে অবিবেচনার কার্য্য হইলেও ইহা সঙ্গত বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল।

ওলিভিয়া তাঁহাকে দেখিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "জন, তুমি?"

জন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন মাত্র। তাহার পর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ওলিভিয়া, আমি তোমাকে সাহায্য করিবার চেষ্টায় এখানে আসিয়াছি। কিন্তু আমার অবসর অত্যন্ত অল্প হইলেও বিষয়টি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি আশা করি, তুমি আমার কোন কথায় বাধা না দিয়া ধীর ভাবে সকল কথাই শুনিবে। তুমি যে মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছ, তাহাতে আমি আদালতে তোমার পক্ষ-সমর্থনের জন্য তোমার সম্মতি লইতে আসিয়াছি। তোমার সম্মতি পাইলে বিচারকালে আমি তোমার অনুকূলে কাজ করিব। তবে আমার আরও কিছু বলিবার আছে, আশা করি, তাহা শুনিতে তোমার আপত্তি নাই। ওকালতি ব্যবসায়ে আমি তেমন প্রতিষ্ঠাপন্ন নহি; কিন্তু আমি বিশেষ যত্ন সহকারে ফৌজদারী আইন অধ্যয়ন করিয়াছি; বিশেষতঃ, আমার বিশ্বাস, আমি গভীর নিষ্ঠার সহিত এই মামলা চালাইতে পারিব। তদ্ভিন্ন, তুমি নিরপরাধ বলিয়াই আমার সুদৃঢ় ধারণা; তুমি এই কার্য্য কর নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

ওলিভিয়া বলিল, "না, আমি করি নাই।"

জন বলিলেন, "তোমার নিকট আপাততঃ ইহার অধিক আর কিছুই আমার জানিবার নাই; তবে পরে তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইবে বটে। কিন্তু তোমাকে এ কথা বলিতে বাধা নাই যে, এই মামলায় জন-সমাজে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সেই জন্য অনেক বিখ্যাত উকিল আদালতে তোমার পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিবে, কোন কোন খ্যাতনামা উকিল সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে তোমার সমর্থন করিবে, অনেকে খ্যাতিলাভের আশায় তোমার অনুকূলে দাঁড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে; কারণ, তাহারা জানে, তুমি তাহাদের চেষ্টায় নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিলাভ করিলে—তাহাদের পসার বাড়িবে। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য স্থির করিবার পূর্ব্বে তোমার ভাবিয়া দেখা উচিত।"

ওলিভিয়া বলিল, "জন, তোমার মহত্ত্ব প্রশংসনীয়; তুমি আমার ধন্যবাদভাজন; ইহার অধিক আমার আর কিছুই বলিবার নাই।"

জন বলিলেন, "তবে তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত? আদালতে আমাকে তোমার অনুকূলে মামলা চালাইতে দিতে রাজী আছ ত?"

ওলিভিয়া বলিল, "হাঁ জন, আমি আনন্দের সহিত তোমার এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইতেছি।"

জন এবার আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "ইহার প্রতিদানে আমি এই মাত্র বলিতে পারি—তুমি যে পর্য্যন্ত নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিলাভ না করিবে—সে পর্য্যন্ত আমি এই চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিব না। আশা করি, আমার এই অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া তুমি আশ্বস্ত হইতে পারিবে। তুমি মুহূর্ত্তের জন্য ভগ্নোৎসাহ হইও না।"

ওলিভিয়া বলিল, "না জন, আমি ভগ্নোৎসাহ বা হতাশ হইব না। আমি সত্যই নিরপরাধ। পিটার ট্রেন্টনকে আমি হত্যা করি নাই।"

এই সময় কারাগারের ওয়ার্ডেস্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জনকে বলিল, "আপনাদের আলাপের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে মহাশয়! আপনাকে বাহিরে যাইতে হইবে।"

* * * * *

এই সময় এই কারাগারের কয়েক মাইল দূরে স্থানান্তরে যে দৃশ্য লক্ষিত হইতেছিল—তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার!

ডেভিড গারসাইড সেই সময় এজ্‌ওয়্যার রোডের পার্শ্ববর্ত্তী ৫নং ফ্ল্যাটের একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া সে সেই কক্ষের অধিবাসিনী একটি

খর্ব্বকায়া তরুণীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আদরের স্বরে বলিল, "দশ মিনিটের অধিক কাল এখানে আমার থাকিবার উপায় নাই প্রিয়ে! তুমি ভাল আছ কি না, তাহাই জানিবার জন্য আমাকে আসিতে হইল, জুনি।"

তরুণী জুনির মুখে কথা ফুটিল না; কিন্তু তাহার হর্ষোজ্জ্বল চক্ষুতে মনের ভাব পরিস্ফুট হইল। ডেভিড সসম্ভ্রমে তাহাকে চুম্বন দান করিল।

এই সময়ের এক মাস পূর্ব্বে ফ্লীট ষ্ট্রীটের কোন সুপরিচিতা মহিলা-সাংবাদিক (a woman journalist) ভোজের যে মজলিস করিয়াছিলেন, সেই মজলিসেই জুন মেরিফের সহিত ডেভিডের পরিচয় হইলে সে তৎক্ষণাৎ এই তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ডেভিড তাহাকে সেই অসার গল্পের মজলিস হইতে নিভৃত পল্লীপ্রান্তে লইয়া যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া বলিয়াছিল, "তোমার মত কোমল-প্রকৃতি তরুণীর এখানে থাকিবার অধিকার নাই। চল, আমরা দূরে চলিয়া যাই, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

ডেভিড তাহাকে সোহো পল্লীর উপকণ্ঠস্থিত রোলিনোর ভোজনাগারে লইয়া গিয়াছিল, সেই স্থানটি নির্জ্জন; আহারের পর সেখানে গল্প করিবার সুযোগ ছিল।

রোলিনোর ভোজনাগারে খাদ্যসামগ্রীর ফরমাস দিয়া ডেভিড জুনিকে বলিল, "প্রথমে তোমার নিজের কথা বল, তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

জুনি তাহাকে সরল ভাবে নিজের জীবনের কথা বলিলে ডেভিড জানিতে পারিল—জুনির বয়স তখন চব্বিশ বৎসর। ছয় মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে পল্লীগ্রামে বাস করিয়াছিল। তাহার পিতা পাদরী ছিলেন, কিন্তু তাহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। জুনির ইচ্ছা ছিল, সাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে। সে তাহার পিতার মৃত্যুর পর যৎসামান্য অর্থের অধিকারিণী হইয়াছিল; তাহাই লইয়া সে লণ্ডনে আসিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

জুনির এই সকল কথা শুনিয়া ডেভিড বলিল, "এখন তোমাকে আমার কথা বলিতেছি, তাহা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইতে পারে। একটি বিষয় ভিন্ন অন্য সকল বিষয়েই আমার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমার ধারণা হইয়াছিল, কঠোর সাধনা-ফলে আমি ঔপন্যাসিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিলাম, এই কার্য্য অত্যন্ত কঠিন, এ জন্য অবশেষে আমাকে সাংবাদিকের ব্রত গ্রহণ করিতে হইল। সংবাদ-পত্রের সেবকগণ সাহিত্যের ক্রীতদাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় হইতে মদ্যপানে আমার আসক্তি অত্যন্ত প্রবল হইল, তাহার ফলে আজ আমি ভীষণ মাতাল, অসংযত মাতাল বলিয়া ভদ্র-সমাজের ঘৃণার পাত্র। যদি আমি এই কদভ্যাস ত্যাগ করিতে না পারি, তাহা হইলে আর দশ বৎসরও আমি বাঁচিব কি না, সন্দেহের বিষয়।"

ডেভিড ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জুনির মুখের দিকে চাহিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "কিন্তু তুমি আমাকে অনুমতি দান করিলে আমি তোমার কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারিতেছি—তোমার অনাহারের কষ্ট অসহ্য হইয়াছে। তুমি যে সকল ছোট গল্প লিখিয়াছ, তাহাদের গ্রাহক নাই; কেহই তাহা ক্রয় করে না। তোমার উপন্যাসের রচনা শেষ হইলে যদি কোন প্রকাশক তাহা প্রকাশ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তুমি ত্রিশ পাউণ্ডের অধিক পাইবে—এরূপ আশা করিতে পার না; কিন্তু আমি তোমার নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড প্রদান করিতে পারিব। তদ্ভিন্ন আমি মধ্যে মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া তোমার সংবাদ লইয়া যাইব—এ জন্য তোমার সম্মতি প্রার্থনা করি।"

এই সকল কথা শুনিয়া জুনি নীরব থাকিলেও তাহার চক্ষুতে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, তাহার কল্যাণের জন্যই পরমেশ্বর তাহাকে সেখানে প্রেরণ করিয়াছেন। ডেভিড ভয়ঙ্কর মাতাল বটে, কিন্তু জুনির ধারণা হইল, তাহাকে সে অনায়াসে বিশ্বাস করিতে—তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে। এ জন্য সে প্রস্তুত হইল।

উক্ত ঘটনার পরদিন ডেভিড ব্যাঙ্ক হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া জুন মেরিফের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইল, এবং তাহার নামে একটি ফ্লাট ভাড়া করিয়া সেই স্থানে তাহার বাসের বন্দোবস্ত করিল। সে জুনিকে বলিল, "এই ফ্ল্যাট এখন তোমার; আমি জীবিত থাকিতে ইহা হস্তান্তরিত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

জুনি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "তুমি আমার এত উপকার করিলে, ইহার প্রতিদানে আমার কিছুই কি করিবার নাই? আমার ইচ্ছা—"

ডেভিড তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "না জুনি, আমি তোমার নিকট কিছুই লইতে চাহি না; আমি কোন কোন সময় এখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে পারিলেই সুখী হইব।"

জুনি ডেভিডের এই কথা শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইল; সে বুঝিতে পারিল—ডেভিডের মনের ভাব বুঝিবার জন্য তাহাকে আরও কিছু কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

ডেভিড একখান আরাম-কেদারায় বসিয়া সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করিলে জুনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার কি করিবার আছে?"

ডেভিড বলিল, "একটা নোংরা ব্যাপারে আমাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেন্টনের হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত ব্যাপার!"

জুনি বলিল, "তাহার সেক্রেটারী সম্ভবতঃ এ কাজ করে নাই।"

ডেভিড বলিল, "তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি?"

জুনি বলিল, "তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছ? যাহার মুখ ঐরূপ সরলতার আধার, সে কখন নরহত্যা করিতে পারে না। তাহাকে কোন দিন দেখিয়াছ কি?"

ডেভিড বলিল, "কেবল কি দেখা? বৌ-ষ্ট্রীটের কারাগারে আজ সকালে তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিয়াছি।"

জুনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আহা বেচারা! তাহাকে কি অত্যন্ত কাতর দেখিলে? তাহার হাতে টাকা-পয়সা কিছু আছে কি?"

ডেভিড বলিল, "সম্বল কিছু আছে বলিয়া মনে হইল না; তবে তাহার পরিধানে পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিলাম বটে।"

জুনি বলিল, "টাকার অভাবে তাহার দুর্গতির যে সীমা থাকিবে না! তাহার মামলা চালাইবার জন্য উকিল-ব্যারিষ্টারদের টাকা দিতে হইবে ত? সে টাকা কোথা হইতে আসিবে?"

ডেভিড বলিল, "হাঁ, তাহার অনুকূলে মামলা চালাইতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন ; কিন্তু কথাটা আমি তোমাকে গোপনে বলিয়া রাখি—'সন' নামক দৈনিক পত্রিকার সহিত আমার সম্বন্ধ আছে। এই পত্রিকার পক্ষ হইতে স্থির করা হইয়াছে, পিটার ট্রেন্টনের হত্যাপরাধে অভিযুক্ত মিস ওলিভিয়া ডেনের সমর্থনের জন্য বিখ্যাত কৌন্সিলী সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবিকে নিযুক্ত করা হইবে। ফৌজদারী মামলা পরিচালনে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ।

জুনি বলিল, 'সন্' কি কারণে মিস্ ওলিভিয়ার পক্ষ সমর্থন করিবে? ইহাতে তাহার স্বার্থ কি?"

ডেভিড বলিল, "ওলিভিয়া ডেনের সহিত ইহার এইরূপ চুক্তি হইয়াছে যে, ওলিভিয়া যদি তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচারে মুক্তিলাভ করে—তাহা হইলে এই ব্যাপারের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ—ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ সে একমাত্র 'সন' পত্রিকায় প্রকাশ করিবে ; অন্য কোন সংবাদপত্রে তাহার তাহা প্রকাশের অধিকার থাকিবে না। বর্ত্তমান কালে সংবাদপত্র-পরিচালনে এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়।"

সারা দিনের কঠোর পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত ডেভিড গারসাইড তাহার আফিসে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার নামে প্রেরিত একখানি টেলিগ্রাম দেখিতে পাইল। এই সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামে লিখিত ছিল,—

"আমি ওলিভিয়া ডেনের পক্ষ সমর্থন করিতেছি—জন।"

জনের টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়া ডেভিড প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া কি চিন্তা করিল। প্রথমে তাহার ধারণা হইল—জন মক্কেল-মহলে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভের আশায় এই মামলা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়া এই সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য উৎসুক হইয়াছেন, নতুবা এই তুচ্ছ সংবাদ ডেভিডকে জানাইবার কি প্রয়োজন ছিল?

ডেভিড কিছু কাল চিন্তার পর তাহার টাইপ-রাইটারের নিকট বসিয়া যে কথাগুলি টাইপ করিল তাহা এই,—

ট্রেন্টন হত্যাকাণ্ডের মামলা—

মিঃ জন গারসাইড আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন। 'সন্' পত্রিকা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেন্টনের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ওলিভিয়া ডেনের বিচারকালে মিঃ জন গারসাইড তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেন। 'সন' পত্রিকার সম্পাদক ওয়ারবর্টন যে কক্ষে বসিয়া অফিসের কাজকর্ম্ম করিতেন, ডেভিড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া টাইপ-করা কাগজখানি তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলে সম্পাদক মুখ না তুলিয়াই তাহা দেখিতে লাগিলেন।

উহা নিস্তব্ধ ভাবে পাঠ করিয়া তিনি নীরস স্বরে বলিলেন, "আমাদের কাগজে ইহা ছাপা হইবে না।"

ডেভিড তাঁহার মুখের উপর বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সর্ব্বসাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক এরূপ জরুরি বিষয় আমাদের পত্রিকায় প্রকাশের সম্পূর্ণ যোগ্য ; বিশেষতঃ, অন্য কোন সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশ করিতে দেওয়া হইবে না। আমার ভাই ইহা আমার নিকট পাঠাইয়াছে। ইহা কিরূপ মূল্যবান্ সংবাদ, তাহা কি তাহার ধারণা করিবার শক্তি নাই?"

সম্পাদক বলিলেন, "সে শক্তি তাঁহার আছে। কারণ, এই ভাবে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জনই তাঁহার লক্ষ্য।"

গারসাইড এই মন্তব্যে অত্যন্ত অপমান বোধ করিল, এই সম্পাদক কর্ত্তৃক সে বহু বার নানা ভাবে অপমানিত হইয়াছিল, কিন্তু এই অপমান অসহ্য বলিয়াই তাহার মনে হইল।

গারসাইড সক্রোধে বলিল, "ওয়ারবর্টন, তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বলিও না, এই সংবাদ যে-কোন শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের পক্ষেও কিরূপ মূল্যবান্, তাহা কি তোমার বুঝিবার শক্তি নাই?"

ডেভিড গারসাইড 'সনের' অন্যতম রিপোর্টার মাত্র, উহার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বজ্ঞান ও সম্মান অনেক অধিক ; ডেভিডের অশিষ্টতায় তিনি বিচলিত হইয়া চক্ষু হইতে চশমা খুলিয়া লইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, এবং হাতের নীল পেন্সিলটি ত্যাগ করিয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ সংবাদ আমরা কাগজে ছাপিতে পারিব না ; একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া তোমাকে সতর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। অভিযুক্তা তরুণীর পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রসিদ্ধ কৌঁশুলী সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবিকে নিযুক্ত করা হইবে, আমরা এইরূপই স্থির করিয়াছি। তবে এই যুবতী বিনাদণ্ডে মুক্তিলাভ করিবে—ইহা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়।"

গারসাইড আর কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষের দ্বারের নিকট অগ্রসর হইল, তাহার পর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "তুমি এই সংবাদ প্রকাশ না করিলে আমি চাকরী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। তুমি আমার ইস্তফানামা গ্রহণ করিও, আমি অবিলম্বেই তাহা পাঠাইয়া দিব।"

ডেভিডের কথা শুনিয়া ওয়ারবর্টন স্তম্ভিত হইলেন ; নিরুপায় ডেভিড পদত্যাগ করিবে—ইহা তাঁহার কল্পনাতীত! তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি তোমার কথার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়াছ?"

ডেভিড বলিল, "না বুঝিয়া কোন কথা বলিবার অভ্যাস আমার নাই। আমি তোমাকে এরূপ একটি মূল্যবান্ সংবাদ আনিয়া দিলাম—যাহা অন্য কোন সংবাদপত্রের প্রকাশের অধিকার নাই। কিন্তু তুমি উহা প্রকাশে অসম্মত! উত্তম, আমি উহা অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছি ; কিন্তু তোমার মূঢ়তা অমার্জ্জনীয়।"

ডেভিড কাগজখানি লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলে ওয়ারবর্টন বলিলেন, "এক মিনিট অপেক্ষা কর। যদি মত-পরিবর্ত্তন করিতে চাও—তাহা হইলে এখনও তাহা করিতে পার ; সে জন্য আধ মিনিট মাত্র সময় দিতে প্রস্তুত আছি।"

ওয়ারবর্টন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ডেভিডকে যাহাই বলুন, তিনি ইহা সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ওলিভিয়া ডেন তাহার যে রহস্যপূর্ণ কাহিনী 'সন্' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লিখিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়া 'সনের' কুড়ি লক্ষ পাঠক আনন্দে ও কৌতূহলে অভিভূত হইবে ; অথচ অন্য কোন সংবাদপত্রের তাহা প্রকাশের অধিকার থাকিবে না। কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকের পক্ষেই এই প্রলোভন উপেক্ষার যোগ্য নহে। ডেভিড কোন্ সাহসে 'সনে'র সম্পাদককে স্পর্দ্ধাভরে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহা তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই ; কিন্তু তিনি তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই জন্য তিনি বলিলেন, "হয় তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, না হয় আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।"

ডেভিড দৃঢ় স্বরে বলিল, "উত্তম, আমি তোমাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি ; আমার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইবার নহে!"

ডেভিড সম্পাদকের আফিস ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল ; পরে সে এই সংবাদ 'অয়ার' (Wire) নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে তাঁহার কাগজে প্রকাশের জন্য প্রদান করিল ; এ জন্য সে এই পত্রিকার নিকট কোন পারিশ্রমিকের দাবী করে নাই। [ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গাছের গায়ে অস্ত্রোপচার

ব্যাধি সারাইয়া গাছকে দীর্ঘজীবী করিবার শক্তি-সামর্থ্যে মার্কিণ উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা আজ সমৃদ্ধ। ব্যাধির ভারে বড় বড় গাছ

রবারে ভরাট করা

শুকাইয়া ফোঁপরা হইয়া গেলে সমাজের ক্ষতি বড় অল্প হয় না! সেই ক্ষতি-পূরণের জন্য তাঁরা আজ এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ওক এল্‌ম্‌ প্রভৃতি দামী গাছের গায়ে অস্ত্রোপচার করিয়া তাদের সম্পূর্ণ নীরোগ ও সুস্থ করিয়া তোলা হইতেছে! 'উরগক্ষত অঙ্গুলির' মত তাঁরা গাছের রোগ-দুষ্ট বা জীর্ণ অংশ কাটিয়া চাছিয়া ফেলিয়া দিতেছেন; তার পর সেই কাটা চাছা অংশ রৌদ্র, বৃষ্টি বা ধূলির স্পর্শে জীর্ণ হইয়া না মরিয়া যায়, এ জন্য ঐ কাটা চাছা অংশ তাঁরা রবার দিয়া ভরাট করিতেছেন! গাছের সমস্ত আর্দ্রতা এই রবার শুষিয়া লয়, তার ফলে গাছ নুইয়া বা বাঁকিয়া পড়ে না, 'ছিনা পড়িয়া' খাটো হয় না! রবারের স্থিতিস্থাপকতা-গুণে গাছ বাতাসে হেলিলে-দুলিলে যেমন কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি ঘটে না, তেমনি তার বাড়েও এতটুকু বাধা থাকে না! রবার এখন দুষ্প্রাপ্য, তবু ফাটা টিউবের রবার লইয়া আমাদের এ দেশে এখনো বোধ হয় এ ভাবে গাছের পরিচর্য্যা চলিতে পারে।

কাঠ মজবুত করা

আমেরিকার মাডিশন ফরেষ্ট ল্যাবরেটরীতে সর্ব্ব-প্রকার কাঠকে মজবুত করিয়া তোলার ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে। এ ব্যবস্থায় কাঠের জান্ প্রায় লোহা-ইস্পাতের মত অজর-অমর হয়। গাছ হইতে সদ্য কাটিয়া আনা ডালপালা ও গুঁড়িকে এই ল্যাবরেটরীতে বিশেষ ভাবে বিরচিত লবণ-দ্রাবকে দু'-এক মাস কাল ভালো করিয়া ভিজাইয়া রাখা হয়। এ ভাবে ভিজাইয়া রাখিবার ফলে কাঠের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লবণ প্রবেশ করে। তার পর কাঠকে শুকাইবার জন্য ইটের পাঁজায় আগুন দিয়া সেই আগুনের তাপে এক সপ্তাহ কাল রাখা হয়।

লবণ-দ্রাবকে কাঠ ডুবানো

এই ভাবে তাপ দিবার ফলে ভিতরকার সমস্ত আর্দ্রতা ঝরিয়া কাঠ একেবারে খটখটে শুষ্ক হইয়া ওঠে। এ কাঠ চটিতে জানে না, ফাটিতে জানে না—এমন মজবুত ছাঁদে গড়িয়া ওঠে!

পায়ের দস্তানা

পা ঘামে? ভয় নাই! মার্কিণ শিল্পীরা যুদ্ধের এই বিপর্য্যয় কোলাহলের মধ্যেও ঘর্ম্মাক্ত শ্রীচরণের কথা ভোলে নাই!

রাঙা পায়ের সজ্জা

পায়ের জন্য তারা মিহি স্বচ্ছ আর্দ্রতা-নিবারক (ওয়াটার-প্রুফ) দস্তানা তৈয়ারী করিয়াছে। এক-এক প্যাকেটে আট জোড়া করিয়া দস্তানা কিনিতে পাইবেন! পায়ে মোজার পরিবর্ত্তে এই দস্তানা

আঁটিলে পা ঘামিবে না; পায়ের স্বাস্থ্যও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইবে না। মার্কিণ শিল্পীরা বলিতেছেন, যাঁরা মাছ ধরেন, শীকারে বাহির হন—তাঁরা এবং পুলিশ ও দমকলের কর্ম্মচারীরা এ চরণ-দস্তানা পায়ে আঁটিলে উপকার ও আরাম পাইবেন। রূপসী বিলাসিনীদের চরণে স্থান পাইলে তাঁদের রাঙা চরণযুগলকে আরাম দিয়া দস্তানা কৃতার্থতা লাভ করিবে নিশ্চয়!

আগাছার জঙ্গল

"জঙ্গল সাফ করো"—"ফশল ফলাও—আরো ফশল!" এ চীৎকারে আমেরিকা শুধু আকাশ-বাতাস ফাটাইয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেছে না; কথার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত আগাছার জঙ্গল আছে, কাটিয়া সাফ করিয়া সে সব জঙ্গলাকীর্ণ জমিতে মৈ দিয়া তাহারা চৌরস্ করিতেছে, সে সব জমিকে উর্ব্বর করিয়া তার বুকে ফশলের বীজ বপন করিতেছে। এ সব কাঁটা-বন-জঙ্গল সাফ করিবার জন্ম কালিফোর্ণিয়ার শিল্পী উইলিয়াম টুশার যে অতিকায় ট্রাক্টর তৈয়ার করিতেছেন, তার শক্তি অমোঘ। এই একটি ট্রাক্টরে এক দিনে একশো জনের কাজ সম্পন্ন হয়। এক জন মাত্র ব্যক্তি ট্রাক্টর চালনা করে। সামনের দিকে আছে ধারালো দীর্ঘ ব্লেড। সে ব্লেডের স্পর্শে জঙ্গল কাটিয়া নির্ম্মূল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক্টরের বালতিতে তাহা উঠিয়া পড়ে। তার উপর ঝাঁটাইয়া নোড়া-নুড়ি সাফ এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটী দলিয়া চোস্ত করা—সকল কাজই একসঙ্গে নিষ্পন্ন হয়।
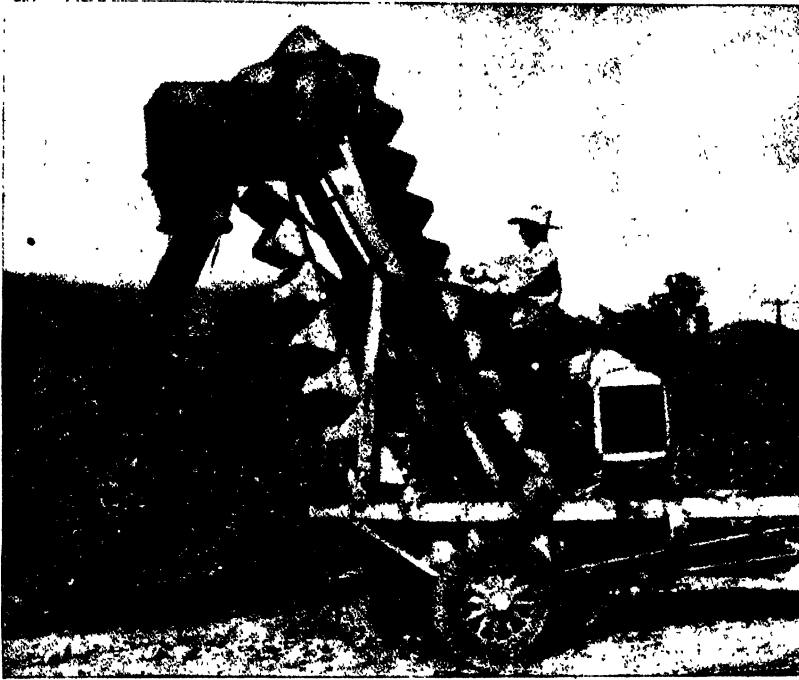
জঙ্গল-সাফ্ ট্রাক্টর

বমার-দূত

শত্রুর বমার আসিতেছে কি না, তার পাহারাদারী করিবার জন্ম বহু স্ত্রী-পুরুষ প্রহরী নিযুক্ত আছে। এ সব প্রহরীর অঙ্গে যে পোষাক, সে পোষাকে শুধু লজ্জা ও শীতাতপ নিবারণ হয় না—সে পোষাকের জোরে বমারের অস্তিত্ব-নিরূপণ হয়। প্রহরীর মাথায় যে-টুপি, ঐ টুপির সঙ্গে সংলগ্ন আছে শব্দ-যন্ত্র,—দূর-আকাশের গায়ে বমারের আবির্ভাব ঘটিবামাত্র এই শব্দযন্ত্রে তার স্পন্দন আসিয়া লাগে। টুপির সঙ্গে যে শ্রুতিযন্ত্র (earphone) আছে, সে যন্ত্রে স্পষ্ট শুনা যায় দূরাগত বমারের অস্পষ্ট ক্ষীণ রব! শুনিবামাত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া ঠিক করিয়া লয়, কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছে! শব্দ নিরূপণ হইবামাত্র স্কন্ধে-ঝুলানো টিউবে-সংলগ্ন মাইক-যন্ত্র-মারফৎ প্রহরী সে-বার্ত্তা বেতার-ষ্টেশনে জানায়। সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে 'সাজ-সাজ' রব ওঠে! প্রহরীর কাছে গ্যাস-মাস্ক প্রভৃতি বর্ম্মাদি থাকে—কাজেই তাহার পক্ষে নিরাপদ থাকা অসম্ভব হয় না!

বমার-দূত

বিদ্যুৎ-গতি এঞ্জিন

সুদীর্ঘ রেল-পথকে আমেরিকা আজ একেবারে চকিতে অতিক্রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে! এ কাজ সিদ্ধ হইয়াছে নব নির্ম্মিত ডিশেল-পাওয়ার এঞ্জিনের জোরে। কলিকাতার পাতিপুকুর হইতে টাকি শ্রীপুরে

ডিশেল-এঞ্জিনে টানা গাড়ী

খবর্দ্দার !

যুদ্ধে যেমন লড়ায়ে-ফৌজ আছে, তেমনি মার্কিণ রণ-বিভাগে এক দল ফৌজ আছে,—তাদের কাজ শত্রুর আগমনের পথে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা। এই বাধা রচনায় বৈচিত্র্য আছে। এক রকমের বাধা—কাঁচি-প্যাটার্ণে মোটা গুঁড়ি-বাঁধা দু' ফুট উঁচু বেড়া; তাছাড়া মাটীর নীচে গভীর গহ্বর—গহ্বরের উপরে ডাল-পালার মাচা তৈয়ারী করিয়া সেই মাচার উপরে মাটী সমতল করিয়া রাখা। এ দলে কার্য্যীর সংখ্যা অত্যধিক। শিক্ষার গুণে ইহারা এমন পটুতা লাভ করিয়াছে যে, শত্রু কোন্ পথে আসিতেছে, সংবাদ পাইবামাত্র দু' দেড় ঘণ্টার মধ্যে সে পথের মাঝখানে খানা খুঁড়িয়া গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া এমন বাধা রচিয়া তোলে যে, শত্রুর সাধ্য থাকে না, সে-পথে পা বাড়াইয়া অগ্রসর হইবে। এ দলের শক্তি-চাতুর্য্যে বিপক্ষ বারে-বারে পরাভূত এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদিসমেত জীবন্ত সমাধি লাভ করিয়াছে।

মার্টিনের যে রেল-পথ, সে পথেও আজ ডিশেল-পাওয়ার এঞ্জিনে ট্রেণ চলিতেছে; তবে মার্টিনের লাইন সরু, গাড়ী ছোট, তার এঞ্জিনে তেমন অতিকায় শক্তি নাই! আমেরিকার শাণ্টা ফে রেলোয়ে লাইনে সমতল ও পাহাড়ে-চড়াই-পথ বহিয়া ট্রেণ চলিয়াছে দৈত্য-শক্তিসম্পন্ন অতি-কায় ডিশেল-পাওয়ার এঞ্জিনের জোরে! এ এঞ্জিনের শক্তি ৫৪০০ অশ্ব-শক্তির সমান। এ এঞ্জিনের সঙ্গে ৬৪খানি গাড়ী জোতা থাকে; এবং সেই ৬৪খানি গাড়ীর ভার বহিয়া ডিশেল এঞ্জিন আজ ন'খানি বাষ্পীয় এঞ্জিনের কাজ সম্পাদন করিতেছে। ইহাতে বহু গুণ সময় এবং অর্থ বাঁচিতেছে।

পদে পদে বাধা

পদাতিকের অস্ত্র-বল

আজ আকাশ-পথে বমার এবং এ্যাণ্টি-এয়ার-ক্রাফ্ট কামান বন্দুকের বজ্র-হুঙ্কারে অনেকের হয়তো ধারণা, এ যুদ্ধে পদাতিক

এ্যাণ্টি ট্যাঙ্ক কামান

এ কামানে মিনিটে-মিনিটে শেল ছোটে

বমারের নব-গ্রহ

ফৌজের কাজ-কর্ম্ম কিছু নাই! সে ধারণা ঠিক নয়। আকাশ-পথে ফৌজ চলিলেও জল-পথে নৌশক্তি এবং স্থলপথে পদাতিকের বল-বৃদ্ধি এবং এ দুই শক্তিকে দুর্দ্ধর্ষ করিতে আমেরিকা এতটুকু ঔদাস্য রাখে নাই! পদাতিক দলকে নূতন নূতন এ্যাণ্টি-ট্যাঙ্ক কামান এবং বিবিধ মেশিন্-গান্ ও মারণাস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছে। পদাতিকদের এ্যাণ্টি-ট্যাঙ্ক কামানের গোলায় এক হাজার গজ দূরে অবস্থিত অতি-কঠিন বর্ম্ম-শস্ত্রাদি নিমেষে যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, তেমনি ৮১ মিলিমীটার কামানে মিনিটে-মিনিটে যে শেল্ ছোটে, তার মুখে দু'-হাজার গজ দূরস্থিত অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম্ম-চর্ম্ম জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়!

বমার-বাহিনী

যে-সব ব্রিটিশ ও মার্কিণ বমারু-প্লেন বোমা-বর্ষণে বাহির হয়, সে সব প্লেনের প্রত্যেক-টিতে লোক থাকে ন'জন করিয়া। দু'জন রেডিয়ো-ম্যান ও গানার; এক জন বম্বার্ডিয়ার গোলন্দাজ; দু'জন এঞ্জিনিয়ার ও গানার; এক জন পাইলট; এক জন ন্যাভিগেটর বা পরিচালক; এক জন সহযোগী পাইলট; এবং এক জন পুচ্ছ গানার। ইনি থাকেন প্লেনের সব পিছনকার আসনে। ইঁহাদিগের প্রত্যেককে এমন ভাবে কার্য্যপদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, একের সহায়তা ভিন্ন অপরে যেমন সাফল্য লাভ করিতে পারেন না, তেমনি আবার মিলিত ভাবে কাজ করিতেও কাহারো এতটুকু বাধে না। কাজ ভাগ করা থাকিলেও সকলেই সব কাজে সুনিপুণ। একের অসমর্থতায় অপরে তার কাজের ভার স্বচ্ছন্দে সম্পাদন করিতে পারে, এমন নিখুঁত সকলের শিক্ষা।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

দেহ-বন্ধ

মেয়েদের রূপশ্রী বা সৌন্দর্য্য গায়ের ফর্শা রঙে নয়—সৌন্দর্য্য নির্ভর করে দেহের সুকুমার বাঁধ-ছাঁদের উপর। দেহের বাঁধ-ছাঁদ বলিতে বুঝায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণ গঠন।

বিধাতা আমাদের সুন্দর করিয়া গড়িয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন—নিসর্গ-বিধি মানিয়া চলিলে আমাদের গঠনের সে সুকুমার ছাঁদে লাবণ্য ঘটিবার কথা নয়! কিন্তু সুশ্রী সুন্দর দেখাইবে বলিয়া কেহ নেন নানা রকম কৃত্রিমতার আশ্রয়, কেহ আবার বিধাতার দেওয়া সৌন্দর্য্য-সুষমার দাম না বুঝিয়া দেহের গঠন সম্বন্ধে অলস, উদাস বা নির্লিপ্ত থাকেন। তাহার ফলে আমাদের দেহের গঠনে এত রকমের বিকৃতি ঘটে।

রূপ, সৌন্দর্য্য-সুষমা—কে না চায়? সে জন্য মুখ এবং গায়ের চামড়া ঘষা-মাজা করিয়া কিম্বা তার উপর নানা রকম রঙের প্রলেপ লাগাইয়াই আমরা দায়ে খালাশ হই! তার ফলে কিন্তু নিজেদের আরো কদর্য্য এবং অসুস্থ করিয়া তুলি! এ কথা বুঝি না যে, beauty is more than skin deep—অর্থাৎ ফর্শা রঙে কাহারো সুষমা-শ্রী খোলে না। দেহের পেশী, হৃদ্‌যন্ত্র, লিভার, ফুস্‌ফুস্‌ এবং রক্ত—এ-সবের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উপরই সৌন্দর্য্যের বিকাশ! নিত্যদিন মুখে ক্রীম বা পাউডার মাখিলে সৌন্দর্য্য সুষমাকে পাওয়া যাইবে না; সৌন্দর্য্য-সুষমা পাইবেন ভালো স্বাস্থ্যে, নিয়মিত ও সংযত আচার-অভ্যাসে। অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত পুষ্টিকর আহার, নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিশ্রাম ও নিদ্রা, মুক্ত আলো-বাতাসে থাকা বা বেড়ানো—তাছাড়া দুশ্চিন্তা ও কুচিন্তাকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলা। তা যদি পারেন, আপনার দেহে যৌবন এবং সৌন্দর্য্য-সুষমা চিরদিন অটুট থাকিবে।

অনেকের ধারণা, সন্তানের জননী হইলেই দেহের লাবণ্য এবং গঠনের সুষমা-ছাঁদ নষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নিয়মিত ভাবে যদি ব্যায়াম-সাধনা এবং স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া চলেন, তাহা হইলে বয়স যতই বাড়ুক, মুখে কোঁচ পড়িবে না, গায়ের চামড়া লোল, গলা দো-ভাঁজ হইবে না! চোখের কোণে কালি পড়া, দেহে মেদ জমা, মাথার চুল ওঠা বা অকালে পাকিয়া যাওয়া—এ-সব উপসর্গ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাময় রাখিতে পারিবেন।

এক জন সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিদ্‌ বলিতেছেন—জন্মক্ষণেই সুস্থ শিশুর পানে চাহিয়া দেখুন, তার ঐ ননীর মত কোমল অঙ্গ, বর্ণে স্বাস্থ্যের দীপ্তি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুস্পষ্ট রেখা—শিশুকে কি সৌন্দর্য্য-সুষমাতেই না ভরিয়া রাখে! অঙ্গের এই কোমলতা ও কান্তি, চামড়ার এই স্বচ্ছ মসৃণতা—বয়স বাড়িবার সঙ্গে এ-সবে যে বঞ্চিত হইতে হয়, তার কারণ শুধু সভ্য সমাজের গড়া কৃত্রিম আচার-রীতির দাস্য!

খাওয়া-পরা চলা-ফেরা বসা-দাঁড়ানো—প্রতি কাজে আমরা নিসর্গ-বিধি ত্যাগ করিয়া নকল বিধি শিরোধার্য্য করি। হিম-রৌদ্র-ধূলা হইতে আমাদের অঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য দেহের উপর আবরণ বা আচ্ছাদন চাই, সত্য। কিন্তু এই আবরণ বা আচ্ছাদন রচনা করিতে যদি স্বাস্থ্যের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া জাঁক-জমকের দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহা হইলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্যই শুধু নষ্ট হইবে না, তার স্বাভাবিক গঠনেও আমরা বহু বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া তুলিব। ব্যায়ামে বা নড়াচড়ায় আমাদের দেহের সকল পেশী সুস্থ; দেহের রক্তচলাচল-ক্রিয়া অব্যাহত থাকে। ব্যায়ামে এবং নড়া-চড়ার কাজে যদি আমরা বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিতে পারি, তাহা হইলে বয়স বাড়ার সঙ্গে আমাদের গলা হাত মুখ বেচাঁদে পরিণত হইতে পারিবে না; গায়ের চামড়াতেও কদর্য্যতার ছোঁয়াচ লাগিবে না! দেহের স্বাস্থ্য ভালো থাকে পরিচ্ছন্নতায়, দেহে রক্ত-চলাচল-ক্রিয়ার সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে, অনলস ব্যায়াম-সাধনায় এবং দেহ-যন্ত্রে তৈল-প্রয়োগে!

১। বাইসিক্‌ল্‌ চালাইবার ভঙ্গীতে

২। ডান হাত নীচে, বাঁ হাত উর্দ্ধে

দেহযন্ত্রে তৈল-প্রয়োগ কি, সে কথা বারান্তরে বলিব। আজ অনলস ব্যায়াম-সাধনার কথা বলিতেছি।

১। চিৎ হইয়া শুইয়া দুই পা উর্দ্ধে তুলুন। এবার দুই হাত দিয়া কোমরের দু'দিক বেশ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ১ নং ছবির মত দুই পা নাড়িতে থাকুন বাইসিকেল চালাইবার ভঙ্গীতে। যখন বাঁ পা মুড়িবেন, ডান পা তখন থাকিবে সিধা উর্দ্ধে প্রসারিত; আবার ডান পা মুড়িবার সময় বাঁ পা থাকিবে সিধা উর্দ্ধে প্রসারিত। দু' পা এমনি ভাবে বেশ দ্রুত-তালে নাড়িতে হইবে—প্রায় আট-দশ মিনিট।

২। এবার সিধা হইয়া দাঁড়ান। দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবেন (২ নং ছবি দেখুন)। ঐ ২ নং ছবির মত ডান হাত

নীচের দিকে প্রসারিত করিয়া হাতের আঙুল দিয়া মেঝে স্পর্শ করুন—বাঁ হাত থাকিবে সিধা ঊর্দ্ধ দিকে প্রসারিত। মুখ সামনের দিকে ফিরাইতে হইবে। তার পর বাঁ হাত নামাইবেন এবং ডান হাত তুলিবেন; এবার মুখ ফিরাইতে হইবে পিছন দিকে। বেশ দ্রুততালে দুই হাত এমনি ভাবে উঠাইতে-নামাইতে হইবে, এ ব্যায়াম করিবেন দশ মিনিট।

৩। এবার পায়ে-পায়ে মিলাইয়া সিধা খাড়া দাঁড়ান—দুই হাত দু' পাশে ঝুলানো থাকিবে। এবার ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত যতখানি সম্ভব উর্দ্ধে প্রসারিত করুন; সঙ্গে সঙ্গে বুক চিতাইয়া মাথা পিছন দিকে হেলাইবেন। তার পর সবেগে হাত নামাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে মাথাও সিধা ভাবে খাড়া রাখিবেন। দুই হাত নামানোর সময় বুক চিতাইয়া রাখিবেন না—বুক থাকিবে স্বাভাবিক সিধা ভাবে। তার পর দু' হাত তুলুন—বুক চিতাইয়া মাথা পিছন দিকে হেলান্। এ ব্যায়াম অন্ততঃ পাঁচ মিনিট করা চাই।

৩। দু'হাত যত দূর সম্ভব উর্দ্ধে

৪। দু' পায়ে মিলাইয়া সিধা খাড়া দাঁড়ান! এবার ৪নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সামনের দিকে নোয়াইয়া অর্থাৎ ঝুঁকিয়া দুই হাত দিয়া দু' পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। করিয়া এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত গুণুন। তার পর বেগে দু' হাত উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া সিধা খাড়া দাঁড়ান। সিধা খাড়া দাঁড়াইবার পর আবার পাঁচ অবধি গুণিয়া প্রথম বারের মত কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত নোয়াইয়া দু' হাত দিয়া পায়ের আঙুল ছোঁওয়া চাই। এ ব্যায়ামও বেশ দ্রুতবেগে করা চাই অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ মিনিট।

৪। সাম্নে ঝুঁকিয়া

এ কয়টি বিধি-পালনে দেহের ছাঁদ সুকুমার হইবে এবং স্বাস্থ্য থাকিবে সর্ব্ব দিক দিয়া অটুট, মজবুত্!

—

ঘর-কর্ণার কথা

শীতের পরে গরম জামা-কাপড় শাল-আলোয়ান-লেপ—এ সব আমরা তুলে রাখি। তুলে রাখবার সময় যদি বিশেষ কতকগুলো বিধি না মানি, তাহলে পোকা-মাকড়ের আক্রমণে সে-সব নিরাপদ থাকবে না।

বাড়ী-ঘর যতই পরিষ্কার রাখি না কেন, কাপড়ের পোকা বা বইয়ের পোকার আক্রমণ থেকে বাড়ী-ঘর নিরাপদ রাখা প্রায় অসম্ভব। অন্ধকার কোণে প্রায়-অদৃশ্য দেহে তারা এমন ভাবে আত্মগোপন করে থাকে যে, খালি চোখে তাদের দর্শন মেলে না! এ সব দুষ্ট পোকা-মাকড় কোথায় থাকে, জানেন? দেওয়ালের বা দরজা-জানলার ফাটলে, টেবিল-চেয়ার ও আলমারি-বাক্সের পিছনে। রাত্রির অন্ধকারে গোপন-আস্তানা থেকে বেরিয়ে এরা জামা-কাপড় এবং বইয়ের মধ্যে আশ্রয় নিতে আসে; আশ্রয় নিয়ে ধ্বংস-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। এ সব পোকা-মাকড়ের এক-একটিতে ডিম পাড়ে প্রায় একশো! পশমী কাপড়, লেপ-তোষক, গদি, র‍্যাগ, কার্পেট, সতরঞ্চি, সোফার কাপড়, গরম পোষাক—এ সব জিনিষ হলো এই সব পোকা-মাকড়ের ডিম পাড়বার এবং সে ডিমের লালন-পরিচর্য্যার পক্ষে নিরাপদ আস্তানা! এ জন্য আমাদের উচিত, মাসে এক দিন করে' বাড়ীর সমস্ত র‍্যাগ-কার্পেট, বিছানা, পোষাক-পরিচ্ছদ, সোফা-কৌচ ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে সাফ করা—ঝেড়ে সাফ করে সেগুলিকে রোদে দেওয়া। গরম কাপড়-চোপড় এবং বই—এ সব ঝেড়েঝুড়ে মাসে একবার করে' যদি রোদে দেন, তাহলে পোকা-মাকড়ের হাত থেকে সেগুলি নিরাপদ থাকবে।

শীতের শেষে গরম কাপড়-চোপড় যখন তুলে রাখবেন, তখন সেগুলি যে ক্ষেত্রে সম্ভব কাচিয়ে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে তবে আলমারিতে বা ট্রাঙ্কে তুলবেন। যেখানে কাচা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে ব্রাশ দিয়ে ধুলা-ময়লা ঝেড়ে রোদে দিয়ে তার পর তুলবেন! ময়লা কাপড়-চোপড়ে চট্ করে পোকা ধরে। তুলে রাখবার সময় কাপড়-চোপড়ের ভাঁজে ভাঁজে কিছু ন্যাপথিলিন রাখবেন। ন্যাপথিলিনের গন্ধ অনেকের বিশ্রী লাগে—তাঁরা ন্যাপথিলিনের বদলে রাখবেন প্যারাডাইক্লোরোবেন্‌জিন। এ জিনিষের দাম একটু বেশী। তবে ন্যাপথিলিন প্রভৃতি দিলেও জানবেন যত দিন এদের গন্ধ থাকবে উগ্র, তত দিনই তাতে পোকা-মাকড়ের ধ্বংস অনিবার্য্য। গন্ধ উবে গেলে পোকা-মাকড়কে ঠেকিয়ে রাখবার সামর্থ্যও এদের সেই সঙ্গে চলে যাবে।

কোনো কাপড়-চোপড় এলো রাখবেন না। ছোট যে-সব জিনিষ, অর্থাৎ মোজা, দস্তানা, কম্ফর্টার, ছেলেমেয়েদের ফ্রক, পেনি, গেঞ্জি—এগুলি রাখবেন ষ্টীল-ট্রাঙ্কে; কাঠের বাক্সে নয়; এবং রাখবেন বেশ টাইট্ করে পুঁটলিতে বেঁধে। পুঁটলি যে বাঁধবেন

—ময়লা কাপড়ে নয়, ধোপদোস্ত কাপড়ে বাঁধবেন। গরম স্যুট, কোট, ওভার-কোট—এ সব জিনিষ প্রথমে বড় কাগজের প্যাকেটে টাইট করে বেঁধে তার পর পুঁটলি-জাত করবেন। মোদ্দা ন্যাপথিলিন দিতে ভুলবেন না। কাগজের প্যাকেটগুলি আঠা-মাখানো ফিতে দিয়ে শীল্ করে দেবেন—কোথাও ফাঁক না থাকে! এ সব জিনিষ প্যাক্ করার জন্য খপরের কাগজ উপযোগী। কারণ, ছাপার কালির গন্ধ এ-সব পোকা-মাকড়ের যম! আলমারির এবং তোরঙ্গর মধ্যে তামাক-পাতা রাখতে পারেন—তামাকের গন্ধে এ সব পোকা-মাকড় এক নিমেষ বাঁচতে পারে না। আলমারিতে রাখবার আগে আলমারির কাঠে ফাঁক বা ফাটল আছে কি না দেখবেন। থাকলে কাঠের পটি মেরে সে ফাটল বা ফাঁক বেমালুম বুজিয়ে দিতে হবে। কাঠের আলমারিতে বা বাক্সে ফাঁক এবং ফাটল থাকলে জামা-কাপড় রাখবার জন্য তা নিরাপদ হতে পারে না, এ কথা ভালো করে মনে রাখবেন।

জামা-কাপড়, র‍্যাগ-কার্পেটে পোকা-মাকড় বাসা বাঁধলে বুঝবেন ডিমও তারা পেড়েছে অজস্র এবং সে সব ডিম ফুটলে র‍্যাগ-কার্পেট নষ্ট হবে! পোকা-মাকড় ধ্বংস করে র‍্যাগ-কার্পেট প্রভৃতি বাঁচাবার উপায় হলো কড়া ব্রাশ বা ঝাঁটা দিয়ে জোরে জোরে সেগুলি ঝেড়ে নেওয়া; তার পর এ্যামোনিয়ায় ব্রাশ ডুবিয়ে কীট-আক্রান্ত র‍্যাগ-কার্পেট প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গ ধুয়ে মুছে নেওয়া। তার পর রৌদ্রে মেলে দিয়ে মোটা লাঠি দিয়ে সেগুলিকে সজোরে পিটতে হবে।

এখন ন্যাপথিলিনের দাম এত বেশী যে, সকলের পক্ষে তা সংগ্রহ করা কঠিন। ন্যাপথিলিনের বদলে কিছু কালো-জিরা ছড়িয়ে দিলেও জামা-কাপড় প্রভৃতি পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারবেন।

আমাদের দেশের শালওয়ালারা বলে, শাল-আলোয়ান তুলে রাখবার সময় সেগুলি ভাঁজ করে নতুন মলমল্-কাপড়ে পুটলি বেঁধে তুলে রাখলে তাতে পোকা-মাকড় আস্তানা পাততে পারবে না। এমন ভাবে প্যাক করা চাই, যেন তার কোথাও একটু ফাঁক না থাকে।

সোফা-কৌচে পোকা হলে তখনি সোফা-কৌচের মিস্ত্রী ডাকিয়ে এনে পরিচর্য্যা করবেন—না হলে সোফা-কৌচকে রক্ষা করা দায় হবে।

তেরশ' পঞ্চাশ সাল

মহাকাল বর্ষচক্রে খুলে দিল ধরণীতে দ্বার—
এল ঐ তের শত পঞ্চাশ এবার।
পিছনেতে কত বর্ষ উল্লাসেতে দুঃখে হেসে কেঁদে
পড়ে রয় তপ্ত ধূলিতলে,
তারি কঙ্কালের 'পরে বজ্র-করে অশ্বে কশা বাঁধি,
মানুষের মহাপাপে দুই চোখে রোষে অগ্নি জ্বলে,
তেরশ' পঞ্চাশ এল গর্জ্জি' বারে বার;
অট্টহাসি হেসে কাল নিজ হস্তে খুলে দিল দ্বার।
সহে না একটু ত্বরা হুঙ্কারিয়া ডাকে বারে-বারে,
—পাপমগ্ন নর-নারী যাত্রা-পথে হুঁশিয়ার!
কিম্বা আজি খাড়া হও মৃত্যু বরিবারে!
সহস্র বৎসর ধরি' জমিয়াছে পাপের পাহাড়,
মহাকাল আছে সাক্ষী তার।
মিথ্যা কথা, হিংসা আর প্রতারণা ভ্রাতায়-ভ্রাতায়,
আত্মসুখে পরদ্বেষে এই বসুধায়
স্নিগ্ধ মাটি তপ্ত হলো প্রতিদিন প্রকাশ্যে-গোপনে,
রক্তভরা কল্লোলিত তার ইতিহাস টগবগ করে সদা মনে।
কত না লজ্জার বাণী গুপ্ত হয়ে কাঁদে নিশিদিন,
সেই সব পাপ দিয়া বাজাইয়া বীণ,
উল্লাসে নাচিয়া চলে ভদ্রবেশী বর্ব্বরের দল,
ধনিকের বণিকের পাপে বিশ্ব করে টলমল,—
গির্জ্জায় মন্দিরে মঠে পণ্যশালে প্রাসাদের তলে,
নিত্য নাচি পাপস্রোত চলে।
ধরিত্রী বহিতে আর পারে নাকো এ পাপের ভার—
তাই আজি মহাকাল অট্টহাসি হেসে
খুলে দিল নববর্ষ-দ্বার।

সেই বর্ষ-দ্বার দিয়া তেরশ' পঞ্চাশ এল
যুগান্তের সে যে মহাদূত,
সম্মুখে প্রলয় তার, পশ্চাতে সৃষ্টির জ্যোতি—
হাহাকার আর্ত্তনাদ দুইটি নকীব ফুকারিছে সঙ্গে অদ্ভুত।
মানবের নবজন্ম মরণের মহাসন্ধি আজি,
পঞ্চাশী বৈশাখ সাথে এল তাই দুর্ভিক্ষ মড়ক,
লোল জিহ্বা করে লক্লক্!
অগ্রসঙ্গী মহারণ রক্ত দিয়া ধৌত করে দ্বার,
গর্জ্জিতেছে অনশন উর্দ্ধে-নিম্নে হাঁকে দৈবরোষ,
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই আর!
চারি দিকে ঘিরে তার আধিব্যাধি দৈন্য মহামারী
হুঙ্কারিছে সর্ব্বনাশা ভয়,
সকল নিগ্রহ আর সমস্যার রুদ্র সমাধান—
তারি অগ্নিকুণ্ডে দহি হইবে নিশ্চয়।
তার পর?—পড়ে' রবে দগ্ধ কোটি নরের কঙ্কাল—
স্তূপাকার ভস্ম-অবশেষ!
সেই মহাভস্ম 'পরে বিশ্বে যারা মহা-ভাগবত,
তাহারা বাজাবে বীণ,
তাহারা রচিবে পুনঃ ধরণী নবীন,
গঠিবে নূতন করি নর-নারী নব পুণ্যদেশ।
এস তবে নমো নমো তেরশ' পঞ্চাশ সাল,
ধ্বংসের কুঠার দিয়া ভাঙ্গি এই পাপ-রাজ্য রুদ্র আশীর্ব্বাদে
ভাবী পুণ্য ধরণীর পথ তুমি করো এসে সুরু!
হে রুদ্র, বিরাট ঘায়ে সাফ্ করো সকল জঞ্জাল—
সেই পথে আসিবেন ত্রাণ-বার্ত্তা নিয়ে ত্রাণগুরু!

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পল্লীগ্রামের সুখ-দুঃখ

গত বৎসর বড়দিনের সময় কলিকাতার বিভিন্ন অংশে বোমা পড়িলে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় অনেকেই কলিকাতা-ত্যাগের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে কলিকাতা-বাস আদৌ নিরাপদ নহে মনে করিয়া বৈবাহিক-মহাশয় তাঁহার কন্যা ও নাতিনীগুলিকে নিরাপদ পল্লীভবনে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কোন আত্মীয়কে আমার বাসায় পাঠাইলে পরিবারবর্গকে আমি তাহার সঙ্গে পাঠাইতে প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু তাহাদিগকে দূরে পাঠাইয়া অন্তিম কালে জীর্ণ দেহে ও ভগ্ন স্বাস্থ্যে একাকী কলিকাতায় বাস করিতে আমার সাহস হইল না, সুতরাং আমাকেও অগত্যা তাহাদের সহগামী হইতে হইল।

গন্তব্য-স্থান রাণাঘাট। রাণাঘাটে যাইবার জন্য যে ট্রেণে উঠিয়াছিলাম, বিভিন্ন ষ্টেশন হইতে বহু যাত্রী সংগ্রহ করিয়া এক ঘণ্টারও অধিক কাল পরে তাহা নৈহাটি ষ্টেশনে পৌঁছিলে শুনিলাম উহা কাঁচড়াপাড়া হইতে শিয়ালদহে ফিরিবে, রাণাঘাটে যাইবে না! অগত্যা আমাদিগকে সেখানে নামিয়া রাণাঘাটগামী ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতে হইবে! কিন্তু কখন সেই ট্রেণ আসিবে, তাহার নিশ্চয়তা ছিল না! সুতরাং কাঁচড়াপাড়ায় নামিলে রাত্রিকালে বিপন্ন হইবার আশঙ্কায় আমরা নৈহাটি ষ্টেশনেই নামিয়া পড়িলাম এবং এক মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত কোন আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় লইয়া তাহার অতিথি হইলাম।

তার পর ট্রেণের সংবাদ পাইবামাত্র ষ্টেশনে আসিলাম! আসিয়া দেখি, কোন কামরায় স্থান নাই—অবশেষে একখানি কামরায় একটু ফাঁক দেখিয়া সকলে সেখানে উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু বসিবার স্থান পাইলাম না। উহা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী। গাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার, একটি আলোও জ্বলিতে দেখিলাম না। রাত্রিকালে ট্রেণের কোন গাড়ীতে আলো নাই, পূর্ব্বে কোনও দিন এরূপ দেখিতে পাই নাই! মিতব্যয়িতার নিখুঁত দৃষ্টান্ত!

যাহা হউক, ঘণ্টাখানেক পরে রাণাঘাট ষ্টেশনে নামিয়া আমাদের চক্ষু স্থির! প্ল্যাটফর্ম্মে এবং ষ্টেশনের ভিতরে ও বাহিরে যেন জন-সমুদ্র! শুনিলাম, বহু লোক কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে পায়ে হাঁটিয়া রাণাঘাট ষ্টেশনে আসিয়াছে; এখানে ট্রেণে চাপিয়া তাহারা পূর্ব্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গে তাহাদের গন্তব্য স্থানে যাইবে বলিয়া ষ্টেশনে প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু অনেকে দুই-তিন দিনের চেষ্টাতেও গন্তব্য স্থানের টিকিট সংগ্রহ করিতে পারে নাই! ট্রেণে স্থান ছিল না, এ জন্য অনেকেই দীর্ঘকাল অনাহারে সেখানে পড়িয়া ছিল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের জন্য অনেকে একটু দুধও সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

আমরা বহু কষ্টে সেই জনতা ভেদ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলাম। এই ষ্টেশনেও কুলির অভাব; এ জন্য সুটকেসগুলি ট্রেণ হইতে নামাইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে তুলিতে আড়াই টাকা কুলি-ভাড়া দিতে হইল। শুনিলাম, কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি ট্রেণে স্থান সংগ্রহ করিতে না পারায় কলিকাতায় বাস ভাড়া করিয়া সপরিবারে রাণাঘাটে আসিয়াছেন, এ জন্য তাঁহাদিগকে পঞ্চাশ-ষাট টাকা বাসের ভাড়া দিতে হইয়াছে। রেলের ও বিভিন্ন কারখানার অনেক কুলি-মজুর প্রাণভয়ে তাহাদের সকল সম্বল—এমন কি গো-মহিষ, ছাগল, ভ্যাড়া প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া পলায়ন করিতেছে। অনেক কুলির স্কন্ধে সদ্যঃপ্রসূত গো-বৎস দেখিলাম। অনেকের গো-শব মাটীর হাঁড়ী চালের জালা হইতে ঢেঁকি খাটিয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থাা সকল দ্রব্য স্তূপীকৃত! সারি সারি বলদ, তাহাদের পিঠের দুই দি প্রসারিত কুলিদের মাল-বোঝাই বস্তা। কুলিদের মাথায় জ্বালা কাঠের বোঝা, কাঁধে বোঁচকা।

রাণাঘাটে আসিয়া যে গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, সেটি চূ নদীর ফেরি-ঘাটের অদূরে অবস্থিত। নদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত পথটির নাম "ফেরি ফণ্ড রোড।"

এই ফেরি ফণ্ড রোডের পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকার খো বারান্দায় বসিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় যান-বাহন ও গো-মহিষা গমনাগমন লক্ষ্য করিতাম। অদূরবর্ত্তী খেয়া-ঘাটে প্রত্যহ অস গাড়ী, ঘোড়া ও গো-মহিষাদি পার হইয়া থাকে। শান্তিপুর প্রভৃ স্থানে যাইবার ইহাই প্রধান পথ। এই পথের ধারে ঘোড়ার গাড় কয়েকটি আস্তাবল আছে, কিন্তু কোচম্যানের দল বিভিন্ন উপা অর্থোপার্জ্জন করে। তাহারা প্রভাতে নদীপার হইয়া অপর-পা পথের ধারে শিকারের প্রতীক্ষা করে এবং অদূরবর্ত্তী বিভিন্ন পল্লীগ্র হইতে যে সকল ফল-মূল ও তরি-তরকারী স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের জ আনীত হয়, তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহারা ঝোড়া বা বস্তাসহ স্ব আস্তানায় লইয়া যায়, এবং যথাসম্ভব অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া কলিকাত রপ্তানী করে। এ জন্য স্থানীয় বাজারে ঐ সকল দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য দুর্ম্মূল্য। প্রত্যহ প্রভাতে দেখিতাম—তাহারা উচ্ছে, কাঁচক বেগুন, পটোল, শিম, লাল আলু, কুল, মূলা, পেঁয়া পালংশাক, পুঁইশাক, শশা, কুমড়া প্রভৃতি নানা প্রকার ফল তরকারী বস্তাবন্দী করিয়া তাহার উপর বালতি-বালতি জল ঢালিত এই জন্যই সেগুলি শীঘ্র শুকাইয়া নীরস হইত না। তাহারা যে সব কুল আমদানী করিত, তাহাদের অধিকাংশ অপক্ক সবুজ বর্ণ কলিকাতার বাজারে উহা সুপক্ক বলিয়া বিক্রয়ের জন্য চটে ঢাকিয়া দু এক দিন রৌদ্রে শুকাইয়া বস্তাবন্দী করা হইত; বস্তার সমস্ত কু পাকিয়া লাল হইত। কলিকাতার ক্রেতারা মনে করিত, উ গাছ-পাকা কুল। পরিপুষ্ট নোনা-আতাগুলিও এই ভাবে দুই-তি দিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা হইলে তাহাতে রঙ্গ ধরিত এবং এক নরম হইত; তখন তাহাদের বোঁটার কিয়দংশ কাটিয়া ফেলি মনে হইত, অর্দ্ধ-পক্ক নোনাগুলি গাছ হইতে পাড়িয়া কলিকাতা প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল বেল এই ভাবে কলিকাতায় রপ্তা হয়, তাহা গাছ-পাকা বেল—এই ধারণায় সেখানে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু ঐ সকল অপক্ক বেল পাকাইবার জন্য যে কৌশ অবলম্বিত হয়, তাহার মৌলিকতা কৌতূহলোদ্দীপক! ঐ সব ব্যাপারী চূর্ণী নদীর অপর-পারস্থ পল্লীগ্রামসমূহে গমন করিয়া পরি পুষ্ট বেলগুলি নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে, অর্থাৎ শতকরা এক টাকা অধিক মূল্য দিতে হয় না। তাহারা বেলগুলি পাড়িয়া বস্তাবন্দী করিয়া স্ব স্ব আস্তানায় লইয়া আসে এবং উঠানে একটি বৃহৎ গর্ত্ত কাটিয়া তাহার ভিতর এক রাশি আস্শ্যাওড়ার (দাঁতনের) পাতা রাখে, তাহার পর সেই পাতার উপর বেলগুলি পর-পর সাজাইয়া গর্ত্তের পাশে একটি মাটীর হাঁড়ি প্রোথিত করে। সেই হাঁড়ি শুষ্ক কাঠখড়ি দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে

রা হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া একটি বাঁশের নলের সাহায্যে হাঁড়ি উত্থিত ধূমরাশি বেলপূর্ণ গর্ত্তের ভিতর সঞ্চালিত করে। এই র দীর্ঘকাল ধূমে আচ্ছন্ন থাকায় বেলগুলির সবুজ খোলা লোহিতাভ এবং তাহার ভিতরের শাঁসও কিঞ্চিৎ নরম হইয়া থাকে। তঃপর বেলগুলি গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া এক দিন রৌদ্রে লিয়া রাখিলে গাছ-পাকা বেল বলিয়াই অনভিজ্ঞ ক্রেতার ধারণা হয়। তাহারা এক একটি বেল চার-পাঁচ পয়সা বা ততোধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া সুপক্ব বেল আস্বাদনের আনন্দ উপভোগ করে। পরিপুষ্ট কাঁচা আমও আস্তাওড়ার পাতা দিয়া ঢাকিয়া কয়েক দিন জাগ দিলে গাছপাকা আম বলিয়াই প্রতীতি হয়। গাড়ী গাড়ী কাঁঠালও রৌদ্রোত্তাপে নরম করিয়া কলিকাতায় চালান দেওয়া হয়; পল্লীগ্রামে একটার মূল্য ছয় পয়সা হইলেও কলিকাতায় তাহা ছয় আনায় বিক্রয় হয়, বস্তুতঃ পুষ্টপ্রায় কাঁঠালগুলি এই ভাবেই পাকাইয়া বিক্রয় করা হয়। 'কিলাইয়া কাঁঠাল পাকাইবার' প্রবচনটি সত্য নহে।

কলিকাতার অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য ভেজাল-মিশ্রিত, ইহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। দুগ্ধে নানা কৌশলে এরূপ ভেজাল মিশাইয়া তাহা বিক্রয় করা হয় যে, দুগ্ধ-পরীক্ষার যন্ত্রেও (ল্যাক্টোমিটারে) তাহা ধরা পড়ে না। কলিকাতায় টাকায় তিন সের দুগ্ধও ভেজাল-বর্জ্জিত নহে। সম্মুখে গাভী দোহন করা হইয়াছে, সে দুগ্ধও 'জলবৎ তরলং'—স্বাদগন্ধ-বিহীন! কিন্তু আমাদের পল্লীগ্রামে দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য হইলেও আট আনায় আড়াই সের দুগ্ধ মুসলমান দুগ্ধ-বিক্রেতার নিকট ক্রয় করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে অল্প জ্বাল দিলেও পুরু চটের মত সর পড়ে; তাহার স্বাদ ও গন্ধ অতুলনীয়। পল্লীগ্রামের বহু স্থানেই পেঁপের গাছ আছে; সেই সকল গাছে সুপক্ব পেঁপের অভাব নাই। সহরবাসী চতুর 'ফড়ে' বা পাইকারের দল সেই সব গ্রামে গমন করিয়া প্রচুর পরিমাণে পাকা পেঁপের বীজ নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে এবং বেণেরা তাহা গোল-মরিচের সহিত মিশাইয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করে। আমরা যে গোলমরিচ রন্ধন-কার্য্যে ব্যবহার করি—তাহার প্রায় অর্দ্ধেক পাকা-পেঁপের বীজ!

কলিকাতার উৎকৃষ্ট মাখনে পাকা কলা ও সুসিদ্ধ আলু মিশাইয়া ভেজাল দেওয়া হইত। এখন আলুর মূল্য চড়া, পাকা কলাও দুর্ম্মূল্য; পাকা কলা ও আলু ছাড়া দোমালা নারিকেলের নরম শাঁস, ভিজা আতপ চাউল ও কাঁচা কলাইয়ের খোসাবিহীন ভিজা ডাল শীলে পিষিয়া মাখনের সহিত মিশাইয়া তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইত! এখন এ সকল ভেজাল মিশাইয়া লাভ করা যায় না—তাহার প্রয়োজনও নাই। এখন 'ট্যালো' বা চর্ব্বি মিশাইয়া ভালো গব্যঘৃত ও জল-সংযোগে ফেনাইয়া তাহা মাখনে রূপান্তরিত হইয়া কলিকাতার বাজারে বেশ চলিতেছে। 'ভেজিটেবল্ প্রোডাক্ট্স্' নামে যে ঘৃত সম্প্রতি 'বনস্পতি' নামে সাধারণ্যে সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়াছে, তাহার উপরেও উচ্চহারে সরকারী-ডিউটির শীল-মোহর পড়িয়াছে, কাজেই "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং" সেবনের পথও রুদ্ধপ্রায়! যাঁহারা কলের ময়দার রুটি বা লুচি দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতেন, তাঁহাদিগকে কি পরিমাণ সাদা পাথর-চূর্ণ জীর্ণ করিতে হইত, ইয়ত্তা ছিল না! এখন ময়দা-আটা গল্প-কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার তামাক-বিক্রেতাগণের অনেকে গয়া-বিষ্ণুপুরের মাখা তামাকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কোৎরা গুড় মিশাইয়া যথেষ্ট লাভ করে। অহিফেনে খয়েরের ভেজাল চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর নহে!

দীর্ঘকাল পরে রেল-ষ্টেশনের প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া মনে হইল, যেন কোন নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছি! কেবল সুদূর আকাশের এক প্রান্তে উড্ডীয়মান এরোপ্লেনের 'ঘ্যানর ঘ্যানর' শব্দ ক্ষণকালের জন্ত মনে কলিকাতায় বোমা-বর্ষণের অপ্রীতিকর স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আরোহিপূর্ণ বাস যখন আমাদের গ্রামের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইল, তখন পথ-প্রান্তবর্ত্তী সহকার-কুঞ্জের মুকুল-ভারাবনত শাখা-পল্লব হইতে নব-প্রস্ফুটিত মুকুলের মধুর সৌরভ নব-বসন্তের সমীরণ-প্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া প্রবাস-প্রত্যাবৃত্ত গ্রামবাসিগণকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। শ্যামল শাখাপত্রের অন্তরাল-সংগুপ্ত কোকিল কুহু-স্বরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া বসন্তের সমাগমবার্ত্তা বিঘোষিত করিল, এবং বংশকুঞ্জের উচ্চ শাখায় উপবিষ্ট ঘুঘু আলস্য-বিজড়িত করুণ স্বরে দিবাবসান-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ঘুঘুর সেই বিষাদাপ্লুত স্বর শুনিয়া পল্লীগ্রামের বৃদ্ধারা বলেন—ঘুঘু বলিতেছে—"কৃষ্ণ হে, উঠ, উঠ, উঠ।" কত কাল পরে এ কথা মনে পড়িয়া গেল! পথের অন্য দিকে সমুচ্চ অশ্বত্থ-শাখায় বসিয়া পাপিয়ার দল সমস্বরে কূজন করায় কবির 'পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা' পল্লীবাটের কথা স্মরণ হইল। কিছু দূরে আমাদের গ্রাম-প্রান্তস্থ বাগানের উন্নতশীর্ষ বৃক্ষশ্রেণী গগনপ্রান্তবর্ত্তী ধূসর মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

বহু কাল পরে গ্রামে প্রবেশ করিলাম, যেন কোন অপরাধী দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী নির্ব্বাসন-দণ্ডের অবসানে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল! পাড়ার বালক-বালিকাগণ পথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া কৌতূহল-বিস্ফারিত নেত্রে আমাদের অধিকৃত 'হাওয়া গাড়ী'র দিকে চাহিয়া ছিল। কোন বালিকার পরিহিত শাড়ীর এক প্রান্ত পথে লুটাইতেছে, কোন উলঙ্গ বালক এক খণ্ড ইক্ষুদণ্ড লইয়া মহা উৎসাহে চর্ব্বণ করিতেছে, ইক্ষুরসে বালকের বক্ষস্থল প্লাবিত। অবশেষে নারিকেলকুঞ্জ-পরিবেষ্টিত পল্লীভবনের সম্মুখে আসিয়া বাস হইতে অবতরণ করিলাম।

কিন্তু আমার রুদ্ধ গৃহ অন্ধকার। যে সুপ্রশস্ত অট্টালিকার প্রতি কক্ষ আমার গৃহবাসী বালক-বালিকাদলের কলহাস্যে নিত্য মুখরিত হইত, তাহাদের কেহই এখন জীবিত নাই! পরিজনবর্গের চিরপরিচিত মুখ একটিও দেখিতে পাইলাম না। তাহাদের সকলকেই একে একে প্রবাসে বিসর্জ্জন দিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। শূন্য-হৃদয়ে সজল-নেত্রে নির্জ্জন গৃহে প্রবেশ করিলাম। এখন যাহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের কেহই পূর্ব্বে কোন দিন আমাদের এ বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। তাহারা যেন এক হোটেল হইতে বহু দূরবর্ত্তী অন্য এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিল! আমার গৃহসংলগ্ন বিভিন্ন গৃহবাসী যে সকল আত্মীয়-স্বজনের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারা আমার গৃহদ্বারে আসিয়া আমাদের বিষাদ-মলিন মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তাহাদের পিতামাতার বিবাহের পূর্ব্বে আমরা গৃহত্যাগ করিয়া একমুষ্টি উদরান্নের আশায় প্রবাসে যাত্রা করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহাদের সকলেরই মুখ আমার নিকট নূতন! যেন অপরিচিত নবীন অতিথিগণের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি! আমার গৃহপ্রান্তবর্ত্তী উদ্যানে যে সকল নারিকেল বৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাদের কাণ্ডগুলি

এখন স্থূল ও বার-চৌদ্দ হাত দীর্ঘ হইয়াছে, প্রত্যেক বৃক্ষেই কাঁদি কাঁদি নারিকেল ফলিয়াছে,—দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। কথিত আছে, কৃতী পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থ এবং স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষের ফল ভোগ করা সৌভাগ্যের নিদর্শন; ভগবান্ এই বার্দ্ধক্যে আমাকে প্রথমটিতে বঞ্চিত করিলেও অন্যটি সম্বন্ধে আমার প্রতি কৃপণতা করেন নাই দেখিয়া আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। দেখিলাম, আমার রোপিত আমের কলমগুলির শাখাপত্র রাশি রাশি মুকুলে ঢাকিয়া গিয়াছে; কেবল যাহাদের ভোগের জন্য এই সকল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহাদের কেহই আজ জীবিত নাই! আমার গোশালা শূন্য পড়িয়া আছে! যে গোঁজে দড়ি দিয়া দুগ্ধবতী গাভী বাঁধিয়া রাখা হইত, সেই গোঁজ ও দড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও সেখানে পড়িয়া আছে। গৃহপ্রান্তবর্ত্তী কূপের জল তুলিবার দড়া অবজ্ঞাত ভাবে অদূরে ধূলায় লুটাইতেছে, জীর্ণ হইলেও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। বাসগৃহের এক কোণে সংরক্ষিত কাঠের দীপগাছায় তৈলহীন মৃৎপ্রদীপ প্রতিদিন সায়ংকালে যাহাদের কোমল করস্পর্শের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই সকল প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই! মাথার চুল বাঁধিবার গুছিগুলি ঘরের কলুঙ্গীতে যেমন পড়িয়াছিল, সেই ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাদের উপর প্রচুর ধূলা সঞ্চিত হইয়াছে। যাহারা উহা কেশের বেণী রচনার জন্য সঞ্চয় করিয়াছিল, আজ তাহারা সকল কামনার অতীত! ইহলোক হইতে অপসৃত!

বহু কাল পরে অনিচ্ছার সহিত আমার নির্জ্জন শোকস্মৃতিপূর্ণ পল্লীভবনে আসিতে বাধ্য হইলেও কয়েক দিন এখানে বাস করিয়া কলিকাতার সহিত পল্লীগ্রামে বাসের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সন্ধ্যাকালে গৃহপ্রান্তে ঝিল্লীর অশ্রান্ত তান, রাত্রিকালে অদূরবর্ত্তী বনের ও ঝোপের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন দলবদ্ধ শৃগালের সমস্বরে গান, সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইলে পাড়ায় পাড়ায় মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে পল্লীবাসিগণের হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও উষা-কীর্ত্তন কেবল যে পল্লীগ্রামের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে এরূপ নহে, পল্লীগ্রামে জীবন-যাপনের মাধুর্য্য অনুভব করিতেও বিলম্ব হয় নাই। কলিকাতায় যে সকল ভেজাল-মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য আহারের অযোগ্য বলিয়া স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইত না, এখানে সেই সকল কদর্য্য ভেজালের অত্যাচার নাই। এখানে ঘোষাণী প্রতিদিন প্রভাতে গাঢ় দধি মন্থন করিয়া ননী তুলিয়া লইয়া যে টাট্‌কা ঘোল প্রস্তুত করে, তাহা সুপেয়, এবং 'জলবৎ তরলং' নহে। পূর্ব্বে প্রতি সেরের মূল্য দুই পয়সা ছিল, এখন দুগ্ধ দুর্মূল্য হওয়ায় এক সের এক আনায় কিনিতে হইতেছে। কলিকাতার মাখন-তোলা দুধের চিনিপাতা দৈ এই ঘোলের তুলনায় স্পর্শেরও অযোগ্য। গো-দুগ্ধ কিছু দিন পূর্ব্বেও টাকায় দশ সের ছিল, এখন গাভীর খাদ্যদ্রব্য খৈল, ভূষি, বিচালী প্রভৃতি দুর্মূল্য হওয়ায় তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিলিতেছে না; এ জন্য গাভীর দুগ্ধ কমিয়া গিয়াছে বলিয়া খাঁটি দুধ টাকায় পাঁচ সেরের বেশী পাইবার উপায় নাই। গোয়ালারা যে দুগ্ধ টাকায় আট সের দরে বিক্রয় করিতেছে, তাহার অর্দ্ধেক জল। তিন পোয়া দুধে এক পোয়া জল দিয়া তাহারা যে 'নির্জ্জলা দুধ' বিক্রয় করে, তাহার দর টাকায় ছয় সের। কিন্তু যদি তাহাদের নিকট সত্যনারায়ণের পূজার জন্য দুগ্ধের বরাত দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই দুগ্ধ তাহারা টাকায় চার সেরের অধিক দিতে সম্মত হয় না; কারণ তাহাদের ধারণা, দেবতার পূজার দুধে একবিন্দু জল দিলে তাহাদের গোয়ালের গাভীগুলি একযোগে প্রাণত্যাগ করিবে! এই ধারণায় মুসলমান দুগ্ধ-বিক্রেতারা দুধে জল দিতে সাহস করে না। ধর্ম্মভয়ে না হইলেও তাহাদের এই ভয় প্রবল। ঘোষাণীরা দধি হইতে ননী তুলিয়া যে টাট্‌কা ঘি জ্বাল দিয়া আনে, তাহার স্বাদ ও গন্ধ কলিকাতার মাখন হইতে প্রস্তুত ঘৃতের স্বাদ ও গন্ধ অপেক্ষা বহুগুণ উৎকৃষ্ট। উভয়ের তুলনা হয় না। এখন তাহার মূল্য প্রতি সের তিন টাকা। যে সকল ঘৃত-ব্যবসায়ী 'ফাড়' বিভিন্ন গ্রাম হইতে গাওয়া-ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গৃহস্থ-বাড়ীতে বিক্রয় করে, সে ঘৃতও ভেজাল-বর্জ্জিত, কিন্তু জ্বালে কাঁচা বলিয়া তেমন সুস্বাদ নহে এবং তাহা সৌরভহীন; তাহার মূল্য প্রতি সের আড়াই টাকা।

আমাদের এই কৃষিপ্রধান গ্রামেও এক সের গম সংগ্রহ করিবার উপায় নাই! এ জন্য ময়দা প্রতি সের বার আনায় কিনিতে হইতেছে। গম কিনিয়া জাঁতায় পিষিয়া লইলে খরচ কিছু কম পড়ে, এখন নূতন গম উঠিতেছে, কিন্তু তাহাও কেবল দুর্মূল্য নহে, দুষ্প্রাপ্য। গোধূম-ব্যবসায়ী অবাঙ্গালীরা ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরিয়া উহা কাটাই-মাড়াই হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতি-মণ ১৬ টাকা দর ধার্য্য করিয়া চাষীদের হাতে বায়নার টাকা গছাইয়া দিতেছে, দরিদ্র চাষীদের পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা কঠিন। এ দিকে জিলার সরকারী কর্ম্মচারীরা মহকুমার প্রত্যেক গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে নোটিস দিয়া আদেশ করিয়াছেন, তাহাদের এলাকায় যত গোধূম উৎপন্ন হইবে, তাহার কিছুই যেন তাঁহাদের অনুমতি ভিন্ন বিক্রয় করা না হয়, অর্থাৎ সরকার তাহা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় করিবেন; সুতরাং গ্রামবাসীদের তাহা সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। অথচ সরকার তাহার কি মূল্য দিবেন, তাহা প্রকাশ নাই; এ জন্য চাষীরা উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছে। তাহারা জানে, ভারতরক্ষা আইনে তাহাদের হাত-পা বাঁধা।

আমাদের গ্রামের কিছু দূরে একাধিক চিনির কল থাকিলেও বার আনা সের চিনি কিনিতে হইয়াছে, এখন আট আনা সের দরে কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর টাকায় পাঁচ সের মধু বিক্রয় হইয়াছে, এখন প্রতি-সের দশ আনায় কিনিতে হইতেছে। মাঘ ফাল্গুন মাসে উহার মূল্য আরও অধিক ছিল; কিন্তু উনিশ টাকায় চাউলের মণ কিনিয়া দশ-বার আনা মূল্যে এক সের মধু কিনিতে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? মধু-বিক্রেতারা বলিতেছে, বনে জঙ্গলে পাহাড়ে মৌচাকের অভাব নাই, বড় বড় মৌচাকে আধ মণ পঁচিশ সের মধু পাওয়া যায়, কিন্তু যখন এক সের চাউল দশ বার পয়সায় মিলিত, তখন টাকায় পাঁচ সের মধু বিক্রয় করিয়াও তাহাদের অন্নাভাব হইত না, কিন্তু এখন বেতের সেরের এক সের 'গুমোচাল' (ওজনের সেরের দেড় সের) এগার আনায় কিনিতে হইতেছে—এ জন্য দশ আনায় এক সের মধু বিক্রয় করিয়াও তাহারা এক সের চাল মিলাইতে পারিতেছে না। কিন্তু 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ'—এই প্রবচনও অচল হইয়া উঠিয়াছে। খেজুরে গুড়ের 'বাইনে' পূর্ব্বে যে নূতন গুড় প্রতি-সের চারি পয়সায় বিক্রয় হইত, এবার তাহার মূল্য তিন আনা চৌদ্দ পয়সা। নূতন আখের গুড় উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য আরও অধিক। কারণ, আখের গুড় শীঘ্র অব্যবহার্য্য হয় না।

কিছু দিন পূর্ব্বে মজুরের দৈনিক মজুরী তিন আনা ছিল, এখন তাহা আট আনা। ধরামীর মজুরী চারি আনা স্থলে বার আনা।

বাঁশ টাকায় বারখানা পাওয়া যাইত, এখন তাহা টাকায় চারখানা কিনিতে হইতেছে। গ্রামবাসীদের বেড়-বাতার রাখা অসাধ্য হইয়াছে। অনেকে মাষকলাই ছোলা মশুর সিদ্ধ করিয়া খাইয়া তদ্দ্বারা অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করিতেছে; কিন্তু তাহাও দুষ্প্রাপ্য। অনেক চাষী অতি কষ্টে এক আধ সের চাউল সংগ্রহ করিয়া তাহা এক হাঁড়ি জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ ও লঙ্কা-মরিচ সহযোগে পরিবারস্থ চার-পাঁচ জনে মিলিয়া আহার করিতেছে। কিন্তু এবার কাঁচা লঙ্কার সের পাঁচ আনা, পূর্ব্বে উহা তিন-চারি পয়সায় কিনিতে পাওয়া যাইত! আর কিছু দিন পরে অনেক গ্রামবাসী খাদ্যাভাবে শুকাইয়া মরিবে। ভিন্ন জিলা হইতে চাউল আমদানী করাও অসাধ্য হইয়াছে। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটরা ভিন্ন জিলায় তাঁহাদের এলাকা হইতে চাউল রপ্তানি করিতে দিতেছেন না। কাজেই ক্ষেত হইতে ফসল চুরি হইতেছে, ধানের গোলা লুঠ হইতেছে। যাহারা লুঠ করিয়া ধরা পড়িতেছে, তাহারা বলিতেছে, জেলে যাইতে তাহাদের আপত্তি নাই, সেখানে অনাহারে থাকিতে হইবে না; সুতরাং শান্তিরক্ষা করা কঠিন হইয়াছে। মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট অল্পমূল্যে প্রত্যেক গৃহস্থকে নির্দ্দিষ্ট দিনে দুই সের চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু সকলে তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অনেকে কাঁদিতে কাঁদিতে রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরিয়া উপবাস করিতেছে। গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ মহকুমার হাকিমের নিকট কেরোসিন তেলের 'কুপন' বা ছাড়পত্র পাইয়াছে, তাহা দেখাইয়া প্রত্যেকে চার দিন অন্তর এক পোয়া কেরোসিন তেল কিনিতেছে, অর্থাৎ প্রত্যহ এক ছটাক তৈলে পলতে ভিজাইয়া অন্ধকারে তাহাদিগকে রাত্রি যাপন করিতে হইতেছে। এ জন্য চুরির সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বহু দরিদ্র পল্লীবাসী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পাকা আম কাঁঠাল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। কিন্তু এবার আম-কাঁঠালের অত্যন্ত অভাব, নারিকেল তেলের এক সেরের মূল্য পাঁচ শিকা, এবং যে নারিকেলের জোড়া ছয় পয়সায় কিনিতে পাওয়া যাইত, তাহার মূল্য ছয় আনা হইয়াছে, অথচ প্রত্যেক গৃহস্থের ডাব-গাছে কাঁদি কাঁদি ডাব!

বাজারে তরি-তরকারি এতই দুর্ম্মূল্য যে, এক আঙ্গুল প্রশস্ত এক টুকরা শুষ্‌নিকুমড়ার মূল্য এক পয়সা। শিম ও বেগুন প্রতি সেরের মূল্য এখনও ছয় পয়সা! গত বৎসর এ সময় পয়সায় দুই সের বেগুন মিলিত। রুই মাছের প্রতি সেরের মূল্য চার আনা স্থলে এখন বার আনা। নূতন সর্ষপ উঠিলেও এখনই তাহার তৈলের মূল্য বার আনা। আমার বয়স যখন দশ-এগার বৎসর, সেই সময় একদিন ঠাকুর-দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি দুই টাকার তেল কিনিয়া বাবার অন্নপ্রাশনের ভোজ সমারোহে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, দুই টাকার তেলের ভোজে সমারোহটা কি রকম হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, ওরে মুখ্‌খু, এখন টাকায় পাঁচ সের তেল, তখন যে দু' টাকায় বত্রিশ সের তেল কিনিয়াছিলাম! বলা বাহুল্য, সে এক শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমার কাকার বহু দিনের পুরাতন চিঠি-পত্রের ফাইলে ঠাকুরদাদার একখানি পত্র পাওয়া যায়, সেই পত্রে তিনি কাকাকে লিখিয়াছিলেন, চাউলের মণ শীঘ্রই পাঁচ সিকা হইতে দেড় টাকা সাত সিকা হইবার আশঙ্কা আছে, এ জন্য কয়েক মণ চাউল সংগ্রহ করা প্রয়োজন। নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত, আর বাঙ্গালার বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তার আমলে চাউল টাকায় দুই সেরে দাঁড়াইয়াছে! ভারতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হউক!

আশা করিতেছি, কেরোসিন তেলের অভাবে শীঘ্রই আবার সে কালের মত মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহকক্ষ আলোকিত করিতে হইবে এবং উপাদানের অভাবে যখন কাঠি গুণিয়াও দিয়াশলাই কিনিতে পাওয়া যাইবে না, তখন পুনর্ব্বার সেই সনাতন ইস্পাতের ঠুক্‌নী, সোলা ও চকমকির পাথরের প্রবর্ত্তন হইবে, এবং পাকাঠির কাঠিতে গন্ধক সংযুক্ত করিয়া তাহার সাহায্যে দীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে গন্ধক কি কিনিতে পাওয়া যাইবে? সুতরাং জীবন-সংগ্রামের জন্য যে সকল সমস্যা দিন দিন জটিল হইতেছে, কি উপায়ে তাহার সমাধান হইবে? নগরবাসিগণ তখন নিরুপায় হইয়া (back to village) পল্লীগ্রামেই আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিবেন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

রামেশ্বরের শিবায়ন

আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্যসেবিগণের জীবনী লিখিবার উপাদানের একান্ত অভাব। প্রাচীন যুগের এমন অনেক বাঙ্গালা পুস্তক অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের রচয়িতার জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। কারণ, সে যুগের বঙ্গভাষাসেবিগণ জীবনী রচনার দিকে তেমন মনোযোগ দিতেন না।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গল-কাব্যের সমৃদ্ধির সীমা নাই। দেব-দেবীকে অবলম্বন করিবা বহু কবি বহু কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। শিবায়ন এ সব কাব্যের অন্যতম। শিবায়নের কবির নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

সৌভাগ্যের বিষয়—মুকুন্দরামের মত কবি রামেশ্বরও তাঁহার রচনার মধ্যে স্বপরিচয়াত্মক যে ভণিতা দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার বংশের এবং সমকালবর্ত্তী সমাজের অনেক তথ্য জানিতে পারি।

কবি রামেশ্বর ছিলেন ভট্টনারায়ণের বংশধর। তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় কেশর কণির সন্তান। উদ্ধৃতাংশ দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার বংশলতিকা এইরূপ ছিল—

সম্ভবতঃ, কবি রামেশ্বরের সন্তানাদি ছিল না; থাকিলে তাঁহাদিগের নাম কবির ভণিতা-মধ্যে দেখিতে পাইতাম; কারণ

ভণিতা-মধ্যে কবি সকলেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গাচরণাদি তাঁহার ছয় ভাগিনেয় ছিল এবং এক ভাগিনেয়ী-পুত্রের নাম ছিল কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহা ছাড়া কবির যে দুই বন্ধু ছিলেন, কবি তাঁহাদিগেরও নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জনের নাম ছিল পরমানন্দ, তিনি ছিলেন কর্ণগড়ের সেনাপতি; অপর বন্ধুর নাম হৃদয়রাম বসু, তিনি ছিলেন কর্ণগড়ের দেওয়ান এবং কবি। ইঁহারা দুই জনেই মহামায়া দেবীর সাধক ছিলেন। কবি রামেশ্বরের দুই বিবাহ দেখিয়া মনে হয়—প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় তিনি দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণ করেন।

কবি রামেশ্বরের পূর্ব্ব-বাস ছিল মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বরদা পরগণাস্থ যদুপুর গ্রামে। এই যদুপুর গ্রাম বর্ত্তমান ঘাটাল হইতে অদূরে অবস্থিত। হিম্মৎ সিংহ নামক জনৈক তৎকালীন রাজ-কর্ম্মচারী কবির সেই যদুপুরের গৃহ ভাঙ্গিয়া দেয়। এইরূপে হিম্মৎ সিংহের অত্যাচারে পর্য্যুদস্ত হইয়া কবি পরিশেষে কর্ণগড়ের বদান্য রাজা রামসিংহের নিকট আশ্রয় লাভ করিয়া কাঁসাই* নদীর তীরে বসবাস আরম্ভ করেন।

এই সব উদ্ধৃতাংশ হইতে আরও দেখিতে পাই, কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে ঐ সকল পরিচয়াত্মক ভণিতা দ্বারা শুধু যে নিজের বংশ-পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, গৃহহারা হইয়া যে সদাশয় গুণগ্রাহী রাজা রামসিংহের আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সেই রাজারও বিস্তৃত বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, এবং সেই রাজার এবং বংশের গুণকীর্ত্তন করিতে বহুমুখ হইয়াছেন। সর্ব্বধ্বংসী কাল কত বড় বড় রাজা-মহারাজার কীর্ত্তি লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মৃতির অতল জলে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সামন্ত রাজা রামসিংহ যদুপুরের নির্য্যাতিত কবি রামেশ্বরকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া কবি তাঁহার কালজয়ী কাব্য দ্বারা আশ্রয়দাতার নাম বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে অমর করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামসিংহ-সুত যশোবন্ত নরনাথ,
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর। পৃঃ—৪৮

শিবায়ন কাব্যের রচনা-কাল বা কবির জন্ম-মৃত্যুর সময় অবধারণ করিবার সুবিধাজনক কোন ভণিতা কাব্য-মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গের অনেক প্রাচীন কবি গ্রন্থ-শেষে গ্রন্থ-সমাপ্তির শক বা সন-সম্বলিত ভণিতা যোজনা করিয়াছেন। সেই সেই ভণিতা বেশ স্পষ্টার্থক হইলে সময়-নির্দ্ধারণের খুবই সুবিধা হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রামেশ্বরের শিবায়নে রচনা-কাল নির্দ্ধারণোপযোগী কোন স্পষ্টার্থক ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র পুঁথির মধ্যে কাব্য-রচনার কাল-নির্ণয়াত্মক পংক্তি এই কয়টি মাত্র দৃষ্ট হয়—

শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম কল্য কোলে।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা। পৃঃ—১১৬

কিন্তু উক্ত শ্লোককে কোন মতে স্পষ্টার্থক বলা যাইতে পারে না। কষ্টকল্পিত অর্থ গ্রহণ করিলে ইহা হইতে একাধিক সন নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে; কিন্তু মনে হয়, তাহা করা শুধু নিজ নিজ বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রদর্শন করা মাত্র; কবির মনে ঐ সকল কষ্টকল্পিত অর্থের মধ্যে কোনটি ছিল কি না সন্দেহ। সুতরাং এ স্থলে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শুধু উদ্ধৃত করিলাম —"আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এই শ্লোক হইতে স্পষ্টরূপে কোন শক বাহির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, উক্ত রচনায় লিপিকর-প্রমাদ বশতঃ পাঠ-ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে। মুদ্রিত পুস্তকে ঐ শকের স্থলে অঙ্ক দ্বারা ১৬৩৪ শক নিবেশিত আছে। উহা অতি কষ্ট-কল্পনায় সঙ্গত করা যাইতে পারে। যাহা হউক, অগত্যা উহাই স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু এ বিষয়ে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৬৫৬ শকে (১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে) এই যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নায়েব-নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি খালিব আলির সহিত দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। * * * যশোবন্ত ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং মুদ্রিত পুস্তকের গণনানুসারে শিব-সঙ্কীর্ত্তন ১৬৩৪ শকে সমাপ্ত হয়—এই ২২ বৎসরের অন্তর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। যেহেতু, যশোবন্তের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খৃঃ অব্দে) শিব-সঙ্কীর্ত্তন রচনা শেষ হওয়া অসম্ভব নহে। * * * ফলতঃ, 'শিব সঙ্কীর্ত্তন' মহাভারতের পরে এবং কবিরঞ্জনের পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"*

অতএব ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে শিবায়নের রচনাকাল ১৬৩৪ শক (১৭১২ খৃষ্টাব্দ)। তাহা হইলে কবির জন্মকাল অনুমান করা যায় ইহার ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে; অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে।

এই সময়ে দেশে অরাজকতা, দস্যুর উৎপাত, নবাবের উৎপীড়ন, জমিদারের নির্য্যাতন পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান ছিল। অরাজকতার বর্ণনা আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যেও দেখিতে পাই। (যদিও মুকুন্দ-রাম বহু পূর্ব্বের কবি ছিলেন।) কবি রামেশ্বর এই অরাজকতার সময়ে নানা প্রকারে নিপীড়িত হইয়া বরদা পরগণার অন্তর্গত স্বীয় জন্মভূমি যদুপুর গ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া কর্ণগড়ের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্ণগড়ের বিখ্যাত মন্দিরের তোরণ-দ্বার-দেশে "যোগী-ঘোপা" বা যোগ-মণ্ডপ নামে এক প্রস্তরময় ত্রিতল বাটী আছে; মহামায়ার মন্দিরে এক পঞ্চমুণ্ডী† আসন আছে। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ যোগাসনে বসিয়া কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিদ্ধ হইয়াছিলেন। অধুনা ঐ কর্ণগড় নাড়াজোল-রাজের সম্পত্তি।

সিদ্ধপুরুষ রামেশ্বরের দেহাবসানে ঐ মন্দিরের নিকটে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। কবির সমাধি-মন্দিরের নিকটেই রাজা যশোবন্ত সিংহের সমাধি-মন্দির আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা দ্বারা কবি স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, যশোবন্ত সিংহ এক জন সাধুপুরুষ ছিলেন। কবির পিতামহ নারায়ণ চক্রবর্ত্তীও "যতি"-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ছিলেন।

---

* সম্ভবতঃ কবি "কাঁসাই"কে "কৌশিকী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর একটি ক্ষীণতোয়া "কৌশিকী" আছে—তাহা হুগলী জেলার অন্তঃপাতী হরিপালের নিকট দিয়া প্রবাহিত।

* পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'—পৃঃ—১৪৬

† বানর, শৃগাল, পেচক, বাদুড়, কুম্ভীর (কাহারও মতে শার্দ্দূল) এই পঞ্চ জন্তুর মস্তক প্রোথিত করিয়া তদুপরি যে আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহাকেই পঞ্চমুণ্ডাসন বলে।

কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে বহু বার আপন আশ্রয়দাতার কল্যাণ কামনা করিয়াছেন—

যশোবন্ত সিংহে দয়া কর হরবধূ।

অন্যত্র— যশোবন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।

প্রভু পূর্ণ কর নরেন্দ্রের অভিলাষ। পৃঃ ৯৬

গ্রন্থান্তিমেও কবি বহুমুখী হইয়া রাজা যশোবন্তের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন— যশোবন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস।

সে রাজসভায় হৈল সঙ্গীত প্রকাশ।
বিদগ্ধ বসুধাপতি অতি বিচক্ষণ।
শক্রসম সভা শোভা করে সুধীগণ।

রামেশ্বর যে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার কাব্য হইতেই পাওয়া যায়; হিন্দী এবং পারসী ভাষাতেও তিনি যে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহাও তাঁহার সত্যনারায়ণের পুঁথি দৃষ্টে জানিতে পারি।

অন্যান্য ধর্ম্ম-কাব্য-প্রণেতৃগণের গ্রন্থ-পাঠে মনে হয়, তাঁহারা স্ব স্ব কাব্যের দেবতাকেই বড় করিবার জন্য সমূহ কবিত্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন; অপর দেব-দেবীকে উচিত মত প্রাধান্য দেন নাই। কিন্তু রামেশ্বর তাহা করেন নাই, তিনি তাঁহার কাব্যে শুধু যে হরি-হরে অভেদ দেখাইয়াছেন, তাহা নহে; সকল দেবতার প্রতি সমান আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন—

অভেদ এ তিন দেবে এ মতি যদ্যপি সেবে
তবে ভবার্ণবে হবে পার।

শিবায়ন কাব্যে কবি "হরি-হরে ঐক্য" প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন; সত্যনারায়ণের ব্রতকথায় তিনি বলিয়াছেন—

রাম রহিম দুই নাম ধরে একে নাথ।

এই পুঁথিতে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম শাস্ত্র মত।
ভক্তি মুক্তি লভিতে অনেক আছে পথ।

কবির সত্যনারায়ণের পুঁথি দৃষ্টে মনে হয়—এই পুঁথির রচনা-কালে তাঁহার ধর্ম্মমত আরও উদার হইয়াছিল; ইহার রস-ঘন রচনা দেখিয়া আরও মনে হয়—সত্যনারায়ণের পুঁথি কবির পরবর্ত্তী রচনা। পূর্ব্বে রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের কথা খুব প্রচলিত ছিল; কিন্তু রামেশ্বরের পুঁথি অতি দীর্ঘ; এখন খাটোর যুগ; মহিলারা মস্তকের দীর্ঘকেশ ছাঁটিয়া এখন খাটো করিতেছেন; মেয়েরা ঘাগরার ঝুল খাটো করিতেছেন; পুরোহিত মহাশয়েরাও অন্য কবি-রচিত সত্যনারায়ণের কথা সংক্ষিপ্তাকারে পাইয়া এখন তাহাই পাঠ করিয়া থাকেন। রামেশ্বরী পুঁথি এখন কদাচিৎ পঠিত হইতে শুনা যায়। সত্যনারায়ণের পুঁথির ভণিতায় কবি যদুপুরের নাম উল্লেখ করা হেতু পণ্ডিত রামগতি ইহাকেই কবির "প্রথম রচনা" বলিয়াছেন। ভণিতা মধ্যে পাই—

পরে সত্যপীর বন্দি কহে কবি রাম।
সাকিন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম॥

ইহাকে কিন্তু রচনার পূর্ব্বত্ব প্রতিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। কবি ঐ ভণিতায় পূর্ব্ববাসও তো উল্লেখ করিয়া থাকিতে পারেন।

এইবার শিবায়ন কাব্যের অনুশীলন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এইখানে একটি কথার উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্ত্তন কবিরঞ্জনের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু রামেশ্বরের

শাঁখারী সুন্দর শুন শাঁখারী সুন্দর।
কি নাম তোমার কহ কোন্ গাঁয়ে ঘর॥ পৃঃ—১১

প্রভৃতি শ্লোক দেখিয়া মনে হয়, কবি তাঁহার শিবায়ন রচনার পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া থাকিবেন; যদিও কাহারও কাহারও মতে ভারতচন্দ্রের কাব্য কবিরঞ্জনের কাব্যের পরবর্ত্তী রচনা। তবে যদি ধরা যায়, অনুপ্রাস-যমকাদি অলঙ্কার তখনকার সকল কবির রচনাতেই দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর কিছু বলিবার থাকে না। রামেশ্বরের কাব্য অনুপ্রাস-বহুল; এবং এই অনুপ্রাসযোজনা দুই-চারি স্থল ব্যতীত অনেক স্থলেই শ্রুতিমধুর হইয়াছে এবং কবির সংস্কৃত জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দুই-চারিটি মাত্র পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

ঠাকুরাণী ঠেলিতে ঠাকুর ঠেকা হ'ল।
* * *
শিব বলে শক্র কিছু চক্রবক্র আছে।
খন্দ হ'লে ক্ষেতে তুমি দ্বন্দ্ব কর পাছে?
বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
পাটাখানি পেলে পরিণাম শুষ্ক হয়। পৃঃ—৭০
সূর্য্য-সুত সাদরে শিবের সেবা করে।
* * * *
কৃতকৃত্য কৃত্তিবাস কুমুদার কাছে। পৃঃ—৭১
* * *
ধর্ম্ম কর ধূর্জ্জটিকে ধান্য দেহ ঋণ। পৃঃ—৭৩
* * *
জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা। পৃঃ—৭৪
* * *
ভব্য সয়া সব্য হস্ত দিব্য জলে ধুইলা। পৃঃ—১০৪

প্রসঙ্গক্রমে কবি রাম-নামের মাহাত্ম্য, শবর উপাখ্যান, রুক্মিণী-হরণ, বাণ রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান কাব্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। শিবের উপাখ্যান অবলম্বনে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় অনেক কাব্য আছে। কবি রামেশ্বর পূর্ব্বসূরিগণের কাব্য হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁর কাব্য মৌলিকতা-শূন্য নহে। মাঝে মাঝে কবি বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে স্বকপোল-কল্পিত ছোট ছোট বহু উপাখ্যান সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। শিবের চাষ আরম্ভ, ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে শিবকে ঠকানো, শাঁখারী বেশে হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক ভগবতীকে শিবের শাঁখা পরান—ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান কবির নিজের কল্পনা-প্রসূত; এগুলি বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং প্রীতিকর। এইগুলি এবং এই প্রকার আরও বহু ক্ষুদ্র উপাখ্যান পরম নৈপুণ্যে নিজ কাব্য মধ্যে

সন্নিবেশিত করিয়া কবি নিজের প্রচুর কবিত্ব-শক্তির তথা উদ্ভাবন-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। বাগ্দিনীর পালা ও শাঁখা পরিধানের বৃত্তান্ত ডম্বরুর তালে গান করিয়া পূর্ব্বে ভিক্ষুকেরা ভিক্ষার্জ্জন করিত; অধুনা তাহার প্রচলন কিছু কমিয়া গেলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। পিতাপুত্রের ভোজন, হরগৌরীর কোন্দল প্রভৃতি অংশগুলিও বেশ সুললিত। বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালার কাজ বর্ণন, নাম-মাহাত্ম্যের সাহায্যে ত্রিশূল নরম করা—প্রভৃতি বর্ণনেও কবি অল্প কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই।

কবি ভণিতা-মধ্যে

স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বরিয়া পুরাণ পাঠে

লিখিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি রাজ-ভবনে শুধু যজমানী পুরাণ-পাঠক ছিলেন না। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইতে পারে। তাঁহার বর্ণিত শাঁখা পরানোর গল্প দেখিয়া এখনও অনেক হিন্দু মহিলা ৺দুর্গাপূজার সময়ে শাঁখা পরিয়া থাকেন, এবং মা দুর্গাকে শঙ্খ প্রদান করেন।

স্বর্ণথালে গঙ্গাজলে শঙ্খ তুলে ধুয়ে।
অথবা গঙ্গাজলে গিরিশ গৌরীর ধুয়ে হাত।

ইত্যাদি কবিতা দ্বারা রামেশ্বর স্পষ্টই বলিয়াছেন—শুদ্ধাচারে শঙ্খ পরিতে হয়। শঙ্খ-পরিধান স্ত্রীলোকদিগের একটি মাঙ্গলিক পর্ব্ব। পরিধানের পূর্ব্বে শঙ্খকে ধান্তদূর্ব্বা দিয়া গঙ্গাজলে ধুইয়া লইতে হয়; তদনন্তর ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া হয় রাধিকাকে নয় দুর্গাকে তাহা উৎসর্গ করতঃ পরিধান করিতে হয়। রামেশ্বরের এই শঙ্খ পরিধানের পালা সরস, প্রাঞ্জল ও উপভোগ্য।

প্রথম দিবসীয় নিশাপালার শেষ ভাগে পৃথিব্যাদির উৎপত্তি বর্ণন-কালে সপ্তদ্বীপ, সপ্তসমুদ্র প্রভৃতির নাম কবি বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে আহরণ করিয়া থাকিবেন। উষা ও অনিরুদ্ধের মিলন এবং বিহার পড়িলে ভারতের বিদ্যাসুন্দরের কথা মনে পড়ে। কোচনীদের বর্ণনেও কবি প্রাচীন কবিগণের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। গৌরীর আটুল বাঁটুল খেলা প্রভৃতি বাল্য-ক্রীড়া বর্ণন বেশ উপভোগ্য। মাঝে মাঝে কবি স্বল্প কথায় সাংসারিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন;—জামাতার নিকট শাশুড়ীর প্রার্থনা—

আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত।
* * *
অন্যত্র—পুত্র হতে পৌত্রকে প্রচুর স্নেহ হয়।

গৌরীর কৈলাস-গমন-কালে—

স্বামী-ঘরে কন্তা থাকে, ধন্ত তার বাপ মাকে,
অভাগার ঘরে থাকে ঝি।

কবির ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত যথা—

পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

পূর্ব্বেই রামেশ্বরের সংস্কৃত জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে শিবায়নের মধ্যে কালিদাসের কুমারসম্ভবের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। কোথাও বা অবিকল অনুবাদের মত মনে হয়। নিম্নে তাহার দু' একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল—

উত্তরে করিয়া স্থিতি, আছেন নগাধিপতি,
হিমালয় দেবাত্মা প্রচণ্ড।
পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে, বিভাগ করিল তারে,
যেন পৃথিবীর মানদণ্ড।।

দেবর্ষি নারদ আসিয়া গিরিরাজকে জানাইয়া দিলেন—

তোমার দুহিতা হবে হর-অর্দ্ধ-তনু। পৃঃ—১৮

রতি-বিলাপে দেখিতে পাই—

পদ্মহীন সরো যেন শশিহীন নিশি। পৃঃ—২০

বালিকা-বয়সের গিরিরাজ-সুতার গহনার যে দীর্ঘ ফর্দ্দ দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অলঙ্কারসমূহের নাম জানিতে পারা যায়। অতঃপর গৌরীর খেলাঘরে কবি যে সকল তরকারির নাম করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মুকুন্দরামের তরকারির দীর্ঘ ফিরিস্তির কথা মনে পড়ে। কবির যুগে প্রচলিত বহু প্রকার ধান্তের নাম আমরা জানিতে পারি শিবায়ন কাব্যের শেষ ভাগ হইতে।

গ্রন্থারম্ভে চৈতন্য-বন্দনা-কালে কবি চৈতন্যদেবের পিতার নাম পুরন্দর মিশ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

মিশ্র পুরন্দর পিতা পরম বৈষ্ণব।

সৃতের কথারম্ভে রামেশ্বর লিখিয়াছেন—

মূল হৈতে বলি শুন পুরাণের সার।
মধুকৈটভের মাংসে মহীর সঞ্চার।

কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—

মধুকৈটভয়োরাসীন্মেদসৈব পরিপ্লুতা।
তেনেয়ং মেদিনী দেবী প্রোচ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।

মধুকৈটভের "মাংসে" মেদিনী তৈয়ারী হওয়ার কথা কবি কোথায় পাইলেন বুঝিতে পারিলাম না!

আর একটি কথার উল্লেখ এখানে আবশ্যক মনে হয়; পৃথিব্যাদির উৎপত্তি-বর্ণন-কালে কবি রামেশ্বর বলিয়াছেন—

হিমাদ্রি দক্ষিণ দিকে ক্ষীরোদ উত্তরে।
সমস্তে ভারতবর্ষ বলেন এহারে।

ইহাও পৌরাণিক বর্ণনা হইতে বিচ্যুতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার সঙ্গত অর্থ করিতে পারিলাম না। বিভিন্ন কবি-বর্ণিত পৃথিবী প্রভৃতির উৎপত্তি বর্ণনে অল্পবিস্তর বৈসাদৃশ্য থাকিলেও রামেশ্বরের এ বিবৃতি অন্য কোন কবি কর্ত্তৃক সমর্থিত হইতে দেখি নাই।

কবি রামেশ্বরের ভাষা সরস, সরল ও প্রাঞ্জল; মাঝে মাঝে সংস্কৃত-বহুল হইলেও সহজবোধ্য। কবিত্ব-শক্তি রামেশ্বরে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়; সৃজনী-শক্তি বা কলা-নৈপুণ্যও তাঁহার কাব্যে অপ্রতুল নহে। অনেক সময়ে স্বল্প কথায় এবং সরস ও প্রাঞ্জল ভাষায় কবি যেরূপ সামাজিক চিত্র পরিস্ফুট এবং সংসারের নানাবিধ চিত্র অনবদ্য ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়।

শ্রীজহরলাল বসু (বি-এল)।

দুগ্রহ

[গল্প]

প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারী করি। মাইনের যা বহর, তাতে ভদ্র ভাবে কলকাতায় বাস করা চলে না। তার ওপর যুদ্ধের হিড়িক। জিনিষপত্তরের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে অথচ মাইনে বাড়বার কোনও লক্ষণই নেই! উল্টে চাকরীটি যাতে বজায় থাকে, তার জন্য প্রত্যহ সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে, কাজ থাকুক না থাকুক, দেখা হোক না হোক, ধর্ণা দিয়ে জুতো এবং সময় ক্ষয় করি! মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান মাইনে-লব্ধ অর্থে হয় না বলে রিপুকর্ম্ম অর্থাৎ টুইশনিও করতে হয়। তার উপর আজকাল বাজার করা মানে, দু'-তিন ঘণ্টার দায়ে নিশ্চিন্ত। অনেক দিন শুধু হাতেই ফিরতে হয়। অভাব নিত্য লেগে আছে। পয়সার,—চাল, ডাল, চিনির এবং সময়ের!

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কারুর বাড়ী যেতে পারি না সময়ের অভাবে। সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করতে পারি না পয়সার অভাবে! বিদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনের চিঠিপত্র আসে, এ সময়ে কলকাতায় আছি, তাঁদের উদ্বেগের সীমা নেই! তাঁরা খরচের জন্য আকুল হয়ে আছেন। রবিবারে বসে সে-সব চিঠির জবাব একসঙ্গে দিয়ে ফেলি। ক'বছর মাষ্টারী করে বাঁধা বুলি আওড়ে আওড়ে এমন জীব বনেছি, যাদের সাক্ষ্য আদালতে গ্রাহ্য হয় না। ভেবে-চিন্তে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কথা লেখবার মত মাথা ও ক্ষমতা, ধৈর্য্য ও সময় থাকে না। তাই অনেক কষ্টে একখানি চিঠি লিখে বাকীগুলি সম্পর্ক-মাফিক শিরোনামা এবং তলদেশ বদল করে নকল করে দিই। এক দিন রবিবারে এমনি খান-দশেক চিঠি লিখে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলুম।

পূজনীয় (বা কল্যাণীয়)

······মার শরীর ভাল। বাজারে চাল নাই। প্রাণ বাঁচান দায়। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে, এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। কত দিন এ ভাবে কাটবে একমাত্র ভগবানই জানেন।······

বশম্বদ

শ্রীঅনাদিকুমার ঘোষ দস্তিদার।

দিন-চারেক পরে সকালে ছোট ভগ্নীপতির টেলিগ্রাম পেলুম। লিখেছেন, "বৃহস্পতিবার রাত্রে পৌঁছিব। মা কেমন আছেন?" টেলিগ্রাম পড়ে অবাক হয়ে গেলুম! অর্থ বুঝতে পারলুম না! খেয়ে দেয়ে স্কুল যাচ্ছি, এমন সময় আর এক টেলিগ্রাম। দাদা লিখেছেন, "শুক্রবার ভোরে পৌঁছিব। মার শরীর কেমন?" আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলুম। মার সম্বন্ধে সকলের কৌতূহল এক সঙ্গে এমন বেড়ে উঠলো কেন?

যাই হোক, স্কুলে গেলুম। ক্লাস নিচ্ছি, এমন সময় বেয়ারাসহ এক জন পিয়ন ক্লাসের দরজায় এসে হাজির। টেলিগ্রাম এসেছে। বাইরে গিয়ে দস্তখৎ করে টেলিগ্রাম নিলুম। পিসতুতো ভাই ভোঁদা লিখেছে—"সস্ত্রীক শুক্রবার 2d Down-এ পৌঁচুচ্ছি। মামীমা কেমন আছেন?"

কি হচ্ছে এ সব! সকলে দল বেঁধে আমাকে fool তৈরী করছে। ক্লাসে আবার ঢুকছি, কানে এল ছেলেরা বলাবলি করছে—"ওরে, স্যারের ছেলে হয়েছে। তাই টেলিগ্রাম এসেছে।" নাঃ, সকলে দেখছি আমায় পাগল পেয়েছে! ক্লাস ছেড়ে দিয়ে চলে এলুম। আগুনের মত হু-হু করে ছড়িয়ে গেল খপর—আমার না কি ছেলে হয়েছে! সকলকে বোঝাতে এবং টেলিগ্রাম দেখাতে দেখাতে ওষ্ঠাগত! বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবার একটা টেলিগ্রাম এসে হাজির। জ্যেঠতুত বোন বুঁচি লিখেছে—"বৃহস্পতিবার রাত্রে পৌঁছুব। কাকীমার কি হয়েছে?" আমি যেন পাগল হবো! একই রকম এই সব টেলিগ্রাম আসবার কারণ কি? মার শরীর খারাপ— এ কথা তো আমি কাকেও লিখিনি। বাড়ী পৌঁছে আরও চারটে এবং রাত্রে ঘুম থেকে উঠিয়ে দু'টো টেলিগ্রাম। ওদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকে এবং শুক্রবার সমস্ত দিন ধরে ছেলে-পিলে, দলবল সহ আত্মীয়-স্বজন গত রবিবারে যাঁদের চিঠি দিয়েছি, সকলেই এসে হাজির! সকলেই মহা খাপ্পা! ব্যাপার কি? এ ঠাট্টার অর্থ? আমার মার শরীর মোটেই খারাপ নয়। আমিও চটেছি। সত্যি, কি ব্যাপার? এ ঠাট্টার অর্থ? মার শরীর খারাপ—এ কথা আমি কবে কাকে লিখলুম? সকলে এই মারে তো এই মারে! লেখোনি? তবে কি আমরা অনর্থক এত পয়সা খরচ করে কলকাতায় বেড়াতে এসেছি! এই বলে সকলে আমার লিখিত পত্র বার করে দেখালেন।

"পূজনীয় (বা কল্যাণীয়)···

······মার শরীর ভাল নাই * * * প্রাণ বাঁচান দায়! যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। কত দিন এ ভাবে কাটবে একমাত্র ভগবানই জানেন।······

বশম্বদ

শ্রীঅনাদিকুমার ঘোষ দস্তিদার

দেখলুম। কি করে এমন হ'লো জানি না! দোষ তাঁদের নয়। এ চিঠি পড়ে কার না প্রাণ উতলা হয়! আমিও অমন চিঠি পেলে ছুটে যেতুম। দোষ কিন্তু আমারও নয়। আসলে আমি কি লিখে-ছিলুম তা তাঁদের বললুম। শুনে তাঁরা খুব একচোট হাসলেন। মা এবং তাঁরা সকলেই শেষ পর্য্যন্ত বললেন—"যাক্, ভালই হলো। ভুলের হিড়িকে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেল। যা দূরে-দূরে সব ছড়িয়ে পড়েছি, দেখা তো হয় না।"

ঠিক হলো যার যে ক'দিন ছুটি, আমার এইখানেই কাটাবেন।

উচিত এবং অত্যন্ত সন্তোষজনক ব্যবস্থা, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভুলের মাশুল দিতে আমার প্রাণ যায়। খাদ্যদ্রব্য জোগাড় করতে সমস্ত দিন কেটে যায়—তার পর যা মেলে, তাও পর্য্যাপ্ত নয়। নিজে আর মা—চালে ডালে সিদ্ধ, ভাতে ভাত চালাতুম। এখন দু-বেলা মাছ মাংস ডিম চলছে! ছেলেপিলে সহ দশ জন আত্মীয় আসাতে খরচ পঞ্চাশ গুণ বেড়ে গেছে।

কিছু চাল কেনা ছিল, হয়তো তাতে আমাদের দিন-সাতেক চলে যেতো। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের পল্টন এক দিনেই ভাঁড়ার ফাঁক করে ছেড়ে দিলে! তাতেও অনেকের পুরো-পেট হলো না। রাত্রি

তিনটের সময় পাড়ার সরকার-নির্দ্দেশিত মুদিখানায় দাঁড়াতে গেলুম। গিয়ে দেখি, তখনই প্রায় শ'খানেক লোক লাইন করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি চালের থলেটা পেতে রাস্তার ফুটপাথে বসে পড়লুম। ছ'টা নাগাদ বৌবাজারের দোকানের সামনে থেকে আরম্ভ করে লাইন কলুটোলা পর্য্যন্ত পৌঁছে গেছে। দোকান খোলবার সময় হয়ে এসেছে, এমন সময় এক জন গুণ্ডার মত লোক এসে জোর করে আমাদের সামনে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। আমি মাষ্টার-মানুষ, মারামারি করা শোভা পায় না। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে এই অত্যাচার দেখতে এবং সহ্য করতে লাগলুম। কিন্তু মাষ্টার ছাড়া লাইনে আরও তো লোক ছিল। সকলেই কিছু স্বাস্থ্যহীন বি-এ বি-টি নয়! সুতরাং দেখতে দেখতে একটা খণ্ড-যুদ্ধ বেধে গেল। ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি পিছন দিকে সরে গেলুম। দু'-এক ঘা আমার ঘাড়েও পড়লো, কিন্তু আমি প্রভু যীশুখৃষ্টের মতাবলম্বী! এক গালে চড় পড়লে অন্য গাল ফিরিয়ে দিই! তাই মার খেলুম, কিন্তু মারলুম না! যাক, ততক্ষণে দোকান খুলেছে, কিন্তু আমি অনেক পিছনে পড়ে গেছি। রাত তিনটে থেকে এসে ধর্ণা দেওয়া সত্ত্বেও যখন আমার টার্ণ এলো, বেলা তখন প্রায় ন'টা। আর পেলুম মাত্র এক সের চাল। তাতে কি হবে! শেষে অধিক—দ্বিগুণেরও বেশী মূল্য দিয়ে আরও সের দুই চাল ভিখিরীদের কাছ থেকে জোগাড় করে যখন বাড়ী ফিরলুম, তখন সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। নাইবার খাবার সময় নেই,—অগত্যা না নেয়ে না খেয়েই স্কুল যেতে হলো। ঘাড়ে বেশ ব্যথা হয়েছে, ক্ষিধেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে—সুতরাং ভালো করে পড়াতে পারলুম না। ওদিকে সহকর্ম্মীদের ঠাট্টা! "কি হে অনাদি, চোখ-মুখ শুকনো, চান হয়নি, রাত্রে ঘুমোও নি—মনে হচ্ছে! ব্যাপার কি হে?"

ব্যাপার আর কি বলবো! একেবারে চরম! টিফিনের সময় দু'পয়সার মুড়ি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলুম। বিকেলে বাড়ী ফিরতেই মা বললেন,—"হ্যাঁ রে অনাদি, বলি, তোর আক্কেলটা কি রকম। বাড়ীতে এতগুলো ছোট ছেলেমেয়ে। চিনি নেই, দুধ খাবে কি করে?"

কাপড়-জামা ছেড়ে সেই মুখেই চিনি আনতে বার হচ্ছি, এমন সময় জ্যেঠতুতো বোন বুঁচির ছেলে নেংটী ধরে বসলো—"মামা, আমিও যাবো।" আমি তখন একটু রেগেই ছিলুম। রাগ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া সকালের ঘটনা তখনও স্মৃতিপটে অত্যন্ত সুপরিস্ফুট ছিল। তাই বললুম—"না, না, ছোট ছেলের ঐ ভীড়ে কগি রোজ নেই।"

গলার স্বর নিশ্চয় একটু চড়া রকমের হয়েছিল। বুঁচি কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলের পিটে সজোরে এক চড় মেরে বললে—"অসভ্য ছেলে, কখনও বাজার দেখনি না কি?" নেংটী চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। কান্নার কি ভলিউম! গলা সাধলে কালে এক জন বড় গাইয়ে হতে পারবে! মা ছুটে এলেন—"কি হয়েছে দাদা?" 'দাদা' ক্রন্দনের ফাঁকে ফাঁকে উত্তর দিলেন—"মামা আমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছে না দিদি, তাই মা আমাকে মে-রে-ছে···" টানটা বেশ ওস্তাদি। মা বুঁচিকে বললেন, "ছি বুঁচি, ছেলেকে মারতে নেই।" আমাকে বললেন—"যা না ওকে সঙ্গে নিয়ে। ছেলেমানুষ, যেতে চাইছে।"

অগত্যা নেংটীর হাত ধরে চিনির উদ্দেশ্যে বার হয়ে পড়লুম।

নেংটী-সহ চিনির দোকানে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে সেই সকালের মত ভিড় আর লাইন। সজোরে নেংটীর হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়লুম। অপেক্ষা করছি তো করছিই, কখন্ নেংটীর হাত ছেড়ে গেছে, লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ দেখি, নেংটী পাশে নেই। চিনি কেনা মাথায় উঠে গেল। খোঁজ-খোঁজ! কিন্তু কোথায় নেংটী? হন্যে হয়ে চার ধারে ছুটোছুটী করতে লাগলুম।

ঘণ্টা দু'য়েক নিষ্ফল খোঁজাখুঁজির পর খালি হাতে বাড়ী ফিরে সকলকে যখন এই দুঃসংবাদ শোনালুম, তখন সকলেই চটে লাল! মহিলাদের কান্নার রোলে আর পুরুষদের তর্জ্জন গর্জ্জন যেন প্রলয়ের সূচনা লাগলো। বুঁচি ঠেস দিয়ে বললে—"আমি জানতুম, এই রকম একটা কিছু ঘটবে।"

থানায় থানায় খবর দেওয়া হলো। সমস্ত রাত ধরে রিক্স ভাড়া করে রাস্তায় রাস্তায় খোঁজ চললো। ভোরের বেলায় মুচিপাড়া থানা থেকে শ্রীমানকে উদ্ধার করা গেল, কিন্তু আমার হৃত মানের আর উদ্ধার হলো—না, যদিও আমি তাকেই খুঁজে বার করলুম!

যে ক'দিন সকলে রইলেন, উঠতে বসতে আমাকে অপদার্থ, জন্তু-বিশেষ ইত্যাদি বিশেষণে জর্জ্জরিত করতে থাকলেন! সকলের মুখেই অসন্তোষের ভাব—মনোমত তোয়াজ হচ্ছে না! গরীব স্কুল-মাষ্টারের দুঃখ কেউ বোঝে না! আমার কি ইচ্ছা হয় না সকলকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করি? কিন্তু রেস্ত? ট্রামে করে এক দিন জু, এক দিন হাওড়ার পোল, এক দিন থিয়েটার, এক দিন সিনেমা—কিছুই বাদ থাকে না। কিন্তু সব ঐ এক দিন করে মাত্র। কারুরই তাতে মন ওঠে না, কিন্তু আমার ভিটেমাটী ওঠবার জো! এক-একটা দিন যায়, ঋণের পরিমাণ হুশ্-হুশ্ করে' কেঁপে ওঠে! অর্থ-চিন্তা এবং বাক্য-যন্ত্রণায় প্রায় পাগল হবার উপক্রম! মা বলেন—"অনেক দিন পরে এসেছ, আরও কিছু দিন থেকে যাও। রেল-ভাড়া দিয়ে সব সময় তো আসা-যাওয়া চলে না।" কথাটা ঠিক—কিন্তু ভীত হয়ে পড়ি। তাঁরা বলেন—"ছুটী নেই, তাছাড়া আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে।" এ কথাও ঠিক এবং শুনে আশ্বস্ত হতে হয়। আর কিছু দিন থাকলে,···যাক্, শেষ অবধি আমি শেষ হবার আগে ছুটী শেষ হলো! তাঁরা চলে গেলেন। কিন্তু আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে গেলেন!

মা খুব খুশী। অনেক দিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা হ'লো। কিন্তু ছেলেকে যে কি শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হয়েছে, তা তিনি বুঝলেন না! বোঝাবার চেষ্টাও করলুম না! কারণ, বুঝতে তিনি পারবেন না! বাজারে দেনার যা পরিমাণ, তাতে তিন মাস না খেয়ে গাছতলায় দিগম্বর সেজে কিংবা ছেঁড়া কাপড় পরে থাকলে হয়তো তা শোধ করা সম্ভব। কিন্তু সে উপায়ও নেই। স্কুলে পড়াই। মোটা ফর্সা ধুতি-পাঞ্জাবী, পায়ে এক জোড়া জুতো, আরও আনুষঙ্গিক অনেক সব খরচ-পত্র আছে। এ সব না করলে ছেলেরা না কি মানবে না! সেক্রেটারীর খিঁচুনী সহ্য করতে হবে! ছেলেদের কাছে মান ও সেক্রেটারীর মন রাখতে গিয়ে কাবলীওয়ালার মন আর রাখতে পারছি না—রোজ সকালে-বিকেলে তাগাদা দিচ্ছে। আর একটা প্রাইভেট টুইশনি খুঁজছি। আপনাদের সন্ধানে থাকলে একটা খবর দিয়ে কৃতার্থ করবেন!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

ইতিহাসের অনুসরণ

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন

চতুর্থ প্রস্তাব

তাম্রশাসনখানি সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য মাসিক বসুমতীর ১৩৪১ অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় তিন প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য সেই সকল তথ্যের সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

এই তাম্রশাসনখানি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন বৎসরে ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায়, কাপাসিয়া থানার অধীন রাজাবাড়ী গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। ভাওয়ালের জমীদার লোকনারায়ণ রায় উহা হস্তগত করেন এবং লোকনারায়ণের পুত্র গোলোকনারায়ণের নিকট হইতে ঢাকার তদানীন্তন মেজিষ্ট্রেট ওয়াল্‌টারস্ সাহেব উহা সংগ্রহ করেন। কোর্টপণ্ডিত ভৈরব তর্কালঙ্কারের মংগড়া পাঠসহ উহা কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন সেক্রেটারী ডক্টর উইলসন তিন জন পণ্ডিতের সাহায্যে শাসনখানির বিশুদ্ধতর পাঠ প্রস্তুত করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখের অধিবেশনে উহার একটি বিবরণ প্রকাশিত করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাত যাইবার কালে শাসনখানি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং ইণ্ডিয়া আফিস-লাইব্রেরীর এক কাঠের সিন্দুকে উহা বিস্মৃত অবস্থায় প্রায় শতাব্দকাল পড়িয়া থাকে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিচিত্র উপায়ে পুনরাবিষ্কৃত হইয়া বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণর সার জন হার্বার্টের সহিত উহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে ফিরিয়া আসে। এসিয়াটিক সোসাইটির আহ্বানে সোসাইটির পত্রিকায় বিস্তৃত প্রবন্ধে (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রবন্ধে) ইংরেজী ভাষায় আমি উহার সম্পাদন করিয়াছি। বসুমতীর পাঠকগণের জন্য সেই প্রবন্ধের মর্ম্ম স্থানে স্থানে বিস্তৃততর, স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ততর করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি।
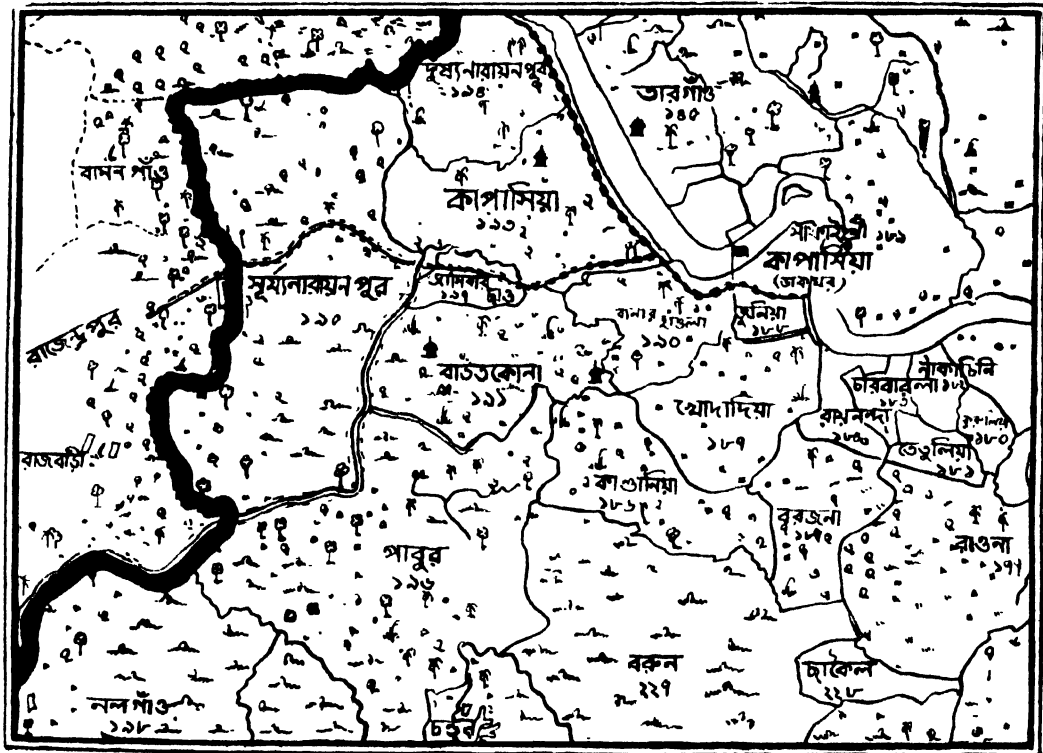
তাম্রশাসনের প্রাপ্তিস্থান রাজাবাড়ী গ্রাম এবং শাসনপ্রদত্ত ভূমির সংস্থান ১´ = ১ মাইলের কিছু বেশী

তাম্রশাসনখানি ১২" × ১৩½" ইঞ্চি একখানা তামার পাতের উপর খোদিত। উহার মস্তকাকৃতি ঊর্দ্ধাঙ্গে রাজকীয় মুদ্রা একটি ক্ষুদ্র সদাশিব মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্বপ্রাপ্ত ছয়খানা তাম্রশাসনের মধ্যে পাবনা জেলার চলন বিলের পূর্ব্বে মাধাই-নগর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের সহিত এই ভাওয়াল তাম্র-শাসনের পদ্যাংশে অবিকল মিল আছে। শাসনের আরম্ভে বিবিধ ছন্দে রচিত ত্রয়োদশটি শ্লোক উভয় শাসনেই এক। প্রথম শ্লোকে পঞ্চাননের বন্দনা। দ্বিতীয়ে সেনবংশের আদি-পুরুষ চন্দ্রদেবের। তৃতীয়ে চন্দ্রবংশে বীরগণের জন্ম বর্ণিত। চতুর্থে এই বংশে জাত পুরাণ-কীর্ত্তিত বীরসেনের বংশে, সামন্তসেনের জন্ম

বর্ণিত। পঞ্চমে সামন্তের পুত্র হেমন্ত বর্ণিত। ষষ্ঠে হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন বর্ণিত। সপ্তমে বিজয়সেনের ত্রিভুবনব্যাপী যশঃ বর্ণিত। অষ্টমে বিজয়পুত্র বল্লাল বর্ণিত। নবমের বক্তব্য, বিজয়সেন চালুক্য-রাজকন্যা রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দশমে বিজয়সেন ও রামদেবী হইতে লক্ষ্মণসেনের জন্ম বর্ণিত। একাদশে লক্ষ্মণসেনের কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত। দৃপ্ত গৌড়েশ্বরের শ্রী হরণ করা ছিল তাঁহার কৌমারকেলি। পরাজিত কলিঙ্গরাজ সর্ব্বদা যুবতী উপহার দিয়া যৌবনে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেন। কাশীরাজকে তিনি সমরক্ষেত্রে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভীরু প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ তাঁহার চরণ-ধূলির বলে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। দ্বাদশের বক্তব্য দিক্‌পতিগণ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশের বক্তব্য, যে ভূমি রাজগণ প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় মনে করেন, লক্ষ্মণসেন শত শত গ্রামরূপে সেই ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসনের মস্তকে রাজকীয় লাঞ্ছন সদাশিব মূর্ত্তি

শাসনের গদ্যাংশে দেখা যায়, মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেন তাঁহার রাজত্বের ২৭শ বৎসরে ৬ই কার্ত্তিক তারিখে ধার্য্যগ্রাম নামক নূতন রাজধানী হইতে মহাদেবী শৃয়া দেবী ও মহাদেবী কল্যাণ দেবীর মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধি কামনায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বাগুন আবৃত্তির বসুশ্রী চতুরকে অবস্থিত মাদিসাহংস ও বসুমণ্ডল গ্রামের অংশ এবং বানার নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত আরও চারিটি খণ্ডক্ষেত্র, সর্ব্বসাকুল্যে বাৎসরিক ৪০০ শত কপর্দ্দক-পুরাণ আয়ের ভূমি মৌদ্গাল্য গোত্রের এবং ঔর্ব্বাদি পঞ্চ প্রবরের কৃষ্ণদেবের প্রপৌত্র জয়দেবের পৌত্র, মহাদেবের পুত্র পাঠক পদ্মনাভ দেবশর্ম্মাকে দান করিতেছেন।

এই শাসনে লক্ষ্মণসেনের প্রতি প্রযুক্ত দুইটি বিশেষণ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, তিনি নিজভুজমন্দর দ্বারা ভীমবেগে বিষম সমরসাগর মথিত করিয়া গৌড়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, তিনি বীরগণরূপ কমল সমূহের বিকাশে ভাস্কর সদৃশ ছিলেন।

এই শাসন ও মাধাইনগর শাসনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিবার জন্য পাঠকগণকে পূর্ব্বের তিনটি প্রস্তাব পুনরায় পড়িতে হইবে। নিম্নে তাম্রশাসনখানির মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

প্রথম পৃষ্ঠ

ছত্র ১। ওঁ নমো নারায়ণায়॥
যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরীপ্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিং সমাশ্রিতমভূদ্যস্যাতি

ছত্র ২। চিত্রং বপুঃ।
দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানো মুখং
দেবস্ত্বাং স নিরস্তদানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ॥ [১]
স্বর্গ্গ

ছত্র ৩। ঙ্গাজলপুণ্ডরীকমমৃতপ্রাঘারধারাগৃহম্
শৃঙ্গারদ্রুমপুষ্পমীশ্বরশিখালঙ্কারমুক্তামণিঃ।
ক্ষীরাম্ভোনিধিজী

ছত্র ৪। বিতং কুমুদিনীবৃন্দৈকবৈহাসিকো
জীয়ান্মন্মথরাজ্যপৌষ্টিকমহাশান্তিদ্বিজশ্চন্দ্রমাঃ॥ [২]
ত্রিভুবন জয়শম্ভু

ছত্র ৫। তালুক্লৃপ্তৈঃ
ক্রতুভিরবারিতসল্লিণোঽমরাণাম্।
অজনিষত তদন্বয়ে ধরিত্রী-
বলয়বিশৃঙ্খলকীর্ত্তয়ো নরেন্দ্রাঃ॥ [৩]

ছত্র ৬।
পৌরাণিভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগণে বীরসেনস্য বংশে।
কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি-কুল-শিরোদাম

ছত্র ৭। সামন্তসেনঃ।
কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমপি ন তরাং তৃপ্যতা নাকনদ্যাং
নির্ম্নিক্তো যেন যুধ্যদ্রিপুরুধিরকণা

ছত্র ৮। কীর্ণধারঃ কৃপাণঃ॥ [৪]
বীরাণামধিদৈবতং রিপুচমূমারাঙ্কমল্লব্রত-
স্তস্মাদ্‌বিস্ময়নীয় শৌর্য্যমহিমা

ছত্র ৯। হেমন্তসেনোঽভবত্।
ক্ষীরোদাধরবাসসো বসুমতীদেব্যা যদীয়ং যশো
রত্নস্তেব সুমেরুমৌলিমি

ছত্র ১০। লিতং ক্ষৌমশ্রিয়ং পুষ্যতি॥ [৫]
অজনি বিজয়সেনস্তেজসাং রাশিরস্মাত্
সমরবিস্ময়রাণাং ভূভৃতামে

ছত্র ১১। কশেষঃ।
ইহ জগতি বিষেহে যেন বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ॥ [৬]

ভূচক্রং

ছত্র ১২। কিয়দেতদাবৃতমভূত্ত্বামনস্যাংঘ্রিণা

নাগানাং কিয়দাস্পদং যদুরসা লঙ্ঘন্তি গূঢ়াজ্যু য়ঃ।

একাহা

ছত্র ১৩। ত্যদনুক্রুরঙ্কতি কিয়ন্মাত্রং তদপ্যম্বরং

স্যেতীব যশো হ্রিয়া ত্রিভুবনং ব্যাপ্যাপি নো তৃপ্যতি॥ [৭]

তস্মাদশেষ

ছত্র ১৪। ভুবনোৎসবপার্ব্বণেন্দু-

র্ব্বল্লালসেনজগতীপতিরুজ্জগাম।

যঃ কেবলং ন খলু সর্ব্ব নরেশ্বরাণা-

মেকঃ স

ছত্র ১৫। মগ্রবিদুষামপি চক্রবর্ত্তী॥ (১) [৮]

ধরাধরান্তঃপুর-মৌলি-রত্নং

চালুক্যভূপালকুলেন্দু-লেখা।

তস্য প্রিয়াভূ

ছত্র ১৬। দ্বহুমান ভূমি-

র্ল্লক্ষ্মী পৃথিব্যো-রপি রামদেবী॥ [৯]

এতাভ্যাং বসুদেবদেবকসুতাদেহান্তরাভ্যামিব

শ্রীমল্ল

ছত্র ১৭। ক্ষ্মণ-সেনমূর্ত্তিরজনি ক্ষ্মাপালনারায়ণঃ।

চক্রে যন্ময়জন্মনিস্পৃহ মিলন্নিদ্রানুবন্ধচ্ছলাত্

ক্রু—

ছত্র ১৮। দ্ধেনাধিপয়োধিকঞ্চুকমিব ত্যক্ত্বা প্রমুগ্ধং বপুঃ॥[১০]

দৃপ্যদ্গৌড়েশ্বর শ্রীহঠহরণকলা যস্য কৌমা

ছত্র ১৯। র-কেলিঃ

কালিঙ্গৈনাঙ্গনাভিঃ প্রতিপদমুপদাশ্চক্রিরে যস্য যূনঃ।

যেনাসৌ কাশিরাজঃ সমর-

ছত্র ২০। ভুবি জিতো যস্য নিস্ত্রিংশধারা

ভাকঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষেন্দ্রশ্চরণজ-রজসা-নির্ম্মমে কার্ম্মণানি॥[১১]

আকৌ

ছত্র ২১। মারং সমরজয়িনা কুর্ব্বতোর্ব্বীমবীরা-

মেতেনামী কথমিব দিশামীসিতারো (২) বিমুক্তাঃ

যুদ্ধোদ্দীপ্তে ব

ছত্র ২২। পুষি কলয়া তস্য তেষ্টৌ প্রবিষ্টাঃ

প্রহ্বীভূতে প্রভবতি নহি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ॥[১২]

যত্রারামদ্রুমদলরু

ছত্র ২৩। চা শৈবলিন্যর্দ্ধগঙ্গা

শস্য (৩) ব্যাজাজ্জয়পদগুণৈর্যেষু রোমাঞ্চিতা ভূঃ।

প্রাণানুঞ্চন্ত্যবনিপতয়ো

ছত্র ২৪। নো পুনর্ধ্যাননেন

গ্রামাস্তেতে সপদি দদিরে কোটিশঃ শাসনানি॥ [১৩]

(১) মূলে চক্রবর্ত্তি পাঠ আছে।

(২) ঈশিতারো পঠিতব্য।

(৩) মূলে সস্য।

তে খলু ধার্য্যগ্রামপরিসরস

ছত্র ২৫।

মাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ পরমেশ্বর-পরমসৌর

পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লা-

ছত্র ২৬।

ল সেনদেবপাদানুধ্যাতনিজভুজমন্দরা-মন্দরপ্রমথিতা

সীমসমর-সাগরসমাসাদিতগৌড়লক্ষ্মা-বীর

ছত্র ২৭।

সকলকুশেশয়বিকাশ (১)বাসরংকর-গৌড়েশ্বর-পর-

মেশ্বরপরমনারসিংহপরমভট্টারক মহারা

ছত্র ২৮। জাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদা বিজয়িনঃ।

সমুপগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণক রা

ছত্র ২৯।

জপুত্ররাজামাত্যমহাপুরোহিতমহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহা

সান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃ

ছত্র ৩০।

তান্তরঙ্গ বৃহদুপরিকমহাক্ষপটলিকমহাপ্রতীহার

মহাভোগিক মহাপীলুপতি মহাগণস্থ দৌঃ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

ছত্র ১।

সাধিকচৌরোদ্ধরণিকনৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি

ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশি

ছত্র ২।

ক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদিন্ অন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবি-

নোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তি—

ছত্র ৩।

তান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্

ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়ন্তি বোধ

ছত্র ৪।

য়ন্তি সমাদিশন্তি চ মতমস্ত ভবতাম্ যথা শ্রীপৌণ্ড্র-

বর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বাগুণাবৃত্ত্যন্তর্গত বসুশ্রীচতু—

ছত্র ৫।

রকে পূর্ব্বে পোঙ্কেসাদাণ্ডিসীমা দক্ষিণে জলদাণ্ডিসীমা

পশ্চিমে মজনদীসীমা উত্তরেপি তথা

ছত্র ৬।

সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নং কবিক্কী চুঞ্চলী গাণ্ডোলী

দেহিয়া খণ্ডক্ষেত্র সমেত বাস্তু

ছত্র ৭।

মণ্ডণগ্রামকিয়দেকদেশঃ পূর্ব্বে গুড়হাস সম্বন্ধিভূসূত্রদ্বয়ং

সিংহজাবিল্কী তথা কেমতগ্রাবাটী পশ্চিমকা

ছত্র ৮।

ণ্ডিস্তথা জলদাণ্ডিসম্বন্ধীয়চতুঃসূত্রস্রষ্টজলনির্গ্গম

জাণঃসীমা দক্ষিণে জলদাণ্ডি-সীমা

(১) মূলে কুশেশয় এবং বিকাস।

ছত্র ৯।
পশ্চিমায়াঞ্চ জলদাণ্ডি সীমা উত্তরে বানহার নদঃ
সীমা। ইত্থঞ্চতুঃসীমাবচ্ছিন্নো মা

ছত্র ১০।
দিসাহংসগ্রামকিয়দেক-দেশঃ ইত্থমেতাবুপরি-
লিখিতভূসীমাবচ্ছিন্নৌ দ্বাবিংশতিহস্ত

ছত্র ১১।
পরিমিতনলেন তলবর্ত্তসমেত কাকিন্যষ্টাবিংশতি ষষ্ট্য-
ধিকপাটেকো (১) সমেত দ্রোণৈকান্বিত

ছত্র ১২।
সমুদয়ভূপাটকাত্মকাঃ সম্বত্সরেণ কপর্দ্দক পুরাণশত
চতুষ্টয়োৎপত্তিক খণ্ড-ক্ষেত্র চতুষ্টয় স (২)

ছত্র ১৩।
সমেতাবাস্থমণ্ডণমাদিসাহংশকিয়দেকভূভাগৌ
সঝাটবিটপৌ সজলস্থলৌ সগর্ত্তো

ছত্র ১৪।
ষরৌ সগুবাক-নারিকেলৌ সহৃদশাপরাধৌ পরিহৃ
সর্ব্বপীড়াবচট্টভট্টপ্রবেশাবকিঞ্চিৎ প্র

ছত্র ১৫।
গ্রাহ্যৌ তৃণপূর্ত্তিগোচরপর্য্যন্তৌ কৃষ্ণদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌ-
ত্রায় জয়দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় মহাদেব

ছত্র ১৬।
দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় মৌদ্গল্য সগোত্রায় ঔর্ব্বচ্যবনভার্গ্গব
জামদগ্ন্যআপ্নুবান্প্রবরায় সামবেদকৌথুম

ছত্র ১৭।
শাখাচরণাবদ্বায়িনে পাঠকশ্রীপদ্মনাভদেবশর্ম্মণে পুণ্যে
অহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগব—

ছত্র ১৮।
ন্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টারকমুদ্দিশ্য মহাদেবী শূয়া দেবী
মহাদেবী কল্যাণদেব্যাঃ ভূতি পৌষ্টি নি

ছত্র ১৯।
মিত্তং বাস্তুগোচরাভ্যাং সম্বর্ষেন শতচতুষ্টয়োৎপত্তি-
কাং ভূমিমুত্সৃজ্যাচন্দ্রার্ক-ক্ষিতিসমকালং যাবৎ

ছত্র ২০।
ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্বা প্রদত্তা অস্মাভিঃ।
তত্ত্ববদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যাঃ ভাবি

ছত্র ২১।
ভি রপি ভূপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াত্ পালনে
ধর্ম্ম-গৌরবাত্ শাসনমিদং পালনীয়ম্। ভব

ছত্র ২২।
ন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। ভূমিং যঃ
প্রতি-গৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্য-
কর্ম্মাণৌ নি

(১) পাটক পঠিতব্য। (২) অতিরিক্ত স বর্জ্জয়িতব্য।

ছত্র ২৩।
য়তং স্বর্গ-গামিনৌ॥ বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ
সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা

ছত্র ২৪।
ফলং। আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহাঃ,
ভূমিদাতা কুলে জাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি। ষ

ছত্র ২৫।
ষ্টির্ব্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চা
মন্তা চ তান্যেব নরকে বসেত্। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো

ছত্র ২৬।
হরেত বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ
পচ্যতে॥ ইতি কমলদলাম্বু-বিন্দু-লোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য

ছত্র ২৭।
মনুষ্য-জীবিতঞ্চ সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি
পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ অরিরাজমদ

ছত্র ২৮।
নশঙ্করনরপতিরকরোন্মহিশতমুখ্যং। শঙ্কর ধরমিহ
দূতং গৌড়মহাসান্ধি-বিগ্রহিকং॥

ছত্র ২৯।
শ্রীনি মহাসাং নি। শ্রীমদ্রাজ নি। শ্রীমদন শঙ্কর নি।
শ্রীমত্সাহসমল্ল নি। সং ২৭। কা দি নে ৬

বঙ্গানুবাদ

সিদ্ধ হউক (১)। ওঁ নারায়ণকে নমস্কার।

যাঁর অঙ্কোপরি প্রিয়া গৌরী যায় দেখা।
শারদ মেঘের বুকে যেন তড়িল্লেখা।
অর্দ্ধদেহে সমাশ্রিয়া হরি [নীল কায়]।
বিচিত্র চিত্রিত দেহ যার শোভা পায়॥
প্রদীপ্ত সূর্য্যের তেজে জ্বলে ত্রিনয়ন।
সেই তেজে ঘোররূপ যাঁহার বদন।
নিরস্তদানব-গজ দেব পঞ্চানন।
সে দেব করুন তব মঙ্গল বর্দ্ধন॥ ১।
সুরনদী জলে যেই পুণ্ডরীক প্রায়।
যাহা হতে সুধা-ধারা নিয়ত চুয়ায়।
প্রেমের বিটপি-শাখে কুসুম আকার।
হরশিরে যেই মুক্তা মণি অলঙ্কার।
ক্ষীরোদসাগরে যেই লভিল জনম।
আনন্দে পূরায় যেই কুমুদী মরম।
মন্মথরাজার রাজ্যসীমা বৃদ্ধি তরে।
দ্বিজরাজ যেই মহাশান্তিযজ্ঞ করে।
[দেবের প্রধান] সেই সে দেব চন্দ্রমা।
দিনে দিনে বাড়ুক সে দেবের মহিমা॥ ২।

(১) স্বস্তিক চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত। ইহা শুণ্ডাকার একটি চিহ্ন। গণেশের শুণ্ডের প্রতীক।

ত্রিলোকজয়ান্তে যাঁরা যজ্ঞ অনুষ্ঠিয়া।
অমরধামের দ্বার ফেলিল খুলিয়া।
ধরা বুকে বাধা হীন ধায় কীর্ত্তিরাশি।
হেন রাজগণ সেই বংশে জন্মে আসি। ৩ ।
পুরাণ-কাহিনী যার ঘোষে গুণগণ।
সেই বীরসেন-বংশে লভিলা জনম।
কর্ণাট হইতে যত ক্ষত্র আসিলেন।
শিরোমাল্য তাঁহাদের শ্রীসামন্ত সেন।

সুমেরু-মৌলিতে পরে [করি কত প্রীতি]।
হেমন্তের যশোরাশি যেন মণিদ্যুতি। ৫ ।
তেজোরাশি শ্রীবিজয় জন্মে হ'তে সেই।
দিগ্বিজয়ী রাজগণে শেষ রাজা যেই।
রাজশব্দ নাম সহ শুধু সহি যায়।
নিজ বংশ আদি বলি মাত্র চন্দ্রমায়। ৬ ।
ভূচক্র গরব আর করে কি লইয়া।
বামনের পদে যারে ফেলে আচ্ছাদিয়া।
পাতালে যে নাগলোক তাও তুচ্ছ লাগে।
লঙ্ঘে যারে বুকে হাঁটি পদহীন নাগে।
আকাশের মহিমা বা গাহিব কি আর।
এক দিনে লঙ্ঘে যারে উরু নাই যার।
এমতি ভাবিয়া তাঁর মহা যশোরাশি।
ত্রিভুবন ব্যাপিয়াও না হইল খুসি। ৭ ।
তাঁ'হতে বল্লালসেন জন্মে জগদিন্দ্র।
অশেষ ভুবনোৎসব পার্ব্বণের চন্দ্র।
নরেশ্বর চক্রবর্ত্তী নহে শুধু যেই।
পণ্ডিতগণেও হয় চক্রবর্ত্তী সেই। ৮ ।
সে রাজার অন্তঃপুর মুকুটের মণি।
চালুক্য রাজার কুলইন্দুলেখা খানি।
হইল তাঁহার প্রিয়া, রামদেবী নাম।
ধরা লক্ষ্মী [সতীনেরও] বহুমান ধাম। ৯ ।
বসুদেব-দেবকীর দেহ হতে যথা।
জনম লভিয়াছিল নারায়ণ, তথা।
এই দুই জন হ'তে ভূপালতনয়।
লক্ষ্মণসেনের মূর্ত্তি হইল উদয়।
ক্ষীরোদসাগরে রাখি নিদ্রামুগ্ধ কায়।
সিন্ধুজলে ছলে ত্যক্ত কঞ্চুকের প্রায়।
কৃষ্ণ সেই ধরাধামে হইলা উদয়।
লক্ষ্মণসেনের রূপে বল্লাল তনয়। ১০ ।
দৃপ্ত গৌড়েশ্বর লক্ষ্মী স্ববলে হরণ করি
খেলিল যে কৈশোরের খেলা।
প্রতিবারে দিব্য নারী উপহারে তোষে যারে
কলিঙ্গরাজায় যুব-বেলা।
সমর-অঙ্গনে যেই কাশীরাজে পরাজিল।
যাঁহার অসির ধার ভয়ে।

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন—প্রথম পৃষ্ঠ

পৃথ্বীতল বীরশূন্য করিয়াও যাঁর।
তৃপ্তির উদয় হৃদে না হইল আর।
ধাইল সে বীর তাই সুরধুনী-তীরে।
শত্রুরক্তকীর্ণ অসি ধুইবার তরে। ৪ ।
শ্রীহেমন্তসেন জন্মে সেই বীর ঘরে।
দেবতা বলিয়া যারে বীরগণ বরে।
তার শৌর্য্য-মহিমায় লাগয়ে বিস্ময়।
মল্লব্রত জীবনের রিপু-চমূ ক্ষয়।
ক্ষীরোদসাগর যার অধোবাসখানি।
সেই বসুমতী দেবী ক্ষৌম শোভা মানি।

ভীরু প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ মন্ত্রঃপূত রক্ষা রচে
যাঁহার চরণধূলি লয়ে। ১১ ।
আকৌমার জয়ী রণে, নিঃশেষিল বীরগণে,
তাই সে জিজ্ঞাসা জাগে মনে।
দিক্-অধিপতি যারা অব্যাহতি লভে তারা
কেমনে এ মহাবীর রণে।
সেই অষ্ট দিক্‌পাল বিস্তারি কৌশল-জাল
যুদ্ধোদ্দীপ্ত পণে দেহে তার।
বিহ্বল অবশ যারা ক্ষত্রিয়ের অসিধারা
নাহি করে তাদের সংহার। ১২ ।

আরামবিটপীদলরুচির প্রভায়।
যথায় তটিনীগুলি অর্দ্ধগঙ্গা প্রায়।
যথা বসুধার সদা জয়গানে মন।
শস্য ছলে বুকে তাহে জাগে শিহরণ।
পরাণ সঁপয়ে, তবু হেন ভূমিখানি।
নাহি ছাড়ে নৃপতিরা [মহারত্ন মানি]।
এই রাজা সেইভূমে শত শত গ্রাম।
[ব্রাহ্মণে] শাসন করি দিল অবিরাম ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রশাসন—দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

ধার্য্যগ্রাম-পরিসর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার (= রাজধানী) হইতে পরমেশ্বর, পরমসৌর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেবের পাদানুধ্যানকারী সেই রাজা, যিনি নিজ ভুজমন্দর দ্বারা ভীম বেগে অসীম সমরসাগর সংমথিত করিয়া গৌড়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যিনি বীরগণরূপ কমলবৃন্দের বিকাশে ভাস্কর-সদৃশ ছিলেন; সেই গৌড়েশ্বর, পরমেশ্বর, পরমনরসিংহভক্ত, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীলক্ষ্মণসেনদেবপাদ বিজয়যুক্ত আছেন।

সমবেত অশেষরাজ, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, মহাপুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌ—বল—হস্তী—অশ্ব—গো—মহিষ—অজ—অবিক (= মেষ) ইত্যাদির অধ্যক্ষ, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি এবং অধ্যক্ষপ্রচারে (= সরকারী রাজকর্ম্মচারীর তালিকায়) উক্ত, কিন্তু এই স্থানে অনুল্লিখিত সকল রাজকর্ম্মচারী এবং চট্ট ভট্ট জাতীয় অধিবাসিগণ, ক্ষেত্রকর (= কৃষক)গণ, ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণেতর সমস্ত অধিবাসিগণকে [রাজা] যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক জানাইতেছেন এবং আদেশও করিতেছেন যে [নিম্নলিখিত ব্যাপারে] আপনাদের মত হউক।

যথা,—শ্রীপৌণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাত বাওন আবৃত্তির অন্তর্গত বসুশ্রী চতুরকে—

[চৌহদ্দি]

পূর্ব্বে পোঞ্চেষাদাণ্ডিসীমা।
দক্ষিণে জলদাণ্ডিসীমা।
পশ্চিমে মজা নদীর সীমা।
উত্তরেও সেই সীমা।

এই চতুঃসীমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন কবিন্ধী, চুঞ্চলী, গাণ্ডোলী এবং দেহিয়াস্থিত খণ্ডক্ষেত্রচতুষ্টয় সমেত বাসুমণ্ডন গ্রামের কিয়দংশ।

পূর্ব্বে গুড়হাস সম্বন্ধীয় ভূসূত্রত্রয়। সিংহজাবিন্ধী, কেমতগ্রাবাটি, পশ্চিমকাণ্ডি এবং জলদাণ্ডির চতুঃসূত্র ভ্রষ্ট জলনির্গম জাণের সীমা।
দক্ষিণে জলদাণ্ডি সীমা।
পশ্চিমেও জলদাণ্ডি সীমা।
উত্তরে বানহার নদ সীমা।

এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মাদিসাহংস গ্রামের কিয়দংশ।

উপরের লিখিতমত সীমাবচ্ছিন্ন দুইটি ভূখণ্ড তলবর্ত্তসমেত বাইশ হাত নলের মাপে ৬ পাটক ১ দ্রোণ ২৮ কাকিনী—সম্বৎসরে যাহা হইতে চারি শত কপর্দ্দকপুরাণ আয় হয়, এমনি চারিটি খণ্ডক্ষেত্র সমেত বাসুমণ্ডন ও মাদিসাহংস গ্রামের কিয়দংশ,—ঝোপঝাড় ও গাছপালা সহ, জলস্থল সহ, গর্ত্ত ও পতিত ভূমি সহ, সুপারি ও নারিকেল গাছ সহ, সমস্ত দায় মুক্ত করিয়া, দশবিধ অপরাধেও বাজেয়াপ্ত হইবে না, এই ব্যবস্থা করিয়া, চটভটগণের অপ্রবেশ্য করিয়া, সম্পূর্ণ করমুক্ত করিয়া, [এমন কি] জঙ্গলা তৃণ পুঁই ইত্যাদি পূর্ণ গোচর জমী সহ কৃষ্ণ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র জয়দেব শর্ম্মার পৌত্র মহাদেব দেব-শর্ম্মার পুত্র, মৌদ্গল্য গোত্রীয়, ঊর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন আপ্নুবান্ এই পঞ্চ প্রবর, সামবেদের কৌথুম-শাখাচরণাবধায়ী পাঠক শ্রীপদ্মনাভ দেবশর্ম্মাকে পুণ্য দিনে, বিধি অনুসারে জলাঞ্জলি সহ, ভগবান শ্রীনারায়ণ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মহাদেবী শূয়াদেবী এবং

গুতাদেবী কল্যাণদেবী মঙ্গল ও সমৃদ্ধির জন্য সম্বৎসরে চারি শত কপর্দ্দক পুরাণ] আয়ের বাস্তু গোচরাদি ভূমি, যত দিন চন্দ্রসূর্য্য পৃথিবী আছে, তত দিনের জন্য, ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুসারে উৎসর্গ পূর্ব্বক তাম্রশাসন করিয়া আমাদের দ্বারা প্রদত্ত হইল।

আপনাদের সকল কর্ত্তৃক [এই দান] অনুমোদিত হউক। পালনে ধর্ম্ম-গৌরব এবং অপহরণে নরকপাতভয় হেতু ভাবী নৃপতিগণেরও এই শাসন পালনীয়।

এই স্থানে [নিম্নলিখিত] ধর্ম্মানুশংসী শ্লোকসমূহ কথিত হয়।

ভূমি যে দান করে এবং যে ভূমিদান গ্রহণ করে, সেই পুণ্যকর্ম্মা উভয় ব্যক্তিই নিরত স্বর্গে গমন করে।

সগরাদি বহু রাজগণ পূর্ব্বে ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন। যে সময় সেই ভূমির মালিক হয়, দানফল তখন তাঁহারই প্রাপ্য হয়।

পিতাগণ বাহ্বাস্ফোট করেন এবং পিতামহগণ আনন্দে নৃত্য করেন (এই বলিয়া, যে) আমাদের কুলে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে আমাদের পরিত্রাণকর্ত্তা হইবে।

ভূমিদাতা ষাট্ হাজার বৎসর স্বর্গে আনন্দ উপভোগ করেন। যিনি সেই দান নষ্ট করেন বা নষ্ট করার অনুমোদন করেন, তিনি সেই পরিমাণ কাল নরকে বাস করেন।

নিজের বা পরের দত্ত ভূমি যিনি হরণ করেন, তিনি বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণের সহিত পচিয়া মরেন।

এইরূপে সমৃদ্ধি এবং মনুষ্য-জীবন কমলপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, ইহা চিন্তা করিয়া, উপরে কথিত বিষয়গুলি বুঝিয়া কোন মানবের পরকীর্ত্তি বিলোপ করা উচিত নহে।

শত দেশে প্রধান বলিয়া স্বীকৃত গৌড়রাজ্যের মহাসান্ধিবিগ্রহিক শঙ্করধরকে অবিরাজ মদনশঙ্কর নরপতি (লক্ষ্মণসেন) এই শাসনের দূতক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রী (ভগবান কর্ত্তৃক) সাক্ষ্যকৃত। মহাসান্ধিবিগ্রহিক কর্ত্তৃক সাক্ষ্যকৃত। শ্রীমদ্রাজা কর্ত্তৃক সাক্ষ্যকৃত। শ্রীযুক্ত মদনশঙ্কর কর্ত্তৃক সাক্ষ্যকৃত। শ্রীমৎ সাহসমল্ল কর্ত্তৃক সাক্ষ্যকৃত। সং ২৭। কার্ত্তিক দিনের ৬।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

বৈষ্ণবমত-বিবেক
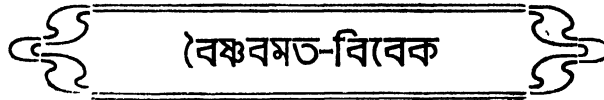
[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দণ্ডমহোৎসব

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে—

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

অর্থাৎ নদীসকল যেমন সর্ব্বদা পরিপূর্ণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাঁহাকে আশ্রয় করে, তিনিই শান্তি লাভ করেন; ভোগার্থী ব্যক্তি সে শান্তি পাইতে পারেন না।

রঘুনাথের চিত্ত ভোগ-কামনায় বিক্ষুব্ধ ছিল না, তথাপি স্থিতধীর যে ধৈর্য্য, তাহা এত দিন তাঁহার অধিগত ছিল না বলিয়াই শ্রীচৈতন্যদেবের এই উপদেশ। বিষয় যে চাহে না, বিষয় আসিয়া তাহাতে উপসন্ন হয় কেন? শ্রীধরস্বামী ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি" অর্থাৎ "সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, ভোগের দ্বারা অবিকৃতচিত্ত হওয়াতেও সেই সকল ভোগ প্রারব্ধ কর্ম্মাবলীর দ্বারা উপনীত হইয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীব্র ভক্তির দ্বারাই প্রারব্ধ ক্ষয় হইতে পারে এবং প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই এই ভোগপ্রবাহের গতি রুদ্ধ হয়, এই জন্যই শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে 'অন্তর্নিষ্ঠার' উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। রঘুনাথ এখন কায়মনোবাক্যে সেই ইষ্টনিষ্ঠাই অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং বাহিরে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে বিষয়ী সাজিলেন।

এই সময়ে একটি অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল। অপ্রতিহতপ্রভাব হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদারেরও যথেষ্ট শত্রু ছিল। এই সপ্তগ্রাম মুলুক বন্দোবস্ত করিয়া লইবার পূর্ব্বে এক মুসলমান চৌধুরী এই মুলুকের অধিকারী ছিলেন। তিনি মুসলমান আমীর বলিয়া যথাসময়ে গৌড়ের বাদশাহের রাজস্ব সরবরাহ করিতেন না; এ জন্য তিনি মুলুকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মুলুকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও গৌড়ের রাজ-সরকারের নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে তাঁহার প্রভাব অল্প ছিল না। পূর্ব্বে এই অধিকারীর সহিত হিরণ্য দাসেরও সৌহৃদ্য ছিল; এই অধিকারী মনে করিয়াছিল যে, হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস মুলুকের অধিকারী হইলে সে-ও মুলুকের উপস্বত্ব হইতে কিছু অংশ পাইবে। কিন্তু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন তাহাকে কিছুই দিলেন না। ইহাতে সে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া গৌড়ের রাজ-সরকারে অভিযোগ করিল যে, হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস সপ্তগ্রাম মুলুক হইতে বহু রাজস্ব আদায় করেন, কিন্তু সরকারে অতি অল্পই হিসাব দিয়া থাকেন। উজীরকে এই ব্যাপারের তদন্ত করিয়া গৌড়েশ্বর অপরাধিগণকে শাস্তি দিতে বলিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সপ্তগ্রামে ফৌজদারি থাকায় সেখানে কারাগারও ছিল। মুসলমান কর্ম্মচারী আসিয়া হিরণ্য দাসকে বা গোবর্দ্ধন দাসকে ধরিতে পারিলেন না—তাঁহারা উভয়েই মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে পলায়ন করিলেন। কিন্তু রঘুনাথ পলাইলেন না—এই জন্য মুসলমান কর্ম্মচারী তাঁহাকে ধরিয়া কারাগারে রাখিল। বলা বাহুল্য যে, এই উজীর বা মুসলমান কর্ম্মচারী সপ্তগ্রামের পূর্ব্ব-অধিকারী চৌধুরীর বন্ধু। চৌধুরী নিজেই রঘুনাথকে পীড়ন করিলে যদি হিরণ্য দাস বা গোবর্দ্ধন দাস ধরা দেন,

এই আশায় প্রত্যহ রঘুনাথকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিত, কিন্তু রঘুনাথের সুন্দর অথচ বিনীত সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত, সে কিছুতেই অত্যাচার করিতে পারিত না। রঘুনাথ এই অশান্তিকর বৈষয়িক ঘটনার একটি শান্তিময় মীমাংসা করিতে অভিলাষী হইলেন। এক দিন তিনি চৌধুরীকে প্রণাম করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি তোমার পুত্রের তুল্য। আমার পিতা ও পিতৃব্য তোমার দুই ভ্রাতার ন্যায়! ভাই-ভাইয়ে আজ হয়ত বিরোধ হইয়াছে, আবার হয়ত কাল মিলন হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া তোমার নিজের পুত্র-তুল্য আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমার কোনও মতে উচিত নহে।" রঘুনাথের এই কথা শুনিয়া চৌধুরী মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার হৃদয় রঘুনাথের প্রতি স্নেহে উদ্বেলিত হইল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। রঘুনাথকে তিনি বলিলেন—"আমি অদ্যই উজীরকে বলিয়া কোনও ছলে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি, তোমার পিতা ও জ্যেঠার বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ যাহাতে না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতেছি। কিন্তু তোমার জ্যেঠা ও পিতাকে বলিয়া আমিও যাহাতে তোমাদের উদ্বৃত্ত অর্থের কিছু পাই, তাহার ব্যবস্থা কর। আমি তোমার জ্যেঠা ও পিতার উপরেই নিষ্পত্তির ভার দিলাম। তাঁহারা যাহা সঙ্গত মনে করেন, আমাকে যেন তাহাই দেন।" এই প্রকারে মুসলমান চৌধুরী বন্ধু উজীরকে বলিয়া রঘুনাথকে মুক্তিদান করিলেন এবং রঘুনাথও তাহার জ্যেঠা ও পিতাকে বলিয়া উজীরকে যথোচিত "সওগাত" এবং মুসলমান চৌধুরীকেও কিছু বার্ষিক দিবার ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথের বৈষয়িক কৌশলেই সমস্ত বিপদের নিষ্পত্তি হইল। এই ব্যাপারে রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য রঘুনাথের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। *

এই সময়ের পূর্ব্বেই "আকর মল্লিক" বা শ্রীরূপ গোস্বামী গৌড় রাজ-সরকারের রাজস্ব-সচিবের পদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং তাহার কিছু দিন পরেই বাদশাহ হুসেন শাহ উড়িষ্যায় অভিযানে বাহির হইয়াছেন। বোধ হয়, এই সময়ের নব-নিযুক্ত মুসলমান উজীরই—যাহার উপর ঐ সময় শাসন-ভার বা রাজস্ব-বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল—সপ্তগ্রাম মুলুকের পূর্ব্ব-অধিকারীর পরামর্শে সপ্তগ্রামের হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের জন্যই এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে উভয়েই উৎকোচ-স্বরূপ অভীষ্ট অর্থ লাভ করিয়া হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাসকে সমস্ত অভিযোগ হইতে মুক্তি দান করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামী এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া তাহার পরেই লিখিতেছেন—

"এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেলা।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈলা॥"

১৪৩৬ শকে শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের সময় পথে শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে যখন অবস্থান করেন, তখনই রঘুনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি রঘুনাথকে উপদেশ ও আশ্বাস দান করেন। উহার পর-বৎসরেই শারদীয়া বিজয়া দশমীর পরেই মহাপ্রভু বন-পথে বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ও ঐ বৎসরই মাঘ মাসের শেষে প্রয়াগে গমন করেন। প্রয়াগে কয়েক দিন অবস্থানের পরেই তিনি ৺কাশীধামে আসিয়া দুই মাস অবস্থান করেন। অতএব ১৫৩৮ শকাব্দের প্রথমেই তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাপ্রভুর কথামত রঘুনাথ ভাবিলেন, মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন এই বার আমি নীলাচলে যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে অবস্থান করিব। ইহা ভাবিয়া তিনি এক দিন রাত্রিকালে উঠিয়া গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। পিতা ও পিতৃব্য লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে অনেক দূর হইতে ধরিয়া আনিলেন। তখন রঘুনাথের মাতা বলিলেন যে, "রঘুনাথ পাগল হইয়াছে, উহাকে এখন হইতে বান্ধিয়া রাখ।" কিন্তু পিতা হতাশ হইয়া উত্তর করিলেন—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে যাহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে?"

—চৈঃ-চঃ, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

বঙ্গদেশে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের ভার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর অর্পিত হইয়াছিল। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজ পরিকরবর্গের সহিত সেই সময়ে ভাগীরথীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সমূহে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি ঐ সময়ে পানিহাটীতে অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া রঘুনাথ পিতা-মাতার আদেশ লইয়া তাঁহার দর্শন-লাভের জন্য পানিহাটীতে আগমন করিলেন। পানিহাটীতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কোটিসূর্য্যসমপ্রভ শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটীর গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ-মূলে বেদীর উপর নিজ পরিকরবর্গের সহিত বসিয়া আছেন। রঘুনাথ দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভুর সম্মুখে পড়িয়া থাকিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সেবক—"রঘুনাথ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছে" বলিয়া রঘুনাথকে চিনাইয়া দিল।

* সপ্তগোস্বামীর লেখক পরম শ্রদ্ধেয় ৺সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন, গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দিন হুসেন শাহই রঘুনাথকে বন্দী করিয়া গৌড়ে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিতই রঘুনাথের এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং হুসেন শাহই শেষে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথকে মুক্তি দান করেন। কিন্তু এই ঘটনার মূল আকর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। উহা পড়িলেই গৌড়ের বাদশাহের সহিত রঘুনাথের যে কথোপকথন হয় নাই, পরন্তু চৌধুরীর সহিত হইয়াছিল; এবং চৌধুরীই যে উহা পাইয়া পরে শান্ত হইয়াছিলেন; এবং চৌধুরীর চক্রান্তে যে এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ইহা সুস্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। চরিতামৃতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৪৩৭ শকে সনাতন গোস্বামী যখন কারাগার হইতে পলায়ন করেন, তখন হুসেন শাহ উড়িষ্যায় যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। অতএব ঐ সময় হুসেন শাহের এই সকল করিবার অবকাশ ছিল না।

"শুনি প্রভু কহে—'চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোয় করিমু দণ্ডন'॥
প্রভু বোলায় তিঁহো নিকট না করে গমন।
আকর্ষিয়া তার মাথে প্রভু ধরিল চরণ॥"

শ্রীচৈতন্য-প্রেমধন হৃদয়ে গোপন করিয়া বা চুরি করিয়া রাখিয়া রঘুনাথ বাহিরে বিষয়ী সাজিয়াছেন, এই জন্য পরম-দয়াল প্রেমমত্ত শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে "চোরা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিই গৌড়ে ধর্মপ্রচারের ও প্রেমদানের ভার দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অগোচরে রঘুনাথ সেই প্রেম-সম্পত্তি লাভ করার জন্যও তাঁহাকে "চোরা" বলা হইতে পারে। যাহা হউক, অতিশয় কৃপা করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে অপূর্ব্ব দণ্ড-দানের আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "এত দিন আমার নিকট না আসিয়া তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার দণ্ডস্বরূপ তুমি আমার পরিকরবর্গকে ও সমাগত ভক্তবৃন্দকে দধি-চিড়া ভোজন করাও।"

রঘুনাথ প্রভুর এই কৃপাদেশ পাইয়া তখনই মহোৎসবের আয়োজন করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইলেন। বহু লোক নাইয়া গ্রাম হইতে ভারে ভারে দধি, দুগ্ধ, চিনি, চিঁড়া ও কলা লইয়া আসিল। প্রকাণ্ড মহোৎসব হইবে, এই কথা প্রচার হওয়ায় পশারীরা বহু সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইল। রঘুনাথ সমস্তই ক্রয় করিয়া লইলেন। ছোট, বড়, মাঝারি—বহু মৃৎপাত্র স্তূপীকৃত করা হইল। বড় বড় মাটীর জালায় করিয়া গঙ্গাজলে চিঁড়া ভিজান হইল। ঐ স্থানে সমাগত প্রত্যেক লোককেই দু'-তিন-চারিটি করিয়া পাত্র দেওয়া হইল। তাঁহারা এক পাত্রে চিঁড়া, অপর পাত্রে দধি, অন্য পাত্রে কলা, দুগ্ধ, ও পাত্রান্তরে চিনি ও অন্য পাত্রে জল লইয়া প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেলেন। ঐ সময়ে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত তাঁহার পরিকরবর্গ অর্থাৎ রামদাস ঠাকুর, সুন্দরানন্দ, গদাধর দাস, মুরারি, কমলাকর, সদাশিব কবিরাজ, পুরন্দর, ধনঞ্জয় পণ্ডিত, গৌরিদাস পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস হোড়, উদ্ধারণ দত্ত-প্রমুখ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহাদের সকলকেই নিজের চতুষ্পার্শ্বে বেদীর উপর বসাইলেন। যে সকল ভট্টাচার্য্য-ব্রাহ্মণাদি উৎসবের কথা শুনিয়া আগমন করিলেন, প্রভু তাঁহাদিগকেও পরম সমাদরে বেদীর উপরে বসাইলেন। অসংখ্য লোক বেদীর নীচে গঙ্গাতীরে বসিল। স্থানাভাবে কেহ কেহ জলে দাঁড়াইয়া সেই স্থানেই চিঁড়া ভিজাইয়া লইল। প্রত্যেককেই এক পাত্রে চিঁড়া ও দধি ও অপর পাত্রে চিঁড়া ও দুগ্ধ, চিনি, কলা ইত্যাদি দেওয়া হইল। বিশ জন লোকে পরিবেষণ-কার্য্যের ভার লইলেন। ঐ সময় শ্রীল রাঘব পণ্ডিত মধ্যাহ্নের ভোগ প্রস্তুত করিয়া প্রসাদ-গ্রহণের জন্য সপরিকর নিত্যানন্দ প্রভুকে সন্ধান করিতে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি মধ্যাহ্নের ভোগ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাও নিবেদন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণের নিবেদিত অন্নভোগ আমরা রাত্রিতে তোমার গৃহে যাইয়া গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া রাঘব পণ্ডিতকেও মহোৎসবের প্রসাদ পাইতে বসাইয়া দিলেন। রাঘব পণ্ডিতও নিজ গৃহে যে সকল নিসকড়ি প্রসাদ ছিল, তাহা ব্রাহ্মণের দ্বারা সেই স্থানে আনয়ন করিলেন। এইরূপে ভোগদ্রব্য পরিবেষিত হইলে নিত্যানন্দ প্রভু প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"সকল লোকের চিঁড়া সম্পূর্ণ যবে হৈল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সভার চিঁড়া দেখিতে লাগিলা॥
সকল কুণ্ডী হোলনার চিঁড়া এক এক-গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস॥
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া॥
এই মত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে॥
কি করিয়া বেড়ায় ইহা কেহো নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন্ ভাগ্যবানে॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অনন্তর নিত্যানন্দ প্রভু নিজের আসনের দক্ষিণ দিকে চারিটি মৃৎখুণ্ডিকাতে ভোগদ্রব্য আনাইয়া দিয়া নিজ আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নিজের দক্ষিণ দিকে এইরূপে মহাপ্রভুর আসন দিয়া তিনি সকলকে "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। সেই বিরাট জনসঙ্ঘের হরিধ্বনিতে আকাশ ও বাতাস পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে গোপবালকগণকে লইয়া যেরূপ আনন্দে পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই মনে হইল। অতঃপর মহাপ্রভুর পাত্রে যে ভোগ ছিল, ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহা ভক্তগণকে পরিবেষণ করা হইল। অতঃপর হরি হরি ধ্বনির মধ্যে পরমানন্দে এই পুলিনভোজের স্মৃতি-উদ্দীপক মহামহোৎসব শেষ হইল—পরিবেষক ব্রাহ্মণগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিলেন—গলায় পুষ্পমাল্য পরাইলেন এবং সেবকে তাম্বুল আনয়ন করিল। তখন তাহা গ্রহণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নিজ হস্তে অবশিষ্ট মালা, চন্দন ও তাম্বুল সমাগত সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রামের পর নিত্যানন্দ প্রভু সপরিকরে রাঘব পণ্ডিতের মন্দিরে আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণসহ সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়া রঘুনাথ চক্ষু সার্থক করিলেন। সকলেই সকল ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া এই সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,—

"ভক্তগণ সব নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে—প্রেমে জগৎ ভাসায়॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে না দেখে অন্যজন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারি নর্ত্তন।
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে?
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে॥"

নৃত্যের অবসানে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু যখন বিশ্রাম করিতেছেন, তখন রাঘব পণ্ডিত প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মনোমত নানা উপচারে রাঘব পণ্ডিত ঠাকুরের ভোগ দিয়াছেন; নিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত পরমানন্দে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। রাঘব পণ্ডিত নিজ হাতেই পরিবেষণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে আহার করাইলেন, অনন্তর রঘুনাথকে সেই পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ দান করিলেন। রঘুনাথকে প্রসাদ দিয়া রাঘব বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্, তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে বাস করিয়া থাকেন। আজিও তাঁহার উদ্দেশে যে ভোগ নিবেদন করা হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পাত্রাবশেষ তোমাকে দিয়াছি। তুমি যখন পরম ভক্তিভরে এই প্রসাদ গ্রহণ করিতেছ, তখন ইহাতেই তোমার সকল বন্ধন খণ্ডিত হইল।"

পরদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাতীরের সেই বটবৃক্ষরাজের নিম্নে বেদীর উপর সপরিকরে উপবেশন করিলেন। অতি বিনীত রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন; নিজে কিছু বলিতে পারিলেন না—অশ্রুজলে তাঁহার চক্ষু ভাসিয়া গেল—বাক্য রুদ্ধ হইল। তিনি রাঘব পণ্ডিতের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-পদে নিবেদন জানাইলেন—

"অধম পামর মুই হীন জীবাধম।
মোর ইচ্ছা হয় পাব চৈতন্য-চরণ।
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়।
যত বার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতামাতা দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া।
তোমার কৃপা বিনে কেহ চৈতন্য না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়।
অযোগ্য মুঞি নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোসাঞি! হইয়া সদয়।
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও' কর আশীর্ব্বাদ।"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

নিত্যানন্দ প্রভু রঘুনাথের এই প্রার্থনা শুনিয়া সকল ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন—"ইহার ইন্দ্রের ন্যায় বিষয়সুখ বিদ্যমান, তথাপি শ্রীচৈতন্য-কৃপাতে ইহার তাহাতে সুখ বোধ হয় না। তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই রঘুনাথ শ্রীচৈতন্যচরণ লাভ করিতে পারে।" বলা বাহুল্য, ভক্তগণ সকলেই প্রিয়দর্শন রঘুনাথকে অকপটে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু অতঃপর প্রণত রঘুনাথের মস্তকে শ্রীচরণ স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি যে এই পুলিনভোজন করাইয়াছ, ইহাতে কৃপা করিয়া মহাপ্রভু নিজে আগমন করিয়াছেন, এবং নিজে কৃপা করিয়া দুগ্ধ-চিপিটকাদি ভক্ষণ করিয়াছেন, তিনি নিজে ভক্তগণের নৃত্য দেখিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন করিয়াছেন, তোমাকে কৃপা করিয়াই তিনি এইরূপে অলৌকিক ভাবে এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তোমার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, তুমি শীঘ্রই মহাপ্রভুর শ্রীচরণ লাভ করিবে এবং তিনি তোমাকে নিজের নিকটে রাখিয়া তোমার ভার তাঁহার অভিন্নহৃদয় স্বরূপ গোস্বামীর উপর ন্যস্ত করিবেন।" অনন্তর রঘুনাথ সকল ভক্তকে বন্দনা করিলেন এবং পরম-করুণ নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে সমস্ত ভক্তের দ্বারা আশীর্ব্বাদ করাইলেন।

রঘুনাথ নিত্যানন্দ প্রভুর জন্য প্রণামী-হিসাবে এক শত মুদ্রা ও সাত তোলা সোণা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ভাণ্ডারীর নিকট অতি গোপনে সমর্পণ করিলেন। পাছে প্রভু তাহা জানিয়া অসন্তুষ্ট হন, এই জন্য এই ব্যাপার এখন গোপন রাখিয়া তিনি গৃহে ফিরিলে পরে তাহা জানাইতে বলিলেন। অতঃপর রাঘব পণ্ডিত এই পরমভক্ত বিষয়-বিরক্ত রঘুনাথকে আদর করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যাইয়া পথে খাইবার জন্য তাঁহাকে প্রচুর প্রসাদ দান করিলেন। রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ভক্তগণের প্রত্যেককে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা-অনুসারে বিশ, পঞ্চদশ, দশ, ছয় ও পাঁচ মুদ্রার দ্বারা পূজা করিতে চাহি"—এই বলিয়া হিসাব-মত মুদ্রা তাঁহার নিকট অর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-ভজনে নিরত নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতকে এক শত মুদ্রা ও দুই তোলা সুবর্ণ দিয়া পূজা করিলেন। রঘুনাথের এই ভক্তপূজাই তাঁহার বিষয়িরূপে শেষ লীলা। কৃপা-লাভের জন্য ভক্তের এইরূপ আকুল আগ্রহ দেখিলে ভগবান্ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি কপিলরূপে নিজেই বলিয়াছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।"

—শ্রীভাগবত, ৩।২৫।২৪

অর্থাৎ সাধুজনের সঙ্গলাভ ঘটিলেই আমার গুণাভিব্যঞ্জক হৃদয়ের ও কর্ণের তৃপ্তিকর কথার আলোচনা হইয়া থাকে। তাহার সেবার দ্বারাই অতি শীঘ্র মোক্ষদানকারী আমার প্রতি যথাক্রমে শ্রদ্ধা, আসক্তি ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে।

শাস্ত্রের অন্যত্রও বলা আছে—

"মহৎ-সেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেঃ"—ভাঃ, ৫।৫।২

মহৎসেবাকেই বিশেষরূপা মুক্তি বা ভক্তিলাভের দ্বার বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই মহৎসেবার ফলে অচিরেই রঘুনাথের সংসার-বন্ধন ক্ষয় হইল।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

অর্থের অনর্থ ও অন্ন-বস্ত্র-সমস্যা

'াঙ্গালা ১৩৪৯ সাল, তথা সরকারী ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দ, অনন্ত কালের ...তন অতীতে বিলীন হইয়াছে; রাখিয়া গিয়াছে—অসংখ্য মৃত্যুর ...বং অসীম ধ্বংসের তীব্র তীক্ষ্ণ স্মৃতি এবং জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ...প্রমাণ কঠোর ও কঠিন সমস্যা—রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং ...র্থনৈতিক। আমরা এই প্রবন্ধে অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহের ...ালোচনা করিব।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের প্রধান ও প্রচণ্ড সমস্যা—অন্ন-...স্ত্রের অভাব বিমোচন। ইহার মূলে অর্থ ও সামর্থ্যের প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন ...াছে। অর্থ ও সামর্থ্য থাকিলে অন্ন-বস্ত্রের অভাব-প্রশমন অসম্ভব ...য়। কিন্তু আমরা পরাধীন—জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সম্পদদ্বয় ...ামাদের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। তাই আমাদের পেটে অন্ন নাই; অঙ্গে বসন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, ...ুদ্ধারম্ভের পর হইতে, যুদ্ধের বিবিধ প্রয়োজনে, যুদ্ধোপকরণ সৃষ্টি ও ...রবরাহের তাগিদে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। সম্প্রতি মোটা ...চাউলের মণ কুড়ি হইতে ত্রিশ এবং মোটা ধুতি-সাড়ীর জোড়া দশ ...ইতে পনেরো টাকায় অত্যূর্দ্ধ গতিলাভ করিয়াছিল! ফলে অভুক্ত ...ও অর্দ্ধভুক্ত, উলঙ্গ এবং অর্দ্ধ-উলঙ্গ নব-নারীর আর্ত্তনাদে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ—বিশেষতঃ বাঙ্গালা পরিপূরিত।

ভারতের অর্থ-সচিব তাঁহার বাজেট-বক্তৃতা-প্রসঙ্গে, মনোরম না হউক, মোলায়েম করিয়া ভারতের যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহার সহিত শতকরা নিরানব্বই জন ভারতবাসী অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলিয়াছেন,—"আমাদের বহিঃস্থ সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং আমাদের বহিঃস্থ ঋণ পরিশোধ দ্বারা ভারতের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির উপর স্থায়ী প্রভাবের সূচনা ঘটিয়াছে। বহু লোকের কর্ম্মপ্রাপ্তির সহিত অধিকতর উপার্জ্জন, কৃষিপণ্যের মূল্য-বৃদ্ধির ক্ষতি পূরণ করিয়াছিল, রায়তের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি এবং প্রাপণীয় উৎপাদন শক্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্রম-বর্দ্ধমান চাহিদার সরবরাহ ঘটিয়াছিল।" অর্থ-সচিব আরও বলিয়াছেন যে, "কৃষিপণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি যদি আর কিছু না করিয়া থাকে, তথাপি স্পষ্টতঃ কৃষি-ঋণের গুরুভার লাঘব করিয়াছিল। এই কৃষি-ঋণই ভারতীয় কৃষককুলের অধিকাংশ গুরুতর আধি-ব্যাধির মূলীভূত কারণ। শ্রমিকেরা অধিকতর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, এবং যদি তাহাদের অতিরিক্ত আয়কে যুদ্ধের স্থিতিকালে অনাবশ্যক দ্রব্যাদির অযথা ক্রয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সংরক্ষণ-ঋণে গচ্ছিত রাখা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতের আপদ-বিপদের বিরুদ্ধে একটি অতি প্রয়োজনীয় সংস্থানের সংস্থিতি ঘটিবে।" কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দীন-দরিদ্র কৃষককুলের দুর্ব্বিসহ ঋণভার লঘুতর না হইয়া গুরুত্বে প্রবৃদ্ধ ...ইতেছে, এবং অপরিসীম দ্রব্য-মূল্য-বৃদ্ধি হেতু শ্রমিকের অতিরিক্ত উপার্জ্জন কর্পূরের ন্যায় নিমিষে উপিয়া যাইতেছে!

অর্থ-সচিবও সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন ...য, "গত বারো মাসে অনুকূল অবস্থার সহিত প্রতিকূল উপসর্গগুলিও ...্রাধান্য লাভ করিয়াছে।" অর্থ-সচিবের ভাষা অতি চমৎকার। "It ...vould be idle to pretend that in the last twelve ...nonths the unfavourable factors have not gained ...elatively to the favourable." পরিচ্ছিন্ন সত্যকে ...পরিচ্ছিন্ন ভাষার বাগ্‌জালে আবৃত করিবার যে কৌশল, তাহার সুন্দর উদাহরণ! তিনি বলিয়াছেন, "সমীপবর্ত্তী প্রদেশ শত্রুকরতলগত হওয়ার ফলে আমরা খাদ্য সরবরাহের একটি প্রকৃষ্ট অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি এবং যান-বাহন চলাচলের বিষম অন্তরায় ঘটিয়াছে। প্রসারণ সত্ত্বেও যুদ্ধের চাহিদা আমাদের শিল্পোৎপাদন শক্তি খর্ব্ব করিয়াছে। আমদানী বাণিজ্যের প্রবল হ্রাস-হেতু প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অনটন ঘটিয়াছে এবং অতিলোভী অর্থ-গৃধ্নু ব্যবসায়ীকে ক্রেতার ঘাড় ভাঙ্গিবার সুযোগ দিয়াছে! আমাদের খাদ্য-সামগ্রীর অপ্রতুলতা সত্ত্বেও সিংহলকে সাহায্য করিতে হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের নিমিত্ত গতাগতির সুগমতা ব্যাহত হইয়াছে এবং বহু লোককে স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক অধিক খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চিত রাখিবার প্রবৃত্তি দিয়াছে। দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রবৃদ্ধ আর্থিক আয় সদ্যঃ-প্রাপ্তব্য স্বল্পতর দ্রব্য-সামগ্রীর উপর ব্যয়িত হইতেছে।"

আংশিক ভাবে ইহা সত্য বটে; কিন্তু এই পরিস্থিতির আদিম নিদান কি? ইহার মূল উৎস কোথায়? সকলেই জানেন যে, গত বারো মাসে দ্রব্যমূল্য অপরিসীম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসী এই অকস্মাৎ অতিরিক্ত মূল্য-বৃদ্ধির নিদারুণ পীড়ন সহ্য করিতেছেন। কলিকাতার শঙ্ক-সংখ্যা (Calcutta Index Number) ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১১৫ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ২৩৮-এ উর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছিল। বোম্বাই-এর খুঁট অঙ্ক ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১০৯ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ২২৯-এ উর্দ্ধমুখী হইয়াছিল। ভারতের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টার দপ্তর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত সাপ্তাহিক পাইকারী মূল্যের শঙ্ক-সংখ্যা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের তুলনায় ১০০ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ১৬৪.৩ সংখ্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আমরা সকলেই জানি যে, কোন কোন দ্রব্যে আমাদিগকে এই খুঁট অঙ্ক অপেক্ষাও অধিকতর মূল্য দিতে হয়, বিশেষতঃ আমদানী-পণ্যে, যাহার অভাব প্রচণ্ডতম। এমন কি, কোন কোন স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের নিমিত্ত আমাদিগকে স্বাভাবিক গড়-মূল্য অপেক্ষা অনেক অধিক দিতে হয়।

যদিও নিত্য-ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যের আপেক্ষিক অনটনের হেতু বিদ্যমান, তথাপি সাধারণ ভাবে সর্ব্ববিধ দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির নিদান, একমাত্র অভাব-অনটন নহে। পরিণত-পণ্যের আমদানী প্রধানতঃ যুদ্ধোপকরণে নিবদ্ধ। বর্ম্মা হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ এবং কোন কোন খাদ্যসামগ্রীর রপ্তানী দেশাভ্যন্তরে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব-অনটন প্রখরতর করিয়াছে সত্য; এবং মাল-চলাচলের বাধা-বিঘ্নও তাহার প্রবল আনুষঙ্গিক কারণ। কিন্তু সর্ব্ববিধ দ্রব্য-মূল্যমানের দ্রুত অযথা অতিরিক্ত বৃদ্ধির মূল কারণ অপরিমিত মুদ্রা বৃদ্ধি। এই মুদ্রা-বৃদ্ধির মাত্রা উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিমাণ হইতে বহু গুণে অধিক। স্বভাবতঃই আমাদের দেশে উৎপাদন-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা দুষ্কর; এবং শান্তিকালে যাহা দুষ্কর, যুদ্ধ-সময়ে তাহা দুঃসাধ্য। সংখ্যা-সংগ্রহের উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থার অভাবই এই মুস্কিলের প্রধান কারণ। যাহা হউক, এ বিষয়ে যথাশক্তি প্রচেষ্টার ফলে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে উৎপাদন শতকরা কুড়ি কিংবা বড় জোর পঁচিশ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত-কারেন্সি-নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ২৫০ অংশ এবং কলিকাতার পাইকারী দ্রব্য-মূল্যের খুঁট অঙ্কের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে শতকরা

১৫০ অংশ। ফলে, প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণের এই অপরিসীম বৃদ্ধি সমসাময়িক উৎপাদন-বৃদ্ধি দ্বারা কোন প্রকারেই সমর্থিত হইতে পারে না। অবশ্য, কাগজের নোটের বৃদ্ধির তুলনায় দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ কম; ১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দের ১১৫ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২৩০; এবং আংশিক ভাবে যথার্থ অভাব-অনটন হেতু।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যুদ্ধারম্ভে প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ যুদ্ধ-প্রয়োজনের নিমিত্ত উপযুক্ত ছিল না। প্রাথমিক মুদ্রাবৃদ্ধি, চাহিদা ও সরবরাহের সমতা রক্ষাকল্পে অনুকূল ছিল; কিন্তু তাহা স্বল্প-কালের নিমিত্ত। দিন দিন মুদ্রা-বৃদ্ধি অধিক হইতে অধিকতর হইতেছিল। কারেন্সি-নোটের প্রচলন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ১৭৯ কোটি হইতে বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ৯ই তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহের শেষে ৬৭২ কোটিতে উন্নীত হইয়াছিল। যুদ্ধের স্থিতিকালে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অবশ্য এই বৃদ্ধির কিয়দংশ উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়-সঞ্চয় হেতু, অর্থাৎ তাহাদের নিজেদের অধিকারে কিংবা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকা প্রযুক্ত, প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার প্রশ্রয় দিবে না। কিন্তু সে অতি ক্ষুদ্র অংশ। নোটের উপর, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ প্রয়োজন অপেক্ষা বহু গুণ বেশী। ফলে, মুদ্রা-প্রকরণের প্রতি এককের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে; এবং তদনুপাতে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ, ডবল পয়সা এখন নিম্নতম একক অর্দ্ধ-পয়সার স্থলাভিষিক্ত; সুতরাং দ্রব্য-মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

Inflation অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির মুস্কিল এই যে, একবার আরম্ভ হইলে, শুধু দ্রুত নহে, প্লুত (gallop) গতিতে প্রতি ধাপে ক্রম-বর্দ্ধনশীল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নিম্নে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যাতালিকা দিলাম।

কারেন্সি নোটের প্রচলন-বৃদ্ধি

খৃষ্টাব্দ	ক্রোর টাকা
১৯৩৯-৪০	৪৯'৪৫
১৯৪০-৪১	১৯'১১
১৯৪১-৪২	১৫২'৪৭
১৯৪২-৪৩	২৬০'১৫

এই কারেন্সি-নোট বৃদ্ধির সহিত আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্রশক্তি ভারতবর্ষ হইতে যে সকল যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতেছেন, তাহার মূল্য ষ্টার্লিং-এ ব্যাঙ্ক-অব্-ইংলণ্ডে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের তরফে জমা হয়। রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক ভারতে সেই ষ্টার্লিং-সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে নোট ছাপিয়া মিত্র-সঙ্ঘের দেনা পরিশোধ করেন; নিম্ন-লিখিত সংখ্যা-তালিকা হইতে এই প্রক্রিয়ার প্রগতি উপলব্ধ হইবে।

	নোটের একুন পরিমাণ ক্রোর টাকা	বাজারে চলতি নোট ক্রোর টাকা	ষ্টার্লিং-সঞ্চয় সংস্থিতি ক্রোর টাকা
আগষ্ট, ১৯৩৯ (মোট)	২১৬'৭৮	১৭৮'৮৯	৫৯'৫০
১৯৩৯-৪০ (গড়)	২২৭'৭৫	২০৮'৮৬	৭৮'৩২
১৯৪০-৪১ "	২৫৮'৭৭	২৪১'৬২	১২৯'৯৭
১৯৪১-৪২ "	৩২০'৬৩	৩০৮'৪৬	১৬৫'৪৮
এপ্রিল, ১৯৪৩ (মোট)	৬৭১'৯৬	৬৬৩'১৯	৪৬৭'৬৩

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধের কয়েক বৎসরে নোটের সংখ্যা অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ষ্টার্লিং-সঞ্চয় বৃদ্ধি হেতুই এই বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে।

মিত্রসঙ্ঘের প্রয়োজনে, রৌপ্য-মুদ্রা সংগ্রহের দুইটি প্রধান উপায়। প্রথম, ঋণের দ্বারা প্রচলিত অর্থের সংগ্রহ; এবং দ্বিতীয়, ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নোট-প্রচলন। এই দ্বিতীয় উপায়ের পরিণাম অযথা মূল্যবৃদ্ধি (Inflation)। ষ্টার্লিং-সংস্থিতির কিয়ৎ পরিমাণ অবশ্য সঞ্চিত (**Reserve**) রাখা যায়, কিন্তু এই সঞ্চয় নির্ভর করে ভারতে বৃটীশ-সরকারের ব্যয়ের পরিমাণের উপর। সাময়িক সরকারী-হুণ্ডীর (Treasury Bills) বিরুদ্ধেও নোট বৃদ্ধি করা যায়। রাজস্ব আদায়ের পূর্ব্বে চলতি-ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সরকার এই উপায় অবলম্বন করেন। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য বৃদ্ধিজীবিগণ (Investors) স্বল্প সময়ের নিমিত্ত এই হুণ্ডি ক্রয় করেন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যদি এই হুণ্ডি গ্রহণ করেন, এবং তাহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত নোট প্রচলিত করেন, তাহা হইলে, সরকারের সাময়িক হুণ্ডির বিরুদ্ধে সরকারের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি করেন। ফলে, অযথা মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া—দ্রব্যমূল্যের অযথা বৃদ্ধি। এইরূপে অর্থ-সংগ্রহের প্রলোভন অত্যন্ত প্রবল। কারণ, ইহা অতি সহজ-সাধ্য এবং ইহার নিমিত্ত নোট ছাপিবার কাগজের মূল্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যয় নাই। এইরূপ নোট প্রচলন অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন Inflation। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একটি জরুরী আইন (Ordinance) জারি হইয়াছিল।

আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য-জমাখরচের উদ্বৃত্ত জমার অঙ্কও এই পরিস্থিতিকে অধিকতর জটিল করে। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক হইলেই উদ্বৃত্ত-জমার অধিকারী হওয়া যায়! সর্ব্বজাতিই বহির্ব্বাণিজ্যে এইরূপ প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে চায়। ইহা উত্তমর্ণ পদমর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য। বহির্ব্বাণিজ্যে গত কয়েক বৎসর আমাদের বে-সরকারী পণ্যের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী নিম্নলিখিত-ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য

খৃষ্টাব্দ	ক্রোর টাকা
১৯৩৮-৩৯	১৬'৮৪
১৯৩৯-৪০	৪৮'২৯
১৯৪০-৪১	৪১'৮৮
১৯৪১-৪২	৭৯'৬০
১৯৪২-৪৩ (প্রথম ছয় মাস)	৩৯'৬৬

১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা প্রকাশিত হইলে দেখা যাইবে যে, তাহা পূর্ব্ব-বৎসরের অঙ্ককে অতিক্রম করিবে। সাধারণতঃ, ভারতের আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী অধিক, এবং ইহার অধিকাংশ কাঁচামাল। পূর্ব্বে আমরা এই উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে বিলাতে প্রদেয় দায় (**Sterling charges**) পরিশোধ করিতাম। এখন এই অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অধুনা ষ্টার্লিং-ঋণ পরিশোধের ফলে বিলাত হইতে আমাদের অর্থপ্রাপ্তির পালা। এই প্রসঙ্গে আমাদের আমদানী অপেক্ষা অধিকতর রপ্তানীর—অনিষ্টকর না হউক, একটি অস্বাস্থ্যকর দিক্ আছে। আমাদের রপ্তানীর অধিকাংশই

চাউল, গম, যব, কলাই, আটা, ময়দা, চিনি, চা প্রভৃতি। গত কয়েক বৎসরের সংখ্যা-তালিকা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর আধিক্য

খৃষ্টাব্দ	খাদ্য-দ্রব্য
১৯৩৯-৪০	৬'৭১ ক্রোর টাকা
১৯৪০-৪১	১১'৪০ "
১৯৪১-৪২	৩৪'৮০ "
১৯৪২-৪৩ (প্রথম ছয় মাস)	২২'৬৫ "

এই অঙ্ক বে-সরকারী পণ্যের। যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকারের তরফ হইতে বহু খাদ্যসামগ্রী এই কয়েক বৎসর ভারতের বহির্ভাগে প্রেরিত হইতেছে। সে অঙ্ক প্রকাশ নিষিদ্ধ। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব-অনটনের একটি কারণ এই বর্দ্ধনশীল রপ্তানী। এই রপ্তানীর আতিশয্য, যাহা এ দেশে অভাব বৃদ্ধি করে, তাহা মূল্য-স্ফীতি এবং অপ্রচুর ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের মূল্যাতিশয্যের নিদানভূত। অপরিমিত মুদ্রাবৃদ্ধিও এক প্রকার কর। সরকার প্রতিদিন নূতন নূতন কারেন্সি-নোট দ্বারা বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। এই নূতন অর্থ প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং পূর্ব্ব-প্রচলিত মুদ্রার সহিত প্রতিযোগিতা-পরায়ণ হয়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল—মূল্য-স্ফীতি। সরকারের নূতন অর্থের বিনিময়ে প্রজাবৃন্দের খাদ্যসামগ্রী সরকারের হস্তে গিয়া পড়ে, ফলে জনসাধারণের খাদ্যাভাব ঘটে এবং এই অভাব-অনটনের অভিঘাত দরিদ্রের উপর কঠোর ভাবে আপতিত হয়। মধ্যবিত্ত, স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র, তাহাদের যৎসামান্য আয়, প্রয়োজন ও দ্রব্যমূল্যের উচ্চতার অনুপাতে স্বল্পতর ও ক্ষীয়মাণ বোধ করে। ধনী উচ্চমূল্যে তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লয়; কারণ, যুদ্ধের উপকরণ সরবরাহ-কার্য্যে তাহারাই অধিকতর লাভবান্ হয়। মুদ্রাস্ফীতির অবশ্যম্ভাবী ফলে দ্রব্য-মূল্যের স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধগতির সহিত মুদ্রা-প্রকরণের এককগুলি ধাপে ধাপে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। পরিণামে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটে। কিছু দিনের নিমিত্ত সম্প্রদায়, অথবা পরিবার, অথবা ব্যক্তিবিশেষ ধনাঢ্য হয় বটে; কিন্তু, অধিকাংশের দারিদ্র্যে এবং মুদ্রা-মূল্যের অযথা ক্রমবর্দ্ধনশীল হ্রাস-হেতু প্রকৃতির প্রতিশোধের ন্যায় অর্থনীতির মূল ভিত্তি শিথিল হইয়া ধনী এবং নির্ধন উভয়েরই সুখ, শান্তি ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে।

উত্থানের পর পতন অবশ্যম্ভাবী। মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতির পশ্চাতে উভয়ের মানের হ্রাস অপরিহার্য্য। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে য়ুরোপে Inflationএর পশ্চাতে Deflation আসিয়া প্রভূত বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পরে ইংলণ্ডও এইরূপ বিপর্য্যয়ের পরিণাম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। জার্ম্মাণীর দুর্দ্দশার কথা কাহারও অবিদিত নাই। এই নিমিত্ত সর্ব্ব জাতিই অধুনা মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতি পরিবর্জ্জন করিতে সর্ব্বপ্রকারে প্রবৃত্তশীল। এই উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমান যুদ্ধে কি নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রণিধান-যোগ্য। যুক্তরাজ্যে ১৯৩৯-৪০ হইতে ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একুন রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬,৯৩৪ মিলিয়ন পাউণ্ড, অর্থাৎ ঐ তিন বৎসরের নির্দ্ধারিত একুন ব্যয় ১৫,৬৪৮ মিলিয়ন পাউণ্ডের শতকরা ৪৪ অংশ। করধার্য্য, বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ করবৃদ্ধি দ্বারা এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, যাহাতে শেষোক্ত বৎসরে রাজস্ব জাতীয় ব্যয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ বহন করিতে পারে। বর্ত্তমানে সেখানে কোন ব্যক্তিগত আয়, কর প্রদান করিয়া, বার্ষিক ৬,০০০ পাউণ্ডের অতিরিক্ত হইতে পারে না। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নিট্ আয় সেখানে ৪,০০০ পাউণ্ড হইতে পারে। সঞ্চয় অভিযান (Savings campaign) এবং শুল্ক পরিমাণ বিক্রয়-কর দ্বারা ভোগ্য বস্তুর ব্যবহার লাঘব (Reduction of consumption) করিয়া, প্রতি সপ্তাহে ৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া যুদ্ধ-ঋণে প্রযুক্ত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মূল্য-শাসন এবং ভোজ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের নিয়মিত ও পরিমিত পরিবেষণ দ্বারা স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের অত্যাবশ্যক জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত সরবরাহ হইতেছে। মজুরী এবং বেতনও যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাতে বর্দ্ধিত-আয়, অসামরিক জনমণ্ডলীর ভোগ্য বস্তু-ক্রয়ের শক্তি হইতে, প্রগতিশীল হারে, তাহাদের প্রচলিত-একুন-মূল্য অতিরিক্ত না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রেও কর-নির্দ্ধারণের মাত্রা যথাসম্ভব উচ্চ স্তরে রক্ষিত হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত আয়েরও একটি মাত্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উৎসাহ দ্বারা সঞ্চয়শীলতা বৃদ্ধি পূর্ব্বক সঞ্চিত অর্থ যুদ্ধকার্য্যে নিয়োগ করিবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় পাদে স্ফীতি-বিরোধী (Anti-Inflation) আইন প্রযুক্ত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি ঐ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মজুরী, বেতন এবং দ্রব্য-মূল্যের যে নিরিখ ছিল, তাহাই বহাল রাখিতে সমর্থ। কিন্তু ভারতের ব্যবস্থা বিভিন্ন। যুদ্ধের ব্যয় ভারত অপেক্ষা যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে অত্যধিক; তথাপি তাহাদের মুদ্রা ও মূল্য-স্ফীতি নিবারণ-প্রচেষ্টা কিরূপ ফলবতী হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তুলনামূলক শঙ্ক-সংখ্যা (Index Number) হইতে বিশদ হইবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির খুঁটি অঙ্ক (একক = ১০০)

খৃষ্টাব্দ	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	ভারতবর্ষ	কলিকাতা
১৯২৯	১০০'০	৯৫'৩	...	১৪১
১৯৩২	৮৭'৮	৬৪'৮	...	৯১
১৯৩৮	৯৫'২	৭৮'৬	...	৯৫
১৯৩৯	৯৬'১	৭৭'১	১২১'১	১০৮
১৯৪০	১১৩'১	৭৮'৬	১১১'৬	১২০
১৯৪১	১২১'৪	৮৭'৩	১২৯'৭	১৩১
১৯৪২—				
জানুয়ারী	১২২'০	৯৬'০	১৪৩'৭	১৫৫
ফেব্রুয়ারী	১২২'০	৯৬'৭	১৪৫'০	১৫৩
মার্চ্চ	১২১'৩	৯৭'৬	১৪৪'২	১৫৩
এপ্রিল	১২২'০	৯৮'৭	১৪৬'১	১৫৭
মে	১২১'৩	৯৮'৮	১৪৮'৪	১৬৯
জুন	১২২'০	৯৮'৬	১৫৫'২	১৮২
জুলাই	১২২'৬	৯৮'৭	১৫১'৯	১৮২
আগষ্ট	...	৯৮'৯	১৬০'০	১৯২
সেপ্টেম্বর	...	৯৯'৩	১৬৪'৩	[illegible]

ছোটদের আসর

ছায়া ও কায়া

[রূপকথা]

এক বছর সময় বড় অল্প নয়। ভয়ে দিনের বেলা বার হই না। একান্ত দরকার হলে গাড়ীতে চড়ে যাই. আর চলে আসি। সঙ্গে আমার প্রিয় ভৃত্য কানাই থাকে। সে এখন আর ভৃত্য নয়। সে আমার বিশ্বস্ত এবং একমাত্র বন্ধু। রাত্রে চাঁদ উঠিলে হোটেলের ঘর থেকে বার হ'তে সাহস হয় না। কখন কে দেখতে পাবে, আমার ছায়া নেই। কিন্তু এ রকম করে দিন-রাত একটা ঘরে বন্দী হয়ে মানুষ কত দিন বেঁচে থাকতে পারে! কানাইয়ের পরামর্শ মত আজবপুর থেকে অনেক দূরে কল্পনাগড় নামক একটা মহাল কিনে ফেললুম। তারই তত্ত্বাবধানে সেখানে এক বিরাট প্রাসাদ গড়ে উঠল—"স্বপ্নপুরী"। কানাই এখন আমার পার্শ্বচর, তাই আর একটি চাকর বহাল করতে হয়েছে। ছোকরা-দেখতে ভাল। কোন বড় বংশের ছেলে বলে মনে হয়। কিছু লেখাপড়াও জানে। নাম অনন্ত মণ্ডল। এক দিন শুভক্ষণে হোটেলের দেনা-পাওনা মিটিয়ে সদ্যঃক্রীত একটা সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ী করে আমি, কানাই এবং অনন্ত কল্পনাগড় রওয়ানা হলুম।

দু'দিন পথে কেটে গেল। তৃতীয় দিন বেলা দশটা নাগাদ আমার জমীদারীর সীমান্তে পৌছলাম। অদূরে অনেক লোক-জন দাঁড়িয়ে। সুমধুর বাদ্য-গীতধ্বনি কানে এল। কানাইকে প্রশ্ন করলুম—"ব্যাপার কি?" সে হেসে উত্তর দিলে,—"আপনার জমীদারীর লোকেরা আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। এখানে আপনার নূতন নামে পরিচয় দিতে হবে।" আশ্চর্য্য হয়ে জিগ্যেস করলুম—"নূতন নামে কেন?" কানাই উত্তর দিলে—"আমি এদের বলেছি, আপনি আসলে কলিঙ্গ দেশের রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নৃপেনাদিত্য বর্ম্মা—শরীর সারাবার জন্য ছদ্মবেশে এখানে কিছু দিন বসবাস করবেন।" ততক্ষণে আমরা তাদের কাছে পৌছে গেছি। ভীড়ের সামনে গাড়ী দাঁড় করাতে হল। গ্রামের মোড়ল একটি সুলিখিত প্রশস্তি পাঠ করলেন। তার পর আমার সুখ্যাতি করে সুললিত কণ্ঠে একটা গীত হ'ল। ধন্যবাদ দেবার জন্য আমি গাড়ী থেকে নামতে যাচ্ছি, এমন সময় কানাই বাধা দিয়ে নিজে নেমে বললে—"আপনাদের এই অভ্যর্থনার জন্য মহারাজ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। তাঁর শরীর অত্যন্ত খারাপ, তাই নিজে নেমে আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারলেন না।" এতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হলেন। "মহারাজের জয় হউক" ধ্বনিতে চারি দিক্ মুখরিত হ'ল। আমি যুক্তহস্তে সকলকে অভিবাদন করলুম। মোড়ল মহাশয় বললেন—"পথ দাও। মহারাজের শরীর অসুস্থ। রৌদ্রে ওঁর কষ্ট হচ্ছে।" জনতা পথ ছেড়ে দিতেই আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হ'ল। পথে কানাই বললে, "এই রৌদ্রে আপনি নামতে যাচ্ছেন দেখে আমি বাধা দিয়েছিলুম।" কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে আমি বললুম, "তুমি আমাকে খুব বিপদ থেকে রক্ষা করেছ। সত্যই, এই রৌদ্রে গাড়ী থেকে নামলেই সকলে জানতে পেরে যেত আমার ছায়া নেই।"

নির্ব্বিঘ্নে প্রাসাদে পৌছুলুম। আমার জন্য কানাই আগে থেকেই একটা খুব বড় ঘর ঠিক করে রেখেছিল। ঘরের জানালাগুলি খুব উচ্চ। চারি ধারে এমন ভাবে আলো জ্বালা যে, মানুষের ছায়া না পড়তে পারে। সেই ঘরের পাশেই আমার শোবার ঘর। তাতেও পূর্ব্ববৎ কৌশল। কানাই আমাকে বললে—"দেখুন, আপনি রাজা। সকলের সঙ্গে দেখা না করলেও খুব খারাপ দেখাবে না। সাধারণ লোকের সঙ্গে আমিই দেখা করে তাদের যা বক্তব্য, আপনাকে জানাব। যদি একান্তই কারো সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয় তো এই ঘরে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন। তাহলে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। দিনে বার হবেন না। লোকে জানে, আপনার শরীর অসুস্থ। সন্ধ্যার পর গাড়ীতে বেরুবেন। আমি সর্ব্বদাই আপনার সঙ্গে থাকব, কিছু ভাববেন না।"

নতুন জায়গায় স্থিতি হতে দু'-চার দিন লাগল। অনেক দাস-দাসী চাকর-বাকরের বন্দোবস্ত হল, কি করে একটা ছায়া জোগাড় করা যায়, সেই চিন্তাই আমায় পেয়ে বসেছিল। এক দিন কানাই পরামর্শ দিলে—"দেখুন, ছায়া যদি কায়া থেকে খুলে নেওয়া যায়, তবে আবার জুড়ে দেওয়াই বা যাবে না কেন? কোন এক জন ভাল চিত্রকরকে দিয়ে একটা ছায়া আঁকিয়ে নিলে কেমন হয়?" কথাটা আমার মনে লাগল। তখনই তাকে দিয়ে এক জন বিখ্যাত চিত্রকরকে ডাকিয়ে আনালুম। সব লোক-জনকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁকে বললুম—"দেখুন, আপনার নাম এবং খ্যাতি অনেক দিন থেকেই শুনছি। আপনাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই—অবশ্য পয়সার জন্য ভাববেন না। আপনি যা চাইবেন, আমি তাই দিতে প্রস্তুত।" চিত্রকর বললেন—"আপনার কথা শুনে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান্ মনে করছি, কিন্তু কি কাজ না জানলে আমার সামর্থ্যে কুলোবে কি না, বলতে পাচ্ছি না।"

আমি বললুম—"কাজ যে কি, তা ত বলবই, কিন্তু কথাটা খুব গোপনীয়। আশা করি, আর কাউকে আপনি সে কথা বলবেন না।" চিত্রকর উত্তর দিলেন—"আপনি নিঃসঙ্কোচে আমায় বলতে পারেন। আমি কথা দিচ্ছি, তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে এ কথা উঠবে না।" একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বললুম—"আমার এক জন অতি নিকট-আত্মীয় হঠাৎ দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর ছায়া হারিয়ে ফেলেছেন। আপনি যদি বেশ ভাল দেখে একটা কৃত্রিম ছায়া এঁকে দেন, তবে তিনি বড়ই উপকৃত হন। অবশ্য পয়সা যা লাগবে আমি দেব।"

বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন—"কি ভয়ানক কথা, ছায়া হারিয়ে ফেলেছেন?" আমি একটু অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলুম। চারি দিকে চেয়ে দেখলুম, না, ভয়ের কোন কারণ নেই। কানাইয়ের আলোক নিয়ন্ত্রণে ছায়া কোথাও পড়ে না। সাহসে ভর করে বললুম—"হ্যাঁ। আপনাকে একটি জুতসই ছায়া এঁকে দিতে হবে। বেচারা ছায়ার অভাবে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন।"

বিস্মিত এবং অবিশ্বাসের সুরে তিনি বললেন—"ছায়া হারিয়ে ফেলেছেন? কি ক'রে?" এই রকম খুটিনাটি প্রশ্নে আমি একটু বিরক্ত এবং ভীত হলুম। অসহিষ্ণু ভাবে বললুম—"যে রকম ক'রে হারান—হারিয়েছেন। এইটাই আসল কথা।" তার পর ভাবলুম—না, একে চটান ঠিক হবে না। তাই মিষ্টি করে বললুম—"কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে ঠাণ্ডায় এক দিন তাঁর ছায়া মাটীর সঙ্গে জমে গেল। তিনি কোন মতেই তাকে নিয়ে আসতে পারলেন না।"

তিনি এমন মুখভঙ্গী করলেন যে, তাতে স্পষ্ট বুঝলুম, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। অতঃপর তিনি উত্তর দিলেন—"আমায় ক্ষমা করবেন। ভগবান-প্রদত্ত নিজের ছায়া যিনি হারাতে পারেন, তাঁকে ছায়া এঁকে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। তাঁর মত অসাবধানী লোকের ছায়া না থাকাই ভালো। সূর্য্যের আলোয় না বেরিয়ে অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে থাকলেই তিনি বেশী বুদ্ধির পরিচয় দেবেন।" এই বলে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি দুঃখে, অপমানে ম্রিয়মাণ হ'য়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলুম।

কতক্ষণ এ ভাবে বসেছিলুম জানি না, কানাইয়ের আগমনে আমার চমক ভাঙ্গল। আমার মুখের দিকে দেখে সে ব্যগ্র ভাবে প্রশ্ন করলে—"আপনার শরীরটা কি খারাপ লাগছে?" আমি ধরা-গলায় উত্তর দিলুম—"এ সংসারে কেবল তুমিই আমার বন্ধু, কানাই! সকলে আমায় ঘৃণা করে, কিন্তু তুমি সব জেনেও আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো। তুমি না থাকলে কবে আমি আত্মহত্যা করে বসতুম।" তার পর চিত্রকরের সঙ্গে যা যা কথা-বার্ত্তা হয়েছিল, সে সব তাকে বললুম। কানাই বললে—"আর কিছু দিন আপনি অপেক্ষা করুন! একটা বছর! একটা বছর শেষ হলেই এর হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।" কানাইএর কথায় মনে অনেকখানি সান্ত্বনা পেলুম।

মোড়ল শ্রীপদ বাবু লোক ভালো। প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মধ্যে মধ্যে তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা ললিতাও আসেন। আমিও দু'-এক বার বেশ মেঘলা দিন দেখে কানাইকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ওখানে গেছি। ললিতা মেয়েটিকে আমার ভালোই লাগে এবং শ্রীপদ বাবুও আমাকে বিলক্ষণ পছন্দ করেন। এক দিন কানাইকে আমার মনের ইচ্ছা জানালুম। সে সানন্দে উত্তর দিলে—"এ ত খুব ভাল কথা। আমি শীঘ্রই এর একটা বিহিত করছি।" এই কথোপকথনের কয়েক দিন পরে শ্রীপদ বাবু এসে আমাকে বললেন—"অনেক দিন থেকেই তোমাকে একটা কথা বলব-বলব মনে করছি, কিন্তু বলে উঠতে পারছি না!—যদি রাগ না করো ত বলি!" আমি বুঝলুম, এ সব কানাইএর কারসাজি। স্মিত হাস্যে বললুম, "কি বলবেন বলুন! রাগ করব কেন?" তিনি বললেন—"ললিতা বড় হয়েছে, ওর এইবার বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন।" আমি বললুম—"তার ভাবনা কি? আপনার কন্যা দেখতে শুনতে ভালো।" তিনি বললেন—"মনোমত পাত্র পাওয়া শক্ত, তবে এক জনকে আমাদের সকলেরই খুব পছন্দ হয়েছে।" উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে আমি বললুম, "কে?" তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—"তোমার কথাই বলছি। তুমি ত ললিতাকে দেখেছ!" আমি লজ্জায় মাথা নীচু করলুম। মৌন থাকাই সম্মতির লক্ষণ, তাই কিছু বললুম না। তিনি বললেন—"তোমার এ বিবাহে আপত্তি নেই তো?" আমি সলজ্জ ভাবে বললুম—"আজ্ঞে না। আমারও মনে এই ইচ্ছাই ছিল। তবে সাহস করে বলতে পারিনি।"

"তা হলে বিবাহের দিন দেখা যাক্"—এই বলে তিনি তখনকার মত বিদায় নিলেন।

কানাইকে সব কথা খুলে বলতে সে বললে—"ভালোই হলো! কিন্তু একটা কথা আছে।" আমি ভীত ভাবে বললুম, "কি কথা? ওদের তো সকলেরই মত রয়েছে।" সে বললে—"আমি বলছিলুম কি, বিয়েটা কিছু দিন পেছিয়ে দিলে ভালো হয়।"

বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলুম, "কেন বল ত?" সে একটু কাঁচুমাচু করে উত্তর দিল—"বছরটা শেষ হয়ে গেলে ভাল হ'ত। কখন তারা জানতে পেরে যাবে—তখন একটা কেলেঙ্কারী!" কথাটা সত্য! কানাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম—"ঠিক বলেছ, এ কথা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম।"

পরদিন মোড়ল মহাশয় এসে বললেন—"আজই বিয়ের একটা খুব ভালো দিন পাওয়া গেছে।" বাধা দিয়ে আমি তাঁকে বললুম—"দেখুন, কিছু মনে করবেন না। বিয়েটা আপাততঃ এ বছরটার জন্য স্থগিত রাখতে হবে।" ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তিনি বললেন—"কেন? তোমার কেন আপত্তি?" বিনীত ভাবে উত্তর দিলুম—"আপত্তি আমার মোটে নেই বরং আগ্রহই আছে। কিন্তু এই বছরের গোড়ায় মাতা-ঠাকুরাণী স্বর্গলাভ করেন। কাল-অশৌচ।" শুনে বিরস বদনে তিনি বললেন—"অবশ্য এর ওপর কথা চলে না। তবে কথাটা পাকা রইল ত? আমি অন্য কোন সম্বন্ধ দেখব না।" আমি ব্যগ্র কণ্ঠে বললুম—"না, না। এ পাকাপাকি বন্দোবস্ত! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" তিনি স্মিতহাস্য সহকারে বললেন—"বেঁচে থাক, সুখে থাক বাবা! তোমার মুখের কথাই আমাদের যথেষ্ট।"

তিনি বিদায় নিলেন। আমি ছায়া-অপহরণকারী বৃদ্ধের কথামত এক বৎসর কবে পূর্ণ হবে, তার হিসাবে মনোনিবেশ করলুম। সিন্দুকের পর সিন্দুক মোহর ভর্ত্তি করে আমি সেই প্রৌঢ়ের আগমনের জন্য উদ্গ্রীব চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলুম। বর্ষ-শেষ দিনে আমার মানসিক চাঞ্চল্য ভয়ানক রকম বেড়ে গেল। সমস্ত রাত জেগে কাটালো। রাত্রি বারটা বাজল। বর্ষ শেষ হলো। আমি ঘড়ির দিকে চেয়ে ভোরের আলোর প্রতীক্ষায় বসে রইলুম! ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না—ঘুম ভাঙ্গল আমার ঘরের দরজার বাহিরে কোলাহল শুনে। তবে কি সে এসে পড়েছে? তড়াক্ করে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লুম। কানে এল অনন্তর কণ্ঠস্বর। চীৎকার করে বলছে—"আমি কোন বাধা শুনব না। এখনি দেখা করব।" আর কানাই তাকে বোঝাচ্ছে—"একটু অপেক্ষা কর। তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন।" ভয়ানক চটে গেলুম। দড়াম করে দরজা খুলে রাগত ভাবে বললুম—"কি ব্যাপার! এত চেঁচামেচি কিসের?" অনন্ত সেই রকম উদ্ধত ভাবে জবাব দিলে—"আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে, কিন্তু কানাই বাবু দেখা করতে দিচ্ছেন না।" আমি কঠোর স্বরে বললুম—"বেশ, ঘরে এসে শান্ত ভাবে তোমার যা বলবার বলে আমার বাড়ী থেকে প্রস্থান কর। তোমার মত লোককে আমি আর রাখব না।" কানাই এবং অনন্ত দু'জনেই ঘরে ঢুকলো। আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললুম—"কি বলতে চাও, বল।" অনন্ত বললে—"আমি আপনার ভৃত্য। ইচ্ছে করলে আপনি তাড়াতে পারেন। যাবার আগে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করতে হবে। দয়া করে ঘরের বাহিরে এসে আপনার ছায়াটি দেখালে আমি কৃতার্থ হব।"

আমি স্তম্ভিত হলুম। সেই সময় ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও এত বিস্মিত হতুম না! ধাক্কা সামলাতে বেশ একটু বেগ পেতে হ'ল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললুম—

"ভৃত্য হয়ে মনিবকে—" অনন্ত কথা শেষ করতে দিলে না। বললে—"ভৃত্য স্বীকার করছি, কিন্তু ভৃত্যেরও একটা আত্মমর্য্যাদা আছে ত। ছায়াহীন প্রভুর সেবা করতে আমি রাজী নই। আপনি জবাব দিয়ে দিয়েছেন—আমি চলে যাচ্ছি।" ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়লুম! কি করা যায়? এ ত এখনি আমার গোপনতম কথা সকলের সামনে প্রকাশ করে দেবে। খুব নরম মিষ্টি গলায় বললুম—"বাবা অনন্ত, রাগের মাথায় যা বলেছি, তাই নিয়ে কি কিছু মনে করতে আছে? তোমায় আমি কত স্নেহ করি, জান ত'? তোমার মাহিনা আমি দ্বিগুণ করে দেব। কিন্তু এ রকম আজগুবি ধারণা তোমার মাথায় এল কোত্থেকে?" সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। বললে—"আপনার ছায়া না দেখালে আমি এখানে থাকব না। যার ছায়া থাকে না, সে মানুষ নয়। হয় ছায়া দেখান, না হয়—" কানাই এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার দিকে ইসারা করতে আমি অনন্তকে বললুম—"বাবা অনন্ত, এই কি স্নেহের প্রতিদান! এমন করে কি মনিবের সঙ্গে তর্ক করে? তোমার কত টাকা চাই বল, এক্ষুণি দিচ্ছি।" বাধা দিয়ে অনন্ত বললে—"ছায়াবিহীন লোকের কাছ থেকে আমি এক কপর্দ্দকও নিতে রাজী নই।" এই বলে সে গটমট করে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি স্থাণুর মত বসে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে কানাই বললে—"আপনি ভাবছেন কেন? আজই ত বর্ষ পূর্ণ হয়েছে। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে!"

ঠিক কথা! সেই প্রৌঢ় এলে তাঁর কাছ থেকে ছায়া ফেরত নেব। কানাইয়ের কথায় মনে অনেকটা শান্তি পেলুম।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে অস্থির চিত্তে প্রৌঢ়ের আগমন-আশায় বসে আছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে মোড়ল শ্রীপদ বাবু এসে হাজির। হাতে একটা চিঠি। ঘরে ঢুকেই আমাকে প্রশ্ন করলেন—"মহারাজ নৃপেনাদিত্য বোধ হয় শম্ভুনাথ বাবুকে চেনেন?" শম্ভুনাথ আমারই আসল নাম। ভীত ভাবে বললুম—"কেন বলুন তো?" তিনি শ্লেষপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলেন—"শুনেছি, শম্ভুনাথ বাবু অনেক গুণের গুণনিধি!" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আমি বললুম—"ধরুন, যদি আমিই শম্ভুনাথ বাবু—" শাণিত কণ্ঠে তিনি বললেন—"সেই গুণনিধিটি নিজের ছায়া হারিয়ে ফেলেছেন। দয়া করে আপনার ছায়াটা যদি দেখান!" আমি কি উত্তর দেব? একেবারে থ' হয়ে ব'সে রইলুম। তিনি বলে চললেন—"নিরীহ ভদ্রলোকের সঙ্গে এ-রকম শাঠ্য করতে আপনার লজ্জা হলো না! না হয় পয়সাই আছে, কিন্তু আপনি কি মানুষ! কোন মানুষের ছায়া নেই, এ কথা ত জীবনে কখনও চোখে দেখিনি, কানে শুনিনি। ছিঃ ছিঃ!" ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম—"একটা তুচ্ছ ছায়ার জন্ম এতটা রাগারাগি করছেন কেন? ছায়ার কি মূল্য আছে, বলুন?" শ্রীপদ বাবু গর্জ্জে উঠলেন—"তা হ'লে স্বীকার করছেন, আপনার ছায়া নেই?" বিনীত ভাবে বললুম, —"অস্বীকার করবো কেন? কিন্তু আপনি আমাকে দু'দিন সময় দিন। ছায়াকে যদি আপনি এত মূল্যবান্ মনে করেন, আমি সেটা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করব।"

"বেশ, দু'দিন সময় দিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার পর কেবল যে, আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ে দেব না তা নয়, সমস্ত দেশে রটিয়ে দেব আপনার ছায়া নেই! আপনি আমাদের মত মানুষ নন!" এই বলে তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শোকে আমি মুহ্যমান হয়ে পড়লুম। দু'দিন মাত্র সময়! এর মধ্যে ছায়ার জোগাড় না হলে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে, মনুষ্য-সমাজে আর বাস করতে পারব না! কেন মরতে অর্থের লোভে ছায়া দিতে গেছলুম! ভাবতে ভাবতে আমি যেন পাগলের মত হয়ে গেলুম। শেষে পকেটে কিছু মোহর এবং যত নষ্টের গোড়া থলেটা নিয়ে কানাইকে না জানিয়ে মহা-অনর্থকারী সেই প্রৌঢ়ের খোঁজে নিজেই বার হলুম। ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীমোহন কর।

বিনা-ক্যামেরায় ফটো

তোমরা ভাবো, ক্যামেরা না থাকিলে কি করিয়া ফটো তুলিব? কিন্তু ক্যামেরা না থাকিলেও ফটোগ্রাফ তোলা যায়। কি করিয়া, তাই বলি।

পাশের ছবি দেখিতেছ,—দীঘির জলে বোট ভাসিতেছে! ২ নম্বরে দেখিতেছ একটি মেয়ের মুখের ছবি। এ ছবি দু'খানি
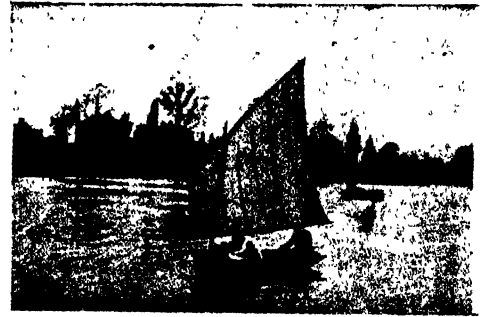
১। দীঘির জলে বোট

তুলিতে ক্যামেরার প্রয়োজন হয় নাই। ছবি দু'খানি তুলিতে সম লাগিয়াছে আধ ঘণ্টা—তুলিতে খরচ যা পড়িয়াছে, তা অতি সামান্য
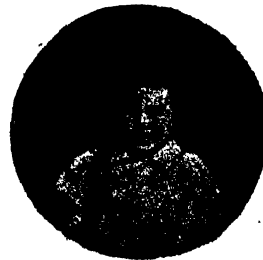
২। একটি মেয়ে

বিনা-ক্যামেরায় ছবি তুলি চাহিলে তার জন্ম আলাদা কাগ চাই। এ কাগজের নাম "সেল্ফ টোনিং পেপার (self-toni paper)। ফটোগ্রাফা দোকানে এ কাগজ কিনি পাওয়া যায়। দাম বেশী ন এক-প্যাকেট কিনিলে বারোখ বড়-সাইজের ফটোগ্রাফ তুলি পারিবে—ছোট ছবি তোলা যা আটচল্লিশখানি। সেল্ফ-টোনিং কাগজের সঙ্গে কিনিতে হইবে আধ হাইপো। হাইপোর দামও বেশী নয়। এ দু'টি জিনিষ হইলেই মনের আনন্দে ফটোগ্রাফ তোলো—নাই বা রহিল ক্যামেরা!

সেল্ফ-টোনিং কাগজের এক পিঠ বেশ মসৃণ, ঝক্‌ঝকে

প্যাকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া তার এক-টুকরা কাটিয়া বাহিরে দিনের আলোয় যদি মেলিয়া ধরো, দেখিবে, কাগজের ঐ ঝক্‌ঝকে দিক্‌টুকু কালো হইয়াছে। আলোয় যত রাখিবে, ততই সে কালো রঙ্‌ হইবে গাঢ়, ঘন। কাগজের যে-অংশটুকু আঙুল দিয়া চাপিয়া থাকিবে, আলো না লাগার দরুণ সেটুকু কালো হইবে না।

৩। পত্র-পল্লব

এ কাগজের এই অদ্ভুত গুণ—দিনের আলো লাগিলে ঝক্‌ঝকে দিক্‌ হইবে মিষ্‌মিশে কালো—আর আলো না লাগিলে যেমন ঝক্‌ঝকে, তেমনি ঝক্‌ঝকে থাকিবে।

এ গুণের পরিচয় পাইলে তো,—এ বারে এ কাগজে বিনা-ক্যামেরায় ছবি তোলো।

গাছের পাতা কিম্বা ছোট একটি ফুল ছিঁড়িয়া এই কাগজের ঝক্‌ঝকে দিকের উপর রাখো—রাখিয়া ঐ ফুলপাতা-সমেত কাগজখানি আলোয় খানিকক্ষণ মেলিয়া রাখো,—দেখিবে, যে-অংশের উপর ফুল বা পাতা রাখিয়াছ, কাগজের সে-অংশে তার প্রতিলিপি হুবহু ছাপা হইয়া গিয়াছে। ৩ নম্বরে যে-ছবি দেখিতেছ, ও ছবিখানি ঠিক এমনি ভাবেই লওয়া হইয়াছে।

অবশ্য কাগজের উপর ফুল বা পাতা রাখিবার সময় সেগুলিকে চাপিয়া কাগজের সঙ্গে সমতল ভাবে রাখিতে হইবে—ফুল ও পাতা যেন কাগজের গায়ে আটকাইয়া থাকে। তাহা থাকিলে তবেই কাগজে সে ফুল-পাতার ফটো ভাঁজে-ভাঁজে রেখায়-রেখায় নিখুঁত হইবে!

চাপিবার জন্ম পুরু এক-টুকরা কাচ ব্যবহার করিবে। ছবির কাচ হইলেই ভালো হয়। ফুল-পাতা না সরিয়া যায়, এ জন্ম কাগজের উপর-পিঠে কাচ এবং নীচের পিঠে মোটা কার্ড-বোর্ড দিয়া রবারের ব্যাণ্ড দিয়া দু'দিক্‌ আটকাইয়া লইলেই ভালো হয়। তাহা করিলে ফুল-পাতা ও কাগজের আর "নড়ন-চড়ন" ঘটিবে না।

ফটো তুলিবার সময় প্রথমে পাতা বা ফুল লইয়া কাচের উপরে রাখো; তার পর কাচের উপরে চাপাও মাপে কাটা সেল্‌ফ-টোনিং কাগজ; এবং কাগজের উপরে চাপাও কার্ড-বোর্ড—তার পর একসঙ্গে রবারের ব্যাণ্ড আঁটিয়া ক'টির মিলনকে করো সুদৃঢ় টাইট্‌। কাগজের চক্‌চকে-দিক্‌ পাতার গায়ে লাগিয়া থাকিবে—এ-কথা ভালো করিয়া মনে রাখিও।

তার পর দিনের আলোয় এটিকে রাখো বাহিরে—কাচের উপ[র] আলো লাগিবে, এমন ভাবে রাখিবে। কাচের মারফৎ আ[লো] লাগিয়া কাগজের যে-অংশে ফুল বা পাতা চাপানো নাই, সে-অ[ংশ] মিষ কালো হইবে—পাতা-ফুল চাপানো অংশটুকুতে ভাঁজে-ভাঁ[জে] ফুল-পাতার ছাপ মসৃণ চক্‌-চকে থাকিবে।

৪। পাতার নেগেটিভ্‌

এবারে আলো হই[তে] আনিয়া হাইপো-মেশানো জলের পাত্রে কাগজখানি ফেলিয়া দাও! দ[শ] মিনিট ফেলিয়া রাখা চাই।

হাইপোর জলের ব্যবস্থা।—মাটীর গামলায় কিম্বা চীনা-মাটীর বড় পাত্রে খানিকটা জল ঢালিয়া তাহাতে কিছু হাইপো ছাড়িয়া দাও। হাইপো গলিয়া জলে মিশিয়া গেলে তবেই সে পাত্রের জলে ছবি ছাড়িবে।

হাইপোর জলে দশ মিনিট রাখিবার পর সে-পাত্র হইতে ছবি তুলিয়া পরিষ্কার-জলে বেশ করিয়া তাহা ধুইয়া লইবে। ধুইয়া দু' ঘণ্টা পরিষ্কার জলে রাখিবে। তাহা হইলে ফুল-পাতার ফটো অর্থাৎ প্রতিলিপি কাগজে সুস্পষ্ট সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত থাকিবে।

হাতের লেখা বা ছাপা-ছবিও ঠিক এমনি প্রণালীতে ক্যামেরার সাহায্য না লইয়া যেমন খুশী ছাপিতে পারিবে। লেখার বা ছবির ছবি তোলা মানে, যে লেখার বা ছবির ফটো তুলিতে চাও, ফুল-পাতার বদলে কাগজের উপর সেই ছবি বা লেখা রাখিয়া ঠিক এমনি ভাবেই ছবি তোলা যায়। তবে ছবির ছবি তুলিতে দু'খানি ফটো লইতে হইবে। কারণ, এ প্রণালীতে ছবির প্রথম যে প্রতিলিপি পাইবে, তাহাতে আমাদের প্রার্থিত ছবি হইবে কালো—মিষ কালো। এই প্রথম প্রতিলিপিটি হইবে নেগেটিভ। এই নেগেটিভ হইতে ঠিক ঐ প্রণালীতেই আর একখানি কাগজে তার প্রতিলিপি তুলিলে দ্বিতীয় প্রতিলিপিখানি হইবে ফটোগ্রাফ। মনোযোগ দিয়া কাজ করিলে ক্যামেরায়-তোলা ফটোগ্রাফের মতই এ প্রতিলিপি সর্ব্বাংশে নিখুঁৎ হইবে।

বিস্ময়

[কার্লাইল]

বিজ্ঞান, দর্শন সবই আয়ত্ত করিয়া যার
জাগে না বিস্ময়,
পুঁথি যন্ত্র তন্ত্র ছাড়ি কখনো ভাবে না যেবা
স্রষ্টার বিষয়,

অবাক্‌ হইয়া যেবা চাহে না বিশ্বের পানে
হায় কোন দিন,
তাহারে জানিও শুধু দূর-বীক্ষণের মত
যন্ত্র প্রাণহীন।

শ্রীকালিদাস রায়।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

৮

কৌমুদীর মামা সত্যবান বাবু সাব-জজ। এখন আছেন মজঃফর-পুরে। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বিবাহে তিনি আসিতে পারেন নাই; স্ত্রী উমাশশী আসিয়াছেন ছেলেমেয়েদের লইয়া। রাজীব চাকরি করে সত্যবানের কাছে। উমাপ্রসন্ন বাবুর যখন মৃত্যু হয়, সত্যবান তখন হাজারিবাগে মুন্সেফী করিতেছিলেন। উমাপ্রসন্নর আশ্রয়-নীড় ভাঙ্গিলে রাজীব আসিয়া আশ্রয় লয় সত্যবানের গৃহে। বিশ্বাসী পুরানো এমন লোক একালে আর মেলে না—উমাপ্রসন্ন বাবুর গৃহে সত্যবানের যাতায়াত ছিল; কাজেই রাজীবের পরিচয় তিনি ভালো রকম জানিতেন।

বিবাহ চুকিল রাত্রি প্রায় বারোটায়। দিলু-নীলু তখনো পরি-বেষণের কাজে মাতিয়া আছে। গৌরী ঠাকুরাণী দু'জনকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন—ব্যাপার কি দিলু? দু'জনে সমানে ছুটোছুটি করছো! মুখে কিছু পড়েনি নিশ্চয়!

উচ্চ হাস্যে দিলু বলিল— এই যে পিশিমা, এই ব্যাচ্‌টা হয়ে গেলে ঐ সব চাকর-বাকর-ড্রাইভারের দল···ব্যস্‌. তাদের খাওয়া চুকলেই ছুটী মিলবে!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—সে কাজ অপরে করবে'খন! তোমরা এসো দু'-ভাইয়ে আমার সঙ্গে। ওদিকে মেয়ে-খাওয়ানোর ঝামেলা নিয়ে আমি নড়বার ফুরসৎ পাইনি, মন কিন্তু পড়ে আছে তোমাদের দুই ভাইয়ের উপর। কাকেই বা বলি! কে ডেকে দেয়! এখন হাত খালি হতে এই ছাদের সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি তোমাদের ধরবো বলে'! ঢের হয়েছে, এসো···

বলিয়া তিনি দিলুর হাতখানা চাপিয়া ধরিলেন। দিলুর হাতে কালিয়ার বালতি।

হাসিয়া দিলু বলিল—এ ব্যাচ্‌টা সেরেনি পিশিমা···

পিশিমা বলিলেন,—না,···পরিবেষণের জন্য অতগুলো বামুন রাখা হয়েছে, সে হতভাগারা করছে কি?···হ্যাঁ রে, ও কেশব···

সত্যবানের কে আত্মীয়—এই কেশব। কেশব হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া আসিতেছিল ছাদ হইতে নামিয়া—তার হাতে ফ্রাইয়ের চ্যাঙারি। গৌরী ঠাকুরাণীর আহ্বানে কেশব বলিল—আমায় বলছেন?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—হ্যাঁ। আমি বলছি, দশ-বারোটা বামুন আনা হলো যে পরিবেষণের জন্য···সব ষণ্ডা-ষণ্ডা জোয়ান··· তাদের কারো টিকি দেখতে পাচ্ছি না, আর তোমরা বাড়ীর ছেলেরা একেবারে খেটে হিমশিম্ হচ্ছো!

কেশব বলিল,—তারা বললে, মেয়েরা খেতে বসেছে··· দোতলায়···সেই দিকে কাজ করছে পাঁচ জন।

গৌরী ঠাকুরাণী ভ্রূ বাঁকাইলেন। ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন—পাঁচ জন না, পঞ্চাশ জন! একটা পিলে-রোগা সিড়িঙ্গে ঠাকুরকে ওদিকে ঠেকিয়ে রেখেছে···ডাল আনতে সে চাটনি আনে, ভাত চাইলে পাঁপরের চ্যাঙারি নিয়ে আসে,···মেয়েদের ওদিকে পরিবেষণ করছি তো আমরাই! সত্যবানের দুই মেয়ে উৎপলা আর চপলা···ভাগ্যে তারা ছিল, মেয়েরা খেতে পেলে!···আহা, বেচারীরা বিয়ে দেখতে পেলে না ে

কেশব ছুটিতে ছিল, হঠাৎ ক'জন বরযাত্রী পটল-ভাজার ক্ষেপিয়াছে···ফ্রাই খাইবে না, তাদের আবার পটল-ভাজা চা সেই জন্য।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—আচ্ছা, যাচ্ছো, যাও—কিন্তু ৎ সর্দ্দার-রসুইকর ঐ ইন্দ্রমণিকে ডেকে দিয়ো বাবা···লক্ষ্মীটি!

—দেবো ডেকে···বলিয়া কেশব ছুটিল পটল-ভাজা আনিতে।

দিলু বলিল—আমায় ছাড়ুন পিশিমা···

পিশিমা বলিলেন,— নীলু কোথায়?

দিলু বলিল,—তাকে দেওয়া হয়েছে জলের ভার। জাগ্‌ ি সে উপরে আছে···সকলকে জল দিচ্ছে।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—বেশ, তাকেও একবার ডেকে দিয়ে বলো, পিশিমা ডাকছে!···আর তুমি···

গৌরী ঠাকুরাণীর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া মৃদু হাস্যে ি বলিল,— আমাকে ছেড়ে দিন···বালতি আমার হাতে···ওপরের ঃ বেছে বেছে কতকগুলি চিংড়ী আনতে হবে···বড় বড় চিংড়ী! ঃ চেঁচামেচি করছে!

—বেশ, ছাড়চি···কিন্তু চিংড়ী মাছ পরিবেষণ করেই আম কাছে আসবে। নীলুকে ডেকে নিয়ে আসবে···আমি এইখানে দাঁড়ি রইলুম।

দিলুকে তিনি ছাড়িয়া দিলেন···মাছের বাল্‌তি লইয়া দি ছুটিল নীচের তলায় ভাঁড়ারে···গৌরী ঠাকুরাণী সেইখানেই দাঁড়াই রহিলেন।

রাজীব উপরে উঠিতেছিল, গৌরী ঠাকুরাণী তাকে ডাকিলেন,— রাজীব···

রাজীব বলিল,—ডাকছেন পিশিমা?

—হ্যাঁ বাবা, তোমার কোনো বিশেষ কাজ আছে?

রাজীব বলিল,—চুরুটের বাক্স চাই···মার কাছে আছে কি-না···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—বেশ, তোমার মার কাছ থেকে চুরুটের বাক্স নিয়ে নীচের দাও গে···দিয়ে আমার একটি কাজ করতে হবে তোমায়।

—বলুন, পিশিমা···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—ভেন্‌কর্‌-বামুনরা এনেছে একপাল লোক···পরিবেষণ করবে বলে। তাদের কারো টিকি দেখতে পাচ্ছি না ···অথচ বাড়ীর ছেলেগুলো খেটে নাকাল হয়ে গেল! তা দিয়ো তো বাবা একবার ডেকে ওদের সর্দ্দারকে···তার নাম বুঝি ইন্দ্রমণি। ডাকা নয়···তুমি তাকে নিয়ে এসো বাবা আমার কাছে···আমি এইখানে আছি, বুঝলে?

রাজীব বলিল,—তাকে আমি এখনি নিয়ে আসছি পিশিমা···

রাজীব গেল উমাশশীর কাছে চুরুটের বাক্স সংগ্রহ করিতে।

ইন্দ্রমণি আসিল···গৌরী ঠাকুরাণী তাকে ধমক দিলেন। বলিলেন,—একপাল লোক এনেছো পরিবেষণ করবে বলে···কোথায় তারা? কি করছে, বলো তো ইন্দ্রমণি?

আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া ইন্দ্রমণি জানাইল, সে নিজে আছে খোলায় ···লুচি ভাজাইতেছে···তার উপর কচুরি বুঝি ফুরাইয়া আসিয়াছে··· আবার লেচি কাটিয়া কচুরি করানো ইত্যাদি···

গৌরী ঠাকুরাণীর আদেশে ইন্দ্রমণি জানাইয়া গেল, এখনি সে বামুনদের ঘাড় ধরিয়া পরিবেষণের কাজে লাগাইয়া দিবে, সে সম্বন্ধে পিশিমার অভিযোগ বা চিন্তার আর এতটুকু কারণ থাকিবে না!···

সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দইয়ের হাঁড়ি হাতে দিলুকে তিনি আবার গ্রেফতার করিলেন; এবং গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের হাঁড়ি কাড়িয়া সেই-হাঁড়ি তখনি তিনি তুলিয়া দিলেন গদাই বামুনের হাতে। নীলুকেও আনানো হইল···এবং তার হাতের জলের জাগ্ কাড়িয়া কেষ্ট ঠাকুরের হাতে দিয়া দু'-ভাইকে সঙ্গে করিয়া গৌরী ঠাকুরাণী তাদের আনিলেন দোতলায় বাথ-রুমের সামনে।

বলিলেন,—তোমাদের ট্রাঙ্ক থেকে কাপড় আর গেঞ্জি বার করে আনি···ঢোকো দিকিনি দু'জনে একে-একে বাথ-রুমে। এত রাত্রে মাথায় জল ঢেলো না। তবে সাবান দিয়ে বেশ করে গা-হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে এসো।

হাসিয়া দিলু কি বলিতে যাইতেছিল, গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন, —মা এখানে পাঠিয়েছে আমার ভরসায়···খাওয়া-দাওয়া রইলো পড়ে···শেষে একটা অসুখ করুক, তার পর মা মরবে কপাল চাপড়ে! তার আর কি সম্বল আছে, বাবা?

শেষের দিকে গৌরী ঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর আবেগে বিজড়িত হইল।

তিনি বলিলেন—বাথ-রুমে সাবান আছে, জল আছে, তোয়ালে আছে···নীলু আগে ঢোকো···আমি এখনি কাপড়-গেঞ্জি আনছি।

তিনি চলিয়া গেলেন···দিলু-নীলু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; হাসিয়া নীলু বলিল—পিশিমা যেন আমাদের চোর ধরেছেন,— না দাদা?

দিলুর মন কিসের ভারে ভরিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে! দিলু বলিল,—মা ছাড়া আর কেউ আমাদের এমন ভালোবাসে না, নীলু!

নীলুর দুই চোখ দাদার কথায় হঠাৎ কেমন আর্দ্র হইয়া উঠিল··· নীলু শুধু বলিল—হুঁ···

৯

মুখ-হাত ধোয়াইয়া দিলু-নীলুকে সঙ্গে লইয়া গৌরী ঠাকুরাণী আসিলেন দোতলার একটা ঘরে। সামনে যাকে পাইলেন, তাকে দিয়া আসন আনাইলেন এবং নিজে গিয়া দু'জনের জন্ত খাবার সাজাইয়া আনিলেন।

বলিলেন—বসো, খেয়ে নাও। তার পর এই ঘরে খাটে ঐ যে বিছানা, ঐ বিছানায় দু'ভায়ে শোবে, বুঝলে! কোনো দিকে আর যাবে না!

গৌরী ঠাকুরাণীর কথায় "না" বলিবে, এমন ছেলে তারা নয়। দু'জনে আসনে বসিল,—গৌরী দেবী সামনে বসিয়া তাদের খাওয়াইতে লাগিলেন।

বাহিরে বিপর্য্যয় কলরব।—কানাই, ওরে ও কবী···গরম লুচি খানকতক নিয়ে আয় পচা, শীগ্‌গির···এমনি ভীম-ভৈরব চীৎকারে সঙ্গে সানাইয়ের বাদ্য, পাশের ঘরে রমণী-কণ্ঠে চড়া পর্দ্দায় হাস্য-ভাব আলো বাঁশী ফুল গান— সমস্ত মিলিয়া যেন ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে

দিলু-নীলু অবাক হইয়া গেছে! একটা বিবাহ উপলক্ষ করি এমন অজস্র অর্থব্যয়! অথচ এই অর্থের কণা মাত্র পাইলে কত ক্ষুধাতু কত রোগাতুর বর্ত্তাইয়া যায়! দিলু ভাবিতেছিল, ইহাকেই ব সম্পদ! এ সম্পদ সত্যই সার্থক হয়, যদি ইহার জোরে আত্মী অনাত্মীয় এত লোককে ডাকিয়া উৎসবের আনন্দকে মানুষ পরিপূ করিয়া তুলিতে পারে! নীলু ভাবিতেছিল, কেহ দু'টো টাকা রোজগা করিতে পারে না, আবার কেহ-বা টাকার উপর টাকা জমাইয়া টাকা পাহাড় গড়িয়া তোলে! এত টাকা মানুষ রোজগার করে কি করিয়া?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—শুতে যাবার আগে একবারটি বাসে গিয়ে বর-কনে দেখে এসো। সেই কৌমুদী···সে আজ বিয়ের কনে ···কৌমুদী তোমাদের কথা বলছিল। মা আসতে পারলে না সে জন্ম কত দুঃখ তার! সুপ্রসন্ন বললে, বিয়ের পরে জোড়ে বর কনে ফিরলে দু'জনকে বাসন্তীতে নিয়ে যাবে! সেখানে ঠাকুর-নমস্কা আছে, তোমার মাকে জামাই দেখানো—মেয়ে-জামাই তাঁকে নমস্কা করবে গিয়ে···আশীর্ব্বাদ নেবে···

এমনি কথার আর শেষ নাই। সে সব কথায় গভীর স্নেহে সহস্র পরিচয় হীরার অজস্র কুচির মতো যেন ঝিকঝিক্ করিতেছে!

এমন সময় ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ঘরে আসিলেন উমাশশী···সত্য বানের স্ত্রী। আসিয়াই বড় আলমারি খুলিলেন। গৌরী ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, —কি চাই রে?

উমাশশী বলিলেন—ফর্শা তোয়ালে! বার করে রেখেছিলুম·· কারা তাতে তরকারী-মাখা হাত মুছে নোংরা করে রেখেছে সে-তোয়ালে কি নতুন জামাইকে দেওয়া যায়, দিদি?

—সত্যি তো! মানুষের আক্কেলও এমনি! চিরজন্ম দেখে আসছি উমা, বিয়ে-বাড়ীতে নেমন্তন্ন এলেই সবাইয়ের মেজাজ যেন গর হয়ে ওঠে! একটু আগে দেখলুম, তোমাদের পাড়ার কোন্ বাড়ীর গিন্নী এসেছিলেন···সবাই খেতে বসলো···তাঁকে বসতে বলা হলো তিনি বললেন, ভুঁয়ে থেব্‌ড়ে থ্‌বড়ে বসে খেতে পারেন না···বাড়ীতে নাকি চেয়ার-টেবিলে খান!···শেষে সত্যবানের সেই চেয়ার-টেবি আনিয়ে জায়গা করে দিলুম। মেম-গিন্নী তবে বসলেন তিন মেয়ে নিয়ে খেতে। পরের বাড়ীতে এসে এমন কথা মানুষ বলে কি করে তাই ভাবি!

উমাশশী তোয়ালে বাহির করিয়া আলমারি বন্ধ করিলেন এবং দিলু-নীলুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ দু'টি ছেলে?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—সেই যে বিকেলে বলছিলুম আমাদের ওখানকার মাষ্টার-মশায়ের বাড়ীর কথা! চমৎকার ছেলে দু'টি! বড় এটি বড়···পাশ করে জলপানি পেয়েছে, কিন্তু মাথার উপর পড়লো সংসারের ভার—হাসি-মুখে জানকী বাবুর কারখানায় ঢুকলো মিস্ত্রীর কাজ শিখতে। দু' পয়সা রোজগার হবে, সে-পয়সায় ছোট ভাই দু'টি মানুষ হবে। এ-বয়সে এ রকম বুদ্ধি-বিবেচনা···অনেক জোয়ান মদ্দ মানুষেরও থাকে না।

উমাশশী বলিলেন,—ও···বুঝেছি !···তার পর তিনি দিলু-নীলুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—তোমাদের সঙ্গে জানাশুনা হলো না বাবা, গোলমালের বাড়ী, কাল বর-কনে চলে গেলে আলাপ করবো।···আমি হলুম কৌমুদীর মামীমা···দিদির কাছে তোমাদের কথা শুনেছি···তোমার মার কত সুখ্যাতি করলেন দিদি। মাকে গিয়ে বলো, কৌমুদীর মামীমা কত দুঃখ করছিলেন, মার সঙ্গে দেখা হলো না, আলাপ হলো না বলে'···বলবে তো ?

উমাশশীর পানে নীলু চাহিয়াছিল এক-দৃষ্টে···উমাশশীর কথায় মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া জানাইল, এ কথা বাড়ী গিয়া মাকে বলিবে।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—ছেলে দু'টি বেশ···না উমা ?

উমাশশী কোন জবাব দিলেন না ; সস্মিত দৃষ্টিতে গৌরীর পানে চাহিলেন। তার পর বলিলেন,—তুমি ওদের খাওয়াও দিদি। বরের খাওয়া হলো···এবার কৌমুদীকে খাইয়ে দি। তার পর বর-কনে নিয়ে মেয়েগুলো বাসরে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করুক !

এ কথা বলিয়া উমাশশী চলিয়া গেলেন।

আহারাদি সারা হইলে গৌরী ঠাকুরাণী তাদের লইয়া বাসরের সামনে আসিলেন। বরাসনে অর্দ্ধশায়িত ভাবে সমাসীন বর···তাকে ঘিরিয়া সুবেশী ক'জন তরুণী রঙ্গিণী···বরকে লইয়া হাসি-গল্প করিতেছে। কৌমুদী বাসরে নাই···উমাশশী তাকে খাওয়াইতে লইয়া গিয়াছেন।

দিলু-নীলুকে গৌরী বলিলেন,—এবার আর কোন কথা নয়···শোবে চলো। তোমাদের শুইয়ে আমি অন্য কাজে যাবো ! কাল সকালে আবার দেখা হবে।

তিন জনে আসিতেছিলেন···যে-ঘরে দিলু-নীলু শুইবে সেই ঘরের দিকে···সামনে হঠাৎ দেখা জয়ার সঙ্গে।

গৌরী ঠাকুরাণী কি বুঝিলেন, তা জানেন অন্তর্যামী···

তিনি বলিলেন,—প্রণাম করো দিলু-নীলু···

দিলু-নীলু যেন কাঠ।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—চেনো না ? তোমাদের পিশিমা···আপন-পিশিমা···কামাখ্যা সাহেবের স্ত্রী···জয়া।

দিলু-নীলু যন্ত্র-চালিতের মতো জয়ার সামনে ভূমিষ্ঠ হইয়া জয়াকে প্রণাম করিল···পায়ের ধূলা লইতে গেল···জয়া দু'পা হটিয়া সরিয়া গেল। বলিল,—থাক থাক, পায়ের ধূলো নিতে হবে না আর !

জয়া দেখিল দু'জনকে। গৌরী ঠাকুরাণী হাসিলেন। হাসিয়া তিনি বলিলেন,—একালে মাসি-পিশির পা কি আর আছে যে ছেলেরা পায়ের ধুলো নেবে ! মাসি-পিশির পা এখন জুতোয় ঢাকা !···জুতো পায়ে দেবে না কি ? দেবে নিশ্চয়। কিন্তু এই সময়টায় আমার কেমন বিশ্রী লাগে জয়া···সত্যি ভাই, ছেলেমেয়ে পায়ের ধুলো নেবে, এ তো ভাগ্যের কথা !

জয়ার মুখে কথা নাই···কাঠ ! চোখের দৃষ্টি কিন্তু দিলু-নীলুর উপর নিবদ্ধ···সরিতে চায় না !···দিলুকে দেখিয়া মনে পড়িতেছিল···মহেন্দ্রর কথা। অবিকল সেই মুখ ! মনে হইতেছিল, মাঝখানকার এতগুলা বৎসর ঠেলিয়া সেই অতীত দিনের কিশোর-মূর্ত্তিতে মহেন্দ্র আসিয়া আবার যেন তাঁর সামনে দাঁড়াইয়াছে !

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জয়া বলিল—তোমাদের নাম ?

দিলু-নীলু নাম বলিল।

জয়া বলিল—তোমরা তো বাসন্তীতেই আছো ? না ?

দিলু বলিল—হ্যাঁ।

জয়া বলিল—শুনেছি···তবে নানান্ ঝঞ্ঝাটে দিন যে কা[টে]···কাটে, আপনার জনের খপর নেবো, তাও পারি না।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমি কেন খপর নিতে যাবে ? ছেলে[রা] ডাগর হয়েছে, খপর নেবে ওরা। দূর-সম্পর্ক নয়, শুনেছি ! পিশিমা·· পিশিমার কাছে যাবে বৈ কি। যেয়ো এবার থেকে মাঝে-মা[ঝে] পিশিমার কাছে. নিজেদের পিশিমাকে চিনলে তো···বুঝলে দিলু··· বুঝলে নীলু···

দিলু-নীলু মাথা নাড়িল। দিলু বলিল—যাবো···

জয়া চলিয়া গেল···মুখে এ-কথা বলিতে পারিল না 'আসিয়ো'! কে যেন জয়ার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল !

পরের দিন সকালে বর-কন্যা বিদায় হইয়া গেলে গৌরী ঠাকুরা[ণী] আবার দু'-ভাইকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন—আজ আর বা[ড়ী] যায় না বাবা। বড্ড খাটুনি গেছে কাল, আজ জিরোও। তাছা[ড়া] কলকাতায় এসেছো, সব ভাখো-শোনো···তার পরে যেয়ো ! কেমন ?

সুপ্রসন্ন কাছে ছিলেন···তিনিও বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ···বুঝে[ছো] দিলু, মাকে বরং তাই লিখে দাও।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—ঠিক কথা বলেছো সুপ্রসন্ন। ছেলেদে[র] ছেড়ে কখনো থাকেনি···আহা ! আমাদের কাছে পাঠালেও ম[ন] কেমন করবে বৈ কি ! ছেলেদের এই প্রথম ছেড়ে দেছে !

বৈকালে সিনেমা দেখিতে যাওয়ার কথা উঠিল···নিমন্ত্রিতের দ[ল] বায়না ধরিয়াছে।

সুপ্রসন্ন বলিলেন—বেশ !

দিলু-নীলু গেল না। বলিল—ভালো লাগে না।

পাশ দিয়া যাইতেছিল পিনাকী-দেবকী···সজ্জিত বেশ···কথাট[া] কাণে গেল। সিনেমা দেখিতে ভালো লাগে না ? জানোয়ার [!] তাচ্ছল্যের হাসি-ভরা দৃষ্টি ছিটাইয়া তারা চলিয়া গেল।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—গেলে না কেন ? এ্যাঁ···

দিলু বলিল—আমার ও-সখ নেই পিশিমা। নীলু কেন গেল না, জানেন ?

নীলু চাহিল দাদার পানে···সে-দৃষ্টিতে অনেকখানি কাকুতি [!]

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—কেন রে ?

দিলু বলিল—ছোট ভাই মোহন বাসন্তীতে আছে···সে দেখবে না কি না, তাই !

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—ও···তা দু'জনে কি করবে এখন ?

দিলু বলিল,—বেড়িয়ে আসি। সেই ইড্‌ন্ গার্ডন, গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত···

গৌরী ঠাকুরাণী কহিলেন,—তাহলে সাবধানে যেয়ো···আর ট্রামের ভাড়া নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে।

দিলু যেন চমকিয়া উঠিল ! বলিল,—না, না পিশিমা, ট্রামে কেন ? হেঁটে যাবো। না হলে আর বেড়ানো হলো কি !···তাছাড়া ট্রামে গেলে কিছুই তো দেখা হবে না···হু-হু করে যাওয়াই সার !

সন্ধ্যার পর দোতলার দালানে মেয়েদের মজলিশ বসিয়াছে···সে মজলিশে উমাশশী, গৌরী ঠাকুরাণী হইতে সুরু করিয়া জয়া এবং বাসন্তীর নিমন্ত্রিতার দলও আছে।

গৌরী ঠাকুরাণী হঠাৎ বলিলেন—আমি যা বলেছি উমা···আমার কথা ভেবে দেখো। তোমার উৎপলার জন্ত পাত্র খুঁজছো···আমি বলি, দিলুর সঙ্গে বিয়ে দাও! পয়সা-কড়ি নেই···কিন্তু যে-মানুষের ছেলে আর যে-শিক্ষা পেয়েছে···আমি বলে রাখছি, ও এক জন মানুষের মতো মানুষ হবে পরে, দেখে নিয়ো!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি চুপ করিলেন, তার পর আবার বলিলেন, —বংশও ভালো। অজানা নয়। এই জয়াকে দেখছো···কামাখ্যা-সাহেবের স্ত্রী···জয়া হলো···ছেলেটির বাপ ছিলেন মহেন্দ্র বাবু···সেই মহেন্দ্র বাবুর বোন!

উমাশশী বলিল—ছেলেটিকে দেখে মন ভরে যায় দিদি। তবে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে—তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সে কথা কয়ো ভাই। ওঁরা পুরুষ-মানুষ···কত দিক দেখেন, বোঝেন মেয়ের জন্ত পাত্র ঠিক করতে, পাত্রের যোগ্যতা পরখ করতে! তবে ওঁরও বড়-মানুষের দিকে ঝোঁক নেই। বলেন, মেয়ের জন্ত বড়-মানুষ পাত্র কোনো দিন খুঁজবো না গো, খুঁজবো শুধু মানুষের মতো মানুষ!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

অকস্মাৎ বিশ্ব-মানচিত্রে উত্তর-আফ্রিকার যে অখ্যাত পার্ব্বত্য অঞ্চল অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এখন ক্রমেই স্তিমিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্ববাসীর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি টিউনিসিয়ার ক্ষুদ্র রণাঙ্গনে নিবদ্ধ ছিল। উত্তর-আফ্রিকার এই পাদভূমি হইতে অক্ষ-শক্তিকে দ্রুত বিতাড়িত করিয়া এই বৎসর গ্রীষ্মকালে একই সময়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্ হইতে তাহাকে আঘাত করাই সম্মিলিত পক্ষের পরিকল্পনা। টিউনিসিয়া-যুদ্ধের ফলাফলের সহিত ভূমধ্য সাগরের ভাগ্য গ্রথিত। ভূমধ্য সাগরে সম্মিলিত পক্ষের প্রভুত্ব স্থাপনেই প্রাচ্য অঞ্চলে তাঁহাদের সমরায়োজন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে। তখন ভারত মহাসাগরে বৃটিশ নৌবহর সন্নিবিষ্ট হওয়া সম্ভব এবং সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযানের পরিকল্পনাও বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। সাফল্যজনক ব্রহ্ম-অভিযানের পর চীনে সাহায্য প্রেরণ এবং জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাতের কল্পনা।

টিউনিসিয়া-যুদ্ধ—

টিউনিসিয়া-যুদ্ধের শেষ অঙ্কে এখন যবনিকা পাত হইতেছে। সুদীর্ঘ ছয় মাস আশা ও উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হইবার পর গত ৭ই মে সম্মিলিত পক্ষের টিউনিস্ ও বিজার্টা অধিকারে আফ্রিকায় অক্ষশক্তির সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে। বন্ অন্তরীপের নিকট যে সামান্ত সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ এখন চলিতেছে, তাহার পরিসমাপ্তির আর বিলম্ব নাই। এই অঞ্চলে ১ লক্ষ ২২ হাজার অক্ষশক্তির সৈন্ত পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ইহাদিগকে কোনপ্রকারে দক্ষিণ-য়ুরোপে অপসারণই এখন অক্ষশক্তির উদ্দেশ্য। সম্মিলিত পক্ষও এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্ত জলপথে ও আকাশপথে ভূমধ্য সাগরের এই অপ্রশস্ত অঞ্চলে মনোনিবেশ করিয়াছেন। অক্ষশক্তির "দ্বিতীয় ডানকার্ক" সৃষ্টির প্রয়াস যদি বিফল হয়, তাহা হইলেই আফ্রিকায় তাহার পরাজয় সম্পূর্ণ হইবে।

টিউনিসিয়া হইতে অক্ষশক্তিকে বিতাড়িত করিবার পর দক্ষিণ-য়ুরোপে তাহাকে আঘাত করাই সম্মিলিত পক্ষের পরিকল্পনা। য়ুরোপ অভিযানের এই প্রাথমিক সর্ত্ত এখন পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু টিউনি-সিয়া হইতে অক্ষশক্তি বিতাড়িত হইবার পর য়ুরোপ অভিযানের উদ্যোগে কিছু কাল অতিবাহিত হইতে পারে। সম্মিলিত পক্ষ যদি ইতঃপূর্ব্বেই গোপনে এই অভিযানের আয়োজন না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই উদ্যোগপর্ব্বে যে সময় লাগিবে, তাহাতে জার্ম্মাণী বিশেষ উপকৃত হইতে পারে; এই সুযোগে পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার আঘাত প্রবল হওয়া সম্ভব।

রুশ-রণাঙ্গন—

গত এক মাসে রুশ-রণাঙ্গনে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; এই সময়ে উভয় পক্ষই গ্রীষ্মকালীন সংগ্রামের জন্ত প্রাণপণ শক্তিতে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালীন সংগ্রামের জন্ত প্রয়োজনীয় ঘাঁটী অধিকারের উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণী পুনঃ পুনঃ উত্তর-ডোনেৎস্ অতিক্রমণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল এবং কুবানে অগ্রসর হইতে প্রয়াস করিয়া বিফলকাম হইয়াছিল। এইবার পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে কেবল জার্ম্মাণীই আক্রমণরত হইবে বলিয়া মনে হয় না; সোভিয়েট রুশিয়াও এবার আক্রমণাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। কোন্ দিকে কাহার আক্রমণ আরম্ভ হইবে, তাহা এখন নিশ্চিত বলা যায় না। তবে ককেসাস্ অঞ্চলের প্রতিই জার্ম্মাণীর লক্ষ্য অত্যন্ত অধিক; এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন অভিযান পরিচালনের উদ্দেশ্যে কুবানের স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্রকে সে এত দিন প্রাণ-পণ শক্তিতে আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে। গত বৎসর জার্ম্মাণী দক্ষিণ অঞ্চলের ৫ শত মাইল রণাঙ্গনেই তাহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া-ছিল; মস্কোকে পার্শ্বে রাখিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। এই বৎসর তাহার সমর-নীতির পরিবর্ত্তন হওয়াই সম্ভব; সম্ভবতঃ, সে এক দিকে ক্রিমিয়া হইতে ককেসাস্ অঞ্চলে এবং অন্ত দিকে ওরেল্ অঞ্চল হইতে মস্কো অভিমুখে আক্রমণ প্রসারিত করিবে। জার্ম্মাণীর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার জন্ত সোভিয়েট সমর-নায়ক-গণও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; ইতোমধ্যে তাঁহারা কুবান অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়া নভরোসিস্কের উত্তর-পূর্ব্বে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংসন ক্রিমস্কায়া অধিকার করিয়াছেন। ইহাতে ককেসাস্ অঞ্চলে জার্ম্মাণীর সম্ভাবিত অভিযানে প্রথম বাধা সৃষ্ট হইল, বলা যাইতে পারে। সোভি-য়েট সেনা এখন নভরোসিস্কের ৫ মাইলের মধ্যে উপনীত হইয়াছে।

এইবার গ্রীষ্মকালেই পূর্ব্ব-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর শেষ অভিযান হইবে; এই অভিযানের ফলাফলের উপরই চরম জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে। এই জন্ত হিট্লার এই অভিযানের পূর্ব্বে তাঁহা

তাঁবেদার শাসকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি সকল দিক্ হইতে সর্ব্বপ্রকারে শক্তি অর্জ্জন করিয়া পূর্ব্ব-য়ুরোপে চরম আঘাত হানিবার আয়োজন করিতেছেন। তবে এই বৎসর জার্ম্মাণীর গ্রীষ্ম-কালীন অভিযান পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের অভিযানের ন্যায় প্রবল আকার ধারণ করিবে কি না, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। গত শীতকালীন অভিযানে জার্ম্মাণীর প্রায় ১২ লক্ষ সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে, তাহার ৬ হাজার বিমান এবং ১০ হাজার ট্যাঙ্ক বিনষ্ট হইয়াছে। জার্ম্মাণীর সমর-শক্তিতে এই ক্ষতির সুদূর-প্রসার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহা ব্যতীত পশ্চিম ও দক্ষিণ-য়ুরোপেও জার্ম্মাণীকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীরও আর পূর্ব্বের সে আত্মবিশ্বাস নাই; নর্ডিক্ জাতি যে অপরাজেয় নহে, তাহা রুশ-রণাঙ্গনেই সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সম্মিলিত পক্ষে সংশয় ও জিরো-দ্য গলে মতানৈক্য—

এখন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর সমর-কৌশল সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলা যাইতে পারে; সে নিজের ইচ্ছা-অনুযায়ী য়ুরোপের বিভিন্ন রণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছে। রুশ-রণাঙ্গনে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর আজ দুই বৎসরের মধ্যে সম্মিলিত পক্ষের য়ুরোপ আক্রমণে অসামর্থ্য তাহাদের বিশাল পরাজয়েরই সমান। হিট্‌লার এক সময় সদম্ভ উক্তি করিয়াছিলেন—কাইজারের কৃত ভুল তিনি করিবেন না, তিনি কখনও একই সময়ে দুইটি রণক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। হিট্‌লারের এই দম্ভ চূর্ণ করা আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই; জার্ম্মাণীকে দুইটি রণাঙ্গনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে সম্মিলিত পক্ষ অসমর্থ হইয়াছেন। কেবল সাময়িক অসুবিধাই এই অসামর্থ্যের কারণ নহে; রাজনীতিক বিষয়ে সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস ইহার অন্যতম কারণ।

ইহা এখন সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সম্মিলিত পক্ষের সেনা য়ুরোপে অবতরণ করিবামাত্র বিভিন্ন অঞ্চলে গণ-অভ্যুত্থান হইবে। সম্মিলিত পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ স্বার্থপ্রণোদিত উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে যোগ দান করিলেও য়ুরোপের এই গণ-অভ্যুত্থানকে তাঁহারা ভীতির চক্ষে দেখেন। এই অভ্যুত্থানের সুযোগে ধনিকতন্ত্র-বিরোধী বলশেভিকবাদ যাহাতে প্রসারিত না হয়, অক্ষশক্তির অধিকৃত অঞ্চলের বিপ্লবী নেতৃবর্গ যাহাতে ঐ সুযোগে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহার জন্য এই শ্রেণীর উৎকণ্ঠা অত্যন্ত অধিক। এই রাজনীতিক সন্দেহ ও আশঙ্কার জন্য য়ুরোপে জার্ম্মাণীকে আঘাতের জরুরী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে আক্রমণের ব্যবস্থা হয় নাই। জার্ম্মাণী এই সুযোগে পূর্ব্ব-য়ুরোপে দুই বার প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে এবং এখন তৃতীয় ও শেষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। টিউনিসিয়া হইতে অক্ষশক্তি বিতাড়িত হইবার পরও এই রাজনীতিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ফলে য়ুরোপ-অভিযান অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইবে কি না, কে বলিবে!

য়ুরোপ-অভিযানের রাজনীতিক ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য জিরো-দ্য গলে সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত মীমাংসা হওয়া উচিত ছিল। জেনারল দ্য গলে অকৃত্রিম ফ্যাসিস্ত-বিরোধী; অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থাতেও তিনি অক্ষশক্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। জার্ম্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সের বিপ্লবীরা তাঁহাকে মানিয়া লইয়াছে; সোভিয়েট রুশিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সম্মিলিত পক্ষ বহুরূপী দার্লার সহিত দহরম-মহরম করিয়া-ছিলেন। শুনা গিয়াছিল যে, সামরিক কারণে ইহার প্রয়োজন হয়। জেনারল কাট্রু প্রভৃতি অবশ্য বলেন যে, ঠিক সামরিক কারণেই দার্লাকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত নহে। সে যাহা হউক, দার্লার মৃত্যুর পর সামরিক কারণেই হয় ত জেনারল জিরোকে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। জেনারল জিরো ফ্রান্স-সম্পর্কিত রাজ-নীতিক সমস্যাগুলি আপাততঃ চাপা দিতে চাহিতেছেন। এই বিষয়েই তাহার সহিত জেনারল দ্য গলের মতবিরোধ। জেনারল জিরোর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট নহে; ফ্রান্স মুক্ত হইবার পর বিপ্লবীদিগকে দমন করিবার জন্য ভিসির ফ্যাসিস্ত দালালদিগের সহিত মিলিত হইবার প্রয়োজন হইতে পারে, সুতরাং এই বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে তিনি মীমাংসা করিবেন কেমন করিয়া? গত ৩রা মে জিরো এক বক্তৃতায় ফরাসী জাতিকে আন্দোলনকারীদিগের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং ফ্রান্সের বাহিরের কাহারও নিকট হইতে নির্দ্দেশ লইতে নিষেধ করিয়াছেন। আন্দোলনকারী বলিতে তিনি স্পষ্টতঃই ফরাসী কম্যুনিষ্টদিগের কথা বলিয়াছেন। "ফ্রান্সের বাহিরের" —অর্থাৎ সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে সতর্ক হইতেই তিনি উপদেশ দিয়াছেন। য়ুরোপে অভিযান আরম্ভ করিতে হইলে যুদ্ধরত ফ্রান্সের রাজনীতিক বিষয়ে ঐকমত্য একান্ত প্রয়োজন। অথচ বৃটিশ ও মার্কিণী রাজনীতিকদিগের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে কোনরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। এই মতবিরোধ জাগাইয়া রাখিয়া ফ্রান্সের বিপ্লবীদিগকে দমনের কোন পরিকল্পনা গোপনে রচিত হইয়াছে কি না, কে বলিবে?

পোল-সোভিয়েট বিরোধ—

সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে রাজনীতিক অনৈক্যের আর একটি দৃষ্টান্ত পোল-সোভিয়েট বিরোধ। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন্ এই বিরোধ সম্পর্কে সকল দোষ জার্ম্মাণীর স্কন্ধে চাপাইতে প্রয়াস করিয়া-ছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস আছে, পোল-সোভিয়েট বিরোধ তাহারই কুৎসিত বহিঃপ্রকাশ; সুচতুর গোয়েবেল্‌স্ ইহাতে উপলক্ষ। তিনি এই বিষয়কে স্বীয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র।

গত শীতকালে সোভিয়েট বাহিনী যখন বিজয়-গর্ব্বে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন য়ুরোপ ও আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তি-গণের অন্তর্দাহ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ এই ব্যক্তিদিগের প্ররোচনাতেই বৃটিশের আশ্রিত রাজ্যহারা পোল্ সরকার ঐ সময় ধুয়া তুলেন— ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট রুশিয়া পোলাণ্ডের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় পোলাণ্ডকে তাহা অর্পণ করিতে হইবে। এই দাবীর সমর্থনে আটলান্টিক সনদেরও দোহাই দেওয়া হয়। পোল্ সরকারের দাবীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; য়ুরোপে প্রাগ্-যুদ্ধের ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনই যে আটলান্টিক সনদের উদ্দেশ্য, এই কথা তখন তাঁহারা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া লইতে চাহেন। সোভিয়েট সরকার এই দাবীর উত্তরে দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দেন যে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে

অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসী বিলো-রাশিয়ানদিগকে সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাঁহাদের আছে; ঐ জাতির বিনা-সম্মতিতে উক্ত অধিকৃত অঞ্চল ফিরাইয়া লইবার অধিকার কাহারও নাই। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানান—কোন জাতির অসম্মতিতে তাহাদিগকে রাষ্ট্রবিশেষের অন্তর্ভুক্ত করা আটলাণ্টিক সনদের মূলনীতির বিরোধী। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের উত্তর সুস্পষ্ট ও সুযুক্তিপূর্ণ; ইহার উত্তরে পোল-ধুরন্ধরদিগের আর বলিবার কিছু ছিল না। তাই তাঁহারা তখন প্রকাশ্য বাদানুবাদে ক্ষান্ত হইয়া লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে ও ওয়াশিংটনের ওয়াল ষ্ট্রীটে কাঁদুনী গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট সেনা প্রথমে পোলাণ্ডের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, পরে তাহার কতকাংশ পরিত্যক্ত হয়। গত মহাসমরের সময় ব্রেস্‌লিটভস্ক সন্ধির অসঙ্গত সর্ত্তে রুশিয়া যে অঞ্চল হারাইয়াছিল, বিলো-রাশিয়ান্ জাতি-অধ্যুষিত সেই অঞ্চলই কেবল রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে—বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পোলাণ্ডে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত ছিল, উহার বহিরাকৃতি গণতান্ত্রিক হইলেও প্রকৃত পোলাণ্ডে মার্শাল স্মীগলী রীজের একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময় পোলাণ্ডে দারিদ্র্য ও অসন্তোষ অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে প্রসারিত হয়। এক-নায়কের শাসনে ও অসহনীয় দারিদ্র্যে প্রপীড়িত পোলাণ্ডের বিলো-রাশিয়ানরা তখন সোভিয়েট-শাসিত স্বজাতীয়দিগের সুখশান্তির প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিত। ঘটনাচক্রে এই স্বজাতীয়দিগের সহিত স্বীয় ভাগ্য গ্রথিত হওয়ায় তাহারা আনন্দিতই হইয়াছিল। তাই আজ সোভিয়েট সরকার সঙ্গত ভাবেই আশা করিতেছেন, বিলো-রাশিয়ানরা কখনও তাহাদের সোভিয়েট স্বজাতীয়দিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পুনরায় পোল্ অছিদিগের শাসন ও শোষণের অধীন হইতে চাহিবে না।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ-প্রচার বিভাগ এই পোল-সোভিয়েট মন-কষা-কষির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং পোল্-ধুরন্ধরগণ অর্ব্বাচীনের ন্যায় গোয়েবল্‌সের তালে নাচিতে আরম্ভ করে। কিছু দিন পূর্ব্বে গোয়েবল্‌সের উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত কাহিনী প্রচারিত হয়—সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে স্মলেনস্কে ১০ হাজার পোল্ কর্ম্মচারীকে হত্যা করেন; জার্ম্মাণী আজ সাড়ে তিন বৎসর পরে এই সকল কর্ম্মচারীর অবিকৃত মৃতদেহ ও দেহগুলির সহিত সমাহিত পরিচয়-পত্র আবিষ্কার করিয়াছে। পোল্ সরকার এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া এতই আত্মহারা হন যে, তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে গোয়েবল্‌সের টোপ গিলিয়া ফেলেন এবং সোভিয়েট কর্তৃপক্ষকে কোন কথা না জানাইয়া আন্তর্জ্জাতিক রেড ক্রস্‌কে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার দেন। সোভিয়েট রুশিয়া এখন যে জার্ম্মাণীর সহিত যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে, সেই জার্ম্মাণীই পোলাণ্ডকে শ্মশান করিয়াছে! অথচ এই শত্রুর স্বভাবসিদ্ধ কৌশলী প্রচারকার্য্যে পোল্ সরকার এতই বিভ্রান্ত হন যে, ঐ প্রচারের সত্যাসত্য সম্বন্ধে মিত্র রাষ্ট্রকে একবার জিজ্ঞাসার প্রয়োজনও বোধ করিলেন না। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, পোল-সোভিয়েট মিত্রতায় পূর্ব্ব হইতে ঘুণ ধরিয়াছিল। সোভিয়েট সরকার এই শিথিল মৈত্রীবন্ধন টানিয়া চলিতে অস্বীকার করিয়াছেন; পোল্-সোভিয়েট কূটনীতিক সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইয়াছে।

চতুর্দ্দিক্ হইতে তিরস্কার শ্রবণ করিয়া পোল্ সরকার এখন সুর বদলাইয়াছেন। তাঁহারা এখন কেবল রুশিয়ায় অবস্থিত পোলদিগকে ফিরাইয়া চাহিতেছেন। ইতোমধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রেড্ ক্রস্ সমিতি কর্ত্তৃক পোল্ সরকারের অনুরোধ রক্ষায় অসুবিধা জ্ঞাপনে ঐ বিষয়টি চাপা পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পোল্ সরকারের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধ দূর করিবার প্রয়াস হইতেছে। কারণ, সম্মিলিত পক্ষের এই ভাঙ্গনে যুদ্ধ-পরিচালনে অসুবিধা সৃষ্ট হইবে। অক্ষশক্তির অধিকৃত দেশগুলির বাহিরে ঐ সকল রাষ্ট্রের যে সেনা-বল আছে, তাহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিবার জন্য সম্মিলিত পক্ষের সহিত ঐ সকল রাষ্ট্রের মিত্রতার সামরিক প্রয়োজন আছে।

পোলাণ্ডের সহিত রুশিয়ার স্থায়ী সদ্ভাব স্থাপন করিতে হইলে যুদ্ধোত্তর-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঐ দুই দেশের সরকারের ঐকমত্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কেবল সামরিক প্রয়োজনে জোড়াতালি দিলে স্থায়ী ফল পাওয়া যাইবে না। মঃ ষ্ট্যালিন্ লণ্ডন 'টাইম্‌সে'র প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—রুশিয়া পোলাণ্ডকে শক্তিশালী ও স্বাধীন দেখিতে চাহে। পোলাণ্ডের সহিত দৃঢ় ও মিত্রতাসূচক মৈত্রী-সম্বন্ধ স্থাপনই রুশিয়ার উদ্দেশ্য; পোল্-জনসাধারণ যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে পোলাণ্ড ও রুশিয়ার পারস্পরিক সাহায্য দানের চুক্তিও হইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয়—মঃ ষ্ট্যালিন্ "পোল্-জনসাধারণ" কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন; প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন সরকার দেশের জনসাধারণের পক্ষ হইতে কথা বলিবার অধিকার দাবী করিতে পারেন না। যুদ্ধের পর বৃটিশের আশ্রিত পোল্ সরকার ঐ দেশের জন-সাধারণের আস্থা-ভাজন থাকিবেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহাদের নিজেদের মনেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই জন্য মঃ ষ্ট্যালিনের আশ্বাসে সিকোর্স্কি-র‍্যাক্‌সিস্কি কোম্পানী শুষ্ক হাসি হাসিলেও রুশিয়ার পোল্ প্রবাসী-দিগকে ফিরাইয়া পাইবার দাবী ত্যাগ করেন নাই; নিজেদের সমর্থকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য এই সকল পোলকে ফিরাইয়া পাওয়া তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজন।

সুদূর প্রাচী—

অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে জাপানের সমরায়োজন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জাপান ২ লক্ষ সৈন্য মজুত করিয়াছে; প্রচুর বিমান-সন্নিবেশ করিয়াছে; সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জাপানের সাবমেরিণ-বহরও অত্যন্ত তৎপর হইয়াছে। পোর্ট ডারুইনে সম্প্রতি জাপানের এক বিমান-আক্রমণে সম্মিলিত পক্ষের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্ষতির কৈফিয়তে বলা হয় যে, এই আক্রমণে জাপানের উৎকৃষ্ট বৈমানিকগণ নিযুক্ত হইয়াছিল।

অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে জাপানের এই সমরায়োজনে উৎকণ্ঠিত হইয়া অষ্ট্রেলিয়ান্ রাজনীতিকগণ পুনঃ পুনঃ সম্মিলিত পক্ষকে অধিকতর সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছেন। তাঁহাদের উক্তিতে প্রায়ই অভিযোগের সুর শুনা যায়। এই অভিযোগ প্রধানতঃ মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। কিছু কাল পূর্ব্বে সমর-পরিচালন সম্পর্কে বৃটেনে

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চলগত দায়িত্ব বণ্টিত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থা অনুসারে সুদূর প্রাচীতে অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব্ব দিকে সমগ্র অঞ্চলের দায়িত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, অষ্ট্রেলিয়ান্ রাষ্ট্রনায়কগণ জাপানের আক্রমণাশঙ্কা সম্পর্কে যে সকল উক্তি করেন, মার্কিণী রাজনীতিকগণ প্রায়ই তাহাতে লঘুত্ব আরোপের চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই অপ-চেষ্টার প্রতিবাদে অষ্ট্রেলিয়ার সমর-সচিব মিঃ ফোর্ড গত ১লা মে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—উত্তরাঞ্চলে জাপান ২ লক্ষ সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছে; টিমর হইতে রবাউল্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাহার যে সকল বিমান-ঘাঁটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে দেড় হাজার বিমান আশ্রয় পাইতে পারে। জাপানের সাবমেরিণ-তৎপরতাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই, কেবল মূর্খরাই বলিতে পারে যে, "বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। জাপানীরা যত দিন অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিমের সমুদ্রাংশে প্রভুত্ব করিবে, তত দিন বিপদের মাত্রা হ্রাস পাইবে না।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—২১শে এপ্রিল মার্কিণী সমর-সচিব মিঃ ষ্টিমসন্ বলিয়াছিলেন, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী সৈন্যের সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা এখন দূরীভূত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, জাপান যে এখন অষ্ট্রেলিয়ার প্রতি বিশেষ ভাবে অবহিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে প্রত্যক্ষ অভিযানের দ্বারা দ্বৈপায়ন মহাদেশটি অধিকার করিতে চাহে, কি উহাকে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করা তাহার উদ্দেশ্য, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, সম্মিলিত পক্ষ যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিতে না পারেন, তাহার জন্য জাপান চরম চেষ্টা করিবে।

জাপান যদি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার নৌবহরের বিশাল অংশ মুক্তিলাভ করিবে। শক্তিশালী নৌবাহিনীর সহযোগে ব্রহ্মদেশে জাপানের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিতে পারে। সম্মিলিত পক্ষের পরিকল্পনা—টিউনিসিয়া-যুদ্ধের পর ভূমধ্যসাগর নিষ্কণ্টক হইবে; দুই একটি নৌ-যুদ্ধে ইটালীয় নৌবাহিনীও পঙ্গু হইতে পারে। তখন বৃটিশ নৌবাহিনীর একটি বিশাল অংশ ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হইতে পারিবে এবং ব্রহ্ম-অভিযান সম্ভব হইবে।

টিউনিসিয়ার যুদ্ধ এখন যেরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহরের প্রভুত্ব স্থাপন অসম্ভব নহে। এইরূপ অবস্থায় জাপান আর বিলম্ব করিতে পারে না; প্রশান্ত মহাসাগর হইতে তাহার নৌবহরের কতকাংশ সত্বর ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচ্য অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের প্রধান আক্রমণ-ঘাঁটী অষ্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হইয়া সে নৌবাহিনী স্থানান্তরিত করিতে পারে না। এই জন্য অষ্ট্রেলিয়া সম্পর্কে অতি দ্রুত হিসাব-নিকাশ হওয়া জাপানের একান্ত প্রয়োজন।

নৌবাহিনীর সহযোগ ব্যতীত সম্মিলিত পক্ষের ব্রহ্ম-অভিযান অসম্ভব; তেমনি নৌবাহিনীর বিনা সহযোগে ব্রহ্মদেশের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। ভূমধ্যসাগর নিষ্কণ্টক হইবার পর সম্মিলিত-পক্ষ তাঁহাদের নৌবহর প্রাচ্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিয়া ব্রহ্ম-অভিযানের ব্যবস্থা পূর্ণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে জাপানের নৌবহরও ব্রহ্মদেশের নিকট-বর্ত্তী সমুদ্রাংশে স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। জাপানী নৌবাহিনী যদি বঙ্গোপসাগরে বৃটিশ নৌবহরকে সজোরে আঘাত করিতে পারে, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষকে আবার বহু দিন রথেডং-বুথিডংএ অগ্র-পশ্চাৎ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনের শক্তি বৃদ্ধি এবং জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাতের পরি-কল্পনা পুনরায় বহু দিনের জন্য শিকায় উঠিবে। পক্ষান্তরে, বৃটিশ নৌবহর যদি বঙ্গোপসাগরে জাপ-নৌবহরকে চূর্ণ করিয়া সমুদ্রপথে ব্রহ্ম-অভিযান চালাইতে পারে এবং স্থলভাগের অভিযাত্রী বাহিনীকে জলপথে সহযোগিতা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশ হইতে জাপানকে বিতাড়িত করিতে বিলম্ব হইবে না।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি—প্রতীচ্য মিত্রের পরোক্ষ সহযোগের সম্ভাবনা না ঘটিলে জাপানের পক্ষে একাকী ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশ আক্রমণে সাহসী হওয়া স্বাভাবিক নহে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে অভিযান-পরিচালনের জন্যও জাপানের নৌবাহিনী একান্ত প্রয়োজন। কি আক্রমণাত্মক, কি প্রতিরোধমূলক উভয় প্রকার সংগ্রামের জন্যই ভারত মহাসাগরে জাপানের নৌবাহিনী স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক।

আরাকানে তৎপরতা—

মাসাধিক কাল পরে জাপান পুনরায় আরাকান্ অঞ্চলে তৎপর হইয়াছে। ইতোমধ্যে সম্মিলিত পক্ষের সেনা বুথিডংএর উত্তর-পশ্চিমে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। বুথিডং হস্তচ্যুত হওয়ায় এবং বুথিডং-মংড রাজপথ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখন মংড রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সম্মিলিত পক্ষ মংড হইতে ডবুবেইক্ পর্য্যন্ত যে পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই পথেও জাপানীরা অগ্রসর হইতে পারিবে। বর্ষাকালে সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য মংডয় সম্মিলিত পক্ষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার মজুত রাখিয়াছিলেন। এখন সব ফেলিয়া তাঁহারা কক্সবাজারে ঘাঁটী স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

বর্ষার পূর্ব্বে জাপান পুনরায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহে; তাহার এই প্রয়াস বিফল হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে। আরাকানে সম্মিলিত পক্ষের সৈন্য ও উৎসাহ ব্যয় আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পর স্থলপথে ঐ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীগুলিতে আক্রমণ প্রসারিত করিবার জন্য জাপান প্রয়াসী হইতে পারে।

১৫।৫।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ

৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—(১) ভারতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন; (২) ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা। প্রথম ভাগ এখনও কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই; দ্বিতীয় ভাগ লইয়া অনেক অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা অর্জ্জিত হইয়াছে। ভারত-শাসন আইন প্রণীত হইবার পূর্ব্বেই প্রাদেশিক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থায় যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল, তাহা গণতন্ত্রানুমোদিত নহে। কতকগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় লইয়া এবং হিন্দুসম্প্রদায়কে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহাতে সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারণ ঘটিবে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিশেষ বিলাতের রাজনীতিকগণ স্থির করিয়াছেন—মুসলমানগণ যে সকল প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ, সে সকল প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যা-তুলনায় অতিরিক্ত অধিকার লাভ করিলেও হিন্দুরা যে সকল প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ, সে সকল প্রদেশে অনুরূপ অধিকারে বঞ্চিত হইবেন। প্রকাশ, লর্ড হেলী এ দেশের লোককে স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত রাখিবার উপায়-রূপে এই ব্যবস্থার কল্পনা করিয়াছিলেন।

যখন ভারত-শাসন আইন আমলে আইসে, তখন পূর্ব্বোক্ত নিদ্ধারণানুসারে ব্যবস্থা পরিষদে ও ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য-নির্ব্বাচন হয়। তখন মন্ত্রীদিগের ক্ষমতার অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকারে অসম্মত হয়েন—অথচ দেখা যায়, অধিকাংশ প্রদেশেই ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যা অধিক।

বাঙ্গালার পরিষদে কেবল যে মুসলমানদিগের সংখ্যা—সেই সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতাহেতু—অধিক তাহাই নহে; পরন্তু, যুরোপীয়-দিগের সংখ্যা অকারণ অধিক! সেই অবস্থায়ও নির্ব্বাচন শেষ হইলে দেখা যায়, বাঙ্গালার পরিষদে দল হিসাবে কংগ্রেসী দলই প্রবল! কিন্তু কংগ্রেসের নির্দ্দেশে কংগ্রেসী দলের দলপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বা তাহাতে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না। সেই সময় যুরোপীয় বণিক্-সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'ক্যাপিট্যাল' লিখেন, সকলেই জানিতেন, খাজা সার নাজিমুদ্দীন প্রধান-মন্ত্রী হইবেন; কিন্তু পটুয়াখালীর নির্ব্বাচনে মিষ্টার ফজলুল হক তাঁহাকে পরাভূত করায় সে ব্যবস্থা আর হইল না। তখন খাজা সার নাজিমুদ্দীন মসলেম লীগের প্রতিনিধি এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার "অপরাধে" মিষ্টার হক লীগ হইতে বহিষ্কৃত। ইহার পর মিষ্টার হক প্রধান-সচিব হইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিলেন এবং খাজা সার নাজিমুদ্দীনকে স্বরাষ্ট্র-সচিব করিলেন। সে সচিবসঙ্ঘ সর্ব্বতোভাবে মসলেম লীগ-প্রভাবিত ও সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট হইল।

এ দিকে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসীরা ব্যবস্থা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় অন্য কোন সচিবসঙ্ঘের পক্ষে কার্য্য পরিচালন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। বিলাতের সরকার ও ভারত সরকার বুঝিলেন—কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার না করিলে তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন অচল হইবে। অথচ তাঁহারা সমগ্র সভ্য জগতকে বুঝাইতে ব্যাকুল—ইংরেজ ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই জন্য বিলাতে ভারত-সচিব ও এ দেশে বড় লাট ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইলেন—গভর্ণরের ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ—অধিকাংশ কাজই মন্ত্রীরা করিবেন এবং সে সকল কাজে গভর্ণর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

এই বিবৃতি প্রচারের পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিলেন! তখন আর বাঙ্গালায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্ভব হইল না। কারণ, তখন মুসলমানরা সচিবসঙ্ঘে একযোগে কায করিতেছেন এবং যুরোপীয় দল তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়াছেন। এমন কি—সচিবদিগের সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তাঁহারা বলিলেন, সচিবসঙ্ঘের বহু ত্রুটি তাঁহারা অবগত আছেন বটে, কিন্তু পাছে কংগ্রেসী সচিবসঙ্ঘ গঠিত হয়, সেই জন্য তাঁহারা সচিব-সঙ্ঘ সমর্থন করিবেন।

এই সচিবসঙ্ঘের সাম্প্রদায়িকতা এত সপ্রকাশ হইল যে, নানারূপ অনাচার ঘটিতে লাগিল। কুলটীতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় সচিবসঙ্ঘ আদালতে বিচার বন্ধ রাখিবার আদেশও দিলেন এবং ঢাকায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইল, তাহার ফলে বহু সহস্র হিন্দু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সামন্তরাজ্য ত্রিপুরায় যাইয়া আশ্রয়-গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করা হইতে লাগিল এবং সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রকে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ-সাহায্য করাও হইল।

এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালার কল্যাণকল্পে উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি স্থির করিলেন, ঐ সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিতে হইবে। মিষ্টার ফজলুল হক ও নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর উভয়কে সেইরূপ সচিবসঙ্ঘে যোগদানে প্ররোচিত করিয়া তিনি হিন্দু-মহাসভার প্রতিনিধি শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও তাহাতে সম্মত করিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন, বিপুল উপার্জ্জন ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করিয়া তিনি মাসিক ৫ শত টাকা মাত্র লইয়া সেই সচিবসঙ্ঘে সচিব হইবেন। মিষ্টার ফজলুল হক, নবাব খাজা হবিবুল্লা বাহাদুর ও শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই ৩ জন সচিবের নাম প্রকাশ করা হইল। স্থির হইল—শরৎ বাবু যে দলের দলপতি, সেই দল হইতে তাঁহার মনোনীত ২ জন ও তিনি স্বয়ং সচিবসঙ্ঘে যোগ দিবেন। কিন্তু সেই সকল নাম প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বদিন শরৎ বাবুকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাখা হইল—তাঁহাকে কলিকাতায়—এমন কি বাঙ্গালায়ও রাখা হইল না! শরৎ বাবুর মনোনয়নে শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সচিব হইলেন। মিষ্টার ফজলুল হক প্রধান-সচিব হইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিলেন।

এই সচিবসঙ্ঘ যাঁহার পরিকল্পনা, তাঁহার অভাবে যে তাঁহার পরিকল্পনা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইতে পারিল না, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সচিবসঙ্ঘের কার্য্যে যে সাম্প্রদায়িক বহ্নিদাহে বাঙ্গালার উন্নতি, শান্তি, স্বস্তি ভস্মসাৎ হইতেছিল, বাঙ্গালা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল।

কিন্তু যে সকল কথা প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাতে লোকের মনে করিবার কারণ ঘটিল—সচিবদিগের কার্য্য সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের ইচ্ছানুসারে হইতেছে না; তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। হয়ত যুদ্ধে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সেইরূপ হস্তক্ষেপের সুযোগও ঘটিয়াছে।

প্রথমে অর্থ-সচিব শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করিলেন। পদত্যাগ করিয়া তিনি প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিলেন, বাঙ্গালায় সচিবসঙ্ঘের মধ্যে অন্য এক সঙ্ঘ আছে—সেই সঙ্ঘ গভর্ণরকে কেন্দ্র করিয়া স্থায়ী কর্ম্মচারীদলে গঠিত এবং কোন কোন বিষয়ে সচিবগণ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বিবৃতিতে স্বীকৃত ক্ষমতা সম্ভোগ করিতে পারিতেছেন না। প্রধান-সচিব মিষ্টার ফজলুল হকও গভর্ণরকে জানাইলেন—ধান্য ও চাউল ক্রয়ে, নৌকাপসারণে, সৈনিকদিগের ব্যবহারে—সচিবদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা ত পরের কথা, তাহার অপেক্ষাও রাখা হয় নাই।

বাঙ্গালায় খাদ্য-সমস্যা দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল—চাউল দুষ্প্রাপ্য হইল। তাহা লইয়া সচিবসঙ্ঘের সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইল, কিন্তু মসলেম লীগের দল ও য়ুরোপীয় দল একযোগেও সচিবসঙ্ঘের পতন ঘটাইতে পারিলেন না। তাঁহারা যে সময় আবার সেই চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় ২৮শে মার্চ্চ গভর্ণর প্রধান-সচিবকে ডাকাইয়া লইয়া তাঁহাকে—স্বাক্ষর-জন্য রক্ষিত পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর দিতে বলিলেন। তিনি সহসচিবদিগের সহিত পরামর্শ করিবার সময় চাহিলে তাহাও পাইলেন না। তাঁহাকে বলা হইল, তিনি আপনিই বলিয়াছেন, তিনি সকল দলের প্রতিনিধিদলে গঠিত সচিবসঙ্ঘের পক্ষপাতী—সেইরূপ সচিবসঙ্ঘ গঠনের জন্যই তাঁহাকে পদত্যাগ করান হইল। ২৯শে মার্চ্চ তখন ব্যবস্থা পরিষদে প্রকাশ পাইল, মিষ্টার হক পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন এবং পূর্ব্বরাত্রিতেই গভর্ণর জানাইয়াছেন—সে পত্রে তিনি সম্মতি দিয়াছেন। তখন সচিবসঙ্ঘ নাই বলিয়া পরিষদের সভাপতি পরিষদের অধিবেশন ১৫ দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন।

পরিষদে তখনও বাজেট গৃহীত হয় নাই! গভর্ণর, বড় লাটের সম্মতি লইয়া ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করিয়া সমগ্র শাসন-ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বাজেট "পাশ" করিলেন এবং তাহার পর অর্থবিলগুলিও আইনে পরিণত করিলেন।

তখনই বুঝা গেল, যদি সচিবসঙ্ঘ গঠন সম্ভব হয়, তবে গভর্ণর সেই সচিবসঙ্ঘকে পরিষদে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের সম্মুখীন হইতে দিবেন না এবং সেই জন্য পরিষদের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করিবেন।

এ দিকে গভর্ণর ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রতিনিধিদিগকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মসলেম লীগ দলের দলপতি খাজা সার নাজিমুদ্দীনকে সচিবসঙ্ঘ গঠনে তাঁহাকে সাহায্য করিতে আমন্ত্রিত করিলেন—এ বার আর সর্ব্বদলের সচিবসঙ্ঘের কথা রহিল না—কেবল সচিবসঙ্ঘ গঠনের কথাই বলা হইল। কারণ, গভর্ণর জানিতেন—পরিষদে খাজা সার নাজিমুদ্দীনের সমর্থক দল সংখ্যালঘিষ্ঠ—তখনও মিষ্টার হকের দলের সংখ্যা অধিক। মিষ্টার ফজলুল হক গভর্ণরকে লিখিলেন,—তিনি (গভর্ণর) যে পরিষদে অধিকাংশ সদস্যের আস্থায় বঞ্চিত একটিমাত্র দলের দলপতি খাজা সার নাজিমুদ্দীনকে সচিবসঙ্ঘ গঠনের সম্ভাবনা বুঝিয়া তাঁহাকে জানাইতে ভার দিয়াছেন, সে ভার অসঙ্গত—কারণ, তাহা নিয়মানুগ নহে।

৩০শে চৈত্র খাজা সার নাজিমুদ্দীন এক বিবৃতি প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন, তিনি আল্লার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার গভর্ণরের সচিবসঙ্ঘ গঠনে সাহায্য করিবার আহ্বানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কার্য্যের নীতি বিবৃত করেন—বলেন, বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবস্থা করিবেন:—

(১) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

(২) সভা করিবার স্বাধীনতা

(৩) রাজনীতিক কারণে গ্রেপ্তার, আটক ও মামলা

(৪) রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকে মুক্তিদানের অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের বিষয় বিবেচনা

(৫) রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের খাদ্যাদি

(৬) রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের পরিবারের ভাতা

(৭) ভারত-রক্ষা নিয়মের ও অর্ডিনান্সের প্রয়োগ

(৮) পাইকারী জরিমানা

৪ঠা বৈশাখ পর্য্যন্ত খাজা সার নাজিমুদ্দীন—"বর্ণ হিন্দু" সদস্য না পাওয়ায় সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিতে পারিলেন না। কিন্তু ঐ দিন জানা গেল, কংগ্রেসী বলিয়া পরিচিত কয় জন হিন্দু সদস্য দল ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল ২ জনের নাম উল্লেখযোগ্য—

শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইন

শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী

আর সকলে উল্লেখের অযোগ্য বলিলে অসঙ্গত হয় না।

পরদিন তুলসীচন্দ্র ঐ কয় জনের পক্ষে এক বিবৃতি প্রচার করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন—

(১) খাজা সার নাজিমুদ্দীন যে সহযোগ চাহিয়াছেন, তাঁহাকে তাহাতে বঞ্চিত করা তাঁহারা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না।

(২) তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগের কারারুদ্ধ নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহাদিগের কার্য্য সমর্থন করিবেন।

অবশ্য তাঁহারা খাজা সার নাজিমুদ্দীনের সহযোগের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবেন কি না, তাহা তাঁহাদিগের বিবেচ্য। কিন্তু তাঁহারা শরৎ বাবুর কথা না বলিলেই শোভন হইত। কারণ, শরৎ বাবুর অনুমতি বা অনুমোদন তাঁহারা পান নাই, পাইবার কথাও নহে।

২৩শে এপ্রিল গভর্ণর ঘোষণা করিলেন, খাজা সার নাজিমুদ্দীনের সাহায্যে বাঙ্গালায় সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বড় লাটের সম্মতি লইয়া ২৫শে হইতে বাঙ্গালায় ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা বাতিল করিলেন।

প্রথমে শুনা গিয়াছিল, ঐ দিনই সচিবদিগের নাম প্রকাশিত হইবে; কিন্তু তাহা হইল না। শুনা গেল, তৃতীয় "বর্ণ হিন্দু" দলত্যাগী—শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় তখনও আসরে দেখা দেন নাই—সাজঘরে ছিলেন এবং তাঁহার দলের (জাতীয় দলের) দলপতিকে না কি বলিতেছিলেন—তিনি সচিব হইবেন না!

সে যাহাই হউক, ২৪শে এপ্রিল (১০ই বৈশাখ) শনিবার অপরাহ্ণে সচিবদিগের নাম ঘোষিত হইল এবং দেখা গেল—

শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী
শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইন
শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়
"বর্ণ হিন্দু" ৩ জন তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের হিন্দু
শ্রীপ্রেমহরি বর্ম্মণ্
শ্রীপুলিনবিহারী মল্লিক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

এই ৩ জনের সহিত ৭ জন মুসলমানও একযোগে সচিবসঙ্ঘে বহাল হইলেন।

যে দিন সচিবসঙ্ঘ গঠিত হইল, সেই দিন অপরাহ্নে কলিকাতা টাউন হলে সার হালিম গজনভীর সভাপতিত্বে গভর্ণরের সচিবসঙ্ঘ গঠন-কার্য্য নিয়মানুগ নহে বলিয়া তাহার প্রতিবাদ করা হইল। প্রতিবাদ-সভায় মিষ্টার ফজলুল হক প্রধান বক্তা ছিলেন এবং সেই দিন হইতে গভর্ণর কর্ত্তৃক তাঁহাকে পদত্যাগ করাইবার রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে বহু সভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন।

প্রথম সভায় তিনি বলেন—

(১) কিছু দিন হইতেই বাঙ্গালায় মসলেম লীগ প্রভাবিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছিল।

(২) গভর্ণর তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, তিনি (মিষ্টার হক) বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালায় সর্ব্বদলের প্রতিনিধিতে গঠিত সচিবসঙ্ঘ চাহেন এবং সে জন্য, প্রয়োজন হইলে পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। এখন তিনি পদত্যাগ করুন। সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া সচিবসঙ্ঘ গঠিত হইবে—এই কথায় তিনি পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর দেন। অথচ এখন যে সে সর্ত্ত পালিত হইতেছে না, তাহা অন্যায়।

(৩) মেদিনীপুরের ও ঢাকা জেলের ব্যাপারে তাঁহার সহিত সরকারের স্থায়ী কর্ম্মচারীদিগের প্রবল মতভেদ ঘটিয়াছে।

ঐ সভায় শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—তাঁহারা সকল দলের প্রতিনিধিতে গঠিত সচিবসঙ্ঘের সমর্থক। কিন্তু খাজা সার নাজিমুদ্দীন মসলেম লীগ ব্যতীত অন্য কোন দলের মুসলমানের সহিত একযোগে কায করিতে অসম্মত।

দ্বিতীয় সভায় মিষ্টার হক বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন :—

বাঙ্গালায় চাউলের অভাব হইয়াছে। বাঙ্গালায় যে চাউলের প্রয়োজন তাহার এক-চতুর্থ-ভাগও নাই। চাউল কোথায় গেল? চাউল কি ব্যবসায়ীরা ও গৃহস্থগণ বাঁধাই করিয়াছেন? না তাহা রপ্তানী হইয়াছে? বাঙ্গালা হইতে চাউল রপ্তানী হওয়াই আজ এই অভাবের কারণ। মূল্য বাড়িয়াছে এবং আগামী ফসল সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে মূল্য-হ্রাসের কোন সম্ভাবনা নাই। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা ও স্বয়ং গভর্ণর মেদিনীপুরের ও ঢাকা জেলের ব্যাপারে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, মেদিনীপুরে অনাচারের অভিযোগ যখন ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হয়, তখন প্রধান-সচিবরূপে মিষ্টার ফজলুল হক অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্বন্ধে নানা কথা শুনা গিয়াছে—এমনও শুনা গিয়াছে যে, যে ঝটিকায় ও জলোচ্ছ্বাসে মেদিনীপুরের কল্পনাতীত ক্ষতি হইয়াছে এবং যাহার সংবাদ বহু দিন প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিল, সেই ঝড়ের ঐ পথে গমন-সম্ভাবনার বিষয় আবহ বিভাগ হইতে জানিয়াও কোন বা কোন-কোন রাজকর্ম্মচারী লোককে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করেন নাই! যদি সে অভিযোগ সত্য হয়, তবে তাঁহারা কি প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও, পরোক্ষ ভাবে, বহু প্রাণনাশের জন্য দায়ী নহেন? যিনি তৎকালে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে সে দিন হাইকোর্ট যে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার পর কি তাঁহার ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত করা হইবে?

মিষ্টার হক বলিয়াছেন, গত বৎসর এপ্রিল মাসে এক দিন বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহাকে নৌকাদি অপসারণ বিষয়ে ভারত সরকারের মত জানাইলে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সেই দিনই তাঁহাকে সরকারী কাযে দিল্লী যাত্রা করিতে হয়। ফিরিয়া আসিয়া তিনি জানেন, বাণিজ্য বিভাগের সচিবের সহিতও পরামর্শ না করিয়া গভর্ণরের আদেশে কতকগুলি স্থান হইতে চাউল অপসারণ আরম্ভ হইয়াছে। গভর্ণর এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, সে কাযের জন্য উপযুক্ত ঠিকাদার বাছিয়া লইবার সুযোগও পাওয়া যায় নাই। আর যাঁহাকে ঠিকা দেওয়া হয়, তাঁহার নিকট হইতে দলিল পর্য্যন্ত না লইয়া তাঁহাকে ২০ লক্ষ টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। ঐ বিষয়ে সরকারের ব্যবহারাজীবদিগের মতও গৃহীত হয় নাই এবং তাঁহারা ঐ কাযের বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। শেষে আরও কয় জন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা যখন সরকার-দত্ত ক্ষমতা লইয়া মফঃস্বলে ধান্য ও চাউল ক্রয় আরম্ভ করেন, তখন লোকের সর্ব্বনাশ সূচিত হয়—বাঙ্গালার অর্থনীতিক ব্যবস্থা ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়। তাঁহাদিগের কেহ কেহ ৩ টাকা মণ দরে ধান কিনিয়া কলিকাতায় ১৪ টাকা মণ দরে বিক্রয় করেন।

এই অবস্থায় আবার নৌকা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় লোকের আরও দুরবস্থা অনিবার্য্য হয়। আমরা জানি, কোন কোন স্থানে কোন কোন কর্ম্মচারী সোৎসাহে নৌকা পুড়াইয়াও দিয়াছিলেন। এই নিয়ন্ত্রণ-ফলে লোকের অসুবিধার একশেষ হয়।

মিষ্টার হক বলিয়াছেন, যে রাজকর্ম্মচারীটি যান-নিয়ন্ত্রণের কায করেন, সচিবদিগকে তাঁহার কাযে কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যের জন্য যে কয় জনকে গভর্ণর বাছাই করিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিয়োগের ও কার্য্যের দায়িত্ব সচিবদি[গের] নহে। এক ব্যক্তির নিয়োগ-সম্পর্কে ভারতীয় বণিক্ সমিতি যখন এক জন ভারতীয়কে নিযুক্ত করিতে বলেন, তখন সচিবদি[গের] সে বিষয়ে প্রদত্ত অভিমত গভর্ণর অগ্রাহ্য করেন এবং বলেন বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কাযে সচিবরা যেন কোনরূপ হস্ত[ক্ষেপ] না করেন। মিষ্টার হক বলিয়াছেন, তিনি গভর্ণরকে বলিয়াছি[লেন] —তাঁহার (গভর্ণরের) ঐরূপ কার্য্য নিয়মানুগ নহে।

আজ বাঙ্গালায় যে অন্নাভাব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য ভূত[পূর্ব্ব] সচিবসঙ্ঘ দায়ী নহেন। কে বা কাহারা দায়ী, তাহা মিষ্টার [হক] প্রকাশ করিয়াছেন। গভর্ণরের পক্ষ হইতে কি তাঁহার উপস্থা[পিত] অভিযোগের প্রতিবাদ করা হইবে?

আর এক সভায় মিষ্টার হক তৎকালীন ডিরেক্টার

সিভিল সাপ্লাইজের সম্বন্ধে অত্যন্ত গুরু অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন :—

তিনি না কি শিল্পকেন্দ্রসমূহে চাউলের জন্ত সমস্ত চাউল মেসার্স শা ওয়ালেস কোম্পানীকে দিয়াছিলেন এবং তাহাতে য়ুরোপীয়েরাই উপকৃত হইয়াছে। তখন কলিকাতার লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছিল। আর সেই কোম্পানীরই এক জন ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছিলেন—সচিবসঙ্ঘ খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই!

আর এই য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের সমর্থনই খাজা সার নাজিমুদ্দীন ও তাঁহার সচিবদিগের প্রধান সম্বল!

বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অবস্থা যে শোচনীয়, তাহা নূতন প্রধান-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীনও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—নূতন সচিবসঙ্ঘের সাফল্য খাদ্য-দ্রব্য সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভর করিবে। বাঙ্গালায় চাউল ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা মণ বিক্রয় হইতেছে। অথচ মধ্য-শ্রেণীর দরিদ্র বাঙ্গালী পরিবারের মাসিক আয় ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা; আর শ্রমিকের মাসিক আয় ১৮ টাকা। "ইহারা যে (চাউলের দর ৩৫ টাকা হইতে ৪০ টাকা মণ হওয়ায়) কিরূপে বাঁচিয়া আছে, তাহা ভগবানই জানেন!"

মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন, খাদ্য-সমস্যার বর্ত্তমান অবস্থা বাঙ্গালা হইতে চাউল রপ্তানীর এবং ধান ও চাউল সরানর জন্তই ঘটিয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে মিষ্টার হকের মতেরই সমর্থন করেন।

খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন বটে, তিনি যে সচিব-স[ঙ্ঘ] গঠিত করিয়াছেন, তাহা প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাহা স্বীকা[র] করা যায় না। কারণ, সে সচিব-সঙ্ঘে মুসলমানদিগের মধ্যে যেম[ন] মসলেম লীগ দল ব্যতীত অন্য কোন দলের কেহই নাই, তেমনি আবার :—

(১) বর্ণ হিন্দুদিগের মধ্যে যে দল শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃ[ত্ব] স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলেন, সে দলের ২ জন দলত্যাগী সদস্য ব্যতীত আর কেহ নাই; এবং

(২) জাতীয় দলের যিনি সচিবসঙ্ঘে যোগ দিয়াছেন, তিনি না কি সচিব হইবার ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্বেও তাঁহার সচিবত্ব স্বীকারের কথ[া] অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং তিনি দল হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন।

(৩) জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মাতাব ও মহারাজ শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী সচিবসঙ্ঘে যোগ দিতে সম্মত হয়েন নাই।

(৪) কৃষক-প্রজা দলের কোন প্রতিনিধি সচিবসঙ্ঘে নাই।

সর্ব্বোপরি কথা—সচিব হইবার পর খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন, তাঁহারা মসলেম লীগের কার্য্যকরী সমিতির ও কাউন্সিলের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

যদি বাঙ্গালার রাজনীতিক কার্য্য—কেবল বাঙ্গালার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সকলের স্বার্থে লক্ষ্য রাখিয়া—কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান-নিরপেক্ষ হইয়া করা সম্ভব না হয়, তবে বাঙ্গালার—অন্যান্য সম্প্রদায় ও দল কখনই এই সচিবসঙ্ঘের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানের দাবী মানিয়া লইবে না।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিধির সংস্কার

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকার হিন্দু-সমাজের সংস্কার-কল্পে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। হিন্দু সমাজের উত্তরাধিকার বিধির সংস্কার, বিশেষতঃ হিন্দু-নারীগণের দায়াধিকার দানই সরকারের বিবৃত উদ্দেশ্য। প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা নিরূপণ করা অতি দুঃসাধ্য।

মহামান্যা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে স্বহস্তে [রা]জ্যভার গ্রহণ করিবার সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাতে [ব]লা হইয়াছিল—বৃটিশ সরকার কোন দিন হিন্দু ও মুসলমানের [দা]য়াধিকার ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এত দিন [তা]র সেই মত কার্য্যও হইয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি এই নীতির [আ]মূল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সদ্দা-আইনে [হি]ন্দু বালিকাদিগের বিবাহের বয়স ন্যূনকল্পে ১৪ বৎসর নির্দ্ধারণ করা [হ]ইয়াছে। এই ব্যাপারে সনাতন হিন্দুসমাজভুক্ত সকল লোকই তীব্র [প্র]তিবাদ করিয়াছিলেন। তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। ব্রাহ্ম, ইউরোপীয় [শি]ক্ষিত প্রগতি-মতাবলম্বী সম্প্রদায় ও কতিপয় শ্রেণীর লোকের [স]হায্যে ও উদ্‌যোগে ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। সরকার-পক্ষে [ভো]টাধিক্য হওয়ায় উহা সম্ভবপর হয়, আর শক্তিমান্ সরকারের ভোট সংগ্রহ করা যে কিরূপ সহজসাধ্য ব্যাপার, তাহা বাঙ্গালার [রাজনৈ]তিক ইতিহাস-অনুধাবনকারী লোকমাত্রই অবগত আছেন।

সম্প্রতি হিন্দু স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার-নিরূপণে এবং স্ত্রীলোকদিগকে স্বামী বা পিতার সম্পত্তিতে অত্যধিক অধিকার দিবার জন্ত সরকার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা অকারণে এবং সনাতন হিন্দুসমাজের নর-নারীর বিনা-আবেদনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন; এবং সেই কমিটির অনুমোদন-অনুসারে এই আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সমিতিতে পেশ করিয়াছেন। আইনটি সমিতির অনুমোদিত হইলে ফল দাঁড়াইবে এই যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজের সম্পত্তির উইল না করিয়া পরলোক গমন করেন, তবে তাঁহার কন্যারাও পুত্রদিগের সহিত তাঁহার সম্পত্তির অংশভাগিনী হইবেন। এই প্রস্তাব লইয়া ভারতের নানা স্থানে আন্দোলন চলিতেছে ও কয়েক জন শিক্ষিতা মহিলা পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাঁহাদের ন্যায়তঃ অধিকার দাবী করিতেছেন। এবং তাঁহাদের এই আন্দোলন যে সরকারের অনুমোদন, সমর্থন ও সাহায্য পাইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্র-মতে পুত্র থাকিতে কন্যার পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ লইবার কোন বিধান পাওয়া যায় না। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারগণকে অন্যায়দর্শী ও হিন্দু নারীদিগের দায়াধিকার-বিরোধী বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে। হিন্দু সমাজের মৌলিক নীতি অন্যান্য

সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিন্দু-মতে সম্পত্তি মাত্রই কুলজাত ব্যক্তিদিগের ভরণ-পোষণ ও জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্ম নির্দ্ধারিত ছিল। পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই সম্পত্তির ভোগ-দখলের ব্যবস্থা ছিল এবং পিতৃ-পিতামহের পিণ্ডদান, কুলগৌরব-রক্ষা, পিতৃ-পিতামহের ঋণশোধ ও সামাজিক কর্ত্তব্য-পরিপালনের ভার পুত্রদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। এযাবৎ এই নীতিতেই হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে।

এইরূপ নীতি সত্ত্বেও কন্যাদিগকে হিন্দুশাস্ত্রকার একেবারে বঞ্চিত করেন নাই। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" এবং "পুত্রেণ দুহিতা সমা" ইহাও মনু স্মৃতিকারের মত। পুত্রহীন পিতার সম্পত্তি পোষ্যপুত্রাভাবে কন্যার ভোগ্য এবং কন্যাদিগের জীবনান্তে এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ দৌহিত্রগামী হইবে, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের মত। যৌবন-প্রারম্ভে কন্যার বিবাহ দেওয়া ও যথাসাধ্য অলঙ্কারা-ভরণ দান করিয়া কন্যাকে শিক্ষিত কুলশীলবান্ বরের হস্তে সমর্পণ করার ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন। কন্যা ভিন্নগোত্র-গামিনী হইবেন ও স্বামীর শ্বশুরকুলের ধনে অধিকার লাভ করিবেন, ইহা তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল। কন্যার বিবাহে যথাসাধ্য ব্যয় আজিও ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে করিয়া থাকেন এবং ইহার ফলে অধিকাংশ গৃহস্থ ও মধ্যবিত্ত লোক সর্ব্বস্বান্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন, ইহাও সকলে অবগত আছেন। ইহা ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রকার বহু প্রকারের স্ত্রীধনের উল্লেখ করিয়াছেন। পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, বন্ধুদত্ত ও স্বোপার্জ্জিত ধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে। এক সময়ে ইংলণ্ডে নারীরা নিজ নামে ধনাধিকারিণী হইতে পারিতেন না। কেহ নিজের কন্যাকে কোন সম্পত্তি বা অর্থ দিতে ইচ্ছুক হইলে কোন পুরুষকে উহা দান করিতেন, তিনি ঐ নারীকে উক্ত সম্পত্তির আয় দিতে স্বীকৃত হইতেন। নারীরা নিজের নামে মোকদ্দমায় বাদী বা প্রতিবাদী হইতে পারিতেন না; কেন না নারী Femme covert বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বহু আন্দোলনের পর স্ত্রীলোকদিগের ঐ সকল নৈতিক বাধা (Legal disabilities) বিদূরিত হয়।

ইংরেজ এবং মুসলমান নারীর বর্ত্তমানে যে সকল অধিকার আছে, সেইরূপ অধিকার হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে দিবার চেষ্টা হইতেছে।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন—যাঁহারা বলেন যে, বিলাতের আদর্শে ভারতীয় সমাজ সংস্কৃত হইলেই ভারতীয় লোকের উন্নতি হইবে এবং ভারত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবে! ইঁহারা ভারত-ললনাকে জাগাইবার জন্য উদযোগী হইয়া উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন! কিন্তু এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজের যে কি ঘোরতর ক্ষতি হইবে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে চাহেন না। আমাদের ধারণা, এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে নিম্নলিখিত কুফল ঘটিবার সমধিক আশঙ্কা আছে।

১। হিন্দু বিশেষতঃ সনাতনী হিন্দুর সমস্ত অধিকার পদদলিত হইবে। অহিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী, ব্রাহ্ম, শিখ প্রভৃতির সাহায্যে সরকার হিন্দু-দলনে আরও উত্তোগী হইবেন। সনাতনী হিন্দুর কি কর্ত্তব্য, তাহা অহিন্দু মাত্রেই নির্দ্দেশ করিতে থাকিবে। জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ আরও দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে। মুসলমান সমাজের বহু-বিবাহ-নিষেধে সরকার সাহসী হন না, কিন্তু হিন্দুর সর্ব্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ বিপর্য্যস্ত করিতে চাহেন! বলা বাহুল্য, সম্প্রতি সরকার সমগ্র ভারতের হিন্দু নারীর প্রতিনিধিরূপে এক জন ব্রাহ্ম-মহিলাকে রাষ্ট্রীয় সমিতিতে মনোনীত সভ্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন! যদি জনমত ও ডিমোক্রেসী মানিতে হয়, তবে ইহার সঙ্গে অন্ততঃ লোকসংখ্যার অনুপাতে অন্যূন ২০০০০ হিন্দু মহিলার মত গ্রহণ করুন বা ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে সভ্যা করুন!

২। হিন্দু সমাজ ও হিন্দু পরিবারগুলির মধ্যে নূতন কলহের সৃষ্টি হইবে। ভ্রাতা ও ভগিনীতে প্রত্যেক পরিবারে মনোমালিন্য হইবে এবং বাহিরের লোক—জামাতা প্রভৃতি আসিয়া প্রত্যেক পরিবারে কলহের সৃষ্টি করিবে। একবার মামলা আরম্ভ হইলে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত ও ধনী পরিবার বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে ও অনেক টাকা উকিল, ব্যারিষ্টার, এটর্নী ও আদালতের পেয়াদারা খাইবে। ষ্ট্যাম্প প্রভৃতিতে সরকার অবশ্য অনেক টাকা লাভ করিতে পারিবেন।

৩। যৌথ পরিবার একেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই আইন পাশ হইলে উহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। দেশে দারিদ্র্য বাড়িবে। গৃহস্থ-পরিবারের একেই তো অভাব-অনটনের সীমা নাই, তখন সেই অবস্থা আরও ভীষণতর হইয়া উঠিবে।

৪। এই আইনের কার্য্য নিবারণের জন্য তখন প্রত্যেক লোককেই মধ্য-বয়সে উইল করিতে হইবে এবং উহাতেও সরকার এবং উকিল-শ্রেণীর বিশেষ সুবিধা হইবে।

৫। সর্ব্বশেষ হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পিতৃ সম্পত্তিতে নিগূঢ় স্বত্ব স্থাপিত হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতা-স্রোত আরও প্রবলতর হইবে। পিতৃ-সম্পত্তিশালিনী কন্যার বর বা অনুরাগী পুরুষের অভাব হইবে না। এই আইন প্রবর্ত্তনের ফলে অনেক যুবতী হয়তো Civil marriage এ আবদ্ধ হইতে পারেন।

৬। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, হিন্দু মাত্রেই এই আইনের বিষময় ফল উপলব্ধি করুন এবং একযোগে দেশব্যাপী প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হউন। আগামী জুন মাসে Select committeeর অধিবেশন হইবে। ইহার পূর্ব্বেই হিন্দু সমাজের সকল সম্প্রদায় হইতে প্রতিবাদ দিল্লীতে পৌঁছান উচিত। এই ঘোর দুর্দ্দিনে লোক যখন প্রাণরক্ষার চিন্তায় আকুল ও লোকের অন্নচিন্তা ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে, তখন সরকারের এই আইন করিবার কোন যুক্তিযুক্ত অধিকার নাই। উপস্থিত (যত দিন যুদ্ধ না মিটে) এই আইনের আলোচনা স্থগিত থাকুক এবং ভবিষ্যতে যখন এই ব্যাপারের পুনরালোচনা হইবে, তখন কেবলমাত্র হিন্দুদিগের মত লইয়া আইন সংস্কারের চেষ্টা হউক। তখন হিন্দু দুহিতা, বিধবা, পুত্রবধূ প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ বা অভাব না হয়, এই ভাবে চিন্তা করিয়া প্রচলিত আইনের সংস্কার করা কর্ত্তব্য। অহিন্দুর দ্বারা হিন্দু সমাজ-সংস্কার ন্যায় ও নীতি বিগর্হিত। সকলেই এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহার যথাশক্তি প্রতিবাদ করুন। আশা করি, হিন্দু মহাসভাও এই মর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইবেন এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে হিন্দু সমাজের স্বার্থানুযায়ী পন্থা অবলম্বন করিবেন।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ, বি-এল, অধ্যাপক)।

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্থান পূরণ

গান্ধীজীর উপবাস উপলক্ষে বড়লাটের সহিত মতানৈক্য বশতঃ সদস্য-পদে অধিষ্ঠিত মিষ্টার এম, এস, এনি, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং মিষ্টার হোমি মোদি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন সেই তিন জন সদস্যের স্থানে সার মহম্মদ আজিজুল হক, সার অশোককুমার রায় এবং ডক্টর এন্, বি, খারে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বড়লাটের সভাশোভন হইবেন। সার আজিজুল হক প্রতিভাশালী বাঙ্গালী। সার অশোকও তাহাই; ব্যবহার-শাস্ত্রে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীযুত নারায়ণভাস্কর খারে কংগ্রেসের লোক। ইনি এখন ভারত সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য হইলেন। ইঁহারা যোগ্য ব্যক্তি। তবে ইঁহারা যে ভাবে শাসন পরিষদে নিযুক্ত হইলেন, সে ভাবে সদস্য নিয়োগের পক্ষপাতী আমরা নহি। যেখানে **A breath can make them as a breath has made,** যেখানে এক নিশ্বাসে উত্থান-পতন,—সেখানে কি কেহ নির্ভীক ভাবে এবং পূর্ণ স্বাধীনতা প্রকাশ করিয়া কাজ করিতে পারেন? যেখানে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই, সেখানে এত টাকা দিয়া সদস্য-নিয়োগের সার্থকতা কোথায়?

বে-আইনী আইন

৮ই বৈশাখ ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় ফেডারাল কোর্টের বিচারপতি সার মরিস গাইয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারত-রক্ষা আইনের ২৬ ধারা যে আকারে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, সে আকারে তাহা প্রবর্ত্তন করা অবৈধ। এখন প্রায় ৮ হাজার লোক মায় মহাত্মা গান্ধীজী এই বে-আইনী আইনের জালে আবদ্ধ হইয়া বহু দিন আটক রহিয়াছেন। এ স্থলে আইনের তর্ক নিষ্প্রয়োজন। ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির রায় পড়িয়া নয়া দিল্লীতে এবং বিলাতের হোয়াইট হলে বিশেষ চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হইয়াছে। ভারতীয় ঐ আট হাজার ব্যক্তিকে সরকার আইনী ভাবে অথবা বে-আইনী ভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছেন, এখন সে বিচার তাঁহারা করিতে চাহেন না; কিন্তু তাঁহারা যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিয়াছেন, সে-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানিতে সম্মত নহেন,—তবে ঠাট্-বজায় রাখিয়া কি উপায়ে অর্ডিনান্সে জোড়াতালি দিয়া তাহাকে সচল রাখিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছেন। শাসন বিভাগের রাজপুরুষদিগের ইচ্ছায় সঙ্কটকালে বিশেষ কঠোর আইন সময়ে সময়ে প্রণয়ন করিতে হয় সত্য, কিন্তু কোন গণতান্ত্রিক দেশে শাসন বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে নাগরিকদিগের মূল স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয় না। ম্যাগনা কার্টা প্রণীত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বিলাতে নাগরিকদিগের অধিকার এইরূপ স্বৈরিতার সহিত কখনও ক্ষুণ্ণ করিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কিন্তু ভারতে উহা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় আইন দ্বারা শাসন হইতেছে, কোথায় স্বৈরিতার দ্বারা শাসন হইতেছে, তাহা বুঝিতে লোকের আর বাকি থাকে না। আবার কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিশেষ আদালতে [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন যে, অর্ডিনান্সের অন্তর্ভুক্ত ৫, ১০, ১৪ এবং ১৬ ধারা স্বকীয় ক্ষমতা লঙ্ঘন করিয়া প্রণয়ন করা হইয়াছে আইন এখন যেমন-তেমন ভাবে প্রণীত হইতেছে! বিশেষ আদাল যে ভাবে বিচারকার্য্য সমাধা করিতেছেন, তাহাতে নিয়মতান্ত্রিক দেশ ছাড়িয়া পলাইতে বসিয়াছে, স্বেচ্ছাচারেরই জয়-জয়কার!

সাক্ষাতে আপত্তি

মার্কিণী প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি মিষ্টার ফিলিপস্ এদে দেখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সংবাদ-দাতাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন যে, গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং কথা কহিবার তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল,—তিনি ঐ বিষয়ে উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা সে অনুমতি দে নাই। এই ব্যাপার লইয়া মার্কিণের এবং বিলাতের সংবাদপত্র মহলে বিলক্ষণ আলোচনা হইতেছে। ওয়াশিংটন পোষ্ট প্রভৃতি বলিতেছে যে, মিষ্টার ফিলিপস্‌কে গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং আলাপ করিতে না দিয়া ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ভুল করিয়াছেন। গান্ধীজী সহিত যদি মিষ্টার ফিলিপস্ দেখা করিবার সুযোগ পাইতেন,—তাহা হইলে আকাশ ভাঙ্গিয়া শাসকবর্গের মাথায় পড়িত না,—সামরিক আয়োজনেও বিপর্য্যয় ঘটিত না। তবে তাঁহাকে মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল না কেন? ওয়াশিংটন পোষ্টের লেখক বলিয়াছেন যে, পাছে ভারতবাসীরা মনে করে যে, মার্কিণ ভারতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন এই শঙ্কায় কর্ত্তৃপক্ষ ফিলিপস্‌কে গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে দেন নাই। এটা নিতান্তই অজ্ঞতার কথা। ভারতবাসীরা তত অজ্ঞ নহে। যাহাদের মনে পাপ আছে, তাহারা ঝোপে-ঝাপে ভূত দেখে এবং সামান্য ব্যাপারেই আতঙ্কিত হয়!

স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞাপত্র

২৫শে চৈত্র ওয়ার্দ্ধায় দায়রা জজ মিষ্টার মধোলকারের বিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞাপত্র নিকটে থাকিলে তাহাতে অপরাধ হয় না। দুই জন ছাত্র এবং দুইটি নারী স্থানীয় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাহাদের নিকট স্বাধীনতার অঙ্গীকার-পত্র ছিল বলিয়া অভিযুক্ত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দিয়াছিলেন। দায়রা জজের নিকট ঐ মামলার আপীল হয়। বিচারপতি বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া বলেন যে, ঐ স্বাধীনতার অঙ্গীকারপত্রে বৃটিশ সরকারকে বিপর্য্যস্ত করিবার মত কোন কথাই নাই। প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারী এই প্রতিশ্রুতি পঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু সে জন্য কাহাকেও অভিযুক্ত করা হয় নাই। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সরকার উহা নিষিদ্ধ করেন নাই। অতএব উহা কাছে থাকা দোষের নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যরূপ কেন বুঝিলেন, তাহা বুঝা গেল না। সূর্য্যতাপ অপেক্ষা প্রতপ্ত বালুকা যে অধিক অসহনীয় হয়,—ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ!

লীগ সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান নহে

১৪ই বৈশাখ দিল্লী সহরে যে মোমিন সম্প্রদায়ের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত সম্মেলন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মিষ্টার জিন্না নিখিল ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, এ কথা কোন মতেই

বলিতে পারেন না। নিখিল ভারতে যে দশ কোটি মুসলমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাড়ে চারি কোটি মুসলমান মোমিন সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহারা মোমিন সম্মেলনকেই কেবল তাঁহাদের মুখপাত্র প্রতিষ্ঠান বলিয়াই জানেন এবং মানেন। অন্য কাহারও নেতৃত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না। মিষ্টার জিন্না এবং তাঁহাকে যাঁহারা উচ্চ মঞ্চে চড়াইয়াছেন—তাঁহারা এ সব কথা কাণেই তুলেন না! কারণ, যাহার জবাব দেওয়া অসম্ভব, তাহা কাণে না তোলাই মস্ত রাজনীতিক চাতুরী। মোমিন সম্প্রদায় মিষ্টার জিন্নার পাকিস্থান পরিকল্পনার ঘোর নিন্দা করিয়াছেন। উক্ত সম্মেলনে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। ভারতকে বিভক্ত করিলে সকল সম্প্রদায়েরই ঘোর অসুবিধা ঘটিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজাদ সম্মেলনও পাকিস্থানের পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সিয়া সম্প্রদায়ও ইহার পক্ষপাতী নহেন। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় ৯ কোটি প্রকাশ্যে এবং অন্তরে পাকিস্থানের বিরোধী। তথাপি মিষ্টার জিন্না নাছোড়বান্দা! ইহাতে তিনি কাহার বা কাহাদের ইঙ্গিতে চালিত হইতেছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না!

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালায় সত্য সত্যই এবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রকাশ, বাঙ্গালায় বহু স্থানে লোক অনাহারে মরিতেছে। চাউলের মূল্য মফঃস্বলে দিন দিন অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে—কাজেই বহু লোক অন্নাভাবে কদন্নভোজন করিয়া উদরাময় প্রভৃতি রোগে মরিতেছে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয় প্রধান-সচিব মৌলভী ফজলুল হক ২১শে বৈশাখ দেশপ্রিয় পার্কে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন—"চাষীরা ক্ষুধার তাড়নায় বীজ-ধান খাইয়া ফেলিয়াছে, ঘাস খাইয়া মরিতেছে। 'অন্ন চাই অন্ন চাই' রবে চারি দিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। যে সকল জিলায় অধিক পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, সেই সকল জিলার দুর্গতি বর্ণনাতীত। কোথাও কোথাও লোক মরা গরু, ভেড়া প্রভৃতি খাইয়া কোন প্রকারে জঠরের তীব্র জ্বালার উপশান্তি করিতেছে। ইহা অপেক্ষা ভীষণ অবস্থা আর কি হইতে পারে?" সার জন হার্বার্ট নিজ প্রভুত্ব-বলে এই সময়ে লীগদলকে সচিবত্বের গদী দিলেন, কিন্তু এখন যদি সচিবসঙ্ঘ এই দারুণ সমস্যার সমাধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ত' আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না! অন্ন-সমস্যার সমাধানে অসমর্থ বলিয়া যাঁহারা ভূতপূর্ব্ব সচিবসঙ্ঘের বিরুদ্ধে বার বার আস্থাহীনতার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যে এখন আপনাদের কথায় আপনারাই দোষী হইতেছেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বেসরকারী সরবরাহ বিভাগের সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী সে দিন ডক্টর নলিনাক্ষ সান্ন্যালের উক্তির প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, "কৃষকগণ, বিশেষতঃ সম্পন্ন কৃষকগণ—বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের শস্য বাজারে বিক্রয় করিতেছে না। উহার কতকগুলি কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহারা দেখিতেছে যে, খাদ্যশস্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে।" এ কথা কিছু সত্য হইতেও পারে। কিন্তু এইরূপ চাষী কয় জন? এবং তাঁহারা কত চাউলই বা গোপন করিয়া রাখিয়াছে? আমাদের মনে হয়, চাষীদিগের হাতে এখন আর এত অধিক ধান নাই, যাহা বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিলে চাউলের মূল্য বিশেষ ভাবে কমিয়া যাইবে। মিষ্টার সুরাবর্দ্দী আরও বলিয়াছেন যে, তিনি যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ধানের মূল্য হ্রাস পাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। এরূপ অবস্থায় এ সময়ে ঐ সকল কৃষকের ধান বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করা উচিত। আমরাও সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু যদি তিনি প্রচুর পরিমাণে ধান বা চাউল বাঙ্গালায় উপস্থিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই স্বর্ণ-প্রসূ বাঙ্গালায় অচিরে উৎকট দুর্ভিক্ষের নরকঙ্কাল-চিহ্নিত বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইবে। সত্য বটে, বাঙ্গালার অনেক স্থানে সরকার নৌকা-চালনায় বাধা অপসারিত করিয়াছেন, কিন্তু এখন অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নৌকাযোগে আর ধান্য প্রেরণ নিরাপদ নহে। বহু স্থানে নৌকা হইতে ধান্য ও চাউল লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ১৬ই বৈশাখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে বাঙ্গালায় নানা স্থান হইতে চারি শতেরও অধিক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। খাদ্য-শস্যের অভাবের জন্যই এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, এত ডাকাতি ত' পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। ইহা ভিন্ন চাউল চুরি, তরকারী চুরি, এমন কি ভাত চুরি পর্য্যন্ত হইতেছে। সরকার শেষে নৌকা সে-ই ছাড়িয়াই দিলেন,—কিন্তু সময় থাকিতে দেন নাই! সম্মুখে এখন ঘোর দুঃসময়। সচিবমণ্ডলের এখন সর্ব্বাগ্রে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত; নতুবা এবারকারের এই দুর্ভিক্ষের ভীষণত্ব ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরকে ছাপাইয়া যাইবে।

শুধুই কি গর্জ্জন?

বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের সাধারণ সরবরাহ বিভাগের সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ডাক দিয়া বলিতেছেন যে, বাঙ্গালায় যেরূপ উচ্চমূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, তাহা হওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। প্রধান-সচিব সার নাজিমউদ্দীন সচিবের তখ্‌ত্‌ পাইয়াই বলিতেছেন, বাঙ্গালায় চাউল ত্রিশ হইতে চল্লিশ টাকা মণ বিকাইতেছে, ইহা সত্য; কলিকাতার উপকণ্ঠে ২৪ পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে মোটা চাউল ত্রিশ টাকা মণ দরেও পাওয়া যাইতেছে না! বাজারে চাউল অল্পই আছে। ইতোমধ্যেই লোকে না খাইতে পাইয়া মরিতেছে শুনা যাইতেছে। অতএব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী—যথার্থই যদি উপকার করিতে চান—তবে ভাঁওতা ছাড়িয়া সত্বর প্রতিকারের সুব্যবস্থা করুন। আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। উহার ফল অত্যন্ত ভীষণ হইবে।

দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—বাঙ্গালায় চাউলের দর—মণ ৩২ টাকা ৭ আনা; আর পূর্ণিয়ায় (বিহার) ১৩ টাকা, বেরিলীতে ১০ টাকা ৪ আনা ৯ পাই, রায়পুরে ৮ টাকা ৬ আনা; বেজাওয়াদায় —৭ টাকা ১১ আনা ১ পাই, কটকে ৬ টাকা ৮ আনা, সিন্ধুতে ৬ টাকা ৪ আনা। এই বৈষম্যের কৈফিয়ৎ সত্বর প্রয়োজন।

বার্ণার্ড শ'য়ের পরামর্শ

মিষ্টার জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' বিলাতের এক জন বিখ্যাত চিন্তাশীল মনীষী, সুলেখক। তাঁহার বয়স এখন ৮৭ বৎসর। সুতরাং প্রবীণত্বের হিসাবেও ইনি সুধী সমাজের অগ্রগণ্য। 'হিন্দু'র দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা সংবাদ দিয়াছেন যে, ইঁহাকে ভারতীয় সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। উত্তরে তিনি বলেন, অবিলম্বে সম্রাটের গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া এবং যে সচিবমণ্ডল তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিয়াছেন,—তাঁহাদের বুদ্ধিহীনতার জন্য ত্রুটি স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন না! প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক এবং ঐতিহাসিক মিষ্টার ওয়াল্টার কেনস্ হলও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বড়লাটকে ফিরাইয়া লইয়া আইস এবং সম্মিলিত জাতিগুলির মধ্যস্থতায় ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার দাবী পূর্ণ করিতে হইবে। 'কারেণ্ট হিষ্টরি' নামক বিখ্যাত মার্কিনী পত্রে তিনি এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি আইসে যায়? যতক্ষণ ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী উইনষ্টন চার্চ্চিল এবং আমেরী ভারতের ভাগ্যস্থানে রন্ধ্রগত শনি-রূপে বিরাজ করিতেছেন, ততক্ষণ কিছুই হইবে না! অতীতে এমন ভুলের ফল অত্যন্ত সুদূরগামী হইয়াছে। স্বার্থান্ধ যুক্তিতে তাঁহারা যদি তাহা না দেখেন, তাহা হইলে দেখাইয়া দিবে কে?

কাগজের বাজার

ভারত সরকার শতকরা ১০ ভাগ কাগজের পরিবর্ত্তে ৩০ ভাগ কাগজ এ দেশের লোকদিগকে দিবেন বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার ফলে ত কাগজের মূল্য কমিল না, কাগজও মিলিতেছে না! কাগজের মূল্য ক্রমেই বাড়িতেছে! ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিষ্টার এন, আর, পিলেই যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আসল কথা বুঝা যাইতেছে না। ভারত সরকার কি পরিমাণ কাগজ ভারত হইতে বিদেশে পাঠাইতেছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন না কেন? তাঁহারা বলিতেছেন, কাগজের চালান অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে কি বুঝিব? সরকারই বা কত কাগজ গ্রাস করিতেছেন, তাহাও বলিতেছেন না! এ সকল বিষয়ের সংবাদ-দানে সরকারের এত সঙ্কোচ কেন? শত্রুপক্ষ ঐ সংবাদ পাইলে কি কাগজ লইয়া লড়াই করিবে? সবই অদ্ভুত! এ দিকে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া যে বন্ধ হইয়া গেল!

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের স্বার্থ-বিরোধী আইন

দক্ষিণ আফ্রিকায় য়ুনিয়ন সরকার তথায় তিন বৎসরের জন্য ভারতবাসীদিগের স্বার্থের ঘোর-বিরোধী এক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ আইন অনুসারে ভারতবাসীদিগের ন্যায্য অধিকার বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইল। উহাতে ঐ দেশ-প্রবাসী ভারতবাসীর বসতি-স্থান, জমি-গ্রহণ এবং ব্যবসায় করিবার অধিকার যথেষ্ট সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। আইনটি আপাততঃ তিন বৎসরের জন্য প্রণীত হইবে সত্য,—কিন্তু উহা আইন-পুস্তক হইতে যে কস্মিনকালে অপসারিত হইবে, এরূপ আশা আমাদের মনে জাগে না। ব্যবসায়ে তুল্যভাবে প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার ঔপনিবেশিক শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবাসীকে দিতে চাহেন না। এই আইন সম্বন্ধে জোহান্সবার্গের ডীন (পাদ্রী) রেভারেণ্ড পামার বলিয়াছেন, "ইহা হিট্‌লারী মতবাদের ন্যায় ময়লাযুক্ত।" এক জন য়ুরোপীয় এক সময় বলিয়াছিলেন যে, রুশিয়ানদিগকে আঁচড়াইলেই তাহার ভিতর হইতে তাতারের মূর্ত্তি বাহির হইবে। আমরাও তেমনই এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে করি, ব্যক্তিগত সামান্য স্বার্থে আঘাত করিলেই অধিকাংশ য়ুরোপীয় হিটলারী মূর্ত্তি ধারণ করে! সেনাপতি স্মাট্‌স সে দিন গণ-শাসন এবং ন্যায্য ব্যবহারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এই আইন রচিত হইল,—ইহা দেখিয়া কি মনে হয়? মনে হয়, য়ুরোপীয়েরা ন্যায্যই হউক আর অন্যায্যই হউক, সকল প্রকার স্বার্থ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেন

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের জনপ্রিয় সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন সেনের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রগণ মিলিয়া কলেজ-ভবনে বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ভূপতিমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম স্থায়ী ভারতীয় অধ্যক্ষ। দ্বাদশ বৎসর তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষতায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি এখানকার এম-এ পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ইংলণ্ডে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সিনিয়র র‍্যাঙ্‌লার"রূপে খ্যাতি এবং কেমব্রিজের দুর্লভ সম্মান "স্মিথস্‌ প্রাইজ" অর্জ্জন করেন। তাঁহার মত প্রতিভাবান্‌ শিক্ষাব্রতী কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও সৎশিক্ষা-বিস্তারে আত্ম-নিয়োগ করিবেন, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

রামানন্দ-জয়ন্তী

আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ 'প্রবাসী', ও 'মডার্ণ রিভিউ'র স্বনামধন্য সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মদিন। ঐদিন তাঁহার ৭৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে বাঙ্গালার সাংবাদিকগণ তাঁহার জয়ন্তী করিবার মনস্থ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ নির্ভীক ভাবে দীর্ঘকাল নিষ্ঠাসহকারে রাজনীতিক সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালার গৌরবের বিষয়। আমরা তাঁহার দেশহিতৈষণা ও জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনার জন্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

অবসর গ্রহণ

যে সকল বাঙ্গালী বাঙ্গালার বাহিরে থাকিয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন, শ্রীযুত কালীনাথ রায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি প্রায় ২৫ বৎসরের অধিক কাল লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদকতা করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার লেখা যে সারগর্ভ, তাহা ইংরেজ ও ভারতবাসী নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। বিলাতে লর্ড লোথিয়ান যখন ভারতীয়দিগের পক্ষ সমর্থন করেন, তখন তিনি কালীনাথ বাবুর কতকগুলি লেখা চাহিয়া লইয়াছিলেন। এখন পরিণত বয়সে কালীনাথ বাবু কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। জীবনের সায়াহ্নে, শান্তিলাভের অবসরেও যেন তাঁহার নিপীড়িত স্বদেশবাসীর কল্যাণ সাধনে তিনি বিরত না থাকেন, ইহাই আমাদের কামনা।

জিন্নার আহ্বান

মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না কি প্রকৃতির লোক, তাহা ভারতের জাতীয়তাবাদী জনগণের অবিদিত নাই। তিনি এক সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা দাদাভাই নৌরোজী, গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং সার ফিরোজ সাহের পদতলে বসিয়া রাজনীতিক পাঠশালে হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন! তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা তাঁহার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে—তাহা তাঁহার ভারতীয় জনগণকে, হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীকে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ফতোয়া দেওয়াতেই সুপ্রকাশ! ভারতবাসীদিগকে এরূপ বিভেদ করিয়া বিরোধ জাগাইয়া রাখা কাহাদের প্রদত্ত শিক্ষার ফল, তাহা বিদিত ভুবনে! দাদাভাই নৌরোজী বা গোপালকৃষ্ণ গোখলে কেহই এই দুই ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীকে কস্মিনকালে দুইটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা একটা ফুটা পয়সার দামে নিজ বিচার-বুদ্ধি স্বার্থবাদীদিগের পদতলে কখনও বিকাইয়া দেন নাই! এহেন সর্ব্বজন-বিদিত মিষ্টার মহম্মদ আলি জিন্না ৮ই বৈশাখ দিল্লী

সহরে মুস্লিম লীগের অধিবেশনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি খুব গরম গরম বুলি ঝাড়িয়া এবং থিয়েটারী বীরের ভঙ্গীতে বাক্য বলিয়া লোককে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই বিচিত্র! তাঁহার সুদীর্ঘ ভাষণে সারগর্ভ কোন কথাই ছিল না,—ছিল কেবল কংগ্রেস এবং গান্ধী-বিদ্বেষ। এই কথাগুলি বলিবার জন্ত তিনি তাঁহার মুরুব্বীদিগের সম্মতি নিশ্চয়ই লইয়াছিলেন! তিনি চাহেন পাকিস্থান! তিনি চাহেন জাতীয়তাবুদ্ধি বর্জ্জন! মহাত্মা গান্ধীর উক্তি হইতে বিক্ষিপ্ত ভাবে কতকগুলি কথা তুলিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, গান্ধী ভারতে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। যাহার বুদ্ধি নাই, তাহার সহিত তর্ক করিতে যাওয়াই ঘোর বিড়ম্বনা! তিনি মৌলভী ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। সে-সব কথা এমন হাস্যোদ্দীপক যে তাহার উল্লেখ বা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানের কল্পনায় সকলে সম্মত হইলে আর কি? একেবারে হাতে হাতে স্বরাজ! "অতএব সকলে সম্মিলিত হও এবং ইংরেজদিগকে তাড়াও।" আমরা ইংরেজদিগকে তাড়াইতে চাহি না,—ইংরেজের সহিত শত্রুতাও কামনা করি না। আমরা চাহি জাতীয় ভাবে ভারতের শাসন-যন্ত্র পরিকল্পিত এবং পরিচালিত করিতে। মিঃ জিন্না ত' বলিতেছেন যে, পাকিস্থান কার্য্যে পরিণত না হইলে মিলন হইবে না! কিন্তু সাড়ে চারি কোটি মোমিন কয় দিন মাত্র পূর্ব্বে ঐ দিল্লী সহরে যে সম্মেলন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারাও ত' পাকিস্থানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আজাদ মুসলমান সম্মেলনও পাকিস্থানের সমর্থক নহেন বরং বিরোধী। তবে জিন্নার দলে থাকিল কে? লীগ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন যে, "যদি পাকিস্থান বর্জ্জন করিয়া কোনরূপ রাষ্ট্র সংগঠন করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, ভারতের মুসলমানগণ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাতে বাধা দিবে! ফলে দ্বন্দ্ব, রক্তপাত ও দুর্গতি ঘটিবে এবং তাহার দায়িত্ব কেবল বৃটিশ সরকারেরই হইবে।" কি বীর-দাপটই দেখাইতেছেন! এ বুলি কে শিখাইয়াছে, তাহা কি ভারতবাসী বুঝে না? সমস্ত ভারতীয় মুসলমান হইতে মোমিন, আজাদ, অহ্রর সম্প্রদায় বাদ গেল। বাকী থাকিল ক'টি লোক? মিষ্টার জিন্নাকে 'আক্কেল' দিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা! বিধাতা না দিলে মানুষকে আর কেহ 'আক্কেল' দিতে পারে না!

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের খসড়া

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে হিন্দুদিগের দায়াধিকার সম্বন্ধে রাও কমিটী কর্ত্তৃক রচিত বিলখানি উভয় পরিষদের সম্মিলিত কমিটীর নিকট বিবেচনার্থে প্রেরণ করিবার জন্ত ভারত সরকারের ব্যবস্থা-সচিব মিষ্টার সুলতান আমেদ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। যে সকল ক্ষেত্রে সম্পত্তির পূর্ব্বাধিকারী উইল করিয়া কোন ব্যবস্থা না করিয়া মারা যাইবেন, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই কৃষিজাত সম্পত্তি ব্যতীত অন্ত সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে এই পাণ্ডুলিপি-কল্পিত ব্যবস্থা খাটিবে, ইহাই হইতেছে সাব কমিটীর মূল কথা। এই পাণ্ডুলিপির তিনটি প্রধান কথা এই যে, (১) কৃষি অর্জিত সম্পত্তি ভিন্ন অন্ত সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এই আইন খাটিবে, (২) সাধারণতঃ হিন্দু নারীদিগের সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধে যে কতকটা অক্ষমতা আছে, তাহা দূর করা এই আইনের উদ্দেশ্য; (৩) এই আইন দ্বারা হিন্দু নারীদিগের সীমাবদ্ধ সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থা তিরোহিত করা হইবে। আমরা এই আইনে সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সার সুলতান আমেদ অবশ্য হিন্দু আইন-কর্ত্তাদিগের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু এ কথা সত্য যে, হিন্দু আইন-কর্ত্তারা যে নারীদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার গূঢ় অর্থ আছে। হিন্দু আইন-কর্ত্তাদের মতে বিবাহিতা নারী তাঁহার শ্বশুরের পরিবারভুক্তা। শ্বশুর-কুলের সমস্ত নিয়ম-কানুন ব্রত তাঁহাকে পালন করিতে হয়। সুতরাং তিনি শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ঘোষিত হইবার যোগ্যা। আজ এই ধর্ম্মহীনতার যুগে অনেকে হয় ত' বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বাড়ী হইতে রাস্তায় তাড়াইয়া দিতেছেন—ইহার অবশ্য সত্বর প্রতিকার হওয়া উচিত। হিন্দু শাস্ত্রকারদিগের আমলে এরূপ ধর্ম্মহীন ব্যবহার কল্পনাতীত ছিল; কাজেই তাঁহারা এ বিষয়ে আইন-কানুন কিছু করিয়া যান নাই। এখন তাহার প্রতিকার কর্ত্তব্য হইয়াছে। সেই জন্ত বিধবা পুত্রবধূর এবং ভ্রাতৃবধূর জন্ত কিছু ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহা না করিয়া এইরূপ পারিবারিক বিদ্বেষ-বর্দ্ধক আইন রচিবার ফল কি? উইল করিয়া বিধবা পুত্র-কন্যাহীনা নারীকে বঞ্চিত করা যাইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সন্তানবিহীনা নারীকে অপরিমিত সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া কোন লাভ নাই, উহা অনর্থের কারণ হইতে পারে!

পরলোকে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২৪শে বৈশাখ, রাঁচীতে লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৮২ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথমা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, ডি, উপাধি লইয়া এ দেশে সরকারী চাকরীতে প্রবেশ করেন ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া কিছু দিন কলিকাতায় ডাক্তারী করিবার পর পুরুলিয়ায় যাইয়া বাস করেন। তিনি হিন্দু-সংস্কৃতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নের উপায় চিন্তায় সমাহিত হইয়া, সুধীজন সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া বরণীয় হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু জাতি'—'এ ডাইং রেস' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার সমাজকল্যাণ চিন্তা ও অধ্যয়নের সুফল।

বিক্ষোভ, বোমাবিস্ফোরণ ও গুলীবর্ষণ

সংবাদপত্র—২৭শে চৈত্র—কাশীর 'আজ' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত বিদ্যাভাস্কর গ্রেপ্তার। ২৯শে—নাগপুরের মারাঠী সাপ্তাহিক পত্র 'ভবিতব্যের' প্রতি সরকারের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন লেখা প্রকাশ করিতে নিষেধাজ্ঞা। ৩০শে, সুরাটের 'দেশমিত্র' প্রেসের মালিক শ্রীযুত মগনলাল ভানমলিদাসকে মুক্তি দানের পর ভারতরক্ষা বিধি বলে পুনরায় গ্রেপ্তার। মৌলভী বাজারের (আসাম) 'অভিযান' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত গোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ৮ই বৈশাখ, দিল্লীর 'হিন্দুস্থান টাইম্‌সের' প্রতি সংবাদাদি সরকার দ্বারা পূর্ব্বে পরীক্ষা করাইয়া লইবার আদেশ প্রত্যাহার। ২২শে বৈশাখ—কটকের 'মুক্তি যুদ্ধ' সম্পাদকের উপর জামানত বাজেয়াপ্তের নোটিশ।

কম্যুনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রী—২৬শে চৈত্র—তমলুকে মেদিনীপুরের ১১ জন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী গ্রেপ্তার। ৩০শে—কাণপুরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের সহকারী সম্পাদক কমরেড এস, জি, সার্দ্দেশাহ, কাণপুর মজদুর-সভার সভাপতি কমরেড এস, এস, ইউসফ ও সম্পাদক কমরেড এস, সি কাপুর ভারতরক্ষা বিধির ১২৯ ধারা অনুসারে

গ্রেপ্তার, ময়মনসিংহের সমাজতন্ত্রী কর্ম্মী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মজুমদারের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ৭ই বৈশাখ—শ্রীহট্টের কম্যুনিষ্ট দলের দেবব্রত ভট্টাচার্য্য গ্রেপ্তার ও নীরেন্দ্র দেব দণ্ডিত। মুর্শিদাবাদ জিলার কম্যুনিষ্ট দলের সম্পাদক সনৎকুমার রাহা ও অপর কয়েক-জনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত। ১১শে—সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক দুই জন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী গ্রেপ্তার।

কলিকাতা—২১শে চৈত্র গোয়েন্দা পুলিস কর্ত্তৃক ৫ স্থানে তল্লাসী—কয়েক জন আটক। ৩০শে—কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ের নিকট ৫।৬ খানি ট্রামের ট্রলির দড়ি ছিন্ন, হ্যারিসন রোড ও শ্যামবাজার লাইনের ট্রাম চলাচল বন্ধ। ছয় স্থানে তল্লাসী। ২রা বৈশাখ চারি স্থানে তল্লাসী। ৮ই, দুই স্থানে তল্লাসী, পলাতক বলিয়া বর্ণিত দুই জনকে গ্রেপ্তার। ফেডারাল কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতরক্ষা বিধির ২৬ ধারা অনুসারে ধৃত ১৮ জনকে ১লা বৈশাখ এবং ২ জনকে ১৩ই বৈশাখ মুক্তিদান। শ্রীরামপুর মিউনিসি-প্যালিটীর ভূতপূর্ব্ব কমিশনার শ্রীযুত শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর দুই জন গ্রেপ্তার। ১৪ই বৈশাখ গোয়েন্দা পুলিস কর্ত্তৃক কয়েকটি বোমা, একখানি ছোরা প্রাপ্তি, এ সম্পর্কে ১২ জন গ্রেপ্তার। পরদিবস উত্তর কলিকাতার কোন গৃহে তল্লাসী করিয়া ৮টি বোমা, ১খানি ছোরা কতকগুলি আপত্তিকর দ্রব্য প্রাপ্তি, ১ জন যুবক গ্রেপ্তার। ১৯শে—স্কট লেনের এক ডাষ্টবীনে ৫।৭টি বোমা প্রাপ্তি, একটি বোমা বিস্ফোরণ। রাত্রি ১০টায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট শ্রীনাথ দাস লেনে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুত ইন্দ্রভূষণ বিদের বাটী-সম্মুখে বোমা বিস্ফোরণ।

ঢাকা—২৬শে চৈত্র—থাসারা গ্রামে এক গোয়েন্দা কনষ্টেবল কর্ত্তৃক রাজনীতিক কারণে আত্মগোপনকারী শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। জনতা কর্ত্তৃক কনষ্টেবল প্রহৃত ও বন্দী উদ্ধার। সশস্ত্র পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রামের কয়েক গৃহে তল্লাসী, ৫০ জন যুবক গ্রেপ্তার। ২৭শে,- বোলঘর গ্রামের (মুন্সীগঞ্জ) অধিবাসীদের উপর ৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য।

যশোহর—২২শে বৈশাখ—জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভবন সরকার কর্ত্তৃক দখল।

বর্দ্ধমান—২৬শে চৈত্র—সশস্ত্র পুলিশ দল কর্ত্তৃক রায়না থানার বেরোগ্রাম হইতে শ্রীদুর্গাপদ হাজরা ও শ্রীবিমল হাজরাকে গ্রেপ্তার, ধামাশ গ্রামে হানা দিয়া শ্রীদাশরথি তা, কার্ত্তিক সামন্ত, গঙ্গারাম হাজরা ও গৌরচন্দ্র হাজরার বাড়ী ঘেরাও।

২৪ পরগণা—১১ই বৈশাখ বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের বুভুক্ষু-গণকে ডায়মণ্ড হারবারের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অন্ন-বস্ত্র সমস্যার সমাধানের দাবী উত্থাপন করিতে উত্তেজিত করিবার অভিযোগে কংগ্রেস-কর্ম্মী ভূপাল কর্ম্মকার ও সরোজ মজুমদার ১ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

নোয়াখালী—২রা বৈশাখ পরশুরাম থানার বাসুড়া গ্রামে জেলে আটক শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরীর গৃহে তল্লাসী।

ফরিদপুর—৩১শে চৈত্র ভূতপূর্ব্ব রাজনীতিক বন্দী শ্রীযুত সত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং ভারতরক্ষা বিধির ১২১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার আটক বিধি অমান্তের জন্ত মাদারীপুরে গৌরাঙ্গচন্দ্র দাস ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

ময়মনসিংহ—১৫ই বৈশাখ, একখানি বাজেয়াপ্ত পুস্তিকা প্রাপ্তির সম্পর্কে টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটীর অবসর প্রাপ্ত ওভার-সিয়ার শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস, সপরিবারে গ্রেপ্তার।

মুর্শিদাবাদ—২৬শে চৈত্র সাগরদীঘির কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীরেবতী-নাথ দে ভারতরক্ষা বিধি বলে গ্রেপ্তার। ৩০শে বহরমপুর মিউনিসি-প্যালিটীর কমিশনার শ্রীযুত সন্তোষ ভট্টাচার্য্যকে মুক্তি দান। সোনাতিকুড়ির নিকট ডাক লুঠ।

হুগলী—২৬শে চৈত্র ভাণ্ডারহাটি ডাকঘর এবং য়ুনিয়ন বোর্ড আক্রমণের অভিযোগে ১০ জন দণ্ডিত।

বরিশাল—২৪শে চৈত্র সহরের কয়েক স্থানে তল্লাসী। কতিপয় ছাত্রের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত।

বোম্বাই—২৮শে চৈত্র এক সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিবার সময় নিখিল ভারত খৃষ্টান সম্মিলনের সংগঠন সম্পাদিকা মিসেস ভায়ওলেট আলভা গ্রেপ্তার। সুরাটে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে ৩ জন মহিলা দণ্ডিত; পুলিসের চৌকীতে অগ্নিদানের অভিযোগে একজন গ্রেপ্তার, "বিদেশী আশ্রমের" সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। বেলগাঁওএ তাভাগের কলাইয়া স্বামীর মঠের গুরু চন্দ্রাইয়া স্বামী ভারতরক্ষা বিধির ১২১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার, গোকক তালুকে ৫০ জনকে ঘেরাও করিয়া ২০ জনকে আটক, এক বরযাত্রী দলকে ঘেরাও করিয়া বরকে গ্রেপ্তার; আকতাদির হলে তল্লাসীর পর কয়েক জন গ্রেপ্তার। নাসিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অভিযোগে শ্রীযুক্তা ইন্দিরাবাই চন্দ্রাত্রি দণ্ডিত, আপত্তিকর পুস্তিকা রাখিবার অভিযোগে ছাত্রী কর্ম্মী শ্রীমতী বীণা রাণাড়ে দণ্ডিত। ৩০শে—আমেদাবাদে জনতার উপর লাঠি চালন, ৬ জন গ্রেপ্তার। ৩১শে—আমেদাবাদে ভারতরক্ষা বিধি বলে ৪ জন গ্রেপ্তার। ৫ই বৈশাখ—একখানি ট্যাক্সিতে ১২ হাজার আপত্তিকর ইস্তাহার প্রাপ্তির অভিযোগে ট্যাক্সিখানি বাজেয়াপ্ত, এক জন আরোহীর অর্থদণ্ড। ২৩শে—১ মাস পর আমেদাবাদে সান্ধ্য আদেশ প্রত্যাহার।

বিহার—২১শে চৈত্র বিহার সরকারের চীফ এঞ্জিনিয়রের ভবনে এক রহস্যজনক ব্যক্তির আবির্ভাব, তাড়া করিলে রিভলভার হইতে গুলীবর্ষণ করিতে করিতে পলায়ন। ইহার প্রায় এক ঘণ্টা পর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কনট্রোলারের গৃহে একই প্রকার ঘটনার পুনরভিনয়। ৩রা বৈশাখ—দানাপুর জেল হইতে পলাতক ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্ম্মী শ্রীযুত অনন্ত মিশির গ্রেপ্তার। ১৬ই—বাঙ্গালার গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক কলিকাতায় বিহার ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী স্পীকার অধ্যাপক আবদুল বারি গ্রেপ্তার পুলিস কিছু দিন যাবৎ তাঁহার সন্ধান করিতেছিল। ছাপরা জেলে নবনিযুক্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খান সাহেব আনোয়ার আলির গৃহে বোমা নিক্ষেপ, এক জন আহত।

যুক্তপ্রদেশ—৩১শে চৈত্র—কাণপুর ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীদলপৎ সিং, খদ্দর ভাণ্ডারের কর্ম্মী শ্রীগিরিধর সেন্ট্রাল ষ্টেশনে বিস্ফোরণ সম্পর্কে গ্রেপ্তার। ৪ঠা বৈশাখ—ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে নৈনী জেল হইতে স্বাস্থ্যের কারণে বিনাসর্ত্তে মুক্তিদান। ১১শে বৈশাখ—ফেরার বলিয়া ঘোষিত বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ গিরুলাকে দিল্লী ষ্টেশনে গ্রেপ্তার। ভারতীয় ইতিহাস পরিষদের সম্পাদক পণ্ডিত জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভারতরক্ষা বিধির ১২১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার।

দিল্লী—২৭শে চৈত্র নূতন ও পুরাতন দিল্লীর কয়েক স্থানে তল্লাসী, ৫ জন গ্রেপ্তার, কাজী হৌজের নিকট ৭ জন গ্রেপ্তার। ৩০শে—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সম্পাদক মিঃ সাদেক আলি গ্রেপ্তার। ৩১শে—নয়াদিল্লীর বাবর রোডে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী দময়ন্তীকে গ্রেপ্তার।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

াঘ, ১৩৫০]

ললিতে কলাবিধৌ

[শিল্পী—শ্রীবজেন্দ্র আচার্য্য

২২শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ | ২য় সংখ্যা

রস

১৬

কোন কোন প্রাচীন আলঙ্কারিক অদ্ভুত-রসকেই অপর সকল রসের উৎস-স্বরূপ বলিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ রসের বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'রসলোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ' অর্থাৎ অলৌকিক চমৎকারই রসের প্রাণস্বরূপ (১)। 'চমৎকার' বলিতে বুঝায়, চিত্তের বিস্তার—যাহার নামান্তর বিস্ময়' (২)। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজ বৃদ্ধ-প্রপিতামহ সহৃদয়-গোষ্ঠী-গরিষ্ঠ কবি-পণ্ডিত-মুখ্য শ্রীমন্নারায়ণপাদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধর্ম্মদত্তও স্বগ্রন্থে নারায়ণের মত উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—চমৎকার (অর্থাৎ বিস্ময়) রসের সার—সকল রসেই ইহা অনুভূত হইয়া থাকে। অতএব, চমৎকার (বা বিস্ময়) যাহার সার (অর্থাৎ স্থিরাংশ), সেই অদ্ভুত-রসই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই হেতু কৃতী আলঙ্কারিক নারায়ণ অদ্ভুতকেই একমাত্র রস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৩)। আর এই কারণেই দশ-রূপকের প্রকৃতি-স্থানীয় (type) শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর রূপক যে নাটক, তাহার উপসংহারে অদ্ভুত-রসের স্ফূর্ত্তি প্রয়োজন—এই কথা আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন। এ অদ্ভুত-রস কেবল কতকগুলি অলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশেই জন্মিতে পারে না। লোকোত্তর চমৎকারের (অর্থাৎ অনন্যসাধারণ রমণীয়তার aesthetic thrill) উদ্রেক ব্যতীত যথার্থ সরসভাবে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিতে পারে না। নারায়ণের উপরি-লিখিত মত দর্শনে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি অলৌকিক-চমৎকার-সারস্বরূপ রসের অখণ্ডতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন; পারিভাষিক-অদ্ভুতরসকেই একমাত্র রস বলেন নাই।

মহর্ষি বলিয়াছেন—অদ্ভুত-রস বিস্ময়-স্থায়িভাবাত্মক। দিব্যজন-দর্শন, ঈপ্সিত ও মনোরথের প্রাপ্তি, উপবন, দেবকুল প্রভৃতি স্থলে গমন, সভা, বিমান, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিভাব হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। নয়ন-বিস্তার, অনিমেষ প্রেক্ষণ, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বেদ, হর্ষ, পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ-প্রদান, পুনঃ পুনঃ (পারিতোষিকাদি) দান, হাহাকার, বাহু-বদন-বস্ত্র-অঙ্গুলি-ভ্রমণ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা এই অদ্ভুত-রসের অভিনয় কর্ত্তব্য (৪)। স্তম্ভ-অশ্রু-স্বেদ-গদ্গদ-রোমাঞ্চ-

(১) "লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ"—সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ। অর্থাৎ অলৌকিক বিস্ময়-ভাব যাহার সার বা স্থিরাংশ।

(২) "চমৎকারশ্চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্য্যায়ঃ"—সাঃ দঃ ৩য় পরিঃ; "তৎপ্রাণত্বং চমৎকারসারত্বং, সারঃ স্থিরাংশঃ"—রাম-তর্কবাগীশ-টীকা।

(৩) "তৎপ্রাণত্বঞ্চাস্মদ্‌বৃদ্ধপ্রপিতামহ-সহৃদয়গোষ্ঠী-গরিষ্ঠ-কবি-পণ্ডিত-মুখ্য-শ্রীমন্নারায়ণপাদৈরুক্তম্। তদাহ ধর্ম্মদত্তঃ স্বগ্রন্থে—

"রসে [illegible] সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্"।
—সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ।

বস্তুতঃ, রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের যেখানে যেখানে অনুভব হইবে, সেই সেই স্থলেই শৃঙ্গার প্রভৃতি বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রযুক্ত হইবে; অন্যথা রত্যাদি বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থায়িভাবের অনুভূতি না হইলে কেবল সাধারণভাবে বিস্ময়ের অনুভবহেতু অদ্ভুত-রসেরই প্রকাশ হইবে। "চমৎকারসারত্বে চমৎকারস্থায়িভাবত্বে। তস্মাৎ সর্ব্বত্রাদ্ভুতরসসম্ভবাৎ। বস্তুতস্তু রত্যাদ্যংশস্যানুভূয়মানত্বে যথাযথং শৃঙ্গারাদিব্যপদেশস্তস্যাননুভবেঽদ্ভুতব্যপদেশ ইতি মন্তব্যম্।
—রাম-তর্ক-টীকা।

চমৎকার—চিত্তবিস্তার, বিস্ময়, aesthetic thrill.

(৪) দিব্যজন—গন্ধর্ব্বাদি; "দিব্যাঃ গন্ধর্ব্বাদয়ঃ" (অভিনবভারতী, নাঃ শাঃ, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩০, বরোদা সং)। "Heavenly

আবেগ-সম্ভ্রম-প্রহর্ষ-চপলতা-উন্মাদ-ধৃতি-জড়তা-প্রলয় প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারিভাব ও সাত্ত্বিক ভাব।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি দুইটি আর্য্যা-শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়াছেন—

অন্যাপেক্ষায় আতিশয্য-বিশিষ্ট যত কিছু বাক্য, শিল্প বা কর্ম—সে সকলই অদ্ভুত-রসে বিভাবস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

স্পর্শগ্রহ, উল্লুকসন, হাহাকার, সাধুবাদ, বেপথু, গদ্গদ-বচন, স্বেদ প্রভৃতি দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য (৫)।

---

hersonages"—Dr Mukherjee. মূলে আছে—"ঈপ্সিত-মনোরথাবাপ্তি"...—"ঈপ্সিতঃ শক্যপ্রাপ্তিরর্থোঽন্যো মনোরথস্তয়োঃ প্রাপ্তিরুপচয়নম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩০; অর্থাৎ যে বিষয় পাওয়া সম্ভব, তাহাকে 'ঈপ্সিত' বিষয় বলা হয় তদতিরিক্ত বিষয় মনোরথ—যাহা কেবল মনেই থাকে, কোন দিন বাস্তব জগতে লব্ধ হয় না। Dr. Mukherjee এ বিভেদ করেন নাই—"the attainment of much longed for desires." দেবকুল—মন্দির, চলিত বাঙ্গালায় 'দেউল'। এই সকল দেবকুল প্রভৃতি স্থানে যেরূপ অপূর্ব্ব সরোবরাদির সন্নিবেশ থাকে, তাহা সচরাচর অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এই কারণে এই সকল স্থানকে অদ্ভুত-রসের হেতুভূত বিভাব-স্থানীয় বলা হইয়াছে "তস্যাদ্ভুতবিভাবো যেন তত্রত্যং সরঃসন্নিবেশাদি ন কচিদ্ দৃষ্টম্"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩১। সভা—গৃহবিশেষ (অঃ ভাঃ); "assemblies" (M). বিমান—দিব্যরথ (অঃ ভাঃ); "air" (M). মায়া—রূপ-পরিবর্ত্তনাদি (অঃ ভাঃ); "enchantment" (M). ইন্দ্রজাল—মন্ত্র-দ্রব্যাদিগুণে অসম্ভব বস্তু প্রদর্শন (অঃ ভাঃ); "sorcery" (M). হর্ষ—হর্ষের অনুভাব বুঝিতে হইবে (অঃ ভাঃ)। মূলে আছে—"হর্ষসাধুবাদদানপ্রবন্ধহাহাকার..."—হর্ষশব্দেন তদনুভাবাঃ। সাধ্বিতি বদনং সাধুবাদঃ। দানং ধনাদেঃ। "প্রবন্ধং সততং কৃত্বা হা-হা-শব্দস্য করণম্" (অঃ ভাঃ)। Dr. Mukherjee 'সাধুবাদ' ও 'দান' দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার না ধরিয়া 'সাধুবাদ-দান' একটি ব্যাপার বলিয়া ধরিয়াছেন—"by gladness, by repeated appreciative exclamations, by cries of "ha" "ha". মূলে আছে "চেলাঙ্গুলিভ্রমণাদিভিঃ"—"চেলস্যাঙ্গুলেশ্চ ভ্রমণম্" (অঃ ভাঃ)। চেল—বস্ত্র। ইহার পাঠান্তর আছে—"করচরণাঙ্গুলি- ভ্রমণাদিভিঃ"। Dr. Mukherjee এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন—"by agitating the fingers of the hands or the toes etc."

আতিশয্যবিশিষ্ট বাক্য, শিল্প বা কর্ম—মূলে আছে—"যত্ত্বতিশয়ার্থযুক্তং বাক্যং শিল্পং চ কর্মরূপং বা"। অন্য অপেক্ষা যে বিষয়ের আতিশয্য দেখা যায়, তাহাই 'অতিশয়ার্থ'—অপরাপর বাক্য-শিল্প-কর্ম হইতে যাহা উৎকৃষ্টতর। "অতিশেতে ইত্যতিশয়োঽন্যাপেক্ষয়া যোঽর্থ উৎকৃষ্টস্তেন বাচ্যভূতেন যুক্তং যদ্বাক্যং যচ্চ শিল্পং কর্মরূপং কর্মাত্মকং "প্রশংসায়াং রূপম্" (প. ?)—"অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩১। Dr. Mukherjee ইংরাজী করিয়াছেন—"what ever is exaggerated, words and arts or actions and forms." কর্মরূপং—ইহাকে অভিনবগুপ্ত 'কর্মাত্মক' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। Dr. Mukherjeeর অনুবাদে দাঁড়াইয়াছে দুইটি পৃথক্ পদ 'কর্ম' ও 'রূপ'।

(৫) স্পর্শগ্রহ—ইহার লক্ষণ অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের দ্বাবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন—কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত নেত্র ও ভ্রূক্ষেপ সহকারে স্কন্ধ ও গণ্ডদেশ স্পর্শ—"স্পর্শগ্রহশব্দেন তদ্বিভাবতয়াভিনয়ো লক্ষ্যমাণো লক্ষ্যতে—"কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে নেত্রে কৃত্বা ভ্রূক্ষেপমেব চ। তথাংসগণ্ডয়োঃ স্পর্শাৎ স্পর্শমেবং বিনিক্ষিপেৎ"। (নাঃ শাঃ ২২।৮০) বরোদা সংস্করণে দ্বাবিংশ অধ্যায় এখন পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই। কাশী-সংস্করণের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে 'বৃত্তি'-সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উক্ত শ্লোকটির সন্ধান পাওয়া যায় না।

উল্লুকসন—আহ্লাদবশে গাত্রের ঊর্দ্ধ কম্পন—"গাত্রস্যোৰ্দ্ধং সাহ্লাদং ধুননমুল্লুকসনম্" (অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩১)। Dr. Mukherjee পাঠান্তর ধরিয়াছেন—"স্পর্শগ্রহণোল্লসনৈঃ"—by touching, slapping, rejoicing."

নাট্যশাস্ত্রের অদ্ভুত-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

ইহার পর সাহিত্যদর্পণের বিবরণ। অদ্ভুত-রসের স্থায়িভাব বিস্ময়, দেবতা গন্ধর্ব্ব, বর্ণ পীত। লোকাতিগ বস্তু ইহার আলম্বন সেই আলম্বনের গুণাবলীর মহিমা (মহত্ত্ব) উদ্দীপন। স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চ-গদ্গদ-স্বর-সম্ভ্রম-নেত্রবিকাশ প্রভৃতি অনুভাব। বিতর্ক-আবেগ-সম্ভ্রম-হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী।

বিশ্বনাথ আর নূতন কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই।

দশরূপক ও অবলোকে বিবৃত হইয়াছে—লোকসীমা অতিক্রমকারী পদার্থ-বর্ণনা যাহার বিভাব, সাধুবাদ-অশ্রু-স্বেদ-বেপথু-গদ্গদ প্রভৃতি যাহার কর্ম্ম (অর্থাৎ অনুভাব), বিস্ময় যাহার আত্মভূত (অর্থাৎ স্থায়িভাব), তাহাই অদ্ভুত-রস। হর্ষ-আবেগ-ধৃতি প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী (৬)।

ইহার পর শারদাতনয়-কৃত ভাবপ্রকাশনের বিশ্লেষণ। বিস্ময় স্থায়িভাব হইতে অদ্ভুত-রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'বিস্ময়' অর্থে চিত্তের বৈচিত্র্য। উহা ত্রিগুণাত্মক—ত্রিধা বিভক্ত। বিবিধরূপ স্ময় (অর্থাৎ হর্ষ) যাহাতে, তাহাই বিস্ময়। যাহা হইতে কেহ স্বয়ং বিস্ময় অনুভব করে, অথবা যাহা দ্বারা অপরকে বিস্মিত করায়, তাহাই বিস্ময়কর (৭)।

হর্ষ-গর্ব্ব-স্মৃতি-মতি-শ্রম-ধৃতি-মদ-তর্ক-বিবোধ-চিন্তা-রোমাঞ্চ-স্তম্ভ বেপথু-স্বেদ—এইগুলি অদ্ভুতরসের ব্যভিচারিভাব। বিচিত্র আকার, বিচিত্র বেশ, বিচিত্র আচার, বিচিত্র বিভ্রম (শোভা) প্রভৃতি যুক্ত মালা-লীলা-বিলাসী প্রাণিগণ অদ্ভুতের আলম্বন (৮)।

---

(৬) "অতিলোকৈঃ পদার্থৈঃ স্যাদ্বিস্ময়াত্মা রসোঽদ্ভুতঃ। ৭০। কর্মাস্য সাধুবাদাশ্রুবেপথুস্বেদগদ্গদাঃ। হর্ষাবেগধৃতিপ্রায়া ভবন্তি ব্যভিচারিণঃ"। ৭১।—দশরূপক। "লোকসীমাতিবৃত্তপদার্থবর্ণনাদিবিভাবিতঃ সাধুবাদাদ্যনুভাবপরিপুষ্টো বিস্ময়স্থায়িভাবো হর্ষাবেগাদিভাবিতো রসোঽদ্ভুতঃ"—দশরূপকাবলোক। দশরূপক ও সাহিত্যদর্পণে ভবভূতির মহাবীরচরিত হইতে শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক হরধনুর্ভঙ্গ-কালে লক্ষ্মণের বিস্ময়-ব্যঞ্জক একটি শ্লোক অদ্ভুত-রসের উদাহরণরূপে উদ্‌ধৃত হইয়াছে—"দোর্দ্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দণ্ড..."।

(৭) "বিস্ময়শ্চিত্তবৈচিত্র্যং স ত্রিধা ত্রিগুণাত্মকঃ।......বিবিধঃ স্যাৎ স্ময়ো হর্ষ ইতি বিস্ময়তেঽথ বা। বিস্মাপ্যতে স্বয়ং কশ্চিদ্বিস্মাপয়তি বা ভবেৎ"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ৩৫, দ্বিতীয় অধিকার।

(৮) "বিচিত্রাকৃতিবেষাশ্চ বিচিত্রাচারবিভ্রমাঃ। অদ্ভুতালম্বনা ভাবা মায়ালীলাবিলাসিনঃ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৬।

বীভৎসরস

অদ্ভুতরস

ভয়ানকরস

বীররস

[রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বহুব্যয়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত দুষ্প্রাপ্য চিত্রের প্রতিচ্ছবি।

অদ্ভুতের উদ্দীপন বিভাবগুলির পারিভাষিক সংজ্ঞা 'চিত্র'। যে সকল ভাব হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়া বৈচিত্র্যের জনক হইয়া থাকে, তাহাদিগের নাম 'চিত্র' বিভাব—উহারা অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের জনক (৯)।

এই সকল চিত্র বিভাব যখন যথোচিত সাত্ত্বিক ভাবাদি সহ অনুকূল অভিনয়ে আশ্রিত হইয়া নিজ স্থায়িভাবে (বিস্ময়ে) অবস্থান করে, তখন প্রেক্ষকগণের মন রজঃসত্ত্বোজ্জ্বল ও বুদ্ধিযুক্ত (অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তিযুক্ত) অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এইরূপ দশাগ্রস্ত অন্তঃকরণের যে বিকার, তাহাই অদ্ভুত-রস (১০)।—ইহা বাসুকি-মত।

নারদমতে—বাহ্য বিষয়ে সঙ্গত মন যখন অহঙ্কার-রজঃ-সত্ত্বযুক্ত, তখন তাহার বিকারই বীররস। আর উক্ত প্রকার অন্তঃকরণ রজোগুণ ও অহঙ্কার বর্জ্জিত হইলে তাহা হইতে অদ্ভুত উৎপন্ন হয় (১১)। অতএব, নারদ-মতে অদ্ভুতোৎপত্তি-কালে অন্তঃকরণে কেবল সত্ত্বগুণ বিদ্যমান—রজোগুণ নাই।

'অদ্ভুত'-শব্দের নির্ব্বচন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—'অথ'-ধাতুর অর্থ বৈচিত্র্য। এই ধাতু হইতেই 'অদ্ভুত' পদের ব্যুৎপত্তি। যাহার দর্শনে বিচিত্র চিত্তবৃত্তির প্রকাশ হয়, তাহাই অদ্ভুত (১২)।

অদ্ভুত-রসের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—যখন ব্রহ্ম-সভায় ভরতগণ-কর্ত্তৃক ত্রিপুরমর্দ্দনের অভিনয় সম্যগ্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তখন ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে সাত্ত্বতী বৃত্তি ও উহা হইতে বীর-রসের উৎপত্তি হয়। এই বীর-রস হইতে অদ্ভুতের নিষ্পত্তি। 'ত্রিপুর' বলিতে বুঝাইত দৈত্যগণের তিনটি পুরী। উহাদিগের একটি লৌহময়—অপরটি রজত-নির্ম্মিত ও তৃতীয়টি হিরণ্ময়। উহাদিগের মধ্যে প্রথমটির (লৌহময় পুরীর) রক্ষার্থ শত-সহস্র (এক লক্ষ) কোটি-সংখ্যক অতিশয় ক্ষিপ্রকারী ও বলবান অসুর স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টির রক্ষার্থ উহার দ্বিগুণ, ও তৃতীয়টির রক্ষার নিমিত্ত তাহার দ্বিগুণ অসুর সেনা স্থাপিত ছিল। এই সকল অসুরের শরবর্ষণ স্মিত-মুখে সহ্য করিতে করিতে অসিতাপাঙ্গী অম্বিকা দেবীকে কটাক্ষে অবলোকন-পূর্ব্বক যখন স্মরহর দেবদেব একাকী একটি মাত্র শরপ্রয়োগে তিনটি পুরীই যুগপৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন, তখন ত্রিভুবনের সকল শ্রেণীর প্রাণিবর্গের নিকটই উহা অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। আর এই কারণেই বলা হয়—বীর-রস হইতেই অদ্ভুতের উদ্ভব (১৩)।

অদ্ভুতের বিভাবাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—অদ্ভুত বিস্ময়াত্মক (অর্থাৎ বিস্ময়-স্থায়িভাবাত্মক)—সমপ্রকৃতি (অর্থাৎ—উত্তম-প্রকৃতি বা অধম-প্রকৃতি নহে)। নরগণের কর্ম্মের আতিশয্য বশতঃ, ঈপ্সিত বিষয়ের সংগ্রহে, মনোরথ-ফলপ্রাপ্তি-হেতু, দিব্য ভাব (পদার্থ) অবলোকন-দ্বারা, বিমান-উদ্যান-ভবন-সভা-আরাম প্রভৃতি দর্শনে, বিরুদ্ধ পদার্থসমূহের পরস্পরের অবিরুদ্ধ ভাবে সমাগম-বশে অসম্ভব বিষয়ের সম্ভব ও উৎপত্তি দর্শনে, অভীষ্ট বিষয়ের অননুকূল দেশে ও কালে অচিন্তিত ভাবে প্রাপ্তিবশতঃ ও এতাদৃশ অন্যান্য বিভাব হইতে অদ্ভুত-রস জন্মিয়া থাকে। স্তম্ভ-বেপথু-রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ-অশ্রুনির্গম ও শৃঙ্গারানুকূল ব্যভিচারিভাব-সমূহ ইহার সঞ্চারী।

মানস-আঙ্গিক-বাচিক-ভেদে অদ্ভুত-রস ত্রিবিধ। ধ্যান, নয়ন বিস্তার, নয়ন ও বদনের প্রসন্ন ভাব, আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, অনিমেষ অবলোকন প্রভৃতি মনের অনিশ্চলত্বের কারণ। অতএব, এই বিকারগুলি মানস অদ্ভুতের সূচক। চেল (বস্ত্র) বা অঙ্গুলির ভ্রমণ, উঠিয়া উঠিয়া লম্ফ প্রদান (বল্গন), সতত দান, নর্ত্তন (নৃত্য), পরস্পর আলিঙ্গন (আশ্লেষ), পরস্পর বাহু ও করতলের আঘাত—এই সকল বিকার আঙ্গিক অদ্ভুত সূচিত করে। হাহাকার, সাধুবাদ, কপোলের (গণ্ডদেশের) আস্ফালন-ধ্বনি (গণ্ডবাদ্য), উচ্চ হাস্য, হর্ষ, ঘোষ (গম্ভীর নিনাদ), গীত, উচ্চাবচ (উঁচু-নীচু) বাক্য—ইত্যাদি বিকার বাচিক অদ্ভুতের সূচক।

অদ্ভুতের অধিদেবতা ব্রহ্মা। সাহিত্যদর্পণ-কারের সহিত শারদাতনয়ের এই স্থলে ভেদ। দর্পণকারের মতে গন্ধর্ব্ব অদ্ভুতের দেবতা। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের অনুবর্ত্তনে শারদাতনয় ব্রহ্মাকে অদ্ভুতের অধিদেবতা বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি অতি সমীচীন। অদ্ভুতের অধিষ্ঠান (বা আশ্রয়) হইতেছে নানা-শিল্পাত্মিকা ধী। এইরূপ নানা-শিল্পকুশল-বুদ্ধি একমাত্র আদিস্রষ্টা প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মারই আছে। অতএব, তিনিই ইহার অধিপতি হইবার যোগ্য (১৪)।

আর অদ্ভুতের বর্ণ পীত।

শারদাতনয়ের অদ্ভুত-রস-বিশ্লেষণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

---

(৯) "স্থিরাশ্চিত্রা বিভাবা যে তে বীরাদ্ভুতয়োঃ ক্রমাৎ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৪। "সদানুভূয়মানা যে হৃদি বৈচিত্র্যকারিণঃ। ভাবাশ্চিত্রা ইতি জ্ঞেয়াস্তেঽদ্ভুতৈশ্বর্য্যভাবকাঃ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ৫।

(১০) "যদা চিত্রা বিভাবাস্তু ভাবৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সহ। স্বাশ্রয়াভিনয়ৈর্যুক্তা বর্ত্তন্তে স্থায়িনি স্বকে। তদা মনঃ প্রেক্ষকাণাং রজঃসত্ত্বোজ্জ্বলং ভবেৎ। বুদ্ধিযুক্তশ্চ তত্রত্যো বিকারো যঃ প্রবর্ত্ততে। স চাদ্ভুতরসাখ্যাং তু লভতে রস্যতে চ তৈঃ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৪।

(১১) "অহঙ্কাররজঃসত্ত্বযুক্তাদ্বাহ্যার্থসঙ্গতাৎ। মনসো যো বিকারস্তু স বীর ইতি কথ্যতে। তস্মাদেবাদ্ভুতো জাতো রজোঽহঙ্কার-বর্জ্জিতাৎ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ, পৃঃ ৪৭।

(১২) "অথ বৈচিত্র্য (?) ইত্যস্য ধাতোরদ্ভুতনির্বচঃ। বিচিত্রা যস্য ভবতি চিত্তবৃত্তিস্ততোঽদ্ভুতঃ"।—ভাবপ্রঃ, ২য় অধিঃ পৃঃ ৪৮-৪৯।

(১৩) "যদাভিনীতং ভরতৈঃ সম্যক্ ত্রিপুরমর্দ্দনম্। সাত্ত্বতী বৃত্তিতো জজ্ঞে বীরো দক্ষিণতো মুখাৎ।······পুরাণি ত্রীণি ঘটিতান্যয়োরজতকাঞ্চনৈঃ। একৈকস্য তু রক্ষার্থমসুরাণাং তরস্বিনাম্। কোট্যঃ শতসহস্রাণি স্থাপিতানি ততস্ততঃ। দ্বিগুণোত্তরবৃদ্ধানি বলান্যতিবলানি চ। অম্বিকামসিতাপাঙ্গীমপাঙ্গেনাবলোকয়ন্। বিষহ্য শরবর্ষাণি স্ময়মানঃ স্মরান্তকঃ। শরেণৈকেন তাঞ্জেকো ভস্মসাদকরোদ্ যদা। তদা সমস্তভূতানামদ্ভুতং যদভূন্মহৎ। তস্মাদদ্ভুতনিষ্পত্তির্বীরাদেবেতি কথ্যতে"।—ভাবপ্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৫৭-৫৮।

(১৪) "মহেন্দ্রদৈবতো বীরস্ত্বদ্ভুতো ব্রহ্মদৈবতঃ।···অদ্ভুতস্যাধিষ্ঠানং নানাশিল্পাত্মিকৈব ধীঃ। ব্রহ্মণঃ সেয়মস্তীতি সোঽয়মস্যাধিদৈবতম্"।—ভাব প্রঃ, ৩য় অধিঃ, পৃঃ ৬৮।

মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশে অদ্ভুতের যে দৃষ্টান্ত-শ্লোকটি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নোক্তরূপ—কি বিচিত্র! কি আনন্দ! এই অবতারটি কি অদ্ভুত! এরূপ কান্তি (আর) কোথায় (দেখিতে পাওয়া যায়)! (ইঁহার গমন-উপবেশন প্রভৃতির) ভঙ্গী কি অভিনব! কি অলৌকিক ধৈর্য্য! অহো কি (অদ্ভুত) প্রভাব! কি (অপূর্ব্ব) আকৃতি! এই সৃষ্টিটি নূতন (অর্থাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি নহে) (১৫)!

বামনকে দেখিয়া দৈত্যরাজ বলি ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। স্থলে 'বিচিত্র' প্রভৃতি শব্দগুলি বামনের লোকোত্তর মহিমার প্রতিপাদক মাত্র—বিস্ময়ার্থক নহে। কারণ, বিস্ময় এ স্থলে স্থায়িভাব। বাক্যে উহা প্রকাশিত হইলে বাচ্যতাদোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। এ স্থলে বামন আলম্বন। কান্তি-গুণ প্রভৃতির আতিশয্য (লোকোত্তরত্ব) উদ্দীপন। বামনের স্তুতি প্রভৃতি অনুভাব। মতি-ধৃতি-হর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী—ইহাই নাগোজীভট্টপাদের অভিমত (১৬)।

গোবিন্দ ঠক্কুর তাঁহার প্রদীপে বিস্ময়ের লক্ষণ দিয়াছেন—বস্তুর মাহাত্ম্যদর্শনে চিত্তের যে বিস্তার, তাহাই বিস্ময়। তাহা হইতে উৎপন্ন রস অদ্ভুত (১৭)।

কাব্যপ্রকাশের অদ্ভুত-রস-বিবরণও এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

রামচন্দ্র-গুণচন্দ্র নাট্যদর্পণে বলিয়াছেন—দিব্যজন-ইন্দ্রজাল-রম্যবিষয় প্রভৃতি দর্শনে, অভীষ্ট সিদ্ধি প্রভৃতি বিভাব হইতে অদ্ভুত-রসের উৎপত্তি। শ্লাঘা-রোমাঞ্চ-হর্ষ প্রভৃতি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য।

'দিব্য' বলিতে বুঝায় ইন্দ্র প্রভৃতি। ইন্দ্রজাল—মন্ত্র-দ্রব্যগুণ হস্তলাঘব প্রভৃতি দ্বারা অসম্ভব বস্তু প্রদর্শন। রম্য বিষয়—আতিশয্য-বশতঃ হৃদ্য বিষয়, যথা—শিল্পকর্ম্ম-রূপ-বাক্য-গন্ধ-রস-স্পর্শ-গীত প্রভৃতি। 'দর্শন'-পদ হইতে স্বয়ং কীর্ত্তন বা শ্রবণও সংগ্রহণীয়। অভীষ্ট—অত্যন্ত ঈপ্সিত; তাহার 'সিদ্ধি' অর্থে প্রাপ্তি অথবা নিষ্পত্তি। পূর্ব্বোক্ত বিভাবগুলি হইতে বিস্ময়-স্থায়ী অদ্ভুত-রসের উদ্ভব হয়। হর্ষাদি অনুভাব। নয়ন-বিস্তার-গাত্রোৎপুলকসন (গাত্রের শিহরণ)-অনিমিষ-প্রেক্ষণ-চেলাঙ্গুলি-ভ্রমণ-গদ্‌গদ-বচন-বেপথু-স্বেদ প্রভৃতি অনুভাবও যথাযোগ্য গ্রহণীয়। আবেগ-জড়তা সম্ভ্রম-স্তম্ভ-অশ্রু-গদ্‌গদ-রোমাঞ্চ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী।

সাগরনন্দীর নাটকলক্ষণরত্নকোষে নাট্যশাস্ত্রেরই সারার্থ প্রদত্ত হইয়াছে—অদ্ভুত বিস্ময়-স্থায়িভাব হইতে উদ্ভূত। প্রাসাদ-উদ্যান-শৈলাদিতে গমন, দিব্যজনের দর্শনলাভ, সভা-বিমান-মায়া-ইন্দ্রজাল-শিল্প প্রভৃতির দর্শন, হৃদয়ের ঈপ্সিত বস্তুর লাভ প্রভৃতি বিভাব-সমূহ হইতে অদ্ভুতের উৎপত্তি। দৃষ্টি ও লোচনের বিস্তার, প্রাসাদ-গমন, রোমাঞ্চ-স্বেদ-হর্ষ-অশ্রু-সাধুবাদ প্রভৃতি অনুভাবের সাহায্যে এই রসের অভিনয় কর্ত্তব্য। স্তম্ভ-অশ্রু-স্বেদ-রোমাঞ্চ-গদ্‌গদ-আলাপ-সম্ভ্রম-জড়তা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারি-ভাব।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণব-সুধাকরে নূতন বিশেষ কিছু বলেন নাই। বিস্ময়-স্থায়িভাব স্বযোগ্য বিভাব অনুভাব-ব্যভিচারিভাব-সংযোগে পুষ্ট হইয়া সদস্যগণের আস্বাদনযোগ্য হইলে অদ্ভুত-রসে পরিণত হইয়া থাকে। ধৃতি-আবেগ-জাড্য-হর্ষ প্রভৃতি ইহার ব্যভিচারী। আর ইহার চেষ্টা (অনুভাব)—নেত্র-বিস্তার-অশ্রু স্বেদ-পুলক প্রভৃতি।

অদ্ভুত-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে।

অতঃপর ভরত-নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি অষ্ট রসের এক প্রকার অভিনব অবান্তর বিভাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—এইরূপ ভেদ-প্রদর্শন-চ্ছলে মহর্ষি প্রধানভূত বিভাবের অনুগুণ ভাবের প্রতিপাদন করিয়াছেন (১৮)।

শৃঙ্গার ত্রিবিধ—(১) বাক্য-গত, (২) নেপথ্য-গত ও (৩) ক্রিয়াগত (১৯)। রতিভাব সূচক বাক্যপ্রয়োগে বাচিক শৃঙ্গারের অভিব্যক্তি। উজ্জ্বল-বেশ-ধারণে নৈপথ্যজ শৃঙ্গারের প্রকাশ। আর ক্রিয়াগত শৃঙ্গার ত সুস্পষ্ট।

হাস্য-রস ত্রিবিধ—(১) আঙ্গিক, (২) নেপথ্যজ ও (৩) বাক্যগত। বিদূষকের বিকৃত আকৃতি বা হাস্যকর অঙ্গ-ভঙ্গী আঙ্গিক হাস্যরসের জনক। বিদূষকাদির বেশও হাস্যোদ্রেক-কর। আর পরিহাস-জনক বাক্য বাচিক হাস্যের উৎস।

রৌদ্র-রসও আঙ্গিক-বাচিক-নেপথ্যজ-ভেদে ত্রিবিধ। উদ্ধত-প্রকৃতি নায়কাদির অঙ্গ-ভঙ্গীতে আঙ্গিক রৌদ্রের অভিব্যক্তি। ক্রুর-কর্ম্মের উপযোগী বেশধারণ নেপথ্যজ রৌদ্রের জনক। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—বাক্য-রৌদ্রই স্বভাব-রৌদ্র বলিয়া ব্যবহৃত থাকে—কারণ, বাক্য স্বভাবানুগামী (২০)।

করুণ ত্রিবিধ—(১) ধর্ম্মোপঘাতজনিত, (২) অর্থাপচয়-কৃত ও (৩) শোকহেতুক। এ স্থলে 'ধর্ম্ম' বলিতে বুঝাইতেছে ধর্ম্মানুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানযোগ্য ধর্ম্মক্রিয়া, যথা—অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি। ধর্ম্মোপঘাত হইতেও করুণের উৎপত্তি হইতে পারে—এ কথা কেন বলা হইল, তাহা বুঝাইতে যাইয়া অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—সাধারণতঃ করুণ-রস স্ত্রীগত বা মধ্যমাধম-প্রকৃতি-গত হইয়া থাকে। উত্তম-প্রকৃতি যাঁহারা, তাঁহারা শোকবশ নহেন; এ কারণে তাঁহাদিগের শোকজ করুণ-রসের উদ্রেক হয় না। তবে ধর্ম্মের বিরোধ দেখিলে তাঁহাদিগেরও চিত্তে দুঃখ জন্মে। এ কারণে, উত্তম-প্রকৃতির পক্ষে ধর্ম্মোপঘাত করুণ-রসের শোভন হেতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে (২১)।

---

(১৫) "চিত্রং মহানেষ বতাবতারঃ ক্ক কান্তিরেষাভিনবৈব ভঙ্গিঃ। লোকোত্তরং ধৈর্য্যমহো প্রভাবঃ কাপ্যাকৃতির্নূতন এষ সর্গঃ॥" —কাব্যপ্রকাশ (৪র্থ উল্লাস)

(১৬) "ইয়ং বামনমুদ্দিশ্য বলেরুক্তিঃ। অত্র চিত্রাদিশব্দাঃ··· লোকোত্তরমহিমত্বপ্রতিপাদকাঃ, নতু বিস্ময়ার্থাঃ। তস্যাত্র স্থায়িত্বাৎ বাচ্যতাদোষাপত্তেঃ।······অত্র বামন আলম্বনম্। কান্তি-গুণাতিশয়াদি উদ্দীপনম্। স্তুবাদয়োঽনুভাবাঃ। মতিধৃতিহর্ষাদয়ো ব্যভিচারিণঃ।"—নাগোজী, প্রদীপোদ্দ্যোত।

(১৭) "বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তারো বস্তুমাহাত্ম্যদর্শনাৎ। তৎকৃতি-রসোঽদ্ভুতঃ।"—গোবিন্দ ঠক্কুর, প্রদীপ।

(১৮) "অথ প্রধানভূতবিভাবানুগুণভাবপ্রতিপাদনং ভেদ-প্রদর্শনব্যাজেন করোতি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২।

(১৯) "শৃঙ্গারং ত্রিবিধং বিদ্যাদ্বাঙ্‌নেপথ্যক্রিয়াত্মকম্"—নাঃ শাঃ, ৬।১৭ (বরোদা সং)।

(২০) "বাক্যরৌদ্রো হি তত্র স্বভাবরৌদ্র ইতি ব্যবহরিষ্যতে, স্বভাবানুসারিত্বাদ্বাক্যস্য"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২।

(২১) "ধর্ম্মোপঘাতজ···উত্তমানামপি শোভনহেতুত্বাৎ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২।

মহর্ষি বলিয়াছেন—ব্রহ্মার মতে বীর-রস ত্রিবিধ—(১) দানবীর, (২) ধর্ম্মবীর ও (৩) যুদ্ধবীর।

ভয়ানকও ত্রিবিধ—(১) ব্যাজহেতুক, (২) অপরাদ্ধহেতুক ও (৩) বিত্রাসিতক। ব্যাজ বলিতে বুঝাইতেছে—বৃতক বা কৃত্রিম। 'অপরাদ্ধ' অর্থে যাহারা অপরাধী—চৌরাদি। অপরাধ করার ফলে তাহারা সদাই সন্ত্রস্ত থাকে। বিত্রাসিতক—বিশেষরূপে যাহারা ত্রাস পায়—অর্থাৎ বালকাদি। স্বভাবতঃ ত্রস্তহৃদয় স্ত্রী-বালকাদি একটি তৃণ কম্পিত হইতে দেখিলেও ভয় পাইয়া থাকে—ইহাই স্বাভাবিক ভয় (২২)।

বীভৎস দ্বিবিধ—(১) ক্ষোভণ বা শুদ্ধ ও (২) উদ্বেগী বা অশুদ্ধ। রুধিরাদি দর্শন-জনিত বীভৎস ক্ষোভণ (মনঃ-ক্ষোভ-কর); ইহার বিভাব (রুধিরাদি) শুদ্ধ বলিয়া ইহাও শুদ্ধ। আর বিষ্ঠা-ক্রিমি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন উদ্বেগী (মনের উদ্বেগজনক)। ইহার বিভাব (বিষ্ঠাদি) অশুদ্ধ বলিয়া তৎসঞ্জাত বীভৎসও অশুদ্ধ (২৩)।

অদ্ভুত-রসও দ্বিবিধ—(১) দিব্য ও (২) আনন্দজ। দিব্যজন বা বস্তু (সভা-বিমানাদির) দর্শনে উৎপন্ন দিব্য। আর মনোরথ-প্রাপ্তি-নিবন্ধন হর্ষ হইতে উদ্ভূত যে অদ্ভুত, তাহাই আনন্দজ।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

(২২) "ব্যাজাদিতি কৃতক ইত্যর্থঃ। অনেনানুভাবমার্দ্দবং দর্শিতম্। অপরাধ্যন্তীত্যপরাদ্ধাশ্চৌরাদয়ঃ। যত্তু স্বভাবত্রস্তহৃদয়ানাং স্ত্রীবালাদীনাং তৃণেঽপি কম্পমানে ভয়ং তদ্বিত্রাসিতকম্। বিশেষেণ ত্রাস্যত ইতি বিত্রাসিতো বালাদিঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২।

আচার্য্য অভিনবগুপ্তের মতে—ভয় সাধারণতঃ স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতির নিকটই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেন না, 'ভয়' বলিতে বুঝায় বিনাশের আশঙ্কা—উহা উত্তম-প্রকৃতিতে সম্ভব নহে। এ কারণে যাঁহারা বলিয়া থাকেন—গুরু-রাজা প্রভৃতির নিকট অপরাধ হেতু উত্তম-প্রকৃতিরও যথার্থ ভয় জন্মিতে পারে, তাঁহাদিগের উক্তি যুক্তিহীন। "গুর্ব্বাদ্যপরাধাৎ পরমার্থতোঽপ্যুত্তমানাং ভয়াবেগ ইতি ত্বসৎ। ভয়ং হি বিনাশশঙ্কাত্মকং নোত্তমেষু সম্ভবতি, তথা চ ভয়ং নাম স্ত্রীনীচপ্রকৃতিকমিতি সামান্যেন লক্ষ্যতে"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২।

(২৩) "রুধিরান্ত্রাদিদর্শনাদ্ যো বীভৎসঃ স ক্ষোভণত্বাচ্ছুদ্ধঃ। যস্তু বিষ্ঠাদিভ্য উদ্বেগী হৃদয়ং চলয়তি, সোঽশুদ্ধঃ, অশুদ্ধবিভাবকত্বাৎ। উপাধ্যায়স্ত্বাহ—বীভৎসস্তাবদ্বিভাববিশেষাদ্ যত্র তু সংসারনাট্যনায়করাগ-প্রতিপক্ষতয়া মোক্ষসাধনত্বাচ্ছুদ্ধঃ, যদাহুঃ—"শৌচাৎ স্বাঙ্গং জুগুপ্সতে" ইতি। তথা "বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্" (যোগসূত্র ২।৩৩) ইতি। তেন সোঽপি পরমার্থতস্ত্রিবিধ এব। দ্বিতীয়ক ইত্যনেন তস্য দুর্লভত্বেন প্রাচুর্য্যং সূচয়তি"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩২। অর্থাৎ আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলেন যে, প্রাচীন আচার্য্যগণ এই দ্বিবিধ বীভৎস ব্যতীত আর এক প্রকার শুদ্ধ পারমার্থিক বীভৎস-রসের উল্লেখ করিয়াছেন। সংসারে বৈরাগ্যবশতঃ যে বিষয়ভোগের প্রতি জুগুপ্সার উদ্রেক হয়, ইহা তজ্জনিত। তবে এই শ্রেণীর বীভৎস অতি দুর্লভ।

হে রাজন্

পশ্চিম আকাশ-কোণে বেলা ডুবে যায়!
হে রাজন্ চেয়ে দেখ তোমা পানে কেহ আজ ফিরে না তাকায়।
যাত্রী তুমি একা—
সঙ্গিহীন চলিতে হইবে পথ এই তব অদৃষ্টের লেখা।

কোথা তব বন্ধু-পরিজন?
কোথা আজ সভাসদগণ?
কোথা সে ময়ূর-পক্ষী-আঁকা সেই তব স্বর্ণ-সিংহাসনখানি,
করিতে যেথায় বসে নিত্য কানাকানি,
ভাঙ্গিবারে গড়িবারে নব নব দেশ?
হায় কত পিপাসা অশেষ!
নাহি তব সৈন্যদল, নাহি আজ বিজয়ের বিপুল উল্লাস,
স্তিমিত নিস্তব্ধ আজ হৃদয়-উচ্ছ্বাস।
নিবে গেছে প্রাসাদের গর্ব্বিত সে আলো
চারি দিকে ঘনাইয়া কালো।
হের সাজ মৃত্যুময় সব,
ক্ষান্ত ওই সম্মুখেতে অর্থহীন স্তুতি-কলরব।
যাত্রী তুমি একা—
সঙ্গিহীন চলিতে হইবে পথ এই তব অদৃষ্টের লেখা!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল

প্রভু ও ভৃত্য

ভৃত্য চাই! লোক এলো। প্রভু কহে তারে,
—কহ বাপু পরিচয়, কে চিনে তোমারে!
শেষ কাজ কোথা ছিল? ঠিক আগে তার?
সে চাকরি গেল কেন? সব সমাচার
না জেনে চাকর রাখা—বোকামির কাজ!
ও-সব বৃত্তান্ত তুমি দিয়ে যাও আজ,
কাল এসে দেখা করো। আজ খোঁজ করি!
তারা যদি বলে, ভালো,—মিলিবে চাকরি।

ভৃত্য কহে, আমারো যে ওই নিবেদন।
আমিও জানিতে চাই, মনিব কেমন!
এ বাড়ীতে আগে কাজ করে গেছে যারা—
মাহিনা পেয়েছে? না কি খেয়ে গেছে তাড়া?
দেখেছেন তাদের কি মানুষের মতো?
কিম্বা হীন জানোয়ার, দীন পদানত?
চলে গিয়ে আপনার যশ তারা গায়?
অথবা ঈশ্বরে ডাকি নালিশ জানায়?
মনিব মানুষ কি না—জানা চাই আগে!
না জেনে চাকরি নিতে ভারী ভয় লাগে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

টিউনিসিয়া

...এবারকার কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে টিউনিসিয়ায় মিত্র-শক্তির এই যে বিজয়-লাভ, এ-বিজয়ে তাহার পক্ষে সম্মুখ-সমরের পথ সুপ্রশস্ত হইয়াছে। বিজয়-লাভের ফলে মিত্র-শক্তি আজ ভূমধ্য-সাগরকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়া জার্ম্মাণী এবং ইতালীকে যেমন মাথা তুলিবার অবকাশ দিবে না, তেমনি ভূমধ্য-সাগরে মিত্র-শক্তির জাহাজ-চলাচলেও বাধা

...কিবে না। তুরস্কের অবস্থান দুর্ভেদ্য হইল এবং মিত্র-শক্তির ...ক্ষ জার্ম্মাণি-আক্রমণের বাধা-বিঘ্নও অনেকখানি কাটিয়া গেল। ...নায়কগণ এখন কি করিবেন, শান্তিকামী প্রত্যেক নর-নারী ...গ্রহে তাহারি প্রতীক্ষায় আছে।

জিব্রাল্টার এবং সুয়েজের মধ্যপথে টিউনিসিয়ার অবস্থান। ...সিলিকে লইলে মনে হয়, টিউনিসিয়া যেন ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব্ব ...বং পশ্চিমের মাঝখানে দেওয়ালের আড়াল তুলিয়া রাখিয়াছে। ...যুগের রাজনৈতিক এবং অর্থনীতিক সমস্যার সমাধানে সাগর-কূলে ...ায় ১০০ মাইলব্যাপী টিউনিসিয়ার মূল্য বড় অল্প নয়।

টিউনিসিয়ার শাসন-ভার নামেই শুধু 'বে' বা রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল; ফরাসী রিপাব্লিক ছিল টিউনিসিয়ার আসল মালিক। শাসন সুবিধার জন্য টিউনিসিয়াকে ১৯টি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করিয়া ফরাসী-গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য এক জন করিয়া গবর্ণর নিযুক্ত করিত! গবর্ণরেরা জাতে টিউনিসিয়ান এবং 'কাইয়াদ' নামে অভিহিত। প্রত্যেক গবর্ণরের অধীনে ছিল কাহিয়া বা 'মেয়র' এবং 'সেখ' বা গ্রাম্য মোড়ল। গবর্ণরদের উপরে এক জন গবর্ণর-জেনারেলের আসন। ফরাসী মিনিষ্ট্রী অফ ফরেন এ্যাফেয়ার্স এই গবর্ণর-জেনারেল নিয়োগ করিয়া টিউনিসিয়ায় পাঠাইত। আলজিরিয়া যেমন ফ্রান্সের উপনিবেশ এবং তাহারি অংশ-স্বরূপ, টিউনিসিয়া তেমন ছিল না। টিউনিসিয়া ছিল ফ্রান্সের প্রোটেক্টরেট বা অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য।

ইতালী হইতে টিউনিসিয়ার দূরত্ব খুব সামান্য; এ জন্য কয়েক শত বৎসর হইতে বহু দরিদ্র ইতালীয়ান টিউনিসিয়ায় আসিয়া আস্তানা পাতে। এখনো টিউনিসিয়ায় ইতালীয়ান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। তারা গরীব,—জন-মজুরীর কাজ করে। টিউনিসিয়ার মুসলমান-অধিবাসীরা এই সব ইতালীয়ানকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। কয়েক ঘর ইতালীয়ান অবশ্য জমিদারী ফাঁদিয়া বিত্তশালী হইয়াছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বে মেনার্ড ওয়েন উইলিয়াম্‌স্ নামে এক জন মার্কিন সুধী টিউনিসিয়া-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। টিউনিসিয়ার সম্বন্ধে বহু কথা লিখিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—ওদিকে সাহারা মরুভূমি, এদিকে ভূমধ্য-সাগর তাহারি মধ্যে টিউনিসিয়া অবস্থিত। টিউনিসিয়া এক দিন ছিল গৌরব-স্মৃতির মন্দিরের মত। চারি দিকে বিরাট স্বপ্নময়তা! এখনকার টিউনিসিয়া আর স্বপ্নপুরী নয়—অস্ত্র-ঝঞ্চনায় টিউনিসিয়ার আকাশ-বাতাস মুখরিত রহিয়াছে। প্রধান সহর টিউনিস। সেখানে ইতালীয়ানের দল চাহিয়া আছে ইতালীর দিকে—ইতালী হইতে যুদ্ধের কি খবর আসে, তাহারি প্রত্যাশায়। আর ৩৩০০০ ফরাসী লক্ষ্য করিতেছে জার্ম্মাণীর কূর্ম্ম-গতি! পথে-ঘাটে মোটর-ট্রাক চলিয়াছে—তৈল আর খাদ্যশস্যাদি লইয়া। এই তৈল আর খাদ্যের

ও-পারে য়ুরোপ—এ-পারে আফ্রিকা

ভার তারা লিবিয়া হইতে ত্রিপোলির দিকে লইয়া চলিয়াছে।

জাহাজ হইতে টিউনিস বন্দরে নামিয়া প্রথমেই পড়ে য়ুরোপীয় বাজার, তার পর দেশী পল্লী। দেশী পল্লীর বাহিরে কাথিড়াল; ভিতরে মসজেদ। পথের সর্ব্বত্র এখন ফৌজের আস্তানা পড়িয়াছে—থরে-থরে মেশিন-গান সাজানো। এই পল্লীতে পূর্ব্বে ছিল বিরাট্ বাঁদী-বাজার,—এখন সে বাজার শুধু গল্প-কথায় পর্য্যবসিত।

বার্বার জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী। বিদেশী কোন জাতিকে তারা ত্রিপোলিতে ও টিউনিসিয়ায় প্রবেশ করিতে দিত না। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে 'ফিলাডেলফিয়া' নামে একখানি মার্কিন জাহাজ ত্রিপোলির কাছে চড়ায় আবদ্ধ হইলে জাহাজের মার্কিন যাত্রী উইলিয়াম ইটন ত্রিপোলিতে নামেন এবং মিষ্ট ব্যবহারে ত্রিপোলির বেকে তুষ্ট করিয়া বের সাহায্যে লিবিয়া পর্য্যন্ত ৬৮০ মাইল পথ তিনি পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। এবং এই ঘটনার পর মার্কিন জাতির উপর ত্রিপোলি এবং টিউনিসিয়ার বার্বার

ব্যাব্ স্যুইকা মহল্লা—টিউনিস্

এল্ জেম্ এ্যাম্পি-থিয়েটার
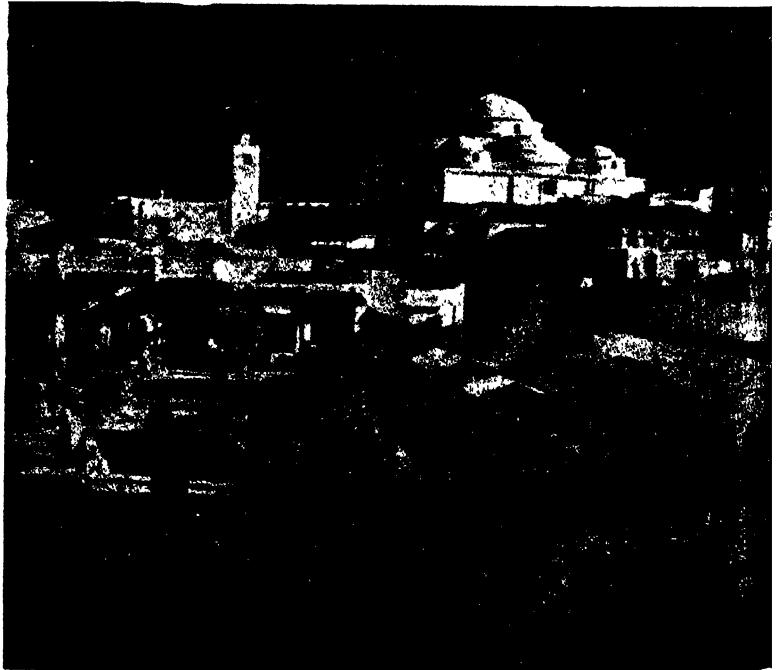
জাতির ঘৃণা-বিদ্বেষের ভাব অন্তর্হিত হয়। তাহার ফলে রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত করিয়া টিউনিসিয়ায় আমেরিকা এক জন কন্‌শল রাখিবার ব্যবস্থা করে। মার্কিন কবি জন হাওয়ার্ড পেইন্ আমেরিকার কন্‌শল হইয়া সত্তর-আশী বৎসর পূর্ব্বে এই টিউনিসে বাস করিতেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫ জানুয়ারি তারিখে টিউনিসে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁর দেহ এখানকার ব্যাব্ সুইকা মহল্লায় সমাহিত করা হয়; পরে এখান হইতে সে দেহ তুলিয়া ওয়াশিংটনে পাঠানো হয় সেখানকার ওক্‌হিল সেমেটেরিতে সমাহিত করিবার জন্য। Home sweet Home নামে সুবিখ্যাত সঙ্গীতটি এই কবি-কন্‌শল্ পেইনের লেখা।

লেখক লিখিয়াছেন—

টিউনিসের বাহিরে লে বার্দো সহর। এখানে বে'র মস্ত প্রাসাদ আছে। রমজানের সময় বে আসিয়া এই প্রাসাদে বাস করেন; তখন এখানে মহা-সমারোহে উপাসনাদি চলে। উপাসনার আসরে সম্রান্ত কর্ম্মচারী এবং আমীর-ওমরাহেরা নিমন্ত্রিত হন্। টিউনিসিয়ান ও পদস্থ ফরাসী রাজকর্ম্মচারীর দল আসিয়া বে'কে সম্মান জ্ঞাপন করেন।

প্রাসাদের বেগম-মহলে এখন আর বেগমদের ঘোমটা-ওড়না-ঘাগরা-পেশোয়াজ দেখা যায় না—সে-মহলে এখন হইয়াছে আলাউই মিউজিয়ম। এ মিউজিয়মে বহু প্রাচীন যুগের পিউনিক, রোমান্, ক্রীশ্চান এবং আরব শিল্প-কলার এত নিদর্শন আজো সযত্নে সংরক্ষিত আছে যে, সে সব অনুশীলন করিতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের হয়তো এক-একটা জন্ম কাটিয়া যায়!

লে বার্দোর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রাচীন সহর কার্থেজ। টিউনিস্ হইতে মোটরে বা ইলেকট্রিক ট্রেণে চড়িয়া যাইতে হয়। কার্থেজ খুব প্রাচীন সহর। কার্থেজ আজো স্মরণীয়

গিরি-নির্ঝরিণী—তোজুর

বে'র প্রাসাদ—লে বাদ্দো

হইয়া আছে, সে শুধু কবি ভার্জ্জিল এবং কথা-শিল্পী গুস্তাভ্ ফ্লোবেয়ারের কল্যাণে।

রেলোয়ে-ষ্টেশনের গায়েই ডেইজি এবং জিরানিয়াম পুষ্পে ভূষি ছোট একটি বাগান। এই বাগানে সালাম্বোর অমর লেখ

ফৌজের কুচ-কাওয়াজ। পিছনে প্রাচীন মসজেদ। কাইরওয়ান্

কুম্ভকারদের হাতের তৈয়ারী সাধারণ কুঁজা

আধুনিক ইহুদী মন্দির—জের্বা

ফ্লোবেয়ারের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি সংরক্ষিত আছে। ফ্লোবেয়ারের লেখায় কার্থেজের যে-ছবি আমরা পাই, সে ছবির সঙ্গে এখনকার কার্থেজের কোনো মিল নাই। কার্থেজের সেই সব প্রাচীন পাষাণ-দুর্গ ও মন্দিরের ধ্বংস-স্তূপের উপর আধুনিক-রীতির গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

প্রাচীন রোমান্ মন্দির—দুগ্‌গা

আকাশ-বাতাস সারা-ক্ষণ পুষ্প-গন্ধে আচ্ছন্ন হইয়া আছে! এখানকার কমলা, গোলাপ এবং ভার্বিনার আতর—পৃথিবীতে তার আর তুলনা নাই! আতরওয়ালারা বলে, তারা সম্ভ্রান্ত মুর-বংশজাত—পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাদের পূর্ব্বপুরুষরা স্পেন হইতে বিতাড়িত হইয়া টিউনিসিয়ায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

পূর্ব্বে কাইরওয়ান সহরের প্রসঙ্গে বলিয়াছি,—রহস্যময় নগর। তার কারণ, মুসলমানের কাছে এ নগর পুণ্যময়। কাই-রওয়ানকে অনেকে বলেন "আফ্রিকার মক্কা"। রোমের তৈয়ারী হর্ম্ম্য-মন্দিরাদি ভাঙ্গিয়া আরব জাতি তাহারি পাষাণ-শিলা লইয়া কাইরওয়ান সহর নির্ম্মাণ করে। মার্কিণ লেখক উইলিয়াম্‌স্‌ লিখিতেছেন, টিউনিসিয়া জলপাইয়ের দেশ। টিউনিসিয়ায় যে জলপাই-য়ের তৈল (olive oil) হয়, সে তৈলে সমস্ত পৃথিবীর অলিভ তৈলের অভাব পরি-পূরণ হইতে পারে।

টিউনিসিয়ার্ পূর্ব্ব-কোণে স্থশে এবং স্ফাক্স—বেশ বড় সহর। এ দু'টি সহরে য়ুরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। প্রাচীন যুগে এই স্থশের নাম ছিল হাড্রুমেতাম। কার্থেজিয়ান্ বীর হানিবল যখন রোম-সম্রাট্ সিপিয়োর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তখন এই হাড্রুমেতাম-ফৌজ ছিল তাঁর প্রধান সহায়।

স্ফাক্সে ফশফেটের বহু খনি আছে। তাছাড়া এ জায়গাটি হইল স্পঞ্জের বিরাট্ আড্ডা। এখানে সমুদ্র-জলে অক্টোপাশ মেলে প্রচুর। স্থশ এবং স্ফাক্সের মাঝামাঝি প্রাচীন রোমান্ সহরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে—এল জেমের এ্যাম্পি-থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। বহু দূর হইতে এ ধ্বংস-স্তূপ দেখা যায়। এ স্তূপ এক বার দেখিলে তাহার মনোরম বৈচিত্র্য জীবনে ভোলা যায় না।

অষ্টম শতাব্দীতে বার্বার-রাণী কাহেনা টিউনিসিয়া হইতে আরবদের বিতাড়িত করিবার জন্য যে সমবায়োজন করিয়াছিলেন, সে আয়োজনে এল জেমের এই এ্যাম্পি-থিয়েটারকে তিনি করিয়াছিলেন তাঁর প্রধান দুর্গ। এই এ্যাম্পি-থিয়েটারে ষাট্ হাজার দর্শক বেশ স্বচ্ছন্দ ভাবে বসিয়া ক্রীড়া-রঙ্গ দেখিতেন—ইহার আয়তন এমন বিরাট্!

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্রোহী টিউনি-সিয়ানরা এই এ্যাম্পি- থিয়েটারের

ঘোর্ফা গৃহ। উটের পিঠে ফশলের মোট
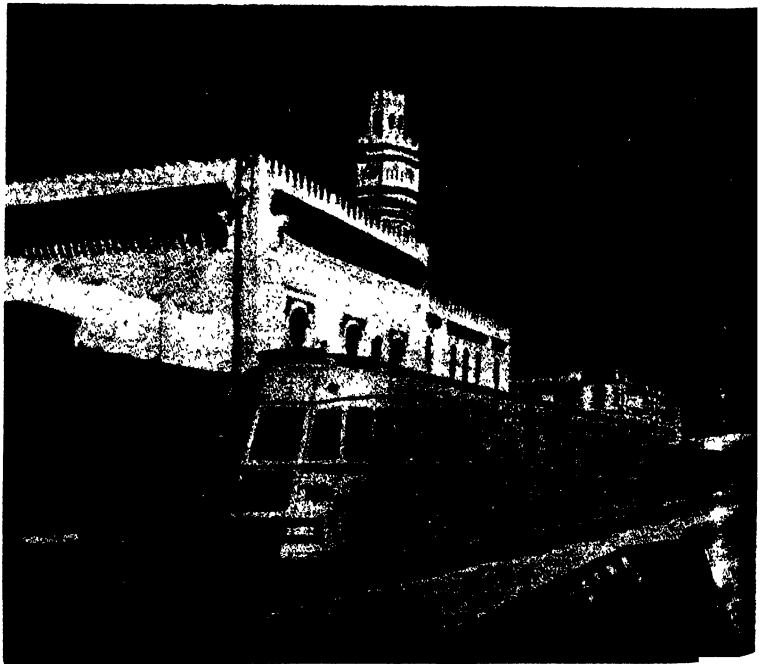
ইলেক্ট্রিক ট্রেণ—টিউনিস হইতে বাইজার্ট যাতায়াত করে

সারা জীবন দেশ ছাড়িয়া পয়সা রোজগারের চেষ্টায় বাহিরে কাটায়, তার পর শেষ-বয়সে দেশে ফিরিয়া আসে। দেশে ফিরিয়া তালীবনকুঞ্জে ঘেরা আবাস-নীড় রচনা করে। সে নীড়ে বাস এবং প্রয়োজন মত ইতস্ততঃ বিচরণের জন্য বাহনস্বরূপ রাখে একটি উট। এই ঘর ও একটি উট—ইহা ছাড়া জের্বানদের জীবনে অন্য কোনো বড় কামনা নাই।

জের্বায় একটি নর-কপাল-স্তম্ভ আছে—(Tower of skulls)। ষোড়শ শতাব্দীতে মুশলিম, সিশিলিয়ান এবং স্পানিশদের মধ্যে যখন ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল, তখন ভোরগাদ বা দ্রাগাৎ নামে এক জন জলদস্যু এমন দুর্দ্ধর্ষ শক্তিমান্ হইয়া ওঠে যে, বারবারেশরা তাকে অধীশ্বর বলিয়া মানিয়া লয়। স্পানিশরা এই দ্রাগাৎকে ভীষণ ঘৃণা করিত। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই জের্বায় স্পানিশদের পরাস্ত এবং বহু শত বন্দী খৃষ্টানকে দ্রাগাৎ নিহত করে। তাদের মুণ্ড লইয়া নর-কপাল-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। এই নর-কপাল-স্তম্ভটি প্রায় তিনশো বছর বিদ্যমান ছিল। তার পর ফরাসীরা সেটিকে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

জের্বায় কুম্ভকারদের কাজ দেখিবার মত। নরম কাদার তাল লইয়া শুধু হাতের নানা ছাঁদে চকিতে কলসী কুঁজা ফুলদানী প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে তারা সুনিপুণ।

লেখক লিখিতেছেন—সেতু নির্ম্মাণ করিয়া রোমানরা জের্বার সহিত টিউনিসিয়ার সংযোগ সাধন করিয়াছিল।

ওয়েলালে দেখিয়া এনা ক্যাস্তারায় ষ্টীমারে চড়িয়া সাগর পার হইয়া আমরা চলিলাম জার্শিসে। জার্শিস হইতে সাহারা-যাত্রার ব্যবস্থা।

কার্থেজ—আধুনিক রূপ

জার্শিস হইতে ফুম তাতাহুইন্ এবং দুই রাৎ পার হইলেই সাহারার প্রবেশ-দ্বার! বিচরণে আর তেমন কষ্ট নাই—বালির বুকে এখন মোটর-ট্রাক চলিয়াছে। আমরা লিবিয়া-সীমান্তে আসিয়া বেন গার্ডেন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

অন্য সময়ে বেন-গার্ডেন সামান্য সহর—চারি-ধারে হাট-বাজার! কিন্তু রণ-দামামা-নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এখন কড়াকড় পাহারার বন্দোবস্ত।

বেন গার্ডেন হইতে বালুবক্ষ ভেদ করিয়া আমরা গেবিশে ফিরিলাম। তার পর কেবিলি, ছোট জেরিদ, তোজুর ও নেফতা মরূদ্যান। কেবিলির গায়ে বিশাল হ্রদ জেবেল তেবাগা—লবণাক্ত ভারী জলে পরিপূর্ণ। এই হ্রদটি যেন ডেড-সীর যমজ-ভাই! এখানে পাহাড় এবং মালভূমি—সর্ব্বত্র প্রচুর ফশ্‌ফেট্ আছে! সে জন্য বাতাস সব সময়ে ভীষণ তপ্ত!

তোজুর মরূদ্যানটি দৃশ্য-বৈচিত্র্যে পরম রমণীয়। চারি-দিকে তাল-বন, মাঝখানে গিরি-নির্ঝর। এ অঞ্চলে বৃষ্টি কি, তাহা সকলের

কাইরওয়ানের বাজার

হাড্রিয়ানের আমলের কূপ

ভূমধ্য-সাগর-কূলে
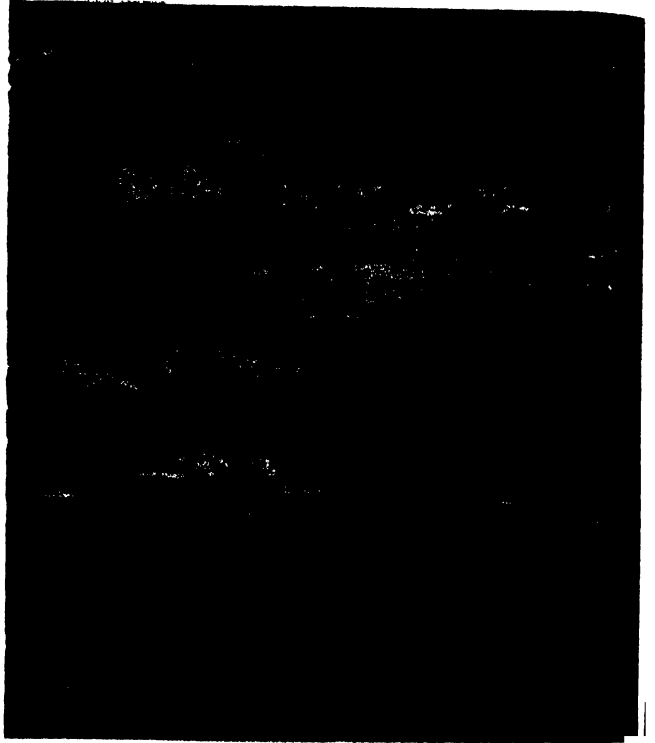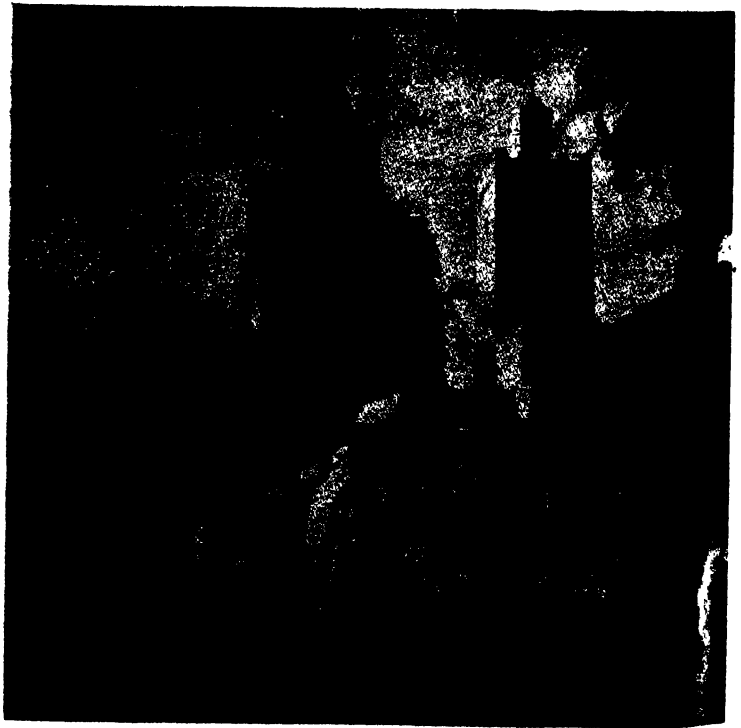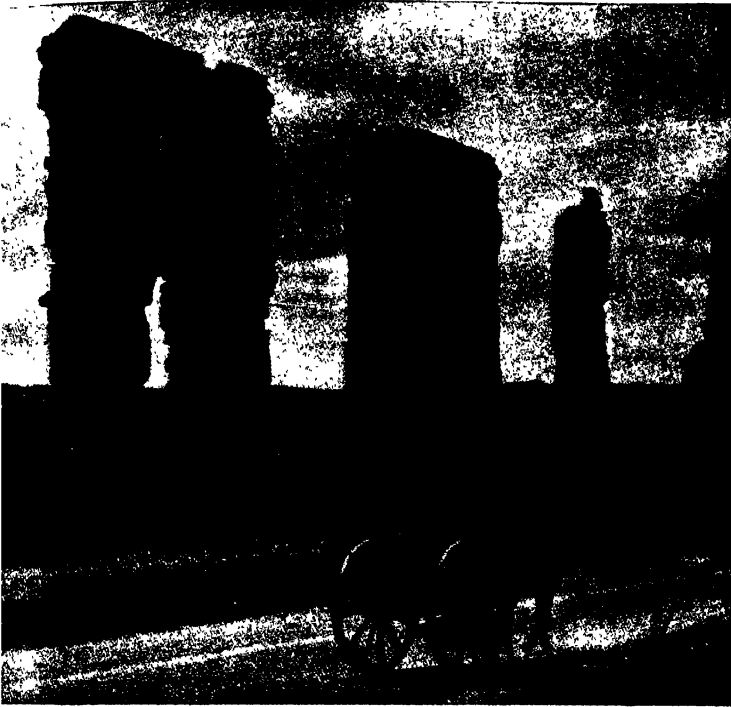
অবিদিত। নির্ঝরে অবিরাম জল ঝরিতেছে। সেই জল নিজ-গতিচ্ছন্দে বহিয়া চলিয়াছে। এখানকার অধিবাসীদের অধিকার নাই, নির্ঝরের স্বাভাবিক গতিবেগ ঘুরাইয়া দিয়া নিজেদের সুখ-সুবিধা করিয়া লইতে। তাছাড়া কাহারো জমিতে যদি জলাশয় বা নালা থাকে, সে জলাশয় বা নালা হইতে মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে অপরে জল লইতে পারে না। লইলে জল-চুরির দায়ে তাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়।

জমি কেনা-বেচার ব্যাপারেও এখানে বেশ বৈচিত্র্য আছে। কাহারো জমিতে জলাশয় আছে—জলাশয়ের স্বত্ব নিজে রাখিয়া শুধু জমিটুকু যেমন সে বেচিতে পারে, তেমনি আবার জমি রাখিয়া জলাশয়ের জল-স্বত্ব বেচিবার অধিকারও তার আছে। বেওয়ারিশ জল-ভাগের মালিক গভর্ণমেণ্ট। তাছাড়া সেখানে গাছের উপর ট্যাক্স-আদায়ের ব্যবস্থা আছে।

তোজুরের মরূদ্যানে যে নির্ঝর, তাহাতে প্রতি সেকণ্ডে ২৫০০ গ্যালন পরিমিত জল জমিতেছে। এ জলাশয়ে জল আসিতেছে ১১৪টি মোহনা দিয়া। এখানে তাল গাছের সংখ্যা প্রায় দু' লক্ষ।

নেফতা ও তোজুর হইতে জল লইয়া গাধার পিঠে সে-জলের পশরা তুলিয়া জলওয়ালারা সেই জল সুদূর গ্রামে-নগরে বেচিয়া বেড়ায়।

লেখক বলিতেছেন,—নেফতা ও তোজুর হইতে আমরা চলিলাম গাফশা ও স্বেইটলার অভিমুখে। সেনাজ্জার এবং মেৎলাউইর পাশ দিয়া পথ। এই মেৎলাউইয়ে ফিলিপ টমাশ নামে ফৌজ-বিভাগের পশু-চিকিৎসক ফশ-ফেটের বিপুল খনি আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন। সে খনি হইতে বছরে আজ বিশ লক্ষ টন ফশফেট মিলিতেছে।

স্বেইটলারে রোমান-আমলের বিজয়-তোর-ণের ধ্বংসস্তূপ আজও বিরাজমান দেখিলাম। তোরণের পরে পাশাপাশি তিনটি মন্দির—ভেনাসের মন্দির।

লেখক লিখিতেছেন,—এদিক্‌কার পাড়ি শেষ করিয়া উত্তরাভিমুখে দুগগা। দুগগা রোমান-সমৃদ্ধির অতীত স্বপ্নের মতো পড়িয়া আছে! বড় বড় শিলাস্তূপ—তার আর কোনো সীমা-পরিসীমা নাই। এখানকার প্রত্যেকটি শিলাখণ্ডে রোমান শৌর্য্য-বীর্য্যের শত স্মৃতি'

কাহিনী বিজড়িত আছে। দুগগার ঈষৎ পূর্ব্বে মাজাশ। রোমান সম্রাট অগষ্টাস্ এ নগর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে জুপিটারের বিরাট বিগ্রহ-মূর্ত্তি-সম্বলিত মন্দির ছিল। মূর্ত্তিটি এখন বাদ্দোয় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে; মন্দিরের ধ্বংসাবশেষটুকু পড়িয়া আছে। এ ধ্বংসাবশেষও মৃত্তিকা-সমাধি লাভ করিয়াছিল। বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসানে জার্ম্মাণ বন্দীদের দিয়া মৃত্তিকাগর্ভ হইতে ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা সে ধ্বংসাবলীর পুনরুদ্ধার করিয়াছেন।

লেখক লিখিতেছেন,—টিউনিসিয়ার আকাশে-বাতাসে যেন রোমান্সের মাদকতা লক্ষ্য করিয়াছি! এই জলপাই আর আঙ্গুর আর তাল-বনের দেশ—আজো কি বিপুল মায়া-বিভ্রমে ভরিয়া আছে, টিউনিসিয়ায় যিনি পদার্পণ না করিয়াছেন, তাঁকে তাহা বুঝানো সম্ভব নয়।

পথ চলিতে কখনো দেখিয়াছি উটের পর উটের সার চলিয়াছে—তাদের পিঠে কত রকমের যাত্রী! যাযাবর বেদুইন নর-নারীর ভিড়—কার্থেজে মরু-যাত্রীর দল, কাইরওয়ানে পুণ্যকামী তীর্থ-যাত্রী, দুর্গে ফরাসী বাহিনী! যে মরুভূমির নাম শুনিলে আমাদের কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়, প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে, সেই মরুবক্ষে দেখিয়াছি মানুষের আরাম-নীড়! সে সব নীড়ে আনন্দ-কলরবের বিরাম নাই! তেমনি আবার দেখিয়াছি সহজ জীবন-যাত্রার পাশে বার্বার দস্যু-তস্করের নৃশংস হিংসাবৃত্তি! ভূমধ্য-সাগরের তীরে য়ুরোপের ও-পারে—এত যুগের এত জাতির সংস্পর্শ সত্ত্বেও টিউনিসিয়ায় নানা জাতির জীবন-ধারা এত কাল ধরিয়া এখনো অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গিয়াছে! মুসলমানের কঠিন অবরোধ-প্রথা, তার পাশে ইহুদী ও য়ুরোপীয়ান জাতির অবাধ মুক্ত স্বাধীনতা—এ দু'য়ে আজো সংঘর্ষ বাধিল না! স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আজো সেই চিরপুরাতনের দেব চলিয়াছে! দীর্ঘকাল টিউনিসিয়া-বিচরণে মনে যে শান্তি, নয়নে যে তৃপ্তি পাইয়াছি, সারা আমেরিকা-পর্য্যটনে তার একাংশ পাই নাই, এ কথা অকপটে স্বীকার করিব।
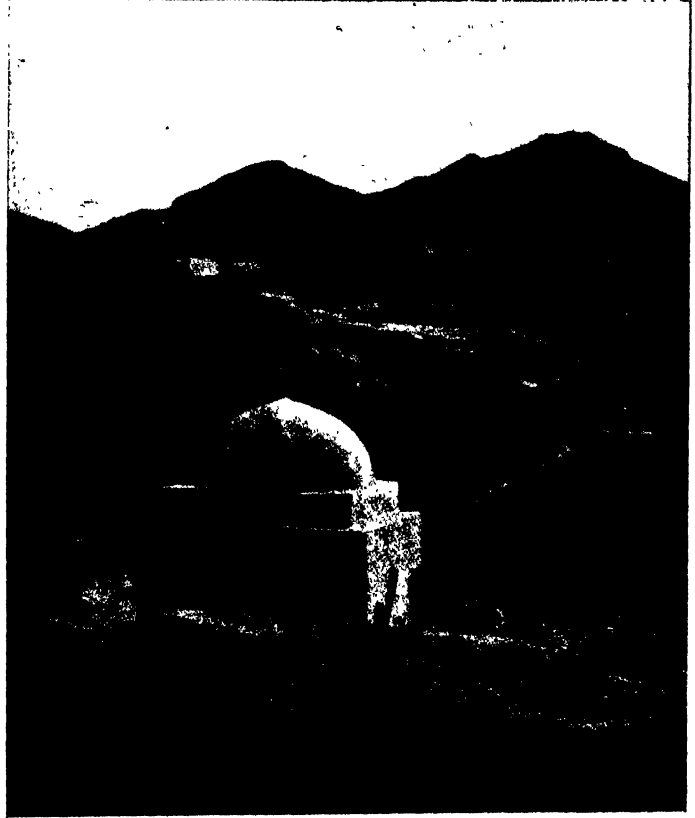
মাৎমাতা—বিদেশী পুরুষদের ও-দিকে যাইবার উপায় নাই—জেনানার গণ্ডী!

ইতিহাসের অনুসরণ

মিহিরকুল ও বালাদিত্য

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হূণ নামক একটি অসভ্য জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করিয়াছিল এবং কিছু দিনের জন্য গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই হূণ জাতি মোঙ্গলগোষ্ঠীয়। মধ্য-এশিয়ার কষ্প্রপ হ্রদের তীরে ছিল ইহাদের বাস। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে এই জাতি মধ্য-এশিয়া হইতে য়ুরোপ আক্রমণ করিয়াছিল। এই জাতির জনৈক আট্টিলা সমস্ত রোম সাম্রাজ্য, জার্ম্মাণ দেশ এবং গণদেশে অশান্তির সঞ্চার করিয়াছিল। ইহারা যেমন দস্যু তেমনি নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী ছিল। য়ুরোপীয়েরা এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ঐ হূণ জাতির একটি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া গুপ্তরাজ্য কতকটা বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। যাহারা ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা শ্বেতবর্ণ হূণ বলিয়া য়ুরোপীয়দিগের অনুমান। স্কন্দগুপ্ত ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দলবল লইয়া তাহার কিছু দিন পরেই ইহারা পুনর্ব্বার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তোরমান এই দলের নায়ক ছিল। এই হূণ দলপতি তোরমানের পুত্র মিহিরকুল পঞ্চনদ প্রদেশের শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন এবং সমুদয় পঞ্চনদ প্রদেশ ও মালয় দেশের কিয়দংশ দখল করিয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। অতিরিক্ত অত্যাচারে সহিষ্ণু হিন্দুদিগেরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তাহারা মিহিরকুল বা মিহিরগুলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে।

এই সময় মালবরাজ্যে দশপুর বা মান্দাশোর জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্ম এবং মগধে গুপ্তবংশীয় বালাদিত্য নামক দুই জন রাজা অনেকটা প্রবল

হইয়া উঠিয়াছিলেন। খান্দাশোর লিপিতে লিখিত আছে যে, জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মদেব হিমালয় হইতে পূর্ব্বঘাট পর্য্যন্ত এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছেন। অনেকেই এই জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মকে সংবৎ প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য ভাবিয়া ভুল করেন। সে কথা একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিব। ঐ দার্যদ অনুশাসনে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, এই রাজা যশোধর্ম্মার গমন-পথে বহু রাজাই নানারূপ নজর দিতেন, এমন কি, তাঁহার হস্তদ্বয় সজোরে মিহির মস্তক অবনমিত করাতে মিহিরকুলের ললাটে বেদনা জন্মে, ইত্যাদি। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, মিহিরকুল সম্মুখ সংগ্রামে জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন (১)। এই দার্যদ লিপিটি মিহিরকুলের সমকালীন; সুতরাং ইহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মা হূণরাজ মিহিরকুলকে নিজ বাহুবলে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইহা এই সমসাময়িক অনুশাসন হইতে জানা যায়।

কিন্তু কেবলমাত্র মালবের অধিপতি যশোধর্ম্মদেবের বাহুবলেই কি সেই অতি দুর্দ্দান্ত হূণরাজ মিহিরকুল পরাজিত এবং ভারত হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন? যে সময়ে হূণরাজ পরাভূত হন, সে সময় মালব রাজ্য বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ কোন নিশ্চিত প্রমাণ ভারতীয় ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় না। কেবল কতকগুলি আধুনিক য়ুরোপীয় এবং তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী এদেশীয় ঐতিহাসিক বলেন যে, এই জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মাই বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সংবৎ অব্দের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন! অথচ ইনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ের সহিত সংবতের গণিত-সময় মিলে না। জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মা যে কস্মিন্ কালেও 'বিক্রমাদিত্য' এই অভিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণই এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অথচ তিনি একটি জাল অব্দ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা য়ুরোপীয়ানরা প্রথমে বলেন, পরে ভারতীয় ঐতিহাসিক যশঃকামীরা গতানুগতিক ভাবে তাঁহাদের মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

সুতরাং সহজ-বুদ্ধিতে বুঝা যায় যে, যশোধর্ম্মদেবের বাহুবলেই কেবল দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ হূণ রাজা মিহিরকুল পরাজিত হইয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন—এ কথায় স্বতঃই মনে কেমন একটা সংশয় আসে। হূণেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত জাতি ছিল। তাহাদের প্রতাপে সরযূতীর হইতে য়ুরোপ জার্ম্মাণী ও ফ্রান্স পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল! তোরমান সেই হূণ জাতির শ্বেত শাখার সর্দ্দার বা দলপতি। সুতরাং তাঁহার বাহুবল ও সৈন্যবল যে প্রবল ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই তোরমানের পুত্র মিহিরকুলকে এক জন সদ্য-উত্থিত মালয়-নৃপতি আচম্বিতে এমন ভাবে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে, তিনি একেবারে ভারতের বাহিরে নির্ব্বাসিত হন্—ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অথচ বহু নৃপতি সম্মিলিত হইলে তাহার সম্ভাবনা বিচিত্র নয়। কিন্তু সেরূপ সম্মিলনের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং মিহিরকুলের ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসনের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আরও কোন কথা অপ্রকাশিত আছে,—অথবা বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! খান্দাশোরের একমাত্র শিলালিপি দেখিয়াই এই বিষয়ে হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে। ঐ শিলা-লিপি হইতে এইটুকু মাত্র বুঝা যায় যে, যশোধর্ম্মদেব সম্মুখ সংগ্রামে অপরাজেয় মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে পরাজয়ের গভীরতা কতখানি ছিল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। সুতরাং এ সম্বন্ধে অন্য কোন কাহিনী বা কিম্বদন্তী, গল্প বা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে কি না, এবং তাহাদের উপর কতখানি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, তাহাও সন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সকলেই কিছু তাম্রশাসন বা শিলালিপি রাখিয়া যাইবেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। অনেক তাম্র-শাসন বা শৈলশাসন, হয়ত এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিম্বা অন্ধকারে আত্ম-গোপন করিয়া আছে কি না তাহা বলাও কঠিন। হয়ত কোন শুভ মুহূর্ত্তে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে। তখন আবার সমস্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঢালিয়া সাজিতে হইবে। সেই জন্য এই সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

আজ কয়েক বৎসর হইল, এ বিষয়ে একটি প্রাচীন জনশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে। পাষাণ বা তাম্রশাসনের ন্যায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে সত্য,—কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে অবহেলা করা যায় না। যে সময় মিহিরকুল ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রায় শতাধিক বৎসর পরে (৬২৯—৪৫ খৃঃ) হুয়েন্থসাং নামধেয় জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ১৫ বৎসর কাল ভারতে ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তিনি অনেক বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে মিহিরকুলের পরাজয় এবং ভারত হইতে নির্ব্বাসন-কাহিনী অতি বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এখন অনেক ইংরেজ এবং জার্ম্মাণ ঐতিহাসিকই ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বতন সিদ্ধান্তের আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছেন। বৃত্তান্তটি সুন্দর। সুতরাং এখানে তাহা বিস্তৃত ভাবে বলা যাইতে পারে। অধ্যাপক এইচ, হেরাস্ ইহার যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই বৃত্তান্ত লিখিত হইল :—

মগধের মহারাজ বালাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের নিয়মাবলী অতীব ভক্তি সহকারে পালন করিতেন এবং তাঁহার প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। যখন তিনি মিহিরকুলের অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত-প্রদেশগুলি সুদৃঢ় করতঃ মিহির-কুলকে কর দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার এই ঔদ্ধত্য দমন করিবার জন্য মিহিরকুল সেনাবল বৃদ্ধি করিলেন। বালাদিত্য মিহিরকুলের প্রতাপ এবং প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার মন্ত্রীদিগকে কহিলেন—আমি শুনিতে পাইতেছি যে, ঐ তস্করের দল আসিতেছে। আমি উহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে সমর্থ হইব না। আমার মন্ত্রিগণের অনুমতি লইয়া আমি জলায় এবং জঙ্গলে আমার জীর্ণ দেহকে লুকাইয়া রাখিব। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার প্রাসাদ হইতে নিক্রান্ত হইয়া পর্ব্বতে এবং মরুস্থলীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজা ছিলেন বলিয়া তাঁহার বহু প্রজা তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল। তাহারাও সংখ্যায় বহু লক্ষ হইবে। তাহারা সাগরস্থ দ্বীপ-বক্ষে আত্মগোপন করিয়া থাকিল।

(১) Fleet. Gupta Inscription.

এ দিকে রাজা মিহিরকুল তাঁহার সৈন্যদিগকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া স্বয়ং বালাদিত্যকে শাস্তি দিবার জন্য নৌকারোহণে সাগরস্থ দ্বীপের দিকে যাত্রা করিলেন। রাজা বালাদিত্য সঙ্কীর্ণ গমনপথগুলি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার লঘু অস্ত্রধারী বাহিনী হইয়া মিহিরকুলকে সংগ্রামে লিপ্ত হইবার জন্য উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মিহিরকুল একটু অগ্রসর হইলেই বালাদিত্যের কাঞ্চনময় রণ-ঢক্কা বাজিয়া উঠিল; আর দেখিতে দেখিতে চারি দিক্ হইতে অগণিত সৈন্য যেন যাদুমন্ত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। মিহিরকুল এই আচম্বিত আক্রমণে পরাজিত হইয়া শত্রুসৈন্যহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে অক্ষত শরীরে বালাদিত্যের দরবারে উপস্থিত করিয়া দিল।

সংগ্রামে পরাজিত মিহিরকুল লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার পরিচ্ছদ দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালাদিত্যের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বালাদিত্য মন্ত্রিমণ্ডল-পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার এক জন মন্ত্রীকে বলিলেন যে, তিনি মিহিরকুলের সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করেন, অতএব তিনি তাঁহার মুখাবরণ উন্মোচন করুন। এই কথা শুনিয়া মিহিরকুল উত্তর করিলেন—"পূর্ব্বে যিনি রাজা ছিলেন, তিনি এখন প্রজা ও বন্দী হইয়াছেন; আর যিনি প্রজা ছিলেন, তিনি এখন রাজা হইয়াছেন। শত্রুরা পরস্পর পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কোন ফল হইবে না। আর কথাবার্ত্তা কহিবার সময় আমার মুখ দেখিয়াই বা কি লাভ হইবে?"

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বালাদিত্য রাজা তিন বার তাঁহার আদেশ মিহিরকুলকে বলিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন বালাদিত্য মিহিরকুলের পাপের কথা ঘোষণা করিয়া দিবার আদেশ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন—"ধর্ম্মক্ষেত্রে ত্রিবিধ পুণ্যের লক্ষ্য জনসাধারণের আশীর্ব্বাদ লাভ করা, কিন্তু তুমি অরণ্যচর পশুর ন্যায় উহা বিপর্য্যস্ত এবং বিনষ্ট করিয়াছ। তোমার পুণ্যের ক্ষয় হইয়াছে। তুমি এখন পুণ্য দ্বারা অরক্ষিত হইয়াই আমার বন্দী। তোমার পাপের মার্জ্জনা নাই। অতএব বধদণ্ডই তোমার শাস্তি।"

বালাদিত্য রাজার জননী ছিলেন বিখ্যাত বিদুষী। তাঁহার বুদ্ধিশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল এবং তিনি কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি শুনিলেন যে, মিহিরকুলের প্রাণদণ্ড হইবে। তখন তিনি বালাদিত্য রাজাকে কহিলেন—"আমি শুনিয়াছি যে, মিহিরকুল অত্যন্ত সুদর্শন। তাহার জ্ঞানের গভীরতা অত্যন্ত অধিক। আমি একটি বার তাহাকে দেখিতে চাহি।" এই কথা শুনিয়া বালাদিত্য মিহিরকুলকে রাজপ্রাসাদে তাঁহার মাতার সম্মুখে আনিবার আদেশ দিলেন।

বালাদিত্যের জননী তখন মিহিরকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মিহিরকুল! লজ্জা করিও না। সকল পার্থিব জিনিষই নশ্বর। অবস্থা-ভেদে জয় এবং পরাজয় ঘটে। আমি তোমাকে আমার পুত্র এবং আমি তোমার মা বলিয়াই মনে করি। তোমার মুখাবরণ খুলিয়া ফেল এবং আমার সহিত কথা কও।"

মিহিরকুল উত্তর করিলেন—"কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমি বিজয়ী রাজ্যের রাজা ছিলাম। এখন আমি বধদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী। আমি আমার রাজ্য-সম্পদ্ সমস্তই হারাইয়াছি, আমি এখন আমার ধর্ম্মকার্য্য করিতে পারি না। এখন আমার পূর্ব্বপুরুষের এক প্রজাদিগের নিকট মুখ দেখাইবার উপায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি সকলের নিকট লজ্জায় অধোবদন হইয়া আছি। আমি আমার উদ্ধারের উপায় দেখিতেছি না। সেই জন্য আমি আমার আলখাল্লার দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছি।"

এই কথার উত্তরে রাজমাতা কহিলেন—"সময়-অনুসারে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য ঘটে। সুখ, দুঃখ, লাভ এবং ক্ষতি পর্য্যায়ক্রমে আইসে। যদি তুমি ঘটনার চাপে ভাঙ্গিয়া পড়, তাহা হইলে তুমি প্রনষ্ট হইবে, কিন্তু যদি তুমি অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আবার উন্নতি করিতে পারিবে। আমার কথা শুন। ভাগ্যের উপর কর্ম্মফল নির্ভর করে। তোমার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া আমার সহিত কথা বল। হয়ত আমি তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারি।"

মিহিরকুল রাজমাতাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন—"আমি আমার পিতৃপুরুষের নিকট হইতে একটি রাজ্য লাভ করিয়াছিলাম সত্য,—কিন্তু আমার রাজ্যলাভের উপযুক্ত গুণ না থাকাতে আমি লোককে শাস্তি দিবার সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করাতে আমার রাজ্য হারাইয়াছি। যদিও আমি এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী, তথাপি এক দিনের জন্য আমি জীবন পাইলেও সন্তুষ্ট হই। আপনি আমাকে যে নির্ব্বিঘ্নতায় আশ্বাস দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি মুখের আবরণ খুলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

এই বলিয়া মিহিরকুল তাহার আলখাল্লা দ্বারা আচ্ছাদিত মুখের আবরণ মোচন করিয়া রাজ-জননীকে তাঁহার মুখ দেখাইলেন। তদ্দর্শনে রাজমাতা কহিলেন—"তাঁহার পুত্র দেখিতে সুদর্শন বটে। তাহার কাল পূর্ণ হইলে সে মরিবে।" তৎপরে তিনি বালাদিত্যকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"পূর্ব্বজগণের নির্দ্ধারিত বিধি-অনুসারে পাপীকে মার্জ্জনা করা উচিত এবং জীবন রক্ষা করিবার জন্য প্রীতি থাকা আবশ্যক। সত্য বটে, মিহিরকুল অনেক পাপ সঞ্চয় করিয়াছে, তথাপি তাহার পুণ্য ক্ষয় পায় নাই। তাহার পুণ্যের কিছু অবশেষ এখনও আছে। তুমি যদি এই লোকটিকে হত্যা কর, তাহা হইলে ইহার বিবর্ণ মুখমণ্ডল তোমার মানস-নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদা ভাসিয়া বেড়াইবে। উহার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, সে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হইবে। উত্তর-অঞ্চলে তাহাকে কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর করা হউক।"

মাতৃভক্ত বালাদিত্য রাজা মাতৃবাক্য লঙ্ঘন করিলেন না। সেই রাজ্যহীন রাজার প্রতি তাঁহার অনুকম্পার উদয় হইল। তিনি মিহিরকুলের সহিত এক কুমারীর বিবাহ দিলেন এবং তাহার সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতে থাকিলেন। তাহার পর তিনি যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই সম্মিলিত করিয়া এবং মিহিরকুলকে কিছু রক্ষি-সৈন্য দিয়া সেই দ্বীপ হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মিহিরকুলের ভ্রাতা নিজ রাজ্যে গিয়া রহিলেন। মিহিরকুল কিছু দিন দ্বীপে এবং মরুমণ্ডলীতে গোপনে থাকিয়া উত্তর-অঞ্চলে গমন এবং কাশ্মীর রাজ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন (২)।

---

(২) Beal—Records of the Ancient World vol I. pages 163—171.

ইহাই হইল হুয়েন্থ সাং (মা ড'য়ান চোয়াং) প্রদত্ত মিহির-কুলের পরাজয়ের বিবরণ। এই ব্যাপার লইয়া বিলক্ষণ বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছে। যশোধর্ম্মদেবের দার্ষদ-লিপি মিহিরকুলের জীবদ্দশায় উৎকীর্ণ। হুয়েন্থ সাংএর বিবরণ মিহিরকুলের পরাজয়ের শতাধিক বর্ষ পরে লিখিত। সেই জন্য এক শ্রেণীর লোক মনে করেন যে, খন্দশোরের শিলালিপির কথাই সমধিক গ্রাহ্য। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, হুয়েন্থ সাং পঞ্চদশ বর্ষ কাল ভারতের নানা স্থানে থাকিয়া যে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যখন বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, তখন এই কাহিনীটি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। বিশেষ শতাব্দী এত দীর্ঘ কাল নহে—যাহার মধ্যে অতি আজগুবি অনেক গল্প রচিত এবং প্রচারিত হইতে পারে। এই বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গিয়াছেন, —তিনি বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। প্রয়াগে মহারাজ হর্ষের পঞ্চবার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানে তিনি একবার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ একেবারে হুবহু মিথ্যা ভিত্তিশূন্য হইবে ইহা মনে করা ভুল। অধুনাতন ঐতিহাসিকরা হুয়েন্থ সাংএর বিবরণ একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। হোর্ণেল এবং মোদি চীন পরিব্রাজকের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ ও হুয়েন্থ সাংএর প্রদত্ত বিবরণ অগ্রাহ্য করা যায় না। ফ্লিট (Fleet) প্রভৃতি বলেন যে, উভয় বৃত্তান্তই ঠিক। মিহিরকুল পূর্ব্ব দিকে বালাদিত্য রাজা কর্ত্তৃক এবং পশ্চিম দিকে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাভূত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, মিহিরকুলের শেষ পরাজয় ঘটে মালব রাজ্যের অধিপতির হস্তে। এ কথা কোন মতেই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। দশপুর বা খন্দশোর (খন্দসর) শিলালিপিতে মিহিরকুলের পরাজয়-বার্ত্তা লিখিত আছে, —কিন্তু তাঁহার ভারত ত্যাগ করিয়া গমনের কথা,—অথবা রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কথা কিছুই নাই। তিনি মালয়রাজ জ্ঞানেন্দ্র যশোধর্ম্মের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিলেন; কেবল ইহাই লিখিত আছে। তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সুদূর কাশ্মীরে ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও দশপুরের দার্ষদ-লিপিতে নাই। সুতরাং ইহা বালাদিত্যের হস্তে মিহিরকুলের পরাজয়ের একটা ঘটনা মাত্র।

এখন জিজ্ঞাস্য—এই বালাদিত্য রাজা কে ছিলেন? ইঁহার অস্তিত্বের কি প্রমাণ এ পর্য্যন্ত মিলিয়াছে? আধুনিক ঐতিহাসিকরা অনেক তথ্য দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইনি মগধের গুপ্ত-বংশীয় রাজা নরসিংহ গুপ্ত। ইঁহার উপাধি ছিল বালাদিত্য। ইনি পুরগুপ্তের পুত্র। ইঁহার জননীর নাম ছিল শ্রীবৎসা দেবী। এই শ্রীবৎসা দেবী বিশেষ বিদুষী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে নিপুণা ছিলেন। বালাদিত্য নাম নহে—উপাধি মাত্র। এলান-প্রমুখ ইতিহাস-বেত্তারা বলেন যে, নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যই হুয়েন্থ সাং-কথিত বালাদিত্য রাজা। ইঁহার পিতার উপাধি ছিল প্রকাশাদিত্য (৩)। সুতরাং বালাদিত্য নামধেয় কোন রাজা ছিল না বলিয়া যাঁহারা হুয়েন্থ সাংএর বিবরণ অগ্রাহ্য করিতে চাহেন,—তাঁহারা ভ্রান্ত। মিহিরকুলের শেষ পরাজয় ঘটে গুপ্তবংশীয় নৃপতি নরসিংহ গুপ্তের হস্তে।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই পরাজয় ঘটিয়াছিল কোথায়? সমস্যা কঠিন। মগধে না আছে সমুদ্র না আছে দ্বীপ। তবে বর্ত্তমান বিহার প্রদেশকে প্রাচীন মগধরাজ্য বলিয়া মনে করিলে বিষম ভুল হইবে। প্রাচীন মগধ সময়ে সময়ে (অনেক সময়ে) গৌড় ও বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। এই সময়ে বঙ্গদেশে অনেকগুলি দ্বীপ ছিল; উহার মধ্যে মধ্যে ছিল সমুদ্র এবং খাড়ি। বালাদিত্য সম্ভবতঃ এই সকল দ্বীপের কোন স্থানে লুকাইয়া ছিলেন। মিহিরকুল ঐ দিকে তাঁহার অনুসরণে গিয়াই বন্দী হইয়াছিলেন। একসঙ্গে যশোধর্ম্মদেব এবং নরসিংহ গুপ্ত কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহাও মনে করা যাইতে পারে না। সুতরাং মিহিরকুলের শেষ পরাজয় ঘটে নরসিংহ গুপ্তের হাতে।

দ্বিতীয়তঃ, মিহিরকুল নরসিংহ গুপ্তের হাতে পরাজিত হইবার পর আর নিজ রাজ্যে গমন করেন নাই। তিনি কিছু কাল দ্বীপে ও জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ইহা হুয়েন্থ সাং তাঁর বিবরণে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া গিয়াছেন। পরে তিনি কাশ্মীর রাজ্যে গিয়া সেখানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র কাশ্মীর রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা সঠিক ভাবে বলা যায় না।

তোরমানের পুত্র মিহিরকুল বা মিহিরগুল ঠিক কোন সময়ে ভারতের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে অনুমিত হয় যে, ৫০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী এবং কঠোর-কর্ম্মা ছিলেন। সেই পাপেই তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। চৈনিক পরিব্রাজক-প্রদত্ত কাহিনীর সহিত খন্দসর-শিলালিপির কোন বিরোধ নাই। চৈনিক পরিব্রাজকের প্রদত্ত কাহিনী সরল এবং সুন্দর ভাবে বর্ণিত। হুয়েন সাং ঐ কাহিনী ভারতের নানা স্থানে এবং নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। সুতরাং আমরা ঐ বিবরণই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। গুপ্তরাজগণ এক সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমতা ক্ষীণ হইলেও নরসিংহ গুপ্তের পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়া মিহিরকুলকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। নরসিংহ গুপ্ত যে মিহিরকুলের সমকক্ষ ছিলেন না, ইহা তিনি জানিতেন এবং সেই জন্যই তিনি মন্ত্রীদের হস্তে রাজ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরের বক্ষে নবোত্থিত জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। কাজেই ইহা লইয়া বিতণ্ডা করা কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যালঙ্কার)।

---

(৩) Allan "Gupta Coins."

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে

[গল্প]

মা ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন্ রজত, আজ আবার চৌধুরী এসেছিল। মেয়ের বিয়ে নিয়ে একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছে। চুপ করে থাকলেও নিস্তার নেই। একে দিয়ে তাকে দিয়ে পিছনে লেগেই আছে।"

রজতের ছোট ভাই প্রবাল নিকটে ছিল। সে বলিয়া উঠিল, 'চৌধুরী মশায়ের পাঁচ বছরের আশা। এত সহজে কি ছাড়তে পারেন মা? মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বড্ড বিব্রত হয়ে উঠেছেন। তোমার আগত দাদার অপেক্ষায় মেয়েকে ওরা বড় করে রেখে অত লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। এখন তোমাদের বিয়ে ভাঙ্গা ঠিক হবে না।"

চিন্তান্বিত ভাবে মা উত্তর দিলেন, "ছেলে-মেয়ে থাকলে বিয়ের কথা অমন হয়, ভাঙ্গে। তা ধরে থাকলে সংসার চলে না। স্বদেশী-মেলায় মেয়ের মা'র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে বিয়ের কথা উঠেছিল মাত্র। সে মেয়ে আমি দেখিনি, পাকা কথাও কিছু দিইনি। লোভে পড়ে মেয়েকে যারা ডাগর করেছে, এখন তার বিয়ের দায় তাদেরই।"

সহাস্যে রজত কহিল, প্রবালের সঙ্গে ওই মেয়েটির বিয়ে দাও না কেন মা, তাহলে তো সব ল্যাঠা চুকে যায়! প্রবালের স্কোলারশিপও সার্থক হয়। আমার বাপু ও-সবে পোষাবে না। আমি চাই প্রচুর টাকা, আর বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমার বিলেতের খরচ সুদে-আসলে আদায় না করে ফাঁদে পা দিচ্ছি না। তোমাদের চৌধুরীর দশ-বিশ হাজারে আমার চলবে না।"

অপ্রতিভ প্রবাল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে জবাব দিল, "ও-কথা বলো না দাদা, আমি তোমার মত বিলেতেও যাইনি, সাহেবও বনিনি। কাজেই তোমার সঙ্গে যাঁর বিয়ের কথা উঠেছিল, তিনি আমার মাননীয়া! আমাদের জমিদারের ঘর হলেও তিন দিদির বিয়ে নিয়ে সোজা বেগ পেতে দেখিনি। আজ-কাল পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সমস্যা হলো মেয়ের বিয়ে। সেই জন্যই বলছিলাম—নইলে আমার আবার ওকালতি কিসের?" বলিতে বলিতে প্রবাল রাগ করিয়াই উঠিয়া গেল।

মা বিরস মুখে বলিতে লাগিলেন, "প্রবালের কথা ছেড়ে দে রজত। একে ওর মন নরম, তায় চৌধুরীর মিষ্টি কথায় গলে গেছে। সে মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দিতে পারি নে, বয়সে প্রায় সমান-সমান—তায় মেয়ে আবার লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ। ছেলের লেখাপড়ায় তেমন ধার নেই। লোকে বলবে কি? থাক গে, আজে-বাজে কথা ছেড়ে এখন আমাদের কাজের কথা হোক। তা হলে নন্দনপুরের রাজ-কন্যাকেই ঠিক করে ফেলি, কি বলিস তুই? ওদের সব ভালো, এক দোষ বাড়ীতে লেখাপড়ার রেওয়াজ নেই। তা না থাকলেও আমরা শিখিয়ে নিতে পারবো। মায়ের অনেকগুলো মরে-হেজে ওই একটি-মাত্র আছে তাই বড় আদরের। তোর মাসীর বাড়ী মেয়েটিকে আমি দেখেছি। গায়ের রং দিব্যি ফরসা। মাথায় বেশ চুল, তবে একটু রোগা। আমি না দেখলেও লোকের মুখে শুনেছি, চৌধুরীর মেয়ে না কি মোটা, কালো, মাথায় চুল কম। থাকার মধ্যে আছে মেয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আর বাপের নাম।"

তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া রজত কহিল, "পাণ্ডিত্য থাকে, মাষ্টারী করুক্ গে। আমরা নামের কাঙ্গাল নই। আমাদেরও নাম আছে। তোমায় সত্যি বলছি মা, বিয়ে করতে আমার এতটুকু ইচ্ছা নেই। তোমাদের উৎপাতেই বিয়ে করা। তাই করতেই যদি হয়, তবে রাজকন্যাই ভালো। তাদের অন্য কিছু না থাকলেও উঁচু মন থাকে। রাজকন্যা আর কোটাল-কন্যা সমান হয় না। বিশেষ সে রাজকন্যা বাপের উত্তরাধিকারিণী!"

পুত্রের সম্মতিতে মা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার গৃহ যে প্রকৃত রাজকন্যার উপযুক্ত স্থান, তাঁহাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী, নাম-প্রতিপত্তি—ছেলেও হিসাব-বিভাগের পরীক্ষায় সম্মানের সহিত কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সাধারণ সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে তিনি তো এমন দুর্লভ রত্নকে বিকাইয়া দিতে পারেন না। শিক্ষার মোহ, নামের মোহ রাজকন্যার ঐশ্বর্য্যের নীচে তলাইয়া যায়। ছোট ছেলে প্রবালের 'অধম-তারণ' প্রকৃতিতে মা তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। বড় রজতের বিষয়-বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত মেঘরেখা নিঃশেষে মিলাইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

কর্ত্তা নামে কর্ত্তা হইলেও কথাটা তাঁহার কাণেও উঠিল। তিনি কোন কিছুরই ধার ধারিতেন না। বিষয়-সম্পত্তির ভার বিশ্বস্ত অনুগত দেওয়ানের উপর ছাড়িয়া দিয়া, সংসারের ভার সুযোগ্য গৃহিণীকে অর্পণ করিয়া তিনি পূজা-অর্চ্চনা লইয়া সময় কাটাইতেন। রাজকন্যা চৌধুরী-কন্যা কাহারও প্রতি তাঁহার আগ্রহ বা আসক্তির লেশমাত্র ছিল না। যে বিবাহ করিবে, তাহার মত—যিনি ঘরকন্না করিবেন, তাঁহার মত—ইহার চেয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। তিনি প্রসন্ন হইয়া প্রীত হইয়া শুভ-বিবাহের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন।

বিবাহের দিন স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। দুই পক্ষই প্রবল প্রতাপশালী, কাজেই হাতী সাজিল, ঘোড়া সাজিল, বাজনা বাজিল, আলো জ্বলিল। আত্মীয়-কুটুম্বে গৃহ ভরিয়া মুখরিত হইল।

পূর্ব্বে তিন মেয়ের বিবাহ হইলেও পুত্রের বিবাহ এই প্রথম। তাই রজতের মা মনের ক্ষোভ মিটাইয়া উৎসবের আয়োজন করিলেন। কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিল না। উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া চৌধুরীর নামেও তিনি বিবাহের আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইলেন।

*　　*　　*　　*

মহাসমারোহে নববধূ রাজবালা শ্বশুর-বংশ ধন্য করিয়া জমিদার-ভবন আলো করিতে আসিল। রাজবালার বয়স কম-নয়। শিক্ষা-হীন পল্লী-জীবন-যাপনের ফলে মেয়েটি অকালপক্কতা লাভ করিয়াছিল। গ্রামের সরলতা সরসতা তাহার প্রকৃতিতে ছিল না। সহরের সভ্যতা ভদ্রতা শিখিবার সুযোগও সে লাভ করে নাই। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ বহুকাল পূর্ব্বে কোন সৎকার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ সরকার হইতে 'রাজা' খেতাব পাইয়াছিলেন। বাঁশবনে শেয়াল-রাজার মত সেই "রাজা" উপাধি বংশের শেষ সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। শুষ্কগর্ভ নদীর মত—নামে নদী থাকিলেও তাহার

জেলায় সুশীতল সলিল-প্রবাহের চিহ্নও নাই! যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহার দৈনিক নিলাম বন্ধ করিতেই প্রাণান্ত!

দান-সামগ্রী এবং নববধূর গহনার স্বল্পতায় রাজবাড়ীর গোপন রহস্যের চাবি হঠাৎ খুলিয়া গেল। রাজত্বের মরীচিকা মায়ামৃগের মত ছলনা করিয়া পলায়ন করিল। সংসারে যাহারা বেশী জিতিতে চায়, পরাজয়ের গ্লানি তাহাদেরই সবচেয়ে বেশী ভোগ করিতে হয়। হতাশ দৃষ্টিতে মা চাহিলেন ছেলের দিকে, ছেলে চাহিল মায়ের পানে। উভয়ের মর্ম্ম-বেদনা উভয়ে উপলব্ধি করিলেন; কিন্তু বাক্যে কেহ তাহা প্রকাশ করিলেন না।

বিবাহের গোলযোগ মিটিলে জমিদার-গৃহে পুরাতন প্রবীণ শিক্ষকের ডাক পড়িল। পূর্ব্বে ইনিই জমিদার-কন্যাদের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। স্কুল-কলেজে না পড়িলেও রজতের ভগিনী-দিগকে কেহ অশিক্ষিতা বলিতে পারিত না। কিন্তু শিক্ষকের আগমন সফল হইল না। অবাধ্য দুষ্ট ঘোড়ার মত নববধূ রাজবালা ঘাড় বাঁকাইয়া শাশুড়ীর মুখের উপর জবাব দিল, "পারবো না আমি লেখাপড়া শিখ্‌তে। আমার ঠাকুমা পিসিমা বলে, সরস্বতীর সেবা করলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়। সেই ভয়ে আমাদের রাজবাড়ীতে লেখা-পড়ার চলন নেই। মেয়ে দূরের কথা, সেখানে ব্যাটা ছেলে পর্য্যন্ত ভয়ে কেতাব ছোঁয় না! আমার দিয়ে সে সর্ব্বনেশে কাজ কেউ করাতে পারবে না। ও-সবের পাট আমাদের নেই।"

"সেখানে না থাকুক, এখানে আছে। তোমার বাবা-কাকারা সরস্বতীর পূজো করেননি বলেই তাঁদের লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে। আমার এখানে মূর্খ হয়ে থাকলে তোমার চলবে না।" বলিয়া গৃহিণী উদগত রোষ-বহ্নি দমন করিলেন!

চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া বধূ বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল, "ওগো ঠাকুমা, ওগো মাগো, তোমরা আমায় এ কোথায় পাঠিয়েছ? আমাদের যা করতে নেই, কেউ কক্ষনো করেনি, এরা আমায় তাই করতে বলে।"

রাজবালার খাসমহলের খাস দাসী যামিনী তাহার সঙ্গে আসিয়া-ছিল। রাজুর করুণ ক্রন্দনে যামিনী বিগলিত হৃদয়ে কাংস্য কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ছেলেমানুষ মেয়েটার ওপর তোমাদের এ কি জোর-জুলুম মা! এমন-ধারা অনাসৃষ্টি কাণ্ড কোথাও দেখিনি। রাজকন্যেকে বলছো নেখা-পড়া করতে, গান-বাজনা শিখতে! শেলাই নিয়ে বসতে! মাগো, শুনে আমি নজ্জায় মরি! যাদের শেলাই করে দরজী, বাইওয়ালি এসে গান-বাজনা শোনায়, তারা কিসের দুঃখে ছোটনোকের কাজ শিখতে যাবে মা?"

গৃহিণী জলদ-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব যদি ছোট-লোকের কাজ, তা হলে এতখানি বয়স পর্য্যন্ত সেখানে কি রাজকাজ শেখা হয়েছে বল্‌তে পারো?"

"তা পারবো না কেনে মা? এঁনারা খেতেন, শুতেন, ঘুমুতেন। ইচ্ছে হ'লে আমাদের সাথে কড়ি খেল্‌তেন। সেখানে কড়ি-খেলার কি ধূম! ঘর-ঘর কড়ির ছক—দিবে-আত্রি কড়ি খেলা। দিদি রাণী কড়ি খেলতে ভালবাসে বলে রাণীমা এক থলি ভর্ত্তি কড়ি দেছে, ছক দেছে। পই-পই করে আমারে বলে দেছে, "যামিনী, তুই সাথে রইলি, বাছারে কড়ি খেলিয়ে ভুলিয়ে রাখিস্‌। মনমরা হতে দিস্‌ নে।"

লজ্জায় ঘৃণায় গৃহিণীর কণ্ঠ রোধ হইল। ক্রন্দনরতা বধূর প্রতি তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু পুত্রের শুষ্ক ম্লান মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। শাসন-তাড়ন আদর-সোহাগ কিছুতেই রাজবালার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সে অক্ষরের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃকুলের অকল্যাণ করিতে পারিবে না।

দিবারাত্রি অনুযোগ-অভিযোগ অসন্তোষ-অভিমানের মধ্য দিয়া ধীর-মন্থর গতিতে সময়ের স্রোত বহিয়া চলিল।

* * *

বিবাহের মাস ছয়েক পরে রজতের বড়দিদি মুক্তার পত্রে জানা গেল, তাহার অধ্যাপক দেবর বিজয়ের বিবাহে নিদারুণ অনিচ্ছা সহসা ইচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। তাহার প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-কারিণী অপর কেহ নয়,—চৌধুরী-তনয়া মণিমালা।

কোন্‌ রেল ষ্টেশনে মণিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিজয় চির-কৌমার্য্যের সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছে।

মুক্তা লিখিয়াছে—"এ বিবাহে তোমাদিগকে আসিতেই হইবে মা। প্রবাল বাবার সঙ্গে পুরীতে আছে; তাহার আসা সম্ভব নয়। রজত আর রাজুকে লইয়া তুমি অবশ্য অবশ্য আসিবে। তোমরা না আসিলে আমার শাশুড়ী খুব দুঃখিত হইবেন। আমিও রাগ করিব, মনে রাখিও।"

চিঠি পড়িয়া মা ক্ষোভের নিশ্বাস মোচন করিলেন। মর্ম্মান্তিক দুঃখ-পরিতাপের মধ্যেও মনের নিভৃত কোণে একটু কৌতূহলের ঝরণা গুহায়-আবদ্ধ গিরি-নদীর মত ঝির-ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। যাহাকে তিনি অবজ্ঞা তাচ্ছিল্যভরে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছেন—সে কি বস্তু, স্বচক্ষে একবার প্রত্যক্ষ না করিলে মনে যেন অনেকখানি অস্বস্তি জমিয়া থাকিবে!

যাহার প্রতি এক দিন আগ্রহের অন্ত ছিল না, উৎসাহের অন্ত ছিল না; রাজা-রাজকন্যার নামের মোহ-কালিমায় সেই কল্পিত ছবি ক্ষণকালের জন্য মলিন হইলেও তাঁহার হৃদয়ের পটভূমি হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। রাজবালার আশে-পাশে আজ-কাল অহরহ সেই কল্পনার মূর্ত্তিখানি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী বেশে উঁকি দেয়!

রজতের নৈরাশ্যকাতর মুখ মা সহিতে পারেন না। ছেলের ইচ্ছায় তিনি যে ভাঙ্গাগড়ার কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন, এখন তাহাও মনে পড়ে না। মায়ের সুকোমল শান্ত হৃদয়ে অনুশোচনার আগুন অপরাধের আগুন সত্যভঙ্গের ঝটিকা প্রবেলবেগে বহিতে থাকে। কোন দিক হইতেই সান্ত্বনার স্নিগ্ধ-প্রলেপ মেলে না। এমন অশান্তি উদ্বেগ লইয়া ইচ্ছা করিয়া কেহ লোকালয়ে যাইতে চায় না। যাইবার প্রবৃত্তি হয় না।

সেই জন্যই মা অনেক ওজর-আপত্তি দেখাইয়া বিজয়ের বিবাহে যোগ দিবার আহ্বান খণ্ডন করিয়া মুক্তাকে চিঠি লিখিলেন।

কিন্তু নিজেকে লুকাইতে চাহিলেই লুকানো যায় না! সংসার, সমাজ, স্বজন তাহাদের দাবী ছাড়ে না। আশাহত বেদনাতুর সন্তাপের পাশে নিভৃত নীড় রচনা করিয়া লইলেও সময়-সময় সে নির্জ্জনতাও লোক-সমাগমে সচকিত হয়।

সে-দিন প্রভাতে মা রজতের সামনে চায়ের সরঞ্জাম ধরিয়া দিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। রাজবালা তখনো শয্যালগ্না।

এমন সময় তাঁহাদের মাঝখানে বিজয়ের মা আসিয়া উপনীত হইলেন।

নব-পরিণীত পুত্র এবং বধূর নূতন সংসার সাজাইয়া-গুছাইয়া দিবার জন্য বিজয়ের মা যে আসিয়াছেন, গৃহিণী ইহা জানিলেও না জানিবার ভাণ করিয়া বেয়ানকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন, "দিদি, আজ আমার সুপ্রভাত দেখছি। কি ভাগ্যি, কবে এলেন? কেমন আছেন?"

"তিন-চার দিন হলো এসেছি বোন। নতুন বৌমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী হলেও ছেলেমানুষ তো! তাই ওদের একটু গুছিয়ে দিতে এসেছি। ফাঁকি দিয়ে বিয়েয় গেলে না বলে আমাকেই তোমার কাছে আসতে হলো বৌ নিয়ে দেখাতে। আজ তোমাদের ছাড়ছি নে। দুপুরে রজতকে নিয়ে বৌমাকে নিয়ে বিজয়ের বাসায় যেতে হবে। মণিমার হাতের রান্না খেতে হবে। আজকের রান্না-বান্না যা কিছু সমস্তই মণিমা নিজের হাতে করবে। আমাদের এ বাড়ীর বৌমা কোথায়? তাকে দেখছি না!"

গৃহিণী কুণ্ঠার সহিত কহিলেন, "এখানেই আছে। শরীর তেমন ভাল নয় বলে শুয়ে রয়েছে। আপনি বসুন দিদি, বৌমাকে আমি ডেকে নিয়ে আসি।"

রজতের বিবাহে আসিয়া বিজয়ের মা রাজবালার স্বরূপ জানিয়া গিয়াছিলেন, তাই বেয়ানের হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, থাক, ডাকতে হবে না। খানিক বাদে তো আমার কাছে যাচ্ছে। তখন দেখবো! শরীর ভালো নেই—একটু শুয়ে থাকুক। আমারও এখন বেশীক্ষণ বসবার সময় নেই, বোন। বিজুর ছ'টি বন্ধুকে বলতে যাবো। আছি ক'দিন, এর মধ্যে এক দিন এসে সারা দুপুর কাটানো যাবে। চা আর খাবো না, খেয়েই বেরিয়েছি। কোন্ সাত-সকালে উঠে মণিমা আমায় চা করে দিয়েছে। কৌটো ক'রে পান সেজে দিয়েছে। এমন বৌ পাওয়া ভাগ্যের কথা বোন! আশীর্ব্বাদ করো, ওরা বেঁচে থাকুক, সুখে থাকুক।

"রজত, তোমরা কিন্তু দেরী করো না বাবা, সকাল-সকাল সবাইকে নিয়ে যেয়ো। দেরী করে গেলে আমি আর এখানে আসবো না। মুক্তোমাকেও পাঠাবো না। চাবি-কাঠি আমার হাতে আছে, মনে রেখো।" এ কথা বলিয়া বিজয়ের মা হাসিতে হাসিতে বিদায় লইলেন।

* * * *

গৃহিণী বধূর শয়ন-গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বৌমা বেলা না দুপুর, এখনো তোমার ঘুম ভাঙ্গলো না। মুক্তোর শাশুড়ী এলেন গেলেন, সাড়া পেয়েও তুমি বিছানা ছাড়লে না?"

যামিনী রাজবালার শাড়ী কোঁচাইতেছিল, সে খন্-খন্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি আবার কি বলছো মা, এত সকালে রাজবাড়ীর কাক-পক্ষীও যে বাসায় থেকে ভুঁইয়ে পা দেয় না। যার যা চেরকালের অভ্যাস তা না করলে ব্যামো হবে যে।"

"ব্যারাম হলে চিকিৎসা করাবো। এটা রাজবাড়ী নয়, এখানে রাজার কায়দা খাটবে না। ওকে তুলে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে চুল শুকিয়ে দাও। মুক্তোর দেওরের ওখানে যেতে হবে। নেমন্তন্ন আছে।" বলিয়া গৃহিণী চলিয়া আসিলেন।

দালানে চায়ের টেবিলে রজত তখনো বসিয়াছিল। মায়ের আদেশ-পালনের কোন লক্ষণ না দেখিয়া রজত উঠিয়া শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিল।

রাজবালা বিছানায় শয়ন করিয়াই যামিনীর কাছে তীব্র ভাষায় শাশুড়ীর সমালোচনা করিতেছিল। স্বামীর অপ্রত্যাশিত আগমনে সবিস্ময়ে সে চুপ করিল, কিন্তু উঠিল না। যামিনী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া শুষ্ক-স্বরে রজত কহিল, "মা ডেকে গেলেন তবু শুয়ে রয়েছ! মার কথা গ্রাহ্য হলো না বুঝি! খানিক বাদে নেমন্তন্নে যেতে হবে, শুনতে পাওনি?"

ঝাঁজিয়া রাজবালা উত্তর করিল, "শুনতে আর পাবো না কেন? কাণের মাথা এখনো খাইনি। দুপুরবেলা পরের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাওয়া আমার বাপু পোষাবে না। খেয়ে উঠে পান গালে দিয়ে তখুনি ঘুমানো আমার চিরকালের অভ্যাস। না হলে আমি থাকতে পারি না, মাথা ধরে।"

"ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে গিয়ে যদি মাথা ধরে, তাহলে অমন মাথা না রাখাই ভালো।"

বধূ সগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বললে? তোমার মাথা, তোমার যে যেখানে আছে তাদের মাথার ব্যবস্থা করে' তার পরে আমার মাথার বিধান দিয়ো। রাজকন্যাকে ভদ্দরতা শেখাতে হবে না। আমরা বাড়ীতে লোক ডেকে খেতে দিই। কারুর বাড়ীতে পাত চাটতে যাই না। দিন-রাত মোটরে চেপে টো-টো করে বেড়ানো হয়, কৈ, কখনো তো সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে দেখি না! আজ একেবারে ভারী দরদ দেখছি যে!"

"কাকে নিয়ে বেড়াবো? লোকের কাছে বের করতে লজ্জায় মরে যাই। এ সব কথা বলার প্রবৃত্তি হয় না। তবু যে বলি, তা মা'র দুঃখে।"

দূর হইতে মা ডাকিয়া কহিলেন, "মা'র দুঃখের কথায় তোর কাজ নেই রজত, যার বুদ্ধির দোষে বিবেচনার দোষে তুই দুঃখের সমুদ্রে ডুবেছিস, তার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তুই বেরিয়ে এসে চট করে চান সেরে নে। যে যাবে না, তাকে আর কিছু বলিস্ নে। চল্, আমরা দু'জনেই আমাদের কাজ সেরে আসি।"

রজত আর কোন কথা না বলিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিল।

* * * *

অপরাহ্নে পুত্রের সহিত মাতা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। রাজবালা তখন দিবানিদ্রা সারিয়া দাসী যামিনীকে লইয়া মহা কলরবে 'দশ-পঁচিশ' খেলিতেছিল। সে-দিকে না চাহিয়া মা নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

রজত আশ্রয় লইল বাহিরের বৈঠকখানায় ঢালা ফরাসের উপর। তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল—জ্ঞানে প্রদীপ্ত বুদ্ধিতে সমুজ্জ্বল সুন্দর একখানি সুকুমার মুখ! সে মুখের প্রীতি-প্রসন্ন হাসি! সরল সৌন্দর্য্য অকৃত্রিম আতিথ্য অকপট ব্যবহার। তাহাদের অনুরোধে এবং বিজয়ের মা'র আদেশে সেই কমল কণ্ঠের একটি গানের কলি—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!"

রজতের মুদিত আঁখিপল্লব বহিয়া বেদনার দু' ফোঁটা অশ্রু উপাধানে ঝরিয়া পড়িল।

শ্রীগিরিবালা দেবী।

বিপদে সম্পদ্

১

যে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিল এক দিন মানুষের, গৃহপালিত পশুর ও পক্ষীর প্রাণদ ও ভূমি শস্যসম্পদশালী করিবার কারণ ছিল, সেই পুষ্করিণীর যখন এমন অবস্থা ঘটে যে, তাহাতে ঘটী ডুবাইবার মত জলও থাকে না, তখনও যেমন তাহার তীরস্থিত তালতরুর জন্ম তাহার "তালপুকুর" নাম তাহার পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি জাগাইয়া রাখে, তেমনই এখন বাঙ্গালায় শরতে দেবীপূজার আগ্রহ ও উৎসব না থাকিলেও "দেবীপক্ষের" সমাদৃত নাম বাঙ্গালার সমৃদ্ধিকালের স্মৃতি বহন করিতেছে। শরতের যে শুক্লপক্ষ দেবীপক্ষ নামে অভিহিত, সেই পক্ষে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান পূজা—দুর্গোৎসব গ্রাম মাতাইয়া রাখিত, আর সেই পক্ষের শেষে—পূর্ণিমায় ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর পূজা। সে পূর্ণিমা কোজাগরী-পূর্ণিমা নামে অভিহিত। সেই পক্ষের জের পরপক্ষ পর্য্যন্ত চলে—সেই পক্ষের শেষে—অমাবস্যায় শ্যামাপূজা ও লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী পূজা।

এখন স্থানে স্থানে সর্ব্বজনীন পূজার প্রচলন হইয়াছে—কোন কোন প্রতিষ্ঠানেও পূজা হয়। কলিকাতার একটি প্রতিষ্ঠানে ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে কালীপূজা হইয়াছিল। "আশ্রমটি" যে ব্যক্তির তিনি ব্রাহ্মণ; কোন ভক্ত শিষ্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া নবভাবের কেন্দ্র আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আশ্রম-স্বামী হইয়া বসেন। সেই আশ্রমের কালী-পূজার উৎসব—যে ভাড়া বাড়ীতে আশ্রম ছিল, তাহারই পার্শ্বে খালি জমিতে হোগলার মেরাপ বাঁধিয়া তাহাতে অনুষ্ঠিত হয়। সে কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে—হালসীবাগানে।

পূজার পরদিন সেই ঘরে যখন ব্যায়াম—গান প্রভৃতির আয়োজন হইয়াছিল এবং কাযও চলিতেছিল, সেই সময় সহজদাহ্য উপকরণে কোথায়—কোনরূপে অগ্নিযোগ হইল। আশ্রমের পক্ষ হইতে লোককে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টার অভাব হয় নাই বটে, কিন্তু আকৃষ্ট নর-নারী-বালক-বালিকার নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার আবশ্যক চেষ্টা হয় নাই। হোগলার চালায় অগ্নিযোগ হইলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার ব্যবস্থা ছিল না—নর-নারী যাহাতে দ্রুত বাহির হইয়া যাইতে পারে, এমন পথ রাখা হয় নাই—এক কথায় ব্যবস্থার নামে অব্যবস্থাই বিরাজিত ছিল।

লোককে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা বিশেষ ভাবেই ফলবতী হইয়াছিল। নিকটস্থ দরিদ্র পল্লীগুলি যেন শূন্য করিয়া নর-নারী সমবেত হইয়াছিল—এক একটি বস্তীতে যত লোক বাস করে, তাহা না দেখিলে অনুমান করাও দুঃসাধ্য। পল্লীর মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ও ধনীরাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কলিকাতার মত বিরাট্ সহরে যে সব অঞ্চলে লোক দিবারাত্রি গৃহেই বদ্ধ থাকে, সে সব অঞ্চলে লোকের পক্ষে এইরূপ সুযোগে বাহিরের অবস্থার সহিত পরিচয় লাভের প্রলোভন সম্বরণ করা দুষ্কর হয়। কাযেই মণ্ডপ জনাকীর্ণ হইয়াছিল—আগন্তুকদিগের মধ্যে বালক-বালিকার সংখ্যাই অধিক—তাহাদিগের জন্য তাহাদিগের অভিভাবকদিগকেও আসিতে হইয়াছিল। মণ্ডপ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। একে ত পথের সঙ্কীর্ণতা ও জনতার অনুপাতে স্বল্পতা কেহ লক্ষ্য করে নাই, তাহার উপর আবার মণ্ডপ পূর্ণ হইলে—স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল।

এই অবস্থায় মণ্ডপের বাহির হইতে "আগুন! আগুন!" রব উত্থিত হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে লোক—এ উহাকে ঠেলিয়া—পতিতকে দলিত করিয়া—আত্মরক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায় সেই মৃত্যু-গৃহ হইতে বাহির হইতে ব্যস্ত হইল। পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশের পথ রুদ্ধ-দ্বার ছিল না—সেই পথে জলস্রোতের মত জনস্রোতঃ বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু মণ্ডপের যে অংশে স্ত্রীলোকরা ছিলেন, সে অংশের অবস্থা অন্যরূপ। সেই অংশের সঙ্কীর্ণ পথে দ্বার পর্য্যন্ত আগমনই জনতার পক্ষে দুঃসাধ্য; তাহার পর সে পথের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ ছিল; যাহারা সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাতে চাবী লাগাইয়াছিল, তাহারা কে কোথায় ছিল—সন্ধান পাওয়া গেল না। জনতার চাপে যখন সেই রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল, তখন মৃত্যু তাহার ধ্বংসলীলা শেষ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রথমেই আকাশে অগ্নিশিখা দেখা দিয়াছিল—সহজদাহ্য উপকরণ দেখিতে দেখিতে দগ্ধ হইয়া নিম্নে জনতার উপর পতিত হইয়া চারি দিকে মৃত্যু ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তাহার পর ধূমে চারি দিক্ অন্ধকার—সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় করিয়াছিল; বাতাসে দগ্ধ মাংসের দুর্গন্ধ; আর সমগ্র পল্লীতে শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা সব বাধা লঙ্ঘন করিয়া কোনরূপে পুরুষদিগের জন্য নির্দিষ্ট অংশে যাইতে পারিয়াছিলেন—তাঁহারাই কেহ কেহ বাহির হইতে পারিয়াছিলেন—মৃতের মধ্যে সেই জন্যই স্ত্রীলোকের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যা-তুলনায় অনেক অধিক।

২

অল্পক্ষণের মধ্যেই দমকল আসিয়া পড়িল এবং ধূমায়িত বহ্নি-নির্ব্বাপিত করিবার জন্য জল দিতে লাগিল। কিন্তু দমকল আসিবার পূর্ব্বেই পল্লীস্থ যুবকগণ বালতী-বালতী জল ঢালিয়া ও ষ্টীরাপ-পাম্প ব্যবহার করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া লোকের উদ্ধার-সাধন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। জাপানের সহিত বৃটেনের যুদ্ধের জন্য যে সকল বে-সামরিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল—সেই সকলে সঙ্ঘবদ্ধ ও শিক্ষিত যুবকগণ সোৎসাহে কায আরম্ভ করিয়াছিল এবং পল্লীর "পারুল পুরীর" অধিকারী রায় বাহাদুর গগনচন্দ্র চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয়চন্দ্র—কোন দলের না হইলেও—তাহাদিগের নেতৃত্ব করিতেছিল।

তাহারা মৃতের শব ও অর্দ্ধ-মৃতের অথবা অচেতনদিগের দেহ বহন করিয়া "পারুল পুরীতে" আনিতেছিল এবং তথায় ডাক্তারের ও যানের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কলিকাতায় আলোক নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থানে আবশ্যক আলোকের অভাবে কে মৃত, কে জীবিত, তাহা বুঝা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

ডাক্তার ও যান আসিলে ডাক্তাররা পরীক্ষা করিয়া যাহাদিগকে মৃত স্থির করিলেন, তাহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে পাঠাইয়া, যাহারা জীবিত, তাহাদিগকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল।

ডাক্তার, যান, পুলিস, উদ্ধারকারী দল সব ব্যবস্থা হইবার পর—পুলিসই ঘটনাস্থলে আলোকের ব্যবস্থা করিল এবং তখন আর কাহাকেও "পারুল পুরীতে" না আনিয়া সরাসরি যাহাকে যে স্থানে পাঠাইবার, তথায় প্রেরণের কায চলিতে লাগিল।

"পারুল পুরীতে" যাহাদিগকে আনা হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে চারি জনকে ডাক্তাররা হাসপাতালে পাঠাইবারও প্রয়োজন নাই, মত প্রকাশ করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে সেই চারি জনের তিন জনের স্বজনগণ আসিয়া তাহাদিগকে যে যাহার গৃহে লইয়া যাইলেন। এক জনকে লইতে কেহ আসিল না। সে "পারুল পুরীর" সম্মুখস্থ পথের অপর পারের গৃহের অধিকারী নিবারণ বাবুর দৌহিত্রী—নন্দরাণী। নিবারণ বাবু মৃত ও অর্দ্ধ-মৃতের স্তূপমধ্যে কন্যার ও দৌহিত্রীর সন্ধান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নন্দরাণীকে তথায় পায়েন নাই। কারণ, উদ্ধারকারীরা তাঁহার তথায় উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞাশূন্যা নন্দরাণীকে "পারুল পুরীতে" লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু পুলিস আসিয়া আলোকের ব্যবস্থা করিলে তিনি কন্যার শব বাহির করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার দেহ—বিশেষ পৃষ্ঠ দগ্ধ হইয়া অঙ্গারবৎ হইয়াছিল—মুখ অবিকৃত ছিল। মাতা ও পুত্রী যে স্থানে পতিতা ছিলেন, তাহা মণ্ডপের এক প্রান্তের স্থান—তাঁহাদিগের উপর প্রজ্বলিত চালার অংশ পতিত হয় নাই—কিন্তু অগ্নির শিখা সে পর্য্যন্ত তাপ বিকীর্ণ করিয়াছিল। দেখিলেই বুঝা যায়, মা—মাতার সহজাত সংস্কারবশে কন্যাকে রক্ষা করিবার আগ্রহে আপনার দেহ দিয়া তাহাকে অন্তরালে রাখিয়াছিল—আপনি দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও মৃত্যুবাহী তাপ আপনিই সহ্য করিয়াছিলেন। সেই কন্যাই বিধবার স্নেহের সম্বল।

নিবারণ বাবু যখন কন্যার শব ও সেই শবের অবস্থা লক্ষ্য করিলেন, তখন তাঁহার অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তিনি দৌহিত্রীর সন্ধানের অবসরও পাইলেন না। তিনি কিছু দিন—কয় বৎসর হইতে হৃদরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; তাহা তাঁহার বাল্যকালে বাতদুষ্ট জ্বরভোগের ফল—জরা যে সময় দেহের সব গুপ্ত দৌর্ব্বল্য প্রবল করে, সেই সময় জামাতার মৃত্যুশোক জরার সহায় হইয়া তাঁহার সেই রোগের বৃদ্ধি করিয়াছিল। তিনি কন্যার শব দেখিয়াই হৃদয়ের পীড়া-বৃদ্ধি অনুভব করিয়া সঙ্গী ভৃত্যের স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিলেন; সে তাঁহাকে কোনরূপে তাঁহার গৃহে লইয়া গেল এবং ডাক্তারকে সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাইয়া শ্মশানভূমিতে পরিণত পূজাপ্রাঙ্গণ হইতে নন্দরাণীর মাতার শব আনিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল।

ডাক্তার আসিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলেন বটে; কিন্তু তখন আর ঔষধের ক্রিয়া হইবার সময় ছিল না। কন্যার মৃত্যুশোকের প্রথম আঘাতই পিতার জীবনান্ত ঘটাইল। নন্দরাণী সংসারে সব হারাইল।

যে বৃদ্ধা দাসী নিবারণ বাবুর মৃতা পত্নীর কাছে ছিল এবং নন্দরাণীর মাতাকে পালন করিয়াছিল, সে-ই সেই মৃত্যুক্ষেত্রে নন্দরাণীর সন্ধানে ছুটাছুটি করিবার সময় শুনিল, কতকগুলি লোককে মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় উদ্ধারকারীরা "পারুল পুরীতে" লইয়া গিয়াছিল ও যাইতেছে। শুনিয়াই সে তথায় গিয়া দেখিল—অজয় তাহার গৃহের প্রবেশ-দালানের শ্বেত মর্ম্মরাবৃত মেঝের উপর নন্দরাণীকে রক্ষা করিল; যেন উন্তেদোন্মুখ কুসুমসম্পন্না লতিকা প্রবল বাত্যায় আশ্রয়দণ্ডচ্যুত হইয়া মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইল। সে ব্যস্ত হইয়া যাইয়া নন্দরাণীর মস্তক আপনার অঙ্কে তুলিয়া লইল। তাহা দেখিয়া গগনচন্দ্রই একটি উপাধান আনিয়া দিলে সে তাহা নন্দরাণীর মস্তকের নিম্নে দিল। তখন সে কাঁদিয়া উঠিল। এক জন ডাক্তার তখন নন্দরাণীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "চুপ কর—বেঁচে আছে।" তিনি নন্দরাণীর দেহে সূচি প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিবার ঔষধ দিলেন। জ্ঞানশূন্যা কিশোরীর দেহ-কম্পন দেখা গেল। দাসীর বিশ্বাস হইল, সে বাঁচিয়া আছে। সে ব্যস্ত হইয়া প্রভু-গৃহে যাইয়া নন্দরাণীর জন্য শয্যা আনিল এবং সংবাদ আনিল—নন্দরাণীর মাতা জীবিতা নাই; নিবারণ বাবুও অজ্ঞান হইয়া আছেন। নিবারণচন্দ্র যে তখন মৃত, তাহা সে জানিত না।

সেই কথা শুনিয়া অজয় তাঁহার সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার গৃহে গেল।

তখন সে দিক্ লোকে লোকারণ্য—পুলিস জনতা সরাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। যখন বহু লোক বিপদে অভিভূত, তখনও কেহ কেহ পরস্বাপহরণপ্রয়াসী।

অজয়, নিবারণ বাবুর গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ গৃহের প্রবেশ-দালানে দণ্ডায়মান পিতাকে বলিল, নিবারণ বাবুরও মৃত্যু হইয়াছে।

রায় বাহাদুর বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "বল কি ?"

৩

সেই সময় যাঁহার নামে গৃহের "পারুল পুরী" নামকরণ হইয়াছিল তিনি—রায় বাহাদুরের প্রৌঢ়া পত্নী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন দিন তাঁহার কুসুমের সৌন্দর্য্য-কোমলতা ছিল কি না, সে বিষয়ে গবেষণা করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, তাঁহার ডাকনাম "পারুল" তাঁহার পিতামহী যখন রাখিয়াছিলেন, তখন তিনি পিতা-মাতার সাত পুত্রের পর জন্মগ্রহণ করায় পিতামহী আদর করিয়া পরিচিত ছড়াটির আবৃত্তি করিতেন—

"সাত ভাই চম্পা জাগ রে।
কেন বোন পারুলী, ডাক রে ?"

তাহার পর তাঁহার জগদম্বা, জগত্তারিণী বা ঐরূপ কোন গুরুগম্ভীর নাম হইয়াছিল; কিন্তু পিত্রালয়ে সকলে যেমন, স্বামীও তেমনই তাঁহাকে পারুল নামেই ডাকিতেন। তাঁহার পিতা সাত পুত্র ও এক কন্যা প্রত্যেককে সম্পত্তির সমান অংশের অধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। সেই জন্য পিত্রালয় হইতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মাসিক আয় আড়াই শত টাকা ছিল। তিনি যে জমিদারের কন্যা ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী, তাহা তিনি কেবল যে সর্ব্বদা মনে রাখিতেন তাহাই নহে, পরন্তু, তাহাতে অত্যধিক গুরুত্ব আরোপও করিতেন। স্বামী কখন কখন তাঁহাকে সে গুরুত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্তি ত্যাগ করাইবার জন্য হেমচন্দ্রের উক্তি শুনাইতেন:—

ডেপুটার ভার্য্যা কন—আমাদের তিনি
চৌকিদারী কাজে পটু, মফঃস্বলে 'গিনি'।
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার !"

কিন্তু গৃহিণী তাহাতে বলিতেন, ও সব ঈর্ষ্যার কথা—ঈশপের উপকথায় শৃগাল দ্রাক্ষাফল পাড়িতে না পারিয়াই তাহা টক বলিয়াছিল। তিনি কঠোর ভাবে পরিবার শাসন করিতেন—সকলেই

তাঁহাকে ভয় করিতেন। স্বয়ং রায় বাহাদুরও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র অজয় তাঁহাকে ভয় করিত না; এমন কি, মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে তিনি সেই জিদী ছেলেকে ভয় করিতেন। গগন বাবু যখন মফঃস্বলে চাকরীস্থলে থাকিতেন, তখন সে যেমন সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলিত—সরকারের বড় চাকরীয়ার পুত্রত্বের ভাব তাহাকে স্পর্শ করিতেও পারিত না, তেমনই গগন বাবু রায় বাহাদুর হইয়া চাকরী হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৈত্রিক গৃহে ভ্রাতাদিগের অংশ কিনিয়া তাহা কতকটা সংস্কৃত ও কতকটা পুনর্গঠিত করিয়া তাহার প্রাঙ্গণে মনোরম উদ্যান রচনা করিয়া তাহার "পারুল পুরী" নামকরণ করিবার পর অজয় পল্লীর তরুণদিগের সকল অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিত। সে দিন সে যখন "আগুন! আগুন!" রব শুনিয়া ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার মাতা তাহাকে নিবারণ করিবার জন্য ডাকিতে ডাকিতে গৃহের বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলেও সে ফিরে নাই এবং সে যখন দগ্ধ ও অর্দ্ধদগ্ধ ব্যক্তিদিগকে গৃহে আনিয়াছিল, তখন তাহাতে বিরক্তি বোধ করিলেও তিনি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই,—পাছে পুত্র রাগ করে।

গৃহিণীর বিরক্তির কারণ একাধিক। প্রথম—তিনি কোনরূপ ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে চাহিতেন না—স্বামীর সঙ্গে নানা স্থানে একাই থাকিয়া তাঁহার সেই ভাব অনুশীলন-হেতু অভ্যাস যেমন স্বভাবে পরিণত হয়, তেমনই তাঁহার ধাতুগত হইয়াছিল। দ্বিতীয়—পরিচ্ছন্নতার আদর তাঁহার পক্ষে সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল—এতটুকু ধূলিও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না—দগ্ধ ও অর্দ্ধদগ্ধ মানুষকে গৃহে আনা তিনি অসহ্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন।

তিনি মনে করিয়াছিলেন—ততক্ষণে যে যাহার স্বজনদিগের শব বা দেহ লইয়া গিয়াছে, তিনি দালানটি ধৌত করাইয়া মুছাইয়া ফেলিবেন। সেই জন্য তিনি মনে অপ্রসন্ন ভাব ও মুখে তাহার বিকাশ লইয়াই আসিয়াছিলেন।

তাঁহার মুখ দেখিয়াই রায় বাহাদুর শঙ্কানুভব করিয়াছিলেন। তিনি কেবল যে স্ত্রীর এইরূপ ব্যাপারে স্বাভাবিক বিরক্তির বিষয় অবগত ছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু নিবারণ বাবুর পরিবার সম্বন্ধে তাঁহার মতও জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। সেই মত আর যাহাই কেন হউক না—প্রীতিস্নিগ্ধ নহে। পল্লী হইতে অদূরে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যে স্থানটি মুক্ত রাখিয়াছিলেন—প্রতিদিন প্রাতে নিবারণ বাবু ও রায় বাহাদুর উভয়ে তথায় বেড়াইতে যাইতেন। সেই সূত্রে প্রতিবেশিদ্বয়ের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। নিবারণ বাবুই এক দিন রায় বাহাদুরকে বলিয়াছিলেন, তিনি বিপত্নীক, তাঁহার হৃদ্‌রোগ আছে—মানুষের কখন কি হয় বলা যায় না, তিনি সব বিবেচনা করিয়া তাঁহার সব সম্পত্তি এক মাত্র সন্তান কন্যার নামে করিয়া দিয়াছেন—কন্যার একমাত্র সন্তান নন্দরাণী পাইবে; জামাতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি কন্যাকে কাছে রাখিয়াছেন—এখন তাহার কন্যাটিকে সুপাত্রে দিয়া যাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারেন। এই সব কথার পর তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন—তাঁহার কন্যার ইচ্ছা অজয়ের সহিত নন্দরাণীর বিবাহ দেন—রায় বাহাদুর তাহাতে সম্মত হইবেন কি? তিনি গৃহিণীর নিকট সে প্রস্তাব করিলে গৃহিণী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিয়াছিলেন, "মেয়ে সুন্দর স্বীকার করি; হয় ত দাদা মহাশয়ের দৌলতে কিছু পা'বেও—সে'ও মা মরবার পর; কিন্তু যা'র তিন কুলে কেহ নাই, তা'র সঙ্গে আমি ছেলের বিবাহ দিব না—ছেলের আদর-যত্ন হবে না। আর ঘরও পরিচয় দিবার মত নহে।" গৃহিণীর মনের ভাব—নিবারণ বাবুর প্রস্তাব বামনের চাঁদ ধরিবার আশার মত। রায় বাহাদুর নন্দরাণীকে বহু বার দেখিয়াছিলেন। নিবারণ বাবুর প্রস্তাব তিনি কোনরূপে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু গৃহের যে বিভাগে পুত্রবধূকে আসিতে হইবে, সে বিভাগে গৃহিণীর ইচ্ছাই যখন আইন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে আর "না উকীল, না দলিল, না আপীল"—তখন আর সে কথার উত্থাপন করেন নাই।

নিবারণ বাবু কিন্তু রায় বাহাদুরকে আর সে কথা বলেন নাই। তাহাতে রায় বাহাদুর বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার কারণ তিনি অনুমান করিতেও পারেন নাই। এক জন ঘটকী ঐ প্রস্তাব রায় বাহাদুরের গৃহিণীর নিকট আনিয়াছিল এবং সে'ও ঐ উত্তর শুনিয়া যাইয়া তাহাই নন্দরাণীর মাতার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল। শুনিয়া নন্দরাণীর মাতা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "উনি বড় মানুষ—তা'তে ছেলের মা, উনি বলতে পারেন। কিন্তু যা'র কপাল পুড়েছে, তা'র মেয়ের কি বিবাহ হয় না?" সে কথা শুনিয়া নিবারণ বাবু কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুই দুঃখ করিস্ না। তোকে আমি হাভাতের ঘরে দিই নাই—অযোগ্য পাত্রেও দিই নাই। তুই যে সব ইচ্ছায় দেওরদের দিয়ে এসেছিস্, সে সব অনেক গৃহস্থের নাই। ভগবান্ যদি করেন, তবে আজ তুই যেমন ঐ ছেলেকে জামাই ক'রতে চেয়েছিস্, ওঁরা তেমনই এক দিন তোর নন্দরাণীকে বৌ করবার জন্য ব্যস্ত হবেন—হয়ত তোর মেয়ে আরও ভাল ঘরে বরে পড়বে।"

গৃহিণীর মুখ দেখিয়া রায় বাহাদুর আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তিনি হয়ত কোন অপ্রিয় উক্তি করিবেন। তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিলেন, "অজয় জেনে এসেছে, নিবারণ বাবু মারা গেছেন।"

কিন্তু রায় বাহাদুর সে কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহিণীর মুখভাবের অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি যাহাকে আপদ বা বিপদ মনে করিয়াছিলেন—তাহাতে সহসা অপ্রত্যাশিত সম্পদ্ মনে করিয়া বলিলেন, "আহা, মেয়েটি এখানে প'ড়ে আছে! বাঁচবে ত?"

ডাক্তার বলিলেন, "আশা ত করি। তবে এখন যা'তে ঘুমিয়ে থাকে, সেই জন্য ঔষধ দিলাম।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী স্বামীকে বলিলেন, "পাশের ঘরে শুইয়ে দিতে হ'বে; আমি চাকরদের ও ঘরে ছোট খাট এনে বিছানা ক'রে দিতে বলছি।"

গৃহিণীর কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

তিনি পার্শ্বের ঘরে খাট আনাইয়া—খাটে বিছানা করিয়া দিয়া নন্দরাণীকে তাহাতে তুলাইয়া দিলেন।

তাহার ব্যবহারে তাঁহার স্বামীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ানুভব করিলেন।

তিনি জানিতেন না, তাঁহার গৃহিণী তথায় আসিয়া একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন—তাঁহার বিরক্তি বেদনার তাপে করুণায় পরিণত হইয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র কন্যা সুধারাণী প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। চিকিৎসা ও

শুশ্রূষা, মাতার স্নেহ কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই অথচ বাঁচিবার জন্য তাহার কি আগ্রহ! জীবনে যে কেবল সুখই লাভ করিয়াছে, সে কি মরিতে চাহে? তাহাকে ঔষধ-প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া কাটিয়া সন্তান বাহির করা হইয়াছিল। আর তাহার জ্ঞান হয় নাই। সে-ও এমনই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। সেই কন্যার সহিত নন্দরাণীর যে এত সাদৃশ্য—তাহা তিনি কখন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, হয়ত কল্পনাও করিতে পারেন নাই। হয়ত মৃত্যুর ছায়া এই ভাবেই বৈসম্যের মধ্যে সাদৃশ্য আনিয়া দেয়।

গৃহিণীর মনে আশঙ্কা হইতেছিল—এ-ও কি বাঁচিবে না? তিনি স্বামীকে বলিলেন, "ডাক্তার বাবুকে বল, জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যেতে পারিবেন না: টাকা যা' চাহিবেন তা'-ই পাবেন।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণীর মনে বেদনার সঙ্গে আপনার কার্য্যের জন্য পরিতাপ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল—এক দিন তিনি এই মেয়েটির সম্বন্ধে কি কথা বলিয়াছিলেন! তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন। সেই অপরাধের প্রতীকার—প্রায়শ্চিত্ত তিনি কিরূপে করিতে পারেন?

৪

দুর্ঘটনার পর এক দিন অতীত হইল—দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পরে নন্দরাণীর ঔষধ-সৃষ্ট—অজ্ঞান-অবস্থা আংশিক দূর হইল। সে চক্ষু উন্মীলিত করিল—যেন অকালজলদোদয়ের পর বর্ষণে ও বাত্যায় ম্লান কমলকোরক প্রভাত-সূর্য্যকর স্পর্শে প্রস্ফুটিত হইল। সে চাহিয়া সেই অপরিচিত পরিবেষ্টনে কিছুই চিনিতে পারিল না; কেবল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—তাহার কাছে পরিচিত—বৃদ্ধা দাসী। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেই এক অপরিচিতা তাহার জ্ঞানোন্মেষ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি ঘুমাও, মা।" তিনি তাহাকে একটু ঔষধ ও পানীয় দিলেন।

নন্দরাণী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। এ বার তাহার নিদ্রা গাঢ় নহে—সে যেন মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

পরদিন নন্দরাণীর ঔষধপ্রসূত আচ্ছন্ন ভাব দূর হইল। সে গৃহে ফিরিতে ও সব সংবাদ পাইতে ব্যস্ত হইল। তখন ডাক্তার বলিলেন—তাহার জীবনের আর আশঙ্কা নাই।

রায় বাহাদুরের গৃহিণী তাহাকে পুনঃ পুনঃ ব্যস্ত হইতে ও গৃহে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু নন্দরাণীর স্বাভাবিক ব্যস্ততা কেবলই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে তাহার মাতার মৃত্যু অনুমান করিয়াছিল; কিন্তু মাতামহের মৃত্যু তাহার কল্পনাতীত ছিল। উভয় সংবাদই সে শুনিল। সে বুঝিল, সংসারে তাহার আপনার বলিবার আর কেহ নাই—সে একা—সে একা। অনেক ক্ষেত্রেই বিপদ তাহার সঙ্গে বিপদ সহ্য করিবার ক্ষমতা লইয়া আইসে, সেই জন্য মানুষ বিপদে পিষ্ট হইয়াও বাঁচিয়া থাকে। নন্দরাণীর তাহাই হইয়াছিল। নহিলে তাহার অবস্থা বুঝিয়াও সে সেই অবস্থা সহ্য করিতে পারিত না।

সে কেবলই গৃহে—তাহার শূন্য গৃহে ফিরিতে ব্যস্ত হইতে লাগিল। রায় বাহাদুরের গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এক দিন যখন বৃদ্ধা দাসী নন্দরাণীকে বলিল, "এ বাড়ীর গিন্নী-মা যে যত্ন করেছেন, তা' অসাধারণ। তিনি জিদ্ করছেন, আরও সুস্থ না হয়ে তুমি বাড়ী যা'বে।"—তখন নন্দরাণী তাহাকে বলিল, "মাসী আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। তুমি কি জান না, ওঃ কথা শুনে মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন? আজ সত্যই আমার তিঃ কুলে আর কেহ নাই; কিন্তু আমি কেন পরের গলগ্রহ হয়ে থাকব?' বলিতে বলিতে দুঃখে ও অভিমানে নন্দরাণীর মন এবং অশ্রুতে তাহাঃ দুই চক্ষু পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধা দাসী বলিল, "সবই জানি মা। সে দিন বাবা বলেছিলেন, ভগবান্ যদি করেন, তবে এঁ'রাই হয়ত এক দিন তোমাকে পা'বার জন্য ব্যগ্র হ'বেন—হয়ত তোমাঃ আরও ভাল সম্বন্ধ আসবে। কিন্তু আজ যে অদৃষ্ট সব আশাই ছাই ক'রে দিলে!" সে চক্ষু মুছিল।

নন্দরাণী দৃঢ় ভাবেই বলিল, "মাসী, মা ত প্রায়ই বলতেন, অদৃষ্টের বাহিরে পথ নাই। তবে আর সে পথ সন্ধান করা কেন? অদৃষ্ট যা'র সব আশা ছাই ক'রে দিয়াছে, সে ছাই ছাড়া আর কোথায় যা'বে? কি পা'বে? আমি কালই বাড়ী যা'ব! তুমি আপত্তি ক'র না।"—

এই সময়ে অজয় কি লইবার জন্য, সাড়া দিয়া, কক্ষে প্রবেশ করিল। সে কথা আর অগ্রসর হইল না। বৃদ্ধা দাসীর দুশ্চিন্তা নন্দরাণী, বোধ হয়, অনুমান করিতেও পারে নাই। গৃহে ফিরিতে তাহারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু তথায় কে প্রাপ্তবয়স্কা নন্দরাণীর অভিভাবক হইয়া থাকিবে? দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া নিবারণ বাবুর কোন কোন আত্মীয় তাঁহার গৃহে আসিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই নন্দরাণীর অভিভাবকত্বের ভার গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কে তাঁহাদিগকে সে ভার দিতে পারে? আর লোক নিশ্চয়ই বলিবে—তাঁহারা স্বার্থের আকর্ষণে আসিয়াছেন—অথচ স্বার্থসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, নিবারণ বাবুর সর্ব্বস্ব এখন নন্দরাণীর। নন্দরাণীর পিতৃকুলের যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও ঐরূপ ভাবই দেখাইয়াছিলেন; কেবল এক পিসীমা বলিয়াছিলেন, "মেয়েটা কি ভেসে যা'বে? আমার ভাইয়ের মেয়ে ত! আমি ওর কাছে থাকতে পারি; কিন্তু আমার সংসারেও এক বৌ—তা'কে ফেলে আমিই বা ক'দিন থাকব?" তবে তিনি তখনও সেই শূন্য গৃহে ছিলেন—নন্দরাণীকে শান্ত করিয়া তবে যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তিনি কয় বার নন্দরাণীর কাছে রায় বাহাদুরের গৃহেও আসিয়াছিলেন।

পরদিন যখন নন্দরাণী রায় বাহাদুরের গৃহিণীকে বলিল, সে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে, তখন তিনি বলিলেন, "কেন, মা, তোমার কি কোন কষ্ট—কোন অসুবিধা হচ্ছে?"

নন্দরাণী বলিল, "আপনার যত্নের যেমন দয়ার তেমনই অন্ত নাই। কিন্তু আমি কত দিন আপনার গলগ্রহ হ'য়ে থাকব?"

"সে কি কথা, মা? তুমি ত আমার গলগ্রহ নও, তোমাকে পেয়ে আমি আমার মেয়েকে যেন ফিরে পেয়েছি।" তাঁহার মন স্মৃতিজাত বেদনায়—ও চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল।

নন্দরাণী তাঁহার ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্কল্পভ্রষ্ট হইল না। সে বলিল, "আমার সবই গিয়াছে—তবুও ঐ বাড়ীই আমার আশ্রয়—দাদামহাশয়ের দান—মা'র স্মৃতিবেষ্টিত মন্দির। সুখে না হ'লেও দুঃখে আমার ঐ বাড়ীই আশ্রয়। আপনি আর আমাকে বাড়ীতে ফিরতে বারণ করবেন না।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী নন্দরাণীর যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি নন্দরাণীকে যত কাছে টানিতে চাহিতেছেন, সে তত দূরে যাইতে চাহিতেছে। তাহাকে কাছে রাখিবার অধিকার ত তাঁহার নাই। এক দিন নিবারণ বাবুই তাঁহাকে সে অধিকার দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যে গর্ব্বে তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, তাঁহার সে গর্ব্ব শোক চূর্ণ করিয়া দিয়াছে—তিনি কন্যার শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন—পূর্ণ করিতে পারিতে-ছিলেন না। কন্যার অভাব পুত্রগণও পূর্ণ করিতে পারে না—তাহারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত হয়-মা'র অভাব তাহারা আর তেমন অনুভব করে না। তাঁহার মনে হইতেছিল, হয়ত নন্দরাণীকে পাইলে তাঁহার কন্যার অভাব, অন্ততঃ আংশিকরূপে পূর্ণ হইত! এক দিন তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি অনুশোচনা অনু-ভব করিতেছিলেন।

কিন্তু পরদিন যখন নন্দরাণী তাহার গৃহে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল, তখন রায় বাহাদুরের পত্নী আর তাহাকে নিবৃত্ত করিবার অধিক চেষ্টা করিলেন না; কেবল বলিলেন, সে আহার শেষ করিলে তিনি সঙ্গে যাইয়া তাহাকে রাখিয়া আসিবেন।

তাহাই হইল। রায় বাহাদুরের পত্নীর আশঙ্কা ছিল, নন্দরাণী তাহার সেই শূন্য গৃহে প্রথম প্রবেশ করিলে মাতার ও মাতামহের জন্য শোকে অভিভূতা হইয়া পড়িবে। সেই জন্য তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু নন্দরাণীর দৃঢ়তায় তিনি বিস্মিতা হইলেন। সে, জ্ঞান হওয়া অবধি, কয়দিন কেবলই আপনার অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়াছিল—ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়াছিল। সেই জন্য সে আপনার পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত আপনার মনের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হইল না।

কেবল তাহার পিসীমা যখন তাহাকে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং বৃদ্ধা দাসী তাঁহার সেই আর্ত্তনাদে যোগ দিল, তখন এক বার সে যেন মনে করিল—সে তাহার নূতন অবস্থায় অভিভূতা হইয়া পড়িবে। তখন রায় বাহাদুরের পত্নী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। নন্দরাণী অল্প সময়ের মধ্যেই আপ-নার অভিভূত ভাব জয় করিল। তবে তাহার মনকে সত্য সত্যই শান্ত করিতে বিলম্ব অনিবার্য্য হইল। সে জন্য তাহাকে সমধিক চেষ্টায় চেষ্টিত হইতে হইল এবং সে তাহার সেই চেষ্টা সফল করিল।

রায় বাহাদুরের গৃহিণী কিন্তু আপনার গৃহে ফিরিবার সময় পথে অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে যাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্বামী সহানুভূতিসিক্ত ভাবে বলিলেন, "দেখছি, মেয়েটি তোমাকে খুবই মায়ায় জড়িয়েছে!"

স্ত্রী বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছিল যেন, আমার সুধা ফিরে এসেছিল।"

সে কথায় স্বামীর চক্ষুও অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। যে বয়সে স্ত্রী সকল বিষয়ে স্বামীর সাহচর্য্য লাভ করিতে চাহে, সে বয়স অতিক্রান্ত না হইলে গৃহিণী তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিতেন—তিনি কেন নন্দরাণীকে পুত্রবধূ করেন নাই; তাহা হইলে সে কখনই পূজা-প্রাঙ্গণে যাইত না; সে না যাইলে তাহার মাতাকেও যাইতে হইত না—এ সর্ব্বনাশ হইত না। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বামিস্ত্রীর আর পূর্ব্বভাব থাকে না—সংসারে যে যাহার কার্য্যক্ষেত্র লইয়া ব্যস্ত থাকেন। সেই জন্য রায় বাহাদুরের পত্নী আর স্বামীকে সে কথা বলিলেন না।

সে কথা রায় বাহাদুরেরও মনে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে কথা উত্থাপিত করিতে চাহিলেন না—হয়ত তাহা গৃহিণীর পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইবে না।

৫

নন্দরাণী গৃহে ফিরিয়া মনে যত বেদনা অনুভব করিতে লাগিল, ততই সে বেদনা অনিবার্য্য বুঝিয়া তাহা সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পিসীমা এক পক্ষ কাল তাহার কাছে রহিলেন। কিন্তু তিনি নন্দরাণীর ব্যবহারে বিসর্জ্জনের ভাব লক্ষ্য করিতে না পারিলেও আবাহনের কোন চিহ্নও পাইলেন না। নন্দরাণী তাঁহাকে তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ ও একমাত্র পৌত্রকে লইয়া তাহার নিকটে আসিয়া থাকিতে বলিবে, এমন আশা তিনি করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া তিনি সে আশার অবকাশ না পাইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাবে নন্দরাণী বলিল, সে তাঁহাকে আর কত দিন থাকিতে বলিবে—তাঁহার সংসারে তাঁহার প্রয়োজন অধিক।

পিসীমা চলিয়া যাইবেন—সে প্রস্তাবে কিন্তু বৃদ্ধা দাসীর ভাবনার অবধি রহিল না। সে ভাবিতে লাগিল, কে নন্দরাণীর অভিভাবক হইয়া থাকিবে—কে-ই বা পিতৃমাতৃহীনার বিবাহের ব্যবস্থা করিবে? সে সে কথা পিসীমা'কে বলিলে তিনি বলিলেন, "যেতে আমারই কি কম কষ্ট হচ্ছে? কিন্তু কি করি, বল—উপায় যে নাই। আমি ভাইদের লিখব আর নিজেও চেষ্টা করব—যা'তে যত শীঘ্র সম্ভব নন্দর বিবাহ হয়ে যায়। তা' না হ'লে আমিই কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব?" যাইবার সময় পিসীমা নন্দরাণীকে বলিলেন, "মা, যাচ্ছি বটে, কিন্তু মন তোমার কাছে পড়ে থাকবে। যখনই কোন দরকার হ'বে, আমাকে সংবাদ দিও। কাকের মুখে সংবাদ পেলেও আমি ছুটে আসব।"

বৃদ্ধা দাসী ব্যতীতও এক জন নন্দরাণীর ভাবনা ভাবিতেছিলেন। তিনি রায় বাহাদুরের পত্নী। তিনি দিনান্তে অন্ততঃ এক বার নন্দ-রাণীকে দেখিতে যাইতেন এবং বৃদ্ধা দাসীর সঙ্গে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন; কিন্তু কিছুতেই এক দিন যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা উত্থাপিত করিতে পারিতেছিলেন না। হয়ত তিনি আশা করিয়াছিলেন; বৃদ্ধা দাসীই আবার সে প্রস্তাব করিবে। কিন্তু তাঁহার সে আশা যদি থাকিয়া থাকে, তবে তাহা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন না। দাসী ঘটকীর প্রস্তাবে তাঁহার উত্তরও শুনিয়াছিল এবং নন্দরাণীর মনোভাবও জানিতে পারিয়াছিল। সেই জন্য সে আর সে কথা বলিতে পারিত না।

নন্দরাণী আপনার অদৃষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার দুরাশা মনে পোষণ করিত না—সেই জন্য সে অবস্থার সহিত তাহার ব্যবস্থার সামঞ্জস্য-সাধনের প্রয়াস করিতেছিল।

এক দিন যখন এক ঘটকী নন্দরাণীর বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিলে বৃদ্ধা দাসী তাহাকে পিসীমা'র ঠিকানা দিয়া তাঁহার নিকট

যাইবার জন্য কয় আনা পয়সা দিল, তখন—তাহা দেখিয়া—নন্দরাণী তাহাকে বলিল, "মাসী, তুমি কেন ঐ সব ঝঞ্ঝাট করছ ?"

বৃদ্ধা দাসী তাহাকে বলিল, "ঝঞ্ঝাট কি ? আজ যদি দিদিমণি বা বাবা বেঁচে থাকতেন, তবে কি তুমি এ কথা বলতে পারতে ?"

নন্দরাণীর মনে হইল, বলে—তাঁহারা যখন নাই, তখন আর সে কথা কেন ? কিন্তু আপনার বিবাহের কথার আলোচনা করিতে সে, তাহার শিক্ষা ও সংস্কারহেতু, লজ্জানুভব করিল। আর দাসীও তাহাকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া বলিল, "কি যে হ'ল, বলতে পারি না—দিদিমণি ও বাড়ীর ঐ বড় ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ঘটক ঠাকরুণ এসে যা' বললেন, তা'তেই সে কথা আর উঠল না। দিদিমণি যে অভিমানী ছিলেন ! কিন্তু ঘটক ঠাকরুণ সত্য বলেছিলেন কি মিথ্যা বলেছিলেন, তা ভগবানই জানেন ; ও বাড়ীর গিন্নীর ব্যবহার দেখে ত তা' সত্য বলে মনে হয় না। তোমাকে কি যত্নই করেছেন ! এখনও দিনে এক বার তোমাকে না দেখে থাকতে পারেন না। ব্যবহার ত মা'র মতই করেন। আর দিদিমণির পসন্দ বটে ! কি ছেলে ! যেন হীরার টুকরা—চাঁদে কলঙ্ক আছে, তবুও ছেলের দোষ নাই। সেই কাল রাত্রিতে কি করল ! দমকলের লোকরা পরিশ্রমে হাঁপাতে লাগল ; ছেলের বিশ্রাম নাই ; আপনার দিকে দৃষ্টি নাই—লোককে উদ্ধার করতে হ'বে। যা'র শক্তি-সামর্থ্য না থাকে, সে আবার পুরুষ কি ? তোমাকে নিয়ে বাড়ীতে এল, যেন মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ হ'লে সতীকে নিয়ে গেলেন। ধন্য ছেলে বটে !"

নন্দরাণী দাসীর কথা শুনিল ; তাহাতে বিরক্তি বোধ করিল না —বরং সে কথা তাহার কাছে সত্য বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

দাসীর কথা শেষ হইলে সে কেবল বলিল, "মাসী, আর ও কথায় কায নাই।"

দাসী বলিল, "তা' কি কখন হয় ?"

দাসীর মত রায় বাহাদুরের গৃহিণীও সংস্কার বশে মনে করিতে-ছিলেন—নন্দরাণীর বিবাহের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই দিনই অপরাহ্ণে তিনি যখন নন্দরাণীকে দেখিতে আসিয়া স্বগৃহে ফিরেন, তখন দাসী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং বলিল, "একটা কথা বলি, আপনি ত নন্দকে বাঁচিয়ে তুললেন—এই বার ওর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করুন।—এক জন কেহ না দাঁড়া'লে ত তা' হ'বে না।"

রায় বাহাদুরের পত্নী বলিলেন, "সে কথা আমিও ভাবছি ; তবে বলতে সাহস করি নাই।"

"দেখুন, মেয়ে ত দেখেইছেন ; আর ওর বাপের সব টাকা আর বাগার বাড়ী, টাকা সবই ত ও পা'বে। ওর মা নাই ব'লে কি ভাল পাত্র পাওয়া যা'বে না ?"

"কেন যা'বে না ? আমি দেখব, ওর উপযুক্ত সম্বন্ধ হয়।"

"তা'-ই করবেন। ওর কেহ নাই ; ওকে নিজের মেয়ে মনে করে দয়া করবেন।"

"আমি ওকে নিজের মেয়ের মতই মনে করব।"

"আর আপনাকেই দাঁড়িয়ে সব ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

"তা'-ই হবে।"

"মা জগদম্বা আপনার মঙ্গল করুন"—বলিয়া বৃদ্ধা দাসী বিদায় হইয়া নন্দরাণীর কাছে ফিরিয়া গেল।

রায় বাহাদুরের গৃহিণী দাসীকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহা আন্তরিকতা-প্রণোদিত। কিন্তু তিনি কিরূপে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি সে বিষয়ে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই ভাবনা বাড়িতে লাগিল। যে উপায় অবলম্বন করিলে সহজেই সে সমস্যার সমাধান হইতে পারিত, তাহা তাঁহার মনে হইলেও তিনি কতকটা আপনার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া কুণ্ঠাহেতু কতকটা বা তাহাই একমাত্র উপায় কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহহেতু সেই উপায় অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রায় পক্ষকাল অতীত হইল ; রায় বাহাদুরের গৃহিণী কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না—সে বিষয়ে স্বামীর পরামর্শও গ্রহণ করিলেন না।

৬

নন্দরাণীর দাসী "মাসীর" সঙ্গে রায় বাহাদুরের গৃহিণীর কথা হইবার পর যে পক্ষকাল অতীত হইল, তাহার মধ্যে নিবারণ বাবু যে সম্পত্তি কন্যাকে দানপত্রে দিয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যার শ্বশুরালয়ের যে অর্থ ছিল উভয়েই নন্দরাণীর আইনতঃ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে হইল। রায় বাহাদুরই সে প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং নন্দরাণী তাহাতে সম্মত হইয়া তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে বলায় যে এটর্ণীর আফিসে অজয় শিক্ষানবিশী করিতেছিল, তিনি তাঁহাকেই সে কাযের ভার দিয়াছিলেন। সেই কাযের জন্য অজয়কে বহু বার নন্দরাণীর গৃহে যাইয়া কাগজপত্র লইতে ও তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল। প্রথম কয় বার সে তাহার মাতাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পর হইতে আর সকল সময় তাহার সুবিধা হয় নাই—তাহাকে একাই যাইতে হইয়াছিল। সে যথাসম্ভব তৎপরতা সহকারে সে কায শেষ করিয়া দিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল এবং যে সকল প্রশ্নে নন্দরাণীর মনে স্মৃতিজাত বেদনার উদ্ভব সম্ভব মনে করিয়াছিল, সে সকল প্রশ্ন— চিকিৎসক রোগীর দেহে যে স্থানে বেদনা সেই স্থান যে ভাবে পরীক্ষা করেন,—সেই ভাবে—করিয়াছিল। তাহার প্রশ্ন করিবার পদ্ধতিতে নন্দরাণী তাহার দয়াসঞ্জাত বিবেচনার পরিচয় বুঝিতে পারিত— যত্নের পরিচয় পাইত। আর বৃদ্ধা দাসী তাহার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া বলিত, "কি মিষ্ট কথা !" দুর্ব্বলের প্রতি সবল তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে, অজয় যেন নন্দরাণীর সম্বন্ধে সেই ধারণাই পোষণ করিত। কিন্তু তাহার যে আরও একটি কারণ ছিল, তাহা অজয় ব্যতীত আর কেহই মনে করিতে পারে নাই। তাহার গৃহে সে তাহার সহিত নন্দরাণীর বিবাহের প্রস্তাবে তাহার মাতার কথা —নন্দরাণীর সহিত তাহার দাসীর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া— জানিতে পারিয়াছিল এবং জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখানুভব করিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, মানুষকে মানুষ তুচ্ছ ভাবে কেন ? তাহার সেই দুঃখ নন্দরাণীর সম্বন্ধীয় ব্যবহার প্রভাবিত করিয়াছিল।

পক্ষকাল পরে এক দিন প্রাতঃকালে অজয় যখন স্নান করিতে যাইতেছিল, তখন অভয় আসিয়া বলিল, "দাদা, আজ তুমি বেলা ৪টার মধ্যে আফিস হ'তে ফি'রে এস। বাবা তোমাকে বলতে বললেন।"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"শুনলাম, এক মেদিনীপুরজার সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। মেয়েটি 'রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।' তাঁ'র বাবা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় এসেছেন।"

"তা'র পর ?"

"তিনি তাঁ'র শালার বাড়ীতে উঠেছেন। বাবা বেলা ৩টার সময় মেয়ে দেখতে যা'বেন। মেয়ে যদি তাঁ'র পসন্দ হয়, তবে কন্যাপক্ষ বেলা ৪টার সময় তোমাকে দেখতে আসবেন।"

"তা' ত হ'বে না।"

"তুমি বাবাকে বা মা'কে ব'লে এস।"

"না। তুমি তাঁ'দের কাহাকেও ব'লে দিও—বাবা যেন এ কাযে অগ্রসর না হ'ন। আমি তাঁ'কে বলতে পারব না।"

"কেন ?"

"প্রথম কথা, আমি এখন বিবাহ করব না। দ্বিতীয়, আমি যুদ্ধ বিভাগে একটা চাকরীর চেষ্টা করছি—আজ বেলা ৩টায় সে জন্য আমাকে দেখা করতে যেতে হ'বে।"

"সবই যে যুদ্ধের দুই ক্ষেত্রে—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সাফল্যের সংবাদের মত রহস্যময়! ব্যাপারটা কি বল ত? তুমি বিবাহ করবে না ?"

"কখন করব না, এমন কথা সাহস ক'রে বলতে পারি না। তবে বর্ত্তমান অবস্থায় যে করব না, তা' বলতে পারি।"

"আর হঠাৎ যুদ্ধের বিভাগে চাকরী !"

"এটর্ণীগিরীর পরিশ্রম—বহুদিনব্যাপী; স্বাবলম্বী হওয়া সময়-সাপেক্ষ।

"তাড়াতাড়ি স্বাবলম্বী হ'বার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন ?"

"আমি জমিদারের দৌহিত্র ও রায় বাহাদুরের পুত্র—দু' দফা দায়িত্বভার বহন করতে অক্ষম। তুমি অভয়—ভয় না ক'রে তা' করতে পার।"

"ব্যাপারটা কি বল ত, দাদা ?"

"অত্যন্ত সহজবোধ্য। বিবাহ যদি করতে হয়, তবে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করতে হ'বে সঙ্কল্প ক'রেই তা' করতে হয়। আমাদের লোকাচারে যে ছেলে বিবাহ করতে যা'বার সময় ব'লে 'মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি' সেই ভাবটাই আমি অন্যায় ও স্ত্রীর সম্বন্ধে অবিচার ব'লে মনে করি।"

অভয় হাসিয়া বলিল, "দাদা, দাসী আনতে যাওয়া একটা কথার কথায় পর্য্যবসিত হয়েছে। কেহ মনে করে না, ওটার কোন সার্থকতা আছে। তোমার ইচ্ছা না হয়, তুমি, না হয়, ও কথা ব'ল না।"

অজয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "অন্যান্য বাড়ীতে হয়ত ও কথার কোন গুরুত্ব নাই; কিন্তু এ বাড়ীতে আছে।"

"কেন ?"

"কারণ, মা মনে করেন, এ বাড়ীর লোকরা আর সব বাড়ীর লোকের তুলনায়, অনেক উচ্চে অবস্থিত।"

"কেন, দাদা ?"

"মা'র যে আভিজাত্য গর্ব্ব আছে, তা' তুমিও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। কিন্তু তা'তে যে মানুষকে তাচ্ছিল্য করা'তে পারে, তা' আমিও আগে জানতাম না।"

"কিসে তা' জানলে ?

"তোমাকে তা' বলছি। নিবারণ বাবুর যে নাতিনীকে আগুনের দুর্ঘটনার পর আরও ক' জনের সঙ্গে আমিই বাড়ীতে এনেছিলাম, তা'র সঙ্গে যে নিবারণ বাবু কখন আমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন, তা' আমি জানতাম না। কিন্তু মেয়েটি যে জ্ঞান হ'বার পর হ'তেই এ বাড়ী ত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়েছিল, তা'র কারণ—সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সময় মা এমন কথা বলেছিলেন যে, তা'তে সে আর মুহূর্ত্তমাত্র তাঁ'র বাড়ীতে থাকতে চাহিতেছিল না।"

অভয় জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, ঐ মেয়েটির সঙ্গে বিবাহে কি তোমার ইচ্ছা ছিল ?"

"আমার সেরূপ কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু আমার অভিসন্ধি থাকা বা না থাকার সঙ্গে লোককে তুচ্ছ করবার কি কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে, অভয় ?"

দাদার কথায় অভয় লজ্জিত হইল, বলিল, "তা নহে, দাদা। আমি ভাবছি, যদি তা'ই হয়ে থাকে, তবে ত আমারও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।"

"সে বিষয়ে আমি তোমাকে কিছু বলব না। কারণ, মা'র সম্বন্ধেও আমাদের কর্ত্তব্য আছে; আমি যদি চ'লে যাই, তবে তোমাকে একাই সে কর্ত্তব্য পালন করতে হ'বে।

অভয় ভাবিতে লাগিল।

অজয় বলিল, "তুমি বাবাকে ব'ল, তিনি যেন আমার বিবাহ সম্বন্ধে অগ্রসর না হ'ন। আমি তাঁ'কে অপদস্থ করতে পারব না—তাঁ'র মনে কষ্ট দিতেও চাহি না।"

অজয় যখন অফিসে যাইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতেছিল, তখন গগন বাবু তাহাকে বলিলেন, "অজয়, আজ তুমি বেলা চারটার মধ্যে বাড়ীতে এস।"

"অভয় আমাকে বলেছে। আপনি তা'র কাছে শুনবেন। আমি আসৃতে—" বলিয়াই অজয় একটু দ্রুত চলিয়া গেল।

কৌতূহলী হইয়া গগন বাবু অভয়কে ডাকিলেন। সে তাঁহার নিকটেই আসিতেছিল।

অজয় তাহাকে যাহা বলিতে বলিয়াছিল, অভয় তাহা পিতাকে বলিল।

শুনিয়া গগন বাবু চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহার প্রশ্নের পর প্রশ্নে অভয় তাহার দাদার নিকট হইতে যে সকল কথা শুনিয়াছিল, সবই পিতাকে বলিল। গগন বাবুর চিন্তা আশঙ্কায় পরিণতি পাইতে বিলম্ব হইল না। কারণ, তিনি পুত্রের প্রকৃতি অবগত ছিলেন; সে স্বভাবতঃ শিষ্ট ও শান্ত; কিন্তু আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে যেমন যে উত্তাপ সঞ্চিত থাকে, তাহা ধ্বংসে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তেমনই তাহার অন্তরে যে ভাব নিহিত, তাহা দৃঢ় সঙ্কল্পে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে—তাহার সে সঙ্কল্প নিবারণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। তিনি অতঃপর কর্ত্তব্য কি, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

৭

গগন বাবু কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন, তাহার পর পুত্রকে বলিলেন, "অভয়, তোমার মা'কে এক বার ডাক ত।"

অভয় চলিয়া গেল। তিনি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

গৃহিণী কখন আসিয়াছিলেন, তাহা গগন বাবু জানিতেও পারেন নাই। সেই জন্ত গৃহিণী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে ডাকছ?"—তখন তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন।

গগন বাবু বলিলেন, "হাঁ। নিবারণ বাবু যখন তাঁ'র নাতনীর সঙ্গে অজয়ের বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন, তখন তা' শুনে তুমি আমাকে যা' বলেছিলে, সে কথা কি আর কাউকে বলেছিলে?"

সেই কথাটা গৃহিণী কয় দিন মনে তোলাপাড়া করিয়াছেন; বলিলেন, "হাঁ, এক ঘটকী এসেছিল, তা'কেও বলেছিলাম।"

গগন বাবু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন; বলিলেন, "ওঃ!"

গৃহিণী বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কি হয়েছে।"

গগন বাবু অভয়কে বলিলেন, "তোমার মা'কে সব বল।"

গৃহিণী পুত্রকে বলিলেন, "কি অভয়?"

অভয় বলিল, "দাদাকে আজ বেলা চারটার মধ্যে বাড়ী ফিরতে বলবার জন্ত বাবা বলে দিয়াছিলেন। কারণ শুনে দাদা বললেন—তিনি বিবাহ করবেন না।"

"কেন?"

"তুমি মানুষকে মানুষ মনে কর না ব'লে।"

"সে কি?"

তখন অভয় অজয়ের নিকট শ্রুত কথা বলিল।

তাহার কথা শেষ হইলেই গগন বাবু বলিলেন, "তা' ছাড়া সে যুদ্ধের কাযে যাচ্ছে।"

গৃহিণী দাঁড়াইয়া ছিলেন—একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "আমি যেতে দিব না। অভয়, তুমি গাড়ী ক'রে গিয়ে এখনই তা'কে ডেকে লয়ে এস।"

গগন বাবু বলিলেন, "অমন কাযও ক'র না। সে যদি এক বার 'বেঁকে বসে' তবেই সর্ব্বনাশ। বরং অভয়, তুমি ট্যাক্সী নিয়ে আমার যাঁ'দের বাড়ীতে মেয়ে দেখতে যা'বার কথা, তাঁ'দের ব'লে এস, আজ আমি যেতে পারব না—তাঁ'রাও যেন না আসেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে যদি যুদ্ধের কাযে যায়?"

"আজ কেবল দেখা করতে যা'বার কথা। সে এলে বুঝিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে হ'বে।"

অভয় পিতার নিকট হইতে গন্তব্য স্থানের নির্দ্দেশ লইলে তাহার মাতা তাহাকে বলিলেন, "খেয়ে যাও।"

অভয় বলিল, "কাযটা সেরেই আসি।"

সে চলিয়া গেল।

গৃহিণী ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিয়া যাইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অজয় এ কথা কিরূপে জানিল? তবে কি নন্দরাণী তাহাকে সে কথা বলিয়াছে? কখন বলিল? যখন সে আফিসের কাযে নন্দরাণীর গৃহে গিয়াছিল, সেই সময়? তবে কি ব্যাপারটা অনভিপ্রেত পথে অগ্রসর হইয়াছে? ছেলের সম্বন্ধে সে বিশ্বাস তিনি মনে স্থান দিতে পারিলেন না। নন্দরাণীকে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাহার সম্বন্ধেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না যে, সে অজয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ঐ কথা বলিয়াছে। তবুও তাঁহার মন হইতে সন্দেহ দূর হইতেছিল না।

সন্দেহ ভঞ্জনের অভিপ্রায়ে তিনি নন্দরাণীর বৃদ্ধা দাসীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সে আসিলে তাহাকে বলিলেন, "নিবারণ বাবু এক দিন কর্ত্তার কাছে অজয়ের সঙ্গে নন্দরাণীর বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন; কিন্তু তা'র পর আর কখন সে কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। তাঁ'র কি সে 'সম্বন্ধে' কোন আপত্তি ছিল? তুমি কিছু জান?"

দাসী বলিল, "জানি। মাসীমা'র জন্ত সম্বন্ধ অনেকই এসেছিল কিন্তু দিদিমণির যেন কোন সম্বন্ধই পসন্দ হচ্ছিল না। তিনি আপনার বড় ছেলের সঙ্গে মাসীমা'র বিবাহ দিবেন, এই ইচ্ছাই তাঁর ছিল। বাবারও সেই মত হয়েছিল। কিন্তু এক ঘটক ঠাকরুণ বললেন, আপনি তাঁ'র কাছে ও কথায় মুখ বাঁকিয়ে বলেছিলেন—মেয়ের তিন কুলে কেহ নাই, আর ঘরও পরিচয় দিবার মত নহে—আপনি ও সম্বন্ধে অসম্মত। সেই কথা শুনে দিদিমণি আর ও কথা বলেন নাই।"

শুনিয়া রায় বাহাদুরের গৃহিণী কেমন অন্যমনস্কা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

দাসী বলিল, "বিপদের সময় আপনি যে যত্ন করেছেন, এখন মাসীমা'কে যে স্নেহ করেন, তা'তে ঘটক ঠাকরুণের কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু—"

সহসা রায় বাহাদুরের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দরাণীও কি সেই কথা শুনেছিল?"

"শুনেছিল। কখন শুনেছিল, তা' আমি জানি না। তবে আপনার দয়ায় আর আশীর্ব্বাদে একটু সুস্থ হয়েই মাসীমা যখন বাড়ীতে ফিরতে ব্যস্ত হ'ল, আর আপনি বারণ করলেন, তখন আমিও আর দু' দিন এখানে থেকে যেতে বলেছিলাম; কারণ, আমি তখন যেন সামনে অপার সমুদ্র দেখছিলাম। তা'তে মাসীমা আপনার সেই কথার উল্লেখ ক'রেছিল। সেই সময় আপনার কা[illegible] ছেলে কি নিতে সাড়া দিয়া ঘরে আসায় সে কথা আর অগ্রসর হয় নাই; আমিও আর সে কথার উত্থাপন করি নাই।"

শুনিয়া রায় বাহাদুরের গৃহিণীর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল বটে কিন্তু সে ভয় মুহূর্ত্তের জন্ত মাত্র। কারণ, তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিলেন না যে, নন্দরাণী তাঁহার সম্বন্ধে অজয়ের নিকট কোন অভিযোগ করিয়াছে এবং অজয় তাহা শুনিয়াছে। সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ দাসীর কথায় অপনীত হওয়ায় তিনি মনে তৃপ্তি অনুভবই করিলেন।

তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দাসী বলিল, "আমি তবে আসি।"

শুনিয়া রায় বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন, "চল, আমি এক বার নন্দরাণীকে দেখে আসি।"

তিনি প্রায় প্রতি দিনই এক বার নন্দরাণীকে দেখিতে যাইতেন—কিন্তু সে অপরাহ্নে। সেই জন্ত তাঁহার কথায় দাসী বিস্মিতা হইল; তবে কোন কথা বলিল না। তিনি কি ভাবিতেছিলেন, তাহা সে অনুমানও করিতে পারে নাই!

নন্দরাণীর গৃহে যাইলে নন্দরাণী তাঁহাকে প্রণাম করিলে গৃহিণী বলিলেন, "মা, আমি আজ আমার ত্রুটির জন্ত তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি—না এসে থাকতে পারলাম না।"

নন্দরাণী তাঁহার কথায় অত্যন্ত বিস্মিতা ও কেমন যেন শঙ্কিতা হইল। সে বলিল, "আপনি ও কি বলছেন? আপনার দয়া আমি কখন ভুলতে পারব না।"

দাসী বলিল, "ওকে অমন কথা বলবেন না; ওতে যে ওর অকল্যাণ হ'বে।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি। মা, তোমার সব অকল্যাণ দূর হয়ে যা'বে। অজয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাবে আমি যা' বলেছিলাম, শুনেছ—তা' মিথ্যা নহে। আমি অন্যায় করেছিলাম; যে দর্পে ভ্রান্ত হয়েছিলাম—দর্পহারী মধুসূদন আমার সে দর্প চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। এখন আমি ভিখারীর অধম। তুমি আমার মেয়ে—আমি মা হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি।"

বলিতে বলিতে রায় বাহাদুরের গৃহিণীর কণ্ঠস্বর গাঢ় ও আর্দ্র হইয়া আসিল—তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া নন্দরাণী আপনার ব্যবহারে লজ্জানুভব করিল—তাহার চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে চেষ্টা করিয়া আপনার উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ সংযত করিয়া বলিল, "আমি যে আপনার দয়ায় আর স্নেহেও পূর্ব্বকথা ভুলতে পারি নাই, সে আমার অপরাধ। আপনি মা'র স্নেহে আমার সে অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী নন্দরাণীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন; বলিলেন, 'তোমার কথায় আমার বুকের ভার দূর হ'ল। তুমি যদি কাল সকালে আমার কাছে যাও আর আমার কাছে থাক তবেই আমি বুঝব, তুমি আমার কথা ভুলতে পেরেছ। কাল আমার বড় দুর্দ্দিন—ঐ দিনেই সুধা আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল।"

বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইলেন।

তখন অভয় মেদিনীপুরের ভদ্রলোকটিকে সংবাদ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে সে সংবাদ দিতেছিল। শুনিয়া ভদ্রলোকটি কি বলিয়াছেন, তাহা রায় বাহাদুরের গৃহিণী পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন না; পুত্রকে বলিলেন, "অভয়, তোমার বিলম্ব হয়ে গেছে—চল খেয়ে নিবে।"

অভয় বলিল, "খাবার দিতে বল; কলেজে যা'ব না ভেবেছিলাম; অবশ্য কাযও বিশেষ নাই; তবে যখন বাবার সঙ্গে যেতে হ'ল না, তখন কলেজে ঘুরে আসি।"

গৃহিণী যাইয়া পাচককে স্বামীর ও পুত্রের আহার্য্য দিতে বলিলেন এবং তাহা দেওয়া হইলে—অন্যান্য দিনেরই মত—তাঁহাদিগের আহারের স্থানে থাকিয়া তাঁহাদিগের আহার পর্য্যবেক্ষণ করিলেন।

তাঁহাদিগের আহার শেষ হইলে তিনি পাচককে বলিলেন, তিনি কিছু আহার করিবেন না—তাহারা সকলে আহার শেষ করুক।

শুনিয়া পাচক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খাবেন না, মা?"

"ভাল লাগছে না"—বলিয়া গৃহিণী যাইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এক জন ভৃত্য যাইয়া সে সংবাদ রায় বাহাদুরকে দিল।

অভয় তখন কলেজে যাইবার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল; ভৃত্যের কথা শুনিয়া পিতার কাছে আসিয়া ভৃত্যকে বলিল, "মা কি বললেন?"

ভৃত্য উত্তর দিল, "বললেন ভাল লাগছে না।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ঘরে শুয়েছেন?"

"ছোট ঘরে।"

শুনিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন, "কাল সুধার মৃত্যু-দিন—আজ সেই কথা মনে পড়ছে।"

সেই ঘরেই কন্যার পূর্ণাবয়ব চিত্র রক্ষিত ছিল। গৃহিণী সেই ঘরেই থাকিতে ভালবাসিতেন—বুঝি তাহাতে একটু তৃপ্তি পাইতেন।

রায় বাহাদুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অভয় কিছু বলিল না বটে, কিন্তু কলেজে যাইবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিল।

৮

অপরাহ্নে অজয় গৃহে ফিরিলেই অভয় তাহাকে বলিল, "দাদা, মা আজ সারাদিন অভুক্ত আছেন।"

অজয় একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? মেদিনীপুরজার শোকে নহে ত?"

অভয় গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমার সব কথা আমি মা'কে বলেছি। শুনে তিনি এক বার নিবারণ বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন—দেখলাম, কাঁদতে কাঁদতে ফিরলেন। তা'র পরে আমাদের খাইয়ে তিনি শয্যা নিয়েছেন। বোধ হয়, তোমার কথা শুনবার আগেই মা'র মনটা ব্যথিত ছিল।"

"কেন?"

"কাল সুধার মৃত্যুদিন।"

অজয়ের মুখের হাসি অন্তর্হিত হইল—সে গম্ভীর হইল, যেন নির্মেঘ আকাশে সহসা মেঘসঞ্চার হইল। কারণ, ভগিনীর সম্বন্ধে উভয় ভ্রাতারই বিশেষ স্নেহজ দৌর্ব্বল্য ছিল। পিতা স্বভাবতঃ গম্ভীর, চাকরীর কাযে অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করিতেন, বিশেষ সংসারের সব কাযে তিনি গৃহিণীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়া পারিবারিক জীবনে অশান্তি-সম্ভাবনা এড়াইয়া চলিতেন। মা সংসারের পরিচালন ও শাসনকার্য্যে এবং স্বামীর পদের গৌরব-রক্ষায় সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন; পুত্রদিগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ কখন তাঁহার শাসন শিথিল করিতে পারে নাই। অজয় ও অভয় উভয়ের স্নেহ ভগিনীতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

অজয় বেশ-পরিবর্ত্তন না করিয়া বলিল, "চল—মা'কে দেখে আসি।"

অজয়কে দেখিয়া তাহার মাতা বলিলেন,—"এখনও কাপড় ছাড় নাই?"

অজয় বলিল, "কেমন ক'রে ছাড়ি বল। আসতেই অভয় সংবাদ দিল, তুমি জলস্পর্শ কর নাই।"

মা অভয়কে বলিলেন, "অভয়, মানুষ যখন শ্রান্ত হয়ে আসে, তখন কি তাকে ব্যস্ত করতে আছে?"

সে উপদেশ অজয় ও অভয় উভয়েই মাতার নিকট হইতে বহু বার পাইয়াছে। কিন্তু আজ অভয় সে উপদেশ পালন করিতে পারে নাই। সে কোন কথা বলিল না।

মা বলিলেন, "অজয়, যাও কাপড় বদলে হাত-মুখে ধুয়ে খাবার খেতে যাও।"

তিনি অজয়কে খাবার দিবার জন্য পাচককে ডাকিলেন, "ঠাকুর!"

অজয় বলিল, "সে হ'বে না, মা। তুমি খেলে তবে আমি খা'ব—নহিলে নহে।"

"পাগলামী করতে নাই।"

"তুমি ত জান, আমি বাজে কথা বলি না।"

সে কথা সত্য। অজয় কোন কথা বলিলে যে তাহাকে "না" বলান দুষ্কর, মা তাহা জানিতেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যুদ্ধে যা'বে ?"

বিষয়টি লঘু করিবার অভিপ্রায়ে অজয় বলিল, "না তুমি বুঝি মনে করেছ, আমি 'তাড়াতাড়ি ঘোড়া চড়ি'—'সমরে চলিনু হামি, হামে না ফিরাও' বলতে বলতে যুদ্ধে যা'ব ? সমর বিভাগে চাকরী—যুদ্ধে যেতে হ'বে না।"

"বিদেশে যেতে ত হ'তে পারে।"

"তা পারে।"

"তোমার আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবার কি প্রয়োজন হ'ল ?

"দেখ, মা, এটর্ণী হয়ে কত দিনে কিছু উপার্জ্জন করতে পারব, তা' বলা দুষ্কর।"

"যদি বিলম্বই হয়, তা'তে ক্ষতি কি ? তোমার কি এতই অভাব ?"

"নিজে উপার্জ্জন করা কি ভাল নহে ?"

"বাপ-মা'কে ফেলে রেখে যাবার কোন প্রয়োজন তোমার নাই। আমাদের যা' আছে, সে কি তোমাদের দুই ভাইয়ের নহে ?"

"কিন্তু মানুষের পক্ষে—"

বাধা দিয়া মা বলিলেন, "অজয়, আজ যদি সুধা বেঁচে থাকত, তবে কি তুমি যেতে পারতে ?"

তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু উথলিয়া উঠিল।

যে স্থানে বেদনা থাকে, সেই স্থানে আঘাতে যেমন হয়, মা'র এই কথায় অজয়ের তেমনই হইল ; সে পরাজয় মানিল—বলিল, "তোমাদের যদি এত আপত্তি থাকে, আমি না হয় যুদ্ধের কাযে যা'ব না। কিন্তু, মা, আমি যেমন তোমার একটা কথা রাখলাম, তেমনই তোমাকে আমার একটি কথা রাখতে হ'বে।"

"কি কথা অজয় ?"

"আমাকে বিবাহ করতে বলতে পা'বে না।"

"কেন ?"

অজয় সে প্রশ্নে উত্তর দিল না।

তাহার মাতা বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ নিশ্চয়ই করেছিলাম ; তা'র ফলে এ জন্মে সন্তানের মৃত্যু-শোক সহ্য করতে হচ্ছে। এ জন্মে কি অপরাধ করেছি যে, শেষ বয়সে সেবা-শুশ্রূষাতেও বঞ্চিত হ'ব ?"

"সেবা-শুশ্রূষা কি তোমার ছেলেদের চাইতেও তোমার বৌরা ভাল ক'রে করবে ?"

"তা' করবে। তোমরা সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য সৃষ্ট হও নাই ; তাই তা' পার না ; সে মেয়েদের কায।"

"সে জন্য তোমাকে ভাবতে হ'বে না। বিশেষ, মা, আজ কাল ত আর বৌরা সেকালের বৌ নহে।"

"কেন, অজয় ? আমি যা'কে মেয়ে মনে করতে পারব, সে আমাকে মা'র মতই মনে করবে।"

"সে কি হ'তে পারে ?"

"পারে,—তুমি দেখবে—পারে।"

অজয় আর তর্ক না করিয়া বলিল, "মা, তুমি আমাকে ঐ কথাটি ব'ল না।"

মা বলিলেন, "তুমি যে ভয় করছ, কাল আমি তোমাকে দেখিয়ে দিব, সে ভয়ের আর কোন কারণ নাই।"

অজয় বলিল, "কাল যা' হ'বে—সে কাল হ'বে ; আজ তুমি উঠ। আমি বলছি, তুমি না খেলে আমি কিছু খা'ব না।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া রায় বাহাদুরের গৃহিণীকে উঠিতে হইল—পুত্র কিছু খাইবে না, ইহা মাতা সহ্য করিতে পারেন না।

অজয় কোনরূপে মা'কে শান্ত করিল বটে, কিন্তু তাহার দুশ্চিন্তার অবসান হইল না—বরং তাহা বর্দ্ধিতই হইল। যুদ্ধের কোন চাকরীতে যাইতে যে তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল, তাহা নহে—কেবল নানা কারণে বিরক্ত হইয়া সে পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী হইয়াছিল। কাযেই সে চাকরীতে যাইবার সঙ্কল্প-বর্জ্জনে তাহার দুঃখ হইল না। কিন্তু মা'র দ্বিতীয় প্রস্তাবই তাহাকে চিন্তিত করিল। মা'র কথা যেন কেমন রহস্য-কুহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়া তাহার মনে হইল। তিনি যদি একান্ত জিদ করেন, তবে যে তাহাকে পিতামাতার মতের ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তাহা সে বুঝিল। কিন্তু পরদিন ভগিনীর মৃত্যু-দিন—সে দিন মা'র মনে কষ্ট দিতে অনিচ্ছাহেতু সে সে বিষয়ে আর অধিক কিছু বলে নাই। সে অবস্থায় তাহাকে যখন—দুই দিন পরে হইলেও—মাতার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, তখন তাহার পক্ষে সংসার অশান্তিময় করিয়া তাহাতে বাস কখনই অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাযেই তাহার পক্ষে স্বাধীন ও শান্ত ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করাই অভিপ্রেত হইবে। অথচ তাহার যে সহজ উপায় সে পাইয়াছিল, তাহা সে ত্যাগ করিল—যুদ্ধের যে চাকরী সে পাইতে পারে তাহা ত্যাগ করিল বলিয়া মা'কে জানাইল! সে কি ভুল করিল না ? মা নন্দরাণীর সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাব যে যুক্তি দিয়া, যে উক্তিতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহাতে সে কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, সংসারে বর্ত্তমান অবস্থায় সে বিবাহ করিলে স্ত্রীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে।

এইরূপ দুশ্চিন্তায় অজয় সে রাত্রি অতিবাহিত করিল। সে যত ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার ভাবনা বাড়িতে লাগিল। অথচ সে ভাবিয়া কোন উপায়ের সন্ধান পাইল না। তাহাতেই তাহার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

৯

পরদিন প্রভাতে রায় বাহাদুরের গৃহিণী উৎসুক ভাবে নন্দরাণীর আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সে সুস্থ হইয়া স্বগৃহে যাইবার পর তিনি এত বার তাহাকে দেখিতে গিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কোন দিন—তাঁহার গৃহে আইসে নাই। তিনিও তাহাকে আসিতে বলেন নাই—সে না আসায় তাহার প্রতি অভিমানও করেন নাই ; কারণ, স্নেহ নিম্নগামী।

বেলা যখন সাড়ে আটটা হইল, তখন রায় বাহাদুরের গৃহিণী আপনার দাসীকে নন্দরাণীর দাসীর নিকট তাহারা কখন আসিবে, সে সংবাদ আনিতে পাঠাইলেন। দাসী যখন নন্দরাণীর গৃহে উপনীত হইল, তখন সে তাহার "মাসীর" সঙ্গে রায় বাহাদুরের গৃহে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল।

নন্দরাণী তাঁহার গৃহে আসিলেই রায় বাহাদুরের গৃহিণী তাহাকে সাদরে যে ঘরে তাহার মৃতা কন্যার প্রতিকৃতি ছিল, সেই ঘরে লইয়া

যাইতে যাইতে বলিলেন, "আমি ভাবছিলাম, বুঝি মা'র রাগ দূর হয় নাই—তা' হ'লে আমাকে আবার যেতে হ'বে।"

বিপদের মত শিক্ষক আর নাই। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত বিপদ নন্দরাণীকে তাহার অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিয়াছিল—সে ভাবিয়া তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিতে শিখিয়াছিল। পূর্ব্বদিন রায় বাহাদুরের গৃহিণী তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার আন্তরিক ভাবের অভিব্যক্তি, তাহাতে তাহার সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাঁহার অশ্রুতে বুঝি তাহার মনের সঞ্চিত অভিমান দূর হইয়া গিয়াছিল। সে কেবলই তাঁহার কথা ও তাঁহার সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্যের বিষয় চিন্তা করিয়াছিল। সেই জন্য সে বলিল, "আপনি ও কথা ব'লে আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমার বিপদের সময় আপনি আমাকে যে যত্ন করেছেন—যে প্রাণ রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই তা'-ও যে যত্নে রক্ষা করেছেন, তা'তে মাসী বলেছে, বোধ হয়, আমরা যে কথা শুনেছিলাম, তা' সত্য নহে। আমিও যেন সেই কথাই মনে করছিলাম; আপনার মুখে সে কথা না শুনলে হয়ত তা'-ই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তা'র পর আপনি যা' ব'লে এসেছেন, তা'তেও কি আর আমার মনে কোন ক্ষোভ থাকতে পারে?"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন, "তা'-ই বল, মা। আমি অপরাধী কি না, তা'-ই তোমার আসতে দেরী দেখে আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করতে পারলে না।"

নন্দরাণী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাহার "মাসী" রায় বাহাদুরের গৃহিণীকে বলিল, "আসবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, আপনি বয়সে মা'র বড়—অত স্নেহ করেন, আপনাকে কি বললে ভাল দেখায়?"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী বলিলেন, "তা'র উত্তর আমি দিচ্ছি। তোমার মা নাই—আমি তোমার মা; আমার মেয়ে গেছে—তুমি আমার মেয়ে। আমরা মা আর মেয়ে, কেহ কাহাকেও আর ছাড়ব না। আজ আমার বড় দুঃখের দিনে আমি তোমাকে পেয়েছি, মা।" বলিতে বলিতে কন্যার কথা স্মরণ করিয়া তিনি অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অশ্রু সংক্রামক। তাহার দুঃখও অল্প নহে—নন্দরাণীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না।

সেই সময় রায় বাহাদুরের গৃহিণীর দাসী আসিয়া বলিল, "বাবা কি বলতে এসেছেন।"

রায় বাহাদুরের গৃহিণী দ্বারের নিকটে দণ্ডায়মান স্বামীর উদ্দেশে বলিলেন, "কি বলবে—এস। এ যে আমার নন্দরাণী—আমার বিপদের সম্পদ্।"

গগন বাবুর কিন্তু—তিনি যে কথা বলিতে আসিয়াছিলেন—নন্দরাণীর সম্মুখে তাহা বলিতে তাঁহার সঙ্কোচ অনুভূত হইতেছিল। গৃহিণী পুনরায় তাঁহাকে তাহা বলিতে বলায় তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মেদিনীপুরের ভদ্রলোকটি আজ এসেছেন।"

গৃহিণী বলিলেন, "বেশ ত, তুমি অজয়কে সঙ্গে ক'রে দেখে এস।"

গগন বাবুর—তাঁহার পত্নীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ ঘটিল। অজয় তাঁহার সহিত মেয়েটিকে দেখিতে যাইবে! কিন্তু সে সময়ে আর সে কথা বলা তিনি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি বলিলেন, "তুমি যদি দেখিতে চাহ—এখন ত তা' হয়।"

"ভাল। তুমি স্থান স্থির কর; আমি নন্দরাণীকে সঙ্গে লয়ে কাল যেতে পারি। আমাদের সেকালের চোখে আর নির্ভর করা যায় না। আর ওর ছোট বোনটিকে ও-ই পসন্দ করবে।"

গগন বাবু স্ত্রীর মস্তিষ্ক সুস্থ নাই ভাবিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া—যাইবার সময় কেবল বলিলেন, "অজয় কি যা'বে?"

গৃহিণী বলিলেন, "যা'বে। আমি তা'কে বলছি। তুমি তা'কে পাঠিয়ে দাও।"

গৃহিণীর স্বর কোমল হইলেও তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক কর্ত্তৃত্ব-ব্যঞ্জক দৃঢ়তা ছিল। গগন বাবু আর কিছু না বলিয়া যাইয়া অজয়কে তাহার মাতার কাছে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাকে পাঠাইবার সময় তিনি তাহাকে বলিয়া দিলেন, সে যেন তাহার মাতার কথা মনোযোগ সহকারে শুনে—কারণ, তিনি তাঁহার কথায় অসংলগ্নতা লক্ষ্য করিয়াছেন।

ভাবিতে ভাবিতে অজয় মাতা যে কক্ষে ছিলেন, তাহার দ্বারে আসিয়া বলিল, "মা, আমায় ডেকেছ?"

মা বলিলেন, "হাঁ। মেদিনীপুর হ'তে একটি ভদ্রলোক মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য মেয়ে দেখাতে এসেছেন। তিনি আগেই ওঁকে পত্র লিখে ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলেন। আজ তিনি এসেছেন; তুমি ওঁর সঙ্গে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে এস। ভদ্রলোকের মেয়ে বার বার দেখা আমি ভালবাসি না। যদি তোমাদের পসন্দ হয়, আমি কাল নন্দরাণীকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে দেখব।"

অজয়ের নিকটেও মাতার কথা অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইল। সে বিস্মিত ভাবে বলিল, "আমি যা'ব কেন, মা?"

"একালের পসন্দ আর সেকালের পসন্দ একরূপ নহে। সেই জন্য আমি যেমন নন্দরাণীকে সঙ্গে করে যা'ব—তেমনই তোমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে বলছি।"

অজয় বলিল, "না, মা, আমি যা'ব না।"

মাতা বলিলেন, "অভয়ের জন্য মেয়ে দেখতে ত আমি তা'কে যেতে বলতে পারি না, অজয়। তোমাকেই যেতে হ'বে।

অজয় কতকটা স্বস্তি অনুভব করিল। সে মনে করিল, সে বিবাহ করিব না বলায় মা অভয়ের বিবাহ দিবেন, স্থির করিয়াছেন।

কিন্তু তাহার সে বিশ্বাস যে ভুল, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। তাহার মাতা বলিলেন, "তোমার বিবাহ আমি নন্দরাণীর সঙ্গে দিব—তা'র পরেই অভয়ের বিবাহ দিলে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়।"

তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত কথায় নন্দরাণী ও অজয় উভয়েরই মুখে লজ্জায় রক্তাভা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু অজয়ের মুখ তাহার পরেই পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তবে সে যাহা বলিতে চাহিল, স্থানকাল বিবেচনা করিয়া তাহা বলিতে পারিল না—নন্দরাণী তথায় ছিল। সে কেবল বলিল, "মা, আমার একটা কথা তোমাকে শুনতে হ'বে।"

তাহার মাতা বলিলেন, "অজয়, আমি তোমার মা। আজ আমার বড় দুঃখের দিন—এ দিন তুমি আমার কথায় 'না'—ব'ল না; আমি তোমার কাছে—মা হয়ে ছেলের কাছে—এই ভিক্ষা চাহিতেছি।"

অজয় ইহার পর আর কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল! তাহার সেই ভাব ঘুচাইয়া তাহার মাতা বলিলেন, "তুমি যে ভয় করছ, তা'র আর কোন কারণ নাই। আমি এক দিন যে ভুল করেছিলাম, তা'র জন্ত অনুতপ্ত হয়ে নন্দরাণীর কাছে ক্ষমা চেয়েছি; সে ক্ষমা যে আমি পেয়েছি তা' নন্দরাণী আজ আমার কাছে এসে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নন্দরাণী যা ভুলতে পেরেছেন, তা' কি তুমি ভুলতে পারবে না?"

অজয় আর কিছু বলিতে পারিল না—বুঝি বলিতে চাহিল না—বলিবার আর কিছু ছিল না।

তাহার মাতা বলিলেন, "অজয়, তুমি যাও—ওর সঙ্গে কথা ব'লে তোমরা কখন যা'বে স্থির ক'রে ভদ্রলোকটিকে ব'লে দাও। বেলা হয়েছে—তাঁ'কে আর অপেক্ষা করান ভাল হ'বে না। নন্দরাণীকে আজ আমি যেতে দিব না। মানুষ যে বিপদের মধ্যেও সম্পদ্ পেতে পারে—আমি আজ তা'ই অনুভব করছি।"

অজয় চলিয়া গেল; যাইবার সময় নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল,—সে তখন দৃষ্টি নত করিয়া আছে। সে বুঝি কান্দিতেছিল। সে ক্রন্দনে দুঃখ ও সুখ উভয়ই কি অভিব্যক্ত হইতেছিল?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্তদেবের শ্রীচরণে

এই দণ্ডমহোৎসবের পর রঘুনাথ নিজ গৃহে গমন করিলেন বটে, কিন্তু নিশ্চিত বুঝিলেন, এই বার তিনি প্রাণের পরমারাধ্য দেবতার চরণ লাভ করিলেন। বিষয়-বিভব ও যুবতী সহধর্ম্মিণীর সঙ্গ কিছুই আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি আর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরে দুর্গামণ্ডপে শয়ন করিতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতা-মাতা ও পিতৃব্য তাঁহার এই ভাব দেখিয়া দুর্গা-মণ্ডপেই উপযুক্ত প্রহরীর ব্যবস্থা করিলেন। রঘুনাথ যেখানে যাইতেন, দুই চারি জন প্রহরী সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। দিবারাত্রির মধ্যে কখনও নিকটে কখনও বা দূরে থাকিয়া তাহারা তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিত—কখনও চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিত না।

রঘুনাথ দাসের বিবাহ হইয়াছিল এইমাত্র পরিচয়। তাঁহার স্ত্রী "অপ্সরার" স্তায় সুন্দরী, ইহাও জানিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীর কি নাম, বা তিনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বা রঘুনাথ দাসের গৃহ-ত্যাগের পর কি ভাবে তিনি জীবন নির্ব্বাহ করিতেন, সে সকল কিছুই জানা যায় না। সমসাময়িক গ্রন্থকার রঘুনাথ দাসের মর্ম্মী শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী হয়ত ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ জানাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনিও সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। রঘুনাথের দুর্গা-মণ্ডপে অবস্থানের দ্বারা পত্নীসঙ্গ-বর্জ্জনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। বিবাহের পরে শাক্যসিংহ (যিনি ভবিষ্যতে গৌতমবুদ্ধ হইয়াছিলেন) কিছু দিন পত্নীপ্রেমে নিমজ্জিত হইয়া কাল-যাপন করিয়াছিলেন—তাঁহার রাহুল নামে একটি পুত্রও জন্মিয়াছিল; কিন্তু শ্রীচৈতন্তদেবের মর্ম্মী ভক্ত তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারী, বৈরাগ্যের প্রকটমূর্ত্তি রঘুনাথ—সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বন্ধন সুন্দরী যুবতী পত্নীর প্রণয়েও উদাসীন। দণ্ড-মহোৎসব হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার এই বৈরাগ্য আজ্যসমিদ্ধ অগ্নির মত আরও প্রবল ভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

এই সময়ে শ্রীভগবৎকৃপায় তাঁহার গৃহত্যাগের একটি সুযোগ মিলিয়া গেল। দীক্ষাগুরু অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য মজুমদারের গৃহে পৌরোহিত্যের কাজ করিতেন। কাজেই রঘুনাথের গৃহ-দেবতার সেবার ব্যবস্থার ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত। আচার্য্য নিজে পুরোহিত-রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সর্ব্বকালীন সেবার ভার যদুনন্দন আচার্য্যের এক জন ব্রাহ্মণ-শিষ্যের উপর ন্যস্ত ছিল। যদুনন্দন আচার্য্য বাসুদেব দত্তেরও অতিপ্রিয় এবং শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের উপদেশে তিনি শ্রীচৈতন্তদেবকে উপাস্ত বলিয়া অবগত ছিলেন। রঘুনাথ তাঁহার প্রিয়শিষ্য। এক দিন রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড থাকিতে আচার্য্য হিরণ্যদাসের বহির্ব্বাটী—যেখানে দুর্গা-মণ্ডপে রঘুনাথ অবস্থান করিতেন—সেই স্থানে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন—"দেখ! যে-ব্রাহ্মণ ঠাকুরের সেবা করিত, সে সেবার কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু সেবা করিতে পারে, এমন উপযুক্ত ব্রাহ্মণও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব তুমি তাহাকে অনুরোধ করিয়া যত দিন যোগ্য ব্রাহ্মণ পাওয়া না যায়—তত দিন যাহাতে সে সেবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, সেইরূপ ব্যবস্থা কর।" যদুনন্দন আচার্য্য দুর্গামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র রঘুনাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। এখন আচার্য্যের আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি আচার্য্যের কথা অনুসারে সেই সেবক ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিবার জন্ত আচার্য্যের সহিত বাহিরে আসিলেন। দৈবক্রমে রঘুনাথের রক্ষকগণও ঐ সময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। রঘুনাথ ভাবিলেন, পলাইবার এই তো উপযুক্ত সুযোগ। তিনি গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া—তাঁহার নিকট যেন পূর্ব্বোক্ত সেবক ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিতে যাইতেছেন—এই ভাবে ছলক্রমে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই সেবক ব্রাহ্মণের গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ঠাকুর-সেবার কথা বলিয়া নীলাচলে শ্রীচৈতন্তদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বেই শিবানন্দ সেন গৌড়ের ভক্তগণকে লইয়া রথযাত্রার প্রাক্কালে পুরীধামে শ্রীচৈতন্তদেবের দর্শন-কামনায় যাত্রা

করিয়াছেন। রঘুনাথ সে পথেও যাইতে পারেন না—পাছে ধরা পড়েন। পিতা ও পিতৃব্য তাঁহার পলায়নের সংবাদ পাইলেই লোকজন ও প্রহরীদের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিবেন। এই জন্য তিনি নীলাচলে যাইবার প্রসিদ্ধ পথে না গিয়া বনপথে বা অপ্রশস্ত পথে চলিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রথম দিন এককপ দৌড়াইতে দৌড়াইতেই ১৫ ক্রোশ বা ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রঘুনাথ এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যবান্ গোয়ালা দুগ্ধের দ্বারা সে রাত্রে এই অতিথির সেবা করিল। দুগ্ধ পান করিয়া ও বাথানে স্থানরূপে রাত্রি-যাপন করিয়া রাত্রি শেষ না হইতেই তিনি আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে পূর্ব্বদিকে গিয়া তথা হইতে দক্ষিণ মুখে চলিলেন। পরে ছত্রভোগ পার হইয়া বহু অপ্রসিদ্ধ গ্রাম দিয়া তিনি সরানে উপস্থিত হইলেন। এই ভাবে রঘুনাথ বারো দিনে শ্রীপুরুষোত্তমধামে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্যদেবের চরণপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এই দ্বাদশ দিনের মধ্যে মাত্র তিন দিন আহার জুটিয়াছিল—এইরূপ বেগে আসিতেছিলেন বলিয়া শিবানন্দ সেনের অধিনায়কত্বে গৌড়ীয় যাত্রীদল পূর্ব্বে যাত্রা করিলেও তাহারা নীলাচলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রঘুনাথ নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এ দিকে প্রাতঃকাল হইতে রঘুনাথের রক্ষীরা রঘুনাথকে না দেখিয়া তাঁহার গুরুদেব যদুনন্দন আচার্য্যের নিকট অনুসন্ধানে গেল। যদুনন্দন আচার্য্য বলিলেন—"রাত্রি থাকিতেই রঘুনাথ মধ্যপথে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক আমার আদেশ পাইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।" রক্ষীরা তখন ফিরিয়া আসিয়া রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্যকে তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইলে তাঁহারা ভাবিলেন যে, শিবানন্দ সেনের সহিত যে যাত্রীদল যাইতেছে, রঘুনাথ তাহাদেরই সঙ্গে পুরী যাইবে বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে! এ জন্য তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া শিবানন্দ তাঁহাদের একমাত্র পুত্রকে যাহাতে ফিরাইয়া দেন, এই ভাবে মিনতিপূর্ণ এক পত্র লিখিয়া রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য দশ জন অশ্বারোহী পাইককে গৌড়ীয় যাত্রীদলের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। তাহারা নীলাচলে যাইবার পথে ঝাকরাতে আসিয়া গৌড়ীয় যাত্রীদলের সাক্ষাৎ পাইল। শিবানন্দ সেন পত্রোত্তরে হিরণ্য দত্ত গোবর্দ্ধন দাসকে জানাইলেন যে, রঘুনাথ তাঁহাদের সঙ্গে আসে নাই বা তাঁহাদের সহিত রঘুনাথের সাক্ষাৎও হয় নাই। এই পত্র লইয়া পাইকগণ কৃষ্ণপুরে ফিরিয়া আসিল। রঘুনাথের পিতা, মাতা ও পিতৃব্য রঘুনাথ কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহার জন্য চিন্তিত রহিলেন।

নীলাচলে কাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপাদি ভক্তগণসহ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ উপস্থিত হইয়া দূর হইতে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সে সময়ে মুকুন্দ দত্ত ঐ স্থানে ছিলেন, তিনি 'রঘুনাথ আসিয়াছে' এই সংবাদ মহাপ্রভুকে জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে নিকটে আহ্বান করিলে রঘুনাথ গিয়া মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করিলেন। মহাপ্রভু তখনই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া রঘুনাথ স্বরূপ-প্রমুখ ভক্তগণকে পাদগ্রহণ-পুরঃসর দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। যদিও তাঁহারা রঘুনাথকে চিনিতেন না, তথাপি রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ দেখিয়া তাঁহারাও জনে জনে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপাই তোমাকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে।" রঘুনাথ অতি বিনীত—তিনি মনে মনে বলিলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণকে জানি না—তোমাকেই জানি। তোমার কৃপাবলেই আমি বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম, ইহাই আমি সত্য বলিয়া মনে করি।" তখন মহাপ্রভু সপ্তগ্রামের অধিকারী হিরণ্য মজুমদারের ও গোবর্দ্ধন মজুমদারের পরিচয় ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিয়া কৌতুকভরে বলিলেন—"আমার মাতামহ শ্রীপাদ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর বন্ধু বলিয়া তোমার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে আমি মাতামহ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। অতএব আমি তাঁহাদিগকে পরিহাস করিয়া বলিতেছি, তাঁহারা দুই জনেই বিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তের কীট, তাঁহারা মহা-বিরক্তিজনক বিষয়ের পীড়াকেই সুখ বলিয়া মনে করেন। যদিও তাঁহারা নিজেরা বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ, ব্রাহ্মণভক্ত ও অর্থাদি দ্বারা ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা বৈষ্ণবের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব নহেন। বিষয়ের স্বভাবই এইরূপ বিষয়-বিভব লোককে অন্ধ করিয়া ফেলে। তাহারা অহিতকে হিত মনে করিয়া যে কর্ম্মের দ্বারা সংসার-বন্ধনের উদ্ভব হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এ হেন মহা মোহজনক বিষয়ের হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণ তোমায় উদ্ধার করিলেন; অতএব কৃষ্ণ-কৃপার সুমহৎ মহিমার কথা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।"

শুষ্ক পথশ্রমে রঘুনাথকে কৃশ ও মলিন দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে স্বরূপ-দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিলেন—

"এই রঘুনাথে আমি সোঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে॥
তিন রঘুনাথ নাম হয় আমার স্থানে।
'স্বরূপের রঘুনাথ' আজি হোক ইহার নামে॥"

অতঃপর মহাপ্রভু নিজ ভৃত্য গোবিন্দকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ উপবাস করিয়া পথক্লেশে কৃশ হইয়াছে, অতএব কিছু দিন ইহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া ও পরিচর্য্যা করিয়া যাহাতে এ সুস্থ হইতে পারে, তাহার উপায়বিধান কর।" বলা বাহুল্য, স্বরূপ-দামোদর ও গোবিন্দ উভয়েই মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। স্বরূপ রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে স্নানাদি করাইয়া গোবিন্দের দ্বারা মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন। গোবিন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের পাত্রাবশেষ দানে রঘুনাথকে পরম পরিতৃপ্ত করিলেন। রঘুনাথ এই অবধি "স্বরূপের রঘুনাথ" নামে পরিচিত হইলেন।

স্বরূপ-দামোদরের পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। ইঁহার পিতার নাম পদ্মগর্ভ আচার্য্য। পদ্মগর্ভ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলের শ্রেষ্ঠ কুলীন। কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ এগারসিন্দুরের নিকটস্থ ভিটাদিয়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। পদ্মগর্ভ যৌবনের প্রারম্ভে ভিটাদিয়া হইতে অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপ আগমন করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য, রূপ ও বংশপরিচয়ে পরিতুষ্ট হইয়া নবদ্বীপবাসী জয়রাম চক্রবর্ত্তী ইঁহার অধ্যয়নের অবস্থাতেই ইঁহাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া ইঁহাকে নবদ্বীপস্থ নিজালয়ে রাখিয়া অধ্যয়ন করান। এখানেই জয়রাম চক্রবর্ত্তীর তনয়ার গর্ভে ইঁহার প্রথম পুত্র পুরুষোত্তম আচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। পুরুষোত্তম আচার্য্য অল্প বয়স হইতেই অধ্যয়নে যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। 'কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায়াদি ষড়্‌দর্শন, বিশেষতঃ

বেদান্তের বৈষ্ণবভাষ্যে ও রসশাস্ত্রে ইনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইনি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া বারাণসীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখিয়া ইঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষার গুরু চৈতন্যানন্দ ইঁহাকে কাশীধামে গিয়া বেদান্ত অধ্যাপনা করিতে বলেন; কিন্তু ইনি তাহা না করিয়া এবং গুরুর স্থানে যোগপট্ট গ্রহণ না করিয়াই ব্রহ্মচারী অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে অবস্থান করিবেন জানিতে পারিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্মসমর্পণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ সময়ে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া পুরুষোত্তমধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি সাদরে ইঁহাকে নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন। পুরীধামে ইনি মহাপ্রভুর অদ্বিতীয় সহায় ও সঙ্গী ছিলেন। ভাব ও তত্ত্ব-বিচারে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহার উপর মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাবের মর্ম্মজ্ঞ এমন আর কেহ ছিলেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ অবস্থায় গম্ভীরা লীলায় ইনি এবং শ্রীল রামানন্দ রায়ই তাঁহার অন্তরঙ্গ সঙ্গিরূপে সতত তাঁহার সহিত অবস্থান করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, ইনি তখনই সুকণ্ঠে সেই ভাবাত্মক গীত গাহিয়া তাঁহার হৃদয় পরিতৃপ্ত করিতেন। ইনি সত্য সত্যই মহাপ্রভুর দ্বিতীয় "স্বরূপ"।

এই স্বরূপের হস্তে রঘুনাথের সমস্ত ভার অর্পিত হইল। এই স্বরূপদামোদর গোস্বামী দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে যাপন করিতেন এবং মহাপ্রভুর অন্তরের ভাবানুযায়ী সঙ্গীত শ্লোকে ও আলোচনায় তাঁহার সেবা করিতেন। অবসর সময়ে তিনি এই অন্তরঙ্গ-সেবার বৈশিষ্ট্য রঘুনাথকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রঘুনাথও স্বরূপের সঙ্গে সর্ব্বদা মহাপ্রভুর নিকটে অবস্থান করিয়া নাম-জপ ও ব্রজলীলার অষ্টকালীন স্মরণ-মননে অভ্যস্ত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সাক্ষাদ্ভগবদ্ভাবের সেবা শ্রীশ্রীরাধাভাবময় বৈশিষ্ট্য সহকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনে প্রকট দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। এই সুদুর্ল্লভ অন্তরঙ্গ সেবার অধিকার পাইয়াও তিনি প্রথমে এক দিন স্বরূপের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট সাক্ষাৎ ভাবে উপদেশপ্রার্থী হইলেন। যথা—

> "প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে—
> রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে—
> কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানি উদ্দেশ।
> আপনি শ্রীমুখে মোরে কর উপদেশ॥
> হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—
> তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল॥
> সাধ্যসাধন তত্ত্ব শিখ ইঁহা স্থানে।
> আমি তত নাহি জানি ইঁহো যত জানে॥
> তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
> আমার এই বাক্য তবে করিহ নিশ্চয়॥
> গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
> ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
> অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
> ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥
> এই ত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
> স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে বিশেষ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্—

> তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
> অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ *
> "এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ।
> মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন॥
> পুন সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
> অন্তরঙ্গ সেবা করে স্বরূপের সনে॥"
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

মহাপ্রভু রঘুনাথকে যে উপদেশ দিলেন, বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য—বৈষ্ণবের বাহ্য ও অন্তরঙ্গ সাধনের উপদেশ এত অল্প কথায় আর কোথাও প্রদত্ত হয় নাই। গ্রাম্যকথায় আলোচনার পর্ব্ব পরচর্চ্চা মাত্র লাভ—আর ইহাতে বিষয়াসক্তিই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; গ্রাম্য-বার্ত্তা শ্রবণেও ঐ ফল। অথচ ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বপ্রকার বিষয়াসক্তি-শূন্য করিয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বরের সেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। এই জন্য বাহ্যভোগ ও বিষয়াসক্তিরূপ আন্তর ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই বৈষ্ণব-সাধনার মূল ভূমি।

আর্য্যসাধনার দুইটি পথ। একটি ব্যতিরেক-মুখে সর্ব্বপ্রকার বিষয়াসক্তি ত্যাগ, আর একটি অন্বয়-মুখে ইষ্টবস্তুতে অভিনিবেশ। ব্যতিরেক-মুখে আহার ও বেশ-বিন্যাসে অভিনিবেশ ত্যাগ ও অন্তরে বিষয়াসক্তি ত্যাগ। অন্বয়-মুখে ইষ্টবস্তুতে আসক্তিলাভ। ভোজনাগ্রহত্যাগ ও বেশবিন্যাসের চেষ্টা ত্যাগ—ব্যতিরেক-মুখের এই সাধনা "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে"—এই কথার দ্বারা তাহারই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "গ্রাম্যকথা না কহিবে ও গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনিবে" ইহার দ্বারা অন্তরের বিষয়াসক্তি বর্জ্জনের উপদেশ দেওয়া হইল। অতঃপর অমানী মানদ হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণের দ্বারা বৈষয়িক ও ব্যবহারিক অহঙ্কারের মূল উচ্ছেদ করিয়া "অহং অভিমানী" জীবকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির অন্বয়মুখীন সাধনে নিযুক্ত করা হইল। ইহাতেই জীবের স্বরূপ কৃষ্ণদাসে পরিণত করা হইল। সাধনভূমির এই কৃষ্ণদাসত্বই সিদ্ধ অন্তরঙ্গ সেবায় পরিণত হইলেই সিদ্ধদেহে মানসে রাধাকৃষ্ণ সেবা লাভ হয়। এই জন্যই মহাপ্রভু

---

* এই শ্লোকের অর্থ চরিতামৃতকার অন্ত্যলীলায় শেষ পরিচ্ছেদে করিয়াছেন, যথা—

> "উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
> দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
> বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
> শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
> যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
> ঘর্ম্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥
> উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
> জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
> এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
> কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥"

রঘুনাথকে মানসে ব্রজধামে রাধাকৃষ্ণসেবা করিবার উপদেশ দান করিলেন।

শ্রীল মহাপ্রভুর এই উপদেশে সর্ব্বপ্রকার সাধনার সার নিহিত। রঘুনাথ মহাপ্রভুর নিকট যে উপদেশ লাভ করিলেন, সমস্ত জীবন ধরিয়া অতি সাবধানে তাহার অনুষ্ঠান করিয়াই তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া "শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী"তে পরিণত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ শুদ্ধ যে এই উপদেশ পাইলেন তাহা নহে, এই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে যিনি এই উপদেশ-সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—আদর্শরূপে সেই মহাপ্রভুর অভিন্নাত্মা শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীকেও শিক্ষাগুরু-রূপে প্রাপ্ত হইলেন। আর সাক্ষাৎ ভাগবত-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকেও প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বহু জন্মের সুকৃতির ফলস্বরূপ রঘুনাথ যে সম্পদ্ লাভ করিলেন, তাহার তুলনায় তাঁহার অতিসমৃদ্ধ বিষয়ভোগ তুচ্ছ হইয়া গেল। তিনি বাহিরের ও অন্তরের পরিপূর্ণতম সম্পদ্‌লাভে কৃতার্থ হইলেন—তাঁহার চিরপোষিত বাসনা এত দিনে সফল হইল। এই সাধনের ক্রমানুসারে রঘুনাথের জীবন কিরূপে উন্নীত হইয়াছিল—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা অতঃপর তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে আগমন করিবার পর শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে পথক্লেশে কৃশ ও দুর্ব্বল দেখিয়া তাঁহার প্রিয় সেবক গোবিন্দের দ্বারা তাঁহাকে মহাপ্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করেন। রঘুনাথ মাত্র পাঁচ দিন এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তাহার পরেই এইরূপে মহাপ্রসাদ গ্রহণ তাঁহার সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। তিনি দিনান্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান থাকিতেন। পুরীধামে এইরূপ নিয়ম আছে যে, যাঁহারা সর্ব্বকাল নামকীর্ত্তনাদিরূপ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা জীবিকা-নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য মন্দিরের সিংহদ্বারে অবস্থান করেন। শ্রীল জগন্নাথের সেবক পাণ্ডাগণ পসারীর দ্বারা ইঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। রঘুনাথ এই ভাবেই জীবিকার জন্য রাত্রিকালে সিংহদ্বারে ভিক্ষার দ্বারা উদরান্ন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। মহাপ্রভু এই সকল জানিতে পারিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন—"ভজনশীল বৈরাগী সর্ব্বদা নাম-সংকীর্ত্তন করিবে এবং ভিক্ষা করিয়া কোনওরূপে জীবন রক্ষা করিবে। বৈরাগী যদি জিহ্বার পরিতৃপ্তির জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহার চিত্ত বিষয়-রসের বশীভূত হইয়া পড়ে। তাহাতে তিনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরাধীন হন এবং সর্ব্ববিষয়ে ভগবানের উপরে নির্ভর করা রূপ যে ধর্ম্ম তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সেই পরমার্থের হানি ঘটে। জিহ্বার লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য যে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেই শিশ্নোদরপরায়ণ ব্যক্তির কখনই শ্রীকৃষ্ণ লাভ হয় না।

এই অবস্থায় রঘুনাথের আর এক বাধা উপস্থিত হইল। গৌড়ের ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া গেলে রঘুনাথের পিতা ও পিতৃব্য তাঁহাদের নয়নের মণি রঘুনাথের এই কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া পুনরায় যখন গৌড়ীয় ভক্তগণ দলবদ্ধ হইয়া রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরীধামে আগমন করেন, তখন এক জন ব্রাহ্মণকে ভৃত্য সঙ্গে দিয়া ও চারি শত মুদ্রা দিয়া নীলাচলে পাঠাইলেন। ইঁহারা আসিয়া রঘুনাথকে ভিক্ষা ত্যাগ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইঁহারা যখন কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন রঘুনাথ ইঁহাদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রতি মাসে মহাপ্রভুকে দুই বার মহাপ্রসাদের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় দুই বৎসর ধরিয়া এই ভাবে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার পর রঘুনাথের হৃদয়ে নির্ম্মল বুদ্ধির আবির্ভাব হইল। তিনি ভাবিলেন—"আমি এই প্রকারে নিমন্ত্রণ করিয়া পরোক্ষ ভাবে শ্রীচৈতন্যদেবকে বিষয়ীর অন্ন ভোজন করাইয়া কষ্ট দিতেছি! প্রভু মহাপ্রভু আমার ন্যায় মূঢ় ব্যক্তি যাহাতে মনে কষ্ট না পায়, তজ্জন্য এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া থাকেন—কিন্তু এইরূপ নিমন্ত্রণে কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হওয়া সম্ভবপর নহে।" ইহা মনে করিয়া রঘুনাথ পিতৃ-প্রেরিত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ বন্ধ করিলেন এবং মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করাও বন্ধ করিয়া দিলেন।

দুই মাস মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ না করার পরে তিনি শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর স্বরূপের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি বলিলেন—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন ছিল।
ভাল হৈল জানিয়া আপনি ছাড়ি দিল॥"

—চৈঃ চঃ, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

এইরূপে রঘুনাথের ভজন-পথের এ বিঘ্ন দূর হইল।

রঘুনাথ কিছু দিন পরেই সিংহদ্বারে ভিক্ষা ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীল পুরুষোত্তমধামে সহৃদয় ভক্তগণ—বহু দেবালয়, মঠও স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল স্থানে ভিক্ষুক সাধুগণকে ভিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। রঘুনাথ এই সকল সত্রে ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দের নিকট হইতে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীল স্বরূপদামোদর বলিলেন যে, "রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা করা দুঃখজনক মনে করিয়া এখন মধ্যাহ্নকালে সত্রে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া আহার করিতেছে।" শ্রীচৈতন্যদেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন—

"—ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥

তথাহি কিমর্থম্? অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি, অনেন দত্তম্ অয়মপরঃ সমেত্যয়ং দাস্যতি, অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতীত্যাদি।"

এইবার শ্রীচৈতন্যদেব দেখিলেন যে, রঘুনাথের সমস্ত অভিমান ত্যাগ হইয়াছে। এইবার তাঁহাকে তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া মনে করিলেন।

শ্রীল শঙ্করানন্দ সরস্বতী নামক এক জন সন্ন্যাসী শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধনের এক খণ্ড শিলা ও তৎসহ এক ছড়া গুঞ্জামালা আনয়ন

করিয়া উহা শ্রীচৈতন্তদেবকে উপহার দেন। শ্রীকৃষ্ণ এক সময়ে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোপগণের যে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের অন্নকূট উৎসবে স্তূপীকৃত অন্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন, শ্রীভাগবতে ইহা বর্ণিত আছে। এই জন্ম ভক্তগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন এবং এই জন্ম পাদস্পর্শ ভয়ে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতে আরোহণ করেন না। পরন্তু, শালগ্রামে যেরূপ নারায়ণ জ্ঞান পূর্ব্বক পূজাদি করা হইয়া থাকে, বৈষ্ণবগণ শ্রীগোবর্দ্ধনের শিলাখণ্ডকেও শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে সেইরূপ সেবা-পূজাদি করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্তদেব এই গোবর্দ্ধনশিলাকে প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে সেবা ও পূজাদি করিতেন এবং সময়ে সময়ে ঐ শিলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইতেন। এইরূপে এই গোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীচৈতন্তদেবের অতিশয় প্রিয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্তদেব এই শিলাকে 'কৃষ্ণ-কলেবর' নামে অভিহিত করিতেন এবং স্মরণের কালে গুঞ্জামালা গলদেশে ধারণ করিয়া এই শিলাকে নয়ন-জলে অভিষিক্ত করিতেন। মহাপ্রভুর পরমাদরের এই দুই অপূর্ব্ব শক্তিশালী বস্তু এইবার তিনি রঘুনাথকে দান করিলেন। কি প্রকারে এই শিলাকে সেবা ও পূজা করিতে হইবে, তাহার বিধানও তিনি রঘুনাথকে বলিয়া দিলেন। যথা—

প্রভু কহে—এই শিলা "কৃষ্ণের বিগ্রহ"।
ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।
এই শিলায় কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন।
অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন।
এক কুজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধ-ভাবে করি।
দুই দিগে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি।

—শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, অন্ত্য, ষষ্ঠ।

রঘুনাথ শ্রীচৈতন্তদেবের স্বহস্ত-প্রদত্ত এই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি অতিশয় আনন্দভরে এই গোবর্দ্ধনশিলার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী এক বিতস্তি প্রমাণ দুইখানি বস্ত্র, একখানি পিঁড়ি ও জলের জন্ম একটি কুজা সংগ্রহ করিয়া দিলে রঘুনাথ সাত্ত্বিক সেবার উপকরণ জ্ঞানে ইহার দ্বারাই পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজাকালে তিনি এই শিলাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিতে পাইতেন। "প্রভু নিজে এই শিলার সেবা করিতেন এবং তিনি স্বহস্তে আমাকে এই দুই দ্রব্য দান করিয়াছেন" ইহা মনে করিয়া রঘুনাথের হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রঘুনাথ এখন কপর্দ্দকহীন বিরাগী, ইহা দেখিয়া স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্তদেবের প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দকে বলিয়া প্রতিদিন পূজা দিবার জন্ম অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অবশেষে এই প্রকার প্রেমপূর্ণ সাত্ত্বিক সাধনে রঘুনাথের প্রতীতি হইল—

"শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে।"

এই প্রতীতির আনন্দে সেবাকালে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মৃতি ঘটিত এবং তিনি সিদ্ধদেহে তাঁহার অভীষ্টদেবের সঙ্গ লাভ করিতেন। রঘুনাথ শ্রীচৈতন্তদেবের আদেশে এই যে নিয়ম অবলম্বন করিলেন—জীবনে আর তাহা ত্যাগ করেন নাই। সমস্ত দিবসের আট প্রহর কালের মধ্যে—সেবা, পূজা, স্মরণে ও নামসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার সার্দ্ধসপ্ত প্রহরকাল কাটিয়া যাইত, মাত্র চারি দণ্ড কালের মধ্যে তিনি আহার ও নিদ্রা শেষ করিয়া লইতেন। সত্রে গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতেও তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত—এই জন্ম অবশেষে তিনি তাহাও ত্যাগ করিলেন। এইবার তিনি এক অপূর্ব্ব উপায়ে জীবন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। যাহারা প্রসাদ বিক্রয় করিত, তাহাদের যে সমস্ত অবিক্রীত প্রসাদ থাকিত, তাহা পচিয়া উঠিলে পসারীরা তাহা সিংহদ্বারে গাভীদিগকে খাওয়াইবার জন্ম তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিত। কিন্তু তখন পচা গন্ধে গাভীরাও উহা খাইতে পারিত না—তখন রঘুনাথ ঐ প্রসাদান্ন সংগ্রহ করিয়া তাহা জলে ধুইয়া উহার ভিতর যে মাজিভাত পাইতেন, লবণ মিশাইয়া তাহা ভক্ষণ করিতেন। রাজপুত্র তুল্য রঘুনাথের এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের সত্যই তুলনা নাই। এই ভাবে তিনি স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গিরূপে শ্রীচৈতন্তদেবের অন্তরঙ্গ সেবায় সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসরকাল নিযুক্ত থাকিয়াও মহাপ্রভুর যাবতীয় লীলা দর্শন করিলেন। রঘুনাথ দাসের এই অনুপম বৈরাগ্য ও সাধনার কথা কহিতে কহিতে আত্মহারা হইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় নিষ্কিঞ্চন সাধকও বলিয়াছেন—

"তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।"

স্বরূপ-দামোদর ক্রমে রঘুনাথ দাসকে এইরূপ ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া নিজে এক দিন রঘুনাথের নিকট হইতে ঐ অপূর্ব্ব মহাপ্রসাদ চাহিয়া লইয়া ভক্ষণ করিলেন। তিনি এই প্রসাদের অপূর্ব্ব আস্বাদে মুগ্ধ হইয়া রঘুনাথকে বলিলেন যে, "তুমি এই অমৃত সম প্রসাদ আস্বাদ করিতেছ, কিন্তু ইহা আমাদিগকে দেও না কেন?" পরে শ্রীচৈতন্তদেব এক দিন রঘুনাথের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ইহার এক গ্রাস আস্বাদন করিলেন এবং দ্বিতীয় গ্রাস লইবার কালে স্বরূপ গোস্বামী তাঁহার হাতে ধরিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। মহাপ্রভু এই প্রসাদ আস্বাদন করিয়া বলিলেন—

"—নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই।"

এই প্রকারে রঘুনাথের বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া শ্রীচৈতন্তদেবও রঘুনাথের উপর পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্য

(উপন্যাস)

তৃতীয় পল্লব

পিতা ও পুত্রী

সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে ওলিভিয়ার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ডেভিড গারসাইড কারা-কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে ওলিভিয়া এমন বিহ্বল হইয়া পড়িল যে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আত্মসংবরণ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল। সে সেই নিভৃত কারা-কক্ষের কড়ি-বরগার দিকে চাহিয়া কত কথাই চিন্তা করিতে লাগিল!

ওলিভিয়া আপনাকে অত্যন্ত অসহায় ও বিপন্ন মনে করিত। সে তাহার পিতা জিওফ্রি ডেনের উপর নির্ভর করিতে পারিত না; তাহার সততায় ওলিভিয়ার আস্থা ছিল না। এক দিন সে রোমণ্ট রেস্তোরাঁয় বসিয়া হঠাৎ শুনিতে পাইল—দুইটি রমণী তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। এক জন তাহার সঙ্গিনীকে বলিল, "ও বেচারাকে দেখিলে সত্যই আমার মনে করুণার উদ্রেক হয়। উহার বাপ যে পাকা চোর, এ কথা উহার জানা আছে বলিয়া তোমার মনে হয় কি?"

দ্বিতীয় রমণী বলিল, "এ সংবাদ উহার জানা না থাকিলেও উহা জানিতে অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পুলিশ যে কোন মুহূর্ত্তে জিওফ্রি ডেনকে গ্রেপ্তার করিতে পারে। সে পুলিশের চক্ষুতে অনেক দিন হইতে ধূলা দিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এক দিন উহাকে জেল খাটিতেই হইবে। সে যে কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে—তাহার কি সংখ্যা আছে? জিমি মাষ্টার্স আমাকে তাহার যে সকল গুণের কথা বলিতেছিল—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ওলিভিয়া একটি রমণীকে তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করিল। সেই রাত্রেই সে তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "বাবা, তোমার সঙ্গে আমার দুই একটা কথা আছে। শুনিলাম, কোন অপরাধজনক কার্য্যেই তোমার কুণ্ঠা নাই! এ কথা কি সত্য?"

তাহার পিতা ক্রূর হাস্যে বিদ্রূপ-ভরে বলিল, "এরূপ স্পষ্ট ভাষায় আমাকে অপরাধী বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিলে না। ইহা পিতৃভক্তির নিদর্শন বটে!"

ওলিভিয়া এ কথায় বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হইয়া বলিল, "কিন্তু আমি সত্য কথা জানিতে চাই। বহু দিন হইতেই তোমার সম্বন্ধে আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা বাধিয়াছে। সর্ব্বদা আমার মনে হয়, অন্যান্য লোকের সহিত তোমার চরিত্রগত পার্থক্য অনেক অধিক।"

পিতা বলিল, "হাঁ, তোমার এ অনুমান সত্য। যদি আমাকে অন্যান্য লোকের মত সাধু ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত, তাহা হইলে এত দিন আমি অনাহারে শুকাইয়া মরিতাম। কিন্তু আমি ইচ্ছামত চলায় এই ফ্ল্যাট ভাড়া লইয়া সুখে বাস করিতেছি এবং তোমাকেও বেশ সুখে রাখিয়াছি। স্বচ্ছন্দে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। এ জন্য আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতার আশা করি না; কিন্তু কৃতজ্ঞ না হইলেও তুমি আমাকে অপরাধী বলিয়া বিদ্রূপ করিবে কেন?"

ওলিভিয়া বলিল, "যাহা শুনিয়াছি—তাহা তবে সত্য?"

জিওফ্রি ডেন বলিল, "সত্য কি না তাহা শীঘ্রই তুমি জানিতে পারিবে।"—ওলিভিয়াকে সে সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিল; কিন্তু ওলিভিয়া না বসিয়া ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "বাবা, আমি আর কোন কথা শুনিতে চাহি না। আমি বড়ই লজ্জা বোধ করিতেছি!"

জিওফ্রি তাহাকে ধরিয়া বসাইবার জন্য হাত বাড়াইল; কিন্তু ওলিভিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ইহা আমার অসহ্য।"

জিওফ্রি ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে বলিল, "তবে কি আমার সংস্রব ত্যাগ করাই তোমার ইচ্ছা?"

ওলিভিয়া বলিল, "হাঁ। ইহা ভিন্ন আমার নিকট আর কি প্রত্যাশা করিতে পারো? আজ রাত্রে তোমার সম্বন্ধে যে কথা শুনিয়াছি—তাহা সত্যই আতঙ্কজনক।"

জিওফ্রি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমার কথা অসঙ্গত নহে বটে, কিন্তু এখন তুমি কি করিবে তাহা শুনিতে চাই। আমার একমাত্র কন্যার স্বার্থরক্ষার জন্য আমার আগ্রহের অভাব নাই,—ইহা তোমার স্মরণ রাখা উচিত।"

ওলিভিয়া বলিল, "আমি সাধু ভাবে জীবিকার্জ্জন করিব;—এই উদ্দেশ্যে তোমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি বাবা!"

ওলিভিয়া অতঃপর তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া জিনিস-পত্র গুছাইতে লাগিল। তাহার পিতা পরদিন প্রভাতে চা-পান করিবার পূর্ব্বেই সে সেই ফ্ল্যাট ত্যাগ করিল; তাহার পর সে ব্লুমস-বারিতে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া স্বাধীন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিল। ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে দুইটি স্বর্ণাঙ্গুরী ও মুক্তার একছড়া কণ্ঠমালা বাঁধা দিতে হইল।

অতঃপর তিন মাস কোন বিদ্যালয়ে সে সেক্রেটারীর কার্য্য শিক্ষা করিল। তিন মাসেই সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী নগরের একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানে তাহার চাকরীর জন্য সুপারিশ করিলেন। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের যুবক পুত্র তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিল। তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ওলিভিয়া অধ্যক্ষের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে যুবকটি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "তোমার ত ভারী তেজ দেখিতেছি! তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে—কে তোমার প্রকৃত মনিব।"

পরদিন প্রভাতে ওলিভিয়ার মনিব তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন—"তুমি আমার ছেলেকে তোমার রূপে ভুলাইয়া কুপথগামী করিবার চেষ্টা করিতেছ; আমি তোমাকে চাকরীতে রাখিতে পারিব না, তুমি এক মাসের বেতন লইয়া চলিয়া যাও। তুমি আমার নিকট প্রশংসা-পত্র পাইবে না।"

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সার জোসেফের মুখে এ কথা শুনিয়া ওলিভিয়া স্তম্ভিত হইল। সে বলিল, "আপনার পুত্রের কত গুণ, তাহা আপনি জানেন না সার জোসেফ! যাহা হউক, আপনি স্বেচ্ছায় আমাকে বিদায় না দিলেও আপনার পুত্রের ব্যবহারে আমি

স্বয়ং আপনার অফিস ত্যাগ করিতাম। এখানে আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চাকরী করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

ওলিভিয়া এখানে চাকরী করিয়া কার্য্যদক্ষতার পরিচয়স্বরূপ কোন প্রশংসাপত্র না পাওয়ায় স্থানান্তরে স্থায়ী চাকরী সংগ্রহ করা তাহার অসাধ্য হইল। দীর্ঘকাল পরে পিটার ট্রেনটন এক জন ভাল সেক্রেটারীর জন্য তাহার শিক্ষয়িত্রীকে অনুরোধ করিলে তিনি ওলিভিয়ার জন্য সুপারিশ করিলেন।

ওলিভিয়া পিটার ট্রেনটনের রচিত কোন কোন উপন্যাস পাঠ করিয়াছিল, তাহার উপন্যাসের সমালোচনাও দেখিয়াছিল; কিন্তু তাহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে ওলিভিয়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। সে পিটার ট্রেনটনের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই জন গারসাইডের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়াছিল।

জন গারসাইডের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় ওলিভিয়া তাঁহার প্রণয়ের আকর্ষণ বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু উভয়ের ঘনিষ্ঠতা হইবার পর এক দিন রাত্রিকালে জন তাহাকে তাঁহার গাড়ীতে থিয়েটার হইতে তাহার গৃহে লইয়া যাইবার সময় বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ অনুরোধ করিলে ওলিভিয়া এই প্রস্তাবে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু সে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিল না; কারণ, সে পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিবার পর তাহার কোন সংবাদ পায় নাই; বিশেষতঃ, তস্করের কন্যা হইয়া কিরূপে সে কোন ভদ্রলোককে বিবাহ করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে? এই জন্য সে তাঁহাকে বলিল, "না জন, আমাদের বিবাহের কোন সম্ভাবনা নাই; আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়াই মনে করিব। আশা করি, আমাদের এই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

দুই দিন পরে ওলিভিয়া সংবাদ পাইল, তাহার পিতা কোন অবৈধ কার্য্য করিয়া ধরা পড়ায় পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছে। কিন্তু ওলিভিয়া এই সময় পিটার ট্রেনটনের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হওয়ায় নূতন বিপদে পড়িল! সে চাকরী আরম্ভ করিলে পিটার প্রথম দিন তাহার মুখের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তোমার নামটি বড়ই মধুর, এ জন্য আমি তোমাকে ওলিভিয়া বলিয়াই ডাকিব। আশা করি, ইহাতে তোমার আপত্তি নাই!"

ওলিভিয়া লজ্জা-বিজড়িত স্বরে বলিল, "ইচ্ছা হইলে আপনি আমার নাম ধরিয়াই ডাকিবেন, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।"

কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই ওলিভিয়া এই নির্লজ্জ লম্পটের ব্যবহারে বিব্রত হইয়া উঠিল! ট্রেনটন তাহার হাত হইতে কাগজ-পত্র লইবার সময় তাহার হস্ত স্পর্শ করিবার সুযোগ ত্যাগ করিল না। তাহার ব্যবহারেও অত্যন্ত উদারতা প্রকাশ পাইতে লাগিল! এক দিন ট্রেনটন আমেরিকা হইতে তার পাইয়া জানিতে পারিল—নিউ ইয়র্কে তাহার একখানি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ দুই হাজার পাউণ্ডে বিক্রয় হইয়াছে। সেই দিনই ট্রেনটন ওলিভিয়াকে একখানি দশ পাউণ্ডের নোট উপহার দান করিতে উদ্যত হইলে ওলিভিয়া তাহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিল।

ট্রেনটন বলিল, "তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ। সাহিত্য-সেবায় তুমি আমার অংশীদার—ইহা কি তুমি অস্বীকার করো? আমি এ পর্য্যন্ত অনেক যুবতীকে সেক্রেটারী রাখিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি ওলিভিয়া!"

অগত্যা চক্ষুলজ্জা বশতঃ তাহাকে সেই দশ পাউণ্ড গ্রহণ করিতে হইল। সে তখন অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল; এই টাকায় সে কোন উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইল।

ইহার পর এক মাসের মধ্যে ওলিভিয়া ট্রেনটনের ব্যবহারে আপত্তির কোন কারণ পাইল না; কিন্তু এক মাস পরে সে ওলিভিয়ার সাহায্যে একখানি উপন্যাস লিখাইতে লিখাইতে হঠাৎ থামিয়া বলিল, "তোমার কাজকর্ম্মে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি ওলিভিয়া! তোমার ন্যায় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ লেখিকা পূর্ব্বে কোন দিন পাই নাই; এ জন্য তোমার কোন অভাবই আমি অপূর্ণ রাখিব না। গুণের পুরস্কার দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি।"

ওলিভিয়া বলিল, "ও সকল কথা থাক, লেখাটা এখন শেষ করুন।"

ট্রেনটন বলিল, "উত্তম! কিন্তু আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।"

তাহার পর পাঁচ মাস সে ওলিভিয়াকে নানা ভাবে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; কিন্তু তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য ট্রেনটনের জিদও ক্রমশঃ প্রবল হইল।

কিছু দিন পরে ওলিভিয়া ট্রেনটনের আফিসে বসিয়া একখানি পত্র পাইল; সেই পত্রের লেফাফায় সে তাহার পিতার হস্তাক্ষর দেখিয়া বিস্মিত হইল। পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় ট্রেনটন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কি কোন পুরুষের পত্র?" ট্রেনটনের কথা শুনিয়া ওলিভিয়া বুঝিতে পারিল—সে মদ্যপান করিতে করিতে তাহার নিকট উঠিয়া আসিয়াছে। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ; সে ওলিভিয়ার ঘাড় ধরিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, পুরুষেরই হস্তাক্ষর দেখিতেছি। কোন পুরুষ মানুষ তোমাকে পত্র লেখে—এরূপ আমার ইচ্ছা নয়। যদি তুমি আমাকে ভাল না বাস, তাহা হইলে অন্য কোন পুরুষের প্রতি তুমি আসক্ত হইতে পারিবে না! না, আমি তাহা সহ্য করিব না। ঐ পত্র তুমি কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ ওলিভিয়া?"

এই কথা বলিয়াই ট্রেনটন ওলিভিয়ার হাত হইতে পত্রখানি ছিনাইয়া লইয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিল!

ওলিভিয়া তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল, তাহার সঙ্কট ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। ট্রেনটন পত্রখানি পাঠ করিয়া উৎসাহভরে বলিল, "তোমার পিতা অপরাধী বলিয়া পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে! কিন্তু তোমার চেহারা দেখিয়া কখন মনে করিতে পারি নাই—তুমি তস্করের কন্যা! যদি তোমাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে এই পত্র পুলিশের হাতে দিতে পারিতাম—ইহা কি বুঝিতে পারিয়াছ? কিন্তু সে কাজ আমি করিব না; তবে আমি বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষে প্যারিসে যাইব, তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

ওলিভিয়া বলিল, "আমার চিঠিখানা আমাকে ফেরত দিন—মিষ্টার ট্রেনটন!"

ট্রেনটন বলিল, "ইহা তুমি নিশ্চয় ফেরৎ পাইবে, কিন্তু

আমি তোমার পিতার বর্ত্তমান ঠিকানা লিখিয়া রাখিব,—তাহাতে পরে সুবিধা হইতে পারে। এই পত্রে তোমার পিতা তোমাকে কিছু টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছে, কিন্তু তোমার কিছু সম্বল আছে বলিয়া মনে হয় না! এ জন্য তোমাকে আমি কুড়ি পাউণ্ডের একখান চেক দিতে পারি—যদি তাহাতে তোমার কোন উপকার হয়।"

ওলিভিয়া বুঝিতে পারিল, তাহাকে নিঃসম্বল দেখিয়া ট্রেনটন তাহাকে উৎকোচ দানে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই লজ্জাজনক প্রস্তাব শুনিয়া তাহার চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি ভদ্রলোক হইলে এ ভাবে আমাকে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করিতে না।"

ট্রেনটন সক্রোধে বলিল, "কি! আমি ভদ্রলোক নহি? তুমি আমার মনের ভাব আমার অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পার?—বেশ, তোমার পত্র ফেরত লও, আজ আর কোন কাজ হইবে না। তুমি বাড়ী ফিরিয়া তোমার জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে আমার সঙ্গে দেখা করিবে। আমাদিগকে রাত্রির ট্রেণ ধরিতে হইবে!"

ওলিভিয়া তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "তুমি জানো—আমি সেখানে যাইব না. তথাপি কেন এ অনুরোধ করিতেছ?"—সক্রোধে সে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

পিটার ট্রেনটনকে একাকী প্যারিসে গমন করিতে হইল। সেখানে সে কি কারণে গমন করিল—ওলিভিয়া তাহা জানিতে পারিল না। কিন্তু ট্রেনটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। স্বদেশে ফিরিয়া সে ওলিভিয়াকে স্পষ্ট ভাবে জানাইল—সে তাহাকে চায়, না পাইলে তাহার মন স্থির হইবে না।

এই ঘটনার দশ দিন পরে ওলিভিয়া তাহার অনুরোধে একখানি সংবাদপত্র কিনিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইল—একখানি ইটালীয় ছোরা তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হওয়ায় সে নিহত হইয়াছে! অতঃপর ওলিভিয়াকেই তাহার হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত হইতে হইল।

চতুর্থ পল্লব

অভিযুক্তা তরুণী ও বিচারপতি

জুন মেরিকের নিকট ডেভিড গারসাইড যে অঙ্গীকার করিয়াছিল, তাহা অবিলম্বেই পালন করিল। সেই রাত্রিতেই সে সোহো পল্লীতে উপস্থিত হইয়া একটি সাধারণ ভোজনাগারে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ষ্টিভ সার্জ্জেণ্ট বেন মরফির সহিত সাক্ষাৎ করিল।

সেই ভোজনাগারের ইটালিয়ান অধ্যক্ষ দ্বিতলের একটি কক্ষ তাহাদের পরামর্শের জন্য ছাড়িয়া দিলে সেই কক্ষে গারসাইড, মরফি, এবং অন্য এক জন লোক গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই তৃতীয় ব্যক্তির নাম সোয়ামেস। এই ব্যক্তি ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেনটনের পরিচারকের পদে নিযুক্ত ছিল।

ডেভিড প্রথমেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চুরির অভিযোগে মিষ্টার ট্রেনটন কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছিলে?"

সোয়ামেস বলিল, "হাঁ, এ কথা সত্য।"

ডেভিড বলিল, "মিস্ ডেনের সহিত মিষ্টার ট্রেনটনের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাই তোমার নিকট জানিতে চাই। তুমি সকল কথা খুলিয়া বলো। মিস ডেন তাহার সেক্রেটারী ছিল, কিন্তু তাহারা কি পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল?"

সোয়ামেস দৃঢ় স্বরে বলিল, "হাঁ, তাহারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ট্রেনটন সুন্দরী যুবতী দেখিলে লোভ সংবরণ করিতে পারিত না, তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত।"

ডেভিড বলিল, "তোমার কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু তুমি কি ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়াছিলে? আমার মনে হয়, তুমি অনুমানে নির্ভর করিয়াই এ কথা বলিতেছ!"

সোয়ামেস বলিল, "আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, এবং নিজের কাণে যাহা শুনিয়াছি, তাহা ভিন্ন আমার অন্য কোন প্রমাণ নাই। ট্রেনটন সম্বন্ধে আমার যতখানি অভিজ্ঞতা আছে, অন্য কোন ব্যক্তির তাহা নাই বলিয়াই আমার ধারণা। আমি সুদীর্ঘ দুই বৎসর কাল তাহার অধীনে চাকরী করিয়াছিলাম, এ কথা স্মরণ রাখিবেন। এই সময়ের মধ্যে আমি কত যুবতীকে তাহার নিকট আসিতে ও বিদায় লইতে দেখিয়াছি। তাহারা সাধারণতঃ এক মাসের মধ্যেই তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িত। সে যুবতীদের বশীভূত করিয়া আমার নিকটেও সে জন্য গর্ব্ব করিতে কুণ্ঠিত হইত না;…"।

ডেভিড বলিল, "লোকটা কি সত্যই এত দূর নির্লজ্জ ছিল?—শূকরেরও অধম?"

সোয়ামেস বলিতে লাগিল, "আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন—তাহা হইলে আমি অসঙ্কোচে বলিব, মিস্ ডেনই তাহাকে খুন করিয়াছে। কেন সে তাহাকে হত্যা করিল—তাহাও আপনাকে বলিতে পারি। আমি ট্রেনটনের চাকরী হইতে বরখাস্ত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে একখানি পত্র লইয়া তাহাদিগকে কলহ করিতে শুনিয়াছিলাম।"

"সে পত্র কাহার নিকট হইতে আসিয়াছিল?"

সোয়ামেস বলিল, "তাহা আমি জানি না; কিন্তু পত্রখানি কোন পুরুষ-মানুষের লেখা, উহা মিস্ ডেনের নামে প্রেরিত হইয়াছিল। আমি ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম। কারণ, মিস্ ডেন যে ঘরে বসিয়া লেখা-পড়া করিত, সেই ঘরে আমিই তাহা লইয়া গিয়াছিলাম। মিস্ ডেন সেই পত্রের লেফাফা খুলিবার পূর্ব্বেই ট্রেনটন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—সে তাহার নিজের চিঠিপত্র, বিশেষতঃ, কোন পুরুষের লেখা চিঠি কি জন্য সেখানে লইয়া আসে?"

ডেভিড বলিল, "মিস্ ডেনকে সে এই কথা বলিল? এ যে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়!"

সোয়ামেস বলিল, "কিন্তু সে তখন ঐ কথা বলায় তাহাকে দায়ী করা যায় না। কারণ, সে তখন মদে চুর হইয়া মিস্ ডেনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার কথা শুনিয়া মিস্ ডেন তাহাকে বলিয়াছিল—যদি সে পুনর্ব্বার তাহার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করে—তাহা হইলে তাহাকে খুন করিবে।"

ডেভিড এ কথা শুনিয়া চেয়ারে ঠেশ দিয়া বসিয়া বলিল, "মিস্ ডেনের মত তরুণী তাহাকে ঐ রকম কথা বলিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।"

সোয়ামেস বলিল, "বিশ্বাস করিতে পার বা না পার, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।"

ডেভিড ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "তুমি আড়ালে থাকিয়া আর কোন্ কথা শুনিয়াছিলে সোয়ামেস?"

সোয়ামেস বলিল, "মিস ডেন তাহার পত্র ফেরত চাহিলে ট্রেনটন তাহাকে পত্র ফেরত দিয়াছিল। তাহার পর ট্রেনটন ঝড়ের মত বেগে সে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া যায়! আমিও ধরা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলাম।"

সোয়ামেসের নিকট আর কোন কথা জানিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া ডেভিড তাহাকে বিদায় দান করিল।

সোয়ামেস সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে ডেভিড ডিটেক্টিভ সার্জ্জেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিল, "সোয়ামেসের কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হয়? তাহার কথা সত্য?"

মরফি বলিল, "সে কথা বলা কঠিন। তবে পরে আমি উহাকে জেরা করিলে রহস্য ভেদ হইতে পারে।"

* * * *

জন গারসাইড ওলিভিয়াকে দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "এখন আমার নিকট তোমার সত্য কথা প্রকাশ করা উচিত। আমার এক ভাই আছে, সে সংবাদপত্রে অপরাধীদের কুকার্য্যের সংবাদ প্রকাশ করে। গত রাত্রে সে ট্রেনটনের এক জন ভৃত্যের জবানবন্দী লইয়াছিল। ট্রেনটনের সেই ভৃত্যের নাম সোয়ামেস। সে আমার ভ্রাতার নিকট স্বীকার করিয়াছিল—সে চুরি করায় ট্রেনটন কর্তৃক পদচ্যুত হইবার দুই দিন পূর্ব্বে সে তোমাকে বলিতে শুনিয়াছিল—ট্রেনটন যদি পুনর্ব্বার তোমার প্রতি মন্দ ব্যবহার করে—তাহা হইলে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে! এই কথা বলিয়া তুমি ট্রেনটনকে ভয় দেখাইয়াছিলে। এ কথা সত্য?"

"না।"

জন বলিলেন, "সে দিন কি তুমি ট্রেনটনের সহিত কলহ করিয়াছিলে?"

ওলিভিয়া বলিল, "হাঁ। ট্রেনটন একটা অমার্জ্জনীয় কাজ করিয়াছিল। সে আমার হাত হইতে একখানা পত্র কাড়িয়া লইয়া আমার অসম্মতিতে তাহা পাঠ করিয়াছিল।"

জন বলিলেন, "সেই পত্র তুমি কাহার নিকট হইতে পাইয়াছিলে, জানিতে পারি?"

ওলিভিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "সে কথা তোমাকে বলিতে পারিব না জন! তবে আমি শপথ করিয়া এ কথা বলিতে পারি যে, পিটার ট্রেনটনের মৃত্যুর সহিত সেই পত্রের কোন সম্বন্ধ ছিল না। আমার এই কৈফিয়ৎই কি যথেষ্ট নহে?"

জন বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট বলিয়া আমার মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তোমার এই কৈফিয়তে অন্য সকলে সন্তুষ্ট হইবে কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তোমাদের এই বিবাদের কথায় আলোচনা করিয়া ফরিয়াদী পক্ষের কৌশুলী কিরূপ সিদ্ধান্ত করিবে, তাহা চিন্তা করিয়াছ কি? আর তাহা জুরিদের মনেও কিরূপ প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা তোমার কর্ত্তব্য।"

ওলিভিয়া এ কথা শুনিয়া কেবল বলিল, "যাহা সত্য, তাহাই তোমাকে বলিলাম। আমি পিটার ট্রেনটনকে হত্যা করি নাই,—ইহার অধিক আর কিছুই আমার বলিবার নাই!"

জন বলিলেন, "কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া তোমার মনে হয়?"

ওলিভিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি কাহাকেও সন্দেহ করিতে পারি নাই; এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ বলিয়াই আমার মনে হয়।"

জন গারসাইড অতঃপর নিরুৎসাহ চিত্তে কারা-কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল, ওলিভিয়া তাঁহাকে সত্য কথাই বলিয়াছে, কিন্তু কিরূপে এই রহস্য ভেদ হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি হেনরী কোজেনের অফিসে উপস্থিত হইয়া ওলিভিয়ার (আসামীর) সহিত তাঁহার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার গোচর করিলেন। হেনরী কোজেন সকল কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এই যুবতী যদি তাহার মনের সকল কথা সরল ভাবে প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিব না। সে যদিও শপথ করিয়া বলিতেছে সে নিরপরাধ, কিন্তু জুরীরা বা স্বার্থডেলের মত দণ্ডানুরাগী জজ তাহার এ কথায় নির্ভর করিবে বলিয়া মনে হয় না। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছি, স্বার্থডেলই এই মামলার বিচার-ভার গ্রহণ করিবে। আরও এক কথা—আমি আজ স্বার্থডেল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছি—ট্রেনটনের সহিত তাহার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল।"

জন গারসাইডকে তাঁহার এই এটর্ণী বন্ধু বলিলেন, "যদি আমি বিচারালয়ে হত্যাপরাধে অভিযুক্তা এই আসামীর সমর্থন করিতাম-তাহা হইলে স্বার্থডেলের মত জজের এজলাশে তাহার মামলার বিচার হওয়া প্রার্থনীয় মনে করিতাম না।"

"স্বার্থডেল তাহার বন্ধুর হত্যাপরাধে অভিযুক্তা আসামীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, তাহার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। স্বার্থডেলই যে এই মামলার বিচার-ভার গ্রহণ করিবে—মিস্ ডেনকে কি এ কথা জানাইয়াছ?"

গারসাইড বলিলেন, "না। কারণ, তোমার নিকট অল্পকাল পূর্ব্বেই আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি। বিশেষতঃ, মিস্ ডেনকে এ কথা জানাইয়া লাভ?"

হেনরী কোজেন বলিলেন, "এ কথা শুনিলে সে হয়ত তাহার মনের সকল কথা খুলিয়া বলিত। ট্রেনটন স্বার্থডেলের বন্ধু ছিল কি না।"

গারসাইড বলিলেন, "সে কথা শুনিয়াছি; কিন্তু ইহা হইতে তুমি কি সিদ্ধান্ত করিতে চাও, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

মিষ্টার কোজেন এ কথায় একটু হাসিয়া নিরুত্তর রহিলেন।

কিন্তু বাহিরের গোপনীয় সংবাদ কারাগারেও প্রবেশ করে। এক দিন কারাগারের প্রবীণা 'ওয়ার্ডেস' ওলিভিয়াকে জানাইল—জজ হোরেসিও স্বার্থডেলের হস্তে তাহার বিচার-ভার অর্পিত হইয়াছে।

এ সংবাদ শুনিয়া ওলিভিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া সদয়-হৃদয় ওয়ার্ডেস্ তাহাকে বলিল, "বিচারপতি স্বার্থডেল তোমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের

বিচার-ভার গ্রহণ করিবেন শুনিয়া তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমার বিশ্বাস, অন্যান্য আসামীর মত তুমিও তাঁহার নিকট সুবিচার পাইবে।"

সে বিচারপতি স্বার্থডেলের নিকট সুবিচার পাইবে! হয়ত মিষ্টার স্বার্থডেল সুবিচারই করিবেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ওলিভিয়ার যে অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা স্মরণ হওয়ায় তাহাকে মিষ্টার স্বার্থডেলের নিকট সুবিচার-লাভের আশা ত্যাগ করিতে হইল।

পিটার ট্রেনটনের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। বন্ধুবর্গের মধ্যে কয়েক জন উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিলেন; বিচারপতি স্বার্থডেল তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাদের বন্ধুত্ব কিরূপ প্রগাঢ় ছিল, ওলিভিয়া কোন দিন তাহা জানিতে পারে নাই। এক দিন রাত্রিকালে ট্রেনটন ওলিভিয়াকে তাহার ইচ্ছার প্রতিকূলে 'মে-ফেয়ার পার্টিতে' যোগদান করিতে লইয়া গিয়াছিল। সেই স্থানে মিষ্টার স্বার্থডেলের সহিত তাহার পরিচয় হয়। ট্রেনটন ওলিভিয়াকে বলিয়াছিল, "ইনি আমার বন্ধু বিচারপতি মিষ্টার স্বার্থডেল। তুমি সাধ্যানুসারে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিবে। কারণ, যদি তুমি কোন দিন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হও, তাহা হইলে উনি তোমাকে কারাগারে পাঠাইতে পারেন।"

ওলিভিয়ার তখন মনে হইয়াছিল, মিষ্টার ট্রেনটন পরিহাস-ছলেই তাহাকে ঐ কথা বলিয়াছিল।

যাহা হউক, ওলিভিয়া কোন দিন বিচারপতি স্বার্থডেলের মনোরঞ্জনে ত্রুটি করে নাই; তাহাদের বন্ধুত্বের বন্ধনও কোন দিন শিথিল হয় নাই।

এক দিন ট্রেনটন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় মিষ্টার স্বার্থডেলের গৃহে যাইতে পারে নাই, ওলিভিয়া একাকী সেখানে গমন করিয়াছিল। এবং ওলিভিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য উৎসুক হইলে মিষ্টার স্বার্থডেল তাঁহার নিজের গাড়ীতে তাহাকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিলেন। ওলিভিয়া তাঁহার সহিত গমন করিতে দ্বিধা বোধ করিল না।

ওলিভিয়া তখন দুই কামরাবিশিষ্ট একটি সঙ্কীর্ণ ফ্ল্যাটে বাস করিত। মিষ্টার স্বার্থডেলের মোটর-কার ফুলহাম-রোডের দিকে চলিতে চলিতে যখন স্লোন স্কোয়ারের নিকট উপস্থিত হইল, সেই সময় ওলিভিয়ার পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বার্থডেল হঠাৎ এক অদ্ভুত কার্য্য করিলেন।

তিনি ওলিভিয়ার হাত ধরিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "তোমাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাইতেছে। তুমি কি কোন সঙ্কটে পড়িয়াছ—মাই ডিয়ার!"

ওলিভিয়া প্রকৃত মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "না, আমি কোন সঙ্কটে পড়ি নাই, আমার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

ওলিভিয়া জানিত, বিচারপতি স্বার্থডেল তাহার মনিব ট্রেনটনের পরম বন্ধু; সুতরাং ট্রেনটন তাহাকে ক্রমাগত কি ভাবে জ্বালাতন করিতেছিল, তাহা তাহার নিকট প্রকাশ করা সে সঙ্গত মনে করিল না।

কিন্তু স্বার্থডেল তাহার কথা শুনিয়াও তাহার হাত ছাড়িলেন না; উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া ওলিভিয়া বিরক্তিভরে মুখ সরাইয়া দৃঢ় স্বরে বলিল, "মহাশয়ের ব্যবহার ভদ্রোচিত বটে!"—সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁহার মুখের উপর অগ্নিময় দৃষ্টি বর্ষণ করিল।

ওলিভিয়ার ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্বার্থডেলের মুখ-ভাবের পরিবর্ত্তন হইল। তিনি মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আশা করি, তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। ক্ষণকালের জন্য আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

ওলিভিয়া মাথা হেলাইয়া তাঁহাকে জানাইল—তিনি তাঁহার ব্যবহারের জন্য যে ভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন—তাহাই যথেষ্ট; কিন্তু সে তাহার ফ্ল্যাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আর একটি কথাও বলিল না, নিস্তব্ধ ভাবে তাঁহার পাশে বসিয়া রহিল। অতঃপর মিষ্টার স্বার্থডেলের মোটর-কার তাহার বাসগৃহের সম্মুখস্থ কার্সিটার রোড়ে আসিয়া থামিলে ওলিভিয়া তাঁহাকে 'গুড নাইট' বলিয়া নামিয়া গেল, কিন্তু মিষ্টার স্বার্থডেলের চক্ষুর দিকে চাহিয়া তাহার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। তাঁহার সেই ক্রোধ-প্রদীপ্ত দৃষ্টি সে এত দিনেও ভুলিতে পারে নাই! সে দৃষ্টি যেন দিবারাত্রি তাহার অনুসরণ করিতেছিল!

ওলিভিয়া এখন নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত, এবং এই ব্যক্তিরই হস্তে তাহার বিচার-ভার অর্পিত! [ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

দূর ও নিকট

সুদূর বিমান-কক্ষে নক্ষত্র রহিয়া
পৃথিবীতে আলোরশ্মি করে বিকিরণ,
মানবের ধরণীরে ভালোবাসা দিয়া
ঘিরিয়া রয়েছে গ্রহ-উপগ্রহগণ!

প্রতিবেশী মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ
দূরত্বের শত ক্রোশ করেছে সৃজন;
হিংসা-দ্বেষ লোলুপতা করি' অবরোধ
দুয়ারে দাঁড়ায়ে রচে সহস্র যোজন।
দূর যারে মনে হয় সে তো দূর নয়—
নিকটস্থ আত্মীয়ের নহে পরিচয়।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট্-ল)।

দুখ-নিশি মোর হবে না কো ভোর—

পিয়াল-বনের পাখী
জানি তুমি আসিবে না, তবু চেয়ে থাকি।
বসে থাকি বাতায়নে
জল নামে দু' নয়নে
মোর দুখ-নিশি কভু পোহাইবে না কি!

ভালোবেসেছিনু তাই দিলে এত জ্বালা
ফুল নিয়ে রেখে গেলে কণ্টকের মালা!
মোর মধু রাতি হায়,
ছেয়ে গেল আঁধিয়ায়
ঝড়ের আঁধারে মরে 'পিউ কাঁহা' ডাকি।

বন্দে আলী মিয়া।

দাবীদার

অনেক দিন আগেকার কথা। তখন ক'বছর মাত্র নূতন দিল্লীর পত্তন হইয়াছে। আজিকার এই সুরম্য হর্ম্যরাজি-শোভিত নূতন দিল্লী তখন ছিল না। জনবিরল পথ, পথের দু'পাশে অধিকাংশ জমিই ছিল অসমতল অনুর্ব্বর রুক্ষ। কয়েকটি মাত্র স্কোয়ার তখন তৈয়ারী হইয়াছে।

ক্লার্কস্ কোয়ার্টার্স ছাড়াইয়া সরকারী অফিসের দিকে যে পথ গিয়াছে, তাহারই এক দিকে সতেরো আঠারো বৎসর বয়সের এক তরুণী দিগ্‌ভ্রান্ত ভাবে পথ চলিতেছিল। মেয়েটির গায়ের রং ফর্সা—মুখ নিখুঁত না হইলেও এমন মাধুরীমাখা যে চাহিলে চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না! তরুণীর দু'চোখে ভীতা হরিণীর মত ত্রস্ত দৃষ্টি।

মাঘ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দু'-এক পশলা বৃষ্টি হইতেছিল, মেয়েটির কাপড়ের সবটাই প্রায় ভিজা—শীতে বিবর্ণ ওষ্ঠ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

তরুণী পথ হারাইয়াছে। কতক্ষণ এমন ঘুরিতেছে ঠিক নাই,—পথে লোকজনের চিহ্ন নাই! একেই এ দিকে দ্বিপ্রহরে পথে লোক দেখা যায় না, তাহার উপর এমন দুর্যোগ।

অনেকক্ষণ পরে আপাদমস্তক বর্ষাতি মুড়ি দেওয়া এক জন হ্যাট-কোটধারীকে দেখিতে পাইয়া তরুণী কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—আপনি বাঙ্গালী?

পথিক দাঁড়াইল। বলিল,—হাঁ। কেন বলুন ত।

মেয়েটি নতমুখে বলিল,—আমি পথ হারিয়েছি। আমায় বাড়ীটা দেখিয়ে দেবেন?

পথিক আগ্রহ-সহকারে বলিল,—কেন দেখিয়ে দেবো না? আপনি কোথায় যাবেন?

—এডওয়ার্ড স্কোয়ারে।

—কি সর্ব্বনাশ! সে যে অনেক দূর! কখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন?

ধীরা বলিল,—অনেকক্ষণ। বেলা তখন এগারোটা।

হাতের উপর হইতে বর্ষাতি সরাইয়া ঘড়ি দেখিয়া পথিক বলিল, আর এখন আড়াইটে। এই সাড়ে তিন ঘণ্টা আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

কথা বলিতে বলিতে দু'জনে অগ্রসর হইতে লাগিল। ধীরা বলিল,—হাঁ। কি করবো! কোন ভদ্রলোককে দেখতে পাইনি। দু'-একটা ছোট জাতের লোক দেখলুম, তাদের কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা হলো না। কি জানি, কোন্ পথ দেখিয়ে দেবে। যা নির্জ্জন, —বড্ড ভয় কচ্ছিল।

অদূরে একখানা খালি টাঙ্গা দেখিয়া পথিক বলিল,—টাঙ্গাটা ডাকি। আপনি বড্ড ভিজে গেছেন। যেতে হবে অনেকটা পথ।

— ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিল,—তাতে আমার কিছু কষ্ট হবে না। তবে আমাকে পৌঁছে দিতে আপনাকে অনেকখানি অকারণ হাঁটতে হবে।

সুরেশ চকিতের জন্য তাহার মুখের পানে চাহিল; চাহিয়া বলিল,—আপনি মেয়েছেলে, আপনি পারবেন, আর আমি পারবো না? বেশ, চলুন হেঁটেই যাওয়া যাক্।

একটু অগ্রসর হইয়া সুরেশ বলিল,—আপনি এখানে নং এসেছেন বুঝি? আপনার বাবা এখানে কাজ করেন?

নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরা বলিল, বাবা নেই। কাকার সা এসেছি। কাকা এখানে বদলী হয়ে এসেছেন। প্রায় তিন মা আছি। এখানকার কথা এখনও কিছু বুঝি না।

সুরেশ বলিল—আমি প্রায় পাঁচ বছর হলো সিমল দিল্লী কচ্ছি, কিন্তু শুদ্ধ-হিন্দী আজও বলতে পারি না! পরে ভাষা অভ্যাস করতে সময় লাগে। আপনারা কলকাতা থেকে এসেছেন?

ধীরা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। ইচ্ছা হইল, সুরেশকে তাহার বাড়ীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করে! কিন্তু অশোভন হইবে ভাবিয়া নীর রহিল।

সুরেশ নিজেই বলিল—আমাদের বাড়ী রামকৃষ্ণপুরে। কোথাকা মানুষ কোথায় রয়েছি।

ধীরা বলিল, রামকৃষ্ণপুর! ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে রামকৃষ্ণপু যেতুম। এখনও ছবির মত মনে পড়ে।

সুরেশ বলিল,—রামকৃষ্ণপুরে যেতেন? কোথায় বলুন ত কাদের বাড়ী?

ধীরা বলিল,—নাম বললে চিনবেন হয়ত—তিনি আগেকা এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁর নাম ছিল পরমেশ রায়।

—পরমেশ রায়? তিনি আমার বাবা। সুরেশ বিস্মিত কণ্ঠে বলিল।

মেয়েটি সর্পাহতের মত চমকিয়া তাহার বিশাল চক্ষু সুরেশের মুখে নিবদ্ধ করিয়া অতর্কিতে দু'পা পিছাইয়া গিয়া বলিল,—আপনি পরমেশ বাবুর ছেলে! সুরেশ বাবু?

সুরেশ তাহার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল,—হাঁ। কেন বলুন ত?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ধীরা বলিল, আমি প্রমথ চৌধুরীর মেয়ে—ধীরা! বাবাকে চিনতেন বোধ হয়!

তাহার কণ্ঠের শ্লেষটুকু সুরেশ অনুভব করিতে পারিল। নিঃশব্দে দু'-চারি পা যাইবার পর সুরেশ ডাকিল,—ধীরা!

চোখ তুলিয়া ধীরা চাহিল। তাহার সমস্ত মুখ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

দৃষ্টি নত করিয়া সুরেশ বলিল,—সাত-আট বছর পরে দেখে তোমাকে চিনতে পারিনি, কিন্তু চিনে আর তোমায় আপনি বলতে পারবো না, সে জন্য কিছু মনে করো না!

তার পর একটু নীরব থাকিয়া বলিল,—তোমার মা ছিলেন না? তিনি এখন কোথায়?

ধীরা মুখ না তুলিয়াই বলিল, মা মেজ কাকার কাছে ঢাকায়, আর আমি সেজ কাকার কাছে ঝি হয়ে আছি।

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পথাতিবাহন করিতে লাগিল। ইহার পর দু'জনেই নির্ব্বাক্। পরে নম্বর দেখিয়া দ্বার ঠেলিবার পূর্ব্বে ধীরা কুঞ্চিত ভ্রূর উপর যুক্ত কর উঠাইয়া বলিল,—আজ আপনি যে উপকার করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। নমস্কার।

২

বাড়ী ঢুকিতেই সেজ কাকিমা তার-স্বরে গালাগালি সুরু করিয়া দিলেন। এবং বহু জন্মের পাপে যে পরের বোঝা বহিয়া মরিতে হইতেছে তাহার জন্য নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ধীরা মৌন-মুখে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া উনানে আগুন দিতে গেল।

দোষটা কাকিমার এবং একবার দেখিয়া পথ চিনিবার অক্ষমতা ধীরা বারে বারে জানাইয়াছিল। তথাপি তাঁর নিকট প্রচণ্ড ধমক খাইয়া যে ধীরাকে কাকিমার বান্ধবীর বাড়ী যাইতে হইয়াছিল, সে-কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবার সাহস ধীরার ছিল না; তা ছাড়া আজ তার মনের অবস্থাও শোচনীয়। কাকিমার ছেলেমেয়েদের লইয়া ধীরা শয়ন করে, পাশের ঘরে কাকিমা থাকেন। আজ ভাই-বোনগুলি ঘুমাইয়া পড়িলে ধীরা জাগিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল—সুরেশ আজ তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াছে!

চির দিন ধীরার অবস্থা এমন ছিল না। সে ছিল পিতার শেষ বয়সের সন্তান। তাহার অনেকগুলি ভাই-বোনের পর সেই মাত্র অতি কষ্টে বাঁচিয়াছিল। ধনীর কন্যা না হইলেও অভাব তাহার কোন দিন ছিল না। পিতা পেন্সন পাইতেন, ছোট একখানি বাড়ী এবং কিছু টাকা ছিল ভরসা। পরমেশ রায় ছিলেন পিতার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। বছর পাঁচেক পূর্ব্বে কোন বিশেষ প্রয়োজনে তিনি টাকার জন্য বন্ধুর শরণাপন্ন হন, বন্ধুও কাহাকেও কিছু না জানাইয়া নগদ টাকা তুলিয়া এবং বাড়ী বন্ধক দিয়া একুনে উনিশ হাজার টাকা পরমেশ বাবুকে দেন। কথা ছিল, এক মাসের মধ্যেই পরমেশ বাবু টাকাটা ফেরৎ দিবেন। কিন্তু টাকা লইয়াই পরমেশ বাবুর রূপ বদলাইয়া গেল। এক মাস পরে স্বচ্ছন্দে তিনি বলিয়া দিলেন, এটা গাঁজার আড্ডা নয় ভাই, বন্ধু বন্ধুর মত থাকো, টাকাকড়ির ল্যাঠা বাধিয়ো না। টাকা যে দিয়েছো বলছো, তার লেখাপড়া কি আছে, দেখাও দিকিন্!

লেখাপড়া সত্যই ছিল না। প্রমথ বাবু বজ্রাহতের মত ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর আরও অনেক বার হাঁটাহাঁটি করিয়াও কোন ফল হইল না। বৃদ্ধ বয়সে টাকার শোক তাঁহার বড় বেশী বাজিল, বিশেষ একমাত্র কন্যা তখন বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিতেছে। দুশ্চিন্তায় তিনি শয্যা লইলেন। কথাটা ক্রমে পত্নী, কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনের কানে উঠিল। আত্মীয়-স্বজন তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ছি-ছি করিতে লাগিল। প্রমথ বাবুর শরীর আরও ভাঙ্গিয়া গেল। কন্যার চিন্তায় তিনি দিশাহারা হইলেন। কোন উপায় না পাইয়া পরমেশ বাবুকে অনুনয় করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া সুরেশের সহিত ধীরার বিবাহ দিয়া অন্তিম সময়ে পরমেশ বাবু তাঁহাকে চিন্তামুক্ত করুন।

বলা বাহুল্য, পরমেশ বাবু সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। ইহার পর প্রমথ বাবু আরও ছয়-সাত মাস রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মুক্তি পাইলেন। বাড়ী বিক্রয় হইয়া গেল। চারি দিক্‌কার ধার-দেনা শোধ দিয়া মাত্র কয়েক শত টাকা বাঁচিল,—সে টাকায় এ কালে কন্যার বিবাহ হয় না!

সেই সব কথা ভাবিয়া ধীরার বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে লাগিল।

দিন পনেরো পরে এক দিন সকালে ধীরা একখানি পত্র পাইল। শিরোনামা অপরিচিত পুরুষ-হস্তের! বিস্মিত হইয়া পত্র খুলিল। পত্রে লেখা ছিল—

কল্যাণীয়াসু

ধীরা, তোমার সঙ্গে সে দিন আশ্চর্য্য ভাবে দেখা হয়েছিল। তোমার সঙ্গে যে আমাদের একটা অপ্রিয় সম্বন্ধ আছে তা জানতুম, কিন্তু বিশ্বাস করো, সঠিক ব্যাপার জানতুম না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই সে দিন পথের মাঝে পরিচয় হতে। আমার খুব সন্দেহ হয়েছিল—আমি তোমার স্নেহটুকু ভুলতে পারিনি। কয়েক দিনের ছুটী নিয়ে দেশে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে সন্ধান নিয়ে যা জানতে পেরেছি, তাতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে! তোমার যে ক্ষতি আমরা করেছি, তাতে তুমি আমাদের ক্ষমা করতে পারবে না বলেই মনে হয়। পারবে ধীরা? তবে তোমায় একটি সংবাদ দিচ্ছি—আমার পিতাও আজ পরলোকে। আজ দু'বছর হলো, তাঁর মৃত্যু হয়েছে,—যদি পারো, মৃত আত্মার প্রতি প্রতিহিংসা ভুলে তাঁর আত্মাকে ক্ষমা করো।

আমি বাবার উত্তরাধিকারী। আমার ইচ্ছা, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একটা ব্যবস্থা করবো। তুমি আমার সঙ্গে এক বার দেখা করবে কি? যদি করো, তাহলে কোথায় দেখা হতে পারে, জানিও।

আর একটা কথা আমি জানতে পেরেছি, দেখা হলে বলবো। ইতি

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

পত্রখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ধীরা বার কয়েক পড়িল। সুরেশ কি কথা জানিতে পারিয়াছে, তাহা বুঝিতে ধীরার বিলম্ব হইল না! নিজের অজ্ঞাতেই বুকের মধ্য হইতে একটা গভীর নিশ্বাস বাহির হইল এবং চোখের পলকে মনে পড়িল, সে দিনের সেই অচেনা পথিকের বুদ্ধি-সমুজ্জ্বল সুন্দর মুখখানি!

দু'-তিন দিন সে ভাবিতে লাগিল—সুরেশের পত্রের উত্তর দেওয়া উচিত কি না। কাকিমাকে কোন কথা জানাইতে সাহস হইল না। অবশেষে ধীরা পত্রোত্তর দেওয়াই সমীচীন বোধ করিল। নিজের জন্য না হোক, বৃদ্ধা মায়ের কষ্ট সহ্য হয় না! যদি কোন ব্যবস্থা হয়, মায়ের কষ্ট কমিবে।

রাত্রে নির্জ্জনে বসিয়া সে পত্র লিখিল। লিখিল—

মান্যবরেষু

আপনার পত্র পাইলাম। কিছু বক্তব্য থাকিলে সেজ-কাকাকে বলিতে পারেন। ইতি　　　　ধীরা

৩

তৃতীয় দিন রাত্রে ধীরা স্কোয়ারের দিকের জানলা খুলিয়া বসিয়াছিল। শীত একটু কমিলেও এখনও হাড়-কাঁপানো বাতাস বহিতেছে—তথাপি জানলায় মাথা দিয়া ধীরা বসিয়াছিল। ক' দিনের অবিরাম চিন্তা তাহাকে যেন ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে! তাই এই শীতল বায়ু-প্রবাহ তাহার সারা শরীর কাঁপাইয়া দিলেও মাথায় বেশ আরাম বোধ হইতেছিল। ঘরে কাকিমার ছেলেমেয়ে ঘুমাইতেছে, পাশের ঘরে কাকা-কাকিমাও বোধ হয় নিদ্রামগ্ন। এই রাত্রি দশটার মধ্যেই

সারা পল্লী ঘুমে অচেতন! ক্বচিৎ কোন শিশুর ক্রন্দন সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, নচেৎ আর সব নীরব। পথ জনমানব-শূন্য।

জানলার বাহিরে লঘু পদশব্দ শুনিয়া ধীরা ত্বরিতে মাথা তুলিল। যাহা দেখিল, দেখিয়া বিস্মিত হইল। জানলার বাহিরে সুরেশ দাঁড়াইয়া আছে। ঘরের বিজলী-বাতির আলো তাহার মুখে পড়িয়াছে। এক-মুহূর্ত্ত ধীরার মুখে কথা ফুটিল না।

সুরেশ বলিল,—কালও এখানে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত ঘুরে গেছি —যদি একটিবার তোমায় দেখতে পাই, এই প্রত্যাশায়!

বিস্ময়-বিমূঢ় স্বরে ধীরা বলিল,—কেন? আমি ত আপনাকে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলুম।

সুরেশ বলিল,—বলেছিলে বটে, কিন্তু আমার মনে হলো, তোমার সঙ্গে কথা বলাই আমার সবচেয়ে প্রয়োজন। কারণ, তোমারই ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয়েছে—আর পিতৃ-শত্রুকে ক্ষমা করা তোমারই সবচেয়ে কঠিন।

ধীরা নিরুত্তর রহিল।

সুরেশ বলিতে লাগিল, যখন এ ঘটনা হয়, আমি তখন সবে চাকরীতে ঢুকে সিমলায় গেছি। এত ব্যাপার আমি জানতুম না— শুধু জানতুম, কোন কারণে জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বাবার মনোমালিন্য হয়েছে। সেটা যে টাকার ব্যাপারে, তা একটু-আধটু শুনেছিলুম। এ বারে গিয়ে খোঁজ নিতে সত্য কথা জানতে পারি।

সুরেশের কণ্ঠে গভীর লজ্জা ও বেদনা ঝঙ্কৃত হইল। একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল,—ক্ষমা চেয়ে প্রহসন করার ইচ্ছে আমার নেই, তবে একটা বক্তব্য আছে।

ধীরা দৃষ্টি উন্নত করিয়া সুরেশের দিকে চাহিল, তাহার নির্ভর-যোগ্য কণ্ঠস্বর ও সরল মুখ ধীরাকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিল। মনে হইল, পরমেশ বাবু, সেই প্রবঞ্চক—তিনি ইঁহারই পিতা!

সুরেশ বলিল,—তুমি যদি টাকা ফেরৎ চাও, তাহলে তাই দেবো, নাহলে তোমাদের বাড়ী বাবা বেনামীতে কিনেছিলেন, সে বাড়ী ফিরিয়ে দেবো। কি ভাবে তুমি নিতে চাও, বলো?

ধীরা জবাব দিল না। তাকে নীরব দেখিয়া সুরেশ পুনরায় বলিল,—তুমি বিশ্বাস করছো না ধীরা? আমি সত্য কথাই বলছি। কি ভাবে তুমি নেবে—এখনি না বলতে পারো, বেশ, দু'-চার দিন ভেবে দ্যাখো। আজ সোমবার,—শুক্রবার রাত্রে আমি এইখানে এসে তোমার কাছ থেকে জেনে যাবো।

ধীরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার দিকে চাহিয়াছিল, মৃদু কণ্ঠে বলিল,— কষ্ট করে কেন মিছে আসবেন! আমি কিছু নেবো না। কিছু আমি চাই না।

সুরেশ বলিল,—কেন? তোমার নিজের জিনিস, তুমি নেবে না কেন?

ধীরা হয়ত এ কথা ভাবিয়া রাখে নাই, কিন্তু মুখ দিয়া ফস্ করিয়া বাহির হইয়া গেল,—ওতে বাবার শেষ নিশ্বাস মিশে আছে! রক্তমাখা! ওই শোকেই তিনি মারা গেছেন।

সুরেশ মুখ নীচু করিয়া রহিল। কয়েক মিনিট পরে বলিল,— এ ছাড়া আর একটা কথা জেনে এলুম, তুমি সে কথা জানো কি না, জানি না!...বলিয়া সে এক মিনিট থামিয়া পরে বলিল,—এই অপদার্থের হাতে জ্যাঠামশাই তাঁর একমাত্র অবলম্বনকে দান করতে চেয়েছিলেন। তার পর আবার একটু নীরব থাকিয়া প্রশ্ন ক —এ কথা তুমি জানতে?

ধীরা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। লজ্জায় ধীরার মুখ র হইয়া উঠিল।

সুরেশ মুগ্ধনেত্রে ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকি আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিল,—তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা সম্ভব নয়?

ধীরার মনশ্চক্ষের সম্মুখে পিতার রোগপাণ্ডুর মুখ ভাসিয়া উঠি তাহার সারা অন্তর বেদনায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল। দৃঢ় ভাবে ঘ নাড়িয়া মৃদু স্বরে ধীরা বলিল,—না।

ক্ষণকাল মৌন-নত মুখে থাকিবার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি সুরেশ বলিল,—কিন্তু যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ, তাকে শাস্তি দেও কি উচিত, ধীরা?

—শাস্তি! সে আবার কি! বলিয়া ধীরা স্থির দৃষ্টি সুরেশের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—কি তা নিজে এখনো ভালো বুঝতে পাচ্ছি না, তোমায় কি করে বোঝাবো তবে একটা অনুরোধ করছি,—মাঝে মাঝে ঘরে আলো জেলে এ জানলায় দয়া করে একটু বসো, সেইটুকুই আমার যথেষ্ট হবে কণ্ঠ ভারী হইয়া আসিল। মিনিট খানেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশ সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

৪

ধীরা অনেক ভাবিয়া মাকে সকল কথা জানানোই স্থির করিল ঐ সঙ্গে সুরেশের পত্রখানি পাঠাইয়া দিল। তৃতীয় দিনে ধীর সুরেশের আর একখানি পত্র পাইল। কাকিমা কাছাকাছির মধ্যে কোথায় ছিলেন বলিয়া সে পিয়নের নিকট হইতে পত্র লইয়া জামা মধ্যে ফেলিয়া রাখিল। আহারান্তে কাকিমা ঘুমাইলে সে পত্র খুলিল

সুরেশ লিখিয়াছে—

স্নেহের ধীরা, তোমায় শত ধন্যবাদ, কাল জানলা খুলে বসেছিলে!...সে দিন তোমায় বলেছিলুম বটে, যে ওই আমার যথেষ্ট হবে, কিন্তু মনে হচ্ছে তা নয়। অ-দেহী প্রেম কাব্য-উপন্যাসে যথেষ্ট গৌরব পেয়ে এলেও সত্যিতে তাকে নিয়ে বাঁচা যায় না। আমি তোমায় চাই,—তোমার ওই দূরের ছবিতে আমার তৃপ্তি হয় না! তুমি কি পূর্ব্ব-কথা ভুলে আমাদের ক্ষমা করতে পারবে না ধীরা? আমি অধীর হয়ে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রইলুম। জ্যাঠাইমাকে সব কথা জানিয়েছ? তাঁর ঠিকানা আমাকে জানিয়ো, আমি তাঁর কাছে মার্জ্জনা চেয়ে চিঠি দেবো। কবে উত্তর দেবে? যদি বুধবার পর্য্যন্ত উত্তর না পাই, তা হলে বৃহস্পতিবার রাত্রি দশটা নাগাদ তোমার দুয়ারে উপস্থিত হবো। তার পর? অন্ত কিছু হয়ত বিশ্বাস না করতে পার, তাই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিয়ে চিঠি শেষ করলুম। ইতি সুরেশ।

ধীরার হাত কাঁপিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! সুরেশ এমন দুঃসাহসী! কাকিমার হাতে যদি এ চিঠি পড়িত! কি বলিতেন তিনি? কুমারী মেয়ে, তাহার পক্ষে এক জন যুবকের সহিত পত্র-ব্যবহার অন্যায়! ধীরা ভ্রূ কুঞ্চিত

করিল। পিতার মুখ স্মৃতি-পথে উদিত হইল. সে দৃঢ় ভাবে আপন মনেই ঘাড় নাড়িল,—না, না, ক্ষমা সে করিবে না। সুরেশের পিতার প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা সে ভুলিতে পারিবে না, সুরেশের শত সোহাগেও না! বাহিরে ভক্তি দেখাইতে গেলে তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারিবে না। না, মিথ্যা অপবাদ না কিনিয়া এখনই সুরেশকে সাবধান করিয়া নির্ম্মম হস্তে এ রঙীন ফানুশ ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে।

কিন্তু চিঠিখানা সে কি জানি কেন, ছিঁড়িতে পারিল না,—অত্যন্ত যত্নে কাপড়ের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিল, যেমন করিয়া লোকে সযত্নে মহামূল্য বস্তু গোপনে তুলিয়া রাখে।

রাত্রে সে সুরেশকে পত্র লিখিল—

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পত্রের আশীর্ব্বাদটুকু ছাড়া আর সমস্তই আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম। মায়ের ঠিকানা দিবার কোন আবশ্যক বোধ করিলাম না; কারণ, আমার মন ক্ষুদ্র, পূর্ব্ব-কথা আমি ভুলিতে পারিব না। আপনি আসিবেন না। কারণ, শীত কমিয়াছে, পাড়া আর তত নিশুতি থাকে না, হয়ত কাহারও চোখে পড়িতে পারেন। অযথা কথার সৃষ্টি না হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। ধীরা।

পত্রখানি ডাকে দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু স্বস্তি পাইল না। দিবানিশি মনের মধ্যে কি যেন একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, সে কি তাহার নিষেধ গ্রাহ্য করিবে? কেন করিবে? রাজপথে বেড়াইবার অধিকার তাহার নিশ্চয় আছে। সে ধীরার আজ্ঞাবহ নয়।

কিন্তু সত্যই সুরেশ আর আসিল না। মায়ের পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন, সুরেশের হাতে তোমায় দেবার ইচ্ছা তাঁর শেষ জীবনে অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল জান ত, এ সুযোগ হারাইও না। তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে। তাকে বলো, সেজঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করে যেন আমায় চিন্তামুক্ত করে। আমি তোমার পত্রের আশায় রইলুম।

ধীরা মায়ের চিঠি খামে পূরিতে পূরিতে গভীর নিশ্বাস ফেলিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, আর সে আসবে না মা, সে পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

বৈশাখ মাসের গোড়ার দিকে এক দিন সুরেশের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। ভাই-বোনদের লইয়া সে কাকিমার বান্ধবী-গৃহে যাইতেছিল। ছোট ছেলেমেয়ে পথে বাহির হইলেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে, পথ জনমানবশূন্য দেখিয়া ধীরা বিশেষ নিষেধ করে নাই, অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে দেখিয়া উচ্চস্বরে ডাকিল,—ওরে দাঁড়া, অত ছুটিসনি! পিছন হইতে কে বলিল,—ডেকো না ধীরা, একটু এগিয়েই যাক্‌ ওরা।

সচমকে ঘাড় ফিরাইতেই পাশে সুরেশকে দেখিয়া ধীরা কুণ্ঠিত হাস্যে বলিল, আপনি?

সুরেশ বলিল, হাঁ। কাল সিমলা যাচ্ছি। অবুঝ মন, বোঝে না ধীরা, আজ আট দিন—সময় নেই অসময় নেই তোমার বাড়ীর আসে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, একটি বার দেখতে পাবার আশায়। আজও হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলুম! ভাবলুম, দেখা আর হলো না! কিন্তু ঈশ্বর দয়া করলেন।

ধীরার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, কি উত্তর দিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া সে মৌন হইয়া রহিল।

সুরেশ বলিল,—ছ' মাসের মত যাচ্ছি। ফিরে এসে যদি ঐ বাড়ীতেই থাকো হয়ত আবার দেখতে পাবো, না হলে এই শেষ দেখা,—কি বলো?

ধীরা মৃদু স্বরে বলিল,—হাঁ।

সুরেশ বলিল,—কিন্তু কেন শেষ দেখা হবে ধীরা? তুমি এ বিষয়ে ভেবে দেখেছ? তোমার মন বদলালো না? জ্যাঠামশায় তোমাকে আমায় দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন, আজ যদি তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাতে তিনি খুশী ভিন্ন বিরক্ত হবেন না, নিশ্চয়ই।

ধীরা নিরুত্তরে পথ চলিতে লাগিল। মনে বিদ্বেষ সত্যই মন্দা হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি আজ স্বমুখে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা জাগিল, এবং মর্য্যাদার দোহাই দিয়া মনকে মিথ্যা আঁখি ঠারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশ তাহার মুখের পানে চাহিয়া ছিল,—গভীর শ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আশীর্ব্বাদটাকে যখন সত্য বলে নিয়েছ, তখন তাই তবে করে যাই, সুখী হয়ো, সকলকে সুখী করো। কি আর বলবো, আর যদি মনে পড়ে, এ অভাগাকে এক-এক বার স্মরণ করো।

৫

ইহার পর দীর্ঘ দু' বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ধীরার মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ধীরা কাকার কাছে ছিল, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া ধীরা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, শেষ-সময়ে একমাত্র সন্তানকে দেখিতে না পাইয়া তিনি কত মনঃকষ্টেই না প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—তাহা মনে করিয়া তাহার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। এক এক বার মনে পড়িত সুরেশকে, যদি তখন আত্মবুদ্ধির উপর নির্ভর না রাখিয়া সে তাহাকে মায়ের ঠিকানা দিত! তাহা হইলে আজ হয়ত মা মৃত্যুকালে দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় লইয়া চক্ষু মুদিতেন না! আর সে নিজেও এমন স্নেহলেশহীন সান্ত্বনা-বিহীন জীবন যাপন করিত না! এই দুই বৎসরের মধ্যে সুরেশের আর কোন সন্ধান সে পায় নাই! মাত্র এক দিন দেখিতে পাইয়াছিল একটি কীর্ত্তনের আসরে। সুরেশ তাহাকে দেখিতে পায় নাই। কারণ, সে কাকিমার সহিত চিকের আড়ালে বসিয়াছিল। কীর্ত্তনীয়া যখন বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছিল,—

কোমল কিশোর শ্যামচাঁদ মোর,
নবনী-গঠিত দেহ!
এ বাহু-বন্ধনে লো পরাণ সখি,
আর না বাঁধিব তেঁহ?
মোর ললাটের লিখা,
আঁখি-লোরে হায়, বসন তিতিল
হৃদয়ে আগুন-শিখা!

তখন কি জানি কেন অনাহূত অশ্রুজলে ধীরার কপোল ভাসিয়া গিয়াছিল। দেখিয়া কাকিমা পাশের বান্ধবীকে বলিলেন,—মেয়ের আদিখ্যেতা দেখেছ! আমরা কীর্ত্তন শুনে কাঁদলুম না, উনি কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন!

বান্ধবী হাসিয়া বলিলেন,—কি করে জানলে বাপু যে ভগবানের নামেই কাঁদলে! বাঘিকার মত মনের ভাব হতে পারে তো!

কাকিমা সগর্ব্বে বলিলেন,—থাম্, আমার চোখ এড়িয়ে একটা পিঁপড়ে যাবার যো নেই, ও সব আমার কাছে চলবে না, তা হলে কবে গলা টিপে দূর করে দিতুম। মেয়েটা এদিকে খাঁটি।

ধীরা চোখের জল মুছিয়া চিকের বাহিরে সুরেশের প্রশান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। ছাই-রংয়ের গরম পাঞ্জাবীর উপর সাদা হাঁসিয়াদার শালখানি জড়ানো, শুধু ডান হাত ও মুখখানি দেখা যাইতেছিল। তথাপি ধীরার মনে হইল, উহার সর্ব্ব-অবয়ব যেন তাহার চোখের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে।

সে বার কাকিমার বড় মেয়ে অচলা সন্তান-সম্ভাবিতা হইতে অসুস্থতার জন্য মাকে যখন সেখানে গিয়া কিছু দিন তাহার কাছে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন কাকিমা বলিলেন,—ঘর-সংসার ফেলে আমি কি করে যাবো? ধীরা যাক।

কাকা বলিলেন,—সেটা কি ভালো দেখাবে? আইবুড় মেয়ে—ওকে পাঠানো কি উচিত হবে?

কাকিমা বলিলেন,—আইবুড়ো ছাড়া এখুনি ওঁর কোন্ রাজপুত্তুর জুটছে? পাঁচ জনের করবে না ত করবে কি? আমি কি করে যাবো? আর ছেলেপুলে, সেয়ানা মেয়ে, সব ফেলে কি জামাইবাড়ী পড়ে থাকতে যাবো?

কাকা বলিলেন,—ঘী আর আগুন, বুঝে দেখো। মেয়েটা শেষে অশান্তির কারণ না হয়!

তাচ্ছিল্যভরা সুরে কাকিমা বলিলেন, হুঁ—সে ভয় করো না। অচলা আমার পেটের মেয়ে, একটু উনিশ-বিশ দেখলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবে। সে ভয় তুমি করো না।

কাকা আর কথা বলিলেন না, ধীরা কিন্তু শুনিয়া প্রমাদ গণিল। তাহার উপর ভগিনীপতিটির যে বিশেষ আকর্ষণ আছে, ধীরা তাহা জানিত। সেই ভগিনীপতির ঘরে অসুস্থ অচলাকে বৃথা আড়াল রাখিয়া সে যে নিরাপদ থাকিতে পারিবে না, তাহা সে ভাল করিয়াই বুঝিতেছিল,—তাছাড়া এখন যাওয়ার অর্থ, দীর্ঘ দিন সেখানে তাহাকে থাকিতে হইবে, অচলা সূতিকাগারে যাইবে,—তখন তাহাকে একেবারে একা থাকিতে হইবে, ভগিনীপতির সান্নিধ্য এড়াইবার উপায়টুকু পর্য্যন্ত থাকিবে না!

কাকিমাকে সে নিজের অনিচ্ছা জানাইল। কাকিমা জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—কেন বলো ত? তুমি কি সন্দেশ না রসগোল্লা যে মোহিত তোমায় গালে ফেলে জল খাবে? বারো মাস ভাত-কাপড় দিয়ে পুষছি, আমার একটা উপকারের বেলা তুমি মুখ বাঁকালে চলবে না'ত। তোমায় যেতেই হবে। ওঁর শরীর খারাপ—আমি যাই কি করে? বুড়ো ধাড়ি মেয়ে—বয়সের গাছ-পাথর নেই। না হয় বরই জুটলো 'না, তা বলে আক্কেল-বিবেচনা থাকবে না?

ইহার পর নিরুপায়! কাকাকে বলিলেও কোন ফল হইবে না, বরং হিতে বিপরীত হইবে, ধীরা তাহা জানিত! তাই শুধু নিজের অসহায় অবস্থা ভাবিয়া চোখের জলে ভাসিয়া যাত্রার আয়োজনে সে ব্যাপৃত হইল।

মোহিত আসিয়া যখন শুনিল, শাশুড়ীর পরিবর্ত্তে ধীরা যাইতেছে, তখন তাহার মনে এমন আনন্দ ফুটিয়া উঠিল যে, তাহার আভাস পাইয়া ধীরা শিহরিয়া উঠিল। কাতর হইয়া মনে মনে সে বলিতে লাগিল, হে লজ্জারক্ষক ভগবান্, তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করেছিলে, আমার লজ্জাও রক্ষা করো। আমি অসহায়, আমি নিরুপায়!

পরদিন অঝোরে কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরা ট্রেণে উঠিল। মোহিত একেবারে আহ্লাদে আটখানা! সে বলিল,—দিদি, এত কাতর হচ্ছেন কেন বলুন ত? আমরা কি আপনার পর না কি? আর এখানে মায়ের কাছে কি অযত্নেই আপনি আছেন! সেখানে মনে করবেন আপনার সব! আপনার ঘর, আপনার সংসার! আমি আপনার গোলাম—আপনি যা করবেন তাই হবে।

কথাটা হয়ত নিষ্পাপ, কিন্তু ধীরার কানে বেসুরো লাগিল! সে মৌন হইয়া একান্ত ভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল।

মোহিত বলিল,—আমি যখন আপনাকে দেখি, তখন ঈশ্বরের বিচার দেখে অবাক্ হয়ে যাই। আপনার এমন রূপ এত গুণ, অথচ আপনি যেন কত অবহেলার পাত্রী! আপনার সিকির সিকি রূপ যাদের নাই,—আর গুণ ত আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না, তারাও সংসারে কেমন মর্য্যাদা আর সম্মান পেয়ে রয়েছে। অচলার কথাই ধরুন। আপনার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, অথচ—

বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে ধীরা বলিল,—আমার ছোট বোনের নিন্দে করলে আমি আনন্দ পাবো না মোহিত। ও আলোচনা রাখো!

মোহিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চুপ করিল।

খানিকটা গিয়া বলিল,—গাড়ীতে তেমন ভীড় নেই, এই একটা সুবিধে। দু'জনেই বেশ ঘুমুতে পাবো। এত বড় কামরা—ওদিকে ওরা তিন জন, আর এদিকে আমরা দু'টি প্রাণী, বেশ আরামে যাওয়া যাবে। এসে বিছানাটা পাতছি। বলিয়া সে শৌচাগারের দিকে গেল।

ও কোণে যে লোকটি বসিয়াছিল, সে এতক্ষণ এক দৃষ্টে ধীরার দিকে চাহিয়া ছিল, মোহিত ভিতরে প্রবেশ করিলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সে বলিল,—ধীরা না?

ধীরার মনে হইল, বুঝি, তাহার আর্ত্ত আহ্বান শুনিয়া পরিত্রাতা ভগবান্ সুরেশের রূপ ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে সে বলিল, হাঁ। আপনি!

সুরেশ বলিল—কোথায় যাচ্ছো?

রুদ্ধ স্বরে ধীরা বলিল,—যমের বাড়ী!

সুরেশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—তাই না কি? সঙ্গে ওটি?

ধীরা বলিল,—যমদূত।

সুরেশ বলিল,—চট্ করে বলো না, ব্যাপার কি? ও লোকটা কিছু এক ঘণ্টা ওখানে থাকবে না ধীরা!

ধীরা চোখ মুছিয়া বলিল, কাকার জামাই। কাকার মেয়ের অসুখ, তাই আমার সেখানে যেতে হচ্ছে। আমার ওপর এর বড্ড দরদ! আমার মাথা খাবার চেষ্টায় আছেন।

এক সেকেণ্ড ভাবিয়া সুরেশ বলিল, এক দিন ফিরিয়ে দিয়েছিলে, আজ নিতে রাজী আছ? অভিভাবকশূন্য মেয়ে কত অসহায় দেখছ ত? কি বলো?

দ্বিধা না করিয়া ধীরা বলিল,—তোমারই হাতে বাবা আমায় দিয়ে গেছেন, তুমি সে দাবী ছাড়লে কেন?

—বাঃ! উল্টো চাপ! বলিয়া তৃপ্তির হাসিতে মুখ ভরিয়া সুরেশ ধীরার পাশে বসিয়া বলিল,—ওদিকে পিঠ করে আমার দিকে তুমি ঘুরে বোস। যা বলতে হয়, আমি বলব। ওঁর নাম কি? সে ধীরার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

লজ্জারক্ত মুখে ধীরা বলিল,—ওঁর নাম মোহিত বাবু। ছি ছি, তুমি আমার হাত ছেড়ে দাও, মোহিত বাবু কি মনে করবেন।

সুরেশ বলিল, না, ছাড়বো না। ট্রেণে না হলে এর চেয়ে আরও কাছে এনে—মোহিত বাবুকে আমার দাবীর পরিমাণ জানিয়ে দিতুম —যাতে আগামী আট-দশ দিনের মধ্যে তোমার দিকে আর হাত বাড়াতে সে সাহস না করে! ভেবো না, ফাল্গুন মাসের ৯ই দিন আছে।

মোহিত বাহির হইয়া হতবুদ্ধির মত সুরেশের দিকে চাহিয়া আছে—দেখিয়া সুরেশ হাসিমুখে বলিল,—আসুন মোহিত বাবু, পরিচয় নেই বটে, তবে আমরা খুব ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব!

মোহিত কাছে আসিয়া সুরেশের হাতে ধীরার হাত দেখিয়া যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল! তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

সুরেশ বলিল,—দাও না গো, তোমাব ভগিনীপতির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে—ভদ্রলোক যে শিঁটিয়ে গেলেন! ওঁকে বলো, আমি তোমার কে!

তৃপ্তিতে ধীরার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। ব্রীড়ানম্র মুখে সে বলিল, আঃ, কি করো! মোহিত বোকা নয়! তুমি কে, ও তা বুঝেছে। পথের লোক আমার কাছে বসতে সাহস করবে না, মোহিত তা জানে।

মোহিত এতক্ষণে কথা বলিল। গলার জড়তা কাটাইয়া বলিল, —কিন্তু উনি যে পথের লোক ছাড়া অন্য কেউ,—তার কোন পরিচয় আমি জানি না। আপনার কাকাকে আমি কি জানাবো?

সুরেশ বলিল,—ঠিক কথা। তাকে লিখবেন, ৺পরমেশ রায়ের ছেলে সুরেশ রায়ের সঙ্গে ৯ই ফাল্গুন ধীরার বিবাহ হবে। আপনারা সবান্ধবে আসবেন। বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর বলিল,—জানেন মোহিত বাবু, ছ' বছর আগে এঁর বাব' এঁকে আমার হাতে দান করে গেছেন। কিন্তু ইনি এমন লুকিয়ে ছিলেন যে, ওঁর কোন পাত্তা পাইনি এত দিন। এ বার আর পালাতে পাচ্ছো না ধীরা—মনে থাকে যেন, আমি দাবীদার।

মৃদু কণ্ঠে ধীরা বলিল,—আমি কি তা অস্বীকার করেছি? বলো!

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

[ইভান ক্রাইলড (১৭৬৮-১৮৪৪) রুশ লেখক। ঈশপের মতো তিনি রুশ-ভাষায় ছোট-ছোট অসংখ্য কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ এবং ঈশপের গল্পের মতোই সেগুলিতে শাশ্বত-সত্যের অমর বাণী গাঁথা আছে। ক্রাইলডের অসংখ্য ছন্দ-কাহিনীর মধ্য হইতে একটির মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিতেছি]

ধনীর প্রাসাদে রাত্রে আসিল শূকর।
উঁকি দিয়া দেখে তার প্রত্যেকটি ঘর—
শয়ন-বৈঠকী-কক্ষ, হেঁশেল-ভাঁড়ার,
বারান্দা—কিছুই বাকী রাখিল না আর!
ভালো লাগিল না কিছু! খিড়কীর পারে
এসে দেখে, আঁস্তাকুড়! উচ্ছিষ্টের ভারে
ডাঁই হয়ে আছে! কাদা, ভ্যাট্‌ভেটে পাঁক—
মশা-মাছি কৃমি-কীট কি তাদের জাঁক!
মাতে শূকরের প্রাণ। পাঁকে দেয় ডুব।
গান গায় ঘোঁৎ-ঘোঁৎ—মনে খুশী খুব!
সারা গায়ে পাঁক মেখে মহানন্দ জিনি
শূকর ফিরিল গৃহে। কহে শূকরিণী—
"ধনি-গৃহে সত্য খুব বিলাস-বিভব?"
হাসিয়া শূকর কয়,—"মিছে কথা সব।
দেওয়ালেতে নক্সা আঁকা; পাথরের মেঝে,
সোফা-কৌচ; তৈজস বাখা ঘষে-মেজে;
বিজলী-বাতির ঝাড়; দুগ্ধফেন শয্যা;
আসবাব, ছবি,—আরো রকমারি সজ্জা!
হেঁশেলে পোলাও-কারি, চপ-কাটলেট;
বাথরুমে গন্ধ-তেল, টয়লেট-শেট!
লোক-মুখে এ-সবের কি-সুখ্যাতি জাগে!
কিছু না, কিছু না, ফাঁকি! মনে নাহি লাগে!
হ্যাঁ, তবে ফিরিতে দেখি কিছু থাকে যদি—
বাড়ীর খিড়কীতে বটে, আহা, পঙ্ক-নদী!
মাখনের মতো পাঁক—এঁটো-কাঁটা-ভরা—
মশা-মাছি-কৃমি-কীটে কিলবিল-করা!
তাহে অবগাহি মোর সব দুঃখ দূর!
না হলে হতাশ-ভারে প্রাণ হতো চুর!

কবি কহে, এ শূকর—এর মতো লোক
সমাজে-সংসারে আছে—যার দুই চোখ
ভালো না দেখিতে পায় কোনো-কিছুতেই—
খুঁৎ খুঁজে, দোষ খুঁজে নাচে থেই-থেই।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

ছায়া ও কায়া

[রূপ-কথা]

গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে চলেছি, মাথার ওপর যে এখনও সূর্য্যদেব রয়েছেন সে খেয়াল নেই। হঠাৎ কয়েকটি লোকের সমবেত চীৎকারে চিন্তাজাল ছিন্ন হলো। কানে গেল, তারা বলছে—"ওরে দেখ দেখ, লোকটার ছায়া নেই।" আমি দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে যে দিকে চক্ষু যায় ছুটতে লাগলুম। কতক্ষণ ঐ ভাবে ছুটেছি, বলতে পারি না। যখন থামলুম, তখন বেলা পড়ে এসেছে, আর আমি পৌঁছে গেছি সহরের প্রান্ত অতিক্রম করে এক জঙ্গলের মধ্যে। বহু দিন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ ছিলুম। দিনান্তে এক-আধ বার যখন বেরোতুম—গাড়ীতেই। কাজেই হাঁটার অভ্যাস ছিল না। ছুটোছুটিতে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। পা দু'টো থর-থর করে কাঁপছিল, সেইখানেই ধপ করে মাটিতে বসে পড়লুম। উত্তেজনা ও শ্রান্তিতে মাথা ঘুরছিল। কখন্ যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম, বুঝতেও পারিনি। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন ভোর হয়ে গেছে। পাখীরা মনের আনন্দে গান করছে। উঠতে চেষ্টা করলুম, পারলুম না। সর্ব্বশরীরে বেদনা, প্রবল জ্বর। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে! ঠিক করলুম, লোকালয়ে আর ফিরে যাব না। অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে জলের সন্ধানে আরও গভীর বনের মধ্যে চলে গেলুম। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করবার পর একটি ছোট নদীর ধারে উপস্থিত হলুম। আঁজলা ক'রে জল খেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে সেইখানেই আবার শুয়ে পড়লুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লুম।

প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে ঘুম ভাঙ্গল। ক্ষুধার জালায় এবং জ্বরের প্রকোপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রইলুম। মনে হতে লাগল যেন মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। একটু চোখ লেগে এসেছে, এমন সময় বিকট একটা আওয়াজে চমকে উঠলুম! দেখি সামনে দাঁড়িয়ে বিরাট এক বাঘ। ভয়ে বুকের রক্ত পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। উঠতে চেষ্টা করলুম, পারলুম না। প্রকাণ্ড হাঁ করে বাঘটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বুঝলুম, মরণ নিশ্চিত! ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম! কিন্তু এ কি! বাঘটা হঠাৎ স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লেজ তুলে দে ছুট! কিছুই বুঝলুম না। পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলুম, সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যাঁর খোঁজে আমি হন্যে হয়ে ঘর ছেড়ে ছুটে এসেছি। তাঁকে দেখেই আমার সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। মনে হ'ল, এর চেয়ে বাঘের মুখে প্রাণ হারানো ভাল ছিল! তিনি কিন্তু একগাল হেসে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন—"আপনি অনর্থক এত কষ্ট পেলেন শম্ভু বাবু। এক দিন অপেক্ষা করলে আমি নিজেই আপনার প্রাসাদে গিয়ে হাজির হতুম। আমার আজ আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল।" আমি রাগত স্বরে বললুম—"আজ মানে? আপনার কথা-মত কাল এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে।" তিনি উত্তর দিলেন—"আপনার ভুল হয়েছে। এটা লীপ ইয়ার। অন্য বছরের চেয়ে এক দিন বেশী।" তাই তো, কি রকম ভুল। উত্তেজনার বশে এ কথা আমার মনেই পড়েনি। ভয়ানক অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। তিনি বলে চললেন—"অশান্তিতে এবং শ্রান্তিতে আপনার দেখছি জ্বর হয়ে গেছে। দেখি যদি আপনাকে সুস্থ করতে পারি।" এই বলে তিনি আমার কপালে হাত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ প্রবাহিত হলো—আর কি আশ্চর্য্য। শরীর একেবারে সুস্থ সবল হয়ে উঠল। কোথায় জ্বর, কোথায় ক্লান্তি। আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি হেসে বললেন—"এখন বেশ ভাল মনে হচ্ছে তো?" অস্বীকার করতে পারলুম না। তিনি তখন বললেন—"এইবার আপনার সঙ্গে একটা কাজের কথা হোক। আপনি ছায়ার বিরহে দেখছি ভয়ানক কাতর হয়ে পড়েছেন। আপনাকে ছায়া ফেরত দিতে রাজী আছি, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে—" তবে কি থলেটা ফিরিয়ে দিতে হবে? মনটা দমে গেল। তাড়াতাড়ি বুক-পকেটে হাত দিলুম—সেই পকেটে থলেটা ছিল। তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে এক-গাল হেসে বললেন—"না, না, থলেটা ফেরত দিতে হবে না। উপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই দিয়েছি। আমি বলছিলুম—যদি রাগ না করেন তো বলি—" এই পর্য্যন্ত বলে জিজ্ঞাসু-নেত্রে আমার দিকে চেয়ে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি ঠিক করেছিলুম, এই লোকটির সঙ্গে আর কোন কারবার করব না। থলেটা দিয়ে ছায়া ফেরত নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। কিন্তু কি জানি কেন থলেটা ফেরত দিতে মন চাইল না। অথচ ছায়ার আমার বিশেষ প্রয়োজন। তাই বললুম—"আপনার কি বক্তব্য বলুন। রাগ করব কেন?" তিনি যেন একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমি বললুম—"বলুন না। যদি অসম্ভব কিছু না হয় তবে তা দিয়ে তার পরিবর্ত্তে ছায়া ফেরত পেতে আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।" তিনি বললেন—"আমি বলছিলুম, আপনি ছায়াটা ফেরত নিয়ে তার পরিবর্ত্তে যদি কায়াটা দেন!"

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললুম—"কি বলছেন আপনি? কায়া দিলে আমার থাকবে কি? আমি তো মরে যাব।" তিনি বললেন—"কায়া দেবেন বটে, কিন্তু কায়ার আদরাটা আপনারই থাকবে। অর্থাৎ আপনার শরীর কাচের মত স্বচ্ছ হয়ে যাবে। উলঙ্গ অবস্থায় আপনাকে কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু কাপড়-জামায় আবৃত থাকলে আকার পরিষ্কার বোঝা যাবে এবং আপনার গায়ে হাত দিলে অনুভবও করা যাবে।" বুঝলুম, ছায়াদানের চেয়ে কায়াদান ব্যাপারটা আরও বেশী গোলমেলে। ও সবের মধ্যে আর না যাওয়াই ভাল। তাই বললুম—"না, আপনার কথায় আমি রাজী হতে পারলুম না। আমি কায়াও দেব না, ছায়াও চাই না। লোকালয়ের বাহিরে বনের মধ্যেই আমি পড়ে থাকবো।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন—"যথা অভিরুচি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে আপনাকে বলতে পারি না।" একটু থেমে আবার বললেন—"আচ্ছা, আপনার ললিতাকে একবার দেখবার ইচ্ছা হয় না।" ললিতার কথা এতক্ষণ প্রায় মনেই ছিল না, নামটা শুনতেই মনটা ভয়ানক উতলা হয়ে উঠল। দেখবার

প্রবল ইচ্ছা জাগল। নিজেকে দমন করতে পারলুম না। বললুম —"ইচ্ছে আছে, কিন্তু যেতে সাহস হয় না। ছায়া নেই—ভয়ানক অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।" তিনি বললেন—"সে জন্য ভাববেন না, সে ভার আমার। আমরা দু'জনে অদৃশ্য হয়ে সেখানে যাব, কেউ দেখতে পাবে না।" আমি উত্তর দিলুম—"কেউ যদি আমায় দেখতে না পায়, তবে সেখানে যেতে আমার আপত্তি নেই।" তিনি তখন পকেট থেকে একটি টুপী বার করে বললেন—"এটি হ'ল অদৃশ্যকারী টুপী। আমি মাথায় দিচ্ছি দেখুন।" এই বলে তিনি টুপীটা মাথায় পরলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কি আশ্চর্য্য—কোথায় যে মিলিয়ে গেলেন! আমি চারিধারে অবাক হয়ে দেখছি, এমন সময় পিছন দিক্ থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর কাণে এল—"কি, আমার কথা বিশ্বাস হ'লো?" তাড়াতাড়ি সেই দিকে ফিরলুম, কিন্তু কই—কাউকে দেখতে পেলুম না। তখন তিনি মাথা থেকে টুপী খুলে ফেললেন। দেখলুম তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমাকে হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি বললেন—"কেমন, দেখলেন তো? এবার আর মোড়লমশাইয়ের বাড়ী যেতে নিশ্চয় কোন আপত্তি নেই, কি বলেন?" আমি আগ্রহ সহকারে বললুম—"এখনই যেতে প্রস্তুত।"

অতঃপর আমরা দু'জনে দু'টো অদৃশ্যকারী টুপী মাথায় দিয়ে দণ্ডপদক্ষেপে সহরের দিকে চললুম এবং কিছুক্ষণ পরে শ্রীপদ বাবুর বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হলুম। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, শ্রীপদ বাবু ও আমার পলায়িত ভৃত্য অনন্ত কথা কইছে! অনন্ত বলছে—"আপনি কিছু ভাববেন না। শম্ভুনাথ বাবু ছায়ার শোকে বিবাগী হয়ে গেছেন আর কানাই তাঁকে খুঁজতে চলে গেছে। সুতরাং বাড়ী এবং টাকা সবই আমার। কানাই যদি ফিরে আসে তাকে মেরে ভাগিয়ে দেব আর ছায়াহীন অবস্থায় শম্ভু বাবু লোকালয়ে আসতে সাহস করবেন না।" শ্রীপদ বাবু উত্তর দিলেন—"তা বাবা, রূপে গুণে তুমি মন্দ নও, আমার পছন্দও হয়েছে তবে বাড়ীতে একবার পরামর্শ না করে কোন উত্তর দিতে পারছি না। তুমি যদি কাল আস তবে—" একগাল হেসে হাত জোড় করে অনন্ত বললে—"বিলক্ষণ! পরামর্শ করবেন বই কি। আমি না হয় কালই এই সময় আসব।" শ্রীপদ বাবু বললেন—"বেশ, বেশ, সেই ভাল।" অনন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। অনন্তকে আচ্ছা করে মার দেবার জন্য আমার হাত নিসপিস করছিল। সেই প্রৌঢ় সঙ্গী আমার হাত দৃঢ় ভাবে ধরে কানে-কানে বললেন—"কোন কথা কইবেন না, কিংবা মারধরের চেষ্টা করবেন না। ধরা পড়ে যাবেন। এখন আমার সঙ্গে চলে আসুন। পরে এই সবের ব্যবস্থা হবে।" মনের রাগ মনে চেপে সঙ্গীর হাত ধরে সেই স্থান পরিত্যাগ করলুম। সহরের বাহিরে পৌছে দু'জনেই টুপী খুলে ফেললুম। প্রৌঢ়টি বললেন—"নিজের চোখেই সব দেখলেন তো। এখন আপনার কি ইচ্ছা! এর একটা প্রতিকার করা কি উচিত মনে করেন না! অনন্ত যে কত বড় পাজী বুঝতে পারছেন তো! ওকে শাস্তি দেবেন না? ঐ রকম একটা বদমায়েস লোকের হাতে পড়ে ললিতার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, আপনি তাতে বাধা দেবেন না?" অনন্তর ওপর আমি আগে থেকেই রেগে ছিলুম, তাঁর কথা শুনে যেন ক্রোধাগ্নিতে পূর্ণাহুতি পড়ল। বললুম—"নিশ্চয়ই, সে ব্যাটাকে আচ্ছা করে জব্দ না করতে পারলে আমি মনে কিছুতেই শান্তি পাব না। আমায় কি করতে হবে বলুন।" তিনি বললেন—"বেশী কিছু করতে হবে না। একবার অনুমতি দিলেই কায়াটা নিয়ে আপনাকে ছায়াটা ফেরত দিতে পারি; অধিকন্তু, এই অদৃশ্যকারী টুপীটাও আপনাকে উপহার দিতে রাজী আছি।" অন্য সময় হলে হয়তো প্রৌঢ়ের প্রস্তাবে রাজী হতুম না, কিন্তু তখন অনন্তকে তার কৃতকর্ম্মের প্রতিফল দেবার আগ্রহ, ললিতাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা এবং অদৃশ্যকারী টুপীটা পাবার লোভ আমাকে পাগল করে তুলেছিল। নইলে এমন প্রস্তাবেও মানুষ রাজী হয়! বললুম—"আপনার প্রস্তাবে আমি রাজী আছি, কিন্তু একটা কথা রয়েছে—" স্মিতহাস্যে তিনি বললেন—"কি কথা বলুন।" আমি বললুম—"সমস্ত দেহটা যদি স্বচ্ছ হয়ে যায়, তবে লোক-সমাজে বার হব কি করে? কাপড়-জামার মধ্যে থেকে হাত, পা ও মাথা তো বেরিয়ে থাকবেই। লোকে দেখবে কবন্ধকাটা হস্ত-পদবিহীন একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে।" তিনি বললেন—"তাই তো এ কথা তো আমার মাথায় আসেনি। বেশ, এক কাজ করছি। আপনার ঘাড় পর্য্যন্ত মাথা ও মুখ, কনুই পর্য্যন্ত হাত ও হাঁটু পর্য্যন্ত পা অবিকৃত অবস্থায় থাক। বাকী শরীর কাচের মত স্বচ্ছ হলে তো আপনার কোন আপত্তি নেই? কাপড়-জামা পরে থাকলে কেউ জানতেও পারবে না।" আমি বললুম—"তবে আর আপনার প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নেই।" একগাল হেসে তিনি বললেন—"এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা।" এই বলে পকেট থেকে বহু-আকাঙ্ক্ষিত হারানো ছায়াটি বার করে তিনি আমার পায়ের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। আমি রৌদ্রে এদিক্ ওদিক্ ঘুরে ফিরে ছায়াটি পরখ ক'রে এমন খুশী হলুম যেন বহু দিন পরে অতি প্রিয়বন্ধু অথবা আত্মীয়ের সন্ধান পেয়েছি। তিনি তখন আমার হাতে টুপীটা দিয়ে বললেন—"এই নিন অদৃশ্যকারী টুপী। এইবার আপনার কায়াটা আমি নিচ্ছি।" সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, কথা-মত স্থানগুলি বাদে বাকী সমস্ত দেহটা স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। গায়ে হাত দিয়ে তবে বুঝতে হ'ল গা আছে কি-না। অতঃপর তিনি কি ভাবে অনন্তকে জব্দ করতে হ'বে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন—"শীঘ্রই আবার দেখা হবে—কবে এবং কোথায় তা এখন বলতে পারছি না।" তার পর তিনি হন্-হন্ করে বনের দিকে চলে গেলেন। আমিও ধীরে ধীরে সহরের দিকে পা বাড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে নিজের প্রাসাদে গিয়ে পৌছুলাম। ছায়া সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে, সুতরাং পথে কোন বিপদই হ'ল না। প্রাসাদে প্রবেশ করেই মাথায় টুপীটা পরে ফেললুম। তার পর নিজের ঘরে ঢুকলুম। ঢুকে দেখি, আমার বিছানায় দিব্য আরাম করে শুয়ে আমারই ভৃত্য অনন্ত তামাক খাচ্ছে। মেজাজটা একেবারে গরম হয়ে গেল। সোজা গিয়ে তাকে এক চড় বসিয়ে দিলুম। সে গালে হাত বুলাতে বুলাতে হতভম্বের মত ঘরের চারি দিকে চাইতে লাগল, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলে না; কারণ, আমার মাথায় অদৃশ্যকারী টুপী। মনের ঝাল মেটাবার জন্য মাথায় গায়ে পিঠে ঘাড়ে যেখানে পারলুম দুমদাম করে কিল চড় মারতে লাগলুম। সে ভীত বিস্মিত ভাবে এদিক্ ওদিক্ ছুটোছুটি করতে লাগল! তার রকম-সকম দেখে আমি আর হাসি চাপতে পারলুম না, হো-হো করে হেসে উঠলুম। আমার গলার স্বর চিনিতে পেরে সে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়িয়ে

অনন্ত অতি বিনয়-সহকারে শ্রীপদ বাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে —"আজ্ঞে, কি বলছেন আপনি ! সে সব কথা ছেড়ে দিন।" পিঁড়েয় সে বসতে যাবে, আমি তখন আর থাকতে পারলুম না—হাতের কাছে ছিল মাটির খালি ভাঁড় সেইটে তুলে ছুঁড়ে মারলুম তার মাথায়। চারি দিকে হুলস্থূল প'ড়ে গেল। ব্যাপার কি! বরকে মারলে কে! অনেকে বললেন—"মেয়েকে নিশ্চয় কোন অপদেবতা ভর করেছে তাই এমন গণ্ডগোলের সৃষ্টি।" কেউ বললেন— "এ বিবাহ বন্ধ থাক্।" কিন্তু তা কি করে সম্ভব! ললিতার জীবনটা নষ্ট হয়ে যায় দেখে বিকৃত কণ্ঠে আমি বললুম— "পাত্রীকে ভর করিনি মশায়, ভর করেছি অনন্তকে। আমি শম্ভু বাবুর প্রেতাত্মা। অনন্তর সঙ্গে বিবাহ দিলে আমি সকলের সর্ব্বনাশ করবো।" অতঃপর পাড়ারই আর এক জন যুবকের সঙ্গে ললিতার শুভ বিবাহ হ'ল। আমি আর সে দৃশ্য দেখতে না পেরে ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করলুম।

সহরের বাহিরে জনহীন অরণ্যে এক নদীর ধারে উদাস ভাবে গিয়ে বসলুম। জীবনে ধিক্কার ধরেছে! অর্থের জন্য ছায়া বিক্রয় করলুম, ছায়ার পরিবর্ত্তে কায়া বিক্রয় করলুম, কিন্তু সুখ কই! অর্থ প্রচুর হ'ল, কিন্তু সুখ-শান্তি তো পেলুম না। মাঝখান থেকে মানুষের মধ্যে অমানুষ বনে রইলুম! নদীর জলে এ জীবন বিসর্জ্জন দেবো! এই ঠিক করে নদীতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন কাঁধের উপর হাত রাখলে! চমকে ফিরে চেয়ে দেখি, সেই আলখাল্লা-পরা প্রৌঢ়। তাকে দেখে আমি ভয়ঙ্কর চটে উঠলুম। তার গলা চেপে ধরে বললুম—"তোমার জন্য আজ আমার এই অবস্থা। সুখ-শান্তি আমার সব গেছে।" অবলীলাক্রমে আমার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে যেন কিছু হয়নি, এমনি ভাবে হেসে বললেন—"আমার জন্য বলবেন না, নিজের লোভের দোষে বলুন।" আমি রাগত স্বরে উত্তর দিলুম—"কিন্তু এ লোভ আপনিই দেখিয়েছেন!"

সেই ভাবেই হেসে তিনি বললেন—"লোভ দেখানোই আমার পেশা। কিন্তু সে কথা যাক্। আপনি অনর্থক আমার উপর রাগ করছেন। আপনার কায়া এই মুহূর্ত্তে আমি ফেরত দিতে রাজী আছি এবং সেই সঙ্গে এই অঙ্গুরীটি উপহার দেব। আগে যে সব জিনিষ দিয়েছি তাও ফেরত চাইব না। এই অঙ্গুরীর অপূর্ব্ব শক্তি। এ অঙ্গুরী হাতে প'রে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। নিন্, পরখ করে দেখুন।" আমার তখন ভয়ানক ক্ষিধে পেয়েছে। আংটীটা হাতে পরেই বললুম—"খাবার চাই।" অমনই নির্জ্জন অরণ্যে রূপার থালায় থরে থরে সাজান রাজভোগ এসে উপস্থিত। পেট ভরে খেয়ে নিলুম। মনটা অনেকখানি হাল্কা হলো। আংটীটা হস্তগত করবার লোভ হলো প্রবল। প্রশ্ন করলুম—"বিনিময়ে কি দিতে হবে?"

তিনি স্মিত হাস্যে বললেন—"বল্‌তে গেলে কিছুই নয়। আপনি এই আংটী এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার কায়াও ফেরত পাবেন, যদি অঙ্গীকার করেন—" এই বলে তিনি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কি এমন অঙ্গীকার, যার পরিবর্ত্তে কায়া এবং এই অমূল্য রত্নলাভ করবো—জানবার জন্য দারুণ কৌতূহল হলো। বললুম,—কি অঙ্গীকার বললেন—"এমন কিছু নয়। আপনি মারা গেলে আপনার আত্মার উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে এই অঙ্গীকার করুন।" অদ্ভুত প্রার্থনা। মনে একটু ভয়ও হলো। আবার কোন নতুন বিপদ উপস্থিত হবে না তো? জিজ্ঞেস করলুম—"আমার মামাও কি এইরূপ অঙ্গীকার করেছিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়ই এক কথাতেই তিনি আত্মা বিক্রয় করেছিলেন বলে আমি তাঁর ক্রীতদাস হয়ে ছিলুম। কাল রাত্রে তিনি মারা গেছেন। এই দেখুন তাঁর আত্মা! এই কথা বলে পকেট থেকে মামার মৃত আত্মা তিনি বার করে দেখালেন। কালো চিম্‌সে-পড়া বুড়ো আঙুলের মাপের বীভৎস এক বামন-মূর্ত্তি। দেখে আমার হৃৎকম্প হলো। ভয়ে গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ থেকে বার হ'ল—"এই পরিণাম!" অট্টহাস্য হেসে তিনি উত্তর দিলেন— "পার্থিব সুখের প্রলোভনে বিবেক আর আত্মাকে যে বিক্রয় করে তার এই পরিণাম।" আমার হাত-পা যেন হিম হ'য়ে গেল। বুকের রক্ত জমাট বাঁধলো। ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম—"আপনি কে?" তিনি হেসে উত্তর দিলেন—"আমি শয়তান। সকল পার্থিব সুখ আপনার আয়ত্ত হবে, যদি আমার কাছে আত্মবিক্রয় করেন!" আমি প্রাণপণ শক্তিতে হৃতবল সঞ্চয় করে চীৎকার ক'রে উঠলুম— "চাই না আমি অর্থ, চাই না সুখ। ছায়া-কায়া কিছু আমি চাই না। আত্মবিক্রয় আমি করব না।" তার পর দ্রুতপদে সেখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু হাত ধ'রে উৎকট হাস্য সহকারে সে বলে উঠল—"এখন এতখানি এগিয়েছেন, তখন ছাড়ছি না।" দু' জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলতে লাগল। আমি কোন মতে হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিলুম।···

শ্রীযামিনীমোহন কর (অধ্যাপক)।

গজরাজ

হাতীর শক্তি এবং বুদ্ধি প্রভৃতির সম্বন্ধে আমরা যে সব গল্প-গাথা পড়িয়াছি, সে সব না কি ভুল! মার্কিন পশুতত্ত্ববিদ্ এডি এলেন আজ প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া পশু-চরিত্রের অনুশীলন করিতেছেন,— জন্তু-জানোয়ারকে শিক্ষা দিয়া বশ করিতে তাঁর জোড়া না কি নরলোকে আর কেহ নাই। তিনি বলেন, ছেলেবেলায় পাঠ্যগ্রন্থে হাতীর সম্বন্ধে নানা বৃত্তান্ত আমরা পড়িয়াছি; যথা, হাতীর স্মরণ-শক্তি না কি বিরাট্ রকমের অদ্ভুত—কেহ অনিষ্ট বা অপমান করিলে হাতী সে কথা জন্মে কখনো ভোলে না; এবং সুদীর্ঘ বৎসর পরেও সে-অপমানের শোধ লইয়া ছাড়ে! তাছাড়া হাতী না কি ভীষণ ধূর্ত্ত—কেহ তার অমর্য্যাদা করিলে তখনকার মত সে-অপমান সে সহিয়া থাকে; এবং ভীষণ রকমের প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ সন্ধান করে! এ সব কথা—এডি এলেন বলেন, আগাগোড়া ভুয়া,— ভিত্তিহীন।

বিশ বৎসর যাবৎ গজ-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি যে-তথ্য নির্ভুল বলিয়া জানিয়াছেন, তাহার বিবরণ গল্প-কথার মত সরস এবং মনোজ্ঞ। পারো তো, এগজামিনার যদি হাতীর সম্বন্ধে এগজামিনে প্রবন্ধ রচনা করিতে দেন তো উত্তর-পত্রে তোমরা এডি এলেনের বর্ণিত বৃত্তান্ত লিখিয়া দিতে পারিবে।

এডি এলেন বলেন, অনেকের বিশ্বাস, হাতী না কি তামাক 'খাইতে' ভালোবাসে; তামাকের নেশায় হাতী একেবারে গোলামের মত

...ীভূত হয়! এ কথা ঠিক নয়। তামাক পাইলে হাতী তার অনাদর করে না, তবে বখাটে ছেলের মত তামাকের উপর তার ঝোঁক নাই! খেয়ালবশে একবার তিনি তাঁর পোষা হাতী 'বেবে'র মুখে জ্বলন্ত চুরুট গুঁজিয়া দিয়াছিলেন,—চুরুটের আগুনে এবং ধোঁয়ায় ...ব খুব বেশী রকম আতঙ্ক এবং বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। ...র পর চুরুট অভ্যাস করাইলেও 'বেব' ঐ খেলাচ্ছলে মাত্র মুখে জ্বলন্ত চুরুট রাখিত, খেলার পালা শেষ হইবামাত্র সে-চুরুট "তুড়োর" ...লিয়া ফেলিয়া দিত!

তার পর হাতীর স্মৃতি-শক্তি। এডি এলেন বলেন, এ-শক্তিও হাতীর আর পাঁচ-জাতের জন্তু-জানোয়ারের মত। অর্থাৎ নিত্যকার রুটিন-বাঁধা কাজ হাতী করিতে পারে—অন্য জন্তু-জানোয়ারের মত। তার বেশী নয়! আর ঐ মনে রাগ পুষিয়া রাখিয়া সুযোগ খুঁজিয়া ...াল ঝাড়া—এডি এলেন বলেন, বাজে কথা। এডি এলেন বলেন,

চশমা-চোখে গুরুগম্ভীর!

বাঁধা রুটিনে হাতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে—সে দিক্ দিয়া তার শিক্ষা সার্থক হয়। তবে কাহারো কোনো কাজে মেজাজ যদি বিগড়ায় তো সে মেজাজ হাতী চাপিয়া রাখিতে পারে না; তৎক্ষণাৎ তপ্ত মেজাজের জ্বালা বর্ষণ করিয়া ছাড়ে! তাঁর একটি হাতী ছিল—তার নাম উইলি। খেলার প্রাঙ্গণে উইলিকে তার মাহুত বুঝি খোঁচা দিয়া চাবুক মারিয়াছিল। দলে ছিল আরো পাঁচটা হাতী—দলের সামনে এত বড় অপমান! উইলি ছাড়িল না! মাহুত যেমন দু'-পা নড়িয়াছে, অমনি উইলি করিল কি, না, মাহুতের দিকে আগাইয়া আসিয়া শুঁড়ে তাকে আচ্ছা করিয়া পাক দিয়া জড়াইয়া ঊর্দ্ধে তুলিল এবং ধাঁইসে দিল আছাড়! মাহুতের দেহ নিমেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। এই উইলি-দস্যু সাত-সাত জন মাহুতকে আক্রোশ-ভরে মারিয়া মেজাজের জ্বালা শান্ত করিয়াছিল!

আর একটি গল্প চলিত আছে যে, ইঁদুরকে না কি হাতী যমের মত ভয় করে! তার কারণ, ইঁদুর হাতীর শুঁড়ের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করে এবং ইঁদুরের এ অনধিকার-প্রবেশে হাতীর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ঘটে! এডি এলেন বলেন, এ ব্যাপার ঘটা সম্ভব নয়। তার কারণ, হাতীর শুঁড়টি বিধাতা এমন ভাবে তৈয়ারী করিয়াছেন—শুঁড়ে প্রায় চল্লিশ হাজার শিরা-উপশিরা আছে; এবং এতগুলি শিরা-উপশিরা থাকিবার জন্য শুঁড়ের ডগায় মশা-মাছি বসিবামাত্র হাতী তাহা তখনি বুঝিতে পারে এবং শুঁড় নাড়িয়া তাদের তাড়াইয়া দেয়! তাছাড়া ঐ চল্লিশ হাজার শিরা-উপশিরা থাকার দরুণ শুঁড়টি আক্রান্ত হইবামাত্র হাতী চকিতে শুঁড়ের মুখ-বিবর বন্ধ করিয়া দিতে পারে। বন্ধ করিলে শুঁড়ের মুখে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না—মশা-মাছি তো ছার!

অনেকে বলেন, হাতীর চামড়া খুব পুরু এবং গণ্ডারের চামড়ার মত দুর্ভেদ্য! এ কথাও ঠিক নয়। হাতীর চামড়া তেমন পুরু নয়; তবে কঠিন বলিয়া যে মনে হয়, তার কারণ চামড়ার নীচে অসংখ্য পেশী আছে! হাতীর চামড়ার অনুভূতি-শক্তি এত প্রখর যে একটা মাছি যদি গায়ে বসে, হাতী তখনি তাহাতে বিচলিত হয়। এবং এই কারণেই মশা-মাছির আক্রমণে অস্বস্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সর্ব্বক্ষণ ধূলা-কাদা ও জল ছিটাইয়া হাতী তার দেহের আচ্ছাদন ঐ চামড়াখানিকে অমন স্নেদযুক্ত করিয়া রাখে।
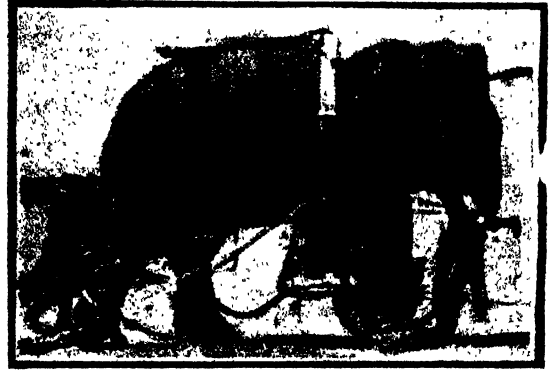
শিক্ষায় হাতী শিকলের এ বাঁধন খুলিতে পারে!

হাতীর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু শ্রুতিশক্তি অসাধারণ রকমের। চকিত-শব্দে হাতী ভয় পায়; কিন্তু অভ্যাসে শব্দ বা উচ্চ কলরব প্রভৃতি তার বেশ সহিয়া যায়।

ঝড়ের আগে হাতী বুঝিতে পারে ঝড়ের আসন্নতা। বাতাসে কি গন্ধ পায়! এবং শুঁড় তুলিয়া হাতী বাতাসে আর্দ্রতার আভাস অনুভব করে। ঝড়কে হাতী রীতিমত ভয় করে। ঝড় উঠিলে সে একেবারে ক্ষেপিয়া মত্ত মাতঙ্গ হইয়া ওঠে!

আর পাঁচটা জন্তু-জানোয়ারের ঘেঁষ হাতী সহিতে পারে না। এ জন্য তাদের সঙ্গে একত্র রাখিয়া হাতীকে পাঁচটা জন্তু-জানোয়ারের ঘেঁষ-সহানো অভ্যাস করাইতে হয়। পরিচয় হইয়া গেলে তাদের সঙ্গে হাতী তখন বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ মনে খেলাধূলা করে, রঙ্-তামাসা করে।

এডি এলেন বলেন—মমতায় হাতী যত শীঘ্র বশ হয়, এমন আর কোনো জানোয়ার নয়। বশ হইলে হাতী তোমার সব কথা মানিয়া চলিবে। তবে সাবধান, শাস্তি দিলে বা বিরক্ত করিলে হাতী মমতা ভুলিয়া সে অপমানের শোধ তুলিতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবে না—তা তোমার সঙ্গে তার যত ভাবই থাকুক! এ জন্য সব সময়ে হাতীর মেজাজ বুঝিয়া চলা চাই। নহিলে সেই ভূত পুষিলে ভূতের হাতে মৃত্যুর কথা যেমন চলিত আছে, তেমনি পোষা হাতীকে রাগাইলে তার হাতে মৃত্যুও—প্রায় বিধাতার লিখনের মত অমোঘ!

বিজ্ঞান-জগৎ

মুখ রক্ষা

আমেরিকায় দুহিতা-জায়ার দল আজ যুদ্ধোপকরণ তৈয়ারীর কাজে কায়-মন জীবন-যৌবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এ কাজে বহু বিপদের

মুখোশ-আঁটা রূপসী

আশঙ্কা—ধাতু-চূর্ণ ধূলি-কণা প্রভৃতি নাসারন্ধ্র দিয়া প্রতিক্ষণে ফুশ-ফুশে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মাদি দুষ্ট ব্যাধির সৃষ্টি করিবে,—তার উপর চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে; এবং নারীর যা সম্পদ, অর্থাৎ যৌবনশ্রী এবং রূপলাবণ্য—তাহাও রক্ষা করা চলিবে না। এ সব বিপদ হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ মিলিবে এই উদ্দেশ্যে মার্কিণ রণ-বিভাগ সম্প্রতি প্লাষ্টিকের বিচিত্র মুখোশ তৈয়ারী করিয়াছে। এ মুখোশের সঙ্গে একাধারে সংলগ্ন আছে চোখ ঢাকিবার গগ্‌ল্‌, নিরাপদ শ্বাস-গ্রহণের উপযোগী নাসাচ্ছাদন প্রভৃতি। মুখোশটির ছাঁদ কিন্তু এমন বেয়াড়া যে দেখিলে আতঙ্ক হয়! উপরের ছবিতে মুখোশ-আঁটা যে মুখ দেখিতেছেন, ও-মুখ ভূতের নয়—রূপসী তরুণী মার্কিন-কর্ম্মিণীর।

সার্শি-জানলা সাফ্

সার্শি-জানলার কোণে যে ধূলা জমিয়া থাকে, সে ধূলা সাফ করিবার একমাত্র উপায়—সাবান-জলে পেইণ্ট ব্রাশ ডুবাইয়া

কোণের ধূলা সাফ

তাহা দিয়া সার্শি-জানলার কোণগুলি ঘষিয়া লইবেন।

মশা-যুদ্ধ

ম্যালেরিয়া রোগে পৃথিবীতে বছরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছে এবং এই ম্যালেরিয়া রোগের উৎপত্তি ঐ এ্যানোফিলিশ জাতীয় মশা হইতে! এ মশক-বংশ ধ্বংস করিতে পারিলে তবেই ম্যালেরিয়া হইতে মুক্তি! বৈজ্ঞানিকের দল তাই নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে এ জাতের মশার সহিত যুদ্ধ করিতেছেন—এ্যানোফিলিশ জাতের মশা-বংশের উচ্ছেদ-কল্পে। এ যুদ্ধের বিবরণ জানা ভালো—যুদ্ধ-প্রণালী জানিলে আমরাও এ্যানোফিলিশ মশা মারিয়া জীবনকে খানিকটা সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারিব। প্রথমে

এ্যানোফিলিশ্ মশা — অপর-জাতের মশা

দেখুন—এ্যানোফিলিশ মশার গড়ন। দাঁড়াইলে এ-মশার দেহখানি থাকে এমনি বঙ্কিম ঠামে.—অর্থাৎ মাথা নীচের দিকে. এবং পুচ্ছ

ঊর্দ্ধ দিগ্‌-অভিমুখী! অন্ত জাতের মশার চাল অন্ত রকম—২নং ছবির মত! ভোরে এবং সন্ধ্যার দিকেই এ-মশাকে ভয় বেশী,—ঐ দুই সময়েই ইহাদের হিংসা জাগ্রত এবং শক্তি বেশী হয়। তাই বলিয়া অন্ত সময়ে নির্বিষ থাকে, এমন কথা মনে করিবেন না! মশা মারিবার জন্ম নালায় নর্দামায় জলায়-পুকুরে ঝোপে-ঝাপে পিচ্‌কারী-ধারায় দু'বেলা কেরোসিন তৈল বর্ষণ করিবেন—হোজ-পাইপে করিয়া কেরোসিন ছিটাইয়া জলা-জঙ্গল সর্ব্বদা সাফ করিবেন। তার উপর চাই কুইনিন সেবন! আমাদের দুর্ভাগ্য, কুইনিন এবং কেরোসিন—দু'টি জিনিষই আজ দুষ্প্রাপ্য। অতএব এখন উপায়?

কূল-রক্ষা

সমুদ্র-তীরবর্ত্তী প্রদেশে বিপক্ষ আসিয়া বোমা ফেলিয়া বোমার আগুনে গ্রাম নগর ছাই করিয়া দিতে পারে,—সে অগ্নিকাণ্ড-নিবারণ-কল্পে আমেরিকা কূলরক্ষক অনল-তরী (ফায়ার-বোট) তৈয়ারী করিয়াছে। এ বোটে চারটি করিয়া পাম্প আছে—সে পাম্পের এমন শক্তি যে, প্রত্যেকটি হইতে মিনিটে ৭০০ গ্যালন জল তীরে বর্ষণ করা চলে। সাগর-বক্ষে বোট রাখিয়া সে বোট হইতে এই পাম্প-যোগে প্রায় পাঁচ-সাত মাইল দূরবর্ত্তী তীর-প্রদেশে জল বর্ষণ করা যায়। কাজেই এ জলে বোমার আগুন চকিতে নিবানো সম্ভব হইয়াছে। এক-এক জন লোক এক একটি পাম্প অনায়াসে চালাইতে পারে।

ফায়ার-বোট্

আঁধারে দৃষ্টি

আলো হইতে অন্ধকার-ঘরে ঢুকিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়া যায়—মনে হয়, যেন অন্ধ হইয়া গিয়াছি! সিনেমা-ঘরের মধ্যে অন্ধকার—ছবি দেখানো সুরু হইয়াছে, সে সময় সিনেমা-ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র এমনি অন্ধতা-বিভ্রম ঘটে। এবং অন্ধকারে খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিবার পর তবে সে-অন্ধকারে আমাদের চোখের দৃষ্টি খোলে—আব্‌ছা-ভাবে ঘরের মধ্যে আমরা সব-কিছু তখন দেখিতে পাই! সিনেমা-ঘরে চোখ দু'টিতে আঁধার সহানোর জন্য প্রতীক্ষা করা চলে, কিন্তু এই বোমা-ফাটা যুদ্ধের বাজারে

লাল গগ্‌ল্‌

রাত্রির অন্ধকারে পাইলট কি করিয়া গতি-নির্দ্ধারণ করিবে—আঁধার ভেদ করিয়া কোন্‌ দিক হইতে শত্রু আসিতেছে, কি করিয়া বুঝিবে? রণতত্ত্ববিদ্‌রা বহু গবেষণা এবং পরীক্ষার পর এ বিষম সমস্যার নিরাকরণ করিয়াছেন। দু'টি উপায়ে অন্ধকারে দৃষ্টি-পরিচালনা কঠিন হইবে না। প্রথম উপায়, একটি চোখের উপর যদি আমরা কালো রঙের পটি বা প্যাচ আধঘণ্টা-কাল আঁটিয়া রাখি, তাহা হইলে আধ ঘণ্টা পরে ঐ পটি বা প্যাচ খুলিবামাত্র যে-চোখে পটি ছিল, সেই চোখে অন্ধকারের মধ্যেও সব আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইব। দ্বিতীয় উপায়, লাল রঙের কাচের গগ্‌ল্‌-চশমা চোখে আঁটিলে দু' চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে এতটুকু ক্ষীণ বা ব্যাহত হইবে না। তবে এই লাল রঙ যেন ফিকা বা খুব-ঘন না হয়, এবং এ গগ্‌ল্‌ যেন চোখে-নাকে বেশ টাইট-ফিট্‌ করে।

আঁধার-পথে রক্ষা-মণি

ব্ল্যাক-আউটের কল্যাণে সন্ধ্যার পর পথ চলায় প্রাণের ভয় আজ অনেক গুণ বাড়িয়াছে। চলন্ত বাস এবং মোটরের ধাক্কা বাঁচাইয়া ঘরে ফিরিতে পারিলে মনে হয়, "আজিকার মত ফাঁড়া কাটিয়াছে! কিন্তু এমন করিয়া ভয়ে ভয়ে পথ চলা যায় না! আমেরিকার এক জন শিল্পী রেমণ্ড টাষ্ক এ-বিপদে জীবন-রক্ষার সহায় হইবে বলিয়া স্প্রিং-দেওয়া এক রকম ক্লিপ্‌ তৈয়ারী করিয়াছেন; সে ক্লিপ জামায় আঁটিয়া

জীবন-দ্যুতি

সন্ধ্যায় বা রাত্রির অন্ধকারে পথে বাহির হইতে পারেন নিরাপদে—মোটর বা বাসের আলো পড়িবামাত্র ঐ ক্লিপে উজ্জ্বল লাল আলোর ছটা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিবে—এমনি বিচিত্র এ ক্লিপের নির্ম্মাণ-কৌশল!

উড়ন-কেল্লা

শত্রুর চাতুরী এবং লালসা-হিংসার উচ্ছেদ এবং আত্মরক্ষা—এ দুই ব্যাপারে সিদ্ধিলাভের জন্য আমেরিকা যে সর্ব্বাঙ্গীণ বমার বা ফাইটার

ফ্লাইইং ফোর্ট্রেশ

প্লেন নির্ম্মাণ করিয়াছে, তার অসীম শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই ফাইটার প্লেনের নাম ফ্লাইইং ফোর্ট্রেশ বা উড়ন কেল্লা। এ প্লেনের সরঞ্জামপত্রে এতটুকু ত্রুটি নাই। এ প্লেন রক্ষা করিতে অন্য পাহারা-প্লেনের যেমন প্রয়োজন নাই, তেমনি যে-কোনো অবস্থান হইতে এ প্লেন শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ। এ প্লেন হইতে এক-হাজার মাইল দূর-সীমানায় বোমা ফেলিলেও তার আঘাত হয় অব্যর্থ। ছোটখাট পাড়িতে এ-প্লেনে বহুসংখ্যক বোমা বহন করা চলে; সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব-অবস্থায় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার দিকেও এতটুকু অসুবিধা ঘটে না।

জলা-বন্ধে মুক্তি

নানা কারণে যুদ্ধ-প্লেন জলায় পড়িয়া সমাধি লাভ করিতেছিল,—সে দায়ে পরিত্রাণ-কল্পে মার্কিণ নেভি তৈয়ারী করিয়াছে 'সোয়াম্প-

জলের বুকে বন্ধু
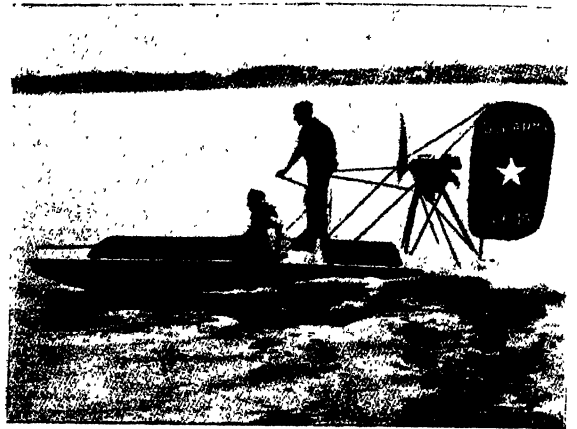
গ্লাইডার' নামে এক-জাতের বোট। ২০ ইঞ্চি পরিমিত গভীর জলেও এ-বোট অনায়াসে পাড়ি দিতে পারে। বৈদ্যুতিক মোটর-যোগে এ-বোট চলে। বোটের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৫ মাইল। জলার বুকে পড়িয়া প্লেন গতিহারা হইলে এ-বোট অনায়াসে গিয়া তাকে টানিয়া নিরাপদ স্থানে আনিতে পারে। কাজেই জলায় পড়িয়া যুদ্ধ-প্লেনের অপমৃত্যুর আশঙ্কা এখন কমিয়াছে।

ছিপির মার নাই!

পুরানো ছিপি ব্যবহারে মলিন জীর্ণ হইলে রুলার কিম্বা এক পীশ তক্তার চাপ দিবেন,—তার পর ছিপিটি জলে তিন-চার ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিবেন—ছিপি আবার নবজীবন লাভ করিবে। বিশ্রী ময়লা বা নোংরা

ছিপির উপর কাঠের চাপ

গরম জলে ছিপি

হইলে জলে তিন-চার বার করিয়া ছিপি সিদ্ধ করিয়া লইবেন। ছিপির সঙ্গে এক পীশ ভারী লোহা বাঁধিয়া জলে ফেলিবেন, নহিলে ছিপি ভাসিয়া উঠিবে। এ প্রক্রিয়ায় ছিপি দিব্য কান্তিতে নব কলেবর লাভ করিবে।

আকাশের রূপকথা

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস রূপকথার চেয়েও মনোজ্ঞ—যেমন বিস্ময়কর তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ! কোন ক্ষেত্রে অতি আকস্মিক ভাবে প্রকৃতি তার মনের কথা বলে ফেলে,—বৈজ্ঞানিকের সাধনাও অমনি

সাধারণ আকারের দূরবীণে-দেখা পূর্ণচন্দ্র

সার্থক হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে রহস্যময়ী চির-চঞ্চলা প্রকৃতি মানিনীর মত বসে থাকে, শত সাধ্য-সাধনাতেও গোপন কথা প্রকাশ করতে চায় না। অনিশ্চয়তার জন্যই আবিষ্কারের নেশা এমন চিত্ত-হরকারী। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এলফ্রেড নোবেল নাইট্রো-গ্লিসারিণ নামক অতি-উগ্র বিস্ফোরক আবিষ্কার করে বহু দিন পর্য্যন্ত তার ক্ষিপ্রতা-নিয়ন্ত্রণের তিনি চেষ্টা করেন; কারণ, বিনা-নিয়ন্ত্রণে এমন উগ্র বিস্ফোরক ব্যবহার করায় বিপদের সীমা নেই। কিন্তু শত চেষ্টাসত্ত্বেও কোন সুবিধা তিনি করে উঠতে পারেননি। হঠাৎ এক দিন সেই বিস্ফোরক ঘরের মেঝের উপরে পড়ে গেল, কিন্তু বিস্ফোরণ হলো না! অমনি নিয়ন্ত্রণকারী দ্রব্যের সন্ধান মিললো। মেঝের উপর "কিসেল ঘর" নামক এক প্রকার পদার্থ ছিল, তারই সাহায্যে তিনি নাইট্রো-গ্লিসারিণকে নিপুণ ভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হলেন। ফলে ডিনামাইটের সৃষ্টি হলো, যার হাতে বিশ্ব প্রায় ধ্বংস হতে বসেছে! ঘটনাটি আকস্মিক, কিন্তু এই ঘটনায় তাঁর বহু-বর্ষব্যাপী সাধনা সাফল্য-মণ্ডিত হলো।

বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেই মানুষ ক্ষান্ত হয় না—সেই সত্যকে উপযোগী কাজে লাগাবার চেষ্টা করে। আকাশে আজ বড় বড় গ্যাসে-ভরা বেলুন উড়ছে; কিন্তু এমন এক দিন ছিল যখন বিস্ফোরণ অথবা আগুন লাগবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। কি উপায়ে বাতাসের চেয়ে হাল্কা অথচ দাহ্য নয়, এমন গ্যাস আবিষ্কৃত হলো, সে কাহিনী সত্যই চমকপ্রদ।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লকইয়ার নামক এক জন বৈজ্ঞানিক পূর্ণ সূর্য্য-গ্রহণের সময় সূর্য্যের চারিধার দিয়ে যে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, স্পেকট্রোস্কোপের* সাহায্যে তার পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় তিনি হাইড্রোজেনের অনুরূপ লিখন পান। সেই লিখন দেখে তিনি বোঝেন যে, সে-গ্যাস পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের অজ্ঞাত। তার পর আটাশ বছর কেটে গেল। সকলেই মনে করতে লাগলো, এ গ্যাস আমাদের পৃথিবীতে জন্মাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। এমন সময় সার উইলিয়ম র‍্যামজে য়ুরানাইট নামক পদার্থ থেকে একটি নূতন গ্যাস আবিষ্কার করলেন। টেষ্ট-টিউবে ভরে বৈদ্যুতিক-প্রবাহের সাহায্যে সেই গ্যাসকে তিনি গরম করেন। গ্যাস থেকে যে আলো নির্গত হয়, স্পেকট্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার লিখন—সূর্য্যগ্রহণের সময় লকইয়ার সূর্য্য-রশ্মিতে যে লিখন পেয়েছিলেন, তারই অনুরূপ। সূর্য্যের গ্যাস পৃথিবীতে তাহলে জন্মালো। কিছু দিন পরে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করলেন, রেডিয়াম থেকে যে গ্যাস নির্গত হয়, তার লিখনের সঙ্গে লকইয়ারের লিখনের আশ্চর্য্য মিল আছে। ক্যাডি নামক এক জন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে বললেন যে, গ্যাসটি জড়বৎ (inert)। পাথুরে কয়লায় যে শ্লেট-পাথর থাকে তা যেমন দাহ্য শক্তিকে কমিয়ে রাখে, সাধারণ গ্যাস সমূহের মধ্যে এর কাজও তদনুরূপ। নূতন এই শিশুর

---

* প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়ে অথবা সাধারণ বেলোয়ারি-কাচের মধ্য দিয়ে সাদা রঙের আলো গেলে বিভিন্ন রঙের আলোয়, সে-আলো বিভক্ত হয়ে যায়। সূর্য্যের আলো সাতটি রঙে বিভক্ত হয়। রামধনুর রঙ সাতটি—তার বৈজ্ঞানিক নাম স্পেকট্রাম। স্পেক্ট্রস্কোপ যন্ত্রের মধ্যভাগে একটি প্রিজম্ এবং এক দিকে একটি দূরবীণ থাকে ও অপর দিকে আলোক-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নল থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা বর্ণালীর (spectrum) ছবি গ্রহণ করা হয়।

নাম হলো—"হিলিয়াম"। তখন থেকে বেলুনে হিলিয়াম ভরা হতে লাগলো। বিস্ফোরণের ভয় নেই! দাহ্য নয়! এমন কি গুলী লাগলেও তাতে আগুন ধরবে না! এই নূতন গ্যাসের সন্ধান দিলেন সূর্য্য!
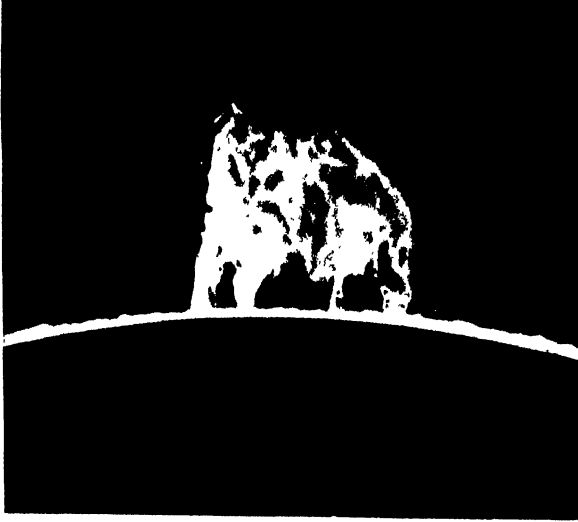
সূর্য্য-গর্ভা অগ্নিশিখা! যেন একটি মেঘ!

এখন বিদ্যুতের যুগ। বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টি করতে প্রয়োজন কয়লার ও তেলের। পৃথিবীতে যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বাড়ছে এবং খনিতে কয়লা ও তেল যে পরিমাণে কমছে, তাতে মনে হয়, কিছু দিনের মধ্যেই কয়লা আর তেল দুষ্প্রাপ্য হবে। তখন উপায়? জ্যোতিষ্কবিদ সূর্য্যের তাপ মাপলেন ঠিক আমরা যেমন জলের অথবা
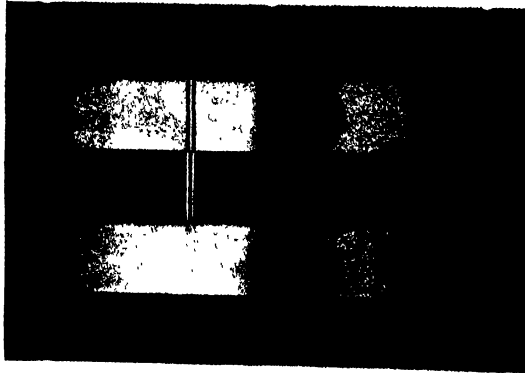
স্পেকট্রা—নক্ষত্রের লিখন-পত্রী

শরীরে তাপ মাপি, তেমনি ভাবে। নর্ডম্যান নামক এক জন বৈজ্ঞানিক বললেন, সূর্য্য থেকে পৃথিবীতে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় ২৬৫,০০০,০০০ অশ্বশক্তি-তুল্য শক্তি আসছে। সেই শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা চলেছে।

পূর্ব্বে ধারণা ছিল, আলোর রশ্মি এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতে মোটেই সময় নেয় না। বৃহস্পতি-গ্রহের চন্দ্রগ্রহণ থেকে রোমার প্রমাণ করলেন, এ ধারণা ভুল। আলোর গতি-বেগ সেকণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। ম্যাক্সওয়েল বললেন, যখন আলোর গতি-বেগ এত বেশী, তখন নিশ্চয় আলোয় ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক তড়িৎ ও বৈজ্ঞানিক গুণ আছে; এবং এমন অনেক তরঙ্গ আছে যা চোখে ধরা না পড়লেও তাদের অস্তিত্ব আছে। সেই তরঙ্গ-সাহায্যে আজ রেডিও-বেতার প্রভৃতি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আলোক-রশ্মির গতি—এই সবের গোড়াকার কথা রোমার আবিষ্কার করেছিলেন বৃহস্পতির-গ্রহের (Jupiter) চন্দ্র-গ্রহণ থেকে!

"টাওয়ার" বা "মঞ্চ"।* এখানে বসিয়া উইলশন্ সূর্য্যানুশীলন করতেন

এত দিন লোকে জানতো, আলোর রশ্মি বস্তু নয়, তরঙ্গ মাত্র এবং আলো সরল রেখায় চলাচল করে। আইনষ্টাইন প্রমাণ করলেন, সে ধারণা ভুল। আলো জড় পদার্থের মতই স্থুল জিনিষ। আলোর রশ্মি যদি সূর্য্যের পাশ দিয়ে ছুটে যায়, তবে আকর্ষণের জন্ম সে সূর্য্যের দিকে হেলে পড়বে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যগ্রহণের সময় ছবি নিয়ে দেখা গেল, তাঁর এ-মত সত্য।
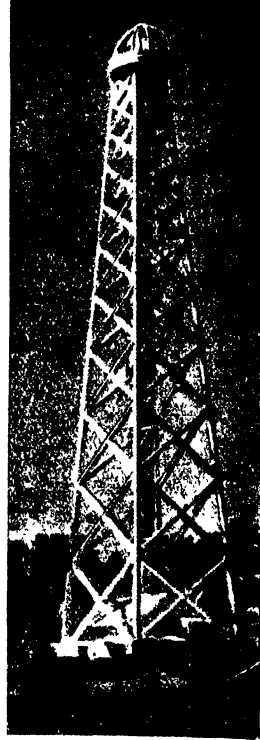
স্পেকট্রোস্কোপিক রেখার সাহায্যে বস্তুর প্রকৃতি এবং উপাদান (constitution) জানা যায়, আকাশ-পথে নক্ষত্রদের চলাচলের বেগ নিরূপণ করা হয় এবং তাদের উত্তাপ নির্দ্দিষ্ট করা চলে। বৈদ্যুতিক আলো জ্বাললে বাল্‌বের ভিতরকার তার (filament) তপ্ত হয়ে ওঠে; তা থেকে আলো নির্গত হয়। কিন্তু আসলে

* মহাপ্রাণ স্বর্গীয় বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার ১৪৭ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট বাড়ীতে ঠাকুর-দালানের ছাদের উপর ষ্টীলের ফ্রেমে পাঁচ তলার সমান উঁচু এমনি একটি মঞ্চ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। প্রত্যহ নিশীথ-রাত্রে এই মঞ্চ হইতে স্পেক্‌ট্রোস্কোপের সাহায্যে তিনি নক্ষত্র-পুঞ্জের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং নক্ষত্রাদির ফটো তুলিতেন। মঞ্চের উপরে বসিয়াই তিনি মোটর-এঞ্জিনের সাহায্যে মঞ্চটিকে প্রয়োজনানুরূপ ঘুরাইতেন-ফিরাইতেন। এক দিন মধ্যাহ্নে প্রবল ঝড়ে সেই মঞ্চটি উড়িয়া যায়। তাহার কিছু দিন পরেই ঠাকুর-দালানের ঐ-অংশের ছাদটিও পড়িয়া যায়। বিজয়চন্দ্রের বহু-ব্যয়ে-প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা হইতেই মাসিক বসুমতী প্রকাশের সূচনা। উক্ত দৈব-দুর্ঘটনার পরেই বিজয়চন্দ্রের মুদ্রাযন্ত্রটি স্থানান্তরিত করিয়া বসুমতীর মুদ্রাযন্ত্রের সহিত সম্মিলিত করা হয়।

—মাসিক-বসুমতী সম্পাদক

ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। বাল্‌বের একটি তারে কোটি-কোটি পরমাণুর (atoms) সমষ্টি আছে। এর পরমাণুর প্রত্যেকটি যেন এক একটি সৌরমণ্ডল। মাঝখানকারটি সূর্য্য পরমাণু-কোষ (nucleus); এবং তার চারিধারে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রদক্ষিণ করছে গ্রহের দল—ইলেকট্রনস্। হাইড্রোজেন পরমাণুর সৌরমণ্ডলে মাত্র একটি গ্রহ আছে।* এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে লঙ্ঘনের ফলে ইথরে (ether) তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য—লঙ্ঘনের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভরশীল। স্পেকট্রোস্কোপিক ছবি সেই সৃজিত তরঙ্গের শ্রেণী নির্দ্দেশ করে। আকাশ-পথ বেয়ে যে আলোর রশ্মি আমাদের কাছে আসছে, তার পরমাণুর মধ্যেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটছে। ইলেকট্রনের কক্ষচ্যুতির ব্যাপারে অল্প-দৈর্ঘ্যের লঙ্ঘন বেশী এবং ছবিতে তাদের রেখা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সমধিক দৈর্ঘ্যের লঙ্ঘন বিরল এবং ছবিতে তাদের লিখনও অস্পষ্ট।
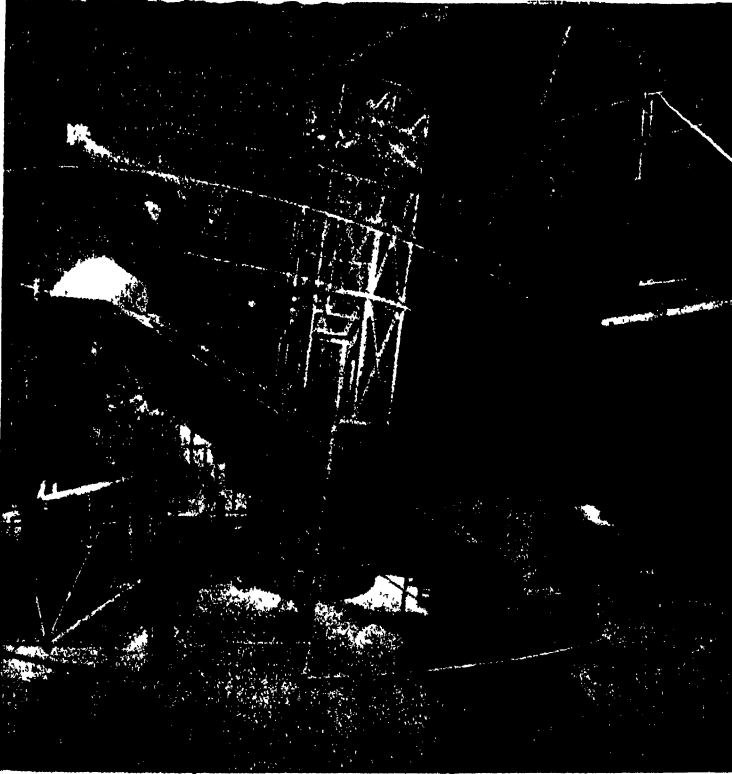
হুকার দূরবীন্ (১০০ ইঞ্চি)—উইলশন অবজার্ভেটরি

স্পেক্ট্রা তিন প্রকার। যখন কোন প্রতপ্ত ঘন বস্তু থেকে আলো নির্গত হয়, তখন স্পেকট্রোস্কোপে রামধনুর মত ছবি ওঠে। জ্বলন্ত গ্যাসের যে আলো, সে আলোর ছবি নিলে দেখবো, একটা কালো স্থূল রেখার (band) মধ্যে কয়েকটি সাদা সাদা রেখা রয়েছে। আবার যখন জ্বলন্ত ঘন বস্তুর আলো শীতল গ্যাসের মধ্য দিয়ে যায়—যেমন সূর্য্যের আলো—তখন সাত রঙের স্থূল রেখার (band) মধ্যে কালো কালো রেখা পাই। এই ছবি যেন স্বাক্ষর—প্রত্যেক পদার্থ নিজের পরিচয় অভ্রান্ত ভাবে তাতে লিখে দেয়।

বৈজ্ঞানিক যখন কোন নক্ষত্রের স্পেকট্রোস্কোপিক ছবি তোলেন, তখনই সেই স্বাক্ষর অর্থাৎ রেখা দেখে তিনি নির্ণয় করেন, সে নক্ষত্রে কি কি পদার্থ আছে। যদি কোন নূতন রেখা দেখতে পান, তখনই নূতন পদার্থের সন্ধান মেলে। লকইয়ারও এমনি নূতন লিখন দেখতে পেয়ে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তার পর বহু গবেষণায় হিলিয়াম আবিষ্কৃত হয়। ধরুন, ডবল-লাইন রেল-পথে একটি ট্রেণ আসছে আর-একটি যাচ্ছে। নিজের ট্রেণের গতিবেগ জানলে শব্দের পার্থক্য থেকে ট্রেণযাত্রী বৈজ্ঞানিক বলে দিতে পারেন অপর ট্রেণটি কত জোরে চলেছে। তেমনি যে-নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে আসছে, তার আলোর ছবির মধ্যে রেখাগুলি বেশী-থাকের (pitch) দিকে ভীড় করবে, আর যে-নক্ষত্র দূরে সরে যাচ্ছে, তার রেখাগুলি কম-থাকের (pitch) দিকে সরে যাবে। এই রেখাগুলির সরে যাওয়ার পরিমাণ নক্ষত্রের গতিবেগের উপর নির্ভর করে। এই স্পেকট্রোস্কোপিক ছবিকে নক্ষত্রদের স্পীডোমীটার বললে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের (axis) উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব্ব দিকে প্রায় সাড়ে তিন সেকণ্ড সময়ে এক মাইল ঘোরে। পৃথিবীবাসী আমরা বুঝতে পারি না যে, পৃথিবী ঘুরচে। আমরা মনে করি, আকাশবাসীরা অর্থাৎ নক্ষত্রদের দল পৃথিবীর উল্টো দিকে মানে পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। পৃথিবীকে পুরো একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকণ্ড। যে-ঘরে বসে বৈজ্ঞানিক নক্ষত্রদের পর্য্যবেক্ষণ করেন, তার নাম অবজারভেটরী। খুব উঁচু পাহাড়ের উপর লোহার ফ্রেমের তৈরী এক বিরাট মঞ্চের উপর ডোমওয়ালা ছাদ দেওয়া সেই ঘর। সে ঘরটা পৃথিবীতে অবস্থিত, অতএব পৃথিবীর সঙ্গে সেটাও ঘুরছে।

সুতরাং কোন এক নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের দিকে দূরবীণ কষে ছবি তুলতে গেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথিবী অন্য দিকে ঘুরে যাবে; অতএব নক্ষত্রটিও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হবে। তাই দূরবীণ এবং

* পরমাণুর জাতিভেদে এই গ্রহ-সংখ্যার কম-বেশী হয়। পরমাণুর ওপর শক্তির আবেশ হলে বাহিরে ইলেকট্রন-স্তর থেকে এক, দুই বা ততোধিক কণা পরমাণু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিতাড়িত হয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পরমাণুর ওপর রঞ্জন-রশ্মি আপতিত করে অথবা অতি দ্রুতগামী কোন তড়িৎ-কণাকে (electron) পরমাণুতে প্রহৃত করে এই ব্যাপার সংসাধিত হয়।

বৈজ্ঞানিক সহ সমস্ত ঘণ্টা ইলেকট্রিক সেটারের সাহায্যে পৃথিবীর গতির উল্টো দিকে যে-বেগে পৃথিবী ঘুরছে, ঠিক সেই বেগে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে নক্ষত্র আর দূরবীণ ছেড়ে পালাতে পারে না, দৃষ্টিপথে আবদ্ধ থাকে। কারণ, নক্ষত্র যে-বেগে সরে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, অবজারভেটরী সেই বেগে তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে,—ঘোরানো হচ্ছে। তখন আর ছবি তোলবার কোন অসুবিধা হয় না। মানুষের চোখে যে সূক্ষ্মতম তথ্য ধরা পড়া সম্ভব নয়, ছবিতে আপনা থেকেই নক্ষত্র তা এঁকে দিয়ে যায়।

আলোর গতিবেগ সেকণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। এমন বহু নক্ষত্র আছে যার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছুতে একুশ বছর সময় লাগে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তারা ১৮৬,০০০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ × ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। এ দূরত্ব কল্পনার অতীত! হয়তো বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্ব-বৃক্ষমূলে বসে তপস্যা করছিলেন, সেই সময় কোন এক নক্ষত্রের কতকগুলি পরমাণুর (atoms) তড়িৎকণা (elctrons) নিজ-কক্ষ (orbit) থেকে অন্য কক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল। মিনিটে প্রায় এক কোটি শতদশ লক্ষ মাইল দৌড়ে সেই তরঙ্গ আজ এসে হানা দিল বৈজ্ঞানিকের
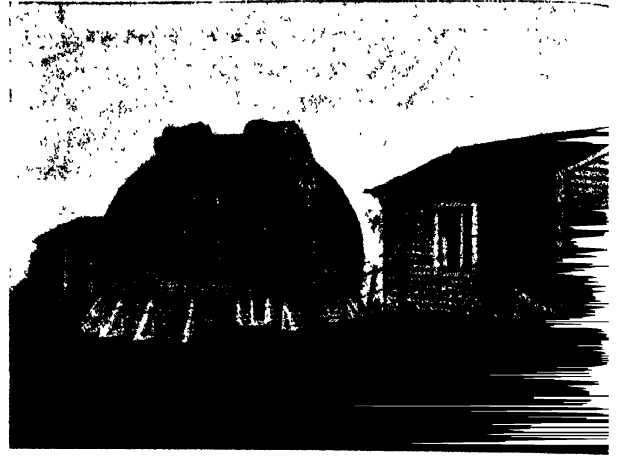
চিলি-সান্তিয়াগো। পাহাড়ের বুকে লিক্ অবজার্ভেটরি (কালিফোর্ণিয়া-বিশ্ববিদ্যালয়ের)
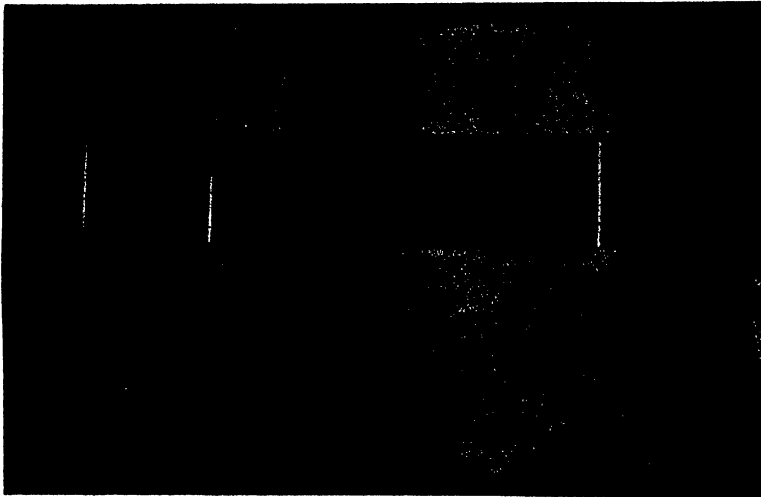
তারার রেখায়-লেখা তারার গতিবেগ

স্পেকট্রোস্কোপে এবং শুধু সেই অতীত যুগের নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ খবরই সে নিয়ে এলো না, কতখানি পথ বেয়ে সে এসে উপস্থিত হয়েছে তাও দিল জানিয়ে!

নক্ষত্রদের দূরত্ব জানতে গেলে শুধু স্পেকট্রাল্ রেখা বা আলোর তারতম্য জানলেই চলবে না, তার একটা মাপকাঠিরও প্রয়োজন। যেখানে যাওয়া সম্ভব নয়, এঞ্জিনীয়াররা এমন স্থানের দূরত্ব একটি নির্দ্দিষ্ট ভূমি (base) নিয়ে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে নিরূপণ করেন। আকাশের ঐ সব নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে হলে তেমনি ভূমি বা base-এর প্রয়োজন। নিকটতম গগনচারী চন্দ্রের দূরত্ব নিরূপণ করতে বৈজ্ঞানিকেরা ভূমির দৈর্ঘ্য নেন আমেরিকা থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত। কিন্তু পৃথিবীর কোন ভূমি নিয়েই নক্ষত্রদের দূরত্ব বার করা যায় না। কারণ, নক্ষত্ররা এত দূরে যে সে দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর আকার একটি বিন্দু মাত্র! এই পৃথিবীর বার্ষিক গতি-পথের ব্যাসকে ভূমি-হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। আজ একটি নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র দেখে ত্রিকোণের এক কোণ মাপা হলো। ছ' মাস পরে আবার সেই নক্ষত্র দেখা হলো, তখন আর একটি কোণ মাপা হলো। তার পর নক্ষত্রের দূরত্ব বার করা হলো ত্রিকোণমিতির সাহায্যে। পৃথিবীর এই দুই পোজিশনের মধ্যে যে দূরত্ব (১৮৬,০০০,০০০ মাইল) অর্থাৎ সূর্য্যের চারিধারে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-পথের ব্যাস—এই দূরত্ব হলো ত্রিকোণের ভূমি।

এই উপায়ে দূরত্ব নিরূপণ যেমন জটিল ও কষ্টকর, তেমনই সময়-সাপেক্ষ। ইয়কস্ অবজারভেটরিতে এক নূতন উপায় আবিষ্কৃত হলো। চোখের সম্মুখে আট ইঞ্চি দূরে একটা পেনসিল ধরে দেওয়ালে-টাঙানো একটা ছবির দিকে ডান চোখ বুজে বাঁ চোখ খুলে দেখে তার পর যদি বাঁ চোখ বুজে ডান চোখ দিয়ে দেখা যায়, তবে দেখবেন পেনসিলটি যেন ছবির একধার থেকে আর একধারে সরে যাচ্ছে! এখন যদি আকাশে অবস্থিত দূরবর্ত্তী নক্ষত্রকে এই উপায়ে ছবি এবং কোন নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রকে পেনসিল হিসাবে ধরে নেওয়া হয় এবং ত্রিকোণের ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর গতিপথের ব্যাস-স্থান দুই চোখের মধ্যকার দূরত্ব বলে ধরা যায়, তবে সেই হিসাব ধরে ছ' মাস অন্তর দু'টি ফটো নিলে দেখা যাবে যে, ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর নিকট-বর্ত্তী নক্ষত্র দূরবর্ত্তী নক্ষত্র থেকে সরে গেছে! এই সরে যাওয়ার পরিমাণ থেকে নক্ষত্রদের দূরত্ব নিরূপণ করা হয়; এবং এই উপায়ে

৩৭১০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০ মাইল দূরত্ব অবধি মাপা সম্ভব হয়েছে!

এই ভাবে ফটোগ্রাফিক প্লেটের সাহায্য-গ্রহণ এখন জ্যোতিষ্ক-শাস্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। চোখে যা ধরা পড়ে না, প্লেটে তার লেখা ফুটে ওঠে। এই লেখাই নক্ষত্রদের ইতিহাস। রেকর্ডগুলি জমিয়ে রাখলে যুগ যুগ ধরে যে সব ছবি উঠবে, তার তুলনা-মূলক গবেষণা থেকে নক্ষত্রদের দেশের নিয়ম-কানুনও জানতে পারা যাবে। এইরূপ গবেষণা থেকেই ধরা পড়েছিল যে, পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-পথ পরিবর্ত্তনশীল এবং মেরুদণ্ডের হেলানও (inclination) এক থাকে না। এর নাম বিষুবের অয়ন, চলন ও অক্ষ-বিচলন।

যদি আলোর রথে চড়ে অর্থাৎ সেকণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল গতিতে আকাশে ওড়া সম্ভব হতো, তবে চাঁদে পৌঁছুতে আমাদের সময় লাগতো এক সেকণ্ড, সূর্য্যে যেতে আট মিনিট এবং নেপচ্যুন-গ্রহে হাজির হতে চার ঘণ্টার চেয়ে একটু বেশী। নিকটতম

এ্যাকুইলায় কালো ছায়া
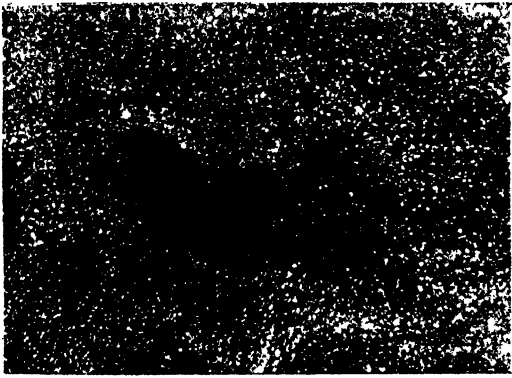
তারকা আ্যালফা সেণ্টরীতে যেতে হলে চার বৎসর অবিরাম উড়তে হবে এবং সিরিয়াসে (লুব্ধক) পৌঁছুতে হলে আট বৎসর। সেখানে গিয়ে দেখবো টিম্‌টিম্-করা সামান্য জোনাকীর মত সিরিয়স—সূর্য্যের সমানই উজ্জ্বল। ভেগা (অভিজিৎ) এবং আর্কটরাসে পৌঁছুতে সময় লাগবে ত্রিশ বৎসর এবং সেখানে গিয়ে বুঝতে পারবো যে, তারা আমাদের সূর্য্যের চেয়ে আশী গুণ প্রখর এবং উজ্জ্বল। ক্যাপেলায় উপস্থিত হবো সাতচল্লিশ বৎসর পরে এবং গিয়ে অবাক হয়ে দেখবো যে, ক্যাপেলা যুগ্ম-তারা এবং সূর্য্যের চেয়ে এক শত গুণ উজ্জ্বল। কালপুরুষ (orion)-স্থিত রিগেলে যেতে সময় লাগবে পাঁচশ' বছর, আর গিয়ে দেখবো যে, আমাদের সূর্য্যের মত ১৩,০০০ সূর্য্য মিলেও তার সমান উজ্জ্বল হতে পারবে না। এ সব বৃত্তান্ত স্পেক্‌ট্রোস্কোপিক ছবি থেকে পাওয়া গেছে।

এই সব দূরত্ব দেখে বিস্মিত হয়ে থাকতে হয়! পাঁচ শত আলোক-বর্ষ অর্থাৎ ৫০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ × ১৮৬,০০০ মাইল! অসীম আর কাকে বলে? কিন্তু এমন অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ আছে—যার তুলনায় এই বিরাট্ দূরত্বও কিছু নয়! স্পেক্‌ট্রোস্কোপ ছবি থেকে জানা গেছে যে, হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জ সেকণ্ডে ১১৫ মাইল গতিতে আমাদের দিকে আসছে। আকারে তারা দশ লক্ষ সূর্য্যের সমান! এমন নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, যার আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসে কুড়ি লক্ষ বর্ষে অর্থাৎ তার দূরত্ব হলো ২০০,০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ × ১৮৬,০০০ মাইল! কল্পনার অতীত, কিন্তু হিসাবে তাও ধরা পড়ছে!

তারকার জন্ম-বৃত্তান্ত যেন একটা চমকপ্রদ রূপকথা! আকাশে কালো কালো দাগ অথবা ঝাপ্‌সা আলোর মত অনেক স্থান আছে। পৃথিবীর ওপর আলোর চাপ এত কম যে, সে একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। উত্তাপ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই চাপ বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব জুড়ে ধূলির মত সংখ্যাতীত মুক্ত পরমাণু সঙ্গীর আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—এত লঘু যে, তার উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব পড়ে না! তার পর তারা
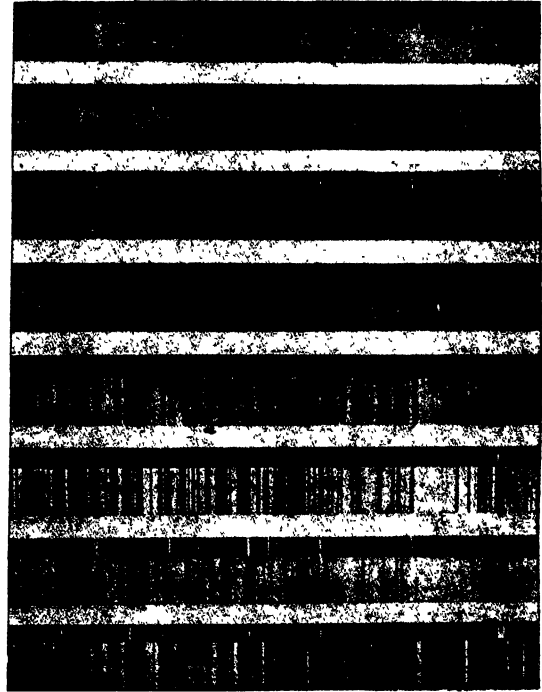
আলোর রেখায় সূর্য্য, আর্কটরাস্ প্রভৃতি অষ্ট নক্ষত্রের কাহিনী

দলবদ্ধ হলো। সেই দলটি যদি কোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের কাছে জোটে, তবে জলন্ত মেঘের মত দেখায়, আর যদি বহু দূরে থাকে, তবে অন্ধকার-পিণ্ডের মত মনে হয়। এই নক্ষত্র-ধূলি জমাট বেঁধে বেঁধে যেই একটু ভারী হয়, অমনি মাধ্যাকর্ষণ তাদের টেনে একত্রিত করে দেয়। তারা চলতে চলতে ধাক্কা-ধাক্কি করে, উত্তাপ সৃষ্টি করে, গরম হয়ে ওঠে; কখনও লাল, কখনও পীত, কখনও সাদা, কখনও বা নীলবর্ণ ধারণ করে। যত ঘনীভূত হয়, উত্তাপ ততই বৃদ্ধি পায়। যখন এই প্রক্রিয়া চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন রিগেল জাতীয় সূর্য্যের চেয়ে ১৩,০০০ গুণ উজ্জ্বল তারকার জন্ম হয়। এই হলো তারকার শৈশব অবস্থা। অত্যন্ত চাপ এবং প্রচণ্ড উত্তাপে সকল বস্তু ভেঙ্গে-চুরে একেবারে আদিম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কোন পরমাণুই নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে না। ফলে শিশু-তারকার মধ্যে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ থাকা সম্ভব হয় না।

তার পর শিশু-তারকা বড় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তাপও

কমে আসে। ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। তাদের ঘড়ির একটি সেকেণ্ড আমাদের কোটি বৎসরের সমান। শুভ্র উজ্জ্বল নক্ষত্র আকারে ছোট হয়ে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তখন উত্তাপ ও চাপের হ্রাস-হেতু হাইড্রোজন ও হিলিয়াম পরমাণু ক্রমেই

স্পেক্‌ট্রোস্কোপ্‌
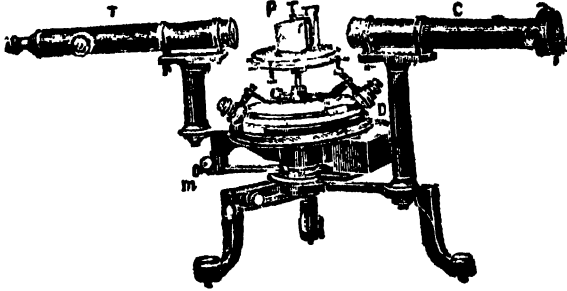
রকমারী মিলনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি করে। আরও দিন কেটে যায়। শিশু অবস্থার বৃহৎ রক্তবর্ণ তারকা যৌবনে আকারে ছোট একটি শুভ্র নক্ষত্র হয়, বার্দ্ধক্যে আবার উত্তাপ কমে যাওয়ার দরুণ রক্তবর্ণ ধারণ করে কিন্তু পূর্ব্বের আকার আর ফিরিয়ে পায় না, অনেকখানি ছোট হয়ে যায়। তার পর আরও উত্তাপ কমে, ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে। তখন তারকার মৃত্যু হয়।

এক-সময় আমাদের সূর্য্যও অণ্টারেসের মত সুবৃহৎ ও রক্তবর্ণ ছিল। যত দিন গেল, সূর্য্য আকারে ছোট এবং ঘনীভূত হতে লাগল এবং তার আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বাড়তে লাগল। শেষে রিগেল জাতীয় নীলাভ-শুভ্র তারকায় পরিণত হলো, এখনকার সূর্য্যের তুলনায় তখনকার সূর্য্যের আকার ছিল ১৩,০০০ গুণ বড়। তার পর ধীরে ধীরে ছোট, আরও ছোট হতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপও কমতে লাগলো। এখনও সূর্য্য পৃথিবীর মত জমাট বাঁধেনি, তখনকার তো কথাই নেই। সে সময়ে হয়তো কোন তারকা ঘুরতে ঘুরতে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল, ফুটন্ত সূর্য্যের দেহে জোয়ার-ভাঁটা খেললো। তারকার আকর্ষণে একটা জোয়ারের ঢেউ এত উঁচু হয়ে উঠলো যে, তার কয়েক ফোঁটা সূর্য্যের দেহ ত্যাগ করে দূরে নিক্ষিপ্ত হলো। সেই দ্রবীভূত নিক্ষিপ্ত পদার্থ থেকে ভেঙ্গে-চুরে গ্রহের সৃষ্টি হলো। তারকা চলে যাবার সময় তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। সেই থেকে তারা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তারকা সূর্য্য সৌরমণ্ডলে পরিণত হলো!

অনন্ত পুরুষের অসীম সৃষ্টি, বিশাল বিশ্ব! অনন্ত কালব্যাপী জীবন-মরণ, ভাঙ্গা-গড়া! ক্ষুদ্র মানবের কতটুকু সামর্থ্য যে, বিরাটের সৃষ্টি-প্রলয়ের হিসাব রাখে অথবা তার কারণ নির্ণয় করে!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

সর্পগন্ধা

সর্পগন্ধা আজ সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বনে-জঙ্গলে যেখানে-সেখানে অযত্ন-সম্ভূত ছোট একটি গুল্ম যে মানুষের এত কাজে লাগিতে পারে, এ কথা কয়েক জন মাত্র জানিলেও চিকিৎসা-জগতে এ বনৌষধির তেমন সমাদর ছিল না বলিলেই হয়।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে ছোট চাঁদড় বলিয়া একটি বনজ গুল্ম কয়েক জন বিশিষ্ট চিকিৎসকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কি ভাবে ইহার ব্যবহার করা চলে, আয়ুর্ব্বেদ বা অন্য চিকিৎসাগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে কি না, সে বিষয়ে খ্যাতনামা চিকিৎসকগণও মনে প্রচুর সন্দেহ পোষণ করিতেন। এমন বহু বনৌষধির নাম চরকাদি গ্রন্থে আছে—তাহার স্বরূপ কি, কি ভাবে সেগুলিকে কাজে লাগান যায়, সে সম্বন্ধে কোন সন্ধান আর পাওয়া যায় না! কি ভাবে এই সব বনৌষধির গূঢ় রহস্য মানুষের প্রথম অধিগত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান লইলে জানিতে পারি, বনচারী ব্যাধকে আশ্রয় করিয়াই ইহার প্রথম প্রকাশ। সর্পগন্ধা সে দিক্ দিয়া অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ মনে হয়।

আমরা শুনিয়া আসিয়াছি, নেউল সাপের দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া কোন একটি বনৌষধি-মূল আহরণ করিয়া সাপের বিষক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষা করে। অবশ্য সাপ-নেউলের চির-শত্রুতার কথা সর্ব্বজনবিদিত ও আত্মরক্ষার উপায় তাহার অধিগত করানো প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা! প্রাচীন শাস্ত্রে নাকুলি নামক বনৌষধির উল্লেখ আছে। নাকুলি এবং গন্ধ-নাকুলির কথা রাজনির্ঘণ্টুতে ও ভেল-সংহিতাতে লিখিত আছে। উন্মাদ রোগে মহাপৈশাচিক ঘৃতে ইহার ব্যবহার হইয়াছে। রাজনির্ঘণ্টুকার মাত্র নাকুলির উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহার সর্পগন্ধা, নাগগন্ধা, অহিভুক্, সর্পাদনী, ব্যালগন্ধা, রক্তপত্রিকা ইত্যাদি দশটি নামের উল্লেখ করিয়াছেন, আবার গন্ধনাকুলি নামক অপর একটি বনৌষধির সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দ্দনিকা, অহিমর্দ্দিনী, মহাহিগন্ধা, অহিলতা প্রভৃতি বারোটি নামের উল্লেখ করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয় প্রকার বনৌষধির গুণ প্রথমোক্ত বনৌষধির তুলনায় কিছু শ্রেষ্ঠ, কিন্তু উভয় বনৌষধিই তিক্তস্বাদ, বিপাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক এবং অনেক বিষবিধ্বংসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

নকুলের সহিত এই বনৌষধির সম্বন্ধ—বিষনাশক গুণের বর্ণনা, বিশেষতঃ, সর্পের নাম আশ্রয়ে সর্পবিষনাশকতার উল্লেখ থাকিলে ইহা কোন্ বনৌষধি, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ বটে। সর্পের চক্ষুর সহিত কোন সাদৃশ্য ইহার কোন-না-কোন অংশের আছে, ইহাও সর্পাক্ষী নাম হইতে অনুমান করা চলে। ওয়াট মহোদয় সমগ্র পৃথিবীর বনৌষধি-সমুদ্র মন্থন করিয়া Economic products of India নামক যে অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই পুস্তকে দেখিতে পাই, তিনি Ophiorrhiza Mungos এবং Rauwolfia serpentina নামক যে বনৌষধি দুইটির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি Ophiorrhiza Mungosকে mongoose plant নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহার সংস্কৃত নাম সর্পাক্ষী, বাংলা নাম গন্ধনাকুলী; এবং বাংলা, আসাম, ব্রহ্মদেশ,

টেনাসেরিম, আন্দামান, নিকোবর, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি স্থানে উহা জন্মায়। ইহার পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—এই বনৌষধির মূল তিক্তাস্বাদ এবং উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। সিংহলে সর্পবিষ-প্রতিষেধক বলিয়া ইহার ব্যবহার আছে। নকুল সর্পদষ্ট হইয়া এই বৃক্ষের সন্ধান করে। কিম্‌ফার মহোদয় (Koempfer) তাঁহার **Aemenitates Exoticae** নামক গ্রন্থে দূষিত জ্বরে ইহার ব্যবহারের কথা এবং অন্যান্য দূষিত রোগে ও কুকুরের দংশনজনিত ক্ষেত্রে মানুষ ও পশুর মধ্যে ব্যবহারের সাফল্য বর্ণনা করিয়াছেন। হর্সফিল্ড মহোদয় এই বৃক্ষের গুণের তেমন উৎকর্ষ নাই বরং **Rauwolfia serpentina** নামক ভেষজের গুণ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শেষোক্ত বনৌষধি ছোট চাঁদড় নামে এ দেশে পরিচিত বলিয়া ওয়াট বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই বনৌষধির সংস্কৃত নাম সর্পগন্ধা; তেলেগু ভাষায় ইহা পাতাল-গারুড়ি নামে খ্যাত। প্রথমোক্ত বনৌষধি যে সকল স্থানে পাওয়া যায়, সেই সকল স্থানে ইহাও সুলভ বটে। ভারতে এবং মালয় উপদ্বীপে সর্পবিষ-প্রতিষেধক ভেষজরূপে ইহার খ্যাতি আছে। অধিকন্তু, বোলতা, ভীম্‌রুল প্রভৃতি কীট-দংশনজাত বিষ-ক্রিয়াতে বা দূষিত জ্বর-নাশে আভ্যন্তর-প্রয়োগে ইহার বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে। পাতা ও মূল পিষিয়া বাহ্য প্রলেপরূপে মূলের ক্বাথ যে কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনজনিত বিষ নাশ করে। দূষিত জ্বর নাশে, আমাশয় বা অন্ত্রপ্রদাহজনিত যে কোন রোগে, এমন কি, গোখ্‌রো বা কেউটে সাপের বিষনাশ করিতে ইহার বিশেষ সাফল্য আছে বলিয়া রামফিয়ান মহোদয় বর্ণনা করিয়াছেন। নকুল সর্পদষ্ট হইয়া এই বৃক্ষের সন্ধান করে; ইহাও তাঁহার বিশ্বাস। সার উইলিয়াম জোনস্‌ কিম্‌ফার মহোদয়-বর্ণিত সর্পগন্ধার সহিত রামফিয়ান মহোদয়-বর্ণিত সর্পগন্ধার সাদৃশ্য বর্ণনা করিলেও কোনটি প্রকৃত সর্পগন্ধা, সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। রক্‌সবরা মহোদয় বলিয়াছেন—মাদ্রাজের তেলেগু চিকিৎসকগণ জ্বর-নাশক ভেষজরূপে যে-কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনজনিত বিষনাশে এবং প্রসূতির সুখ-প্রসবের জন্য ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ঔষধের বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া হর্সফিল্ড মহোদয়ও মনে করেন। ডিমক্‌ বলেন, কনকান্‌ প্রদেশে আমাশয় ও অতিসারে শ্রমজীবিগণ ইহার বহুল ব্যবহার করেন। মোটের উপর ছোট চাঁদড় মূল নাকুলি, তাহাও পূর্ব্বকথিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থ পাঠে বুঝিতে পারা যায়। বড় চাঁদড় মূলের ব্যবহার তেমন নাই।

ইদানীং এই বনৌষধি ভারতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এই বনৌষধি সম্বন্ধে গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, গত পঞ্চাশ বৎসর উন্মাদ রোগের বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা এক জন চিকিৎসক উন্মাদের ঔষধ আবিষ্কার করিয়া তাহার প্রধান উপাদানরূপে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন। এই ঔষধ বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এখনও বিক্রীত হয়। পাটনার একটি সুবিখ্যাত মুসলমান-পরিবার এই মূল ।০—।৵ মাত্রায় ৵০ আনা গোলমরিচ-চূর্ণ সহ পিষিয়া উন্মাদ-রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। বাজারেও এ ঔষধের খ্যাতি আছে। কলিকাতায় স্বর্গীয় স্বনামধন্য কবিরাজ ৺বিজয়রত্ন সেন মহাশয় উন্মাদরোগে ইহা ব্যবহার করিতেন। শিষ্য-পরম্পরায় উন্মাদ রোগে বিভিন্ন নামে ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। **Blood Pressure** রোগে (যাহা চরকে বিবিধশোণিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে রক্তপিত্তহরী চিকিৎসার উল্লেখ আছে)—ইহার ব্যবহার আছে। উত্তর-বঙ্গের এক জন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী সর্পদষ্ট রোগীকে এক তোলা হইতে দুই তোলা মাত্রায় দিয়া তাহার জীবন দান করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কলিকাতায় কয়েকটি ঔষধ-প্রতিষ্ঠান আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুরাসার (**Rectified Spirit**) সাহায্যে ইহা হইতে নব-ধারার ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন। বর্ত্তমানে **School of Tropical Medtcine** নামক নব্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। এই ভাবে এই অযত্ন-

সর্পগন্ধা

সম্ভূত বনৌষধি আজ রোগী ও চিকিৎসক সকলের নিকট সমাদরের বস্তু হইয়াছে। বিশেষতঃ, নব্য বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক কথিত **Blood Pressure** রোগ—যাহা রক্তের বিষক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয় এবং যাহা ক্ষেত্রবিশেষে শিরোঘূর্ণনাদি বক্তভেদ বা রক্ত-বমনাদিরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং যান্ত্রিক পরীক্ষায় রক্তের স্বাভাবিক গতিবিধির অস্বাভাবিকতা অর্থাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, সেরূপ ক্ষেত্রে রক্তের গতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে এই মূলচূর্ণ ৵০ আনা হইতে ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে নিদ্রাকর্ষণ ও তৎসহ রক্তের চাপ স্বাভাবিক হয়। বহু উন্মাদ-রোগীকে এ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগমুক্ত করা গিয়াছে। রক্তের চাপ কম বা বেশী, উভয় ক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ চলে। আভ্যন্তর বিষক্রিয়া যে কোন কারণে সংঘটিত হইলে ইহা প্রয়োগ করা চলে। বিছার দংশনে বা ভীমরুলের দংশনে ইহার পাতা ও মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার আশু উপশম হয়। পল্লীগ্রামে স্ব স্ব বাস্তুভূমিতে এই অতি-প্রয়োজনীয় বনৌষধি বৃক্ষ রোপণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে কোন বিষ-চিকিৎসায় ইহার উপযোগিতা যখন প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, তখন সর্পবিষনাশে ইহার উপযোগিতা থাকা খুবই সম্ভব। মোটের উপর, এই বনৌষধি সম্বন্ধে গভীরতর এবং ব্যাপকতর গবেষণার বা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য (এম, এ)।

মরু-তৃষা
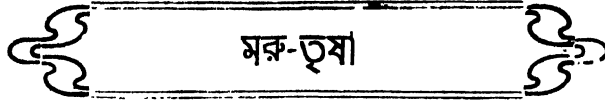
[উপন্যাস]

৮

অমিয় বসিয়া রত্নার সহিত গল্প করিতেছিল।

সকালে চা পানের পর্ব্ব চুকিয়াছে। গোস্বামী-সাহেব ঢুকিয়াছেন অফিস-কামরায়, মাকে লইয়া অনিল বাজারে বাহির হইয়াছে, বাড়ীতে শুধু রত্না ও অমিয়। নিরবচ্ছিন্ন অবসর-ভরা পৌষের সকাল-টুকুকে উপভোগ করিতেছে। বারান্দার গোল-টেবিলের সামনে একখানা চেয়ারে বসিয়াছে অমিয়, আর তার সামনের চেয়ারে বসিয়াছে রত্না। সার্শির রঙিন কাচ দিয়া সোনালী রৌদ্র-কিরণ বিচিত্র বিভায় রত্নার শাড়ীতে, পদতলে, অনাবৃত বাহুমূলে পড়িয়া পরীর মত তাকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে। অমিয় রত্নাকে বুঝাইতেছিল,—আশার যেমন অন্ত নেই, মানুষকে বড় করে তোলবার মত এত-বড় প্রেরণাও তেমনি আর কিছুতে নেই! তবু মানুষ বলে, আশাই দুঃখের মূল! কিন্তু এই দুঃখেই মেলে সুখের সন্ধান!

রত্না মৃদু হাসিল। কহিল,—আশা পূর্ণ না হলে মনে যখন আমরা বেদনা পাই, তখন বার বার আশা করে শুধু কষ্ট বাড়ানো সার হয়। তাতে সুখের পথ তৈরী হয় কি না জানি না—কিন্তু দুঃখের মাত্রা বাড়ে! তাই কোনো-কিছুর আশা না করাই ভালো নয় কি?

—না, সে কি করে হতে পারে! যার আশা নেই, জানবে তার মৃত্যু ঘটেছে! আশাই আমাদের প্রাণের উৎস। সংসারে আমরা সব কিছুরই আশা করতে পারি। পাওয়া না পাওয়া—ভাগ্য, না হয় পুরুষকার!

স্থির নেত্রে রত্না অমিয়র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বুকের মধ্যে অকস্মাৎ একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল। তাহারই অদম্য বেগ দমন করিতে রত্নার কর্ণমূল হইতে ললাট পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

কথার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া অমিয় কহিল,—ও কি, একদম চুপ! কি ভাবছেন?—বলিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে সে রত্নার মুখের পানে তাকাইল।

রত্না কহিল,—কি জবাব দেবো খুঁজে পাচ্ছি না।

—ও, আচ্ছা, ও-তর্ক তাহলে থাক। আসুন, আমরা একটু গল্প করি। সেখানে অর্থাৎ আমার কুমিল্লার বাংলাতে এমন সময়ে কি করি, জানেন?

সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রত্না কহিল—কি?

—স্নানের পর প্রসাধন-ক্রিয়া অর্থাৎ পোযাক পরা! সে এক ভীষণ ব্যাপার!

—কেন, আপনার বেয়ারা তো সব গুছিয়ে রাখে!

—হ্যাঁ, চাপরাশি আবদুল সব গুছিয়ে রাখে, সত্যি! কিন্তু আমি নিজেই যে মূর্ত্তিমান্ বেগোছ! বিশেষ রুমাল-সংক্রান্ত ব্যাপারে। সে বেচারার দোষ নেই, আমি বুঝি! তবু রাগ হয় বিষম এবং তাকে দি বকুনি।

—হাকিম কি না! রত্না হাসিল।

অমিয়ও হাসিল। কহিল,—ঠিক কথা বলেছেন। আমাদের মত লোকের বিচার এমনি বটে! বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল,—আমার এই বিদ্‌কুটে ভুলের জন্ম মার কাছে ছেলেবেলায় কম বকুনী খেয়েছি! কিন্তু মাতামহের স্বভাব বিসর্জ্জন দিই কি করে? গদীর নীচে দলিল রেখে তিনি পুলিসে চুরির ডায়রী করাতেন। তাঁর নাতি তো!

রত্না হাসিতে হাসিতে কহিল,—খুব ভালো মানুষ ছিলেন বুঝি! কিন্তু অত বড় জমিদারী চালাতেন কি করে?

—বুদ্ধির তো অভাব ছিল না!

পরিহাস-মাখা সুরে রত্না কহিল,—যেমন আপনার!

—আমার! তা ঠিক বলেছেন! কিন্তু আমায় এমন করে এ্যানালাইজ্ করলেন কেন বলুন তো?

রত্নার মুখ সিঁদূরের মত রাঙা হইয়া উঠিল। লজ্জানত চক্ষে কি বলিতে গিয়া সে থামিল। অনিল কক্ষে প্রবেশ করিল। রত্নার লজ্জা-রাঙা মুখ এবং অগ্রজের সকৌতুক হাস্য-রেখা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিমেষে সে দেখিয়া লইল।

সহোদরকে দেখিয়া অমিয় কহিল,—মার্কেটটা উজাড় করে আনলে না কি?

হাসিয়া অনিল কহিল,—ইচ্ছে থাকলেও ব্যাগের সে সামর্থ্য ছিল না।

—ইস্! থাকলে তাহলে সর্ব্বনাশ হতো! আপনি ভারি উড়নচণ্ডী মানুষ—বলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে রত্না অনিলের পানে চাহিল।

—তা কি করবো! ভালো জিনিষের উপর আমার ভয়ঙ্কর লোভ! বলিয়া সে রত্নার মুখের দিকে চাহিল।

অমিয় হাসিয়া কহিল—সেইটেই মস্ত বিপদ! এক জন খুব কড়া হুঁসিয়ার মানুষ চাই তোমায় আগলাতে।

অনিল হাসিল। কহিল,—কড়া মানুষ! না, তেমন কড়া আমার প্রয়োজন নেই! এমন মানুষ আমি চাই, যাকে আমার অদেয় কিছু থাকবে না।

এ সভ্য সমাজ। রহস্যালাপ এখানে নূতন ধরণের! এখানকার আদব-কায়দায় চাল-চলনে রত্নার যতখানি চমক লাগে, বিস্ময় লাগে তার চেয়ে অনেক বেশী! তবু এ সব তার খুব ভালো লাগে। ইহাতে সে আমোদ পায়!

খপ্ করিয়া রত্না কহিল,—তাহলেই মুস্কিল! তেমন লোক আপনি খুঁজে পাবেন কোথায়? আর পেলেও তার নাগাল পাবেন কি করে?

কৌতুক-ভরা কণ্ঠে অনিল কহিল,—হয়তো খুঁজে পেয়েছি! কিন্তু নাগাল পাইনি। চাঁদকে তো হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না, চোখে শুধু দেখাই যায়। বলিয়া চকিতে সে জ্যেষ্ঠের দিকে চাহিল। দেখিল, টেবলের আস্তরণের সূচী-কার্য্যটি সহসা সে নিরীক্ষণ করিতে মনোযোগী হইয়াছে।

মিসেস্ গোস্বামী আসিলেন! কহিলেন,—এই যে অমি রয়েছে! আমি ভাবলুম, এতক্ষণে মোটর নিয়ে কোন্ বন্ধুর বাড়ী পাড়ি দিয়েছে।

অমিয় কহিল,—না, উঠি-উঠি করে আর উঠতে পারলুম না! হঠাৎ মিস্ বোসের সঙ্গে একটা তর্ক লাগলো।

তর্ক নাম শুনিয়াই মিসেস্‌ গোস্বামী মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ তুলিয়া কহিলেন,—তর্ক জিনিষটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী! ও ফিলজফি পড়ার রোগ! বলিয়া পরক্ষণেই কহিলেন,—কিন্তু অমি, মিস্‌ বোস্‌ বলছো কাকে? রত্নাকে?

অমিয় হাসিল।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—না, না, সঙ্কোচ কিসের? আমি অতটা খেয়াল করিনি! রত্নার তুমি নাম ধরো না কেন? ওকে রত্না বলেই ডেকো। অনিল রত্না বলে।

অভিযোগ তুলিয়া অনিল কহিল,—কিন্তু মা, রত্না আমাদের 'আপনি' বলে কেন? তুমি ওকে আপনি বলতে মানা করো!

মিসেস্‌ গোস্বামী হাসিলেন। সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন,—তা ঠিক! ভায়েদের সঙ্গে 'আপনি' বলে সঙ্কোচ সৃষ্টি করো না রত্না! 'তুমি' বলেই কথা কয়ো। লজ্জা কিসের? বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন,—এসো অমি, জিনিষ দেখবে।

অমিয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। এবং রত্নাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল,—তুমিও চলো, রত্না। মা কি আলাদা করে তোমায় ডাকবেন?

সহাস্যে অনিল কহিল,—রত্না তাই ভাবে।

সকলে আসিয়া ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল।

বেয়ারা তখন সদ্যঃ-ক্রীত জিনিষগুলা টেবলের উপর সাজাইয়া রাখিতেছিল!

একখানা শাড়ী তুলিয়া সপ্রশংস-নেত্রে দেখিতে দেখিতে অমিয় কহিল,—প্রেটি নাইস্‌ কলার! বেশ দামী। কত পড়লো শুনি!

সগর্ব্বে অনিল কহিল,—একশো পঁচিশ! ভেলভেট্‌ সিল্ক। বাবার বার্থ-ডেতে রত্নাকে দেওয়া হবে বলে কিনলুম।

—বেশ করেছিস! শাড়ীখানা তোমার কেমন লাগছে রত্না?

সলজ্জ হাস্যে রত্না কহিল,—আপনাদের পছন্দর কাছে—

অনিল বলিল,—কেন, তোমার পছন্দই বা আমাদের উপর যাবে না কেন? আর আপনি বলছো কাকে?

পুলকিত কণ্ঠে রত্না কহিল,—আমার খুব ভালো লেগেছে।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—আগে এই ছবির বইখানা ছাখো। এইখানা থেকে উর্ব্বশীর নাচের ড্রেস্‌ করাতে হবে। অনিল দর্জ্জিকে ফোন করেছো?

—হ্যাঁ। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে।

অমিয় কহিল,—রমেশ বাবুকে বাবা চিঠি লিখেছেন?

মা বলিলেন—হ্যাঁ, কাল ওঁকে দিয়ে সে কাজ করিয়েছি; উনি তো তাঁকে আসতে নিমন্ত্রণ করেছেন। মোদ্দা একটা কথা অমি, অনিল গানের সুরগুলো দিয়ে দিচ্ছে, তুমি সব পার্ট ঠিক করে দেবে।

অমিয় কহিল,—কাকে কোন্‌ পার্ট দেওয়া হবে, তুমি তো ঠিক করেছো!

—মোটামুটি ঠিক করেছি! তুমি সেটা দেখো। অনিল ইন্দ্র সাজবে। তুমি অর্জ্জুন! উর্ব্বশীর পার্ট দিচ্ছি রত্নাকে। চিত্রলেখা, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা—আমার স্কুলের চারটি মেয়েকে দিয়েছি! বকু সাজবে ভরত। অলক বরুণ। শচীর পার্টটা ঠিক হচ্ছে না! কাকে দি?

অমিয় কহিল,—সে আমি এক জনকে দেবো। সুশীল চ্যাটার্জ্জির বোন কল্পনা চ্যাটার্জ্জি। বলিয়া রত্নার পানে চাহিয়া অমিয় কহিল,—তোমার সঙ্গে পড়ে না?

কল্পনা নামটা কাণে আসিতে রত্নার মন বিরস হইয়া গেল। সংক্ষেপে সে কহিল,—হ্যাঁ।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—কল্পনা মেয়েটি কেমন?

অমিয় কহিল—মন্দ নয়! চলে যাবে! রাণী সাজবার ঝোঁক তার খুব। সার চাটার্জ্জির মেয়ে তো! অনিল, তুমি ছাখোনি কচ-দেবযানীতে সে দেবযানী সেজেছিল?

অনিল কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি! দেখেছি আমি তাকে। নিউ এম্পায়ারে তো? পারবে সে? ভালো কথা মনে পড়েছে—ক'খানা টিকিট পাওয়া গেছে।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—কিসের টিকিট?

—ওই যে 'মন্দির' হবে এম্পায়ারে। সাধনা বোস মধু বোসের দল। চলো না আজ।

বিস্ফারিত নেত্রে মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—আমি যাবো 'মন্দির' দেখতে, আর আমার অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর কি ব্যবস্থা হবে? তাছাড়া দর্জ্জি! এই পর্য্যন্ত বলিয়া জ্যেষ্ঠ সন্তানকে তিনি কহিলেন,—তুমি এখনি ফোন্‌ করো। কল্পনাকে আসতে বলেছো অমি? সুশীলও যেন আসে। এইখানেই সব চা খাবে। বুঝলে!

—দিচ্ছি আমি ফোন্‌ করে।

—দিচ্ছি নয়। আগে উঠে ফোন্‌ করো। কি জানি, কোথায় কি নিমন্ত্রণ নিয়ে ফেলবে।

অমিয় আদেশ পালন করিতে উঠিয়া গেল।

বেয়ারা আসিয়া জানাইল, ওস্তাগর।

—আসতে বল্‌। অনিল তুমি ওকে কাজটা বুঝিয়ে দাও!

বেয়ারার পশ্চাতে বাঙালী মুসলমান দর্জ্জির প্রবেশ। মিসেস্‌ গোস্বামীকে সেলাম করিয়া সাহেবদের সে অভিবাদন জানাইল।

অনিল কহিল,—কাজটা তোমাকে সাত দিনের মধ্যে দিতে হবে করিম।

—আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিন হুজুর।

—নাচের পোষাক। বেনারসী আর অরগাণ্ডি মিশিয়ে করতে হবে। মানে, তোমরা যেমন করো তেমন নয়, এই বইটা থেকে দেখে করতে হবে। জিনিষটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলিয়া রূপচিত্রের বইখানা অনিল খুলিল।

অমিয় আসিল, কহিল—কল্পনাকে নিয়ে সুশীল বিকেলে তিনটের সময় আসবে। মহা খুশী—তুমি নিমন্ত্রণ করেছো শুনে!

দুই ভাইয়ে এইবার দর্জ্জিকে নাচের পোষাক সম্বন্ধে উপদেশ দিতে সুরু করিল। মাঝে মাঝে মিসেস্‌ গোস্বামীও ওস্তাগরকে একটু আধটু বাতলাইয়া দিতে লাগিলেন।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—রত্না, তোমার মাপটা করিমকে দাও।

হাতের ফিতা লইয়া ওস্তাগর রত্নার সামনে আসিল। রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। অমিয় অনিল এবং মিসেস্‌ গোস্বামী রত্নার কোন্‌খানের মাপটা কেমন হইবে, তাহার আলোচনা করিয়া দর্জ্জিকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন!

৯

অমলা বসিয়া বড়ি দিতেছিলেন, রমেশ আসিয়া উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন,—ওগো, শুনেছো ?

মুখ তুলিয়া অমলা কহিল,—কি ? হাতে ও কলকাতার চিঠি বুঝি ?

—হ্যাঁ ! রত্নাকে নিয়ে সেখানে হৈ-চৈ পড়ে গেছে একেবারে।

চমকিত কণ্ঠে অমলা কহিল,—কেন ? কি করেছে সে ? মুখ তাহার পাংশু।

—ভঃ ! তোমার কেবলি ভয়। বলি, মেয়ে তোমার ক্ষণ-জন্মা গো ! শাপভ্রষ্টা সরস্বতী !

অমলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল,—কি হয়েছে ?

—চিঠিখানা পড়ে ছাখো, সত্যপ্রসাদ কি লিখেছে ! মেয়ের পরিচয়েই আজ আমাদের পরিচয় !

সে-কথায় সাড়া না দিয়া অমলা কহিল,—খুকী আছে কেমন ? বড়দিনের ছুটীতে যে তাকে আসতে লিখেছিলুম—

রমেশ বিরক্ত হইলেন, কহিলেন,—কেন ? তোমার বড়ি দিতে ? না, ঘুঁটে দিতে ? তাঁহার স্বরে শ্লেষ।

স্বামীর এ কথায় অমলার রাগ হইল। ঝাঁজালো স্বরে তিনি কহিলেন,—দোষ কি ? তার মা যে কাজ করতে পারে, তার তাতে লজ্জা কিসের ?

—খুব—খুব লজ্জা আছে। মা তো আর মেয়ের মত রূপ-গুণ নিয়ে জন্মায়নি !

—রূপ-গুণ নিয়ে জন্মালে কি করতো শুনি ? যাত্রা ? না, থিয়েটার ? এ কথার প্রচ্ছন্ন খোঁচা রমেশ আমলেই আনিলেন না ; উৎসাহের সুরে কহিলেন,—নিশ্চয় থিয়েটার। রত্না করবেও তাই ! সত্যপ্রসাদ সেই কথাই লিখেছে।

বিমূঢ় স্বরে অমলা কহিলেন,—পাগল হয়েছো না কি তোমরা ! গেরস্ত-ঘরের মেয়ে থিয়েটার করবে কি ?

কৃপা-দৃষ্টিতে পত্নীর পানে চাহিয়া মৃদু হাস্যে রমেশ কহিলেন, —সাধে বলতে হয়, কুয়োর ব্যাঙ কি সমুদ্দুরের খবর রাখতে পারে !

স্বামীর উপমা শুনিয়া অমলার ভয়ানক রাগ হইল। না হয় মেয়ে দু'পাতা ইংরেজী পড়িয়াছে, পিতৃ-আকৃতির বর্ণ-বর্ণ পাইয়া সুঠাম প্রতিমায় সরস্বতী হইয়াছে ! তাই বলিয়া তিনি গর্ভধারিণী ! প্রতি পদে কথার রূঢ় আঘাতে গর্ব্ব হইয়া শেষে কুয়োর ব্যাঙে পরিণত হইবেন ! কেন ?

বিরস কণ্ঠে অমলা কহিলেন,—সমুদ্দুর তো চোখে দেখিনি কখনো ! তার ডাক শোনবার দরকারই বা কি ! মিছে আপশোষ থেকে যাবে।

পাটীর আসনখানা রোয়াকে পাতিয়া রমেশ উপবেশন করিলেন। কহিলেন,—খালি ঝগড়া করবে ? না, চিঠি শুনবে ? সুর তাঁহার নরম।

কিন্তু অমলার মনের ক্রোধ তখনও শান্ত হয় নাই। উষ্ণ কণ্ঠেই তিনি কহিলেন,—মুখ্যু মানুষ, তোমার হোমরা-চোমরা মেয়ের চিঠি আমি আর কি শুনবো ! বলিয়া বড়ি-দেওয়া হাতটা পাশের গামলার জলে ধুইতে লাগিলেন।

পত্নীকে তুষ্ট করিবার জন্য রমেশ কহিলেন,—হার মানচি গো ! ফল দেখেই মানুষ গাছ চেনে। তুমি বুদ্ধিমতী না হলে কি আর তোমার মেয়ে এমন বীণাপাণি হতে পারতো ! ঠাট্টা করে আমোদ করে যদি একটা কথা বলে থাকি, তাতে এমন গোঁসা !

এমনি বাক্য-বিন্যাসে স্বামি-স্ত্রীতে সন্ধি হইয়া গেল। পত্নী কহিলেন—সত্যপ্রসাদ বাবু কি লিখেছেন ?

—বাবু নয় ! সাহেব। রত্নার খুব সুখ্যাতি করেছেন। সত্যর জন্মদিনে একটা নাটিকার অভিনয় করাবেন ! রত্নাকে তিনি উর্ব্বশী সাজাতে চান, তাই আমার সম্মতি চেয়েছেন।

—থিয়েটার করবে রত্না ! পাঁচ জনে দেখতে আসবে ?

—তা না তো কি দোরে খিল দিয়ে থিয়েটার করবে ! তোমরা যেমন ছোটবেলায় বউ বউ খেলতে গো ! তা সে হলো সহর কলকাতা, সেখানে ও-সব বাছ্-বিচার চলে না ! তারা হলো সব সভ্য, শিক্ষিত !

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অমলা কহিলেন,—তারা সভ্য বলে কি বাপ-মা ভাই-বোন—অচেনা পুরুষ বিচার করবে না ? সোমত্ত মেয়েরা সেজে-গুজে নাচবে সকলের চোখের সামনে বাইজীর মত ?

—কি তাতে দোষ শুনি। আমাদের পুরাণে নেই ? বেহুলা যে ইন্দ্রের সভায় নেচেছিল ! তোমার মেয়ে যদি নাচে তো সে তার ভাগ্য বলে জেনো !

অমলা উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—চললে যে !

—ও-দিকে কাজ আছে। এ তো সাহেবের বাড়ী নয় যে বেয়ারা-খানসামা ঘুরছে। গৃহস্থের সংসার ! বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মধ্যাহ্নে আহার সারিয়া রোয়াকে মাদুর পাতিয়া তাকিয়া লইয়া রমেশ বিশ্রাম করিতে বসিলেন। অমলা পাণ-দোক্তা মুখে পুরিয়া কাছে আসিয়া বসিল। সকালে যে চাপা কলহে দু'জনের মন তিক্ত হইয়াছিল, এখন ভোজন-পর্ব্বের পর অবসর-মুহূর্ত্তে তাহার কোন চিহ্নও ছিল না।

রমেশ হাসিতে হাসিতে গোস্বামি-গৃহের সম্পদ-বিভবের অপূর্ব্ব কাহিনী পত্নীর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছিলেন। এবং হৃষ্ট চিত্তে রূপকথা শোনার মত মুগ্ধ বিস্ময়ে অমলা সেই বহুবার-শ্রুত প্রত্যেক কথাটি মনে গাঁথিয়া লইতেছিল।

রমেশ কহিলেন—সোজা কথা ! সত্যর এক ছেলে হাকিম, আর এক ছেলে ব্যারিষ্টার—সত্যরই সে জুনিয়ার।

অমলা কহিল,—ভগবান্ যাকে দেন, সবই ভালো দেন। এ তো আমাদের মত হতভাগার অদৃষ্ট নয় !

মাথা চুলকাইয়া রমেশ কহিলেন,—তা বটে ! দেখ না ওরা বামুন, আমরা কায়েত—এ এক মস্ত ব্যবধান ! না হলে—যাক্‌গে, এই তিন আঙুল জমিই সব ! বলিয়া নিজের কপালে হাত দিলেন। কহিলেন,—একটা কথা কি ভাবি, জানো ? বলিয়া চারি পাশে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—ওখানে সব ঘর-আনা ঘরের রুই-কাতলারা আনাগোনা করে ! রত্নাকে সত্য নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসে, যদি তার একটাকে গেঁথে দিতে পারে ! আমার মেয়ের রূপ কেমন—যদি এই পাড়াগাঁয়ে আনি, তাহলে কি আর তা হবে ? তুমি কি বলো ?

ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ-গৃহিণী কহিলেন,—তা বটে। তা তোমার সাহেব কি লিখেছে? মেম-সাহেবই বা কি লিখেছেন!

—সেই আমার উর্ব্বশী সাজার দুর্দ্দশার কাহিনী। সত্য স্ত্রীর কাছে সে গল্প করেছে। সে ভয়ানক জিদ ধরেছে, সত্যর জন্মদিনে অর্জ্জুন উর্ব্বশীর অভিনয় হবে—তাতে রত্নাকে সাজতে হবে উর্ব্বশী। ওর ছেলেরাও নামবে! আমাকে ভরত-মুনি সাজতে অনুরোধ করেছে! লিখেছে, ভয় নেই, গুরুজনরা থাকবেন না, দুর্দ্দশার কোনো সম্ভাবনা নেই!

পুরানো দিনের সকল কথা অমলার মনে পড়িল। হাসিয়া সে কহিল—তুমি যাচ্ছো তাহলে?

—না। ইচ্ছা ছিল, যাই। কিন্তু ঘটে উঠবে না। ইস্কুল ইন্‌স্পেকসনে আসবে, খবর এসেছে। যাই কি করে?

হাসিতে হাসিতে অমলা কহিল—ভরত-মুনি সাজলে দেখাতো ভালো—দাড়ি-চুল তো কিছু কম নেই!

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ঠাট্টা! আমি যদি নামতুম, দেখতুম, তুমিই সত্যকারের মুনি ভেবে পায়ের গোড়ায় ঢিপ্‌ করে পেন্নাম করতে!

—না হয় এখনই পেন্নাম করছি। সে দুঃখ আর থাকে কেন!

রমেশ হাসিয়া কহিল—তোমাদের শুধু পায়ের ধূলো নিয়ে পাদোদক খেয়ে ভক্তি করা। কিন্তু ওরা জানে, যাকে ভালোবাসি, তাকে কি করে আনন্দ দিতে হয়। সত্যি লেখাপড়া না শিখলে মানুষ ভালোবাসতে পারে না।

অমলার প্রফুল্ল মুখ ঈষৎ গম্ভীর হইল। নীরস কণ্ঠে কহিল,—তাদের ভালোবাসা তারাই বোঝে! আমরা তেমন শিক্ষা-দীক্ষা পাইনি—আর আমাদের স্বামী দশ-বিশ হাজার টাকা রোজগার করে আনলো না তো! অল্প যা আনে, তাতে দিন-গুজরান করতেই আমাদের দিন কাটে, এতেই আমরা সুখী! এই পর্য্যন্ত বলিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর কহিল,—সুখ কিছুতেই নেই গো, সুখ মানুষের মনে। যাই, দেখিগে বড়িগুলো।

পত্নী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। রমেশ তাকিয়াতে হেলান দিয়া গায়ের কাপড়খানা ভালো করিয়া গায়ে টানিয়া দিয়া চক্ষু মুদিলেন—নিদ্রার চেষ্টায়।

১০

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। পল্লীবধূর শঙ্খরোল কুয়াশা-ভরা আকাশকে চঞ্চল করিয়া থামিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যা সরিয়া গেলেও পিছনে চাঁদের আলো নাই,—নিবিড় অন্ধকার।

গায়ের র‍্যাপারখানা মুড়ি দিতে দিতে রমেশ কহিল,—একবার হরিশের ওখানে যাচ্ছি বড়-বৌ।

ঠাকুর-ঘর হইতে অমলা কহিল,—কেন, সকালে গেলে হতো না? যে রকম ঠাণ্ডা পড়েছে।

—না, বেশ করে মুড়ি দিয়েছি। এই কাণ-ঢাকা টুপি কিনলুম কেন? ঘুরে এখুনি আসছি। বলিয়াই রমেশ ভ্রাতৃ-উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া হরিশ ছেলে-মেয়েদের পড়াইতে বসিয়াছিল। অকস্মাৎ জ্যেষ্ঠের কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া ব্যস্ত স্বরে উত্তর দিলেন—কে? দাদা!

রমেশ উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছিল,—হরিশ ওপরে না কি?

হরিশ ত্রস্তে বারান্দায় বাহির হইলেন। কহিলেন—এখনি নীচে যাচ্ছি!

—না, না, আসতে হবে না, আমিই উপরে যাচ্ছি। বলিয়া রমেশ উঠিয়া আসিলেন।

মণি তখন এ্যালজেবরা খুলিয়া অঙ্ক কষিতেছিল। জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিয়া অঙ্ক ভুলিয়া অবাক হইয়া চাহিল।

রমেশ কহিল,—আঁক কষছিস্! দ্যাখো হরিশ, রত্নাকে সন্ধ্যেবেলা বসে পড়াতুম—তাই এ সময়টা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। ভাবি, এখানে আসি,—এদের একটু—

হরিশ যেন বর্ত্তাইয়া গেছে এমনি আগ্রহে কহিল,—তোমায় কষ্ট করে আসবার দরকার কি দাদা! এরাই তোমার ওখানে যাবে।

মণি কহিল,—জ্যাঠামণি, তুমি তো রত্নাদিকে পড়াতে, তাই সে কুড়ি টাকা করে—

—হ্যাঁ মা, তবে রত্নার কথা আলাদা!

হরিশ কহিল,—নিশ্চয়! রত্নার সঙ্গে কার তুলনা হয়?

রমেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ করি এমনি একটা প্রসঙ্গের অবতারণাই তিনি চাহিতেছিলেন। উৎসাহিত কণ্ঠে কহিলেন,—কিছু মিথ্যে বলিস্‌নে ভাই! এই কলেজেই দেখ্ না, প্রিন্সিপাল কি রকম ওকে ভালোবাসে! আরো কত মেয়ে তো রয়েছে!

বিস্মিত স্বরে হরিশ কহিল,—তাই না কি! আহা, দাদা, ও যদি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাতো, তাহলে আমাদের বংশের একটা নাম রাখতো।

রমেশ অন্তরে ঈষৎ আহত হইলেন। তাচ্ছিল্য স্বরে কহিলেন,—ছেলে-মেয়ের তফাৎ আমি মানি না! এই তফাৎ-বোধে কত ক্ষতি হয়, জানো?

অগ্রজের মনের দুর্ব্বলতা কোন্‌খানে—হরিশ তাহা ভালো করিয়াই জানেন। তাই সে তর্ক ছাড়িয়া নিরীহের মত কহিলেন,—সে তো নিশ্চয় দাদা, আমাদের সমাজের ওই একটা মস্ত দোষ! গোড়া থেকেই ছেলে-মেয়েতে তফাৎ করে।

রমেশ কহিলেন,—তাই তো আমি তোমার বৌদির ঘ্যানঘ্যানানি কাণে না তুলে ওকে কলেজে পড়তে পাঠালুম! কলকাতার সমাজে তাকে নিয়ে কি রকম হুলস্থুল পড়ে গেছে আজ।

বিমূঢ় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হরিশ অগ্রজের পানে চাহিল।

রমেশ বলিয়া চলিলেন,—এখন হাইকোর্টে সব চেয়ে বড় ব্যারিষ্টার হচ্ছেন গোস্বামী-সাহেব।

হরিশ কহিল,—সুকুমারী পিসির ছেলে না?

মাথা নাড়িয়া রমেশ কহিলেন,—হ্যাঁ! আমার সঙ্গে কি ভাবটাই তার ছিল! তাই তো সত্যপ্রসাদকে রত্নার গার্জ্জেন করে এসেছি।

অবাক হইয়া হরিশ কহিল,—এ্যা, তিনি তোমায় চিন্‌তে পারলেন?

—পারবে না? বলে, বন্টু বলতে সে অজ্ঞান! রত্নাকে কি রকম ভালোবাসে। ওর স্ত্রী তাকে নিজের মেয়ের মতই দেখেন! আমার সঙ্গেই ছিল ছোট-বেলার সত্যপ্রসাদের সব কিছু গল্প,—ভাবটা আমাদের কম ছিল না তো।

হরিশ হাঁ করিয়া রত্নার প্রসঙ্গ গিলিতে ছিল। প্রত্যেকটি শব্দ-বর্ণ—সমস্ত যেন মনের মধ্যে গাঁথিয়া লইতেছিল। রমেশ থামিতে সে কহিল,—এত দিন বলতে হয় দাদা, তা হলে আফিসের লোকের কাছে গল্প করতুম। এত বড় কৌশুলী আমার দাদার ফাষ্ট ফ্রেণ্ড—আমার ভাইঝী তাঁর পুষ্যি-মেয়ের মত মানুষ হচ্ছে।

—নিশ্চয়! পুষ্যি মেয়ে ছাড়া আর কি বলতে পারা যায়! জানো না, সত্য চিঠি লিখেছে—তার জন্মদিনে অর্জ্জুন-উর্ব্বশী প্লে হবে—রত্নাকে উর্ব্বশী সাজতেই হবে। ওঁর ছেলেরাও নামবে। এক ছেলে আই, সি, এস; বুঝলে রমেশ,—আর এক ছেলে ব্যারিষ্টার।

মাথা নাড়িয়া হরিশ কহিল,—একেই বলে ভাগ্য, দাদা! রত্না ভুল করে আমাদের ঘরে জন্মেছে—সে ওর চেহারাতেই মালুম,—তার পর বিদ্যাবুদ্ধি!

কথাটা রমেশের মনঃপূত হইল না! মুখের চেহারাতেই তাহা বুঝা গেল! কহিলেন,—না হরিশ, ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে জানা চাই।

—সে তো ঠিক কথা! হাত চাই, খাতিরদারও চাই। হাঁ দাদা, ছুটিতে তা হলে রত্না এখানে আসবে না?

রমেশ কহিলেন,—না। কি করে আসবে? সত্যর বার্থ-ডে পড়ছে! আমাকেও যাবার জন্য সত্য নিমন্ত্রণ করেছে!

—তোমাকেও নিমন্ত্রণ করেছে! তা দেখ দাদা, তুমি যদি যাও, এ-সব ধুতি-পাঞ্জাবী পরে যেয়ো না।

—রামচন্দ্র! তারা একদম সাহেব—বাড়ীতে ঢুকলে বোঝে কার সাধ্যি যে বাঙালীর বাড়ী, কি ইংরেজের বাড়ী!—কিন্তু সত্যর আসল মেজাজটা দেখলুম একটুও বদলায়নি।

সে কথায় কাণ না দিয়া হরিশ কহিলেন,—ওখানে আলাপ রাখতে গেলে এক-প্রস্থ স্যুটের দরকার।—তা আমায় টাকা দিলে আপিসের ফেরৎ চাঁদনীর চক্ হতে সস্তা দেখে তোমার কোট-প্যান্ট-সার্ট সব আনবো।

সঙ্কুচিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—কিন্তু এটা শীতকাল—গরম স্যুট চাই তাহলে। আবার ওভার-কোট। আমি আবার ছাই টাই বাঁধতে জানি না যে!

—ও সব কিছু ভাবনা নেই। বাঁধা টাই পর্য্যন্ত চাঁদনীর বাজারে পাওয়া যায়। আমাদের আপিসে সব দেখি তো, পরে আসচে! আমি সব কিনে আনবো ঠিক!

—হাঁ, সে জানি, হরিশ! কিনতে যদি হয় তুমিই ভালো পারবে। আমার আবার রুমাল থেকে পায়ের সু অবধি চাই কি-না—টাকা কিছু বেশী পড়বে। মেয়েটার জন্য অত খরচ—তাছাড়া আমার আয় তো তোমার অবিদিত নয়!

হরিশ মাথা চুলকাইয়া কহিলেন,—কিন্তু আয়ের হিসেব দেখে সব সময় ব্যয় করা চলে না দাদা। মাঝে মাঝে চোখ-কাণ বুজে কিছু দমকা খরচ করতে হয় বই কি! না হলে বড়লোকের সঙ্গে ভাব রাখা যায় না!

মাথা নাড়িয়া সমর্থনের সুরে রমেশ কহিলেন,—যুক্তিটা ঠিক! আর ওরা যেমন করে চিঠি লিখেছে—চিঠিখানা যে ফেলে এলুম, ছাই!

মণি নীরবে পিতার এবং জ্যেষ্ঠতাতের কথা শুনিতেছিল। সাগ্রহে কহিল,—যাবো জ্যাঠামণি? চিঠিখানা আনবো?

—যাবি?—তা যা! আচ্ছা, রোস্, দেখি বুক-পকেটটা! বলিয়া সযত্নে রক্ষিত পত্রখানা পকেটের মধ্যে হাত দিয়া অনুভব করিয়া কহিলেন,—না রে, চিঠিখানা এই যে রয়েছে। তোকে আর যেতে হবে না! বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

চিঠিখানা যে হরিশের দু'টি চক্ষুকে সার্থক করিয়া দিবার জন্য তিনি আনিয়া ছিলেন, হরিশ তাহা বুঝিতে পারিলেও রমেশের এ ছলনাটুকু মণির চোখে ধরা পড়িল না। আগ্রহ-সহকারে সে কহিল,—দেখি, অত-বড় ব্যারিষ্টারের হাতের লেখা!

রমেশের হাত হইতে হরিশ চিঠি লইয়া খুলিবামাত্র পিতাপুত্রে একসঙ্গেই হারিকেনের আলোর সামনে আনত হইলেন।

মণি কহিল,—এঁ্যা, এমনি হাতের লেখা! আজ সকালেই বিশ্রী হাতের লেখার জন্য মণি বাপের কাছে ধমক খাইয়াছিল।

আক্ষেপের সুরে হরিশ কহিল,—বড় হওয়া কপাল! আমরা ছোটবেলা হাতের লেখা ভালো করবার জন্য কি বকুনিই খেতুম—তাই মরছি কেরাণীগিরি করে—

রমেশ কহিলেন,—সে যুগ গেছে রে ভাই,—চিঠিখানা চেঁচিয়ে পড়তো, সবাই শুনি! আচ্ছা, আমিই পড়ছি। ও হাতের লেখা তুই ভাল পড়তে পারবি না! বলিয়া রমেশ বহুবার-পড়া চিঠি আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

প্রিয় সুহৃদ্

রত্না-মার এই ছেলের জন্মদিনে উর্ব্বশী-নাট্য অভিনয় হবে, মিসেস্ গোস্বামীর বিশেষ ইচ্ছা, রত্না সাজবে উর্ব্বশী। আমিও তাহলে খুব আনন্দিত হই। অপেক্ষা শুধু তোমার অনুমতির, আর সেই প্রতীক্ষাতেই রইলুম! আর আমার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ পত্রযোগে তোমায় জানাচ্ছি। বন্ধু, এসো, ভারী খুশী হবো। সে দিন তোমার উর্ব্বশী সাজার দুর্দ্দশার গল্প এঁদের কাছে করেছিলুম। হাসির তোড়ে আমার ড্রইং-রুমে শিলিংগুলো অবধি কেঁপে উঠেছিল। মিসেস্ গোস্বামী তোমাকে ভরতমুনি আর আমাকে নারদ ঋষি সাজাবেন, বলছেন। ওঁর হাতে পড়ে আমাকে বেহাল না হতে হয়। বন্ধু তুমি সহায় হতে এসো। হরিপদ গাঙ্গুলীর খোঁজ নিয়ো। সুরেন অধিকারীকে তো আর পাবো না।

আশা করি, তোমার সব ভাল। আমারও সমস্ত কুশল। ইতি

তোমার

এস, পি।

তাহারই নীচে ছোট অক্ষরে লেখা মিসেস্ গোস্বামীর লেখা কয়েক ছত্র।

হাসিতে হাসিতে রমেশ কহিলেন,—শোনো, তার স্ত্রী কি লিখেছে। বলিয়া পড়িলেন,—

"গুরুজনরা থাকিবেন না! নির্ভয়ে বন্ধু-যুগলে অভিনয় করিয়া আমাদের নয়ন-মন সার্থক করুন। সত্বর আসুন।"

হরিশ কহিল,—এরা তোমায় যেমন খাতির করে দাদা, তেমনি ভালোও বাসে। একটা কথা বলো তো—

সহর্ষ কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—বল্ না, কি কথা!

—ইনসিওর কোম্পানীর একটা বড় চাকরী খালি আছে। শুনেছি, উনি বললেই হয়। বেশ মোটা মাহিনা। যদি—

সবটা শুনিবার প্রয়োজন হইল না। রমেশ কহিলেন,—নিশ্চয়

করবো, না হয় রত্নাকে দিয়ে জেদ করিয়ে তোকে দেওয়াবোই ও চাকরি। আমি কথা দিচ্ছি তোকে !

১১

গভীর রাত্রে অমলা স্বপ্নের ঘোরে কাঁদিয়া উঠিল। রমেশের ঘুম ভাঙিয়া গেল। পত্নীকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিলেন, কহিলেন,—ও বড়-বৌ, কি স্বপ্ন দেখছিলে ? চোর এসেছে ?

—এঁ্যা ! বলিয়া অমলা চোখ চাহিল। রমেশ গায়ে হাত দিয়া কহিল,—ইস্, ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে ! ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে না এঁটে ঘরের ছ্যাঁদা অবধি বুজিয়ে শোয়া—জানলা খুলে দিই—ঘরটা ঠাণ্ডা হোক। বলি, কি স্বপ্ন দেখছিলে ?

—খারাপ স্বপ্ন।

হাসিয়া রমেশ কহিলেন,—কি ? আমি মরে গেছি ?

—কি কথার ছিরি !

—তবে ? আমি আর একটা বিয়ে করেছি ?

—করে থাকো, করেছো। তাতে আমার কি !

—আঃ, বলো না, তবে কি ? ও, বুঝেছি, লজ্জা হচ্ছে ! সত্যব হাত ধরে তুমি চলে যাচ্ছ—আর তোমার বুকের মধ্যে বসে সতী-নারী অঝোরে কাঁদছে !

অমলা ফুঁসিয়া উঠিল—মরি মরি, কি কল্পনা ! নিজে যেমন বন্ধুর ঐশ্বর্য্য-বিভব দেখে মুগ্ধ, ভাবো সকলেই তেমনি !

—অয়ি সুলোচনে, অর্থের মোহিনী-শক্তি মাদকতা তুমি জানো না—তাই তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছো, কিন্তু সে মহা-বস্তু !

—হয়েছে গো হয়েছে। দেখ, রত্নাকে তুমি থিয়েটার করতে দিয়ো না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমেশ কহিলেন,—কেন ?

—আমি বড্ড বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।

গম্ভীর কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—কি স্বপ্ন ? মুখে তাঁহার বিরক্তির চিহ্ন।

মিনতির স্বরে অমলা কহিল,—দেখ, যত মুখ্যুই হই, আমি তার মা। আমার চেয়ে তার মঙ্গল-চিন্তা আর কারু বড় হতে পারে না !

বাধা দিয়া রমেশ কহিলেন,—আমি তার বাপ বড়-বৌ। শুধু বাপ বললেই কথা বলা হলো না। জগতে আমার যা কিছু—আমার মরা-বাঁচা—সব ওই রত্নার উপর নির্ভর করছে ! আর বড়-বৌ, আমার মত রত্নাকে তুমি পারো ভালোবাসতে ?

—না, সে কথা আমি বলিনি ! আমি স্বপ্ন দেখছিলুম—

তাচ্ছল্যের ভবে রমেশ কহিলেন,—স্বপ্ন চিরকালই মিথ্যা হয়। তাই লোকে বলে, যা বাস্তব নয়, তাই স্বপ্ন ! আচ্ছা বলো, তবু কি স্বপ্ন, শুনি।

—বলছি। দেখ, স্বপ্ন দেখলুম, রত্না থিয়েটার করছে—কি চমৎকার তার পোষাক—তেমন পোষাক স্বর্গের মেয়েরাই পরে ! কি সুন্দর সে নাচছে—কত লোকে তাকে ঘিরে রেখেছে—সে কি বাহবা পাচ্ছে—সকলে অজস্র ফুল দিচ্ছে, মালা দিচ্ছে, তোড়া দিচ্ছে—

সাগ্রহে রমেশ কহিলেন,—তার পর ?

অশ্রুসিক্ত স্বরে অমলা কহিল,—কে বললে, সে আমার মেয়ে। তারা সকলে রত্নাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি রত্নাকে কত ডাকচি—কিন্তু সে এমন মাতোয়ারা যে আমার ডাক শুনতেই পাচ্ছে না !

হাসিয়া রমেশ কহিলেন,—এ তো আনন্দের স্বপ্ন !

—আনন্দ কি গো ? স্বপ্নে মা ছেড়ে চলে-যাওয়া খারাপ !

রমেশ কহিলেন,—তার চেয়ে বলো তোমার মাথা খারাপ। এটুকু বুঝতে পারলে না বড়-বৌ, রত্না তোমার গর্ভে জন্মালেও সে এসেছে অপ্সরা-লোক থেকে। আমার মুখে গল্প শোনোনি, নূরজাহান মরুভূমিতে জন্মালেও শেষে হয়েছিলেন ভারত-সম্রাজ্ঞী ! তোমার এই মেয়েও তাই ! না হলে সত্য তাকে এত স্নেহ করবে কেন ?

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অমলা কহিলেন,—তাই—

কথা শেষ হইল না।

মাথার দিকে নিম-গাছে একটা পেচক হঠাৎ কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

মাটি ও ফুল

দেহ চায় দেহ হ'তে উৎসারিতে প্রেমের কমল
সম্ভোগের রূপে-রসে দিতে চায় স্থান ;
প্রেম চায় বন্ধ হোক্ অবারিত গতি
দেহ হতে দেহাতীতে অনন্ত প্রয়াণ !
তনু চায় আভরণে সাজাতে নিজেরে
অপরূপ আবরণে আবরিতে লাজ ;
প্রেম চায় খুলে দিতে সর্ব্ব-আভরণ,
আছাড়ি ভাঙ্গিতে চায় ভূষণের সাজ।
দেহ চায় বাহু দিয়ে বাঁধিতে প্রেমেরে
দেহের অতলে তারে রাখিতে লুকায়ে,—
প্রেম চায় প্রতি-বারে প্রতিটি পরশে
প্রতিটি চুম্বনে তারে ফেলিতে চুকায়ে !

মাটি চায় আকাশেরে ধরিয়া রাখিতে
বাঁধিবারে আপনার সীমারেখা-মাঝে ;
অনন্ত অসীম ঊর্দ্ধে হেসে কয় তারে—
কোথায় আকাশ ? আজো খুঁজে পেলি না যে !
ফুল চায় গন্ধটুকু রাখিতে ধরিয়া
চিরকাল আপনার বুকের কোরকে ;
গন্ধ চায় দ্বার খুলি বাহিরে আসিয়া
আনন্দে পাইতে ছাড়া মুক্তির আলোকে।
যে কমল ফুটে ওঠে পঙ্কতল হতে
ধরণীর মাটি তারে পিছে হতে টানে ;
মূল রাখি মৃত্তিকায় ফুল ফোটে দূরে—
পঙ্ক শুধু বৃথা কাঁদে গন্ধের সন্ধানে !

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

সংসার-খরচ

অনেক সংসারে দেখি, স্বামি-স্ত্রীতে মনের সম্পর্ক বেশ প্রীতিমধুর হলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপারে স্বামী একেবারে সরকারী-অডিটরের মত কঠিন রুক্ষ! স্ত্রীর উপর সংসার-পরিচালনার ভার, অথচ পাঁচ পয়সার জায়গায় সাত পয়সার মশলা খরচ হলে স্বামীর কৈফিয়ৎ-তলবে স্ত্রীর প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ ঘটে! আমরা এমন পরিবারের কথা জানি—শিক্ষিত এবং কালচার্ড পরিবার—সংসারে চাল-ডাল নুণ-তেলের বাইরে পোষাকী খরচপত্রের বেলায় স্ত্রীকে স্বামীর কাছে হাত পেতে পয়সার প্রত্যাশী হয়ে দাঁড়াতে হয়! স্বামী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, অথচ এ সব পোষাকী খরচের বেলায় লক্ষ জেরায় স্ত্রীকে জর্জ্জরিত করে' তবে স্বামী তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করেন। কখনো বা এ খরচের জন্য স্ত্রী যদি পঞ্চাশ টাকা চান তো জেরায় পর্যাস্ত করে স্ত্রীর হাতে স্বামী দেন চল্লিশটি টাকা! এ যেন কৌন্সিলের সেই (cut-motion) 'কাট্-মোশন্'!

সে দিন আমাদের পরিচিতা এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলা সখেদে বলছিলেন, স্বামী খরচ-পত্রের টাকা তাঁর হাতে নিঃসঙ্কোচে নিঃসংশয়ে তুলে দেন, কিন্তু হিসাবের খাতাখানি দেখেন নিত্যদিন সন্ধ্যার পর—অফিসের বড় সার্জ্জেন এ্যাকাউণ্টাণ্টের হিসাব যে ভাবে পরীক্ষা করেন, ঠিক তেমনি ভাবে। অথচ উড়নচণ্ডী বলে ঘরে-বাহিরে এ মহিলাটির এতটুকু দুর্নাম নেই!

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, স্বামী তাঁর রোজগারের কড়ির সবটুকু স্ত্রীর হাতে ধরে দেন—তা থেকে স্ত্রী দেন স্বামীর ইনসিওরেন্সের টাকা এবং হাত-খরচার টাকা। স্বামীর যদি অন্য কোন ব্যাপারে টাকার দরকার হয়, তাহলে স্বামী এসে স্ত্রীর কাছে সে-টাকা চেয়ে নেন। বাজে খরচ মনে হলে স্ত্রী টাকা দেন না! এ সংসারে টাকা-কড়ির অনটন যেমন ঘটে না, তেমনি সংসারে শৃঙ্খলা এবং শান্তিও সুরক্ষিত থাকে। দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ার দরুণ বহু উড়নচণ্ডী স্ত্রীর উড়নচণ্ডী-ব্যাধি সেরেছে এবং সংসারে তাঁরা শৃঙ্খলা স্থাপিত করতে পেরেছেন বলে আমরা জানি!

মাসিক বসুমতীতে 'এই পৃথিবী' উপন্যাসে পড়ছিলুম, ভাটিয়া শাড়ীওয়ালাদের কাছ থেকে মাস-কিস্তীর বন্দোবস্তে দামী পোষাকী শাড়ী কেনার কথা। এ নীতি অবলম্বন করে অনেকে তাল রাখতে পারেন না—ঋণভারে জড়িয়ে পড়ে সংসারে দুঃখ-কষ্ট অশান্তির সৃষ্টি করেন। এ বন্দোবস্তে দু'-একখানা শাড়ী কিনতে চান, কিনুন—কিন্তু গৃহস্থের আয়-ব্যয়ের দিকে নজর রেখে কিনবেন। এ পথে যদি তাল সামলাতে পারেন, তবেই মঙ্গল। নচেৎ ধারে শাড়ী কিনে আত্মঘাতী হওয়া কোনো মতে বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। আয় বুঝে ব্যয় করা চাই। যে সংসারে আয় হয়তো একশো টাকা,—সে সংসারের গৃহিণী যদি একশো টাকা দামের শাড়ী কিনতে চান—তা সে মাসিক কিস্তীতে হোক বা অন্য উপায়েই হোক্—তাহলে তাঁর সে খেয়ালকে কোনো দিক্ দিয়ে সমর্থন করা চলে না। তাঁরা হয়তো বলবেন, দামী শাড়ী চাই! না হলে সমাজে মর্য্যাদা থাকবে না! কিন্তু ধার-করা টাকার শাড়ী-গয়না মিললেও তাতে মর্য্যাদা মিলতে পারে না, শান্তি বা স্বস্তিও দেশ-ছাড়া হয়। সংসারের আয় ও দায় দেখে তবে শাড়ী-গহনার ব্যবস্থা! না হলে পেটে খেতে অন্ন জুটছে না, ও-দিকে জর্জ্জেট শাড়ীর বাহার—লোকে তাতে হাসে! ঘৃণা করে!

কিন্তু এক কথা থেকে অন্য কথায় এসে পড়ছি। যা বলছিলুম মানে, টাকা-পয়সার ব্যাপারে স্বামি-স্ত্রীর অধিকারের কথা। অর্থাৎ এ ব্যাপারে ধরা-বাঁধা বিধি-নিয়ম চলে না। তবে মোটামুটি বলতে পারি, স্বামী এবং স্ত্রী সংসারের মালিক! সংসারের সব দায়িত্বই দু'জনের উপরে ন্যস্ত! জীবনে দু'জনের লক্ষ্য এক। কাজেই আয় বুঝে দু'জনে একযোগে ব্যয়ের ব্যবস্থা করবেন। স্বামীর আছে সিগারেটের নেশা, স্ত্রীর আছে সিনেমা দেখার নেশা! ছেলেরা চায় ফুটবল-ম্যাচ দেখতে, মেয়েরা চায় গান-বাজনা শিখতে। অর্থাৎ চার তরফা সৌখীন খরচ! অথচ সকলের সখ মেটাবার সংসারের আয়ের পরিমাণ হয়তো অনুকূল নয়। এক্ষেত্রে রফা করতে হবে। সকলে 'দশ-ভুজা' হয়ে সখের পিছনে পয়সা খরচ করলে চলবে কেন? হাতে কিছু সঞ্চয় সব সময়ে রাখা প্রয়োজন। সঞ্চয়ের সে পয়সা একেবারে আলাদা করে শীল-প্যাকেটে মুড়ে রাখুন। তার পর সকলের স্বার্থে কিছু-কিছু কাটকুট করে সখ মেটাবার উপায় করুন! মানুষ 'মেশিন্' নয়! শুধু খাওয়া-দাওয়া আর কর্ত্তব্য সাধন করে মানুষ বাঁচতে পারে না—তাতে জীবনে মরচে ধরে। সখ্ চাই,—তবে আয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে!

সে জন্য সব দিক্ দিয়ে বিচার-বিবেচনা করে আমাদের মনে হয়, রোজগার করে রোজগারের টাকা স্বামী এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেই ভালো হয়। কারণ, মেয়েরা স্বভাবতঃ বুঝে-সুঝে সংসার-চালনায় নিপুণ। দু'-এক জন লক্ষ্মীছাড়া উড়নচণ্ডী আছেন মানি, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ব্যবস্থা হবে অন্যরকম। মেয়েদের হাতে টাকা-কড়ির ভার থাকলে খরচে তাঁরা সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারবেন। কর্ত্তার আয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলে মেয়ে-জাতের হাত ব্যয়-সম্বন্ধে দরাজ হয়। সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে মেয়েরা যেমন বুঝে-সুঝে সংসার চালনা করতে পারবেন, এমন আর কেউ নয়। পুরুষ-মানুষ রোজগার করতে পারে, কিন্তু রোজগারের টাকায় গুছিয়ে সংসার চালানো পুরুষের ধাতে পোষায় না।

এই সঙ্গে আর একটি কথা না বললে আমাদের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

স্বামী রোজগার করে রোজগারের টাকা এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন—স্ত্রী সে টাকা খরচ করছেন সংসারে সকলের সুবিধা-কল্পে—এ খুব ভালো কথা! কিন্তু ধরুন, সংসারে আছেন স্বামীর বিধবা মা, স্বামীর ভাই-বোন—তাঁরা নির্ভর করছেন ঐ স্বামীর উপর! এ ক্ষেত্রে বহু সংসারে দেখি, স্ত্রী শুধু স্বামীর এবং ছেলেমেয়েদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই লক্ষ্য রাখেন—শাশুড়ী এবং ননদ-দ্যাওর যেন গলগ্রহ! যে-বাড়ীর গৃহিণীর মনোভাব এমন, সে গৃহের কর্ত্তা স্ত্রীর হাতে যথাসর্ব্বস্ব তুলে দিলে সংসার হবে অভিশাপ-গ্রস্ত। বিধবা মা দ্বাদশীর দিনে একটা ডাব পাচ্ছেন না, অথচ গৃহিণী তাঁর স্বামি-পুত্রের জন্য কেক্-বিস্কুটের ডালিতে ঘর ভরিয়ে রেখেছেন। আপাততঃ আরাম ভোগ করলেও এমন সংসারে ছেলেমেয়ের মন উদার ভাবে গড়ে উঠতে পারে না! বিধবা শাশুড়ীকে যে স্ত্রীলোক অগ্রাহ্য করেন,

ভাজের-ননদকে দুর-ছাই করেন, সে-স্ত্রীলোক সংসারের দায়িত্ব নেবার যোগ্য নন! এমন স্ত্রীলোকের হীন-মনের প্রভাবে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়—সংসার উৎসন্ন যায়। অতএব এমন সংসারে কর্ত্তাকে ধরতে হবে সংসার-তরণীর হাল, নাহলে বানপ্রস্থ নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

রূপ-সাধনা

দিনে দিনে আমাদের দেশের মেয়েরা যে রূপ-লাবণ্যে বঞ্চিত হইতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! অল্প বয়সেই রক্তহীন বিবর্ণ মুখ! গায়ের চামড়ার মসৃণতা বা দীপ্তি নাই! মুখে ও গায়ে আঁচিল! গলার নীচে ভাঁজ পড়িতেছে,— ঘাড় ও গলা যেন কাঠের মত! চোখের কোণে কালি! মুখে কেমন নিষ্প্রভ অনাসক্ত ভাব—কোনো মতে যেন বাঁচিয়া থাকা! দুঃখ-দারিদ্র্য বা দুশ্চিন্তাই ইহার একমাত্র কারণ হইতে পারে না। দুঃখ দারিদ্র্য অভাব-দুশ্চিন্তা চির-যুগ সংসারে আছে, তবু বিশ বৎসর পূর্ব্বে সংসারের লক্ষ্মীরা লাবণ্য-দীপ্তিতে এতখানি বঞ্চিতা হন নাই তো!

বৈশাখ মাসের মাসিক বসুমতীতে বলিয়াছি, প্রকৃতির বিধি-নিয়ম যদি মানিয়া চলেন, তাহা হইলে রূপ-লাবণ্য হইতে মেয়েদের বঞ্চিত হইবার কথা নয়! আহারে-বিহারে অনিয়ম; স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ঔদাস্য; এবং সভ্যতা রাখিতে গিয়া কৃত্রিম আচার-ব্যবহারের দাস্য—এ কয়টি যেন রূপ-লাবণ্যের যম! তেলে-জলে শরীর বলিয়া যে-কথা এ দেশে চলিত আছে, সে কথা না মানিয়া চলিবার ফলেই মেয়েদের আজ এতখানি দুর্ভোগ! যন্ত্রে তেল দিলে যন্ত্র যেমন স্বচ্ছন্দ-সক্রিয় এবং মসৃণ-উজ্জ্বল থাকে, দেহ-যন্ত্রেও তেমনি তৈল-দানের প্রয়োজন। আজ সেই তৈল-দানের কথা বলিতেছি।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে skin of velvety smoothness. আমাদের দেশের কথা—

১। ঠোঁট থেকে রগ

নবনীত জিনি তনু। এ কথার অর্থ, কোমল মসৃণ তনু—হাড়ের মালার উপর রং-করা চামড়ার আচ্ছাদন মাত্র নয়! এই নবনী-কোমল তনু কি করিলে পাওয়া যায়? চামড়ায় কোঁচ পড়িবে না—গায়ের বর্ণে কালির ছোপ লাগিবে না—সংসারের কাজকর্ম্ম, লেখাপড়া, রোদে-জলে ঘোরা,—এ যুগে এ সব উপসর্গ মেয়েদের আষ্ঠে-পৃষ্ঠে ধরিয়াছে—এ-দিক্ বজায় রাখিয়া লাবণ্য-দীপ্তি ও কোমলতা কি করিয়া রক্ষা করা যায়?

২। চিবুক পর্য্যন্ত

৩। ডান কাণ থেকে

৪। ঘাড়ের দু'দিক্

৫। চিবুকের নীচে

কাজ-কর্ম্ম করিতেই হইবে। আলস্যে স্বাস্থ্য-হানি এবং তার ফলে রূপশ্রীর বিসর্জ্জন—এ-কথা ভালো করিয়া মনে রাখিবেন

৬। কপালে

সে-কালে সকালে তেল মাখিয়া স্নান—স্নানের সময় ভিজা গামছা গায়ে ঘষিয়া গাত্র-মর্দ্দন—এ ঘর্ষণে massageএর কাজ হইত।

ঘষিয়া ঘষিয়া গায়ে তেল মাখিবার ফলে গায়ের চামড়াকে মসৃণ কোমল রাখা যায়। আজকাল সাবানের বেওয়াজ হইয়াছে। সাবান মাখা দোষের নয়। ঘষিয়া ঘষিয়া গায়ে সাবান মাখিলে তাহাতেও massage এর ফল পাওয়া যায়। শুধু দেখিবেন, বাজে সাবান গায়ে মাখিবেন না। বাজে সাবানে গায়ের তেলা-ভাব উবিয়া যায়, গায়ের চামড়া রুক্ষ শুষ্ক কঠিন হয়! নোংরা জলে স্নান করাও দোষের। আমাদের গায়ের চামড়া যে হাড়-মাসের উপর রমণীয় আচ্ছাদন মাত্র, এ কথা ভাবিবেন না। এই চামড়ার অজস্র লোমকূপ দিয়া আমাদের দেহের মধ্যে অহর্নিশ বাতাস প্রবেশ করিতেছে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো ভিঞ্চির মডেলের সর্ব্বাঙ্গে সোনালি প্রলেপে ঢাকিয়া দিবার ফলে বেচারীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল! হিম, রৌদ্রের তাপ, বৃষ্টির ছাট, ধূলা, ঝড়—এ সবের আক্রমণ হইতে আমাদের গায়ের চামড়াকে সযত্নে রক্ষা করা চাই। কারণ, ও সবে চামড়ার তেলা মসৃণ ভাব নষ্ট হয়, রূপশ্রী মলিন হয়।

মুখ, হাত, পা, গা সুস্থ ও লাবণ্যদীপ্ত রাখিতে হইলে ক্রীম ব্যবহার করা চাই। বাজে ক্রীম কিনিবেন না। যে ক্রীম বেশ হাল্কা এবং তৈলাক্ত (oily)—গায়ে দিবামাত্র গায়ের তাপে গলিয়া যায়, এমন ক্রীম মাখিবেন। ভালো এবং উপযোগী ক্রীম মাখিলে গায়ের ও মুখের চামড়ার ধূলা-ময়লা মুছিয়া যাইবে। গলা, ঘাড়, হাত, মুখ—সর্ব্ব-অঙ্গে ক্রীম লাগাইয়া মৃদু-ঘর্ষণে ক্রীমটুকু অঙ্গমধ্যে বিলীন করিতে হইবে। তার পর massage বা দলন-মর্দ্দনের জন্য চাই বিশেষ বিধি-পালন।

এ বিধি পালন করিতে চাই ধীরে ধীরে অঙ্গ চাপড়াইবার জন্য 'প্যাটার'। ছবি দেখুন। গোল করিয়া একটু রবার কাটিয়া একটি হ্যাণ্ডেলে আটিয়া লইবেন। তাহারি নাম প্যাটার।

প্যাটার কি ভাবে ব্যবহার করিবেন, সে কথা জানিবার আগে আর একটা কথা বলি। আমাদের চামড়ার ঠিক নীচেই দেহ-মধ্যে আছে জালের মত বিছানো অসংখ্য রক্ত-থলি (blood vessels)। অঙ্গে প্যাটার দিয়া মৃদু ভাবে নিয়মানুগ আঘাত করিলে সেই থলিসমূহের রক্ত চপল স্রোতে দেহমধ্যে তরঙ্গায়িত হইবে—দেহের কোনো স্থানই রক্ত-প্রবাহ হইতে বঞ্চিত থাকিবে না। যে অঙ্গে রক্ত-স্রোত পৌঁছায় না, সে অঙ্গ জড়বৎ অলস হইয়া থাকে এবং তার ফলে হয় বাত, পক্ষাঘাত এবং এমনি বহু ব্যাধি। সুতরাং রক্ত-চলাচল-ক্রিয়া কোনো দিক্ দিয়া ব্যাহত না হয়, তাহার জন্য চাই পরিচ্ছন্নতা এবং ব্যায়াম।

ট্যাপার ভিন্ন এ ব্যায়াম অন্য উপায়ে চলিবে না, তা নয়। আঙুল টিপিয়াও ট্যাপারের অনুরূপ ফল পাওয়া যাইবে।

১। প্রথমে নাকের কাছে আঙুল টিপিয়া ট্যাপার দিয়া ঠোঁটের পাশ দিয়া রগ পর্য্যন্ত মৃদু আঘাত করুন। চক্রাকারে এ আঘাত সম্পাদন করিতে হইবে—ডান দিক্ ও বাঁ দিক্—পর্য্যায়ক্রমে সারিয়া লইবেন। (১নং ছবি)

২। তার পর ২নং ছবির ভঙ্গীতে ঠোঁট হইতে চিবুক পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশে ট্যাপারের মৃদু আঘাত—মুখের দুই দিকে পর্য্যায়ক্রমে আঘাত করা চাই।

৩। এবার ৩নং ছবির ভঙ্গীতে ডান কাণের পাশ হইতে ও-দিকে বাঁ কাণের নীচে পর্য্যন্ত—চিবুকাস্থি ধরিয়া ট্যাপারের আঘাত।

৪। ৪নং ছবি দেখিয়া ঘাড়ের দু'দিক্; ৫নং ছবির ভঙ্গীতে চিবুকের তলা; এবং ৬নং ছবির ভঙ্গীতে ললাটদেশে ট্যাপারের আঘাত।

এ ব্যায়ামের নিত্য-নিয়মিত সাধনায় মুখের কোথাও বিকৃতি ঘটিবে না, চামড়া থাকিবে মসৃণ কোমল এবং লাবণ্যদীপ্ত।

আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সমন্বয় পরিকল্পনা

যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ-বিস্তার-সৌকর্য্যার্থে যুক্তরাজ্যে ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা-প্রকরণকে একটি বিশিষ্ট সার্ব্বভৌম সীমমুদ্রাতে শৃঙ্খলিত করিবার জল্পনা কল্পনা কিছু দিন হইতে প্রগাঢ় ভাবে চলিতেছে। সম্প্রতি উভয় দেশেই এই পরিকল্পনা বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। আপাততঃ মিত্র শক্তি-সঙ্ঘকে লইয়াই এই পরিকল্পনা পরিপুষ্ট। শান্তি-সমাগমে সন্ধি সংস্থাপনের সহিত বর্ত্তমানে শত্রু-পর্য্যায়-ভুক্ত দেশ-সমূহকেও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। যুক্তরাজ্যের কর্তৃত্বাধীন ভারতবর্ষও অবশ্য এই পরিকল্পনার সহিত দৃঢ় ভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের টাকা ষ্টার্লিং এর লেজুড় মাত্র।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বিলাতের প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার চার্চিল একটি বেতার-বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"যাহারা কঠোর ভাবে প্রচলিত মুদ্রা-শাসন-নীতির পক্ষপাতী, আমি তাহাদের দলভুক্ত নহি। তথাপি আমি বলি, মানুষের সহিত মানুষের এবং ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত দশ হইতে পনের বৎসর পর্য্যন্ত মূল্য-মানের (values) একটি ন্যায্য এবং সুদৃঢ় অবিচ্ছিন্ন (continuity) রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধকালে দর-দাম আমরা দৃঢ় রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। যুদ্ধান্তেও আমরা সর্ব্ব-প্রযত্নে দৃঢ়তা অবিচলিত রাখিতে ইচ্ছুক। যুদ্ধের শেষে কর-ভার পূর্ব্বকার অপেক্ষা অধিকতর ভারী হইবে। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যম ও উৎসাহপ্রসূত প্রবর্ত্তন-প্রচেষ্টা যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ অথবা খর্ব্ব না হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর-নির্দ্ধারণ ও কল্পনাকে আকার প্রদান করিব।"

যুক্তরাজ্যে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সম্ভব, সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু পরাধীন ভারতে জাতীয় সর্ব্বজনীন স্বার্থই প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে। অন্য একদেশদর্শী প্রবল ও প্রচণ্ড স্বার্থের সহিত ইহার নিত্য বিরোধ—নিয়ত সঙ্ঘর্ষ। এই নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে মিষ্টার হুসেন ভাই লালজী বিনিময় এবং আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-প্রকরণের ভবিষ্যৎ-নিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত মিত্র-সঙ্ঘের আলাপ-আলোচনার সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ-স্থাপনের

...দেশ্যে একটি মুলতুবী প্রস্তাব (Adjournment proposal) ...পিত করিয়াছিলেন। অর্থ-সচিব এ আলোচনার অভিনবত্ব স্বীকার করেন এবং আশ্বাস দেন যে, "কোন প্রকার নূতন ...নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে পরিষদে তাহার বিচার-বিতর্কের ...ও সুযোগ দেওয়া হইবে। আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-বিষয়ক-ব্যবস্থার ...আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ এবং ভারতবর্ষও ...পরিকল্পনা-কল্পনার প্রাথমিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।" ...টি কি, তাহাই এখন আমাদিগকে প্রণিধান করিতে হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সৌকর্য্যের মূল ভিত্তি —মুদ্রা-বিনিময়ের একটি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারিত হার। আদান-প্রদানে ...বিনিময়-হার স্থিতিশীল না হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ...ঘটে। বিনিময়-হারের উত্থান-পতন এবং দ্রুত অথবা ...পরিবর্ত্তন ব্যবসায়-বাণিজ্যের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে অতি ...নিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি করে। বিনিময়-হার স্থির থাকিলে, অল্প ...অধিকতর হউক, বণিক্ ও ব্যবসায়ী এবং তাহাদের পশ্চাতে ...ও প্রাথমিক উৎপাদক লাভের অঙ্ক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ...থাকিতে পারে। যুদ্ধান্তে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেনা-পাওনার ...একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য উপায় প্রবর্ত্তনই এই আন্দোলন ও ...আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। একতরফা যদৃচ্ছা মুদ্রা-মানের পরিবর্ত্তনের ...বিবর্ত্তে যাহাতে একটি আন্তর্জ্জাতিক নির্দ্দিষ্ট বিধান-অনুযায়ী সর্ব্ব-...দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের নিয়ন্ত্রণ সম্পাদিত হয়, তাহাই ...জাতির কাম্য। সাময়িক অসুবিধায় বিপন্ন কোন জাতির ...দেশিক দায় মিটাইতে অত্যধিক ক্লেশ না ঘটে, অথচ যথাসম্ভব ...ঐ বিপন্ন জাতি তাহার আর্থিক স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে, সে ...উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। এই সকল বিধি-বিধানের ...মুখ্য উদ্দেশ্য,—আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও অবাধ ...এবং এই পরিকল্পনার অংশভাগী দেশ-সমূহে জাতীয় জীবন-যাত্রা ...মানের উন্নততর ধারার প্রবর্ত্তন।

এই শুভ এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্তরাজ্যের তরফ হইতে ...কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীনেস্ একটি আন্তর্জ্জাতিক ...নিষ্পত্তি-বিধায়ক সম্মিলনী (International Clearing Union) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক ...নৈতিক সহযোগিতা-সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান-হেতু এই ...ষ্ঠান হইবে প্রাথমিক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রী ব্যাঙ্কগুলির ...দিয়া এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জ্জাতিক হিসাব-নিষ্পত্তির যোগসূত্র স্থাপিত করিবে। অনেকেই জানেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে ...সুইজারল্যাণ্ড দেশের বেসল (Basle) সহরে একটি আন্তর্জ্জাতিক ...হিসাব-নিষ্পত্তি ব্যাঙ্ক (Bank of International Settlements) স্থাপিত হইয়াছিল। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সকলকেই প্রস্তাবিত ...আন্তর্জ্জাতিক দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি-সম্মিলনীর সভ্য হইতে হইবে। ...নিরপেক্ষীয় কোন রাষ্ট্রকে সভাসদ করিতে হইলে তাহার প্রতি ...বিশেষ নিয়মের বিধান নিহিত হইবে।

লর্ড কীনেস্ যে মুদ্রা-প্রকরণের বিধান দিয়াছেন, তাহার নাম ...ব্যাঙ্কর প্রকরণ (Bancor Currency)। ইংরেজী অর্থ-...শাস্ত্রে Banco শব্দ বিশেষজ্ঞের সুপরিচিত। বণিক্ সম্প্রদায়ে ...পরিচিত এই "ব্যাঙ্কো" একটি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারিত মূল্যের আদর্শ অঙ্কমুদ্রা। ইহার দ্বারা ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের হিসাব রক্ষা করে এবং ইহা স্থানীয় চলতি মুদ্রা হইতে স্বতন্ত্র। এই Banco হইতেই লর্ড কীনেস্ Bancor শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। "ব্যাঙ্কর" আন্তর্জ্জাতিক চলতি মুদ্রা হইবে এই হিসাবে যে, ইহা হইবে বিনিময়-হারের পরিমাপক অর্থাৎ নির্দ্ধারক একক। যে কোন ব্যাঙ্কার অথবা ব্যবসায়ী তাহার বৈদেশিক কারবার পাউণ্ড-ষ্টার্লিং, ডলার অথবা ফ্রাঙ্কে পরিচালন করিতে পারিবে; এবং তাহার শাসনতন্ত্র-সম্মিলনী হইতে "ব্যাঙ্কর" ধার করিতে সমর্থ এই অধিকার তাহাকে একটি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারিত হারে বৈদেশিক মুদ্রা-বিনিময়ের সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করিবে,—এ সুবিধা সে অন্য কোন প্রকারে লাভ করিতে পারিত না। ফলে দৈব-বাণিজ্য (speculation) সঞ্জাত সর্ব্বপ্রকার বিনিময়-হারের অযথা ও অবৈধ হ্রাস-বৃদ্ধি নিবারিত হইবে।

বৃটিশ পরিকল্পনানুযায়ী "ব্যাঙ্কর" একককে প্রথমতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণে সীমায়িত (defined) করা হইবে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, প্রয়োজন অনুভূত হইলে এই মানের (weight) পরিবর্ত্তন চলিবে। প্রত্যেক দেশই স্বর্ণের বিনিময়ে সম্মিলনী হইতে "ব্যাঙ্কর" পাইবেন; কিন্তু "ব্যাঙ্করের" বিনিময়ে স্বর্ণ পাইবেন না। কোন দেশই জাতীয় মুদ্রা-প্রকরণ-অনুযায়ী নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে, দেশাভ্যন্তরে অথবা বৈদেশিক আদান-প্রদানে স্বেচ্ছানুযায়ী অল্প অথবা অধিক স্বর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবেন। স্বর্ণের বর্ত্তমান অত্যুচ্চ মূল্য এবং কোন কোন উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ইহার উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই পরিকল্পনা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাকে জগতের স্বর্ণ-সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকোপ হইতে মুক্ত রাখিবে। অধিকন্তু, স্বর্ণের পৃষ্ঠপোষকতাই (Gold backing) যে এই মুদ্রা-মানের একমাত্র ভিত্তি-ভূমি, সে ধারণাও দূর করিবে। সম্মিলনীর শাসক-মণ্ডলীতে (Governing body) প্রত্যেক সভ্য-দেশের প্রতিনিধি থাকিবে এবং তাহারাই "ব্যাঙ্করের" মূল্য নির্দ্ধারিত করিবে। সম্মিলনী হইতে ঋণ লইবার এবং সম্মিলনী-পরিচালনার দায়িত্বেরও একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রা প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রের পক্ষে নির্দ্ধারিত থাকিবে। এই পরিকল্পনা-রচয়িতার বিশ্বাস, জগতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক শাসন-তন্ত্রের মেরুদণ্ড হইবে—এই সম্মিলনী।

যুক্তরাষ্ট্রের খাজাঞ্চীখানার অধ্যক্ষ মিষ্টার মর্গেনথো-পরিকল্পিত মুদ্রা-স্থৈর্য্য-সম্পাদক সঙ্কল্পের লক্ষ্য-বস্তু ছয়টি। এইগুলি বিনিময়-হারকে স্থিতিশীল করিবে। বিভিন্ন সভ্য-দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের মূল্যকে স্থিতিশীল করিবার নিমিত্ত মিঃ মর্গেনথো একটি স্থায়িত্ব-সম্পাদক ভাণ্ডার (International Stabilisation Fund) প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সভ্য-দেশের মুদ্রা-প্রকরণের ক্রয়-বিক্রয়-মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে এই ভাণ্ডার। কোন জরুরী পরিস্থিতি সমুপস্থিত হইলে মণ্ডলীর অনুমতি লইয়া বিনিময়-হারের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক মন্ত্রণা ব্যতীত বিনিময়-হারের পরিবর্ত্তন ঘটিবে না, সুতরাং সভ্য-দেশ সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস (Currency depreciation) সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সভ্য-দেশের বৈদেশিক দায়-ভার মণ্ডলী যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার

সহিত মিটাইয়া দিবেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ প্রত্যেক সভ্য দেশকে পাঁচ হাজার মিলিয়ন ডলার চাঁদা দিতে হইবে এবং ইহার অর্দ্ধেক স্বর্ণমুদ্রা এবং সরকারী-খৎ (Government securities) দ্বারা দিতে হইবে। প্রত্যেক সভ্য-দেশের স্বর্ণ-সঞ্চয়, বৈদেশিক-বিনিময়, জাতীয়-আয় এবং উদ্বৃত্ত জমা অথবা পাওনা অঙ্কের (Balance of Payments Positions) উপর সেই সেই দেশের চাঁদার পরিমাণ নির্ভর করিবে। এই চাঁদাই অবশ্য ভাণ্ডারের সম্পদ। তৃতীয়তঃ, বিনিময় শাসনের (Exchange controls) অপসারণ। এই সকল ব্যবস্থার ফলে দেশ-বিশেষের পক্ষে বিনিময়-শাসন পরিচালনার প্রয়োজন তিরোহিত হইবে। মূলধনের অবাঞ্ছিত গতি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন দেশই নূতন বিনিময়-শাসন-বিধি অবলম্বন করিতে পারিবে না, এবং এরূপ বিধানের প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডারের অনুমতি লইতে হইবে। ভাণ্ডারের অনুমোদন ব্যতীত বহুবিধ মুদ্রা-প্রকরণ ব্যবহারের ফিকির (Multiple currencies devices) এবং দুই পক্ষের মধ্যে বিনিময় নিষ্পত্তি-বন্দোবস্ত (Bi-lateral exchange clearing arrangements) নিষিদ্ধ হইবে। যে ক্ষেত্রে যুদ্ধে সম্ভূত অর্থের অবরুদ্ধ অবশিষ্টের অবরোধ মোচন, দেশাভ্যন্তরে ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারে, ভাণ্ডার সে ক্ষেত্রে তাহার মুক্তি নিয়ন্ত্রণ করিবে।

ভাণ্ডারের ক্ষমতার পরিসর চতুর্থ বিবেচ্য বিষয়-বস্তু। ভাণ্ডার স্বর্ণমুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারী হইবে এবং সভ্যদেশ সমূহের অনুমোদন-অনুযায়ী তত্তৎ দেশের খৎ প্রভৃতি (securities) বিকি-কিনি করিতে পারিবে। ভাণ্ডার যে-কোন দেশের অনুমতি লইয়া সেই দেশের চলতি-মুদ্রা কর্জ্জ করিতে পারিবে। সভ্য তালিকাভুক্ত দেশ-সমূহের সরকারী খাজাঞ্চীখানা, কেন্দ্রী ব্যাঙ্ক, কিংবা তাহাদের রাজস্ব সম্বন্ধীয় গোমস্তা এবং তাহাদের অধিকার-ভুক্ত আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত মাত্র ভাণ্ডারের কাজ-কারবার চলিবে। ভাণ্ডারের পঞ্চম বিচার্য্য বিষয়, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-একক। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জ্জাতিক শীর্ষ-একক স্বর্ণমুদ্রার নাম "ইউনিটাস্" (Unitus); ইহার মান দশ ডলারের মূল্য। এই মুদ্রার অঙ্কেই ভাণ্ডারের হিসাব রক্ষিত হইবে। ভাণ্ডার "ইউনিটাস্" নামক কোন মুদ্রা অথবা নোট প্রচলিত করিবে না; কিন্তু সভ্য দেশ-সমূহ ভাণ্ডারে স্বর্ণ জমা দিলে "ইউনিটাসের" অঙ্কে তাহার মূল্যাধিকার (credit) পাইবেন এবং স্বর্ণের আকারেই তাহার পুনরুদ্ধার সাধন পূর্ব্বক বিভিন্ন সভ্য দেশ-সমূহের মধ্যে তাহার আদান-প্রদান চালাইতে পারিবেন। ভাণ্ডারের পরিচালনা, ষষ্ঠ বিচার্য্য-বস্তু। ভাণ্ডার সভ্যশ্রেণীভুক্ত দেশ-সমূহের প্রতিনিধি-গঠিত একটি পরিচালক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। প্রত্যেক দেশ তৎপ্রদত্ত চাঁদার অনুপাতে ভোটের অধিকার পাইবেন, কিন্তু কেহই মোট ভোটের শতকরা ২৫ অংশের অধিক ভোট পাইবেন না। সাধারণতঃ পরিচালক-মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অধিক-সংখ্যক ভোটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে চার-পঞ্চমাংশ ভোটের প্রয়োজন হইবে। ভাণ্ডারের দৈনিক কার্য্যাবলী পরিচালক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক নিযুক্ত কার্য্যকরী-সমিতি ও কর্ম্মাধ্যক্ষ পরিচালক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে।

এখন আমরা এই দুইটি পরিকল্পনার পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই আমরা দেখিতেছি যে, যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রচুর স্ব স্বর্ণের অধিকারী হেতু স্বর্ণকেই প্রাধান্য দিয়াছে। "ইউনিটাস্" স্বর্ণ কিংবা যে কোন মুদ্রা-প্রকরণে পরিবর্ত্তনীয় করিয়া যুক্তরাষ্ট্র এব যথাসম্ভব কঠোর স্বর্ণ-মানের (Gold standard) পুনঃপ্রব প্রয়াসী। পক্ষান্তরে, যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনায় "ব্যাঙ্কর", আন্তর্জ্জাতি খালাস-নিষ্পত্তি সম্মিলনীর সম্মতি ব্যতীত, স্বর্ণে পরিবর্ত্তনীয় ন সুতরাং স্বর্ণের সহিত ইহার সম্পর্ক তত দৃঢ় নহে। যুক্তরা পরিকল্পনায় সভ্য-দেশ সমূহের চাঁদার পরিমাণ মজুত স্বর্ণ, উদ্বৃত্ত অথবা পাওনা (Balances of payments) এবং জা আয়ের উপর নির্ভরশীল; কিন্তু লর্ড কীনেসের পরিকল্পনায় চাঁ হিস্যা (Quotas) যুদ্ধ-পূর্ব্ব বাণিজ্য-জমা-খরচের উদ্বৃত্ত জ অঙ্কের উপর অধিষ্ঠিত। দশ ডলারের মূল্যের সমান ব "ইউনিটাস্" যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে ডলার-মান কিংবা স্বর্ণ-মা মর্য্যাদা প্রদান করে না। যত দিন পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের খাজা খানা বিক্রয়ার্থ প্রদত্ত স্বর্ণ (Gold offerings) একটি নি হারে ক্রয় করিতে সম্মত থাকিবে, তত দিন "ব্যাঙ্কর" কিংবা কোন স্বর্ণ-এককের (Gold unit) একটি নির্দ্দিষ্ট ডলার থাকিবে। নোটের উপর দশটি ডলারের মূল্যের সমতুল এব সুবিধাজনক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্প সভ্য-দেশ সমূহের চাঁদার অংশ মজুত স্বর্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট বি যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের অধিকার অধিকতর হইবে। এই ব্যবস্থার ফ যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা যদি শতকরা ২০ অংশের অধিক হয়—বস্তুতঃ, ই সর্ব্বোচ্চ শতকরা ২৫ অংশেও পরিণত হইতে পারে—তাহা হই যুক্তরাষ্ট্রের ভোটের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বপ্রধান হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় আন্তর্জ্জাতিক ভাণ্ডারের সংগঠন-ব্যব কিয়দংশে জাতীয় আধিপত্যের হানিকারক। বৃটিশ পরিকল্প আন্তর্জ্জাতিক পরামর্শের অধীন; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পন বিনিময়-হারের নির্দ্ধারণ কিংবা পরিবর্ত্তন-ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সভ দেশ সমূহের আয়ত্ত-বহির্ভূত হইবে। যুক্তরাষ্ট্র বিনিময়-শাস পরিহারের পক্ষপাতী অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিময়-বাজারের পুনরভ্যুদ সমর্থক। সভ্য-দেশ-সমূহ স্ব স্ব চলতি-হিসাব-সম্পর্কিত কারবা অন্তরায় দূর করিবার ক্ষমতা লাভ করিবেন বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভাণ্ডার যথেষ্ট প্রতিপত্তির সহিত তাহার অসম্মতি অথবা আপ নিবেদন করিতে পারিবে। পরন্তু, ভাণ্ডারের সম্মতি ব্যতী নূতন কোন প্রতিবন্ধক প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না। যে-কো আন্তর্জ্জাতিক কার্য্যকরী-পরিকল্পনা কোন সভ্য-বিশেষের স্ব নির্দ্ধারণ খর্ব্ব করিতে বাধ্য; কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা সমূলে পরি করিতে হইলে ভাণ্ডারের সংগঠন যথার্থই আন্তর্জ্জাতিক হও অবশ্য প্রয়োজন। এ কথা স্বীকার্য্য যে, স্থূলভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পরিকল্পনা বহু-তরফা খালাস-নিষ্পত্তি (Multi-later clearing) প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্কের পক্ষপাতী ইহার চাঁদার হিস্যা কার্য্যতঃ ভাগীদারী মূলধন। ভাণ্ডারের বিভি কর্ম্মকেন্দ্রে বৈদেশিক বিনিময়-বাজারের প্রচলন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র ভাণ্ডার প্রত্যেক বৈদেশিক বিনিময়-বাজার অপেক্ষা অধিকত খালাস-নিষ্পত্তিমূলক (clearing) প্রতিষ্ঠান হইবে না। বিনিম বাজারগুলিকে যদি দৈধ-বাণিজ্য (speculation) প্রবৃত্তি এ

বিশৃঙ্খলতা-মূলক স্বল্প-মেয়াদী (short-term) মূলধনের গতিবিধি হইতে মুক্ত রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে উহাদের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার যান্ত্রিক পার্থক্য উপেক্ষণীয় বলিয়াই অনুমিত হইবে।

মূলধনের অনধিকারমূলক গতিবিধি নিবারণার্থ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পরের জাতীয় বৈদেশিক সম্পদ সম্বন্ধে সংবাদ আদান-প্রদানের যে ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যাঙ্কার ও তাহার খরিদদারগণের (customers) মধ্যে হিসাব সংগোপনের যে চিরাচরিত প্রথা আছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে। অবশ্য যুদ্ধের অভিঘাতে এই সম্পর্কের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন উদ্‌বৃত্ত অর্থের অধিকারী দেশকে তাহার কোন বিশিষ্ট খাতকের প্রচলিত মুদ্রা গ্রহণ করিতে হইতে পারে, এবং এরূপ ক্ষেত্রে ভাণ্ডারের সাধারণ বণ্টন তহবিলের উপর তাহার দাবীর অধিকার থাকিবে না। ইহাতে কোন স্পষ্টতঃ দুর্ব্বল ক্রেতার নিকট স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অতিরিক্ত রপ্তানী নিবারিত হইবে বটে, কিন্তু বিনিময়-ক্ষতি সম্ভাবনাহেতু ব্যবসায়ের হানি ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে, কোন সদস্য-দেশবিশেষের মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিকালে, ভাণ্ডারের সংস্থিতির স্বর্ণ-মূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলে, বিনিময়-ক্ষতির সম্ভাবনাকে লঘু করা যাইবে। কিন্তু এই সকল খুঁটিনাটি পার্থক্যের বহু উর্দ্ধে, বহু গুণে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের বিষয়,—চলতি-হিসাব সম্পর্কে একটি সাম্যাবস্থা-সম্পন্ন বিনিময়-তন্ত্র (Exchange system) সংস্থাপন সঙ্কল্পে বৃটিশ ও মার্কিণ উভয় পরিকল্পনার ঐকান্তিক উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য। ই সাধু উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার জাতীয় ক্ষমতার কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা অবশ্যম্ভাবী। উভয় পরিকল্পনার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য এই যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সঙ্কল্পে দৃঢ় উদ্‌বৃত্তের অধিকারী দেশগুলিকে স্বচ্ছলতা-বিহীন দেশ-সমূহ হইতে পণ্যে এবং কৃত্যে (service) প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এই নিমিত্ত, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় বাণিজ্য-শুল্কের (Tariff) কোন উল্লেখ নাই ; অথচ এইরূপ শুল্ক আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানের সাফল্যের জন্য মুখ্য-প্রয়োজন। বিশেষতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-শুল্ক যুদ্ধোত্তর জগতের সমস্যার বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-শুল্কের একমাত্র প্রশমন,—বিদেশে বিশিষ্ট ঋণ-দান। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ এবং বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী মহাযুদ্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তিকালের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আদৌ ভরসা-প্রদ নহে। যুদ্ধান্তেও যদি স্বর্ণের আদানই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র কাম্য হয়, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তর-জগতের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। যুক্তরাষ্ট্র যদি তাহার দেশ-বহির্ভূত উদ্‌বৃত্ত জমা কিংবা পাওনার অঙ্কের সহিত স্বীয় অর্থ নৈতিক নীতির সামঞ্জস্য বিধান না করেন, তাহা হইলে কোন আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কার্য্যকারী হইবে না।

এই সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র একাভিসন্ধি হইয়া কার্য্য করিলে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনীতিকে যথেচ্ছ পরিচালন করিতে পারে ; কিন্তু অন্যান্য বিশেষতঃ মিত্র-দেশের স্বার্থ এবং তাহাদের নিজেদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে যুক্তরাজ্যের রপ্তানী-বাণিজ্যে অবনতি ঘটিয়াছিল, এবং তাহার ফলে উদ্‌বৃত্ত জমা অথবা পাওনার অঙ্ক অধোগতি লাভ করিয়াছিল, আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার হ্রাস ঘটিয়াছিল এবং রপ্তানী-শিল্পে বিষম বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের অবসানে এই সকল সমস্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিবে। আন্তর্জ্জাতিক অর্থনিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্ররূপে লণ্ডন অতি অল্প সময়ের মধ্যে টাল্ সামলাইয়াছিল ; কিন্তু ষ্টার্লিংএর দুর্ব্বলতা এবং জাতীয় অর্থ-বিধানের মন্দা সহজে তিরোহিত হয় নাই। স্বর্ণমান পরিবর্জ্জন এবং বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের কল-কৌশল মুস্কিল প্রশমন করিয়াছিল মাত্র,—দূর করিতে পারে নাই। যুক্তরাষ্ট্রাভিমুখে স্বর্ণের অবাধ গতি আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-শক্তিকে বিপন্ন করিয়াছিল এবং রপ্তানী বাণিজ্যের অন্তরায় হেতু স্বর্ণের বিহিত বিতরণ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান মহাবিপ্লবের অবসানে যুক্তরাজ্যে স্বর্ণের স্বল্পতা প্রখররূপে প্রকট হইবে। এই হেতু বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্‌গণ যুদ্ধান্তে বৃটেনের রপ্তানী-বাণিজ্য-বিস্তার সাধনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত আছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিলাত হইতে স্বর্ণ যেমন নির্গত হইতেছে, মার্কিণে স্বর্ণ তেমনি পুঞ্জীভূত হইতেছে। খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁচামাল আমদানী করিতে বৃটেন ব্যগ্র। মার্কিণের প্রচেষ্টা—যাহাতে বিদেশ হইতে সস্তা পণ্য আসিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-শক্তিকে খর্ব্ব না করে। প্রভূত স্বর্ণের অধিকারী মার্কিণের প্রচেষ্টা—আন্তর্জ্জাতিক অর্থবিধানে যাহাতে স্বর্ণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। বৃটেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা—স্বর্ণের অভাবে যাহাতে স্বল্প-স্বর্ণের অধিকারী দেশ-সমূহের আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত না হয়। এইখানেই উভয়ের উদ্দেশ্যের বৈষম্য। তথাপি উভয়েরই ঐকান্তিক বাসনা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যকে যথাসম্ভব বাধাবিঘ্ন-বিমুক্ত করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করা।

সঙ্কীর্ণ পরিসরে স্বর্ণের অবস্থিতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অসঙ্গত অসামঞ্জস্য ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের আরও দুইটি বিষম অন্তরায়,—অত্যধিক বিনিময়-শাসন এবং অযথা মুদ্রামূল্য-হ্রাস-প্রতিযোগিতা। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের বিপর্য্যয় প্রধানতঃ, আন্তর্জ্জাতিক উৎপাদন-তৎপরতার তারতম্য অনুযায়ী ঘটে। এই তৎপরতার বিধিসঙ্গত বণ্টন প্রয়োজন। বিধিসঙ্গত বণ্টনের মূলে অবশ্য অর্থ-সামর্থ্য-সঙ্গতি নিহিত। কাঁচামাল ও শ্রমিকের প্রাচুর্য্যের সহিত উপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত অর্থ-সরবরাহের প্রয়োজন। আন্তর্জ্জাতিক অর্থবিধানের সহিত জগতের শিল্প ও বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আন্তর্জ্জাতিক অর্থবিধানে স্বর্ণের মর্য্যাদা অবিসম্বাদী। স্বর্ণ সম্পদ্-বিহীন হইলে, অথবা স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, যে-কোন দেশ উদ্‌বৃত্ত জমা অথবা পাওনার অধিকারীর প্রাপ্য মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত হয়। আর্থিক সামর্থ্যে প্রবল জাতি দুর্দ্দিন ও দুর্দ্দশা কোনরূপে অতিক্রম করিতে পারে ; কিন্তু দুর্ব্বলকে বাঁচিবার অধিকার না দিলে, আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-বাণিজ্যে এবং অর্থ-বিধানে স্বাস্থ্যকর সাম্যাবস্থা সম্ভবপর হয় না। অতএব আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানকে কেবল আন্তর্জ্জাতিক খালাস-নিষ্পত্তি-মূলক করিলে চলিবে না, তাহাকে আন্তর্জ্জাতিক অর্থ ও শিল্প-বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ-মূলক করিতে হইবে।

এক-তরফা প্রচেষ্টা দ্বারা মুদ্রা-মূল্য-হ্রাস প্রতিরোধ বিষয়ে বৃটিশ ও মার্কিণ উভয় পরিকল্পনাই এক-মত। কিন্তু বৃটেন, মার্কিণের ন্যায়, বিনিময়-শাসন ও জাতীয় আধিপত্য পরিহারের পক্ষপাতী নহে। এই নিমিত্তই কীনেস্ পরিকল্পনায় দুর্ব্বল তৃস্থ দেশের ঋণ, আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত হুণ্ডী-বরাদ্দ (overdraft) অতিক্রম করিলেই, আন্তর্জ্জাতিক পরামর্শের ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। বৃটিশ অভিমতের ধারা এই যে, যদি জাতীয় আধিপত্য পরিহার করিতে হয়, তাহা হইলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক যথার্থই আন্তর্জ্জাতিক হইবে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের গঠন বিষয়ে উভয়ের মতভেদ। বৃটিশ-বিধানে সদস্য দেশসমূহের চাঁদার পরিমাণ নির্ভর করিবে যুদ্ধ-পূর্ব্ব-বাণিজ্য জমা-খরচের উদ্বৃত্ত-জমার অঙ্কের উপর, আর মার্কিণ বিধানে চাঁদার ভিত্তি হইবে সঞ্চিত স্বর্ণ, উদ্বৃত্ত জমা অথবা পাওনা এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণ। বৃটেন আন্তর্জ্জাতিক নিকাশ-নিষ্পত্তি মারফতে উত্তমর্ণ দেশসমূহে স্বর্ণের অত্যধিক গতি-স্থিতি নিবৃত্তির পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে, মার্কিণ এমন একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করেন, যাহা বিনিময়-শাসন দূর করিয়া, নিরঙ্কুশ খালাস-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিবে। উভয়েরই উদ্দেশ্য,—যুদ্ধান্তে স্ব স্ব দেশে যেরূপ পরিস্থিতির উৎপত্তি ঘটিবে, তাহারই জাতীয় স্বার্থানুমোদিত প্রতিবিধান। বৃটেন যুদ্ধান্তে জাতীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উচ্চ ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অভিলাষী। মার্কিণের অভিপ্রায়—মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস নিবারণ পূর্ব্বক, জগতের বাণিজ্য-বাজারে আত্ম-প্রতিপত্তির প্রসার সাধন।

ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থ সামর্থ্যের নিয়ন্ত্রণ যুদ্ধোত্তর বৃটেনের শক্তি-সামর্থ্য পরিস্থিতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিবদ্ধ। বর্ত্তমানে বৃটিশ ও মার্কিণ পরিকল্পনার দৌড় যতটুকু আমরা অনুধাবন করিতে পারি, তাহাতে অন্ততঃ কোন কোন অবস্থায়, ইহা ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী হইবে বলিয়াই মনে হয়! জাতীয় অর্থ-নীতির অনুশীলনে ও পরিচালনায় ভারত যদি পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে এবং বর্ত্তমান পরাধীন-পরিস্থিতি অনুযায়ী মাত্র কাঁচা মাল কিনিবার এবং পরিণত পণ্য বিক্রয় করিবার ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ পরিস্থিতির ফলে যুদ্ধান্তেও আমাদের অর্থ-নৈতিক নিকৃষ্ট অবস্থা এবং জাতীয় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের অতিশয় হীন ও হেয় ধারা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব।

যুদ্ধান্তে সর্ব্বজাতি কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত নবযুগে, নবভাবে, সুস্থ ও সবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সর্ব্ব জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার উৎপাদন-তৎপরতার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন, যাহাতে পরার্থ-পীড়কে অবৈধ স্বার্থ-সাধন (Unfair exploitation) এবং অর্থ-নৈতিক পর-পীড়নের (Economic aggression) পরিবর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক পণ্য-বিনিময় ন্যায়সঙ্গত-বিনিময়ে (Fair exchange) পর্য্যবসিত হইতে পারে। আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করিলে, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমবিভাগের এবং আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে সাম্য-মৈত্রী-সংস্থাপনের নূতনতর যোগসূত্র এবং ভিত্তিভূমির অধিকার অসম্ভব হইবে না। পরন্তু, জাতি-বিশেষের শোষণ-মূলক দারিদ্র্যের অবসান ঘটিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের অপরিসীম আভ্যন্তরীণ সম্পদ্, অসামান্য মূলধন-সংস্থান এবং অনন্যসাধারণ উৎপাদন-বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য তাহাকে সর্ব্বপ্রকার নীচাশয় প্রলোভনের অতি ঊর্দ্ধে অবস্থিত করিয়াছে। যদি যুক্তরাষ্ট্র সহৃদয়তার সহিত একটি যুক্তিসিদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক শ্রম-বিভাগের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতি অবহিত হন, এবং জগতের সমস্ত জাতিকে প্রচুর পরিমাণে ইজারা ও দানে মুক্তহস্ততাহেতু অর্জ্জিত অসামান্য অধিকার ও প্রতিপত্তির সদ্ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বত্র ক্রয়-বিক্রয়-বাজারের নীচ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ-প্রণোদিত হিংসা-দ্বেষ ও বিবাদ-বিরোধ বিদূরিত করিয়া একটি সুসঙ্গত, সুসমঞ্জস, সুসম্বদ্ধ জাগতিক অর্থবিধান ও নিয়ন্ত্রণ-তন্ত্রের সমুত্থান গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে, যথার্থই নববিধানের আবির্ভাব ঘটিবে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে বিজেতার ক্ষতি-পূরণার্থে বিজিতের প্রতি আর্থিক উৎপীড়ন জগতের অর্থ-বিধানকে পঙ্গু করিয়াছিল। এই নিমিত্ত যুক্তরাজ্য বর্ত্তমান যুদ্ধকালে প্রদত্ত ইজারা-ঋণ সাহায্যের পরিশোধ, যুদ্ধান্তে অর্থের পরিবর্ত্তে পণ্যে ও কর্ম্মে গ্রহণ করিবেন। ইহা অপেক্ষা জ্ঞানসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ মঙ্গল অর্থনৈতিক মূলতত্ত্ব জগতে দুর্লভ। ইহা স্বর্ণের জয় নহে—তত্ত্বের জয়। স্বর্ণ নিমিত্ত মাত্র। লর্ড কীনেস্-প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্গণের উদ্দেশ্য পূর্ব্ব-প্রচলিত বৃটেনের হিরণ্য-স্বল্পতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাহার রপ্তানী-বাণিজ্যের আয়তন ও পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। গত কয়েক বৎসরে স্বকীয় বিপুল স্বর্ণ-সঞ্চয়কে বাধ্য হইয়া সমুদ্রপারে বিসর্জ্জন দিয়া ভারতের লক্ষ্য এখন আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানে স্বর্ণের স্থান ও মানের প্রতি নিবদ্ধ নহে। ঈসপের গল্পের দ্রাক্ষাফল-লুব্ধ শৃগালের ন্যায় স্বর্ণ এখন তাহার আয়ত্ত-বহির্ভূত, সুতরাং কটু। ভারতের দৃষ্টি এখন উৎপাদন-তৎপরতার ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জ্জাতিক বণ্টনের প্রতি দৃঢ় সম্বদ্ধ।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-বিধানের মূল ভিত্তি বাণিজ্য-সম্পর্ক। এই বাণিজ্য-সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে জগতের সমস্ত জাতির মধ্যে উৎপাদন-তৎপরতার যুক্তিসিদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের উপর। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর অর্থ-বিধান ও মুদ্রা-সমন্বয় পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা বাণিজ্য-সম্পর্কের গুপ্ত ও গূঢ় সমস্যা-সঙ্কটে বিপর্য্যস্ত হইবার প্রকৃষ্ট সম্ভাবনা। ভারত এ ক্ষেত্রে স্রষ্টা—দ্রষ্টা নহে; ফল বিশিষ্ট ভোক্তা; দুর্ভোগই তাহার চিরন্তন নিরবচ্ছিন্ন নিয়তি!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্মী ও নিষ্কর্ম্মা

মৌমাছি নিয়ত কর্ম্ম-নিরত,
মুখে মৃদু গুঞ্জন;
ভোমরার নাই কোন কাজ, তাই
চীৎকার সারাক্ষণ।

শ্রীনীরদরতন দাশ (বি-এ)।

এই পৃথিবী

উপন্যাস]

১০

দশ-বারো দিন পরের কথা।

দিগঙ্গনার এক সম্বন্ধ আসিয়াছে। পাত্রটি মুঙ্গোড়া কোল-কোম্পানির অফিসে মাইনিং-এঞ্জিনিয়ার। দিগঙ্গনার পিতা রামহরি সান্যালের সঙ্গে পাত্রের পিতা এক-সময়ে এক-কলেজে সহাধ্যায়ী ছিলেন। ছেলে এ-চাকরিতে দেড়শো টাকা মাহিনা পায় এবং থাকিবার জন্য ফ্রী-কোয়ার্টার্স। কোম্পানির মালিক সিদ্ধেশ্বর বাবু ছেলেটিকে সুনজরে দেখেন, কাজেই ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে।

রামহরি বলিল,—পরশু রবিবার পাত্র নিজে আসবে গো, তোমার মেয়েকে দেখতে।

দিগঙ্গনার মা প্রিয়ম্বদা বলিল,—কতগুলি দিতে হবে?

রামহরি বলিল—বেশী চাইতে পারবে না। জানা-শোনার ভেতর।

—বেশ!

রবিবার সকালে দিগঙ্গনাকে বলা হইল,—কোথাও বেরুস নে, তোকে আজ দেখতে আসবে!

দিগঙ্গনা যেন কাঠ! দেখিতে আসিবে! এতখানি স্বাধীনতার তাহা হইলে···

মা বলিল,—অবাক হয়ে রইলি যে!

দিগঙ্গনা বলিল—বিয়ে দেবে না কি আমার?

মা বলিল—দিতে হবে না? ডাগর হয়েছো···তোমার বয়সে যে আমি তোমার মা হয়েছি।

দিগঙ্গনা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল—তোমাদের সেকালের কথা ছেড়ে দাও। আমি এখন বিয়ে করবো না!

—বিয়ে করবি না! তার মানে?

—মানে আবার কি! যেখান থেকে যাকে হোক ধরে আনবে, আর···আমার বিয়ে করবার ইচ্ছা নেই!

মা বিরক্ত হইল, কহিল,—তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা দেখলে তো চলবে না। বড় হয়েছো···তোমার বিয়ে দেওয়া এখন আমাদের কর্তব্য।

দিগঙ্গনা বলিল—তোমাদের কর্তব্য বলে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে পায়ে চেপে গুঁড়িয়ে দিতে হবে! মজা মন্দ নয়!

মা বলিল—ধেড়ে মেয়ে হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়ানো—এতে ভারী পৌরুষ···না?···ছেলে ভালো···জানা ঘর···যেচে আসছে। তা ছাড়া মুঙ্গোড়ার কোল-মাইনে ছেলে কাজ করছে—এঞ্জিনিয়ার। দেড়শো টাকা করে এখন পাচ্ছে—তাছাড়া থাকবার বাঙ্‌লা!

দিগঙ্গনার ভ্রূযুগ আরো বেশী কুঞ্চিত হইল। কোনো জবাব না দিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মুঙ্গোড়ার মাইনিং এঞ্জিনীয়ার প্রবোধ লাহিড়ী আসিয়া রামহরি সান্যালের গৃহে দেখা দিল, বেলা তখন বারোটা। অভ্যর্থনায় ত্রুটি হইল না। বন্ধুর ছেলে···তার উপর ভাবী জামাতা!

এই বাড়ীতেই সে স্নানাহার করিল।

রামহরি বলিল—আজই রাত্রের গাড়ীতে ফিরতে হবে না কি?

প্রবোধ বলিল—ছুটী শুধু এক দিনের। বাবা চিঠি লিখলেন কাশী থেকে—আজই এখানে আসবার জন্য!

রামহরি বলিল—তোমার বাবা আমাকে লিখেছেন, রবিবারে তুমি এখানে আসবে। তাই তিনি তোমাকেও লিখে জানিয়েছেন। আমি ভেবেছিলুম, একটা দিন অন্ততঃ থাকবে।

প্রবোধ কহিল,—থাকবার উপায় নেই! সদ্য একটা পিটে কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই যে এসেছি, সিধু বাবু বললেন, এত বড় ব্যাপার ···'যেয়ো না' বলতে পারি না! তবে এক দিনের বেশী দেরী করো না।

রামহরি বলিল—বিয়ে যদি হয়?

প্রবোধ কহিল—তাহলে ছুটী দেবেন বৈ কি।

আরো বহু কথা হইল।

ছেলেটি খুব সপ্রতিভ। নিজের বিবাহের ভার নিজেই লইয়াছে। মা-বাপ মাথার উপরে আছেন, সেটুকু না মানিলে নয়! পাত্রী পছন্দ, দেনাপাওনা—সে সম্বন্ধে নিজে যাহা স্থির করিবে, তাহাই হইবে। বাপ ঠিক করিয়াছিলেন, তাঁর ছেলেবেলাকার কে মজুমদার বন্ধু, তার মেয়ের সঙ্গে প্রবোধের বিবাহ দিবেন! কিন্তু সে-মেয়ে একেবারে সেকেলে প্রথায় মানুষ—ইংরেজীর এ-বি সি-ডি জানে না, একালে তেমন স্ত্রী লইয়া সংসার করা চলে না। অন্ততঃ প্রবোধের যে ষ্টাণ্ডার্ড! তাই বাবা বলিলেন, বেশ, বাসন্তীতে রামহরির মেয়ে আছে···জানাশুনা ঘর···মেয়েটি লেখাপড়ায় ভালো··· গান-বাজনা জানে! আর একালের মেয়ের···যেমন স্মার্টনেশ্ চাও, তাই। কথায় কথায় প্রবোধ সব কথাই রামহরিকে খুলিয়া বলিল। স্পষ্ট বলিল—নিজে দেখিয়া বিবাহ করিতে চাই আমি। মেয়ের বংশ আর গায়ের রঙ কিম্বা শ্বশুরের দেওয়া যৌতুক লইয়া নয়! মানে, সে চায় স্মার্ট ওয়াইফ্! জীবনে এ্যাম্বিশন্ আছে! বেশ ফ্রী এ্যাণ্ড ইজি! সাহেব-সুবার সঙ্গে মেলামেশা করা···তাহাতেই উন্নতির সম্ভাবনা! তার সঙ্গে পার্টিতে যাইতে পারিবে! সংসারের ঘানিক্ষেত্রে নিজেকে জুতিয়া দিয়া নারী-জন্মকে কৃতার্থ মনে করিবে না, এমন স্ত্রী! নহিলে সেকালের মতো জড়ভরত জবড়জং স্ত্রী··· এ যুগে অচল!

আহারাদি চুকিতে বেলা দু'টা বাজিয়া গেল। প্রবোধ বলিল,—এবারে আসল কাজটুকু সেরে ফেললে হয় না···যে জন্য আমার আসা?

রামহরি বলিল—এখন একটু জিরোও, তার পর বিকেলে রোদ পড়লে মেয়ে দেখো।

প্রবোধ কহিল—মানে, আমার কি ইচ্ছা, জানেন?

রামহরি বলিল—বলো!

প্রবোধ কহিল—আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, অবশ্য··· মানে, তাঁকে দেখে একটু আলাপ-পরিচয় করা উচিত! লাইফ সম্বন্ধে তাঁর views কি, তাঁর টেষ্ট এ্যাণ্ড টেম্পারামেণ্ট···এগুলো বিশেষ ভাবে জানা দরকার! কথাবার্তায় সে পরিচয় পাওয়া যাবে নিশ্চয়। তার পর···অর্থাৎ আমি নিজেই তো দেখছি, আমাদের সমাজ-সংসার এখন যে সেই আগেকার ধারা মেনে চলবে,···ইম্পশিবল্!

পাত্রের মুখের কথায় এ যুগের যে-ছবি ফুটিতে লাগিল, সে ছবি দেখিয়া রামহরি সান্যাল হতভম্ব! নিজের সম্বন্ধে রামহরির ধারণা ছিল, সে খুব আপ-টু-ডেট! কিন্তু মুঙ্গোড়া কোলিয়ারীর এই নব্য মাইনিং এঞ্জিনীয়ারের পাশে নিজেকে মনে হইল, কিছু না! তবে এটুকু রামহরি ভালো করিয়াই জানে, একালে সব দিকে দারুণ পরিবর্ত্তন···এটা পরিবর্ত্তনের যুগ···এবং তার উপর কন্যাকে পরের হাতে দিতে হইবে। সে-দানে যতখানি সুযোগ-সুবিধা করা যায়, ছাড়া উচিত নয়।

রামহরি বলিল—এখনি তাহলে দেখতে চাও?

—মিথ্যা সময় নষ্ট করে লাভ কি!

—তা বেশ। আমি তাকে নিয়ে আসি।

রামহরি আসিল অন্দরে। প্রিয়ম্বদাকে বলিল—অঙ্গনা? ও এখনি মেয়ে দেখতে চায়!

প্রিয়ম্বদা বলিল—মেয়ে বেড়াতে বেরুলেন! খেয়ে উঠে মেয়ে বললেন, আমার একটু কাজ আছে···এখনি আসছি।

—বাড়ী নেই?

—না।

রামহরি বিরক্ত হইল, বলিল—কোথায় আবার গেল এখন? আঃ!

প্রিয়ম্বদা বলিল—কোথায় গেছে, জানি না। আমাকে বলে যায়নি তো!

—খপর রাখতে পারো না? পাত্র উপস্থিত মেয়ে দেখবার জন্য! আজো তাঁর পাড়া বেড়াতে না গেলে চলতো না! বারণ করলে না কেন?

প্রিয়ম্বদা বলিল—বারণ করলেই তোমার মেয়ে শুনতো কি না! সে-শিক্ষা দিয়েছো তাকে!

রামহরি বলিল—কিন্তু তা নিয়ে এখন তর্ক করলে চলবে না তো! ছাখো, কোথায় গেছে···ডাকিয়ে পাঠাও। ছেলে বলছে, এখনি দেখবে!

প্রিয়ম্বদা বলিল—তাও বলি বাবু, ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে না কি! দেখা তো পালিয়ে যাচ্ছে না···ছেলে তো কাল সকাল পর্য্যন্ত এখানে আছে।

—আছে, জানি। কিন্তু যে জন্য এসেছে···নাও, নাও, খোঁজ করে অঙ্গনাকে ডাকাও। আমি গিয়ে ওকে বলি, মেয়ে আসছে।

রামহরি আসিল বাহিরে; এবং অতীত দিনের নানা কথা কাঁদিয়া কোনো মতে সময়ক্ষেপের ব্যবস্থা করিল।

ঘড়িতে চারিটা বাজিল। দিগঙ্গনার তখনো দেখা নাই! পাত্র প্রবোধ বলিল—ওদিকে একবার দেখুন দয়া করে। আমি আবার একটু বেরুবো···সন্ধ্যার আগে। এলুম এত দূর···বাসন্তীর এত নাম শুনেছি দূর থেকে, সেই বাসন্তীতে এলুম···একবার দেখে যাবো না? অন্ততঃ একটা বার্ডস্-আই ভিউ···

রামহরিকে উঠিতে হইল। কম্পিত বক্ষে আবার অন্দরে প্রবেশ। আসিয়া দেখে, সামনে দিগঙ্গনা! আঃ, যে-বুক দশ হাত নামিয়া গিয়াছিল, সে-বুক আবার যেন পাহাড়ের মতো উঁচু হইল!

প্রিয়ম্বদা কহিল—মেয়ে এসেছেন! কিন্তু উনি পণ করেছেন··· কনে দেখার মধ্যে উনি নেই।

—নেই! তার মানে? ও তো তোমাকে দেখতে আসেনি!

রামহরির দুই চোখ কপালে উঠিল!

প্রিয়ম্বদা বলিল—তোমার মেয়ে বিয়ে করবেন না···স্বাধীন জেনানা হবেন।

—স্বাধীন জেনানা! মেয়ের নিকুচি করেছে! আয় আমার সঙ্গে ···কথাটা বলিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া রামহরি সজোরে টানিল।

—উঃ! বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া মেয়ে কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

ঘর-বাড়ী চকিতে সব যেন সরিয়া গেল···রামহরির চোখের সামনে তরঙ্গোচ্ছ্বসিত অকূল সমুদ্র!

প্রিয়ম্বদা বলিল—বলছি, বেশ বাপু, করিস নে বিয়ে···ভদ্রলোকের ছেলে এসেছে কত দূর থেকে···একবারটি গিয়ে দেখা দিয়ে আয়! তাতে তোমার মেয়ে জবাব দিলেন, আমার মর্য্যাদা নেই বুঝি?··· নাও, মেয়ের মর্য্যাদা যেমন বাড়িয়েছো, এখন সে মর্য্যাদার পায়ে পড়ে মাথা কোটো!

রামহরি চাহিল মেয়ের পানে···দু'চোখে অগ্নিদৃষ্টি ভরিয়া। ···দিগঙ্গনা দাঁড়াইয়া আছে বিদ্রোহী বন্দীর মতো! সে মূর্ত্তি দেখিয়া রামহরির ভয় হইল। বুঝিল, রাগ করিয়া লাভ নাই। তর্জ্জন-গর্জ্জনের স্বর যদি ও-ঘরে গিয়া পৌঁছায়! তার চেয়ে···

নরম হইয়া রামহরি বলিল,—ঘাট হয়েছিল আমার! তোমার মত না নিয়ে ওকে আসতে বলে আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু এ কাজ করে ফেলেছি যখন, আমার মান রাখতে একটি বার দয়া করে এসে দেখা দাও। বিয়ে তোমায় করতে হবে না···সে-দিব্যি করতে বলো, করছি। এখন এসো, একটি বার দেখা দিয়ে আমাকে অপমান থেকে বাঁচাও···আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হবেন!

দিগঙ্গনার কি মনে হইল, সে বলিল,—বেশ, আমি যাবো, কিন্তু সাজতে-গুজতে পারবো না।

কৃতাঞ্জলি-পুটে রামহরি বলিল—তোমার যেমন অভিরুচি। তাই চলো। আমাকে বাঁচাও! মানে, যদি একটুও কৃতজ্ঞতা বোধ করো···

দিগঙ্গনা আসিল।

সামনের চেয়ার দেখাইয়া প্রবোধ বলিল—বসুন।

দিগঙ্গনা বসিল।

প্রবোধ বলিল···

অনেক কথা বলিল। নাটকে-নভেলে জীবনকে উপভোগ এবং সার্থক করিয়া তোলার সম্বন্ধে যে সব কথা লেখা থাকে···যে সব কথা পড়িতে-শুনিতে চমৎকার লাগে, অথচ যে সব কথার মানে বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায় না, এমনি সব কথা! বিবাহে বিরাগ থাকিলেও কথাগুলা দিগঙ্গনার মন্দ লাগিল না।

এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরিয়া এমনি কথার স্রোত বহিল; তার পর সে স্রোতে ভাঁটা পড়িলে প্রবোধ কহিল—দু'একখানা গান যদি···

দিগঙ্গনা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

প্রবোধ লক্ষ্য করিল। বলিল,—আচ্ছা, রাত্রে শুনবো। রাত্রে আছি তো এখানে।

দিগঙ্গনা বলিল—আমার তাহলে ছুটি?

প্রবোধ কহিল—বেশ, আসুন।

দিগঙ্গনা চলিয়া গেল।

মা জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম দেখলি রে?

মেয়ে কোনো জবাব না দিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। তার পর দিব্যবেশে সাজিয়া তখনি বাহির হইয়া গেল। মা বলিল—কোথায় চললি?

মেয়ে বলিল—বেড়াতে।

রামহরি আসিল অন্দরে, প্রিয়ম্বদা বলিল,—মেয়ে দেখে কি বললে?

—বোধ হয়, পছন্দ হয়েছে! কথার ভাবে মনে হলো। বললে, আপনারা কি-রকম খরচপত্র করবেন? আমি বললুম, সামর্থ্য তেমন নেই! তবে মেয়ের গুণ আছে···আপ-টু-ডেট্···শিক্ষা পেয়েছে···আই-সি-এস্ পেলে সে-স্বামীর সঙ্গেও তাল রাখতে পারবে! এটুকুর উপরেই যা ভরসা! চুপ করে শুনলো, তার পর বেরুলো। বললে, পরে একবার চারিধার দেখে আসি।

১১

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার সময় প্রবোধ আসিল পার্ল সিনেমার সামনে! ক্যাথরিণ হেপবার্ণের ছবি চলিতেছে···টিকিট কিনিয়া প্রবোধ গিয়া ফাষ্ট ক্লাশ সীটে বসিল।

ইনটারভালের সময় আলো জ্বলিলে চারি দিকে চাহিয়া দেখে, চার-আনার আট-আনার সীট একেবারে ভর্ত্তি। পিছনে ক'খানা বক্স ···একটি বক্সে···

মনে হইল, স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? কিন্তু স্বপ্ন নয়! দিগঙ্গনা! সদ্য দেখিয়া আসিয়াছে···মুখখানা এখনো যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে! তবে দিগঙ্গনা একা নয়···তার সঙ্গে সাহেবী পোষাক-পরা এক জন তরুণ ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মুখে সিগারেট···দিগঙ্গনার সামনে সে চকোলেট ধরিয়াছে!

প্রবোধের মনখানা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল! দিগঙ্গনাকে তার পছন্দ হইয়াছে। কথা কম কহিলেও প্রবোধ বুঝিয়াছিল, মেয়েটির বুকের মধ্যে মন বলিয়া পদার্থ টুকু আছে! সজীব মন। তার কথায় দিগঙ্গনা শুধু প্রতিধ্বনি তোলে নাই···দু'-একটা বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করিয়াছিল। সে মতবিরোধ প্রবোধের ভালো লাগিয়াছে! এমন স্ত্রী সে চায় না, যে-স্ত্রী সে-কালের প্রথায় স্বামীর কথায় 'ডিটো' বলিয়া সায় দিয়া যাইবে! কিন্তু···

যার সঙ্গে বেলা পাঁচটায় সাক্ষাৎ সারিয়া মনে খানিকটা রঙ লাগাইয়াছে, এখানে সন্ধ্যা সাতটায় তাকেই দেখিবে তরুণ বন্ধুর সঙ্গে সিনেমার বক্সে···এটুকু ছিল তার কল্পনাতীত। তরুণ মেয়ের তরুণ বন্ধু থাকা বিচিত্র নয়! তাই বলিয়া এতখানি অন্তরঙ্গতা··· প্রবোধের মনে বিদ্রোহের সুর দেখা দিল!

দিগঙ্গনা যদি বলিত, সন্ধ্যায় তার এনগেজমেণ্ট আছে এক বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখিবার জন্য···তাহা হইলে প্রবোধের মনে হয়তো এতখানি বিপ্লব দেখা দিত না। একবার ভাবিল, দেখা করিবে না কি?···তার পর মনে হইল, উচিত হইবে না। সে কোথাকার কে? ও বন্ধুটি পরম-অন্তরঙ্গ!···ভুম করিয়া যদি বলিয়া বসে, হু আর ইউ?

সত্যিই তো! তার স্ত্রী নয় দিগঙ্গনা···বিবাহের জন্য সে দেখাশুনা করিতে আসিয়াছে মাত্র।

উদ্ধত বাসনাকে সবলে দমন করিয়া প্রবোধ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—বক্সের পানে আর চাহিল না।

তার পর সুরু হইল ছবির ক্রম-গতি। পর্দ্দার বুকে সে ছবির সচল গতিটুকুই শুধু দেখিল, সে গতি-ছন্দে কাহারা আসিয়া কি কথা কহিয়া কি ঘটনা পর্দার পটে আঁকিয়া গেল, সে দিকে তার খেয়ালও রহিল না।

রাত্রি আটটায় ছবি শেষ হইল। সিনেমা ভাঙ্গিল। প্রবোধ কৌতূহল দমন করিতে পারিল না···কে ও ভদ্রলোক?

বাহিরে অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া দেখিল, দু'জনে আসিল···হাসিতে হাসিতে হাত-ধরাধরি করিয়া। সামনে ক'খানা সাইকল-রিক্শ। তাহারি একটায় দু'জনে চড়িয়া বসিল। ঘণ্টায় ঠুং ঠুং রব তুলিয়া রিক্শওয়ালা সাইকেলের প্যাডলে চাপ দিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল।

সিনেমার লোকদের প্রশ্ন করিতে জবাব মিলিল—উনি বাসন্তী সিণ্ডিকেটের ম্যানেজার চ্যাটার্জ্জী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র পিনাকী চ্যাটার্জ্জী।

সঙ্গিনীকে প্রবোধ জানে, কাজেই সে পরিচয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিল না। প্রশ্ন সে না করিলেও সিনেমার টিকিট-বাবু বলিল —ও মেয়েটি ওঁর সঙ্গে প্রায় আসে সিনেমায়। অন্য মেয়েরাও আসে···পিনাকী চ্যাটার্জ্জী এ-সিনেমার মস্ত পেট্রন···তাঁর লেডি-ফ্রেণ্ডের সংখ্যা অল্প নয়!

এ কথার প্রয়োজন ছিল না···কিন্তু টিকিট-বাবুর মনের কোণে হয়তো লুকাইয়া ছিল হিংসার বিন্দু। বয়সে সে-বেচারা এখনো প্রবীণ হয় নাই, চেহারা মন্দ নয়, সাজপোষাক কেতা-মাফিক, সিনেমা-গৃহে ফ্রী পাশ-বিতরণে তার অধিকার আছে···যে-কোনো আসনে··· তার ভাগ্যে লেডি-ফ্রেণ্ড জুটিল না···আর ঐ পিনাকী চ্যাটার্জ্জী! তাও ট্যাক্সি বা মোটরে করিয়া বান্ধবীদের আনে না—আনে ঐ সস্তার সাইকল-রিক্শয় চড়াইয়া!

প্রবোধ আর দাঁড়াইল না···সেও একখানা সাইকল-রিক্শ ভাড়া করিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল। বলিল, খুব খানিকটা ঘুরাইয়া আমাকে নামাইয়া দিবে এখানকার সিণ্ডিকেটের এ্যাকাউনটাণ্ট সান্ন্যাল বাবুর গৃহে। রিক্শওয়ালা বলিল—একটি টাকা লিবো বাবু। হাঁ।

প্রবোধ কহিল—বেশ!

চারি দিকে পরিষ্কার জ্যোৎস্না। সহর ছাড়িয়া খোলা পথে চলিল সাইকল-রিক্শ। পথের দু'ধারে বন-বাগান ক্ষেত-ময়দান···দূরে বসতির রেখা স্বপ্নপুরীর মতো আভাসে দেখা যায়। চমৎকার লাগিতেছিল। প্রবোধ থাকে কোলিয়ারী-সহরে—রাত্রে পথ চলিতে সেখানে দেখে কোথাও খনি-গর্ভ হইতে আগুনের জ্বলন্ত শিখা লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে, দৈত্যের লোলুপ লাল রসনার মতো···কোথাও বা মিষ কালো কয়লার ধোঁয়ায় ছনিয়ায় দিগন্তব্যাপী কালির পাথার!

প্রবোধের মনে অনেক কথার উদয়াস্ত চলিয়াছে···

হঠাৎ রিক্শওয়ালা বলিল—পাশে পার্ক। জানকী বাবু করিয়ে দেছেন। যাবেন?

প্রবোধ বলিল—পার্কে দেখবার কিছু আছে ?

রিক্শওয়ালা বলিল—দেখবার কিছু নেই। বাবুরা হাওয়া খেতে আসেন। ছেলেমেয়েরা বেড়াতে আসে, পার্কে খেলা করে।···ভিতর দিয়ে পথ আছে···ছুই পীরপাড়ায় গিয়ে পড়বো।

প্রবোধ কহিল—পীরপাড়ায় যাবার দরকার নেই বাপু, তবে বলছো, পার্ক···বেশ, চলো।

পার্কের মধ্যে ঢুকিল প্রবোধের সাইক্ল্-রিক্শ। ছোট একটি হট-হাউস, ঝর্ণা, সিমেন্টে বাঁধানো বসিবার আসন, লতাকুঞ্জ···

প্রবোধ জানে, শুধু এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানটি নয়, বন কাটিয়া বাসন্তী সহরটাকেই গড়িয়া তুলিয়াছেন জানকী বাবু! সহর গড়িয়া তোলার অর্থ বুঝা যায়। ব্যবসায়ীর মাথা···সে দিকে কোনো ত্রুটি রাখেন নাই! খরচ করিয়া সহর গড়িলে তার দাম উঠিয়া আসিবে! তাই বলিয়া সে সহরে আবার এমন পার্ক! ব্যবসা-বুদ্ধির কোথাও একটু রন্ধ্র এবং সে রন্ধ্রে ছিট না থাকিলে সহরে কেহ পার্ক গড়িয়া দেয় না··· কারণ, এ খরচের এক পয়সা উশুল হইবার নয়!

তাল-খেজুরের কেয়ারি-করা পথের ধারে সীমেন্টে বাঁধানো বেদীর উপরে সে বসিল। মাথায় শত চিন্তা যেন মাকড়শার জাল রচনা করিতেছে! বাবা-মা ধরিয়াছেন, বিবাহ করিতে হইবে। তার নিজেরো কোনো আপত্তি নাই! তবে পাঁচখানা বইয়ে যেমন পড়ে··· কলিকাতা পাঠ্যাবস্থায় যেমন দেখিয়াছে, বাঙালীর মেয়ে···জড়োসড়ো ভাবের আড়াল ভাঙ্গিয়া মুক্ত স্বচ্ছন্দ-বিহারিণীর মূর্ত্তিতে তার সুচারু বিকাশ! দেখিলেই নয়ন-মন আশায় আনন্দে ভরিয়া ওঠে! নিজের ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকিতে গিয়া এমনি একটি তরুণী-মূর্ত্তি বার-বার স্বপ্নের মাঝে কেন্দ্রিত হইয়া ওঠে! দিগঙ্গনাকে দেখিয়া মনের সে স্বপ্ন সফল হইবে ভাবিয়া আনন্দ হইয়াছিল অনেকখানি। সিনেমায় তাকে দেখিয়া সে আনন্দ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবার জো! গুটি ভাঙ্গিয়া যে সুন্দর প্রজাপতি বাহির হইল, সে প্রজাপতি এমনি করিয়া···

মন বলিল, তা কেন? বন্ধুর সঙ্গে যদি একটু মেলামেশা করে? নিজের কথা মনে পড়িল। মুঙ্গেরোয় সেও তো দু'-চারিটা অনাত্মীয় পরিবারে মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়াছে। সে সব পরিবারে দিগঙ্গনার মতো কুমারী মেয়েদের সঙ্গে পিকনিকেও বাহির হইয়াছে ···পিকনিকে প্রমোদ-বিচরণের সে আনন্দে কালির রেখা আছে বলিয়া কখনো মনে হয় নাই!

তবু···

মন বলিল, হায় রে, পুরুষের মনে চিরকাল সংশয়-বিষের বাষ্প···এ বাষ্প কোনো দিন সে মন হইতে দূর করিতে পারিল না!···

হঠাৎ ও-দিক হইতে একটা চীৎকার এবং আস্ফালন···দু'জন ছোকরা-বয়সী ভদ্রলোক নেশা করিয়া জড়িত বচনে প্রতিপত্তি জাহির করিতেছে···সেই সঙ্গে চৌকিদারের ঠ্যালা এবং গালিগালাজ!

প্রবোধ ভাবিল, সহরের এত দূরে বাসন্তী···সহরের ভালো-মন্দ সবই এখানে আছে!

চৌকিদারের সঙ্গে কলরব করিতে করিতে তারা চলিয়া গেল। একটা কথা শুধু প্রবোধের কানে আসিয়া লাগিল তীক্ষ্ণ ভাবে···মাতালরা বলিতেছিল,···চ্যাটার্জ্জী সাহেব কা লেড়কা! মজা দেখে গা!

চ্যাটার্জ্জী সাহেব! সিনেমায় শুনিয়াছে, সেই সৌখীন ভদ্রলোকটি চ্যাটার্জ্জী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র! এটিও তাঁর পুত্র?

রাত্রে প্রবোধ আর রামহরি সান্ন্যালের বাসায় ফিরিল না··· সোজা গেল রেলওয়ে-ষ্টেশনে। ষ্টেশনে বসিয়া রামহরি সান্ন্যালের নামে একখানি চিঠি লিখিয়া রিকশওয়ালার মারফৎ পাঠাইয়া দিল। রিকশওয়ালাকে বলিল,—আমার সুটকেশ আর বিছানা সে বাড়ীতে আছে, তাহা লইয়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবি। চিঠি দিলাম···এ জন্য দু'টাকা আলাদা ভাড়া মিলিবে।

রিকশওয়ালার পুরা তিন টাকা লাভ!···খুশী-মনে সে গাড়ী লইয়া রামহরি স্যান্যালের গৃহে ছুটিল।

১২

চিঠি পড়িয়া রামহরির চক্ষুস্থির! মেয়েদের কঠিন শাসনে দাবিয়া রাখার সে পক্ষপাতী নয়। তাদের স্বাধীন বিচরণে আপত্তির কোনো হেতুও সে দেখে না। তালা-চাবি কিম্বা লগুড়ের ভয় দেখাইয়া মানুষকে ঠিক রাখা যায়, আর তাহার ব্যতিরেক হইলে সর্ব্বনাশ ঘটে—এ কথা রামহরি মানে না! কিন্তু চিঠিতে যে কথা পড়িল···

পিনাকীর সঙ্গে মেয়ে সিনেমায় যাইতে চায়, যাক···কিন্তু বাড়ীতে বলিয়া গেল না কেন?

প্রিয়ম্বদাকে প্রশ্ন করিয়া জানিল, মেয়ে কোথায় যায়, তাকে বলিয়া যায় না!

রামহরির কথায় প্রিয়ম্বদা ডাকিল দিগঙ্গনাকে, বলিল—সন্ধ্যা সময় কোথায় গিয়েছিলি, শুনি!

দিগঙ্গনা বলিল,—ওদের বাড়ী।

—ওদের বাড়ী!···কাদের বাড়ী?

দিগঙ্গনা বলিল,—সামন্ত বাবুর মেয়েরা এসেছে।···ডেকেছিল। তাই···

রামহরি ছিল অন্তরালে। মেয়ের এ-কথায় সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। আগুনের হলকার মতো তার কণ্ঠে কথা বাহির হইল—মিথ্যা কথা! তুই গিয়েছিলি সিনেমায় চ্যাটার্জ্জী সাহেবের ছেলে ঐ পিনাকীর সঙ্গে।

মেয়ের দু'চোখে ভ্রুকুটি-রেখা···মেয়ে বলিল—জানো যদি তো জিজ্ঞাসা করো কেন? হ্যাঁ, তাই গিয়েছিলুম। বেশ করেছিলুম, গিয়েছিলুম! বন্ধু হয়···সে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল!

রামহরি সান্ন্যাল বলিল—বাড়ীতে সে কথা বলে গেলেই তো পারতে! তাছাড়া গিয়েছিলে যদি তো তোমার মাকে এ মিথ্যা জবাব দেবার মানে?

মেয়ে বলিল—তোমরা যদি পছন্দ না করো! তাছাড়া এতে দোষ কি? সে বন্ধু।

প্রিয়ম্বদা বলিল—বন্ধু! বলতে লজ্জা করছে না?

রামহরি বলিল,—বড়লোকের ছেলে! সে তোমার বন্ধু কি রকম! কি নিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব? তাছাড়া সে পুরুষ-মানুষ···তুমি মেয়ে,···তোমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ে না···কিছু না···

দু'চোখে আগুন ভরিয়া দৃষ্টির সে-আগুন মা-বাপের উপর বর্ষণ করিয়া দিগঙ্গনা বলিল—এ বন্ধুত্ব তোমাদের বোঝবার কথা নয়···

সেকালের নোংরা মন নিয়ে তোমরা করো মানুষের বিচার !···তোমরা ভেবেছো কি, শুনি ? আমাদের এ বন্ধুত্বে **there is nothing wrong.**

প্রিয়ম্বদা বলিল—তা নেই, সে যেন আমরা বুঝলুম ! কিন্তু যারা তোমায় চেনে না, জানে না···তোমার মনের শিক্ষা বোঝে না··· তাদের চোখে বিশ্রী লাগে তো !

ঝঙ্কার দিয়া দিগঙ্গনা বলিল—লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। আমি নিজে যা ভালো বুঝবো, তা করবো···এতে লোক কি, তোমরাও যদি দোষ ধরো **I would not care.**

কথাটা বলিয়া দুমদুম্ করিয়া বিজয়-গর্ব্বে মেয়ে গিয়া ঢুকিল নিজের ঘরে।

রামহরি এবং প্রিয়ম্বদা একেবারে থ !

রামহরি কিন্তু এইখানেই থামিল না—দাউ-দাউ জ্বলন্ত আগুনের মতো তখনি গিয়া পড়িল কামাখ্যা সাহেবের উপর।

কামাখ্যা সাহেবের মেজাজ তিক্ত···এইমাত্র থানার অফিসার আসিয়াছিল পুত্র দেবকীর বিরুদ্ধে মাতলামির কেস্ লইয়া চুপি-চুপি তার হেস্তনেস্ত করিতে। সন্ধ্যার সময় পীরপাড়ায় তাড়ির দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া তাড়ি খাইয়াছে—তার পর তাড়িওয়ালা দাম চাহিতে তাড়িওয়ালার অন্দরে ঢুকিয়া হৈ-হৈ ব্যাপার···তাড়িওয়ালা শেষে চৌকিদার ডাকিয়া চৌকিদারের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে।

তাড়িওয়ালার ভাঁড় ভাঙ্গিয়া কলসী ভাঙ্গিয়া কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া তার প্রায় ষোল-সতেরো টাকা লোকসান করিয়া আসিয়াছে ! ···সেই টাকাটা দিয়া ছেলেকে কোনো মতে আদালতের বাহির হইতেই মুক্ত করিয়া কলঙ্কের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন ! সে ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে আবার রামহরি !

রামহরি পিনাকীর নামে নালিশ জানাইল, পাত্র প্রবোধ আসিয়াছিল মেয়ে দেখিতে—মেয়েকে পছন্দও করিয়াছিল। তার পর সিনেমার বক্সে মেয়েকে পিনাকীর সঙ্গে দেখিয়া বিবাহের কথা কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাঁপিতে কাঁপিতে রামহরি বলিল, এ তো শুধু সম্বন্ধ ভাঙ্গা নয়—মুখে-মুখে এ কথা প্রচার হইলে তার মেয়ের বিবাহের উপায় কি বা কি করিয়া হইবে !

রামহরির কথা শুনিয়া কামাখ্যা সাহেব পিনাকীকে ডাকাইয়া আনিল। বলিল—কাল তুমি এর মেয়ে দিগঙ্গনাকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলে ?

বাপের কণ্ঠ এমন কঠিন রুক্ষ যে পিনাকী অস্বীকার করিতে পারিল না···চোরের মতো ভীরু কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ।

—ওঁদের বাড়ীতে বলে তাকে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলে ?

পিনাকী বলিল—আমার ফ্রেণ্ড হয়। সে প্রায় আমায় বলে, সিনেমা দেখাতে হবে। তাই দেখাই। বন্ধু···

কামাখ্যা সাহেব হাঁকিল,—বন্ধু ! আমাদের সমাজ এ বন্ধুত্ব মানবে ? তোমাদের মতো বয়সের **young man and young girl** ! এই ভাখো চিঠি···ওঁর মেয়েকে কাল একটি পাত্র এসেছিল দেখতে। সিনেমায় সে তোমাদের এক-বক্সে দেখে ওঁকে এই চিঠি লিখে বিয়ের কথা কেটে দিয়ে চলে গেছে।

বলিয়া চিঠিখানা সে দিল পিনাকীর হাতে।

পিনাকী বলিল—এ চিঠি ! আমি···

কামাখ্যা সাহেব জোর গলায় বলিল—হ্যাঁ, এ চিঠি তোমাকে পড়তে হবে। পড়ো

চিঠি পিনাকীকে পড়িতে হইল। পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে—

এত বড় মেয়ে কোথাকার এক জনের সঙ্গে সিনেমা দেখতে চলেছে ! আপনার তরফ থেকে কোনো লোক তার সঙ্গে নেই ! দেখে আমার ভয় হয়, এ মেয়েকে বিবাহ করে সুখের প্রত্যাশা অসম্ভব !

আরো অনেক কথা লেখা ছিল।

চিঠি পড়া হইলে পিনাকী চিঠি দিল কামাখ্যা সাহেবের হাতে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এঁর মেয়ের যে ক্ষতি করেছো এ অবিবেচনায়, সে ক্ষতি তোমাকে পূরণ করতে হবে !

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিনাকী চাহিল কামাখ্যা সাহেবের পানে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এই মেয়েকে তুমি বিবাহ করবে··· বুঝলে ! উনি বারেন্দ্র, আমরা রাঢ়ী—তবু।

পিনাকীর মুখে উত্তর নাই।

কামাখ্যা সাহেব বলিল,—রাজী আছো ? বলো···

পিনাকী বলিল—না।

না ! কামাখ্যা সাহেব জ্বলিয়া উঠিল। বলিল,—না ! তার মানে ? তোমার তো বন্ধু হয় এঁর মেয়ে···তুমি বললে ! তবে ?

পিনাকী বলিল—বন্ধু হতে পারে, তা বলে বিয়ে করে তাকে করবো স্ত্রী ! অসম্ভব !

অসম্ভব ! কামাখ্যা সাহেব গর্জ্জন করিল,—তাকে নিয়ে সিনেমায় যেতে পারো, আমোদ-প্রমোদ করতে পারো, আর তাকে স্ত্রীর সম্মান দিতে পারবে না ! **This is the way you mean to treat your lady friends !**

তার পর চাহিল রামহরির পানে, বলিল,—পিনাকীর মতো রাস্কেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে, এমন কথা তোমাকে বলতে পারি না। তবে বিবাহের জন্য পাত্র ভাখো···মেয়ের যৌতুক হিসাবে পিনাকী আমার কাছ থেকে যা পাবে···টাকা-কড়ি আমি মারা গেলে···ওর সে-টাকার অংশ থেকে কেটে নিয়ে আমি দেবো দু' হাজার টাকা···ড্যামেজ ! পিনাকী মাষ্ট সাফার এ্যাণ্ড পে কম্‌পেন্‌সেশন্ ! তোমার মেয়ের মর্য্যাদার দাম ওকে দিতে হবে এই দু' হাজার টাকা !

যেন বাজ পড়িয়াছে ঘরে···এমনি স্তব্ধতা ! পিনাকী নিঃশব্দে সরিয়া পড়িতেছিল, কামাখ্যা সাহেব বলিল—একটি ছেলে তাড়ি খেয়ে মাতলামি করে এসেছেন···আর একটি কুলধ্বজ !

তার পর চাহিল রামহরির পানে, বলিল—মেয়েকে পিনাকীর সঙ্গে আর মিশতে দিয়ো না। এর পর যদি কোনো কিছু ঘটে আমি দায়ী হবো না রামহরি···**beware !**

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব-রণাঙ্গনে ভূমধ্যসাগর-বক্ষের গুরুত্বই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অসংখ্য রণ-বিমানের অবিরাম ঘর্ঘর শব্দে এবং কামান ও মেসিন্ গানের বজ্রনির্ঘোষে ভূমধ্যসাগরের জল, জলরাশি-পরিবেষ্টিত ভূমিখণ্ডগুলি ও দিগন্তব্যাপী আকাশ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। যে বিঘোষিত উদ্দেশ্যের প্রাবম্ভিক অনুষ্ঠানরূপে জলে ও অন্তরীক্ষে এই তৎপরতা, তাহার বাস্তব প্রকাশ দেখিবার জন্য এখন উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা চলিতেছে। পূর্ব্ব-য়ুরোপের রণাঙ্গনে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় অক্ষশক্তি আক্রমণ চালাইয়া থাকে, সেই অবস্থা এখন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। চরম সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উভয় পক্ষ সেখানে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুতও বটে; আসন্ন সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্র নির্মাণের জন্য উভয় পক্ষের বিমান-তৎপরতাও আরম্ভ হইয়াছে। এখন কোন্ মুহূর্ত্তে কে কোথায় কি ভাবে আঘাত করিবে—তাহার জন্যই সাগ্রহে সুযোগের সন্ধান! প্রাচ্য অঞ্চলে জাপানের মনোভাব এখনও অস্পষ্ট। সম্মিলিত পক্ষ তাহাকে প্রত্যাঘাতের যে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা কোন্ দিকে কি ভাবে প্রকাশ পাইবে, উহা এখনও সুস্পষ্ট নহে!

আসন্ন "দ্বিতীয় রণাঙ্গন"—

উত্তর-আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষ এখন প্যান্টেলেরিয়া, সিসিলি ও সার্দ্দিনিয়া দ্বীপে এবং ইটালীতে প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চালাইতেছে। এই অঞ্চলে তাহাদের নৌবাহিনীর তৎপরতাও সময় সময় প্রকাশ পাইতেছে; বৃটিশ নৌবহর ইতোমধ্যে কয়েক বার প্যান্টেলেরিয়ায় গোলা বর্ষণ করিয়াছে। অন্যান্য দ্বীপের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও গোলা বর্ষিত হইয়াছে। স্পষ্টতঃই, উত্তর-আফ্রিকা হইতে যে দ্বীপমালা ইটালীতে পৌঁছিবার সোপান-স্বরূপ, সম্মিলিত পক্ষ এক একটি করিয়া তাহা অধিকারে প্রয়াসী; ভূমধ্যসাগরপথ নির্ব্বিঘ্ন করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে, য়ুরোপে অভিযানের জন্যও ঐ সকল দ্বীপে অধিকার-প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য। সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে বাধা-দানের উদ্দেশ্যে এবং সাধারণ ভাবে ইটালী ও তাহার অধিকৃত অঞ্চলের আকাশে প্রাধান্য স্থাপনের জন্যও এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের এই প্রবল বিমান-তৎপরতা।

টিউনিসিয়ার যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র য়ুরোপ অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সম্মিলিত পক্ষ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবার মুহূর্ত্ত আজ সমাগত। রুশিয়া আকুল আগ্রহে ভূমধ্যসাগরের দিকে চাহিয়া আছে, রুশ জনসাধারণ যেন ধরিয়া লইয়াছে—এবার আর দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রসঙ্গ চাপা দেওয়া সম্ভব হইবে না; অতি সত্বর ইঙ্গ-মার্কিণ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে জার্ম্মাণ সমর-শক্তির কতকাংশ প্রত্যাহৃত হইবেই। সম্মিলিত পক্ষের আয়োজন দেখিয়াও মনে হইতেছে যে, তাঁহারা এ বার প্রত্যক্ষ ভাবে নাৎসী ফ্যাসিষ্ট শক্তির কেশাকর্ষণে প্রবৃত্ত হইবেন; কেবল পাঁয়তারা কষিয়াই দায়িত্ব এড়াইবার প্রয়াস করিবেন না।

এখন প্রশ্ন—কোন্ দিক্ হইতে কি ভাবে এই অভিযান আরম্ভ হইবে? উত্তর-আফ্রিকায় এবং পশ্চিম এশিয়ায় সম্মিলিত পক্ষ এখন যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে একই সময়ে কয়েকটি স্থান হইতে তাঁহাদের আক্রমণ প্রসারিত হওয়া সম্ভব। প্যান্টেলেরিয়া ও সিসিলির পথে দক্ষিণ-ইটালীতে এবং সর্দ্দেনিয়া হইতে মধ্য-ইটালীতে আক্রমণ চলিতে পারে; সার্দ্দিনিয়াকর্সিকা হইতে দক্ষিণ-ফ্রান্সে আঘাত করা সম্ভব; সাইপ্রাস্ হইতে ডোডেকেনীজের পথে স্যালোনিকায় এবং তথা হইতে বলকান অঞ্চলে আক্রমণ প্রসারিত হওয়াও অসম্ভব নহে; ক্রীট্ অধিকৃত হইলে গ্রীসে আঘাত করা যাইতে পারে। ইটালীতে অভিযান কিছু দূর অগ্রসর হইলে হয় ত আড্রিয়াতিক সাগর অতিক্রম করিয়া আলবেনিয়াতেও আঘাত করা যাইবে। তবে, প্রথমেই যুগোশ্লোভিয়ায় আক্রমণ-পরিচালন সম্ভব নহে; কারণ, ডালমেসিয়ার উপকূল পর্ব্বত-সঙ্কুল ও দুর্গম। আর, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তর ও পশ্চিম য়ুরোপে আঘাতের সুবিধা ত আছেই। ঐ অঞ্চলেও এখন প্রবল বিমান-তৎপরতা চলিতেছে। দক্ষিণ-য়ুরোপে অভিযানের আয়োজন ও আস্ফালনের দ্বারা শত্রুকে বিভ্রান্ত করিয়া উত্তর ও পশ্চিম য়ুরোপেও অভিযান আরম্ভ হইতে পারে।

ইঙ্গ-মার্কিণ সমর-নায়কগণ যদি সত্যই অক্ষশক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত করিতে চাহেন, তাহা হইলে বিভিন্ন দিক্ হইতে তাঁহাদের আক্রমণ পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। কেবল দক্ষিণ-ইটালীতে আঘাত করিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে অসামর্থ্যের অপবাদ ঘুচান যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করা সম্ভব হইবে না। ইটালীর কতকাংশ যদি ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের দ্বারা মথিতও হয়, তাহা হইলেও জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার সমরায়োজন হ্রাস করিবে না; সে জানে—এইবার গ্রীষ্মের কয়েকটি মাসেই পূর্ব্ব-য়ুরোপে তাহার শেষ সুযোগ।

এখন প্রশ্ন—ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকগণ কি সত্যই প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া অবিলম্বে রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইতে অভিলাষী? এখনও সোভিয়েট রুশিয়ার সংগ্রাম-শক্তি আছে, তাহার যতই শক্তিক্ষয় হউক না, এখন তাহার আঘাতে জার্ম্মাণীর রক্ত-মোক্ষণের সম্ভাবনা দূরীভূত হয় নাই। কাজেই, এখনই যদি য়ুরোপের অন্যত্র অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট বাহিনীর পক্ষেও শত্রুকে প্রবল প্রত্যাঘাত করা সম্ভব হইবে, হয় ত অতি সত্বর সোভিয়েট সেনা তাহাদের স্বদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মধ্য য়ুরোপেও প্রবেশ করিবে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সৈন্য অন্য দেশে প্রবেশ করিলে উহাতে তথায় সুদূরপ্রসারী রাজনীতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কগণ যদি এখনই য়ুরোপ অভিযানের সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে এই সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াই তাঁহাদিগকে উহা করিতে হইবে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে—য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রশ্নের সহিত রাজনীতিক সমস্যা বিশেষ ভাবে জড়িত; সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকদিগের পরিপূর্ণ আস্থা না থাকিলে স্বভাবতঃ তাঁহারা পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইয়া রুশ সেনার মধ্য-য়ুরোপে প্রবেশের সম্ভাবনা ঘটাইবেন না। এইরূপ অবস্থায় তাহারা রুশিয়ায় আরও শক্তিক্ষয় এবং জার্ম্মাণীর আরও রক্তমোক্ষণের পর নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে শেষ আঘাত করিয়া একসঙ্গে বিজয়ের কৃতিত্ব অর্জ্জন এবং বলশেভিক মতবাদের প্রসার-নিবারণের জন্য প্রতীক্ষা করিবেন।

ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কদিগের সাম্প্রতিক উক্তিতে এবং তাঁহাদের আয়োজনে মনে হইতেছে যে, ব্যাপক ভাবে হউক, আর নামমাত্রই হউক, তাহারা শীঘ্রই য়ুরোপের শত্রুকে আঘাতের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত ৮ই জুন মিঃ চার্চিল বৃটিশ কমন্স সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, ব্যাপক ভাবে জটিল ও বিপৎসঙ্কুল "উভচর যুদ্ধ" আসন্ন! কিন্তু এই উভচর যুদ্ধ প্রচণ্ড ভাবে চালাইয়া পূর্ব্ব দিক্ হইতে রুশিয়ার এবং

দক্ষিণ দিক্ হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের চাপে অক্ষশক্তিকে অবিলম্বে চূর্ণ করিবার প্রয়াস হইবে কি না, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ এখনও আছে। কি কারণে এই সন্দেহ, তাহার সন্ধান করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না।

য়ুরোপের যুদ্ধের সহিত আমেরিকার প্রত্যক্ষ স্বার্থ-সম্বন্ধ অল্পই। অক্ষশক্তি আজ পরাজিত হউক, আর দুই বৎসর পরে পরাজিত হউক, তাহাতে আমেরিকার বিশেষ আসিয়া যায় না। তবে, অক্ষশক্তির পরাজয় আমেরিকার আকাঙ্ক্ষিত; কারণ, অক্ষশক্তির শাসিত দেশের দাস-শ্রমিক দ্বারা উৎপন্ন স্বল্প মূল্যের পণ্যের সহিত আমেরিকা কখনই প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না। মার্কিণী শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান হ্রাস করাইয়া অক্ষশক্তির সহিত সমান তালে চলিবার প্রয়াসও কার্য্যতঃ অসম্ভব। তবে, অক্ষশক্তির পরাজয়ে কিছু বিলম্ব ঘটিলে তাহার ক্ষতি নাই; অক্ষশক্তির পরাজয়ের পর য়ুরোপের অর্থের বাজার আমেরিকার পক্ষে উন্মুক্ত থাকিবার নিশ্চয়তা পাইলেই সে সন্তুষ্ট। কিন্তু বৃটেনের অবস্থা স্বতন্ত্র; যুদ্ধোত্তর কালে য়ুরোপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃটেনের আগ্রহ আমেরিকার অপেক্ষা অল্প না হইলেও বর্ত্তমান যুদ্ধ অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত চলিতে দিলে তাহার প্রত্যক্ষ বিপদের সম্ভাবনা আছে। যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব কারণে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অক্ষশক্তির সমরশক্তির আঘাতে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ চূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। বৃটিশ রাজনীতিকদের পক্ষে এই সম্ভাবিত বিপদকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিতে প্রয়াসী হওয়া স্বাভাবিক।

এইরূপ অবস্থায়, য়ুরোপে প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া দ্রুত অক্ষশক্তির পরাজয় সাধনে বৃটেন ও আমেরিকার আগ্রহ যদি সমান না হয়, তাহা হইলে উহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। আমেরিকার এক শ্রেণীর মধ্যে এখন য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি না করিয়া জাপানের প্রতি মনোযোগ প্রদানের কথা বলা হইতেছে। সেনেটর বার্টন্ হুইলার স্পষ্টই বলিয়াছেন—রুশিয়া যখন কম্যুনিজম্ প্রচারে বিরত থাকিবার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয় নাই, জাপ-বিরোধী যুদ্ধেও সহযোগিতার কথা দেয় নাই, তখন য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি না করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। এই উক্তি এক জন মার্কিণী সেনেটরের ব্যক্তিগত অভিমতমাত্র নহে—এক শ্রেণীর মার্কিণী রাজনীতিকের মনোভাব ইহাতে প্রতিভাত। ঠিক এই সময় জাপান কর্ত্তৃক আমেরিকা আক্রমণের পরিকল্পনা আবিষ্কার, চীনের প্রতি দরদের আতিশয্য প্রভৃতি য়ুরোপ অপেক্ষা সুদূর প্রাচীর গুরুত্ব অধিক প্রতিপন্ন করিয়া দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটাইবার সুকৌশলী প্রয়াস কি না, তাহা কে বলিবে? আমেরিকায় কয়লার খনিতে যে বিরাট্ ধর্ম্মঘট হইয়া গেল, তাহার সহিত কোন কোন মার্কিণী ধনকুবেরের গোপন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। ঠিক এই সময়ে কয়লা-শিল্প পঙ্গু করিয়া আমেরিকার সমরোপকরণ উৎপাদনে বিঘ্ন-সৃষ্টির প্রয়াসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্য্য মনে করা অসঙ্গত নহে। কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর দালালরূপে শ্রমিক নেতা লুইস রুজভেল্ট-চার্চ্চিল পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইবার দূরবর্ত্তী উদ্দেশ্য লইয়া যে আসরে অবতীর্ণ হন নাই, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অবিশ্বাস হেতু দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টিতে এই দ্বিধা ব্যতীত, বিশ্ব-সংগ্রামের কৌশল হিসাবেও এই বিষয়ে আপাততঃ ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইতে পারে। সোভিয়েট রুশিয়ার আঘাতে জার্ম্মাণীর বহু শক্তি ক্ষয় হইয়াছে, আরও শক্তিক্ষয়ের সম্ভাবনা আছে। পক্ষান্তরে, জাপান এখনও অটুট-শক্তি; নব-লব্ধ সাম্রাজ্যের রস আহরণে তাহার শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিতও হইতেছে। কাজেই, ইঙ্গ-মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কগণ জাপানের জন্য তাঁহাদের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে আগ্রহান্বিত হইতে পারেন; জনমতের দাবীতে য়ুরোপে নামমাত্র "দ্বিতীয় রণাঙ্গন" সৃষ্টি করিয়া জার্ম্মাণীকে আরও দুর্ব্বল করিবার প্রকৃত দায়িত্ব এখনও সোভিয়েট রুশিয়ার স্কন্ধে ফেলিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। জার্ম্মাণীকে শেষ আঘাত হানিবার সুযোগ যাহাতে না যায়, আবার অধিক শক্তিও যাহাতে ক্ষয় না হয়, সেই ভাবে তাঁহারা সুকৌশলে অগ্রসর হইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরিকল্পিত য়ুরোপ অভিযানের সহিত সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধের অবস্থা বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট; সরবরাহ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ না হউক, উহার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উন্নতি না হইলে য়ুরোপ অভিযান সম্ভব হইবে না। মিঃ চার্চ্চিল আশার বাণী শুনাইয়াছেন—সাবমেরিণের উপদ্রব বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে; এই উপদ্রব নিবারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, মার্কিণী নৌ-সচিব কর্ণেল নক্স বলিয়াছেন—মে মাসে সাবমেরিণের উপদ্রবের স্বল্পতা জুন মাসে উহার প্রাবল্য বৃদ্ধির আভাস হইতে পারে; এই বিষয়ে অত্যধিক আশান্বিত হইয়া উচিত নহে। বস্তুতঃ, সমুদ্রবক্ষে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে আমেরিকা হইতে সময় সময় আশঙ্কা প্রকাশিত হয়; আর বৃটিশ রাজনীতিকগণ উহাতে লঘুত্ব আরোপের প্রয়াস করেন। আটলাণ্টিক মহাসাগর, ভূমধ্যসাগর, মেরুসাগর, ও ভারত মহাসাগরের পূর্ব্বাঞ্চল নিরাপদ রাখিবার দায়িত্ব বৃটেনের। কাজেই, মার্কিণী রাজনীতিকগণ এই নিরাপত্তায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া পরোক্ষে বৃটেনের বিরুদ্ধেই অযোগ্যতার অভিযোগ করিয়া থাকেন। বৃটেন্ ও আমেরিকার পারস্পরিক ব্যবহারে অন্যের প্রতি এই দোষারোপের চেষ্টা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ নহে। ইহা ব্যতীত, সমুদ্রবক্ষের নিরাপত্তায় এই সন্দেহ প্রকাশ য়ুরোপে ব্যাপক অভিযান পরিচালনে অসামর্থ্যের পরোক্ষ কৈফিয়ৎ নহে ত?

আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল—

সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বিশ্বের রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গত মহাযুদ্ধের পর রুশিয়ায় কম্যুনিষ্ট-বিপ্লব সফল হইলে—১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল বা "কমিণ্টার্ণ" গঠিত হয়। এই দলের প্রধান কেন্দ্র মস্কৌয় প্রতিষ্ঠিত হইলেও রুশ সরকারের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ—অন্ততঃ প্রকাশ্য সম্বন্ধ ছিল না। মঃ ষ্টালিন কিছু দিন পূর্ব্বে রুশিয়ার প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দলের রুশ-শাখার সেক্রেটারী ছিলেন। রুশিয়ার শাসন-ব্যবস্থার সহিত মঃ ষ্টালিনের তখন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না; কাজেই, তিনি রুশ কম্যুনিষ্ট দলের সেক্রেটারী থাকায় "কমিণ্টার্ণের" সহিত রুশ সরকারের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপিত হয় নাই। কমিণ্টার্ণের সহিত রুশ সরকারের সম্বন্ধ প্রকাশ্যে স্বীকৃত হইত না বলিয়াই রুশ-জার্ম্মাণ অনাক্রমণ-চুক্তি ও রুশ-জাপান নিরপেক্ষতা চুক্তি সম্ভব হইয়াছে। জার্ম্মাণী ও জাপান কমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তির স্বাক্ষরকারী। নান্কিং সরকারের সহিত জাপানের চুক্তিতে কমিণ্টার্ণের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

কমিণ্টার্ণের সহিত রুশ সরকারের প্রকাশ্য সম্বন্ধ না থাকিলেও এই প্রতিষ্ঠানটি যে রুশ সরকারের সাহায্যপুষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রতিষ্ঠান এক দিকে যেমন বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশে মার্কসবাদ

প্রচার করিত, অন্য দিকে তেমনই কম্যুনিষ্ট রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হইত। এই শেষোক্ত কারণে কমিণ্টার্ণকে আন্তর্জ্জাতিক সোভিয়েট-সুহৃদ্ প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে।

কম্যুনিজম্ আন্তর্জ্জাতিক মতবাদ; ইহা সমগ্র মানব-সমাজকে সমান অধিকারসম্পন্ন বিরাট্ পরিবারে পরিণত করিতে চাহে। কম্যুনিষ্টরূপে লেনিন ও ষ্টালিনের উদ্দেশ্যও ইহাই। তবে এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ট্রটস্কির ন্যায় তাঁহারা অবিলম্বে মুক্ত অসি লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতে চাহেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস—কম্যুনিজম্ রপ্তানী করিবার পণ্য নহে। লেনিনের নির্দেশে ষ্টালিন এমন একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহার বহিরাকৃতি জাতীয় (national) এবং আভ্যন্তরীণ গঠন সমাজতান্ত্রিক (socialistic) হইবে। এই রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণ অনুপ্রাণিত হইবে, এই রাষ্ট্রও গণ-স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস করিবে। এই রাষ্ট্রের সাহায্যে ও নির্দেশে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট দল বিভিন্ন দেশের নিপীড়িত জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করাইতে সচেষ্ট হইবে; জনগণ যখন শোষক শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে, তখন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করিবে। স্পেন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও চীন সম্পর্কে এই নীতির অকপট অনুসরণ দেখা গিয়াছে। আবার, কম্যুনিষ্ট রুশিয়া যে সত্যই জোর করিয়া কাহাকেও কম্যুনিজম্ গিলাইতে চাহে না—কম্যুনিজম্ রপ্তানী করিবার দুর্ব্বুদ্ধি যে তাহার সত্যই নাই, তাহাও পরাজিত ফিন্ল্যাণ্ডের প্রতি তাহার ব্যবহারে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

কমিণ্টার্ণের নেতৃবৃন্দ আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিজম্ প্রচারের এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার অপরিহার্য্যতায় তাঁহারা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহা বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন হইল যে, শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই আজ সাম্রাজ্যবাদের শেষ আশ্রয় ফ্যাসিষ্ট মতবাদ নিশ্চিহ্ন হইবার সম্ভাবনা অদূরবর্ত্তী। রুশিয়ার প্রচণ্ড সমর-যন্ত্র যদি জার্ম্মাণীর গতিরোধ না করিত, তাহা হইলে দুই বৎসর পূর্ব্বেই পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশে ফ্যাসিজম্ সুপ্রতিষ্ঠিত হইত।

বর্ত্তমানে সোভিয়েট রুশিয়াকে বাঁচাইয়া রাখাই পৃথিবীর সকল কম্যুনিষ্টের কাম্য; সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ নূতন রূপ ফ্যাসিজমের উচ্ছেদ সাধনই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বর্ত্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। কাজেই, ঐ সকল রাষ্ট্রের জাতীয় উদ্দেশ্যের সহিত কম্যুনিষ্টদিগের আশু লক্ষ্যের আর কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং, ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সংগ্রামরত রাষ্ট্রগুলিতে যে কম্যুনিষ্ট দল আছে, তাহাদিগকে আশু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আর কোন নির্দ্দেশ দিবার প্রয়োজনও নাই; ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী জাতীয় নীতিই কম্যুনিষ্টদিগের অনুসরণীয়। ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের কম্যুনিষ্টরাও তাহাদের এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। এইরূপ অবস্থায় আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট দলের অস্তিত্বের আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই। তাই, সম্প্রতি কমিণ্টার্ণের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এই দল ভাঙ্গিয়া দিতে সুপারিশ করিয়াছেন। অতঃপর বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট দল তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিবে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম্যুনিষ্ট নেতৃবর্গের রাজনীতিক দূরদর্শিতাও প্রকাশ পাইয়াছে। রুশিয়ার প্রতি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সন্দেহের কারণ—রুশিয়া কম্যুনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী; কম্যুনিজম্ আন্তর্জ্জাতিক মতবাদ। আর কমিণ্টার্ণই আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কম্যুনিজম্ প্রচারের যন্ত্র; রুশ সরকার এই যন্ত্রের চালক। কমিণ্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দিয়া কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ আজ এই কথা বলিলেন যে, তাঁহারা কম্যুনিজম্ রপ্তানী করিতে চাহেন না; সুতরাং, "হে ইঙ্গ-মার্কিণ ধুরন্ধরগণ! তোমরা এই মিথ্যা অজুহাতে আর দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিও না। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি অবিশ্বাস ত্যাগ কর।"

মিঃ চার্চ্চিলের সফর—

মিঃ চার্চ্চিল সদলবলে মে মাসের শেষভাগে আট্‌লাণ্টিক পাড়ি দিয়াছিলেন। এক পক্ষকাল ওয়াশিংটনে বসিয়া সমর-নীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সকল প্রকার নীতির আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া তিনি আকাশপথে আলজিয়ার্সে আসেন। তথায় বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন্ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর, তাঁহারা যুগলে উত্তর-আফ্রিকায় রণক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া, সেনাপতিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং ভোজসভায় সকলকে আপ্যায়িত করিয়া জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন।
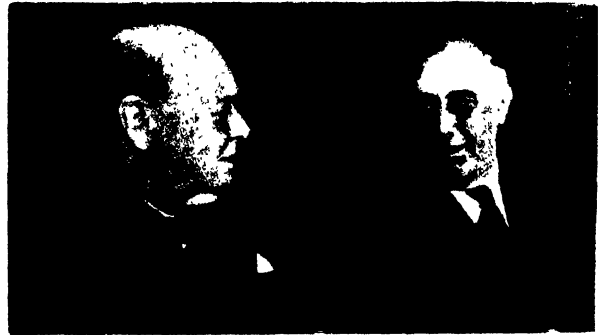
আলোচনারত মিঃ চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট

মিঃ চার্চিল ওয়াশিংটনে কোন্ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন, তাহা স্বভাবতঃই অপ্রকাশিত আছে। ঠিক এই সময় পত্রবাহক মিঃ ডেভিস্ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কোন্ বিষয়ে লিখিত পত্র লইয়া মঃ ষ্টালিন সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং রুশ প্রধান-মন্ত্রীর কি উত্তর লইয়া আবার ওয়াশিংটনে ফিরিয়াছেন, তাহাও প্রকাশিত হয় নাই।

মিঃ চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়—একই সময় য়ুরোপে ও জাপানের বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণ পরিচালনের প্রতিশ্রুতি। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিনের বিবৃতি হইতে পরে জানা গিয়াছে যে, একই সময় সুদূর প্রাচীতে ও য়ুরোপে সমান বিক্রমে সংগ্রাম পরিচালিত হইবার প্রতিশ্রুতি তিনি পাইয়াছেন; রুজভেল্ট-চার্চ্চিল সম্মিলনের অন্যতম সিদ্ধান্ত ইহাই। মিঃ চার্চ্চিলের ওয়াশিংটনের বক্তৃতায় জাপান অপেক্ষা জার্ম্মাণীর প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদানের কৈফিয়ৎ ছিল, তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল—জার্ম্মাণীর পরাজয়েই জাপানের পরাজয়, কিন্তু জাপানের পরাজয় জার্ম্মাণীর পরাজয় নহে। মিঃ চার্চ্চিলের উক্তি শ্রবণ করিয়া মনে হইয়াছিল—আমেরিকার জনমত যেন তাঁহার বিরুদ্ধে জাপানকে উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মাণীর প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদানের অভিযোগ করিয়াছে; আর তিনি অভিযোগকারীর সমক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। মিঃ চার্চ্চিলের সেই বক্তৃতা আমেরিকার মনোভাব সম্পর্কে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মন্তব্যের পরোক্ষ সমর্থক বলা যাইতে পারে। লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে অতি সত্বর জলে ও স্থলে তৎপরতার আভাস আছে। ইহাই তাঁহার বক্তৃতার একমাত্র

উল্লেখযোগ্য বিষয় হইলেও ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই; এই তৎপরতার প্রাবল্য কিরূপ হইবে, জার্ম্মাণীকে এই বৎসরই চরম আঘাত হানিবার প্রয়াস হইবে কি না, বক্তৃতায় তাহা সুস্পষ্ট নহে।

রুশ-রণাঙ্গন—

মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—রুশিয়ার ২ হাজার মাইল রণাঙ্গনে ১৯৮ ডিভিসন জার্ম্মাণ সৈন্য এবং তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির ২৮ ডিভিসন সৈন্য সন্নিবিষ্ট। টিউনিসিয়ার রণাঙ্গনে কেবল ১৫ ডিভিসন অক্ষশক্তির সৈন্য ছিল; তাহাদিগকে পরাজিত করিতে ৫০ হাজার বৃটিশ সৈন্য নিহত হইয়াছে। এই হিসাব হইতে রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর আয়োজনের ব্যাপকতা উপলব্ধি হইবে এবং রুশিয়ায় জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস পাইবার জন্য য়ুরোপের অন্যত্র সম্মিলিত পক্ষের আঘাত কিরূপ প্রচণ্ড হওয়া প্রয়োজন, তাহাও বুঝা যাইবে।

রুশ-রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিচালনের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা এখন সৃষ্ট হইয়াছে; উভয় পক্ষ জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তথায় প্রস্তুত। স্থলভাগে তৎপরতার প্রারম্ভিক পর্ব্ব—প্রবল বিমান-আক্রমণও আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি ৫ শত জার্ম্মাণ বিমান কুর্স্ক সহর নিশ্চিহ্ন করিতে উদ্যত হইয়া ব্যর্থকাম হয়। সোভিয়েট বিমানবাহিনী ইহার প্রত্যুত্তরে ওরেলে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল। রুশ-রণাঙ্গনে সাম্প্রতিক বিমান-তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—সোভিয়েট রুশিয়ার বিমান-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্ম্মাণীর বিমান-আক্রমণ-প্রচেষ্টা পুনঃ পুনঃ বিফল হইতেছে; সোভিয়েট বিমানবাহিনী শত্রুকে আঘাতও হানিতেছে।

রুশ-রণাঙ্গনে কোন্ অঞ্চলে এবার প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, সাধারণ ভাবে দক্ষিণ-রুশিয়ায় এবারও জার্ম্মাণীর আঘাত পতিত হইবার সম্ভাবনা; ঐ সময় মস্কো অঞ্চলেও তাহার আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে। আঙ্কারার সংবাদ—মস্কো অধিকারের উদ্দেশ্যে হিট্লার ১০ লক্ষ সৈন্য মজুত করিয়াছেন।

রুশ-রণাঙ্গনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মনে হয়—জার্ম্মাণী যেন এবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিতে পারিতেছে না। গত বৎসর মে মাসের মধ্যভাগে জার্ম্মাণীর আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও তাহার আক্রমণ আরম্ভ হয় নাই। মিঃ চার্চ্চিল প্রকাশ করিয়াছেন—ধৃত জার্ম্মাণ সেনাপতিদিগের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, টিউনিসিয়ার প্রতিরোধ আগামী আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চলিবে বলিয়া হিট্লার আশা করিয়াছিলেন। টিউনিসিয়া যুদ্ধের অপ্রত্যাশিত দ্রুত অবসানে জার্ম্মাণ সেনানায়কদিগের পরিকল্পনায় বাধা উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে; রুশ-রণাঙ্গনে আক্রমণ-পরিচালনে বিলম্বের ইহা অন্যতম কারণ হইতে পারে।

সুদূর প্রাচী—

মধ্য-চীনে জাপ-সৈন্যের পরাজয় এবং উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ সেনা কর্ত্তৃক আলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আটটু দ্বীপ অধিকার সুদূর প্রাচীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সম্প্রতি ইয়াংসী নদীর তীরে ইচাংএর নিকটবর্ত্তী স্থানে আড়াই লক্ষাধিক জাপ-সৈন্য আক্রমণরত হইয়াছিল। ইয়াংসী নদীতীরে ইচাংই পশ্চিম দিকে জাপানের শেষ অধিকৃত স্থান; গত তিন বৎসর এই স্থানটি জাপানের অধিকারভুক্ত আছে। জাপান কি উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এই আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা দুর্ব্বোধ্য। এই অঞ্চলের ধান্যক্ষেত্রগুলি বিধ্বস্ত করিয়া চীনের জনগণের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে; চুংকিং অঞ্চলের প্রতিরোধ-শক্তির পরীক্ষাও তাহার উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব। যে উদ্দেশ্যেই এই আক্রমণ পরিচালিত হউক, জাপ-সেনা বিশেষ ভাবে পরাজিত হইয়াছে এবং তাহাদের ৩০ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। ইয়াংসী নদীর দক্ষিণ তীরে ইচাংএর বিপরীত দিক্ হইতে টাং টিং হ্রদ পর্য্যন্ত অঞ্চলে চীনা সৈন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইচাংএও তাহাদের আক্রমণ চলিতেছে।

মধ্য-চীনের সাম্প্রতিক যুদ্ধ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আজ ৬ বৎসর জাপানের সহিত অসম যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিবার পরও চীনের সংগ্রাম-শক্তি অটুট আছে। এই যুদ্ধে চীনা সেনা বিমান-বাহিনীর সহযোগ লাভ করিয়াছিল। বিমানবাহিনীর সহযোগে চীনা সৈন্য কিরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে, তাহাও এই যুদ্ধে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তাহার পর, মার্কিণী সৈন্যের আটটু দ্বীপ অধিকার। উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের ভৌগোলিক অবস্থিতি সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন; গত বৎসর জুন মাসে জাপান এই দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাপান হাওই দ্বীপপুঞ্জকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত করিয়াছিল। নৌ ও বিমানবাহিনীর সহযোগে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্ব-বিস্তারের পক্ষে এই দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটী হইতে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে আঘাত করাও সম্ভব। পক্ষান্তরে, আলিউসিয়ান্ অঞ্চল হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে জাপ-অধিকৃত গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপসমষ্টিতে আঘাত করা যায়; তথা হইতে দূর-পাল্লার বিমানের সাহায্যে জাপানে প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালিত হওয়া সম্ভব। আলিউসিয়ানের আটটু ঘাঁটী মার্কিণী সৈন্য ইতোমধ্যে অধিকার করিয়াছে; কিস্কার উদ্দেশ্যে তাহাদের অভিযান আসন্ন।

মিঃ চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জাপানে বিমান-আক্রমণ-প্রচেষ্টার আভাস দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বিবৃতিতে তিনি এই কথাও বলেন যে, জাপানের সহিত যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য রুশিয়ার সহযোগিতার কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। জাপানের বিরুদ্ধে বিমান আক্রমণে রুশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের ঘাঁটী যদি ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য কেবল পূর্ব্ব-চীনের চেকিয়াং ও ফুকিয়েন্ প্রদেশের ঘাঁটীগুলিই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু অবরুদ্ধ চীনের এই অঞ্চলে জাপানে ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনের উপযোগী বিমান, বিভিন্ন প্রকারের বোমা, মেসিন্ গান ও গোলাগুলী সঞ্চিত হইতে পারে কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। তবে, দূর-পাল্লার মার্কিণী বিমানগুলি আলিউসিয়ান্ অঞ্চল হইতে বহির্গত হইয়া জাপানে বোমাবর্ষণের পর চেকিয়াং ও ফুকিয়েন্ প্রদেশের ঘাঁটীতে আশ্রয় লইতে পারে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে মিঃ চার্চ্চিলের আশ্বাসের সহিত আলিউসিয়ান্ দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণী সেনার তৎপরতার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হইবে।

৯।৬।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠিত কাঁকুড়গাছির "শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান" এত দিন পরে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে জানিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্রের কন্যা ও উত্তরাধিকারিগণের সম্মতিক্রমে যোগোদ্যান-পরিচালক স্বামী যোগবিমল গত ৪ঠা বৈশাখ ট্রাষ্ট-ডীড সম্পাদন করিয়া যোগোদ্যান এবং তৎসম্পর্কিত সম্পত্তি বেলুড় মঠে সমর্পণ করিয়াছেন। অতঃপর কলিকাতার উপকণ্ঠবর্ত্তী এই মঠ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণের নিয়ন্ত্রণে সুপরিচালিত হইবে জানিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসম্প্রদায় তৃপ্তি লাভ করিবেন।

সার গুরুদাস শতবার্ষিকী

বাঙ্গালার সুসন্তান দেশপূজ্য সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম-শত-বার্ষিকী স্মৃতি-পূজার উদ্দেশ্যে নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে গুরুদাস শতবার্ষিকী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। সমিতির সভাপতি ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মনীষী গুরুদাসের শত-বার্ষিকী স্মৃতিরক্ষা ও তাঁহার উচ্চ আদর্শের প্রচার-কল্পে বাঙ্গালার বিভিন্ন সংস্কৃতিকেন্দ্রে উৎসব অনুষ্ঠান করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। সার গুরুদাসের মহান্ আদর্শদীপ্ত জীবনের বিভিন্ন অংশ আলোচনা করিয়া স্মারক-গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনাও হইয়াছে। আমরা আশা করি, সহৃদয় দেশবাসী কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

কুইনাইনের নিদারুণ অভাব

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আরম্ভ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার একমাত্র প্রতিষেধক কুইনাইন দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। যাভা হইতে ভারতে প্রচুর কুইনাইন আমদানী হইত, কিন্তু যাভা এখন জাপানী-অধিকারে। যাভার শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়িগণের স্বার্থহানির আশঙ্কায় সরকার ভারতে সিনকোনার চাষ-প্রচলনের সুব্যবস্থা করেন নাই। এ দেশে যথেষ্ট সিনকোনা গাছ উৎপন্ন হইতে পারিত—কিন্তু কুইনাইন প্রস্তুত করিবার উপযোগী সিনকোনা গাছ উৎপন্ন হইতে ৮ বৎসর সময়ের প্রয়োজন। ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইয়া দরিদ্র গ্রামবাসীরা যদি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, তবে এই ৮ বৎসর পরে সুলভ মূল্যে কুইনাইন সেবন করিয়া ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন! দক্ষিণ-আমেরিকায় সিনকোনার আবাদ হয়—সমুদ্রপথ এখন অনেকটা নিরাপদ। ভারত সরকার কি দক্ষিণ-আমেরিকা হইতে সুলভ মূল্যে পর্য্যাপ্ত কুইনাইন আনাইয়া দিতে পারেন না? কেবল কুইনাইন নহে, বহু ঔষধই দুষ্প্রাপ্য—দুর্ম্মূল্যতার জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। সরকার অনায়াসেই ত' তাহা আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত জার্ম্মাণীর মার্কের কারখানা হইতে আনাইয়া দিতে পারেন।

রেজকি দুষ্প্রাপ্য

৩রা জ্যৈষ্ঠ ভারতের অর্থসচিব সার জেরেমি রেইসম্যান বলিয়াছেন, এখন ভারতের টাকশালগুলিতে যত রেজকি প্রস্তুত হইতেছে—এত রেজকি কোন দুই বা তিনটি দেশেও প্রস্তুত হইতেছে না। অথচ কলিকাতা ও মফঃস্বলের সর্ব্বত্রই রেজকির নিদারুণ অভাব। ট্রামে-বাসে—ষ্টেশনে-ডাকঘরে—ব্যাঙ্কে-দোকানে—বাজারে কোথাও রেজকির দেখা মিলে না। ভাঙ্গানীর অভাবে হাট-বাজার করা দায় হইয়াছে! তামার পয়সা মিউজিয়মের দর্শনীয় বস্তু হইয়াছে—ফুটা পয়সারও অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। ভারতের টাকশালে প্রস্তুত এত রেজকি-পয়সা কোথায় উড়িয়া যাইতেছে? ইহা কি প্রস্তুত হইবার পর টাকশালেই মজুত থাকিতেছে? না, শত্রুপক্ষের লোকেরা ইংরেজ-শাসনের প্রতি অসন্তোষ জন্মাইবার জন্য এত রেজকি-পয়সা গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে?

অতঃপর এই সকল 'কাঁপা' টাকা ভাঙ্গাইয়া কিছু খরচ করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া সরকার একটি নূতন অর্ডিনান্স জারি করিলেই ত' রেজকি-সমস্যার সমাধান অনায়াসেই হইতে পারে।

সম্পাদক-সম্বর্দ্ধনা

'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সুযোগ্য প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ শরীরে শায়িত অবস্থায় ৯ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে সাংবাদিক-সঙ্ঘের অভিনন্দন গ্রহণ করিয়াছেন। রামানন্দ বাবু প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল নির্ভীক নিরপেক্ষ ভাবে রাজনীতিক ব্যাপারের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি আরও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জাতীয় কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

লুই ফিসার

মিষ্টার লুই ফিসার মার্কিণের প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুলেখক। সম্প্রতি মার্কিণের সংবাদপত্রে এবং বহু সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অনেক কথাই এ দেশের সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকেই সে সকল পাঠ করিয়াছেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লী হইতে কেন্দ্রী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত সরকারের প্রধান মুদ্রাযন্ত্র-সম্পর্কিত পরামর্শদাতার অনুমোদন ব্যতিরেকে ভারতের কোন সংবাদপত্র তাঁহার বক্তৃতার বা লেখার কোন অংশ উদ্‌ধৃত বা অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিবেন না। তাঁহার বক্তব্যের কতকাংশ প্রকাশের পর ভারত সরকার আচম্বিতে এই প্রকার আদেশ কেন জারি করিলেন, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! গত বৎসর মিষ্টার ফিসার ভারতে আসিয়া সেবা-গ্রামে মহাত্মা গান্ধীর সহিত কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভারতীয় ও বৈদেশিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক কথাই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা বা কথা এ দেশে প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; বরং মার্কিণে তাহা প্রকাশ করিলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কিণের অধিবাসীদের অনেক ধারণাই পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত। সান্ ফ্রান্সিস্কো টাইম-কলে

তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, ভারতের অনেক সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচনা প্রকাশে বাধা দিয়া ভারত সরকারের বিশেষ কি লাভ হইবে বুঝা কঠিন! বিলাতের বাম্মিংহামের বিশপ ডক্টর বার্ণেস, 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশান', 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন' পত্র, মনীষী বার্ণার্ড স, ব্রেল্‌সফোর্ড প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভারত সম্বন্ধীয় যে সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, মিষ্টার ফিসারের কথায় তাহা অপেক্ষা বিশেষ-কিছু আপত্তিকর আছে বলিয়া ত মনে হয় না। তবে মিষ্টার ফিসার একটা কথা বলিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী জাপানের পক্ষপাতী—এ ধারণা একেবারেই ভুল! সেই জন্য কি তাঁহার উক্তিতে ভারত সরকার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন?

—

মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দাও!

মনীষী বার্ণার্ড স মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভারত সরকারকে বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ঐ কার্য্যের দ্বারা ভারত সরকার ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রে সম্প্রতি তাঁহার ঐ উক্তি বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

—

ডক্টর বার্ণেসের উপদেশ

বাম্মিংহামের বিশপ ডক্টর বার্ণেস্ গত মার্চ্চ মাসে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় প্রেমের দ্বারা ভারতবাসীকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। পশুবলের দ্বারা তাহা সংসাধিত হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন—সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে এমন কি অমৃতসরের ঘটনার পর হইতে সমস্ত পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসীর একটা বিশিষ্ট সভ্যতা আছে। তাহারা এই পার্থিব জনসমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে চায়! ভারতের জনসংখ্যা সমধিক এবং নেতৃবর্গও বিচক্ষণ; কাজেই পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন—খৃষ্টধর্ম্ম প্রাচী হইতে প্রতীচীতে আসিয়াছে। সুতরাং য়ুরোপীয় অপেক্ষা মহাত্মা গান্ধী খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অনেক মূলতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝেন। খৃষ্টধর্ম্মে যে য়ুরোপীয়দিগের অনুসৃত গুণসমূহ আছে, তাহাও যেমন আমরা দেখাইতে পারি, ভারতবর্ষের লোক তেমনি খৃষ্টধর্ম্মের গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা ভাল ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু ডক্টর বার্ণেসের ঐ কথা সাম্রাজ্যবাদীরা কি মানিতে পারিবেন?

—

অতিরিক্ত লাভ-কর

ভারত সরকার সম্প্রতি দুইটি অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। একটি অতিরিক্ত লাভ-কর-সম্পর্কিত ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬নং অর্ডিনান্স। সরকার বলিতেছেন—এই অর্ডিনান্স মুদ্রার স্ফীতি-নিবারণের জন্য পরিকল্পিত। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ অর্ডিনান্স দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার ফলে আর কিছু হউক আর না হউক, দেশের শিল্প এবং বাণিজ্য যে বিশেষ বাধা পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রচলিত আইন অনুসারে অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৬৬⅔ অংশ আয়-কর সরকার লইতেন। ইহা ব্যতীত শতকরা ১৩⅓ আয়-কর (Income tax) এবং অতিরিক্ত কর (Super tax) দিতে হইত। ইহাতে ব্যবসায়ীদিগের হাতে শতকরা ২০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত লাভ থাকিত। নূতন অর্ডিনান্সে ব্যবস্থা করা হইল যে, অতিরিক্ত লাভের ঐ যে ২০ টাকা শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীরা পাইতেন, তাহা হইতে আবার শতকরা ১৩⅓ অংশ সরকারের হাতে দিতে হইবে। সুতরাং কারবারীদের পক্ষে অতিরিক্ত লাভ যাহা হইবে, তাহা কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল হইল! ঐ শতকরা ৬⅔ লভ্যাংশ হইতে কারবারীরা অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ এবং লাভ দিবেন। অর্ডিনান্সে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক ভাবে যে লভ্যাংশ জমা দেওয়া হইবে, তাহার ঐ শতকরা ২০ অংশের সুদ শতকরা ২ টাকা হিসাবে সরকার দিবেন। ঐ ২০ অংশের মধ্যে যে শতকরা ১৩⅓ অংশ সরকারের কাছে জমা থাকিবে, ব্যবসায়ীরা যুদ্ধ শেষ হইবার বার মাস পরে অথবা ঐ গচ্ছিত টাকা রাখিবার দুই বৎসর পরে তাহা ফেরৎ পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার তিন বৎসর পরে সরকার ঐ টাকা ফেরৎ দিবেন। সরকার বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মুদ্রা-মূল্যের স্ফীতি-সাধনের প্রতিরোধ-কল্পে এই অর্ডিনান্স জারি করিলেন। কারণ, ইহার দ্বারা সরকারের হাতে এক শত কোটি টাকা আমানত হইবে। ইহার ফলে টাকার বাজারে টান পড়িবে; সুতরাং মুদ্রার স্ফীতি-সাধনেরও প্রতিকার হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার নিয়মগুলি অতি ভীষণ। প্রথমে ত' সরকারী এসেসাররা প্রায় কখন যথাযথ ভাবে আয়ের অনুমান করেন না। আয়-কর-এসেসারদের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সাধারণের এটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের কৃত আয়ের অনুমান—প্রকৃত আয়ের অতিরিক্তই হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহা হইবে না, এমন বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায়ীরা যে মাত্র শতকরা ৬⅔ অংশ পাইবেন, তাহাতে তাঁহাদের কার্য্য-পরিচালনায় কোন উৎসাহ থাকিবে না। ইহাতে কেবল তাঁহাদের 'ভূতের বেগার' খাটাই সার হইবে! সকল দেশের লোকই যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত কিছু লাভ করিতেছিলেন। সেই অতিরিক্ত লাভের দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের দেশে যুদ্ধের পর শিল্প-বাণিজ্যের পুনর্গঠনকল্পে অর্থনিয়োগ করিয়া থাকেন। এই অর্ডিনান্সের দ্বারা ভারতবাসীর সে পথ রুদ্ধ করা হইল। ইহা যে দেশের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সেই জন্য দেশে এতখানি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে! মুদ্রার স্ফীতি-সাধনের জন্য মুদ্রামূল্যের হ্রাস হইয়াছে—এ কথা সরকার এ পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই। এবার এই অর্ডিনান্স দ্বারা কার্য্যতঃ মুদ্রামূল্যের হ্রাসের (inflation) কথা তাঁহারা স্বীকার করিয়া ফেলিলেন এবং সেই অজুহাতে ৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাকা এই দেশ হইতে আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন! আমরা কোন মতে সরকারের এই নীতির সমর্থন করিতে পারিলাম না। ইহার দ্বারা ভারতের প্রভূত অনিষ্ট হইবে এবং যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তথাপি সরকার যদি এই অর্ডিনান্স জারি করেন, তাহা হইলে দেশে বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

—

দ্বিতীয় অর্ডিনান্স

দ্বিতীয় অর্ডিনান্সটি আরও ভীষণ। ইহা ভারত-রক্ষার নূতন বিধি। দেশে যাহাতে নূতন যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহার জন্যই যেন ইহা পরিকল্পিত! ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতীত কেহ কোন প্রকার মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন না; বৃটিশ-শাসিত ভারতে কেহ কোন প্রকার ঋণপত্র বিক্রয় করিতে পারিবেন না; কেহ কোন কারবারের অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিয়া অংশ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। আসল কথা এই যে, ভারত সরকারের অনুমতি ব্যতীত কেহ কোন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না! কেন্দ্রী সরকার কেবল কার্য্যতঃ সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইহার ফলে দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনের আর উপায় থাকিবে না। শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন বিষয়ে সরকারের এইরূপ ঘোর স্বৈরতাপূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশে কখনই শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব হইবে না। এইরূপ স্বৈরতাপূর্ণ ব্যবস্থা অন্য দেশে আছে কি না, জানি না। সম্ভবতঃ নাই। সরকার বলিতেছেন যে অতিরিক্ত আয়ের প্রায় সমস্তটাই গ্রাস করিয়া তাঁহারা মুদ্রার স্ফীতিসাধন অর্থাৎ মুদ্রা-মূল্যের হ্রাস খর্ব্ব করিতেছেন। কিন্তু অন্য দিকে তাঁহারা দেশের মূলধন দেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগ করিতে না দিয়া দেশে যে অতিরিক্ত অনিয়োজিত অর্থ রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে মুদ্রার স্ফীতি কিছুতেই কমিবে না। আমরা সরকারের এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়াছি। ইহাতে সরকার মুখে যাহা বলিতেছেন, কাজে তাহা প্রকাশ পাইতেছে না। আমরা এই দুই অর্ডিনান্সেরই তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। যুদ্ধের পর এ দেশে এইরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনে যদি বাধা দেওয়া হয় এবং বিদেশ হইতে ভূরি পরিমাণে পণ্য এদেশে আমদানি হয়, তাহা হইলে ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠিত করা কস্মিন্ কালে সম্ভব হইবে না। ইহাতে ভারতে আর্থিক বিষয়ে অধীনতা অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ভারতবাসীকে কেবল কাঁচা মালের উৎপাদনে এবং চির-দারিদ্র্যেই আবদ্ধ রাখা হইবে।

বস্ত্রের মূল্য

১৯৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে সরকার ক্রমাগত বস্ত্রের মূল্য হ্রাস এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাহির করিবার আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন। মধ্যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় দুই-এক জোড়া না কি বাজারে দেখা গিয়াছিল! তাহাতে বাঙ্গালার জন-সাধারণের বস্ত্রের দুঃখ কিছুমাত্র কমে নাই— দিন দিন এ দুঃখ বাড়িয়াই চলিয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের কর্ত্তাদের সহিত বোম্বাই কার্পাস-কলওয়ালাদের সস্তায় কাপড় যোগাইবার একটা চুক্তি হইয়াছে, শুনিলাম। এরূপ কথা বার বার শ্রবণে কান ঝালা-পালা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে নিখিল ভারতে ৭০০ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। তাহার মধ্যে ভারতীয় কলগুলি ৪০০ কোটি গজ, তন্তুবায়েরা ২০০ কোটি গজ এবং বিলাত ও জাপান ৭০ কোটি গজ কাপড় দিত। শুনা যায়, ভারত সরকার সামরিক প্রয়োজনের জন্য মিলের উৎপন্ন কাপড়ের শতকরা ৩০ ভাগ লইতেছেন। এইরূপ অবস্থায় যদি ভারতীয় কলগুলি সূতা যোগাইতে পারিত, তাহা হইলে ভারতীয় তাঁতীরা এই বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হইত। ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালারা এবং ভারত সরকারের পরামর্শদাতারা এই সহজ পথ অবলম্বন না করিয়া ভিন্ন পথ কেন ধরিলেন, বুঝা কঠিন। আমাদের বিশ্বাস, বোম্বাই কলওয়ালাদের সহিত সরকারের এই পরামর্শ যে বিশেষ ফলপ্রদ হইবে, তাহা বলা যায় না। এখন দেখিতেছি, অন্ন, বস্ত্র এবং ঔষধের অভাবে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে! সরকারের আশ্বাস যেরূপ ভাবে ব্যর্থ হইতেছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই।

সরকারের আদেশ

সম্প্রতি বঙ্গীয় সরকার ধান-চাউল সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—লোকের ঘরে কত অতিরিক্ত ধান-চাউল সঞ্চিত আছে কি না—তাহার অনুসন্ধান করিবেন। কিন্তু এই কার্য্য পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। নিরীহ লোক অকারণে যাহাতে উৎপীড়িত না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামে দলাদলি, রেষারেষি প্রভৃতির ফলে অনেক সময় এরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে। সে জন্য সম্বন্ধে সংবাদপত্রে সমালোচনার পথ মুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করুন।

বাঙ্গালায় খাদ্যসঙ্কট

বাঙ্গালায় কি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহা লইয়া [illegible] ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত সরকারের অনুমোদনে বঙ্গীয় সরকার ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার উৎপন্ন খাদ্যশস্যের একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ হিসাব যে সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালা সরকার বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে বাঙ্গালায় ৬৯ লক্ষ টন চাউল জন্মিয়াছে; আর গত বৎসর ১০ লক্ষ টন চাউল মজুত ছিল। হিসাবের এই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক করিয়া ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা ভিন্ন ভারত সরকারও কিছু চাউল, আটা, গম প্রভৃতি দিয়াছেন। ফলে বাঙ্গালায় ৮৭ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য বর্ত্তমানে আছে। অতএব মা ভৈঃ। বাঙ্গালায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব নাই! তবে লোকে চাউল বাঁধি করিয়া রাখিয়াই যত গোল ঘটাইতেছে! বলা বাহুল্য, এই হিসাব দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। হিসাবে দেখা যায়, গত বৎসর বাঙ্গালায় কিছু কম পৌনে ১৯ কোটি মণ চাউল জন্মিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য বৎসর সরকারের প্রকাশিত হিসাব দেখিলে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালায় ২৬ হইতে ২৭ কোটি মণ চাউল জন্মায়। তবে গত বৎসর ধান যে কম জন্মিয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহা সরকার স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালায় যে ধান জন্মায়, তাহার সমস্তই ধান্যোৎপাদক কৃষীবল এবং ক্ষেত্রস্বামীরা বাজারে আনিয়া বিক্রয় করে না। অনুমান—অন্যান্য বৎসর ৫ কোটি মণ চাউল বাজারে বিক্রয়ার্থে আসে; [illegible] চাষী ক্ষেত্রস্বামীদের কেহ কেহ আপনাদের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেয়। গত বৎসর ধান যখন কম জন্মিয়াছিল, তখন বাজারে অপেক্ষাকৃত অল্প

চাউলই বিক্রয়ার্থে আসিয়াছিল। কারণ, কৃষকরা আপনাদের খোরাকী এবং বীজ-ধান না রাখিয়া বিক্রয় করে না। এখন জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালায় কি পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন? ছয় কোটি বাঙ্গালীর জন্য অন্ততঃ ৩০ কোটি মণ চাউলের প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গালায় চাউল জন্মিয়াছে, সরকারী হিসাবেই, কিছু কম ১৯ কোটি মণ। সম্প্রতি এক জন বিশেষজ্ঞ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এবার বাঙ্গালায় ৯০ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন, অর্থাৎ ২৫ কোটি ৬১২ লক্ষ মণ। সুতরাং চাউলের অভাব হইবেই। তদ্ভিন্ন ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে বঙ্গীয় সরকারের প্রকাশিত হিসাবে ১০ লক্ষ টন চাউল মজুত ছিল, এ হিসাব একেবারেই হাস্যজনক! ইহার অর্দ্ধেক চাউলও মজুত ছিল কি না সন্দেহ! আমাদের মনে হয়, গত বৎসরের চাউল ৪ লক্ষ টনের বেশী মজুত ছিল না। বরং কম হইতে পারে। ইহা ভিন্ন সরকারী হিসাবে এ প্রদেশ হইতে যে পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে, তাহার কোন হিসাব দেখিলাম না! বরং ভারত সরকার ৮০ হাজার টন খাদ্যশস্য দিয়াছেন তাহার উল্লেখ আছে। এই প্রকারে হিসাবে ফাঁকি প্রকট হইলে লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে না। সরকার এবং এখানকার বিদেশী সদাগররা বাঙ্গালা হইতে বিদেশে যে চাউল রপ্তানী করিয়াছেন, তাহার হিসাব এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট ভাবে পাওয়া যায় নাই। আন্দাজে আমরা কি বলিব? গত বৎসর হইতে উদ্বৃত্ত যে পরিমাণ চাউল পাওয়া গিয়াছিল, সেই পরিমাণ চাউলই বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ইহা ধরিলে বাঙ্গালায় মোট সরকারী হিসাবে পৌণে উনিশ কোটি মণ চাউল পাওয়া গিয়াছে, ধরিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালার প্রয়োজন অন্ততঃ পক্ষে ২৫ কোটি ৬১ লক্ষ মণ। অবশিষ্ট ৬ কোটি ৯২ লক্ষ মণ অর্থাৎ কিছু কম ৭ কোটি মণ চাউলের অভাব পড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই পরিমাণ চাউলের সংস্থান না করিলে বাঙ্গালার খাদ্য-সঙ্কটের অবসান ঘটিবে না। হিসাবে অনেক বিষয়ই প্রমাণিত বলিয়া মনে হয়। অনেক সময় গোঁজামিল দিয়া লোকা বানানো সম্ভব। আসল কথা, বাঙ্গালায় এবার চাউলের অভাব স্পষ্টই প্রকাশমান।

নাজিমুদ্দীনের সচিব-মণ্ডলীর অসাফল্য

প্রায় আড়াই মাস পূর্ব্বে মিষ্টার ফজলুল হকের সচিব-মণ্ডলী পদত্যাগ করিয়াছেন। দেড় মাস কাল নাজিমুদ্দীন-সচিব-মণ্ডলী সচিবের গদী দখল করিয়া আছেন। তাঁহারা গদী পাইয়াই আশ্বাসের লম্বা লম্বা বাণী দিতেছেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের সে আশ্বাস-বাণী বাতাসে উড়িয়া যাইতেছে! তাঁহারা বলিতেছেন, বাঙ্গালায় খাদ্যশস্যের অভাব নাই। আবার বলিতেছেন, বাঙ্গালী চাউলের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু অর্থাৎ আটা, যোয়ার, বাজরা, ছোলা, ভুট্টা প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করুক! তাহা হইলে তাহারা পরাক্রমশালী পালোয়ান হইয়া দাঁড়াইবে! কিন্তু সেই আটা প্রভৃতিও বাজারে তাঁহাদের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গালীর এখন পালোয়ান হইবার বাসনা অপেক্ষা প্রাণ-বাঁচানোর বাসনাই বলবৎ। খাদ্যশস্যের মূল্য এখনও দিন দিন বাড়িতেছে। অনেক সময়ে চাউল মিলিতেছে না। যদি বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে থাকিত, তাহা হইলে সুরাবর্দ্দী সাহেব বাঙ্গালীকে তাহাদের দুষ্পাচ্য বাজরা, ভুট্টা খাইবার সুপরামর্শ খয়রাৎ করিতেন না! ও দিকে ডক্টর গুহ বাঙ্গালীকে ঘাসের চপ অর্থাৎ বড়া খাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সে বড়া ভাজিবার জন্য সরিষার তৈল বা কোথায় মিলিবে? চাউলের প্রাচুর্য্যই যদি থাকিবে, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে ঘাস খাইবার পরামর্শ দেওয়া হইবে কেন? ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালার এক জন ছোটলাট বাঙ্গালীকে তণ্ডুলের পরিবর্ত্তে কেশুর খাইবার পরামর্শও দিয়াছিলেন। যথারীতি পারিশ্রমিক দিয়া সে দিন এক জন অধ্যাপক-মারফৎ রেডিও আসর হইতে কচুসিদ্ধ, ওলসিদ্ধ, রাঙাআলু সিদ্ধ খাইবার সৎপরামর্শও বিতরিত হইয়াছে! ইঁহারা মনে করেন যে, বাঙ্গালী সব খাইয়াই হজম করিতে পারে! ইতোমধ্যে নাজিমুদ্দীন সচিব-মণ্ডলী মফঃস্বলে দুই-এক স্থানে কণ্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রিত দোকান খুলিয়া নির্দ্ধারিত মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতেছিলেন। ব্যক্তি-পিছু এক পোয়া করিয়া চাউলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ ছয় দিন যাইতে না যাইতে সে চাউল ফুরাইয়া গেল! যে অতি দরিদ্রদিগকে ঐ চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দেওয়া হইতেছিল, তাহাদের সকল আশা নৈরাশ্যের অকূল পাথারে বিলীন হইল! ইহাতে কি এ প্রদেশে চাউলের প্রাচুর্য্য প্রমাণিত হয়? সুতরাং সকল দিক্ দিয়াই তাঁহারা নিজেদের বিফলতাকেই বিকট ভাবে ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছেন! আটা ময়দা—তাহাও ত পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা বাড়ী বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া গুপ্ত ধান্য ও চাউল বাজারে আনিয়া দাখিল করিবেন বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িতেছেন! এবং সে জন্য অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাও চাহিতেছেন! কিন্তু ইহাতেও যদি চাউলের মূল্য তাঁহারা কমাইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এ লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে কোথায়? আবার শুনিতেছি, এবার বোরো ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মানয় ময়মনসিংএ চাউলের মূল্য মণকরা তিন-চার টাকা কমিয়া গিয়াছে। আর আউস ধান্য হইলেই বাঙ্গালায় না কি আর কোন ভাবনা থাকিবে না! ভাদ্র মাসের পূর্ব্বে ত আউস ধান্য হইবে না, হইলেও সকলে উহা খাইয়া হজম করিতে পারিবে না। লোকে অনাহারে না মরিয়া উদরাময়ে মরিবে! অতএব সচিব মহাশয়েরা রসনা সংযত করিয়া হাতে-হাতিয়ারে তাঁহাদের কার্য্যের ফল প্রদর্শন করুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ!

মুক্তির প্রহসন

ফেডারাল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস্ গাওয়ার এই মর্ম্মে রায় দিয়াছিলেন যে, ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা বর্ত্তমানে যে আকারে রচিত রহিয়াছে, তাহা অবৈধ। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বিশেষ আদালতে বসিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঐ অর্ডিনান্সের ৫, ১০, ১৪ এবং ২৬ ধারাগুলি অবৈধ। তদনুসারে কলিকাতা হাইকোর্টে হেবিয়াস্ কর্পাস্ আইন অনুসারে শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার-প্রমুখ নয় জন সিকিউরিটি বন্দীকে মুক্তি দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। এই মামলার বিচারের জন্য বিচারপতি মিষ্টার মিত্র, মিষ্টার খোন্দকার এবং মিষ্টার সেনকে লইয়া বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছিল। মামলার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে

তিন জন একমত হইতে পারেন নাই। বিচারপতি মিত্র এবং সেন একমত হইয়া বন্দীদিগকে মুক্তির আদেশ দেন। বিচারপতি খোন্দকার ভিন্ন-মত প্রকাশ করেন। তদনুসারে হাইকোর্টে ২০শে জ্যৈষ্ঠ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার পর তাঁহারা বিচার-কক্ষ হইতে বারান্দায় আসিবামাত্র পুলিস ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। এই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি! আইন অনুসারে গঠিত আদালত মুক্তি দিতে বলিলে যদি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়, তাহা হইলে আদালতের সে আদেশের মূল্য কি? ইংরেজের শাসনে আইনের মর্য্যাদা সর্ব্বদা রক্ষিত হয়, এ ধারণা মোটের উপর এ দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল ছিল। আইনের দ্বারা শাসকগণ নিয়ন্ত্রিত—ইহাই লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এইরূপ ব্যাপারে সে ধারণা এবং সে বিশ্বাস বিশেষ ভাবে বিচলিত হইয়াছে। ইহাতে আদালতের মর্য্যাদাহানি হইয়াছে কি না এ স্থলে এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনা করিব না। কুমারী মীরা দত্তগুপ্তার আবেদন অনুসারে উহা একটি স্বতন্ত্র মামলার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এ মামলা এখন বিচারাধীন; সুতরাং সে সম্বন্ধে এখন কোন মন্তব্য প্রকাশ করা চলে না। কিন্তু এরূপ ভাবে যদি আদালতের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, তবে স্বতঃই ইহা মনে হয় যে, এখন ভারতে বৃটিশ শাসনে আইন এবং আদালতের আদেশ অপেক্ষা শাসকগণের স্বৈরিতাপূর্ণ আদেশই বলবত্তর। লোকের মনে এরূপ ধারণা জন্মিতে দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নহে। ইহাই যদি শাসনকর্ত্তাদিগের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এত টাকা খরচ করিয়া এই বিশাল ভারতে আদালত ও ব্যবস্থা পরিষদ রাখিবার সার্থকতা কি?

---

৩ নম্বর

যখন পঞ্জাবে লালা লজপত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে—স্বদেশী আন্দোলনের সময়—১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনের বলে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করা হয়, তখন তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি উহাকে "মরিচা ধরা তরবার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। উহা যে বর্ত্তমানের উপযোগী ব্যবস্থা নহে, তাহাই তাঁহার মত ছিল। কিন্তু তাহার পর এ দেশে সরকার বহু বার সেই রেগুলেশন ব্যবহার করিয়া লোককে বিচারে বঞ্চিত করিয়াছেন। এ বার যখন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারে যাঁহাদিগকে ভারতরক্ষা নিয়মের ২৬ ধারায় আটক রাখা অসিদ্ধ বলা হয়, সরকার তাঁহাদিগকে আদালত গৃহেই এই রেগুলেশনের বলে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়াছেন, তখন—সেই কার্য্য আদালতের অপমান কি না, তাহা বিবেচনাকালে অনেক প্রশ্নই আদালতের বিবেচ্য হইবে, সন্দেহ নাই। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল ঐ রেগুলেশন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ঐ বিধি অনুসারে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে হইলে সপার্ষদ বড় লাটের নির্দ্দেশে কেন্দ্রী সরকারের কোন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীকে ওয়ারাণ্ট জারি করিয়া তাহা যে কর্ম্মচারীর অধীনে ধৃত ব্যক্তিকে রাখা হইবে, তাঁহাকে দিতে হয়। তাহার পূর্ব্বে—যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইবে, তাঁহাকে আটক করিবার যথেষ্ট কারণ আছে কি না এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আটক রাখা সঙ্গত কি না, সে সব সপার্ষদ বড় লাটকে বিবেচনা করিতে হইবে।

সপার্ষদ বড় লাটের এই ক্ষমতা তিনি কোন প্রাদেশিক গভর্ণরকে বা প্রাদেশিক সরকারকে হস্তান্তরিত করিতে পারেন কি না, তাহা প্রথম বিবেচনার বিষয়। যদি বড় লাটের হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে কলিকাতা হাইকোর্ট তাঁহাদিগকে মুক্তিদানের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাদিগকে ঐ বিধিবলে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধে আদেশ করিবার পূর্ব্বে সপার্ষদ বড় লাট তাঁহাদিগের অপরাধ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া এ বিধিই প্রযোজ্য এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন কি না? আর যে ওয়ারেণ্ট বলে জন কয়েক পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে তাহাতে ভারত সরকারের কোন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারীর স্বাক্ষর ছিল কি না এবং কাহার অধীনে তাঁহাদিগকে রাখা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল?

তাহার পর প্রত্যেকের জন্য যে ব্যয় (ভাতা) নির্দ্ধারিত হইবে তাহা কি হাইকোর্ট বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়া দিতে পারেন না?

যে ভাবে কলিকাতা হাইকোর্ট যাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ৩ নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া আজ আমরা এই সকল বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি।

আমরা এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলেই দমনমূলক বিধিসমূহের প্রত্যাহার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে সমিতি রাষ্ট্রীয় পরিষদ কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতি এই ৩ নং রেগুলেশন বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া কেবল সামন্ত রাজ্য ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। সার তেজ বাহাদুর সপ্রু সেই সমিতির সভাপতি এবং কেন্দ্রী সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সদস্য সার উইলিয়ম ভিনসেণ্ট সেই সমিতির সদস্য ছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার অদ্যাপি সেই পরিবর্ত্তন করেন নাই। কি ভাবে তাঁহারা ইহা প্রযুক্ত করিতেছেন, তাহা আমরা এ বারও দেখিতে পাইতেছি। পরিবর্ত্তন না করায় কি রাষ্ট্রীয় পরিষদের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে?

লর্ড মিণ্টো বড় লাট হইয়া যখন এই রেগুলেশনের প্রয়োগে বাহুল্য করিয়াছিলেন, তখন অগত্যা তাহাতে সম্মতি দিলেও তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন :—

(১) যাঁহাকে ঐ রেগুলেশনে নির্ব্বাসিত করা হইবে, তাঁহার যত্নসহকারে পরিকল্পিত কার্য্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইলে তিনি রেগুলেশন প্রয়োগ সমর্থন করিবেন না।

(২) এক বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ দিতেছেন—কোন ক্ষেত্রে যেন অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান না হয়।

আমরা মিষ্টার আমেরীর নিকট হইতে অবশ্যই লর্ড মর্লির মনোভাবের ও মনুষ্যত্বের পরিচয়-প্রাপ্তি আশা করিতে পারি না। কারণ, লর্ড মর্লির মত ছিল—

(১) ইংরেজ অবশ্যই ভারতে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। কিন্তু অতিরিক্ত কঠোরতায় শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না—তাহাতে অনাচার উদ্ভূত হয়।

(২) যে সকল উপায় পূর্ব্বে সমর্থনযোগ্য ছিল, সে সকলই বর্ত্তমানে প্রযোজ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

আজ আমরা কেবল মনে করিতে পারি—আমাদিগকে হয়ত অনেক স্বৈরশাসনদ্যোতক কায সহ্য করিতে হইবে। কারণ, আমরা যে দেশে বাস করি, সে দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল নহে—তাহা পরাধীন।

আল্লাবক্সের হত্যাকাণ্ড

সিন্ধু প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার মহম্মদ উমার আল্লাবক্স গুণ্ডার হস্তে গত ৩০শে বৈশাখ শুক্রবার প্রাতে নিহত হইয়াছেন। এই সংবাদে ভারতের সর্ব্বত্রই ঘোর বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ—যে স্থানে তাঁহাকে হত্যা করা হয়, তাহার নিকটে এক দল পুলিসের লোক ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া পলাইবার সময় ঐ গুণ্ডাকে ধরিবার জন্য পুলিস কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে

আল্লাবক্স

কোন সংবাদ প্রকাশ পায় নাই! যেখানে এক দল পুলিসের লোক ছিল, সেখান হইতে খুনী গুণ্ডা পলাইতে পারিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে! আল্লাবক্সের আততায়ীকে ধরিবার জন্য পুলিস দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে সত্য, কিন্তু আততায়ী এখনও ধরা পড়ে নাই। সিন্ধু ব্যবস্থাপক পরিষদে ইতঃপূর্ব্বে আরও দুই জন সদস্য গুণ্ডার হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকেও পুলিস ধরিতে পারে নাই। সিন্ধু ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিষ্টার পাম্‌নাল্‌ এবং শীতল দাসকে যাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহারাও এ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। সিন্ধু প্রদেশের পুলিসের এই লজ্জাজনক অসাফল্য চিরকাল ইতিহাসের পৃষ্ঠা কালিমা-লাঞ্ছিত রাখিবে। সিন্ধু প্রদেশকে স্বতন্ত্র করিবার পর মিষ্টার আল্লাবক্স দুই বার সেখানকার প্রধান সচিব-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সাধনে তিনি বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে দিল্লীতে স্বাধীন মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সমিতির অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের ভেদ-নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রুর সমিতিতে এক জন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। আল্লাবক্স যত দিন প্রধান-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তত দিন মুসলিম লীগ মুসলমান-প্রধান সিন্ধুপ্রদেশে বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। খাঁ বাহাদুর এবং ও, বি, ই উপাধি ত্যাগ করিয়া বড় লাটকে পত্র লেখার জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সিন্ধুপ্রদেশে মুসলিম লীগের সচিবত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আল্লাবক্সের পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। মুসলমান সমাজের এক জন বিশিষ্ট এবং স্মরণীয় ব্যক্তি বলিয়া যে তিনি সম্মানিত থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে

মুঙ্গেরের জনকল্যাণব্রত প্রবীণ ব্যবহারাজীব তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৭৭ বৎসর বয়সে ২০শে জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তারাভূষণ বাবু আইন-ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা—সম্পদ—সম্মান অর্জ্জন করিয়াই নিরস্ত হন নাই; স্বদেশী শিল্পের উন্নতি-বিধানে বিহারে তিনি চিনির কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্র-অনুশীলনেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত মুঙ্গেরে কয়েকটি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া তিনি বিপন্নদিগকে চাউল, বস্ত্র ঔষধাদি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী আজও বিদ্যমান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক—নাট্যকার—বোম্বাইয়ে ফিল্ম ডিরেক্টার। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনগণকে সমবেদনা জানাইতেছি।
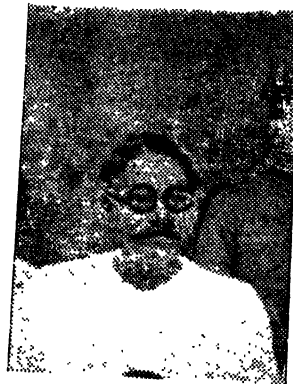
তারাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তার সার নীলরতন সরকার পরলোকে

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর স্বনামধন্য ডাক্তার সার নীলরতন সরকার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ৮২ বৎসর বয়সে গিরিডিতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ডায়মণ্ড হারবারের জাতড়া গ্রামে দরিদ্র পরিবারে নীলরতনের জন্ম। ছাত্র-জীবনেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশ সূচিত হইয়াছিল। তিনি বৃত্তি পাইয়া এণ্ট্রান্স ও এফ-এ

পাশ করেন। কিছু দিন ক্যাম্পবেলে ডাক্তারী পড়িবার পর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। বি-এ পাশ করিয়া তিনি চাতরা হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেয়ো হাসপাতালের হাউস সার্জ্জেন হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এম-এ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি হন। তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। তিনি ভারতীয় চিকিৎসকগণের শ্রেষ্ঠ স্থান সগৌরবে অধিকার করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি য়ুরোপে গমন করিলে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'এল, এল, ডি'—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি, পি, এল'

ডাক্তার সার নীলরতন সরকার

উপাধি প্রদান করেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পোষ্টগ্রাজুয়েট আর্টস্ ও সায়েন্স বিভাগের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ইহাতেই সার নীলরতনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক নব নব যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইবামাত্র যতই ব্যয়সাধ্য হউক, তিনি তাহা সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করিতেন। তিনি স্বদেশী শিল্পের উন্নতি বিধান ও সংগঠন প্রয়াসে চামড়ার কারখানা এবং ন্যাশন্যাল সোপ ইণ্ডাষ্ট্রী প্রভৃতি স্থাপন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া অগাধ উপার্জ্জন সত্ত্বেও বিশেষ কিছু সঞ্চয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হইয়া বিভিন্ন শাখার সম্পাদকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'নাইট' হন। ১৯১২—১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিকেল ক্লাবের সভাপতি এবং ১৯১৮ ও ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারত মেডিকেল কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

সার নীলরতনের কর্ম্মময় জীবনের অবসান হইয়াছে। দরিদ্র সন্তান যে আত্মশক্তি-বলে স্বাবলম্বী হইয়া সাধনা-প্রভাবে শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে পারেন, তাঁহার মহান্ জীবন তাহার সমুজ্জ্বল আদর্শ। উদ্‌ভ্রান্ত বাঙ্গালী সে আদর্শ অনুসরণে আশান্বিত ও উদ্দীপিত হইবেন।

ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকে

আমাদের বাল্যবন্ধু প্রতিভাবান্ ঐতিহাসিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এচ-ডি ৫২ বৎসর বয়সে ৭ই জ্যৈষ্ঠ সহসা সন্ন্যাসরোগে লোকান্তরিত

ডক্টর নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়াছেন জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। নারায়ণচন্দ্র তাঁহার পিতা রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্মে পরম নিষ্ঠাবান্—হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি রক্ষা-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রণীত কৌটিল্য অর্থনীতি ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। 'মাসিক বসুমতীতে' পূর্ব্বে ও সম্প্রতি বৈশাখ সংখ্যায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজের আগমন-কালে বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে সম্প্রতি বিশেষ অনুশীলনে তথ্য সঙ্কলন করিয়া তিনি গ্রন্থ-রচনায় সমাহিত ছিলেন। আমরা তাঁহার অকাল-বিয়োগে বন্ধু-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গৌরীশঙ্কর

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

সংস্কৃত নাট্যে প্রহসন

কি দার্শনিক-চিত্তে—কি কবি-হৃদয়ে দুঃখবাদের প্রভাব বড় কম নহে। বিশ্বের বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে দুঃখময় চিত্র—কবি ও দার্শনিকদের এতই আকর্ষণ করে যে, অধিকাংশ কাব্য ও দর্শন—দুঃখের কথা লইয়াই পরিপূর্ণ হইয়া আছে।

শুধু বেদান্ত-দর্শনে যেমন চরমে এক পরম আনন্দের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, দশরূপকের মধ্যেও একমাত্র প্রহসনে নিরাবিল আনন্দধারার উৎস প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রহসনে দুঃখ-বেদনা বা অশান্তিকর আবেগ উদ্বেগময় ভাবের স্থান নাই। এ জন্য 'ভগবদজ্জুকীয়ম্' নামক প্রহসনের প্রস্তাবনায় সূত্রধার-মুখে কবি বলিতেছেন—অথ ঃ নাটক-প্রকরণোদ্ভবাসু ঈহামৃগডিমসমবকারব্যায়োগভাণ-সল্লাপবীথ্যং-উৎসৃষ্টিকাঙ্কপ্রহসনাদিষু দশজাতিষু নাট্যরসেষু হাস্যমেব প্রধানমিতি পশ্যামি। তস্মাৎ প্রহসনমেব প্রয়োক্ষ্যামি।

অর্থাৎ আমি দেখিতেছি—'নাটক প্রকরণ হইতে উদ্ভূত ঈহামৃগ প্রভৃতি দশ জাতির মধ্যে—নাট্যরসে হাস্যই প্রধান, সুতরাং প্রহসন প্রয়োগ অভিনয় করিব।'

নাট্যরসের মধ্যে হাস্যকে প্রধান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,—প্রহসন-অভিনয় দর্শনে যে অবিমিশ্র আনন্দলাভ করা যায়, তাহা অন্য রসের অভিনয় অপেক্ষা বিজাতীয়, ইহাই যেন 'ভগবদজ্জুকীয়ম্' প্রহসন লেখকের অভিপ্রায়।

সাধারণতঃ বলা যায় বটে যে, কবি যখন প্রহসন লিখিতেছেন,—তখন প্রহসনকে বড় করিবার জন্যই হাস্যরসকে প্রধান বলিয়াছেন; যেমন বেদব্যাস যখন শৈবপুরাণ লিখিয়াছেন, তখন শিবকেই পরম দেবতা বা ব্রহ্মরূপে বলিয়াছেন; আবার যখন বৈষ্ণব-পুরাণ লিখিয়াছেন, তখন বিষ্ণুকেই পরমেশ্বররূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—এই যুক্তিতে প্রহসন অভিনয়-প্রসঙ্গে হাস্যরসকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ আলঙ্কারিকগণের দৃষ্টিতে শৃঙ্গার-রসই আদি বা প্রধান রস, হাস্যরস কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে না।

এ বিষয়ে একটু বিচার্য্য আছে। শৃঙ্গাররসের দুইটি ভেদ আছে—একটি সম্ভোগ-শৃঙ্গার, দ্বিতীয়টি বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার। এই বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের সহিত করুণরসের অনেকটা সাদৃশ্য থাকায় শ্রোতৃবৃন্দের অশ্রুপাতাদি বিকার ঘটিয়া থাকে। উভয়ের পার্থক্য এই যে, করুণ-রসে—শোক হইল স্থায়িভাব এবং বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে রতি স্থায়িভাব, কিন্তু শৃঙ্গারেও দুঃখ-দৈন্য-বৈবর্ণ্য-অশ্রুপাত প্রভৃতি সম্ভবপর বলিয়া শ্রোতৃচিত্তে করুণ-রসের মতই বিকার বিশেষ উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং শৃঙ্গার ও করুণরসে চিত্ত যে ভাবে দ্রবীভূত হয়, হাস্যরসের অভিনয়ে সেরূপ কোন বিকার ঘটে না। রৌদ্র, বীভৎস—ভয়ানক রসের অভিনয়ে চিত্তের যেরূপ অস্থিরতা ও উদ্বেগের অনুভূতি আসে, হাস্যরসে তাহাও হয় না। এই বিজাতীয় আনন্দ—হাস্যরস হইতেই শ্রোতৃ-চিত্তে সম্ভবপর হয় বলিয়া, মনে হয় 'ভগবদজ্জুকীয়ম্' নামক প্রহসন রচয়িতা হাস্যরসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। যদিও আলঙ্কারিকগণ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—

> করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
> সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥

করুণ, বীভৎস, ভয়ানক প্রভৃতি রসেও যে পরম আনন্দ উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে সহৃদয়দিগের অনুভবই একমাত্র প্রমাণ।

> 'কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ'

যদি উক্ত রসে দুঃখ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কেহই সেই সমস্ত রসের অভিনয়-দর্শনের জন্য উন্মুখ হইত না। কে ইচ্ছা করিয়া আত্মদুঃখ বরণ করে? লৌকিক জগতের দুঃখ—কাব্যজগতে চিত্রিত হইলেই তাহা অলৌকিক আনন্দময় হইয়া উঠে, নতুবা আজও শত শত শ্রোতা রামের বনবাস বা হরিশ্চন্দ্র-চরিত অভিনয় দর্শনের জন্য

ব্যাকুল হয় কেন? মোটের উপর সমস্ত রসের অভিনয়েই যে আনন্দ-সম্ভোগ হয়, এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই (১)। তথাপি, হাস্যরসের অভিনয়ে বিক্ষেপরহিত একটি বিজাতীয় নির্ম্মল আনন্দ উদ্ভূত হয়, ইহাও সহৃদয়-হৃদয়বেদ্য। প্রহসনের অভিনয়ে যে প্রাণ-খোলা হাসির উদয় হয়, তাহা অন্যবিধ নাট্যাভিনয়ে অনুভূত হয় না।

শান্তরসে চিত্তের বিক্ষেপ বা উদ্বেগসৃষ্টি করে না, হাসির উল্লাসও হয় না, এ জন্য শান্তরসের দ্বারা প্রহসনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

প্রহসন কেবলমাত্র হাস্যোল্লাসের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য না হইলেও হইতে পারে, হাস্যরসের মধ্যে কোন একটি বিশিষ্ট আদর্শ প্রদর্শিত হইলে তাহাকে dignified বা উচ্চাঙ্গের প্রহসন বলা যায়। সে ভাবে বিচার করিলে—'ভগবদজ্জুকীয়ম্' এক অপূর্ব্ব রচনা, ইহাতে শান্তরসের সহিত হাস্যরসের মিশ্রণে—চাপল্যরহিত এক গভীর হাস্যরস সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার টীকাকার গূঢ়ার্থ নামক যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহাতে শিষ্যের হাস্যরসের মধ্যেও অন্তঃস্রোতা তত্ত্ববার্ত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ব্বপ্রবন্ধে এই প্রহসনের উপাখ্যান-ভাগ প্রদত্ত হইয়াছে; এক্ষণে রচনা-প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি—

পরমযোগী পরিব্রাজক গভীর বেদান্ততত্ত্বগুলি সরস ও শান্তভাবে উপদেশ করিতেছেন, শিষ্য প্রশ্নের ছলে হাস্যরস সৃষ্টি করিতেছে। যেমন,—পরিব্রাজক বলিলেন,—'বৎস! রাগদ্বেষ হইতে উদাসীন হওয়ার নাম অসঙ্গতা'। এই কথায় শিষ্যের নিজের বেদনার কথা মনে হইল, অধ্যয়ন না করিলে গুরু মধ্যে মধ্যে প্রহার করিয়া থাকেন, প্রহার যিনি করেন, তিনি অবশ্যই দ্বেষের বশীভূত, ইহা মনে করিয়া শিষ্য বলিল—'অসঙ্গতা কি কোথাও আছে?' গুরু—'অসদ্বস্তুর কি নাম থাকে? (অসঙ্গতা—এরূপ শব্দ যখন আছে, তখন ইহার অস্তিত্বও আছে, ইহাই তাৎপর্য্য। টীকাকার এখানে দেখাইয়াছেন যে,—শশবিষাণ প্রভৃতি শব্দের যে অস্তিত্ব আছে, তাহার কারণ শশ পদার্থ এবং বিষাণ পদার্থ উভয়ই প্রসিদ্ধ এবং তাহাদের সম্বন্ধও পৃথগ্‌রূপে অপ্রসিদ্ধ নহে)'।

শিষ্য বলিল,—অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা কি (practice) করা যায়—এ কথা আপনি বলেন?

গুরু। তাহাতে সংশয় কি?

শিষ্য। ইহা অলীক, অলীক, (শিষ্য উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গুরুর এই ধারণা যে অলীক, তাহা ঘোষণা করিল)।

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?

শিষ্য। ভগবন্—আপনি আমার উপর কুপিত হ'ন কেন?

গুরু। তুমি পড় না, এজন্য।

শিষ্য। আমি পড়ি বা না পড়ি, আপনি মুক্ত (পুরুষ)—আপনার তাহাতে কি?

গুরু। ও কথা ব'লো না। শিষ্যের শিক্ষার্থ তাড়ন করা বিধেয়, এজন্য কুপিত না হইয়াই আমি তোমায় তাড়না করিয়া থাকি।

শিষ্য। আশ্চর্য্য! কোপ নাই—অথচ আমাকে প্রহার করেন? শিষ্য আর সুবিধা না পাইয়া বলিল—এ কথা ছাড়িয়া দিন, ভিক্ষার সময় যে বহিয়া যায়!

গুরু বলিলেন,—মূর্খ, এখনও মধ্যাহ্ন হয় নাই, ইহা পূর্ব্বাহ্নকাল যখন মুষল ভূতলে পড়িয়া থাকিবে, অগ্নিনির্ব্বাণ হইবে, সকলের আহার সমাপ্ত হইবে, তখন আমাদের ভিক্ষার সময়—ইহাই উপদেশ। সুতরাং বিশ্রামের জন্য চল যাই—ঐ উদ্যানে প্রবেশ করি।

শিষ্য এইবার মজা পাইল এবং বলিয়া উঠিল—হা! ... এইবার আপনার প্রতিজ্ঞাহানি হইয়াছে।

গুরু। কেমন করিয়া?

শিষ্য। আপনার পক্ষে ত' সুখ-দুঃখ দুই-ই সমান। (... আবার বিশ্রাম চা'ন কেন?)

গুরু। হাঁ, আমার আত্মা সমদুঃখ-সুখ; কিন্তু কর্ম্মাত্মা বিশ্রাম চায়।

শিষ্য উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—এই আত্মাই ... আর ঐ কর্ম্মাত্মাই বা কে?

গুরু। শুন,—সুষুপ্তি কালে যিনি আকাশবৎ (ব্যাপক ... উপাধিশূন্য) হ'ন, তিনিই আত্মা; আর কর্ম্মফলবশে যিনি দেহধারণ করিয়া নরনামে বা অন্যনামে কথিত হ'ন, তাঁহাকে কর্ম্মাত্মা ... হয়। এই কর্ম্মাত্মাই বিশ্রামসুখ-ভাজন হইয়া থাকে।

শিষ্য একটু কথাটা ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—যিনি ... অমর, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য তিনি আত্মা; আর যিনি স্বয়ং হাসেন, অপরকে হাসান, শয়ন, ভোজন করেন ও বিলীন হ'ন—তিনি কর্ম্মাত্মা,—এই ত'?

গুরু ইহাতে খানিকটা সম্মতি প্রদান করিবামাত্র শিষ্য বলিল—প্রভু, এইবার—স'রে পড়ুন,—নতুবা আমার কাছে ধরা প'ড়ে ... (অর্থাৎ নিগ্রহস্থানের বিষয় হইবেন)

গুরু। কিরূপে শুনি।

শিষ্য। যিনি আত্মা তিনিই ত' এখন কর্ম্মাত্মা। ... ব্যতীত আর ত' কিছুই নাই।

(কর্ম্মাত্মার অস্তিত্বস্বীকার করিলে শরীরভেদে আত্মার ... স্বীকার করিতে হয়, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত তাহা নহে)

গুরু। আরে—ইহা লৌকিক ভাবে বলিয়াছি। ... দেহভেদ, ইহাও ত' শাস্ত্র হইতে শুনা যায়—তাই এইরূপ বলিয়াছি।

শিষ্য তখনও জিদ্ ছাড়িল না, জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ... থাক্—আপনি কে—বলুন দেখি?

গুরু। আমি প্রাণিধর্ম্মবিশিষ্ট কোন একটি পদার্থ, পাঞ্চভৌতিক সচল দেহ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়-সমন্বিত—নরনামধারী।

শিষ্য। হা! হা! এমনি ভাবে নিজেকেই জানেন না, আবার পরমাত্মা জানিবেন কিরূপে? (২)—ভগবন্—এই ত' ...।

গুরু। আগে প্রবেশ কর, আমরা ত' শূন্য গৃহ বা অরণ্যে থাকিতেই চাহি।

---

(১) হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ।
(সাঃ দঃ ৩ পরিঃ, ৬৭)।

(২) নিজেকে পরমহংস বলিয়া প্রকাশ না করায়, সাধারণ সকল মানুষের মত নিজেকে মনে করায়—শিষ্য বুঝিল, গুরু নিজেকে জানেন না।

শিষ্য। প্রভো, আপনিই আগে চলুন, আমি পিছনে পিছনে যাইতেছি।

গুরু। কি জন্য ?

শিষ্য। আমার মা—এক জন পৌরাণিক. তাঁর মুখে শুনিয়াছি, অশোক-পল্লবের অন্তরালে বাঘ বাস করে। তা' আপনিই আগে যান—আমি পিছনে আছি।

গুরু। বেশ।

শিষ্য। (পিছু পিছু যাইতে যাইতে) গেলাম গো! আমায় বাঘে ধরেছে! বাঘের মুখ হ'তে আমায় রক্ষা কর। অনাথের ন্যায় আমি বাঘ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হ'লাম। বক্ষদেশ হ'তে রক্ত পড়ছে যে!

গুরু। শাণ্ডিল্য! ভয় নাই, ভয় নাই; এটা ময়ূর।

শিষ্য। সত্য ময়ূর ?

গুরু। হাঁ, সত্যই ময়ূর।

শিষ্য। যদি ময়ূর হয়, তাহা হইলে এইবার চোখ খুলি ?

গুরু। স্বচ্ছন্দে।

শিষ্য। ওরে! বেটা বাঘ আমার ভয়ে ময়ূররূপ ধ'রে পলাইল!

শিষ্যের পূর্ব্ব সংস্কারবশে অলীক ব্যাঘ্রভীতি এবং গুরুর দৃষ্টান্তাকারে তাহার অপনোদন—ইহা যেমন শিক্ষাপ্রদ, তেমনই কৌতুকাবহ (১)।

সেই উদ্যানে প্রবেশের পর—গুরু-শিষ্য উপবেশন করিলে উভয়ের মধ্যে তত্ত্বকথার আলোচনা চলিতে লাগিল। শিষ্য উদরচিন্তায় বিভোর, গুরু তখনও সদুপদেশদানে বিমুখ নহেন। কিয়দ্দূরে এক পক্ষিরা গান ধরিল—

মধুমাসজাতদর্পঃ
কন্দর্পঃ কামিনীকটাক্ষসখঃ।
অপি যোগিনামিহ মনো
বিধ্যতি ফুল্লৈরশোকশরৈঃ॥

শিষ্য এই গানশ্রবণে গুরুকে বলিল—কর্ণ হইতে মধুবর্ষণ হইতেছে—ভগবন্, একটু শুনুন।

(১) টীকাকার এখানে এক গূঢ় ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—অশোকপল্লব মনোহর বলিয়া ইহা বিষয়স্বরূপ, ব্যাঘ্র হিংস্র বলিয়া বিষয়াভিলাষ-তুল্য এবং বিষয়ের দোষদর্শন হইলে তাহা ময়ূরের মতই মৃদুলস্বভাব হইয়া যায়।

ভগবদজ্জুকীয়ম্ 'প্রহসন'খানি সমস্তই যে রূপকের উপর কল্পিত, তাহা টীকাকার ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং তিনটি শ্লোক উল্লেখ করিয়া রূপকটি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—

অস্মিন্ নাট্যরসে নিসর্গগহনে যোগীন্দ্রশিষ্যাবুভা-
বাত্মানৌ পরজীবশব্দকথিতাবস্তা তথৈবাজ্জুকা।
মূলাধারসমুদ্গতা সুষুম্নিরা নাড়ী সুষুম্নাহপরে
চেট্যৌ চোভয়পার্শ্বগে সুষুম্নিরে নাড্যাবিড়াপিঙ্গলে।
অবিদ্যা গণিকামাতা মহান্ রামিলকো মতঃ।
বৈদ্যৌ বিকল্পসঙ্কল্পৌ কালস্তু যমপূরুষঃ।
এবং প্রেক্ষাময়ং যোগং যুঞ্জন্ নর্ত্তকতাপসঃ।
প্রত্যক্‌ষমচ্যুতং সদ্যঃ সাক্ষাৎকৃত্য সুখীভবেৎ।

গুরু। শুধু শব্দ গ্রহণ করিবার জন্যই বর্ণের প্রয়োজন, ইহাতে আসক্তি রাখিব না।

শিষ্য। আসক্তিও আসিত, যদি পয়সা থাকিত।

গুরু। আঃ! (ক্রুদ্ধ সহিত) উচিত ব্যবহার শিক্ষা কর।

শিষ্য। আপনি রাগ করিবেন না। সন্ন্যাসীদের রাগ করা ঠিক নহে।

এই ভাবে শিষ্য-কথায় হাস্যরসের দ্যোতনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অবিশ্বাসী বিক্ষিপ্তচিত্ত শিষ্য গুরুকে ছলে, কৌশলে নিগৃহীত করিতে চাহিতেছে; আর গুরু তাঁহার অনন্ত মহিমায় শিষ্যের সমস্ত ধৃষ্টতা সহ্য করিয়া আপনার যোগশক্তি দেখাইয়া—তাহাকে বিশ্বাসী ও ভক্ত করিলেন। প্রহসনের মধ্যেও এমন শিক্ষা প্রদান সাহিত্য-জগতে স্বল্পই দেখা যায়। এই জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ইহা বরং Comedy—ঠিক farce নহে এই প্রহসনের ভাষা-ভাব ও কল্পনা, চাতুরী—সমস্তই অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ইহার নিকটে 'লটকমেলকম্' প্রভৃতি প্রহসন নিতান্ত বালক্রীড়া বলিয়া মনে হইবে। তথাপি কালভেদে রুচিভেদ হইয়া থাকে, দ্বাদশ শতাব্দীর কবি শঙ্খধর তাৎকালিক কান্যকুব্জ সমাজের কতিপয় অনাচার চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত নিজ কল্পনা কৌশলে যে প্রহসন-সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ভাষার সৌষ্ঠব আছে, ভাবের লালিত্য আছে—উদ্ভটকল্পনাও আছে। লটকমেলকের কতিপয় শ্লোক প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত হইয়াছে।

উপাখ্যানাংশে এই প্রহসনের কোন বিশেষত্ব নাই বা আকর্ষকত্ব নাই। ইহাতে চাপল্যের চিত্রই অধিক। ফলে এই অভিনয় দর্শনে হাস্যলহরী উঠিতে পারে—বহু দুর্জ্জনের নানাবিধ দুশ্চরিত চিত্র দেখিয়া হাস্যোল্লাস উপভোগ করা যাইতে পারে, এই মাত্র। ইহাতে দুইটি অঙ্ক—একটির নাম লজ্জাবিক্রয়, দ্বিতীয়টির নাম দন্তুরা-পরিণয়।

দন্তুরা একটি পরিণত-বয়স্কা বেশ্যা, নামেই তাহার রূপের পরিচয়। তাহার একটি যুবতী কন্যা আছে—তাহার নাম মদনমঞ্জরী। এক দিন এই দন্তুরার গৃহে সভাসলি নামক এক মূর্খ উপাধ্যায়—সঙ্গে কুলব্যাধি উভয়ে উপস্থিত হইল। সভাসলি এক জন বৈদিক মার্গের প্রতিকূল বামাচারী পঞ্চমকার সাধনার নামে কখনও বেশ্যাবাড়ীতেও থাকে, আবার অন্য প্রণয়িনীও রাখে। কুলব্যাধির নামেই পরিচয়, কুলের ব্যাধিস্বরূপ। সভাসলি যখন দন্তুরার গৃহে মদনমঞ্জরীর জন্য ব্যগ্রতা দেখাইতেছে, তখন কুলব্যাধি সভাসলির অন্য প্রণয়িনী কলহপ্রিয়ার বিষয় প্রকাশ করিয়া দিল। কলহপ্রিয়ার সহিত সেই দিনই না কি সভাসলি উপাধ্যায়ের দন্তাদন্তি, নখানখি, হাতাহাতি, মাথামাথি হইয়া গিয়াছে! শেষে কলহপ্রিয়া হাতার বাড়ি মারিয়া, আঙ্গরা ছুড়িয়া, পীড়ি ফেলিয়া শেষে হাঁড়ীর ঘায়ে—সভাসলিকে বিতাড়িত করিয়াছে। সভাসলিও উপস্থিত বুদ্ধি মত বলিল যে, তাহারও সেই জন্য নির্বেদ হইয়াছে—তাই এই বেশ্যাগৃহে আগমন। দন্তুরাই বা ছাড়িবে কেন? সে-ও বলিল, আপনি আপনার মত মহাপণ্ডিতের উচিত কার্য্যই করিয়াছেন। দন্তুরার পায়ে একটা ঘা ছিল, সভাসলি তাহা দেখিবামাত্র বেশ সহানুভূতির স্বরে কারণ জিজ্ঞাসা করিল—দন্তুরা বলিল কে রাউত্তরাজ সংগ্রাম-বিসর একটা কুকুর বন্ধক দিয়া গিয়াছিল, সেই কুকুর আমাকে কামড়াইয়াছে। রাউত্তরাজের নাম সংগ্রামবিসর,

সংগ্রাম হইতে সরিয়া পড়াই যাহার কার্য্য. সভাসলি তৎক্ষণাৎ মহাবৈদ্য জন্তুকেতুকে ডাকাইবার ব্যবস্থা করিল। জন্তুকেতু সগর্ব্বে আত্ম-পরিচয় দিল যে, আমি তদ্বির করিলে ব্যাধি রোগীর দেহে পোষ মানিয়া থাকে, আমার হাতের অমৃত বিষ হয়, আর আমি রোগীর সম্মুখে থাকিলে যমেরও প্রয়োজন নাই আর কোন ঔষধেরও কার্য্য থাকে না। জন্তুকেতুর ঔষধ চমৎকার !

যস্য কস্য তরোর্ম্মূলং যেন কেন চ পেষয়েৎ।
যস্মৈ কস্মৈ প্রদাতব্যং যদ্বা তদ্বা ভবিষ্যতি ॥

যে কোন গাছের মূল যার তার দ্বারা পেষণ করাইবে, যাকে তাকে তাহা দিবে ; তাহা হইলেই যা হয় তা হয় একটা হইবে। আর চক্ষুরোগের ব্যবস্থা এই,—

অর্কক্ষীরং বটক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তথৈব চ।
অঞ্জনং তিলমাত্রেণ পর্ব্বতোঽপি ন দৃশ্যতে ॥

আকন্দর আটা, বটের আটা, মনসার আটার একটুখানি অঞ্জন চোখে লাগাইলে পর্ব্বতও আর দেখা যাইবে না।

জন্তুকেতু আবার শিশু-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ (specialist), কেন না, অনেক সময়ে এরূপ চিকিৎসককে অন্তিম কৃত্য করিতে হয়, শিশু হইলে বিশেষ কষ্ট হয় না, বয়স্ক রোগী হাতে পড়িলেই—খাটিয়া মাথায় করিতে হয়—এজন্য জন্তুকেতু সাধ করিয়া শিশু-চিকিৎসা ধরিয়াছিল।

চিকিৎসা বিষয়ে এইরূপ আলোচনা হইতেছে—এমন সময়ে এক দিগম্বর (জৈন) নাম জটাসুর আসিয়া উপস্থিত হইল ; কারণ এই যে, তাহার নিরপরাধা ছাগীটাকে তপস্বী অজ্ঞানরাশি হত্যা করিয়াছে। ইহার বিচার করিবে উপাধ্যায় সভাসলি। এ দিকে তপস্বী অজ্ঞানরাশিও আসিয়া পড়িল। সভাসলির নিকট বাদী দিগম্বর অভিযোগ উপস্থিত করিল। অজ্ঞানরাশি উত্তরে বলিল যে, —আমার ফুলবাগানে ছাগী চরিতেছিল, তাই হত্যা করিয়াছি। সভাসলি অনেক বিচার করিয়া বলিল যে,—যদি জ্ঞানপূর্ব্বক ছাগী হত্যা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার মূল্য দিতে হইবে, নতুবা কিছুই হইবে না।

অজ্ঞানরাশি বলিল—আমি ছাগী বলিয়া মোটেই বুঝিতে পারি নাই—আমি বাছুর ভাবিয়া মারিয়াছি।

সভাসলি বলিলেন—ওঃ, তাহা হইলে ত' অজ্ঞানরাশির জয় ! এই জয়পত্র (ডিক্রী) লও।

সভাসলি তপস্বী অজ্ঞানরাশিকে প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়া ফেলিল—জটা ও কুলটার এমন মিলনক্ষেত্র যেখানে—সেখানে ত' জয় হইবেই।

অজ্ঞানরাশি এই প্রশংসাকে উপহাস মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সভাসলিকে গালি দিল। সভাসলিও তাহার উপরে গালি চড়াইল। সেই অশ্লীল গালি শুনিয়া দন্তুরা বলিল—তোমরা কি লজ্জা বিক্রয় করিয়া এখানে আসিয়াছ ?

কিন্তু মদনমঞ্জরীর দিকে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট। সভাসলি, দিগম্বর ও অজ্ঞানরাশি তিন জনই তাহাকে চাহে। দিগম্বর একটু সুবর্ণের লোভ দেখাইতেই মদনমঞ্জরী যেন অন্যমনস্কা হইল, আর দন্তুরাও সময় বুঝিয়া বলিল যে, এখান হইতে কুরূপ মলিন ব্যক্তি দূর হইয়া যাও, আমার মেয়ের মন খারাপ হইতেছে।

দিগম্বর তাড়াতাড়ি একগাছি লাঠি লইয়া অন্য সকলকে তাড়াইয়া দিল। প্রথমাঙ্কের এইখানেই সমাপ্তি।

দ্বিতীয় অঙ্কে—দৃশ্য—দন্তুরার গৃহ।

কুকুর-বন্ধকদাতা সংগ্রামবিসর এক জন বীর পুরুষ, মদনমঞ্জরীকে মনে হওয়ায় যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। আসিয়া কুকুরটার সন্ধান লইয়া জানিল যে, সেই কুকুরটা শিকল ছিঁড়িয়া আর দন্তুরাকে কামড়াইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এখন বন্ধকের জিনিষ চলিয়া গেল, অথচ ঋণের টাকা শোধ হইল না, উপায় কি ? সঙ্গে ছিল তাহার এক বন্ধু, নাম বিশ্বাসঘাতক। তাহাকে বলিল, তুমি দন্তুরাকে বুঝাইয়া বল যে, এই কুকুরটা এক শত টাকায় কেনা ছিল, আর কি শিকারী। এত দিন আমার বাপের মত আহার যোগাইয়াছে। সুতরাং জিনিষটা যাওয়াতে আমারও ক্ষতি হইয়াছে। বিশ্বাসঘাতক দন্তুরার কাণে কাণে বলিল—ঐ কুকুরটা বেচিলে পাঁচ কড়াও দাম হইবে না। তবে সংগ্রামবিসরের একটা সোণার ঘড়া আছে, সেইটা তুমি হাতাও দেখি, তার পর আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া ওকে এখান থেকে তাড়াইয়া দিলেই হইবে। দেখ, ওর মতলব ভাল নহে, মদনমঞ্জরীকে চুরি করিয়া লইতে চায়।

দন্তুরা বলিল—তোমাদের এই গুণেতেই ত' আমার মেয়ে মজিয়া আছে।

সংগ্রামবিসর তখন তাহার বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া আসিয়া বলিল যে, কুকুরের পরিবর্ত্তে এই বুড়ীমাকে বন্ধক রাখ, তোমার বাড়ীতে দাসীর কার্য্য করিবে। কটকসার নামে এক জন ধনী আসিয়া বলিল—সংগ্রামবিসর ! কুকুরের কড়ি শোধ দিতে যদি না পার ত' মাকে বেচিয়া সেটা শোধ কর না ? সংগ্রামবিসর তাহাতে স্বীকৃত হইলেও ঋণ করিতে যেরূপ নিয়মবন্ধন করিতে হয়, তাহাতে তাহার ভয় হইল। দন্তুরাও বুঝিল যে, কেহ এক পয়সা দিবে না, শুধু মদনমঞ্জরীকে উপহাস করিতেছে।

তখন মিথ্যাশুক্ল অভয় দিতে দিতে প্রবেশ করিল— অন্য দিকে ফুস্কটমিশ্র (কেহ কেহ 'কুক্কুটমিশ্র' এইরূপ নাম দিয়াছেন) আসিলেন। তৎপরে মিথ্যাশুক্ল ও ফুস্কটমিশ্রের বিচার, ঐ বিচার হইতে কনৌজ প্রদেশের তাৎকালিক মনোভাব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর-মতের উপর বিদ্বেষ এবং বাঙ্গালায় প্রভাকর-মতের আদর হওয়াতে তাহার উপর কটাক্ষ। শঙ্করের অদ্বৈত মতেও কিঞ্চিৎ অনাদর প্রদর্শন এবং মীমাংসার ভট্টপাদের মতবাদে আস্থার বিষয় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ফুস্কটমিশ্র শুষ্ক বিচার হইতে বিরত হইয়া মদনমঞ্জরীর স্বস্ত্যয়নার্থ যে তাহার আগমন, ইহাই মিথ্যাশুক্লকে বলিলে—তাহার দৃষ্টি মদনমঞ্জরীর উপর পতিত হইল। উভয়েই মদনমঞ্জরীর প্রতি লোভ বশতঃ ঈর্ষান্বিত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হইল। মিথ্যাশুক্ল ফুস্কটমিশ্রকে তাড়াইয়া দিল।

এই সময়ে প্রবেশ করিল—এক বৌদ্ধ, নাম—ব্যসনাকর। ব্যসনাকরকে দেখিয়া দিগম্বর (জৈন) ফিরিয়া আসিল, উভয়ের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইল। ব্যসনাকর এক রজকী-বিরহে কামাতুর, তাহা জানিয়া দিগম্বর তাহাকে রজকী জাতির স্পর্শে দূষিত বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিল। ব্যসনাকর বলিল—জাতিই নাই—সমস্ত ভাবপদার্থ ক্ষণিক, আত্মাও স্থিরবস্তু নহে, (ক্ষণে ক্ষণে যদি বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহা হইলে জাতিই থাকিতে পারে না) সুতরাং আমার রজকী স্পর্শে কোন দোষই ঘটে নাই।

এ দিকে সভাসলি ইহাদের বিচার শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু দিগম্বর ব্যসনাকরকে মদনমঞ্জরীর প্রতিস্পর্দ্ধী প্রণয়ী মনে করিয়া তাড়াইল। শেষে দিগম্বর বুঝিল মদনমঞ্জরীর প্রতি সভাসলির লোভ আছে—সভাসলিকে তাড়ানও কঠিন কাজ, আমার একটি নারী চাহি, সুতরাং আমি দন্তুরাকে বিবাহ করি। তাই সে সভাসলিকে অনুরোধ করিল যে, দন্তুরার সহিত তাহার বিবাহ ঘটাইয়া দেও; আর তুমি মদনমঞ্জরীকে গ্রহণ কর। সভাসলি তখন হৃষ্ট হইয়া দন্তুরাকে বলিল—তুমি নব্বুই বৎসরের নব্যা যুবতী, তোমাকে দিগম্বর বিবাহ করিতে চাহে, তুমি সম্মতা হও। দন্তুরা একটু লজ্জার সহিত বলিল—যদি তোমাদের মত হয়, আমার আপত্তি নাই। তখন চতুর্ব্বেদ নামক জঙ্গম সম্প্রদায়ের এক পুরোহিতকে ডাকাইয়া জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে—শনিযুক্ত ধনুর্লগ্নে বিবাহের ব্যবস্থা হইল। আকন্দ ফুলের মালা পরাইয়া দিগম্বরের বরবেশ রচনা হইলে পুরোহিত ফুল ও আলোচাল লইয়া আশীর্ব্বাদ করিল—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

পুরোহিত দক্ষিণা চাহিলে—দিগম্বর দুইটি হরীতকী প্রদান করিল। পুরোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—আমি অনেক ব্রতনিয়ম করিয়াছি, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী শুক্ল মহাব্রাহ্মণ; আমার দক্ষিণা লোপ করিলি—তুই নির্লজ্জ, নগ্ন দিগম্বর! আমি এই দন্তুরাকে লইয়াই চলিলাম। তখন পুরোহিত ও যজমান সেই দন্তুরাকে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল, এ দিকে কুলব্যাধি আসিয়া তখন নৃত্য করিতে লাগিল। প্রহসন এখানেই সমাপ্ত হইল।

এই প্রহসনের প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে যে,

'চিত্রং চরিত্রং স্খলিতব্রতানাং
শীলাকরঃ শঙ্খধরস্তনোতি।'

কবি শঙ্খধর—স্খলিতব্রত—অর্থাৎ ভ্রষ্টদিগের বিচিত্র চরিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের পরিচয়ে লিখিয়াছেন—"শীলাকরঃ", সৎস্বভাবযুক্ত। কবি যে সকল চরিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে নিজভাবের প্রতিবিম্ব কবিরচনায় আসিয়া পড়ে, ইহা সাধারণের ধারণা, এ জন্য কবি যে ঐরূপ ভ্রষ্টভাবের পরিপোষক নহেন, তাহা প্রথমেই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভ্রষ্টদিগের স্বরূপ দ্বিবিধ—(১) স্বভাবতঃ (২) কর্ম্মবশতঃ, লটকমেলক প্রহসনে দ্বিবিধ ভ্রষ্টের চিত্রই প্রদর্শিত হইয়াছে। বেশ্যা, বেশ্যাদুহিতা, কামলোলুপ দিগম্বর, বৌদ্ধ ব্যসনাকর প্রভৃতি—কবি-দৃষ্টিতে প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত। আর বামাচারচ্ছলে কদাচারপরায়ণ সভাসলি, মূর্খ ব্রাহ্মণকুমার কুলব্যাধি, নিরক্ষর চিকিৎসা-ব্যবসায়ী জন্তুকেতু, কাপালিক অজ্ঞানরাশি দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্গত। এই সকল দুর্জ্জনের মিলন হইয়াছে বলিয়া এই প্রহসনের নাম হইয়াছে 'লটকমেলক'।

কবি শঙ্খধরের সময়ে—মীমাংসার কুমারিল ভট্টপাদের সম্প্রদায় ও প্রভাকর সম্প্রদায়ে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের তখন পতন হইয়াছে। তান্ত্রিক কুলাচার কনৌজ সমাজে প্রবেশ করিলেও তাহা নিন্দিত হইয়া আছে। জঙ্গম নামক শৈব সম্প্রদায়ও তখন নিন্দিত কার্য্যে ব্যাপৃত। এই জঙ্গম বেশ্যার বিবাহে আসিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়াছিল যে, সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসাতে সন্ধ্যোপাসনা ভুলিয়া গিয়াছিল। এবং এটা যে ভাল হয় নাই, তাহার প্রমাণস্বরূপে একটি শ্লোক তুলিয়াছে—

যথা চাহ ভগবান্ ব্যাসঃ—

স্বকার্য্যব্যাপৃতেনাপি ধর্ম্মঃ কার্য্যোঽন্তরান্তরা।
দাম্না বদ্ধোঽপি হি ভ্রাম্যন্ ঘাসগ্রাসং করোতি গৌঃ॥

ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন যে,

নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেও মাঝে মাঝে ধর্ম্ম করিবে—রজ্জু দ্বারা বদ্ধ থাকিলেও গোরু যেমন ঘুরিতে-ঘুরিতে ঘাস খাইয়া লয়। এই জঙ্গমের নাম—চতুর্ব্বেদ, দন্তুরার সহিত দিগম্বরের বিবাহে—এই ব্যক্তিই পৌরোহিত্য করে।

মিথ্যাশুক্লের স্বভাবের পরিচয় এইরূপ—

পরাপকারশূন্যো যঃ ক্ষণার্দ্ধমপি তিষ্ঠতি।
স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি ন জীবতি॥

যে ব্যক্তি পরের অপকার না করিয়া অর্দ্ধক্ষণও থাকে—সে কামারের হাপরের মত বায়ুগ্রহণ করিলেও তাহাকে জীবিত বলা যায় না।

ফুক্কটমিশ্র বা কুক্কুটমিশ্র—লটকমেলকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র, ইহা বঙ্গ সাহিত্যিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার পরিচয়-শ্লোকটি চমৎকার—পাঁচ দিনে মীমাংসার প্রভাকর গ্রন্থ, তিনদিনে বেদান্ত পাঠ করিয়া—আর ন্যায়শাস্ত্রের গন্ধমাত্র গ্রহণ করিয়া পূজ্যপাদ ফুক্কটমিশ্র আসিতেছেন। উভয়ের যখন মিলন হইল, তখন প্রণত শুক্লকে ফুক্কটমিশ্র জিজ্ঞাসা করিল—'কিসের ব্যাখ্যান হইতেছে?' মিথ্যাশুক্ল বলিল—"চোদনা-লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ"—এই সূত্রের দ্বারা ধর্ম্মনির্ণয় করিয়াছি—তৎপরে "ভট্টাকপালং চরুনির্ব্বপেৎ স্বর্গকামঃ" এই যুক্তি দ্বারা সাধনাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছি।

এখানে প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা হাস্যোদ্দীপক সন্দেহ নাই!

ইহা শুনিয়া ফুক্কটমিশ্র বলিল—বৎস মিথ্যাশুক্ল, তুমি মহামহোপাধ্যায় হইয়াছ।

তোমার ব্রাহ্মণ্য না থাকিলেও খুব প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এইরূপ রাঢ় দেশের প্রসিদ্ধি যে,—ব্যাকরণ জানা নাই, কাব্যে শ্রম করা হয় নাই, কুমারিল ভট্টকৃত বার্ত্তিক গ্রন্থ শুনিলে আচমন করে, তাদৃশ গ্রন্থে যাহারা বিদ্বান্, তাহাদের স্পর্শ করিলে স্নান করে, তর্কপটু নৈয়ায়িকদের চাণ্ডালের মত মনে করে, অথচ সেই রাঢবাসিগণ হর্ষগদ্গদচিত্তে প্রভাকরের গ্রন্থ পাঠ করে।

এই রাঢ়দেশ বলিতে বাঙ্গালার কথাই সম্ভাবনা করা যায়। কেন না—বাঙ্গালাদেশে—মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর মত বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। শুধু কনৌজ কেন—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মিথিলায়ও প্রভাকর মতের খণ্ডন চলিয়াছিল। নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক গঙ্গেশোপাধ্যায় তাঁহার তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন যে,—আমি প্রভাকর মত জ্ঞাত হইয়া তাহাকে পূর্ব্বপক্ষরূপে এই আন্বীক্ষিকী (ন্যায়শাস্ত্র) প্রণয়ন করিতেছি। *

এই প্রহসনে—প্রভাকর মতের উপর খুবই আক্ষেপ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম-এ (অধ্যাপক)

* 'অন্বীক্ষানয়মাকলয্য গুরুভির্জ্ঞাত্বা গুরূণাং মতম্' ইত্যাদি (তত্ত্বচিন্তামণি—২ পৃঃ)।

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

১২

পোষাকের মাপ লইয়া ওস্তাগর চলিয়া গেল। মায়ের পানে চাহিয়া অনিল বলিল,—তুমি তা হলে যেতে পারবে না! কণ্ঠে ক্ষোভের সুর।

মা কহিলেন,—কি করে হবে! সুশীল আসবে। কল্পনা আসবে, তাদের আবার চা খেতে বলেছি।

—তবেই তো মুস্কিল! বলিয়া অনিল ঊর্দ্ধে কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল। যেন সমস্যার সমাধান সেইখানে লেখা আছে!

অমিয় রত্নাকে কহিল,—তোমার সঙ্গে কল্পনার বোধ হয় আলাপ আছে?

কুণ্ঠিত স্বরে রত্না কহিল,—তেমন নেই!

—তা হলে আজ আলাপ হবে! কল্পনা বেশ ভালো পিয়ানো বাজাতে পারে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তাই না কি? আর ও বড়লোকের মেয়ে—জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জী কম লোক ছিলেন না—ওর কথাই আলাদা!

রত্নার চোখ মুখ নিমেষে আরক্ত হইয়া উঠিল। মিসেস্ গোস্বামী পরিচয়-হিসাবে যে কথাগুলা বলিলেন, সেগুলা রত্নাকে আঘাত করিল। রত্নার উপর মিসেস্ গোস্বামীর যে স্নেহ-মমতা—রত্নার মনে হইল, সে শুধু কৃপা-করুণা!

ঠিক সেই সময়ে অনিল তাহার আশু অর্থহানি নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিল। মাকে বলিল,—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? রত্না আজ চলুক। আর একখানা যা টিকিট রইলো, সেখানাতে—

সংশয়-পীড়িত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—একা যাবে?

—বাঃ। একা কোথা! আমি যাচ্ছি। শচীনরা যাবে। না হলে অতগুলো টাকা নষ্ট হবে?

মিসেস্ গোস্বামী দ্বিধায় পড়িয়া অনুমতি দিলেন, কহিলেন,—তবে যাও, উপায় যখন নেই।

উৎফুল্ল মুখে অনিল কহিল,—আর বুঝেছো মা, সাধনা বোসের নাচটা একবার দেখা উচিত।

মিসেস্ গোস্বামী মাথা নাড়িলেন।—তা সত্যি, রত্না তুমি তবে যাও।

অমিয়র পানে চাহিয়া সঙ্কুচিত ভাবে রত্না কহিল,—আপনি? সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কাটিল, জিভ্ কাটিয়া কহিল,—তুমি যাবে না?

অমিয় হাসিল। ঔদাস্য-সহকারে কহিল,—আপনি—তুমি,—না, আমি—আমার আজ যাওয়া হবে না। কি করে যাবো? বাড়ীতে অতিথি আসচে।

—তা বটে! বলিয়া রত্না চুপ করিল।

অনিল কহিল,—অতিথি বলে অতিথি! সম্ভ্রান্ত অতিথি। তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। বলিয়া অগ্রজের পানে চাহিয়া কহিল,—কল্পনা চ্যাটার্জ্জিকে তো এখন প্রায়ই আসতে হবে। তার সঙ্গে অন্য এক দিন আলাপ করলেই হবে—কি বলো?

অমিয় ফুলদানীর গোলাপগুলা দেখিতেছিল,—কনিষ্ঠের কথায় মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল,—সেই ভালো। আজ তোমরা বেরিয়ে পড়ো, টাইম আর নেই।

মিসেস্ গোস্বামী রত্নার পানে চাহিয়া কহিলেন,—যাওয়া যখন স্থির, তখন মিছে দেরী করা কেন! যাও রত্না, উঠে পড়ো, তৈরী হয়ে নাও। সভ্য সমাজের রীতি—ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা।

রত্না উঠিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ গোস্বামীর উপদেশ দেওয়া স্বভাব; এবং রত্নাকে পাইয়া তাকে মানুষ করিবার সব ভার নিজের হাতে লইয়া সে-ভারকে মস্ত দায়িত্বের মত দেখেন। তাই প্রতি পদক্ষেপে সকল কাজে তালিম দিয়া তাকে বুঝাইতেছেন,—কেতাদুরস্ত সমাজে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা করিতে কি কি প্রয়োজন! রত্না দ্বিধাহীন চিত্তে সকল উপদেশ-নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলে। ইহাতে মিসেস্ গোস্বামী যেমন প্রীতিলাভ করেন, অন্য দিকে এই একান্ত অনুগতা তরুণীর প্রশংসা-কীর্ত্তনেও তিনি সহস্রমুখ হন। রত্না এবার তেমন সরল চিত্তে এ কথাগুলা গ্রহণ করিতে পারিল না! তাহার মনে হইল, একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা ভরিয়াই মিসেস্ গোস্বামী তাহাকে এ কথাগুলা বলিলেন।

নিজের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া কৌচের উপর রত্না চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বেশভূষা করিবার প্রবৃত্তি রহিল না। অহেতুক একটা অভিমান জলন্ত অঙ্গারের মত মনের মধ্যে ঝি-ঝি করিয়া জ্বালা দিতে লাগিল। মানস-নেত্রে সে যেন সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিল, ঘড়িতে তিনটার ঘরে ছোট কাঁটাটা পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতার সহিত কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! মিসেস্ গোস্বামী মহানন্দে তাহাদের সম্ভাষণ করিতেছেন। অমিয় সেই মহামান্য ভ্রাতা-ভগিনীর আদর-আপ্যায়নে ব্যাকুল-অধীর! সম্ভ্রান্ত অতিথির সম্মুখে নিজের কোন ত্রুটি না ঘটে, মাতা-পুত্রের সে দিকে সতর্কতার সীমা নাই। সুশীল চ্যাটার্জ্জির সহোদরা, জাষ্টিস্ চ্যাটার্জ্জির কন্যা—তাহাকে পিয়ানোর টুলে বসাইতে অমিয় হয়তো কৃতার্থ নেত্রে কল্পনার মুখের পানে চাহিতেছে! এ তো রত্না নয়!

পোষাক পরিয়া অনিল রত্নার ঘরের বাহিরে আসিয়া পর্দ্দার ওদিক হইতে কহিল,—মে আই কাম্?

সচকিতে রত্না কহিল,—ইয়েস্।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া রত্নার পানে চাহিয়া অনিল হতভম্ব হইয়া গেল! বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—এ কি, এমন চুপচাপ জুজুবুড়ীর মত বসে আছো! যাবে না?

রত্না অনিলের মুখের পানে চাহিল, ত্রস্ত কণ্ঠে কহিল,—তোমার হয়ে গেছে?

অনিল কহিল,—আমি তো তোমার মত কুড়ে নই! চটপট কাজ করা আমার স্বভাব! পনেরো মিনিট হয়ে গেছে, তুমি এখনো চুলে চিরুণী দাওনি, মাটীর ডেলার মত বসে আছো!

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি! তুমি বসো। আমি এলুম বলে! বলিয়া রত্না পাশের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

অনিল কহিল,—আমি এই ঘড়ি খুলে রইলুম। পাঁচ মিনিটের

এক সেকণ্ড যেন বেশী না হয়! তাহলে ভয়ঙ্কর বকুনি খাবে—বুঝেছো।

রত্না কোন সাড়া দিল না। এমন পরিহাস অনিলের এই প্রথম বা নূতন নয়! কৃত্রিম শাসন-বাক্য-প্রয়োগে নিজের আধিপত্য বিস্তারের দাবী জানাইতে সে খুব পটু। এবং এ-সকলের উত্তরে রত্না শুধু সলজ্জ একটু হাসি হাসে।

আজও তেমনি রহস্যচ্ছলে অনিল বকুনি শব্দটা ব্যবহার করিয়াছিল; কিন্তু রত্নার কাণে সেটা এখন মিষ্ট লাগিল না।

মন তার সহজ ভাবে এ শাসনটুকু গ্রহণ করিল না! সত্যকারের শাসনের তীক্ষ্ণতাই যেন তাহাকে বিঁধিয়া মনকে তিক্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে রত্না যখন আবার এ ঘরে আসিল, তখন তাহার সুসজ্জিত মনোরম তনুর দিকে চাহিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে অনিল কহিল,—বাঃ! চমৎকার!

রত্নার কর্ণমূল অবধি আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল,—কি চমৎকার? যে এমন চমকে উঠলে!

—সে তুমি বুঝবে না! গোলাপ জানতে পারে না বাগানের সে কতখানি শোভা! দর্শকের সে কতখানি আনন্দ!

—না, তা জানে না! জানে কেবল তার ডালে কাঁটা আছে।

অনিল হাসিল। কহিল,—ঠিক বলেছো! কিন্তু গোলাপ সে কাঁটাকে জানে, কাঁটা সে গ্রাহ্য করে না। হাতে ফোটে, রক্ত ঝরে, ব্যথা পায়, তবু গোলাপকে চায়! কথাটা বলিয়া রত্নার মুখের পানে অনিল তাকাইল।

রত্না কহিল,—খুব হয়েছে! তোমার গোলাপ ফুলের ব্যাখ্যা মোটরে বসেও হতে পারে!

—নিশ্চয় পারে! ওঃ তুমি আমাকে উল্টে বকুনী দিচ্ছ! চলো! সত্যি আর দেরী নয়!

গাড়ীতে বসিয়া অনিল কহিল,—তোমার কোট আনোনি!

অপ্রতিভ ভাবে রত্না কহিল,—ভুলে গেছি! আনছি,—বলিয়া নামিতে উদ্যত হইল।

অনিল হাত ধরিয়া বাধা দিল, কহিল,—পাগল হয়েছো! আচ্ছা পাল্লায় পড়া গেছে! বেয়ারা থাক না কোটটা আনতে। না হয় আমি যাচ্ছি! বলিয়া সোফারের দিকে চাহিয়া কহিল,—ভূষণ, মিস্ বোসের কোটটা আমার কাছ হতে আনো তো!

ভূষণ আদেশ পালন করিতে গেল।

রত্নার দিকে চাহিয়া অনিল কহিল,—আমি গাড়ী চালাবো। মুখে তাহার মৃদু হাসি!

রত্না কহিল,—তুমি কেন চালাবে? ভূষণ?

—না, আমিই চালাবো। অনিল রত্নার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কৌতুক কণ্ঠে কহিল,—আমাদের যাত্রা-পথে ভূষণকে আনবে কেন!

—যাত্রা-পথে!

—হ্যাঁ! যদি অনির্দ্দিষ্ট পথে পাড়ি দি? অনিলের দৃষ্টি উজ্জ্বল।

ভীত কণ্ঠে রত্না কহিল,—কি বলছো তুমি! না, না, ও কি ঠাট্টা!

ভূষণ আসিয়া কোট দিয়া সোফারের দরজা খুলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

অনিল কহিল,—এস্প্লানেড!

গাড়ী ছুটিল। রত্না ও অনিল নীরব। রহস্যের মাঝে হঠাৎ যেন উদ্ভট সত্য আবিষ্কার হইয়া গিয়াছে! দু'জনে তাই স্তব্ধ!

কিছুক্ষণ পরে অনিল মুখ ফিরাইল। এ নীরবতা দুর্ভার আকারে তাহাকে পীড়ন করিতেছিল! তাই সেই স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ফিরাইতে সে রত্নার মুখের দিকে তাকাইল। দেখিল, রত্না তখনও গম্ভীর মুখে পথের দিকে চাহিয়া আছে।

মৃদু হাসিয়া অনিল ডাকিল,—রত্না!

মুখ না ফিরাইয়া রত্না কহিল,—কেন?

—রাগ হলো! না, ভয় পেলে! ভাবলে, সত্যি বুঝি নিজের আত্মীয় সমাজ সব ছেড়ে তোমাকে নিয়ে পালাবো! না রত্না, যত লোভনীয়ই তুমি হও, সে দুর্ব্বুদ্ধি আমার কখনো হবে না।

রত্নার অন্তর আহত হইল। অনিলের কথাগুলা যেন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। সে নির্ব্বাক্ বসিয়া রহিল।

অনিলের এই অনুনয়ে রত্না কিন্তু আগেকার মত হাসিল না! শুধু মৃদু কণ্ঠে কহিল,—আমি—আমি গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে! রত্নার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল।

—ইস্! এখনও রাগ। না গো না, সত্যি রত্না, তোমায় নিয়ে আমি উড়ে যাবো না ওই মেঘের বুকে নীড় বাঁধতে! বোকা মেয়ে, ঠাট্টা বোঝো না?

অনিলের কথায় এবার মুখ তুলিয়া রত্না সভয়ে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল, স্তরে-স্তরে মেঘ জমিয়া অস্তমিত দিবালোককে আড়াল করিয়াছে।

১৩

পরের দিন অমিয়র সঙ্গে রত্নার দেখা হইতেই অমিয় কহিল,—কি রকম! তুমি না কি কল্পনা চাটার্জ্জিকে চেনো না!

শুষ্ক মুখে রত্না কহিল,—চিনি না বলিনি তো, তবে তেমন ভাব নেই।

—ও—তোমাদের ঝগড়া! অর্থাৎ তোমার এ্যান্টিপার্টি, তা বলতে হয়!

রত্না হঠাৎ ফুঁশিয়া উঠিল। কহিল,—কেন, কল্পনা বলেছে না কি যে তার সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে? আমি তার এ্যান্টিপার্টি?

—কেন? তাহলে কলেজে গিয়ে তুমি তাকে বিধিমত শিক্ষা দেবে? অমিয় সকৌতুকে হাসিতে লাগিল।

মিসেস্ গোস্বামী আসিয়া দর্শন দিলেন। কহিলেন,—কল্পনা এসেই কাল তোমায় খুঁজলো রত্না,—বললে, বড্ড-আশা করেছিলুম,—তাকে পাবো।

'কেকে' একটা কামড় দিয়া অনিল কহিল,—নৈরাশ্যের ব্যথা তাকে বেশী দিন ভোগ করতে হবে না! আজও তিনি আসছেন!

অনিলের এই বাক্যটুকুর অর্থ রত্না বোধ করিতে পারিল না! শুধু অনিলের দিকে এক বার চাহিয়া দেখিল।

—হ্যাঁ, আজ তিনটের সময় তাদের আসবার কথা। তুমি সে সময় অনিল থেকো। আমার ইস্কুলের মেয়েদের আনতে বাস যাবে।

বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী পুনশ্চ কহিলেন,—কি বলো অমি, কল্পনা আমার সিলেক্‌সনের সুখ্যাতি তো ?

—তোমার সিলেক্‌সনের কে ভুল ধরতে পারে মা ! তুমি যে রত্নাকে উর্ব্বশীর পার্ট দিয়েছো, এতে কেউ 'না' বলতে পারবে না।

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—আমাদের ষ্টাফ চমৎকার হয়েছে। তার পর, কাল 'মন্দির' কেমন দেখলে রত্না ?

রত্না বলিল,—চমৎকার।

অমিয় সহাস্যে কহিল,—সাধনা বোসের নাচের মধ্যে কোন্‌টা ভালো লাগলো ?

অনিল কহিল,—ডেথ্-ডান্সটা। পুরোহিত আয়ুধের সঙ্গে ক্লাইমাক্স-সীনটা—সত্যি চমৎকার। দেবদাসী মঞ্জুলার দুঃখে রত্নার দু'চোখে জলধারা বয়েছিল।

সহাস্যে মিসেস্ গোস্বামী বলিলেন,—সত্যি ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রত্না বলিল—খুব ভালো অভিনয় করেছিল সাধনা বোস্। শুধু আমি কেন, সকলেই খুব সুখ্যাতি করেছে।

সকলে নিঃশব্দে চা পান করিতে লাগিলেন।

তার মধ্যে সহসা মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন—কাল লক্ষ্য করেছিস্ অমিয় ? গাড়ীর কথায় কল্পনা বললে,—গাড়ী পাঠাতে হবে না মাসিমা, আমাদের বুইকে আমি আসবো নিজেই ড্রাইভ করে'! মোটর চালাতে ওরা জানে—লাইসেন্স আছে !

অমিয় রত্নার পানে চাহিল, কহিল,—রত্না তোমাকেও ও-বিদ্যায় কল্পনা চ্যাটার্জ্জীর সমান করবো। আমি তোমাকে গাড়ী চালাতে শিখিয়ে দেবো।

সায় দিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন—তা দিয়ো ! শিখতে পারে ও খুব শীগগির। তুমি ওর পিয়ানো শোনোনি অমিয় ! রত্নার হাত ভারি মিষ্টি। চমৎকার বাজায় ও। অনিলের কাছে এত অল্প দিনে শিখেছে যে আমাকে অবাক্ করে দেছে !

বিস্ময়ে অমিয় কহিল,—তাই না কি ! রত্না, তুমি ছবি আঁকতে পারো ?

মাথা নাড়িয়া সলজ্জ মুখে রত্না কহিল,—না।

—কল্পনা বেশ আঁকতে পারে—ড্রইংএ ওর হাত আছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কল্পনা পেণ্টিং শিখেছে—রত্নাকে তো শেখানো হয়নি। শেখালে ও নিশ্চয় ভালো পারবে !

সায় দিয়া অনিল কহিল,—তা পারবে ! বিদ্যাকে আয়ত্তে আনবার শক্তি ওর আছে ! তা না হলে দাদা, তুমি যদি আগেকার রত্নাকে দেখতে !

কৌতুকে অমিয় কহিল,—কি রকম ?

অনিল কহিল,—তবে শোনো সে-কাহিনী ! বলিয়া আড়ম্বর সহকারে আরম্ভ করিল,—প্রথম দিন থেকেই বাবা রত্নার উপর পার্শিয়াল। রত্নাকে বাবা বললেন,—চা করতে জানো মা ? মাথাটা একেবারে এক দিকে হেলিয়ে রত্না জানিয়ে দিলে,—জানে। তার পর হাতের কসরতিতে কি করে যে পেয়ালা-সমেত চামচে লেগে গড়িয়ে বাবার কোলে চা পড়লো—সে শুধু রত্নাই বলতে পারে !

রত্নার লজ্জা-রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া অমিয় হাসিতেছিল, কহিল,—অনিল তোমার ভারি খেলো করে দিচ্ছে রত্না। আচ্ছা, আমিও ওর ছোটবেলার ইতিহাস বলছি, শোনো।

উৎসাহ-দীপ্ত কৃষ্ণ-তারকাযুগল অমিয়র মুখের উপর স্থাপিত করিয়া রত্না কহিল,—বলুন তো—সত্যি !

অমিয় কহিল,—কলেজ-ষ্টুডেণ্ট—শীকার শেখবার ঝোঁক হলো—বন্দুকের টিপ্ প্র্যাকটিস্ কচ্ছে—কিন্তু অদ্ভুত কেরামতি ! এম্‌নি একটা গ্লোব। ওয়ান্, টু, থ্রী বলে ফায়ার করে ওড়ালো নিজের বুড়ো আঙুল ! তুমি বুঝি ওর পায়ের বুড়ো আঙুলটা ছাখোনি ?

তাচ্ছল্যভরে অনিল কহিল,—বাঃ, সে এমন কি দোষ ! সে আমার বন্দুকে প্রথম হাত—একদম যাকে বলে আনাড়ি। কিন্তু রত্নার তো তা নয়—হাতা, বেড়ী, খুন্তী নাড়তে পোক্ত ও !

রত্নার মুখ পলকে ম্লান হইল। চকিতে সে দৃষ্টি নমিত করিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তা হোক, তখন এখানে এসে যা-কিছু দেখতো সবই ওর নতুন ঠেকতো ! তোমার বন্দুক ধরার মত চায়ের সাজানো টেবল দেখে ও ভড়কে গিয়েছিল ! কিন্তু এখন কি ও আর সে-রকম আছে ?

ফোন্ বাজিল। বেয়ারা আসিয়া জানাইল,—চ্যাটার্জ্জি মিসি-বাবা বড় সাহেব-কো সেলাম্ দিয়া।

মিসেস্ গোস্বামী পুত্রের পানে চাহিয়া কহিলেন,—কল্পনা ফোন কচ্ছে।

অমিয় উঠিয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কল্পনা মেয়েটি বেশ—দেখতে শুনতেও ভালো।

রত্নার চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল, কহিল,—আমি উঠি মাসিমা—খান-দুই চিঠি লিখতে আছে।

—যাও ! তোমার বাবার চিঠির জবাব এখনও পেলুম না কিন্তু ! জবাব না দিয়ে বোধ হয় তিনি সশরীরে হাজির হবেন। তা হলে কিন্তু বেশ হয়।

রত্নাকে নিজের ঘরে যাইতে হইলে সে-ঘর ও বারান্দা পার হইতে হয়, তাহার শেষ প্রান্তে টেলিফোন। রত্নাকে যাইতে দেখিয়া অমিয় হাত তুলিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল।

রত্না স্থাণু হইয়া রহিল। কল্পনার কথাগুলা শুনিতে পাইল না, অমিয়র কথা শুনিল। অমিয় বলিতেছিল, না, লেট্ মোটেই নয় ! বেশ. ওই কথাই রইলো ! নমস্কার ! বলিয়া রিসিভার রাখিতে রাখিতে কহিল,—ঘরে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ, খানকতক চিঠি লিখতে হবে।

—দেশে ? অমিয় জিজ্ঞাসা করিল।

নত মুখে রত্না কহিল,—হ্যাঁ।

—বেশ, চট্ করে সেরে নাও। বিকেলে চারটের সময় কল্পনা আসবে,—দুপুরে আমি গাড়ী নিয়ে বেরুবো।

বিস্মিত দৃষ্টিতে রত্না কহিল,—তার সঙ্গে আমার—

—তোমাকে গাড়ী চালাতে শেখাবো ! দেখবো তোমার ডেক্সটারিটি !

—কল্পনার চেয়ে ? অসম্ভব ! বলিয়া রত্না কেমন থতমত খাইয়া গেল।

অমিয় হাসিল। কহিল,—না, না, কল্পনাকে তোমার ভয় নেই, সে বড়লোকের মেয়ে হলেও ভগবানের দেওয়া জিনিষ তোমাতেই বেশী।

রত্না চকিত হইয়া দৃষ্টি উন্নত করিয়া অমিয়র পানে তাকাইল। অধরে কৌতুকের মৃদু হাসি।

রত্না কহিল,—মাসি-মা অনুমতি দেবেন?

—তাঁর বিনা অনুমতিতে আমি তোমায় নিয়ে যাবো কেন? তোমার নিজের অনিচ্ছা আছে?

ব্যগ্র কণ্ঠে রত্না কহিল,—না, না! কোথাও যেতে পেলে আমার ভারী আহ্লাদ হয়! সত্যি বলছি,—আমায় যদি নিয়ে যান, খুব খুশী হবো।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর বসিবার ঘরে সকলে বিশ্রামালাপে বসিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি তাহলে একটু সকাল সকাল ফিরো অমি।

অনিল সহাস্যে কহিল,—রত্নার তাক্ লেগে যাবে! কাল নিউ এম্পায়ারে গিয়ে ভারী খুশী হয়েছিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তাই আমি কিছু বলি না! না হলে আজকের যাওয়া আমি মানা করতুম।

ঔদাস্য-সহকারে অমিয় কহিল,—তবে আজ থাক্ মা।

—না, না, তুমি তো বাড়ী থাকবে না। গাড়ী নিয়ে বেরুবেই। শিখুক না ও! কোন বিদ্যা কেউ শিখতে চাইলে তাতে আমি না বলতে পারি না।

ছেলেরা হাসিল।

রত্না আসিল।

রত্নাকে সজ্জিত দেখিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—এই যে রত্না তৈরী হয়ে এসেছে!

অনিল কহিল,—ওর তর সয় না মা! বলিয়া কপট গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিল,—কিন্তু আজ তোমার যাওয়া হতে পাবে না রত্না। দাদাকে এখনি যেতে হবে মিস্ চ্যাটার্জ্জির ওখানে।

আগুনের তাপ-লাগা জবাফুলের মত পলকে রত্নার মুখ ম্লান হইয়া গেল! চকিতে সে অমিয়র মুখের পানে চাহিয়া হতাশ নয়নে মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—না না, ও দুষ্টুমি করছে। ওর কথা তুমি বিশ্বাস করো না!

অনিল হাসিয়া উঠিল।

রত্নাও হাসিল।—মা গো, এমন সব বলতে পারো! দেখুন মাসিমা, আমি কুড়ের ঢিপি, আর অমি-দা বসে আছে একেবারে অচলায়তন! রত্নার কণ্ঠস্বরে একরাশ অভিমান উপছাইয়া পড়িল।

অনিল কহিল,—রত্নার নালিশ, ওকে কাল কুড়ে বলেছিলুম বলে। কিন্তু সত্যি কথাই বলেছিলুম, ছাখো, কল্পনা তোমার চেয়ে ঢের বেশী স্মার্ট! হাউ ভেরি কুইক্!

রাগ করিয়া রত্না কহিল,—বেশ তো, আমি তো বলিনি যে আমি কল্পনার চেয়ে ভালো—যে আমাকে খোঁটা দিচ্ছ!

ভালো মানুষের মত অনিল কহিল,—না, সে তোমার এ্যান্টিপার্ট কি না

কৃত্রিম রোষে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কেন বাপু ওর সঙ্গে লাগছো!—অমি, তুমি যদি ওকে গাড়ী চালাতে শেখাবে তো উঠে পড়ো বাপু।

মায়ের কথায় অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

১৪

গাড়ী ছুটিতেছিল। রত্না-অমিয় পাশাপাশি বসিয়া—অমিয় মাঝে মাঝে গাড়ী চালানো সম্বন্ধে রত্নাকে উপদেশ দিতেছিল। গভীর আগ্রহে রত্নাও তাহার প্রত্যেকটি কথা মনের মধ্যে গাঁথিয়া লইতেছিল।

গাড়ীর গতির কম-বেশী ঘুরানো-ফিরানো, কল-কব্জার কূট-কৌশল—এ সব বুঝাইতে বুঝাইতে হঠাৎ অমিয় মুখ ফিরাইতেই রত্নার মুখে তার মুখ ঠেকিল। শুনিবার আগ্রহে রত্না অমিয়কে ঘেঁষিয়া এতখানি তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়াছিল,—যে তাহার এই স্পর্শে সম্বিৎ পাইয়া অরুণ-রাঙ্গা আকাশের মত রক্তিম মুখে সে ঈষৎ সরিয়া বসিল।

অমিয়র কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না,—সে তখন কোন্ কল টিপিয়া কোন্ প্যাঁচ ঘুরাইয়া গাড়ীকে কি ভাবে হাতের ক্রীড়নক করিতে হয়, কেমন করিয়া জড়পদার্থকে বিদ্যুৎগামী করিয়া আজ্ঞাবাহী করিতে হয়, সেই রহস্য বুঝাইতে ব্যস্ত।

কিছুক্ষণ পরে রত্না জিদ ধরিল—অমি-দা আমার হাতে গাড়ী দাও।

অমিয় মাথা নাড়িল—পাগল! তুমি আরো দু'দিন জেনে নাও—সব দ্যাখো, বোঝো!

—সে সময়ে নেবো! কিন্তু এখন একটিবার দাও!

—বাপ্ রে, এই রাস্তার ভীড়ে হয় না। আগে মাঠে যাই!

ময়দানের পথে গাড়ী আসিতেই রত্না মিনতি-ভরে অমিয়র কাঁধে হাত রাখিল, বলিল,—অমি-দা এইবার!

—পারবে? না, শেষে একটা এ্যাক্সিডেন্ট—

অধীর কণ্ঠে রত্না কহিল,—না, না, এ্যাকসিডেন্ট করবো না। এই তো বেশ ফাঁকা পথ—কেউ নেই,—আমায় গাড়ী দাও! রত্না অমিয়র হাত ধরিল, কহিল,—তুমি আমার সীটে এসো।

অমিয় কহিল,—যখন ছাড়বে না, নাও। বলিয়া উভয়ে আসন বদল করিয়া বসিল।

অমিয় কহিল,—খুব হুঁশিয়ার। নাও, ষ্টিয়ারিং ধরে বসো। আচ্ছা, লেফ্‌ট সাইডেই গাড়ী চালাও! হ্যাঁ, ষ্টিয়ারিং ঘোরাও রাইট্ সাইডে। আচ্ছা, নাও, ষ্টপ্ করো—'রিভার্স গিয়ার' টিপে গাড়ী ব্যাক করাও। অমিয় বলিয়া চলিল।—হ্যাঁ—এবার ফার্ষ্ট গিয়ার, সেকণ্ড গিয়ার,—থার্ড! এই ছাখো গাড়ী কি রকম রান্ করছে। গিয়ার দেখে নাও।

রত্না মহা-উৎসাহে এ্যাকসিলারেটার পা দিয়া চাপিয়া ধরিল। বাম হাতে সে গিয়ার-ব্রেক চাপিয়া আছে।

অমিয় হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—থাক! থাক! করছো কি! বলিয়া রত্নার দিকে নত হইয়া হাত দিয়া সে তাহার পা সরাইয়া দিল। অমিয়র দেহের দক্ষিণ-অংশটুকু রত্নার অঙ্গের উপর পড়িয়া তাহার কুমারী-বক্ষে সহসা একটা দোলন দিল।

অমিয়র সে দিকে হুঁশ ছিল না—তাহার দেহের স্পর্শ যে একজনের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ বহাইয়া দিল! আনন্দের শিহরণ তুলিয়া বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে সহসা দ্রুত করিল, কিছুই সে জানিল না। সোজা হইয়া বসিয়া হাসিমুখে অমিয় কহিল,—বিপদ আর কি! ভারী দুষ্টু তো! নতুন চালাতে বসেই এতখানি স্পীড্ বাড়ায়!

হাসিমুখে রত্না কহিল,—ঝড়ের মত আমি উড়ে যেতে চাই !

—ব্রেভ্ গার্ল ! বলিয়া অমিয় হাসিল ! কহিল—শেখো আরো ভালো করে ! বলিয়া সে রত্নার শিক্ষকতা করিতে লাগিল।

শিক্ষা যখন দেওয়া যায়, তখন শিক্ষিতের সে শিক্ষা-গ্রহণে পটুত্ব ও আয়ত্তের কুশলতা দেখিলে দাতার আনন্দ যেমন বাড়ে, নিঃশেষে বিদ্যা-দানে আগ্রহও তেমনি জাগে। তাই দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে ব্রহ্মাস্ত্রগুলি দান করিয়াছিলেন।

রত্নার শিক্ষা-নৈপুণ্যে অমিয় যেমন বিস্মিত পুলকিত হইতেছিল, তেমনি প্রীতির রসে অজ্ঞাতে তার অন্তরও সিঞ্চিত হইতেছিল।

অমিয় স্বল্পভাষী-গম্ভীর প্রকৃতি। তাহাদের সমাজের তরুণীর দল যখনই গায়ে পড়িয়া আলাপে হাস্য-পরিহাসে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে আসে, তার মনে তখনই কেমন বিরূপতা জাগে ! তাই বলিয়া কোন দিন সে রূঢ় বা অশিষ্ট আচরণে কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করে নাই ! তাহার স্বভাব ভদ্র—মানুষের সহিত সদ্ব্যবহারে চির দিন সে অভ্যস্ত। কিন্তু সেই মানুষটি আজ রত্নার সহিত হাস্যালাপে চপল হইয়া উঠিল। হঠাৎ পথের ধারে গাড়ী যখন থামিয়া গেল, কি হইল বলিয়া অমিয় বিগড়ানো-গাড়ীকে দেখিতে রত্নার হাত ধরিয়া কহিল,—খুব হয়েছে ! এখন এদিকে এসো তো !

রত্না উঠিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিল। এবং এটা ঘুরাইয়া সেটা নাড়িয়া গাড়ী হইতে নামিয়া এঞ্জিনটা দেখিয়া-শুনিয়া অমিয় ঠিক করিল। গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই রত্না গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া কহিল,—কি হয়েছিল ?

অমিয় রত্নার মুখের দিকে চাহিল ! একটু হাসিয়া কহিল,—বিকল ! তোমার স্পর্শে গাড়ী কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

লজ্জা-রাঙা মুখে রত্না কহিল,—যাও—কেবলই ঠাট্টা !

আবার গাড়ী চালানোর কাজে শিক্ষানবীশি আরম্ভ হইল। অপরাহ্ণ সায়াহ্নে আসিয়া মিশিল, মাঠের চারি দিকে ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলা জ্বলিয়া উঠার সঙ্গে হঠাৎ দু'জনের গৃহে ফিরিবার কথা মনে পড়িল।

অমিয় কহিল,—মাটী করেছে !

সভয়ে রত্না কহিল,—মাসিমা খুব রাগ করবেন ! চারটের মধ্যে ফেরবার কথা ছিল।

—তা কি করা যায় ! যা দেরী হবার হয়েছে ! কিছু না খেয়ে তো আর পাচ্ছি না ! ভয়ঙ্কর ক্ষিদে পেয়েছে।

অবাক হইয়া রত্না কহিল,—এই মাঠে-ময়দানে কি খাবে ! খাবার তো কিছু আনা হয়নি। না, না, বাড়ী চলো', কল্পনা এসে বসে আছে। ভয়ানক রেগে যাবে সে !

—ইস্ ! কল্পনার রাগের ভয়ে আমি একেবারে কাঁটা !

—মাসিমা ?

—স্পষ্ট বলে দেবো, রত্না ভুলিয়ে রেখেছিল, ওকে বকো।

—আমি ভুলিয়ে রেখেছিলুম ?

—নিশ্চয়। এখন সাধু সাজলে চলবে কেন ! রেখেছিলে তো তুমি ভুলিয়ে ! চলো, খেতে যাই।

—কোথায় খেতে যাবে ?

—আশ্চর্য্য ! সামনে ঐ নীল আলোগুলো দেখতে পাচ্ছো না ? ফিরপোর !

১৫

—হ্বালো, মিষ্টার গোস্বামী ! গুড্ ইভ্‌নীং !

অমিয় ও রত্না ফিরপোর ডাইনিং রুমে চা খাইতেছিল। দ্বারদেশ হইতে আহ্বান-ধ্বনি আসিতেই অমিয় সচকিতে মুখ ফিরাইল। ঈষৎ হাস্যে মাথা নাড়িয়া কহিল,—গুড্ ইভ্‌নীং মিষ্টার ডাট।

ডাট আসিয়া অমিয়র পাশে দাঁড়াইল। রত্নাকে দেখিয়া সকৌতুক দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে তাকাইল; চাপা গলায় কহিল,—বিউটীফুল ! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অমিয় কহিল,—কি হয়েছে ?

—বিশেষ কিছু নয়। অভিনন্দন জানাচ্ছি ! ঠিক সময়ে যেন উপস্থিত হতে পারি।

রত্নার সমস্ত মুখে অদৃশ্য হাতে কে যেন এক কৌটা লাল আবীর ছড়াইয়া দিল ! ব্রীড়া-নত দৃষ্টি সামনের টেবলে আঁটিয়া গেল।

ব্যগ্রকণ্ঠে অমিয় কহিল,—আরে, কাকে কি বলছো ! রত্না—মিস্ বোস—আমার নিকট-আত্মীয় !

—হ্যাঁ, আরো নিকটতম অভিন্ন হোন্—আমরা কামনা করি। বলিয়া নত-মুখী রত্নার দিকে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া ডাট কহিল,—মিস্ বোস, আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো, অন্তরের আনন্দ জানাবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি আমার বন্ধুর কঠিন কৌমার্য্য-ব্রত ভঙ্গ করেছেন, এ আশ্বাস আমরা এত দিনে পেলুম। বলিয়া ডাট হাসিতে লাগিল।

রত্নার চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল। অমিয় উঠিয়া পড়িল। কহিল,—কি বাজে বকছো ! বলিয়া বন্ধুর দিকে হাত বাড়াইয়া করমর্দ্দন করিয়া কহিল,—আমার একটু তাড়া আছে, ভাই !

অমিয়র এই অপ্রতিভ ভাবটুকু ডাটকে আনন্দ দিতেছিল হাসিতে হাসিতে সে কহিল,—নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! নিরবচ্ছিন্ন অবসর, একান্ত নির্জ্জনতাই এখন পরম কাম্য !

—আঃ, তবু ঐ বাজে কথা ! আচ্ছা, আসি। এসো রত্না—বলিয়া অমিয় রত্নার হাত ধরিল।

কিন্তু কয়েক পা অগ্রসর হইতেই বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। ধর-দম্পতি একেবারে সম্মুখে। মিসেস্ ধর কহিল,—অমন করে চোরের মত পালাচ্ছেন যে আমাদের দেখে !

সিনেমা হইতে ফিরিয়া সব ফিরপোয় উঠিয়াছিল। সুজিত মল্লিক অমিয়র কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—ভেরী বিউটীফুল লেডী।

ধর সাহেব কহিলেন,—আমাদের কবে নিমন্ত্রণ অমিয় ?

কথাটা ঘুরাইয়া অমিয় কহিল,—বাবার বার্থ-ডেতে।

মিসেস্ ধর কহিল,—সে দিন না বাড়ীতে কি একটা নাটক অভিনয় হবে, শুনছি।

—হ্যাঁ, অর্জ্জুন-উর্ব্বশী।

মিষ্টার ধর চাহিল রত্নার দিকে। দৃষ্টিতে অনেকখানি প্রশংসা ফুটিয়া উঠিল।

মিসেস্ ধর কহিলেন,—উর্ব্বশী বোধ করি ইনি সাজবেন !

ধর সাহেব কহিল,—তোমার বাক্‌দত্তা বধূর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দাও।

—পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ! কিন্তু ভুল বলছেন ! ইনি মিস্ বোস—আমার আত্মীয় !

মিসেস্ ধর হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—হাকিম সাহেব নিজের কথাতেই বেসামাল! বোস্ বলছেন! আত্মীয় বলছেন!

—না, ব্লাড-রিলেসন নয়! মিস্ বোস আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে।

মিসেস্ ধর রত্নার পানে চাহিয়া অভিবাদন করিয়া কহিল,—আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আপনাকে দেখে আমাদের খুব আনন্দ হলো।

একটু হাসিয়া সরম-রাঙা মুখে রত্নাও অভিবাদন করিল।

মিষ্টার ধর অমিয়র কানের কাছে মৃদু স্বরে কহিল,—কলেজ গার্ল?

—হ্যাঁ, এ বছর আই, এ দেবে।

সহাস্যে সুজিত কহিল,—সাফল্য কামনা করি।

—ধন্যবাদ! মিস বোস্ ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ হোল্ড করেছেন; এখনও ওর কলেজ আশা রাখে···

মিসেস্ ধর সহাস্যে কহিল,—এত দিনে একটি জীবন্ত সরস্বতী পেলেন!

অমিয় রত্নাকে লইয়া মোটরে উঠিল। নিজেই সে চালকের আসন গ্রহণ করিল।

পথের বিজলী-বাতি অমিয়র মুখে পড়িতেই রত্নার মনে হইল, অমিয় কেমন যেন অন্যমনস্ক! ঈষৎ বিস্মিত হইয়া রত্না কহিল,—এমন জায়গায় আমায় নিয়ে গেলেন কি বলে অমি-দা!

গাড়ী চালাইতে চালাইতে অমিয় উত্তর দিল,—কে জানে আজ যা এসে জুটবে! চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল, তাই! অমিয়র স্বরে যেন জবাবদিহির ভাব!

একটু চুপ করিয়া রত্না কি ভাবিল। তার পর কহিল,—তুমি চিরকুমার থাকবার প্রতিজ্ঞা করেছিলে কেন অমি-দা? রত্নার অধরে কৌতুকের হাসি।

অমিয় মুখ ফিরাইল; রত্নার মুখের দিকে তাকাইল, কহিল,—ওঃ তোমাদের স্বভাব! ভারী কৌতূহলী তোমরা। তোমাদের সব কথায় জবাব দিতে হবে! না দিলে এমন সব কথা ভেবে বসো, যার চেয়ে খুলে বলাই ভালো!

মুখ টিপিয়া ভালো মানুষের মত একটু হাসিয়া রত্না কহিল,—আমিও তাই বলি, লক্ষ্মী ছেলের মত বলো আমায়! কাউকে আমি বলবো না! বলিয়া সে অমিয়র দিকে সরিয়া বসিল। উভয়ের গায়ে গা ঠেকিল।

হাসিয়া অমিয় কহিল,—কি ভালো-মানুষটি! আহা! কিন্তু আমার গল্পের মধ্যে মজা নেই! আমি কারুর কাছে কখনো বলে বেড়াইনি যে আমি বিয়ে করবো না!

—তবে ওঁরা যে বল্লেন! রত্নার দৃষ্টি কৌতুকে উজ্জ্বল।

অমিয় কহিল,—বত্রিশ বছর বয়স অবধি যে বিয়ে করিনি তাই থেকে ওরা ধরে নিয়েছে, ও কাজটা আমি কখনো করবো না!

—এখন? রত্নার মাথায় কেমন দুষ্ট-বুদ্ধি জাগিল।

—এখন কি?

—না, বলছি, এত দিন কেন বিয়ে করোনি? আচ্ছা, মাসিমা কোনো তাগিদ দেননি?

—তাগিদ হয়তো কিছু হয়েছিল, কিন্তু আমি যে কাউকে খুঁজে পাইনি!

—কখনো কাউকে পাওনি? রত্নার কৃষ্ণ-তারকা সহসা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অমিয় কহিল,—একেবারে না বললে মিথ্যে হবে। হয়তো কাউকে পেয়েছি! মনে হয়, যাকে জীবনসঙ্গিনী পেলে আনন্দ হয়! কিন্তু মনকে শাসন করি—সে হবার নয়! এ দুর্লভ কামনাকে মন থেকে বার করে দেবার চেষ্টা করি!

অমিয়র কাঁধের উপর হাত রাখিয়া রত্না কথা কহিতেছিল, এখন হাত নামাইয়া একটু সরিয়া বসিল।

গাড়ী চালাইতে চালাইতে অমিয় কহিল,—কি হলো?

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে-মুখে রত্না কহিল,—কিছু না। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

ছায়ালোক

আমার মনের কামনার রঙে নেয়ে জাগিয়াছে শুধু রিক্ত বালুর চর,
ওরা আসিয়াছে প্রেমের তরণী বেয়ে, ফিরে চলে গেছে নীরব নিরুত্তর।
নিবিয়াছে দীপ, ছিঁড়িয়া গিয়াছে মালা,
শুকায়েছে ফুল, ভরেছি শূন্য ডালা;
সোনার স্বপনে রাঙানো ফসল দিয়ে ভরিয়া তুলেছি ওদের কমল-কর!
ওরা আসিয়াছে প্রেমের তরণী বেয়ে, ফিরে চলে গেছে নীরব নিরুত্তর।

ওদের পরশ-শিহরণে বুঝি হায়, মনের কিনারে বেজেছে ঢেউয়ের গান,
ছায়ালোক নামে গোধূলি ঝরিয়া যায়, মেটেনি দুরাশা কামনা অনির্ব্বাণ।
আঁধার ঘনায় মুখর বনের কোলে
তারার দৃষ্টি ঢেউয়ের বক্ষে দোলে,
যারা আসিবে না তাহাদেরই পথ চেয়ে,
স্বপন-বিলাসে কাঁদে তটিনীর চর।
ওরা শুধু আসে প্রেমের তরণী বেয়ে, ফিরে চলে যায় নীরব নিরুত্তর।

ব্যথার বেণুতে নামিল কি ঘুমঘোর, কি সুর বাজালি ওরে ও পাগল কবি?
বুকের রক্তে ভিজালি যে তুলি তোর,
রেখা দিয়ে তার আঁকিলি সে কোন্ ছবি!
আমারই ভুলের আমারই ব্যথার দান—
অশ্রু-রেখায় লিখেছি যে তার গান,
মুছে দিই আজ সোনার স্বপনে আঁকা, রিক্ত ফসল নিঃস্ব দিনের ঘর।
ওরা শুধু আসে প্রেমের তরণী বেয়ে, ফিরে চলে যায় নীরব নিরুত্তর।

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী।

নন্দরাণী
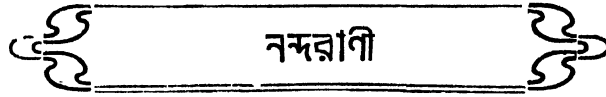
[গল্প]

কিছু দিন আগেও সারা মাঠটা শস্য-সবুজ ছিল। অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার পর হইতেই সুদূর-প্রসারী মাঠখানা ধূসর বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া খাঁ-খাঁ করিতেছে। এই মাঠের কোলেই সরকারী রাস্তার একধারে পুকুরটা। নামও তাই "মাঠের পুকুর।"

গ্রামের পশ্চিম-পাড়ায় যে কয়-ঘর বামুন-কায়েত ও সদ্‌গোপের বাস, তাহারাই মাঠের পুকুরের নির্ম্মল ও স্বচ্ছ জলের সুবিধাটুকু পায়।

হরকালী মিত্রের বাড়ী পশ্চিম-পাড়ারই এক প্রান্তে। বর্ত্তমানে তিনটি মাত্র প্রাণীকে বুকে ধরিয়া এক-কালের এই বৃহৎ বাড়ীখানা যেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে! স্ত্রী হেমাঙ্গিনী এবং ২০।২২ বৎসরের কন্যা নন্দরাণীকে লইয়াই হরকালীর সংসার।

চৈত্রের অপরাহ্ণ। হেমাঙ্গিনী উঠান হইতে শুক্‌না-কাঠ কয়খানি রান্নাঘরে তুলিতে তুলিতে কহিল—"কাল বোশেখীর দিন নন্দ। এই বেলা গা ধুয়ে আয়—ঝড়-টড় উঠলে আর হয়তো যেতে পারবি না।"

মায়ের কথায় নন্দরাণী রান্নাঘরের দাওয়া হইতে পিতলের শূন্য ঘড়াটা ও গামছাখানা লইয়া মাঠের পুকুরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘাটে তখন জন চার-পাঁচ স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল এবং এবার এ-অঞ্চলে যে ধান হয় নাই, সেই সম্বন্ধে তাহাদের আলোচনা-আন্দোলন হইতেছিল!

ঘোষাল-গিন্নী কহিলেন—"আসছে বছরও হবে না, এই আমি বোলে রাখচি, তোমরা দেখে নিও। কেন না, 'আমে ধান—তেঁতুলে বান'।"

ঘোষেদের মেজ বউ কহিল—"এবার কি বোলটাই হোয়েছিল খুড়ী, তা আর একটিও নেই!"

"তাই ত বলচি মা, এবার আমও হবে না, সুতরাং ধানও হবে না।"

পাঁচুর মা কহিল—"হবে কোত্থেকে দিদি! পৃথিবী পাপে টলমল করচে, এখন এই রকমই হবে। কলির শেষ কি না! এখন যত অঘটন ঘটবে! লোকে ভাববে এক, হবে আর এক।" তার পর নন্দরাণীর দিকে চাহিয়া বলিল—"তার সাক্ষী দেখ না কেন, আমাদের এই নন্দ। কত খুঁজে-পেতে বে দিলে, ভাবলে, মেয়েটা সুখী হবে, তা হোল কি না ঠিক তার উল্টো!"

ঘোষাল-গিন্নী কহিল—"কেন, হরু ঠাকুর-পো ত ভাল হাতেই ওকে দিয়েচে। জামাইয়ের রূপ-গুণ, স্বভাব-চরিত্তির সবই ত ভাল, তিন-তিনটে পাশ......"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া পাঁচুর মা কহিল—"পাশ, না ছাই-পাঁশ! তবে আর বলচি কি! রূপও আছে, গুণও আছে, কিন্তু সবই বৃথা হোল। আজ ৫।৭ বছর বে হোয়েচে, তা মেয়েটাকে নিয়ে যেতে পারলে না এখনো। আর নিয়েই বা যাবে কি করে বল, সে-বেচারা নিজের পেটই চালাতে পাচ্ছে না, তা......তাই ত বলচি, মেয়েটার কি বরাত দেখ!"—বলিয়া আর একবার বক্রদৃষ্টি দিয়া নন্দরাণীর দিকে চাহিল।

এই পাঁচুর মাকে নন্দরাণী যেমন ভয় তেমনি অপছন্দ করিত। তাহার মুখের প্রীতি ও সহানুভূতি যে মিছরীর ছুরির ন্যায়, তাহা সে ভালই জানিত। তাহার মুখের মিছরীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে যে বিষ থাকিত, পাড়ার কাহারো তাহা জানিতে বাকী ছিল না। তাই ঘ.. নামিয়া তাড়াতাড়ি নন্দরাণী তাহার কাজ সমাধা করিল এবং ঘড়াতে জল ভরিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তাহার মুখ-ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনী কহিল—"কিছু হোয়েচে মা কি রে নন্দ?"

"কি আবার হবে?"

"নিশ্চয় কিছু হয়েচে। ত্যাখ, তুই-ই আমার পেটে হোয়েছিস্, আমি তোর পেটে হইনি! ঘাটে কে ছিল বল্ দেখি।"

"ছিল ওই ঘোষাল-গিন্নী, মিত্তিরদের মেজ বৌ, পাঁচুর মা, কেষ্টর......"

"পাঁচুর মা ছিল ত! তা হোলে নিশ্চয় সেই-ই কিছু বলেচে। কি বলেচে বল্ না।"

যাহা বলিয়াছিল নন্দরাণী তাহা বলিলে হেমাঙ্গিনী কহিল,—"ও আবাগী যমের বাড়ী যাবে কবে! বড্ড নাড়ীর টান কি না, তাই তোর ব্যথা ওর বুকে বিঁধেচে! আমি হোলে মুখের মত জবাব দিয়ে আসতুম। বলি, তুই যে পাড়া-জ্বালানী চিরটা কাল ভাইয়ের ঘরে কাটালি! দু'দিনের জন্যে স্বামীর ঘরও যে তোর ভাগ্যে ঘটেনি! নিজের ঘা দেখতে পায় না, পরের ঘা দেখে বেড়ায়।" তাহার পর খানিক নীরবে থাকিয়া কহিল—"আমার সঙ্গে একবার দেখা হোলে শুনিয়ে দোবো'খন আচ্ছা কোরে!"

কিন্তু হেমাঙ্গিনী পাঁচুর মাকে আর শোনাইতে পারিল না শোনাইল হরকালীকে। রাত্রে হরকালী আহারে বসিলে হেমাঙ্গিনী আসিয়া সামনে বসিল এবং একটি একটি করিয়া স্বামীর কাছে অনেক কিছুই বলিল। এ সব শুনিয়া হরকালী কহিল—"কি বলব বল, সবই আমাদের ভাগ্য। রূপে-গুণে জামাই করলুম, কিন্তু দেখচি, আমাদের ভাগ্যই খারাপ।...সুপ্রকাশ কি যে কোচ্চে! বি-এ পাশ—একটা চাকরী কেন যে যোগাড় করতে পারচে না! আজকালকার ছেলের মত মোটেই চালাক চতুর নয়। কত মুখ্যুতে চাকরী জুটিয়ে নিচ্চে, আর ও লেখাপড়া শিখে...সবই ভাগ্য!"

সবই যে ভাগ্য, তাহাতে ভুল নাই। বছর ছয়-সাত পূর্বে হরকালী যখন নন্দরাণীর বিবাহ দেয়, তখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান সুপ্রকাশ বি-এ পড়িতেছিল। পুত্রের বিবাহ দিয়া সুপ্রকাশের পিতামাতা কাশী যায় এবং হঠাৎ উভয়ে বেরি-বেরিতে আক্রান্ত হইয়া সেইখানেই মারা যায়। ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়ীখানা যে মহাজনদের কাছে বন্ধক ছিল, তাহাও সুপ্রকাশ জানিত না। সুতরাং বাপ-মায়ের সঙ্গে পৈতৃক বাড়ীখানাও সুপ্রকাশকে হারাইতে হইল। সম্বল রহিল শুধু তাহার বি-এ পাশের সার্টি-ফিকেটখানা। সেই সম্বলটুকু হাতে করিয়া এ যাবৎ সুপ্রকাশ চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু কোথাও সুবিধা করিতে পারিতেছে না। সুতরাং সবই যে ভাগ্য, তাহাতে আর ভুল কি!

বর্ত্তমানে সুপ্রকাশ কালীঘাটে এক ভদ্রলোকের তিনটি ছেলেকে দুই বেলা পড়ায়; তাহার বদলে সেইখানেই খায়-দায়, থাকে এবং মাসে পাঁচটি করিয়া টাকা হাত-খরচস্বরূপ পায়। সম্প্রতি সে কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে হাঁটা-হাঁটি করিয়া

একটা স্কুল-মাষ্টারীর আশা পাইয়াছে। বেতন আপাততঃ ৩৫ টাকা, তবে সে গ্রাজুয়েট্ বলিয়া পরে আরও বৃদ্ধি হইবে। এই উদ্দেশ্যেই সে দিন যখন আহারাদির পর সে বাহির হইতেছিল, তখন ডাক-পিয়ন তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। খামখানার আঁকা-বাঁকা ঠিকানা লেখা দেখিয়া বুঝিল, নন্দরাণীর চিঠি। তখনি নিজের ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সে চিঠিখানা পড়িল।

নন্দরাণী লিখিয়াছে—'আমি আর এখানে কিছুতেই থাকৃব না। লোকে তোমার ওপর কটাক্ষ কোরে যে দু'কথা বলবে, তা আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। যদি আধ-পেটা খেয়ে এক-বস্ত্রে তোমার কাছে আমি থাকতে পাই, সেই আমার সুখ। তুমি যাতে শীঘ্র আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পার, তার চেষ্টা কর।'

সুপ্রকাশ সেই প্রকৃতির লোক যে, একটুতেই উৎফুল্ল হইয়া ওঠে আবার একটুতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। নন্দরাণীর চিঠি পড়িয়া সে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে দিন আর তাহার কর্পোরেশন আফিসে বাহির হওয়া হইল না। বালিসের তলায় চিঠিখানা রাখিয়া সে শয্যায় শুইয়া পড়িল এবং আকাশ-পাতাল যাহা ভাবিতে লাগিল, তার কোন দিকেই কোন কূল-কিনারা দেখিতে পাইল না।

* * *

বালীগঞ্জের ওই দিকে কোথায়-এক স্কুলে সুপ্রকাশের সেই চাকুরীটা হইয়াছে। রেল-লাইনের ও-পারে কসবায় এক ভদ্র-গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে সে ৫ টাকায় একখানি ঘর ভাড়া করিয়া নন্দরাণীকে আনিয়াছে।

সকালে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া, চা খাইবার পর, বাজার করিয়া ফিরিতেই বেলা ৯টা বাজিয়া যায়। তাহার পর স্নানাহার সারিয়া দশটার পরই তাহাকে বাহির হইতে হয়। বাসায় ফিরিতে পাঁচটা বাজে। যে দিন ছুটির পর মাষ্টাররা বসিয়া একটু গল্প-গাছা করে, সে দিন তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইয়া যায়। একই কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছেলেদের স্কুলের পাশেই মেয়েদের স্কুল। ও-স্কুলের দিদিমণিরা ছুটির পর মধ্যে মধ্যে যে দিন আবার এ-স্কুলে গল্প করিতে আসিতেন, সে দিন তাহার ফিরিতে আরও বেশী বিলম্ব হইত।

সে দিন ছুটির পর মাষ্টাররা উঠি-উঠি করিতেছে, এমন সময় ও-স্কুলের চার জন দিদিমণি আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। একটি তরুণীকে দেখাইয়া হেড্-মিষ্ট্রেস্ কহিলেন—"ইনি আজ থেকে আমাদের এখানে 'জয়েন্' করলেন।"

হেড্-মাষ্টার সহাস্য মুখে কহিল,—"তাই না কি? আপনার কি এই প্রথম য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট?"

মুখ টিপিয়া মৃদু হাসির সহিত তরুণী কহিল—"আজ্ঞে হাঁ, গোয়ালে এই প্রথম ঢুকলুম।"

সকল মাষ্টারেরই তরুণীর উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

অবিবাহিতা তরুণীর নাম মিস্ লালিমা সরকার। বয়স আন্দাজ ২২।২৩ হইবে। সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু রূপ চর্চ্চায় এবং বেশ-ভূষার পারিপাট্যে তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। গলার সরু মফ্-চেনটা বাঁ-হাতের একটা আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে মিস্ লালিমা সুপ্রকাশের দিকে চাহিয়া কহিল—"শুনলুম, আমার মত আপনিও এক জন নতুন অতিথি।"

সুপ্রকাশ কহিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ! তবে আপনার মত একেবারে আনকোরা নয়; মাস-খানেকের পুরোনো।"

সে দিন সুপ্রকাশের বাসায় ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইল। নন্দরাণী কহিল—"আজ তোমার এত দেরী হোল কেন আসতে? আমি পাঁচটার পর থেকেই জানালার ধারে বোসে পথের দিকে চেয়ে আছি, কখন্ আস কখন্ আস। চা খাওয়া হয়নি ত?"

"না! মাথাটা বোধ হয় তাই ধরেচে।"

সুপ্রকাশের মুখ-হাত-পা ধোয়া হইলে নন্দরাণী ঘরের মেজেতে একখানা আসন পাতিল এবং নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ থালা তাহার সামনে রাখিয়া কহিল—"বোসো। আমি চা কোরে আনি।"

থালার দিকে চাহিয়া সুপ্রকাশ বিস্ময়ের সহিত কহিল—"ঈস্! ব্যাপার কি! এত সব কোত্থেকে এলো?"

"সকালে তাড়াতাড়িতে পেরে উঠিনি, তাই দুপুরবেলা আমি দোকান থেকে আনিয়ে রেখেছিলুম।"

"পয়সা পেলে কোথা?"

"আসবার সময় মা একটা টাকা দিয়েছিলো, তাই দিয়ে আনিয়েছি।"

"তা শুধু-শুধু সে টাকা নষ্ট করে এ সব কেন আনালে, নন্দ?"

"শুধু-শুধু নয়; আজ যে তোমার জন্মদিন।"

"জন্মদিন! আমার?……ওঃ, ঠিকই ত! আজ ত পঁচিশে শ্রাবণ বটে! আমার জন্মদিন, আমারই মনে নেই, কিন্তু তোমার ঠিক মনে আছে দেখচি।"

মৃদু হাসিয়া নন্দরাণী কহিল,—"তোমার জন্মদিন আমার মনে থাকবে না? তোমার সব কথাই আমার মনে গাঁথা থাকে। নাও, খেতে বোসো।" বলিয়া নন্দরাণী চা আনিতে রান্নাঘরে গেল।

জলযোগান্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুপ্রকাশ কহিল—"আজ ক্ষিধেটা যেমন পেয়েছিল, তেমনি তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হোল।"

নন্দরাণী গলায় আঁচল দিয়া সুপ্রকাশের পায়ে প্রণাম করিল। সুপ্রকাশ হাসিয়া কহিল—"আজ কি বোলে তোমায় আশীর্ব্বাদ কোরব, বল ত?"

নন্দ উঠিয়া কহিল—"এই বোলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমায় এই রকম তৃপ্তি দিতে পারি, আর যাবার বেলায় যেন এই রকম প্রণাম করে, তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে, যেতে পারি!"

পরের দিন সকালে স্কুল যাইবার আগে সুপ্রকাশ কহিল—তোমার পায়ের মাপটা আজ নিয়ে যাবো।"

আশ্চর্য্য হইয়া নন্দরাণী কহিল—"পায়ের মাপ কি হবে?"

"আজ একজোড়া স্যাণ্ডেল্ কিনে আনব তোমার জন্যে।"

স্যাণ্ডেল্ নিয়ে কি করব আমি?"

"কোথাও যেতে-আসতে পরবে।"

"জুতো পায়ে দেবো!"

"কেন, দিতে নেই? আজ-কাল সকলেই দেয়।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নন্দরাণী বলিল—"যারা দেয়, তারা দেয়। দেওয়া দোষের, তা বলচি না। তবে জুতো পায়ে দিয়ে আমি যাবো কোথা? আর তা ছাড়া জুতো পায়ে দিতে আরম্ভ করলেই, তখন মনে হবে, ভাল একখানা সাড়ী পরি; আর সাড়ীর

সঙ্গে নানারূপ ইচ্ছে তখন আসবে,—ব্রাউশ, লেস্, ক্রচ, রিষ্টওয়াচ, স্নো, ক্রীম, পাউডার······আমাদের ঘরে যা আছে, তাই ভাল! যাদের পয়সা আছে, তারা ও-সব করুক গো।"

সুপ্রকাশ দেখে—আজকাল পথে-ঘাটে সকল স্ত্রীলোকের পায়েই জুতা। তার ইচ্ছা, নন্দরাণীও দেয়। কিন্তু আবার ইহাও ভাবে, মেয়ে-মানুষকে জুতো পায়ে দিলে কেমন-যেন পুরুষ-পুরুষ দেখায়, নারীর কোমল ভাবটুকু যেন থাকে না। পরক্ষণেই আবার ভাবে—মেয়েদের শুধু-পায়ে দেখে-দেখেই চোখ অভ্যস্ত হোয়ে গেছে, তাই জুতো পায়ে দেওয়া দেখলেই হয়ত ওই রকম মনে হয়। তবে এ ঠিক যে, জুতো পায়ে দিলে রাস্তার কাঁকর, কাঁটা, কাচ-টাচগুলো পায়ে ফোটে না, আর রাস্তার নোংরাগুলো জুতোর তলাতেই থাকে, পায়ের সঙ্গে সেগুলো ঘরে ঢুকতে পারে না······। সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ভাবে—'না—না, জুতোর সঙ্গেই রাস্তার যত নোংরা এসে ঘরে ঢোকে। তাতে কত রোগের 'ব্যাসিলি' থাকে! খালি পায়ে ঘুরে এসে পা ধুয়ে ঘরে ঢোকবার আমাদের রীতি আছে; তাহলে সেগুলো আর ঘরে ঢুকতে পায় না। নন্দ যা বলেছে তাই ঠিক, জুতো পায়ে দিয়ে সে যাবে কোথা? আর পয়সা হোলে ও-সব অভ্যাস করতে বেশী দেরী হবে না।'

পরের দিন শনিবার। সকাল-সকাল স্কুল হইতে ফিরিয়া সুপ্রকাশ কহিল—"চল, আজ একটু পার্কে বেড়িয়ে আসি।"

নন্দরাণী শ্যামবর্ণা হইলেও তার অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতি সুন্দর। তার মুখাবয়ব অতি সুশ্রী। আর সবচেয়ে সুন্দর কোমলতায় ভরা ভাসা-ভাসা তার চোখ আর সেই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে বিস্ময় ভরিয়া নন্দরাণী কহিল—"পার্কে বেড়াতে? সে আমি পারবো না। আমার ভারি লজ্জা করবে।"

সুপ্রকাশ কহিল—"এ তোমার অন্যায় লজ্জা। গেল রবিবার আমার সঙ্গে কালীঘাটে যেতে ত লজ্জা করলো না।"

"সে যে কালীদর্শনে গিয়েছিলুম। সে যাওয়া যে দেবতার টানে। তোমার কাছে আসতে কি আমার লজ্জা করে?"

"নাঃ—তুমি একেবারে জংলী।"

সুন্দর মুখে সুন্দর এক রকম ভঙ্গী করিয়া নন্দরাণী কহিল, "এই জংলীই ভালো।"

ইহার দিন-পনেরো পরে স্কুলের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আদেশ আসিল যে, পরের বুধবার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণকে শিবপুর কোম্পানীর বাগানে অর্থাৎ বোটানিকেল্ গার্ডেনে যাইতে হইবে। যাহাতে আনন্দ-ভ্রমণের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রাকৃতিক পর্য্যবেক্ষণ-স্পৃহা বৃদ্ধি পায়, সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে এইরূপ করা হইত।

বুধবার বেলা ন'টার মধ্যে স্নানাহার সারিয়া সুপ্রকাশ স্কুলে চলিয়া গেল। দু'খানা দোতালা বাস্ শিবপুর যাতায়াতের জন্য 'রিজার্ভ' করা হইয়াছিল। যথাসময়ে তাহাতে করিয়া সকলে কোম্পানীর বাগানে পৌঁছিল। সেখানে সারাদিনটা সকলের বেশ আনন্দ-উৎসাহে কাটিল। ছেলে-মেয়েরা সারা বাগান ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাষ্টার ও মিষ্ট্রেসরা কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো উন্মুক্ত 'লনে', কখনো সহস্র-ঝুরি সেই অতিবৃদ্ধ বটের ছায়া তলে, কখনো বা বৃক্ষবনের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া গল্প-গাছা ও আলাপ-আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

অদূরে মস্ত বড় একটা লজ্জাবতীর ঝোপ দেখিয়া লালিমা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল এবং পাতার উপর এখানে ওখানে অঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিতে লাগিল। একপা-একপা করিয়া সুপ্রকাশও সেখানে গিয়া দাঁড়াইল; কহিল—"জিনিষটা খুবই সাধারণ, কিন্তু কি অসীম বিস্ময় এর ভেতর রয়েছে!"

"সত্যি, ভারি মজার।"

"আচ্ছা, আপনি 'বন-চাঁড়ালে'র গাছ দেখেছেন?"

"দেখা ছেড়ে কখনো নামও শুনিনি" বলিয়া লালিমা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

"সে আরো আশ্চর্য্যের ব্যাপার! তার পাতার কাছে আপনি আঙুলের তুড়ি যদি দেন ত তার সেই পাতাটা তুড়ির তালে-তালে নাচতে থাকবে।"

হাসিতে হাসিতে লালিমা কহিল—"তা হোলে ওদের দেখছি নাচ-গানের চর্চ্চা আছে বলুন।"

"বাস্তবিক, উদ্ভিদ-জগতের মধ্যে কত বড় একটা বিস্ময় যে রয়েচে! আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ত ভাল ভাবেই প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, মানুষের মত ওদের সব রকম বোধ-শক্তিই আছে। ক্ষুধা আছে, ভয় আছে, রাগ আছে, দুঃখ আছে, মান-অভিমান, শীত-গ্রীষ্ম ·········ওদের যে শীত লাগে, শীত ছাড়ে, সে কথা ত আমাদের শাস্ত্রের বচনেও আছে:—

অশীতান্তরবো মাঘে
ফাল্গুনে মৃগপক্ষিণঃ
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ব্বে
বৈশাখে নর-বানরাঃ।"

"আপনি দেখচি, উদ্ভিদবিদ্যায় খুব এক জন······"

"না, না, মোটেই না। আমার ইচ্ছে করে বটে, এ সম্বন্ধে একটু জানি-শুনি, একটু······

"আমাদের বাড়ী-ওলা জ্ঞানময় বাবুরও এ-সব বিষয়ে খুব জানা শোনা। উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাঁর যে কত বই আছে।"

"তাই না কি? তাঁর ওখানে গিয়ে যদি কিছু-কিছু পোড়ে আসি, তাতে তিনি······"

"খুবই সুখী হবেন, তিনি খুব অমায়িক লোক।"

"তাহোলে স্কুলের পর রোজ গিয়ে······আপনাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি?"

"ঐ লেক-বাজারের কাছে, ৩২ সাউথ লেন। চা খাবেন সুপ্রকাশ বাবু? আমি ফ্লাস্কে কোরে এনেচি। চলুন, ভুঁড়নের হবে'খন তাইতে।"

কিছু আগে লালিমার সুকোমল অঙ্গুলি স্পর্শে লজ্জাবতীর যে পাতাগুলি লজ্জায় বুজিয়া গিয়াছিল, সেগুলি তখন একে একে আবার প্রসারিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

* * *

"এ ছবিটা যে দেখছেন, এটা 'বিগোনিয়া'। এর দেহের প্রত্যেক অঙ্গে প্রাণের বীজ। একটা পাতা ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতে দিন, দেখবেন তার থেকে শেকড় বেরিয়ে নতুন গাছের সৃষ্টি হোয়েছে।"

"আচ্ছা, বটে !"

"ওটা 'ক্যাক্‌টাস্'—কি সুন্দর ওর ফুল দেখেছেন ! অনেক দিনের সঞ্চিত কামনায় ওর বুকের ভেতর থেকে ঐ সৌন্দর্য্য ফুটে বেরিয়েচে ! তাকে বাইরের কঠিন হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ও যেন ওর সমস্ত দেহের কাঁটাগুলো ফুলিয়ে বোসে আছে।"

"কিন্তু ভারি সুন্দর ফুল ত !"

"হ্যাঁ ! আমাদের এই 'মনসা'র জাত ! কিন্তু খুব উঁচু ঘরানা—অর্থাৎ রাজা-রাজ্‌ড়া।"

তিন-চার মাস পরের কথা। ৩।২ সাউথ লেনের দোতলার একখানা ঘরে বসিয়া জ্ঞানময় বাবু আর সুপ্রকাশ উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনা করিতেছিল। সামনে একখানা বিলাতী বইয়ের পাতা খোলা।

এই তিন মাস ধরিয়া প্রত্যহ ছুটির পর সুপ্রকাশ এখানে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব আলোচনা করিতে আসিতেছে। চারিটার পর লালিমার সঙ্গে আসে এবং নীচের তলায় তাহাদের ঘরে চা খাইয়া, ছ'টা পর্য্যন্ত জ্ঞানময় বাবুর বাড়ীতে কাটায়। তবে এই কাটানোর রুটিন ক্রমেই একটু রদ-বদল হইয়া আসিতেছে। প্রথম মাসে লালিমাদের ঘরে চা খাইতে তাহার আধ ঘণ্টা লাগিত, বাকী দেড় ঘণ্টা কাটিত জ্ঞানময় বাবুর কাছে। দ্বিতীয় মাসে সময়টা অর্দ্ধেক আধা-আধি হইয়া গিয়াছিল ; অর্থাৎ এক ঘণ্টা লালিমাদের ঘরে, এক ঘণ্টা জ্ঞানময় বাবুর কাছে। এ মাসে জ্ঞানময় বাবুর ঘরে কাটিতেছে আধ ঘণ্টা, আর বাকী দেড় ঘণ্টা কাটে লালিমাদের ঘরে।

সে দিন সন্ধ্যা হয়-হয়, তবু উপরে জ্ঞানময় বাবুর ঘরে না গিয়া সুপ্রকাশ নীচে লালিমাদের ঘরে একখানি আরাম-কেদারায় শুইয়া "বিষবৃক্ষ" পড়িতেছিল। লালিমা পাশের একখানা টুলে বসিয়া পশমের 'পুল-ওভার' বুনিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্‌খানটায় পড়ছেন বলুন ত, তন্ময়তার হেতু বুঝি।"

পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক ভাবে সুপ্রকাশ কহিল—"যেখানে হরিদাসী বৈষ্ণবী—"

"আর বলতে হবে না, বুঝেছি। সাতাশ-আটাশ বছরের মধ্যে এ সব পড়বার মোটেই অবকাশ পাননি দেখচি। খালি ভাল ছেলে হয়ে স্কুল-কলেজে গেছেন আর বছর-বছর পাশ করে এসেচেন !—যাক, আজ তা হলে আর ওপরে যাচ্চেন না ত ?"

"না, ও আর ভাল লাগে না।"

"না-লাগবারই কথা। দুর্ব্বো ঘাস আর বাঁশ যা'তে বলে—একই জিনিষ, সে বিদ্যে না জানাই ভাল।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিতেই লালিমা যখন আলোর 'সুইচ' টিপিয়া দিল, তখন সুপ্রকাশ বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া কহিল—"মাথাটা বড্ড ধরেচে।"

একটু হাসিয়া লালিমা কহিল—"বোধ হয় হরিদাসী বৈষ্ণবীর গান শুনে !"

"শরীরটাও কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করচে।" বলিয়া সুপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাসায় ফিরিয়া নন্দরাণীকে কহিল—"দেখ, আজ আর কিছু খাব না আমি। শরীরটা বড় খারাপ লাগচে।" বলিয়া সুপ্রকাশ শয্যায় শুইয়া পড়িল।

নন্দরাণীর মুখখানা চিন্তাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"মাথা ধরেছে ?"

"খুব। বোধ হয় জ্বর-টর কিছু হবে।"

নন্দরাণী শিয়রে বসিয়া সুপ্রকাশের মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সুপ্রকাশ কহিল—"যাও, তুমি রান্না-বান্না করগে।"

"কার জন্য আর রাঁধবো ! আমার ত পেট ভার হোয়ে রয়েছে, ক্ষিধে-টিদে কিছু নেই। দু'টি মুড়ি আছে, তাই খাব এখন।"

মধ্যরাত্রে সুপ্রকাশের খুব জ্বর আসিল। পরের দিনও সে জ্বর ছাড়িল না। জ্বরের ঘোরে সারাদিন সুপ্রকাশ বেহুঁসের মত পড়িয়া রহিল। নন্দরাণী কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। দুশ্চিন্তায় ভয়ে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। বিদেশে কোনই অভিভাবক নাই ; সে কি করিবে ! মনে-মনে সে বার-বার ঠাকুরকে স্মরণ করিতে লাগিল।

চার দিনের দিন সকালের দিকে সুপ্রকাশের জ্বর অনেকটা নামিল ; কিন্তু দুপুর বেলা আবার বেশী করিয়া জ্বর আসিল। বাড়ীওয়ালা-গিন্নী নন্দরাণীকে বলিল—"ডাক্তার এনে দেখাও মা, জ্বরটা বোধ হয় বাঁকা।" নন্দরাণীর অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় ডাক্তার পাওয়া যায়, আমি ত কিছুই জানি না। আপনারা যদি একটু দয়া কোরে…"

"আচ্ছা, আমার ছেলেকে দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে আনাবো এখন। এখানে ঐ বাজারের কাছে বেশ ভাল ডাক্তার আছে। চার টাকা করে ভিজিট নেয়।"

তার পর নন্দরাণী তাঁহাকে চুপি চুপি কি বলিয়া হাতের দু'গাছা রুলি খুলিয়া দিল। খানিক পরে বাড়ী-ওলা গিন্নী কুড়িটি টাকা আনিয়া নন্দরাণীর হাতে দিয়া গেল।

বিকালের দিকে ডাক্তার আসিল এবং সুপ্রকাশকে দেখিয়া কহিল—"কোন ভয় নেই। তবে জ্বরটা রেমিটাণ্ট টাইপের। খুব শীত পড়েচে—যেন ঠাণ্ডা-টাণ্ডা না লাগে। ওষুধটা আজ এক দাগ খাওয়াবেন, কাল তিন বেলা তিন দাগ।"

তিন-চার দিনেই জ্বর নরম পড়িল। কুইনিন্ দিয়া ডাক্তার বলিলেন—"কালকের দিনটা বাদে পরশু দু'-একখানা সুজির রুটি একটু মাছের ঝোল দিয়ে খেতে পারবেন।"

তের দিন পরে সুপ্রকাশ সুস্থ হইয়া স্কুলে গেলে হেড্‌মাষ্টার হাসিতে হাসিতে কহিল—"ভগবান্ ক'দিন আপনাকে যেমন একটু কষ্ট দিলেন প্রকাশ বাবু, তেমনি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করেচেন।" বলিয়া উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল। সুপ্রকাশ চিঠি পড়িয়া দেখিল, তাহাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে এই স্কুলের হেড্‌মাষ্টারের পদে উন্নীত করা হইয়াছে। হেড্‌মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর আপনি ?"

"আমাকে নেবুতলায় 'ট্রান্সফার' কোরেচে।"

সেই দিন চারিটা বাজিতে-না-বাজিতেই ও স্কুলের মিষ্ট্রেস্‌রা আসিয়া সুপ্রকাশকে ধরিয়া বসিল, সুসংবাদ, সুতরাং তাহাদের সকলকে মিষ্টি-মুখ করাইতে হইবে। হাসিতে হাসিতে সুপ্রকাশ কহিল—"নিশ্চয়। এই শনিবারই তার ব্যবস্থা হবে। দয়া কোরে আপনারা………"

লালিমা হাসিতে হাসিতে কহিল—"দয়া আমরা যথেষ্টই করবো,

কিন্তু এখানে বোসে আমরা কেউ খাব না। আপনার বাড়ী গিয়ে খাব।"

চারখানা করে বাতাসা আর এক কাপ চা খেতে এতটা পথ যাওয়া—আপনাদের মজুরী পোষাবে না!"

"সে কথায় ত আপনার দরকার নেই! সে আমরা বুঝবো।"

পরের শনিবার একটার সময় স্কুলের ছুটি হইলেই মাষ্টার এবং মিষ্ট্রেসরা সুপ্রকাশের বাসায় আসিয়া হাজির হইল।

পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রকাশ তাহাদের জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। রান্নাঘরের মধ্যে থাকিয়া নন্দরাণী জলখাবারের রেকাবীগুলা নানাবিধ মিষ্টান্ন-পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিতে লাগিল: আর সুপ্রকাশ এ-ঘরে প্রত্যেকের কাছে তাহা দিয়া যাইতে লাগিল।

হেড্ মিষ্ট্রেস্ কহিল—"এই বুঝি আপনার চারখানা করে বাতাসা, প্রকাশ বাবু?"

সবিনয় মৃদু-হাস্তে সুপ্রকাশ কহিল—"তাছাড়া আর বিশেষ কি, বলুন। আপনারা খান্, আমি চা-টা নিয়ে আসি।"

লালিমা কহিল—"সবই আপনি হাতে কোরে আনবেন? আপনার বাড়ীতে আজ আমরা 'গেষ্ট্'। আপনার স্ত্রী চা এনে না দিলে আমরা কিছুতেই খাব না। কি বলেন সুরেশ বাবু?"

সুরেশ বাবু কহিল—"দেখুন, আমি তাঁর দিক নিয়েই বলি। তিনি সহরের আপ্-টু-ডেট্ স্ত্রীলোক নন, তিনি হলেন গ্রামের··· সুতরাং······"

"ও-সব বাজে কথা কিছুতেই আমরা শুনবো না। তিনি চা পরিবেষণ না করলে আমরা কিছু খাচ্চি না। আচ্ছা, মিসেস্ রক্ষিত, আপনি বলুন তো।" বলিয়া লালিমা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুপ্রকাশ কহিল—"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। নিশ্চয় তিনি চা পরিবেষণ করবেন।" বলিয়া সুপ্রকাশ রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

নন্দরাণী মনে মনে প্রমাদ গণিল। এরূপ অবস্থায় সে একেবারেই অনভ্যস্ত। শুধু মিষ্ট্রেসরা হইলেও একরূপ হইত। কিন্তু এতগুলি অপরিচিত পুরুষের সামনে সে কেমন করিয়া······

ভয়ে তাহার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। এক দিকে লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয়, অপর দিকে স্বামীর জেদ। অবশেষে নেহাৎ নিরুপায় হইয়া তাহাকে আট কাপ চা-শুদ্ধ ট্রেখানা দুই হাতে ধরিয়া শোবার ঘরের দিকে আসিতে হইল। কিন্তু ঘরের মধ্যে আর ঢুকিতে হইল না। এদিকে এক হাত ঘোমটা, ওদিকে ভয়ে ও লজ্জায় এই দারুণ শীতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল, হাত-পা থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল—সেই অবস্থায় দ্বারের কাছে আসিবামাত্র তাহার শিথিল হাত হইতে ঝন্-ঝন্ শব্দে ট্রে-সমেত কাপ-ডিস্ মেজের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। দ্বারের বাহিরে ও ভিতরে চায়ের ঢেউ খেলিতে লাগিল। মূর্চ্ছার হাত হইতে কোনও রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নন্দরাণী একটু আড়ালে সরিয়া গেল এবং দেওয়াল ধরিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

*　　*　　*　　*

সে দিন নন্দরাণী মূর্চ্ছার হাত হইতে নিজেকে সামলাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর সুপ্রকাশের নিকট হইতে ক্রমাগত যে ধাক্কা আসিতে লাগিল, তাহা সামলাইবার শক্তি আর তাহার রহিল না।

চিরকালের বাতাস হঠাৎ যেন ঘুরিয়া গিয়াছিল! কিছু দিন হইতে সুপ্রকাশ নন্দরাণীর প্রতি কথায়, প্রতি কাজে ভিতরে ভিতরে বিরক্তির ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছে। যে-নন্দরাণীর চিন্তাও তাহার সুখের এবং কাম্য ছিল, এখন স্বয়ং সেই নন্দরাণী তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে! যে কথা না কহিলে নয়, এখন সেইরূপ দু'-একটা কথা ছাড়া সুপ্রকাশ তাহার সহিত আর কথাই কহে না। যাহা কহে—তাহাও অসন্তুষ্ট চিত্তে; তাহাতে না আছে প্রীতি, না আছে সহানুভূতি,—একটা অন্তর্নিহিত তিক্ততা সে-কথায় সঙ্গে-সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে এবং নন্দরাণীর বুকে গিয়া তাহা আঘাত করে। নন্দরাণী অপরাধীর মত নীরবে সকল আঘাত সহ্য করিয়া যায়। সে দিন-রাত একলা বসিয়া ভাবে—তাহার কি দোষ, কোথায় দোষ! কিন্তু ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারে না। এক-এক দিন—যে দিন তাহার তিল-তিল সঞ্চিত দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিত, সে দিন আর সামলাইয়া উঠিতে পারিত না, বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া চোখ-মুখ ফুলাইত।

আজকাল সুপ্রকাশ খুব কম সময়ই বাসায় থাকে। প্রায় রোজই সে খুব সকাল-সকাল অর্থাৎ ন'টার সময় আহারাদি করিয়া স্কুলে চলিয়া যায়। বাসায় ফিরিতে কোন দিন রাত ৯টা; কোন দিন বা ১০টা হয়। জিজ্ঞাসা করিলে, হেডমাষ্টারী কাজের অজুহাত দিয়া বলে—"তুমি একটা সেকেলে প্যাটার্ণের মুখ্যু মেয়ে-ছেলে, এক জন হেড মাষ্টারের কত কাজ, কত দায়িত্ব, তা তুমি বুঝবে কি করে!"

সে দিন খুব সাহস করিয়া নন্দরাণী বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, আমি কি দোষ করেচি তুমি বল। তুমি আগেকার মত আর আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কও না কেন?"

মুখখানাকে বাঁকাইয়া সুপ্রকাশ কহিল—"কথা কওয়া চলে না বলে।"

"আগে ত কথা কইতে।"

সুপ্রকাশ কোন উত্তর দিল না।

"আমি স্যাণ্ডেল পায়ে দোবো; তুমি আমায় এনে দিও। আর তুমি যদি একটু সকাল-সকাল এসো, তা হোলে রোজ আমি তোমার সঙ্গে 'পার্কে' বেড়াতে যাব। লক্ষ্মীটি, তুমি আমার ওপর এ রকম রাগ করে থেকো না। তুমি আমায় ঠেলে দিলে, এত বড় পৃথিবীতে কার মুখ চেয়ে থাকবো। তোমার সুখেই আমার সুখ, শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ। তুমি যদি বিরূপ হও, আর তখনো যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহোলে সে কঠিন শাস্তি···"

নন্দরাণী আর বলিতে পারিল না। তাহার গলা বুজিয়া গেল, দুই চোখ ভরিয়া জল ঠেলিয়া আসিল। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—"তুমি কি চাও বল, আমি তাই করবো। আমি ভাল লেখাপড়া জানি না বটে, কিন্তু তোমার আনন্দের জন্য আমি সব করতে পারি। এই দেখ আমি কি করেচি"—বলিয়া রান্নাঘর হইতে একখানা 'ফাষ্ট বুক' আনিয়া কহিল—"বাজার থেকে কিনে আনিয়ে রোজ দুপুরবেলা বাড়ীওলার মেয়ের কাছে পড়চি।"

সুপ্রকাশ পূর্ব্বের মতই কোন উত্তর না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ছিল রবিবার। স্কুল বন্ধ থাকিলেও দুপুরবেলায় আফিস-ঘরে বসিয়া সুপ্রকাশ আর লালিমার কথা হইতেছিল।

"আচ্ছা প্রকাশ বাবু!"

"কি আজ্ঞা হয়, বলুন।"

"উদ্ভিদ্-বিদ্যার আলোচনা আপনার শেষ হোয়েচে ত?"

"এক রকম।"

"এবার কোন্ বিদ্যার আলোচনা করবেন?"

"যে বিদ্যা সামনে পাব।"

"কি সর্ব্বনাশ! তাহোলে ত এখন আপনার সামনে থাকা দায়।"

"সামনে না থাকলেও ক্ষতি নেই! সুড়ঙ্গ আর মালিনীর মত কেউ আমার সহায় থাকলেই আমার নিশ্চিত বিদ্যালাভ।"

একটা আনন্দ-ভঙ্গীর সহিত লালিমা কহিল—"রসে দেখচি আপনি ভরপূর!"

"নিশ্চয়। আমি যে সু—অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ। বাজে কথা যাক, আপনার কাণের গোড়ার বীচিটা কেমন?"

"কমে গিয়েচে। দেখুন না হাত দিয়ে।"

সুপ্রকাশ উঠিয়া গিয়া কাণের নীচে একটু টিপিতেই লালিমা বলিয়া উঠিল—"ও কি! বিনা-দোষে আমার কাণ মোলে দিলেন!"

"আমার ছাত্রী হোতেন ত, তাই দিতুম।"

"তাহোলে আমিও রোজ স্কুল পালাতুম। তা এখন উঠবেন কি না, বলুন। চা খাবার সময় হোল যে। মা আপনাকে 'বড়ি-প্যালেস' কোরে নিয়ে যেতে বলেচেন।"

এখানে একটা কথা বলিবার আছে। ৩।২ সাউথ লেনের নীচের তলার বাসায় লালিমা ও লালিমার মা ছাড়া উহাদের আর কেহ থাকে না। থাকিবার আর কেহ নাই-ও। লালিমার পিতা যদিও আছেন বটে, কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর সন্ধি-বিচ্ছেদের ফলে স্ত্রী কলিকাতায়, আর স্বামী 'ক্যালিকট' না 'কালিম্পং'য়ে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন; ব্যাকরণের নিয়মানুসারে উভয়ের মধ্যে আর মিলন ঘটিবার কোন আশা-ভরসাই নাই। তাহা না থাকিলেও লালিমার মা যে অপূর্ব্ব 'সূত্রে' লালিমা ও সুপ্রকাশের মধ্যে মিলন ঘটাইবার আয়োজন করিলেন, তাহা 'মুগ্ধবোধে' নাই, 'কলাপে' নাই, 'সুপদ্মে' নাই; এমন কি, 'পাণিনি'র 'অষ্টাধ্যায়ী' খুঁজিলেও পাওয়া যায় না!

বড় বড় বৈয়াকরণিকেরা যে সন্ধির কথা তাঁহাদের গ্রন্থে লিখিতে পারেন নাই, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা শুধু যে দুঃসাধ্য তাহা নহে, অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এক দিন স্কুলে বসিয়া আনন্দ-আলাপের মধ্যে সুপ্রকাশ যে বিদ্যা-লাভের কথা বলিয়াছিল, তিন মাস পরে বৈশাখের এক শুভদিনে এবং শুভক্ষণে তাহার সেই বিদ্যা-লাভ ঘটিয়া গেল। ৩/২ সাউথ লেনের নীচের তলায় যখন এই শুভ মিলনোৎসব সঙ্গোপনে সম্পন্ন হইতেছিল, ঠিক সেই সময় কসবার ছোট ঘরখানির মধ্যে একা বসিয়া বেচারা নন্দরাণী তাহার 'ফার্ষ্ট-বুক'-খানি লইয়া বৃথা বিদ্যা-লাভের চেষ্টা করিতেছিল আর তাহার হৃদয়-সর্ব্বস্ব স্বামীর ফিরিবার আশায় মুক্ত গবাক্ষপথে বার-বার পথের দিকে তাকাইতেছিল।

* * * *

সাধের বিবাহের পর দশ মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই দশ মাস কাল নন্দরাণীর কি করিয়া কাটিয়াছে, তাহা নন্দরাণী ও তাহার অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই জানে না। সুপ্রকাশের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপেক্ষা এবং অনাদরের সহস্র আঘাতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিনই সুপ্রকাশ রাত্রে বাসায় আসে না। যদিও কৈফিয়ৎ দানের কোন আবশ্যকতা ছিল না, তথাপি সুপ্রকাশ নন্দরাণীকে বুঝাইয়া দিয়াছে, ৫০৲ টাকা আয়ে কলিকাতার খরচ কুলায় না, তাই তাহাকে শ্যামবাজারে তিরিশ টাকায় একটা 'টিউসনি' লইতে হইয়াছে এবং যে দিন পড়াইতে রাত হইয়া যায়, সে দিন সেইখানেই আহারাদি করিয়া তাহাকে শয়ন করিতে হয়।

শ্যামবাজারে না হউক, যে-বাজারে সে পড়ায়, সেখানে নিম্নোক্তরূপ পড়াশুনার কাজ চলে—

"তোমার হাত দু'খানা এত নিটোল আর মোলায়েম, মনে হয় যেন ননী দিয়ে গড়া!"

"ও রকম মনে কোরো না, দোহাই বলচি! শেষকালে লোভ সামলাতে না পেরে কবে হয় ত রুটী দিয়ে টোষ্ট বানিয়ে খেয়েই ফেলবে।"

"আচ্ছা লালিমা, আমার দিকে কতক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে পার?"

"পারি অনেকক্ষণ, কিন্তু তাতে তুমি হয় ত ভস্ম হোয়ে যেতে পার।"

"ভস্ম হব না! তবে গলে যাবার ভয় আছে।"

"তাই ত চিনির পুতুলকে দিন-রাত আগলে-আগলে রাখি। তবু ফাঁক পেলেই কসবার মাঠে ছুটতে কসুর কর না! হ্যাঁ, ভাল কথা, ডাক্তারে কি স্পষ্টই বোলেচে যে টি-বি?"

সুপ্রকাশ কপালটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া কহিল—"তাই ত বলেচে।"

"রুগী শুনেচে এ কথা?"

"না। সে হোল মুখ্যু জংলী। এ সব বিষয়ে তার কোন ধারণা আছে?"

এই সময় বাহির হইতে লালিমার মাতা ঘরের মধ্যে আসিয়া কহিল—"তা হোলে কি করবে বাবা? সাংঘাতিক রোগ! আমার ভারি ভয় করে, ছোঁয়া-ছুঁয়ি কোরে পাছে আবার তুমি ও-রোগটি এখানে……"

"তাই ত! কি করা যায় বলুন ত?"

"ওকে ওর বাপ-মায়ের কাছে দিয়ে এস। ও বিপদ এখানে রাখতে আছে?"

"আমিও তাই মনে করচি।"

"মনে করা-করি নয় বাবা, ও বিপদ ঘরে পুযে রেখো না। আর বলছিলুম কি বাবা, লালির আমার চুড়ির কত দূর কি হোল? ওর পাঁচটা বন্ধু-বান্ধবের সামনে শুধু হাতে……সে দিন অমিয় বাবুদের টি-পার্টিতে যাবার জন্য কত কোরে ওকে বলে গেল। কিন্তু শুধু

হাত বোলে ও গেল না। সবাই ওকে কত ভালবাসে! ডাক্তার মৃন্ময় গাঙ্গুলী······"

"চুড়ি ত আজকালই দেবার কথা। আচ্ছা, আমি যত শীগ্‌গির পারি······"

সে দিন রাত্রে বাসায় আসিয়া সুপ্রকাশ নন্দরাণীকে কহিল—"তোমার শরীর কেমন আছে?"

"একটু খারাপ। তবে ও সেরে যাবে, ওর জন্য তুমি ভেবো না। আজ আর বেশী কাসি হয়নি। তুমি কেমন আছ? মাথা ধরেনি ত তোমার? টিপে দেবো একটু!"

"ওষুধ খাচ্চ রোজ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। ওর জন্য তুমি অত ব্যস্ত হোয়ো না। দেখ, আমি টাকাকে পাই করা শিখে ফেলেচি। আর 'ফার্ষ্ট বুক'ও প্রায় শেষ হব-হব।"

নন্দরাণীকে যে কাল-ব্যাধিতে ধরিয়াছে, তাহা সে বুঝিতেই পারে নাই। সে 'টি বি'র নাম শুনিয়াছে, কিন্তু তাহা যে এই, তাহা সে ভুলিয়াও মনে করে না। তাহার প্রত্যহ ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হয়, সে মনে ভাবে—ম্যালেরিয়া। কাসির সঙ্গে রক্ত অবশ্য এখনো দেখা দেয় নাই। তবে চেহারা যে দিন-দিন ফ্যাকাশে হইয়া যাইতেছে, মনে করে—তাহাকে কলিকাতার 'নোনা' লাগিয়াছে!

সুপ্রকাশ কহিল—"দেখ, দিন-কতক তোমায় দুর্গাপুরে রেখে আসব।

চমকাইয়া উঠিয়া নন্দরাণী কহিল—"কেন?"

"ইংরেজ আর জার্ম্মেণীতে যে যুদ্ধ হোচ্চে, সেই জার্ম্মেণীরা কোলকাতায় এসে বোমা ফেলবে। অনেকেই তাই মেয়ে-ছেলে সব কোলকাতা থেকে সরিয়ে দিচ্চে। তা আসচে শনিবারেই তোমাকে দুর্গাপুরে······"

"আর তুমি?"

"আমাকে ত এখানে থাকতেই হবে, নইলে······"

"না, তা কিছুতেই হবে না। তোমাকে একলা রেখে আমি কিছুতেই যেতে পারব না। তুমি না হয় চাকরী ছেড়ে দাও। সেখানে এক রকম করে চলে যাবেই। পাঁচুর মা যা' বলে বলুক। তোমাকে কিন্তু এখানে ফেলে কিছুতেই যেতে পারব না।"

"আগে তোমাকে রেখে আসি. তার পর আমি না হয় ছ' মাসের ছুটি নিয়ে চলে যাব।"

"হ্যাঁ, তাই কোরো। তা না হোলে তোমার জন্য ভেবে-ভেবেই আমি মরে যাব।"

আজ নন্দরাণীর মন অনেকটা হাল্কা বলিয়া বোধ হইল। মনে ভাবিল, সে আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরকে ডাকিয়াছিল, তারি জন্য সুপ্রকাশ আজ তাহার সহিত ভাল ভাবে কথা কহিয়াছে। রান্নাঘরে গিয়া সুপ্রকাশের ভাত বাড়িতে বাড়িতে সে মনে মনে স্থির করিল, রোজ ঠাকুরকে সে এমনি ভাবেই ডাকিবে।

পরের শনিবারেই সুপ্রকাশ নন্দরাণীকে দুর্গাপুরে রাখিয়া আসিল। নন্দরাণীর চেহারা দেখিয়া হরকালী ও হেমাঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিল। সুপ্রকাশ গোপনে শ্বশুরকে বুঝাইল—"ডাক্তাররা বলে, গ্রামের মুক্ত বায়ু থেকে হঠাৎ কোলকাতার ঘেঞ্জির মধ্যে গেলেই মেয়েদের প্রায় এই রোগটা ধরে। তা কোন ভয় নেই, মাস-ক··· এখানে থাকলেই আবার সেরে যাবে।"

হরকালীর আর কিছু বলিবার ছিল না; নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * *

শ্রাবণের সন্ধ্যা।

আজ সকাল হইতে প্রায় সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সুপ্রকাশের মনের মধ্যেও আজ যেন শ্রাবণের বাদল নামিয়াছে। নীরব গৃহের মধ্যে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় আজ ক্ষণে ক্ষণে তাহার মনের মধ্যে নন্দরাণীর কথা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। তিন মাসের অধিক কাল সে তাহাকে দুর্গাপুরে রাখিয়া আসিয়াছে। কেমন আছে কোন খবর লয় নাই। যে খবরের মধুরতার মধ্যে সে এই ক··· মাস নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ তাহা তাহার অন্তরে নিষ্ঠুর ভাবে নাড়া দিয়া উপহাস করিতে করিতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। অনবরত টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। মনের অস্বস্থতা কাটাইবার উদ্দেশে সুপ্রকাশ একখানা গল্পের বই খুলিয়া বসিল, কিন্তু যাহা পড়িয়া যাইতে লাগিল তাহার কিছুই অন্তরে প্রবেশ করিল না! বই বন্ধ করিয়া স্কুলের কতকগুলা দরকারী কাজ বাড়ীতে সারিবে বলিয়া বাসায় আনিয়াছিল। সেই কাগজ-পত্র লইয়া বসিল। তাহাও ভাল লাগিল না। অগত্যা সেগুলিও তুলিয়া রাখিল। তখন শয্যার উপর আসিয়া বসিতেই বাহিরে জুতার শব্দ শুনিল।

"কে?"

দরজা ঠেলিয়া লালিমা প্রবেশ করিয়া কহিল—"আমি। ··· কোথায়?"

"তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। তুমি সেই সকালে বেরিয়ে এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?"

ছাতাটা দেওয়ালের হুকে ঝুলাইয়া রাখিতে রাখিতে লালিমা কহিল—"নিমা দিদির বাড়ী।"

"নিমা দিদি? কই, এত দিন ত নিমা দিদি বলে কারো নাম শুনিনি! তিনি কে?"

একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে লালিমা কহিল—"তিনি—তিনি।"

"তার মানে?"

"তার মানে 'ভিক্ষুনারী'তে লেখা আছে, খুলে দেখ"—বলিয়া লালিমা অপ্রসন্ন চিত্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুপ্রকাশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর অনাহারেই সে দিন শুইয়া পড়িল।

বুকের মধ্যে যে দুষ্ট ক্ষত দিনের পর দিন এইরূপে ক্রমশঃ ···িয়া উঠিতেছিল, তাহাতে প্রলেপ দিবার ইচ্ছায় সুপ্রকাশ ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া এক মাসের ছুটি লইল এবং মধুপুরে এক বন্ধুর গৃহে গিয়া অতিথি হইল। কিন্তু যাহার অন্তর বিকট তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছে, জগতে কোন 'মধু'র সাধ্য নাই, সে-তিক্ততা দূর করে! মধুপুরে গিয়াও সুপ্রকাশ শান্তি পাইল না। বরং কলিকাতায় তাহার স্কুলের কাজ-কর্ম্ম লইয়া অনেকটা সময় অন্যমনস্ক ভাবে কাটিয়া যাইত, কিন্তু মধুপুরে দিন-রাত মন বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। মধুপুরের

জল হাওয়া বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য তাহার মনে শান্তি দিতে পারিল না। সে-কারণ দিন-আষ্টেক সেখানে কাটাইবার পর, কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছায় এক দিন প্রাতে সুপ্রকাশ ষ্টেশনে আসিয়া কলিকাতার গাড়ীতে চাপিয়া বসিল।

সারা দিনের পর অপরাহ্ন সময়ে গাড়ী যখন চন্দননগর ষ্টেসনে আসিয়া থামিল, তখন প্ল্যাটফরমের উপর এমন-এক দৃশ্য সুপ্রকাশের চোখে পড়িল, যাহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া কাঁপিতে লাগিল! প্রথম দিক্‌কার গাড়ীগুলির একখানিতে সে বসিয়াছিল। সামনে জানালার ফাঁকে সতর্কতার সহিত নিজেকে আড়ালে রাখিয়া সে দেখিল, ডাক্তার মৃন্ময় গাঙ্গুলী আর লালিমা দুই জনে হাত-ধরাধরি করিয়া হাসিতে-হাসিতে সেকেণ্ড ক্লাসের কি ইণ্টার ক্লাসের একখানা গাড়ীতে উঠিল।

হাওড়ার প্ল্যাটফরমে ভাল করিয়া গাড়ী থামিতে-না-থামিতেই খুব তাড়াতাড়ি সুপ্রকাশ নামিয়া পড়িল এবং দরজায় সর্ব্বপ্রথম টিকিট দিয়া বালীগঞ্জগামী একখানা বাসে গিয়া উঠিল।

বাসায় আসিয়া শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—"লালিমা কোথায়?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া শাশুড়ী কহিলেন-"তুমি এবি মধ্যে চলে এলে যে বাবা!"

"বড্ড অসুবিধে হোল থাকবার। লালিমা কোথায়?"

"সে গেছে তার মেসোমশায়ের বাড়ী।"

"মেসো?"—লালিমার কোন মেসোর কথাই সুপ্রকাশ ইতিপূর্ব্বে শোনে নাই।

"হ্যাঁ বাবা, তার এক মেসোমশাই থাকেন কেষ্টনগরে। অনেক করে এসে তাকে আজ একবার সেখানে···ছেলেবেলা থেকে বড্ডই উনি ওকে ভালবাসেন কি না। কালই হয় ত এসে পড়বে। তুমি হাত মুখ ধোও, আমি চা কোরে আনি।"

সুপ্রকাশ বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার কিছু পরে বাসার সামনে একখানা ট্যাক্সির শব্দ পাইয়া সুপ্রকাশ জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ফুটপাথের উপরকার লাইটের আলো গাড়ীর ভিতর পড়িয়াছিল; দেখিল—গাড়ীর মধ্যে ডাক্তার মৃন্ময় গাঙ্গুলী আর লালিমা। লালিমাকে নামাইয়া দিয়া ট্যাক্সি চলিয়া গেল। লালিমা বাড়ী ঢুকিল।

ঘরের দরজার সামনে আসিতেই সুপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে বলিল—"এসো।"

"তুমি?···হঠাৎ মধুপুর থেকে?"

"চলে এলুম। তোমার জন্যে বড্ড মন-কেমন করতে লাগলো।"

"মা কোথায়?···তা তুমি···ও কি!···"

"ফ্রেঞ্চ চন্দননগর থেকে বৃটিশ কোলকাতায় এলে, তোমায় একটু অভ্যর্থনা করতে চাই!" বলিয়াই সুপ্রকাশ লালিমার গলাটা ধরিয়া এমন জোরে ঝাঁকানি দিল যে, তাল সামলাইতে না পারিয়া লালিমা মেঝের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িল। সেই অবস্থায় সুপ্রকাশ ছড়ি লইয়া সপা-সপ করিয়া এমন কয়েক-ঘা মারিল যে, লালিমা মুখ গুঁজিয়া পড়িল—উঠিবার শক্তি রহিল না! তার পর ক্ষিপ্তের মত সুপ্রকাশ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"কাঞ্চন ফেলে কাচকে যেমন আমি বুকে নিয়েছিলুম তার শাস্তি······"

আঘাতের যাতনায় ক্ষতবিক্ষত লালিমা মেঝেয় পড়িয়া ছট্‌-ফট্ করিতে লাগিল।

আবার মাঠের পুকুর। কিন্তু আড়াই বৎসর পরে। পশ্চিম দিকের সেই দিগন্তপ্রসারী মাঠখানা এখন আর শূন্য অবস্থায় খাঁ-খাঁ করিতেছে না। এখন তাহা শস্যপূর্ণ। অপরাহ্নের মৃদু-মন্দ বাতাসে তাহার শ্যামল তরঙ্গ দিগন্তের কোলে শরতের নীলাকাশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

মাঠের পুকুরে সেই কাঁচা-ঘাটের বালির উপর সকলেরই পায়ের দাগ পড়ে, শুধু নন্দরাণীর আর পড়ে না। অনেক দিন পরে আজ সে শুষ্কপ্রায় লতার মত শীর্ণ দেহে এবং অবশ চরণে ধুঁকিতে ধুঁকিতে ঘাটের একধারে আসিয়া বসিল।

হেমাঙ্গিনী তাহাকে বাটী হইতে বাহির হইতে দেয় না। আজ ও-পাড়ায় মুখুজ্যে-বাড়ীর কি একটা কাজের উপলক্ষে হরকালী ও হেমাঙ্গিনী দু'জনেই সেখানে গিয়াছে। এই ফাঁকে পিতলের ঘড়াটা লইয়া বহুকাল পরে নন্দরাণী মাঠের পুকুরের ঘাটে আসিয়া বসিল। দেখিল, সব ঠিক তেমনি আছে। উত্তর-পাড়ের সেই শেয়াকুল-কাঁটার গাছগুলা, সেই বৈঁচি-ঝোপ, আশে-পাশে সেই বন-যুঁইয়ের চারা, পথের পাশে সেই কাল-কাসুন্দার গাছগুলা—সবই আছে। কোণের তালগাছ কটায় আগেকার মত অনেকগুলা বাবুই পাখীর বাসা এখনো ঠিক তেমনিই, দুলিতেছে। ওদিক্‌কার-পাড়ের নীচে যে 'নয়ানজুলি', তাহাতে আগেকার মতই বর্ষার মাঠের জল কল্‌-কল্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নালার মুখে ফকির হাড়ির 'আড়া' পাতা রহিয়াছে। আগেকার দিনের মতই তাহাতে কত শোল, পুঁটি, ল্যাটা, পাঁকাল ঝাঁকে-ঝাঁকে আসিয়া জমিতেছে।

দুর্ব্বল দেহ আর অবসন্ন মন লইয়া নন্দরাণী কত-কি অতীত বর্ত্তমান ভাবিতে লাগিল—ঐ যে বাঁ-দিকে অনেক দূরে যেখানে মাঠ শেষ হয়েচে,—ঐ যে নারকোল ঝাউগাছ—ওইটে ভুরুলগাছ। আগে ওখানে খুব ধুম-ধাম করে 'বারোয়ারী' হোত। একবার ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে ও-গাঁয়ে যাত্রা শুনতে গেছলুম। পালা হোয়েছিল—কংস-বধ। যাত্রা দেখে এসে তার পরদিন হিমুদের চণ্ডীমণ্ডপে কাপড় খাটিয়ে হিমু, ননী, 'দূরের জল' পাঁচি, 'সই', ভানু—সবাই মিলে আমরাও যাত্রা করেছিলুম! ভানু বাঁখারীর তলোয়ার কোরেছিল। ননী 'ধুচুনী'তে রঙ্গীণ কাগজ মেরে মুকুট মাথায় দিয়েছিল! ওঃ! 'দূরের জল'-এর বাবার কি বকুনি তাকে!—আহা, 'দূরের জলকে' কত দিন যে দেখিনি! তার বোধ হয় পর-পর দু'টি ছেলে হয়েচে। তারা পশ্চিমের কোথায় অনেক দূরে গিয়ে পড়েচে—রাওয়ালপিণ্ডি, না কি! 'সই' বেশ কাছে পড়েচে—ধনেখালি। বিয়ের পর শুধু একটি বার তার সঙ্গে দেখা হোয়েছিল। কোথায় যে সব গেল! কা'রো সঙ্গেই আর দেখা হয় না। পাঁচি এখন বোধ হয় কোলকাতায়। কোলকাতা এখান থেকে এই উত্তর পূব কোণায়। 'কসুবা'ও তাই।······খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ নন্দরাণীর সারা অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্য হইতে একটা টানা নিশ্বাস বাহির হইল। বাল্য-সঙ্গিনীদের স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল—'আমায় একলা ফেলে কোথায় চলে গেলি সব! আমি যে আর পারি না! আমি কি করবো! ওরে, তোরা আয়—তোরা আয়!'

বিষ্টু বাগ্দী নারাণপুরের হাট হইতে তার খালি গাড়ীখানা লইয়া ফিরিতেছিল। নন্দরাণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"দিদিমণিকে অনেক দিন পরে দেখলুম যে গো। ইস্! তোমার চেহারায় যে আর কিছু নেই দিদিমণি! তোমাব অমন নন্দরাণীর মত চেহারা, আহা……"

"কোথায় গিয়েছিলে, বিষ্টুদাদা?"

"ধান নিয়ে হাটে গিয়েছিলুম। মাথার ওপব একখানা শবতের মেঘ এসে জমলো দিদিমণি। যাও, পুকুর-ঘাটে আর একলা থেকো না। তুমি যে এ-রকম হোয়ে গেছ, তা ত জানতুম না। ঘরে যাও দিদিমণি।"

"যাই দাদা।" বলিয়া নন্দরাণী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং জলে নামিয়া শূন্য ঘড়াটায় জল ভরিল, কিন্তু কাঁকালে তুলিতে গিয়া কিছুতেই তুলিতে পারিল না। তাহার অজ্ঞাতসারে এক ঘড়া জল তুলিবার শক্তিও যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, আজ তাহা সে বুঝিল। নিরুপায় হইয়া পুকুরের জল আবার পুকুরে ঢালিয়া দিয়া, শূন্য কলসী-হাতে ঘাটে উঠিতেই মাথার উপরকার সেই মেঘ হইতে ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল ও তাহার সমস্ত কাপড় ভিজিয়া সারা অঙ্গ বহিয়া স্রোতের মত জল ঝরিতে লাগিল। নিকটে কোথাও দাঁড়াইবারও স্থান ছিল না। তাড়াতাড়ি চলিবার শক্তি নাই। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ক্ষীণ-মন্থর গতিতে নন্দরাণী খিড়কী দিয়া বাড়ী ঢুকিল। ঢুকিয়াই দেখিল—তাহাব শয়ন-ঘরেব দাওয়ার উপর দাঁড়াইয়া হেমাঙ্গিনী।

হেমাঙ্গিনী কোন কথা না বলিয়া শুধু বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে নন্দরাণীর দিকে তাকাইয়া রহিল।

"কি দেখচো মা অমন কোরে?"

হেমাঙ্গিনী তথাপি নিরুত্তর।

"বল না, কি দেখচো?"

"নন্দ তুই নিজেও মলি, আমাকেও মারলি!"

"কেন, কি হোয়েচে?"

"আচ্ছা, তোর না বিছানা থেকে ওঠা বারণ! আব তুই এই বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চান কোরে এলি!"

গামছা দিয়া গা-মাথা মুছিতে মুছিতে নন্দরাণী কহিল—"তা, কি করবো বলো। একলাটি ঘরের মধ্যে চুপ করে থাকা যায় কখনো? তাই একটি বার আস্তে-আস্তে…"

"আস্তে আস্তে এমনি কোরেই তুই প্রাণটাকে বার কোরে দিবি নন্দ!"

"তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! একটু ভিজেচি, অমনি প্রাণ বেরিয়ে যাবে! আমি ত সেরে উঠেচি। এই দেখ, হাত-পায়ে আমার কত জোর হোয়েচে"—বলিয়া ব্যায়ামের ভঙ্গীতে নন্দরাণী সজোরে তাহার বাহু-যুগল সামনের দিকে আগাইয়া দিল এবং গুটাইয়া লইল।

হেমাঙ্গিনী ভরা-গলায় কহিল—"শেষ পর্য্যন্ত কি যে তুই ঘটাবি মা, বুঝতে পারচি না। শীগ্গির কাপড় ছেড়ে, কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে পড়্গে। গায়ে এক ফোঁটা নেই রক্ত, হাড় ক'খানা শুধু ছালে ঢাকা, এক পা চলতে তোর হাঁফ্ ধরে, কাসির সঙ্গে তোর রক্ত…"

মায়ের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নন্দরাণী কাপড় ছাড়িয়া নিজের শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিল এবং কি একখানা গানের প্রথম কলিটা গুন্-গুন্ করিয়া গাহিতে-গাহিতে অবসন্ন দেহ-ভার বিছানার উপর লুটাইয়া দিল।

আজ কয় দিন হইতে নন্দরাণীর ঘুস্-ঘুসে জ্বর একটু কম পড়িয়াছিল। সেই রাত্রি হইতে আবার তাহার ঘামের সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। এবার কাসির সঙ্গে বেশ রক্ত আসিতে লাগিল। যে ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি কহিলেন—"এবার লক্ষণ খুব খারাপ।"

তাহাই হইল। দিন-দিন এক দিকে যেমন তাহার প্রাণশক্তি ক্ষয় পাইতে লাগিল, অন্য দিকে তাহার কোটরগত চক্ষুর দীপ্তি তেমনি বাড়িতে লাগিল।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী। নন্দরাণী সারাদিন ছট্-ফট্ করিয়া কাটাইয়াছে। সন্ধ্যার পব হেমাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, চাঁদ উঠেচে?"

"খানিক পরে উঠবে মা।"

"উঠলে বোলো ত একবার দেখবো। বাবা কোথায় মা?"

"ডাক্তারের কাছে গেছেন। 'হরলিক্' একটু তৈরী কোরে আনবো মা, খাবে?"

"হ্যাঁ, খাবো মা, নিয়ে এস। উঃ!"

হেমাঙ্গিনী চলিয়া যাইবার দুই-চারি মিনিট পরেই খাটের সামনে কাহার ছায়া পড়িল।

"কে?"

"আমি।"

"তুমি!" অধীর উৎসাহে নন্দরাণী কহিল—"তুমি এসেছ! এস—এস। আমি ক'দিন ধরে দিন-রাত তোমারই কথা ভাবচি। বোসো। আমার এই মাথার কাছে এসে বোসো।"

"নন্দ!"

"আরো কাছে সরে এসো তুমি! তোমার জন্মদিনে যে আশীর্ব্বাদ আমি চেয়েছিলুম, সে কথা তুমি ভোলনি!"

নন্দরাণী অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া সুপ্রকাশের পায়ের উপর মাথা রাখিল এবং তাহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল। "আঃ! তোমার সঙ্গে আমার কত কথা ছিল! বাবা এখনো ফেরেনি, মা? চাঁদ উঠেছে বোধ হয়…না! উঃ!"

"নন্দ!—নন্দ!"

নন্দরাণী আব সাড়া দিল না।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্য

(উপন্যাস)

পঞ্চম পল্লব

বেনামী চিঠি

বিভিন্ন দেশের প্রত্যেক প্রধান নগরের কোন কোন সুসভ্য ও শিক্ষিত নগরবাসিগণের অপরিচিত। লণ্ডনেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। লণ্ডনের এই অংশ 'হাউস অফ্ দি এবমিনেবল' নামে পরিচিত। যে সকল ব্যক্তি উক্ত অঞ্চলে বাস বা কার্য্যোপলক্ষে গমন করিত, ইহার গুপ্ত রহস্য কেবল তাহারাই জানিত!

ডেভিড গারসাইড 'ডেভিলস্ কালড্রণ' নামক স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রিত হইলে সেই স্থানে গমন কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা বুঝিতে পারিল। তাহার পথপ্রদর্শক একটি দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "আপনি আসুন ডেভিড, আপনাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয়, সে দিকে আমার লক্ষ্য থাকিবে।"

ডেভিড চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাম্রকূট-ধূমে সমাচ্ছন্ন কক্ষের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে সেখানে একটি দীর্ঘ-দেহ কৃশ ব্যক্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর; তাহার পরিচ্ছদ আড়ম্বরপূর্ণ, কেশরাশি শুভ্র, এবং সর্ব্বাঙ্গে দম্ভের পরিচয় সুস্পষ্ট। ডেভিড অল্পকাল পরে সেই স্থান ত্যাগ করিবার সময় তাহার সঙ্গীকে এই লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমি উহার বিশেষ পরিচয় জানি না; তবে এইমাত্র জানি যে, সকলে উহাকে 'কাউণ্ট' নামে সম্বোধন করে। শুনিয়াছি, ভদ্রবংশেই উহার জন্ম। উহার আকার-প্রকার দেখিয়া কি আড়ম্বরপ্রিয় লোক বলিয়া মনে হয় না?"

অতঃপর ডেভিড যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া লোকটির সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিল, তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়াই তাহার মনে হইল; কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা করিল না।

ডেভিড ক্ষুণ্ণ মনে আডেল্ফি-স্থিত বাসভবনে প্রত্যাগমন করিয়া আলো জ্বালিতে তাহার টেবিলের উপর সংরক্ষিত একখানি পত্র দেখিতে পাইল। পত্রখানির লেফাফায় তাহার যে নাম ও ঠিকানা ছিল—তাহা টাইপ-করা।

পত্রখানির লেফাফা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে ডেভিড এক ফর্দ কাগজ বাহির করিল; তাহা হাতে লইয়া তাহার ধারণা হইল, পত্রখানি তাহার কোন শত্রুর লিখিত। তাহার এই সন্দেহ যে অমূলক নহে, পত্রখানি পাঠ করিয়াই সে তাহা বুঝিতে পারিল।

পত্রখানিতে যাহা লিখিত ছিল, তাহা এই ;—

ফ্লীট ষ্ট্রীটের সংবাদপত্রগুলিতে তুমিই লোমহর্ষণ সংবাদসমূহ সরবরাহ করিয়া থাক, এই সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে। তুমি তোমার চক্ষু-কর্ণের ব্যবহারে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বন করিবে। আমি তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য নিম্নে যাহা লিখিলাম, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়াই লিখিত হইল। তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে তুমি সোহো পল্লীতে প্রবেশ করা বন্ধ করিবে। তুমি উক্ত পল্লীতে গমন করিয়া তোমার ব্যবহারে ইতিপূর্ব্বেই যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছ। এতদ্ভিন্ন তোমাকে এ কথাও জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যদি তুমি এখনও গোয়েন্দাগিরি পেশা চালাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া থাক, তাহা হইলে সেই অনধিকার-চর্চ্চার জন্য তুমি উপযুক্ত ফলভোগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। কারণ, তোমাকে অতঃপর ঐরূপ অনধিকার-চর্চ্চা করিতে দেওয়া হইবে না। এই পত্র দ্বারা তোমাকে সতর্ক করা হইল। আমি তোমাকে পুনর্ব্বার আর কোন পত্র লিখিব না। আশা করি, এই সতর্ক-বাণীই তোমার চৈতন্য-সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে করিবে, এবং ইহার অন্যথা করিবে না।"

পত্রখানির নীচে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না। ডেভিড পত্রখানি পাঠ করিয়া প্রথমে মনে করিল, উহা তাহার কোন প্রতিযোগী সংবাদ-দাতার প্রেরিত পরিহাসপূর্ণ পত্র! কিন্তু পূর্ব্বদিন যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার আদ্যোপান্ত মনে মনে আলোচনা করিয়া সে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই বাধ্য হইল। তথাপি উহা পাঠ করিয়া সে সতর্কতা অবলম্বন নিষ্প্রয়োজন মনে করিল; কিন্তু পরে সে বুঝিতে পারিয়াছিল, পত্রখানি ঐরূপ উপেক্ষাযোগ্য নহে!

ষষ্ঠ পল্লব

বিচার আরম্ভ

'সেণ্ট্রাল ক্রিমিনাল কোর্টের' প্রথম আদালত বেলা দশটার পূর্ব্বেই দর্শকবৃন্দে পূর্ণ হইল। জজ তখনও এজলাসে প্রবেশ করেন নাই।

ডেভিড গারসাইড বেলা ১০টা ২৫ মিনিটের সময় তাহার পরিচয়-পত্র দেখাইলে দুই জন পুলিশ-কর্ম্মচারীর সাহায্যে আদালতের ভীড় ঠেলিয়া রিপোর্টারগণের জন্য সংরক্ষিত আসনে উপবেশন করিল। ডেভিড দৈনিকপত্র 'অয়া'র'এর সম্পাদকের অনুরোধে মিস্ ওলিভিয়া ডেনের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচারের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে সম্মত হইয়াছিল। মামলার বিচার তখনও আরম্ভ না হওয়ায় সমাগত দর্শকগণের মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনিতে কক্ষ মুখরিত হইতেছিল।

ডেভিড এজলাসের নীচে ব্যারিষ্টারগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে তাহার ভ্রাতা জনকে আসামীর এটর্নী কোজেনসের সহিত চিন্তাকুল চিত্তে গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে দেখিল। ফরিয়াদী পক্ষের ব্যারিষ্টার সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবিও এজলাসের অদূরে বসিয়া মামলার কাগজপত্র দেখিতেছিলেন।

কিছু দূরে পুরু কাচ দ্বারা পরিবেষ্টিত আসামীর কাঠরা। সেই কাঠরায় একখানি মাত্র চেয়ার স্থাপিত ছিল। অনেক বিখ্যাত অপরাধী সেই চেয়ারে বসিয়া তাহাদের মামলার বিচার শ্রবণ করিয়াছিল। ডেভিড বুঝিতে পারিল, মিস্ ওলিভিয়া ডেনকেও যে কোন-মুহূর্ত্তে আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া সেই চেয়ারে উপবেশন করিতে হইবে।

সাড়ে দশটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ওলিভিয়া ডেন প্রহরিবেষ্টিত

হইয়া ধীরে ধীরে আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিল। সে চতুর্দ্দিকে ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; কিন্তু তাহার ম্লান মুখে মানসিক চাঞ্চল্য প্রতিফলিত হইল না।

অতঃপর বিচারপতি মিঃ স্বার্থডেল্স তাঁহার পেস্কারকে সঙ্গে লইয়া গম্ভীর মুখে এজলাসে প্রবেশ করিলে সেই কক্ষের সকল লোক দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। মিঃ স্বার্থডেল এজলাসে আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিচারালয়কে এবং জুরীগণকে অভিবাদন করিলেন।

সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি এই বার দণ্ডায়মান হইয়া জজ ও জুরী-দলকে মামলা বুঝাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি যে সরকারের অনুকূলে এই মামলা পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সার এডমণ্ড গম্ভীর ভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মাই লর্ড এবং জুরী মহোদয়গণ, দুঃখের সহিত আমাকে জানাইতে হইতেছে যে, আসামীর বিরুদ্ধে এই মামলা পরিচালিত করিবার জন্য অদ্য আমাকে 'পাবলিক প্রসিকিউটার'-রূপে দাঁড়াইতে হইল। আপনারা সকলেই জানেন, মাসাধিক কাল পূর্ব্বে মিঃ পিটার ট্রেন্টন সহসা অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে নিহত হইয়াছিলেন; কি ভাবে তিনি নিহত হইয়াছিলেন, আজ আমরা তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।"

অতঃপর তিনি মিঃ ট্রেনটনের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের বিষয় সবিস্তারে আলোচনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, "একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা (stiletto) মিঃ পিটার ট্রেনটনের বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার জীবনান্ত ঘটিয়াছিল। ঈর্ষ্যাই এই শোচনীয় দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি জজ ও জুরীদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার এই সিদ্ধান্ত তাঁহারা কি ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহাই বোধ হয় বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার পর তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "এই হত্যাকাণ্ড-সংক্রান্ত ঘটনাগুলিতে বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই। যে তরুণীকে আমরা এই মামলার আসামিরূপে পাইয়াছি, তাহার কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা সন্তোষজনক নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, যে আফিসের চাকরীতে সে প্রথমে নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই আফিসের মালিকের পুত্রের নিকট কোন গর্হিত প্রস্তাব উত্থাপন করায় তিনি তাঁহার পুত্রকে উহার প্রলোভন হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহাকে সেই চাকরী হইতে বিতাড়িত করিতে—"

পাবলিক প্রসিকিউটারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কৌন্সিলীর টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ার পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া আসামীর কৌন্সিলী জন গারসাইড উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি জজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাই লর্ড, আমি এই অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিতেছি। বাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌন্সিলী এই মাত্র আসামীর স্কন্ধে যে অপবাদের বোঝা চাপাইলেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ভ্রমপূর্ণ। আমার মক্কেল—"

জজ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "এই মামলা আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আপনি কয়েদীকে আসামীর কাঠরায় দাঁড় করাইতে ইচ্ছুক আছেন কি?"

"হাঁ, নিশ্চিতই তাহা করাইব মাই লর্ড।"

জজ বলিলেন, "উত্তম। ঐরূপ করা হইলে আপনি আপনার মক্কেলের অনুকূলে জুরীদের সকল কথাই বুঝাইবার যথেষ্ট সুযোগ পাইবেন।"

সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি অতঃপর ঈষৎ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "জুরী মহোদয়গণ, আমি আপনাদিগকে যে কথা বলিতেছিলাম, তাহা শেষ করিবার পূর্ব্বেই আসামীর পক্ষসমর্থনকারী আমার সুবিজ্ঞ বন্ধু আমার মুখে থাবা মারিয়া সে কথায় বাধা দেওয়াই সঙ্গত মনে করিলেন! কিন্তু আমি আপনাদিগকে এই কথাই বলিতেছিলাম যে, মিঃ ট্রেন্টনের নিকট এই আসামীর কৃতজ্ঞ থাকিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে, আসামী যখন তাঁহার নিকট চাকরীর প্রার্থনা করে—সে সময় সে তাঁহাকে সন্তোষজনক প্রশংসাপত্র প্রদর্শন করিতে না পারিলেও তিনি তাহাকে প্রচুর বেতনে দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"কিন্তু এই আসামী তাঁহার এইরূপ উদারতা, দয়া ও সুবিবেচনার বিনিময়ে তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? জুরী মহোদয়গণ, গভীর ক্ষোভের সহিত আপনাদিগকে ইহা জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, এই আসামী চাকরী আরম্ভ করিয়াই প্রতি পদে তাঁহাকে অসুবিধায় ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি আশা করি আপনাদিগের নিকট ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করিতে পারিব যে, এই আসামী যে দিন সর্ব্বপ্রথম মিঃ ট্রেন্টনকে দেখিতে পায়—সেই দিন হইতেই তাঁহাকে উদ্দাম প্রেমে অভিভূত করিবার চেষ্টা করে; তাঁহাকে প্রণয়ে মুগ্ধ করাই তাহার জীবনের [illegible] দাঁড়ায়! উহার ঐরূপ স্বার্থকলুষিত ব্যবহারে দিনের পর দিন তাঁহার জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

"এই তরুণী উক্ত চাকরীতে নিযুক্ত হইয়া যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিত, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জুরী মহোদয়গণ, আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগকে জানাইতেছি, উহার মনিব উহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে কোন দিন কার্পণ্য প্রকাশ না করায় উহার মন অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়াছিল।

"কিন্তু এই যুবতী একটি বিষয়ে সাংঘাতিক ভ্রম করিয়াছিল। উহার ধারণা হইয়াছিল—উহার মনিব উহার প্রতি প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ ঐ ভাবে উহার উপকার করিতেন। কিন্তু মিঃ ট্রেন্টন কোন দিন উহার প্রণয়ে প্রশ্রয়-দান করিয়াছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ আপনাদিগকে প্রদর্শন করিতে পারিব না; বরং উহার প্রণয়কে আমি এইমাত্র—"

সার এডমণ্ডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে দর্শকগণের গ্যালারি হইতে অসংযত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল; একটি যুবতী তাহার আসন হইতে সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবির দিকে সহাস্য মুখ প্রসারিত করিয়া বিদ্রূপভরে বলিল, "তুমি অতি নির্ব্বোধের ন্যায় কথা বলিতেছ। তোমার ঐ কথার কোন মূল্য নাই। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, লম্পট ট্রেন্টন কোন রমণীর প্রতি ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল না।"

তাহার এই মন্তব্য শুনিয়া আদালতের এক জন প্রহরী গর্জ্জন করিল, "চুপ রহ।"

জজ স্বার্থডেল সেই রমণীর হাস্যরঞ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া

প্রহরীকে আদেশ করিলেন, "ঐ স্ত্রীলোকটাকে আদালত হইতে বাহির করিয়া দাও। এরূপ ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য।"

এক জন সাংবাদিক ডেভিডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকটা কাউন্সিলিকে বেশ শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়াছে; জোঁকের মুখে নুণ পড়িয়াছে!"

এই মন্তব্য শুনিয়া সার এডমণ্ডের মুখ বিবর্ণ হইল। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সংযত করিতে সমর্থ হইলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমার কথা শুনিয়া আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—ঐরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় মিঃ ট্রেন্টন কি কারণে এই নির্লজ্জা স্ত্রীলোকটার সংস্রব ত্যাগ করেন নাই? আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।—এই যুবতীর প্রতি তাঁহার দয়াই ইহার একমাত্র কারণ। তিনি উহার অতীত জীবনের বিবরণ অবগত ছিলেন; তিনি জানিতেন, যদি উহাকে তাঁহার নিরাপদ আশ্রয় হইতে বিতাড়িত করেন, তাহা হইলে এই দুর্ভাগিনী আর কোন স্থানে ভাল চাকরী জুটাইতে পারিবে না, উহার অবশিষ্ট জীবন ব্যর্থ হইবে। এইরূপ করুণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি দীর্ঘকাল নীরবে উহার সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন।

"কিন্তু অবশেষে অবস্থা এরূপ সঙ্কটজনক হইয়াছিল যে, ঐ ভাবে আর অধিক দিন চলিবার উপায় ছিল না। মিঃ ট্রেন্টন উহার প্রেমের অভিনয় অসহ্য মনে করিয়া উহার কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য কিছু দিন প্যারিসে বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।"

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোন্ সময়, সার এডমণ্ড?"

সার এডমণ্ড বলিলেন, "মাই লর্ড, আমি সংবাদ পাইয়াছি—মিঃ ট্রেন্টন যে দিন তাঁহার শয়ন-কক্ষে বক্ষঃস্থলে ছোরা বিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছিলেন,—তাহার ঠিক দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

জজ তাহা লিখিয়া লইয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ।"

কৌন্সিলী বলিল, "মিঃ ট্রেন্টন তাঁহার এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে এই আসামীকে ভয়ানক উত্তেজিত দেখা গিয়াছিল। আমার এই উক্তি যে সত্য, তাহা সাক্ষীরাই আপনার নিকট প্রতিপন্ন করিবে। আসামীর মনে এই সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাহার মনিব আর এক জন স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্যই প্যারিসে গমন করিতে উৎসুক হইয়াছেন। বস্তুতঃ, উহার মন এই সন্দেহে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।"

এই সময় দর্শকের গ্যালারি হইতে আর একটি স্ত্রীলোক সার এডমণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আসামীর বিরুদ্ধে মামলাটি ত খোদা সাজাইয়াছ, দেখিতেছি!"

জজের আদেশে এই স্ত্রীলোকটিকেও বিচার-কক্ষ হইতে বিতাড়িত করা হইল।

সার এডমণ্ড মুখ বিকৃত করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "যে রাত্রিতে মিঃ ট্রেনটনের সহিত আসামী ঝগড়া করিয়াছিল, সেই রাত্রিতে একখানি পত্র উহার হস্তগত হইয়াছিল; পত্রখানি কোন স্ত্রীলোকের লিখিত। মিঃ ট্রেনটনের মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্যেই আসামী কোন কৌশলে সেই পত্রখানি সেখানে আনাইয়াছিল কি না, তাহা আমার অজ্ঞাত; তবে সে যে পুরুষের লিখিত একখানি পত্র পাইয়াছিল—ইহার প্রমাণ আছে, এবং আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে ইহাই আমি যথেষ্ট মনে করি। বলা বাহুল্য, আসামী সেই পত্রখানি তাহার মনিবকে দেখিতে দিয়াছিল।"

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই পত্র কি আদালতে দাখিল করা হইবে?"

সার এডমণ্ড বলিলেন, "মাই লর্ড, আসামীর বিজ্ঞ কৌন্সিলী এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।"

জজ জন গারসাইডের মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

জন গারসাইড উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মাই লর্ড, আমি জানিতে পারিয়াছি, সেই পত্র নষ্ট করা হইয়াছে।"

জজ বলিলেন, "আপনার আর কি বলিবার আছে বলুন সার এডমণ্ড!"

সার এডমণ্ড বলিলেন, "এই বার আমি উক্ত দুর্ঘটনার রাত্রিতে কি ঘটিয়াছিল তাহারই আলোচনা করিব। জুরী মহোদয়গণ, কয়েকটি জরুরী ঘটনার প্রতি আপনাদিগকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। আমার প্রথম কথা এই যে, সেই রাত্রিতে মিঃ ট্রেনটনের ফ্ল্যাটে আসামীর গমন করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, আমি জানিতে পারিয়াছি, সেই দিন অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় মিঃ ট্রেনটন আসামীকে জানাইয়াছিলেন—তিনি সে দিন সন্ধ্যার পর শয়ন করিতে যাইবেন, সুতরাং সে রাত্রে তাহার সেখানে উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে আমি বিচারপতিকে জানাইতে চাহি যে, যে সময় মিঃ ট্রেনটনের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল—সেই সময় তাঁহার পরিধানে পায়জামা ও গাউন ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদ ছিল না।

"এই স্থলে আমি এ কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি যে, মিঃ ট্রেনটন কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলেও আসামী সেই রাত্রিতে তাঁহার কার্জ্জন ষ্ট্রীটস্থ ফ্ল্যাটে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, আসামী রাত্রি পৌনে আটটার সময় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহার পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে মিঃ ট্রেন্টনকে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

"এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে সেখানে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই; সুতরাং কেহই তাহার সাক্ষী নাই। কিন্তু সেই সময় কি ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝিবার জন্য অধিক কল্পনা-শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। আসামীর নিকট মিঃ ট্রেনটনের ফ্ল্যাটের যে চাবি ছিল, সেই চাবির সাহায্যে সে ফ্ল্যাটের দ্বার খুলিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছিল। সে প্রথমে মিঃ ট্রেনটনকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে, তাহার পর লিখিবার টেবিলের যে দেরাজে ইটালীয়ান ছোরাখানি থাকিত, দেরাজ খুলিয়া আসামী সেই ছোরা বাহির করিয়া লইয়াছিল, এবং ক্রোধান্ধ হইয়া সেই ছোরার আঘাতে মিঃ ট্রেনটনকে হত্যা করিয়াছিল।

"সেই ছোরার হাতলে আসামীর অঙ্গুলি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, সাক্ষী দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইবে।"

সরকার পক্ষের কৌন্সিলী এই সকল কথা বলিয়া উপসংহারে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পর তাঁহার আসনে উপবেশন করিলে দর্শকগণের মধ্যে পুনর্ব্বার গুঞ্জন-ধ্বনি আরম্ভ হইল। সকলেই অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল, "ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলী আসামীর প্রতিকূলে যে-সকল কথা বলিলেন, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে;

এই আসামীই মিঃ ট্রেনটনকে গোপনে হত্যা করিয়াছে। এ অবস্থায় তাহার মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।"

সপ্তম পল্লব

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর জেরা

অতঃপর সার এড্‌মণ্ড ব্যাটার্সবি ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী মিঃ জর্জ্জ ম্যালরিকে আহ্বান করিয়া সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিতে বলিলেন, তদনুসারে মিঃ ম্যালরি সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া যথানিয়মে হলপ করিলেন।

সার এডমণ্ড বলিলেন, "মিঃ ম্যালরি, আমার বিশ্বাস, মেসার্স কার্সন এণ্ড ম্যালরি নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের আপনিই 'সিনিয়র পার্টনার'।"

"হ্যাঁ, এ কথা সত্য।"

"গত পাঁচ বৎসর হইতে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মৃত মিঃ পিটার ট্রেন্‌টনের উপন্যাস সমূহ প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে?"

"হ্যাঁ, আমরাই তাহা প্রকাশ করিয়াছি।"

সার এডমণ্ড এবার বলিলেন, "গত ১ই অক্টোবর রাত্রিকালে কিরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ আপনি এই আদালতে বিবৃত করিবেন কি?"

মিঃ ম্যালরি বলিলেন, "মিঃ ট্রেনটনের শেষ নভেলখানির পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় আমার দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। তিনি টেলিফোনে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন—নির্দ্দিষ্ট দিনে এই নভেলের পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হইবে; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় আমার ইচ্ছা হইল, ১ই অক্টোবর রাত্রিকালে আমি তাঁহার ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিব।"

"মিঃ ম্যালরি, আপনি কি সেইরূপই করিয়াছিলেন?"

"হ্যাঁ, ১ই অক্টোবর রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমি তাঁহার ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়াছিলাম।"

"কে আপনাকে সেই ফ্ল্যাটের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল?"

সাক্ষী আসামীর কাঠরার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মিস্ ওলিভিয়া ডেন। আসামী আমাকে দেখিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিয়াছিল—মিঃ ট্রেনটনের অবস্থা অতি ভীষণ!"

"তাহার পর আপনি কি করিলেন?"

"আমি তাহার পাশ দিয়া বসিবার ঘরে উপস্থিত হইলাম।"

"সেখানে আপনি কি দেখিতে পাইলেন?"

এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বিচারককে বলিলেন, "আমি মিঃ ট্রেনটনকে পায়জামা পরিধান করিয়া পড়িয়া-থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল না।" তিনি নিহত হইয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

সার এডমণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "মিস্ ডেন কি ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিল?"

সাক্ষী ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার স্মরণ হইতেছে—আসামী আমাকে বলিয়াছিল, সে কিছু কাল পূর্ব্বে সেই ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইলে মিঃ ট্রেনটন তাহাকে সেই দিনের একখানি সান্ধ্য সংস্করণের দৈনিক আনিতে আদেশ করেন। তদনুসারে সে সেই কাগজ সংগ্রহ করিতে বাহিরে যায়। সে হ্যামিল্‌টন প্লেসের মোড়ে উপস্থিত হইয়াছিল কারণ সে জানিত এক জন সংবাদপত্র-বিক্রেতা সেই স্থানে সংবাদপত্র বিক্রয় করে। সে তাহার নিকট হইতে একখানি কাগজ কিনিয়া লইয়া মিঃ ট্রেনটনের ফ্ল্যাটে প্রত্যাগমন করে। সে সেখানে ফিরিয়া আসিয়া মিঃ ট্রেনটনকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পায়। একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আমূল প্রোথিত ছিল। সেই আঘাতেই তিনি নিহত হইয়াছিলেন।"

"আপনি কি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সে কতক্ষণ সেই ফ্ল্যাটের বাহিরে ছিল?"

"হ্যাঁ, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে আসামী বলিয়াছিল—সে দশ বারো মিনিটের অধিক কাল সেই ফ্ল্যাটের বাহিরে ছিল না।"

এবার সার এডমণ্ড সাক্ষীকে বলিলেন, "মিঃ ম্যালরি, অতঃপর আপনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন আদালতকে তাহা জানাইবেন কি?

সাক্ষী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া দুই-তিন মিনিট কাল আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাহার পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পুলিশকে টেলিফোনে আহ্বান করি।"

জজ এ-কথা শুনিয়া মাথা তুলিয়া বলিলেন, "এই কার্য্য বেশ সঙ্গতই হইয়াছিল মিঃ ম্যালরি!"

ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলী সাক্ষীকে বলিলেন, "তাহার পর পুলিশ আসিলে আপনি এজাহার দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন কি?"

সাক্ষী বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সেইরূপই করিয়াছিলাম।"

সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি তাঁহার আসনে উপবেশন করিলে আসামী পক্ষের কৌন্সিলী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঃ ম্যালরি, আপনি যখন সেই ফ্ল্যাটে উপস্থিত ছিলেন, সেই সময় আপনি সেখানে কি কোন সংবাদপত্র দেখিয়াছিলেন?"

"হ্যাঁ, কৌচের হাতার উপর কাগজখানি পড়িয়াছিল।"

আসামীর কৌন্সিলী বলিলেন, "যদি বলি, কাগজখানি দেখিয়া আপনার মনে হইয়াছিল তখন পর্য্যন্ত তাহার ভাঁজ খোলা হয় নাই, তাহা হইলে সে কথা কি অসঙ্গত হইবে?"

"না, অসঙ্গত হইবে না।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "তাহা হইলে আসামী যাহা বলিয়াছে—অর্থাৎ সে একখানি সান্ধ্য সংস্করণের কাগজ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ফ্ল্যাট ত্যাগ করিয়াছিল—তাহার এই কথা মিথ্যা—আপনি এরূপ মনে করিবার কোন কারণ পান নাই?"

"না।"

"মিঃ ম্যালরি, আপনাকে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করিব। কোন শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না তরুণী সহসা কোন ভীষণ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সম্মুখীন হইলে যেরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িত, উক্ত দৃশ্যে মিস্ ডেনের সেইরূপ বিহ্বল হওয়া কি স্বাভাবিক বলিয়াই আপনার মনে হয় না?"

"হ্যাঁ, স্বাভাবিক বটে।"

জন গারসাইড উপবেশন করিতে উদ্যত হইয়া সাক্ষীকে বলিলেন, "মিঃ ম্যালরি, কেবল ঐ কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল।"

তাঁহার কথা শুনিয়া ডেভিডের ধারণা হইল, জন যদি এই ভাবে মামলাটি শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে পারেন, তাহা হইলে বাদী পক্ষের কৌন্সিলীর জয়লাভের চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা অল্প।

* * * *

সার জোসেফ মাইগুমে পনীরের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তেমন মাতব্বর লোক বলিয়া মনে হইত না। তিনি সাক্ষীর কাঠরায় উঠিয়া হলপ করিলে সার এড্‌মণ্ড ব্যাটার্সবি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম সার জোসেফ মাইগুমে?"

সাক্ষী খন্‌খনে আওয়াজে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাহাই বটে।"

"এই মামলার আসামী কত দিন আপনার নিকট চাকরী করিয়াছিল?"

সাক্ষী বলিলেন, "আসামী ঠিক এক মাস আমার নিকট চাকরী করিয়াছিল। তাহার কাজ-কর্ম্মে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ হইয়াছিল। আমার পুত্রের প্রতি তাহার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।"

সরকার-পক্ষের কৌন্সিলী অতঃপর প্রশ্ন করিলেন, "সার জোসেফ, আপনার যাহা বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া বলুন। আপনি কি বলিতে চাহেন। আসামীর চরিত্রদোষের জন্য আপনার নিকট অভিযোগ করা হইয়াছিল?"

সাক্ষী কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "না, আমি ঠিক সে কথা বলিতে চাহি না। তবে মিস্ ডেন তাহাকে ডিনার খাইতে লইয়া যাইবার জন্য আমার পুত্রকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করিত।"

প্রশ্ন হইল, "আসামীর এইরূপ ব্যবহার আপনার পুত্রের প্রীতিকর হয় নাই?"

"না, নিশ্চিতই প্রীতিকর হয় নাই।"

"আপনার পুত্রের অভিযোগে আপনি তৎক্ষণাৎ উহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন?"

"হ্যাঁ, তাহাই করিয়াছিলাম।"

সাক্ষী অতঃপর সাক্ষীর কাঠরা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় আসামীর কৌন্সিলী জন গারসাইড উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—

"এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করুন সার জোসেফ!"

সাক্ষী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ গারসাইড বলিলেন, "আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনার চরিত্রবান্ পুত্র মরিসকে শীঘ্রই একটি চুক্তিভঙ্গের মামলার আসামী হইতে হইবে। তাহার বিরুদ্ধে ফিলিস্ সুইনটন নাম্নী একটি নর্ত্তকীর এই অভিযোগ। এ সকল কথা সত্য কি না আপনি বলুন।"

সাক্ষী জজের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

জজ বলিলেন, "আপনাকে নিশ্চিতই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে সার জোসেফ!"

সাক্ষী মৃদু স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, এ কথা সত্য।"

"এবং এ কথাও কি সত্য যে, নয় মাস পূর্ব্বে আপনার পুত্র মরিস্ মাইগুমে লণ্ডন হইতে ব্রাইটনের পথে রেলের প্রথম শ্রেণীর কামরায় একটি তরুণীর সম্ভ্রমহানির অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছিল?"

সাক্ষী জজকে লক্ষ্য করিয়া ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "বিচারপতির নিকট আমার প্রার্থনা—"

আসামীর কৌন্সিলী উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর চাই মহাশয়!"

বিচারপতি মিঃ স্বার্থডেন দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে সার জোসেফ!"

সাক্ষী মৃদু স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, এ কথা সত্য।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "অতঃপর আপনার পুত্র লণ্ডনের কোন পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নীত হইলে সেই ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার কুড়ি পাউণ্ড জরিমানা করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য?"

সাক্ষী অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ সত্য।"—তাঁহার কণ্ঠস্বর সেই কক্ষে উপস্থিত অতি অল্প লোকেরই কর্ণগোচর হইল।

কৌন্সিলী বলিলেন, "আর একটিমাত্র প্রশ্ন সার জোসেফ!—আপনার কার্য্যালয়ে যে সকল তরুণী নানা কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের কেহ কেহ কি আপনার পুত্রের দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট অভিযোগ করে নাই? আপনি 'হ্যাঁ' বা 'না' বলিয়া এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দান করুন।"

সাক্ষী নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া জজ বলিলেন, "আপনাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

সাক্ষী ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ, ঐরূপ অভিযোগ কখন কখন পাইয়াছি বটে।"

আসামী পক্ষের কৌন্সিলী বলিলেন, "সাক্ষীকে আমার আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নাই।" তিনি উপবেশন করিলেন। দর্শকগণের গ্যালারি হইতে তাঁহার প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল।

প্রহরী চিৎকার করিয়া বলিল, "চুপ রহ।"

* * * *

পরবর্ত্তী সাক্ষী ভিক্টর সোয়ানেস। ডেভিড গারসাইড কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সোহোর একটি ভোজনাগারে তাহার বক্তব্য সকল কথাই শুনিয়াছিল। সোয়ামেস সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া যথারীতি হলপ পাঠ করিল।

সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি তাহার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলে দেখা গেল—আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাঁহাকে যেরূপ প্রফুল্ল দেখা গিয়াছিল, তাঁহার সেই প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইয়াছে।

তিনি সাক্ষীকে প্রশ্ন করিলেন, "কত দিন তুমি মিঃ ট্রেনটনের নিকট চাকরী করিয়াছিলে?"

"দুই বৎসরের অধিক কাল।"

"তুমি মিঃ ট্রেনটনের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলে, এ কথা কি সত্য?"

"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্য, সার এডমণ্ড! আমার মনে হয়, আমি ঐ

কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, মিঃ ট্রেনটন আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং আমিও তাঁহার অনুরক্ত ছিলাম।"

"সোয়ামেস, এইবার আমি তোমাকে একটি অত্যন্ত জরুরী কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই মামলার আসামী যত দিন তোমার মনিবের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিল, সেই সময় কোন দিন কি তিনি তাহার চরিত্র অথবা ব্যবহার সম্বন্ধে তোমার নিকট কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন?"

"মিঃ ট্রেনটন আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই তরুণী তাঁহাকে প্রণয়ে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এ জন্য তিনি কি করিবেন—তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।"

ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলী তাঁহার ফাইলের কাগজপত্র পরীক্ষার পর মাথা তুলিয়া বলিলেন, "এইবার আমরা গত ২৬এ সেপ্টেম্বর তারিখের রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। সেই সকল ঘটনার কথা তোমার স্মরণ হয় কি?"

সাক্ষী উৎসাহভরে বলিল, "হাঁ, সেই রাত্রির সকল ঘটনার কথা আমার উত্তম স্মরণ আছে।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "তোমার যখন তাহা উত্তমরূপে স্মরণ আছে, তখন সেই রাত্রে সেখানে কি ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি বোধ হয় হাকিমকে খুলিয়া বলিতে পারিবে।"

সাক্ষী বলিতে লাগিল, "সেই দিন বিকালের ডাকে মিস্ ডেনের নামে একখানি পত্র আসিলে সেই পত্রখানি আমিই উহাকে দিতে গিয়াছিলাম। সেই সময় ফ্ল্যাটের দ্বার বন্ধ থাকায় আমি দ্বারে ধাক্কা দিয়াছিলাম; কিন্তু তখন আমার মনিবের সঙ্গে মিস্ ডেন এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে ঝগড়া করিতেছিল যে, উহাদের কেহই আমার কথা শুনিতে পায় নাই।"

কৌন্সিলী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই সময় আসামী তোমার মনিবকে কি কথা বলিয়াছিল তাহা কি তুমি হাকিমকে বলিবে? তুমি সেই ঘরে আসিয়া আসামীকে কি কথা বলিতে শুনিয়াছিলে?"

সাক্ষী বলিল, "আসামী মিঃ ট্রেনটনকে বলিয়াছিল, 'যদি তুমি আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে খুন করিব।' আমি মনিবের সম্মতিক্রমেই সেই কামরায় উপস্থিত থাকিয়া আসামীকে এ-কথা বলিতে শুনিয়াছিলাম।"

সাক্ষীর কথা শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইল,—যেমন সেই কক্ষে বোমা ফাটিল!

কৌন্সিলী বলিলেন, "এই বিরোধের মূল কারণ কি—তাহা কি তুমি ধারণা করিতে পারিয়াছিলে?"

"আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, মিঃ ট্রেনটন আসামীকে বলিয়াছিলেন, তিনি প্যারিসে যাইবেন; তাহা শুনিয়াই আসামী তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতেছিল।"

"তুমি যে সময় সেই কক্ষে ছিলে, সে সময় কি আর কোন ঘটনা ঘটিয়াছিল?"

"হাঁ, আসামী আমার মনিবকে একখানা পত্র দেখাইয়াছিল।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "তুমি তাহাকে যে পত্র আনিয়া দিয়াছিলে, উহা কি সেই পত্র? সেই পত্রের লেফাফায় যে নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল—তাহা কি কোন পুরুষের হস্তাক্ষর?"

"হাঁ, উহা পুরুষের হস্তাক্ষর বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল।"

সরকার পক্ষের কৌন্সিলী উপবেশন করিলে সাক্ষী আসামী[illegible] কৌন্সিলীর জেরায় কি বলে তাহা শুনিবার জন্য সকলেই উ[illegible] হইয়া রহিল।

জন গারসাইড সাক্ষীর জেরা আরম্ভ করিলেন; তিনি বলিলেন "শোন সোয়ামেস, আমি বলিতে চাহি যে, তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যা সা[illegible] দিয়াছ! আমার বিজ্ঞ বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে তুমি বলিয়াছ— তোমার মনিব তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, ইহা কি সত্য?"

সাক্ষী বলিল, "হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য।"

"তুমি হলপান সাক্ষ্য দিয়াছ যে, যে সময় মিস্ ডেনের স[illegible] তোমার মনিবের কলহ চলিতেছিল, সেই সময় তিনি তোমাকে [illegible] কক্ষে থাকিতে দিয়াছিলেন—তোমার এ কথায় কতটুকু সত্য আছে?"

সাক্ষী বলিল, "আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, সেই সম[illegible] আমি সেই কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। ইহা হইতেই আপনি বুঝি[illegible] পারিবেন আমার কথা সত্য কি না।"

"তুমি কি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পার—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা[illegible] কলহ চলিয়াছিল—ততক্ষণ তুমি সেই কক্ষেই উপস্থিত ছিলে?"

"হাঁ, তাহাই বলিতেছি। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।"

"কিন্তু এই বিচারালয়ে এখন এরূপ এক ব্যক্তি উপস্থিত আছে —যিনি হলপ করিয়া বলিতে প্রস্তুত—তুমি তাঁহাকে বলিয়াছি[illegible] তুমি সত্যই সেই কক্ষে উপস্থিত ছিলে না,—তুমি দ্বারের বাহি[illegible] থাকিয়া আড়াল হইতে সকল কথা শুনিয়াছিলে! আমার এ ক[illegible] শুনিয়া তুমি কি বিস্মিত হইবে না?"

সাক্ষী উভয় হস্তে সাক্ষীর কাঠরার রেলিং চাপিয়া ধরিয়াছি[illegible] জন গারসাইডের এই প্রশ্নে তাহার হাত দুইখানি কাঁপিতে লাগিল সে নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

জজ কৌন্সিলীকে বলিলেন, "আপনি কি সেই সাক্ষীর জবানবন্দী লইবেন মিঃ গারসাইড?"

কৌন্সিলী বলিলেন, "প্রয়োজন হইলে লইতে পারি; কিন্তু বর্তমা[illegible] সাক্ষীর জেরা শেষ হইলে সম্ভবতঃ তাহার প্রয়োজন হইবে না।"

অনন্তর কৌন্সিলী সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কা[illegible] মিঃ ট্রেনটনের চাকরী ছাড়িয়াছিলে—হাকিমকে তাহা [illegible] বলিবে কি?"

সাক্ষী অনিচ্ছাভরে বলিল, "মত-বিরোধের জন্য আমি [illegible] চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আমি কোন কোন বিষয়ে [illegible] সহিত একমত হইতে পারি নাই।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "মত-বিরোধের জন্য চাকরী ছাড়িয়াছিলে! তবে কি এ কথা সত্য নহে, তোমার চুরি করিবার অভ্যাস থাকা[illegible] মিঃ ট্রেনসন তোমাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছিলেন?"

সাক্ষী হাত কচ্লাইতে কচ্লাইতে বলিল, "হাঁ, মিঃ ট্রেনটন আমাকে তাড়াইবার জন্য ঐরূপ অছিলাই করিয়াছিলেন ব[illegible] কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমি কোন দিন তাঁহার কোন [illegible] চুরি করি নাই।"

"কিন্তু সোয়ামেস, তুমি চোর, চুরি করিয়া তুমি জেল খাটিয়াছিলে এ কথা কি অস্বীকার করিতে পার? তুমি চুরি করিয়া কয়েক বার জেল খাটিয়াছিলে—এ কথা কি সত্য নহে?"

সাক্ষী মাথা চুল্‌কাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, সত্য।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "আর একটা প্রশ্নের উত্তর চাই! তুমি কি এখনও বলিবে, আসামীর সহিত তোমার মনিবের কলহের সময় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তুমি সেই কক্ষে উপস্থিত ছিলে?"

সাক্ষী নির্ব্বাক্। সে মুখ চূণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জজ বলিলেন, "এ প্রশ্নের উত্তর দাও।"

সাক্ষী তথাপি নিরুত্তর।

মিঃ গারসাইড উত্তরের জন্য সাক্ষীকে আর পীড়াপীড়ি না করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল।

* * * *

অতঃপর পুলিশের প্রধান সাক্ষী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর উইলিয়ম মরিসন সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া বলিলেন, "দুর্ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমি উক্ত ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববর্তী সাক্ষী মিঃ জর্জ্জ ম্যালরির জবানবন্দী ও আসামীর এজাহার গ্রহণ করিলাম। তৎপূর্ব্বেই আমি আসামীকে যথানিয়মে সতর্ক করিয়াছিলাম। তাহার পর আমি মিঃ ট্রেনটনের মৃতদেহ পরীক্ষা করি। তাঁহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। যে ছোরার ফলা মিঃ ট্রেনটনের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ ছিল, তাহা তাঁহারই ছোরা বলিয়া পরে সনাক্ত করা হইয়াছে।"

সরকার পক্ষের কৌন্সিলী পুনর্ব্বার উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাক্ষীকে প্রশ্ন করিলেন, "যে ছোরার আঘাতে মিঃ ট্রেনটন নিহত হইয়াছিলেন, আমার বিশ্বাস, তাহা ইটালীয়ান 'ষ্টিলেটো' (Stiletto)। আপনি কি তাহার হাতলে অঙ্গুলি-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ইন্‌স্পেক্টর?"

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন বলিলেন, "আমি সেই ছোরার হাতলে যে অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিয়াছিলাম, আসামীর অঙ্গুলি-চিহ্ন পরীক্ষা করিয়া এই উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই নাই।"

অতঃপর সে দিন বিচার-কার্য্য বন্ধ করিয়া জজ এজলাস ত্যাগ করিলেন। [ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

ইতিহাসের অনুসরণ

বামনী না বহমানি ?

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন হাসান গাঙ্গু বামনী দাক্ষিণাত্যের বামনী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-নাম ছিল জাফর খাঁ; কিন্তু দেবগিরি দখল করিয়া তিনি আলাউদ্দীন হাসান গাঙ্গু বামনী এই নাম গ্রহণ করেন। এখন তাঁহার এই গাঙ্গু বামনী নাম লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। কেহ বলেন, তিনি গাঙ্গু পণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন; সেই জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব প্রভুর নামের সহিত নিজের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন। আর এক দল লোক বলেন যে, তিনি পারস্যের সমনী রাজ্যের রাজবংশের বহমন ও ইসফন্দিয়ার বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার নামের সহিত বহমানি নাম সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ কথাটি সত্য, তাহা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কি বলেন, সেই কথার আমরা আলোচনা করিব।

তারিখ-ই-ফেরিস্তা বলেন যে, হাসান বাল্যকালে গাঙ্গু পণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর ভৃত্য ছিলেন। এই গাঙ্গু পণ্ডিত দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তুঘলকের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। গাঙ্গু পণ্ডিতের কৃষিক্ষেত্রে হাসান এক দিন হলচালনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার লাঙ্গলের মুখে একটি লোহার শৃঙ্খল ঠেকিল। বিস্মিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, শৃঙ্খলের উভয় মুখই মাটীর মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে তিনি একটি তাম্রের কলস পাইলেন। ঐ কলস সুবর্ণে পূর্ণ ছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি ঐ সুবর্ণ-পূর্ণ তাম্র-পাত্রটি প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন; তাঁহার সাধুতা এবং সরলতা দেখিয়া গাঙ্গু পণ্ডিত অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি সেই কথা দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তুঘলককে বলেন এবং হাসানকে বাদশাহের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। মহম্মদ তুঘলক তাঁহার সাধুতার কথা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ এক শত অশ্বারোহী সেনার নায়কের পদ প্রদান করিলেন। ইহার পর হাসান সম্বন্ধে গাঙ্গু পণ্ডিত এই ভবিষ্যৎ-বাণী করেন যে, তিনি এক সময়ে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। সেই সঙ্গে তিনি হাসানকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লন যে, তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে গাঙ্গু পণ্ডিতকে তাঁহার রাজস্ব-সচিব করিবেন এবং তাঁহার নামের সহিত গাঙ্গু পণ্ডিতের নাম সংযুক্ত করিবেন। সেই জন্য যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন নাম লইলেন হাসান গাঙ্গু বামনী।

ফেরিস্তা আরও বলিয়াছেন—কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, হাসান পারস্যের সমনী রাজগণের বংশধর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফেরিস্তা এ কথাও বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে এই বংশধারার কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তাঁহার তোষামোদকারীরা তাঁহার এই বংশধারা রচনা করেন। তাঁহার বংশধারার পরিচয় এইরূপ—"আলাউদ্দীন হোসেন গাঙ্গু বহমানি পিতার নাম কৈকায়ুস্। কৈকায়ুসের পিতার নাম মহম্মদ। মহম্মদের পিতার নাম আলী। আলীর পিতার নাম হাসান। হাসানের পিতার নাম সহস্। সহসের পিতার নাম সিমুন। সিমুন ছিলেন সালমের পুত্র। সালম্ ছিলেন ইব্রাহিমের পুত্র। ইব্রাহিম ছিলেন নসীরের পুত্র। নসীর ছিলেন মনসুরের পুত্র। মনসুরের পিতা রোস্তম্। রোস্তমের পিতার নাম কৈকোবাদ। কৈকোবাদের পিতার নাম মিনুচির। মিনুচিরের পিতার নাম নামদার। নামদার ছিলেন ইস্‌ফান্দিয়ারের পুত্র। ইস্‌ফান্দিয়ারের

পিতার নাম কৈয়ুমার। কৈয়ুমারের পিতার নাম খুরসিদ ইত্যাদি বংশ-লতা ধরিয়া তাঁহাকে ইস্ফান্দিয়ারের বহমনের বংশধর ঠিক করিয়াছেন।" ফেরিস্তা বলিয়াছেন—"এই বংশ-লতায় আস্থা স্থাপন করা যায় না।" হাসান সম্বন্ধে তাজকীরাট্‌-উল্‌মুলুক এইরূপ একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এক দিন হাসান ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষচ্ছায়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে এক প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ মুখে সবুজবর্ণ একটি ঘাস লইয়া তাঁহার দেহ হইতে মাছি তাড়াইতেছিল। তিনি জাগিয়া উঠিবা মাত্র সাপটি মাথা নীচু করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। গাঙ্গু পণ্ডিত এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি এ-ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। হাসানকে তিনি বলিলেন, তোমার ভাগ্যে খুব বড় সম্মান রহিয়াছে। তাহার পর তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক তাহার বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "যখন তুমি রাজা হইবে, তখন আমাকে উচ্চপদ প্রদান করিবে এবং তোমার নামের সহিত আমার নাম সংযুক্ত করিয়া দিবে;" অর্থাৎ তিনি যখন কোন ফার্ম্মানে স্বাক্ষর করিবেন, তখন তাঁহার নামের সহিত বামনী নামটি জুড়িয়া দিবেন। এই গ্রন্থে হাসান যে গাঙ্গু পণ্ডিতের ভৃত্য ছিলেন এরূপ কথা নাই।

তবকুরাট্‌-ই-আকবরি নামক গ্রন্থে গাঙ্গু পণ্ডিতের নাম দেখা যায়। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, গাঙ্গু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, হাসান এক সময়ে রাজা হইবেন। কিন্তু তিনি যে গাঙ্গু পণ্ডিতের ভৃত্য ছিলেন, এমন কথা ঐ গ্রন্থে নাই। কাফি খাঁ তাঁহার মোন্তাখাঁবুল-লুবাব গ্রন্থে ফেরিস্তা যাহা বলিয়াছেন তাহাই বলিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া সহজেই মনে হয় যে, গাঙ্গু পণ্ডিত নামক এক ব্যক্তি সত্য সত্যই হাসানের রাজত্ব-লাভের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন, তাহা সত্য। কিন্তু বহু ঐতিহাসিক সম্প্রতি ইহাতে এই আপত্তি তুলিতেছেন যে, হাসান শাহের নামের সহিত ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী এরূপ কথা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রিগস্‌ সাহেব তাঁহার ফেরিস্তা নামক গ্রন্থে ২১৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে—"**The appellation of Bahmani he (Hasan) certainly took cut cf compliment to his master Gangu, the Brahman, a word often pronounced 'bahman'**" অর্থাৎ বামনী এই অভিখ্যা তাঁহার প্রভু গাঙ্গুর প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ব্রাহ্মণ' এই কথাটি সচরাচর 'বামন' বলিয়া উচ্চারিত হয়।" মিষ্টার ব্রিগসের এই কথার আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বাঙ্গালা দেশে শতকরা ১০ জন লোক ব্রাহ্মণকে বামন বলিয়া থাকেন! দাক্ষিণাত্যে এইরূপ উচ্চারণ হয়, শুনিতে পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন তাঁহারা প্রায় বামন বলিয়া থাকেন, বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকেরা উহা যে বামনই বলিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং হাসানের নামের সহিত ব্রাহ্মণ না থাকিয়া বামন লেখা অস্বাভাবিক নয়। সত্য বটে, ফারসী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে ব্রাহ্মণ এই শব্দটি স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এ কথা সপ্রমাণ হয় না যে, 'বামন' এই শব্দটি গাঙ্গু ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থে গৃহীত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, জনৈক মুসলমান রাজা যে তাঁহার উপকারী ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য বামনি বা ব্রাহ্মণী এই নামটি তাঁহার বংশ-ধারার সহিত জুড়িয়া দিবেন, ইহা দেখিলেও প্রত্যয় হয় না। তিনি বড় জোর তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে একটি উচ্চপদ দিয়া সম্মানিত করিতে পারেন। হাসান শাহ যে গাঙ্গু ব্রাহ্মণকে দেওয়ান বা রাজস্ব-সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কোন ঐতিহাসিকই সে কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু গাঙ্গু যদি সেই দুঃসময়ে হাসান শাহকে এই প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার নামের সহিত গাঙ্গুর নাম সংযুক্ত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে তিনি কেন তাহা করিবেন না, তাহা বুঝিতে পারি না। সকলই যে দুঃসময়ে কৃত প্রতিজ্ঞা সুসময়ে ভুলিয়া যায়, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। সেই আমাদের বিশ্বাস—হাসান প্রথমেই গাঙ্গু ব্রাহ্মণ এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি বা তাঁহার বংশধরেরা উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া বহমানি এই পারস্য অভিখ্যায় পরিণত করেন। সে কথা আমরা পরে বলিতেছি।

সকল মুসলমান ঐতিহাসিক অবশ্য গাঙ্গু ব্রাহ্মণের কথা উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু যাঁহারা সে কথা উল্লেখ করেন নাই, তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, দুরবস্থায় পতিত এবং অজ্ঞাত-কুলশীল হাসান শাহ এক সময়ে রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবেন, ইহা অনেকেই জানিতেন। বুরহানি মায়াশির নামক গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন যে, মহম্মদ তোঘলকের রাজত্বকালে হাসান দিল্লীতে গমন করেন। তিনি সে সময় যে পারস্যের উচ্চ রাজবংশসম্ভূত, এমন কথা প্রকাশ করেন নাই। তিনি উহা প্রকাশ না করিয়াই মহম্মদ তোঘলকের অধীনে চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি এই সামান্য চাকরী করিতেন, সে সময়ে দিল্লীর স্বনামধন্য নিজামুদ্দীন মহম্মদ তোঘলকের সম্মানের জন্য একটি বড় রকমের ভোজ দিয়াছিলেন। ভোজ-শেষে মহম্মদ তোঘলক চলিয়া গান। তিনি চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরে হাসান নিজামুদ্দীনের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভৃত্য সে কথা শেখ নিজামুদ্দীনকে জানাইয়াছিল। শেখ নিজামুদ্দীন সে কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এক জন নরপতি চলিয়া গেলেন; আর এক জন দ্বারদেশে উপস্থিত। তাঁহাকে ভিতরে আনো।" এই কথা শুনিয়া ভৃত্য হাসানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে শেখ নিজামুদ্দীনের নিকট উপস্থিত করিল। নিজামুদ্দীন তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিলেন এবং বলিলেন যে, এক সময়ে তিনি রাজা হইবেন। এই কথায় হাসানের মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি যে রাজা হইবেন, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। তিনি মনে মনে উহা সফল করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বুরহানি মায়াশির গ্রন্থের লেখক গাঙ্গু পণ্ডিতের কথা এ... আমল দিতে চাহেন নাই। তিনি হাসান শাহের পারস্যের ... প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ... বর্ণিত আখ্যায়িকায় এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা পা... তিনি যে আসল তথ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ... ভাবে প্রতিপন্ন হয়। প্রথমে শেখ নিজামুদ্দীন এক জন ... জ্যোতিষী ছিলেন না। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের ... উল্লেখ কোথাও নাই। বিশেষতঃ হাসান শাহ কাহারও নিকট তাহার বংশ-পরিচয়ের কথা আকারে-ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন নাই।

এরূপ অবস্থায় হাসান শাহ যে ভবিষ্যতে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহা তিনি কিরূপে বুঝিয়াছিলেন ? নিজামুদ্দীন সম্ভবতঃ গাঙ্গু পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথাই শুনিয়া থাকিবেন। নতুবা তিনি এক জন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে পরম সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া রাজভোগ খাওয়াইবেন কেন ? দ্বিতীয়তঃ, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, গাঙ্গু তো কাহারও নাম হয় না। গঙ্গা নাম অনেকের থাকে। সম্ভবতঃ হাসান শাহের প্রাথমিক জীবনের প্রভু গাঙ্গু পণ্ডিতের নাম গঙ্গাধর পণ্ডিত বা গঙ্গাচরণ পণ্ডিত অথবা ঐরূপ গঙ্গাযুক্ত কোন নাম ছিল। লোকে তাঁহাকে গঙ্গা পণ্ডিত বলিত। মুসলমান লেখকগণ এই গঙ্গা পণ্ডিতের নামটি বিকৃত করিয়া গাঙ্গু পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন। সে জন্য গাঙ্গু পণ্ডিতের কোন অস্তিত্ব ছিল না, এ সিদ্ধান্ত কোন মতেই করা যাইতে পারে না। ইহা ভিন্ন মুসলমান-লিখিত কোন কোন ফারসি গ্রন্থে গঙ্গা পণ্ডিতের নাম থাকিলেও হাসান শাহ যে গঙ্গা পণ্ডিতের ভৃত্য ছিলেন, এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া ফেরিস্তা-কথিত কাহিনীই বা অস্বীকার করা যায় কি করিয়া ? মানুষের অবস্থা ভাল হইলে অনেকে তাহাদের অতীত জীবনের কথা চাপা দিবার চেষ্টা করেন। অতীত জীবনের দুরবস্থার কথা অনেকে যে চিত্তদৌর্ব্বল্যবশতঃ প্রকাশ করিতে সম্মত হন না, ইহা স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এক জন প্রবল-প্রতাপ মুসলমান রাজা এক জন হিন্দু পণ্ডিতের দাসত্ব করিয়াছিলেন, এ কথাও তদানীন্তন আভিজাত্যাভিমানী মুসলমানগণ সহজে স্বীকার করিতে চাহিবেন না, ইহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। হাসান শাহ হাসান গাঙ্গু বামন নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন, তাহা বুঝা যায় না। পরবর্ত্তী মুসলমান লেখকগণ গাঙ্গু স্থলে 'কাঙ্কু' এই পারস্য নাম বসাইয়াছেন। তাঁহারা হাসানকে পারস্যের বহমানি রাজবংশসম্ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে বংশ-তালিকা প্রস্তুত করেন, তাহা বিচারসহ নহে, তাহা অনেক মুসলমান লেখকই বলিয়া থাকেন। কোন কোন মুসলমান লেখক এ কথাও বলিয়াছেন যে, এই বংশ-তালিকা সত্য কি না, তাহা ভগবানই জানেন! তাঁহার যে সব বংশ-তালিকা দেওয়া হয়, সেগুলির পরস্পরের মধ্যে বিশেষ মিল নাই। ফেরিস্তা সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন, হাসান শাহের এই আভিজাত্য কথা কত দূর সত্য, ভগবানই তাহা বলিতে পারেন! ফেরিস্তার কথা আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

তাজকীরাট-উল-মুলুক নামক গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে যে, হাসান শেখ মহম্মদ সিরাজ জুনাইদির নিকট কাজ করিতেন। তিনি তাঁহারই অনুগ্রহে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব-পদ পাইয়াছিলেন। হাসানই সিরাজ জুনাইদিকে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রণোদিত করেন। এই গ্রন্থে হাসান কর্ত্তৃক অনেক অদ্ভুত জয়-লাভের কথা বর্ণিত আছে। উহার একটিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। হাসান হিন্দুদিগের ঘোর বিরোধী ছিলেন না। তিনি যে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য শেখ মহম্মদ সিরাজ জুনাইদিকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেহ কেহ বলেন যে, এই গ্রন্থে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা সত্য নহে। অধিকাংশ কাহিনী বাজার-গুজবের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলেও উহাতে গাঙ্গু পণ্ডিতের কথা বাদ পড়ে নাই।

তবে এ কথা সত্য যে, সিংহাসন লাভ করিবার পর হাসান শাহ তাঁহার বংশের সহিত হিন্দু নাম গ্রথিত করিবার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ, সমস্ত মুসলমান সমাজ তাঁহার এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের এইরূপ তীব্র প্রতিবাদ এবং বিরুদ্ধ ভাব হাসান শাহ কখনই নিরাপদ মনে করেন নাই। সেই জন্য তিনি পরে বাধ্য হইয়া নিজ-নাম আলাউদ্দীন হাসান গাঙ্গু বামন হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া আলাউদ্দীন হাসান কাঙ্কু বাহমনী নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম সকল গ্রন্থে একরূপ নহে, তারিখ-ই-ফেরিস্তায় তাঁহার নাম আল্লাউদ্দীন হাসান কাঙ্কু বামনী। তাবাকত-ই-আকবরিতে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে আল্লাউদ্দীন হাসান সাধু। বুরহান্-ই-মায়াশিরে তাঁহার নাম দেওয়া হইয়াছে আলাউদ্দীন হাসান গাঙ্গু বামনী। মুক্তাখাবুৎ-তারিখে নাম দেওয়া হইয়াছে আলাউদ্দীন বামন শাহ। এইরূপ বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার বিভিন্ন নাম দেখিয়া মনে স্বতঃই সন্দেহের সঞ্চার হয় যে, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় এবং নাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তিনি চেষ্টা করিয়াই তাঁহার নামের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার নাম লইয়া এত বিভ্রাট ঘটিবে কেন ? এবং বামন বা বামনী এই অভিখ্যা ঢাকিবার জন্য নিজেকে পারস্যের বহমন্ এবং ইস্ফান্দিয়ারের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি ঐরূপ উজ্জ্বল বংশের বংশধর এ কথা কেহই জানিতেন না। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি তাঁহার ঐ বংশধারার কথা জাহির করিয়াছিলেন! কিন্তু প্রথমেই তিনি তাঁহার নামের সহিত গাঙ্গু বামনী এই নাম যে সংযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিকন্তু তিনি গাঙ্গু পণ্ডিত বা গঙ্গা পণ্ডিতকে যে দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয়, গঙ্গা পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ-বাণীর কথা মিথ্যা নহে। তাঁহার যে বংশ-ধারা প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলিতে ঐক্য নাই। তাঁহার এই 'বামন' উপাধি পারস্য ভাষার 'বহমান' উপাধির অপভ্রংশ কিংবা সংস্কৃত ভাষার 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অপভ্রংশ, তাহা লইয়া বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় লাভ নাই। শেখ আজুরি 'বামন-নামা' নামক কবিতায় বামন-বংশের এক ইতিহাস লিখিয়াছেন। এখানি 'ফেরিস্তা' এবং 'তবাতবা' গ্রন্থের পূর্ব্বে লিখিত। ইহাতে হাসানকে এবং তাহার বংশধরগণকে বামন বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই সময় হইতেই হাসান শাহের 'বামন' এই উপাধি যে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ হইতে গৃহীত উহা ঢাকিবার চেষ্টা হইতেছিল ; কিন্তু সকলে তাহা গ্রহণ করেন নাই।

বামনী বংশের মুসলমান রাজগণ হিন্দুদিগের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। হাসান কতকটা পর-মতসহিষ্ণু ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ তাহা ছিলেন না। হাসান ক্ষিপ্রতার সহিত রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই পশ্চিমে কোঙ্কন হইতে পূর্ব্বে বরঙ্গল এবং উত্তরে বেরার হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্ত্তী কতকটা স্থান লইয়া বিজয় নগরের হিন্দুরাজাদিগের সহিত প্রায় তাঁহাদের বিবাদ বাধিত।

আলাউদ্দীন হাসান শাহ গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ্যটিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া যান। মৃত্যুকালে আলাউদ্দীন হাসান শাহ তাঁহার বংশধরদিগের জন্য যে রাজ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছিল। তিনি ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তাঁহার বংশধরগণ হিন্দুগণের উপর বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন না; অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করিতেন। অনেকে বলেন যে, হিন্দু নাম গ্রহণের অপবাদ ঢাকিবার জন্য তাঁহারা হিন্দুদের উপর অত্যধিক নির্য্যাতন করিতেন। ফলে আমাদের যত দূর মনে হয়, 'গাঙ্গু' এই নামটি হাসান শাহ তাঁহার প্রথম জীবনের প্রভুর ভবিষ্যৎ-বাণীর উপর সম্মান দেখাইবার জন্য প্রথমে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং উত্তরকালে উহা বাঁচাইয়া অন্যরূপ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যেখানে প্রকৃত তথ্যের অপলাপ করিয়া অন্যরূপ চেষ্টা হয়, সেখানে প্রায় মতভেদ দেখা যায় এবং আসল ব্যাপার বড় কঠিন হয়। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিতে চাহি না। মুসলমান-লিখিত গ্রন্থ হইতেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব। বামনী রাজবংশের অভিখ্যা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নাম হইতেই গৃহীত হইয়াছে; পারস্যের বহমন রাজা হইতে নয়।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

স্বর্ণমূল্য ও স্বর্ণমান

আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সমন্বয় সঙ্কল্পে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা সম্প্রতি প্রবল ও প্রগাঢ় হইয়াছে। কারণ, স্বর্ণের ভিত্তিভূমিতে নিখিল জগতের সর্ব্ববিধ প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের আন্তর্জ্জাতিক স্থৈর্য্য-সম্পাদনার্থ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনাদ্বয় অচিরে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বৈঠকে আলোচিত হইবে। এই পরিকল্পনা-দ্বয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ পূর্ব্বে আমরা একটি প্রবন্ধে করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য-সাধনার্থ, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রভূত সঞ্চিত-স্বর্ণের অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় স্বর্ণের প্রাধান্য সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ-একক "ইউনিটাস্" (Unitus) স্বর্ণে কিংবা যে কোন প্রচলিত মুদ্রায় পরিবর্ত্তনীয়; সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র সুকঠোর স্বর্ণমানের (Gold standard) পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে আন্তর্জ্জাতিক খালাস-নিষ্পত্তি প্রতিষ্ঠানের (International Clearing House) সম্মতি ব্যতীত যুক্তরাজ্যের শীর্ষ-একক "ব্যাঙ্কর" (Bancor) স্বর্ণে পরিবর্ত্তনীয় নয়। সুতরাং স্বর্ণের সহিত ইহার সংযোগ তত কঠোর নয়। উভয় পরিকল্পনারই ভিত্তিভূমি অবশ্য স্বর্ণ। এই নিমিত্ত সম্প্রতি স্বর্ণের মূল্য অকস্মাৎ অকারণে গগনস্পর্শী হইয়াছিল।

স্বর্ণ একটি বাণিজ্য দ্রব্য (Commodity)। ইহা অর্থের (Money) আকার ধারণ করে, যখন কোন দেশ, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ প্রচলিত জাতীয় মুদ্রা-প্রকরণের বিনিময়ে একটি নির্দ্ধারিত ওজনের স্বর্ণ ক্রয় কিংবা বিক্রয় করিতে আইন-সঙ্গত বাধ্যতা স্বীকার করেন। ফলে, ইহার নির্দ্ধারিত মুদ্রামূল্য (Currency value) নির্ভর করে জাতীয় আইনের (Legislation) উপর; সুতরাং, স্বর্ণের নির্দ্ধারিত মুদ্রা-মূল্য অপ্রকৃত, কল্পিত অথবা কৃত্রিম (Fictitious)। কোন দেশ পূর্ণ-স্বর্ণমান গ্রহণ করিলে, তাহাকে সর্ব্বদা ইহার প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের কোন ক্ষুদ্রতম এককে (Minimum unity) স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত, (Exchange into gold) এবং ঐ প্রচলিত মুদ্রা প্রকরণে নির্দ্ধারিত-মূল্যে স্বদেশী, অথবা বিদেশী, উভয় পক্ষকে, কিংবা তাহাদের নিকট হইতে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়। ইহার ফলে, আপনা হইতেই, সেই দেশের সমগ্র প্রচলিত মুদ্রা ও অর্থের ক্রয়-মূল্য স্বর্ণের ক্রয়-মূল্যের উত্থান-পতনের সহিত কমে, বাড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্য স্বর্ণমানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও আইনতঃ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, তথাপি প্রকৃত পক্ষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্য স্বর্ণমান হইতে বিচ্যুত ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে এবং ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাণিজ্য-ব্যবসায়ী দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণমানে দৃঢ় ছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৭ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণের রপ্তানী বন্ধ করিয়া, স্বর্ণ-মানের আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়াছিলেন।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যুক্তরাজ্যে প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণে বিষম অনটন ঘটে। তজ্জন্য বৃটিশ সরকার সরকারী নোট (Treasury notes) প্রচলিত করিয়া হাতে হাতে চলতি মুদ্রার অনটন দূর করিয়া জন-সাধারণের আতঙ্ক নিরসন করেন। ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য বহুলাংশে অগ্রিম-বিনিময়-চুক্তি বাজারের (Market for forward exchange) সাহায্যে পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য "স্বর্ণ-বাট মান" (Gold Bullion Standard) অবলম্বন করেন। ইহা পূর্ব্বে প্রচলিত স্বর্ণ-মানের ঈষৎ পরিবর্ত্তিত রূপ মাত্র। এই প্রকরণে কাগজের নোট এবং তাহার সঙ্গে চলতি বাজারে অপেক্ষা কম ধাতু মূল্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব ভাক্ত মুদ্রা নিত্য-প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করে। এই বিধান প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণকে, স্বর্ণ-মুদ্রার পরিবর্ত্তে, একটি নির্দ্ধারিত হারে, নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের বাটে পরিবর্ত্তিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। তথাপি স্বর্ণের মূল্যবৃদ্ধি এবং তদানুষঙ্গিক দ্রব্য-মূল্যের সাধারণ মাত্রার হ্রাস, নিরুদ্ধ হয় নাই। ফলে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যকে পুনরায় এই নূতন মান পরিত্যাগ করিতে হয়। তদবধি অবশ্য ষ্টার্লিং-এর মূল্য স্বর্ণের মূল্যের তুলনায় অধিকতর স্থিতিশীল হইয়াছে।

স্বর্ণ-মানের আর একটি প্রকারান্তর "স্বর্ণ-বিনিময় মান" (Gold Exchange Standard)। এই প্রথাতেও নোট এবং ভাক্ত ধাতব মুদ্রাই প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণের বিশিষ্ট অঙ্গ। এ দেশে

সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ইহার বৈদেশিক বিনিময়-হারকে স্বর্ণ-মান-বিশিষ্ট-দেশ সমূহের মুদ্রা-প্রকরণের একটি বিশিষ্ট তুল্য-মূল্য নিরিখের যথাসম্ভব সমীপবর্ত্তী রাখিবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে-কোন-প্রকার স্বর্ণ-মান-বিশিষ্ট দেশের প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণে পরিবর্ত্তনীয় সম্পদ—যথা স্বর্ণ, বৈদেশিক হুণ্ডী অথবা খৎ (Foreign Bills), ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ (Bank Deposits), কারবারে নিযুক্ত মূলধন (Investments) প্রভৃতি বিদেশে রক্ষা করেন। বহু বৎসর ধরিয়া, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষ এই স্বর্ণ-বিনিময় মানে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইংরেজ-শাসিত ভারতে প্রচলিত-মুদ্রা-প্রবর্ত্তন ইতিহাসের সূত্রপাত ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, যখন রৌপ্য-মুদ্রার টাকা মান-মুদ্রা-(Standard Coin) রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। বৃটিশ-অধিকৃত ভারতে টাকাই তখন মূল্য-পরিমাণ আদর্শ, অথবা নিরিখ (Standard Measure Value) নির্দ্ধারিত হয়। এই ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, প্রায় ষাট বৎসর, ভারতে "রৌপ্য-মান" (Silver Standard) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ টাকার বিনিময়-হার নির্দ্ধারিত হইত, টাকার অঙ্গীভূত রৌপ্য-সমষ্টির স্বর্ণ-মূল্যানুযায়ী। ফলে, রৌপ্যের স্বর্ণ-মূল্যের উত্থান-পতনের সহিত টাকার বৈদেশিক বিনিময়-হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কয়েকটি য়ুরোপীয় দেশ রৌপ্যকে চল্‌তি অর্থের উপাদান-মূলক মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত (Demonetisation) করেন এবং দুই-ধাতু-নির্ম্মিত প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণের প্রথা (Bi-metallic Standard) পরিত্যাগ করেন। ফলে, রৌপ্য-মূল্যের অনিবার্য্য পতনের সহিত, টাকার বিনিময়-হারের গুরুতর অবনতি হয় এবং বিলাতের নিকট ভারতের আর্থিকদায় (Home charges) মিটাইতে, তদানীন্তন ভারত সরকারকে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। এই সঙ্কটে হার্শেল-সমিতির (Harschell Committee) তদন্তের ফলে, রৌপ্য-মুদ্রা-প্রস্তুত বন্ধ খর্ব্ব করিয়া টাকার অস্বাভাবিক অনটনের সৃষ্টি, এবং ১ শিলিং ৪ পেন্সে তাহার বিনিময়-হার নির্দ্ধারণ-নীতি প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই প্রচেষ্টার ফলে শেষোক্ত বৎসরে, টাকার বিনিময়-হার ১ শিলিং ৪ পেন্সে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে। এই বৎসর ফাউলার তদন্ত-সমিতির (Fowler Committee) আবির্ভাব। ফাউলার সমিতি টাকার বিনিময়-হার স্বর্ণমূল্যে ১ শিলিং ৪ পেন্স নির্দ্ধারিত করিতে, ১৫ টাকা মূল্যে স্বর্ণমুদ্রা "সভারেণ" প্রস্তুত করিয়া নিরঙ্কুশ ভাবে টাকার বিনিময়ে প্রচলিত করিতে এবং অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে টাকার প্রচলন (Unlimited legal tender) পরিচালন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, ভারতে স্বর্ণ-বিনিময়-মানের প্রতিষ্ঠা ঘটে; এবং কেবলমাত্র ১৯০৭-০৮ খৃষ্টাব্দ ব্যতীত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত থাকে। টাকার বিনিময়-হার স্বর্ণমূল্যে ১ শিলিং ৪ পেন্সে দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত, ভারত হইতে অর্থ-প্রেরকদিগকে বিলাতে স্বর্ণ-বিনিময়, এবং বিলাত হইতে অর্থ-প্রেরকদিগকে ভারতে রূপার টাকা-বিনিময় দিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, টাকার বিনিময়-হারের অতি সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিত। নিম্নে ১ শিলিং ৩৩/৩২ পেন্স এবং ঊর্দ্ধে ১ শিলিং ৪১/৮ পেন্স—এই ব্যবধানের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বিনিময়-হারের এই স্থৈর্য্য দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত ভারত সরকারকে বিলাতে স্বর্ণ অথবা ষ্টার্লিং এবং ভারতবর্ষে রূপার টাকা মজুত রাখিতে হইত। এই সময়ে দ্রব্য-মূল্য দৃঢ় ছিল এবং শিল্পের উন্নতি ও প্রসার ঘটিয়াছিল।

ইতিমধ্যে, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে, যুদ্ধ ঘোষণার ফলে ভারতের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ এবং তাহার বিনিময়ের মুস্কিল ঘটে। এ পর্য্যন্ত ভারত সরকার ১৫ টাকা, অর্থাৎ ১ পাউণ্ড ষ্টার্লিং মূল্যে স্বর্ণ দিতেছিলেন। যুদ্ধারম্ভ হইতেই স্বর্ণ প্রদান রহিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বর্ণ-বিনিময় মান চলিয়াছিল, কিন্তু পর-বৎসরের প্রারম্ভেই ইহা পরিত্যক্ত হয়, কারণ, ইতিমধ্যে বিলাতের সহিত বাণিজ্য-জমা-খরচে ভারতের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত-জমার অঙ্ক এত অধিক হইয়াছিল যে, ভারতের উপর প্রদত্ত হুণ্ডীর দাবী মিটাইবার উপযুক্ত রূপার টাকা সরকারের তহবিলে ছিল না। রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং আতঙ্কগ্রস্ত ভারতবাসী কর্ত্তৃক স্বর্ণ ও রৌপ্যের গুপ্ত সঞ্চয় হেতু, দ্রব্য-মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি কালে, ক্রম-বর্দ্ধমান শিল্প-বাণিজ্যের চাহিদা মিটাইতে, রূপার টাকার যোগান অসম্ভব হইয়াছিল। ফলে, ভারতবর্ষকে বাধ্য হইয়া রৌপ্য-মানে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সন্ধি সংস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সরকার পুনরায় স্বর্ণ-বিনিময়-মান অবলম্বন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে, ব্যাবিংটন-স্মিথ্ তদন্ত-সমিতির শুভাগমনে টাকার বিনিময়-হার স্বর্ণ-মূল্যে ২ শিলিংএ স্থিরীকৃত হয়। ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন এবং স্বর্ণ ও ডলারের সম্পর্কে ষ্টার্লিংএর গুরু হ্রাস ঘটে। পক্ষান্তরে, ষ্টার্লিংএর সম্পর্কে ইহার মূল্যাবনতির সঙ্গে, রূপার টাকার বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি পায়। ইত্যবসরে রৌপ্য-মূল্য এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, ভারত সরকারকে পুনরায় স্বর্ণ-বিনিময় মান বর্জ্জন করিয়া ঘটনা-স্রোতের উপর নির্ভর করিতে হয়। রূপার টাকা স্বর্ণমূল্যে ২ শিলিং হইতে ২ শিলিং ৮ পেন্সে ঊর্দ্ধগতি লাভ করে। এই অনুকূল বিনিময়-হারের সুযোগ লইয়া ভারতীয় শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ বহুবিধ পরিণত পণ্যের নিমিত্ত মোটা টাকার ক্রয় চুক্তি করেন। কিন্তু আমদানী বৃদ্ধির অনুকূল বিনিময়-হার রপ্তানী-বৃদ্ধির প্রতিকূল। সুতরাং রপ্তানী বাণিজ্যের বিষম হ্রাস ঘটে। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া,—বিনিময়-হারের অধোগতি। ২ শিলিং ৮ পেন্স হইতে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, বিনিময়-হার ১ শিলিং ৮ পেন্সে এবং পরে মাত্র ১ পেন্সে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্যক্রমে অনতিবিলম্বে ভারতীয় দ্রব্যাদির, বিশেষতঃ কৃষি-পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং টাকার বিনিময়-হার ধীরে ধীরে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে, ১ শিলিং ৬ পেন্সে স্থিতিলাভ করে। এই সময়ে যুক্তরাজ্য পুনরায় স্বর্ণের সহিত তাহার মুদ্রা-প্রকরণের সংযোগ সাধন করেন; এবং ১ শিলিং ৬ পেন্স ষ্টার্লিং অর্থাৎ স্বর্ণমূল্যে, রূপার টাকার বিনিময়-হার ১ শিলিং ৬ পেন্সে দৃঢ় হয়। এই সন্ধিক্ষণে হিল্টন্-ইয়ং রাজকীয় তদন্ত সমিতির আবির্ভাব।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে হিল্টন্-ইয়ং সমিতি তাহাদের তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করেন। টাকার বিনিময়-হার স্বর্ণমূল্যে ১ শিলিং ৬ পেন্সে নির্দ্ধারিত হয় এবং ভারতবর্ষকে স্বর্ণ-বাট মানে (Gold Bullion Standard) প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অর্থাৎ ভারত সরকার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণবাট ক্রয়-বিক্রয় করিতে সম্মত হন। নোট প্রচার করিবার

ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ হয়। স্থির হয়, এই ব্যাঙ্ক কেবল সরকারের নহে, অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিরও ব্যাঙ্করূপে কার্য্য করিবে। কিন্তু ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের চলতি মুদ্রা ও মুদ্রা প্রস্তুত-করণ আইনে (Currency and Coinage Act of 1927) কিছু ত্রুটি থাকিয়া যায়। ভারত সরকার তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী স্বর্ণবাটের পরিবর্ত্তে ষ্টার্লিং-বিনিময় করিতে পারিতেন। এই ত্রুটি, প্রয়োজন অনুযায়ী ভারত সরকারকে স্বর্ণ-বাট-মানের পরিবর্ত্তে, ষ্টার্লিং-বিনিময়-মান প্রবর্ত্তিত করিবার অধিকার দেয়। এই অধিকারের ফলে, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য যখন স্বর্ণ-মান পরিত্যাগ করেন, তখন ভারত সরকার একটি ঘোষণা দ্বারা টাকা এবং নোটের বিনিময়ে স্বর্ণ দিতে অস্বীকার করেন, এবং টাকার বিনিময়-হার ষ্টার্লিং-মূল্যে ১ শিলিং ৬ পেন্সে নির্দ্ধারিত করেন। এই পরিবর্ত্তন লইয়া তদানীন্তন অর্থসচিবের সহিত ভারত-সচিবের মতদ্বৈত ঘটে, শুনা যায়। যাহা হউক, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার সহিত টাকার বিনিময়-হারকে ১ শিলিং ৬ পেন্স ষ্টার্লিং-এ দৃঢ় রাখিবার ভার ঐ ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তদবধি প্রয়োজন-অনুযায়ী, ষ্টার্লিং অথবা ষ্টার্লিং-বিনিময় ক্রয়-বিক্রয় করিয়া টাকার বিনিময়-হার দৃঢ় রাখিতেছেন। কাগজের নোট-প্রচারের ভারও এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একায়ত্ত।

অধুনা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-সমন্বয় সঙ্কল্পে স্বর্ণ-মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে, তৎপ্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন মানের আপেক্ষিক দোষ-গুণের আলোচনা করিব। বহু অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত এখনও কোন-না-কোন আকারে স্বর্ণমান পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। আবার অনেক বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ী ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান। সাধারণতঃ স্বর্ণ-মানের স্বপক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি প্রদর্শিত হয়।

(১) মনুষ্য-সমাজে স্বর্ণ সর্ব্বত্রই মূল্যবান বলিয়া আদৃত।

(২) ইহা সহজে বহনোপযোগী এবং স্থানান্তরকরণোপযোগী।

(৩) স্বর্ণ-মান-প্রচলিত দেশসমূহে দ্রব্যমূল্যের স্তর প্রায় এক-রূপই থাকে।

(৪) স্বর্ণের মূল্য স্থিতিশীল।

(৫) কোন দেশের প্রচলিত মুদ্রা-প্রকরণ কোন প্রকার স্বর্ণ-মানে দৃঢ়বদ্ধ না থাকিলে, ঐ দেশের শাসনতন্ত্র সহজেই অযথা মুদ্রা-স্ফীতি (Inflation) ঘটাইতে পারেন, এবং রপ্তানি বাজারের সাহায্যার্থ বিনিময়-হারকে যদৃচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন।

(৬) স্বর্ণমান আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের পোষকতা করে, যদিও ঐরূপ বাণিজ্যের নিমিত্ত ইহার প্রয়োজন সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় না।

আমরা একে একে এই যুক্তিগুলির সারবত্তা বিচার করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ, স্বর্ণ সর্ব্বত্র সমাদৃত সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার মূল্যের তারতম্য ঘটে। স্বর্ণমান জাতীয় প্রচলিত-মুদ্রা-প্রকরণে স্বর্ণের মূল্য নির্দ্ধারণ করে। সুতরাং একটি মাত্র পণ্য, অর্থাৎ স্বর্ণ, যোগান ও চাহিদার মূলগত নিয়মকে ব্যাহত করে। দ্বিতীয়তঃ, সহজে বহনোপযোগী এবং স্থানান্তর-করণোপযোগী বলিয়া, বিনিময়-উদ্দেশ্যে স্বর্ণের সমাদর সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাচীন কালে এই উপযোগিতা অত্যাবশ্যক ছিল; কিন্তু অধুনা অর্থের আদান-প্রদানের বিভিন্ন প্রকার সহজসাধ্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক মূলধন সংশ্লিষ্ট সম্পদ (Investmen[illegible] ক্রয়-বিক্রয় এখন নিত্য অতি সহজেই নিষ্পন্ন হইতেছে; এবং [illegible] সুগমতা ও তৎপরতা বিনিময়ের উপর স্বর্ণের আমদানী-রপ্তান[illegible] সদৃশ ফল প্রদান করে। তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমান-সমন্বিত দেশ [illegible] আন্তর্জ্জাতিক পণ্য ও পরিচর্য্যা-মূল্যের (Prices of inter-national goods and services) কিঞ্চিৎ সমতা [illegible] হয় বটে, কিন্তু স্বর্ণ-মানই তাহার একমাত্র উপায় নয়। বি[illegible] পরিস্থিতিকে দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত স্বর্ণের আমদানী-রপ্তানী [illegible] বাট্টা ও সুদের হারের পরিবর্ত্তন (Changes of discount [illegible] interest rates) আন্তর্জ্জাতিক মূল্য সম্পর্কেও যোগান [illegible] চাহিদার অর্থনৈতিক ক্রিয়া শক্তিকে খর্ব্ব ও বিলম্বিত করে। [illegible] শাসিত দেশসমূহেও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দ্রব্য-মূল্যের নিদারুণ [illegible] ফলে দুঃখ-দুর্দ্দশা, বেকার-বৈগুণ্য, লভ্যাংশের হানি এবং সুদ ও [illegible] আর্থিক দায় মিটাইবার অসামর্থ্য প্রবল আকার ধারণ করিয়া[illegible] ফলে, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে নহে, দেশান্তর্গত ব্যবসা-বাণি[illegible] মন্দা ঘটিয়াছিল এবং সর্ব্ব দেশেই বহির্বাণিজ্য অপেক্ষা অন্ত[illegible] অধিকতর মূল্যবান। একটিমাত্র পণ্য স্বর্ণের উত্থান-পতনে বৈদে[illegible] ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-বিপর্য্যয় কোন প্রকারেই স্পৃহণীয় [illegible] আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনে, স্বর্ণ-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত, আভ্যন্তরী[illegible] মজুরী ও বেতন, এবং সুদ এবং অন্যান্য নির্দ্ধারিত আয়ের ক্রয়-শক্তি[illegible] হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে; আভ্যন্তরীণ পণ্য, পরিচর্য্যা ও অর্থ-সামর্থ্যের [illegible] ও চাহিদার অপেক্ষা রাখে না।

চতুর্থতঃ, স্বর্ণের মূল্য কদাচ দৃঢ়রূপে স্থিতিশীল নহে। [illegible] নিরিখে স্বর্ণের মূল্য স্থিতিশীল হইতে পারে, এমন কোন চলতি মুদ্[illegible] মারফতে যাহার অঙ্গীভূত স্বর্ণের ওজনের মূল্যে তাহার মূল্য নির্দ্ধা[illegible] হইয়াছে। স্বাধীন ভাবে, অন্য কোন পণ্যের সংস্রবে আসিলেই, ইহ[illegible] মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বিগত মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণের নির[illegible] (In terms of gold) পণ্যমূল্য অধোগতি লাভ করি[illegible] এবং পণ্যের নিরিখে (In terms of commodities) স্বর্[illegible] মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পঞ্চমতঃ, আভ্যন্তরীণ চলতি মুদ্রা-প্র[illegible] নিমিত্ত স্বর্ণ আবশ্যক, কিংবা সর্ব্বোত্তম মূল-ভিত্তি নহে। [illegible] অবশ্য স্বীকার্য্য—যে স্বর্ণের নিগড়ে বদ্ধ না থাকিলে, শাসনতন্ত্র ক[illegible] অযথা মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা সমধিক। কিন্তু ১৯১৪ হইতে ১৯[illegible] খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পরে, যুক্তরাজ্য এবং [illegible] কয়েকটি দেশের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, চ[illegible] স্বর্ণে পরিবর্ত্তনীয় নহে বলিয়াই যে এইরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা [illegible] কোন শাসন-তন্ত্রের অপরিমিত নোট ছাপিবার অবাধ ক্ষমতা [illegible] ঋণ পরিশোধার্থ কর ধার্য্য কিংবা সুদ-পরিবাহী ঋণের [illegible] মুদ্রাস্ফীতি নীতি অবলম্বিত হইতে পারে। শাসনতন্ত্রের অমি[illegible] এবং আয়-ব্যয়ের সমতা-বিবর্জ্জিত বাজেটের ফলেও এরূপ [illegible] পারে। ব্যাঙ্কের বিচক্ষণতাহীন কাজ-কারবারেও মুদ্রাস্ফীতি [illegible] নহে। ষষ্ঠতঃ, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের নিমিত্ত আবশ্যক না হইলেও উন্নতির মুখে স্বর্ণ-মান-বিশিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য [illegible] হয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই; কিন্তু এই সৌকর্য্য উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে হয়। স্বর্ণমান গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বাণিজ্যশীল দেশসমূহের এবং ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী

কালের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, স্বর্ণমান বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্ত অত্যাবশ্যক নহে। কারণ, স্বর্ণমান-বিচ্যুত দেশ সমূহ, স্বর্ণমান-বিশিষ্ট দেশ সমূহের সম-সময়ে প্রচুর বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে। স্বর্ণমান-বিচ্যুত দেশ সমূহের সহিত বাণিজ্য ব্যপদেশে আমদানী ও রপ্তানী-বণিককে বিনিময়-হারের সম্ভাব্য পরিবর্ত্তনের প্রতিকার হেতু কোন নির্দ্দিষ্ট চলতি-মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া, ভবিষ্য-দায়-গ্রহণকারী বিনিময় বাজারের (Forward Exchange markets) শরণ লইতে হয়। এই প্রথা বাণিজ্যকে অনেক সময় সঙ্কটজনক করে বটে, কিন্তু এরূপ সঙ্কট অনতিক্রমণীয় নহে।

পক্ষান্তরে, পণ্য ও পরিচর্য্যার উপর স্বর্ণ-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের হানি ঘটে। ফলতঃ, স্বর্ণমানই জগতের তেজী ও মন্দা পরিস্থিতির নিমিত্ত দায়ী। স্বর্ণের মূল্য-বৃদ্ধি ঘটিলে দ্রব্য-মূল্যের হ্রাস ঘটে, সুতরাং মন্দার সৃষ্টি করে। কোন দ্রব্য-মূল্যের স্থৈর্য্য তাহার চাহিদা ও যোগানের সমতার উপর নির্ভরশীল। খনি হইতে উত্তোলনের বাধা-বিপত্তি ও হ্রাস-বৃদ্ধি এবং কোন জাতি অথবা ব্যক্তিবর্গের গুপ্ত-সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির উপর স্বর্ণের সরবরাহ নির্ভর করে। জগতের উৎপাদন শক্তি এবং অর্থ-প্রয়োজনে প্রাপ্তব্য স্বর্ণের পরিমাণ সর্ব্বদেশের শাসন-শক্তির আয়ত্ত-বহির্ভূত। স্বর্ণের চাহিদা ও যোগানের সহিত আন্তর্জ্জাতিক পণ্য এবং পরিচর্য্যার চাহিদা ও যোগান সম্পর্ক-শূন্য। সুতরাং স্বর্ণের ব্যবহার ব্যতীতও অর্থনৈতিক-পরিস্থিতি-সম্মত বিপর্য্যয় অপেক্ষা, পণ্য ও পরিচর্য্যার মূল্যের এবং তাহাদের চাহিদা ও যোগানের অধিকতর বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা এবং চলতি মুদ্রার বৃদ্ধি, স্বর্ণের যোগান কিংবা তাহার মিতব্যবহারের তুলনায় অধিকতর অথবা অল্পতর হইতে পারে। কোন কোন দেশ কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে তাহাদের সরকারী অথবা ব্যাঙ্কের কোষাগারে প্রচুর স্বর্ণ নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারে। দেশের স্বর্ণ, দেশচ্যুত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে, অধিকাংশ দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আয়ত্তান্তর্গত স্বর্ণকে "যখের ধনে" পরিণত করে। স্বর্ণের লোভ অতি প্রবল; সুতরাং শক্তি, অর্থ কিংবা অন্য উপায় দ্বারা জাতি ও ব্যক্তিমাত্রই স্বর্ণের সংস্থিতি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। বর্ত্তমানে, জগতের অধিকাংশ স্বর্ণ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে।

ভারতের এই সম্পর্কে যথেষ্ট দুর্নাম আছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বহু বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ প্রচুর স্বর্ণের আমদানী করিয়াছিল; কিন্তু ঐ বৎসর হইতে ভারত বহু স্বর্ণের রপ্তানী করিয়াছে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করেন এবং টাকা ষ্টার্লিং-এর সহিত যুক্ত হয়। ভারতে এবং বিলাতে স্বর্ণের মূল্য অপরিসীমরূপে বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নিদারুণ মন্দা উপস্থিত হয়। লাভের লোভেই হউক, অথবা অর্থের অভাবেই হউক, যাহার ঘরে যতটুকু স্বর্ণ ছিল, ভারতবাসী তাহা বিক্রয় করে। অর্থ-নীতিবিদের দৃষ্টিতে ভারত হইতে এই স্বর্ণ রপ্তানী ভারতের জাতীয় সম্পদের হানিকর হইলেও ইহা সত্য যে, ভারত সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থায় প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত তাহার স্বর্ণ-সংস্থিতির প্রায় শতকরা বিশ অংশ দেশান্তরিত করিয়াছিল এবং তাহার ফলে তাহার বৈদেশিক ঋণভার বহুল পরিমাণে হালকা হইয়াছিল। ভারতে কত স্বর্ণ আছে কেহ তাহা বলিতে পারে না; তবে ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসরের আমদানী-রপ্তানীর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই কালকে পাঠকের বিবেচনার সুবিধার্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। ১৯০০-০১ হইতে ১৯৩০-৩১ একাদশ এবং ১৯৩১-৩২ হইতে ১৯৩৮-৩৯ আট বৎসর।

	আমদানী		রপ্তানী	
	পরিমাণ ও মূল্য		পরিমাণ ও মূল্য	
	আউন্স (কোটি)	টাকা (ক্রোর)	আউন্স (কোটি)	টাকা (ক্রোর)
১৯০০-০১ হইতে ১৯৩০-৩১	১১·৬৪	৭১৪·৫০	২·৭১	১৬৬·৭৫
১৯৩১-৩২ " ১৯৩৮-৩৯	·১৩	১০·৭৮	৩·৯৮	৩৮৮·৪৮

নিখিল জগৎ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের তুলনায় ভারতের খনিজ স্বর্ণ-সম্পদ্ অতি অকিঞ্চিৎকর,—মাত্র ৩ লক্ষ আউন্স এবং তাহার স্বাভাবিক মূল্য ৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ, সম্পদ্ অপেক্ষা সংগ্রহ ও সঞ্চয় বহুলাংশে অধিক।

আর্থিক প্রয়োজনে নিখিল জগতের অর্থ স্বর্ণ (Monetary gold) সমষ্টির দুই-তৃতীয়াংশ আইন-সঙ্গত নিম্নতম মজুত সংস্থিতি। বক্রী এক-তৃতীয়াংশ মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির মারফতে সচল, অর্থাৎ আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়। এই যে সতর্ক প্রহরি-পরিবৃত ভূগর্ভস্থ অন্ধকূপে চির-নিশ্চল স্বর্ণ-সম্ভার—ইহার মূল্য কি? স্বর্ণের পরিবর্ত্তে সোনালি ইট জমা রাখিয়া যদি তাহাকে স্বর্ণ মনে করা যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? জন-সাধারণের মনে সম্পদ্-সমৃদ্ধি সম্পর্কে বিশ্বাস উৎপাদন ও দৃঢ়ীকরণ ব্যতীত ইহার বাস্তব মূল্য কিছুই নাই। পরন্তু, এরূপ ক্ষেত্রে বহু ক্লেশে, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া খনি হইতে উত্তোলন এবং সংস্কারের ব্যয় ও পরিশ্রম, অর্থনৈতিক সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে কিন্তু ইহাই আমাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে। আমাদের বক্তব্য এই যে, যখনই বিশুদ্ধ (Orthodox) স্বর্ণমান অনুযায়ী কোন দেশের চলতি মুদ্রাকে স্বর্ণের নিগড়ে বদ্ধ করা হয়, তখনই তাহার সমস্ত অর্থের, সুতরাং তাহার পণ্য ও পরিচর্য্যার বিনিময়-মূল্যকে পরিবর্ত্তনশীল স্বর্ণ-মূল্যের সহিত পরিবর্ত্তনশীল করা হয়।

যখন স্বর্ণমান অনুযায়ী স্বর্ণের মূল্য কোন দেশের চলতি মুদ্রাতে নিবদ্ধ করা হয়, তখন তাহার মূল্য হয় আপেক্ষিক অথবা অবাস্তব। ইহার যথার্থ মূল্য, পণ্য ও পরিচর্য্যা ক্রয় করিবার শক্তি। এইরূপ দেশে স্বর্ণের মূল্য এবং পণ্যও পরিচর্য্যা মূল্যের সাধারণ স্তর পরস্পরের প্রতিকূল, অর্থাৎ বিপরীত। স্বর্ণ মহার্ঘ হইলে, পণ্য ও পরিচর্য্যা সুলভ হয়; কারণ, স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি হইলে সেই স্বর্ণের সহিত সংযুক্ত স্বর্ণমান-বিশিষ্ট দেশের চলতি মুদ্রা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ পণ্য ও পরিচর্য্যা ক্রয় করিতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে, স্বর্ণ সুলভ হইলে পণ্য ও পরিচর্য্যা মহার্ঘ্য হয়। কোন দেশের চলতি মুদ্রার স্বর্ণ-মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সেই দেশকে আমদানী-বাণিজ্যে প্ররোচনা দেয়, এবং ঐ মূল্য হ্রাস পাইলে, রপ্তানী বাণিজ্যে প্রবৃত্তি দেয়। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে, দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে বিপর্য্যস্ত করে। ফলে, তেজী-মন্দার সৃষ্টি হয়।

যদি সর্ব্বজাতি সম্মিলিত ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে কোন নির্দ্দিষ্ট অথবা নির্দ্ধারিত নীতি অনুযায়ী স্বর্ণমানকে ক্রিয়াশীল করেন, তাহা হইলে সুফল প্রদান করিতে পারে। কিন্তু জাতিগত, ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় বালাই। পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ-সংঘর্ষে অকপট আচরণ —অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে—Playing the game—কি সম্ভব? বস্তুতঃ, জগতের নিখিল স্বর্ণ সম্পদ্‌কে সচল ও সক্রিয় করিতে হইবে; সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় ও নিরর্থক করিলে, অকপট আচরণের নিয়ম (Rules of the game) ভঙ্গ হইবে। জিঘাংসাপরায়ণ, অতিলোভী জাতিগুলির পক্ষে কি তাহা সম্ভব? আন্তর্জ্জাতিক সন্ধি ও সমবায় জগতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—সর্ব্বাবস্থাতেই সুদূরপরাহত বলিয়া মনে হয়। যখন পরম মিত্র যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যে প্রবল পার্থক্য,—তখন অন্য জাতির কথা নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় স্বার্থ প্রায়ই আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীর পরিপন্থী!

আমরা আর একটি মাত্র কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। যদি স্বর্ণমানকেই পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে স্বর্ণ-বাট-মানই শ্রেয়স্কর। জাতীয় চল্‌তি মুদ্রা প্রকরণে স্বর্ণমুদ্রার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আভ্যন্তরীণ চল্‌তি মুদ্রার নিমিত্ত বৈদেশিক বিনিময়-সংস্থিতিও (Holdings of foreign exchange as reserves for domestic currency) নিষ্প্রয়োজন। গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে এ সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। বিলাতে ১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্ত্তে "ট্রেজারি" নোট চলিয়াছিল এবং তজ্জন্য আইন অনুযায়ী স্বর্ণের মজুত সংস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলন এখন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং নিত্য-নৈমিত্তিক আদান-প্রদান কাগজের নোটে চলিতেছে; পরন্তু, এই কাগজের নোটের পশ্চাতে মজুত-স্বর্ণ অতি সামান্য; অধিকাংশই খৎ-তমসুক প্রভৃতি (Securities)। হিল্টন-ইয়ং তদন্ত সমিতি অতি সমীচীন যুক্তি দ্বারা স্বর্ণ-বাট-মান সমর্থন করিয়াছিলেন। সে যুক্তির সারবত্তা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

স্বর্ণলুব্ধ জগতের অধিকাংশ জাতিই স্বর্ণমানের পক্ষপাতী, সুতরাং স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল; কিন্তু স্বর্ণমান লীলা-চঞ্চল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতিস্মর

অলকনন্দা-তীরেতে একটি বাড়ী,—
তুহিনের ভয়ে অতিথি হলাম তা'রি।
শ্যামল মাধবী, আঙিনা ফেলেছে ছেয়ে,
বাড়ী ভরে আছে ফুল ফল ছেলে মেয়ে,
সে কি পবিত্র, সে কি সুন্দর মুখ—
গোটা পাহাড়ের সুষমার যৌতুক।
আত্মীয়তায় মনে হলো সারারাত,
একটা জন্ম কেটেছে ওদের সাথ।

একদা প্রভাতে অচেনা পথেতে যেতে,
বিশাল সায়র পড়িল সম্মুখেতে।
রৌপ্যশুভ্র উতল সফরীগুলি
লাফায়ে উঠিছে রবি-করে চঞ্চলি।
ফুটে আছে নীরে শুভ্র পদ্মফুল।
চেনা মুখ বলি হইল আমার ভুল।
দুলিছে কমল, সরোবরে উঠে ঢেউ—
মনে হলো ছিনু আমি উহাদেরি কেউ।

একদা নিশীথে স্তব্ধ মৌন সব—
চমকি উঠিনু শুনিয়া বংশী-রব।
যত মধু, তত বিষ যে মাখানো সুরে।
দূর কাছে আনে, নিকটকে দেয় দূরে।
অসহনীয় ব্যথা, অসহ আনন্দ,
নিশ্বাস মেরে করে যেন বন্ধ!
বংশীর গানে ফিরে পেলো যেন হিয়া
দূর জন্মে যা গিয়াছিনু যক দিয়া।

ওই ধ্রুবলোকে করিয়াছি আমি বাস,
বক্ষিতে তার এখনো পাই আভাস।
মিটি-মিটি আলো ওই যে আকাশ-জোড়া,
সুদূর স্মৃতির আলোক-চিত্র ওরা।
আমি অতিক্ষীণ প্রাণময় জ্যোতিঃ যাঁর
যত দূরে থাকি, কাছ-ছাড়া নই তাঁর।
অবিচ্ছিন্ন আমি নহি তাঁর পর
ইহাই আমারে করে যে জাতিস্মর।

কভু যমুনার, কভু সরযূর তীরে,
নারায়ণে আমি হেরেছি নরের ভিড়ে।
ভিক্ষু হইয়া ছিলাম অজন্তাতে,
সোমনাথে আমি লড়েছি পাঠান সাথে।
নিরঞ্জনার তীরে করিয়াছি দান,
মহাপথে আমি করিয়াছি প্রস্থান।
ত্যাগ করি দেহ আমিই কাম্য-কূপে,
গিয়েছি এসেছি হেথা নব নব রূপে।

সুন্দর আমি যাহা কিছু দেখি ভবে
মোর দৃষ্টির কস্ লাগিয়াছে সবে।
রয়েছে ধরার সকল সুরভি জুড়ি,
আমার বুকের প্রণয়ের কস্তুরী।
সকল সলিলে আমার অঙ্গবাস,
সব সমীরণে আমারি যে নিশ্বাস।
ঘন অনুভূতি দেয় মোরে সন্ধান
সকল প্রাণেই রয়েছে আমার প্রাণ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিজ্ঞান-জগৎ

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

এ যুদ্ধে অন্নে-বস্ত্রে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অর্থাৎ সকল দিকেই টান পড়িয়াছে! যে-সব জাতি যুদ্ধ করিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে কামান গোলা গুলী বারুদ এরোপ্লেন পাঠাইলেই তাদের কর্ত্তব্য সিদ্ধ হইবার নয়! যে কোটি কোটি লোক ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া যুদ্ধ করিতেছে, নিত্য-নিয়মিত ভাবে তাদের অন্ন-বস্ত্র জোগানো, খাদ্য জোগানো,
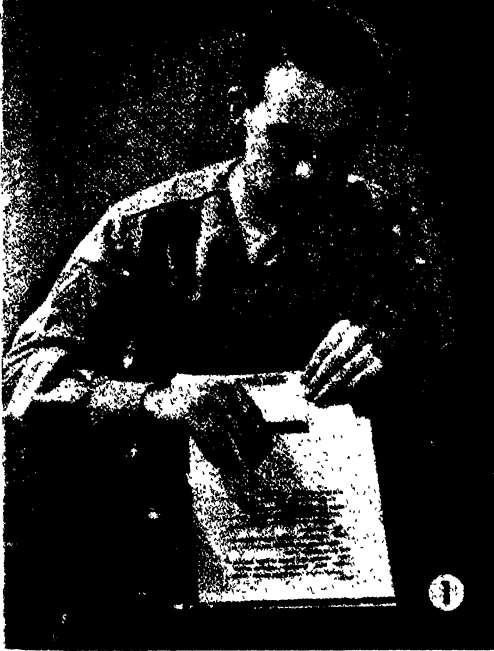
ফর্ম্মে-লেখা চিঠির ফটো

আত্মীয়-স্বজনের কুশলাদি সংবাদ-সম্বলিত পত্র পাঠানো চাই। এ সব ব্যাপারেও যুধ্যমান জাতিসমূহের কার্য্যতৎপরতার আজ সীমা নাই। জিনিসপত্র এমন ভাবে পাঠানো চাই যে, সেগুলি সুনিশ্চিত ভাবে এবং যথাসম্ভব সত্বর যেন পৌছায়! নচেৎ বিলম্ব ঘটিলে কার্য্যহানি

ছোট ব্যাগে চিঠির সংখ্যা দেড় লক্ষ!

এবং বিপত্তি। এ জন্য আমেরিকার ডাক-বিভাগে সংক্ষেপ ও বিচিত্র সঙ্কেত রীতির প্রচলন হইয়াছে। অর্থাৎ বড় চিঠি লিখিয়া সকল সংবাদ পাঠাইতে চাই—কিন্তু বড় প্যাকেট ডাকে পাঠাইতে নানা অসুবিধা! সে জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে—ডাক-ঘরে বিশেষ ফর্ম্ম আছে; সে ফর্ম্ম চাহিলেই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। সেই ফর্ম্মে চিঠি লিখিয়া ডাকঘরে দিলে সে-চিঠির তারা ফটো তোলে—১৬ মিলিমাম্ মাইক্রো-ফিল্মে; তুলিয়া সেই ফটো এনলার্জ করিয়া মেইল-ব্যাগে ভরিয়া বিমান-ডাকে পাঠানো হয়। ইহাতে খরচ পড়ে কম এবং ডাক শীঘ্র যায়। এ ফর্ম্মে-লেখা চিঠি অষ্ট্রেলিয়া-আমেরিকায় যাতায়াতে সময় লাগে আট দিন—ইংলণ্ড-আমেরিকায় যাতায়াতে সময় লাগে ছয় দিন। বিমান-চালক যদি মারা যায়, তবু চিঠি মারা যাইবার ভয় নাই! কারণ, চিঠির মূল-নেগেটিভ থাকে যে ডাক-ঘর হইতে চিঠি পাঠানো হয়, সেই ডাক-ঘরে। একশো ফুট দীর্ঘ ফিল্মে দেড় হাজার চিঠির ফটো তোলা চলে। আমেরিকা এবং য়ুরোপ হইতে এমনি ফটো-চিঠি ভারতে এখন নিত্য অজস্র সংখ্যায় বিলি হইতেছে।

প্যারাশুট-উর্দ্দী

শূন্যপথের উড়ন্ত প্লেন হইতে ঝাঁপ দিবার জন্য প্যারাশুটের ব্যবস্থা বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। সে ব্যবস্থায় অনর্থ না ঘটে, এমন নয়। প্যারাশুট-যাত্রীর পোষাকের কিম্বা প্যারাশুটের গলদে মহা বিপত্তি ঘটিবার আশঙ্কা ছিল খুবই। সম্প্রতি মার্কিণ বিমান-বিভাগ এক-রকম জ্যাকেট তৈয়ারী করিয়াছে—তাহার নাম প্যারাশুট-জ্যাকেট। প্যারাশুট-যাত্রী এ জ্যাকেট আঁটিয়া

প্যারাশুট-জ্যাকেট

শূন্যমার্গ হইতে অনায়াসে এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে ঝাঁপ খাইতে পারেন—জামার রচনা-কৌশলে এতটুকু বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই! তাছাড়া এ জ্যাকেট গায়ে দিয়া নড়ায়-চড়ায় যেমন বাধা বা অসুবিধা ঘটে না, তেমনি নিজের অবস্থান সম্বন্ধেও এতটুকু অনিশ্চয়তার আশঙ্কা নাই।

নকল মণি

ায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বাজারে নকল হীরা াসিয়া টেট্‌স্ ডায়মণ্ড নামে দেখা দিয়াছিল। সে হীরার ক্ষণ-প্তিতে ভুলিয়া এখানকার বহু ভদ্র নর-নারী অনেক পয়সা দিয়া সে
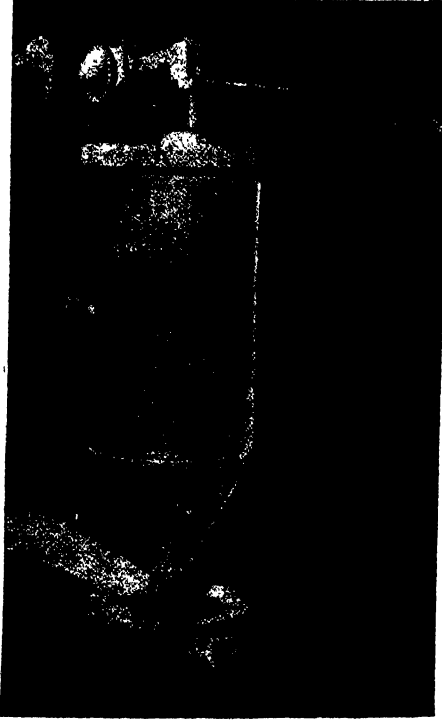
নকল মণি তৈয়ারীর যন্ত্র

সব নকল হীরা কিনিয়া পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন! আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে ভেল্কিদারের ফাঁকি-বাজিতে নয়,

নকল মণির পালিশ

বৈজ্ঞানিকের সাধনায় নানা-রকমের নকল মণিরত্ন আবার তৈয়ারী হইতেছে। এই সব নকল মণি-মুক্তার রচনা-ব্যাপারে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাধনা আছে, তাহা উপেক্ষার বা অবজ্ঞার বিষয় নয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন, ইন্দ্রনীল মণি বা নীলায় এবং চুণীতে আছে এ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড। আগ্নেয়-গিরির তাপে এবং চাপে বসুন্ধরা তাঁর আগ্নেয়-গিরি-নামক ল্যাবরেটরিতে চুণী ও নীলা তৈয়ারী করেন। সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বাষ্পের সংযোগে নানা ধাতু তপ্ত করিয়া বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শুধু নীলা ও চুণী নয়, হীরা-মুক্তাও বৈজ্ঞানিকেরা তৈয়ারী করিতেছেন। এ বিদ্যায় সুইজার-ল্যাণ্ডের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। ঘড়িতে ব্যবহারের জন্য সেখানে এই সব নকল মণিরত্ন অজস্র ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। সেখানকার এক একটি ল্যাবরেটরিতে দিনে দু'লক্ষ ক্যারাট্ মণি-রত্ন তৈয়ারী হইতেছে। এ সব মণি-রত্নের জন্ম হইবামাত্র নানা শিল্পী কাটিয়া বিঁধিয়া নানা প্রক্রিয়ায় সেগুলিকে যথাযথ রূপে-বেশে সুসম্পন্ন করিয়া তোলেন। এ-সব নকল মণি-মুক্তা একেবারে ভুয়া নয় এবং কোনোটির দীপ্তি ক্ষণেকের নয়!

কাগজী কাপড়

কাগজ পাকাইয়া জাল দিয়া তাহার মণ্ড হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মার্কিণ বৈজ্ঞানিকের দল অধুনা যে-কাপড় তৈয়ারী করিতেছেন, দেখিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না! কাগজ হইতে তৈয়ারী এই কাপড় রীতিমত মজবুত এবং এ-কাপড়ে যে-সব ব্যাগের সৃষ্টি হইতেছে, ভার বহিবার এবং সহিবার সামর্থ্য
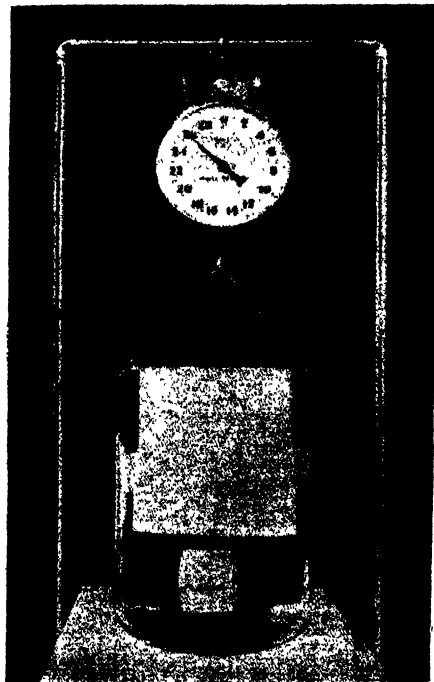
কাগজী-কাপড়ের ব্যাগে ১৩ সের ওজনের ভার

সে সব ব্যাগের অপরিসীম। একরাশ কাগজের শীট্ প্রথমে দু'-চারি দিন জলে ভিজাইয়া রাখা হয়; তার পর সেই ভিজা কাগজ চটকাইয়া

মণ্ড পাকাইয়া বিশেষ রাসায়নিক দ্রাবকে তাহা ডুবাইয়া লইলেই কাগজের পল্‌কা তন্তুগুলি (fibres) বেশ সুদৃঢ়, মজবুত এবং শীট-বস্ত্রখণ্ডে পরিণত হয়। এই কাগজী কাপড়ে আমেরিকা এখন তৈয়ারী করিতেছে তোয়ালে, তরী-তরকারী প্রভৃতি বহিবার ব্যাগ, বালিশের ওয়াড়, পর্দা প্রভৃতি রকমারী গৃহস্থালী দ্রব্য। এ কাগজের নাম "এ্যাকোয়ালাইজ" (aqualized) কাগজ। এক-একখানি কাগজের শীট এমন মজবুত হয় যে, তাহাতে পুঁটলি বাঁধিয়া তেরো-চৌদ্দ সের ওজনের জিনিষপত্র অনায়াসে বহন করা চলে।

বিমান-ট্যাঙ্ক

এবারকার যুদ্ধে ব্রিটিশ ব্রিষ্টল বো-ফাইটার নামে এক নূতন জাতের বিমান-ট্যাঙ্ক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ ট্যাঙ্ক একেবারে ভস্মলোচনের মত বিপক্ষ-পক্ষকে দগ্ধ-ভস্ম করিয়া দিতেছে! সাধারণ প্লেনে
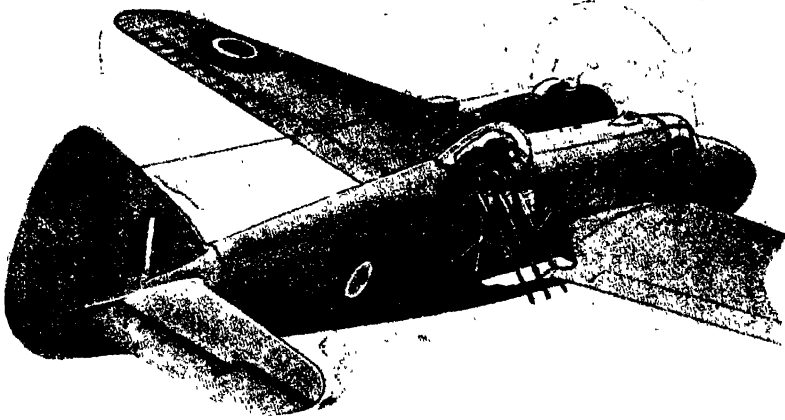
ব্রিটিশ বো-ফাইটার

এ্যাণ্টি-ট্যাঙ্ক-কামানের ব্যাটারি সংযুক্ত; এবং সেগুলিকে সংলগ্ন করা হইয়াছে নিম্নমুখী ভাবে—তাহার ফলে শূন্যপথে বিচরণ-কালে নীচে তাগ করিয়া এ ট্যাঙ্কের অস্ত্রধারী যাত্রী সারি-সারি অগ্নিবর্ষণে সমর্থ! সে অগ্নির হাতে রক্ষা পাইবে, এমন ব্যবস্থা এখনো বিপক্ষ-পক্ষের কল্পনাতীত!

পাত্র-শোধন

এলুমিনিয়ামের প্যান, কেটলি, পেয়ালা, গ্লাস প্রভৃতির ভিতর-গায়ে যদি গুঁড়া-চুণের মত এলুমিনিয়াম-চূর্ণ জমিতে থাকে, তাহা হইলে এক কাজ করিবেন,—পাত্রমধ্যে জল না দিয়া আগুনের তাপে বেশ করিয়া পাত্রটিকে তাতাইবেন; তার পর পাত্রটি উপুড় করিয়া তার গায়ে কাঠের হাতা বা বেলুন দিয়া ধীরে ধীরে ঘা দিবেন—দেখিবেন, এলুমিনিয়ামের

এলুমিনিয়ামের প্যান-শোধন

গায়ের জীর্ণ অংশ ঝরিয়া যাইবে! তার পর পাত্রমধ্যে আর গুঁড়া জমিবে না।

নূতন মার্কিণ-ট্যাঙ্ক
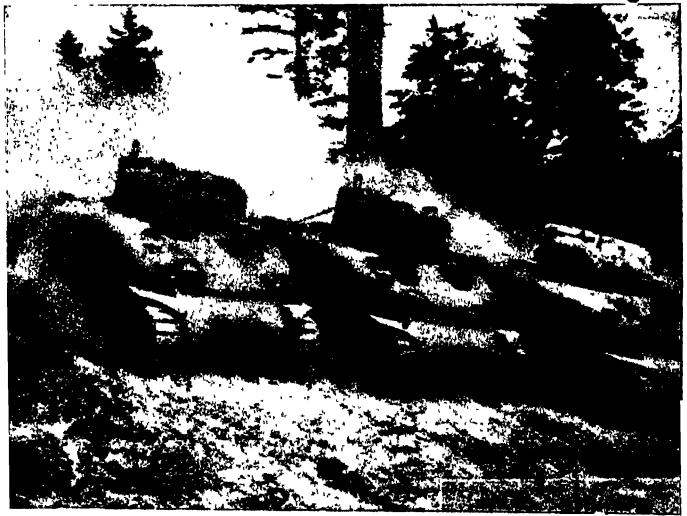
জোড়া-তালি না দিয়া, স্ক্রু-পেরেকের প্যাচ না আঁটিয়া পুরাপুরি কাষ্টিং করিয়া মার্কিণ সমর-বিভাগ "জেনারেল লী" নামে নূতন প্যাটার্ণের স্থল-ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিয়াছে। এ ট্যাঙ্কের শক্তি চলিত-ট্যাঙ্কসমূহের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। অখণ্ড ধাতব শীটে তৈয়ারী বলিয়া এ ট্যাঙ্কে সহজে যেমন ভাঙচুর ঘটে না, তেমনি এ ট্যাঙ্কের দেহকে বিপক্ষের অস্ত্রও সহজে বিঁধিতে পারে না।

নূতন মার্কিণ ট্যাঙ্ক

গ্রহণ

সরল রেখায় আলোক-রশ্মির গতি-পথ। যদি কোন ঘন (opaque) বস্তু গতি-পথের সামনে পড়ে, তবে পিছন-দিকে তার ছায়াপাত হইবে। ছায়াটি ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করিলে দেখিব, মধ্য-ভাগ ঘন কৃষ্ণবর্ণ এবং দু'পাশে আধ-আলো আধ-ছায়া-ভাব।
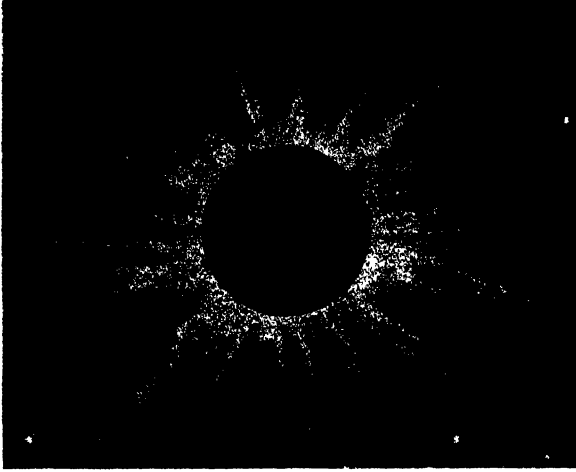
সূর্য্যের পূর্ণগ্রাস

আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করি, পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিয়া পশ্চিমে অস্ত যায় এবং পর-দিন সকালে আবার পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। ইহা হইতে স্বতঃই ধারণা হয় যে, সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিতেছে। ব্যাপার কিন্তু আসলে তা নয়। আলোর সামনে একটি ঘন (opaque) বল রাখিলে তার যে-দিক্ আলোর দিকে, সেই দিক্ আলোকিত এবং অপর দিক্ হয় অন্ধকার। এখন বলটিকে যদি একটি লৌহ-শলাকায় বিঁধিয়া অক্ষদণ্ডের (axis) উপর ঘুরানো হয়, তবে বলের প্রত্যেক বিন্দুটি অর্দ্ধ-কাল আলোয় এবং অর্দ্ধ-কাল অন্ধকারে থাকিবে। এই অক্ষদণ্ডটি যদি পৃথিবীর কক্ষতলের উপর লম্বালম্বি ভাবে একটু হেলানো-অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে আলোয় এবং অন্ধকারে থাকার সময় ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে। আলো সূর্য্য এবং বলটি আমাদের পৃথিবী। এই ঘোরার (rotation) জন্যই দিন ও রাত্রির সৃষ্টি।

ইহা ছাড়া পৃথিবীর আর একটি গতি আছে। ঘুরিবার সময় লাট্টু যেমন অক্ষদণ্ডের উপর ঘোরে তা ছাড়া অগ্রসর হইয়া চলে, পৃথিবীও তেমনই ঘুরিতে ঘুরিতে আগাইয়া চলে; এবং এক বছরে সেকেণ্ডে প্রায় ১৮॥ মাইল বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সে পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই গতি-পথের নাম কক্ষ। পথটি প্রায় বৃত্তাকার এবং সূর্য্য এই কক্ষের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত।

পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে এক-বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীকে প্রায় এক মাসে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। পৃথিবী সূর্য্যের ভৃত্য; গ্রহ আর চন্দ্র পৃথিবীর ভৃত্য—উপগ্রহ। পৃথিবীর ও চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই, সূর্য্যের আলোয় তারা আলোকিত হয়।

চন্দ্র, সূর্য্য এবং পৃথিবী সমসূত্রে অবস্থান করিলে তবেই 'গ্রহণ' সম্ভব। সে ক্ষেত্রে পৃথিবী যদি চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থান করে, তখন সূর্য্যের আলো ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া চন্দ্রে পড়িতে পারে না অর্থাৎ পৃথিবীর গোলাকার ছায়া চন্দ্রকে গ্রাস করে; তেমনি আবার চন্দ্র যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে আসিয়া পড়ে, সে সময়ে যদি পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্য্য একই সরল রেখায় থাকে, তাহা হইলে চন্দ্রকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের আলো পৃথিবী পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে না, ফলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। পূর্ণিমার দিন ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ ও অমাবস্যার দিন ছাড়া সূর্য্যগ্রহণ সম্ভব নয়; কারণ, কেবল সেই দুই দিনই সূর্য্য পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরল রেখায় অবস্থান করে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ এবং প্রতি অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ হয় না কেন? যদি পৃথিবী এবং চন্দ্রের কক্ষ সমতলস্থিত হইত, তাহা হইলে তাহাই ঘটিত বটে। কিন্তু চন্দ্রের কক্ষতল পৃথিবীর কক্ষতলের সঙ্গে প্রায় ৫ ডিগ্রী কোণ করিয়া আছে। পৃথিবীর কক্ষতলের ও কেন্দ্রে এবং পৃথিবী চন্দ্রের প্রদক্ষিণ-কক্ষ কেন্দ্রে অবস্থিত। অতএব চন্দ্র, পৃথিবী এবং সূর্য্য সর্ব্বক্ষণ একই সমতলে থাকে না। সুতরাং এক সরলরেখাতেও থাকে না। চন্দ্রের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষতলকে দুই বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। তাহাদের নাম রাহু এবং কেতু (Nodes)। গ্রহণের জন্য চন্দ্রকে এই দুই
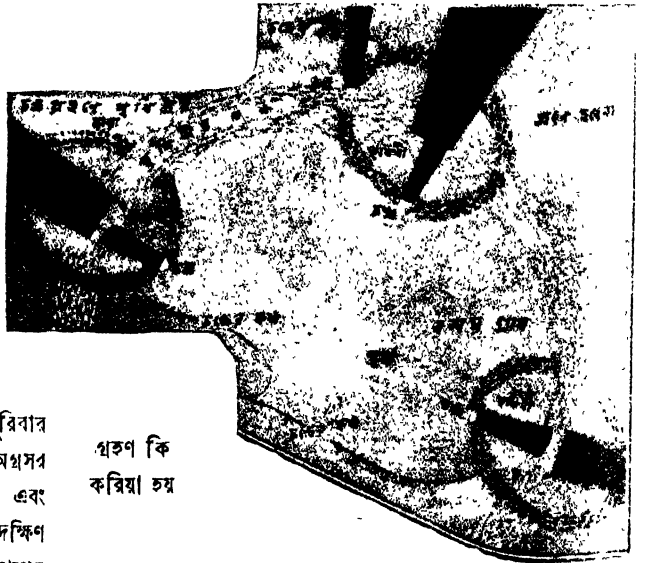
গ্রহণ কি করিয়া হয়

বিন্দুর একটিতে কিংবা তার খুবই নিকটে অবস্থান করিতে হইবে এবং সেই সময়ে পৃথিবী যদি সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যে একই সরল রেখায় থাকিয়া ছায়াকোণের সৃষ্টি করে এবং পূর্ণচন্দ্র সেই ছায়াকোণের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র যদি পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে থাকিয়া সূর্য্যের আলো পৃথিবী অবধি পৌছিতে না

দেয় এবং সে সময় যদি অমাবস্যা থাকে, তবে সূর্য্যগ্রহণ হয়। সাধারণ লোকের ধারণা—সূর্য্য অথবা চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করে! চন্দ্রগ্রহণ
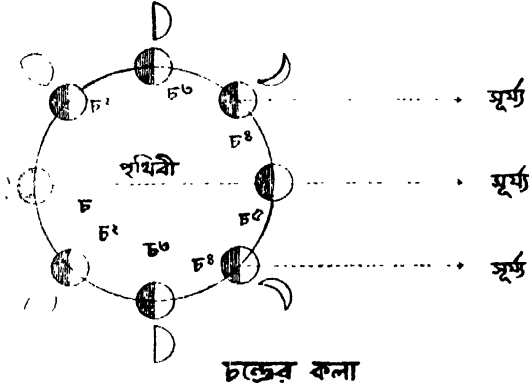
চন্দ্রের কলা

...ম পূর্ণ অথবা আংশিক। সূর্য্যগ্রহণ কিন্তু তিন প্রকারের—পূর্ণ, ...শিক এবং বলয়গ্রাস (annular)।

ছবিতে দেখিতেছি, চন্দ্র যখন প্রদক্ষিণ-কক্ষের 'ক' বিন্দু হইতে ...বিন্দুতে যায় তখন সূর্য্যগ্রহণ হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ক খ ...থবা গ ঘ বৃত্তাংশ বড়; অতএব চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্যগ্রহণের ...বনা বেশী। হয়ত তাই। কথাটা কেহ বিশ্বাস করিতে ...বেন না; কারণ সকলেই সূর্য্যগ্রহণ অপেক্ষা চন্দ্রগ্রহণই বেশী ...য়া থাকেন। কারণ অতি সহজ। চন্দ্রগ্রহণ হয় চন্দ্র ... পৃথিবীর পশ্চাতে ছায়া-কোণে প্রবেশ করে। পৃথিবীর ...শের মুখ সূর্য্যের দিকে ও বাকী অর্দ্ধাংশের মুখ চন্দ্রের ...। যে অর্দ্ধাংশস্থিত লোক সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছে, তাদের ...দিন; অপরাংশে রাত্রি। তারা পূর্ণচন্দ্র দেখিতেছিল, হঠাৎ ছায়াকোণে প্রবেশ করাতে চন্দ্রগ্রহণ ঘটিল। পৃথিবীর অর্দ্ধেক-...বাসী একসঙ্গে চন্দ্রগ্রহণ দেখিল; কিন্তু সূর্য্য-গ্রহণের সময় ঠিক ...ঘটে না। চন্দ্র পৃথিবীর চেয়ে আকারে ছোট এবং পৃথিবী ...র চেয়ে ছোট, অতএব চন্দ্র সূর্য্যের চেয়ে আকারে অনেক-বেশী ... এবং তার ছায়াকোণও অত্যন্ত ছোট। সূর্য্যের দিকে

সূর্য্যগ্রহণ হবে
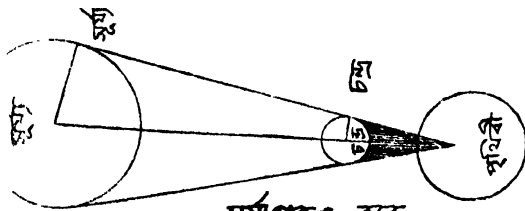
...র যে অর্দ্ধেক-অধিবাসীর মুখ করা ছিল, তারা সকলেই এক-ছায়া-কোণের মধ্যে পড়িল না,—মাত্র এক-অংশ ছায়াতে পড়িল। পড়িল, তারাই শুধু সূর্য্যগ্রহণ দেখিল; অবশিষ্ট লোক দেখিতে ...না। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে কোন এক স্থান হইতে সূর্য্য-...র চেয়ে চন্দ্রগ্রহণ দেখিবার সম্ভাবনা বেশী। যদিও পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের হিসাব করিলে চন্দ্রগ্রহণের চেয়ে সূর্য্যগ্রহণের সংখ্যা অনেক বেশী দেখা যাইবে।

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রের সময় লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট। ততক্ষণে পৃথিবীও একটু অগ্রসর হইয়াছে। কারণ, তাকেও সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হইয়াছে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায়। সুতরাং পৃথিবীর অধিবাসীদের মনে হয়, এক স্থান হইতে যাত্রা সুরু করিয়া চন্দ্রের পক্ষে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিতেছে সাড়ে উনত্রিশ দিন। অর্থাৎ চন্দ্রের এক কলা (যেমন পূর্ণিমা অথবা অমাবস্যা) হইতে পুনরায় সেই কলা আসে সাড়ে উনত্রিশ দিন পরে। এই সময়কে চান্দ্রমাস বলে। চন্দ্র এবং পৃথিবীর কক্ষ যে দুই বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে (রাহু এবং কেতু) সেই দুই বিন্দুও স্থির নয়; বছরে ১৯° করিয়া পিছু হঠে অর্থাৎ ১৮ বছর ৮ মাসে উল্টো দিকে একটা সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে। সেই জন্য উক্ত বিন্দুদ্বয় দ্বারা যদি বছরের হিসাব কষা যায়, তাহা হইলে দিনসংখ্যা কমিয়া যাইবে। কারণ, সেই স্থানে পৃথিবীর আসিবার পূর্ব্বেই রাহু অথবা কেতু আগাইয়া গিয়া পৃথিবীকে ধরিয়া ফেলে। তাহাতে বছর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টার স্থানে বছর সম্পূর্ণ হইয়া যায় ৩৪৬ দিন ৭ মাসে। প্রথমটিকে সৌর বৎসর এবং দ্বিতীয়টিকে চান্দ্র বৎসর বলে। এক মাসে ২৯½ দিনে সূর্য্য এই বিন্দু হইতে প্রায় ৩০½ ডিগ্রী সরিয়া যায়।
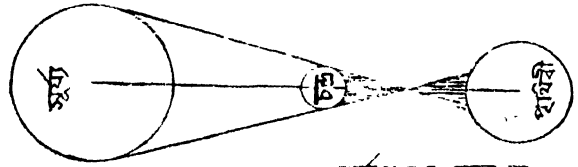
সূর্য্যগ্রহণ হবে না

সূর্য্য হইতে পৃথিবীর এবং পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব যত বেশী হইবে, পৃথিবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী ছায়া-কোণও তত দীর্ঘ হইবে। সুতরাং চন্দ্রের এই ছায়া-কোণে প্রবেশ অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনাও তত বেশী হইবে। সেই সময় চন্দ্র যদি পৃথিবীর খুব নিকটে অবস্থান করে, তবে চন্দ্রগ্রহণের সম্ভাবনা আরও বেশী বাড়িবে। চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষ-তলের মধ্যের কোণও পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং ইহার উপর যদি এই কোণটিও সেই সময় ছোট হয়, তাহা হইলে আর কথাই নাই! এই সব নিয়মগুলিই চন্দ্রগ্রহণের পক্ষে অনুকূল অবস্থা। এই নিয়মগুলি পালিত হইলে যদি গ্রহণ হয়, তবে এ-কথা জোর করিয়া বলা চলে না যে, ইহার দু'-একটা নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও গ্রহণ হইবে! রাহু অথবা কেতু হইতে পৃথিবীর ছায়ার মধ্যবিন্দুর দূরত্বকে গ্রহণ-সীমা (ecliptic limit) বলে। সব কথাগুলিই যদি চন্দ্র-গ্রহণের অনুকূল বলিয়া ধরা যায়, তবে এই দূরত্বকে শ্রেয়ঃ চন্দ্রগ্রহণ-সীমা (major ecliptic limit) এবং সবই যদি বিপরীত হয়, তবে এই দূরত্বকে হেয় চন্দ্রগ্রহণ-সীমা (minor ecliptic limit) বলা হয়। ঠিক এইরূপ শ্রেয়ঃ এবং হেয় গ্রহণ-সীমা সূর্য্যেরও আছে। হেয় সীমার মধ্যে সূর্য্য অথবা চন্দ্র অবস্থান করিলে গ্রহণ হইবেই;

কিন্তু শ্রেয়ঃ সীমার মধ্যে থাকিলে গ্রহণ হইতে পারে, আবার না হইতেও পারে। যেমন পরীক্ষার আগে কোন ছাত্র কোন মতে প্রশ্নপত্র জানিতে পারিয়া উত্তর মুখস্থ করিয়া পকেটে নোট করিয়া লইয়া যায় এবং পরীক্ষার হলে সকলের চোখ এড়াইয়া খাতা লিখিয়া যদি পাশ করে, তবে এই সব ব্যাপারগুলির মধ্যে দু'-একটি ফাঁসিয়া গেলেই তার পাশ করার সম্ভাবনা একেবারে নিঃশেষ হয়! কিন্তু কোন ছাত্র যদি উপরিউক্ত কোন রকম সুবিধা না পাইয়াও পাশ করে, তবে কোনরূপ সুবিধা পাইলেও সে পাশ করিবেই!

বছরে দুইটি সূর্য্যগ্রহণ হইবেই, চন্দ্রগ্রহণ অবশ্য একটিও না হইতে পারে। কিন্তু যদি সুযোগ ও সুবিধা মেলে, তবে একই বছরে সাত

সূর্য্যগ্রহণ

সাতটি গ্রহণও সম্ভব—পাঁচটি সূর্য্যের, দুইটি চন্দ্রের; অথবা চারটি সূর্য্যের এবং তিনটি চন্দ্রের।

একটি চান্দ্র বৎসর প্রায় ৩৪৬ দিন ৭ ঘণ্টার সমান, অতএব ১৯ বৎসর ৬৫৮৫ দিনের সমান। একটা চান্দ্রমাস (অর্থাৎ এক পূর্ণিমা হইতে আর এক পূর্ণিমা) ২৯ দিন ১২ ঘণ্টার সমান। অতএব ২২৩ মাস ও ৬৫৮৫ দিনের সমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আজ সূর্য্য ও চন্দ্র যেখানে আছে, ৬৫৮৫ দিন পরে সূর্য্য ও চন্দ্র রাহু এবং কেতুর অবস্থান হিসাবে পুনরায় ঠিক সেইখানেই থাকিবে। অর্থাৎ ৬৫৮৫ দিনে (১৮ বৎসর ১০ অথবা ১১ দিন) পরে পরে একই সময় একই রকম চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ হয়। এই ভাবে একবার কয়েক বৎসরের গ্রহণের সময় কষিয়া লইলে ভবিষ্যতে গ্রহণের সময় নির্দ্ধারণ করিতে কোন অসুবিধা হয় না।
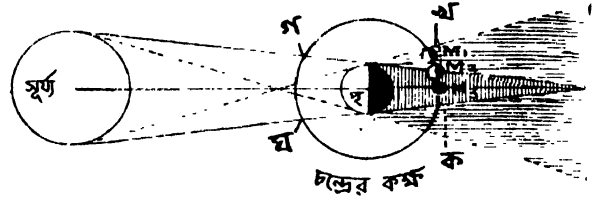
এ বছর ১৫ই শ্রাবণ রবিবার ১৩৫০ সালে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, কিন্তু ভারতে তাহা অদৃশ্য। আর ২৯শে শ্রাবণ রবিবার চন্দ্রগ্রহণ হইবে, আংশিক এবং ভারতে দৃশ্য। চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইবার সময় রাত্রি ঘ ১১।৫১ মিঃ আর ছাড়িবার সময় রাত্রি ঘ ২।৫১ মিঃ। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৪ দিনের ব্যবধানে দুইটি
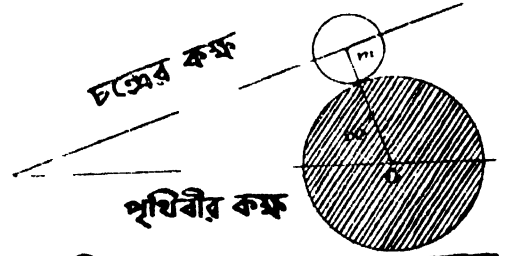
পৃথিবীর ছায়া ও চন্দ্রের অবস্থান

গ্রহণ হইবে! কারণ, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ব্যবধান চৌদ্দ দিনে; অমাবস্যার দিন সূর্য্যগ্রহণ এবং পূর্ণিমার দিন চন্দ্রগ্রহণ হয়।

শ্রীযামিনীমোহন কর এম-এ (অধ্যাপক)

নীলাভ

মোমের বাতির মত দিন মোর হয়ে আসে ক্ষীণ
আমার কুসুম ঝরা স্বপনে রঙীন যত দিন,
শেষ হলো আমার এ ক্ষণেকের ভীরু পরিচয়—
মরণের তীরে এসে আজ আমি হয়েছি নির্ভয়।

আমার জীবনভরা সভ্যতার তীব্র কশাঘাত
আমারে করেছে মূক; কত শত অন্ধকার রাত
আমার রঙীন দিনে কালিমার টীকা এঁকে দিয়ে!
আমারে গিয়েছে ফেলে আমার সমস্ত কিছু নিয়ে।

আমার মরুভূ-দেহে রঙে রঙে স্বপ্নময় দিন
সহসা আসিয়া কবে একেবারে হলো যে বিলীন,—
আজ মোর মনে নাই, মনে নাই কখন আবার
আমার কুসুম-দিনে চুপি চুপি এলো যে আঁধার!

প্রেয়সীর লাজে-কাঁপা অর্থময় নীল দু'টি চোখে
চেয়ে চেয়ে কত কথা বলেছি যে ওকে!
সহসা ফিরায়ে মুখ দেখিলাম চেয়ে তার পানে,
ধূসর ঘোলাটে রঙ আজ তার চোখে শুধু আনে!

আরো কত ঝড়-ঝঞ্ঝা জীবনের পথে পথে আসে—
চুপ করে সয়ে যাই মরণের দুঃসহ নিশ্বাসে;—
এ মোর আকাশ নীল পর-পারে রয়ে গেছে কালো,
আমার মরণে যদি নীল হয়, তাই হবে ভালো!

শ্রীসিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশাব্লাঙ্কা

যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল না, তখন ইংলণ্ড হইতে আফ্রিকা-য়ুরোপ ও এসিয়ায় আসিবার পথ ছিল জিব্রাল্টারের গা ঘেঁষিয়া ভূমধ্য-সাগরের বুকের উপর দিয়া। যাঁরা বিমানপোতে আসিতেন, তাঁদের পথ ছিল স্বতন্ত্র। আজ এই যুদ্ধের জন্য ও-পথ নিরাপদ নয়—যথেষ্ট বিঘ্নসঙ্কুল। কিছু কাল অর্থাৎ টিউনিসিয়া-বিজয়ের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ভূমধ্য-সাগরের বুক ছিল নির্জ্জন—এ পথে আদৌ জাহাজ চলিত না!

মুর-মহল্লার পাঠশালা—কাশাব্লাঙ্কা

ইংলণ্ড হইতে আসিতে জাহাজ বইতে জিব্রাল্টারের কাছে প্রথমেই আফ্রিকার সর্ব্বোত্তরাবস্থিত মরক্কোর* দেখা মেলে। দক্ষিণে জিব্রাল্টার এবং টাঞ্জিয়ারের মধ্যে দেখা যায় মরক্কো এবং উত্তরে স্পেনের দক্ষিণাবস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী। জাহাজ হইতে মরক্কোর যেটুকু দেখা যায়, তাহাতে আছে শুধু প্রাচীন প্রাসাদ-হর্ম্ম্যাদির ধ্বংসস্তূপ, হার্কিলিসের বিজয়-স্তম্ভ প্রভৃতি। এখানে অন্তরীপটুকু ন' মাইল চওড়া—টাঞ্জিয়ারের দিকে পরিসর পড়িয়া বারো মাইল হইয়াছে; তার পর ট্রাফালগার এবং স্পার্টেল অন্তরীপের উপর দিয়া জিব্রাল্টার অন্তরীপ ঘেঁষিয়া আতলান্তিকের বিরাট দেহে নিজের দেহ এলাইয়া দিয়াছে। স্থল-ভাগ বলিতে এখান হইতেই সমুদ্রগামী জাহাজগুলি তাদের শেষ-সিগনাল পায়! ভূমধ্য-সাগরের মুখে মরক্কো যেন প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে।

কিছু কাল পূর্ব্বে টাঞ্জিয়ার-নিবাসী মার্কিণ রাজদূত সাইরাশ উইকার এই পথে পাড়ি দিয়াছিলেন। এ পথের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন:

জাহাজ হইতে সুদূর উত্তর দিকে চাহিয়া প্রাচীন নগর তারিফার দর্শন পাইলাম। বারো শত বৎসর পূর্ব্বে মুসলিম বীর তারিফ এবং মুশা স্পেন-বিজয়ে বাহির হইয়া এই সহরেই প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। সহরের বাঁ-দিকে ট্রাফালগার অন্তরীপ—এইখানে বিশ্ব-বিজয়ী নেপোলিয়ন পরাজয়ের প্রথম কালিমায় লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-দিকে জিব্রাল্টার—ব্রিটিশ প্রতিপত্তির বিজয়-মুকুটের মত চোখে পড়ে। দক্ষিণে আফ্রিকা।

লেখককে রাজকার্য্য-উপলক্ষে স্পানিশ-ফরাসী-অধিকৃত মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া * পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তিনি বলেন, নব্য শিক্ষা সভ্যতা এবং সংস্কৃতির হিসাবে মরক্কো এখনো সকলের বহু-পিছনে পড়িয়া আছে। য়ুরোপীয়ানদের সঙ্গে মরক্কোর সমুদ্রকূলবর্ত্তী নগরগুলির যা-কিছু ঐ পরিচয়। মরক্কোর অভ্যন্তর ভাগে আজও প্রাচীন কায়েদ জাতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেশ শাসন করিতেছে।

লেখক লিখিতেছেন—উত্তর আফ্রিকার গা বহিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতে উল্লেখযোগ্য প্রথম নগর ফেজ। বালি ও রৌদ্রের দেশ। ফেজে যব এবং গম জন্মায় প্রচুর। এখানকার ভেড়া, ছাগল এবং ঘোড়া গর্ব্বের বস্তু। ফেজের জমি খুব উর্ব্বর—খাদ্যশস্যসম্ভারে রীতিমত সমৃদ্ধ। টাঞ্জিয়ার হইতে ফেজ পর্য্যন্ত রেলওয়ে-লাইন নির্ম্মিত হইয়াছে—ফরাসী ও স্পানিশ কোম্পানি এক-যোগে এ লাইনটির পরিচালনা করে। এ লাইনটির রক্ষার উপর উভয় জাতির স্বার্থ ও জীবন ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। রেলওয়ে-লাইনটি গিয়াছে সমুদ্রের সঙ্গে সমন্তরাল-রেখায় অলেকাজারকুইভার পর্য্যন্ত, তার পর পেটিটজীনে বাঁকিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তারিত ফরাসী ট্রাঙ্কলাইনে গিয়া মিশিয়াছে।

পেটিটজীন হইতে একটি শাখা দক্ষিণ-পশ্চিমে মেকেনিজের মধ্য দিয়া ফেজে গিয়াছে। ফেজ হইতে আলজিরিয়ার সীমান্তে উজদায় এ শাখার শেষ। অপর শাখা গিয়াছে পশ্চিমে আতলান্তিক-তীরবর্ত্তী রাবাটে; সেখান হইতে আতলান্তিকের কূল বহিয়া এক দিকে কাশাব্লাঙ্কায় অপর দিকে মারাকেশে এ শাখার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। মরক্কো হইতে এই লাইন ওরান, আলজিয়ার্স, কনষ্টানটাইন হইয়া টিউনিসিয়ার মধ্য দিয়া বাইজার্ত্ত এবং টিউনিস

* মরক্কোর সচিত্র বিশদ বিবরণ ১৩৪৯, চৈত্র সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

* টিউনিসিয়ার সচিত্র বিশদ বিবরণ গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

সহর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তার পর আলাদা লাইন আছে—টিউনিস সহর হইতে গেবিশ-উপসাগরের তীরে গেবিশ সহর পর্য্যন্ত। *

এ লাইনের কল্যাণে এই যুদ্ধের সময় ফৌজ এবং ফৌজের রশদ-পত্রাদি জোগানের কাজ কতখানি সহজ হইয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। শুধু আফ্রিকার ফৌজ নয়—য়ুরোপও এই রেল-লাইনের কল্যাণে এ দুর্দ্দিনে খাদ্যশস্যের জোগান পাইয়া বর্ত্তাইয়া গিয়াছে।

লেখক বলিতেছেন, টাঞ্জিয়ার হইতে বাসে চড়িয়া আমি দেশের পরিচয়-গ্রহণে বাহির হইয়াছিলাম। এ পরিভ্রমণে যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত! পথে কোথাও দেখি, সার-সার উট চলিয়াছে, কোথাও বা গাধার সার—তাদের পিঠে লোকজন এবং খাদ্য-শস্যের ভার! কোথাও বা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে অসংখ্য মেষ ও ছাগল তাড়াইয়া পথে চলিয়াছে। দূরে দূরে দেখা যায়, পাহা-ড়ের কোলে অনাড়ম্বর ছোট ছোট গ্রাম—গ্রামের কোলে ফশল-ভরা ক্ষেত-খামার—বলদ দিয়া চাষীরা ক্ষেতে চাষ করিতেছে। দেখিয়া বার-বার বাই-বেলে-পড়া অতীত দিনের সরল নির্ম্মল শান্তিময় জীবনের কথা মনে পড়িতেছিল।

রাবাটের রাজপথে অন্ধ দরবেশ

এ-সব গ্রামে এখনো বহু যুগের প্রাচীন আচার-প্রথা বিরাজ করিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতা-সংস্কারের বিন্দুবাষ্পও সে সব প্রথার গায়ে লাগে নাই! মৃত্তিকানির্ম্মিত দেবতাকে লইয়া গ্রামবাসীদের পূজা দেখিলাম। এ দেবতাটির পূজা করিলে না কি শস্যসম্ভারে ক্ষেত ভরিয়া ওঠে! দেবতার উপর এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস দেখিলাম অটল! এ দেবতার পূজা করিয়া তারা কোনো দিন তাঁর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হয় নাই। তারা বলিল, পূজায় তিনি চিরদিন তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন এবং সে তৃপ্তির প্রসাদে শস্যাদি লাভে তারা কৃতার্থ হইতেছে চিরদিন।

সেবু নদীর মুখে পাইলাম মেদিয়া—তার পর রাবাট সহর।

* অবস্থানের জন্য গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত টিউনিসিয়ার মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ শতাব্দীতে এই রাবাটে হাসান-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বিজয়ী বীর ইয়াকুব এল মনসুর। এ স্তম্ভটি বহু দূর হইতে চোখে পড়ে!

বন্দর হিসাবে রাবাটের তুলনা নাই! মরক্কোয় চারটি বড় সহর আছে—রাবাট তার অন্যতম। অপর তিনটি সহর—ফেজ, মারাকেনা এবং পুণ্যতীর্থ মেকিনিজ। মেকিনিজেই মরক্কো স্থলতানের প্রাসাদ—এবং এই মেকিনিজেই ফরাসী রেসিডেন্ট জেনারেলের আবাস এবং অফিস।

রাবাট সহরটি যেন হরগৌরীর মতো—অর্থাৎ অর্দ্ধাংশে পুরানো মুরজাতির বাস, অপরার্দ্ধে আধুনিক ফরাসী সহর। মুর-মহল্লায় প্রাচীন যুগের আবহাওয়া, ফরাসী সহরে পদার্পণ করিলে তেমনি মনে হইবে যেন য়ুরোপীয় সহরে প্রবেশ করিয়াছি! লেখক লিখিয়াছেন, —রাবাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ষাট মাইল দূরে বিখ্যাত সহর কাশাব্লাঙ্কা। স্পানিসরা এ সহরের নাম দিয়াছে কাশাব্লাঙ্কা বা সাদা বাড়ী—সহরের পুরানো মুর নাম দার-এল্-বাইদা অর্থাৎ সাদা কুঠি!

কাশাব্লাঙ্কা আতলান্তিকের কূলে প্রসিদ্ধ বন্দর। ফরাসীরা সুদৃঢ় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া কাশাব্লাঙ্কাকে যথাসম্ভব দুর্ভেদ্য করিয়াছে। ডাকারের উত্তরে আতলান্তিকের তীরে এমন বাণিজ্য-কেন্দ্র আর দু'টি নাই! কাশাব্লাঙ্কা হইতে রেলওয়ে-লাইন উত্তরে, পশ্চিমে এবং পূর্ব্বে গিয়াছে উত্তর আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া। উত্তর আফ্রিকার খাদ্যশস্য বিদেশে চালান যায়—এই কাশাব্লাঙ্কা মারফৎ। বন্দরে সব-সময়েই অসংখ্য জাহাজ রহিয়াছে।

আলজিরিয়াকে উত্তর আফ্রিকার "মরাই" বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আলজিরিয়াকে মরাই বলিলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্তী সমস্ত বন্দর যদি কোনো কারণে অবরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেও মরক্কোর মারফৎ সর্ব্বপ্রকার চালানী মাল নিরাপদে এই কাশাব্লাঙ্কায় আনিয়া সেখান হইতে তাহা বাহিরে চালান দিতে কোনো অসুবিধা ঘটিবে না। আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশগুলিতেও কাশাব্লাঙ্কা-মারফৎ মালপত্র চালান দেওয়ায় কোনো কারণে বাধা ঘটিতে পারিবে না।

লেখক লিখিতেছেন—উত্তর আফ্রিকার পূর্ব্ব দিকে যাইতে হইলে বাস বা ট্রেণ—যে-কোনো গাড়ীতে চড়িলেই চলিবে। দু'টি পথই
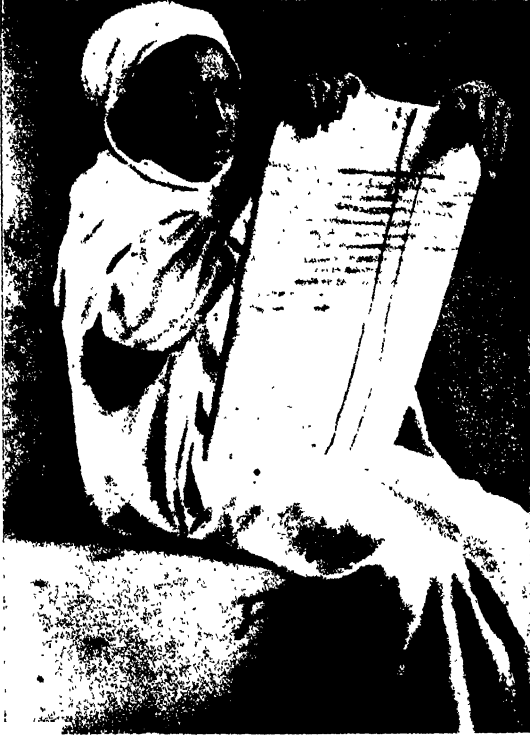
মুশলিম ছাত্র কোরাণ পড়িতেছে—কাশাব্লাঙ্কা

দৃশ্য-বৈচিত্র্যে মনোজ্ঞ। দু'ধারে পাহাড়, সমুদ্র, বালুকারাশি এবং মালভূমি—চোখের সামনে ক্ষণে ক্ষণে যেন ছবির পরে কে ছবি উল্টাইয়া দিতেছে! এ পথে ডান-দিকে পাইলাম আলজিরিয়ার এ্যাটলাশ এবং গ্রান্দি কাবিলি পাহাড়। এ দু'টি পাহাড় গায়ে গায়ে মিশিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে পড়িয়া আছে! পাহাড়ের ওপারে ধূ-ধূ মরুভূমি বালুকায় ভরা।

উত্তরে রিফ-পর্ব্বতশ্রেণী। এ পাহাড় এমন দুর্গম দুর্ভেদ্য যে, আজ পর্য্যন্ত বহু প্রয়াসেও ইহার রোমাঞ্চকর পরিচয়-কাহিনী কোনো সভ্য জাতি সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

এ-অঞ্চলে মরক্কোর দিকে তাজা ও উজদা, আলজিরিয়ার দিকে ত্লমসেন ও সিদি-বিল-আবেশ—মিলিটারী সহর। এ চারটি সহরে শুধু ফরাশী ফৌজের ব্যারাক আছে। বেসামরিক অধিবাসীর চিহ্নও নাই! পথে-ঘাটে শুধু সামরিক উর্দ্দি-পরা লোকজনের ভিড়। স্পাহী-অশ্বারোহীর জীবন লইয়া ফরাশী কথাশিল্পী পীয়ের লোটি যে রোমান্স লিখিয়া গিয়াছেন, সে রোমান্স অমর হইয়া থাকিবে! স্পাহী ফৌজ ছাড়া এ সব ব্যারাকে বাস করে তুর্কো, জুয়াভা, আলজিরিয়ান, মরক্কোন ও সেঙ্গলীজ ফৌজদল।

ওরান একটি চমৎকার বন্দর। এখানে সে-দিন মিত্র-বাহিনীর সঙ্গে অক্ষশক্তির তুমুল সংঘর্ষ ঘটিয়া গিয়াছে। এ্যাডমিরাল ডার্লান যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ জারি করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে ফরাশীরা বন্দরের স্বল্পপরিসর স্থানে জাহাজ ডুবাইয়া বন্দর-মুখ বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। বহু জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ ও ব্রিটিশ এঞ্জিনীয়ারের দল অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সে-সব জাহাজ তুলিয়া বন্দরে প্রবেশ-পথ মুক্ত করে।

ওরান প্রাচীন নগর। এখানে সেই সাবেকী আমলের মসজেদ, বাজার, তালবন, নকল ফোয়ারা আজও অখণ্ড দেহে বিরাজ

ফেরি-ঘাট—বাইজার্ত্ত

করিতেছে। নূতনের মধ্যে এখানকার বিমান-ক্ষেত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন নিরাপদ ও দুর্জ্জয় বিমান-ক্ষেত্র আফ্রিকায় আর নাই। বিমান-ক্ষেত্রটির সহিত সুদৃঢ় দুর্গ আছে। তাছাড়া বিমান-ক্ষেত্র হইতে চার মাইল দূরে আছে নবনির্ম্মিত নৌঘাটি—মার্শ-এল্-কেবির।

ভূমধ্য-সাগরের অধিনায়কত্ব লইয়া এখানে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুলাই তারিখে ফরাশীর সহিত ইংরেজের প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল।

আলজিয়ার্স হইতে ৪০ মাইল দূরে বোর-আর-জমিয়া। এখানে রোমান বীর মার্ক এণ্টনি এবং মিসর-রাণী ক্লিওপেট্রার একমাত্র কন্যা ক্লিওপেট্রা সেলিনার সমাধি।

সেলিনার সম্বন্ধে চমৎকার কাহিনী শুনা যায়। এখানকার রাজা জুমিদিয়ার বংশধর রাজা জুবা রোমান-সম্রাট অগষ্টাশকে কার্থেজ-বিজয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। সে উপকারের পুরস্কার

র‍্যাগ্‌-কার্পেটের মেলা—টিউনিসিয়া

স্বরূপ সম্রাট্ অগষ্টাশের কাছে জুবা রাজা সেলিনার পাণি প্রার্থনা করেন। অগষ্টাশ ভাবিলেন, এ বিবাহ হইলে জুবার রাণী সেলিনা রোমের সঙ্গে আর কখনো শত্রুতা করিবেন না। তাই তিনি এ বিবাহে সম্মতি দিলেন। বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা সেলিনার মনে আকাঙ্ক্ষা ছিল, রোম জয় করিবেন। বিবাহের পর কিন্তু জুবার আদরে-প্রেমে সেলিনা সে-আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া দর্শন এবং শিল্প-সাধনায় মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। রোম সাম্রাজ্য বহু বিঘ্ন হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচিল। সমাধি-মন্দিরটির আয়তন বিরাট্। এবারকারের যুদ্ধে গোলাগুলীর পীড়নে এ সমাধি-মন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ক্লক-টাওয়ার—কাশাব্লাঙ্কা
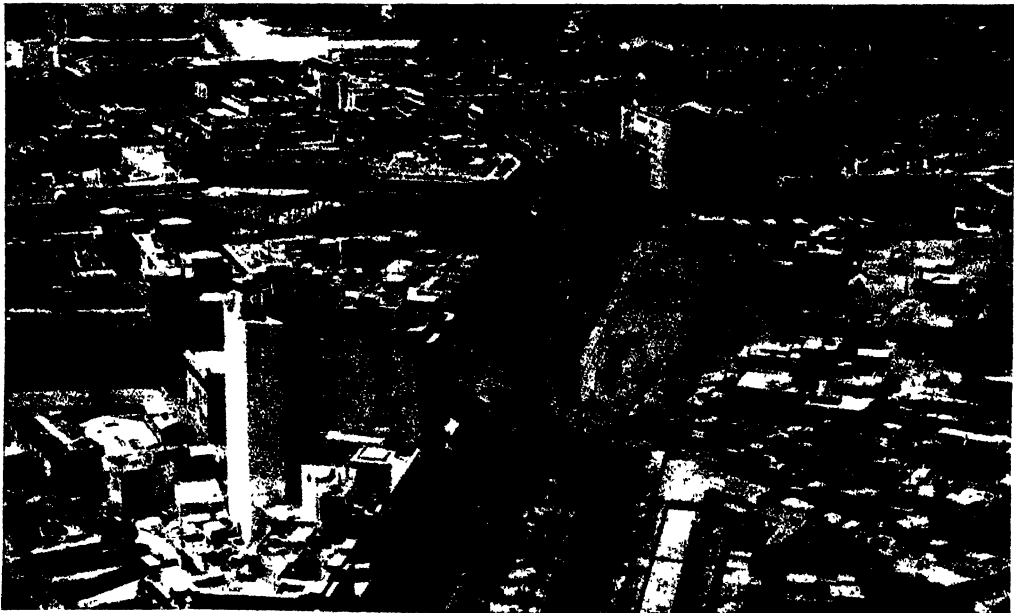
আলজিয়ার্স বন্দর—ষোল ঘণ্টার যুদ্ধে মার্কিনের করগত

ওরান্ বন্দর

আলজিরিয়ার প্রধান সহর আলজিয়ার্স। আলজিয়ার্স সমৃদ্ধ বন্দর। এখান হইতে ভূমধ্য-সাগরের বুকের উপর দিয়া ফ্রান্সে ও জার্ম্মানিতে প্রচুর খাদ্যশস্য, সুরা এবং অলিভ তৈল চালান যাইত। এবারকারের এ যুদ্ধে গোল ঘটার মধ্যে আলজিয়ার্স ফরাশী ও অক্ষ-শক্তির হস্তবিচ্যুত হইয়া আমেরিকার করতলগত হইয়াছে।

কিন্তু বন্দর হিসাবেই শুধু আলজিয়ার্সের মূল্য নয়—এমন বিরাট্ উর্ব্বর দেশ বোধ হয় সারা আফ্রিকায় আর নাই! প্রাচীন রোমান আসলে এই আলজিয়ার্স ছিল সমগ্র রোমের অন্ন-ভাণ্ডার!

বাসের প্রতীক্ষায় লাইনে দাঁড়ানো—আলজিয়ার্স

আজও এখানকার জমির উর্ব্বরতা এতটুকু কমে নাই! অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিকর্ম্ম লইয়া আছে। এখানকার উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমিতে আছে ঘোড়া, ছাগল এবং ভেড়ার জন্য সমৃদ্ধ চারণ-ক্ষেত্র; বুকে অজস্র প্রচুর দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং বিচিত্র ফলের বাগান; সমতল মালভূমে আছে নানা রকমের শস্যে সমৃদ্ধ বিরাট্ বিপুল ক্ষেত্রসমূহ। জাহাজে তুলিয়া ভূমধ্য-সাগর পার করিয়া ক্ষুধিত য়ুরোপ এ-শস্যাদির কল্যাণে আজ বাঁচিয়া আছে, ব্যবসা বাণিজ্যের লক্ষ্মীকে সে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে!

আলজিরিয়া হইতে দেশ-দেশান্তরে চালান যায় গম, সুরা, ছোলা, যব, বিবিধ খাদ্যশস্য, তামাক, অজস্র বিচিত্র জাতের ফল,—তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কমলা লেবু, বাদাম, পীচ, কুল এবং খেজুর। আলজিরিয়া দ্রাক্ষায় সমৃদ্ধ। এই দ্রাক্ষা নিঙড়াইয়া এখানে যে সুরা তৈয়ারী হয়, আলজিরিয়ার জল-বাতাসের গুণে সে সুরা—বিশেষজ্ঞদের মতে—না কি স্বর্গের সুধা! তার আর তুলনা নাই!

ফরাশীর হাতে আলজিরিয়ার মাটির উর্ব্বরা-শক্তি বহু গুণ বাড়িয়াছে। ফরাশীরা সর্ব্বত্র প্রচুর নলকূপ বসাইয়াছে; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিপদ্ধতি শিখাইয়া এখানকার কৃষকদের তারা রীতিমত মায়াবী গড়িয়া তুলিয়াছে! তাহার ফলে কৃষিলক্ষ্মী আজ আলজিরিয়ায় তাঁর আসনখানি কায়েমি করিয়া পাতিয়া সেই আসনে অচঞ্চল বসিয়া পূর্ণ-তৃপ্তি ভোগ করিতেছেন এবং প্রীতির দানে আলজিরিয়াকে ভরিয়া তুলিতেছেন।

আলজিরিয়ার পূর্ব্বে টিউনিসিয়া। টিউনিসিয়ার অন্তর্গত বাইজার্ত্ত সহরটি যেন এ অঞ্চলের দুর্জ্জয় প্রহরী! পাহাড় এবং সমুদ্রের বুকে এমন চমৎকার তাহার অবস্থান। তার উপর এক দিকে দুর্গ কারুবা আর এক দিকে দুর্গ সিদি আমেদ। এই অপূর্ব্ব অবস্থানের জন্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বাইজার্ত্ত সহরটি যেন ইতালীর বুক তাগ্ করিয়া পিস্তল উঁচাইয়া আছে (a pistol pointed at the heart of Italy)!

লেখক লিখিতেছেন—বাইজার্ত্তের অদূরে প্রাচীন কার্থেজ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। উত্তর-আফ্রিকার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত

বার্বার তরুণী—আলজিরিয়া

ঘুরিয়া মনে হয় যেন ভূমধ্য-সাগরের পশ্চিমাবস্থিত এই বিরাট্ উপকূলভাগই শুধু এ যুদ্ধের শেষ মীমাংসা করিতে সমর্থ! যে-শক্তি এই উত্তর আফ্রিকায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে,—এক দিক্ দিয়া সে যেমন অন্ন-শক্তিতে বঞ্চিত হইবে না, তেমনি অপর দিকে এখানকার দুর্ভেদ্য অবস্থানে নিজেকে নিরাপদ রাখিয়া ফ্রান্স-ইতালী-জার্ম্মানির স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবার পক্ষেও অনেকখানি সুবিধা ও সামর্থ্য লাভ করিতে পারিবে। তাই এ অঞ্চলটিকে এ যুগের কুরুক্ষেত্র বলিয়া যেমন আখ্যা দিতে পারি, তেমনি যদি মনে করি, এই কুরুক্ষেত্রেই দানবী-লীলার রুধির সমাধি ঘটিবে, তাহা হইলে সে কল্পনাকে অলীক ভাবিবার কোনো হেতু নাই!

ছোটদের আসর

তোমাদের বয়সী ছেলে

জগতের চারি দিকে এই যে আজ নিত্য-নব-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের লীলা দেখিতেছ, এ-সব আবিষ্কার-বৈচিত্র্যে তোমরাও নিশ্চয় স্বপ্ন জাগো—তোমরাও যদি নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে পারো তো বেশ হয়!

এ স্বপ্ন-দেখায় লজ্জা নাই! সাধনায় মানুষ এমনি স্বপ্নকে জীবনে সফল করিয়াছে—তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সাধনা করিলে তোমাদের ছেলে-বয়সের স্বপ্নও সফল হইবে, নিশ্চয়!

পরাধীনতার চাপে স্বাধীন দেশের ছেলেদের মতো কল্পনাকে তোমরা দিক্-বিদিকে পাঠাইতে পারো না! তার উপর আছে দারিদ্র্য—হয়তো এ-সব ভাবিয়া তোমাদের কল্পনা মধ্যপথে থামিয়া যায়! কিন্তু না, কল্পনাকে ছাড়িয়া দাও, নিষ্ঠাভরে যদি সাধনা করিতে পারো, জানিয়ো, তার ফল পাইবেই!

বিদেশী কয়েকটি ছেলের কথা বলিতেছি। ধনীর ঘরে তারা জন্ম লয় নাই! শুধু সন্ধানী মন লইয়া কল্পনাকে তারা সার্থক করিবার জন্য সাধনা করিয়াছিল,—সে সাধনায় কতখানি সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সে কথা শুনিলে তোমাদের দ্বিধা-সংশয় ঘুচিবে, মনে উৎসাহ পাইবে, শক্তি পাইবে। একটা কথা মনে রাখিও, জগতে এক জনে যে-কাজ করিয়াছে, সে-কাজ অপরেও করিতে পারিবে নিশ্চয়! মানুষের পক্ষে অসম্ভব বা অসাধ্য বলিয়া জগতে কিছু নাই! এই যে মোটর-গাড়ী, বায়োস্কোপ, রেডিয়ো, সিনেমা—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এ সবের কল্পনাও মানুষের মনে জাগে নাই! আর আজ? সহজ সত্য-রূপে মানুষ এ-সব বস্তু অনায়াসে লাভ করিয়াছে।

কিন্তু এ সব কথা থাক—এখন সেই বিদেশী ছেলেদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বলি। আমেরিকার এলেন টাউনে রবার্ট স্পেলিঙের বাস। ছোট ছেলে। রবার্টের বয়স তখন ন' বছর; রবার্টের বড় দাদা উইলিয়মের বয়স এগারো বছর। রবার্টের বাপ ছিলেন রাসায়নিক—তাঁর ল্যাবরেটরি ছিল। লিখিবার কালি লইয়া উইলিয়ম এবং রবার্টের মন খুঁৎ খুঁৎ করিত—বিশ্রী কালো কালি! তাদের পছন্দ হইত না। কালি তৈয়ারীর নানা মশলার কথা বইয়ে দুজনে পড়িত। সেই সব মশলা লইয়া নিজেদের ঘরের ল্যাবরেটরিতে বসিয়া দু'ভাই নানা কৌশলে কালি তৈয়ারী করিত। এক দিন এক প্রণালীতে ব্লু-ব্ল্যাক কালি তৈয়ারী হইল। কালি দেখিয়া দু'জনে খুব খুশী! ছেলেদের তৈয়ারী এ কালি বাপ দেখিলেন—আরো পাঁচ জনে ব্যবহার করিলেন। সকলেই মহা খুশী। এমন কালি পূর্ব্বে তাঁরা চোখে কখনো দেখেন নাই। এবং সংবাদ পাইয়া ওখানকার এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী উইলিয়ম এবং রবার্টের তৈয়ারী কালির পেটেন্ট লইয়া বাজারে বাহির করিলেন। উইলিয়ম এবং রবার্ট সেই অল্প বয়সেই হইল কালির ব্যবসায়ে ব্যবসায়ীর অংশীদার।

সান ফ্রানসিশকোর এক ইস্কুলের ছাত্র লিয়ন সালানেভ—বয়স বারো বৎসর। পাড়ায় এক ভদ্রলোকের দূরবীক্ষণ-যন্ত্র লইয়া যখন তখন দূর আকাশের গায়ে নক্ষত্র দেখিত। আকাশের নক্ষত্র দেখা ছিল তার খেলা। নক্ষত্র সম্বন্ধে লেখা ছেলেদের পাঠ্য-বই দেখিলেই পড়িত। সেই সব বই পড়া এবং দূরবীক্ষণে এমনি করিয়া নিত্য নক্ষত্র দেখা—ইহার মধ্যে এক দিন লিয়ন দেখিল, আকাশের পরিচিত নক্ষত্র-পুঞ্জের সঙ্গে অজানা নক্ষত্রের আবির্ভাব—সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত নক্ষত্রগুলির আসন যেন টলিয়াছে! সে এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ পিতৃ-বন্ধুর কাছে এ কথা বলিল। পিতৃ-বন্ধুও স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখিলেন। তখনি এ সংবাদ দিকে দিকে রাষ্ট্র হইল এবং বিশেষজ্ঞেরা অনুশীলন-কার্য্যে রত হইলেন। সে অনুশীলনের ফলে নূতন কয়টি নক্ষত্রের আবিষ্কার ঘটিল।

লিয়নের নক্ষত্র দেখা

জর্ডান ও জর্ডানের মা

আর একটি ছেলে, জর্ডান রিয়ারম্যান। নিউ-ইয়র্কের নিউ রোশেলে বাড়ী। বয়স সাত বৎসর। জর্ডানের খেলা ছিল বাড়ীর ভাঙ্গা তৈজসপত্র লইয়া জোড়াতালি দিয়া নূতন কিছু খেলনা তৈয়ারী করা। এই খেলা খেলিতে খেলিতে সে এক নূতন রকমের দেওয়াল-আন্‌লা তৈয়ার করিয়া বসিল। আন্‌লা দেখিয়া মা অবাক্! সে আন্‌লার উপযোগিতা যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল। সাত বছরের ছেলের তৈয়ারী সে আন্‌লার পেটেন্ট রেজিষ্ট্রী হইয়া গেল; এবং সে আন্‌লার কারবার করিয়া জর্ডান আজ ক্রোড়পতি হইয়াছে।

লস এঞ্জেলেসে জ্যাক বেটারিজ মোটর-গাড়ীর ভাঙ্গাচোরা পরিত্যক্ত অংশ কেনা-বেচা করিত। জ্যাকের ছেলে বিলির বয়স পনেরো বৎসর। সেই ভাঙ্গাচোরা অংশ জোড়াতালি দিয়া বিলি চাহিত ছোট-ছেলেদের মোটর-গাড়ী তৈয়ার করিতে। এ বিষয়ে তার সাধনার বিরাম ছিল না এবং এক দিন বিলি এমনি ভাঙ্গাচোরা অংশ লইয়া একখানি মোটর-গাড়ী তৈয়ারী করিল একা—আর কাহারো সাহায্য না লইয়া! ব্যাটারি ফিট করিয়া সে মোটর বিলি পথে চালাইল—মোটর ছুটিল ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে।

দু'-চারিটি নয়, আমেরিকার অনেক ছেলে এমনি অভিনব আবিষ্কারে সকলের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে! তোমাদের মধ্যেও অনেকের এমন সখ আছে—কত কি গড়িবার বাসনা! এগুলাকে

অলস-খেলা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এ সব ছেলের মা-বাপকে বলি, ছেলেদের এমন শেখায় উৎসাহ দিবেন! সে উৎসাহে এ সব ছেলে নব নব আবিষ্কারে জগৎকে বিস্মিত করিয়া
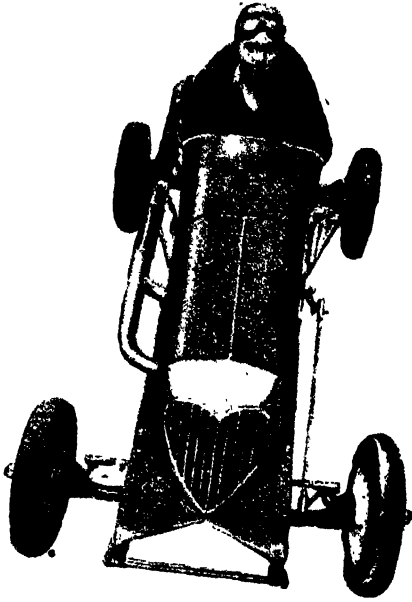
বিলির তৈয়ারী মোটর-গাড়ী

নিজেদের জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।'

লেখার হদিশ

এক জন বড় লেখককে আমরা একবার ধরেছিলুম। বলেছিলুম,—কি করে আপনি এত সব বই লেখেন? আমরা কেন লিখতে পারি না?

এ কথার উত্তরে হেসে তিনি বলেছিলেন,—তোমরা লেখবার চেষ্টা করো না বলে লিখতে পারো না। আমরা প্রশ্ন করেছিলুম,—লেখবার চেষ্টা করলেই কি লিখতে পারবো? তিনি বলেছিলেন,—নিশ্চয়।

তার পর তিনি বলেছিলেন—যাঁরা বই লেখেন, তাঁদের সে লেখায় কি থাকে? চোখে তাঁরা যা দেখেছেন, কাণে শুনেছেন, বইয়ে প ড়ছেন বা যে সব বিষয় চিন্তা করছেন—এই সবই তাঁদের লেখার বিষয়-বস্তু। আমাদের মধ্যে অনেকে যে অনেক-কিছু দেখে-শুনেও সে সম্বন্ধে কিছু লিখতে পারেন না, তার কারণ, তাঁরা দেখার মত করে কোনো বস্তু দেখেন না। কিম্বা দেখলেও শৃঙ্খলা-পর্য্যায়ক্রমে সাজিয়ে গুছিয়ে সেগুলির বর্ণনা—মুখের ভাষায় বা লেখার হরফে প্রকাশ করতে পারেন না। সব বিদ্যার মতন লেখা-বিদ্যারও চর্চ্চা করতে হয়।

এই কথা বলে তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন—বেশী নয়, একটি দিন তোমরা ঘুম থেকে উঠে যা-কিছু কাজ করবে, রাত্রে শুতে যাবার আগে ধারাবাহিক ভাবে তারই বর্ণনা লেখবার চেষ্টা করো। প্রথমে যে লেখা হবে, তা দেখে হয়তো হাসি পাবে, কিন্তু এমনি দিনের পর দিন লিখতে লিখতে শেষে ভালো লিখিয়ে হতে পারবে!

তিনি বললেন, ধরো, একটা রবিবারে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখতে গেলে। সেখানে নানা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লোকের ভিড়ে কত রকম বৈশিষ্ট্য দেখলে। চিড়িয়াখানা থেকে ফিরে এসে লেখো সেই সবের বিশদ বিবৃতি। তার চেয়েও সহজ উপায় হচ্ছে, কোনো সুলেখকের লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বা গল্প-উপন্যাস পড়ে পড়ার শেষে সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বা গল্প-উপন্যাসের চুম্বক নিজের ভাষায় পর-পর লিখে যাও। এমনি করে লেখা মক্সো করতে শিখতে হয়।

বললেন,—স্কুলে essay লেখা। ক্লাসের টীচার essay লিখতে দিলেন—"এগজিবিশন"। তোমাদের মধ্যে অনেকেই একটা না একটা এগজিবিশন দেখেছো। তাতে যা দেখেছো, মনে করে করে লেখো তার বর্ণনা। এগজিবিশন মানে, বিস্তীর্ণ ঘেরা মণ্ডপ—তার মধ্যে বিচিত্র ষ্টলে বা কামরায় নানা দেশের নানা লোকের তৈরী নানা রকম জিনিষ জড়ো করে দেখানো হয়। এ-সব জিনিষের মধ্যে কি কি আছে, সে সব জিনিষ রাখবার জন্য কে কি রকম ষ্টল তৈরী করেছে,—ক'আনার টিকিট কিনে এগজিবিশন দেখতে ভিতরে ঢুকতে হয়; রকমারি জিনিষ-পত্র ছাড়া এগজিবিসন-ক্ষেত্রে আমোদ প্রমোদের কি রকম সব ব্যবস্থা ছিল, কত রকমের লোক এসেছিল এগজিবিশন দেখতে—তাদের আচার-ব্যবহারে কি রকম বৈশিষ্ট্য ছিল- মনে করে-করে পর-পর এই সব লিখে যাও! তার পর ভেবে-চিন্তে লেখো এগজিবিশনের উপকারিতা কি,—মানুষ বুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ের বলে এই যে এত সব জিনিষপত্র তৈরী করেছে, সে-সবের কোথায় আরও কি উন্নতি করা যেতে পারে—এ সব কথা লেখো। এমনি ভাবে স্মরণ এবং মনন-শক্তি বা চিন্তার সংযোগ-সাধন করতে পারলেই লিখতে পারবে।

তার পর লেখার ভাষা ও ষ্টাইল। ভাষা এবং ষ্টাইল রপ্ত করবার জন্য কোনো সুলেখকের লেখাকে আদর্শ করে প্রথমে লেখা মক্সো করতে হবে! কপি-বই দেখে তার অক্ষরের আদর্শে যেমন অক্ষর লিখতে শিখেছিলে, তেমনি ভাবে সুলেখকের ভাষা এবং ষ্টাইলের আদর্শে নিজের ভাষা আর ষ্টাইল গড়ে নিতে হবে। ভাষা ও ভাব চুরি করবে না—ভাষার ও সুরের অনুকরণ করবে মাত্র। তবে শুধু অনুকরণ করলেই চলবে না—অনুকরণে মস্ত কুফল ফলে এই যে, লেখকের নিজস্ব ষ্টাইল কোনো দিন গড়ে ওঠে না।

ষ্টাইল এবং ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে-কথা বলে গেছেন, তার চেয়ে বড় কথা আর নেই! তিনি বলে গেছেন,—সকলে যে-ভাষা বুঝতে পারবে, এমনি সহজ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখবে; ষ্টাইল হবে যথাসম্ভব সহজ (plain) এবং সরল। দাঁত-ভাঙ্গা শক্ত কথা বা বাঁকানো জটিল রীতি যথাসম্ভব বর্জ্জন করে চলবে। যা লিখতে চাও, তা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিম্বা বহু সমাস-উপমায় জড়িয়ে কণ্টকিত করবার চেষ্টা করো না। জটিলতায় লেখা দুর্ব্বোধ হবে যে লেখা পড়ে সহজে তার অর্থবোধ হবে না, সে লেখা কেউ পড়বে না—এ কথা মনে রেখো।

লেখার হদিশ সম্বন্ধে আজ গোড়ার কথাটুকুমাত্র বলে রাখলুম। আরও যদি জানতে চাও, এ সম্বন্ধে পরে বিশদ ভাবে আরও অনেক কথা বলবো।

বিচার

উজ্জয়িনী নগরের প্রান্তে ছোট্ট একটি পর্ণকুটীরে এক তরুণ সন্ন্যাসীর বাস। আপন মনে সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন, কারো সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করেন না। এক দিন সকালে স্নান শেষ করে ভগবানের নাম করছেন, এমন সময় ক'জন সদাগর তাঁর কাছে এসে উপস্থিত। তাদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে কুশলাদি প্রশ্নের পর সন্ন্যাসী আগমনের কারণ জিগ্যেস করলেন। তারা বললে—"প্রভু, আমাদের একটি উট হারিয়েছে। সেই উট খুঁজতে খুঁজতে আমরা এখানে এসে পড়েছি।" সন্ন্যাসী ক্ষণকাল চিন্তা করে বললেন—"আচ্ছা, তোমাদের উট কি কাণা ছিল?" এক জন সদাগর উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সন্ন্যাসী বললেন—"ডান চোখ কাণা?" আর এক জন উত্তর দিলে—"ঠিক বলেছেন।" তখন তিনি বললেন—"আর বোধ হয় তার বাঁ পা খোঁড়া ছিল?" তারা সমস্বরে বলে উঠল—"আজ্ঞে, ঠিক ঠিক! আপনি উটটা শেষ কোথায় দেখলেন?" সন্ন্যাসী সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—"আর তার পিঠে বোধ হয় মধুর পাত্র ছিল?" সদাগরেরা বুঝলে, সন্ন্যাসী নিশ্চয় তাদের উট দেখেছেন। সাগ্রহে প্রশ্ন করলে—"আমাদের উট কোথায় আছে বলুন।" সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বললেন—"আমি বাপু তোমাদের উট দেখিনি।" তারা কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করতে পারলে না। বললে—"কেন রহস্য করছেন প্রভু? আপনি নিশ্চয় দেখেছেন। না হলে কখনও এমন হুবহু বর্ণনা মিলতে পারে?" সন্ন্যাসী বললেন, "বিশ্বাস করো, সত্যি আমি তোমাদের উট দেখিনি।" সদাগরেরা দেখল, সন্ন্যাসীর মতলব ভাল নয়। নিশ্চয় উটটি চুরি করে লুকিয়ে রেখেছেন। তারা জোর করে সন্ন্যাসীকে ধরে তখন উজ্জয়িনীর রাজা মহেন্দ্র-প্রতাপের কাছে নিয়ে গেল।

মহারাজ মহেন্দ্র-প্রতাপ পাত্র-অমাত্যসহ সভায় বসে আছেন, এমন সময় সন্ন্যাসীকে নিয়ে সদাগররা এসে উপস্থিত। সভার লোক অবাক্। সন্ন্যাসীকে ধরে এনেছে কি? রাজার প্রিয় অমাত্য লক্ষ্মীকান্ত সদাগরদের জিগ্যেস করলেন—"কি ব্যাপার? তোমরা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে ধরে এনেছ কেন?" এক জন সদাগর উত্তর দিলে—"আমাদের একটি উট হারিয়ে গেছে। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, ইনি সেই উট লুকিয়ে রেখেছেন।" মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"এমন সন্দেহের ন্যায্য কারণ আছে?" এক জন সদাগর তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললে।

মহারাজ সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলেন—"আপনি উটটিকে নিশ্চয় দেখেছেন?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"না মহারাজ, উট আমি দেখিনি, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি, এখনও বলছি।" অমাত্য লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। না দেখে নিখুঁত বর্ণনা করা যায় না।" মহারাজ সন্ন্যাসীকে বললেন—"অমাত্য উচিত কথা বলেছেন। আপনার কথা যদি সত্য হয়, যথার্থ যদি আপনি উটটি না দেখে থাকেন, তবে আমাকে বুঝিয়ে দিন, কি করে আপনি হুবহু বর্ণনা করলেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"মহারাজ! ভগবান্ চোখ দিয়েছেন দেখতে আর বুদ্ধি দিয়েছেন চিন্তা করতে। এই দুইয়ের ঠিকমত ব্যবহারে ছোট জিনিষ থেকে মূল্যবান্ অনেক তথ্য জানা যায়। সকালে নদীতে স্নান সেরে কুটীরে ফেরবার সময় আমি দেখলুম, পথে পিঁপড়ের সার আর মৌমাছিরা ভন্-ভন্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে। বুঝলুম, এ পথে কোন মিষ্টি জিনিষ পড়েছে এবং সেটা মধু। আরও লক্ষ্য করলুম, পথের বাঁ-ধারের গাছগুলির উঁচু ডালে যে-পাতা, সে-সব পাতা কোন জানোয়ারে খেয়েছে। বুঝলুম সে উট—আর তার ডান চোখ কাণা। কারণ, সে জন্তুটি ডান-দিকের কোন ডাল ছোঁয়নি। তা ছাড়া অন্য কোন জন্তু অত উঁচু ডালের পাতা খেতে পারে না। আরও দেখলুম, তিনটি পায়ের দাগ স্পষ্ট এবং অপর একটি অস্পষ্ট। ভাবে বুঝলুম, উটটি খোঁড়া।" সন্ন্যাসীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে একটা কোলাহল শোনা গেল এবং একটু পরেই সদাগরদের দলের এক জন লোক এসে সংবাদ দিলে, উট পাওয়া গেছে। তখন তারা মহারাজের আদেশ-মত সন্ন্যাসীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রস্থান করল।

মহারাজ মহেন্দ্র-প্রতাপ সন্ন্যাসীকে বললেন—"প্রভু, আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ দীনের আতিথ্য স্বীকার করেন, তবে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।" অনেক অনুনয়-অনুরোধের পর সন্ন্যাসী উজ্জয়িনী নগরীতে থাকতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদে নয়, মহারাজ তাঁর জন্য রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে নদীর ধারে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী সেইখানে থাকেন, সাধন-ভজন করেন। মহারাজ সকাল-সন্ধ্যা যখনই সময় পান, তাঁর কাছে যান। অনেক ধর্ম্মকথা এবং উপদেশ-বাণী শ্রবণ করেন। প্রত্যেক কাজেই তাঁর পরামর্শ নেন। এই সব দেখে প্রধান অমাত্য লক্ষ্মীকান্ত সন্ন্যাসীর উপর মনে মনে ভয়ানক চটে উঠলেন। কিন্তু মহারাজের ভয়ে মুখে কিছু বলতে সাহস করেন না! সর্ব্বদা সুযোগ খুঁজতে লাগলেন, কখন্ কি উপায়ে সন্ন্যাসীকে অপ্রস্তুত করা যায়! এক দিন হয়েছে কি, রাজ-দরবারে তিনটে খুব ঘোরালো রকমের মামলা এসে উপস্থিত। পাত্র মিত্র মন্ত্রী মহারাজ সবাই গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছেন, এমন সময় মহামন্ত্রী লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"মহারাজ, একটা উপায় মাথায় এসেছে!" আগ্রহ-সহকারে মহারাজ বললেন—"কি উপায় বলো, শুনি।" লক্ষ্মীকান্ত উত্তর দিলেন, "সন্ন্যাসীকে একবার ডাকলে হয় না?" মহারাজ তাঁর কথার অনুমোদন করে তখনি সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসতে তাঁর চরণ বন্দনা করে মহারাজ বললেন—"প্রভু, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। ক'টি মামলা এসেছে, সেগুলির কোন মীমাংসা আমরা করতে পারছি না।" সাধু বললেন—"বেশ, ব্যাপারটি আমায় খুলে বল।" মহারাজ বললেন—"প্রভু, বিদেশ থেকে এই দু'টি স্ত্রীলোক এই শিশুকে নিয়ে এসেছে। দু'জনেই বলছে, ছেলেটি তার। আমি তো কিছুতেই মীমাংসা করতে পারছি না।" এই বলে তিনি মহিলা দু'টি ও শিশুকে দেখালেন। সন্ন্যাসী বললেন, "বেশ, আর একটি কি মামলা বলুন।" মহারাজ বললেন—"এই মাংসওয়ালা এই তৈল-ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিছু অর্থ পাবে। তৈল-ব্যবসায়ী বলছে, মুদ্রাগুলি সে মাংস-বিক্রেতাকে দিয়েছে, আর মাংস-বিক্রেতা বলছে, এ মুদ্রাগুলি তার; তৈল-ব্যবসায়ী তারই দোকান থেকে তুলে নিয়ে তাকে দিয়েছে। সত্যি এ অর্থ কার, নির্ণয় করতে পারছি না।" সন্ন্যাসী বললেন—"বেশ, এরও বিচার হবে। তৃতীয়টি কি বলুন।" মহারাজ বললেন—"এই যে

তিনটি ছেলে উপস্থিত রয়েছে, এরা তিন ভাই। এদের পিতা মৃত্যুকালে বলে গেছেন, যে তাকে সব চেয়ে বেশী ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, সেই সমস্ত সম্পত্তি পাবে। তিন জনেই পুত্র, অতএব পিতাকে ভক্তি করে। কাজেই বিচার করতে পারছি না সম্পত্তি কার পাওয়া উচিত।" সন্ন্যাসী বললেন,—"কাল বিচার হবে। সকলকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসতে বলে দিন।"

পরদিন রাজসভায় লোকে লোকারণ্য। সবারই মনে দারুণ আগ্রহ চাঞ্চল্য। যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হলো। প্রথমেই শিশু এবং মহিলা দু'টিকে উপস্থিত করা হলো। সাধু জিগ্যেস করলেন—"ছেলে কার?" উভয়েই সমস্বরে উত্তর দিল—"প্রভু, এ শিশু আমার।" কঠোর স্বরে সাধু প্রশ্ন করলেন—"এক ছেলে দু'জনের হতে পারে না। সত্যি করে বলো, এ শিশু কার?" পুনরায় উভয়েই একসঙ্গে বলে উঠল—"ছেলে আমার।" সন্ন্যাসী তখন বললেন—"যখন তোমরা উভয়েই সত্য কথা বলছ, তখন দু'-জনেই এই ছেলের সমান অংশ পাবে। জল্লাদ! এই ছেলেটিকে ঠিক মাঝখান্ থেকে দু'ভাগে কাটো—একে দাও এক ভাগ, আর ওকে বাকীটুকু!" জল্লাদ খড়গ উত্তোলন করলে, সকলে হায়-হায় করে উঠল। এক জন স্ত্রীলোক তখন উন্মাদের মত সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পড়ে বলে উঠল—"প্রভু, ছেলে আমি চাই না, ওকেই দিন।" অপর রমণী মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। সাধু ইঙ্গিতে জল্লাদকে নিরস্ত করে মহারাজকে বললেন—"মহারাজ, শিশুটি এঁর—যিনি কাঁদছেন! অপরটি মিথ্যে কথা বলেছে।" লক্ষ্মীকান্ত আপত্তি জানালে—"কিন্তু এ বিচারের প্রমাণ কই?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলে—"প্রকৃত মাতা সন্তানের প্রাণের জন্য ব্যাকুল।" মহারাজ প্রকৃত মাতাকে শিশুটি দিয়ে অপরটিকে কারারুদ্ধ করবার আদেশ দিলেন। সভাশুদ্ধ লোক ধন্য-ধন্য করে উঠল। তার পর মাংসবিক্রেতা ও তৈল-ব্যবসায়ীর বিচার আরম্ভ হলো। সাধু বললেন—"এই মুদ্রা তৈল-ব্যবসায়ীর, মাংস-বিক্রেতা মিথ্যা কথা বলেছে।" লক্ষ্মীকান্ত প্রশ্ন করলেন—"আপনি কি করে জানলেন?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"কাল সমস্ত রাত্রি এই মুদ্রাগুলি একটি পাত্রে জলে ডুবিয়ে রেখেছিলুম। সকালে উঠে দেখি, জলের উপর তেল ভাসছে। কিন্তু রক্তের কণামাত্র নেই! তাতেই বুঝলুম, এই মুদ্রা তৈল-ব্যবসায়ীর, মাংস-বিক্রেতার নয়।" মহারাজ তৈল-ব্যবসায়ীকে অর্থ প্রদান করে মাংসওয়ালাকে কারাগারে পাঠাবার হুকুম দিলেন। অবশেষে তিন ভাইয়ের বিচার আরম্ভ হলো। সাধু তিন ভাইকেই জনান্তিকে একটি ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকতে আদেশ করলেন। সে আসতে তিনি বললেন—"দেখ বাপু, মৃত্যুকালে তোমার পিতা যা বলে গেছেন, সে সব ধাপ্পাবাজি। তিনি আগেই দানপত্র করেছিলেন, তাতে তোমায় কিছু দেননি, অপর দুই পুত্রকে সমান সমান অংশ দিয়ে গেছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর কি অবনিবনা ছিল! থাকলেও একেবারে বঞ্চিত করে যাওয়া উচিত হয়নি।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উত্তর দিল—"আজ্ঞে, আমার বাবা ঐ রকমই ছিলেন। তাঁর বিচার-বুদ্ধি বলে কিছু ছিল না! এত দিন বিষয়-সম্পত্তি পাবার আশায় চুপ করে ছিলুম। কিন্তু যখন কিছুই পাব না, তখন আর বলতে বাধা কি? তিনি ভয়ানক খিট্‌খিটে ছিলেন, আমি তাঁকে দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না।" তাকে বিদায় দিয়ে মধ্যম ভ্রাতাকে ঐরূপ জেরা করতে প্রকাশ পেল, সেও তার পিতাকে ভালো চোখে দেখতে পারত না। অবশেষে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডেকে অনুরূপ কথা বলতে সে উত্তর দিল—"বাবা যা ভাল বুঝেছেন করেছেন! তিনি আমার গুরুজন, তাঁর বিচার করবার অধিকার আমার নেই।" সন্ন্যাসী মহারাজকে বললেন—"সম্পত্তি পাবার প্রকৃত অধিকারী এই,.. মহারাজ!" মহারাজ তখন তিন-ভ্রাতাকে ডেকে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে, বড় দু'জনকে শুধু সামান্য একটা মাসহারার বন্দোবস্ত করে দিলেন। সভা ভঙ্গ হলো। রাজ্যময় সন্ন্যাসীর বুদ্ধির এবং বিচার-শক্তির প্রশংসায় জাগলো। মহারাজ সন্ন্যাসীর একান্ত অনুরক্ত এবং অনুগত হয়ে পড়লেন। লক্ষ্মীকান্ত ও তাঁর দলের লোকেরা হিংসেয় ফেটে যেতে লাগলেন এবং কি করে মহারাজের চোখে সন্ন্যাসীকে হীন প্রতিপন্ন করবেন, তারই উপায় দিবারাত্র চিন্তা করতে লাগলেন।

তার পর থেকে রাজ্যে চুরি-ডাকাতি বিদ্রোহ হতে লাগল, কিছুতেই থামে না। মহারাজ লক্ষ্মীকান্তকে ডেকে পাঠালেন; কি ব্যাপার? রাজত্বে এ রকম হচ্ছে কেন? লক্ষ্মীকান্ত উত্তর দিলেন—"মহারাজ, কিছুই তো বুঝতে পারছি না, পূর্ব্বে কখনও এমন হয়নি। আপনি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।" মহারাজ বললেন—"নির্ভয়ে বলো। রাজকার্য্যে ভয়ের স্থান নেই।" একটু ইতস্ততঃ করে লক্ষ্মীকান্ত বললেন—"দেখুন, বললে হয় ত বিশ্বাস করবেন না; আমার মনে হয়, এ সবের মূল হচ্ছেন সন্ন্যাসী। শাস্ত্রে বলেছে, অজ্ঞাত-কুলশীলকে বিশ্বাস করো না।" মহারাজ রেগে বললেন—"কি বলছ লক্ষ্মীকান্ত! এক জন সাধু ব্যক্তির নামে এমন হীন অপবাদ দিতে তোমার লজ্জা হলো না? আমায় প্রমাণ দেখাতে পার?" লক্ষ্মীকান্ত উত্তর দিলেন—"তাও পারি, আজ সন্ধ্যার পর।"

লক্ষ্মীকান্ত নিজের দলের লোকদের সন্ধ্যার সময় সন্ন্যাসীর কুটীরে গিয়ে হল্লা করতে শিখিয়ে দিলেন। তার পর কথামত মহারাজকে নিয়ে যখন সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন রীতিমত সেখানে বিদ্রোহীদের আড্ডা চলেছে। মহারাজ দূর থেকে সব দেখে শুনে আত্মপরিচয় না দিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন। পরদিন সভায় সন্ন্যাসীকে বিচারের জন্য আনা হলো। অপরাধ অতি গুরুতর—রাজদ্রোহ। প্রকাশ্য দরবারে সন্ন্যাসী অভিযুক্ত হবার পর মহারাজ তাঁকে জিগ্যেস করলেন—"কিছু বলবার আছে?" তিনি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন,—"আমার কিছুই বক্তব্য নাই। মহারাজ যদি এত দিনে আমার প্রকৃতি না বুঝে থাকেন, তবে আমার দু'টো কথায় আর কি বুঝবেন!" লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে মহারাজ পরামর্শ করে সন্ন্যাসীর নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেন। সন্ন্যাসী কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে প্রশান্ত ভাবে বললেন—"সন্ন্যাসী হয়ে রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা আমার অন্যায় হয়েছিল। এ তার প্রায়শ্চিত্ত। আপনার অপরাধ নেই মহারাজ! ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘায়ু করুন।"

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)

অদ্ভুতের পর শান্ত-রস। বরোদা-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে শান্ত-রসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত ভরত-নাট্যশাস্ত্রের 'রসাধ্যায়ে', নির্ণয়-সাগর কাব্যমালা-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজের অন্তর্গত নাট্যশাস্ত্রে অষ্ট-রস-বিবরণের পরই নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিতে দেখা যায় (১)। বরোদা সংস্করণের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমাংশে এমন একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহর্ষি ভরতের মতে নাট্য-রস আটটি মাত্র—শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানক-বীভৎস-অদ্ভুত (২)। পক্ষান্তরে, যে শ্লোকে ডক্টর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রসাধ্যায়ের বা কাব্যমালা ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, বরোদা-সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায় সে স্থলে সমাপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত তিনটি সংস্করণের সমাপ্তি-শ্লোক ১নং পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকের সংখ্যা ডক্টর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রসাধ্যায়ে ৮৪। কাব্যমালা ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে ৮২। আর বরোদা-সংস্করণে উহার সংখ্যা ১০২। ইহার পরই বরোদা-সংস্করণে পূর্ব্বোদ্ধৃত চরম শ্লোকটির পরিবর্ত্তে শান্ত-রসের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আর উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, রস নয়টি (৩)। বরোদা-সংস্করণে ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম দিকের যে শ্লোকটিতে অষ্ট নাট্যরসের নাম পাওয়া যায়, তাহারও এমন একটি পাঠান্তর আছে, যাহাতে নয়টি নাট্যরসের নাম প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ—রৌদ্র--বীর--ভয়ানক--বীভৎস--অদ্ভুত--শান্ত (৪)। কাব্যমালা-সংস্করণে, ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত রসাধ্যায়ে ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে অবশ্য আটটি নাট্যরসেরই উল্লেখ আছে (৫)। কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণে প্রকাশিত নাট্যশাস্ত্রের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে নব-রসেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (৬)। কিন্তু কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে উক্ত শ্লোকের পাঠ অন্যরূপ (৭)। এই সকল মতান্তর দর্শনে নাট্যশাস্ত্রের মূল শ্লোকগুলির বিভিন্ন পাঠ মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়া নির্ণয় করা অতি সুকঠিন—ভরত-নাট্যশাস্ত্র-মতে রস আটটি কিংবা নয়টি।

আচার্য্য উদ্ভট তাঁহার 'কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহে' বরোদা-সংস্করণে দৃষ্ট নব-নাট্যরস-সম্বন্ধীয় শ্লোকটি যথাযথ ভাবে গ্রহণপূর্ব্বক রসের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন—নয়টি নাট্য-রস (৮)। অবশ্য উদ্ভট এ কথা স্পষ্ট বলেন নাই যে, তিনি নাট্যশাস্ত্র হইতে উক্ত কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তাঁহার পাঠ নাট্যশাস্ত্রের কোন এক পাঠান্তরের অনুরূপ বলিয়া এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে, উদ্ভটের আকর-গ্রন্থ নাট্যশাস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বরোদা-সংস্করণে শান্ত রস সম্বন্ধে যে অতিরিক্ত মূলাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর আচার্য্য অভিনবগুপ্তপাদের টীকাও আছে। টীকার ঐ অংশের উপোদ্ঘাতে আচার্য্য বলিয়াছেন—যাঁহারা নব-রস-বাদী, তাঁহাদিগের মতানুসারে শান্তরসের স্বরূপ বলা হইতেছে ইত্যাদি (৯)। ডক্টর সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রসাধ্যায়েও 'অভিনব-ভারতী'র এই অংশটুকু প্রদত্ত হইয়াছে (১০)। অথচ উহার মূলাংশ তিনি ছাপেন নাই। হয়ত যে পুঁথি দেখিয়া তিনি 'রসাধ্যায়' সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে নাট্যশাস্ত্রের উক্ত অতিরিক্ত মূলাংশটুকু ছিল না। কিন্তু অভিনব-ভারতীর উক্ত অতিরিক্ত টীকার মূলভাগ যে অন্ততঃ পাঠান্তর-রূপেও বর্ত্তমান থাকা সম্ভব—এরূপ ধারণা যে ডক্টর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'রসাধ্যায়' সম্পাদন-কালে ছিল, তাহার কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন তিনি তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কুত্রাপি ভাষায় প্রকাশ করেন নাই। অথচ তাঁহার সম্পাদিত রসাধ্যায়ের মধ্যে প্রকাশিত অভিনব-ভারতীতেও নাট্য-শাস্ত্রের মূল হইতে প্রতীক উদ্ধৃত হইয়াছে (১১)। অথচ ঐ টীকাংশ সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন—ষষ্ঠাধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে অষ্ট রসের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও উদ্ভট উহার যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নব রসের উল্লেখ আছে ও অভিনবগুপ্তও সেই পাঠেরই অনুসরণ করিয়াছেন (১২)।

---

(১) "এবমেতে রসা জ্ঞেয়াস্ত্বষ্টৌ লক্ষণলক্ষিতাঃ। অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভাবানামপি লক্ষণম্"।—(৮৩ শ্লোক, কাব্যমালা ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ ; ৮৫ শ্লোক, ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের রসাধ্যায়)।

(২) "শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ"।—(নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৬।১৬)।

(৩) "এবং নব রসা দৃষ্টা নাট্যজ্ঞৈর্লক্ষণান্বিতাঃ। এবমেতে রসা জ্ঞেয়া নব লক্ষণলক্ষিতাঃ। অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ভাবানামপি লক্ষণম্"।—(নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৬।১০৯)।

(৪) শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যরসাঃ স্মৃতাঃ"।—(নাঃ শাঃ, বরোদা সং, ৬।১৬ পাঠান্তর)।

(৫) ২নং ফুটনোটে উদ্ধৃত শ্লোকটি দ্রষ্টব্য। উহা বরোদা-সংস্করণে ষষ্ঠাধ্যায়ের ১৬শ শ্লোক ; কিন্তু ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের কাব্যমালা সংস্করণে ও কাশী-সংস্কৃত-সিরিজে ১৫শ শ্লোক)।

(৬) "অব্যক্তরূপং সত্বং হি জ্ঞেয়ং নবরসাশ্রয়ম্" (নাঃ শাঃ, কাব্যমালা, ২২।৩, পৃঃ ২৪১)।

(৭) "......ভাবরসাশ্রয়ম্" (নাঃ শাঃ, কাশী-সংস্কৃত-সিরিজ, ২৪।৩, পৃঃ ২৬৯)।

(৮) "শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ। বীভৎসাদ্ভুতশান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ"। (—উদ্ভট, কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ, চতুর্থ-বর্গ, চতুর্থ শ্লোক)।

(৯) "যে পুনর্নব রসা ইতি পঠন্তি তন্মতে শান্তস্বরূপমভিধীয়তে" (—অভিনবভারতী, নাঃ শাঃ, বরোদা সং, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৩)।

(১০) "যে পুনর্নব রসা ইতি পঠন্তি তন্মতে শান্তস্বরূপমভিধীয়তে তত্র কেচিদাহুঃ..." ইত্যাদি (—ডক্টর মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রসাধ্যায়, অভিনবভারতী, পৃঃ ১০৯-১১৭)।

(১১) '"এবমেতে রসা জ্ঞেয়া নবে"তি'—রসাধ্যায়, অভিনব-ভারতী, পৃঃ ১১৭।

(১২) "It is curious to note that the text of Bharata. Chapter VI verse 15, in the most of the manuscripts, mentions eight rasas, which agrees also with the number mentioned in the last śloka, but the same śloka 15 quoted by Udbhaṭa mentions nine rasas including śānta, the tranquil as a separate sentiment, a reading which is

নবম রস শান্ত—এই পক্ষ গ্রহণ করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা যাইতেছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বহু বিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। শান্ত রস হইতে পারে কি না—ইহা প্রথম বিচার্য্য। বিচারের প্রক্রিয়া আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য হইবে না—উহা ভবিষ্যতে অন্য এক বা একাধিক পৃথক্ প্রবন্ধে বিবৃত হইবে। তবে এ প্রসঙ্গে মহর্ষির পদাঙ্কানুসরণে আচার্য্য অভিনবগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'শান্ত' নামে রস সম্ভব (১৩)। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিচার উঠিয়াছে—শান্ত-রসের স্থায়ী ভাব কি—শম না নির্ব্বেদ ? একদল আলঙ্কারিক বলিয়াছেন—'শম' ও 'শান্ত' পদদ্বয় পর্য্যায়-স্বরূপ বলিয়া নির্ব্বেদই স্থায়ী—শম নহে। এ বিষয়ে অভিনবগুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—যেমন 'হাস' (স্থায়িভাব) ও 'হাস্য' (রস) পর্য্যায় হয় না, ঠিক সেইরূপ 'শম' (স্থায়িভাব) ও 'শান্ত' (রস) পর্য্যায় হইতে পারে না। আর 'নির্ব্বেদ' যদি তত্ত্বজ্ঞান-জনিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে 'শম'-স্থায়ীরই অপর নাম 'নির্ব্বেদ' বলা যাইতে পারে। অতএব, শান্ত-রসে শম স্থায়িভাব—নির্ব্বেদ নহে, যদি অবশ্য নির্ব্বেদের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করা হয় (১৪)।

মহর্ষি বলিতেছেন—

শান্তরস শম-স্থায়িভাবাত্মক ও মোক্ষের প্রবর্ত্তক। ইহা তত্ত্বজ্ঞান-বৈরাগ্য-আশয়-শুদ্ধি ইত্যাদি বিভাব-দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যম-নিয়ম-অধ্যাত্মধ্যান ধারণা-উপাসনা-সর্ব্বভূতদয়া-লিঙ্গগ্রহণাদি অনুভাব-দ্বারা ইহার অভিনয় কর্ত্তব্য। ইহার ব্যভিচারি-ভাব হইতেছে—নির্ব্বেদ-স্মৃতি-ধৃতি-সর্ব্বাশ্রমশৌচ-স্তম্ভ-রোমাঞ্চ ইত্যাদি (১৫)।

এই প্রসঙ্গে মহর্ষি কয়েকটি আর্য্যা-শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

মোক্ষবিষয়িণী অধ্যাত্মচিন্তা হইতে সমুত্থিত, তত্ত্বজ্ঞান-রূপ প্রয়োজনীয় হেতু-সংযুক্ত, নিঃশ্রেয়সের নিমিত্ত উপদিষ্ট শান্ত-রসের সম্ভাবনা আছে (১৬)।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের সংরোধে চিত্ত অধ্যাত্মচিন্তা-সংশ্রিত হইলে সকল প্রাণীর সুখ-হিত-কর শান্তরস উৎপন্ন হয় (১৭)।

যাহাতে দুঃখ নাই—সুখ নাই—দ্বেষ নাই—মাৎসর্য্য নাই—যাহা সর্ব্বভূতে সম, তাহাই শান্ত-রস নামে প্রথিত (১৮)।

রতি-প্রভৃতি ভাবগুলি বিকার, শান্ত উহাদিগের প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে বিকৃতির উৎপত্তি ও পুনরায় প্রকৃতিতেই বিকৃতি-সমূহের বিলয় হইয়া থাকে (১৯)।

নিজ নিজ নিমিত্ত-লাভে শান্ত হইতে রত্যাদি ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার তত্তৎ নিমিত্তের অপগমে ঐ সকল ভাব শান্তেই লীন হইয়া যায় (২০)।

ভরত-নাট্য-শাস্ত্রের রসাধ্যায় এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী সপ্তমাধ্যায়ে মহর্ষি ভাব-লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন।

ধনঞ্জয়-কৃত দশরূপকের অবলোক টীকায় ধনিক শান্তরস-সম্বন্ধে সংক্ষেপে সুন্দর বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—শান্ত-রস-সম্বন্ধে বাদিগণ নানাপ্রকার পরস্পর-বিরোধী মত পোষণ করিয়া থাকেন। এক দল বলেন—'শান্ত' নামে কোন রসই নাই, যেহেতু, আচার্য্য উহার বিভাবাদির প্রতিপাদন করেন নাই বা লক্ষণও দেন নাই। অপর এক পক্ষ বলেন—পুস্তকস্থ সিদ্ধান্তে উহার সম্ভাবনা থাকিলেও জগদ্ব্যবহারে বস্তুতঃ উহার অভাব; যেহেতু, অনাদিকাল-প্রবৃত্ত রাগ-দ্বেষাদি-প্রবাহের উচ্ছেদ করা অসম্ভব। তৃতীয় পক্ষ বীর-বীভৎসাদির মধ্যে উহার অন্তর্ভাব স্বীকার করেন;

---

followed by Abhinavagupta in his commentary" --Dr. Mukherjee's Rasadhyaya, Preface, p. V.

(১৩) তস্মাদস্তি শান্তো রসঃ।...ইতিহাসপুরাণাভিধানকোশাদৌ চ নব রসাঃ শ্রূয়ন্তে, শ্রীমৎসিদ্ধান্তশাস্ত্রেষপি। তথা চোক্তম্—

"অষ্টানামিহ দেবানাং শৃঙ্গারাদীন্ প্রদর্শয়েৎ।
মধ্যে চ দেবদেবস্য শান্তং রূপং প্রকল্পয়েৎ"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৪০

(১৪) "কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানোৎপিতো নির্ব্বেদ ইতি শমস্যৈবায়ং নির্ব্বেদ ইতি নাম কৃতং স্যাৎ। শমশান্তয়োঃ পর্য্যায়ত্বং তু হাসহাস্যাভ্যাং ব্যাখ্যাতং সিদ্ধং সাধ্যতে, যদলৌকিকত্বেন সাধারণাসাধারণতয়া চ বৈলক্ষণ্যং শমশান্তয়োরপি সুলভমেব, তস্মান্ন নির্ব্বেদঃ স্থায়ীতি"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৬।

(১৫) শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। আমাদিগের ইন্দ্রিয় বা করণ দ্বিবিধ—(১) বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ ও (২) অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ। বহিরিন্দ্রিয় দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়—নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক্ ও কর্ণ; (২) কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। অন্তরিন্দ্রিয়—মন। ইহার চারিটি বিভাগ—(১) মন—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক; (২) বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা; (৩) চিত্ত—স্মরণাত্মক; ও (৪) অহঙ্কার—গর্ব্বাত্মক। শম—মনোজয়; দম—বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ। আশয়শুদ্ধি—চিত্তশুদ্ধি বা সত্ত্বশুদ্ধি। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য (কামেন্দ্রিয়-সংযম) অপরিগ্রহ (বিষয়গ্রহণে অস্বীকার)। নিয়ম—(শরীর ও মনের) শুচিতা, (লব্ধ বস্তুতে) সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন, প্রণব-জপ), ঈশ্বর-প্রণিধান (পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ)। অধ্যাত্মধ্যান—একাগ্রভাবে আত্মবিষয়িণী চিন্তা; ধ্যান—চিন্তার একতানতা। ধারণা—নাভি-হৃদয়াদি দেহাবয়বে অথবা কোন বাহ্যবস্তুতে জ্ঞানপূর্ব্বক চিত্তের বন্ধ বা স্থাপন। উপাসনা—বৈষ্ণব-মতে ইহারই অপর নাম ভক্তি; উপাস্যের প্রতি তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ। লিঙ্গ—চিহ্ন—সন্ন্যাস-চিহ্ন—মস্তক-মুণ্ডন, বিবর্ণ (গৈরিকাদি) বসন ইত্যাদি।

(১৬) নিঃশ্রেয়স—যাহা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই, অর্থাৎ মোক্ষ।

(১৭) সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধে চিত্ত আত্মচিন্তা-সংস্থিত হইয়া থাকে।

(১৮) দ্বেষ—অপকার। মাৎসর্য্য—পরগুণে দোষের আবিষ্কার।

(১৯) প্রকৃতি—উপাদান-কারণ, যেমন মৃত্তিকা; বিকৃতি—উহার কার্য্য, যেমন ঘটাদি।

(২০) একই মৃত্তিকা হইতে যেরূপ বিভিন্ন নাম-রূপাদি নিমিত্ত অবলম্বনে ঘট-শরাবাদি মৃন্ময় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, আবার ঐ নাম-রূপাদি নিমিত্তের বিলয়ে ঘট-শরাবাদি বিকার একই মৃত্তিকা-রূপ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে,—ঠিক সেইরূপ একই শান্ত হইতে বিভিন্ন নিমিত্তবশে রতি-হাসাদি বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। আবার নিমিত্ত-নাশে ভাবগুলি স্বকীয় বৈচিত্র্য হারাইয়া একই শান্তে বিলীন হইয়া যায়।

ইঁহারা শম-স্থায়িভাব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। মোটের উপর ধনিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—অভিনেয় নাটকাদিতে শমের স্থায়িত্ব নিষিদ্ধ। যেহেতু, শম হইতেছে সকল প্রকার ব্যাপারের (ক্রিয়ার) প্রবিলয়-স্বরূপ; উহা অভিনয়ে প্রদর্শনের অযোগ্য। কারণ, অভিনয় ক্রিয়াত্মক; উহা দ্বারা পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার স্বরূপ প্রদর্শন অসম্ভব (২১)।

এই প্রসঙ্গে ধনঞ্জয়-ধনিকের সিদ্ধান্ত এই যে, শান্তরস স্বরূপে অনির্ব্বাচ্য। তবে তাহার উপায়ভূত মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা প্রভৃতির আস্বাদন সহৃদয়গণ করিতে সমর্থ হন। ইহাকেই শান্ত-রসের (গৌণ) আস্বাদন বলা হইয়া থাকে।

বিচার-প্রসঙ্গে ধনিক বলিয়াছেন—শান্ত রসবাচ্য নহে বলিয়া যদিও নাট্যে উহার প্রবেশ-সম্ভাবনা নাই, তথাপি ইহা ত স্বীকার্য্য যে, সূক্ষ্ম-অতীতাদি সকল বস্তুরই শব্দ-দ্বারা প্রতিপাদিত হইবার যোগ্যতা আছে (অর্থাৎ শব্দ সকল বস্তুর প্রতিপাদনেই সমর্থ); অতএব, শান্ত-রস কাব্যের বিষয় হইবার পক্ষে বাধা থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে ধনঞ্জয় মূল কারিকায় বলিয়াছেন—শম-স্থায়ীর প্রকর্ষভূত শান্ত-রস অনির্ব্বাচ্য; তবে গৌণভাবে মুদিতা প্রভৃতি উপায় শান্ত-রসাত্মক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। যথায় সুখ-দুঃখ-চিন্তা-রাগ-দ্বেষ-ইচ্ছাদি কিছু নাই, সর্ব্বপ্রকার ভাবের মধ্যে শম প্রধান, সেই রসকেই মুনীন্দ্রগণ 'শান্ত' নাম দিয়া থাকেন। যদি শান্ত-রস এইরূপ লক্ষণাক্রান্তই হয়, তাহা হইলে এক মোক্ষ-দশায় আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তির অবস্থাতেই উহার প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। অতএব, স্বরূপতঃ উহা অনির্ব্বচনীয়। শ্রুতিও এই মোক্ষ-স্বরূপ শান্ত-রসকে 'নেতি' 'নেতি' বাক্য-দ্বারা নিষেধমুখেই প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রকার শান্ত-রস সহৃদয়গণের আস্বাদন-যোগ্য কদাপি হইতে পারে না। তবে মোক্ষপ্রাপ্তির যে সকল উপায় যোগদর্শনে কথিত হইয়াছে—মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা—ইহাদিগের আস্বাদদ্বারাই শান্ত-রসের আস্বাদন গৌণভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে (২২)।

সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথের মতে—শান্তের স্থায়িভাব শম, উহা উত্তম-প্রকৃতিক, কুন্দেন্দু-সুন্দর-চ্ছায়, শ্রীনারায়ণ উহার অধিদেবতা। অনিত্যত্বাদি-হেতু-বশতঃ অশেষ বস্তুর নিঃসারতা অথবা পরমাত্ম-স্বরূপ ইহার আলম্বন। পুণ্য আশ্রম, হরিক্ষেত্র, তীর্থ, রম্যবনাদি ও মহাপুরুষ-সঙ্গ ইত্যাদি ইহার উদ্দীপন। রোমাঞ্চ, দয়া ইত্যাদি অনুভাব (২৩)। নির্ব্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি, ভূত-দয়া ইত্যাদি ব্যভিচারী।

দর্পণের টীকাকার শ্রীরামতর্কবাগীশের মতে নির্ব্বেদ ইহার স্থায়িভাব। এই পক্ষে অবজ্ঞার বিষয়ভূত ধনসম্পত্তিই আলম্বন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রন্থকার-মতে নির্ব্বেদ ব্যভিচারী বলিয়া উহার স্থায়িত্ব স্বীকৃত হয় নাই; পক্ষান্তরে, শমই তাঁহার নিকট স্থায়িরূপে অনুভূয়মান হওয়ায় তিনি শমকেই স্থায়ী বলিয়াছেন (২৪)।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দয়াদি গুণের আতিশয্যবশতঃ শান্ত-রস দয়া-বীরাদির অন্তর্গত হইবে না কেন? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন—অহঙ্কার-বর্জ্জিত বলিয়া ইহা দয়া-বীরাদির অন্তর্ভূত হইতে পারে না। দয়া-বীরের সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত নাগানন্দের নায়ক জীমূতবাহন—যিনি সর্প শঙ্খচূড়ের জীবন-রক্ষার্থ গরুড়ের গ্রাসে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ বলেন যে, জীমূতবাহনের চরিত্রে প্রথমে মলয়বতীর প্রতি অনুরাগ ও শেষে বিদ্যাধরগণের চক্রবর্ত্তিত্ব-লাভ দর্শনে বুঝা যায় যে, তাঁহার অহম্ভাবের উপশম হয় নাই। শান্ত-রসে সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কারের প্রশমন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ কারণে জীমূতবাহন দয়া-বীরের দৃষ্টান্ত—শান্ত-রসের নহেন (২৫)।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শান্ত-রস যদি সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-চিন্তা-ইচ্ছাদি-বর্জ্জিত-স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ত এক মোক্ষাবস্থায় এই আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থায় ত আর ব্যভিচারি-ভাবাদির প্রকাশ হইতে পারে না। তাহা

---

(২১) "শমমপি কেচিৎ প্রাহুঃ পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য" (দশরূপক ৪।৩৫—ইহাতে বুঝা যায়, ধনঞ্জয় স্বয়ং শম-স্থায়ী স্বীকার করেন না; অন্ততঃ কাব্যে করিলেও নাট্যে করেন না)। "ইহ শান্তরসং প্রতি বাদিনামনেকবিধা বিপ্রতিপত্তয়ঃ। তত্র কেচিদাহুঃ—নাস্ত্যেব শান্তো রসঃ। তস্যাচার্য্যেণ বিভাবাদ্যপ্রতিপাদনাল্লক্ষণাকরণাৎ" (আচার্য্য—ধনঞ্জয়)। অন্যে তু বস্তুতস্তস্যাভাবং বর্ণয়ন্তি। অনাদিকাল-প্রবাহায়াতরাগদ্বেষয়োরুচ্ছেত্তুমশক্যত্বাৎ। অন্যে তু বীরবীভৎসাদা-বন্তর্ভাবং বর্ণয়ন্তি। এবং বদন্তঃ শমমপি নেচ্ছন্তি। যথা তথাস্তু। সর্ব্বথা নাটকাদাবভিনয়াত্মনি স্থায়িত্বমস্মাভিঃ শমস্য নিষিধ্যতে। তস্য সমস্তব্যাপারপ্রবিলয়রূপস্যাভিনয়াযোগাৎ"—অবলোক (৪।৩৫)।

(২২) "নন্বু শান্তরসস্যানভিধেয়ত্বাদ্ যদ্যপি নাট্যেঽনুপ্রবেশো নাস্তি তথাপি সূক্ষ্মাতীতাদিবস্তূনাং সর্ব্বেষামপি শব্দপ্রতিপাদ্যতয়া বিদ্যমানত্বাৎ কাব্যবিষয়ত্বং ন নিবার্য্যতে। অতস্তদুচ্যতে—

শমপ্রকর্ষোঽনির্ব্বাচ্যো মুদিতাদেস্তদাত্মতা ॥ ৪৫ ॥

শান্তো হি যদি তাবৎ—'ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা। রসস্তু শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু শমপ্রধানঃ'।—ইত্যেবংলক্ষণঃ, তদা তস্য মোক্ষাবস্থায়ামেবাত্মস্বরূপা-পত্তিলক্ষণায়াং প্রাদুর্ভাবাত্তস্য চ স্বরূপেণানির্ব্বচনীয়তা। তথাহি শ্রুতিরপি 'স এব নেতি নেতি' ইত্যন্যাপোহরূপেণাহ। ন চ তথাভূতস্য শান্তরসস্য সহৃদয়াঃ স্বাদয়িতারঃ সন্ত্যথ তদুপায়ভূতো মুদিতামৈত্রী-করুণোপেক্ষাদিলক্ষণস্তস্য চ বিকাশবিস্তারক্ষোভবিক্ষেপরূপতৈবেতি তদুক্ত্যৈব শান্তরসাস্বাদো নিরূপিতঃ"।—দশরূপকাবলোক (৪।৪৫)

মুদিতা—হর্ষ; পুণ্যশীল প্রাণিগণের প্রতি মুদিতা-ভাবনা কর্ত্তব্য। মৈত্রী—সৌহার্দ্দ; সুখী প্রাণিগণের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা কর্ত্তব্য। করুণা—পরদুঃখ-প্রহাণেচ্ছা; দুঃখী প্রাণিগণের প্রতি করুণা-ভাবনা কর্ত্তব্য। উপেক্ষা—মধ্যস্থভাব; অপুণ্যশীল প্রাণিগণের প্রতি উপেক্ষা-ভাবনা কর্ত্তব্য। এই উপায়-চতুষ্টয়-দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইয়া স্থিতিলাভ করে—একাগ্র হয়।

(২৩) "রোমাঞ্চাদ্যা ইত্যাদিপদেন দয়াদীনামপি গ্রহণম্"—রামতর্কবাগীশ-টীকা।

(২৪) "শান্ত ইতি অত্র নির্ব্বেদঃ স্থায়িভাবঃ। এতৎপক্ষে অবমাননীয়ত্বমেবালম্বনম্। নির্ব্বেদস্য ব্যভিচারিত্বেন স্থায়িত্বাযোগাৎ শমস্য স্থায়িত্বেনানুভূয়মানত্বাচ্চ গ্রন্থকৃতা তদুপেক্ষিতম্"।—রাঃ তঃ টীকা।

(২৫) "নন্বু শান্তে দয়াদ্যতিশয়সম্ভবেন দয়াবীরাদিরেবায়ম্—(রাঃ তঃ টীকা)। "নিরহঙ্কাররূপত্বাদ্দয়াবীরাদিরেষ নো"।—সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ) "দয়াবীরাদৌ হি জীমূতবাহনাদৌ অন্তরা মলয়বত্যনু-রাগাদেরন্তে চ বিদ্যাধরচক্রবর্ত্তিত্বাদ্যবাপ্তের্দর্শনাদহঙ্কারোপশমো ন

হইলে আর উহাকে রস বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা চলে যে—যুক্ত-বিযুক্ত-দশায় অবস্থিত যে শম-স্থায়ী তাহাই যেহেতু রসত্ব প্রাপ্ত হইয়েছে, অতএব তদবস্থায় সঞ্চারি-ভাবাদির স্থিতি বিরুদ্ধ হইতে পারে না (২৬)। অর্থাৎ—ভোগ্য বিষয়-সমূহ হইতে প্রত্যাহরণ-পূর্ব্বক সাক্ষাৎকারের যোগ্য বস্তুতে মনোনিধান করিলে চিত্তার একতানতা বা একাগ্রতা হইয়া থাকে। ইহারই নাম ধ্যান বা সমাধি বা যোগ। এই যোগ-যুক্ত ব্যক্তির নাম সমাহিত—যোগযুক্ত বা 'যুক্ত'। এই যোগজ-ধর্ম্ম-সহকৃত মনের সাহায্যে জ্ঞেয় বস্তুর সাক্ষাৎকার (অর্থাৎ—অপরোক্ষ অনুভূতি) হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত যোগের অভ্যাসে রত—ভূতেন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ প্রথমে নানা বিভূতি অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টকাম-সিদ্ধি ও দূর-দর্শন-দূর-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ অংশতঃ সিদ্ধ যোগী যখন সমাধি-দশায় অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বলা যায় বিশেষরূপে সমাহিত—বিশিষ্ট যোগযুক্ত বা 'বিযুক্ত'। আর তদবস্থায় তাঁহার যোগজ-ধর্ম্ম-সহকৃত বাহ্যেন্দ্রিয়-সমূহ স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে অলৌকিক-শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। অর্থাৎ—তৎকালে বিষয়সমূহ ইন্দ্রিয়-দ্বারা গ্রহণযোগ্য মহৎ-পরিমাণ-বিশিষ্ট অথবা ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও কেবল যোগবলে গৃহীত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, অতিসূক্ষ্ম বা ব্যবহিত বিষয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না। তবে যোগবলে তাহাও হওয়া সম্ভব। এক কথায়—তখন অন্তঃকরণ একাগ্র হওয়ায় সেই অন্তঃকরণ-প্রেরিত বাহ্যেন্দ্রিয়গুলি অতি সূক্ষ্ম ও ব্যবহিত বিষয়ের গ্রহণেও সামর্থ্য দেখাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান পূর্ণ-সিদ্ধ পুরুষকে 'যুক্ত-বিযুক্ত' বলা যায়। যুক্ত-বিযুক্ত পুরুষ একাধারে যেরূপ একাগ্রচিত্ত—যোগযুক্ত, সেইরূপ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিষয়-গ্রহণেও সমর্থ। যুক্ত পুরুষ কেবল একাগ্রচিত্ত। বিযুক্ত পুরুষ যোগাভ্যাসের ফলে অলৌকিক সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। আর যুক্ত-বিযুক্ত পুরুষ যোগযুক্ত অবস্থাতেও দূর-দর্শন-দূর-শ্রবণ-সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিষয়-গ্রহণাদি অলৌকিক-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন। এইরূপ যুক্ত-বিযুক্ত-দশায় অবস্থিত শম স্থায়ী বিনা বাধায় বিভাবাদির সহিত যুক্ত হইতে পারে (২৭)।

আর একটি প্রশ্ন—এইরূপ আত্মস্বরূপাপত্তি-দশাতে ত পরমানন্দ অনুভূতি হইতে থাকে বলিয়া শাস্ত্রাদিতে (উপনিষৎ প্রভৃতি আ[illegible] বিদ্যা-মূলক শাস্ত্রে) উক্ত হইয়াছে; তবে ঐ দশাতে 'সুখ নাই' ("ন যত্র দুঃখং ন সুখং") বলা হইল কেন? ইহারও উত্তরে বলা যায় যে, এস্থলে 'সুখ' শব্দটি বিষয়ভোগ-জনিত সুখকেই বুঝাইতেছে বৈষয়িক সুখ-দুঃখের অতীত যে লোকোত্তর আনন্দ তাহা এই সুখ হইতে ভিন্ন। এই কারণেই বলা হয় যে—ইহলোকে কাম্য-বিষয় ভোগের যে সুখ, অথবা স্বর্গ-ভোগ্য যে দিব্য-সুখ—এই উভয় প্রকার সুখই তৃষ্ণাক্ষয়-সুখের যোড়শ ভাগেরও তুল্য নহে (২৮)।

সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কার-রহিত হইলে পর দয়া-বীর, ধর্ম্ম-বীর, দান-বীর, দেবতা-বিষয়িণী রতি প্রভৃতি শান্ত-রসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে (২৯)।

'অহঙ্কার' বলিতে বুঝায় অভিমান। 'অভিমান' অর্থে মনে করা। দেহ-ইন্দ্রিয়-মনে 'অহম্' (অর্থাৎ 'আমি')—এই ভাব আরোপ করার নাম 'অহঙ্কার' বা 'অহমভিমান'। দেহটাকে—ইন্দ্রিয়গুলিকে বা অন্তঃকরণকে আমি বা আত্মা বোধ করিলে 'অহঙ্কার' (আমি-ভাব—পরমহংসদেবের ভাষায় 'কাঁচা আমি') প্রকাশ পায়। দেহাদি-সম্বন্ধীয় পুত্র-গৃহ প্রভৃতিতে 'মম' (অর্থাৎ 'আমার')—এই ভাবের আরোপও ইহার আনুষঙ্গিক। এই 'আমি' ও 'আমার' ভাব সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হইলে দয়া-বীরাদি শান্ত-রসে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে—ইহাই দর্পণ-কারের উক্তির সার মর্ম্ম (৩০)।

সাহিত্যদর্পণের শান্ত-রস-প্রকরণ এই স্থলেই সমাপ্ত হইয়াছে। আগামী সংখ্যায় রসের বিবরণ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

দৃশ্যতে। শান্তস্য সর্ব্বপ্রকারেণাহঙ্কারপ্রশমৈকরূপত্বাৎ তত্রান্তর্ভাব-মর্হতি"।—(সাঃ দঃ)। "তথা চাহঙ্কারাদিসম্বলিতো দয়াদিরেব দয়াবীরাদেৰ্ব্বিকস্থায়িভবঃ শান্তরস ইতি বিশেষঃ"।—রাঃ তঃ টীকা।

(২৬) "ননু—'ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা ন দ্বেষরাগৌ ন চ কাচিদিচ্ছা। রসঃ স শান্তঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ সর্ব্বেষু ভাবেষু সমপ্রমাণঃ'—ইত্যেবংরূপস্য শান্তস্য মোক্ষাবস্থায়ামেবাত্মস্বরূপাপত্তি-লক্ষণায়াং প্রাদুর্ভাবাৎ তত্র সঞ্চার্য্যাদীনামভাবাৎ কথং রসত্বমিত্যুচ্যতে।

যুক্তবিযুক্তদশায়ামবস্থিতো যঃ শমঃ স এব যতঃ।
রসতামেতি তদস্মিন্ সঞ্চার্য্যাদেঃ স্থিতিশ্চ ন বিরুদ্ধা"।—
(সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ)

'সমপ্রমাণঃ'—'শমপ্রধানঃ' এইরূপ পাঠও দেখা যায়। তবে তাহা খুব সঙ্গত নহে। 'সম' (তুল্য) প্রমাণ (প্রতীতি) যাহার—বিষ্ঠা-চন্দন লোষ্ট্র-কাঞ্চন ইত্যাদি বিভাবে দ্বেষ-রাগ বর্জ্জন-হেতু তুল্য বোধ যাহার—এই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। "দ্বেষো রিপূণাম-পচিকীর্ষা রাগঃ সুহৃদামুপচিকীর্ষা ইচ্ছা বৈষয়িকসুখতদুপায়েচ্ছা ভাবেষু পদার্থেষু লোষ্ট্রকাঞ্চনাদিবিভাবাদিষু সৎসু রাগ-দ্বেষরাহিত্যেন সম-বিষমং প্রমাণং প্রতীতির্যেন। শমপ্রধান ইতি পাঠস্তু ন মনোরমঃ অর্থসঙ্গতেঃ"—রাঃ তঃ টীকা।

(২৭) "বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য সাক্ষাৎকর্ত্তব্যে বস্তুনি মনো নিধায় বর্ত্তমানশ্চিত্তাসন্তানবান্ যুক্তঃ। যস্য যোগজধর্ম্মসহ[illegible] মনসা জিজ্ঞাসিতবস্তুসাক্ষাৎকারো জায়তে। যশ্চ ভূতেন্দ্রিয়[illegible] অণিমাদ্যাঃ কামসিদ্ধীর্দূরশ্রবণাদ্যাশ্চ ইন্দ্রিয়সিদ্ধীরাসাদিতবান্ স সমাধা[illegible] স্থিতো বিযুক্তঃ। যস্য যোগজধর্ম্মসহকৃতানি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি স্বে স্বে বিষয়ে মহত্ত্বসন্নিকর্ষাদিসহকারিনিরপেক্ষাণি বর্ত্তন্তে স এব যুক্তবিযুক্তঃ"—রাঃ তঃ টীকা।

(২৮) "যশ্চাস্মিন্ সুখাভাবোঽপ্যুক্তস্তস্য বৈষয়িকসুখপরত্বান্ন বিরোধঃ। উক্তং হি—'যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ যোড়শীং কলাম্'।"—(সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ)

(২৯) "সর্ব্বাকারমহঙ্কাররহিতত্বং ব্রজন্তি চেৎ। অত্রান্তর্ভাব-মর্হন্তি দয়াবীরাদয়স্তথা।। আদিশব্দাৎ ধর্ম্মবীরদানবীরদেবতাবিষয়-রতিপ্রভৃতয়ঃ" (সাঃ দঃ, ৩য় পরিঃ)

(৩০) "সর্ব্বাকারং সর্ব্বপ্রকারং এতেনাহঙ্কারসামান্যাভাবঃ প্রতীয়তে। সর্ব্বং দেহেন্দ্রিয়াদি আকার আশ্রয়ো যস্য তথা অহঙ্কারোঽভিমানঃ···অভিমানশ্চ দেহেন্দ্রিয়য়োরহমিত্যারোপঃ। দেহাদি-সম্বন্ধিনি পুত্রাদৌ মমেত্যারোপশ্চ" (—রাঃ তঃ টীকা)।

মহারাষ্ট্রের পথে

বাল্যকাল হইতেই দেশভ্রমণে আমার ইচ্ছা প্রবল। ছেলেবেলায় মোটর-গাড়ীতে চড়িলেই মনে হইত, আমি 'সুদূরের পিয়াসী' এবং বহু দূর দেশের যাত্রী। এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই আজ প্রায় বিশ বৎসর গৃহহীন পরিব্রাজক-বেশে সিংহল, বর্ম্মা এবং ভারতের প্রায় সকল প্রদেশে ঘুরিয়াছি। ভ্রমণকালে গঙ্গা, সিন্ধু, গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র ও কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করিয়াছি—প্রসিদ্ধ বহু তীর্থ দর্শন করিয়াছি এবং নীলগিরি, (সিংহলের) নিউয়ারা এলিয়া শিলং শৃঙ্গ, ত্র্যম্বক পর্ব্বত, দার্জ্জিলিং, মসুরী, কোয়েটা, মায়াবতী প্রভৃতি পাহাড়ে বিচরণ করিয়াছি। গত দুই বৎসর করাচী-প্রবাসের সময় সিন্ধুদেশ ও বেলুচিস্থানের দর্শনীয় স্থানগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছি। বাকী ছিল কাথিয়াবাড় এবং মহারাষ্ট্র; তাহাও এইবার শেষ করিলাম।

বোম্বাই

করাচী হইতেই বোম্বাই আসিলাম। বোম্বাই শুধু মহারাষ্ট্রের বৃহত্তম নগর নয়, বোধ হয় সমগ্র হিন্দুস্থানের বৃহত্তম নগর। সহরটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। নগরবাসিগণ গৃহে বসিয়াই আরব উপসাগরের তরঙ্গমালা দেখিতে পান। বন্দরটিও বিরাট্ এবং জাহাজে পরিপূর্ণ। সহরে আসিয়াই প্রথমে ৺মুম্বা দেবী দর্শন করিলাম। এই দেবীর নামানুসারেই সহরের নাম মুম্বাই বা বোম্বাই হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় বা মারাটিগণ এখনও 'মুম্বাই' শব্দ ব্যবহার করেন। বোম্বাইয়ে যত প্রাসাদোপম বৃহৎ অট্টালিকা আছে, বোধ হয়, কলিকাতায় তত নাই। পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের ইহা একটি প্রধান দ্বার। প্রথমে দেখিলাম—'Gateway of India.' তাজমহল হোটেলের কাছেই। এই সুউচ্চ তোরণটি সমুদ্রবক্ষ হইতে দেখা যায়। সহরের এই অঞ্চলেই বিশ্ববিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, মিউজিয়াম, বিজ্ঞান-মন্দির, টাউনহল প্রভৃতি বিরাজিত। কলিকাতার ন্যায় এখানেও 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী'র একটি শাখা আছে। এখানে উক্ত সোসাইটীর শাখা টাউনহলের একাংশে অবস্থিত এবং ইহার একটি বিশাল গ্রন্থাগার আছে। জাহাঙ্গীর কাউয়াসজী হলটি বোম্বাইর বৃহত্তম বক্তৃতা-গৃহ। এই সহরটি লম্বায় বড় এবং খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী জামসেদ টাটা-পরিবারের স্যর রতন টাটা-প্রমুখ দানবীরগণের দান-ভাণ্ডারের অর্থে নির্ম্মিত বহু অট্টালিকা এখানে আছে, সেখানে শত শত মধ্যবিত্ত পার্শী সপরিবারে নামমাত্র ভাড়া দিয়া থাকিতে পারে। আমরা একটি পার্শী কলোনিতে গেলাম। তাহাতে প্রায় আড়াই শত পরিবার এই ভাবে বাস করিতেছেন। করাচীর মত এখানেও বহু পার্শী হিন্দুভাবাপন্ন। একটি পার্শীর উপাসনা-গৃহে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ-প্রমুখ হিন্দু সাধকগণের ছবি দেখিলাম।

বোম্বাই সহর বৃহত্তর বঙ্গের একটি বড় কেন্দ্র। এখানে বহু শত বাঙ্গালী আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চপদস্থ। এলফিন্‌ষ্টোন (গবর্ণমেণ্ট) কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য্য ৺ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের যোগ্য-পুত্র ডক্টর শীল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। পার্শীদের সুবিখ্যাত তাজমহল হোটেলের (এ হোটেলটি এশিয়ায় না কি অতুল!) ম্যানেজার বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙ্গালী ডক্টর দাশ এখানকার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ। শক্তি ও সাধনা ঔষধালয়দ্বয়ের শাখা এখানে আছে। প্রবাসী বাঙ্গালীগণ সহরের দুই উপকণ্ঠে গত ১০।১২ বৎসর যাবৎ প্রতিমায় ৺দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালার গৌরব শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একটি আশ্রম সহরের এক প্রান্তে খারে আছে। তাহাদের হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার ও ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতিতে সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট। কলিকাতার ন্যায় এখানে বাস ও ট্রাম আছে, তবে কলিকাতার ট্রাম বোম্বাইয়ের ট্রাম অপেক্ষা অনেক উন্নত। এখানে সহরের মধ্য দিয়াই রেল-গাড়ী যাতায়াত করে—তবে এখানে মাদ্রাজ সহরের মত ইলেক্‌ট্রিক্ (বিদ্যুৎ-চালিত) রেলগাড়ী খুব চলে। কিন্তু কলিকাতায় ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেন নাই। এখানে সহরের মধ্যে এবং বাহিরে বহু দূর পর্য্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রেন চলে। পুণা অবধি এই ট্রেনে যাইতে পারা যায়। ভাড়াও বেশ সস্তা। প্রায় পনের মিনিট পর-পর সহরে গাড়ী যাতায়াত করে। সহরটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া লম্বায় বড়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের হাওয়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, গরম তাই অসহ্য বোধ হয় না। গৌড়ীয় মঠের একটি শাখাও এখানে আছে। থিওজফিক্যাল সোসাইটী, আস্তিক-সমাজ, শঙ্কর মঠ, প্রার্থনা-সমাজ প্রভৃতি বহু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান এখানে আছে।

বাঙ্গালার ব্রতচারী আন্দোলনের ন্যায় মহারাষ্ট্রে 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ' নামক একটি আন্দোলন আছে। সমগ্র হিন্দুস্থানে উহার বারো শত শাখা আছে। গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হেড্‌জেয়ার এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা আজ পরলোকে। এই সঙ্ঘের সভ্যসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষাধিক। এক কোটি হিন্দুকে এই সঙ্ঘভুক্ত করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। অধ্যাপক গোলবলকার এই সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ। তিনি পূর্ব্বে কিছু দিন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অবিবাহিত এবং স্বামী বিবেকানন্দের অনুরাগী ভক্ত। অধ্যাপক গোলবলকার ইংরেজিতে "We or our nationhood defined" নামক একটি চিত্তাকর্ষক পুস্তিকা লিখিয়াছেন। বইখানিতে দেশসেবক শ্রীএম, এস, এ্যানে'র একটি বিস্তৃত ভূমিকা আছে। উক্ত পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানে হিন্দু-সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের ভিত্তিতেই হিন্দু জাতিকে গঠন করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য রাজনীতির আদর্শে রাষ্ট্রগঠন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। জাতি ও রাষ্ট্র এক বস্তু নহে। রাষ্ট্রের ভিত্তি রাজনীতি, আর জাতির ভিত্তি সংস্কৃতি ও সভ্যতা। বাংলার প্রতাপাদিত্য, রাজপুতানার রাণা প্রতাপসিংহ, পঞ্জাবের রণজিৎসিংহ এবং মহারাষ্ট্রের শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মহাজাতি গঠন। ডাঃ হেড্‌জেয়ার ও অধ্যাপক গোলবলকার তাঁহাদের সঙ্ঘের সভ্যগণকে হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষকরূপে প্রস্তুত করিতেছেন। সভ্যগণকে লাঠিখেলাদির দ্বারা শরীরচর্চ্চা করিতে হয়। তাহারা অধিকাংশই যুবক। মারাট্টী যুবকগণ খুব তেজস্বী ও বলীয়ান্। হিন্দু মহাসভা আন্দোলন এই বীরভূমি মহারাষ্ট্র হইতেই উৎপন্ন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাসভার সভাপতি ব্যারিষ্টার সাভারকর ও ডাঃ মুঞ্জে মহারাষ্ট্রের বীরসন্তান। মহাসভার সভাপতি ভি, ডি, সাভারকর তাঁহার 'Hindutva' নামক ইংরেজি গ্রন্থে এবং তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতা শ্রীজি, ডি, সাভারকর তাঁহার 'রাষ্ট্রীয় মীমাংসা' নামক মারাট্টী

গ্রন্থে হিন্দুর জাতিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রে হিন্দুদের মহা-জাগরণ আসিয়াছে।

বোম্বাইয়ে এলিফ্যাণ্টা ও বোরিভলি নামক স্থানে অনেক বৌদ্ধ-গুহা আছে। এইগুলি যাত্রিগণের দর্শনযোগ্য। এই সহরে বৌদ্ধ-সমিতি নামক বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারের একটি প্রতিষ্ঠান আছে—উহা হইতে 'বৌদ্ধ-প্রভা' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সহরের মালাবার পাহাড়ে 'Hanging Garden'টিতে নানা প্রকারের ফুলের গাছ দেখিলাম। Madras Marina এবং Colombo Blackএর মত বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরও অতি রমণীয় স্থান। এই সহরটি গুজরাটীদের একটি বড় আড্ডা এবং পার্শীদের প্রধান বাসস্থান। এখানকার Victoria Terminus ভারতের বৃহত্তম রেলওয়ে ষ্টেশন।

নাসিক

বোম্বাই হইতে নাসিক যাই। নাসিক মহারাষ্ট্রের ৺কাশীধাম। বোম্বাই হইতে প্রায় ১১০।১২ মাইল দূরে। অর্দ্ধেক পথ ইলেক্‌ট্রিক ট্রেনে যাইতে হয়। পথে প্রায় ১৫।২০টি Tunnel বা সুড়ঙ্গ পড়ে। দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে রেলপথ গিয়াছে। কোন কোন টানেল এক মাইল লম্বা। করাচী হইতে কোয়েটা যাইতে বেলুচিস্থানের পাহাড়ে এইরূপ বহু টানেল আছে। জি, আই, পি লাইনে নাসিক রোড ষ্টেশনে নামিয়া মোটর বাসে পাঁচ মাইল গেলে নাসিক সহর পাওয়া যায়। নাসিক সহরটি ছোট এবং পবিত্র-সলিলা গোদাবরী নদীর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। এইখানে প্রাচীন তীর্থ পঞ্চবটী। পঞ্চবটীতে ভগবান্ রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতা-দেবী সহ কয়েক বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করেন। পঞ্চবটীতেই সীতাগুহা আছে। সীতাগুহা শতাধিক ফিট গভীর। এই গুহাতে সীতাদেবী থাকিতেন। পঞ্চবটীতে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। বট গাছটি অতি প্রাচীন মনে হইল। নাসিক রামক্ষেত্র। এই স্থানের শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির প্রসিদ্ধ। গোদাবরীতে স্নান করিয়া ৺কপালেশ্বর শিবমন্দির দর্শন করিতে হয়। এই শিবমন্দির না কি শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দর্শন করিয়াছিলেন। রাবণের ভগ্নী শূর্পণখা লক্ষ্মণকে পতিরূপে পাইবার জন্ম ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাহাতে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূর্পণখার নাসিকা কাটিয়া দেন। তদনুযায়ী এই তীর্থের নাম হইয়াছে নাসিক।

নাসিকে একটি কলেজ আছে। তাহাতে প্রায় ৩০০ শত ছাত্রছাত্রী। কলেজটি গোখেল শিক্ষা সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত। কলেজে কুমারী সেন নামক একটি মাত্র বাঙ্গালী ছাত্রী আছে। তাহার পিতা মধ্যপ্রদেশে কর্ম্ম করেন। শ্রীউপেন্দ্র-মোহন সাহা নামক বাঙ্গালী অধ্যাপক এই কলেজে আছেন গত ১০।১২ বৎসর যাবৎ। নাসিক ইলেকট্রিক কোম্পানির ম্যানেজার এক জন বাঙ্গালী মিঃ এস, এন, মিত্র। কলেজের জনৈক অধ্যাপক আঠাবলের গৃহেই আমরা অতিথি ছিলাম। অধ্যাপক মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম ভক্ত এবং স্বগৃহের নাম দিয়াছেন 'রামকৃষ্ণ ধাম'। তিনি মারাঠী ভাষায় "হৃৎপদ্ম' বা 'পরমহংস-প্রতিভা' নামক একটি বই লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাপক বিলাত-ফেরৎ এবং ফরাসী ভাষা উত্তমরূপেই শিখিয়াছেন। রোঁমা রোলাঁ ফরাসী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সারগর্ভ যে দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা তিনি ফরাসী ভাষায় পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত পুস্তকদ্বয়ের ভারতে প্রচলিত ইংরেজি অনুবাদ মূলানুগত নহে। কয়েক স্থানে তিনি মূল ফরাসী ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি ও তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী বাঙ্গালা শিখিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত "কথামৃত" পাঠ করিবার জন্য। তাঁহার বাড়ীতে বাঙ্গালায় প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী প্রায় সবই দেখিলাম। পরমহংসদেব যে বাঙ্গালা গানগুলি গাহিয়া সমাধিস্থ হইতেন, সেইগুলি তিনি গাহিতে ও হারমোনিয়ামে বাজাইতে জানেন। গাহিয়া ও বাজাইয়া তিনি আমাদের কয়েকটি গান শুনাইলেন। গ্রন্থের নাম 'হৃৎপদ্ম' কেন রাখিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়-পদ্ম যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল আর সেইরূপ কাহারও হয় নাই। হৃৎপদ্মের যেমন দ্বাদশটি পাপড়ি—তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বাদশটি প্রধান সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের জনৈক গুজরাটী ব্রহ্মচারী এখানে থাকেন। তিনিও বাঙ্গালা পড়িতে ও বলিতে পারেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব-প্রচারে তিনি এখানে খুব যত্নশীল। তাঁহার ঘরেও অনেক বাঙ্গালা পুস্তক আছে এবং তিনিও বাঙ্গালা গান গাহিতে পারেন।

নাসিকে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু মঠ ও আশ্রম আছে। আমরা কৈলাস মঠ দেখিতে গেলাম। ইহার অধ্যক্ষ মণ্ডলেশ্বর মুরলীধরানন্দ স্বামী। ইঁহার বিহারী শরীর। নাসিকে এক অদ্ভুত সাধু দেখিলাম। তিনি পূর্ব্বে পোষ্ট অফিসে চাকুরী করিতেন। চাকুরী ছাড়িয়া গত ২০।২২ বৎসর এখানে মৌন হইয়া আছেন। বৈরাগ্যের প্রাবল্যে তিনি প্রথম ১০।১২ বৎসর কপালেশ্বর শিব-মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্নান, আহার ও নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া সাধনায় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। গত ৫।৭ বৎসর জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সাধুকে একটি কুটীরে রাখিয়া সেবাদি করিতেছেন। সাধু বাক্‌শক্তিহীন নহেন। তিনি কথা বলিতে পারেন। তবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২।১টির বেশী কথা বলেন না। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কেমন আছেন?' তিনি মারাঠিতে বলিলেন, 'ভাল আছি, বেশ ভাল আছি'। শিশুর মত তাঁহাকে খাওয়াইতে, শোয়াইতে ও মলমূত্র ত্যাগ করাইতে হয়। সাধুটির প্রসন্ন-গম্ভীর মুখ দেখিয়া মনে হইল, তিনি গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অভিভূত। নাসিকে কোলাপুর শঙ্কর মঠের শঙ্করাচার্য্য ডাঃ কুর্ত্তকোটীর সহিত দেখা হইল। তিনি মনোবারী। 'Heart of the Gita' নামক তাঁহার ইংরেজি গ্রন্থখানি শিকাগো প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানির পাঁচ-ছয়টি সংস্করণ হইয়াছে। ডাঃ কুর্ত্তকোটী নাসিকেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। ইন্দোর-মহারাজের মার্কিণ পত্নীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পূর্ব্বে তিনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত এবং অতি অমায়িক ব্যক্তি।

নাসিক সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুই হাজার ফিট উচ্চ এবং খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা দাক্ষিণাত্যের উপত্যকার মধ্যে। বিন্ধ্য পর্ব্বতের সহ্যাদ্রি শ্রেণীর উপরে নাসিক, পুণা ও মহাবালেশ্বর প্রভৃতি স্থান অবস্থিত। নাসিকে বৎসরে ৪০।৫০ ইঞ্চি মাত্র বৃষ্টি হয়। এই

তীর্থস্থানে একটা জমাট ধর্ম্মভাব আছে। নাসিক হইতে ১৭।১৮ মাইল দূরে ত্র্যম্বক পর্ব্বত ও ত্র্যম্বকেশ্বর শিব। মোটর-বাসে করিয়া আমরা ত্র্যম্বকে গেলাম। ত্র্যম্বক পাহাড় প্রায় ৪৫০০ ফিট উচ্চ। আমরা প্রায় ১।০।২ ঘণ্টায় পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিয়া ব্রহ্মগিরি গঙ্গাধারাদি দেখিলাম। গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থান এই ত্র্যম্বক পর্ব্বতে। আমরা গোদাবরীর উৎপত্তিস্থানে স্নান করিয়া শরীর, মন শুদ্ধ করিলাম। ত্র্যম্বক-শৃঙ্গ হইতে চতুর্দ্দিকে বহু মাইল-ব্যাপী বিস্তক্ষেত্রের স্বর্গীয় দৃশ্য অপূর্ব্ব। হিমালয় পাহাড়ের বক্ষ হইতে উত্তর-শৃঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইলেও বিস্তৃত ভূখণ্ডের এইরূপ মনোহারী দৃশ্য পাওয়া যায় না। ত্র্যম্বক পাহাড়ে শিবাজী-নির্ম্মিত একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। এই পাহাড়ের গাত্রদেশে বহু গুহা দেখা যায়। এই সকল গুহায় সাধু-মুনিগণ তপস্যা করিতেন এবং এখনও অনেকে করেন। ত্র্যম্বক-শৃঙ্গে বসিলে মন এক দেবভাবে আপ্লুত হয়। এখানে সত্যই অনুভব করা যায় যে, ইহা দেবভূমি! এইরূপ উচ্চ স্থানে উঠিলে সমতল ভূমির সঙ্কীর্ণতা স্বতঃই মন হইতে অপসৃত হয়। ত্র্যম্বক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র এবং তীর্থস্থান। এখানে বৎসরে প্রায় ১৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। আমরা সেই দিনই ত্র্যম্বক হইতে নাসিকে ফিরিলাম। নাসিকে অনেকগুলি হাই-স্কুল, একটি পুলিশ ট্রেনিং-স্কুল এবং ডাঃ মুঞ্জে-প্রতিষ্ঠিত ভোঁসলে মিলিটারী স্কুল আছে। শেষোক্ত স্কুলটিতে হাই-স্কুলের কোর্সও পড়ান হয়। স্কুলের কার্স চারি বৎসরের এবং প্রত্যেক বৎসর এক শত করিয়া ছাত্র লওয়া হয়। বিখ্যাত মারাঠি ভক্ত-গায়ক ৺বিষ্ণুদিগম্বরের জন্মস্থান এই নাসিকে। তাঁহার গৃহে ৺রামচন্দ্র-মন্দিরে "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। পতিতপাবন সীতারাম"—এই পদটি দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টা গীত হইতেছে। বিষ্ণুদিগম্বরের শিষ্য ভাতখণ্ডে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভাতখণ্ডের সঙ্গীত-গ্রন্থগুলি ভারত-প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্র আজও রামায়ণ ও মহাভারতাদির পুণ্যস্মৃতি বুকে করিয়া আছে। সমগ্র হিন্দুস্থান ভ্রমণ করিলে মনে হয়, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যও নিহিত আছে। শিবাজী-গুরু রামদাস স্বামী মহারাষ্ট্রে ১১৫০টি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, প্রচার ও সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নাসিকে স্বামী রামদাসের সমাধি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত একটি মঠ দেখিলাম। রামদাসজীর "দাসবোধ" গ্রন্থ একখানি উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ। তুলসী-দাসী রামায়ণ বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'দাসবোধে'র বাঙ্গালা অনুবাদ এখনও হয় নাই। এই রামদাসই সম্রাট্ শিবাজীকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া মহারাষ্ট্রের পতাকা গৈরিকরঞ্জিত করিয়াছিলেন।

পুণা

নাসিক হইতে পুণায় যাই। পুণা নাসিকের মতই দুই হাজার ফিট উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত। ইলেক্ট্রিক ট্রেণে বোম্বাই হইতে পুণা সাড়ে ৩ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। বোম্বাই হইতে পুণা মাত্র ১১৪ মাইল। পুণা অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সহর। হিন্দু ইতিহাসের এক অমর অধ্যায় এই স্থানেই লিখিত হইয়াছে। ইহা মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। বোম্বাইয়ের ন্যায় পুণা হইতেও বহু মূল্যবান্ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত প্রস্থান-ত্রয়-ভাষ্য নির্ভুল ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ৪৫০০ ফিট উচ্চ মহাবালেশ্বর পাহাড় এখান হইতে প্রায় ৭১ মাইল দূরে মোটর-বাসে যাইতে হয়। এখানে বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। সহরের এক প্রান্তে সহস্রাধিক ফিট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপরে ৺পার্ব্বতীদেবীর মন্দির। মন্দিরটি প্রাচীন এবং পেশোয়াগণের উপাসনা-স্থল। মন্দির হইতে পুণা সহরের একটি সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। সহরের চারি দিকে উচ্চ পর্ব্বতের প্রাকৃতিক প্রাচীর। বহু মাইল-ব্যাপী পাহাড়ের গাত্রে অসংখ্য সেনানিবাস আছে। পার্ব্বতীদেবীর সম্মুখে 'সপ্তশতী'র নারায়ণী-স্তোত্র পাঠ করিলাম। পার্ব্বতী জাগ্রতা দেবী বলিয়া মনে হইল। হিন্দুর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে তীর্থস্থানে; তাই হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ এবং হিন্দুসংস্কৃতি ধর্ম্মমূলক। আর পাশ্চাত্ত্যের সভ্যতা ও সহরের সৃষ্টি বাণিজ্য-স্থানে ও যন্ত্র-নির্ম্মাণকেন্দ্রে। সেই জন্য পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতি জড়বাদ-মূলক। হিন্দু সংস্কৃতি আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহা কত জাতির উত্থান ও পতন দেখিয়াছে, কিন্তু স্বয়ং বাঁচিয়া আছে।

পুণায় ভারতীয় মেটিওরোলজিকাল বিভাগের হেড অফিস আছে। এই বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাঙ্গালী ডক্টর ব্যানার্জ্জি। এই বিভাগে ডক্টর সুপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও ডক্টর উৎসব বসু ও অন্যান্য কয়েকটি বাঙ্গালী আছেন। পুণাতে প্রায় ১৫০।২০০ বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষে আছেন। গত বৎসর হইতে তাঁহারা প্রতিমা গড়িয়া দুর্গাপূজা করিতেছেন। ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি জার্ম্মেনির মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন। শুনিলাম, মেটিওরোলজিক্যাল বিভাগের হেড অফিস দিল্লীতে শীঘ্র স্থানান্তরিত হইবে। এখানে একটি ক্ষুদ্র বিবেকানন্দ সোসাইটী আছে। সর্দ্দার মুদালিয়র নামক জনৈক তামিল ইহার সম্পাদক। ইনি রামকৃষ্ণভক্ত। উক্ত সোসাইটীর উদ্যোগে প্রতি বৎসর স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পুণাতে অনুষ্ঠিত হয়। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে একটি নূতন জাতীয় উৎসব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহার নাম গণেশ-উৎসব। গণেশ চতুর্থীতে অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর যেমন ৺দুর্গাপূজা, মারাঠির তেমনি গণেশ-উৎসব। মৃন্ময়ী প্রতিমায় গণপতির পূজা হয়। এই উৎসবে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। আমরা গণেশ উৎসবের সময়েই এখানে উপস্থিত ছিলাম। উৎসব দেখিয়া মনে হইল, হিন্দুর পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় আনন্দোৎসবই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া। আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনের মূলে আছে ধর্ম্ম। তাই স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন ধর্ম্মজাগরণ। ধর্ম্ম-জাগরণ দ্বারাই সহজে হিন্দুর জাতীয় জাগরণ আসিবে। পুণা হইতে ১০।১২ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে শিবাজীর দুর্গ সিংহগড়। জ্ঞানেশ্বর ও তুকারাম-প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয় সাধুগণের জন্মস্থান পুণার অদূরে। অধ্যাপক কার্বে পুণায় নারী-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার জনৈক মহিলা। পুণায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, আইন কলেজ, ফার্গুসন কলেজ, শিবাজী মিলিটারী-স্কুল ও বহু হাই-স্কুল আছে। পুণাতে মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। জয়াকর-প্রমুখ বিশিষ্ট মারাঠিগণ

এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। গোখ্‌লে-প্রতিষ্ঠিত "Servant of India Society" দেখিলাম। ইহা একটি নির্জ্জন স্থানে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত! সোসাইটীর অদূরে একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গে পটবর্দ্ধন ও দেবধর নামক বন্ধুদ্বয়ের সহিত মহামতি গোখ্‌লে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। সেই স্থানে একটি প্রস্তর-বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্থানটি এখন মারাঠি যুবকগণের নিকট খুব পবিত্র। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শত শত যুবক-যুবতী এই একান্ত স্থানে যাইয়া গোখ্‌লের অশরীরী আত্মার নিকট স্বদেশপ্রীতির অনুপ্রেরণা লাভ করে। Servants of India Societyর কাছেই Bhandarkar Oriental Research Institute. ডাঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সংস্কৃতবিৎ ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহার পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু কাল ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। উক্ত ওরিয়েণ্ট্যাল ইনষ্টিটিউট্ একটি ভারতবিখ্যাত সংস্কৃত গবেষণাগার। এই প্রতিষ্ঠান হইতে সম্প্রতি মহাভারতের একটি সংশোধিত বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালা দেশে তেমন গবেষণাগার নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই প্রথমে বিশ্বভারতীতে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতায় একটি সুবৃহৎ গবেষণাগারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পুণায় অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিবাস। এক সময় এখানে সংস্কৃতের খুব চর্চ্চা হইত, এখনও কিছু কিছু হয়। এখানে গোখেল শিক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক বহু কলেজ ও স্কুল পরিচালিত হয়। এই সমিতির স্কুল-কলেজের অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ শিক্ষাপ্রচারের ব্রতধারী ও অল্প পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করেন। গোখেল বাঙ্গালীদের ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সত্যই বলিয়াছিলেন—'বাঙ্গালী আজ যা ভাবে, অবশিষ্ট ভারত আগামী কাল তা ভাববে'। ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতে এবং এমন কি, রাজনীতিতেও বাঙ্গালা এখনও ভারতে সর্ব্বাগ্রণী। জাতীয় আন্দোলনের উৎসই বাঙ্গালা। কংগ্রেসে আজ বাঙ্গালার উচ্চস্থান না থাকিলেও কংগ্রেস বাঙ্গালার মত ত্যাগ করিতে পারে নাই। চিত্তরঞ্জনের মত প্রথমে কংগ্রেস গ্রহণ না করিলেও শেষে বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গান্ধী সুভাষচন্দ্রের মতের প্রতিবাদ করিলেও কংগ্রেস আজ সুভাষচন্দ্রের মতানুবর্ত্তী। মারাঠি ভাষা বেশ সমৃদ্ধ। একমাত্র মারাঠি ভাষায় গীতার উপর দু'খানি ভাল টীকা রচিত হইয়াছে—একখানি জ্ঞানেশ্বর-কৃত, অপরটি বালগঙ্গাধর তিলকের। তিলকের গীতারহস্য ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকার বাঙ্গালা তর্জ্জমা এখনও হয়নি। জ্ঞানেশ্বরের 'অমৃতানুভব' নামক একটি অপূর্ব্ব মারাঠি ধর্ম্ম-গ্রন্থ আছে। জ্ঞানেশ্বরের গীতাটীকা এবং 'অমৃতানুভব' মারাঠিগণ কর্ত্তৃক বহু ভাবে পঠিত হয়। জ্ঞানেশ্বরের গীতা টীকার উপর তিলকের গীতারহস্য বিরচিত। তিলকের গীতারহস্য এবং অরবিন্দের গীতাভাষ্য উভয়ই মৌলিক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ভাষ্য প্রথমে ইংরেজিতে রচনা করেন। অধ্যাপক আর, ডি, রাণাডে তাঁহার "Maharashtra Mysticism" নামক বিশাল ও সারবান্ গ্রন্থে মহারাষ্ট্রের সাধুগণের ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মারাঠিগণের বুদ্ধি ও বিদ্যানুরাগ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

পুণার পুরানো সহরে পথগুলিতে অসংখ্য সরু গলি। কিন্তু নূতন সহরটি বেশ সুন্দর এবং এখানকার রাস্তাগুলি বেশ চওড়া। নূতন সহরটির নাম 'শিবাজী নগর'। শিবাজী নগর নামে একটি রেলওয়ে ষ্টেশনও আছে। নূতন সহরেই কংগ্রেস ভবন, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও গভর্ণমেণ্ট আফিসগুলি অবস্থিত। পুণায় স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তিলকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এখানে থিওজফিক্যাল সোসাইটি, কবীর মঠ, দাদু মঠ, শঙ্কর মঠ প্রভৃতি বহু ধর্ম্মস্থান আছে। পুণা ভ্রমণ সংক্ষেপে শেষ করিয়া বোম্বাই ফিরিলাম। আজকাল যুদ্ধের জন্য ট্রেণের সংখ্যা অনেক কম হওয়ায় যাতায়াতে বিশেষ অসুবিধা। বরোদা ও নাগপুরও মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত। নাগপুর বহু পূর্ব্বে সমাপ্ত করিয়াছিলাম। তাই বরোদাভিমুখে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি।

হিন্দু জগতের প্রায় সমস্ত প্রদেশে ঘুরিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, হিন্দুধর্ম্মে বহু সম্প্রদায় ও শাস্ত্র থাকিলেও, হিন্দুসমাজের বহু বিভাগ থাকা সত্ত্বেও, হিন্দু জাতি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও, হিন্দু জগতের সাংস্কৃতিক ঐক্য অচ্ছেদ্য, অভেদ্য এবং সুদৃঢ়। হিন্দু জাতি বর্ত্তমানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও এই অমর জাতির ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা অধিকতর গৌরবময়।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

অবতার

"রবিরে ফেলেছি ঢেকে"—কালো মেঘ কয়,
"জগতের কেহ আর নাহি পাবে আলো!"
হাহা-রবে তাড়া করি' আসিয়া মলয়
"হেথা ভিড় করো কেন?"—বলি ধমকালো।

জগতের যত হিংসা যত হানাহানি
"সত্যেরে মেরেছি" ব'লে মাতে উৎসবে।
কবি কহে, "বুকে যার অমৃতের বাণী,
তাহারে করিতে হত্যা কে পেরেছে কবে?

"মানুষ ঘুমায় যবে অজ্ঞান-তিমিরে,
অবতার জন্ম লয় তাহারি কুটীরে।"

শ্রীমতী সুষমা চক্রবর্ত্তী

শুভবিবাহ

[গল্প]

এই সে দিনের কথা।

গত চৈত্র মাসের শেষ। বেলা তখন প্রায় আটটা। থলি-হাতে বাড়ী ফিরিয়া জীবনচন্দ্র গৃহিণী হেমলতা দেবীকে বলিলেন—নাও গো, ওদের কনট্রোলের দোকানে চাল পাওয়া গেল না!

ভাঁড়ারের সামনে দালানে বঁটি পাতিয়া হেমলতা দেবী আনাজ কুটিতেছিলেন, স্বামীর কথায় মুখ তুলিয়া কহিলেন,—তা'হলে আমাদের ঐ চালই চাকরদের জন্য বার করে দি!

থলি ফেলিয়া জীবনচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; সামনে মোড়ার উপর বসিয়া বলিলেন—তার পর?

হেমলতা দেবী অম্লান অকুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—তার পর আর কি, আমাদের যে গতি, ওদেরো তাই!

এ কথার অন্তরালে জীবনচন্দ্র অনেকখানি প্রমাদের আভাস পাইলেন! উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন—আমাদের এ চালের দাম কত জানো? মণ নেছে তেইশ টাকা করে! চাকর-বামুনকে ঐ তেইশ টাকা মণের চাল খাওয়াবে?

হেমলতা দেবী বলিলেন—তোমার বাড়ীতে চাকরি করতে এসেছে বলে তো না খেয়ে ওরা চাকরি করতে পারে না! ওদের খেতে দিতে হবে।

কথাটা বলিয়া হেমলতা দেবী স্বামীর পানে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া তরকারীর চ্যাঙারিটা ঠেলিয়া দিয়া ডাকিলেন—ঠাকুর···

দালানের নীচে ছোট উঠান। উঠানের ওপারে রান্নাঘর। রান্নাঘর হইতে ঠাকুর জবাব দিল—যাই মা···

ছোট টুকরি হইতে একটা লেবু তুলিয়া লইয়া হেমলতা দেবী বঁটির গায়ে ধরিলেন, ঠাকুর আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

হেমলতা দেবী বলিলেন—ঝোলের আনাজ কুটে দিয়েছি, নিয়ে যাও। খোকা বাবুর ইস্কুল আছে। ওর জন্য ঝোলটা আগে চড়িয়ে দাও। তার পর ও ভালোবাসে আলু-ভাতে, আলুর খোশা ভাজা··· আর কুচো চিংড়ী আনতে দিয়েছি, সেই কুচো চিংড়ীর সঙ্গে এই থোড় কুটে দিয়েছি, থোড়-চিংড়ী করে দিয়ো। এই পেলেই ও সোনা-মুখ করে' খাবে'খন!

ঝোলের আনাজ লইয়া ঠাকুর আবার গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

জীবনচন্দ্র গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন! তাঁর মাথাটা মুহূর্ত্তে যেন বাংলা থিয়েটারের ষ্টেজ হইয়া উঠিয়াছে! এবং সে ষ্টেজের উপরে হৃদয়-বিদারক পারিবারিক নাটকের অভিনয় সুরু!

ডেপুটিগিরি করিয়া আজ ন'মাস তিনি পেন্‌সন লইয়াছেন। অনাবারী করিবার বাসনা মনে ছিল প্রবল, কিন্তু গৃহিণী হেমলতা দেবীর ভ্রূ-ভঙ্গীতে সে-বাসনা অন্তর-মধ্যে লীন হইয়াছে! হেমলতা দেবী শ্লেষ-ভরে বলিয়াছিলেন—গোলামির মোহ কখনো ঘুচবে না?

জীবনচন্দ্র বলিয়াছিলেন—এ তো মাইনের চাকরি নয় গো··· অনারারি! মানে, নিজের খোশ-খেয়ালে কাজ করা! বদলির ভয় নেই! জবাবদিহি নেই!

হেমলতা জবাব দিয়াছিলেন—না। পাকেচক্রে কতকগুলো নিরীহ নিরপরাধকে জেল-জরিমানা-দণ্ড না দিলে নয়? ও-পাপ আর ই করলে! মানুষ নিজের বিচার নিজে করতে পারে না—তার আস্পর্দ্ধা হয় কি করে' দণ্ডমুণ্ডধর সেজে পরের বিচার করতে! তুমি ভাবো, সাজানো মিথ্যা মামলা তুমি ঠিক ধরতে পেরেছো?··· ও-পথে আর নয়। তার চেয়ে সংসার ছাখো, জিরিয়ে আরাম ভোগ করো! পড়াশুনা করো সে হ্যাঁ, লেখাপড়া শিখেছিলে এক কালে, সে লেখাপড়া সার্থক হবে!

হিন্দু ঘরের সাধ্বী সতী সহধর্ম্মিণী হইলেও হেমলতা দেবী কোনো দিনই একান্ত ভক্তি-ভরে স্বামীর সকল কর্ম্মে-আচরণে মাথা নীচু করিয়া সায় দেন না! যেটা উচিত মনে করেন, সেটা বেশ সতেজে বলিতে পারেন! শুধু বলা নয়···

অর্থাৎ এ-কারণে ডেপুটিত্বের প্রতাপ মর্ম্মে গাঁথা থাকিলেও জীবনচন্দ্র স্ত্রীকে চিরদিন ভয় করেন, ভক্তি করেন! উপরিওয়ালাদের উপর যেমন ভয়-ভক্তি, এ ভয়-ভক্তি তেমন নয়, সে-কথা বলা বাহুল্য!

এখন পট উত্তোলন করিয়া মাথার ষ্টেজে ট্রাজেডির অভিনয়! প্রথম অঙ্কে পেন্সনের কল্যাণে, ঘরে বসিয়া বিরাম-আরাম উপভোগের কল্পনা! তার পর দ্বিতীয় অঙ্কে ট্রাজেডির সূত্রপাত! জাপানী বোমার ভয়ে ইভাকুয়েশন! তার ফলে সহরের অর্দ্ধেক দোকান বন্ধ; বাকী অর্দ্ধেকে চাল-ডাল হইতে কাপড়-চোপড়ের দাম চড়িয়া অভ্রভেদী হিমালয়ের মাথায় উঠিতেছে! আরও উঁচুতে চড়িলে কোন্ হিম-বাষ্প-কুহেলিকার মধ্যে সব অদৃশ্য হইয়া যাইবে। বাংলা ট্রাজেডিতে মাঝে-মাঝে যেমন নিয়তি বা উদাসিনী আসিয়া সান্ত্বনার কথা বলিয়া, আশার গান শুনাইয়া ট্রাজেডির ঘনঘোর আভাসকে খানিকটা হালকা করিয়া দেয়, এ-নাটকেও তেমনি সান্ত্বনা-স্বরূপ দু'টি কনট্রোলের দোকান মিলিয়াছিল। একটি তাঁর হাকিমী-আমলের এক আমলার ভাইয়ের মুদিখানা—সেই কালীঘাটে মন্দিরের কাছে; আর একটি শ্যামবাজারে জীবনচন্দ্রের পিসতুত-ভাইয়ের বাড়ীর বাহিরের ঘরে ভাড়াটিয়া ভূষণ সাধুখাঁর দোকান। এ দু'টি দোকানে সপ্তাহে চার-দিন করিয়া হাজিরা দিয়া তিন ঘণ্টা ধরিয়া নানা খোশ-গল্পে দোকানদারের তৃপ্তি-সাধনান্তে দু'সের, চার সের করিয়া চাল লইয়া আসেন কনট্রোলের দরে! সে-চালে বামুন-চাকরের অন্নের সংস্থান হয়। বাজার-হিসাবে দাম পড়ে অনেক কম—কাজেই এতখানি পরিশ্রম ও তোষামোদের আঁচ গায়ে তেমন লাগে না! তবু এক-একবার দোকানের তক্তাপোষে বসিয়া মনে হয়, দু'দিন আগে এ সব লোকের স্পর্দ্ধা হইত কি তাঁর সঙ্গে সমান ভাবে কথা কয়? আর এখন? কোন্ পাপের ফলে ইহাদের তৃপ্তি-সাধনের জন্য খুঁজিয়া বাছিয়া বচন-বিন্যাস করিতে হয়! পয়সা দিয়া চাল কেনা—মনে হয়, যেন ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি! এই সব দোকানীর মুখের মৃদু হাসি এবং নয়নের ভ্রূভঙ্গীকে যে-ভাবে মানিয়া চলেন, ডেপুটিগিরি করিবার সময় উপরিওয়ালা সাহেবকেও বোধ করি, এতখানি মানিয়া চলেন নাই!

কিন্তু সব সহিয়াছিল কম-দামে চাল মিলিত বলিয়া! রুটিন-মাফিক আজ সকালে কালীঘাটের কনট্রোল-দোকানে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তারা বলিয়াছে, সরকারী কড়াক্কড় অত্যন্ত বেশী হইয়াছে! মাপ-জোপের উপর কড়া পাহারা! ভবিষ্যতে চাল দেওয়া কঠিন! তাছাড়া সাপ্লাই কমিয়াছে ইত্যাদি!

পেন্সনের ছাইয়ে চাপা পড়িয়া তেজানল নিবিয়া নিষ্প্রভ হইয়াছিল, দোকানদারের এ-কথায় ছাই সরাইয়া সে-তেজ যে মনের মধ্যে অগ্নি-শিখায় জ্বলিয়া ওঠে নাই, এমন নয়! সামান্ত মুদির এত বড় স্পর্দ্ধা. তিনি মহকুমায় হাকিমী করিয়া আসিয়াছেন, যে ভাবে মুদি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করিল, যেন তিনি মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিলেন !

মন বলিল, ওঠো কোঁশ করিয়া—দাও একটি ছোবল ! বলো, আমাকে দু'সের চাল দিতে পারো না, আর ঐ খাকী শর্ট-সার্ট-পরা সিভিক গার্ড···লাইন-বন্দী ক্রেতাদের বঞ্চিত করিয়া তাদের প্রাপ্য চাউল হইতে দশ সের বারো সের করিয়া বগলি ভরিয়া ঐ সিভিক গার্ডকে দাও যে···যদি একটি. রিপোর্ট ঝাড়িয়া দিই ?

কিন্তু এ-কথা বলিতে পারেন নাই। বলিতে গেলে সে-কথার উত্তরে মুদি যদি বলে···

তাই মনের ভিতরে রাজ্যের অন্ধকার ভরিয়া জীবনচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন···হাতে শূন্য থলি !

সহসা কি মনে হইল, জীবনচন্দ্র বলিলেন—শুনচো !

বৈকালের জল-খাবারের জন্য হেমলতা দেবী ছেঁচকির আলু-পটল কুটিতেছিলেন···সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবেই বলিলেন—বলো···

জীবনচন্দ্র এক বার চারি দিকে চাহিলেন ! তার পর কণ্ঠ মৃদু করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন—আমি বলছিলুম, চালের সমস্যা দিন-দিন বাড়বে বৈ কমবে না ! তাই···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি থামিলেন। হেমলতা দেবীর মুখে ভাব-বিপর্য্যয়ের চিহ্ন লক্ষ্য হইল না। দেখিলেন, ও-মুখে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাব ! তখন সাহস হইল। কাসিয়া গলা সাফ করিয়া আবার বলিলেন,—ওদের খোরাকির জন্য যদি টাকার ব্যবস্থা করো ! ধরো, তোমার ঠাকুর মাইনে পাচ্ছে বারো টাকা করে, আকলু পাচ্ছে দশ টাকা, পূর্ণ ন' টাকা···ঠাকুরকে যদি কুড়ি টাকা দাও, আকলুকে আঠারো, আর পূর্ণকে সতেরো ? আটটা করে টাকা বেশী যা পাবে, তাতে ওদের খাবার ব্যবস্থা ওরা নিজেরা করে নেবে !

হেমলতা দেবী এবার স্বামীর পানে চাহিলেন···দু' চোখের দৃষ্টি বরাভয়প্রদ নয়, বিভীষিকা-সঞ্চারী ! আকাশের গায়ে লক-লক করিয়া বিদ্যুৎ-বিকাশ হইলে দারুণ বজ্রনাদের আশঙ্কায় মানুষের বুক যেমন কাঁপিয়া ওঠে, জীবনচন্দ্রের বুক তেমনি কাঁপিল ! কিন্তু বিদ্যুতের আগুন যখন ছুটিয়া গিয়াছে, তখন বজ্রনিনাদ অনিবার্য্য এবং অচিরে ঘটিবে ! জীবনচন্দ্রও তাই···

হেমলতা দেবী কহিলেন,—এ বাজারে আট টাকায় দু'বেলা পেট পূরে মানুষের খাওয়া হয় কখনো ? ওদের মোটা চালের দাম তুমিই তো দিচ্ছিলে সতেরো টাকা করে' মণ ! তার পর আটা আছে, ডাল আছে, আনাজ-তরকারী আছে। ওরা গতর খাটিয়ে কাজ করে···খায় তোমার-আমার ডবল, তিনগুণ। নাহলে শরীর থাকবে না ! শরীর রাখতে পারলেই তবে ওদের অন্ন জুটবে ! দু'টো বাদাম খেলে তোমার চলে যাবে, মাথার খাটুনি তাতে আটকাবে না ! ওদের দেহের খাটুনি !···তাছাড়া তোমার বাড়ীতে খাটবে, তুমি ওদের মুখ চাইবে না ? এ দুর্দ্দিনে তোমার কষ্ট হবে বলে ওরা আধ-পেটা খেয়ে কাজ করবে ? তোমার মুখ চেয়ে আছে···তোমার উপরে নির্ভর···আর তুমি ওদের ঠেলে দেবে !···এমন কথা তুমি ওদের বলবে কি করে ?···ছি ছি, হাকিমী করে-করে বুকখানা না হয় পাথর করেছো, তা বলে বুদ্ধি-বিবেচনাও খুইয়েছো ?

জীবনচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ-তর্কে কোনো দিন তিনি হেমলতা দেবীর সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না ! এ সব আলোচনার সূচনা হইতেই হেমলতা দেবী চিরদিন এমন সুদৃঢ় যুক্তির উপর নিজেকে দাঁড় করান যে, জীবনচন্দ্রের যুক্তির গোলাগুলী, ভর্ৎসনা-চীৎকারের বোমা তাঁকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক তাঁর নাগালও পায় না ! এবং সরিয়া গিয়া হেমলতা দেবীর যুক্তির কথা যতই তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন, ততই সে সব যুক্তির অকাট্যতায় অভিভূত হইয়াছেন !···পারিবারিক ব্যবস্থাপক সভায় এ-ব্যাপারের ব্যতিক্রম কোনো দিন ঘটে নাই ! এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। কাজেই চিরদিনকার মতো আজো তিনি হেমলতা দেবীর যুক্তি-বচনের মাঝখানে পলায়নে আত্মরক্ষা করিলেন।

পলাইয়া তিনি গিয়া ঢুকিলেন বাহিরে বসিবার ঘরে। টেবিলের উপর খবরের কাগজ। কাগজ খুলিতে চোখ পড়িল প্রথমেই বড় বড় অক্ষরে ছাপা হেড-লাইনের উপর !

Difficulties in securing Food grains
How to meet them.

পড়িতে লাগিলেন। মর্ম্ম এতটুকু হৃদয়ঙ্গম হইল না। ভাবিলেন, ব্যাপার কি ? ইংরেজী ভুলিয়া গেলাম না কি ? মানে বুঝিতে পারি না !···মনোযোগ দিয়া ছত্রের পর ছত্র পড়িতে লাগিলেন। ছাপার অক্ষরে যা লেখা আছে, তার প্রত্যেকটি কথার অর্থ খুব জানা ! অথচ সব-কটা কথা অর্থাৎ ভার্ব, নাউন, এ্যাডজেক্‌টিভ্‌ মিলিয়া এমন হেঁয়ালি রচিয়া রাখিয়াছে, তার কাছে কোথায় লাগে ক্রশ-ওয়ার্ড পাজ্‌ল্‌ ! কাগজ রাখিয়া তিনি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মাথার মধ্যে যেন এক-হাজার প্লেন সশব্দে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল !

এমনি বিড়ম্বনার মাঝখানে ভাগিনেয় গোপালচন্দ্রের আবির্ভাব !

গোপাল ডাকিল—মামাবাবু···

মামাবাবুর মাথার মধ্যকার প্লেনগুলা চকিতে থামিয়া গেল। মামাবাবুর চেতনা ফিরিল এবং তিনি মর্ত্ত্যলোকে ফিরিলেন। বলিলেন—গোপাল !

—হ্যাঁ !

—ব্যাপার কি ? খপর ভালো ?

গোপাল বলিল—হ্যাঁ। মা পাঠালেন···মানে, মামীমাকে একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে···আজই !

জীবনচন্দ্র বলিলেন—হঠাৎ ? কেন রে ? দিদির অসুখ না কি ?

গোপাল বলিল—না। মানে, বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল। তেশরা বোশেখ।

জীবনচন্দ্র যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ! বলিলেন—বিয়ে ! কার বিয়ে ?

ঈষৎ লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে গোপাল বলিল—আমার।

জীবনচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—ও, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক··· ক'মাস ধরে কথা চলছিল বটে !

গোপাল বলিল—হ্যাঁ। কাল সকালে পাকা দেখা। গায়ে হলুদ আর বিয়ে দুই-ই ঐ তিন তারিখে।

জীবনচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন—কিন্তু এই মাগ্‌গির বাজার···লোকজন খাওয়ানো···সে তো যার নাম, বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার!

গোপাল বলিল—আপনি যাবেন···মামীমা যাবেন···মার সঙ্গে কথা কয়ে সব ব্যবস্থা করবেন। পাকা দেখা···মানে, তারা আসবে বেলা পাঁচটায়···তার পর আমাদের দিক্‌ থেকে পাকা দেখতে যেতে হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। সাড়ে সাতটার মধ্যে পাকা দেখা সারতে হবে। কালকের দিন ছাড়া এর মধ্যে আর দিন নেই!

জীবনচন্দ্র শুধু বলিলেন—হুঁ···

সঙ্গে সঙ্গে বুকের উপর যেন আলিপুরের চিড়িয়াখানা জাগিয়া উঠিল···রাজ্যের পশু-পক্ষীর মিশ্র চীৎকার-গর্জ্জন!

গোপাল বলিল—মামীমা আছেন তো?

জীবনচন্দ্র বলিলেন—থাকবেন না তো যাবেন কোথায়! যা, ভিতরে যা।

গোপাল গেল অন্দরে মামীমা হেমলতা দেবীর কাছে।

জীবনচন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন, এই বাজারে···ছেলের বিবাহ দিবার জন্ম দিদির এখন ক্ষেপিয়া না উঠিলে চলিত না! সামান্ত একটা ছোট সংসারের দৈনিক বরাদ্দর চাল-ডাল জোটে না, আর একটা বিবাহ! এ বৃষোৎসর্গ এখন না করিলে নয়! তাছাড়া দিদিকে সে জানে! গোপাল ছোট ছেলে···তার বিবাহ দিদির জীবনে শেষ কাজ! হুঁঃ! যুদ্ধ চুকিলে বিবাহ দিলে চলিত না? সংসারে যারা আছে, যাদের ফেলিবার উপায় নাই, তাদেরি অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয় না, এ দুঃসময়ে বাহির হইতে আর একটি জীবকে আনিয়া অন্ন-বস্ত্রের দায় বাড়ানো! শাস্ত্রকারেরা স্ত্রী-বুদ্ধিকে প্রলয়ঙ্করী বলিয়াছেন, এ কথা মিথ্যা নয়!

রাশীকৃত চিন্তার ভারে বুক অসহ্য ভারী হইল। তিনি আসিলেন অন্দরে।

দেখেন, হেমলতা দেবীর কুটনা কোটা শেষ হইয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, গোপালও দাঁড়াইয়া। দু'জনে কথা হইতেছে।

তাঁকে দেখিয়া হেমলতা দেবী বলিলেন—শুনেছো গা, গোপালের বিয়ে। দিদি আমাকে আজই যেতে বলেছেন। গোপাল এখনি আমায় নিয়ে যেতে চায়। আমি বলছি, এখন নয়···খাওয়া-দাওয়া সারি···তার পরে যাবো। তুমি পারবে আমাকে নিয়ে যেতে?

জীবনচন্দ্র বলিলেন—কখন?

হেমলতা দেবী বলিলেন—বারোটা নাগাদ। এর মধ্যে নাওয়া-খাওয়া সেরেনি। তার পর···কিন্তু গিয়ে আজ কি আর ফিরতে পারবো? কাল পাকা দেখা···তারা বিকেলে আসবে।···খাওয়ার পাট না থাকলেও নতুন কুটুম···যা হোক খাতির-অভ্যর্থনা তো করা চাই! দিদি বলে দেছেন, কি করতে হবে, কি করা উচিত, এ-সব তিনি ভুলে গেছেন···আমি গেলে তবে সব ঠিক হবে।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—এ সময়ে কি আর করবে? কিছুই পাওয়া যায় না! যা পাওয়া যায়, তার দাম একেবারে আগুন! দিদিকে বুঝিয়ে বলো, ঐ বর নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে শুধু বৌ আনা—ব্যস্‌! লোকজন খাওয়ানো বা অন্য সমারোহ···পরে। এখন চলবে না··· চলতে পারে না!

হেমলতা বলিলেন,—কি যে বলো! জন্মের মধ্যে কর্ম্ম বিয়ে! কিছু করতে বলবো না কি রকম?

জীবনচন্দ্র বলিলেন—তার পর? ম্যাও ধরবে কি কবে? হুঁঃ! গায়ে-হলুদের তত্ত্ব যাবে তো?

হেমলতা দেবী বলিলেন—নিশ্চয় যাবে।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—মিলের ধুতি-শাড়ীর দাম যা হয়েছে, তাতে দু'দিন আগে হাতী কেনা যেতো। আর বেনারসী-ফেনারসী··· যার নাম, হুঁঃ!

হেমলতা দেবী বলিলেন—তুমি থামো তো। সে যা হবার, দেখা যাবে। বিয়ে হচ্ছে···বৌকে বেনারসী দেবে না বটে? লাইনে দাঁড়িয়ে তোমার ঐ কন্‌ট্রোলের দোকান থেকে দশ হাত চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের শাড়ী কিনে দিতে হবে···না?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি চাহিলেন গোপালের দিকে, বলিলেন—বেনারসী-টসী কিনছে কে? অমুজ?

অমুজ গোপালের ভাগিনেয়। ভারি হুঁশিয়ার চালাক ছেলে! সব কাজে আগে গিয়া দাঁড়ায়, হঠিতে চায় না!

মামীমার কথার উত্তরে গোপাল বলিল—হ্যাঁ।

হেমলতা দেবী বলিলেন—তুমি তাহলে যাও গোপাল, তোমারো তো শুধু টুঁটো বর সেজে বিয়ে করতে গেলে চলবে না, বাজার করা আছে, আরও পাঁচটা কাজ আছে!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—কোথা থেকে বিয়ে করতে যাবি রে? তোদের বাড়ী তো ছোট ফ্ল্যাটের এক-তলায়···তারো আবার আধখানা। ওখানে থেকে···

গোপাল বলিল—না। বাড়ী নেওয়া হয়েছে। স্কট্‌স্‌ লেনে তিনতলা মস্ত-বড় বাড়ী। কাল সকালেই সে-বাড়ীতে যাবো। সেই বাড়ীতে হবে পাকা দেখা।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—অত-বড় বাড়ী নেবার কি দরকার ছিল? আমার এখান থেকে বিয়ে করতে যাওয়া হতো না? রাজসূয় যজ্ঞ করবি ভেবেছিস্‌! নারদের নেমন্তন্ন করবি এই দুঃসময়ে! তার পর?

কুণ্ঠিত মৃদু হাস্যে গোপাল বলিল—যেখানে যে আছে, মা বললে, সকলকে জানাতে হবে তো···আসতেও বলতে হবে! তবে আসবে না কেউ, কলকাতায় সত্ত সে দিন বোমা পড়েছিল···বোমার ভয়!

হেমলতা দেবী বলিলেন,—বাড়ীর ভাড়া দিতে হবে কত?

গোপাল বলিল—ডেলি পনেরো টাকা করে!

চমকিয়া জীবনচন্দ্র বলিলেন—তার মানে, এক মাসে···এ-মাস একত্রিশ দিনে! অর্থাৎ তা'হলে একত্রিশ ইনটু পনেরো···তার মানে পনেরোর পাঁচ—হাতে থাকে এক! তার পর তিন-পনেরোয় পঁয়তাল্লিশ আর ঐ এক অর্থাৎ চারশো পঁয়ষট্টি টাকা! ওরে বাবা! এত বড় অবিবেচনার কাজও করে! নাঃ, তোদের নিয়ে আর পারা যাবে না!

হার্ট বুঝি ফেল্‌ হইবে···বুকখানা সাংঘাতিক বেগে দুলিয়া উঠিল! বুকের সে তীক্ষ্ণ তীব্র স্পন্দন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে নিরুপায় হতাশ্বাসে জীবনচন্দ্র স্থান ত্যাগ করিলেন!

সন্ধ্যার সময় স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্বামী জীবনচন্দ্র। স্ত্রী হেমলতা দেবী।

গোপালদের বাড়ী হইতে হেমলতা দেবী সগু ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখনো বেশভূষা ত্যাগ করেন নাই। সেখানে যজ্ঞের যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা দিতেছিলেন। বলিলেন, এ যজ্ঞে তাঁকেই যজ্ঞেশ্বরীর আসনে বসিয়া দিদিকে পুত্র-দায় হইতে উদ্ধার করিতে হইবে! জীবনচন্দ্রও সারা দিন বাড়ীতে বসিয়া মনে-মনে অনেক ছবি আঁকিয়াছেন! দিদির জোর তাগিদ, তাঁকে গিয়া বর-কর্ত্তা হইয়া বসিতে হইবে! ছেলে-ছোকরারা করিবে সব সত্য, কিন্তু মাথার উপর এক জন ভারিক্কি লোক না থাকিলে তাদের চালাইবে কে? তাই জীবনচন্দ্র ভাবিতেছিলেন···

হেমলতা দেবী বলিলেন,—দিদি বললেন, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাল থেকেই ওখানে গিয়ে আমাকে ক'দিন থাকতে হবে। কিন্তু আমি রাজী হইনি। সময় খারাপ। ছেলে-মেয়েদের আমি যে ভাবে নিয়ম করে চালাই, ওখানে ভিড়ে ওদের সে-নিয়ম থাকবে না অসুখে পড়বে! লোক তো বড় কম হবে না!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—কেন, গোপাল যে বললে, বলা হবে সকলকে, কিন্তু কেউ আসবে না···কলকাতায় সগু সে-দিন বোমা পড়েছিল জানুয়ারি মাসে···সেই বোমার ভয়ে।

হেমলতা দেবী বলিলেন—মেদিনীপুর থেকে দিদির ননদ সুখদা লিখেছে, সকলে আসবে···গোপালের বিয়ে···দিদির শেষ কাজ··· না এলে দিদির মনে চিরদিনের জন্য দুঃখ থেকে যাবে। তবে দিনাজপুরে আছে গোপালের এক জ্ঞাতি-কাকা। তিনিও কাল আসছেন সপরিবারে। তার পর তারকেশ্বরে পিসতুতো বোন আছে মানি। সেই মানি বোন, ভগ্নীপোত কামাখ্যা বাবু, তাদের পাঁচ-সাতটা ছেলেমেয়ে, তারাও কাল আসছে!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—রজনী? শিশির? ওরা আসবে না?

রজনী গোপালের বড়দা। শিশির মেজদা। রজনী থাকে দিল্লীতে, শিশির বাঙ্গালোরে। সেখানে বড় চাকরী করে।

হেমলতা দেবী বলিলেন—না, তারা আসতে পারবে না। লিখেছে, অফিসে ছুটী মিলবে না। যুদ্ধের জন্য তাদের কাজের আর অন্ত নেই! বড় ভাই পাঠিয়েছে এক হাজার টাকা···মেজ দু'হাজার! আর লিখেছে, যেমন যা করতে চাও, করো। আরও টাকার দরকার হলে লিখো, পাঠাবো।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—হুঁ!

তার পর যেমন যাহা ঘটিয়াছিল:

চৈত্র-সংক্রান্তির দিন। বৈকালে স্কটস্ লেনের বাড়ীতে গিয়া জীবনচন্দ্র দেখেন, প্রকাণ্ড তিন-তলা বাড়ী লোকে ঠাশা! অবস্থা ঠিক ট্রামের মতো! অর্থাৎ পা বাড়াইবেন, এমন জায়গা নাই! ভিড় গমগম্ করিতেছে। চ্যাঁ-ভ্যাঁ-চীৎকার···ছুটাছুটি···হুড়াহুড়ি। সামনে সিমেন্টে-বাঁধানো উঠান। উঠানের গায়ে চওড়া রোয়াক। সেই রোয়াকের উপরে জোয়ান্ ষণ্ডা-গোছ চার-পাচটি ছেলে বসিয়া কুলপী বরফ খাইতেছে। সামনে কুলপীওয়ালা—হাত পুরিয়া হাঁড়ির মধ্য হইতে বিদ্যুতের গতিতে একটার পর একটা টিন বাহির করিতেছে এবং খুলিবামাত্র সাফ! জীবনচন্দ্র কাহাকেও চেনেন না। কাজেই ষ্টেজের উপরে নাটকের নায়ক আবির্ভূত হইয়া সরবে যেমন স্বগত-উক্তি করে, তেমনি সরবে আত্মগত ভাবে অর্থাৎ কাহাকেও উদ্দেশ না করিয়া তিনি বলিলেন—গোপাল আছে? গোপাল? অম্বুজ?

সামনের ছোকরাটি সাতটা কুলপী খাইয়া হাঁপাইয়া দম লইতেছিল! সে বলিল,—তারা বাড়ীর মধ্যে আছে। ডেকে দেবো?

জীবনচন্দ্র বলিলেন—থাক্, আমি বাড়ীর মধ্যে যাচ্ছি।···পথ কোন্ দিকে?

অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দ্বার দেখাইয়া সে কহিল—ঐ দিকে।

জীবনচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

অন্দরে ঢুকিতেও অমনি দৃশ্য, তবে একটু রূপান্তর! এখানে কুলপী বরফের বদলে খাবারের মস্ত চ্যাঙারি···সে চ্যাঙারিতে হিঙের কচুরি ঠাশা! আর সে-কচুরি ধ্বংস করিতেছে সাত-আটটি মেয়ে বসিয়া। এক ধারে দোতলার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া বাঁয়ে বারান্দা। বারান্দায় আসিয়া দেখেন, অম্বুজ দাঁড়াইয়া আছে।

জীবনচন্দ্রকে দেখিয়া অম্বুজ বলিল,—এই যে ছোটদাদু! দিদিমা এ ঘরে।

জীবনচন্দ্র আসিলেন নির্দ্দিষ্ট ঘরের সামনে। ঘরে রাশীকৃত জিনিষ ডাঁই-করা। জলচৌকি, পিতলের গামলা, বাসনকোসন, প্রদীপ হইতে সুরু করিয়া কনের জন্য কাঠের বাক্স, খেলনা, আয়না, সাবান, রুজ, সেণ্টের শিশি, একরাশ বেনারসী শাড়ী। আর সে-সব নাড়া-চাড়া করিতেছেন মহিমময়ী রাজেন্দ্রাণীর বেশে তাঁহারই গৃহিণী হেমলতা দেবী। জীবনচন্দ্র যে আসিয়াছেন, সে দিকে দেবীর লক্ষ্যই নাই!

অম্বুজ বলিল—চেয়ে দেখুন ছোট দিদিমা, নিকুঞ্জ-দ্বারে উপস্থিত অতিথি!

অম্বুজ ছেলেটা জ্যাঠা ফাজিল—মুখে তার কোন কথা বাধে না! অম্বুজের কথায় হেমলতা চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন—এসেছো! এই সব শাড়ী ছাখো। তোমার নাতি এনেছে। এ থেকে ক'নের দু'খানা শাড়ী পছন্দ করতে হবে!

বলিয়া তিনি বেনারশী মেলিয়া দেখাইতে লাগিলেন—এখানা দু'শো পঁচিশ, এখানা আড়াইশো, এখানা তিনশো পচাত্তর, আর এখানা চারশো। আমি বলছি, পরকে দেওয়া নয়···ঘরের বৌ! আমাদের গেরস্ত-ঘরে এই যা দেওয়া! চারশো টাকারটা দাও গায়ে-হলুদে আর এই আড়াইশোর খানা বৌভাতে! জন্মের মধ্যে কর্ম! বিয়ের সময় যেমন মানাবে, তেমনি এর পরে পার্টি-টার্টিতেও পরে যেতে পারবে···একালে যেমন ফ্যাশন হয়েছে। কি বলো?

এ-সব ব্যাপারে জীবনচন্দ্রের নিজের কোন বক্তব্য কোন কালে নাই। চিরদিন তিনি গৃহিণীর কথায় সায় দিয়া আসিয়াছেন।

অম্বুজ বলিল—তাছাড়া বরের কাণ্ড জানেন ছোটদাদু? বলে, দে, দে ভালোই দে—একশো-দু'শো টাকার জন্য কেন আর, হ্যাঁ! বুঝলে ছোটদাদু, বৌয়ের উপর এখনি এমন টান হয়েছে যে, সকালে আমি কতকগুলো হেয়ারপিন্ এনেছিলুম মুর্গীহাটা থেকে···দু'টাকা দশ আনায় ছত্রিশটা।···সে ওর পছন্দ হলো না। নিজে গিয়ে সেই আর্মি-নেভি ষ্টোর্স থেকে সাত টাকায় এক-ডজন কিনে আনলো! বলে, ভালো জিনিষ দে···ওরা বিদেশে থাকে, খুব আপ-টু-ডেট! শেষে ভাববে, আমরা কিছু জানি না!

শুনিয়া জীবনচন্দ্র হতভম্ব! একালের ছেলেদের এতটুকু

লজ্জা-সরম নাই! মনে পড়িল, তাঁর বিবাহের সময় বর সাজিয়া তিনি কাহারো মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারেন নাই··· এত লজ্জা···

হাসিয়া অম্বুজ বলিল—ঠিক বয়সে না দিয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে দিচ্ছেন···এ সব আপনাদের সইতে হবে বৈ কি!

হাসিয়া হেমলতা দেবী বলিলেন—তোমার বেলায় তুমি কি করো, দেখবো ভাই!

অম্বুজ বলিল—তা করবো বৈ কি! যা করবো, একটা কীর্ত্তি রাখবো ছোট দিদিমা, দেখে নেবেন তখন!

হেমলতা দেবী বলিলেন—দেখাও চটপট। নইলে কবে মরে যাবো! তোমার বিয়ে দেখে যাওয়া হলো না, এ আপশোষ নিয়ে যেন না মরি!

·

জীবনচন্দ্র নিঃশব্দে শুধু দেখিতে লাগিলেন।

হেমলতা দেবী বলিলেন—দিদি ভেবেছিলেন, কেউ আসবে না মামার ভয়ে! তা আসতে কেউ আর বাকী নেই!

অম্বুজ বলিল—জানেন ছোটদাদু, খাই-খরচ যা হচ্ছে, সে-খরচে বোম্বাইয়ের তাজ-মহল হোটেল চালানো যায়।

—যা বলেছিস্ অম্বুজ! সন্ত বোম্বাই গিয়ে দেখে তো এলুম!

হেমলতা দেবী সন্ত বোম্বাই গিয়াছিলেন! তাজমহল হোটেল দেখিয়া আসিয়াছেন। সেখানে আছে দক্ষিণা···হোটেলের ম্যানেজার ···তাঁরা ওখানেই ছিলেন! কথায় কথায় তিনি এখন বোম্বাইয়ের কথা তুলিয়া সকলের তাক্ লাগাইয়া দেন!

হেমলতা দেবী বলিলেন—বাজার করছে অম্বুজ! খাওয়া-দাওয়া থেকে কনের জিনিষপত্র অবধি কেনা—সব। এক-বাড়ী লোক—চাল যাচ্ছে সব ত্রিশ টাকা মণের। ঘী আটা ময়দা চিনিতে বাড়ী একেবারে যা করে তুলেছে! ভাবি তাই, পথে লাইন করে একমুঠো চালের প্রত্যাশায় হাঁ করে সব দাঁড়িয়ে আছে···দশ-বারো ঘণ্টা করে···তাও কিছু পাচ্ছে না!···আর এ কি অপচয়!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—এই ভেবেই সব এসেছে আর কি যে বিয়ে-বাড়ীর দৌলতে 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' ভুলতে পারবে ক'দিন!

অম্বুজ বলিল—সত্যি তাই, ছোটদাদু! নাহলে ঐ পুঁটু পিসির মেয়েরা···ওরে বাস্ রে, খেঁদির বিয়ের সময় আনতে গিয়েছিলুম, নাক সিঁটকে বলেছিল বিয়ে-বাড়ীর ভিড়···পাঁচ জনের সঙ্গে নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া···হে-হৈ! তাই আসেনি! আর এবারে খপর মাত্র এসে হাজির! পা যেন বাড়িয়ে ছিল! একটি মেয়ে এসেছে বর্দ্ধমান থেকে, আর একটি সেই শান্তিপুর থেকে!

হেমলতা দেবী বলিলেন—তার উপর পাঁচ জনের পাঁচ-রকম বায়না কি! ইনি বলেন, ছেলেরা দাদখানি ছাড়া খেতে পারে না, রুচে না। উনি বলেন, জাঁতা-ভাঙ্গা আটার রুটি! কারো ছানা চাই জল-খাবারে···কারো চাই পাঁচ-রকমের ফল! এমনি—

জীবনচন্দ্র বলিলেন—সকলের সব আব্দার রাখতে হচ্ছে তো?

অম্বুজ বলিল—নিশ্চয়! নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন···ওঁদের মান-মর্য্যাদা কি সামান্য!···তারকেশ্বরের ঐ কামাখ্যা-মেসো··· সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত হুঁকো মুখে আঁটা আছে! তার উপর রাত্রে শয়ন যত বার ঘুম ভাঙ্গবে, হাঁকবেন, তামাক দে রে! চাকর শশধরের প্রাণ গেল তামাক সাজতে-সাজতে! ভাবি, এই ওয়াল্টার র‍্যালের ছেলে কত তামাক খেতেন তারকেশ্বরে! হুঁঃ!··· মামারা এবার ঘায়েল হয়ে যাবে। এখনো বিয়ের তিন দিন দেরী··· কত লোকের এখনো আসতে বাকী!

পরের দৃশ্য ২রা বৈশাখ তারিখে। কাল বেলা তিনটা।

জীবনচন্দ্র আসিলেন···হেমলতা দেবীর ফরমাশ-মাফিক পাঁচ-সাতটা গহনা লইয়া। বৌয়ের মুখ দেখিবেন হেমলতা দেবী, তাহারই জন্ম একখানা গহনা পছন্দ করিবেন।

ভিতর-বাড়ীর উঠানে পা দিবামাত্র দেখেন, রোয়াকে আসন আর কলাপাতা বিছাইয়া একরাশ লোক খাইতেছে। ছোট-বড়-মাঝারি বয়সের প্রায় ষাট জন লোক। ক'জনের পাতে বড় বড় মাছের মুড়া···আর রকমারি তরকারী-ব্যঞ্জনের পাহাড় একেবারে! রোয়াকের পিছনে খোলা দ্বার-পথে দেখা যাইতেছে ওদিক্‌কার ঘর···সে-ঘরে মহিলা-মজলিস। সে-ঘরেও তিল-ধারণের স্থান নাই··· এত মহিলা খাইতে বসিয়াছেন!

অম্বুজ বলিল—বসে' যান ছোটদাদু···পাতা করে দি।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—আমি খেয়ে দেয়ে এসেছি রে!···তোর ছোট দিদিমা কোথায়?

অম্বুজ বলিল—ঐ তো, আপনার সম্পর্ক শুধু এক ব্যক্তির সঙ্গে! আমরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছি!

সহাস্যে জীবনচন্দ্র বলিলেন,—জ্যাঠামি রেখে বল, কোথায় তোর ছোট দিদিমা?

অম্বুজ বলিল—তিনি ভাঁড়ারে বসে তদারকীর কাজ করছেন। যাবেন? ঐ দিকে।

জীবনচন্দ্র বলিলেন,—যাবো। দরকার আছে।

ভাঁড়ারে আসিয়া দেখেন, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হেমলতা দেবী এটা-ওটা নাড়িতেছেন···ঠাকুর আসিয়া বলিতেছে, দু'হাঁড়ি দই দিন ···ভৃত্য শশধর আসিয়া বলিতেছে—মশলার যে ফর্দ্দ দিয়েছেন, তাতেই সব লেখা আছে তো মামীমা? অনিল বাবু বাজারে যাচ্ছে বৌভাতের খাওয়ানোর সব মশলা কিনতে···

হেমলতা দেবীর মুখ একেবারে রাঙা সিঁদূর! আঁচলে মুখের ঘাম মুছিয়া তিনি বলিলেন—হাঁ রে, ও-ফর্দ্দে সব জিনিষ লেখা আছে···খুঁটিয়ে সব যেন আনা হয়। অনিলকে বলো, কোনো জিনিষ বাদ না পড়ে। এলে ও-সব আমি গুছিয়ে ফেলবো। একটি ভুল হলে অনর্থ ঘটবে শেষে!

—না মামীমা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকুন গো···আমি থাকতে ভুল হবার জো কি!

একটু পরে অম্বুজ আসিয়া ডাকিল—ছোট দিদিমা···

হেমলতা দেবী বলিলেন,—বলো···

অম্বুজ বলিল—সন্দেশ চাই।

—আর সব দেওয়া হয়ে গেছে?

—হাঁ। কত খাবে আর? বুঝলেন ছোটদাদু, নেমন্তন্ন এসে খাচ্ছে সব যেন দু'মাসের খোরাক! ভাবছে, বাড়ী গিয়ে দু'মাস আর খাবে না! চালের জন্ম দু'মাস ভাবতেও হবে না।

জীবনচন্দ্র বলিলেন—যা বলেছিস্! এত লোক এসে জমেছে···

মনে হচ্ছে, সিভিল পপুলেশন্ আর বাকী নেই! বৌভাতের দিন মিলিটারীদেরও নেমন্তন্ন করিস্ অম্বুজ!

অম্বুজ বলিল—যা বলেছেন! জানেন ছোটদাদু, সিনেমায় অত ভিড় হয় তো, এখন একদম্ খালি!···তারা এসে আজ শাসিয়ে গেছে, এ সব লোককে খাইয়েই যেন আমরা বার করে দি···নাহলে সিনেমায় খালি বাড়ীতে তাদের ছবি দেখাতে হবে!

হেমলতা দেবী সহাস্যে বলিলেন,—চুপ কর্ রে লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, সকলে শুনতে পাবে যে!

—ভাবছেন শুনলে অপমান বোধ করে সরে যাবে? রামচন্দ্র! এ দুর্দ্দিনে যে অন্ন দান করে, সে দু'টো কড়া গালাগাল দিলেও তা গায়ে মাখবে না!

আরও দু'ঘণ্টা পরে ছোট একটি ঘটনা।

গোপাল বলিল অম্বুজকে,—ওরে মামাবাবুকে চা এনে দে আর সেই যে পাইকপাড়ার গাঙ্গুলি-বাড়ী থেকে বড় বড় রাজভোগ পাঠিয়েছে আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্বে, সেই রাজভোগ!

অম্বুজ বলিল—বেশ···

অম্বুজ গেল চা এবং রাজভোগ আনিতে। গোপাল বলিল—জানলেন মামাবাবু, গাঙ্গুলিরা রাজভোগ পাঠিয়েছে মোটে ষোলখানি—কিন্তু এক-একখানার ওজন বোধ হয় পাঁচ-সের করে···না মামীমা?

অম্বুজ ফিরিল। হাতে চায়ের পেয়ালা এবং প্লেটে দু'টো আইসক্রীম-সন্দেশ।

গোপাল বলিল—রাজভোগ?

অম্বুজ বলিল—সাবাড়!

—সাবাড়! বলিস্ কি! গোপালের দুই চোখ যেন ঠিকরিয়া বাহির হইবে!

অম্বুজ বলিল—তোমার সেই মেদিনীপুরের সুখদা পিসি গো, তাঁর দুই ছেলে কটা আর জটা···তারা রাজভোগ পেলে না কি আর কিছু চায় না! তাই সুখদা পিসি রাজভোগের পরাতখানি তাদের সামনে ধরে দেছেন। তারাও মাতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থে সব রাজভোগ সাবাড় করেছে!

গোপাল বলিল—বলিস্ কি! দু'টো ছেলেতে মিলে ষোলখানা ঐ বিশম্ভর-ছাঁদের রাজভোগ উড়িয়েছে! ত্যাখ্, ত্যাখ্, বেঁচে আছে তো এখনো?

অম্বুজ বলিল—নিশ্চয়! কি বপু! বুঝলেন ছোটদাদু, চেহারা দেখেননি? দেখবার মতো। হ্যাঁ, ওঁরা দু' ভাইয়ে আজ ভাত খাননি। বললেন, ভাত তো মানুষ রোজ খায়! রাজভোগ খেয়ে দু' ভাইয়ে বায়োস্কোপ দেখতে গেছেন!

গোপাল যেন তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল! বলিল,—রাক্ষস! ভিটে খেয়ে তবে বেরুবে অম্বুজ, তুই দেখে নিস্!

হেমলতা দেবী ভর্ৎসনা করিলেন,—হচ্ছে কি গোপাল? নেমন্তন্ন করে এনেছো না?

গোপাল বলিল—নেমন্তন্ন করে এনে এমন মহাপাতক করেছি যে আমাদেরও খাবে!···তাছাড়া এদেরই বা হলো কি? ঐ এ-আর-পী? দিক্ না এ-সময়ে একবার সাইরেন বাজিয়ে!

এমনি ব্যাপার! বাড়ী যেন মিলিটারী কান্টান! কাহারো কোনো অভাব নাই! যে যা চায়,···বিড়ি, সিগারেট, তাস, পাশা···সব পায়!

বাড়ীতে থাকিতে এক সের চাল আর আধ সের চিনির জন্য ঘুরিয়া চোখে যারা অন্ধকার দেখিত, এখানে তারা গোপালের শুভবিবাহের কল্যাণে আলোর পারাবারে সাঁতার কাটিতেছে! কে চায় আবার অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে!

কাজেই বিবাহের পরেও কেহ নড়িবার নামটি করিল না। সকালে-বিকালে চা আসে। শেয়ালদার বাজার হইতে দু'-বালতি দুধ। আর চিনি? অম্বুজ বাড়ীতে চিনির পাহাড় বসাইয়াছে!

তার পর শেয়ালদার বাজারে আনাজ-তরকারী যা আসে, এ বাড়ীতে আনিয়া পোরা হয়। ও-তল্লাটের লোক-জন বাজারে গিয়া খালি হাতে বাড়ী ফেরে,—নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, মিলিটারীর জন্য মাছ-মাংস-আনাজ-তরকারীতেও শেষে টান পড়িল!

বেচারীরা জানে না মিলিটারী নয়, সিভিল পপুলেশনের অর্দ্ধেক ঐ স্কট্স্ লেনের একটা বাড়ীতে ঠাশাঠাশি এত বেশী জমিয়াছে যে তাদের জন্যই বাজার উজাড়!

সে-দিন গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া গোপাল আর অম্বুজ আসিল জীবনচন্দ্রের গৃহে।

গোপাল বলিল—বিয়ের পর জোড়ে শ্বশুর-বাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখি, বাড়ী এখনো জমজমাট, মামাবাবু! কাল আবার দু'মণ চাল এসেছে···দাম পড়েছে চল্লিশ টাকা করে'!

অম্বুজ বলিল,—গোপাল প্রকাশ্যে এমন চ্যাচামেচি আর গালাগাল সুরু করেছে যে, আমাদের লজ্জা করে, অথচ ওরা বেশ নির্ব্বিকার বসে আছে!

গোপাল বলিল—শুধু বসে থাকা! বাদশাই ভোজ চলেছে—তার উপর একদল দেখবেন বায়োস্কোপ···একদল থিয়েটার। কেউ যাবেন দক্ষিণেশ্বর, কেউ যাবেন চিড়িয়াখানা দেখতে। তা যাবি, যা না বাবা, গাঁটের পয়সা খরচ করে যা!···তা নয়, এ-সবের পয়সা মার কাছ থেকে নিচ্ছে অম্লান-বদনে!

অম্বুজ বলিল—বাড়ীর ভাড়া হলো···এই দেখুন না, সাতাশে চৈত্র থেকে আজ হলো বোশেখ মাসের ষোল তারিখ···একুশ দিন। একুশ দিনের ভাড়া তা হলে হলো তিনশো পনেরো টাকা!

গোপাল বলিল—ভ্যালা বিয়ে করেছি! প্রাণ যেতে বসেছে! আমি বলি, ভাগাও সব। মা বলে, চুপ, চুপ···আপনার জন··· নেমন্তন্ন করে এনেছি, গলা টিপে তাড়াবো কি রে!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—তাঁদের তো ভাবা উচিত, অনর্থক বাড়ী-ভাড়ার টাকাটা···জানে তো সব, বাড়ীর ভাড়া দিচ্ছ কি রেটে?

ঝাঁজিয়া গোপাল বলিল—জানে না? উঠতে-বসতে দু'বেলা সে কথা শোনাচ্ছি! তা কা কস্য পরিবেদনা!

অম্বুজ বলিল,—একটা মতলব ঠিক করেছি ছোটদাদু··· আইনের প্যাঁচে না পড়ি; তাই আপনি হাকিম-মানুষ, আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।

জীবনচন্দ্র বলিলেন,—কি মতলব রে?

ছাপানো একখানা বাদামি কাগজ মেলিয়া ধরিয়া অম্বুজ বলিল—এই কাগজ···আমার এক বন্ধুর ছাপাখানা আছে, সেখান থেকে ছাপিয়ে

নিয়েছি। যেন ডিরেক্টর অফ্ মিলিটারী এ্যাফেয়ার্স ইন ইণ্ডিয়া নোটিশ দিচ্ছে, মিলিটারী লোকের আস্তানার জন্ম তিন দিনের মধ্যে স্বটস্ লেনের ও-বাড়ী ছেড়ে দেওয়া চাই। নাহলে ডি-আই-রুলে প্রসিকিউশন! অফিসারের একটা নামও জাঁকালো ভাবে সই করেছি···কিচ্ছু বোঝা যায় না···এই দেখুন! এই কাগজ দেখিয়ে একবার চেষ্টা···

হাসিয়া জীবনচন্দ্র বলিলেন,—কাগজখানা করেছিস্ মন্দ নয়! মাথা আছে! কিন্তু খবর্দার, এ কাগজ নিয়ে বাইরে নাড়াচাড়া করিস্ নে! এ নিয়ে পাবলিককে ভয় না দেখালে কিসের ভয়?··· জাষ্ট ফান্!

—ব্যস্, ব্যস্, ব্যস্! অম্বুজ লাফাইয়া উঠিল; গোপালের হাত ধরিয়া টানিয়া অম্বুজ বলিল,—চলে এসো। শুভস্য শীঘ্রং। বাড়ীতে গিয়ে এ-নোটিশ এখনি জারি করে দেবো। সঙ্গে সঙ্গে তোমার বৌ আর লগেজপত্র নিয়ে ও-বাড়ী থেকে সরে পড়ো বাপু! তার পর নিমন্ত্রিতের দল···ডি-আই রুলের গুঁতো বড় সহজ নয়··· ও-নামে পালাবার সব পথ পাবে না!···ওদের তাড়াতে না পারলে ছোট দিদিমাকেও এ বাড়ীতে ফিরিয়ে আনছি না ছোটদাদু···ওঁর জন্তই আমরা খেতে পাচ্ছি। নাহলে ঐ এক-বাড়ী লোক···আর-কারো মুখের পানে তাকাতে জানে না, সকলে শুধু নিজেদের মুখ নিয়েই আছে!

তাহাই হইল। অম্বুজের সেই নোটিশের জোরে যেখানকার যে, সেখানে সে সরিয়া পড়িল। এবং হেমলতা দেবীকে তাঁর গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে আসিল অম্বুজ!

হেমলতা বলিলেন,—কী ছেলে এই অম্বুজ! মা গো!

জীবনচন্দ্র বলিলেন—বিয়েতে কত খরচ হলো অম্বুজ?

অম্বুজ বলিল—সে-কথা আর বলবেন না ছোটদাদু। হিসেবের ফর্দ্দ বাড়ীতে জড়ো করেছি একটি বস্তা। সে-হিসেবে যোগ দিইনি! ও-বস্তার দু'টি কাপি তৈরী করে' এক-কাপি পাঠাবো বড় মামাকে, আর এক কাপি মেজ মামাকে। হিসেব জুড়ে দু'ভাইয়ে দেখবেন··· ছোট ভাইয়ের বিয়ে ভাননি তো তাঁরা, কড়াক্রান্তি-হিসাবে নিজেদের পিতৃ-মাতৃঋণ শোধ করেছেন···মায় সুদ-সমেত!

হেমলতা দেবী বলিলেন,—গোপালের তো বিয়ে হলো, এবারে তুমি একটি বিয়ে করো অম্বুজ, তা হলেই আমাদের মনের খেদ মেটে!

একটা সুদীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া অম্বুজ বলিল—রক্ষা করুন ছোট-দিদিমা! যুদ্ধ থামবার আগে নয়! এই সব নিমন্ত্রিতদের কন্ট্রোল করা··· ব্যস্ রে, হোল্ এ্যালায়েড ফোর্স যদি কেউ আমাকে কন্ট্রোল করতে বলে, হাসি-মুখে সে-ভার আমি মাথায় নিতে পারি! কিন্তু এঁদের? ওরে বাব্বা! কাজেই এ যুদ্ধ চোকবার আগে আমার বিয়ে···নৈব নৈব চ!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

"এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে"

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য

সামঞ্জস্য

বাঙালীর ঘরে এমন অনেক মহিলা আছেন, যাঁরা সংসারে শুধু খেটেই চলেছেন! স্বামী, ছেলেমেয়ে প্রভৃতির পাণ থেকে চুণ না খশে, তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যে কোথাও এতটুকু ব্যাঘাত না ঘটে, তারি তদারকীতে জীবন সমর্পণ করেছেন! নিজেদের সুখ-দুঃখের পানে তাকাতে জানেন না! নিজেদের সুখ-দুঃখ আছে—সে কথাই যেন তাঁরা ভুলে গেছেন! নিজের সত্তায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামী ও ছেলেমেয়ের সুখ-শান্তির যূপকাষ্ঠে এ ভাবে নিজেকে বলি দেওয়ায় স্বামি-পুত্র আরাম পান হয়তো, কিন্তু এতে মনুষ্যত্বের অপমান হয়।

এ কথার মানে অবশ্য এ নয় যে, মেয়েরা স্বামি-পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে না চেয়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণমাত্রায় আদায় করবেন! স্নেহ-মায়া-মমতার ধার ধারে না,—নিজের সুখ-সুবিধায় মত্ত, মশ্‌গুল এমন পুরুষ সংসারে আছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী বলে মনে হয় না। স্বামীর জন্য স্ত্রী নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পানে চেয়ে দেখেন না—মা ছেলেমেয়ের তৃপ্তির জন্য নিজের দুঃখ-কষ্ট-নৈরাশ্যকে পায়ে চেপে মাড়িয়ে চূর্ণ করছেন—অনেক স্বামী অনেক ছেলেমেয়ে এ ত্যাগের মর্ম্ম বোঝেন; বুঝে স্ত্রীর মুখের পানে স্বামী তাকান। ছেলেমেয়েরাও মাঁয়ের মন বুঝে মায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মনোযোগী হয়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে স্ত্রী বা মাকে আপন সত্তা সম্বন্ধে উদাসীন দেখলে পুরুষের মনে শুধু মমতা-দরদ জাগে না, বিরক্তিও জাগে।

পুরুষের স্বভাব—কোনো-কিছুতে বাড়াবাড়ি পুরুষ ভালোবাসে না, পুরুষ চায় সামঞ্জস্য। অর্থাৎ সে চায় সংসারের সকল কাজে মেয়েরা যেমন শৃঙ্খলা রাখবেন, রুটিনের মতো সংসার চলবে, তেমনি সে রুটিনের মধ্যে নিজেদের সখ-সাধ-সম্পূরণেও ঔদাস্য করবেন না। অর্থাৎ স্বামী চান্ বাহিরের কাজকর্ম্ম সেরে বাড়ীতে ফিরে এলে স্ত্রী হাসিমুখে যেমন তাঁকে জলখাবার ধরে দেবেন, তেমনি তিনি বেশভূষাতেও পারিপাট্য সাধন করবেন। স্বামী বাড়ী এসে যদি দেখেন, স্ত্রী মস্ত বঁটি পেতে বসে এঁচোড় কুটছেন—কিম্বা স্বামীর জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুর-চাকরের মারফৎ এবং এ ব্যবস্থা যদি কায়েমি ভাবে চলতে থাকে, তাহলে স্বামীর পক্ষে গৃহ হবে অরণ্য। গৃহে তাঁর আরাম-বিরামের আশা দিনে-দিনে সুদূরগামী হয়ে উঠবে! আমাদের দেশে সেই যে কথা আছে,—যিনি রাঁধেন তিনি কি চুল বাঁধেন না? এ কথার দাম আছে সত্যই।

স্বামী বললেন—চলো, আজ সিনেমায় যাই! এ কথার উত্তরে হলুদ-মাখা শাড়ী পরে' হাতের কালী দেখিয়ে স্ত্রী যদি বলেন—বাপ্‌রে, আমার সময় কোথায়? ওদিকে রান্না চড়িয়েছি—বাটনা বাটতে বাকী ইত্যাদি,—তাহলে এমন সংসারে স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু সেই বিয়ের সময়ে পড়া মন্ত্রটুকুকে ধরেই কোনো মতে বজায় থাকবে—স্বামি-স্ত্রীর আসল যে মনের সম্পর্ক, তা যাবে টুটে! গৃহকর্ম্ম নিয়ে বড়াই বা অভিমান করা স্ত্রীর পক্ষে চলে না! গৃহ কার? স্বামি-স্ত্রী—দু'জনের। স্ত্রী যেমন খরচের সুসারের জন্য এবং সকলের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গৃহকর্ম্ম করছেন, স্বামীও তো তেমনি সংসারকে রক্ষা এবং পালন করবার জন্য উদয়াস্ত কাল উপার্জ্জনে মত্ত!

স্বামীর তরফেও অপরাধ আছে। সে অপরাধ—কাজকর্ম্ম আর বন্ধুবান্ধবের মজলিশ নিয়ে তিনি মত্ত থাকেন, গৃহ এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের মুখের দিকে তাকান না! সংসারের খরচ-পত্র, সেই সঙ্গে গহনা কাপড় বা সিনেমার দাবী মেটালেই স্বামীর কর্ত্তব্য চোকে না। সংসার দাঁড়াতে পারে শুধু স্বামি-স্ত্রী পুত্রকন্যা-পরিজনবর্গের সম্মিলিত স্নেহ-প্রেম-মমতা-দরদের উপর। যে সংসারে স্বামী শুধু অন্ন জোগান, স্ত্রী সে-অন্ন পরিবেষণ করেন, ছেলেমেয়ে ছোটবেলায় শুধু আবদার আর লেখাপড়া করে, এ ছাড়া কারো আর অন্য কাজ নেই, কর্ত্তব্য নেই—সে-সংসারের সঙ্গে মেশ বা হোটেলের তফাৎ কোথায়?

সকল দিকে সামঞ্জস্য চাই। নানা বিরুদ্ধ মতবাদের আবহাওয়ায় বাঙালীর সংসারে স্বার্থ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে—স্বামি-স্ত্রী ছেলেমেয়ের দল নিজ-নিজ কর্ত্তব্যমাত্র পালন করে চলেছে—পরস্পরের সুখে-দুঃখে পরস্পরে সংযোগ রাখছে না! কেউ বা আত্মসুখ-কামনায় অপরের সম্বন্ধে দারুণ উদাসীন হচ্ছে! লক্ষণ ভালো নয়। স্নেহ-মায়া-মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে আত্মসুখ স্বার্থ নিয়ে মানুষ কোনো দিন সুখী হতে পারবে না। বাহিরে বন্ধুবান্ধব, সোসাইটি পার্টি—তার যত আকর্ষণই থাকুক, ও মোহ চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাছাড়া পরের জন্য দরদে যাঁরা বিগলিত হন, ঘরের অতি-প্রিয় আত্মীয়দের উপর যদি সে-দরদের কণাও না মনে জাগে, তাহলে সব মিথ্যা হয়ে যাবে। এজন্য সংসারে সামঞ্জস্য-বিধানের দিকে স্ত্রী-পুরুষ সকলের বিশেষ সচেতন হওয়া দরকার।

মসৃণ অঙ্গ

দেহখানিকে সুঠাম-সুন্দর করিয়া গড়িতে এবং দেহের সুছাঁদ রক্ষা করিতে যেমন ব্যায়ামের প্রয়োজন, তেমনি দেহের লাবণ্য এবং স্নিগ্ধ মসৃণতা রক্ষা করিতেও গাত্রচর্ম্মের ব্যায়াম প্রয়োজন। উদ্ভট শুনাইলেও কথাটা খুব সত্য।

আমাদের দেহের উপরে এই যে চর্ম্ম, এ চর্ম্ম শুধু দেহের আবরণ-আচ্ছাদন মাত্র নয়। এ-চর্ম্মে যে অজস্র লোমকূপ, সেগুলি দেহ-গেহের বাতায়ন। দেহের অভ্যন্তরপ্রদেশে নির্ম্মল আলো-বাতাস যাইবে, তাহারি জন্য বিধাতা এত অজস্র বাতায়ন তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন! এই লোমকূপ দিয়া দেহের ভিতরকার সর্ব্বপ্রকার দূষিত ক্লেদ, গ্লানি, বিষ যেমন অহরহ বাহির হইয়া যাইতেছে, তেমনি এই কূপ-পথে বাহিরের বাতাস এবং আলো গিয়া দেহাভ্যন্তর-ভাগকে নির্ম্মল ও সুস্থ-স্বচ্ছন্দ রাখিতেছে। এই আলো-বাতাস দেহাভ্যন্তরে আমাদের রক্তে গিয়া মেশে, রক্তকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখে—রক্তকে গ্লানি-মুক্ত করে। এজন্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন—আমাদের এই গাত্র-চর্ম্ম **excellent barometer of health—an excellent health-meter.**

কাজেই যে-চর্ম্মে বাতায়নরূপ অজস্র লোমকূপের অবস্থান, সে চর্ম্মকে সুস্থ রাখা চাই। সে জন্য বিশেষজ্ঞেরা গাত্র-চর্ম্মের ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। কড়া তোয়ালে বা ব্রাশ দিয়া আমাদের গা ঘষা-মাজা প্রয়োজন। ব্রাশ দিয়া ঘোড়ার ও পোষা

কুকুরের গা যেমন মার্জ্জনা করি, ঠিক তেমনি ভাবে। এই ঘর্ষণ অর্থাৎ ঘষা-মাজাকে বিশেষজ্ঞেরা বলেন, Friction exercises.

গাত্রচর্ম্মের ব্যায়াম করিলে খোশ, পাঁচড়া, ফোড়া, চুলকানি, দাদ, মায় আঁচিল-তিল—এ-সব উপসর্গ দেহে আশ্রয় লইতে পারিবে না। গাত্রচর্ম্মের ব্যায়াম-সম্বন্ধে অনেকের হুঁশ নাই। গায়ে একরাশ জামাজোড়া চাপাইয়া রাখিলে গায়ের চামড়া অস্বাস্থ্যের বিষে জর্জ্জরিত হয়। গায়ে রৌদ্র-বাতাস লাগানো চাই। জামা-জোড়া গায়ে চাপানো থাকিলেও গায়ে আলো-বাতাস লাগে। সে-লাগা ঐ জামাজোড়া ভেদ করিয়া। জামাজোড়াতেই এ আলো-বাতাসের নির্ম্মলতার অর্দ্ধেকের উপর ক্ষয় পায়—কাজেই সে আলো-বাতাসে সুফল যা লাভ হয়, তা একেবারে অতি যৎকিঞ্চিৎ! কতকগুলা জামাজোড়া গায়ে চাপাইয়া রাখিলে কে না অস্বস্তি বোধ করে? তার কারণ, দেহ চায় বাহিরের নির্ম্মল অনাবিল আলো-বাতাস—তা হাতে বঞ্চিত হইলেই অস্বস্তি ঘটে। এবং এ অস্বস্তি লাঘব করিবার জন্যই আমরা গায়ের ঠিক উপরে নরম ও হাল্কা কাপড়ের আচ্ছাদন দিই। অস্বস্তি অবশ্য তাহাতে কিছু কমে। নিত্য-স্নানে দেহের ক্লেদ পরিষ্কার হয়। তবে স্নানের পর কড়া তোয়ালে বা কড়া শুষ্ক গামছায় গাত্র মার্জ্জনা কর্ত্তব্য। বেশ জোরে-জোরে গাত্র মার্জ্জনা করিবেন।
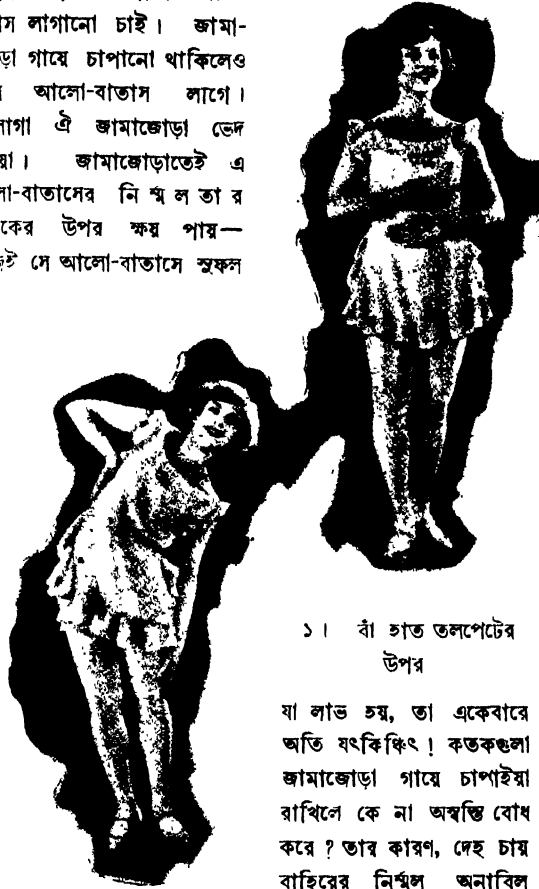
১। বাঁ হাত তলপেটের উপর

২। বাঁয়ে হেলিয়া

চামড়ার নীচে অনেকখানি রক্ত থাকে। এ রক্ত আবদ্ধ থাকিলে নানাবিধ চর্ম্মরোগ দেখা যায়। অসুখ হইলে স্নান বন্ধ থাকে; তখন চামড়া খশখশে হয়। সে সময় আঙুল দিয়া চামড়া ঘষিলে প্রচুর ময়লা বাহির হয়। ইহা হইতেই বুঝিবেন, দেহের মধ্যকার যত কিছু ক্লেদ-গ্লানি-বিষ ঐ চর্ম্মরন্ধ্র দিয়া নিত্য-নিয়ত বাহির হইতেছে। স্নান করিলে সে ময়লা ধুইয়া সাফ হইয়া যায়। স্নান না করিলে ঐ ক্লেদ-গ্লানি-বিষ চামড়ার উপরে জমিতে থাকে—লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায়। এ জন্য অসুখের সময়েও চিকিৎসকেরা গরম জলে স্পঞ্জিংয়ের ব্যবস্থা করেন। স্পঞ্জিংয়ের ফলে চামড়ায় সঞ্চিত ক্লেদ-গ্লানি সাফ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য মেলে, তেমনি রোগেরও অনেকখানি উপশম ঘটিতে দেখা যায়।

কালক্রমে আচার-রীতিতে পরিবর্ত্তন ঘটে। সে পরিবর্ত্তনে অনেক সময়ে স্বাস্থ্যহানি এবং দেহ-বিকৃতি লাভ হয়! আমাদের দেশেই কিছু কাল পূর্ব্বে মেয়েদের বেশে এতখানি আঁটসাঁট-বাঁধনের বাহুল্য ছিল না। আজ সভ্যতার যুগে ফ্যাশনের খাতিরে বডিস্, টাইট্ বডি-সেমিজ প্রভৃতির বন্ধন অনিবার্য্য হইয়াছে। সভ্যতার খাতিরে আগেকার সে ঢিলাঢালা বা লজ্জা-নিবারণ-উপযোগী অল্প-স্বল্প আবরণের রেওয়াজ হয়তো সম্ভব নয়—কাজেই গায়ের চামড়ার ব্যায়াম সম্বন্ধে নিয়মিত বিধি পালন করা কর্ত্তব্য, এ ব্যায়াম-সাধনায় গায়ের চামড়া থাকিবে মসৃণ-চিক্কণ এবং ললিত লাবণ্যে দীপ্ত সমুজ্জ্বল।
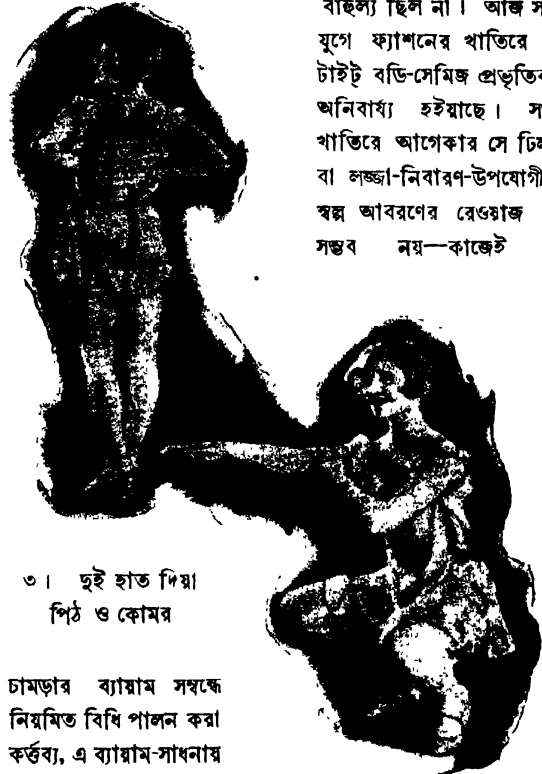
৩। দুই হাত দিয়া পিঠ ও কোমর

৪। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া

লজ্জা-নিবারণ এবং শালীনতা রক্ষার জন্য অঙ্গে বস্ত্রাবরণ রাখিতেই হইবে; তবে বাহুল্য বর্জ্জনীয়—বিশেষ বর্ত্তমান সময়ে! পোষাক-পরিচ্ছদের অতিরিক্ত চাপে গাত্র-চর্ম্মে শুষ্কতা, রুক্ষতা এবং অঙ্গের গঠনে বিকৃতি ঘটিবেই। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—চর্ম্ম-ব্যায়াম-সাধনায় দেহ চর্ম্মরোগ-প্রতিরোধে সমর্থ হইবে—সর্দ্দি কাসি জ্বরের ভয়ও একেবারে তিরোহিত হইবে।

এবার চর্ম্ম-ব্যায়াম-সাধনার কথা বলিতেছি।

১। পিছন দিকে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়ান। দুই হাত রাখুন ১ নং ছবির ভঙ্গীতে—বাঁ হাত তলপেটের উপর, ডান হাত পেটের উপর। এবার তলপেট হইতে সুরু করিয়া বুকের উপর দিয়া গলা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ দুই হাতে ঘষিয়া ঘষিয়া মর্দ্দন করুন। তলপেট হইতে হাত যখন উপর-অঙ্গে উঠিবে, তখন নিশ্বাস গ্রহণ

করিবেন ; তার পর এক-মুহূর্ত্তও বিরাম না দিয়া গলা হইতে তলপেট পর্য্যন্ত এমনি ঘর্ষণ করিতে করিতে হাত নামিবে। হাত যখন নামিবে, তখন আর পিছনে হেলা নয়, সিধা-খাড়া দাঁড়াইবেন এবং এই সময়ে শ্বাস ত্যাগ করিবেন। তলপেট হইতে গলা পর্য্যন্ত ; পরক্ষণেই বিরামহীন ভাবে গলা হইতে তলপেট পর্য্যন্ত হাত দিয়া ক্রমান্বয়ে ঘর্ষণ-মর্দ্দন—এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃ ষোল-বার।

২। এবার ২ নং ছবির ভঙ্গীতে ডান হাত দিয়া ডান কোমর হইতে ডান গলা পর্য্যন্ত,
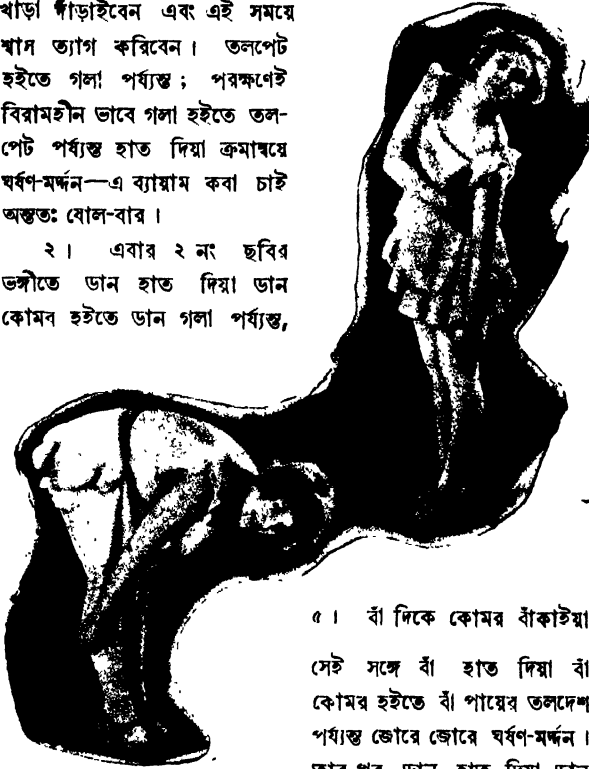
৫। বাঁ দিকে কোমর বাঁকাইয়া

৬। দুই পায়ের গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত

সেই সঙ্গে বাঁ হাত দিয়া বাঁ কোমর হইতে বাঁ পায়ের তলদেশ পর্য্যন্ত জোরে জোরে ঘর্ষণ-মর্দ্দন। তার পর ডান হাত দিয়া ডান কোমর হইতে ডান পায়ের তলদেশ এবং বাঁ হাত দিয়া বাঁ গলা পর্য্যন্ত ঘর্ষণ। এ ব্যায়াম ক্রমপর্য্যায়ে করিবেন ষোল-বার। জোরে জোরে ঘর্ষণ মানে অবশ্য এমন জোর নয়, যাহাতে গায়ের লোম ছিঁড়িয়া যায় বা হাতে-পায়ে-গায়ে জ্বালা ধরে, এ কথা মনে রাখিবেন।

৩। ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত দিয়া পিঠ ও কোমর—হাতে পিঠের যতখানি নাগাল পান—ঘর্ষণ-মর্দ্দন। পাঁচ মিনিট।

৪। ৪ নং ছবির ভঙ্গীতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ডান হাত প্রসারিত করিয়া বাঁ হাত দিয়া ডান হাত ঘর্ষণ—তার পর বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া ডান হাত দিয়া ঘর্ষণ। পাঁচ মিনিট।

৫। এবার বাঁ দিকে কোমর ঈষৎ বাঁকাইয়া বাঁ হাত হাঁটুর উপরে ডান হাত বাঁ-কোমরে—বাঁ হাত হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত লম্বালম্বিভাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তলপেটের উপর সরাসরি (৫ নং ছবি দেখুন)। পরক্ষণে ডান দিকে কোমর বাঁকাইয়া ডান হাতে ডান হাঁটু হইতে কোমর এবং বাঁ হাতে ডান দিক্ হইতে বাঁয়ে তলপেট পর্য্যন্ত ঘর্ষণ-মর্দ্দন। এ ব্যায়াম অন্ততঃপক্ষে পাঁচ মিনিট করা চাই।

৬। ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া দুই হাত দিয়া দুই পায়ের গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত মর্দ্দন—তার পর খাড়া দাঁড়াইয়া কোমর হইতে জঘনদেশের উপর দিয়া কোমরের পিছন-দিক্ পর্য্যন্ত—পরক্ষণে বাঁ দিককার কোমর হইতে দু'হাত নামিবে হাঁটু হইয়া দু'পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত। হাঁটু হইতে গোড়ালি এবং গোড়ালি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত মর্দ্দন-কালে ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে নুইতে হইবে। নুইবার সময় শ্বাসগ্রহণ—তার পর হাঁটু হইতে কোমর পর্য্যন্ত মর্দ্দন-কালে খাড়া দাঁড়ানো এবং শ্বাস ত্যাগ। এ ব্যায়াম করা চাই—পাঁচ মিনিট।

নিত্য নিয়মিত এ ব্যায়ামে গায়ের চামড়া থাকিবে নবনী-কোমল দীপ্তোজ্জ্বল এবং সুস্থ ; সেই সঙ্গে দেহে মেদ জমিবে না—এবং দেহের গড়ন যৌবন-সুকুমার থাকিবে।

চাওয়া-পাওয়া

আমি চাই না তুমি নিশিদিনই কাছে থাকো !
দু'টি বাহুর মালা দিয়ে আমায় ঘিরে রাখো !
থাকো আমার আঁখির আগে
বুকে রাখো অনুরাগে—
সকল ছেড়ে আমারি হও—
এমন আমি চাহি না কো !

• •

আঁধার যদি নামে কভু নিখিল ঘিরে,
আঁখি যদি তোমায় খুঁজে না পায় ফিরে—
আছি একই আকাশ-তলে
একই বাতাস বয়ে চলে
পরশ করি দোঁহার শিরে—যদি জানি—
তোমায় পাওয়ার বাকী কি আর ? ধন্য মানি !

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা

কবির প্রতি

কত যুগ কত বর্ষ ধীরে ধীরে চলে যাবে কবি,
তব জীবনের ছিন্ন পৃষ্ঠাগুলি আর ছিন্ন ছবি
অবান্তর পরিচয়—একে একে পড়িবে ঝরিয়া,
শুধু রবে কাব্য-গীতি কল্প-বীথি ভুবন ভরিয়া !
বিরহে-মিলনে-ত্যাগে জীবনের উপলব্ধি যত
জীবন-বিচ্ছেদ-শোকে সেই কাব্য সেই গীতি শত
কণ্ঠে কণ্ঠে মুখরিত হবে কত বসন্তে শরতে
বর্ষার বিজন রাত্রে। হৃদয়ের পরতে-পরতে
মূর্চ্ছনা তুলিবে গোষ্ঠ-গৃহে নদী-তটে সন্ধ্যাতারা,
যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস, সাড়া পাবে পথহারা
অমৃত-সঙ্গীতে তব। কেন বন্ধু ভগ্ন-মনোরথ ?
ঈর্ষা-সিন্ধু-বক্ষে হের জাগে তব জয়যাত্রা-পথ।
অশ্রু যেথা রচিতেছে মানবের দুঃখ-ইতিহাস
অন্তরের গানখানি সেথা তুমি করো গো প্রকাশ।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

১৩

সেদিন পঞ্চমী। সন্ধ্যার সময় জ্যোৎস্নার খানিকটা আলো ফুটিয়াছে, সে-জ্যোৎস্নায় মণিময়ের সঙ্গে বাড়ীর লনে বেঞ্চে বসিয়া দিলীপ কল-কারখানার প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিল। কি করিয়া প্রথম অগ্নি-বাষ্পের শক্তি আবিষ্কার হইল এবং সে-শক্তিকে মানুষ নিজের কাজে লাগাইল ; তার পর ঐ বিদ্যুতের শক্তি···

মণিময় একাগ্র মনে শুনিতেছিল। তার মানস-নয়নের সামনে মৃদু জ্যোৎস্নার আলোয় ফুটিতেছিল এই পৃথিবী···যেন বিরাট্ এক কর্মশালা···মানুষের জ্ঞান-তপঃসাধনায় তুষ্ট হইয়া নিসর্গ আসিয়া মানুষের হাত ধরিয়া তার সঙ্গে কাজে নামিয়াছে!···

এ-আলোচনার মধ্যে হঠাৎ মণিময় বলিল,—মাষ্টার মশাই···

দিলু বলিল,—কেন ?

মণিময় বলিল,—চমৎকার লাগছে আপনার কথা। রূপকথার চেয়েও চমৎকার! আচ্ছা, এত সব চমৎকার আর সত্যি কথা না লিখে ছেলেদের জন্য ঐ সব আজগুবি থ্রিলার গল্প এঁরা কেন লেখেন বলতে পারেন ?

দিলু বলিল,—তার কারণ আজগুবি গল্প লেখা সহজ! ওতে ভাবনা-চিন্তার কিছু নেই! যা মনে আসে, লিখে গেলেই হলো! বিজ্ঞানের কথা লিখতে গেলে লেখককে ভালো করে বিজ্ঞান বুঝতে হবে। বুঝে সে সব কথা গুছিয়ে লিখতে অনেকখানি শক্তির দরকার। ছোটদের জন্য এই সব আজগুবি গল্প যাঁরা লেখেন, তাঁদের সে শক্তির অভাব!

মণিময় কি ভাবিল, তার পর বলিল,—কলকাতার ক'জন পাবলিশারকে বাবার অর্ডার দেওয়া আছে, ছোটদের জন্য নতুন বই বেরুলেই আমাকে তারা সে বই পাঠাবে। কাল আমি তাদের চিঠি লিখে বারণ করে দেবো, এ সব বই যেন আর না পাঠায়! ···বিজ্ঞানের খানকতক বই আপনি আমাকে আনিয়ে দেবেন মাষ্টার মশাই? পড়ে বুঝতে পারি, এমন সহজ বই ?

দিলু বলিল,—দেবো আনিয়ে। তেমন বাঙলা বই পাবো না, তবে ইংরেজীতে অনেক ভালো-ভালো বই আছে···পড়ে বুঝতে পারবে, এমনি সহজ করে বিজ্ঞানের কথা সে-সব বইয়ে লেখা আছে।

জোগু ভৃত্য আসিয়া বলিল, কর্ত্তাবাবু দু'জনকে ডাকিতেছেন।

দিলু বলিল,—আমাকেও ডাকছেন ?

জোগু বলিল,—হ্যাঁ।

—এসো মণি।

দু'জনে বিলম্ব করিল না, তখনি জানকী বাবুর কাছে আসিল। জানকী বাবু বসিয়াছিলেন তাঁর ঘরে···একা। সামনে টেবিলের উপর একরাশ মোটা খাতা। একখানা খাতা খুলিয়া তারি একটা পাতায় তিনি নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন।

মণিময় ডাকিল,—বাবা···

জানকী বাবু চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

মণিময় বলিল—আমাদের ডেকেছো বাবা ?

জানকী বাবু বলিলেন,—হ্যাঁ···বসো দু'জনে।

দিলু আর মণিময়···দু'খানা চেয়ারে পাশাপাশি দু'জনে বসিল ···জানকী বাবুর সামনে।

মণিময় বলিল—বিজ্ঞানের কি চমৎকার কথা বলছিলেন মাষ্টার মশাই! আমি একেবারে জলের মতো সব বুঝতে পারছিলুম! আচ্ছা, তুমি বলো তো বাবা, ঘুমোবার সময় আমরা চোখ বুজি কেন ? চোখ না বুজলে আমরা ঘুমোতে পারি না কেন ?

চুপ করিয়া সাগ্রহে সোৎসুক নয়নে মণিময় চাহিয়া রহিল জানকী বাবুর পানে। জানকী বাবুর মুখে হাসির দীপ্তি! তিনি চাহিলেন মণিময়ের পানে, বলিলেন—কেন চোখ বুজি ?

কথাটা বলিয়া তিনি চাহিলেন দিলীপের পানে···মণিময় তাহা লক্ষ্য করিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—না মাষ্টার মশাই, আপনি বাবাকে বলে দেবেন না। তুমি বলো বাবা···তোমাকে বলতে হবে।

সহাস্যে জানকী বাবু বলিলেন—অনেক জিনিষই জানি মণি··· কিন্তু রোজ চোখ বুজে ঘুমোচ্ছি···সেই কোন্ ছেলেবেলা থেকে ; কখনো এর ব্যতিক্রম হলো না···অথচ ঘুমোবার সময় চোখ খুলে না রেখে আমরা চোখ বুজি কেন, তা জানি না।···আচ্ছা, তুমিই বলো ···তোমার কাছ থেকে শুনে আমি শিখি।

বাপের কথায় মণিময়ের আনন্দ যেন ধরে না! উৎফুল্ল কণ্ঠে সে বলিল,—জানো, আমাদের যে এই চোখের পাতা···যখন জেগে থাকি, তখন এই চোখের পাতা খুলে রাখবার জন্য আমাদের রীতিমত চেষ্টা করতে হয়! আমরা ক্লান্ত হলে তবেই তো ঘুম পায়! কাজেই সে-ক্লান্তি হবার জন্য চোখের পাতা খুলে রাখবার সামর্থ্য আমাদের থাকে না···ক্লান্তির জন্য সর্ব্বশরীর ঝিমিয়ে আসে, চোখের পাতাও ক্লান্তিতে বুজে আসে। এ ছাড়া আরো কারণ আছে···তার সবটুকু বোঝা হয়নি। তুমি ডাকলে, তাই চলে এলুম।

জানকী বাবু শুনিয়া খুশী হইলেন। ছেলেবেলায় মাথায় সেই আঘাত লাগিবার ফলে তাঁর একটিমাত্র ছেলে মণিময়ের বুদ্ধিতে যে জড়তার আবেশ, বহু চিকিৎসাতেও সে জড়তা সারিল না! ছেলে মূর্খ হইয়া থাকিবে, এ দুঃখ তাঁর মনে কাঁটার মতো বিঁধিয়া আছে চিরদিন! দেখিয়া শুনিয়া কত মাষ্টার রাখিলেন! বই খুলিয়া পড়াইয়া যতটুকু শিখানো যায়, শিক্ষা দাও—তার পর পৃথিবীর সর্ব্ববিষয়ে কথা কহিয়া গল্প করিয়া ছেলেকে শুনাও—সেই সব কথা ও গল্প শুনিয়া ছেলের জ্ঞান জন্মিবে! তা কোনো মাষ্টার-মশাই-ই ছেলের মনে জ্ঞানের প্রদীপ তেমন করিয়া জ্বালিতে পারিল না!

দৈবাৎ অবশেষে ছেলের মুখে সেদিন দিলীপের সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা···দিলীপকে দিয়া তাই আর একবার চেষ্টা! সে চেষ্টা এই অল্প-দিনে এতখানি সার্থক হইয়াছে!

দিলীপের উপর অনেকখানি প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন—খুব খুশী হয়েছি দিলীপ। মণি যে এত-বড় কথা বুঝেছে আর বুঝে আমাকে বোঝাতে পেরেছে, এ থেকে বুঝছি, তুমি শুধু পড়াশুনা করো না, যা পড়ো, তা একেবারে মজ্জাগত করো···করে' সে-জ্ঞান অপরকে দিতে পারো! এ ক্ষমতা সামান্য নয়! আমাদের মাষ্টার

মশাইদের মধ্যে জ্ঞানকে অনেকে চান মাথার মধ্যে ঠেশে দিতে; মনের মধ্যে গুঁজে দিতে জানেন না। তাই আমাদের পাশ-করা সমাজে আসল জ্ঞান দেখি এত কম! এর রিওয়ার্ড দরকার···এ্যাপ্রিসিয়েশন···সামনের মাস থেকে মণিময়ের শিক্ষা-হিসাবে বখশিস নয়, একশো টাকা করে তুমি পাবে···দক্ষিণা!

দিলীপ যেন আকাশ হইতে পড়িল···এমনি বিস্ময়ে সে একেবারে অভিভূত!···নিমেষে সে ভাব সম্বৃত করিয়া দিলু বলিল—কিন্তু এ একশো টাকার প্রত্যাশা আমি করিনি! যা আমাকে দিচ্ছেন···

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন—সব ব্যাপারে দর-কষাকষি করে আমাদের মস্ত একটা দোষ জন্মেছে এই যে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষার দাম নিয়ে আমরা কষাকষি করি···করে' কত সস্তায় মাষ্টার পাবো সেই চেষ্টা করি! তার ফলে সস্তার হয় তিন অবস্থা! অর্থাৎ ভালো লোক পেলেও সে ভালো লোক দাম বুঝে বিদ্যা দান করেন। টাকায় যেখানে পাঁচপোয়া বিদ্যা দরকার, সেখানে কৃপণতা করে আমি যদি আট আনা দি, মাষ্টার মশাইরাও তাহলে পাঁচপোয়া না দিয়ে বিদ্যা দেবেন আড়াই-পোয়া ওজনের!

কথার শেষে জানকী বাবু উচ্চহাস্য করিলেন। তার পর বলিলেন—হ্যাঁ। ডেকেছি কেন, বলি।···আমার একবার সখ হয়েছিল, আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নিজের যেটুকু অভিজ্ঞতা, সে কথা সহজ করে লিখবো। ব্যবসাক্ষেত্রে যাঁরা নামতে চান, সে লেখা পড়ে তাঁরা সমৃদ্ধি লাভ না করলেও অনর্থক লোকসান না ভোগ করেন, এইটুকু সাহায্য তাঁদের হবে। তা বইখানি আমি লিখেছি···ইংরেজীতে···লিখে শেষ করেছি। ছ'-তিনবার ছাপাতে দেবো ভেবে লেখা উল্টে দেখতে আমি কুণ্ঠিত হয়েছি শুধু এই ভেবে যে, বাঙালী হয়ে বাঙলা ভাষায় বই না লিখে ইংরেজীতে লিখলুম···ইংরেজী-জানা সমাজ আমার ইংরেজীর ভুল ধরে তামাসা না করে শেষে! তোমাকে পেয়ে তাই আমি ভাবছি, তোমায় দিয়ে একবার সে-লেখা দেখিয়ে নিই!···আমাদের ইংরেজী হলো সেকালের শেখা। ইডিয়ম, ষ্টাইল সব সেকেলে রকম। তোমার হাত দিয়ে এটা আগাগোড়া আমি রিভাইশ করাতে চাই। অবশ্য তার জন্য···

তাঁর কথা শেষ হইল না। বাধা দিয়া সলজ্জ কম্পিত ভাষে দিলু বলিল—কিন্তু আমার সামর্থ্য···

জানকী বাবু বলিলেন—সে সামর্থ্যের বিচার আমি করেছি দিলীপ। আমেরিকার ইঙ্গার্শল কোম্পানির সঙ্গে আমাদের সেই যে গোলযোগ ঘটেছিল, তার সমাধানের জন্য আমার কথামতো তুমি চিঠি ড্রাফ্‌ট করেছিলে! সেই ড্রাফ্‌ট দেখে বুঝতে আমার দেরী হয়নি যে, তোমার মধ্যে জ্ঞানের যে আগুন, সে সামান্য স্ফুলিঙ্গ মাত্র নয়!

জানকী বাবুর মুখে এতখানি প্রশংসা! গৌরবে দিলীপের মন একেবারে ভরিয়া উঠিল! মনে হইল, যদি উপায় থাকিত, এখনি ছুটিয়া গিয়া মার কাছে এ গৌরব-আনন্দ নিবেদন করিত! এ কথা শুনিলে মার মনে কতখানি আনন্দ হইবে! আহা, দুঃখিনী মা! তিনটি ছেলের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া বাঁচিয়া আছেন! ছেলে তিনটি মানুষ হইবে, দশের সভায় তারা আসন পাইবে—ইহা ভিন্ন মায়ের মনে অন্য কামনা নাই! মনে পড়িল বাপ মহেন্দ্রর কথা···সে বাপ আজ কোথায়!

জানকী বাবু বলিলেন—সমস্যা এই, এ কাজ কখন তুমি করবে।

দিলীপ কোনো জবাব দিল না···নিরুত্তরে রহিল। বুকের মধ্যে যা হইতেছিল···বুঝি, ইহাকেই কবিরা বলেন পুলকের প্লাবন!

মণিময় বলিল—কেন, ফ্যাক্টরির কাজে ওঁকে ছুটী দাও!

জানকী বাবু বলিলেন—সে-কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি হতে পারে দিলীপ! কেন না, প্রথম দিনে তুমি যে কথা আমায় বলেছো···সেই···ফ্যাক্টরিতে থেকেও কেন বড় হওয়া যাবে না? তোমার সে-কথা আমি ভুলিনি দিলীপ! খুব বড় কথা! জজের আসনে বসতে পেয়েও অনেক জজ যে সে-আসনকে ছোট করে, কলঙ্কিত করে! আসনে গৌরব নেই—গৌরব মানুষের মধ্যে। যে-ফ্যাক্টরির ভোলা কালু আবদুল ছিদাম টম্ জ্যাক্ কাজে ফাঁকি দেয়, নেশা করে,—সেই ফ্যাক্টরিতে কাজ করে ইংলণ্ডে-আমেরিকায় কত স্তর ব্যারণ দিকপালের সৃষ্টি হচ্ছে!

মণিময় বলিল—আমাদের দেশেও স্তর আর এন্ মুখার্জ্জি···

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন—ঠিক কথা। স্তর আর এন তোমার আদর্শ হোন্ দিলীপ! তুমিও এক দিন ফ্যাক্টরিকে গৌরবান্বিত করবে!···কিন্তু সে কথা যাক্! এখন আমি ভাবছি, এ-লেখা কখন তুমি পড়বে বলো তো? আমার অবশ্য খুব তাড়া নেই···আস্তে আস্তে এ কাজ করলেও চলবে।

দিলীপ এবার মুখ তুলিল, মুখ তুলিয়া বলিল—রাত্রে আমি লেখাপড়া করি, সে সময় অনায়াসে আপনার লেখা পড়তে পারবো! আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা···ও-লেখা পড়বার জন্য আমার খুব আগ্রহ···পড়লে নিজে কতখানি শিক্ষা পাবো! ও-লেখা দেখতে আমার দেরী হবে না।

সেই রাত্রেই দিলুর হাতে জানকী বাবু তাঁর লেখা মোটা ছ'খানি খাতা দিলেন। খাতা লইয়া দিলু বাড়ী আসিল। খাতায় লেখা নয়, যেন সে বিজয়-লক্ষ্মীর আহ্বান পাইয়াছে!

১৪

জানকী বাবুর শরীর এখন ভালো আছে। কাজে-কর্ম্মে তিনি পরিপূর্ণ মনোযোগ অর্পণ করিলেন। নানা ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষদের অকস্মাৎ এখন অফিস-কামরায় তলব হয়। তাঁদের বলেন কাজ-কর্ম্ম, খাতা-পত্র বুঝাইয়া দিতে! দেখিতে চান, অধ্যক্ষেরা হাজিরামাত্র দিয়া মাহিনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, না, অধীনস্থ লোক-জনের কাজ-কর্ম্ম মন দিয়া দেখিতেছেন; এবং সে-কাজ তাঁরা বোঝেন!

সেদিন ডাক পড়িল পিনাকীর। কেতা-দুরস্ত সাহেবী পোষাক-আঁটা পিনাকী আসিয়া দাঁড়াইল জানকী বাবুর ঘরে।

জানকী বাবুর সামনে টেবিলের উপর খোলা খাতা। সেই খাতায় একটা অঙ্ক দেখাইয়া জানকী বাবু প্রশ্ন করিলেন—এটা পড়ো তো পিনাকী!

পিনাকীর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! তখনি নিজেকে সামলাইয়া ঝুঁকিয়া খাতার অঙ্ক দেখিল,—লেখা আছে চার হাজার সাতশো পঁচাত্তর টাকা বারো আনা ন' পাই।

মুখে এ-অঙ্ক সে উচ্চারণ করিয়া পড়িল।

জানকী বাবু বলিলেন,—বেশ, এ টাকাটা দেওয়া হয়েছে কাকে?

খাতায় নাম লেখা ছিল। দেখিয়া পিনাকী পড়িল,—হ্যামার্টন ষ্টীল ওয়ার্কস্ গ্লাসগো।

জানকী বাবু বলিলেন,—এ টাকা কিসের জন্য দেওয়া হয়েছে?

পিনাকীর বুকের মধ্যে কে যেন কামান দাগিল! সে বলিল,—আজ্ঞে, এ্যাকাউন্টান্ট রামহরি বাবুকে জিজ্ঞাসা করে এসে বলছি এখনি।

জানকী বাবু বলিলেন,—না, না! তাঁকে তো আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি। তা নয়। তুমি বলো···তুমি এ্যাসিষ্টান্ট-ম্যানেজার হয়ে কাজ কি দেখছো···অফিসের কোথায় কি হচ্ছে, এ সব খপর তোমার জানা উচিত!

পিনাকীর মুখে কথা নাই! সে নিরুত্তর।

জানকী বাবু বলিলেন,—কাজ যদি না দেখবে, তাহলে শিখবে কি করে? তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো···কোথা থেকে ছোট বোল্ট্ আসছে, স্ক্রু আসছে, তাদের কোন্‌টা ভালো···কোন্‌টার কত দাম পড়ছে···সব তিনি বলে দেবেন! কোন্ জিনিষের কোথায় কি দরকার, কতটা দরকার···তাও তিনি বলে দিতে পারেন। এই যে ফী-মেলে বিলিতী-ডাকে সেখানকার দর-দামের রিপোর্ট আসছে···সে রিপোর্ট দ্যাখো?

পিনাকী কোন কালে দেখে না! দেখিবার প্রয়োজন মনে করে না। সে জানে এখানকার ম্যানেজার অর্থাৎ সর্ব্বময় কর্ত্তা বাপ কামাখ্যা চাটার্জ্জী···পিনাকী সেই কামাখ্যা চাটার্জ্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র! নিজেকে এ-রাজ্যে সে দেখে যেন প্রিন্স-অফ-ওয়েলস্! অফিসে আসে মাসিক এ্যালাউয়্যান্স মাসের শেষে হস্তগত হইবে, সেই লোভে! সাজিয়া আসে, তার কারণ আর সকলের চেয়ে তার পোজিশন যে অনেক উঁচুতে তাহা বুঝাইতে! সে কি কাহারো সঙ্গে মেশে এখানে? মিশিবে কি করিয়া? সে ম্যানেজারের ছেলে—আর উহারা তুচ্ছ শ্রমিক-শিল্পী কেরাণী কুলি বৈ নয়!···তার উপর জানে, পরে সে ম্যানেজার বা বড় সাহেব হইবে! তার কাজ শুধু সাজিয়া অফিসে আসিয়া নিজেকে জাহির করা, ঘন্টা টিপিয়া বেয়ারা ডাকা, এবং সকলের উপর হুকুম চালানো!···

পিনাকীর মুখে কথা নাই! কি কথা বলিবে? অফিসের বাবুদের ডাকিয়া জানকী বাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা পড়া করেন,—এ সংবাদ পিনাকীর অজানা নয়। উহারা ম্যানেজারের ছেলে নয়, উহাদের দেখিবেন বৈ কি! তাই বলিয়া তাহাকেও এমনি ভাবে পরীক্ষা দিতে হইবে, এ কল্পনা পিনাকীর মনে কোনো দিন উদয় হয় নাই!

তাকে নিরুত্তর দেখিয়া জানকী বাবু বলিলেন—তুমি জানো না। এ-সব না জানলে চলবে কেন পিনাকী? এক দিন ম্যানেজার যে এত বড় কারবার তোমাকেই যদি চালাতে হয়? নিজে না দেখে না জেনে তোমার আণ্ডারে যারা কাজ করে, তাদের কথার উপর যদি নির্ভর করো, তাহলে তাদের হাতে তোমাকে পুতুল বনে' থাকতে হবে! দিস্ ওন্ট ডু, মাই বয়। তুমি যাও, আজ থেকে খাতাপত্র দেখে শেখবার চেষ্টা করবে।

পিনাকী তাড়াতাড়ি বলিল—আজ্ঞে হাঁা, আপনি যেমন বলছেন, কাল থেকে তাই হবে। ভবিষ্যতে আর এমন হবে না!

জানকী বাবু বলিলেন—হাঁা···এই আমি চাই!···

পিনাকী চলিয়া যাইতেছিল, জানকী বাবু বলিলেন—একটা ···

পিনাকী দাঁড়াইল। জানকী বাবু বলিলেন,—বাইরের একটা অফিসের ভার আমাদের হাতে আসছে। সেখানে এক জন ম্যানেজার পাঠাতে হবে···আমাদের নিজের লোক! তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে এর মধ্যে তোমাকে সে-কাজে যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে, পিনাকী!···তোমার বাবা এ-কথা জানেন। তাঁকে আমি বলেছি, বাহিরের সে-অফিসের জন্য যোগ্য লোক চাই। তাতে তিনি তোমার কথা বলেছেন। সেই জন্য তোমাকে আমি ডেকেছিলুম···শুধু দেখতে ইফ ইউ কুড ম্যানেজ দেয়ার!···কিন্তু যা দেখলুম···

কথাটা শেষ না করিয়া জানকী বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। পিনাকীর বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

জানকী বাবু বলিলেন—এখনো মাসখানেক সময় আছে। এর মধ্যে নিজেকে তৈরী করে নাও।

পিনাকী বলিল—আজ্ঞে হাঁ, নিজেকে তৈরী করে নেবো।

—হুঁ···

পিনাকী চলিয়া গেল···জানকী বাবু ডাকিলেন—মুরারি···

মুরারি আসিল।

জানকী বাবু বলিলেন—নাম লেখা স্লিপ পাঠিয়েছে···কে দেবীদাস ভটচায্যি···বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে নিয়ে আয়।

মুরারি চলিয়া গেল। এবং পাঁচ মিনিট পরে ফিরিল; তার সঙ্গে নিরীহ-গোছ এক জন বাঙালী ভদ্রলোক।

জানকী বাবু বলিলেন—আপনার নাম দেবীদাস ভট্টাচায্যি?

ভদ্রলোক কহিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি চাই আপনার?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমি কলকাতা থেকে আসছি। মানে, এখানকার সুপ্রসন্ন বাবু···তাঁরি শ্বশুরবাড়ী থেকে। তাঁরা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। সুপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধী সত্যবান বাবু···সাব-জজ···তাঁর সম্বন্ধীর একটি ছেলে আছে। বিলেত থেকে মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছে। ছেলের বাপ মস্ত বড় কনট্রাক্টর···পি-ডব্লু-ডীর সব কাজ তাঁর একেবারে বাঁধা। বাপের নাম জগদীশ রায়। ছেলের নাম অমরেশ। অমরেশের জন্য ওঁরা পাত্রী খুঁজছেন। আপনার কাছে তাই ওঁরা আমাকে পাঠালেন,—আপনার যদি পছন্দ হয়···অর্থাৎ আপনার কন্যার সঙ্গে···

জানকী বাবু বলিলেন—আপনি ঘটক?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

জানকী বাবু বলিলেন—আমার মেয়ে আছে এবং তার জন্য পাত্রও খুঁজছি। তবে বিলেত-ফেরত মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার? সাহেব-মানুষকে কেমন ভয় করে, ঘটক মশাই! জীবনে অভিজ্ঞতা তো বড় অল্প হলো না!···আপনার বয়স বেশী নয়···আমাদের মতো প্রবীণ লোকের অভিজ্ঞতার কথায় আপনারা বোধ হয় হাসবেন! আপনাদের বয়সে আমরাও হাসতুম!···কিন্তু দেখছি, হাসা অন্যায় হয়েছিল। অভিজ্ঞতার দাম সামান্য দাম নয়! কালে মানুষের রুচির অদল-বদল হতে পারে, কিন্তু মানব-চরিত্র কখনো বদল হতে দেখলুম না!

ঘটক-ভদ্রলোক এ-কথার মর্ম্ম বুঝিলেন না, তার কি জবাব দিবেন! জানকী বাবুর মন রাখিতে তিনি শুধু মৃদু হাস্য করিলেন।

জানকী বাবু বলিলেন—এ-ছেলেটির বয়স?

—আজ্ঞে, সাতাশ বছর।

মশাইদের মধ্যে জ্ঞানকে অনেকে চান মাথার মধ্যে ঠেশে দিতে; মনের মধ্যে গুঁজে দিতে জানেন না। তাই আমাদের পাশ-করা সমাজে আসল জ্ঞান দেখি এত কম! এর রিওয়াড দরকার··· এ্যাপ্রিসিয়েশন···সামনের মাস থেকে মণিময়ের শিক্ষা-হিসাবে বখশিস নয়, একশো টাকা করে তুমি পাবে···দক্ষিণা!

দিলীপ যেন আকাশ হইতে পড়িল···এমনি বিস্ময়ে সে একেবারে অভিভূত!···নিমেষে সে ভাব সম্বৃত করিয়া দিলু বলিল—কিন্তু এ একশো টাকার প্রত্যাশা আমি করিনি! যা আমাকে দিচ্ছেন···

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন—সব ব্যাপারে দর-কষাকষি করে আমাদের মস্ত একটা দোষ জন্মেছে এই যে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদের শিক্ষার দাম নিয়ে আমরা কষাকষি করি···করে' কত সস্তায় মাষ্টার পাবো সেই চেষ্টা করি! তার ফলে সস্তার হয় তিন অবস্থা! অর্থাৎ ভালো লোক পেলেও সে ভালো লোক দাম বুঝে বিদ্যা দান করেন। টাকায় যেখানে পাঁচপোয়া বিদ্যা দরকার, সেখানে কৃপণতা করে আমি যদি আট আনা দি, মাষ্টার মশাইরাও তাহলে পাঁচপোয়া না দিয়ে বিদ্যা দেবেন আড়াই-পোয়া ওজনের!

কথার শেষে জানকী বাবু উচ্চহাস্য করিলেন। তার পর বলিলেন—হ্যাঁ। ডেকেছি কেন, বলি।···আমার একবার সখ হয়েছিল, আমাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে নিজের যেটুকু অভিজ্ঞতা, সে কথা সহজ করে লিখবো। ব্যবসাক্ষেত্রে যাঁরা নামতে চান, সে লেখা পড়ে তাঁরা সমৃদ্ধি লাভ না করলেও অনর্থক লোকসান না ভোগ করেন, এইটুকু সাহায্য তাঁদের হবে। তা বইখানি আমি লিখেছি···ইংরেজীতে···লিখে শেষ করেছি। দু'-তিনবার ছাপাতে দেবো ভেবে লেখা উল্টে দেখতে আমি কুণ্ঠিত হয়েছি শুধু এই ভেবে যে, বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষায় বই না লিখে ইংরেজীতে লিখলুম··· ইংরেজী-জানা সমাজ আমার ইংরেজীর ভুল ধরে তামাসা না করে শেষে! তোমাকে পেয়ে তাই আমি ভাবছি, তোমায় দিয়ে একবার সে-লেখা দেখিয়ে নিই!···আমাদের ইংরেজী হলো সেকালের শেখা। ইডিয়ম, ষ্টাইল সব সেকেলে রকম। তোমার হাত দিয়ে এটা আগাগোড়া আমি রিভাইশ করাতে চাই। অবশ্য তার জন্য···

তাঁর কথা শেষ হইল না। বাধা দিয়া সলজ্জ কম্পিত ভাবে দিলু বলিল—কিন্তু আমার সামর্থ্য···

জানকী বাবু বলিলেন—সে সামর্থ্যের বিচার আমি করেছি দিলীপ। আমেরিকার ইঙ্গার্শল কোম্পানির সঙ্গে আমাদের সেই যে গোলযোগ ঘটেছিল, তার সমাধানের জন্য আমার কথামতো তুমি চিঠি ড্রাফ্‌ট করেছিলে! সেই ড্রাফ্‌ট দেখে বুঝতে আমার দেরী হয়নি যে, তোমার মধ্যে জ্ঞানের যে আগুন, সে সামান্য স্ফুলিঙ্গ মাত্র নয়!

জানকী বাবুর মুখে এতখানি প্রশংসা! গৌরবে দিলীপের মন একেবারে ভরিয়া উঠিল! মনে হইল, যদি উপায় থাকিত, এখনি ছুটিয়া গিয়া মার কাছে এ গৌরব-আনন্দ নিবেদন করিত! এ কথা শুনিলে মার মনে কতখানি আনন্দ হইবে! আহা, দুঃখিনী মা! তিনটি ছেলের কল্যাণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া বাঁচিয়া আছেন! ছেলে তিনটি মানুষ হইবে, দশের সভায় তারা আসন পাইবে—ইহা ভিন্ন মায়ের মনে অন্য কামনা নাই! মনে পড়িল বাপ মহেন্দ্রর কথা···সে বাপ আজ কোথায়!

জানকী বাবু বলিলেন—সমস্যা এই, এ কাজ কখন তুমি করবে।

দিলীপ কোনো জবাব দিল না···নিরুত্তরে রহিল। বুকের মধ্যে যা হইতেছিল···বুঝি, ইহাকেই কবিরা বলেন পুলকের প্লাবন!

মণিময় বলিল—কেন, ফ্যাক্টরির কাজে ওঁকে ছুটী দাও!

জানকী বাবু বলিলেন—সে-কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি হতে পারে দিলীপ! কেন না, প্রথম দিনে তুমি যে কথা আমায় বলেছো···সেই···ফ্যাক্টরিতে থেকেও কেন বড় হওয়া যাবে না? তোমার সে-কথা আমি ভুলিনি দিলীপ! খুব বড় কথা! জজের আসনে বসতে পেয়েও অনেক জজ যে সে-আসনকে ছোট করে, কলঙ্কিত করে! আসনে গৌরব নেই—গৌরব মানুষের মধ্যে। যে-ফ্যাক্টরির ভোলা কালু আবদুল ছিদাম টম্ জ্যাক্ কাজে ফাঁকি দেয়, নেশা করে,—সেই ফ্যাক্টরিতে কাজ করে ইংলণ্ডে-আমেরিকায় কত স্যর ব্যারণ দিকপালের সৃষ্টি হচ্ছে!

মণিময় বলিল—আমাদের দেশেও স্যর আর এন্ মুখার্জ্জি···

হাসিয়া জানকী বাবু বলিলেন—ঠিক কথা। স্যর আর এন তোমার আদর্শ হোন্ দিলীপ! তুমিও এক দিন ফ্যাক্টরিকে গৌরবান্বিত করবে!···কিন্তু সে কথা যাক্! এখন আমি ভাবছি, এ-লেখা কখন তুমি পড়বে বলো তো? আমার অবশ্য খুব তাড়া নেই···আস্তে আস্তে এ কাজ করলেও চলবে।

দিলীপ এবার মুখ তুলিল, মুখ তুলিয়া বলিল—রাত্রে আমি লেখাপড়া করি, সে সময় অনায়াসে আপনার লেখা পড়তে পারবো! আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা···ও-লেখা পড়বার জন্য আমার খুব আগ্রহ···পড়লে নিজে কতখানি শিক্ষা পাবো! ও-লেখা দেখতে আমার দেরী হবে না।

সেই রাত্রেই দিলুর হাতে জানকী বাবু তাঁর লেখা মোটা দু'খানি খাতা দিলেন। খাতা লইয়া দিলু বাড়ী আসিল। খাতায় লেখা নয়, যেন সে বিজয়-লক্ষ্মীর আহ্বান পাইয়াছে!

১৪

জানকী বাবুর শরীর এখন ভালো আছে। কাজে-কর্ম্মে তিনি পরিপূর্ণ মনোযোগ অর্পণ করিলেন। নানা ডিপার্টমেন্টের অধ্যক্ষদের অকস্মাৎ এখন অফিস-কামরায় তলব হয়। তাঁদের বলেন কাজ-কর্ম্ম, খাতা-পত্র বুঝাইয়া দিতে! দেখিতে চান, অধ্যক্ষেরা হাজিরামাত্র দিয়া মাহিনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন, না, অধীনস্থ লোক-জনের কাজ-কর্ম্ম মন দিয়া দেখিতেছেন; এবং সে-কাজ তাঁরা বোঝেন!

সেদিন ডাক পড়িল পিনাকীর। কেতা-দুরস্ত সাহেবী পোষাক-আঁটা পিনাকী আসিয়া দাঁড়াইল জানকী বাবুর ঘরে।

জানকী বাবুর সামনে টেবিলের উপর খোলা খাতা। সেই খাতায় একটা অঙ্ক দেখাইয়া জানকী বাবু প্রশ্ন করিলেন—এটা পড়ো তো পিনাকী!

পিনাকীর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! তখনি নিজেকে সামলাইয়া ঝুঁকিয়া খাতার অঙ্ক দেখিল,—লেখা আছে চার হাজার সাতশো পঁচাত্তর টাকা বারো আনা ন' পাই।

মুখে এ-অঙ্ক সে উচ্চারণ করিয়া পড়িল।

জানকী বাবু বলিলেন,—বেশ, এ টাকাটা দেওয়া হয়েছে কাকে?

খাতায় নাম লেখা ছিল। দেখিয়া পিনাকী পড়িল,—হ্যামার্টন ষ্টীল ওয়ার্কস্ গ্লাসগো।

জানকী বাবু বলিলেন,—এ টাকা কিসের জন্ম দেওয়া হয়েছে ?

পিনাকীর বুকের মধ্যে কে যেন কামান দাগিল ! সে বলিল,—আজ্ঞে, এ্যাকাউন্টাণ্ট রামহরি বাবুকে জিজ্ঞাসা করে এসে বলছি এখনি।

জানকী বাবু বলিলেন—না, না ! তাঁকে তো আমিও জিজ্ঞাসা করতে পারি। তা নয়। তুমি বলো···তুমি এ্যাসিষ্টাণ্ট-ম্যানেজার হয়ে কাজ কি দেখছো···অফিসের কোথায় কি হচ্ছে, এ সব খপর তোমার জানা উচিত !

পিনাকীর মুখে কথা নাই ! সে নিরুত্তর।

জানকী বাবু বলিলেন,—কাজ যদি না দেখবে, তাহলে শিখবে কি করে ? তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো···কোথা থেকে ছোট বোল্ট্ আসছে, স্ক্রু আসছে, তাদের কোন্‌টা ভালো···কোন্‌টার কত দাম পড়ছে···সব তিনি বলে দেবেন ! কোন্ জিনিষের কোথায় কি দরকার, কতটা দরকার···তাও তিনি বলে দিতে পারেন। এই যে ফী-মেলে বিলিতী-ডাকে সেখানকার দর-দামের রিপোর্ট আসছে···সে রিপোর্ট দ্যাখো ?

পিনাকী কোন কালে দেখে না ! দেখিবার প্রয়োজন মনে করে না। সে জানে এখানকার ম্যানেজার অর্থাৎ সর্ব্বময় কর্ত্তা বাপ কামাখ্যা চাটার্জ্জী···পিনাকী সেই কামাখ্যা চাটার্জ্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ! নিজেকে এ-রাজ্যে সে দেখে যেন প্রিন্স-অফ-ওয়েল্‌স্ ! অফিসে আসে মাসিক এ্যালাউয়ান্স মাসের শেষে হস্তগত হইবে, সেই লোভে ! সাজিয়া আসে, তার কারণ আর সকলের চেয়ে তার পোজিশন যে অনেক উঁচুতে তাহা বুঝাইতে ! সে কি কাহারো সঙ্গে মেশে এখানে ? মিশিবে কি করিয়া ? সে ম্যানেজারের ছেলে—আর উহারা তুচ্ছ শ্রমিক-শিল্পী কেরাণী কুলি বৈ নয়!···তার উপর জানে, পরে সে ম্যানেজার বা বড় সাহেব হইবে ! তার কাজ শুধু সাজিয়া অফিসে আসিয়া নিজেকে জাহির করা, ঘণ্টা টিপিয়া বেয়ারা ডাকা, এবং সকলের উপর হুকুম চালানো !···

পিনাকীর মুখে কথা নাই ! কি কথা বলিবে ? অফিসের বাবুদের ডাকিয়া জানকী বাবু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা পড়া করেন,—এ সংবাদ পিনাকীর অজানা নয়। উহারা ম্যানেজারের ছেলে নয়, উহাদের দেখিবেন বৈ কি ! তাই বলিয়া তাহাকেও এমনি ভাবে পরীক্ষা দিতে হইবে, এ কল্পনা পিনাকীর মনে কোনো দিন উদয় হয় নাই !

তাকে নিরুত্তর দেখিয়া জানকী বাবু বলিলেন—তুমি জানো না ! এ-সব না জানলে চলবে কেন পিনাকী ? এক দিন ম্যানেজার হয়ে এত বড় কারবার তোমাকেই যদি চালাতে হয় ? নিজে না দেখে না জেনে তোমার আণ্ডারে যারা কাজ করে, তাদের কথার উপর যদি নির্ভর করো, তাহলে তাদের হাতে তোমাকে পুতুল বনে' থাকতে হবে ! দিস্ ওণ্ট ডু, মাই বয়। তুমি যাও, আজ থেকে খাতাপত্র দেখে সব শেখবার চেষ্টা করবে।

পিনাকী তাড়াতাড়ি বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি যেমন বলছেন, এবার থেকে তাই হবে। ভবিষ্যতে আর এমন হবে না !

জানকী বাবু বলিলেন—হ্যাঁ···এই আমি চাই !···

পিনাকী চলিয়া যাইতেছিল, জানকী বাবু বলিলেন—একটা কথা···

পিনাকী দাঁড়াইল। জানকী বাবু বলিলেন,—বাইরের একটা অফিসের ভার আমাদের হাতে আসছে। সেখানে এক জন ম্যানেজার পাঠাতে হবে···আমাদের নিজের লোক ! তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, তাহলে এর মধ্যে তোমাকে সে-কাজে যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে, পিনাকী !···তোমার বাবা এ-কথা জানেন। তাঁকে আমি বলেছি, বাহিরের সে-অফিসের জন্ম যোগ্য লোক চাই। তাতে তিনি তোমার কথা বলেছেন। সেই জন্ম তোমাকে আমি ডেকেছিলুম···শুধু দেখতে ইফ ইউ কুড ম্যানেজ দেয়ার।···কিন্তু যা দেখলুম···

কথাটা শেষ না করিয়া জানকী বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। পিনাকীর বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

জানকী বাবু বলিলেন—এখনো মাসখানেক সময় আছে। এর মধ্যে নিজেকে তৈরী করে নাও।

পিনাকী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, নিজেকে তৈরী করে নেবো।

—হুঁ···

পিনাকী চলিয়া গেল···জানকী বাবু ডাকিলেন—মুরারি···

মুরারি আসিল।

জানকী বাবু বলিলেন—নাম লেখা শ্লিপ পাঠিয়েছে···কে দেবীদাস ভটচায্যি···বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে নিয়ে আয়।

মুরারি চলিয়া গেল। এবং পাঁচ মিনিট পরে ফিরিল; তার সঙ্গে নিরীহ-গোছ এক জন বাঙালী ভদ্রলোক।

জানকী বাবু বলিলেন—আপনার নাম দেবীদাস ভট্টচায্যি ?

ভদ্রলোক কহিলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি চাই আপনার ?

ভদ্রলোক বলিলেন—আমি কলকাতা থেকে আসছি। মানে, এখানকার সুপ্রসন্ন বাবু···তাঁরি শ্বশুরবাড়ী থেকে। তাঁরা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। সুপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধী সত্যবান বাবু···সাব-জজ···তাঁর সম্বন্ধীর একটি ছেলে আছে। বিলেত থেকে মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছে। ছেলের বাপ মস্ত বড় কনট্রাক্টর···পি-ডব্লু-ডীর সব কাজ তাঁর একেবারে বাঁধা। বাপের নাম জগদীশ রায়। ছেলের নাম অমরেশ। অমরেশের জন্ম ওঁরা পাত্রী খুঁজছেন। আপনার কাছে তাই ওঁরা আমাকে পাঠালেন,—আপনার যদি পছন্দ হয়···অর্থাৎ আপনার কন্যার সঙ্গে···

জানকী বাবু বলিলেন—আপনি ঘটক ?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

জানকী বাবু বলিলেন—আমার মেয়ে আছে এবং তার জন্য পাত্রও খুঁজছি। তবে বিলেত-ফেরত মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার ? সাহেব-মানুষকে কেমন ভয় করে, ঘটক মশাই ! জীবনে অভিজ্ঞতা তো বড় অল্প হলো না !···আপনার বয়স বেশী নয়···আমাদের মতো প্রবীণ লোকের অভিজ্ঞতার কথায় আপনারা বোধ হয় হাসবেন ! আপনাদের বয়সে আমরাও হাসতুম।···কিন্তু দেখছি, হাসা অন্যায় হয়েছিল। অভিজ্ঞতার দাম সামান্য দাম নয় ! কালে মানুষের রুচির অদল-বদল হতে পারে, কিন্তু মানব-চরিত্র কখনো বদল হতে দেখলুম না !

ঘটক-ভদ্রলোক এ-কথার মর্ম্ম বুঝিলেন না, তার কি জবাব দিবেন ! জানকী বাবুর মন রাখিতে তিনি শুধু মৃদু হাস্য করিলেন।

জানকী বাবু বলিলেন—এ-ছেলেটির বয়স ?

—আজ্ঞে, সাতাশ বছর।

জানকী বাবু বলিলেন—আমার মেয়ের বয়স হলো চোদ্দ···তা বেমানান্ হবে না!

জানকী বাবু কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন—ছেলেমেয়ে বিবাহ-যোগ্য হলে পাঁচটা পাত্র-পাত্রী দেখতে হয়, দেখে নাড়াচাড়া করতে হয়। তবে বুঝছেন তো, আমার এই বয়স,—আর দেহের সামর্থ্য! এ-বয়সে কলকাতা পর্য্যন্ত ছুটে গিয়ে পাত্র দেখা ··মস্ত অসুবিধার ব্যাপার!

ঘটক-ভদ্রলোক বলিল—তা নয়। বলেন যদি, তাঁরা মেয়ে দেখতে আসবেন তো···এখানে সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ী রয়েছে···মেয়ে দেখতে পিতাপুত্র দু'জনেই না হয় আসবেন! পাত্রটিকে আপনি তখন এইখানেই চোখে দেখবেন।

জানকী বাবু বলিলেন—বিয়ে হবে, কি, হবে না···মানে, নিশ্চয়তা নেই তো! এত দূরে তাঁরা আসবেন কষ্ট করে?

ঘটক-ভদ্রলোক বলিল—নিশ্চয় আসবেন। কন্যা-দায় যেমন দায়, পুত্র-দায়ও তেমনি!

জানকী বাবু বলিলেন—আপনি কলকাতা থেকেই বরাবর আসছেন তো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—খাওয়া দাওয়া?

ঘটক বলিল—সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে এসে নেমেছি। সেইখানেই স্নানাহার সেরে আপনার কাছে আসছি। রাত্তিরের ট্রেণে যদি ফিরতে পারি, ইচ্ছা আছে। তাহলে ওঁদেরো যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে এনে পাত্রী দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারি! আজ নমস্কার, আমি আসি।

জানকী বাবু বলিলেন—তা হয় না। অতিথি! আমার ওখানে একবারটি যেতে হবে।···ওরে মুরারি···

মুরারি কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—আজ্ঞে···

জানকী বাবু বলিলেন—বাবুকে বাড়ীতে নিয়ে যা! নিজে থেকে ওঁর জলখাবারের ব্যবস্থা করিয়ে জলখাবার খাওয়াবি। তার পর সুপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসবি। আমার গাড়ী রয়েছে···ঐ গাড়ীতে করে এখান থেকে যা।

তার পর তিনি চাহিলেন ঘটক-ঠাকুরের পানে, বলিলেন—আমার এখন যাবার উপায় নেই ঘটকমশায়। এ ত্রুটি···

—না···না, বলেন কি আপনি! আপনার ত্রুটি? শশব্যস্তে প্রতিবাদ জানাইয়া ঘটক দেবীদাস ভটাচার্য্য মুরারির সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

১৫

দু'দিন পরের কথা।

বেলা সাড়ে ন'টা। সুভাষিণী স্নান করিতে গিয়াছে, মোহন বসিয়া লেখাপড়া করিতেছিল, হঠাৎ উঠানে আহ্বান জাগিল,—কোথায় গো বাড়ীর লোকজন?

এ কণ্ঠ গৌরী ঠাকুরাণীর। কণ্ঠ সুভাষিণীর কাণে পৌঁছিল। সুভাষিণী চিনিল। কুয়াতলা হইতে সুভাষিণী বলিল—দিদি! কি ভাগ্যি! বসো, আমি যাচ্ছি। আমার স্নান শেষ হয়েছে।

গৌরী ঠাকুরাণী কহিলেন—ছেলেরা কোথায়?

সুভাষিণী বলিল—দিলু কাজে বেরিয়ে গেছে। নীলু এখানে থাকে না তো···সে রঙপুরে···সেখানকার কলেজে পড়ছে। আর মোহন···নেই ওখানে?

মোহন ছিল দাওয়ায়, মায়ের মুখে নাম উচ্চারিত হইবামাত্র সে বলিল—আমি এইখানে, মা।

মা বলিল—পিসিমা এসেছেন। তাঁকে বসাও মোহন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও···আমি এখনি আসছি।

মোহন উঠিয়া গৌরী ঠাকুরাণীর পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। মোহনের চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন লইয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আমাকে চেনো?

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাস্যে মোহন বলিল—চিনি।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—কি করে চিনলে আমাকে? তুমি সেই কবে দেখেছো···কত কাল আগে!

সলজ্জ মৃদু হাস্যে মোহন বলিল,—আমি জানি।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—কোন্ ক্লাসে পড়ছো?

মোহন বলিল—ক্লাস সেভেন্।

—দাদাদের মতো এগজামিনে ফার্ষ্ট হচ্ছো তো?

মোহন সলজ্জে মাথা নত করিল, কোনো কথা বলিল না।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—গেল-এগজামিনে কত হয়েছিলে?

মাথা তুলিয়া মোহন বলিল,—ফার্ষ্ট!

খুশী-মনে গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—এই তো চাই বাবা। মায়ের খালি বুক···তোমরা তিন ভাইয়ে মাণিক-রতন হয়ে মায়ের বুক ভরে রাখো! মাকে সুখী করো। মায়ের চেয়ে বড় পৃথিবীতে তোমাদের আর কেউ নেই। এই মাকে কোনোদিন তুচ্ছ করো না বাবা, যত বড়ই হও! মাকে যে মানে না, কোনো দিন সে বড় হতে পারে না।

গৌরী ঠাকুরাণী তাঁর মন হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে সব কথায় যেন বিদ্যুতের প্রবাহ! মোহনের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চে ভরিয়া উঠিল।

সুভাষিণী আসিল। ভিজা কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গে মুড়িয়া···মাথায় দীর্ঘ কেশের রাশি এলায়িত। সাদা থানের আবরণ ভেদ করিয়া অঙ্গের উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে!

হাসি-ভরা মুখে সুভাষিণী বলিল,—ভিজে কাপড়ে প্রণাম করবো না দিদি···কাপড় ছেড়ে এসে প্রণাম করবো।

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তোমার প্রণাম নিতে আমি আসিনি বৌ। বাড়ী এলুম, তাই সব দেখতে-শুনতে এসেছি! দূরে থাকলেও মন আমার তোমাদের কাছে এইখানে পড়ে আছে···এ কী বন্ধনে বেঁধেছো! এক দিকে ঐ কুমু···আর এক দিকে তোমরা। বুড়ো বয়সে কোথায় তীর্থধর্ম্ম করবো···তা নয়! কোনো তীর্থে গিয়ে মনস্থির করে থাকতে পারি না!

সুভাষিণী বলিল,—স্নেহ এমন জিনিষ দিদি! নীচের দিকেই তার গতি! উপর-দিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা···সে-ভক্তিও এই স্নেহের সঙ্গে পেরে ওঠে না!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—তাই। এখন যাও দিকিনি, ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে এসো; আমি বসছি··· মোহনের কাছে!

সুভাষিণী ঘরে ঢুকিল কাপড় ছাড়িতে। গৌরী ঠাকুরাণী বসিলেন দাওয়ায় মেঝেয়। মোহন শশব্যস্তে বলিল,—মেঝেয় বসছেন কেন, পিসিমা? আমি আসন নিয়ে আসি।

বলিয়া মোহন আসন আনিবার জন্য ছুটিতেছিল, তাকে নিবৃত্ত করিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—না, না! পাগলা ছেলে! আসনে কাজ নেই, তোমার পিসিমা সাহেব নয় যে মেঝেয় বসলে মানহানি হবে!

ভিজা কাপড় ছাড়িয়া শুকনো কাপড় পরিয়া সুভাষিণী তখনি আসিল। বলিল,—ও কি দিদি! মাটীতে কেন?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—মাটীই ভালো! এই মাটীর মায়াতেই তো আমাদের ঠাকুর-দেবতারা মাটীর পৃথিবীতে জন্ম নেন! আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না বৌ! এই তো বাড়ী এসেছি···এখনো স্নান করিনি! মন পড়ে রয়েছে এখানে···স্নান সেরে আসবো, তার তর সইলো না!

সুভাষিণী বলিল—হঠাৎ বাড়ী এলে যে!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—হঠাৎ নয় বৌ। ওরা টেনে নিয়ে এলো। মানে, সত্যবানের সম্বন্ধী জগদীশ বাবু। তিনি এসেছেন, জগদীশ বাবুর স্ত্রী এসেছে, জগদীশ বাবুর ছেলে অমরেশ এসেছে। কুমু আর জামাই জ্যোতির্ময়ও এসেছে। বিয়ের পর মেয়ে-জামাইকে এখানে এনে বাস্তু-দেবতাকে প্রণাম করানো হয়নি তো! সুবিধা হলো এখন···বললুম, চলো সব···তাই আসা।

সুভাষিণী বলিল,—ওঁরা এলেন যে?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—এলেন···মানে, জগদীশ বাবু তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন। চমৎকার ছেলে···যেমন চেহারায়, তেমনি বিদ্যাবুদ্ধিতে! বিলেতে ছিল পাঁচ বছর। মাস-খানেক হলো পাশ করে ফিরেছে। জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচির সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলুম আমি···তাই এসেছেন! মেয়ে-ছেলে দু' পক্ষের দুই দেখা হয়ে যাবে।

সুভাষিণী বলিল—জানকী বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—ওরা মেয়ে খুঁজছিল, বললুম। কলকাতায় আছি···কুমুর দিদিমা আমাকে ছাড়লেন না। বলেন, একা পড়ে আছি গৌরী···তোমার মতো মেয়ে থাকতে একা কেন থাকবো? যে কটা দিন দুই মায়ে-ঝীয়ে এক সঙ্গে থাকা যায়, থাকি এসো। বুড়ো মানুষের কথা ঠেলতে পারি না ভাই! চমৎকার মানুষ! সেকেলে বিধবা···আচার-নিয়ম মানেন! তবু একালের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কোনোখানে মতের অমিল দেখি না! তাদের অনাচার-অনিয়মগুলিও এমন সহজ বুদ্ধিতে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারেন, আশ্চর্য্য!

তার পর অনেক কথা হইল। ঘর-সংসারের কথা···ছেলেরা কে কি করিতেছে···তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের আশার কথা···

গৌরী ঠাকুরাণী কহিলেন—আর একটি নতুন মানুষ এসেছে আমাদের সঙ্গে···সত্যবানের লোক। রাজীব। এ রাজীব কে, জানো?

সুভাষিণী বলিল—না।

গৌরী ঠাকুরাণী কহিলেন—তোমার মামাশ্বশুর ছিলেন প্রসন্ন বাবু ···তাঁর কাছে এই রাজীব কাজ করেছে চির-জীবন। তাঁর সুখে-দুঃখে এই রাজীব ছিল সাথী।···তিনি মারা যাওয়া ইস্তক সত্যবানের কাছে আছে। সত্যবান্ তাকে কলকাতায় রেখে গেছে। মায়ের এই বয়স! বললে, লোকটি খুব বিশ্বাসী আর কাজের···বাড়ীর চার্জ্জ সে অনায়াসে নিতে পারবে···অনেক অসুবিধা থেকে পরিত্রাণ পাবে, মা! তা লোকটি ভাই, সত্যি চমৎকার!

সুভাষিণী একাগ্র মনে এ কথা শুনিল। শুনিয়া কিছু বলিল না··· নিরুত্তরে রহিল। মনের উপর বহু-অতীত দিনের কথা স্বপ্নাভাসে জাগিয়া উঠিল। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে স্বামীর মুখে শুনিয়াছে রাজীবের স্নেহ-মমতার কথা, রাজীবের যত্ন-আত্তির কথা! মহেন্দ্র বলিত, —তাকে কোনো দিন চাকর বলে মনে করিনি সুভা···এমন তার দরদ! মনে হতো কোন্ পূর্ব্বজন্মে রাজীব যেন ছিল মায়ের পেটের ভাই! যে সেবা-যত্ন করতো, অনেক ভাইয়েও তেমন করে না···

সেই রাজীব! রাজীবের বুকে স্বামী মহেন্দ্রর সমস্ত বাল্য-জীবনটাই যেন মণির মতো সযত্নে সংরক্ষিত আছে! সাধ হয়, ও বুকের ডালা খুলিয়া সে মণি-রত্নের সন্ধান লইতে! একটা অন্তর্গূঢ় বেদনায় সুভাষিণীর দুই চোখ বাষ্পে ভিজিয়া উঠিল!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আমার সঙ্গে অনেক কথা হয় এই রাজীবের। কুমুর বিয়ের সময় কামাখ্যা সাহেবের স্ত্রী জয়া গিয়েছিল তো কলকাতার বাড়ীতে! জয়াকে দেখেই চিনলো! জয়াদি-জয়াদি বলে কি যত্নই করতো···ওর ছেলেমেয়েদের উপর কত মায়া! তাতেই তো রাজীবের মুখে শুনলুম ওর পরিচয়···উমাপ্রসন্ন বাবুর কথা···মহেন্দ্র বাবুর কথা। মহেন্দ্র বাবুর কথা ও প্রায় বলে। বলে, কর্ত্তা রাগ করে মুখে বলতেন ছেঁটে দিয়েছি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক, স্নেহের সব বন্ধন···তবু থেকে থেকে কি অস্থির না হতেন! শেষে মারা যাবার আগে মহেন্দ্র বাবুর কত সন্ধান তিনি করেছিলেন। মহেন্দ্র বাবুকে দেখবার জন্য হাঁপিয়েই প্রাণটা বেরিয়ে গেছে! মারা যাবার ঠিক আগে জয়া আর জামাই কামাখ্যাকে কাছে আনিয়েছিলেন···উইল লিখিয়ে ছিলেন···তাতে সম্পত্তি ভাগ করে অর্দ্ধেক দিয়ে গেছেন জয়াদের আর বাকী অর্দ্ধেক মহেন্দ্র বাবুকে ···যাকে বলে, একেবারে চুলচেরা ভাগ!···বাড়ী-ঘর, জমি-জায়গা, ব্যাঙ্কের টাকা, কোম্পানির কাগজ···যা-কিছু করেছিলেন, সেই সর্ব্বস্বের অর্দ্ধেক।

সুভাষিণীর পায়ের তলায় পৃথিবী যেন দুলিতে লাগিল! চোখের সামনে দিনের আলো মলিন নিষ্প্রভ হইয়া মিলাইয়া যাইতেছিল! আর বুকের মধ্যে···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আমার মুখে তোমাদের কথা শুনে··· হাজার হোক চাকর মানুষ···রক্ত-সম্পর্ক নয়···কেঁদে একেবারে আকুল! খালি বলতো, বাসন্তীতে কবে আপনি যাবেন পিসিমা? আমি সঙ্গে যাবো। দাদার ছেলেদের দেখবো! বলতো, বিয়েতে দুই ছেলে কলকাতায় এসেছিল···তা চোখেও দেখলুম না···চিনলুম না তাদের!···সে এলো আমাদের সঙ্গে শুধু তোমাদের দেখতে!··· এসেই জয়ার কাছে গেল। বললে, ওবেলায় এখানে আসবে। আমাকেই নিয়ে আসতে হবে।

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহে

শ্রীল রঘুনাথ দাস পুরীধামে আগমন করিয়া তথায় ষোড়শ বৎসর অবস্থান করেন। এই ষোড়শ বৎসর ধরিয়া তিনি কাশীমিশ্রের ভবনে (যাহা অধুনা শ্রীরাধাকান্ত মঠ নামে পরিচিত) শ্রীল স্বরূপদামোদরের সহিত একসঙ্গে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের এই ষোড়শবর্ষব্যাপী যাবতীয় লীলা দর্শন করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলায় শ্রীস্বরূপদামোদরের সহকারিরূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছেন। এইরূপে রঘুনাথ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব লীলা, শ্রীবল্লভভট্টের সহিত প্রভুর পুরীধামে মিলন ও তৎপরে বল্লভভট্টের দাম্ভিকতার জন্য তাঁহার প্রতি মহাপ্রভুর বিরক্তি ও অবশেষে বল্লভভট্টের বিনয়পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনায় তাঁহার প্রতি শ্রীচৈতন্যদেবের করুণা, অতঃপর বল্লভভট্টের শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট হইতে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর ও শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মিলন, মহাপ্রভুর সহিত গৌড়ীয় ভক্তগণের মিলন, রথাগ্রে মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের নৃত্য ও সংকীর্ত্তন, ভবানন্দ রায়, রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক ও বাণীনাথ পট্টনায়ক সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার এবং এই বংশের প্রতি মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব কৃপা, রামানন্দ রায়ের অলৌকিক চরিত্র—নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া উত্তরকালীন ভক্তবৃন্দের জন্য তাহা জানিবার উপায় করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য ও শেষজীবনের ভজন-সহচর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই সকল ব্যাপার প্রধানতঃ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে শুনিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলার কয়েক বৎসর তিনি শ্রীকৃষ্ণের তীব্র বিরহে সর্ব্বদা "ভ্রমময় চেষ্টা" করিতেন ও "প্রলাপময় বাক্য" বলিতেন—এবং যাহা শ্রীচৈতন্যদেবের গম্ভীরালীলা * নামে বিখ্যাত হইয়া ভক্তবৃন্দের পরমানন্দ বিধান করিতেছে—তাহা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীই প্রত্যক্ষ করেন এবং তাঁহার মুখে শুনিয়াই মনস্বী পণ্ডিত ভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহা নিজ গ্রন্থে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ লীলা শ্রীল স্বরূপদামোদরও কিছু কিছু করচা (notes) করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ করচা সুবিস্তৃত গ্রন্থ না হইলেও উহাতে সূত্রাকারে ও অন্যান্য ভাবে মহাপ্রভুর লীলার অনেক কথা ছিল। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী যখন ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত এই করচা বর্ত্তমান ছিল; কারণ, ভক্তিরত্নাকরের অষ্টম তরঙ্গে (৫৪৭ পৃঃ বহরমপুর সংস্করণ) এই করচা হইতে পূর্ব্বে অন্য কোনও গ্রন্থে অনুল্লেখিত শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার পরেই ঐ করচার আর সন্ধান পাওয়া যায় না। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—ঐ করচার রঘুনাথ দাস গোস্বামী একটি পঞ্জী বা বৃত্তি রচনা করেন। বলা বাহুল্য, তাহারও এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ মিলে নাই; অতএব তাহাও লোপ পাইয়াছে। কিন্তু অতি সাবধানী ভক্তপ্রবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" ঘটনা হিসাবে তাহার কোনও ঘটনা বাদ দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সেই জন্যই স্বরূপের ও রঘুনাথের রক্ষিত সকল লীলার কথাই বর্ত্তমানে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাইতে পারি।

অবশেষে ১৪৫৫ শকে নীলাচলের এই চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। অদ্বৈত আচার্য্য গৌড়দেশ হইতে জগদানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা একটি তর্জ্জা মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইলেন। তর্জ্জাটি এই—

> "বাউলকে কহিও—লোকে হইল বাউল।
> বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল।
> বাউলকে কহিও—কাজে নাহিক আউল।
> বাউলকে কহিও—ইহা কহিয়াছে বাউল।"

এই অদ্ভুত তর্জ্জা শুনিয়া স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর নিকট ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—"আচার্য্য অতিশয় শক্তিশালী পূজক। তিনি আগমশাস্ত্রের বিধানে পূজাদি করিতে অতিশয় সুদক্ষ। আগমশাস্ত্রানুসারে পূজার জন্য ঘটে বা প্রতিমূর্ত্তিতে দেবতার আবাহন করিয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে দেবতাকে নিরোধ করিয়া রাখেন, পরে পূজা সমাপ্ত হইলে দেবতাকে বিসর্জ্জন দেন। তবে আচার্য্য এই তর্জ্জার দ্বারা কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না—কারণ, মহাযোগেশ্বর আচার্য্য নানাপ্রকার তর্জ্জা রচনা করিতে পারেন, সাধারণে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না।

শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন—কিন্তু তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যের ঐকান্তিক প্রার্থনায় শ্রীল মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন, এ কথা সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। আমাদের মনে হয়, প্রভুকে অবতীর্ণ করাইয়া যে কার্য্য সুসিদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইয়াছে—অতএব ধরাধামে আর প্রভুর প্রকট থাকিবার প্রয়োজন নাই; আচার্য্যের তর্জ্জার মধ্যে বোধ হয় এই প্রকারের ইঙ্গিত বর্ত্তমান ছিল। ইহা বুঝিতে পারিয়াই স্বরূপদামোদর গোস্বামী "বিমন" হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মহাপ্রভু অতি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবেন। এই তর্জ্জা পাইবার পরেই মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের দশা আরও বাড়িয়া গেল। ইহার কিছু দিন পরেই পুরীধাম অন্ধকার করিয়া অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্ররূপী শ্রীচৈতন্যচন্দ্র লীলা সম্বরণ করিলেন।

ইহার কিছু পরেই মহাপ্রভুর দ্বিতীয়স্বরূপ তদ্গতপ্রাণ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী অপ্রকট হইলেন। পুরীধামে মহাপ্রভুর ভক্তগণের যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য আমাদের নাই। শ্রীল নন্দনন্দন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া যখন অক্রূর কর্ত্তৃক মথুরাপুরে নীত হন, তখন শ্রীবৃন্দাবনধাম যেমন হতশ্রী হইয়া গিয়াছিল—

---

* নীলাচলে মহাপ্রভুর অবস্থান করিবার জন্য মহারাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার গুরু কাশীমিশ্রের ভবন তাঁহাকে অর্পণ করেন। এই স্থানে মহাপ্রভু যে একতলা সঙ্কীর্ণ ঘরে অবস্থান করিতেন, সেই ঘরটি "গম্ভীরা" নামে বিখ্যাত। এই স্থানে অদ্যাপি মহাপ্রভুর গাত্রের ছিন্ন কন্থা ও পায়ের কাষ্ঠ-পাদুকা রক্ষিত হইয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উদ্দীপ্ত রাখিয়াছে।

বৃন্দাবনের পুষ্পলতা-পল্লবাদি যেরূপ শুকাইয়া গিয়াছিল—পুরীধামের পরমানন্দ-নিকেতনও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অভাবে সেই রূপ ধারণ করিল। স্বরূপদামোদরাদি ভক্তগণের বিরহে পুরীধাম সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, চক্রেশ্বর পণ্ডিত, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের যে অবস্থা হইল তাহা বর্ণনাতীত। প্রায় সমকালে মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানে রঘুনাথ একেবারে আশ্রয়হীন হইলেন। রঘুনাথের তখন শ্রীবৃন্দাবনের কথা মনে পড়িল। শ্রীচৈতন্যদেব গোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়া শ্রীল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের আশ্রয় দান করিয়া গিয়াছেন—এবং গুঞ্জামালা দিয়া তাঁহাকে শ্রীরাধিকা-চরণের আশ্রয় দান করিয়া গিয়াছেন, এই কথা মনে করিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিলেন, "মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদর এই উভয়েই যখন আমাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন আর আমার অনর্থক জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? আমি শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শীর্ষদেশ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব।" এই মনে করিয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমনপূর্ব্বক শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদিগের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামীও যে মহাপ্রভুর বিরহ-বেদনায় বিশেষরূপে ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতকে দিয়া মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকটে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন নাই। যথা শ্রীচরিতামৃতে—

> "আমিহ আসিতেছি"—কহিও সনাতনে।
> আমার তরে এক স্থান যেন করে বৃন্দাবনে॥"
>
> —অন্ত্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী এই যে সংবাদ-প্রেরণ-বিবরণ লিখিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই মিথ্যা হইতে পারে না। অথচ দেখা যাইতেছে যে, এই সংবাদ প্রেরণের পর প্রকট দেহে শ্রীচৈতন্যদেব আর শ্রীবৃন্দাবনে যান নাই। অতএব তাঁহার এই সংবাদ প্রেরণের ব্যাপারের মধ্যে যে গভীর রহস্য বিদ্যমান, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমাদের মনে হয়, শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীপুরুষোত্তমধামের প্রকট লীলা-নাট্যের উপসংহার করিয়া আনন্দময় অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলায় সমাগত হইলেন। আমরা দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্যদেবের পুরুষোত্তমলীলা সম্বরণের সঙ্গেই শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিগণের কার্য্যশক্তি বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল এবং শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীল মদনমোহন দেবকে ও শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবোত্তমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ সকলেই শ্রীবৃন্দাবনে বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন আলো করিয়া বসিলেন। অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ং শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বিগ্রহরূপে পুরীধাম হইতে আগমন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সম্পূর্ণ করিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী অনতিবিলম্বে তাঁহার সুবিখ্যাত নাটকদ্বয় ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদ্বয় শেষ করিলেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীভাগবতের পাঠকরূপে শ্রীশ্রীগোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলার অলৌকিক ভাবের উন্মেষ সাধন করিতে লাগিলেন। এই সময়েই শ্রীচৈতন্যদেবের ও শ্রীল স্বরূপদামোদরের বিয়োগে করুণার মূর্ত্তিমান বিরহ-বিগ্রহ-রূপে শ্রীল রঘুনাথ দাস শ্রীবৃন্দাবনে সমাগত হইলেন।

শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান হন নাই। তাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতির আলোকে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমলীলার অবসানে অপ্রাকৃত লীলাবিগ্রহরূপে শ্রীমচ্চৈতন্যদেবকে শ্রীবৃন্দাবনে প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীও তাঁহাদের এই বিদ্বৎপ্রতীতির অংশী হইলেন এবং তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বিয়োগ-ব্যথায় অভিভূত না হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদিগের প্রতি যে যে কার্য্যের ভার দিয়া গিয়াছিলেন, নবীন উদ্যমে অসীম উৎসাহে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতন যখন তাঁহাদের প্রাণের অভীষ্ট ধন শ্রীমদ্দাস গোস্বামীকে শ্রীবৃন্দাবনে পাইলেন, তখন তাঁহারা তাঁহার সকল দুঃখ মুছিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রীবৃন্দাবনের পরমানন্দময় সত্তায় ডুবাইয়া ফেলিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব যে তাঁহার নিত্য স্বরূপেব সপরিকরে শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজমান, ইহা তিনি অনুভব করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে ভৃগুপতনের দ্বারা প্রাণনাশের সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন! শ্রীবৃন্দাবনে তিনি বৈরাগ্যের ও ভজনের আদর্শ শ্রীমদ্দাসগোস্বামিরূপে শ্রীবৃন্দাবনের ভজনশীল বৈষ্ণবগণের, বিশেষতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পরিকরগণের এক স্থায়ী সম্পদরূপে পরিণত হইলেন।

স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণবসমাজে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই। স্মার্ত্ত-সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে বহুমান করিয়া সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মতে—

> "যদি যোগী সমর্থশ্চেৎ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ।
> তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥"

যদি যোগসিদ্ধ পুরুষ যোগবলে বিনা-যানে সমুদ্র-লঙ্ঘনেও সমর্থ হন, তথাপি তিনি যেন মনের দ্বারাও কখন লৌকিক সামাজিক বিধিকে লঙ্ঘন না করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও সমাজে যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতার সঞ্চার না হয়, সেই জন্য নিজে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া সেই আশ্রমের বিধানগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ন্যায় মহাপুরুষও আপনাকে ম্লেচ্ছ সংসর্গে পতিত বলিয়া মনে করিয়া শ্রীল জগন্নাথের সেবকগণের সহিত সংস্পর্শ হইলে অপরাধী হইবেন, মনে করিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সমুদ্রের তপ্ত বালুকাময় পথে যমেশ্বর টোটায় অবস্থিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত দেখা করিতে আসেন এবং পথে আসিতে উত্তপ্ত বালুকার স্পর্শে তাঁহার পায়ে ফোস্কা হয়; কিন্তু সনাতনের এই ব্যবহারে শ্রীচৈতন্যদেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

> "যদ্যপি তুমি হও জগত-পাবন।
> তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ॥
> তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা রক্ষণ।
> মর্য্যাদা পালন হয়—সাধুর ভূষণ॥
> মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
> ইহলোক পরলোক দুই লোক নাশ॥
> মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট কৈলে মোর মন।
> তুমি ঐছে না কৈলে আর করিব কোন্ জন?"
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৪র্থ পরিচ্ছেদ

কায়স্থকুলগৌরব রঘুনাথ দাস পরমভাগবত এবং শ্রীরূপ-সনাতনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ হইলেও তিনি চির দিন শাস্ত্রবিধি ও সমাজবিধি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। বিনয়ের অবতার রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে "দাসগোস্বামী" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইলেও তিনি আচার্য্যের অধিকার-গ্রহণে কোন দিনও উৎসুক ছিলেন না। শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবার পরই শ্রীরূপ তাঁহার হস্তে সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গোস্বামীকে সমর্পণ করেন। এই মহাপণ্ডিত পরমভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীল দাসগোস্বামীকে গুরুজ্ঞানে সেবা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, শ্রীল কৃষ্ণদাসের সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জন রাধা-কুণ্ডে তাঁহার দিন পরমানন্দে ভজন-সুখে অতিবাহিত হইত। কর্ম্মী ভক্ত কৃষ্ণদাস শ্রীল রঘুনাথের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর শেষলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠেই বলিয়া গিয়াছেন—

"তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।"—আদি, ১০ম পরিচ্ছেদ

"চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে
তাঁহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহাঁ বিবরিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে।"—মধ্য, ২য় পরিচ্ছেদ

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীচৈতন্যদেবের অসীম কৃপাপারাবারে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার পরমগুরু শ্রীস্বরূপদামোদরের কর্ম্মী শিষ্যরূপে অবস্থান করিয়া সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসরকাল রঘুনাথ ও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের যে যে লীলা দর্শন ও শ্রবণ করিয়াছিলেন, শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া ভক্তগণের নিকট রঘুনাথ তাহা প্রকাশ করিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীপুরীধামে অবস্থান করিয়া শ্রীল মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ভজনরীতির সহিত শ্রীমহাপ্রভু ও তৎপরিকর-গণের আচরণ মিলাইয়া শুদ্ধা ভজনরীতির আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন আবার তাঁহারা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দের ভজনাদর্শ শ্রবণ করিয়া আরও দৃঢ় ভাবে সেই আদর্শ প্রচারের যোগ্যতা লাভ করিলেন। শ্রীল রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া কয়েক মাস ধরিয়া শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত-কথা শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিলেন। তিনি ঐ সময় হইতে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিদিন এক প্রহর কাল ধরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব চরিত-কথা ভক্তগণকে পরিবেষণ করিতেন। বৃন্দাবনের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এই প্রকারে শ্রীগৌরাঙ্গের ত্রিলোকপাবনী জীবনকথায় অভিষিক্ত হইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। অপর দিকে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীল সনাতন ও শ্রীরূপের সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের চিরপোষিত মনোরম লতাকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমভক্তিরসামৃতে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাদেশে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী তাঁহাকে যে রসময় ভজনপদ্ধতির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, শ্রীরূপ গোস্বামীও সেই শুদ্ধা রসগর্ভা ভজন-মাধুর্য্য সম্পদের অধিকারী। এই জন্ত তিনি শ্রীরূপের সঙ্গলাভে শ্রীল স্বরূপদামোদরেরই সঙ্গ যেন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, শ্রীল দাস গোস্বামী তাঁহার স্তবাবলী গ্রন্থাদিতে শ্রীরূপের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ভজনবর্ত্মোদ্দেশী গুরুর ন্যায় অবলম্বন করিয়াছেন। ফলতঃ, তিনি শ্রীরূপে ও স্বরূপে অভিন্নতা দর্শন করিয়াই যেন কৃতকৃতার্থ হইলেন। এই জন্যই আমরা তাঁহার "দানকেলি-চিন্তামণি"র প্রারম্ভেই দেখিতে পাই—

"উদ্দামনর্ম্মরসরঙ্গতরঙ্গকান্ত-
রাধাসরিদ্‌গিরিধরার্ণবসঙ্গমোত্থম্।
শ্রীরূপ-চারুচরণাব্জ-রজঃপ্রভাবা-
দন্ধোঽপি দাননবকেলিমণিং চিনোমি।"

অনুবাদ—উদ্দাম পরিহাস-রঙ্গরূপ তরঙ্গে পরিপূর্ণা পরমরমণীয়া শ্রীরাধিকারূপা নদীর সহিত শ্রীগিরিধারিরূপ সাগরের মিলনে যে দাননবকেলিমণির উদ্ভব হইয়াছে, আমি অন্ধ হইলেও শ্রীরূপ গোস্বামীর সুচারু চরণপদ্মের রজের প্রভাবে তাহা চয়ন করিতেছি।

বস্তুতঃ, রসতত্ত্বভূপতি শ্রীরূপের বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-প্রমুখ গ্রন্থাবলীই শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অবলম্বন হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীরূপের ললিতমাধব নাটকের তৃতীয় অঙ্ক অধ্যয়ন করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর যে তীব্র বিরহানলে শ্রীব্রজদেবীগণ ও শ্রীবৃন্দাবন দগ্ধ হইয়াছিল, তাহার তাপে তিনিও অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্যই শ্রীরূপ গোস্বামী "দানকেলিকৌমুদী" নামে এই একাঙ্কের নাটকখানি রচনা করেন। এই দানকেলিকৌমুদীর লীলা-মাধুর্য্য অনুভবের ফলেই তাঁহার "কেলিচিন্তামণি"র আবির্ভাব। এই জন্যই তিনি দানকেলিচিন্তামণির প্রারম্ভেই ঐ ভাবে শ্রীরূপের ঋণ স্বীকার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, পরন্তু এই "দানকেলিচিন্তামণি"র শেষেও বলিতেছেন—

"রাধামাধবয়োর্দানকেলিচিন্তামণিং গিরৌ।
লব্ধমন্ধেন বীক্ষন্তাং শ্রীমদ্রূপগণাঃ প্রিয়াঃ।
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজ-রজোঽহং স্যাং ভবে ভবে।"*

অনুবাদ—"এই অন্ধ ব্যক্তি শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের যে "দানকেলিচিন্তামণি" লাভ করিয়াছে, শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর প্রিয় পরিকরগণ তাহা বিশেষ ভাবে বিচারপূর্ব্বক আস্বাদন করুন।

"দশনে তৃণধারণ করিয়া আমি পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন জন্মে জন্মে শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মের রজোরূপে পরিণত হইতে পারি।"

[ক্রমশঃ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

* এই চিন্তামণিস্বরূপ দানকেলিচিন্তামণি শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজীর কৃপায় লোকলোচনের গোচর হইয়াছে। (এই শ্রীল বাবাজী মহারাজ পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীহরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম-এ, নামে কুমিল্লা কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।)

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

জার্ম্মাণীর প্রত্যাশিত অভিযান:—

প্রায় সাড়ে তিন মাস প্রতীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের পর জার্ম্মাণী রুশ-রণাঙ্গনে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর যে সময় তাহার অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল, এই বৎসর তাহার দেড় মাস পর সে আক্রমণ আরম্ভ করিল। রুশ-রণাঙ্গনে আক্রমণাত্মক-যুদ্ধ-পরিচালনের মাত্র পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে দেড় মাস সময় জার্ম্মাণী নিশ্চয়ই ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করে নাই। গত শীতকালে ষ্ট্যালিনগ্রাড্ ও অন্যান্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সমরনায়কদিগের তিক্ত অভিজ্ঞতা, টিউনিসিয়া যুদ্ধের দ্রুত অবসান এবং তাহার ফলে য়ুরোপখণ্ডের প্রত্যক্ষ বিপদ্ বৃদ্ধি—এই সকল কারণে জার্ম্মাণীকে বিবেচনা করিয়া এবং বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইয়া আক্রমণাত্মক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর অভিযানে বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছিলেন—জার্ম্মাণী বোধ হয় আর আক্রমণাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হইবে না, সে এখন শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-নীতি গ্রহণ করিবে। ইতিমধ্যে জনরবও রটিয়াছিল যে, জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে সৈন্য অপসারণ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব-য়ুরোপে আক্রমণে প্রবৃত্ত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। প্রতিরোধ-নীতির যথাযথ অনুসরণের জন্যও এই অঞ্চলে তাহার আক্রমণ প্রয়োজন। অক্ষশক্তির অধিকৃত য়ুরোপখণ্ড এখন একরূপ পরিবেষ্টিত; দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি এবং পূর্ব্ব দিকে সোভিয়েট-রুশিয়া যদি নিরুদ্বেগে শক্তি সঞ্চয়ের আরও সুযোগ পায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহাদিগের দ্বিমুখী আক্রমণের প্রতিরোধ জার্ম্মাণীর পক্ষে অসাধ্য হইবে। বর্ত্তমানে সম্মিলিত পক্ষের প্রসারিত বিশাল "সাঁড়াশীর" অন্ততঃ একটি বাহু চূর্ণ করিতে পারিলে, জার্ম্মাণী অন্য দিকে অখণ্ড মনোযোগ প্রদান করিতে পারে; সেই অবস্থায় যুদ্ধকে বহুকাল স্থায়ী করিয়া সম্মিলিত পক্ষে সন্ধির আগ্রহ সৃষ্টির আশা করা তাহার পক্ষে অসঙ্গত নহে। অক্ষশক্তি এখন আর প্রতিপক্ষকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবার আশা করিতে পারে না; বহুকাল যুদ্ধ পরিচালন করিয়া রণক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি এবং তাহার ফলে সম্মিলিত পক্ষে সন্ধির আগ্রহ সঞ্চারের চেষ্টাই তাহার একমাত্র পথ।

পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে জার্ম্মাণীর সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত প্রচারকার্য্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এক শ্রেণীর ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিক য়ুরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির বিরোধী। তাঁহারা টিউনিসিয়া যুদ্ধের সময় হইতেই প্রচার করিতেছেন যে, জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে—রুশিয়ার প্রতি নাৎসী সেনার চাপ হ্রাস পাইয়াছে; সুতরাং য়ুরোপে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযানের আর প্রয়োজন নাই। সোভিয়েট রুশিয়া এই অন্যায় প্রচারকার্য্যের বিরুদ্ধে একাধিকবার প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছে যে, পূর্ব্ব-য়ুরোপ হইতে সৈন্য অপসারণ করা দূরে থাকুক, ইঙ্গ মার্কিণ শক্তির য়ুরোপ অভিযান আসন্ন হওয়া সত্ত্বেও জার্ম্মাণী য়ুরোপের অন্যান্য অঞ্চল হইতে পূর্ব্ব-য়ুরোপে সৈন্য ও সমরোপকরণ স্থানান্তরিত করিয়াছে।

গত ৫ই জুলাই প্রাতে সেনাপতি ফন্ ক্লুজের নেতৃত্বে জার্ম্মাণীর ১৫ ডিভিসন্ উৎকৃষ্ট যান্ত্রিক (পাঁৎসার) বাহিনী, ১ ডিভিসন মোটরচারী সেনা এবং ১৪ ডিভিসন্ পদাতিক সৈন্য ওরেল্ হইতে বিয়েল্গোরোড পর্য্যন্ত প্রসারিত ১৮০ মাইল রণাঙ্গনে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। সপ্তাহ কালের যুদ্ধে ওরেল্ হইতে কুরস্ক পর্য্যন্ত ১ শত মাইল স্থানে সোভিয়েট সেনার প্রতিরোধ একরূপ অলঙ্ঘ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিয়েল্গোরোড্ অঞ্চলে জার্ম্মাণ সেনা সোভিয়েট-ব্যূহ সামান্য ভেদ করিয়াছিল। ফন ক্লুজ এই স্থানে প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সোভিয়েট-ব্যূহে প্রবিষ্ট "বর্শাফলক" বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিয়েলগোরোডের অতি সন্নিকটে জার্ম্মাণীর বিশাল আক্রমণ-ঘাঁটী খারকভ অবস্থিত; কাজেই, এখানে আক্রমণের বেগ প্রয়োজনানুযায়ী বৃদ্ধি করা ফন্ ক্লুজের পক্ষে সহজসাধ্য।

জার্ম্মাণীর আশু সামরিক লক্ষ্য এখনও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তবে, তাহার আক্রমণ-ক্ষেত্রের সামরিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া

মনে হয়, সোভিয়েটের প্রধান সরবরাহ-সূত্রগুলিই তাহার আশু লক্ষ্য। প্রতিপক্ষকে একাধিক ভাগে বিভক্ত করিয়া পরে এক একটি অংশকে পৃথক ভাবে আক্রমণ করাই নাৎসী রণনীতি। এই নীতি প্রয়োগের পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান আক্রমণ-ক্ষেত্র হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া নাৎসী সেনা যদি ডন্ নদী অতিক্রম করিয়া মিচুরিন্স্ক পর্য্যন্ত পৌছিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্য ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের পারস্পরিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবে। তখন বিচ্ছিন্ন-সংযোগ দুইটি অংশকে সে পৃথক্ ভাবে আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইবে। ওরেল্-বিয়েল্গোরোড অঞ্চল হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইবার পর নাৎসী সমর-নায়কগণ উত্তরে মস্কো পরিবেষ্টনের এবং দক্ষিণে ককেসাস্ অভিযানের প্রয়াস করিবেন। একই সময়ে দুই দিকে এই অভিযান চলিতে পারে; অথবা একটি অঞ্চলে অভিযান কিছু দূর প্রসারিত হইবার পরে তখন অন্য দিকে তাঁহাদের মনোযোগ পতিত হওয়াও সম্ভব।

সম্প্রতি জনরব প্রচারিত হইয়াছে যে, রুশিয়াকে স্বতন্ত্র ভাবে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অভিযান। এই জনরবে গুরুত্ব আরোপ করিয়া জার্ম্মাণ রাজনীতিকদিগের

কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তায় সন্দেহ প্রকাশ করা অন্যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কগণ কোন্ ধাতুতে গঠিত, তাহার পরিচয় এত দিনে হিট্লার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ পাইয়াছেন। ষ্টালিন্-ক্যালিনিন্-মলোটভ্‌কে যে পেতাঁ-লাভালের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধিও তাঁহাদের আছে।

বলা বাহুল্য, সোভিয়েট সমর-নায়কগণ কেবল ওয়েল্স-বিয়েল্-গোরোড্ অঞ্চলে প্রতিরোধরত থাকিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিবেন না। গ্রীষ্মকালে তাঁহারা ব্যাপক প্রতি-আক্রমণে প্রবৃত্ত হন না বটে; তবে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার প্রয়োজনেই তাঁহাদিগকে স্থানে স্থানে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মধ্য রণাঙ্গনে ল্যাটাভিয়া সীমান্তের ৬০ মাইল পূর্ব্ব দিকে ভেলিকাইলুকিতে রুশ সেনা পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ফন্ ক্লুজের বর্ত্তমান আক্রমণ-ক্ষেত্রে নাৎসী সেনার বেগ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য রণাঙ্গনে এই ভেলিকাই-লুকিতে রুশ সেনার আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে। দক্ষিণ অঞ্চলে আজভ সাগরের তীরেও রুশ সেনার তৎপরতা আরম্ভ হওয়া সম্ভব।

অভিযানে প্রবৃত্ত হইবার পর হইতে জার্ম্মাণী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। এই সংবাদ অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা, তেমনই ইহাতে অত্যুৎসাহী হওয়াও অন্যায়। ক্ষতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সমগ্র শক্তির প্রয়োগে একটি ক্ষেত্রে শত্রুর ব্যূহভেদে প্রয়াসী হওয়াই জার্ম্মাণ রণকৌশলের অঙ্গ। কাজেই, প্রায় দুই শত মাইল রণাঙ্গনে সপ্তাহকালের যুদ্ধে আড়াই হাজার ট্যাঙ্ক ও এক হাজার বিমান ধ্বংস হওয়া অসম্ভব নহে। এই ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্ম্মাণী যদি সোভিয়েটের প্রতিরোধ-প্রাচীরে ফাটল ধরাইতে পারে, তাহা হইলে তখন সেই লাভের তুলনায় বর্ত্তমান ক্ষতি নগণ্য প্রতিপন্ন হইবে। আর এই ক্ষতি স্বীকার সত্ত্বেও সোভিয়েটের প্রতিরোধ যদি হিমালয়ের ন্যায় অটল থাকে, তাহা হইলে নাৎসী বাহিনীর ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি-ক্ষয়ের ফলে সোভিয়েট বাহিনীর পরবর্ত্তী আক্রমণে তাহারা সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার সিসিলি আক্রমণ—

রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অভিযানের আশু ফল যাহাই হউক না কেন, ইহার প্রকৃত সাফল্য বা বিফলতা ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির য়ুরোপ অভিযানের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতার উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেছে। কাজেই, ঠিক এই সময়ে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার সিসিলিতে অবতরণ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ১০ই জুলাই ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা ইটালীর পাদভূমি—ভূমধ্য সাগরের বিশালতম দ্বীপ সিসিলিতে অবতরণ করিয়াছে; দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল তাহাদিগের প্রথম অবতরণ-ক্ষেত্র। ইতোমধ্যে সীরাকিউস্ হইতে লিকাটা পর্য্যন্ত প্রসারিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের সমস্ত বন্দর ও বিমানঘাঁটী তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

সিসিলির দক্ষিণে প্যান্টেলেরিয়াকে সিসিলির পাদভূমি বলা যাইতে পারে; আর সিসিলি ইটালীতে পৌঁছিবার শেষ সোপান। প্যান্টেলেরিয়া অধিকারের পর সম্মিলিত পক্ষের বিমান বাহিনী সিসিলির পেলারমো, মার্সালা, ক্যাটনিয়া প্রভৃতি পোতাশ্রয়ে এবং বিভিন্ন বিমানক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছিল। সিসিলি ও ইটালীর মধ্যে দুই মাইল প্রশস্ত মেসিনা প্রণালী অবস্থিত; এই প্রণালীতে খেয়ার সাহায্যে রেলগাড়ী পারাপারের ব্যবস্থা আছে সম্মিলিত পক্ষের বিমান এই প্রণালীর দুই পার্শ্বের মেসিনা ও রেগিও-ডি-ক্যালাব্রিয়া এক প্রকার ধূলিসাৎ করিয়াছে। নিয়মিত বিমান আক্রমণের ফলে সিসিলির প্রতিরোধ-কেন্দ্রগুলি যে ভাবে চূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে অবতীর্ণ সেনাবাহিনীর কর্ত্তব্য সহজেই সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অবশ্য, অক্ষশক্তি সহজে প্রতিরোধ-প্রচেষ্টা ত্যাগ করিবে না, প্রত্যেক পদে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটাইয়া রুশ রণাঙ্গনের সহযোদ্ধ্‌গণকে অগ্রসর হইতে সময় ও সুযোগ দেওয়াই এখন অক্ষশক্তির রণনীতি। এই জন্যই সিসিলির প্রতিরোধ-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে তথায় শেষ মুহূর্ত্তেও জার্ম্মাণ সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। তবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে,

ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যকে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করিবার শক্তি অক্ষশক্তির নাই; তাহারা সেরূপ আয়োজনও করে নাই, তাহাদের পরিকল্পনাও সেরূপ নহে। ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীকে যথাসম্ভব অধিক কাল আটক রাখিয়া পূর্ব্ব-য়ুরোপে আক্রমণের বেগ বর্দ্ধিত করাই অক্ষশক্তির বর্ত্তমান নীতি।

সিসিলি অভিযান ইটালীতে প্রত্যক্ষ আক্রমণেরই সূচনা। সিসিলিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সম্মিলিত পক্ষ তথাকার বিমান ক্ষেত্রগুলির দ্রুত সংস্কার করিবেন এবং তথা হইতে ইটালীতে তাঁহাদের প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চলিবে। বিমান আক্রমণের দ্বারা ইটালীর প্রতিরোধক্ষেত্রগুলি বিধ্বস্ত করিবার পর তখন স্থলপথে আক্রমণ প্রসারিত করিবার প্রয়াস হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইটালী ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলিতে সম্মিলিতপক্ষের সেনাবাহিনীর অবতরণ-সম্ভাবনার কথা বুঝিয়াই জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপে অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের অবতরণে এবং ইটালীর কতকাংশ তাহাদের দ্বারা মথিত হইলেও জার্ম্মাণী পূর্ব্ব-য়ুরোপে আক্রমণের বেগ হ্রাস করিবে না। সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি নাৎসী বাহিনীর চাপ হ্রাস করাইতে হইলে দক্ষিণ-য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে এবং পশ্চিম ও উত্তর-য়ুরোপে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। কেবল ইটালীতে কিছু সৈন্য প্রবেশ করাইলে সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সমর্থকদিগকে সাময়িক ভাবে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু উহাতে সামরিক উদ্দেশ্য বিশেষ সাধিত হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আশার কথা শুনাইয়াছেন—সিসিলিতে

প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহারা বিভিন্ন দিকে আক্রমণ প্রসারিত করিবেন; ফ্রান্সও তাঁহাদের অন্যতম ক্ষেত্রস্থল। এই সম্পর্কে আর একটি সুলক্ষণ—সিসিলি অভিযানে ফরাসী সৈন্ত যোগ দেয় নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বিপন্ন ফ্রান্সকে ইটালী পশ্চাদ্দিক হইতে ছুরিকাঘাত করিয়াছিল। সেই ইটালীর বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিবার জন্ম ফরাসী সেনার আগ্রহ স্বাভাবিক। কিন্তু তাহারা এই প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ লয় নাই। সঙ্গত ভাবেই মনে করা যাইতে পারে, ফরাসী সেনাবাহিনী তাহাদের মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামে নিযুক্ত হইবার জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে।

সুদূর প্রাচী—

অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে নিউ গিনিতে ও সলোমন্‌সে সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণাত্মক তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। নিউ গিনিতে নেসো উপসাগরে সম্মিলিত পক্ষের সেনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; উত্তর উপকূলে জাপানের বিশাল ঘাঁটী স্যালামুয়া এখন একরূপ পরিবেষ্টিত। এই অঞ্চলে স্যালামুয়া ও লে অধিকারই সম্মিলিত পক্ষের আশু লক্ষ্য। সলোমন্‌সে নিউ জর্জ্জিয়ায় মার্কিণী সেনা সাফল্যজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে। তথায় মুণ্ডা জাপানের একটি প্রধান ঘাঁটী, মুণ্ডা এখন প্রায় পরিবেষ্টিত, হয় ত তাহার পতনও আসন্ন। মুণ্ডা অধিকারে সমর্থ হইলে সম্মিলিত-পক্ষ এখন উত্তর দিকে বুগাঁভিলের উদ্দেশ্যে আক্রমণ প্রসারিত করিবেন। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে নিউ বৃটেনের রবাউল জাপানের বিশালতম নৌ ও বিমান ঘাঁটী। এখান হইতেই তাহার প্রধান প্রধান আক্রমণ চালিত হইয়া থাকে। জেনারল ম্যাক্-আর্থারের শেষ লক্ষ্য এই রবাউল।

সম্মিলিত পক্ষের এই আক্রমণাত্মক-তৎপরতা প্রধানতঃ প্রতিরোধমূলক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপ হইতে ধীরে ধীরে জাপানীদিগকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ও ফিলিপাইনের উদ্ধার এবং জাপানে আক্রমণের প্রসার কার্য্যকরী পরিকল্পনা নহে। তবে, অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপান বিতাড়িত হইলে অষ্ট্রেলিয়ার সমূহ বিপদ দূরীভূত হইবে। আর এই অঞ্চলে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীতে জাপান এখন প্রতিষ্ঠিত, উহা ব্যবহারের সুবিধা পাইলে সম্মিলিত-পক্ষ জাপানের নৌ ও বিমান-শক্তিতে প্রবল আঘাত হানিতে পারিবেন।

সম্প্রতি জনরব রটিয়াছিল যে, জাপান মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে সৈন্ত-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছে; রুশিয়ার বিরুদ্ধে তাহার আক্রমণ আসন্ন। এই জনরবে অধিক গুরুত্ব আরোপের সঙ্গত কারণ নাই। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত-পক্ষের উদ্যত খড়্গ উপেক্ষা করিয়া রুশিয়ার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করিতে যাওয়া এখন জাপানের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। অবশ্য, সম্প্রতি ইরাণ হইতে রুশিয়ার মধ্য দিয়া চীনে সাহায্য পৌছিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার জন্ম জাপান হয় ত উৎকণ্ঠিত। তবে, এই সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সে রুশিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবে না। বিমান-আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়াই হউক, আর স্থলপথে সৈন্ত পরিচালনা করিয়াই হউক, সে চীনের মধ্যেই ঐ পথ বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইবে।

জাপান অত্যন্ত কৌশলে তাহার প্রকৃত অভিসন্ধি গোপন রাখিতেছে। সে যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া প্রতিরোধ-নীতি অবলম্বন করে নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। চীনে তাহার কূটনীতিক কৌশল সফল হইবে বলিয়াই জাপান আশা করে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—জাপান নান্‌কিং সরকারের সাহায্যে অবরুদ্ধ চুংকিংএর সমর্থকদিগকে প্রভাবান্বিত করিতে প্রয়াসী। সম্প্রতি মাদাম চিয়াং-কাই-সেক্ অটোয়ায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। মাদাম্ চিয়াং বলিয়াছেন—অবরুদ্ধ চীন আজ ৬ বৎসর চরম দুঃখ সহিয়াছে; আর তাহারই পার্শ্বে নান্‌কিং জাপানের সাহায্যে ক্রমেই পুষ্ট হইতেছে। আর জাপান অবিরাম প্রচারকার্য্য চালাইতেছে যে, সে চীনাদিগের মিত্র—চীনাদিগের উৎপীড়কগণকেই সে কেবল শাস্তি দিতে চাহে; যে জাপান প্রথমে চীনাদিগের প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, সেই এখন চীনাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ মাদাম্ চিয়াং বলেন—হংকংএ ধৃত ইংরেজদিগের প্রতি জাপানীরা দুর্ব্যবহার করিয়াছিল বটে; কিন্তু চীনাদিগের প্রতি তাহারা সদ্ব্যবহার করে। মাদাম্ বলেন—জাপানীদের এই প্রচার-কৌশল অত্যন্ত ভয়াবহ।

সম্মিলিত পক্ষ আশা করেন—য়ুরোপে যুদ্ধের অবস্থা যখন তাঁহাদের অনুকূল হইতেছে, তখন ভারত মহাসাগরে নৌবহর স্থানান্তরিত করিয়া সত্বর ব্রহ্ম অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। ব্রহ্মদেশ মুক্ত হইলে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া জাপানকে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করা যাইবে। সম্মিলিত-পক্ষের এই পরিকল্পনা অনুসারে তৎপরতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই জাপান চুংকিংকে সমর্থকশূন্য নিঃসঙ্গ করিবার জন্ম প্রয়াসী হইয়াছে।

এই সময়ে—বর্ষা অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম-অভিযানের ঘাঁটী পূর্ব্ব-ভারতে জাপানের আঘাত পতিত হইবার সম্ভাবনাও উপেক্ষা করা যায় না। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অভিযান পরিচালনের জন্ম নৌশক্তির বিশেষ প্রয়োজন। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রয়োজন মিটাইয়া জাপান বর্ত্তমানে ভারতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনানুরূপ নৌবাহিনী প্রয়োগ করিতে পারিবে কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে, ইহা সত্য—জাপান যদি আপাততঃ ভারতের উদ্দেশ্যে সৈন্ত পরিচালনে অসমর্থও হয়, তাহা হইলেও সম্মিলিত-পক্ষের পরিকল্পিত ব্রহ্ম-অভিযান ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে সে পূর্ব্ব-ভারতে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইবে। গত শীতকালে জাপানের বিমান-আক্রমণের যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহার দ্বারা জাপানের আক্রমণ শক্তির পরিমাপ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। সম্প্রতি জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারল টোজোর সিঙ্গাপুর এবং প্রাচ্য অঞ্চলের অন্যান্য রণক্ষেত্র পরিদর্শন হয় ত অর্থশূন্য নহে। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালিত করিতে হইলে সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুণ ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জই সে অভিযানের প্রধান ঘাঁটী হইবে। আসাম বা বাঙ্গালার পূর্ব্ব-সীমান্ত দিয়া কেবল স্থলপথে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চলিতে পারে না।

১১।৭।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

লাট পরিবর্ত্তন

লর্ড লিন্‌লিথগোর কার্য্যকাল—৫ বৎসর—অতীত হইয়া গিয়াছে; তাহার পরেও তাঁহাকেই ভারতবর্ষের বড়লাট পদে রাখা হইয়াছে। যুদ্ধ যে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ, তাহা বলা বাহুল্য। তবে লর্ড লিন্‌লিথগোর কার্য্যকাল যে ভারতবাসীর দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে সাফল্যমণ্ডিত তাহা বলা যায় না। তিনি বড়লাট হইয়া আসিবার পূর্ব্বে ভারতীয় কৃষি কমিশনে সভাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন। আমরা সেই জন্য আশা করিয়াছিলাম, তিনি বড়লাট হইয়া আসিয়া সেই কমিশনের নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করিবেন এবং তাহাতে এই কৃষিপ্রাণ দেশের লোকের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু আমাদিগের সে আশাও পূর্ণ হয় নাই। বড়লাট হইয়া আসিয়া তিনি এ দেশে গোজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হইয়াছে, বলা যায় না। তিনি স্বয়ং রক্ষণশীল দলের রাজনীতিক। সেই জন্য তিনি ভারতবাসীর রাজনীতিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন করিতে পারেন নাই। বিশেষ যুদ্ধ ও তাহার পর কংগ্রেসী আন্দোলন যেন তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছে।

এত দিনে তিনি বিদায় লইতেছেন। তাঁহার স্থানে কে নিযুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া কয় মাস কাল বিশেষ আলোচনা ও অনুমান চলিয়াছিল। ৪ঠা আষাঢ় সব সন্দেহের অবসান হইয়াছে। ঐ দিন বিলাতী সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতের জঙ্গীলাট সার আর্চিবল্ড ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হইয়া আগামী অক্টোবর মাস হইতে লর্ড লিন্‌লিথগোর স্থানে কার্য্য করিবেন। আর সার আর্চিবল্ডের স্থানে সার ক্লড অচিনলেক ভারতের জঙ্গীলাট হইলেন।

এই সঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। স্থির হইয়াছে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার দায়িত্ব হইতে জঙ্গীলাটকে অব্যাহতি দিয়া ঐ কার্য্যের জন্য "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কমাণ্ড" নামক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইবে। অর্থাৎ নূতন দপ্তর ও নূতন পদ সৃষ্ট হইবে। আমাদিগের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি, এ দেশে নূতন পদ সৃষ্ট হইলে তাহা আর রহিত হয় না। সুতরাং এ বার যে নূতন পদ সৃষ্ট হইতেছে—জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলেও তাহা যাইবে কি না—অর্থাৎ তাহা আরব্য উপন্যাসের সাগরিক বৃদ্ধের মত ভারতের স্কন্ধে চাপিয়া থাকিবে কি না, তাহা বলা যায় না। তবে পদের সৃষ্টি বা বিলোপ কিছুই ভারতবাসীর মতসাপেক্ষ নহে। বিশেষ বর্ত্তমানে তাহার আলোচনা করিয়া কোন ফল নাই; ভবিষ্যতেও থাকিবে কি না, বলা যায় না।

সার আর্চিবল্ড ভাইকাউণ্ট হইয়া বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায়-ভুক্ত লর্ড ওয়াভেল হইয়াছেন।

এই নিয়োগের বৈশিষ্ট্য—এত দিন রাজনীতিকদিগকেই ভারতের বড়লাট করা হইত; এমন কি লর্ড কিচেনারের বড়লাট হইবার বাসনা থাকিলেও তৎকালীন ভারত-সচিব তাহাতে সম্মত হন নাই। এ বার জঙ্গীলাটকে বড়লাট করা হইল। নূতন পদের কার্য্যে তিনি যে অনভিজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই জন্য কয় মাস কাল তিনি ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠ লইবেন। তিনি ইতোমধ্যেই তাহা আরম্ভ করিয়াছেন।

যদিও বলা হইয়াছে, এই নিয়োগ সাময়িক ব্যবস্থা নহে; তথাপি এ কথা বলা অসঙ্গত হইতে পারে না যে, পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা যদি ভারতবর্ষও স্পর্শ না করিত—জাপানের সহিত যুদ্ধে ভারতবর্ষ যদি কেবল বৃটেনের নহে, সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের প্রধান ঘাঁটী না হইত—চীনকে সাহায্যদান যদি ভারতবর্ষ হইতেই করিতে না হইত—ব্রহ্ম পুনরধিকার-চেষ্টা যদি ভারতবর্ষ ব্যতীত হইতে পারিত—তবে জঙ্গীলাটকে বড়লাট নিযুক্ত করা হইত কি না—সন্দেহ।

লর্ড ওয়াভেলের রাজনীতিক মতের পরিচয়দানের অবসর এত দিন ঘটে নাই। তবে আমরা জানি, সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যখন বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতীয় নেতৃগণকে দেশরক্ষা ব্যাপারে জঙ্গীলাটের সহিত আলোচনা করিতে বলা হইয়াছিল এবং তাহাতে ভারতীয় নেতৃগণ এই বিশ্বাস লইয়া আসিয়াছিলেন যে, সার আর্চিবল্ড ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত-শাসন—দেশরক্ষার অধিকার দিতে আগ্রহশীল নহেন। সুতরাং মনে করা অসঙ্গত নহে যে, বিলাতের বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী ও বর্ত্তমান ভারত-সচিব যে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, তাঁহারা সেই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক বুঝিয়াই লর্ড ওয়াভেলকে লর্ড লিন্‌লিথগোর পরে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিলেন। ইংরেজ কবি মিল্টন যেমন তাঁহার কাব্যরচনার আরম্ভে তাঁহার যাহা অন্ধকার আছে তাহা আলোকিত করিবার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ চাহিয়াছিলেন—তেমনই লর্ড ওয়াভেলের যেটুকু অজ্ঞতা আছে, তাহা তিনি ইণ্ডিয়া আফিসে শিক্ষায় দূর করিতে পারিবেন।

প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের কৈফিয়ৎ

২০শে আষাঢ় কয় মাস পরে নূতন সচিবসঙ্ঘের কার্য্যকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়া ২১শে আষাঢ় শেস হইয়াছে। প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের অবসানের কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। বাঙ্গালার গভর্ণর খাদ্য-সমস্যার গুরুত্ব দেখাইয়া ব্যবস্থা পরিষদের আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘের অবসান ঘটাইয়া মসলেম লীগ-প্রভাবিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করাইয়া ৩ সপ্তাহের কিছু অধিক কাল শাসনকার্য্যের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন সচিবসঙ্ঘ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিতে বিরত থাকায়—

(১) পরিষদের পক্ষে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের সম্বন্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় নাই

(২) সচিবসঙ্ঘকে অননুমোদিত ব্যয় করিতে দেওয়া হইয়াছে

(৩) প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের পক্ষে পদত্যাগের জন্য কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ ঘটে নাই।

এ বার অধিবেশনের আরম্ভে প্রাক্তন প্রধান-সচিব প্রভৃতি তাঁহাদিগের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে চাহিলে নিয়মের কথা তুলিয়া বর্ত্তমান প্রধান-সচিব তাহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু পার্লামেণ্টে প্রচলিত প্রথা—পদত্যাগী প্রধান-মন্ত্রী বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন। সেই নজিরে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি মিষ্টার ফজলুল হক ও তাঁহার

সহ-সচিবদিগের বিবৃতিদানের অধিকার স্বীকার করিলে প্রথমে মিষ্টার হক ও তাহার পর শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিবৃতি প্রদান করেন। মিষ্টার হকের বিবৃতি দীর্ঘ। সে বিবৃতি বাঙ্গালার গভর্ণরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-তালিকা—জনগণের নিকট অভিযোগের আর্জ্জি বলিলে অসঙ্গত হয় না। তিনি বলিয়াছেন, তিনি সার জন হার্বার্টের সম্বন্ধে গুরু অভিযোগসমূহ উপস্থাপিত করিলেন; সার জনের পক্ষে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বা পরিষদে তাঁহার বক্তব্য ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দেশে জনমতের মর্য্যাদা বিদেশী শাসকগণ স্বীকার করেন না, সে দেশে যে গভর্ণর তাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন, এমনও মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

তবে যতক্ষণ সার জন ঐ সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন না করিবেন, ততক্ষণ লোক মনে করিবে—এ দেশে যে শাসন-পদ্ধতিকে বৃটিশ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বলিয়া পরিচিত করেন, তাহা গণতন্ত্রানুমোদিত নহে—স্বায়ত্ত-শাসন হিসাবে তাহা "ধাপ্পা" বলা যাইতে পারে। কারণ, মিষ্টার হকের অভিযোগ—যদিও বলা হইয়াছিল, যে সকল বিভাগের ভার সচিবদিগের, গভর্ণর সে সকলে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তথাপি সার জন পদে পদে সেরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং তাহাতে বাঙ্গালা সরকারের আর্থিক ক্ষতিও হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন স্বৈর-শাসন ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। প্রথমে—স্বতন্ত্র ভাবে পদত্যাগ করিয়া ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই কথাই বলা হইয়াছিল। কিন্তু মিষ্টার ফজলুল হক যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি ভিত্তিহীন না হয়, তবে শ্যামাপ্রসাদের বিবৃতির পরেও সার জনের ব্যবহার ও মনোভাব সংশোধিত হয় নাই; বোধ হয় লর্ড লিনলিথগোও তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই।

মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন—প্রথমাবধিই সার জন প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের বিরোধী ছিলেন। অথচ সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া সেই সচিবসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার পরিচালনা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সম্মিলিত ভাবে করা হয়। মিষ্টার হকের অনুযোগ, সার জন মুসলেম লীগ-প্রভাবিত সচিবসঙ্ঘের পক্ষপাতী এবং সেই জন্য—নূতন সচিবসঙ্ঘের ১৩ জন সচিব, ১৩ জন পার্লামেণ্টারী, ৪ জন অতিরিক্ত "হুইপ" মঞ্জুর করিয়া—ব্যয় বর্দ্ধিত করিলেও প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘকে বিস্তার লাভ করিতে দেন নাই এবং ৭ জন মাত্র সচিবকে এক জন মাত্র পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী দেওয়া হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে—সার জন চাউল অপসারণের ব্যবস্থায় সচিবদিগের সহিত পরামর্শও করেন নাই এবং তাঁহার ব্যবস্থায় বাঙ্গালা সরকারের যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অল্প নহে। সার জন সচিবদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া এক জন ইংরেজ ব্যবসায়ীকে ও এক জন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীকে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, পরন্তু নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের কার্য্যে সচিবগণ কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। সে বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া মিষ্টার হক তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি মিষ্টার হককে বিবৃতি প্রদানকালে তাহা পাঠ করিতে নিষেধও করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের রাজকর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত হইলে মিষ্টার হক যখন সে বিষয়ে তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তখন সার জন সে জন্য তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করেন। মিষ্টার হকের অভিযোগ পাঠ করিয়া মান্দ্রাজের 'হিন্দু' পত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ সকল যদি ভিত্তিহীন না হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে—সার জন হার্বার্ট গভর্ণরের পদে থাকিবার যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। খাদ্য-দ্রব্য-সমস্যার সমাধানে সার জন যে কায করিয়াছেন, তাহাও প্রশংসনীয় বলা যায় না। মিষ্টার হক পত্রের নকল নজীররূপে প্রদান করিয়া তাঁহার অভিযোগ প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। কাযেই যদি সার জন অভিযোগসমূহ ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন করিতে না পারেন, তবে লোক সে সকল অভিযোগ সত্য বলিয়াই মনে করিতে পারে। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সর্ব্বতোভাবে মিষ্টার ফজলুল হকের অভিযোগের সমর্থন করিয়াছেন। সার জন যদি তাহার কোন কৈফিয়ৎ না দেন, তবে তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে হইবে—তিনি লোকমতের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না, সুতরাং তিনি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত করিবার অযোগ্য।

বাঙ্গালার বাজেটের ভাগ্য

যে সময় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার বাজেটের আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় সমগ্র বাজেট পরিষদে গৃহীত হওয়া পর্য্যন্তও অপেক্ষা না করিয়া বাঙ্গালার গভর্ণর তৎকালীন সচিব-সঙ্ঘের অবসান ঘটান। তাহার পর যত দিন তিনিই শাসনের সকল বিভাগের পরিচালনা করিয়াছিলেন, তত দিন তিনি ব্যয় মঞ্জুর করিবার অধিকারী হইলেও যে দিন হইতে আবার সচিবসঙ্ঘ কায়েম করা হইয়াছে, সেই দিন হইতে সরকার বাজেটের অনুমোদিত ব্যয় ব্যতীত ব্যয় করিতে পারেন না। সেই জন্য ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা অনিবার্য্য হয়। সরকার পক্ষ পরিষদে বাজেটের অবশিষ্ট অংশ পেশ করিতে চাহেন। কিন্তু ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন—যে সময় গভর্ণর ব্যয়ের জন্য দায়ী ছিলেন, সে সময়ে কত ব্যয় হইয়াছে, তাহা না জানিলে পরিষদ কখনই সমগ্র ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারেন না। বিস্ময়ের বিষয়, এই সহজ কথা বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘের ও গভর্ণরের বোধগম্য হয় নাই। ব্যয়ের অবস্থা ও পরিমাণ না জানিয়া—বাজেটের এক ভগ্নাংশের ব্যয় মঞ্জুর করা যে অসম্ভব তাহা বুঝিয়া পরিষদের সভাপতি ঐরূপ বাজেট পেশ করিতে দিতে অসম্মত হন। ফলে বিনা বাজেটেই কায চলিতেছে এবং বর্ত্তমান প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—তাঁহাদিগকে "অননুমোদিত" ব্যয় করিয়া যাইতে হইবে। অননুমোদিত ব্যয় সরকার করিতে পারেন কি না—অর্থাৎ ভারত-শাসন আইনের নির্দ্দেশে তাহা হইতে পারে কি না, তাহা এখন বিচার্য্য হইবে। তবে সে বিচার আদালতে হইবে, কি একাউণ্টেণ্ট-জেনারলের মতানুসারে হইবে, তাহা দ্রষ্টব্য। জানা যাইতেছে, এ বিষয়ে বাঙ্গালার এড-ভোকেট-জেনারল যে যুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, পরিষদের সভাপতি

তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন না কি বাঙ্গালা সরকার বড়লাটের মারফতে এ বিষয় ভারত-সচিবের গোচর করিয়া তাঁহার নির্দ্ধারণের জন্য অপেক্ষা করিবেন। বাস্তবিক যদি বিনা বাজেটে সরকারের কায চালান সম্ভব হয়—যদি "অনমুমোদিত" ব্যয় করা যায়—তবে ব্যয়বহুল সচিবসঙ্ঘ, ব্যবস্থা পরিষদ, ব্যবস্থাপক সভা এ সকলের সার্থকতা কি? প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের সহিত ব্যবহারে বাঙ্গালার গভর্ণর দেখাইয়াছেন—এ দেশে স্বৈরশাসন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের ছদ্মবেশে গণতন্ত্রকে ভুল বুঝায়; আর এখন তাঁহার সৃষ্ট সচিবসঙ্ঘ "অনমুমোদিত" ব্যয় করিতেছেন! একাউণ্টেণ্ট-জেনারল যদি ঐরূপ ব্যয় মঞ্জুর করিতে অসম্মত হন, তবে কি গভর্ণর তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতায় তাহা মঞ্জুর করিতে পারেন? যখন ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা বাতিল হয় অর্থাৎ যখন তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বাজেট মঞ্জুর করার অধিকার ব্যবস্থা পরিষদের হয়। সে নিয়ম কি বাঙ্গালায় লঙ্ঘিত হইতে পারে? বাজেটের প্রত্যেক অংশ ব্যবস্থা পরিষদে আলোচিত হয় এবং পরিষদ যে বাজেট মঞ্জুর করেন, তদনুসারেই সচিবসঙ্ঘ ব্যয় করিতে পারেন। এমন কি যে সচিবসঙ্ঘ একখানি সংবাদপত্রকে টাকা দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন সে সচিবসঙ্ঘকেও সে ব্যয় পরিষদে মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইয়াছিল। ব্যবস্থা পরিষদে যে বাজেট মঞ্জুর হয় নাই, সে বাজেটকে বাজেট বলা যায় না। সে অবস্থায় সরকারের ব্যয় কিরূপে চলিতে পারে? যে সময় গভর্ণর শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিয়াছেন, সে সময় যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার হিসাব কি তাহার পর দুই মাসেও করা সম্ভব হয় নাই? এ সবই বিস্ময়কর ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। বাজেট না হইলে—যে সকল বিভাগের ব্যয় মঞ্জুর হয় নাই, সে সকল বিভাগের কর্ম্মচারীরা কিরূপে বেতন পাইতে পারেন, তাহাও জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। এই অবস্থায়ও যে বাঙ্গালায় আবার ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করা হইল না, তাহাতে মনে হয়—ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশে তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার উদগ্র আগ্রহেই—নিয়মানুগ ব্যবস্থা করিতে না পারিলেও—বাঙ্গালায় তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে।

আইন ও বে-আইনী

সরকারের অর্ডিনান্স-বলে যে সকল "স্পেশাল" আদালত—ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে গৃহের মত দেখা গিয়াছিল, সে সকল আইনতঃ সিদ্ধ কি না, তাহা বিচার্য্য হইলে প্রথমে কলিকাতা হাই-কোর্ট তাহা অসিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তাহার পর বাঙ্গালা সরকার সেই নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে ফেডারল কোর্টে আপীল করিলে সে আপীল যখন অগ্রাহ্য হয়, তখন সরকার তাড়াতাড়ি আবার এক অর্ডিনান্স জারি করেন। সেই অর্ডিনান্সে আদালতের নির্দ্ধারণের সম্ভ্রম আংশিকরূপে রক্ষা করা হয়—ঐ জাতীয় আদালতের বিলোপ সাধন করা হয় এবং নির্দ্ধারণ দান করা হয়—যে সকল আসামী ঐরূপ আদালতে বিচারাধীন, তাহাদিগের বিচার সাধারণ আদালতে হইবে। এ পর্য্যন্ত ভাল কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফতোয়া দেওয়া হয়—যে সকল বিচার ঐরূপ আদালতে হইয়া গিয়াছে, সে সকল বিচার সাধারণ আদালতের বিচার বলিয়া বিবেচিত হইবে। অর্থাৎ যে আদালত আইনতঃ অসিদ্ধ তাহার বিচার আইনতঃ সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। ইহা সঙ্গত কি না, তাহা কলিকাতা হাইকোর্টে বিবেচিত হইয়াছে—অর্থাৎ পুরাতন অর্ডিনান্স বাতিল করিয়া যে নূতন অর্ডিনান্স জারি করা হইয়াছে, তাহা সিদ্ধ কি না—তাহারই বিচার হইয়াছে। বিচারে চীফ জাষ্টিস ও মিষ্টার জাষ্টিস খোন্দকার অর্ডিনান্সের শেষাংশ সিদ্ধ বলিয়াছেন—অর্থাৎ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ জাতীয় আদালতে যে সকল মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে, সে সকল মামলার বিচার সাধারণ আদালতে হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে। কিন্তু মিষ্টার জাষ্টিস সেন সে মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন—যে সকল আদালত আইনতঃ অসিদ্ধ, সে সকল আদালতের বিচার কখনই সিদ্ধ আদালতের বিচার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তাঁহার কথা—মাথা যদি না থাকে, তবে মাথা-ব্যথা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। মিষ্টার জাষ্টিস সেন যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন—অপর দুই জনের রায়ে সে যুক্তি খণ্ডিত হয় নাই।

বন্দীর মুক্তি

বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় রাজনীতিক কারণে বন্দীর সংখ্যা অল্প নহে—১ হাজার ৭ শত। প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘ এই সকল বন্দীর মধ্যে কতকাংশকে মুক্তি প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; কারণ, পুলিস তাহাতে সম্মত হয় নাই। শেষে তাঁহারা যখন পদত্যাগ করেন, তখন তাঁহারা ৫ শত বন্দীকে মুক্তিদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ গঠনের প্রাক্কালে প্রধান-সচিব যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের মুক্তি, তাঁহাদিগের পরিজনগণের বৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে সহানুভূতি সহকারে বিবেচনার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের পূর্ব্ববর্ত্তী যে সচিবসঙ্ঘে বর্ত্তমান প্রধান-সচিব স্বরাষ্ট্র-সচিব ছিলেন, সেই সময় যখন ভারত সরকার রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের স্বজনগণের ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন তিনিই তাহাতে আপত্তি করিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই জন্য এ বার যে সচিবসঙ্ঘ প্রায় এক শত বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন ও বন্দীদিগের স্বজনগণের ভাতা বর্দ্ধিত করিতেছেন বলিয়াছেন, ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু তাহা "ধাপ্পা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তবে দেখা যাইতেছে, যে সকল ব্যক্তিকে এখন মুক্তিদানে পুলিসের আপত্তি হইতেছে না, তাঁহাদিগেরই প্রধানদিগের মুক্তির প্রস্তাব প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘ করিলে তাহাতে বিশেষ আপত্তি হইয়াছিল! কেবল তাহাই নহে, যাঁহাদিগের মুক্তিদান প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের অভিপ্রেত ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেককে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে মিসেস নেলী সেন গুপ্তা বন্দীদিগকে মুক্তিদানের যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা উপলক্ষ করিয়া সচিবদলের পক্ষীয় মিষ্টার আব্দর রহমন সিদ্দিকী বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের কার্য্যের সমর্থক এক সংশোধক প্রস্তাবও

উপস্থাপিত করেন। প্রস্তাব আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হয়—প্রস্তাব সম্বন্ধে ভোট গৃহীত হয় নাই।

কিন্তু প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে যে সকল কথা জানা গিয়াছে, সে সকল বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিবার—যাঁহারা এখনও বন্দিদশায় কালক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বয়স ৭০ বৎসর এবং তিনি অসুস্থ। তথাপি তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইতেছে না। এক জন ডাক্তারের আয় মাসিক দেড় শত টাকা থাকিলেও তাঁহাকে বন্দী করার বহু দিন পরে মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল! সম্প্রতি বন্দীদিগকেও স্থানান্তরিত করিবার সময় হাতকড়া দিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

কেবল পূর্ব্বোক্ত কথাই নহে। বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ যে সকল বন্দী হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মুক্তির আদেশের সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ নং রেগুলেশন জারি করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখিতেছেন।

মেদিনীপুর জেলে না কি রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগকেও ঘানী ঘুরাইতে হইয়াছে। কখন্ এই ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ পায় নাই। তবে আমরা দেখিয়াছি, মেদিনীপুরে যখন রাজনীতিক কারণে হাঙ্গামা প্রবল হয়, তখন যে ব্যক্তি তথায় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—তিনি যে আপনার সম্ভ্রম সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণাবশে অনাচার করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারকের মন্তব্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

খাদ্য-সমস্যা

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা দিন দিন তীব্র ও জটিল হইয়া উঠিতেছে। প্রাক্তন সচিব-সঙ্ঘের দোষ দেখাইয়া বা বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘকে দায়ী করিয়া সে সমস্যা সমাধানের আশা নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা রক্ষা পাইতে পারি, তাহাই বিবেচ্য। প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘ বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অভাব স্বীকার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ যত দিন পারিয়াছেন, সেই সত্য গোপন করিয়াছেন —বলিয়া আসিয়াছেন—অভাব নাই। তাঁহারা এই মতের সমর্থনে হিসাবও দাখিল করিয়াছেন! কিন্তু সে হিসাব যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা অল্প দিনের মধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন—অভাব আছে এবং লোককে অল্প আহার করিয়া—দুই বেলা না জুটিলে এক বেলা খাইয়া বাঁচিতে হইবে! অথচ কি পরিমাণ আহার ব্যতীত দেহ কর্ম্মক্ষম থাকে না, তাহা তাঁহারা বলিতেছেন না এবং সেই আহার যোগাইতে পারিতেছেন না! তাহার পর তাঁহারা পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিতেছেন; কোন পরীক্ষাই সফল হইতেছে না। তাঁহাদিগের কোন্ কোন্ পরীক্ষায় কিরূপ ফল ফলিতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া কায করা প্রয়োজন। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। খাদ্য-সচিব মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, ভারত সরকার বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই প্রদেশচতুষ্টয়ে "পূর্ব্বাঞ্চল" গঠিত করিয়া ও তাহাতে খাদ্য-শস্যের অবাধ বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত করিয়া খাদ্য-শস্য ক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে বলায় তিনি ইস্পাহানী কোম্পানীকেই সে ভার দিয়াছেন। তিনি ইস্পাহানী কোম্পানীর যত প্রশংসাই কেন করুন না—তিনি যে এ বিষয়ে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের যে দুর্ভিক্ষে ("ছিয়াত্তরের মন্বন্তর") বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে তৎকালীন শাসক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে এমন অভিযোগও উপস্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহারা দেশে সমস্ত শস্য লইয়া দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহারা যে মূল্যে শস্য কিনিয়াছিল, তাহার আট দশ দ্বাদশ গুণ মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তাহারা—ইচ্ছামত মূল্য দিয়া কৃষকদিগের সামান্য সঞ্চিত শস্য লইয়াছিল,—যে সকল নৌকায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাউল আসিতেছিল, সে সকল ধরিয়া চাউল লইয়াছিল, কৃষকদিগকে বীজ-ধানও বিক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সমগ্র সরকারের বিরুদ্ধে আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শস্যের ব্যবসা করার অভিযোগ শুনা গিয়াছিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাই এই সকল অপরাধে অপরাধী ছিলেন।

এ বার যাহাতে তাহা হইতে না পারে, সে জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে? সে বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার লোককে কিছুই জানান নাই।

কেন্দ্রী সরকার আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারা দুর্দ্দিনে বাঙ্গালাকে সাহায্য করিতে কার্পণ্য করিবেন না। কিন্তু সে আশা কত দূর ফলবতী হইবে, তাহা কে বলিবে? সে দিন ব্যবস্থা পরিষদে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাঞ্চল" সৃষ্টির পূর্ব্বে কেন্দ্রী সরকার বাঙ্গালাকে ৫ লক্ষ টন খাদ্য-শস্য (চাউল, গম প্রভৃতি) প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাহার কি হইয়াছে? সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই। তাহার পর বলা হয়, কেন্দ্রী সরকার বাঙ্গালার জন্য ৫ কোটি টাকার খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন। তাহা কোথায় সঞ্চিত হইয়াছে? চাউলের যখন অভাব থাকে না, তখনই বাঙ্গালায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন গমের প্রয়োজন হয়, এখন চাউলের যেরূপ অভাব, তাহাতে অনেক অধিক গমের প্রয়োজন অনিবার্য্য। অথচ সমগ্র ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাতে মোট প্রায় ২ লক্ষ ২৪ হাজার টন গম দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার এক-চতুর্থাংশের অধিক গম পাওয়া যায় নাই। তদ্ভিন্ন বাজরা প্রভৃতি এ বৎসর মোট ২ লক্ষ টন দেওয়া হইবে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত—অর্থাৎ জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ১০ হাজার টনের অধিক ঐ সকল শস্য লাভ বাঙ্গালার ভাগ্যে ঘটে নাই।

মিষ্টার সুরাবর্দ্দী যখন এই হিসাবের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই, তখন ইহাই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে কি অবস্থা অনিবার্য্য? চাউলের আশা কোথায়? বিহার যে বাঙ্গালাকে সাহায্য করিবে—এমন আশা নাই বলিলেই হয়। উড়িষ্যায় চাউল রপ্তানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে এবং উড়িষ্যায় খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন, উড়িষ্যায় (খাস উড়িষ্যায় ও উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্যসমূহে) বাহিরে দিবার মত যে চাউল ছিল, তাহা ইতোমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। উড়িষ্যা আপনি উপবাস করিয়া অপরের অন্ন যোগাইবে না। ইতঃপূর্ব্বেই উড়িষ্যার প্রধান-সচিব এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছিলেন, বাঙ্গালার জন্য ক্রীত বলিয়া বাঙ্গালার সচিব যে চাউল ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিলেন,

তাহা উড়িষ্যা সরকার উড়িষ্যার প্রয়োজনে আটক করিয়াছিলেন। এই চাউল কে বা কাহারা কিনিয়াছিল এবং কি দরে কিনিয়াছিল ?

আসামের ব্যাপারটি রহস্যাচ্ছন্ন। কারণ, আসাম সরকার বাঙ্গালা হইতে লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল কিনিয়াছেন এবং তাহার মূল্য বাঙ্গালা সরকারের মারফতে প্রদান করা (মেসার্স স ওয়ালেস কোম্পানীকে ?) হইয়াছে! আবার আসামের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—আসামের যে অংশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই অংশে যে ইস্পাহানী কোম্পানী চাউল কিনিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে আসামের প্রধান-সচিবের এক পুত্র কোম্পানীর লোকের সহগামী ছিলেন।

সুতরাং কি হইবে ?

সম্প্রতি শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুত হরিচরণ ঘোষ যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখান হইয়াছে, বাঙ্গালার অভাবের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য-শস্য প্রয়োজন, তাহা পাইবার আশা নাই।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে, সে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আনিতে যত মালগাড়ী প্রয়োজন, তাহাও সরকার যোগাইতে পারেন না। জ্বালানী কয়লার আমদানী সম্পর্কেও আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, তিনি "জ্ঞানপাপী" হইলেও অপরাধী নহেন! কারণ, অভাবের কথা বলিলে লোক ভয় পাইবে ও সঞ্চয়ে আগ্রহ করিবে বলিয়া তিনি অভাবের কথা বলিতেই চাহেন নাই এবং তিনি যে সংবাদ লইয়াছিলেন ও কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে সরবরাহের যে আশা পাইয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসে বলিতে পারিয়াছিলেন অভাব নাই বা থাকিবে না। বিশেষ খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে লোকে অল্প আহার করায় অভাব হ্রাস পাইতেছে!

খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে লোকের পক্ষে আহারের পরিমাণ হ্রাস করা যদি স্বস্তির কারণ হয়, তবে ত অনাহারে বহু লোকের মৃত্যুও আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে! একেই ত সার চার্লস এলিয়ট মন্তব্য করিয়াছেন—"আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমাদিগের (ইংরেজের শাসনাধীন ভারতবর্ষের) কৃষকদিগের অর্দ্ধাংশের ক্ষুধা বৎসরে কখন পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না"—তাহার উপর আবার যখন খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে বহু লোক সেই স্বল্পাহারও স্বল্প করিতে বাধ্য হয়, তখন কি জীবিতগণ জীবন্মৃতই হয় না ?

যাহারা জীবিত হইলেও জীবন্মৃত, তাহাদিগের দ্বারা কি অধিক শস্যোৎপাদনের শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে ? সমগ্র জাতির অবস্থা তাহাতে কিরূপ হয় ?

কলিকাতায় কতকগুলি দোকানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল ও আটা পাওয়া যায়; কিন্তু যে স্থানে মাত্র সাড়ে চারি শত লোক প্রতিদিন তাহা পাইতে পারে, তথায় প্রতিদিন সহস্রাধিক ক্রেতার সমাবেশ হয়। যাহারা মূল্য দিয়া খাদ্য-দ্রব্য কিনিতে আইসে, তাহারা ভিখারীর অধম কষ্টভোগ করিতে বাধ্য হয়—জনতায় মৃত্যুর সংবাদও যে পাওয়া যায় না তাহা নহে।

মফঃস্বলে অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার আভাস ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের সমর্থক দলের সদস্য খাঁন বাহাদুর আবদুল ওয়াহেদ খাঁনের বিবৃতিতে পাওয়া যায়, যে বরিশাল বাঙ্গালার ধান্যের গোলা বলিয়া বিবেচিত হয়, তথায় তিনি কয়টি স্থানে স্বয়ং দেখিয়াছেন :—

বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোকদিগকে বিক্রয়ার্থ পটুয়াখালী লইয়া যাওয়া হইতেছে। কেহ কেহ স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছে। লো খাদ্যাভাবে অখাদ্য—এমন কি মৃত গরুর মাংসও আহার করিতেছে।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বার লোক মৃত গরু মাংসও খাইতেছে বলায় মিষ্টার সুরাবর্দ্দী তাঁহার নিন্দা করিয়াছিলেন এ বার তিনি খাঁন বাহাদুরের উক্তির প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই

আর যে দেশে সভ্য সরকার বিদ্যমান, সেই দেশে লোক স্ত্রী-কন বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে! ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছি তাহার ফলে লোক—"পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিয়াছিল—শেষে কিনিবা লোক পাওয়া যাইত না।" ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ক নহে—ইহা সরকারী দপ্তরের বিবরণ হইতে ইংরেজ ঐতিহাসিক কর্তৃ সঙ্কলিত বিবরণ। সে বার সেই দুর্ভিক্ষের পর ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—পুরাতন পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল

লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; তাহাদিগে বিক্ষোভের বহির্বিকাশ দেখা যাইতেছে না। তাহার কারণ, সা উইলিয়ম হাণ্টার বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর স্বভাবই এই যে, বাঙ্গাল নিঃশব্দে সহ্য করে—বিশেষ ঘরের কথা পরকে জানিতে দিতে চা না। সেই জন্য ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতেও গৃহস্থ-গৃহে মহিলারা অনাহারে তিলে তিলে মরিয়াছেন—তথাপি বাহির হইতে কোনরূপ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতাহেতু বর্দ্ধমানের মহারাজ নিজ গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন, বীরভূমের মহারাজ কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরের বৃদ্ধ রাজা কারাগার হইতে মুক্তি লাভের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ছিলেন—তিনি গৃহবিগ্রহ "মদনমোহন" বন্ধক দিয়াও আবশ্যক অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সে বার বাঙ্গালার আর্থিক জীবনে বিপ্লব ঘটিয়াছিল; এবার সামাজিক জীবনেও কি তাহাই হইতেছে না ?

প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘের যখন অবসান ঘটে, তখনই প্রদেশে খাদ্য দ্রব্যের অভাব অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু তখন চাউলের যে মূল্য ছিল, এখন তাহার তিন গুণেরও অধিক হইয়াছে। তখনই প্রধান-সচিব খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছিলেন, দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ কিরূপে বাঁচিয়া আছে, তাহা ভগবান্ই জানেন! আজ যদি বলা হয়, তাহারা অনাহারে মরিতেছে, তবে কি তাহা অত্যুক্তি হইবে ?

প্রাক্তন ও বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘের পরস্পরকে দোষ দিলে যে অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহা নহে। আর ওদিকে ভারতবাসীর সহিত সম্পূর্ণরূপে সহানুভূতিহীন ভারত-সচিব মিষ্টার আমেরী বিলাতের লোককে বুঝাইতেছেন—কৃষকগণ শস্য বাজারে ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় ও লোকের আয়-বৃদ্ধিতে অধিক আহারে ভারতে খাদ্য-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অথচ তিনিই কিছু দিন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ায় বাঙ্গালার অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়াছে। তাঁহার কোন্ কথায় লোক বিশ্বাস স্থাপন করিবে ? না—কোন কথাই বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য নহে। আমরা পূর্ব্বেই সার চার্লস এলিয়টের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। সার উইলিয়ম হাণ্টারও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—কৃষকের ঘরে সঞ্চয় থাকে না। আর আমরা

দেখাইতে পারি, ভারতে লোকের আয় ব্যয়ের তুলনায় বর্দ্ধিত না হইয়া হ্রাসই পাইয়াছে। তিনি বিলাতের লোককে যাহাই কেন বুঝাইবার চেষ্টা করুন না—অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা দেশের লোক বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছে।

তিনি কি এ বিষয়ে সরকারের (বৃটিশ সরকারেরও) দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারেন ?

বাঙ্গালা সরকারের খাদ্য-সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন, লোক যাহাতে আতঙ্কিত না হয়, সেই জন্য তিনি অভাবের বিষয় আলোচনা করিতে চাহেন নাই। কিন্তু লোক কি অনাহারেও অভাব বুঝিতে পারিতেছে না ?

এ দেশে যে সকল য়ুরোপীয় শোষণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ সহানুভূতিহীন তাহার পরিচয় ২১শে আষাঢ় ব্যবস্থা পরিষদে পাওয়া গিয়াছে। সে দিন যখন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "সরকারকে বাঙ্গালার জন্য বৃটিশ সরকারের ও ভারত সরকারের নিকট হইতে খাদ্য-দ্রব্য আনিতেই হইবে"—তখন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠেন—"টোজো (অর্থাৎ জাপান) তোমার বন্ধু।" বিরক্ত হইয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলেন—"য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমরা ঐরূপ উত্তরই পাইব, জানি। যদি য়ুরোপীয়দিগের সহিত ভারতে ১ শত ৭০ বৎসরের সম্বন্ধের পর বাঙ্গালাকে এই ভাবে অনাহারে মরিতে হয়, তবে যে অন্ততঃ য়ুরোপীয়রা আমাদিগের বন্ধু নহে—তাহাতে সন্দেহ নাই।" য়ুরোপীয় সদস্যটির নিষ্ঠুর উক্তির নানারূপ ব্যাখ্যাও করা যায়।

যখন বাঙ্গালার এই অবস্থা, তখনও বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বীকার করিয়া লোককে—দুর্ভিক্ষকালীন—খাদ্য সরবরাহের ভার গ্রহণ করিলেন না! অথচ বাঙ্গালার গভর্ণরের অনুমোদনে ১৩ জন সচিব ও ১৩ জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ও ৪ জন অতিরিক্ত "হুইপ" সরকারের ব্যয় বর্দ্ধিত করিয়া—"অননুমোদিত" ভাবে বেতন গ্রহণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহা যে গভর্ণরের ও সচিবদিগের দেশের লোকের দুর্দ্দশায় সহানুভূতির পরিচয় নহে, তাহা বলিতে দ্বিধাবোধের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্য বৃদ্ধির যে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হইয়াছে, তাহার পরিচয়ও আমরা পাইতেছি না।

কাযেই ভবিষ্যতের অন্ধকারে আশার ক্ষীণ আলোকও প্রতিভাত হইতেছে না।

আদালতের মান ও অপমান

কলিকাতার হাইকোর্ট ও ফেডারল কোর্ট ভারত-রক্ষা নিয়মের ২৬ দফা অসিদ্ধ বলায় কলিকাতা হাইকোর্ট যে সকল বন্দীকে মুক্তি দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে যে পুলিস ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনের বলে এজলাসে বা আদালতের অলিন্দে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আদালতের অপমান করা হইয়াছিল কি না, তাহা কলিকাতা হাইকোর্টে বিচার্য্য ছিল। বিচারে চীফ-জাষ্টিস ও মিষ্টার জাষ্টিস খোন্দকার সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই নিরপরাধ বলিলেও মিষ্টার জাষ্টিস মিত্র (শ্রীযুত রূপেন্দ্রনাথ মিত্র) দারোগা হাসান, গফুর ও জানভ্রিণকে আদালতের অবমাননার অপরাধে অপরাধী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

চীফ-জাষ্টিসের রায়ে তিনি স্বীকার করিয়াছেন বটে, শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের প্রতি অকারণ বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল (এডভোকেট জেনারেলও তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন) কিন্তু ফতোয়া দিয়াছেন—সে বিষয়ে নীহারেন্দু ও গ্রেপ্তারকারীদিগের সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে। আদালত-গৃহে ঐরূপ বল প্রযুক্ত হইয়া থাকিলেও তাহাতে আদালতের অপমান হয় নাই। আর দারোগা গফুর যাহা বলিয়াছিল, তাহাতেও আদালতের অপমান হয় নাই বলিয়া তিনি তাহাকে সদুপদেশ দিয়াছেন—ভবিষ্যতে সে যেন যাহা জানে তাহার মধ্যেই উক্তি সীমাবদ্ধ রাখে।

রূপেন্দ্র বাবু কিন্তু বলিয়াছেন :—

(১) দারোগা হাসান যাহা বলিয়াছে, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না।

(২) জানভ্রিণের এফিডেভিটে প্রকৃত কথা ঢাকিবার চেষ্টা আছে। তাহা সন্তোষজনক নহে।

(৩) মনে করিবার কারণ আছে, জানভ্রিণ যখন গ্রেপ্তার করে, তখন তাহার নিকট ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশনে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট ছিল না। অর্থাৎ সে বিনা-ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তারের পর ওয়ারেণ্ট পাইয়াছিল বা আনাইয়া লইয়াছিল।

দারোগা হাসানের সম্বন্ধে রূপেন্দ্র বাবু মন্তব্য করিয়াছেন—তাহার উক্তি বিশেষ ভাবে আদালতের অবমাননাকর। সে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে বুঝাইবার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট ছিল—হাইকোর্ট যাহাই কেন করুন না—পুলিসই সর্ব্বেসর্ব্বা। সে পুলিস—সুতরাং কোন্ অধিকারে সে গ্রেপ্তার করিতেছে, তাহাও দেখাইতে বাধ্য নহে। তাহার কার্য্যে আদালতের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা।

পুলিসের এক জন কর্ম্মচারী যে বলিয়াছিল—"তামাসা" শেষ হইয়াছে; তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—সে হাইকোর্টের বিচারকে "তামাসা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল।

চীফ-জাষ্টিস একাধিক বার—যেন কৈফিয়তে—বলিয়াছেন বটে, পুলিস আদিষ্ট হইয়া কাজ করিতেছিল, কিন্তু রূপেন্দ্র বাবু মত প্রকাশ করিয়াছেন—সে কথা দণ্ডদানকালে বিবেচ্য। অর্থাৎ তাহাতে অপরাধ দূর হয় না—অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস হয় কি না, তাহা বিবেচনার বিষয় হয়। যখন তাঁহার সহঃ-বিচারকদ্বয় আসামীদিগকে নিরপরাধ মনে করিয়াছেন, তখন আর সে বিষয়ে আলোচনার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

রূপেন্দ্র বাবু বাঙ্গালী। তিনি পুলিসের ব্যবহার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যে এ দেশের লোকের মত, তাহা আমরা দৃঢ়তা সহকারেই বলিব।

মিষ্টার জাষ্টিস খোন্দকার মিষ্টার দত্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—এ দেশের পুলিসের সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়াছেন—পুলিসের ধৃষ্টতায় অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু সে সব বলিয়া বলিয়াছেন—তাহাতে আদালতের অবমাননা করা হয় নাই।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য পুলিসের ঐ সকল কর্ম্মচারীর পদোন্নতি হইবে কি না, তাহা অবশ্য হাইকোর্টের লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে; আর আমরা তাহা বিবেচনার অধিকারী নহি। আমরা কেবল জানিলাম—পুলিসের ব্যবহার অশিষ্ট হইলেও তাহাতে হাইকোর্টের অপমান হয় নাই।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

৩০শে আষাঢ় বোম্বাই নগরে নিখিল-ভারত সংবাদপত্র-সম্পাদক-সঙ্ঘের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বড়লাটের শাসন পরিষদে সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সার সুলতান আমেদ যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে এ দেশে সংবাদপত্রের অবস্থা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তাহা মনে করিবার উপায় নাই। তিনি বলিয়াছেন—তিনিও যুদ্ধকালেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতারক্ষার পক্ষপাতী। তিনি সে বিষয়ে সংবাদ-পত্রকে সাহায্য করিয়া সংবাদপত্রের সাহায্য চাহিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি সংবাদপত্রের নিকট হইতে সরকারের প্রচারকার্য্যে সহযোগিতা চাহেন। তিনি প্রচার পরামর্শ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন এবং তাহাতে যোগদান জন্য সাংবাদিকদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছেন।

তাঁহার বক্তৃতার উত্তরে সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত কস্তুরীরঙ্গ শ্রীনিবাসন যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে দেখান, সরকারের এই বিভাগের গুরুত্ব ও প্রয়োজন যত অধিকই কেন হউক না, ইহা যুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহু পরে সৃষ্ট হইয়াও সময় সময় কর্ণধারহীন তরণীর দশা প্রাপ্ত হইয়া শেষে বেতার বিভাগের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনে ইহা মিত্রদেশসমূহে ভারতীয় নেতৃগণের সম্বন্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ ও নিন্দা প্রচারের উপায়ে পরিণত হয় এবং রাজনীতিসংক্রান্ত সকল সংবাদ কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা আরম্ভ হয়।

যে ভাবে মার্কিণের সাংবাদিক মিষ্টার লুই ফিশারের প্রবন্ধাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত শ্রীনিবাসন বলেন—যদি এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হয়, তবে সংবাদপত্রের পক্ষে কর্ত্তব্য পালন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? হয় ত সার সুলতান বলিবেন, সে কায অন্য বিভাগের। কিন্তু এ কথা যদি সত্য হয় যে, যোগ্যতা-বৃদ্ধির জন্যই বিবিধ বিভাগের সৃষ্টি করা হয়, তবে এইরূপ অবস্থায় সংবাদ ও বেতার বিভাগের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? এই বিভাগ টিউনিসিয়ার বিজয়-ঘোষণার উৎসবের জন্য সংবাদপত্র-সমূহকে অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন; অথচ সে জন্য অতিরিক্ত কাগজ চাহিলে বলা হয়—তাহা দেওয়া হইবে না, সংবাদপত্রগুলি এক দিন প্রচার বন্ধ রাখিয়া সেই কাগজ ঐ সংখ্যার জন্য ব্যবহার করিতে পারেন! এইরূপ ব্যবহারে সহযোগ আকৃষ্ট করা যায় না।

সার সুলতান যে পরামর্শ সমিতি প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, তাহা সাংবাদিকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে না এবং তিনি সে সমিতিতে সাংবাদিকদিগকে বর্জ্জন করিলেই ভাল হয়। তিনি যদি সঙ্ঘের অধিবেশনে উপস্থিত হয়েন, তবে তিনি অধিক উপকৃত হইবেন।

সার সুলতান বলিয়াছিলেন, যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রের পক্ষে যতটুকু স্বাধীনতা সম্ভোগ করা সম্ভব, ভারতে সংবাদপত্র ততটুকু স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রী. সরকারের দপ্তর হইতে সংবাদ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে সকল আদেশ ও নির্দ্দেশ প্রচারিত হয়, তিনি সে সকলের সংবাদ রাখেন না। দিল্লীতে যে সকল সংবাদপত্রের প্রতিনিধি আছেন তাঁহারা ও সঙ্ঘ সরকারের নিকট যে সকল অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, সে সকলের সংবাদও কি সার সুলতান রাখেন না তিনি নূতন পদে নবপ্রতিষ্ঠিত; কিন্তু তিনি যদি সকল বিষয় জানিয়া সম্পাদক-সঙ্ঘে বক্তৃতা করিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে তাহা সঙ্গত ও শোভন হইত।

তিনি কি জানেন না, সংবাদপত্রের সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে সংবাদপত্রসমূহের প্রচার বন্ধ রাখাও হইয়াছিল এবং কলিকাতায় যে প্রবীণ সম্পাদক সম্পাদকসমূহের যে সভায় প্রচার বন্ধ রাখা স্থির হয়, তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—ভারতরক্ষা নিয়মের বলে তাঁহাকে গ্রেপ্তারও করা হইয়াছিল? বাঙ্গালার ব্যবস্থা পরিষদে বার বার উল্লেখিত হইয়াছে—সরকার সংবাদপত্রের সম্বন্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংবাদপত্রসমূহকে যে সকল নির্দ্দেশ প্রদান করা হয়, সে সকল যদি "গোপনীয়" বলিয়া চিহ্নিত না হইত, তবে আমরা সেইরূপ বহু নির্দ্দেশ প্রকাশ করিতে পারিতাম।

আমরা সংবাদপত্রের বিষয়েই আলোচনা করিতেছি। নহিলে বেতার সম্বন্ধেও যে অনেক কথা বলিতে পারিতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বেতারে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়া ফেডারল কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারক সার মরিস গাওয়ারও যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেতার আফিসে যিনি ফেডারল কোর্টের চীফ-জাষ্টিসের বক্তৃতায় আইনগত আপত্তি করিতে পারেন, তাঁহার জয় হউক।

শ্রীযুত শ্রীনিবাসন বলিয়াছেন, ভারতের রাজকর্ম্মচারীরা অনায়াসে এ দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বৃটেনে ও মার্কিণের সংবাদপত্রের যে স্বাধীনতা আদর্শ বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার তুলনায় আমাদিগের স্বাধীনতা স্বাধীনতা-নামের যোগ্য কি না, তাহা কে বলিবে?

তবে সার সুলতান যদি মনে করেন, স্বাধীন দেশে সংবাদপত্র যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করে, পরাধীন দেশের সংবাদপত্রের পক্ষে তাহা সম্ভোগ করিবার আশা দুরাশা—সে স্বতন্ত্র কথা। তিনি কি বলিবেন—পরাধীন, স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত ভারতের সংবাদপত্রসমূহ যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট?

দীনেন্দ্রকুমার রায়

১২ই আষাঢ় স্বগ্রাম মেহেরপুরে (নদীয়া জিলা) ৭৪ বৎসর বয়সে প্রবীণ সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্বগ্রামে অধ্যয়নের পর কৃষ্ণনগরে আসিয়া—শেষে পিতৃব্যের নিকট মহিষাদলে গমন করেন। পঠদ্দশাতেই দীনেন্দ্রকুমার সাহিত্যানু-রাগের পরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার গ্রাম্যচিত্র ও গ্রামপরিবেষ্টনে স্থাপিত চরিত-চিত্র লইয়া রচিত গল্প বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত তিনি গ্রামের ও গ্রাম্যসমাজের চিত্র অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের সায়াহ্নে—বহু দিন 'বসুমতী'র সেবা উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিবার পর তিনি যে মাত্র কয় মাস পূর্ব্বে গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া তথায় শেষ শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনের সহিত

সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্যসম্পন্ন। তিনি যেন তাঁহার পল্লী-জননীর আকর্ষণ অনুভব করিয়া তাঁহার অঙ্কে ফিরিয়া গিয়াছিলেন! মনে করিয়াছিলেন :—

"সন্ধ্যা হ'ল বেলা গেল—
কোলের ছেলে নে মা, কোলে।"

দীনেন্দ্র বাবু জীবনে বহু শোক ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোগ-শোক এ সকল কখন তাঁহার সাহিত্য-সেবায় অন্তরায় হইতে পারে নাই; পরন্তু তিনি বলিতে পারিতেন, সাহিত্য-সেবাতেই—

"পাইয়াছি শোকে শান্তি, পাইয়াছি দুঃখে সুখ;
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক।"

তাঁহার সেই সাহিত্য-সেবা কিরূপ ছিল, তাহার শেষ পরিচয় তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। তিনি 'মাসিক বসুমতী'র জন্য

দীনেন্দ্রকুমার রায়

একখানি উপন্যাসের অনুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহার উপন্যাসের অনুবাদ মৌলিক রচনার মত মনোরম হইত। গত মাসেও 'কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্যে'র দুইটি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ দিয়া তাঁহার পুত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি "উপন্যাসের কপি কিছু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, পরে পাঠাইতেছি।" তখন তাঁহার পুত্রও জানিতেন না—আমরাও কল্পনা করিতে পারি নাই—তিনি কায অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান নাই! রচনা শেষ করিয়া—"সম্পূর্ণ" লিখিয়া—স্বাক্ষর করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। হয় ত মৃত্যুর পূর্ব্বদিন বা তাহার পূর্ব্বদিন তিনি রচনাটি শেষ করিয়াছিলেন।

"সাপ্তাহিক বসুমতী"তে তিনি প্রথম সাংবাদিকের কাযে প্রবৃত্ত হয়েন। তখন তিনি ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতির নিকট সাংবাদিকের শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। পরে কিছু কাল "সাপ্তাহিক বসুমতী"র সম্পাদকরূপে কায করিয়া তিনি সংবাদপত্রের কায ত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার আসিয়া কিছু দিন 'দৈনিক বসুমতী'তে কায করেন, এবং শেষ পর্য্যন্ত 'মাসিক বসুমতী'র সহিত সম্বন্ধ ছিলেন।

তিনি অনুবাদ কিরূপ সরস ও সুন্দর করিতে পারিতেন, নেপোলিয়নের জীবনচরিতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় সপ্রকাশ। অরবিন্দ যখন বরোদা রাজ্যে কায করিতেন, তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার জন্য এক জন সঙ্গীর সন্ধান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের মনোনয়নে দীনেন্দ্র বাবু তথায় গমন করেন।

যে সময় তিনি বরোদায় ছিলেন, সে সময়ের কথা তিনি যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ভাষা মার্জ্জিত, সরল, প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছন্দগামী ছিল। সেই ভাষার গুণেই তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ-সহস্র অনূদিত উপন্যাস পাঠক-পাঠিকাদিগের বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত মৌলিক উপন্যাসের সংখ্যা অল্প। কিন্তু তিনি যেমন বহু ইংরেজী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তেমনই বহু ছোট গল্পও রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনায় যে শুচিতা ছিল, তাহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের ও গ্রাম্য জীবনের দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। আজ যেমন সেকালের বিলাতের গ্রাম্য জীবনের পরিচয় গ্রহণ করিতে পাঠকগণ জর্জ্জ ইলিয়টের পুস্তক পাঠ করেন, তেমনই বাঙ্গালার অতীত গ্রাম্য জীবনের চিত্র বাঙ্গালী পাঠক দীনেন্দ্র বাবুর রচনায় পাইবেন। দীনেন্দ্র বাবু যদি অন্য কোন গ্রন্থ আর না লিখিতেন, তথাপি তাঁহার রচিত "পল্লীচিত্র" এবং "পল্লী-বৈচিত্র্য" তাঁহার কীর্ত্তি চির-সমুজ্জ্বল রাখিত। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার লেখনীর বিশ্রাম ছিল না। সাহিত্য-সেবায় তিনি কখন আলস্য দেখান নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা এক জন পুরাতন বন্ধু ও সহকর্ম্মী হারাইয়া বেদনানুভব করিতেছি।

পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন

৮ই আষাঢ় ঢাকার সান্নিধ্যে নোয়াদ্দাগ্রামে প্রবীণ বৈয়াকরণ পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন ৮৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অসাধারণ শাব্দিক পণ্ডিত কৃষ্ণানন্দ সার্ব্বভৌমের নিকট কলাপ ব্যাকরণ, ন্যায়ের শব্দখণ্ড প্রভৃতি পাঠ করিয়া নিজ ভবনে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তাঁহার ভ্রাতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ তাঁহার ছাত্রদিগের অন্যতম।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

১২ই আষাঢ় ১১ দিন টাইফয়েড রোগে পণ্ডিত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রীর দেহান্ত হইয়াছে। অতি অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া তিনি জন্মস্থান রাজসাহী ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন এবং তথায় বিশ্রুতকীর্ত্তি মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রীর নিকট পাণিনি ব্যাকরণের আদ্যোপান্ত ও বেদান্তাদি নানা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আকুমার অনন্যচিত্তে শাস্ত্রাভ্যাসের ফলে আকুমারিকা-হিমাচল ভারতের পণ্ডিত সমাজে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছিল। বারাণসী সংস্কৃত কলেজে তিনি পাণিনি

ব্যাকরণের আচার্য্যপদ লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত এই পদ লাভ করেন নাই। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তাঁহার পাণিনি ও বেদান্তের অধ্যাপকপদে নিয়োগ হয়। 'মাসিক বসুমতী'তে তিনি ভগবান্ পতঞ্জলি কৃত পাণিনির
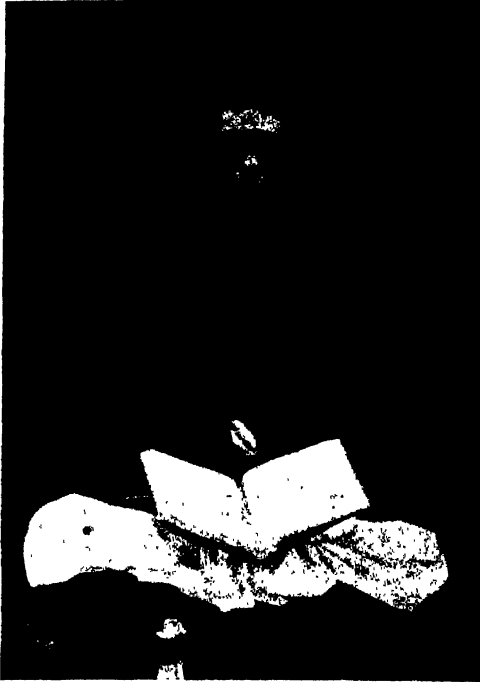
হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী

অষ্টাধ্যায়ী মহাভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোভাবে বাঙ্গালা হইতে পাণিনীয়-ব্যাকরণ-দর্শন-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইল বলা যায়। তাঁহার মৃত্যুতে দেশমাতৃকা এক জন প্রতিভাবান্ কৃতী সন্তান হারাইলেন—বাঙ্গালার পাণ্ডিত্য ম্লান হইল।

শৈলেন্দ্র বাগচী

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, ১১শে আষাঢ় মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে রেশম-শিল্পবিশেষজ্ঞ পিতা সুধাংশুশেখরের পুত্র—ঐ শিল্পে বিশেষজ্ঞ পুত্র শৈলেন্দ্র সহসা সন্ন্যাসরোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লইয়া জাপানে গমন করেন এবং তথায় ৩ বৎসর রেশম-শিল্প অধ্যয়ন করিয়া জাপান সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া বিলাতে এবং তাহার পর ফ্রান্স, জার্ম্মাণী ও ইটালীতেও শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি যখন ভারত সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন, তখন জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিনানুমতিতে গমনাগমন নিষিদ্ধ হয় এবং সেই জন্য সতর্ক পুলিস তাঁহার শব শ্মশানে লইয়া যাইবার পথেও বাধা দিয়াছিল।

প্রবোধচন্দ্র দে

প্রবোধচন্দ্র দে সিদ্ধান্তসিন্ধু ১১শে আষাঢ় ৫৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে পরলোকগত হইয়াছেন! তিনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কিশোরীচাঁদ মিত্রের একমাত্র সন্তান কন্যার—কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাঁহার তৃতীয়াগ্রজ শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দের মত প্রবোধ-চন্দ্র বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। তিনি মৃত্যুকালে বরিশালে জিলা ও দায়রা জজ ছিলেন। তাঁহার মধ্যমাগ্রজ ডাক্তার। প্রবোধচন্দ্র নাগপুরের সর্ব্বজন-সমাদৃত সার বিপিনকৃষ্ণ বসুর জামাতা ছিলেন। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা এবং বিধবা রাখিয়া গিয়াছেন।

বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৫ই আষাঢ় ৬৪ বৎসর বয়সে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও রাজনীতিক বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের আত্মীয় ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের রাজনীতিক গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিজয়চন্দ্র অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের সহকর্ম্মিরূপে দেশসেবা আরম্ভ করেন। 'বন্দে মাতরম' পত্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। আজ, বোধ হয়, এ কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, যে প্রবন্ধের জন্য সরকার 'বন্দে মাতরমের' ছাপাখানা প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন—কারাগারে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর হত্যা লইয়া লিখিত—সেই প্রবন্ধ বিজয়চন্দ্রের রচনা। তিনি গোলটেবল বৈঠকে বাঙ্গালার হিন্দুদিগের দাবী পেশ করেন এবং ফিরিয়া আসিয়া চাকরী প্রভৃতিতে হিন্দুকে অর্দ্ধেক ও মুসলমানকে অর্দ্ধেক অংশ দিয়া হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার সমাধান-চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বহু রাজনীতিক মোকদ্দমায় অভিযুক্তদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টাররূপে তিনি ভাওয়ালের মামলায় সন্ন্যাসীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করেন—তাহাতে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করে। মৃত্যুকালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন এবং অসুস্থ শরীরে কর্পোরেশনের জল-সরবরাহ বিষয়ের অভিযোগের তদন্তকার্য্যে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রোগ বর্দ্ধিত হয়। জনসাধারণের কার্য্যে তাঁহার আগ্রহের ইহাও অন্যতম প্রমাণ।

পরলোকে লীলা দেবী

সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী আর্য্যকুমার চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী—সার আশুতোষ চৌধুরীর পুত্রবধূ—শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুরের একমাত্র কন্যা লীলা দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ—নাটক প্রণয়নে বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার আলোক-চিত্র 'মাসিক বসুমতী'র চিত্র-গৌরব সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২২শ বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৫০ | ৪র্থ সংখ্যা

রস

১৮

ভাবপ্রকাশনে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, নাট্যবিদ্‌গণের মতে স্থায়ি-ভাব আটটি মাত্র—নয়টি নহে। কারণ, শমকে নাট্যোপযোগী স্থায়ী বলা চলে না। শমে সকল ব্যাপার (ক্রিয়া) বিলীন হইয়া যায়—এ হেতু উহার অনুভাব থাকিতে পারে না (১)। অতএব, নাট্যে উহার অভিনয় প্রদর্শন সম্ভব নহে। আর সেই কারণেই উহার বৃথা প্রয়োগে রস-পুষ্টি হয় না। তাই শারদাতনয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আটটি মাত্র স্থায়ী ভাবই নাট্যের উপযোগী (২)।

স্থায়ি-ভাবের স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে গিয়া শারদাতনয় বলিয়াছেন—উহা লবণ-মিশ্রিত জলের ন্যায়। বিশুদ্ধ জলে লবণ মিশাইলে বাহ্য-দৃষ্টিতে জলে লবণের পৃথক্ অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না—জল ও লবণ তাদাত্ম্যভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ স্থায়ি-ভাবে আগন্তুক ব্যভিচারি-ভাবগুলি আরোপিত হইলে উহাদের পৃথক্ সত্তা তখন আর লক্ষিত হয় না—স্থায়ী ও ব্যভিচারী অভিন্ন হইয়া যায় (৩)। ব্যভিচারি-ভাবগুলি স্থায়ি-ভাবের উপর সমুদ্রজলোপরি তরঙ্গের মত একবার ওঠে, একবার নামে। তরঙ্গ যেমন ক্ষণ-পরে জলেই বিলীন হয়, ব্যভিচারি-ভাবগুলিও সেইরূপ ক্ষণমধ্যে স্থায়ীতে মিলাইয়া যায়। তাহাদিগের এ আত্মপ্রকাশ ক্ষণিকের নিমিত্ত—এই কারণেই তাহাদিগকে স্থায়ী বলা চলে না; পক্ষান্তরে, তাহাদিগের সঞ্চারী বা ব্যভিচারী নাম দিতে হয় (৪)। ইহাই হইল স্থায়ী ও ব্যভিচারীর মূলগত বিভেদ। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক—শান্ত-রসের স্থায়ি-ভাব বলিয়া যাহা সাধারণতঃ গণ্য হইতে পারে, সেই শম প্রকৃতই স্থায়িরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না। যদিও শম অন্যান্য স্থায়ি-ভাবেরই ন্যায় একটি ভাব—তথাপি উহা স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কারণ, শম এমনই একটি ভাব, যাহার সহিত নির্ব্বেদাদি অন্য কোন ব্যভিচারি-ভাবই মিশ্রিত হইয়া তাদাত্ম্যাপন্ন হইতে পারে না। আরও একটি কথা এই যে, সেই ভাবই স্থায়ী হইবার যোগ্য, যাহা রস-রূপে পরিণত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, শম রসের পরিপোষক ত নহেই—বরং বিরসতারই হেতু। অতএব, নাট্যবিদ্‌গণের মতে আটটিই স্থায়ি-ভাব (৫)।

প্রেক্ষকগণের চিত্ত-বৃত্তি কিরূপে রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে,

---

(১) কোন ব্যাপার বা ক্রিয়া সঙ্ঘটিত হইলে উহার কার্য্য বা ফল দৃষ্টিগোচর হয়। অনুভাব—কার্য্য। শৃঙ্গারের অনুভাব—হাস্য-কটাক্ষ প্রভৃতি। শম স্থায়ী হইলে উহাতে কোন ক্রিয়াই থাকে না। অতএব, উহার অনুভাবও প্রকাশ পাইতে পারে না।

(২) "বিলীনসর্ব্বব্যাপারঃ শমঃ স্থায়ী ভবেদ্ যতঃ। অতোঽনুভাবরাহিত্যান্ন নাট্যেঽভিনয়ো ভবেৎ। তস্মাদবৃদ্ধপ্রয়োগেণ রসপোষো ন জায়তে। ততোঽষ্টৌ স্থায়িনো ভাবা নাট্যস্যৈবোপযোগিনঃ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধি, পৃঃ ২৬

(৩) "যতঃ স্বরূপারোপেণ ভাবানন্যানুপস্থিতান্। স্বাত্মত্বৈক্যেন গৃহ্ণাতি স স্থায়ী লবণোদবৎ"।—ভাবপ্রঃ, ১ম অধিঃ, পৃঃ ২৬

(৪) "বিশেষাদাভিমুখ্যেন চরন্তো ব্যভিচারিণঃ। স্থায়িন্যুন্মগ্ন-নির্মগ্না কল্লোলা ইব বারিধৌ। উন্মজ্জন্তো নিমজ্জন্তঃ কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে। তস্যোৎকর্ষং বিতন্বন্তি যান্তি তদ্রূপতামপি। স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাস্তথৈব ব্যভিচারিণঃ। পুষ্ণন্তি স্থায়িনঃ স্বাংশ্চ তত্র যান্তি রসাত্মতাম্। যদ্যপি সান্দ্রসাত্মত্বং তেষাং ক্বাপি কদাচন। অস্থিরত্বাদথৈতে স্যুর্নাট্যাঙ্গত্বনুপযোগিনঃ"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ২৫-২৬

(৫) "যতঃ স্বরূপারোপেণ ভাবানন্যানুপস্থিতান্। স্বাত্মত্বৈক্যেন গৃহ্ণাতি স স্থায়ী লবণোদবৎ। ভাবসাধারণত্বেঽপি নির্ব্বেদাদ্যৈর্ন শক্যতে। স্থায়িত্বমাত্মনো নেতুমতাদ্রূপ্যস্বভাবতঃ। যত্র ক্বচিৎ স্যাত্তৎপোষো বৈরস্যায়ৈব কল্প্যতে। অতো নাট্যবিদামষ্টাবেবাত্র স্থায়িনো মতাঃ। প্রকৃষ্যমাণো যো ভাবো রসতাং প্রতিপদ্যতে। স এব ভাবঃ স্থায়ীতি ভরতাদিভিরুচ্যতে"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ২৬

তাহার বিস্তৃত বিবরণ শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তাহার পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে। এই দর্শক-চিত্ত-বৃত্তি শারদাতনয়ের মতে অষ্টবিধ—নববিধ হইতে পারে না। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন যে, কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির মতে মনোবৃত্তি নব-সংখ্যক। অতএব, তন্মতে নাট্যেও শান্ত-রস বর্তমান বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু নাটকাদি দৃশ্যকাব্যগুলিতে তপশ্চরণ-ক্রিয়ার অভিনয় করা প্রায় অসম্ভব। অতএব, তপশ্চর্য্যার বিবরণ-যুক্ত বাক্যার্থ বা তপস্যা-রূপ পদার্থ হইতে সহৃদয় সামাজিকগণের মনে শান্ত-রস উৎপন্ন হয় না। শম-স্থায়ি-ভাব যথাস্থান-নিবেশিত বিভাবাদি-দ্বারা যদি বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে শান্ত-রসও সম্ভব হয়—কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, শম-ভাবের কোন বিকারই না থাকায় উহা রসস্বরূপে পরিণত হইতেই পারে না। অতএব, শান্তরসের উদ্ভব সম্ভব নহে—আর সেই কারণে নাট্যরস আটটি মাত্র। ইহা পদ্মভূর মত (৬)।

তবে কি 'শান্ত'-নামক কোন রসই কখনও সম্ভূত হইতে পারে না?—ইহার উত্তরে শারদাতনয় বলিয়াছেন যে, রসজ্ঞ কবির শান্ত-রস-দ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে। রসোৎপত্তি-প্রকার সম্যগ্‌রূপে আলোকন, শ্রবণ ও অনুভব করিয়া—পরকে উহা দেখাইয়া শুনাইয়া ও অনুভব করাইয়া সর্ব্বপ্রকারে সম্পূর্ণকাম সন্তুষ্টচিত্ত কবি চরমে শান্ত-রসেই মুক্তি পাইয়া থাকেন (৭)।

শান্ত-রসের বিভাব-বর্ণনা-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন—বিষয়ের হেয়ত্ব দর্শন ও শ্রবণ, ধর্ম্মোপাখ্যান-পুরাণাদি শ্রবণ, পুণ্যতীর্থে অবগাহন, পুণ্যাশ্রমে নিবাস, যোগিগণের সহিত নিত্যসঙ্গ, জড় (বোবা)-অন্ধ-বধির-গণের তারতম্য দর্শন, ব্যাধি-দারিদ্র্য-মরণ, নরক-যাতনা-শ্রবণ, পুণ্যক্ষয়বশতঃ স্বর্গ হইতে পতন, কুযোনিতে জন্মলাভ প্রভৃতি, ক্লেশ-প্রযত্নের বৈফল্য প্রভৃতির আলোচনা, দুঃখত্রয়-ঘাতন প্রভৃতি বিভাব হইতে শমাত্মক স্থায়ি-ভাব কাহারও কাহারও নিকট রসরূপে পরিণত হইয়া থাকে (৮)।

---

(৬) "কেচিন্নবাষ্টিকামাহুর্মনোবৃত্তিং বিচক্ষণাঃ। ততঃ শান্তো রসো নাট্যেঽপ্যস্তীতি প্রতিজানতে। নাটকাদিনিবন্ধে তু তপশ্চরণ-বস্তুনি। অভিনেতুমশক্যত্বাত্তদ্বাক্যার্থপদার্থয়োঃ। সামাজিকানাং মনসি রসঃ শান্তো ন জায়তে। শমঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্যথাস্থান-নিবেশিতৈঃ। বর্দ্ধিতশ্চেদ্রসঃ শান্তোঽপ্যস্তীত্যুদ্ভাব্যতে ক্বচিৎ। অস্য সর্ব্ববিকারাণাং শূন্যত্বাত্তু রসাত্মনা। পরিণেতুং ন শক্নোতি তস্মাচ্ছান্তস্য নোদ্ভবঃ। তস্মান্নাট্যরসা অষ্টাবিতি পদ্মভুবো মতম্"।

—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ৪৭

(৭) "এবম্প্রকারাণালোক্য সমাকর্ণ্যানুভূয় চ। পরেভ্যো দর্শয়-ন্নেবং শ্রাবয়ন্নমুভাবয়ন্। সর্ব্বপ্রকারৈঃ সম্পূর্ণকামঃ সন্তুষ্টমানসঃ। প্রাপ্নোতি মুক্তিং চরমে শান্তেনৈব রসেন সঃ"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ১৩৫

(৮) "শান্তো বিষয়হেয়ত্বদর্শনশ্রবণাদিভিঃ। ধর্ম্মাখ্যান-পুরাণৈশ্চ পুণ্যতীর্থাবগাহনৈঃ। পুণ্যাশ্রমনিবাসৈশ্চ যোগিভির্নিত্য-সঙ্গমৈঃ। জড়ান্ধবধিরাদীনাং তারতম্যাবলোকনৈঃ। ব্যাধিদারিদ্র্য-মরণৈর্নারক্যযাতনাশ্রুতৈঃ। পুণ্যক্ষয়প্রপতনকুযোনিশ্রয়ণাদিভিঃ। ক্লেশপ্রযত্নবৈফল্যাদ্দুঃখত্রিতয়ঘাতনৈঃ। ইত্যাদিভির্বিভাবৈঃ স্যাচ্ছমাত্মা কস্যচিদ্রসঃ"।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ১৩৫

শান্ত-রসাস্বাদনকারী যোগিগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণন-প্রসঙ্গে শারদাতনয় বলিয়াছেন, দুঃখি-নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে যথাশক্তি পরিত্রাণ, অনুরাগ ব্যতীত সর্ব্বত্র সুখিগণের অনুমোদন, শাক-মূল-ফলাদি-দ্বারা শরীরের স্থিতি-সাধন, ব্রত-উপবাস-নিয়ম, বল্কল-অজিন-ধারণ, সর্ব্বভূতে অহিংসা, প্রাণি-নির্ব্বিশেষে অনুগ্রহ, অঙ্গের কৃশতা ও কর্কশতা, ত্রিষবণ স্নান, ঋজু ও আয়তভাবে উপবেশন, ধ্যান, নাসাগ্রে দত্ত-দৃষ্টি, ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি-নিরোধের নিমিত্ত বিষয়সমূহ হইতে নিয়মন—এইগুলি প্রায়ই শান্ত যোগিগণের বৈশিষ্ট্য (১)।

শম-স্থায়ীর প্রায় কোন অনুভাব থাকিতে পারে না। কারণ, শম মানে-অপমানে-শোকে-হর্ষে-সুখে-দুঃখে সমবৃত্তি। পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়ে সমবৃত্তিক হওয়ায় উহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। যিনি শত্রু ও মিত্রে সমভাবাপন্ন, তাঁহার উহাদের একের প্রতি আকর্ষণ ও অপরের প্রতি বিরূপতা জনিত কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। তবে সাত্ত্বিক-ভাবগুলিকে অনুভাবের প্রকারভেদ বলিয়া ধরিলে বলা চলে—আনন্দাশ্রু-রোমাঞ্চ স্বেদ-স্তম্ভ—এই গুলিই শান্ত-রসের অনুভাব। অপর কেহ কেহ মনে করেন—শান্তের অনুভাব একমাত্র রোমাঞ্চ। কোন সঞ্চারি-ভাবই শান্তের উপকার সাধন করিতে পারে না। এ কারণে শান্তরসকে বিকলাঙ্গ বলা হইয়া থাকে। যখন বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত হয়, অন্তঃকরণ যখন শান্তিলাভে উন্মুখ, তখন নির্ব্বেদা[illegible]

---

(১) যথাশক্তি পবিত্রাণং দুঃখিনামবিশেষতঃ। বিনা রাগেণ সর্ব্বত্র সুখিনামনুমোদনম্। শাকমূলফলৈরন্যৈঃ শরীরস্থিতিসাধনম্। ব্রতোপবাসনিয়মো বল্কলাজিনধারণম্। অহিংসা সর্ব্বভূতানামবিশেষাদনুগ্রহঃ। অঙ্গেষু কার্শ্যং কার্কশ্যং স্নানং ত্রিষবণোচিতম্। ঋজ্বায়তাসনং ধ্যানং নাসাগ্রাহিতলোচনম্। বিষয়েভ্যো নিয়মনমিন্দ্রিয়াণাং নিবৃত্তয়ে। ইত্যাদয়ো বিশেষাঃ স্যুঃ প্রায়ঃ শান্তেষু যোগিষু।"—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ১৩৫।

দুঃখি-নির্ব্বিশেষে দুঃখ-দূর করা, বিনা অনুরাগে সর্ব্বত্র সুখিগণে অনুমোদন—"মৈত্রঃ করুণ এব চ"—গীতা (১২।১৩)। ইহাতে যোগসূত্রের মৈত্রী-করুণাদির (১।৩৩) ইঙ্গিত পাওয়া যায়—"সর্ব্ব প্রাণিষু সুখ-সম্ভোগাপন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ। দুঃখিতেষু করুণাম্" —ব্যাসভাষ্য, যোগসূত্র (১।৩৩)। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গ (যোগসূত্র ২।২৯)। অহিংসা-সত্য-অস্তেয় (অচৌর্য্য)-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহ = যম (যোঃ সূঃ ২।৩০)। এই গুলিই সার্ব্বভৌম ভাবে প্রযুক্ত হইলে 'মহাব্রত' নামে কথিত হয় (যোঃ সূঃ ২।৩১)। শৌচ-সন্তোষ স্বাধ্যায়-তপস্যা-ঈশ্বর-প্রণিধান = নিয়ম (যোঃ সূঃ ২।৩২)। বল্কল (বৃক্ষত্বক্ পরিধেয়)। অজিন—কৃষ্ণসার-মৃগ-চর্ম্ম। অহিংসা যম সাধন—যোগাঙ্গ। সবন—সোম-রস নিষ্কাশন; উহার গৌণার্থ যে সময়ে সোমরস বাহির করা হয়—প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা; ত্রিষবণ স্নান—প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে সায়ংকালে তিনবার স্নান। ঋজু আয়তভাবে উপবেশন—আসন—স্থিরসুখ আসন (যোঃ সূঃ ২।৪৬)। প্রত্যয়ের (জ্ঞানের) একতানতা—ধ্যান (যোঃ সূঃ ৩।২)। নাসাগ্রে দৃষ্টি—নাসাগ্র বলিতে বুঝায় নাসারন্ধ্রের নিকটবর্ত্তী অগ্রভাগ, অথবা ভ্রূ-মধ্য; ইহাই যোগাঙ্গ 'ধারণা' (যোগসূত্র ৩।১)। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-সমূহ হইতে নিয়মন—'প্রত্যাহার' (যোঃ সূঃ ২।৫৪)।

ব্যভিচারি-ভাবেরও বাহ্য প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। তাহা ছাড়া শান্তের অনুভাব নাই। হর্ষাদির অনুভব হয় না বলিয়াই ত শান্ত-রসকে বিকলাঙ্গ বলা হয়। 'আছে'—মাত্র এই সত্তা-রূপেই শান্ত-রস প্রতীত হইয়া থাকে—অন্য কোন ভাব ইহাতে প্রকাশিত হয় না। এ হেতু ইহার নাট্যে অভিনয়ও সম্ভব নহে। শম ইহার স্থায়ী ভাব বলিয়া ধরিলে হর্ষাদি সঞ্চারি-ভাব বা কোনরূপ অনুভাব তথায় থাকিতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শম সর্ব্বব্যাপার-বিহীন—উহাতে কোন ক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এ হেতু উহার কোন কার্য্য (effect) বাহ্যতঃ প্রকাশিত হয় না ; তাই উহার অনুভাব (=কার্য্য) নাই। আর শম এমনই ভাব যে, উহাতে জলতরঙ্গের ন্যায় ক্ষণে আবির্ভূয়মান ক্ষণপরে তিরোভাবশীল কোন ব্যভিচারি-ভাবের মিশ্রণও সম্ভব নহে। অনুভাব ও ব্যভিচারি-ভাব না থাকায় উহার দুইটি অঙ্গ বিকল বলা চলে। কিন্তু অঙ্গবৈকল্যের বাহুল্য-সত্ত্বেও উহাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কারণ, দেহিগণের পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ, তাহার প্রকৃষ্ট উপযোগী এই শম (১০)।

অতএব, মোটের উপর দাঁড়াইতেছে এই যে. শারদাতনয়ের মতে শম-স্থায়ী হইতে শান্ত-রস জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু উহা নাট্য-রস-রূপে অভিনেয় হইতে পারে না।

শারদাতনয় শান্ত-রসের দেবতা, বর্ণ, উৎপত্তির ইতিহাস প্রভৃতির বর্ণনা করেন নাই। এই স্থলেই তাঁহার শান্ত-রস-প্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে।

কাব্যপ্রকাশ-কার মম্মট ভট্ট ব্যভিচারি-ভাব-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া শান্ত-রসের বিষয় নিপুণ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ত্রয়স্ত্রিংশৎ ব্যভিচারি-ভাবের প্রথমটিই নির্ব্বেদ। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে—রস আনন্দ-স্বরূপ—কল্যাণের নিদান। তাহার পরিপোষক ব্যভিচারি-ভাবসমূহের মধ্যে প্রথমেই অমঙ্গল-বহুল নির্ব্বেদের উল্লেখ অসঙ্গত। তথাপি শাস্ত্রে প্রথমেই উহার নাম কেন ? ইহার উত্তরে প্রকাশ-কার বলিয়াছেন যে, নির্ব্বেদের প্রথম উল্লেখের পর্য্যাপ্ত কারণ আছে। ইহা ব্যভিচারি-ভাবান্তর্গত হইলেও যোগ্যকালে স্থায়ীর রূপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ—নির্ব্বেদ-স্থায়ী শান্ত-রস-রূপ নবম রসও বর্ত্তমান আছে—ইহা মম্মটের মত। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি যে প্রসিদ্ধ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য নিম্ন-রূপ—

সর্পে অথবা হারে, কুসুম-শয্যায় অথবা পাষাণে, মণিতে অথবা লোষ্ট্রে, প্রবল শত্রুতে অথবা মিত্রে, তৃণে অথবা স্ত্রীজনে ও পবিত্র অপবিত্রে সম-সমদৃষ্টিবিশিষ্ট আত্মার পবিত্র অরণ্যে (অর্থাৎ তপোবনে) 'শিব-শিব-শিব' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দিন যাইতেছে (১১)।

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ ঠক্কুর বলিয়াছেন—প্রকাশকারের উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ, আলঙ্কারিকগণের মত এই যে, 'শান্ত'-নামক রস অনুভব-সিদ্ধ বলিয়া উহার অপলাপ (বা অপহ্নব) করা সম্ভব নহে। কিন্তু উহার স্থায়ী 'নির্ব্বেদ'—ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। কারণ, নির্ব্বেদ বলিতে বুঝায়—বিষয়ে হেয়ত্ব-জ্ঞান, অথবা দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাকে অবমান। পক্ষান্তরে, শান্তি (অর্থাৎ শম) হইতেছে নিখিল বিষয়ের পরিহার-জনিত কেবল শুদ্ধ আত্মার বিশ্রমানন্দের প্রাদুর্ভাব—উহাও অনুভব-সিদ্ধ। এই কারণেই

---

(১০) "মানাপমানয়োঃ শোকহর্ষয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ। সমবৃত্তিতয়া প্রায়ো নানুভাবা ভবন্তি হি॥ আনন্দবাষ্পরোমাঞ্চস্বেদস্তম্ভাঃ স্যুরেকদা। শান্তানুভাবো রোমাঞ্চ এক এবেতি কেবলঃ। নোপকুর্ব্বন্তি শান্তস্য ভাবাঃ সঞ্চারিণো যতঃ। তস্মাচ্ছান্তরসস্যৈবং বিকলাঙ্গত্বমুচ্যতে॥ নিবৃত্তে বিষয়াসঙ্গে স্বান্তে শান্তিমুপেয়ুষি। নির্ব্বেদাদেরনুদয়াদনুভাবো ন দৃশ্যতে। অতো হর্ষাদ্যনুভবরাহিত্যাদ্বিকলাঙ্গতা॥ অস্তীতি সত্তামাত্রেণ প্রায়ঃ শান্তো বিভাব্যতে। যতো ন ভাবোঽভিনয়ো ন শক্যো নাট্যকর্ম্মণি॥ শমে স্থায়িনি তত্র স্যুর্ভাবা হর্ষাদয়ঃ কথম্। অতোঽয়ং বিকলপ্রায়স্তথাপি শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ প্রকৃষ্টস্যোপযোগিত্বাৎ পুরুষার্থস্য দেহিনাম্" ।—ভাবপ্রঃ, পৃঃ ১৩৫-১৩৬

(১১) "নির্ব্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য প্রথমমনুপাদেয়ত্বেঽপ্যুপাদানং ব্যভিচারিত্বেঽপি স্থায়িতাভিধানার্থম্। তেন—

নির্ব্বেদস্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ।
যথা—অহৌ বা হারে বা কুসুমশয়নে বা দৃষদি বা
মণৌ বা লোষ্ট্রে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা।
তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যান্তি দিবসাঃ
ক্বচিৎ পুণ্যেঽরণ্যে শিব শিব শিবেতি প্রলপতঃ॥

"নির্ব্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য পশ্চান্নির্দ্দেশ্যত্বেঽপি প্রাঙ্ নির্দ্দেশো মুখ্যত্ব-প্রকাশনেন স্থায়িত্বপ্রতিপাদনায়।···স্ত্রৈণং স্ত্রীসমূহঃ"।—প্রদীপ। নাগোজী ভট্ট শ্লোকটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"ক্বচিদমেধ্যে মেধ্যে বা। প্রয়োজনাভাবাচ্ছিবশব্দোচ্চারণস্যাপি প্রলাপরূপত্বেন তত্রাপ্যুদ্বিগ্নত্বদ্যোতনম্।···যান্তীতি পাঠে জীবন্মুক্তেন বিদ্যমানায়াঃ স্বাবস্থায়াঃ পরামর্শো বোধ্যঃ। বস্তুতো যান্ত্বিতি পাঠোঽযুক্ত এব। তাদৃশদিনগমনে রতেঃ প্রতীয়মানত্বেন তৎপ্রধানভাবধ্বনিত্বাপত্তেঃ। অত্র ক্বচিদিত্যনেনামেধ্যে মেধ্যে বেত্যর্থকেন শান্তপরিপোষসম্ভবে পুণ্যারণ্য ইত্যধিকং প্রতিকূলং চেত্যাহুঃ। অত্র মিথ্যাত্বেন পরিভাব্যমানং জগদালম্বনম্। তপোবনাদ্যুদ্দীপনম্। অহিহারাদ্যোঃ সমদর্শনমনুভাবঃ। মতিধৃতিহর্ষাঃ সঞ্চারিণঃ"।—উদ্দ্যোত। অর্থাৎ—শ্লোকস্থিত 'ক্বচিৎ' পদের অর্থ—অপবিত্রে বা পবিত্রে। শ্লোকস্থ 'প্রলপতঃ' শব্দের অর্থ—'শিব' শব্দের উচ্চারণেও এরূপ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি তিনি যখন উহা উচ্চারণ করিতেছেন, তখন বুঝিতে হইবে, উহাও তাঁহার নিকট প্রলাপ বলিয়া মনে হইতেছে ও এ কারণে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। 'যান্তু' ও 'যান্তি'—দুইটি পাঠই মূলে আছে। 'যান্তি' পাঠ ধরিলে বুঝিতে হইবে যে, জীবন্মুক্ত কোন পুরুষ নিজের জীবন্মুক্ত-দশার যথাযথ বিবরণ দিতেছেন। 'যান্তু'-পাঠটি অসঙ্গত। কারণ 'যান্তু' এই লোট্-প্রত্যয়ান্ত-পদে কোনরূপ ইচ্ছা সূচিত হয়। অতএব, এ স্থলে যখন যথোক্ত ভাবে দিন যাওয়ার প্রার্থনা আছে, তখন বুঝিতে হইবে, ঐ প্রকার দিন যাইলে কোন প্রকার রতি (প্রীতি)-অনুভবের কামনাই প্রধানভাবে ধ্বনিত হয়। তাহা জীবন্মুক্তের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। 'ক্বচিৎ' অর্থে অপবিত্রে অথবা পবিত্রে এরূপ অর্থ-দ্বারা শান্ত-রসের পরিপোষ সম্ভাবিত হওয়ায় 'পুণ্যারণ্য'-পদটি অধিক ও পূর্ব্বভাবের বিরোধী। মিথ্যারূপে চিন্তনীয় জগৎ এ স্থলে আলম্বন। তপোবনাদি উদ্দীপন। অহি-হারাদিতে সমদৃষ্টি অনুভাব। মতি-ধৃতি-হর্ষাদি ব্যভিচারী।

(শাস্ত্রে) বলা হইয়াছে—'ইহলোকে যাহা কামোপভোগজনিত সুখ, আর পরলোকে যাহা দিব্য মহাসুখ,—সে সকল সুখ তৃষ্ণাক্ষয়-জনিত সুখের ষোড়শ ভাগেরও সমান হয় না।' অতএব, 'সর্ব্বচিত্ত-বৃত্তির বিরাম ইহার স্থায়ী'—এই মত নিরস্ত হইল। কারণ, সর্ব্বচিত্ত-বৃত্তির বিরাম অভাব মাত্র। অভাব ত আর স্থায়ী ভাব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এ হেতু শমই শান্তরসের স্থায়ী। নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী মাত্র। এই শম-স্থায়ীর লক্ষণ—নিশ্চেষ্ট ও নিস্তব্ধ অবস্থায় স্বাত্মবিশ্রাম-জনিত যে আনন্দ, তাহাই শম (১২)।

নাগোজী ভট্ট গোবিন্দ ঠক্কুরের এই মতের প্রতিবাদ-পূর্ব্বক প্রকাশকারের মত সমর্থন ও ভরত-মতের সহিত তাঁহার অবিরোধ প্রতিপাদিত করিয়াছেন। কারণ, মহর্ষির মতে শমই স্থায়ী—নির্ব্বেদ নহে। গোবিন্দ ঠক্কুর বলিয়াছেন—বিষয়ে হেয়ত্ব বোধই 'নির্ব্বেদ'। 'বিষয়' এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা তদতিরিক্ত বাহ্য বিষয়। নির্ব্বেদের অপর লক্ষণ আত্মাবমাননা। ইহার অর্থ দেহাদি উপাধি-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে তুচ্ছত্ব জ্ঞান। ইহা হইতে বোধ হয় যে, নির্ব্বেদ সুখরূপ নহে—এ কারণে উহা স্থায়ী হইতে পারে না। নাগোজী ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—করুণ-রসের স্থায়ী শোকও ত সুখরূপ নহে, তবে উহা স্থায়ী হয় কিরূপে? অতএব, প্রদীপকারের এই সমাধান গ্রাহ্য নহে। বস্তুতঃ, রতি-স্থায়ীকে অবলম্বন করিয়াই হর্ষাদির যেরূপ প্রবর্ত্তন হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান-জনিত নির্ব্বেদকে আশ্রয় করিয়াই শমাদির প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়; অতএব শম স্থায়ী নহে—স্থায়ী উহার আশ্রয়ভূত নির্ব্বেদ (১৩)।

এই প্রসঙ্গে ইহা বক্তব্য এই যে, নাগোজীর এই উক্তি-দ্বারা কাব্যপ্রকাশের উক্তির সমর্থন ও গোবিন্দ ঠক্কুরের উক্তির খণ্ডন আপাততঃ যুক্তিযুক্ত মনে হইলেও সর্ব্বাংশে উহার সমর্থন করা যায় না। কারণ, স্বয়ং মহর্ষি ভরত ও আচার্য্য অভিনব গুপ্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শান্ত-রসে শম বা তত্ত্বজ্ঞানই স্থায়ী—নির্ব্বেদ নহে। তবে নির্ব্বেদ যদি তত্ত্বজ্ঞানোত্থিত বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে উহা শমেরই নামান্তর—ইহাও পূর্ব্বপ্রবন্ধে (আষাঢ়, ১৩৫০, পৃঃ ২৪৮) বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও উহা আলোচিত হইবে। তত্ত্বজ্ঞা নির্ব্বেদ—বৈরাগ্যের চরম—জ্ঞানেরও পরাকাষ্ঠা—উহাই আত্মস্বরূপ-মুনির মতে উহাই শম।—ইহা অভিনবের সিদ্ধান্ত। ইহার উ আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা চলে না। এ কারণে—তত্ত্বজ্ঞানোত্থি নির্ব্বেদ ও শমে কোন ভেদ করা যায় না। ইষ্টবিয়োগ অনিষ্টপ্রাপ্তি জনিত নির্ব্বেদের সহিত সে প্রভেদ দেখান যাইতে পারে। ই নাগোজীও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞান-জনিত নির্ব্বেদ-বিষয়ে বিদ্বেষ—উহাই স্থায়ী হইয়া থাকে। আর ইষ্টবিয়োগ অনিষ্টপ্রাপ্তি জনিত নির্ব্বেদকে শুধু ব্যভিচারী বলা যায়—"স্থা স্যাদ্ বিষয়ে দ্বেষস্তত্ত্বজ্ঞানাদ্ভবেদ্ যদি। ইষ্টানিষ্টবিয়োগাপ্তিকৃত ব্যভিচার্য্যসৌ"। ইহা নিজমুখে স্বীকারের পরও নাগোজী যে কে তত্ত্বজ্ঞানোৎপন্ন নির্ব্বেদ ও শমের মধ্যে পার্থক্য দেখাইলেন, তাহা বু গেল না। সম্ভবতঃ জগন্নাথ পণ্ডিতরাজের প্রভাব।

নাগোজী প্রকাশকারকে সমর্থন করিতে যাইয়া অন্তরে অন্ত অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই সিদ্ধান্ত মহর্ষি ভরতের সিদ্ধান্ত বিরোধী বলিয়া হেয় হইতে পারে। কারণ, মহর্ষির মতে—'শান্ত-র —শমস্থায়িভাবাত্মক মোক্ষপ্রবর্ত্তক' (১৪)। তাই নাগোজ বলিতেছেন—তাঁহার সিদ্ধান্তে কোনরূপেই মুনির উক্তি-বিরোধ আশ করা উচিত হইবে না। কারণ মুনি (ভরত) যে শমকে স্থা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—যাহা হইতে শম লাভ হ অর্থাৎ—'নির্ব্বেদ'। 'তৃষ্ণাক্ষয়' পদের অর্থ—তৃষ্ণার ক্ষয় হয় যা হইতে অর্থাৎ—নির্ব্বেদই। অতএব, মুনি যে বলিয়াছেন—যে ভাবের সংখ্যা উনপঞ্চাশ—মুনির সে উক্তির সহিত সঙ্গতি রক্ষি করিয়াই এ সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত হইয়াছে। আটটি স্থায়ি-ভা আটটি সাত্ত্বিক, তেত্রিশটি ব্যভিচারি-ভাব—মোট উনপঞ্চাশ ভাব পক্ষান্তরে, শমকে অতিরিক্ত নবম ভাব বলিয়া ধরিলে একটি অধি হইয়া মোট পঞ্চাশটি ভাব দাঁড়ায়। উহাই বরং মুনির সিদ্ধান্ত বিরোধী। (১৫)

আপাত-দৃষ্টিতে নাগোজীর উক্তি নির্দোষ বলিয়া বোধ হইলে উহা নির্ব্বিচারে মাথা পাতিয়া লওয়া সম্ভব নহে। মহর্ষি ভরত অতি সুস্পষ্ট ভাষায় শমকেই স্থায়ী বলিয়াছেন। আর তাহা ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে অভিনব গুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন—মোক্ষ-নামক প পুরুষার্থের উপযোগিনী চিত্তবৃত্তিই স্থায়ী। কেহ কেহ উহার না দেন—'নির্ব্বেদ'। এ নির্ব্বেদ অবশ্য দারিদ্র্যাদি-জনিত নহে—প তত্ত্বজ্ঞানোৎপন্ন। এ নিমিত্ত উভয় 'নির্ব্বেদ' বিভিন্নরূপ—যেহেতু উভয়ের কারণ ভিন্ন—একের—দারিদ্র্যাদি, অপরের—তত্ত্বজ্ঞান ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে বহু বিচারের পর অভিনব বলিয়াছেন—

---

(১২) "শান্তো নাম রসস্তাবদনুভবসিদ্ধতয়া দুরপহ্নবঃ। ন চৈতস্য স্থায়ী নির্ব্বেদো যুজ্যতে। তস্য বিষয়েঽলংপ্রত্যয়রূপত্বাদাত্মাবমানরূপত্বাদ্বা। শান্তশ্চ নিখিলবিষয় পরিত্যাগজনিতাত্মমাত্রবিশ্রমানন্দপ্রাদুর্ভাবময়ত্বানুভবাৎ।" তদুক্তম্—'যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥ ইত্যাদি। অতএব 'সর্ব্বচিত্তবৃত্তিবিরামোঽস্য স্থায়ী' ইতি নিরস্তম্। অভাবস্য স্থায়িত্বাযোগাৎ। তস্মাচ্ছমোঽস্য স্থায়ী। নির্ব্বেদাদয়স্তু ব্যভিচারিণঃ। স চ—'শমো নিরীহাবস্থায়ামানন্দঃ স্বাত্মবিশ্রমাৎ'। ইতি।—প্রদীপ।

(১৩) "বিষয়েষ্বিতি। স্বস্মিন্ স্বাতিরিক্তে চ। অলংপ্রত্যয়ঃ। হেয়ত্বপ্রত্যয়ঃ। আত্মাবমাননম্। দেহাদ্যবচ্ছিন্ন আত্মনি তুচ্ছত্ববুদ্ধিঃ। তথা চ সুখরূপত্বাভাবান্ন তৎস্থায়িকস্য রসত্বমিতি ভাবঃ। শোকবৎ সমাধানমিদং চিন্ত্যম্।...বস্তুতো রত্যাদিমুপজীব্য হর্ষাদিরিব তত্ত্বজ্ঞানজনির্ব্বেদমুপজীব্য শমাদিপ্রবৃত্তেঃ স এব স্থায়ী ন শমঃ"। —উদ্দ্যোত।

(১৪) "শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকো মোক্ষপ্রবর্ত্তকঃ"—না শাঃ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৩৩৩, বরোদা সং।

(১৫) "ন চ ক্বচিচ্ছম ইতি মুন্যুক্তিবিরোধঃ। শম্যতে যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তস্য নির্ব্বেদপরত্বাৎ। তৃষ্ণায়াঃ ক্ষয়ো যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা তৃষ্ণাক্ষয়োঽপি নির্ব্বেদ এব। অতএবৈকোনপঞ্চাশদ্ভাবা ইতি মুন্যুক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে। অষ্টৌ স্থায়িনোঽষ্টৌ সাত্ত্বিকাস্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ব্যভিচারিণ ইত্যেবং গণনয়া হি তত্ত্বম্। শমস্যাপি ভাবত্বে স্বাধিক্যাপত্তিরিতাঃ" —উদ্দ্যোত।

তত্ত্বজ্ঞান হইতে নির্ব্বেদ জন্মে না, পরন্তু, নির্ব্বেদ হইতেই তত্ত্বজ্ঞান, আর তত্ত্বজ্ঞান হইতেই মোক্ষ (১৬)। বৈরাগ্য হইতে মোক্ষ হয় না—হয় প্রকৃতিলয় (১৭)। অতএব, বৈরাগ্য বা নির্ব্বেদকে স্থায়ী বলা চলে না।

যদি কেহ বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞানিগণেরই দৃঢ় বৈরাগ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব, তত্ত্বজ্ঞান-জনিত বৈরাগ্য (—নির্ব্বেদ) স্বীকারে বাধা কি? ইহার উত্তরে আচার্য্য বলিয়াছেন,—ভগবান্ পতঞ্জলির মতে তাদৃশ পরবৈরাগ্যই ত জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। অতএব, দাঁড়াইতেছে যে—তত্ত্বজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর। গোড়ার দিকের স্তরগুলির পরিপোষক শেষের দিকের স্তরগুলি। সর্ব্বশেষ স্তর পরবৈরাগ্য—উহাই পরম জ্ঞান। এ সিদ্ধান্তেও নির্ব্বেদ স্থায়ী হইতে পারে না। পরন্তু, তত্ত্বজ্ঞানই স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায় (১৮)।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ভগবান্ অক্ষপাদ মিথ্যাজ্ঞান-নাশের কারণ-ভূত তত্ত্বজ্ঞানকেই ত বৈরাগ্যেরও কারণ বলিয়াছেন। তাহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, বস্তুতঃ বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ এক নহে—ভিন্ন। নির্ব্বেদ হইতেছে শোক-প্রবাহের প্রসরণ-কারিণী চিত্তবৃত্তি-বিশেষ, আর বৈরাগ্য রাগাদির প্রধ্বংস। আর যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে, বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ অভিন্ন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যেহেতু, উহার যে কারণ তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই শাস্ত্রে মোক্ষের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—মধ্যবর্ত্তী বৈরাগ্য মোক্ষ-কারণ বলিয়া গণ্য হয় না। আরও এক কথা—তত্ত্বজ্ঞান হইতে যে নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্যের উৎপত্তি, সে পরম বৈরাগ্যও শমেরই নামান্তর মাত্র। অতএব, সাধারণতঃ যে অর্থে 'নির্ব্বেদ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই অর্থ ধরিলে নির্ব্বেদ শান্ত-রসের স্থায়ি-ভাব হইতে পারে না (১৯)।

এ সম্বন্ধে অভিনব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—যেহেতু, তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষ-সাধন, অতএব উহাকেই শান্ত-রস-স্বরূপ মোক্ষের স্থায়ি-ভাব বলা উচিত। তত্ত্বজ্ঞান বলিতে বুঝায় আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান ইন্দ্রিয়-দ্বারা লভ্য—উহা বিষয়-জ্ঞানের তুল্য নহে—উহা আত্মার স্বরূপভূত জ্ঞান। অর্থাৎ—উপনিষদের সিদ্ধান্তে আত্মাই আত্মজ্ঞান। অতএব, একমাত্র আত্মাই শান্ত-রস-স্বরূপ মোক্ষে স্থায়ী। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে স্থায়িরূপে ইহা বর্ণিত হয় নাই কেন? ইহার উত্তরে অভিনব বলিয়াছেন—রতি প্রভৃতি ভাব নিত্য স্থায়ী নহে—পরন্তু, উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিয়া আপেক্ষিক-রূপে স্থায়ী। নিত্য স্থায়ী আত্মাকে ভিত্তিরূপে আশ্রয় করিয়া ইহারাও কিছু কালের নিমিত্ত স্থায়ি-রূপে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ, অধিষ্ঠানভূত আত্মার স্থায়িত্ব-নিবন্ধনই ইহাদিগের স্থায়িত্ব—অন্যথা ইহাদিগের স্বতন্ত্র স্থায়িত্ব নাই। পক্ষান্তরে, রতি প্রভৃতি অপর সকল ভাবের অধিষ্ঠান (=আশ্রয় বা ভিত্তি)-স্থানীয় যে তত্ত্বজ্ঞান, (=আত্মজ্ঞান=আত্মা) তাহা সকল স্থায়িভাবের মধ্যে স্থায়িতম—স্বভাবতঃ স্বতঃসিদ্ধ স্থায়ী। একারণে উহার আর পৃথগ্ গণনা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব, মহর্ষি-প্রোক্ত ঊনপঞ্চাশ ভাবের আধিক্যসম্ভাবনায় মুনির উক্তি-বিরোধ আশঙ্কনীয় নহে (২০)।

এই আত্মস্বভাব বা আত্মস্বরূপ নিত্য-স্থায়ী—ইহা কখনও ব্যভিচারী হইতে পারে না; যেহেতু, ইহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব নহে—ইহা নিত্যই একরূপ। এইরূপ সমাত্মভাবকেই

---

(১৬) "……মোক্ষাভিধানপরমপুরুষার্থোচিতা চিত্তবৃত্তিঃ কিমিতি রসত্বং নানীয়ত ইতি বক্তব্যম্। যা চাসৌ তথাভূতা চিত্তবৃত্তিঃ সৈবাত্র স্থায়িভাবঃ। এতত্তু চিন্ত্যম্—কিং নামাসৌ? তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্ব্বেদ ইতি কেচিৎ। তথাহি দারিদ্র্যাদিপ্রভবো যো নির্ব্বেদস্ততোঽন্য এব, হেতোস্তত্ত্বজ্ঞানস্য বৈলক্ষণ্যাৎ। ………বিরক্তো হি তথা প্রযততে যথাস্য তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যতে। তত্ত্বজ্ঞানাদ্ধি মোক্ষো, ন তু তত্ত্বং জ্ঞাত্বা নির্ব্বিদ্যতে নির্ব্বেদাচ্চ মোক্ষ ইতি…………"। —অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৩৪—৩৫।

(১৭) "বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ (সাঙ্খ্যকারিকা ৪৭) ইতি হি তত্রভবন্তঃ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৫।

(১৮) "নন্থ তত্ত্বজ্ঞানিনঃ সর্ব্বত্র দৃঢ়তরং বৈরাগ্যং দৃষ্টম্। তত্র ভগবদ্ভিরপ্যুক্তং—"তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুণবৈতৃষ্ণ্য"মিতি (যোগসূত্র ১।১৬)। ভবত্যেবং, "তাদৃশং তু বৈরাগ্যং জ্ঞানস্যৈব পরা কাষ্ঠে"তি ভুজঙ্গবিভুনৈব ভগবতাভ্যধায়ি। ততশ্চ তত্ত্বজ্ঞানমেবেদং তত্ত্বজ্ঞান-মালয়া পরিপোষ্যমাণমিতি ন নির্ব্বেদঃ স্থায়ী, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানমেব স্থায়ীতি ভবেৎ"।—অভিনবভারতী, পৃঃ ৩৩৫। এ মতে অভিনব নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্য একই বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

(১৯) "নন্থ মিথ্যাজ্ঞানমূলো বিষয়গন্ধস্তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রশাম্যতীতি দুঃখজন্মসূত্রেণাক্ষপাদৈর্ভগবদ্ভির্মিথ্যাজ্ঞানাপচয়কারণতত্ত্বজ্ঞানং বৈরাগ্যস্য দোষাপায়লক্ষণস্য কারণমুক্তম্। নন্থ ততঃ কিম্? নন্থ বৈরাগ্যং নির্ব্বেদঃ। ক এবমাহ? নির্ব্বেদো হি নাম শোকপ্রবাহপ্রসররূপশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ। বৈরাগ্যং তু রাগাদীনাং প্রধ্বংসঃ। ভবতু বা বৈরাগ্যমেব নির্ব্বেদস্তথাপি তস্য স্বকারণবশান্মধ্যভাবিনোঽপি ন মোক্ষে সাধ্যে সূত্রস্থানীয়তা…। কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতো নির্ব্বেদ ইতি শমস্যৈবেদং নির্ব্বেদনাম কৃতং স্যাৎ…তস্মান্ন নির্ব্বেদঃ স্থায়ীতি"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৬

এস্থলে তিনটি কথা আছে। প্রথমতঃ, মহর্ষি গৌতমের ন্যায়সূত্র-মতে (১।১।২—"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি"……) তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান-নাশের কারণ—বৈরাগ্যেরও কারণ। অভিনব বলিতেছেন—এ বৈরাগ্য আর নির্ব্বেদ এক নহে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ধরিয়া লইলেন যে, নির্ব্বেদ বৈরাগ্য একই। তৎসত্ত্বেও শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, নির্ব্বেদ নহে। ইহা সত্য যে, তত্ত্বজ্ঞান হইতে নির্ব্বেদ জন্মে। এ কারণে নির্ব্বেদেরই মোক্ষ-কারণ হওয়া উচিত। কিন্তু শাস্ত্রে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। নির্ব্বেদের কারণ তত্ত্ব-জ্ঞানকেই মোক্ষ-কারণ বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান-জনিত যে নির্ব্বেদ তাহারই নামান্তর শম—উহা তত্ত্ব-জ্ঞানেরই পরিপূর্ণ অবস্থাভেদ মাত্র।

(২০) "ইহ তত্ত্বজ্ঞানমেব তাবন্মোক্ষসাধনমিতি তস্যৈব মোক্ষে স্থায়িতা যুক্তা। তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ নামাত্মজ্ঞানমেব।…তেনাত্মৈব…স্থায়ী …রত্যাদয়ো হি তত্তৎকারণান্তরোদয়প্রলয়োৎপদ্যমাননিরুধ্যমানবৃত্তয় কঞ্চিৎকালমাপেক্ষিকতয়া স্থায়িরূপাত্মভিত্তিসংশ্রয়াঃ স্থায়িন ইত্যুচ্যন্তে, তত্ত্বজ্ঞানন্তু সকলভাবান্তরভিত্তিস্থানীয়ং সর্ব্বস্থায়িভ্যঃ স্থায়িতমং… নিসর্গত এব সিদ্ধস্থায়িভাবমিতি…অতএব পৃথগস্য গণনা ন যুক্তা।… তেনৈকান্নপঞ্চাশত্তাবা ইত্যব্যাহতমেব"।—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৭

মুনি 'শম'-শব্দ-দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে ইহা'ক 'শম'-শব্দ-দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাউক, অথবা 'নির্ব্বেদ'-শব্দ-দ্বারাই ইহার উল্লেখ করা হউক,—ইহা যে সাধারণ একটি ভাবমাত্র নহে—শম-রূপ চিত্তবৃত্তি বা দারিদ্র্যাদি-জনিত নির্ব্বেদের তুল্য নহে—ইহা বুঝিতে হইবে। ইহা আত্মস্বরূপ আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান—ইহাই শমতা। ইহাই আচার্য্য অভিনব গুপ্তের অভিমত (২১)।

বলা বাহুল্য এই যে, কাব্যপ্রকাশ-কার প্রথমে নাট্যে অষ্টরস বলিয়া উপক্রম-পূর্ব্বক উপসংহারে শান্তও নবম রস—এইরূপ কথা বলিয়াছেন। গোবিন্দ ঠক্কুর এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—শান্ত-রসে রোমাঞ্চাদির অভাব-বশতঃ উহা অভিনয়-যোগ্য বলিয়া গণ্য হয় না—উহা কেবল কাব্যের বিষয়ীভূত। তাই নাট্যে অষ্টরস এই কথা মূলে উল্লিখিত হইয়াছে। অথবা, এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে—নাট্যে অষ্টরস প্রতিপাদিত হইল, কাব্যেও এই আটটিই রস (২২)।

নাগোজী ইহার উপর উদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—শান্ত-রস সর্ব্ববিষয় হইতে উপরম-স্বরূপ বলিয়া উহার অভিনয় সম্ভব হয় না। এই কারণে প্রাচীনগণ অষ্ট নাট্য-রস বলিয়াছেন। অথবা প্রাচীনগণের কথা ছাড়িয়া নবীনগণের সিদ্ধান্ত ধরা যাউক। এ পক্ষের মতানুসারে—উপসংহারে যে বলা হইয়াছে—'শান্তও নবম রস'—ইহা নাট্য-কাব্য-সাধারণ (২৩)। কারণ, বহু ব্যক্তি উহার অভিনয়-যোগ্যতাও স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব, প্রকাশকারের মতে শান্ত নবম রস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তবে তাহা নাট্য-রস হইতে পারে কি না—এ বিষয়ে তিনি দুইটি বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

এ প্রসঙ্গে অন্যান্য আলঙ্কারিকগণের মতও সংক্ষেপে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

(২১) "ন চাস্যাত্মস্বভাবস্য ব্যভিচারিত্বাসম্ভবাদবৈচিত্র্যাবহত্বা-নৌচিত্যাচ্চ। সমাত্মস্বরূপস্য দম (শম ?)-শব্দেন মুনির্ব্যপদিষ্টঃ (?) যদি তু স এব শমশব্দেন ব্যপদিশ্যতে নির্ব্বেদ-শব্দেন বা তন্ন কশ্চিদ্ভাব এব কেবলং শমশ্চিত্তবৃত্ত্যন্তং, নির্ব্বেদোঽপি দারিদ্র্যাদি-বিভাবান্তরোত্থিতনির্ব্বেদতুল্যজাতীয়ো ন ভবতি।···তদিদমাত্মস্বরূপ-মেব তত্ত্বজ্ঞানং শমতা চ"—অঃ ভাঃ, পৃঃ ৩৩৭-৩৩৮

(২২) কাব্যপ্রকাশের ৪।২৯ কারিকায় বলা হইয়াছে··· "অষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।" উহার উপর গোবিন্দ বলিতেছেন—"শান্তস্য রোমাঞ্চাদিবিরহেণানভিনেয়ত্বাৎ কাব্যমাত্রগোচরত্বমিত্যভি-ধানান্নাট্য ইত্যুক্তম্। যদ্বা নাট্যে তাবদষ্টৌ রসাঃ প্রতিপাদিতাঃ। অতঃ কাব্যেঽপি তাবন্ত এব"।—প্রদীপ।

(২৩) "অনভিনেয়ত্বাদিতি। সর্ব্ববিষয়োপরমস্বরূপত্বাত্তস্যেতি ভাবঃ। গীতবাদ্যাদেস্তদ্বিরোধিত্বাচ্চেত্যপি বোধ্যম্।···অভিধানাদিতি পাঠে বৃদ্ধৈরিতি শেষঃ। যদ্বেতি। অত্র পক্ষে শান্তোঽপি নবমো রস ইত্যেতদ্বক্ষ্যমাণং নাট্যকাব্যসাধারণম্। তস্যাপ্যভিনেয়ত্বস্য বহুভিরঙ্গীকারাদিতি ভাবঃ। গীতাদিকমপি তদ্বিষয়ং ন তদ্বিরো-ধীত্যাহুঃ"—উদ্দ্যোত।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

সাঁতার-ব্যায়াম

যাঁরা রীতিমত সাঁতার কাটেন, তাঁদের দেহ যেমন রমণীয় ছাঁদে গড়িয়া ওঠে, সে-ছাঁদ তেমনি সহজে ভাঙ্গিতে-চুরিতে জানে না! সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও থাকে অটুট। তবে সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিলেই কুফল ফলে—'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্'। সাঁতার কাটিব বলিয়া যদি চব্বিশ ঘণ্টা জলে পড়িয়া মাতন তুলি, তাহা হইলে দেহের সুকুমার ছাঁদ রক্ষা করা যেমন কঠিন হয়, স্বাস্থ্য-হানিরও তাহাতে তেমনি আশঙ্কা!

পল্লীর খিড়কি-পুকুরে বহু মহিলা আজো হয়তো স্নানের সময় একটু-আধটু সাঁতার-চর্চ্চা করেন। তবে সেখানেও যে সাঁতারে তাঁরা সুনিয়ম রক্ষা করিতে পারেন, এমন মনে হয় না। সাঁতারে স্বাস্থ্য ভালো থাকে—দেহের ছাঁদ সুকুমার থাকে। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে নদীতে বা পুকুরে সাঁতার-চর্চ্চায় বহু বিঘ্ন; এবং সে-বিঘ্ন হয়তো নানা কারণে বিদূরিত করা সম্ভব নয়।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, নদীতে বা পুকুরে সাঁতার কাটিবার সুযোগ মেয়েদের যদি না মেলে, নির্জ্জন ঘরে লোকলোচনের অন্তরালে তাঁরা সাঁতারের রীতিতে অনায়াসে ব্যায়াম-চর্চ্চা করিতে পারেন। এ ব্যায়ামে দেহ যেমন সুশ্রী সুকুমার ছাঁদে গড়িবে, দেহের সে ছাঁদ যেমন অটুট্ থাকিবে, তেমনি স্বাস্থ্যও থাকিবে অক্ষুণ্ণ; সর্দ্দিকাশি অজীর্ণতার বালাই ঘটিবে না; মন থাকিবে স্নিগ্ধ প্রফুল্ল; এবং মেয়ে-জন্মের সব চেয়ে যে বড় দায়, সন্তান-প্রসব—সে-সময় কোনোরূপ অস্বাচ্ছন্দ্য বা বিপর্য্যয় ঘটিবার ভয় থাকিবে না। প্রসবান্তে বহু নারীর দেহ যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যে নানা উপসর্গ দেখা দেয়, সে-সব হইতেও নিস্তার পাইবেন,—এ আশা খুব বেশী বলিয়াই বিশেষজ্ঞেরা রায় দিতেছেন।

আজ সেই সাঁতার-ব্যায়ামের কথা বলিতেছি।

১। প্রথমে ১ নং ছবির ভঙ্গীতে দু'পা একসঙ্গে সংলগ্ন করিয়া সিধা দাঁড়ান—দুই হাত দু'দিকে ঝুলানো থাকিবে। তার পর সবেগে দু'হাত তুলুন ঊর্দ্ধে; তুলিয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ পর্য্যন্ত গুণিবেন। গোণা শেষ হইবামাত্র সবেগে দু'হাত একসঙ্গে নামাইবেন। হাত নামাইয়া আবার গুণিবেন ১, ২, ৩, ৪, ৫। তার পর আবার আগেকার মত দু' হাত ঊর্দ্ধে তোলা। নামাইবার সময় দু'হাত আসিয়া ঠেকিবে জঘনদেশে। দুই হাত তুলিবার সময় নিশ্বাস লইতে

হইবে এবং নামাইবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিবেন। এ ব্যায়াম করিবেন পাঁচ মিনিট।

১। দু'পা একসঙ্গে সিধা দাঁড়ান

২। সাঁতারে জল কাটিবার ভঙ্গীতে

৩। টেবিলের উপর

২। ছোট একটি জলচৌকির উপর একটি বালিশ রাখুন। রাখিয়া ২ নং ছবির ভঙ্গীতে বালিশের উপর পেটের ভর দিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ুন—দুই হাত এবং দুই পা থাকিবে চৌকির বাহিরে প্রসারিত। সাঁতারে জল কাটিবার ভঙ্গীতে এবার ডান হাত সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া ঘুরান। এ সময় মুখ ফিরাইবেন বাঁ দিকে এবং বাঁ হাত থাকিবে ট্যারচা ভাবে বাঁ-দিককার জঘনদেশে। তার পর ডান হাত টানিয়া রাখুন ডান দিকে জঘনদেশের উপর—শোয়ানো ভাবে; বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া দিবেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইবেন ডান দিকে—ঠিক ঐ ২ নং ছবির অনুরূপ ভঙ্গীতে। এই সঙ্গে ডান হাত সিধা প্রসারিত করিবার সময় ডান পা উপর দিকে তোলা চাই; বাঁ পা নীচের দিকে নামান, আবার বাঁ হাত প্রসারিত করিয়া দিবার সময় বাঁ পা তুলিবেন এবং ডান পা নামাইবেন। ডান ও বাঁ হাত প্রসারিত করা—সেই সঙ্গে দুই পা তোলা-নামা করা এবং মুখ ডাহিনে-বাঁয়ে ফিরানো—ইহাতে এতটুকু বিরতি না দিয়া ক্রমান্বয়ে করা চাই অন্ততঃপক্ষে বিশ-পঁচিশ বার। সাঁতার কাটিবার সময় মানুষ যেমন করিয়া হাত-পা ছোড়ে, ঘাড় নাড়ে, তেমনি করিয়া ডাহিনে-বাঁয়ে হাত-পা ছোড়া প্রভৃতি সাঁতার-রীতির অনুকরণে এ ব্যায়াম-রীতির প্রবর্ত্তন।

৩। এবারে চাই একটি উঁচু টেবিল কিম্বা খাট অথবা তক্তাপোষ। টেবিল বা তক্তাপোষের উপর ছোট তোষক বা বালিশ রাখিবেন—নহিলে কঠিন কাঠের স্পর্শে গায়ে বেদনা বোধ করিবেন। টেবিল বা তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়ুন। এমন ভাবে শুইবেন, দু'পা যেন কোনো অবলম্বন না পায়; ঝুলন্ত ভাবে থাকিবে (৩ নং ছবি দেখুন)। এবার ৩ নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত কাঁধের সঙ্গে সরাসরি আনিয়া মুড়ুন—দুই কর-পল্লব আসিবে কাঁধের উপর। পরক্ষণে দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করিয়া দিন উরুর উপর পর্য্যন্ত, সঙ্গে সঙ্গে দু'পা হাঁটুর কাছে দুমড়াইয়া গোড়ালি দু'টি আনুন টেবিল বা খাট-তক্তাপোষের দিকে। দুই হাঁটু এ সময় সংলগ্ন না রাখিয়া বিযুক্ত করিয়া দিবেন। তার পর আবার দুই হাত তুলিয়া কাঁধের সঙ্গে সরাসরি ভাবে রাখা। এ ব্যায়াম বিরাম-বিহীন ভাবে করা চাই পাঁচ-সাত মিনিট। এ ব্যায়ামে সর্ব্বাঙ্গে যে ঝাঁকানি লাগিবে, তার ফলে মেদ ঝরিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিটোল সুকুমার ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে।

৪। এবার টেবিল বা খাট-তক্তাপোষের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া দুই হাত ৪ নং ছবির মতো মুড়িয়া দু'পা হাঁটুর কাছ হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া একবার দু'পা ফাঁক করিবেন, পরক্ষণে আবার দু'পা সংলগ্ন করিবেন। দু'পা ফাঁক করা এবং পুনরায় সংলগ্ন করা—এ কাজ করিতে হইবে বেশ দ্রুত তালে। দু'পা সংলগ্ন করিবামাত্র সংলগ্ন দু'পা নিজের দিকে সবেগে আকর্ষণ করিবেন। তার পর এমনি সংলগ্ন ভাবেই নিজের দিক্ হইতে ঠেলিয়া দু'পা ফাঁক করিয়া যতখানি সম্ভব পরস্পরের কাছ হইতে অপসারণ। এ ব্যায়াম ক্রমান্বয়ে বিরতিহীন ভাবে করা চাই অন্ততঃ-ছ'-সাত মিনিট।

৫। এবার সিধা খাড়া দাঁড়ান; দু' পায়ের হাঁটুতে-হাঁটুতে ঠেকিয়া থাকিবে। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করুন (৫ নং ছবির ভঙ্গীতে)। প্রসারিত করিয়া দুই হাত দু'দিকে জোরে-জোরে চক্রাকারে

৪। এবার উপুড় হইয়া

ঘুরান ; সামনে-পিছনে ঘন-ঘন এবং দ্রুততালে ঘুরান। এ ব্যায়ামে সর্ব্বাঙ্গে দোলন লাগিবে। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

৫। দু' হাত দু'দিকে প্রসারিত

৬। এবার ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দুই পা পরস্পর সংলগ্ন রাখিয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলুন—এমনি ছবির অনুরূপ ভাবে। এমনি ভাবে অবস্থান করিয়া দু'হাত দু'দিকে বেশ জোরে জোরে—যেন জল কাটিতেছেন,—এমনি ভঙ্গীতে তোলা-নামা করুন। হাত যখন তুলিবেন তখন নিশ্বাস লইবেন ; হাত নামাইবার সময় শ্বাস ত্যাগ করিবেন। এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট।

৭। এবার ৭ নং ছবির ভঙ্গীতে দাঁড়ান—দেহকে সামনের

৬। সামনে ঈষৎ ঝুঁকিয়া

দিকে অনেকখানি ঝুঁকাইয়া দিয়া ; তার পর সাঁতারের ভঙ্গীতে ডান হাত সামনের দিকে প্রসারণ, সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত পিছন দিকে এবং
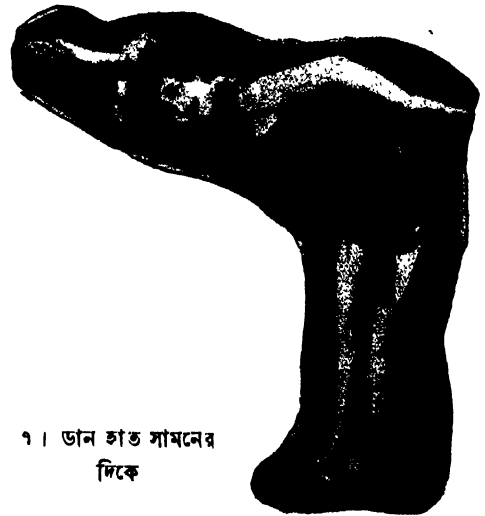
৭। ডান হাত সামনের দিকে

মুখ বাঁ দিকে ফিরানো ; পরক্ষণে মুখ ডান দিকে ফিরাইয়া বাঁ হাত সামনের দিকে, ডান হাত পিছন দিকে প্রসারিত করা। এ ব্যায়ামও দ্রুততালে বিরতিহীন ভাবে করা চাই পাঁচ মিনিট।

এ কয়টি ব্যায়াম যদি নিত্য পালন করেন, তাহা হইলে দেহের সুকুমার শ্রী-ছাঁদ, সঙ্গে সঙ্গে তারুণ্য কোনো দিন লোপ পাইবে না—স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে। মেদ জমিয়া যাঁদের দেহ কদর্য্য পিণ্ড হইয়া গিয়াছে, এ ব্যায়ামে মেদ-পিণ্ডত্ব-বর্জ্জিত হইয়া তাঁদের দেহও সুকুমার হইবে এবং সেই সঙ্গে বহু অস্বাস্থ্যের অবসান ঘটিবে।

বিজ্ঞান-জগৎ

ফিল্মে চলন্ত ট্রেণের ছবি

একরাশ টুক্‌রা ছবি জোড়াতালি দিয়া ফাঁকির কারসাজি নয়, ক্যামেরার দিকে মুখ করিয়া ট্রেণ আসিতেছে লাইনের উপর দিয়া—তার ছবি আমেরিকার ফিল্ম-শিল্পীরা আজ অপরূপ কৌশলে তুলিতেছেন। কৌশলের কথা বলি। যে-লাইনে ট্রেণ আসিতেছে, সেই লাইনের
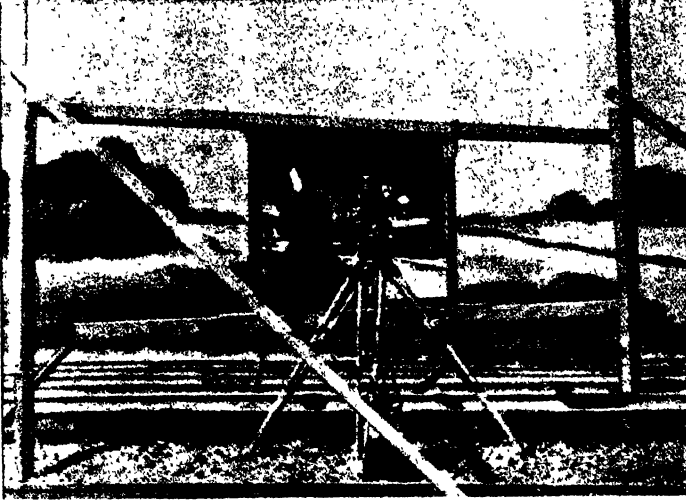
সামনা-সামনি চলন্ত ট্রেণের ছবি তোলা

পাশে ক্যামেরা রাখা হয়। ক্যামেরার পাশে থাকে একখানি কাঠের ফ্রেম—লাইনের এদিক্‌ হইতে ওদিক্‌ পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া এ ফ্রেম খাটানো হয়। এবং এই ফ্রেমের মাঝামাঝি উপর-দিকে একখানা আয়না ঝুলানো থাকে। আয়নাখানি থাকে দু'দিককার লাইনের
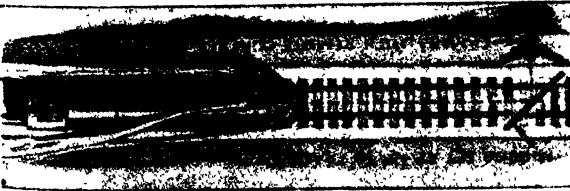
লাইনে ট্রেণ—ট্যার্‌চা-লাইনে আয়না!

উপর সরাসরি ভাবে। লাইনে চলন্ত ট্রেণের প্রতিবিম্ব পড়ে আয়নার গায়ে—আয়নাখানি ক্যামেরার লেন্সের সমরেখায় ঝুলানো থাকে; কাজেই তাহাতে চলন্ত ট্রেণের প্রতিবিম্ব পড়িবামাত্র লেন্সে ছবি ওঠে। ট্রেণখানি আয়নাটিকে ধাক্কায় চূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে আয়নার গায়ে ধাক্কা লাগিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত ট্রেণ সবেগে সামনে আসিতেছে, সে ছবি পুরাপুরি গ্রহণ করা চলে।

প্রাথমিক পরিচর্য্যা

শত্রুর বোমা কখন কোথায় পড়িয়া কত মানুষকে জখম করিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। এবং এ বিপদে সত্ত যদি জখমী-লোকের যথারীতি পরিচর্য্যা না করা হয়, তাহা হইলে তাকে বাঁচানো দায়। কোথায় কাহার কাছে প্রাথমিক পরিচর্য্যার সরঞ্জাম-পত্র, কখন তাহা পাওয়া যাইবে, সব ঠিক পাওয়া যাইবে কি না—চিন্তার কথা! আমেরিকার এক আম্বুলান্স-কোরের ধাত্রী শ্রীমতী কাম্পিজিলিয়া এ বিপত্তি-মোচনের জন্ত প্রাথমিক পরিচর্য্যার সরঞ্জাম-পত্র সর্ব্বক্ষণ পোষাকে আঁটিয়া রাখিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

সব সরঞ্জাম পিঠের ব্যাগে

ব্যাগের মধ্যে ঔষধপত্র, ব্যাণ্ডেজ, ফেল্ট, হাইপোডার্ম্মিক নীড্‌ল্‌, মরফিনের বোতল, চোখের লোশন,—অর্থাৎ সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যাগের বিভিন্ন পকেটে মজুত থাকে; এবং চওড়া দু'টি ষ্ট্রাপের সহিত সংযুক্ত করিয়া এ ব্যাগ শুশ্রূষাকারীর পিঠে ঝুলাইয়া রাখা হয়। কাজেই আপৎকালে পরিচর্য্যার কাজে অসুবিধা ঘটিতে পারে না।

অল্পাহার

অতিভোজন যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে মহা-অনিষ্টকর, অল্পাহারও ঠিক তেমনি। এ যুগে নানা কারণে আমাদের আহারের সময় ও ব্যবস্থাদিতে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনেকে সকালে এক পেয়ালা চা, টোষ্ট; তার পর কার্য্য-ক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় নাকে-মুখে কোনো মতে দু'মুঠা ভাত-ডাল গুঁজিয়া আহারের বালাই চুকাইয়া লন। তার উপর মধ্যাহ্নে কার্য্যক্ষেত্রে কেহ খান এক পেয়ালা চা, দু'খানি টোষ্ট—কেহ বা দু'খানা কচুরি-সিঙ্গাড়া-সন্দেশ! তার পর খুশী-মনে পেট ভরিয়া যে আহার, তাহা ঘটে রাত্রে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ ব্যবস্থায় শরীর মাটী হয়! এ-আহারে দেহের পুষ্টি হইতে পারে না। এমন অল্পাহারে দেহ বা শক্তি-সামর্থ্য সত্ত বেজুত বোধ না করিতে পারেন—কিন্তু তিলে তিলে যেমন তাল গড়িয়া ওঠে, নিত্য দিনের এ অল্পাহার-রীতির ফলে স্বাস্থ্যও তেমনি তিলে-তিলে ভাঙ্গিয়া শেষে অকর্ম্মণ্য হয়। আমাদের দেশে মেয়েরা সাধারণতঃ বড় অল্পাহারী সে জন্ত তাঁদের স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরিয়াছে। দেহে একটা না একটা উপসর্গ লাগিয়াই আছে! বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সারা দিনে মাঝে মাঝে একটু কিছু যদি খান, তাহা হইলে স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরিবার ভয় থাকিবে না।

ভীম-ভৈরব সাইরেন

সাইরেনের রব কিরূপ বিকট—অনেকের তাহা ভালো করিয়া জানা আছে! সমর-বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা ও সাধনার ফলে নিউ-

অতি ভৈরব রভসে

ইয়র্কে সম্প্রতি যে অভিনব সাইরেনের সৃষ্টি হইয়াছে, তার নিনাদ এমন ভীম-ভৈরব যে, পঞ্চাশ মাইল দূরেও সে রব গিয়া পৌঁছায়। এ সাইরেন-যন্ত্রটি চালাইবার জন্য যে এঞ্জিন, তার শক্তি ১৪০ অশ্ব-শক্তির সমতুল্য।

শত্রুর পিছনে

ব্রিটিশ সমর-বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি বিপক্ষ-অনুসারী প্লেন তৈয়ারী হইয়াছে। ৪৮ মিনিটে এ প্লেন চলে ৩২৭ মাইল; অর্থাৎ ঘণ্টায়
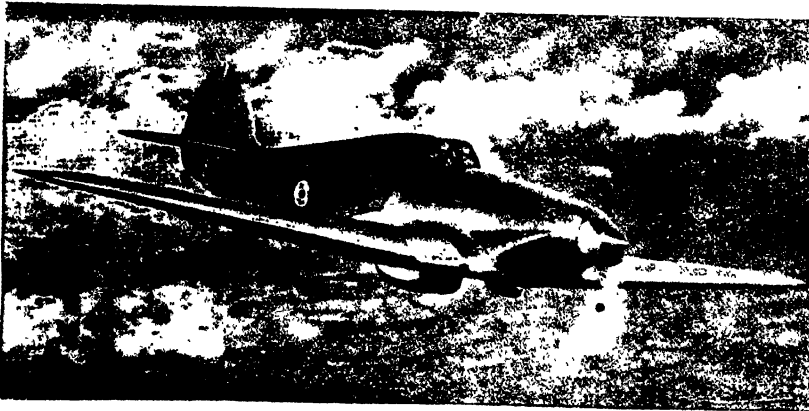
শত্রুর পিছনে তাড়া

৪০৯ মাইল রেটে। দিনে-রাত্রে বৃষ্টি-কুয়াশাতেও এ প্লেনের গতি রুদ্ধ বা মন্থর হইতে জানে না। ভিতরকার কলা-কৌশল সামরিক বিভাগ প্রকাশ করিতে চায় না। এইটুকু শুধু জানা গিয়াছে যে, ইহার গতি নিঃশব্দ। এঞ্জিনের শক্তি ১১০ অশ্ব-শক্তির সমতুল্য। এ প্লেনের পাখা এবং অবয়ব প্রভৃতি বস্ত্রাবরণে আচ্ছাদিত; আকাশের বর্ণ বুঝিয়া আচ্ছাদন-বস্ত্রের বর্ণও যেমন-খুশী বদল করা যায়।

তৃষ্ণার জল

এ যুদ্ধে রণক্ষেত্রে, জাহাজ-ডুবিতে, প্লেন-ভাঙ্গায় অর্থাৎ সর্ব্বদিকে যেন নরমেধ-যজ্ঞ চলিয়াছে। সাগরের বুকে ভেলায় ভাসিয়া অথবা বি... প্রদেশে ঠাঁই পাইলেও প্রাণরক্ষার আশা সুদূর-পরাহত। ক্ষুধায় খাদ্য নাই, পিপাসায় জল মিলিবে না! তার উপর রৌদ্র-তাপ, বৃষ্টির জল, শীতের হিম প্রাণঘাতী হইয়া ওঠে! এ সম্বন্ধে অনুশীলন করিয়া মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন,—মানুষের দেহের যে-ভার—ওজন করিলে দেখা যাইবে, এ ভারের দশ-আনা ভাগ হইল দেহমধ্যস্থ জলের ভার। দেহের এ ভার ঠিক রাখিতে হইলে প্রায়ই আমাদের জল পান করিতে হয়। প্রচুর জল পান করা চাই; নহিলে দেহের ব্যালান্স থাকিবে না। দেহ-মধ্যে জলের অভাব ঘটিলে আমাদের পিপাসা পায়। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সাড়ে তি... দিন এক বিন্দু জলপান না করিয়াও বাঁচিয়া থাকা যায়,—শীত-প্রধান দেশে বাঁচা চলে চার দিন। আমাদের দেহের যে ওজন, দেহ-মধ্যস্থ রক্তের ওজন সে-ওজনের এক-ত্রিংশতম ভাগ। যে-ব্যক্তির দেহের ওজন দু'মণ সতেরো সের, তার দেহে সাড়ে সা... সেরী ওজনের অর্থাৎ ১৫ পাইট রক্ত থাকা আবশ্যক—নচেৎ তার প... সুস্থ থাকা অসম্ভব। কাজেই জলের অভাবে আমাদের রক্তই প্রথ... দূষিত হয়। দেহমধ্যে জলের মাত্রা কমি... রক্ত গাঢ় হয়। সে সময় জল পান ন... করিলে এ গাঢ়তা এত বাড়িয়া ওঠে যে আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা-মারফ... রক্তের জোগান পায় না—'ডিলিরিয়াম' দেখা দেয়,—চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ-ঝাপ্‌সা হ... এবং হার্ট ফেল হইয়া মৃত্যু ঘটে।

জাহাজ-ডুবি হইয়া সমুদ্রে ভেলার বুকে যে-সব লোক কোনো মতে আশ্রয় লয়, তাদের পক্ষে সমুদ্র-জল পান করা চলে—অতএব তাদের মৃত্যু কেন ঘটিবে? তাছাড়া আমাদের রক্তে লবণ আছে, সাগর-জলেও লবণ, সুতরাং লবণাক্ত জল-পানে মৃত্যু ঘটিবে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, সাগর-জলে লবণ আছে অত্যন্ত বেশী। সাগর-জল পান করিলে সে জল হইতে লবণরাশি গিয়া পাকস্থলীতে জমে। কাজেই দেহ-মধ্যস্থ রক্তের তরলতা নষ্ট হয়; তরলতা নষ্ট হইলে জমাট রক্ত দেহমধ্যে প্রবাহিত হইতে পারে না; কাজেই মৃত্যু ঘটে। তরকারী বেশী লবণাক্ত

করিয়া খাওয়া বা শুধু শুধু খানিকটা করিয়া লবণ খাওয়ার অভ্যাসে মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনা হইবে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল পান করিলে পাকস্থলী তাহা সহ্য করিতে পারে না। সে জল কড়া জোলাপের কাজ করিবে। তাহাতে উগ্র উদরাময় রোগ হইবে, পিপাসা বেশী-রকম বাড়িবে এবং তার ফলে মৃত্যু আশু এবং সুনিশ্চিত। পচা পুকুরে, খানায়, ডোবায় বা মরুভূমির বুকে সঞ্চিত যে জল পাওয়া যায়, সে জলে প্রচুর ক্ষার (alkali)। সে জল পান করিলেও পিপাসা বাড়িবে এবং রক্তে টান ঘটিবে। অতএব সাবধান, সে জল কদাচ পান করিবেন না। পিপাসার সময় পানীয় জল না পাইলে শুধু মানুষ নয়, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি পশু এবং পক্ষিকুলও ঠিক ঐ কারণে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। সুতরাং "প্রাণিনাং প্রাণাঃ" সে জল—শাস্ত্রের এ-বচনে বিমূঢ় গোঁড়ামি বা এতটুকু অত্যুক্তি নাই!

ডাঙ্গায় চলে, জলে চলে

জলে-স্থলে অবাধে চলে

কালিফোর্ণিয়ার বিজ্ঞান-শিল্পীর অপূর্ব্ব দান—নূতন গড়নের মোটর ট্রাক্টর। যন্ত্রপাতি ও রশদপত্র বহিবার জন্য এই নূতন ট্রাক্টরে যে এঞ্জিন লাগানো হইয়াছে, নদীতে নামিলেও সে এঞ্জিন অচল বা নিষ্ক্রিয় হয় না। অর্থাৎ জলে-স্থলে পাহাড়ে-নালায় পাকা কঠিন পথে এবং পঙ্ক-কর্দ্দমেও এ ট্রাক্টর অবাধে চলে; এবং চলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে। পাথরের ঠোক্করে এ ট্রাক্টর যেমন অক্ষত, নদীর জলে স্নান করিয়া ডাঙ্গায় উঠিলেও তেমনি সবল, সচল। এ-ট্রাক্টরের সৃষ্টিতে কর্ম্ম-জগতের বহু সুবিধা হইবে।

বিপক্ষের গুপ্ত তথ্য

বিপক্ষ-পক্ষে যে-সব মন্ত্রণা-পরামর্শের আদান-প্রদান চলে, সে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য আমেরিকায়, ব্রিটেনে এবং ফ্রান্সে নূতন কৌশলে বেতার-ষ্টেশন নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্টেশনগুলি মৃত্তিকা-গর্ভে অবস্থিত; এবং শিক্ষিত সংবাদ-গ্রহীতারা সেখানে সর্ব্বক্ষণ বসিয়া আছে—কাণে 'হেডফোন্' লাগাইয়া। বিপক্ষ-পক্ষে বেতার-

মাটীর নীচে ষ্টেশন

মারফৎ যে সব বার্ত্তা প্রচারিত হয়, এই সব ষ্টেশনে বসিয়া সংবাদ-গ্রহীতার দল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাহা শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে শর্ট-হ্যাণ্ড রীতিতে লিখিয়া লয়। এ প্রণালীতে বিপক্ষ-পক্ষীয় রাজনীতিক-গণের উক্তি, জন-সাধারণের মতামত নিমেষে জানা যায়। প্রচার-কার্য্যে এতখানি তৎপরতার জন্য কাজের অনেক সুবিধা হইতেছে।

গোধূলি

প্রান্তরের শ্যামল আঙ্গিনা দিগন্তের ধূসরে বিলীন,
গোধূলির রূপালি ধূসর আঁখি-পাত আবেশে ঝিমায়—
এলোকেশী সরম-আভায় আপনাতে নীরবে নিলীন।
আকাশের নীলিম আড়ালে একাকিনী কিশোরী তারকা
দিনান্তের পৃথিবী-জীবন চেয়ে দেখে চকিত নয়নে—
সুদূরের গোধন বিদায় গোধূলির ধূলির বারতা।

ক্লান্ত-পাখা পাখীর ডানায় ভেসে আসে কাদের নিশ্বাস?
অজানার কোন্ সে মেয়ের জীবনের সোহাগ-বেদনা?
মিশে যায় গোধূলি-বেলায় মুহূর্ত্তের সকল উচ্ছাস!
গাছে গাছে লেগেছে যেখানে রজনীর কাজল-পরশ,
পাখীদের কাকলী-আলাপ—চাঁদিমার চিকণ রেখাটি
আন-মনে গগন-কিনারে গোধূলির বিদায় হরষ।

শ্রীঅজিত সেন (এম-এ, বি-পি-ই)।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

১৬

বৈকালে গৌরী ঠাকুরাণী আবার আসিলেন। সঙ্গে রাজীব।

গৌরী ঠাকুরাণী পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজীব কাঁদিয়া আকুল! বলিল—কথা-কাটাকাটি করে দাদা সেই যে চলে এলো, আর দেখা হলো না! কর্ত্তা কম কেঁদিয়েছিলেন! দাদা চলে আসার পর থেকে একটি দিনের জন্য মনে শান্তি ছিল না! শেষ নিশ্বাস পড়বার সময়েও মুখে শুধু একটি কথা মহীন···মহীন···মহীন!

তার পর খুঁটিয়া খুঁটিয়া রাজীব সব কথা বলিল। বলিল, নূতন উইল লিখাইবার জন্য কি জেদাজেদি! কাগজ আসিল। মুখে তিনি বলিতে লাগিলেন বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থার কথা···জামাই কামাখ্যা বাবু লিখিতে লাগিলেন···তার পর সহি করিতে গিয়া চোখে কি হইল, কিছু আর দেখিতে পান না! রাজীবকে কি ধমক··· আলো জ্বালে নাই কেন? রাজীব যত বলে, আলো জ্বলিতেছে—জোরালো-বাল্‌বের আলো···তত তিনি ধমক দেন! বলেন, না, না। রাজীব মস্করা করিতেছে!···উইল সহি করা হইল না···জয়াদি সে-উইল রাখিয়া দিল কর্ত্তার ড্রয়ারে···কর্ত্তার স্বস্তি ছিল না···শেষে জয়াদি কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—নাই বা সই হলো জ্যাঠাবাবু···তাকে যা দিতে চান, সে পাবে; তবে কর্ত্তা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন!···তার পর তিন-দিন তিন-রাত চেতনা নাই···যে-চোখ মুদিয়াছিলেন, সে-চোখ আর এ-জন্মে খুলিলেন না! সে উইলও আর সহি হইল না!···রাজীবের সব মনে আছে···পর-পর যা-যা ঘটিয়াছিল, সব!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তোমার জয়াদির কাছে তো গিয়েছিলে, উইলের কথা বলেছিলে রাজীব?

রাজীব বলিল—বললুম বৈ কি মা! বললুম, মহীন দাদার ছেলেরা এইখানেই রয়েছে···তাদের যা পাবার, সব দেছ তো দিদি··· কর্ত্তা বাবুর ব্যবস্থা-মতো?

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তাতে তোমার জয়াদি কি জবাব দিলে?

রাজীব বলিল,—বললে, ও সব টাকা-কড়ির কথা তোমার জামাইবাবু জানে, রাজীব!···তার পর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজীব আবার বলিল—জয়াদি আর সে-জয়াদি নেই! কেমন যেন! বড় ঘরের গিন্নি হয়েছে···এখানে এত মান-সম্ভ্রম···বোধ হয় তাই বদলেছে! কি, হয়তো বদলায়নি! অনেক দিন পরে দেখছি বলে আমারি বোঝবার ভুল!

সুভাষিণীকে দেখিয়া রাজীব বলিল—কর্ত্তাবাবু ভয়ঙ্কর জেদী মানুষ ছিলেন বৌমা! ভেবেছিলেন, মানুষ হয়ে মহীন দাদা তাঁকে ত্যাগ করে গেল···কখনো তিনি তাঁর নাম করবেন না! কিন্তু বলতেন আমার কাছে মাঝে-মাঝে, হ্যাঁ রে রাজীব, সে এমন ভুলে গেল আমাকে? বিয়ে-থা করেছে নিশ্চয়! বৌমাকে নিয়ে একবার এলো না আমার কাছে যে আমি বৌমাকে দেখবো? কাজের মানুষ ছিলেন··· কাজ নিয়ে অহরহ ব্যস্ত···একলা থাকলেই আমাকে ডেকে আর কোনো কথা নয়, বৌমা···শুধু মহীনদার কথা!···কলকাতায় আসতে চাইতেন শুধু মহীনদার খোঁজে···তা আসবার অবসর ছিল কি!

কাঠ হইয়া সুভাষিণী বসিয়া শুনিতেছিল··· তার দু' চোখ ভারে আচ্ছন্ন!

নীলু বলিল—ছেলেবেলায় বাবার মুখে তোমার অনেক শুনেছি। বাবা বলতেন, তোমাকে খুব ভয় করতেন। সত্যি?

সুভাষিণী বলিল—কাকা বলো নীলু···তোমাদের কাকা!

রাজীব একটা নিশ্বাস ফেলিল। বলিল—তোমার বাবা বল চিরদিন খাটবে রাজীব? মামাবাবুকে বলে পেন্সন নাও। ব বলতুম, তোমার ছেলেমেয়ে হলে তখন পেন্সন দিয়ো দাদাবা তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তখন গল্প করে দিন কাটাবো!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—জীবনে মানুষ কত কি পায়! বে টার কি দাম তা যদি মানুষ বুঝতো!···এঁর কি যাবার কথা? যাবার বয়স হয়েছিল? তাছাড়া মামাবাবুর অত স্নেহ-মায়া···

সুভাষিণী বলিল—কত দুঃখ করতেন! বলতেন, মন আ পড়ে আছে মামাবাবুর উপর···যেতে ভয় করে। যদি বলেন, হয়ে যা···সহ্য করতে পারবো না? স্নেহের অভাবের কথা মামা বলেছিলেন, সে-কথা কাঁটার মতো আজীবন তাঁর মনে বিঁধে ছি তবু বলতেন, যাবো মামাবাবুর কাছে। যেতে পারেননি পাছে কি ভাবেন পয়সার কষ্ট পাচ্ছেন···পয়সার লোভে এসেছে আত্মী করতে!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—কত ভুল যে আমরা করি! ব সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, ভুলগুলোই চিরদিন বড় হয়ে আমা মনে বাসা বাঁধে!—ভুলকে ভুল বুঝে সে-ভুল শোধরাবার কে চেষ্টা করি না!···ভাবো তো, দু' পক্ষ যদি দু' পক্ষের ভুল এ ভুলের বোঝাপড়া করতেন! তিনিও তাহলে সারা জীবন অশান্তি ভোগ করতেন না, মহীনবাবুকেও অশান্তির যাঁ জর্জ্জরিত হতে হতো না!···পৃথিবীর চেহারাই যেতো বদলে!

রাজীব নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—বড় ছেলেটিকে দেখছি না!

নীলু দিল জবাব। বলিল,—দাদার ফিরতে দেরী হয়। অফি কাজ সেরে জানকীবাবুর বাড়ীতে যায়। তাঁর ছেলে দাদার কা পড়ে। তাছাড়া জানকীবাবু আরো কত কাজ দেন। দাদা জানকীবাবু খুব বেশী ভালোবাসেন!

রাজীব বলিল,—কার ছেলে তোমরা বাবা···তোমাদের ভালো বাসবে না, এমন মানুষ পৃথিবীতে থাকতে পারে না!

ছোট মোহন একান্তে বসিয়া ক্লাসের হোম-টাস্ক লিখিতেছিল· সেই সঙ্গে এ-সব আলোচনা তার কাণে যাইতেছিল না, তা নয়!

সুভাষিণীকে বলিলেন গৌরী ঠাকুরাণী—আমি আশ্চর্য্য হয়ো বোন, রাজীবের মুখে এ-কথা শুনে! তোমার মামাবাবু মারা যাবা সময় সম্পত্তি ভাগ করে তার অর্দ্ধেক তোমাদের দেবার ব্যবস্থা ক গেছেন! অথচ···

মুখে মলিন হাসি···সুভাষিণী বলিল—যাঁর টাকা, তাঁর কাছে যখন এলো না···টাকার অভাবে রোগে এক দিন বিশ্রাম পেলেন না ···এমন ভাবে দেহ-পাত করে চলে গেলেন! ও-টাকায় আমার কিছুমাত্র লোভ নেই, দিদি!···ও টাকা···আজ যদি ওরা দিতে আসেন তো সে হবে বিষের বাতি!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন,—আমি কিন্তু শুনোতে ছাড়বো না! এতখানি দেমাক করে বেড়ায়···তোমাদের মানে না···তোমরা যেন অজাত, না, বেজাত! অথচ তোমাদের টাকা ফাঁকি দিয়ে বসে আছেন!···পরকে ফাঁকি দিয়ে যে নবাবী করে, সে আবার নাক তুলে বেড়ায় কিসের দর্পে!

সুভাষিণী বলিল,—না, না দিদি, আমাদের জন্ত কেন তুমি ওদের শাপ-মন্যি কুড়োবে! কিছু বলো না!···আমি জানি দিদি ···উনি বলতেন, মানুষকে মানুষ কিছু দিতে পারে না কখনো··· দেবার মালিক ভগবান্! তিনি না দিলে মানুষের সাধ্য নেই দিয়ে কারো দুঃখ দূর করবে!

কথাটা বলিয়া সুভাষিণী নিশ্বাস ফেলিল। টাকা থাকিলে এমন না হইয়া কত কি হইতে পারিত, বুঝি, মনের মধ্যে চকিতে জাগিয়া উঠিল তাহারি ছবি!

রাজীব বলিল—কাকেও বলতে হবে না মা। জয়াদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম টাকার কথা।···জয়াদি তাতে জবাব দিলে, টাকা-কড়ির কথা তোমাদের জামাইবাবু জানে!···এ কথা জামাইবাবুর কাছেই পেড়ে দেখবো···তিনি কি বলেন!···আর এও বলি বৌমা, তোমার নিজের টাকা···ভিক্ষে নয়, এ-টাকা তোমাকে যে দেছে, তার কাছে তুমি সত্যবদ্ধ হয়ে সে টাকার ভার নিয়েছো। সে-টাকা আত্মসাৎ করবে, এ কেমন কথা!

সুভাষিণী বলিল—কি হবে দাদা টাকায়? তোমরা আশীর্ব্বাদ করো···তোমাদের আশীর্ব্বাদ থাকলে আমার ছেলেদের কোনো অভাব, কোনো দুঃখ থাকবে না।

১৭

রাত্রে কামাখ্যা সাহেব খাতাপত্র খুলিয়া বসিয়াছে, জয়া আসিয়া সামনের চেয়ারে বসিল।

বলিল—রাজীব এসেছিল···তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

কথাটা কামাখ্যা সাহেব শুনিয়াও শুনিল না! জয়া দেবী বলিল —কথাটা কাণে গেল না বুঝি?

কামাখ্যা সাহেব বুঝিল, জয়া দেবীর কথা শুনিতেই হইবে। ভাব দেখিয়া মনে হয়, জয়া পণ করিয়া আসিয়াছে, কথা না শুনাইয়া ছাড়িবে না! মুখ তুলিয়া অগত্যা প্রশ্ন করিল—কি বলছো?

জয়া বলিল—রাজীব এসেছে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—হুঁ।

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—না।

জয়া বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা করবে।···অনেক কথা বললে। বললে, ওদের ওখানে যাবে···মহীনের ছেলেদের জন্ত মন আকুল হয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলে, মহীনের টাকা-কড়ি তাকে দেওয়া হয়েছে তো?

কামাখ্যা সাহেব জ্বলিয়া উঠিল! বলিল—গুরুঠাকুর এসেছেন উপদেশ দিতে!···তুমি ওকে মাথায় তুলেছো নিশ্চয়!

জয়া বলিল—মাথায় আমি কি তুলবো! আমাদের এতটুকু বেলা থেকে দেখছে! জ্যাঠামশাই ওকে মাথায় রাখতেন। কাজেই কোনো দিন চাকরের মতো ওকে আমরা দেখিনি তো।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—হুঁ···

এইটুকু মাত্র বলিয়া কামাখ্যা সাহেব আবার খাতাপত্রে মনোনিবেশ করিল।

জয়া বলিল—মহীনের বাড়ীতে আজ বিকেলে ওর যাবার কথা ছিল, বৌকে আর ছেলেদের দেখতে! জ্যাঠামশায়ের উইলের কথা, টাকার কথা তাদের কাছে ও বলবে না, ভাবো?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—যদি বলে, সে জন্ত কি করতে হবে?

জয়া কহিল—কি করতে হবে, তুমিই জানো! আমি তোমাকে বলেছিলুম, ওদের একেবারে বঞ্চিত করো না! তুমিই বলেছিলে থামো, থামো, বৈষয়িক ব্যাপারে মেয়ে-মানুষ হয়ে কথা কইতে এসো না!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—সে-দিন যদি ও কথা বলে থাকি, তাহলে আজো আমি ঐ কথাই বলছি—এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই!

জয়া বলিল—এ কথা যদি ওঠে, কি জবাব দেবে শুনি?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কাকে জবাব দিতে হবে? তোমার ভাইয়ের ছেলেদের? না, ঐ খানশামা-বাবুকে?

জয়া বলিল—তুমি ভাবো, এ কথা যদি ওঠে, তাহলে জানকীবাবুর কাণে এ-কথা পৌঁছুবে না?···জানকীবাবুকে তো মহীনের বড় ছেলে খুব বশ করে ফেলেছে, ছেলেরা বলে। তোমার ছেলেকে ছেড়ে তারি উপর জানকীবাবুর অনেক বেশী নির্ভর!

কামাখ্যা সাহেব এ সব কথা জানে না, তা নয়। জানে। তবে এ-কথা লইয়া জানকীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিতে চায় না। জানকীবাবুকে সে ভালো করিয়া জানে। অপরে যদি কোনো বিষয়ে জিদ ধরিয়া বসে, জানকীবাবু সে-জিদ ভাঙ্গিবেন, নিশ্চয়! তাই কামাখ্যা সাহেব মনে-মনে মস্ত আশা গড়িয়া রাখিয়াছে,··· অর্থাৎ সুবিধা বুঝিয়া ছেলের আসন উঁচুতে তুলিয়া সে-আসনকে কায়েমি করিবে! এ-সব তুকতাক্ কামাখ্যা সাহেবের ভালো করিয়া জানা আছে! সে কৌশল কামাখ্যা সাহেবের জানা না থাকিলে এখানে সর্ব্ববিভাগে কামাখ্যা সাহেব এত কাল একচ্ছত্র আধিপত্য রক্ষা করিতে পারিত না!

জয়ার কথার উত্তরে কামাখ্যা সাহেব বলিল—তুমি কিছু ভেবো না। তোমার জ্যাঠামশায়ের সে উইলের মুশাবিদা আমিই করেছিলুম। এখন তোমার গুরুঠাকুর রাজীব যদি সে উইলের কথা তোলে তো তার হেস্তনেস্ত আমিই করতে পারবো!···একটা চাকর এসে আমার সামনে হুমকি দেবে, আমাকে করবে কাহিল, এতখানি অপদার্থ আমি নই, সত্যি!

স্বামীর এ কথায় কোনো আশ্বাস মিলিল না। স্বামী গোঁ ধরিয়া আছে, গোঁ ছাড়িবে না! কাজেই আশ্বাস মিলিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কামাখ্যা সাহেবের অফিস-কামরা ত্যাগ করিয়া জয়া নিজের মহলে আসিল। আসিয়া দেখে, পিনাকী বসিয়া আছে খাটের উপর···মলিন মুখ।

জয়া বলিল—হঠাৎ এমন সময় আমার ঘরে?

সুপুত্রের মতো নম্র কণ্ঠে পিনাকী বলিল—ভারী বিপদে পড়েছি।

জয়া বলিল—বিপদ তো তোমাদের লেগেই আছে! এত সম্পদেও তোমাদের বিপদ ঘটে কি করে', বুঝি না! আমার অদৃষ্ট!

এ কথায় পিনাকী ভড়কাইয়া গেল ! বাবার ঘরে মা গিয়াছিল, সে জানে। বুঝিল, নিশ্চয় ছেলেদেরি কোনো ব্যাপার লইয়া বাপের সঙ্গে মায়ের মতান্তর-মনান্তর ঘটিয়া গিয়াছে নিশ্চয় ! মার মন তাই এমন···

কিছুক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মা বলিল,—কি বিপদ বাধিয়েছো শুনি ?

পিনাকী বলিল—সুপ্রসন্নবাবুর মেয়ের বিয়েতে কলকাতায় গিয়েই তো মুস্কিল বাধলো। জানো আমার একটু পোষাক-আশাকের সখ আছে ! এক দিন চৌরঙ্গীর দিকে বেরিয়ে ওয়াটশন কোম্পানির দোকানে ঢুকেছিলুম। কি সব স্যুট দেখলুম ! লোভ সামলাতে পারলুম না ! দু'টো নতুন স্যুটের অর্ডার দিলুম। সঙ্গে ছিল গোটা পঁচিশেক টাকা···তাই থেকে দশ টাকা দিলুম তাদের এ্যাডভান্স ! এখন সে-পোষাক তৈরী। তারা পোষাক পাঠিয়েছে ভি-পি পার্শ্বেল-পোষ্টে। দাম দিতে হবে একশো বারো করে', যার নাম দু'শো চব্বিশ টাকা !

কথা শুনিয়া জয়ার দুই চোখ কপালে উঠিল ! জয়া বলিল—দু'শো চব্বিশ টাকায় দু'টো স্যুট্ ! কি ভেবেছো পিনু ?

পিনাকী বলিল—তবু তো দশ টাকা এ্যাডভান্স দিয়েছি ! না হলে দু'শো চৌত্রিশ টাকা পড়তো। এ টাকা অবশ্য ডাক-খরচা নিয়ে···আলাদা ডাক-খরচা দিতে হবে না !

জয়া কোনো জবাব দিল না···মুখ ফিরাইয়া ডাকিল,—মুখ্যি···

মুখ্যি ওরফে মোক্ষদা দাসী। জয়ার খাশ-পরিচারিকা। রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে মুখ্যি আসিয়া জয়ার পায়ে হাত বুলাইয়া পা টিপিয়া দেয়। ঘুম তো সহজে আসে না ! কি যে হইয়াছে ! অনেকক্ষণ পা টিপিতে টিপিতে তবে ঘুম আসে !

মুখ্যি আসিলে আর্জী পাশ করানো কঠিন হইবে, তাই পিনাকী বলিল—আজ পোষ্ট-আপিসের লোক গিয়েছিল অফিসে। আমি বলে দিয়েছি, বাড়ীতে টাকা আছে। বাড়ীতে আসতে বলেছি। টাকা নিয়ে পোষাকের প্যাকেট ডেলিভারী দিয়ে যাবে। কাল বেলা ন'টার মধ্যে বাড়ীতে আসবে। কিন্তু টাকা আমার হাতে নেই।

উদাস কণ্ঠে জয়া বলিল—হাতে টাকা না থাকে, প্যাকেট ফেরত যাবে।

পিনাকী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল—তা কখনো হয় ? সই করে অর্ডার দিয়ে এসেছি ! বাঃ !

জয়া বলিল—যার সামর্থ্য নেই, এমন অর্ডার সে দেয় কেন ?

পিনাকী বলিল—বা রে, তখন কি জানতুম এত দাম পড়বে ! —তাছাড়া বাবা আমার এ্যালাউয়ান্স বন্ধ করে দেছে ! বলে, অফিস থেকে টাকা পাচ্ছো তো। না হলে তোমাকে শুধু শুধু জ্বালাতন করবো কেন ? কখনো জ্বালাতন করেছি নিজের সখের খাতিরে, বলো ?

জয়া দেবী বলিল—অফিস থেকে টাকা পাচ্ছো ! ভাতের খরচ দিতে হয় না ! সখের পোষাকের খরচ তাই থেকে দেবে !

পিনাকী বলিল—ভারী তো টাকা পাই অফিস থেকে ! হুঁঃ, মাসে দেড়শোটি মাত্র টাকা।

জয়া দেবী বলিল—তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা যারা পায়, তারা সে টাকায় সংসার চালায় পিনু। আর দেড়শো টাকায় তোমার হয় পয়সার অভাব ! কি তোমার খরচ, শুনি ?

পিনাকী বলিল—যে ভাবে মানুষ করেছো, মানে, সে ভ[াব] বজায় রেখে চলতে গেলে তার খরচপত্র কত পড়ে, হিস[াব] আছে ?

জয়ার ভাব কঠিন ও অবিচল ! জয়া বলিল—হিস[াব] থাকলেও তোমাকে এ টাকা দেবার সামর্থ্য আমার নেই, পিনু তুমি তো জানো, আমার নিজের টাকা-কড়ি কিছু নেই···তোমাদে[র] সংসারে আমিই শুধু বিনা ভাতায় বাস করছি !

পিনাকী মায়ের দুই পা জড়াইয়া ধরিল, বলিল—লক্ষীটি মা··· এইবার···শুধু এইবারটির জন্য ! এই আমি কাণ মলছি, নাক মল[ছি] এবার থেকে আমি বুঝে চলবো···আর কখনো তোমার কাছে হা[ত] পাতবো না···একটি পয়সার জন্যও না ! এবারকারের মতো আমা[কে] রক্ষা করো।

জয়া বলিল—ওঁর কাছে বলো গে না, যিনি দেবার মালি[ক] ···যাঁর কাছ থেকে বরাবর সব পেয়ে আসছো !

দুই চোখ কপালে তুলিয়া থিয়েটারী ভঙ্গীতে পিনাকী বলিল—বাবার কাছ থেকে ?

—তা নয় তো রাস্তার লোকের কাছে চাইতে যেতে বলছি ?

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পিনাকী বলিল—তবেই হয়েছে ···বাবা বলে, হুঁঃ···যেথান থেকে যে এসে আমার নামে নালিশ করে বলবে, টাকা পাবে, বাবা তাকে দিচ্ছে টাকা···আর আমাকে শাসাচ্ছে তোমার এ্যালাউয়ান্স থেকে আসছে মাসে এ টাকা কাটা যাবে ! কাটলো টাকা। এই করেই তো বাবা আমাকে আরো বেহাল করে দেছে !···বাবার কাছে আমি যেতে পারবো না টাকার জন্য। মরে গেলেও না !···তুমি দাও টাকা।

জয়া বলিল—আমায় কেটে ফেললেও একটি পয়সা বেরুবে না ! আমাকে মিছে বলা !···

মুখ্যি আসিল। দেখিয়া জয়া বলিল—এসেছিস ! আয়···

বলিয়া জয়া স্নানের উদ্যোগ করিল।

পিনাকী ডাকিল—মা···

সে স্বরে আবেদনের গভীর কাকুতি ! মা বলিল—আমি সত্যি কথাই বলেছি পিনু। একটি পয়সা দেবার সামর্থ্য আমার নেই !··· আর এ'ও বলি, দেড়শো টাকা পেয়েও তোমার সখ আর বাবুয়ানা মেটাতে পারো না ! আর ঐ মহীনের ছেলে···তাদের সংস্থানের কথা ভাবো দিকিনি !

এ কথায় পিনাকী একেবারে খ্যাঁক করিয়া উঠিল ! বলিল—ডার্টি বেগার্স ! ওদের মতো থাকতে বলো ? হুঁঃ ! কিসে আর কিসে !

জয়া বলিল—যাও ! আমাকে মিছে জ্বালাতন করো না। আমার হাতে দু'টো টাকা নেই আর রাত পোহালে আমি তোমায় দেবো দু'শো চব্বিশ টাকা !

এ কথা বলিয়া জয়া দেবী শয্যায় দেহ-ভার লুটাইয়া দিল। মুখ্যি পা দু'খানা নিজের কোলে টানিয়া খাটের প্রান্তে বসিল।

নৈরাশ্যের আক্রোশে দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া পিনাকী বলিল—দেবে না টাকা ? বেশ ! কাল সকালে উঠে দেখবে, তোমার বড় ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে মরে ঝুলছে !···এ দেশী দোকানের বিল নয় যে ফেরত দেবো ! বিলিতি দোকান। তাদের কাছে যদি মান না রইলো তো প্রাণ রেখে কল ?

১৮

গ্রহ-নক্ষত্রগুলা যেন বাঁকিয়া একজোটে সব কি চক্রান্ত করিয়া বসিয়াছে। পরের দিন সকালে কামাখ্যা সাহেব চা পান শেষ করিয়া বাড়ীর অফিস-কামরায় চিঠিপত্র খুলিয়া বসিয়াছে, মঙ্গল-গ্রহের মতো রামহরি সান্যাল আসিয়া নমস্কার করিয়া সামনে দাঁড়াইল।

রামহরিকে দেখিবামাত্র কামাখ্যা সাহেব চমকিয়া উঠিল। সে-দিনের সব কথা মনে পড়িল। ভাবিল, আবার বুঝি কোনো নূতন নালিশ দায়ের করিতে আসিয়াছে! কহিল—কি খপর সান্যাল?

রামহরি বলিল—আজ্ঞে, এসেছিলুম···তার মানে, আপনি যেমন বলেছিলেন, আপনায় কথা-মত মেয়ের জন্য একটি পাত্র স্থির করেছি। তাদের পাকা কথা দিতে পারছি না···মানে, আপনার কাছ থেকে আশ্বাস না পেলে!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—আমার কাছ থেকে আশ্বাস!

রামহরি বলিল—আজ্ঞে, জানেন তো, ভালো সম্বন্ধ কেন ভেঙ্গে গেল···সেই মুল্লোড়া-কোলিয়ারীর এঞ্জিনীয়ার ছেলেটি! আপনার কাছে তাই কেঁদে এসে পড়েছিলুম। সব শুনে আপনি বলেছিলেন! সেই···মানে, পিন্টুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে যখন দেওয়া যাবে না, আপনি বলেছিলেন, বিয়ের সময় কিছু অর্থ সাহায্য করবেন!

কামাখ্যা সাহেব স্থির-মনে কথাটা শুনিল। শুনিয়া কোনো জবাব দিল না।

অবিচল নেত্রে রামহরি চাহিয়া রহিল কামাখ্যা সাহেবের পানে—উত্তরের প্রত্যাশায়! বড়লোকের মুখের কথা···সে কথায় নির্ভর রাখিবে, এতখানি বিমূঢ়তা তার নাই! তবু···কথাটা যখন কামাখ্যা সাহেব বলিয়াছে, একবার সে কথার খেই ধরিয়া তাকে নাড়া দিতে ক্ষতি কি? যদি কিছু আসে!

কামাখ্যা সাহেবকে নিরুত্তর দেখিয়া রামহরির বুকখানা কাঁপিল। রামহরি বলিল—তাহলে আমার সম্বন্ধে অনুমতি···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—টাকা দেবো, বলেছিলুম,—বটে! কত টাকা, বলো তো?

রামহরি বলিল—আজ্ঞে, আপনি বলেছিলেন দু'হাজার!··· নে,সেই কথার উপর ভরসা করেই এখানে সব ঠিক করে ফেলেছি। ছেলেটি ভালো। বাপ কলকাতার এক বড় সদাগরী আপিসের বড় বাবু···ছেলেটিকেও বাপ নিজের আপিসে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। তারা চায় সবশুদ্ধ সাড়ে তিন হাজার টাকা! তার পর খাওয়ান-দাওয়ান আছে। মোট যার নাম, চার হাজারের কমে হবে না। তা আমি কোনো মতে দু'হাজার জোগাড় করতে পারবো···স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে···আর গবর্ণমেণ্ট পেপার বেচে। বাকী দু'হাজার···মানে, আপনার কথায় ভর করে তাদের সঙ্গে অনেকখানি এগিয়েছি···বাকী শুধু বিয়ের দিন স্থির করে পাকা দেখা সেরে ফেলা!

কামাখ্যা সাহেবের বুকে যেন কে মুগুর মারিল! বুকখানা এমনি টন্ টন্ করিয়া উঠিল! কামাখ্যা সাহেব বলিল—এত টাকা রোজগার করছো সান্যাল···আর মেয়ের বিয়ের জন্য দু'হাজার টাকার জোগাড় করতে···বলছো, কোম্পানির কাগজ বেচবে, স্ত্রীর গহনা বন্ধক দেবে।

রামহরি বুঝিল বড়লোকের যা ধুয়া···বলিল—আজ্ঞে, আপনিও তো বোঝেন···একটা পোজিশন্ আছে এখানে চাকরির জন্য···সে পোজিশন রেখে চলতে হলে···আপনিই দেখুন না···আপনি তো এখানকার মালিক বললেই চলে··· খরচপত্র কত বেশী করতে হয়! আপনার পোজিশনে আপনি যেখানে এক হাজার দু'হাজার বাড়তি খরচ করেন, আমরা চুনোপুঁটির দল···পোজিশনের জন্য আমাদের সেখানে কম্-সে-কম্ পঞ্চাশটা টাকাও তো বাজে-খরচে যায়!···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—হুঁ···বিয়ে কবে দেবে, স্থির করেছো?

রামহরি বলিল—এই মাসের শেষাশেষি! তাঁরা তাই চান। আরো দু'টি-তিনটি পাত্রী তাঁদের হাতে রয়েছে! যে আগে কথা দেবে, তার সঙ্গেই তাঁরা পাকা কথা কবেন!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—বেশ! যখন বলেছি দেবো···তখন ও দেওয়া হয়েছে, জেনো!···কথা তুমি দাও গে।

রামহরির মন তবু প্রবোধ মানিতে চায় না! রামহরি বলিল—টাকার জন্য কবে নাগাদ আপনাকে আবার জ্বালাতন করতে আসবো তাহলে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—বিয়ের পাঁচ-সাত দিন আগে এসে টাকা নিয়ে যেয়ো!

এ-কথার উপর আর কথা চলে না। উত্তর ভালো। তবু মনের ভার এ উত্তরে লঘু হইল না! উপায় কি! রামহরি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কামাখ্যা সাহেব আবার চিঠিপত্র খুলিয়া বসিল। মনে সে সহজ প্রসন্নতা নাই···মন বিরসতায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

জয়া আসিল, বলিল—একটা কথা ছিল···

কামাখ্যা সাহেব বিরক্ত হইল। বলিল—আবার কথা! তোমাদের পাঁচ জনের কথার জ্বালায় আমার কাজকর্ম সব বন্ধ হবে, দেখছি!

এ কথায় জয়া দমিল না। বলিল—জানকীবাবু মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন কলকাতা থেকে! শুনলুম, কারা এসেছে মেয়ে দেখতে।

কামাখ্যা সাহেব এ সংবাদ শুনিয়াছে। উত্তরে বলিল—হবে!

—হবে! জয়া বলিল—হবে, মানে? তবে যে তুমি বরাবর বলে আসছো, তোমার ছেলের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে ঠিক করে রেখেছেন···তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে তোমার ছেলে এখানকার ছত্রধর হয়ে বসবে···সে কথা তবে বাজে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—ছেলেকে তুমি এমন তৈরী করেছো যে, তার সঙ্গে জানকীবাবু দেবেন তাঁর মেয়ের বিয়ে, ভাবো?

জয়া বলিল—ছেলে আমি তৈরী করেছি? না, তুমি?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—সে সম্বন্ধে এখন তর্ক করে লাভ নেই। ···ছেলে যা তৈরী হয়েছে···তোমার-আমার এখন সাধ্য নেই যে, তাদের ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়বো!···এই মাত্র এসেছিল রামহরি সান্যাল। তার ডাগর মেয়েকে নিয়ে তোমার ধিঙ্গি ছেলে যে-চালে চলেছিলেন···ভাগ্যে দেশটা বিলেত নয়—তাহলে বহু টাকা খেশারত দিতে হতো! তবু রামহরি যে রকম চ্যাঁচামেচি সুরু করেছিল, পাছে পাঁচ-কাণ হয়, দায়ে পড়ে তাই তার মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলুম। আর বলেছিলুম, তার সে-মেয়ের বিয়েতে আমি দু'হাজার টাকা দেবো!

শুনিয়া জয়া শিহরিয়া উঠিল! তুমি দেবে দু'হাজার টাকা? সত্যি?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—দু'হাজার না দি, কিছু দিতে হবে। যে-রকম লোক···বাগে পেয়েছে···কিছু টাকা না নিয়ে ছাড়বে না··· বুঝছি!

জয়া ক্ষণকাল নিরুত্তরে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কি মনে হইল, ফিরিল। ফিরিয়া বলিল—রাজীবের কথা খেয়াল রেখো! সে আসবে তোমার কাছে···মহীনের সম্পত্তির কথা কইতে।

কামাখ্যা সাহেব রাগিয়া অগ্নিশিখা হইয়া উঠিল! কহিল—সম্পত্তি! কার সম্পত্তি? কিসের সম্পত্তি, শুনি?

জয়া বলিল—জ্যাঠামশায়ের সম্পত্তি। মারা যাবার সময় নিজের হাতে তুমি উইল লিখেছিলে···রাজীব ছিল তার সাক্ষী!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কিসের সাক্ষী? কিসের উইল? মরবার সময় মাথা খারাপ হয়ে তিনি যা তা ভুল বকছিলেন···তাঁকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্ম আমি কতকগুলো ছাই-পাঁশ লিখেছিলুম!···হুঁঃ! সে উইল? কোনো দেশের কোনো আইনে তাকে উইল বলে না! আসুক রাজীব···তাকে আমি বুঝিয়ে দেবো'খন উইলের মর্ম!

উত্তর শুনিয়া জয়া আরো স্তম্ভিত হইল। পায়ের নীচে মাটী যেন দুলিতে লাগিল! দেহ-মন ব্যাপিয়া তাহারি দোলনের কাঁপন!

জয়া বলিল—আমি জ্যাঠামশায়ের কাছে বলেছিলুম, নাই বা সই হলো জ্যাঠামশাই···যাকে তুমি যা দিয়ে যাচ্ছো, সে তা পাবে··· আমি দেখবো। সে-কথা?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—যদিই বা সে কথা তুমি বলে থাকো··· সে কথায় তোমার জ্যাঠামশায়ের পুরোনো উইল বাতিল নামঞ্জুর হয়ে যাবে? হতো বটে বাতিল, তিনি যদি এ উইলে সই করতেন! এ হলো আইনের কথা! বুঝলে···আইন! এ আইনের যুগ! আমরা পুরুষ মানুষ···কাজের লোক···আমরা আইন মেনে চলি। ও-সব বে-আইনী মেয়েলি কাঁদুনির আমরা প্রশ্রয় দিই না!

স্থির অবিচল নেত্রে জয়া চাহিয়া রহিল স্বামীর পানে। তার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল···বাতাসের দোলায় গাছের কচি কিশলয় যেমন কাঁপে, তেমনি! মনের মধ্যে বিভীষিকা যেন কালো কালির ফণা তুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিল!

জয়া বলিল—তোমার এই পাপেই ছেলেগুলো এমন বিগড়ে গেল!···এছাড়া তার আর অন্য কোনো কারণ নেই।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—পাপ! কি পাপ করলুম আমি শুনি?

শান্ত সংযত কণ্ঠে জয়া বলিল—থাক্···তুমি স্বামী···শাস্ত্রে বলে, পরম-গুরু···তোমার পাপের কথা মুখে উচ্চারণ করে' আরো অমঙ্গল ডেকে আনবো শেষে? আমার ভয় করে! এ কথা বলিয়া জয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

কামাখ্যা সাহেবের চিঠিপত্র আর পড়া হইল না। মনের মধ্যে সমস্ত একাকার করিয়া যেন আগুনের লহর বহিতেছে···বিকট তার তাপ···অসহ্য তার জ্বালা!···নিঃশব্দে সে বসিয়া রহিল!

যেন কি একটা ঘটিয়া গিয়াছে···বিরাট্ বিপর্যয়! এবং কামাখ্যা সাহেব আজ একান্ত নিরুপায়, অসহায়! স্ত্রী? মুখের পানে না চাহিয়া চলিয়া গেল! পুত্র-কন্যা? তারা নিজেদের লইয়া মত্ত···শুধু স্বার্থ···শুধু দাও আর দাও! বাপের সুখ-দুঃখের কোনো খপর রাখে না!

আলোর প্রখর দীপ্তিতে নিজের সমস্ত অতীত জীবনটা যেন জ্বলজ্বল্ করিয়া উঠিল!···

কিসের জন্য? কাহার জন্য···কি করিয়া সারা জীবন কাটাইয়া দিল? টাকা···টাকা···টাকা! সে-টাকার বিনিময়ে আরাম-বিরাম কোথায় মিলিয়াছে? শান্তি কৈ?

এ আলোয় অতীতের যতখানি দেখা যায়···তার কোথাও এতটুকু আরাম বা শান্তির ছায়াময় স্নিগ্ধ তরুতলের দেখা মেলে না!

জ্বলন্ত জতুগৃহ মধ্যে বসিয়া কামাখ্যা সাহেবের দেহ-মন পুড়িতে লাগিল।

সহসা কে ডাকিল—জামাইবাবু···

কামাখ্যা সাহেবের চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখে···মুখ যেন পরিচিত! কে···?

আগন্তুক কহিল—আমি রাজীব।

রাজীব! এখনো বাঁচিয়া আছে! আশ্চর্য্য!

একটু পূর্ব্বে যে-রাজীবের নামে অতখানি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিয়াছে, এখন সে-রাজীবকে সামনে দেখিয়া কামাখ্যা যেন কাঁটা হইয়া গেল! কোনো মতে মুখে বলিল—ও···হ্যাঁ···রাজীব!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রূপকথা

নাই বা এলে কদম তলে—কুঞ্জবীথি থাকুক দূরে!
রাজার কুমার ছুটাক ঘোড়া তেপান্তরে দূর সুদূরে।

আজকে প্রিয়া আমরা কেবল খেলবো মনের গোপন কোণে,
চাঁদের কিরণ নাই ছড়ালো মধুর হাসি কুঞ্জবনে;
শাঙন-সাঁঝের আঁধার যদি নামে নামুক ধরার 'পরে,
তায় বা কিসের ক্ষতি মোদের? থাকবো মোরা আঁধার ঘরে!
তোমার উজল হাসির রেখা আমার ঘরে জ্বালবে আলো—
আঁধার আমি চাই সখি আজ, আঁধার আমার লাগবে ভালো!
বাহিরে বয় বাদল বাতাস করুণ কাতর নিপীড়নে,
উতল বাতাস আজকে সখি কইছে কথা আমার মনে—
বলছে যেন রাজকুমারী সোনার কাঠির পরশ পেয়ে
উঠলো বেঁচে দৃষ্টি-বিহ্বল রাজকুমারের পানে চেয়ে!
তুমিই সখী রাজার কুমার, আজকে আমি রাজকুমারী—
আজকে তুমি সকল আমার—সহজ কথায় বলতে পারি।
সোনার কাঠির পরশ দিয়ে ঘুম ভাঙালে আমার মনে,
বাদল বাতাস জানায় ফাগুন, জাগলো কুসুম হৃদয়-বনে।
আজকে তুমি নাও গো সখি আজকে আমায় আপন করে'
নিঃস্ব করে' রিক্ত করে' এই বাদলের অন্ধকারে!

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক গগনে যে কু-গ্রহের উদয় হইয়াছিল, গত ২৬শে জুলাই তাহা কক্ষচ্যুত হইয়াছে। ফ্যাসিজমের মন্ত্রগুরু সীনর মুসোলিনি এই দিন ইটালীর এক-নায়কত্বের গদি হইতে অপসারিত হইয়াছেন। ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল্ স্বয়ং সম্মিলিত পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনের ভার লইয়াছেন। প্রবীণ সেনাপতি মার্শাল্ বাদোগ্লিও প্রধান-মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজা ভিক্টর ও মার্শাল বাদোগ্লিও ইটালীর শাসনভার গ্রহণ করিবার পর ফ্যাসিষ্ট দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বহু ফ্যাসিষ্ট

ভিক্টর ইমানুয়েল্

সীনর মুসোলিনি

কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু তবুও ইটালী যে ফ্যাসিষ্ট-প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। রাজা ভিক্টরের দৌর্ব্বল্যের সুযোগে যে ফ্যাসিজম্ ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রভুত্ব অপ্রতিহত রাখিবার জন্য ২১ বৎসর কাল এই নৃপতি স্বীয় রাজনীতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত রাখিয়াছিলেন। সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মার্শাল্ বাদোগ্লিও ফ্যাসিজমের প্রতি প্রসন্ন না থাকিলেও ফ্যাসিষ্ট সরকারের ভৃত্যরূপে তিনি আবিসিনিয়ায় বিষ-বাষ্প ব্যবহার করিয়াছিলেন, আদ্দিস্-আবাবার ডিউক্ উপাধিতেও ভূষিত হইয়াছিলেন। পরে, ইনি ফ্যাসিষ্ট দলের সভ্যও হন। এই গুণধর মার্শাল ও দুর্ব্বলচিত্ত রাজা ভিক্টর এখন ইটালীর কর্ণধার।

কিরূপ অবস্থায় এবং কেন মুসোলিনি পদত্যাগে বাধ্য হইলেন, তাহার নির্ভরযোগ্য সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই; ইটালীকে জার্ম্মাণীর প্রয়োজনানুরূপ সাহায্যদানে অসম্মতিই যে মুসোলিনির পতনের একমাত্র কারণ—ইহা অনুমান মাত্র। সে যাহা হউক, মুসোলিনির পতনে ইটালীর প্রতিরোধের অবসান হইবে বলিয়া যে আশা পোষণ করা হইয়াছিল, তাহা ফলবতী হয় নাই। সম্মিলিত পক্ষের পণ—অক্ষশক্তি বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহারা অস্ত্র সম্বরণ করিবেন না। তাই, জেনারল আইসেনহাওয়ার ইটালীর জনসাধারণ ও রাজা ভিক্টরের উদ্দেশে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় কেবল ইটালীর আত্মসমর্পণই দাবী করিয়াছিলেন, কোনরূপ সর্ত্ত উপস্থাপিত করেন নাই। মার্শাল বাদোগ্লিও দুর্দ্ধান্ত সেনাপতি; তিনি বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিবার লোক নহেন। ইহা ব্যতীত, যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার পর ইটালীর অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা না জানিয়া ইটালীর পক্ষে অস্ত্র ত্যাগ করা স্বাভাবিকও নহে। জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য ইটালী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী; অতঃপর সম্মিলিত পক্ষ যদি এই ঘাঁটী ব্যবহার করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ভীষণতা হইতে ইটালী নিস্তার পাইবে না; অর্থাৎ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন লাভ হইবে না। কাজেই ইটালীকে ঘাঁটীরূপে ব্যবহারের প্রলোভন যে সম্মিলিত পক্ষ ত্যাগ করিবেন—এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্য্যন্ত ইটালীর পক্ষে অস্ত্র ত্যাগ করা কার্য্যতঃ অসম্ভব।

ইটালীকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখায় জার্ম্মাণীর গভীর সামরিক স্বার্থ আছে; সে আপাততঃ ইটালীকে দিয়া তাহার প্রতিরোধমূলক সংগ্রাম চালাইতে চাহে। ইটালী যদি সম্মিলিত পক্ষের সহিত পৃথক্ সন্ধি করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী প্রত্যক্ষ ভাবে বিপন্ন হইবে। তখন সমগ্র দক্ষিণ-য়ুরোপের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়োজন হইবে; ইটালীয় নৌবহর হস্তচ্যুত হওয়ায় সমুদ্রবক্ষেও জার্ম্মাণী দুর্ব্বল হইবে। কাজেই, ইটালী জার্ম্মাণীকে ত্যাগ করিতে চাহিলেও জার্ম্মাণী এখন সহজে ইটালীকে ত্যাগ করিতে পারে না। এই দুই মিত্ররাষ্ট্রের মতদ্বৈধের ফলে যদি মুসোলিনির পতন ঘটিয়াও থাকে, তাহা হইলেও এখন এই দুই রাষ্ট্রের মৈত্রীবন্ধন নূতন করিয়া দৃঢ় হইয়া উঠা স্বাভাবিক। এখন মার্শাল্ বাদোগ্লিওর বহু জুলুম আবদারও হিটলার সহ্য করিবেন।

ইটালীকে লক্ষ্য করিয়া সম্মিলিত পক্ষের অভিযান পরিচালিত হইবার রাজনীতিক কারণ আছে। অবশ্য, উত্তর-আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইটালীকে আঘাতের সামরিক সুবিধাও তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। রাজনীতিক দিক্ হইতে ইটালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সম্মিলিত পক্ষ আশা করিয়াছিলেন-

যুদ্ধের অবস্থা প্রতিকূল হইবামাত্র ইটালীতে রাজনীতিক বিপর্য্যয় ঘটিবে ; সে তখন স্বতন্ত্র সন্ধির জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিবে। এই হিসাব অনুসারে মুসোলিনির পতনে তাঁহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছিলেন। ইটালী যদি সত্যই স্বতন্ত্র সন্ধির প্রার্থী হইত, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষ বিনা অস্ত্র সঞ্চালনে যুদ্ধের একটি বড় অধ্যায়ে জয়ী হইতেন। যে কারণেই হউক, তাহা সম্ভব হয় নাই। ফলে, সম্মিলিত পক্ষ এখন যুদ্ধ-সম্পর্কে জার্ম্মাণীর পরিকল্পনার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলেন। বর্ত্তমানে ইটালীকে দিয়া প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালানই জার্ম্মাণীর সমর-পরিকল্পনা ; সম্মিলিত পক্ষকে এখন ইটালীয় ভূমিতে ইটালীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে এবং একাধিক বড় যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিতে হইবে।

মার্শাল বাদোগ্‌লিও

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ইটালীকে জার্ম্মাণীর সহিত সম্বন্ধচ্যুত করাইবার পরিকল্পনা যখন সফল হইল না, তখন অবিলম্বে জার্ম্মাণীকে অন্যান্য ক্ষেত্রে আঘাত করা প্রয়োজন। কেবল ইটালীকে লইয়া বসিয়া থাকিলে জার্ম্মাণীর সুবিধাই হইবে ; য়ুরোপে প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হইবে না। এবার গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণী আর পূর্ব্ব-য়ুরোপে আক্রমণাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই ; তথায় সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মাণীকে প্রবল ভাবে আঘাত করিতেছে। এই সময় উত্তর, পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর অঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে আঘাত করা প্রয়োজন ; সেই আঘাত যদি প্রবল ও ব্যাপক হয়, তাহা হইলে আগামী বৎসর জার্ম্মাণী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতে পারে। এই বিষয়ে বিলম্ব করিলে সম্মিলিত পক্ষের অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইবে ; কারণ, শীতকালে য়ুরোপের কতকগুলি অঞ্চলে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম-পরিচালন দুষ্কর।

সিসিলির যুদ্ধ—

সিসিলির যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্ব উপকূলে অক্ষশক্তির প্রধান প্রতিরোধ-ব্যূহ ক্যাটানিয়র পতন ঘটিয়াছে ; পশ্চিমে উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল দিয়া মার্কিণী সৈন্য এবং মধ্য অঞ্চল দিয়া ক্যানাডীয় সৈন্য দ্রুত মেসিনা প্রণালীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সময় সমুদ্র-বক্ষে বৃটিশ নৌ-বাহিনীও অত্যন্ত তৎপর। উপকূলস্থে গোলাবর্ষণ করিয়া তাহারা অক্ষশক্তির সেনাবাহিনীর পশ্চাদপসরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে ; অবিরাম গোলাবর্ষণে মেসিনা প্রণালী অলঙ্ঘ্য করিয়া তুলিতেছে।

সিসিলির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কিছু অক্ষশক্তির সেনা "দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া" শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে বলিয়া মনে হইয়াছি[ল]। ইতোমধ্যে অক্ষশক্তির সেনা দলে দলে সিসিলি ত্যাগ ক[রিতে] আরম্ভ করিয়াছে। কাজেই মনে হয়, অক্ষশক্তি সি[সি]লিতে আর সৈন্যক্ষয় করিতে চাহে না। শত্রুসেনার পশ্চা[দ]পসরণের পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সম্মি[লিত] পক্ষের নৌ ও বিমানবাহিনী এখন মেসিনা প্রণালীর প্রতি [ও] ইটালীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে বিশেষ ভাবে অবহিত।

রুশ-রণাঙ্গন—

পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর আক্রমণাত্মক প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। গত ৫ই জুলাই জার্ম্মাণ সেনাপতি ফন্ ক্লুজ ওরেল-কুরস্ক ও কুর[স্ক]-বিয়েলগোরোড অঞ্চলে আক্রমণ আরম্ভ করেন। প্রথম আক্রম[ণে] উত্তরাঞ্চলে ৫ মাইল এবং দক্ষিণ অঞ্চলে ১৫ মাইল সোভিয়েট ব্যূ[হ] ভেদ হইয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট সেনা অকস্মাৎ প্রবল প্রতি[-]আক্রমণ আরম্ভ করে এবং ২৩শে জুলাইয়ের মধ্যে তাহাদের হৃ[ত] অঞ্চল পুনরধিকার করিয়া লয়।

রুশ সেনাপতিমণ্ডল ঐ সময় ওরেলে জার্ম্মাণীর ২॥ লক্ষ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও নিশ্চিহ্ন করিবার সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধ করিতে থাকেন। বিয়েলগোরোড অভিমুখে তাঁহাদের আক্রমণ চলিতে থাকে। গত ৪ঠা আগষ্ট সোভিয়েট বাহিনী ওরেল ও বিয়েলগোরোড পুনরধিকার করিয়াছে। কি[ন্তু] ওরেলের জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিবার পরিকল্পনা সফ[ল] হয় নাই ; তাহারা উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে ব্রিয়ানস্কের দিকে পশ্চাদ[প]সরণ করিতে পারিয়াছে। উত্তরে ব্রিয়ানস্ক এবং দক্ষিণে জার্ম্মাণী[র] অন্যতম প্রধান ঘাঁটী খারকভের উদ্দেশে এখন সোভিয়েট বাহিনী[র] প্রচণ্ড আক্রমণ চালিত হইতেছে। খারকভের তিন দিক্ হইতে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণ সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টন করিবার উদ্দেশ[্য] লইয়াই রুশ সেনা অগ্রসর হইতেছে। ইতোমধ্যে খারকভের ২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে চুগুয়েভ রুশ সৈন্যরা অধিকার করিয়াছে ; খারকভ-পলটভা রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। খারকভের পতন হইলে দক্ষিণ অঞ্চলে জার্ম্মাণী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ; ইহার পর যুদ্ধক্ষেত্র হয়ত অতি সত্বর নীপার নদীর তীর পর্য্যন্ত সরিয়া যাইবে। মধ্য-রণাঙ্গনে স্মলেনস্কই জার্ম্মাণীর প্রধানতম ঘাঁটী ; ব্রিয়ানস্ক, উত্তরে ভোলকাইলুকি এবং উত্তর-পূর্ব্বে ভিয়াসমা হইতে এই স্মলেনস্ক অভিমুখে আক্রমণ প্রসারিত করাই সোভিয়েট সেনাপতিদিগের উদ্দেশ্য।

এবার গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণীর আক্রমণ যে এই ভাবে ব্যর্থ হইবে এবং নাৎসী সেনাদল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রতিরোধে রত থাকিতে বাধ্য হইবে, তাহা অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। রুশিয়ার বিরুদ্ধে শেষবার প্রবল অভিযান চালাইয়া তাহার সমর-শক্তি চূর্ণ করিতে প্রয়াসী হওয়াই জার্ম্মাণীর পক্ষে স্বাভাবিক। এই ভাবে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের শেষ ক্ষীণ আশা তাহার ছিল। বস্তুতঃ, এই আশা লইয়া সে আক্রমণেও প্রবৃত্ত হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর এই শেষ আশা যখন বিফল হইয়াছে, তখন প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে কালক্ষয় করিয়া যুদ্ধে অচল অবস্থা আনয়ন এবং সম্মিলিত পক্ষে সন্ধির জন্য আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়াসই তাহার একমাত্র অবশিষ্ট পন্থা। কাজেই, এখন কি পূর্ব্ব-য়ুরোপ, কি উত্তর ও দক্ষিণ-য়ুরোপ—সর্ব্বত্র জার্ম্মাণী প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কালক্ষয় করিতে প্রয়াসী হইবে এবং

সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে বিভেদ ও পারস্পরিক সন্দেহ সৃষ্টির জন্য কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিতে থাকিবে। ভবিষ্যতে রণক্ষেত্র অপেক্ষা কূটনীতিক্ষেত্রেই জার্ম্মাণীর তৎপরতা অধিক প্রকাশ পাইবে বলিয়া মনে হয়।

জাপানের রুশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা?

য়ুরোপে অক্ষশক্তির অবস্থা যে অত্যন্ত প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ষ্ট্যালিনগ্রাড ও টিউনিসিয়া তাহাকে প্রবল আঘাত দিয়াছে, সিসিলি ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপাবলী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সে ভূমধ্যসাগরে দুর্ব্বল হইয়াছে, পশ্চিম-য়ুরোপে ক্রমবর্দ্ধমান বোমাবর্ষণের ফলে তাহার প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, য়ুরোপখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণাশঙ্কা তাহাকে সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, যুদ্ধের এই গতি পরিবর্ত্তনের জন্য অক্ষশক্তি এখন তাহাদের প্রাচ্য সহচরকে রুশিয়া আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করিবে। এই অনুমানের সমর্থনে তাঁহারা বলেন—বের্লিনস্থিত জাপ-দূত সম্প্রতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন এবং টোকিওর জাপ পররাষ্ট্র-সচিবের সহিত পুনঃ পুনঃ আলাপ করিয়াছিলেন। এইটুকু সংবাদে ভিত্তি করিয়া জাপানের রুশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় না। অক্ষশক্তির বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে জাপানের রুশিয়া আক্রমণ সম্ভবপর মনে হইতে পারে; যুদ্ধের গতি ফিরাইবার জন্য ইহাই অক্ষশক্তির শেষ উপায়। য়ুরোপে জার্ম্মাণী যদি পরাজিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র অক্ষশক্তির চরম সমাধি অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইবে; জাপানে টোজো কোম্পানীর অন্তর্ধানে বিলম্ব হইবে না।

পূর্ব্ব দিক্ হইতে রুশিয়াকে আঘাত করিবার প্রয়োজন বোধ হইবামাত্রই যে জাপান এই দারুণ বিপজ্জনক অভিযানে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা মনে করা যায় না। রুশিয়া পশ্চিম রণক্ষেত্রে যতই বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকুক না কেন, উহাতে পূর্ব্বাঞ্চলে তাহার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই। জাপানের সহিত যে কোন মুহূর্ত্তেই তাহার সজ্ঘর্ষ আরম্ভ হইতে পারে—ইহা জানিয়াই রুশিয়া তাহার সমর-পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। মাঞ্চুকোয় ১০ লক্ষ সৈন্যের অবস্থিতির কথা চীনা রাজনীতিকদিগের নিকট পৌছিল; কিন্তু রুশ রাজনীতিকগণ তাহা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেন না—ইহা কখনও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে রুশিয়া ব্যাপক সমরায়োজন করিয়াছে; পশ্চিমাঞ্চলের সহিত পূর্ব্বাঞ্চলের এই আয়োজনের সম্পর্ক নাই—স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী, স্বতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র এবং স্বতন্ত্র গোলাগুলীর কারখানা পূর্ব্ব-এশিয়ায় প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় জাপান যে এক আঘাতে রুশিয়ার কিছুই করিতে পারিবে না—ইহা নিশ্চিত। পূর্ব্ব-রুশিয়ায় যদি কিছু কাল যুদ্ধ চলে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান যদি নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে পশ্চিম দিকে রণক্ষেত্র সরাইয়া লইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে জাপান নিজে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। রুশিয়ার পূর্ব্ব অঞ্চলেই জাপানে প্রত্যক্ষ বিমান-আক্রমণের সর্ব্বোত্তম ঘাঁটী; এই ঘাঁটী ব্যবহারের সুযোগ পাইলে, সম্মিলিত পক্ষ এত দিন যে অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন, তাহা দূর হইবে। ইহা ব্যতীত, অবরুদ্ধ চীনে মার্কিণী সাহায্য প্রবেশের পথও তখন মিলিবে। ইতোমধ্যে আমেরিকার দূর পাল্লার বোমাবর্ষী বিমানগুলি জাপানের উত্তরে কিউ-রাইল দ্বীপপুঞ্জে বোমা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে অতর্কিতে সৈন্য অবতরণ করাইয়া জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাতের পরিকল্পনা হয়ত আমেরিকার আছে। এই সময় জাপনকে আঘাত করিবার জন্য পূর্ব্ব-এশিয়ার ঘাঁটী ব্যবহারের সুযোগ যদি সম্মিলিত পক্ষের হয়, তাহা হইলে জাপান অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এইরূপ অবস্থায় জাপানের পক্ষে রুশিয়া আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ ব্যাপার নহে; এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে জেনারল টোজো বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিবেন।

সুদূর প্রাচী—

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সম্মিলিত পক্ষের মুণ্ডা অধিকার। সলোমনস্ দ্বীপপুঞ্জে নিউ জর্জ্জিয়ায় মুণ্ডা জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী ছিল। সম্প্রতি এই ঘাঁটী সম্মিলিত পক্ষের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাফল্যে অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু জাপানকে এই ভাবে পরাজিত করিবার আশা বাতুলতা। প্রশান্ত মহাসাগরের এক একটি দ্বীপ হইতে জাপানকে বিতাড়িত করিতে যদি এত সময় অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষের জাপানী দ্বীপপুঞ্জে পৌছিতে শতাব্দী কাল অতিবাহিত হইবে।

তবে, একটি আশার কথা—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে যে ভাবে জাপানের নৌ ও বিমান-বাহিনী পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহাতে যে অতি সত্বর সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে; এই ক্ষতিপূরণের উপযোগী উৎপাদন-শক্তি জাপানের নাই। জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নৌ-যুদ্ধের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। স্থলভাগে জাপানের সহিত শক্তি-পরীক্ষার পূর্ব্বে সমুদ্রবক্ষে তাহাকে যদি হীনবল করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাহাকে পরাভূত করা অত্যন্ত দুষ্কর হইবে। কাজেই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান নৌ-যুদ্ধে পরাভূত হইতে থাকিলে স্থলভাগে তাহার চরম পরাজয়ও নিকটবর্ত্তী হইবে।

সম্মিলিত পক্ষ বর্ষার পরে ব্রহ্ম-অভিযানের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশে তাঁহাদের বিমান-আক্রমণের প্রাবল্য সম্প্রতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ প্রসারিত হইবার পূর্ব্বে ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের সহিত জাপানের প্রবল শক্তি-পরীক্ষা হইবে; সেই শক্তি-পরীক্ষার ফলাফলের উপরই ব্রহ্ম-অভিযানের ফলাফল বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে। কাজেই, প্রশান্ত মহাসাগরের নৌ-যুদ্ধের সহিত ব্রহ্ম-অভিযানের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রশান্ত মহাসাগরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জাপান যদি ভারত মহাসাগরে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে সে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িবে।

ব্রহ্মদেশে বসিয়া জাপান কেবল সম্মিলিত পক্ষের আক্রমণ প্রতি-রোধের আয়োজনই করিবে, কি ঐ অঞ্চলে যুদ্ধ প্রসারিত হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ব-ভারতে আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবে, তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধই জাপানের প্রকৃত জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম। সম্মিলিত পক্ষ যদি ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারে সমর্থ হন, তাহা হইলে

ব্রহ্মচীন পথ উন্মুক্ত হইবে এবং চীনের শক্তি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। চীনের শক্তিবৃদ্ধিই জাপানকে পরাভূত করিবার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। কাজেই, ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্ম জাপান যে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্রহ্মদেশ রক্ষার প্রয়োজনে সে পূর্ব্ব-ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতভূমিতে রণক্ষেত্র প্রসারিত করিবার জন্ম প্রলুব্ধ হইতে পারে। বিশেষতঃ, ভারতের রাজনীতিক জটিলতা ও শোচনীয় অর্থনীতিক অবস্থা জাপানকে উৎসাহিত করিবার সম্ভাবনা আছে। সে এই অলীক আশা পোষণ করিতে পারে যে, এই সময় ভারতের বেসামরিক জনসাধারণ তাহাকে মুক্তিদাতা বলিয়া গ্রহণ করিবে; তাহাদের সহযোগে রণক্ষেত্রে জাপান-সেনার দায়িত্ব লঘু হইবে।

মিঃ চার্চ্চিলের সফর—

গত ১০ই আগষ্ট মিঃ চার্চ্চিল পুনরায় আমেরিকায় গিয়াছেন কুইবেকে মার্কিণী রাষ্ট্রনায়কদিগের সহিত তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এবার কেবল য়ুরোপের যুদ্ধ সম্পর্কেই নহে—জাপানের বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযান সম্পর্কেও কুইবেকে আলোচনা হইবে বলিয়া মনে হয়। তবে, আলোচনা সামরিক প্রসঙ্গেই নিবদ্ধ থাকিবে। জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সহিত ভারতে ও ব্রহ্মদেশের রাজনীতিক প্রশ্ন বিশেষ ভাবে জড়িত। কিন্তু এ বিষয়ে কুইবেকে যে কোনরূপ আলোচনা হইবে না, তাহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১২।৮।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন

বাঙ্গালার এই ঘোর দুর্দ্দিনেও যে বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশন ২৬শে আষাঢ় চন্দননগরে নিত্যগোপাল স্মৃতি-মন্দিরে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা সত্যই আনন্দের বিষয়। বঙ্গভাষা এবং বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি, বঙ্গভাষার প্রতি উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদর্শন এবং ভাষার বহুল প্রচার ও প্রসার কামনাই এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত হরিহর শেঠ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চন্দননগরের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে চন্দননগরের অবদানের উল্লেখ করিয়া গর্ব্ব করিবার মত তেমন কিছু না থাকিলেও ভারতচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয়স্থানরূপে; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের উদ্বোধন-স্থানরূপে; আত্মোৎসর্গের অতুল্য দৃষ্টান্ত কানাইলালের জন্ম-স্থানরূপে; মাইকেল, বিদ্যাসাগর, রঙ্গলাল, ভূদেব, বঙ্কিম, নবীনচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গভারতীর সুসন্তানদিগের স্মৃতি-বিজড়িত তাঁহাদিগের বাঞ্ছিত স্থানরূপে; জয়পুর মানমন্দিরের অন্যতম নির্ম্মাতা জ্যোতিষী ফাদার পঁ ও বুদিয়ে, বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নব সংস্করণের প্রকাশক ফাদার গেঁরার প্রবাস-বাসের স্থানরূপে; কবি পাঁচালী তর্জ্জা যাত্রার আদি অন্যতম প্রবর্ত্তক রাসু, নৃসিংহ, নিত্যানন্দ, আণ্টুনি সাহেব, চিন্তেমালা, বাণভট্ট, গুরুবল্লভ, বউমাষ্টার, মহেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির বাসস্থান ও কর্ম্মক্ষেত্ররূপে আমরা আমাদিগের জন্মস্থান এই চন্দননগরের জন্য গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। * * বাঙ্গালী যদি জগতে কালজয়ী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে জাতীয় ভাষা, জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন দ্বারা শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা চাই-ই এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির মধ্যে ভাষার বিস্তার সাধন আবশ্যক।"

সম্মেলনের মূল সভাপতি রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার অভিভাষণে বিশ্বসাহিত্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"বাংলা গদ্য সাহিত্য সেইরূপ, যে আজ সভ্য জগতের দরবারে একটি সম্মানিত আসন অধিকার করবার স্পর্দ্ধা করছে, তার কারণ এর পিছনে আছে পদ্য সাহিত্যের বিরাট ঐতিহ্য। এখনও আমাদের বাংলা কাব্য-সাহিত্য বিশ্বের বিস্ময়ের সামগ্রী। সুতরাং আমরা এ কথা গৌরব করেই বলতে পারি যে, কি পদ্যে, কি গদ্যে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার যোগ্যতা রাখে।···জননী বঙ্গভাষার স্নেহ-কোমল সূত্রে দুইটি বড় জাতিকে বাঁধতে পারতো—কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য তা হলো না। এক দিন হয়ত হবে। হয়ত কেন? নিশ্চয় হবে। এক দিন হয়েছিল, যখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কণ্ঠে কণ্ঠে সঙ্গীত মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল চারুশিল্পে ভাস্কর্য্য মহিমা-মণ্ডিত হয়েছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ না করেও এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি যে, বঙ্গভাষা-জননীর প্রসাদে আমাদের উভয় শাখার মধ্যে যে সংস্কৃতিগত ঐক্য গড়ে উঠেছে, তা সাময়িক স্বার্থান্ধতায় ক্ষুণ্ণ হলেও চিরদিন সে ঐক্যকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।"

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সুললিত আবেগময়ী ভাষায় সাহিত্য কি? তাহার উদ্দেশ্য কোথায়? তাহার সার্থকতা ইত্যাদির আলোচনা সম্বন্ধে বলেন—"সাহিত্যকে শুধু কবিতা ও উপন্যাসের বন্ধন থেকে সর্ব্বমানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং জীবন-সংগ্রাম ও জীবনকর্ম্মের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে, তাকে অবসর-বিনোদনের বিলাসিতা থেকে কঠোরতর বাস্তবতার অগ্নিদাহিকার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে, আত্মানুসন্ধান ও মুক্তির সন্ধান হবে আমাদের জিজ্ঞাসা এবং সেই জিজ্ঞাসার বাহনরূপে দেখা দিবে নূতনতর সাহিত্যের চিন্তা।"

বিজ্ঞান-শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বিভা মজুমদার বাঙ্গালা ভাষার ভিতর দিয়া সাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে সচেষ্ট হইবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন—"সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যাহাতে সত্বর বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই দুরূহ কার্য্য এক মাতৃভাষার সাহায্যেই সম্ভব। জগদীশচন্দ্র সর্ব্ব-প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষার সাহায্যেই বিজ্ঞানের আলোচনা করা উচিত। তাই তিনি প্রায় ৫২ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি বাংলা ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন, এমন কি, তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলির নামকরণ বাংলা ভাষাতেই করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষাতেই বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবার জন্ম প্রফুল্ল-চন্দ্র চিরদিন বিজ্ঞানসেবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টা বিফল হয় নাই। এখন আমাদের বিজাতীয় ভাষার মোহ প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে।"

খাদ্য-সমস্যা

বাঙ্গালায় খাদ্য-সমস্যার সমাধান হওয়া ত পরের কথা, সে সমস্যা দিন দিন অধিক তীব্র হইয়া উঠিতেছে। অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা কলিকাতা কর্পোরেশনে বিবৃত একটি ঘটনায় বুঝা যায়। হিন্দু সংকার সমিতি এক দিনে কলিকাতার রাজপথ হইতে ২৭টি শব শ্মশানে লইয়াছেন। ইহার সহিত যদি মুসলমান সৎকার সমিতির হিসাব যোগ করা যায়, তবে দেখা যাইবে—যে কলিকাতা বাঙ্গালার রাজধানী—যে কলিকাতায় বাঙ্গালার গভর্ণর বিরাজিত—সেই কলিকাতার রাজপথে যদি প্রতিদিন অনাহারে এইরূপ লোক মরিয়া পড়িয়া থাকে, তবে মফঃস্বলে অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কারণ, কলিকাতায় লোককে চাউল ও গম দিবার—যেমনই কেন হউক না—ব্যবস্থা আছে জানিয়া মফঃস্বল হইতে লোক কলিকাতায় আসিতেছে—অনেকে যে পথেই মরিতেছে, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাঙ্গালা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের সচিব—মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী সচিব হইয়া বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অভাব যদি থাকে, তবে তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে—থাকিলে সে অভাব অনায়াসে অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানীর দ্বারা পূর্ণ করা যাইবে। তাহার পর তাঁহার সুর ক্রমেই—অনাহার ক্লিষ্টের কণ্ঠস্বরের মত—ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। তবে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—পাছে অভাবের উল্লেখ করিলে লোক ভয় পায়, সেই জন্য এবং কেন্দ্রী সরকারের প্রতিশ্রুতিতে নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—অভাব নাই। অর্থাৎ তিনি মিথ্যা কথা বলিলেও তাহা খাঁটী মিথ্যা নহে!

কেন্দ্রী সরকারের প্রতিশ্রুতিও রক্ষিত হয় নাই। কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য সার আজিজুল হক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর উক্তির সহিত "তুল্য-মূল্য।" তিনি বলিয়াছেন—যখন অন্যান্য প্রদেশের আপত্তিতে খাদ্য-শস্যে অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থা বাতিল করিতেই হইল, তখনও তিনি হাল ছাড়িলেন না। তিনি ও যান-সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল সব ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়ে লাহোরে গমন করিলেন। তথায় যখন তাঁহারা সব বাধা অতিক্রম করিবার উপায় করিতে পারিলেন—ঠিক সেই সময়ে—বাঙ্গালার এমনই দুরদৃষ্ট যে—দামোদরের বন্যায় রেলপথ ভাঙ্গিল। কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টার ক্রটি হইল না। তাঁহারা স্থলপথ না পাইয়া জলপথ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন—জাহাজে বাঙ্গালায় গম পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। দুইখানি জাহাজে গম বোঝাই করাও হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ দুইখানিরই কল বিগড়াইয়া গেল! এখনও জাহাজের কল সংস্কৃত হইতেছে। অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ কেহ নিবারণ করিতে পারে না; কিন্তু যে জাহাজে মাল বোঝাই করিবামাত্র তাহার কল অচল হয়, সে জাহাজ কোথা হইতে কে সংগ্রহ করিয়াছিল? এ দিকে যে বাঙ্গালায় লক্ষ লক্ষ লোকের দেহের কল অচল হইতেছে—তাহার জন্য কি কেহ দায়ী নহে? মানুষের কাছে দায়িত্ব হইতে—কৈফিয়ৎ দিয়া—অব্যাহতি লাভ করা যায় বটে, কিন্তু ভগবানের কাছেও কি তাহা হইতে পারে?

সার আজিজুল হক যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, দামোদরের বন্যার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় গম পাঠাইবার আবশ্যক ব্যবস্থাও হয় নাই?

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী এ বার বাঙ্গালার অবস্থার সহিত "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" সময়ে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন—এ যেন পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন হইতেছে।

যুদ্ধের জন্যই যে বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা প্রধানতঃ ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ:—

(১) যুদ্ধের জন্য (ব্রহ্ম অধিকারচ্যুত হইবারও পূর্ব্বে) ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছিল—এখন তাহা আমদানী হইতেই পারে না।

(২) ব্রহ্ম জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে বহু নরনারী তথা হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে—অনেকে বাঙ্গালার পথে মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে গিয়াছে।

(৩) সামরিক প্রয়োজনে বাঙ্গালায় বহু সৈন্য রাখিতে হইয়াছে।

এই সকল কারণেও যে বাঙ্গালা সম্বন্ধে কেন্দ্রী সরকারের বিশেষ দায়িত্ব আছে, তাহা বলা বাহুল্য। কেন্দ্রী সরকার সে দায়িত্ব-বিষয়ে কি অবহিত হইয়াছেন?

বাঙ্গালায় যখন চাউলের অভাব, তখনও যে বাঙ্গালা হইতে চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। বিদেশ হইতে গম আনাইবার কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। মধ্যে যে বলা হইয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়া হইতে কয় জাহাজ গম ভারতে আমদানী হইয়াছে, তাহা সত্য হইলেও অর্দ্ধসত্য। কারণ, ঐ গম ভারতের জন্য উদ্দিষ্ট ছিল না—ইরাকে বা ইরাণে—অথবা উভয় দেশে যাইতেছিল। সেই সময় ভারতে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব অত্যন্ত অধিক হওয়ায় (হয়ত বা সৈনিকদিগের প্রয়োজনে) জাহাজ কয়খানি ভারতবর্ষে আনিয়া গম লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে আবার গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ঋণ শোধ করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে যদি ইরাকে বা ইরাণে গম পাঠান সম্ভব হয়, তবে ভারতেই বা হয় না কেন; সে বিষয়ে কি আবশ্যক চেষ্টা হইয়াছে বা হইতেছে?

বাঙ্গালার যে খাদ্য-সচিব লোককে অভয় দিয়াছিলেন, চাউলের অভাব হইবে না; তিনিই আজ তার-স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—ভাত পাইবার সম্ভাবনা অল্প—সুতরাং ফেন খাইতে থাক। তিনি সরকারী সদাব্রত খুলিবার পূর্ব্বে সদাশয় ব্যক্তিদিগকে সদাব্রত খুলিতে আহ্বান করিতেছেন। দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন না। তিনি যে ফেনের কথা বলিতেছেন, তাহারও "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" ঠিক করিয়া দিবেন এবং কেহ বিতরণ করিতে চাহিলে সরকারী খানাঘরে তাহা কিনিতে পাইবেন। তিনি যেমন ভাবে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে চাউল কিনিবার ঠিকা মসলেম লীগের সম্বন্ধে সহানুভূতিসম্পন্ন মেসার্স

ইস্পাহানীকে দিয়াছিলেন, তেমনই কি এই ফেন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিবার ঠিকাও কাহাকেও দিয়াছেন বা দিতেছেন?

তিনি তাঁহার ঐ ফেনের উপকরণের পরিচয় দিয়াছেন:—

"কলে পিষ্ট বা হাতে চূর্ণ করা জওয়ার, বাজরা, গম, চীনাবাদাম, নানারূপ ডাল এবং বহু পরিমাণে কুমড়া বা মিঠা আলু প্রভৃতির সঙ্গে ছিটাফোঁটা চাউল ফেলিয়া তাহার সঙ্গে পেঁয়াজ ও হলুদ—অবশ্য একটু লবণও দিয়া—সিদ্ধ করিলেই এই ফেন হইবে। তাহা কেবল বলকারকই নহে—পরন্তু মুখরোচকও বটে।"

ঐ ফেন ২ ছটাক—অভাবে দেড় ছটাক আত্মস্থ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

অবশ্য এ বিষয়ে পরীক্ষা সচিবরা আপনারা করিয়াছেন কি না এবং যে গভর্ণর সার জন হার্বার্ট খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রাক্তন সচিবসঙ্ঘকে পদত্যাগ করাইয়াছিলেন তাঁহাকেও পরীক্ষা করিতে বলিয়াছেন কি না, তাহা আমরা জানি না।

তবে কলিকাতায় একটি সদাব্রত উদ্বোধন উপলক্ষে জাষ্টিস চারুচন্দ্র বিশ্বাস যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত অনেকেই একমত হইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের শোচনীয় ও লজ্জাজনক ভুলের জন্যই আজ এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

এই সকল ভুলের জন্য দায়ী কে?

ভুল যে কেন্দ্রী সরকার যেমন, প্রাদেশিক সরকারও তেমনই করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার পরিচয় আমরা দিয়াছি। কিন্তু ইহার প্রতীকারের উপায় কি?

আজও যে বাঙ্গালার গভর্ণর হইতে বাঙ্গালার সচিবরা কেহ কোন সাহায্যদান কেন্দ্রে তাঁহাদিগের বেতনের অনুপাতে সাহায্য দিয়াছেন, এমন কথা বাঙ্গালার লোক শুনে নাই।

যে দিন কেন্দ্রী পরিষদে খাদ্য-দ্রব্য সম্বন্ধীয় আলোচনা শেষ হয়, সেই দিনই ঘোষিত হয়, সার আজিজুল হক খাদ্য-সদস্যের পদ ত্যাগ করিবেন এবং পরদিন হইতেই সার জে, পি, শ্রীবাস্তব সেই পদের ভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এ দেশে সরকারী কাযে প্রায়ই দেখা যায়—হাকিম যাইলেও হুকুম বহাল থাকে। সেই জন্যই আজ আমরা তাঁহার উক্তির আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

সার আজিজুল বলিয়াছিলেন:—

বোধ হয় কোন প্রদেশই দেশে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। কেবল বাঙ্গালার দোষ নহে।

অবশ্য তাঁহার এই উক্তিতে বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ সন্তুষ্ট হইবেন; কারণ, ইহা সেই "দশে মিলি করি কায" হইতেছে। কিন্তু ইহাতে সকল প্রদেশের সরকারেরই যে ত্রুটি স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য প্রদেশ যাহাই কেন বলুন না—তাহা সরকারের ব্যবস্থার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। প্রদেশে খাদ্য-শস্যের অবস্থা কিরূপ, তাহাও না জানা যে কোন সরকারের পক্ষে লজ্জার কথা এবং যে ব্যবস্থায় তাহা হয় তাহার প্রতীকার প্রয়োজন। সে বিষয়ে কেন্দ্রী সরকার কি করিয়াছেন?

কেন্দ্রী সরকার বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই প্রদেশ চতুষ্টয় লইয়া "পূর্ব্বাঞ্চল" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যয়বহুল নূতন পদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা এই "পূর্ব্বাঞ্চলে" খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রথম কার্য্যের সমর্থনে সার আজিজুল বলেন, বাঙ্গালার অবস্থা প্রতীকারাতীত হইয়া উঠিতেছিল দেখিয়া উপায়ান্তর না থাকায় সরকারকে ঐ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

যদি তাহাই হয়, তবে কেন্দ্রী সরকার কি জন্য তাহা বজায় রাখিলেন না?

সার আজিজুল যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ত উহা বহাল রাখার প্রয়োজনই প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলিয়াছেন, ঐ অবস্থায় অভাবগ্রস্ত প্রদেশে খাদ্য-শস্য আমদানীতে আসন্ন বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ সম্ভব হইয়াছিল। যদি সে ব্যবস্থা রক্ষা করা যাইত, তবে কোন কোন স্থানে খাদ্য-শস্যের মূল্য কিছু বর্দ্ধিত হইলেও মূল্যের সমতা রক্ষিত হইত ও মূল্য, মোটের উপর হ্রাস পাইত। কিন্তু, অবাধ বাণিজ্যনীতি ঘোষিত হইবার পর হইতেই তাহার প্রচলন-পথে নানারূপ বাধা স্থাপিত হইতে থাকে—যে সকল মাল ক্রীত হইয়াছিল, সে সকল সরকারের জন্য গৃহীত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রীত মালের কতকাংশ অল্প মূল্যে দিতে ক্রেতাকে বাধ্য করা হয়; মজুদদারদিগকে ঝাঁপ বন্ধ করিতে আদেশ করা হয়; ব্যবসায়ীদিগকে মাল বিক্রয় করিতে. ষ্টেশন-মাষ্টারদিগকে মালগাড়ী দিতে ও গো-যানের চালকদিগকে মাল বহন করিতে নিষেধ করা হয়; ব্যবসায়ী এজেণ্টদিগকে গ্রেপ্তার ও মামলাসোপর্দ্দ করা হয়—ইত্যাদি। কাযেই, অবাধ-বাণিজ্যনীতি রক্ষিত হয় নাই। একটি প্রদেশে সরকার গত জানুয়ারী মাস হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত সস্তায় চাউল না কিনিলেও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেই আপনাদিগের প্রদেশের জন্য চড়া দরে চাউল কিনিয়া সঞ্চয় করিতে থাকেন।

সার আজিজুল কোন্ প্রদেশে এইরূপ হইয়াছে, তাহা বলেন নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গালার খাদ্য-সচিব মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী পূর্ব্বেই উড়িষ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে লোকের সে বিষয় অনুমান করিতে বিলম্ব হইবে না।

কিন্তু অবস্থা যখন এইরূপ—ভারতের এক প্রদেশ যখন অন্য প্রদেশের দুর্দ্দশায় এত উদাসীন, তখন কি—

(১) কেন্দ্রী সরকার তাঁহাদিগের চরম দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন না? তাঁহারা যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা উপাপিত করেন, তবে কি আমরা বলিতে পারি না—বহু ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে? ভারত সরকারই কি বাঙ্গালা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন?

(২) বাঙ্গালা সরকার কি—

(ক) কেন্দ্রী সরকারকে যুদ্ধের কার্য্যে নিযুক্ত সৈনিক প্রভৃতির আহার্য্য যোগাইতে বলিয়াছেন?

(৩) উড়িষ্যা, বিহার বা আসাম বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় বাণিজ্য করিতে চাহিলে—বাঙ্গালীর শবের উপর আপনারা প্রাচুর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে সেই সকল প্রদেশের লোককে—সঙ্কটকালে—বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

উড়িষ্যায় ও আসামে যে সচিবসঙ্ঘ রহিয়াছে, তাহা সরকারের অনুগ্রহ ও সাহায্য ব্যতীত এক দিনও থাকিতে পারে না। সেই সকল সচিবসঙ্ঘ যখন বাঙ্গালার, অন্য প্রদেশের, দুর্দ্দশার উপর

আপনাদিগের স্থায়িত্ব রক্ষিত করিতে চাহেন, তখনও কি কেন্দ্রী সরকার তাঁহাদিগের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগের সাহায্য ও অনুগ্রহ প্রত্যাহার করা প্রয়োজন ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না? বিহারে ত তথা-কথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনও নাই। তথাপি যদি সে প্রদেশ বাঙ্গালার দুর্দ্দিনে বাঙ্গালাকে আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল দিতে অস্বীকার করে, তবে কি সে জন্য গভর্ণরকেই দায়ী করিতে হয় না?

সার আজিজুল হক বলিয়াছেন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তনের প্রয়াস করিতেছেন। তাহা কি সার জে, পি, শ্রীবাস্তব সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করিবেন? আর যদি তাহা হয়, তবে যত দিনে সে ব্যবস্থা হইবে, তত দিনে বাঙ্গালার কত লোক অনাহারে মরিয়া খাদ্য-সমস্যার সমাধান-পথ পরিষ্কৃত করিবে?

গত ২৭শে শ্রাবণ কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনাল, ইণ্ডিয়ান, মুসলিম ও মাড়বারী বণিক্‌সঙ্ঘ-চতুষ্টয় কেন্দ্রী সরকারকে তার করিয়াছিলেন—তাঁহারা শুনিয়াছেন, সম্প্রতি দেশ হইতে বহু পরিমাণ চাউল দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করা হইয়াছে। বণিক্‌সঙ্ঘ-চতুষ্টয় ইহাতে আপত্তি করিয়া জানাইয়াছেন, যে সময় এ দেশে চাউলের একান্ত অভাব এবং সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—ভারতবর্ষের কোন স্থান হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী করা হইবে না, সেই সময় এই রপ্তানী বিশেষ অসঙ্গত। আর যে দক্ষিণ-আফ্রিকা আজ তথায় ভারতীয়দিগকে মনুষ্যের অযোগ্য অপমানে লাঞ্ছিত করিতেছে—সেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে চাউল দিয়া সাহায্য করা ভারতবাসীর জাতীয় আত্মসম্মান-জ্ঞানে দুরন্ত আঘাত করা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ ভারতবাসীর সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহা ভারত-সরকারেরও অবিদিত থাকিবার কথা নহে। এক বার দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার খনিতে ভারতীয় শ্রমিক-দিগের প্রতি কুব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—সে দেশ হইতে যে কয়লা আসিবে, তাহা বেত্রাহত ভারতবাসীর রক্তে সিক্ত।

এখন যদি সেই দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্যার্থ ভারতবর্ষের নিরন্ন নরনারীর মুখের গ্রাস প্রেরণ করা হয়, তবে আর বলিবার কি থাকিতে পারে?

কেন্দ্রী সরকার চেম্বার অব কমার্স সমূহের কথার আংশিক প্রতিবাদ ২৯শে শ্রাবণ করিয়াছেন। তাঁহারা এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় এ দেশ হইতে চাউল রপ্তানী হইয়াছে এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প—বর্ত্তমান বৎসরে মাত্র ৭ শত ২৭ টন—কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী হইয়াছে—আর সে-ও ভারতীয় নাবিকদিগের জন্য। যদি তাহাই হয়, তবে কি আমরা বলিতে পারি না—এ দেশে যে লক্ষ লক্ষ বৃটিশ ও মার্কিণ সৈনিক আছে এবং বড়লাট ও জঙ্গীলাট হইতে সার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েল, সার এডওয়ার্ড বেন্থল প্রভৃতি ইংরেজ মজুদ আছেন, এই সময়ে তাঁহাদিগের জন্য তাঁহাদিগের দেশ হইতে—অন্ততঃ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে গম প্রভৃতি আনান হউক? যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় চাউল পাঠান সম্ভব হয়, তবে ভারতবর্ষের বাহির হইতে ভারতে গম প্রভৃতি আমদানী করাই কি অসম্ভব?

গত জানুয়ারী মাসেও পারস্যোপসাগরে ২ হাজার টন চাউল রপ্তানী হইয়াছে। কেন? পারস্যোপসাগরেও কি "অন্নভোজী" ভারতীয় আছে? যে সময় বাঙ্গালায় এক সের চাউলেও এক জনের জীবন একাধিক দিন রক্ষিত হইতে পারে, সেই সময় এই ২ হাজার টনের মূল্য কি অল্প?

সরকারী বিবৃতিতে কেবল কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানী চাউলের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে আরও বন্দর আছে। সে সকল হইতেও চাউল রপ্তানী হয় নাই ত?

কেন্দ্রী সরকার আপনাদিগের কার্য্যের সমর্থনকল্পে বলিয়াছেন:—

"১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে মোট ৯ লক্ষ টন খাদ্য শস্য বিদেশে পাঠান হয়। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে তাহার পরিমাণ—৫৫ হাজার টন হয়; ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন হয়। এই ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টনের অর্দ্ধাংশ সিংহলে প্রেরিত হয়। তথায় ৮ লক্ষ ভারতীয় কায করিতেছে এবং ব্রহ্ম ও মালয় জাপানের হস্তগত হওয়ায় তাহাদিগকে চাউলের জন্য ক্রমেই ভারতবর্ষের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পারস্যোপসাগরে, আরবে, ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে ও আফ্রিকার বন্দরসমূহেও চাউল গিয়াছে। সে সকল স্থানে ভারতীয় সম্প্রদায় আছে এবং দীর্ঘকাল ভারতের সহিত ব্যবসা ও রাজনীতিকসূত্রে বদ্ধ সম্প্রদায়ও বিদ্যমান।"

১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে যে রপ্তানী খাদ্য-শস্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর কল্যাণকল্পে—তাহাদিগের খাদ্যাভাব মোচনের জন্য, কি সমুদ্রপথ জাহাজের পক্ষে সঙ্কটসঙ্কুল বলিয়া তাহা প্রকাশ নাই। বৃটেন বহুদিন ভারতের সহিত বাণিজ্য ও রাজনীতিক সূত্রে বদ্ধ। সেই কারণে কি বৃটেনেও চাউল রপ্তানী সমর্থিত হইতে পারিবে?

সিংহলে যে ৮ লক্ষ ভারতীয় কায করিতেছে—তাহারা কাহা-দিগের কায করিতেছে? তাহাদিগের জন্য চাউলের ব্যবস্থা করা কি তাহাদিগের নিয়োগকারীদিগেরই কর্ত্তব্য নহে? সে জন্য ভারত সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ কি, তাহাই কি ভারতবাসীর জিজ্ঞাস্য নহে। সিংহলের সরকার ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সদ্ব্যবহার? না—অসদ্ব্যবহার? সেই সিংহলে ভারতীয়গণের জন্য ভারতবর্ষ অনাহারে থাকিয়া চাউল পাঠাইবে কেন?

যদি বিদেশে ভারতবাসীকে খাওয়াইবার দায়িত্ব ভারত সরকারের থাকে, তবে এ দেশে ইংরেজ ও মার্কিণীদিগকে খাওয়াইবার জন্য কি বৃটেন ও মার্কিণ হইতে খাদ্য-দ্রব্য আমদানী করা সঙ্গত বলা যায় না?

সার ব্যারণ জয়তিলক এ দেশে চাউলের সন্ধানে আসিবার পূর্ব্বে এ দেশের লোক সিংহলকে চাউল প্রদানজন্য ভারত সরকারের প্রতি-শ্রুতির বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। সে কথা কি জন্য গোপন রাখা হইয়াছিল? সামরিক প্রয়োজনই কি তাহার কারণ?

এ দেশে কি দক্ষিণ আফ্রিকার লোক নানা কারণে নাই? যদি থাকে, তবে তাহাদিগের জন্য কি দক্ষিণ আফ্রিকা খাদ্য-দ্রব্য প্রেরণ করিতেছে?

ভারত সরকারের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—ভারতীয় খালাসী ব্যতীত আর কাহারও জন্য এখন আর ভারত হইতে খাদ্য-শস্য রপ্তানী করা হইতেছে না। যখন বাঙ্গালার লোককে চাউলের অভাবে বাজরা, জওয়ারও খাইতে বাধ্য হইতে হইতেছে, তখন কি বিদেশে ভারতীয় খালাসীদিগকে সেই সেই দেশের খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করা অসম্ভব?

এ দিকে বাঙ্গালার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ বৈঠকের পর বৈঠক বসাইয়া "বিবেচনা" করিতেছেন। যদি বৈঠকে ও বিবেচনায় নিরন্নের অন্নাভাব হইত, তবে বাঙ্গালী আজ অতিভোজনে অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইত। এই সকল বৈঠকে ও বিবেচনায় বুঝা যায়—তাঁহারা কি কর্ত্তব্য তাহা জানেন না—অন্ধকারে পথের সন্ধানমাত্র করিতেছেন। শেষ নির্দ্ধারণ—"চাউলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, সরকারের নিয়ন্ত্রণে যে সকল স্থানে অধিক চাউল আছে, সে সকল স্থান হইতে অভাব-পীড়িত স্থানে চাউল আনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর সে জন্য অবিলম্বে বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া এক কমিটী গঠিত করা হইবে।"

এই সকল বিশেষজ্ঞকে কোথা হইতে কে আমদানী করিবেন? আমরা দেখিয়াছি বে-সরকারী সরবরাহ বিভাগ পুলিস হইতেও লোক বাছাই করিয়া লইতেছেন। পুলিসে চাকরীয়ারা কি খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন? সে অভিজ্ঞতা কিরূপ?

পূর্ব্বাঞ্চলে (বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ চতুষ্টয়ে) যে অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বাতিল হইয়াছে। কিন্তু এখনও কি মেসার্স ইস্পাহানী বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে চাউল কিনিবার ঠিকা সম্ভোগ করিতেছেন না? মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ইঁহাদিগের যোগ্যতার পরিচয়ে বলিয়াছিলেন—ইঁহারা মসলেম লীগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন। তাহাও কি যোগ্যতার পরিচায়ক?

মেসার্স ইস্পাহানীকে বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে কত টাকা অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের সহিত কি চুক্তি হইয়াছে, তাহা কি প্রকাশ করা হইবে? মিষ্টার ফজলুল হক বলিয়াছেন, বাঙ্গালার গভর্ণর বিনাচুক্তিতেই কোন ঠিকাদারকে চাউল সম্বন্ধে যে ঠিকা দিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারের অনেক টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা। এ বার যদি কোন চুক্তি হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত বাঙ্গালার লোকের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, তাহারা তাহা জানিতে চাহিলে তাহা কখনই অসঙ্গত বলা যায় না।

কেন্দ্রী পরিষদে খান-সদস্য সার এডওয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন, তিনি কলিকাতায় ও হাওড়ায় খাদ্য-শস্য সরবরাহের জন্য অসাধারণ ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বলিয়াছিলেন—কলিকাতা ও হাওড়াই সমগ্র বাঙ্গালা দেশ নহে। কিন্তু কলিকাতায় ও হাওড়ায় আমরা লোকের যে দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাও কি তাঁহার ও খাদ্য-সদস্যের পক্ষে লজ্জাজনক নহে?

পঞ্জাব সরকার না কি ১০ লক্ষ টন চাউল রপ্তানী করিতে দিতে সম্মত হইয়াছেন। যদি পঞ্জাবে এখনও—অপরকে প্রদানের উপযোগী—এত চাউল মজুত থাকে, তবে এত দিনেও তাহা বাঙ্গালায় আনিবার ব্যবস্থা না করা কি "বাসা থাকিতে বাবুই পাখী ভিজার" মতই বলা যায় না?

বড় দুঃখেই কি শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বলেন নাই—যে অব্যবস্থা আমরা লক্ষ্য করিতেছি, নির্ব্বোধ ও দুষ্টবুদ্ধিরা ব্যবস্থা করিবার ভার পাইলেও তদপেক্ষা অধিক অব্যবস্থা করিতে পারিত না। বলা বাহুল্য, তিনি ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দোষারোপ করেন নাই।

এখন কি হইবে?

ভারতের (বিশেষ বাঙ্গালার) খাদ্য-সমস্যা যে বিলাতেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যাইতেছে। বিলাত হইতে আমরা সাহায্য পাই নাই—সহানুভূতি পাইয়াছি এবং তাহাতে যে আমাদিগের অভাব ঘুচিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিরূপ সংবাদ বিলাতে পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, বিলাতের সংবাদপত্র-সমূহে প্রকাশিত মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হয়, তথায় লোক এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ হয় বুঝিতে পারে নাই, নহেত—তাহার সম্মুখীন হইতে চাহিতেছে না। 'টাইমস' যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিতে হয়, "নাচে ভাল—পাক দেয় খারাপ।" 'টাইমস' বলিয়াছেন, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সরকার ও জিলার রাজকর্ম্মচারীরা আপনাদিগের (প্রদেশের বা জিলার বা মহকুমার) কৃষকদিগের স্বার্থের নিকট জাতির ও দেশের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহাদিগের কাজ নিন্দনীয়। লোককে ভয় দেখাইয়া সঞ্চিত শস্য বাহির করান সম্ভব নহে। কিন্তু কিসে তাহা সম্ভব হয়, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। প্রত্যেক প্রদেশে প্রকৃত প্রতিনিধি দলে গঠিত সচিবসঙ্ঘ গঠিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর ভার দিলেই ইহা সম্ভব হইতে পারে—নহিলে নহে।

আর একখানি পত্র ('ইয়র্কশায়ার পোষ্ট') ভারতের বিরাটত্ব হইতে জাতিভেদ পর্য্যন্ত অসুবিধায়ই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই দুর্ভিক্ষের পরেও ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইবে না। বর্ত্তমানে তাহার সহিত অন্যান্য দেশের যোগ না থাকায় সে বিপন্ন—ব্রহ্ম, মালয়, চীন প্রভৃতি যে সকল দেশ আজ জাপানীদিগের দ্বারা অধিকৃত, সে সকলের সহিত সংযোগ না ঘটিলে ভারতের উন্নতির আশা নাই। সে সংযোগ স্থাপিত হইলেও ভারতের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। যত দিন ভারতবর্ষ আপনার শিল্প-প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ অধিকার লাভ না করিবে—তত দিন কিরূপে তাহার দারিদ্র্যের মূল কারণ দূর হইতে পারে?

সে পরের কথা। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ইংরেজ সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে নীতিতে বৃটেন কিরূপ উপকৃত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—পরে বৃটেন—এই যুদ্ধে অর্থ ব্যয়ের বিষয় মনে করিয়াও তাহার পরিবর্ত্তন করিবে কি না, তাহার আলোচনা আজ আর আমরা করিব না।

আজ সম্মুখে কর্ত্তব্য—লোককে অনাহারজনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করা। নূতন খাদ্য-সচিব কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন—তিনি সকলের সহযোগ চাহেন। কিন্তু তিনি সহযোগ লাভের সদুপায় অবলম্বন করিবেন কি?

"মেঘেতে বিজলি হাসি"

১

"ক্ষেপা কুকুর! ক্ষেপা কুকুর!"—"বাতুলা কুকুর!"—সমুদ্র-গর্জ্জন ডুবাইয়া এই সকল রব এবং ভয়াকুল পলায়নপর জনতা—কূলগামী সমুদ্র-তরঙ্গের মত দ্রুত দূর হইতে নিকটে আসিয়া পড়িল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই—দিনান্ত-রবিকর কেবল—বেলাবালু ও নীল জলের উপর হইতে প্রখর আলোক স্নিগ্ধ করিয়া সন্ধ্যার ধূসরতায় আপনাকে মিশাইবার চেষ্টা করিতেছে। জ্যৈষ্ঠের অপগাহ্ন। পুরীর সমুদ্রতীর পবন-স্পর্শলোলুপ নরনারীতে পূর্ণ। একটি ক্ষিপ্ত কুকুর সহর হইতে বিতাড়িত হইয়া সমুদ্রকূলে আসিয়াছিল এবং তথায় একাধিক ব্যক্তিকে দংশন করিয়া আর সকলকে আক্রমণের জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল।

ভীতিব্যঞ্জক রব শুনিয়া বহু লোক বেলাভূমি ত্যাগ করিয়া গেল; দুই চারি জন গেল না। শেষোক্তদিগের মধ্যে এক যুবক রহিল। তাহার দেহ সুগঠিত—মুখে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব। যে জনতা পলাইয়া আসিতেছিল—তাহার সর্ব্বশেষে এক তরুণী। বোধ হয়, তাহার রক্তবর্ণ রেশমী কাপড় কুক্কুরটিকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল এবং সে তাহাকে দংশন করিবার জন্য ছুটিতেছিল। যুবক যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল তরুণী ও কুকুরটি দৌড়াইতে দৌড়াইতে যখন সেই স্থানে আসিল, তখন—উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আর না-ই বলিলেই হয়—কুকুরটি তরুণীর শাড়ী কামড়াইবার জন্য মুখ খুলিয়াছে। যাঁহারা দেখিলেন—তাঁহাদিগের সকলেরই মনের মধ্যে যেন ভীতির ছুরিকা-প্রবেশ অনুভূত হইল।

যুবক মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া শুষ্ক বালু তুলিয়া লইয়াছিল—অতর্কিত ভাবে কুকুরটির মুখ লক্ষ্য করিয়া তাহা ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সবল বাহুতে তরুণীকে বদ্ধ করিয়া—যেন শূন্যে তুলিয়া সমুদ্রের বিপরীত দিকে সরাইয়া আনিল।

চক্ষুতে বালুকাপাতে দৃষ্টি হারাইয়া কুকুরটি যে দিকে ছুটিয়া গেল, সে দিকে "নুলিয়া"—ধীবরগণ দিনশেষে জাল গুটাইতেছিল। কুক্কুরটি সেই জালে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নুলিয়ারা ও কুক্কুরটির পশ্চাদ্ধাবনকারীরা লাঠি দিয়া তাহাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া মৃত্যুমুখযাত্রী করিতে লাগিল—তাহার আর্ত্ত চীৎকার প্রথমে আকাশ পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল।

এ দিকে যুবক তরুণীকে নিরাপদ স্থানে আনিয়া বাহুবন্ধ শিথিল করিলেই লক্ষ্য করিতে পারিল—বোধ হয়, শ্রান্তিতে ও ভীতির পরবর্তী অবসাদে—সে পড়িয়া যাইতেছে। কাযেই যুবক তাহাকে ধরিয়া সেই স্থানে বসাইয়া দিল এবং আপনি তথায় দাঁড়াইয়া রহিল।

অল্পক্ষণ পরেই এক জন মহিলা প্রায় দৌড়াইতে দৌড়াইতে তথায় আসিয়া তরুণীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন—তাহাকে ডাকিলেন, 'বিজলি!'

তরুণী মুখ তুলিয়া চাহিল।

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "কি বিপদ হ'তেই উদ্ধার পাওয়া গেছে!"

তিনি সঙ্গী ভৃত্যকে বলিলেন, "উদয়! রিক্সা, ট্যাক্সী, ঘোড়ার গাড়ী—যা' পাও আন।"

ততক্ষণে একটি বালক ও একটি বালিকাও তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাহাদিগের মুখ হইতে তখনও আতঙ্কভাব দূর হয় নাই।

যে যুবক তরুণীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছিল, বহু লোকের প্রশংসমান দৃষ্টির কেন্দ্র হইয়া সে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। এই বার আর তাহার তথায় থাকিবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়াই সে চলিয়া গেল।

তখন জলের উপরে যেমন স্থলেও তেমনই আলো আর অন্ধকার পরস্পরের উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। ওদিকে কুকুরটির আর্ত্তনাদ ও জীবন উভয়ই শেষ হইয়া গিয়াছে।

২

গৃহে ফিরিয়াই অঞ্জলি পিতামহীকে ঘটনার বিষয় বলিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন, "জগবন্ধু রক্ষা করেছেন। তোরা একা একা যাস্, আমার ভয় হয়।"

বিজলী বলিল, "তোমার সব তা'তেই ভয়, ঠাকুরমা। তুমি আমাদের বল্‌তে—

'আহার, নিদ্রা, ভয়
যত বাড়াও ততই হয়।'

তুমি নিজে আহার আর নিদ্রা ত প্রায় ত্যাগই করেছ—কিন্তু ভয় বাড়িয়েই চলেছ।"

"যে অদৃষ্ট ক'রে এসেছি, দিদি!"—বলিয়া ঠাকুরমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অদৃষ্ট বটে। একমাত্র পুত্র লইয়া তিনি বিধবা হইলে তিনি যখন শ্বশুর বর্ত্তমানে স্বামীর মৃত্যুতে শ্বশুরালয়ের সম্পত্তিতে বঞ্চিতা হইয়া পিত্রালয়ে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, সে আজ বহু দিনের কথা। মধ্যম ভ্রাতা একটা কোন সূত্রে ব্রহ্মে যাইয়া ওকালতী করিয়া মান ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের কেহই উকীল হইতে না পারায় তিনি ভাগিনেয়কে বিবাহ দিয়া বিলাতে পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনিয়া আপনার সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। ঠাকুরমা পিত্রালয়েই থাকিতেন। তাহার পর ব্রহ্মেই অঞ্জলি, নির্ম্মল ও বিজলি জন্মগ্রহণ করে। অমিতব্যয়ী পুত্র সন্তানদিগকে যেমন বিলাসে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের শিক্ষার জন্য তেমনই অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। অঞ্জলির বয়স যখন চৌদ্দ উত্তীর্ণ হয়, তখন তাহার বিবাহ দিতে আসিয়া—গগনচন্দ্রের সহিত বহু ব্যয়ে তাহার বিবাহ দিয়া তিনি ব্যবস্থা করিয়া যান, কলিকাতার বাসায় ঠাকুরমা নির্ম্মল ও বিজলিকে লইয়া থাকিবেন—তাহারা কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যালয়ে পড়িবে—তাহাদিগের মাতা বৎসরে দুই বার ও তিনি এক বার ব্রহ্ম হইতে আসিবেন। সেই ব্যবস্থায় প্রায় পাঁচ বৎসর কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জামাতা গগনচন্দ্র উকীল হইলে তাঁহার শ্বাসকষ্টের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহার শ্বশুরই তাহার সমুদ্রতীরে পুরীতে ওকালতীর ব্যবস্থা করিয়া তথায় তাহার জন্য বাড়ী কিনিবার টাকা দিয়াছিলেন। তাহার পরে যে বৎসর নির্ম্মল আই, এ, পরীক্ষায় ও বিজলি প্রাথমিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া উত্তীর্ণ হয়, সেই বৎসর তাহাদিগের মাতৃবিয়োগ হয়। সে আঘাত তাঁহার স্বামীর পক্ষে দারুণ হয় এবং

দুই বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই এক দিন সংবাদ আসে, তিনি তিন দিনের জ্বরে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি কোন দিনই সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী ছিলেন না—বিশেষ পত্নীর মৃত্যুর পর প্রায় দুই বৎসর ব্যবসায়ে অমনোযোগী হইয়াছিলেন—অথচ কলিকাতায় পুত্রকন্যার জন্য যেমন, পুরীতে কন্যা-জামাতার জন্য তেমনই প্রভূত অর্থ মাসে মাসে পাঠাইতেন। কাযেই কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সেই অবস্থায় ঠাকুরমা নির্ম্মল ও বিজলিকে লইয়া যেন অকূলে ভাসিলেন। তিনি কয় বৎসর হইতেই বিজলির বিবাহ দিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ হয় নাই—সে জিদ করিয়াছিল, পড়িবে, তাহার পিতাও তাহার মতের বিরোধী হয়েন নাই।

অবস্থা বুঝিয়া নির্ম্মল কলেজের অধ্যাপকের সাহায্যে যুদ্ধে একটা বেসামরিক চাকরী যোগাড় করিয়া দিল্লীতে গিয়াছে, কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া—বহু আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া টাকা ঠাকুরমা'কে দিয়া তাঁহাকে ও বিজলিকে পুরীতে ভগিনীর কাছে রাখিয়া গিয়াছে—চাকরীর অবস্থা বুঝিয়া পরে যে ব্যবস্থা হয় করিবে।

ঠাকুরমা অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটি কে?"

অঞ্জলি লজ্জিত ভাবে বলিল, "গোলমালে আমি তা' জানবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম, ঠাকুরমা। কি হ'বে?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "গগন আসুক—সে ঠিক জানতে পারবে।"

গগনচন্দ্র সে দিন একটা মোকর্দ্দমা করিতে কটকে গিয়াছিল। তাহার ফিরিতে রাত্রি ৯টা বাজিবে।

৩

যথাসময়ে গগনচন্দ্র ফিরিয়া আসিল। সে আহার করিতে বসিলে ঠাকুরমা বলিলেন, "দাদা, আজ যে কাণ্ড হয়েছে!"

সে বলিল, "এই দেখুন, ঠাকুরমা, ক' ঘণ্টা মাত্র আমি ছিলাম না—এর মধ্যেই কাণ্ড হয়ে গেল? কাণ্ডটা কি?"

ঠাকুরমা অঞ্জলিকে বলিলেন, "বল ত, দিদি।"

অঞ্জলি ঘটনাটি বিবৃত করিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, "আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'ত। কি রক্ষাই পেয়েছে!"

গগনচন্দ্র বলিল, "শুধু কি সেই রক্ষা—আপনার ছোট নাতনীটি যে মনের দুঃখে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন নাই, সে-ও রক্ষা।"

ঠাকুরমা বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "কেন, দাদা?"

"প্রথম কথা—এক জন পুরুষ যে কায করতে পারলে, উনি তা' পারেন নাই; তা'র পর এক জন পুরুষ ওঁকে বিপদ হতে উদ্ধার করল—এ কি কম অপমান! পুরুষের যে ক্ষমতা—শ্রেষ্ঠত্ব বলতে সাহস হয় না—উনি অস্বীকার করবার জন্য চুলও ছেঁটেছিলেন—তা'র এই পরিচয় পেয়ে যে উনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন নাই, সে কি আশ্চর্য্যজনক নহে?"

গগনচন্দ্রের কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের যত আঘাতই কেন থাকুক না, তাহা অসঙ্গত নহে। কারণ, কলেজে অধ্যয়নকালে বিজলি নারী-প্রগতি আন্দোলনের নেতৃত্ব করিত। সে সমানভাবে ছাত্রদিগের সহিত মিশিত—আলোচনা করিত। কিন্তু তাহার ব্যবহারে এমন ব্যবধান ও কথায় এমন ক্ষুরধার ছিল যে, তাহার স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতায় যে সকল ছাত্র আকৃষ্ট হইত, তাহারা কখন ঘনিষ্ঠতা দ্বারা দূরত্বের সীমা অতিক্রম করিতে পারিত না। তাহার কথা তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিত—"ও সেই—

'..........................যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।'

বিজলিই বটে।

তাহার পর গগনচন্দ্র বিজলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়াছ ত?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে যে কে, গোলমালে তা' জানবার কথা অঞ্জলির মনে হয় নাই।"

গগনচন্দ্র বলিল, "অঞ্জলির কথা হচ্ছে না, ঠাকুরমা। উনি—মনে ইচ্ছা থাকলেও কাযে অগ্রসর হ'তে পারেন না। যিনি পুরুষদের 'থোড়াই কেয়ার' করেন, তাঁ'র কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

বিজলি কিছু বলিতে পারিল না। সত্যই সে কথা তাহার মনে হয় নাই।

ঠাকুরমা বলিলেন, "ছেলেটি কে, তা'-ও ত জানা গেল না।"

গগনচন্দ্র বলিল, "তা' জানতে বেশী সময় লাগবে না। অত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল—তখন সেখানে অনেক লোকও ছিল। হরিচরণকে ব'লে দিব—কাল সকালেই সব সংবাদ আনবে।"

হরিচরণ উকীলের মুহুরী। দূরসম্পর্কীয় এক খুড়-শ্বশুরের নাম হরিনাথ কি হরিমোহন, কি হরিদাস, কি হরিপদ একটা কিছু ছিল। তাই ঠাকুরমা হরিচরণকে কেবল চরণ বলিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চরণ সংবাদ আনতে পারবে?"

"তা' আর পারবে না? কথায় বলে তিনটা বেটো ঘোড়া ম'রে একটা দালাল হয়; আর তিনটা দালাল ম'রে তবে একটা উকীলের মুহুরী হয়।"

সকলেই হাসিলেন।

গগনচন্দ্র বিজলিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাল আমার সঙ্গে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিতে যা'বে ত?"

বিজলি সপ্রতিভ ভাবে বলিল, "যা'ব।"

তখন গগনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা সত্য ত?"

অঞ্জলি বলিল, "কি বলছ?"

"ভাবছি হয় ত—ঐ ক্ষেপা কুকুর, ঐ ছুট—ও সবই মায়া; আর মায়াবসানে দেখা যা'বে—এসে উপস্থিত—তোমার ভগিনীপতি।"

অঞ্জলি বলিল, "তুমি উকীল না হয়ে কবি হ'লে না কেন?"

"কবি হ'তে যা'ব কেন? বরং বৈদান্তিক হ'লে হ'ত।"

৪

গগনচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল, সে সকল বিজলিকে বিস্মিত করে নাই। তাহার কারণ, সে সকল কথা সে গগনচন্দ্র বলিবার পূর্ব্বেই ভাবিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার মনের মধ্যে সব কেমন বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতেছিল। যে মত সে সমগ্র আগ্রহে দৃঢ় করিয়া আসিয়াছে—তাহার মূল যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল। এক মুষ্টি বালু—সেই বেলাবালুবিস্তার হইতে তুলিয়া লইয়া কুকুরের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ—কি সহজসাধ্য কায। অথচ তাহা তাহার মনে হয় নাই! তাহার

পর যখন হয়ত আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলেই সে দষ্ট হইত, ঠিক সেই সময়ে তাহাকে দৃঢ় বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া সরাইয়া আনা কেবল যে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক তাহাই নহে, পরন্তু তাহাতে আপনার বিপদ তুচ্ছ করিয়া অপরকে রক্ষা করিবার যে প্রবল প্রকৃতি আত্মবিকাশ করে, তাহা স্বতঃই লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। বহু লোক যখন পলায়নে রত, যে যাহার নির্ব্বিঘ্নতার সন্ধান করিয়াছিল, তখন যে ব্যক্তি আপনার কথা না ভাবিয়া অপরিচিত বিপন্নের কথাই ভাবিয়াছেন, তিনি সাধারণ লোক হইতে কত ভিন্ন—কিরূপ স্বতন্ত্র-প্রকৃতির, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়—তাঁহার মনুষ্যত্ব মহত্ত্বে পরিণতি লাভ করিয়া উদয়াস্ত-ভাস্কর-কিরণোজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গের মতই প্রতিভাত হয়।

পুরুষের সহিত নারীর অধিকার-বৈষম্য যে প্রাকৃতিক ব্যবধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—এই মত সে এতই অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছিল যে, তাহার জন্য পুরুষের প্রতি তাহার যেন বিদ্বেষ উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু আজ যেন বিনা তর্কে—বিনা যুক্তিতে তাহার মত শিথিলমূল বলিয়া অনুভূত হইতেছিল। বিস্ময়ের বিষয়, তাহাতে সে কোনরূপ বিক্ষোভ অনুভব করিতেছিল না—বেদনা ত পরের কথা।

সে যে সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে তাঁহার কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল, সে জন্য সে কুণ্ঠানুভব করিতেছিল।

সে রাত্রিতে নানা ভাবনায় বিজলির সুনিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে সে-ই এক বার গগনচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—হরিচরণ কি সংবাদ লইতে পারিয়াছে?

বেলা প্রায় ১টার সময় গগনচন্দ্র গৃহের ভিতরের অংশে আসিয়া জানাইল, হরিচরণ সংবাদ আনিয়াছে—লোকটি তাহাদিগের গৃহের অদূরে আছেন। তিনি তাঁহার মাতাকে লইয়া পুরীতে আসিয়াছেন; অধ্যাপকের কায করেন; নাম—অভ্রকুমার দে।

বিজলির মুখ বিবর্ণ—যেন রক্তশূন্য হইয়া গেল।

তাহার মনে কয় বৎসর পূর্ব্বের একটি ঘটনা যেন চলচ্চিত্রের যবনিকায় চিত্রের মত ফুটিয়া উঠিল। তখন সে কলেজে ছাত্রী। সে দিন নবনিযুক্ত ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক প্রথম অধ্যাপনা করিবেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া—সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন—তাঁহার যে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি সেই সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরীক্ষকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন—এরূপ বিদ্যাপরিচয় পূর্ব্বে কোন পরীক্ষার্থী দিয়াছেন কি না, সন্দেহ—ইহা অপেক্ষা অধিক বিদ্যাপরিচয় যে কেহই দেন নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁহার অধ্যাপনা কিরূপ হয়, জানিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বিজলির মনে দুষ্ট অভিসন্ধি পুষ্ট হইতেছিল—সে অধ্যাপককে বিব্রত করিবে।

অধ্যাপক—অভ্রকুমার দে। সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে অধ্যাপনা-কক্ষে প্রবেশ করিল—একটি ভৃত্য কতকগুলি পুস্তক লইয়া আসিল—সেগুলি টেবলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। অধ্যাপক তরুণ—তাহার চক্ষুতে বুদ্ধির দীপ্তি—মুখে গাম্ভীর্য্য। ছাত্র-ছাত্রীদিগের হাজিরা লইয়া সে বলিল, "তোমরা টেনিশনের কবিতা পড়িবে। আমি প্রথমে তোমাদিগের পাঠ্যপুস্তকে প্রথম কবিতাটি অবলম্বন করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব। যদি কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে আমি যথাসাধ্য উত্তর দিব।"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ছাত্রছাত্রীরা মুগ্ধ হইয়া অধ্যাপকের কথা শুনিতে লাগিল। কেবল বিজলি ছল সন্ধান করিতে লাগিল।

অধ্যাপক সেই কবিতাটির দুইটি চরণ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিল:—

"Love took up the harp of Life, and
smote on all the chords with might;
Smote the chord of Self, that, trembling,
pass'd in music out of sight."

"প্রেম তুলি' নিল জীবনের বীণা
ঝঙ্কার দিল—তারে তারে তা'র;
'আপন'-তন্ত্রী ঝঙ্কারে গেল
সঙ্গীতে মিশি'—ফিরিল না আর।"

ঐ চরণদ্বয় আবৃত্তি করিয়া অভ্রকুমার কোন বক্তব্য করিবার পূর্ব্বেই বিজলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুস্পষ্ট ভাবে বলিল, "সার, এ উক্তি কি হাস্যোদ্দীপক—অন্তঃসারশূন্য ভাবাভিনয়মাত্র নহে?"

অভ্রকুমার মুখ তুলিল—একবার চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"মানুষ কি কখন তাহার 'আপনত্ব' ত্যাগ করিতে পারে? তাহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে?"

অভ্রকুমার একটু বিব্রত হইল—কারণ, যে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছে, সে ছাত্র নহে ছাত্রী। কিন্তু সে তাহার বিব্রত ভাব অতিক্রম করিয়া বলিল, "পৃথিবীর বিপুল সাহিত্য ঐ কথাই বলে—প্রেম তাহার রসায়নে স্বত্ব পরিবর্ত্তিতরূপ করে। সে তাহার উক্তির সমর্থনে নানা দেশের সাহিত্য হইতে কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিতে যাইতেছিল। সেই সময় বিজলি বলিল—আবার এক জন বড় ইংরেজ লেখকও লিখিয়াছেন—

"মাটন চপের মতই প্রণয়
ত্বরিতে শীতল হয়—"

সে সমগ্র কবিতাটি আবৃত্তি করিবার পূর্ব্বেই ছাত্র-ছাত্রীদিগের হাস্যরোলে কক্ষ মুখরিত হইল।

সেই হাস্যরোল—তাঁহার কক্ষে শুনিতে পাইয়া অধ্যক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে প্রমাদ গণিল। কারণ, অধ্যক্ষ অত্যন্ত শৃঙ্খলাপ্রিয়—কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তিনি সে জন্য সকলকে কঠোর দণ্ড দিয়া থাকেন। অনেকেই বিজলির প্রতি বিরক্ত হইল।

অধ্যক্ষ আসিয়া হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহাকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অভ্রকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "বিদ্যার্থীদিগের নির্দ্দোষ হাস্য। উহাতে আপত্তির কিছুই নাই।"

অধ্যক্ষ চলিয়া যাইলেন।

বিদ্যার্থীরা স্বস্তি অনুভব করিল—অধ্যাপকের প্রতি শ্রদ্ধানুভব করিল।

অভ্রকুমার পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিল, তখনও তাহার পড়াইবার সময় ১০ মিনিট আছে। সে পুস্তকগুলি গুছাইয়া লইয়া—"বন্ধুরা, বিদায়"—বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইল। এক জন ছাত্র যাইয়া বলিল, "আমি বহিগুলি লইয়া যাইতেছি।" —অভ্রকুমার বলিল, "ধন্যবাদ, কিন্তু আমিই লইয়া যাইব।"

অভ্রকুমার চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার "বিদায়ের" প্রকৃত অর্থ সে দিন কেহ বুঝিতে পারিল না। পরদিন যখন সে আর আসিল না এবং তাহার স্থানে আর এক জন অধ্যাপক আসিলেন, তখন সকলে তাহা বুঝিতে পারিল।

বিজলি যেন বিজয়ের গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল। সতীর্থদিগের মধ্যে এক দলের বিরক্তিতে সে গর্ব্ব মলিন হইতে লাগিল। অভ্রকুমারের পরে যে অধ্যাপক আসিলেন—তাহার অধ্যাপনায় অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। গানের বৈঠকে যাহাকে "আসর জ্বালাইয়া যাওয়া" বলে অভ্রকুমার যে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অধ্যাপনা করিয়াছিল, তাহাতে তাহাই করিয়া গিয়াছিল।

ছাত্র ছাত্রীরা জানিত না, বাঙ্গালার বাহিরে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সে অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করিতে আহূত হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গালী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের সুযোগ সে ত্যাগ করিতে চাহে নাই। সে দিনের ঘটনার পর সে বাঙ্গালার বাহিরে যাওয়াই স্থির করিয়াছিল। সতীর্থগণ উৎকৃষ্ট অধ্যাপক হারাইবার জন্য বিজলিকেই দায়ী করিতে লাগিল।

তাহার পরে বিজলির জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আর এত দিন পরে, সেই অভ্রকুমারই তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া রক্ষা করিয়াছে। হয়ত পূর্ব্বে এরূপ ঘটিলে সে আপনাকে ধিক্কার দিত। কিন্তু এখন সে তাহা করিতে পারিল না। কেন পারিল না, তাহা সে আপনিই বুঝিতে পারিল না।

৫

আদালত হইতে ফিরিয়া বেশপরিবর্ত্তনান্তে হাত-মুখ ধৌত করিয়া—আহার করিয়া গগনচন্দ্র যখন বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বিজলিকে ডাকিল—"চল, ধন্যবাদ দিয়া আসবে"—তখন বিজলি যাইতে অসম্মত হইল।

গগনচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া অঞ্জলিকে বলিল, "তোমার ভগিনীটিরও লজ্জা হ'ল!"

অঞ্জলি বলিল, "না-ই বা গেল—তুমিই যাও।"

"তা' ত যাবই; কিন্তু এ ত ভাল লক্ষণ নহে!"

"কেন?"

"বিজলি টেনিসনের কবিতা বড় ভালবাসে—একটি কবিতায়—'সুপ্ত সুন্দরী'তে আছে—বাঞ্ছিতের এক বার স্পর্শে মায়াপুরীর মায়া-বন্ধন ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল—সুপ্ত সুন্দরী চক্ষু মেলেছিলেন।"

অঞ্জলি বলিল,—"এতও তুমি জান!"

গগনচন্দ্র চলিয়া গেল।

বিজলি সত্য সত্যই টেনিসনের কবিতা পাঠ করিত। সে অভ্রকুমারের সেই আবৃত্তির পর হইতে কি না, তাহা সে কখন ভাবিয়া দেখে নাই।

গগনচন্দ্র যাইবার পূর্ব্বে অঞ্জলি তাহাকে বলিয়াছিল, বিজলি কলেজে ঐ অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিল এবং সেই সময় তাঁহাকে এত উত্যক্ত করিয়াছিল যে, তাহা স্মরণ করিয়া এখন তাঁহার কাছে যাইতে লজ্জানুভব করিতেছে।

গগনচন্দ্র অভ্রকুমারকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিল, "যাঁকে কাল আপনি কুকুরের কামড় হ'তে রক্ষা করেছেন, সে এক সময়ে আপনার ছাত্রী ছিল।"

অভ্রকুমার বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ছাত্রী!" সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতে গিয়াছিল, তথায় কোন ছাত্রী তাহার নিকট অধ্যয়ন করে নাই।

গগনচন্দ্র বলিল, "তা'-ই ত সে বলেছে।"

"বাঙ্গালায় আমি ত এক দিন—এক ঘণ্টারও কিছু কম সময় অধ্যাপকের কায করেছিলাম।"

"কিন্তু সে বলেছে, কলেজে আপনাকে উত্যক্ত করেছিল। সেই জন্য নিজে এসে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পারলে না।"

অভ্রকুমার হাসিয়া উঠিল। সেই এক দিনের অধ্যাপকের কাযের কথা তাহার মনে পড়িল। তবে কি এই তরুণীই তাহাকে বিব্রত করিয়াছিল? সে বলিল, "সে জন্য তাঁকে লজ্জিত হ'তে বারণ করবেন। বাঙ্গালা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া আমার পক্ষে শাপে বর হয়েছিল—কায অল্প ও অবসর অধিক থাকায় আমি গবেষণার সুবিধা ও সুযোগ পেয়েছি।"

"আমি তাঁকে তা' বলব। কাল বা পরশু তাঁকে আর তাঁর দিদিকে অর্থাৎ আমার স্ত্রীকে আনব—আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ ক'রে যা'বেন।"

অভ্রকুমার আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আমার স্ত্রী!—সে যে আকাশ-কুসুম।"

গগনচন্দ্র বলিল, "তিনি কত দিন—"

বাধা দিয়া অভ্রকুমার বলিল, "তিনি গত হ'ন নাই; আগতই হ'ন নাই।"

"আপনি একাই এসেছেন?"

"না। মা আছেন। 'আনন্দ মঠের' সন্তানের মত আমি বলি, আমার আছেন ঐ মা। মা'র শরীর দুর্ব্বল, তা'র উপর হিন্দু বিধবার কৃচ্ছ্রসাধন। আমি যে স্থানে অধ্যাপক ছিলাম, তথায় শীত ও গ্রীষ্ম দুইই প্রবল—মা'র কষ্ট হয়। সেই জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরী স্বীকার ক'রে বাঙ্গালায় ফিরে আসছি।"

"সমুদ্রের কূলে বেড়াইতে যা'বেন?"

"না। আজ আর যাওয়া হইবে না; মা মন্দিরে যা'বেন—তাঁ'কে নিয়ে যেতে হ'বে।"

"মন্দিরে যা'বেন? আমাদের ঠাকুরমা—আমার স্ত্রীর ঠাকুরমা আছেন; তিনিও এখনই—এই পথে মন্দিরে যাবেন; তাঁ'র সঙ্গেই যাবেন।"

গগনচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখনই অদূরে তাহার মোটর যানের বাঁশী শুনিয়া সে পথে আসিয়া দাঁড়াইল এবং যান দাঁড় করাইয়া ঠাকুরমা'কে জানাইল, "ঠাকুরমা, যিনি কাল বিজলিকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি এই বাড়ীতে আছেন। তাঁর মা ঠাকুরও মন্দিরে যা'বেন। আমি বললাম, আপনারা একসঙ্গে যা'ন।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "বেশ ত।"

গগনচন্দ্রের কথায় ঠাকুরমা যান হইতে অবতরণ করিয়া

অভ্রকুমারের গৃহে গমন করিলেন এবং তাঁহার মাতাকে লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন। অভ্রকুমার সঙ্গে গেল।

গগনচন্দ্রের সামাজিক শিষ্টাচার সকলকে আকৃষ্ট করিত।

মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরমা অভ্রকুমারের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন—"যেমন রূপ, তেমনই কি গুণ! কি মিষ্ট কথা! খালি পায়ে গেল—আর কি যত্নে—কত সাবধান হয়ে মা'কে নিয়ে গিয়ে জগবন্ধু দর্শন করাল! সঙ্গে সঙ্গে আমার যা'তে কোন অসুবিধা না হয়, সে দিকে কি লক্ষ্য রাখতে লাগল! মা'র এক ছেলে—এক সন্তান—কিন্তু—এক চন্দ্রে অন্ধকার দূর হয়"—ইত্যাদি।

৬

পরদিন মন্দিরে যাইবার জন্য ঠাকুরমা অভ্রকুমারের মাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই অভ্রকুমার মাতাকে লইয়া গগনচন্দ্রের গৃহে আসিল এবং তথা হইতে মা তাঁহার সঙ্গে মন্দিরে গমন করিলেন।

সে দিন বিজলি আবার অভ্রকুমারকে দেখিল। তাহার মনে হইল, এই কয় বৎসরে তাহার দৃষ্টিতে মনীষার ঔজ্জ্বল্য মলিন হয় নাই—মুখের ভাব গাম্ভীর্য্যে আরও সুন্দর হইয়াছে।

বিজলি পূর্ব্বদিন গগনচন্দ্রের নিকটে শুনিয়াছিল, অভ্রকুমার বলিয়াছে—সে কলেজে চাপল্যহেতু যে ব্যবহার করিয়াছিল, সে জন্য তাহার লজ্জিত হইবার কারণ নাই—অভ্রকুমারের পক্ষে তাহা শাপে বর হইয়াছিল। সে কেবলই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, অভ্রকুমার সত্য সত্যই তাহার সেই অশিষ্ট ব্যবহারের জন্য তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে ত? অভ্রকুমার যে তাহাকে ক্ষমা করিয়াছে—তাহা আপনাকে বুঝাইবার জন্য বিজলি কেবলই চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম দিনের সেই কথা সে কখন ভুলে নাই—অধ্যক্ষকে সে বলিয়াছিল, "বিদ্যার্থীদিগের নির্দ্দোষ হাস্য। উহাতে আপত্তিকর কিছুই নাই।" সেই উক্তিতে ক্ষমার যে বিকাশ ছিল, তাহা সেই দিনই সকল বিদ্যার্থী অনুভব করিয়াছিল। তাহার পর—ভাগ্যচক্রের কি বিস্ময়কর আবর্ত্তন—অভ্রকুমারই তাহাকে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া অপ্রত্যাশিত স্থানে অতর্কিতে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সে কি তাহার যে অকারণ গর্ব্ব সে পর্ব্বত বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে—তাহা বল্মীকমাত্র প্রমাণ করিবার জন্য? তাহার সবল বাহুর স্পর্শেই কি তাহা হইয়াছে? অভ্রকুমার বলিয়াছে বটে, বিজলির কলেজে ব্যবহারে লজ্জার কোন কারণ নাই—কিন্তু সে কি সত্য সত্যই তাহার সেই প্রগল্‌ভতা—সেই ধৃষ্টতা—সেই অশিষ্টতা ক্ষমা করিতে পারিয়াছে? সে দিন তাহার ব্যবহার বিজলির নিকট প্রগল্‌ভতার,—ধৃষ্টতার ও অশিষ্টতার পরিচয় বলিয়া মনে হয় নাই—পরে হইতেছিল—আজ সে বিষয়ে তাহার আর সন্দেহ নাই। অভ্রকুমার তাহার সেই ব্যবহার ক্ষমা করিয়াছে—আপনাকে বুঝাইবার জন্যই যেন তাহার মনে আগ্রহ অনুভূত হইতেছিল; সে মনে করিতেছিল, নহিলে সে কখনই গগনচন্দ্রের গৃহে তাহার মাতাকে লইয়া আসিত না।

বিজলির মনে হইতেছিল, তাহার মত, তাহার দৃঢ়তা—সব যেন বন্যায় ছিন্নমূল তরুর মত ভাসিয়া যাইতেছিল; সে সে সকল রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু কিসে সে সকল ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

এদিকে ঠাকুরমা'র সঙ্গে অভ্রকুমারের মাতাকে মন্দিরে পাঠাইয়া গগনচন্দ্র তাহাকে লইয়া সমুদ্রকূলে বেড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া—বাহিরের ঘরে যাইবার পূর্ব্বে অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করিল—"আজ তোমরা বেড়া'তে যাও নাই?"

অঞ্জলি "না" বলিলে সে বিজলিকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "এক দিন একটা কুকুর তাড়া করাতেই ভয়ে আর সেদিকে গেলে না! এমনই ক'রে কি স্ত্রীস্বাধীনতা লাভ হইবে?"

বিজলি মনে মনে কি ভাবিল বটে, কিন্তু মুখে বলিল, "কেন—আমরা অধীনতা ভোগ করছি না কি?"

"অভ্রকুমার বাবুকে নিয়ে গিয়াছিলাম—কোন্ স্থানটায় ঘটনাটি ঘটেছিল দেখালেন। বহু লোকই তাঁ'কে দেখিয়ে বলতে লাগলো—তিনিই আগের দিন এক তরুণীকে রক্ষা করেছিলেন; তিনি তা'তে কি লজ্জিতই হয়ে পড়ছিলেন! শিক্ষাব্রতীদের অমনই হয়—তা'রা ডানপিটে হয় না।—"

অঞ্জলি বলিল, "উকীলদের মত?"

এই সময় ঠাকুরমা ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাদিগের তিন জনকে কথোপকথনরত দেখিয়া বলিলেন, "কি ছেলে! দেখলে চক্ষুর পাপ যায়।"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া গগনচন্দ্র বলিল, "কে, ঠাকুরমা? আপনার নাৎজামাই ত?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তুমি ত, দাদা, ভাল বটেই', আমি সেই ছেলেটির কথা বলছি। তা'র মা'কে ত বললাম, এখনও ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, ছেলে বিয়ে করতে চাহে না। বলে তাঁ'র অসুবিধা হ'বে।"

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"ছেলে লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করবার পক্ষপাতী। পাছে তা'তে মা'র কোন অসুবিধা হয়, সেই ভয়ে সে হাজার বললেও বিয়ে করতে চাহে না! মা'কে এত ভক্তি করে। তিনি দুঃখ করছিলেন, তিনি আর কত দিন? কিন্তু ছেলে শুনে না।"

গগনচন্দ্র অঞ্জলিকে বলিল, "শুনলে ত? পিতৃ-ভক্তির আদর্শ—প্রতীক ভীষ্মও পুরুষ মানুষ ছিলেন; আর মাতৃভক্তির আদর্শ অভ্রকুমার বাবুও পুরুষ মানুষ।"

সেই দিন ঠাকুরমা বিজলির অসাক্ষাতে অঞ্জলিকে বলিলেন, "ছেলেটি ত লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করতে চায়—তুই দেখ না, বিজলির মত করাতে পারিস্ কি না। তা' হ'লে আমি ছেলেটির মা'কে বলি।"

অঞ্জলি বলিল, "তুমি ব'লে দেখ, ঠাকুরমা।"

"আমি ওর সঙ্গে তর্কে পারি না।"

অঞ্জলি মুখে বলিল, "ব'লে দেখব;" কিন্তু মনে মনে বলিল—অসম্ভব। কারণ, ভগিনীকে সে জানিত এবং সে পাঠ্যাবস্থায় অধ্যাপক অভ্রকুমারের সহিত যে অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিল তাহা সে-ই বলিয়াছে।

কিন্তু অঞ্জলি সেই দিন রাত্রিকালে যখন পিতামহীর কথা গগনচন্দ্রকে বলিল, তখন গগনচন্দ্র বলিল, "দেখ কি হয়—অনেক অসম্ভবও সম্ভব হয়। অভ্রকুমার যে কোন কথা মনে গিঁর দিয়ে রেখেছেন, তা' তাঁ'র ব্যবহারে মনে হয় না। আর তোমার

ভগিনীটিকে দু'দিন খুবই শিষ্টশান্ত দেখছি—যেন স্থির বিজলি! তবে সে মানসিক পরিবর্ত্তনে কি সে দিনের সেই ঘটনায় স্নায়বিক আঘাত-ফল তা' বলতে পারি না। কারণ, সে হয়ত ডাক্তারের এলাকায় পড়ে—উকীলের পক্ষে তা' বিবেচনা করতে যাওয়া অনধিকার প্রবেশ।"

৭

পরদিন প্রাতঃকালে অভ্রকুমার আসিয়া গগনচন্দ্রের গৃহে উপনীত হইল। গগনচন্দ্র "আসুন! আসুন!" বলিয়া তাহাকে বসাইয়া বলিল, "এক পেয়ালা চা দিতে বলি?"

অভ্রকুমার বলিল, "না।"

"চা কি পান করেন না?"

"নিয়মিত যাত্রী নহি। কিন্তু আজ পান নিষিদ্ধ।"

"কেন?"

"আজ মা'র ছেলেটির জন্মতিথি। আমি ভুললেও মা ভুলেন না—পিণ্ডাধিকারীর জন্য আজ তিথি-পূজা আছে। সেই জন্যই আমি সকালে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।"

"বিরক্ত কি, অভ্রকুমার বাবু?"

"রক্তই হ'ন আর বিরক্তই হ'ন—মা'র আদেশ আমাকে পালন করতেই হ'বে, তবে আমি দূত অবধ্য। মা বললেন, আজ আপনারা সকলে মা'র কাছে খা'বেন। যদি আপনারা যা'ন, তিনি এসে ব'লে যা'বেন।"

গগনচন্দ্র বলিল, "তিনি আসবেন কেন? আপনার আসা কি নামঞ্জুর?"

অভ্রকুমার বলিল, "একটু কথা আছে। মা বলেছেন, আপনার ঠাকুরমা'কেও পা'র ধুলা দিতে হ'বে। তিনি বললেন, আর কোথাও হ'লে বলতে সাহস করতেন না—এ শ্রীক্ষেত্র, প্রসাদই গ্রহণ করা হ'বে।"

"দেখুন, আজকাল ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ—আমার কথাই আমি বলতে পারি, তা-ও হয়ত পূরা পারি না। আমি সব জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।"

"ঠাকুরমা! ঠাকুরমা!" বলিতে বলিতে গগনচন্দ্র বাড়ীর ভিতরের অংশে গেল এবং সকল কথা বলিয়া আসিয়া অভ্রকুমারকে বলিল, "চলুন, আপনার কথা আপনিই বলবেন।"

অভ্রকুমার যাইয়া ঠাকুরমা'কে প্রণাম করিল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গগনচন্দ্র তাহাকে বলিল, "ঠাকুরমা'র ঘোমটার ঘটা দেখেছেন! এখন কনে বৌরাও অমন ঘোমটা দেয় না।"

অভ্রকুমার বলিল, "উনি ত এখনকার ন'ন। আমিও মা'র দেখে অমনই ঘোমটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি কিন্তু ওকে ঘোমটার ঘটা বলি না—শিষ্টাচারের ঘটা বলি; সেরিডেন এ দেশের অন্তঃপুরের কথায় কি বলেছেন, তা'ত জানেন।"

সে সেরিডেনের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি আবৃত্তি করিল।

সে যাহা বলিল, তাহাতে ঠাকুরমা আর "না" বলিতে পারিলেন না। তিনি কেবল বলিয়া দিলেন, অভ্রকুমারের মা'কে কষ্ট করিয়া আসিতে হইবে না।

যাইবার সময় অভ্রকুমার গগনচন্দ্রকে বলিল, "আপনার আদালতে কখন যেতে হ'বে।"

গগনচন্দ্র বলিল, "আদালতে কাযের যে বহর—তা'তে যখন হয় গেলেই হয়—না গেলেও ক্ষতি নাই। আমি ঠিক যা'ব।"

তাহাই হইল।

সে দিন বিজলিকে দেখিয়া অভ্রকুমারের মাতা ঠাকুরমা'কে বলিলেন, "আপনি ত আমাকে বলছিলেন—ছেলের বিয়ে কেন দিইনি। আমি জিজ্ঞাসা করি—নাতনীর বিয়ে দেননি কেন?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "আমার অদৃষ্ট। যাদের কায তা'রা চ'লে গেল—আমারই ডাক আসছে না। আমি কি এ ভার বহিতে পারি? বিশেষ ওরা লেখাপড়া শিখেছে—আমাদের পসন্দ হয়ত ওদের ভাল লাগে না; আমিও জোর ক'রে কিছু বলতে সাহস করি না।"

অভ্রকুমারের মাতা আর কিছু বলিলেন না।

সেই দিন মন্দিরে জগবন্ধু দর্শন করিয়া আসিবার সময় ঠাকুরমা অভ্রকুমারের মাতাকে বলিলেন, "বলতে ভরসা হয় না—যদি অনুগ্রহ করেন—"

অভ্রকুমারের মাতা বলিলেন, "কি?"

"যদি আমার নাতনীটিকে গ্রহণ করেন।"

"আজ অভ্রকুমারের জন্মদিন—শ্রীমন্দিরে আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিব না; কিন্তু বলি, আমি ত অভ্রকুমারের বিয়ে দিলে বেঁচে যাই। আপনি আপনার বড় নাতজামাইকে ওকে বলতে বলুন। আর ও ফিরে এলে আমিও বলব।"

বিস্মিত ভাবে ঠাকুরমা বলিলেন, "ফিরে এলে?"

অভ্রকুমারের মাতা বলিলেন, "হাঁ। পশ্চিমে আমার শীতে আর গ্রীষ্মে কষ্ট হয় ব'লে ও কলিকাতায় চাকরী নিয়েছে। কিন্তু আমাকে ব'লে নাই যে, কায বুঝিয়ে দিতে ওকে এক বার সেই চাকরীর স্থানে যেতে হ'বে—আমি জগবন্ধু দেখবার ইচ্ছা এক দিন জানিয়েছিলাম ব'লে পুরীতে এসেছে। আমি জানলে একেবারে সেখানকার কায সেরে আসতে বলতাম। এখন কাল ওকে যেতে হ'বে। তা'ই ভাবছি কি হ'বে।"

"কেন?"

"ছ' সাত দিন ত হ'বেই। সম্বল পুরাণ চাকর—ও সঙ্গে না গেলে অভ্রকুমারের কষ্ট হ'বে—আবার ও গেলে এখানে—নূতন জায়গায়—থাকে কে?"

"আমি গগনকে ব'লে তা'র ব্যবস্থা করব। আপনার বাড়ী ত কাছেই।"

শুনিয়া অভ্রকুমারের মা যেন স্বস্তি অনুভব করিলেন।

ঠাকুরমা গৃহে আসিয়া গগনচন্দ্রকে অভ্রকুমারের মাতার কথা বলিলে সে পরদিন অভ্রকুমারের কাছে যাইয়া আবশ্যক ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিল; বলিল, অভ্রকুমার পুরাতন ভৃত্যকে লইয়া যাইতে পারে; এ কয়দিন সে তাহার গৃহের তত্ত্বাবধান গ্রহণ করিবে—দ্বারবান দিবে এবং তাহার মাতা যদি অনুগ্রহ করিয়া এ কয় দিন তাহার গৃহে থাকিবার প্রস্তাবে অসম্মত হন, তবে তাহার স্ত্রী, ঠাকুরমা ও বিজলি যতক্ষণ সম্ভব তাঁহার কাছে থাকিবেন।

অভ্রকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রা করিতে পারিল।

৮

গগনচন্দ্র যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা পালন করিল এবং তাহাতে ঠাকুরমা ও অঞ্জলি তাহাকে বিশেষ সাহায্য করিলেন।

অঞ্জলি ও বিজলি অভ্রকুমারের মাতার নিকটেই প্রায় সমস্ত দিন থাকিল—অঞ্জলিকে যখন সংসারের কাযে গৃহে আসিতে হইল, তখন সে বিজলিকে তাঁহার নিকটে রাখিয়া আসিল। বিজলি যেরূপ শান্তভাবে তাঁহার কাছে থাকিল, তাহাতে অঞ্জলিও বিস্ময়ানুভব করিল। প্রথম দিন অভ্রকুমারের মাতা রাত্রিকালে গগনচন্দ্রের গৃহে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে গগনচন্দ্র যখন বলিল, "আপনি একা থাকবেন—সে হ'বে না; বিজলি আপনার কাছে থাকুক" তখন তিনি "না" বলিলেও বিজলি যে তাহাতে আপত্তি করিল না, তাহা অঞ্জলি লক্ষ্য করিল।

সন্ধ্যার পর আহারান্তে অঞ্জলি যখন সত্য সত্যই বিজলিকে তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইবার জন্য আনিল, তখন অভ্রকুমারের মাতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেও বিব্রত না হইয়া পারিলেন না। কারণ, একে তাঁহার গৃহে সাধারণতঃই আসবাবের বাহুল্য থাকে না—গৃহে কেবল মা আর ছেলে, তাহাতে পুরীতে তাঁহারা অল্পদিনের জন্য আসিয়াছেন। কেবল পুস্তক বলিলে যদি আসবাব বুঝায়, তবে অল্পদিনের জন্যই হউক আর অধিক দিনের জন্যই হউক অভ্রকুমার যে স্থানেই যাইত, সেই স্থানেই সে আসবাবের অভাব থাকিত না। বিশেষ এ বার সে নূতন পদে অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মা যে ঘরে শয়ন করিতেন, তাহার পার্শ্বের ঘরটি বড়, তাহাই অভ্রকুমার শয়নের ও অধ্যয়নের কক্ষরূপে ব্যবহার করিত। মা আপনার খাটখানি সেই ঘরে অভ্রকুমারের খাটের পার্শ্বে লইলেন এবং স্বয়ং অভ্রকুমারের খাটে বিজলির জন্য শয্যা-রচনা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে বিজলি গগনচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া যাইবার পরে অভ্রকুমারের মাতা পূজার্চনা সারিয়া তথায় যাইয়া বিজলির পিতামহীকে বলিলেন, "আপনাদের কি বিব্রতই করলাম!"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে কি কথা?"

"আপনার নাতিনী যে ভাবে আমাকে আগলেছে, তা' বোধ হয়, আমার মেয়ে থাকলে সে-ও পারত না—ও একেবারে মা'র মত ব্যবহার করেছে।"

বিজলি তাঁহার কথায় মনে যুগপৎ আনন্দ ও লজ্জা অনুভব করিল। সে দৃষ্টি নত করিল।

অভ্রকুমারের মাতা বলিলেন, "যদিও ও যে যত্ন করেছে, তা'তে আপনাকে তা' হ'তে বঞ্চিত করতে ইচ্ছা হয় না; তবুও ওকে আর ব্যস্ত করব না—আজ আমিই আসব।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে হ'বে না—এ যে আপনার স্নেহ আর আশীর্ব্বাদ লাভ করবার সুযোগ পেয়েছে, সে বিজলির পরম ভাগ্য; ও-ই আপনার কাছে থাকবে।"

তিনি বিজলিকে বলিলেন, "দিদি, তোমার কোন অসুবিধা হ'বে না ত?"

বিজলি বলিল, "না"।—কিন্তু বলিতে মনে কেমন লজ্জানুভব করিল। সে ভাবটি তাহার পক্ষে নূতন।

৯

গমনের দশ দিন পরে অভ্রকুমার ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া লক্ষ্য করিল—যে ঘরে সে অধ্যয়ন ও শয়ন করিত, দুইখানি খাটই সেই ঘরে—মনে করিল, সেই ঘরটিতেই অনেক জিনিষ থাকায় মা সেই ঘরেই তাহার অনুপস্থিতি কালে শয়ন করিতেন; আর লক্ষ্য করিল, তাহার টেবল, পুস্তক প্রভৃতি সবই ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখা হইয়াছে।

সেই দিন মধ্যাহ্নে সে আহারে বসিলে তাহার মাতা বলিলেন, "বাবা, এ বার আমি তোর বিয়ে দিবই—তোর কোন আপত্তি শুনব না।"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "মা, এই ক'দিন ছেলের কায করবার ছিল না—সেই দীর্ঘ অবসরে তুমি বুঝি ভেবে ভেবে ছেলেকে মা'র কাছ হ'তে দূর করবার ঐ উপায়টি আবিষ্কার করেছ?"

"না, বাবা, যা'র সঙ্গে তোর বিয়ে দিব, তাকেই আবিষ্কার করেছি। ভাল ক'রেই দেখে—চিনে নিয়েছি।"

"অর্থাৎ লোক টাকা যেমন বাজিয়ে নেয়, তেমনই সে খাঁটী কি মেকী তা দেখেছ?"

"তা-ই বটে। দেখে নেবার এমন সুযোগ প্রায়ই হয় না।"

"সে কে?"—অভ্রকুমার হাসিতেছিল।

মা বলিলেন, "যে মেয়েটিকে তুই সমুদ্রের ধারে সেদিন রক্ষা করেছিলি—বিজলি।"

অভ্রকুমারের মুখ হইতে হাসি অন্তর্হিত হইল। সে বলিল, "বল কি, মা!"

মা বলিলেন, "কেন? তোর কি আপত্তি হ'তে পারে?"

"ও সব কলেজে-পড়া মেয়ে তোমার অসুবিধা হ'বে। তুমি যা'তে সুখী হ'তে পারবে না, সে কায আমাকে করতে ব'ল না, মা।"

"অভ্র, তোর বৌ হ'তে যদি আমি অসুখী হই, তবে আমি বুঝব, দোষ আমার আর দোষ আমার অদৃষ্টের। তুই সে ভয় করিস না।"

"তুমি জান না—"

মা তাহার কথা আর অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিলেন, "আমি ভালরূপই লক্ষ্য করেছি। এ দশ দিন সে ত আমার কাছেই ছিল। তুই দেখিস নাই—তোর বসবার ঘরেই দু'খানা খাট—আমরা দু'জন ঐ ঘরে শু'তাম। ঘর-দ্বারের অবস্থা লক্ষ্য করিস নাই? সব ঝাড়া-মুছা—ঘর যেন হাসছে। কি কাযের মেয়ে! আর প্রতিদিন মন্দিরে কি যত্ন ক'রেই আমাদের ঠাকুর-দর্শন করিয়েছে।"

অভ্রকুমার বুঝিল, কয় দিনে ব্যাপারটা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সে গম্ভীর ভাবে বলিল, "মা, তুমি ব্যস্ত হয়ে কিছু স্থির ক'র না। ভাল ক'রে ভেবে দেখ।"

মা বলিলেন, "আমি ভাল ক'রেই ভেবে দেখেছি। তবে তোকে না ব'লে শেষ কথা দিই নাই—এ বার দিব। তুই অমত করিস না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি—তোরা সুখী হ'বি। বাঙ্গালীর—হিন্দুর ছেলে মেয়ে—কেন অসুখী হ'বে? আমার বিশ্বাস, আমি যে শ্রীক্ষেত্রে এসেছি আর সে দিনের ঘটনাক্রমে যে মেয়েটির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, সে সবই জগবন্ধুর কৃপায়।"

অভ্রকুমার ভাবিতেছিল।

মা বলিলেন, "তুই ভাবিস না, বাবা। আমার মেয়ে নাই—মেয়েটির মা নাই। আমি ওকেই আনব।"

অভ্রকুমার কোন কথা বলিল না—সে ভাবিতেছিল। সে যত ভাবিতেছিল, তাহার ভাবনা তত বাড়িতেছিল।

শেষে এক এক বার অভ্রকুমারের মনে হইতে লাগিল—

যে ভাবনার অন্ত নাই, তাহার অন্তলাভের আশা ত্যাগ করিয়া "বস্তুবিধ্য" মনে করাই হয়ত ভাল।

সে দিন শনিবার। গগনচন্দ্র মধ্যাহ্নের পরেই কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল, অভ্রকুমারের মাতা অভ্রকুমারের আনীত খাবার প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে-সব দেখিয়া, তাহার কৌতূহল হইল—অভ্রকুমার যুদ্ধজনিত অবস্থার কি নূতন সংবাদ বা জনরব আনিয়াছে সে তাহা জানিয়া আসিবে; কারণ, সংবাদ-নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহার স্বরূপ সে একাধিকবার অভ্রকুমারের সহিত আলোচনা করিয়াছে।

গগনচন্দ্র অভ্রকুমারের গৃহে যাইয়া দেখিল, অভ্রকুমার গম্ভীর মুখে বসিয়া আছে। সে কুশল প্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে যেন চিন্তিত দেখছি!"

মৃদু হাসিয়া অভ্রকুমার বলিল, "যে ষড়যন্ত্র আপনি করেছেন! মা'কে কি বলেছেন?"

"বাধ্য হয়েই তাঁ'কে বিরক্ত করতে হয়েছে, অভ্রকুমার বাবু। আপনি ত আর কোথাও জব্দ হ'বেন না।"

"আমার মনে পড়ে না—মা কখন কোন কায আমাকে করতে হ'বে ব'লে জিদ করেছেন। কাজেই তিনি কোন কথা বললে তা'তে 'না' বলতে আমার যে কত কষ্ট হয়, তা' আর কেহ বুঝতে পারবে না।"

"কেনই বা 'না' বলবেন? মা'র কি বিজলিকে পসন্দ হয় নাই?"

"না হ'লে ত কথাই ছিল না। বেশী পসন্দই হয়েছে।"

"তবে আপনিই বা আপত্তি করবেন কেন?"

"সেই কথাই ত মা'কে বলছি—কলেজে-পড়া মেয়ে—মা'র কি অসুবিধা হ'বে না?"

"কেন হ'বে, অভ্রকুমার বাবু? কলেজে পড়লেই কি বাঙ্গালীর মেয়ে সংস্কারও অতিক্রম করতে পারে। তা' হয় না।"

"অর্থাৎ আপনি বলেন, 'যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না? হয়ত বাঁধে—কিন্তু যদি চুল না থাকে, তবে চুল বাঁধবে কেমন ক'রে?"

"আমাদের মেয়েদের চুলের অভাব ত লক্ষ্য করতে পারি না। বরং তা'র প্রাচুর্য্য—সুবাসিত কেশতৈলের খরচ যোগা'বার সময় বাহুল্য ব'লেই মনে হয়। তবে কা'রও কা'রও যদি চুল তুলবার বাতিক থাকে, সে আমি বলতে পারি না।"

অভ্রকুমার ভাবিতে লাগিল।

গগনচন্দ্র বলিল, "আর ভেবে কি করবেন?"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "আপনারা ত মক্কেলের ফাঁসীর আদেশ হ'লে বলেন—'দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়—তা'র পর দেখা যা'বে।' আপনি কি জানেন, আপনার শ্যালিকাটির মত কি?"

"ওর আবার মত! আপত্তির কোন লক্ষণ ওর দিদি লক্ষ্য করেন নাই।"

"সে মত নহে, গগন বাবু। উনি এক দিন বলেছিলেন—'মাটন চপের মতই, প্রণয় ভরিতে শীতল হয়'—সব বাজে।" বলিয়া অভ্রকুমার হাসিতে লাগিল।

গগনচন্দ্র বলিল, "ছেলে মানুষ—বিদ্যা জাহির করবার জন্ত তখন কি বলেছিল, তা' ধরতে নাই।"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "আমি তখনই কলেজের অধ্যাপককে সে কথা বলেছিলাম—তরুণদের নির্দ্দোষ হাসি।"

গগনচন্দ্র বলিল, "তা' হ'লে আর অমত করবেন না।"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "কেবল একটা কথা আছে, গগন বাবু—আপনার শ্যালিকা প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বত্ব সম্বন্ধে খুব দৃঢ় মত পোষণ করতেন, সে মত কি তিনি পরিবর্ত্তন করেছেন; যদি ক'রে থাকেন, তবে তা'র কারণ কি?"

গগনচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখব। উত্তর এনে দিব।"

১০

গৃহে ফিরিয়া গগনচন্দ্র হাসিতে হাসিতে সব কথা বলিল। চুল সম্বন্ধে অভ্রকুমারের উক্তিতে তাহার পঠদ্দশায় প্রগতির প্রতীক মনে করিয়া চুল ছাঁটার সম্বন্ধে ইঙ্গিত ছিল, কি না—বিজলি তাহা ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সেই সব কথা শুনিয়া তাহার সেই সময়ের দুষ্টবুদ্ধি যেন আবার উদিত হইতে লাগিল। গগনচন্দ্র যখন বলিল, "অভ্রকুমার বাবুর কথার কি উত্তর দিব, বল, বিজলি?"—তখন সে বলিল, "আপনি অত মাথা ঘামা'বেন না; উত্তর পা'বেন।"

তাহার পরে ঠাকুরমা যখন অভ্রকুমারের মাতাকে মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্ত তাহার গৃহে গমন করিলেন, তখন—কয়দিনের মতই, বিজলি তাঁহার সঙ্গে গেল। সে কয়দিন পূর্ব্বে তাহার মাতাকে বলিয়া অভ্রকুমারের টেবল হইতে একখানি পুস্তক আনিয়াছিল। সে সেইখানি ফিরাইয়া দিতে গেল এবং আপনি যাইয়া সেখানি যে স্থান হইতে লইয়াছিল, সেই স্থানে রাখিয়া আসিল। তাহার মুখে মৃদু হাসি।

সন্ধ্যার পরে ভৃত্য টেবলে আলোকদান রাখিয়া যাইলে অভ্রকুমার দেখিল—টেবলের উপর একখানি কাগজ—কাগজখানা চাপা দেওয়া রহিয়াছে। কৌতূহলবশে সে প্রথমেই তাহা দেখিল। তাহাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত—"উত্তর" এবং তাহার পরে টেনিসনের কবিতার দুই চরণ:—

"প্রেম তুলি' নিল জীবনের বীণা
ঝঙ্কার দিল—তারে তারে তা'র;
'আপন' তন্ত্রী ঝঙ্কারে গেল
সঙ্গীতে মিশি'—ফিরিল না আর।"

পরদিন মা যখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলিস, বাবা? আর অমত করিস না।"—তখন অভ্রকুমার বলিল, "তোমার যা' ভাল মনে হয় কর।"

তাহার পরেই যখন গগনচন্দ্র আসিয়া বলিল, "অভ্রকুমার বাবু, বিজলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম; সে বলেছে, 'উত্তর পাবেন'।"

অভ্রকুমার হাসিয়া বলিল, "উত্তর পেয়েছি।"

"নির্ভুল হয়েছে ত?"

"হাঁ। পূর্ণ নম্বর পাবার মত।"

"সে ত উত্তরের জন্ত। আর পরীক্ষাতে খুসী হ'লে ত পূর্ণ নম্বরেরও অধিক কিছু দিবার গল্প আছে।"

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

অভ্রকুমারের মাতা গগনচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমার ঠাকুর-মা'কে ব'ল—মন্দিরে বসে আমরা বিয়ের দিন স্থির করব।"

* * * *

গগনচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া ঠাকুর-মা'কে বলিল, "ঠাকুর-মা, নির্ম্মলকে বার ক'রে এলাম।"

ঠাকুর-মা বলিলেন,—কিসের জন্য, দাদা ?"

"সে-ই যে—

'মেঘেতে বিজলি-হাসি আমি বড় ভালবাসি,
যে যা'বি সে যা'বি তোরা, গিরিজায়া যায় রে!'

অভ্রকুমার বাবুর মা বললেন, মন্দিরে আপনারা দু'জনে বিয়ের দিন স্থির করবেন। নির্ম্মল কবে আসতে পারবে—জানতে হ'বে ত ?"

ঠাকুরমা'র মুখে হর্ষ বিকশিত হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, বিজলির মুখে আনন্দ-দীপ্তি।

অঞ্জলি স্বামীকে বলিল,—"নিজের বুদ্ধিতে কায ক'রে—মিছা-মিছি তার ক'রে ক'টা টাকা নষ্ট করলে।"—বলিয়া সে একখানি তার গগনচন্দ্রের হস্তে দিল—নির্ম্মল তার করিয়াছে, সে কলিকাতায় বদলী হইয়াছে; প্রথমেই পুরীতে আসিতেছে।

ঠাকুরমা জগবন্ধুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শব-যাত্রা

(রুশ কবি ইভান্ ক্রাইলভ)

সেকালে মিশরে ছিল রীতি—গেছে জানা—
ধনীর মৃত্যুতে হতো বহু লোক ভাড়া করে আনা;
শব নিয়ে শবযাত্রী পথে হলে বার—
এরা যেতো সঙ্গে সঙ্গে তুলি হাহাকার,
আর্ত্ত ক্রন্দনের রোল! সেই শোকোচ্ছ্বাস
বিদীর্ণ করিত সারা আকাশ-বাতাস!
একদা মরিল এক ধনী। শবযাত্রা সমারোহে চলে;
পিছে লোক হাজার-হাজার বিগলিত শোক-অশ্রুজলে
ফুকারি-ডুকারি কাঁদে কত, বক্ষে রুদ্র করাঘাত হানে।
দেখে মনে হয়, এরা বুঝি এখনি মরিবে ব্যথা-বাণে!

বিদেশী পথিক এক পথে—এ দৃশ্যে দুলিল তাঁর মন।
প্রিয়-জন-বিয়োগ-বিধুর! সবারে ডাকিয়া তিনি—
"বুঝিতেছি প্রিয়-হারা সবে শোকে হেন অধীর হৃদয়।
বাঁচাবার মন্ত্র আমি জানি, বাঁচাইয়া দিলে কিবা হয়?"
এ কথা শুনিয়া সবে কয়,
"এত যদি জানো দয়াময়,
বাঁচাইয়া দাও মৃতে দু'দিনের তরে—
দু'টি দিন গত হলে ফের যেন মরে!
ধনী লোক বাঁচে যদি, নাহি কোনো লাভ
বাঁচিলে না ঘোচে কভু মোদের অভাব!
মরিলে আনিবে ডাকি বহু অর্থ দিয়া
আমাদেরে,—মৃত্যুশোকে বক্ষ বিদরিয়া
ক্রন্দন-উচ্ছ্বাসে মোরা জানাইব শোক—
মোরা ধন্য হবো অর্থে; শোকে ধন্য হবে ধনী লোক!"

কবি কহে, ঠিক কথা! হেন ধনী আছে
যাহার মরণে বিশ্ব প্রাণ পেয়ে বাঁচে!
যাবৎ জীবন রহে এ সব ধনীর
কণামাত্র লাভ তাহে নাহি ধরণীর!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুঞ্জয়

জীবনের যত গ্লানি
মোদের বক্ষের 'পরে জমা হয়ে আছে, তাহা জানি।
অত্যাচারী হেনেছে আঘাত,
তাদের ভ্রূকুটি-ভঙ্গে উৎসারিত আসন্ন উৎপাত।
কত জাতি জিনে নিল দেশ—
তাদের আদেশ
যুক্ত করে নত মুখে করেছি বহন।
অপমানে জর্জ্জরিত হইয়াছে মন—
তবু মৃত্যু ঘটে নাই, বাঁচিয়াছি মরিতে মরিতে।
উত্তপ্ত রক্তের স্রোত বহিয়াছে শীর্ণ ধমনীতে।
মৃত্যুরে করি না আর ভয়,
মোরা মৃত্যুঞ্জয়।
মৈত্রীভরা সাধনা সাম্যের
শুধু এনে দিতে পারে মুক্তি এ মহাবিশ্বের।
ছলে বলে নিষ্পেষণে,
অত্যুগ্র শাসনে
যাহা কভু হয়নি সম্ভব;
পশু-শক্তি যেখানে মেনেছে পরাভব,
সে কর্ম্ম সাধিতে পারে সাধনা সাম্যের—
এনে দিতে মুক্তি-মন্ত্র মহামানবের।
তাই মোরা যুগে যুগে জাগি
মৃত্যুভয় ত্যাগি,
আপন অহিত করি বিশ্ব-হিত তরে,
শত্রু-মিত্রে প্রেম-মন্ত্রে বাঁধা পরস্পরে।
পেয়েছি সন্ধান
মৃত্যুর অমৃত মাঝে জীবনের নব জয়-গান!
স্বার্থভরা শোষণের সর্ব্বগ্রাসী প্রলুব্ধ বাসনা,
অশান্তির দ্বারে দ্বারে হানা
মুছে যাবে চিরতরে এই বিশ্ব হতে
সর্ব্বজন-মুক্তি লাগি আলোর প্রভাতে।
তাই মোরা চিরমৃত্যুঞ্জয়,
জিনিয়াছি ঘৃণা, লজ্জা, ভয়।

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

কৌশুলী বলিলেন, "ফরিয়াদী-পক্ষ একটি ঘটনায় বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে ছোরার আঘাতে মিঃ ট্রেনটন নিহত হইয়াছিলেন, সেই ছোরার হাতলে তোমার অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি তুমি দয়া করিয়া প্রকাশ করিবে মিস্ ডেন!"

আসামী যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিল, "আমি পূর্ব্বে কোন দিন কোন মৃতদেহ দেখি নাই, এ জন্য মিঃ ট্রেনটনের মৃতদেহ দেখিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। আমি—আমি তখন জানিতে পারি নাই, এমন কি, প্রথমে বুঝিতেও পারি নাই যে, মিঃ ট্রেনটন সত্যই মরিয়াছেন কি না। সুতরাং তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। কিন্তু বুকে ছোরা বিদ্ধ অবস্থায় নিস্তব্ধ ভাবে তিনি পড়িয়া আছেন দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে ছোরাখানি টানিয়া বাহির করিবার জন্য আমি তাহার হাতল স্পর্শ করিয়া—"

ওলিভিয়া এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইল। কৌশুলী তাহাকে কথা শেষ করিবার সুযোগ না দিয়াই বলিলেন, "মিস্ ডেন, আমার আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে। সোয়ানেস হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, মিঃ ট্রেনটনের সহিত তোমার বিরোধের সময় তুমি না কি তাঁহাকে বলিয়াছিলে, "তুমি আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিলে আমি তোমাকে খুন করিব।" মিঃ ট্রেনটন নিহত হইবার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তুমি এই কথা বলিয়াছিলে। সত্যই কি তুমি তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছিলে?"

"না, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিলে আমি আপনার চাকরী ত্যাগ করিব।' সাক্ষী সেই কক্ষে ছিল না। সে কোন্ প্রমাণে ঐ কথা বলিল?"

সার এডমণ্ড ব্যাটার্সবি এবার মিস্ ডেনকে জেরা করিতে উঠিয়া বলিলেন, "মিঃ ট্রেনটনের নিকট চাকরী করা যখন তোমার এতই অপ্রীতিকর হইয়াছিল, তখন তুমি কি কারণে তাঁহার চাকরী ত্যাগ কর নাই, ইহা কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি? তোমার ন্যায় তরুণীর এরূপ আকর্ষণ-শক্তি থাকিতে স্থানান্তরে চাকরী সংগ্রহ করা কি কঠিন হইত?"

সাক্ষী প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "সার এডমণ্ড, আপনি যদি পৃথিবীতে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে চাকরীর বাজারে এই ভীড়ের ভিতর চাকরী সংগ্রহ করা নারীর পক্ষে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার সহজেই তাহা বুঝিতে পারিতেন।"

এই সুস্পষ্ট জবাব শুনিয়া সার এডমণ্ড সাক্ষীর মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অসন্তুষ্ট স্বরে বলিলেন, "তুমি হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছ, তুমি যখন তোমার মনিবের সহিত কলহ করিতেছিলে —সেই সময় সাক্ষী সোয়ানেস সেই কক্ষে ছিল না। তুমি কি এখনও সে কথা অস্বীকার করিতে চাও?"

"আমি এখনও বলিতেছি, সোয়ানেস সে সময় সে ঘরে ছিল না।"

কৌশুলী বলিলেন, "তোমাদের কলহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সোয়ানেস একখান পত্র আনিয়া তোমার হাতে দিয়াছিল, এ কথা কি তুমি অস্বীকার কর না?"

"না, আমি তাহা অস্বীকার করি না।"

"উহা কি কোন পুরুষের পত্র?"

এই প্রশ্ন শুনিয়া সাক্ষী নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল না।

জজ বলিলেন, "তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

সাক্ষী অস্ফুট স্বরে বলিল, "উহা পুরুষের লিখিত পত্র।"

"সেই পুরুষ কি তোমার প্রণয়ী?"

সাক্ষীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "না।"

"যদি উহা তোমার প্রণয়ীর পত্র না হয়, তাহা হইলে তুমি কি কারণে তাহা মিঃ ট্রেনটনকে দেখিতে দিয়াছিলে?"

সাক্ষী বলিল, "মিঃ ট্রেনটনকে আমি তাহা দেখাই নাই। তিনি তাহা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন।"

"উহা তোমার প্রণয়ীর পত্র না হইলে সেই পত্রের কথা স্বীকার করিতে তোমার ঐরূপ লজ্জিত হইবার কারণ কি?"

এই সময় সেই কক্ষের দ্বার-প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি জজকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মাই লর্ড, এই প্রশ্নে আমার আপত্তি আছে!"

আদালতের সকল লোক আগন্তুকের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কোন দিকে না চাহিয়া বিচারকের সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে প্রহরীরা তাহাকে বাধা দান করিল। সে তাহাদিগকে ঠেলিয়া-ফেলিয়া সাক্ষীর কাঠরার সোপান-প্রান্তে উপস্থিত হইল। তাহার পর সে বিচারকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মাই লর্ড, আমি এই আসামীর পিতা। উহাকে সাক্ষীর কাঠরায় তুলিয়া সেই চিঠির লেখক কে তাহা জানিবার জন্য সরকার-পক্ষের কৌশুলী উহাকে জেরা করিতেছে। আমি স্বীকার করিতেছি, আমিই সেই পত্রের লেখক। পুলিশ আমার অনুসরণ করায় আমি বিপদে পড়িয়াছিলাম; এ জন্য আমি আমার কন্যার নিকট কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়াছিলাম, নতুবা তাহাকে ঐ পত্র লিখিতাম না। কারণ দীর্ঘকাল আমি কন্যার সন্ধান লই নাই, এবং অত্যন্ত লজ্জাজনক ভাবে পিতার কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু ওলিভিয়াই আমার একমাত্র সন্তান, আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। আমি আর অধিক দিন—"

কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল; সে সতৃষ্ণ নয়নে ওলিভিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, এবং সহসা তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রহিত হওয়ায় মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

নবম পল্লব

সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে

সেই দিন সংবাদপত্র সমূহের সান্ধ্য-সংস্করণে মোটা মোটা অক্ষরে প্রকাশিত হইল,—

ট্রেনটন হত্যার মামলার
অদ্ভুত পরিণতি।
আসামীর পিতা ওলড্ বেলী আদালতের কক্ষে
সহসা মৃত্যুমুখে পতিত!
বিয়োগান্ত নাটকে নূতন অঙ্কের অভিনয়!

ডেভিড গারসাইড যখন আদালত হইতে পথে বাহির হইল, তখন সংবাদপত্রবিক্রেতা বালকেরা চিত্তাকর্ষক প্ল্যাকার্ড হাতে লইয়া সান্ধ্য-সংস্করণের সংবাদপত্রগুলি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিল; পথিকগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই সকল সংবাদপত্র ক্রয় করিতেছিল। আদালত-কক্ষে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ পাঠ করিবার জন্য সকলেই উৎসুক। ডেভিড তাড়াতাড়ি 'অয়ার' (Wire) সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া 'টাইপ রাইটারে' পূর্ব্বোক্ত ঘটনার বিবরণ টাইপ করিবার জন্য ব্যাকুল!

ডেভিড চিপ সাইডের মোড়ে প্রবেশ করিতেই কে তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া পথের অন্য ধারে সরাইয়া দিল। কে তাহাকে ঐ ভাবে ধাক্কা দিল, ইহা দেখিবার জন্য সে মুখ ফিরাইতেই এক ব্যক্তির বিবর্ণ মুখ দেখিতে পাইল; সেই মুখের উর্দ্ধাংশ ফেল্টের টুপিতে আবৃত থাকিলেও তাহাতে হিংসা পরিস্ফুট। লোকটির চক্ষু সর্পের চক্ষুর ন্যায় খলতাপূর্ণ।

লোকটাকে পেশাদার তস্কর বলিয়াই ডেভিডের ধারণা হইল। সে মুখ তাহার পরিচিত; কিন্তু পূর্ব্বে কোথায় তাহাকে দেখিয়াছিল তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না। ডেভিড তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে তাহাকে পাশে ফেলিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সম্মুখে অগ্রসর হইল, এবং জনতার মধ্যে মিশিয়া অদৃশ্য হইল।

কিন্তু এই ঘটনার কথা অধিক কাল ডেভিডের স্মরণ রহিল না; 'অয়ার' পত্রিকায় কি ভাবে হত্যাকাণ্ডের বিবরণটি লিখিতে আরম্ভ করিবে, সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সে 'অয়ার' পত্রিকার কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া একটি 'টাইপ রাইটারে'র সম্মুখে বসিয়া পড়িল এবং কয়েক মিনিট চিন্তার পর গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় ধূমপানের জন্য উৎসুক হইয়া কোটের বাঁ দিকের পকেটে হাত পুরিয়া তামাকের থলিটি (Pouch) বাহির করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তামাকের থলির পরিবর্ত্তে একখানি লেফাফায় তাহার হাত পড়িল!

সবিস্ময়ে সেই লেফাফাখানি টানিয়া বাহির করিয়া তাহাতে তাহার নাম দেখিতে পাইল। লেফাফাখানি খুলিয়া তাহার ভিতর এক ফর্দ্দ সাদা কাগজ পাইল। তাহাতে পত্রখানির তারিখ লেখা থাকিলেও লেখকের নাম ছিল না। তাহাতে লিখিত ছিল,—

"আমার পূর্ব্বপত্রে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম—তোমাকে সতর্ক করিবার জন্য পুনর্ব্বার সংবাদ দিব না।

তুমি জানিয়া রাখ আমার সে কথার ব্যতিক্রম হইবে না।"

এক জন লোক এই সময় ডেভিডের পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ডেভি?"

প্রশ্নকর্ত্তা 'অয়ারের' সংবাদ-বিভাগের সম্পাদক মেড্‌লি। সর্ব্বসাধারণের ঔৎসুক্যবর্দ্ধক উক্ত চাঞ্চল্যজনক সংবাদটি ডেভিড কি ভাবে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য আগ্রহ হওয়ায় মেড্‌লি তাড়াতাড়ি ডেভিডের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তিনি ডেভিডকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এখনও উহা লিখিতে আরম্ভ কর নাই?"

ডেভিড তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিল, এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি শীঘ্রই লিখিয়া দিতেছি; আপনি আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন মহাশয়!"

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই দুই স্তম্ভব্যাপী গল্পটি লিখিত হইল। সংবাদ-বিভাগের সহকারী সম্পাদকগণের হস্তে প্রদানের পূর্ব্বে মেডলি তাহা তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, "ডেভি, তোমার গল্প-রচনার শক্তি অসাধারণ। এই অল্প সময়েই তুমি কি চমৎকার কৌশলে ইহা লিখিয়া ফেলিয়াছ! আমি তোমাকে কত দিন বলিয়াছি, তুমি বেতনভোগী সহকারিরূপে আমার সংবাদ-বিভাগে যোগদান কর। যদি বার্ষিক পনের শত পাউণ্ড বেতন অল্প বলিয়া তোমার—"

ডেভিড হাত তুলিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমরা পরে এই বিষয়ের আলোচনা করিব—যদি আমার ভাগ্যে 'পরে' বলিয়া কিছু থাকে।"

ডেভিডের কথায় মেডলি মুখের পাইপ হাতে লইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখন তুমি মদে বেহুঁস হইয়াছ বলিয়া ত মনে হয় না! তবে এ রকম অসংলগ্ন কথা বলিবার কারণ কি? 'যদি আমার ভাগ্যে পরে বলিয়া কিছু থাকে'—ইহার কোন অর্থ আছে কি?"

ডেভিড চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া মেডলিকে সংযত স্বরে বলিল, "দেখুন, যদি আমি আপনাকে কোন গোপনীয় কথা বলি, তাহা হইলে আপনি কি আমার নিকট অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত আছেন যে, তাহা আপনার ওষ্ঠের বাহিরে আসিবে না? আপনি সম্পাদক, আমি আপনার সংবাদদাতা, আপনার সহিত আমার এরূপ সম্বন্ধের কথা না ভাবিয়া আমরা উভয়েই ভদ্রলোক এই প্রকার সম্বন্ধ ধরিয়া আমি আপনার নিকট আমার মনের কথা প্রকাশ করিব। আমার কথা আপনি বুঝিতে পারিলেন?"

মেডলি বলিলেন, বুঝিয়াছি; এখন কি বলিতে চাও বল।"

ডেভিড বলিল, "তবে শুনুন; কথাটা জরুরী। আমার বিশ্বাস, মিঃ ট্রেনটনের প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরিয়া দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। যে তরুণীকে আসামী করা হইয়াছে, সে আপনার আমার ন্যায়ই নিরপরাধ, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।"

মেডলি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ইহা কি তোমার আন্তরিক কথা?"

"হাঁ, আমি অন্তরের সহিত এ কথা বলিতেছি। আপনি ইহা পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।" পকেট হইতে সতর্কতা-জ্ঞাপক পত্রখানি বাহির করিয়া ডেভিড মেডলির সম্মুখে প্রসারিত করিল।

মেডলি তাহা হাতে লইয়া পাঠ করিলে ডেভিড বলিল, "ওখানি একই মর্ম্মের দ্বিতীয় পত্র। পত্রলেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্যে সন্দেহের কোন কারণ নাই; ইহা ধাপ্পা নহে। আপনার কিরূপ মনে হয়?"

মেড্‌লি বলিলেন, "আমি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম না এ কি ব্যাপার তাহা তুমি আমাকে খুলিয়া বলিবে?"

ডেভিড বলিল, "কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি পিটার ট্রেনটনের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম। আমি একাধিক কারণে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ওলিভিয়া ডেন আমার ভ্রাতাকে তাহার অনুকূলে কৌঁশুলী নিযুক্ত

করে; ভ্রাতাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্ম আমার আগ্রহ হওয়ায় আমি অধিকাংশ সময় হত্যাকারীর সন্ধানে রত থাকিতাম।"

মেড্‌লি বলিলেন, "তোমার কি বিশ্বাস—হত্যাকারীর অনুসন্ধান কার্য্যে তুমি ঠিক পথের অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলে?"

ডেভিড বলিল, "এখন আমি সে সকল কথা প্রকাশ করিব না; তাহার একটি কারণ এই যে, এখন পর্য্যন্ত আমি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। দ্বিতীয় কারণ, এ কথা প্রকাশ করা বিপজ্জনক। সংবাদপত্রের সম্পাদক আপনি,—মানহানির মামলার দায়িত্ব আপনার অজ্ঞাত নহে।"

মেড্‌লি হাসিয়া বলিলেন, "আজকাল পাগলকে পাগল বলিলে সেও মানহানির আইনের সাহায্যে নষ্টমান উদ্ধার করিতে চায়!"

ডেভিড বলিল, "আপনার কথা সত্য। সুতরাং আপনার দায়িত্ব উপেক্ষার যোগ্য নহে।"

মেড্‌লি বলিলেন, "কিন্তু সংবাদপত্র সম্পাদনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি অপরাধ-তত্ত্বের হিসাবে এই কাহিনী এরূপ চাঞ্চল্যজনক ও চিত্তাকর্ষক হইবে যে, গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এ দেশে এরূপ বিচিত্র কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্যই আমরা ইহা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিব।"

ডেভিড বলিল, "আপনি নিশ্চিতই ইহা প্রকাশ করিবেন; এবং যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে ইহা পাঠ করিয়া পাঠক-সমাজ কি অভিমত প্রকাশ করেন—তাহাও জানিতে পারিব।"

মেড্‌লি সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি সত্যই মনে কর, এই কাহিনী প্রকাশ করিলে তোমার জীবন বিপন্ন হইবে?"

ডেভিড সেই পত্রখানির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; তাহা তখন পর্য্যন্ত তাহার হাতে ছিল।

অতঃপর সে বলিল, "এই পত্রখানি যে ব্যক্তি আমার পকেটে গুঁজিয়া দিয়া ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, আপনি যদি তাহার মুখ দেখিবার সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে এ কথা জিজ্ঞাসা করাই আপনি নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন।"

—

দশম পল্লব

ঘটনা-বৈচিত্র্য

তিন ব্যক্তি গুপ্ত পরামর্শের জন্ম মিলিত হইয়াছিল। 'হাউস অফ দি এবমিনেবলের' পরিচালক এম, ডিগো এবং সোহো পল্লীর বদমায়েসদের আড্ডায় যে দীর্ঘকায়, ভীমমূর্ত্তি গুণ্ডা 'কাউণ্ট' নামে পরিচিত ছিল—সেই 'কাউণ্ট' ব্যতীত এক জন সুবেশধারী বিদেশী সেই সমিতিতে যোগদান করিয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তির প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। সে 'গুণ্ডা সর্দ্দার' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তাহার পাণ্ডুর মুখে নেশাখোরের মুখমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট; তাহার চক্ষু দু'টি সর্পের নির্নিমেষ নেত্রের ন্যায় খলতাপূর্ণ। সেই গুপ্ত সমিতিতে তাহাকে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হইল, তাহা সে আগ্রহ-ভরে শুনিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে সে তাহার সহযোগিদ্বয়কে বলিয়াছিল, "আজ অপরাহ্নে ডেভিড গারসাইড ওল্ড বেলি হইতে পথে আসিলে আমি তাহাকে পশ্চাৎ হইতে ধরিয়া সেই পত্রখানি তাহার পকেটে গুঁজিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলাম।"

"সে কি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়া তোমার মনে হয়?"

"সে কথা বলা বড় শক্ত সর্দ্দার! কিন্তু সে আমার মুখের দিকে এমন কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়াছিল যে, আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল।"

এম, ডিগো মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু আমার বিশ্বাস, তুমি তাহার মুখের উপর আরও অধিক কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলে। তোমার স্মরণ রাখা উচিত বন্ধু সাগ্রিন, যে, এ সকল ব্যাপারে খুব বিবেচনা করিয়া চলাই কর্ত্তব্য।"

সাগ্রিন নামক গুণ্ডাটি গম্ভীর স্বরে বলিল, "সে কথা আমার ভালই জানা আছে। কিন্তু সেই লোকটিকে দ্বিতীয় বার পত্রদ্বারা সতর্ক করিবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? তুমি তাহাকে সাবাড় করিতে প্রস্তুত ছিলে! সুতরাং তাহাকে ঐ ভাবে সতর্ক করা পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে হয়।"

'কাউণ্ট' গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "সাগ্রিন, উহার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু এখন আমি সে সকল কথার আলোচনা করিতে চাহি না। আমাদের আশা ছিল, উক্ত ভদ্রলোকটি সতর্কতা-জ্ঞাপক পত্রের প্রথমখানি পাইয়াই সতর্ক হইবে, কিন্তু দেখা গিয়াছে, সে নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করিয়াছিল। তাই সে বেচারার দুর্ম্মতির জন্য আক্ষেপ হয়।"

* * * *

এবার আমরা অন্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

সুন্দরী জুনের সুনীল চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তাহার প্রণয়ী ডেভিডকে দেখিয়া বলিল, "ডেভিড, প্রিয়তম, আমি শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে—এ আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আসিয়াছ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।"

ডেভিড জুনকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত; তথাপি ডেভিড কোনরূপে উচ্ছাস প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বসিবার জন্ম ইঙ্গিত করিল। তাহার মন চিন্তাকুল, মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

জুন তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি? তোমার কি হইয়াছে?"—আতঙ্কে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইল।

ডেভিড গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমার কথা শোন জুন! তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার কর—যদি তোমার সঙ্গে কিছু দিন আমার দেখা না হয়—তাহা হইলে তুমি উৎকণ্ঠিত হইবে না, বা ভবিষ্যতে আমার সহিত সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিবে না।"

"তুমি কোথায় যাইতেছ?"

ডেভিড বলিল, "যে কাজ আমি হাতে লইয়াছি—সেই কাজে।"

জুন মুখ ভার করিয়া বলিল, "তুমি কি সেই মেয়েটার জন্ম যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার কর নাই? আমি জানি সে নিরপরাধ, এবং প্রথম হইতেই আমি তোমাকে সে কথা বলিয়া আসিতেছি। তাহার সম্বন্ধে যে সকল কথা খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে—আজ রাত্রে সেগুলি সমস্তই আমি মন দিয়া পড়িয়া দেখিয়াছি। আমার বিশ্বাস,

পৃথিবীর কোন জুরী তাহাকে অপরাধী বলিয়া রায় প্রকাশ করিতে পারিবে না।"

ডেভিড বলিল, "এই যুবতী মুক্তিলাভ করিলেই যথেষ্ট হইল—এরূপ আমি মনে করি না। তাহাকে মুক্তিদানের জন্য চেষ্টা করিব—প্রথমে এইরূপই আমার সঙ্কল্প ছিল। তুমি আমাকে তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলে বলিয়াই আমি যে ঐরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম—এ কথা মনে করিও না, বা তোমার বা আমার নিজের কথা ভাবিয়া ঐরূপ করিয়াছিলাম ইহাও ভাবিও না। এতদ্ভিন্ন আমার ভাই আদালতে তাহার পক্ষ সমর্থন করায় আমি আমার ভ্রাতার স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় উহা করিয়াছিলাম—যেন এ চিন্তাও তোমার মনে স্থান না পায়। ঐ সকল ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য আমার আগ্রহের অন্য কারণও এখন দেখা যাইতেছে।"

"সে কারণ কি, তাহা আমাকে বলিবে?"

ডেভিড জুনকে সেই কথা বলিতে উদ্যত হইল বটে, কিন্তু তাহার মুখে কথা বাহির হইল না; ওষ্ঠে আসিয়া তাহা মিলাইয়া গেল। (found the words freezing on his lips.)

ডেভিড বলিল, "যখন আমার বলিবার শক্তি হইবে, তখন তোমার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিব। ইহা আমার অঙ্গীকার বলিয়া মনে করিতে পার। এখন আমি তোমার নিকট বিদায় লইব।"

ডেভিড জুনকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ওষ্ঠ চুম্বন করিল; তাহার পর তাহাকে আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেই সময় পথে জনসমাগম ছিল না, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। ডেভিড তাহার প্রণয়িনীর কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই পথে চলিতে লাগিল। সেই সময় এক জন লোক কিছু দূরে থাকিয়া সতর্ক ভাবে তাহার অনুসরণ করিতেছিল, ডেভিড তাহা বুঝিতে পারিল না; কোন দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

ডেভিডের অনুসরণকারী দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে তাহার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া তাহার মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতেই ডেভিডের দেহ ধরাশায়ী হইল দেখিয়া তাহার দুই জন অনুসরণকারী তাহার অচেতন দেহ ধরিয়া ফেলিল। সেই পথের মোড়ে এক জন কনষ্টেবল পাহারা দিতেছিল; তাহার ধারণা হইল—কোন পথিক মদের নেশায় বিভোর হইয়া খানায় পড়ে দেখিয়া তাহার দুই জন বন্ধু তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল।

কনষ্টেবল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মনে মনে হাসিয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের অধিকাংশ পুলিশ প্রহরী এই ভাবেই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে!

* * * * *

মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত প্রাপ্ত হইলে সংবাদ-সংগ্রাহক ডেভিড গারসাইডের অবস্থা কিরূপ হইল, এখন আমরা তাহার আলোচনা করিব।

চেতনা লাভ করিয়া ডেভিডের মনে হইল, তাহার মাথার ভিতর অবিশ্রান্ত ভাবে করাত চলিতেছে! তাহার তখন নড়িবার শক্তি ছিল না। জুন যে ফ্ল্যাটে বাস করিত, সেই ফ্ল্যাটের কয়েক শত গজ দূরবর্ত্তী পথে তাহার এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। সেই সময় জুন তাহার ঘরের জানালা দিয়া পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় ডেভিডের উপর গুণ্ডার আকস্মিক আক্রমণ তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

ডেভিড চেতনা লাভ করিয়া তাহার সঙ্কটের কথা চিন্তা করিতে করিতে শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল, তাহার চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার হাত-পা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ ছিল! সে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহাকে কোথায় আটক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাও নির্ণয় করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল। তাহার অনুমান হইল, সেই স্থানটি সোহো পল্লীর সন্নিহিত কোন গুণ্ডার আড্ডা।

ডেভিড ভাবিতে লাগিল, যে গুণ্ডা সেই দুইখানি পত্র লিখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়াছিল, সে কি তাহাকে হত্যা করিতে সাহসী হইবে?

ডেভিড সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে কতক্ষণ অচেতন অবস্থায় শায়িত ছিল তাহা ধারণা করিতে পারিল না, ট্রেনটনের হত্যাকাণ্ডের বিচার শেষ হইয়াছিল কি না তাহাও বুঝিতে পারিল না। ওলিভিয়া ডেন কি মুক্তিলাভ করিয়াছে? তাহার মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হইল, তাহার উত্তর স্থির করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল!

সেই সময় বৈদ্যুতিক দীপালোকে সেই কক্ষ আলোকিত হইলে ডেভিড বুঝিতে পারিল, তাহার কোন শত্রু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

আগন্তুক ডেভিডের মাথার কাছে আসিয়া বলিল, "ওহে সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার, এখন কেমন আছ?"

ডেভিড তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল। সে যখন লণ্ডনের দস্যু, তস্কর ও গুণ্ডাদলের বাস-পল্লীতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল, সেই সময় দুর্দ্দান্ত নরহন্তা বলিয়া তাহার পরিচয় পাইয়াছিল।

আগন্তুক ক্রূর দৃষ্টিতে ডেভিডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কঠোর স্বরে বলিল, "তোমার যাহা প্রার্থনা ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। আশা করি, এই ভাবে ফাঁদে পড়িয়া তুমি খুসী হইয়াছ।"

ডেভিড ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ, এইরূপই আমার ধারণা হইয়াছিল। তবে এ কথাও সত্য যে, লণ্ডনের প্রত্যেক সংবাদপত্রের পরিচালক চতুর্দ্দিকে আমার সন্ধান করিতেছে; তাহাদের কেহ না কেহ আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।"

গুণ্ডাটা দৃঢ় স্বরে বলিল, "তাহারা তোমার সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই তুমি এই কক্ষের নিম্নস্থিত ভূগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে। তুমি জীবিত অবস্থায় সমাহিত হইবার জন্য প্রস্তুত হও।"

* * *

বিচারক মিঃ স্কার্থডেল তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত নথিপত্র হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার পত্নী সুসানকে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আমার অনুরোধ—তুমি এখন কয়েক মিনিট আমাকে বিরক্ত করিও না। আমি আগামী কল্য পুনর্ব্বার ট্রেনটন-হত্যাকাণ্ডের মামলার বিচারে প্রবৃত্ত হইব, ইহা বোধ হয় তোমার স্মরণ নাই। কিন্তু—"

তাঁহার স্ত্রী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ হোরেসিও,

আমার তাহা বিলক্ষণ স্মরণ আছে, এবং এখন তোমার সঙ্গে সেই বিষয়েরই আলোচনা করিতে আমার আগ্রহ হইয়াছে। আমি জানি, আমার নিকট তুমি এ সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে চাহ না, তথাপি আমাকে তাহা বলিতে হইবে।"

এ কথা শুনিয়া মিঃ স্বার্থডেল পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, এবং সময় দেখিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে বল, আমি তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম, তাহার পর আর এক সেকেণ্ড সময় পাইবে না।"

সুসান স্বার্থডেল তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "হোরেসিও, তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার কর, আসামী বেচারাকে মুক্তিদানের জন্ম তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। তুমি হয় ত আমাকে নির্ব্বোধ মনে করিতেছ, সম্ভবতঃ আমি সত্যই নির্ব্বোধ; কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই অভাগা নারীর সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে— তাহা সমস্তই আমি পাঠ করিয়াছি। এখন আমার নিঃসংশয়ে ধারণা হইয়াছে—ওলিভিয়া ডেন সত্যই নিরপরাধ।"

মিঃ স্বার্থডেল এ কথা শুনিয়া পত্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার বাম বাহুমূলে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন। সুসানের মনে হইল, তাঁহার নখরগুলি বাহুর ত্বকে বিদ্ধ হইয়া তাহা বিদীর্ণ করিবে।

স্বার্থডেল স্ত্রীর মুখের উপর পূর্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তরুণী ডেন যে নিরপরাধ তোমার এরূপ ধারণার কারণ কি সুসান? সে যদি তাহার মনিবকে খুন না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কে তাহাকে খুন করিল?"

সুসান তাঁহার স্বামীর অগ্নিময় চক্ষুর দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "তাহা আমি জানি না; আমি কিরূপে জানিব যে—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে মিঃ স্বার্থডেল কঠোর স্বরে বলিলেন, "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

পত্নীকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি তুমি কোন দৈবজ্ঞের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলে?"

সুসান যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন! কথাটা মিথ্যা হইলেও সুসান তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হাঁ হোরেসিও, যে ব্যক্তি লোকের ভাগ্য-ফল গণনা করেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন, আমি নিউবণ্ড ষ্ট্রীটে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ওলিভিয়া ডেন নিরপরাধ। তিনি তাঁহার ফটিক-চক্রে তাহার নির্দ্দোষিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।"

মিঃ স্বার্থডেল অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "সেই লোকটা নির্ব্বোধ এবং প্রতারক। আমি পুলিশের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিব। পুলিশের নিকট তোমাকে এজাহার দিতে হইবে। কারণ—"

সুসান আতঙ্কে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "না, না, পুলিশকে এখানে আসিতে দিও না। তাহারা যেন দূরে থাকে। হোরেসিও, তাহাদিগকে তফাতে রাখিও।"

সুসান অবসন্ন দেহে স্বামীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন; তথাপি তাঁহার নিষ্ঠুর স্বামী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুলিশকে কি কারণে এখানে আসিতে নিষেধ করিতেছ?"

সুসান কাতর স্বরে বলিলেন, "তুমি নিজেই তাহা জান হোরেসিও! তোমার তাহা অজ্ঞাত নহে—ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে?"

এ কথা শুনিয়া স্বার্থডেল পত্নীর মুখের উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই কক্ষের প্রাচীর-সংলগ্ন বৃহৎ ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং একটি দেরাজ খুলিয়া এক গাছা চাবুক বাহির করিলেন। সেই চাবুক যাহার পিঠে পড়িত, তাহার পিঠ কাটিয়া রক্তের স্রোত বহিত!

* * *

ডেভিড তাহার প্রণয়িনী জুনের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে জুন তাহার বাসকক্ষের জানালা খুলিয়া ডেভিডের গন্তব্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে জুন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে দেখিল, দুই জন লোক হঠাৎ একটি প্রাচীরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া ডেভিডকে আক্রমণ করিল। মুহূর্ত্ত পরে একখান মোটর-কার সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলে সেই দুই ব্যক্তি আহত ও হতচেতন ডেভিডকে ধরাধরি করিয়া তাহাদের মোটর-কারে নিক্ষেপ করিল! তার পর গাড়ী ডেভিডকে লইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

এই লোমহর্ষণ ঘটনায় জুন আতঙ্কে অভিভূত হইলেও অবিলম্বে আত্মসংবরণ করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পরিচ্ছদে সজ্জিত হইল। সে স্থির করিল, 'অয়ার' পত্রিকার সম্পাদকের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বিপদের কথা জানাইবে এবং সাহায্য প্রার্থনা করিবে। তাহার আশা হইল—'অয়ারের' ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন ও শক্তিশালী পত্রিকার পরিচালকবর্গ যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে ডেভিডকে শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন।

'অয়ারের' সংবাদ বিভাগের সম্পাদক মেড্‌লির নিকট জুন ডেভিডের বিপদের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

তাহার কথা শুনিয়া মেড্‌লি বলিলেন, "মিস্ মেরিক্, আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের সংবাদপত্রের যে শক্তি আছে— তাহা আমরা এই কার্য্যে বিনিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইব না—এ কথা অনায়াসেই আপনাকে বলিতে পারি, এই প্রকার পীড়নে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না। মিঃ গারসাইডকে যেখানেই 'গুম্' করিয়া রাখা হউক, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইবে না।"

জুন 'অয়ারের' কার্য্যালয় ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মেড্‌লি তাহাকে বলিলেন, "আপনি একা বাড়ী ফিরিবেন না মিস্ মেরিক! আমার কোন কর্ম্মচারী ট্যাক্সিতে আপনাকে আপনার বাড়ীতে রাখিয়া আসিবে। আপনি দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন।"

মিস মেরিক প্রস্থান করিলে মেড্‌লি তাঁহার কার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। বিলাতের প্রত্যেক সংবাদপত্রের অফিসে বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষে ব্যবহারের জন্ম টেলিফোনের গোপনীয় নম্বর আছে। মেড্‌লি সেইরূপ একটি নম্বর বাহির করিয়া ডিটেকটিভ-সার্জ্জেণ্ট বেন মর্কিকে আহ্বান করিলেন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট বেন মর্কি 'অয়ার' অফিসের অনুকূলে গোপনে গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্ম নিয়মিত ভাবে দক্ষিণা পাইত।

বেন মর্কি টেলিফোনে সাড়া দিলে মেড্‌লি তাহাকে বলিলেন, "একটি দারুণ চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়াছে। তাহার বিবরণ বলিবার পূর্ব্বে তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তাহা যেন তোমার মুখে

প্রকাশ না পায়। ডেভিড গারসাইড প্রায় চল্লিশ মিনিট পূর্ব্বে এজমগ্যার রোডের সন্নিহিত সিয়ার ষ্ট্রীট দিয়া যাইবার সময় দুই জন গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; তাহারা তাহাকে তাহাদের মোটর-কারে তুলিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে! আমার অনুরোধ, তুমি তাহাকে যেরূপে পার খুঁজিয়া বাহির কর। কাজটি অত্যন্ত জরুরী। কথাটা গোপন রাখিবে। এমন কি, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও এখন এ কথার আলোচনা করিও না।"

বেন মরকি বলিল, "আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সেই গুণ্ডা দু'টোর চেহারা কি রকম?"

মেড্‌লি বলিলেন, "আমি তাহাদিগকে দেখি নাই। তবে সিয়ার ষ্ট্রীটের কোন ফ্ল্যাট হইতে গারসাইডের কোন বন্ধু তাহাদের এই গুণ্ডামী দেখিতে পাইয়াছিল। এ জন্য তাহারাই দায়ী।"

বেন মরকি বলিল, "উত্তম। আমার যাহা সাধ্য তাহার ত্রুটি করিব না কর্ত্তা!"

ক্রমশঃ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

মামা-ভাগ্নে

[গল্প]

হাওড়া-আমতা রেলপথে শীতলপুর গ্রাম। এই গ্রামের হাট-তলায় অক্ষয় ঘোষের মুদীখানায় এক দিন সকালে গ্রামের পাঁচ জন বসিয়া অন্যান্য দিনের মত তামাক পোড়াইতে পোড়াইতে গল্প-গাছা করিতেছিল।

নীলু গোঁসাই কহিল—"'চেতাবণী'র কথা সবই যখন প্রায় খেটে আসচে, তখন কলিযুগের যে শেষ এবং সত্যযুগ আসন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

ইহাদের সকলের মধ্যে সুরেশ হালদার ছিল বয়সে নবীন। সে এবার আই, এ, পরীক্ষা দিয়া দুই বৎসর পরে গ্রামে আসিয়াছে এবং তাহার দ্বারা জগতের কি একটা অসাধারণ এবং শ্রেষ্ঠ কাজ সম্পন্ন হইবে, তাহা অনুমান করিতে না পারিয়া, যেন তাহারই অপেক্ষায় তাস, ফুটবল, দিবানিদ্রা, নভেল, খোসগল্প, পাঁঠা মারিয়া 'পিক্‌নিক্' প্রভৃতি কার্য্যে দিনাতিপাত করিতেছে। নীলু গোঁসাইএর কথায় সুরেশ কহিল—"যত সব নন্‌সেন্স্! কতকগুলো বাজে কথা নিয়ে বেশ-কিছু বই বিক্রী কোরে নিলে! যেমন বোকা দেশ!"

নীলু গোঁসাই কোঁশ্ করিয়া উঠিল—"দু'পাতা ইংরিজী পোড়ে এমন ভাবে গোল্লায় যেয়ো না। তবে কি না এটাও ঠিক যে, দু'পাতা পোড়েই ত গোল্লায় যাবার কথা! একটু বেশী কোরে—অর্থাৎ পড়ার মত পড়লে আর······"

গোঁসাইয়ের কথাটা কাড়িয়া লইয়া ননী বিশ্বাস সুরেশের দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া কহিল—"কিন্তু লেখাগুলো যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাচ্ছে!"

সুরেশ হাসিতে হাসিতে কহিল—"কি ফলে যাচ্চে?"

"এক নম্বর থেকে ধর। প্রথমে এই যুদ্ধেই ত লক্ষ লক্ষ জীবক্ষয়! তার পর ধর, মেদিনীপুরের বন্যা, তা'তে আপাততঃ ঐ এগার হাজারই ধর। কোথায় ইন্দোচীন, সেখানকার ঝড়েও এগার হাজার। তার পর হালসীবাগানের আগুন······

রমানাথ কহিল—"আমেরিকার বোষ্টনে অগ্নিলীলা; সেটা ধর?"

"হাঁ। তার পর, টার্কীতে উপরি উপরি দু' দফা ভূমিকম্প। হাজার হাজার লোক তাতে মরেচে। তার পর বাঙ্গলা দেশের মন্বন্তর! এ আর বিস্তারিত বুঝিয়ে বলবার বোধ হয় আবশ্যক হবে না।"

শিবকালী বাঁড়ুয্যের হাতে ছিল হুঁকা। একটা 'সুখটান' দিয়া শিবকালী কহিল—"অপরঞ্চন কিং ভোবিষ্যতিম্! আরো না-জানি কি অঘটন ঘটে!"

ননী বিশ্বাস শিবকালীর হুঁকা হইতে কলিকাটা খুলিয়া লইয়া নিজের হুঁকার মাথায় বসাইল এবং একটা জোর দম দিয়া সুরেশের উদ্দেশে কহিল—"নাতি, একেবারে শেষ কলির ছেলে তোমরা, এগুলো শাস্ত্রীয় কথা, একটু বিশ্বাস কোরো। চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো ভাবতে পেরেছিল যে চাল হবে চল্লিশ টাকা মণ?"

বৃন্দাবনের আফিং সেবনের অভ্যাস ছিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আফিংয়েরও যে এই রকম দুষ্প্রাপ্যতা ঘটবে, এও কি কেউ কখনো কল্পনা করতে পেরেছিল!"

নীলু গোঁসাই কহিল—"কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, চল্লিশ টাকা মণ চাল হওয়া সত্ত্বেও এখনো কাতারে-কাতারে লোক মরচে না কেন?"

অক্ষয় ঘোষ এতক্ষণ খরিদ্দার বিদায়ের দিকে ব্যস্ত ছিল; এক্ষণে কহিল—"এর মধ্যেও দেবতার কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে জানবে খুড়ো-গোঁসাই!"

শিবকালী কহিল—"ভেতরে-ভেতরে লোক খুবই মরচে, কে কার খবর রাখে বল? এই সে দিন মুন্সীর হাট ষ্টেশনে একটা লোক মর-মর অবস্থায় পোড়েছিল। লোকটা না কি ভদ্দর লোক। চৌদ্দ দিন পেটে অন্ন-জল পড়েনি। তাকে খাওয়াবার জন্যে ভাত-তরকারী আনা হোল। সে কিছুতেই খেলে না। বল্লে—আমার স্ত্রী-পুত্র না খেতে পেয়ে আমার চোখের সামনে মরেচে, সুতরাং আমি আর নিজেকে বাঁচাবার জন্যে খাব না।' তার পর, সেই রাত্রেই লোকটা মারা যায়।"

এমন সময় কার্ত্তিক হন্ত-দন্ত হইয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কহিল—"ভুঁইপাড়ায় গিয়েছিলুম—এক বীভৎস ব্যাপার দেখে এলুম। তিন জনে একসঙ্গে গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে!"

শিবকালী একটু গা-নাড়া দিয়া বসিয়া কহিল—"নীলু, শোন—শোন। কি ব্যাপারটা বল ত বাবাজি!"

কার্ত্তিক তখন বলিতে আরম্ভ করিল; কেমন করিয়া ভুঁই-পাড়ার এক জন লোক, তার স্ত্রী আর তার ভাই অন্নাভাবে নদীর ধারের আমবাগানে তিনটা গাছে তিন জনে গলায় দড়ি দিয়া

ঝুলিয়াছে, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা করিতে লাগিল। বর্ণনা শেষ করিয়া কহিল—"পথে আসতে শুনে এলুম, মাকাল্পুরের বাবুদের বাড়ী কাল না কি তিনশো প্রজা এসে ধন্না দিয়ে পড়েছিল—'খেতে দাও—খেতে দাও!'—কিন্তু একটা সুখের বিষয়, ধান আর পাট এবারে যা হোয়েচে, এ রকম বহু কাল হয়নি। দু'ধারের সব ক্ষেত দেখতে দেখতে এলুম, মা-লক্ষ্মী যেন সবুজ সাড়ী পোরে প্রাণভরা আনন্দেতে হাসচে! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!"

সুরেশ এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই; এইবার বলিল—"কলিযুগের শেষ যদি, তবে এ রকম সু-ফসল হ'বার ত কথা নয়! আপনাদের 'চেতাবণী' এ বিষয়ে কিছু বোলেচেন না কি?"

নীলু গোঁসাই কথার শ্লেষটা লক্ষ্য করিল; কহিল, "বোলেচেন বই কি! একটু মাথা খাটিয়ে বুঝে নিতে হয়। সত্যযুগ যে আসচে, এ সব তারই লক্ষণ। সূর্য্য ওঠবার আগে এক দিকে অন্ধকার আস্তে আস্তে সরে যায়, আর এক দিকে একটু একটু কোরে আলো দেখা দেয়, এ-ও তাই।"

অক্ষয় ঘোষ দেখিল, আলোচনা বন্ধ হওয়াই ভাল। সে কার্ত্তিকের দিকে চাহিয়া কহিল—"মামার খবর কি গো কার্ত্তিক বাবু? মামীর সঙ্গে ভাবের পালা, না আড়ির পালা?"

কার্ত্তিক হাসিতে হাসিতে কহিল—"সকালের খবরটা অবশ্য জানি না, তবে কাল রাত্তির পর্য্যন্ত ত ভাবের পালা-ই ছিল দেখেছি।" বলিয়া কার্ত্তিক সুরেশের হাত ধরিয়া টানিয়া গয়লা-পাড়ার দিকে চলিয়া গেল।

যদি এ কথা সত্য হয় যে, যাহার নাম করা যায়, সে লোক তখনি সেই স্থানে আসিয়া পড়িলে তাহার দীর্ঘজীবন প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কার্ত্তিকের মাতুল শশধর ঘোষাল বহু কাল বাঁচিবে। কেন না, মিনিট পাঁচেক পরেই ধীরে ধীরে এবং বিমর্ষচিত্তে শশধর দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অপর কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া কোন দিকে না চাহিয়া দোকান হইতে বার আনা দিয়া অর্দ্ধ সের চিঁড়া লইয়া চলিয়া গেল।

কিছু আগে কার্ত্তিককে অক্ষয় যে-প্রশ্ন করিয়াছিল, এই ব্যাপারে সে-প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্ট ভাবে পাওয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে, গত রাত্রে ভাবের পালা থাকিলেও, সকাল হইতে শশধর এবং শশধর-গৃহিণীর মধ্যে ঝগড়ার পালাই চলিতেছে; নচেৎ দোকান হইতে চিঁড়ে যাইত না।

* * * *

বিয়ের সময় বর-ক'নের নামে এক-থালা জলের উপর 'মোনা-মুণী' ভাসানো হয়। 'মোনা-মুণী' বেণের দোকানে বিক্রী হয়; দেখিতে অনেকটা কলার বীচির মত। ভাসিতে ভাসিতে যদি 'মোনা-মুণী' পরস্পর একত্র হইয়া গায়ে-গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দাম্পত্য-জীবনে কখনো গরমিলের সম্ভাবনা নাই। আর যদি 'মোনা-মুণী' পরস্পর না মিলে, তাহা হইলে বর-কন্যার জীবনেও মিল হইবার আশা থাকে না। আর যদি এমনই হয় যে 'মোনা-মুণী' একবার মিশিতেছে, আবার পরক্ষণেই দু'টাতে দু' পাশে সরিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, দাম্পত্য-জীবনও সেইরূপ যাইবে! অর্থাৎ—একবার আলো, একবার অন্ধকার! একবার মিল, একবার অমিল!

পাড়ার বৃদ্ধার দল, যাহারা জানিত, তাহারা বলে—শশধর আর প্রমীলার বিয়ের সময় 'মোনা-মুণী'র অবস্থা শেষোক্তরূপ ঘটিয়াছিল; তাই এবেলা-ওবেলা উভয়ের মধ্যে ঝগড়া এবং ভাব, ভাব এবং ঝগড়া। আবার অনেকে বলে যে, শুভদৃষ্টির সময়ে কোন দুষ্ট লোক 'মন্দ' করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, শশধর এবং তদীয় পত্নী প্রমীলাবালার মধ্যে মিনিটে-মিনিটে ঝগড়া এবং মিনিটে-মিনিটে ভাব হয়! যেন শরতের আকাশ—এই বৃষ্টি, এই রৌদ্র!

আজিকার সকালের আকাশ ছিল—শুভ্র কাশের আন্দোলনে আন্দোলিত, কুসুম-সুরভিত, রৌদ্র-দীপ্ত, হঠাৎ প্রমীলার একটা কথায় নির্মেঘ আকাশে মেঘ সঞ্চার এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ষণ!

শশধর দালানে বসিয়া আরামের সহিত চুমুকে-চুমুকে চা পান করিতেছিল, আর প্রমীলা সুমুখে বসিয়া পাণ সাজিতেছিল। পাণের উপর সুপারী দিতে দিতে প্রমীলা কহিল—"বাবা! সুপুরীর কী দাম হোল!"

শশধর কহিল, "সুপুরীর দাম মানে? আর কোন জিনিসের বুঝি দাম বাড়েনি, খালি সুপুরীরই দাম বেড়েচে?"

"তাই ত বলচি যে……"

"না? তাতো বল্‌লে না! বল্‌লে, সুপুরীর কী দাম বাড়লো!"

"আরে কী মুস্কিল!—তা, বলিচি ত বলিচি, বেশ কোরেচি!"

—মেঘ আকাশ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল!

"বেশ করেছি? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা।"

"হ্যাঁ, তত বড় কথা! ইস্! ভারি 'ইয়ে' হোয়েচে!"

ইহার পরই মেঘ-গর্জ্জন এবং বর্ষণ! প্রমীলা পাণের বাটা দেয়ালের গায়ে ছুঁড়িয়া দিল; সাজা পাণগুলা ছত্রাকারে ছড়াইয়া ফেলিল; তার পর সারা দালান কাঁপাইয়া শয়ন-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আর শশধর নিষ্ফল আক্রোশে বসিয়া বসিয়া গর্জ্জাইতে লাগিল!

অনেক বেলায় কার্ত্তিক বাড়ী আসিয়া দেখিল, বাড়ী নিস্তব্ধ। মামী তাহার রান্নাঘরের মেঝেয় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। আর মামাকে কোথাও দেখিতে পাইল না। শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, ভাঁড়ার, গোয়াল, ঢেঁকি-শাল, কাঠের-চালা—কোথাও না। ভুঁইপাড়ার আম-বাগানের কথা ভাবিয়া হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে উদয় হইল। সে তখন তাড়াতাড়ি আর একবার সব ঘরের কড়ি ও আড়াগুলি এবং খিড়কীর বড় বকুল গাছটার ডালগুলা ভালরূপে লক্ষ্য করিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া কার্ত্তিক ভাবিতে লাগিল—মামা গেল কোথায়? ঝগড়া-ঝাঁটি ত প্রায় নিত্যই হয়, কিন্তু মামা ত কখনো ঘরছাড়া হয় না। কালী ঝি-টাই বা কই?—একটা সুখের কথা, শশধরের পুত্র নাই, কন্যা নাই, ভ্রাতা নাই, ভগিনী নাই; অর্থাৎ তাহার জন্য ভাবিবার কেহ নাই; কিন্তু তবু এমন-এক জন আছে যে, তাহার জন্য ভাবিয়া থাকে এবং সে-এক জন হইতেছে—ভাগিনেয় কার্ত্তিক। কিন্তু দুঃখের কথা, লোকে তবু প্রবাদ রটনা করে—'জন, জামাই, ভাগনা। তিন নয় আপ্‌না।'

কিন্তু যাহাই হউক, কার্ত্তিকের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিবার সময় নাই। সুরেশ প্রভৃতি মিলিয়া আজ তাহাদের একটা বড় রকমের 'পিক্‌নিক্' করিতেছে। পাঁঠা মারা হইয়াছে। কার্ত্তিকের উপর ঘি-এর ভার। সেই দ্রব্যের সন্ধানেই সে গৃহে আসিয়াছিল। কিন্তু

মামাকে কোথাও না পাইয়া যখন সে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল, তখন উপরে চিলের ঘরের মধ্য হইতে প্রবল একটা নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাইল। এ নাসিকাধ্বনি মাতুলের না হইয়া যায় না! কারণ, মাতুলের হ্রস্ব এবং স্থূল দেহের মতই এ ধ্বনির সামঞ্জস্য বর্ত্তমান। ধ্বনির অনুসরণ করিয়া কার্ত্তিক টিপি-টিপি ছাদে আসিয়া দেখিল, তাই বটে! মাতুল চিৎ হইয়া শয়ান। প্রভূত রোমাবলী-সমন্বিত বিশাল বক্ষের উপর ভিজা গামছাখানি পাট করিয়া রক্ষিত। এক পাশে চিঁড়ার ফলারের উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি পড়িয়া আছে।

তেমনি সতর্ক পদক্ষেপে কার্ত্তিক নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিল, মামী তেমনই ঘুমাইতেছে। তখন নিশ্চিন্ত চিত্তে কার্ত্তিক ভাঁড়ারের ভিতর প্রবেশ করিল এবং ঘি-এর ভাঁড়ে যে আধ-সেরটাক আন্দাজ ঘি ছিল, সঙ্গে আনীত একটি এলুমিনিয়ম পাত্রে তাহা ঢালিয়া লইল এবং মাটির ঘি-এর ভাঁড়টি তিন টুকরায় ভাঙ্গিয়া তাহা মেঝের উপর রাখিয়া দিল। আশ-পাশের আরো দুই চারিটা মাটীর পাত্র—কোনটা ভাঙ্গিয়া, কোনটা না-ভাঙ্গিয়া—মেঝের উপর ছড়াইয়া রাখিল। তার পর পকেট হইতে কাগজে জড়ানো একটা পাঁঠার ঠ্যাং-এর খানিকটা অংশ বাহির করিল। আজ তাহাদের পিক্‌নিকে যে পাঁঠাটাকে মারা হইয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে-ই এই ঠ্যাং-এর অধিকারী ছিল। হাড়খানা কার্ত্তিক মেঝের একধারে ফেলিয়া রাখিল এবং তৎপরে ঘৃতপাত্র হস্তে সন্তর্পণে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে শীতলাতলার কাছে কালী ঝি-এর সঙ্গে দেখা হইল। কালী জিজ্ঞাসা করিল—"দাদাবাবু, কি ওতে?" কার্ত্তিক কহিল—"গঙ্গাজল।"

সে-রাত্রে কার্ত্তিক বাড়ী ফিরিবার আর অবসর পাইল না।

পরদিন বেলা প্রায় এক প্রহরের সময় যখন সে গৃহে ফিরিল, দেখিল—মামা দালানে বসিয়া হাসি-হাসি মুখে চা খাইতেছে আর কিছু দূরে মামী বসিয়া কুটনা কুটিতেছে।

চায়ের খালি কাপটা পাশে রাখিয়া দিয়া মামা সহাস্য বদনে মামীর উদ্দেশে কহিল—"তার পর?"

মামী কহিল—"তার পর গাছের সেই শুকনো পাতাটা মাটিতে পড়েই হোয়ে গেল একটা প্রকাণ্ড সাপ। কাছেই একটা গরু ঘাস খাচ্ছিল; সাপটা গিয়ে তাকে ছোবল দিলে। গরুটা সেইখানেই পড়লো ঢলে! তার পর সাপ এঁকে-বেঁকে গিয়ে হঠাৎ হোল এক ভীষণ বাঘ! বাঘ হ'য়েই মারলে এক হরিণ। কিন্তু খেলে না কো। না খেয়েই······

কার্ত্তিক বুঝিল—'পিস্' (peace)—ভয়ানক 'পিস্'! নচেৎ রূপকথার গল্প চলিত না।

কার্ত্তিককে দেখিতে পাইয়া প্রমীলা তাহাকে কহিল—"তোর ব্যাপার কি বল্ ত? কাল সারা রাত আর তুই বাড়ী···

মামীকে কথা শেষ করিতে অবসর না দিয়া কার্ত্তিক কহিল—কাল সারা দিন-রাত মস্ত এক হাঙ্গামায় পড়েছিলুম, মামী-মা। ও-পাড়ার সুরেশের পেটের মধ্যে অশথ গাছ জন্মেছিল; তাই দিন-দিন ও শুকিয়ে যাচ্ছিল।"

"বলিস্ কি রে! পেটের ভেতর অশথ গাছ! ধরা পড়ল কি রে?"

"মুন্সীরহাটের বিপিন রোজা ধরে ফেল্লে। এত বড় 'গুণীন্' ত এ-তল্লাটে আর নেই। সে-ই কাল এসে মন্তর-তন্তর, ঝাড়-ফুঁক্ তুক্-তাক্ কত-কি কাণ্ড-কারখানা কোরে সেই অশথ গাছ মারলে।" —এই সূত্রে কার্ত্তিক কহিল, কাল তাহাকে কি রকম খাটিতে হইয়াছে। এক-হাজার-এক অশথ পাতা, বেল-কাঠ, ভেড়ার দুধ, হোমের ঘি—কত-কি সব যোগাড় করিয়া আনিতে হইয়াছে তাহাকে।

প্রমীলা তাহার দিকে চাহিয়া কহিল—"ঘি-এর কথায় মনে পড়ে গেল, কাল কি হোয়েচে জানিস্? কোত্থেকে একটা কুকুর একটা পাঁঠার ঠ্যাং মুখে করে এনে আমাদের ভাঁড়ারে ঢুকেচে। ঢুকে, বেঞ্চির ওপর থেকে ঘি-এর ভাঁড় ফেলে ভেঙ্গেচে আধ সেরটাক আন্দাজ ঘি ছিল, সব খেয়েচে! সে আর কি বলবো তোকে, একেবারে নৈ-নেত্য করে গিয়েচে!"

"আচ্ছা কোরে ধরে ঠ্যাঙ্গাতে পারলে না তাকে?"

"আমি তখন ঘুমুচ্ছিলুম। তুই বাড়ী ছিলি না, কালীও ছিল না। কালী এসে বল্লে—'দাদাবাবু গঙ্গাজল নিয়ে ঐ দিকে যাচ্চে।' —তা সুরেশের পেটে আর অশথ গাছ নেই ত?"

"না, মামী-মা। পেটে আগে গাছের হাওয়া বইতো; ঐ সব করবার পর কাল থেকে আর হাওয়া বয় না।"

প্রমীলার মুখের দিকে চাহিয়া শশধর কহিল—"দেখ, আমার পেটের মধ্যেও বোধ হয় গাছ জন্মেচে! হাওয়া বয়। তবে সম্ভব—তেঁতুল গাছ! কেন না, খালি-খালি টক ঢেঁকুর ওঠে।"

"তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! খেয়ে-দেয়ে ত আর অন্য কাজ নেই!"

"তার মানে, আমি একটা নিষ্কর্ম্মা—এই বলতে চাও?"

"নিষ্কর্ম্মাই ত।"

শশধরের মুখ-ভাব চকিতে পরিবর্ত্তিত হইল; চোখের দৃষ্টিতে একটা তীব্রতা ফুটিয়া উঠিল। কপাল কুঞ্চিত হইল। এমন যখন অবস্থা, তখন উঠান হইতে শম্ভু বাগদীর বৌয়ের ডাকে প্রমীলা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ঝড় উঠিতে-উঠিতে উঠিল না।

* * * * *

আগে হইতেই বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষের নিষ্ঠুর হাওয়া বহিতেছিল। হঠাৎ এই সময়টায় তাহার সহিত মিতালী করিতে আর একটা চাঞ্চল্যকর হাওয়া প্রবাহিত হইল। সরকার হইতে প্রচারিত করা হইল যে, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে কি-পরিমাণ ধান-চাউল মজুত আছে তাহার অনুসন্ধান চলিবে। সাধারণ লোকে এ কার্য্যের আদ্যোপান্ত না জানিয়া এবং সদুদ্দেশ্য না বুঝিয়া একটু যেন আতঙ্ক-চঞ্চল হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, সরকার বুঝি তাহাদের সঞ্চিত ধান-চাউল বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে। এইরূপ যাহারা ভাবিল, তাহাদের মধ্যে শশধর এক জন। শশধরের প্রায় পঞ্চাশ মণ চাউল মজুত ছিল, যাহার মূল্য বর্ত্তমানে প্রায় দুই হাজার টাকা।

শশধর কার্ত্তিকের শরণাপন্ন হইল, কহিল—"কি হবে কার্ত্তিক?"

ধান-চাউলের প্রকৃত ব্যাপারটা কার্ত্তিক জানিত; কিন্তু সেই-ই শশধরকে উল্টা বুঝাইয়া দিয়া ভয় খাওয়াইয়া দিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাহার একটা মতলব ছিল! মতলব এই যে, তাহার আর পাড়া-গাঁয়ে পড়িয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছে না! সে চায়—কলিকাতায় গিয়া থাকে। পাড়া-গাঁর মাঠ-ঘাট, জল-কাদা,

ঝোপ-জঙ্গল, আর অক্ষয় ঘোষের দোকান—তাহার একান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সে অনেক বার মামাকে কলিকাতায় গিয়া থাকিবার জন্ম অনেক প্রকার সৎপরামর্শ দিয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এবার আপনা হইতেই সুযোগ আসিয়া পড়িল। কার্ত্তিক কহিল—"কোলকাতা এ-আইনে পড়েনি, সুতরাং চালগুলো নিয়ে কোলকাতায় গিয়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত। দু' হাজার টাকা ত আর কম নয়!"

শশধরও নিজের মনে বার বার বলিতে লাগিল—দু' হাজার টাকা কম নয়!

সর্ব্বদাই একটা দুশ্চিন্তা শশধরকে পাইয়া রহিল। কর্ম্মহীন অবস্থায় দুশ্চিন্তা যেন আরো বেশী করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে। কোন একটা কাজ লইয়া থাকিলে চিন্তাটা তত জোর করিতে পারে না। এ জন্ম শশধর কাজ খুঁজিয়া বেড়ায়। সে দিন বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় শশধর একটা কোদাল লইয়া উঠানের এক ধারে মস্ত বড় গর্ত্ত খুঁড়িতে সুরু করিল। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল—"উঠোনের মাঝে গর্ত্ত খুঁড়চ কেন?"

খুঁড়িতে খুঁড়িতে শশধর বলিল—"আবার বুজিয়ে দেবো এখন। দিয়ে এর মধ্যে সীমের বীচি পুঁতে দেব।"

"যাচ্চ ত কোলকাতায় চলে, সীম তোমার খাবে কে? বলে—

—'কাজের কাজি নইকো আমি, অকাজের ধাড়ী!
ভাল করতে সাধ্যি নেই— মন্দ করতে পারি।'

—তা তোমার তাই হোয়েচে!"

কট্-মট্ করিয়া প্রমীলার দিকে চাহিয়া শশধর কহিল—"তার মানে?"

"তার মানে বুঝে নাও।"

রাগে শশধরের শ্বাস জোরে-জোরে বহিতে সুরু করিল, চোখের চাহনির মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সারা দেহ কাঁপিতে লাগিল। হাতের কোদালটা পাঁচিলের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রমীলার অনুসরণে রান্নাঘরের দিকে ধাবিত হইল। তার পর কথার তুবড়ী, চীৎকার, হুঙ্কার, লম্ফ-ঝম্ফ এবং যবনিকা-পতন! অর্থাৎ প্রমীলা চলিয়া গেল—পাশের ভট্‌চার্য্যি বাড়ী; আর শশধর শয়ন-ঘরে ঢুকিয়া লাগাইল খিল!

অনেক বেলায় কার্ত্তিক বাড়ী ফিরিয়া বুঝিল—বাড়ীর আকাশ মেঘাবৃত; মামী বাড়ী নাই; মামার ঘরে খিল দেওয়া; আর রান্না-ঘরের দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া কালী ঝি অঘোরে ঘুমাইতেছে। রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া দেখিল, রান্না-বান্না সবই প্রস্তুত, শুধু খাইবার লোকের অভাব। সুতরাং কার্ত্তিক স্নান করিয়া আসিল এবং হাঁড়ী হইতে ভাত-তরকারী বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল।

সন্ধ্যার পরই কার্ত্তিক বাড়ী ফিরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার জ্বর হইয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বর। শশধর ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"কাল সকালেই ডাক্তারখানা থেকে কুইনাইন এনে খাবি; বুঝলি?"

"খাবো, মামা।"

প্রমীলা আসিয়া কহিল, "খবরদার, কুইনাইন্ খাবি না, জ্বর তা হোলে আটকে যাবে। আমি বেলপাতা আর গোলঞ্চর রস কোরে দেবো, খাস্।"

"তাই খাবো।"

খানিক পরেই শশধর পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া কহিল—"আজ রাত্রে শুধু একটু জল-সাবু খেয়ে থাকবি।"

দালান হইতে প্রমীলা হাঁক দিয়া কহিল—"রাত্রে জল-সাবু খেলে বুকে সর্দ্দী লাগবে, কেতো। কিছুতেই জল-সাবু খাবি না। দুধ-খই দেবো, তাই খাবি।"

দিন পাঁচ-সাত পরে কার্ত্তিক আরোগ্য হইলে, শশধর কহিল—"কোলকাতায় যদি যেতে হয়, তাহোলে আর দেরী কোরে ফল নেই।"

কার্ত্তিক কহিল—"শীগ্‌গীর না গেলে ওই দু'হাজার টাকার চাল চলে যাবে মামা! সুতরাং আর দেরী……"

"না, না, তাহোলে আর দেরী করা নয়। তুই কাল গিয়ে অল্প ভাড়ায় ছোটখাটো একটা বাড়ী ঠিক করে আয়।"

পরদিন মামার কাছ হইতে ট্রেণ-ভাড়া আদি লইয়া কার্ত্তিক কলিকাতা চলিয়া গেল; কিন্তু দুই দিন ধরিয়া বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও ছোট খালি বাড়ী বাহির করিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকে লোকারণ্য। এমন কি, ফুট্‌পাথগুলা এক শ্রেণীর লোক দ্বারা অধিকৃত। যে-কলিকাতায় 'টু লেট্'-এর ছড়াছড়ি ছিল, সেখানে এখন আর একখানিও 'টু লেট্' খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক জন ভদ্রলোক কার্ত্তিককে কহিল—"এখন too late! বাড়ী এখন আর পাবেন না।"

ঘুরিতে-ঘুরিতে কার্ত্তিক দেখিল, কালীঘাট সদানন্দ রোডে বেশ একটি ছোট বাড়ী খালি রহিয়াছে। তিনখানা শয়ন-ঘর, রান্না-ঘর, কল, পাইখানা; তবে পাকা দেয়ালের উপর টিনের আচ্ছাদন। তা হউক, বাড়ীখানা পছন্দসই। কিন্তু পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোকের নিকট অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উহা ভাড়া হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ভাড়া লইয়াছেন, আজই তাঁহারা আসিবেন। বাড়ীটার ভাড়াও অন্যান্য বাড়ীর তুলনায় সুবিধাজনক ছিল—২৫৲ টাকা। বাড়ীর মালিক এক বিধবা স্ত্রীলোক—থাকেন বালীগঞ্জে। একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়া কার্ত্তিক পুনরায় সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া দেখিল, তিনখানা ঠেলাগাড়ী-বোঝাই মাল-পত্র লইয়া একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছে। গাড়োয়ানরা মাল-পত্রগুলি নামাইবার আয়োজন করিতেছে। কার্ত্তিক ভদ্রলোককে কহিল—"এ বাড়ী কি আপনিই ভাড়া নিলেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আপনার নিবাস?"

"নিবাস ময়মনসিং। এখানে এসেছিলাম চেতলায় 'ভায়রা'র বাসায়।"

একটু চিন্তিত ভাব দেখাইয়া কার্ত্তিক কহিল—"এই বাড়ীতেই থাকবেন?—তা থাকুন! কালীর পীঠস্থান, মা-কালীর নাম নিয়ে থেকে যান।"

অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত ভদ্রলোকটি কহিল—"কেন? কেন? ব্যাপার কি?"

"পাড়ার লোকে আপনাকে কিছু বলেনি?"

"না, কিছুই ত কহে নাই।"

একটু ঢোঁক গিলিয়া কার্ত্তিক কহিল—"এসে যখন পোড়েছেন, তখন কালী-মার নাম কোরে থেকে যান।"

অত্যন্ত অধীর উদ্বিগ্নতার সহিত ভদ্রলোক কহিল—"না—না, নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে, আপনাকে বলতেই হবে।"

"আপনি আমাকে মহা ফ্যাসাদে ফেল্‌লেন। তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে মিছে কথাই বা কি কোরে বলি!"

"না—না, আপনি সত্যই বলুন। আমি বিদেশী লোক, আপনি এক জন ভদ্দর ব্যক্তি…………"

"এ বাড়ীতে আর থেকে কাজ নেই। এটা 'থাইসিস্'য়ের বাড়ী। এর আগে যতগুলি ভাড়াটে এ বাড়ীতে থেকে গেছেন, সকলেরই একটি—না—একটি ওই রোগে…………"

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ময়মনসিংয়ের ভদ্রলোক কহিল—"বলেন কি! টি বি! ওঃ, আপনি বড়ই উপকারটা করলেন, মশাই! —গাড়ীওলা, চিজ্-উজ্ মৎ নামাও। যাঁহাসে লে আয়া, ফের উঁয়া লে যানে হোগা।"

ভদ্রলোক কার্ত্তিককে অশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া ধূলাপায়েই আবার 'ভায়রা'র বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

* * * *

শশধর স-পরিবার এবং স-চাউল কলিকাতায় আসিয়াছে। সদানন্দ রোডের সেই বাড়ী। বাড়ীখানা শশধর ও প্রমীলার বেশ পছন্দ হইয়াছে। এই বাড়ীর সূত্রেই সে দিন কার্ত্তিক ময়মনসিংয়ের সেই ভদ্রলোকটির নিকট হইতে অশেষ ধন্যবাদ পাইয়াছিল, এখন মাতুল-মাতুলানীর নিকট হইতেও আর এক দফা ধন্যবাদ পাইল।

শশধর প্রমীলাকে কহিল—"কোলকাতার খরচ-পত্র যদিও একটু বেশী পড়বে বটে, কিন্তু থাকা যাবে বেশ সুখে। কি বল?"

"নিশ্চয়। বাবা! এত দিন পরে দু'বেলা রান্নার হাত থেকে বাঁচলুম।"

কলিকাতায় আসিয়া শশধর দেখিল, শুধু কালী ঝিয়ের দ্বারা এখানে সব কাজ চলিবে না। বাজার করা, দোকান করা, তা ছাড়া কন্‌ট্রোলের দোকান হইতে এ-ও-তা আনা, এ সমস্ত একা কালীর দ্বারা হইবে না। সে জন্য জগু নামক এক জন বেহারীকে রাখা হইয়াছে। তার দ্বারা দুই বেলা রান্নার কাজও চলিতেছে।

কলিকাতা আসিবার পর হইতে কার্ত্তিক বড় একটা বাড়ীতেই থাকে না! নানা কাজে-কর্ম্মে-মতলবে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। শুধু দুই বেলা খাবার সময় তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

সে দিন সারা-বেলার পর বিকালের দিকে বাড়ী ফিরিয়া কার্ত্তিক অনুমান করিল—মামা-মামীর মধ্যে যেন গণ্ডগোল বাধিয়াছে। এ বিষয়ে কালীকে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করাতে, ইঙ্গিতে সে যাহা জানাইল, তাহাতে কার্ত্তিক বুঝিয়া লইল যে তাহার অনুমান ঠিকই।

কার্ত্তিকের গলার সাড়া পাইয়া শশধর কহিল—"কেতো, ঠাকুরকে বোলে দে, এ বেলা খিচুড়ী আর ইলিস্ মাছ ভাজা হবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে প্রমীলা কার্ত্তিকের উদ্দেশে বলিল—"ওরে, ঠাকুরকে বল্, এ বেলা চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা হবে।"

কিছু পরে শশধর ও-ঘরে কার্ত্তিককে ডাকাইয়া কহিল—"ঠাকুরকে বলেচিস্—খিচুড়ী আর ইলিস মাছ ভাজার কথা?"

"বলেচি মামা।"

কার্ত্তিক এ-ঘরে আসিলে প্রমীলা বলিল—"ফলারের কথা বোলে দিয়েছিস্ ত?"

"হ্যাঁ, মামী-মা।"

ঠাকুরকে কার্ত্তিক উভয় রকমেরই ব্যবস্থা করিতে উপদেশ দিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল এবং রাত্রে ফিরিয়া মামার সঙ্গে খিচুড়ী ইলিস মাছ ভাজা এবং মামীর সঙ্গে চিঁড়ে দইয়ের ফলার খাইয়া শুইয়া পড়িল।

পরের দিন দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে ও-ঘরে শুইয়া শশধর স্থির করিল যে, এ-জীবন আর সে রাখিবে না! আত্মহত্যা করিবে! আফিং খাইয়া মরিবে। সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুরকে ডাকিয়া তাহার হাতে দুইটা টাকা দিয়া বলিল—"দু-টাকার আফিং আনবে।"

এ-ঘরে প্রমীলাও শুইয়া শুইয়া ঠিক করিয়া ফেলিল, গায়ে কেরোসিন্ ঢালিয়া সে পুড়িয়া মরিবে; এবং কালীকে ডাকিয়া দু' টাকার কেরোসিন আনিতে বলিল।

ঘণ্টা-দুই পরে দু'জনেই ফিরিয়া আসিল। ও-ঘরে গিয়া ঠাকুর শশধরকে জানাইল—"আফিং নেহি মিল্‌তা বাবু। দিনভোর 'লাইন'মে খাড়া হোনে সে দো পয়সাকা মিল্‌নে সক্‌তা।"

এ-ঘরে আসিয়া কালী প্রমীলাকে কহিল—"কেরাছিন পাওয়া যাবে না মা! ওরে বাবু রে! কী ভীড়! গোটা দিন দাঁড়িয়ে থাকলে সিকি-বোতলটাক হয় ত পাওয়া যেতে পারে।"

অগত্যা ভাগ্যবিড়ম্বনায় কাহারও আর মরা হইল না।

সন্ধ্যার পর কার্ত্তিক বাড়ী আসিলে প্রমীলা তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"এ রকম স্বামীর ঘর করার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। তাহোলে আমিও বাঁচি, উনিও বাঁচেন!"

খুব আস্তে আস্তে কার্ত্তিক কহিল, "মামাও তাই বলে। বলে— 'ওটা মরে গেলে গায়ে বাতাস লাগে। সোনার প্রায় একশো টাকা কোরে ভরি। মলে পরে ওর গয়না ক'খানা বিক্রী কোরে, ঐ টাকায় মজাসে কিছু দিন তোয়াজ কোরে খাওয়া-দাওয়া করি।"……

বারুদে অগ্নি সংযোগ হইলে তুবড়ী যেমন ফোঁস করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, প্রমীলাও সেইরূপ আগুনের ফোয়ারার মত হইয়া কহিল— "গয়নাগুলো বিক্রী কোরে মজা করে খাবেন! মরি যদি, তাহোলে কি আর গয়নাগুলো রেখে যাব! ও-সব, কেতো, তোকে আমি দিয়ে যাব।" তার পর কিছুক্ষণ মনে-মনে গজরাইবার পর কহিল— "তোকে আমার সব গয়না এখনি দিয়ে দিচ্চি। বাক্সটা—তোর কাছে—তোর ঘরে রেখে দে—আজই রেখে দে।"

গহনা যদিও বেশী নয়, তবুও আজ-কালকার বাজারে তাহার দাম প্রায় হাজার-খানেক টাকা হইবে।

বাক্সটা হাতে লইয়া কার্ত্তিক কহিল—"না—না মামী-মা, তা কি কখনো হয়! এ তুমি তোমার কাছেই রেখে দাও মামী-মা। মামার কথা ছেড়ে দাও।"

"কিছুতেই না। ও গয়না আমি তোকে দিলুম, তুই তোর কাছে রেখে দে। দেখি, কি করে আমার!"

অগত্যা বাধ্য হইয়া গহনার বাক্সটা কার্ত্তিককে লইতেই হইল এবং উহা নিজের ঘরে লইয়া গিয়া রাখিল।

একটু পরে শশধর কার্ত্তিককে ডাকিয়া কহিল—"সংসারটা ছারেখারে দিলে! কত বড় দুষ্ট মেয়ে-মানুষ! আর আমার এক দণ্ড এ সংসারে থাকতে ইচ্ছে হয় না, কার্ত্তিক। সবই ত দেখছিস্!"

অনুচ্চ কণ্ঠে কার্ত্তিক বিজ্ঞের ন্যায় কহিল—"ভয়ানক স্বভাব

খারাপ মামী-মার। কি আর বলব বলুন! একটু আগেই ত মামী-মাকে বল্‌ছিলুম যে, কেন তুমি এ-রকমটা কর? শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে কবে হয় ত মামা বিবাগী হোয়েই বেরিয়ে যাবে।"

"অ্যাঁ—অ্যাঁ! বলেছিস্ এ কথা?"

"এই ত খানিক আগে বলে এলুম!"

"কি বল্লে তা'তে?"

"খুব রেগে উঠলো। বল্লে—"বিবাগী হোয়ে যায় যদি ত বয়েই গেল। আমার শ্বশুরের ভিটে আছে, বাগান-পুকুর আছে, ৫১ বিঘে ধান-জমী আছে, আমার থাকবার খাবার ভাবনা নেই। আমি···"

তড়াক্ করিয়া শশধর সপ্তমে উঠিল! কহিল—"ভিটে আছে! ৫১ বিঘে ধান-জমী আছে!—তার একচুল আমি ওর জন্তে রেখে যাচ্চি কি না! সব আমি তোর নামে দান-পত্তর লিখে দেবো, কেতো। ওকে আমি পথে বসিয়ে যাব!"

ফিস্-ফিস্ করিয়া কার্ত্তিক কহিল—"চুপ করুন, চুপ করুন, মামা।"

অধিকতর উত্তেজিত হইয়া শশধর কহিল—"কিছুতেই না। সব আমি তোকে রেজেষ্টারী দান-পত্তর কোরে দিয়ে যাব। ওই ৭০০ টাকার নোটের বাণ্ডিল আজ আট মাস বুকে কোরে রেখে দিয়ে এসেচি, মিত্তিরদের ঐ বিশ বিঘের জমাটা কিনবো বোলে। ছাই কিনবো! ও সাতশো টাকা তোকে আমি দিয়ে দেবো।"

হিতৈষী উপদেষ্টার মত কার্ত্তিক কহিল—"না মামা, না। টাকাটা দিয়ে মামী-মার নামে ঐ জমাটা···········"

অদ্ভুত মুখভঙ্গীর সহিত চীৎকার করিয়া শশধর কহিল—"মামী-মার নামে! মামী-মার নামে ছাই দেবো! এ টাকা আমি তোকে দেবো।"

হাউইয়ের মত ঘর হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহিরে আসিয়া প্রমীলাও সমভাবে চীৎকার করিয়া কহিল—"তবে ত আমার সব বোয়ে গেল! যাকে ইচ্ছে তাকে দাও।"

"দেবোই ত। একুণি দেবো!"—বলিয়া ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া গিয়া শশধর ট্রাঙ্ক হইতে সেই সাতশো টাকার নোটের বাণ্ডিলটা বাহির করিয়া আনিয়া কার্ত্তিকের হাতে দিল। কার্ত্তিক কহিল—"এ কি করচেন, মামা!" কিন্তু তা সত্ত্বেও নোটের বাণ্ডিলটা তাহাকে লইতেই হইল। না লওয়া ছাড়া অন্য উপায় রহিল না।

হায় মোনা-মুণী! কেন তোমরা ভাসিতে ভাসিতে পরস্পর গায়ে-গায়ে মিশিয়া যাও নাই!

* * * *

পরদিন সকালে শশধরের ছোট সংসারে বড় রকমের একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কার্ত্তিক নিরুদ্দেশ! হাজার টাকার গহনা আর সাতশো টাকার নোটের বাণ্ডিল—নিরুদ্দেশ হইবার পক্ষে এরূপ সুবর্ণ সুযোগ যে জীবনে আর দ্বিতীয় বার আসিবে না, কার্ত্তিক তাহা বুঝিয়াছিল!

এক দিকে ক্রোধ ও ক্ষণেকের উত্তেজনার ফলে সতেরশো টাকা এই ভাবে পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল! অপর দিকে সেই পাখার ঝাপটায় স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে চিরকালের ঝগড়া-ঝাটি, রাগারাগি বহু দূরে বিতাড়িত হইল।

প্রমীলা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল—"উঃ। কী সর্ব্বনাশ হোলো আমার! ওগো, কেন তুমি আমার সঙ্গে রাগারাগি ঝগড়া করতে গেলে গো!"

শশধর নির্ব্বাক্। তিন দিন পর্য্যন্ত তাহার বাক্যস্ফুরণই হইল না! শুধু মাঝে মাঝে একটা ঝাড়া নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

তিন দিন পরে তাহার মুখ হইতে প্রথম কথা বাহির হইল—"উঃ! কল্কীর চেহারাটা কী ভীষণ! ঘোড়াটা দেখেছ? একেবারে সাদা ধব্‌ধবে।"

কান্নার সহিত জড়িত হইয়া প্রমীলার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—"এ সব তুমি কী বলছ গো!

"বলচি যে, এ ধাক্কা সামলানো দায়, প্রমীলা। তাই এই রকম একটা কিছু কল্পনা কোরে নিয়ে মনকে না বোঝালে বাঁচবো না—উঃ। কলির শেষে কল্কী আবির্ভূত হয়ে সব একেবারে তচ্-নচ্ করে দিয়ে গেল! তলোয়ারখানার ধার কি! যাক্ বাবা, আমরা খুব বেঁচে গেছি। খালি সতের শো টাকার ওপর দিয়ে এত বড় বিপদটা কেটে গেল।"

সত্যই এ ধাক্কা সামলানো শশধরের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িল। কলি, কল্কী, সত্যযুগ—কোন কল্পনাই এ ধাক্কায় টিকিল না। অন্তরের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া কোন আলোকের রেখাই আসিতে পারিল না। তত্রাচ শশধর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এই সতের শো টাকা যেমন করিয়া হউক বাহির হইতে তাহাকে উপায় করিতে হইবে। আর কার্ত্তিককে একবার সামনে পাইলে সে খুন করিবে!

অতঃপর শশধরের প্রধান চিন্তার বিষয় হইল, কি করিয়া কিছু টাকা উপায় করা যায়। দিন-রাত সে এই চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিল। কি করিবে সে? চাকুরী?—জীবনে কখনো করার অভ্যাস নাই, চাকুরী করা তাহার পোষাইবে না। ব্যবসায়?—এ বাজারে কোন ব্যবসা ফাঁদা সুবিধার হইবে না। চাকুরী নয়, ব্যবসা নয়—তাহোলে পয়সা উপায়ের আর কি উপায়? ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার মাথা খারাপ হইবার উপক্রম হইল। কালীঘাট একটা তীর্থস্থান। এখানে যাত্রী-ধরা দালালরা বেশ কিছু উপায় করে। তাই করিলে হয় না?—না, পোষাইবে না; বড় হীন কাজ। আর তা ছাড়া বড্ড ঘোরা-ঘুরি করিতে হয়! আর যাত্রীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতে হয়। তাহোলে—তাহোলে—তাহোলে···········

দিন-পাঁচ সাত ধরিয়া এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ শশধরের মাথায় একটা ফন্দী ঢুকিল। সে দেখিল, দেশের এই মহা দুর্দ্দিনে লোকের মামলা—মোকদ্দমা ঠিকই বজায় আছে। সে এক দিন আলিপুর জজকোর্টে গিয়া দেখিল, এমন দুর্ভিক্ষের দিনেও উকীল-মোক্তার, মক্কেল, মকর্দ্দমার সংখ্যা কিছু মাত্র কমে নাই, বরং আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। শশধর ঠিক করিল, সে এক 'মামলা-কালী' প্রতিষ্ঠা করিবে। এই মামলা-কালীকে প্রণামী-পূজা দিলে মোকদ্দমায় তাহার শুভ হইবেই। শশধর ভাবিয়া দেখিল, অন্যান্য কার-কারবারের দিকে ভীড় হইলেও এ জিনিসটায় এখনো কেহ হাত দেয় নাই। ফিরিঙ্গি-কালী আছে, পাগলা-কালী আছে, ডাকাতে-কালী আছে, শ্মশান-কালী আছে, চীনে-কালী আছে, রোটন্তী-কালী আছে—কিন্তু মামলা-কালী নাই!—নতুন জিনিষ! শশধর আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। সে ইংরেজী-শিক্ষিত হইলে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিত—'ইউরেকা! ইউরেকা!'

কালীঘাটে 'পটুয়া পাড়া' নামে একটা পল্লী আছে, সেখানে পটুয়াদের বাস। সারা বছর ধরিয়া নানারূপ দেব-দেবীর প্রতিমা গড়াই তাহাদের পেশা। শশধর ফরমাস দিয়া সেইখান হইতে একটি কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আনিল। তৎপূর্ব্বেই বাড়ীর মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া একখানা ঘরের রাস্তার দিকের দুইটা জানালা খুলিয়া সেই স্থানে বড় বড় দুইটা দরজা বসানো হইয়াছিল। শুভদিনে রাস্তার উপরকার সেই ঘরে 'মামলা-কালী' অধিষ্ঠিত হইয়া মক্কেলদের শুভাশীর্ব্বাদ দান ও পূজা-প্রণামী গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন।

আহ্বানের সাড়া আসিতে লাগিল—মন্দ নয়। লোকের মুখে-মুখে এবং সামান্য কিছু হ্যাণ্ডবিলের সাহায্যে বহু বাদী, প্রতিবাদী, আসামী, ফরিয়াদীর কাণে মামলা-কালীর সংবাদ গিয়া পৌঁছাইল এবং প্রত্যহই ভক্তগণের নিকট হইতে দু'-পাঁচ টাকা করিয়া 'ফী'—অর্থাৎ প্রণামী পড়িতে লাগিল।

শশধরের মনের ক্ষতস্থানে মামলা-কালী-প্রদত্ত দৈব-মলমের প্রলেপ পড়িল। তাহার মনে আবার সুখ, শান্তি, আনন্দ, উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

* * * *

"বলিস্ কি কালী!"

"হাঁ দাদাবাবু। কাল সাড়ে তিন টাকা পেন্নামী পড়েচে। পরশু পড়েছিল দু'টাকা সাড়ে চোদ্দ আনা। শনি-মঙ্গলবার সব চেয়ে বেশী পড়ে।"

কার্ত্তিক আর কালী-ঝিয়ের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। কার্ত্তিক মাতুলের বাসা হইতে সে দিন অতি প্রত্যুষে অদৃশ্য হইবার পর হইতে ভবানীপুরের এক 'মেস্'-এ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বাজারের সময় সে বাজারে আসিয়া গোপনে কালীর সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে মাঝে-মাঝে দু-একটা টাকা দিয়া বশ করিয়া ফেলে। কালী সুযোগ পাইলেই কার্ত্তিকের 'মেস্'-এ আসিয়া তাহাকে শশধর-সম্পর্কীয় সকল সংবাদ সরবরাহ করিয়া যায়।

কার্ত্তিক কহিল—"খুব ফন্দী বার কোরেচে ত! মামীর সঙ্গে আর ঝগড়া-ঝাটি হয় না?"

"না। এখন খুবই আনন্দে আছে। তবে তোমার ওপর যা রাগ, তা আর বলবার নয়।"

মিনিট দু'চার একান্ত মনে কি ভাবিয়া কার্ত্তিক বলিল—"দ্যাখ্ কালী, তোকে আমি মামীর সব গয়নাগুলো দিয়ে দেবো, যদি এক কাজ করতে পারিস্! দু'জনে আমরা তাহোলে লাল হোয়ে যাব, কালী।"

কালী কহিল—"কি কাজ বল।"

"ওরা মাটীর 'মামলা-কালী' করেচে, আমি 'মকর্দ্দমা বাবা' বসাবো। তোকে করবো বাবার 'ভৈরবী'। তোকে মানাবেও বেশ। দ্যাখ, পারবি? দু'হাত দিয়ে তাহোলে টাকা কুড়ুবো কালী। আদ্ধেক তোর, আদ্ধেক আমার।"

কালী চুপ!

কার্ত্তিক কহিল—"কি বলিস্ কালী? রাজী আছিস্? বহু টাকা রোজগার হবে! আদ্ধেক আমার, আদ্ধেক তোর।"

"আদ্ধেক আমায় দেবে ঠিক?"

"নিশ্চয়। তুই হবি পাটনার! না দিলে তুই 'ভৈরবী' থাকবি কেন?"

কালী রাজী হইল।

অতঃপর এক সপ্তাহের মধ্যেই আলিপুর গোপালনগর রোডের মোড়ের উপর—যেখান হইতে একটি রাস্তা জজ্-কোর্টের দিকে, আর একটি রাস্তা ফৌজদারী কোর্টের দিকে গিয়াছে, সেইখানে এক প্রশস্ত এবং প্রকাণ্ড গৃহের মধ্যে বিশেষরূপ আয়োজন এবং আড়ম্বরের সহিত মকদ্দমা-বাবার প্রতিষ্ঠা হইল। মাটীর চতুর্ম্মুখ এক ব্রহ্মা-মূর্ত্তি! সঙ্গে-সঙ্গে সমগ্র কলিকাতা ও চব্বিশ-পরগণা জেলায় মকর্দ্দমা-বাবার কথা প্রচারিত হইয়া গেল এবং প্রত্যহ দলে-দলে মকর্দ্দমা-সংশ্লিষ্ট নর-নারীগণ, এমন কি—উকীল-মোক্তারের দলও আসিয়া মকর্দ্দমা-বাবার পাদদেশ 'প্রণামী'র দ্বারা পূর্ণ করিতে লাগিল।

যথাসময়ে এই সংবাদ শেলের মত শশধরের কর্ণে নয়—বক্ষে আসিয়া বাজিল!

* * * *

"ওঃ! আমি মরে গেলুম! প্রমীলা, আমি মরে গেলুম! কেতোকে আমি খুন করবো।"—দুই হাতে বুক চাপিয়া শশধর মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। প্রমীলা তাহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—"উঃ! কী শত্রুতাই শেষকালে কার্ত্তিক করলে গো!"

"আমি ওকে খুন না কোরে ছাড়বো না। সব দিক দিয়ে আমায় নষ্ট করলে! উঃ!"—শশধর অন্তর-যন্ত্রণায় ছট্-ফট্ করিতে লাগিল।

"দেখ, ও-রকম কোরো না, স্থির হও। টাকা-গয়না গেছে, প্রাণ থাকলে আবার হবে।"

"আর হবে না, আর হবে না। হবে কোত্থেকে? মামলা-কালী থাকলে হতো বটে। উঃ! কত ভেবে-চিন্তে, মাথা খাটিয়ে 'মামলা-কালী' বার করলুম, তার মাথাও শেষকালে খেলে! রোজ চার-পাঁচ টাকা কোরে প্রণামী পড়তে সুরু হোয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই আমার······কেতোকে আমি খুন করবো। কেতোকে খুন করবো, আর ঐ ভৈরবী বেটিকেও খুন করবো।" শশধর হাঁপাইতে লাগিল।

প্রমীলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"'জন জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা।'—ওরে একেবারে ঠিক কথা রে—একেবারে ঠিক কথা! চল, এখানে থেকে আর আমাদের দরকার নেই, আমরা শেতলপুর যাই।"

শশধর যেন পাগলের মত হইয়া গেল। স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই। কখনো বসিয়া, কখনো দাঁড়াইয়া, কখনো শুইয়া শূন্যদৃষ্টিতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে আর মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—"খুন করব কেতোকে! কালীকে খুন করব!"

প্রমীলা আতঙ্ক-বিহ্বল হইয়া বলে—"ওগো, তুমি স্থির হও, ও-রকম কোরো না। স্থির হোয়ে আগেকার মত আমার সঙ্গে ঝগড়া কর।"

পাশের বাড়ীর বোসেদের গিন্নীর সঙ্গে প্রমীলার ভাব-সাব হইয়াছিল। বোস-গিন্নী কহিল—"কাল সকালে আমার মেজ

মেয়েকে দেখতে ভবানীপুরের এক জন ভাল ডাক্তার আসবে। তাকে দিয়ে দেখিয়ে একটা ভাল ওষুধ-বিষুদের ব্যবস্থা কর। এ-রকম হওয়া ত ভাল নয়।"

পরদিন সকালে ভবানীপুরের সেই ভাল ডাক্তার শশধরকে দেখিতে আসিল। ডাক্তার শশধরকে পরীক্ষা করিয়া এবং প্রমীলার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল—"ভয়ানক 'শক্' পেয়ে 'ব্রেণ ম্যাফেক্ট' করেচে। একটা প্রেসকৃপশন্ লিখে দিয়ে যাচ্চি, এইটে রোজ তিনবার কোরে……"

প্রেস্কৃপশন্ লিখিতে লিখিতে শশধরের মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, দাস্তটা রোজ পরিষ্কার হয় ত ?"

শশধর কোন উত্তর দিল না। সে তখন কল্পনা-নেত্রে দেখিতে লাগিল,—দুই কোর্টের মধ্যবর্ত্তী পথে মোড়ের উপর সুপ্রশস্ত ঘর। ঘরের মধ্যস্থলে মকর্দ্দমা-বাবার সামনে ভৈরবী-রূপিণী কালী ঝি আসন-পীড়ি হইয়া বসিয়া আছে। তাহার সমস্ত কপালদেশ সিঁদুরে লেপা, হাতে সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল—সারা ঘর ধূপ-ধুনার গন্ধ ধূমে আচ্ছন্ন। একপাশে রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া সেবকরূপী কার্ত্তিক কম্বলাসনে বসিয়া আছে; আর এক পাশে জবা ও বিল্ব-দলের মধ্যে সিন্দূর-চর্চ্চিত পাঁচটি মড়ার মাথা। কালীর সম্মুখে অসংখ্য ভক্তের দল; আর সেই ভীড়ের মধ্য হইতে বৃষ্টির ধারার মত টাকা-পয়সা সিকি-আধুলী দোয়ানী প্রণামী-স্বরূপ আসিয়া মকর্দ্দমা বাবার পদতলে পড়িতেছে।

ডাক্তার কহিল—"এইটে আনিয়ে নেবেন। রোজ তিন দাগ কোরে…

ক্ষিপ্তের মত শশধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া মালকোঁচা কষিল; তার পর প্রেসকৃপশন্‌টা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে এক জনদের বেড়া হইতে একখানা বাঁশ খুলিয়া লইয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে গোপালনগর রোডের অভিমুখে ছুটিল। পথিকরা তাহাকে দেখিয়া কেহ বা বিস্মিত হইল, কেহ বা আতঙ্কিত হইল। যাহারা নিষ্কর্ম্মা, তাহারা কৌতূহলী হইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

গলদঘর্ম্ম হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে শশধর মকর্দ্দমা-বাবার ঘরের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উন্মাদের মত উদ্ভ্রান্ত অসংখ্য জনতা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। হঠাৎ সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া কার্ত্তিক চকিতে আসন হইতে উঠিয়া পড়িল এবং চক্ষের নিমেষে গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি দীর্ঘ বংশযষ্টি হাতে লইয়া মাতুলের সম্মুখীন হইল। তার পর…

তার পর যে বীভৎস ব্যাপার ঘটিল, তার বর্ণনা না করাই ভালো!

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

অভিযাত্রিক

বিদ্রূপ হানো আরো—
ঘৃণা-মিশ্রিত শব্দের স্রোতে ক্ষতি নাই আজ কারো!
যে দিন প্রথম জন্ম লভেছি মহা বিশ্বের বুকে—
বাজেনি শঙ্খ, দয়া করি কেহ মধু দেয় নাই মুখে,

অসহায়া নারী বক্ষে চাপিয়া অনাহূত সন্তানে—
শঙ্কিত চিতে প্রণাম জানাল বধিরের ভগবানে!
সম্বল তার নয়নের জল ললাটে পড়েছে ঝরি
নব-বিধাতার অতি অপূর্ব্ব লেখনী স্মরণ করি!

তার পর এই বন্ধুর পথে যাত্রা করেছি সুরু,
নীলাকাশে জাগে মহা ধূমকেতু বুক করে দুরু-দুরু!
নব পথিকের অর্ব্বুদ আশা আজিকার এই রাতে
অঙ্কিত হয় বালুকা-বেলায় আমাদের পদাঘাতে!

কাল রাতে জানি মহা সাগরের ঊর্ম্মির অভিসারে
আমাদের গত পথের চিহ্ন ধুয়ে যাবে বারে-বারে—
অভিযাত্রিক আমরা তখন হয় ত দাঁড়ায়ে আছি
অনতিক্রম্য মরুভূর কোন্ সীমানার কাছাকাছি!

ক্ষমা করো প্রিয় বুঝিতে পারিনি কবে করি গেছে দান
চির-দারিদ্র্য আমাদের লাগি খৃষ্টের সম্মান,—
শুধু মনে জাগে পাষাণ ভাঙ্গিয়া নগরী সৃজন করি
তারি রাজপথে তোমাদের রথে চিরকাল চাপা পড়ি!

চির-যৌবনা এই পৃথিবীর বিম্বাধরের সুরা
চূর্ণ করিয়া কত সৃষ্টির আকাশচুম্বী চূড়া,
বহ্নি-দগ্ধ রেখে যায় যত ধূমায়িত শেষ ছাই—
অভিযাত্রিক আমরা কেবল ভাগ করে নিই তাই!

এমনি কেটেছে হাজার বরষ এখনো রয়েছে বাকি—
দু'হাতে জড়ানো লোহার শিকলে মনে হয় রাঙ্গা রাখি!
মৃত প্রেমিকার সমাধি-ভূমিতে পূর্ণিমা-রজনীতে
কত বার মোরা ফিরে আসিয়াছি প্রেমের অর্ঘ্য দিতে,—

স্থির মহাকাল আমাদের সাথে মিতালি করিয়া হেথা
শক্তি পেয়েছে মোদের শোণিতে হয়েছে দুর্ব্বিচেতা!
অক্ষম জানি, তবু সান্ত্বনা মোরা পারি বারে-বারে
ধ্বংসের লাগি সৃষ্টি করিতে আপনার বিধাতারে!

শ্রীঅমর ভট্ট।

১৬

অমিয় এবং রত্না ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিল।

মিসেস্ গোস্বামী গম্ভীর মুখে একবার তাহাদের দিকে চাহিয়াই নিজের কাজে মনোনিবেশ করিলেন।

অমিয় সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল! কৈফিয়তের সুরে কহিল,—গাড়ীটা হঠাৎ—

মিসেস্ গোস্বামী মুখ তুলিলেন। দৃষ্টিতে উদ্বেগ। কহিলেন,—তোমরা নিরাপদে ফিরেছো! কোনো ক্ষতি হয়নি তো?

অমিয় কহিল,—না।

রত্না চাহিয়া দেখিল,—ড্রইং-রুমে আজ অনেকগুলি জীব জড়ো হইয়াছে। এবং সকলের চোখেই কৌতূহলী দৃষ্টি! সে দৃষ্টি রত্নার উপর নিবদ্ধ। অনিল শুধু পিছন ফিরিয়া পিয়ানো বাজাইতেছে এবং তাহার পাশের কৌচ অধিকার করিয়া কল্পনা বসিয়া গান গাহিতেছে।

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তোমার যে গান ক'খানা তৈরী করতে দিয়েছিলুম, হয়েছে?

মাথা নাড়িয়া রত্না জানাইল,—হইয়াছে।

—বেশ, কল্পনার পাশে গিয়ে বসো, অনিল বাজাবে। আমি আজ একে একে সকলের গান শুনবো। বলিয়া পুত্রকে কহিলেন,—তোমার অর্জ্জুনের পার্ট ধরো অমি।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখের মত কণ্ঠস্বরও গম্ভীর।

অমিয় হাত বাড়াইতেই টেবলের উপর হইতে পিন্-আঁটা ক'খানা কাগজ তিনি পুত্রের হাতে দিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন,—লাবণ্য, চন্দ্রা, প্রভা, রেখা—

মিসেস্ গোস্বামীর ইস্কুলের ছাত্রীরা আসন ছাড়িয়া একে একে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

—নাও। তোমাদের পার্ট! এটা রইল রত্নার—ও যদি গান দিয়ে আজ খুশী করতে পারে, উর্ব্বশীর পার্ট ও পাবে।

রত্নার সমস্ত অন্তর যেন অপমানে রাঙা হইয়া উঠিল! বিবর্ণ মুখে ধীরে ধীরে সে কল্পনার পাশে গিয়া বসিল।

অলক রায়, শচীন সেন আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। উভয়েই নিয়ার ব্যারিষ্টার—অনিলের বন্ধু। তাহাদের নারদ ও ভরত মুনি সাজিবার কথা। মিসেস্ গোস্বামীকে তাহারা অভিবাদন দিল।

প্রত্যভিবাদনের পর প্রফুল্ল স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—আমি জানতুম তোমরা ঠিক সময়ে আসবে।

এ কথার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন খোঁটা ছিল, অতি সূক্ষ্ম হইলেও তীক্ষ্ণ ভাবে সে খোঁটা অমিয়কে বিঁধিল। মুখ না তুলিয়াই হাতের পাতাখানা সে নিবিষ্ট মনে পড়িতে লাগিল।

অলক রায় রত্নাকে আজ প্রথম দেখিল। মিসেস্ গোস্বামীকে প্রশ্ন করিল,—ইনিই উর্ব্বশী সাজবেন? চক্ষে তাহার প্রশংসার প্রদীপ্ত দৃষ্টি।

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—সেই রকম তো মনে করেছি! কিন্তু রত্না অনুপস্থিত ছিল। বেশ লেট।

রত্না মাথা নত করিল। যেন তাহার মস্ত গুরু অপরাধের বিচার হইতেছে! মুখেও তেমনি বিষণ্ণতা!

কল্পনার গান শেষ হইল। মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তোমার গলা ভারি মিষ্টি মা কল্পনা!

কল্পনা একটু হাসিল। সেই সঙ্গে কটাক্ষে রত্নার ম্রিয়মাণ মুখখানাও দেখিয়া লইল। কহিল,—রত্নার গলাও চমৎকার মাসিমা। কত দিন কলেজে আমরা শুনেছি তো।—হ্যাঁ রত্না, অমন চুপ-চাপ কেন ভাই?

কল্পনার মিহি সুরে এই কপট আত্মীয়তা-প্রকাশে রত্নার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বালা করিয়া উঠিল! সে কোন উত্তর দিল না।

অনিল পিয়ানো হইতে মুখ ফিরাইল। রত্নার দিকে চাহিয়া কহিল,—এই যে রত্না এসেছো! এবার তোমার টার্ণ! বলিয়া সে একটু হাসিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—হ্যাঁ, এইবার তুমি আরম্ভ করো, রত্না!

রত্না অনিলের দিকে ফিরিয়া বসিল। তাহার বিষাদ-মলিন মুখ দেখিয়া অনিল বুঝিল, রত্নার অভিমান হইয়াছে! মৃদু কণ্ঠে কহিল,—চা খেয়েছো?

রত্না কোন সাড়া দিল না।

অনিল বাজনা ধরিল।

রত্না গাহিল। সমস্ত অন্তর ঢালিয়া নিঃশেষে সে যেন সঙ্গীতে আত্মসমর্পণ করিয়া দিল। ঝরণার বাধাহীন জলধারার ন্যায় সুমিষ্ট কণ্ঠ-নিঃসৃত সুরের স্বচ্ছ প্রবাহ-ছন্দ, তাল, লয় যেন কক্ষস্থ সকল প্রাণীকে কিছুক্ষণের জন্য আবিষ্ট করিয়া রাখিল।

মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সকলে নীরব, নিস্তব্ধ! অমিয় রুদ্ধ নিশ্বাসে নিষ্পলক নেত্রে রত্নার দিকে চাহিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল। সুরের পর সুর স্বপ্নের জাল বিছাইয়া চলিল! গানের পর গান নেশার মত সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল!

কল্পনা আসিয়া অমিয়র পাশের আসনে বসিল এবং মৃদু কণ্ঠে কহিল—মিষ্টার গোস্বামী সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন যে। পুলকিত মাধবের মত! তার মুখে ব্যঙ্গের হাসি!

কল্পনা চাহিয়া দেখিয়াছে,—যতক্ষণ সে গান গাহিতেছিল,—মিষ্টার গোস্বামী সেই সময়টায় নিজের পার্টের কাগজে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন! তাই অমিয়র এই তন্ময়তা ঈর্ষ্যার মত তাঁহার মনে বিদ্বেষ সঞ্চারিত করিল! রত্নার মুখের ম্লানিমাই যে মিসেস্ গোস্বামীর গম্ভীরতার হেতু, এটুকু সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল; এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই প্রথম হইতে তার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সঙ্গীত-স্রোত থামিল। মিসেস্ গোস্বামী প্রফুল্ল স্বরে কহিলেন চমৎকার হয়েছে। সাধে বলি রত্না,—তুমি ক্ষণজন্মা মেয়ে! যাক, তোমার আজকের দেরীটুকু আমি মাপ করলুম। কাল নাচের রিহার্সাল চলবে। এখন চা আসুক।

চা আসিল। সকলেই হাত বাড়াইল, পেয়ালা গ্রহণ করিল। রত্নার কাছে ট্রে আসিতে সে মাথা নাড়িল।

অনিল কহিল,—তুমি চা খাবে না?

—আমি চা খেয়েছি! আর ইচ্ছে নেই।

—ও, তাই তোমাদের ফিরতে এত দেরী! কথা হইতেছিল

মৃদু স্বরে। কল্পনা তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। মিসেস্ গোস্বামীকে কহিল,—রত্না চা নিলে না, মাসিমা!

অনিল উত্তর দিল—না! ওর ভালো লাগছে না!

অমিয় অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল। কথার শেষ অংশটা তাহার কর্ণে লাগিতেই সে কহিল,—কি ভালো লাগছে না অনিল?

—রত্না চা খাবে না! সেই কথা হচ্ছে!

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—না, ওকে তোমরা জিদ করো না! ওর অসুখ করলে আমার ভারী ভাবনা হবে।

কৃত্রিম অভিমান-ভরা কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—আমাদের অসুখ করলে আপনার ভাবনা হবে না মাসিমা?

অমিয় সহসা মুখ তুলিল। ধীর স্বরে কহিল,—না! সাধারণ ভাবেই মন অসুস্থ হবে মিস্ চ্যাটার্জ্জি। কিন্তু রত্নার কথা আলাদা! ওর জন্য প্রতিপদে আমাদের চিন্তিত হতে হবে। ও যে আমাদের কাছে আছে।

মিসেস্ গোস্বামীর কান বাঁচাইয়া গলা নামাইয়া কল্পনা কহিল,—সকলের চেয়ে বেশী ভাবনা বোধ করি আপনারই হবে!

—হলে খুব অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক লাগবে? অমিয় উত্তর করিল।

যেন প্রচ্ছন্ন স্বীকার-উক্তি! রত্নার বিরুদ্ধে কল্পনার সমস্ত মন নিমেষে তাতিয়া উঠিল। পাড়াগেঁয়ে একটা গরীবের মেয়েকে উচ্চ-শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃযুগল অনুক্ষণ যেন পাহারা দিয়া আগলাইয়া রাখিয়াছে! যেন অমৃত-পাত্রের সম্মুখে সুদর্শন-চক্র! কিন্তু কি আছে রত্নার? শুধু রূপ! বসন্ত-সমাগমে পুষ্পিত কাননে লুব্ধ মধুপের গুঞ্জন-ধ্বনির মত এই স্তাবকের দল রত্নার যৌবনশ্রী-মণ্ডিত অপরূপ তনুর লাবণ্যে যেন আত্মহারা! মোহাচ্ছন্ন! জ্বলন্ত অঙ্গারের মত নিষ্ফল ক্রোধে কল্পনার সমস্ত মন ধিক্-ধিক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

আরতি কহিল,—চা খাওয়া শেষ হলো মাসিমা। অমিয়-দা এবার পার্ট আরম্ভ করুন।

মিসেস্ গোস্বামী কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাকে কহিল,—আজ আমি ভারি ক্লান্ত মা, কাল থেকে তোমার কাজে লেগে যাবো! বলিয়া রত্নার পানে চাহিয়া কহিল,—ওর গান তো শেষ হোল,—বাকী কাজগুলো ও কাল করবে। আজ তুমি ওকে ছুটী দিয়ে দাও, মা! আজ ও অনেকটা পরিশ্রম করেছে আমার সঙ্গে।

গম্ভীর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী অনুমতি দিয়া কহিলেন,—বেশ, তাই হোক! আজ আমি এদের দেখি।

সকলকে অভিবাদন করিয়া অমিয় রত্নাকে কহিল,—তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করোগে! আমিও চললুম। বলিয়া কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কক্ষ হইতে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। জানিতেও পারিল না, ভ্রুকুটি-ক্ষুব্ধ দুই চোখ কল্পনা অগ্নি-কটাক্ষে ভরিয়া দু'জনের পানে চাহিয়া আছে!

১৭

রত্নার অত্যন্ত ভাবনা পিতাকে লইয়া। গোস্বামী সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে তিনি যদি এখানে আসেন, তবে—

পিতাকে রত্না চিঠি লিখিয়া আসিতে নিষেধ করিতে পারে নাই! কেমন সঙ্কোচ হইতেছিল! অথচ এই বিশিষ্ট সভ্য সম্প্রদায়ের মাঝখানে গ্রাম্য ইস্কুল-মাষ্টারের আসন কোন্খানে, তাহা ভাবিতে মন তাহার পদে পদে কুণ্ঠিত হইতেছিল। অবশ্য পিতা উচ্চ-শিক্ষিত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট! তথাপি অনাড়ম্বর পল্লী-জীবন-যাত্রায় তিনি অভ্যস্ত। সরল প্রকৃতির মানুষ! কৃত্রিম আচার-প্রিয় এ সমাজের আদব-কায়দায় তিনি একেবারেই অনভ্যস্ত! এখানকার চলাফেরা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আনাড়ি। অবশ্য সকলেই তাহার পিতাকে সানন্দে গ্রহণ করিবে—সাদর সম্বর্দ্ধনা দিবে! তবু তাহাদের চোখের অর্থময় দৃষ্টি, অধরের বক্র হাস্য-রেখা, নিঃশব্দ ইঙ্গিতে রত্নাকে বুঝাইয়া দিবে, এই সম্ভ্রান্ত সমাজের মণি হইবার জন্য রত্নার যে এই বিপুল প্রয়াস, এ শুধু বাতুলতা!

বহু তিক্ত অভিজ্ঞতায় রত্না জানিত—ছদ্ম সহানুভূতি, কপট দুঃখ প্রকাশ, কৃত্রিম বেদনাভিনয় এবং মৌখিক আনন্দ প্রকাশ এ সমাজের অঙ্গ! এখানকার আচরণে পিতা পদে পদে বিভ্রান্ত হইবেন, রত্না কিন্তু লজ্জায় মরিয়া যাইবে!

সমস্ত কথাই রত্নার মনে জাগিতে লাগিল। প্রথম যখন বোর্ডিং-এ থাকিত, সহাধ্যায়িনীর দল তাহার শাড়ী-ব্লাউস লইয়া কত রঙ্গ-কৌতুক কত হাসাহাসি করিত। এ সকল হইতে আশাতীতরূপে মুক্তি দিলেন, মিসেস্ গোস্বামী।

মিসেস্ গোস্বামী তাহার একটা লম্বা লেস-ঝুলানো জামার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কাল দর্জ্জি আসবে, তোমার জামা, সায়া, সেমিজ, বডিস্ সমস্তর মাপ তাকে দিয়ো রত্না। ওগুলো আর পরো না মা।

অনিল বই পড়িতেছিল, মায়ের কথায় মুখ তুলিয়া রত্নার পানে চাহিল। কহিল,—কেন, দিব্বি জিনিষ তো! রং-চংও তেমনি—পয়সা দিয়ে রত্না খবদ্দার কম কাপড় নিয়ো না!

মিসেস্ গোস্বামী কৃত্রিম তিরস্কারে পুত্রকে শাসন করিয়া কহিলেন—থাম্—ও কি তোর মত উড়নচণ্ডী হবে!

লজ্জিত মুখে রত্না কহিল,—এগুলো সব কেনা মাসিমা।

স্নেহ হাস্যে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—জানি মা, পাড়াগেঁয়ে পছন্দর সঙ্গে সহরের পছন্দ-রুচি খাপ খায় না। তাহার পর সেই জামা-কাপড়ের ফ্যাশনে সহাধ্যায়িনীর দল ঈর্ষ্যান্বিত দৃষ্টিতে রত্নার প্রশংসা করিত। বিনিময়ে মিসেস্ গোস্বামীর প্রতি রত্নার চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া থাকিত।

পিতার সম্বন্ধে তেমনি একটি হাস্যোদ্দীপক বিভ্রাটের আশঙ্কায় রত্নার মন অনুক্ষণ শুধু অস্বস্তি অনুভব করা নয়, ভীত হইতেছিল। যদি তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ সাহেব সাজিবার বাসনায় চাঁদনির বাজার হইতে সস্তার কোট-প্যান্ট কিনিয়া সেই বেশে দর্শন দান করেন? মুখে কেহ কিছু বলিবে না! কিন্তু সেই অদ্ভুত ছাঁটকাটের পোষাকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পাঁচ জনের মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠিবে, সে-ভাষা পড়িবার বিদ্যা রত্নার আয়ত্ত হইয়াছে।

রত্না পাশ ফিরিল। কল্পনার কথা মনে আসিল। ক্ষুব্ধ অভিমানে দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। গান শেষ করিয়া কল্পনা যখন অমিয়র পাশে গিয়া আসন গ্রহণ করিল, তাহার সেই কথা বলিবার ছন্দ, গ্রীবার ভঙ্গী অমিয়র পাশে বসিবার মুহূর্ত্তে ওষ্ঠের মৃদু হাসি—সে সমস্তই রত্না লক্ষ্য করিয়াছিল। অমিয়র দিকে ঝুঁকিয়া

তাহার হাতের কাগজগুলো কল্পনা পড়িতে লাগিল। অমিয়র আচরণে বা মুখে রত্না যদিও এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই, কল্পনা কিন্তু এমন করিয়া চাপা-গলায় অমিয়র সহিত কথা কহিতেছিল, হাসিতেছিল,—যে তাহার উপর যেন কল্পনার কোন বিশেষ অধিকারে নিবিড় দাবী প্রতিপন্ন হইয়া উঠিতেছিল!

রত্না ভাবিবার চেষ্টা করিল,—কল্পনার এই আধিপত্য কিসের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত? ওরা তো ব্রাহ্মণ! অমিয় আজ সন্ধ্যায় রত্নাকে বলিয়াছে, তাহা হইতে পারে না! মনকে তাই প্রতিক্ষণে নিবৃত্ত করিতেছিল—কিন্তু কি হইতে পারে না? কোন্ অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা? সে কি?

লেপের মধ্যে রত্না ঘামিয়া উঠিল। এতক্ষণে রত্না নিজেকে কল্পনার সহিত মিলাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিল,—সৌন্দর্য্যে, সংগীতে-নৃত্যে সকল দিকেই সে কল্পনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! তবে কি জন্য? কেন? কল্পনা অমিয়র কাছে অগ্রসর হইবে, আর উদাস নেত্রে রত্না তাহার পিছনে পড়িয়া থাকিবে? না, না! রত্না কল্পনাকে প্রতিহত করিবে! নিজের দুর্ব্বার শক্তিতে সে তাহাকে বাধা দিবে। অমিয়—অমিয়ই রত্নার সর্ব্বস্ব! অমিয়র চোখের সম্মুখে নিজেকে সে এমন করিয়া দীপ্ত সুধা-মণ্ডিত করিয়া তুলিবে, কল্পনা নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে! বিবেকের কোন অনুশাসন রত্না শুনিবে না! কল্পনার জয়ী হওয়ার অর্থ, গোস্বামি-পরিবারে সে হইবে এক জন কৃপার পাত্রী!

সম্পদ্ বিভব বা প্রভুত্বের এমন প্রচণ্ড প্রভাব, এতখানি মোহিনী মায়া যে অপরের নিকট ধার করা হইলেও আপনার করিয়া বাহিরের সমাজে দেখাইবার লোভ মানুষ কিছুতে ত্যাগ করিতে পারে না! তাহাতে ভিতরের ফাঁক যতই বাড়িয়া উঠুক, সেই ছদ্ম সম্মানের মুখোস খুলিয়া ফেলা সাধ্যাতীত হয়!

হঠাৎ রত্নার মনে হইল,—কল্পনা হইবে অমিয়র অধিকারী আর সে হইবে বাহিরের অতিথি,—এ অপমান সে সহিবে না।

রাত্রি-শেষের দিকে রত্নার চোখে ঈষৎ নিদ্রা আসিয়াছিল, কিন্তু নীলিমা-তলে উষার বিকাশের সন্ধিক্ষণেই কমল-নেত্র উন্মীলন করিয়া সে চাহিয়া দেখিল।

গোস্বামি-ভবনের প্রতি শয়ন-কক্ষে সংলগ্ন বাথরুম! রত্না মুখ-হাত ধুইয়া আলনা হইতে গরম গায়ের কাপড় লইয়া স্লিপার পায়ে যখন ঘরের বাহিরে আসিল, তখন আলো-অন্ধকারে যেন ভাগাভাগি হইতেছে! বারান্দায় সেই আবছায়া-কুয়াশায়-ভরা উদ্যানের গাছপালায় অদৃশ্যপ্রায়-বাড়ী অর্দ্ধ সুপ্তি-মগ্ন! ভৃত্য-পরিচারিকার দল সবে গাত্রোত্থান করিয়া কাজে যোগ দিতেছে।

বারান্দায় এমন অসময়ে রত্নাকে দেখিয়া তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টি পলকের জন্য রত্নার উপর নিপতিত হইল। রত্না সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না! গোটা-দুই বারান্দা পার হইয়া সে আসিয়া অমিয়র শয়ন-কক্ষের সামনে দাঁড়াইল।

অমিয়র ঘরের কপাট ভেজানো। ভিতর হইতে বন্ধ কি না, সে শুইয়া আছে, কি জাগিয়া আছে, কিছু বুঝিতে না পারিয়া একটা রেলিং ধরিয়া স্তব্ধ চিত্তে রত্না দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই অমিয়র খানসামা একটি পাত্রে খানিকটা গরম জল লইয়া মনিবের কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া রত্নাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

রত্না জানিতে চাহিল, সাহেব উঠিয়াছে কি না?

অভিবাদন করিয়া ভৃত্য জানাইল, প্রভুর ঘুম ভাঙ্গিলেও গাত্রোত্থান এখনো হয় নাই।

রত্না কহিল,—সেলাম দিয়ো।

১৮

নৈশ পরিচ্ছদের উপর ড্রেসিং-গাউন চাপাইয়া অমিয় ঘরের বাহিরে আসিয়া সামনে প্রতিমার ন্যায় রত্নাকে দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কহিল,—আমায় ডাকচো?

—হ্যাঁ। তুমি বেড়াতে যাবে না অমিয়-দা?

অবাক্ হইয়া অমিয় কহিল,—বেড়াতে! এত সকালে? আমার তো এখনো হাত-মুখ ধোয়া হয়নি!

—বেশ, আমি দাঁড়াচ্ছি,—তুমি চটপট সেরে নাও।

অমিয়র বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। কহিল,—আমি দাঁড়াচ্ছি, মানে? তুমি যাবে না কি?

—হ্যাঁ, যাবো! রত্নার স্বর দৃঢ়।

অমিয় মুহূর্ত্ত কাল রত্নার পানে চাহিয়া রহিল।

রত্না কহিল,—তুমি না বললে, ভোরে উঠে তুমি বেড়াতে যাও!

—মিথ্যে বলিনি। কিন্তু রাত্রি শেষ হবার আগে যে উঠি, এমন কথাও তো বলিনি!

আব্দারের সুরে রত্না কহিল,—না গো, না। রাত্রি শেষ নয়! ভোর অনেকক্ষণ হয়েছে। এ কুয়াশা।

—হবে। কিন্তু এত তাড়া দিচ্ছ কেন তুমি?

—দেবো না? মাসিমা এখনি উঠবেন! আমার আর বেড়াতে যাওয়া হবে না।

বিস্মিত কণ্ঠে অমিয় কহিল,—মাসিমাকে না বলেই তুমি যেতে চাও না কি?

অকুণ্ঠিত কণ্ঠে রত্না কহিল,—হ্যাঁ।

চমকিত হইয়া অমিয় কহিল,—সে কি!

এতটুকু অপ্রতিভ না হইয়া রত্না কহিল,—কেন, এতে দোষ কি! আমরা তো সকালের মধ্যেই ফিরে আসবো। তোমার খালি না নিয়ে যাবার ফন্দী!

অমিয় একটু হাসিল। কহিল,—আমার না নিয়ে যাবার ফন্দী, কিন্তু তোমারই বা এত জিদ কেন?

—আমি গাড়ী চালাতে শিখবো। বিকেলে হবে না, মাসিমার কাছে হাজির থাকতে হবে! আর ক'টা দিন বাদেই তো তুমি চলে যাবে, আমার আর শেখা হবে না।

এতক্ষণে জিনিবটা স্বচ্ছ হইল। হাঁ, গাড়ী হাঁকাইবার নেশা এমনি বটে! কিশোর কালে অমিয়কেও এক দিন এ আশায় পাইয়াছিল! বাপের নূতন গাড়ী—হাত দিবার অনুমতি নাই! তাহাকে লইয়াই গোপনে সে পাড়ি দিত! ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত, ভর্ৎসিত হইয়াছে, তথাপি গাড়ী লইতে ছাড়িত না। উত্যক্ত হইয়া পিতা একখানা ছোট গাড়ী তাহাদের দুই ভাইকে কিনিয়া দিলেন।

অমিয় হাসিল।—বুঝেছি! তাই তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত চুপি-সাড়ে পালাতে চাও! কিন্তু মা বকুনি দিলে আমি জানি না। আঙুল দেখিয়ে দেবো সোজা তোমায়। একটি কথা বলবো না।

—তাই দিয়ো! আমি তো কোন অন্যায় কাজ করছি না। নাও অমিয়-দা, ওই দ্যাখো, আকাশে আলো ফুটেছে।

অমিয় আকাশের দিকে চাহিল। তার পর হাসিয়া কহিল,—ঘরে যাও—পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার হয়ে যাবে।

মাথা নাড়িয়া জিদের সুরে রত্না কহিল,—না, আমি এক-পা নড়বো না—তুমি দেরী করবে।

—না রে পাগল, না! আমি নিচ্ছি। এমন করে দাঁড়িয়ে থাকে না। যাও, ঘরে গিয়ে জুতো-মোজা পরে এসো। অমিয়র স্বরের শেষের দিকে কর্তৃত্বের আভাস।

কোন উত্তর না দিয়া রত্না আদেশ পালন করিতে গেল।

পাঁচ মিনিট পরে রত্না যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কেবল পায়ের হিল-জুতা সিল্কের মোজা নয়—মাথার চুল হইতে শাড়ীখানা পর্য্যন্ত সমস্ত পরিপাটি করিয়াই সে উপস্থিত হইল। গায়ে মূল্যবান সোনালী ওভার কোট।

অমিয়কে ডাকিয়া রত্না কহিল,—হয়েছে অমিয়-দা?

—হ্যাঁ ভাই, এই যে! বলিয়া টুপি হাতে লইয়া অমিয় বাহির হইয়া আসিল; এবং রত্নার পানে চাহিয়া সহাস্যে কহিল,—তোমায় দেখেই বুঝি কবিরা উষার বর্ণনা লিখেছে!

রত্নার কপোল ডালিম ফুলের মত রক্তিম হইয়া উঠিল।

সলজ্জ হাস্যে রত্না কহিল,—আপনার কবিত্ব মাঠে বসে শুনবো! তখন খুব মিষ্টি লাগবে। এখন চলুন।

কপট গাম্ভীর্য্য সহকারে অমিয় কহিল—গাড়ী চালানো নয়, আরো অনেকখানি মতলব আছে সেই সঙ্গে।

গাড়ীতে উঠিয়া রত্না কহিল,—আমি তোমার সীটে বসবো, এখন তো ভীড় নেই!

সহাস্যে অমিয় কহিল,—চাপা পড়ে পড়ুক! গরীব মেথর ধাঙড়—ওদের প্রাণের কি আর দাম আছে?

সকৌতুকে রত্না কহিল,—না সিদ্ধার্থ দেব, প্রাণী মাত্রের দুঃখে আমি বিগলিত না হলেও মানুষের প্রাণের দাম আছে আমার কাছে।

কৌতুক-ভরা দৃষ্টিতে অমিয় ফিরিয়া একবার রত্নার মুখের পানে চাহিয়া আবার গাড়ী চালাইতে লাগিল। কহিল,—হঠাৎ আমায় মূর্ত্তিমান অহিংস ঠাউরালে কি করে সে?

—অহিংস না হোক, তেমনি উদাসীন তো!

—হুঁ! বলিয়া অমিয় নীরব রহিল।

গাড়ীর মোড় ঘুরিতেই রত্না কহিল,—লেকের দিকে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। বলিয়া অমিয় কহিল,—কি বললে তুমি, উদাসীন? তা বটে! পার্থের মত!

"ব্রহ্মচারী ব্রতচারী আমি
তব যোগ্য নহি বরাননে!"

রত্নার সুগৌর মুখের উপর শোণিতের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। সে কহিল,—পার্থ ও কথা বলেছিল চিত্রাঙ্গদাকে—কিন্তু শেষে তার হাতেই নিজেকে সমর্পণ করেছিল। আমি যদি নাটক নির্ব্বাচন করতুম—'চিত্রাঙ্গদা-অর্জ্জুন' করতুম, উর্ব্বশী-অর্জ্জুন করতুম না।

—কেন করতে না?

রত্না কহিল,—উর্ব্বশীর অভিসার ব্যর্থ হয়েছিল। চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে পেয়েছিল।

অমিয় কহিল,—তা পেয়েছিল। কিন্তু সে পাওয়া ছিল বিড়ম্বনার মত, নয় কি?

রত্না অমিয়র পিঠের উপর হাত রাখিল। কহিল,—এবার আমি চালাই অমিদা।

—চালাও এসে। সীট বদল করি। বলিয়া গাড়ী থামাইয়া সীট বদল করিয়া অমিয় বসিল। তাহার চোখে-মুখে প্রদীপ্ত উৎসাহ। সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ স্বরে অমিয় কহিল,—প্লেন চালাতে আরও আনন্দ, রত্না, তুমি এয়ার-সার্ভিসে ভর্ত্তি হও।

রত্না চমকিয়া উঠিল। অতীতে কথার ছলে এমনি একটি ভবিষ্যৎ-বাণী হইয়াছিল।

শান্ত স্বরে রত্না কহিল,—মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা শক্তি থাকলে কি সব জিনিষ হয় অমিয়-দা?

—কেন হবে না? চেষ্টায় সংগ্রহ করতে হয়।

—না অমিয়-দা, চেষ্টা করলেও হয় না। আমার মনে একান্ত ইচ্ছা বা যোগ্যতা থাকলেও আমি এয়ার-সার্ভিসে যোগ দিতে বা পাইলট হতে কখনই পারবো না, সে আমার আকাশ-কুসুম!

—কেন তুমি আকাশ-কুসুম বলছো! কি অসুবিধা তোমার?

—অসুবিধা! অভাবই মস্ত অসুবিধা! রত্নার মুখে বিষাদের ছায়াপাত হইল।

অমিয় শান্ত স্বরে কহিল,—না রত্না, আমি তোমার সে অভাব রাখবো না! তুমি কখনো তোমার অসামর্থ্যের কথা ভেবে দুঃখ পেয়ো না। তাতে আমিও দুঃখিত হবো।

রত্নার আয়ত নেত্র হইতে একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

—কাঁদচো রত্না! না, গাড়ী থামাও—এমন উতলা মন নিয়ে গাড়ী চালানো হয় না। থামাও গাড়ী।

রত্না গাড়ী থামাইল। অমিয় কহিল,—এসো আমরা খানিকটা মাঠে বেড়াই।

উভয়ে গাড়ী হইতে নামিল।

রত্নাকে একটা আসনে বসাইয়া পাশে অমিয় নিজে বসিল। রত্নার হাত ধরিয়া মৃদু চাপ দিয়া কোমল স্বরে কহিল,—নিজেকে কখনো অভাবগ্রস্ত মনে করো না রত্না। আমি যেখানে যত দূরেই থাকি, তোমার প্রয়োজনটুকু শুধু আমায় জানিয়ো।

১৯

চায়ের টেবলে বসিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অমিয় রত্না?

বয় জানাইল,—বাহার গিয়া।

মিষ্টার গোস্বামী সবিস্ময়ে পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—প্রাতর্ভ্রমণ। চা না খেয়ে?

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ অন্ধকার হইল! গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—শুনছি তো! আমার অনুমতি নেওয়া বোধ হয় তারা উচিত মনে করেনি!

গোস্বামী সাহেব সাড়া দিলেন না।

অনিল এতক্ষণ টোষ্ট চিবাইতেছিল। সেটা শেষ হইতে কহিল,—না, ভেবেছে, এখনি তো ফিরবে।

—তা হোক অনিল। আমি যখন আছি, বাড়ীর মাথা—তখন মুহূর্ত্তের জন্য হোক, অনেক ক্ষণের জন্যই হোক, সকল কাজেই আমায় অনুমতি নেওয়া,—আমায় জানানো প্রয়োজন।

গূঢ় ক্রোধের আভাসে মিসেস্ গোস্বামীর স্বর অত্যন্ত গম্ভীর। অনিল আর সাড়া দিল না। জননী স্নেহ দিতে যেমন কোমল, শাসন করিতেও তেমনি কঠিন, সে তা জানে। মনে মনে রত্নার জন্ম সে শঙ্কিত হইল। রত্না জননীর স্নেহের দিকটাই দেখিয়াছে; তাঁহার কঠোরতার দিক তার সম্পূর্ণ অপরিচিত! তাই এত বড় ভুল সে স্পর্দ্ধার মত করিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু বিস্ময় সেখানে নয়। অনিলের আশ্চর্য্য ঠেকিতেছিল অগ্রজের আচরণ। এ যেন অদ্ভুত হেঁয়ালি! মনে মনে চিন্তা করিয়া অনিল তাহার মর্ম্ম অবগত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। জ্যেষ্ঠ কিশোর-কাল হইতে ধীর-প্রকৃতি। অনিলের বাচালতায় কত দিন বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছে। নিয়মানুবর্ত্তিতার ভক্ত! স্বেচ্ছাচারিতা তার দু' চোখের বিষ! তাহার পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইল সকলের অজ্ঞাতে রত্নাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হওয়া! অনিলের অবিদিত নয়, কত কুমারী জ্যেষ্ঠকে পাইবার জন্ম লালায়িত হইয়া শেষে নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ হইয়াছে। অনিল নিঃসংশয়ে জানে, চপলতাই ছিল ভ্রাতাকে পাইবার পথে বিশেষ অন্তরায়। কল্পনার প্রচেষ্টা হয়তো এমনি বিপত্তিতে টুটিয়া এক দিন খান-খান হইয়া যাইবে! সেই মানুষ রত্নার কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত অভাবিত জটিল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল কি করিয়া? কেন?

সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মিষ্টার গোস্বামী পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—এবার বণ্টু এলে বলে দেবো স্পর্শমণিটিকে দ্যাখো! ইনি আমাকে যেমন একেবারে বদল করে নিয়েছেন, তেমনি তোমার মেয়েকে নিজের বলে চিনতে পারবে না! বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখের আঁধার ফিকা হইয়া আসিলেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল না! মিষ্টার গোস্বামী বুঝিলেন, ভার্য্যার মনে ওই যে স্ফুলিঙ্গ রহিল, ইহাকে নিঃশেষে নির্ব্বাপিত না করিতে পারিলে বেচারী মেয়েটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

মিষ্টার গোস্বামী প্রশংসিত কণ্ঠে কহিলেন,—এ তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা লীলা! আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না, প্রথমে যে রত্নাকে দেখেছিলুম,—এত অল্প দিনে সে এমন হবে! কি রকম জড়সড় লাজুক ছিল। প্রথম তুমি যে দিন ওকে নাচ শেখাতে গেলে, আমি কিছু না বললেও মনে মনে ভেবেছিলুম, নিজের পাগলামী তুমি বুঝতে পারবে! কিন্তু এখন—

মিসেস্ গোস্বামীর মুখে এতক্ষণে সকালের মেঘহীন আকাশের আলো ঝল্-মলানির মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কৌতুক কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—এখন—কি?

—এখন—এখন অবাক্ হয়ে যাই! তাক লেগে যায়—সেই রত্না এই উর্ব্বশী সেজে আমার বন্ধুদের অবাক্ করে দেবে, এ বিশ্বাস আমি রাখি। তাই আনন্দ হয়, গর্ব্ব বোধ করি তোমার হাতে গড়া জিনিষ বলে! তাই তো বণ্টুকে অত করে নিমন্ত্রণ করলুম!

বেয়ারা ট্রেতে করিয়া ডাকের চিঠিগুলা আনিয়া মিসেস্ গোস্বামীর সম্মুখে ধরিল!

মিসেস্ গোস্বামী সকলের চিঠি বিলি করিতেন। অনিলের চিঠি তাহার হাতে দিয়া আর একখানা তুলিয়া কহিলেন,—এ তো হরিপালের ছাপ! রত্নার চিঠি। তার ঘরে দিয়ে এসো। এই নাও তোমার হরিপালের চিঠি! এখানা আমার মধুপুরের। বলিয়া বাকী চিঠিগুলা হাকিম সাহেবের কামরায় রাখিয়া আসিতে বেয়ারাকে আদেশ করিলেন।

পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া নিজের চিঠিখানা খুলিয়া তাহাতে দৃষ্টি বুলাইয়া গোস্বামী হাস্য করিলেন। কহিলেন,—বণ্টুর চিঠি! সে-দিন সে আসতে পারবে না। তার ইস্কুল ইনস্পেক্‌সনে আসবে! তাই মাপ চেয়েছে।

উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্নার কথা কি লিখেছেন? তার থিয়েটার করা সম্বন্ধে?

—হ্যাঁ গো, ফুল পারমিসন্! মিসেস্ গোস্বামীর বিবেচনার উপর তার পরিপূর্ণ আস্থা! কন্যা সম্বন্ধে উর্ব্বশী সাজার অনুমতি দিয়েছে! আর তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যে, তুমি তার কন্যাকে নৃত্যে এতখানি পারদর্শী করেছো বলে। রত্নার মাও তোমায় তাঁর আন্তরিক আনন্দ জানিয়েছেন।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ওদের বাড়ীতে হয়তো হৈ হৈ পড়ে গেছে। পাড়া-গাঁ তো!

—তা আর বলতে! পুকুর-ঘাটে হয়তো ঝগড়াই বেধে গেল!

মা হাসিলেন, কহিলেন,—ঝগড়া কি রে? সেখানে হয়তো কত ঘোঁট হচ্ছে,—মেয়ে খৃষ্টানী হলো বলে!

—তা হোক! কিন্তু তারা বলছে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে, তাই অত ফরফরানি। আঙুর ফল টক্ বলার মত ওরা আমাদের সহরের নিন্দা করে! এ আমি তোমায় বাজি রেখে বলতে পারি।

মা হাসিতে লাগিলেন।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—আমি অফিস্-কামরায় চললুম।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের সভায় উপস্থিত থেকো।

—থাকতে পারি। কিন্তু বণ্টু যখন আসেনি, তখন তোমাদের নারদ, ভরত হতে রাজি নই!

মিসেস্ গোস্বামী হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—না গো না, তোমাদের বন্ধু-যুগলকে আমি বনমানুষ সাজাচ্ছি না! আমি দর্শক হিসাবে নিমন্ত্রণ করছি।

—অল্ রাইট! এখন আমি চল্লুম। বলিয়া গোস্বামী সাহেব প্রস্থান করিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী ঘড়ির দিকে চাহিলেন। কহিলেন,—সাড়ে সাতটা বাজলো, এখন তারা ফিরলো না।

যে মেঘখানা হাস্যালাপের সুবাতাসে অন্তর্হিত হইয়াছিল, আবার তাহা ঘনায়মান হইল। গুমোট সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখিয়া ত্রস্তে অনিল কহিল,—রত্নার সব নতুন কি না, তাই ওকে নিয়ে বেড়াতে গেলে আনন্দ পাওয়া যায়! বোধ হয়, ফিরতে তাই দেরী হচ্ছে!

অপ্রসন্ন মুখে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—সেই জন্মই রত্নাকে আমি বিশেষ কিছু বলি না! কিন্তু আজকের আচরণটা তার শুধু বাড়াবাড়ি নয়, গর্হিত, এ তোমার স্বীকার করতে হবে।

—না, তাতে আমি 'না' বলছি না। বলছি, পাড়াগেঁয়ে বুনো মেয়ে ও অত এটিকেটের ধার ধারে না! ওর সৌভাগ্যই ওকে তোমার স্নেহচ্ছায়ায় এনেছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—মেয়েটার বিয়ে যদি একটা বড় ঘরে দিতে পারি !

অনিল চুপ করিয়া রহিল।

মিসেস্ গোস্বামী একটু নীরব থাকিয়া কহিলেন,—আমার ইচ্ছে থাকলে কি হবে! ওর বাপ যে বড্ড পাড়া-গেঁয়ে! বড় ঘরের ছেলেরা শ্বশুর-বাড়ীর একটা পোজিসন্ খোজে। এই ছাখো না, আমি যখন তোমাদের বিয়ে দেবো, তখন আমার সমকক্ষ ঘরই খুঁজবো! শুধু রূপ দেখলেই তো চলবে না!

—কিন্তু মা, রূপের সঙ্গে যে সবলকার সব থাকবে, তা তো হতে পারে না।

—তা না হতে পারে। তবে একটা পরিচয়ের কামনা সকলেই করে। দু'টো হাই-ফ্যামিলির সঙ্গে নিকট না হোক, দূর কনেক্সন আছে, লোকে দেখতে চায়।

—তা বটে! বলিয়া অনিল অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন—এই কল্পনাকেই ছাখো। রত্নার চেয়ে ওকে দেখতে ঢের নীরেস। যার চোখ আছে, সেই স্বীকার করবে। কিন্তু তা বললে কি হয়,—ওর বাপ ছিল স্যার—হাইকোর্টের জজ! ভাই ম্যাজিষ্ট্রেট! ওর পরিচয়ই আলাদা। জানা শোনা, মেলা-মেশা সে গুর ঢের বেশী। আমি রত্নাকে সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মানলেও ইন্দ্রাণীর পার্টটা কল্পনাকে দেওয়াই উচিত বিবেচনা করলুম! তুমি কি বলো?

নীরস সুরে অনিল কহিল—না, ও কিছু খারাপ পার্ট করেনি!

টেলিফোন বাজিল।

আরদালী আসিয়া জানাইল, চ্যাটার্জ্জি মিসিবাবা, হাকিম সাহেবকো সেলাম ভেজা।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অনিল, তুমি বলোগে অমিয় বাড়ী নেই।

অনিল গিয়া কল্পনাকে জানাইল,—দাদা প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

কল্পনা প্রশ্ন করিল,—কতক্ষণ?

অনিল উত্তর দিল,—ঠিক জানি না। ঘুম থেকে উঠে তাকে দেখিনি।

—আচ্ছা। অনুগ্রহ করে রত্নাকে একবার ডেকে দিন্।

অনিল কহিল,—সে-ও নেই।

—সে কোথায় গেল? ঘুম থেকে উঠে তাকেও দেখেননি?

অনিল কহিল,—না! সে-ও দাদার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

বিদ্রূপের সুরে কল্পনা উত্তর দিল—ওঃ! আচ্ছা, আপনি তাহলে এখন একা?

—না, মার সঙ্গে গল্প করছিলুম।

মাসীমা! আচ্ছা, তাঁকে বলবেন—আজ আমার যেতে দশ মিনিট লেট হবে। তিনি রাগ না করেন।

বেশ। আর কিছু বলবার আছে?

'না' বলিয়া কৌতুক কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—দেবরাজ, আসি তবে, বিদায়, নমস্কার।

সহাস্যে অনিল কহিল,—আশীর্ব্বাদ দিলাম ইন্দ্রাণি! যাত্রা হোক শুভ তব।

২০

সন্ধ্যার আসরে সকলে সম্মিলিত। বড় হল-ঘরে সভা বসিয়াছে। ঘর যেন গম্-গম্ করিতেছে। নাটকের আজ পূর্ব্বাভিনয়-রাত্রি! বিচারকের আসনে গোস্বামী সাহেব তাঁহার দুই অন্তরঙ্গকে লইয়া বসিয়াছেন! নাটকের দোষগুণ, ত্রুটি, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যোগ্যতার আজ পরীক্ষা।

অনিলের পরিচালিত যন্ত্রি-সঙ্ঘের একতান থামিল।

যবনিকা উত্তোলিত হইল। ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী বেশে কল্পনা ও অনিল রাজসভায় প্রবেশ করিলেন।

তাহাদের চিন্তা, কথা, সখীদের নাচগান একে একে শেষ হইল! গোস্বামী সাহেব তারিফ করিলেন,—কল্পনার পার্ট সুন্দর হয়েছে।

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন,—মিসেস্ গোস্বামী চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন।

এবার অপ্সরাদের নৃত্যগীত। মিষ্টার গোস্বামী সপ্রশংস নেত্রে পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—আমি যদি একটা থিয়েটারের ব্যবসা করতুম, তোমাকে ডিরেক্টর করতুম।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তাঁহার পরিচালনায় যে নাটক অভিনীত হইতেছে, তাহার মনোরম বৈশিষ্ট্য সকলের মনোহরণ করিতে পারিবে, এই উপলব্ধি গর্ব্বের মত তাঁহার অন্তরকে স্ফীত করিয়া তুলিতেছিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—'ষ্টেটসম্যানের' ফটোগ্রাফারকে এনে রাখবার ব্যবস্থা করেছি আমি।

মিষ্টার গোস্বামী হাসিলেন।

মিষ্টার বাকৃচি নিজের কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, —বয়েস থাকলে আমিও এ অভিনয়ে যোগ দিতুম।

গোস্বামী সাহেব হাসিয়া উঠিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী সহাস্যে কহিলেন,—বেশ তো, আসুন না! আপনাকে বেছে একটা পার্ট আমি দিচ্ছি।

মিষ্টার গ্যাংলি কহিলেন,—অষ্টাবক্রের পার্ট যদি থাকে বাকৃচিকে দিন। আমি গ্যারাণ্টি, বাকৃচি সাকসেসফুলি প্লে করবে।

আবার একটা হাসির তুফান উঠিল।

মিষ্টার বাকৃচি কহিলেন,—গ্যাংলি, তুমি আমার গাউট আর সায়েটিকা নিয়ে ঠাট্টা করছো! শীত পড়ার সঙ্গে রোগটা বেড়েছে, কিছু বলতে পাচ্ছি না। তবে অক্সফোর্ডে যখন পড়তুম, হ্যাঁ, নাচ তখন কিছু কিছু শিখেছিলুম বৈ-কি! ওদিকে সখ ছিল। মামার এ পক্ষে নেহাৎ ছেলে হোয়ে পড়লো। কে জানে, আদিম মামী ফস্ করে মরে যাবে, মামা পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার ভাগ্যবান হবেন! পুত্রমুখ দর্শন করবেন!

মিষ্টার গোস্বামী কহিলেন,—তার পর?

—তার পর চিঠিতে এই শুভ সংবাদ পেয়ে "পুনর্মূষিকো ভব"র মত নাক-কাণ বুজে পি, এইচ, ডি, পাশ করে ফিরতে হলো। অন্ন-চেষ্টা আছে তো!

গ্যাংলি কহিলেন,—তার পর সারাজীবন গরু ঠ্যাঙাচ্ছ!

—যা বলেছ! আজ-কাল আবার শুধু ছাত্র নয়! ছাত্রীরাও আক্রমণ করেন। বিশেষ এগজামিনের পর। সে কি ঘোরাঘুরি! জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—না, সে রকমে আমি প্রশ্রয় দিই না।

গ্যাংলি কহিলেন,—অর্জ্জুনের পার্ট তো কুমিল্লার ভাগ্য-বিধাতা করবেন?

—হ্যাঁ, সব্যসাচীর পার্টে অমিকেই আমি বেশী পছন্দ করি।

সহাস্যে অমিয় কহিল—আমার কিন্তু বিশেষ আপত্তি ছিল। ও শাপ গাল খেতে আমি রাজি নই। তাকে মিথ্যা বুঝে কি নাস্তানাবুদই করলে, ওঃ, একেবারে টেরিবল্!

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তুমি পার্ট বদলে নাওনি কেন?

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অমি মুখে যাই বলুক, অর্জ্জুনের পার্টেই ওকে মানায় ভালো। করেও চমৎকার। নাও, অমি উঠে পড়ো!

মিষ্টার বাক্‌চি কহিলেন,—হ্যাঁ, প্রচণ্ড বিক্রমে স্বর্গপুরী আক্রমণকারী অসুরকে নিপাত করো। ভালো, আপনাদের ইন্দ্রাণী কিন্তু চমৎকার হয়েছে!

কল্পনার পানে স্নেহ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—হ্যাঁ, এক জন ট্যালেণ্টেড্ এ্যাকট্রেশ! বলিয়া তিনি পরিচয় দিলেন,—ও আমাদের সুশীলের বোন।

—কে সুশীল? রায়পুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সুশীল চ্যাটার্জ্জী? মিষ্টার বাক্‌চি প্রশ্ন করিলেন।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—হাঁ! অমিয়র বিশেষ বন্ধু। আমাদের ছেলের মত।

গ্যাংলি কহিলেন,—মিস্ চ্যাটার্জ্জিকে 'দেবযানী' প্লে করতে আমি দেখতে গিয়েছিলুম।

মৃদু হাস্যে কল্পনা উত্তর দিল,—হ্যাঁ! এম্পায়ারে আমরা শকুন্তলা অভিনয় করেছিলুম।

মিষ্টার বাক্‌চি কহিলেন,—আমি তখন মুসৌরিতে! কাগজে খুব সুখ্যাতি পড়েছিলুম বটে।

গ্যাংলি কহিলেন,—ও, সেই জন্যে আপনার অভিনয় এত ভালো হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের গ্রুপে আপনিই হচ্ছেন বেষ্ট।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—অনিলও ইন্দ্রের ভূমিকা বেশ করেছে।

হ্যাঁ, প্রশংসাযোগ্য বটে! আমি দেবযানীর গানের সুখ্যাতি করছি।

মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, চিত্রলেখার ভূমিকায় যাহারা নামিয়াছিল, মিসেস্ গোস্বামী তাঁহার সেই ছাত্রীদের পরিচয় করিয়া দিলেন।

আবার ইন্দ্রের সভা। মন্ত্রণা-বৈঠক। ভরত মুনি। নারদ মুনি সব বসিয়াছেন। গভীর গবেষণা হইতেছে, পার্থ ধনুর্দ্ধরকে কেমন করিয়া কি ভাবে স্বর্গে অভিনন্দিত করা হইবে।

গ্যাংলি পুলকিত কণ্ঠে কহিলেন,—মিসেস্ গোস্বামীর পরিচালনা করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। আমার মনে হচ্ছে, যাকে যে পার্ট দিয়েছেন, সে যেন তার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। আচ্ছা, উর্ব্বশী কাকে দেছেন?

—সে আমাদের জানা একটি মেয়ে।

মিষ্টার গোস্বামী সচকিতে কহিলেন,—কৈ? রম্ভা কোথায়? বলিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, সকলের পিছনে দূরে একটা কোণে চুপ করিয়া রম্ভা বসিয়া আছে। কমল মুখে ক্ষুণ্ণতার অতি সূক্ষ্ম ছায়া যেন জড়াইয়া আছে!

মিষ্টার গোস্বামী স্নেহ কণ্ঠে ডাকিলেন,—রম্ভা লক্ষ্মী,—

মিসেস্ গোস্বামী স্বামীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাহিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন,—ও কি, রম্ভা, তুমি অত পিছনে বসেছো কেন? বলিয়া সহাস্যে স্বামীর বন্ধুদের পানে চাহিয়া কহিলেন,—ওর সবে এই হাতে-খড়ি!

মিষ্টার বাক্‌চি কহিলেন,—এত-বড় একটি ভূমিকা দিচ্ছেন!

গোস্বামী সাহেব উত্তর দিলেন,—হাঁ, প্রথম হলেও রম্ভার উপর মিসেস্ গোস্বামীর বিশ্বাস অনেকখানি। কথাগুলা অতি সাধারণ, কিন্তু তাঁহার উচ্চারণের প্রত্যেক শব্দে তিনি এমন জোর দিলেন যে, ইহা লইয়া কেহ আর প্রতিবাদ করিল না।

কল্পনা একেবারে অমিয়র পাশে নিজের আসন লইয়াছিল। কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া অমিয়র কাণে বলিল,—রম্ভার সৌভাগ্য, মিষ্টার গোস্বামী অবধি তার তরফে আছেন।

ঈষৎ হাস্যে তেমনি মৃদু কণ্ঠে অমিয় উত্তর দিল,—হাঁ, আমিও তাই কামনা করি!

অমিয় বা কল্পনার কোন বাণীই রম্ভার কাণে পৌছাইল না। দূর হইতে নির্নিমেষ নয়নে সে শুধু উভয়কে দেখিতেছিল।

মিসেস্ গোস্বামীর আহ্বানে রম্ভা উঠিয়া মন্থর গতিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সকলের বিস্মিত দৃষ্টি নিপতিত হইল রম্ভার উপর।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, ফাল্গুনী তোমরা যে যার জায়গায় গিয়ে বসো।

সভাসদ যে যার আসন গ্রহণ করিল। এবার উর্ব্বশীর নৃত্য আরম্ভ হইবে।

রম্ভা চাহিয়া দেখিল, কল্পনার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইল অনিল।

কল্পনার বাঁ দিক্‌কার আসন অধিকার করিয়া বসিল—অমিয়।

একতান আরম্ভ হইল। এবং তাহা থামিতেই ইন্দ্রাণী পার্থের পরিতোষের জন্য উর্ব্বশীকে নৃত্য করিতে আদেশ দিলেন।

কল্পনা রাজ্ঞী, রম্ভা তাহার সভা-নর্ত্তকী।

হঠাৎ রম্ভার মাথার মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। নাক, কাণ দিয়া যেন প্রচণ্ড উত্তাপ বাহির হইতে লাগিল। কঠোর আয়াসে আত্মদমন করিয়া সে গান আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহার কোকিল-কণ্ঠের সুমিষ্ট সুর কেবলই জড়িমা-যুক্ত হইতে লাগিল। সে স্বচ্ছ উচ্ছ্বাস-ধারা যেন উপলখণ্ডে প্রতিহত।

নৃত্যে রম্ভা ছন্দ হারাইল। তাল, লয় কেবলই কাটিতে লাগিল। দর্শকদের চোখে প্রতিপদে তাহার ত্রুটি সুস্পষ্ট হইতে লাগিল।

পার্থের আসনে বসিয়া অমিয় বিস্মিত দৃষ্টিতে রম্ভার পানে চাহিল। অনিল বিমূঢ়! মিসেস্ গোস্বামীর মুখ অন্ধকার! মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে বিদ্যুতের মত থমকিয়া থমকিয়া তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইতে লাগিল। কল্পনার ওষ্ঠপুটে হাসি।

ঘরে সকল প্রাণীর মুখেই পরিবর্ত্তনের রেখা। ভাবান্তর ঘটিল না শুধু মিষ্টার গোস্বামীর প্রশান্ত মুখে। স্নেহ-কোমল চক্ষেই তিনি রম্ভার ভুলচুক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দৃষ্টি তাঁহার প্রসন্ন

উর্ব্বশীর নৃত্য শেষ হইতে মিসেস্ গোস্বামী ঘোষণা করিলেন,—পার্ট বদলাতে হবে।

সকলে উৎসুক নেত্রে মিসেস্ গোস্বামীর পানে চাহিল।

বাক্‌চি মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—এটা মেন্ পার্ট! এমন ফেলিয়োর! এক জন বেটারকে চাই!

মিসেস্ গোস্বামী আঁধার-মুখে কহিলেন,—হ্যাঁ, আমারই ভুল হয়েছে! যাক, আমি শুধরে নেবো!

কৃত্রিম সহানুভূতি ঢালিয়া কল্পনা বিলাতী মেমের কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া কহিল,—রত্নার বোধ হয় শরীর তেমন ভাল নেই। তাই আজ তেমন পারলো না। মাসিমা তো বলেন,—ও সকলের চেয়ে ভালোই করে।

অনিল উত্তর দিল,—মিথ্যে বলেন না।

লজ্জিত মুখে সঙ্কুচিত পদে রত্না যে সরিয়া গেল, অনিলের তাহা দৃষ্টি এড়াইল না। এতগুলা দৃষ্টির সম্মুখে এমন পরাভব হইলে মানুষ মরমে মরিয়া যায়! সে অনুভূতি অনিলের ছিল।

পিতার স্থায় অমিয়ও নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়াছিল। আজিকার অভিনয় রত্নার জন্ম ব্যর্থ হইয়া গেল! এ যেন আঘাতের মত তাহার বুকে বাজিতে লাগিল।

মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন,—কল্পনা—

সুমিষ্ট কণ্ঠে উত্তর হইল—মাসিমা—

—তোমার মাসিমার মেয়ে, না, কে, বলছিলে না—কি নাম তার?

কল্পনা কহিল,—পারুল মুখার্জ্জি! এ বছর বি-এ পাশ দেবে। বার-কয়েক সে পারফারমান্সে নেমেছে।

—তাকে চাই! কীর্ত্তন ইন্‌ষ্টিটিউটে। সে না গান করে—আমি নাম শুনেছি তার। বসন্ত-উৎসবে এম্পায়ারে নেমেছিল,—তাকে আনাতে পারবে?

হাসিয়া কল্পনা কহিল,—আপনি ডেকেছেন শুনলে সে ছুটে আসবে। আমায় তো সে দিনও বলছিল,—তোদের নাটকে আমায় একটা পার্ট দিলিনি!

—তবে তুমি আমার নাম করে তাকে ডাকো মা!

উৎসাহিত মুখে কল্পনা কহিল,—আপনি যদি বলেন, আমি এখনি আপনার নাম করে তাকে ফোন করতে পারি।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তাই করো।

গ্যাংলি কহিলেন,—আপনি কি মনে করেন, একটা দিনের মধ্যে মিস্ মুখার্জ্জি তাঁর ভূমিকা তৈরী করে নিতে পারবেন?

—নাও যদি পারে—তবু এ উর্ব্বশীর চেয়ে ভালো হবে। আমি চেহারার দিকে চেয়েই উর্ব্বশী নির্ব্বাচন করেছিলুম।

অমিয় প্রশ্ন করিল,—উর্ব্বশীর ভূমিকা থেকে রত্নাকে তুমি ক্যান্‌সেল করলে?

দৃঢ় কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—নিশ্চয়।

অমিয় নীরব রহিল।

অনিল কহিল,—একটা দিন মোটে মিস্ মুখার্জ্জি পাচ্ছেন, যদি তিনি ফেলিয়োর হন? তার চেয়ে রত্না খানিকটা তৈরী করেছে—ক'দিন তো করছে।

মিসেস্ গোস্বামী মাথা নাড়িলেন। কহিলেন,—তোমরা এখনও সে আশা করো! কিন্তু আমি রাখি না। এই ক'জন নতুন লোকের সামনে ওর যদি এই হয়, তাহলে সে-দিন অত লোকের সামনে কি হবে না, বলতে পারো?

কল্পনা কহিল,—সে একটা ভাবনার কথা।

—তুমি বলতো মা! বলিয়া তিনি কল্পনার পানে চাহিলেন। কহিলেন,—তোমাদের এ সব অভ্যাস আছে। রত্নার তো তা নয়। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে! এটুকু এরা বোঝে না।

অনিল প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—তবু তো একটা দিক্ নিখুঁত হবে, উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য!

বাক্‌চি অনিলের দিকে চাহিলেন,—এটা বিউটী একজিবিসন হচ্ছে? না, আর্টের বিচার? আচ্ছা, মিসেস্ গোস্বামী, আপনার সেট থেকে কাউকে উর্ব্বশী করুন না! তার পার্ট ওই মেয়েটিকে দিন। একটু অদল-বদল!

মিসেস্ গোস্বামী কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিলেন,—তাই করি। কিন্তু কল্পনা, তুমি মা তোমার পারুল বোনটিকে ফোন করো। কি বলো অমিয়? কথাটা বলিয়া পুত্রের সমর্থন লইতে গিয়া দেখিলেন, নির্ব্বিকার চিত্তে চেয়ারে হেলিয়া উর্দ্ধদিকে মুখ করিয়া অমিয় গৃহের শিলিংএর কারুকার্য্য দেখিতে অকস্মাৎ মনোযোগী হইয়াছে।

ব্যঙ্গ হাস্তে কল্পনা কহিল,—মিষ্টার গোস্বামী হঠাৎ এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা আয়ত্ত করতে চাইছেন না কি?

অমিয় মুখ ফিরাইল। কহিল,—ক্ষতি কি? মনটা সব সময় একটা কাজে জুড়ে রাখলে অন্ততঃ পাশের লোকগুলো একটু অব্যাহতি পায়।

কল্পনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। [ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

নারী

বাহিরে তোমারে যতখানি খাটো করি,
অন্তরে তুমি ততখানি বড় হও!
কণ্ঠ তোমার যত চেপে চেপে ধরি,
লেখনীর মুখে তত তুমি কথা কও।

ছোট করিবার ছলে ছোট হয়ে নিজে
ব্যর্থপ্রয়াসে মোরা যত উঠি রেগে,—
তব গরিমার সোনার মুকুটখানি
উজ্জ্বল রাগে শির তোলে কালো মেঘে!

হে নারি, তোমারে মলিন করার লোভে
এনেছিনু যত পথের ধূলা ও বালি—
এক কণা তার লাগিল না তব দেহে,
মোরা শুধু গায়ে মাখিলাম মিছে কালি!

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাঞ্চুরিয়া

এশিয়া-ভূখণ্ডে আজ রণচণ্ডীর যে এই মত্ত তাণ্ডব, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধকে উপলক্ষ করিয়াই এ তাণ্ডবের সূচনা! আগুন তখন প্রকাশ্যে তেমন না জ্বলিলেও আক্রোশের বহ্নি-ধূম মনে-মনে পুঞ্জিত হইতেছিল! বাহিরে সে-আগুন একেবারে প্রকাশ পায় নাই, এমন নয়! একটি সংগ্রামে উভয় পক্ষে তখন

মাঞ্চুরিয়া

এক লক্ষ সৈন্যেরও সমাবেশ হইয়াছিল; এবং সে-যুদ্ধে প্রায় আঠারো হাজার জাপানী হতাহত হয়।

এ সব বিরোধ-সংঘর্ষে তখন পৃথিবীর টনক নড়ে নাই। তার কারণ, জাপান এবং রাশিয়ার কোনো পক্ষেই রণ-মত্ততার তেমন হুঙ্কার-টঙ্কার ছিল না এবং এ বিরোধ ঘটিয়াছিল সুদূর মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে।

তার পর মাঞ্চুরিয়ার নাম নিখিলের চিত্ত-পটে সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিল। তখন সকলে বুঝিল, মাঞ্চুরিয়া লইয়া উভয় পক্ষের সংঘর্ষ সুনিশ্চিত। টোকিয়ো হইতে রাশিয়ার ভ্লাডিভস্টক পৌছিতে বিমান-পথে সময় লাগে তিন ঘণ্টা। ভ্লাডিভস্টক-দুর্গ সুরক্ষিত এবং তার পিছনে সোভিয়েট-ফৌজের প্রবল শক্তি উদ্যত, এ জন্য জাপানের মনে সব-সময়েই ভীষণ আতঙ্ক! এ আতঙ্ক দূর করিতে না পারিলে জাপান বুঝিতেছিল, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে তার স্বস্তির আশা নাই! ঐ ভ্লাডিভস্টক হইতে যে-কোনো মুহূর্ত্তে মার্কিণ বমার আসিয়া জাপানকে বিধ্বস্ত করিতে পারে, মার্কিণ-ফৌজও মাধুবিয়ায় জড়ো হইতে পারে জাপানের ধ্বংস-সাধনকল্পে!

ভ্লাডিভস্টকের আতঙ্ক দূর করিতে জাপানকে মাঞ্চুরিয়া লইতেই হইবে। মাঞ্চুরিয়া হস্তগত হইলে ভ্লাডিভস্টকের পিছনে যে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলোয়ে-লাইন, সে লাইন চূর্ণ করিয়া য়ুরোপীয়-রাশিয়া হইতে এশিয়াটিক-রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাকে অনেকখানি দুর্ব্বল করা যাইবে—এই উদ্দেশ্য লইয়া জাপানের কোয়ানতাং ফৌজকে নেপথ্যে মাঞ্চুরিয়া-বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করিতে জাপানের ত্রুটি ছিল না।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাকলে প্রথম যে কয়টি যুদ্ধ হয়—জলে এবং অন্তরীক্ষে—সে সব যুদ্ধে জাপান হইতে ফৌজের পর ফৌজ আসিয়াছে—মাঞ্চুরিয়া হইতে আসে নাই।

কোয়ানতাং ফৌজ আসে নাই—সে ফৌজ ছিল স্বতন্ত্র। জাপানের কোয়ানতাং ফৌজ—যাহাকে বলে একেবারে বাছাই-করা দল। তাদের অস্ত্রশস্ত্রাদিও একেবারে সর্ব্বোত্তম শ্রেণীর। তার উপর এই কোয়ানতাং ফৌজ শুধু সামরিক কলা-কৌশলেই অভিজ্ঞ নয়; তাদের রাজ-নৈতিক কুশলতাও অনন্যসাধারণ। কোয়ানতাং ফৌজ শুধু যে আজ মাঞ্চুরিয়া শাসন করিতেছে তা নয়, টোকিও গভর্ণমেন্টে আজ তারাই সর্ব্বেসর্ব্বা।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হিডেকি টোজো এই কোয়ানতাং ফৌজ-দলভুক্ত। তাঁর সচিব ও পরামর্শদাতারাও কোয়ানতাং ফৌজ দলে পদস্থ কর্ম্মচারী। ইহারাই আজ জাপানের রাজনীতি পরিচালনা করিতেছেন। জাপানের কোনো ব্যাপারে জন-সাধারণের কোনো অধিকার বা শক্তি নাই। সামরিক দল লইয়াই জাপানের ক্যাবিনেট

বা মন্ত্রিসভা সংগঠিত। জাপানের যিনি সর্ব্বময় সম্রাট্, তিনি নামেই সম্রাট্! আসলে তিনি শুধু এই সামরিক দলের রবার-ষ্ট্যাম্প বা শীলমোহর!

প্রাচ্য জগতে জাপান যে এই বিরাট্ ধ্বংস-যুদ্ধ ফাঁদিয়াছে, সে যুদ্ধের ব্যবস্থাপকও ঐ কোয়ানতাং ফৌজ।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান-গভর্ণমেণ্টের সম্মতি না লইয়া গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোয়ানতাং দলের তরুণ কর্ম্মচারীরা মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে; চীনের অধিকার হইতে মাঞ্চুরিয়াকে জাপান কাড়িয়া লয়; কাড়িয়া মাঞ্চুরিয়া নাম কাটিয়া নূতন নাম-করণ করে মাঞ্চুকুয়ো।

মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া এখানে তারা সামরিক ঘাঁটী নির্ম্মাণে উদ্যত হয়, সোভিয়েটকে এ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে।

এ কাজে জাপান এখনো বিলম্ব করিতেছে কেন? বিলম্বের কারণ, কোয়ানতাং দল এখন বুঝিয়াছে, সোভিয়েট-শক্তি সামান্য নয়। এই জন্যই তারা স্থির করে, দক্ষিণ-এশিয়া সুরক্ষিত নয়; দক্ষিণ-এশিয়াকে পূর্ব্বে অধিকার করা চাই; তার পর হিটলার-কর্ত্তৃক রাশিয়া কতখানি খর্ব্ব হয়, জাপান তাহা দেখিবে। হিটলারের হাতে রাশিয়া খানিকটা হতবল হইলে তখন ইণ্ডীজের অজস্র তৈল ও খনির জোরে প্রচুর সামর্থ্য লাভ করিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিবে—ইহাই জাপানের অভিপ্রায়। জাপানের সে অভিপ্রায় কিয়দংশে সিদ্ধ হইয়াছে। মালয় এবং ইণ্ডীজ প্রদেশের ধাতু ও রাসায়নিক সম্পদ-সম্ভার আজ জাপানী ফ্যাক্টরিসমূহে ভারে-ভারে আসিয়া জমিতেছে এবং তাহা দিয়া অজস্র-ভাবে প্লেন, ট্যাঙ্ক, গুলীগোলা, বারুদ তৈয়ারী হইতেছে। জাপানের হাতে এখন এত লৌহ ও তৈলখনি যে, তাহার জোরে জাপান বহু বৎসর যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ হইবে!

এ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সূচনা-কালে উইলার্ড প্রাইস্ নামে এক জন মার্কিণ সুধী মাঞ্চুরিয়া-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। মুকদেনে এক দস্যু-সর্দ্দারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এ সর্দ্দারের বাস মাঞ্চুরিয়ায়। আমেরিকায় তিনি শিক্ষালাভ করেন। আইনের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া মাঞ্চুরিয়ায় ফিরিয়া তিনি আইনের ব্যবসা আরম্ভ করেন। কিন্তু পশার হইল না বলিয়া পয়সার জন্য ডাকাতের দল খুলিয়া সে-দলের তিনি সর্দ্দার হন। তাঁর দৌরাত্ম্যে গবর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁকে ভালো চাকরি দিয়া বশীভূত করিয়াছে।

প্রাইস সাহেবকে সে ভদ্রলোক মাঞ্চুরিয়ার যে ইতিবৃত্ত শুনাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম যেমন বিচিত্র তেমনি মনোরম।

খৃষ্ট-জন্মের পূর্ব্ব হইতেই মাঞ্চুরিয়ার বুকে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। তার পর ৯০৭ খৃষ্টাব্দে খিতান জাতি আসিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে। খিতান-জাতি উত্তর-চীনে

চীনা বাজির দোকান—মুকদেন

জাপানী ফৌজ চলিয়াছে দস্যু-দলনে—মুকদেন রেল-ষ্টেশন
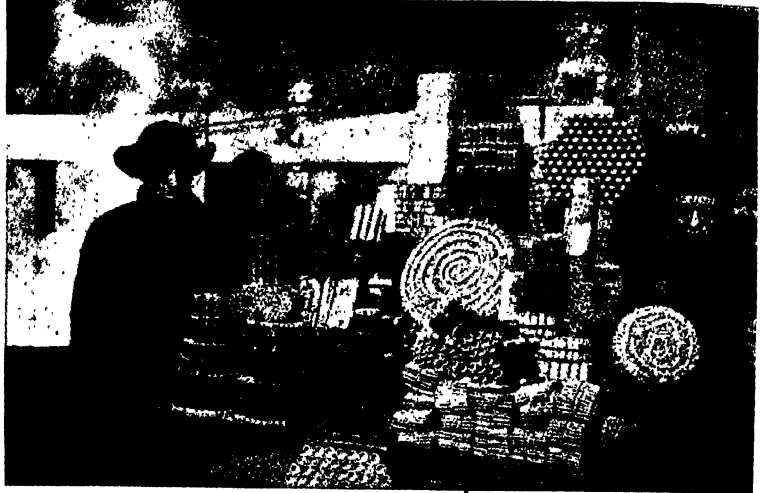
রাজ্য এবং রাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। ১১১৫ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ার সামরিক জুটিন জাতি খিতান বংশের উচ্ছেদ করিয়া মাঞ্চুরিয়ার স্বর্ণ-বংশ (Golden Dynasty) প্রতিষ্ঠা করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিশ খান্ আসিয়া চীন আক্রমণ করে এবং তাহার হাতে স্বর্ণ-বংশের বিলোপ সংসাধিত হয়। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে নুর হাচু নামে এক দুর্দ্ধর্ষ বীর আসিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করেন।

মাঞ্চুরিয়া অধিকারের পর তিনি চীনের সিংহাসন লাভে অভিলাষী হন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বীর নুর হাচুর পৌত্র বসেন চীন সম্রাট্ হইয়া চীনের সিংহাসনে। তিনিই মাঞ্চুরিয়ার আধুনিক মাঞ্চু-বংশের আদিপুরুষ।

হার্বিন রেলোয়ে-ষ্টেশন

কাগজের ঘোড়া-গরু—চিনচৌয়ের মাঞ্চুরা মৃতদেহের সঙ্গে চিতাগ্নিতে জ্বালায়

ও-দিকে রাশিয়া তখন সাইবেরিয়া গ্রাস করিতেছিল। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে আসিয়া রাশিয়া দেখিল, বরফে সব জমিয়া আছে! সাগর-কূলে বন্দরের সন্ধানে অগ্রসর হইয়া তারা শেষে মাঞ্চুরিয়ায় আসিয়া পৌছিল।

মাঞ্চুরিয়ার উপর জাপানেরও ক্রমে লক্ষ্য পড়িল। এত কাছে শক্তিমান্ রাশিয়া আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছে, ইহাতে জাপানের অমঙ্গল ঘটিতে পারে ভাবিয়া জাপানের অশান্তি এবং অস্বস্তির সীমা ছিল না। সে অস্বস্তি মোচনের জন্য ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়া-গ্রহণের উদ্দেশ্যে জাপান যুদ্ধে নামিল। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না; তবু জাপান বিরাম মানিল না। ১৯০৪-৫ এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নবোদ্যমে আবার মাঞ্চুরিয়া অভিযানের উদ্যোগ চলিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপানী অভিযান সফল হইল—মাঞ্চুরিয়া গেল জাপানের হাতে।

মাঞ্চু-সর্দার ভদ্রলোকটি বলেন, মাঞ্চুরিয়া আজ জাপানের অধিকারে সত্য—কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, কোনো বিজয়ী পক্ষই দীর্ঘ কাল মাঞ্চুরিয়া ভোগ করিতে পারে নাই। ফুট-বলের মতো মাঞ্চুরিয়াকে লইয়া জাপান, চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধ-ক্রীড়ার বিরাম কোনো দিন ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না!"

অবিরাম এই যুদ্ধ-বিরোধ-বিগ্রহের ফলে মাঞ্চুরিয়ার অধিবাসীদের প্রকৃতি চিরদিন চঞ্চল রহিয়া গিয়াছে—তারা শ্রমশিল্পে বিমুখ; মতি-স্থৈর্য্যও তাহাদের অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। মাঞ্চু জাতির প্রকৃতিতে দস্যুর উদ্দামতা তাই খুব বেশী লক্ষিত হয়।

লেখক বলিতেছেন, মাঞ্চুরিয়ায় যত দস্যুর বাস, পৃথিবীর আর কোনো প্রদেশে এমন নয়! এ দস্যুতার উচ্ছেদকল্পে জাপানী গবর্ণমেণ্ট প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে—তবু সে চেষ্টা সফল হইতেছে না। এ-অঞ্চলে যদি দস্যুতা ঘুচিল তো ও-অঞ্চলে তার প্রাদুর্ভাব! ঢাকা দিলে ফুটন্ত জলকে যেমন স্থির রাখা যায় না, মাঞ্চু জাতির উদ্দাম প্রকৃতিকেও তেমনি কাহারো সাধ্য নাই, স্থির বা শান্ত রাখিবে!

মাঞ্চুরিয়ার কৃষকের দল ক্ষেত-খামার বা ফশল সম্বন্ধে কখনো নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। তাদের বিশ্বাস, ফশল যেমন ফলিবে, তখনি হয় ডাকাতে তাহা লুটিয়া লইয়া যাইবে, নয়তো যুদ্ধ-বিগ্রহে ক্ষেত হইবে কুরুক্ষেত্র এবং সমস্ত ফশল হইবে নষ্ট! এ জন্য কাজে তাদের নিষ্ঠার অভাব। সুযোগ পাইলে তারা দস্যুবৃত্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। চাষের কাজে মনোযোগী না হইয়া তারা তাই দস্যুদল গড়িয়া জীবিকার্জ্জনে মত্ত থাকে। যারা বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, তারাও দস্যুদলের সর্দ্দারী করিয়া জীবনাতিপাত করিতেছে। এক-এক দলে ডাকাতের সংখ্যা ২৫০০।৩০০০

দস্যু-দলনী-ফৌজ-বাহী ট্রেণ—এ-ট্রেণ ছদ্মবেশে পথ চলে
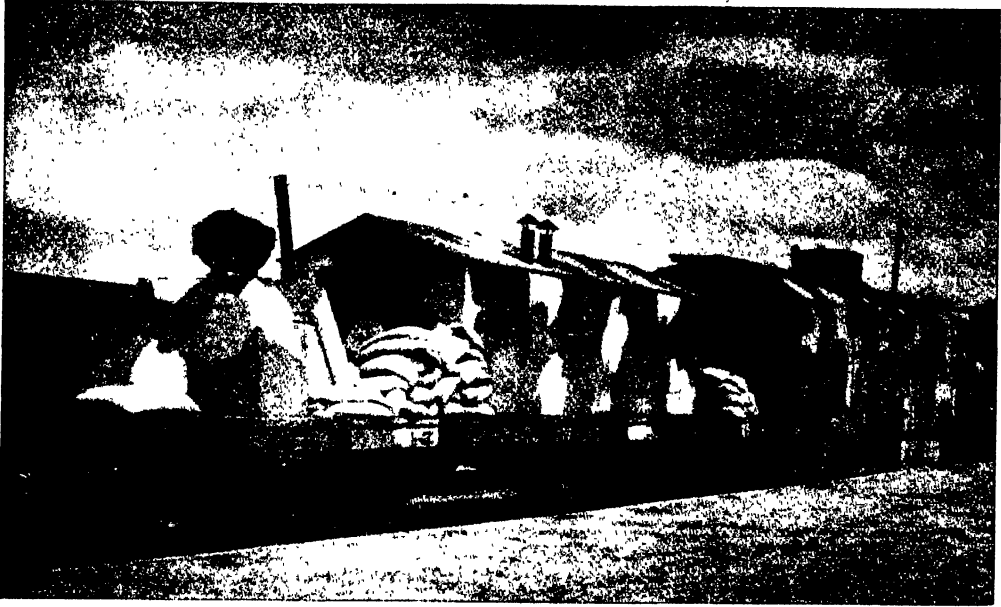
দস্যুদের মাঞ্চুরা বলে হুঙ্-হুংজু (Red Beards)। এখানকার আদিযুগের দস্যুরা না কি জাতে ছিল মাঞ্চুরিয়াবাসী কশাক; তাহারি জন্য ও-নামের সৃষ্টি। অনেকে বলেন, তা নয়! মুখে লাল দাড়ি আঁটিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হয় বলিয়াই এ-নামের উৎপত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চীনের শান-চুঙ এবং চিহ্‌লি হইতে বহু চীনা মাঞ্চুরিয়ায় বাস করিতে আসে। দস্যুতা ছিল সে সব চীনার জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন।

জাপানী শাসনের কঠিন চাপে দস্যুরা আজ প্রকাশ্য ভাবে ডাকাতি করিতে পারিতেছে না। তাই তারা পীপলস্ রেভলিউসনারি আর্মি; ন্যাশন্যাল স্যালভেশন আর্মি; কোরিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি

মোঙ্গোল-ফৌজের কেল্লা—হাইলার
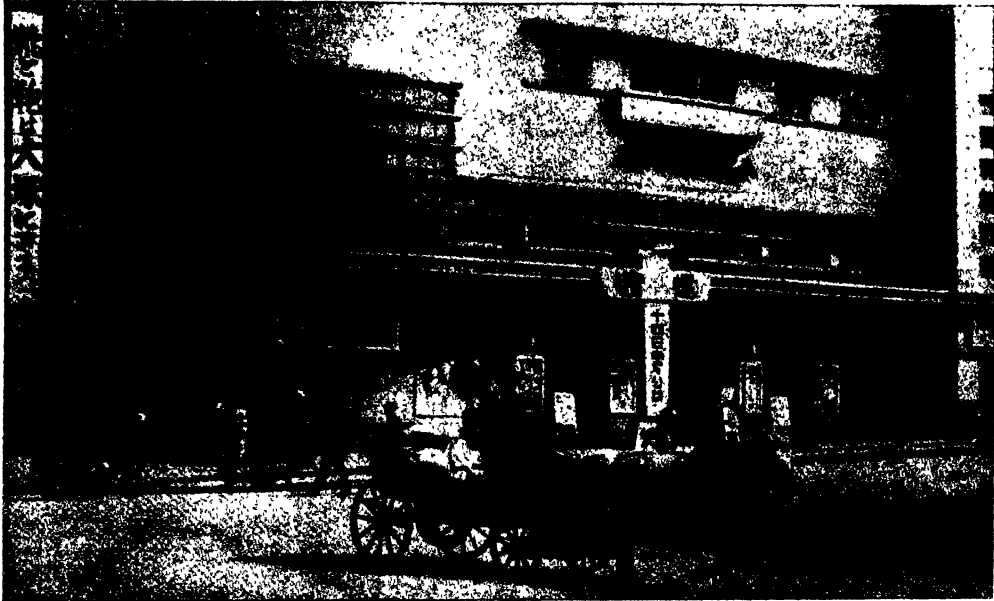
জাপানী টকি-হাউস—শিংকিং। এখানে শুধু চীনা ও জাপানী-ফিল্ম দেখানো হয়—মার্কিন-ফিল্ম নিষিদ্ধ

—এই সব নাম লইয়াছে এবং দস্যুতাকে বলিতেছে স্বাধীনতা-লাভের জন্য সংগ্রাম! দলের নাম যাহাই দিক, তাদের আসল কাজ দস্যুতা। আচারে-ব্যবহারে পশুর মত ইহারা নির্ম্মম নৃশংস। আজ জাপানী শাসনেও মাঞ্চুরিয়ায় পথিকের পক্ষে একাকী পথ চলা মোটে নিরাপদ নয়; প্রাণ হাতে লইয়া পথ চলিতে হয়। যেখানে পথ মাঠ বা জলার মধ্য দিয়া গিয়াছে, সে সব পথে দস্যুরা সব সময়ে ওৎ পাতিয়া আছে! পথিকের কাছ হইতে যাহা পায় তাহাই লুঠ করিবে। মাঞ্চুরিয়ায় এক-রকম ফশল হয়, তার নাম কাওলিয়াং। এই কাওলিয়াং মাথায় বাড়িয়া দশ-বারো হাত উঁচু হয়। কাজেই মাঠের কাওলিয়াং-ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া থাকা

মরু-ফৌজদলের মোঙ্গোল অশ্বারোহী

মোটে কঠিন নয়। জুন মাসে কাওলিয়াঙের ফশল অজস্র ভাবে বাড়িয়া ওঠে। জুন মাসে খুন ও লুঠের বহরও তাই বাড়িয়া ওঠে অসাধারণ রকম।

যারা বুদ্ধিমান, তাদের ডাকাতিতে বেশ একটু চাতুর্য্য আছে। পথিকের সঙ্গে অমায়িক ভাবে মিশিয়া তারা আলাপ করে; তার পর তাকে করে চায়ের নিমন্ত্রণ। সে নিমন্ত্রণ লইয়া পথিক যদি ডাকাতের সহগামী হয় তো বহু অলি-গলি ঘুরাইয়া তাকে আড্ডায় আনা হয়। সেখানে গল্প-গুজব, চা-পান এবং আলাপ-পরিচয় চলে। আলাপ-পরিচয়ে আসর বেশ জমিয়া ওঠে। জমিবামাত্র রুদ্র শাসনে সহসা আদেশ জারি হয়,—বাড়ীতে চিঠি লিখিয়া দাও—এত অর্থ চাই। এখনি! নহিলে তোমার বাড়ী ফেরা ঘটিবে না, শমন-সদনে গমন!

সাউথ-মাঞ্চুরিয়ান রেলে ট্রেণের কামরায় জাপানী যাত্রী—ট্রেণ-পরিচারিকার কাজ করে রুশ-রমণী

চিঠির উত্তরে টাকা যদি আসে তো পথিক পায় মুক্তি, নয় তাকে হত্যা করে।

লেখক লিখিতেছেন, আমি এক দিন খুব রক্ষা পাইয়াছিলাম! চাংচুঙ সহরের বাহিরে ই-তুঙ-সিয়েন গ্রাম। সেই গ্রামে যাইতেছিলাম। চাংচুঙ হইতে ই-তুঙ-সিয়েন ৩০ মাইল মাত্র দূরে। আমি চলিয়াছিলাম গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া। গ্রামে পৌঁছিয়া শুনিলাম, আগের দিনে সে পথ হইতে বহু যাত্রীকে ডাকাতরা ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমার বিপদ না ঘটিবার কারণ, ডাকাতরা সে-দিন কোথায় একখানা গ্রাম লুঠিতে গিয়াছিল। আমি যে-দিন গ্রামে পৌঁছিলাম, তার পরের দিন শুনিলাম, ডাকাত ধরিবার জন্য এক দল মাঞ্চুরিয়ান ফৌজ পাঠানো হইয়াছে। বৈকালে শুনিলাম, ফৌজ ফিরিয়া আসিয়াছে; তারা না কি আঠারো জন ডাকাতের মুণ্ড কাটিয়া আনিয়াছে! আদালতে তাদের আনা হইয়াছে। শুনিয়া আদালতে গেলাম ডাকাত দেখিতে। আদালতে চীনা ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁর পাশে এক জন জাপানী মন্ত্রী। মন্ত্রী বসিয়াছেন বিচার পরিদর্শন করিতে। টেবিলের উপর ১৮টি নরমুণ্ড। সম্মুখে এক দল সেনা।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রশ্ন করিলেন,—এগুলি ডাকাতদের শির?

ফৌজের ক্যাপটেন বলিল—হাঁ হুজুর।

জাপানী মন্ত্রীর পানে চাহিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—আমাদের সাহসী সেনাদল আঠারো জনের মুণ্ড কাটিয়াছে। বাকী ডাকাতগুলা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে।

জাপানী মন্ত্রীর এ কথা বিশ্বাস হইল না। তিনি তখন প্রশ্ন করিলেন ক্যাপটেনকে—ঠিক কথা বলিতেছ? এগুলা ডাকাতের মুণ্ড? গ্রামের মোড়লদের মুণ্ড নয়?

বেশ-বল্ খেলার গ্রাউণ্ড—দাইরেন্

ক্যাপটেন বলিল—না হুজুর।

জাপানী প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের মধ্যে ক'জন মারা গিয়াছে?

—এক জনও না।

জাপানী বলিলেন—তোমাদের গায়ে সামান্য চোটও নাই, অথচ আঠারো জন ডাকাতের শির কাটিয়াছ! ভয়ঙ্কর বীরত্ব! তোমাদের কামান-বন্দুক ছিল?

ক্যাপটেন বলিল—ছিল। দশটি কামান ছিল। তাছাড়া বন্দুক ছিল।

জাপানী। সে কামান-বন্দুক কৈ?

ক্যাপটেন। গুলীগোলা ফুরাইলে কামান-বন্দুক রাখিয়া দিই—দিয়া ছুরি হাতে আক্রমণ করিয়াছিলাম।

জাপানী প্রশ্ন করিলেন—ছুরি কৈ, দেখি?

ক্যাপটেন বলিল—ছুরি সঙ্গে আনি নাই হুজুর!

জাপানী বলিলেন—মিথ্যাবাদী! ডাকাত মারিবে কি, তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র তারা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে! লজ্জা ঢাকিতে তোমরা গ্রামের নিরীহ লোক মারিয়া তাদের শির আনিয়াছ! যাও সব ব্যারাকে। সামরিক আদালতে তোমাদের বিচার হইবে!

জাপানী মন্ত্রীটি পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আমাদের অসুবিধা কত, দেখিতেছেন তো! আমরা চাই এখানকার জনসাধারণের কল্যাণ। কিন্তু ইহারা পণ করিয়াছে, আমাদের সহযোগিতা করিবে না।

কথাটা সত্য। কারণ, যে সব চীনা বা মাঞ্চু কর্ম্মচারী আছে, তারা জাপানী গবর্ণমেণ্টের বেতন খাইলেও পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাছাড়া এই সব মাঞ্চু ডাকাত জাপানের বশ্যতা মানিতে

আইনভঙ্গ দস্যু-সর্দ্দার

চায় না। তারা জাপানের শত্রু। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে চীনা বা মাঞ্চু কর্ম্মচারীরা অঙ্গুলি তুলিবে না! এই সব ডাকাত এখন যে লুঠপাট করে, সে লুঠপাটের উদ্দেশ্য টাকা এবং অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে! এ-সব ডাকাত নিজেদের এখন ভলাণ্টিয়ার বলিয়া পরিচয় দেয়।

কাজেই জাপান যদি রাশিয়া আক্রমণ করিতে চায়, তাহা হইলে মাঞ্চুরিয়ান্ বা চীনাদের কাছ হইতে তিলমাত্র সাহায্য পাইবে না। মাঞ্চুরা জাপানের বিরুদ্ধাচরণ করিবেই। জাপানীরা তাহা ভালো করিয়া জানে। তাই তারা এখানকার লোকদের বলে, বেইমান! অকৃতজ্ঞ! মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীরা ভালো পথ-ঘাট রেল-লাইন প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া দিয়াছে; কৃষির উন্নতি করিতেছে; শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতেছে; এত সব উপকারের জন্য ইহাদের এতটুকু কৃতজ্ঞতা নাই!

এ প্রসঙ্গে লেখকের সহিত এক জন চীনা কর্ম্মচারীর আলোচনা হইয়াছিল। চীনা কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন,—জাপানের কত দরদ আমাদের উপর! ক্ষেতে ফশলের প্রাচুর্য্য—সে সব যায় জাপানীর ভোগে! খনি খুলিতেছে—তার সম্পদ যায় জাপানে! যাহা কিছু হোক্, খাটিয়া মরিব আমরা, আর তার ফল খাইবে জাপানী! আমাদের ভালো করিবার জন্য কি দরদ!

জাপান মাঞ্চুরিয়ায় পাইয়াছে কুবেরের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার। মাঞ্চুরিয়ার জন-সংখ্যা ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। ইহার মধ্যে কোরিয়ান, মোঙ্গোল, মাঞ্চু, রুশ এবং জাপানীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ; বাকী চীনা। ইহাদের দাস্যে নিযুক্ত করিয়া জাপান এখানে

জাপানী সেনার গরম-জলে স্নান

আজ কুবের-ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছে। মাঞ্চুরিয়া খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ। সে সব খনিতে খাটিয়া মরিতেছে চীনা ও মাঞ্চুরা! আর খনির লভ্যাংশ যাইতেছে জাপানী-জঠরে! মাঞ্চুরিয়ায় কয়লা মেলে সীমাহীন ভাবে। ফুশুনের কয়লা-খনি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিরাট্। তেমনি এখানে প্রচুর লৌহ আছে। তাছাড়া ম্যাগনেসাইট, শিলাজতু, বেলে পাথরও অজস্র পরিমাণে মিলিতেছে। এ-সবের জোরে জাপানের কল-কারখানা, তোপখানা আজ একেবারে সমৃদ্ধি-ভারে ভরিয়া উঠিয়াছে। মাঞ্চুরিয়ায় বড় বড় বন আছে—সেখানে কাঠ মেলে বিপুল ভাবে; এবং বেশ দামী ও ভালো কাঠ। পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়গুলি যেন খনিজ সম্পদের এক একটি তোষাখানা। তাছাড়া এখানে জমির উর্ব্বরতাও সীমাহীন।

মাঞ্চুরিয়ার বুক চিরিয়া লিয়া-ও নদী বহিয়া চলিয়াছে—এই নদীর স্নেহস্পর্শে এমন উর্ব্বরতা। শীতের সময় নদীর বুক বরফে ভরিয়া থাকে—'স্লেজ' গাড়ীতে করিয়া পারাপার ও মাল-চালানীর কাজ চলে।

মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া জাপানী কৃষি-জীবীদের আনিয়া এখানকার মাটীতে সোনা ফলাইবে, ইহাই ছিল জাপানের উদ্দেশ্য। কিন্তু জাপানের কৃষক-সম্প্রদায় দেশ ছাড়িয়া এখানে আসিতে চাহে না। সে জন্য মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের উপনিবেশ-স্থাপনার কল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। মাঞ্চুরিয়ায় যে সব জাপানী আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছে, তাদের মধ্যে এক দল মদগর্ব্ব-স্ফীত প্রভুত্বকামী; আর এক দল স্বার্থপর ভাগ্যান্বেষী। লঠ করিয়া উদর-পূর্ত্তি করাই সকলের উদ্দেশ্য।

মাঞ্চুরিয়ায় অসংখ্য জাপানী ল্যাবরেটরি খোলা হইয়াছে। সে সব ল্যাবরেটরিতে চলিয়াছে জমির পরীক্ষা, যোগ্য সার-তৈয়ারীর আয়োজন। মার্কিন হইতে জাপান তুলা লইত। কোনো দিন কোনো কারণে যদি সে-তুলায় টান পড়ে, তাই মাঞ্চুরিয়ার নানা ফশল হইতে জাপান তুলা তৈয়ার করিতেছে। এ তুলা এমন অজস্র পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে যে, জাপান আজ অন্য কোনো দেশের তুলা চাহে না—এ তুলায় নিজেদের চাহিদা মিটাইয়া অপরকেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করিয়া তার বিনিময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাপান আগে পশম লইত। এখন মোঙ্গোলিয়ান মেষের লোম হইতে পশম তৈয়ারী করিতেছে। মোঙ্গোলিয়ান মেষ ছাড়া তারা ফ্রান্স হইতে মেরিনো মেষ আনিয়া সে-মেষ লালন করিতেছে। কুঙচুকিঙে পশমের যে কারখানা করিয়াছে, তাহার আয়তন ও কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না! জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা মোঙ্গোলিয়ান মেষের দেহে মেরিনো মেষের লোম জুড়িয়া মেরিনো লোম উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানের দিক দিয়া মাঞ্চুরিয়ার নব-জন্ম হইয়াছে, সত্য; এবং এখানকার চীনাদের সে বিজ্ঞানে জ্ঞানও জন্মিয়াছে প্রচুর। কিন্তু এ জ্ঞানের ফলে পার্থিব সম্পদ যা কিছু মিলিতেছে, তাহা জাপান লুঠিয়া লইতেছে। অর্থাৎ শাঁস খাইতেছে জাপান আর চীনা অধিবাসীর ভাগ্যে শুকনো খোলাই শুধু সার! জাপান চীনা শ্রমিকদের বশে রাখিয়াছে আফিমের মৌতাতে! সিগারেটে তামাকের বদলে চীনা শ্রমিকের দল আফিমের ধূম্র সেবন করে। সে ধূম্র-সেবায় পেশীর শক্তি কমে না, মন কিন্তু মরিয়া নির্জীব হয়। চেতনা-বিহীন পশুর মত তারা খাটিয়া মরে। আফিমের রকমারি সিগারেট-সিগার তৈয়ারী করিয়া জাপান সেগুলি চীনা শ্রমিকের বাজারে ছাড়িয়াছে শস্তা দামে। এ জন্য এ সব শ্রমিক নীরবে কাজ করে। অবিচার বুঝিলেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আত্মোন্নতি করিবে, সে চিন্তাও আফিমের ধূম্র-বাষ্পের মহিমায় তাদের মনে চাপা পড়িয়াছে।
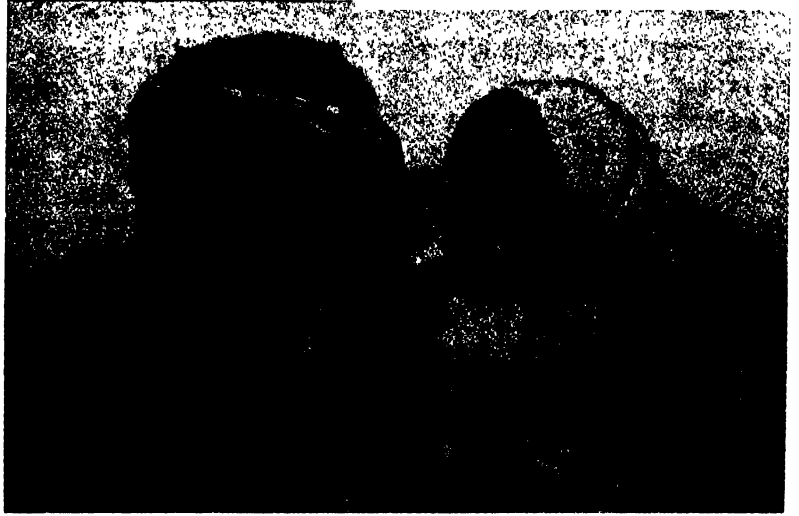
পৌত্র-পৃষ্ঠে মোঙ্গোল-পিতামহী

অসি-ক্রীড়ার জন্য জাপানী ও শ্বেত-রাশিয়ানদের সাজ-সজ্জা

লেখক লিখিতেছেন, মাঞ্চুরিয়ার সর্ব্বদক্ষিণে দাইরেন বন্দর। পথ-ঘাট বেশ বড় এবং জাপানীরা বাড়ী-ঘর তৈয়ারী করাইয়াছে পাথর দিয়া। জাপানীরা বলে, এখানে পাকা ব্যবস্থা করিবার কারণ, এখানে আমরা চিরকালের জন্য থাকিতে চাই। সহরে আজ কর্ম্ম-চাঞ্চল্যের সীমা নাই। বন্দর-মারফৎ চালানি এবং আমদানি মালপত্রের প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য সত্যই অসাধারণ রকমের।

বন্দরের পিছনে প্রায় দশ হাজার চীনার বাস। ইহারা শানতুঙ হইতে মাঞ্চুরিয়ায় আসিয়াছিল অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে। তারা থাকে পিছনকার মহল্লায়। সংখ্যায় প্রায় দশ হাজার। এ-সব চীনা কাজ করে বন্দরে ও কল-কারখানায়। জাপানীদের বেতনের চেয়ে বিশ ভাগ কম বেতন পায়। অর্থাৎ দেহ ও মস্তিষ্ক খাটাইয়া যে-কাজে জাপানীরা পারিশ্রমিক পায় বিশ টাকা, চীনারা সে-কাজের জন্য পায় এক টাকা! পেটের দায়ে কাজ ছাড়িয়া বন্দর ছাড়িয়া যাইবে, সে উপায়ও বেচারীদের নাই! তার কারণ, জাহাজে টিকিট মিলিবে না। অল্প আয়, ঋণভারে তারা কাতর—জর্জ্জরিত। এ ঋণ লইয়াছে মনিব-কোম্পানির কাছ হইতে। কাজেই পরিশোধের আশা নাই—আজন্ম ক্রীতদাস হইয়া আছে! ইহাদের বাসের জন্য লম্বা টানা ব্যারাক-বাড়ী আছে—এক এক কামরায় পঞ্চাশ জন করিয়া লোকের বাস। ইট পাতিয়া সেই ইটের উপরে একখানা চ্যাটাই বা মাদুর বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন! জাপানীরা বহু স্থানে 'আদর্শ গ্রাম' তৈয়ারী করিতেছে। বাসের জন্য এ-সব গ্রামে গৃহের দেওয়াল সিমেন্টের বা কাঠের অথবা মাটার; মাথার উপর এক পুরু টালির আচ্ছাদন।

মাঞ্চুরিয়ার দেহ বিদীর্ণ করিয়া চারি দিকে রেলোয়ে-লাইন পাতা হইয়াছে। এ সব লাইনের কল্যাণে সমস্ত সহরগুলির সঙ্গে যোগসূত্র রচিত। দাইরেনের কাছে রিয়ো জীন্ চমৎকার স্বাস্থ্য-নিবাস। কিরণ্ড বা চিন্‌চৌ অতি প্রাচীন নগর। এখানকার লোকজনের আচার-ব্যবহার এখনো সেই মান্ধাতার আমলে প্রবর্ত্তিত আচার-ব্যবহারের অনুরূপ রহিয়াছে। মুকদেন সর্ব্বপ্রধান নগর। নূতন-পুরাতনে মুকদেন দেখিতে যেন হরগৌরীর মত! এক দিকে জাপানীদের তৈয়ারী নূতন সহর টোকিয়োর আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে—আর এক দিকে পড়িয়া আছে পুরাতন সহর। পুরাতন সহরের বুকে মাঞ্চুরাজ নুর হাচুর সমাধি-ভবনটি এখনো টিঁকিয়া আছে। জাপানী মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুকুয়োর রাজধানী শিংকিং (ভূতপূর্ব্ব চাঙচুন)। শিংকিং পূর্ব্বে ছিল মশা-মাছির আড্ডা—জাপানীর হাতে সুদৃশ্য বেশে নগরের শোভা হইয়াছে এখন ছবির মত অপরূপ!

রুশ-আমলের প্রাচীন গির্জ্জা—হার্বিন

উত্তরে হার্বিন। হার্বিনের লোকসংখ্যা ৬৬০০০০ (ছেসট্টি লক্ষ)। হার্বিনে শিঙ্গুরা নদী। এ নদীর জন্য দেশ উর্ব্বরতায় সমৃদ্ধ। নদীতে শীতকালে জল দেখা যায় না—বরফে ঢাকিয়া থাকে।

রুশ সম্রাটের আমলে হার্বিন ছিল নির্ব্বাসিত শ্বেতাঙ্গ-রাশিয়ানদের কারা-আশ্রয়। এখন রাজ-ধর্ম্মী রাশিয়ানরা এখানে আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছে। সোভিয়েট-রাশিয়ায় তাদের প্রবেশ করিবার জো নাই—করিলে নিগ্রহের সীমা থাকিবে না। এই হার্বিনের পরেই রাশিয়া।

লেখক লিখিতেছেন, হার্বিন হইতে আমরা আমুর নদীর তীরে আসিলাম। আমুরের তীরে তাহেই-হো। আমুর নদীটি চওড়ায় এক মাইল। ওপারে সাইবেরিয়া। নদী পার হইয়া আমরা গিয়া পৌঁছিলাম সাইবেরিয়ার ব্লাগোভেশ্‌চেন্‌স্ক সহরে। নদী পার হইলাম নৌকাযোগে, সেতু নাই। রাশিয়ায় আসিয়া দেখি, এখানকার লোকজন নিঃসংশয় মনে বাস করিতেছে; ওপারে জাপানীদের আস্তানার জন্য তাদের মনে বিন্দুমাত্র অস্বস্তি নাই! ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ-সূচনায় জাপান প্রথমে লক্ষ্য করিতেছিল রাশিয়া এ যুদ্ধে চীনের পক্ষ

লইয়া চীনকে সাহায্য করে কি না। সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া তবে জাপান এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

নুর-হাচুর সমাধি-ভবন। পুরাতন তুঙ-লিঙ মহল্লা—মুকদেন্

মাঞ্চুরিয়ায় বহু মোঙ্গোলের বাস। জাপানীদের তারা সুনজরে দেখে না—সুযোগ পাইলেই লুঠপাট ও দৌরাত্ম্যে মোঙ্গোলরা জাপানীদের বিব্রত করে।
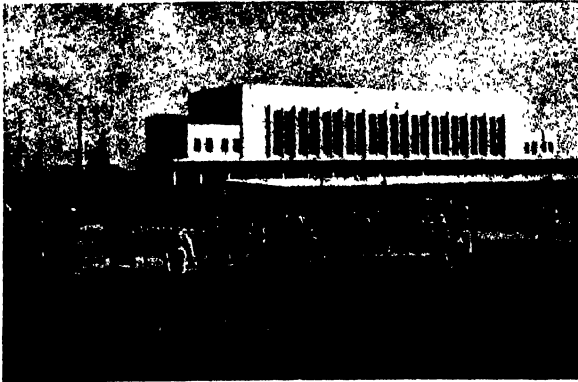
দাইরেন রেল-ষ্টেশন

ভ্লাডিভষ্টক সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন, জায়গাটি গিরিপর্ব্বত-সঙ্কুল—এখানে ২০৬০০০ দু'লক্ষ ছ'হাজার লোকের বাস। তাহারা জনে-জনে সাহসী যোদ্ধা।

ভ্লাডিভষ্টকে বহু বিমান-ক্ষেত্র আছে। অজস্র গিরিগুহার মধ্যে তোপখানা গুলী-গোলা-বারুদ সঞ্চিত আছে প্রভূত পরিমাণে কাজেই নগরটিকে সুরক্ষিত দুর্গ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।
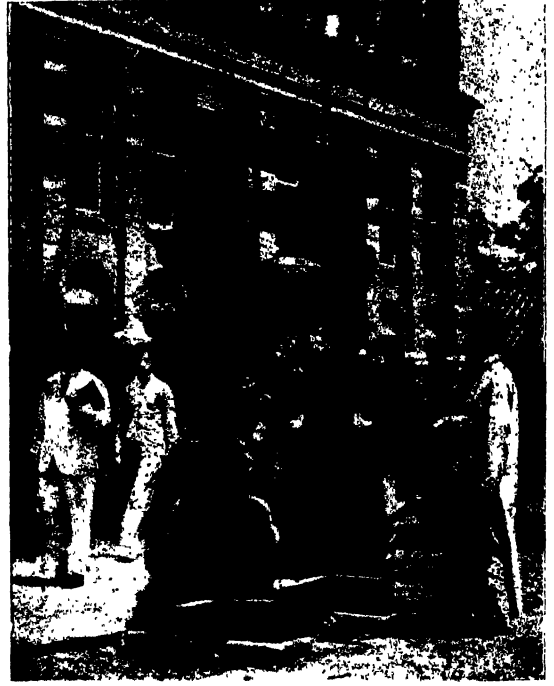
চীনা মন্দির—মুকদেন্

ভ্লাডিভষ্টক এবং কামচাট্কা-অন্তরীপ—এ-দু'টি যেন সতর্ক প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া আছে। জাপান জানে, ভ্লাডিভষ্টক যদি বা করায়ত্ত হয়, কামচাট্কা দুরধিগম্য। এবং এই কামচাট্কা-মারফৎ আমেরিকা

মোঙ্গোলদের আস্তানা
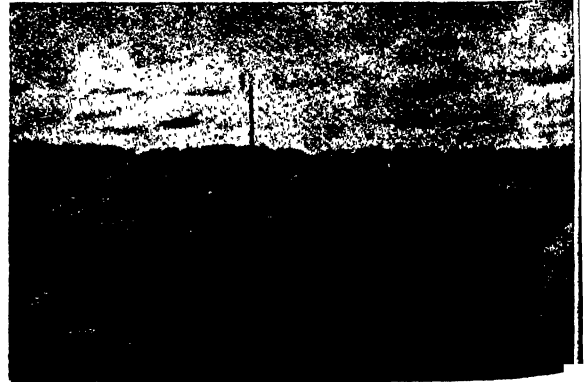
নিমেষে আসিয়া রাশিয়াকে সাহায্য করিতে পারে; কামচাট্কার দুরধিগম্যতা বুঝিয়া জাপানীরা অলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে মাতু, আগাত্ত এবং কিশ্কা অধিকার করিয়া সে তিন জায়গায় পাকা সমর-ঘাঁটী তৈয়ারী
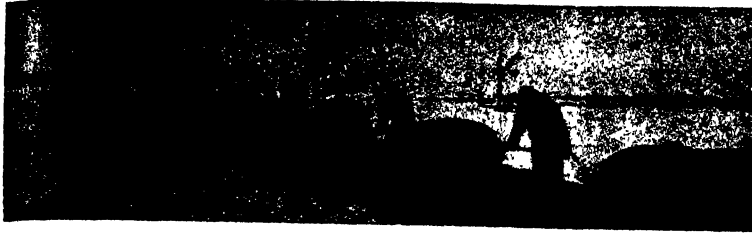
বরফ-জমা লিয়া-ও নদী। বীনের চালান

বরফ-জমা শিঙ্গুরা নদী—হার্বিন

করিয়াছে। জাপানের কিউরাইল দ্বীপ কামচাট্‌কা হইতে বিশ মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। কামচাট্‌কার কোলে সাগর-জলে জাপানী ধীবরের দল মাছ ধরে। তাহাতে বাধা নাই, নিষেধ নাই। কিন্তু কামচাট্‌কার কূলে আসা—জাপানীদের সে-অধিকার আদৌ নাই।

লেখক লিখিয়াছেন, প্রাচ্যে সমর-ঘাঁটী খুলিতে হইলে মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত হইবে তাহার পক্ষে যোগ্য স্থান! সে জন্য মাঞ্চুরিয়াকে দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তোলায় জাপানের যেমন স্বার্থ, মিত্রশক্তিও তেমনি মাঞ্চুরিয়ার সম্বন্ধে উদাসীন নয়। মাঞ্চুরিয়া যদি জাপানের করচ্যুত হয়, তাহা হইলে জাপানের পক্ষে যেমন বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবে, তেমনি মাঞ্চুরিয়া রক্ষা করিয়া জাপান যদি কোনো দিন রাশিয়া জয় করিতে পারে, তাহা হইলে মিত্রশক্তির পক্ষেও স্বাধীন পৃথিবীর স্বপ্ন আকাশ-কুসুমে পরিণত হইবে!

বর্ষার পল্লীবাস

পাষাণ-ঘরে বসত করা চায় না আমার মন—
মেঠো মেটে বাড়ীর লাগি মন করে কেমন!
ঝড় ও জলের উপদ্রবটা সেথায় যে পাই টের
সমদুখী, ব্যথার ব্যথী যত দরিদ্রের—
কর্দ্দমময় পিচ্ছিল পথ করছে নিমন্ত্রণ।

হঠাৎ ভীষণ হরপা এসে ধাক্কা মারে দ্বারে,
ঘাগ্‌রা ঘুরায় ঘূর্ণী রাঙা নিষেধ মানে না রে।
দিবস-রাতি দুলে দুলে কাতর তরু-শির,
আনন্দেতে বিরাম-বিহীন নাচে অজয়-নীর,
মাঠ ডুবায়ে বন্যা-বারি বাড়ছে ক্ষণেক্ষণ।

মাছরাঙা বক টিটিভ ডাকে ডাহুক ধরে সার,
জলসা হাওয়ায় ঝিঙার ডাকও লাগে চমৎকার!
'বাদার ঘাটে' জলে-কাদায় হাটুরেদের ভিড়,
সুদূর থেকে ভেসে আসে গন্ধ মালতীর,
ফলের ভারে নত ঘন নিবিড় জম্বুবন।

চক্ষু জুড়ায় শ্যাম-বনানী নব তৃণাঙ্কুর।
শ্যামলিমার নাইকো সীমা ভুবন পরিপূর!
দুঃখ বহুৎ, কষ্ট বহুৎ, নানান রকম ভয়,
সুখে আছে, সুখে থাকুক দূরে যারা রয়—
পল্লী-কুটীর আমায় দেখায় স্বর্গেরই স্বপন!

ভয় করে' কি দেখবো না কো নৃত্য অভয়ার?
জড়ের সাথে জড়িয়ে থাকা বন্ধ আকাঙ্ক্ষার!
পশু-পাখীর এ আনন্দ দেখবি না কি তুই?
দিনে দিনে মূর্ত্তি নূতন ধরছে কেমন ভুঁই?
করবি নাকো এমন সবুজ সাগরে তর্পণ?

হাসিসূনে ভাই, তোদের কারো ভাগ্য এমন নাই!
হেথা আমি দিগম্বরের করের পরশ পাই!
ওঠে নামে চরণ তাঁহার শিঙায় ওঠে বোল,
ডম্বরু তাঁর বাজে করি পবন উতরোল—
পাই যে শিবের খণ্ড-শশীর অমৃত কিরণ।

সৌধ-প্রাসাদ দেখলি অনেক—পেলি আনন্দ?
দুঃখ দেখে অশ্রু ফেলা—নয় সেটা মন্দ!
চাল মেলেনি বৈকালেতে জ্বেলেছে উনান,
দৈন্য-অভাব মনকে করে পবিত্রতা দান—
বুকের কাছে সরিয়ে পাতে হরির সিংহাসন!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

যশোধরা

১

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান জানি, কিন্তু এ'ও জানি, মহাভারত ছাড়াও ভারতীয় ইতিহাসে ও সাহিত্যে নানা অমৃত-কথা সঞ্চিত আছে। আজও ভূলোকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানব যাঁহাকে 'লোকনাথ' বলিয়া স্মরণ করে, যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া 'শরণং গচ্ছামি' বলিয়া আকুল প্রার্থনা জানায়, বেদপন্থিগণও যাঁহাকে পরিশেষে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, তাঁহার কাহিনীও অমৃত-সমান !

কাহিনী বলিতেছি, কারণ গৌতম বুদ্ধের জীবনী বলিয়া যাহা চলে, তাহার কতটুকু ইতিহাস, আর কতখানি ইতিহাস নয়, নির্ণয় করা অসাধ্য। পরবর্ত্তী কালের ভক্ত-পরম্পরার ফেনিল কল্পনাস্রোতের আবর্ত্তে জন্ম, এবং বাঁধনহারা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে পরিপুষ্ট কাহিনীগুলির নীচে পড়িয়া ইতিহাস এমনই আত্মগোপন করিয়াছে যে, পাশ্চাত্ত্য মনীষার গবেষণার তীব্র আলোকসম্পাতেও সে ইতিহাসকে বহু স্থানে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। কাহিনীগুলির রচনা কোনও দেশ-বিশেষের বৌদ্ধগণের নয়, অথবা একই সম্প্রদায়েব সাহিত্যের ভিতর দিয়াও তাহাদের প্রকাশ নয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা, অথবা স্থানবিশেষে একই রূপকথার অদ্ভুত রূপান্তর! ফলে বহু স্থলেই স্থবিরবাদিগণের পালি ভাষায় নিবদ্ধ কাহিনীর সহিত সংস্কৃতে রচিত কাহিনীর সঙ্গতি নাই, কিংবা উত্তর-ভারতের কাহিনীর সঙ্গে দক্ষিণ-ভারতীয় কাহিনীর অথবা ভারতীয় কাহিনীর সহিত বৃহত্তর ভারতের কাহিনীর সাদৃশ্যের শোচনীয় অভাব। কাজেই এই সকল অসঙ্গতির মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন করিতে গিয়া ঐতিহাসিককে পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত এবং দিশাহারা হইতে হয়।

এ-কথা স্মরণ রাখিলে যে নারী যৌবনের সমস্ত কামনা, বাসনা ও সুখস্বপ্ন লইয়া একদা রাজোপম ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্র গৌতমের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে শয্যাভাগের অধিকার লইয়া,—সেই নারীর ইতিহাস উদ্ধার করা আরও কত কঠিন, তাহা উপলব্ধি হইবে। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস আজও জানে না সে নারীর নামটা কি? পালি ত্রিপিটকের মধ্যে কেবল বিনয়পিটকের সম্ভবতঃ এক স্থানেই তাঁহার উল্লেখ আছে; সে উল্লেখও তাঁহার নিজের পরিচয় নয়, স্বামীর পরিচয় নয়, 'রাহুল-মাতা' বলিয়া। অথচ সঙ্ঘের প্রাচীন আচার্য্যগণ যে নাম জানিতেন না, অথবা জানিয়াও জানাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, পরবর্ত্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁহারই কত নাম! ভদ্দকচ্চা বা ভদ্দকচ্চানা (ভদ্রকাঞ্চনা), সুভদ্দকা (সুভদ্রকা), বিম্বা, বিম্বাসুন্দরী গোপা, যশোধরা। হয়তো এগুলির কোনটাই তাঁহার প্রকৃত নাম নয়, কিংবা ইহাদের মধ্যে যে কোনটি তাঁহার নাম হওয়াও অসম্ভব নয়!

* * * * *

কপিলবাস্তুর শাক্যনায়ক শুদ্ধোধনের বিগতযৌবনা পত্নী মায়া যে দিন দেবদহে পিত্রালয়ে যাইবার পথে লুম্বিনীর উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে শালতরুর (অথবা অশোকতরুর) শাখা ধরিয়া সহসা প্রসববেদনায় কাতর হইয়া দণ্ডায়মান অবস্থাতেই পুত্র প্রসব করিলেন, সে দিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সেই দিনই সদ্যোজাতকে কপিল-বাস্তুতে ফিরাইয়া আনা হইল, আর সেই পুণ্যদিনেই ইহলোকে না কি আরও সপ্ত প্রাণীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক জন ছিলেন মানবী। এই মানবীই রাহুল-মাতা। 'ললিতবিস্তরে'র মতে তাঁহার নাম গোপা, আর তিনি দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা। তিব্বতীয় বিনয়পিটক 'দুলব' অনুসারে দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যার নাম যশোধরা। যশোধরাই রাহুল-মাতা। আর গোপা ও মৃগজা নামে গৌতমের অপরা দুই পত্নী ছিল। 'বুদ্ধচরিতে' রাহুল-মাতার নাম দিয়াছেন যশোধরা, যদিও কাহার কন্যা, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু পালি সাহিত্যের সাক্ষ্যানুসারে রাহুল-মাতা দণ্ডপাণির ভ্রাতা সুপ্পবুদ্ধ (সুপ্রবুদ্ধ); এবং অমিতা (অমৃতা) নাম্নী তাঁহার ভার্য্যার তনয়া। সুপ্পবুদ্ধও ছিলেন শাক্যবংশীয় নেতা। কিন্তু তাঁহার আরও গৌরবের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। তিনি না কি মায়ার সহোদর ভ্রাতা, অর্থাৎ গৌতমের মাতুল কিন্তু মতান্তরে অমৃতা ছিলেন গৌতমের পিতৃস্বসা।

পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের শেষ বুদ্ধকে প্রসব করিয়া সাত দিন পরে জননী মায়াদেবী লোকান্তর গমন করিলেন। মায়ার ভগিনী ও সপত্নী তখন মাতৃহারা শিশুকে মায়ের মতই স্নেহে ও যত্নে মানুষ করিতে লাগিলেন। দিন যায়। ষোল বৎসর পরে শুদ্ধোধন তাঁহার শাক্যজ্ঞাতিবর্গের নিকট দূত পাঠাইলেন, তাঁহাদের কন্যাদের মধ্যে কাহাকেও পুত্রের জন্য পাত্রী মনোনীত করিয়া আসিবেন! কিন্তু জ্ঞাতি হইলে কি হয়, জাতি-হিসাবে শাক্যেরা ছিলেন অহঙ্কারী। তাঁহারা সম্মত হইলেন না। মেয়ে তাঁহারা দিবেন না! শুদ্ধোধনের ছেলের রূপ আছে সত্য, কিন্তু বিদ্যা? ধনুর্ব্বিদ্যায় বা অন্য কোন পুরুষোচিত ক্রীড়ায় কিছুমাত্র নৈপুণ্য নাই! বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে রক্ষা করিবে কি করিয়া? এ অবস্থায় মেয়ে তাঁহাকে কি করিয়া দেওয়া চলে?

কথাটা গৌতমের কানেও উঠিল। রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কোন বিদ্যাই তাঁহার নাই? মেয়ে উহারা দিবে না বটে!

এক বিরাট জনসভায় সমস্ত শাক্যদের আহ্বান করিয়া সমবেত সকলের সম্মুখে গৌতম ধনুর্ব্বিদ্যায় নিজের নানা কৃতিত্বের পরীক্ষা দিলেন। দেখিয়া শাক্যদের যেমন হইল বিস্ময়, তেমনই আনন্দ। তাহারা তখন প্রত্যেকে উদ্‌গ্রীব হইয়া নিজের নিজের মেয়ে পাঠাইয়া দিল কপিলবাস্তুতে গৌতমের উদ্দেশ্যে। ফলে ইহাদের সংখ্যা দাঁড়াইল না কি চল্লিশ হাজার! গৌতমের একাধিক পত্নী ছিল কি না, অনুমান করা কঠিন থাকিলেও প্রধানার স্থান যিনি অধিকার করিলেন, তথাকথিত ইতিহাসে তাঁহার যশোধরা নামই চলে বেশী। আর সম্ভবতঃ তিনি সিদ্ধার্থের সমবয়স্কা মামাতো অথবা পিসতুতো ভগিনী।

২

তার পর তের বৎসর। তের বৎসর ধরিয়া যশোধরা স্বামীর ঘর করিলেন। স্বামীর সুন্দর সুঠাম তনু। তেজোদৃপ্ত দু'টি চোখ যশোধরাকে দেখিলেই সে চোখ দু'টি হাসিয়া নাচিয়া ওঠে। যশোধরা পলাইয়া যান। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর কণ্ঠলগ্না হন। দিনে গগনের রামধনুর সপ্তবর্ণের ছায়া পড়ে দম্পতির বুকে। পরক্ষণেই যশোধরা সলজ্জ হাস্যে অভিযোগ করেন, গৌতমের কাছে গৌতমেরই অত্যাচারের কথা। গৌতম আশ্বাস দেন, আচ্ছা

আর নয়। কিন্তু রাত্রির আকাশের গায়ে চাঁদ ওঠে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায়,—আশ্বাসের কথা গৌতম ভুলিয়া যান। যশোধরা আর পারেন না! প্রহরে প্রহরে এ কি জ্বালাতন! বহু মিনতির পর প্রণয়ভীতা রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া বাঁচেন।

বুঝি বা এমনি করিয়াই যশোধরা ও তাঁহার দয়িতের প্রথম যৌবনের পুলকঘন কৌতুকোজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলি আদরে সোহাগে চুম্বনে মান-অভিমানে কাটিয়াছিল নয়নাভিরাম সৌধের উপরতলার কক্ষে কক্ষে,—কিন্তু ইতিহাস তাহার কোন সন্ধান দেয় না। ইতিহাসের দৃষ্টি শুধু বাহিরের ঘটনাবলীর উপর, অন্তর-রাজ্যের কথা তাহার গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কে জানে, পাষাণের বুক দিয়া বহুমুখী জলধারা এক দিন গড়াইয়া যাইত কি না! কিংবা মহাভিনিষ্ক্রমণের পূর্ব্বক্ষণে একখানি নারী-মুখ এ-জন্মের মত আর একবার চোখের দেখা দেখিয়া লইবার লোভে কি কাহারও চিত্ত লালায়িত হয় নাই? গভীর নিশীথে সেই নিদ্রিতা রমণীর শয়নকক্ষের দ্বারে আসিয়া সন্তর্পণে কেহ কি উঁকি মারে নাই? সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল?

কথাটা জানা হইলেও একটু খুলিয়া বলি। আট জন ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া শুদ্ধোধন শঙ্কিত ছিলেন, কোন্ মুহূর্ত্তে বংশধর বুঝি গৃহত্যাগী হইয়া যায়। এই আশঙ্কায় তিনি সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেন—যাহাতে পুত্রের দৃষ্টিপথে ব্যাধি, জরা বা মৃত্যুর কোন দৃশ্য পতিত হইয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার না করে।

পুত্রের চিত্ত সংসারের প্রতি যাহাতে আসক্ত থাকে, সে জন্য পুত্রের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এক মনোরম প্রাসাদে। সেখানে রহিল সকল প্রকার ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা, পুত্রের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ লোভনীয় দ্রব্যসম্ভার। তরুণী রূপসী নর্ত্তকীর দল বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া, সুচারু ছাঁদে কবরী বাঁধিয়া হাস্যে লাস্যে ভাষ্যে সঙ্গীতে দিবানিশি কত চেষ্টাই না করিতে লাগিল বোধিসত্ত্বের মনকে বিমুগ্ধ রাখিবার জন্য! পুত্র যাহাতে প্রাসাদের নিম্নতলে না আসিতে পারেন, সে জন্য শুদ্ধোধন প্রহরীদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু নিয়তি পিতার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। বোধিসত্ত্বের চোখে একে একে সবই পড়িল,—বৃদ্ধ, রোগাতুর এবং মৃত। কি করিয়া সকল দুঃখের অতীত হওয়া যায় এবং দুঃখ-হেতুর উচ্ছেদ সাধন করা যায়, তাহাই হইল উনত্রিশ বৎসরের যুবকের একমাত্র চিন্তা। তার পর এক দিন এক আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে বোধিসত্ত্ব দেখিলেন এক শান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া এবং সন্ন্যাসি-জীবনের আনন্দের কথা শুনিয়া তিনি বড় তৃপ্তি পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি সত্যকার পথের সন্ধান পাইয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি গিয়া বসিলেন রাজোদ্যানের বাপীতীরে। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সংবাদ পাইলেন যশোধরার গর্ভে তাঁহার পুত্র রাহুলের জন্ম হইয়াছে। এ আবার এক নূতন মায়ার বন্ধন! আর নয়, এবার তাঁহাকে যাইতে হইবে, সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। ধীরে ধীরে গৌতম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে বীণার ঝঙ্কারে, নূপুরের নিক্কণে, গানের মূর্চ্ছনায় মুখরিত হইয়া উঠিল সমগ্র প্রাসাদ। কিন্তু বোধিসত্ত্বের এ সকল প্রমোদ তখন তিক্ত মনে হইল। তিনি শয্যায় গিয়া নিদ্রামগ্ন হইলেন। অর্দ্ধ রজনীতে যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, দীপালোকে বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, নর্ত্তকীগণ ঘুমে অচেতন। কেহ কেহ ঘুমঘোরে বিড়-বিড় করিয়া কত কি কহিতেছে, কাহারও বসন অসংযত, আর কতগুলির বিকট দেহে কি ঘৃণ্য কদর্য্যতাই না প্রকাশ পাইতেছে! দেখিয়া গৌতমের মনে হইল, তিনি বুঝি পূতিগন্ধময় গলিত শবরাশিতে ভরা এক শ্মশানক্ষেত্রে রহিয়াছেন, আর বাড়ীর চারি দিক্ ঘিরিয়া বুঝি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে লেলিহান বহ্নি! তাঁহার নির্দ্দেশে বাহিরে রথ প্রস্তুত। গেলেই হয়। গৌতম উঠিলেন, কিন্তু প্রাসাদ-ত্যাগের পূর্ব্বে কি যেন ভাবিয়া যশোধরার সূতিকাগৃহে গেলেন। দ্বারপথে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, মাতৃত্বের অপূর্ব্ব প্রতিচ্ছবি। দেখিলেন, যূথিকার ফুলশয্যায় শুইয়া যশোধরা পুত্রের মাথার উপরে নিজের বাহুলতা প্রসারিত করিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছেন। যে লোভে গৌতম গেলেন সেই গৃহাভিমুখে, তাহা পূর্ণ হইল কি না, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার গোপন হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল কি না, কে বলিবে! কিন্তু যশোধরার আরও নিকটে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না,—কি জানি, যদি ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়! বোধিসত্ত্ব আর বিলম্ব না করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

* * * *

ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের পরে গৌতমবুদ্ধ রাজগৃহের বেলুবন হইতে প্রথমবার আসিলেন কপিলবাস্তু নগরীতে। সঙ্গে শত সহস্র অনুচর। কেন আসিলেন, জানি না। কাহিনীতে বলে, পিতার একান্ত অনুরোধে হইতে পারে। হয়তো সত্যই তাঁহার মনে আর কোন বাসনা বা অভিপ্রায় ছিল না। কপিলবাস্তুতে প্রবেশ করিয়া তিনি রহিলেন নগরীর প্রান্তে ন্যগ্রোধারামে, এবং পরের দিন বাহির হইলেন কপিলবাস্তুরই রাজপথে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে। এ সংবাদ রাষ্ট্র হইল নিমেষে বায়ুবেগে নগরীর সর্ব্বত্র। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই নিস্পন্দ হইয়া শুনিল অপূর্ব্ব বিস্ময়কর কথা। কথাটা যশোধরাও শুনিলেন!

স্খলিত পদে কম্পমান বক্ষে এক পাগলিনী গিয়া দাঁড়াইলেন প্রাসাদের গবাক্ষ-পথে,—যদি দেখা যায়! কিন্তু যদি না যায়? বিচিত্র কি, নির্ম্মম যদি এ পথে না আসেন? কিন্তু ঐ যে, ঐ তো দেখা যায় সেই মানুষ,—সেই মুখ, সেই অঙ্গ, সেই চলনভঙ্গী! আগের চেয়েও দেহকান্তি যেন অনেক বাড়িয়াছে! ঐ তিনি! আর পিছনে—একেবারে লোকারণ্য! যশোধরার বুক হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল! তাঁহার দেবতা আজ আর তাঁহার একার নয়, এখন তিনি সকল বিশ্বমানবের দেবতা। তাঁহার উপর যশোধরার নিজস্ব কোন দাবীই আজ নাই, তিনি এখন সকলের মধ্যে এক জন মাত্র। বাতায়ন হইতে যশোধরা নিঃশব্দে সরিয়া আসিলেন।

সেই দিনই আবার শুদ্ধোধনের নিমন্ত্রণে গৌতমবুদ্ধ আসিলেন পিতৃভবনে অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া। আহার-শেষে তাঁহাকে প্রণাম করিবার উদ্দেশ্যে পুররমণীগণ প্রত্যেকে গেল সেই স্থানে, কেহ বাকী রহিল না। রহিল শুধু এক জন। তিনি যাইবেন না, কিছুতেই না। তাঁহার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কেন? তিনি আসিতে পারেন না যশোধরার নিকটে? যদি না পারেন, তের বৎসর ধরিয়া প্রাণপ্রিয়া বলিয়া অত ভালবাসার অভিনয়ের কি প্রয়োজন ছিল? প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পুরানো দিনের সকল কথাই ভুলিতে হয়? বেশ, এক জন যদি ইচ্ছা করিয়া এত পাষাণ হইতে পারেন, যশোধরাও বধির হইতে জানেন। কিন্তু যশোধরা সেই মহানিশার পর হইতে এত দিন ধরিয়া একান্ত চিত্তে নারীধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন,

তাহা যদি ব্যর্থ না হইয়া থাকে, তবে আজিকার দিনে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠকে আসিতেই হইবে তাঁহার সান্নিধ্যে।

যশোধরার কল্পনাস্রোত কত দূরে কোথায় গিয়া গড়াইত কে জানে! অকস্মাৎ বুদ্ধের আগমন-বার্ত্তায় বাধা পড়িল সেই সুখ-স্বপ্নে। যশোধরা শুনিলেন, বুদ্ধদেব সত্যই আসিতেছেন তাঁহারই নিকটে। এতক্ষণ মনে মনে যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সম্ভব-অসম্ভব কত কল্পনা, তাঁহারই আগমন-সংবাদে যশোধরা হঠাৎ বিবশা হইয়া পড়িলেন। বুক ফাটিয়া কান্না আসে! অন্তর্যামীর উদ্দেশ্যে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন—"করুণাময়, আমাকে শক্তি দাও, আমাকে বলিয়া দাও কেমন করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিব?" যশোধরা উঠিলেন। তিনি বুঝি আসিয়া পড়িলেন। শশব্যস্তে উঠিয়া গিয়া,—তাঁহার ভবনে যত নর্ত্তকী ছিল, সকলকে যশোধরা আদেশ দিলেন তাড়াতাড়ি কাষায়বস্ত্র পরিধান করিতে। আর সেই ক্ষমাসুন্দর আসিয়া যে আসনে বসিবেন, সেই আসন-সজ্জা যশোধরা নিজে ততোধিক ক্ষিপ্র-হস্তে সজ্জিত করিয়া রাখিলেন।

তিনি আসিলেন। সঙ্গে দুই জন ভিক্ষু (অগ্রশ্রাবক) আর ভিক্ষাপাত্র লইয়া স্বয়ং শুদ্ধোধন। তাঁহার সম্মুখে যশোধরা গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কেমন করিয়া, তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। গিয়া স্থাণুর মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যেন এক পাষাণ-প্রতিমা, চোখে-মুখে রক্তের লেশমাত্র নাই, দেহে প্রাণবায়ুর স্পন্দন নাই! তথাগত কহিলেন,—"তোমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে পার, যশোধরা!" যশোধরা নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, সেই মুহূর্ত্তে স্বামীর পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন, আর পা দুইখানি দুই হাতে জড়াইয়া চরণযুগলে স্থাপন করিলেন নিজের শির!

সময় বুঝিয়া শুদ্ধোধন কহিতে লাগিলেন,—"ভদন্ত! আমার পুত্রবধূ যে দিন শুনিলেন তুমি কাষায় বসন পরিয়াছ, তখন ইনিও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন তুমি মাল্যাদি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন ইনিও বিলাসের সকল সামগ্রী ত্যাগ করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন আরম্ভ করিলেন। যখন জানিলেন, তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, তখন হইতে ইনিও বিধবারই মত শুদ্ধাচারে ও নিষ্ঠায় দিন যাপন করিতেছেন। ইনি তোমার প্রতি এমনই নিবদ্ধচিত্তা ও অনন্যনেয়া।"

বুদ্ধ কহিলেন,—"জানি। এ শুধু আমার এই শেষ জন্মে নয়, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি আমার প্রতি এরূপ নিবদ্ধচিত্তা ও স্নেহশীলা ছিলেন। শুনুন সেই অতীত কাহিনী।"

* * * *

পাঁচ দিন পরের কথা।

যশোধরা ডাকিল, "রাহুল!"

পুত্র উত্তর দিল, "মা!"

—"কে রে?"

—"চিনিনে ত মা!"

মাতা পুত্রের চোখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল, —"ঐ তোর বাবা।"

রাহুল কোনও মতে চোখ সরাইয়া সেই প্রশ্নই করিল,—"আমার বাবা?"

—"হ্যাঁ। তোর স্বর্গ, তোর ধর্ম্ম, তোর পরম তপস্যা। তুই গেলিনে রাহুল ওঁর কাছে?"

প্রশ্ন শুনিয়া শিশুর অন্তরে ভয় জাগে। কোন্ ভরসায় সে যাইবে ঐ একান্ত অপরিচিতের কাছে, এক অজানা অচেনা সন্ন্যাসীর কাছে? যাইবেই বা কেন সে? আর গিয়া কি বলিবে? তাহার মা যেন কেমনতর, কিছুই বোঝে না!

কিন্তু মাতা চেনেন পুত্রকে। সাত বৎসরের দুলালের বক্ষে কি তুফান উঠিয়াছে, তাহা বুঝিতে মাতার এতটুকু দেরী হইল না। চোখ মুছিয়া মাতা সস্নেহে কহিলেন,—"ওরে বোকা ছেলে! আমি বলছি, যা। গিয়ে বল, আমার উত্তরাধিকার (দায়জ্জ) কই?"

পুত্র চলিল পিতৃসন্দর্শনে। শুদ্ধোধনের ভবনে ভোজনরত পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া মায়ের শিখানো কথাগুলিই আবৃত্তি করিল। বুদ্ধ আত্মজের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রশান্ত দৃষ্টি। কই, ভয় ত লাগে না! তাহার বাবা ত বেশ! কিন্তু তাহার প্রশ্নের উত্তর কৈ? রাহুলের বাবা তাহার দিকে আর একবার তাকাইলেনও না, প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না, ভোজনশেষে পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া চলিলেন। অবোধ বালক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, —তাহার মাতার কথাগুলিই পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে পিতার পশ্চাদনুসরণ করিল। অবশেষে বুদ্ধ নন্দনকে উত্তরাধিকারই দিলেন। সারিপুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "রাহুলকে দীক্ষা দাও।"

* * *

সেইক্ষণে এ জন্মের মত পুত্রও যশোধরার পর হইয়া গেল। অর্থাৎ সংসারে তাঁহার যেটুকু আকর্ষণ ছিল, তাহারও সমাধি ঘটিল। তবে আর কেন? আর দেরী কিসের? যে পথে স্বামী গিয়াছেন, পুত্র গেল, সেই পথ তাঁহার পক্ষে আর কত দূর? শোনা গেল, সে পথের বাধা দূর হইয়াছে, নারীজাতিও প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি পাইয়াছে, আর ভিক্ষুণীসঙ্ঘের নেত্রী হইয়াছেন মহাপ্রজাপতি গৌতমী। যশোধরা মন স্থির করিয়া ফেলিলেন।

ভগবান্ তখন শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রমণের রাহুলও তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। যশোধরা অনতিবিলম্বে প্রব্রজ্যা-গ্রহণ করিলেন, এবং কপিলবাস্তুর দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রাবস্তীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে মহাপ্রজা-পতি গৌতমীর অধীনে, ভিক্ষুণীদের এক উপাশ্রয়ে যশোধরা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তবু ত সেখানে দিনান্তে বার কয়েক স্বামী ও পুত্রকে চোখের দেখা দেখিবার সুযোগ আসে তাঁহার, তাহাই যে অভিশপ্ত নারী-জীবনে পরম লাভ। এটুকু না হইলে তিনি কাঙ্গালিনী বাঁচেন্ কেমন করিয়া?

রাহুলও আসে মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে। প্রকোষ্ঠের বাহিরে মাতাপুত্রে সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্ত্তা হয়। এক দিন আসিয়া সে শুনিল মায়ের অসুখ, তাঁহার উদরবায়ু কুপিত হইয়াছে। রাহুল মাতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া প্রশ্ন করিল,—"কি খেলে ভাল হয়, মা?" রোগক্লিষ্টা ব্যথিত স্বরে কহিলেন,—"সে আর এখানে কোথায় পাব, রাহুল? কপিলবাস্তুতে যখন ছিলাম, তখনও এ অসুখই ত আমার। তখন আমের রসের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে খেলেই সঙ্গে সঙ্গে সেরে উঠতাম। কিন্তু এখানে যে ভিক্ষা করে খেতে হয়, আম কে ভিক্ষা দেবে? কোথায় পাব তা?"

পুত্র গাত্রোত্থান করিল। উপাধ্যায় সারিপুত্রের নিকট সকল কথা বিবৃত করিয়া সারিপুত্রের সাহায্যে মহারাজ প্রসেনজিতের নিকট হইতে রাজোদ্যানের সুপক্ক আমের রস সংগ্রহ করিয়া মাতাকে দিল। সেই রস পান করিয়া যশোধরা সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

অপর এক জাতকে অনুরূপ কাহিনী পাই। যশোধরার উদরের আন্ত্রিক যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত রাহুলের অনুরোধে সারিপুত্র প্রসেনজিতের নিকট হইতে লাল মৎস্য দ্বারা সুবাসিত পোলাও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

যশোধরার জীবনের আর বেশী কথা অবগত হওয়া যায় না। সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া ভদ্দকচ্চানা থেরী নামেই বোধ হয় তিনি সমধিক পরিচিতা হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কাঞ্চনের মত উজ্জ্বল দেহের বর্ণই এই নামের কারণ। 'থেরী অপদানে'র এক স্থানে থেরী যশোধরার উল্লেখও আছে। ভিক্ষুণী হইয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হতী হইয়াছিলেন। তার পর ক্রমশঃ সাধনমার্গের আরও উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া ভিক্ষুণীশ্রেষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সারিপুত্ত, মোগল্লান এবং বক্কুল ব্যতীত আর কেহই না কি যশোধরার মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন নাই!

সম্ভবতঃ ৭৮ বৎসর বয়সে বুদ্ধের মহাপরিনির্ব্বাণের পূর্ব্বেই যশোধরার নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়াছিল। মৃত্যুর ক্ষণকাল পূর্ব্বে বুদ্ধের নিকট হইতে তিনি বিদায় লইয়া আসেন, তার পর না কি কতকগুলি আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় দিয়া লোকান্তর গমন করেন।

এ সংবাদ কখন এবং কেমন ভাবে শাস্তার কানে গেল জানি না! কিন্তু এ সংবাদে তথাগতের একটুকুও বিচলিত হওয়ার কথা নয়, কারণ তিনি সম্যক্ সম্বুদ্ধ। এক জন নারীর মৃত্যু সংবাদে কেন তিনি চঞ্চল হইবেন? সকল দুঃখের অতীত হইয়াছেন বলিয়াই ত তিনি বুদ্ধ, ভগবান্!

শ্রীসাধনা দাশগুপ্ত

অতিরিক্ত লাভকর ও নূতন যৌথ মূলধন আইন

অজস্র জরুরী আইন (Ordinances) জারীর ফলে লর্ড লিন্‌লিথগোর ভারত-শাসন কাল ভারতের ইতিহাসে একটি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে। ব্যবস্থা পরিষদকে ব্যাবহারিক বিধি-বিধানের বহির্ভূত করিয়া, বড়লাট বাহাদুর মামুলী রীতির আইন-কানুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ হইতে ক্রমবর্দ্ধমান জরুরী আইন দ্বারা ভারত শাসন করিতেছেন। এত দিন এই জরুরী আইন রাজনৈতিক বিধি-বিধানে নিবদ্ধ ছিল; তার পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে; এখন করনির্দ্ধারণ ক্ষেত্রেও প্রকট হইল।

গত মে মাসের প্রারম্ভে বাজারে গুজব রটিয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই যদৃচ্ছা লভ্যাংশ বিতরণ করিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া, অল্পতর পরিমাণে কারবারী লভ্যাংশ বণ্টনের নির্দ্দেশ দিয়া একটি জরুরী আইন জারী করিবেন। তার কিছুদিন পরে গুজব রটিয়াছিল যে, সরকার অতিরিক্ত লাভকরের (Excess Profits Tax) হার বৃদ্ধি করিবেন। যাহা হউক, গত জুন মাসের মধ্যভাগে সরকার দুইটি জরুরী আইন জারী করিয়াছেন,—প্রথমটি অতিরিক্ত লাভকর সম্বন্ধে; এবং অপরটি যৌথ কারবারের নূতন মূলধন সম্পর্কে। প্রথমোক্তটি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬নং অর্ডিনান্স। প্রচলিত আইন অনুসারে অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৬৬⅔ অংশ সরকার গ্রহণ করিতেন। ইহা ব্যতীত শতকরা ১৩⅓ আয়-কর (Income Tax) এবং অতিরিক্ত কর (Super Tax) দিতে হইত। ইহাতে ব্যবসায়ীদিগের হাতে শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত লাভ থাকিত। নূতন আইন অনুসারে এই শতকরা ২০ অংশ হইতে শতকরা ১৩⅓ অংশ সরকারের হাতে দিতে হইবে। অবশিষ্ট শতকরা ৬⅔ অংশ হইতে কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ বিতরণ করিবেন। সরকারের কাছে বাধ্যতামূলক ভাবে যে লভ্যাংশ জমা থাকিবে, তাহার পূর্ব্বোক্ত শতকরা ২০ অংশের উপর সরকার শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে সুদ দিবেন। আবার এই শতকরা ২০ অংশের মধ্যে যে শতকরা ১৩⅓ অংশ সরকারের নিকট জমা থাকিবে, যুদ্ধ শেষ হইবার এক বৎসর পরে অথবা ঐ গচ্ছিত টাকা রাখিবার দুই বৎসর পরে কারবারীরা ঐ টাকা ফেরত পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হইবার তিন বৎসর পরে সরকার ঐ টাকা ফেরত দিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রায় এক শত কোটি টাকা সরকারের হাতে আসিবে। সুতরাং ঐ পরিমাণ টাকা বাজারে প্রচলিত হইতে না পারিলে মুদ্রাস্ফীতির কিছু সঙ্কোচ ঘটিবে।

দ্বিতীয় অর্ডিনান্সটি ভারতরক্ষা আইনের (Defence of India Act) নূতন বিধি। এই বিধির ফলে ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতীত কেহ কোন কারবারের নিমিত্ত নূতন মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। বৃটিশ-শাসিত ভারতে কেহ কোন প্রকার ঋণপত্র (Debenture) বিক্রয় করিতে পারিবেন না; কিংবা কোন কারবারের অনুষ্ঠান-পত্র (Prospectus) বাহির করিয়া অংশ বিক্রয় দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। কার্য্যতঃ কেবল কেন্দ্রীয় সরকার জন-সাধারণের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ফলে, ভারতরক্ষা ঋণ সংগ্রহ সুলভ ও সুকর হইবে।

এই হইল নূতন বিধান দুইটির সার মর্ম্ম। এখন আমরা পারিভাষিক খুঁটিনাটি পরিত্যাগ করিয়া, যথাসম্ভব সহজ-বোধ্য সরল ভাষায় উভয়ের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অতিরিক্ত লাভকরের পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত শতকরা ২০ অংশ হইতে মাত্র ৬⅔ অংশ পরিত্যাগ করিয়া, বাধ্যতামূলক ভাবে ১৩⅓ অংশ গ্রহণের ফলে দেশাভ্যন্তরে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ও প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হইবে। কারণ, অর্থের অনটনে শিল্পে নিযুক্ত কারবারীর পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার আগ্রহের কোন হেতু থাকিবে না। অন্যান্য দেশের ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে এরূপ বিধানের কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্যান্য অধিকাংশ দেশই, ভারতের তুলনায় সমধিক শিল্প-সমৃদ্ধি সম্পন্ন এবং তাহাদের জাতীয় আয়ও প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে, পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত শতকরা ২০ অংশের ১৩⅓ অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া বহু প্রতিষ্ঠানকে "জাল গুটাইতে" হইবে। কারণ, অধিকাংশ মাঝারি

ও ছোট প্রতিষ্ঠানে লব্ধ লাভ কারবারে খাটে। ভবিষ্যতে, দীর্ঘ-কালের নিমিত্ত, এই লাভের টাকা সরকারের নিকট গচ্ছিত থাকিবে, এবং তাহার জামিনে ঋণ সংগ্রহও সম্ভব হইবে না। যথা-সময়ের পূর্ব্বে অনুমান সিদ্ধান্ত অনুসারে, সরাসরি অতিরিক্ত লাভকর নিরূপণ যথেচ্ছ দাবীর সৃষ্টি করিতে পারে। ইতিমধ্যে যদি কোন কারণে শেষ নিরূপণে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে করদাতৃগণের প্রতি অযথা পীড়নের হেতু ঘটিতে পারে। অতিরিক্ত আদায়ের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ প্রদান, অসুবিধা ও ক্ষতির অনুপাতে অনিষ্ট নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টায় অভিজ্ঞতা ভারতীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের পক্ষে কখনই প্রীতিকর হয় নাই। কর্ম্মচারীর সংখ্যার তুলনায় হিসাব-নিকাশের বিলি-ব্যবস্থায় বিলম্ব ঘটে প্রচুর। কর্ম্মচারীর অদল-বদলও অনেক সময় বিভ্রাট ঘটায়। কখন কখন নথীপত্রও খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হয়। ফলে, হিসাব চুকাইবার বিঘ্নবিলম্বে করদাতৃগণের ক্ষতি ও দুর্ভোগ ঘটে প্রচুর। কারণ, অনেক সময় করদাতাগণকে শতকরা ৫৲ টাকার অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া অগ্রিম টাকা জমা দিতে হয়। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী কালের নিমিত্ত সরাসরি কর নির্দ্ধারণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি হিসাব-নিকাশ চুকাইবার ব্যবস্থাই অধিকতর সমীচীন। আয়কর বিভাগের আভ্যন্তরীণ বিঘ্ন-বিলম্ব এবং খাম-খেয়ালের নালিশও কর্ত্তৃপক্ষের অবিদিত নহে। কেহ কেহ এরূপ ধারণাও মনে পোষণ করেন যে, কর নিরূপণ ও সংগ্রহ বিভাগের যথোপযুক্ত সংস্কার সমধিক হইলে অর্থ-বিভাগ যে এক শত কোটি টাকা বাকি পড়ার অভিযোগ করিয়াছেন, তাহার কোন হেতু ঘটিত না।

নূতন আইন অনুযায়ী, অল্পকালীন কর নিরূপণের (Provisional assessment) ফলে করদাতৃগণের আরও একটি অসুবিধা ঘটিবে। আমরা শুনিয়াছি, বহু করদাতৃ ইতিমধ্যে ঘটনা-চক্রের অসাধারণত্ব হেতু অতিরিক্ত লাভকর আইনের ৬ (৩) ধারা অনুযায়ী নিষ্পত্তিকারক মণ্ডলীর (Board of Referees) নিকট এবং ২৬ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় রাজস্ব-মণ্ডলীর (Central Board of Revenue) নিকট উচ্চতর লাভমানের (Higher Standard Profits) নিরিখ নির্দ্ধারণের দাবী দাখিল করিয়াছেন। অল্পকালীন কর নিরূপণ, অতিরিক্ত লাভকর আইনের নূতন ১৪-এ ধারা অনুযায়ী নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট লাভের ভিত্তি-ভূমিতে (on the basis of standard profits) নির্দ্ধারিত হইবে। ফলে, নিষ্পত্তিকারক-মণ্ডলী, কিংবা কেন্দ্রীয় রাজস্ব-মণ্ডলীর বিচারাধীন আবেদনগুলি নিষ্ফল হইবে। বস্তুতঃ, এই আবেদনকারীদিগের প্রতি কর নির্দ্ধারণ, অতিরিক্ত লাভকর আইনের নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট লাভ অনুযায়ী হইলে তাহাদের প্রতি অবিচার হইবে। অধিকাংশ করদাতৃগণের পক্ষে এই অনিশ্চিত নির্দ্ধারণের (Provisional assessment) পুরা দাবী মিটান দুঃসাধ্য হইবে। এই নিমিত্ত দেয় অর্থের শতকরা ৮০ অংশ লইয়া বাকী ২০ অংশ চূড়ান্ত নির্দ্ধারণের পরে লওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে দাবীর নির্দ্দিষ্ট কাল (Chargeable accounting periods) বিভিন্ন হইবে; কারণ, সকল প্রতিষ্ঠান একই নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে বৎসর গণনা করে না। অতিরিক্ত লাভকর আইন বিধিবদ্ধ করিবার সময়ে অর্থ-সচিব ব্যবস্থা পরিষদে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, এই করের দাবী মিটাইবার সুবিধার্থ যুক্তিসঙ্গত কিস্তির ব্যবস্থা হইতে পারিবে। প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থের উপর শতকরা ৫৲ টাকা হারে সুদ এতই সামান্য যে, চূড়ান্ত নির্দ্ধারণে অযথা বিলম্ব ঘটিলেও সরকারের বিশেষ অসুবিধা হইবে না; বিলক্ষণ অসুবিধা এবং যথার্থ ক্ষতি ঘটিবে মন্দভাগ্য করদাতৃগণের। এই অসুবিধা ও ক্ষতি নিবারণার্থ কঠোর বিধি-বিধানের প্রয়োজন।

নূতন অর্ডিনান্স জারীর পূর্ব্বে অতিরিক্ত লাভ-কর আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী করদাতা শতকরা ২০ অংশ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জমা দিতে পারিতেন। জমা দিবার এক বৎসর পরে শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে সুদসহ এই টাকা ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল; এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত লাভ-করের এক-দশমাংশ তাহার প্রাপ্তব্য ছিল। নূতন বিধান অনুসারে এই স্বেচ্ছাকৃত জমাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই বাধ্যতার ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ঘটিবে; এমন কি, অনেককে ঋণদায়-গ্রস্ত হইতে হইবে। এই বাধ্যতামূলক জমা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান-বিশেষের প্রতি কিরূপ ক্লেশকর হইবে, অঙ্কের সাহায্যে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। মনে করুন, কোন করদাতার

	(টাকা)
দাবী-কালের আয় (Income in chargeable accounting period)	৪,৫০,০০০৲
নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট কালের লাভ (Standard period profits)	৩,৬০,০০০৲
আধিক্য	৯০,০০০৲
অতিরিক্ত লাভকর (Excess profits tax)	৬০,০০০৲
জমা (Deposit)	১২,০০০৲
	৭২,০০০৲
আয় (Income)	৪,৫০,০০০৲
বাদ (Less excess profits tax)	৬০,০০০৲
	৩,৯০,০০০৲
আধিক্য (Excess)	৯০,০০০৲
বাদ (Less excess profits tax)	৬০,০০০৲
	৩০,০০০৲
৫০ পাই হিসাবে ৩০,০০০৲ টাকার উপর আয়কর (Income tax on Rs 30,000 at 50 pies)	৭,৮১২৲
১০৮ পাই হিসাবে ৩০,০০০৲ টাকার উপর বাড়তি কর (Super tax on 30,000 at 108 pies)	১৬,৮৭৫৲
	২৪,৬৮৭৲
আধিক্য (Excess)	৯০,০০০৲
অতিরিক্ত লাভকর (Excess profits tax) ৬০,০০০৲ জমা (Deposit) ১২,০০০৲ আধিক্যের উপর আয় ও বাড়তি কর (Income tax and super-tax on excess) ২৪,৬০০৲	৯৬,৬০০৲
ঘাটতি	৬,৬০০৲

এই ক্ষেত্রে করদাতাকে তাহার নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট লাভের অতিরিক্ত ৫,০০০৲ টাকার ঘাটতি বহন করিতে হইবে। এই সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ একটি বিষয় বিবেচনা করিতে ভুলিয়াছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে, সার্ব্বলৌকিক যৌথ কারবারের (Public Joint Stock Companies) টাকায় দুই আনা হিসাবে একটি সম-পরিমাণ সমিতি করের (Flat Corporation Tax) তুলনায়, ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রথায় (by the slab system) উচ্চতর হারে বাড়তি কর দিতে হয়। বাধ্যতামূলক ভাবে টাকা জমা দিবার প্রথা সার্ব্বলৌকিক (public) যৌথ কারবার অপেক্ষা ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীগত সীমাবদ্ধ (Private limited) কারবারকে অধিকতর বিপন্ন করিবে। কারণ, ভারতীয় আয়কর আইনের (Indian Income Tax Act) ২৩-এ ধারা অনুযায়ী ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীগত সীমাবদ্ধ কারবারকে অন্ততঃ শতকরা ৬০ অংশ করনির্দ্ধারণোপযোগী আয়ের উপর লভ্যাংশ (Dividend) ঘোষণা করিতে হয়। এবং বাধ্যতামূলক গচ্ছিত টাকা এই আয়ের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত অঙ্ক-তালিকায় ইহা প্রকট :—

	(টাকা)
করনির্দ্ধারণযোগ্য হিসাব-নিকাশ কালে অর্জ্জিত আয় (Profit during the Chargeable Accounting period)	১০,০০,০০০
নিরিখ-নির্দ্দিষ্ট কালের লাভ (Standard Period Profits)	১,০০,০০০
অতিরিক্ত লাভ (Excess Profits)	৯,০০,০০০

মোট ১০,০০,০০০৲ টাকা হইতে যে যে বাবদ কর দিতে হইবে :—

৯,০০,০০০৲ টাকার উপর শতকরা ৬৬⅔ অংশ অতিরিক্ত আয়কর	৬,০০,০০০৲
৬,০০,০০০৲ টাকার শতকরা ২০ অংশ বাধ্যতামূলক জমা	১,২০,০০০৲
১০,০০,০০০ — ৬,০০,০০০ = ৪,০০,০০০৲ টাকার উপর প্রদেয় আয়কর ও বাড়তি কর	১,৫৪,১৬৬৲
আইন অনুযায়ী শতকরা ৬০ অংশ লভ্যাংশ	১,৪৭,৫০০৲
	১০,২১,৬৬৬৲

সুতরাং এই শ্রেণীর কারবারকে শুধু যে লাভ হইতেই টাকা জমা দিতে হইবে তাহা নয়, মূলধন হইতেও দিতে হইবে। এই নিমিত্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীগত সীমাবদ্ধ কারবারগুলির ক্ষেত্রে টাকা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক না হইয়া, স্বেচ্ছামূলক হওয়া উচিত। এবং অতিরিক্ত লাভকর আইনের দ্বিতীয় তালিকা অনুযায়ী এই জমা টাকা কারবারে নিযুক্ত মূলধন রূপে গণ্য হওয়া উচিত। সুখের বিষয় যে, বাধ্যতামূলক জমার টাকা চূড়ান্ত কর-নির্দ্ধারণের পরে দিতে হইবে।

কারবারে নিযুক্ত কর্ম্মচারী ও শ্রমিকগণকে লাভের অঙ্ক হইতে যে পুরস্কার (Bonus) ও দস্তুরি (Commission) দেওয়া হয়, সরকার তাহাও সীমাবদ্ধ করিতে উদ্যত। সাধারণতঃ মোট লাভের অঙ্ক হইতে বোনাস্ ও কমিশন বাদ দিয়া কর ধার্য্য করা হয়। সরকার "নিজস্ব কোলে অধিকতর ঝোল টানিবার" নিমিত্ত দুর্ম্মূল্য-প্রপীড়িত শ্রমিক, কারিকর ও অন্যান্য কর্ম্মীদিগের যৎকিঞ্চিৎ উপরি পাওনাও খর্ব্ব করিয়া করনির্দ্ধারণযোগ্য অঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সরকার নিজের কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চ বেতনের উপর দুর্ম্মূল্য-ভাতা (dearness allowance) দিতেছেন এবং কোন কোন কারবারী প্রতিষ্ঠান হইতে লোক লইয়া তাহাদিগকেও উচ্চতর বেতন দিতেছেন। যাহা হউক, আয়কর আইনের ১০ (২) ধারায় কিরূপ পরিমাণ বোনাস্ ও কমিশন কারবারী ব্যয় বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহার বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। ঐ নির্দ্দেশগুলি সরকারকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবার যথেষ্ট প্রতিকূলে। তাছাড়া, বিভিন্ন কারবারে বিভিন্ন রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা। সুতরাং একটি সর্ব্বজনীন নিয়ম নির্দ্ধারণ সম্ভবপর নহে। আয়কর কর্ম্মচারীরাও মোট লাভের অঙ্ক হইতে বোনাস ও কমিশনের অংশ বাদ দিতে কঠোরতা ব্যতীত কখন কোমলতা প্রকাশ করেন না।

নির্ব্বিঘ্নে কারবার পরিচালনার নিমিত্ত ভাণ্ডারে কিরূপ পরিমাণ কাঁচা মাল মজুত থাকিবে, সে সম্বন্ধেও সরকার নিয়ম নির্দ্ধারণে উদ্যত। কারবারে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও গুদামে কি পরিমাণ মজুত রাখা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধেও বিধান নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই সকল কাঁচা ও পাকা মালের মূল্য কারবারে নিযুক্ত মূলধনের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তাহা লাভ-করের পরিধির বহির্ভূত। কাঁচা ও পাকা মালের মজুত পরিমাণ খর্ব্ব করিয়া, লাভ-করের অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে গেলে কারবারকে পঙ্গু করা হইবে। গতাগতির অসুবিধা হেতু প্রয়োজন-মত কাঁচা মাল পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা অধিক পরিমাণে মজুত রাখিতে হয়। পক্ষান্তরে, পাকা মাল চালান দিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেই যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ মাল চালান দেওয়া যায়, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। কাঁচা মাল এবং পাথুরিয়া কয়লার অভাবে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প ইতিমধ্যে অচল অবস্থার সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। এ বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করিলে সরকারের যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ-কার্য্যও ব্যাহত হইবে। অতিরিক্ত লাভকর এবং বাধ্যতামূলক জমার টাকা দাখিল করিয়া অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত কাঁচা কিংবা পাকা মাল মজুত রাখা কখনই সম্ভবপর হইবে না। বিশেষতঃ মজুত কাঁচা মাল হইতে উৎপন্ন পাকা-মাল বিক্রীত হইলেই তদুপরি প্রাপ্য সরকারী পাওনা-গণ্ডা আদায় হইবে, সুতরাং সরকারের উৎকণ্ঠার কারণ কি?

ভারতরক্ষা বিধিনিচয়ে (Defence of India Rules) একটি নূতন নিয়ম (৯৪-এ) সন্নিবেশিত করিয়া ভারত সরকার নূতন কারবারী মূলধন সংগ্রহের সঙ্কোচ সাধনপূর্ব্বক ভারতে বিভিন্ন শিল্প সম্প্রসারণের প্রচেষ্টাকে অকারণ খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই বিধান অনুসারে কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ, কিংবা সমবায় ভারত সরকারের সম্মতি ব্যতীত বৃটিশ-ভারতে নূতন মূলধন যাচিতে, কিংবা সার্ব্বলৌকিক ভাবে খৎ, তমসুক, কর্জ্জপত্র প্রভৃতি (Securities) বিক্রয় কিংবা মেয়াদ পূর্ণোন্মুখ খৎ, তমসুক, ঋণস্বীকারপত্রকে পুনরুজ্জীবিত অথবা পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইতিমধ্যে এ দেশে এমন কোন বৈধ বাণিজ্যমূলক যৌথ কারবার সংগঠিত হয় নাই, কিংবা এমন কোন ঋণ-পত্র পুনরুজ্জীবিত অথবা পরিশোধিত হয় নাই, যাহাতে আতঙ্কের কারণ ঘটিতে পারে। সম্প্রতি কয়েকটি

ব্যাঙ্কিং, বীমা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে "ব্যাঙের ছাতার ন্যায়" যৌথ কারবার গজাইবার কোন লক্ষণ এখন প্রকাশ পায় নাই। বস্তুতঃ, মূলধন-বাজারের হাবভাব বুঝিবার নিমিত্তই ইহাদের আবির্ভাব মনে হয়।

যুদ্ধ প্রয়োজনে সম্প্রতি যে সকল বিভিন্ন শিল্পের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধি সাধিবার নিদারুণ অভাব অনুভূত হইয়াছে, সেই গুলিকেই প্রচলিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এখনও যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র বর্তমান প্রয়োজন সাধন হেতু নহে, ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও তাহাদের যেরূপ বনিয়াদ আবশ্যক, তদুপযুক্ত অর্থ-সংগ্রহ, সময় ও সুযোগ-সাপেক্ষ। এই শুভ-প্রচেষ্টার প্রারম্ভে বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি নিদারুণ প্রতিকূলতা। এইরূপ অনেক প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত মূলধনের অভাবে খর্ব্বাবস্থায় কার্য্য পরিচালন করিতে হইবে এবং তাহার ফলে যুদ্ধকার্য্যই ব্যাহত হইবে। সরকার অবশ্য নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন একেবারে নিষিদ্ধ করেন নাই; কিংবা প্রতিষ্ঠিত কারবারের প্রবর্দ্ধিত অংশ বিক্রয়ের পথ রুদ্ধ করেন নাই। পরন্তু, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান-পত্র বিচার-বিবেচনা করিবার নিমিত্ত একটি বিভাগীয় সদস্য-মণ্ডলী (Departmental Committee) প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু সরকারের কোন দৃঢ় নিয়ম-নীতি এবং যুক্তিসঙ্গত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, সুসম্পূর্ণ পরিকল্পনার অভাবে ভারতের বর্তমান যুদ্ধোদ্যম-প্রসূত শিল্প-বাণিজ্য ও বৃত্তি-ব্যবসায়-সম্প্রসারণের সুবর্ণ সুযোগ চিরতরে অন্তর্হিত হইবে।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যখন ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্র সর্ব্ব প্রযত্নে সেই সকল দেশে শিল্প-সম্প্রসারণ নীতির সম্যক্ অনুসরণ করিতেছেন, পরাধীন ভারতের পরিচালকবর্গ তখন অত্যাবশ্যক অতি প্রয়োজনীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষীণ প্রচেষ্টাকে সবলে সংহত করিবার উপায় নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত! গত বৎসরে একমাত্র অষ্ট্রেলিয়া রাজস্ব হইতে ৪২,২৩০,০০০ মিলিয়ন (নিযুত) পাউণ্ড ব্যতীত, শিল্প-সম্প্রসারণের নিমিত্ত ৪৭,২৬০,০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণ প্রদান ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বায়ত্তশাসনশীল ও স্বায়ত্তশাসনহীন রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রবল পার্থক্য এখানে প্রকৃষ্টরূপে প্রকট।

প্রবর্ত্তিত নিয়মের সুপরিচালিত প্রয়োগের নিরপেক্ষ ব্যবস্থা ব্যতীত, এই বিধানের বিধি-নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া, স্বল্প বিত্ত ও সম্পদ্-সম্পন্ন ভারতীয় শিল্পনিষ্ঠ উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে সুপরিমিত শিল্প-সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অসম্ভব। কিন্তু জনসাধারণ এবং বণিক্-সম্প্রদায়ের মনে দারুণ সংশয় আছে যে, এই অস্বাভাবিক এবং অত্যদ্ভুত ক্ষমতার পরিচালন-ফল ভারতের ও ভারতবাসীর স্বার্থের অনুকূল হইবে না। বিভাগীয় সদস্যমণ্ডলীর সহিত বে-সরকারী শিল্পব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সংযোগের অভাবে যৌথ কারবারের যথোপযুক্ত বৃদ্ধি ব্যাহত হইবার আশঙ্কাই আমাদের মনে প্রবল। এই বিধি-নিষেধের পশ্চাতে সরকারের কি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, জানি না। সম্প্রতি সংগঠিত কয়েকটি অর্থ সংক্রান্ত যৌথ প্রতিষ্ঠানের মূলে প্রবর্ত্তকগণের ব্যক্তিগত অহমিকা কারবারের দৃঢ়তা নিশ্চয়াত্মক সঙ্কল্পকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে; এ অভিযোগ আমাদের কর্ণেও পৌঁছিয়াছে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট মনে হয়, এবং সরকার যদি ঐ প্রতিষ্ঠানের মারফত অর্থ সংক্রা[ন্ত] নূতন প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন কঠোরতর সূক্ষ্মানুসন্ধান এবং দৃঢ়ত[র] শাসনের অনুবর্ত্তী করেন, তাহা হইলে অপপ্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা প্রতি[হত] হইতে পারে। পরন্তু, স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত ভারতীয় মূলধনে[র] শিল্পবাণিজ্যাভিমুখে উন্মুখ অবাধ গতিকে প্রতিহত করা কো[ন] প্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে, যৌ[থ] কারবার ক্ষেত্রে অপরিমিত আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের অবসান কত দিনে হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই পক্ষান্তরে, দুই যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী কালে সরকার এবং জনসাধার[ণ] বিশেষতঃ শিল্প বাণিজ্য ও বৃত্তিব্যবসায়ী সম্প্রদায়, প্রচুর ও প্রচ[ুর] প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে যে কঠোর শিক্ষালাভ করিয়াছে[ন] তাহা নিরর্থক হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে শিক্ষান[বিশ] শিল্পোৎসাহী অথচ কাজ-কারবারে অনভিজ্ঞ যুবক-সম্প্রদায় অর্থে[র] অনর্থ এবং প্রকৃষ্ট প্রচেষ্টার নিকৃষ্ট ব্যর্থতা ঘটাইয়াছিল। এবার যুদ্ধ কালেই প্রয়োজনের তাগিদে অপরিহার্য্য এবং অত্যাবশ্যক গুরু লঘু, মূল ও স্থূল শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে প্রবৃত্ত শিল্পোদ্যো[গী] পুরুষদের উৎসাহ ও উদ্যমের পশ্চাতে প্রয়োজনানুযায়ী অভিজ্ঞ[তা] এবং সাফল্য লাভের দৃঢ় সঙ্কল্প আছে। প্রয়োজনের তাগি[দে] সরকারেরও পৃষ্ঠপোষকতা আছে। অর্থের অনটন নাই, বর[ং] সুপ্রাচুর্য্য আছে; সুতরাং সুযোগ ও সুলক্ষণের শুভ সংযোগ[।] এরূপ অবস্থায় সুপর্য্যাপ্ত অর্থের শিল্পে বিনিয়োজন ব্যাহ[ত] করিলে সেই অর্থের গুরু চাপ স্বল্পপরিমিত ক্ষীয়মাণ ভোগ[্য] ও ভোগ্য দ্রব্যের উপর আপতিত হইবে। তাহাতে সরকারে[র] উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল প্রদান করিবে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি উভয়ই প্রচণ্ডতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে।

নূতন অতিরিক্ত লাভ-কর অর্ডিনান্সের সাহায্যে শতকর[া] ৬২ অংশ ব্যতীত সমস্ত লাভের অঙ্ক সরকারের তহবিলে টানিয়া লইলে এবং ভারতরক্ষা নিয়ম-নিচয়ের নূতন ধারা অনুযায়ী নিত্য-নূতন যৌথ-কারবারের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠিত-প্রচলিত পুরাতনের প্রসা[র] হেতু সুপ্রচুর অর্থের বিনিয়োজন প্রতিহত করিলে কি মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি অনিষ্টের সংশোধন হইবে? ভারত সরকার কিছু কা[ল] হইতে যে আর্থিক নীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহাই কি এই দুর্দ্দৈবের নিমিত্ত দায়ী নহে? প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা কম মূলে ভারতীয় পণ্যের বিদেশে বিক্রয় এবং ইউনাইটেড কিংডম্ কমার্শিয়াল করপোরেশনকে অযথা সুবিধা ও বিশেষ অধিকার কিংবা অনুগ্রহ প্রদর্শন কি ভারতীয় শিল্পী ও বণিক্-সম্প্রদায়ের মনে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য ও বৃত্তি-ব্যবসায় বিস্তার সম্পর্কে অসন্তোষের সৃষ্টি করিতেছে না? বৃটিশ-ভারতে ব্যতীত, বৃটিশ-ভারতের বহির্ভাগে এমন কি দেশীয় রাজ্যসমূহে অবস্থিত যৌথ কারবার সম্পর্কে বৃটিশ ভারতীয় ধনিক ও অংশীদারগণের অধিকার খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্য কি? প্রচলিত যৌথ-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এরূপ অধিকার-খর্ব্বের অর্থ কি অধিকার-বঞ্চনা (Expropriation) নহে? বিশেষতঃ যেখানে বৈদেশিক কিংবা দেশীয় রাজ্যাভ্যন্তরস্থ যৌথ কারবার, তাহাদিগকে অংশ প্রদান করিতে উৎসুক ও উদ্যত? এই দুইটি কঠোর বিধান অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পী-বণিক সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ করা সরকারের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল।

অসামরিক সম্প্রদায়ের ভোজ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের (Consumer's Goods) একান্ত অনটন ও অভাব এবং তাহার উপর অপরিসীম মুদ্রাস্ফীতির প্রচণ্ড চাপে দ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে যে জটিল ও কুটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রতিকারকল্পে শিল্পোন্নতি ও উৎপাদন-বৃদ্ধি প্রয়োজন। বিলাতে ভারতের অনুকূলে যে ষ্টার্লিং-সংস্থিতি পুঞ্জীভূত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধে ভারতে অজস্র কাগজের নোট প্রচলিত হইতেছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার, বৃটিশ ও মিত্রশক্তিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক ক্রীত ভারতীয় রসদ, বস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণের বিনিময়ে, ভারতে অবস্থিত বৃটিশ সম্পত্তিকে ভারতীয় অধিকারে হস্তান্তরণ। বিলাতে আমাদের ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। এখনও এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব, সমীচীন ও স্বাভাবিক। ইহাই ভারতীয় জনসাধারণের এবং শিল্পী-বণিক্ সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত সুদৃঢ় অভিমত। সরকারের মারফতে এই হস্তান্তরণে অনেক জটিল ও কুটিল প্রশ্ন ও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিতে পারে। এই নিমিত্ত বেসরকারী জন-সংসদ অথবা শিল্পী বণিক্-সঙ্ঘ-সম্প্রদায়ের মারফতে এই আদান-প্রদান অনুষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সরকারী তদারক তত্ত্বাবধানই যথেষ্ট হইবে। কিছু ষ্টার্লিং, কিছু ডলার এবং আমাদের সহিত বাণিজ্য-সংসৃষ্ট অন্যান্য দুই একটি দেশের মুদ্রা প্রকারের কিছু সংস্থিতি অবশ্য থাকিবে। কিন্তু শুনিতেছি, সরকার এই অতি সমীচীন উপায়ের পরিবর্ত্তে আমাদের বিলাতী পরিচারকবর্গের পেনসন, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড প্রভৃতি অনাগত প্রাপ্যের নিমিত্ত আমাদের ষ্টার্লিং-সংস্থিতি হইতে ২৪০ মিলিয়ন পাউণ্ড একটি কায়েমী ভাণ্ডারে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের হেফাজতে রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এ প্রস্তাব গত বাজেটে ছিল। মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি নিবারণের ইহাই কি প্রতিকার?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারের বর্ষা

এবারের বর্ষা
সব আশা-ভরসা
করে দিল ফর্শা !
অর্থাৎ রবি-শশি-তারকার চিহ্ন
একেবারে লুপ্ত—ছিন্ন ও ভিন্ন !
সকাল কি সন্ধ্যা, নিশি-মধ্যাহ্ন—
ঘড়ি ছাড়া নির্ণয়ে পন্থা নাস্ত্য !
ঊর্দ্ধে চাহিলে দেখি আকাশ তো নাই !
পথে পথ ছিল কি না, খুঁজিয়া না পাই।
জলে-জলে জলময়—যেন্তে চাই গামলা।
ট্রামগাড়ী বন্ধ ! বাসে প্রাণ সামলা !
পার্কেতে যাবো কি ? শুধু পাঁক-কর্দ্দম !
জামা জুতো পচে ঢোল ভিজে-ভিজে হর্দম্ !
পৃথিবীর চার-ভাগে এক-ভাগ থল ভার—
এবারের বর্ষায় ধুয়ে মুছে একাকার !
বধূরা—বেণী, ভোলা, অম্বর গুপ্ত—
দেখা নাই। কোথা গেল ? টিকি সব লুপ্ত !
ঘরে বসে পচে মরি নিজ্ঝুম্ নিশ্চুপ !
বাহিরেতে অবিরাম জল ঝরে ঝুপঝুপ !
ভোজ্যের চাল-আটা মিলছিল মাগ্যি—
জলে তার আশা গেল—কম দুর্ভাগ্যি !
কনট্রোলে যেতে হলে প্রাণ হা-হা-হুত্ত
রিফাইন্ সে-লাইন জল তলগস্ত !
হাসি নাই, আলো নাই, নাই সুখ-শান্তি
ঘন ঘোর আঁধিয়ার—অবসাদ-শ্রান্তি !
এবারের বর্ষায় ভগ্ন অদৃষ্টে
বন্ধন চারি দিকে আষ্টে ও পৃষ্ঠে !
এ বাঁধন হতে ত্রাণ নাই ইহ-জন্মে—
ঘটে যা, তা দেখে বেশ বুঝিতেছি মর্ম্মে !
এত চাপ, এত দাপ—নাই আর রক্ষে !
দায় হলো প্রাণটাকে ধরে রাখা বক্ষে !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ঝড়

ঝড় উঠিয়াছে অস্ত-সাগর-পারে,
প্রলয়-আরাবে কম্পন লাগে ধরণীর চারি ধারে।
যে পথে সে চলে, ওঠে বসবাস, লোটে মানবের ধাম,
আকাশের পথে আগুন ঢালিয়া পোড়ায় নগর-গ্রাম ;
গৃহে, রাজপথে, বনে, গহ্বরে, কোনোখানে নাহি ত্রাণ,
লক্ষ বক্ষ বিদারি ক্ষণেকে খেলাছলে নাশে প্রাণ,
জননীর বুকে শিশু উড়ে যায় ধূলি-ধূমে আঁধিয়ারে,
অস্ত-সাগর-পারে।

তারি এক ভাগ ছুটিয়া আসিছে পূর্ব্ব-আকাশ হতে,
শ্যামল মানুষে রাঙিয়া রক্ত-স্রোতে ;
মোরা অসহায়, কম্পিত বুকে প্রতি মুহূর্ত্ত গণি,
যত দিন যায় ঘনাইয়া আসে, কাণে উঠে রণরণি
তারি তাণ্ডব, আকাশে-বাতাসে মহা-আশঙ্কা রাজে,
কোটি কোটি জন অতি অশরণ, কোথা যাবে জানে না যে !
অকূল সাগরে কে ভিড়াবে তরী ? বড় আঁধি, দিশা নাই !
মাঝি, কোথা তুমি ভাই ?

আকাশ কি নীল ? ধরণী কি শ্যাম ? আজি ত যায় না বলা,
বড় দুর্গম জীবনের পথে চলা।
কে দিবে অন্ন ? কে দিবে বস্ত্র ? ডাক পড়িয়াছে তার !
মহান্ সেবার হেন মহাক্ষণ আসে নাই আর বার !
অকপট বীর-পুরুষরা কোথা ? শ্রম-স্নেহশীলা নারী ?
ডাক পড়িয়াছে তারি।
আশ্বাস দাও, বিশ্বাস দাও, শক্তি-সাহস দাও,
আঁধার নেমেছে, প্রভাতও আসিবে এ-হেন অভয় গাও !
মরণে বাঁচার পথ খুঁজে দিতে, বিদায় করিতে নিশা,
দিশারি, দেখাও দিশা।

শ্রীগোপাললাল দে

ছোটদের আসর

ঠাকুর্দ্দা

(গল্প)

সুধীরচন্দ্র দাঁ আর সুধীশচন্দ্র খাঁ দু'জনেই আই, এস্, সি পাশ করে কলকাতার মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়তে ঢুকলো। এবং দু'জনেই মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে এক হোটেলে পাশাপাশি ঘরে থাকতো। কালীতারা হোটেলটি নামে হোটেল হলেও কার্য্যত: মেডিকেল কলেজ-হোষ্টেলের মত হয়ে গিয়েছিল। অনেকগুলি সিঙ্গল-সিটেড ঘর এবং প্রায় প্রত্যেকটিতেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ২৭নং ঘরে থাকতো সুধীরচন্দ্র দাঁ আর ২৮এ থাকতো সুধীশচন্দ্র খাঁ। দু'জনেরই ডাক-নাম সুধা। সেই নামেই সকলের কাছে তারা পরিচিত। পরস্পরকে তারা স্যাঙ্গাত বলে ডাকে। দু'জনেরই পয়সা আছে—বড় লোকের ছেলে—মফঃস্বলে বাড়ী; এবং দু'জনে বন্ধুত্ব বেশ নিবিড়।

এক দিন সুধীর দাঁ ঘরে বসে একখানা নভেল পড়ছে, শরীর খারাপ বলে সে দিন বেড়াতে বেরোয়নি, এমন সময় মোটা বেঁটে মাথা-জোড়া-টাক খোঁচা-খোঁচা-দাড়ি এক বৃদ্ধ ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে বছর তিনেক বয়সের একটি ছেলে। ঘরে ঢুকেই এক-গাল হেসে তিনি বললেন, "কি সুধা, ভাল তো?" আগন্তুককে সুধীর জীবনে কখনও দেখেনি! এমন পরিচিত আহ্বানে সে বিস্মিত হলো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললে—"আপনাকে চিনতে পারছি না তো!"

হো-হো করে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে তিনি বললেন—"চিনতে পারবে কোত্থেকে? তোমার বাবা যখন এই এতটুকু (সঙ্গের ছেলেটিকে দেখালেন), তখন আমি ব্যবসা করতে বর্ম্মায় যাই। যুদ্ধের হিড়িকে এই কিছু দিন আগে প্রায়-পদব্রজে ফিরে এসেছি বললে ভুল হবে না। সম্পর্কে আমি তোমার বাবার পিসে হই অর্থাৎ তোমার দাদু। দাদা, তোমার আর এক জন দাদাকে প্রণাম করো।"

খোকাটি এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে বিস্কুট খাচ্ছিল। বিস্কুট শেষ হতে বলে উঠলো, "বাবার কাছে যাব।" সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কি ক্রন্দন। গলার এবং ফুসফুসের জোর দেখে সুধীর অবাক! এইটুকু ছেলের গলার যখন এমন ভলিউম, তখন কালে ও-একটা বড় দরের ওস্তাদ না হয়ে যায় না! যাই হোক, নিজেকে সামলে নিয়ে সুধীর বললে—"আপনি বসুন দাদু। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?" দাদু বসলেন এবং সঙ্গী নাতিটিকে সুধীরের খাটের ওপর বসিয়ে দিলেন। তার নোংরা পায়ে সুধীরের ফর্সা বিছানা বিচিত্র রাগে রঞ্জিত হলো। মুখে ক'টা কড়া কথা এসে পড়েছিল—কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে চেপে গেল। দাদু স্মিত হাস্যে বললেন—"তার পর সব ভাল তো? বাড়ীর সকলে ভাল আছে?" বিনীত ভাবে সুধীর বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" খোকার নন-ষ্টপ গলা-সাধা চলেছে। বৃদ্ধ বললেন—"দাদা-ভাইয়ের বোধ হয় ক্ষিধে পেয়েছে।" ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সুধীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরে যখন ফিরলো, তখন তার হাতে এক-চ্যাঙ্গারী খাবার। বৃদ্ধ এবং তাঁর ক্ষুদ্র নাতিটি এমন রেটে আহার আরম্ভ করলে যেন ফাঁসীর খাওয়া! ভোজন-পর্ব্ব চুকলে বৃদ্ধ বললেন—"দাদা, বড় আপ্যায়িত করলে। বুড়ো মানুষ, এই এক পেট খেয়ে এখন তো নড়তে পারব না। বাইরে গাড়ী দাঁড় করিয়ে এসেছি। ভেবেছিলুম, তোমার দেখা না পেলে চলে যাব। তাকে পাওনাটা মিটিয়ে দিয়ে আসি। আমার কাছে দশ টাকার নোট রয়েছে। তুমি যদি খুচরো একটা টাকা দাও তো বড় সুবিধা হয়।" টাকা দিতে সুধীরের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু করে কি বর্ম্মার দাদু! বাবার পিসে-মশাই! দিতে হলো। ভদ্রতা!

বৃদ্ধ ফিরে এসে আবার গ্যাট হয়ে বসলেন। এ-কথা সে-কথা চলতে লাগল। এমন সময় স্যাঙ্গাত সুধীশচন্দ্র খাঁ এসে ঘরে ঢুকল। সুধীর পরিচয় করিয়ে দিলে—"ইনি আমার দাদু আর এ হলো আমার বন্ধু সুধীশচন্দ্র খাঁ।" বৃদ্ধকে সুধীশ প্রণাম করলে। বৃদ্ধ তার দিকে এক-দৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—"এ্যাঁ, তোমার নাম সুধীশচন্দ্র খাঁ! সুধা?" সুধীশ উত্তর দিলে—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" বৃদ্ধ চটে লাল! "তবে ও কে? ও তো আমার নাতি নয়, অথচ ও বললে ওর নাম সুধা। এ রকম মিথ্যা বলার মানে?" সুধীশ বললে—"আপনি অনর্থক রাগ করছেন। ওর নামও সুধা, সুধীরচন্দ্র দাঁ। এ রকম ভুল অনেকেরই হয়।" বৃদ্ধ বললেন—"সে যাই হোক, এখন তোমার ঘরে চলো। এখানে আমি আর এক দণ্ড থাকব না।" অতঃপর খোকা-নাতিসহ বৃদ্ধ ট্রান্সফার্ড হলেন সুধীশের ঘরে। খোকার কান্না তখন থেমে গেছে, কারণ, তার দু'হাতে এবং মুখের মধ্যে একটি করে রসগোল্লা। সুধীর বেচারীর বিছানা রস-সিক্ত হলো।

সুধীশের ঘরে এসে বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দিলেন—"আমায় বো[ধ] হয় চিনতে পারছ না দাদা! আমার নাম অধমতারণ তা[illegible] চিনবেই বা কি করে? তুমি তখন জন্মাওনি! তোমার বাপই তখন এতটুকু এইটুকু (সঙ্গের ছেলেটিকে দেখালেন)। আমি ব্যবসা করতে বর্ম্মায় যাই। যুদ্ধের হিড়িকে এই কিছু দিন আগে প্রায়-পদব্রজে এখানে ফিরে এসেছি। সম্পর্কে আমি তোমার বাবার পিসে হই, অর্থাৎ তোমার দাদু।" তার পর মামুলি কিছুক্ষণ সাংসারিক কথাবার্ত্তা হলো। ততক্ষণে রাক্ষুসে নাতির রসগোল্লা ভোজন পরিসমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং আবার তার ক্রন্দন সুরু হলো। বৃদ্ধ বললেন—"দাদা-ভাই, তুমি যদি এই টাকাটা নিয়ে কিছু লেবেঞ্চুস আর পাণ নিয়ে এসো তো বড় ভাল হয়। ছেলেটা চুপ করে, আমারও মুখ-শুদ্ধি হয়।" সুধীশ বললে—"আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। গলির মোড়ে দোকান আছে। আমি এনে দিচ্ছি। আপনি বসে বিশ্রাম করুন।" এই কথা বলে সে ঘর থেকে বেরি[illegible]

পাণ এবং লজেঞ্চেস নিয়ে ঘরে ফিরে এসে সুধীশ দেখে, দাদু নেই। ছেলেটা একলা বসে তার ঘরে "বাবার কাছে যাব" বলে চীৎকার করে কাঁদছে। বৃদ্ধ কোথাও গেছে এখনই আসবে—মনে করে ক্রন্দন-রত ক্ষুদে-রাক্ষসের হাতে লজেঞ্চেসের ঠোঙাটা দিয়ে সুধীশ বৃদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু বৃদ্ধ আর ফেরে না। তখন সুধীরের ঘরে গিয়ে বললে—"আমি পাণ আর লজেঞ্চেশ্ আনতে গিয়াছিলুম—ফিরে এসে দেখি, দাদু নেই। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, তিনি ফিরছেন না। ওদিকে যে-নাতিটিকে রেখে গেছেন, কেঁদে সে বাড়ী ফাটিয়ে ফেললে!"

ইতিমধ্যে হোটেলের অন্য ছেলেরাও এসে পড়েছে। এক জন বললে— "থানায় চল। যদি কোন এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে থাকে!" সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলে। জামা-কাপড় পরতে গিয়ে সুধীশ দেখে, সর্ব্বনাশ! তার রিষ্ট-ওয়াচ, পার্কার পেন এবং মনি-ব্যাগ গায়েব! সুধীশ স্তম্ভিত। তবে কি ঠাকুর্দ্দা চুরি করেছে? কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে? চুরি করে কেউ ছেলে রেখে যায়? ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠলো। শেষে পুলিশে খবর দেওয়াই স্থির হলো।

ছেলে নিয়ে সুধীশ, সুধীর এবং হোটেলের আরও ক'জন ছাত্র থানায় গিয়ে হাজির! যাবার সময় হোটেলের ম্যানেজারকে বলে যাবার কথা কারও মনে হলো না। সব শুনে ইন্সপেক্টর বললেন— "আপনার ঠাকুর্দ্দা বলে যিনি পরিচয় দিলেন, তাঁকে আপনি চেনেন?" সুধীশ উত্তর দিল—"আজ্ঞে না। জীবনে কখনও তাঁকে দেখিনি। দেখবো কি করে? বললেন, আমার জন্মাবার আগেই তিনি বর্ম্মায় গিয়েছিলেন ব্যবসা করতে।" তিনি বললেন— "তা হলে কোন জোচ্চোর আপনাকে ঠকিয়েছে নিশ্চয়। ছেলেটিকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেছলো হয়তো!" ঠিক সেই সময় এক জন হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। এসে বললে, "মশাই, আমার ছেলে হারিয়েছে।" তার পর হঠাৎ হারানো দাদুর এই নাতিকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। ছেলেটিও "বাবা" বলে ছুটে তাঁর কাছে গেল। ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন—"আপনার ছেলে?" তিনি উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপিসে গেছি, হঠাৎ চাকর গিয়ে খবর দিলে, খোকাকে পাওয়া যাচ্ছে না! সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ কি! খোকার গলার হার?"

ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। জাল-ঠাকুর্দ্দা ছেলে ভুলিয়ে এনে তার গলার হার চুরি করেছে এবং হোটেলে এসে সুধীশকেও বেকুব বানিয়ে চম্পট দেছে! যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। থানায় ডায়েরি করে সকলে ফিরে এলো।

ঠাকুর্দ্দা ওরফে অধমতারণ তা হোটেলের সামনে এক রেস্তরাঁয় চা পান করছিলেন এবং দরজার পিছনে বসে হোটেলের ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন। সুধীর, সুধীশ এবং আরও অনেকগুলি ছেলে তাঁর আনীত সেই খোকাকে নিয়ে হল্লা করতে করতে চলে গেল— দেখে তিনি মনে মনে খুবই প্রীত হলেন। চা পান শেষ করে ধীর-পদক্ষেপে বৃদ্ধের মত ঠুকঠুক করতে-করতে আবার তিনি হোটেলে প্রবেশ করলেন। এবার কিন্তু কোন বাসিন্দার ঘরে নয়, একেবারে ম্যানেজারের আপিসে এসে হাজির। ম্যানেজার নমস্কার করে চেয়ারে বসতে বলে প্রশ্ন করলেন—"কাকে চান?" প্রতি-নমস্কার করে বৃদ্ধ বললেন—"আমার নাম জ্যোতির্বার্ণব দিব্যেন্দ্রসুন্দর চতুর্ব্বেদী শঙ্খচক্র-গদাপদ্মনিধি। সুধীশচন্দ্র যাঁর কুল-গুরু। তার সঙ্গে একবার দেখা করব।" ম্যানেজার নকুড়চন্দ্র কন্থুই অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। কপালে চন্দন-তিলক গলায় তুলসীর মালা। তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিয়ে তিনি বললেন—"বসুন, আমি দেখে আসছি।" ভক্তিতে তিনি এমন গদগদ হয়ে পড়লেন যে, চাকরকে ডেকে খোঁজ করতে না বলে নিজেই চললেন দেখতে। উঠে দাঁড়াতেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মনিধি মহাশয় বলে উঠলেন—"দাঁড়ান।" কন্থুই মশাই ব্রেক-কষা গাড়ীর মত হঠাৎ নিষ্কম্প স্থির হয়ে দাঁড়ালেন—একেবারে নট-নড়ন-চড়ন নট্-কিচ্ছু। নকুড়চন্দ্রের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে জ্যোতির্বার্ণব নিজের মনে বললেন—আশ্চর্য্য! ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য! নকুড় বাবু ভীত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন— "কি আশ্চর্য্য দেখলেন?" চতুর্ব্বেদী উত্তর দিলেন—"আপনার ললাটে রয়েছে রাজ-টীকা। শীঘ্রই ধন-প্রাপ্তির সম্ভাবনা।" নকুড়-চন্দ্র বিনয়ে কুঁকড়ি হয়ে বললেন, "কবে আর পাব বলুন! বয়স তো কম হলো না।" জ্যোতির্বার্ণব বললেন, "শীঘ্রই পাবেন। আচ্ছা, আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ান। আমি ধ্যানে দেখে নিচ্ছি প্রাপ্তি-যোগ কবে।" নকুড়চন্দ্র বাইরে গেলেন। শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্ম-নিধি চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। মিনিট খানেক পরেই নকুড় বাবুকে ডাকলেন। তিনি ভিতরে আসবামাত্র নিধি মহাশয় তাঁর হাত ধরে একটু চিন্তা করবার পর বললেন—"আচ্ছা, আপনি হাতের মুঠো বন্ধ করে ভগবানের নাম করুন। যতক্ষণ না বলি, মুঠো খুলবেন না।"

একটু পরে নিধি বললেন—"এবার মুঠোটা খুলুন।" নকুড়-চন্দ্র মুঠো খুললেন—কিন্তু আশ্চর্য্য! হাতের তালুতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা ১৩৫০! নকুড়ের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া এবং শঙ্খচক্রগদা-পদ্মনিধি ভক্তিতে শিবনেত্র! নিধি বললেন—"এই বছরেই প্রাপ্তি-যোগ! সবই তাঁর ইচ্ছা!" গদগদ নকুড়চন্দ্র পাঁচটি টাকা প্রণামী দিয়ে বললেন—"এ অধমের উপর এতই যখন দয়া করলেন, তখন আরও একটু অনুগ্রহ করুন। কি উপায়ে ধন লাভ হবে, সেটা বলে দিন।" অত্যন্ত বিনয়-সহকারে নিধি বললেন—"আমি তার কি বলব! কর্ত্তা তিনি, আমি উপলক্ষ মাত্র। তবে যখন ধরে বসেছেন, বলছি—যদিও আমার গুরুর নিষেধ। কষে বার করতে হবে। একটু দেরী লাগবে। আপনি ততক্ষণ সুধাকে ডেকে আনুন।" "বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছি।" এই কথা বলে নকুড়চন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘুরে সুধীশকে না পেয়ে নকুড়চন্দ্র ঘরে ফিরে এলেন। এসে দেখেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মনিধি মহাশয় নেই! একখানি চিঠি পড়ে আছে। পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা আছে— "আমি ধ্যানে জানতে পারলুম, সুধীশ হোটেলে নেই। আপনি লটারীর টিকিট কিনুন। ধন-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।" নকুড়চন্দ্রের ভক্তি-রস গাঢ়তর হয়ে উঠল!

সুধীর, সুধীশ এবং অন্যান্য ছেলেরা ইতিমধ্যে হোটেলে ফিরে এসেছে। তাদের দেখে নকুড়চন্দ্র বললেন—"কোথায় গিছলেন সুধীশ বাবু?" "থানায়"—বলে সুধীশ সমস্ত ঘটনা খুলে বললে। সব শুনে নকুড় বাবু বললেন—"বটে! ব্যাপার তো তাহলে রীতিমত ঘোরালো। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, আপনাদের গুরুদেব এসেছিলেন।"

"আমাদের গুরুদেব!" বিস্মিত হয়ে সুধীশ বললে।

নকুড় বাবু উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। নাম বললেন জ্যোতির্বার্ণব শ্রীদিব্যেন্দ্রসুন্দর চতুর্ব্বেদী, শঙ্খচক্রগদাপদ্মনিধি।" সুধীশ অবাক!—"ও নামের কাউকে আমি চিনি না।" এমন সময় মুদীর লোক এসে হাজির—"বাবু, আজ টাকা দেবেন বলেছিলেন— দেবেন কি?" নকুড়চন্দ্র বললেন—"নিশ্চয়। তোমাদের টাকা আমি আনিয়ে রেখেছি। দেরাজে আছে, দিচ্ছি। কৈ, চাবীটা কোথায় গেল? টেবিলের ওপরই রেখেছিলুম যে।"

খুঁজতে খুঁজতে চাবী মিললো টেবিলের তলা থেকে। দেরাজ খুলে ম্যানেজার আর্ত্তনাদ করে উঠলেন—"সর্ব্বনাশ!"

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! ছেলেরা প্রশ্ন করলে—"কি হলো নকুড় বাবু?" তিনি প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে উত্তর দিলেন—"আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! ব্যাঙ্ক থেকে আজ দুশ' টাকা এনে রেখেছিলুম। তার একটি কাণাকড়ি নেই,—সব গেছে!" সুধীশ প্রশ্ন করলে—"আপনি সমস্ত ক্ষণ ঘরে ছিলেন?" তিনি জবাব দিলেন—"প্রায় সমস্ত সময়ই ছিলুম বৈ কি! মধ্যে মিনিট দশেকের জন্ম শুধু আপনাকে খুঁজতে গেছলুম।" সুধীর জিগ্যেস করলে—"ঘরে তখন আর কেউ ছিল?" নকুড়চন্দ্র উত্তর দিলেন—"আপনার গুরুদেব ছিলেন।" সুধীশ চটে উঠল—"থামুন। আমার গুরুটুরু কেউ নেই!" "তবে?" তবে আর কি! থানায় খবর দেওয়াই সাব্যস্ত হলো।

সব শুনে থানার ইন্সপেক্টর বললেন—"এ দেখছি সেই ঠাকুদ্দার কাজ! আপনি যখন ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন, চাবী আপনার সঙ্গে ছিল?" নকুড় বাবু উত্তর দিলেন—"না, টেবিলের উপর পড়েছিল। নিয়ে যেতে ভুলে গিছলুম। কিন্তু তিনি এক জন সাধুপুরুষ!" ইন্সপেক্টর বললেন—"সাধুপুরুষ না ছাই! ভক্তিগদগদ লোককে ঠকাবার জন্ম অনেক জোচ্চোরই সাধু সেজে ঘোরে!" নকুড়চন্দ্র এ-কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন—"কিন্তু আমার হাতে লেখা ফুটে উঠলো!

ইন্সপেক্টর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"সে আবার কি ব্যাপার?" নকুড়চন্দ্র তখন তাঁর ধনপ্রাপ্তির শুভ সংবাদের কথা জ্ঞাপন করলেন। শুনে ইন্সপেক্টর হেসে বললেন—"এ অতি সহজ ব্যাপার! নিজের হাতের বুড়ো আঙ্গুলে উল্টো করে ১৩৫০ লিখে আপনার হাত চেপে ধরেছিল। তাই লেখা ফুটে উঠেছিল।" নকুড়চন্দ্র রেগে বললেন—"ব্যাটাকে আমি আবার পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়েছি মশাই। তাকে আমি জেলে দেবো।" ইন্সপেক্টর বললে—"ধরতে পারলে তবে তো!"

সকলে হোটেলে ফিরে এল। ঠাকুদ্দাকে আর পাওয়া গেল না! সুতরাং সুধীশের ঘড়ি, পেন, মণিব্যাগ কিম্বা নকুড়চন্দ্রের টাকারও আর উদ্ধার হলো না। সুধীরের একটা টাকা আর কিছু মিষ্টান্নের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে! কিন্তু এর পরে হোটেলে-কলেজে টেঁকা সুধীশ আর সুধীর দু'জনের পক্ষেই মুস্কিল হয়ে উঠলো! কলেজ শুদ্ধ ছেলেরা তাদের ক্ষেপাতে লাগলো—"কি হে, ঠাকুদ্দার খবর কি?" এ দিকে নকুড়চন্দ্রও উঠতে-বসতে বলতে লাগলেন—"আপনাদের ঠাকুদ্দার জন্মই আমার এই সর্ব্বনাশ হলো! দু'দুশো টাকা, মশাই।" শেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু'জনেই ট্রান্সফার নিয়ে ঢাকায় চলে গেল।

শ্রীযামিনীমোহন কর

জলের বুকে বন্ধু

এ বর্ষায় বাংলা দেশের চারি দিকে আবার বন্যার প্রাদুর্ভাব। ঘর-বাড়ী ক্ষেত-খামার ডুবে কত লোকের অকাল-বিয়োগ ঘটছে, ভাবলে জ্ঞান থাকে না!

বন্যার জলে ডুবে যাঁরা গতাসু হ'চ্ছেন, সাঁতার না জানার দরুণ যে তাঁদের অনেকের অপমৃত্যু ঘটেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই! সাঁতার জানা থাকলেও বন্যার খরস্রোতে প্রাণ রক্ষা করা কঠিন সত্য; তবু সাঁতার জানা থাকলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচা কতক সম্ভব হয়!

সাঁতার সকলের শেখা উচিত! কারণ, জলযানে ভ্রমণ করতে বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়! সাঁতার জানা থাকলে জলমগ্ন মানুষ বা পশুর জীবন রক্ষা করা যেতে পারে!

১। তোলা একখানি হাত ধরিয়া

খুব ভালো সাঁতার জানা থাকলেও জলমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারকল্পে জলে নামতে হলে কলা-কৌশল দুরস্ত থাকা প্রয়োজন: নচেৎ রক্ষা করতে গিয়ে রক্ষা-কর্ত্তাকেও অনেক সময় জলমগ্ন ব্যক্তির সঙ্গে অতল জলে তলিয়ে যেতে হয়! এমন ঘটনা অনেক ঘটে।
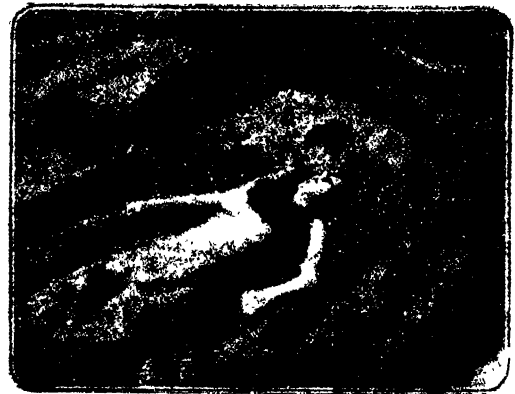
২। জলমগ্নের মূর্চ্ছা হইলে

চোখের সামনে মানুষ বা পশু-পাখী জলে ডুবে মরছে দেখলে কার প্রাণ না চঞ্চল হয়ে ওঠে? তাদের উদ্ধার করবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করতে মানুষ কাতর হয় না। কিন্তু যিনি সাঁতার জানেন না, এ দায়ে তিনি যদি উদ্ধার করতে জলে নামেন, তাহলে জলে যিনি ডুবছেন, তাঁর সঙ্গে উদ্ধার-কর্ত্তারও রক্ষা পাবার আশা থাকে কম।

সাঁতারে যিনি পটু, তিনিও জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে জলে ঝাঁপ দিলে কতকগুলি বিষয়ে যেন হুঁশিয়ার থাকেন! কি সে বিষয়, তারই সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলছি।

'জলে-ডুবি'র মত বিপত্তি ঘটলে মানুষের জ্ঞান থাকে না, হাবু-পাকু করে রক্ষা পাবার প্রয়াস পান উগ্র-রকম। তার ফলে দু'দণ্ড যদি বা ভেসে থাকা যেতো, সে-উপায় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়। এ অবস্থায় সাঁতার-জানা কোনো ব্যক্তি উদ্ধারের জন্য জলে নামলে জলমগ্ন ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্য তাঁকে এমন জড়িয়ে ধরেন যে, সে-চাপে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে উদ্ধার-কর্ত্তার পক্ষে রক্ষা পাওয়া দায় হয়। যিনি উদ্ধার করতে জলে নামবেন, এ কথা মনে রাখা তাঁর উচিত, জলগ্নম ব্যক্তি যদি সচেতন থাকেন, তাহলে তাঁর নাগাল থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা। জলমগ্ন ব্যক্তিরও উচিত ১নং ছবির ভঙ্গীতে দু' হাত তুলে মাথা উঁচু করে জলে চুপচাপ থাকা। উদ্ধার-কর্ত্তা তাঁর একখানি উত্তোলিত হাত ধরে তাঁর নাগাল থেকে নিজেকে সতর্ক ভাবে যথাসম্ভব দূরে রেখে কূলের দিকে জলমগ্ন ব্যক্তিকে টেনে আনবেন। জলমগ্ন ব্যক্তি যদি নিশ্চেতন বা দুর্ব্বল হন, তাহলে ২নং ছবির ভঙ্গীতে তাঁর বুকের উপর দিয়ে হাত চালিয়ে তাঁকে বক্ষলগ্ন করে কূলে নিয়ে আসতে হবে। জলমগ্ন ব্যক্তি যদি উদ্ধার-কর্ত্তাকে চেপে ধরেন, তাহলে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে জলমগ্ন

৩। সবলে ঝাঁকা দিয়া সরাইয়া

৪। কূল হইতে দূরে—সারবন্দী ভাবে

ব্যক্তিকে সবলে ঠেলে সরিয়ে তাঁর আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে—নচেৎ দু'জনেরই মরণ সুনিশ্চিত।

জলের স্রোত যদি প্রখর হয় এবং যদি দেখেন, কূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে কেউ জলমগ্ন হচ্ছে, তাহলে ভালো রকম সাঁতার জানলেও এক জনের পক্ষে রক্ষা-কার্য্যে নামা খুব নিরাপদ নয়। এমন অবস্থায় চার-পাঁচ জন সাঁতার-জানা ব্যক্তি বিপত্তিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে সাঁতার-জানা উদ্ধার-কর্ত্তারা ৪নং ছবির মতো লাইন-বন্দী ভাবে অবস্থান করে জলমগ্ন ব্যক্তিকে তীরে আনবার ব্যবস্থা করবেন।

—

বড় হওয়া

[বয়]সে বয়সে বা মাথায় বাড়িয়া বড় হওয়া নয়; কৃতিত্বের [দি]কে নিজেকে বড় করিয়া তোলা। কি করিয়া [বড়] করিয়া তোলা যায়, সে সম্বন্ধে আমেরিকায় অনু-[শীলনে]র নাই।

অনুশীলন এবং পরীক্ষা করিয়া মার্কিণ বিশেষজ্ঞেরা বলেন—বড় হইতে হইলে জ্ঞানানুশীলন ছাড়া অন্য উপায় আর নাই!

আমাদের দেশে কথা আছে—বিদ্যা মহা-ধন; এ ধন যত দান করিবে, তত বাড়িবে। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বলিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানোপার্জ্জনের মত উপার্জ্জন আর নাই; জ্ঞানোপার্জ্জন করিলে সে উপার্জ্জনের সুদ দিন-দিন বাড়িবে—সে সুদের মার নাই। আমেরিকার এক জন ক্রোড়পতি অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন—যদি প্রচুর টাকা রোজগার করিতে চাও, তাহা হইলে কৃপণতা নয়! টাকা খরচ করিয়ো। এক পয়সা বাঁচাইবার দিকে যার ঝোঁক, ঐ এক পয়সার উপরে তার পুঁজি আর কোনো দিন বাড়িয়া দু'পয়সা হইবে না। যে দু'পয়সা রোজগার করিতে চায়, তার আকাঙ্ক্ষাও ঐ দু'পয়সাতে পর্য্যবসিত হইবে—দশ পয়সা তার ভাগ্যে কদাচ ঘটিবে! মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার—এই নীতিই ভালো। ইংরেজীতে কথা আছে—Make thy projects high.

অর্থ বা কৃতিত্ব, খ্যাতি বা প্রতিপত্তি যদি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে দেহ-মনের স্বাস্থ্য ভালো করো। জগতে যাঁরা কৃতী হইয়াছেন, তাঁরা একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন, ভালো স্বাস্থ্য এবং শিক্ষিত মন—এ দু'টির মত মূলধন আর নাই! তাছাড়া সবার উর্দ্ধে বড় হইয়া যদি দাঁড়াইতে চাও তো জানিয়ো, ঐ অক্লান্ত

ভালো স্বাস্থ্য এবং শিক্ষিত মন—ইহাদের উপর ভর করিয়াই শুধু বড় হইয়া দাঁড়ানো যায়। স্বাস্থ্যকে ভালো এবং মনকে শিক্ষিত করিতে চাহিলে নিয়ম মানিতে হইবে—সব বিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তী হইতে হইবে।

যে-সব কৃতী মহাজন নব নব আবিষ্কারে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁরা ধনীর গৃহে জন্ম লন নাই। তাঁরা ছিলেন দরিদ্র ঘরের সন্তান। টাকা থাকিলেই মানুষ শিক্ষা লাভ করিতে পারে, নচেৎ পারে না—এ ধারণা যে কতখানি ভুল, আবিষ্কারক এই সব কৃতী মহাপুরুষের জীবনী আলোচনা করিলে তাহার অকাট্য প্রমাণ মিলিবে।

যে হেনরি ফোর্ড পৃথিবীর মধ্যে আজ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি ছিলেন প্রথম জীবনে সামান্য এক জন মিস্ত্রী। কিন্তু মিস্ত্রীর কাজ করিয়াই তিনি দিন কাটাইতেন না—ঘরে বসিয়া জ্ঞান-চর্চ্চা করিতেন। তাই তাঁহার কৃতিত্বে পৃথিবী আজ ধন্য হইয়াছে।

এডিশন প্রথম জীবনে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। দারিদ্র্যে বিজড়িত থাকিলেও জ্ঞান-লাভের জন্য তাঁর স্পৃহা, আগ্রহ এবং চেষ্টা ছিল অসাধারণ রকম: বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারও ইঁহারা মাড়ান নাই—মাড়াইবার সামর্থ্য ছিল না। ঘরে বসিয়া জ্ঞানানুশীলন করিয়া ইঁহারা বড় হইয়াছেন। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও ঘরে বসিয়া জ্ঞানানুশীলন করিয়াছেন; পাশ করিয়া মেডেলের মালা গলায় দুলান্ নাই! কিন্তু তাঁর শিক্ষা, কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কাছে ইউনিভার্সিটির মেডেল-মার্কা কোনো দিগ্‌গজ দাঁড়াইতে পারেন না!

স্কুল-কলেজে পড়া উচিত। সে সুযোগ যাদের মেলে, তাদের উচিত, সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। তাই বলিয়া কলেজে পড়িবার সুযোগ না মিলিলে শিক্ষা লাভ হইবে না—এ কথা ঠিক নয়। শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া এগজামিন পাশ করিয়াই যারা ভাবে, চূড়ান্ত শিক্ষা লাভ করিলাম, আসলে তারা হয় পণ্ডিত-মূর্খ! তাদের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় ছোট গণ্ডীর মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যায়। সেই জন্যই দেখি, ইউনিভার্সিটির পাশের তকমা-আঁটা বহু ছাত্রের পর-জীবন নামহীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত থাকে!

আসল যে শিক্ষা, সে শিক্ষায় মনের কোনোখানে অজ্ঞান-অন্ধকার থাকিতে পারে না! জীবন-যাত্রার উপযোগী হইতে হইলে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা লাভ প্রয়োজন। সেক্সপীয়রের নাটক বা ব্রাউনিংয়ের কবিতার মর্ম্ম বুঝিলেই চলিবে না—কি করিলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, বিবিধ রোগে প্রতিকার কি, আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় কেন? অমাবস্যা-পূর্ণিমা কি? সূর্য্যগ্রহণের অর্থ কি—অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু দেখি শুনি, সে সব বিষয় জানিতে হইবে। ও-সবে বিমূঢ়ের মত অবাক হইয়া থাকিলে চলিবে না। এক দিক দিয়া পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া অন্য সব ব্যাপারে অজ্ঞ থাকিলে জীবন-যাত্রায় পদে পদে বাধা ঘটিবে—জীবনে সাফল্য বা প্রতিষ্ঠা-লাভের আশা থাকিবে না।

জীবনকে সফল করিতে চাহিলে, কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া নিজের নামকে বরণীয়-স্মরণীয় করিতে চাহিলে আলস্যে বা বিলাসে এক-তিল সময় নষ্ট করা নয়! শুধু জিওমেট্রি এ্যালজেব্রা বা গ্রামার শেখা নয়—ছুতার, কামার, মুচি, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর কাজও কিছু-কিছু জানা চাই। নহিলে বহু ক্ষেত্রে শুধু যে বেকুব বনিতে হইবে, তা নয়—লেখাপড়া শিখিলেও পরের হাতে পুতুল বনিয়া দিন কাটিবে।

ভবিষ্যতের ভাবনা

যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধের জন্য আজ চারি বৎসর কাল ভারতবাসীদিগকে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এ কষ্ট দ্বিবিধ। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার প্রয়োগে এবং অপপ্রয়োগে ভারতবাসীর সামান্য যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, তাহাও বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিসে অপরাধ হয়, কিসে হয় না, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন। কাজেই লোকে প্রাণ খুলিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছে না। কিন্তু ইহার চেয়ে আর্থিক দিক্ দিয়াই লোকের কষ্ট আরও ভীষণ হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রদেশে বহু লোক খাদ্য-অভাবে মৃতপ্রায়—অনেকে মরিয়া যাইতেছে। এরূপ অনাহারে কত লোক মরিতেছে, কে বলিবে? এই যে দিন—২রা শ্রাবণ সহর কলিকাতার রাজপথ হইতে ২৭টিরও অধিক হিন্দুর শব সরানো হইয়াছিল! অহিন্দু কত, তাহা প্রকাশ পায় নাই। সরকার সে সংবাদ দিতে পারিতেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টই বা প্রকাশ হইল না কেন? মফঃস্বলে যে অনেক লোক মরিতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকলেই নিজ নিজ সঙ্কট অবস্থা লইয়া ব্যস্ত, এ অবস্থায় তাহারা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে কি করিয়া? সুতরাং রাজনীতিক সঙ্কট যত দারুণ হউক, আর্থিক সঙ্কট যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই! এখন সাধারণের পক্ষে উভয়বিধ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ-লাভের ইচ্ছা এবং চেষ্টা স্বাভাবিক। তন্মধ্যে রাজনৈতিক দিক্ হইতে আমাদের মুক্তি পাইবার আশা অতি অল্প। কারণ, উহা আমাদের শাসকদিগের ইচ্ছা এবং প্রসন্নতার উপর নির্ভর করিতেছে। এবং আমরা গত চারি বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা কোন মতেই ভারতবাসীকে রাজনৈতিক মুক্তি দিতে সম্মত নহেন। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এবং ভারত-সচিবের উক্তি হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। আর্থিক উন্নতির দিক্ হইতেও আমরা বিশেষ কিছু করিতে পারি না। যাঁহাদের হস্তে রাজনৈতিক অধিকার ন্যস্ত, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে ভারতবাসীর যে কোন প্রচেষ্টায় বাধা দিতে পারেন, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য না করেন, তাহা হইলে প্রায় কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাহা হইলেও আমরা আর্থিক দিকে কিছু হয়তো করিতে পারি, শাসকগণ তাহাতে সর্ব্বতোভাবে বাধা দিতে পারেন না।

রাজনৈতিক দিক্ হইতে কেহ কেহ আশার ক্ষীণ আলোক দেখিয়া উৎফুল্ল হইতেছেন। আমাদের বিশ্বাস, এ বিষয়ে বিশেষ উৎফুল্ল বা আশান্বিত হইবার কোন কারণ ঘটে নাই। অনেকে

বলিতেছেন, এই যুদ্ধের পরে যখন শান্তি-স্থাপন হইবে, তখন সমস্ত সম্মিলিত শক্তির মত লইয়াই যাহা করা উচিত, তাহা করা হইবে। তাহা আমরা এখন ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্তী ব্যাপার দেখিয়া সকলের তাহা বুঝা উচিত। বিগত মহাযুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবর্গের অন্যতম প্রবল শক্তি মার্কিণের প্রেসিডেন্ট উইলসন যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা যদি যথাযথ ভাবে গৃহীত ও প্রতিপালিত হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ের এই ভীষণ লোকক্ষয়কর এবং জগৎ-জোড়া যুদ্ধ কিছুতেই ঘটিতে পারিত না। কিন্তু সে যুদ্ধ-শেষে যখন মীমাংসার কথা উঠিয়াছিল, তখন মিত্রপক্ষের অন্যান্য শক্তিবর্গ বিজয়লাভে উৎফুল্ল হইয়া প্রেসিডেন্ট উইলসনের কথা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট উইলসন অন্যান্য মিত্রশক্তিবর্গের চক্রান্তে একেবারে 'বোকা বনিয়া' গিয়াছিলেন। গ্রেট বৃটেনের এবং ফ্রান্সের সাধারণ লোক যে প্রতিহিংসামূলক সন্ধি করিয়াছিলেন,—সেইরূপ প্রতিহিংসামূলক সন্ধি যদি এবারও করা হয়, তাহা হইলে এ যুদ্ধেই ভবিষ্যৎ শান্তির প্রতিষ্ঠা হইবে না। মিষ্টার হ্যামডেন জ্যাকসন বিগত যুদ্ধের সন্ধি সম্বন্ধে তাঁহার The Post-war World গ্রন্থে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল (১)। ঐরূপ প্রতিহিংসামূলক সন্ধির জন্যই যে বর্ত্তমান যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রেসিডেন্ট উইলসন সেই জন্য সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, এই ভবিষ্যদ্-বাণী করিয়াছিলেন। এবারও কিরূপ ভাবে সন্ধি হয়,—সর্ব্ব দেশের সকল লোকের রাজনীতিক স্বার্থ কিরূপ ভাবে রক্ষিত হয়,—তাহা না দেখিলে কিছুই বলা যাইতেছে না। কেবলমাত্র বিজয়ী জাতির গৌরব প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অন্যের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া কোন ব্যবস্থা করিলে কোন লাভই হইবে না। আবার বহু লোকের শোণিতে ধরণী প্লাবিত করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। ইহাই অনেক মনস্বী নর-নারীর মত। শ্রীমতী পার্ল বাক যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন। বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে তাঁহার সেই বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই, উহা লইয়া নিউইয়র্ক সহরে চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। পার্ল বাক বলেন—বর্ত্তমান যুদ্ধ যে সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল,—উহা এখন সে ভাব পরিত্যাগ করিতেছে। তিনিই শুধু এ কথা বলেন নাই, য়ুরোপের আরও অনেক মনস্বী লেখক এ কথা বলিয়াছেন। মিষ্টার বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন যে, যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ যুদ্ধের পর আবার যুদ্ধ হইবে। গত ১০ই এপ্রিল তারিখে 'নিউ লীডার' পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ধনিক-শাসিত মার্কিণ এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত শেষ পর্য্যন্ত অন্য শক্তিবর্গের মতের কতটা মিল হইবে, তাহা অনুমান করা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু বিলাতের সাম্রাজ্যবাদীর দল ইঁহাদের এই হিতবাণী শুনিবেন বলিয়া মনে হয় না। মহামায়ার মায়াচক্রে বিঘূর্ণিত এবং ঐশ্বর্য্য-মদে প্রমত্ত ব্যক্তিরা সহজে হিত-বচন শুনিতে সম্মত হন না। সেই জন্য সংসারে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, এত বাদ-বিসম্বাদ। গত বারের অভিজ্ঞতায় সম্মিলিত শক্তিবর্গের যদি প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা আমাদের এবং ধরাবাসী সমস্ত মানব জাতির ঘোর দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। মিষ্টার বার্ণার্ড শয়ের মতে রুশিয়া এবং চীনই প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। ইংলণ্ড ধনিক-শাসিত, সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী। মার্কিণও বোধ হয় অনেকটা ঐরূপ। তথাকার চিন্তাশীল লোকরা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী হইলেও পদস্থ লোকেরা তাহা নন। আটলান্টিক চার্টারের ঘোষণা-বাণী ভারতের সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া বৃটেনের অপ্রীতিভাজন হইতে চাহেন না। কিন্তু বৃটেনের প্রধান-সচিব মিষ্টার উইনষ্টন চার্চ্চিল স্পষ্ট ভাষায় এবং অকুতোভয়ে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের কিংবা এসিয়ায় কোন জাতির সম্বন্ধে এই চার্টারের প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইবে না। ভারতকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র গ্রেট বৃটেনই দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা দিবেন না। চার্চ্চিলের উক্তিতেই তাহা সুপ্রকাশ। অতএব ভারতবাসীর রাজনীতিক আশা সফল হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

মার্কিণের জনগণ ইদানীং ভারতের অবস্থা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া এদেশে অনেকে ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে মনে বিপুল আশা পোষণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দূর হইতে সহানুভূতি প্রকাশ করা যত সহজ, ভিন্ন দেশকে স্বাধীনতা প্রদানের চেষ্টা তত সহজ নয়। মার্কিণের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক এদেশের অবস্থা জানিবার জন্য ব্যগ্র এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এদেশবাসীর উপর সহানুভূতি-সম্পন্ন, তাহাও সত্য। কিন্তু তাঁহারা কি করিতে পারেন? তাঁহারা বড় জোর গ্রেট বৃটেনকে তাঁহাদের ভুল দেখাইতে পারেন, হয়ত বা বিশেষ অনুরোধ করিতে পারেন,—কিন্তু তাহার অধিক আর কিছুই করিতে পারেন না। মার্কিণের বিগত প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের সময় যে মিষ্টার ওয়েণ্ডেল উইল্‌কী নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে রিপাবলিক্যান দলের মুখপাত্র হইয়া রুজভেল্টের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন,—তিনিও ভারতবাসীর পক্ষে কতকগুলি সহানুভূতি-সূচক উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই সহানুভূতি-সূচক বাক্য কেবল ভারতবাসীর সম্বন্ধে নহে, ধরাবাসী সমস্ত অশ্বেত জাতির সম্বন্ধে। তিনি 'কৃশ্চিয়ান এডভোকেটে' এই কথাই লিখিয়াছেন যে, এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, এই পৃথিবীর সমস্ত নরনারীই জাতি, ধর্ম্ম এবং বর্ণনির্ব্বিশেষে রাজনীতিক চেতনা লাভ করিয়াছে। তাঁহার আসল কথা এই যে, যে সকল ব্যক্তি সেই সেকেলে ধুয়া ধরিয়া আছেন যে, বর্ণী জাতিরা শ্বেতকায় জাতির ভারস্বরূপ, এবং সহর্ষে বলিয়া থাকেন যে, এই বিষয়ে যুদ্ধের

(১) The readers of Northcliff (The Times and the Daily Mail) wanted a vindictive peace and helped to win the election of a vindictive House of Commons. The French public wanted a vindictive peace and even blamed the octogenarian Clemenceau for being too lenient. They got the peace they deserved.—The Post-war World, page 31.

পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল পরেও সেই অবস্থায় থাকিবে, তাঁহারা হয় হিসাব জানেন না, অথবা জানিয়াও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন! বহু শতাব্দী ধরিয়া নির্ব্বিঘ্ন ভাবে বশ্যতা স্বীকার করিয়া এসিয়ার কোটি কোটি লোক উজ্জ্বল আলোক দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা আর পাশ্চাত্ত্য জাতির প্রাচ্য-ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে চাহে না। আফ্রিকায়, মধ্য প্রাচীতে, চীনে এবং সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডে জনগণের মতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার উচ্ছেদই স্বাধীনতার অর্থ। সার্ব্বত্রিক যুদ্ধের ইহাই প্রথম লক্ষ্য ছিল, এ কথা বলিলে অধিক বলা হইবে না। সম্প্রতি আমাদেরও উহাই লক্ষ্য, ইহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই।" তাঁহার এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, প্রাচ্যখণ্ডের সর্ব্বত্রই রাজনীতিক এবং আর্থিক স্বাধীনতার জন্য লোক জাগ্রত হইয়াছে,—ইহা তিনি বেশ বুঝেন। কিন্তু সে কথা কে না বুঝে? মিষ্টার চার্চ্চিল এবং মিষ্টার আমেরী প্রভৃতি সকলেই তাহা বুঝেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা পশুবলে তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। আমরা অহিংসার পথে আমাদের মুক্তি পাইবার জন্য চেষ্টা করিব। অহিংসার পথে ফললাভ করিতে বিলম্ব ঘটে। কাজেই এ যুদ্ধের পর আমরা রাজনীতিক-মার্গে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারিব, এ আশা উপস্থিত দুরাশামাত্র!

আমরা যখন সাত্ত্বিক ভাবে আমাদের অভীষ্ট লাভ করিতে চাহি, তখন আমাদের ব্যস্ত হইলে কাজ হইবে না। আমাদের মন হইতে শত্রু, মিত্র সকলের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া চলিতে হইবে। সাত্ত্বিক পথ সহিষ্ণুতার পথ। কিন্তু এই পথে থাকিয়া সাধনা করিতে পারিলে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আমাদের উপর বর্ষিত হইবে। ইহার ফলে আমরা যে কল্যাণের অধিকারী হইব, তাহা স্থায়ী হইবেই হইবে। প্রতিহিংসার প্রণোদনে যাহা করা যায়, তাহা সফল হইলেও তাহার সেই আশুফল ক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। য়ুরোপের বর্ত্তমান অশান্তি তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। আমরা সেই জন্য অহিংসার পথে, সাত্ত্বিকতার পথে, মনুষ্যোচিত পথে আমাদের দেশবাসীকে মুক্তির সন্ধান করিতে বলি।

কিন্তু রাজনীতিক অধীনতা অপেক্ষা আর্থিক বিষয়ে পরবশ্যতা অত্যন্ত ভীষণ। এ পর্য্যন্ত বহু বলদৃপ্ত জাতিই সাম্রাজ্যবাদী হইয়াছে। রোম আদি সাম্রাজ্যবাদী। গ্রীসে মেসিডন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। প্রাচীন কালে রোমক সাম্রাজ্য অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যের জন্যই রোমকদিগের অধঃপতন ঘটিয়াছিল, ইতিহাস-পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। কালের ফুৎকারে এবং স্বকীয় কর্ম্মদোষেই সেই রোমক সাম্রাজ্যের সব গিয়াছে,—আছে কেবল অত্যাচারের স্মৃতি আর সাম্রাজ্যের নাম। স্পেনের সাম্রাজ্য আমেরিকায় বিশেষ বিস্তার-লাভ করিয়াছিল, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। উহা যেন ঐন্দ্রজালিকের দণ্ড-স্পর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং দমকা বাতাসে নিবিয়া গিয়াছে। ভগবান্ স্পেনকে যে সুবিধা দিয়াছিলেন, সেই সুবিধা পাইয়া স্পেনবাসীদের মাথা এত দূর টলিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা এক দিকে অত্যাচারে অভিসম্পাত অর্জ্জন করিয়া অন্য দিকে বিলাসে আত্মহারা হইয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে। বিধাতার নিশ্বাসে যে দিন অজেয় স্পেনিস রণতরী (Armada) সাগর-বক্ষে নিমজ্জিত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে যদি স্পেনবাসীরা সাবধান হইতে পারিত, তাহা হইলে এখন তাহাদিগকে এমন দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না। স্পেনের পর পর্ত্তুগালের রাজ্যবিস্তার-কাহিনীও বিস্ময়জনক। পর্ত্তুগাল ভগবানের প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া আজ অতীত গৌরবের নামশেষ মাত্র হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার ব্রাজিল রাজ্য এখন স্বাধীন। এই তিনটি সাম্রাজ্যবাদী জাতি তাহাদের অধীন দুর্ব্বল জাতিদিগের উপর অত্যাচার করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিল। রোমকরা বরং কতকটা ভাল ছিল। তাহারা অধীন দেশে সভ্যতার বিস্তার সাধন করিয়াছিল। সাড়ে তিন শত বৎসর কাল রোমকদিগের অধীনে থাকিয়া গ্রেট বৃটেনের—বিশেষতঃ দক্ষিণ বৃটেনের—অধিবাসীরা সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। রোমকদিগের আমলে বৃটেনের অধিবাসীরা সম্মিলিত হইয়াছিল এবং খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা বৃটেনের বন্দীদিগের এক দিকে যেমন লাভ হইয়াছিল, অন্য দিকে তাহারা দুর্ব্বল এবং আত্মরক্ষায় অক্ষম হয়। সেই জন্য তাহারা স্যাক্সন জাতি কর্ত্তৃক সহজে পরাভূত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। রোমক-অধিকারে বৃটেনগণ সুখে ছিল বলিয়া রোমক সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইয়াছিল। তথাপি রোমকরা যে কোনরূপ অত্যাচার করে নাই, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। বোডেসিয়ার কাহিনী তাহার বিশেষ উদাহরণ।" স্পেন এবং পর্ত্তুগাল তাঁহাদের অধীন রাজ্যে চেষ্টা করিয়া বিশেষ উপকার করেন নাই,—সেই জন্য তাঁহাদের রাজ্য অতি অল্প দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

পর্ত্তুগালের পর ইংরেজ জাতিই জগতে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। রোমক, স্পেন এবং পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা বৃটিশ জাতির সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃটিশজাতি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া অধীন রাজ্যের ধন সবলে অধিকার করিবার জন্য কখনই চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের প্রথম হইতেই উদ্দেশ্য ছিল, এই বিস্তীর্ণ দেশে বাণিজ্য-বিস্তার। বাণিজ্য করিতে হইলে দেশে শান্তি স্থাপন করিতে হয়। সেই জন্য ইঁহারা যখন যে দেশ অধিকার করিয়াছেন, তখনই সেই দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা এদেশে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার এবং আমাদের জাতীয়তা-বোধের উচ্ছেদ সাধন করেন নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু আমাদের দারিদ্র্য-মোচনের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

অভাব এবং দারিদ্র্য মানুষের মনে ঘোর তিক্ততা এবং অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এদেশে একটি প্রাচীন প্রবচন প্রচলিত আছে "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্" অর্থাৎ ক্ষুধা-কাতর লোক সর্ব্ব প্রকার পাপই করিয়া থাকে। এদেশে এই দারিদ্র্যের প্রবল কারণ শিল্প-বাণিজ্যের অতিমাত্র সঙ্কোচ-সাধন। সরকারী নীতির ফলেই যে এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ কথা সত্য যে, গ্রেট বৃটেনে ধনের এবং ধনিকের সম্মান অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ধন-জনিত কৌলীন্য বৃদ্ধির ফলে বিলাতের সকলেই ধন-উপার্জ্জনে অতিশয় যত্নশীল হইয়াছেন। ঐ দেশে শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক উন্নতি হওয়ায় সেখানে অল্প ব্যয়ে অত্যন্ত অধিক পণ্য উৎপাদন করা যাইতেছে। এই উৎপন্ন পণ্যের সামান্য ভগ্নাংশও তাঁহাদের স্বদেশে প্রয়োজন হয় না। সুতরাং উহা তাঁহারা বিদেশেই কাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্য বৃটিশ ধনিক এবং কারবারের

ধিকারীরা ঐ সকল উদ্বৃত্ত পণ্য তাঁহাদের অধিকৃত দেশে বিক্রয় রিতে বদ্ধপরিকর। উহার সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ দরিদ্র বং অসহায় জাতিদিগের শিল্প-বাণিজ্য উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। লে ঐ সকল দেশে দারিদ্র্য অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সঙ্গে তথাকার লোকের মনে দারিদ্র্য-জনিত বেদনা এবং অসন্তোষ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকে শাসক জাতির মধ্যে যে সকল ধনিক আছেন, তাঁহারা অর্থার্জ্জনের জন্য এতই লোলুপ যে, ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। দুই-এক জন চিন্তা করিলেও কি হইবে, ইহার প্রতিকারের উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কাজেই এ সমস্যার সমাধান তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় কঠিন। তবে অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থলোলুপ ধনিকই এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নহেন। কারণ, তাঁহারা সামরিক লোক-সংহারক যন্ত্রের সাহায্যে এই সকল অধীন দেশকে চির-পরাধীন করিয়া রাখিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর ভারতবর্ষ বৃটিশের অধিকারে আছে। এই দীর্ঘকালে ভারতের আর্থিক দিকে যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, তাহা কোন মতেই বলা যায় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকরা যখন এদেশে প্রথম বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, তখন এদেশে শিল্প-বাণিজ্য অনেক উন্নত ছিল, তাহা তৎকালীন অনেক লেখকের লেখা হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু আজ সে শিল্প-বাণিজ্য কোথায়? উহা একে একে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উহা যখন বৈদেশিক পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইতেছিল, তখন দেশের লোক এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিতে পারে নাই।

পক্ষান্তরে, বহু কাল অরাজকতার পর ইংরেজ যখন কতকটা এই দেশবাসীর ধর্ম্মকার্য্য অবাধে করিতে দিয়াছিলেন, এবং দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকটা ন্যায় বিচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন এদেশের লোক তাহাতে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিল। সেই জন্য ম্মাণ অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারও বলিয়াছিলেন যে, ইংরেজ জাতি কেবল দেশজয় করিতে জানে না, তাহারা দেশ শাসন করিতেও জানে।

বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত এই অবস্থা বেশ চলিয়াছিল। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে যখন এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা অত্যন্ত হীন হয় এবং দেশে বেকার লোকের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পায়, তখনই জঠরজ্বালায় কাতর ভারতবাসীর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিশেষতঃ কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন যখন সরকার কর্ত্তৃক নির্ম্মম ভাবে উপেক্ষিত হইতে লাগিল, তখনই এ বিষয়ে দেশের লোকের চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, এই সময়ে তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়া রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বেকারের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশের বহু লোক দুই বেলা আহার সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। বহু লোক অন্নাভাবে মরিয়া যাইতেছে। পৌনে দুই শত বৎসর কাল বাঙ্গালা দেশ, তথা ভারতবর্ষ, বিবিধ সাংঘাতিক রোগ-বীজাণুর (microbes) লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ্যে ভেদনীতি প্রচারিত এবং সমর্থিত হইতেছে। ভারতবাসীর যেন শ্বাস-প্রশ্বাস উপস্থিত হইয়াছে। চিন্তার স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা একে একে অপহৃত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু এই অসন্তোষ লাভের মূল কারণ জঠরজ্বালা। ধনিক সাম্রাজ্যবাদীদিগের শোষণ-নীতিই ইহার কারণ। এই অবস্থা যখন সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রান্ত করিতেছিল, তখনই মহাত্মা গান্ধী অহিংসানীতি এবং ক্রিয়াহীন প্রতিরোধ নীতি (passive resistance) প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু বিলাতী ধনিকদিগের মধ্যে যাহারা সাম্রাজ্যবাদী এবং অতিমাত্র অর্থলোভী, তাহারা সকল বিষয়ে প্রধান থাকায় ভারতের শাসন-নীতি পরিবর্ত্তন করা কিছুতেই সম্ভব হয় নাই।

এইরূপ আর্থিক এবং রাজনীতিক কারণে ভারতীয় জনসাধারণের মনে অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। তাহার পর বিগত যুদ্ধের সময় মিষ্টার মণ্টেগু যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের মন কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা এদেশের রাজনীতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনের মত হয় নাই। সেই জন্য লোকের মনে অসন্তোষ আবার তীব্র ভাবে দেখা গিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদীদিগের নকিবরা কঠোর পশুবল প্রয়োগে এই অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেনাপতি ডায়ার এই সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিরস্ত্র ব্যক্তিদিগের এক সভায় গুলী চালাইয়া ৪ শত নিরীহ লোককে নিহত এবং ১২ শত লোককে আহত করিয়াছিল। তাহার সেই ঘোর নিষ্ঠুরতার কার্য্যের জন্য ধনিক-চালিত বিলাতের লর্ড-সভা ডায়ারের এই বীরত্বের জন্য ২৬ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ভারতীয় ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন! ইহাতেই বুঝা যায়, সাম্রাজ্যবাদী ধনিক ইংরেজরা এদেশবাসীর অসন্তোষ কি প্রকারে নিবারণ করিতে চাহেন! কিন্তু ইহার ফল যে বিপরীত হইয়াছে, তাহা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও বুঝিয়াও বুঝেন না, দেখিয়াও দেখেন না! ইহার ফলে আব্রহ্ম ভারতের সর্ব্বত্রই যে অসন্তোষের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কালে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে কি না, বুঝা কঠিন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেষ্টারের পিটার্লু প্রান্তরে (পিটার্স ফিল্ড) নিরীহ আন্দোলনকারীদিগের উপর গুলী চালাইবার ফলে বিলাতে কিরূপ অসন্তোষের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা ইংরেজমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু সেই হাঙ্গামায় ১৩ জন মাত্র নিহত এবং ৬ শত জন আহত হইয়াছিলেন। গ্রেট বৃটেনে যাহারা এই ঘোর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদিগকে কেহই পুরস্কৃত করে নাই, সকলেই তিরস্কার করিয়াছিল।

কিন্তু বিগত যুদ্ধের পর একটা শুভ লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। এই সময়েও ভারতে শ্রমশিল্পের কিছু উন্নতি হইয়াছিল। দেশের লোকের হাতে কিছু অধিক অর্থ আসিতেছিল,—অর্থাৎ দেশের টাকা অনেকটা দেশের লোকের হাতে থাকিতেছিল, বিদেশী শিল্পজীবীদিগের হাতে চলিয়া যাইত না। এখনও সেই অবস্থা আছে। ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি পূর্ব্বে গড়ে ১ শত কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত করিত,—বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহা সাড়ে ৪ শত ক্রোটি গজে পরিণত হয়। এই সাড়ে তিন শত কোটি গজের কাপড়ের মূল্য ত ভারতেই থাকিয়া যাইতেছিল। জাতীয়তার দিক দিয়া এ লাভ সামান্য নয়। অন্যান্য আরও কতকগুলি শিল্পজ পণ্য ভারতে এইরূপ অধিক প্রস্তুত হইতেছিল। সেই জন্য এই বিস্তীর্ণ দারিদ্র্য-দগ্ধ দেশবাসীর মন অনেক শান্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজনীতিক দিক হইতে কর্ত্তৃপক্ষ ভারতবাসীর অগ্রগতি-সম্পাদনে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সে জন্য ভারতে রাজনীতিক ভাবে ভাবিত

অর্থাৎ শিক্ষিত জনসাধারণের মনের তৃপ্তি তাদৃশ ঘটে নাই। কংগ্রেস স্বায়ত্ত-শাসন এবং মুক্তির আশ্বাস পাইলে তবে যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন' বলিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কংগ্রেস বৃটিশ জাতির সমরায়োজনে বাধা দিবেন না, এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছিলেন। গান্ধীজী সিভিল ডিসোবীডিয়ান্স চালাইবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু চালান নাই। এদিকে জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করে। প্রায় নিখিল য়ুরোপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জার্ম্মাণীর করতলগত হইয়াছে। এখন এই যুদ্ধ কত দিন চলিবে তাহা বুঝা কঠিন। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন, ইহা আরও কয়েক বৎসর চলিতে পারে। ইহার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরেজকে এই যুদ্ধের ব্যয় বিশেষ ভাবে বহন করিতে হইতেছে। সামরিক প্রয়োজনে ইংরেজ ভারত হইতে যুদ্ধের জন্য আবশ্যক পণ্য লইতেছেন। এমন কি, খাদ্যদ্রব্য পর্য্যন্ত তাঁহারা বিদেশে চালান দিতেছেন। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কল্পনাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে। ইহার ফলে যাহারা রাজনৈতিক কারণে শাসকদিগের উপর অসন্তুষ্ট হয় নাই,—তাহারা অনাহারে মরিতেছে বলিয়া অসন্তুষ্ট এবং উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ইংরেজ বিগত যুদ্ধের পর হইতে যে বৈদেশিক বাণিজ্য হারাইয়াছেন, এবার তাহার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য স্বতঃ এবং পরতঃ চেষ্টা করিতেছেন। বৃটিশ-বাণিজ্য অন্যান্য দেশেও সঙ্কুচিত হইয়াছে, ভারতেও সঙ্কুচিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে বৃটিশ-বাণিজ্যের সঙ্কোচ নিবারণ করা সহজ হইবে না,—বৃটিশ জাতির অধীন ভারতে তাহা করা কতকটা সম্ভব হইবে। কিন্তু এদেশের শিল্প-বাণিজ্য যাহাতে সঙ্কুচিত না হয়, ভারতবাসীকে তাহার জন্য প্রাণান্ত পণে চেষ্টা করিতে হইবে। আত্মরক্ষার জন্য, জাতির সম্পদ রক্ষা করিবার জন্য ভারত-বাসীকে তাহা করিতে হইবে।

কিন্তু এই যুদ্ধের সময় সামরিক এবং অন্যান্য কারণে ভারতীয় শিল্প সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলি নূতন। কিন্তু কয়লা সরবরাহের অভাবে সেগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কলগুলি বন্ধ হইলে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইবে। কারণ, উহাতে যে সকল মজুর কাজ করিতেছে তাহাদের কাজ যাইবে। তাহারা নানা দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে এবং কেহ অনাহারে মরিবে এবং কেহ ক্ষুধার জ্বালায় অন্য কর্ম্মে এবং অপকর্ম্মে লিপ্ত হইবে। এই প্রকারে অনেক কলওয়ালারা দক্ষ শিল্পী হারাইবে। কেবল বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয় নাই। কাচ-শিল্প প্রভৃতি বহু শিল্পেরই এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। এ জন্য দায়ী কে?

দায়ী সরকার। কারণ, সরকার যদি এদেশে মালগাড়ী এবং রেলওয়ে এঞ্জিন প্রস্তুত করিবার কিছু ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে কখনই আজ এ দশা উপস্থিত হইত না। সরকার তাহা না করিয়াই এই দশা ঘটাইয়াছেন। তাই সমগ্র বঙ্গ-প্রদেশ জুড়িয়া রন্ধনের কয়লার অভাবে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে,—কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনস্বরূপ জলের কল অচল হইবার শঙ্কা উঠিতেছে। তবে এই সকল ব্যাপারে বুঝা যায় যে, সরকার ইচ্ছা করিলে অথবা ভুল করিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিলে তাহারা শিল্পের বাধা ঘটাইতে পারেন। মানুষ অনিচ্ছায় যে ভুল করে, সরকারও সে ভুল করিতে পারেন। তাহার ফলও মন্দ হইতে পারে। অনেক সাধারণ লোকের ভ্রান্তি বা প্রমাদ-জনিত নীতির ফলে কুফল যেরূপ ফলে, সরকারের ভ্রান্তিজনিত কর্ম্মের কুফল তদপেক্ষা প্রবল ও স্থায়ী ভাবে প্রকাশ পায়। কারণ, সরকারের কার্য্য বহু লোকের বিবেচনা-প্রসূত এবং বহু প্রজার উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইংরেজ জাতি এই দেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কৃষির কিছু উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, —কিন্তু ভ্রমেও কোন প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করেন নাই।

সরকারের রাজ-নীতিক এবং অর্থনৈতিক কর্ম্মধারা কিরূপ খাতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, এ প্রবন্ধে স্থূলভাবে সেই কথাই বলিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাজনীতিক ক্ষেত্রে আমরা এখনও ভবিষ্যতের আশা-ব্যঞ্জক কোন ক্ষীণ আলোকও দেখিতে পাইতেছি না। অর্থনীতিক দিকেও আমরা তিমিরান্ধকারে দিশাহারা হইয়া বসিয়া আছি।

এ কথা সত্য, গ্রেট বৃটেনের সহিত ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য অধিক হইতেছে। ভারতের সহিত গ্রেট বৃটেনের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে তাহা হইবেই। ঘরখরচা এবং ঋণের সুদ বাবদ ভারতকে প্রতি বৎসর অনেক টাকা দিতে হয়। ইদানীং ঘরখরচা (Home charge) অনেক কমিয়াছে এবং সরকারের বিলাতী ঋণ প্রায় পরিশোধ হইয়াছে। ইহাতে বিলাতী দেনার পরিমাণ অনেক কমিবে। কিন্তু ভারতে গ্রেট বৃটেনের ধনিকদিগের প্রায় ২০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং অর্থাৎ ২ শত ৭০ লক্ষ টাকা মূলধন নানা ব্যবসায়ে ও কারবারে নিযুক্ত আছে। উহার লভ্যাংশের প্রায় সমস্তই বিলাতে যায়। ভারতে এই যুদ্ধের সময় যে পাউণ্ড ষ্টার্লিং জমিয়াছে, তাহা দিয়া উহার কতক অংশ পরিশোধ করিবার প্রস্তাবে বিলাতের ধনিক নাছোড়বান্দা সাম্রাজ্যবাদীরা কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন, যুদ্ধের পরে পুনর্গঠনের সময় ঐ পাউণ্ড ষ্টার্লিং হইতে যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু কেনা হইবে। আপাততঃ ঐ টাকা জমা রহিল। তাহা হইলে ভারতের পক্ষে শিল্পক্ষেত্রে ঐরূপ করিলে বিশেষ উপকার হইবে না,—বরং ক্ষতির সম্ভাবনা। ইহা ভিন্ন মূল্যস্ফীতি প্রভৃতির ফলে ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে কি না, বলা কঠিন। সেই জন্য ভারতবাসীকে ঐ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। ফলে আর্থিক ব্যাপারেও আমাদের ভবিষ্যৎ বিশেষ আশাপ্রদ নহে। এক্সপোর্ট ইনষ্টিটিউটে মিষ্টার আমেরী এবং মিষ্টার ওয়াটসনের বক্তৃতা পড়িয়া অতিমাত্র আশ্বাস্বিত হইলে চলিবে না। তবে রাজনীতিক ক্ষেত্রে এদেশে যেমন চোরা বালির সৃষ্টি সম্ভব—জনসাধারণের আস্থাহীন ব্যক্তিকে যেমন জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানে কৌশলে বা অন্য উপায়ে বসান সম্ভব,—আর্থিক ব্যাপারে তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর্থিক ক্ষেত্রে দেশের লোকের কতকটা প্রভাব থাকিবেই। সেই জন্য আর্থিক ব্যাপারে কথা কহিতে গিয়া আমেরী-ওয়াটসন কোম্পানীর সুর অত খাদে নামিয়াছে। এখন ভারতবাসী যদি আপন স্বার্থ বুঝিয়া চলিতে পারে, তবেই এ দুর্দ্দিনে টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে—নচেৎ অতল তলে ডুবিয়া যাইবে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

সাময়িক-প্রসঙ্গ

বন্যা

আষাঢ় মাসের সংক্রান্তির দিন—প্রবল বন্যায় দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। ঐ বন্যায় বহু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ঐ সকল স্থানে আশুধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, হৈমন্তিক ধান্যের চারারও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই বটে, কিন্তু এখনও যে বাঁধের ভাঙ্গন বন্ধ করা ও বহু পথের সংস্কার সম্ভব হয় নাই, তাহাতেই বন্যার প্রকোপ কিরূপ হইয়াছিল তাহা বুঝা গিয়াছে। কেবল দামোদরেই বন্যা হয় নাই—অজয়, ময়ূরাক্ষী ও কাঁসাইও কূল প্লাবিত করিয়াছে। বর্তমান বৎসরে বাঙ্গালায় খাদ্য-দ্রব্যের অভাব যেরূপ তীব্র, তাহাতে যে আশুধান্যের উপর অনেক আশা স্থাপিত হইয়াছিল, নানা স্থানে তাহার নাশে সে অবস্থার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইল, তাহা বলা বাহুল্য। হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষতিও বিশেষ আশঙ্কার কারণ, সন্দেহ নাই। এখনও অনেক স্থান জলমগ্ন। এই বন্যায় প্রাণহানি অধিক হয় নাই—কিন্তু বন্যার ফলে যে অনাহারে বহু প্রাণনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থানে স্থানে সর্ব্বস্বান্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য সাহায্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা আপনারা নানারূপে বিপন্ন, তাহারা কিরূপ সাহায্য করিতে পারে? তাহাদিগের সাহায্যের পরিমাণ কিরূপ হইতে পারে? বাঙ্গালা সরকার কি এ বিষয়ে তাঁহাদিগের দায়িত্ব সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন? বাঙ্গালায় যখন এই অবস্থা, সেই সময় বাঙ্গালার বাহিরে কোন কোন স্থান হইতেও প্রবল বন্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালার উপকণ্ঠে ঘাটশিলা প্রভৃতি অঞ্চলেও বন্যায় প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। গত ১৩ই শ্রাবণ স্বভাবতঃ বিরলবর্ষণ আজমীর মাড়বার ও মেবারে প্রবল বন্যা আরম্ভ হয়। এই বন্যায় প্রায় ৪ শত বর্গ-মাইল স্থান জলমগ্ন হয়—৫০খানি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়। একটি মাত্র নগরে ৭ হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৪ হাজার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—বহু গবাদি পশু ভাসিয়া গিয়াছে; শব অপসারণের জন্য সৈনিকদিগকে নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। উড়িষ্যায়ও বন্যা হইয়াছে। দামোদরের বন্যা যে বাঁধের জন্য অধিক প্রবল হয় ও অধিক ক্ষতি করে, তাহা এখন আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু বন্যার প্রাবল্য বৃদ্ধির যে কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে যে ভাবে গাছ কাটা হইয়াছে—সে ভাবে নূতন গাছ লাগান হয় নাই। গাছ যখন ঘন-সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন তাহার শিকড়ে বাধা পাইয়া যেমন পাথরে বাধা পাইয়াও তেমনই বৃষ্টির জল দ্রুত নামিয়া আসিতে পারে না। কিন্তু গাছের অভাবে কেবল যে জল দ্রুত নামিয়া আসে, তাহাই নহে, পরন্তু শিকড়ে বাধা না পাওয়ায় পাথর ও জলের বেগে মাটী লইয়া নদীর খাতে আসিয়া পড়ে—নদীর গর্ভ উচ্চ হয়। এক উচ্চ হইলে খাতে পূর্ব্ববৎ অধিক জল থাকিতে পারে না, তাহাতে আবার জলরাশি দ্রুত খাতে পড়ায় সহজেই বন্যা প্রবল হয়। কাযেই স্বাভাবিক নিয়মের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং বৎসর বৎসর বর্ষায় বন্যায় লোকের বিশেষ ক্ষতি হয়। মেদিনীপুরে পূর্ব্ব বন্যায় ক্ষতির ক্ষত শুকাইবার পূর্ব্বেই যে আবার ক্ষতি হইল, তাহার ফল ভয়াবহই হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। সরকার দেশে খাদ্য-শস্যের হিসাব রাখেন নাই—এমন কি, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেও তাহা করা হয় নাই। সুতরাং এই সকল বন্যায় শস্যহানি কিরূপ হইবে এবং তাহার ফলে, অন্ততঃ বাঙ্গালায়, অবস্থা আরও কিরূপ ভয়াবহ হইবে, তাহা বুঝিবার উপায়ও হইতেছে না। সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য প্রদানে যে সহযোগ ঘটিলে কায সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়, সে সহযোগ সংগঠিত হইতেছে, তাহা মনে হয় না। তাহার কারণ, সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে এবং যেরূপ ভাবে কায করিলে জনসাধারণের সাগ্রহ সহযোগ লাভ করা যায়, সে ভাবে যে সচিবরা সকলে কায করিতেছেন বা করিতে পারিতেছেন, তাহাও মনে হয় না।

সদাব্রত

দুর্ভিক্ষের সময় সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নের সংস্থান করা এ দেশে প্রাচীন প্রথা। যে সময় লোক অর্থ পরমার্থ জ্ঞান করিত না এবং হিন্দু সমাজ ধনিকবাদের সহিত ধন সাম্যবাদের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিল—সেই সময়ে মানুষ অর্থ অর্জ্জন করিলে তাহাতে সমাজের কল্যাণকর কার্য্যে অবাহত হইত। এখনও গঙ্গার কূলে বহু ঘাট, অসংখ্য দেবায়তন ও বহু পুষ্করিণী, পান্থশালা, পথ প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। লোকের অন্নকষ্ট কালে সদাব্রত প্রতিষ্ঠা সেই সকলের অন্যতম কায। গত উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষে যখন নিরন্ন উড়িয়ারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল—তখন কলিকাতার একাধিক ধনী সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া লোককে অকাতরে অন্নদান করিয়াছিলেন।

এ বার আবার সেই কায আমরা লক্ষ্য করিতেছি। সিংহের গর্জ্জন যদি মেষশিশুর রবে পরিণতি সম্ভব হয়, তবে, তাহা যেরূপ হয়—বাঙ্গালার খাদ্য-সচিবের উক্তি তেমনই হইয়াছে। তিনি কয় মাস পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, আজ আর তাহা বলিতেছেন না। আজ তিনি বলিতেছেন, ধনীরা সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া লোককে রক্ষা করুন। তিনি সে সদুপদেশ দিবার বহু পূর্ব্বেই কলিকাতায় কোন কোন ধনী ও প্রতিষ্ঠান সে কায করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বার অবস্থা অন্যান্য বারের অবস্থা হইতে ভিন্ন—এ বার খাদ্য-শস্যের অভাব এবং সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে সরকারের সাহায্য ব্যতীত খাদ্য দ্রব্যের উপকরণ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু যাঁহারা সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে সরকারের নিকট খাদ্য-দ্রব্যের উপকরণ সংগ্রহে আবশ্যক সাহায্য লাভ করিয়াছেন, তাহাও আমরা বলিতে পারি না।

সরকার এখনও "আপনি আচরি" লোককে শিক্ষা দিতেছেন না; মনে করিতেছেন না—উপদেশ অপেক্ষা আদর্শ অধিক ফলোপধায়ী।

কিন্তু সুখের বিষয়, দেশের বেসরকারী লোকরা আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছেন। সার বদরীদাস গোয়েঙ্কাকে সভাপতি, ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সহকারী সভাপতি ও শ্রীযুত ভগীরথ কানোড়িয়াকে সম্পাদক করিয়া বাঙ্গালায় 'রিলিফ কমিটী' গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি কলিকাতায় দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রায় ১০ হাজার লোককে সুলভ মূল্যে চাউল ও আটা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন: যে সকল পরিবারে জনপ্রতি মাসিক আয় ২০ টাকার

অধিক নহে, সেই সকল পরিবারকে ১৫ টাকা মণ দরে চাউল ও ১৬ টাকা ৮ আনা মণ দরে আটা বিক্রয় করা হইবে। কলিকাতার প্রত্যেক ওয়ার্ডে এক হাজার লোক এইরূপ সাহায্য লাভ করিবে।

বাঙ্গালার বাহির হইতেও এই কমিটীর কার্য্যে সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। বোম্বাইয়ের টাটা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদিগের আশা আছে, আরও সাহায্য পাওয়া যাইবে।

এ দিকে বাঙ্গালা সরকারের ব্যবস্থায় যে নানা ত্রুটি সংশোধিত হইতেছে না, তাহা পরিতাপের বিষয়। কয় দিন মাত্র পূর্ব্বে কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন :—

"অদ্য (১১ই আগষ্ট) প্রাতে বেলা প্রায় ৯টার সময় আমি টালিগঞ্জ থানার সম্মুখে ফুটপাতের উপর একটি প্রায় ৮ বৎসর বয়স্ক নিরাশ্রয় বালককে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত দেখি। মনে হয়, তাহার অবস্থার জন্য অনাহার যেমন আংশিকরূপে দায়ী, বৃষ্টিতে আচ্ছাদনহীন স্থানে পতিত থাকাও তেমনই দায়ী। আমি থানায় অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারি, পূর্ব্বরাত্রিতেই পল্লীর কয় জন লোক থানার দারোগাকে এ বিষয় জানান। দারোগা এম্বুলেন্স আনাইয়া বালকটিকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ও পরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। কোথাও তাহার স্থান হয় নাই—হাসপাতাল হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়—স্থান নাই। কাযেই এম্বুলেন্সের চালক বালককে আনিয়া যে স্থান হইতে লইয়া গিয়াছিল, সেই স্থানে রাখিয়া যায়। সেই সময় হইতে বালক তথায় পড়িয়াছিল। পুলিসের দারোগা জানান, তিনি মৃতের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার নির্দ্দেশ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু মরণাহত সম্বন্ধে কি করিবেন, সে নির্দ্দেশ লাভ করেন নাই।"

এ বিষয়ে কি কাহারও দায়িত্ব নাই?

সে যাহাই হউক, কলিকাতায় নানা স্থানে লোকের বদান্যতায় সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন ধনী যে অন্ততঃ ২ আনা না লইয়া লোককে খাদ্য দিতেছেন না, তাহাতে বহু লোক আহার্য্যে বঞ্চিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে বিনামূল্যে—প্রকৃত সদাব্রতে—লোককে অন্নদান করা হইতেছে।

তদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে বালক-বালিকাদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে কলিকাতা বিডন ষ্ট্রীটে লেডী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী হেমলতা মিত্রের আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত সদাব্রত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সদাব্রত শ্রীযুত মহাদেব বিড়লার ব্যয়ে পরিচালিত হইতেছে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন—দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্রের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" দেখা গিয়াছিল—দুর্ভিক্ষের সময় শিশুরাই সর্ব্বাগ্রে গতপ্রাণ হয়—তাহারাই অনাহার-ক্লেশ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সহ্য করিতে পারে। সেই জন্য সেই মন্বন্তরের পরে বাঙ্গালার লোকক্ষয় নিবারণ হইতে বহু দিন লাগিয়াছিল। আমরা জানি, দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য—সুতরাং দুর্ম্মূল্য। কিন্তু শিশুদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এ বিষয়েও আমরা বাঙ্গালা সরকারের কোন ব্যবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। যে সিপাহী বলিয়াছিল—তাহার এক হাতে ঢাল আর এক হাতে তরবার ছিল, সুতরাং সে কিরূপে যুদ্ধ করিতে পারে—তাহারই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কি বাঙ্গালা সরকার বলিবেন—তাঁহারা এক দিকে বন্যা আর এক দিকে গম প্রভৃতি সংগ্রহ এই দুই কার্য্যে ব্যস্ত, সদাব্রতের ব্যবস্থা করিবার সময় পাইবেন কিরূপে?

আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না যে, এইরূপ সময়ে লোক সরকারের নিকট যে সাহায্য পাইবার আশা স্বভাবতঃ করে ও করিতে পারে, বাঙ্গালার লোক বাঙ্গালা সরকারের নিকট সে সাহায্য আজও লাভ করিতে পারে নাই।

—

পরের কথা

বাল্মীকি না কি রামের অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সমগ্র রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে—যুদ্ধের পরে কি হইবে—কি ভাবে পুনর্গঠন হইবে—তাহা লইয়া গবেষণার অন্ত নাই। সম্প্রতি বিলাতে 'অবজারভার' পত্রে সার উইলিয়ম বেভারিজ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন—জাতীয় ঐক্য যেমন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর নির্ভর করে না; জাতির সকলের এক ও তুল্য লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, তেমনই আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য সকল জাতির সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে অবহিত ভাবের উপর নির্ভর করে। তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন—ভিন্ন ভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত ছাড় বা চার্টারের উপর সম্মিলিত জাতিবা যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয় নাই—সকল জাতির অধিকারের ও দাবীর সুমীমাংসা ও সকলের নির্ব্বিঘ্নতার ভিত্তি দৃঢ় করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বিশ্বাস, কি যুদ্ধকালে, কি শান্তির সময়ে যাহাতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিও সুখে-শান্তিতে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন—কোন বা কোন কোন জাতির গৌরববৃদ্ধি প্রয়োজন নহে। তাহারা যদি সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তবে তাহাদিগের বিজয় কখন সার্থক ও সফল হইবে না।

এ সকল কথা প্রয়োজনকালে রাজনীতিক বেদী হইতে বহু বার বহু ভাবেই ব্যক্ত ও উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মানুষের স্বার্থের সম্মুখে সে সবই ফুৎকারে জলবিম্বের মত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় যখন অনেক চেষ্টায় মার্কিণের রাষ্ট্রপতি উইলসনকে মিত্র-শক্তির পক্ষাবলম্বী করা সম্ভব হইয়াছিল, তখন আমরা এমনই অনেক কথা শুনিয়াছিলাম—তখন আমরা শুনিয়াছিলাম, পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করা—দুর্ব্বল জাতিসমূহকেও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা মার্কিণের যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য। সে বার যে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেই য়ুরোপের যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সে বার যুক্ত-রাষ্ট্রের সাহায্যলাভ না করিলে যে মিত্রশক্তির বিপদ ঘটিতে পারিত, তাহা মিসেস্ হামফ্রে ওয়ার্ডের পুস্তকে সরল ভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছিল। কারণ, সে বার রুশিয়া যুদ্ধের প্রথম ভাগেই খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়—ফ্রান্স ও বৃটেনকেই যুদ্ধের বেগ সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইটালী তখন তুচ্ছ। কিন্তু যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হইলে কি হইয়াছিল? কোন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন, যুক্ত-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইলসন পৃথিবী গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ না করিয়া ছলনার জন্য নিরাপদ করিয়াছিলেন কোন দুর্ব্বল জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে নাই। যে

শান্তি অস্ত্রমুখে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই অশান্তির বীজ উপ্ত ছিল।

গত জার্ম্মাণ যুদ্ধের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আজ কেবল ভারতের নহে, পরন্তু সমগ্র জগতের নিরপেক্ষ লোক বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আটলান্টিক চার্টারে বা চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার উক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিলে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে না। বিশেষ গত যুদ্ধে যদিও দেশভেদে ব্যবহার-ভেদের কথা বলা হয় নাই, এ বার তাহাও হইয়াছে। মিষ্টার চার্চ্চিল বলিয়াছেন, আটলান্টিক চার্টার ভারতবর্ষ (বোধ হয় অধীন দেশ মাত্রই) সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট যে চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা যদি সকল দেশ সম্বন্ধে প্রযুক্ত করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি হয়ত—মিষ্টার চার্চ্চিলের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন—আটলান্টিক চার্টার সকল অঞ্চলের সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য—ভারতবর্ষ তাহার সীমাবহির্ভূত নহে। আর তাহা হইলে বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য ('টকিং পয়েণ্টস' ও 'ফিফ্‌টি ফ্যাক্টস'—প্রভৃতি) পরিচালিত হইতে পারিত না। কি ভাবে যে সে প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকা আজ ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিতেছে, তাহারও উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যায়। কাযেই সকলের তুল্যাধিকারের কথা যত না বলা হয়, ততই ভাল। গণতন্ত্রের মর্য্যাদা সম্বন্ধেও তাহাই।

আলোচ্য প্রবন্ধে বলা হইয়াছে—সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ যুদ্ধে পরাভূত হইলে করিবার আর কিছুই থাকিবে না, কিন্তু তাহাদিগের জয় হইলে গঠন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কারণ, এই যুদ্ধে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মূল পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহা বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অনিবার্য্য। গত যুদ্ধের সময়, বিলাতে "শেলে" উপকরণ পূর্ণ করিবার জন্য জর্জ্জ টাউন নামক স্থানে যে সহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ১০ হাজারেরও অধিক তরুণী কায করিত। সেই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাহাদিগের এক জন পরিদর্শিকা বলিয়াছিলেন—এই যে সহস্র সহস্র ভদ্রঘরের কন্যা বিপজ্জনক শ্রমিকের কায করিয়া অর্থার্জ্জন করিতেছে, ইহারাই কি সমাজের ব্যবস্থায় বিপ্লব প্রবর্ত্তিত করিবে না? সেই যুদ্ধের সময় তরুণীরা "জাতির তরুণ ত্রাতা" সৈনিকদিগকে যে ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহাতে তাহাদিগকে বুঝাইতে ও নিবৃত্ত করিতে "গার্ল গাইড" সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। আর সে সময় বিলাতের আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করিয়া বিশপ ওয়েলডন লিখিয়াছিলেন—পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা ও স্থায়িত্ব নষ্ট হইতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধ যে গত যুদ্ধ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক ও ভয়াবহ, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই এই যুদ্ধের পর সমাজের অবস্থা কি হইবে, তাহা মনে করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষে এখনও প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। তথাপি "কণ্ট্রোল" দোকানে ও সদাব্রতে (কিচেনে) আমরা যে একাকার লক্ষ্য করিতেছি, তাহাও সমাজের ভিত্তি দুর্ব্বল করিতেছে, বলা যায়।

যুদ্ধের পর আরও একটি বিষয় বিশেষ বিবেচ্য হইবে। যুদ্ধের পরে যে বেকার-সমস্যা আরও বিকট আকারে প্রকট হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। য়ুরোপে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের অবসানে আয়র্লণ্ডের কি অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আজ যাহারা যুদ্ধে ও যুদ্ধের প্রয়োজনে নানা শিল্পে অর্থার্জ্জন করিতেছে, তাহারা যে বেকার-বাহিনী পুষ্ট করিবে এবং সমগ্র দেশে শোচনীয় অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা অনায়াসে অনুমান করা যায়। সময় থাকিতে সে বিষয়ে সতর্ক হইয়া আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই রাজনীতিকোচিত কার্য্য।

আমরা দেখিতেছি, বিলাতে সে বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। কিন্তু এ দেশে? যে দেশে লোককে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য খাদ্য-দ্রব্যের পরিমাণ-বৃদ্ধির আবশ্যক ব্যবস্থাও হয় নাই—সে দেশে যুদ্ধের পর যে ব্যবস্থা আছে, তাহাই যে থাকিবে না এমন আশা কিরূপে করা যায়? অর্থাৎ যুদ্ধের পরেও এ দেশ অর্থনীতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিক ব্যবস্থারই মত "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকিবে—সেই সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হইতেছে।

সে বিষয়ে আমরা যে বাহির হইতে কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য লাভ করিব, সে আশা মনে পোষণ না করিয়া আপনাদিগের চেষ্টায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাই আমাদিগের পক্ষে প্রয়োজন—সেই প্রয়োজনই আমাদিগকে আমাদিগের কর্ত্তব্যের সন্ধান দিবে।

যুদ্ধের পরে কি হইবে, তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়—হয়ত আশঙ্কার বিষয়ও বলা যায়। কিন্তু আপাততঃ যুদ্ধের সময় কি হইবে, তাহাই আমাদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয়—আতঙ্কের বিষয়ও বটে। যে সকল দেশ স্বায়ত্ত-শাসনাধীন তাহারা ইতোমধ্যেই যুদ্ধের পর কি হইবে ও কি করা প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিতেছে। আমরা সে বিষয়ে চিন্তা করিলেও সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা কোন পরাধীন দেশের নাই।

ভারতীয়ের লাঞ্ছনা

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা কাহারও অবিদিত না হইলেও বৃটেন তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করে নাই ও করিতেছে না। যে সকল অঞ্চল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, সে সকলে ভারতীয়গণ সম্পত্তি করিতে—বাস করা ত পরের কথা—পারিবে না। নূতন ব্যবস্থায় বহু ভারতীয় যে ভাবে সম্পত্তি ত্যাগে বাধ্য ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহার প্রতিবাদে এ দেশে কেন্দ্রী রাষ্ট্রীয় পরিষদেও আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। তবে সে আইনের বিধান যেরূপ, তাহাতে উপযুক্ত প্রতিশোধ-গ্রহণ সম্ভব নহে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা যেরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করে, এ দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদিগকে সেইরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য করাই প্রয়োজন ছিল এবং তাহা করিতে পারিলে হয়ত, তাহাদিগের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইত। কিন্তু এ দেশে যে সেরূপ কার্য্যের পথে অনেক বাধা আছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে নূতন আইন হইল, তাহার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অভিযোগ জানাইবার জন্য জেনারল স্মাটসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে

অস্বীকার করিয়াছেন। জাতিগর্ব্বে—অর্থাৎ বর্ণগর্ব্বে গর্ব্বান্ধ শ্বেতাঙ্গরা যে শ্বেতাতিরিক্ত জাতিসমূহের সম্বন্ধে এইরূপ অশিষ্টাচারের পরিচয় পূর্ব্বেও অনেক ক্ষেত্রে দিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন।

এ বার জেনারল স্মাট্‌স তাঁহার কার্য্যের যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা যেমন ঔদ্ধত্যের তেমনই অশিষ্টতার পরিচায়ক। বলা হইয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় কংগ্রেস যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, সে সকল অন্যান্ত দেশের নিকট প্রতীকারজন্য আবেদন করা বলা যায়।

আমরা জানি, কংগ্রেস একটি প্রস্তাবে বৃটেনে ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া সে-দেশদ্বয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের অবস্থা অবগত করাইতে চাহিয়াছেন। ইহাকে যদি বিদেশে প্রতীকারের জন্ম আবেদন বলিতে হয়, তবে তাহাতে নিশ্চয়ই লোক বিস্ময়ানুভব করিবে। কারণ, এই প্রস্তাবের যথাসম্ভব কদর্থ করিলেও ইহাতে এমন বুঝায় না যে, ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের স্বায়ত্ত-শাসনশীলতা অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা অস্বীকার করিলেও যে দক্ষিণ আফ্রিকা পরাধীন হইত, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই।

যে সকল দেশের লোকমত সর্ব্বত্র সম্মানিত ও প্রভাবসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত, সে সকল দেশে আপনাদিগের অভাব অভিযোগের আলোচনা করা—সে সকল সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য পরিচালিত করা যে কখনই অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। যদি জেনারল স্মাট্‌সের সরকারের ভারতীয়দিগের সম্বন্ধীয় ব্যবহারে লজ্জিত হইবার কোন কারণ না থাকিত, তবে তাঁহারা বৃটেনে ও মার্কিণে ভারতীয়দিগের প্রচারকার্য্যের কল্পনায় ক্রুদ্ধ হইবেন কেন? জেনারল স্মাট্‌সের, বোধ হয়, মনে আছে, অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি নাৎসীদিগের দ্বারা ইহুদীদিগের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন যুদ্ধের পরে হিসাব-নিকাশ হইবে, তখন যদি হিটলারের দল বলেন, ইহুদীরা বিদেশের লোকমত আপনাদিগের পক্ষে সৃষ্ট ও আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করায় ইহুদীদিগকে লাঞ্ছনা করা হইয়াছে—তবে তাহা কি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে বা হইতে পারে? আজ যদি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে অবিচার হইতেছে, তাহা জানাইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশের সহানুভূতি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন মনে করেন, তবে জেনারল স্মাট্‌সের সরকারের ব্যবহারই তাহার কারণ।

জেনারল স্মাট্‌স্ নিশ্চয়ই জানেন, সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনার কার্য্যের সমর্থনে মার্কিণে ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার-বিস্তারবিরোধী প্রচারকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে? সে জন্ত কি বৃটিশ সরকারের কর্ম্মচারীরাও মার্কিণে প্রচারকার্য্য পরিচালনার্থ প্রেরিত হন নাই এবং তাঁহাদিগের জন্ম পুস্তিকা প্রচার করাও হই-'তেছে না? সে সকল প্রচারকার্য্যে কি অনেক অসত্য ও অর্দ্ধসত্য সংগৃহীত হয় নাই?

যদি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ আপনাদিগের সম্বন্ধে সরকারের ব্যবহার অসঙ্গত মনে করেন, তবে কি তাঁহাদিগের তাহা সভ্য জগতের গোচর করিবার অধিকারও শ্বেতাঙ্গগণ অস্বীকার করিবে?

জেনারল স্মাট্‌স ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—মানুষের সরকার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইবার সময় সমুপস্থিত। যদি তাহা করা না হয়, তবে (জার্ম্মাণ) যুদ্ধ বৃথা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সে জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী, জেনারল স্মাট্‌স্ কি তাঁহাদিগের অন্যতম নহেন? তিনি সে দিন যে নীতির প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আজ কি—ক্ষমতা পাইয়া—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে সেই নীতিই পদদলিত করিয়া স্বৈর মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছেন না? তিনি কি মনে করেন, রাজনীতিক অধিকার শ্বেতাঙ্গরাই সম্ভোগ করিবার অধিকারী এবং শ্বেতাতিরিক্ত জাতিরা তাহা সম্ভোগের আশাও কল্পনা করিতে পারে না?

—

পুলিস ও হাইকোর্ট

অল্প দিন পূর্ব্বে হাইকোর্টের জজরা আদালতে কয় জন পুলিস চাকরীয়ার ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছিলেন। জজদিগের মধ্যে এক জন এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, এক জন দারোগার ব্যবহার আদালতের অপমান বলা যায়। সেই সকল পুলিস কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে পুলিস কমিশনার ও বাঙ্গালা সরকার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কলিকাতার পুলিস কমিশনার হাইকোর্ট কর্তৃক ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

"সম্প্রতি হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভয়ানক অপরাধীদিগের সম্বন্ধে ভারতরক্ষা নিয়মের ২৬ ধারা ব্যবহার চলিবে না। ভারতরক্ষা নিয়মের ১২৯ ধারার বলে ধৃত ঐরূপ কতকগুলি লোককে—২৬ ধারা অনুসারে ধরিয়া রাখা যায় না বলিয়া—ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। ইহাতে কলিকাতায় অপরাধ এবং আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমানে যখন সহরে আলোক-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন যে অপরাধের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে, সে ঐ ২৬ ধারা প্রয়োগের ফলে।"

যত দিন ভারতরক্ষা নিয়মের কোন ধারাই ছিল না, তখন কি পুলিসের পক্ষে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার পথ বিঘ্নবহুল ছিল? সে যাহাই হউক, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত সহরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অন্তরায় হইতে পারে—পুলিস কমিশনারের সেইরূপ মত প্রচার করিবার অধিকার থাকিলেও তাহা আদালতের সম্ভ্রমে আঘাত দান করে কি না, তাহা নিশ্চয়ই বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিবাদ্বৈতবাদ

াজকাল দেশে আবার দার্শনিক চিন্তাস্রোত ফিরিয়া আসিতেছে। ক মনীষীই সাগ্রহে এবং সাদরে ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন। বহু সুপ্রাচীন এবং মূল্যবান পুস্তক—যাহা :পূর্ব্বে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছিল মনে হইত—এখন তাহা বিষ্কৃত হইয়া মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। তঃ, অল্পদিনের মধ্যেই দার্শনিক আলোচনা এদেশে যথেষ্ট সমুন্নতি ভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দুই চারিটি বিষয় এখনও নালোচিত রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তন্মধ্যে প্রধান—ন্ত্র বা আগমশাস্ত্র, অথচ অনেক দিক্ হইতে বিচার করিলে মনে য়, তন্ত্রালোচনার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। তন্ত্রশাস্ত্র যেরূপ শাল, উহার বিষয়ও তেমনি গম্ভীর। তার পর আমাদের সামাজিক াচার, ব্যবহার, সাধনা, সবই মুখ্যতঃ তন্ত্রদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিশেষতঃ ঙ্গদেশে তন্ত্রেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। সেই বাঙ্গালাদেশও অধুনা ন্ত্রের প্রতি বড় হতাদর। অবশ্য ইহার অন্যতম কারণ, কতকগুলি জ্ঞ তন্ত্রোপজীবীর তন্ত্রের অপব্যবহার। অপর কারণ, 'ষড়্দর্শন' কটি এমন ভাবে রূঢ় হইয়া গিয়াছে যে, অনেকেই মনে করেন, য়াদি ছয়টি বিশিষ্ট দর্শনশাস্ত্র ভিন্ন আর দর্শন, এদেশে নাই। শ্য কোন্ দিন হইতে যে ষড়্দর্শন শব্দটি তাদৃশ ছয়খানি দর্শনকেই াইতেছে, তাহা বলা দুষ্কর। প্রাচীন কালে যে এদেশের লোকের দৃশ ধারণা ছিল না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে মনে হয় । প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রেও ষড়্দর্শন শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারাও সেস্থলে ঐ শব্দ দ্বারা বর্ত্তমান বিশিষ্ট ছয়খানি দর্শন ঝিতেন না। অবশ্য ষট্‌তন্ত্রী, ষড়্দর্শন ইত্যাদি শব্দ সুপ্রাচীন। াচীন জৈনগ্রন্থেও ষট্‌তন্ত্রী শব্দের উল্লেখ আছে। তাঁহারাও ই স্থলে বর্ত্তমান ছয় দর্শন মনে করেন নাই। অন্ততঃপক্ষে সময় হরিভদ্র তাঁহার ষড়্দর্শনসমুচ্চয় লিখিয়াছিলেন, তখনও ড়্দর্শন শব্দে ঐ কয়খানি বিশিষ্ট দর্শন, ষড়্দর্শন নামে খ্যাত ছল না।

সুবিশাল তন্ত্রশাস্ত্র নানাশাখাভেদে ভিন্ন। তন্মধ্যে মাহেশ্বর-শাখা আবার দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অদ্বৈত-দৃষ্টিতে শৈব রৌদ্র এবং ভৈরবনামে ত্রিধা বিভক্ত। অবশ্য দৃষ্টিভেদই ঐ ভেদের প্রতি নিমিত্ত। কোন বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে, প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ হইতেই তাহার বিশ্লেষণ হওয়া আবশ্যক, নতুবা আলোচনার পূর্ণতা হয় না। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণও ঐ নিমিত্তই দৃষ্টিভেদ বশতঃ প্রস্থানভেদ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ভৈরবাগম মূলতঃ চতুঃষষ্টিসংখ্যক, * এবং ইহাই অদ্বৈতদৃষ্টিপ্রধান এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য-শিবাদ্বৈতবাদের মূল উপজীব্য। আগমশাস্ত্র সাম্প্রদায়িকগণ কর্ত্তৃক বেদেরই ন্যায় অপৌরুষেয়রূপে সমাদৃত। কিছুদিন পূর্ব্বেও পণ্ডিতগণের মধ্যে তন্ত্রের প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। অনেকে মনে করিতেন, বৌদ্ধ মহাযানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, এবং তৎপর, ক্রমশঃ ঐ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ সাধিত হইয়াছে; কিন্তু আর আজকাল পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের তদ্রূপ ধারণা নাই। মোহেঞ্জোদারো প্রভৃতি স্থানে যে সব প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা দ্বারা কেহ কেহ অনুমান করেন, তন্ত্র বেদ হইতেও প্রাচীনতর। আমরা অপ্রাসঙ্গিক বোধে ঐ সকল মতবাদের আলোচনা করিব না। প্রকৃত স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, প্রাচীন কালে অর্থাৎ উপনিষদের যুগেও বেদ-তন্ত্রের তাদৃশ মার্গভেদ স্বীকৃত হইত না। রহস্যময় বৈদিক সাধনাই তান্ত্রিকসাধনা নামে পরিচিত ছিল, ইহাই আমাদের ধারণা। বৃহদারণ্যক (৬।২) এবং ছান্দোগ্যে (৫।৮) বর্ণিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রকরণে ইহার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। ছান্দোগ্যের উদ্গীথবিদ্যার আলোচনায় (২।১৩) যে বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃই তান্ত্রিকসাধনা। ঐ উপনিষদেই (৩।১—১০) মধুবিদ্যার আলোচনায় সূর্য্যের পূর্ব্বাদি রশ্মিরূপ—মধুনাড়ীচক্রের মধু-কৃদ্‌রূপে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্বাদি—রসের বর্ণনা করিয়া, ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং ইতিহাস-পুরাণকে তাহাদের

* বিস্তৃত বিবরণ সৌন্দর্য্যলহরীর ৩১ শ্লোঃ লক্ষ্মীধরটীকা দ্রষ্টব্য।

পুষ্পরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অতঃপর বলা হইয়াছে, সূর্য্যের উর্দ্ধ-রশ্মিই উর্দ্ধ মধুনাড়ী, তাহার আদেশ অর্থাৎ উপাসনাবিধি 'গুহ্য', ব্রহ্মই তাহার পুষ্প *—ইহাও যে স্পষ্টতঃ তান্ত্রিক রহস্য-সাধনা, তদ্বিষয়ে সম্ভবতঃ সন্দেহের অবকাশ নাই। তন্ত্রের একটি পারিভাষিক নাম—রহস্যশাস্ত্র, ইহাও এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক। বারান্তরে আম্নায়ভেদ এবং বেদের স্বরূপ-আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। সম্প্রতি অদ্বৈত শৈবদর্শনের ইতিহাস, সাহিত্য এবং আচার্যদিগের সম্বন্ধে অতি-সংক্ষিপ্ত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া ইহার দার্শনিক মতবাদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণই তাঁহাদের অনন্য-সাধারণ সাধনাদ্বারা এই শাখার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন—এই নিমিত্ত, ইহা কাশ্মীর-শিবাদ্বৈতবাদ নামেও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

শিবাদ্বৈতদর্শনের উৎপত্তি এবং বিস্তার

কথিত আছে, পরমশিব তাঁহার উর্দ্ধবক্ত্র হইতে অদ্বৈতশিবাগম প্রকাশ করিয়া লোককল্যাণার্থ জগতে প্রচার করেন। ইহা তাঁহার লোককল্যাণকারিণী অনুগ্রহশক্তিরই কার্য্য। অতঃপর আমরা দেখিব, পরমেশ্বর নিয়ত, প্রতিক্ষণেই অনুগ্রহাদি পঞ্চকৃত্যকারী; অতএব তাঁহার এই অদ্বৈতজ্ঞানপ্রকাশের সহিত কালিকসম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এবং ফলতঃ প্রকৃতস্থলে তাহা ইতিহাসের উপযোগীও হইবে না। সোমানন্দনাথ-বিরচিত শিবদৃষ্টির সপ্তম আহ্নিকে 'কালে' এই জ্ঞান প্রচারের কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত দেওয়া আছে, আমরা তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

পুরাকালে মহামুনি দুর্ব্বাসা একদা কৈলাসাদ্রিতে বিচরণ করিতে-ছিলেন। তখন পরমেশ্বর শ্রীকণ্ঠ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া রহস্য-সম্প্রদায়ের যেন বিচ্ছেদ না হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পৃথিবীতে প্রচারের জন্য শিবজ্ঞান শিক্ষা দিলেন। দুর্ব্বাসা ত্র্যম্বক, আমর্দক এবং শ্রীনাথনামক মানসপুত্রত্রয় সৃষ্টিপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞান শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে ত্র্যম্বককে অদ্বৈত, আমর্দককে দ্বৈতাদ্বৈত, এবং শ্রীনাথকে দ্বৈতমতবাদ উপদেশ করেন। ত্র্যম্বকদ্বারা প্রচারিত হওয়ায় এই মতকে ত্রৈয়ম্বকমতও বলা হইয়া থাকে। ত্র্যম্বক হইতে পঞ্চদশ পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ বিদ্যা মানসপুত্রক্রমেই উপদিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। পঞ্চদশ পুরুষ কোন ব্রাহ্মণীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং তাঁহারই গর্ভে সঙ্গমাদিত্য নামক পুত্রের জন্ম হয়। সঙ্গমাদিত্য ভ্রমণ করিতে করিতে কাশ্মীরদেশে চলিয়া আসেন এবং তখন হইতে কাশ্মীরই ঐ দর্শনের প্রধান পীঠরূপে পরিগণিত হয়। সঙ্গমাদিত্যের পুত্র বর্ষাদিত্য, বর্ষাদিত্যের পুত্র অরুণাদিত্য, অরুণাদিত্যের পুত্র আনন্দ এবং আনন্দেরই পুত্র সোমানন্দ। সোমানন্দের কাল ৮৫০ খৃষ্টাব্দ, এইরূপ পণ্ডিতগণ স্থির করেন। ইনি ত্র্যম্বকাদিত্য হইতে বিংশপুরুষ। প্রতিপুরুষে ২৫ বর্ষ হিসাবে গণনা করিলে ত্র্যম্বকের কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হয়, অতএব ঐ সময় অদ্বৈত শৈবদর্শনের প্রচার হইয়াছিল—বলা যাইতে পারে। এই সোমানন্দের গুরু বসুগুপ্ত, এই বসুগুপ্ত হইতেই কাশ্মীর-শৈবদর্শন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার পর হইতেই এই মতবাদের বহু দার্শনিক গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছে।

* অথ যেঽস্যোর্দ্ধা রশ্ময়স্তা এবাস্যোর্দ্ধা মধুনাড্যো—গুহ্য এবাদেশা মধুকৃতো ব্রহ্মৈব পুষ্পম্—ছান্দোগ্য ৩।৫।১।

সাহিত্য এবং আচার্য্য

অন্যান্য আগমশাস্ত্রের ন্যায় এই সম্প্রদায়েরও বহু পুস্তক আজক[াল] অনুপলব্ধ। কাশ্মীর-রাজের শুভ প্রচেষ্টায় সম্প্রতি অনেকগুলি অমূ[ল্য] গ্রন্থের উদ্ধার-সাধন হইয়াছে। উৎপল, অভিনবগুপ্ত প্রভৃ[তি] আচার্য্যের গ্রন্থে যে সব আচার্য্য এবং গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়া[ছে] তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ঐ সব আলোচনা করিলে ম[নে] হয়, কাশ্মীর দর্শনের মূলে যে সব গ্রন্থ ছিল, তাহার অত্যল্প ভাগই মা[ত্র] আমাদের জ্ঞানগোচর হইতেছে। প্রাচীন কালে স্বচ্ছন্দ, মালিনী-বিজয়, নেত্রতন্ত্র, বিজ্ঞানভৈরব প্রভৃতি গ্রন্থ কাশ্মীরে অত্যন্ত সমাদৃ[ত] ছিল। ঐ সব গ্রন্থের অনেকই সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে। সোমানন্দে[র] গুরু—বসুগুপ্ত হইতেই অবিচ্ছিন্নধারাক্রমে আচার্য্যগণ বহুদিন প[র্য্যন্ত] বহু প্রকরণ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বসুগুপ্ত স্বপ্নে শিবাদিষ্ট হই[য়া] কাশ্মীরের কোন পর্ব্বতের বৃহৎ শিলাখণ্ডে কতকগুলি সূত্র উৎকী[র্ণ] অবস্থায় পাইয়াছিলেন। এই শিলাখণ্ড এবং তাহার ছায়াচি[ত্র] কাশ্মীররাজ-প্রকাশিত শিবসূত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা শিবসূত্র নামে বিখ্যাত। বসুগুপ্তের অপর গ্রন্থ স্পন্দকারিক[া]। ইহাতে তিনি স্পন্দতত্ত্ব বিশদ করিয়াছেন, এই স্পন্দই সর্ব্বেশ[্বরের] শক্তি। তিনি গীতার উপরও টীকা লিখিয়াছিলেন, উহা বাসবী টী[কা] নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন পর্য্যন্ত ঐ টীকা প্রকাশিত হয় নাই। বসুগুপ্তের শিষ্য সোমানন্দ, বিখ্যাত শিবদৃষ্টি গ্রন্থ রচনা করেন। রুদ্রযামলান্তর্গত পরাত্রিংশিকা বা পরাত্রীশিকা খণ্ডেরও তিনি টী[কা] প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বসুগুপ্তের দ্বিতীয় শিষ্য কল্লটাচার্য্য স্পন্দকারিকার উপর 'স্পন্দসর্ব্বস্ব' নামক অত্যন্ত উপাদেয় এক বৃ[ত্তি] রচনা করিয়াছেন। সোমানন্দের শিষ্য উৎপলাচার্য্য প্রত্যভিজ্ঞাকারিক[া] নামক কতকগুলি কারিকা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ অত[্যন্ত] প্রৌঢ় এবং কাশ্মীরাদ্বৈতবাদবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার প্রমেয় এবং যুক্তি[তে] সুসমৃদ্ধ। শিবাদ্বৈতবাদ মননের জন্য বৃত্তিসহিত ইহার আলোচ[না] পরমাবশ্যক। এতদ্ভিন্ন সিদ্ধিত্রয়ী (অজড়প্রমাতৃসিদ্ধি, ঈশ্বরসি[দ্ধি] এবং সম্বন্ধসিদ্ধি) এবং শিবস্তোত্রাবলী নামক ভক্তিরসে পরিপূ[র্ণ] কতকগুলি স্তোত্রও তিনি রচনা করেন। উৎপলের প্রশিষ্য এ[বং] লক্ষ্মণগুপ্তের শিষ্য অভিনবগুপ্তের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে চিরপ্রসি[দ্ধ] হইয়া থাকিবে। ইঁহার সমকক্ষ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ভারতে অতি অল্প[ই] জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখ[ী]। নাট্যশাস্ত্রটীকা, ধ্বন্যালোকটীকা প্রভৃতি হইতেই অভিনবের প্রতিভা[র] পরিচয় সুধী-সমাজ পাইয়া আসিয়াছেন। অভিনবের আরও স[ব] কীর্ত্তি আছে, তাহারাও তেমনি গৌরবময়। তন্মধ্যে বিশালকা[য়] তন্ত্রালোক তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয় বিশ্বকোষ। ইহা ত্রয়োদশ ভাগে কাশ্মী[র] হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অভিনবগুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা[র] উপর দুইটি বৃত্তি রচনা করেন—একটি প্রত্যভিজ্ঞাবিবৃতিবিমর্শিনী বা বৃহতী বৃত্তি, অপরটি প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী বা লঘুবৃত্তি। এতদ্ব্যতী[ত] মালিনীবিজয়বার্ত্তিক, পরাত্রিংশিকাবৃত্তি, তন্ত্রসার, পরমার্থসা[র] কারিকা, প্রবোধপঞ্চদশিকা, রহস্যপঞ্চদশিকা, অনুত্তরতত্ত্ববিমর্শিনী লঘুবৃত্তি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ অভিনবগুপ্তেরই অমর কীর্ত্তি। ইহা[র] মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশিত হইলেও অনেকগুলি এখন[ও] অপ্রকাশিত আছে। পাণ্ডিত্য এবং সাধনা অভিনবে অপূর্ব্বভা[বে] সমন্বিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাকে মহাসিদ্ধরূপেই গণ[্য]

করিয়া থাকেন। অভিনবগুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ। ইঁহার গ্রন্থের মধ্যে শিবসূত্রবিমর্শিনী নামক শিবসূত্রটীকা, স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, এবং নেত্রতন্ত্রের টীকা, প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়, স্পন্দসন্দোহ, স্পন্দনির্ণয়, এবং শিবস্তোত্রাবলী-টীকা প্রধান। ক্ষেমরাজের শিষ্য যোগরাজ, পরমার্থসারের টীকা প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত দেবরাজ, বরদরাজ এবং ভাস্করকৃত শিবসূত্রবার্ত্তিক, উৎপলবৈষ্ণবের স্পন্দপ্রদীপিকা, জয়রথের তন্ত্রালোকটীকা, মহেশ্বরানন্দকৃত পরিমল সহিত মহার্থমঞ্জরী ইত্যাদি এই সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ। উৎপলাচার্য্যের সময় দশমশতকের প্রথম ভাগ। ইহাই হইল এই মতবাদের আচার্য্য এবং গ্রন্থাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দার্শনিক মতবাদ। তত্ত্বাতীত পরমশিব, প্রকাশবিমর্শ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কাশ্মীর-শৈবদর্শনের মূলে অদ্বৈতদৃষ্টি বর্ত্তমান। এই মতে সমগ্র ভাবরাশি একমাত্র প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের স্বপ্রকাশ মাত্র। প্রকাশভিত্তি লগ্ন না হইয়া কোন পদার্থেরই সত্তা সিদ্ধ হয় না, অতএব ভেদ, অভেদ, ভাব, অভাব, সাকার, নিরাকার ইত্যাদি যাবতীয় বিকল্পই অর্থাৎ ভাবই পরমার্থতঃ একমাত্র প্রকাশরূপ। এইরূপে উপায়োপেয়ভাব, কার্য্যকারণভাব, দেশকাল প্রভৃতি সবই যেহেতু প্রকাশাব্যতিরিক্ত, সেই হেতু উহারা সকলেই পরমার্থভূত; কারণ, ঐ সকল পদার্থ কখনও প্রকাশরূপতা হইতে প্রচ্যুত হয় না। প্রকাশই ভাবসমূহের স্বভাব; অতএব ভাব বলে যেহেতু কখনই তদিতরস্বভাবের যোগ হয় না, সেই হেতু প্রকাশে ভেদও কল্পিত হইতে পারে না। দেশ কালও প্রকাশের ভেদসাধক হইতে পারে না; কারণ, দেশ এবং কাল—উভয়ই প্রকাশস্বভাব। অতএব প্রকাশ এক এবং অদ্বিতীয়। উহাকেই সংবিৎ বলা হইয়া থাকে; কারণ, অর্থের প্রকাশই যে সংবিদের রূপ—এ বিষয়ে কাহারও বিপ্রতিপত্তি নাই। ঐ প্রকাশ পরতন্ত্র নহে; কারণ, প্রকাশ্যতাই পারতন্ত্র্য। প্রকাশ্যতা আবার প্রকাশান্তরসাপেক্ষ। প্রকাশে ভেদ কল্পিত হইতে পারে না—ইহা এই মাত্রই বলা হইল। অতএব প্রকাশ এক এবং স্বতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্য বশতঃই দেশ, কাল এবং আকারদ্বারা প্রকাশের পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। অতএব বলিতে হইবে প্রকাশ ব্যাপক, নিত্য এবং সর্ব্বাকারনিরাকারস্বভাব। দেশ এবং কাল—প্রকাশমাত্ররূপে বিবেচিত হইলে তাহাতে ক্রম আছে, তাহাও আর পাওয়া যাইবে না, অথবা আরও পরিশুদ্ধভাবে বলিলে বলিতে হইবে, ঐ ক্রম অক্রমেরই গর্ভস্থিত হইয়া পড়িবে; কারণ, প্রকাশ অক্রমপদ। তদ্রূপ কার্য্যকারণভাবও প্রকাশগর্ভস্থ হইয়া পারমার্থিকপদবাচ্য হইবে বটে, কিন্তু সেই পারমার্থিক কার্য্যকারণভাবে কারণ এবং কার্য্যের ব্যবধান তিরোহিত হইয়া যাইবে, অথবা প্রকাশ্যমগ্ন হওয়াতে কার্য্য, কারণ এবং ব্যবধান—সমস্তই একক্ষণোপারূঢ় হইয়া যাইবে। প্রকাশস্থ, প্রকাশের স্বরূপভূত, এবং অত্যন্ত অভিন্ন—এই যে ভাববৈচিত্র্যাধায়ক স্বাতন্ত্র্য শক্তির কথা বলা হইল, ইহারই অপর নাম বিমর্শ। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশের প্রকাশতাও সিদ্ধ হয় না, অতএব বিমর্শই প্রকাশের প্রাণ। অভিনবগুপ্ত প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনীতে বলিয়াছেন, বিমর্শশূন্য প্রকাশ অপ্রকাশকল্প *। এই কথাই ভর্ত্তৃহরিও তাঁহার বাক্যপদীয়ে বলিয়াছেন যথা—বাগ্রূপতাবিমর্শই প্রকাশের প্রকাশত্ববিধায়ক, প্রকাশ হইতে বাক্ উৎক্রান্ত হইলে প্রকাশও অপ্রকাশকল্প হইয়া পড়ে। *

এই বিমর্শকে শাস্ত্রে পরাশক্তি, পরাবাক্, হৃদয়, হৃল্লেখা ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐ প্রকাশই আগমোক্ত শিবতত্ত্ব। প্রকাশের আত্মবিশ্রান্তিই 'অহম্' রূপী বিমর্শ এবং এই বিমর্শ অন্যাপেক্ষিতাশূন্য হওয়ায় ইহাই পূর্ণতা-স্বরূপ। এই নিমিত্ত ইহাকে 'পূর্ণাহন্তা' অর্থাৎ 'আমি' ভাবের পূর্ণতা-নামেও অভিহিত করা হয়। 'আমি পূর্ণ' ইহাই নিত্যসিদ্ধ আত্মজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ। এই পূর্ণাহন্তাপদ শিবশক্তির সামরস্যস্বরূপ হইলেও ইহা তত্ত্বাতীত। ইহারই নামান্তর অনুত্তর, পরাসংবিৎ, পরমেশ্বর, পরমশিব ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সামরস্য শব্দদ্বারা কেহ মনে করিবেন না—শিবশক্তি দুইটি পৃথক্ তত্ত্বের মিলিতরূপই পরমশিব; কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিবশক্তির পৃথক্ ব্যপদেশ হইলেও এই মতে উভয়ের অত্যন্ত অভেদই স্বীকৃত হইয়াছে—শিবশক্তিরিতি হ্যেকং তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ। প্রকাশের স্ববিশ্রান্তিরূপ সমপদকে বুঝাইবার জন্যই সামরস্য শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই পরমশিবদশা অপর পক্ষে অভিন্নদৃক্‌ক্রিয়াস্বরূপ; কারণ, জ্ঞান এবং ক্রিয়ার পারমার্থিক ভেদ এই মতে স্বীকৃত হয় না †—প্রকাশবিমর্শের অত্যন্ত অভেদ বলাতে—এই কথাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মায়াতত্ত্বে যে জ্ঞান ও ক্রিয়ার ভেদ পরে প্রদর্শিত হইবে, সেই ভেদের নিরসনই এই মতে মুক্তির সাধনা। যে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রকাশের স্বাত্মানুভব সিদ্ধ হওয়ায় প্রকাশের জড়বিলক্ষণতা সিদ্ধ হয়, তাহাই বিমর্শ। এই বিমর্শকেই শিবের স্বভাব বলা হইয়া থাকে।

ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তত্ত্বাতীত অনুত্তর হইতেই ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বময় বিশ্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহাদের নাম (১) শিব, (২) শক্তি, (৩) সদাশিব, (৪) ঈশ্বর, (৫) শুদ্ধবিদ্যা, (৬) মায়া, (৭) কাল, (৮) বিদ্যা, (৯) কলা, (১০) রাগ, (১১) নিয়তি, (১২) পুরুষ, (১৩) প্রকৃতি, (১৪) বুদ্ধি, (১৫) অহঙ্কার, (১৬) মন, (১৭) শ্রোত্র, (১৮) ত্বক্, (১৯) চক্ষুঃ, (২০) জিহ্বা, (২১) ঘ্রাণ, (২২) বাক্, (২৩) পাণি, (২৪) পাদ, (২৫) পায়ু, (২৬) উপস্থ, (২৭) শব্দ, (২৮) স্পর্শ, (২৯) রূপ, (৩০) রস, (৩১) গন্ধ, (৩২) আকাশ, (৩৩) বায়ু, (৩৪) তেজ, (৩৫) জল এবং (৩৬) পৃথিবী। সদাশিব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বগুলি আবার অন্য প্রকার বিভাগবশতঃ চারিটি অণ্ডে বিভক্ত যথা—শক্ত্যণ্ডে সদাশিব ঈশ্বর শুদ্ধবিদ্যা এই তিন তত্ত্ব, মায়াণ্ডে মায়া হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত ৭ তত্ত্ব, এবং প্রকৃত্যণ্ডে প্রকৃতি হইতে জল পর্য্যন্ত ২৩টি তত্ত্ব অন্তর্গত। পৃথিবী তত্ত্বকেই পৃথ্যণ্ড বা ব্রহ্মাণ্ড বলা হইয়া থাকে, ইহাতে পৃথিবীরূপ একটি মাত্র তত্ত্ব বিদ্যমান। এইরূপে এই চারিটি অণ্ডের মধ্যে উক্ত ৩৬টি তত্ত্ব অন্তর্গত। আমরা এখন ক্রমশঃ ঐ তত্ত্বগুলির বিবরণ প্রদান করিব। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, উপর্য্যুক্ত বিভাগে তত্ত্ব হিসাবে শিবশক্তি কোন

---

* (বাক্‌তত্ত্বাবমর্শশূন্যস্য চ প্রকাশস্য অপ্রকাশকল্পত্বাৎ—প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী—উপোদ্‌ঘাত—কাশ্মীর ১৯১৮ ইং ৯ পৃষ্ঠা)।

* (বাগ্রূপতা চেদুৎক্রামেদবাবোধস্য শাশ্বতী ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী—বাক্যপদীয় ব্রহ্মকাণ্ড)।

† জ্ঞানং বিমর্শানুপ্রাণিতং বিমর্শ এব ক্রিয়েতি, ন চ জ্ঞানশক্তিবিহীনস্য ক্রিয়াযোগঃ—প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ৩।১।১।

অণুমধ্যে বিন্যস্ত নহে। ইহার কারণ, বিশ্ব, শিবাভিন্না মহাশক্তিরই বিলাস। সমুদয় তত্ত্বগ্রাম ঐ শক্তিগর্ভেই নিহিত। জ্ঞানক্রিয়ার বৈষম্য বশতঃ প্রথম যে তত্ত্বের উদয় হয়, উহাই সদাশিবতত্ত্ব—সদাশিবাবধি তত্ত্বগ্রাম সমুদায়ই শক্তিতে অবস্থিত, এই জন্য ব্যাপকতম অণুের নাম শক্তি, সদাশিবাদি স্বয়ং অণুমধ্যে বিন্যস্ত। অতঃপর আমরা ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বান্তর্গত শিব এবং শক্তির আলোচনা করিব।

শিবশক্তি

পরমেশ্বর তাঁহার পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যলক্ষণ মাহেশ্বর্য্যরূপা শক্তিদ্বারা নিত্য আলিঙ্গিত। স্বাতন্ত্র্যশক্তি অনন্তশক্তি চক্রের একমাত্র অধিষ্ঠান হইলেও সামান্যতঃ মুখ্য পঞ্চ শক্তিতে নিয়তবিলসনশীলা। অতএব প্রতিক্ষণেই পরমেশ্বর পঞ্চকৃত্যবিধায়ক—এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ঐ শক্তিপঞ্চককে যথাক্রমে চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং ক্রিয়া নামে অভিহিত করা হয়। প্রকাশবিমর্শময় অনুত্তরের প্রকাশাংশ পৃথগ্‌রূপে বিবেচিত হইলে উহাকেই চিচ্ছক্তিপ্রধান শিবতত্ত্ব বলা হয়। ইহাই ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বের অন্তর্গত প্রথম তত্ত্ব। এই দশায় বিশ্বোত্তীর্ণতার বিমর্শমাত্র হইয়া থাকে। বিশ্বোত্তীর্ণতা-মাত্রের বিমর্শ, আগম মতে পূর্ণতার স্বরূপ হইতে পারে না। যে স্বাত্মানুভবে বিশ্বোত্তীর্ণতা এবং বিশ্বময়তার ভেদ বিগলিত হইয়া "আমি পূর্ণ" এইরূপ একমাত্র বিমর্শ অবশিষ্ট থাকে, সেই মহাবিমর্শই পূর্ণপদবাচ্য। বিশ্ব অনন্তশক্তিরূপে স্বাতন্ত্র্য-শক্তির গর্ভে অভেদে বিদ্যমান, অতএব বিশ্বময়তার বিমর্শযুক্ত প্রকাশ-দশাকেই শক্তিতত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। ইহা আনন্দ-প্রধান দ্বিতীয় তত্ত্ব। বিমর্শলক্ষণে বলা হইয়াছে, প্রকাশের আত্মবিশ্রান্তিই বিমর্শ। যাঁহার ক্রোড়ে অনন্তশক্তি বিদ্যমান সেই স্বাতন্ত্র্যশক্তি প্রকাশে বিশ্রান্ত হইলে তাহা অহন্তার পূর্ণতাসাধনপূর্ব্বক আনন্দরূপতাই প্রাপ্ত হইবে; কারণ, এই দশা ইদংরূপতাব বিকল্পশূন্য, অতএব স্বাত্মপ্রথার প্রাতিকূল্য-লেশবর্জ্জিত। প্রথান্তরব্যবধানশূন্য নিরর্গল স্বাত্মপ্রথাই আনন্দ। ন্যায়াদিশাস্ত্রেও বেদনের অনুকূলতাকেই সুখনামে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, নিয়ত অভিন্ন-স্বরূপ অথচ প্রকাশ-বিমর্শের বিশ্লেষণযুক্তিতে বিবেচনমাত্র দ্বারা পৃথক্‌কৃত, প্রকাশা-বস্থাকেই শিবতত্ত্ব এবং বিমর্শাবস্থাকে শক্তিতত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। বিমর্শবিরহিত প্রকাশকে শিব নামে অভিহিত করায় ঐ অবস্থাকে শূন্যাতিশূন্য পদও বলা হয়। এই শিবতত্ত্ব এক অদ্বিতীয়, বিশ্বোত্তীর্ণ প্রকাশস্বরূপ হইলেও ইহা শাঙ্কর-বেদান্তের ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তত্ত্ব; কারণ, শাঙ্কর-বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের পারমার্থিক কর্তৃত্ব সম্ভাবিত হয় না। ব্রহ্ম প্রপঞ্চাধিকরণ মাত্র; কিন্তু কাশ্মীর-দর্শনের শিব, নিয়ত সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহরূপ পঞ্চকৃত্যকারী, অতএব কর্তৃত্ব তাঁহার স্বভাব, উহা আরোপিত নহে। বিশ্বসিসৃক্ষা বশতঃ জ্ঞানক্রিয়ার বৈষম্যহেতু অদ্বৈত ভূমিতেই যে তত্ত্ব-ত্রয় আবির্ভূত হয়, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব। তাহাকেই শক্ত্যণ্ড বলা হয়।

শক্ত্যণ্ড—সদাশিব, ঈশ্বর এবং শুদ্ধবিদ্যা

পূর্ব্বোক্ত স্বাতন্ত্র্যশক্তি নিমেষোন্মেষরূপ ব্যাপারদ্বয়যুক্তা। স্বরূপ-বিমর্শরূপা ঐ শক্তির আন্তর বৃত্তিকেই নিমেষ অথবা জ্ঞান-শক্তি এবং উহার বহির্বৃত্তিকে উন্মেষ অথবা ক্রিয়াশক্তি বলা হইয়া থাকে। নিমেষোন্মেষের সমতাই মহাসামরস্য বা পূর্ণতানামক তত্ত্বাতীত পদ। মহাশক্তি নিজ স্বাতন্ত্র্যমহিমায় যখন স্বভিত্তিতে বিশ্বকে উন্মীলিত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহাতে 'অহমিদম্' এইরূপ অস্ফুট ইদন্তা-গর্ভিত অহন্তার বিমর্শ হইয়া থাকে। এতাদৃশ বিমর্শময় প্রকাশই সদাশিবতত্ত্বনামে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এই তত্ত্বে অহন্তা প্রধান, ইদন্তা- অত্যন্ত অস্ফুট। ইহা আন্তর জ্ঞানদশার সমুদ্রেকস্বরূপ, ক্রিয়া এস্থলে গৌণতাপ্রাপ্ত। এই তত্ত্বে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রমহেশ্বর নামক প্রমাতৃবর্গ অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা সৃষ্টিক্রমো-পদেশে প্রথম উল্লেখ্য সাদাখ্য তত্ত্ব।

অতঃপর প্রকাশের 'ইদমহম্' রূপ, ইদন্তাপ্রধান অহন্তাগর্ভিত যে বিমর্শদশা; সেই বিমর্শযুক্ত প্রকাশকেই ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হয়। এই দশায় ইদন্তা প্রধান হওয়াতে ক্রিয়াশক্তিময় বহির্ভাগের সমুদ্রেক স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে, এইজন্য এই ঈশ্বরপদ ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। এই তত্ত্ব বক্ষ্যমাণ মন্ত্রেশ্বরনামক প্রমাতৃবর্গ দ্বারা অধিষ্ঠিত। বস্তুজাত আমাদের অন্তঃকরণমাত্রবেদ্য হইলে অথবা কোন চিত্রফলক অত্যস্ফুট রেখামাত্রবিচিত্র হইলে যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, সদাশিব-দশায় বিশ্বও তদ্রূপ অস্ফুটরূপে প্রোন্মীলিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্বে ঐ বিশ্ব আমাদের ইন্দ্রিয়বেদ্য জগতের ন্যায় অথবা নানাবর্ণে বিচিত্র চিত্রের ন্যায় স্ফুট প্রতিভাত হয়। মনে রাখিতে হইবে, উভয়ত্রই বিশ্ব প্রকাশের স্বাঙ্গকল্পরূপে অথবা প্রতিবিম্ব-কল্পরূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকে; কারণ, আমরা এযাবৎ অদ্বৈত ভূমিরই প্রসঙ্গ করিতেছি।

মায়া প্রমাতায় অর্থাৎ বদ্ধজীবে, অহন্তা এবং ইদন্তা—এতদুভয় পৃথক্ পৃথক্ অধিকরণনিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু যে দশায় সেই পৃথগধিকরণত্ব নিরসিত হইয়া একই অধিকরণে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে তাহাব সম্বন্ধ হয়, সেই দশাকেই শুদ্ধবিদ্যা বা বিদ্যাতত্ত্ব বলা হয়। এই বিদ্যাতত্ত্বেই যখন অহংএর চিন্মাত্র-স্বরূপ অধিকরণে ইদমংশ উল্লসিত হয় তখনই 'অহমিদম্' এই আকারের বিমর্শাশ্রয় প্রকাশকে সদাশিব এবং তাহাতেই যখন সেই ইদমংশের অধিকরণে অহম্-অংশের বিমর্শ নিষিক্ত হইয়া 'ইদমহম্' এই প্রকার আকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাদৃশ বিমর্শাশ্রয় প্রকাশকে, ঈশ্বরতত্ত্ব বলা হইয়া থাকে। এই তত্ত্বকে শুদ্ধবিদ্যা বলা হয়, তাহার কারণ, ইহা দ্বারা বস্তুর যথাবৎ বিদ্যা অর্থাৎ বোধ হইয়া থাকে। ভাব মাত্রের বোধ অর্থপ্রকাশ। ইতঃপূর্ব্বে অন্যোন্যোন্মুখ বিমর্শরূপ অহমই যে প্রকাশ—ইহা দেখান হইয়াছে। অতএব বস্তুর ইদন্তারূপে যে বিপরীত ভাণ; তাহার নিষেধক বলিয়া ঐ বেদন শুদ্ধ, অতএব উহা শুদ্ধবিদ্যা নামে আখ্যাত। বেদ্যভাবনিষ্ঠদশাকেই তত্ত্ব বলা হয়। মন্ত্রেশ্বরাদি শুদ্ধপ্রমাতৃবর্গ কর্তৃকই ঐ বেদ্য সকল বিদিত হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রমাতৃগণের যে বেদনদশা, তাহাই শুদ্ধবিদ্যা এবং ঐ প্রমাতৃবর্গের অধিষ্ঠাতৃত্বই সদাশিব বা ঈশ্বররূপ দশা ইহাই প্রভেদ *। অনন্যাপেক্ষঅহমরূপ পূর্ণাহন্তাপদ পরদশা, এবং অন্যাপেক্ষ ইদংরূপ অপূর্ণতাদশাই অপর দশা।

* বেদ্যভাবনিষ্ঠা দশা তত্ত্বস্বরূপা, তদবভাসয়িতৃমন্ত্রেশ্বরাদিশুদ্ধ-প্রমাতৃ-সংবেদ্যবস্তুসারা। যা তু তন্নিষ্ঠসংবেদনদশা সা শুদ্ধা বিদ্যা, তৎপ্রমাতৃবর্গাধিষ্ঠাতৃত্বং শ্রীসদাশিবেশ্বরভট্টারকরূপতা—(প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিনী—৩।১।৫)।

—এই উভয় দশার মধ্যবর্ত্তী শুদ্ধবিদ্যাদশায় সদাশিব এবং ঈশ্বরতত্ত্বে অহম্ এবং ইদম্এর স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতারূপ, উভয় অংশেরই স্পর্শ থাকায় এই দশাকে পরাপরদশাও বলা হইয়া থাকে *।

প্রমাতৃপ্রমেয়রূপ বিশ্ব পরাহন্তাচমৎকারসার হইলেও মহাশক্তির স্বরূপাপোহনের ইচ্ছাই ইদন্তার অবভাসনদ্বারা প্রমাতৃপ্রমেয়ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। সেইজন্য স্বাত্মনিষেধব্যাপার-রূপা সেই পারমেশ্বরী শক্তিই স্বয়ং শক্ত্যণ্ড। ইহাই ব্যাপকতম অণ্ড। কোশরূপে আচ্ছাদক বলিয়া ইহাদিগের অণ্ড নাম দেওয়া হইয়াছে। সদাশিব এবং ঈশ্বরই শক্ত্যণ্ডের অধিপতি †। স্বাত্মতিরোধানকরী স্বাতন্ত্র্যশক্তি, সঙ্কোচের অবভাসবশতঃ কিঞ্চিৎ মাত্র ভেদের উল্লাস করিলেও বিদ্যাপদে অভেদপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বথা তিরোহিত হয় না। এই নিমিত্ত বিদ্যাপদ ভেদাভেদদশাস্বরূপ। অতঃপর সঙ্কোচ আরও অগ্রসর হইলে যে পদে অ-ভেদ প্রতিষ্ঠা আত্যন্তিক ভাবেই তিরোহিত হইয়া যায় তাহাই মায়াপদ। এই মায়া স্বকীয় ব্যাপারদ্বারা শাঙ্করবেদান্তের অনুরূপ হইলেও, সর্ব্বথা অভিন্ন নহে। যে অংশে ভেদ লক্ষিত হইবে, তাহা আমরা এখনই মায়াতত্ত্বের আলোচনায় দেখিতে পাইব।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এ, শাস্ত্রী।

* অত্র চ তত্ত্বদ্বয়ে ভাবানাং ধ্যামলাধ্যামলরূপাণামুভয়াংশস্পর্শাৎ পরাপরত্বমিতি—(প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী ৩।১।৫)।

† বিশ্বস্য প্রমাতৃপ্রমেয়রূপস্য পরাহন্তাচমৎকারসারস্যাপি স্বস্বরূপাপোহকাত্মাখ্যাতিময়ী নিষেধব্যাপাররূপা যা পারমেশ্বরী শক্তিঃ, সৈব আচ্ছাদকত্বেন বন্ধকতয়া শক্ত্যণ্ডম্ ইত্যুচ্যতে। সদাশিবেশ্বর-শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্বপর্য্যন্তদলং সং বক্ষ্যমাণমণ্ডত্রিতয়মস্তঃ সমস্তাৎ গর্ভীকৃত্য অবতিষ্ঠতে ইতি কোশরূপতয়া এষা শক্তিরনেন শব্দেন সংজ্ঞিতা। এতস্মিন্ অণ্ডে সদাশিবেশ্বরাবেবাধিপতী। (পরমার্থসার ৪র্থ কারিকা।)

বৈষ্ণবমত-বিবেক

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রীগোবর্দ্ধনে

শ্রীচৈতন্যদেব যে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্রীগুঞ্জামালা ও শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি মনে করিয়াছিলেন যে—"মহাপ্রভু আমাকে গুঞ্জামালা দান করিয়া আমাকে শ্রীরাধিকার চরণে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার পরিকরভুক্ত করিয়া দিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দান করিয়া আমাকে শ্রীগিরিরাজের আশ্রয় দান করিলেন।" এই জন্যই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীগোবর্দ্ধন হইতে নিপতিত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনপাদমূলে আত্মদেহ বিসর্জ্জন দিবেন বলিয়া শ্রীপুরীধাম হইতে স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামীও এক দিন পুরীধামে গমন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথচক্রতলে নিজদেহ বিসর্জ্জন দিবেন স্থির করিয়াছিলেন; অন্তর্যামী শ্রীচৈতন্যদেব তাহা জানিতে পারিয়াই শ্রীল সনাতনকে বলিয়াছিলেন—

—তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে?
*　　*　　*　　*
নিজ প্রিয় স্থান—মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাঁহা এক ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজ বলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে—দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে সহিব?

এই বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল সনাতনের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনধামে যে যে কার্য্য সম্পাদন করিবেন, তাহার উল্লেখ করেন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীও শ্রীল মহাপ্রভুর পদপল্লবে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—ত্যাগ, বৈরাগ্য ও আদর্শ বৈষ্ণবের সদাচার এবং ভজনপদ্ধতির মূর্ত্তিমান আদর্শরূপে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীরঘুনাথ দাসকে গড়িয়াছিলেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব সম্পত্তি রঘুনাথ নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? এই জন্য শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গদান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সংকল্পের পরিবর্ত্তন-সাধন করাইলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত অতি প্রিয়তম স্থল শ্রীরাধাকুণ্ডে স্থাপন করিয়া জগতের জীবের ভবিষ্যৎ চরমপথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই অত্যুজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। শ্রীল রঘুনাথ যখন দেখিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দিষ্ট কার্য্যসাধনের জন্যই তাঁহার জীবন—তখন অন্তঃকরণে তাঁহারই প্রেরণা অনুভব করিয়া এই সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন ভগবদেকপ্রাণ মহাপুরুষ শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীশ্রীরাধিকাজীর প্রিয়কুণ্ডের তটে আগমন করিলেন। এই স্থানেই তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা স্মরণ-মননে কালযাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু শ্রীব্রজমণ্ডলের সমস্ত ভার শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উপরে ন্যস্ত—এই জন্য আত্মহারা রঘুনাথের আত্ম-রক্ষার জন্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীও অলক্ষিতে শ্রীল দাস-গোস্বামীর

'ক্রিয়ামুদ্রা' দর্শন করিতে ও তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়া দেখিতে পাইলেন, আত্মহারা রঘুনাথ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামগানে ও লীলাস্মরণে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের সন্নিকটবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে বৃক্ষমূলে আবিষ্ট অবস্থায় উপবেশন করিয়া আছেন। যে স্থানে রঘুনাথ বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, তাহার নিকট দিয়া একটি প্রচণ্ড ব্যাঘ্র চলিয়া গেল। যে কারণেই হউক, আত্মসমাহিত রঘুনাথের দিকে শ্বাপদ-প্রবর আর অগ্রসর না হইয়া শ্রীল রাধাকুণ্ডের মানসপাবন ঘাট হইতে জল পান করিয়া চলিয়া গেল *। শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং রঘুনাথকে বলিয়া তাঁহাকে কুটীরে বাস করিতে সম্মত করাইলেন। রঘুনাথ কুটীরে থাকিতে সম্মত হইলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী আরিট্ গ্রামের ব্রজবাসিগণকে আহ্বান করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে শ্রীল দাস-গোস্বামীর জন্য একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীল দাস-গোস্বামীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার জন্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। জগৎপাবন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পবিত্র চরিত্রে ও ভজনপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া শ্রীদাস নামক একটি ভক্ত ব্রজবাসী শ্রীল রঘুনাথের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই ব্রজবাসী ভক্তপ্রবরই শ্রীল রঘুনাথ দাসের ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সেবার যাবতীয় বন্দোবস্ত করিবার ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীল দাস-গোস্বামী যখন রাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাহার মাত্র ১৬।১৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণে আসিয়া আরিট্ গ্রামের দুইটি ধান্যক্ষেত্রে এই রাধাকুণ্ডের ও শ্যামকুণ্ডের আবিষ্কার করেন। যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলা সম্বরণ করেন, তখন তাঁহার প্রপৌত্র বজ্রনাভ মথুরামণ্ডলের রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই তাঁহার মাতা শ্রীমতী উষা দেবীর ও মহর্ষি গালবের সাহায্যে ব্রজমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলার স্মারক যাবতীয় তীর্থাবলী রক্ষা করেন ও উপযুক্ত স্থানে যথাযোগ্য দেববিগ্রহ স্থাপন করেন। কিন্তু কালক্রমে মথুরাধামে জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ঘটায় এবং পরবর্ত্তী কালে মুসলমানগণের নিদারুণ অত্যাচারে মথুরামণ্ডল একরূপ জনহীন হইয়া পড়ায় বহু তীর্থ লোপ পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, শ্রীলোক-নাথ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীল সনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ ভট্ট-প্রমুখ ভক্তগণের চেষ্টায় ব্রজমণ্ডলের এই লুপ্ত তীর্থাবলীর উদ্ধার সাধিত হয় এবং বহু স্থানে দেবসেবা প্রবর্ত্তিত হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবই এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের ও শ্যামকুণ্ডের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখনও কুণ্ডদ্বয় অসংস্কৃত অরণ্যে পরিবেষ্টিত। শ্রীল রঘুনাথের হৃদয়ে কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারের বাসনা জাগিল। শ্রীভগবান্ কি নিষ্কিঞ্চন ভক্তের মনের বাসনা অপূর্ণ রাখিতে পারেন?

এক ধনী শেঠের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ছিল। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শ্রীবদ্রীনারায়ণজীর শ্রীপাদপদ্মে ঐ ঐশ্বর্য্যসম্ভার উৎসর্গ করিবার সংকল্প করিয়া তিনি শ্রীবদ্রীনারায়ণে গমন করেন। তিনি শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণকে বহু অর্থ ভেট দিবার বাসনা করিয়াছিলেন কিন্তু তীর্থে উপস্থিত হইবামাত্র বদ্রীনারায়ণ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলেন, "পরমবৈষ্ণব নিষ্কিঞ্চন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-কুণ্ডের তীরে বাস করিতেছেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড নামক তীর্থদ্বয় অসংস্কৃত দর্শন করিয়া উহার সংস্কারের বাসনা করিয়াছেন। তুমি অবিলম্বে এই অর্থ লইয়া তাঁহার নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে এই স্বপ্নের বিষয় বলিয়া এই অর্থের দ্বারা তাঁহাকে কুণ্ডদ্বয় সংস্কার করিতে বলিও।*"

যখন এই কুণ্ড সংস্কারের জন্য অর্থ আসে, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই শ্রীবৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য লীলায় সমাগত হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর কাল শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীল দাস-গোস্বামী ইঁহাদের স্নেহে, যত্নে ও সৌহৃদ্যে লালিত পালিত হইতেছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শেষ বয়সে শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মানসগঙ্গার তীরে, চক্রেশ্বর শিবের সন্নিকটস্থ বৈঠানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, শ্রীল দাস-গোস্বামী ঐ সময়ে প্রায়ই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গ-লাভে তৃপ্ত হইতেন। শ্রীরূপও অনেক সময় আসিয়া শ্রীল সনাতনের নিকট অবস্থান করিতেন এবং শ্রীদাস গোস্বামীও ঐ সুযোগে শ্রীরূপের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইতেন। তিনি পুরুষোত্তম ধাম হইতে আগমন করিয়াই শ্রীল সনাতনের নিকট শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে প্রথমে কিছু কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; তাহার পরেই তিনি শ্রীল সনাতনের ও শ্রীরূপের অনুমতি লইয়া শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের পাদমূলে শ্রীল রাধাকুণ্ড-তীরে আগমন করেন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিবার পরই শ্রীল সনাতন আসিয়া তাঁহার জন্য ভজন-কুটীর নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করিয়া যান। শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের জলে পাদস্পর্শ করাইতেন না। শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটে শ্রীল দাস গোস্বামীর জন্য একটি কূপ খনিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তিনি শ্রীগোবর্দ্ধনের উপর হইতে ভৃগুপাত করিবার সংকল্প করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেও শ্রীল সনাতনের ও শ্রীরূপের সংসর্গে এবং তাঁহাদের উপদেশে তাঁহার সে সংকল্প দূর হইয়াছিল এবং তিনি আর পাদস্পর্শ ভয়ে গিরিরাজে আরোহণ করেন নাই। কিন্তু ভক্তের হৃদয়ধন শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ নানা স্থলে গোবর্দ্ধনশীর্ষ হইতে অবতরণ

---

* ভক্তিরত্নাকর। প্রবাদ এইরূপ যে, সনাতন গোস্বামী দেখিতে পান—যাহাতে ব্যাঘ্র রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দিকে অগ্রসর না হয়—তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপবালকবেশে এক লগুড় হস্তে ব্যাঘ্রকে অন্য দিকে বিতাড়িত করেন। শ্রীল রঘুনাথকে রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এইরূপ কষ্ট পান, শ্রীল সনাতনের মুখে এই ঘটনা অবগত হইয়াই অগত্যা রঘুনাথ দাস-গোস্বামী কুটীরের মধ্যে বাস করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের বহু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। কারণ, শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের সময়ে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রকট দেহে থাকিলে শ্রীজীবের নামে কুণ্ডের জমি ক্রয় করা সম্ভবপর হইত না।

* ভক্তিরত্নাকর।

করিয়া শ্রীল দাস-গোস্বামি-প্রমুখ ভক্তগণকে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

বৈরাগ্যের প্রকট মূর্ত্তি শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীপুরীধামে পসারীর পরিত্যক্ত অন্ন ধুইয়া তাহার সারভাগ লবণ সহযোগে ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর ও শ্রীদাস গোস্বামীর যুবক পদকর্ত্তা শ্রীল রাধাবল্লভ দাস বলিতেছেন যে, দাস-গোস্বামী শ্রীল মহাপ্রভুর ও শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অদর্শনে অন্নাহার ত্যাগ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে আসিবার পর হইতে তিনি ফলমূল ও কিয়ৎপরিমাণ মাঠা ভক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। তাঁহার প্রিয় সেবক ও শেষ বয়সের সঙ্গী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও বলিতেছেন—

> "অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন।
> পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ।"
>
> শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি। ১০ম পরিচ্ছেদ

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া তিনি এই প্রকারে এতদপেক্ষা কঠোর নিয়মে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া ভক্তিরত্নাকরে উল্লেখ আছে *।

শ্রীল রাধাকুণ্ড সংস্কারের ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ঐ সময়ে শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালের সেবা কি ভাবে চলিতেছিল তাহা জানা প্রয়োজন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বপ্নাদেশে শ্রীবজ্রনাভের স্থাপিত শ্রীগোবর্দ্ধননাথ গোপালকে এক কুঞ্জ হইতে আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী শ্রীল গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময়ে গোপালজীর ছোট একটি মন্দির ছিল। গোপালজীর প্রতিষ্ঠার কিছু কাল পরেই শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী পশ্চিমের লোককে "মূঢ় ও অনাচারী" দেখিয়া গৌড় হইতে তীর্থ দর্শনে আগত দুই জন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে গোপালজীর সেবার ভার দিয়া গোপালজীর স্বপ্নাদেশে তাঁহার জন্য চন্দন আনয়ন করিতে শ্রীপুরীধামে গমন করেন এবং উহার পরে আর তিনি ফিরিয়া আসেন নাই। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিবার কয়েক বৎসর পরে শ্রীবল্লভাচার্য্য শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন এবং গোবর্দ্ধনে গোবর্দ্ধননাথ গোপালকে দেখিয়া তাঁহার পদে আত্মসমর্পণ করেন এবং সেবার সৌষ্ঠবাদি বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন। কিছু দিন পরে আম্বালার পূর্ণমল্ল নামক এক জন ক্ষত্রিয় ভক্ত বহু অর্থব্যয় করিয়া গোপালের জন্য এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ১৪২২ শতাব্দের বৈশাখ মাসে এই মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ১৪৪২ শকাব্দের বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে এই মন্দিরে শ্রীগোপাল স্থাপিত হন। প্রবাদ এইরূপ যে, গোবর্দ্ধননাথ নিজেই পূর্ণমল্লের গৃহে গমন করিয়া তাহাকে স্বপ্নাদেশ দান করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতে বলেন এবং ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণকর্ত্তা মিস্ত্রী হীরামণকেও স্বপ্নে এই মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দান করেন। এই মন্দিরে গোপালজী প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দশ বৎসর পরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের তিরোভাব হয়, এবং ১৪৫৫ শকাব্দে যখন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পুরীধাম ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন, তখন শ্রীবল্লভাচার্য্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীল বিঠ্ঠলনাথজীই শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপালজীর সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন *। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া যখন শ্রীগোবর্দ্ধনকে শ্রীহরি-তনুজ্ঞানে গোবর্দ্ধন আরোহণ পরিত্যাগ করিলেন, তখন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আর পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিতেন না। কিন্তু বল্লভাচার্য্যের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের ঐ বাধা ছিল না—সুতরাং শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের অধিনায়কতায় তাঁহারাই গোবর্দ্ধননাথজীর সেবা-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। শ্রীল বল্লভাচার্য্যজী মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। আমাদের বিশ্বাস, তিনি সুবোধিনী গীতা রচনা শেষ করিবার পরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতজীর নিকট হইতে কিশোর-গোপালের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া পুষ্টিমার্গের প্রচার করেন। এই হইতেই বল্লভাচার্য্যজীর তিলক শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের পরিবারের তিলকের আকার ধারণ করে। এখনও শ্রীল বল্লভাচার্য্যজীর শেষ বয়সের শিষ্য ও পুত্রস্থানীয় শ্রীউজ্জ্বলঘরিয়া গোস্বামীর পরিবারের তিলক এই জন্যই শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পরিবারের তিলকের সদৃশ। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে কথিত ইতিহাস বিশেষ প্রামাণিক। যাহা হউক, যখন শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন এই আদর্শ-ভক্তকে পরম প্রেমিক শ্রীল বিঠ্ঠলেশ্বর বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন। ভক্তিরত্নাকরে এ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান কালে একদা শ্রীল দাস-গোস্বামী অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী দুই জন বিচক্ষণ কবিরাজকে লইয়া শ্রীল দাস-গোস্বামীকে দেখিতে আসেন। সে কালের কবিরাজী চিকিৎসকগণের অতি সুন্দররূপ নাড়ীজ্ঞান ছিল। তাঁহারা দাস-গোস্বামীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যে কোনও গোদুগ্ধজাত গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে শ্রীমদ্দাস-গোস্বামীর এই অজীর্ণ দেখা দিয়াছে। দাস-গোস্বামী মাত্র ২।৩ পল মাঠা ভক্ষণ করিতেন, তাঁহার মত সংযমী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের পক্ষে গুরুপাক গব্যদ্রব্য ভোজনের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ঐ স্থানে সমাগত ভক্তগণের কবিরাজের কথায় সন্দেহ হইল। তখন শ্রীল দাস-গোস্বামী নিজেই কহিলেন যে—চিকিৎসকেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ,—তিনি মানসসেবায় পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দকে ভোগ নিবেদন করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহার অজীর্ণ

---

* ভক্তিরত্নাকরে আছে, পথে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ও শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাবের পর শ্রীল দাস-গোস্বামী মাঠা খাওয়াও ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না।

* পরবর্ত্তী সময়ে বল্লভ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে যে হিন্দী গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত গোবর্দ্ধননাথজীর সম্বন্ধ সযত্নে মুছিয়া ফেলিয়া গোপাল আবিষ্কারের অন্য উপাখ্যানের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শ্রীল বল্লভাচার্য্যজী ও শ্রীবিঠ্ঠলনাথজী শ্রীচৈতন্যদেবকে ও তৎসম্প্রদায়ের ছয় গোস্বামীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের তিরোভাবের পরেই এই সকল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

হইয়াছে। এইরূপে লোকোত্তর-চরিত্রসম্পন্ন মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে সাধারণ শারীরিক নিয়ম ও স্বাস্থ্যবিধি প্রযোজ্য নহে।

যাহা হউক, শ্রীল বিঠ্ঠলনাথ পরম ভক্ত ছিলেন এবং তিনি গোবর্দ্ধনের সন্নিহিত পাঁচুনিগ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন *। শ্রীবিঠ্ঠলনাথ শ্রীল দাস-গোস্বামীর ও শ্রীজীব গোস্বামীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীল দাস-গোস্বামী শ্রীগোপালরাজস্তোত্রে শ্রীবিঠ্ঠলনাথ যে পরম প্রেমভরে শ্রীগোপালজীর সেবা করিতেন—একাধিক স্থলে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যখন শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোধান হইল, তখন শ্রীজীব গোস্বামি-প্রমুখ শ্রীবৃন্দাবনের নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল দাস-গোস্বামীর আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক পরামর্শ করিয়া শ্রীল বিঠ্ঠলনাথের হস্তেই শ্রীগোপালজীর সেবার সমস্ত ভার অর্পণ করেন। যথা—

"শ্রীমদ্দাস গোস্বামী আদি পরামর্শ করি।
শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী।"

ভঃ রঃ ২১৩ পৃঃ।

পরমভাগবত শ্রীল দাস-গোস্বামী এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডে যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন—তখন তিনি বিনয়ের পরাকাষ্ঠায় ও ভজনের আদর্শে সর্ব্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবমাত্রের পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ও বল্লভ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণই প্রধানতঃ শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজ করিলেও সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার অপেক্ষা প্রকৃত বৈষ্ণবতার দিকেই বৈষ্ণবপ্রধানগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। নিম্বার্ক সম্প্রদায়, বল্লভ সম্প্রদায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন অতীব সুদৃঢ় ছিল। বিশেষতঃ, সর্ব্বত্যাগী বিনয়ের অবতার শ্রীরূপ-সনাতন-প্রমুখ গোস্বামিগণের মনোরম ব্যবহারে সকলেই তাঁহাদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই সময়ে শ্রীরূপ-সনাতনের তিরোভাবের পরেই শ্রীল দাস-গোস্বামীর উপর যখন কার্য্যতঃ শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবের নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হইল—তখনই শ্রীল দাস-গোস্বামীর মনে শ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীবদরীনারায়ণের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শেঠজী বহু অর্থ লইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিলেন। নিরন্তর অন্তর্দ্দশায় ভজনপরায়ণ দাস-গোস্বামীর অবসর সময়ে শেঠজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। তখনই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীল রাধাকুণ্ডে আগমন করিয়া শ্রীবিঠ্ঠলেশ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড সংস্কারের কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিনি সর্ব্বপ্রথমে আরিট্ গ্রামের যে যে কৃষক শ্রীল রাধাকুণ্ডের ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের ভূমি নিজ নিজ স্বত্বে দখলিকার আছে বলিয়া দাবী জানাইল, তাহাদিগের সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া ক্ষতিপূরণের জন্য যথেষ্ট অর্থদান করিয়া ঐ স্থানের ভূমি ক্রয় করিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, নিষ্কিঞ্চন দাস-গোস্বামী নিজ নামে এই ক্রয়ের দলিল করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না—তখন শ্রীজীব গোস্বামী নিজ নামে এই স্থানের দলিল করাইয়া লইলেন। তখনকার রাজদ্বারে প্রচলিত উর্দ্দু ভাষাতেই এই সমস্ত দলিল লিখিত হইয়াছিল। শ্রীশ্যামকুণ্ডের ও শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বত্ব লইয়া প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে মথুরার আদালতে আভাগড়ের মহারাজের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যে মোকর্দ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে এই সমস্ত দলিল নিত্যধামগত শ্রীল কৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজীর ও ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ বি, এ, মহাশয়ের চেষ্টায় দাখিল হইয়াছিল।

শ্রীজীব গোস্বামী ব্রজবাসিগণের সমবেত চেষ্টায় ও শ্রীবিঠ্ঠলনাথ-প্রমুখ স্থানীয় বৈষ্ণবগণের সহযোগিতায় যখন শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড খনন করেন, তখন শ্রীশ্যামকুণ্ডের অভ্যন্তরস্থ বজ্রনাথকুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়া কুণ্ডদ্বয়ের স্থান-নির্ণয় যে অভ্রান্ত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। কথিত আছে, স্থানীয় খনকগণ যখন শ্রীশ্যামকুণ্ড চতুষ্কোণাকারে খনন করিতে যাইতেছিল, তখন পাঁচটি সুবৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষ স্বপ্নযোগে শ্রীল দাস-গোস্বামীর সহিত রাত্রিকালে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা পঞ্চপাণ্ডব—বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া বহু দিন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন—তাঁহাদিগকে ছেদন করিয়া যেন তাঁহাদিগের শ্রীবৃন্দাবন-বাস বন্ধ না করা হয়। স্বপ্নে এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া শ্রীল দাস-গোস্বামী খননকারিগণকে এই প্রাচীন বৃক্ষগুলি ছেদন করিতে নিষেধ করেন, এই জন্য শ্যামকুণ্ড চতুষ্কোণ হইতে পারিল না। তদবধি শ্যামকুণ্ডের তীরে এই পঞ্চবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে।

চিরকাল-নিয়মানুগত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়াও তাঁহার ভজনের নিয়ম বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র শিথিল করেন নাই। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য তাঁহার এই নিয়মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"সহস্র দণ্ডবৎ করেন লয়ে লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম।
রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন।
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে পতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান।
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহো নহে কোন দিনে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১০ম অধ্যায়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই ভাবে স্বীয় গুরুর নিত্য-কৃত্যের পরিচয় প্রদান করিয়া হৃদয়ের পরিপূর্ণ আবেগে আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন—

"তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।"

শ্রীল দাস-গোস্বামী এই প্রকারে প্রতিদিন লক্ষ নাম জপ করিতেন এবং প্রতিবার অষ্টোত্তরশত নাম-জপের অবসানে একবার করিয়া দণ্ডবৎ করিতেন, এই ভাবে সহস্র দণ্ডবৎ করা হইত। তিনি, শাস্ত্রের লিখিত, দৃষ্ট, শ্রুত প্রায় দুই সহস্র বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ প্রণাম করিতেন। দিবারাত্রির অষ্ট-প্রহরে তিনি প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণসখিগণ সঙ্গে থাকিয়া যে লীলা করিতেন, ধ্যানে তাহার চিন্তা

* ভক্তিরত্নাকর।

করিয়া নিজ মানসিক সিদ্ধদেহে তাঁহাদের সেবা করিতেন। শ্রীপুরুষোত্তমে পার্ষদগণবেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের যে যে লীলা তিনি দর্শন করিয়াছেন—শ্রবণেচ্ছু ভক্তদিগের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন অথবা শ্রবণ করিবার লোক না থাকিলে মনে মনে তাহা এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডের জলে পাদস্পর্শ না করাইয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় তিন বার শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিতেন। ব্রজবাসী বৈষ্ণব দর্শন করিলেই তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনাদির দ্বারা সেবা ও তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য মর্য্যাদাদান করিতেন। দিবসের অষ্ট প্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহর তিনি এই প্রকার ভক্তিসাধনে রত থাকিয়া চারি দণ্ড কাল মাত্র নিদ্রা যাইতেন, তাহার মধ্যেও স্বপ্নাবস্থায় মানসসেবায় সংস্কারানুযায়ী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা দর্শন করিতেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর তিরোভাবের পরে গৌড়, বঙ্গ, উৎকল হইতে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর নামে যাঁহারা উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, সেই তিনটি যুবক শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যখন ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করেন, তখন তাঁহারা শ্রীল দাস-গোস্বামীকে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করিয়া দর্শন করিয়া যাইতেন। এই তিন জনের মধ্যে দুঃখী কৃষ্ণদাস (উত্তরকালে যিনি শ্যামানন্দ ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ হন) আগে শ্রীবৃন্দাবনে না আসিয়া আগেই শ্রীরাধাকুণ্ডে যাইয়া শ্রীল দাস-গোস্বামীর চরণে যাইয়া শরণ গ্রহণ করেন; শ্রীল দাস-গোস্বামী অধ্যয়ন ও ভজনাদি শিক্ষার জন্য তাঁহাকে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করেন। যখন এই তিন জনে অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন শ্রীজীবাদি গোস্বামিগণ বহু গোস্বামি-গ্রন্থ ও বৈষ্ণব-গ্রন্থ ইঁহাদিগের সহিত গৌড়ে প্রেরণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় গোস্বামিগণ ও বৈষ্ণবগণ শ্রীজীবের আহ্বানে শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে সমবেত হইয়া ইঁহাদিগকে বিদায় দান করেন। শ্রীল দাস-গোস্বামীর তখন শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত আসিবার সাধ্য নাই, এই জন্য তিনি প্রিয়শিষ্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজকে শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে প্রেরণ করিয়া ইঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ জানান। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সময় নিয়ত শ্রীদাস গোস্বামীর নিকট বাস করিতেন এবং তাঁহারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবন যাতায়াত করিতেন। 'প্রেমবিলাস' নামক একখানি অনৈতিহাসিক বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বির যখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিত গ্রন্থরাজি লুণ্ঠন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মনের দুঃখে শ্রীরাধাকুণ্ডে পতিত হন এবং অচেতন অবস্থায় সে স্থান হইতে ইঁহাকে উঠাইলে তিনি শ্রীদাস গোস্বামীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণ উৎক্রামণ করেন। কিন্তু এই উপাখ্যান আদৌ প্রমাণসহ নহে। কারণ, বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বিরের রাজসভায় অপহৃত গ্রন্থরাজির সন্ধানে যখন শ্রীনিবাস আচার্য্য উপস্থিত হন, তখন তাঁহার শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং ভক্তি-প্রভাব দর্শন করিয়া বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বির তাঁহার পুরোহিত ব্যাস আচার্য্যের সহিত সস্ত্রীক শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গ্রন্থরাজি প্রত্যর্পণ করেন। ইহার কিছু পরেই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়ে খেতুরীতে মহোৎসব সম্পন্ন করেন। এই মহামহোৎসবে তৎকালীন বৈষ্ণব-প্রধানগণের সহিত শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীল জাহ্নবা দেবীও উপস্থিত হন। তিনি খেতুরীর উৎসবের কিছু পরেই শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। তিনি সপরিকরে মথুরা পর্য্যন্ত আসিলে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রমুখ তাৎকালিক বৈষ্ণব-প্রধানগণ মথুরায় গমন করিয়া শ্রীল জাহ্নবা দেবীকে সঙ্গে লইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে আসেন। ভক্তিরত্নাকরে এই সময়ে স্পষ্ট ভাবেই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নাম দেখা যায়, ইহার পরেও শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীল বীরচন্দ্র গোস্বামী যখন শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন, তখনও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকে তাঁহার সঙ্গিরূপে দেখিতে পাওয়া যায় *। অধিক কি, শ্রীজীব গোস্বামীর পত্রাবলী সমস্তই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র শ্রীল বৃন্দাবন আচার্য্যের জন্মের পরে লিখিত। ঐ পত্রের মধ্যেও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ-প্রমুখ বৈষ্ণবগণকে লিখিত চতুর্থ পত্রে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উল্লেখ আছে †। সুতরাং প্রেম-বিলাসের ত্রয়োদশ বিলাসে বর্ণিত শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামীর গ্রন্থরাজির সংবাদ শ্রবণে শ্রীরাধাকুণ্ডে পতিত হইয়া "মুদিত নয়নে প্রাণ নিষ্ক্রামণের" কথা নিতান্তই অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক। "কর্ণানন্দ" নামক একখানি নাতিপ্রামাণিক গ্রন্থেও এই ব্যাপারের প্রতিবাদ পরিদৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)

---

* শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী
"গোবর্দ্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে।
তথা হইতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা।
—ভক্তিরত্নাকর, ত্রয়োদশ তরঙ্গ, ১০২২ পৃষ্ঠা।

† এই পত্রখানি প্রেম-বিলাসে ও (যশোদানন্দ তালুকদারের সংস্করণ) চতুর্ব্বিংশ বিলাসের পর অর্দ্ধবিলাসে ষষ্ঠ পত্ররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে আছে—"ইহ কৃষ্ণদাসস্য নমস্কারা ইতি।" শ্রীপ্রেমবিলাসে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে—"এখানে শ্রীকৃষ্ণদাস, কবিরাজ নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ।"

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

২১

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি তা হলে ফোন করো কল্পনা! ছাখো, পারুল যদি এখন আসতে পারে।

কল্পনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোস্বামী সাহেব এতক্ষণ নীরব ছিলেন। এখন পত্নীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—কল্পনা কাকে ফোন করবে লীলা?

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন, কথাগুলো কি এতক্ষণ শুনছিলে না?

—শুনছিলুম! তবে তোমার ব্যবস্থায় হাত দেওয়া উচিত নয় ভেবে নীরব শ্রোতা হয়েছিলুম।

হাসিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—হঠাৎ তা হলে এখন বক্তা হয়ে উঠলে যে!

গোস্বামী কহিলেন,—মহাভারতের উপদেশ মনে পড়লো।

গ্যাংলি রঙ্গ করিয়া কহিল,—গোস্বামী এতক্ষণ ধরে অষ্টাদশ পর্ব্ব হাতড়াচ্ছিলে না কি?

—হ্যাঁ, বামুনের ছেলে! ধড়া-চুড়োয় যতই সাহেব সাজি, ভিতরে রক্তের পোকাগুলো মাঝে-মাঝে বন্ বন্ করে ওঠে।

বাক্‌চি হাসিয়া কহিলেন,—তা সত্যি! কিন্তু হঠাৎ সে পোকা-গুলো এমন সময়ে মাথা নাড়া দিলে কেন?

গোস্বামী সাহেব মাথা নাড়িলেন। কহিলেন,—ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। বিচারকের কাছে গজ্‌গজ করা পেশা—নীরবতা তাই হঠাৎ কেমন বিঁধলো। মনে পড়ে গেল, মহাভারতের অনুশাসন।

মিসেস্ গোস্বামী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর পানে তাকাইলেন, কহিলেন,—সে অনুশাসনটা কি, শুনি।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—সভায় উপস্থিত থাকলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়, না হলে পতিত হবো।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কোথায় কি অন্যায় পেলে?

ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—একটু যেন পাচ্ছি মনে হচ্ছে!

সকলেই উদ্‌গ্রীব নেত্রে গোস্বামীর পানে চাহিল।

অমিয়, অনিল মনে মনে শঙ্কিত হইল। মা নিজের মত বাহাল রাখিতে কতখানি দৃঢ়, ভালরূপেই তাহা তাহারা জানে।

মৃদু হাস্যে কোমল কণ্ঠে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—সে অপ্রিয় আলোচনা বাদ দাও না, লীলা! আমি বলি, তোমার সিলেকসন কখনো ভুল হয় না। তুমি যাকে যে ভূমিকা দিয়েছো, তার যেন অদল-বদল না হয়! তাতে যে যেমন্ পারে!

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ভালো যুক্তি! কিন্তু গোল বাধবে ওইখানে, যারা নিমন্ত্রণ পেয়ে দেখতে আসবে। তারা জানবে, আমার পরিচালনায় এ নাটক অভিনয় হচ্ছে—কাজেই তার দোষ-গুণের জন্য আমাকেই তারা দায়ী করবে।

হাসিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—করুক না, এ তো একটা উৎসব! এখানে শুধু আনন্দের পরিমাপ-বিচার।

অবাক্ হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অভিনয়টা ফেলিয়োর হবে?

সহাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—এতগুলো শিল্পীর সাফল্য, তোমার এতখানি উৎসাহ, চেষ্টা—এ সব একটি মানুষের জন্য ফেল্ হতে পারে না। আমি বলি, রত্নাকে তুমি নিজের হাতে যে পার্ট দিয়েছো, তার বদল না করাই ভালো।

মিসেস্ গোস্বামী মনে মনে বিরক্তি বোধ করিলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া শান্ত স্বরেই তিনি বলিলেন—তোমার কথা রাখতে পারলে খুশী হতুম। কিন্তু এত বড় একটা ভূমিকা এমন এক জন আনাড়ীর হাতে দিয়ে মাটী করতে পারি না।

পত্নীর মনের দৃঢ়তা গোস্বামী বুঝিলেন। তথাপি ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না; অনুরোধের কণ্ঠে কহিলেন,—আজ না পারলেও সে দিন যে পারবে না, তার মানে নেই।

অসহিষ্ণু স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি বুঝছো না! পাঁচ জনকে দেখলে রত্না ভেবড়ে যাবে। যাওয়া স্বাভাবিক।

গোস্বামী হাসিলেন। কহিলেন,—সে সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম। তুমি দেখো, রত্না উর্ব্বশীর ভূমিকা সে দিন ভালোই করবে লীলা।

মিসেস্ গোস্বামী নীরব রহিলেন।

নিজের আসনে বসিয়া কল্পনা কহিল,—মাসিমা আমিও বলি, সেই ভালো।

গোস্বামী সাহেব কল্পনার দিকে চাহিলেন। কহিলেন,—আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল তো কল্পনা! বলিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—রত্না কোথা গেল?

মিসেস্ গোস্বামী রত্নার শূন্য আসনের দিকে চাহিলেন, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল।

বিস্মিত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্না কখন্ উঠে গেল?

কল্পনা উত্তর দিল,—সে তো বসেনি! তার নাচ শেষ হতেই সে চলে গেছে।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখে রোষের রক্ত আভা ফুটিল। নীরস কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—আমায় না জানিয়ে চলে গেল!

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—বোধ হয় তোমার অনুমতি নেবার মত শরীর তার ছিল না। পাছে তুমি ভাবো, তাই নিঃশব্দে চলে গেছে! তার মুখ আজ ভারী শুকনো দেখাচ্ছিল।

মিসেস্ গোস্বামী স্বামীর এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কোন জবাব না দিয়া শুধু কহিলেন,—কল্পনা তুমি পারুলকেই আনবে—সে উর্ব্বশী সাজবে।

—তা হতে পারে না লীলা! গোস্বামী সাহেবের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

সচকিত হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কেন হতে পারে না?

—এটুকু তুমি ভুলে যাচ্ছ, সেটা আমার জন্মদিন!

হতভম্বের মত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তাতে কি হয়েছে?

মৃদু হাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তুমি এত বড় উৎসবের আয়োজন কচ্ছ আমায় তৃপ্তি দিতে, আনন্দ দিতে। যাকে কেন্দ্র করে এই নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করলে, আজ তাকে বাদ দিলে লক্ষ্যচ্যুত হবে।

অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিবাদের মত মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—কিন্তু—

গোস্বামী কহিলেন,—না লীলা, কিন্তু নয়! আমার জন্মদিনে আমি প্রত্যেককে আনন্দ দিতে চাই! সে আনন্দে কেউ যেন না বাদ পড়ে। তা ছাড়া ফেলে-আসা একটা দিনকে স্মরণ করেই না এই উৎসব! কাজেই রত্নাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলে না।

অধীর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—বাদ তো তাকে দিচ্ছি না।

দৃঢ় স্বরে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—বাদ দেবার কথা হচ্ছে না! রত্নাকে তুমি যে ভূমিকা দিয়েছিলে, তার বদল হবে না। রত্নাকে ক্ষুণ্ণ করার অর্থ আমার জন্মদিনে আমাকে ক্ষুণ্ণ করা। কারণ, রত্নাকে আমি সব চেয়ে বেশী ভালোবাসি। সকলের চাইতে সে আমার স্নেহের পাত্রী!

একটা অতি সামান্য উত্তরও কাহারও মুখে ফুটিল না।

মিসেস্ গোস্বামী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

২২

পরাভবের ধিক্কার, লজ্জা ও গ্লানি মাখিয়া রত্না যখন হল-ঘর ছাড়িয়া আসিল—তাহার কর্ণে শুধু এইটুকু পশিল, মিসেস্ গোস্বামী কহিতেছেন,—ভূমিকা বদলানো চাই! তাঁহার স্বর বেশ তপ্ত!

বাকী কথাগুলো রত্না দাঁড়াইয়া আর শুনিতে পারিল না। দ্রুত-পদে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। পথে পড়িল গোস্বামি-গৃহের প্রধানা পরিচারিকা মঙ্গলা।

তাহাকে দেখিয়া রত্না কহিল,—মঙ্গলা-দি, মাসিমাকে বলো, আজ আমি কিছু খাবো না।

মঙ্গলা ভদ্র-ঘরের বিধবা। গোস্বামি-প্রাসাদের গৃহিণীপণা, সকলকার আহারের পরিচর্য্যার ভার তাহার উপর।

মঙ্গলা কহিল,—কিছু খাবে না। একটু দুধ-মিষ্টি বা কিছু ফল?

শ্রান্ত কণ্ঠে রত্না কহিল,—না, আমার বড্ড মাথা ধরেছে। কিছুই খাবো না।

নিজের ঘরে পা দিয়া রত্না কপাট বন্ধ করিয়া জুতা-মোজা খুলিয়া আলো নিবাইয়া একেবারে বিছানায় গিয়া এলাইয়া পড়িল।

একটা নিশ্বাস পড়িল। যাক্, আজিকার মত অব্যাহতি! গোস্বামি-গৃহে খাইবার অনিচ্ছা জানাইয়া দিলে আহারের আর তাগিদ আসে না! এবং অভুক্ত থাকার জন্য কৈফিয়ৎ লইতেও কেহ ছুটিয়া আসে না। একটু বিশ্রাম ও বিরাম পাওয়া যায়।

কিন্তু এখন আহারে বিতৃষ্ণা লইয়া বালিশে মাথা রাখিতেই দপ্ করিয়া নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়িল। সেখানে কোন মান-অভিমান লইয়া দু'দণ্ড উপবাসী থাকিলে মায়ের আহারের তাগিদ, জিদ, জবরদস্তি যেন উৎপাতের মত অস্থির করিয়া অনশন-সঙ্কল্পকে ভাঙিয়া দিত।

বাড়ীর কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রত্নার মনে পড়িল—মা তাহাকে বাড়ী যাইতে কত করিয়া লিখিয়াছিল। মায়ের আহ্বানকে রত্না উপেক্ষা করিয়াছে গোস্বামি-গৃহের তীব্রতম আকর্ষণে! মন ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু অন্তরে সে জন্য অনুতাপ জাগিল না। সমস্ত চিন্তাকে সরাইয়া ঠেলিয়া মিসেস্ গোস্বামীর সেই অন্ধকার মুখ রত্নার মানস-দৃষ্টিতে ভাসিতে লাগিল। ইহা লইয়া মিসেস্ গোস্বামীকে অভিযুক্ত করিতেও মন পরাঙ্মুখ হইতেছিল। মন বলিতেছিল, তিনি যে রত্নার উপর অনেকখানি আশা রাখিয়াছিলেন। আশা-ভঙ্গের মনঃ-পীড়া ক্ষুব্ধ অন্তরে ক্রোধের সঞ্চার করে; সেই জন্যই মিসেস্ গোস্বামীর আচরণ রত্নার অন্তরে তেমন ক্লেশ দিতে পারিতেছিল না। শুধু ঐ কল্পনার জন্য মর্ম্ম-দাহ হইতেছিল, সমস্ত মন যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছিল।

কল্পনা যখন দেবেন্দ্রাণী সাজিয়া অনিলের পাশে বসিল, মন তখন পীড়া অনুভব করিলেও, এমন করিয়া জ্বলিয়া ওঠে নাই! কিন্তু অমিয় যে মুহূর্ত্তে কল্পনার বাঁয়ে বসিল, সে দুঃসহ দৃশ্যে রত্নার বুক যেন হু-হু করিয়া উঠিয়াছে!

দূরে বসিয়া রত্না তাহাদের এতটুকু কথা শুনিতে পায় নাই। কিন্তু অমিয়র মুখের মৃদু হাসি ও কল্পনার সেই ক্ষণে-ক্ষণে আরক্ত মুখ রত্নার মনে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল!

রত্না স্থির নেত্রে দু'জনের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। এবং দুর্জ্জয় আগ্নেয়গিরি যেমন অন্তরে কালান্তক অনল-প্রবাহকে ভরিয়া বাহিরে শান্ত মূর্ত্তি ধরিয়া থাকে, তেমনি বহু আয়াসে সে নিজেকে শান্ত রাখিয়াছিল। এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ায় হৃত-সর্ব্বস্বের দীনতা লইয়া নত-শিরে সে অভিনয়-স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

রত্নার মাথার মধ্যে দপ দপ্ করিতেছিল। দুই হাতে রগ চাপিয়া নিদ্রার চেষ্টায় সে চক্ষু মুদিল। কিন্তু নিমীলিত নেত্রের দুই পাশ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল অশ্রু-প্রবাহ। মনকে নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। এ নিষ্ফল কান্নায় কেন নিজেকে অপমানিত করা! কিন্তু ক্রন্দন কিছুতেই নিষেধ মানিল না, উৎসের মত ঝরিতে লাগিল।

ঘড়ির বাজনায় অনেকক্ষণ পরে রত্না চক্ষু মুদিল। মধ্য-রাত্রি। গোস্বামি-প্রাসাদ নিস্তব্ধ। রত্না বুঝিল, আগন্তুকের দল গৃহে ফিরিয়াছে।

দৃষ্টির বাহিরে যাহা অতীন্দ্রিয়, রত্নার দৃষ্টিপথে তাহাই যেন ভাসিতে লাগিল! মানস-চক্ষে সে দেখিল,—কল্পনার আনন্দ-দীপ্ত মুখ! তাহার সাফল্যে পুলকিত অমিয় নিজে তাহাকে মোটরে তুলিয়া দিবার জন্য আসন ত্যাগ করিল। প্রত্যেকের সপ্রশংস দৃষ্টি কল্পনার উপর ন্যস্ত! বিদায়-সম্ভাষণে মিসেস্ গোস্বামী আহ্লাদের সহিত তাহার গাল দু'টি টিপিয়া দিলেন! 'মা' বলিয়া একটু আদর করিলেন। কল্পনার দুই গাল পাকা আপেলের মত রাঙা হইল, অমিয়র মুগ্ধ দৃষ্টি সেইখানে নিবদ্ধ! উঃ! বলিয়া রত্না পাশ ফিরিল।

রত্না ঠিক করিল,—কাল সকালে মিসেস্ গোস্বামীকে সে জানাইয়া দিবে, উর্ব্বশীর ভূমিকা অভিনয় করিবার সামর্থ্য তার নাই! কল্পনা যেখানে রাণী, অভিসারিকার মত রত্না সেখানে দাঁড়াইতে পারিবে না।

মনে হইল, তাহার জীবনটা মিথ্যা! সকলে তাহার রূপের যে এত প্রশংসা করে, সে রূপ মিথ্যা। উজ্জ্বল রবি-কিরণের মত এই রূপ শুধু তাহাকে দগ্ধ করিবে! স্নিগ্ধ শরৎ-কৌমুদীর মত কোনো দিন মনে প্রীতি বা আরাম দিবে না!

রত্না ভাবিল, কেন এমন হইল? চোখে আঙুল দিয়া মন বলিল, সামাজিক মর্য্যাদা! মিসেস্ গোস্বামী কল্পনার পরিচয় দিতে নিজেই যে গৌরবে দুলিয়া ওঠেন। কল্পনা যে সেই নিমেষের জন্য তাহার পানে চাহিয়াছিল, সে দৃষ্টিতে কি করুণাই না মাখানো ছিল। গোস্বামী সাহেবের সস্নেহ আহ্বানে যখন সকলের সামনে আসিল, তখন সকলের বিস্মিত দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন জাগিল, মিসেস্ গোস্বামী এই বলিয়া তাহার উত্তর দিলেন,—ও আমাদের একটি মেয়ে—বাস্তবিক, এই পদগৌরবশালীদের সামনে কোন অখ্যাত গ্রামের এক মাষ্টারের মেয়ে বলিতে গৌরবের কি আছে? সে পরিচয় দিলে সভ্য সম্প্রদায়ের কাছে রত্নাকে যেন খর্ব্ব করা হইত!

২৩

এমনি মর্ম্মান্তিক বেদনায় নিদ্রাহীন চক্ষে রত্না যখন বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল, ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে জর্জ্জরিত হইতেছিল, সেই সময়ে অন্য এক প্রাসাদের সুরম্য প্রকোষ্ঠে আর একটি তরুণীও জটিল সমস্যা লইয়া বিনিদ্র নেত্রে নিজের শয্যায় জাগিয়াছিল,—সে কল্পনা।

কল্পনা যখন বাড়ী ফিরিল, উল্লাসে তাহার মন তখন পরিপূর্ণ।

দাদার ঘরে ঢুকিয়া দাদা ও বৌদিকে সম্ভাষণ করিয়া উৎসাহিত কণ্ঠে কল্পনা বলিল,—তোমরা যাচ্ছ তো পরশু?

সুশীল এবং ইভা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—নিশ্চয়।

সুশীল কহিল,—আজ তোদের ফুল রিহার্শাল ছিল তো!

কল্পনা কহিল,—হ্যাঁ, দিয়ে এলুম।

ইভা তাহার সস্মিত মুখের পানে চাহিয়া কহিল,—তোমার পার্ট বুঝি খুব সুন্দর হয়েছে?

হাসিতে হাসিতে কল্পনা কহিল,—হ্যাঁ, সকলের চেয়ে ভালো। তোমরা তো যাচ্ছ, দেখতেই পাবে। পারুলদিরও বোধ হয় ওখানে ডাক পড়বে।

সুশীল কহিল—পারুলকে কেন?

—উর্ব্বশী সাজবার জন্য। উর্ব্বশী নিয়ে মিসেস্ গোস্বামী ভারী বিপদে পড়েছেন। যেন সাপের ছুঁচো-গেলা! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ইভা কহিল,—কি রকম? উর্ব্বশীর অসুখ করলো না কি? তোমার দাদার তা হলে থিয়েটার দেখা মাটী! উর্ব্বশীর নামে উনি একেবারে পাগল।

মুখ বিকৃত করিয়া কল্পনা কহিল,—অসুখ না হাতী! সে একটা পাড়াগেঁয়ে জংলী, বুঝলে কি না বৌদি!

ইভা গালে হাত দিল। কহিল,—অবাক্ করলে! বলো কি? এমন রূপসীকে কেউ উর্ব্বশীর পার্ট সিলেক্ট করে! এরা পাগল না কি?

উৎসাহিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—বলে কে, বলো! আজ তেমনি জব্দ।

বিমূঢ় কণ্ঠে সুশীল কহিল,—সে কি রে! উর্ব্বশী জংলী কি রকম?

—চেহারাতে বলছি কি! তা নয়। জংলী চাল-চলনে! রীতিমত বুনো! সেই যে বৌদি রত্না, আমাদের বোর্ডিংএ থাকতো, তোমায় গল্প বলতুম।

ইভা মাথা নাড়িল! কহিল,—ওঃ! বুঝেছি। তাই বলো, তা সে তো খুব সুন্দরী!

তাচ্ছল্য-সহকারে কল্পনা কহিল,—রংটা একটু কটা বটে!

সুশীল কহিল—তোদের উর্ব্বশী শুধু গায়ের রংএ কি রে, সব দিকেই তো পরমা সুন্দরী!

অবজ্ঞাভরে কল্পনা কহিল,—কে জানে বাপু, তোমরা সব কি চোখে তাকে দেখেছো! আমি তো এমন কিছু দেখি না। তবে হ্যাঁ, মুখখানা মন্দ নয়!

সুশীল হাসিল। কহিল,—মেয়েরা কখনও অন্য মেয়েকে সুন্দরী দেখে না। হাঁ রে, অমিয় তো তাকে বিয়ে করবে?

ইভা হাসিয়া কহিল,—'দুষ্মন্ত-শকুন্তলা' বলো।

দু'চোখ কপালে তুলিয়া কল্পনা কহিল,—কি যে বলো বৌদি! ঐ জংলী পাড়াগেঁয়ের সঙ্গে! এ তোমরা ভাবতে পারো?

সুশীল কহিল,—আমাদের ভাবতে কিছু হবে না! যিনি ভাববার, তিনিই ভাবে বিভোর।

ইভা কহিল,—তোর কথাই ধরি—আপত্তি কিসের?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—আপত্তি! বলি, মত কে দিলে? মাসিমা আগে রত্নার নামে গলে যেতেন! এ ক'দিন দেখছি যেন চটে আছেন! তবে খুব চাপা কি না উনি। আমাদের চোখে এড়ায় না কিছু!

সুশীল প্রশ্ন করিল,—চটে আছেন কেন?

কল্পনা হাসিয়া দাদার খাটের উপর বসিল! কহিল—একটা কথা আছে না—নাই দিলে কারা মাথায় ওঠে!

আশ্চর্য্য হইয়া সুশীল কহিল,—অর্থাৎ? সে-দিন তো মিসেস্ গোস্বামী আমাদের বল্লেন, খুব ভালো মেয়ে! এস্‌প্লানেডে মন্দির দেখতে গেছে। থাকলে আলাপ করে দিতুম!

ঘাড় নাড়িয়া পুলকিত স্বরে কল্পনা কহিল,—এমনি বলতেন বটে! আমাকেও বলেছেন! এখন মেয়ের গুণ বেরিয়েছে, মাসিমাকেও ডিঙিয়ে চলে।

ইভা কহিল,—অবাক্ করলে কল্পনা!

—হ্যাঁ, বৌদি সত্যি। মনে করে, সে যেন ধিঙ্গি! কিছু এটিকেট জানে না।

সুশীল কহিল,—তা যা হোক, মেয়েটির কিন্তু বাহাদুরী আছে, অমিয়র প্রতিজ্ঞা ও ভেঙ্গে দেছে তো!

বিস্ফারিত চক্ষে কল্পনা কহিল,—কিসের প্রতিজ্ঞা?

—বিয়ে না করবার! আমরা তাগাদা দিলে ঠাট্টা করলে বলতো, কাকে বিয়ে করি খুঁজে পাই না!

—এখন পেয়েছে?

হাসিতে হাসিতে সুশীল কহিল,—তা জানি না। পরশু দেখা হলে একটা অভিনন্দন দেবো, কি বলিস্?

বলিবার যে কি, কল্পনা তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সে যেন হেঁয়ালির মধ্যে পড়িয়াছিল! সত্রাস দৃষ্টিতে কহিল,—কি বলছো দাদা?

সুশীল হাসিতেছিল, কহিল—অমিয় ভারী চাপা ছেলে! সহজে কিছু ভাঙে না। কিন্তু ধর্ম্মের কল!

ইভা কহিল,—কি রকম? দৃষ্টিতে তাহার কৌতুক উছলিয়া পড়িতেছে।

পত্নীর পানে চাহিয়া সুশীল কহিল,—তোমাদের আদর্শ মানুষ গো,—যাকে শুকদেব ব্রহ্মচারী উপাধি দেবে ভাবছিলে—একেবারে হাতে-নাতে ধরা! ধর-সাহেব বামাল-সমেত তাকে ধরে ফেলেছে। বলে, অমিয় এত দিনে জালে পড়লো হে।

কল্পনা প্রশ্ন করিল,—কেন ধর-সাহেব কি ধরেছেন?

ভগিনীর পানে চাহিয়া সুশীল কহিল,—তারা স্বামি-স্ত্রী স্বচক্ষে দেখেছে। মিসেস্ ধর বললেন,—মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি, আপনি যদি মিষ্টার গোস্বামীর মুখ দেখতেন, যেন আষাঢ়ের আকাশ! ঠাট্টা করে আমরাই যেন দোষী! এমনি ভাবখানা তিনি প্রকাশ করে চলে গেলেন।

কল্পনার উদ্বেগ বাড়িল। সে কহিল,—কোথায় ধরের সঙ্গে মিষ্টার গোস্বামীর দেখা হলো?

হাসিতে হাসিতে সুশীল কহিল,—কেন, স্থানের অভাব আছে? কারপোষ্। উর্ব্বশীকে নিয়ে উনি সে দিন সেখানে উঠেছিলেন। হাত ধরাধরি করে যাচ্ছিল, ধরকে দেখে অবশ্য পালাবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু ধর হলো ঝানু ছেলে—সে সুযোগ না দিয়ে একেবারে তাদের সামনে—

নিগূঢ় বিস্ময়ে কল্পনা কহিল,—বত্নার সঙ্গে? নিশ্বাস যেন তাহার বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

সুশীল ভগিনীর মুখের বিবর্ণতার অন্য অর্থ না বুঝিয়া কহিল,—ওই তোমাদের স্বভাব। অমিয়র সম্বন্ধে কোন কথা বিশ্বাস করতে চাও না। ভাবো সে একটি জন্তু,—বলিয়া হাসিল; হাসিয়া কহিল,—অবশ্য আমিও ভাবতুম, ও হয়তো বিয়ে-থা করবে না! কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙ্গেছে। সকালে বালিগঞ্জ থেকে ফিরছি, দেখি, লেকের ধারে বেঞ্চে পাশাপাশি দু'টিতে বসে প্রভাত-বায়ু সেবন করছেন! আমি আর তাদের বিরক্ত করতে গেলুম না।

—মিসেস্ গোস্বামী যে বললেন, রত্নাকে মোটর ড্রাইভ শেখাতে নিয়ে গেছেন।

সুশীল কহিল,—আর কি বলবে? তা অমিয়র মন যা-তা দেখে যে টলেনি, এটা সত্যি চাক্ষুষ করলুম। সেই যে বলে,—মুনিজন-মনোহরী! হ্যাঁ, রূপ বটে। উর্ব্বশী বলতে হয়। একটি সোনালী কোট গায়ে দিয়ে বসেছিল! চার্ম্মিং!

কল্পনা আর কোন কথা কহিল না! ধীর পদবিক্ষেপে সে ঘর হইতে নিক্রান্ত হইয়া নিজের ঘরে আসিল এবং সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বেশভূষা মোচনের সময় সুবৃহৎ দর্পণে প্রতিফলিত নিজের আবরণ-মুক্ত অবয়বের পানে চাহিল। সুন্দরী না হইলেও সুদর্শনা সে! রূপের দরবারে অনেক রূপসীর সে আসন অধিকার করিতে পারে।

কেন সকলে রত্নাকে এত রূপসী বলিয়া স্তুতিগান করে—রত্নার কাছে কোথায় সে নিরেস বুঝিতে পারিল না!

নির্জ্জন ঘরে ছোট একটা নিশ্বাস কল্পনা কিছুতেই রোধ করিতে পারিল না।

পৃথিবীতে সকলেই রূপের কাঙাল। সৌন্দর্য্যের পূজা চলিয়া আসিতেছে আবহমান কাল। নারীর রূপ লইয়া কত সিংহাসন কত রাজ্য ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে! কত মুনি-ঋষি-যোগী-তাপসের কঠোর তপস্যা ভঙ্গ হইয়াছে এই নারীর রূপে! সেখানে তুচ্ছ অমিয়, তুচ্ছ তাহার সংযমী চিত্ত। তাহার জ্ঞান, বিদ্যা, পদগৌরব সমস্তই মূল্যহীন! কল্পনার মনের মধ্যে এমনি চিন্তা তীব্র হইয়া তাহাকে অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলিল।

বালিশে মাথা রাখিয়া কল্পনা মনে মনে আঁকিতে লাগিল নিজের ছবি, অমিয়র ছবি, রত্নার ছবি। এবং এমনি ছবি আঁকিতে আঁকিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল,—অনিল যেন ইন্দ্র সাজিয়া পারিজাতের হার আনিয়া তাহার কণ্ঠে দুলাইয়া দিল! ইন্দ্রের চোখের পরিপূর্ণ মুগ্ধ দৃষ্টি কিন্তু নৃত্যশীলা সভা-নর্ত্তকী উর্ব্বশীর উপর নিবদ্ধ।

ঘুমের ঘোরেই কল্পনা চমকিয়া উঠিল!

২৪

গোস্বামী সাহেবের গৃহে নিয়ম ছিল, সকালে চায়ের টেবলে পরিবারস্থ সকলকে উপস্থিত হইতে হইবে। অন্য সময়ে না হইলে ক্ষতি ছিল না! কিন্তু এই সময়টায় আত্মীয়বর্গ সকলের ভালো-মন্দ তত্ত্ব লইয়া তবে কর্ম্মের গহন অরণ্যে তিনি প্রবেশ করিতেন।

প্রথামত আজও তিনি আসিয়া চায়ের টেবলে বসিলেন। একে একে সকলে আসিল এবং সকলের শেষে আসিল রত্না।

গোস্বামী সাহেব তাহাকে স্নেহ-কণ্ঠে 'সুপ্রভাত' জ্ঞাপন করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন,—এ কি রত্না! তুমি করেছো কি?

সবিস্ময়ে সকলে রত্নার পানে চাহিল। পৌষের এই কন্‌কনে ঠাণ্ডায় সকালেই সে স্নান সারিয়াছে। তাহার নিবিড় ঘন কুন্তলরাশি এলাইয়া পৃষ্ঠে বাহুতে পড়িয়া জানু স্পর্শ করিয়া কৃষ্ণ সর্পের ন্যায় ঝুলিতেছে! সেই কুঞ্চিত কেশদাম, শুভ্র ললাটের চূর্ণ অলকগুচ্ছ তাহাকে অপূর্ব্ব শ্রীতে ভূষিত করিয়াছে! পরণে একখানা সাদা লালপাড় শাড়ী, সুডৌল বাহু অনাবৃত রাখিয়া গায়ে একটা হাতকাটা সেমিজ; শীত নিবারণ করিতে লাল রংএর ফ্লানেল স্কার্ফ! পায়ে সবুজ রংএর স্লিপার,—সমস্তই তাহাকে ঘিরিয়া অপূর্ব্ব রূপের হিল্লোল তুলিয়াছে।

মিসেস্ গোস্বামী তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—এতে অসুখ করবে না, রত্না? তাঁহার কণ্ঠ বিরস।

ঈষৎ ম্লান হাস্যে রত্না মুখ নীচু করিল। মৃদু স্বরে কহিল,—খুব ভোরে স্নান করা আমার অভ্যাস আছে। দেশে আমি তাই করতুম।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—সে পাড়াগাঁ, টান জায়গা। আর অসুখ-বিসুখ কিছু হলে, ভাবনা ছিল তাঁদের। কিন্তু এ হলো সহর, এমন করে ঠাণ্ডা লাগালে এখানে সহ্য হবে না। এখানে অসুখ-বিসুখ হলে দায়িত্ব আমার! কাজেই আমায় ব্যস্ত হতে হবে।

অমিয় কহিল,—এত ভোরে স্নানের হেতু?

চকিতে চোখ তুলিয়া রত্না আবার তখনি দৃষ্টি নত করিল।

রত্না তাহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে গেলে গোস্বামী সাহেব

সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন,—ওখানে নয় মা, আমার পাশে এইখানে তুমি বসো।

রত্না তাঁহার পাশে গিয়া বসিল। মুখে ঈষৎ তৃপ্তি ফুটিল; পক্ষি-শাবক যেন তাহার নিরাপদ নীড়ে আশ্রয় পাইল।

গোস্বামী সাহেব কৌতুক হাস্যে কহিলেন,—তোমার বাবা তোমার নাম রেখেছে রত্না। আমি হলে কি নাম রাখতুম জানো? হংসেশ্বরী!

সকলের মুখ প্রফুল্ল হইল। ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস উজ্জ্বল প্রভাতকে যেন আনন্দময় করিয়া তুলিল।

গোস্বামী সাহেবের দিকে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি যখন কলেজে পড়তে তখন কাব্যচর্চ্চা করতে না? কি সব কবিতা লিখতে!

—যখন কলেজে পড়তুম তখন কি, তার পরেও কত লিখেছি! যত দিন—ব্রীফলেশ ছিলুম, তত দিন কবিতা লিখেছি। আচ্ছা অমিয়, দেবীর রূপ বর্ণনা করতে হলে ঋষিরা মুক্তকুন্তলা বলেন, নয় কি? সমস্ত শোভা ওই খোলা চুলেই।

রত্নার কেশের পানে চাহিয়া অমিয় একটু হাসিল। এবং তাহার সামনের আসন অধিকার করিয়া লজ্জিতা রত্না আরক্তিম মুখ আরও নত করিল।

মিসেস্ গোস্বামী সহাস্যে কহিলেন,—আজ রত্নাকে দেখে হঠাৎ অতীতের কাব্য চেপে ধরলো তোমায়!

মাথা নাড়িয়া সহাস্যে গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তাই হয় গো—তাই হয়। আমরা নাতী-পুতিকে এত ভালবাসি কেন? আমাদের শৈশবের প্রতীক তারা! আচ্ছা, তুমি তো এক জন সাইকলজিষ্ট অমিয়, এ বিষয়ে তুমি কি বলো?

কিছু বলিবার জন্যই বোধ করি অমিয় মুখ তুলিয়াছিল, কিন্তু মিসেস্ গোস্বামী তাহাকে থামাইয়া দিলেন। কহিলেন,—আবার ওই উদ্ভুটে তর্ক। ও আমার মোটে ভালো লাগে না। হ্যাঁ রত্না, কাল তুমি খেলে না কেন? কি অসুখ করেছিল?

নত-মুখে রত্না কহিল,—মাথাটা বড্ড—

অনিল যেন লাফাইয়া উঠিল। সে কহিল,—দেখলে তো মা! আমি তখনই মনে করেছি, রত্নার শরীর ভালো নেই!

গোস্বামী সাহেব সায় দিয়া কহিলেন,—আমিও তা বুঝেছিলুম—ওর শুকনো মুখ!

স্নেহার্দ্র স্বরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—বলতে হয়! না জানি কাল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে নাচতে কত কষ্ট হয়েছিল! বোকা মেয়ে! আমায় জানাতে নেই?

একটু খুশীর আমেজে গত রজনীর গুমোট-ক্লেশ সকলের চিত্ত হইতে নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সদয় কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী জ্যেষ্ঠ সন্তানের পানে চাহিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ অমিয়, তুমি রত্নাকে নিয়ে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনো না! মনটা তাজা হবে ওর—শরীর ভালো হবে।

রত্না চকিতে অমিয়র পানে চাহিল। নিমেষের জন্য দেখিল,—নিজের প্রাতরাশের প্রতি অমিয় সুগভীর মনোযোগী। মুখ না তুলিয়াই সে উত্তর দিল,—আজ তো আমার ফুরসৎ নেই মা।

এমনি উত্তরই যেন মিসেস্ গোস্বামী খুঁজিতেছিলেন। প্রীত কণ্ঠে কহিলেন,—তা বটে, আমারও আজ মরবার অবকাশ নেই। কল্পনাকে এখনি আসতে বলে দিয়েছি। অনিলেরও অনেক কাজ—

রত্না ভিতরে ভিতরে চমকিয়া উঠিল। সহসা মনে হইল, কল্পনার প্রতীক্ষাতেই অমিয় নড়িল না। মনের মধ্যে একটা নিষ্ফল অভিমানের উচ্ছ্বাস বহিয়া গেল।

এমনি হয়। সংশয়-পীড়িত মন নিজের অশান্তি সৃষ্টি করিতে যেমন মজবুত, অপরকে তেমনি কারণে-অকারণে দোষী করিতেও সে পটু!

কথাগুলা অবশ্য এমন কিছু নয়—খুবই ছোট! সামান্য! তথাপি ছোট ছোট সংলাপে এবং হাসি-পরিহাসে মন লঘু হয়, তাই রহস্যালাপে মানুষ মাতিয়া ওঠে! এই টুকরা-টুকরা কথাবার্ত্তাগুলা রত্নার মনে বায়ুহিল্লোলে তরুশাখার ন্যায় মাতন তুলিতেছিল। কিন্তু অমিয়র এই ঔদাস্য ও মৌনতা সহসা বায়ুহীন গুমোট দিনের মত রত্নার সমস্ত দেহ-মনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—বণ্টু আসতে পারবে না রত্না। আমায় জানিয়েছে। কিন্তু সে এলে—

বেয়ারা আসিয়া জানাইল, দর্জ্জি আসিয়াছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্নার নাচের পোষাক এলো।

ড্রইং-রুমে টেবলে সুবৃহৎ পিজ-বোর্ডের বাক্স-অভ্যন্তরে যে মূল্যবান পোষাক পাতলা কাগজে ঢাকা ছিল, সকলের আগে অনিল সেটা বাহির করিল! এবং তারিফের সুরে কহিল,—ছাখো মা, ডিজাইনটি কেমন দিয়েছিলুম!

মিসেস্ গোস্বামী পোষাকের দিকে চাহিলেন। প্রফুল্ল মুখে কহিলেন,—চমৎকার হয়েছে।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—ভেরী নাইস্। রংটা কে পছন্দ করেছিল?

অনিল কহিল,—আমরা।

অমিয় ঝুঁকিয়া পড়িয়া পোষাক দেখিতেছিল, কহিল,—এইগুলো সবচেয়ে ভালো হয়েছে অনিল! এই সার-বন্দী শলমার হাঁসগুলো। হ্যাঁ, নাচের মুখে এই তার দেওয়া আছে, পার্ট-পার্ট খুলে যাবে, চমৎকার দেখতে হবে মা, সব তাক্ লেগে যাবে!

প্রদীপ্ত মুখে রত্না নত হইয়া পোষাক দেখিতে লাগিল। অন্তরের সমস্ত অভিমান পুলকের বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া গেল।

রত্না কহিল,—কত বিল হলো মাসিমা?

করিম বিলের কাগজ সকলের চোখের সামনে বাড়াইয়া দিল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ইস্! দু'শো পঁচাত্তর ধরেছ! করেছ কি!

অমিয় হাসিয়া কহিল,—তুমি যেমন কাজ দেবে, তোমার ফরমাস তো সাধারণ নয়!

অনিল সহাস্যে রত্নার পানে চাহিল, কহিল,—রত্না তোমার দাম বেড়ে যাবে।

দ্বারের পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—এই যে কল্পনা এসেছে! কেমন পোষাক হলো উর্ব্বশীর, দেখো তো!

কল্পনার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বিস্ময়ভরা স্বরে কহিল,—আপনি উর্ব্বশীর পোষাক করতে দিয়েছিলেন, মাসিমা!

উৎফুল্ল কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন;—নাচের ড্রেস চাই

বৈ কি মা। আমি, অমিয়, অনিল—সবাই মিলে পাঁচখানা বই দেখে এই ডিজাইন ঠিক করলুম। তোমার কেমন লাগছে?

কল্পনার মুখের চেহারা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে কহিল,—এর উপর আর কার কথা চলে? এমন পোষাক পরা ভাগ্য!

মিসেস্ গোস্বামী খুব খুশী হইলেন। কহিলেন,—মাপ আমরা দিয়েছিলুম। কিন্তু রত্নার সাধ্য নেই নিজে এ পোষাক পরে। তুমি যাও তো, ও ঘরে রত্নাকে পোষাক পরিয়ে দাও গে। ও এসে আমাদের দেখাক, ঠিক হলো কি না। রত্না, তুমি কল্পনার সঙ্গে যাও মা।

মিসেস্ গোস্বামীর আদেশে রত্না ও কল্পনা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—করিম, পাশের কামরায় পোষাকটা দিয়ে এসো।

নীরবে দুই তরুণী করিমের অনুবর্ত্তী হইল। এক জনের মুখ প্রভাত-রবির মত উজ্জ্বল, অপরের মুখ সন্ধ্যা-তপনের ন্যায় মলিন।

২৪

আজ আটাশে পৌষ। গোস্বামী সাহেবের জন্মদিন। সুবৃহৎ পুরী পত্র-পুষ্পে উৎসব-সজ্জায় বিভূষিত। আলোক-মালায় উদ্ভাসিত।

রত্না মিসেস্ গোস্বামীর প্রদত্ত সেই বহুমূল্য শাড়ী পরিয়াছে। মিসেস্ গোস্বামীর ক'খানা সৌখীন গহনাও পরিয়াছে।

এই দামী গহনাগুলি অঙ্গে তুলিতে তাহার কতখানি আনন্দ হইতেছিল! শঙ্কাও জাগিতেছিল অনেকখানি। তাহার কুণ্ঠা দেখিয়া মিসেস্ গোস্বামী স্নেহার্দ্র স্বরে কহিলেন,—সঙ্কোচ কিসের? আমি পরতে দিচ্ছি, তুমি পরবে! না, না, অত ভয় কেন? কিছু খোয়া যাবে না! যত বড় ঘরের মেয়ে-বৌ সব আজ আসবে! গিন্নীরা আসবে। তাদের সামনে তোমায় নিরাভরণ রাখতে পারি? না, ছোট হতে দিতে পারি? হলোই বা হীরে-মুক্তো।

রত্নার চোখ সজল হইয়া উঠিল। মিসেস্ গোস্বামী পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন,—যাও তোমার ঘরে সব নিয়ে।

আহ্লাদে গলিয়া যেন নাচিতে নাচিতে অলঙ্কারের কেস্‌গুলা বুকে ধরিয়া রত্না নিজের ঘরে আসিল। এবং প্রসাধন সমাপ্ত করিয়া বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা সে যখন ড্রইংরুমে আসিয়া দেখা দিল, তখন অস্তগামী রবিরশ্মি-জালের পানে উদাস নেত্রে তাকাইয়া অমিয় একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়াছিল। উৎসবে, ব্যসনে, কাজকর্ম্মে অনিলের যেমন দক্ষতা, অমিয়র ছিল তেমনি অক্ষমতা—তাই কোন কর্ম্মে বা ফরমাসে মিসেস্ গোস্বামী তাহাকে ডাকিতেন না।

অমিয় রত্নার আগমন জানিতে পারিল না। রত্না মিসেস্ গোস্বামীর সন্ধানে হল-ঘরে যাইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঈষৎ হাসির সুরে রত্না কহিল,—

ধ্যানমগ্ন যোগীন্দ্র বসি যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দু'নয়নে
কাহারে ধেয়াও?

অমিয় চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল। চিত্রার্পিতের ন্যায় রত্নার অনিন্দ্য-সুন্দর মাধুরী-মূর্ত্তির পানে মুহূর্ত্তের জন্য সে অভিভূত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। চোখে পলক পড়ে না।

সলজ্জ হাস্যে গাঢ় রক্তিম কপোলে রত্না কহিল,—অমন করে কি দেখছো?

অমিয় হাসিল। কহিল,—তোমাকে! সত্যি রত্না! আজ মডেল করে ছবি আঁকতে লোভ হচ্ছে। বলিয়া রত্নার শাড়ীর দিকে চাহিয়া কহিল,—এইটে না তোমার জন্য অনিল সে দিন কিনে এনেছে?

পুলকিত দীপ্ত মুখে রত্না কহিল—হ্যাঁ।

অমিয় কহিল,—আমার মত তুমিও এখন বেকার! কি বলো?

রত্না হাসিল।

অমিয় কহিল,—তবে বসে পড়ো,—একটু গল্প করা যাক।

মিসেস্ গোস্বামী কল্পনার সহিত কথা বলিতে বলিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিসেস্ গোস্বামী বলিতেছিলেন,—তুমি বাছা খুব উপকার করলে—যেমনটি আমি ভালবাসি! তুমি ঠিক তেমনি একটা হাতের দোসর হলে!

কল্পনা উত্তর দিল,—সত্যি মাসিমা, তাই আমি ভাবি, মাসিমা ক্ষণজন্মা মেয়ে। এ দিকে গিন্নীপণা, ওদিকে ইস্কুল, তার উপর আবার এই থিয়েটার!

মিসেস্ গোস্বামী আত্মপ্রশংসা শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইলেন। কহিলেন,—তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তাই সব কাজে তোমার পরামর্শ নিই। রত্না তো এ সব কিছু বোঝে না,—পেরেও ওঠে না।

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কল্পনা কহিল,—তা সত্যি! এ সব বিলি-ব্যবস্থা তো কেতাবে লেখা থাকে না যে মুখস্থ করে মানুষ শিখবে! যে যেমন সংসারে মানুষ হয়! রত্না আবার হয়তো যে সমস্ত কাজ পারবে, আমরা তাতে একেবারে আনাড়ি।

সংক্ষেপে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তা বটে। আজ কথার মাত্রার মাঝেও যে কেহ কোনরূপ ক্ষুণ্ণতা বোধ করে, তাহাও তিনি চাহেন না। কহিলেন,—হ্যাঁ, তুমি যে প্রত্যেক মেয়ের মাথায় বেলফুলের মালা আর গলায় গোলাপের হার দেবার ব্যবস্থা করলে, এ আমার খুব সুন্দর লেগেছে।

অনিল আসিয়া খবর দিল, ফুল আসিয়াছে। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল—মালাগুলা সকলকে দেবে কে? রত্না তো?

মিসেস্ গোস্বামী দ্বিধায় পড়িলেন। এত বড় একটা অভ্যর্থনার ব্যাপার! চিন্তিত নেত্রে মুখ ফিরাইতেই রত্নাকে দেখিলেন,—ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাশের চেয়ারে রত্না প্রতিমার মত বসিয়া আছে।

মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—এই যে অমিয়, তুমি কি বলো? সকলকে ফুল দিয়ে, মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করবে কে? রত্না পারবে কি?

সহাস্যে অমিয় একবার রত্নার পানে তাকাইল। তার পর কহিল,—না, মা, ও কাজটি তুমি মিস্ চ্যাটার্জ্জিকে দাও—অত ঝক্কির মধ্যে রত্না যেতে পারবে না।

মা খুশী হইলেন। কহিলেন,—সেই ভালো। কল্পনা, তুমি তো আমার মেয়ের মত, তুমিই এ কাজের ভার নাও মা!

যেন সমস্ত দ্বন্দ্ব ঘুচিল। পুলকিত কণ্ঠে কল্পনা কহিল—আপনি যেমন বলবেন!

গোল মিটিল! কিন্তু মেঘ কাটিল না।

২৫

আহারাদির পর অভিনয়ের ব্যবস্থা। ভোজন-পর্ব্ব শেষ হইতেই নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলারা আসিয়া হলঘরের অভিনয়-মঞ্চের সম্মুখে সার-বন্দী গদি-আঁটা চেয়ারে বসিলেন।

শিল্পীর দল প্রবেশ করিলেন গ্রীণ-রুমে।

মিসেস্ গোস্বামীও সজ্জা-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে-দিকে কিছুক্ষণ তদারক করিয়া, নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন।

যন্ত্রি-সঙ্ঘের একতান আরম্ভ হইল। মিসেস্ গোস্বামী গিয়া স্বামীর হাত ধরিলেন। কহিলেন—একবার এদিকে এসো।

সবিস্ময়ে গোস্বামী সাহেব কহিলেন—কোথায়?

মঞ্চের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—ওই পর্দ্দার ভিতরে।

গোস্বামী সাহেব পত্নীর অনুবর্ত্তী হইলেন।

একতান থামিল। পর্দ্দা উঠিল। দর্শকদলের উৎসুক দৃষ্টি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল, পত্র-পুষ্পে সজ্জিত এক সুবৃহৎ চেয়ারে গোস্বামী সাহেব আসীন! এবং দুই পার্শ্বে নারী ও পুরুষ শিল্পিবৃন্দ সার বাঁধিয়া দণ্ডায়মান! হাতে সকলের পুষ্পমাল্য! কুসুম-স্তবক।

সগর্ব্বে মিসেস্ গোস্বামী ধীর-পদবিক্ষেপে স্বামীর নিকটে গিয়া তাঁহার কণ্ঠে মালা দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

গোস্বামী সাহেবের বন্ধুদল করতালি দিয়া উঠিল।

তাহার পর অমিয়, অনিল, রত্না, কল্পনা একে একে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী আসিয়া গোস্বামী সাহেবের গলায় পুষ্পমাল্য, হস্তে কুসুম-গুচ্ছ দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

গোস্বামী সাহেব সস্নেহে সকলের পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নাট্যমঞ্চ ত্যাগ করিয়া তিনি আসিয়া বন্ধুদের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

যবনিকা পড়িল।

গ্যাংলি এবং বাকৃচি গোস্বামী সাহেবের দুই পার্শ্বে দু'জনে বসিয়াছিলেন। বন্ধুকে প্রশ্ন করিলেন,—উর্ব্বশী কি সেই মেয়েটি হবে?

গোস্বামী সাহেব জবাব দিলেন,—হ্যাঁ! রত্না আমার বাল্যবন্ধুর কন্যা।

বাকৃচি কহিলেন,—তিনি জীবিত?

—নিশ্চয়! এবং সুস্থ। কর্ম্মঠ। পণ্ডিত ব্যক্তি। নিমন্ত্রণ করেছিলুম তাকে কিন্তু বিশেষ কাজে সে আসতে পারেনি।

ঘণ্টা পড়িবার সঙ্গে পর্দ্দা উঠিল। কথা বন্ধ করিয়া সকলে চাহিল নাট্যমঞ্চের দিকে। সেখানে তখন ইন্দ্রের সভা। চিন্তিত মুখে সিংহাসনে বসিয়া বাসব—পাশে ইন্দ্রাণী শচী।

অপ্সরার দল নাচিয়া গাহিয়া চলিয়া গেল।

এবার দেখা দিল, পরামর্শ-সভা। মন্ত্রণা বৈঠক! সপারিষদ দেবেন্দ্র মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত শত্রু-নিপাত-ব্যবস্থার আলোচনা করিতেছেন।

কালনেমি দৈত্যের প্রচণ্ড বিক্রমে, নিষ্ঠুর অত্যাচারে স্বর্গের সুখ-শান্তি বিনষ্ট! আনন্দ বিলুপ্ত! স্বর্গ ম্লান।

একে একে বহু উপায়ের কথার পর অবশেষে স্থির হইল, একমাত্র পার্থ ধনুর্দ্ধর এই দুর্দ্দান্ত দানবকে দমন করিতে সমর্থ; তাঁহাকেই আনা প্রয়োজন।

গাণ্ডীবীকে নিমন্ত্রণ করিতে নারদকে পাঠানো হইল।

দৃশ্যপট বদলাইয়া গেল।

এবার দেখা দিলেন গাণ্ডীবধারী ফাল্গুনি। নাট্যমঞ্চে অর্জ্জুনের সহিত অমিয়র কোন সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অর্জ্জুনের অভিনয়ে বাহবা পড়িল।

ইন্দ্রাণী স্বয়ং আসন হইতে উঠিয়া স্মিত-মধুর হাস্যে কিরীটীরে অভ্যর্থনা করিলেন।

দেবেন্দ্র বলিলেন স্বর্গের বিপদ-বার্ত্তা! দেবগণকে শঙ্কাশূন্য করিতে তিনি সব্যসাচীর শরণাপন্ন হইয়াছেন।

অর্জ্জুন গাণ্ডীব স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, অমরাবতীকে অরাতি-মুক্ত করিবে।

সভায় ধন্য-ধন্য রব উঠিল। অপ্সরারা পুষ্পবৃষ্টি করিল! বাসব মন্দাকিনীর পূত-সলিলে গাণ্ডীবীর অভিষেক করিলেন। ব্রহ্মা বারি দিলেন। স্তাবক গাহিল। যন্ত্রী বাদ্য করিল। দেবনারীরা উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি করিলেন। দেব-ঋষিগণ স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন।

ইন্দ্রাণী নিজের পারিজাতের হার হইতে একটি পারিজাত লইয়া সাদরে অর্জ্জুনের হাতে দিলেন।

নত মস্তকে সসম্মানে অর্জ্জুন অভিবাদন করিয়া পারিজাত গ্রহণ করিলেন; মস্তকে স্পর্শ করিয়া পারিজাতের আঘ্রাণ লইলেন।

পটক্ষেপের পর আবার দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল।

প্রলয়-ত্রাস-সঞ্চারী অদ্ভুত রণ-বীর অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতেছে, কালান্তকারী কালনেমির সহিত। অসুর-নাশ হইল। স্বর্গ নির্বিঘ্ন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন। সভা। অমরগণ প্রফুল্ল! স্বর্গের মালিন্য ঘুচিয়াছে। এখন পরামর্শ চলিল,—কি অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠ পার্থকে অভিনন্দন করা হইবে; তাহাকে গৌরবান্বিত করিতে কিরূপ উৎসব হইবে।

ভরতমুনি উপদেশ দিলেন,—উর্ব্বশীকে আহ্বান করা হোক! অমরাপুরীর শ্রেষ্ঠ রত্ন। স্বর্গের নিষ্প্রভতায় সে অপসৃত হইয়াছিল। আজ স্বর্গে আনন্দ ফিরিয়াছে! স্বর্গ এখন নিষ্কণ্টক! শত্রুশূন্য! এখন সেই অপ্সরা-কুল-গরীয়সী নর্ত্তকীর তো বাসবের সভায় নৃত্যে বাধা রহিল না।

দেবরাজ মালা-চন্দন দিয়া প্রতিহারীকে উর্ব্বশীর কাছে পাঠাইলেন! ভরতমুনি দিলেন ধান-দূর্ব্বা।

ইন্টারভ্যাল। একতান সুরু হইল।

দর্শকগণ সমস্বরে অভিনয়ের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। মিসেস্ গোস্বামীর পরিচালনার প্রশংসা উঠিল। সকলেই এখন ব্যস্ত উর্ব্বশীকে দেখিবার জন্য।

নাটকখানি লিখিয়াছে অমিয়। তাহার যশ হইল। অনিলের গানের সুরও যে মধুর হইয়াছে, সকলে গানের সুখ্যাতি করিল।

মিসেস্ গোস্বামীর উৎফুল্ল মুখে তবু কেমন উৎকণ্ঠার ছায়া! মনের সংশয় ঘুচিতেছিল না। রত্না কেমন অভিনয় করিবে, স্বামীর জিদে রত্নাকে তিনি উর্ব্বশীর ভূমিকা হইতে খারিজ করিতে পারেন নাই। নহিলে তাহার উপর তিনি এতটুকু আস্থা রাখেন না! কৃষ্ণনগরের কারিগরের গড়া পুতুলের মত মেয়েটির অপরূপ তনু ছাড়া ইহার ভিতরের কোন গুণ কোন কর্ম্মদক্ষতা যেন মিসেস্ গোস্বামীর চোখে পড়ে না।

কল্পনা এখন তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়াছে। কাজে; কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, কথায়-বার্ত্তায় রত্নার চেয়ে কল্পনাকেই অনেকখানি শ্রেষ্ঠ মনে হয়! এবং কল্পনাও তাঁহাদের সমযোগ্য ঘর—কুটুম্বিতায় এখানে নিজেকে খাটো করা হয় না। হ্যাঁ, অমিয়কে লইয়া,—

তার পর অনিল! একা আর ভাল লাগে না! রত্নাকে কাছে টানিয়া লইয়াছিলেন! কিন্তু রত্না তাঁহার হইবার নয়। শুধু স্নেহের পাত্রী!

২৬

ইন্টারভ্যাল শেষ হইল। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে একতান থামিল।

মিসেস্ গোস্বামী কম্পিত বুকে সম্মুখে চাহিলেন। এইবার উর্ব্বশী রত্না তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে কি ম্লান করিবে, কে জানে? মিসেস্ গোস্বামীর ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

পট উত্তোলনে নূতন দৃশ্য দেখা দিল।

নন্দন কানন। উর্ব্বশী পারিজাত বৃক্ষের তলে প্রজাপতির সহিত খেলা করিতেছে। মাঝে মাঝে লোভীর মত পারিজাত-পাপড়ি বায়ু-হিল্লোলে সেই কমনীয় বরতনুকে স্পর্শ করিতে তাহার কোমল অঙ্গে ঝরিয়া পড়িতেছে।

উর্ব্বশী কখনও আনমনা, কখনও হাস্যময়ী! তাহার মুখে কমল-ভ্রমে মধুলোভী ভ্রমর ছুটিয়া আসিতেছে! রত্নখচিত অঞ্চল উড়াইয়া উর্ব্বশী ভ্রমরকে তাড়াইতেছে। শিথিল কবরী হইতে পুষ্প খশিয়া পড়িতেছে, সে দিকে উর্ব্বশীর হুঁশ নাই! প্রজাপতি ধরিতে ব্যস্ত! খেলায় সে বিভোর। তাহার বক্র-পেলব চরণ-ক্ষেপে মৃণাল-বাহুর আন্দোলনে, চারি পাশে যেন সৌন্দর্য্যের হিল্লোল বহিতেছে। মাঝে মাঝে প্রফুল্ল মুখে চিন্তার ছায়াপাত হইতেছে। করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া উর্ব্বশী চিন্তিত।

অমরপুরী শত্রু-কবলে ম্লান। তাই ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশী আর নাচিতে যায় না। তাহার নৃত্য যে বৈজয়ন্তীর চিহ্ন, জয়ন্তীর আনন্দেই উর্ব্বশী হয় বাসবের সভায় নৃত্যশালিনী।

প্রতিহারী প্রবেশ করিল। ভূমিষ্ঠ প্রণামে উর্ব্বশীকে সম্মান জ্ঞাপন করিল।

উর্ব্বশী দেবরাজের কুশল জানিতে চাহিলেন।

প্রতিহারী মালা-চন্দন দিয়া জানাইল, দেবরাজের বাণী সে বহন করিয়া আনিয়াছে। বৈজয়ন্তী পুরী শত্রু-বিমুক্ত, অমরগণ শঙ্কাশূন্য, দেবগণ উর্ব্বশীর নৃত্য-দর্শনের জন্য ব্যাকুল।

উর্ব্বশী জানিতে চাহিল,—কোন্ রথি-শ্রেষ্ঠের বিক্রমে স্বর্গের গৌরব দীপ্ত উজ্জ্বল হইল?

প্রতিহারী উত্তর দিল,—সে মহামানব কুরুবংশ-সম্ভূত অর্জ্জুন।

উর্ব্বশী চমকিত। বিস্মিত দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে কহিল,—কুরুবংশ-সম্ভূত অর্জ্জুন,—তৃতীয় পাণ্ডব—

নত মস্তকে প্রতিহারী জানাইল,—ধনঞ্জয় ব্যতীত এত শৌর্য্য কার?

উর্ব্বশী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। আত্মগত কহিল,—শ্রেষ্ঠ বীর অর্জ্জুন! তার পর কহিলেন,—দেবরাজ আমার প্রতি কি আদেশ জানিয়েছেন?

বিনীত কণ্ঠে প্রতিহারী কহিল,—পার্থের অভিনন্দন-উৎসবে অপ্সরকুলাগ্রগণ্যা উর্ব্বশীর নৃত্য তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন। কারণ, কিরীটী নিজেও এক জন শ্রেষ্ঠ নট, নৃত্য-গীত-বাদ্য-বিশারদ।

উর্ব্বশী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। মিসেস্ গোস্বামী এতক্ষণ রুদ্ধ নিশ্বাসে বসিয়াছিলেন। দু'চোখ আনন্দ-দীপ্ত হইয়া উঠিল। রত্না নিখুঁত অভিনয় করিয়াছে। রত্না ছাড়া কাহারও সাধ্য ছিল না, উর্ব্বশী সাজিতে। মিসেস্ গোস্বামী মনে মনে প্রশংসা করিলেন। এই তো সত্যকার নন্দন-কানন-বাসিনী উর্ব্বশী! কল্পনা স্বরূপা বটে—কিন্তু রত্না?

পট উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ গোস্বামী ব্যগ্র চক্ষে দেখিতে লাগিলেন,—উর্ব্বশী সহচরীদের আদেশ দিলেন, মনোহারী পরিচ্ছদে তাহাকে বিভূষিতা করিতে! মনে দর্প, পার্থ নরকুল-চূড়ামণি হইলেও উর্ব্বশীর কাছে তাহাকে পরাজয় মানিতে হইবে।

দৃশ্য পরিবর্ত্তনের পর দেখা দিল,—দেব-সভা। স্বর্গ উৎসবে মাতোয়ারা। স্বরলোকের বৈভব! ইন্দ্রাণী শচী অপরূপ সজ্জায় বাসবের পাশে—অমরগণ নিজ নিজ আসনে সমাসীন।

পার্থ প্রবেশ করিয়া দেবগণকে প্রণাম করিল। দেবসেনারা শঙ্খধ্বনি করিলেন! কুঙ্কুম রাগে ললাটে জয়তিলক অঙ্কিত করিলেন। দেবরাজ স্বয়ং গাণ্ডীবীর হাত ধরিয়া মণিময় সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইলেন।

বৈতালিক গান গাহিল। অপ্সরারা নৃত্য করিল। দেবর্ষি মুনি, নারদ মুনি স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেন।

দেবরাজ কহিলেন,—হে বীর-শ্রেষ্ঠ, স্বর্গের অগ্রগণ্যা নর্ত্তকী উর্ব্বশী তাঁর নৃত্যকলায় তোমার তৃপ্তি সাধন করিবে! শুনেছি, তুমিও নট-শ্রেষ্ঠ।

অর্জ্জুন হাস্য করিলেন।

অমর-সভায় এতক্ষণে মনোহর গতিচ্ছন্দে উর্ব্বশী প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র-দেবেন্দ্রাণীকে প্রণাম দিয়া সভাসদবর্গকে অভিবাদন দিল। ঋষিগণের পদধূলি গ্রহণ করিল! তাঁহারা কহিলেন,—জয়োহস্তু।

দর্শকদের উৎসুক দৃষ্টি সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল, উর্ব্বশীর রূপজ্যোতি, কমনীয় তনু রূপের ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে। উর্ব্বশীর বহুমূল্য নৃত্য পরিচ্ছদ—অঙ্গের মণি-আভরণ, পৃষ্ঠের কৃষ্ণ সর্পাকৃতি বিলম্বিত বেণী, চরণের নূপুর—সমস্ত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব লাবণ্যের তরঙ্গে দর্শক-দৃষ্টিকে বিমোহিত করিল।

এমনি করিয়া সমাগত দল চাহিয়া রহিল। যেন সুরাসুর বিহ্বল নেত্রে মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিতেছে!

বাদ্য যন্ত্রের সহিত উর্ব্বশীর নৃত্য আরম্ভ হইল। প্রতি চরণ-বিন্যাসে মাধুরী ঝরিয়া পড়িল। সকল অবয়বের মনোহর ভঙ্গীতে ছন্দ ফুটাইয়া, চারু নৃত্যকলার প্রতি মুদ্রা প্রদর্শনে যেন রূপের হিল্লোল বহিয়া চলিল।

উর্ব্বশী নাচিতেছে। স্বর্গের গৌরব-দীপ্তি ম্লান বলিয়া বাসবের সভায় সে ছিল অন্তর্ধান! আজ লুপ্ত গৌরব সমুজ্জ্বল, উর্ব্বশী তাই নৃত্যশীলা। অন্তরের অভিলাস ফাল্গুনিকে বুঝাইয়া দিবে, উর্ব্বশীই কেবল উর্ব্বশীর তুলনা! মানুষকে সে চারুকলার নৈপুণ্যে মুগ্ধ অভিভূত করবে। তাহা না হইলে, উর্ব্বশী মিথ্যা! তাহার নৃত্য মিথ্যা! তাহার মুনিজন-মনোহারী সৌন্দর্য্য মিথ্যা!

জয়স্তিকা শুধু উর্ব্বশীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত ললাটেরই শোভা!

অর্জ্জুন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে স্তব্ধের মত বসিয়া নৃত্য অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঝরিতেছে আনন্দ।

দেবসভায় সকলেই নিস্পন্দ-প্রায়।

গাঙ্গুলী কহিলেন,—চমৎকার!

রায় কহিলেন,—এ-যে আমাদের দিশী প্যাভলোভা হে!

গোস্বামী সাহেব হাসিলেন। কহিলেন,—উর্ব্বশী নয়, প্যাভলোভা।

মিসেস্ গোস্বামীর মুখ প্রদীপ্ত। স্বামীকে তিনি মনে মনে সহস্র ধন্তবাদ দিতেছিলেন।

নৃত্য-শেষে সভা হইতে উর্ব্বশী বিদায় গ্রহণ করিলেন। পার্থের বিহ্বল দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিল।

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেখা দিল,—বাসবের কক্ষ। পার্ষদের পরামর্শে দেবেন্দ্র উর্ব্বশীকে অর্জ্জুনের চিত্তবিনোদনের জন্ত প্রেরণ করিলেন।

পার্ষদ একবাক্যে দেবরাজকে জানাইল,—ফাল্গুনির মনোরঞ্জন করিতে একমাত্র উর্ব্বশীই সমর্থ। পার্থের নির্নিমেষ দৃষ্টি উর্ব্বশীতে আবদ্ধ ছিল।

নিশীথ রাত্রে অভিসারিকার বেশে উর্ব্বশী দেখা দিল,—অর্জ্জুনের নিভৃত শয়ন-কক্ষে।

অর্জ্জুন স্তম্ভিত! বিমূঢ়! বিভ্রান্ত নেত্রে সে উর্ব্বশীর অলৌকিক রূপরাশি অবলোকন করিতে লাগিল। এই দেবভোগ্যা অপ্সরী, মানুষের ভোগের জন্ত আসিয়াছে! এ কি বিচিত্র রহস্ত!

উর্ব্বশী চঞ্চল হইল। অর্জ্জুনের দৃষ্টিতে অনুরাগ নাই, আসক্তি নাই! রহিয়াছে শুধু গভীর বিস্ময়! তথাপি উর্ব্বশী ক্ষান্ত হইল না! অকুণ্ঠ কণ্ঠে সে নিজের প্রেম নিবেদন করিল। পার্থের শৌর্য্যে-বীর্য্যে অপূর্ব্ব রূপচ্ছটায় উর্ব্বশী বিমুগ্ধ!

জিতেন্দ্রিয় অর্জ্জুন শান্ত-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—অদ্ভুত! বরাননে, অদ্ভুত বাসনা তব! দেবভোগ্যা তুমি, হে কুরুকুলের আদি জননি, পার্থ নহে যোগ্য তব। অর্জ্জুনের তুমি শুধু লহ নমস্কার।

অর্জ্জুনের বিমুখতায় উর্ব্বশী কুপিতা হইল। নয়নে জ্বলিল বহ্নি।

উর্ব্বশীর অভিসার ব্যর্থ, অর্জ্জুন তাহাকে উপেক্ষা করিল। অপ্সরা-সমাজে এ যেন কলঙ্কের মত তাহাকে হেয় করিল। যুগে-যুগে সে পুরুষের চিত্তে চির-অভীপ্সিতা—আজ তাহার এ কি পরাজয়! মর্ম্মাহতা উর্ব্বশী ভুজঙ্গীর ন্তায় ফুঁশিয়া অর্জ্জুনকে অভিশাপ দিল।

যবনিকা-পাত হইল। নাট্যমঞ্চের আলো নিবিল। সুবৃহৎ হল-ঘর উর্ব্বশীর প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল।

অভিনেতা-অভিনেত্রীর দল বেশভূষা ত্যাগ করিয়া সমাগতদের সহিত আসিয়া মিলিল।

গোস্বামী সাহেব রত্নার মাথায় হাত দিলেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

দুঃসময়ে

আনন্দের রুদ্ধ গতি, প্রাণের অঙ্কুর এবে আপনারে করে না প্রকাশ,
আছে কি স্থিরতা কিছু যাবে দূরে এক দিন আজিকার অশ্রু-জলোচ্ছ্বাস!
এখনো কি আছে আশা কম্পিত-কুণ্ঠিত মোর জন্মভূমি লভিবে বৈভব!
জীবন-ঐশ্বর্য্য পাবে ঝঞ্ঝা-রাত্রি-অবসানে লক্ষ্মীহীনা শূন্ত পুরী সব?
পান্থের নয়ন 'পরে ভবিষ্যের বৈজয়ন্তী উড়িবে কি সূর্য্যকরঘাতে?
সেদিন শারদ-প্রাতে হাসিবে কি শতদল ভাস্করের কিরণ-সম্পাতে!

পুষ্পফুল্ল নহে পথ, আজি তার প্রান্তে হেরি বিনিদ্রিত প্রেমতীর্থ বট!
সুখের সৌরভ কোথা? দুঃখের বিকট গন্ধ সংসারের শবাচ্ছন্ন তট।
রোষ-দীপ্ত বিভীষিকা রাত্রির বীভৎস ছায়ে স্পর্দ্ধাভরা হিংসার আবেগে
স্তব্ধতার বিস্তৃতির স্তরে স্তরে সুভ্যতার আনে মৃত্যু-শঠতারে ডেকে।

গৃহচ্যুত নর-নারী, শঙ্কিত ক্ষুধিত প্রাণ, দেবতা যে কঠিন পাষাণ,
ন্তায়ধর্ম্ম অরক্ষিত, অন্তায়ের সমাদর, সবলের আছে শুধু স্থান!
শতাব্দীর রুদ্র রূপ অদৃষ্টের পরিহাস! ঘরে সদা শোকের শেফালি,
ত্রাণকর্ত্তা আসিবে কি! শ্মশানের পথপ্রান্তে দিব তারে কঙ্কালের ডালি।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

নিশি-পদ্ম

ভালো বেসেছিনু সখি এক দিন বিপুল আগ্রহে,
উদ্দাম নদীর মত ভীম নাদে তীব্র করি' গতি
ভাসাইয়াছিনু তরী লঙ্ঘি' বাধা উপল-বিরতি,
লভি নাই প্রেম তবু কেঁদেছিনু বিধুর বিরহে,
নির্ম্মম কটূক্তি-নিন্দা গেছে মোর সারা প্রাণ দহে'
বেসেছিনু শুধু ভালো! স্পর্শ-সুখ স্বরগের প্রতি
লোভ নাই,—চেয়েছিনু স্নেহকণা সহি' শত ক্ষতি,
তার চেয়ে আরো কিছু জানিতাম মোর প্রাপ্য নহে।

সেদিন চলিয়া গেছে। আজো তবু ভাবি আমি বসি'
যে লগ্ন হারায়ে যায়, নিশি-পদ্ম স্বপ্ন-ভারানত
ঊর্দ্ধমুখে বার-বার আঁখি তুলি ভূমে পড়ে খশি,—
জানি, সে ফেরে না কভু রহি তবু স্মর-ধ্যানরত।

আজি নাই সে চাপল্য—জরাগ্রস্ত,—গত বহু দিন,
ধ্যানময়ী এলো কাছে যবে আমি মণি-রত্নহীন।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সূর্য্য

প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সূর্য্যকে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার এবং উজ্জ্বল বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষুদ্রতম তারকা ছাড়া আর কিছু নয়। তবু যে খুব বড় বলে মনে হয়, তার কারণ, সূর্য্য পৃথিবীর খুবই নিকটাবস্থিত। তার তুলনায় নিকটতম তারকার দূরত্ব ৩০০,০০০ গুণ।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে সূর্য্যকে প্রকাণ্ড উজ্জ্বল একখানি থালার মত দেখায়, যার ব্যাস চোখে ½ ডিগ্রীর কোণ সৃষ্টি করে। এই ব্যাস নিয়মিত ভাবে বাড়ে এবং কমে, যার থেকে বোঝা যায় যে, পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব সমান নয়, কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। যদি পৃথিবীর সূর্য্য-প্রদক্ষিণের কক্ষ বৃত্তাকার হতো, তাহলে দূরত্ব সব সময়েই এক থাকতো, কারণ, সূর্য্য এই কক্ষের কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু দূরত্ব পরিবর্ত্তনশীল, অতএব কক্ষ একটি উপবৃত্ত (ellipse) এবং সূর্য্য সেই উপবৃত্তের (ellipse) নাভিতে (Focus) অবস্থিত। মোটামুটি পৃথিবী থেকে সূর্য্যের দূরত্ব প্রায় ৯২,৯০০,০০০ মাইল এবং সূর্য্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৪,০০০ মাইল। প্রকাণ্ড বটে, কিন্তু তারকার তুলনায় নগণ্য। সূর্য্যের ভর (mass) পৃথিবীর ৩৩২,০০০ গুণ,কিন্তু আয়তন ১,৩৩১,০০০ গুণ। ঘনাঙ্ক (density) ১'৪১, পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ।

ভাল ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, হারকিউলিসের (Hercules) চতুর্দ্দিকের নক্ষত্রগুলি একধারে ফাঁক্-ফাঁক্ হয়ে যাচ্ছে আবার অপর ধারে কাছাকাছি হচ্ছে। তার অর্থ হলো যে, সৌরমণ্ডল (সূর্য্য এবং গ্রহের দল) ক্রমেই হারকিউলিসের (Hercules) দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ছবিতে সূর্য্যের গতি—বামে ঐ কালো দাগ ছ'দিনে মাঝখানে ; আরো ছ'দিনে ডাহিনে

সূর্য্যের ভূমি ঠিক সমতল নয়, মনে হয়, যেন একটা থালার উপর চাল ছড়ানো রয়েছে ! কিন্তু সেই চালের কণার আয়তন দৈর্ঘ্যে হাজার মাইল আর প্রস্থে তিন শত মাইলেরও অধিক। উজ্জ্বলতাও সর্ব্বত্র সমান নয়, মধ্য-ভাগ বেশী এবং ধারগুলি কম উজ্জ্বল। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে কালো কালো দাগ আছে, যাকে সৌরকলঙ্ক (sun-spot) বলে। দাগের মধ্য-ভাগ গাঢ় (umbra) এবং চারি ধার ফিকে কালো (penumbra)। আসলে কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ স্থানগুলিও আলোকিত, তবে সূর্য্যের অপর স্থানগুলি এত বেশী উজ্জ্বল যে, তুলনায় দাগগুলি কালো মনে হয়। অনুমান, কম আলোকিত গভীর গর্ত্তের জন্য এই রকম দেখায়। গভীরতা প্রায় ছ'হাজার মাইলের কিছু কম। কলঙ্ক প্রায়ই একত্র হয়ে পড়ে, কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় যে, তারা জোড়ে থাকে। সূর্য্যের থালার উপর দিয়ে কলঙ্কের এক ধার থেকে আর এক ধারে সরে যাওয়া দেখে স্পষ্ট মনে হয় যে, সূর্য্য নিজ অক্ষের উপর ঘুরছে। অতএব সূর্য্য পৃথিবীর মত প্রায় গোলাকার। তার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের নাম ফটোস্ফীয়ার (Photosphere); তবে পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে সূর্য্যের ঘোরার এক বিরাট পার্থক্য আছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থান একই বেগে ঘোরে (angular velocity), কিন্তু সূর্য্যের ঘূর্ণাবেগ যত তার বিষুবরেখার দিকে যাওয়া যাবে, ততই বেশী হতে থাকবে। বেশীর ভাগ সৌর-কলঙ্কই মধ্য-ভাগে অবস্থিত। মোটামুটি সৌর-কলঙ্কের অক্ষের চারি ধারে একবার ঘুরতে সময় লাগে ২৫'৩৮ দিন—যদিও বিষুবরেখার কাছে হলে লাগে মাত্র ২৪'৫ দিন।

কোন একটি সৌর-কলঙ্কের দাগ ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ক' দিন অথবা ক' মাস পরে সেই দাগ অদৃশ্য হয়। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রতি ১১ বছর চার মাস অন্তর সৌর-কলঙ্কের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হয়। পৃথিবীর চৌম্বক ক্রিয়ার জন্য সৌর-কলঙ্কের তারতম্য ঘটে বলে অনুমিত হয়।

পৃথিবীর গতি দু' রকম। প্রথম—আহ্নিক গতি, নিজ কক্ষের ওপর ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেণ্ডে একবার ঘোরে। দ্বিতীয়—বার্ষিক গতি, সূর্য্যের চারি ধারে প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা। আহ্নিক গতির জন্য মনে হয়, আকাশস্থিত তারকারাশি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে যাচ্ছে, আবার পরে পূর্ব্বস্থানে আসতে সময় লাগছে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৪ সেকেণ্ড। কিন্তু ঐ ভাবে সূর্য্যের ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ৩ মিঃ ৫৬ সেকেণ্ড (১ ডিগ্রী) পেছিয়ে পড়ছে। ফলে আকাশে সূর্য্যের একটি পৃথক্ গতি-পথ অঙ্কিত হচ্ছে—যার নাম ক্রান্তিবৃত্ত (ecliptic)। অতএব নক্ষত্রের তুলনায় সূর্য্য ঠিক পূর্ব্বেকার স্থান দিয়ে আসবে এক বৎসর অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা পরে (১৮ ঘণ্টা মিঃ ৫৬ সেকেণ্ড) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-কক্ষই হলো সূর্য্যের গতি-পথ, আর পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য মনে হয়, সূর্য্য প্রদক্ষিণ করছে। ক্রান্তি-বৃত্তের উপর ১২ রাশি অবস্থিত। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এক রাশি থেকে আর এক রাশি পর্য্যন্ত যেতে এক মাস সময় লাগে। মেষ রাশি থেকে বর্ষের প্রথম মাস আরম্ভ হয় আর মীন রাশিতে বর্ষ শেষ হয়। ৩১শে ডিসেম্বর পৃথিবী সূর্য্যের সব চেয়ে নিকটে এবং ১লা জুলাই সব চেয়ে দূরে থাকে।
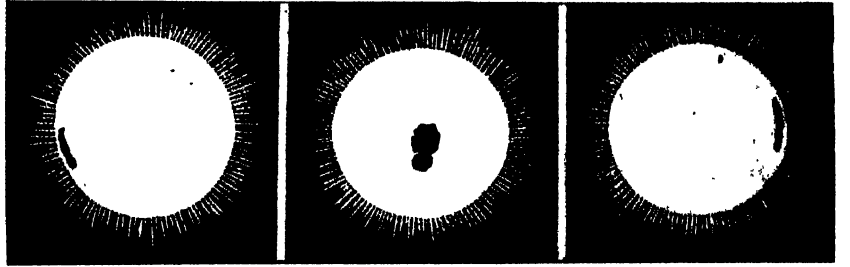
পৃথিবীর কক্ষের আর বিষুবরেখার ভূমির (Plane) মধ্যের কোণ ২৩°২৮'। অক্ষ সর্ব্বক্ষণ কক্ষের ওপর হেলে থাকে ৬৬°৩২' কোণে এই হেলান থাকার জন্যই পৃথিবীতে ঋতু-পরিবর্ত্তন ঘটে। ২১ জুন গ্রীষ্ম, ২২ সেপ্টেম্বর শরৎ, ২৬ ডিসেম্বর শীত এবং ২১ মার্চ্চ বসন্ত। গ্রীষ্ম ৯৩ দিন ১৪ ঘণ্টা, শরৎ ৮৯ দিন ১৮ ঘণ্টা, শীত ৮৯ দিন ১ ঘণ্টা এবং বসন্ত ৯২ দিন ২১ ঘণ্টা।

আহ্নিক গতির জন্য দিন বা রাত হয় ; কিন্তু তাদের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে সূর্য্যের বিষুব লম্ব (destination) পৃথিবীর উপর দর্শকের অক্ষাংশের (latitude) উপর। বিষুবরেখার উপর যাদের বাস তাদের দিন-রাত সমান ; আবার উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরুবাসীদের দিন ছ'মাস আর রাত ছ'মাস। ২৩ ডিসেম্বর দিন সব চেয়ে ছোট, রাত সব চেয়ে বড ; আর ২১ জুন রাত সব চেয়ে ছোট, দিন সব চেয়ে বড।

সূর্য্য অস্ত গেলে রাত এবং উদয় হলে দিন হয়। কিন্তু উদয়ের পূর্ব্বে সূর্য্যকে না দেখা গেলেও তার আলো পাওয়া যায়। সেই সময়কে বলে উষা। তেমনি সূর্য্যাস্তের পরও কিছুক্ষণ আলো থাকে। তাকে বলে গোধূলি। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে সমস্ত রাত্রি ধরে গোধূলি থাকে ; অর্থাৎ সূর্য্য দেখা যায় না বটে, কিন্তু আলো থাকে।
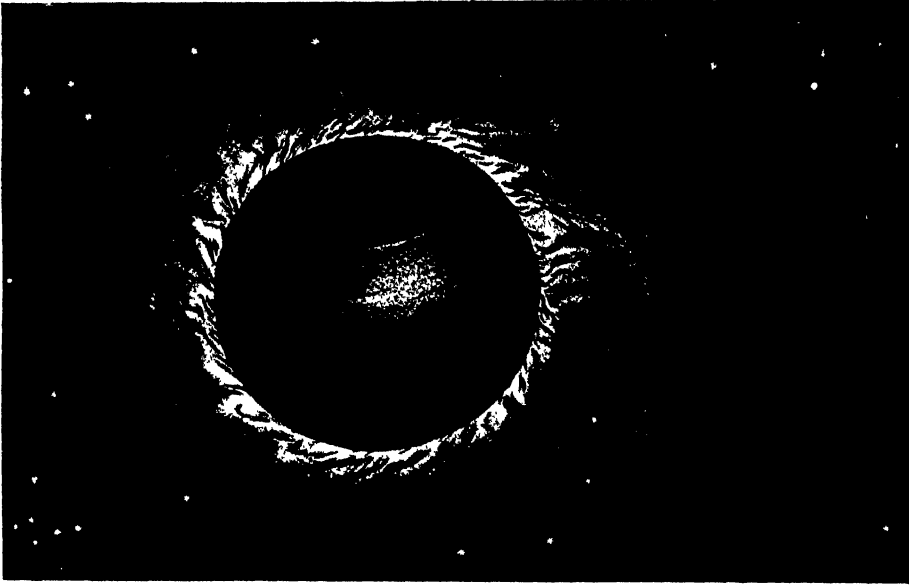
আদিম অগ্নি-গোলক—এখনকার পৃথিবী

পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় যখন নিষ্প্রভ চন্দ্র ভাস্বর সূর্য্যের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন মনে হয়, চন্দ্রের চারি ধার দিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখা বার হচ্ছে। আসলে কিন্তু সে অগ্নিশিখা সূর্য্যের, চন্দ্রের কালো পর্দ্দার পিছন থেকে উঁকি মারছে বলে ঐ রকম দেখায়। অন্য সময় এ শিখা দেখা যায় না, তার কারণ, সূর্য্যের প্রচণ্ড আলোয় চারি ধার-আলো হয়ে থাকে। এই শিখার উচ্চতা অনেক সময় লক্ষাধিক মাইল পর্য্যন্ত হয়। আর একটি লক্ষ্য করবার বস্তু—পূর্ণ-গ্রাসের সময় আচ্ছাদিত সূর্য্যের চারি ধারে আলোর ঝকমকে একটি জ্যোতির্ম্মণ্ডল (halo)। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডল কিন্তু প্রত্যেক বারই নতুন রকমের হয়। সৌর-কলঙ্কের সঙ্গে এর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়। কারণ, সৌর-কলঙ্ক কম-বেশী হলে এই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের (halo) আলোর পরিমাণও কম বেশী হয়।

স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে সাদা আলোক-রশ্মিকে সাত রঙে বিভক্ত এবং প্রত্যেক রঙকে পাতলা খাড়া রেখায় পরিণত করা হয়। ফলে (স্পেকট্রাম লাইন) বর্ণালী রেখার সৃষ্টি হয়। কোন পদার্থ বাষ্পে (vapour) পরিণত করলে যদি আলো নির্গত হয়, স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে তার লিখন হবে কয়েকটি রেখা মাত্র (isolated lines), যাদের থাকবার স্থান নির্ভর করছে পদার্থের উপর। যদি কোন ঘন তরল অথবা অত্যন্ত বেশী চাপের বাষ্পীয় (gas) পদার্থ (যেমন তারকা) থেকে আলোক নির্গত হয়, তাহলে লিখন হবে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী লাল থেকে বেগুনে পর্য্যন্ত, ঠিক রামধনুর মত। যদি এই ধরণের আলো কোন অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাষ্পের স্তর ভেদ করে আসে, তবে অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীর মধ্যে কালো কালো রেখা দেখা যাবে। সেই রেখাগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাষ্পের রেখার অনুরূপ, তবে উজ্জ্বল না হয়ে হ'ল কালো। একপ ঠাণ্ডা বাষ্প নিজের রেখাগুলি শোষণ (absorb) করে নিয়েছে। এর নাম হল শোষণ বর্ণালী (absorbtion spectrum)। সূর্য্যের স্পেকট্রাম ও এই শ্রেণীর মধ্যে কালো কালো রেখা থাকে, যার নাম ফ্রনহফার রেখা। দূরবীক্ষণ দিয়ে যে তথ্য ধরা পড়ে না, এই লিখনের সাহায্যে তা সম্ভবপর হয়েছে।

একই পদার্থের বিভিন্ন স্পেকট্রাম লিখন পাওয়া যেতে পারে, উত্তাপের (temperature) চৌম্বক ক্ষেত্রের (magnetic field) এবং আলোক-উৎসের গতির তারতম্যের জন্য। উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে যৌগ (compound) ভেঙ্গে মৌলে (element) পরিণত হয়। পূর্ব্বেকার লিখন ধীরে ধীরে নূতন লিখনকে স্থান ছেড়ে দেয়। অতএব কম উত্তাপের (low temp) লিখন এবং বেশী উত্তাপের (high temp) লিখন বিভিন্ন হতে পারে। পৃথিবীর মত সূর্য্যও একটি বিরাট চুম্বক। সে জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের তারতম্যে লিখনের তারতম্য হয়। তৃতীয় কারণটির নাম হলো Doppler's effect : যখন আলোক-উৎস দর্শকের (observer) দিকে অগ্রসর হয় অর্থাৎ তাদের মধ্যের দূরত্ব কমে যায়, তখন প্রত্যেক লিখন-রেখার তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও (wave length) কমতে থাকে। এই কমাটা নির্ভর করে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এবং অগ্রগতি-বেগের উপর। দূরত্ব বাড়লে সেই রকম তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। সুতরাং লিখনের নড়া-চড়ায় দূরত্বের হিসাব পাওয়া যায়। এই উপায়ে তারকার মধ্য দিয়ে সূর্য্যের গতিবেগ নিরূপণ করা হয়েছে এবং কবে বেরিয়েছে যে, আমাদের সৌরমণ্ডল আকাশে প্রতি সেকেণ্ডে ১২ মাইল সরে যাচ্ছে। ডপলার্স এফেক্ট থেকে আর একটা তথ্য

নির্দ্ধারিত হয়েছে—সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) স্রোত। সূর্য্যের দেশে আমাদের দেশের মত প্রায়ই ঝড় ওঠে, কিন্তু সেই ঝড়ের বেগের তুলনায় আমাদের প্রচণ্ড ঝটিকাও মৃদুমন্দ সমীরণ মাত্র! ঝড়ে সূর্য্যের চারি ধার দিয়ে অগ্নিশিখা লক্‌লক্ করে বেরিয়ে পড়ে।

কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখে দেখবার লেন্সের স্থানে যদি এমন একটা স্পেকট্রোস্কোপ এঁটে দেওয়া যায়—যার সামনে আলোকের নিয়ন্ত্রণের জন্য ছোট একটি ছিদ্র (Camera slit) আছে, তাহলেই মোটামুটি স্পেকট্রো-হিলিওগ্রাফ তৈরী হয়ে গেল। এই যন্ত্রের সাহায্যে এক-রঙা আলোয় সূর্য্যের ছবি তোলা হয় এবং স্পেকট্রামের লিখন থেকে সূর্য্যের আবহাওয়ার হদিশ মেলে ও তার থেকে সূর্য্যের মধ্যে কি কি পদার্থ আছে তারও সন্ধান পাওয়া যায়।

সূর্য্য প্রতি সেকেণ্ডে ৩'৭৯ × ১০৩৩ আর্গস শক্তি (energy) আলোক, উত্তাপ এবং অন্যান্য তরঙ্গে চারি দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ এবং উপগ্রহ মিলিয়ে এই বিরাট শক্তির ১২ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পাচ্ছে। বিলিয়ে দেবার (radiation) শক্তি সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থেরই বেশী থাকে; সুতরাং সূর্য্যের রঙও কালো এ কথা মনে করলে ভুল হবে না। অত্যন্ত উত্তপ্ত বলে রঙটা লাল দেখায়; আরও বেশী প্রতপ্ত হলে সাদা দেখাতো। এই শক্তি-বিকিরণ থেকে সূর্য্যের বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ মাপা হয়েছে এবং গাত্রের উত্তাপ প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী।

অসংখ্য ভাঙ্গাচোরা পরমাণু প্রচণ্ড গতিতে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে আর মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা তাদের আটকে রাখা হয়েছে, এই হলো সূর্য্যের ভিতরকার হাল-চাল। পরমাণুগুলি যেন এক একটি সৌরমণ্ডল! মধ্যে সূর্য্যস্থানে ধনাত্মক (positive) নিউক্লিয়াস এবং চারি দিকে প্রদক্ষিণ করছে গ্রহের দল, ঋণাত্মক (negative) ইলেকট্রন্স। হাইড্রোজেনে একটি চার্জ্জের নিউক্লিয়াস একটি চার্জ্জের ইলেকট্রন, হিলিয়ামে দু'টি চার্জ্জের নিউক্লিয়াস দুই চার্জ্জের ইলেকট্রন্স আবার ইউরেনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা ভারী এলিমেন্টের ৯২ চার্জ্জের নিউক্লিয়াস আর ৯২ চার্জ্জের ইলেকট্রন্স। নানাবিধ উপায়ে ইলেকট্রনদের কক্ষচ্যুত করা যায়। অবশিষ্ট পরমাণুকে আয়ওনাইজড পরমাণু বলা হয়। সুযোগ পেলেই ইলেকট্রন টেনে নিয়ে ক্ষতি-পূরণ করে পরমাণু আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ভাঙ্গা-চোরায় শক্তি (energy) সৃষ্টি হচ্ছে আর আমরা পাচ্ছি আলো

সূর্য্যমণ্ডলের আকার এবং জ্যোতি

এবং তাপ। ক্রমে এই শক্তি কমে যাবে। সূর্য্যের দেহের ক্ষয়ের পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ৪,০০০,০০০ টন। এক দিন সূর্য্যও পৃথিবী চন্দ্র ইত্যাদির ন্যায় জড় পদার্থে পরিণত হবে। তবে সে অবস্থা আসতে সময় লাগবে কোটি কোটি বৎসর!

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)।

নারীর দ্বন্দ্ব

জীবনের এক ঘাটে স্বচ্ছ ভালোবাসা
লভিবারে আগ্রহ অপার
অন্য দিকে শূন্য সব, ব্যর্থতায় ভরা—
আছে শুধু কর্ত্তব্যের ভার।

আজি বিকশিত তার যৌবন-কুসুম
চপল-চটুল আজি প্রাণ—
তবুও সে পরিম্লান! ভাবে শুধু মনে
কোন্ পথে দ্বন্দ্ব অবসান!

শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য

শবরীর প্রতীক্ষা

[গল্প]

১

যুক্তপ্রদেশের এক প্রসিদ্ধ সহরের ঘটনা।

টালি-ছাওয়া একখানি বাড়ীর বাহিরের ঘরে বসিয়া দু'টি যুবক কথা কহিতেছিল। আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় দু'জনের মুখেই মলিন ছায়া। এক জনের বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ আর এক জনের বয়স বাইশ-তেইশ।

বড় কীর্ত্তিপ্রকাশ বলিতেছিল,—বড় প্রলোভনের দেশ, খুব সাবধানে থাকবে। যেমন যাচ্ছ, এমনি ফিরে এসো, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

দু' হাত কপালে ঠেকাইয়া ঈষৎ আর্দ্র কণ্ঠে ছোট দীপচন্দ বলিল,—আপনার আশীর্ব্বাদ আমি যেন সফল করতে পারি।

কীর্ত্তি বলিল,—সেখানে নিরামিষ খাওয়া চলবে না। সে চেষ্টা করো না। তবে যতটা পারো, শুদ্ধাচারে থেকো। আর তুমি ছোট, কি আর বলবো, স্ত্রীলোক আর সুরা—এ দু'টিকে খুব সাবধান! চাঁদনীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়নি, কিন্তু বিবাহের কথা পাকা।

দীপ বলিল,—আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে। তার পর দু'জনেই ক্ষণকাল নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ পরে কীর্ত্তি বলিল,—কাল এতক্ষণে ট্রেণে থাকবে, পরশু বম্বে, তার পরদিন এমন সময় জাহাজের বুকে!

আর্দ্র কণ্ঠে দীপচন্দ বলিল,—হ্যাঁ।

কীর্ত্তি বলিল,—দেশের মুখ উজ্জ্বল করো।

আর একটু বসিয়া দীপ উঠিয়া পড়িল, বলিল—চাঁদনীর সঙ্গে এই বেলা দেখা করে আসি, কাল আর সময় হবে না।

দীপচন্দ ভিতরে গেল।

উঠানে প্রকাণ্ড নিম গাছে দোলা খাটানো। সেই দোলায় কুড়ি-একুশ বৎসরের শ্যামা যুবতী বসিয়া পায়ের টিপে মৃদু-মন্দ দোল খাইতে খাইতে অলস কণ্ঠে গাহিতেছিল—

> উমড়ি ঘুমড়ি আই কারীরে বদরীয়া
> যায় রহে পিয়া মোর কৌন নগরীয়া।
> যব্ সে গয়ে মোরী সুধ হু নলিনি
> এ হি সোচ মোরী বারী রে উমরিয়া। *

শ্রাবণ মাস—পশ্চিমে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী এ সময় দোলা খাটানো হয়। মেয়েরা দোলনায় বসিয়া দোল খায়, গান গায়। 'কাজরী' গান।

মৃদু পায়ে কাছে আসিয়া দীপচন্দ দোলার দড়ি ধরিয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিল,—ও অলক্ষুণে গানটা আজ আর কেন গাইছ চাঁদনী? বিদেশে যাচ্ছি, কি জানি সেখানে কি হবে।···আজ যাবার দিনে ও-গানটা আর গেয়ো না!

চাঁদনী দোলা হইতে নামিল। দু' চোখে জল টল্‌টল্ ঝরিতে-ছিল, ধানীরংয়ের ছোপানো কাপড়ের আঁচলে চোখের জল মুছিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

দীপ বলিল,—এসো, ভিতরে বসি।

শ্রাবণের আকাশ সীসা-রং ধরিয়াছে। দুই একটা বড় বড় ফোঁটা দু'জনের গায়ে পড়িল। চাঁদনী নিরুত্তরে দীপের সহিত ভিতরে গেল।

চাঁদনীর পিতা আর্য্য-সমাজী প্রচারক ছিলেন, দীপচন্দ তাঁহার বন্ধুর পুত্র। দু'জনেই যখন শিশু, দু'জনের বিবাহ দিতে তখন তাঁহারা বাগ্‌বদ্ধ হন। তবে স্থির হয়, দীপচন্দ উপার্জ্জনশীল হইলে তখন বিবাহ হইবে।

তাহার পর প্রায় দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চাঁদনীর পিতার লোকান্তর হইয়াছে—অবস্থাও পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু গিরিধারীলাল তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভুলেন নাই। স্থির ছিল, এই আষাঢ়েই বিবাহ হইবে। কিন্তু দীপচন্দ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈদেশিক শিক্ষার বৃত্তি পাওয়ায় গিরিধারীলাল ও চাঁদনীর দাদা কীর্ত্তিপ্রকাশ দু'জনেই স্থির করিলেন, সে ফিরিয়া আসিলে বিবাহ হইবে।

কীর্ত্তি কাংড়া গুরুকুল ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষা শেষ করিয়া ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য বরণ করিয়া লইয়াছিল। বিবাহ করে নাই। অন্য ভগিনীদের বিবাহ হইয়াছে; তাহারা শ্বশুরালয়ে আছে, শুধু অনূঢ়া চাঁদনী তাহার কাছে থাকে। ভ্রাতার আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল নয় বলিয়া চাঁদনী স্থানীয় আর্য্যকন্যা-পাঠশালায় শিক্ষয়িত্রীর চাকরী লইয়াছে। ভাবী শ্বশুর গিরিধারীলাল তাহাতে অমত করেন নাই।

দীপচন্দ খাটিয়ার উপর বসিয়া চাঁদনীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—এসো, এখানে বসো। পরস্পরকে স্বামি-স্ত্রী জানিলেও তাহারা কখনও বাড়াবাড়ি করে নাই, তাই চাঁদনী দীপচন্দের মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

দীপ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আর একটু কাছে টানিয়া বলিল,—কখনও বলিনি। কত দিনের মত যাচ্ছি, কত দিন দেখতে পাবে না, আজ একটু কাছে এসে বসো।

চাঁদনী নিরুত্তরে তাহার কাছে আসিয়া বসিল,—কপোলের উপর দিয়া জলবিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

দীপ তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সযত্নে সে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া সজল কণ্ঠে বলিল,—চুপ করো চাঁদনী। আড়াইটে কি বড় জোর তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। মন খারাপ করো না। প্রতি মেলে যেন চিঠি পাই।

চাঁদনী অস্ফুট স্বরে বলিল,—আমি লিখবই,—তুমি ভুলো না।

দীপ বলিল, কেন এখন থেকেই সে ভয় করছ না কি?

রুদ্ধ কণ্ঠে চাঁদনী বলিল, জানি না। আমার কেমন কেবলই মনে হচ্ছে, তোমায় যেন আর আমি পাবো না।

হাসিয়া দীপ বলিল, তুমি একেবারে পাগল হয়ে গেছ। এমন ভয় করলে এই আড়াই বছর তিন বছর তুমি কি করে কাটাবে? ছি, মন খারাপ করো না, আমি ঠিক তোমার কাছে ফিরে আসবো।

---

* "আকাশ ঘনঘোর মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। আমার প্রিয় বিদেশে যাইতেছেন। বিদেশে গিয়া পর্য্যন্ত আমার স্মরণ করেন নাই। আমার বালিকা বয়স, ইহাই চিন্তার কারণ।"

আজ বিশ বছর থেকে তুমি আমার, তোমায় কি ভুলতে পারি? চাঁদনীর সিক্ত আঁখিপাতে দীপ চুম্বন করিল।

২

অজস্র পত্র আসিতে লাগিল—বম্বে, এডেন, পোর্টসৈয়দ, মাল্টা, জিব্রাল্টার হইতে। কীর্ত্তিও চিঠি পাইতেছিল। হাসিয়া এক দিন কীর্ত্তি চাঁদনীকে বলিল,—এত চিঠি কিন্তু বিলেত পৌঁছে দেবে না, কি বলিস্ চাঁদনী?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া চাঁদনী লজ্জানত মুখে বলিল,—না। এখন দূরে গেছেন, মায়া বেশী।

কীর্ত্তি বলিল, তাছাড়া এখনও বাইরের কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়নি। সেখানে গিয়ে পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ হলে এত চিঠি দেবার সময় আর পাবে না। কি বলিস্?

কীর্ত্তির অনুমান মিথ্যা হইল না। কেম্ব্রিজে ভর্ত্তি হইবার পর হইতেই দীপচন্দ্রের পত্র আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল, এবং সে সব পত্র আকারে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে লাগিল। যাহা আসিত, অর্দ্ধেকটা সে দেশের নারীজাতির গুণকীর্ত্তনে পূর্ণ থাকিত।

গিরিধারীলাল এক দিন কীর্ত্তিকে বলিলেন,—দীপ দেখছি ওদেশের মেয়েদের ভারী ভক্ত হয়ে পড়েছে! একটা কিন্তু ভালো নয়!

ভালো কীর্ত্তি-প্রকাশেরও লাগিতেছিল না। কিন্তু উপায় কি! বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে বলিল,—এতে আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন কাকা? এদেশের তুলনায় তারা কত আলাদা, ও ছেলেমানুষ,—ওর কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে বলেই লেখে।

একটু মৌন থাকিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—তোমার কথাই যেন সত্য হয়। চাঁদনীকে চিঠিপত্র লেখে তো?

কীর্ত্তিপ্রকাশ বলিল,—লেখে।

গিরিধারীলাল একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন,—তোমার বাবার কাছে আমি সত্যে বদ্ধ আছি। দীপ তা থেকে কি করে আমায় মুক্তি দেবে, তাই আমার ভাবনা। সে ফিরলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ইহারই পরের মেলে কিন্তু একখানি পত্র পাইয়া কীর্ত্তি স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার পরিচিত একটি ছেলে বিলাতে ছিল। সে দীপচন্দ্র ও চাঁদনীর সম্পর্কের বিষয় অবগত ছিল। সে লিখিতেছে, আট-দশ দিন পূর্ব্বে উইক এণ্ডে দীপকে একটি স্ত্রীলোকের সহিত সে গ্রামে যাইতে দেখিয়াছে,—দু'জনের আচরণ তেমন ছিল না ইত্যাদি।

কীর্ত্তি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। চাঁদনী দীপচন্দ্রের পত্র না পাইয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া আছে, সে যদি এ কথা জানিতে পারে?......

কীর্ত্তিপ্রকাশ চিন্তায় এমন মগ্ন ছিল যে, গিরিধারীলাল কখন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, জানিতে পারে নাই!

বিলাতী ছাপ-মারা পত্র দেখিয়া গিরিধারীলাল বলিলেন,—কার চিঠি কীর্ত্তি?

কীর্ত্তি সহসা কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

গিরিধারীলাল বলিলেন,—দীপ ভাল আছে ত?

কীর্ত্তি কি উত্তর দিবে ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, দীপের চিঠি নয় কাকা!

গিরিধারীলাল একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন—দীপের কোনো খবর আছে না কি?

কীর্ত্তি তখন অগত্যা পত্রখানা পড়িয়া শুনাইল।

গিরিধারীলাল বহুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিবার পর সক্ষোভে বলিলেন, চাঁদনীকে যেন কিছু জানাইও না। আমি আজই তাকে চিঠি দেব। হুঁ! ছেলে আমার মানুষ হয়ে এলো! এই তার উচ্চ শিক্ষা!

কীর্ত্তি নিশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

গিরিধারীলাল চলিয়া গেলে কীর্ত্তি ভিতরে আসিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—চাঁদনীর কাছে লুকানো চলে নাই। সে ভিতরে দ্বারের গায়ে মাথা ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, মুখখানি তাহার বেদনার ছায়ায় মলিন। কীর্ত্তিকে দেখিয়া সে নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

৩

কিন্তু ঐটুকুতেই নিষ্কৃতি মিলিল না। বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে দীপচন্দ্র একটা নারী-ঘটিত মামলায় জড়িত হইয়া পড়িল। ধনবান পিতা জলের মত অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু কথাটা গোপন রহিল না। সংবাদপত্রের দ্বারা রাষ্ট্র হইয়া গেল। আত্মীয়-স্বজনের এত দিন চিন্তার অবধি ছিল না, যে দিন কেব্‌লে জানা গেল দীপ মুক্তি পাইয়াছে, সে দিন সকলেই যেন নূতন হাওয়ায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! চাঁদনী দীপচন্দ্রের ছবিখানি বাহির করিয়া বহুক্ষণ সে দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, গালের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল অবিরল জলধারা। ব্যথিত মৃদু কণ্ঠে সে বলিল, আমাকে ভুলেছ, তার জন্যে অনুযোগ করি না। কিন্তু নিজেকে এমন করে বিপন্ন করলে কেন?

ইহার দুই তিন দিন পরে গিরিধারীলাল আসিয়া কীর্ত্তিকে বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।

কীর্ত্তি সসম্ভ্রমে বলিল, বলুন।

গিরিধারীলাল ক্ষণকাল মৌন থাকিবার পর নিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন, আমার চোখে দীপচন্দ্র মরে গেছে, তার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু আমি তোমার বাপের কাছে যে সত্য করেছিলুম, সে সত্য আমি জীবিত থাকতে অটুট থাকবেই—কি বলো?

কীর্ত্তি নীরব রহিল। কত বড় মনোবেদনায় যে বাপের মুখ দিয়া এমন কথা বাহির হয়, তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহার মুখে ভাষা ফুটিল না।

গিরিধারীলাল বলিলেন, আমার সত্য আমার কাছে। আমি একটা প্রস্তাব করছি—তুমি কি বল শুনি।

কীর্ত্তি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বলুন।

গিরিধারীলাল বলিলেন, প্রেমচন্দ্র চাঁদনীর চেয়ে ছোট, আমার সে জন্য অমত আছে। কিন্তু ধ্যানচন্দ্রের সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, আমি মনে কচ্ছি, তার সঙ্গে চাঁদনীর বিয়ে দিয়ে মৃত বন্ধুর কাছে সত্য-মুক্ত হই। একটু থামিয়া বলিলেন, ধ্যানচন্দ্র তোমারই সবচেয়ে বন্ধু, কাজেই তার সম্বন্ধে আমার চেয়েও তুমিই বেশী জানো। অবশ্য তার একটি মেয়ে আছে, তবে আশা করি, চাঁদনীর কাছে তার অযত্ন হবে না।

কীর্ত্তি ক্ষণকাল মৌন থাকিবার পর গিরিধারীলালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, চাঁদনী কি রাজী হবে?

গিরিধারীলাল বলিলেন, মেয়ে আছে বলে বলছ ?

কীর্ত্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে জন্য নয়। দীপচন্দ্রের সঙ্গে তার কুড়ি বছরের সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে অন্যকে বিয়ে করতে—

গিরিধারীলাল বলিলেন, আমি তার বাপের বয়সী। আমি কি ন্যায়-অন্যায় বুঝি না ? তাকে বলো, এতে ধর্ম্মের কোন হানি হবে না। তুমি চাঁদনীকে একবার জিজ্ঞাসা করো।

কীর্ত্তি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, বৃদ্ধ গিরিধারীলালের কাছে ধর্ম্মই একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছে, কিন্তু তরুণী চাঁদনীর কাছে ইহারও উপর একটা জিনিস আছে—অন্তর,—সে যদি গিরিধারীলালের প্রস্তাবিত বিবাহে সায় না দেয়, তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে কি ? তথাপি সে নিজেও স্বীকার করিল, গিরিধারীলালের প্রস্তাব চাঁদনীর পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু বলি বলি করিয়াও সে চাঁদনীর নিকট কথাটা সে দিন বলিতে পারিল না। পরদিন এক সময় চাঁদনী রন্ধন করিতেছে দেখিয়া সে রন্ধনাগারের দ্বারের নিকট গিয়া বসিল। চাঁদনী বা হাতে একখানা পিঁড়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ওঠ, পিঁড়েটায় বোস।

কীর্ত্তি একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বলিল, কাল কাকা এসেছিল।

চাঁদনী তরকারী নাড়িতে নাড়িতে বলিল, জানি। তাঁর গলা পাচ্ছিলুম।

কীর্ত্তি তখন চোখ-কাণ বুজিয়া তাঁহার প্রস্তাবটি চাঁদনীর কাছে বলিয়া ফেলিল। কথা সমাপ্ত করিয়া সে চাঁদনীর দিকে চাহিয়া দেখিল, চাঁদনী পলকহীন প্রস্তরীভূত দৃষ্টি তাহার মুখে নিবদ্ধ করিয়া আছে ! সে এত স্থির যে, প্রাণের চিহ্ন তাহার দেহে নাই। কীর্ত্তি ব্যথিত ভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। সে সবই বোঝে, তবু তাহার কর্ত্তব্য ও মঙ্গলেচ্ছা তাহাকে কঠোর হইতে বাধ্য করিতেছে। মিনিট পাঁচ-সাত পরে আবার টুংটাং শব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইয়া কীর্ত্তি দেখিল, চাঁদনী আবার তাহার আরব্ধ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছে। কীর্ত্তি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাকাকে কি বলব চাঁদনী ? তিনি তোমার উত্তরের অপেক্ষা করছেন।

চাঁদনী চাপা-গলায় বলিল, কাকা পাগল হয়েছেন।

কীর্ত্তি বলিল, পাগলামী নয় চাঁদনী, জ্ঞানীর কথা। দীপ ত বয়ে গেল, ওর ওপর আর আশা করা যায় না, কিন্তু তোমার ত একটা উপায় করা চাই !

চাঁদনী উনানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আমি ত উপার্জ্জন করেই খাচ্ছি, আমার আর উপায় কি ?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কীর্ত্তি বলিল, আমরা বেঁচে থাকতে ঐ ব্যবস্থাকে তোমার শেষ ব্যবস্থা বলে স্বীকার করে নিতে পারি না।

চাঁদনী মৃদু কণ্ঠে বলিল, তাই তোমরা এই ব্যবস্থা ঠিক করেছ ?

কীর্ত্তি বলিল, তাছাড়া উপায় কি ? তাছাড়া কাকা আমাদের গুরুজন, তিনি বিচক্ষণ, তিনি কি অন্যায় কথা বলতে পারেন ?

চাঁদনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা সত্যি, কিন্তু ছেলের ব্যবহারে কাকা মর্ম্মাহত হয়ে এ প্রস্তাব করেছেন। বাবার সঙ্গে কাকা যে সত্যবদ্ধ ছিলেন, তা তিনি ভাঙ্গেননি, ভবিতব্য ভেঙ্গেছে। অন্য ছেলের সঙ্গে তিনি বাগ্‌দান করেননি, কাজেই তাঁর দায়িত্ব কেটে গেছে। কাকা তাঁর ছেলেকে মৃত জ্ঞান করতে পারেন,—কিন্তু আমি তা পারব না। কুড়ি বছরের সম্বন্ধ, জলের আঁক নয়।

শেষের দিকটা তাহার গলা ধরিয়া আসিল।

৪

ইহার পর দীপচন্দ্রের পত্র আসিল। আষ্টে-পৃষ্ঠে ভরিয়া আট পাতা পত্র লিখিয়া সে আপনাকে যতটা পারিয়াছে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিয়াছে, এবং চাঁদনী যেটুকু অবশ্য জানে, সেটুকুর জন্য বার বার ক্ষমা চাহিয়া পত্র শেষ করিয়াছে। কুৎসিত ব্যাপারের যবনিকা পাত হওয়ায় সকলেই স্বস্তি বোধ করিল, শুধু চাঁদনী ম্লান হাসি হাসিয়া পত্রখানা তুলিয়া রাখিল। দীপচন্দ্রের আট পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রের বিষয়ে না করিল কোন জেরা, না চাহিল কোন কৈফিয়ৎ ! যেন কিছুই হয় নাই এমনই করিয়া তাহাকে উত্তর দিল।

নিশ্চিন্ত হইল না শুধু কীর্ত্তি। সে দীপচন্দ্রের খোঁজ-খবর খুব বেশী করিয়া লইতে লাগিল, এবং তাহার নৈতিক অবনতির সংবাদ প্রায় প্রতি মেলেই পাইতে লাগিল। তাই তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, চাঁদনীর সহিত তাহার সূক্ষ্ম যোগসূত্রটিকে ছিন্ন করিয়া দিয়া তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করে।

সুযোগ মিলিল। এই সময় কীর্ত্তির বাল্যবন্ধু মহেন্দ্র সিং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিল। মহেন্দ্র অকৃতদার। কীর্ত্তি তাহার সহিত চাঁদনীর পরিচয় করিয়া দিল, এবং ঘন ঘন আসিবার নিমন্ত্রণ দিল। মনে করিল, অনুপস্থিত উচ্ছৃঙ্খল দীপচন্দ্রের ছায়া চরিত্রবান্ সুদর্শন মহেন্দ্র সিং যদি ঢাকিয়া দিতে পারে,—হয়ত চাঁদনীর জীবন ব্যর্থ না হইয়া সার্থক হইতে পারে।

আকর্ষণীয় বস্তুর অভাব না পাইয়া মহেন্দ্র সিং তাহার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিল না।

অস্বস্তি বোধ করিল চাঁদনী। সে কীর্ত্তির আন্তরিক ইচ্ছা অনুমান করিতে পারিয়াছিল,—কীর্ত্তির উপর সে জন্য রাগ করিতে পারিল না, বরং স্নেহময় অগ্রজের মঙ্গলেচ্ছা তাহাকে অভিভূত করিল, তথাপি সে ভাবিয়া পাইল না—এমন অসম্ভব কাজ সে কি করিয়া করিতে পারে ! মহেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গ তাহার ভালো লাগে না, তাহার বিবেকে আঘাত লাগে,—মনে হয়, দীপ যে দেশেই থাকুক, তাহাদের কুড়ি বৎসরের সম্পর্ক চাঁদনীর চারি পাশে একটি গণ্ডী টানিয়া রাখিয়াছে, সেখানে মহেন্দ্র সিংয়ের প্রবেশাধিকার নাই। তথাপি শিষ্ট, ভদ্র মহেন্দ্র সিংয়ের ব্যবহার এমনই মার্জ্জিত ও সম্ভ্রমপূর্ণ যে, তাহাকে এড়ানো চলে না। অথচ নির্ব্বিবাদে এই ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দিলে ক্রমে তাহা ঘনিষ্ঠতর হইয়া জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে !

মহেন্দ্র সিং এক দিন কীর্ত্তিকে বলিল,—তুমি যদি রাজী হও, তাহলে চাঁদনীকে আমার হাতে দাও।

কীর্ত্তি বলিল,—তোমার হাতে চাঁদনীকে দিতে পারলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান্ মনে করব মহেন্দ্র, কিন্তু মুস্কিল কি জান, আমি চাঁদনীর অমতে কিছু করতে পারি না। তুমি চাঁদনীর মত নাও, আর এ কথাও তাকে বলো, আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি তাকে বিবাহ করো।

মহেন্দ্র সিং প্রীত হইয়া বলিল,—আচ্ছা।

ইহারই কয়েক দিন পরে এক দিন মহেন্দ্র সিং চাঁদনীর কাছে প্রস্তাব করিল। চাঁদনী কীর্ত্তির জন্য পুল-ওভার বুনিতেছিল। বোনা থামাইয়া মহেন্দ্র সিংয়ের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিন্তু

বিস্মিত হইল না। সে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—আপনি জানেন, আমি বাগ্‌দত্তা ?

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল,—না, তা-ত' জানি না। কার বাগ্‌দত্তা আপনি ?

চাঁদনী বোনা গুটাইতে গুটাইতে বলিল,—গিরিধারীলাল রইসের ছেলে দীপচন্দের—যিনি বিলেত গেছেন।

মহেন্দ্র সিং একটু খোঁচা দিয়া বলিল,—যিনি মিস্ গার্ডিনীরকে নিয়ে একটা মকর্দ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ?

চাঁদনীর মুখ কালো হইয়া গেল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সেই বটে !

মহেন্দ্র এক মিনিট নীরব থাকিবার পর বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

চাঁদনী চোখ তুলিয়া চাহিল।

মহেন্দ্র সিং বলিল,—তিনি কি সে সম্পর্কের মর্য্যাদা রেখেছেন ?

চাঁদনী শ্লেষের সহিত বলিল,—চোখের আড়াল হলে ক'জন পুরুষ রাখে ?

মহেন্দ্র আহত ভাবে বলিল,—সমস্ত জাতকে দোষ দেবেন না চাঁদনীজী ! কেউ কি রাখে না ?

চাঁদনী নির্লিপ্ত স্বরে বলিল,—হবে, সকলে হয়ত সমান নয়।

মহেন্দ্র কথাটাকে ঐখানেই শেষ হইতে দিল না, জের টানিয়া বলিল,—কিন্তু তাঁর দিক্ থেকে যখন কথার মর্য্যাদা রাখা হয়নি তখন তার মূল্য কি ? এ একটা পবিত্র কনট্রাক্ট, এক জন ভাঙ্গলে দ্বিতীয়ের আর কোন দায় থাকে না।

ঈষৎ হাসিয়া চাঁদনী বলিল,—মহেন্দ্রজী, আপনি আইন নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা নাড়াচাড়া করেন বলে আপনার কাছে আইনের ফাঁকি সহ্য হয় না। কিন্তু এ কনট্রাক্ট আমরা সই করিনি, এ কনট্রাক্ট স্থির করে রেখেছিলেন, আমাদের দু'জনের পিতা। কাজেই সই করা না থাকলেও পাকা দলিল। এর নাম আইন নয়, ধর্ম্ম।

মহেন্দ্র সিং বলিল, ধর্ম্মের অন্য নাম কি জানেন ? ঠকানো। মানুষকে ধর্ম্মের নাম শুনিয়ে যত মূঢ়-বুদ্ধি করে দেওয়া যায় তত আর কিছুতেই নয়। প্রাচীন কালের লোক বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাই ধর্ম্মের নাগপাশে মনুষ্য-সমাজের হাত-পা বেঁধে রেখে গেছেন।

চাঁদনী বলিল, অতএব তাকে অগ্রাহ্য করা মানুষের সাধ্য নয় ? মিছিমিছি কতকটা অশান্তির সৃষ্টি হয় মাত্র ?

মহেন্দ্র সিং বলিল, আপনি ভুল বলছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার জীবনে অশান্তি এনে দিচ্ছে আপনার ধর্ম্মের প্রেরণা। আপনি যদি ঐ অকিঞ্চিৎকর দুই বৃদ্ধের মুখের কথাকে অগ্রাহ্য করেন, তা হলে আপনার জীবনে সুখ এবং শান্তির অভাব হবে না।

চাঁদনী বলিল, তাঁরা দু'জনেই আমার পূজনীয়। তাঁরা আমার শুভ কামনাই করেছিলেন, সার্থক হলো না—সে আমার ভাগ্য ! তাঁরা তার দায়িত্ব নিতে পারেন না।

মহেন্দ্র সিং বলিল, কিন্তু জেনে-শুনে এমন দুশ্চরিত্রকে—

বাধা দিয়া চাঁদনী বলিল, মহেন্দ্রজী, আপনার আর আমার মত মিলবে না, আপনি দেখছেন আইনের দিক থেকে, তাই আমার কথা আপনার অযৌক্তিক লাগছে। কিন্তু আমি দেখছি ধর্ম্মের দিক থেকে, তাই আমার কাছে এটা অসহনীয় লাগছে না, আমি ভাগ্য বলে এটা স্বীকার করে নিচ্ছি।

মহেন্দ্র বলিল, এ ভাবে ভাগ্য মেনে নেওয়া জড়তার নামান্তর নয় কি ? পুরুষকার বলে কি কিছু নেই ? আপনার ভবিষ্যৎ আপনার হাতে, আপনি ইচ্ছে করলেই তাকে নিতে পারেন। তবু আপনি তা না নিয়ে ভাগ্যকে আঁকড়ে থাকবেন ? এ ভাগ্যনিষ্ঠা শুধু আপনাকে বিড়ম্বনা দেবে। জলের আঁক, সহজেই মোছা যায় চাঁদনী।

চাঁদনীজী ম্লান হাসিয়া বলিল, জলের আঁক হলে আপনি মুছে যায়, মুছতে হয় না মহেন্দ্রজী। সব জিনিষ কি পরকে বোঝানো যায় ?

মহেন্দ্র বলিল, আপনি এখনও নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাই মনে কচ্ছেন জগৎ বুঝি চিরদিন এমনি থাকবে। কিন্তু তা তো থাকে না। মানুষের অসুখ-বিসুখ বিপদ্ আপদ্ সবই আছে। একলা সে ঝড় ঝাপটা সহ্য করা কঠিন হয় বলেই মানুষের চিরজীবনের সাথীর প্রয়োজন হয়—যে দুর্দ্দিনে পাশে এসে দাঁড়াবে। আপনি একলা পথ চলতে চাইছেন, কিন্তু দুর্দিনে আপনার রক্ষক কে ?

চাঁদনী শুষ্ক হাসিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিল। বলিল, ওঁর চেয়ে বড় রক্ষক কেউ নাই মহেন্দ্রজী। স্বামীও নয়। উনি স্বামীরও রক্ষক। তাহার পর এক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিল, আপনি দাদার বন্ধু, দাদার মতনই আপনিও আমার মাননীয়, এ কথা আর উত্থাপন করবেন না। ছোট বোন বলেই মনে করবেন।

৫

সময় পূরা হইয়া গেলে দীপ দেশে ফিরিল। ইদানীং তাহার সম্বন্ধে তেমন কিছু মন্দ সংবাদ না পাইয়া সকলেই তাহার সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছিল।

কিন্তু সকলের আশাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া দীপচন্দ একেবারে বিবাহ করিয়া ফিরিল।

গিরিধারীলাল অন্য দুই পুত্র ও কীর্ত্তিসহ ষ্টেশনে গিয়াছিলেন তাহাকে আনিতে, সকলে মুখ কালো করিয়া গৃহে ফিরিলেন। দীপচন্দ সস্ত্রীক হোটেলে গেল।

* * * *

বাড়ী ফিরিয়া কীর্ত্তি দেখিল, চাঁদনী অত্যন্ত প্রত্যাশাপন্ন মুখে জানলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উৎসুক দৃষ্টির পানে চাহিয়া কীর্ত্তির যেন চোখ ফাটিয়া জল আসিবার উপক্রম হইল ! কেমন করিয়া কীর্ত্তি তাহার বুকভরা আশায় বজ্রাঘাত করিবে ! চাঁদনী ক্ষণকাল কীর্ত্তিপ্রকাশের বেদনাহত স্তব্ধ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কি যেন অনুমান করিয়া লইয়া মৃদু পদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কীর্ত্তি বাহিরের ঘরে বসিয়াই আত্মসম্বরণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে হইল, চাঁদনী কত উৎকণ্ঠায় আছে ! এ উৎকণ্ঠার অপেক্ষা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সঠিক ভাবে জানিয়া লওয়াই ভাল। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সে ভিতরে গেল। শয়ন-কক্ষের দ্বারে পিঠ দিয়া চাঁদনী নিমগাছটার দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, কীর্ত্তিকে দেখিয়া শিথিল অঞ্চল কাঁধে তুলিয়া দিল।

তাহার শুষ্ক, করুণ মুখের পানে চাহিয়া কীর্ত্তির বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিল, মুহূর্ত্ত কাল তাহার কণ্ঠে শব্দ ফুটিল না, তাহার পর কাতর স্বরে বলিল, দীপচন্দ বিয়ে করে ফিরল চাঁদনী !

চাঁদনী এমনই একটা কিছু অপ্রিয় সংবাদ শুনিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাই বিস্মিত হইল না। শান্ত শোকাচ্ছন্ন দৃষ্টি তুলিয়া কীর্ত্তিপ্রকাশের মুখপানে মিনিটখানেক চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বলিল, উপায় কি? যার যা রুচি!

ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু মেয়েটির দিকে কীর্ত্তি ক্ষণকাল অবাঙ্মুখে চাহিয়া থাকিবার পর ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেল।

গভীর রাত্রে কীর্ত্তিপ্রকাশের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন-ধ্বনি কানে যাইতে সে উঠিয়া বাহিরে আসিল। চাঁদনীর কক্ষের মুক্ত দ্বারপথে দেখিতে পাইল, ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ছোট একখানি টিপয়ের উপর, দীপচন্দের একখানি ছবি রহিয়াছে এবং চাঁদনী মৃদু স্বরে তুলসীকৃত রামায়ণ হইতে শবরীর প্রতীক্ষা পড়িতেছে। গালের উপর দিয়া গড়াইতেছে জলধারা। কীর্ত্তির দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

বৈষ্ণব-পদাবলী

বৈষ্ণব-পদাবলী লইয়া আলোচনা করিলে মনে হয়—এইগুলি যেন একটি রসগোষ্ঠীর সমবেত সৃষ্টি। একটা ভণিতা দেওয়ার প্রথা ছিল, তাই যেন একটা ভণিতা দ্বারা পদগুলি পরিসমাপ্ত। বহু কবি তাঁহাদের রচিত পদে বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের ভণিতা চালাইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন—সেই জন্যই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নামে পদসংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া গিয়াছে। একই নামের কবি একাধিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা আপন আপন ভণিতাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার চেষ্টাও করেন নাই। আত্মবিলোপই যে তাঁহাদের সাধনার অঙ্গীভূত। পদগুলি যেন একটি রসধারার কতকগুলি কলবিন্দ। রসধারার প্রবাহ-রক্ষাই সেকালের সাধক কবিদের লক্ষ্য ছিল। রসস্রোতের সোণার তরীতে সোণার ফশল তুলিয়া দিয়াই তাঁহারা দায়মুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে যায় চ'লে তার দেয় না ঠিকানা।"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনাই অধিকাংশ কবির আদর্শ ছিল। তাঁহাদের কথাই পরবর্ত্তী কবিরা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়াছেন। একই বক্তব্যকে কেহ বা নূতন অলঙ্কারে—কেহ বা নূতন ছন্দে—কেহ বা অভিনব রীতিতে বাণী-রূপ দিয়াছেন। বলিবার ভঙ্গীটাকেই তাঁহারা প্রাধান্য দিয়াছেন। যাঁহার যাহা নিজস্ব ছিল—অনেক সময় সেটুকুকেও তাঁহার রচনায় রূপ দেওয়ার সুযোগ সুবিধা হয় নাই, প্রচলিত রসাদর্শ ও বিধি-বিধানের অনুগত হইয়া তাঁহাদের চলিতে হইত। পাছে রসাভাস ঘটে, পাছে সুরসৌষম্য নষ্ট হয়—পাছে গোষ্ঠী-ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হয়—পাছে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অনুশাসন লঙ্ঘিত হয়, এ আশঙ্কা তাঁহাদের লেখনীকে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। একটা বিরাট মহাসংকীর্ত্তনে দুই এক জন মূল-গায়নের কণ্ঠের সঙ্গে সকলে সুর মিলাইয়া গিয়াছেন।

পদাবলী-সাহিত্যকে গীতি-কবিতা (lyric) আখ্যা দেওয়া চলে না। গীতি-কবিতার একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য থাকে। কবি তাহাতে নিজের প্রাণের কথাই বলেন, নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকেই ছন্দে রূপ দান করেন। পদাবলীর মত একটা গোষ্ঠী, সমাজ বা সম্প্রদায়ের ভাব-ধারাই তাহার উপজীব্য হয় না। অন্ততঃ রচনাশৈলী বা ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী গীতি-কবির নিজস্ব থাকে—অন্ধ ভাবে একটা অনুশাসনের বিধিবদ্ধ রীতি বা ভঙ্গীর অনুসরণ গীতি-কবিতা নয়। গায়কের কণ্ঠের মুখাপেক্ষী হইয়া গীতি-কবিতা রচিত হয় না। পদাবলী যেন অর্দ্ধ সৃষ্টি—পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে গায়কের কণ্ঠে। গানের সুরের দিকে উৎকর্ণ হইয়া অথবা মনে মনে গাহিয়া পদকর্ত্তারা পদ রচনা করিতেন বলিয়া মনে হয়। তাই বোধ হয় তাঁহাদের কাছে সে সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে হইত।

পদগুলি যেন এক একটি শ্লোকের মত। শ্লোকের মতই যেন ইহাদের চতুঃসীমা বিধিবদ্ধ। অনেক পদ রূপ গোস্বামী, কবিকর্ণপুর ইত্যাদি কবিদের বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকের ভাবানুবাদ। কোন একটি বিশেষ ভাবকে বিকসিত করিয়া তোলাই বহু পদের উদ্দিষ্ট নয়, সনেটের মত নির্দ্দিষ্ট সীমা-বন্ধনের মধ্যে সুরের প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই পদকর্ত্তারা স্বকীয় ভণিতা দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিতেন; —গীতি-কবিতার বিকাশ-ধারা অনুসরণ করিতেন না। অনেক সময় কোন একটি বিশিষ্ট ভাবের বিকাশ সাধন না করিয়া তিন চারিটি বিভিন্ন ভাবের অন্তরার সাহায্যে পদটিকে পরিপূর্ণতা দান করিতেন। পদের গঠনে একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী থাকায় বাধ্য হইয়া কবিদের ভাবাবেগ সংবরণ করিতে হইয়াছে। অনেক পদে একই লেখার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অনেক পদ একই অলঙ্কারের ভিন্নভিন্ন দৃষ্টান্তের একত্র গুম্ফিত রূপ। অলঙ্কার-বিশেষের প্রয়োজন মিটিয়া গেলেই অনেক পদ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

শব্দালঙ্কার ও প্রাণহীন অর্থালঙ্কারের আতিশয্য বহু সংস্কৃত কাব্যকে অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছে। বৃন্দাবনলীলা হৃদয়-মাধুর্য্যের মহা মহোৎসব। ইহাতে ঐ শ্রেণীর আলঙ্কারিক-আতিশয্য আমরা প্রত্যাশা করি নাই। চৈতন্যোত্তর কবিদের বহু পদে আমরা ক্লিষ্ট কল্পনা ও শ্লিষ্ট কল্পনার আলঙ্কারিক-প্রাধান্য দেখিতে পাই। রূপ-বর্ণনার ত কথাই নাই—অভিসার, বিহার ইত্যাদি বর্ণনাতেও আলঙ্কারিক-চাতুর্য্যের প্রসাধন অত্যন্ত বেশী। অভিসারের আয়োজন ও অভিযানের বর্ণনা একেবারে conventional, ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই বক্রোক্তি ও শ্লেষের আতিশয্য। তৃণাদপি সুনীচ কামিনী-কাঞ্চন-বিরাগী দীনদাসের দল অলঙ্কারের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই কেন? ইহার একটা উত্তর আছে। ভক্ত কবিরা শাব্দিক কলাচাতুর্য্য-সৃষ্টিকেও উপাসনা বা সাধনার অঙ্গীভূত মনে করিতেন।

গায়ক ভক্ত যেমন গানের দ্বারা নটী, উপাসিকা বা দেবদাসীরা যেমন নৃত্যের দ্বারা শিল্পী, ভক্ত যেমন অঙ্গরাগ ও ভক্তি রচনার দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তেমনি ভাষা-ছন্দের মণ্ডন-শিল্পের দ্বারা তাঁহাদের উপাস্যের উপাসনা করিতেন। যাহার যাহা সম্বল, ভগবানের উদ্দেশে তাহার সমর্পণই উপাসনা। দেবতার শৃঙ্গার-বেশ রচনা যেমন পরিচর্য্যা ও উপাসনার অঙ্গ, আলঙ্কারিক-চাতুর্য্য সৃষ্টিও তেমনি সাধনারই অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। যাঁহার এইরূপ আলঙ্কারিক-চাতুর্য্যসৃষ্টির শক্তি আছে—তিনি যদি তাহা রাধাশ্যামের সেবায় সমর্পণ না করেন—তাহা হইলে সেবাপরাধ হইবে—ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের ধারণা ছিল।

যেখানে বিহার ও সম্ভোগ-লীলার বর্ণনা করিতে হইয়াছে, সেখানে তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইয়াছে। সর্ব্বজনোচ্ছিষ্ট অনলঙ্কৃত ভাষায় সে বর্ণনা দিলে অনধিকারী প্রাকৃত জনের পক্ষে সহজে অধিগম্য হইয়া উঠিবে। তাই তাঁহারা সম্ভোগ বর্ণনার পদগুলির ভাষাকে অতিরিক্তরূপ অলঙ্কৃত, পুষ্পিত, বক্রোক্তিময় ও বিদগ্ধজনের অধিগম্য করিয়া রাখিয়াছেন। অলঙ্কারের আবরণে ও আভরণে তাঁহারা অশ্লীলতার দোষ খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে পদকর্ত্তারা নিজেদেরও ব্রজলীলার অঙ্গীভূত মনে করিতেন। ইঁহারা গোষ্ঠ-সঙ্গীতে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং মধুর-রসের পদাবলীতে নিজেদের সখীস্থানীয় মনে করিতেন। ভণিতায় ইঁহারা সখীভাবে শ্রীরাধাকে উপদেশ, আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়াছেন এবং কোথাও কোথাও অগেয়ানী বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন, রাধার প্রতি অবিচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণকেও টিটকারি দিয়াছেন। ইঁহারা জানিতেন—'গোকুলকুল-জরতীনাং পরুষা বাগপি যথা প্রমোদয়তি। স্তুতিরপি মহামুনীনাং মধুরপদা মাং সখে ন তথা॥' এ সব ভক্তিরসের অতি উচ্চ স্তরের কথা। বিশাখা বৃন্দা ইত্যাদি সখীরা রাধা-শ্যামের প্রেমলীলার দৌত্য, সহায়তা, পরিচর্য্যা ইত্যাদির মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া যে লীলা-রস উপভোগ করিয়াছেন, ইঁহারাও সেই লীলারসেরই আস্বাদ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সখীর সহায়তা এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্ত্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণসমর্পণম্॥
নর্ম্মাশ্বাসনতঃ পথ্যং হৃদয়োদ্‌ঘাটপাটবম্।
ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা॥
শিক্ষাসংগমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।
নায়িকা প্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ॥

কবিরাজ গোস্বামী লীলাসহচরী সখীর গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—

সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার।
সবে এই সখীগণের ইহা অধিকার॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী বিনা এ লীলায় নাহি অন্য গতি।
সখী ভাবে তাহা যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥
সখীর স্বভাব এই অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥

পদকর্ত্তারা এই সখীর ভাবে বিভাবিত হইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী সখীর মহিমা-কীর্ত্তনচ্ছলে যে সকল কথা বলিয়াছেন, পদকর্ত্তাদের সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথাই বলা চলে।

পদাবলী-সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহাতে মাধুর্য্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-ভাব কোথাও মিশ্রিত করা হয় নাই। তাহা করিলে বৈষ্ণব-রসতত্ত্বজ্ঞদের মতে রসাভাব হয়। শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যভাব আরোপ করিলে যে রসের সৃষ্টি হয়, তাহা দেবাদিস্তুতি শ্রেণীর সাধারণ ভক্তিভাব—তাহা নিম্নস্তরের বস্তু। মধুর ভাবের ত কথাই নাই—সখ্য-বাৎসল্যভাবও উচ্চতর রসবস্তু। সখ্যবাৎসল্য রসের সহিতও ভক্তিভাব মিশ্রিত করা হয় নাই। সে জন্য পদাবলীকে অনেকে মিষ্টিক কবিতা বলেন না। পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করা হয় নাই এবং রাগ-রসকে ঐশ্বর্য্য-শিথিল করা হয় নাই বলিয়া সাহিত্যের দিক হইতে যথেষ্ট লাভই হইয়াছে। অভিসার, মান, অভিমান, প্রণয়, কলহ ইত্যাদির সহিত নায়িকা-জীবনের বৈচিত্র্য মিলিত হইয়া রাধাশ্যামের প্রেমলীলাকে অপূর্ব্ব সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব নিগূহিত হইলেও এইগুলির মিষ্টিক সার্থকতাও আছে। অবশ্য এ মিস্‌টিসিজম অন্তর্নিহিত নয়—আরোপিত। বৈষ্ণব পরাতত্ত্ব, সাধকতা ও সাত্ত্বিকতার আবেষ্টনী, শ্রীচৈতন্যদেবের মহাভাবাবিষ্ট লীলা-বৈচিত্র্য, পদকর্ত্তাদের শুদ্ধসত্ত্ব ভাগবত-জীবন হইতে সংক্রামিত। পদাবলীকে যদি আধ্যাত্মিক বা নিমিষ্টিক কবিতা বলিয়া ধরা না-ই হয়—ইহাকে সাধারণ আদিরসের কবিতাও বলা যায় না। তামিল আলোয়ারদের রস-কবিতা ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষে সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় যত আদিরসের কবিতা আছে, তাহাদের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই এ পার্থক্য উপলব্ধ হইবে।

ইহা শুধু নরনারীর অনুরাগ, সম্ভোগ, মিলন, বিপ্রলম্ভ ও অন্যান্য লীলাবিলাসের অভিব্যক্তি নয়। ইহার মধ্যে যে আত্মসত্তাবিলোপ, সর্ব্বস্ববিসর্জ্জন, সর্ব্বসংস্কার-মুক্তি, সর্ব্ববন্ধচ্ছেদ, দ্বৈতভাবের বিলোপ, সর্ব্ববাধাবিপ্লবজয়, বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ইত্যাদির ভাব আছে—তাহা সাধারণ আদিরসের রচনা হইতে ইহাকে অনেক উর্দ্ধে তুলিয়া ইহার উপাদান উপকরণগুলিকেও একটা লোকোত্তরতার মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রাকৃত প্রেমের সকল বিভাব, অনুভাব ও সকল লীলা-বৈচিত্র্যের কথা আছে—কিন্তু সব যেন অপ্রাকৃত বর্ণে অতিরঞ্জিত। সাধারণ রাগ-রসের কবিতায় যে অনৌচিত্যের জন্য রসাভাস হয়—মহারাগ রসের পদাবলীতে তাহা হয় না। যে স্বপতিনিষ্ঠতার অভাব সাধারণ আদিরসের কবিতায় রসাভাস ঘটায়—তাহাই পদাবলীতে রসের পরিপোষক—'অলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণমেব ন তু দূষণমিতি'—যেখানে সবই অপ্রাকৃত, সেখানে প্রেমের অভিব্যক্তিতে কোথাও কবিদের বিধিনিষেধ মানিতে হয় নাই।

প্রেমলীলা-বৈচিত্র্যে পদাবলীর কবি যেরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন—সংস্কৃত কবিগণ তাহা পান নাই।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কবিতায় প্রণয়ের প্রকৃত ভাব আমরা যতই লক্ষ্য করি না কেন—শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব আমরা যতই ভুলিয়া যাই না কেন—লীলাক্ষেত্রটা যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবন,—বিদিশা বা অবন্তীর পুষ্পবাটিকা নয়, গোপীগণ যে সাধারণ গোয়ালিনী মাত্র নয়—মায়াকল্পিত বিগ্রহ, বংশীধ্বনিটা যে সাধারণ বাথানিয়া বাঁশীর তান মাত্র নয়, এ কথা ভুলিবার উপায় নাই।

যে ভাবস্বপ্নের আবেষ্টনীর মধ্যে এই বৃন্দাবনী-লীলা—তাহার মধ্যে চিরন্তন মানব-হৃদয় ছাড়া বাস্তব কিছু নাই—রক্ত-মাংসের একটা মানুষ নাই—সবই মায়া-বিগ্রহ। যে স্বপ্নলোক সকল তরুই কল্প-তরু, সকল মৃগই স্বর্ণ-মৃগ, সকল পুষ্পই পারিজাত, সকল ধেনুই সুরভি. এ যেন সেই স্বপ্নলোক; বৈষ্ণবকবিগণ সেই স্বপ্নলোকের স্বপ্ন-মাধুরীর গান গাহিয়াছেন—স্বপ্নাবেশই তাঁহাদের কবিধর্ম্ম। এই স্বপ্ন যাহাতে আঘাত পায়, তাহাই রসাভাস; তাঁহারা সেই রসাভাস এড়াইয়া গিয়াছেন। সুদর্শনচক্রের আঘাতে যাহাতে এই স্বপ্নপুরী ভাঙ্গিয়া না যায়—সে দিকে তাঁহাদের অবহিত দৃষ্টি ছিল।

এই স্বপ্নলোকের আবেষ্টনী পদাবলী-সাহিত্যকে এক ভাবে লোকোত্তরবিচ্ছিত্তি দান করিয়াছে। অন্য ভাবে বৈষ্ণব ঐতিহ্যধারী বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণব সমাজ, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনমুকুরে মহাভাবের ছায়াপাত, পদকর্ত্তাদের সাধকজীবন, ভাগবতের অনুবৃত্তি সমস্ত মিলিয়া বৈষ্ণবপদাবলীকে লোকোত্তর করিয়া তুলিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্য প্রধানতঃ মধুররসের রচনা, কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া একটা অলৌকিক কারুণ্য-ধারা প্রবাহিত। এই কারুণ্য এই শোক-দুঃখ-সঙ্কুল সংসারের প্রাকৃত কারুণ্য নয়। যে ধামকে অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচিত, তাহা ত আনন্দধাম, সেখানে প্রাকৃত বেদনার স্থান নাই। সে ধামে "নান্যস্তাপঃ কুসুম-শরজাদিষ্টসংযোগসাধ্যাৎ, নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ।" এ কারুণ্য কি তবে মিলন-বাধার কারুণ্য? তাহা ত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া ডাকিতে যে শ্রীদামের চোখে জল আসে, গোপালের গায়ে হাত দিতে যশোদা যে কাঁদিয়া ফেলেন, ইহা কোন্ কারুণ্য? বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজগোপীরা কোন্ অজ্ঞেয় রহস্যময় বেদনায় উন্মনা হইয়া উঠে? ইহা কোন্ বেদনা? যে কারুণ্যে রাধা-শ্যাম দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে;···নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মাগি ···সে কারুণ্য কিসের? ভাবসম্মিলনের উল্লাস ও গভীর কারুণ্যেরই ছলনাময় রূপ।

'চীর চন্দন উরে হার না দেলা। সো অব গিরি নদী আঁতর ভেলা' যাহার সঙ্গে ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে বলিয়া বুকে বসন, চন্দন, হার পর্য্যন্ত রাখি নাই, আজ তাহার সঙ্গে গিরি-নদীর ব্যবধান হইয়া গেল। এই যে হাহাকার, এ কি যমুনার এপার ওপারের দূরত্বের জন্য? জনম অবধি রূপ দেখিয়াও নয়ন যে তৃপ্তি লাভ করে না। লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়াও যে হৃদয় জুড়ায় না, এ কি সেই অতৃপ্তির বাণী নয়? সে প্রেমসম্ভোগে তৃপ্তি পায় না, বিরহেও দীপ্তি হারায় না, এ কি সেই প্রেমের কথা নয়? মানব-জীবনের চিরন্তন অপূর্ণতা, অসীমতা, অসহায়তা, অস্বস্তি ও অশক্তির বেদনার সুরই সমস্ত পদাবলীর মধ্যে আমরা শুনিতে পাই। মানবাত্মার এই Tragedyই পদাবলীর মাথুর। হৃদয়ে যে কোন বৃত্তি গভীর, গাঢ় ও অন্তর্গূঢ় হইলেই আমরা পূর্ণের সান্নিধ্যলাভ করি, তখনই আমরা নিজেদের অপূর্ণতাও উপলব্ধি করি। এই উপলব্ধি যে কারুণ্যের সৃষ্টি করে, তাহা প্রাকৃত কারুণ্য নয়!

পদাবলীর মধুর রস এক হিসাবে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের শান্তরসের সহোদর। পদাবলী-সাহিত্যে যে বংশীধ্বনির আকর্ষণীর কথা বার বার আছে—তাহা ব্রহ্মাণ্ড ভুলাইয়া দিতেছে—নিজের দেহ ও জীবনকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত করাইতেছে! যে প্রেমের গভীরতা পদাবলী-সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, তাহা কুল শীল মান লজ্জা ভয় গৃহসংসার প্রিয়পরিজন সুখদুঃখ সমস্তকেই তুচ্ছ অসার ও অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলে। সে প্রেমে কোন বাস্তববস্তুর প্রতি কোন সমতা থাকে না—কোন সংস্কারের বন্ধন থাকে না। ইহাই ত বৈরাগ্য। রাধা ত ভোগিনী নয়—রাধা যোগিনী। রাধা বার বার যোগিনী হইবার সংকল্প জানাইয়াছেন, কিন্তু তিনি ত রূপানুরাগা হইতেই যোগিনী। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, "মহাযোগিনীর পারা।" পদাবলী-সাহিত্যে বাচ্যার্থে যাহা শৃঙ্গার-রস, লক্ষ্যার্থে তাহাই করুণরস আর ব্যঙ্গার্থে তাহাই শান্তরসের উদ্দীপন করিতেছে! এই রসের ব্যঞ্জনা রাধার সর্ব্বস্ব সমর্পণ ও আত্মবিস্মরণে আছে বলিয়াই পদাবলী-সাহিত্য ধর্ম্ম-সাহিত্য। সে জন্য বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী সাধক কবিদের জীবনের সহিত ইহার সংযোগ ও সামঞ্জস্য ঘটিতে পারিয়াছে এবং শ্রীচৈতন্য-দেবের সাধক-জীবনে ইহা আশ্রয় লাভ করিয়া নূতন রূপ, নবকলেবর ও অভিনব প্রেরণা ও সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিদের রূপানুরূপ প্রাকৃত প্রেমের রূপানুরাগের অনেক উর্দ্ধে। যে রূপ দেখিয়া রাধা মুগ্ধ। সে রূপ কামনার দেহকেই আশ্রয় করিয়া থাকে নাই—তাহা দেহকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে রূপ আকাশে মেঘমালায়, বনের তমালশ্রীতে, যমুনার জলোচ্ছ্বাসে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠের চিক্কণতায় ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে। এই Pantheistic conception বহু কবিতাতেই দেখা যায়। রাধা বলেন—"দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।" এই রূপদর্শনের অনুরাগ প্রাকৃত অনুরাগের মত নয়। এই অনুরাগের যে বেদনা তাহা সাধারণ প্রেমার্ত্তি মাত্র নয়। প্রেমার্ত্তির বর্ণনা আমরা সংস্কৃত কাব্যে-নাট্যে যথেষ্টই পড়িয়াছি। ইহার সঙ্গে তাহার মিল হয় না। কালিদাস এ প্রেমার্ত্তির কবি নহেন। চণ্ডীদাসই ইহার যথার্থ কবি। চণ্ডীদাস এ বেদনাকে যে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাও অভিনব। এই যে অনুরাগ—এ অনুরাগ একের প্রতি অনুরাগ কিন্তু সমগ্র জগতের প্রতি—নিজের দেহ—এমন কি, নিজের জীবনের প্রতিও বিরাগ। এ অনুরাগ রাধাকে যোগিনী মহা-বৈরাগিণী করিয়াছে।

এই অনুরাগের বেদনা অনির্বচনীয়। ইহা বেদনা বটে, কিন্তু ইহাতে মন ত জ্বলিয়া পুড়িয়া যায় না—কোন অনাস্বাদিত আনন্দের আভাসে মনে শিহরণ জাগে। এ যেন—'বিষামৃতে একত্র মিলন'—তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন। 'চরণ তপত কুশারি'।

সখীর সহিতে জলেরে যাইতে সে কথা কহিবার নয়।

যমুনার জল করে ঝলমল তাহে কি পরাণ রয়।

কিন্তু কিছুই বলা হইল না—কারণ, সে কথা কহিবার নয়। সাহিত্য হিসাবে বৈষ্ণব-পদাবলী যে অপূর্ব্ব সে বিষয়ে অবৈষ্ণব ও আধুনিক

শিক্ষিত লোকদেরও কোন সংশয় নাই। যাঁহারা এ সাহিত্য পড়িবেন, তাঁহাদের অন্ততঃ বিলাস-কলার কুতূহল ইহাতে চরিতার্থ হইবে। পড়িতে পড়িতে একটা প্রশ্ন মনে জাগিবে, যাঁহারা এই সকল রসলীলার পদ রচনা করিয়াছেন—তাঁহারা কেহই ভোগী গৃহস্থ ছিলেন না। তাঁহাদের অনেকেই বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী সাধক পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের সহিত এই রস-সাহিত্যের মিল কোথায়? পাঠক পড়িতে পড়িতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাইবেন—ঘষিতে ঘষিতে যেরূপ চন্দনের গন্ধের বিস্তার হয়, অনুশীলনের ফলে সেইরূপ ঐগুলির লোকোত্তর সার্থকতা স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন; কোন কবিতারই রসবোধের ক্রিয়া এক দিনেই পরিসমাপ্ত হয় না। একই কবিতা কাল, যুগধর্ম্ম, জীবনের গতি-প্রকৃতি ও মনের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব অর্থের দ্যোতনা করে। জীবনের দশা, প্রকৃতি ও গতি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে নূতন নূতন সার্থকতার আবিষ্কার করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

নানা জনে লবে তার নানা অর্থ টানি। তোমা পানে যায় তার শেষ অর্থখানি। বৈষ্ণব কবিতার শেষ অর্থখানিও এক দিন আবিষ্কৃত হয় সকল পাঠকেরই জীবনে। যদি রসবোধের আদর্শের পরিবর্ত্তনের ফলে বা জীবনের দশা-বিপর্য্যয়ে তাহা না ঘটে, জীবনের অপরাহ্ণে যখন মানুষ স্বতঃই নূতন দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখিতে থাকে, জীবন ও যৌবন দুই-ই যখন স্বতঃই গেরুয়া রঙে রঞ্জিত হইয়া যায়—তখন তদুপযোগী সার্থকতা আপনিই আবিষ্কৃত হয়। এ জন্য ভাগবত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না—এ জন্য রূপ-সনাতন জীব গোস্বামীর বৈষ্ণবতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন হয় না বা বৈষ্ণব মঠ-মন্দিরের পরিবেষ্টনীর প্রয়োজন হয় না। এই অর্থের আধা দেয় ঐ পদাবলী—আধা দেয় ঘাতপ্রতিঘাতে সুপরিণত পাঠকের মন।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে বৈষ্ণব কবিতার উপরে একটি কবিতা লেখেন—তাহার প্রথম পংক্তি "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?" এই কবিতায় তিনি বৈষ্ণব কবিতার প্রচলিত আধ্যাত্মিক সার্থকতা স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিয়াছিলেন—এ কি শুধু দেবতার?

প্রশ্নচ্ছলে তিনি আধ্যাত্মিকতাকে বৈষ্ণব কবিতার মুখ্য উপজীব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিয়াছিলেন—প্রাকৃত প্রেমের অভিব্যক্তি হিসাবে ইহার গৌণ সার্থকতা আছে। ঐ কবিতায় তিনি আধ্যাত্মিকতার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন—কোন আধ্যাত্মিক অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। সে অর্থের ইঙ্গিত যে একেবারে নাই, তাহা নয়।

> এ গীত-উৎসব মাঝে
> শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জ্জনে বিরাজে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কোন একটি রচনায় অভিসারকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর একটি আধ্যাত্মিক অর্থ কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি হইতে বোধগম্য হইবে।

> তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে আনন্দের নব নব পর্য্যায়।
> পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে নিত্যপুষ্প নিত্যচন্দ্রালোকে
> নিত্যই সে একা, সেই ত একান্ত বিরহী।
> যে অভিসারিকা, তারই জয়। আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।
> সেও ত নেই স্থির হ'য়ে যে পরিপূর্ণ
> সে যে বাজায় বাঁশী প্রতীক্ষার বাঁশী
> সুর তার এগিয়ে চলে—অন্ধকার পথে।
> বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
> পদে পদে মিলেছে এক তালে।
> তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে—
> সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। (পুনশ্চ, বিচ্ছেদ)

'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।' অল্পে সুখ নাই। এই অল্প কি? যাহা অনিত্য তাহাই অল্প—যাহা নিত্য তাহাই ভূমা। কুলশীল, সমাজ-সংস্কারের বন্ধন, ধনজন গৃহসুখ এ সকলে অত্যাসক্ত হইয়া থাকিলে বেদনার অবধি থাকে না। এক দিন দারুণ আঘাতে সব চূর্ণ হইয়া যায়। এ সমস্তে সুখ নাই। যাহা নিত্য, সত্য ও ধ্রুব তাহাকে আশ্রয় করিলে স্বপ্ন ভঙ্গ হয় না—অক্ষয় দিব্যানন্দ লাভ করা যায়। জীব যখন এই সত্য উপলব্ধি করে, তখন তাহার নিত্যের প্রতি প্রেম জন্মে—অনিত্যের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। সে তখন দুর্ব্বার গতিতে নিত্যের পানে ধাবিত হয়। এই মহিমার কথাই বৈষ্ণব-সাহিত্যে রূপ-মুগ্ধতার ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। শ্যামের পক্ষে যাহা রূপ, নিত্যের পক্ষে তাহাই মহিমা। রাধার পক্ষে যাহা মিলনাগ্রহ—জীবের পক্ষে তাহাই নিত্যানন্দ লাভের জন্য সাধনা। যে পথে জীব নিত্যের অভিমুখে ধাবিত হয়—সে পথে ক্ষুরের ধারের ন্যায় নিশিত দুরত্যয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে অভিসারের পথ তাই অতি দুর্গম, বিঘ্নসঙ্কুল, মন্দির বাহির কঠিন কবাট। চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট।

তঁহি অতি দুরতর বাদর দোল। বাধে কি বারই নীল নিচোল।

বিনা সাধনায় এ পথে চলিবার শক্তি ও সাহস পাওয়া যায় না। তাই কবি বলিয়াছেন—

> কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি;
> গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
> মাধব, তুয়া অভিসার মাগি
> দুস্তর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনি জাগি।

নিত্যের অভিমুখে যাত্রা করিতে হইলে এই ভাবে তপস্যা করিতে হয়।

যে প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বাধা বহন করেন, যে প্রেমে নন্দ শ্রীকৃষ্ণকে গোরু চরাইতে মাঠে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করেন না, যে প্রেমে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধিয়া শাসন করেন, যে প্রেমে শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে চড়িয়া খেলার পরাজয়ের দণ্ডবিধান করেন এবং উচ্ছিষ্ট খাওয়ান, যে প্রেমে ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে চোর, শঠ, লম্পট, শতঘরিয়া, গোপগোঙার ইত্যাদি বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না আর শ্রীরাধা যে প্রেমে মানিনী হইয়া পায়ে ধরাইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণকে নিষ্কৃতি দেন, সেই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানবর্জ্জিত প্রেমই বৈষ্ণব কবিদের একমাত্র অবলম্বন। কবিদের রচনার বিষয়বস্তু আর কিছু নাই। কাব্যের দিক হইতে ইহা আত্ম-গোপাত্মক প্রেমের পরাকাষ্ঠা—সাধনার দিক হইতে ইহাই রাগানুগা ভক্তি। পদাবলী-সাহিত্যে এই রাগানুগা ভক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লীলা-বৈচিত্র্য দেখানো হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ পদাবলী-সাহিত্যে প্রেমের সেই ভিন্ন ভিন্ন স্তর লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"আমরা যাহাকে ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না—সমস্ত হৃদয় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না—তখন সে আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম ও প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে—তখন এই সমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে যে একটা সীমাতীত লোকাতীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।"

নিত্য, শাশ্বত, পরিপূর্ণ, অনন্ত, অসীম যে নামেই ব্রহ্মকে আমরা অভিহিত করি—তাহার প্রতি প্রেম একটা alshaclion মাত্র, ইহার কোন সার্থকতা নাই। তাহাকে সীমার বন্ধনে উপলব্ধি করিলেই তাহার সার্থকতা। বৈষ্ণব কবিগণ এই ভাবে অসীম অখণ্ডকে প্রেমের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। ব্রহ্ম গোপালবেশে আমাদের প্রিয়তম হইয়া উঠিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া ভক্ত তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। আকাশ যেমন গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও অসীম এবং আকাশই, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অসীম ব্রহ্ম ব্রহ্মই আছেন।

মানব-মনে অসীমের সার্থকতা সীমাবন্ধনে আসিয়া। তাহার মধ্যে আসিলেই তাহা প্রেমের বস্তু হয়। নতুবা প্রেমাস্বাদ সম্ভবই নয়। অসীমের মধ্যে সীমাও নাই—প্রেমও নাই। সঙ্গিহারা অসীম সীমার নিবিড় সঙ্গ চায়, প্রেমের জন্য। ব্রজের কৃষ্ণরূপও রাধারূপের মধ্যে এই তত্ত্বই নিহিত। অসীম ও সীমার মিলনের আনন্দই পদাবলীর রূপ ধরিয়া সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে।"

এত অল্প কথায় অল্প পরিসরের মধ্যে পদাবলীর আধ্যাত্মিক অর্থ আর কেহ দিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না।

পদাবলী-সাহিত্যকে আধ্যাত্মিক সাহিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও সমগ্র বঙ্গসাহিত্যে তাহার দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের মহাধারাকে পদাবলী-সাহিত্যের ধারা কত দূর পুষ্ট করিয়াছে—তাহাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—

"শাক্তধর্ম্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে—বৈষ্ণবধর্ম্মে এই ভেদকেই নিত্য মিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্য স্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন! এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাঙ্গালা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে—যাহা পূর্ব্বাপরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া মনে হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা। উপমা ও আবেগের প্রবলতা সমস্তই বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে বিদূরিত হইল। ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়? ছন্দ এত সঙ্গীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নয়। প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নয়, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জ্জিত কালোয়াতি সঙ্গীত থই পাইল না। দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত-প্রণালী তৈরি করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।"

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কাব্যধারাকেই বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান ঝরণাধারা বলিয়াছেন—এই ধারার সঙ্গে অন্যান্য ধারা মিশিয়া সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বৈষ্ণব-কাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎ ভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। কিন্তু নানা দিক হইতে নানা ধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না। নানা দিক হইতে নানা ধারা আসিয়া বৈষ্ণব-কবিতার ঝরণাধারায় মিলিত হইয়াছে। তাহার ফলেই আজ বাঙ্গালায় গদ্যে পদ্যে সম্মিলিত সাহিত্য বাঙ্গালী জনসাধারণের হৃদয় হইতে বিচিত্র ভাবস্রোত বিবিধ জ্ঞানপ্রবাহ অহরহঃ আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।"

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত সাহিত্য সম্বন্ধেও বৈষ্ণব-কবিদের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। *

শ্রীকালিদাস রায়।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেঙ্গলি এসোসিয়েসনের বিশিষ্ট অধিবেশনে পঠিত।

প্রিয়া

যে ফুল দলেছ পথে যেতে যেতে সে ফুল কুড়ায়ে মরি
যে কথা কহিয়া বেদনা দিয়েছ বারে বারে তাহা স্মরি!

চোখের জলেতে ব্যথার না হয় শেষ তাই ত বাদল ঝরে
মরীচিকা সম তোমায় খুঁজিয়া মরি বিরহের বালু-চরে!

ফাগুন-বাতাসে মদিরা নাহিকো আজি চাঁদে কোথা রোশ্‌নাই!
রজনীগন্ধা বৃথা তুমি ফুটিয়াছ—প্রিয়া মোর কাছে নাই!

শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

কথাশিল্পীর হত্যারহস্য

[উপন্যাস]

একাদশ পল্লব

মামলা মুলতবির পর

পরদিন আদালতে ট্রেন্টন-হত্যার মামলা উঠিলে ফরিয়াদী পক্ষের কৌন্সিলী সার এডমণ্ড ব্যাটার্স'বি জজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মি লর্ড, আজ এই মামলা আরম্ভ হইবার কথা; কিন্তু আমি জানিতে পারিলাম, যে সকল জুরির নিকট এই মামলার বিচার চলিতেছিল, তাঁহাদের এক জন হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছেন; তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই মামলার বিচার চলিতে পারে না। এ অবস্থায় আমার প্রার্থনা, উক্ত ভদ্রলোক সুস্থ হইয়া আদালতে উপস্থিত হইতে না পারা পর্য্যন্ত এই মামলা মুলতবি রাখিবার আদেশ হউক।"

জজ আসামী পক্ষের কৌন্সিলী জন গারসাইডকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এই মামলা ঐ সময়ের জন্য মুলতবি রাখিতে আপনার কি আপত্তি আছে মিঃ গারসাইড?"

জন গারসাইড বলিলেন, "না মি লর্ড, আমাদের পক্ষে আপত্তির কোন কারণ নাই, বরং ইহা মুলতবি রাখা আমরাও প্রার্থনীয় মনে করি। মি লর্ড, আমি আপনাকে জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, এই মামলার পরিচালনে ইহা অপেক্ষাও সঙ্কটজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। মিঃ ডেভিড গারসাইড এই মামলায় আসামী পক্ষের এক জন প্রধান সাক্ষী। আজ প্রথম আদালতেই তাঁহার সাক্ষ্য-দানের কথা ছিল; কিন্তু সহসা তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন!"

জজ তাঁহার চেয়ারের সম্মুখে ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি! অদৃশ্য হইয়াছেন?"

কৌন্সিলী বলিলেন, "মি লর্ড, প্রকৃত ঘটনা যেরূপ, তাহাতে 'অদৃশ্য' হইয়াছেন বলিলে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে না। আমি সংবাদ পাইয়াছি, মিঃ গারসাইড গত রাত্রিতে এজ অয়ার রোডের সন্নিহিত সিয়ার ষ্ট্রীটে দুই জন গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইলে তাঁহাকে দ্রুতগামী মোটর-কারে তুলিয়া লইয়া অন্যত্র প্রেরণ করা হয়! আমার এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে যে, তাঁহাকে কোন গুপ্ত আড্ডায় লইয়া গিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছে। এমন কি, তাঁহার জীবন ইতিমধ্যে বিপন্ন হইয়া থাকিলেও বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।"

জজ তাঁহার সম্মুখস্থ 'ব্লটিং প্যাডের' উপর চশমার এক প্রান্ত ঠুকিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এ যে দেখিতেছি গীতিনাট্যের ন্যায় অদ্ভুত ব্যাপার! সে যাহাই হউক, আমি আপনার অনুরোধে এই মামলা মুলতবি রাখিলাম সার এডমণ্ড!—কৌন্সিলী মিঃ গারসাইডের আপত্তি যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই!" গারসাইড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

* * * *

ডেভিড গারসাইডকে গুণ্ডাটা বলিতে লাগিল,—"তোমার যে সকল বন্ধু খবরের কাগজে চাকরী করে, তোমার বিপদের জন্য তাহারাই দায়ী। তাহারা আজ 'অয়ারে' তোমার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা না হইলে তোমার আরও এক দিন জীবিত থাকিবার আশা থাকিত; কিন্তু আর তোমার প্রাণের আশা নাই। তোমার সম্বন্ধে আমি কর্ত্তব্য পালনের আদেশ পাইয়াছি।"

অতঃপর নরহন্তা সাগ্রিনের হাতের রিভলভারে টর্চের আলোক প্রতিফলিত হইল। সে তাহা ডেভিডের বক্ষঃস্থলে উদ্যত করিল। ডেভিডের তখন নড়িবারও শক্তি ছিল না, সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইল।

সাগ্রিন তাহার হস্তস্থিত পিস্তলের ঘোড়া স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে একখানি হাত আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাহার মস্তকে এরূপ প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই সাগ্রিনের প্রাণহীন দেহ ডেভিডের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। মৃত্যুকালে তাহার কণ্ঠ-নিঃসৃত অস্ফুট আর্ত্তনাদ শূন্যে বিলীন হইল।

সাগ্রিনের আততায়ী আড়াল হইতে বাহির হইয়া ডেভিডের সম্মুখে দাঁড়াইলে ডেভিড তাহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া উৎসাহ-ভরে বলিল,—"বেন মরফি! তুমি?"

ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট মরফি প্রসন্ন মনে বলিল, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিয়াছি ডেভি! আমার এখানে আসিতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে তোমাকে জীবিত দেখিতে পাইতাম না!"

ডেভিড বলিল, "তোমার কথা সম্পূর্ণ সত্য।"

ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট মরফি ডেভিডকে যে কথা বলিল, তাহা অদ্ভুত। মেড্‌লি তাহাকে আহ্বান করিয়া কি উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা প্রথমে তাহাকে জানাইয়া অবশেষে বলিতে লাগিল, "কিন্তু আমি ভাবিতে লাগিলাম—কোথায় তোমার সন্ধান মিলিবে? সোহো পল্লীর সর্ব্বস্থান আমি খুঁজিয়া দেখিব—ইহা অসম্ভব বলিয়া আমার মনে হইল। যদি এক মাস সময় পাইতাম, তাহা হইলে হয়ত সেই চেষ্টাই করিতাম। আমি তোমার সংবাদ-সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া কলড্রনে দশ মিনিট কাল অতিবাহিত করিলাম। সেখানে গমন করিয়া আমি এই বদমায়েস গুণ্ডাটাকে দেখিতে পাইলাম"—এই কথা বলিয়া সে পদপ্রান্তবর্ত্তী সাগ্রিনের মৃতদেহে পদাঘাত করিল।

"আমি সেখানে উহাকে ধড়িবাজ বদমায়েস 'কাউণ্টের' সহিত আলাপ করিতে দেখি।"

ডেভিড বলিল, "ভাল কথা, তোমার কাছে ছুরি আছে? ছুরি থাকিলে আমার হাতের বাঁধনটা শীঘ্র কাটিয়া দাও।"

ডেভিডের হাতের বাঁধন ছিন্ন হইলে সে মরফিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কিরূপে জানিলে যে সাগ্রিন যাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছিল —সে সেই বদমায়েস কাউণ্ট?"

মরফি তাহার প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, "তুমি কি অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিতে চাও? না, তাহা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ নাই?"

ডেভিড বলিল, "হাঁ শুনিব। তুমি সব কথা খুলিয়া বল।"

মরফি বলিল, "সেখানে উহাদিগকে গল্প করিতে দেখিয়া আমার মনে হইল, এই গুণ্ডাদলই সিয়ার ষ্ট্রীটে তোমাকে প্রহারে অচেতন

করিয়া, মোটর-গাড়ীতে তুলিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল। তুমি ট্রেনটনের হত্যারহস্য সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত কথা জান—এই সন্দেহে উহারা দলপতির আদেশে তোমাকে কোন স্থানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। তুমি গুণ্ডাগুলার অপকার্য্য সম্বন্ধে 'অয়ারে' যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলে, তাহা পাঠ করিয়া উহারা ঐ কাজ করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।"

"এখন সময় কত বেন?"

মরফি বলিল, "আমি যে সময় কলডনে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখন রাত্রি প্রায় একটা। কিন্তু তুমি এখন কোথায় পড়িয়া আছ, তাহা কি ধারণা করিতে পারিয়াছ?"

ডেভিড বলিল, "না, আমার তাহা ধারণা করিবার শক্তি নাই।"

মরফি বলিল, "তুমি গ্রীক ষ্ট্রীটে ভূগর্ভস্থ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, কিন্তু এ কথা বোধ হয় তুমি বিশ্বাস করিতে পারিবে না। তোমার ধারণা, তুমি শত শত মাইল দূরে নির্ব্বাসিত হইয়াছ!"

ডেভিড ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "না বেন, আমার আর কিছু ধারণা করিবার শক্তি নাই। আমার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।"

মরফি বলিল, "সে যাহাই হউক, আমি আমার কথা সংক্ষেপে শেষ করি; কারণ, আমার বিশ্বাস, এই স্থান ত্যাগ করিবার জন্ত তুমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছ।—সাগ্রিন ও তাহার মুরুব্বি 'কাউণ্ট' কলডন ত্যাগ করিলে আমি গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিলাম। তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে গ্রেটার নিউপোর্ট ষ্ট্রীটে সাগ্রিনের ফ্ল্যাটে উপস্থিত হইল। আমি তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানে গমন করিয়া একটা পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের অবশিষ্ট কথা শুনিতে লাগিলাম।

"তাহাদের পরামর্শের মধ্যে তোমার নাম শুনিতে পাইলাম। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের মতলব বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, তাহারা তোমাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। কিন্তু আমার যাহা জানিবার ছিল, তাহা তাহাদের মুখে শুনিতে পাইলাম না, তাহারা তোমাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, তাহাই জানিবার জন্ত আমার আগ্রহ হইয়াছিল। অবশেষে বহু চেষ্টায় আমার আশা পূর্ণ হইয়াছিল, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে আমি তাহা জানিতে পারি। এই ভাবে তোমার সন্ধান পাইয়া আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

মরফির কথা শেষ হইলে ডেভিড বলিল, "বেন, তোমার এই উপকার আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না। কিন্তু কিরূপে আমি প্রত্যুপকার করিব—তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না!"

* * * *

অসুস্থ জুরি সুস্থ হইয়া যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইলে ট্রেনটন-হত্যার মামলার বিচার আরম্ভ হইল। বিচার-কার্য্য কয়েক দিন মুলতবি থাকিবার পর বিচার আরম্ভ হওয়ায় বিচার দেখিবার জন্ত জনসাধারণের কৌতূহলের সীমা রহিল না। আসামীর প্রতি সকলেরই সহানুভূতি লক্ষিত হইল।

আসামী পক্ষের কৌন্সিলী সংবাদপত্রের লেখক ডেভিড গার-সাইডকে সাক্ষীর কাঠরায় উঠিবার জন্ত আহ্বান করিলে সকলের দৃষ্টি ডেভিডের দিকে আকৃষ্ট হইল। দর্শকগণের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া ডেভিড গারসাইড সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিল। তাহার মস্তকের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র পটি আঁটা ছিল, তাহা ব্যতীত আঘাতের কোন নিদর্শনই তাহার মস্তকে লক্ষিত হইল না। বিচারক মিঃ স্বার্থডেল তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও তাহার মুখ-ভাবের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না।

কৌন্সিলী বলিলেন, "তোমার নাম ডেভিড গারসাইড?"

"হাঁ, উহাই আমার নাম।"

কৌন্সিলী এবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোয়ানেস নামক এক ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছে; তুমি পূর্ব্বে কোন দিন কি তাহার সঙ্গে এই মামলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলে? কোন্ তারিখে কোন্ সময় কোথায় সে আলোচনা হইয়াছিল, তাহা কি তুমি আদালতে প্রকাশ করিবে?"

"হাঁ; গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে সোহো পল্লীর ৫১৬ নং কার্থ ষ্ট্রীটস্থ ভোজনাগারের দ্বিতলস্থ কক্ষে এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হইয়াছিল।"

কৌন্সিলী বলিলেন, "সাক্ষী সোয়ানেস তোমার সঙ্গে আলোচনা করিবার সময় যে সকল কথা বিবৃত করিয়াছিল, এবং সাক্ষ্যদান কালে যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল কি?"

"না।"

প্রশ্ন হইল, "আসামীর সহিত তাহার মনিবের কলহের সময় সোয়ানেস কোথায় থাকিয়া তাহাদের কলহ শুনিয়াছিল, তাহা কি সে তোমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল?"

ডেভিড বলিল, "আমার সহিত আলোচনা কালে সে স্বীকার করিয়াছিল, সে দ্বারের বাহিরে 'গাঁটা দিয়া' তাহাদের ঝগড়া শুনিয়াছিল।" (eavesdropping outside the door.)

আসামীর কৌন্সিলী বলিলেন, "তোমাকে আমার আরও দুই একটি প্রশ্ন আছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তুমি কোথায় ছিলে?"

এই প্রশ্নে সকলেই উৎকর্ণ হইয়া সাক্ষীর মুখের দিকে চাহিল।

সাক্ষী বলিল, "উহার অধিকাংশ সময় আমি গ্রীক ষ্ট্রীটের কোন ভূবিবরে আটক ছিলাম। এজ্ওয়ার রোড-সন্নিহিত সিয়ার ষ্ট্রীটে অবস্থিত একটি ফ্ল্যাট হইতে গত পরশু সন্ধ্যার পর আমি বাহিরে যাইবার সময় দুই জন লোক পশ্চাৎ হইতে আমাকে আক্রমণ করিয়া মাথায় আঘাত করায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি। জ্ঞানসঞ্চার হইলে বুঝিতে পারি, হাতে-পায়ে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় আমি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে পড়িয়া আছি!"

প্রশ্ন হইল, "সে লোক দুইটি যে সময় তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই সময় কি তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলে?"

ডেভিড বলিল, "না, সে সময় তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; পরে আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম তাহাদের এক জন গুণ্ডাদলের সর্দ্দার, তাহার নাম সাগ্রিন।"

প্রশ্ন হইল, "এই ব্যক্তি কি তোমাকে খুন করিবার ভয় দেখাইয়াছিল?"

"সাগ্রিন গত রাত্রে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তখন রাত্রি

কত, তাহা ঠিক বলিতে পারিব না। সে আমাকে রিভলভার দিয়া গুলী করিবার ভয় দেখাইয়াছিল। সে আমাকে হত্যা করিবার জন্য রিভলভার উদ্যত করিবামাত্র তাহাকে নিহত হইতে হইয়াছিল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ-সার্জ্জেণ্ট মরফি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, নতুবা আজ তোমাকে এই সকল কথা বলিতে আমি জীবিত থাকিতাম না।"

আসামী পক্ষের কৌঁসিলী এবার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি হাকিমকে বলিবে কি কারণে তোমাকে ঐ ভাবে হত্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল? এ সম্বন্ধে তোমার নিজের ধারণা কি?"

ডেভিড বলিল, "হাঁ, আমি বলিতে পারি। কিন্তু আমার তাহা বলিবার ইচ্ছা নাই।"

জজ স্বার্থডেল এ কথা শুনিয়া সাক্ষীকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ গারসাইড, তোমার বোধ হয় ধারণা করিবার শক্তি আছে যে, আমি ইচ্ছা করিলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমাকে বাধ্য করিতে পারি?"

"হাঁ মাই লর্ড, আমার তাহা জানা আছে; কিন্তু আমি সসম্মানে বলিতে চাই যে, আমার এই সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হইবে না।"

জজ বলিলেন, "আর যদি আমি তোমাকে আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের অভিযোগে কারাগারে প্রেরণ করি?"

"হাঁ মাই লর্ড, আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অভিযোগে আপনি আমাকে কারাগারে প্রেরণ করিলেও আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিব না।"

যে অভিযুক্তা তরুণী সাক্ষীর কাঠরা হইতে আসামীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়াছিল, সকলের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ডেভিডের কথা শুনিয়া সকলেই সাগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; সে দর্শকগণের মনে নূতন কৌতূহলের সৃষ্টি করিল।

জজ সাক্ষীকে নীরস স্বরে বলিলেন, "তুমি নামিয়া যাও, কিন্তু আমার আদেশ ব্যতীত আদালত ত্যাগ করিবে না।"

ডেভিড যখন সাক্ষীর কাঠরা ত্যাগ করে, তখন তাহার মুখে বিদ্রূপ-হাস্য লক্ষিত হইল।

অতঃপর দুইটি মহিলা সাক্ষীর কাঠরায় প্রবেশ করিয়া আসামীর অনুকূলে সাক্ষ্য দিলেন। তাঁহারা উভয়েই রূপবতী তরুণী এবং কিছু দিন ঔপন্যাসিক ট্রেন্‌টনের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিলেন যে, ট্রেন্‌টন অসৎ অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করায় তাঁহারা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সেই 'বিখ্যাত' ঔপন্যাসিকের চাকরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ট্রেন্‌টন নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করিতে জানিতেন না। তিনি মাতাল ও লম্পট ছিলেন।

জন গারসাইড এবার উঠিয়া বলিলেন, "আমার আর কিছুই বলিবার নাই—মাই লর্ড!"

দ্বাদশ পল্লব

জুরি সমক্ষে বিচারকের বিবৃতি

উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা শেষ হইলে বিচারক মিঃ স্বার্থডেল জুরিদিগকে মামলা বুঝাইতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "এই মামলার ঘটনা-পরম্পরায় বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই, সুতরাং তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এক ব্যক্তি তাঁহার অবলম্বিত বৃত্তিতে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এক দিন হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে ডাক্তার তাঁহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে—এই অভিমত প্রকাশ করেন। আসামীর কাঠরায় সংস্থাপিত তরুণীকে তাঁহার হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে—এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনাই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে।"

এই সকল কথা বলিয়া বিচারক তাঁহার সম্মুখে সংরক্ষিত নথিপত্র দেখিতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু প্রমাণ সংগ্রহ করিবার সময় আমাদিগকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। ফরিয়াদী পক্ষের ও আসামী পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীতে এতই পার্থক্য লক্ষিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সাক্ষীর উক্তি আপনাদিগকে বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচনার পর গ্রহণ করিতে হইবে। এক দিকে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীরা তাহাদের সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে—এই যুবতীই প্রকৃত অপরাধী; অন্য দিকে আসামীর সুবিজ্ঞ কৌঁসিলী তাঁহার মক্কেলের অনুকূলে ফরিয়াদী পক্ষের প্রত্যেক যুক্তি যথেষ্ট দক্ষতা সহকারে খণ্ডন করিয়াছেন। আপনারা যখন আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একযোগে পরামর্শ করিবেন, সেই সময় সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে, আপনাদিগকে কিরূপ গুরু দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

"এখন কথা এই যে, হত্যাপরাধে অভিযুক্তা এই দুর্ভাগিনী তরুণী যদি মৃত ঔপন্যাসিকের জঘন্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির অনুরোধে নানা ভাবে নিগ্রহ সহ্য করিতে বাধ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহার চাকরীতে লিপ্ত থাকা তাহার পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন। বর্ত্তমান কালে অধিক বেতনের উৎকৃষ্ট চাকরী সংগ্রহ করা যে অত্যন্ত কঠিন, ইহা আপনাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, কোন সচ্চরিত্রা তরুণী ঐ প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থায় নিপতিত হইয়াও চাকরীর অনুরোধে ঐরূপ দুশ্চরিত্র মনিবের বাসগৃহে গমন করিত; তদ্ভিন্ন এ কথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, উক্ত দুর্ঘটনার রাত্রিতে আসামী অপমানের ভয়ে তাহার মনিবের বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার পর অধিকতর অপমান ও বিড়ম্বনা সহ্য করিবার আশঙ্কা সত্ত্বেও সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। ইহা কত দূর সম্ভব তাহাও আপনাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

"এইবার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কি কারণে এই নিষ্ঠুর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল? আততায়ীর উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? সাক্ষী সোয়ানেসের জবানবন্দী নিশ্চিতই আপনাদের স্মরণ আছে। আসামী পক্ষ হইতে তাহার সাক্ষ্যের তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। তাহার সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হয় যে, মিঃ ট্রেনটন কয়েক দিনের জন্য প্যারিস গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় এই তরুণী আসামীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। যদি আমরা মুহূর্ত্তের জন্য স্বীকার করি, সোয়ানেসের সাক্ষ্যে বিন্দুমাত্র সত্য থাকিতেও পারে—তাহা হইলে আমরা যে সকল ঘটনার বিবরণ জানিতে পারিয়াছি—তাহাদের সহিত উহার কোন সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

"এই প্রসঙ্গে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হইবে। সেই বিষয়টি অভিযুক্তা যুবতীর বংশ-পরিচয়। আসামীর পিতা নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্ম করিয়া পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তারের আশঙ্কা সত্ত্বেও সম্ভবতঃ সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীকার করিয়াছিল যে, সে বহু বৎসর হইতে নানা অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত ছিল। জুরিগণ, আপনাদিগকে ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য যে, যে অপরাধ-প্রবণতা সেই ব্যক্তির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাহার দুর্ভাগিনী কন্যা—এই আসামী উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহা লাভ করিয়াছিল, এরূপ ধারণা করা কি অযৌক্তিক বা অসঙ্গত ?"

বিচারকের এই পক্ষপাতমূলক অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য শ্রবণ করিয়া আসামীর কৌন্সিলী জন গারসাইড বিরক্তি দমন করিতে পারিলেন না ; তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "মাই লর্ড, আপনি এই মাত্র যে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, অত্যন্ত আপত্তিজনক বলিয়া আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।"

মিঃ গারসাইডের এই প্রতিবাদে দর্শকগণের গ্যালারী হইতে বহু কণ্ঠনিঃসৃত হর্ষধ্বনিতে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। দর্শকগণের এই ব্যবহারে বিচারক মিঃ স্বার্থডেল এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, ক্রোধে তাঁহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইল, এবং তাঁহার আত্মসংযমের শক্তি বিলুপ্ত হইল ; কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় আত্মসংযম করিয়া কোন কথা বলিবার জন্য মুখ তুলিয়া মিঃ গারসাইডের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভ্রূভঙ্গিতে মিঃ গারসাইড বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বা তাঁহার দাবী ত্যাগ করিলেন না।

মিঃ স্বার্থডেল নীরস স্বরে বলিলেন, "মিঃ গারসাইড, আপনি আসামীর অনুকূলে যে ভাবে মামলা পরিচালিত করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন কৌন্সিলী বিচারক কর্ত্তৃক জুরিদিগকে মামলা বুঝাইয়া দেওয়ার সময় তাঁহার উক্তিতে বাধাদান করিয়া অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। আপনি এখন উপবেশন করুন মহাশয়!"

মিঃ গারসাইড বলিলেন, "আপনার আদেশ পালন করিতেছি বটে, কিন্তু আমার আপত্তি আমি পরিহার করিলাম না।"

মিঃ স্বার্থডেল কৌন্সিলীর এই উক্তিতে এরূপ বিচলিত হইলেন যে, মনস্থির করিতে তাঁহার সময় লাগিল। তিনি মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে ইহাই বলিতে পারি যে, পিটার ট্রেনটনের উক্তিতে তাঁহার হত্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য আসামীর নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার প্যারিস গমনেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি সত্যই প্যারিসে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

"আসামী যখন তাহার মনিবের সহিত কলহে লিপ্ত ছিল, সেই সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসামী একখানি পত্র পাইয়াছিল, এই সংবাদ আমাদের সুবিদিত। আসামীর পিতাই সেই পত্র লিখিয়াছিল—ইহা পরে জানিতে পারা গিয়াছে। মিস্ ডেন মিঃ ট্রেনটনের মনে ঈর্ষা উৎপাদনের জন্য সেই পত্র তাঁহাকে দেখাইয়াছিল, এরূপ ধারণার কোন কারণ নাই! আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে, আসামী বলিয়াছিল, মিঃ ট্রেনটন অত্যন্ত অভদ্র ভাবে পত্রখানি তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া পাঠ করিয়াছিলেন এবং তিনি এই সংবাদ তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই যে, এই মামলায় আসামীপক্ষ কর্ত্তৃক এতই অধিক পরিমাণে নাট্যরসের অবতারণা করা হইয়াছে যে, ঘটনাসমূহের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন বলিয়াই মনে হয়। আসামী তাহার মনিব পিটার ট্রেনটনের প্রসঙ্গে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছে তাহা কত দূর সত্য—নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

"যাহা হউক, আমার আর অধিক কিছুই বলিবার নাই। উপসংহারে আমার ইহাই বক্তব্য যে, আপনাদের বিবেচনায় আসামী নিরপরাধ হইলে আপনাদের তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত প্রমাণগুলি যদি অকাট্য ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া আপনাদের ধারণা হয়, এবং আসামীই তাহার মনিবকে হত্যা করিয়াছে, এই বিশ্বাস যদি আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে আসামীই প্রকৃত অপরাধী—এই অভিমত প্রকাশ করাই আপনাদের উচিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। পিটার ট্রেনটন অন্য কোন ভাবে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে আসামী পক্ষ সে সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করে নাই। আসামীর কৌন্সিলী আপনাদের নিকট কেবল ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহার মক্কেল এই তরুণী নিরপরাধ, সে নরহত্যা করে নাই ; কিন্তু আমি আপনাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দ্দেশ দিতে চাহি যে, উহা প্রতিপন্ন করা আসামী পক্ষের অবশ্য-প্রয়োজনীয়।"

বিচারক অতঃপর ঘড়ির দিকে চাহিয়া জুরিদের জানাইলেন—পরদিন তিনি তাঁহার অবশিষ্ট বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিবেন।

বিচারক এজলাস হইতে উঠিয়া পড়িলে আদালতের কার্য্য বন্ধ হইল

[ক্রমশঃ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

অন্নহীনের অন্নপূর্ণা-আবাহন

এবার আশ্বিনে অন্নহীনের আর্ত্তনাদে যখন মেদিনী পূর্ণ, তখন অম্বিকা অন্নপূর্ণার শুভাগমন ঘটিতেছে। জগৎ-জোড়া যুদ্ধের অভিঘাতে, নৃশংস হত্যা ও নিষ্ঠুর ধ্বংসের প্রকোপে, প্রভূত ধন-জন-নাশের ফলে, মানবের সুখ-শান্তি তিরোধানের সঙ্গে, অন্ন-বস্ত্রের নিদারুণ অভাব-অনটন এবং ক্ষয়িষ্ণু স্বল্প-পরিমিত আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের অপরিসীম দুর্ম্মূল্যতা হেতু যেমন ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোণার বাঙ্গালায়, তেমনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী বিশাল ভারতের এবং ততোধিক বিশাল-বিস্তৃত নিখিল জগতের প্রায় সর্ব্বত্র দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার নিরবচ্ছিন্ন নিপীড়ন ঘটিতেছে। জগজ্জননীর শুভাগমন এবার নৌকায় এবং শুভযাত্রা দোলায়; সুতরাং আগমনে পৃথিবী জলপ্লুতা হইবে এবং গমনে মড়ক! বর্ত্তমান বর্ষে শনি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী। রাজ্যাধিপতির ফল :—

শনৈশ্চরে ভূমিপতৌ সকুজ্জলং প্রভূতবোগৈঃ পরিপীড্যতে জনঃ।
যুদ্ধং নৃপাণাং গদতস্করাগ্নৈর্ভ্রমন্তি লোকাঃ ক্ষুধিতাশ্চ দেশান্।

মন্ত্রীর প্রভাবে—

বিগ্রহোপহতা লোকা ভবেদন্যোহন্যদুর্জ্জয়ঃ।
কুতর্কানুগতা ভূপা যত্র মন্ত্রী ধরাত্মজঃ।

ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের আকাশে শনি, মঙ্গল, প্রজাপতির প্রভাব এবং বৃহস্পতি শনি মহাসংযোগের (ইং ১১৪১) সহিত পশ্চিমাকাশস্থ রাহুগ্রস্ত রবি-চন্দ্রের রেখা পুষ্যানক্ষত্র হইতে মঘানক্ষত্রাবধি প্রায় লম্বাংশে থাকায় ভারতে ও বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, শস্যহানি, চোর-দস্যুভয়, আতঙ্ক, প্রাকৃতিক উৎপাত, শত্রুভয় এবং ব্যাপক ভাবে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিবে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, কাশ্মীর, সুরাট, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, সিন্ধু ও নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী দেশসমূহের অবস্থা শুভ নহে। বঙ্গোপসাগরে ও সমুদ্রের উপকূলভাগে প্রবল ঝটিকা দুর্য্যোগকারক হইতে পারে। ভূকম্পনেরও সম্ভাবনা আছে। কৃষির অবস্থা অনুকূল নহে। কৃষির উপযোগী সুনিয়মিত বৃষ্টির অভাব, প্রবল ঝটিকা এবং অতিবৃষ্টি হেতু বন্যায় দেশের ও শস্যের ক্ষতি অনিবার্য্য। জলবায়ু ও আবহাওয়া স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। তাই বোধ হয়, ভগবতী অন্নপূর্ণা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবার তিন দিনও থাকিবেন না। তৃতীয় দিনেই নবমী ও দশমীর পূজা গ্রহণ করিয়া কৈলাসে প্রত্যাগমন করিবেন।

বর্ষশেষে চৈত্র মাসে বাসন্তীরূপে দেবীর শুভাগমন হইবে দোলায় —ফল মড়ক। দেবী তখন পূর্ণ তিন দিন অবস্থান করিয়া প্রস্থান করিবেন গজে; ফল—"গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।" আশার কথা। আশাই মানুষের জীবন। আমাদের মধ্যে যাহারা তত দিন বাঁচিবে, তাহারা আশায় বুক বাঁধিয়া থাকিবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদের মুখ্য বিচার্য্য নহে। বর্ত্তমানকে লইয়াই আমাদের কাজ-কারবার। এই নিমিত্ত আমরা বর্ত্তমান দেশব্যাপী অন্ন-বস্ত্রের অভাব-অনটনের হেতু ও প্রতিকারের উপায় আলোচনা করিব। দৈব প্রতিকূল, পুরুষকারের দ্বারা তাহাকে যতটুকু প্রশমিত করিতে পারা যায়, সেই প্রচেষ্টাই আমাদের অবশ্য প্রতিপাল্য। কিন্তু পুরুষকারহীন দৈবের ন্যায় দৈবহীন পুরুষকারও নিষ্ফল।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের অধিকাংশ লোক কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং সেই জন্য শতকরা ৮৯ জন লোক গ্রামে এবং মাত্র ১১ জন সহরে বাস করে। এই নিমিত্ত এত বড় দেশ হইলেও ভারতে সহরের সংখ্যা কম। এক লক্ষ বা অধিক লোক বাস করে এরূপ সহর ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৩৮টি আছে। কৃষিপ্রধান ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে রপ্তানী-পণ্যের অধিকাংশই কৃষিজ দ্রব্য,—চাউল, গম, তৈলবীজ, চা, কফি, মশলা, তামাক, তুলা, পাট, শণ প্রভৃতি। এক সময় ভারত খাদ্য-শস্যের আত্ম-প্রাচুর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন আর ভারতের সে দিন নাই। আপাতরম্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাকচিক্যে স্বল্প-সন্তুষ্ট, নিরাড়ম্বর প্রাচ্য সংস্কৃতি পরাভূত। ফলে, ভারত এখন খাদ্যদ্রব্যেও আত্মনির্ভরশীল নহে—পরমুখাপেক্ষী। অন্নপূর্ণার অন্নক্ষেত্রে তাই আজ অন্নের নিমিত্ত হাহাকার!

বর্ত্তমান যুদ্ধের অভিঘাতে, সামরিক প্রয়োজনে প্রভূত পরিমাণে ক্রমবর্দ্ধমান রসদ, পরিচ্ছদ ও বহুবিধ যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন ও সরবরাহ করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই অ-সামরিক জনমণ্ডলীর নিত্য-প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের স্বল্পতা ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে, বৃটিশ ও অন্যান্য মিত্রশক্তির নিকট যুদ্ধার্থে আবশ্যক দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে প্রচুর অর্থ প্রাপ্য হইতেছে, তাহা বিলাতে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ষ্টার্লিং-সংস্থিতিতে জমা হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তদ্বিনিময়ে এদেশে প্রচুর কাগজের নোট ছাপিয়া অযথা অপরিমিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতেছেন। ফলে, স্বল্প পরিমিত অসামরিক ক্ষয়িষ্ণু দ্রব্যসম্ভারের জন্য বাজারে অপরিমিত অর্থের আমদানী হওয়াতে দ্রব্যমূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং অর্থবান্ ব্যক্তিবর্গ অতি উচ্চমূল্যে স্বল্প পরিমাণে প্রাপ্তব্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য চাউলের প্রয়োজন যেমন অধিক, তাহার অভাব অনটনও তত বেশী ঘটিয়াছে। ফলে, দেশে অন্নের নিমিত্ত হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। তাই এবার অন্নহীনের অন্নপূর্ণার আবাহন!

যুদ্ধের জটিল ও কুটিল পরিস্থিতিজনিত সমুদ্র-বাণিজ্যবর্ত্মের সঙ্কট হেতু বিদেশ হইতে খাদ্য-সামগ্রীর আমদানী রুদ্ধ হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে সমর বিভাগের খাদ্য-দ্রব্যের ব্যয় শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমর বিভাগের প্রয়োজন পূরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহা অসামরিক জন-মণ্ডলীর পক্ষে অত্যন্ত কম। যুদ্ধের অগ্রগতির সহিত যুদ্ধের স্থিতিকাল যত বৃদ্ধি পাইবে, খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও অনটন তত বৃদ্ধি পাইবে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্য। দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেরই এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের শান্তিকামী রাজশক্তি যুদ্ধের বিরাট আয়োজনের নিমিত্ত আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং যখন যুদ্ধ বিঘোষিত হইল এবং ক্ষিপ্রগতিতে শত্রুপক্ষ দেশের পর দেশ গ্রাস করিতে লাগিল, তখন আমাদের কর্তৃপক্ষ আত্মহারা হইয়া যুদ্ধোদ্যমে মনোযোগী হইলেন। সামরিক প্রয়োজন ব্যতীত অপরিহার্য্য অসামরিক প্রয়োজনের দিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দান করিবার অবকাশ পাইলেন না। ফলে, যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে যুদ্ধযাত্রীদের প্রধান সহায় ও সম্বল যে বিপুল অসামরিক জনসাধারণ, তাহাদের তুষ্টি ও পুষ্টির প্রতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।

বিলাতে কিংবা আমেরিকায় কিন্তু এরূপ অদূরদর্শিতা ঘটে নাই। সেখানে কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের সূচনা ও উদ্যোগপর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহকারী জন-সাধারণের খাদ্য-পেয় ও স্বাস্থ্য-সন্তোষের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ফলে, সমুদ্র-পথের বিষম সঙ্কট এবং মালবাহী জাহাজের যথেষ্ট অপ্রতুলতা সত্ত্বেও তথায় যুদ্ধ-পূর্ব্ব মূল্যাপেক্ষা অনধিক উচ্চ মূল্যে অসামরিক জনসাধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য-সম্ভারের যথোপযুক্ত সরবরাহ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, ভারত সরকার অচিরে ভারতে যে দুর্গতি ঘটিবে, তৎপ্রতি বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া ইরাক, ইরাণ, মিশর, মরিসাস্ এবং সিংহল প্রভৃতি দেশে প্রভূত পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিতেছিলেন। দেশবাসীর তীব্র প্রতিবাদেও তাঁহারা প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে যখন বাঙ্গালা প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশের অবস্থা অতিমাত্র সঙ্কটাত্মক হইয়া উঠিল, তখনও তাঁহারা সিংহলকে প্রচুর পরিমাণে চাউল সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। স্বগৃহেই যে দাতব্যের আরম্ভ,—সে নীতি তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এমন কি, দেশাভ্যন্তরে যখন খাদ্য-সঙ্কট চরমে পৌঁছিয়াছিল, তখনও তাঁহারা খাদ্য-দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ করেন নাই। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে অন্যূন ৪৮ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য-দ্রব্য ভারতের বাহিরে গিয়াছে! ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে মাল-চলাচলের মুস্কিল বৃদ্ধি পাইতেছিল; এবং কয়েকটি প্রদেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলায় খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষের সীমান্ত-সান্নিধ্যে উপনীত হইল। দেশে কিরূপ খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে, তাহার হিসাব না লইয়া কেন্দ্রীয় ও কয়েকটি প্রাদেশিক সরকার এমন বিধি-বিরুদ্ধ মূল্য-শাসন নীতি অবলম্বন করিলেন যে, কৃষিজীবীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া মাল বাঁধাই করিতে আরম্ভ করিল। ফলে, বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের সহজ ধারা রুদ্ধ হইল। এরূপ অবস্থায় দ্রব্য-মূল্য যে অযথা উচ্চাভিমুখী হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক আহার্য্য-দ্রব্য অতি উচ্চ মূল্যেও দুর্লভ হইল। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র। দুই বেলা পেট ভরিয়া আহার তাহাদের কদাচিৎ জুটিয়া উঠে। অতি কায়ক্লেশে অর্জ্জিত স্বল্পাহারের উপর নিদারুণ দুর্ম্মূল্যের তীব্রতা আপতিত হইয়া তাহাদের অতি হীন ও ক্ষীণ জীবনযাত্রার ধারাকে অনশনের উপান্তে পৌঁছাইয়া দিল। তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা চরমে উঠিল।

ভারতবাসীর নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রীর অধিকাংশ ভারতে উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডকে তাহার অত্যাবশ্যক খাদ্য-দ্রব্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সাগর-পার হইতে আমদানী করিতে হয়। তথাপি ইংলণ্ডে খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য শতকরা ২৫ অংশের অধিক বৃদ্ধি পায় নাই; আর দুর্ভাগ্য ভারতের কলিকাতা নগরীতে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা আট শত অংশ! আমাদের প্রধান খাদ্য-দ্রব্যের ঘাটতির পরিমাণ অন্যূন ৭০. নিযুত মণ। সরকার লোক-প্রতি প্রতিদিন ৬ ছটাক চাউল যথেষ্ট মনে করেন। এই চাউলের খাদ্য-তাপ পরিমাণ ১৫০০ ক্যালরীর (Calories) অধিক নহে। অথচ এক জন সাধারণ মনুষ্যের খাদ্য-তাপের প্রয়োজন অন্ততঃ ২৫০০ ক্যালরী। কৃষকদের পক্ষে এই প্রয়োজন জন-প্রতি ৩,৫০০ ক্যালরী। যে ভাতের মণ্ড (Rice gruel) ব্যবস্থা হইতেছে, তাহার খাদ্য-তাপ পরিমাণ ৫০০ ক্যালরী মাত্র, কারণ, ইহার প্রকৃষ্টাংশ মাত্র জল। ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে খাদ্য-তাপের জন-প্রতি নিরিখ ইহার অন্ততঃ দেড় গুণ অধিক। জার্ম্মাণীতে সাধারণ লোকের জন্য খাদ্য-তাপের জন-প্রতি নিরিখ ৪,০০০ ক্যালরী এবং গুরু পরিশ্রমকারী শ্রমজীবীদের পক্ষে ৫,০০০ হইতে ৭,০০০ ক্যালরী। আমাদের দেশের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; সুতরাং স্বভাবতঃই ক্ষীণজীবী। বর্ত্তমান মন্বন্তরে অনাহারে ও সিকি আহারে তাহাদের জীবনীশক্তির কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে? ফলে, মৃত্যুই তাহাদের একমাত্র নিয়তি! ঘটিতেছেও তাহাই!

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটি খাদ্য-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এক জন খাদ্য-মন্ত্রীও নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিভাগ সাতটি উপায়-সম্বলিত একটি নীতি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অভাবগ্রস্ত প্রদেশগুলির নিমিত্ত ১০০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য কিনিবার একটি নির্দ্ধারণ আছে। সৌভাগ্যক্রমে পঞ্জাব প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে গমের উত্তম ফসল ফলনের ফলে সঙ্কটের কিঞ্চিৎ প্রশমন ঘটিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালার অবস্থা ভীষণ হইতে ভীষণতর পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার সহিত ভূতপূর্ব্ব হক্ মন্ত্রিমণ্ডলীর এ বিষয়ে সংঘর্ষ ও তাহার পরিণাম সকলেরই সুবিদিত। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী শাসনকর্ত্তার এবং শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায়ের "নেক্ নজর" লাভ করিয়াও বিশেষ কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না; কারণ, রোগীর শ্বাস যখন কণ্ঠাগত, তখন কোন ডাক্তার, বৈদ্য, অথবা হাকিমের তীব্রবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগেরও উপায় থাকে না; প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইলেও কদাচিৎ ফল-প্রসূ হয়। বাঙ্গালার শ্বাস এখন কণ্ঠাগত!

বাঙ্গালার নব-নিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, খাদ্য-দ্রব্যের যথার্থ অভাব ঘটে নাই; কৃষক ও মজুতদারগণের মাল বাঁধাই প্রক্রিয়ার ফলে অনটন ঘটিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার একটি প্রচণ্ড মজুত-বিরোধী তাড়না (Anti-hoarding Drive) পরিচালনার ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, মফঃস্বলে মজুত অপেক্ষা —অভাবই অধিক। এই তাড়নার ফলে যে ১৫ লক্ষ মণ চাউলে আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহা উদ্বৃত্তও নয়; প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর নয়। এই মজুত মাল বাজারে উপস্থিত করা হয় নাই মাত্র সে দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং তাহার পরেও খাদ্য-মন্ত্রী স্বীকা করিয়াছেন যে, যথার্থই অভাব ঘটিয়াছে। এই ঘাটতির পরিমা সমগ্র উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকা বাঙ্গালাকে যে ৫২ কোটি টাকার খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিবার প্রতি শ্রুতি দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য-শস্য যোগাইতে পারেন নাই। ফলে, খাদ্য-মন্ত্রী বাঙ্গালায় শাসন-নিয়ন্ত্রিত (Controlled) দোকানে বুভুক্ষু জন-সাধারণকে যে পরিমাণ চাউ যোগাইতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও পারেন নাই। এখন মুস্লীম লীগ দল বলিতেছেন, এই খাদ্য-সঙ্কটের দায়িত্ব বাঙ্গালার লাট কিংবা ভূতপূর্ব্ব অথবা বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলীর নহে,—দোষ কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু বাঙ্গালার সরকারকেই দায়ী করিয়াছেন। এক্ষেত্রে বাঙ্গালা সরকার সহরে ও মফঃস্বলে যে আট শত সরকা দোকান খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন,—তাহাতে কি ফলোদয় হইবে চাউলেরই যখন যথার্থ অভাব, তখন তাহার যোগান কোথা হইতে

চলিবে? এবং এরূপ অবস্থায় নীতিসঙ্গত বণ্টনই বা কি প্রকারে সম্ভব? কেবল মাত্র চাউল নহে,—গম, যব প্রভৃতি অন্যান্য শস্য-দানাও প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে কম!

বাঙ্গালায় নব-নিযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক ভারত সরকারের আনুকূল্যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কিয়দংশ লইয়া একটি পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী অবাধ-ব্যবসা-মণ্ডলীর (Eastern Free Trade Zone) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ এই অংশ হইতে যুদ্ধ-পরিস্থিতি হেতু প্রবর্ত্তিত খাদ্য-সামগ্রীর অবাধ চলাচল প্রতিরোধক নিয়মাবলির প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, প্রতিবেশী-প্রাদেশিক বাজার হইতে বাঙ্গালার নিমিত্ত খাদ্য-সামগ্রী কিনিবার অবাধ অধিকার বিঘোষিত হইবামাত্র বাঙ্গালা হইতে ধনিক ও বণিক যাইয়া যদৃচ্ছা উচ্চ মূল্যে ঐ সকল স্থানে খাদ্যদ্রব্য কিনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ফলে ঐ সকল স্থানে দ্রব্য-মূল্য যে অকস্মাৎ উর্দ্ধগামী হইল তাহা নহে; অচিরে খাদ্য-দ্রব্যের অভাব-অনটন ঘটিবার নিদারুণ সম্ভাবনা দেখা দিল। সুতরাং প্রতিবেশী-প্রদেশের শাসনতন্ত্রগুলি অবিলম্বে ভারত সরকারকে তাহাদের আসন্ন বিপদের গুরুত্বের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া অবাধ-কেনাবেচা বন্ধ করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলেন এবং নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে যতটুকু অবাধ-রপ্তানী বন্ধ করা সম্ভব, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। ভারত সরকার সর্ব্ব প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া নয়া দিল্লীতে একটি বৈঠক বসাইলেন এবং তাহাতে এই অবাধ ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রত্যাহার করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। কেবল বাঙ্গালার কাকুতি-মিনতিতে এইটুকু অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইল যে, যত দিন বাঙ্গালা তাহার বিষম বিপদ হইতে কিঞ্চিৎ প্রশমন লাভ না করে, তত দিন অবাধ ক্রয়-বিক্রয় চলিবে; এবং বিভিন্ন প্রদেশে যে ক্রয়-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, সেগুলিকেও কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। এই অবাধ ক্রয়-বিক্রয় নীতি গত ১৬ই আগষ্ট হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে সমগ্র ভারতে এই নীতি অবলম্বিত হইলে, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য দরিদ্র জন-মণ্ডলীকে তীব্র অনশন-ক্লেশ সহ্য করিতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করিতে হইত না! কিন্তু মন্দভাগ্য ভারতের যথার্থ শাসন-কর্ত্তা সাগর-পারে অবস্থিত; স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে অধিকার—নামে মাত্র। ইতিমধ্যে সাগর-পার হইতে এক জন খাদ্যনিয়ন্তা ও এক জন খাদ্য-শাসন-উপদেষ্টা মোটা বেতনে ভারতে শুভাগমন করিয়াছেন! অতএব 'মা ভৈঃ!'

যাহা হউক, নয়া দিল্লীর বৈঠকে নিম্নলিখিত নীতিগুলি অবধারিত হইয়াছে; ক্রমে অবলম্বিত হইবে, সূচী পরে প্রকাশ্য।

(১) যত শীঘ্র সম্ভব সহর অঞ্চলে জনসংখ্যানুযায়ী খাদ্য-সামগ্রীর নীতি-সঙ্গত বণ্টন (Rationing) ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং তাহার ক্রম-প্রসারণ।

(২) বর্ত্তমানে বাধ্যতামূলক ভাবে অর্থাৎ আইনের সাহায্যে দ্রব্যমূল্যের কোন নিম্নতম ক্রম (minimum prices) নির্দ্ধারিত হইবে না; তবে সর্ব্বপ্রকার পণ্যের মূল্য কমাইবার এবং তাহা যুক্তিসঙ্গত, পর্য্যায়ে দৃঢ় রাখিবার সর্ব্ববিধ চেষ্টা অনুসৃত হইবে। প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাহাদের স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে অবস্থা অনুযায়ী মূল্যমানকে আয়ত্তান্তর্গত করিবার নিমিত্ত বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।

(৩) অতিরিক্ত লাভের উদ্দেশ্যে গুপ্ত-সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতে কঠোর বিধি-বিধান প্রযুক্ত হইবে,—যেমন প্রদেশগুলিতে, তেমনি দেশীয় রাজ্যগুলিতে।

(৪) স্বাভাবিক অবস্থা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অবাধ ব্যবসায়ের প্রস্তাব বিবেচিত হইতে পারিবে না।

(৫) সরাসরি সরকার কর্তৃক অথবা প্রদেশগুলির কিম্বা দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পূর্ণ শাসনাধীন গোমস্তা (Agencies) দ্বারা মূল নীতি (Basic plan)-অনুবর্ত্তী খাদ্যদ্রব্য-সংগ্রহ প্রচেষ্টা (Procuration) পরিচালিত হইবে।

(৬) অভাবগ্রস্ত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন ভাবে তাহাদের মৌলিক হিস্যার (Basic quota) পরিধির মধ্যে প্রাচুর্য্য-সম্পন্ন অঞ্চল হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ এবং রেল ও ষ্টীমার-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সংগৃহীত মাল স্থানান্তর করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৭) ভারত সরকার সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিবেন—যাহাতে জন-সাধারণের ভোজ্য ও ভোগ্য দ্রব্যের (Consumers' goods) স্বল্পতার যথাসম্ভব ত্বরিত প্রতিকার ঘটে।

(৮) বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার (Long-range planning) বিষয়, সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির একটি প্রতিনিধি-বৈঠকে আলোচিত হইবে।

আলোচনার অন্ত নাই। জনসাধারণের দুঃখেরও অন্ত নাই। উপরোক্ত বিধানগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্ব্বতন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী (সার আজিজুল হক্) বলিয়াছেন যে, সর্ব্ব প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে খাদ্যদ্রব্য-শাসন হুকুমের (Food-grains Control Order) প্রবল প্রয়োগ ব্যতীত মৌলিক সঙ্কল্প (Basic plan), অর্থাৎ উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের যোগান কিংবা সুশৃঙ্খল ভাবে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের (Procurement operations) কার্য্য-পরিচালনা সম্ভবপর নহে। ইহা অবশ্য সর্ব্ববাদিসম্মত যে, অভাবগ্রস্ত প্রদেশগুলির অভাব পূরণ করিতে না পারিলে সমগ্র দেশের শান্তিই বিক্ষুব্ধ হইবে। উদ্বৃত্ত ও অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের মধ্যে আর্থিক বন্দোবস্ত তাহাদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে; কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং উদ্বৃত্ত অঞ্চলের ক্রয়কারী গোমস্তা-গিরির অধীনে অভাবগ্রস্ত অঞ্চলের নিমিত্ত ক্রয় এবং ক্রীত খাদ্য-সামগ্রীর স্থানান্তরকরণ নিষ্পন্ন হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মত আদেশ-উপদেশ দ্বারা সাহায্য করিবেন। অভাবগ্রস্ত অঞ্চল-গুলিরও কয়েকটি সাধারণ নীতির পরিসরে সর্ব্বপ্রকার উপায় অন্বেষণের অধিকার থাকিবে। খাদ্যদ্রব্য-শাসন হুকুমেরও কোন পরিবর্ত্তন প্রয়োজন কি না, তাহাও বর্ত্তমানে ভারত সরকারের বিচারাধীন আছে। কারণ, খাদ্য-সমস্যা সমাধানের একটি মাত্র দিক্ নহে। ইহার বিভিন্ন দিক্ হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক, শাসন-সম্বন্ধীয়, ব্যবস্থা-সম্মত ও আইন-সঙ্গত বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন।

চাহিদা, যোগান ও মূল্যসমস্যাগুলিই প্রবল। কেন্দ্রীয় সরকার যথাসম্ভব তিনটি বিষয়েই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কিন্তু "গয়ং গচ্ছ" ভাবে লক্ষ্য রাখিবার দিন চলিয়া গিয়াছে; এখন ত্বরিত প্রতিকার প্রয়োজন। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরেও অভাব অনটন প্রবল; পরন্তু

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। সমগ্র ভারতে উচ্চতম মূল্যমান নির্দ্ধারণ ব্যতীত কি মূল্য-প্রশমন সম্ভব? চাহিদা হইতে যোগান যত দিন অধিকতর না হইবে, তত দিন স্বাভাবিক গতিতে মূল্য হ্রাস কবি-কল্পনা বলিয়াই অনুমিত হয়। অধিকতর হওয়া দূরে থাকুক, চাহিদা ও যোগানে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইতে এখনও দীর্ঘ দিন প্রয়োজন। মিত্র ও সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহ হইতে অবিলম্বে প্রচুর খাদ্য-শস্য আমদানী ব্যতীত তাহা কখনই সম্ভব নহে। সুখের বিষয়, মূল্যস্ফীতির মূলে যে মুদ্রাস্ফীতি, তৎপ্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এত দিনে চৈতন্য সমুদ্ভূত হইয়াছে। মূল্যমানকে সংযত ও সঙ্গত পর্য্যায়ে অবনমিত করিবার শুভ ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ-কল্পে দৃঢ় ভাবে কয়েকটি উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু যে একমাত্র সহজ সরল উপায় অবলম্বন করিলে সব দিক্ রক্ষা পায়, তাহার অন্তরালে দৃঢ়-অধিকৃত স্বার্থের (Vested interests) প্রবল সংঘর্ষ। বিলাতে সঞ্চিত ষ্টার্লিং-সংস্থিতির বিনিময়ে ভারতে অর্জ্জিত বিলাতী সম্পত্তিকে ভারতবাসীর হস্তে সমর্পণ ব্যতীত অনর্থের আমূল সংশোধন সম্ভব নহে। জোড়াতালি দিয়া বিপদ কাটাইবার প্রচেষ্টা বিফল।

বাঙ্গালার খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দ্দী সাহেব শাসাইয়াছেন যে, অক্টোবর-নবেম্বরের মধ্যে ভারত সরকারের অযথাস্ফীত-মুদ্রা-প্রকরণ-সঙ্কোচের সুফল পরিস্ফুট হইবে। ইতিমধ্যে কলিকাতায় ও হাওড়ায় কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত আছে, তাহারও হিসাব লওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় মজুত মালের পরিমাণ বিশেষ আশাপ্রদ মনে হয় না। যাহা হউক, সরকার খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যশাসন নীতি পুনরায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে মূল্য হ্রাস করিতে কৃতসঙ্কল্প! কিন্তু খাদ্য-দ্রব্যের যথার্থই অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে, এবং সে অভাব পূরণ করিবার উপায় নির্ভর করিতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙ্গালাকে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করিবার সক্ষমতার উপর। ভারত সরকার এ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে যে পারিবেন, সে সম্ভাবনাও অনিশ্চিত; কারণ, প্রতি-বেশী-প্রদেশ সমূহ পূর্ব্ব-প্রান্ত মণ্ডলে অবাধ-বাণিজ্যের অভিঘাতে তাহাদের প্রাদেশিক স্বার্থের প্রতিকূল যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে অবাধ বাণিজ্যকে প্রতিহত ও প্রতিরুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ভীতি-প্রদ। প্রাদেশিক সরকার বাঙ্গালাকে "দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত" স্বীকার করিতে অস্বীকার করিতেছেন। কিন্তু সরকারের অস্বীকৃতিতে দুর্ভিক্ষ পশ্চাৎপদ নহে। সম্মুখে ভীষণ দুর্ভিক্ষ! মাত্র "দুর্ভিক্ষের অনুরূপ" প্রতিকার-প্রচেষ্টায় মরণোন্মুখ অনশনক্লিষ্ট নরনারী ও বালক-বালিকাকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এখনও দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিলে কিছু প্রতিকার হইতে পারে। কয়েকটি পরিবেষণ-কেন্দ্র (Distributing centres) এবং মণ্ড-বিতরণকারী রন্ধনশালা (Gruel kitchens) সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যদান, কিংবা বন্যার জলে দাবানল, কিংবা বাড়বানল নির্ব্বাপণের প্রচেষ্টার ন্যায় প্রহসনে পরিণত হইবে।

অচিরাৎ প্রদেশান্তর ও দেশান্তর হইতে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যুক্তিসঙ্গত মূল্যে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে সহরে-মফঃস্বলে সর্ব্বত্র ত্বরিত বণ্টনের ব্যবস্থা ব্যতীত সাক্ষাৎ ও আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই। ঠিকা-মজুরী কার্য্য (Test Relief Work) কিংবা কৃষিঋণ প্রদান এবং অধিকতর পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি পরের কার্য্য। আশু আহার্য্য যোগাইয়া কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীদের প্রাণ রক্ষা না করিলে কৃষি-কার্য্য, কুটীর-শিল্প ও শ্রম-শিল্পের কার্য্য করিবে কে? বন্যার প্রকোপে আউস ফসল বিনষ্ট-প্রায়। আমন ফসল পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অন্নহীনের অন্ন-সংস্থান এবং বস্ত্র-হীনের বস্ত্র-সংস্থানই সাক্ষাৎ বর্ত্তমানের জটিল সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান মন্ত্রিমণ্ডলী কিংবা শাসক ও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ আয়ত্ত-বহির্ভূত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, মনে হয়। সম্মুখে ঘোর অন্ধকার! মৃত্যুর বিভীষিকা ব্যতীত,—আশার আলোকের মৃদু রশ্মিও দ্রষ্টব্য নহে। জগৎপালিনী জগদীশ্বরী ব্যতীত এ সঙ্কটে ত্রাণ করিতে পারে, এমন শক্তি কোথায়?

কিন্তু জগজ্জননী আশ্বিনে নৌকায় আসিয়া দোলায় গমন করি-বেন এবং পুনরায় চৈত্র মাসে দোলায় আসিয়া গজে গমন করিবেন। এই নৌকায় আগমন ও গজে গমনের মধ্যবর্ত্তী সময় অতি সঙ্কটের কাল,—ইহার অন্তরে মৃত্যু তাহার তাণ্ডবলীলা সম্পাদন করিবে! কিন্তু সকলেই কিছু মরিবে না। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরেও লোক বাঁচিয়াছিল এবং পৃথিবী পুনরায় ধনজন ও শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণা হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধের পর শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুখের পর যেমন দুঃখ, দুঃখের অন্তেও তেমনি সুখ। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। সুখের ন্যায় দুঃখও চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং সেই অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুঃখের মধ্যেও আমাদিগকে ভবিষ্যৎ সুখের সংস্থান করিতে হইবে। এই নিমিত্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনার (Long-term planaing) প্রয়োজন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন-অভিযানের সার্থকতা। এই প্রয়োজন কেবল মাত্র বাঙ্গালার, কিংবা ভারতের নহে;—নিখিল জগতের। সম্প্রতি মার্কিণে মিত্রশক্তি-সম্মিলনের খাদ্য-বৈঠকের (Food Conference) অধিবেশন হইয়াছিল। সাক্ষিগোপালস্বরূপ ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত কয়েকটি কর্ম্মচারী "ভারতের প্রতিনিধি" আছিলায় উপস্থিত ছিলেন। কিছু বাক্যব্যয়ও তাঁহারা করিয়াছিলেন। এই বৈঠকের দৃষ্টি যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের প্রতি নিবদ্ধ,—বর্ত্তমানের সহিত সম্পর্কশূন্য। এই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে যে ত্রিশটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা এখন ওয়াশিংটনে অবস্থিত একটি কার্য্যকরী আন্তর্জ্জাতিক প্রতিনিধি-মণ্ডলীর (Interim International Commission) বিবেচনা-ধীন। এই মণ্ডলীতে "ভারতের প্রতিনিধি"রূপে স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী স্থান পাইয়াছেন। যুদ্ধান্তে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ও একটি আন্তর্জ্জাতিক শস্য-ভাণ্ডার (International Granary) প্রতিষ্ঠাই এই মণ্ডলীর বিবেচনার মুখ্য বিষয়।

অধুনা শত্রুমিত্র সকল দেশেই খাদ্যাভাব-সমস্যার সমাধান হেতু প্রবল প্রচেষ্টা চলিতেছে। কেবল বর্ত্তমানের জন্য নহে, ভবিষ্যতের জন্যও উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। আমাদের ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলিও দেশীয় রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগে আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য অধিকতর শস্যোৎপাদন প্রচেষ্টায় যত্নশীল হইয়াছেন। ভারত

সরকার একটি দূরপ্রসারী ভবিষ্যদ্দর্শী সমিতিও (Lon-range Committee) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ কার্য্যে জনসাধারণের, বিশেষতঃ কৃষি, শিল্পজীবী ও বণিক্ সম্প্রদায়ের আন্তরিক সহযোগ ও সমর্থন অবশ্য প্রয়োজন। অধিকতর শস্য উৎপাদনার্থ উৎকৃষ্ট বীজ, উৎকৃষ্ট সার, উন্নততর সেচ-ব্যবস্থা এবং দেশ, কাল ও পাত্র হিসাবে ঋণ, অথবা অর্থ-সাহায্য (Subsidies) প্রয়োজন। কেবলমাত্র প্রচার প্রভাবে কার্য্য হইবে না। 'শুধু কথায় চিঁড়া ভিজে না।' ভারতের বিশাল আয়তনে বহু জমি পতিত রহিয়াছে। তাহাদিগকে কর্ষণোপযোগী করিয়া তাহাতে শস্য ফলাইতে হইবে। নতুবা নিস্তার নাই। দুর্ভাগ্য ভারতের উপর দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নিপতিত হইয়াছে;—প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ও মহামারী তাহার সঙ্গী! অন্তরীক্ষে গ্রহবৈরিতার প্রচণ্ড দুর্যোগ! ক্ষিতিতলে দুর্দ্ধর্ষ শত্রু বাঙ্গালার সীমান্তে সমুপাগত!

প্রচুর শস্যের প্রয়োজন। ইংরেজীতে একটি কথা আছে, To grow two blades of corn where one grew before, অর্থাৎ পূর্ব্বে যেখানে একটি শস্যশীর্ষ জন্মিত, সেখানে দুইটি জন্মাইতে হইবে। সম্প্রতি যুদ্ধপরিস্থিতি হেতু ভারতে বহু লোক-সমাগম ঘটিয়াছে। অগণ্য বৈদেশিক বন্দী, সৈন্য এবং বর্ম্মা, সিঙ্গাপুর, মালয় প্রভৃতি জাপান-পর্য্যুদস্ত দেশ হইতে প্রত্যাগত জনসমূহে ভারতের লোকসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে খাদ্যব্যয়ও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং আমাদের খাদ্য-শস্যের উৎপাদন যথার্থই দ্বিগুণ না করিলে উপায় নাই। কৃষিপ্রধান ভারতে কৃষিই আমাদের প্রধান সম্বল; শিল্প তাহার অনুগামী ও অনুষঙ্গী। ভূমিই আমাদের জনয়িত্রী ও পালয়িত্রী। এই নিমিত্তই জননী জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী। শস্যের মধ্যে ধান্যই প্রধান; কারণ, ভারতে চাউলই প্রধান খাদ্য। অধুনা নহে, সেই ত্রেতাযুগ হইতে ধান্যই আমাদের প্রধান অবলম্বন। ধান্যই আমাদের লক্ষ্মী। শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের পরে রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভরতকে প্রথম কুশল প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

> উৎপত্তিবিষমা যস্য নিত্যং যস্য ধান্যো ভবেৎ।
> সর্ব্বশস্যপ্রধানস্য ধান্যস্য কুশলং বদ॥

এই ধান্যের কুশলেই প্রজাবর্গের কুশল। ধান জন্মিলে প্রকৃতি-পুঞ্জ সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের সংস্থান করিতে পারে। অতএব ধান্যই আমাদের প্রকৃত ধন। এই হেতু ধনের সহিত ধান্যের নিত্য সংযোগ। "ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ কর"—আমাদের আশীর্ব্বচন। এই ধান্য ও ধনের অধিকারী যিনি, সেই জগজ্জননী জগদীশ্বরী দুর্গা দেবীর অর্চ্চনা-আবাহন এই সুনির্ম্মল শরৎকালে সুখে-দুঃখে আমরা সম্পন্ন করিয়া থাকি। মায়ের জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না, তাঁহার হৃতসর্ব্বস্বা নগ্নিকা কালী মূর্ত্তিই আজ আমাদের সম্মুখে প্রকট; চণ্ডিকা মূর্ত্তিতে আজ তিনি রণোন্মাদে প্রমত্ত! কিন্তু এই ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীমা মূর্ত্তির পশ্চাতে তাঁহার জগৎপালন-কারিণী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি অন্নপূর্ণা; আমরা আজ অন্নহীন; সুতরাং তিনি ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় উপায় নাই। তাই এ বৎসর অন্নহীনের অন্নপূর্ণার আবাহন।

> শ্রীদুর্গাং ধনদামন্নপূর্ণাং পদ্মাং সুরেশ্বরীম্।
> শস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নমো নমঃ॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যযুগ

হে যুগ-শ্রেষ্ঠ, তোমারে প্রণাম করি!
এসো অনাগত সুকাল তোমারে স্মরি।
সত্য পুণ্য আনো আরোগ্য আয়ু,
পবিত্র মন, পবিত্র জল-বায়ু,
এসো এ ধরায় ধর্ম্মের ডোর ধরি।

কোন্ যে জনমে দেখিব—তা ঠিক নাই!
অকাল বোধনে বন্দনা গেয়ে যাই।
এ জীবনে যাহা হবে না, তাহাই হোক!
এসো মহাযুগ এসো হে পুণ্যশ্লোক,
সব পাপ-তাপ, সব গ্লানি লও হরি।

নূতন করিয়া গড় মানবের মন।
পরশে হউক সব লোহা কাঞ্চন!
ঘুচাও হিংসা, ঘুচাও পাতিত্য,
মানুষে-মানুষে বাড়ুক জ্ঞাতিত্ব,
দাও স্বাধীনতা, শৃঙ্খল অপসরি।

ঝঞ্ঝা বন্যা প্রলয় চাহে না লোক—
অমৃত-বৃষ্টি পুষ্প-বৃষ্টি হোক!
সাগর বাড়ায়ে সরিতা যেমন আসে,
আসে পূর্ণিমা গৌরবে নীলাকাশে—
এসো প্রতিপদে পারিজাত মুঞ্জরি।

তোমার চেয়ে ত কোন যুগ নাই বড়!
মানুষ ভাঙিয়া ধরায় দেবতা গড়।
একই জীবনে নূতন জীবন দাও,
ক্ষুদ্র, ক্ষণিক, ক্ষীণ যাহা তাহা নাও,—
দুর্ব্বলে দাও শক্তি মহেশ্বরি!

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যুগ, তব জয় জয়!
সত্য ধর্ম্ম পুণ্যেরই আশ্রয়!
রেখো না রেখো না ভগবানে এত দূর—
গাও তব মহা সঙ্গীত সুমধুর!
দম্ভ দর্প লুটাক ধূলায় পড়ি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মিস্ বকু

মিস্ বকুকে আমার খুব ভালো লেগেছিল—তাকে ভালোবেসে ছিলাম বললেও অত্যুক্তি হয় না!

যখন তার সঙ্গে পরিচয়, তখন তার বয়স কেবলমাত্র চৌদ্দ—কৃশ, তন্বী বালিকার দেহটি সবেমাত্র বয়ঃসন্ধির মাদকতা ও বিকাশোন্মুখ যৌবনের কোমলতায় ভরে উঠেছে। কৈশোরের প্রগলভ একটা সরলতা ও চাঞ্চল্য তখনও দেহে-মনে রয়ে গেছে। ক্লাস নাইনের ছাত্রী সে—পড়ায় বেশ ভালো। হাঁটবার চেয়ে ছোটবার দিকেই ঝোঁকটা তার তখন বেশী, কথা বলার চেয়ে শোনবার দিকেই আগ্রহ অধিকতর। লিক্‌লিকে শরীরে একটা দুর্লভ রংএর প্রলেপ—জরদ্ রংএর পাতলা শাড়ীর ফাঁকে সেটা যেন আরও সুন্দর দেখায়।

আমার সঙ্গে পরিচয় তার আকস্মিক নয়—অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে। দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেবার জন্য আগেই বলে রাখা ভালো যে, তখন আমার বয়স তিরিশের কোঠায়। কেবলমাত্র বিবাহিত নয়, পিতাও বটে—তবু স্বীকার করতে ক্ষতি নেই তাকে ভালোবেসে ছিলাম।

পরিচয়টা ছিল তার দিদির সঙ্গে; কারণ, তিনি আমার সহপাঠিনী। এক বার বড়দিনের পূর্ব্বে আলাপ-প্রসঙ্গে জানা গেল, তাঁর বাড়ী যে জেলার সদর সহরে, আমার শ্বশুর-গৃহও হুবহু সেখানে; এবং বড়দিনে শ্বশুর-গৃহে অবস্থান করবো শুনে তিনি সাদরে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—কলকাতায় এই আড়ষ্টতার মাঝে নৈকট্য জন্মায় না, ওখানে গেলে অনেকখানি যেন আপনার মনে হবে।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম এবং সঙ্গিহীন কয়েকটি দিনে তাঁদের মত পরিচিত লোক পেয়ে মনটা বেশ একটা তৃপ্তি পেয়েছিল। শ্বশুর-গৃহের অনতিদূরেই ওদের বাসা, অতএব সকাল-বিকাল আড্ডাটা বেশ জম্‌তো।

প্রথম দিনে শ্বশুর-গৃহে প্রচুর জলযোগ করে সকালে তাদের ওখানে উপস্থিত হলাম। সহপাঠিনী মিস্ দাশগুপ্তা বললেন,—তাও কি হয়, আমাদের দেশের জামাই, প্রথম দিন একটু মিষ্টিমুখ না করলে লোকে নিন্দে করবে যে!

বাধ্য হয়ে কিছু খেতে হলো। তার পর নানা কথা—অবান্তর এবং প্রসঙ্গহীন। আমি লেখক না হলেও কিছু কিছু লিখি—তাই মিস্ বকু জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, আপনি কি করে লেখেন?

আমি একটু হেসে জবাব দিলাম—প্রশ্নটা বড় শক্ত। উত্তর দিচ্ছি; কিন্তু তার পূর্ব্বে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হবে। তুমি গান করতে পারো?

মিস্ বকু বললে,—না, গলা-সাধা আরম্ভ করেছি।

মিস্ দাশগুপ্তা বললেন,—না না, ও বেশ গাইতে পারে এবং নাচে বহু মেডেল পেয়েছে।

আমি অভিমান করে বললাম,—আমাকে গান শুনোতে হবে সে-ভয়ে মিথ্যা কথাটা না বললেও পারতে। ইচ্ছে করে আমাকে গান না শোনালে আমি সে গান শুনি না। অতএব তুমি যত দিন পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় আমাকে গান না শোনাবে, তত দিন আমি বলবো না যে গান শোনাও। আচ্ছা যাক্—তুমি গান গাও কেমন করে, বুঝিয়ে দিতে পারো?

—গেয়ে যাই। কেমন করে গাই তা কি করে বলবো!

—আমার অবস্থা গুরুতর, হারমোনিয়ামের কোন পর্দ্দায় আমার গলা মেলে না। তোমাদের যে কি করে অমন হয়, ভেবে আশ্চর্য্য হই।

সকলে হেসে উঠ্‌ল। বকু বললে,—বেশ, তাতে কি হলো?

—তুমি কেমন করে গান করো যেমন বলতে পারলে না, আমিও তেমনি কেমন করে লিখি বলতে পারি না। তুমিও যন্ত্র ধরে গান গাও, আমিও কলম ধরে লিখি।

আবার সকলে হেসে উঠলো। মিস্ দাশগুপ্তা খানিকটা আত্ম-প্রসাদের সঙ্গে বলে উঠলেন—আমার ভাই-বোন সবাই বিস্তু গান করতে পারে।

—আপনি?

মিস্ দাশগুপ্তা ব্যঙ্গ করলেন—আপনার মত! কোন পর্দ্দাতেই গলা মেলে না।

আমি পরিহাস করলাম,—আপনার ভাই-বোন সকলে গান করতে পারে, এ কথা আপাততঃ বিশ্বাস করলাম না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলে বিশ্বাস অবশ্যই করবো।

মিস্ বকু উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আচ্ছা দাঁড়ান, গান শোনাচ্ছি; কিন্তু যতক্ষণ গান গাইব বসতে হবে, উঠে যেতে পারবেন না।

—নিশ্চয়ই যাবো না, কিন্তু সিগারেট খাবো। ঘড়ি দেখে বললাম,—সাড়ে দশটায়, সাড়ে বারোটায়, আড়াইটেয় ও সাড়ে পাঁচটায় চা দিতে হবে।

—হ্যাঁ, দেবো।

মিস্ বকু চাকর দিয়ে হারমোনিয়ামটা এনে বললে—কি গান শুনবেন? আধুনিক? কাব্য-সঙ্গীত? না ক্লাসিক?

—আমি ত শুনবো না, তুমি শোনাবে। অতএব।

—আমার ইচ্ছা ত? বেশ।

বকু একটু হেসে বললে,—আপনি ভারি দুষ্টু! সে আর কোনো কথা না বলে গান শুরু করলে। সত্যি ভাল গায়, কণ্ঠ শিশুর অর্দ্ধস্ফুট কথার মত মধুর। আমি শুনছিলাম। গান শেষ করে সে বললে,—কেমন? আর গাইবো? না—কাকের কণ্ঠার হবে?

—প্রশংসা যদি করতেই হয়, তোমার সামনে নিশ্চয় করবো না।

গান চললো প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত। বকু কিছুতেই থামে না, আমাকে জব্দ করবে বলে আমারও আসা হয় না প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। অবশেষে মিস্ দাসগুপ্তা বললেন,—বকু তোর না হয় নাওয়া-খাওয়া বাদ দিলে চলবে!- উনি এখানে জামাই, সকলে ওঁর জন্যে বসে আছেন।

বকু বললে—আচ্ছা তবে থাক এখন যতীন বাবু, কেমন?

—তোমার ইচ্ছা।

বকু আমার হাতের ঘড়িটা দেখে বললে,—সাড়ে এগারো। তা চা খেতে হবে ত আর একবার?

—প্রতিশ্রুতি অনুসারে খাওয়া উচিত।

বকু চা আনতে গেল, সহপাঠিনী বান্ধবীকে বললাম,—বাস্তবিক

বকু গান গাইতে পারে। সুর আর কথার একটা সমাবেশ ওর গানেই যেন প্রথম পেলাম। ও নাচ শিখ্‌লে কোথায়?

নাম-করা এক জন নাচিয়ে মেয়ের নাম করে বান্ধবী বললেন,—তিনি ওঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং স্বেচ্ছায় নাচ শিখিয়ে গেছেন।

বল্‌লুম, ওকে ভাল না বাসা একটা মস্ত বড় সংযম সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার মধ্যে কি ওর সারল্য আর সুকণ্ঠের কিছুই নেই?

—প্রথমটার অভাব দেখ্‌লেন—এর মানে?

—দেখলাম ত। সরল ভাবে গান করতে আপনিও পারতেন।

—আমি সত্যি গাইতে পারি না। তবে তার আফ্‌শোষ আপনাকে মিটিয়ে দেব। কাল-পরশু ওর নাচটাও দেখিয়ে দেব—তার জন্য একটু জোগাড় দরকার।

—দেখলে আনন্দিত হব, এবং মনে মনে ধন্যবাদ দেব।

বকু চা নিয়ে এল। চা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—আচ্ছা তা হলে উঠি এখন, নমস্কার।

—বিকেলে আস্‌বেন কিন্তু।

—বিকেলে নয়, সন্ধ্যার পরে আস্‌বো। বেরুতে বেরুতেই সন্ধ্যা হয়, তা ছাড়া একটু বেড়ানোও দরকার। শ্বশুর-গৃহে ভূরি-ভোজনের পরে সেটা স্বাস্থ্যকর। চলে আস্‌ছিলাম, কে যেন পিছন থেকে হাত ধরে আকর্ষণ করলে। বকু হাতখানা ধরে ফেলেছে। এই নিঃসঙ্কোচ সারল্যের প্রশংসা করবো কি নিন্দা করবো বুঝ্‌লাম না, তবে মনে মনে একটু খুশী হলাম। বকু বল্‌লে, বেশ লোক আপনি! এত গান শোনালুম অথচ যাবার সময় একটা কিছুই বলা দরকার মনে করলেন না? দিদি আপনার বন্ধু, তার সঙ্গে ভদ্রতা না করলেও ক্ষতি ছিল না। আমার সঙ্গেই বরং প্রথম পরিচয়, কিছু বলা উচিত ছিল।

আমি পরিহাস করলাম,—ওহো! তুমি যে এক জন রেস্‌পেক্টেবল লেডি তা ভুলে গিয়েছিলাম। নমস্কার মিস্ বকু, অনুমতি করলে আস্‌তে পারি।

বকু অপ্রাকৃত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্‌লে,—সেধে ভজে এ নমস্কারের কোনো দাম আছে?

আমি হাত জোড় করে বল্‌লাম,—ভুল হয়েছে। ক্ষমা চাচ্ছি।

বকু হো হো করে হেসে উঠে বল্‌লে,—ক্ষমা চাইলেন একেবারে! ছিঃ ছিঃ!

আমার হাত ধরে আমার অতি সন্নিকটে দাঁড়িয়ে সে বল্‌লে—সন্ধ্যায় আস্‌বেন ত?

—হ্যাঁ, আস্‌বো। নিম্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম,—তোমার দিদি গান করেন না?

বকু বল্‌লে,—ছেড়ে দিয়েছে। এখন গান লেখে।

বান্ধবী তিরস্কার করলেন,—আমি আবার গান লিখ্‌লাম কবে রে মিথ্যাবাদী?

—বা, 'জীবন-ছায়ার বসে' গানটা যে গাইলাম, সেটা তোমার লেখা না?

বান্ধবী একটু লজ্জিত হলেন, আমি বকুর হাতখানা আকর্ষণ করে বল্‌লাম,—সত্য ভাষণে অপরাধ নেই।

কেবল অনুরোধে নয়, যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গেই সন্ধ্যার পর বান্ধবীর ওখানে উপস্থিত হলাম। বাহিরের ঘরে বকু একা কি যেন করছিল, আমাকে দেখে বললে,—এই যে এসেছেন, বেশ! এত দেরী করতে হয়! অন্দরের উদ্দেশ্যে উচ্চ কণ্ঠে কহিল,—ছোড়দা, যতীন বাবু এসেছেন।

একটু হেসে আমাকে বললে,—কিন্তু দিদি এখন নেই। কেমন জব্দ। সে বড় দিদির ওখানে বেড়াতে গেছে।

জব্দ হওয়ার কি সঙ্গত হেতু আছে বুঝলাম না, তাই প্রশ্ন করলাম,—জব্দ কেন?

—বাঃ দিদি নেই, কে অভ্যর্থনা করবে, আলাপ করবে? ফিরে যেতে হবে ত!

—কেন? তুমি আছ! না, সেটাও ভুল দেখ্‌ছি?

সে অকারণ হো হো করে হেসে উঠে বললে,—আমি আছি তা হলে।

—সেই রকমই অনুমান করছি।

—আচ্ছা, তা হলে বসুন। সে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দিল।

—না, এই শীতে চেয়ারে বসবার যো নেই। ফরাসের উপরই জড়োসড়ো হয়ে বস্‌তে হবে।

—চা আন্‌তে হবে?

—তোমার অতিথি-সেবায় আন্তরিকতার অভাব দেখা যাচ্ছে।

—আমার অতিথি ত নন্, দিদির অতিথি। না, আমারও অতিথি?

—যাই হোক, চা-খরচ একটু অদৃষ্টে আছে।

তথাকথিত ছোড়দা এলেন। তিনি আই-এ ক্লাসের ছাত্র। বকু বললে,—তুমি গান শোনাও ছোড়দা, আমি চা আনি। কেমন?

—যা, চা নিয়ে আয়। ছোড়দা ওরফে গৌর বাবু বললেন,—দিদির মুখে আপনার কত কথা শুনেছি! ও-বেলা আমি একটু বেরিয়েছিলাম তাই দেখা হয়নি। আপনি কেবল লেখক নন্, ভালো অভিনয়ও করেন।

হেসে বললাম,—গুণপনার অন্ত নেই! কিন্তু বকু আপনাকে যে আদেশ করে গেল, তার কি হবে?

—গান? আচ্ছা গাইছি। গান গাইতে আমার সঙ্কোচ নেই। হয় ভাল হবে না হয় খারাপ হবে। গাইব তা হলে?

—অবশ্যই।

ফরাসের উপরই হারমোনিয়াম ছিল। সে গান করতে সুরু করলে। ভূমিকায় বললে—গানটা লেখা দিদির, আর সুর আমার।

অপটু হাতে তৈরী জলবৎ এক কাপ চা বকু এনে দিল। গান চলছিল, তার মাঝে সেটা গলাধঃকরণ করে সঙ্গীতান্তে বকুকে বললাম,—তোমার তৈরী চা, খেয়েই বুঝলাম।

—কেমন করে?

—চায়ে নাচিয়ে-মেয়ের হাতের একটু স্বাদ পেলাম।

বকু তার টানা-টানা চোখ দু'টির বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে একটু লজ্জিত কণ্ঠে বললে,—ওঃ, ভালো হয়নি বুঝি, তাই ঠাট্টা কচ্ছেন! ঠাকুর যে জল গরম করে দিলে তা ঠাণ্ডাই রয়েছে, তাতে চা ভাল হবে কেমন করে? তাই পাতলা হয়েছে। সে

হেসে উঠলো। ব্যঙ্গ করে বললে,—দিদি এলে ভালো চা খাওয়াবে। আমি ত প্রশ্নী।

আমি পরিহাস করলাম,—যথেষ্ট করেছ! বসতে না বললেও আমার বলার কিছু ছিল না।

বকু বললে,—উঃ, আপনি এত বড় অকৃতজ্ঞ!

কৃতজ্ঞতার অভাব ছিল সত্য, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল না, তাই কট‍ূক্তিকে হেসে হাল্‌কা করেছিলাম। ছোড়দা পুনরায় গান করলেন। বকু কখন্ আমার ঠিক পাশে এসে বসেছে—বিজলী-বাতির নীলাভ আলোয় একটা জিনিষ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে দেখলাম—বকুর হাতখানা তারই কোলের মাঝে অত্যন্ত অচপল ভাবে পড়েছিল—আঙুলগুলো চাঁপার কলির মত মসৃণ ও সুন্দর। নীলাভ আলোয় সেগুলো অত্যন্ত শুভ্র দেখাচ্ছিল। আমি বকুর হাতখানা হাতে নিয়ে বললাম,—তোমার আঙুলগুলি কি সুন্দর!

হাতখানা সে ছিনিয়ে নিয়ে বললে,—যান্! আর ঠাট্টা করতে হবে না।

গান শেষ হলে বললাম,—তোমাদের নাচের মাঝে কি সমস্ত মুদ্রা ব্যবহার হয় সে সব কিছু বুঝি না, আর ওরিয়েণ্টাল ডান্সের মাঝে দেখি কেবল সাপের মত দেহটা জোড়ামোড়া করে! এর অর্থটা বুঝিয়ে দিতে পারো? এ শাস্ত্রের কিছুই বুঝলাম না জীবনে।

বকু একটু দুঃখিত হয়ে বললে,—ওই ত আপনাদের দোষ। না জেনেও সমালোচনা করেন।

—সমালোচনা করিনি, অজ্ঞতা প্রকাশ করেছি।

—আচ্ছা দাঁড়ান, আমি যা জানি বলছি। নৃত্যকলা সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা সে মুখস্থ কবিতার মত বলে গেল, তার পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে,—আচ্ছা দেখাচ্ছি।

অত্যন্ত সংক্ষেপে কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে নিয়ে সে তার ছোড়দাকে বললে,—কেদারার কন্সার্টটা বাজাও না ছোড়দা—ওঁকে বুঝিয়ে দেব।

বকু নৃত্যের সঙ্গে মুদ্রা ও দৈহিক অভিব্যক্তির টীকা করে যেতে লাগলো,—হঠাৎ হেসে বললে, একটু অসুবিধে হবে বুঝতে, তবলা ত নেই। আচ্ছা, তার পরে—

নৃত্যকলা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল না, বকু কি বললে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারিনি, কিন্তু মনে মনে ওর কথাই ভাবছিলাম। ওর অসঙ্কোচ সারল্য ও নির্ভীক আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল! ও যেন ঠিক খাঁচার পাখীর মত নয়, প্রজাপতির মত রঙীন লঘুপক্ষভরে চলেছে। এই সামান্য পরিচয়ে আপনার গুণে ও বয়সের দূরত্বকে উপেক্ষা করে আমাকে অত্যন্ত নিকটে টেনে নিয়েছে—তাতে আমার কোন নৈপুণ্য নেই! তার দুর্ব্বার বাহুর আকর্ষণে আমাকে সে নিজেই আপনার করে ফেলেছে। তাই ভাবলুম, মানুষ ভালোবাসে না, অসহায় ভাবে ভালোবাসতে বাধ্য হয়।

বকু শ্রান্ত হয়ে এসে বসলো। শ্রমে মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে, তাতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মকণা সঞ্চিত হয়ে আলোয় অভ্ররেণুর মত চিক্‌মিক্ করছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—কেমন বুঝলেন?

বলা বাহুল্য, কিছুই বুঝিনি! তাই বললাম,—সামান্য একটু আলোর আভাস যেন পেয়েছি!

—না, আপনার দ্বারা হবে না।

—না না, রক্ষে কর, নাচ শেখবার দুরাকাঙ্ক্ষা জীবনে কখনও হয়নি। নিজের শরীরের শীর্ণতা এবং দৈর্ঘ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে বললাম,—আমি নাচ যদি শিখিই, তবে একমাত্র ভূশণ্ডীর মাঠেই তা দেখানো সম্ভব হবে।

ঘরের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠলো। মিস্ দাশগুপ্তা ফিরে এসে বললেন,—ওঃ, আপনি এসেছেন! যা হোক্, আপনারও কথার ঠিক আছে তা হলে!

আমি বললাম,—আয়নায় নিজের মুখ দেখছেন না ত?

—যাক্, বকু থাকতে আপনার অযত্ন নিশ্চয় হয়নি। গোঁড়ুর গান শুনেছেন?

—হ্যাঁ, কিছুই বাকী নেই। আপনাকে বিদায়-নমস্কার করাটা শুধু বাকী।

মিস্ দাশগুপ্তা হাত জোড় করে বললেন,—ক্ষমা চাইছি আর কখনও বিকেলে বেরুবো না, হলো তো?

শ্বশুর-গৃহের ভূরি-ভোজন ও ওদের বাড়ীর ভাইবোন ক'টির অসঙ্কোচ ও সহৃদয় ব্যবহারের মাঝে বড়দিনের ছোট দিন ক'টি কেটে গেল। এবার বিদায় নিতে হবে—কিন্তু এবারকার বন্ধটা যেন অনাবশ্যকরূপে সংক্ষিপ্ত বলে মনে হলো।

বকুর গান-নাচ প্রভৃতি দেখা সমাপ্ত, এক দিন প্রসঙ্গক্রমে সে বলেছিল,—এত গান করলুম, আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?

—কি চাও?

—আপনার নতুন বই বেরুলে একখানা বই দেবেন, তাতে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে।

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম দেবো এবং ভুল হবে না, তাও জানিয়ে দিলাম।

বিদায়ের দিনে জানা গেল, মিস্ দাশগুপ্তা সেই দিনই কলকাতা যাবেন এবং আমি যাবো পরের দিন। আমি প্রশ্ন করলাম,—আজই যাবেন তা হলে?

—হ্যাঁ, আপনার রংপুর ত্যাগ দু'-চার দিনে হবে বলে মনে হয় না।

—শ্বশুর-গৃহের প্রতি আকর্ষণ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তা ত্যাগ করতে হবে।

বিদায়-নমস্কার করে আসছিলাম, বকু পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে,—কাল আস্‌বেন কিন্তু।

আমি জবাব দিতে একটু ইতস্ততঃ করছিলাম। বকু ব্যঙ্গ করলে,—ওঃ, দিদি চলে যাচ্ছে, কাল আবার কেমন করে আস্‌বেন, তাও ত বটে!

আমি বললাম,—আমার বাধা এখন আর নেই তোমার কৃপায়। তবে আসা হবে কি না সন্দেহ, কারণ, কাল নানা স্থানে আত্মীয়-সন্দর্শনে যেতে হবে।

আরও কিছু আলাপের পরে আসবার সময় বকু আমার অতি সন্নিকটে দাঁড়িয়ে হাত ধরে বললে—কাল আস্‌বেন কিন্তু! আস্‌বেন ত?

বললাম—আস্‌বো!

বকুর সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছিলাম—ইচ্ছা না ছিল এমন নয়, কিন্তু একটা সঙ্কোচ বোধ করেছিলাম। কলেজে এক দিন তাই মিস্ দাশগুপ্তা বল্লেন,—আপনি ত আসবার দিন আমাদের ওখানে যাননি।

—না, যাওয়া হয়নি, কিন্তু আপনি জান্‌লেন কি করে?

—বকু লিখেছে, "তোমার বন্ধুকে জানিও যে তিনি মিথ্যাবাদী।"

আনন্দ হলো,—বকু অন্ততঃ আমাকে ভুলে যায়নি।

বৎসরাধিক পরের কথা।

পুনরায় রংপুর যেতে হলো। তার পর এক দিন সকালে বেড়াতে বেরিয়ে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ওদের বাড়ীতে বেড়াতে গেলাম। যে ঘরটায় সাধারণতঃ বসতাম, সেটায় বসে পড়লাম—বাইরে কেউ নেই। উচ্চ কণ্ঠে ডাকব, কিন্তু কাকে? সকালের কাগজ ও উচ্ছিষ্ট চায়ের কাপ পড়ে রয়েছে। কাগজটা হাতে নিয়ে পড়বার ভাণ কর্‌ছিলাম।

বাড়ীর ভিতরে একটা কোলাহল হচ্ছিল। জনৈক বর্ষীয়সী মহিলা বল্‌ছিলেন,—এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে—কোন কিছুই করতে পারো না। এক কাপ চা তৈরী করার যোগ্যতা নেই, কেবল নাচ-গান করলেই চলবে? সংসার করতে হবে না? এক দিন রাঁধতে পারো না? ঠাকুরের অসুখ!

—সংসার করবো কিসের দুঃখে?

—না? বিয়ে হবে না? তখন দেখবি।

—বিয়ে আমি করবো না।

কে যেন আসছে—পদশব্দ নিকটবর্ত্তী হলে দেখলাম, বকু। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আপনি এসেছেন?

কোনরূপ ভদ্রতা না করে সে অত্যন্ত দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। বুঝলাম, খবর দিতে গেছে। পরক্ষণেই ফিরে এসে বল্‌লে,—দিদিকে বলে এলাম। কিন্তু আপনার কথার ঠিক নেই, যাবার দিনে এলেন না। সমস্ত বিকেলটা বসেছিলাম।

—বসেছিলে? আশ্চর্য্য হয়েছিলাম তার কথা শুনে, তার মত মেয়ের পক্ষে আমার মত বয়স্ক লোকের জন্য প্রতীক্ষা করার মাঝে যে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, সেটা না থাকাই উচিত ছিল। তাই একটু পরিহাস করে বল্‌লাম,—তোমার বয়সে তোমার বসে থাকা উচিত, তোমার ছোড়দার বন্ধু-বান্ধবদের জন্য। আমার জন্যে বসে থাকাটা ত খুব সঙ্গত নয়।

বকু ভ্রূ কুঞ্চিত করে অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলে, কেন?

—আমরা বুড়ো হয়েছি,—উপন্যাসে যেমন পড়ি তাই বল্‌ছি। সেইটেই স্বাভাবিক।

বকু কিছুক্ষণ চিন্তা করে অর্থটা বুঝে নিয়ে বল্‌লে,—ওঃ, মাঝে মাঝে অস্বাভাবিকও ত ঘটে। সে আগের মতই অত্যন্ত প্রগল্‌ভ ভাবে হেসে উঠল।

মিস্ দাশগুপ্তা এসে বল্‌লেন,—কবে এলেন?

—দিন তিনেক।

—তিন দিন পরে মনে হলো?

—মনে করাটা আর আসাটার মাঝে কিছু সময় থাকাই ভাল। আপনি আছেন কি না খোঁজ নিতে হবে ত!

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পরে বকুকে একটু একান্তে বললাম,—তোমার একটা গোপন কথা শুনে ফেলেছি—অবশ্য অন্যায় ভাবেই!

—কি?

—বিয়ে করবে না বলে তোমার মায়ের সঙ্গে তুমি বচসা করেছিলে, আমি শুনে ফেলেছি।

—শুনেছেন, ভালোই।

—বিয়ে সত্যি করবে না, না কি?

—কি হবে বিয়ে করে? স্বাধীন জীবনই ভাল।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম তার মুখস্থ করা কথা কয়েকটি শুনে। বললাম,—এমন কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয়নি জীবনে যে বলেছে যে, সে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে? বাপ-মায়ে ধরে-বেঁধে দিয়েছে আর তারা অত্যন্ত অনিচ্ছায় বিষ-বড়ি খাওয়ার মত বিবাহ কার্যটি শেষ করেছে?

বকু আগের চেয়ে একটু বড় হয়েছিল, তাই বললে,—যদি ঘর-সংসার করাই জীবনের মোক্ষলাভ হয় তবে লেখাপড়া গান-নাচ ছেড়ে রান্না-বান্না দেখাই উচিত।

—তা কেন? ওগুলো হবে ঘর-সংসারকে সম্পূর্ণ করতে। যার চাকরী করার দরকার নেই, সে পুরুষ-মানুষ কি লেখাপড়া শিখবে না? লেখাপড়া শেখে ভদ্র হতে, মানুষ হতে।

আরও কিছু তর্ক-বিতর্কের পর বকু একটু হেসে বললে,—আপনার ideaগুলো সব সেকেলে হয়ে গেছে, কিন্তু লেখার মধ্যে ত তেমন নেই।

—হবে। কিন্তু এবার অতিথিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করা হচ্ছে না!

—কেন? গান শোনাতে হবে?

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিদায় নিতে হলো। আসবার দিনে বারান্দায় আমার অতি-সন্নিকটে দাঁড়িয়ে হাত ধরে সে বললে,—দিদি থাক্ না থাক্, যখনই আসেন, এখানে আসবেন। কেমন?

তার কণ্ঠে এবং বিস্ফারিত দু'টি চোখে কাতর মিনতি প্রকাশ পেয়েছে, তার মাঝে চপলতা নেই। একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম,—আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে এমন অনুরোধ তুমি কেন কর?

সে অবনত মস্তকে পায়ের আঙুল ক'টা দিয়ে বারান্দার উপর অর্দ্ধবৃত্ত আঁকতে আঁকতে বললে,—কেন, জানি না।

—এলে খুশী হও?

—হ্যাঁ, খুব খুশী হই।

—তবে অবশ্যই আসবো।

প্রায় বিশ বৎসর পরের কথা হচ্ছে।

সময়ের গতি রোধ করা সম্ভব নয়, তাই চুলও পেকেছে এবং শরীরও জীর্ণ হয়েছে। অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, শারীরিক অপটুতার জন্ত রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। মধ্যম শ্রেণীতেই ভ্রমণ করি। স্থানান্তরে যাচ্ছিলাম। মধ্যম শ্রেণীর

কামরাখানা একেবারে খালি, এক কোণে বসে কাগজ পড়ছিলাম। একটা বড় জংসনে এসে গাড়ীটা থামলো।

একটি ভদ্রলোক গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলেন, গাড়ীটা ফাঁকা, তাই উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করলেন—এদিকে—এদিকে এসো সব।

দেখতে দেখতে চার-পাঁচটা কুলি বিরাট্ লটবহর নিয়ে এসে ঘরখানার শ্বাসরুদ্ধ করে দিলে। তার পিছনে এলেন তাঁর পত্নী এবং গণ্ডাদেড়েক সন্তান-সন্ততি। এক কোণে বিছানা করে নিয়ে জিনিষ-পত্র ঠিক আছে কি না দেখতেই সময় চলে গেল। গাড়ী ছাড়লো।

সন্তানগুলির বড়টি মেয়ে, বছর তের। তার পরে দু'বছরের পার্থক্য রেখে বাকী ছ'টি। কনিষ্ঠটির বয়স বছর দু'য়েক হবে। ছেলে-মেয়েগুলি খুব বিবেচক বলা যায় না।

বড় মেয়েটি আমার দিকে একটু তাকিয়ে কাঁধের পিন্ আর খোঁপা ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখলে। তার পরে ভ্রাতাটি জানালায় মাথা গলিয়ে কি দেখতে গিয়েছিল, চোখে কয়লার গুঁড়ো পেয়ে চোখ রগড়াতে লাগলো; তার পরেরটি বাঙ্কের চেন ধরে ঝুলতে সুরু করেছে, তার পরেরটি বায়না ধরেছে জল খাবো ইত্যাদি এবং সর্ব্বকনিষ্ঠটির ইজের-পরিবর্ত্তনের আশু প্রয়োজন হয়েছে।

ছেলেটি বললে—দিদি, চোখে কি পড়লো, ত্যাখ্। মা বললেন, খোকার ইজের বের করে দে। আর অন্য ছেলে বললে, দিদি জল দে। ইতিমধ্যে দোদুল্যমান ছেলেটির পদাঘাতে তার ভ্রাতা ধরাশায়ী হয়ে তারস্বরে কেঁদে উঠলো,—এই সংসারের যিনি মূল কর্ত্তা, তিনি সমস্ত দুর্ঘটনা উপেক্ষা করে জিনিষপত্র বার-বার গুণ্তি করছিলেন। ধরাশায়ী বালকটি ক্রমবর্দ্ধিত উচ্চগ্রামে কাঁদছে।

মহা রুষ্ট হয়ে বললেন,—এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে হয়েছ কিছু পারো না! মণ্টু কাঁদছে দেখ্ছো,—ধরে তুলতেও পারো না একটু! কেবল নাচ আর গান পরমার্থ হয়েছে!

কন্যা জবাব দিল,—একসঙ্গে কত কাজ করবো? ইজের বের করবো—

—চুপ কর্! আবার তর্ক!

তথাকথিত ধরাশায়ী মণ্টু বিস্কুট-আহারান্তে শান্ত চিত্তে বাইরের দিকে ধাবমান বৃক্ষশ্রেণী দেখতে লাগলো। ছোট খোকা বললে, মা, বি—বি অর্থাৎ বিস্কুট।

মা বললেন, ত্যাখো তো গো, ঘীয়ের পাত্রটা ভাঙ্গলো না কি। কুলিটা যে আছাড় দিয়েছে—মশলার কৌটোগুলোই কি আর আছে?

কর্ত্তা পরীক্ষা করে বললেন,—না ভাঙ্গেনি, কিন্তু কিছু ঘি পড়ে গেছে।

কর্ত্রী একটা হাঁড়ি পরীক্ষা করে বললেন,—দেখলে, হাঁড়িটা ভেঙ্গে সব ডাল পড়ে গেছে।

বড় মেয়ে হেসে উঠলো। টিপ্পনি করলে, বালাই গেছে!

মাতা বললেন, তোমার ত কিছুই লাগে না, বিবি হয়ে ঘুরে বেড়ালেই চলবে!

—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কুড়িয়ে আনলে অমন একটু ভাঙ্গেই।

কন্যার প্রতি একটু বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মা করুণ সুরে বললেন,—আহা, এমন ডাল কি আর মিলবে!

রেল-ভ্রমণের প্রথম দুর্য্যোগটা কাটলো।

চেয়ে চেয়ে দেখ্ছিলাম। এই গৃহবধূটিকে কোথায় যেন দেখেছি সামনের দাঁত দু'টির মাঝখানে পোকায় খাওয়া কালো দাগটুকু—কথা বলার সময় ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিরক্তি প্রকাশ করা যেন আমার পরিচিত। জীবনের অতীত পৃষ্ঠাগুলি দ্রুত ওলটাতে লাগ্লাম, কিন্তু ঐ মুখখানি কবে কখন্ বিস্মৃতির মাঝে ডুবে গেছে!

মাতা-কন্যায় বচসা হচ্ছিল, মা বললেন,—সংসার করা শেখো, নাচ-গান কোন কাজে লাগবে না। সংসার করতে হবে ত!

—না।

—না, তবে কি সিনেমায় নেচে বেড়াবে! বিয়ে হবে না?

—দরকার নেই।

হঠাৎ মনে পড়ল, এই গৃহ-বধূ সেই মিস্ বকু! শ্রাবণের সেই নাতিপরিপূর্ণ নদীস্রোতের মত চঞ্চল বকু আজ শীতের শুষ্ক শীর্ণ স্থির জলকল্লোলের মত অচঞ্চল—আষাঢ়ের শ্যামল ভূপৃষ্ঠ যেন শীতের নিষ্ঠুর পাণ্ডুরতায় পর্য্যবসিত হয়ে গেছে! মনে পড়ে, অত্যন্ত স্বল্প-পরিচয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ও আমাকে নৃত্যকলা ব্যাখ্যা করে-ছিল। আর আজ মেয়ের সঙ্গে এমনি বচসা করছে সেই বকু! তার জীবনেই এ দৃশ্যের অভিনয়! হেসে উঠ্লাম।

হাসিটা সম্ভবতঃ সশব্দে হয়েছিল, তাই বকু ও অন্য সকলে আমার দিকে ফিরে তাকালো। চোখোচোখি হতেই বকুকে বল্লাম,—চিন্তে পারো বকু?

বকু মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে সহাস্যে এগিয়ে এসে বললে, আপনি? যতীনদা? উঃ, চুল পেকে কি হয়েছে! চেন্বার যো নেই যে! এত বুড়ো হয়েছেন!

দাদা সম্বোধন নতুন, তবু প্রতিবাদ করলাম না,—হেসে বল্লাম,—আমি কি ভেবেছি যে, যে-বকু এক দিন আমাকে নৃত্যকলা বোঝাবার জন্য নেচে ঘর্ম্মাক্ত হয়েছে, সে আজ তার মেয়ের সঙ্গে নাচ-গান নিয়ে বচসা করছে!

—সে কথা বলে লজ্জা দেবেন না। বিয়ের আগে পর্য্যন্ত ঐ সব করেছি বলেই ত এখন সংসার সামলাতে হিমসিম হতে হয়। তখন বুঝিনি যে, ও সব কোন কাজেই লাগে না!

পুত্র-কন্যাগুলি কৌতূহল-পরতন্ত্র হয়ে আমাদের নিকটে এসে ভীড় করলে। বকু বললে, বিনু, প্রণাম কর। বড় মেয়ে বিনু প্রণাম করলে। তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে বল্লাম, বোসো মা-লক্ষ্মী।

তার পর বকুর কথার জবাব দিলাম,—নাচ-গান কি জীবনের কোনো কাজে লাগেনি?

—কৈ লাগলো?

—লেগেছে। 'যে নদী মরু-পথে হারালো ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।' তোমাকে চেনা আজ কিছুতেই সম্ভব হতো না; যদি না তোমার সেই মুদ্রাব্যাখ্যার দৃশ্যটা মনে পড়তো! আমার মনের কোণে সেটুকু ধরা পড়ে রয়েছে কালজয়ী হয়ে! আর তার চেয়েও বেশী হয়ে আছে ওঁর কাছে।

আমি বকুর স্বামীকে ইঙ্গিত করেছিলাম। বকু লজ্জিত হয়ে বললে, যান্—কি বলছেন সব!

—তোমার মেয়ে আজ ঘীয়ের পাত্র আর হাঁড়ির ডালের কথা চিন্তা করে হাসছে, আবার এক দিন সযত্নে ও মসলার কৌটো বেঁধে আসবে।

—কিন্তু ও যে সংসারের কিছুই শিখলো না।

হেসে উঠলাম। গম্ভীর ভাবে বললাম—জগতে এই বিধি। যৌবনের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের এ বচসা চিরদিন চলেছে, কিন্তু সে বচসার সম্পূর্ণ অপচয় হয়নি জগতে। যৌবনের বেগবান্ অশ্বের পৃষ্ঠে যদি বার্দ্ধক্যের ভারী সওয়ার না থাক্‌তো, তাহলে অশ্বটি ওখানে পড়ে মরতো।

বকু আনমিত চোখে বললে,—হ্যাঁ, আজ আপনার সঙ্গে পরিচয়ের দিনটা মনে পড়লে হাসিই পায়।

গাড়ীখানা অকারণ দ্রুত ছুটে আমাকে গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী করে দিল।

বহু দিন পরে বকুকে পেয়ে এত শীঘ্র ছেড়ে যেতে হবে ভেবে দুঃখ হচ্ছিল। বল্‌লাম—আমাকে এই ষ্টেশনে নাম্‌তে হবে বকু।

—এখানেই?

—হ্যাঁ। কত দিন পরে দেখা!

প্লাটফরমে নেমে দাঁড়ালাম। বকু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে,—এখানে সেখানে ত যান। যদি পাবনা যান, তবে আমার ওখানে যাবেন নিশ্চয়— উনি কো-অপারেটিভ ইন্‌স্‌পেক্টর।

আর এক দিন অত্যন্ত করুণ মিনতি-ভরা কণ্ঠে সে বলেছিল— যখনই আস্‌বেন, এখানে আস্‌বেন কিন্তু! আজও তেমনি মিনতি-ভরা কণ্ঠে অনুরোধ জানালো।

গাড়ী চলে গেল। এই শ্লথগতি-মন্থর বকু যেন আমার জীবনের বিশ বছরের ব্যবধানটিকে অকস্মাৎ অত্যন্ত দীর্ঘ করে দিয়ে গেল। অজ্ঞাত বেদনায় মনটা ভারী হয়ে উঠলো। ভাবলাম— মিনতিভরা কণ্ঠে বার-বার আমাকে ও আমন্ত্রণ করে কেন? হাত ধরে কেন পিছু টান্‌তে চায়?

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ)।

শান্তির স্বরূপ

শান্তির কথা উঠিতেছে। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইতেছে, এই নৃশংস নরমেধ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি পড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। যত দিন গিয়াছে তত দিন আর যাইবে না, ইহার অবসান হইলে মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। গত মহাযুদ্ধের পর যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাকে স্থায়ী করিবার জন্ত চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। কেন স্থায়ী হইল না, তাহার কারণ অনুসন্ধানের ফলে অনেক ত্রুটি, অনেক প্রমাদ ধরা পড়িতেছে। এবার যাহাতে সেরূপ ত্রুটি না থাকে, সেরূপ ভ্রান্তি না ঘটে, তাহার জন্ত চেষ্টা হইতেছে। বড় বড় ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক, মনস্তত্ত্ববিৎ এবং অর্থশাস্ত্রবিৎ সুধীগণ এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন এবং রাজনীতিকদিগকে বিনামূল্যে অনেক পরামর্শ-সুধা বণ্টন করিতেছেন। উপযাচক হইয়া বিনামূল্যে সাধারণ উপদেশ দানের যে গতি হইয়া থাকে,— এই সকল বিজ্ঞচয়ের উপদেশেরও সেইরূপ গতি হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। এখন যেমন রণ-ডঙ্কার ভৈরব রবে তাঁহাদের সেই উপদেশাবলি সাম্রাজ্যচালক ব্যক্তিদিগের কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে না,—যুদ্ধান্তে বিজয়োৎসবে আত্মহারা রাজনীতিকদিগের বিজয়-বাদ্যের মধ্যে সেইরূপ বাহিরের লোকের সদুপদেশরাজি যে আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহার প্রমাণ এখন হইতে কিছু কিছু পাওয়া যাইতেছে।

এই যুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিবর্গের প্রতিপক্ষ অক্ষশক্তির মধ্যে জার্ম্মাণীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পক্ষ। এই জার্ম্মাণীর সহিত কিরূপ সন্ধি করা উচিত, তাহাই হইতেছে এখন প্রধান সমস্যা। ইটালীকে লইয়া সমস্যা তেমন প্রবল নয়। জাপান প্রাচ্য শক্তি। উহার কথা শ্বেতাঙ্গের নিকট বিশেষ গুরু নয়। এই জার্ম্মাণীর সহিত কিরূপ ভাবে সন্ধি করা হইবে, তাহাই হইতেছে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এমন কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যাহাতে এই বিংশ-শতাব্দীর বৃত্রাসুরকে চিরকাল লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ রাখা যায়! কি প্রকারে এই কালানল-সদৃশ বিষধরী মহানাগের বিষদন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া বহু যুগ ধরিয়া তাহাকে পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভবে, তাহা লইয়াই ইদানীং রাজনৈতিক পণ্ডিত-মহলে ঘোর বিতণ্ডা ও গবেষণা উপস্থিত হইয়াছে। এখনও যত দিন এই সংগ্রাম চলিবে, তত দিন সজীব খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থাকারী ভ্রাতুষ্পুত্রের মত কতকগুলি লোক এইরূপ পরামর্শ-সুধা বণ্টন করিতে থাকিবেন। শেষকালে যাহা বিধাতা-দেবের ইচ্ছা তাহাই হইবে। যিনি ভ্রান্তিরূপে কর্ত্তৃত্বকারী রাজনীতিকদিগের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহাদিগকে অনেক সময়ে বিপথে আগাইয়া দেন, তিনি যদি এবার শক্তিশালী রাজনীতিকদিগের মন হইতে ভ্রান্তির কুহেলিকা অপসারিত করেন, তাহা হইলে অবশ্য ইহার একটা স্থায়ী মীমাংসা হইবেই।

গত বারে ভার্সাই সন্ধিতে যে সকল ভুল করা হইয়াছিল, মনীষিগণ এবার একে একে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কোন মনীষীই সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। মানুষের মনের মধ্যে স্বভাবজাত যে দুইটা দৈত্য আছে, অহঙ্কার এবং ক্ষমতা-প্রিয়তা—সেই দুইটাই যত গোল বাধাইতেছে। রাজনীতিকরা যে তাহা বুঝেন না, তাহা নয়। তাঁহারা গত বারের অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, ক্ষিপ্রতার সহিত সন্ধি করিলে তাহাতে অনেক দোষ এবং ত্রুটি থাকিয়া যায়। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা তখন বিজয়ী পক্ষের মনে প্রবল থাকাতে তাহারা নিরপেক্ষ ভাবে সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। সেই জন্ত ভার্সাইয়ের সন্ধি স্থায়ী হয় নাই। সেই জন্ত অধ্যাপক সিডনী

বি ফে (Sidney B Fay) বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের বিরতি হইলেই সন্ধি করা কর্ত্তব্য হইবে না। যুদ্ধবিরতি হইবার দুই তিন বৎসর পরেই সন্ধির সর্ত্তগুলি নির্দ্ধারিত করা সমুচিত হইবে। এই দুই-তিন বৎসর কাল লোকের মস্তিষ্ক শীতল করা আবশ্যক হইবে। এই দুই-তিন বৎসর কাল অনশনক্লিষ্ট লোকদিগকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে—পারিবারিক ব্যবস্থা করিতে হইবে,—স্বাভাবিক আর্থিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং সমস্ত যুরোপে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সংশোধন করিতে হইবে। ইহা সত্য যে, যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মাণীতে স্থায়ী কোন শাসনযন্ত্র থাকিবে না। জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে তখন কেহ সমীচীন ব্যবস্থার কথা বলিতে পারিবে না। মিষ্টার হেরল্ড নিকলসন তাঁহার Peacemaking গ্রন্থে বলিয়াছেন, "যখন যুদ্ধজনিত ঘৃণা এবং মনের বিকার থাকে, তখন অবিলম্বে স্থায়ী সন্ধি করা সম্ভব হয় না।" এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এ কথা শুনিবে কয় জন? মার্কিণের এবং বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদিগণ যখন প্রতিপক্ষের গলা টিপিয়া ধরিবেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের দুষ্পূরণীয় স্বার্থ-সাধন করিবার প্রলোভন কিছুমাত্র সঙ্কুচিত করিতে চাহিবেন কি না, তাহা দ্রষ্টব্য। তাঁহারা যদি ত্যাগ-স্বীকার করিতে চাহেন, তবেই স্থায়ী সন্ধি সম্ভব হইবে; নতুবা কিছুতেই তাহা হইবে না।

আজ-কাল আর্থিক ব্যাপার লইয়াই যুদ্ধ হয়। সকল যুদ্ধের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, তাহার ভিতরে একটা আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা লুকাইয়া রহিয়াছে। বিগত যুরোপীয় মহাযুদ্ধের অন্তরালেও এই প্রকার একটা উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল, এবারও তাহা আছে। আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের সংবাদ লইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু এবার এই যুদ্ধে ভারতবাসী যত ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে বা করিতে বাধ্য হইয়াছে, এত আর কোন জাতিই করিতে বাধ্য হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সন্ধির সময় কোন ভারতীয় প্রকৃত জন-নায়ককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বা সন্ধি বিষয়ে কোন মত প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হইল না—এরূপ মনে করিবার কারণ যে নাই তাহা বলা যায় না। প্রতীচ্য শাসন-কর্ত্তারা কোন কালেই প্রাচ্য-জাতির মতামতের যে কোন মূল্য আছে তাহা মনে করেন না। তবে এ বিষয় লইয়া আমাদের শিরঃপীড়ার কারণ কি? কারণ আছে। কারণ, আবার যদি কোন কারণে এইরূপ একটা ব্যাপক যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে আমাদিগকে আবার এইরূপ দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। হয়ত বা ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। কাজেই সন্ধির ব্যাপারে ভারতবাসীর স্বার্থ যে আছে, তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য এই গুরু বিষয়টি আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে সন্ধি করিবার সময় জার্ম্মাণীকে নানারূপে দমিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার ফলে জার্ম্মাণী ঠিক দমিত হয় নাই। তাই আজ এক-পাদ-শতাব্দী যাইতে না যাইতেই সেই রণনির্জ্জিত নির্জ্জীবপ্রায় জার্ম্মাণী অতিকায় দৈত্যের মত উত্থিত হইয়া সমস্ত য়ুরোপকে মথিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান যুগের সমস্ত যুদ্ধেরই মূল কারণ শিল্প এবং বাণিজ্য-বিস্তার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সাম্রাজ্যবাদী চার্চ্চিল তাহা জানেন, রুজভেল্টও তাহা বুঝেন। তাই আটলাণ্টিক চার্টারের ঘোষণায় তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "ছোটই হউন আর বড়ই হউন, বিজয়ীই হউন আর বিজিতই হউন, সকলেই তাঁহাদের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর সকল দেশ হইতে শ্রমশিল্পের জন্য কাঁচা মাল লইতে পারিবেন; তাঁহাদের মধ্যে অধিকারের কোন তারতম্য করা হইবে না।" অধ্যাপক ফে বলেন যে, এই সর্ত্তটি অত্যন্ত সমীচীন হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যতে যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প হইতে পারে। কিন্তু যে সময়ে এই আটলাণ্টিক চার্টার লিখিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল, সে সময়ে জার্ম্মাণীর বা অক্ষশক্তির প্রতাপ এত দূর হ্রাস পায় নাই। তখনকার প্রতিশ্রুতি সমরান্তে প্রতিপালিত হইবে কি না, তাহা বুঝা কঠিন। মুসোলিনীর পদত্যাগের বা পদচ্যুতির পর এত দিনেও ইটালী আত্মসমর্পণ করিল না কেন, ইহা এক বিষম সমস্যা। যাহা হউক, যদি এই সমস্যার সমাধান হয় এবং যুদ্ধের পরও সন্ধি করিবার সময় এই সর্ত্ত ঠিকমত প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় যুদ্ধ ঘটিবার একটা বড় কারণ যে অপসৃত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আটলাণ্টিক চার্টারের ঘোষণার দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, যাঁহারা ঐ সনদে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা সত্য সত্যই পৃথিবী হইতে রাজনীতিক অত্যাচারের এবং সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধনে বিশেষ অবহিত। তিনি বলিয়াছেন যে, উহাতে দুইটি উদ্দেশ্যের এবং নীতির কথা বলা হইয়াছে। প্রথমতঃ, সকল মানুষের ইচ্ছামত শাসন-ব্যবস্থা বাছিয়া লইবার প্রতি শ্রদ্ধা; দ্বিতীয়তঃ, সকলের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষা করিবার জন্য এই বিশ্বে সর্ব্বজনীন সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা। কথাগুলি শুনিতে অতি সুন্দর—বলিতেও প্রাণে একটা উৎসাহের সঞ্চার হয়ত হয়। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করা অতিশয় কঠিন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা অত্যাচার করে এবং নির্ব্বিঘ্নতার এবং সুবিচারের ক্ষতি করে, তাহারা সকলেই আমাদের শত্রু। কারণ, তাহারা সভ্যতার অগ্রগতির হন্তারক। কথাগুলি সবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু নিহিত স্বার্থে স্বার্থবান্ ক্ষমতাশালী লোকদিগকে বাধা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। উহাদের কূট কৌশল ভেদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পূর্ব্বে সাম্রাজ্যবাদীরা সরল কথা বলিত, এখন আর তাহারা তাহা বলে না। এখন তাহারা নীতিধর্ম্মের দোহাই দিতে আরম্ভ করিয়াছে; নানারূপ ভাঁওতায় লোক-লোচনে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ কেহ এত দূর অবনত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা সয়তানীকেই ভগবানের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। সেই জন্য এই জাতীয় বিড়ালব্রতিক সাম্রাজ্যবাদীর উল্লেখ বাহিরের লোকের পক্ষে বুঝা কঠিন। পৃথিবীতে যত দিন প্রভাবশালী ব্যক্তিদিগের মন হইতে লালসা সমূলে উৎপাটিত না হইতেছে, যত দিন মানুষ বিশ্ব-মানবতার মধ্যে ভগবান্‌কে না দেখিতে পাইতেছে, তত দিন এই পৃথিবী হইতে ঐ প্রকার দানবীয় অত্যাচারের তিরোধান করা সম্ভব হইবে না। মার্কিণ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে কার্য্যতঃ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ উদারতার জন্য ফিলিপাইনের অধিবাসীদিগের চিরকৃতজ্ঞ থাকা স্বাভাবিক। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ফিলিপাইন যতই

দুর্ব্বল হউক না কেন, উহা মার্কিণের একটা অতি প্রবল সহায় হইবে। সত্য বটে, এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসি-সংখ্যা অধিক নয়; দেড় কোটিরও কম। দেড় কোটি মানবকে সুহৃদ্রূপে পাওয়া নিতান্ত অল্প সুবিধার কথা নয়। কিন্তু মার্কিণ যাহা করিয়াছে, সম্মিলিত শক্তিবর্গের অন্য সকলে তাহা করিতে পারিয়াছে কি? গ্রেট বৃটেন ধনিক-চালিত দেশ। সেখানকার ধনিকরা অধিকাংশই উৎকট সাম্রাজ্যবাদী। মার্কিণের অধিবাসীদিগকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য বিদেশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। মার্কিণরা বরং বিদেশে প্রচুর খাদ্যশস্য রপ্তানী করিতে পারে। মার্কিণে যে পরিমাণ গম জন্মায়,—নিখিল ভারতবর্ষে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণও গম জন্মায় না। মার্কিণে ধান্যও জন্মায়—তবে ভারতের তুলনায় অল্প জন্মায়। অন্যান্য খাদ্যশস্যও মার্কিণে প্রচুর জন্মায়! এরূপ অবস্থায় মার্কিণ যাহা করিতে পারে, গ্রেট বৃটেন তাহা করিতে ভরসা পায় না। সেই জন্য এবং দূরদৃষ্টির অভাব-বশতঃ তাহারা মার্কিণের ন্যায় উদার হইতে সাহস করে না। গ্রেট বৃটেনের ধনিক সম্প্রদায় অন্যরূপ আবেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধ। এবং তাহাদের অর্থাকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল। সেই জন্য তাহারা ছলে বলে কৌশলে অধীন রাজ্যগুলিকে মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ রাখিতে উৎসুক। কাজেই মার্কিণের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ বর্জ্জন সহজ হইতে পারে, কিন্তু গ্রেট বৃটেনের পক্ষে তাহা সহজ নয়। গ্রেট বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝে না যে, শোষণ নীতি অপেক্ষা সখিত্ব পরিণামে অধিক ফলপ্রদ। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, Conscience does make cowards of us all. যাহারা স্বার্থপরতার জন্য অন্যের উপর অসঙ্গত ব্যবহার করে, তাহারা সেই ভাবে ব্যবহৃত লোককে কখনই মন খুলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। এই সকল কারণে আমাদের শঙ্কা হয়, সম্মিলিত শক্তিবর্গের মধ্যে সকলেই এক-মতে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত চলিতে সমর্থ হইবেন না! যুদ্ধের পর তাঁহাদের পরস্পরের স্বার্থ লইয়া সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইবেই।

এখন এ কথা জানিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয় যে, এই যুদ্ধের পরে কি বহুকালস্থায়িনী শান্তির প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব? আমাদের ধারণা, তাহা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সম্মিলিত শক্তি-চতুষ্টয় অক্ষশক্তিত্রয়কে সম্পূর্ণ নির্জ্জিত করিতে পারেন, যদি অক্ষশক্তিবর্গ ধরা-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়াও যায়,—তাহা হইলেও কি পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির প্রচেষ্টা সম্ভব হইবে? যাঁহারা পশুবলে অতি-বিশ্বাসী, তাঁহারা তাহা মনে করিতে পারেন,—কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা একেবারেই ভুল। জার্ম্মাণী, ইটালী এবং জাপান চূর্ণ হইয়া গেলেও লোকের মনে হিংসা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতা কখনই লোপ পাইবে না। এক জাতি সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা অতি প্রবল হইলে অন্য জাতি তাহাকে হিংসা করিবেই করিবে এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। জগতের জাতিসমূহ যে রাতারাতি নিতান্ত নিষ্কাম কর্ম্মে আসক্ত হইবে, এ ভরসা আমাদের নাই। সুতরাং কোন্ দিক্ দিয়া ব্যাধ আসিয়া সাম্রাজ্যবাদরূপ এক-চক্ষু হরিণকে মর্ম্মাহত করিবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ে গ্রেট বৃটেনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী জাতি। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ওলন্দাজ এবং জাপানও সাম্রাজ্যবাদী। মার্কিণও সাম্রাজ্যবাদী। অবশ্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে যদি মার্কিণ এই যুদ্ধান্তে স্বাধীনতা দেন, তাহা হইলে মার্কিণে অধিক সাম্রাজ্য থাকিবে না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও শিল্প ও বাণিজ্য-বিস্তার বিষয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী। বিক্রেতাই হউন, ক্রেতাই হউন,—ছোটই হউন, আর বড়ই হউন, সকল জাতিই সকল দেশ হইতে সমান দরে এবং সমান সুবিধায় ব্যবহার্য্য পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল লইতে পারিবেন,—আটলাণ্টিক চার্টারের এই সর্ত্ত হইতেই বুঝা যায় যে, শিল্প বিষয়ে অগ্রসর জাতিদিগকে তুল্য সুবিধাদানই মার্কিণের উদ্দেশ্য। মার্কিণ মহাযন্ত্রযোগে শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতিসাধন করিয়া পশ্চাৎপদ জাতিকে যেন কতকটা পঙ্গু করিয়া রাখিতে চাহেন। কতকগুলি দেশ বা জাতি কেবল জগতের হাটে যোগাইবার জন্য কাঁচা মালের উৎপাদন করিতে থাকিবে, আর কতকগুলি শিল্পপ্রধান জাতি কেবল সেই কাঁচা মাল হইতে পাকা মাল (finished article) প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগের নিকট চড়া দরে সেই পাকা মাল চিরকালই বেচিতে থাকিবে—আশা করি, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাহা আশা করেন না। য়ুরোপের এক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত অর্থনীতিবিদ বলিয়াছেন যে, যে দেশের লোক অন্য দেশের শিল্পীদিগের জন্য কাঁচা মাল মাত্র উৎপাদন করিয়া তাহা বিকায়—সে দেশের লোক এক-হস্ত-বিশিষ্ট লোকের সহিত তুলনীয়। অর্থাৎ তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি অর্দ্ধমাত্রা মাত্র। আর যাহারা বিদেশীদিগের নিকট কাঁচা মাল বিক্রয় করিয়া তাহাদের নিকট হইতে পাকা মাল বা ব্যবহার্য্য পণ্য ক্রয় করে,—তাহাদের সেই একটিমাত্র হস্তও পরের নিকট বন্ধক দেওয়া বা বাঁধা আছে। অর্থাৎ আর্থিক বিষয়ে সেই জাতি বা দেশ একেবারে ক্ষমতাহীন। পরাজিত জার্ম্মাণীকে কাঁচা মাল পাইবার সুবিধা দেওয়া হইবে,—এ কথা বলিবার জন্য হয়ত এই সর্ত্ত আটলাণ্টিক চার্টারে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধশান্তির পর ইহার যে অন্যরূপ অর্থ করা যাইবে না, তাহা মনে হয় না। এবং শিল্প ব্যাপারে পশ্চাৎপদ জাতি যে কোন উপায়ে আপনাদের শ্রমশিল্পের উন্নতি সাধন-কল্পে চেষ্টা করিবে, তাহাদিগকে তাহাতে উৎসাহ দান ভিন্ন বাধা দান কেহ করিতে পারিবেন না—এইরূপ একটা সর্ত্ত আটলাণ্টিক চার্টারে দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। আমরা যেমন রাজনীতি ক্ষেত্রে তেমনি আর্থিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন করি না। যাহা হউক, বাণিজ্যবিষয়ে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী কি না, তাহা এই যুদ্ধশেষে সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

এখন ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, অক্ষশক্তিত্রয় নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেলেও পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদ লোপ হইবে না। সাম্রাজ্যবাদী জাতি থাকিতে ধরাতল হইতে হিংসা-দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা ঘুচিবে না, মানব-সমাজে তাহা থাকিবেই থাকিবে। কাজেই বর্ত্তমান যুদ্ধের পরে যাঁহারা চিরশান্তি স্থাপনের আশা করিতেছেন, তাঁহাদের সে আশা সফল হইবার কোন সম্ভাবনাই বুঝা যাইতেছে না। এক জাতির পতন হইলে অন্য জাতি মস্তক উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিবে। নির্জ্জিত জাতিও মনে মনে বিজেতা জাতির উপর বিদ্বেষ এবং বৈরভাব পোষণ করিবে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে, পশুশক্তি-বলে সাম্রাজ্যবাদ যত দিন ধরাতলে থাকিবে,—যত দিন মানুষ অন্য জাতির স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া ষোল আনার উপর আঠার আনা মাত্রায় আত্মস্বার্থ সাধন করিতে রত থাকিবে, তত দিন মানব-সমাজ হইতে সমর একেবারে নির্ব্বাসিত

করা সম্ভব হইবে না,—শান্তিও মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। দ্বিতীয় কথা, জার্ম্মাণী বা জাপানকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলা সম্ভব হইবে না। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর তারিখে ষ্ট্যালিন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "জার্ম্মাণীকে নষ্ট করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, কারণ, জার্ম্মাণীকে ধ্বংস করা রুশিয়াকে ধ্বংস করার ন্যায় অসম্ভব। কিন্তু হিটলার-পরিচালিত রাষ্ট্রকে উচ্ছিন্ন করা যায় এবং উহাকে উচ্ছিন্ন করা আবশ্যক।" কথা সত্য। হিটলারের সৈন্যদল এবং হিটলারী নীতির পরিচালকবর্গের উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, মানুষ যাহা সম্ভব এবং আবশ্যক মনে করে, তাহা করিয়া উঠা সম্ভব হয় না—যেন কোন দুর্ভেদ্য কুহেলিকা আসিয়া তাহাতে বাধা ঘটায়। ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তদ্ভিন্ন আর একটা কথাও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা বিধেয়। কোন একটা মতবাদকে সাময়িক ভাবে উচ্ছিন্ন করিলেও উহা একেবারে উচ্ছিন্ন হয় না। উহা কেমন অলক্ষ্য ভাবে আত্মগোপন করিয়া কাল-সহকারে এবং সুবিধা-মতে বিশেষ জনসমাজে আত্মপ্রকাশ করে। আজ জার্ম্মাণ জাতি যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পায়, তাহা হইলেও যে ঐ মতবাদ এবং ঐ প্রকার দানবীয় শক্তি এবং মত যে অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে প্রকট হইবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? ইতিহাসে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা জানা কথা। সমস্ত সভ্যজাতির বিশেষজ্ঞগণ তাহা ভালরূপ জানেন। যে জাপান বুদ্ধদেবের সর্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মের উপাসক, সেই জাপান কঠোর সাম্রাজ্যবাদ প্রসার লাভ করিল কি জন্য, তাহা বুঝা কঠিন। যে গ্রেট বৃটেন ক্রীতদাসদিগের কষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া ক্রীতদাস-প্রথা তিরোহিত করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই, সেই গ্রেট বৃটেনের নিজ সাম্রাজ্যে আজ সহস্র সহস্র নেত্র হইতে অভাবের দুঃখজনিত অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেলেও রাজধানীর রাজপথে অভুক্ত নরনারীর মৃতদেহ পতিত দেখিলেও তাহার প্রতিকার জন্য কোন জরুরী পন্থা অবলম্বন করিতেছেন না কেন? খৃষ্টান-ধর্ম্মশাস্ত্র বলে যে He that hateth his brother whom he hath seen how can he love God whom he hath not seen? কিন্তু সভ্য সমাজের মানুষের মনের ভিতর যে ক্ষমতা লাভের লালসা পূতনা রাক্ষসীর ন্যায় ওত পাতিয়া আছে, তাহা নানা বেশ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষকে পশুত্বে অবনমিত করিয়া তাহাকে সাম্রাজ্যবাদে প্রলুব্ধ করিয়া থাকে। সুতরাং যতক্ষণ এই লালসাগুলি মানবের মানসক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত না হইতেছে, তত দিন স্বয়ং ভগবান্‌ও এই ধরাধামে আসিয়া মানব-সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এখন কেবল গণতন্ত্রবাদের ধুয়া ধরিয়া নাৎসীবাদ এবং ফাসীবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হইতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদকে বাদ দিয়া ঐ কার্য্য করিতে গেলে তাহা নিষ্ফল হইবে। সাম্রাজ্যবাদ নাৎসীবাদ হইতে কিছু ভাল হইলেও বহু অনর্থের কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এই সকল কারণে আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, বিগত যুদ্ধের ফল যেরূপ হইয়াছিল, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলও সেইরূপ হইবে। অর্থাৎ ইহার পর চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইতোমধ্যেই তাহার ঈষৎ আভাস প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু সে কথা লইয়া আমরা এখন কোন কথা বলিব না। সম্মিলিত শক্তিবর্গের বিজয় লাভ যতই স্পষ্ট হউক, সাম্রাজ্যবাদ থাকিতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। বিগত যুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রবাদ এবং কমিউনিজম বা সর্ব্বস্বত্ববাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এবার হয়ত ঐ মত আরও প্রবল হইতে পারে। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ যে সাম্রাজ্যবাদে অধিক ভরপূর হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সেই জন্য ভারতবাসীর মন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে শক্তি-চতুষ্টয় সম্মিলিত হইয়া অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন। তন্মধ্যে স্থল-যুদ্ধে রুশিয়াই প্রধান। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে স্থল-যুদ্ধে রুশিয়া যেরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে, অন্য কোন শক্তিই তাহা করে নাই। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, যুদ্ধ পরিচালনা এবং সন্ধি সংস্থাপন বিষয়ে যে সমস্ত পরামর্শ হইতেছে, তাহাতে ইংরেজ ও মার্কিণই রহিয়াছেন; রুশিয়া নাই। কি কাসাব্লাঙ্কায়, কি আদানায়, কি কুইবেকেও ষ্ট্যালিন নাই। ইহা যেন কেমন একটা প্রহেলিকার মত মনে হয়। প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিন সামরিক কার্য্য পরিচালনার জন্য এত ব্যস্ত যে, দেশ ছাড়িয়া তিনি এখন কুইবেকে যাইতে পারেন না। তিনি না যাইতে পারেন, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে কি কেহই যাইতে পারেন না? বলা হইয়াছে যে, তাঁহাকে সকল কথা জানান হইবে। সকল কথা জানান হইলেই যদি কাজ মিটিত, তাহা হইলে রুজভেল্টকে মার্কিণ হইতে কুইবেকে যাইতে হইল কেন? এ দিকে কাসাব্লাঙ্কায় সম্মিলনের সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটি কথা এই বলিয়াছিলেন যে It is just a British and American Conference অর্থাৎ "ইহা ইংরেজ ও মার্কিণের পরামর্শ-পরিষদ।" অন্য দিকে রুশিয়ার টাস্ নিউজ এজেন্সি সংবাদ দিয়াছেন যে, "আগামী কুইবেক পরামর্শ-বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিলের যে সম্মেলন বসিবে, তাহাতে কেবল চার্চ্চিল এবং রুজভেল্ট সদলে যোগ দিবেন, সোভিয়েট সরকারকে ঐ বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই।" এ কথা শুনিয়া কেবল এ দেশের নয়, বিলাতের অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বৈঠকে যদি ষ্ট্যালিনের যোগ দেওয়া অসম্ভবই হইয়া থাকে, তাহা হইলে মলোটোভ, মৈস্কি বা লিট্ভিনফই বা অন্য কোন ব্যক্তিই বা যাইতে পারিলেন না কেন? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা এই যুদ্ধ কেন বিলম্বিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, অনেকের মনে এইরূপ ধারণাই জন্মিতেছে। ষ্ট্যালিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত জিদ ধরিয়াছেন। কিন্তু কি জানি কেন, মার্কিণ এবং ইংরেজ তাহাতে বিশেষ অগ্রসর হইতেছেন না। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি হইলে জার্ম্মাণীকে পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে অনেক সৈন্য সরাইয়া লইতে হইত; তাহাতে বিপদও কিছু ছিল। কিন্তু যুদ্ধ বিলম্বিত হইলে রুশিয়াকেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, ইহাই রুশিয়ার ধারণা। চীন প্রাচ্য শক্তি। কাজেই এই কুইবেক-সংসদে জাপানের সহিত কিরূপ ভাবে সংগ্রাম চালাইতে হইবে, কেবল তাহার পরামর্শ করিবার জন্য চীনকে কুইবেক পরামর্শ-পরিষদে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। চীনের পররাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার টি ভি সুঙ্গ এই সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন। যত দূর প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে অনুমান, প্রাচ্য এসিয়াখণ্ডে জাপানের সহিত সংগ্রাম পরিচালনার সকল

কথাই রুজভেল্ট এবং চার্চ্চিল ডক্টর সুঙ্গের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ফলে এবার যুদ্ধের জাল গুটাইবার জন্য কতকটা ব্যবস্থা যেন কুইবেকে করা হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। য়ুরোপ-খণ্ডে নানা দিকে রণাঙ্গনের এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপান্তে ব্যাপক ভাবে যুদ্ধের আয়োজনে বোধ হয় এইবার যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবে এবং যুদ্ধান্তে বিধাতা মিত্রশক্তিকে জয়-মাল্য দিবেন। অবশ্য এ সকল অনুমানের কথা। তবে লক্ষণে এই অনুমানেরই সমর্থন পাই। এখন যত শীঘ্র এ সংগ্রামের অবসান হয় ততই মঙ্গল।

কিন্তু ইহার আর একটা দিকও যে নাই তাহা নয়। মুসোলিনীর পতনের পর রাজা ইমানুয়েল এবং মন্ত্রী বডোগিলিও সম্মিলিত শক্তির সহিত সন্ধি করিবেন, অনেকে ইহাই আশা করিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে ইটালীই দেখিতেছি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইটালী সন্ধি করিল না। এই ভাঙ্গা বাজারে ইটালী কিসের আশায় সংগ্রাম করিতেছে? ব্যাপার বুঝা কঠিন। অবশ্য সম্মিলিত শক্তিবর্গ অর্থাৎ মার্কিণ ও বৃটেন তাহাকে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরম পরাজয় হইলে ইটালীকেও শেষে তাহাই করিতে হইবে। ইটালীও তাহা বুঝে। তবে এ অহেতুক বিলম্ব কেন? তবে কি ইটালীর মনে এখনও সংশয় আছে যে, অক্ষশক্তিবর্গ হয়তো পরিণামে জয়লাভ করিতে পারে? এবারকার নৈদাঘ অভিযানে জার্ম্মাণী রুশিয়ার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, ইহা ত ইটালী দেখিতেছে। তবে তাহার আশা কোথায়? কেবল জার্ম্মাণীর অনুরোধে বা ভয়ে যে ইটালী এখনও নিরাশাময় যুদ্ধে যোগ দিয়া রহিয়াছে—ইহা মনে করা কঠিন। তবে ইটালী এখন আর কিসের আশায় সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছে—তাহা বুঝা কঠিন। ইতোমধ্যে জার্ম্মাণী জাপান ও ইটালীর একটা পরামর্শ-পরিষদ হইয়া গিয়াছে। শুনা গিয়াছে, তাহার কথা বিশেষ জানিতে পারা যায় নাই।

জাপান এদিকে সাগরবক্ষে যতটা স্থান দখল করিয়া লইয়াছে, —ততটা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু পূর্ব্ব উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রাদি রক্ষা করিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। সিঙ্গাপুর রক্ষা করিতে পারিবে মনে না করিলে জাপান কখনই অত্যন্ত অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া সিঙ্গাপুরের ডুবা ডক আবার ভাসাইত না। ফলে সম্মিলিত পক্ষের জয়লাভের লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলেও অক্ষপক্ষ যে একেবারে হতাশ হইয়াছে, এমন মনে হয় না।

'ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্।' বিধাতার মনে কি আছে, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। আর যুদ্ধের পরে আমাদের দশা কি হইবে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ভারতবর্ষ যদি কেবল চাষার দেশে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। উহাতে ভারতেরও ক্ষতি, পৃথিবীরও ক্ষতি। তাহা বুঝিবার মত মনোবৃত্তি সাম্রাজ্যবাদীদিগের নাই।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

দৃষ্টি-রহস্য

দুঃখ পেয়েছ ধরণীর কোলে বুঝি?
　　তাই বুঝি তব আঁখি দু'টি ছল-ছল?
ভুলে যাও প্রিয়ে—নহিলে উপায় নাহি
　　হিসাব খতায়ে কি ফল পাইবে বল!

ক্ষুদ্রতা আর ঈর্ষা দিয়াছে পীড়া?
　　কহিছ সে কথা? কহিয়া লাভ কি আছে?
জীবন-দ্বন্দ্বে যত কিছু হলাহল—
　　নহে তা অজানা মোর বুদ্ধির কাছে।

এই সংসার—এ যেন বনাত কালো—
　　ময়ূর-কণ্ঠী রঙ আছে তারি মাঝে,—
সামনে দেখিলে দেখিবে শুধুই কালো—
　　বাঁকায়ে ধরিলে সুন্দর রঙে সাজে!

যে কবি গাহিছে "ছিন্ন করিয়া লহ
　　বিলম্ব আর সহিছে না এ জীবনে"—
সেই তো গাহিছে আনন্দ-বিহ্বল
　　"মরিতে চাহি না সুন্দর এ ভুবনে।"

অঙ্গার আর হীরক—বস্তু একই—
　　আলোর খেলায় তফাৎ অনেক তবু!
মনের রঙেতে যেমন রঙাবে তুমি—
　　বিষাদ-তিমির এ ধরা মোহন কভু!

শিল্পীর চোখে শিল্পের সেরা দারু—
　　আর কারো চোখে কাষ্ঠ মাত্র তাই!
লোষ্ট্র বলিয়া তুচ্ছ ভাবিবে যারে,
　　শিল্পেতে তারি তুলনা হয়তো নাই!

চিত্তে তোমার রসের পিপাসা আছে,
　　সরস চক্ষে হের জগতের রূপ—
দৈনন্দিন আঘাতে জীর্ণ ধরা
　　দৈন্য লুকায়ে প্রভাতিবে অপরূপ!

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী।

বিজ্ঞান-জগৎ

কার্টুন পুতুল

ফিল্মে যে কার্টুন-ছবি আমরা দেখি,—সূক্ষ্ম এবং পর্য্যায়-সঙ্গত গতিভঙ্গীসহ প্রাণী ও বস্তু-নিচয়ের ছবি আঁকিয়া তাহারি ফটো তুলিয়া সে কার্টুন-ছবির সৃষ্টি হয় বলিয়া জানি। কিন্তু জর্জ্জ প্যাল্ নামে এক জন হাঙ্গারিয়ান্ ফটোগ্রাফার আঁকা ছবির সাহায্যে নয়,

পুতুলের বিধাতা
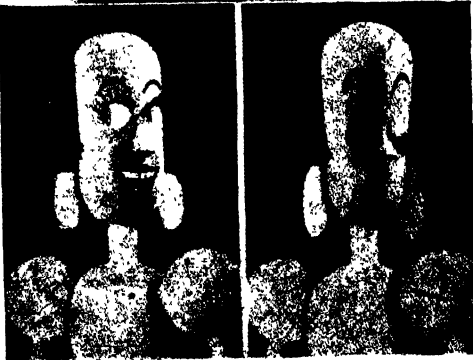
ভঙ্গী-ভরা পুতুল

হাতের তৈয়ারী পুতুল লইয়া এমনি কার্টুন-টকি-ফিল্ম তৈয়ারী করিতেছেন। প্রত্যেকটি পুতুল-প্রাণী অন্ততঃ পক্ষে ত্রিশ রকম মুখ-চোখের বিচিত্র ভঙ্গীসহ তিনি তৈয়ারী করেন এবং প্রয়োজন-মত দৃশ্য ও ভাবসঙ্গত ভঙ্গী-চিত্রিত পুতুলকে বৈদ্যুতিক যন্ত্র-সাহায্যে গতি দিয়া সচল সজীব মূর্ত্তিতে ক্যামেরার সামনে অভিনয় করাইয়া তাদের ছবি তুলিতেছেন।

নিশি-চশমা

জাপানের এক চক্ষু-চিকিৎসক বিচিত্র চশমা তৈয়ারী করিয়াছেন। এ চশমা চোখে দিলে রাত্রির অন্ধকারেও লেখাপড়া করা কিংবা

চশমার আলো

কোনো কিছু দেখার কাজ খুব সহজ ও অনায়াস হইবে। রিফ্লেক্টরে তিনি চশমার লেন্সের দু'ধার মুড়িয়া দিতেছেন, এবং এই রিফ্লেক্টরের উপর বসাইতেছেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকারের বাল্‌ব্। লেন্সের ঐ ধার-মুড়ির সঙ্গে চুলের মত মিহি তার লাগাইয়া তাহার এক প্রান্তে আঁটিয়াছেন পকেট-ড্রাই-সেল ব্যাটারি। ব্যাটারির গড়ন পেণ্ডান্টের মত; কাজেই ইহাতে সৌখীনতার ত্রুটি ঘটিবে না। সুইচ টিপিবামাত্র বাল্‌ব্ জ্বলে এবং সে আলো রিফ্লেক্টরে প্রতিচ্ছুরিত হইয়া দ্রষ্টব্য কাগজ প্রভৃতিতে গিয়া পড়ে—কাজেই সব কিছু সুস্পষ্ট ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

দন্তরুচিকৌমুদী

দাঁতের স্বাস্থ্যের উপর আমাদের দেহের স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং পরমায়ু নির্ভর করে—প্রমাণ-প্রয়োগের দ্বারা এ যুগের বৈজ্ঞানিকেরা এ সত্য
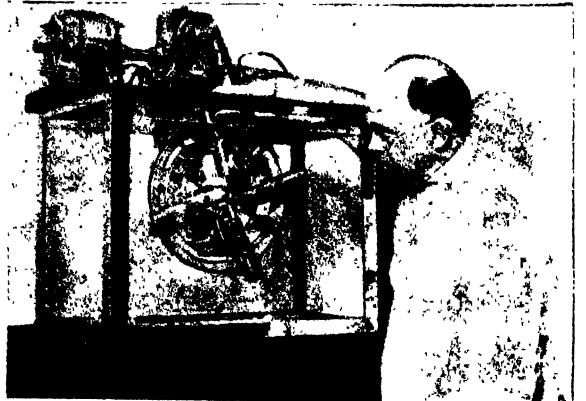
দাঁত পরীক্ষা

সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। রোগ-বীজাণুর শক্তি-প্রতিরোধে আমাদের দাঁতের শক্তি অসাধারণ। দিনে পাঁচ-সাত বার করিয়া দন্ত-মার্জ্জনা করা উচিত। কোনো কিছু আহার করিলে—পাণ-সিগারেট সেবন করিলেও তখনি দন্ত-মার্জ্জনার বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে খাদ্যের অতি ক্ষুদ্র কণাও না জমিয়া থাকে, সাবধান! মাঝে মাঝে দন্ত-চিকিৎসকের কাছে গিয়া দাঁত দেখানো খুব ভালো। দাঁতে ব্যথা হোক না হোক, তবু! পরিপাক-শক্তির গোলযোগের মূলে আছে দাঁতের অস্বাস্থ্য, এ-কথা ভালো করিয়া জানিয়া রাখিবেন। দাঁতের গায়ে যে টার্টার জমে, সে টার্টারকে বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। টার্টার জমিলেই যোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা সমূলে তার বিনাশ-সাধন করিতে হইবে। দাঁতের গায়ে যে এনামেল আছে, সে এনামেল দাঁতের অপচয় ঘটিতে দেয় না। এই এনামেলে প্রচুর ফস্‌ফরাশ্‌ আছে। দন্ত-মঞ্জনের জন্য যা-তা পাউডার বা পেষ্ট কদাচ ব্যবহার করিবেন না। সর্ষপ তৈল এবং লবণ দন্ত-মার্জ্জনার জন্য সবচেয়ে উপযোগী। দাঁতের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ যন্ত্র-সাহায্যে থুতু পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলিতে পারেন—দাঁতের স্বাস্থ্য কেমন, দাঁতের কিরূপ অপচয়ই বা কি ভাবে সংঘটিত হইতেছে। টিউবের মধ্যে থাকে দাঁতের এনামেল-চূর্ণ; যে ব্যক্তির দাঁতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইবে, তাহার থুতু লইয়া এই টিউবের ঐ চূর্ণের সঙ্গে মিশাইয়া যন্ত্রমধ্যে টিউবটিকে চার ঘণ্টা কাল ঘরানো হয়। যদি দেখা যায়, থুতুর সঙ্গে মিশিয়া টিউবের এনামেল-চূর্ণ গলিয়া গিয়াছে, তবে বুঝিতে হইবে, মুখে বিষ আছে; সেই বিষের ক্রিয়াবশতঃ স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া দাঁতের ক্ষয় হইতেছে। পরীক্ষান্তে যথারীতি চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

মোটর-মেরামতির চলন্ত কারখানা

মোটর-গাড়ী বিগড়ায়—কল-কব্জা ভাঙ্গে, বিকল হয় এবং নানা উপসর্গাদিও ঘটে। যুদ্ধে যে সব ট্যাঙ্ক ও ট্রাক চলে, সেগুলি পথে বিগড়াইলে মেরামতির জন্য কারখানায় পাঠানো—ভয়ানক ব্যাপার। এ বিপত্তি মোচনের জন্য জার্ম্মান সমর-বিভাগ মেরামতির সর্ব্ববিধ সরঞ্জামপত্র সঙ্গে লইয়া চলে। এ সব সরঞ্জাম থাকে ঐ ট্রেলারে। ট্রেলারে ওয়েল্ড করিবার উপযোগী অক্সি-এসেটিলিন সরঞ্জাম, ড্রিল-প্রেস,
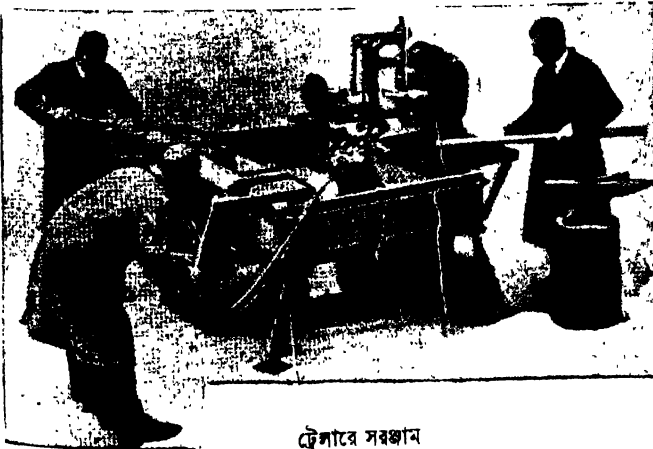
ট্রেলারে সরঞ্জাম

শাণ-যন্ত্র প্রভৃতির পাকা ব্যবস্থা মোতায়েন থাকে। নিপুণ মিস্ত্রীর দল ট্রেলার হইতে কারখানার এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাহির করিয়া যথাযথরূপ মেরামতির কাজ করে।

নিরাপদ্‌ ফটোগ্রাফার

ফিল্ম-ক্যামেরায় যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফটো তুলিয়া তাহা দেখাইলে ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এ সব ব্যাপারের ফটো তোলা

ক্যামেরাম্যানের পোষাক

নিরাপদ্‌ নয়। কি করিয়া এ সব ছবি তোলা যায়, তাহারি উপায় সংসাধনকল্পে মার্কিন সংবাদচিত্র-গ্রহীতা আর্ভিং স্মিথ চর্ম্মাবরণ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মুখে গ্যাস-মাস্ক—মাথায় ইস্পাতের টুপি এবং অঙ্গে গোলাগুলী-বারক প্যাণ্ট কোট ভেষ্ট। এ পোষাকে আত্মরক্ষা করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘনঘটার মধ্যে দাঁড়াইয়া ক্যামেরায় ইনি সে সব ব্যাপারের ছবি তুলিতেছেন নিরাপদে।

পাল-তোলা বাইক

সৌখীন ফরাসী শিল্পীর মস্তিষ্কবলে সাইকেলের জন্য পালের ব্যবস্থা হইয়াছে। শীটের পিছনে তিনি ক্যাম্বিশের পাল খাটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দিকে চলিয়াছি বাতাস যদি সেই দিকে বহে, তবে এ-পালে বাতাস লাগিয়া বাইকের গতিকে সহজ ও বর্দ্ধিত করিবে; বাতাসের বিপরীত দিকে চলিবার সময় তেমনি সামনে চার-ব্লেডযুক্ত প্রোপেলারের তিনি ব্যবস্থা

পাল-তোলা বাইক

করিয়াছেন। হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে এই প্রোপেলার সংযুক্ত। প্রোপেলারের গুণে প্রখর বায়ুবেগ কাটাইয়া স্বচ্ছন্দে বাইসিকেল চালানো যায়।

ফৌজের নদী পার

নদী পার

অসংখ্য বাহিনীকে একসঙ্গে ও চকিতে বড় বড় নদী বা জলাশয় পার করাইবার জন্ত জার্ম্মান সমর-বিভাগ রবারের প্রশস্ত ভেলা তৈয়ারী করিয়াছে। ভেলাগুলিকে একত্র সংযুক্ত করিয়া মোটর-লঞ্চের সহিত বাঁধিয়া দিলে সহজেই ফৌজ-বাহিনীকে পার করার কাজ সুসিদ্ধ হয়। প্রশস্ততা হেতু যে সব বড় বড় নদী বা হ্রদ প্রভৃতির উপর দিয়া কোনো রকম সেতু তৈরী করা সম্ভব হয় না, কিংবা সেতু রচনা করিতে কালবিলম্ব ঘটে, সেই সব নদী ও হ্রদ পার করার পক্ষে রবারের ভেলার উপযোগিতা অপরিসীম।

ইলেক্‌ট্রিক টুথ-ব্রাশ

বিদ্যুৎকে লইয়া মানুষ আজ কি সেবা-পরিচর্য্যার কাজই না করাইয়া লইতেছে! আমেরিকায় বিদ্যুৎশক্তি-বাহিত নূতন টুথ ব্রাশের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাশটি চক্রের মত সুগোল। প্লাগে অাঁটিয়া এ ব্রাশ লইয়া মুখের ভিতর ধরিলে দাঁত এবং দাঁতের মাড়ি পরিষ্কার করা যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের গুণে মুখ-বিবরের শিরা-উপশিরাগুলির মেশাজও (massage) সুনির্বাহিত হয়; দাঁত কোনো দিন অসুস্থ হইবে না—দেতের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এ টুথ-ব্রাশ হাতে ধরিয়া দাঁতে ঘষিতে হয় না। দাঁতে ব্রাশ ধরিয়া প্লাগে সংযুক্ত করিলে ব্রাশ আপনা হইতে পরিমার্জ্জনা-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবে।

ইলেক্‌ট্রিক টুথ-ব্রাশ

শরতে

নদীর বুকে শরৎ এলো ভরা পালের নৌকাতে,
কূলে তাহার কেশের চামর দুলায়ে।
বন-বাগানে শরৎ এলো ছাতিম ফুলের মৌতাতে
মধুকরের নয়ন নেশায় ঢুলায়ে।
হ্রদের জলে শরৎ এলো সারস হাঁসের উৎসবে,
মাঠে মাঠে পীবর আশায় চিকণ-শ্যামল বৈভবে।

গোষ্ঠে এলো পয়স্বিনীর আপীন-ভরা গৌরবে
রামধনুতে ব্যোমের মানস ভুলায়ে।
শিউলি ফুলের লাজ ছড়ায়ে এলো মেঘের অঙ্গনে
আলিম্পনের চিত্র-শোভায় ডালিম বনের রঙ্গনে,
অঙ্গনাদের অঙ্গে এলো লাবণ্যে হার-কঙ্কণে,
কূজন তুলে এলো পাখীর কুলায়ে।

শ্রীকালিদাস রায়

গার্গী

[গল্প]

বিবাহের পরে বাসব জানিতে পারিল, বধূ পাগল !

ফুলশয্যার রাত্রি। ফুলের শয্যায় গার্গী হঠাৎ ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। বিস্ফারিত নেত্রে বাসবের মুখের পানে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, এই মালাগুলো যদি আমি ছিঁড়ে ফেলি ? আর এই আলমারীর কাচখানা যদি ভাঙ্গি, ভারী মজা হয়, না ? বলিয়া হি-হি করিয়া সে হাসিতে লাগিল।

চমকিয়া বাসব শয্যায় উঠিয়া বসিল। কথার সঙ্গে গার্গীর দুই চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি—তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না, সে বিকৃত-মস্তিষ্কা কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে।

টেবলের উপর হইতে তাড়াতাড়ি গোলাপের ডিকাণ্টারটা লইয়া গার্গীর মাথায় খানিকটা জল ঢালিয়া দিল। গাজিপুরের উৎকৃষ্ট গোলাপের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল।

বাসব কহিল,—নাও, শুয়ে পড়ো। মাথা তোমার বড্ড গরম হয়েছে ! আমি বাতাস করছি।

স্থির দৃষ্টিতে গার্গী কিছুক্ষণ বাসবের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তার পর ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—তুমি তো বর ! তুমি আমাকে বাতাস করবে ? তোমায় দেখতে বেশ !

এ-সব কথার উত্তর না দিয়া বাসব কহিল,—হাঁ, বেশ ! এখন তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকিনি। বাসবের সর্ব্বাঙ্গ ছম্-ছম্ করিতেছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া গার্গী বাসবের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। যেন কত কি ভাবিতেছে—তার পর ঝুম্ করিয়া বাসবের উরুর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাসবের সমস্ত রাত্রি কিন্তু জাগিয়া কাটিল।

শ্বশুর-বাড়ীর স্নেহ-মমতা, যত্ন-আদর সমস্তই মনের মধ্যে তাজা রহিয়াছে। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদের মমতাসিক্ত আচার-ব্যবহারগুলা বাসবের অন্তরকে প্রীতিমুগ্ধ করিতেছিল,—এখন সেই তাহাদেরই উপর মন একেবারে বিষাইয়া উঠিল। প্রতারণা করিয়া একটা পাগল মেয়েকে তার ঘাড়ে তারা চাপাইয়া দিয়াছে ! এ বোঝা এখন তাহাকে বহিতে হইবে সারা জীবন !

বাসর-ঘরেও গার্গী ঘুমাইতেছিল। পাঁচ জন যখন ফুলশয্যা করাইতে বসিয়াছিল,—তখনো সে নিদ্রায় ঢুলিয়া পড়িতেছিল ! ঘুমের ঝোঁকে সকলের সম্মুখে বাসবের বাঁ কাঁধে মাথা রাখিয়াছিল। সকলে হাসিয়াছিল ; কিন্তু গার্গী লজ্জা পায় নাই। এখন সে নিদ্রা-বিহ্বলা।

গার্গীর সেই ঘুমন্ত মুখের পানে বাসব বার-বার চাহিয়া দেখিতেছিল। যেন সরল শিশুর মুখ ! দেখিলে মমতা হয় ! সুডৌল ললাটে অলকগুচ্ছ ছড়াইয়া পড়িয়াছে ! খোঁপায়-আঁটা গোলাপ, কণ্ঠে ফুলের মালা, সুগঠিত সুঠাম মূর্ত্তি—দেখিলেই ভালোবাসিতে ইচ্ছা করে ! কিন্তু জ্ঞানহীনা উন্মাদ !

বাসবের পা টন্‌টন্ করিতেছিল। মনে হইল, উরুর উপর হইতে গার্গীর মাথা তুলিয়া ফুটন্ত ফুলের মত মুখখানি উপাধানে রাখিয়া দেয় ! তখনি মায়া জাগিল,—যদি ঘুম ভাঙিয়া যায় ? না, না, এমনি থাক্।

আরও খানিকটা গোলাপ-জল গার্গীর মাথায় ঢালিয়া দিয়া নীরবে সে বসিয়া তাকে বাতাস করিতে লাগিল।

গার্গী চিৎ হইয়া শুইয়াছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসে বক্ষের ওঠা-নামাতে বাসব নিদ্রার গাঢ়তা বুঝিল। তথাপি প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সে বসিয়া রহিল। চোখে ঘুমের বাষ্পও আসিল না।

ভোরের আলোয় ঘর ভরিয়া গেল। গার্গীর ঘুম কিন্তু ভাঙ্গিল না। ওদিকে বাহিরে আর সকলকার জাগরণের সাড়া ; ক্রমে কাক-কণ্ঠের কলরব জাগিল। এইবার উঠিতে হইবে। বাসব দুই হাতে সযত্নে ধরিয়া গার্গীর মাথা বালিশের উপর রাখিল ! গাঢ় নিদ্রা এতটুকু ভাঙ্গিল না।

ঘরের দ্বার খুলিয়া বাসব বারান্দায় পা দিবা মাত্র ভ্রাতৃজায়া উর্ম্মিলা সহাস্যে কহিল,—উঃ, এত বেলাতে উঠতে হয় ঠাকুরপো ! মা গো, কি বেহায়া ছেলে তুমি—না হয় বুড়ো বয়সেই বিয়ে হয়েছে ! এ কথা বলিয়া উর্ম্মিলা হাসিতে লাগিল।

—হুঁ—বলিয়া বাসব বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল। নিজের পড়িবার ঘরে ইজিচেয়ারে শুইয়া ছোট টেবলের উপর পা দু'টা তুলিয়া সে সমস্ত রাত্রির অনিদ্রা পোষাইয়া লইতে চক্ষু মুদিল।

* * * *

—ইস্, বেলা দশটা বেজে গেল—এখনো ঘুমোচ্ছিস্। ওঠ্ ! ওঠ্ ! আচ্ছা ছেলে যা হোক্ ! সঞ্জয় আসিয়া বন্ধুকে ধাক্কা দিল। বাসব চোখ মেলিয়া চাহিতে সঞ্জয় কহিল,—কি রে, আমাদের বিয়ে হয়নি ? না, আমরা ফুলশয্যা করিনি ? বাবা, বাইরে এসে যেন কুম্ভকর্ণ ! ওরে অধর, বাবুর চা নিয়ে আয়। তুই উঠেছিস্ ? না তোরও কাল ফুলশয্যা গেছে ?

বাসব উঠিয়া বসিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল,—ইস্, দশটা !

অধর চা লইয়া আসিল।

—বোস্ ভাই ! মুখটা ধুয়ে আসি। বলিয়া বাসব উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে তোয়ালেতে মুখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল। বসিয়া কহিল,—উঃ ! আমার মত যদি রাত জাগতে হতো, সব মিয়াঁই বুঝতেন তাহলে !

—থাম্ ! নিজের মুখে আর জাঁক করতে হবে না ! তুই কি রকম রাত জেগেছিস্—খাড়া এক পায়ে দাঁড়িয়ে গিন্নীকে বাতাস করেছিস্ না কি ?

চায়ের পেয়ালা অধরের হাত হইতে লইয়া বাসব কহিল,—তারও বেশী।

—কি রকম ? বল ভাই সত্যি !

—সে বলবার নয় ! ভয়ঙ্কর রোমান্স ! বলিয়া মুচ্‌কাইয়া হাসিল।

—ননসেন্স ! খালি বকামি ! জানি তো তোকে চিরকাল কুম্ভকর্ণের পকেট-এডিশন তুই ! আজ সে নিরীহ বেচারার কাঁধে দোষ চাপাচ্ছিস্ ? বলিয়া সে তখনি আবার কহিল,—তোর, গিন্নীও তো

খুব ঘুমোতে পারে—আমায় গিয়ে বল্লে—তোরা তাহলে মাণিক-জোড় মিলেছিস্ দেখছি!

বাসব উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

সঞ্জয় কহিল,—বল্ না, প্রথম রাত্রির কথা। আমার বউ আমার সঙ্গে প্রথম কি বলেছিল, জানিস্? অনেক সাধ্য-সাধনার পর কথা কইলে,—বললে,—কাল আমি বাপের বাড়ী যাবো! কিন্তু সে ছিল তখন তেরো বছরের মেয়ে—তাও আবার আট বছর আগে; কিন্তু তোর তো তা নয়! তোর বৌ কি বললে বল্?

রহস্যের সুরে বাসব কহিল,—তোর ভারী আপশোষ হচ্ছে না সঞ্জয়—ছোট বেলা বিয়ে হয়েছিল বলে?

—নিশ্চয়! কম দুঃখ! দিদিমার ওপর কম রাগ হয়। নাত-বৌয়ের মুখ না দেখে বৈকুণ্ঠে যেতে পারছিল না! হুঁঃ! একটু রোমান্স করতে পারলুম না! এমন একটা কচি মেয়ে!

বাধা দিয়া বাসব কহিল,—তুই নিজে বুঝি তখন মস্ত লায়েক ছিলি!

—আরে ভাই, দুঃখ তো ওইখানেই। আমার বয়স তখন সবে আঠারো। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি। বৌয়ের সঙ্গে কথা কইতে গেলে লজ্জা হতো। পাছে কেউ কোথা দিয়ে দেখে ফেলে! বৌদি ডেকে যতক্ষণ না ঘরে শুতে দিয়েছে, যেতে পারিনি! আরে ছ্যা, ছ্যা! তার পর বি-এ পড়লুম! এল-এ, পাশ করলুম। জীবনে কত স্বপ্ন জাগলো, কিন্তু সব মাটী—সেই বালিকা-বধূ তখন মস্ত গিন্নী—একেবারে যৌবন-সায়াহ্নে উপনীতা—গোটা পাঁচেক কাচ্ছা-বাচ্ছার মা! হাঁড়ি-মুখ করে সংসার কচ্ছেন। না আছে সখ, না আমোদ!

বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া বাসব হাসিতে লাগিল।

সঞ্জয় কহিল,—সত্যি বলছি বাসব, তোদের সুখের দিকে চেয়েই আমার এখন বেঁচে থাকা। ডাক্তারী ফাইনাল দিয়ে তবে বিয়ে করলি! এর জন্যে তোকে ধন্যবাদ। বেশ করেছিস্,—জীবনে এই তো তোদের বসন্ত এলো!

বাসব সুরে গাহিল,—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী;
সখি জাগো জাগো॥"

সঞ্জয় লাফাইয়া উঠিল, বন্ধুর পিঠ চাপড়াইয়া মহানন্দে কহিল,—ব্রাভো! ব্রাভো! সত্যি রে,—"মেলি রাগ-অলক-আঁখি—সখি জাগো, জাগো—।" এই যে তুই যখন কলে বেরুবি, বউ এসে তোর গলায় টাই বেঁধে দেবে। আমার মত বলবে না, খুকী, তোর অমুকের কাপড়গুলো গুছিয়ে দে, আমি ঠাকুর-ঘরে যাচ্ছি!

বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া বাসব কহিল,—তা হলে আমি ভাগ্যবান্ বল্!

—নিশ্চয়! এ কথা আবার জিজ্ঞেস করছিস্! অমন সুন্দরী বউ—আজ যুগল মূর্ত্তি দর্শন করে চক্ষু সার্থক করে যাবো। বাসব হাসিতে লাগিল।

* * * *

ঠাকুর-ঘর হইতে রমলাকে আজ একটু সকাল সকাল নামিতে হইল। ভাঁড়ার দেখিতে হইবে। বাড়ীতে আজ পুরুষ-যজ্ঞি। বাসবের বৌ-ভাত! কাল ফুলশয্যায় মেয়ে-নিমন্ত্রণ শেষ হইয়াছে!

বাসব আসিয়া ডাকিল, মা—

পুত্রের আহ্বান কাণে বাজিতেই রমলা মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—কি রে, ডাকছিস্?

—হ্যাঁ মা, একবার শুনে যাও।

রমলা চমকিত হইলেন। কহিলেন,—এখনি যেতে হবে?

পুত্র কহিল—হ্যাঁ, একবার এ ঘরে এসো।

—যাই! ও বড় বৌমা, তোমার জা ঘুম থেকে উঠেছে—তা হলে তার জল-খাবারের ব্যবস্থা করে দাও। সরবৎ ভিজুনো আছে। বলিয়া তিনি পুত্রের সহিত নিজের শয়ন-কক্ষে আসিলেন।

বাসব জননীর পালঙ্কে বসিল। মায়ের পানে চাহিয়া কহিল,—পাগলের সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দিয়েছ?

রমলার মুখে বেদনার ছায়া! তিনি কহিলেন,—আমি কিছু জানি না বাছা।

—তুমি জান্তে না, ও পাগল?

—আমি? হ্যাঁ, আমি? না! বিয়ের আগে শুনেছিলুম, শক্ত ব্যামোয় মাথা কেমন একটু—

—তবু রাজী হয়েছিলে?

থতমত খাইয়া রমলা কহিলেন,—আমি নই বাবা—তোমার উনি।

—কিন্তু তুমি আমায় সে কথা জানাওনি কেন মা?

—উনি শক্ত নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, বাসবের কাণে কথাটা তুলো না—বেঁকে বসতে পারে।

—চমৎকার! আমার বিয়ে হবে—অথচ আমি জানবো না যে, একটা পাগলকে আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ! তোমার পেটে আমি জন্মেছি, তুমি তো আমার বিমাতা নও, মা!

রমলার মুখ কালো হইয়া গেল। আহত স্বরে তিনি কহিলেন,—অমন করে বলিস্‌নি বাসু—আটটা দিন কোনো রকমে সয়ে থাক্ বাবা।

অবাক্ হইয়া বাসব কহিল,—তার মানে? আট দিন পরে কি এমন মিরাকল্ ঘটবে যে—

ইতস্ততঃ করিয়া ঢোঁক গিলিয়া রমলা কহিলেন,—পাগল নিয়ে কি মানুষ ঘর করতে পারে বাবা? আমি ওঁকে অনেক মানা করেছিলুম। বলেছিলুম,—বাসু জন্মের মত অসুখী হবে। তাতে জবাব দিলেন,—চোখ-কাণ বুজিয়ে আটটা দিন কাটিয়ে দিও।

—এই আটটা দিনের মানে আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছি না মা। বাসবের কণ্ঠ রুক্ষ, নীরস।

—আহা, বুঝছিস্ না! তার পর বৌমা বাপের বাড়ী চলে যাবে—বাস! তা না হলে আমরা গেরস্ত-মানুষ—এত যজ্ঞি জালা সাত দিন ধরে করবার মানে কি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাসব প্রশ্ন করিল,—এর মানে কি? কি তোমাদের প্ল্যান? আমায় স্পষ্ট বুঝিয়ে বলো।

রমলা একটু রাগ করিলেন। কহিলেন,—ভাখো বাসু, অমন গোঁয়ারের মত আমার সঙ্গে কথা কয়ো না। আমি কি জানি? আমাকে দোষী করা। যা বলতে হয়, ওঁর কাছে গিয়ে বলো।

—বেশ, বাবার কাছেই আমি যাচ্ছি।

* * * *

পিতৃ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিনা-ভূমিকাতে বাসব কহিল,—আমার সঙ্গে আপনি এক পাগলের বিয়ে দিয়েছেন ?

মেডিক্যাল জার্ণালখানা হাত হইতে নামাইয়া টেবলে রাখিয়া চারু বাবু কহিলেন,—চুপ ! চুপ !!

অসহিষ্ণু কণ্ঠে পুত্র কহিল,—কি চুপ করবো বাবা ?

—আহা, এ ব্যাপার নিয়ে এত গোলমাল কেন ? আমি কাঁচা কাজ করিনি। এই ক'টা দিন পরেই ও চলে যাবে তো।

—কেন চলে যাবে ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চারু বাবু কহিলেন—পাগল কখনো স্বামীর ঘর করে ?

—তবে বিয়ে হলো কেন ?

বিরক্ত কণ্ঠে চারু বাবু কহিলেন—অমন জেরার মত কথা কইছো কেন ? ওকে যে ঘুমোবার ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছিলুম, তার এ্যাক্সন কি কেটে গেছে ? তা হলে বড় বৌমাকে বলো, জলের সঙ্গে গুলে আরও দু'টো দিতে। ঘুমিয়ে পড়বে'খন। কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না।

বাসব ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। কণ্ঠে ভাষা যোগাইল না। তাহার চিকিৎসক পিতা জানিয়া শুনিয়া এক বিকৃত-মস্তিষ্ক মেয়েকে পুত্রের কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছেন !

চারু বাবু পুত্রের পানে চাহিয়া সগর্ব্বে ঈষৎ হাস্য করিলেন। কহিলেন—দেবেন মল্লিক কি শুধু শুধু চল্লিশ হাজার টাকা নাতনীর বিয়েতে বার করেছে বাপু ? পঁচিশ হাজার যা নগদ দিয়েছে, তা থেকে তোমায় আমি পনেরো হাজার দিচ্ছি বিলেতের খরচা, তুমি তো আই, এম, এস পড়তে যেতে চাইছ। বাকী টাকা রইল—ফিরলে তোমার মোটর গাড়ী ইত্যাদি আরও পাঁচ রকম খরচ আছে তার জন্য ! আমার গাড়ীতে তোমার কিছু প্র্যাক্‌টিস করা চলবে না ! বলিয়া পুনরায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—শুধু লেখাপড়া শেখা আর পুঁথিগত পণ্ডিত হলেই দুনিয়ায় চলা যায় না। একটু খেলোয়াড়ী বুদ্ধি পুঁজি রাখতে হয় ! বুড়োর এই সদুপদেশটুকু মনে রেখো।

বাসব চুপ করিয়া রহিল।

চারু বাবু বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। কহিলেন—একটা পাগলের অত্যাচার ! তাও তেমন নয়। আমি জানি, ও মারধর করে না কখনো ! ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি ! কেউ বুঝতে পারবে না। এই সব হাঙ্গাম চুকলে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। ল্যাঠা চুকে যাবে। বাস্ !

—ওরা তা হলে আপনাকে জানিয়েছিল যে মেয়ে পাগল ?

—বিলক্ষণ ! জানিয়েছিল মানে ? ওর টাইফয়েডে আমিই তো চিকিৎসা করেছিলুম। বাঁচবার আশা ছিল না ! বাঁচলো, কিন্তু ব্রেন হয়ে গেল নষ্ট। দেবেন বাবু খুব ভয় পেলেন। বল্লেন, —কি হবে ? এই একটা নাতনীই আমার সম্বল—এ যে মরার বাড়া হলো ডাক্তার বাবু ! কে একে নেবে ? আমি তাঁকে অভয় দিয়ে বললুম, আমি নেবো আমার ছোট ছেলের জন্যে। দেবেন মল্লিক যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে একেবারে গলে গেলেন। তাই তো বাড়ীখানি উদ্ধার করতে পেরেছি। ছিল তো ওরই কাছে মর্টগেজ ! একটা পয়সা না নিয়ে তোমার নামে লিখে দিলে ! এ উদারতা ! স্বার্থ না থাকলে—

বাধা দিয়া বাসব প্রশ্ন করিল,—দেবেন বাবুর সঙ্গে আপনি কি বন্দোবস্ত করেছেন যে, বিয়ের আটটা দিন কেটে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দেবেন ?

—না বাসব ! তুমি এম-ডি পাশ করলে হবে কি—এদিকে জ্ঞান কিছু নেই ! এ কথা কেউ বলে ? না, ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে ? এ আমার মনোগত অভিপ্রায়। তুমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছো, তাই বললুম—সান্ত্বনা পাবে।

—কি বলে ফেরত দেবেন ?

—সোজা উত্তর—বলবো, পাগল নিয়ে কি ঘর করা যায় ? অসম্ভব !

—কিন্তু তিনি তো এ কথা গোপন করেননি।

—ও, কন্‌সেন্সে বাধছে ! তুমি আবার সেণ্টিমেণ্টালিষ্ট ! আচ্ছা, সে আমি বুঝবো ! তুমি এখন এসো।

বাসব প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যায় নিমন্ত্রিতবর্গ সকলেই সমুপস্থিত। কিন্তু নব-বধূর সন্দর্শন কেহই পাইল না। ত্রিতলের এক নির্জ্জন নিরিবিলি কক্ষে বধূ গভীর নিদ্রায় নিমগ্না। চারু বাবু জাহির করিয়া দিলেন,—বধূ হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছে, তাই তিনিই এ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিকিৎসকের উপর কে আর কথা কহিবে !

* * *

কি একটা প্রয়োজনে বাসব ভিতরে আসিয়াছিল। ছোট বোন অনুজা কহিল,—বৌ বাপের বাড়ী যাচ্ছে বলে তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেছে।

—হুঁ ! বলিয়া বাসব ফিরিয়া যাইতেছিল,—সম্মুখে পড়িল গার্গী। পরনে বিবাহের লাল বেনারসী শাড়ী ! বাসবকে দেখিয়া টিপ করিয়া গার্গী তাহার পায়ে একটা প্রণাম করিল।

অনুজা হাসিয়া উঠিল।

গার্গী মুখ তুলিল। অনুজার পানে চাহিয়া কহিল,—হাসছো যে ! বরকে প্রণাম করবো না ? দাদু বলে দিয়েছে, দেবতা !

কপট গাম্ভীর্য্যে অনুজা কহিল,—হ্যাঁ, দেবতাই তো ! বরকে খুব ভক্তি করবে।

বাসব কিন্তু এ সকল কথা কানে তুলিল না, বা এতটুকু লজ্জিত হইল না ! গার্গীকে কহিল,—বাপের বাড়ী যাচ্ছো ! স্বর মমতাসিক্ত।

গার্গী উত্তর দিল,—হ্যাঁ।

—আবার কবে আসবে ?

—শাশুড়ী বললে—

বাসব কহিল,—শাশুড়ী বলতে নেই। বলো, মা ! কেমন ? মা বলো !

—মা তো নেই ! স্বর্গে গেছেন। বলিয়া গার্গী আকাশের দিকে অঙ্গুলি দেখাইল।

বাসব কহিল,—না, আমার মা তোমারও মা ! মা বলতে হয়। মা বলো।

অপ্রসন্ন মুখে গার্গী কহিল,—মা !

রমলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাসব কহিল,—মাকে নমস্কার করো গার্গী!

বাসবের মুখের পানে চাহিয়া গার্গী রমলাকে প্রণাম করিল।

বাসব কহিল,—জিজ্ঞেস করো, কবে আবার তুমি আসবে!

কথাটা বলিয়া বাসব চাহিল মায়ের মুখের পানে।

যন্ত্র-চালিতের মত গার্গী কহিল,—কবে আবার আসবো মা?

একটা ঢোক গিলিয়া রমলা কহিলেন, যখন ইচ্ছা হবে, এসো মা। তোমারই তো ঘর! রমলার কণ্ঠ শেষের দিকে আর্দ্র হইয়া আসিল। চক্ষু সজল হইল।

বাসব কহিল,—চলো, বাবাকে নমস্কার করবে। বলিয়া মায়ের সম্মুখেই সে ডান হাত বাড়াইয়া গার্গীর বাম করপল্লব ধারণ করিল। ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া কহিল,—বাবার কাছে চলো।

ধীর পদে গার্গী স্বামীর সহগামিনী হইল।

ডাকে বাহির হইবার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া চারু বাবু বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল পুত্র, পুত্রবধূ। গার্গী তাঁহাকে প্রণাম করিল।

চারু বাবু কহিলেন,—চল্‌লে বৌমা।

কবে আবার আসবো বাবা? দম্-দেওয়া গ্রামোফোনের মত কথাটা গার্গী উচ্চারণ করিল। পথে আসিতে বাসব এ কথাটা শত বার তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে।

—আসবে! হ্যাঁ, আসবে বই কি! চারু বাবু কটাক্ষে পুত্রের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, পুত্র গম্ভীর মুখে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তিনি কহিলেন, আমার মোটর তোমাকে আনতে যাবে। দাদুকে বলো, বাবা আসতে বলেছেন।

—হ্যাঁ, আপনি তো ডাক্তার বাবু! আমার বাবা তো স্বর্গে।

—হ্যাঁ রে বেটী, হ্যাঁ! ডাক্তার বাবু। এখন সে ডাক্তার বাবু তোমার শ্বশুর। দাদুকে বলো, শ্বশুর বলেছেন আসবেন তোমার কাছে। কেমন? বলিয়া চারু বাবু পুত্রবধূর পিঠ চাপড়াইলেন। কহিলেন, চলো, তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।

বধূকে লইয়া যাইবার সময় বক্র দৃষ্টিতে তিনি একবার পুত্রের পানে তাকাইলেন। দেখিলেন, সে মুখের অন্ধকার যেন ঈষৎ লঘু দেখাইতেছে।

* * * *

ক'বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক রকম উলট-পালটও হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের এক মাসের মধ্যে চারু বাবু এক রকম জোর করিয়া পুত্রকে বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ দেবেন্দ্র বাবু বাসবের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন—ছেলে বৌ দু'জনেই যখন বুড়োকে ফাঁকি দিলে, তখন গার্গী তিন বছরের মেয়ে, ওকেই সর্বস্ব করে মানুষ করেছি, ওই সোনার পুতুল আমার নয়ন-মণি হয়েছিল। কিন্তু কি রোগ যে ষোল বছর বয়সে ওকে ধরলো,—এগজামিনের টাকা জমা দেওয়া—আমি পৃথিবী অন্ধকার দেখলুম! জানি তো কি দুরন্ত ব্যাধি। আমার ছেলে-বৌ দু'জনকে খেয়েছে। সহরের ডাক্তার কাকেও আর আমি বাকী রাখিনি তাদের দেখাতে! সেই রাক্ষস আবার ধরলো আমার গার্গীকে। কিন্তু বাসব, তোমার বাবার দয়াতেই ওকে ফিরে পেলুম! তাঁর চিকিৎসাতেই ওকে বাঁচালুম! কিন্তু মরার বাড়া হলো। জ্ঞান কোথায়? ওর মাতামহ আধ-পাগলা ছিল, বিয়ের আগে জানতুম না! বৌমার রূপ দেখেই ঘরে এনেছিলুম। কিন্তু ভাই, মহৎ প্রাণ তোমার বাপের। মানুষের যে এত বড় ছাতি হয়, আমি জানতুম না। চারু বাবু আমায় প্রতিশ্রুতি দিলেন, গার্গীকে তিনি নেবেন তোমার জন্য। আমি দেখেছি বাসব, ভগবান্ গার্গীকে যেমন দুঃখী করেছেন, তেমনি সৌভাগ্যও তাকে দিয়েছেন! তোমার মত দেবতাকে সে পেয়েছে; কিন্তু আমার পাপ কতখানি!—তোমার ঘাড়ে আমি পাগল চাপিয়ে দিয়েছি!

মৃদু হাস্যে বাসব কহিল,—যদি বিয়ের পর পাগল হতো? ওকে আমি ফেলে দিতুম?

তরু-পল্লবে সঞ্চিত বৃষ্টির জল বাতাসের মৃদু আঘাতে যেমন ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে, বাসবের কথায় দেবেন বাবুর চক্ষু হইতে তেমনি অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। দুই হাত বাড়াইয়া বাসবকে আলিঙ্গনে বুকে টানিয়া উচ্ছসিত কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—ওরে, যতীশের জন্য বুকটা আমার দিনরাত জ্বলছে। তুমি আমার সেই জ্বালা এত দিনে জুড়িয়ে দিলে ভাই। তুমি বেঁচে থাকো, বাসব, সুখী হও! জয়ী হয়ো। আমার যা কিছু সব তোমার বাসব। কান্নায় দেবেন বাবুর স্বর ভাঙ্গিয়া গেল।

ত্বরিত কণ্ঠে বাসব ডাকিল,—দাদু! দাদু! ও কি, অমন অস্থির হচ্ছেন কেন?

দেবেন বাবু বাসবের হাত চাপিয়া ধরিলেন। অনুনয়ের সহিত কহিলেন,—আমি কি তোমাকেই নিত্য-পূজা করি? ধ্যান করি? তুমিই কি আমার গুপীনাথ? গার্গীর স্বামী হয়ে দেখা দিয়েছো দাদা?

বাসব দাদা-শ্বশুরের হাত চাপিয়া ধরিল। দৃঢ় কণ্ঠে কহিল,—এত উতলা হবেন না, দাদু! আমি দেবতা নই, গুপীনাথ নই! আমি আপনার নাত-জামাই, গার্গীর স্বামী।

* * * *

বিলাতে বসিয়া দেবেন বাবুর নিকট হইতে বাসব যে ক'খানা পত্র পাইয়াছিল,—গার্গী কুশলেই আছে। দেবেন বাবু লিখিয়াছেন,—গার্গী মাঝে মাঝে তোমায় খোঁজে! তোমাকে দেখিতে চায়! অত্যন্ত অস্থির হয়। সে জন্য দেবেন বাবু লিখিয়াছিলেন,—তুমি গার্গীকে চিঠি লিখো বাসব, আমায় সে কেবল তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।

বাসব গার্গীকে চিঠি লিখিয়াছিল,—

গার্গী! আমার ফটো তোমায় পাঠালুম! আসবার সময় যে আংটি তোমার আঙুলে পরিয়ে দিয়ে এসেছি, সেটা আঙুলে রেখো! কেমন? এ দেশ খুব ঠাণ্ডা! বরফ পড়ে। তুমি আমায় চিঠি দিও! দেবে তো? তা হলে আমার খুব আহ্লাদ হবে। এবার থেকে তুমি নিয়মিত আমার চিঠি পাবে।

হ্যাঁ, আমি যখন ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরবো, তখন তোমায় এ দেশে আনবো। আসবে তো তুমি? ইতি

তোমারই

বাসব।

বাসবের খানকয়েক চিঠির মধ্যে একখানার সে উত্তর দিয়াছিল। গার্গী লিখিয়াছিল,—

'তুমি কবে আসবে? তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে।'

উত্তরে বাসব গার্গীর নামে নিজের একখানা ফটো আবার পাঠাইল।

পিতার পত্রে বাসব জানিতে পারিল, দেবেন বাবু পীড়িত, শয্যাশায়ী; চারু বাবু তাহার চিকিৎসা করিতেছেন।

বাসব উদ্বিগ্ন রহিল গার্গীর কথা ভাবিয়া, গার্গীর কি হইবে? ক্রমে পিতার পত্রে দেবেন বাবুর পীড়া বৃদ্ধি; তাঁহার পরলোক যাত্রা সমস্ত সমাচার সে অবগত হইল। চারু বাবু পুত্রকে জানাইলেন, দেবেন বাবু তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির একজিউটার করিয়া গিয়াছেন চারু বাবুকে। বাসব যত দিন না শিক্ষা শেষ করিয়া দেশে ফিরিবে, তিনি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবেন। তিনি এবং গার্গী যদি হঠাৎ মরিয়া যান; বাসব আবার বিবাহ করিলে বাসবের পুত্র-কন্যারা এ সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

পত্র শেষ করিয়া বাসব নিশ্বাস ফেলিল। গার্গী তাহার পরম শুভাকাঙ্ক্ষীকে জন্মের মত হারাইয়াছে!

পিতা-মাতাকে বাসব জানাইল, এই মুহূর্ত্তে তাহার গার্গীর নিকটে যাওয়া উচিত, কিন্তু তাহা যখন পারিল না, তখন পিতা-মাতাকে প্রবাসী পুত্রের একটি মাত্র অনুরোধ—গার্গীর সেবা, পরিচর্য্যা ও যত্নের যেন সামান্য ত্রুটিও না হয়!

পিতা আশ্বাস দিয়া পত্র দিলেন, গার্গীর দায়িত্ব, স্বামী বলিয়া একা বাসবেরই নয়। দেবেন বাবু শেষ নিশ্বাস ফেলিবার সময় গার্গীর দু'হাত ধরিয়া তাকে তাঁদের হাতে দিয়া গিয়াছেন।

বাসব নিশ্চিন্ত হইল। পড়াশুনায় মন দিল। ফিরিতে বাকী আর আটটা মাত্র মাস।

* * * *

বাসবের দেশে ফিরিতে আর দু'মাস বাকী, অকস্মাৎ চারু বাবুর পত্র আসিল—গার্গী মারা গিয়াছে। দুঃখ করিয়া চারু বাবু লিখিয়াছেন,—বাঁচাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু মৃত্যু যাহাকে লইবার জন্য হাত বাড়ায়, তাহাকে কে রক্ষা করিবে?

পত্র-হাতে বাসব বহুক্ষণ আবিষ্টের মত বসিয়া রহিল। গার্গীর মৃত্যু—সে জন্য চোখে অশ্রু আসিল না, হৃদয়ে উল্লাসও জাগিল না। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, চিন্তা-শক্তি সমস্তই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যালোকের মত কেমন আচ্ছন্ন, আবৃত থাকিয়া তাহাকে জড়-পুতুলের মত করিয়া দিল।

সমস্তই নিয়তির বিধান! ভাগ্যচক্র! উপায় কি?

দেখিতে দেখিতে দু'টি মাস কাটিয়া গেল। বিলাতের বড় ডিগ্রী লইয়া বাসব দেশে ফিরিল।

* * * *

মহোল্লাসে চারু বাবু পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। বাড়ী, গাড়ী, সার্ভিস—সমস্তই বাসবের জন্য গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন।

দেহের ত্বক্ মোচনের মত বিদ্রোহী ভাবগুলা বাসবের নিজের অজ্ঞাতেই মন হইতে ক্রমশঃ চলিয়া গেল। অন্তরের মালিন্যও মুছিয়া গেল।

এবার উঠিল বাসবের বিবাহের প্রস্তাব।

রমলা কহিলেন—উনি বলছেন তুমি নিজে দেখে-শুনে—তা হ্যাঁ রে বাসু, তোর মামিমার বোন ঝি তিনটে পাশ করা! খরচ-পত্তরও বেশ করবে, আমাকে ধরেছে বড্ড।

বাসব হাসিল, উত্তর দিল না।

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কলেজে যাইবার জন্য বাসব প্রস্তুত হইতেছিল। গৃহের প্রত্যেকটা আসবাব গার্গীর পিতামহের প্রদত্ত। কোথায় আজ তাঁরা? গলার টাই বাঁধা স্থগিত রাখিয়া কিছুক্ষণ সে জিনিষগুলার দিকে চাহিয়া রহিল।

কনে দেখা হইল। বাসব নিজে দেখিতে গিয়াছিল, মামিমার বোন-ঝি তিনটি পাশ-করা, সুদর্শনা হইলেও বাসবের পছন্দ হইল না। ডাক্তার চৌধুরীর মেয়ের কপাল ফিরিল।

বাসব এখন দস্তুরমত বড়লোক। বিবাহে ধুমধাম হইল। ইন্দ্রাকে পাইয়া বাসব নিজেকে যেন কৃতার্থ বোধ করিল।

দুঃস্বপ্নের মত গার্গীর স্মৃতি-বিস্মৃতিতেই আজ সুখ, আনন্দ!

* * * *

কারমাইকেল মেডিকেল্ কলেজের জুবিলী উৎসবে চিকিৎসক-সম্মিলন হইয়াছে। রাঁচী মেণ্টাল হসপিট্যালের ডাক্তার সেন—কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। উৎসবে আহূত হইয়া তিনি আসিয়াছেন।

বাসবের খুড়তুত শালীর সে স্বামী। অর্থাৎ ইন্দ্রার কাকার মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। বাসবের বিবাহে সে উপস্থিত হইতে পারে নাই। এখন শ্বশুরবাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসিয়া বাসবের সহিত পরিচয় হইল। বাসবের মুখের পানে চাহিয়া প্রথমে কেমন চমকিত হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া নূতন ভায়রাভাইয়ের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল।

দিন কয়েকের মধ্যে বাসবের সহিত তাহার সৌহার্দ্য বেশ্ জমিয়া উঠিল। বাসব নিজের গৃহে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইল। বিদায়ের প্রাক্কালে বাসবকে বিশেষ করিয়া ডাক্তার সেন অনুরোধ করিল,—তাঁহার কর্ম্মস্থানে গিয়া দিন-কয়েক অতিথি হইবার জন্য।

ইন্দ্রা কহিল,—দিনরাত পাগল দেখতে আপনার ভাল লাগে জামাই বাবু? বিরক্তি ধরে না?

—না ভাই, তাদের সুখ-দুঃখের কথা আমি শুনি। অনেক কথায়, অনেক ব্যথায় আমি তাদের বন্ধু হতে চাই! তারা আমায় ভালোবাসে।

—উপকার সত্য কিছু হয়?

—হয় বই কি। অনেকে সেরেও যায়।

—তবু পাগল। মা গো, মনে হলেই কেমন ভয় হয়।

—না, না, পাগল বলে অমন আঁতকে উঠো না ইন্দ্রা! তাদের কথা ভাবতে হয়। দরদ দিয়ে তাঁদের দেখতে হয়। আহা, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করেছে। একটু ভালোবাসা তাদের জন্য রাখতে হয় বই কি! মমতা নিয়ে চিকিৎসা করলে ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

বাসব এ আলোচনায় যোগ দেয় নাই। এখন উঠিয়া দাঁড়াইতে ডাক্তার সেন কহিল,—উঠছো?

—হ্যাঁ, ঘরটা বড্ড গরম ঠেকছে।

বাসব বারান্দায় আসিল।

বাসবের পিতার ব্লাডপ্রেসার বাড়িয়াছে।

বাসব কহিল,—চেঞ্জে চলুন! ফুল রেষ্ট চাই।

—হুঁ, কিন্তু যাই কোথায়?

একটু চিন্তা করিয়া বাসব কহিল,—রাঁচী চলুন! শীতকাল, ওখানে ভাল বাড়ীও পাওয়া যাবে! ডাক্তার মিত্তির রয়েছেন!

—না, না, রাঁচী নয়! বাপ রে, রাঁচী! হঠাৎ দুই চোখ রক্তবর্ণ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে চারু বাবু কহিলেন,—কেন বলো তো, মতলব কি? আমায় পাগল পেয়েছো যে রাঁচী পাঠাতে চাও!

পিতার কথায় বাসব চমকিত হইল। পিতাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল,—তা বেশ তো, আপনার যেখানে ভালো লাগে চলুন। পাহাড়ে যেতে চান,—সমুদ্রের ধারে যেতে চান,—

এক অদ্ভুত হাসি হাসিয়া চারু বাবু কহিলেন,—আমি সব বুঝি বাসব! রাঁচী কথাটা তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো, তার মানে তুমি ভেবেছো আমার মাথা খারাপ! আমি পাগল হয়েছি!

—না। বেশ তো, আপনার ইচ্ছা না হয় আপনি কোথাও যাবেন না।

রমলা স্বামীর মাথায় বরফের ব্যাগ চাপিয়া ধরিলেন।

কক্ষ অন্ধকার করিয়া ফ্যানের রেগুলেটারটা বাড়াইয়া দিয়া বাসব পিতাকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্লাডপ্রেসারের ঝোঁকে অস্থির চারু বাবু বকিতে লাগিলেন,—রাঁচী, না—খবর্দার। ও সব চলবে না আমার কাছে। আমি যা করেছি, বাসব, তোমার জন্যই করেছি। পুত্র-স্নেহ!

অসংলগ্ন এ কথার অর্থ না বুঝিয়া বাসব নীরব রহিল।

* * * *

ব্লাডপ্রেসারের জন্য শেষে চারু বাবুর মস্তিষ্ক সত্যই বিকৃত হইল। ধমনীতে রক্তের চাপ বৃদ্ধির জন্য একটা না একটা ঝোঁক অহরহ চাপিয়া ধরিতেছে, বাসব তাহা বুঝিল। পিতার চিকিৎসা স্বয়ং সে করিতে লাগিল। বায়ু-পরিবর্ত্তনের প্রসঙ্গে পিতা যেন ক্ষেপিয়া উঠেন! সে কথায় ক্ষিপ্ততা এমন বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহাকে শান্ত করা মুস্কিল হয়।

রমলা কাছে যাইতে ভয় পায়। বলে,—বাস্তু, যে রকম রাগ ওঁর বেড়েছে, ভয় করে।

ইন্দ্রা বলে, না, আর এখানে এ বাড়ীতে আমি থাকতে পারবো না।

—কেন? বাবা তো নিজের ঘরেই থাকেন। তোমার এলাকা মাড়ান না তো।

ক্ষুণ্ণ স্বরে ইন্দ্রা বলে,—কি রকম রাগারাগি চেঁচামেচি করেন! তুমি তো থাকো কলেজে, কিংবা ক্লাবে,—তার জানবে কি?

বাসব বলে,—আমি না জানলেও সব বুঝি, ও ব্লাডপ্রেসারের ঝোঁক ছাড়া আর কিছু নয়।

—তা হোক, আমার এই কটি ছেলেমেয়ে—ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি সর্ব্বক্ষণ। পাগলের সম্পত্তি নিয়েই তোমাদের ঐশ্বর্য্য! তাই আমার ভারী ভয় করে!

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাসব নিরুত্তরে ইন্দ্রার পানে চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রা কহিল—আমি শুনেছি। দেবেন বাবু মেসোমশায়ের বাবার বন্ধু ছিলেন। মেসোমশাই কত কি বলতেন। ভাখো, সেই অভিসম্পাতে বুঝি বা—

বিস্মিত বাসব কহিল—অভিসম্পাত!

একটি ঢোক গিলিয়া ইন্দ্রা কহিল—ওঁর মাথা গরম হয়েছে শুনে মেসোমশাই সে দিন বলছিলেন—দেবেন বাবুর নাতনীর টাইফয়েডে মাথা খারাপ হলো। বাবা ঢের বলেছিলেন যে দেবেন, ওকে ঠাণ্ডা পাহাড়ে কিছু কাল ফেলে রাখো, সেরে যাবে। তখন মেসোমশাই জলপাইগুড়িতে। বল্লেন, অনাদির কাছে রাখো! কিম্বা আমার পুরীর বাড়ীতে থাকুক। দেবেন বাবু ডাক্তারের মত চাইলেন, তিনি মত দিলেন না। দেবেন বাবুও রাজি হলেন না। ডাক্তারের উপর দেবেন বাবুর ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। তাঁর ছেলে-বৌ কেউ তো বাঁচেনি টাইফয়েডে। মেসোমশাই বল্লেন—পাগল সারাবার মত কৈ, তেমন কিছু করা হয়নি।

এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দিতে পারিলেই বাসব যেন বাঁচে! তাহার ভিতরটা হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। কহিল, যাক, যে বিষয়ে সঠিক কিছু জানি না, তার আলোচনায় দরকার নেই।

* * * *

হঠাৎ একটা কাজে বাসবকে ছুটিতে হইল রাঁচী। ডাক্তার সেনের গৃহে সে অতিথি হইল।

সাদর সম্বর্দ্ধনায় ডাক্তার সেন কহিল—নিমন্ত্রণ তো পূর্ব্বাহ্ণেই করে রেখেছি। এখন পেয়ে ভারী খুশী হলুম। ভেবেছিলুম, প্রতিশ্রুতি বুঝি রাখতে পারবে না!

সবিস্ময়ে বাসব কহিল—এমন ভাবনার অর্থ?

মৃদু হাস্যে ডাক্তার সেন কহিলেন—গিন্নী ছাড়বে না!

—কেন? না ছাড়ার তো কিছু কারণ নেই।

—ও: বলিয়া ডাক্তার সেন চুপ করিয়া গেল এবং কথা পাল্টাইয়া অন্য প্রসঙ্গ আনিল।

পরের দিন সকালে চা খাওয়ার পর ডাক্তার সেন কহিল—চলো হে, আমার রাজত্বে একটু ঘুরে আসবে। একটা নতুন জগৎ দেখবে, চলো।

ডাক্তার সেনের সহিত বাসব আসিল—সেণ্ট্রাল হস্পিটালে। অনেক মহামহিম, রাজাধিরাজের সঙ্গে ডাক্তার সেন পরিচয় করাইয়া দিল। কেহ জানাইল, সে রাজা প্রতাপ সিংহ! কেহ বলিল, আমি সম্রাট্ আকবর খাঁ। কেহ বলিল, আমি জার্ম্মাণ সম্রাট্! এক জন কতকগুলা সূতা আর গাছের পাতা লইয়া নিবিষ্ট ছিল, সেনকে দেখিয়া কহিল, ডাক্তার আমার এই নতুন আবিষ্কারটা।

এদিক্-সেদিক্ ঘুরিয়া ডাক্তার সেন কহিল, স্ত্রীলোকের বিভাগে চলো।

বাসব চলিল।

দু'-একটি রমণীর সহিত হ্যাঁ, না সংক্ষিপ্ত উত্তরে কথা কহিয়া কোথাও ক্ষুদ্র অভিবাদন দিয়া ডাক্তার সেন একটি ঘরের মধ্যে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

চাপরাশি আসিয়া তাহার হাতে দুইটা গোলাপের তোড়া দিল।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাসব চাহিল।

ডাক্তার সেন কহিল, আমার বাগানের ফুল! আমি নিজের যত্নে এর জন্য ফুলের তোড়া আনি। বাস্তবিক এঁর দুরদৃষ্টের জন্য

আমি ব্যথা বোধ করি বাসব! এসো। বলিয়া একটি ঘরের পর্দা সরাইয়া ডাক্তার সেন বাসবকে লইয়া প্রবেশ করিল! নত মস্তকে অভিবাদন জানাইয়া কহিল, আপনার ফুল।

গোলাপের তোড়া দু'টা রমণীর দিকে বাড়াইয়া দিল।

ফুল? দিন! দিন! বলিয়া যুবতী ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার সেনের হাত হইতে চিলের মত ছোঁ মারিয়া সে গোলাপের তোড়া দু'টা লইয়া গৃহ-কোণে ছুটিল। সেখানে টেবিলের উপর ফটো! ফুল লইয়া গিয়া ফটোর সামনে রাখিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল,—নাও দেবতা, ফুল নাও! দাদু যেন বেঁচে থাকে।

বাসব ছবির পানে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। নিমেষে মুখ পাংশু হইয়া গেল।

ফটোতে ফুল দিয়া প্রণাম শেষ করিয়া যুবতী বাসবের দিকে ফিরিয়া চাহিল। কহিল,—এঁকে চেনেন না? ওমা, দেবতা! দাদু রোজ ফুল দিতে বলেছে! দাদু বলেছে,—ফুল দিলেই দেবতা আসে—বলিয়া ডাক্তার সেনের দিকে চাহিয়া কহিল,—সত্যি, আমি এক দিন এই বড় বড় গোলাপ ফুল খোঁপায় পরেছিলুম। গলায় পরেছিলুম! সে দিন দেবতা এসেছিল। আমাকে বাতাস করলে—আচ্ছা, আসেনি? এই দ্যাখো, দেবতার চিঠি!

ময়লা জীর্ণ একখানা পত্র সে জামার অভ্যন্তরে বুকের নিকট হইতে টানিয়া বাহির করিয়া কহিল,—দেখ তার চিঠি! বিলেত থেকে লিখেছে। বলিয়া চিঠিখানা ডাক্তার সেনের হাতে দিল। এমন সে বহু বার দিয়াছে! বলিয়াছে, পড়ে দেখ।

পত্রখানা বাসবের হাতে দিয়া ডাক্তার কহিল—অভাগিনীর স্বামীর পত্র!

স্তম্ভিত বাসব দেখিল, তাহারই লেখা চিঠি।

সংশয়ের পর্দা সরিয়া গেল।

বাসব প্রশ্ন করিল,—একে কোথা পেলেন?

—ভালো কথা, তোমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে যে! তোমার [illegible]বা চারু বাবুই আমার কাছে রেখেছেন। মাসে একশো করে টাকা [illegible]ন! একে আপনি চেনেন? এখন বেশ প্রকৃতিস্থ হয়েছে। এই [illegible]টা আর চিঠি নিয়ে সময় কাটায়। বলে, দাদু বলেছে, দেবতা! [illegible]মি চারু বাবুকে লিখেছিলুম, কোন উৎপাত ঝঞ্ঝাট নেই, প্রায় [illegible]স্থ—এঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যান! তিনি রাজী হন না! [illegible] রাজী হবেন কি? এঁকে যখন দিয়ে গেলেন,—তখন তো [illegible]ক্ষ-ওলা পাগল ছিল না। পাগল ছিল বটে, এঁর স্বামীর কাছে [illegible]না হচ্ছে বলেই একে এখানে দিয়ে গেলেন। আমার হাত [illegible] কি কান্না,—বলে, দেবতা কই? আমি কথা দিলুম, বললুম। [illegible]মার কথা শুনে বললে, দেবতাকে আপনারা এনে দেবেন? সেই [illegible]ক আমার ভারী বাধ্য। এর উপর আমার অত্যন্ত মমতা [illegible]য়েছে। কি ভাবছেন?

—কিছু নয়। কি বলছেন ডাক্তার সেন, এঁকে চিনি কি [illegible]? চিনি! এ আমার কে, জানেন? আমার স্ত্রী! এঁর পিতামহের [illegible]ত্তিতে আমি আজ বড়লোক।—হ্যাঁ, আমি জানি, এঁর টাইফয়েড [illegible]ছিল, তাতে ব্রেন্ উইক হয়। সে দিকটার চিকিৎসা হয়নি—বা [illegible] উচিত ছিল। হয়েছিল তার বদলে আমার সঙ্গে বিবাহ! [illegible]মিও ওকে ছেড়ে চলে গেলুম। ভাবিনি পর্দার আড়ালে এতখানি রহস্য আছে। আজ আমার বাবাও ব্লাড্‌প্রেসারে পাগল।

ডাক্তার সেন স্তম্ভিত নয়নের পলকহীন দৃষ্টিতে বাসবের পানে চাহিয়া রহিল।

বাসব ডাকিল,—গার্গী—

চমকিয়া গার্গী মুখ ফিরাইল। বহুক্ষণ পলকহীন চোখের স্থির দৃষ্টি বাসবের মুখে নিবদ্ধ রাখিয়া পাথরের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর এক পা, এক পা করিয়া বাসবের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

বাসব কহিল,—আমায় চিনতে পারছো গার্গী?

মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে গার্গী কহিল,—হ্যাঁ।

—বলো তো, কে? আমি তোমার কে হই?

গার্গীর মুখ সিঁদুরের মত রাঙা হইল।

বাসব কহিল,—বলো, আমি কে?

বাম হস্তে মস্তকে কাপড় তুলিয়া গার্গী কহিল,—আমার স্বামী।

বাসবকে দেখিয়া গার্গী এই প্রথম কথা কহিল।

বাসব গার্গীর হাত ধরিল। কহিল,—তুমি আমার সঙ্গে চলো গার্গী!

বাসবের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাত সবেগে টানিয়া লইয়া গার্গী চীৎকার করিয়া উঠিল,—না গো, না! আমি যাবো না। আবার জোর করে তারা আমায় পাগলা-গারদে দেবে! ফাঁকি দিয়ে আবার তারা আমায় নিয়ে যাবে। দাদু! দাদু গো!—বেতস পত্রের মত গার্গীর দেহ কাঁপিতেছিল। বাসব ধরিবার পূর্বেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

উভয় চিকিৎসকই নত হইয়া গার্গীর সংজ্ঞাহীন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

ডাক্তার সেনের মুখ দিয়া বাহির হইল,—হোপলেস্।

* * * *

বাসব ফিরিয়া আসিয়াছে।

চারু বাবু উন্মাদ।

রমলা আসিয়া পুত্রের কাছে কাঁদিয়া কহিলেন,—কি মানুষ কি হয়ে গেল! আমাকে মেরেছেন। এই ছাখ বাসব, ফুলো দাগ। এ বাড়ীতে থাকতে ভয় করে। আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে।

বাসব কহিল, এ বাড়ীতে থাকতে হবে না মা, এ-বাড়ী আমাদের ছাড়তে হবে।

দুঃখ, শোক, তাপ সব ভুলিয়া রমলা চাহিলেন পুত্রের পানে,—যে-গৃহের প্রতি বীতরাগে তিনি কাশীবাসের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন, সেই গৃহ পরিত্যাগের কথায় কহিলেন,—তার মানে?

—ঠিক কথাই বলছি! মি তো জানো সব, এ সম্পত্তি গার্গীর পিতামহের,—তাই আজ বাবা পাগল। কিন্তু তোমরা আমার মা-বাপ—তোমরা—

বাসবের কথা শেষ হইল না। রমলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি বাসব—মুখ কালো করিয়া তিনি কহিলেন,—আমি মেয়ে-মানুষ, বাবা।

—কিন্তু আমায় তুমি বলতে পারতে। ভেবেছিলে, পাছে আমি অসুখী হই! আমার সুখের পথ তাই পরিষ্কার করে রেখেছিলে।

জানো মা, গার্গী আমার চোখের উপরে মরে গেল। বলিয়া বাসব কক্ষ ত্যাগ করিল।

বাড়ী ছাড়ার কথা যথাসময়ে ইন্দ্রার কর্ণগোচর হইল। বজ্রাহতের মত সে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল,—মাথা গুঁজে থাকবো কোথায়! আর তুমিই বা এমন নতুন বাড়ী কোন্ দুঃখে ছাড়বে, তোমার প্রাণটা কাঁদবে না?

প্রাণ কাঁদচে বলেই এ বাড়ীতে থাকবো না ইন্দ্রা। পরের পয়সা ভোগ করবো না। এ বাড়ী আমি বেচে ফেলবো।

—মানে?

—মানে, এ বাড়ীকে করবো "গার্গী মেণ্টাল হস্‌পিট্যাল" আর রায়েদের কাছে সব বিক্রী করে পাঁচ লাখ টাকা পাচ্ছি,—সে টাকা জমা হবে "গার্গী ফণ্ড" এই হস্‌পিট্যালের জন্য।

ভগ্ন কণ্ঠে ইন্দ্রা কহিল,—বাবা অনেক আশা করে তোমার হাতে আমায় দিয়েছিলেন। আমিও সুখী হবো ভেবেছিলুম। ইন্দ্রার চক্ষু সজল হইল।

বাসব কহিল,—কাঁদচো কেন ইন্দ্রা? আমি তোমারই রইলুম গার্গী বেঁচে নেই। কিন্তু পরের সম্পত্তি এ ভাবে ভোগ করা যায় না তাতে পাপ হয়।

বাসব হইল উন্মাদ রোগের চিকিৎসক। বিকৃত-মস্তিষ্কদের লইয়াই সে জীবন কাটাইতে চায়।

শুভাকাঙ্ক্ষীর দল কহিল,—সে কি!

বাসব কহিল,—বুঝছো না, আমার বাবাই যখন পাগল হলেন—

বন্ধুরা অন্তরালে কহিল,—পাগলা বাপের পাগলা ছেলে! অত প্র্যাকটিস্, অত পয়সা—চিরকাল জানি, ও ভয়ঙ্কর সেণ্টিমেণ্টাল!

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনের অবসানের ও ইংরেজ শাসনের আরম্ভের সন্ধিকালে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল—যে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার অর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা —"বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে ঘটিয়াছিল বলিয়া"—"ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে অভিহিত। এই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার জনবহুল বহু স্থানে এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কিন্তু এই দারুণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ বিস্তৃত ভাবে লিখিত হয় নাই। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, ইংরেজের লিখিত এ দেশের ইতিহাসগুলি "আমরা সাধ করিয়াই ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধ পূরণ মাত্র"—"আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজী গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই।" কারণ, "বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই।" মার্শম্যানের যে ইতিহাস দীর্ঘকাল এ দেশের প্রামাণ্য ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত ছিল, তাহাতে লেখক ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় শাসন-পরিবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল —অসামঞ্জস্য ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া একটি অধ্যায়ের শেষে তিন ছত্রে এই দারুণ দুর্ভিক্ষের কথায় বলিয়াছেন—"বঙ্গের নিম্নাংশের অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে যে বিষম দুর্ভিক্ষে বিনষ্ট হয়, তাহাতে দেশের দুর্দ্দশা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।" এই কয় ছত্র পাঠ করিয়া ঐ দুর্ভিক্ষের স্বরূপ কি অনুমান করা যায়? ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে —অর্থাৎ ঐ দুর্ভিক্ষের প্রায় এক শত বৎসর পরে ঐ দুর্ভিক্ষের বিবরণ—ইংরেজ দপ্তরের বিবরণ হইতে—রচনা করিবার সময় ইংরেজ ঐতিহাসিক হাণ্টার লিখিয়াছিলেন—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বহু উৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। যে কেহ ভারতে আমাদিগের স্বদেশীয়দিগের কার্য্যের বিষয় জানিতে পারেন; আমরা তাঁহাদিগের অনুসৃত নীতি ও যুদ্ধ-ব্যবস্থা অবগত আছি * * কিন্তু আমাদিগের ইতিহাস ইংরেজের দেশ জয়ের ও বিজেতৃগণের বিবরণ, ভারতের লোকের ইতিহাস নহে।" তিনি যখন ইহা বলিয়াছিলেন—পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকরা উহার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন বা উহা উপেক্ষা করিয়াছেন।

ইহাতেই দেশের লোকের দ্বারা দেশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন ও সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়; বিদেশীর রচিত ইতিহাসে জাতির মর্ম্মকথা স্থানলাভ করে না—স্থানলাভ করিলেও তাহাতে আবশ্যক গুরুত্ব আরোপিত হয় না। কারণ—

"কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যা'রে?"

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ সরকারের দপ্তরখানায় কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি মন্বন্তরের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ বর্ণনা—তাহাতে কল্পনার অনুরঞ্জন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই; সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। * * * অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না; মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তার পর একসন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তার পর দুই সন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যে কিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গালায় বড় কান্নার কোলাহল পড়িয়া

"লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তার পরে কে ভিক্ষা দেয়? উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তার পরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল। বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল। তার পর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল, তার পরে ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তার পর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুক্কুর, ইন্দুর বা বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল। যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল; যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল।

"রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত। বিশেষত: বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে? কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখে না; মরিলে কেহ ফেলে না। অতি রমণীয় বপু অট্টালিকামধ্যে আপনা আপনি পচে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী ফেলিয়া ভয়ে পলায়।"

এই এক বর্ণনা।

আর এক বর্ণনা জন শোরের। তিনি তখন চাকরী লইয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন; পরে প্রতিভাবলে উচ্চ পদ লাভ করিয়া লর্ড টেনমাউথ হয়েন। তিনি ঐ সময়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, একটি কবিতায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন :—

"এখন(ও) মানস-ক্ষেত্রে সেই দৃশ্য করি নিরীক্ষণ—
নয়ন কোটরগত, শীর্ণ দেহ, শবের বরণ।
শুনি—মাতৃ-আর্ত্তনাদ, শিশু-কণ্ঠে কাতর ক্রন্দন,
নিরাশের হাহাকার, যাতনায় অস্ফুট রোদন।
মৃত ও মরণাহত এক সাথে গড়াগড়ি যায়;
শিবার অশিব রবে শকুনির চীৎকার মিশায়;
কুক্কুর ডাকিয়া ফিরে,—দিবাভাগে খর রবিকরে
স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করে মৃত ও মুমূর্ষু স্তরে স্তরে।
সে দৃশ্য লেখনী-মুখে বর্ণনায় ব্যক্ত নাহি হয়,
কালে তাহা স্মৃতি হ'তে কোন দিন মুছিবার নয়।"

হাণ্টার বলিয়াছেন, এই পদ্যে ঘটনার স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, গদ্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইতে পারিত না।

হাণ্টার বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষের ২০ বৎসর পরে বাঙ্গালার অবশিষ্ট লোকের সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩ কোটি বলিয়া নির্ণীত হয়; কাজেই আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এক বৎসর অন্নকষ্টের পর এক বৎসর শস্যহানিতে ৯ মাসে এক কোটি লোকের মৃত্যু হইয়াছিল।

কিন্তু এক বৎসর ফসল ভাল না হইবার পর এক বৎসর অজন্মায় কিরূপে বাঙ্গালার মত স্থানে লোকের এমন দুর্গতি হইতে পারে? সেই কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শতবর্ষে বাঙ্গালার—সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার কথা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

এই দারুণ দুর্ভিক্ষ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তাহার শতবর্ষ পূর্ব্বে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট্। তাঁহার রাজত্ব ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। তাঁহার রাজত্বকালে বিদেশী পর্য্যটক বার্ণিয়ার এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং তিনি ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আগমন করেন। বার্ণিয়ার বাঙ্গালার উর্ব্বরতা, সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ বর্ণনা হইতে আমরা কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

সকল সময়েই মিশরকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর দেশ বলা হইয়াছে; কিন্তু দুই বার বাঙ্গালায় যাইয়া আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সৌন্দর্য্যে ও উর্ব্বরতায় বাঙ্গালারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গালায় এত চাউল হয় যে, উহা কেবল নিকটস্থই নহে, পরন্তু দূরস্থ দেশসমূহেও সরবরাহ করা হয়। জলপথে বাঙ্গালায়, পাটনায় এবং সমুদ্রপথে মৌছলীপটম ও করমণ্ডল উপকূলে বহু বন্দরে চাউল চালান যায়। সিংহলে ও মালদ্বীপেও চাউল প্রেরিত হয়। বাঙ্গালায় প্রচুর পরিমাণে চিনিও প্রস্তুত হয় এবং ঐ চিনি গোলকণ্ডায়, কর্ণাটে, আরবে, মোকা ও বসোরার পথে মেসোপোটেমিয়ায় ও বন্দর-আব্বাসের পথে পারস্যেও প্রেরিত হয়।

বাঙ্গালার আম্র প্রভৃতি নানারূপ ফলের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বাঙ্গালায় মিশরের মত অধিক পরিমাণ গম উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু তাহার কারণ, বাঙ্গালার লোক চাউলই অধিক আহার করে।

তাহার পর কার্পাস ও রেশমের কাপড়। বাঙ্গালাই এ সকল দ্রব্যের প্রধান কেন্দ্র। বিদেশী বণিকরাও বাঙ্গালা হইতে কত সূতী ও রেশমী কাপড় রপ্তানী করে, তাহা দেখিয়া বার্ণিয়ার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, রাজমহল হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার দুই দিকে অসংখ্য খাল আছে। সে সকল পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কালে অসীম পরিশ্রমে খনিত হইয়াছিল—সেই সকল খাতে বাণিজ্যতরী যায় এবং সেই জলে ধান্য, ইক্ষু, ডাইল, তৈল-শস্য ও রেশম-কীটের খাদ্য তুঁত গাছের চাষ হয়।

বহু কাল পরে—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া প্রসিদ্ধ সেচ-এঞ্জিনিয়ার উইলকক্স এই সকল খালের উল্লেখ করিয়া বলেন—যেন ভগীরথ শঙ্খনাদ করিতে করিতে গিয়াছেন, আর গঙ্গার প্রবাহ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে!

বাঙ্গালার উর্ব্বরতার আরও অনেক প্রমাণ আছে।

আকবর বাদশাহের সময়ে ঈশা খাঁর শাসনে চাউল টাকায় ৪ মণ বিক্রীত হইত। তাহার পর শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার শাসক হইয়া ঢাকায় আসিয়া যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি শোভাযাত্রা করিয়া নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া ঢাকা ত্যাগ করিয়া নির্দ্দেশ দেন, ঐ দ্বার বন্ধ করা হইবে এবং তাহার উপর লিখিত থাকিবে—চাউলের মূল্য ঐরূপ (টাকায় ৮ মণ) না হইলে ঐ দ্বার মুক্ত করা হইবে না। তাঁহার গমনের পরে যিনি ঐ মূল্যে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি ঐ দ্বার মুক্ত করেন। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে—ঢাকা ত্যাগের ৫ বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং মনে করা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তদশ

শতাব্দীতেও বাঙ্গালায় কোন কোন স্থানে চাউল ঐরূপ মূল্যে বিক্রীত হইত।

আমরা বাঙ্গালার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে আর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁন বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিম উভয় পদের সকল কায করিতে থাকেন। দেওয়ান ও নাজিম হইয়া তিনি প্রথম পুণ্যাহের পরে দিল্লীতে যাহা প্রেরণ করেন, তাহার হিসাব এইরূপ :—

তোসাখানার দারোগার অধীনে ৩ শত অশ্বারোহী ও ৫ শত পদাতিক সৈনিকের হেপাজতে ২ শত গোযানে এক কোটি ৩০ লক্ষ নগদ টাকা প্রেরিত হয়। জায়গীরের ও খাস নবিসীর টাকা স্বতন্ত্র দেওয়া হয়। তদ্ভিন্ন হস্তী, টাঙ্গন ও গুন্থনামক এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় পার্ব্বত্য অশ্ব, মহিষ, হরিণ, বাজপাখী, জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) বয়ন করা পাদশাহের ব্যবহার্য্য সূক্ষ্ম বস্ত্র, গণ্ডার-চর্ম্মের ঢাল, শ্রীহট্টের মাদুর (স্বর্ণ ও গজদন্তের), মৃগনাভি, আসামের বস্ত্র, তরবারের ফলক, য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বহুবিধ দ্রব্য প্রেরণ করা হয়।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অবস্থা এইরূপ ছিল।

তাহার পর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাসীতে সিরাজদ্দৌলা পরাভূত হইলে ইংরেজ বণিক মীরজাফরকে নবাব করিয়া ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন; বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হয়।

১১৭৬ বঙ্গাব্দে—যখন মন্বন্তর হয়, তখন অবস্থা বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় এইরূপ—

"১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লয়েন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপ্যাচ লিখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

মীরজাফরের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা স্কটের বর্ণনায় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন, মীরজাফর মসনদ লাভের পূর্ব্বে যাঁহাদিগের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, মীর্জ্জা সামসুদ্দীন তাঁহাদিগের অন্যতম। এক দিন মীর্জ্জার বিরোধীরা মীরজাফরকে জানান যে, মীর্জ্জার অনুচরগণ কর্ণেল ক্লাইভের অনুচরদিগের সহিত কলহ করিয়াছে এবং ক্লাইভ তাহাতে রুষ্ট হইয়াছেন। অল্পক্ষণ পরে মীর্জ্জা মীরজাফরের নিকটে উপস্থিত হইলে মীরজাফর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন—"তুমি কি কর্ণেলের মর্য্যাদা জান না যে, তোমার লোকরা তাঁহার বন্ধুদিগকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে?" মীর্জ্জা কৃত্রিম কাতরতার ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠেন, "প্রতিপালক আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৩ বার কর্ণেলের গর্দ্দভকে সেলাম করিয়া থাকি; আমি কি মুখ তুলিয়া কর্ণেলের দিকে চাহিতে সাহস করিতে পারি?" মীরজাফর আর কোন কথা না বলিয়া—যেন মীর্জ্জার কথার অর্থবোধ করিতে পারেন নাই, এমনই ভাব দেখান।

এই মীরজাফর সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া নবাব হইয়া আবার ইংরেজের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদিগের (অর্থাৎ হল্যাণ্ডের অধিবাসী বা ডাচ) সহিত ষড়যন্ত্র করেন। সেই সংবাদ পাইয়া ক্লাইভ চুঁচুড়া আক্রমণ করিয়া ওলন্দাজদিগকে লাঞ্ছিত করেন। তাহার পর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভ্যান্সিটার্ট তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কায করিতে থাকেন। মীরজাফর ইংরেজদিগকে প্রতিশ্রুত টাকা দিতে না পারায় তাঁহার জামাতা মীরকাশিম কলিকাতায় যাইয়া মীমাংসা করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় প্রীত হইয়া ইংরেজরা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরকে অপসৃত করিয়া তাঁহাকেই নবাব করেন।

যে কারণে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ এই ত্রয়োদশ বর্ষকালের মধ্যে বাঙ্গালায় দারুণ দুর্ভিক্ষ সম্ভব হইয়াছিল, সেই কারণেই মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ বাধে। সে কারণ—ইংরেজ কর্ত্তৃক এ দেশ শোষণ। তখনও এ দেশে রেলপথ স্থাপিত হইতে শতবর্ষ বিলম্ব ছিল—শস্য-সঞ্চয় তখন রীতি ছিল—বাঙ্গালার লোক অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া বাস করা পরম সুখ মনে করিত। সে অবস্থায় যে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অন্নাভাবে বাঙ্গালার লোকের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ইংরেজের শোষণই তাহার কারণ। সেই শোষণ বাঙ্গালার সার-শস্য গ্রাস করিয়াছিল—মাত্র ১০ বৎসরই সে জন্য যথেষ্ট ছিল।

বাদশাহী সনন্দবলে ইংরেজ কোম্পানী এ দেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিতেন। সেই অধিকারের সুযোগ লইয়া আপন আপন নৌকায় কোম্পানীর নিশান তুলিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও বিনা মাশুলে ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের নিকট হইতে "ছাড়" কিনিয়া অনেক ভারতীয় বণিকও শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেন। তাহার প্রতীকার-প্রচেষ্ট হইয়া মীরকাশিম ইংরেজের বিরাগভাজন হয়েন এবং ইংরেজরা আবার মীরজাফরকে নবাব করিয়া বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে) মীরকাশিমকে পরাভূত করেন।

এই সময় ইংরেজের অত্যাচার ও এ দেশের লোকের তজ্জনিত দুর্দ্দশার বর্ণনা ওয়ারেণ হেষ্টিংস গভর্ণরকে লিখিত তাঁহার পত্রে করিয়াছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে নদীপথে পাটনা পর্য্যন্ত যাইতে তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—প্রত্যেক নৌকায় এমন কি কূলে নানা স্থানেও—ইংরেজের নিশান উড্ডীন ছিল অর্থাৎ ইংরেজরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতেছিল। ইংরেজ ব্যবসায়ী ও তাহাদিগের অনুচরদিগের অত্যাচারের ভয়ে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দোকান বন্ধ ও অধিবাসীরা পলায়িত দেখা গিয়াছিল। ইংরেজদিগের বে-আইনী কায নবাবের রাজস্ব, দেশের শান্তি ও ইংরেজের সম্ভ্রম—সকলই নষ্ট করিতেছিল। শক্তিশালী ভাগ্যান্বেষীরা (ইংরেজরা) ভীত, শঙ্কিত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। ইংরেজরা বাঙ্গালার লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছিল।

ডীন ইঙ্গে লিখিয়াছেন—যে অতর্কিত শিল্পবিপ্লবে বিলাতের আকৃতি ও বিলাতের লোকের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, ক্লাইভের ভারতে জয়লাভ-ফলে যে লুণ্ঠিত অর্থ ৩০ বৎসরকাল স্রোতের মত বিলাতে আসিয়াছিল, তাহাতেই তাহার উদ্ভব। তিনি এই অর্থ পাপলব্ধ বলিতে দ্বিধানুভব করেন নাই।

মেকলে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহাতে যে এক দল ইংরেজের উদ্ভব হয়, বিলাতের লোক তাহাদিগকে "নবাব" বলিত। তাহাদিগের অধিকাংশই ধনী বা সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিল না, অল্প-বয়সে ভারতে প্রেরিত হইয়া তথা হইতে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহাদিগের "আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছে"র ধৃষ্ট ব্যবহারে বিলাতের লোক যেমন বিরক্ত হইত, তাহারা সমাজে অর্থের অনুপাতে সম্ভ্রম না পাইয়া তেমনই বিরক্ত হইত। ক্লাইভও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না। জলৌকা যেমন জীবদেহে আপনাকে সংযুক্ত করিতে পারিলেই রক্ত শোষণ করিয়া পুষ্ট হয়, এই সকল ইংরেজ তেমনই ভারতের রক্ত শোষণ করিয়া পুষ্ট হইত।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সে জন্য কাহারা দায়ী তাহা আর বলিয়া দিতে হয় না।

হান্টার স্বীকার করিয়াছেন, "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" প্রভাব অনুভূত না হওয়া পর্য্যন্ত বিলাতের লোক বাঙ্গালাকে বহুভাগ্যান্বেষী ইংরেজের প্রভূত অর্থার্জ্জনের ক্ষেত্র—মালের গুদাম বলিয়াই বিবেচনা করিত। অবশ্য তাহারা জানিত, সে দেশে বহুসংখ্যক লোক বাস করিত—কিন্তু তাহারা যে বিবেচনার বিষয় হইতে পারে, তাহা বিলাতের লোকের ধারণায় আসিত না। অর্থাৎ বাঙ্গালায় লোক ছিল, ইহাই তাহারা জানিত এবং সে সকল লোক তাহাদিগের স্বার্থ-সাধনের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত।

বিলাতের প্রসিদ্ধ মনীষী মিল বলিয়াছেন—এক জাতির দ্বারা অপর জাতির শাসনের অর্থ বা সার্থকতা কিছুই থাকিতে পারে না; কারণ, সে অবস্থায় শাসক জাতি শাসিত জাতিকে তাহার পশুক্ষেত্ররূপে—স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করে, আর কিছুই মনে করে না।

ক্লাইভ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যাইয়া—বাঙ্গালা-শোধিত অর্থে "নবাব" হইয়া বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মীরজাফরকে সরাইয়া মীরকাশিমকে নবাবী প্রদান ও তাঁহাকে পদচ্যুত করা এই সকলে আপনাদিগের স্বার্থ বিপন্ন হইতে পারে মনে করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে আবার বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। তিনি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, মীরজাফর মৃত ও তাঁহার এক পুত্র নাজিমুদ্দৌলা গদীতে উপবিষ্ট।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দ ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ—মধ্যবর্ত্তী ৫ বৎসরে বাঙ্গালার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছিল। মেকলে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাহাজেই বাঙ্গালা হইতে শঙ্কাজনক সংবাদ বিলাতে যাইতেছিল। বাঙ্গালা প্রদেশে শাসন ব্যাপারের বিশৃঙ্খলা চরমে উঠিয়াছিল। ক্লাইভের মতে মানুষ যে প্রলোভন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না, সেই প্রলোভনে প্রলুব্ধ, অবাধ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্ম্মচারীদিগের নিকট আর কি আশা করা যায়? তাহারা যে কোম্পানীর নিকট কৈফিয়তের দায়ী সেই কোম্পানীও অসাধু, উচ্ছৃঙ্খল ও অজ্ঞ; বিশেষ তাহা এত দূরে অবস্থিত যে, পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর পাইতে দেড় বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হয়। কাযেই ঐ ৫ বৎসরে বাঙ্গালায় ইংরেজ-শাসন যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা সমাজের অবস্থিতির সহিতও সামঞ্জস্যশূন্য। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নিষ্ঠুর না হইলেও আপনারা ধনী হইবার চেষ্টায় যাহা করিত, তাহা নিষ্ঠুরতাকে পরাভূত করিত। তাহারা তাহাদিগেরই সৃষ্ট নবাব মীরজাফরকে গদী হইতে ফেলিয়া দিয়া মীরকাশিমকে নবাব করিয়াছিল। মীরকাশিম স্বয়ং তাঁহার প্রজাদিগকে অত্যাচার করিতে প্রস্তুত হইলেও অপরের যে অত্যাচারে বাঙ্গালার লোক পিষ্ট ও চূর্ণ হইতেছিল এবং তাঁহার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছিল, সে অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেই জন্য ইংরেজরা মীরকাশিমকে গদীচ্যুত করিয়া আবার মীরজাফরকে নবাব করেন। প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই রাজকোষ শূন্য করিয়া বিদেশী প্রভুদিগকে অর্থ দিতে হইয়াছিল। যে ইংরেজরা নবাব করিতে ও নবাবকে বিতাড়িত করিতে পারিত, তাহাদিগকে বাঙ্গালার জনগণের উপর যথেচ্ছ উৎপীড়ন করিবার অধিকার দিতে হইত। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের জন্য প্রদেশে ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার লইয়াছিল। তাহারা দেশের লোককে অল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে ও অধিক মূল্যে কিনিতে বাধ্য করিত। তাহারা অনায়াসে দেশের বিচারক, পুলিস ও অর্থ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে অপমান করিত—তাহাদিগের অনুগৃহীত এক দল দেশীয় লোক সমগ্র প্রদেশে সর্ব্বনাশ ও আতঙ্ক বিস্তার করিতেছিল। বৃটিশ কুঠীর প্রত্যেক কর্ম্মচারী তাহার প্রভুর সকল ক্ষমতা এবং তাহার প্রভু কোম্পানীর সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিত। যখন বাঙ্গালায় ৩ কোটি লোকের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না, সেই সময় কলিকাতায় কেহ কেহ দ্রুত প্রভূত ধন সঞ্চিত করিতেছিল। দেশের লোক শাসকের অত্যাচারে অভ্যস্ত হইলেও কখন এমন অত্যাচারে পীড়িত হয় নাই। কোম্পানীর অত্যাচার সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারের তুলনায় দুঃসহ বলিয়া বোধ হইত। পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকদিগের সময়ে তাহাদিগের নিষ্কৃতিলাভের একটি উপায় ছিল—অত্যাচার অসহনীয় হইলে লোক শাসনের পরিবর্ত্তন-সাধন করিত। কিন্তু ইংরেজ-শাসন নষ্ট করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজ সরকার বর্ব্বরদিগের অত্যাচার-দ্যোতক সরকার অপেক্ষাও হীন হইলেও—সভ্যতার শক্তিতে শক্তিশালী ছিল। তাহা অত্যাচারী শাসকের শাসন অপেক্ষা দানবের শাসনের মত বোধ হইত। বাঙ্গালীরা কখন সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত; কখন বা পলাইয়া যাইত—ইংরেজের আগমন-সংবাদে গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাইত।

এই অবস্থায় যে লোক মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।

ক্লাইভ নবাবের সহিত ব্যবস্থা করিলেন—"সৈন্য"-সংক্রান্ত ও রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় ভার ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের হস্তে থাকিবে; কর-সংগ্রহ, বিচার, দণ্ড বিধান প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য যেমন নবাবের নামে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছিল, তেমনই চলিবে; এবং সাংসারিক ও বিচারালয়াদি সংক্রান্ত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবাব বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন।" তিনি বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর নামে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" গ্রহণ করেন (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট)।

দেওয়ানী লাভের পরে রাজস্ব সম্বন্ধীয় সব ব্যবস্থা করিবার অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়। কিন্তু নবাবের সহিত রাজকার্য্য

নির্ব্বাহের যে সকল চুক্তি হইয়াছিল, ক্লাইভ সে সকলের ব্যতিক্রম করিলেন না। মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালার এবং রাজা সিতাব রায় বিহারের নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহাদিগের হস্তে সমুদায় কর্ম্মভার অর্পিত হইল।

ক্লাইভ কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অনাচারে ও অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া সে সকলের যথাসম্ভব প্রতীকার করিলেন। তাহাতে তিনি ইংরেজ কর্মচারী ও ইংরেজ সৈনিক সকলেরই বিরাগ-ভাজন হইলেন।

ক্লাইভ ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ভেরেলষ্ট তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কায করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং অসাধু না হইলেও কর্ম্মচারীদিগের অসাধুতা দমন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। কর্ম্মচারীরাও সুযোগ লাভ করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে অনাচারের ও অত্যাচারের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এক দিকে দ্বৈত শাসন, আর এক দিকে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার বাঙ্গালীকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে লাগিল।

এই অবস্থায় যখন পর্জ্জন্য বিমুখ হইলেন, তখন দেবতার রোষ ও মানুষের অত্যাচার বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে আরম্ভ করিল। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"—দেখা দিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে এক দিকে যেমন দেশের শিল্প নষ্ট করিয়া সমগ্র বাঙ্গালাকে বিলাতের পণ্যোৎপাদনের জন্য উপকরণ উৎপন্ন করিবার ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই বাঙ্গালা হইতে অর্থ বিলাতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

কোম্পানী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মার্চ্চ এ দেশে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে বলা হইয়াছিল—বাঙ্গালায় রেশমী বস্ত্র বয়নের পথ বিঘ্নাস্তৃত করিয়া লোককে কেবল রেশম উৎপন্ন করিতে উৎসাহিত করা হউক, আর যাহারা রেশমী সূতা "কাটে", তাহাদিগকে কোম্পানীর কুঠীতে কায করিতে বাধ্য করিয়া—স্ব স্ব গৃহে কায করিতে নিষেধ করা হউক।

বিলাতের পার্লামেণ্টের 'নাইনথ রিপোর্টে' দেখা যায়—সিলেক্ট কমিটী স্বীকার করিয়াছিলেন—বাঙ্গালার শিল্প নষ্ট করাই অভিপ্রেত ছিল। কোম্পানীর নীতিতে শিল্পপ্রধান বাঙ্গালাকে বিলাতের জন্য পণ্যোপকরণ উৎপাদন-ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়। বাঙ্গালা কৃষিপ্রাণ হয়।

এ দেশ হইতে ধন বিলাতে লইয়া যাওয়া কি ভাবে হইয়াছিল, তাহার পরিচয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির সময় হইতে ৬ বৎসরের হিসাবে পাওয়া যায়:—

বৎসর (খৃঃ)	মোট আদায় (পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ টাকা)	খাঁটী মুনাফা (পাউণ্ড)
১৭৬৫—৬৬	২,২৫৮,২২৭	৪৭১,০৬৭
১৭৬৬—৬৭	৩,৮০৫,৮১৭	১,২৫৩,৫০১
১৭৬৭—৬৮	৩,৬০৮,০০৯	৮৭১,৬২২
১৭৬৮—৬৯	৩,৭৮৭,২০৭	৮২৯,০৬২
১৭৬৯—৭০	৩,৩৪১,৯৭৬	৩৩৬,৮১২
১৭৭০—৭১	৩,৩৩২,৩৪৩	২৭৫,০৮৮

সুতরাং দেখা যাইতেছে—দারুণ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও আদায় হ্রাস পায় নাই এবং ঐ ৬ বৎসরে—বাদশাহের প্রাপ্য, নবাবকে দেয় প্রভৃতি ও দুর্গাদির ব্যয় বাদ দিয়াও মুনাফা ৬ কোটি ৩৭ হাজার ১ শত ৫২ টাকা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল যে রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশই বিদেশে গিয়াছিল, তাহা নহে—যে সকল বেসামরিক ও সামরিক কর্ম্মচারীর বেতনে বহু অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহাদিগের সঞ্চয় বিলাতে প্রেরিত হইত, আর এ দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া শিল্প ও ব্যবসায়ে ইংরেজরা যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিত, তাহার এক কপর্দ্দকও এ দেশে থাকিত না। গভর্ণর ভেরেলষ্ট ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ এই তিন বৎসরে বাঙ্গালায় আমদানী-রপ্তানীর যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, ঐ কয় বৎসরে—

আমদানী দ্রব্যের মূল্য ৬২৪,৩৭৫ পাউণ্ড
রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ৬,৩১১,২৫০ পাউণ্ড

অর্থাৎ কোম্পানী যে টাকার মাল আমদানী করিতেন, তাহার দশ গুণ টাকার মাল রপ্তানী করিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া ভেরেলষ্ট কোম্পানীর কর্ত্তাদিগকে লিখিয়াছিলেন:—

"পূর্ব্বে যে টাকা রাজস্বরূপে দিল্লীতে প্রেরিত হইত, তাহা বাঙ্গালার বিপুল বাণিজ্যে আবার বাঙ্গালা লাভ করিত। এখন সে অবস্থার কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সকল য়ুরোপীয় কোম্পানীই এ দেশে ব্যবসা করিয়া প্রতি বৎসর অধিক ধন সঞ্চয় করিতেছে—অথচ তাহাতে দেশের সম্পদ্ এক কপর্দ্দকও বর্দ্ধিত হইতেছে না।"

এই সকল কোম্পানী কিরূপ হীনতা স্বীকার করিয়াও প্রাচীতে ব্যবসার অধিকার লাভ বা রক্ষা করিতে চাহিত, তাহা বিবেচনা করিলে তাহাদিগের লোভের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগের সহিত যে ইংরেজদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, তাহাদিগের হীনতা স্বীকারের দুইটি দৃষ্টান্তমাত্র দিয়া আমরা নিরস্ত হইব:—

(১) সুমাত্রার রাজা একটি শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কোন "সম্ভ্রান্ত" ইংরেজ স্বীয় কন্যাকে দিতে চাহিয়াছিলেন। যদি রাজার অন্য পত্নীরা ঈর্ষাবশে তাহাকে বিষদানে হত্যা করে, সে কথা উত্থাপিত হইলে পিতা সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেও সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

(২) ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে কয় জন ইংরেজ বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার ছাড় পাইবার চেষ্টায় উড়িষ্যায় উপনীত হইলে—উড়িষ্যার শাসক (বাঙ্গালার নবাবের প্রতিনিধি) তাঁহার চরণ অগ্রসর করিয়া দিলে তাহাদিগের নেতা কার্টরাইট সেই চরণ চুম্বনও করিয়াছিল।

য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীরা পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল এবং লবঙ্গের ক্ষেত্র এম্বয়নায় ওলন্দাজগণ ইংরেজদিগের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

সেইরূপ কষ্টে যে অধিকার লাভ করিতে হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে কোন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ি-সম্প্রদায়েরই দ্বিধা ছিল না।

১৭৬৮ ৬৯ খৃষ্টাব্দে শস্যের মূল্য কিছু অধিক ছিল বটে, কিন্তু অভাব হয় নাই। তাহার পরবৎসর ফসল ভাল হয় নাই। কিন্তু ইংরেজরা সে দিকে মনোযোগ দেয় নাই—সাবধান হওয়া ত পরের কথা। মহম্মদ রেজা খাঁর পরামর্শে ইংরেজ রাজস্ব শতকরা ১০ টাকা বর্দ্ধিত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। হাণ্টার বলিয়াছেন, বাহিরের

অবস্থা দেখিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝাও সহজসাধ্য নহে। কারণ, বাঙ্গালী ঘটনা-পরিবর্ত্তনে সহজে বিচলিত হয় না; সে ধনী হইলেও যেমন দরিদ্র হইলেও তেমনই নীরবে অবস্থা-পরিবর্ত্তন গ্রহণ করে। তাহার প্রকৃতির ভাবপ্রবণতা দমন করিয়া রাখা হয়। বিশেষ পারিবারিক ব্যাপার প্রকাশ করা তাহার পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ। এমন কি, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেও বহু পরিবারে মহিলারা অনাহারে তিলে তিলে মরিয়াছেন—সে কথা প্রকাশ পায় নাই—তাঁহাদিগকে সাহায্য-প্রদান করাও সম্ভব হয় নাই।

বিষ্ণুপুরের দেশীয় কর্ম্মচারী সংবাদ দেন—মাঠে ধান শুকাইয়া খড় হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় কর্ম্মচারীরা কলিকাতায় আতঙ্কজনক বিবরণ প্রদান করিলেও সরকার সে সব সংবাদ বিলাতে প্রেরণ করিলেন না। এমন কি, যে পত্রে বিলাতে প্রথম দুর্ভিক্ষের আগমন-সংবাদ প্রেরিত হয়, প্রেসিডেণ্ট ভেরেলষ্ট তাহাতে স্বাক্ষর দেন নাই। তিনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর—বিলাতে দুর্ভিক্ষের কোন সংবাদ প্রদান না করিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। কার্টিয়ার তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরবর্ত্তী জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে প্রথমে একটি জিলায় দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া ১০ দিন পরে লিখিলেন—লোকের কষ্ট তীব্র হইলেও রাজস্বের কোন ক্ষতি দেখা যায় নাই। ইংরেজ কেবল রাজস্বের কথাই ভাবিতেছিল—লোকের জীবনরক্ষায় অবহিত হয় নাই।

সেনাদলের জন্য শস্য-সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত। তাহাও হইল এবং সেনাদলকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল—কৃষকরা বলিতে লাগিল, তাহারাই লোকের জীবনধারণের উপায় নষ্ট করিতে লাগিল।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লিখিত হয়, দুর্গের কাযের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ ও রক্ষা করা দুষ্কর হইতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে চাউল দিবার ব্যবস্থা করা হউক। হিসাব করিয়া বলা হয়, ৮ হাজার শ্রমিককে ৮ মাস প্রতিদিন এক সের হিসাবে চাউল দিলে মোট ৪১ হাজার মণের অধিক চাউল প্রয়োজন হইবে না। সেই পরিমাণ চাউল সরবরাহের নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছিল—কতক চাউল মজুতও ছিল। বক্সীকে তদনুসারে আদেশ করাও হয়।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে লোক মরিতে লাগিল। কৃষকগণ গরু ও লাঙ্গল প্রভৃতি বিক্রয় করিল, বীজ-ধান খাইয়া ফেলিল, পুত্রকন্যা বিক্রয় করিল—শেষে ক্রেতা রহিল না। তাহারা গাছের পাতা ও মাঠের ঘাস খাইতে লাগিল। জুন মাসে দরবারে রেসিডেণ্ট লিখিলেন—জীবিতগণ মৃতদিগকে আহার করিতেছে। গ্রীষ্মের আরম্ভেই মুর্শিদাবাদে বসন্ত দেখা দিয়াছিল। রাজপথে মৃতস্তূপ—কুক্কুর ও শৃগাল শব খাইয়া শেষ করিতে পারিতেছিল না—গলিত শবে লোকের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল।

মেকলে লিখিয়াছেন—দুর্ভিক্ষ সমগ্র প্রদেশে দুর্দ্দশা ও মৃত্যু ব্যাপ্ত করিল। শ্রমে অনভ্যস্তা যে সকল নারী কখন জনগণের সম্মুখে অনবগুণ্ঠিতা হয়েন নাই—তাঁহারা অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া পথিকদিগের সম্মুখে পতিত হইয়া শিশু-সন্তানের জন্য এক মুষ্টি অন্ন ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নদীতে—ইংরেজদিগের গৃহের সম্মুখ দিয়া সহস্র সহস্র শব ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কলিকাতার রাজপথ মৃতে ও মুমূর্ষুতে পূর্ণ হইয়া গেল। দুর্ব্বল জীবিতগণের দেহে মৃতদিগকে সংকারার্থ লইয়া যাইবার শক্তি না থাকায় শব পচিতে লাগিল—দিবাভাগেও শৃগাল ও শকুন শবের নিকট হইতে কেহ তাড়াইত না।

জনরব ব্যাপ্ত হয়—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা সব চাউল "ধরিয়া" দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিল—তাহারা শস্য কিনিয়া ৮, ১০, ১২ গুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল এবং এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারীর এক বৎসর পূর্ব্বে দেড় হাজার টাকা না থাকিলেও সে ঐ দুর্ভিক্ষকালে ১ লক্ষ টাকা বিলাতে পাঠাইয়াছিল। মেকলে এই সকল অভিযোগ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন—কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা হয়ত চাউলের ব্যবসা করিয়াছে এবং যদি তাহা করিয়া থাকে, তবে প্রভূত লাভও করিয়া থাকিতে পারে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তারা কিন্তু কর্ম্মচারীদিগকে দোষী বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ৩ কোটি নিরন্নকে অন্ন দানের জন্য মাত্র ৮০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। দেশের ধনীরা তদপেক্ষাও কিছু অধিক টাকা ব্যয় করেন। এই টাকা লোকের সংখ্যার তুলনায় যৎসামান্য। আর তাহা লোককে খয়রাতী দানে ও শস্য আমদানীর জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। হাণ্টার বলিয়াছেন, যখন নিরন্নদিগের জন্য শস্য আমদানীর কথার আলোচনা করা যায়, তখন যে ঘৃণ্য অনাচারের ও নির্ম্মমতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, যে সামান্য সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহাও বিপন্ন ব্যক্তিরা পাইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সমগ্র সরকারের অর্থাৎ সরকারের প্রত্যেক লোকের সম্বন্ধে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য খাদ্য-শস্যের ব্যবসা করার অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল। বিলাত হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ পত্রের পর পত্রে অপরাধীদিগের নাম জানিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সে বিষয়ে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। অপরাধি-নির্দ্ধারণের জন্য সন্তোষজনক অনুসন্ধান হয় নাই এবং যে সকল দেশীয় লোকের দ্বারা ইংরেজরা কায চালাইত, তাহাদিগের সম্বন্ধে অদ্যাপি এই সকল অভিযোগের কারণ রহিয়াছে:—

(১) তাহারা তাহাদিগের ইচ্ছামত অল্প মূল্য দিয়া কৃষকের সামান্য শস্য-সঞ্চয় লইয়া যাইত।

(২) যে সকল নৌকায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাউল আমদানী করা হইত, তাহারা সে সকল আটকাইয়া চাউল লইয়া যাইত।

(৩) তাহারা কৃষকদিগকে পরবর্ত্তী ফসলের জন্য রক্ষিত বীজধানও বিক্রয় করিতে বাধ্য করিত।

বলা বাহুল্য, কৃষকের অন্নাভাবে বীজধান খাইয়া ফেলা অপেক্ষাও তৃতীয় দফার কথা ভয়ানক।

কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পদস্থ কর্ম্মচারীরাই অপরাধী, তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল।

কোর্টের এইরূপ কথায় রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন, কোর্ট কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারের যত নিন্দাই কেন করুন না, আপনারা যে কায করিয়াছিলেন, তাহা অল্প নিন্দনীয় নহে—তাঁহারা আপনাদিগের স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন—তখন বদান্যতার প্রভাব তাঁহাদিগের কার্য্য স্পর্শও করিতে পারে নাই। ভূমি-রাজস্ব ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব হইলেও কোর্ট তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। যে বৎসর দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার লোকের শতকরা ৩৫ জন ও কৃষকদিগের শতকরা ৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছিল, সে বৎসর ভূমি-রাজস্ব শতকরা ৫ টাকাও কমান হয় নাই—পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য শতকরা ১০ টাকা বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কোম্পানী যেন যে কোন প্রকারে আপনাদিগের অর্থ-লাভ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ ও ১১শে এপ্রিল দরবারে রেসিডেণ্ট রিচার্ড বেচার সিলেক্ট কমিটীকে লিখিয়াছিলেন—

"আমার প্রভুরা যাহাতে (দারুণ দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থায়) রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস হওয়ার অসুবিধা ভোগ না করেন, আমি সর্ব্বদাই সে চেষ্টা করিতেছি।"

ঐ বৎসর মে মাসে কলিকাতা কাউন্সিল বিলাতে লিখেন :—

"যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহার তীব্রতা, মৃত্যু-সংখ্যা, ভিক্ষুকের আধিক্য—এ সব বর্ণনাতীত। পূর্ণিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; তথায় অধিবাসীদিগের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; অন্যান্য স্থানেও অবস্থা ঐরূপ।"

তাহার পর ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা লিখেন :—

"লোকের দুর্দ্দশা অতিরঞ্জিত করা সম্ভব নহে। এই অবস্থার প্রভাব রাজস্ব সংগ্রহে পতিত হওয়ায় বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু সুখের বিষয়, আমরা রাজস্ব যেরূপ হ্রাস পাইবে মনে করিয়াছিলাম, তাহা হয় নাই।"

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁহারা লিখেন :—

"দুর্ভিক্ষের তীব্রতা ও তাহার জন্য লোকক্ষয় সত্ত্বেও বর্ত্তমান বৎসরের জন্য রাজস্ব বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।"

পরবৎসর ১০ই জানুয়ারী তারিখে লিখিত হয় !—

"রাজস্বের প্রত্যেক বিভাগে আদায় আশানুরূপ ভাবে হইয়াছে।"

রাজস্ব আদায় আশানুরূপ হয় নাই—আশাতিরিক্ত হইয়াছিল। কারণ, মুর্শিদাবাদ হইতে বোর্ড অব রেভিনিউ যে হিসাব দাখিল করেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহা ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের আদায় অপেক্ষা অধিক—দুর্ভিক্ষের বৎসরও আদায় কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রাজস্ব আদায়ে উৎপীড়নই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা বলা বাহুল্য।

কয় বৎসরের রাজস্ব আদায়ের হিসাব এইরূপ :—

মোট আদায়—	টাকা—
১১৭৫ বঙ্গাব্দ (১৭৬৮-৬৯ খৃ:)	১,৫২,৫৪,৮৫৬···৯···৪···৩
১১৭৬ বঙ্গাব্দ (১৭৬৯ খৃ:—এই বৎসরের শস্যহানিতে পর-বৎসর দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়)···	১,৩১,৪৯,১৪৮···৬···৩···২
১১৭৭ বঙ্গাব্দ (১৭৭০ খৃ:—ইহাই দুর্ভিক্ষের ও মড়কের বৎসর)	১,৪০,০৬,০৩০···৭···৩···২
১১৭৮ বঙ্গাব্দ (১৭৭১ খৃ:)	১,৫২,২৬,৫৭৬,···১····২···১

১১৭৮ বঙ্গাব্দের এই রাজস্ব হইতে নানা কারণে সরকারের ক্ষতি (মোট ৩,৯২,৯১৫···১১···১২···৩) বাদ দিলেও পাওয়া যায়·········১৫৩,৩৩,৬৬····১৪···৯···২ টাকা

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর বাঙ্গালার রাজস্ব বিভাগের পত্রে দেখা যায়—অত্যুগ্র চেষ্টায় রাজস্ব ঐরূপে আদায় করা হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে (১৫ই মে) মহম্মদ রেজা খান তাঁহার প্রভুদিগকে লিখিয়াছিলেন—রাজস্বের সকল বিভাগে আদায় জন্য তিনি মানুষের যতটা সাধ্য তত চেষ্টা করিয়াছেন—কোন ক্রটি করেন নাই। অথচ তিনি ঐ পত্রেই লিখিয়াছিলেন—"পুষ্করিণী ও উৎস শুকাইয়া গিয়াছে—জল সংগ্রহ করা দিন দিন অধিক কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র অগ্নিদাহে বহু পরিবার নিঃস্ব হইতেছে ও বহু লোক মরিতেছে!"

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ওয়ারেণ হেষ্টিংস ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা কোর্ট অব ডিরেক্টারসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের এরূপ দুরবস্থায়ও রাজস্ব হ্রাস না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন :—

"যে সকল কারণে ইহা হইয়াছিল, সে সকল কারণের নির্দ্দেশ সহজসাধ্য নহে—যে সকল জটিল উপায়ে রাজস্ব সংগৃহীত হয় এমন কি, রাজস্বের উপকরণ সকল কিরূপ, তাহা নির্দ্দেশ করা দুষ্কর। তবে আমরা একটি কারণের উল্লেখ এই স্থানে করিব। ইহাকে 'নাজাই' বলে। ইহাতে মৃত বা পলায়িত প্রজাদিগের দেয় খাজনা গ্রামের অন্যান্য প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়।"

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বলেন, এই ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত নহে; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময়েও ইহা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং তাহাতে রাজস্বের পরিমাণ-বৃদ্ধিতে সহায়তা হইয়াছিল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতির এই পত্রে রাজস্ব আদায় ব্যাপারে বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। কোম্পানী দেওয়ানী পাইবার পূর্ব্বেও বিশৃঙ্খলা ছিল। নাজিমরা জমিদারদিগের নিকট হইতে যত টাকা পারিতেন, তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া, আদায় করিতেন; জমিদাররা আবার প্রজার নিকট হইতে অর্থ লুণ্ঠন করিয়া ধনশালী হইতেন এবং আবার নাজিমদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইতেন। নাজিম ও জমিদার উভয়ের মধ্যে যেমন জমিদার ও প্রজার মধ্যে তেমনই মুৎসুদ্দীরা ছিলেন। তাঁহারাও ঐ সব আয়ের অংশ পাইতেন। এ সবই বে-আইনী বলিয়া গোপন রাখা হইত। যে যাহা পারিত লুণ্ঠন করিয়া লইত। হেষ্টিংস প্রভৃতি বলেন, ইহাতে মন্দের ভাল এই হইত যে, অনেক টাকা দেশে থাকিত। পূর্ব্ববর্ত্তী এই সকল বিশৃঙ্খলা সরকারের বিশৃঙ্খলায় আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বাগ্মিবর বার্ক বলিয়াছিলেন—

"তাতারদিগের আক্রমণ অনিষ্টকর ছিল; ইংরেজের রক্ষাদান ভারতবর্ষ বিনষ্ট করিতেছে।"

ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, প্রথম আঘাত জমিদারদিগের উপর পতিত হইয়াছিল। ইংরেজদিগের রাজস্ব আদায়ে দেশের জমিদার ও প্রজা উভয় সম্প্রদায়ের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা কয়টি কথা বলিব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আপনাদিগের স্বার্থ "ষোল আনা" অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যখন কর্ম্মচারীদিগের অনাচারে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, তখন রাজা সিতাব রায় ও মহম্মদ রেজা খাঁনকেই বিরাগভাজন করিয়া সকলের অপরাধ চাপা দিবার চেষ্টা হইল। রাজা সিতাব রায়কে ও মহম্মদ রেজা খাঁনকে পদচ্যুত করিয়া কোম্পানীর অর্থাপহরণের ও নানা অনাচারের অভিযোগের কৈফিয়ৎ দিবার জন্য কলিকাতায় আনিবার আদেশ পাইয়া হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে জানাইলেন, তিনি অনিচ্ছায় প্রভুদিগের আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়কেই আত্মপক্ষ সমর্থনের সব সুবিধা দিবেন। তাঁহারা নামমাত্র নজরবন্দী থাকিলেন! উভয়েই পরে নিরপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

কোম্পানীর কার্য্যও যে দুর্ভিক্ষের কারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় কি?

হাণ্টার ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে পরবর্ত্তী দুর্ভিক্ষের তুলনায় অধিক লোকক্ষয়ের ৩টি কারণ প্রধান বলিয়াছেন :—

(১) ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের আরম্ভেই সরকার অসঙ্গত ভাবে ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিয়া সব শস্য বাজারে আনাইয়াছিলেন। পরবৎসরের জন্য চাউল মজুৎ রাখা অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; যে কেহ চাউল মজুৎ করিলে জনগণের শত্রু বলিয়া অভিহিত হইতেন—জনতা তাঁহার মাল লুণ্ঠন করিত, তাঁহার গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা ছিল। শস্যের ব্যবসা বিপজ্জনক হয়; যে সময় ব্যবসা-বুদ্ধিতেই দেশ রক্ষা পাইতে পারিত, সেই সময় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ব্যবসা করিতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল বা ব্যবসা ত্যাগ করিতে

বাধ্য করা হইয়াছিল। কাহাকেও সঞ্চয় করিতে না দেওয়ায় অচিরে দর-বৃদ্ধিতে যে সুফল ফলিতে পারিত তাহা ফলিতে পায় নাই। ঐরূপ দর-বৃদ্ধিতে লোক সময় থাকিতে সতর্ক হয়, ব্যবহার হ্রাস করিয়া সঞ্চয় রক্ষা করিবার চেষ্টা করে এবং অভাব দীর্ঘকাল বিস্তৃত করায় অভাবের শেষ সময়ে তাহার তীব্রতা হ্রাস হয়।

(২) পথের অসুবিধায় খাদ্য-শস্য বণ্টনের সুব্যবস্থা হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত অসুবিধায় অন্য স্থান হইতে আবশ্যক পরিমাণ শস্য আমদানী করা অসম্ভব হয়।

(৩) স্থলপথে ও জলপথে মাল আমদানী করা সম্ভব হইলেও বাঙ্গালায় তাহা কিনিবার টাকা ছিল না। বাঙ্গালা হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য যেন ঝাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

প্রথম কারণের সমর্থন করা যায়। সরকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে—আপনারা বা ঠিকাদার প্রভৃতির দ্বারা ব্যবসার স্বচ্ছন্দ গতিতে বাধা না দিলে ব্যবসায়ীরা বাজারের অবস্থা বুঝিয়া যেমন অধিক মাল কিনিতে থাকে, তেমনই দর অধিক হওয়ায় লোক ব্যবহার হ্রাস করিয়া সঞ্চয়ে পরবর্ত্তী ফসল পর্য্যন্ত চালাইবার ব্যবস্থা করে। সরকার ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়।

দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় রাজপথের অবস্থা যেমনই কেন থাকুক না, জলপথের অভাব ছিল না। কিন্তু হাণ্টারই স্বীকার করিয়াছেন, রাজকর্ম্মচারীরা ও তাহাদিগের লোকরা স্থানান্তর হইতে আমদানী চাউলের নৌকা ধরিয়া মাল তুলিয়া লইয়াছিল—যে কোন মূল্য দিয়া কৃষকের নিকট হইতে চাউল লইয়াছিল—ইত্যাদি। সেরূপ অবস্থায় কে ব্যবসা করিতে আগ্রহশীল হয়?

তৃতীয় কারণ—পূর্ব্ববর্ত্তী ১০।১২ বৎসরের লুণ্ঠনের ফল। লোকের ঘরে অর্থ ছিল না—ধান্য বা চাউল বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কাযেই অবস্থা শোচনীয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

"ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" বাঙ্গালার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপ্লব হইয়াছিল।

আমরা বলিয়াছি, প্রথমে জমিদারদিগকে উৎপীড়িত করিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তখনও জমিদারদিগের ঘরে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত কিছু অর্থ ছিল এবং তাঁহারাও সম্পত্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টায় সেই অর্থ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দিনাজপুরের রাজা তাঁহার জমিদারীর নিম্নলিখিতরূপ হস্তবুদ দাখিল করিয়া এবং ১২ লক্ষ টাকা দিয়াও অবশিষ্ট টাকা দিবার জন্য সময় চাহিয়া তাহা পায়েন নাই—

১১৭৬ বঙ্গাব্দে রামচন্দ্র সেনের হিসাবে হস্তবুদ···

১৮,৬৫,৬৬১ টাকা ১২ আনা ২ পাই ৩ গণ্ডা।

আমীন রেয়াল রমাস লাহিড়ী তাহা বাড়াইয়া—

২০,৮৩,১৪১ টাকা ১৪ আনা ১১ গণ্ডা ১ কড়া করেন।

ঐ হস্তবুদ হইতে সরঞ্জামী খরচ প্রভৃতি বাদ দিলে

১৮,৪৬,৯১৪ টাকা ২ আনা ৩ গণ্ডা ১ কড়া থাকে।

রাজা প্রজাদিগের মৃত্যুতে ও পলায়নে যে টাকা কম হয় তাহা বাদ পাইয়া ১৩,৭০,৯০২ টাকা ৩ আনা ৬ গণ্ডা ৩ কড়া ধার্য্য করিতে বলিলে সরকার সে হিসাবে বিশ্বাস করিতে অসম্মত হইয়া তাঁহাকে আনিয়া সর্ত্তানুযায়ী টাকা দিতে বাধ্য করিবার ভয় দেখান।

বর্দ্ধমানের জমিদার মহারাজ দুর্ভিক্ষের শেষ ভাগে যখন পরলোকগত হয়েন, তখন তাঁহার অর্থের এমনই অভাব যে, তাঁহার উত্তরাধিকারী, মূল্যবান্ তৈজসপত্র গলাইয়াও পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবার জন্য সরকারের নিকট ঋণ চাহিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৬ বৎসর পরেও তিনি রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতাহেতু আপনার গৃহে নজরবন্দী অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

নদীয়ার (কৃষ্ণনগরের) রাজা আর্থিক দুরবস্থাহেতু জমিদারীর ভার পুত্রকে দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাণী ভবানী (রাজসাহী) অসাধারণ দক্ষতাসহকারে জমিদারী রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্প দিন পরে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হওয়ায় তাঁহাকে জমিদারীভ্রষ্ট করার ও তাঁহার জমিদারী বিক্রয় করার ভয় দেখান হইয়াছিল।

বীরভূমের মুসলমান রাজা সাবালক হইয়াই রাজস্ব প্রদানে অক্ষমতাহেতু বন্দী হয়েন।

বিষ্ণুপুরের বৃদ্ধ রাজা অধমর্ণের কারাগার হইতে মুক্তি পাইবার পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

বাঙ্গালার যে সকল পুরাতন জমিদার-বংশ মোগল সম্রাট-দিগের শাসনকালে আংশিকরূপে স্বাধীন শাসকের অধিকার সম্ভোগ করিতেন এবং যাঁহাদিগকে বৃটিশ শাসকগণও পরে ভূমির অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দুর্দশার অবধি ছিল না। তাঁহাদিগের দুই-তৃতীয়াংশের সর্ব্বনাশ হয়, কেহ বা নাম-শেষ হয়েন, কেহ বা ভূমি সম্পত্তির অধিকাংশ হারাইয়া বা ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকেন। আর বহু ক্ষুদ্র জমিদারের জমিদারী বিক্রীত হয়; অনেককে কারারুদ্ধ হইতে হয়। বাঙ্গালায় নূতন জমিদার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় ও সমাজে প্রাচীনবংশজ জমিদাররা তাঁহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজপতি, প্রজাপালক ও প্রকাশাসক জমিদার-দিগের স্থান অধিকার করেন। বাঙ্গালার সমাজ-ব্যবস্থায় অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থান আভিজাত্য-হীন ধনীরা গ্রহণ করেন। এই পরিবর্ত্তন পরবর্ত্তী সমাজ-ব্যবস্থায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর বাঙ্গালার জনগণ? যে কৃষকের কথায় লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, তাহারাই রাজস্বের অধিকাংশ প্রদান করে, তাহাদিগের শ্রমেই শস্য উৎপন্ন হয়, তাহারাই দেশের মেরুদণ্ড, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। কবির কথা—অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি মুখের কথায় হইতে পারে, কিন্তু যে কৃষক-সম্প্রদায় দেশের গৌরব সেই সম্প্রদায় এক বার নষ্ট হইলে আর তাহা-দিগের স্থান পূর্ণ করা যায় না। অবশ্য এ দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভেদ আছে এবং সেই প্রভেদ সামাজিক ব্যবস্থার ও পবিত্রতার ফল। বিলাতে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের ব্যভিচারের ফল—পুত্রগণ অভিজাত সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিল। তিনি বারবারা পামারকে ডাচেস অব ক্লিভল্যাণ্ড করেন এবং গ্রাফটনের ডিউক-পরিবার সেই অনাচার হইতে উদ্ভূত। বারাঙ্গনা ও অভিনেত্রী নেল গুইনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইতে সেণ্ট আলবান্সের ডিউকদিগের উৎপত্তি। ফ্রান্স হইতে তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য প্রেরিত লুই ডি কুইরোইল্লী ডাচেস অব পোর্টস-মাউথ ও রিচমণ্ড পরিবারের আদি জননী। লুসী ওয়াল্টারসের গর্ভজাত পুত্রকে তিনি ডিউক অফ মনমাউথ করেন। বাঙ্গালায় কখন এইরূপ ব্যাপার সম্ভব হইত না। কিন্তু সকল দেশে ও সর্ব্ব-কালেই কৃষকগণ দেশের গৌরব ও শক্তি। এই দুর্ভিক্ষে সেই সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ হয়। মেকলে লিখিয়াছেন—মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় নাই; কিন্তু লোক বলিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বলেন—তিনি চারি দিকে এই দুর্ভিক্ষের ক্ষতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন: বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ জমি বন্য পশুর বাসস্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। এই অবস্থায়ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব বর্দ্ধিত করিতে

দ্বিধানুভব করেন নাই। কাযেই দেখা যায়, বীরভূম জিলায় ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে আবাদযোগ্য জমির এক-তৃতীয়াংশের প্রজা ফেরার বলিয়া লিখিত হইলেও এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে অর্দ্ধেক জমিই পতিত এবং বহু জমিতে চাষের লোক না থাকিলেও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হস্তবুদ যে স্থানে ১ লক্ষ পাউণ্ড (পাউণ্ড ১৫ টাকা) ছিল ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানে প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড হয়। প্রজাদিগকে মুসলমান সৈনিকদিগের দ্বারা উৎপীড়িত করিয়া খাজনা আদায়ের চেষ্টা হয়। কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। আমরা নিম্নে বীরভূমের কয় বৎসরের হস্তবুদ ও আদায়ের হিসাব দিতেছি:—

বৎসর (খৃষ্টাব্দ)	হস্তবুদ (পাউণ্ড)	আদায় (পাউণ্ড)
১৭৭২	৯১,৪১৩	৫৫,২০৭
১৭৭৩	১০৩,০৮৯	৬২,৩৬৫
১৭৭৪	১০১,৭১৯	৫২,৫৩৩
১৭৭৫	১০০,৯৮৩	৫৩,১১৭
১৭৭৬	১১৪,৪৮২	৬৩,৩৫০

গ্রামের চারিদিকে জঙ্গল—ব্যাঘ্রাদির আশ্রয়স্থান হয়। পূর্ব্বে যে পথে সেনাদল গতায়াত করিত ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তথায় এক দল সিপাহী দুর্গম জঙ্গল ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিল। ঐ বৎসর 'হিকিস গেজেট' পত্রে এক জন লিখিয়াছিলেন, প্রতি রাত্রিতে তাঁহাদিগের শিবিরের কাছে ব্যাঘ্র ও ভল্লুক আসিত। দেওঘরে যাইতেও পথে বন্যহস্তীর কৃত ধ্বংসচিহ্ন দেখা যাইত। "পতিত" জমি চাষের জন্য অন্যান্য স্থান হইতে কৃষক আনিয়া "পত্তন" করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল।

লোকক্ষয় দীর্ঘ ১৫ বৎসর কাল চলিয়াছিল। তাহার কারণ, দুর্ভিক্ষের সময় প্রথমেই শিশুরা অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কাযেই যত দিন আবার শিশুরা জাত ও বর্দ্ধিত না হয়, তত দিন বৃদ্ধদিগের মৃত্যুতে যে লোকক্ষয় হয়, তাহা পূর্ণ করিবার কোন উপায় হয় না।

লোকক্ষয়হেতু জমিদাররা খাজনা হ্রাস করিয়া "পতিত" জমি "উঠিত" করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন—কৃষককে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় পরস্পর দাঙ্গাহাঙ্গামা করিতে লাগিলেন এবং নূতন প্রজারা অল্প খাজনায় "পত্তন" হওয়ায় পুরাতন প্রজারা তাহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাভূত হইয়া জমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

বাঙ্গালার কৃষকের পক্ষে পরিচিত সমাজ ও পূর্ব্বপুরুষের গৃহ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাওয়া কিরূপ কষ্টকর ও দুঃসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু অনন্যোপায় হইয়া বাঙ্গালার কৃষকগণ দলে দলে তাহাই করিতে লাগিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টমাশ লিখেন,—"প্রত্যেক জমিদার জমির উন্নতিসাধন জন্য পাহাড় হইতে লোক আনিবার চেষ্টা করিতেছেন।" বাঙ্গালায় কত কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি এই সূত্রে আসিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তথাপি সহজে পতিত এক-তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধেক ভাগ জমিতে আবাদ হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল।

অভিজাত সম্প্রদায় ও কৃষকদিগের পর আমরা বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের কথা বলিব। এই সম্প্রদায় স্বচ্ছল অবস্থায়—জমির আয়, ব্যবসার মুনাফা ও চাকরীর বেতন লাভ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্যার চর্চ্চা হইত। এই সম্প্রদায়ই গ্রামে বাস করিয়া গ্রামে যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সহায় হইতেন, তেমনই গ্রামের শ্রী সম্পাদিত করিতেন। দেশে যে অবস্থা ঘটিল তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে জমি চাষ করিবার লোক লাভ করা দুঃসাধ্য হইল, ব্যবসার প্রবাহ শুষ্ক হইয়া আসিল, চাকরী দুর্ল্লভ হইল। বীরভূমের বিবরণে আমরা দেখিতে পাই—দুর্ভিক্ষের ২০ বৎসর পরে কারাগার খাজনা প্রদানে অক্ষম বন্দীতে পূর্ণ—তাঁহাদিগের কাহারও দেয় খাজনা দিয়া মুক্তিলাভের কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। বাঙ্গালার আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, তাহাতে যে বাঙ্গালা "সোণার বাঙ্গালা" বলিয়া অভিহিত হইত, সে বাঙ্গালা ইতিহাসের পৃষ্ঠাগত হইল; যে বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্যে ও প্রাচুর্য্যে বিস্মিত হইয়া বার্ণিয়ার বলিয়াছিলেন, প্রবাদ ছিল, বাঙ্গালায় প্রবেশের শত দ্বার ছিল—বাঙ্গালা হইতে বাহির হইবার একটি দ্বারও ছিল না অর্থাৎ যে এক বার বাঙ্গালায় আসিত সে আর যাইতে চাহিত না; যে বাঙ্গালা দেশ-বিদেশে অন্ন বিতরণ করিত বলিয়া যে কেহ বাঙ্গালায় আসিলে অন্নাভাবমুক্ত হইত এবং কেবল দুর্ভাগ্য ব্যক্তিরাই বাঙ্গালায় আসিলেও দুর্দ্দশাভোগ করে, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবাদ ছিল—

"আমি যা'ব বঙ্গে,
আমার কপাল যা'বে সঙ্গে"

সে বাঙ্গালা আর রহিল না। বাঙ্গালার যে জমিদারগণ—আইন-আকবরীতে লিখিত বিবরণে সম্রাটের সাহায্যার্থ ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৭০ হস্তী, ৪,২৬০ কামান ও ৪,৪০০ নৌকা যোগাইতেন—যাঁহাদিগের হস্তিশালায় হস্তী, অশ্বশালায় অশ্ব ছিল, যাঁহারা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন, সদাব্রত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—যাঁহাদিগের দ্বার হইতে প্রার্থী কখন বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিত না, সেই জমিদার সম্প্রদায় উচ্ছিন্ন হইলেন। বাঙ্গালার যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের গর্ব্ব ছিলেন, সেই সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ সাধিত হইল। বাঙ্গালার যে কৃষক সম্প্রদায় দেশের সমৃদ্ধির কারণ ছিল—নানারূপ দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির উপায় করিত, সেই কৃষক সম্প্রদায়ের যাহারা মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইল, তাহারা শ্রমিকে পরিণত হইল—দারিদ্র্য তাহাদিগের নিত্য-সহচর হইল, মহাজনের ঋণ তাহারা আর শোধ করিতে পারিল না। বাঙ্গালার যে বাণিজ্যে "শতমুখে" অর্থাগম হইত সেই বাণিজ্য বিদেশীর হস্তগত হইল—দেশের লোকের ভাগ্যে "খোশা ভূষী" মাত্র রহিল। সংস্কারের অভাবে বাঙ্গালার যে সকল জলপথের প্রশংসা বার্ণিয়ার করিয়াছিলেন, সে সকল শুষ্ক হইতে লাগিল—রোগকেন্দ্র হইতে লাগিল। "শস্যশ্যামলা" বাঙ্গালার কৃষির যে দুর্গতি হইতে লাগিল, তাহাতে শতবর্ষ পরে যখন ইংরেজ শাসক সার চার্লস ইলিয়ট ও ইংরেজ ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম হাণ্টার তখন মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন, এ দেশের অধিকাংশ কৃষক পূর্ণাহার পায় না, তখন তাঁহারা বাঙ্গালার কৃষককে সেই মতের ব্যতিক্রম বলিতে পারিলেন না। রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে সুযোগ লইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পঙ্গপাল যেমন শস্যক্ষেত্র নিঃশেষ করিয়া খাইয়া ফেলে তেমনই বাঙ্গালার ঐশ্বর্য্য ও শ্রী শোষণ করিবার পর "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে" এক বৎসর সুবর্ষণের অভাবের পর এক বৎসর বর্ষণাভাব বাঙ্গালার যে দুর্দ্দশার কারণ হইল তাহাতে জনবহুল বাঙ্গালায় কৃষিকার্য্যের লোকাভাব হইল, বহু ভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হইল, বহু জলাশয় শুকাইয়া গেল, বহু খাল মজিয়া গেল। সেই বাঙ্গালায়—সেই নূতন ও শ্রীহীন বাঙ্গালায় নূতন শাসন আরম্ভ হইল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মিনিয়া কোঙ্কা

জাপানীরা বর্মারোড অধিকার করিলে চীনের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক রাখা মিত্র-শক্তির পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। এখন কিন্তু চীনের বুকে নূতন করিয়া আবার প্রাণের স্পন্দন জাগিয়াছে। এ প্রাণ-বায়ু বহিয়া আনিয়াছে আমেরিকা। অর্থাৎ ভারত হইতে মার্কিণ প্লেনে

মিনিয়া কোঙ্কা

যাত্রীদের পথ-রেখা

চীনে পৌঁছিবার নূতন পথ বাহির হইয়াছে তিব্বতের পূর্বপ্রান্ত ভাগে।

এ অঞ্চলে গিরিপর্ব্বত দুর্লঙ্ঘ্য এবং প্লেনের পক্ষে সে পথে চলা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। পাহাড়ের গায়ে পাহাড়, তার গায়ে আবার পাহাড়—এ সব পাহাড়ে মেঘ আর তুষার-পাতের নিমেষ-বিরাম নাই। এই দুরন্ত মেঘ ঠেলিয়া মার্কিণ পাইলটের দল আসিয়া মিনিয়া কোঙ্কা গিরির কোলে সমতল উপত্যকা-ভূমির উপর প্লেন নামাইতেছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া বৃষ্টি-পুষ্পবন্ত জল-প্রণালীর খাদের গা বহিয়া পথ গিয়া মিশিয়াছে সেই চুং-কিঙের গায়ে। সারা বৎসর এ পথ কুয়াশায় ঢাকা থাকে; সে কুয়াশা ভেদ করিয়া সূর্য্য এখানে কচিৎ কখনো দর্শন দেন!

মিনিয়া কোঙ্কা গিরির শিখর-দেশ ২৪১০০ ফুট উঁচু। তিব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে এ শিখর আবার সব চেয়ে উঁচু।

বর্ত্তমান যুদ্ধের কয় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে মার্কিণ পর্য্যটকের দল আসিয়া এ পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন। এ দলের অধিনায়ক ছিলেন রিচার্ড বার্ডশল এবং টেরিস মুর।

মিনিয়া কোঙ্কা গিরি এবং গিরির কোলে অবস্থিত মালভূমি সম্বন্ধে তাঁরা লিখিয়াছেন, আমরা কল্পনা করিতে পারি নাই যে, এ অঞ্চলে প্লেন বা মোটর-গাড়ী কোনো দিন আসিতে পারিবে! ক'বৎসরে কালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য—কিন্তু ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র ঘটে নাই।

মিনিয়া কোঙ্কার পশ্চিম গায়ে তিনটি বড় বড় খরস্রোতা নদী আছে। নদীগুলির প্রত্যেকটি পঞ্চাশ মাইলের ব্যবধান রাখিয়া পাহাড়ের কোল বহিয়া নামিয়া তিনটি প্রদেশে বড় বড় তিনটি নদী-রূপে প্রাণের উৎস জোগাইতেছে। সে তিনটি নদী—চীনে ইয়াংসী; ইন্দো-চীনে মেকং এবং বর্মায় শালুইন।

এ তিনটি নদীর দু'শো মাইল দূরে এবং এই তিন নদীর সমরেখায় তিব্বত হইতে নামিয়াছে ব্রহ্মপুত্র—নামিয়া ভারতের বুকে গিয়াছে।

দক্ষিণ-তিব্বতের যে অঞ্চলে এই ত্রিবেণী-সঙ্গম, সে অঞ্চলটুকু চীনের অধিকারভুক্ত; এবং এ অঞ্চল শিকাং নামে পরিচিত। অধিবাসীর সংখ্যা এখানে খুব অল্প; এবং অধিবাসীরা সকলেই তিব্বতী। যুদ্ধের পূর্ব্বে শিকাঙে আসিবার পথ ছিল তিনটি—বর্মায় ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত ভামো হইতে জল-পথে; দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে কুনমিং হইতে রেল-পথে; এবং সাংহাই হইতে ইয়াংসী নদীর উপর দিয়া নৌকাযোগে। প্রথম দু'টি পথ ছিল সুদীর্ঘ এবং দুর্গম; তৃতীয় পথটি সুদীর্ঘ ছিল না বলিয়া এই পথেই তাঁরা এখানে আসিয়াছিলেন। দলে ছিলেন চার জন—বার্ডশল এঞ্জিনীয়ার; ইয়ং চীনাম্যান—মার্কিন মুল্লুকে ইহার জন্ম; মুর এবং এমন্স। শেষোক্ত দু'জন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, মিনিয়া কোঙ্কার উচ্চতা মাপিবেন এবং এ পাহাড়ে সকলের আগে তাঁরা চড়িবেন ; পাহাড়ে উঠিয়া পাহাড়ের উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের তত্ত্বানুশীলনও করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

তাঁদের পূর্ব্বে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এক দল পর্য্যটক মিনিয়া কোঙ্কার পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত সোঙ্গো পাহাড় পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে তাঁরা মিনিয়া কোঙ্কার দর্শন লাভ করেন। মিনিয়া কোঙ্কার নাম তাঁরা শুনিয়াছিলেন বো কোঙ্কা। তারপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আর দু'জন পর্য্যটক থিয়োডোর এবং কার্মিট রুজভেল্ট এ-অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পাহাড়ের উচ্চতা অনুমান করিয়াছিলেন, ৩০০০০ ফুট। মিনিয়া কোঙ্কায় তাঁরা আসেন নাই। ইহার প্রায় পাঁচ-সাত বৎসর পরে বার্ডশল দলের এই অভিযান।

বার্ডশল লিখিয়াছেন—জুন মাসের মাঝামাঝি সাংহাই হইতে আমরা যাত্রা সুরু করি। ইয়াংসী নদীর বুকের উপর দিয়া মোটর বোটে চড়িয়া ন' দিনে ১৫০০ মাইলের পাড়ি শেষ করিয়া চুংকিঙে পৌছিয়াছিলাম। তার পর ইচাঙের পাশ দিয়া পার্ব্বত্য নদী-নির্ঝর বহিয়া অগ্রসর হই। গ্রীষ্মে ও বর্ষান্তে এই সব পার্ব্বত্য নদী জলে পরিপূর্ণ থাকে। সে জলে প্রখর স্রোত; এবং সে স্রোত সবেগে চলিয়াছে ইয়াংসীর বুকে। পাথর ঠেলিয়া এ জলস্রোত পাহাড়ের দুই কূল প্লাবিত করিতে পারে না ; সে জন্য এখানে জলের গভীরতা অপরিসীম। এক জায়গায় মাপিয়া দেখি, জলের গভীরতা ১০৫ ফুট। শুনিলাম, সময়-সময় জল এত বাড়ে যে, ২৮০ ফুট গভীর হয়। স্রোতের বিপরীত মুখে চলিতে আমাদের মোটর-বোটের দু'খানি এঞ্জিনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল; এবং বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা কূলের কাছে ভিড়িতে পারি নাই।

সেমি গিরিদ্বার

বৌদ্ধ মঠ—কোঙ্কা গম্ফা

চুঙকিঙে আমরা মোটর-বোট ছাড়িয়া ছোট ষ্টীমার লইলাম এবং ষ্টীমারে চড়িয়া চার দিনে আসিলাম ইপানে। তার পর আর তিন দিনে মিন নদীর বুক বহিয়া লোশানে আসিয়া পৌঁছিলাম। লোশানে নদীর পূর্ব্ব-তীরে পাহাড়ের শিলাখণ্ডে বিরাট এক বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটি আসনোপবেশনে অবস্থিত এবং ১১৬ ফুট উঁচু। ৭০০ খৃষ্টাব্দে এ মূর্ত্তিটি খোদিত হইয়াছিল।

ইয়াংচৌ হইতে তাংসিয়েনলুর পথে

যাত্রীদের ছাউনি—এখান হইতে পাহাড়ের উচ্চতা মাপা হইয়াছিল

লোশান হইতে বাসে চড়িয়া খাড়া পাহাড়-পথে আমরা আসিলাম চেংতু। চীনের কুনবজুল জেচোয়ান প্রদেশের প্রধান সহর চেংতু। এখানে দু'-তিন দিন বাস করিয়া বাস এবং রিকসাযোগে আমরা ইয়াংচৌয়ে আসিলাম। ইয়াংচৌয়ে আসিয়া দেখি, সামরিক কর্ম্মচারীদের জিম্মায় কুলির মাথায় আমাদের মালপত্র আমাদের পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আমাদের মালপত্রের ওজন ছিল প্রায় ১৮ মণ। আঠারো জন কুলির মাথায় এই মালপত্র চাপাইয়া এখান হইতে যাত্রা করিলাম কানটিঙের (তাং-সিয়েনলু) দিকে। ইয়াংচৌয়ের মেয়র আমাদের সঙ্গে পাহারাদারীর জন্য দু'জন সশস্ত্র সেনা দিয়াছিলেন। তাং-সিয়েনলুতে যাইবার পথ আছে দু'টি; যেটি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং যে পথে লোক-চলাচল বেশী, আমরা সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। এই পথেই পূর্ব্বে পাইপিং-লাশার বাণিজ্য পণ্যাদির আদান-প্রদান চলিত। প্রখর রৌদ্র-তাপে পথ দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল। বড় বড় ছাতার নীচে মাথা রক্ষা না করিয়া দু'পা চলিবার উপায় ছিল

না। এ পথে গাড়ী চলে না। অশ্বতর এ পথে একমাত্র বাহন। অশ্বতরের পিঠে কামান-বন্দুকও বহা হয়, দেখিলাম।

এক এক জায়গায় গিরি-দ্বার খাড়া ১০০০ ফুট উঁচু। পাথরের সোপান বহিয়া ওঠা-নামা করিতে হয়। প্রথম গিরি-দ্বার তাশিয়াং লিঙ। এখান হইতে মিনিয়া কোঙ্কা বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায়। পাইপিং হইতে লাশায় যাইতে ঠিক মধ্যপথে একটি বৌদ্ধ-মন্দির আছে। পুরাকালে লাশায় যখন চীনের রাজকর্ম্মচারীরা বাস করিতেন, তখন এই পথে চীন ও তিব্বতের ডাক যাতায়াত করিত। যাতায়াতে সময় লাগিত উনিশ দিন।

পনিঘোড়া এবং অশ্বতর এখন এ পথের বাহন। তিব্বতে চা যায় অশ্বতরের পিঠে—চায়ের বহু প্যাকেট। কুলিরাও চায়ের ভারী মোট মাথায় বহিয়া লইয়া যায়। ইংরেজী T অক্ষরের ছাঁদে তৈয়ারী মোটা লাঠির গায়ে চায়ের ভারী প্যাকেট বাঁধিয়া কুলিরা সেই মোট বহিয়া পাহাড়-পথে চলে। চায়ের ব্যবসায়ের জন্য তাৎসিয়েন্‌লুর সমৃদ্ধি এবং প্রাধান্ত অপরিসীম। এখানকার নিসর্গ-দৃশ্যও অপরূপ। ৩০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের গা কাটিয়া বিপুল বেগে খর-স্রোতা নদী বহিয়া চলিয়াছে। ১৫ মাইল পথ বহিয়া পূর্ব্ব চীনের দিকে ওয়াশেজকোয় আসিয়া এ নদী মিশিয়াছে তুঙ নদীর গায়ে। পথে বহু ছোট ছোট নদী-নির্ঝর ও খাদ আছে। সে-সব উত্তীর্ণ হইবার জন্য পুল আছে—দড়ির পুল, বাঁশ-বাখারির পুল।

পাহাড়-পথে চায়ের কুলি

লেখক লিখিতেছেন—তাৎসিয়েনলু হইতে দু'জন তিব্বতী ড্রাইভার এবং ১৬টি ঘোড়া ও ইয়াক্ সহ আমরা যাত্রা করিলাম। এখানে পথ একেবারে ৮৫০০ ফুট নীচে নামিয়াছে।

নীচে ধরণীর শ্যাম শোভা অপরূপ—অজস্র তৃণ-পল্লবে চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন। উপরের সে রূঢ় কর্কশতার বাষ্পও নাই! ফল-ফুলও এখানে বিচিত্র এবং অজস্র। এ্যাষ্টার, বাটার-কাপ, ডাণ্ডেলিয়ন, পিঙ্ক, ফরগেট-মি-নট—সব রকমের ফুলই অজস্র ফুটিয়া আছে! এ-সব ফুল ছাড়া নাম-না-জানা কত ফুল যে বর্ণে-গন্ধে দশ দিক্ আকুল করিয়া আছে, তার সংখ্যা নাই! এ অঞ্চলে নানা জাতের গাছপালা দেখিলাম।

তৃতীয় দিনের সকালে আমরা জেশি গিরি-দ্বারে উঠিলাম। পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে দেখিলাম প্রার্থনা-পতাকা। এ বর্ত্মের শিখর ১৫৬৮৫ ফুট উঁচু। কুয়াশা এবং সেই সঙ্গে করকাপাত বশতঃ সামনে পিছনে বা পাশে কোনো কিছু দেখা যায় না।

এই বর্ত্ম পার হইয়া আমরা আসিলাম তিব্বতে। আমাদের সঙ্গে যথাযোগ্য ছাড়পত্র ছিল। আসিয়া সামনে দেখি, বিরাট্ প্রসারিত মাল-ভূমি। এখানে তৃণশস্য আছে—কিন্তু বড় গাছের চিহ্ন দেখিলাম না।

ইয়ং এবং বার্ডশল্

এত উঁচুতে ফশল ফলে না। গ্রীষ্মকালে সামান্য যে তৃণ-গুল্ম জন্মায়, তাহা খাইবে বলিয়া তিব্বতীরা তাদের ইয়াকদের আনিয়া এইখানে ছাড়িয়া দেয়। পাহাড়ের গায়ে বহু ইয়াক চরিতেছে, দেখিলাম।

উনিশ হাজার পাঁচশো ফুট উপরে মুর (আগে), বার্ডশল্ (নীচে)

চীনা পতাকা পোঁতা

এখানকার ইয়াকগুলি আকারে গোরুর মত। রঙ কালো, পুচ্ছ লোমশ এবং শিং বেশ দীর্ঘ। ইয়াক চলে খুব মৃদু-মন্থর গমনে; তবু এ পথে তার মত বাহন আর মিলিবে না। তবে ইয়াক খুব মেজাজী জীব। পুরাতন পথে বিরাগ—নূতন পথেই সর্ব্বদা চলিতে চায়; এবং পাহাড় বা খাদ ও খানা-খোন্দলের কোনো বাধা তারা মানিতে জানে না।

লেখক লিখিতেছেন, এ পথে আমরা আসিলাম য়ুলোরশি গ্রামে। এখানে বহু লোকের বাস। বাড়ী-ঘর পাথরের তৈয়ারী। প্রতি গৃহের ছাদে দু'টি করিয়া খুঁটির উপর পতাকা সংলগ্ন—এ পতাকা উপাসনা-নিবেদনের সঙ্কেত। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, ছাদে যেন রেডিয়োর বাঁশ খাড়া করা হইয়াছে। ইহার উপর প্রতি গৃহে বহু শিলাখণ্ড স্তূপাকারে সংরক্ষিত থাকে। সেগুলির প্রত্যেকটিতে মন্ত্র খোদা—'ওঁ মণিপদ্মে হুম্!'

য়ুলোরশির ক'মাইল উত্তর-পূর্ব্বে একটি পর্ব্বত-শিখরে এক হ্রদের তীরে রাত্রি-বাসের জন্য আমরা ছাউনি ফেলিলাম। এ শিখরটি ১৪১০০ ফুট উঁচু। আমাদের সঙ্গে ছিল তিব্বতী পাচক। তার নাম গাওমো। সে চীনা ভাষায় কথা বলিতে পারে। জলের ধারে ছাউনি ফেলিতে চাহিলে সে ভীষণ প্রতিবাদ তুলিল। বলিল, জলের ধারে ভূতপ্রেত-দানায় বাস! আমরা তার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলাম না। নিরুপায়ে সে আমাদের ছাউনিতে না থাকিয়া বহু দূরে ছোট ছাউনি ফেলিয়া সেখানে গিয়া রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা করিল।

বর্ষা ছিল আসন্ন। সে জন্য আমরা কোথাও কাল-বিলম্ব করিলাম না। ১লা অগষ্ট তারিখে আমরা দু'টি শিখরে নির্দ্দেশক দণ্ড পুঁতিয়া মিনিয়া কোঙ্কার উচ্চতা পরিমাপের ব্যবস্থা করিলাম।

আমাদের ছাউনি হইতে মিনিয়া কোঙ্কা ছিল সাত মাইল মাত্র দূরে—বুচু উপত্যকার গায়ে।

পরিমাপ-কার্য্যে আমাদের সময় লাগিল প্রায় তিন সপ্তাহ। তার পর ২২শে অগষ্ট দারুণ তুষারপাত সুরু হইল। আমরা ছাউনির মধ্যে আশ্রয় লইলাম। পরিমাপের অঙ্ক কষিয়া দেখা গেল, মিনিয়া কোঙ্কা ২৪১০০ ফুট উঁচু।

তখন ভাবিলাম, ও-পাহাড়ে চড়া কি সম্ভব হইবে না? কাছে আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিব?

না! তুষার-বর্ষণ কমিবামাত্র আমরা পাহাড়ে চড়িবার উদ্যোগ-আয়োজন করিলাম। ইয়াকের দল জড়ো করিয়া সকাল সকাল পাহাড় হইতে নামিয়া বুচু উপত্যকায় আসিলাম। এ পথে পাইলাম সেমি গিরিদ্বার। চারি দিক মেঘে ঢাকা। ছোট একটি নদী আছে। সে নদীর কল্যাণে একটা কল চলিতেছে, দেখিলাম!

সেমিতে ইয়াক বদল করিতে হইবে; তাই রাত্রে আমরা কোঙ্কা গম্পায় যে-মঠ আছে, সেই মঠ দেখিবার ব্যবস্থা করিলাম।

মঠটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। মঠে প্রধান আচার্য্যের সঙ্গে

দেখা হইল না। শুনিলাম, তিনি লাশায় গিয়াছেন। মঠের অধিবাসীরা আমাদিগকে সুমধুর আতিথ্যে আপ্যায়িত করিলেন। আমাদের তিব্বতী পাচক গাওমো দোভাষীরূপে মঠের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ যেন উপভোগ্য করিয়া তুলিল। মঠে আমরা তিব্বতী চা পান করিলাম। ভোজের জন্য ছিল,—শাম্বা—বার্লির পিষ্টক; লবণ এবং মাখন; সবজীও ছিল। মঠে রাত্রি কাটাইলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল দাঁড়কাকের ডাকে! উঠিয়া শুনিলাম, বালকের দল পাঠাভ্যাস করিতেছে। তিব্বতের বিধি—প্রতি পরিবারের একটি ছেলেকে মঠে পাঠানো চাই—মঠে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একটি বালক হইবে লামা।

প্রাতরাশ সারিয়া আমরা মিনিয়া-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দারুণ তুষারপাতে আমাদের গতি অবরুদ্ধ হইল। বাধ্য হইয়া কোনো মতে আবার মঠে ফিরিয়া আসিলাম। মঠের অধিবাসীরা নিষেধ করিলেন; বলিলেন, ও-পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিও না। ও-পাহাড়ে দেবতাদের বাস। পাহাড়ে চড়িলে তাঁহাদের শান্তি ভঙ্গ হইবে। তাঁহারা বিরক্ত হইবেন।

তুষারাচ্ছন্ন শিখর—মিনিয়া কোঙ্কা

ফেরার মুখে—ইয়া নদীর বরফ-জমা বুকে নৌকা

তাঁরা বলিলেন, কিছু কাল পূর্ব্বে সুইশ ভূতত্ত্ববিদ্ ডক্টর হিম একবার ও-পাহাড়ে উঠিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হয় নাই। দারুণ তুষার-বর্ষণে তাঁর বহু সঙ্গী মারা যায় এবং তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

ডাংসিয়েনলু

বারো হাজার ফুট উপরে

জমাট বরফ ঘেঁষিয়া পাহাড় হইতে নামা

চা ও পশমের ভারবাহী ইয়াকদল
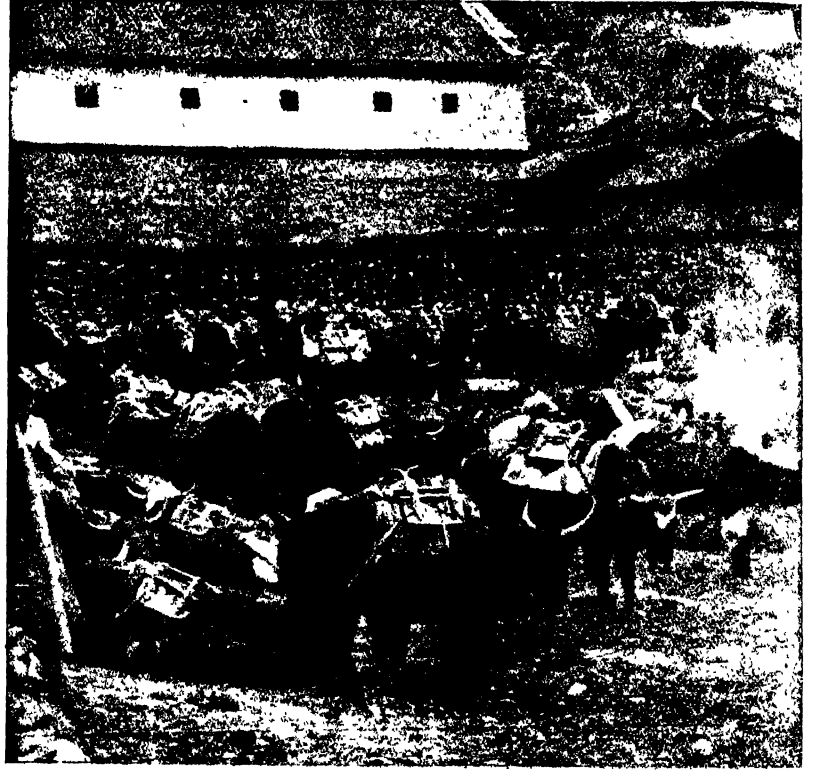
এ কথায় আমরা নিবৃত্তি মানিলাম না। আমাদের সঙ্গী ইয়ং বলিলেন—আমরা গিরি-দেবতার পূজা করিব। এখানে গিরি-দেবতার পূজার জন্য আসিয়াছি। পূজা না দিয়া আমরা ফিরিব না। এ কথা বলিয়া পূজার জন্য মঠে প্রণামী দিলাম এবং ধূপধুনা জ্বালিলাম। তখন যাইবার অনুমতি মিলিল। পাচক গাওমো যাইতে চাহিল না; তাকে খরচপত্র দিয়া আমরা তাৎসিয়েনলুতে ফেরত পাঠাইলাম।

২রা অক্টোবর ছ'জন কুলি (কুলিদের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক) সঙ্গে লইয়া আমরা যাত্রা করিলাম। প্রথমেই বহু কষ্টে খরস্রোতা একটি তুষার-নদী পার হইলাম; তার পর পশ্চিম দিকে এক বিরাট্ তুষার-হ্রদের উপর দিয়া আমরা চলিলাম মিনিয়া কোঙ্কা অভিযানে।

পশ্চিম দিক দিয়া উপরে প্রায় পাঁচ মাইল পথ উঠিয়া সামনে দেখি, পাহাড়ের গায়ে তৃণ-সমাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। গা ঘেঁষিয়া ছোট একটি নদী বহিতেছে। এ জায়গাটি ১৪৪১৫ ফুট উঁচু। রাত্রে এ পথে প্রচুর তুষার-বর্ষণ হয়। দিনের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তুষার গলিয়া শুকাইয়া যায়। আমরা সমতল ভূমিতে ছাউনি ফেলিলাম।

তার পর ধীরে ধীরে পাহাড়ে ওঠা। সাত দিনে উঠিলাম ১৮০০০ ফুট; তার পর তিন দিনে ১৯৮০০ ফুট; এবং আরো

পাহাড়ের তিব্বতী অধিবাসী

সাত দিনে উঠিলাম ২২০০০ ফুট। এখনো উঠিতে প্রায় ৩০০০ ফুট বাকী।

আমাদের গতি যেমন মন্থর তেমনি প্রতি-পদে অবরুদ্ধ হইতেছিল।

প্লেনে চড়িয়া এ পথে আসিতে অক্সিজেন বাষ্পের প্রয়োজন হয়। আমাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় নাই। বোধ হয় ধীরে ধীরে উঠিতেছিলাম বলিয়া এখানকার ঘন বায়ুভার আমাদের অভ্যস্ত হইতেছিল!

তার পর বহু প্রয়াসে আরো এক হাজার ফুট উপরে উঠিলাম। উদর-তৃপ্তির জন্য সঙ্গে ছিল চীনা বিস্কুট—বরফে জমিয়া সেগুলা পাথরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছিল—ভাঙ্গিয়া ষ্টোভের আগুনে তাতাইয়া তাহাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিলাম।

২৮শে অক্টোবর তারিখে রাত্রি তখন ৩-৪০ মিনিট, দারুণ তুষার-বর্ষণ সুরু হইল। ছাউনির মধ্যে আমাদের হাত-পা সব জমিয়া যাইবার জো। ষ্টোভ জ্বালিয়া তাহারি তাপে হাত-পা সেঁকিতে লাগিলাম। রাত্রিটা এমনি করিয়া কাটিল। সকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে তুষার-বর্ষণের বিরাম এবং সূর্য্য-কিরণে আবার আমরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিলাম।

প্রাতরাশ সারিয়া হামা দিয়া বাহিরে আসিলাম। শীত-নিবারক আচ্ছাদনীতে আপাদ-মস্তক ঢাকা ছিল—হামা দিয়া প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আবার হাঁটিয়া চলা সুরু।

বেলা ৮॥টায় আরো ৫০০ ফুট উর্দ্ধে উঠিলাম। এবার পথ বেশ খাড়া। লোহার সরু বড় ছুড়িয়া কঠিন বরফে সেগুলা পুঁতিয়া দড়ির বন্ধনী ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। এখান হইতে আগাগোড়া এমনি দড়ি ধরিয়া উপরে ওঠা। বেলা ২-৪০ মিনিটে অনেকখানি উর্দ্ধে উঠিলাম; এবং তিন দিন পরে আসিয়া পৌছিলাম মিনিয়া কোঙ্কার সর্ব্বোচ্চ শিখরে।

এ পাহাড় হইতে ৫৫ মাইল দূরে জারা গিরিশ্রেণী; পূর্ব্ব দিকে চেংতু-উপত্যকা; দক্ষিণে তুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী এবং পশ্চিমে নীল সাগরের মত তিব্বতের গিরিমালা—অপরূপ দৃশ্য!

চীনা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-পত্র লইয়া আমাদের এ পাহাড়ে আসা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া এখানে চীনা পতাকা পুঁতিয়া আমরা চীনের বিজয় ঘোষণা করিলাম।

তার পর পাহাড় হইতে নামিয়া আভিযাত্রিকের দল এ কাহিনী দিকে দিকে প্রচার করিলেন। ইয়াংচৌয়ে আসিয়া নৌকা-যোগে ইয়া নদী-বক্ষ বহিয়া তাঁরা নানকিং-এ আসিয়া পৌছিলেন। তাঁরা যখন নানকিং-এ আসিয়াছেন, জাপান তখন দানবী-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে!

এই আভিযাত্রিকদের কাহিনী অবলম্বন করিয়াই মার্কিন সমর-বিভাগ আজ বর্ম্মারোড জাপানী-অধিকারভুক্ত হইলে মিনিয়া কোঙ্কার পথে প্লেনযোগে চীনের সাহায্যকল্পে সামরিক সরঞ্জাম পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছে। এ সামরিক দলে আছেন জ্যাক ইয়ং এবং মুর। ইয়ং

পাচক গাওমো

আছেন চুংকিঙে চীনা সমর-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে; মুর আছেন এ যুদ্ধে চীনের পক্ষে কোয়ার্টার-মাষ্টার জেনারেলের পদে। এ পথে বিজয়লক্ষ্মী আসিয়া চীনকে অভিনন্দিত করিবেন, সে আশা মার্কিন দুরাশা বলিয়া মনে করে না!

শতকরা ৯৯ জনের প্রতি

খ্যাতির আসনে নাহিকো তোমার ঠাঁই,
কাগজে ছাপেনি কখনো তোমার নাম!
চাকরি-বাকরি লয়ে দিন কেটে যায়—
কেহ কষিবে না তোমার কাজের দাম!
জীবনের পথে তুমি চলিয়াছ তবু
কোনো কলরব ঘেরেনি তোমারে কভু!
কবে কি বলেছো, কার কি করেছো হিত—
বিশাল ধরণী জানিবে না কিছু তার—

গৃহে ছেলে-মেয়ে-পত্নী-স্বজন আছে—
দুখে না পায়—সাধনা করেছো সার!
তাদেরি সুখের লাগি দিন-রাত খেটে
তোমার জন্ম-জীবনটা গেল্ কেটে!
তোমার মরণে সভা ডাকিবে না কেহ,
বাগ্মীর মুখে ফুটিবে না মৃত-বাণী!
আত্মজনেরা নীরবে সহিবে ব্যথা—
ভুলিবে না কভু—এ কথা ভালোই জানি!

পাখী গেয়ে যায়; ফুল ঝরে গৃহ-কোণে—
—তাদেরে ভুলিতে পারে বলো কোন্ জনে?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ছোটদের আসর

দর্পচূর্ণ

(গল্প)

১

"সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে! আপনারা শুনছেন? বাড়ীতে ভীষণ চুরি!"

সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীত-মুখর হল-ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ছুঁচ পড়লে শোনা যায়, এমন গভীর নিস্তব্ধতা! সকলের গা ছমছম্ করতে লাগল। মহিলারা বার-বার চমকে উঠে পিছন-দিকে দেখতে লাগলেন, কেউ আসছে না তো!

প্রতি বছর ঝুলন-পূর্ণিমার দিন হীরক-নগরীর মহারাজ যতীন্দ্রবিমল পাল চৌধুরী প্রাসাদে বিরাট্ উৎসবের আয়োজন করেন। বহু ধনী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হয়। মহারাজ নিজে সৌখীন—বাছা-বাছা গাইয়ে-বাজিয়ে এবং নর্ত্তকীদের আমন্ত্রণ করে নিমন্ত্রিতদের চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করেন। খাওয়া-দাওয়া যা হয়, যাকে বলে ভুরিভোজন! এবারও বহু ধনী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি এসেছেন। মজলিস পুরো দমে চলছে, এমন সময় মহারাজ নিজে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এসে উপস্থিত! কম্পিত ক্লিষ্ট স্বরে বললেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে! শুনছেন? বাড়ীতে ভীষণ চুরি!" ঘর নিস্তব্ধ। ভীত শঙ্কিত চিত্তে সকলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি বললেন—"আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা কত দূর হলো মহারাণী দেখতে গেছলেন। তাঁর দেরী হচ্ছে দেখে আমি তাঁকে ডাকতে যাই। এ-কথা আপনারা জানেন। গিয়ে দেখি, হাত-পা-বাঁধা তিনি নিজের ঘরে পড়ে আছেন! জ্ঞান নেই। অঙ্গে একখানি অলঙ্কার নেই। বিলেত থেকে আমি যে দামী হীরার নেকলেস এনেছিলুম, সেটি আজ তিনি পরেছিলেন। সেটিও গেছে।"

ঘরে যেন বোমা পড়েছে বা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! সকলে স্তব্ধ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলেন। কারও মুখে কথা নেই। এ যে একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার! মহারাজ বললেন, "চোর বাড়ী থেকে বেরুবার সুযোগ পায়নি! দেউড়ীতে দরোয়ানকে বলে এসেছি, যেন কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে বা বাড়ী থেকে বেরুতে সে না দেয়। আজ রাত্রে আপনাদের বাড়ী ফেরা নিরাপদ হবে না। কে জানে, বাড়ীর বাইরে তার কোনও সঙ্গী লুকিয়ে আছে কি না! অবশ্য বাড়ীর ভিতরেও ভয়ের কারণ বিলক্ষণ রয়েছে।" মহারাজ বললেন—"আমার বিশ্বাস, সে এখনও বাড়ী ছেড়ে যেতে পারেনি। আমার মনে হয়, আপনাদের দামী যা-সব জিনিষ, তা আজকের মত আমার সিন্দুকে রাখাই কর্ত্তব্য। আপনারা কি বলেন?"

সকলেই তাঁকে সমর্থন করলেন। তখন মহারাজ যতীন্দ্রবিমল পকেট থেকে রুমাল বার করে টেবিলের উপর রাখলেন। যার কাছে যা বেশী দামের সামগ্রী ছিল, সব রুমালে জড়ো করে দিলে। পুঁটলি বেঁধে তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে দু'-এক জন জোয়ান লোক আসুন। আপনারা আবার আগেকার মতন গান-বাজনা চালান, কিন্তু কান খাড়া রাখবেন—একটু সতর্ক থাকবেন। একেবারে চুপচাপ বসে থাকলে চোর বেরুবে না।"

দু'জন লোক নিয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হল-ঘর পার হয়ে সিঁড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ বাড়ীশুদ্ধ আলো নিবে গেল। সকলে "আলো আলো" করে চেঁচিয়ে উঠলেন, মহিলারা ভয়ে চীৎকার করতে লাগলেন। চাকররা হুড়োহুড়ি করে টর্চ্চ নিয়ে সিঁড়ির কাছে এসে দেখলে, কে মেন্-সুইচ্ অফ্ করে দিয়েছে। সুইচ্ জ্বালতেই বাড়ীশুদ্ধ আলো জ্বলে উঠল। যে দু'জন লোক মহারাজের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা বিস্মিত হয়ে এদিক্ ওদিক চাইতে লাগলেন! মহারাজ কোথায়? তখনি চারি দিকে খোঁজ-খোঁজ রব পড়ে গেল। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, একটা ঘরে মহারাজ অজ্ঞান-অচেতন হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর হাত-পা বাঁধা। তখনি তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান করাবার চেষ্টা হলো। অনেকক্ষণ শুশ্রূষার পর মহারাজ চোখ মেলে চাইলেন। এক জন প্রশ্ন করলেন,—এখন কি রকম বোধ করছেন? তিনি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলেন,—একটু ভাল। আর এক জন জিগ্যেস করলেন,—আপনাকে সিঁড়ির কাছে আক্রমণ করলে? তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, না। ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় কে রুমাল দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলে। লোকটা অত্যন্ত জোয়ান বলে মনে হলো। আমি ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারলুম না। রুমালে বোধ হয় ক্লোরোফর্ম ছিল। আর এক জন প্রশ্ন করলে, আলো নেববার সময় আপনি কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, "আলো নেবা? আলো নিবল কখন?" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে আর এক জন জিগ্যেস করলেন—"গহনার পুঁটলি?" মহারাজ কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"গহনার পুঁটলি মানে?" ভদ্রলোক শঙ্কিত ভাবে বললেন—"গহনার পুঁটলির কথা আপনি কিছু জানেন না?" মহারাজ যতীন্দ্রবিমল উত্তর দিলেন—"না। ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তখন তাঁকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলা হলো। সব শুনে তিনি বললেন—"এ নিশ্চয় সেই চোরের কারসাজি! এই মুহূর্ত্তে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত।" পুলিশকে খবর দিয়ে মহারাণীর উদ্দেশ্যে সকলে যাত্রা করলেন। গিয়ে দেখলেন, জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু তাঁর হাত-পা-মুখ বাঁধা।

পুলিশের লোক আসবার সময় রাস্তায় দেখলে, এক জন টেলিগ্রাফ-পিয়ন সাইকেলে করে যাচ্ছে। মহারাজের প্রাসাদে এসে গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা প্রশ্ন করলেন—"আপনার কাছে এখন কোন টেলিগ্রাম এসেছিল?" তিনি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"না। হঠাৎ এ-কথা জিগ্যেস করছেন কেন?"

কথাবার্ত্তার পর পরিষ্কার বোঝা গেল যে, চোর জাল মহারাজ সেজে সকলের গহনা এবং আর দামী জিনিষপত্র নিয়ে টেলিগ্রাফ-পিয়নের বেশে চম্পট দেছে! পুলিশ তখনই চারিধারে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলে, কিন্তু পিয়নকে পাওয়া গেল না, গহনারও উদ্ধার হলো না।

মহারাজের ছদ্মবেশ ধরে তাঁরই গৃহ থেকে তাঁর অতিথিদের ঠকিয়ে চলে গেছে—সে জন্য মহারাজ যতীন্দ্রবিমল নিজেকে অনেকটা দায়ী মনে করলেন। মহারাণীর অলঙ্কার ছাড়া অভ্যাগতদের প্রায়

হাজার ত্রিশেক টাকার জিনিষ গেছে। তাই তিনি পুলিশের মারফৎ ঘোষণা করে দিলেন, চোরকে যে ধরে দিতে পারবে অথবা কোন ব্যক্তি তার সন্ধান বলে দিতে পারবে যাতে চোর ধরা সম্ভব হয়, তাকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। পুলিশ থেকেও হাজার দু'য়েক টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষিত হলো। তারাও চেষ্টার ত্রুটি করলে না। কিন্তু সব মিথ্যা হলো। দু'মাসের পর কেটে গেল, চোর ধরা পড়ল না।

দু'মাস পরের ঘটনা। চোর ধরা বা অলঙ্কারাদি উদ্ধারের আশা সকলেই ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় এক দিন সকালে মহারাজ যতীন্দ্রবিমল একখানি চিঠি পেলেন। সাদা কাগজে ছাপা অক্ষর কেটে কেটে তাই জুড়ে চিঠি লেখা। চিঠি পড়ে মহারাজ অবাক্ হয়ে গেলেন। লোকটা পাগল না কি? চিঠিতে লেখা ছিল—শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রবিমল পাল চৌধুরী সমীপেষু—"আপনাদের চোখের সামনে দিয়ে গহনাপত্র চুরি করে এনেছি। ৩রা আশ্বিন রাত্রি ন'টার সময় আবার আপনার ঘরে গহনাপত্র রেখে আসব। চুরি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বুদ্ধির কৌশল দেখানোয় আমার আনন্দ! পূজোর সময় কেউ মন-মরা হয়ে থাকে আমার ইচ্ছা নয়। মনে রাখবেন, আমার কথার নড়চড় হয় না।

আপনার একান্ত অনুগত

ভদ্রবেশী চোর।"

মহারাজ তখনই চিঠি নিয়ে পুলিশের কর্ম্মকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হলেন। সেই দিনই ৩রা আশ্বিন! ঠিক হলো, তিনি নিজে গিয়ে রাত আটটা থেকে বারোটা অবধি মহারাজের কাছে থাকবেন; বাড়ীর চারিধারে পুলিশ মোতায়েন থাকবে এবং তারা তাঁকে এবং মহারাজকে ছাড়া আর কাউকে বাড়ীর মধ্যে যেতে অথবা বাড়ী থেকে বেরোতে দেবে না! একটা মারামারিও হতে পারে। মহারাণীকে রাত্রের জন্য অন্যত্র রাখলে ভাল হয়!

বিকেল পাঁচটার সময়ে মোটরে করে মহারাণীকে এক জন বিশ্বস্ত দরোয়ান এবং ঝি-সহ মহারাজের পিসীমার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তার একটু পরেই এক জন লোক এসে গেটে দরোয়ানকে বললে—"মহারাণী আমাকে আজ আসতে বলে দিয়েছিলেন। পূজোর জন্য তিনি কিছু গহনা কিনবেন। তাই আমি ক্যাটালগ নিয়ে এসেছি।" এই বলে সে দরোয়ানকে তার দোকানের কার্ড আর ক্যাটালগ দেখালে। দরোয়ান উত্তর দিলে—"আজ মহারাণীর সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি এইমাত্র পিসীমার বাড়ীতে গেলেন। কাল আসবেন।" "তাই তো, আজ তবে কাজটা হলো না! আচ্ছা কাল আসব।" এই কথা বলে আগন্তুক প্রস্থান করল।

রাত্রি ঠিক আটটার সময় পুলিশের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত পুণ্ডরীকাক্ষ মজুমদার মহারাজ যতীন্দ্রবিমলের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন। দু'জনে হল-ঘরে বসে চা এবং ধূমপান করতে করতে ভদ্রবেশী চোরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিষ্টার মজুমদার মহারাজের পরিচিত লোক। জলসার দিন বিশেষ কাজে আটক পড়ায় তিনি আসতে পারেননি। সেই দিন রাত্রের ঘটনার কথা মহারাজ পুনরাবৃত্তি করলেন। মজুমদার সাহেব বললেন—"আজকে মেন্ সুইচের কাছে এক জন বিশ্বাসী লোককে মোতায়েন রাখুন। সেদিন-কার ঘটনা আজ আবার না ঘটে!"

তখনই মহারাজ এক জন পুরাতন ভৃত্যকে সেখানে বসিয়ে দিলেন। তাকে বলে দিলেন, কাউকে যেন সুইচের কাছে আসতে না দেয়।

রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। মহারাজ উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ফোন্ ধরলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন—"মুস্কিল হয়েছে। আমাকে এখনই একবার পিসীমার বাড়ী যেতে হবে।" মজুমদার সাহেব প্রশ্ন করলেন—"কেন? কি হয়েছে?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"সেখান থেকে ফোন্ করেছে মহারাণীর ভয়ানক অসুখ। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ডাক্তাররা ভয় করছে হার্টফেল না করে! ডাক্তার আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বসে থাকবেন।" মিষ্টার মজুমদার বললেন—"এ ক্ষেত্রে আপ-নার যাওয়া একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, টেলিফোনের সংবাদ মিথ্যা নয় তো? মহারাণীর কি হার্টের অসুখ আছে?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"ছিল। মধ্যে একটু কমেছিল, কিন্তু সেদিনকার চুরি ঘটনার পর থেকে আবার বেড়েছে। ডাক্তাররা বলেন, যে-কোন মুহূর্ত্তে উত্তেজনা-বশতঃ হার্টফেল হতে পারে!" মজুমদার সাহেব প্রশ্ন করলেন—"আজকের ব্যাপারটা তিনি জানেন?" যতীন্দ্রবিমল উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তাঁকে বলেছি। আমাকে তিনি এখানে একলা রেখে যেতে চাইছিলেন না। জোর করে পাঠিয়েছি। বোধ হয় সেই জন্য এ রকম হয়েছে।" মজুমদার সাহেব বললেন—"তা হতে পারে। তাঁকে আজকের বিষয় কিছু না বললেই ভাল হতো। আচ্ছা, আপনি তা হলে চট্ করে ঘুরে আসুন। আমি এইখানে রাত বারোটা অবধি জেগে বসে থাকব। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসবেন।"

মিনিট দু'য়েকের মধ্যে মহারাজের গাড়ী ফটক পার হয়ে বেরিয়ে গেল। মজুমদার একলা পাইপ টানতে টানতে একটা উপন্যাস পড়তে লাগলেন।

ন'টা বাজতে পাঁচ মিনিট। মজুমদার সাহেব বই রেখে পাইপ মুখে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। এমন সময় একটা গাড়ী ফটকে ঢুকল। মহারাজ হল-ঘরে ঢুকে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বললেন—"আপনি ঠিক বলেছিলেন। টেলিফোনের খবর একেবারে মিথ্যা—সর্ব্বৈব মিথ্যা। মহারাণীর কিছুই হয়নি। গিয়ে দেখলুম, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন! মিছিমিছি কর্ম্মভোগ। আমি এখনই আসছি।" এই কথা বলে তিনি হল-ঘর পার হয়ে অন্দরে চলে গেলেন। ঘড়ীতে ঢং-ঢং করে ন'টা বাজল। ভদ্রবেশী চোরের দেখা নেই! একটু পরে মহারাজ হল-ঘরে ঢুকে বললেন—"বুঝলেন মজুমদার সাহেব, সব ধাপ্পাবাজী! চোরের তো দেখা-সাক্ষাৎ নেই!" মজুমদার সাহেব হেসে বললেন—"তাই দেখছি। অনর্থক কর্ম্ম-ভোগ। তবে এখনও বলা যায় না। রাত বারোটা অবধি আমি অপেক্ষা করে দেখব।" মহারাজ বললেন—"এখন ন'টা। আপনি কিছু খাবেন?" মজুমদার সাহেব উত্তর দিলেন—"না, আমি একেবারে খেয়ে বেরিয়েছি।" মহারাজ বললেন—"এখনও তিন ঘণ্টা বাকী। কাছেই এক ভদ্রলোক থাকেন। তাঁরা দুই ভাই ভাল ব্রীজ খেলতে পারেন। তাঁদের নিয়ে আসছি। সময় কাটাতে

হবে তো। কি বলেন ?" মজুমদার সাহেব মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"মন্দ কি! সময়টা তাহলে একটু ভাল ভাবেই কাটে। এ ভাবে চুপ-চাপ বসে থাকা অত্যন্ত একঘেয়ে।" "আমি এখনই আসছি। ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন! ভদ্রবেশী চোরের কথার নড়চড় হয় না, লিখেছে।" এই কথা বলে মহারাজ মোটর হাঁকিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় মিনিট কুড়ি পরে আবার একখানা মোটর এসে বাড়ীর ফটকে ঢুকল। নেমে এসে হল-ঘরে প্রবেশ করলেন মহারাজ যতীন্দ্রবিমল। তাঁকে দেখেই মজুমদার সাহেব প্রশ্ন করলেন—"এ কি! একলা ফিরলেন? আপনার বন্ধুরা?" বিস্মিত ভাবে মহারাজ উত্তর দিলেন—"বন্ধু! তার মানে? একটা মিথ্যা টেলিফোনের জন্য এই রাত্রে পিসীমার বাড়ী ছুটতে হলো। গিয়ে দেখি মহারাণীর কিছুই হয়নি। সম্পূর্ণ সুস্থ। মাঝ থেকে যাবার সময় পথে কোথাকার কে গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখেছিল। ধাক্কা খেয়ে একটা টায়ার বার্স্ট করল। বদলাতে এতখানি সময় নষ্ট হলো। কর্ম্মভোগ আর কি! এ কি! আপনি এমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে আছেন কেন?" দু'বার ঢোক গিলে মিষ্টার মজুমদার বললেন —"এতক্ষণ তবে বাড়ীতে কে ছিল? আপনি নন্? একটু আগে আপনি উপরে গেলেন আবার বন্ধুদের ডাকতে বেরিয়ে গেলেন!" বাধা দিয়ে মহারাজ বললেন—"কি অসম্ভব কথা বলছেন আপনি! আমি তো এই ফিরছি।"

দু'জনে দু'জনের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। তবে কি? একই সঙ্গে দু'জনের কাছে ব্যাপারটা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। আগন্তুক জাল যতীন্দ্রবিমল—সেই ভদ্রবেশী চোর! দু'জনে তখনই উপরে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখেন, টেবিলের ওপর অলঙ্কারের রাশি। ঠিক যেগুলি চুরি গেছলো সেইগুলিই অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। সঙ্গে একটি চিঠি। খুলে পড়লেন—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রবিমল পাল চৌধুরী সমীপেষু—

ঠিক ন'টার সময় আমার কথামত গহনা ফেরত দিলুম। এক দিন আপনি ও পুলিশ কর্ম্মাধ্যক্ষ মিষ্টার মজুমদার বলাবলি করছিলেন যে, আপনাদের কেউ ঠকাতে পারবে না। মজুমদার সাহেব সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা, আর আপনি এক জন মহারাজ। দু'জনেরই ধারণা, আপনাদের মত বুদ্ধিমান্ আর কেউ নেই। তাই সে দর্প চূর্ণ করবার জন্য একটু সামান্য খেলা দেখালুম মাত্র। ভবিষ্যতে আমার আরও পরিচয় পাবেন। নমস্কার।

বিনীত

এবং আপনাদের একান্ত অনুগত

ভদ্রবেশী চোর।"

শ্রীযামিনীমোহন কর (এম-এ, অধ্যাপক)

মরণের মুখে

এবারকারের যুদ্ধে মানুষ যেমন রাক্ষসের মত নৃশংস হইয়াছে, তেমনি আবার সে নৃশংসতার দমন এবং প্রতিকারকল্পে তার শক্তি এবং সাহসও দেখা যাইতেছে অনেকখানি।

জলে-স্থলে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি মানুষ যুদ্ধ করিতেছে,—তাদের পিছনে খবরাখবর লইয়া তেমনি লক্ষ লক্ষ লোক ছুটাছুটি করিতেছে। স্থলপথে যারা ছুটাছুটি করিতেছে, বাহন-স্বরূপ তাদের অবলম্বন মোটর-বাইক। এ সব মোটর-বাইক চালাইবার জন্য কলিকাতা-সহরের পাকা চৌরঙ্গী-রাস্তার মত এমন পাকা পথ তাঁদের মেলে না! পথ বলিতে তাঁদের ভাগ্যে মেলে বন-জঙ্গল, পাহাড়-নালা! কাজেই সে-পথে মোটর-বাইক চালানো কি ভয়ানক দুঃসাহসিকতার কাজ, সহজেই তাহা অনুমান করিতে পারো! অনেক সময় বনপথে পদে-পদে নালা-খানা-ডোবা দেখা দেয় এবং বাইকবাহী দূতের পক্ষে বাইক-সমেত লাফ দিয়া সে সব নালা-খানা-ডোবা পার হইয়া দৌত্যকার্য্য সম্পাদন সাংঘাতিক হইয়া ওঠে।
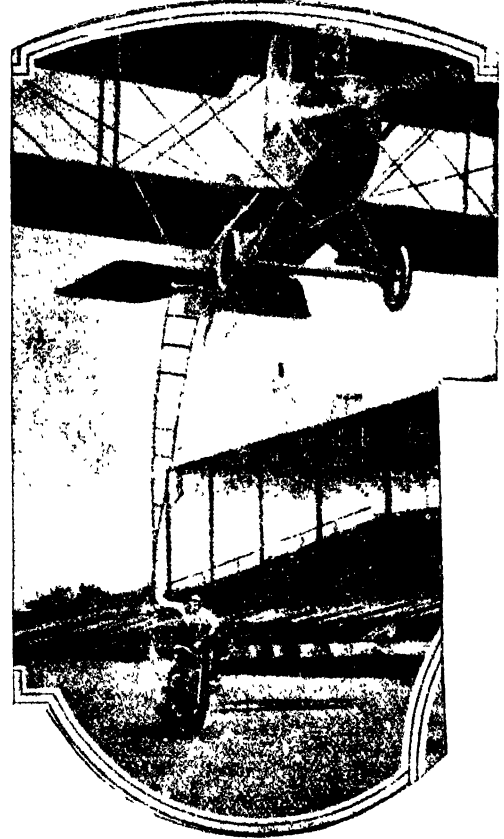
চলন্ত বাইক হইতে উড়ন্ত প্লেনে

মোটর-বাইকবাহী দূতদের বাইক-চালনা শিক্ষার ধারাই স্বতন্ত্র! নালা বা খানা ডিঙ্গানোর মত মোটর-বাইকে চড়িয়া ঢালু পাহাড়ে ওঠা-নামা করাও সহজ ব্যাপার নয়—ইহাকে বলে মরণের মুখে অগ্রসর হওয়া!

সখের জন্য বা বাহাদুর বলিয়া খ্যাতি কিনিবার জন্য অনেকে মোটর-বাইকে চড়িয়া এমনি দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন। কিন্তু এ সখ নয়,—কঠিন কর্ত্তব্য! এ কর্ত্তব্য-সম্পাদনের উপর জাতির জয়-পরাজয় নির্ভর করিতেছে।

খেলার ছলে মোটর-বাইকে চড়িয়া পাহাড়ে চড়ায় বিপদের ভয় অল্প! পথের দুর্গমতা বুঝিবামাত্র ও-কাজে নিবৃত্ত হওয়া যায়।

কিন্তু যুদ্ধে দূতের কাজে বাহির হইয়া তো নিরস্ত হইলে নিস্তার মিলিবে না! তবু খেলার ছলে এ নেশায় যাঁরা মজিয়াছেন, তাঁরাও দুঃসাহসিকতায় হঠিতে চান্ না! আমেরিকায় খেলার ছলে মোটর-বাইকে চড়িয়া পাহাড়ে ওঠা-নামার প্রতিযোগিতা চলে। সে প্রতিযোগিতা দেখিতে দর্শক জড়ো হয় হাজার-হাজার; এবং এ প্রতিযোগিতায় ব্যালান্স রাখিতে না পারিয়া চলন্ত বাইক-সমেত ডিগবাজী খাইয়া কত বাইক-বাহী যে হাড়-পাঁজরা ভাঙ্গিয়া মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছে, তার সংখ্যা নাই।

পাইপের উপর দিয়া চলা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন দুঃসাহসিক বাইক-বাহী মোটর-বাইকে চড়িয়া প্রশান্ত মহাসাগরবর্ত্তী এক তুঙ্গ গিরির শিখরদেশে উঠিয়াছিলেন। পাহাড়টি ছিল খুব ঢালু। হিল নামে আর এক জন সাহসী ভদ্রলোক পম্পটন পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন মোটর-বাইকে চড়িয়া। পাহাড়ের অনেকখানি উপরে উঠিয়া তিনি দেখেন—এদিককার পথ হইতে ওদিককার পথের মাঝখানে প্রায় পাঁচ-ছ' হাত চওড়া খাদ। জোরে বাইক চালাইয়াছিলেন—থামিবার উপায় ছিল না। তাঁর মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। চোখের সামনে দেখিলেন মরণের ছায়া! উপায় ছিল না। সজোরে বাইক সমেত তিনি লম্ফ দিলেন। ভাবিয়াছিলেন, এ লম্ফ মৃত্যুর গহ্বরে। কিন্তু ভাগ্যগুণে বাঁচিয়া গেলেন! লাফ দিয়া বাইক-সমেত তিনি খাদ পার হইয়া ওপারের পাহাড়-পথে নামিলেন! গাড়ীর বেগ কমাইলেন না—দ্রুতবেগে ওদিককার পথে চলিলেন।

চলন্ত মোটর-বাইক-সমেত লাফ দিয়া পথ অতিক্রম করার ব্যাপারে যাঁরা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁদের মধ্যে কানাডাবাসী মরিশ জোসেফের নাম উল্লেখযোগ্য। অনটারিয়ো হ্রদের কিনারা হইতে মোটর-বাইক-সমেত লাফ দিয়া তিনি ২১০ ফুট চওড়া এক গভীর গহ্বর অতিক্রম করিয়াছিলেন।

সিনেমা-ছবিতে মোটর-বাইকে চড়িয়া দুঃসাহসিক কশরতি দেখাইতে প্যারিশ নামে এক মার্কিণ বাইক-বাহীর পটুতা ছিল অসাধারণ। চলন্ত মোটর-বাইক হইতে তিনি দড়ির সিঁড়ি ধরিয়া উড়ন্ত প্লেনে উঠিয়া যাইতেন! বাইক-সমেত মাঠের মধ্যে শূন্যমার্গে লাফ দেওয়া ছিল তাঁর অশেষ সহজসাধ্য। সার্কাশের রঙ্গক্ষেত্রে তক্তার উপর দিয়া বাইক চালাইতে চালাইতে ঝাঁপ খাওয়া—এ খেলা দেখাইয়া তিনি বহু দর্শকের তাক লাগাইয়া ছিলেন! শেষে একবার জলার ধারে মোটা পাইপের উপর দিয়া তিনি চলিয়াছিলেন মোটর-বাইকে চড়িয়া—বেশ বেগে। পাইপ হইতে যেখানে সমতল ভূমে নামিবেন, সেখানে একটি রমণী ও বালক আসিয়া উপস্থিত। পাইপের উপর দিয়া মোটর-বাইকে চড়িয়া মানুষ আসিতেছে দেখিয়া তারা দু'জনে হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া পড়িল। প্যারিশ দেখিলেন, ও দিকে গাড়ী থামাইবার উপায় নাই—যেখানে নামিবেন সেখানে ঐ স্ত্রীলোক এবং বালক দাঁড়াইয়া আছে। সোজা নামিলে তাদের ঘাড়ে পড়িবেন,—তাদের প্রাণ যাইবে। তখন তাদের প্রাণ রক্ষা করিতে তিনি বিপথে ঝাঁপ দিলেন। গাড়ী-সমেত তিনি গিয়া পড়িলেন পাথরের স্তূপে। গাড়ী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল; সঙ্গে সঙ্গে প্যারিশের দুই পা ভাঙ্গিল। সে ভাঙ্গা পা জীবনে আর জোড়া লাগে নাই!
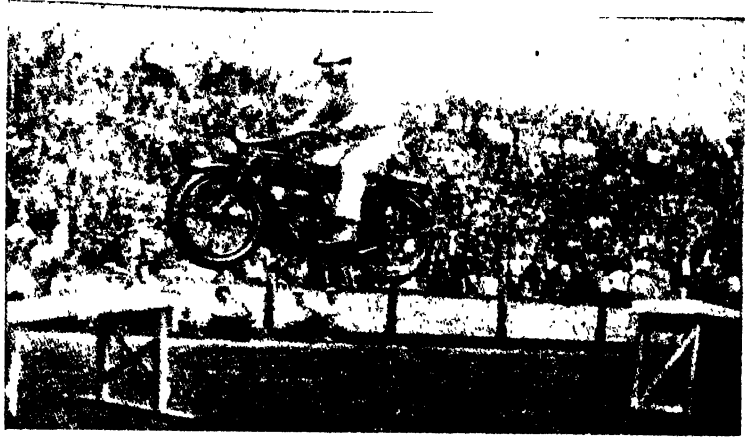
মাঠে চলিতে চলিতে ঊর্দ্ধে লম্ফ দান

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

১৯

জয়ার কাছে একটু আগে অতখানি আস্ফালন করিলেও সামনে এখন অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজীবকে দেখিয়া কামাখ্যা সাহেবের বুকখানা ধড়াশ করিয়া উঠিল! মনে পড়িল, উমাপ্রসন্ন বাঁচিয়া থাকিতে এই রাজীবের প্রতাপ ছিল কতখানি! উমাপ্রসন্নর মেজাজ যখন তাতিয়া উঠিত, তখন কামাখ্যা সাহেব তো জামাই, জামাইয়েরও সাধ্য ছিল না, সে তপ্ত মেজাজের সামনে গিয়া দাঁড়ায়! এই রাজীবকে ধরিয়াই কামাখ্যা সাহেব এক দিন উমাপ্রসন্নর কাছে কত আবেদন-নিবেদন পেশ করিয়াছে! তখন বিলাতী কারখানায় কাজ শিখিয়া আসার সার্টিফিকেটখানি মাত্র ছিল কামাখ্যা সাহেবের সম্বল! চাকরির ধান্দায় এ-দ্বারে ও-দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত! উমাপ্রসন্নই তার চাকরি করিয়া দেন; এবং সে চাকরির উমেদারী করিতে কামাখ্যা সাহেব এই রাজীবকেই মুরুব্বি ধরিয়াছিল! তার পর উমাপ্রসন্নর দেওয়া লাইট-রেলওয়ের চাকরি হইতে এখানে বাসন্তীতে এই চাকরির জোগাড়! উমাপ্রসন্ন চটিয়া আগুন হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, পাখা গজাইয়াছে—পাখা গজাইলেই ওড়ার চেষ্টা! বটে!

সাফল্যের চাপে এ সব কথা মনের মধ্যে ঢাকা ছিল! আজ পুরানো দিনের পুরানো লোক সেই রাজীবকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে সব কথা মনে পড়িল।

রাজীব বলিল,—মহীনদার ছেলেদের দেখে এলুম। খাশা হয়েছে ছেলেগুলি!

কামাখ্যা সাহেব কাগজ-পত্রের মধ্যে মনঃসংযোগ করিয়াছিল, রাজীবের কথার জবাব দিল না। জবাব দিবার প্রয়োজন মনে করিল না।

রাজীব একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কি দুঃখ-কষ্টই না পেয়ে গেছে!···যেমন মামা, তেমনি ভাগনে! দু'জনের বরাতেই সমান দুঃখ-ভোগ হলো!···বড় ছেলেটি শুনলুম পড়া ছেড়ে দেছে!···কথার শেষে আবার একটা নিশ্বাস!

সে-নিশ্বাসে যেন আগুনের হল্‌কা! কামাখ্যা সাহেবের মনে হইল, নিশ্বাসের ও-হল্‌কা যেন তাকে স্পর্শ করিয়াছে।

রাজীব বলিল—আচ্ছা জামাইবাবু, ওদের পয়সা-কড়ি···কর্তা-বাবু মারা যাবার সময় যা দিয়ে গেলেন, সে টাকা ওদের তুমি দিয়েছো?

কামাখ্যা সাহেবের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! ভাবিল, নগণ্য চাকর হইয়া এতখানি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে! এক দিন যে-মনিবের প্রশ্রয়ে মাথায় চড়িয়াছিল, সে-মনিব বাঁচিয়া থাকিলেও নয় কথা ছিল,—তা বলিয়া এখনো? সে-কাল আজ আর নাই—চাকরকে একালে মানুষ চাকর করিয়াই রাখে—তাকে মাথায় তোলে না! তুলিলেই তো এমনি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া বসিবে!

একটা উত্তর অথচ না দিলে নয়! কামাখ্যা সাহেব বলিল—এ খপর কে দিলে?

স্বরে তাচ্ছল্য ভাব···রাজীব বুঝিল। রাজীব বলিল—আমিই কথায় কথায় বৌমাকে জিজ্ঞাসা করলুম কি না! বৌমা বললেন, টাকার কোনো কথা তিনি জানেন না।

কাগজ-পত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই কামাখ্যা সাহেব বলিল—টাকা তোমার বৌমাকে দেবার ব্যবস্থা ছিল কি?

রাজীব বলিল—বৌমাকে নয়। মহীনদাকে দেবার কথা ছিল। মহীনদা টাকা পেলে বৌমা সে-টাকার কথা জানতেন না?

কামাখ্যা সাহেব বিরক্ত হইল, বলিল—তোমার সঙ্গে এখন সে সব কথা কইতে হবে না কি?

রাজীবের বয়স হইয়াছে। মানুষের মনে কত ঘোর-প্যাঁচ দুরভিসন্ধি জমে, তার তা একেবারে অবিদিত নয়! সে বলিল—সে-কথা জানতে আমার ইচ্ছা হবে বৈ কি জামাইবাবু! তুমি জানো না···তুমি তো এ বাড়ীতে এসেছো অনেক পরে—দুই ভাই-বোনকে কোলে-পিঠে করে আমি মানুষ করেছি। ওদের সেই এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি। দু'জনে ছিল যেন কর্তার দু'চোখের তারা! মহীনদার উপরে কর্তা রাগ করলেন···মহীনদা চাকরি নিয়ে চলে গেল বলে'! তার পর কর্তা আমার কাছে কত দুঃখই জানাতেন!···শেষে শেষ সময় এগিয়ে আসছে বুঝে আমাকে ডেকে ধমকে বললেন, খুঁজে ডেকে নিয়ে আয় মহীনকে।···আমি পারলুম না। তখন আমাকে বললেন, জয়াকে চিঠি লেখ, আসতে বল্···মহীনের বিষয়-সম্পত্তি জয়াকে বুঝিয়ে তার হাতে আমি দিয়ে যাবো। তাই তোমাদের হাজারিবাগে আসতে লেখা হয়েছিল। কর্তার কথায় বিষয়ের নতুন ব্যবস্থা করা হলো। তার জন্য সেই উইল লেখানো! চোখের সামনে আমি সব দেখতে পাচ্ছি জামাই-বাবু! আমার চোখের সামনে সে-সব জ্বলজ্বল্ করছে! তুমি উইল পড়ে শোনালে···তার পর সই করতে গিয়ে কর্তার চোখ এলো ঝাপ্‌সা হয়ে! তখন আমাকে তাঁর সেই ধমক···কোথা থেকে কম-জোরের আলো এনেছিস্. চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না···!

আবেগের উচ্ছ্বাসে রাজীবের স্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিল; কথা শেষ হইল না!

কথাগুলা কামাখ্যা সাহেবের মনে তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিঁধিয়া তাকে জর্জ্জরিত করিতেছিল। কামাখ্যা সাহেব বিরক্ত হইল। একে বাড়ীতে ছেলেদের জন্য অশান্তি জমিয়াছে অনেকখানি! তার উপর এ আবার কি নূতন দুর্গ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল! রাজীবের কথা কোনো দিন তার মনে হয় নাই! সামান্য একটা ভৃত্য··· কোথায় কাহার গৃহে চাকরি করিতেছিল···ঘটনাচক্রে সে এখানে আসিয়া জুটিয়াছে!

কিন্তু চটাচটি-বকাবকি করিয়া লাভ হইবে না! উমাপ্রসন্নর প্রশ্রয়ের প্রভাব এখনো কাটে নাই! এখনো সে প্রশ্রয়ের স্মৃতি প্রখর হইয়া রাজীবকে এমন দুর্দ্ধর্ষ রাখিয়াছে! এ সব কথার একটা জুৎসই জবাব দিয়া রাজীবকে চুপ করাইতে না পারিলে সহজে ও এ-প্রসঙ্গ ছাড়িবে বলিয়া মনে হয় না! জুৎসই জবাব ভাবিয়া ঠিক করা দরকার! কড়া মেজাজে চটু করিয়া কিছু বলা ঠিক হইবে না

তাই কোনো মতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কামাখ্যা সাহেব শান্ত স্বরে বলিল—এর মধ্যে অনেক কথা আছে রাজীব। আইন-কানুনের কথা। এখন কাজের সময় সে সব কথা হতে পারে না। তুমি দু'-চার দিন এখানে আছো তো···সামনের রবিবারে এসো। সে সময় সব ব্যাপার তোমাকে বুঝিয়ে দেবো···বুঝলে!

কথাটা রাজীবের খুব মনঃপূত হইল না। বুঝিল, ভিতরে মস্ত অভিসন্ধির খেলা আছে! কথায় বলে, জামাই কখনো আপনার হয় না···কামাখ্যা সাহেব তো সেই জামাই! রাজীব বলিল—আমি কি অত দিন থাকবো, জামাইবাবু? কালই বোধ হয় চলে যাবো। আমার এ কথা বলার মানে, কর্তার কাছে তুমি আর জয়াদি—দু'জনে বাকাদও আছো! মারা যাবার সময় তাঁকে কথা দিয়েছিলে। আমি সে কথার সাক্ষী! আমার মনে সে জন্য কি অস্বস্তি যে জেগে আছে! তোমার সঙ্গে উইলের কথা ঐ দিনই হয়েছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে হামেশা এই সব কথা হতো! বলতেন, উকিল ডেকে আন্···উইল লেখাবো···সব মতীনকে দিয়ে যাবো···তার উপর অবিচার করেছি··· জানি, মেচে অভাব নিয়েছে সে···বৌ-ছেলেমেয়ে···সকলকে নিয়ে অনেক দুঃখ পাবে সে! আমিই আরো বলতুম—তাকে সব দেবে কেন বাবু? জয়াদিকেও মানুষ করেছো···উইলে জয়াদিকে একবার যখন সব-কিছু দেছ···ওরা জানে, জয়াদিই তোমার সব কিছু পাবে, জয়াদির ছেলেমেয়েরা পাবে, এখন সব কেড়ে নিলে তাদের নিশ্বাস পড়বে না?

একসঙ্গে এতগুলা কথা বলিয়া রাজীব যেন হাঁপাইয়া পড়িল··· সে চুপ করিল। তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল, —আমার কাছে তোমরা যা, মতীনদাও তাই। তাছাড়া আইন-কানুন নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি আমি! চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি, কর্তা সেই পড়ে আছেন···মুখে কথা নেই, অথচ ভিতরে টন্‌টনে জ্ঞান! জয়াদির পানে কি-চোখে চেয়েছিলেন! জয়াদি' যখন বললে, কিসের ভয় জ্যাঠামশাই? উইল সই না করলেও মতীনের টাকা আমি মতীনকে দেবো···তুমি নিশ্চিন্ত থাকো! জয়াদির এ কথায় মনে শান্তি পেয়ে তবে তিনি চোখ বুজলেন!

রাজীবের কথায় উমাপ্রসন্নর অন্তিম-ক্ষণের দৃশ্য কামাখ্যা সাহেবের চোখের সামনে জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিল!···বুকের মধ্যে যেন শ্রাবণ-মেঘের গর্জ্জন চলিয়াছে···মুখ পাংশু বিবর্ণ···কামাখ্যা সাহেবের কণ্ঠে কথা বাহির হইল না!···কি কথা কহিবে?

রাজীব বলিল—আমি শুধু জানতে চাই, ওদের ভাগ ওদের তোমরা দিয়েছো কি না। জয়াদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম···জয়াদি বললে, বিষয়-আশয়ের কথা তোমার জামাইবাবু জানেন—আমি মেয়েমানুষ ও-সব কিছু জানি না, রাজীব। তাই···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—বেশ, তাহলে আজ সন্ধ্যার সময় এসো। সব ব্যাপার তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেবো।

রাজীব বলিল—আমি মুখ্যু মানুষ···বোঝাবার কি-বা আছে এতে যে বোঝাবে বলো? ও-বাড়ীতে বৌদি বললেন, মামাবাবুর দেওয়া একটা কাণাকড়ি তাঁরা পাননি! পেলে হয়তো মতীনদার চিকিৎসা হতো···দেহে রোগ নিয়ে ভুগে খেটে ছেলেটা মারা যেতো না!···তুমি তাহলে সে-টাকা ওদের দাওনি!

কামাখ্যা সাহেবের মনের মধ্যে বৈশাখী মেঘে-মেঘে ঠোকাঠুকি লাগিয়া বিদ্যুতের আগুন বাহির হইল। বিদ্যুতের সে আলোয় কামাখ্যা সাহেব যেন উপায় দেখিতে পাইল! জোর গলায় বলিল—সে লেখাকে উইল বলে না রাজীব। কোনো আদালত তা গ্রাহ্য করতো না। উকিলদের সঙ্গে ও-সম্বন্ধে আমি অনেক পরামর্শ করেছি। তাঁরা সকলেই বললেন, আদালতে সে-লেখা বার করলে হেসে আদালত সে-লেখা ছিঁড়ে ফেলবে। আইন নিয়ে আদালতের কাজ···আইন না মেনে পৃথিবীতে আজ এক-পা চলবার জো নেই!

কথাটা বলিয়া বিজয়ীর মতো দীপ্ত দৃষ্টিতে কামাখ্যা সাহেব চাহিল রাজীবের পানে।

কামাখ্যা সাহেবের পানে রাজীব অবিচল নেত্রে চাহিয়া রহিল··· ক্ষণ কাল। তার পর একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তাঁর মৃত্যুকালে জয়াদি তাঁকে যে-কথা বলেছিল···তাঁর শেষ ইচ্ছা··· জয়াদি সে-কথা মানবে না? একটা ধর্ম্ম আছে তো।

কামাখ্যা সাহেবের আর সহ্য হইল না···খ্যাক করিয়া উঠিল। বলিল—ধর্ম্ম শিখবো আমি একটা খানশামা চাকরের কাছে! আস্পর্দ্ধা কম নয়, দেখছি। যাও···চলে যাও এখান থেকে···বিরক্ত করো না। এটা আমার বাড়ী, কাছারি নয় যে এখানে এসে মোক্তারি করবে!

রাজীব চমকিয়া উঠিল। সেই জামাইবাবু···এক দিন যে এই খানশামা চাকরকে মুরুব্বি ধরিয়া কর্ত্তার কাছে বায়না জানাইত···

শান্ত স্বরে রাজীব বলিল—যাচ্ছি জামাইবাবু। কিন্তু একটা কথা বলে যাচ্ছি, এখনো চন্দর-সুয্যি উঠছে। মানুষকে ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ নয়।

রাজীব ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। কামাখ্যা সাহেব বসিয়া রহিল নিঃশব্দে···যেন কাঠ!

একটু পরে ঘরে আসিয়া ঢুকিল জয়া।

জয়া বলিল—কার সঙ্গে চেঁচামেচি করছিলে?

বিরক্ত কণ্ঠে কামাখ্যা সাহেব বলিল—তোমার মামাবাবুর সেই পেয়ারের খানশামা রাজীব···লেকচার দিতে এসেছেন···আমাকে দেন ধর্ম্ম-উপদেশ! ইমপার্টিনেন্ট র‍্যাস্কেল!

জয়া বলিল—জ্যাঠাবাবুর উইলের কথা বলছিল বুঝি?

—হ্যাঁ। বলে, ওদের ভাগ ওদের বুঝিয়ে দেছো তো? তোমার কাছেও এসেছিল, শুনলুম!···তুমি নিশ্চয় আস্কারা দিয়েছো!

জয়া বলিল—আস্কারা দিয়েছি!···তার মানে?

কামাখ্যা সাহেব বলিল—মানে-টানে বুঝি না। বললে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি বলেছো, বিষয়-সম্পত্তির কথা···মেয়েমানুষ তুমি কিছু জানো না···জানে জামাইবাবু।

জয়া বলিল—বলেছি ও-কথা।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—হুঁঃ! উইল! ওকে উইল বলে না! কোনো আইনে বলে না! সই নেই, কিছু না···হুঁঃ! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো গে!

স্বামী আশ্বাস দিলেও জয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। পুরানো দিনের প্রত্যেকটি কথা কাঁটার মতো অহর্নিশি বুকে বিঁধিয়া মনকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিল!······

কিন্তু উপায় কি ? কত দিন কাটিয়া গিয়াছে···এখন জয়া কি করিতে পারে ?

করিবার কথা যখন মনে জাগিয়াছিল, তখন কোথায় ছিল মহীন ? তার সন্ধান জানিলে হয়তো বা···

২০

রাজীব আসিয়া গৌরী ঠাকুরাণীর কাছে কামাখ্যা সাহেবের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। নিজে হইতে বলিতে হইল না! গৌরী ঠাকুরাণীই তাকে উস্কাইয়া দিয়াছিলেন···বলিয়াছিলেন,—তুমি যাও রাজীব, গিয়ে তোমাদের জামাই সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ও-কথা বলো গে! কিসের ভয়! তুমি সে সময় কাছে ছিলে··· সব জানো-শোনো! কেনই বা বলবে না? তুমি থাকতে এদের ফাঁকি দেবে, এ কেমন কথা!

সুভাষিণী মানা করিয়াছিল,—না দিদি! থাক্! কি হবে আমার ও-টাকায়! যাঁর টাকা, তাঁর কাজে লাগলো না যখন? ···মামাবাবুর রাগটুকু মাথায় নিয়ে তিনি যখন চলে গেলেন···

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—তুমি চুপ করো। এ কথায় চুপ করে থাকলে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হবে! শুনিই না কামাখ্যা সাহেব কি জবাব দেয়!

কাজেই গৌরী ঠাকুরাণীর প্রশ্নে তাঁর কাছে রাজীবকে কথাটা প্রকাশ করিতে হইল।

শুনিয়া গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—আইন দেখিয়েছে! বটে! আচ্ছা, ও টাকা আদায় হয় কি না, দেখে নেবো! আমি গৌরী বামনী···উনি কত বড় সাহেব, আমিও দেখে নেবো।

এখানে রাজীবের আর থাকা হইল না। সুরুচিকে দেখাশুনার সঙ্গে সঙ্গে ও-বাড়ীতে বিবাহের কথা এক-রকম পাকা হইয়া গেল। ছেলে দেখিয়া জানকী বাবুর পছন্দ হইল। আর পাত্রী? পাত্রীর তো কথাই নাই। সুরুচির মতো মেয়ে···জানকী বাবুর মতো কুটুম···বহু সৌভাগ্য না থাকিলে এমন মেলে না!

পরের দিন বাসন্তী ত্যাগ করিয়া পাত্র-পক্ষ চলিয়া গেল! জানকী বাবু বলিলেন—যত শীঘ্র হয় দিন-ক্ষণ দেখিয়ে স্থির করে জানাবেন···আমি সব সময়ে তৈরী আছি!

গৌরী ঠাকুরাণীর এখানে থাকা হইল না। সেখানে সত্যবানের মার সনির্বন্ধ অনুরোধ! তাছাড়া এখানে একলা পড়িয়া থাকা! তিনিও কলিকাতায় ফিরিলেন। যাইবার সময় সুভাষিণীকে বলিয়া গেলেন,—বিয়ের সময় এখানে আসবো বৌ···দিলুর বিয়ের ঠিক করে আসবো। মেয়ে আমার দেখা···চমৎকার বৌ হবে···রূপে-গুণে যাকে বলে, লক্ষ্মী!

সজল চক্ষে সুভাষিণী বলিল—তোমার ছেলে!···আমি কি মানুষ, দিদি? তুমি ওদের মানুষ করে সংসারে থিতু করে দিয়ো। আমি তো বসে বসে যাবার দিন গুণছি!

গৌরী ঠাকুরাণী বলিলেন—এর মধ্যে যাওয়া কি! ছেলেদের মানুষ করলে···ছেলে-বৌ নিয়ে দু'দিন সুখভোগ করো, তার পর যাবার কথা মনে এনো। সংসারে এসেছিলে কেবল দুঃখ-কষ্ট সইতে! ···বুকের রক্ত দিয়ে ছেলেদের মানুষ করেছো···হোমরা-চোমরা পুরুষমানুষে পারে না ছেলে মানুষ করতে! তুমি মেয়েমানুষ হয়ে সে-কাজ করেছো। তোমার গুণেই ছেলেরা আজ মাথা তুলে পাঁচ জনের মাঝখানে দাঁড়াবার মতো হয়েছে···

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুভাষিণী বলিল—আমার গুণে নয় দিদি···ওদের নিজের গুণে আর তোমাদের আশীর্ব্বাদে ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে··· না হলে আমি কে? শুধু দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি!···সব সময় ভয়ে যেন কাঁটা হয়ে আছি!

—না, না, কিসের ভয়! তোমার মন ভালো···তার ফল পাবেই বোন্!

পরের দিন অফিসে একটা কলরব শুনা গেল। জানকী বাবু বাহিরের যে নূতন কোম্পানির ভার লইয়াছেন, সেটি চাল্‌শার ওদিকে মস্ত এক চা-বাগান। চাল্‌শা ডুয়ার্স লাইনে। গুজব, সেখানে ম্যানেজারের আসনে দিলীপকে বসানো হইবে।

অফিসে আসিয়া পিনাকী এ কথা শুনিল. শুনিয়া হিংসায় রাগে সে জ্বলিতে লাগিল!···ওদিকে বাড়ীতে বরাবর শুনিয়া আসিয়াছে, জানকী বাবুর মেয়ে সুরুচির সঙ্গে তার বিবাহ হইবে এবং সে-বিবাহের দৌলতে পিনাকী এক দিন···

ওদিককার আশার রঙীন ফানুশ ছিঁড়িয়া চুরমার হইয়াছে। জানকী বাবু তাঁর মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়াছেন কোথাকার এক বিলাত-ফেরত এঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে! তার পর এদিকেও নূতন অফিসে তার ম্যানেজারীর আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল!···

বাপের উপর রাগ হইল। শুধু নিজের স্বার্থ, নিজের পোজিশন লইয়া মত্ত। ছেলের উপর বাপের যে একটা কর্ত্তব্য, সে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এতখানি উদাসীন! স্বার্থপর বাপ!···

তার পর ঐ দিলীপ···অবস্থা যেমন, কোথায় পায়ের তলায় পড়িয়া থাকিবে, না, মোসাহেবীতে জানকী বাবুকে তুষ্ট করিয়া আজ এতখানি উচ্চাসন লাভের স্পর্দ্ধা হইয়াছে তার! ম্যানেজারী করিতে হইলে যে শিক্ষা-দীক্ষা, যে সোশাল পোজিশন থাকা প্রয়োজন, সে শিক্ষা-দীক্ষা, সে পোজিশন···উহার আছে না কি? উহাকেই কি না জানকী বাবু ম্যানেজারের আসনে বসাইবেন! অবিচার আর কাহাকে বলে!

নিজের চেয়ারে বসিয়া পিনাকী সিগারেট টানিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আগুনের চাকা ঘুরিতেছে! টেবিলের উপর ক'খানা কাগজ পড়িয়া আছে···খাতা দেখিয়া রেফারেন্সের নম্বর নোট করিয়া দিতে হইবে, সে-দিকে তার হুঁশ নাই!

বেয়ারা আসিয়া দু'-তিন বার ঘুরিয়া গেল। দেখিয়া গেল, পিনাকী কাগজের তাড়ায় হাত দেয় নাই!

দিলীপ ডাকিল বেয়ারাকে। বলিল,—সে কাগজগুলো আনলে রঘু?

বেয়ারা রঘু বলিল—পিনাকী বাবু, কাগজ এখনো দেখেননি। কাগজ যেমন, তেমনি পড়ে আছে।

দিলীপ বলিল—দু'ঘণ্টা আগে দেবার কথা যে! যাও, যাও বাবুকে বলো কাগজগুলো ঠিক করে আনো! এখনি ডাক যাবে; ও কাগজ আজ পাঠানো চাই-ই। বাবুকে তুমি বলো গে···খুব জরুরি কাগজ। ওঁর বোধ হয় মনে নেই!

রঘু বলিল—টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে বাবু বসে সিগারেট খাচ্ছেন!

দিলীপ বলিল—তুমি বলো গে যাও···আমার নাম করে বলো, কাগজগুলো এখনি না দিলে নয়!

এ সব কাজের দায়িত্ব এখন দিলীপের···অফিসের ডাক যায় তার হাত দিয়া।

রঘু গিয়া পিনাকীকে বলিল—কাগজ···দিলীপ বাবু বললেন, এখনি দরকার।

—কে বলেছে?

—দিলীপ বাবু।

মনের মধ্যে বারুদ জমানো ছিল! দিলীপের নাম···সে বারুদে পড়িল যেন দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি! পিনাকী জ্বলিয়া উঠিল এবং সশব্দে গর্জ্জন তুলিল—দিলীপ বাবু! তিনি হুকুম করেছেন আমাকে! বলো গে, আমার শরীর ভালো নয়···সুস্থ হলে কাগজ দেখে পাঠাবো।

পিনাকীর মেজাজ রঘু জানে। তার উপর পিনাকী এখানকার ম্যানেজার সাহেবের পুত্র···ভয়ে সিঁটাইয়া রঘু দাঁড়াইয়া রহিল।

পিনাকীর গ্রাহ্য নাই! সে যেমন, তেমনি সিগারেট টানিতে লাগিল।

রঘু বলিল—বাবু···

পিনাকী ধমক দিল, বলিল—যাও···

রঘু অফিসের বেয়ারা, বাড়ীর নয়। অফিসের চাকরি নিরাপদ, তা সে জানে; এবং জানকী বাবুর মতো মনিবের নিমক খায়, কাজেই ও-ধমকে সে দমিল না। নিমকের মর্য্যাদা রাখিয়া আবার বলিল—এখনি ডাক যাবে···কাগজ না দিলে নয় বাবু, দিলীপ বাবু বলে দিলেন।

চেয়ার ঠেলিয়া পিনাকী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—কাগজ যাবে না···আমার হুকুম!···যাও! গিয়ে তোমার দিলীপ বাবুকে বলো, তিনি আমার মনিব নন্ যে মুখের কথা খশাবামাত্র তাঁর হুকুম আমি তামিল করবো! দিলীপ বাবু চালাবেন আমার উপর হুকুম! বটে!···গেট্ আউট্···

কথাটা বেশ উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ পাইল এবং সে কণ্ঠ শুনিয়া ঘরে ঢুকিলেন জানকী বাবু। জানকী বাবু বলিলেন—ব্যাপার কি পিনাকী? এমন ধমক-চমক?

হাতের সিগারেট সতর্ক ভাবে মেঝেয় ফেলিয়া জুতা দিয়া মাড়াইয়া পিনাকী বলিল—আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে···তাই খাতা দেখে কটা রেফারেন্স দিতে দেরী হয়েছে···দিলীপ বাবু জোর তাগাদা দিচ্ছে! তাই বলছিলুম রঘুকে···

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জানকী বাবু চাহিলেন রঘুর পানে, বলিলেন—কি হয়েছে রঘু?

রঘু সব কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া জানকী বাবু বলিলেন—অফিসের কাজ কারো জন্ম পড়ে থাকতে পারে না পিনাকী! তোমার শরীর অসুস্থ হয়ে থাকে, সে কথা দিলীপকে বলে তোমার কাজের ব্যবস্থা আর কাকেও দিয়ে করাতে পারো!···তাছাড়া অফিসের মধ্যে এমন তর্জ্জন-গর্জ্জন···

পিনাকী একেবারে কাঠ! তার মুখে কথা ফুটিল না। জানকী বাবু বলিলেন—তোমার কথা আমার কাণে গেছে! তুমি বলছিলে, দিলীপ বাবু তোমার মনিব নন যে, তোমাকে তিনি হুকুম করবেন! অফিসের মধ্যে যিনি যে-ডিপার্টমেন্টের হেড, সে-ডিপার্টমেন্টের আর-সকলে অফিসের কাজে সে-হেডের আণ্ডারে সাবর্ডিনেট। হেড যা বলবে, সাবর্ডিনেটরা তা মানতে বাধ্য। হেডের উপর ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব।···অফিসের মধ্যে সামাজিক পদ-মর্য্যাদা কিম্বা পৈত্রিক ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের কথা উঠতে পারে না। তোমার বাবা অফিসের ম্যানেজার···তাঁর বিধি-নিয়ম ভেঙ্গে আমিও নিজের ইচ্ছায় অফিসে কিছু করতে পারি না। তার কারণ, তা করলে অফিসের ডিসিপ্লিন ভাঙ্গবে···অফিস অচল হবে।

পিনাকী নিঃশব্দে এ কথা শুনিল। মনে হইতেছিল, ভাগ্য বিরূপ! নহিলে কাজের দিক্ দিয়া এতখানি বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইবে কেন?

জানকী বাবু বলিলেন—আজ তোমার মুখে যে-কথা শুনলুম, এ-ঘরে এসে যে-মেজাজ দেখলুম, ভবিষ্যতে এমন যেন আর না হয়! হলে এ অফিসে তোমাকে রাখা অফিসের পক্ষে নিরাপদ মনে করতে পারবো না!

তার পর রঘুর পানে চাহিয়া বলিলেন—কি কাগজ দরকার?

রঘু বলিল—কলকাতার এ্যাণ্ডারসন কোম্পানির বিল আর অন্ত কি সব কোম্পানির চিঠি। ঐ যে ফাইল···ঐ ফাইলে আছে।

জানকী বাবু সে-ফাইল হাতে লইলেন এবং পিনাকীর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—পারবে তুমি দেখে দিতে? না, তোমার শরীর অসুস্থ···আর কাকেও এ কাজের ভার দেবো?

পিনাকী যেন জালে-পড়া বাঘের মতো। হুঙ্কার থামিয়াছে! শান্ত স্বরে পিনাকী বলিল—মাথাটা আমার ভয়ানক ধরে রয়েছে···হিসেবে পাছে ভুল হয়···

—বেশ···আমি প্রকাশ বাবুকে বলছি, তিনি দেখে দেবেন! তুমি অসুস্থ বোধ করো, ছুটী দিচ্ছি···বাড়ী যেতে পারো। ইউ বেটার গো হোম্ এ্যাণ্ড টেক্ রেষ্ট!

ফণা তুলিয়া ছোবল দিতে গিয়া এভাবে জর্জ্জরিত হইলে সাপও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে···পিনাকী তো মানুষ। জানকী বাবুর এ কথার পর অফিস ত্যাগ করিয়া ইজ্জৎ বাঁচাইতে পাইয়া সে যেন বর্ত্তাইয়া গেল।

পাঁচ-সাত দিন পরে পিনাকীর মাথায় আবার বজ্রাঘাত হইল। কামাখ্যা সাহেবের অফিস-কামরায় বেলা দুটার সময় পিনাকীর ডাক পড়িল। পিনাকী আসিয়া কামাখ্যা সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল।

কামাখ্যা সাহেবের মূর্ত্তি গম্ভীর! বলিল,—বসো।

পিনাকী বসিল কামাখ্যা সাহেবের সামনের চেয়ারে। নিজের খাশ-বেয়ারা নাথুকে কামাখ্যা সাহেব বলিল—তুই বাইরে যা! দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যা। কেউ যেন এ ঘরে এখন না আসে···দরজায় তুই মোতায়েন থাকবি।

নাথু অক্ষরে-অক্ষরে মনিবের আদেশ পালন করিল। সে চলিয়া গেলে ঘরে রহিল শুধু পিতা কামাখ্যা সাহেব এবং পুত্র পিনাকী।

কামাখ্যা সাহেব একখানা চেক এবং চেকের সঙ্গে ব্যাঙ্কের

স্লিপ পিনাকীর হাতে দিল। দিয়া বলিল—এর মানে বলতে পারো পিনাকী বাবু?

চেক দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে পিনাকীর বিলম্ব হইল না! সে বলিল—কি জানতে চান্ বলুন?

কামাখ্যা সাহেব বলিল,—এ দেখছি পাঁচশো টাকার চেক! তোমার নামে আমি ড্র করেছি···নীচে আমার নাম সই এবং তারিখও দেখছি হপ্তা-খানেকের মধ্যে!

কথাটা বলিয়া কামাখ্যা সাহেব চাহিল পিনাকীর পানে··· তার দু'চোখের দৃষ্টি গম্ভীর।

পিনাকী বলিল—ওতে তাই লেখাও আছে।

কামাখ্যা সাহেবের মুখ আরো গম্ভীর হইল এবং গম্ভীর কণ্ঠে কামাখ্যা সাহেব কহিল,—আমার যত দূর মনে হয়, দু'মাসের মধ্যে তোমাকে আমি একটি পয়সার চেক দিইনি! আমার স্মরণ-শক্তি প্রখর বলেই আমার বিশ্বাস! এ চেক আমি তোমাকে দিয়েছি, তুমি বলতে চাও?

পিনাকী বলিল—আপনি আমাকে জানেনি। আমার টাকার খুব দরকার হয়েছিল···আপনার কাছ থেকে টাকা চাইলে আপনি দেবেন না, কাজেই নিজে থেকে এ টাকার ব্যবস্থা আমাকে করে নিতে হয়েছে।

—তার মানে?···এ সই আমার, তুমি বলতে চাও?

নদীর জলে জোয়ারের বেগ ক্ষণে ক্ষণে যেমন বাড়ে, পিনাকীর সাহস তেমনি ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য্য রেটে বাড়িয়া উঠিতেছিল!

পিনাকী বলিল—সে-সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ হচ্ছে? হবার কথা নয় কিন্তু! It is so alike.

রাগে কামাখ্যা সাহেবের অস্থিমজ্জা জ্বলিয়া উঠিল। কামাখ্যা সাহেব বলিল—এ জাল সই! তুমিই তাহলে জাল করেছো আমার নাম!

পিনাকী বলিল—করেছি।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এই চিঠি···এ-চিঠি লিখে পাঠিয়েছে এখানকার সিল্ক-শাড়ীওলা সাতরামলের ম্যানেজার। লিখেছে, আপনার ছেলে আপনার ড্র-করা ক্রশচেক আমাদের কাছে দিয়ে নগদ পাঁচশো টাকা নিয়ে গেছেন···জরুরি দরকার বলে। চেক কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে···নাম-সই ঠিক মেলেনি বলে!

পিনাকী এতক্ষণে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে! সে বলিল,—হ্যাঁ! আপনার ড্রয়ার থেকে চেক-বই বার করে' নিয়ে ও-চেকে আপনার নাম আমি সই করে আমার নামে পাঁচশো টাকার চেক কেটেছি। সে-চেক সাতরামলের ম্যানেজারের হাতে দিয়ে বলেছিলুম নগদ টাকার এখনি দরকার···এ চেক রেখে আমাকে আপনারা পাঁচশো টাকা দিন···তার পর ব্যাঙ্কে চেক পাঠিয়ে ভাঙ্গিয়ে আপনারা টাকা নেবেন। তাই বিশ্বাস করে ঐ চেক রেখে তিনি আমাকে পাঁচশো টাকা দেছেন।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এখন সে চেক ফেরত এসেছে! টাকাটা তুমি ওদের পাঠিয়ে দাও।

পিনাকী বলিল—আমার টাকা কোথায় যে পাঠাবো?

—সাত দিনে পাঁচশো টাকা খরচ করে বসেছো! বাপের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করেছো না কি?

পিনাকী বলিল—পোষাকের বিল এসেছিল···দু'শো চব্বিশ টাকা। আরো কতকগুলো খুচরো দেনা ছিল···আপনি আমার এ্যালাওয়েন্স বন্ধ করে দেছেন! মার কাছে টাকা চেয়েছিলুম, মা জবাব দিলে, মার হাতে টাকা নেই। কাজেই···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কাজেই আমার নাম জাল করে চেক কাটবে! Downright forgery!

পিনাকী চলিয়া যাইতেছিল, কামাখ্যা সাহেব ডাকিল—শোনো···

পিনাকী ফিরিল।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—এ টাকা কে দেবে?

—আপনার চেক···আপনি দেবেন। আপনার ইজ্জৎ···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—নেভার! জানো, তুমি যা করেছো, এর জন্য তোমার জেল হতে পারে?

পিনাকী বলিল—দিন আমাকে জেলে! কি ভালো আমার করেছেন আপনি যার জন্য আমি আপনাকে মেনে চলবো? বাড়ী আমার জেলখানা বলে' মনে হয়। আমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ করে দেছেন···ভাবেন, আমার পোজিশন নেই?···তার উপর আমাকে ডিঙ্গিয়ে কাঙ্গালী-ভিখিরীর ছেলেরা অফিসে উঁচু পোষ্ট পাচ্ছে! আপনি আমায় জেলে দিন। জেলে গেলে বাড়ীর চেয়ে আমি বেশী আরামে থাকবো। তাতে আপনারো প্রেষ্টিজ বাড়বে···কীর্ত্তি থাকবে!

দুঃখে রাগে কামাখ্যা সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিল—স্কাউণ্ড্রেল!

সঙ্গে সঙ্গে পিনাকীর গালে সবেগে চপেটাঘাত পড়িল। এ আঘাতের জন্য পিনাকী প্রস্তুত ছিল না, বেগ সামলাইতে না পারিয়া দুম্ করিয়া সে কামরার মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

নিরুপায় রোষে কাঁপিতে কাঁপিতে কামাখ্যা সাহেব চেয়ার টানিয়া চেয়ারে বসিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

ভাঙা পূরবী

পূরবীর অনেক পুরানো তান হেথা বসে শুনি,
সন্ধ্যার আকাশে তারা সকরুণ ভাঙা সুরে কাঁপে;
কত আশা শেষ হলো, কত কান্না এলো, তাই গুণি—
অন্ধকার কত রাত একা একা বসে বসে যাপে।

হিসাবের শূন্য খাতা পূর্ণ শুধু ব্যর্থ আর্ত্ত স্বরে,
যুগান্তের সেই ছবি চিরদিন রুক্ষ শুষ্ক ম্লান,
যত গান যত আলো, তবে হায় ছিল কার তরে?
আজিকে সন্ধ্যায় তাই শোনা যায় ভাঙা-চোরা তান!

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব-সংগ্রাম পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। দারুণ উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তায় সুদীর্ঘ তিন বৎসর অতিবাহিত হইবার পর চতুর্থ বৎসরের শেষভাগে যুদ্ধের গতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ ঘোষণার দিন স্মরণ করা হইয়াছিল, তখন এত শীঘ্র যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার পর গত এক বৎসরের মধ্যেই জার্ম্মাণীর আক্রমণ-শক্তি চূর্ণ হইয়াছে, ফ্যাসিজমের জন্মদাতা মুসোলিনীর পতন ঘটিয়াছে; সর্ব্বোপরি, অক্ষশক্তির অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সহচর ইটালী জার্ম্মাণীর অজ্ঞাতসারে ত্রিশক্তির চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সম্মিলিত পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। প্রাচীতে যুদ্ধের অবস্থা এখনও সম্মিলিত পক্ষের বিশেষ অনুকূল না হইলেও য়ুরোপীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এই অঞ্চলের অবস্থাও আশাপ্রদ হইয়া উঠিতেছে। সামরিক অবস্থার এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ কারণ—মৃত্যুঞ্জয়ী রুশ সেনার অপরিসীম দৃঢ়তা। ষ্ট্যালিনগ্রাডে তাহারা হিমালয়ের ন্যায় যে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল, তাহা ভেদ করিয়া প্রতীচীর অক্ষশক্তি তাহার প্রাচ্য সহচরের সহিত মিলিত হইতে পারে নাই। অক্ষশক্তির দুই বাহুর ঘনিষ্ঠ সামরিক সহযোগের পথে এই অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন তাহাদের চরম পরাজয়ের সম্ভাবনা নিশ্চিত করিয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাড-রক্ষীদের অতুলনীয় বীরত্বের জন্যই অক্ষশক্তি মিশর জয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনানুরূপ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে নাই; সম্মিলিত পক্ষ ঐ সময়ে শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়া সজোর প্রত্যাঘাত করিতে পারিয়াছে।

ইটালীর আত্মসমর্পণ—

গত ৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববাসী অকস্মাৎ শ্রবণ করিয়াছে—পাঁচ দিন পূর্ব্বেই ইটালীর সহিত সম্মিলিত পক্ষের যুদ্ধ-বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া গিয়াছে; খাস ইটালীতে বৃটিশ ও কানাডীয় সৈন্যের অবতরণ এবং দক্ষিণ ইটালীতে তাহাদের যুদ্ধ—এই সকলই অভিনয় মাত্র। জার্ম্মাণীকে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই এই গোপনতা ও অভিনয়। বাদোগলিও-সরকার না কি বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁহাদিগকে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। ইটালীর সহিত যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কিত আলোচনা না কি কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল।

জেনারল আইসেন-হাওয়ারের বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে—যুদ্ধ-বিরতি নিছক সামরিক ব্যাপার; ইহাতে কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সর্ত্ত নাই। স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্রে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সর্ত্ত না থাকিলেও ইটালী যে কোনরূপ রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি লাভ করে নাই—ইহা বিশ্বাস করা দুষ্কর। ইটালীর পক্ষ হইতে যখন যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা আরম্ভ হয়, তখন তাহার সামরিক শক্তি সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হয় নাই। সৈন্য ও সমরোপকরণ ব্যয় না করিয়া সেই শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করায় সম্মিলিত পক্ষের সামরিক স্বার্থ ছিল। কাজেই, বাদোগলিও-সরকারের পক্ষে পরাভূত নিস্তেজ শত্রুর ন্যায় আচরণ করা স্বাভাবিক নহে। ইটালীর সমর-যন্ত্র যদি সম্পূর্ণরূপে বিকল হইয়া যাইত, তাহার জন্য সম্মিলিত পক্ষের সময় ও শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন যদি একেবারেই শেষ হইত, তাহা হইলে ইটালীয় রাজনীতিকদের পক্ষে "ব্লাঙ্ক চেকে" স্বাক্ষর দান ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না। কিন্তু সেরূপ অবস্থায় ইটালীর সহিত সম্মিলিত পক্ষের যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা হয় নাই। এই সকল কারণে মনে হয়, ইটালীর এই আত্মসমর্পণ হয়ত সম্পূর্ণ বিনা সর্ত্তে নহে।

এই সর্ত্ত কি, তাহা নিশ্চিত বলা সম্ভব নহে। তবে অনুমান করা যায়, মার্শাল বাদোগলিও হয়ত আশ্বাস পাইয়াছেন—ফ্যাসিষ্ট সরকারের কৃত অন্যায়ের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাকে ও অন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দায়ী করা হইবে না; ফ্যাসিষ্ট-তন্ত্রের সহযোগী বলিয়া ইটালীর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাঁহারা অপাংক্তেয় হইবেন না। সর্ব্বোপরি, এই নিশ্চিন্ত আশ্বাস হয়ত বাদোগলিও কোম্পানী পাইয়াছেন যে,—এত দিন যে সকল বামপন্থী ইটালীয় ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। বর্ণচোরা বাদোগলিও বুঝিয়াছিলেন—অক্ষশক্তির জয়ের আশা আর নাই. সময় থাকিতে "রং বদলাইয়া" ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির তাঁবেদারী করিতে পারিলে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিপত্তি বজায় থাকিবে। এই সম্পর্কে তিনি আশ্বাস পাইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

ইটালীর আত্মসমর্পণের কথা প্রকাশিত হইবামাত্র জার্ম্মাণী কালবিলম্ব না করিয়া ইটালীতে নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ করিয়াছে। সমগ্র ইটালীকে সামরিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত হইবার সুযোগ জার্ম্মাণী কখনই দিতে পারে না, এই জন্য জার্ম্মাণী উত্তরাঞ্চলে তাহার নিজের প্রভুত্বাধীনে "ফ্যাসিষ্ট ইটালী" গঠন করিতে প্রয়াসী। ইটালীর বর্ত্তমান অবস্থা হয়ত ক্রমে চীনের অবস্থার সহিত তুলনীয় হইতে পারিবে।

হিটলার তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় মুসোলিনীর উচ্ছ্বসিত গুণগান করিয়াছেন এবং ইটালীর আত্মসমর্পণের জন্য বাদোগলিও-সরকারকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করিয়াছেন। জার্ম্মাণী যে ইটালীকে সাহায্য দানে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নাই, তাহাও তিনি উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়াছেন। তাহার পর জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর প্যারাসুটধারী সৈন্যরা মুসোলিনীকে মুক্ত করিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি এখন জার্ম্মাণীর অধিকৃত ইটালীতে নীত হইয়াছেন। ইতোমধ্যে জার্ম্মাণী উত্তর ইটালীতে একরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর রোম অধিকারে মনে হয়, সে তাহার অধিকৃত অঞ্চল ঐ পর্য্যন্ত প্রসারিত করিবে; রোমই জার্ম্মাণীর প্রভুত্বাধীন ফ্যাসিষ্ট ইটালীর রাজধানী হইবে। মুসোলিনীর প্রশংসা করিয়া হিটলার ইটালীর ফ্যাসিষ্ট মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে আকৃষ্ট করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এখন তাঁবেদার সরকারের শীর্ষস্থানে মুসোলিনীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি ঐ সরকারকে শক্তিশালী করিতে প্রয়াসী হইবেন।

এখন প্রশ্ন—ইটালীর আত্মসমর্পণে জার্ম্মাণীর সামরিক অবস্থা কিরূপ হইল? হিটলার বলিয়াছেন—সামরিক দিক্ হইতে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই; কারণ, ইটালীকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ জার্ম্মাণীকেই বহন করিতে হইত। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। দক্ষিণ ইটালীতে সম্মিলিতপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এখন বল্‌কান্ অঞ্চল বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইতেছে। সম্মিলিত পক্ষের রণপোত এখন স্বচ্ছন্দে আড্রিয়াটিকে বিচরণ করিবে। টীরানিয়ান্ সাগরে ইটালীর

নৌ ও বিমান ঘাঁটী হইতে দক্ষিণ ফ্রান্সে আঘাত করা সম্ভব হইবে। সর্ব্বো পরি, উত্তর দিকে ইটালীর অর্দ্ধাংশে জার্ম্মাণীর তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইটালীর সমরোপকরণ, জাহাজ বা বিমানের দ্বারা জার্ম্মাণরা আদৌ উপকৃত হইবে না ; ঐ অঞ্চলে জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের শক্তিতে যুদ্ধ করিতে হইবে। ইটালীর নৌবহর সম্মিলিত পক্ষের হস্তে পতিত হওয়ায় ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-মার্কিণ নৌবাহিনী এখন একরূপ নিরঙ্কুশ। সাধারণ ভাবে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির নৌবলও শত্রুর নৌবল অপেক্ষা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। জার্ম্মাণী সহজে উত্তর ইটালী ত্যাগ করিতেও পারিবে না ; কারণ, তাহাতে ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়া বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িবে, ঐ অঞ্চলের বিমান-ঘাঁটী হইতে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও যুগোশ্লেভিয়ায় প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চলিতে পারিবে। এই দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে মনে হয়—সম্মিলিত পক্ষ জার্ম্মাণীর অধিকৃত অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ করাইবার গুরু দায়িত্ব না লইয়াই ইটালীতে শত্রুকে এখন ব্যাপৃত করাইবার সুযোগ পাইবে। জার্ম্মাণী যদি উত্তর ইটালীতে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষ তখন অন্য দিক্ হইতে জার্ম্মাণীকে আঘাত করিবার অধিকতর সুযোগ পাইবেন।

কুইবেক্ সম্মিলনী—

মিঃ চার্চ্চিল মাসাধিক কাল আট্‌লাণ্টিকের পশ্চিম তীরে অবস্থান করিতেছেন। ইতোমধ্যে কুইবেকে ঘটা করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনৈতিক ও সমর-নায়কদের সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আলোচনান্তে যে সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বলা হয়,—আলোচনার সিদ্ধান্ত কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল—পূর্ব্ব-এশিয়ার সেনাপতিপদে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ। তাহার পর প্রকাশিত হইয়াছে যে, ফরাসী জাতীয় মুক্তি পরিষদকে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন্ এত দিন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অখ্যাত ছিলেন। শুনা যায়, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের যুদ্ধে সামঞ্জস্য বিধানের কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা অপরিসীম। জাপানের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব-এশিয়ায় আক্রমণ-পরিচালনের জন্য এই তিন দল সেনাবাহিনীর তৎপরতায় সামঞ্জস্য হওয়া একান্ত প্রয়োজন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন্ যদি সত্যই এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষ হন, তাহা হইলে পূর্ব্ব-এশিয়ার সেনাপতিপদে যোগ্য ব্যক্তিই নিযুক্ত হইয়াছেন বলিতে হইবে। অবশ্য, এই যোগ্যতার প্রকৃত পরিচয় কার্য্যক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে।

বৃটেন, আমেরিকা ও রুশিয়া কর্ত্তৃক ফরাসী জাতীয় পরিষদের স্বীকৃতিতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বৃটেন ও রুশিয়া পূর্ব্ব হইতে জেনারল দ্য-গলের স্বাধীন ফরাসী সমিতিকে মানিয়া লইয়াছিল ; জেনারল জিরো আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট। কাজেই, দ্য-গল ও জিরো যখন নিজেদের মধ্যে আপোষ করিয়া উভয়ে জাতীয় মুক্তি-পরিষদে স্থান গ্রহণ করেন, তখনই বৃটেন, আমেরিকা ও রুশিয়ার পক্ষে ঐ পরিষদকে মানিয়া লইবার পথ সুগম হয়। অবশ্য, জিরো ও দ্য-গলের মধ্যে যে ভাবে মীমাংসা হইয়াছে, তাহাতে এই মীমাংসা স্থায়ী হওয়া দুষ্কর। সম্মিলিত পক্ষ জাতীয় মুক্তি পরিষদকে ফ্রান্সের বৈধ সরকার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে, ফ্রান্সের পক্ষ হইতে যুদ্ধ চালাইবার এবং সমগ্র বিশ্বে ফ্রান্সের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার অধিকার যে এই প্রতিষ্ঠানের আছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে খাস ফ্রান্স যখন শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইবে, তখন নূতন রাজনৈতিক সমস্যা যে জটিলতা সৃষ্টি করিবে না, জাতীয় মুক্তি পরিষদকে মানিয়া লওয়ায় সে আশ্বাস পাওয়া যায় নাই।

মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—প্রধানতঃ জাপানের সহিত যুদ্ধ পরিচালন-প্রসঙ্গই কুইবেকে আলোচিত হইয়াছিল। অথচ, এই সম্পর্কে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ ব্যতীত সম্মিলিত পক্ষের আর কোনরূপ ব্যবস্থা এখনও প্রকাশ পায় নাই। কুইবেকে কোন রুশ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না ; মিঃ চার্চ্চিলের কৈফিয়ৎ—জাপানের সহিত রুশিয়া অনাক্রমণ-চুক্তিতে আবদ্ধ, তাই জাপ-বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনার সময় রুশ প্রতিনিধি স্বভাবতঃ অনুপস্থিত ছিলেন। এই কৈফিয়ৎ যুক্তিসহ নহে। কুইবেকে কেবল প্রাচ্য অঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কেই আলোচনা হয় নাই ; অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রসঙ্গও আলোচিত হইয়াছে। জাপানের সহিত রুশিয়ার অনাক্রমণ-চুক্তি সত্ত্বেও জাপানের শত্রু বৃটেন ও আমেরিকার সহিত তাহার মিত্রতা যখন সম্ভব হইয়াছে, তখন কুইবেকে রুশ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলেই "ভাগবত অশুদ্ধ" হইয়া যাইত না।

সম্প্রতি যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, কুইবেক্ বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইটালী স্বতন্ত্র সন্ধি সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। অন্ততঃ কুইবেক্ বৈঠকে আলোচনা চলিবার সময় সম্মিলিত পক্ষ যে ইটালীর প্রস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ ইডেন্ হয়ত ইটালীর প্রস্তাব লইয়া এবং এই সম্পর্কে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই কুইবেকে ছুটিয়াছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার সময় রুশ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় নাই। সঙ্গত ভাবেই মনে করা যায়, ইটালীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এবং জার্ম্মাণীর অধিকৃত অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কুইবেকে আলোচনা হইয়াছে এবং ইচ্ছা করিয়া এই আলোচনা হইতে রুশিয়াকে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনৈতিকগণ জানেন যে, য়ুরোপে যুদ্ধ প্রসারিত হইবার পর শত্রুর কবল হইতে মুক্ত অঞ্চলগুলি সম্বন্ধে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হইবে। কিন্তু এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণে তাঁহাদের দীর্ঘসূত্রতা যেন ইচ্ছাকৃত। ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনৈতিকগণ যেন এই বিষয়ে রুশিয়ার সহিত এক-মত হইতে পারিবেন না বলিয়া আশঙ্কা করেন এবং সেই জন্য "বর্ত্তমানে কেবল অস্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে"—এই কথা বলিয়া তাঁহারা রুশিয়াকে দূরে রাখিতেছেন। কুইবেকে তাঁহাদের কৌশলে রুশিয়া বিরক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে ওয়াশিংটনের রুশ প্রতিনিধি মঃ লিটভিনফকে ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে। লণ্ডন হইতে মঃ মেইস্কির অপসারণের অব্যবহিত পরেই মঃ লিটভিনফের অপসারণ নিশ্চয়ই গুরুত্বহীন বিষয় নহে। কুইবেক্ সম্মিলনের সময় রুশিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান "টাস্ এজেন্সী" মন্তব্য করিয়াছিল —রুশিয়া এই সম্মিলনীতে আমন্ত্রিত হয় নাই ; এই সম্মিলনে রুশিয়ার যোগদান অভীপ্সিতও ছিল না। মস্কোর 'যুদ্ধ ও শ্রমিকশ্রেণী' নামক পাক্ষিক পত্র এই সময় ত্রিশক্তির সম্মিলনীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, লণ্ডনে

অবস্থিত বিভিন্ন দেশের সরকারের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির ব্যবহার রুশিয়ার পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—কুইবেক্ সম্মিলনীর পর তাঁহার ও মিঃ চার্চ্চিলের সহিত মঃ ষ্টালিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কিত আয়োজন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। হয়ত অতি সত্বর এই তিন জনের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হইবে। তিন জন রাষ্ট্রনায়কের প্রত্যক্ষ আলোচনার ফলে য়ুরোপের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেই ——। নতুবা, সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে এই ক্রমবর্দ্ধমান মতানৈক্যের কুফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হইতে পারে।

রুশ রণাঙ্গন—

রুশ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য সাফল্য তাহাদের খারকভ অধিকার। খারকভ ইউক্রেণের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া পরিচিত; ইহা দক্ষিণ রুশিয়ার অন্যতম প্রধান শ্রমশিল্প-কেন্দ্র। দক্ষিণাঞ্চলে খারকভই জার্ম্মাণীর সর্ব্বপ্রধান আক্রমণ-ঘাঁটী ছিল। খারকভ অধিকারের পর রুশ সেনা ডোনেৎস অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে; উত্তর ইউক্রেণে কিয়েভ লক্ষ্য করিয়াও তাহাদের আক্রমণ বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর প্রধান ঘাঁটী স্মলেনস্ক অভিমুখে তিন দিক হইতে সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণ চলিতেছে। রুশ রণক্ষেত্রের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আশা হয়—আগামী শীতকালে সমগ্র রুশ-ভূমি জার্ম্মাণীর কবল হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

রুশিয়ার সাম্প্রতিক সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেও সোভিয়েট বাহিনী কোথাও জার্ম্মাণীর বিপুল সেনাবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাহাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিতে পারে নাই। ওরেলে বিপন্ন ২। লক্ষ জার্ম্মাণ সেনা সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল; তাহার পর, খারকভ, ডোনেৎস্ অববাহিকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও জার্ম্মাণী তাহার সেনাবাহিনী অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাজেই, সোভিয়েট বাহিনীর সাম্প্রতিক সাফল্য জার্ম্মাণীর সংগ্রাম-শক্তিতে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে নাই; জার্ম্মাণীর সমর-শক্তি চূর্ণ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। আশা করা যায়, রণক্ষেত্র হইতে ইটালীর অপসৃতির পর ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি এখন জার্ম্মাণীকে প্রবল ভাবে আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবে; রুশ সৈন্যের মধ্য য়ুরোপে প্রবেশের আশঙ্কা এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে আর দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিবে না। যদি দ্বিধাশূন্য ভাবে তাঁহাদের এই অভিযান আরম্ভ হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর সমর-শক্তি দ্রুত চূর্ণ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—জার্ম্মাণী এখন দীর্ঘকাল প্রতিরোধাত্মক সংগ্রামে রত থাকিয়া সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে রাজনৈতিক মতদ্বৈধ ও সন্ধির আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করিতে চাহে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিসর স্থানে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও প্রয়োজনীয় সমরোপকরণ সন্নিবেশ করিতে পারিলেই প্রতিরোধাত্মক সংগ্রাম পরিচালন সহজসাধ্য হয়। রুশ রণাঙ্গন হইতে জার্ম্মাণী যদি অক্ষত অবস্থায় তাহার সৈন্য ও সমরোপকরণ অপসারণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই সাময়িক সুবিধা লাভ অসম্ভব নহে। অবশ্য, যুদ্ধ পরিচালনে সামরিক দিকই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে, উহার নৈতিক দিকও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। জার্ম্মাণী যদি কেবলই তাহার অধিকৃত অঞ্চলগুলি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ জাতির প্রতি উহার বিশেষ কুপ্রভাব পতিত হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধ-পরিচালনে জার্ম্মাণ জাতির কোন আদর্শগত ভিত্তি নাই, নাৎসীরা কেবল পরস্বাপহরণে পুষ্ট হইবার স্বপ্নই জার্ম্মাণ জাতিকে দেখাইয়াছে। এই স্বপ্নে জাতি বিভোর থাকিতে পারে ততক্ষণ, যতক্ষণ রণক্ষেত্র হইতে নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসে—নূতন নূতন অঞ্চল অধিকারে রাজ্যের সীমান্ত বিস্তৃত হইবার সুসংবাদ মিলে। রণক্ষেত্র হইতে ক্রমাগত নৈরাশ্যজনক সংবাদ আসিলে আদর্শহীন জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনাই অধিক। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে মনে হইবে, জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি অটুট থাকিতেও জার্ম্মাণ রাজ্যের অভ্যন্তরে আকস্মিক নাৎসী বিরোধী বিপ্লব সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে।

রুশ-ভূমি হইতে সমগ্র জার্ম্মাণ সৈন্য অপসারিত হইবার পরও জার্ম্মাণ জাতি যদি অচঞ্চল থাকে, তাহা হইলে তখন জার্ম্মাণী হয়ত শেষবার তাহার কূটনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিবে। ততদিন রুশিয়ার সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির মতানৈক্য যদি দূরীভূত না হয়—নূতন নূতন রাজনৈতিক সমস্যা লইয়া যদি সম্মিলিত পক্ষের শিবিরে মত-বিরোধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী তখন রুশিয়াকে স্বতন্ত্র সন্ধিতে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রবল প্রয়াস করিবে। বর্ত্তমানে এই সম্পর্কে যে সকল জনরব মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইয়া থাকে, তাহার কোন মূল্য নাই। সমগ্র রুশ-ভূমি জার্ম্মাণীর কবল হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্বে এই সম্পর্কে কোন কথা উঠিতে পারে না।

অবশ্য, রুশ-ভূমি জার্ম্মাণীর কবল হইতে মুক্ত হইলেই রুশিয়া যে জার্ম্মাণীর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর যে বিরোধ—ইহা আদর্শগত। কাজেই, ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির আগ্রহ অপেক্ষা রুশিয়ার আগ্রহই অধিক। তবে, দুর্ভাগ্য বশতঃ রুশিয়ার যদি এইরূপ সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ ঘটে যে, তাহার প্রতি ও য়ুরোপের গণশক্তির প্রতি অবিশ্বাসহেতু ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি হিটলার-মুসোলিনীর পরিবর্ত্তে নূতন ফ্যাসিষ্ট দলকে য়ুরোপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তখন এই প্রয়াস ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে রুশিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছায় অপ্রত্যাশিত কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিতে পারে।

সুদূর প্রাচী—

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আলিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়ন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মুণ্ডা পুনরধিকার—ইহাই প্রাচ্য অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা। বর্ত্তমানে নিউগিনিতে লে ও সালামুয়ায় ২০ হাজার জাপানী সৈন্যকে সম্মিলিত পক্ষের সেনা পরিবেষ্টিত করিয়াছে। হয়ত জাপানের এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী সত্বর সম্মিলিত পক্ষের অধিকার-ভুক্ত হইবে।

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জাপান বিতাড়িত হওয়ায় পশ্চিম গোলার্দ্ধের বিপদ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছে। সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্ব করিবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীতেও জাপান

বঞ্চিত হইল। আর, সম্মিলিত পক্ষও আলিউসিয়ান অঞ্চল হইতে খাস জাপানে বিমান আক্রমণ চালাইতে পারিবেন। ইতোমধ্যেই মার্কিণী দূরপাল্লার বিমান দুই বার কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে হানা দিয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। এই অঞ্চলে সম্মিলিত পক্ষের সাম্প্রতিক সাফল্যে অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ বহু পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। তবে ঐ অঞ্চলে জাপানের বিশালতম ঘাঁটী রবাউলে যত দিন সে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, তত দিন অষ্ট্রেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইবে না। তবে অন্য দিক্ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের গুরুত্ব আছে। সম্মিলিত পক্ষ দাবী করেন—এই অঞ্চলে শক্তিক্ষয়কারী যুদ্ধ (War of attrition) চলিতেছে। যদি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের নৌ ও বিমান শক্তি সত্যই বিশেষ আঘাত পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্যের গতি মন্থর হইলেও ঐ অঞ্চলের যুদ্ধের গুরুত্ব অল্প নহে, সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডের যুদ্ধে উহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হইবে।

পূর্ব্ব এশিয়ার সেনাপতি পদে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগে এবং সম্মিলিত পক্ষের রাজনীতিকদিগের বিভিন্ন উক্তিতে ইহা এখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, সম্মিলিত পক্ষ ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে ব্যাপক অভিযান পরিচালনের আয়োজন করিতেছেন। আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিক বার বলিয়াছি—জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাত করিবার ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশ; ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনের শক্তি বৃদ্ধি করাই জাপানকে পরাভূত করিবার প্রকৃত উপায়। আমরা এই কথাও বলিয়াছি যে, ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিতে হইলে ভারত মহাসাগরে সম্মিলিত পক্ষের বিশাল নৌবাহিনী সন্নিবিষ্ট করা প্রয়োজন; ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তপথে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে ইটালীর আত্মসমর্পণে ভূমধ্য সাগরে সম্মিলিত পক্ষের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। কাজেই, সঙ্গত ভাবে আশা করা যায় যে, সম্মিলিত পক্ষ এখন ভারত মহাসাগরে প্রয়োজনানুরূপ নৌশক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এই নৌ-বাহিনীর সহযোগে পূর্ব্ব-ভারত হইতে স্থলপথেও অভিযান চলিবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—ব্রহ্মদেশে অভিযান পরিচালনের অনুকূল রাজনীতিক অবস্থা বৃটেন এখনও সৃষ্টি করিতে পারে নাই; ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটেনের প্রতিশ্রুতি এখনও স্পষ্ট নহে। বৃটিশ রাজনীতিকদের এই অযোগ্যতা সম্মিলিত পক্ষের সামরিক তৎপরতায় বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। গত বৎসর জাপান যখন ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে, তখন তাহাকে প্রতিরোধের জন্য বৃটেন ব্রহ্মবাসীর সহযোগিতা লাভ করে নাই; বরং বেসামরিক বর্ম্মীরা জাপানের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে বলিয়াই শ্রুত হইয়াছে। জাপান ব্রহ্মবাসীর স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী, সে বৃটিশের কবল হইতে ব্রহ্মদেশকে মুক্ত করিয়া বর্ম্মীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবে—ইহাই বর্ম্মীরা আশা করিয়াছিল। সম্প্রতি শুনা গিয়াছে যে, জাপান ব্রহ্মদেশকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিয়াছে। এই স্বায়ত্ত-শাসনের স্বরূপ কেমন এবং বর্ম্মীরা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে, জাপানীদিগের সহিত বর্ম্মীদের বিরোধের ও অসহযোগের সংবাদও শ্রুত হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সম্মিলিত পক্ষের আসন্ন অভিযানের সময়, বর্ম্মীদের বিরোধিতা নিবারণ করিতে হইলে তাহাদিগকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে বৃটিশ ধুরন্ধরগণ যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন, উহা জাপ-বিরোধী বর্ম্মীদের পক্ষেও অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। জাপান জানে, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ তাহার পক্ষে জীবন-মৃত্যু সংগ্রাম। কাজেই, ব্রহ্মদেশ রক্ষার জন্য সে তাহার সামরিক শক্তি বিশেষ ভাবেই প্রয়োগ করিবে; সেই সঙ্গে যদি সমগ্র ব্রহ্মবাসীকে সে বৃটিশ-বিরোধী সমর-প্রচেষ্টায় নিয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনীর পক্ষে ব্রহ্মভূমি হইতে শত্রুকে বিতাড়িত করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে।

১০।৯।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

চরণ-যুগল

পায়ের পরিচর্য্যার কথা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। যাঁরা নিত্য ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন, চরণ-পরিচর্য্যায় তাঁদেরো ঔদাসীন্য দেখিতে পাই অত্যন্ত অধিক। অথচ পায়ের স্বাস্থ্যের উপর, অটুট গঠনের উপর আমাদের দেহের গঠন ও সৌকুমার্য্য নির্ভর করে। জুতা পায়ে দিই,—দোকানে গিয়া সাইজ দেখিয়া জুতা কিনি! জুতা পায়ে কষিয়া চাপিয়া ধরে, অথচ সে জুতা পায়ে দিয়া চলাফেরা করি, তবু তাহা ত্যাগ করি না। জুতার এ অস্বাচ্ছন্দ্যে স্বাস্থ্য যে ক্ষুন্ন হয়, এ কথা আমাদের মনে উদয় হয় না!

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আমাদের হাত আমরা যেমন খুশী যে ভাবে খুশী নাড়িতে পারি; পা দু'খানিও যদি তেমনি ভাবে নাড়িতে-চাড়িতে পারি, তবেই বুঝিবেন, পায়ের স্বাস্থ্য অটুট আছে। যে-সব মানুষ সভ্যতা এবং ফ্যাশনের দাস্য জানে না, আজো তারা পা দিয়া নৌকার দাঁড় টানে, পায়ের আঙুল দিয়া ঝুড়ি বোনে, পায়ের আঙুলে ধরিয়া মাটী হইতে মার্বেল, ছুঁচ-সূতা কুড়াইয়া তুলিতে পারে। এ সব লোকের পায়ের স্বাস্থ্য ভালো, গড়নও ভালো। তাদের পায়ে কড়া পড়ে না, হাঁটিতে-খাটিতে পা টনটন করে না, এবং পায়ের স্বাস্থ্য ভালো বলিয়া দেহও তাদের নানা উপসর্গ হইতে বিমুক্ত থাকে।

সার্কাশে দেখিয়াছি, খোঁটায়-খাটানো তারের উপর দিয়া মানুষ দেহের ব্যালান্স রক্ষা করিয়া দিব্য চলাফেরা করে। পা দু'খানি যে দোলা তারের উপর দেহের ভার রক্ষা করিতে পারে, তার কারণ তাদের পায়ের স্বাস্থ্য অটুট—গড়নে খুঁৎ নাই, তাই। পায়ের ব্যায়াম-পরিচর্য্যা করিলে নিয়মিত খানিকটা অভ্যাসে আমরা সকলেই তারের উপর দিয়া অমনি স্বচ্ছন্দ ভাবে চলাফেরা করিতে পারিব।

পায়ের ব্যায়াম-পরিচর্য্যায় পায়ের গড়ন মজবুত এবং সুছাঁদের

হইবে; তার ফলে দেহও নড়বড়ে হইতে পারিবে না এবং চলার নিখুঁত ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া দেহের গড়নকে সুকুমার রাখিতে পারিব। পায়ের পরিচর্য্যার সঙ্গে পায়ের জুতার সম্বন্ধে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। যে জুতা পায়ে দিলে পায়ে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিবে, এমন জুতা কদাচ পায়ে দিবেন না।

এবার পায়ের ব্যায়াম-বিধির কথা বলি :—

১। প্রথমে দুই হাত প্রসারিত করিয়া দু'পায়ের আঙুলে মাত্র ভর রাখিয়া ১নং ছবির ভঙ্গীতে ধীর ভাবে ঘরের মেঝেয় পাঁচ মিনিট পায়চারি করিয়া বেড়াইবেন। বেড়াইবার সময় গ্রীবা থাকিবে সরল এবং সামনের দিকে প্রসারিত দুই হাতের উপর দু'চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন।
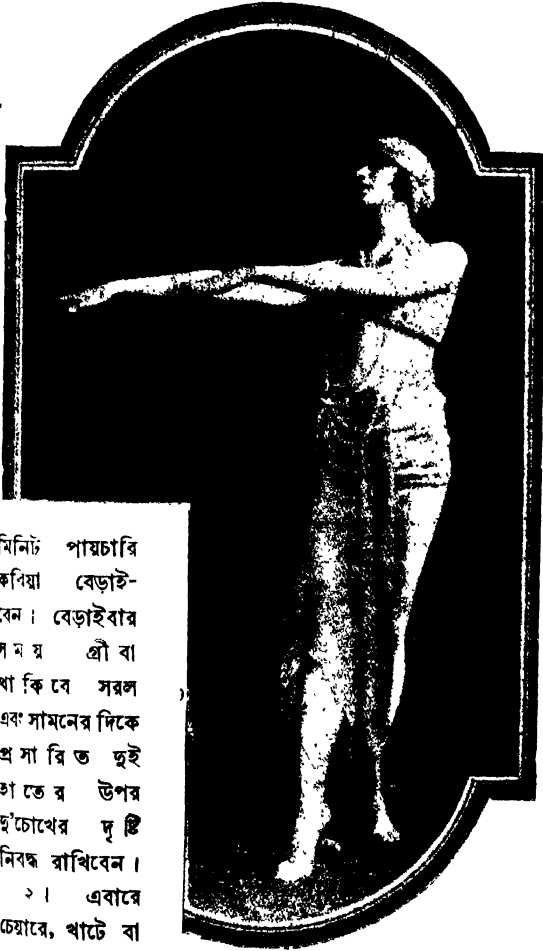
১। দুই হাত প্রসারিত করিয়া পায়চারি

২। এবারে চেয়ারে, খাটে বা তক্তাপোষে বসুন, ডান পায়ের ভর রাখুন গোড়ালি তুলিয়া শুধু আঙুলগুলির উপর—তার পর ডান হাঁটুর উপর মুড়িয়া বাঁ পা ডান দিকে আনিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ পায়ের আঙুল মুড়িয়া সেই আঙুলগুলির সাহায্যে মেঝে হইতে কাগজ, রুমাল কিম্বা মার্ব্বেল কুড়াইয়া তুলিবার অভ্যাস করিবেন। তার পর এই প্রণালীতে ডান পায়ের আঙুল দিয়া রুমাল কুড়াইয়া তুলিবার অভ্যাস করা চাই। আঙুল মুড়িয়া রুমাল প্রভৃতি তোলার এই যে প্রয়াস, এ প্রয়াসে আঙুলগুলির গড়ন হইবে সুশ্রী, নধর—পায়ের আঙুল কোনো দিন কাঠের মতো কঠিন হইবে না।

২। আঙুল দিয়া রুমাল তোলা

৩। এবার চেয়ারে বসুন। ডান পা রাখুন গোড়ালি তুলিয়া শুধু আঙুলগুলির উপর ভর দিয়া—গোড়ালি তুলিয়া রাখিবেন। এবার ডান পায়ের হাঁটুর উপর দিয়া বাঁ পা ডান দিকে আনিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গীতে পায়ের তলদেশটুকু—গোড়ালি হইতে আঙুল পর্য্যন্ত উপরে-নীচে সামনে-পিছনে ঘুরান। পাঁচ মিনিট কাল ঘুরাইবেন। বাঁ পায়ের তলদেশ ঘুরানোর পর ঠিক এই প্রণালীতে ডান পায়ের তলদেশ ঘুরাইবেন। এ ব্যায়ামে হাঁটু মজবুত এবং সবল হইবে—হাঁটিতে খাটিতে পা শ্রান্ত হইবে না; "ডিম" হইবে সুডৌল।

৩। পায়ের তলা ঘুরানো

৪। চেয়ারে বসুন; দু'পা মেঝে ছুঁইয়া থাকিবে। এবার মেঝেয় গোড়ালি ঠেকাইয়া রাখিয়া দু'পায়েরই সামনের দিক্ অর্থাৎ আঙুলের দিক্ উপরে তুলিয়া (৪নং ছবির ভঙ্গীতে) পা নাড়ুন—প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট ধরিয়া নাড়িবেন অবিচ্ছেদে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এবং চিৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া যখন-তখন এ ব্যায়াম সাধনা করিবেন। এ ব্যায়ামের ফলে যত দীর্ঘ পথই চলুন না কেন,

যতক্ষণই দাঁড়াইয়া থাকুন, শ্রান্তিভরে পা টাটাইয়া ভারী হইবে না—পায়ের স্বাস্থ্য এবং গড়নও মজবুত থাকিবে।

৫। এবারে বসিয়া থাকিয়া দু'পায়ের গোড়ালি তুলুন—আঙুলগুলির উপর পায়ের ভর রাখুন (৫নং ছবির মত)। ভর রাখিয়া ঝাঁকি দিয়া দু'পায়ের গোড়ালি ঘন-ঘন নাড়ুন—উপর দিকে আর নীচের দিকে।

এ কয়টি ব্যায়াম-বিধি-পালনে পায়ের ছাঁদ ও শক্তি যেমন অটুট থাকিবে, দেহের ছাঁদও তেমনি সুঠাম সুকুমার থাকিবে।

৪। গোড়ালি ঠেকাইয়া

৫। দু'পায়ের গোড়ালি তুলিয়া

তার পর বেশী হাঁটাহাঁটি বা পরিশ্রমের পর পদ-পরিচর্য্যার কয়েকটি উপায়ের কথা বলি। ঈষৎ গরম জলে এক ছিটা লবণ এবং এক-চামচ (চায়ের চামচ) সোডা ফেলিয়া দিন। দিয়া সেই জলে পা দু'খানি ডুবাইয়া পাঁচ মিনিট বসিয়া থাকুন; তার পর পা তুলিয়া ঠাণ্ডা জলে ডুবান—পাঁচ সেকেণ্ড। পাঁচ সেকেণ্ড পরে ঠাণ্ডা জল হইতে পা তুলিয়া নরম তোয়ালে বা গামছায় ঘষিয়া পা মুছুন। পা মুছিয়া পায়ের তলায় ঘষিয়া ঘষিয়া একটু সরিষার তৈল বা ভ্যাসেলিন মর্দ্দন করুন। ইহাতে প্রচুর আরাম পাইবেন এবং শ্রান্তি মোচন হইবে।

পায়ের নখ যথারীতি কাটিবেন—নখ বড় রাখিবেন না।

অশ্রু-অর্ঘ্য

রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব

দেশহিতে আত্মনিবেদিত-প্রাণ রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব মহাশয় ৬৩ বৎসর বয়সে ১৪ই ভাদ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। ছাত্র-জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, দারপরিগ্রহ না করিয়া তিনি মহান্ আদর্শদীপ্ত জীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন যুগে সরকারী চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি দেশ-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি জাতির জয়-যাত্রায় অগ্রণী হইতেন। বঙ্গভঙ্গ—অসহযোগ—স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি কোন আন্দোলনেই তিনি পশ্চাদ্‌পদ হন নাই—এ জন্ত বহু বার সাদরে কারাবরণ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির সভাপতি ছিলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠায়—কর্ম্মিগণের বিরোধ মীমাংসায় তিনি চিরদিন উৎসাহী ছিলেন। যে পতাকা তিনি দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন—মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাহা ত্যাগ করেন নাই। দেশবাসীকে সেই পতাকার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভার সাদরে অর্পণ করিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।
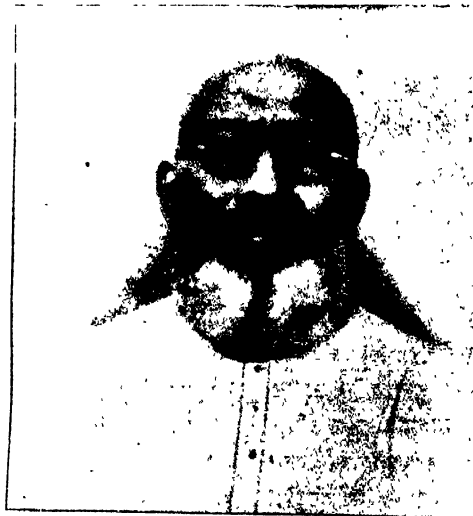
রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব

প্রভাবতী দাসী

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হরিপদ অধিকারীর পুণ্যবতী সহধর্ম্মিণী প্রভাবতী দাসী ২৬শে শ্রাবণ ৫৫ বৎসর বয়সে স্বর্গীয়া হইয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত।

পোলার্ডের মামলা

মিষ্টার আর, সি, পোলার্ড পুলিসের বড়কর্ত্তা—বহরমপুরের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস। বহরমপুরের উকিল শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল মজুমদারকে প্রহার করার অভিযোগে ইনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারে বহরমপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস, কে, চ্যাটার্জ্জি মিষ্টার পোলার্ড, উকিল মজুমদারকে প্রহার করিয়াছিলেন, ইহা সত্য মনে করিয়া তাঁহার দুই শত টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। মিষ্টার পোলার্ড এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন এবং হাইকোর্টের সাহায্যে ঐ আপীলের মামলা নদীয়ার জিলা জজের এজলাসে উঠাইয়া লইয়া যান। নদীয়ার দায়রা জজ আপীল ডিস্‌মিস্ করেন। মিষ্টার পোলার্ড হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হইয়াছিলেন। তখন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডার্ব্বিশায়ার, বিচারপতি খন্দকার এবং বিচারপতি লজকে লইয়া গঠিত এক বিশেষ বিচারাসনের অধিবেশনে মিষ্টার পোলার্ডকে দণ্ডের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই মামলা লইয়া এ দেশের সংবাদপত্রে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, দেশের অধিকাংশ লোক হাইকোর্টের এই রায়ে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সত্য সত্যই সত্যগোপাল মজুমদারকে প্রহার করিয়াছিলেন কি না,—এবং যদি প্রহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই প্রহার আইন অনুসারে সঙ্গত হইয়াছিল কি? কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, বিচারপতি ডার্ব্বিশায়ারের রায়ে সে বিষয়ের আলোচনা দেখিলাম না। তাঁহার রায় কেবল জিয়াগঞ্জ চাউল-লুণ্ঠন মামলা সম্বন্ধে তৎকালীন প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার ফজলুল হক বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা সমালোচনায় পূর্ণ। অথচ প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন যে, বাহিরের কোন লোককে বিচারকের উপর চাপ দিয়া বিচার-কার্য্যে কোনরূপ বাধা ঘটান কর্ত্তব্য নহে। কথা খুবই সত্য। কিন্তু কেবল লোকের অনুরোধে বা চাপেই যে বিচারপতির বিচার-বুদ্ধি ব্যাহত হয় তাহা নহে—বাল্যকালের পরিচয়, পূর্ব্বকালের বন্ধুত্ব এবং আনুগত্যও অনেকের মনকে কর্ত্তব্যসাধনে বিচলিত করিতে পারে। বিচারপতি লজ যখন ময়মনসিংহে ছিলেন, তখন ঐ মিষ্টার পোলার্ডও তথায় পুলিসের জুনিয়ার কর্ম্মচারী ছিলেন। ময়মনসিংহের ন্যায় সুদূর মফঃস্বলে ভিন্ন-জাতীয় আবেষ্টনের মধ্যে মুষ্টিমেয় য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে বয়সের পার্থক্য থাকিলেও প্রগাঢ় সখ্য ঘটা স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় বিচারক লজকে এই বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতিরূপে গ্রহণ না করাই কি সঙ্গত ও শোভন হইত না? মিঃ হক ও মিঃ চাটার্জ্জীর পত্র-ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিতে চাহি না। জিয়াগঞ্জ চাউল লুঠের মামলার সহিত এই মামলার এত কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা বুঝা গেল না। এই মামলা সম্বন্ধে কি মিঃ ফজলুল হক ম্যাজিষ্ট্রেটকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন?

সরকারের মঞ্জুরী ব্যতীত এই মামলার আপীল করা যাইতে পারিবে না, এই মাত্র নির্দ্দেশ দিয়া কি বিচারপতি ডার্ব্বিশায়ার ফরিয়াদীর বিচার-প্রাপ্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নাই? মজুমদার মহাশয় পোলার্ডের হস্তে প্রহৃত হইয়াছিলেন বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহার ত বিচার হইল না। এখন জিয়াগঞ্জের চাউল লুঠের মামলার দায়ে কাহাকে কেন পোলার্ডের প্রহার নীরবে হজম করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিলাম না।

বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ

বাঙ্গালায় যে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কলিকাতায় প্রতিদিন রাজপথে বহু মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতেছে,—বহু মুমূর্ষু লোক রাজপথে পড়িয়া দীর্ঘ শ্বাস টানিতেছে। পুলিস প্রতিদিন যে সকল শব লইয়া যাইতেছে, কেবল তাহারই হিসাব প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দু সৎকার-সমিতি এবং মুসলমানদিগের শব সমাহিত করিবার সমিতি যে সকল শব দাহ বা সমাহিত করিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব প্রকাশিত হয় নাই। হাসপাতালে মুমূর্ষু লোকের স্থানাভাব।

যাহারা কলিকাতায় রাজপথে মরিয়া পড়িয়া রহিতেছে অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় খাবি খাইতেছে, তাহারা সকলেই না হউক,—অনেকেই মফঃস্বলের গৃহস্থ সম্প্রদায়ের। উহারা এক মুষ্টি অন্নের জন্য রাজ্যের সহর কলিকাতায় আসিয়াছিল, কিন্তু হতাশ হইয়া তাহারা নিরাশ্রয়ে ও অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতেছে। যাহারা একটু সাহসী ও শক্তিশালী, তাহারাই কলিকাতায় আসিতেছে, অবশিষ্ট সকলে গ্রামে ও পল্লীগ্রামে থাকিয়া মরিতেছে। এরূপ মৃতের সংখ্যা যে কত, তাহা নিরূপণ করা যায় না। সরকার নিয়ন্ত্রিত দরে যে চাউল বা আটা দিতেছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, উহাতে অদ্ধাশনও হয় না,—এবং এক দিন দেওয়া হয় ত তিন দিন দেওয়া হয় না। মফঃস্বলে কোন কোন স্থলে শুনিতেছি, কোন পরিবারে যত লোকই থাকুক না কেন, কাহাকেও সপ্তাহে তিন সেরের অধিক চাউল দেওয়া হইবে না,—যাহাদিগকে চাউল দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে আটা বা ময়দা দেওয়া হইবে না নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অথচ মোটা বেতনের সচিবরা বলিয়া আসিতেছিলেন—ভয় নাই চাউল যথেষ্ট আছে। এ সকল মিথ্যা বাক্য দ্বারা লোককে প্রতারিত করিবার সার্থকতা কি? মৌলভী ফজলুল হকের অদৃষ্ট ভাল, তাই তিনি পদত্যাগে বাধ্য হইয়া, এই সহস্র সহস্র লোকের জীবনত্যাগের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য সরবরাহ বিভাগের সচিব সার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব কলিকাতা হইতে দিল্লী যাইবার সময় বলিয়াছেন,—"প্রকৃত কথা এই যে, আমরা সকলেই ভুল করিয়াছি।" পাইকারী হিসাবে এক সময়ে সকল সরকারী কর্ম্মচারীই কেন ঠিক একই ভুল করিলেন, সার জ্বালাপ্রসাদ সে কথা বলেন নাই। যাঁহারা সরকারী নোকরি করে নাই,—বা করেন না, তাঁহাদের কিন্তু ঠিক ঐরূপ ভুল হয় না। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কিন্তু সকলেরই একই রকম হইতে দেখা যায় না। যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন কারণ আছে।

সে কারণ কি, তাহা সার জ্বালাপ্রসাদ যদি বলিতে পারিতেন,

তাহা হইলে ভাল হইত। তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন,—"আসুন আমরা এখন একযোগে যাহা কর্ত্তব্য তাহা যথাসাধ্য করি।" আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সরকারী পুরুষরা যে ভ্রান্তির মালা গাঁথিয়া আসিতেছেন, এবার তাঁহারা সেই মালায় আরও যে কয়েকটা ভ্রান্তির ঘেঁটুফুল সংযোগ করিবেন না, কে বলিতে পারে? যাঁহারা সরকারী নোক্‌রি করেন না, তাঁহাদের সহিত তাঁহারা যে একমত হইবেন, তাহার প্রমাণ কি? আসল কথা, যেরূপ ভাবে সরকারী কর্ম্মচারীরা নির্ব্বাচিত এবং কাজে নিযুক্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের ভুল হইবেই। সার জওলাপ্রসাদ কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন,—বাঙ্গালায় কি কারণে এই জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল? ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যুদ্ধের জন্য দুর্ম্মূল্যতা তীক্ষ্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও বাঙ্গালার মত এত সাংঘাতিক হয় নাই কেন? বাঙ্গালায় যখন খাদ্যশস্যের দারুণ অভাব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া জনসাধারণের মধ্য হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিরা সরকারকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন,—তখন বেসরকারী ইংরেজদল বাঙ্গালায় এই খাদ্য-সমস্যার প্রতিকার করিতে বদ্ধপরিকর না হইয়া উহাকে তদানীন্তন লোকের কতকটা আস্থাভাজন সচিবসঙ্ঘকে অপসারিত করিবার যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন কেন? সার জওলাপ্রসাদ কি নির্ভীক ভাবে বলিয়া দিবেন যে, পঞ্জাবের ব্যেপার-মণ্ডল যখন বলিয়াছিলেন, যদি সরকার মাল চালান নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি শিথিল করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্গালায় প্রভূত পরিমাণে চাউল চালান দিতে পারেন, তখন সে কথা শুনা হয় নাই কেন? লাহোরের আর্য্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি-সভা, রাওয়ালপিণ্ডির ব্যবসায়ী দল ঐরূপ সর্ত্তে বাঙ্গালায় চাউল ও গম পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন,—সিন্ধু ও বোম্বাই অঞ্চল হইতেও ঐরূপ সর্ত্তে বাঙ্গালায় চাউল ও গম পাঠাইবার প্রস্তাব আসিয়াছিল,—কিন্তু কেন্দ্রী সরকার ও বাঙ্গালা সরকার উহাতে সম্মত হন নাই কেন? বাঙ্গালায় এবারের এই দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালার ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যুক্ত প্রদেশের চল্লিশের মন্বন্তর এবং উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষকেও অতিক্রম করিবে বলিয়া শঙ্কা হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য, ভগবানের বিচারে এ ভুলের কি মার্জ্জনা মিলিবে?

সরকারী কন্‌ট্রোলের দোকান

বাঙ্গালা সরকারের বে-সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগের ভাগ্যবান্ কর্ত্তা মিষ্টার সুরাবর্দ্দী কলিকাতা ও মফঃস্বলের স্থানে স্থানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য-শস্যাদি প্রদানের যে দোকান খুলিতেছেন, তাহা লোককে প্রকৃত সাহায্যদানের জন্য খোলা হইতেছে কি না সন্দেহ! কারণ, নিয়ম করা হইয়াছে যে, কোন পরিবারকে সপ্তাহে তিন সেরের অধিক চাউল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দেওয়া হইবে না এবং যাহাকে চাউল দেওয়া হইবে তাহাকে আর আটা দেওয়া হইবে না। ইহার অর্থ কি? ইহাতে কি গৃহস্থের খাদ্যাভাব ঘুচিতে পারে? যে পরিবারে ৬ জন লোক, সেই পরিবারের এক দিনে তিন সের চাউলে কুলায় না। সাত দিন উহাতে চলিবে কি প্রকারে? যাহাদের পরিবারে ৩ জন মাত্র লোক, তাহাদের তিন সের চাউলে বড় জোর দুই দিন চলিতে পারে, —আর পাঁচ দিন তাহারা কি খাইয়া বাঁচিবে? এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে তিলে তিলে মারিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্য কি? গত বার অজন্মা হয় নাই। কিছু শস্য নষ্ট হইলেও উহাতে এত অভাব হইতে পারে না। বে-সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগ এক এক স্থানে দুই-তিন শত মণ চাউল দিয়া তাহা দশ সহস্র দুঃস্থ লোকদিগের মধ্যে বণ্টনের নির্দ্দেশ দিতেছেন। ইহা কি সম্ভব? এ দিকে লোক ত মরিয়া উজাড় হইয়া যাইতেছে। মফঃস্বলে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সরকারী সরবরাহ বিভাগের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা একটা লোক-দেখান ভাণ মাত্র। যাহাদের পয়সা নাই,—তাহারা ত নগদ মূল্য দিয়া খাদ্য কিনিতে পায় না। তাহাদের উপায়? সর্ব্বত্র লঙ্গরখানা নাই। যাহা আছে তাহা এতই একাকার ব্যাপার যে, সকলে সেখানে যাইতে চাহে না—যাহারা যায়, তাহাদেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া খাদ্য দেওয়া হয় না। দুই বা তিন ছটাক মাত্রায় যে, মণ্ড বিতরিত হয়, তাহা সুরাবর্দ্দী-সুধা নামে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছে। উহাতে জঠর-জ্বালা নিবৃত্ত না হইয়া মহামারীর বিস্তারে ভবজ্বালার অবসানই ঘটাইতেছে! যত দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহাতে অজন্মাহেতু খাদ্য-শস্যেরই অভাব হইয়াছে এবং মূল্য বাড়িয়াছে। এবার সকল জিনিষের মূল্যই অতিশয় অধিক। চারি আনার সাগু না হইলে এক জন রোগীর এক বেলার পথ্যও সম্ভব হয় না। তাহাও দুষ্প্রাপ্য। সমস্যা সঙ্গীন। অমর না হইলে এই সুরাবর্দ্দী মার্কা সুধাপানে বলক্ষয়ের ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

অনাহারে মৃত্যু

কলিকাতার রাজপথে প্রত্যহ বহু লোকের মৃত্যু হইতেছে। কত লোক এই প্রকার শোচনীয় ভাবে মরিতেছে, তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। ২৯শে শ্রাবণ হইতে ২৬শে ভাদ্র পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে ৫৫০ জন লোক মরিয়া পড়িয়াছিল এবং ২৮০৫ জন হাসপাতালে নীত হইয়াছিল—সেখানে ৬১১ জন মরিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় এ পর্য্যন্ত অনশনে মৃতের সংখ্যা ১০৪২ বলিয়া অসম্পূর্ণ হিসাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা বাইশ জন মাত্র ছিল বলিয়া সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ। কলিকাতার 'ষ্টেটস্‌ম্যান' এবার ভীষণ মরণের কয়েকখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া সাম্রাজ্যবাদীদিগের পোঁ-ধরা লোকেরা 'ষ্টেটস্‌ম্যান'কে তীব্র ভাবে তিরস্কার করিয়াছেন। যাহাদের কৃপায় রাজপথ শ্মশানে পরিণত হইতেছে, তাহাদের কোন দোষ নাই, যে তাহা দেখে বা দেখায়, তাহারই যত দোষ! ইহাই সাম্রাজ্যবাদীদিগের গণতন্ত্র-নিষ্ঠার স্বরূপ। গণতন্ত্রের কাছে রাজা ও রাখালের প্রাণের মূল্য সমান। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এ দিক্‌টার মর্ম্ম কতখানি বুঝেন, তাহা এই বীভৎস ব্যাপারেই সুপ্রকাশ। দেশের লোক এই দুঃসময়ে সার্ব্বভৌম দুর্ম্মূল্যতার চাপে অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইলেও স্বদেশবাসীদিগের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারিগণ, বিদেশী সওদাগরগণ, বাঙ্গালার বর্ত্তমান সচিবমণ্ডলী এবং বে-সরকারী খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কর্ম্মচারীরা এ ব্যাপারে এক কপর্দ্দকও দিয়াছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত শুনি নাই!

মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী এখন বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলিতেছেন,—চাউলের মণ ৩০ টাকাই হউক আর ৪০ টাকাই হউক, উহা যে লোক কিনিতে পাইতেছে, ইহাতেই তাঁহার কেরামতি শত-সূর্য্য-সম তেজে ভাস্বর! আজ যদি হকের সচিবমণ্ডলী থাকিত, তাহা হইলে তাহাও

পাইতে পারিত না। একমাত্র লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ ত্রিভুবন-বিজয়ী হইতে চায়। পল্লী-অঞ্চল হইতে ৮০ হাজার ক্ষুধার্ত্ত লোক অন্নের আশায় কলিকাতায় আসিয়াছে, তাহাদের ৪০ হাজার নিঃস্ব ও ১৮ হাজার লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সরকারী হিসাবে প্রকাশ। নিরন্ন লোকদিগকে কলিকাতা হইতে সরাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। কলিকাতায় লোক মরিলে তাহা একেবারে চাপা দিবার উপায় নাই। তাই কি মফঃস্বলে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহাদিগকে সরাইবার চেষ্টা হইতেছে? ইহাদিগের অধিকাংশকেই ২৪ পরগণা (প্রায় ৩১ হাজার) আলমডাঙ্গা শিবিরে লইয়া যাওয়া হইবে। তদ্ভিন্ন হাওড়া, ডোমজুড়, জগদ্বল্লভপুর, পতিহাল, মুন্সিরহাট প্রভৃতি ১১টি স্থানে ৫২ হাজার ২ শত লোককে কলিকাতা হইতে সরাইয়া পল্লীগ্রামের স্নিগ্ধ শ্যাম বনবিটপি-বহুল, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইবে। ইহাতে কলিকাতায় এই কুদৃশ্য কতক ঢাকা পড়িতে পারে, কিন্তু আরও লোক যে অন্নাভাবে কলিকাতায় আসিবে না তাহার প্রমাণ কি? এখনও যাহারা হাতা-কাঁথা বেচিয়া অন্নের যোগাড় করিতেছে,—তাহা ফুরাইলে তাহাদের কি হইবে? নূতন আমন ধান উঠিলেই যে এই সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা নহে। তখন সিংহলও থাকিবে,—দক্ষিণ আফ্রিকাও থাকিবে। থাকিবে না কেবল বাঙ্গালীর গোলায় ধান-চাল! আর ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি? হনোজ দিল্লী দূরাস্ত! যে সময় বাঙ্গালায় মানুষের সহিত কুকুরের খাদ্য লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে, অন্নের জন্য জননী সন্তানকে বিসর্জ্জন দিতেছে, তখন সেই সব মৃত্যুপথযাত্রীর অর্থে যে সচিবমণ্ডলী মোটা বেতন ও ভাতা লইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না, দেশের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক আছে কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। এই বেতন গ্রহণ কি আইন-সঙ্গত লুণ্ঠন নয়?

বে-আইনী আটক

ভারতে প্রত্যক্ষ ভাবে খাস বৃটিশ-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে, এ দেশের লোক উহা ন্যায়সঙ্গত আইন-মতে পরিচালিত হইবে বলিয়াই আশা করিয়াছিল। সেই জন্য প্রায় সকলেই ইংরেজ শাসনের অনুরক্তও হইয়া পড়ে। কারণ, প্রকৃত আইন—নিরপেক্ষ মানবের পক্ষপাত-বর্জ্জিত বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত সত্য। কোন্ কার্য্য সৎ এবং কোন্ কার্য্য অসৎ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা যাহা শাশ্বত এবং অপরিবর্ত্তনীয় তাহারই নির্দ্ধারণ হইল আদর্শ আইনের বনিয়াদ। সুতরাং আইনের শাসন সুশাসন বলিয়াই গণ্য। তবে ইহা সত্য যে, মদ ও পদ-গর্ব্বিত মানুষ নীচ স্বার্থপরতা অথবা ভ্রান্তির বশে অবৈধ আইনও প্রণয়ন করে। উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অসন্তোষ ও অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শাসকগণ শুধু যেন জিদের বশে বে-আইনী আইন রচিয়া তদনুসারে দেশ শাসন করিতে চান! পাঠক জানেন, ভারতরক্ষা আইনের ২৬ ধারা অসিদ্ধ—হাইকোর্ট এইরূপ রায় দিলে কেন্দ্রী সরকার ঐ ধারা অনুসারে আটক সিদ্ধ করিবার জন্য আবার এক অর্ডিনান্স জারি করেন। সে অর্ডিনান্স যে অসিদ্ধ, এখন কলিকাতা হাইকোর্ট এবং ফেডারাল কোর্টও তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। ফেডারাল কোর্ট রায় দিয়াছেন যে, "ভারতরক্ষা নিয়মের ২৬ ধারা অনুসারে লোককে আটক রাখিবার যে সকল হুকুম জারি করা হইয়াছে, তাহা সমস্তই অসিদ্ধ,—অতএব আটক আসামীদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। সরকার সে সিদ্ধান্ত মানিতে সম্মত হইতেছেন না। তাঁহারা ফেডারাল কোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিতেছেন। কিন্তু ভারতের দুইটি উচ্চ আদালত যে সিদ্ধান্ত দিয়াছেন বিলাতের প্রিভি কাউন্সিল যদি তাহার ঠিক বহাল রাখেন, তখন কি হইবে? বে-আইনী ভাবে লোকের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য সরকার কি তাঁহাদিগকে খেসারৎ দিবেন?

এই অর্ডিনান্স অনুসারে কি ভাবে কাজ করা হয়, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। পুলিস আটক ব্যক্তিদিগের তালিকা দিয়া তাহাদিগকে ২৬ ধারা মতে গ্রেপ্তার করিতে বলে। তখনই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার করিবার পর পুলিস ঐ আটক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ পাঠায়। উহা সচিবদিগের নিকট পাঠান হয়। ধৃত ব্যক্তিকে আটক না রাখার কোন কারণ আছে কি না, সচিবই তাহা দেখেন। সচিব যদি মনে করেন, আটকের হুকুম বাতিল করিবার হেতু আছে, তাহা হইলে তিনি গবর্ণরকে সে কথা বলিবেন। ফলে দেখা যায়, এই ব্যাপারে পুলিসই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহারা আদালতে আটক ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না। যাহাকে আটক করিবার জন্য পুলিস নামের ফর্দ্দ দেয়, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কতদূর সত্য কি ভাবে তাহার যাচাই হয়, বুঝা যায় না। ফলে পুলিস ইচ্ছা করিলে তাহাদের অপ্রিয় ব্যক্তিকে আটক করিতে পারে। এই মামলা উপলক্ষে বিচারপতিরা বলিয়াছেন যে, "এই সকল ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা অতীব নিন্দনীয়। আইনের নির্দ্দেশের এবং লোকের স্বাধীনতা-সম্বন্ধে নিয়ম উপেক্ষার অধিকতর গুরু দৃষ্টান্ত আর ধারণা করা যায় না।" এই মন্তব্য চূড়ান্ত। বিচারপতি বরদাচারী এবং জাফরুল্লা বলিয়াছেন, "যে সকল আদেশ সম্বন্ধে বিচার হইতেছে,—তাহার প্রত্যেকটিই আইনের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ।" আরও বলা হইয়াছে যে, ১লা অক্টোবর হইতে এ পর্য্যন্ত ১২৯ ধারা মতে যাহাদিগকে আটক করা হইয়াছে, তাহাদিগের আটক আইন মতে সিদ্ধ বলা যায় না। এখন আমরা বিলাতে আপীলের ফল দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীমতী নেলী সেন গুপ্তা রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে বে-সরকারী য়ুরোপীয় দলের নেতা বলেন,—"আবার—বল কি? সরকার যেন সাধারণ ভাবে মুক্তি বিতরণ-বিলাসে গা ভাসাইয়া না দেন!" মিষ্টার এ. আর. সিদ্দিকী কেবল ব্যুরোক্রেসীর বাঁধা বুলিই আওড়াইয়াছিলেন। সার নাজিমুদ্দীন বলিয়াছেন যে, তিনি আটক বন্দীদিগের খোরাকীর ব্যয় দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যখন চতুর্গুণ হইয়াছে,—তখন ব্যয়ের বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হইয়াছে! অর্থাৎ খাদ্যের পরিমাণ অর্দ্ধেক কম হইয়াছে! পারিবারিক বরাদ্দ সম্বন্ধেও তাহাই! ভারতীয় উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে যখন এই আটক-আইন অসিদ্ধ বলা হইয়াছে, তখন এ সব বন্দীর বন্দিত্ব কেন ঘুচিতেছে না, ইহা ভাবিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই! সচিবের গদিনশীন হইবার পূর্ব্বে সার নাজিমুদ্দীন উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, রাজবন্দীদের মুক্তি দান সম্বন্ধেও তিনি অবহিত হইবেন। কিন্তু গদি তিনি পাইয়াছেন

চার মাস পূর্ব্বে—এ চার মাসের মধ্যে ২১৬ জন মাত্র আটক-বন্দী মুক্তি পাইয়াছেন—অর্থাৎ গড়ে মুক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় মাসে ৫৪ জন হিসাবে! ইহা তাঁহার জাঁকের জমকালো পরিচয় বটে!

লাট বদল

বাঙ্গালার লাট সার জন হার্ব্বার্ট পীড়িত হইয়া পদত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন। লেডি মেরি হার্ব্বার্ট ইহার মধ্যে মালপত্র লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে গিয়া স্বামীর অসুস্থতার সংবাদ পাইবা-মাত্র বিমানে চড়িয়া অচিরে আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। অকস্মাৎ তাঁহার এই বিলাতযাত্রা—বাঙ্গালার লোক সে সংবাদ আদৌ জানিত না,—জানিল, তাঁহার প্রত্যাগমন-সংবাদে। সকলেই এখন আশা করিতেছেন, অতঃপর সুস্থ হইয়া সার জন হার্ব্বার্ট পত্নীসহ স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন! সার জন হার্ব্বার্টের স্থানে বিহার প্রদেশের গবর্ণর সার টমাস রাদারফোর্ড অস্থায়িভাবে কার্য্য করিবেন। সম্প্রতি তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, "বাঙ্গালায় যে অবস্থা চলিতেছে, আমরা অবশ্যই যে কোন প্রকারে তাহার প্রতিকার করিব।" তিনি আশা করেন, এই কার্য্যে তিনি ব্যবসায়ীদিগের সহযোগিতা লাভ করিবেন। ফলে জানুয়ারী মাসের শেষ নাগাদ তিনি মোটা চাউলের মূল্য ৯ টাকা মণ, আর মাঝারি চাউলের মণ ১০ টাকায় দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিবেন। জানুয়ারী মাস আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এ পর্য্যন্ত ত চাউলের বাজার নামিল না। সম্প্রতি বঙ্গীয় বে-সরকারী সরবরাহ বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১১ই ভাদ্র হইতে ২৩শে ভাদ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ধান ১৫ টাকা মণ এবং চাউল ৩০ টাকা মণ দরে বেচিতে হইবে। ইহাই উচ্চতম বাজার-দর। তাহার পর ১০ই ভাদ্র হইতে ৭ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ধানের মূল্য প্রতি মণ ১২ টাকা ২ আনা এবং চাউলের মূল্য প্রতি মণ ২৪ টাকার অধিক দরে কেহ ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। তাহার পর ৮ই আশ্বিন হইতে ধানের দর ১০ টাকা এবং চাউলের দর ২০ টাকায় নামিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এ দরে সর্ব্বত্র বাজারে চাউল কিনিতে পাওয়া যাইতেছে কি? আমরা যত দূর জানি, সর্ব্বত্র তাহা পাওয়া যাইতেছে না। খুচরা মণ-করা ২ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে না—এই আদেশ অবহেলিত হইতেছে কি প্রতিপালিত হইতেছে, তাহা দেখিবার ভার কেবল পুলিসের হাতে দিয়া রাখিলেই কি তাহা প্রতিপালিত হইবে? এ আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু দোকান হইতে চাল যে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইতেছে? দেশের লোক এখন জীবন্মৃত। তাহারা দোকানদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বিশ্বস্ত গোয়েন্দা পুলিস দ্বারা সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করাইলে কি ফল হইবে? দোকানদারের বিরুদ্ধে থানায় গিয়া নালিশ জানাইলে চাল মিলিবে না। কাগজে-কলমে হুকুম নিবদ্ধ রাখিলেও লোকে চাল পাইবে না এবং লোকের প্রাণ বাঁচিবে না। আর এক কথা, ধানের দর ১০ টাকা হইলে চাউলের দর ২০ টাকা হইবে কেন? এক মণ ধানে প্রায় ২৬ সের চাউল হয়,—কোন কোন স্থলে দুই-এক সের কম হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে চাউলের মণ ১৮ টাকার অধিক হইতে পারে না। তাহার পর ইহাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই সমভাবে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঘুষের ব্যবস্থার ন্যায় ইহার দ্বারা সাক্ষ্য প্রমাণের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং দুর্নীতি যেমন অবাধে চলিতেছে,—চাউলের অধিক দরও তেমনি অধিক থাকিবে। প্রতিকার হইবে না। বাঙ্গালায় বিষম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত! এরূপ অবস্থায় সার টমাস কি করিবেন? সার টমাস রাদারফোর্ড ২০শে ভাদ্র বাঙ্গালার শাসন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, তিনি কি ভাবে খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হন।

পরলোকে কুমুদিনী বসু

যশস্বিনী সুলেখিকা সমাজসেবিকা কুমুদিনী বসু বি-এ ৬৫ বৎসর বয়সে ১৮ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনি স্বনামধন্য কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা—'ব্যবসা-বাণিজ্য' সম্পাদক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর সহধর্ম্মিণী। তাঁহার

কুমুদিনী বসু

রচিত 'শিখের বলিদান' 'মেরী কার্পেণ্টার' 'জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী' প্রভৃতি সমাদৃত। তিনি 'সুপ্রভাত' মাসিক পত্র ও স্বামীর মৃত্যুর পর 'ব্যবসা বাণিজ্য' সম্পাদনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

তিনি নারীরক্ষা-সমিতি ও নারী-কল্যাণ আশ্রমের সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার—১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনে মহিলা বিভাগের সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি ভারত স্ত্রী-শিক্ষা-সদনের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। নারীর ভোটাধিকার লাভ তাঁহার আন্দোলনের সাফল্য। নারী সমাজের কল্যাণ সাধন তাঁহার জীবন-ব্রত ছিল।

"শ্মশান ভালবাসিস্ বলে"

দীর্ঘ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এক নিশীথে চিতোরের প্রাসাদে স্তম্ভ-শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথে অশরীরী বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল—"মৈঁ ভুখা হোঁ!—মৈঁ ভুখা হোঁ।" আজ শরতের মেঘালোকবিচিত্র বাঙ্গালার আকাশে বাতাসে সেই বাণী ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে—"মৈঁ ভুখা হুঁ—মৈঁ ভুখা হুঁ।" শঙ্কায় স্তম্ভিত বিপ্লবে বিব্রত বাঙ্গালী সেই ধ্বনিতে মৃত্যুর আহ্বান শুনিতেছে।

রাজপথে শব—আর শতছিন্ন মলিন-বাস কঙ্কালসার নরনারী বালক-বালিকা—যেন প্রেতপুরীর দ্বার মুক্ত পাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। তাহাদিগের মুখে রক্ত নাই—কোটরগত চক্ষুতে ক্ষুধার তীব্র জ্বালা। দেখিলে মনে হয়, এই কি বাঙ্গালা—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাঙ্গালা! এই ত মা যাহা হইয়াছেন—"কালী অন্ধকার-সমাচ্ছন্না—কালিমাময়ী।" দেশের সর্ব্বত্র শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল-মালিনী—আপনার শিব আপনি পদে দলিতেছেন।

সমাজ, সংসার, সংস্থান, সংস্কার, নীতিজ্ঞান সবই অভাবের তাড়নায় নষ্ট হইতেছে, কেবল বাঙ্গালীর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হয় নাই। সেই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াই এক জন ইংরেজ লিখিয়াছেন—বাহিরের অবস্থা দেখিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। সেই জন্যই বাঙ্গালী না খাইয়া মরে, তথাপি আপনার অভাব প্রকাশ করিতে চাহে না। অন্য দেশ হইলে লোক অনাহারে মরিবার ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মৃত্যু দেখিবার পূর্ব্বে যাহাদিগের অন্ন আছে, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া খাইবার চেষ্টা করিত—সে চেষ্টায় প্রাণ দিতেও ইতস্ততঃ করিত না। বাঙ্গালায় তাহা হয় নাই! বাঙ্গালায় যে বিপ্লব হইতেছে, তাহাতে হিংসার বিকাশ নাই; তাহা মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে পরিবর্ত্তন সংসাধন করিতেছে, তাহা জড়বাদ-জর্জ্জরিত মানবের সভ্যতাকে ধিক্কার দিতেছে। তাহা যুদ্ধ অপেক্ষাও ভয়ানক—কারণ, তাহা মানুষকে পশুর অধম করিতে পারে—করিতেছে। তাহা ঝটিকা নহে—আগ্নেয়গিরির গৈরিক প্রবাহ।

বাঙ্গালীর স্বভাবের যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আমরা করিয়াছি, তাহারই জন্য প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া ও যে স্থানে প্রতীকার প্রয়োজন সেই স্থানে তাহা করা যাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, তাঁহারা যে তাহা করেন নাই, তাহা আমরা ফল দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি।

বর্ষার বর্ষণারম্ভের পূর্ব্বেই জানা গিয়াছিল—বাঙ্গালার কোন কোন অংশ হইতে বোমা বর্ষণে সর্ব্বস্বান্ত বা অনশনে পীড়িত নরনারী আসামে যাইতেছিল—কেহ ট্রেণের কামরায়, কেহ ষ্টেশনের প্রাঙ্গণে, কেহ বৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করিতেছিল—তাহাদিগের দেহে জীবনী-শক্তির অভাব, আর যাহারা বাঁচিয়া থাকিতেছিল, তাহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতেছিল।

কিন্তু কেহ তাহাদিগের সম্বন্ধে মনোযোগী হয় নাই। যাহারা দরিদ্র, অসহায় তাহাদিগের সম্বন্ধে কয় জন—বিশেষ কয় জন বিদেশী অবহিত হয়? তাহাদিগের জীবনের মূল্য কি? বিশেষ তাহারা যদি নেতৃহীন হয়, তবে তাহাদিগের দুর্দ্দশা আরও শোচনীয় হয়, তাহারা আপনাদিগের অবস্থার প্রতীকারের চেষ্টাও করিতে পারে না।

অথচ এ বার যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃতিকেই সর্ব্বতোভাবে দায়ী করা যায় না। বন্যা ও বাত্যা বাঙ্গালার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা যে ক্ষতি করিয়াছে, সে ক্ষতি চেষ্টা—উপযুক্ত চেষ্টা করিলে পূর্ণ করা যাইত। মানুষের অবজ্ঞা ও অবহেলাই এই অবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। তাহা না হইলে আজ বাঙ্গালা শ্মশান হইত না—সেই শ্মশানে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইত না—"মৈঁ ভুখা হুঁ! মৈঁ ভুখা হুঁ!"

এ দিকে যে বাঙ্গালার শাসকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই, তাহাও বলা যায় না—তাঁহারা অজ্ঞতার পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন না—যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, এমনও বলিতে পারেন না। তাহার প্রমাণ, বাঙ্গালার গভর্ণর চাউলের মূল্য-বৃদ্ধিতে সচিবসঙ্ঘকে

অপসারিত করিয়াছিলেন—কিন্তু লোকের অন্নাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। আর কেন্দ্রী সরকার প্রকৃত সংবাদ বৃটেনে ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে যাইতে দেন নাই, তাহা নিষিদ্ধ ছিল। মাদ্রাজে দারুণ দুর্ভিক্ষকালে যখন ভারত সরকারের নিকট হইতে আবশ্যক সাহায্য পাওয়া যায় নাই, তখন মাদ্রাজের গভর্ণর ভারত সরকারের অপেক্ষা না রাখিয়া বিলাতে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক ও পরে বড় লাট লর্ড কার্জ্জন—বিদেশেও সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া সাহায্য পাইয়াছিলেন।

এ বার বিদেশে সংবাদ-প্রেরণ নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু বিদেশ হইতে সাহায্য না পাইলেও ভারতের খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে বণ্টনের আবশ্যক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিলেই যে বাঙ্গালার সহস্র সহস্র নরনারীর মৃত্যুর দায়িত্ব কাহাকেও গ্রহণ করিতে হইত না, তাহাও অনায়াসে বলা যায়। প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ করিবার পরেই যাহা হইয়াছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া আমরা এ কথা অনায়াসে বলিতে পারি।

বাঙ্গালা প্রদেশ এখনও দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষণা করিয়া সরকার লোকরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই—দুর্ভিক্ষ কমিশনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ নির্দ্দেশ এখনও সর্ব্বোতোভাবে কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই—যে সচিবের হস্তে খাদ্য বিভাগের ভার আছে, তিনি দুর্ভিক্ষ "কোডের" নিয়ম পালন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই—লোককে যে খাদ্য-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু মানুষ জীবন্মৃত হইয়া আরও কিছু দিন বাঁচিয়া থাকে—পরে আর কখন পূর্ণ স্বাস্থ্য ও শক্তি পুনরায় লাভ করিতে পারে না। তিনি লোকের গৃহ হইতে সঞ্চিত খাদ্য-শস্য বলপূর্ব্বক টানিয়া আনিয়া—লোকের ভাণ্ডার শূন্য করিবার পরে তাহাদিগকে তাহাদিগের চিরাগত ও সংস্কারগত দয়ার অনুশীলন করিতে—নিরন্নকে অন্ন দিতে বলিয়া নিষ্ঠুর নির্লজ্জতার পূর্ণ পরিচয় প্রকট করিয়াছেন—মানুষের জীবন যেন তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মানবোচিত সহানুভূতির কোন পরিচয় আজও বাঙ্গালী পায় নাই। আর কবে পাইবে? পরে যদি কখন পায়, তত দিনে বহু লোক ভবযন্ত্রণা-মুক্ত হইবে এবং যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারাও যে জীবন-সংগ্রামের জন্য আবশ্যক শক্তি হারাইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

মানুষ কিরূপে মানুষের বৈশিষ্ট্যও হারাইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সার জগদীশপ্রসাদ লিখিয়াছেন, ফরিদপুরে একটি লোক অনাহারে থাকিয়া গ্রাম হইতে সহরে আসিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহ-দ্বারেই সে পতিত হয় ও প্রাণ হারায়। যখন তাহার শব অপসারণ করা হইতেছিল, সেই সময় অদূরে উপবিষ্টা একটি স্ত্রীলোক একটি পুটুলী ঠেলিয়া দিয়া বলে—"এটিও লইয়া যাও।" তাহাতে তাহার মৃত শিশু ছিল। জননীর নেত্রে অশ্রু নাই—বুঝি মনে বেদনার অনুভূতিও সে হারাইয়াছে! কলিকাতার শ্মশানে চিতানল নির্ব্বাপিত হইতেছে না।

অথচ ইংরেজ সরকারের নিয়ম, কতকগুলি লক্ষণ প্রকট হইলেই দুর্ভিক্ষ-সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা পরিশ্রম করিতে পারে, তাহাদিগকে কায করাইয়া বিনিময়ে সাহায্য যে সকল স্ত্রীলোক সামাজিক নিয়মহেতু গৃহের বাহিরে আসিয়া এবং যে সকল অক্ষম পুরুষ শারীরিক দৌর্ব্বল্যহেতু সাহায্য-দান কেন্দ্রে আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে সাহায্য-গৃহে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষেও সরকার—যাহারা কাযের বিনিময়ে সাহায্য লইবে, তাহাদিগের জন্য একরূপ "টোকন" মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন, তাহা দিলে তাহারা এক টাকা মূল্যের খাদ্য-শস্য পাইত।

সে বার এত বিবেচনা করিয়া সাহায্যদান ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আর এ বার? এ বার এমনই অব্যবস্থা হইয়াছে যে, যে শস্য (বাজরা) দ্বাদশ ঘণ্টাকাল না ভিজিলে রন্ধনের উপযুক্ত হয় না, তাহাই চাউল ও ডাইলের সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লোককে প্রদান করা হইয়াছে! তাহাতে যে লোকের স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য্য, তাহাও বিবেচনা করা হয় না!

কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালার অভাবমোচনকল্পে পঞ্জাবের যে সরকার গম, আটা ও ময়দা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে সরকারকে দিতে-ছেন, সেই সরকারের এক জন সচিব হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকার সেই সকল দ্রব্যে অযথা লাভ করিতেছেন—আর এক জন হিসাব করিয়া সেই লাভের পরিমাণ পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়াছেন।

আহার্য্যের অভাবে কি হইতেছে, তাহা বাঙ্গালা সরকার পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ব্যবস্থা পরিষদে এক জন মুসলমান সদস্য বলিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছেন, বালিকাদিগকে বিক্রয়ার্থ পটুয়া-খালীতে আনয়ন করা হইতেছে—লোক আহার্য্য দিতে না পারিয়া স্ত্রী ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু সে কথাও যেন লোকরক্ষার দায়িত্ব যাঁহাদিগের, তাঁহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিলেও মর্ম্ম স্পর্শ করে নাই! তখনও বলা হইয়াছে—অভাব নাই, অভাব হইবেও না! যেন ইংরেজ সরকার যে নিয়ম করিয়াছিলেন—যে উপায়েই কেন হউক না, লোককে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে হইবে—সে নিয়ম পদতলে পিষ্ট করা হইবে।

যে সকল দেশ যুদ্ধে শত্রুর করতলগত হয়, সে সকল দেশে জন-গণের যে অবস্থা ঘটে, তাহার তুলনায়ও কি বাঙ্গালার অবস্থা অধিক শোচনীয় বলা যায় না? বাঙ্গালায় আজ কত লোক মৃত্যুকেই মুক্তি বলিয়া মনে করিতেছে!

বাঙ্গালার সচিবগণ বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করিয়া—দুর্ভিক্ষে লোক-রক্ষার দায়িত্ব কাহার, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে ব্যবস্থা ও ব্যবহার করিয়াছেন, ও করিতেছেন, সে সকল সম্বন্ধে অভিযোগের অন্ত নাই।

পঞ্জাব সরকারের দুই জন সচিবের অভিযোগের উল্লেখ আমরা করিয়াছি। উড়িষ্যা সরকারেরও অভিযোগ আছে। আসাম সরকারের ব্যবহার রহস্যাচ্ছন্ন। প্রতিদিন যে খাদ্য-শস্য ও খাদ্য-দ্রব্য বাঙ্গালায় আসিতেছে, তাহাতেও যে অবস্থার উল্লেখযোগ্য

পরিবর্ত্তন হইতেছে না, তাহা কেন্দ্রী সরকারের বিস্ময়ের ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। কিন্তু তবুও তাঁহারা বাঙ্গালায় লোকরক্ষার ভার গ্রহণ করেন নাই। তথা-কথিত স্বায়ত্ত-শাসনে রাজনীতিক পরীক্ষা হইতেছে—জনগণ ও সরকার উভয়ের মধ্যে কতকগুলি সচিব রাখিয়া—তাহাদিগের যোগ্যতা ও উপযোগিতা থাকুক আর না থাকুক—ইংরেজীতে যাহাকে "shock absorber" বলে তাহারই ব্যবস্থা করা হইতেছে।

বড় লাট লর্ড লিন্‌লিথগো তাঁহার বিদায়ী বক্তৃতায় তাঁহার দীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী শাসনকালের অনেক ব্যাপারেরই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু যে দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালা শ্মশান হইতেছে, তাহার উল্লেখও করেন নাই। আর যে লর্ড ওয়াভেল তাঁহার স্থানে বড় লাট হইয়া আসিতেছেন, তিনি তাঁহার মানসিক আধারে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, বাঙ্গালার লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ সে সকলের মধ্যে নাই। যেন বাঙ্গালায় অনাহারে লোকক্ষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা কাহারও অভিপ্রেত নহে। যেন—

"যুদ্ধের গরুড় যবে ঝটিকায় উপেক্ষিয়া উড়ে—
কে দেখে ধরায় কোথা শস্যক্ষেত্র বজ্রাঘাতে পুড়ে?"

অথচ বাঙ্গালা যে যুদ্ধের পূর্ব্বক্ষেত্র হইবে, তাহার আয়োজনের অন্ত নাই। সে জন্য বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনও যেন অনুভূত হয় না—বাঙ্গালা শ্মশান হইলেও তাহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন নহে!

বাঙ্গালার এই শ্মশান-দৃশ্য এ বার বাঙ্গালীর পূজার উপহার। আজ আর বাঙ্গালীর কণ্ঠে আগমনী ধ্বনিত হইতেছে না—

"উঠ, মা, উঠ, মা, বাঁধ, মা, কুন্তল
ঐ এল তোর ঈশানী—পাষাণী।"

বাঙ্গালী আজ মৃত্যুর ঘনায়িত অন্ধকারে জিজ্ঞাসা করিতেছে—

"শ্মশানে কেন, মা, গিরিকুমারী
কেন, মা, তোমার এমন বেশ?"

এই প্রশ্নই আজ বাঙ্গালী করিতেছে। যাঁহাকে আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি, তিনিই ইহার উত্তর দিতে পারেন। কিন্তু শ্মশানের যে নিস্তব্ধতা কেবল মানবের আর্ত্ত চীৎকারে মধ্যে মধ্যে যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছে, সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—প্রলয়ের গর্জ্জনের মত তাঁহার উত্তর এখনও শ্রুত হইতেছে না। যত দিন—যতক্ষণ সে উত্তর শুনা না যাইবে; ততক্ষণ আমরা কেবল বলিতে পারি :—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মৃত্যুরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

মানবের দীর্ঘদিনের ইতিহাস স্বার্থে ও ত্যাগে, নিষ্ঠুরতায় ও করুণায়, পাপে ও পুণ্যে যুদ্ধের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজ আমরা পৃথিবীতে যাহা লক্ষ্য করিতেছি তাহাও তাহাই। আমাদিগের দেশে যাহারা মনুষ্যচরিত্র নখদর্পণে দেখিতেন—যাঁহারা ত্রিকালের সীমা নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এই সংগ্রাম ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে সংগ্রাম বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্যই যে কুরুক্ষেত্রে মানুষের রক্তে ধরণীর পাপ প্রক্ষালিত হইয়াছিল, তাহাই ধর্ম্মক্ষেত্র নামে পরিচিত এবং সেই ধর্ম্মক্ষেত্রেই যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডবদলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে অস্ত্রঝনৎকার স্তম্ভিত করিয়া মানুষকে আশা ও আশ্বাস দিয়াছিলেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে।" তিনিই মানুষকে ক্লৈব্যাভিভূত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ কবি রোমের কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—যে দিন রোমের পতন হইবে, সে দিন পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইবে। সে কথা কবি-কল্পনার অতিরঞ্জন। রোম তাহার বিলাস-সাগরে ডুবিয়া মরিয়াছে; য়ুরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস আজ মৃত্যুর সুষুপ্তিতে মগ্ন; প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি মিশর আজ তাহার মরুকান্তারে পিরামীডের অন্ধকার অন্তরে সমাহিত। কিন্তু ভারতবর্ষ জীবিত—সে ইহকাল-সর্ব্বস্ব নহে বলিয়াই তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি তাহাকে মানবের সকল ধ্বংস-প্রচেষ্টা উপেক্ষা করিবার বল দিয়াছে।

আর রোমের সম্বন্ধে কবির উক্তি কল্পনার অতিরঞ্জন হইলেও বাঙ্গালা সম্বন্ধে তাহার সার্থকতা আছে। বাঙ্গালা যদি ধ্বংস হয়, তবে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইবে, তাহা কখন পূর্ণ হইবে না। সে ক্ষতি কি কেবল ভারতবর্ষেরই হইবে? যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের জন্মভূমি—সেই ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ্ গণতন্ত্রানুরাগ বাঙ্গালাই—অগ্নিহোত্র দ্বিজ যে নিষ্ঠাসহকারে আপনার অগ্নি রক্ষা করে, সেই নিষ্ঠাসহকারে—রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং যখনই সুযোগ আসিয়াছে, তখনই বাঙ্গালার গোমুখী-মুখে জাতীয়তার পাবনী ধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশের কল্যাণ ও উদ্ধার-সাধন সহায় হইয়াছে। বাঙ্গালা নবভারতের ভাবকেন্দ্র হইয়া রহিয়াছে।

এই বাঙ্গালা বিনষ্ট হইতে পারে না। ইহার বিনাশ-সাধন মানুষের ক্ষমতাতীত—বাঙ্গালা যুগে যুগে তাহার বিনাশ-সাধন-চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে—তাহাতে উপহাস করিয়া সেই চেষ্টার ভগ্নস্তূপের উপর আপনার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আজ আশা ও বিশ্বাস ত্যাগ করিব না—এই অস্বাভাবিক প্রলয়ের পরে আবার বাঙ্গালার মেঘমুক্ত আকাশ উন্নতির ভাস্কর-করে সমুজ্জ্বল হইয়া সমগ্র ভারতে সেই আলোক বিস্তৃত করিবে। সেই জন্য ক্লৈব্যাভিভূত না হইয়া—বাঙ্গালীকেই বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার কর্ত্তব্য ধর্ম্মজ্ঞানে পালন করিতে হইবে। সে সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আজ বাঙ্গালীকে ভক্তিভরে যুক্তকরে আবেদন করিতে হইবে—

"যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটিমূর্ত্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।"

এই আর্ত্তনাদ-মুখরিত—অকল্যাণের অন্ধকারে আপনার মন ও আপনার দেশ প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। যুগে যুগে বাঙ্গালী যে সময় দুর্গতিনাশিনীর পূজা করিয়াছে, সেই সময়েই তাঁহার অভয়বাণী শ্রুত হইবে—"মাভৈঃ।"

অন্ধকার—একাবাদ—অনাচার—অত্যাচার—এই সব মৃত্যু-সহচরকে দূর করিতে হইবে—জীবনের আবির্ভাবে নব যুগারম্ভ হইবে। যে শক্তির লীলা এই পৃথিবীতে আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই শক্তি কেবল জীবনেই প্রকট হয় না—তাহা মৃত্যুতেও প্রকট হয়। সেই জন্যই—সৃষ্টির জন্য—পরিবর্ত্তনের জন্য—শ্মশানের সৃষ্টি প্রয়োজন হয়। সেই জন্যই সাধকের উক্তি শক্তিরূপিণী শ্মশান ভালবাসেন।

শ্মশানে অকল্যাণ দলিত—মর্দ্দিত—নষ্ট করিয়া—মৃত্যুর পরে নব জীবনের আরম্ভ হয়। তাহাকেই যুগ-পরিবর্ত্তন বলা যায়

পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাসে ইহা লক্ষিত হইয়াছে। ভারতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। যে জীবন মৃত্যুর নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না, সে জীবনের স্থানে যদি নব-জীবনের প্রতিষ্ঠাই অভিপ্রেত হয়, তবে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই সেই মোক্ষের দিকে অগ্রসর হইবার প্রয়োজন থাকিতে পারে। দলে দলে যাত্রী সেই মোক্ষের পথেই প্রাণ হারায়—কিন্তু তাহাদিগের মৃত্যু কখন ব্যর্থ হয় না। স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইংরেজ কবি যাহা লিখিয়াছেন—মোক্ষ ও মুক্তি সম্বন্ধে তাহা আরও প্রযোজ্য। স্বাধীনতার সংগ্রাম এক বার আরম্ভ হইলে রক্তসিক্তদিগের মৃত্যুশিথিল হস্ত হইতে পতাকা পরবর্ত্তীরা গ্রহণ করে—বার বার পরাভূত হইলেও জয় অবশ্যম্ভাবী হয়। মুক্তি যে আরও অধিক কাম্য তাহাতে সন্দেহ নাই। হয়ত যে পথে বাঙ্গালী মুক্তির সন্ধান করিতেছিল, তাহা প্রকৃত পথ নহে; তাই তাহাকে অন্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে যে মৃত্যুর মধ্যে জীবনের বীজ উপ্ত হইবে—অকল্যাণের পঙ্কে কল্যাণের শতদল জন্মলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যাহারা এই মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাহাদিগের কি হইবে এবং তাহাদিগের পরিণাম কি, তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই মৃত্যুকেই আমরা শেষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না—করিবও না।

এই শ্মশানেই আবার স্বর্ণদীপ প্রজ্বলিত হইবে; সেই দীপালোকে আমরা দেখিতে পাইব, যে নূতন বাঙ্গালার উদ্ভব হইবে, তাহাতে দৌর্ব্বল্যের, দুঃখের, দৈন্যের স্থান থাকিবে না।

আজ শক্তিপূজার সময়ে তাহাই বাঙ্গালীর একমাত্র কামনা।

বাঙ্গালী বহু পরীক্ষায়—অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া—হিংস্র জন্তুর আপদ নিবারণ করিয়া গঙ্গার পূতধারাবাহিত মৃত্তিকায় গঠিত এই বদ্বীপকে মানবের কর্ম্মকেন্দ্র—লক্ষ্মী-সরস্বতীর অনুগ্রহশ্রীসম্পন্ন দেশে পরিণত করিয়াছে। এই বাঙ্গালায় ভাগ্যপরীক্ষা করিবার জন্য বিদেশ হইতে বহু লোক—উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল সাগর ও তুষারমণ্ডিত হিমগিরি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। এই বাঙ্গালায় সুদূর প্রাচী হইতে মানুষ জ্ঞানের অন্বেষণে আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের জন্য অকাতরে রক্তদান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছে। আর এই বাঙ্গালার কবি, বাগ্মী, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, ধর্ম্মগুরু মানব সভ্যতা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই বাঙ্গালা কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। আজ আমরা সেই বিশ্বাসে বলী হইয়া শক্তির উৎসে স্নান করিয়া—কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইব। আমাদিগের সে যাত্রা জয়যাত্রাই হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

উমা ও মেনকা

"আমি যত কাল জীব আর না মা পাঠাইব
ফলভারে ভাঙ্গেনাক ডাল।"
রামেশ্বরের শিবায়ন।

উমারে রাখিয়া বুকে চুমা দিয়া চাঁদমুখে
গিরিরাণী কেঁদে কেঁদে কয়,—
"মা তোরে বিদায় দিতে বাসনা হয় না চিতে,
শুধু ভয় কি জানি কি হয়।
ভিখারী হরের ঘরে কত ক্লেশে অনাদরে
অযতনে কাটে তোর দিন,
আলুথালু তোর বেশ, তৈলহীন রুক্ষ কেশ,
ভোলানাথ সদা উদাসীন।
কেন বাছা চাস্ যেতে? হয়ত পাস্ না খেতে,
দুই বেলা উদর পূরিয়া।
রাজার ভাণ্ডার ভরা হেথা সবই ফেলা ছড়া,
মরি মা গো ঝুরিয়া ঝুরিয়া।
যাস্ না মা মাথা খাস্, দিব তোরে যাহা চাস্,
এই ঘরে থাক চিরকাল,
পূরিতে সংসার তোর কোন ক্লেশ নাই মোর,
ফলভারে ভাঙ্গেনাক ডাল।"

আপন অঞ্চল দিয়া মা'র চোখ মুছাইয়া
কয় উমা "ব'লো না ব'লো না
মা হ'য়ে অমন কথা, ব্যথার উপরে ব্যথা
দিয়ে মা গো ক'রো না ছলনা।
কি ফল ও ফল ভার ফলাবার বহিবার
বিফল যে ফলের জীবন?
দেবতার ভোগে রাগে যদি তাহা নাহি লাগে,
যদি তা না কর নিবেদন।
কন্যা হ'য়ে জননীরে এ সহজ কথাটিরে
বুঝাইতে মা গো লজ্জা করে,
ফলাবার অধিকার আছে শুধু মা তোমার,
ফল শুধু সঁপিবারই তরে।"

শ্রীকালিদাস রায়।

শ্মশানে কেন মা ?

শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি !

আজ বঙ্গভূমি শ্মশানে পরিণত ! শস্য-শ্যামলা সুজলা সুফলা বঙ্গজননীকে আজ দেখিতেছি—দীনা—হৃতসর্ব্বস্বা—কাঙ্গালিনী। তার নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হাহাকার ! পথে পথে দ্বারে দ্বারে কঙ্কালসার বুভুক্ষু নরনারী-মূর্ত্তি প্রেতপিশাচের বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে !

গ্রামে শুধু অন্ন নাই—তাহা নহে, বন্যার ধ্বংসলীলায় গৃহগুলিও বিধ্বস্ত ! ধান্যের ক্ষেত্রগুলি জলমগ্ন থাকিয়া তৃণহীন হইয়াছে। গোজাতির আহার্য্য নাই—বাসস্থান নাই—পালন করিবার লোক নাই,—কসাই-হস্তে আত্মদান করিয়া তাহারা দুঃখ হইতে মুক্ত হইতেছে।

সহস্র সহস্র নিরন্ন নরনারী গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিতেছে—পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে, দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে, জনে জনে নিজ দুঃখ-দুর্দ্দশার আবেদন জানাইতেছে ! কেহ কিছু পায়—কেহ পায় না। বিড়াল কুকুরের মত নর্দ্দমা হইতে পাত কুড়াইয়া একটু তরকারীর কণা খাইবার জন্য ছুটিতেছে !

নগরের পথে পথে মৃতদেহ পতিত, কে কাহার সৎকার করে ! মুমূর্ষুর কাতর ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ, ক্ষুধাতুর শিশুগণের ক্রন্দনে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত, নগ্নপ্রায় রমণীশ্রেণি—একমুষ্টি তণ্ডুলের আশায় পথের উপর শয়ন করিয়া রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় পাতিয়া লইতেছে ! শবের পূতিগন্ধে নগর পরিব্যাপ্ত। ক্ষুধার জ্বালায় স্নেহময়ী জননী নিজ সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তার মত চলিয়াছে—এক কণিকা অন্নের জন্য। মাতৃ-পরিত্যক্ত শিশু এক বিন্দু দুগ্ধের অভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে !

এক দিকে এইরূপ হৃদয়বিদারক চিত্র, অন্য দিকে সমরানলের লেলিহান শিখা—নরনারীর প্রাণাহুতি-লোভে দিনে দিনে বিস্তার লাভ করিতেছে। শ্মশানের পূর্ণ ছবিখানি আজ চক্ষুর সম্মুখে বাস্তব মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আজ এই বঙ্গভূমির শ্মশান-প্রাঙ্গণে বিশ্বজননীর আগমনবার্ত্তায় সাধক চকিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারি !

কেন মা এই ভীষণ দুর্দ্দিনে—এই ভয়াবহ শ্মশানে—তোমার ঐ কোকনদবিনিন্দি-চরণযুগল স্থাপন করিতে চাহিতেছ ? প্রতিবর্ষে তোমার আগমন-সূচনায় দুর্দ্দিনের করাল ছায়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়, দুঃখ-ম্লানমুখে সুখের হাস্যরশ্মি ফুটিয়া উঠে। অন্ততঃ তোমার এই তিন দিনের জন্য বঙ্গগগন আনন্দ-কোলাহলে মুখর হইয়া উঠে, কিন্তু আজ যেন সমস্তই নিস্তব্ধ—নিষ্ক্রিয় ! তোমার আগমনেও স্পন্দন নাই—চিন্তা-স্তিমিত মুখে আনন্দরেখা ফুটিতেছে না, প্রকৃতিও যেন আজ বিষাদ-গম্ভীর। শারদ প্রভাতের সে উজ্জ্বলতা নাই, হরিৎক্ষেত্রে সে শ্যামলতা নাই, নদনদীতে সে নির্ম্মলতা নাই। সর্ব্বত্র আতঙ্ক—শঙ্কা—বিষাদের ঘন ছায়া ঘেরিয়া আছে।

প্রকৃতি-প্রদত্ত জল ও ফলফুলই তোমার পূজার প্রধান উপকরণ। চন্দন-বিল্বপত্রে তোমার অর্ঘ্যরচনা, সাগর-সরোবর-নদনদীর জলে তোমার পাদ্য ও স্নান, লবঙ্গ-জায়ফল-কক্কোলের সুরভি সলিলে তোমার আচমন, ঘৃত দধি মধু-শর্করায় তোমার মধুপর্ক,—অরণ্যজাত বৃক্ষের নির্য্যাসে তোমার ধূপদান, ঘৃতসিক্ত কার্পাসবর্ত্তিতে তোমার দীপশিখা, কদলী-নারিকেল-লড্ডুক-শোভিত নৈবেদ্য শুভ্রতণ্ডুলে তোমার নৈবেদ্য, পূগকর্পূর-যোজিত তাম্বূলে তোমার মুখশুদ্ধি, ভারতের ভূমি হইতে স্বভাবোৎপন্ন সুলভ দ্রব্যজাতই তোমার পূজার উপচার, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাংস্য-করতালের ধ্বনি—তোমার সন্তোষ-বিধান বাদ্য। কিন্তু আজ কোথায় লুকাইল—সেই অনায়াসলভ্য দ্রব্যবিতান ? আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বায়ুযান ও বিমানবাহিনীর সঞ্চারে—বৃক্ষলতা গুল্ম পর্য্যন্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ফল—ফুল প্রদানে বিরত, দূর্ব্বাদল দলিত, বিল্ববৃক্ষ উৎপাটিত, ধান্যক্ষেত্র বিমান-উড্ডয়ন-ভূমিতে পরিণত, গোজাতি উৎসন্ন,—তদুপরি ঘৃতদুগ্ধ অপব্যয়িত, তণ্ডুল নিঃশেষে অপহৃত, নদ-নদী বলুষিত—শঙ্খঘণ্টাধ্বনির বিনিময়ে বিমানের কর্ণপটহবিদারী ঘর্ঘর শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে।

কোন্ প্রভাবে আজ তোমার পূজার উপচার বঙ্গজননীর বক্ষঃ হইতে এমন ভাবে তিরোহিত হইল ? কোন্ অচিন্তনীয় বিপৎ আসিয়া ভারতের এই দৈবী সম্পৎকে আবৃত করিয়া ফেলিল—আজ তাই সাধক-চিত্তে চিন্তার অন্ত নাই। সাধক বলিল—মা, তুমি 'উমা হৈমবতী বহু শোভমানা' রূপে দেবতাদিগের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের সংশয় অপনোদন করিয়া থাক, আজ আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র সংশয়টুকু বিদূরিত করিবে না কি ? আজ দেশের দুরবস্থা দর্শনে মনে হইতেছে—তুমি কি তোমার সেই 'ভীষণং ভীষণানাম্'—মূর্ত্তি প্রকট করিয়া তোমার ব্রহ্মস্বরূপতা জ্ঞাপন করিতেছ !

'ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ'—তোমারই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হইয়া থাকে, তোমারই ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র ও যম স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকেন। তোমার এই ভয়াবহ রূপের মধ্যেও মাধুরীর পরিচয় পাই, কেন না—'ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ হুতাশন যম তপন—তোমারই আজ্ঞাবহ হইয়া জগৎ রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও তোমার ভীষণ রূপ প্রলয়ের সূচনা করিবে, তখন জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সৈব কালে মহামারী·········।

•   •   •   •

সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে।

তুমি মহামারী মূর্ত্তিতে—অলক্ষ্মীস্বরূপে সমস্ত বিশ্বের বিনাশের কারণ হইবে।

মা ! আজ কি তাহারই সূচনা দেখিতেছি ? অথবা এই যে দুর্দ্দিন—ইহা তোমার ইঙ্গিতে হয় নাই,—হইয়াছে—কোন আসুর-ভাবের বিকাশ হইতে। কেন না—দেবীভাগবতে দেখিতে পাই, তারকাসুরের অভ্যুদয়কালে বিশ্বের এইরূপই এক ভাবের প্রকাশ হইয়াছিল।

আনন্দঃ শুষ্কতাং যাতঃ সর্ব্বেষাং হৃদয়ান্তরে।

উদাসীনাঃ সর্ব্বলোকাশ্চিন্তাজর্জ্জরচেতসঃ।

সদা দুঃখোদধৌ মগ্না রোগগ্রস্তাস্তদাভবন্। ৭।৩১।৭—৮

আজও দেখিতেছি—সকলের হৃদয় নিরানন্দময়, সমস্ত মানব চিন্তায় জর্জ্জর ; দুঃখ-সমুদ্রে মগ্ন হইতেছে।

সাধক নয়ন নিমীলিত করিয়া মাতৃ-চরণ ধ্যান করিতে করিতে অর্দ্ধ-জাগ্রৎ অর্দ্ধ-সুপ্ত অবস্থায় দেখিতে পাইল—সত্যই আসুর ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে জগৎ জর্জ্জরিত হইতেছে। একের অন্ন অপরে কাড়িয়া লইতেছে, মানুষ মানুষকে হত্যা করিবার জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া ধাবমান হইতেছে। ব্যভিচার, হিংসা, চৌর্য্য ও বঞ্চনা, শৌর্য্যরূপে..

প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। নারীর কোমলতা, শালীনতা, সতীধর্ম্ম ও পতিচিন্তানুবর্ত্তিতা—কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত। আর্য্য ভাব বিলুপ্ত হইয়া অনার্য্যতা ও নিষ্ঠুরতার আসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; সম্মুখে মা বিশ্বরূপে দণ্ডায়মানা।

সাধক ভীতি-কম্পিত হইল এবং কথঞ্চিৎ আশ্বস্তও হইল। ভীতির কারণ এই যে,—এই আসুর ভাব কিরূপে প্রশমিত হইবে, ইহার দারুণ প্রকোপে পৃথিবীর কোন্ অংশ রক্ষা পাইবে এবং কোন্ অংশ যে ধ্বংসমুখে পতিত হইবে—তাহা কে জানে ?

আশ্বাসের কারণ,—মায়ের অভয় বাণী—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

দানবের কৃত কার্য্য যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন,—জগদম্বার অনুগ্রহে তাহার অন্ত হইবেই—সাময়িক আধিব্যাধি—অত্যাচার—উৎপীড়ন কালে প্রশমিত হইবেই। ইহার ভার গ্রহণ করিয়া—দেবগণ-সম্মুখে স্বয়ং জগদীশ্বরী তাঁহার প্রতিজ্ঞা-বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি কালে কালে এইরূপ আবির্ভূতা হইয়া দানব ভাবের ধ্বংস করিয়াছেন। তিনি যে পূর্ণ ব্রহ্ম-স্বরূপিণী—তাহা শাস্ত্রে নানা ভাবে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। শক্তিই তাঁহার স্বরূপ, শক্তিই তাঁহার লীলা-বিলাস—শক্তিই তাঁহার প্রকাশ। তিনি যখন তারকাসুর বধের জন্য দেবতাদিগের প্রার্থনায় হিমালয়গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তখন তিনি স্বমুখে বলিয়াছিলেন—

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা॥

যা কিছু জগতে বস্তুরূপে দেখা যায় বা শুনা যায়, তাহার অন্তর ও বহিঃ ব্যাপিয়া আমিই সর্ব্বদা বিরাজমানা।

ইহা শুনিয়া হিমালয় কৌতূহলী হইয়া বলিলেন,—দেবি, সমস্ত বস্তুর সমষ্টিরূপে তোমাকে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। দেবতারা ছিলেন—সন্নিধানে, তাঁহারাও পরম আনন্দ সহকারে হিমালয়ের প্রার্থনা-বাক্য সমর্থন করিলেন। তখন দেবী বিরাট্ রূপ ধারণ করিলেন।

সে বিরাট্ রূপের মস্তক হইল দ্যৌঃ, চক্ষুর্দ্বয়, চন্দ্রসূর্য্য—দিক্ শ্রোত্র, বেদ হইল বাক্য, বায়ু প্রাণ, বিশ্ব হৃদয়, পৃথিবী জঘনদেশ, নভস্তল—নাভিবিবর, জ্যোতিশ্চক্রমণ্ডল—বক্ষঃস্থল। মহর্লোক গ্রীবা, জনোলোক মুখ, ইন্দ্রাদি বাহু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নাসিকা, যম দন্তশ্রেণি, হাস্য হইল মায়া। মেঘমালা তাঁহার কেশপাশ, উভয় সন্ধ্যা—বস্ত্রযুগ্ম, উদর—সমুদ্র, গিরিসমূহ অস্থি, নদীসমূহ—নাড়ী, চন্দ্র—মনঃ, শ্রীহরি—বিজ্ঞানশক্তি, রুদ্র—অন্তঃকরণ, অশ্ব প্রভৃতি তাঁহার শ্রোণিদেশের ভূষণ; তাঁহার জিহ্বা—লেলিহান স্বয়ং শত শত অগ্নিজ্বালায় সমুজ্জ্বল, দন্তে কটকটাশব্দ, নানায়ুধধারিণী, সহস্রশীর্ষা, সহস্রনয়না, সহস্রচরণা কোটিসূর্য্য-প্রকাশা, বিদ্যুৎকোটিপ্রভা সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিদর্শনে দেবতাদিগেরও ভয় উপস্থিত হইল, তাঁহাদের হৃদয় কম্পিত হইল এবং মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। (দেবীভাগবত, ৭।৩৩)

এই প্রকার বিরাট্ রূপ দর্শনে অর্জ্জুনও এক দিন বিমূঢ় হইয়াছিলেন; যুদ্ধকালে বা অসুরের অত্যাচারে মানব যখন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখনই এই বিরাটরূপ বা বিশ্বরূপের প্রকটন আবশ্যক হইয়া উঠে। আজ তাই সাধকের চক্ষে—শ্মশানে গিরিকুমারী ও 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ'—লোকক্ষয়কারী কালমূর্ত্তির সঙ্গে কোন ভেদ প্রতিভাত হয় না। কাল শব্দে কাল্যা অয়ং এই অর্থে কালী সম্বন্ধীয় রূপবিশেষকে বুঝাইতে পারে। তাই অর্জ্জুনদৃষ্ট বিশ্বরূপ ও দেবগণদৃষ্ট দেবীর বিরাট্ রূপে কোন ভেদ নাই। ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥

হে অর্জ্জুন! আমার দুর্ল্লভ-দর্শন যে রূপ তুমি দর্শন করিলে—এই রূপ-দর্শনের জন্য দেবগণও আকাঙ্ক্ষা করেন।

শ্রীভগবানের এই উক্তিতে স্পষ্ট বুঝা যায়;—দেবগণ ঈদৃশ রূপ একবার দর্শন করিয়াছেন—তাই নিত্য দর্শন-আকাঙ্ক্ষা করেন, যদি একেবারেই দর্শন না ঘটিত, তাহা হইলে 'নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ' না বলিয়া শুধু 'দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ' ইহা বলাই সঙ্গত হইত। দেবগণ ঈদৃশ রূপ কোথায় দর্শন করিলেন? অর্জ্জুনপক্ষীয় দূতরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্য্যোধন সমীপে সন্ধিপ্রস্তাব লইয়া গমন করিয়াছিলেন তখন একবার তাঁহাকে বিরাট্ রূপ ধারণ করিয়া ভীষ্মাদি বীরবৃন্দকে মোহিত করিতে হইয়াছিল, সেখানে দেবতাদের উপস্থিতি বর্ণিত হয় নাই। দেবীভাগবতে হিমালয় সন্নিধানে কেবলমাত্র দেবগণের সাক্ষাতে দেবীর বিরাট্ রূপ ধারণ উল্লিখিত আছে, সুতরাং এই বিরাট্ রূপ দেবতারা দর্শন করিয়াছিলেন এবং গীতোক্ত বিশ্বরূপ গ্রহণের সময়ে যে দেবতাদের নিত্য দর্শনাকাঙ্ক্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার হেতু ঐ দেবীর বিরাট্ রূপ একবার দেবতাদের দর্শনীয় হওয়ায় পুনরায় দেবগণের তাদৃশ রূপ সতত দর্শনের ইচ্ছা সম্ভবপর।

গীতায় কথিত হইয়াছে—'লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ' লেলিহান মুখে সমস্ত লোক গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত সেই বিশ্বরূপ, যাহা দেখিয়া অর্জ্জুনও ভীতি-কম্পিত হইয়াছিল শুধু বঙ্গের বক্ষে নহে, পৃথিবীর বিরাট্ রণাঙ্গনে দেবী বিরাট্ রূপে লোকক্ষয়কর কালরূপে আজ প্রকটিত হইয়াছেন। এই কালরূপকে সংহার করাইতে হইলে চাই—সাধনা, কাতর প্রার্থনা ও শরণাগতি। ভ্রষ্টরাজ্য সুরথ মহারাজকে এক দিন মেধসমুনি উপদেশ দিয়াছিলেন—

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥

মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণাপন্ন হউন, তিনি আরাধিতা হইলে মানবের ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ এই ত্রিবিধ কল্যাণই প্রদান করিয়া থাকেন।

বিশ্বের এই সঙ্কটকালে মা তুমি প্রসন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হও, তোমার সংহারকারী ভীষণ বিরাট্ রূপদর্শনে—দেবগণও কম্পিত হইয়াছিলেন, অর্জ্জুনের মত শক্তিশালী বীরের হৃদয়ও স্পন্দিত হইয়াছিল, মন্দমতি সাধারণ মানব যে ভীত—বিমূঢ় হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? আজ কাতর-কণ্ঠে তোমাকে আবাহন করিতেছি—

এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয়জয়প্রদে!

তোমার পদ-কোকনদস্পর্শে এই শ্মশানসদৃশ বঙ্গভূমি আবার শস্য-সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক—তোমার করুণা-সম্পদ্ লাভ করুক, আর দানব ভাব বিদূরিত হউক। তোমার অভয়বাণীতে সকলের শ্রদ্ধা অঙ্কুরিত হউক। ব্রহ্মরূপিণি মা, তোমার অদেয় কি আছে, তোমার প্রসন্নতায় বিশ্ব ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠে, দীনতা বিদূরিত হয়, মুমূর্ষুর প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়া উঠে।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ (এম-এ, অধ্যাপক)।

ক্রমশঃ-প্রকাশ্য

[গল্প]

গেল-বছর ইভাকুয়েশনের হিড়িকে সহর কলিকাতার বুক যখন অর্দ্ধেকের উপর খালি হইয়া গেল, মৃগাঙ্কর তখন ভয় হইল! জোর করিয়া বিধবা মা এবং ভাইবোনদের বহুকালের পরিত্যক্ত পল্লী-ভবনে পাঠাইয়া সে এখানে রহিল একা। রহিল অবশ্য চাকরির দায়ে।

তিন-বছরের চাকরি। ইভাকুয়েশনের দৌলতে উপরের দু'-তিন ধাপ হইতে লোক সরিয়া গেলে টক্ করিয়া মৃগাঙ্কর হইল প্রোমোশন্ ষাট টাকা হইতে একেবারে একশো টাকা মাহিনায়।

মৃগাঙ্কর তরুণ বয়স। এই বয়সে একশো টাকা মাহিনা···জাপানী বোমার ভয় মন হইতে মিলাইয়া গেল! চোখে সে দেখিল ভবিষ্যৎ রঙে-রঙে রঙীন!

মৃগাঙ্ক থাকে ভবানীপুরের বাড়ীতে,—সঙ্গে ভৃত্য দামু। একাধারে সে ভৃত্য, পাচক এবং সুখ-দুঃখের সহচর। মৃগাঙ্কর এখনো বিবাহ হয় নাই। বিবাহের কথা চলিতেছিল; পাকা-কথা পাকিবার উপক্রম করিয়াছে এমন সময় সাইরেনের ভেঁপু বাজিয়া উঠিল! কাজেই বিবাহের কথা সিকায় তুলিয়া পাত্রীর পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন! পাত্তা দিয়া যান্ নাই; সুতরাং বিবাহের সম্ভাবনা কোন্ সুদূর ক্ষণে তিরোহিত হইয়াছে!

বন্ধুদের মধ্যে কেহ পলাতক, কেহ বা নানা কারণে বাহিরে যোগ্য আশ্রয়ের অভাবের জন্য কিম্বা পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ্য-মোচনার্থে কলিকাতায় রহিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় যারা আছে, তাদের মধ্যে বন্ধু উমাকান্তর নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—কারণ ক্রমশঃ-প্রকাশ্য!

বৈশাখ মাস। ক'মাসে কলিকাতার পথের চেহারা বদলাইয়া গিয়াছে,—রূপে-রসে বেশ রমণীয়তার সমাবেশ ঘটিয়াছে। মৃগাঙ্ক তাহাতে বিমুগ্ধ। পেট্রোলের ট্যাঙ্কে চাবি পড়িয়াছে, কাজেই ট্রামে-বাসে অসূর্য্যম্পশ্যা বঙ্গ-ললনাদের সহজ এবং নিঃসঙ্কোচ বিচরণ সহরের পথ-চারণাকে এমন কমনীয়তায় ভরিয়া তুলিয়াছে যে, মৃগাঙ্কর মনে মাঝে মাঝে বিভ্রম জাগে—এ সত্য? না, স্বপ্ন? না, মায়া? আধুনিক উপন্যাসের ক'খানা ছেঁড়া পাতা যেন বৈশাখী বাতাসে চোখের সামনে উড়িয়া বেড়াইতেছে! ট্রামে-বাসে যাইতে আঁচলের বাতাস গায়ে লাগে, মৃগাঙ্ক ভাবে···

অনেক কথা ভাবে!

সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঐ ময়দান···কার্জ্জন গার্ডেনস্···এস্‌প্লানেড··· সিনেমা-হাউসগুলার লাউঞ্জ···রকমারি শাড়ীর অঞ্চল-বীজনে, হাসি-কথার ঝাপটায় সহর যেন মায়াপুরীতে রূপান্তরিত হইয়াছে!

সে-দিন সন্ধ্যার পর গম্ভীর মুখে মৃগাঙ্ক আসিল উমাকান্তর গৃহে··· রেডিয়ো-সেট্ খুলিয়া উমাকান্ত শুনিতেছিল অর্কেষ্ট্রা।

মৃগাঙ্ক আসিয়া নিঃশব্দে বসিল। তার মুখে চিন্তার কালো ছায়া ···দেখিয়া উমাকান্তর মনে কৌতূহল জাগিল! উমাকান্ত কহিল—ব্যাপার কি মৃগাঙ্ক? বাড়ী থেকে কোনো দুঃসংবাদ এলো না কি? না, অফিসে সাহেবের খিঁচুনী?

একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া মৃগাঙ্ক কহিল—না।

—তবে?

মৃগাঙ্ক বলিল—তুমি তো বিয়ে করেছো উমাকান্ত···

হাসিয়া উমাকান্ত বলিল—নিশ্চয়! এবং স্ত্রীর গরবে আমি গরবী!

মৃগাঙ্ক বলিল,—হুঁ···নারী-চরিত্র সম্বন্ধে তাহলে তোমার খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে, নিশ্চয়!

কথা শুনিয়া উমাকান্ত অবাক্! মুখে বলিল—নারী-চরিত্র কি সহজ বস্তু, ভাই! উপনিষদ্ পড়ে তার অর্থ যদি বা বুঝতে পারি, কিন্তু নারী-চরিত্র!···তবে হ্যাঁ, নারী-চরিত্রে বর্ণ-পরিচয় সবে মাত্র আরম্ভ করেছি, তা অস্বীকার করবো না···এখনো 'ঐক্য'-'বাক্য' পাঠ পর্য্যন্ত এগুতে পারিনি!

মৃগাঙ্ক বলিল—ওতেই হবে।···আচ্ছা, বলতে পারো সম্পূর্ণ অপরিচিতা তরুণী···ট্রামে তাঁর সঙ্গে নিত্য ক'দিন দেখা হচ্ছে···তাঁকে আমি ভালো করে জানতে চাই! তার উপায়?

উমাকান্ত বলিল—তার মানে, তাঁর নাম-ধাম-পরিচয় জানতে চাও? না, তাঁর মন জানতে চাও?

মৃগাঙ্ক বলিল—সব আমি জানতে চাই। বলতে পারো কি করে জানা যায়? অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় ক'দিনই দেখা হচ্ছে···ট্রামে তিনি লেডিজ সীটে বসেন···ভিড় ঠেলে আমি ট্রামে উঠে দাঁড়াই ঠিক তাঁর পিছনে! বাঁধা টাইম···সন্ধ্যা ছটায় আমি উঠি ডালহৌসি স্কোয়ারে···দেখি, তিনি বসে আছেন লেডিজ্ সীটে। কালীঘাটের ট্রাম···তিনি নামেন বকুলবাগানের মোড়ে···ভিড় সরিয়ে তাঁর জন্য আমি পথ ক্লীয়ার করে দি'।

উমাকান্ত বলিল—কিন্তু তোমার তো নামবার কথা জোগুবাবুর বাজারের মোড়ে···যেহেতু তোমার বাড়ী পদ্মপুকুরে! অতখানি পথ তোমার এগিয়ে যাবার হেতু?

মৃগাঙ্ক বলিল—আমি এগিয়ে যাই তার মানে, তাঁর জন্য! মানুষগুলো ট্রামে প্যাসেজ জুড়ে এমন ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে··· সব রীতিমত অসভ্য···তাই তাঁর নামতে অসুবিধা হয়! তিনি ক'দিন লক্ষ্য করেছেন, ট্রাম থেকে নামবার সময় তাঁর পথ কি ভাবে আমি ক্লীয়ার করে দি'। আমিও লক্ষ্য করেছি, তাঁর দুই চোখে কেমন একটু যেন···কিন্তু ভয়ে আমি এমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি যে, তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মেলবামাত্র আমার চোখে চারিধার কেমন ঝাপ্‌সা হয়ে আসে! তাঁর তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের কোনো সাড়া কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পাইনি! বলতে পারো কি করলে বুঝতে পারবো তাঁর মনোযোগ আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে···এবং ভাষায় তিনি তা প্রকাশ করবেন কবে?

উমাকান্ত বলিল—খুব সহজ উপায় আছে। ভয়ে তুমি অমন কুণ্ঠিত হয়ো না। ট্রাম থেকে নামবার সময় তুমি যখন পথ ক্লীয়ার করে দেবে, তোমার পানে তখন তিনি তো একবার চেয়ে দেখেন, বললে,—সে সময় অর্থাৎ তোমার চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হবার আগে তুমি ধাঁ করে একটু হেসো···যাকে বলে মৃদু হাসি! অর্থাৎ অধর-প্রান্তে হাসির বিদ্যুৎ-শিখা! বুঝলে?

কথা শুনিয়া মৃগাঙ্ক কি যেন ভাবিল···দু'মিনিট। তার পর একটা নিশ্বাস চাপিয়া বলিল,—তাই করবো। এবার একটু সাহসী হবো।···

পরের দিন অফিসের ছুটীর পর সেই বাঁধা টাইম···অপরাহ্ন ছটায় মৃগাঙ্ক আসিয়া ডালহৌসি স্কোয়ারে কালীঘাটের ট্রামে উঠিল···এবং উঠিয়া দেখে, নিত্যদিনের মতো সে-ট্রামে লেডিজ্ শীটে বসিয়া আছেন সেই তরুণী। সারা পথ মৃগাঙ্ক নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে চলিল,—আজ উমাকান্তর উপদেশ মানিয়া চলিবে! সে চাহিয়া রহিল অপরিচিতার পানে···কখন আসিবে বকুলবাগানের মোড়, অপরিচিতা নামিবেন···সে প্যাসেজ ক্লীয়ার করিয়া দিবে! এবং তখন···

এসপ্লানেড, পার্ক ষ্ট্রীট, লোয়ার সার্কুলার রোড, এলগিন রোড··· সব কটা মোড় পার হইয়া ট্রাম চলিয়াছে। কিন্তু ট্রামে আজ ভিড় নাই। যাত্রীরা সব শীটে বসিয়া···কেহ দাঁড়াইয়া নাই। প্যাসেজ ক্লীয়ার! কাজেই মৃগাঙ্কর আজ ওয়ালটার র‍্যালের ভূমিকাভিনয়ের প্রয়োজনও নাই!

কি মনে হইল···মনের মধ্যে যে-যুদ্ধ চলিয়াছিল, বুঝি তাহারি বেয়নেটের খোঁচা লাগিল!···মৃগাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইল লেডিজ শীটের ঠিক পিছনে।

এলগিন রোডের মোড় ছাড়িয়া ট্রাম চলিল···কণ্ডাক্টর বলিল—শীট খালি রয়েছে, বসুন স্যর···প্যাসেজে দাঁড়াবেন না। ইন্‌স্‌পেক্টর দেখলে আমার নামে রিপোর্ট করবে।

মৃগাঙ্কর গা ছমছম্ করিয়া উঠিল! ট্রামের কামরায় ক'জন যাত্রী কণ্ডাক্টরের কথায় তাহারি পানে চাহিয়া আছে! সে বলিল—একটু আগেই আমি নামবো!

•

বন্ধু উমাকান্তর গৃহে আসিয়া মৃগাঙ্ক রিপোর্ট দাখিল করিল।

শুনিয়া উমাকান্ত একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, বলিল—আচ্ছা, এঁর বিবাহ হয়েছে? না, কুমারী?

মৃগাঙ্ক বলিল—কি করে তা বলবো? তাঁর সঙ্গে আমার আলাপই হলো না মোটে!

উমাকান্ত বলিল—বাঙালীর ঘরের মেয়ে···আলাপ না হলে এটুকু বুঝতে পারো না? মুখ্যু কোথাকারের! তাঁর সীঁথেয় সিঁদুর দেখেছো?

মৃগাঙ্ক অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল! তার পর বলিল—কৈ, সীঁথেয় সিঁদুর দেখেছি বলে তো মনে হয় না! যত দূর মনে পড়ছে, সিঁদুর যেন দেখিনি!

উমাকান্ত বলিল—তাহলে কথা কয়ে ফ্যালো! সাহস আনো মনে! রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' পড়েছো নিশ্চয়! সেই চিরকুমার সভায় পূর্ণ যেমন বলেছিল—গড়ের মাঠে বেলুন উড়েছিল দেখেছেন? তেমনি ধরণের একটা কথা···

মৃগাঙ্ক বলিল—কিন্তু বেলুন এখন ওড়ে না। প্লেন ওড়ে··· অসংখ্য। প্লেনের কথা বলা চলে না।···আচ্ছা, কি কথা বলবো, বলতে পারো?···মানে, সে-কথার একটা মানে থাকা চাই তো!

উমাকান্ত বলিল—মানেওলা যে-কথা বলতে চাইছো, সে-কথা দুম করে গোড়ায় বলে বসা ঠিক হবে না! প্রথমে বা-তা কথা বলে ফ্যালো। তার মানে যত না থাকে, ততই ভালো! মানে, মানে-না-থাকা কথায় চট্ করে ওঁদের যেমন সিম্প্যাথি পাওয়া যায়, অর্থযুক্ত কথায় তার সিকির সিকি সিম্প্যাথি মেলে না!

এ কথা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কাজ করিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিল—ঠিক হয়েছে। জিজ্ঞাসা করবো, আপনাদের পাড়ায় কাল রাত্রে সাইরেন বেজেছিল, শুনেছিলেন?

উমাকান্ত বলিল,—কিন্তু সাইরেন তো সত্যি বাজেনি মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক বলিল—না বাজুক, ঐ সাইরেনই হলো আজকালকার মোষ্ট ইন্‌টারেষ্টিং টপিক। ঐ সাইরেন ধরে নানা কথা উঠতে পারে···ওঁর বাড়ীর কথা···উনি এখানে কেন আছেন···কোথায় আছেন···ইভাকুয়েট করেননি কেন···এমনি নানা কথা।

উমাকান্ত বলিল—এই তো, তোমার ইন্‌স্পিরেশন এসেছে, দেখছি!···আচ্ছা, তিনি দেখতে কেমন?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিল,—মোষ্ট চার্মিং! মানে, যে-সব বাঙালী মেয়েদের পথে-ঘাটে হামেশা এখন ছাখো—কারো বিপর্য্যয় স্থূল বপু···কারো বা অস্থিসার দেহ···মুখে কেউ জ্যাবড়া করে রং মাখে···ইনি তাদের কারো মতো নন্! এঁর রূপ-লাবণ্য আর তারুণ্য···সে-সব বিধাতা এঁকে দেছেন যেন ম্যাথেমেটিক্‌স্ কষে··· নিক্তির ওজনে! কোথাও এ-সবে এক-তিল কম-বেশী হয়নি।

উমাকান্ত বলিল,—বটে! তা হলে অসামান্যা! সাহস করে সাধনায় লেগে যাও, বন্ধু! জানো তো none but the brave···

মৃগাঙ্কর বুকের মধ্যে যেন হাজার দীপের ঝাড় জ্বলিয়া উঠিল··· সে আলো তার দুই চোখে প্রদীপ্ত ছটায় উদ্ভাসিত হইল!

পরের দিন ট্রামে আবার দেখা। ট্রামে আজ খুব ভিড়। ঠেলিয়া ঠুকিয়া মৃগাঙ্ক আসিয়া দাঁড়াইল লেডিজ্ শীটের পিছনে। মন বলিল রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—

> অলি বার-বার ফিরে যায়
> অলি বার-বার ফিরে আসে,
> তবে তো ফুল বিকাশে···

এ-কথা কি মিথ্যা? এই যে বারে-বারে আমাদের দেখা হইতেছে, ইহার কি কোনো গভীর অর্থ নাই? এমন তো পূর্ব্বে কখনো হয় নাই! কেন এখন এমন ঘটিতেছে? ট্রামে তো কত লোক যায়-আসে···এত লোকের মধ্যে দু'জনের এই একই ট্রামে নিত যাওয়া-আসা···একই সময়ে···নিশ্চয় ইহাতে চতুর বিধাতার কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে!

এস্‌প্লানেড! ট্রাম ছাড়িয়া দু'পা চলিবামাত্র সামনে কি উপসর্গ বুঝি, ড্রাইভার কষিয়া ব্রেক্ টানিল। দাঁড়ানো-প্যাসেঞ্জারের দল গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি লাগাইয়া একটা বিপর্য্যয় ব্যাপারের সৃষ্টি করিল। এ ঠোকাঠুকির জন্য মৃগাঙ্ক প্রস্তুত ছিল না···হুমড়ি খাইয়া পড়িল সে এমন ভাবে যে তার মাথা ঠুকিয়া গেল অপরিচিতার মাথার সঙ্গে। অপরিচিতা তার পানে চাহিল···দু'চোখে যেন অগ্নি-বৃষ্টি! মৃগাঙ্ক ভয়ে একেবারে এতটুকু! সবিনয়ে কোনো মতে বলিল,—মাপ করবেন।

অপরিচিতার কাণে সে-প্রার্থনা পৌঁছিল কি না, বুঝা গেল না। ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া তার মধ্য হইতে ছোট আয়না বাহির করিয়া

অপরিচিতা নিজের কেশগুলা ঠিক করিয়া লইল। মৃগাঙ্ক পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল যেন শুষ্ক কাঠ! তার মনের মধ্যে ছিল যে আবেগ-রস-ধারা, অপরিচিতার দৃষ্টির আগুনে সে ধারা শুষিয়া লইয়াছে!

পার্ক ষ্ট্রীট···কোনো মতে মৃগাঙ্ক নিজেকে আবার ঠিক করিয়া তুলিয়াছে। উমাকান্তর উপদেশ মনে জাগিতেছে, সাহস আনা চাই···None but the brave···বলিবে না কি সেই সাইরেনের কথা?

থিয়েটার রোডের মোড় পর্য্যন্ত মনের সঙ্গে বহু তর্কাতর্কি চলিল। তার পর মুখ নামাইয়া অপরিচিতার কাণের কাছে মুখ আনিয়া হুম্ করিয়া সে বলিয়া বসিল,—কাল রাত্রে সাইরেন বেজেছিল আপনাদের পাড়ায়?

কথাটা বলিবামাত্র নিজের সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল···নিজের কাণেই কথাটা অত্যন্ত বিশ্রী—বিসদৃশ ঠেকিল!

এ কথায় অপরিচিতা ফিরিয়া চাহিল মৃগাঙ্কর পানে···মৃগাঙ্কর দৃষ্টির সহিত অপরিচিতার দৃষ্টি মিলিল। মৃগাঙ্ক লক্ষ্য করিল, অপরিচিতার এবারকারের দৃষ্টিতে আগুন নাই! আগুনের বদলে যা আছে, সে কি···মৃগাঙ্ক বুঝিতে পারিল না। সে-দৃষ্টি যেন তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটার মতো বিঁধিতেছে···মুখ ফিরাইয়া চাহিল প্যাসেজে-দাঁড়ানো যাত্রীর পানে। যাত্রীর হাতে একটা থলি···থলির মধ্য হইতে মুখ বাড়াইয়া আছে কতকগুলা শাক-পাতা।···

বকুলবাগানের মোড়ে অন্য দিনকার মতো মৃগাঙ্ক প্যাসেজ ক্লীয়ার করিয়া দিল। ক্লীয়ার প্যাসেজ দিয়া অপরিচিতা নামিল ট্রাম হইতে···মৃগাঙ্কর পানে ভুলিয়াও আজ চাহিয়া দেখিল না। নিমেষের জন্য না!

সন্ধ্যার পর উমাকান্তর কাছে আসিয়া মৃগাঙ্ক রিপোর্ট পেশ করিল। বলিল—সাইরেনের কথায় রাগ করেছেন হয়তো। নাহলে প্যাসেজ ক্লীয়ার করে দেবার সময় আজ একবার নোটিশও করলেন না আমায়! শী র‍্যাদার ইগনোর্ড মী।

গম্ভীর কণ্ঠে উমাকান্ত বলিল,—হুঁ···

মৃগাঙ্ক বলিল—এখন তুমি কি পরামর্শ দাও?

উমাকান্ত বলিল—তোমাকে নিয়ে তিনি খেলা করছেন!

—তার মানে?

—তার মানে তিনি বুঝেছেন তুমি ওঁর ভয়ঙ্কর অনুগত হয়ে পড়েছো। এক-ট্রামে রোজ দেখা···হয়তো উনি ভেবেছেন, তুমি তাগ্ করে থাকো ওঁর ট্রামের প্রত্যাশায়!

উমাকান্ত চুপ করিল।

উমাকান্তর কথায় অনেকখানি সাসপেন্স।

মৃগাঙ্ক বলিল—কথাটা শেষ করো! তুমি বুঝছো না হাউ আই ফীল্!

উমাকান্ত বলিল—আমি খুব বুঝছি মৃগাঙ্ক! এক কাজ করতে পারো?

উৎসাহভরে মৃগাঙ্ক বলিল—বলো···একটা কি, আমি লক্ষ কাজ করতে পারি···একেবারে সহস্রবাহু হয়ে। কি কাজ তুমি করতে বলো আমাকে?

উমাকান্ত বলিল—তাঁর সঙ্গে ছাতা থাকে?

স্মৃতির গহন হাতড়াইয়া মৃগাঙ্ক বলিল—না।

উমাকান্ত বলিল—ঠিক হয়েছে! তুমি ছাতা নিয়ে বেরোও?

মৃগাঙ্ক বলিল—না। ছাতা নিলেই হারাই। অনেক ছাতা হারিয়েছি। তাই ছাতা আর নিই না।

উমাকান্ত বলিল—কাল থেকে ছাতা নিয়ে বেরুবে! নতুন একটা ছাতা কেনো। যা-তা ছাতা নয়···একটু ফ্যাশনেব্‌ল্ হয় দেখতে, এমন ছাতা!

মৃগাঙ্ক বলিল—ছাতা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে?

উমাকান্ত বলিল—বুঝছো না, বোশেখ মাস···সন্ধ্যার সময় হঠাৎ এর মধ্যে যদি কালবোশেখীর দুর্য্যোগ নামে, তিনি তো ছাতা নিয়ে বেরোন না···তোমার ঐ ছাতা ধরে তাঁর মাথা বাঁচিয়ো··· তাহলেই···আঃ···চমৎকার আইডিয়া!

নিজের আইডিয়ার চমৎকারিত্বে উমাকান্ত এতখানি বিমুগ্ধ হইল যে, এইখানেই তার কথা বন্ধ হইয়া গেল···কিছুক্ষণ তার মুখে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না!

মৃগাঙ্ক ভাবিতে লাগিল।···

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—মোষ্ট রিমোট পশিবিলিটি!···এ বছর যদি কালবোশেখী না নামে?

উমাকান্ত বলিল—কালবোশেখী নামবে না কি? আলবৎ নামবে! ল অফ্ নেচার! তোমার সঙ্গে নেচার নিশ্চয় নিষ্ঠুর তামাসা করবে না!

দু'চোখের সামনে মৃগাঙ্ক দেখিল যেন নৈরাশ্যের অকূল পাথার! ভাবিল, উমাকান্ত পাগল—নহিলে কালবৈশাখীর উপর নির্ভর করিতে বলে···অর্থাৎ দৈব? বিশেষ ইন্ সিরিয়াস্ এ্যাফেয়ার্স অফ্ দী হার্ট!

উমাকান্ত বলিল—অপেক্ষা তোমাকে করতেই হবে! নিরাশ হচ্ছো কেন? স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালের ভাগ্য খুলেছিল বৃষ্টি-ভেজা কাদা-মাটীর দৌলতে। আর এ হলো বাঙ্‌লা দেশ···এবং বোশেখ মাস। বোশেখ মাসে এ দেশে চিরকাল ঝড়-বৃষ্টির বিপর্য্যয় উৎপাত ঘটে···তোমার বেলায় নেচারের ল' যাবে উল্টে? তা যদি ভাবো, তাহলে ইউ মাষ্ট বী এ গ্রেট্ ফুল!

উপায় কি! কালবৈশাখীর উপর নির্ভর করিতেই হইবে! সভ্য জগতে বাস···আইন-কানুনের রাজ্য···এ যুগে অপরিচিতার কাছে হৃদয়াবেগ প্রকাশ করার অন্য উপায়ও যখন নাই···

অবশেষে আকাশের মেঘের করুণা হইল। চার দিন পরে কাল-বৈশাখী নামিল। অফিস হইতে বাহির হইয়া মৃগাঙ্ক দেখে, সারা আকাশ মেঘে অন্ধকার! মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিল, দুর্য্যোগ চাহিয়া! তার জানা সমস্ত ঠাকুর-দেবতাকে ডাকিল···ডাকিয়া প্রার্থনা জানাইল···ট্রামে যেন তাঁকে দেখি, আর ট্রামে ওঠবার পরে ঢালিয়ো জল, আকাশ কাঁপাইয়া কলিকাতা-সহরের বুকে···সহরকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া একশা করিয়া দাও!

ডালহৌসি স্কোয়ারে ট্রাম। লেডিজ্ সীটে সেই অপরিচিতা! কালো মেঘ আকাশের বুকে এখনো অটুট রহিয়াছে···আকাশের কোনো কোণ এখনো জমাট মেঘের চাপে একটুকু ফাঁশে নাই!

মৃগাঙ্ক বলিল—ঠাকুর, ঠাকুর এইবার···

লালদীঘি ঘুরিয়া ট্রাম আসিল গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের সামনে···

ট্রামের ক'জন প্যাসেঞ্জার উচ্চকণ্ঠে মা-কালীকে ডাকিতে সুরু করিয়াছে,—ডিপোয় ট্রাম পৌঁছুবার আগে পর্য্যন্ত জলটুকুকে আকাশের বুকে ধরিয়া রাখো ঠাকুর···তার আগে জল ঢালিয়ো না!

মৃগাঙ্ক চমকিয়া উঠিল! কাউণ্টার-প্রার্থনা! মনে মনে সে ডাকিতে লাগিল, মেঘে! বুকে যত জল আছে, আর দেরী নয় প্রভু··· ঢালো, ঢালো···এবার ঢালো!

পরম ভক্তিভাজন এবং অতি-গম্ভীর ঠাকুর-দেবতা হইলেও তাঁদের কৌতুকবোধ এখনো এ-যুগে ক্ষয় পায় নাই! কৌতুক দেখিবার জন্য দেবতারা আকাশের একটা কোণে খোঁচা দিয়া আকাশ ফাঁশাইয়া দিলেন! মৃগাঙ্কর ট্রাম তখন লাট-সাহেবের বাড়ীর সামনে ঘুরিয়া এসপ্লানেডের পথ ধরিয়াছে···মুষলধারে বর্ষণ সুরু হইল রমঝম্ করিয়া!···মৃগাঙ্কর মনের মধ্যে যেন ব্যাণ্ড, কনসার্ট, ঢাকের বাদ্য,—একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল! বৃষ্টির জলে অসম্ভব তোড়! মৃগাঙ্ক যে প্রার্থনা জানাইয়াছিল, তাই! অর্থাৎ কলিকাতা সহর বুঝি এ জলে ডুবিয়া ভাসিয়া একশা হইবে!

যাত্রীদের মনে বিপুল ত্রাস। ট্রাম চলিয়াছে বৃষ্টির মধ্য দিয়া, যেন নদীর বুকে ষ্টীমার চলিয়াছে!···নদীর জলে যেমন ঢেউ ওঠে, পথের জলে তেমনি ঢেউ! সে ঢেউয়ের দোলায় মৃগাঙ্কর বুক দুলিতে লাগিল।

থিয়েটার রোডের মোড় পার হইবার পর বেগ একটু কমিল! জোগুবাবুর বাজারের পর আরো একটু···

তার পর চড়কডাঙ্গার মোড়ের পর বকুলবাগানের মোড়! বৃষ্টি পড়িতেছে···তোড় এখন অনেক কম!

ভয়ে ভয়ে অপরিচিতা বাহিরের পানে চাহিল। তার পর উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃগাঙ্ক ট্রামের দড়ি ধরিয়া টানিল—প্যাসেজ ক্লীয়ার করিয়া দিল। শাড়ী চাপিয়া-ধরিয়া জড়ো-সড়ো মূর্ত্তিতে অপরিচিতা ট্রাম হইতে নামিল।

মৃগাঙ্ক আজ আর ট্রামে দাঁড়াইয়া রহিল না। সেও নামিল বকুলবাগানের মোড়ে। বৃষ্টির ফোঁটা···তার মনে হইতেছিল, ও যেন ফোটা ফুলের রাশীকৃত পাপড়ি! আকাশের দেবতারা সহরের বুকে আজ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন!

নামিয়া ছাতা খুলিয়া মৃগাঙ্ক বলিল অপরিচিতাকে উদ্দেশ করিয়া—ভিজবেন না। আপত্তি না থাকলে আমার ছাতা···

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছাতা খুলিয়া সম্পূর্ণ ভাবে আগাইয়া সে অপরিচিতার মাথায় ধরিল···নিজে ভিজিয়া কাদা।

অপরিচিতা বলিল—আপনি যে ভিজে ঢোল হয়ে গেলেন!

মৃগাঙ্ক বলিল—আমার ভেজা অভ্যাস আছে। আপনারা··· মানে···কোথায় যাবেন আপনি?

অপরিচিতা বলিল—আমি যাবো টাউনশেণ্ড রোডে।

মৃগাঙ্ক বলিল,—ও! আমিও ঐ দিকে যাবো। তাহলে এ ছাতা আপনি মাথায় দিন।

অপরিচিতা বলিল—আপনি?

মৃগাঙ্ক বলিল—আমার কিছু হবে না।

অপরিচিতা বলিল—দু'জনেই তাহলে ছাতা শেয়ার করি, আসুন।

এমন সৌভাগ্য···দু'জনে পাশাপাশি চলিবে! বিপুল উল্লাসে মন টাউনশেণ্ড রোডে একটা বাড়ী দেখাইয়া অপরিচিতা বলিল—ঐ বাড়ীতে আমি যাবো!

বাড়ীর নম্বর মৃগাঙ্ক লক্ষ্য করিল, বলিল—আপনার বাড়ী!

অপরিচিতা বলিল,—না, আমার বাড়ী নয়। এ বাড়ীতে আমি গান শিখতে আসি। গানের ক্লাশ হয়···রোজ। বাঁধা টাইম।

—ও! কিন্তু গান শিখে এর পর বাড়ী ফিরবেন কি করে?

অপরিচিতা বলিল—বৃষ্টি যদি না থামে, একখানা রিকশ নিয়ে যাবো। না হয় আরো অনেকে গান শিখতে আসে, তাদের কারো গাড়ীতে।

মৃগাঙ্কর মনে হইতেছিল সে বলে, বাড়ী আপনার কোথায়? কিন্তু বলিতে পারিল না। কি মনে করিবেন! সাইরেনের কথা বলিয়া চোখে যে অগ্নি-দৃষ্টি দেখিয়াছে, আজ বর্ষার জলে আগুন নিবিয়া সে দৃষ্টি স্নিগ্ধ হইয়াছে! এ স্নিগ্ধতার উপর আবার যদি আগুন জ্বলিয়া ওঠে? সে শুধু বলিল—আচ্ছা, নমস্কার।

অপরিচিতা বলিল—নমস্কার! নমস্কার! আমার অজস্র ধন্যবাদ জানবেন!

কণ্ঠে যেমন উচ্ছ্বাস, চোখের দৃষ্টিতে তেমনি প্রীতি বিগলিত! মৃগাঙ্ক মুগ্ধ হইল। ও-দৃষ্টির জন্য বৃষ্টিতে ভেজা কি, সে বোধ হয় অথৈ সাগরের জলে ডুব দিতে পারে।

রিপোর্ট শুনিয়া উমাকান্ত বলিল—কেমন···বলেছিলুম তো··· শুধু একটি ছাতা···কালবোশেখী নামা পর্য্যন্ত ওয়েট করো! আজ দেখলে তো?

গদগদ কণ্ঠে মৃগাঙ্ক বলিল—হুঁ···কিন্তু এর পর?

উমাকান্ত বলিল—এর পর ট্রামে এ আলাপটুকু জমিয়ে ঘন করে তোলো। তবে এ-সব ব্যাপারে ধৈর্য্য চাই! আর তার সঙ্গে সময়! টাইম এ্যাণ্ড পেসেন্স উড় ডু ওয়াণ্ডার্স। এ-কথা মনে রেখো।

—নিশ্চয় মনে রাখবো।

একটু একটু করিয়া আলাপ জমিল।

শনিবারে মৃগাঙ্ক বলিল—রবিবারেও আপনি গান শিখতে যান?

অপরিচিতা বলিল—না। রবিবারে ছুটী।

মৃগাঙ্ক বলিল—সিনেমা আপনার কেমন লাগে?

দু'চোখে উল্লাস! অপরিচিতা বলিল—চমৎকার।

—যাবেন কাল? একখানা ভালো বিলিতি ছবি দেখাচ্ছে। আমি কাল যাবো ভাবছি। তবে একা···ছবি তেমন ভালো লাগে না! আপনি যদি যান···

অপরিচিতা বলিল—বেশ। কটার শো?

মৃগাঙ্ক বলিল—সন্ধ্যা ছটা।

—বেশ!···কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

মৃগাঙ্ক বলিল—আপনি বলুন···

অপরিচিতা কি ভাবিল, ভাবিয়া বলিল—কালীঘাট ট্রাম ডিপোয় আমি আসবো। স'পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। কেমন?

মৃগাঙ্ক বলিল—এ কথা তাহলে পাকা!

—নিশ্চয়।

মৃগাঙ্ক বলিল—আমি দু'খানা সীট রিজার্ভ করে রাখবো!

—বেশ।

সিনেমা। ইন্টারভালের সময় বয় আসিয়া সামনে দাঁড়াইল… ট্রেতে চকোলেট, কোল্ডড্রিঙ্ক, আইস্‌ক্রীম…

মৃগাঙ্ক কিনিল দু' প্লেট আইসক্রীম।

অপরিচিতা বলিল—কেন আবার বাজে খরচ করছেন?

মৃগাঙ্ক বলিল—আপনার তেষ্টা পায়নি?

অপরিচিতা বলিল—তা পেয়েছে…মিথ্যা বলবো না।

—আমার তো গলা শুকিয়ে কাঠ!

দু'জনের হাতে আইস-ক্রীমের প্লেট…

মৃগাঙ্ক বলিল—একটা কথা…মানে, আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগে!

অপরিচিতা বলিল—কি?

—আমার অফিস আছে…ছুটীর পর ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে রোজ ট্রাম ধরি…বাঁধা টাইম। কিন্তু আপনাকেও ঐ ট্রামে রোজ দেখি…আপনার বুঝি একেবারে ঘড়ি ধরে ট্রামে বেড়াতে বেরুনো অভ্যাস?

অপরিচিতা বলিল—না, আমিও চাকরি করি। ছুটী হয় পাঁচটায়। অফিস থেকে বেরিয়ে কারেন্সি-অফিসের সামনে ট্রামে উঠি।

—কোথায় চাকরি করেন, জানতে পারি?

অপরিচিতা বলিল—এ-আর-পীতে।

—ও!

পরের দিন মৃগাঙ্ক আসিয়া রিপোর্ট দিল উমাকান্তকে—কাল সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিলুম…গিয়েছিলেন।…কথা চলো…বললেন, চাকরি করেন।

উমাকান্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিল…বলিল—তার পর?

—তার পর আর কি!

—মনের কথা তুমি বললে যে, তুমি তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছো? ভয়ঙ্কর রকম ভালোবাসা!

লজ্জায় মৃগাঙ্কর কাণ-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। মৃদু-কণ্ঠে সে বলিল,—না।

—সে-কথা বলো।

—বড্ড লজ্জা করে! মনে হয়, এমন হঠাৎ…দু'দিনের আলাপেই এ কথা…

উমাকান্ত হাসিল, হাসিয়া বলিল—আর বেশী অগ্রসর হবার আগে ওটা বোঝাপড়া করে নেওয়া উচিত। যে দিনকাল পড়েছে, এমন হতে পারে যে, উনি কাকেও ভালোবাসেন। হয়তো তার সঙ্গে ওঁর বিবাহের কথা ঠিক হয়ে আছে। তা যদি হয়, তাহলে তোমার পক্ষে আর বেশী অগ্রসর হওয়া…মানে, যার নাম চার-তলা বাড়ী থেকে ধুপ্‌ করে হবে নীচেয় পতন!

এ কথা মৃগাঙ্কর মনে জাগে নাই। এখন জাগিল; এবং এ কথা মনে জাগিতে মন মুহূর্ত্তে এতটুকু হইয়া গেল!

উমাকান্ত বলিল—স্পষ্ট ভাবায় না বলে বলতে পারো তো যে, তুমি নিঃসঙ্গ…বিবাহের জন্য সঙ্গিনীর সন্ধান করছো…এমনি নানা কথা আর কি!

মৃগাঙ্ক বলিল—দেখবো চেষ্টা করে'?

উমাকান্ত বলিল—হুঁ। নাহলে তুমিই ভেবে ছাখো, তিনি যদি আর কারো বাক্যদত্তা হন, তাহলে তোমার পক্ষে…মানে, বী সিরিয়স্‌ এ্যাণ্ড প্র্যাকটিক্যাল ইন্‌ লাভ্‌! তাহলে মনস্তাপ-অনুতাপ…এ সব উপসর্গ থেকে রক্ষা পাবে!

মৃগাঙ্ক বলিল—যা বলেছো!

সেদিন ট্রামে দেখা।

অপরিচিতাই আগে কথা কহিল। বলিল—আজ যাবেন সিনেমায়?

—আপনার গানের ক্লাশ?

—মিউজিক-টীচারের অসুখ…তাই আজ ছুটী। অফিসে বসে ভাবছিলুম, আপনার সঙ্গে দেখা হলে বলবো আপনি যদি সিনেমায় যান!

মৃগাঙ্কর মন আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সে বলিল—বেশ…

—আপনার কোনো অসুবিধা হবে না?

—না।

—কাজের কোনো ক্ষতি?

—না…না।

অপরিচিতা বলিল—কিন্তু একটা অনুরোধ…

—বলুন…

অপরিচিতা বলিল—আজ আমি টিকিট কিনবো।

মৃদু হাস্যে মৃগাঙ্ক বলিল—আমার সেদিনকার টিকিটের শোধ?

অপরিচিতা হাসিল, বলিল—শোধ নয়,…এমনি। মানে, আজ মাইনে পেয়েছি কি না। আমার নিমন্ত্রণে আজ আপনি যাচ্ছেন সিনেমায়, তাই।

—বেশ…

দু'জনে সিনেমায় আসিল। অপরিচিতা কিনিল দু'খানা টিকিট।

ইনটারভ্যালে মৃগাঙ্ক দিল আইসক্রীমের দাম।

তার পর সিনেমা ভাঙ্গিল সাড়ে আটটায়।

মৃগাঙ্ক ভাবিল, কথাটা এবার বলিবে? কিন্তু পথে সে-কথা বলা চলে না! তার চেয়ে…

মৃগাঙ্ক বলিল—আমার একটি মিনতি আছে…

অপরিচিতা বলিল—তা অত সঙ্কোচ করছেন কেন? আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে…আপনি বন্ধু…যা বলবার, বলুন।

মৃগাঙ্কর মনের মধ্যে রঙমশালের আলো! বন্ধুত্ব! সে বলিল—যদি কোনো রেস্তরায় যাই এখন? ধরুন, ক্যাশানোভা কিম্বা মোণিকা?

অপরিচিতা যেন শিহরিয়া উঠিল! বলিল—ও…না, না। আজ আর হয় না। মানে, সাড়ে আটটা বেজে গেছে…রাত নটার মধ্যে আমাকে বাড়ী পৌঁছুতেই হবে। না হলে আমার স্বামী অস্থির হয়ে উঠবেন। এই কনডিশনে আমাকে তিনি একলা বেরুতে দেছেন।

স্বামী! মৃগাঙ্কর মনে হইল, তার মাথায় সবলে কে যেন লাঠি মারিয়াছে!

সে বলিল—আপনার স্বামী! কিন্তু এ কথা তো কোনো দিন বলেননি যে আপনার বিবাহ হয়েছে! যে আপনি···মানে, আপনার স্বামী আছেন!

অপরিচিতা বলিল—না বলায় আমাদের বন্ধুত্বে কোনো অসুবিধা হয়েছে কোনো দিন? আপনার ভদ্রতা আর সৌজন্য দেখে এ-কালের-আপনাদের সম্বন্ধে আমার কি মস্ত বড় ভুলই ভেঙ্গে গেছে! আমার স্বামীকে আমি বলি যে ওগো, আমি এক জন বন্ধু পেয়েছি···তোমাদের বয়সী···কি চমৎকার তাঁর ভদ্রতা!

মৃগাঙ্কর বুকের উপর দিয়া যেন ষ্টীম-রোলার চলিতেছে···

অপরিচিতা বলিল,—তার চেয়ে আমার সঙ্গে আসুন আমার ওখানে। আমার স্বামী বলেন, তোমার বন্ধুকে এক দিন নেমন্তন্ন করে এখানে আনো ···আপনি তো এখানে একলা থাকেন, বলেছেন··· সো লোন্‌লি···আসুন আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে!···

মৃগাঙ্ক কোনো কথা বলিল না।

অপরিচিতা তার হাত ধরিল, বলিল,—না, আমি শুনবো না! আপনাকে টেনে নিয়ে যাবো। বেশী দূরে নয়, উল্টো দিকেও নয়। ভবানীপুরে আমাদের বাড়ী···ল্যান্সডাউন রোড।

মৃগাঙ্কর মুখে কথা নাই!

অপরিচিতা বলিল—আপনি তো থাকেন পদ্মপুকুরে। আমাদের বাড়ী পদ্মপুকুর থেকে পাঁচ-সাতখানা বাড়ীর পর। উমাকান্ত রায়ের নাম শুনেছেন? প্রোফেশর?

মৃগাঙ্কর পিঠে যেন চাবুক পড়িল!

অপরিচিতা তাকে ধরিয়া টানিল···বলিল,—আসুন···

মৃগাঙ্ক বলিল—মাপ করবেন। আজ থাক। কাল বরং যাবো। আজ মানে, মাথাটা বড্ড ধরে রয়েছে···বেশীক্ষণ বসতে পারবো না ···তার চেয়ে কাল বরং···

অপরিচিতা বলিল—এ-কথা তাহলে পাকা? বেশ হবে। কালও আমার গানের ক্লাশ নেই···ছুটী। অফিস থেকে দু'জনে এক-ট্রামে তো ফিরি···আপনি আমার সঙ্গে আমাদের ওখানে যাবেন। ঐখানেই কাল রাত্রে খাবেন। বাড়ীতে চাকরকে বলে আসবেন। আমিও সেই বন্দোবস্ত করবো। আমার স্বামী খুব খুশী হবেন আপনাকে পেলে। আমার কাছে আপনার কথা শুনে রোজ তিনি বলেন, তোমার বন্ধুকে এক দিন আনো। আপনার উপর তাঁর ভয়ঙ্কর রিগার্ড। আপনারো তাঁকে ভালো লাগবে···নিশ্চয়।

মৃগাঙ্ক বলিল—আপনাকে তাহলে ধরে রাখবো না···নটায় আপনার এ্যাটেণ্ডান্স। আমার একটু দেরী হবে···মানে, মিউনিসিপাল মার্কেটটা একবার ঘুরে যাবো, ভাবছি। সকালে চায়ের সঙ্গে রুটি খাই কি না, তাই রুটি আর মাখন কিনে নিয়ে যাবো।

অপরিচিতা বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

মৃগাঙ্ক কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···অনেকক্ষণ!

তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাসের সঙ্গে তার গোটা মনখানাই শুধু বাহির হইয়া গেল না, আলো-ভরা পৃথিবীখানাই যেন চোখের সামনে হইতে মুছিয়া গেল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আশাবাদ

দুঃখ শ্রাবণ-শর্ব্বরী যদি না পোহায়
অন্ধ আবেগে তামস চিহ্ন আঁকে,
অশ্রু সুচির সঞ্চিত যদি না শুকায়,
ক্লান্ত বিহগ তিমিরে পক্ষ ঢাকে!
বিশ্ব কি রবে কৃষ্ণ-ছায়ার গুণ্ঠিত,
নিঃস্ব মলিন ধূসর-ধূলায় কুণ্ঠিত,
কে খুলিবে দ্বার? কে করিবে সুধা লুণ্ঠিত?
পূর্ব্ব-তোরণে উদয়-সূর্য্য হাঁকে।

নিষ্ঠুর-মাঘে যদি ফুল-কলি ঝরে যায়,
শীত-জর্জ্জর পৌষ-মুখর রাতে,
পল্লবদল পিঙ্গল ম্লান মরে যায়
তীক্ষ্ণ কঠোর তুহিন-খড়্গাঘাতে।
বসন্ত পুনঃ জাগিবে ধ্বান্ত আবরি'
চম্পক-রচা দুলাইয়া নব-কবরী,
চিররাধা যাবে যমুনাতে লয়ে গাগরী,
শত সখী সহ সুখ বসন্ত-প্রাতে।

দুয়ারে মৃত্যু করে যদি ঘন করাঘাত,
ভীতি-বিহ্বল আতুর চিত্ত মূরছায়,
মাভৈঃ মন্ত্র জপ বসি' কবি সারা রাত,
অভয়-শঙ্খ মেঘ-কন্দরে গরজায়!
মৃত্যু আনিবে নব জীবনের জয়-গান,
পৌষ-রজনী নব বসন্তে অবসান,
শরৎ আনিবে শ্রাবণ-অন্তে কলতান,
দুঃখ-সুখের চক্র নিয়ত ঘুরে যায়।

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস (এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল)।

মরু-তৃষা

[উপন্যাস]

২৭

নিমন্ত্রিতের দল আসিয়া রত্নাকে ঘিরিয়া ধরিল। রত্নার নৃত্য আর অভিনয় এত চমৎকার হইয়াছে যে, বিলাতের কোন কোন ফেমশ্‌ আর্টিষ্টের সহিত রত্নার তুলনা করা চলে! শতমুখে সেই কথা, সেই আলোচনা! তরুণের দল রত্নার সঙ্গ-লাভের জন্য অধীর আকুল হইয়া উঠিল।

কল্পনার কাণে-কাণে অনিল বলিল—ইন্দ্রাণী, আমাদের যশোভাতি উর্ব্বশী ম্লান করে দিয়েছে।

মুখখানা বিকৃত করিয়া কল্পনা উত্তর দিল,—প্রধান ভূমিকাই একে দেওয়া হয়েছিল! বরাতে সেটা কোন মতে উতরে গেছে।

অনিল কহিল,—হ্যাঁ, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের তফাৎ নেই! রত্নাকে নিয়ে ওরা একেবারে মত্ত! চলো, আমরা একটু বিশ্রাম করিগে।

অনিল ও কল্পনা ড্রইংরুমের বারান্দায় আসিল। সুদীর্ঘ বারান্দায় সাজানো টবে পাতা-বাহার গাছের ছায়া—খণ্ড খণ্ড স্থানে ম্লান আলো যেন আঁধার রচনা করিয়াছে! তাহারই নিভৃত এক অংশের ছায়া যেখানে সুনিবিড়, সেইখানে আসিয়া কল্পনার হাত ধরিয়া অনিল কহিল,—এখানটা বেশ নির্জ্জন কল্পনা, একদম ভীড় নেই। কথাবার্ত্তা ক'বার পক্ষে চমৎকার জায়গা!

মধুর কণ্ঠে কল্পনা কহিল,—আমারও আর-পাঁচ জনের সঙ্গ ভালো লাগছে না। ক'দিনের পরিশ্রমে নিজেকে ভারি ক্লান্ত বোধ হচ্ছে অনিল। বলিয়া মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল, একখানা ইজিচেয়ারে আলো-আঁধারে মিশিয়া অমিয় অর্দ্ধ-শয়ান রহিয়াছে। চকিতে অনিলের হাতের মধ্য হইতে নিজের হাতখানা টানিয়া লইয়া স্বরে উদ্বেগ মিশাইয়া কল্পনা কহিল,—মিষ্টার গোস্বামী এখানে এমন করে' একলা যে!

অমিয় উঠিয়া বসিল, উত্তর দিল,—হ্যাঁ, আমার বিশ্রাম করা হয়ে গেছে! তোমরা বসে গল্প করো। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

অনিলের মুখ লজ্জায় ঈষৎ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল,—উঠছো কেন দাদা?

—ও-দিকটা একটু ঘুরে আসি। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অমিয় সে স্থান ত্যাগ করিল।

চাঁদের উপর মেঘের আবরণের ন্যায় কল্পনার মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে অনিলের দিকে চাহিয়া সে কহিল,—তুমি আমায় এমন অপ্রতিভ করে দিলে! কে জানে, মিষ্টার গোস্বামী এখানে আছেন!

হাসিয়া অনিল কহিল,—তাতে কি হয়েছে! দাদা তো আমাদের দেখেই সরে গেলেন! তিনি তো অবুঝ নন্‌।

কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া কল্পনা কহিল,—যাও! তোমার সব তাতে কেবল ঠাট্টা!

অভিনয়ের ভঙ্গীতে অনিল কহিল,—কোথায় যাবো বলো দেখি? ওধারে উর্ব্বশী এখন স্তাবক-পরিবেষ্টিতা—দেবেন্দ্রের তুমিই আশ্রয় শুধু!

ক'দিন ধরিয়া বসিবার ঘরে চায়ের টেবলে,—অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনার তুমুল ঝড় বহিল। গোস্বামী সাহেব গর্ব্বিত-কণ্ঠে কহিলেন,—কেমন লীলা, আমি তোমায় বলেছিলুম রত্নার কথা। দেখলে, সে কেমন কোহিনূর!

হাসিয়া মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—তা আমি স্বীকার করি। তোমার জন্যেই সে-দিন এতটা সাকসেসফুল হলো!

চা খাওয়া শেষ হইল।

উঠিবার সময় অমিয় কহিল,—আজ দু'টোর গাড়ীতে আমি যাচ্ছি মা।

গোস্বামী সাহেব বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন,—আজই! কেন? তোমার ছুটী তো এখনও দু'দিন রয়েছে। বলিয়া পুত্রের পানে চাহিলেন।

টেবলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অমিয় কহিল,—এখানটা আর আমার ভালো লাগছে না। শুধু অপেক্ষা করছিলুম আপনার বার্থডের জন্য! সে তো হয়ে গেছে! বলিয়া হাসিয়া সে আবার কহিল,—আর সবচেয়ে আনন্দের মধ্যেই সেটা হয়েছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পিতা কহিলেন,—আজ তাহলে তোমার যাওয়া স্থির?

—হ্যাঁ, সকালে উঠেই আমি বেয়ারাকে বলে দিয়েছি সব গুছোতে।

মিসেস্‌ গোস্বামী নীরবে পিতা ও পুত্রের কথা শুনিতেছিলেন! এতক্ষণে তিনি কথা কহিলেন। বলিলেন,—তুমি যদি আজই যাবে, তাহলে আগে আমায় সে কথা জানাওনি কেন?

—আগে কিছু স্থির ছিল না। আজ ঘুম থেকে উঠেই স্থির করলুম। বলিয়া একটু থামিয়া সে কহিল,—এতে অসুবিধার কিছু নেই তো।

গম্ভীর মুখে মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—একটু আছে বই কি। এ-কথা জানলে আমি কল্পনাদের আজ নিমন্ত্রণ করতুম না। সে, তার বৌদিদিরা, তবে সুশীল—সন্ধ্যার পর সবাই আসবে।

মৃদু হাস্যে অমিয় কহিল,—তাতে তো ক্ষতি নেই। আমি যাচ্ছি বেলা দু'টোর গাড়ীতে।

—কিন্তু তুমি তো জানতে, তারা আসবে! মিসেস্‌ গোস্বামী প্রদীপ্ত চক্ষে পুত্রের পানে চাহিলেন। কহিলেন,—তুমি আমায় স্পষ্ট জানিয়ে যাও অমিয়, তোমার ইচ্ছা কি!

—কোন্‌ বিষয়ে?

বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—কোন্‌ বিষয়ের জন্য আমি ব্যস্ত, তুমি জানো না! তুমি হলে বড় ছেলে।

অমিয় নীরব রহিল।

মিসেস্‌ গোস্বামী কহিলেন,—তুমি আমায় খোলাখুলি জবাব দিয়ে যাও।

অমিয় মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিল। কহিল,—এ বিষয়ে কোন রকম আলোচনা করতে আমি এখন পারবো না মা।

—বুঝেছি। মিসেস্‌ গোস্বামীর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ!

অমিয়র সুগৌর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্তব্ধ ভাবে সে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল।

গোস্বামী সাহেব নির্ব্বাক্ ছিলেন, এইবার কথা কহিলেন। বলিলেন,—কত দিনে তুমি ফিরছো ?

অমিয় উত্তর দিল,—আবার এমনি সময়ে।

গোস্বামী সাহেব একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—এক বছরের মধ্যে তোমার আসার সম্ভাবনা তাহলে নেই ?

অমিয় কহিল,—সম্ভব তাই ! বলিয়া পিতামাতাকে অভিবাদন করিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

রত্না এতক্ষণ নির্ব্বাক্ পুতুলের মত বসিয়া ছিল। অমিয় প্রস্থান করিতেই ব্যাকুল কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—অমিয়-দা কি আর এক বছরের মধ্যে আসবেন না—সত্যি ?

তাহার ব্যাকুল স্বরে গোস্বামি-দম্পতি তাহার দিকে একবার চাহিলেন ; কোন উত্তর দিলেন না। কথা বলিল অনিল। অনিল উত্তর দিল,—দাদা সহজে আসে না। এবার এসে যে এত দিন ছিল, এই যথেষ্ট !

২৮

নিজের ঘরে চেয়ারে বসিয়া টেবলের দিকে ঝুঁকিয়া অনিল কি লিখিতেছিল। অবসর-মত সে সাহিত্যচর্চ্চা করে, নাটক লেখে। অর্জ্জুন-উর্ব্বশী নাটকখানি তাহারই রচনা! এ নাটক সে মায়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছে।

এখন তেমনি পিনে-আঁটা কতকগুলা কাগজপত্র কাটিয়া-কুটিয়া সংশোধন করিতেছিল। সামনের সেলফে সাজানো মহাভারতগুলার পানে মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

ঘরে ঢুকিবার দরজা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। তাই পর্দ্দা ঠেলিয়া কে এক জন যখন ঘরে ঢুকিল, অমিয় তার কিছুই জানিতে পারিল না। যে আসিল, তাহার পদবিক্ষেপ লঘু—তাই মেঝেয় পাতা কার্পেটের উপর এতটুকু শব্দ হইল না। যে আসিল, সে একেবারে অমিয়র পিঠে মৃণাল বাহুর দুই কর-পল্লব স্থাপিত করিয়া ডাকিল,—অমিয়-দা—

ভীষণ চমকিয়া অমিয় ফিরিয়া চাহিল। প্রচণ্ড বিস্ময়ে কহিল,—এ কি ! রত্না ! তুমি ! ইহা ছাড়া আর কোন ভাষা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

পূর্ব্বে রত্না কোন দিন অমিয়র এ ঘরে প্রবেশ করে নাই। বসিবার ঘরে, বারান্দায়, লাইব্রেরী-ঘরে অমিয় রত্নার সহিত আলাপ করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, বসিয়া গল্প জুড়িয়াছে ! কিন্তু নিজের ঘরে কখনো নয়। তথাপি এমন করিয়া বিনা-প্রশ্নে প্রবেশ-অনুমতি না লইয়া রত্না এমন অনাহূত ভাবে তাহার ঘরে প্রবেশ করিবে, এই অসঙ্গতি অমিয়কে অবাক্ করিয়া দিল ! এবং এই রীতি-গর্হিত কাজটা তাহার চিত্তকে বিচলিত করিলেও নিজেকে সংযত করিয়া অমিয় কহিল,—কি হয়েছে রত্না ? তোমার মুখ-চোখ অমন কেন ? কেঁদেছো না কি ? বসো—বসো।

ক্রন্দন-বিবশা রত্না কহিল,—না, বসবো না। আগে তুমি বলো, তুমি আজ যাবে না ! গভীর মিনতিতে রত্না অমিয়র হাত চাপিয়া রত্নার দিকে চেয়ারখানা ফিরাইয়া তাহাতে বসিয়া অমিয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাস্যে কহিল,—কেন বল তো, আমাকে ধরে রাখবার জন্য তোমার এত জিদ ?

বেদনা-বিজড়িত কণ্ঠে রত্না কহিল,—মাসিমা, মেসোমশাই সকলের ইচ্ছা, তুমি এখানে থাকো ! না অমিয়-দা, এত শীগ্‌গির তুমি যেও না। লক্ষ্মীটি, থাকো। বলিয়া সে অমিয়র হাত চাপিয়া ধরিল।

অমিয় নিজের হাতখানা রত্নার কুসুম-পেলব হাতের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া লইল। একখানা চেয়ার টানিয়া রত্নাকে বসিতে দিয়া ধীর স্বরে কহিল,—তুমি ভুলে যাচ্ছ রত্না, আমি পার্থ।

এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে রত্না আরক্ত হইয়া উঠিল ; কিন্তু থামিতে পারিল না। নিজেকে এখন সম্বরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। হিষ্টিরিয়া-আক্রান্ত রোগী যেমন আত্মদমন করিতে পারে না, ধৈর্য্যকে আড়ষ্ট করিয়া ভিতরের বিপুল খেদ মানুষকে যেমন কাঁদায়, ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, রত্নাকেও যেন তেমনি কিসের উন্মত্ততা ভয়ানক বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল ! তাহার বিচার-বোধ তখন বিলুপ্ত।

রত্না কানে যা শুনিয়াছিল, তাহার সে সন্দেহ সত্য ! সগোষ্ঠী কল্পনার আজিকার আসার নিবিড় কারণ আছে ! আত্মীয়তা-বন্ধনের জন্য কথা পাকা করিবার সাদর আহ্বান ! কল্পনা আজ বিজয়িনী ! অমিয়র কল্পনা—আজ তাহারি প্রতিশ্রুতি-দান হইবে। এই উগ্র চিন্তা রত্নাকে যেন অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল ! মৃত্যুর তীরে দাঁড়াইয়া বাঁচিবার আকুল প্রচেষ্টায় সে অমিয়র কাছে আসিয়াছে ! বুকের মাঝে স্তিমিত দীপশিখার ন্যায় বিশ্বাসের ম্লান একটা আলো এখনো জ্বলে—অমিয়ও রত্নাতে আকৃষ্ট ! তাই সে আজ মুখরা, চপলা।

গভীর মিনতি-ভরে রত্না কহিল,—অমি-দা তুমি যেও না—থাকো।

গম্ভীর স্বরে অমিয় কহিল,—কেন, তা তুমি বলোনি ! অমিয়র কণ্ঠে যেন কৈফিয়ৎ-তলবের সুর !

—বললুম তো ! আর কত বার করে বলবো ? মাসিমা, মেসোমশাই—সকলের ইচ্ছা।

একটু হাসির সুরে অমিয় কহিল,—সে-কথা তাঁরা আমায় জানিয়েছেন, সে তো তাঁদের কথা ! তোমার কথা বলো।

—আমার কথা ? রত্না একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,—আমার কথা ? আমি তোমায় ছাড়তে চাই না ! ছেড়ে দেবো না।

অমিয় স্তম্ভিত ! ক্ষণকাল নিষ্পলক নেত্রে সে রত্নার শিশির-সিক্ত রক্তোৎপলের মত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এই ক্ষণিক সময়টুকুর মধ্যে বিদ্যুৎ-গতিতে মন কত কি ভাবিয়া লইল ! তার পর অতি ধীর শান্ত কণ্ঠে সে কহিল,—না রত্না, তা হয় না !

—কি হয় না ? তোমার এখানে থাকা ?

অমিয় কহিল,—হ্যাঁ। তুমি এখানে লেখাপড়া শিখতে এসেছো রত্না, লেখাপড়া শেখো ! আর তা যদি ভালো না লাগে, তাহলে দেশে ফিরে যাও ! আমার কথা শোনো রত্না ! অমিয়র স্বরে আকুতি !

প্রচ্ছন্ন শ্লেষ-বোধে রত্না নিমেষে জ্বলিয়া উঠিল। তিক্ত স্বরে কহিল,—তোমাকে ধন্যবাদ ! আমার অভিভাবকদের যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি

আছে আমার শুভাশুভ চিন্তা করবার! সেখানে তোমার সদুপদেশ দেবার প্রয়োজন নেই।

অমিয় যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। রত্নার কটূক্তি, অসঙ্গত আচরণ তাহাকে যেন বিভ্রান্ত করিয়া তুলিল। হতভম্বের মত সে শুধু চাহিয়া রহিল।

একটা মাসও পূর্ণ হয় নাই। প্রথম দিন যে-রত্নার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিয়াছিল, যে ব্রীড়াবনত-মুখী লজ্জাশীলা নিরীহ-প্রকৃতি রত্নাকে অমিয়র ভালো লাগিয়াছিল, এ কি সেই রত্না? এমন অদ্ভুত আমূল-পরিবর্তন তাহার কি করিয়া ঘটিল? কিছুই যেন সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

মানুষের প্রকৃতিতে যখন একটা ওলট্-পালট্ ঘটে, অন্তরালে যখন ঝড় ওঠে, বন্যা বহে, তখন সেই উন্মত্ততার মাঝে তাহার আসল রূপ এমন বিকৃত হইয়া ওঠে যে, তাহাকে চেনা অসাধ্য হয়! নূতন অনুভূতি তড়িৎ-বেগের মত তীব্র ও দুঃসহ হইয়া মনোজগতে যে মাতন জাগায়, তাহাতে পূর্ব্বেকার শিষ্ট মানুষটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যে বিরল হইবে, ইহা স্বাভাবিক! বিপ্লবের নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, পদ্ধতি নাই, নীতি নাই! অনুশাসনকে দু'পায়ে সে দলন করে—তাই তার ধর্ম্ম! তাই তার নাম বিপ্লব।

রত্নার বুকে তেমনি বিপ্লবের ঝড়, বিদ্রোহের বন্যা বহিতেছিল। অমিয়কে হারাইতে হইবে, এই শঙ্কা যেন ভিতরে ভিতরে তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। যে-অমিয়কে সে সবার অজ্ঞাতে, হয়তো অমিয়রও অজ্ঞাতে নিঃশেষে এমন করিয়া ভালোবাসিয়াছে, সে যে এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া যাইবে তাহা সহ্য করা যেন মৃত্যুর মত! রত্নার নিকট যন্ত্রণাময় বিভীষিকা-পূর্ণ!

সূর্য্যাস্ত-রাগের মত রত্নার রাঙা মুখের পানে চাহিয়া শান্ত স্বরে অমিয় কহিল,—তুমি বুঝতে পাচ্ছ না রত্না তুমি কি করছো, কি বলছো! তোমার মন সুস্থ নেই।

তীব্র স্বরে রত্না কহিল,—না, সুস্থ নেই। আজ আমি পাগল। আজ আমার সর্ব্বস্ব হারাবার দিন! আমি কেমন করে স্থির থাকবো? তুমি—অমিয়-দা, আমি বিশ্বাস করতুম, তুমি উদার, তোমার বিবেচনা-বোধ আছে। কিন্তু আজ বুঝতে পারলুম, সে মন তোমার মুখোস! আসলে তুমি ভণ্ড—স্বার্থপর—লোভী!

শান্ত কণ্ঠে অমিয় বলিল,—ভণ্ড! লোভী!

কঠিন কণ্ঠে রত্না কহিল,—হ্যাঁ তাই। আমি গরীব বলে তুমি আমায় অবহেলা করলে! কল্পনা জজের মেয়ে, তুমি চাও টাকা, সামাজিক মর্য্যাদা, তাই তুমি আমার হবে না? তুমিই না এক দিন বলেছিলে, আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলে, যত দূরেই থাকি যেখানেই থাকি, আমার প্রয়োজন তোমায় জানাবো! নিজেকে কখনো অভাব-গ্রস্ত মনে করবো না!

বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে অমিয় কহিল,—আজও সেই কথা বলছি! তুমি বিশ্বাস করো রত্না, তোমার অর্থ নেই বলে তোমাকে আমি অবহেলা করছি না। আমি তোমার কল্যাণ-কামী!

ব্যঙ্গোক্তিতে রত্না কহিল,—যথেষ্ট! ধন্যবাদ তোমায়? জেনে কৃতার্থ হলুম, তুমি আমার কল্যাণকামী! পরম সুহৃদ্! তোমার বদান্যতা দেখে সুখী হয়ে—কি বলো, কল্পনার দরবারে আমি ভিখিরীর মত হাত পেতে দাঁড়াবো, এই তুমি চাও? না অমি-দা, আমি কাঙাল নই। ভিখিরী নই। অভাব হয়, মাসিমা মেসোমশাই আছেন তাঁরা দেখবেন। তুমি নও!—বলিতে বলিতে রত্না কাঁদিয়া সহস্রধারে যেন ফাটিয়া পড়িল! নিজের দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া মূর্ত্তিমতী বিষাদের মত সে বসিয়া রহিল। এবং তাহার চম্পক-অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া অশ্রু-উৎসের ধারা অমিয়র সম্মুখে বহিতে লাগিল। একান্ত নিরুপায় দৃষ্টিতে, বিবর্ণ মুখে সামনের আসনে ভাস্বর-মূর্ত্তির ন্যায় অমিয় নিশ্চল বসিয়া সেই ক্রন্দন-বিবশা প্রতিমার পানে চাহিয়া রহিল।

সেই সময়ে দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া মিসেস্ গোস্বামী ঘরে প্রবেশ করিলেন; এবং রত্না ও অমিয়কে তদবস্থায় দেখিয়া সামনে সাপ দেখার মত ভীষণ চমকিয়া দু'পা তিনি পিছাইয়া গেলেন।

২৯

কঠোর কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী ডাকিলেন,—রত্না—

চমকিয়া রত্না মুখ তুলিল। অশ্রু-লাঞ্ছিত মুখের উপর হইতে শোণিতের শেষ-বিন্দু অবধি সরিয়া মৃতের মত সে মুখ যেন সাদা হইয়া গিয়াছে।

অমিয় চকিত হইয়া ফিরিয়া কহিল,—মা—

শ্লেষের সহিত মিসেস্ গোস্বামী কহিল,—অতি অবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে আমি এসেছি! না?

নিমেষে অমিয়র মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। অবিচলিত কণ্ঠে কহিল,—না। অবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তে নয়—এখনই আসার দরকার ছিল।

রত্নার পানে চাহিয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—তোমার বাবা এসেছেন তোমায় নিতে। তোমার মার অসুখ। অফিস্-কামরায় তিনি আছেন। যাও।

রত্না উঠিয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী পুত্রের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—আমি কৈফিয়ৎ চাই অমিয়! এমন সময়ে রত্না তোমার এ ঘরে কেন?

মায়ের দিকে চেয়ারখানা ঠেলিয়া দিয়া অমিয় কহিল,—তুমি বসো, আমি বলছি।

মিসেস্ গোস্বামী আসন গ্রহণ করিলেন।

অমিয় কহিল,—রত্না আমাকে বোঝাতে এসেছিল আমি যেন আজ না যাই! এই কথা বলতেই ও এ ঘরে এসেছিল।

বিদ্রূপের সুরে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—রত্নার এত মাথা-ব্যথার কারণ? ওর এত অনুরোধ কেন?

অমিয় কহিল,—আমিও সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। ও জবাব দিলে, মাসিমা, মেসোমশাই যখন ক্ষুণ্ণ হবেন—

—তুমি তার কি উত্তর দিলে?

—আমি? অমিয়র মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইল। সে কহিল,—আমি বললুম, তোমার এ অনুরোধ রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব? মিসেস্ গোস্বামীর সুরে ব্যঙ্গের আভাস! অমিয়র মনের ভিতরটা গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তপ্ত বাতাসের ঝাপটা-মারার মত জ্বালা করিয়া উঠিল। সযত্নে সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল,—আমি যদি থাকতুম, তোমার নিষেধই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অন্য কারও উপরোধ দরকার হতো না! কিন্তু আমি তো থাকবো না।

—কেন থাকবে না, জানতে পারি অমিয় ?

অবিচল কণ্ঠে অমিয় কহিল,—পারো। আজ তুমি কল্পনাদের নিমন্ত্রণ করেছো! আমায় না জিজ্ঞেস করেই যে কথা তুমি দিয়েছ, তারা স-গোষ্ঠী আসবে সেই কথা পাকা করে নিতে! কিন্তু আমার পক্ষে তা একেবারে অসম্ভব!

ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—অসম্ভব কিসে ?

দৃঢ়-স্বরে অমিয় কহিল,—হ্যাঁ, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোন মতেই এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না। কাল সারারাত আমি এই নিয়ে অনেক ভেবেছি! এই আমার সিদ্ধান্ত মা। কোন মতেই কোন অনুরোধ-উপরোধে এর নড়-চড় হবে না? আমি তোমাকে মিনতি কচ্ছি—তোমরা আমায় অনুরোধ করো না।

মিসেস্ গোস্বামী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বুদ্ধি-বিবেচনায় চিরদিন তাঁর গভীর আস্থা। এমন ধীর প্রকৃতি শান্ত স্বভাব গম্ভীর তীক্ষ্ণধী পুত্রের জননী বলিয়া মনে মনে তাঁহার গর্ব্ব ছিল। কিন্তু সেই একান্ত প্রিয় পুত্র অকস্মাৎ যখন তাঁহার মতের সহিত প্রচণ্ড বিরোধিতা করিতে বসিল, তখন কিছুক্ষণের জন্য তিনি হতবাক্ হইয়া জড়ের মত ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বুদ্ধি যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল! চিন্তাশক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

মিসেস্ গোস্বামীর অন্তরের আশার বর্ত্তিকা—অমিয় শেষ অবধি পরাভব স্বীকার করিবে! সংসারে স্বামী-পুত্র তাঁহার একান্ত বশীভূত! আর অবস্থা একান্ত সঙ্গীন হয়, অমিয় নিতান্ত বাঁকিয়া *থাকে তো তিনি স্বামীর সাহায্য লইবেন। সেখানে তাঁহার এই* চিরদিনের বিনয়ী পুত্র ট্যাঁ-ফোঁ করিতে পারিবে না।

কিন্তু এখন বুঝিলেন, অমিয়র সঙ্কল্প ধনুকভাঙা পণের মতই সুদৃঢ়। মিসেস্ গোস্বামী কিছুক্ষণের জন্য হতবাক্ হইয়া রহিলেন। চোখের সামনে যেন আশায় গড়া সাত-তলা বাড়ীখানা ভূমিকম্পের দুঃসহ আঘাতে হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

মিসেস্ গোস্বামী মুখ তুলিলেন। জবাবদিহি চাওয়ার সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কল্পনা কি তোমার চেয়ে কোন অংশে খাটো ?

অমিয় নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল,—আমি তো তা বলিনি।

—তবে তোমার এমন সুদৃঢ় আপত্তির অর্থ আমি কি বুঝবো ?

শান্ত স্বরে অমিয় কহিল,—আমার ভালো লাগল না। কেবল এই।

মিসেস্ গোস্বামী উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। পর্ণকুটীরবহুল পল্লীতে আগুন লাগার ন্যায় মনের ভিতরটা চক্ষের নিমেষে হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—তবে কি ভালো লাগে রত্নাকে ?

অমিয়র গায়ে যেন কাঁটার চাবুক পড়িল। আহত স্বরে সে ডাকিল,—মা—

মিসেস্ গোস্বামী তখন দারুণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলের এই বেদনা-বিদ্ধ স্বরে তিনি কর্ণপাত না করিয়া ঘৃণার সহিত কহিলেন,—তুমি জেনো অমিয়, তুমি যদি সারাজীবন বিয়ে না করো, তবু রত্নাকে বিয়ে করবার অনুমতি আমি দেবো না। আর যদি জোর করে বিয়ে করো, জানবো, আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

অমিয়র মুখ সাদা হইয়া গেল। জননীর কটূক্তিপূর্ণ তিরস্কার তাহার জীবনে এই প্রথম! তথাপি নিজের সহিষ্ণুতার জোরে আত্মদমন করিয়া শান্ত স্বরে সে কহিল,—এ তুমি কি বলছো মা!

মিসেস্ গোস্বামীর মনে তখন প্রচণ্ড ক্রোধ সাপের মত ফুঁশিয়ে গর্জ্জন করিতেছে! অগ্নি-চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—আমি সব বুঝি। এই জন্যেই তুমি রত্নাকে মোটরে নিয়ে যেতে! তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু আমি বিশ্বাস কর্‌তুম না! ভাবতুম, অমিয় আমার ভালো ছেলে! এখন প্রমাণ হয়ে গেল যে, অমিয় তা নয়!

অমিয়র মুখের মত কণ্ঠস্বরও বিষাদ-গম্ভীর। সে কহিল,—আমি মন্দ ?

উত্তেজিত কণ্ঠে মিসেস্ গোস্বামী কহিলেন,—হ্যাঁ, নিশ্চয়! প্রমাণ হলো বৈ কি! তাই তুমি কল্পনাকে বিয়ে করতে পারবে না—পালিয়ে যাচ্ছো! জেনে রেখো, কল্পনা আমার পুত্রবধূ হবেই। আমার কথার নড়চড় নেই! তুমি আমার এক ছেলে নও অমিয়।

অমিয় উত্তর দিল,—বেশ তো, তাতে আমি সুখী হবো। সে-দিন আশীর্ব্বাদ করতে আসবো।

•

মধ্যাহ্নে বিদায়-প্রাক্কালে অমিয় মাতৃ-সন্নিধানে আসিয়া জননীর পদধূলি লইল।

মিসেস্ গোস্বামী কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। হাতটা শুধু মাথায় ঠেকাইয়া সংসার-খরচের খাতা দেখিতে ব্যস্ত রহিলেন।

একটু অপেক্ষা করিয়া,—চল্লুম মা, বলিয়া অমিয় মাতৃকক্ষ হইতে *নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতার লাইব্রেরীতে আসিয়া ঢুকিল।*

গোস্বামী সাহেব রাশীকৃত পুস্তক লইয়া জটিল মামলার কূট অর্থ অন্বেষণ করিতেছিলেন। অনিল এবং আর এক জন তরুণ ব্যারিষ্টার তাঁহার সহকারি-রূপে এ কাজে সাহায্য করিতেছে।

পুত্রকে দেখিয়া গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—চললে!

প্রণাম করিয়া পুত্র কহিল,—হ্যাঁ।

অনিল মুখ তুলিল। কহিল,—দু'টো পঁয়তাল্লিশে গাড়ী না?

—তাই।

—কিন্তু আর একটা ছিল,—আটটা দশে।

একটু হাসিয়া অমিয় কহিল,—হ্যাঁ। সেটাতে গেলে অনেক রাত্রে গাড়ী চেঞ্জ করতে ঝঞ্ঝাট—ভোর বেলায় নামা!

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—তা ঠিক! যাওয়াই যখন স্থির তখন এইটেতে যাওয়াই ভালো! অত রাত্রে নামা-ওঠায় ঝঞ্ঝাট লাগে। আমি এই সুন্দরলালের পুষ্যি ক্যানসেলের কেসটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। মানুষ যে কেন পুষ্যি নেয়,—বুঝি না। একটা খুনো খুনী কাণ্ড ঘটে গেল।

গমন-উদ্যত অমিয় কহিল,—দুধের তেষ্টা ঘোলে মেটায়।

গোস্বামী সাহেব কহিলেন,—ঠিক বলেছো! যত ঝঞ্ঝাট জড়ায় সেইখানে। ভগবান্ যা দেননি, জোর করে তা তৈরী করতে গেলে ফল হয় বিপত্তি বরণ করা!

জুনিয়ার ব্যারিষ্টারের সহিত করমর্দ্দন করিয়া কনিষ্ঠের পিঠ চাপড়াইয়া অমিয় ঘরের বাহিরে আসিল। মোটরের ফুটবোর্ডে পা দিতে দুই চোখের কোণ সজল হইল। ত্রস্তে রুমালে চোখ-মু

মুছিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিতে গিয়া অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়িল,—দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর দিকে। মনে হইল, গাছগুলার পিছনে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। শাড়ীর একটা অংশ যেন দৃষ্টিগোচর হইল। গাড়ী হইতে নামিয়া অমিয় বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইল। দেখিল, রত্না নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে।

অমিয়র পদশব্দে মুখ তুলিতেই চারি চক্ষে মিলন হইল।

—মাপ করো অমিয়-দা,—তুমি আমায় দেখতে পাবে বুঝতে পারিনি! বলিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

অমিয় কোন উত্তর দিল না। ধীর পদ-বিক্ষেপে আসিয়া মোটরে উঠিল। গাড়ী ষ্টার্ট দিল। অমিয় মুখ ফিরাইয়া গৃহের পানে চাহিল। দৃষ্টিতে পড়িল গর্ভধারিণী মা গবাক্ষ ধরিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছেন! মুখ তাঁহার অন্ধকার! মাথা নাড়িয়া অমিয় জননীকে অভিবাদন জানাইল।

৩০

দিন কয়েক পরেই অমলার পীড়ার উপশম হইল। রমেশ কহিলেন,—চলো রত্না, তোমায় রেখে আসি।

নির্জীবের মত অমলা বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। অনুরোধের সুরে কহিলেন,—আর দু'টো দিন থাকুক না!

বিরক্তির সহিত রমেশ কহিলেন,—পার্সেণ্টেজ সর্ট পড়ছে। ক'দিন কলেজ কামাই হলো!

—কিন্তু আজ যে ভরা অমাবস্যা গো!

—রাখো তোমার অমাবস্যা! কি ভেদ-বমি হলো না হলো, ওগো খুকীকে দেখাও গো, আমি আর বাঁচবো না! হুঁ, মানুষের অন্তর্জলী হবার সময়েও কেউ অমন করে বলে না যে মরে যাবো! কৈ, মরতে পারলে না তো! তখন তেরস্পর্শ, অমাবস্যা, প্রতিপদ শুনতে পাইনি তো!

অমলা নীরব রহিলেন। বিসূচিকার আক্রমণ তেমন নিদারুণ হয় নাই; মৃত্যু গ্রাস করিল না! এজন্য অবশ্য সে অপরাধী, কতকগুলা অর্থব্যয় করিয়া বাঁচিয়া উঠিল!

গর্ভধারিণীর জন্য রত্না বার্লি প্রস্তুত করিতেছিল! মুখ তুলিয়া সে বলিল,—আজকের দিনটা—

—তবে থাক! কিন্তু বলে দিলুম, তোমার মা'টিকে চেনো না, ও আবার প্রতিপদের হাঙ্গামা তুলবে।

বিক্ষুব্ধ হইয়া দুর্ব্বল কণ্ঠে অমলা কহিল,—ঘাট মানচি—তুমি নিয়ে যাও তোমার মেয়েকে। মরণ হলেও আর ডাকবো না।

—না, ডেকো না! তোমার মুখে জল দিতে ও আসতে পারবে না। নে খুকী, আজই তোর জামা-কাপড় গুছিয়ে নে।

ডাক দিয়া হরিশ উঠানে আসিল।—রত্না সরস্বতী কোথায় রে? এ কি রত্না, তুই উনুনের সামনে!

রত্না যেন ভয়ানক কি অপকর্ম্ম করিয়াছে, এমনি বিস্ময় তাঁর চোখের দৃষ্টিতে ফুটিল।

—না কাকাবাবু, রান্নাবান্না নয়। মার জন্যে বার্লি করছি।

—কেন, ও-বাড়ীতে বলে পাঠালেই হতো।

—বামুন পিসী রান্না করে! এ আর কি এমন! কাকিমা আবার ব্যস্ত হবেন।

—না গো মা-লক্ষ্মী, কিছু ব্যস্ত নয়। তোমার কাকিমার হাড় রেঁধে রেঁধেই পেকেছে। হ্যাঁ রত্না, তোর কাকিমা দুঃখ করছিল, মেয়ে এলো, তা একবার দেখা করলে না!

বিস্মিত রমেশ প্রশ্ন করিলেন,—তুই ও-বাড়ী যাস্‌নে রত্না?

লজ্জাবতী লতার ন্যায় রত্না যেন কুঁচকাইয়া গেল। কহিল,—কিছু আনা হলো না তাড়াতাড়িতে। পূজোর বন্ধে যখন আসবো—

হরিশ হাসিলেন।—দূর পাগলী—নাই বা জিনিষ হলো—তবু তোকে দেখলে—হ্যাঁ রত্না, থিয়েটার তো করলি! আপিসে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পড়লুম—তাতে তোর খুব সুখ্যাতি দেখলুম।

রমেশ ব্যস্ত কণ্ঠে কহিলেন,—এ্যাঁ, দেখলে না কি? আরে আমায় বলতে হয়! না হয় একখানা কাগজ কিনে আনতে, দাম কি আমি দিতুম না? না হরিশ, অত কঞ্জুষ-বৃত্তি ভালো নয়!

ভ্রাতার কথায় হরিশ লজ্জায় যেন এতটুকু হইয়া গেল। মাথা চুলকাইয়া কহিল,—হ্যাঁ, ইয়ে—আমার মাথায় অতটা এই—যাকে বলে ষ্ট্রাইক করেনি।

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—ইস্, তারিখটা মনে আছে? ডেট্ না পেলে কাগজ সংগ্রহ করবো কি করে? একটা কাটিং রাখবো। আর কি-কি লিখেছে?

—রত্নার খুব সুখ্যাতি। সাধনা বোসের সঙ্গে তুলনা করেছে। অফিস্-শুদ্ধ লোক আমায় ঘিরে ধরলে! বলে, এ্যাঁ, হরিশ বাবু, মিস্ রত্না বোস আপনার ভাইঝী! বলেন কি?

গর্ব্বিত দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া আনন্দ-বিগলিত কণ্ঠে রমেশ কহিলেন,—হুঁ, বুঝলে না, সেটা কলকাতা—আর্টের কদর তারা বোঝে।

—নিশ্চয়! নিশ্চয়! এ কি আমাদের পাড়া-গাঁ? গুণের মধ্যে পরের কুচ্ছো! কাজ বলতে দল-পাকাপাকি! তা ওদের গ্রুপ্-ফটোও তো বেরিয়েছে।

আনন্দে বালকের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে রমেশ কহিলেন,—তাই না কি! এ্যাঁ সত্যি?

রত্না পিতার সেই আনন্দ-দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া উৎফুল্ল স্বরে কহিল,—আচ্ছা বাবা, আমি যখন পূজার সময়ে আসবো—সব ফটো এক কপি করে আনবো।

পিতা কহিলেন,—আরও ছবি তোলা হয়েছে না কি তোমাদের?

বার্লিটা জুড়াইতে জুড়াইতে রত্না কহিল,—হ্যাঁ, আমরা যে যে অভিনয় করেছি, সকলকার ছবিই উঠেছে। আবার অভিনয় করছি, সে-ছবিও উঠেছে।

—ইস্, বলিস্ কি! বলিয়া পিতা অবাক্ হইয়া কন্যার মুখের পানে চাহিলেন।

খুল্লতাত হরষিত কণ্ঠে কহিলেন,—এবার তোর পরিচয়েই আমাদের পরিচয় দিতে হবে!

উভয় ভ্রাতাই হরষিত!

মধ্যাহ্নে সারা গ্রাম তোলপাড় করিয়া রমেশ কন্যার বিজয়বার্ত্তা প্রকাশ করিয়া গৃহে ফিরিয়া অপরাহ্নে দুহিতাকে ডাকিয়া কহিলেন,—খুকী, তোর একখানা চিঠি রে। দেবু হরকরা দিয়ে গেল।

পিতার হাত হইতে পত্র লইতে হাত বাড়াইতেই রত্নার বুকখানা দুলিয়া উঠিল। এ পত্র? না, অসম্ভব! তা কেন হইবে?

খামখানা হাতে করিয়া গৃহে আসিয়া সে হস্তাক্ষরের পানে চাহিল। হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত পত্র খুলিয়া দিবা-অবসানে গৃহের স্বল্লালোকের জন্য সে সরিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল; এবং আগে পত্রলেখকের স্বাক্ষরটা পাঠ করিল। পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিল! অলক রায়! যে সেই নারদ মুনি সাজিয়াছিল! সে কেন রত্নাকে চিঠি লিখিল?

রুদ্ধ নিশ্বাসে রত্না পত্র পড়িল। বিস্ময়ের সহিত খানিকটা অসঙ্গতি মনে জাগিল।

অলক লিখিয়াছে,—

প্রিয় উর্ব্বশী

নারদ কলহপ্রিয় হলেও স্বর্গ-মর্ত্ত্যের খবর আদান-প্রদানে সে ছিল ওস্তাদ। আমার পত্র তোমায় আশ্চর্য্য করলেও বিরক্ত করবে না। কারণ দূতের কাছ থেকেই সংবাদ নিতে হয়। তোমাদের নৃত্য-কলা সে-দিন যে বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়েছিল, তারই শব্দ-রোলে আমরা বিমোহিত। সাদর নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি, প্রার্থনা নিবেদন করছি—আমাদের বন্যা-রিলিফের জন্য যে অভিনয় আয়োজন চলছে, তার নৃত্য-ভূমিকাতে তোমাকে চাই। আর কত দিন বনবাসে থাকবে? অমরাপুরী অন্ধকার হয়ে আছে। এসো ফিরে এসো উর্ব্বশী। ইতি

নৃত্যমুগ্ধ

নারদ (অলক রায়)।

পত্র হাতে বিমূঢ়ের মত রত্না ক্ষণকাল বাতায়ন-পথে সন্ধ্যা বিলীয়মান রক্তালোকের পানে চাহিয়া রহিল।

অমলা এ পাশ ফিরিয়া আবিষ্টের মত কন্যাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলেন,—কার চিঠি রে?

রত্না মুখ ফিরাইল। তাহার মুখে গোধূলির আলোক-রাগ!

সে কহিল,—কলকাতার এমনি চিঠি। তোমায় বালিশ দিই মা।

অমলা বুঝিল, কথাটা কন্যা এড়াইয়া গেল! দুর্ব্বল দেহে অল্পেই মনে অভিমান হয়! অনাসক্ত থাকিতে চায়।

ক্ষুব্ধ অভিমানে অমলা অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া নির্লিপ্ত স্বরে কহিলেন,—দাও।

পেটের মেয়েও যদি মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে সংসারের ভালো-মন্দয় কিসের আসক্তি!

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী পুষ্পলতা দে

পি, ডবলিউ, ডি

নহি দেশ-নেতা, দশের কর্ত্তা, তাহাতে নাহিক ক্ষতি—
আমরা রয়েছি তবুও সতত দেশেরি কার্য্যে ব্রতী।
করি সুন্দর, করি নিরাপদ
দশের লাগিয়া গড়ে দিই পথ,
দুর্জ্জয় নদী বাঁধি সেতু দিয়া শিশু করে গতায়তি।

পাহাড়ের গায়ে সুরঙ্গ কাটি, সোপান গিরির শিরে,
স্তম্ভ বসাই পদ্মার বুকে, দমি দুর্দ্দম নীরে।
ঘন-অরণ্যে গিরি-সঙ্কটে,
পাগলা-ঝোরার নেহাৎ নিকটে,
বিপদ মরণ তুচ্ছ করিয়া ভ্রমিতেছি ঘুরে ফিরে।

দেশকে আমরা সজ্জিত করি, সুশোভিত মনোরম,
জন-সেবা তরে সদা উন্মুখ প্রস্তুত, সক্ষম।
সাড়া দিই মোরা সবার ডাকেই,
রূপ দিয়ে ফিরি কল্পনাকেই,
কঠিন লইয়া কারবার করি অবসর বড় কম।

আমরা জাতির গৌরব গড়ি, উন্নত করি দেশ,
স্থপতিতে রাখি যুগের কৃষ্টি, প্রতিভার উন্মেষ।
মৌর্য্য মোগল গ্রীক ও রোমান
যুগের যুগের শ্রেষ্ঠ যে দান,
হূণ ও গথের সেরা অবদান করি হেথা সমাবেশ।

প্রতি পথে, প্রতি দেউলে, সৌধে, রেখে যাই ভালবাসা,
অনাগত কত যুগের মানব করিবে যে যাওয়া-আসা।
কত আনন্দ কত উৎসব
অনুরঞ্জিত করিবে এ সব,
আমরা তখন কোন্ দূরে রব শেষ করে কাঁদা-হাসা!

কর্ম্মই করি, অধিকার নাই মোটেই কর্ম্ম-ফলে।
রচিয়া এবং সাজাইয়া গৃহ মোরা দূরে যাই চলে।
জনতার ধারা ধরে যেই পথ,
সরে যাই মোরা ছোট ভগীরথ
পাতাইয়া উপনিবেশ, নিজেরা ত্যাগ করি সিংহলে।

আমরা মোদের সৃষ্টির পানে যখন ফিরাই আঁখি,
হেরি অপূর্ব্ব চারুতা তাহার বিমোহিত হয়ে থাকি।
উহাতে মোদের কতটুকু দাবী,
হাত ধরে কে যে গড়ায় তা ভাবি,
পাষাণে রচিয়া ভক্তি-অর্ঘ্য রেখে যাই তাঁরি লাগি!

শ্রীকুমুদরঞ্জন

ভাস্কর রায় ও শাক্তাদ্বৈত-বাদ

মহামতি ভাস্কর রায় (১) বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ শাক্ত দার্শনিক ও সাধক। শক্তি-তত্ত্ব-সম্বন্ধে স্বীয় অতুলনীয় গ্রন্থ 'বরিবস্যা-রহস্যে' তিনি সংক্ষেপে বহু বিষয় অতি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। শাক্তাগম-সম্প্রদায়ের রহস্য অবগত হইতে হইলে তাঁহার এই গ্রন্থখানি সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য।

শ্রুত্যুক্ত নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়-নির্ব্বিকার-নিরবয়ব-নিরবদ্য-নিরঞ্জন পরম ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। ইনি সকলের আত্মরূপে প্রসিদ্ধ। ইনি অতি মহান্—মহতো মহীয়ান্—ভূমা। দেশ বা কাল ইঁহার ইয়ত্তা-পরিচ্ছেদে সমর্থ নহে। ইনি সর্ব্বদা অনাবৃত আত্মস্বরূপ-জ্যোতিঃ (২)।—ইহাই উপনিষদ্‌গুলির সার মর্ম্ম। এখন এ বিষয়ে তান্ত্রিকী প্রক্রিয়া কি—তাহা ভাস্কর উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন।

'আমি ইচ্ছা করি', 'আমি জানি'—ইত্যাদি বাক্যে যে জ্ঞান উহার অন্তরে উত্তমপুরুষ-একবচন (অর্থাৎ 'আমি') ভাসমান থাকে। এই জ্ঞান স্ফুরণাত্মক (অর্থাৎ স্বপ্রকাশ)। এই জ্ঞানই তন্ত্রের 'প্রকাশ'-নামক ব্রহ্ম-স্বরূপ। ঐ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বকর্তৃত্ব-পূর্ণত্ব-ব্যাপকত্বাদি-শক্তি-সম্বলিত। ব্রহ্মের স্বরূপ—সৎ-চিৎ-আনন্দ। ইহার মধ্যগত আনন্দ-রূপ অংশই 'স্ফুরণ', 'পরাহন্তা' 'বিমর্শ', 'পরা', 'ললিতা', 'ভট্টারিকা', 'ত্রিপুরসুন্দরী', ইত্যাদি পদ-দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'বিরূপাক্ষ-পঞ্চাশিকা'র 'বিশ্বশরীর-স্কন্ধে' বলা হইয়াছে—'ঈশ্বরতা, কর্তৃত্ব, স্বতন্ত্রতা ও চিৎস্বরূপতা—এইগুলি অহন্তার পর্য্যায়রূপে সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ 'অহন্তা'-পদের বাচ্য মহাশক্তি ঐশ্বর্য্যময়ী, কর্তৃস্বরূপিণী, স্বতন্ত্রা ও চিদ্রূপা বলিয়াই একবাক্যে সকল শাক্তাগমে কথিত হইয়া থাকে—ইহাই ভাস্করের উক্তির তাৎপর্য্য (৩)।

এই 'পরাহন্তা' ব্যতিরেকে 'ইদন্তা'র স্ফুরণ দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ—'ইদং'-পদ-বাচ্য দৃশ্য বিষয়সমূহ এই 'পরাহন্তা'-পদ-বাচ্য মহাশক্তির সাহায্যেই দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া থাকে। এই কারণে তান্ত্রিকাগমের সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু 'অহং'-বোধ ('আমি'—এই জ্ঞান) ও ইদং-বোধ ('এই'—এবম্প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ বিষয়-জ্ঞান) পরস্পর সম্বদ্ধ, অতএব 'ইদং'-পদ-গম্য দৃশ্য-পদার্থ-সমূহ 'অহংতা-রূপ' শক্তি-দ্বারা অথবা তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম-দ্বারা জনিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ—এক কথায় দৃশ্য বিষয়সমূহ শক্তির পরিণাম। অথবা, এ কথাও বলা চলে যে—শক্তি পরাহন্তা, শক্তিমান্ ব্রহ্ম, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন—অতএব দৃশ্য বিষয়সমূহ সশক্তিক ব্রহ্মেরই পরিণাম। বামকেশ্বর-তন্ত্রে ইহাই বলা হইয়াছে—'সেই শক্তির পরিণাম স্বীকার করিলে আর তদতিরিক্ত অপর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'। অর্থাৎ—শক্তির পরিণাম এই দৃশ্য জগৎ—ইহাই তান্ত্রিক-সিদ্ধান্ত বটে। তথাপি এ কথা মনে করা উচিত নহে যে, দৃশ্য প্রপঞ্চ শক্তি-পরিণাম হয় হউক, শক্তি ব্যতীত ব্রহ্ম অপরিণত অবস্থায় থাকেন—তাঁহার কদাপি পরিণাম হয় না। কারণ, তান্ত্রিক-সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। শক্তির পরিণাম হইলেই শক্তিমান্‌ও সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হইয়া যান। শক্তি হইতে অতিরিক্ত শক্তিমান্ অপরিণত অবস্থায় থাকেন—এরূপ কখনও সম্ভব হয় না (৪)।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে—'সকল বিকারই বাক্যমাত্র-দ্বারা আরব্ধ—কারণমাত্রই সত্য' ইত্যাদি—উহার স্বারসিক তাৎপর্য্য এই অর্থে ধরিতে হইবে। শক্তি উপাদান, শক্তিমান্ উপাদেয়—উভয়ের অত্যন্ত অভেদ—উপনিষদ্ (অর্থাৎ বেদান্ত) মতে যেরূপ ভেদাভেদ—সেরূপ নহে। অর্থাৎ—জগৎ ব্রহ্মশক্তির বিকার বা পরিণাম। এই ব্রহ্মশক্তি আবার শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভিন্ন। কোন কোন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মতে (৫) যেমন শক্তি ও

---

(১) ভাস্কর রায় বা ভাসুরানন্দনাথ দাক্ষিণাত্যনিবাসী বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম গম্ভীর রায় ও মাতা কোনমাম্বা। তিনি ৺কাশীধামে নৃসিংহাধ্বরীর নিকট অষ্টাদশ বিদ্যা আয়ত্ত করেন। গৌড়তর্কে তাঁহার গুরু ছিলেন গঙ্গাধর বাজপেয়ী। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম আনন্দী ও দ্বিতীয়ার নাম পার্ব্বতী। প্রথমা পত্নীর গর্ভে পাণ্ডুরঙ্গ নামে তাঁহার এক সন্তান জন্মে। তিনি নৃসিংহ বা নৃসিংহানন্দনাথ গুরুর নিকট শ্রীবিদ্যা-পঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন ও শিবদত্ত গুরুর নিকট তাঁহার পূর্ণাভিষেক হয়। বারাণসীতে তিনি ক্ষাম-যাগ সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বেদ ও আগমের সমন্বয়-বাদী। আগম যে বেদমূলক—ইহা প্রতিপাদনেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কাব্য-ব্যাকরণ-ছন্দঃ-স্তোত্র-স্মৃতি-বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা-ন্যায়-মন্ত্রশাস্ত্রাদি বিষয়ে তিনি অন্যূন ৪২খানি মহামূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। তাঁহার অন্যতম শিষ্য উমানন্দনাথ 'ভাস্কর-বিলাস' নামে তাঁহার যে জীবনী রচনা করিয়াছিলেন, উহা নির্ণয়সাগর প্রেস (বোম্বাই) হইতে সম্প্রতি মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) "স জয়তি মহান্ প্রকাশঃ" (বরিবস্যারহস্য ১।৩)—"স সর্ব্বেষামাত্মত্বেন প্রসিদ্ধঃ মহান্ দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নঃ পরাপ্রকাশ্যঃ, প্রকাশঃ সর্ব্বদানাবৃতাত্মস্বরূপজ্যোতিঃ"—বরিবস্যারহস্য-প্রকাশ (ভাস্কর-কৃত) (১।৩)।

(৩) "'ইচ্ছামি' 'জানামি' ইত্যাদাবুত্তমপুরুষান্তর্ভাসমানং স্ফুরণাত্মকং জ্ঞানমেব প্রকাশাভিধং ব্রহ্ম। তচ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বকর্তৃত্বপূর্ণত্বব্যাপকত্বাদিশক্তিসম্বলিতম্। তস্য চানন্দরূপাংশ এব স্ফুরণং পরাহন্তা বিমর্শঃ পরা ললিতা ভট্টারিকা ত্রিপুরসুন্দরীত্যাদি পদৈর্ব্যবহ্রিয়তে। উক্তঞ্চ বিরূপাক্ষপঞ্চাশিকায়াং বিশ্বশরীরস্কন্ধে—ঈশ্বরতা কর্তৃত্বং স্বতন্ত্রতা চিৎস্বরূপতা চেতি। এতেঽহন্তায়াঃ কিল পর্য্যায়াঃ সদ্ভিরুচ্যন্তে।"—ব: র: প্র:, পৃ: ৪।

(৪) "পরাহন্তামন্তরেণেদন্তায়া অসংস্ফুরণাদহমিদমোঃ সম্বন্ধি-ত্বাদিদম্পদগম্যস্য দৃশ্যস্যাহন্তারূপশক্ত্যা তদ্বিশিষ্টব্রহ্মণা বা জন্যত্বম্। তচ্চ দৃশ্যং তৎপরিণাম এব, 'তস্যাং পরিণতায়ান্তু ন কশ্চিৎ পর ইষ্যতে' ইতি বামকেশ্বরতন্ত্রাৎ।"—ব: র: প্র:, পৃ: ৪-৫

(৫) ইহা অদ্বৈত-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত নহে—'ভেদাভেদবাদীর সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত মতে—কারণ হইতে কার্য্য অনন্য অর্থাৎ কারণ-সত্তা ব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই—ইহাই বলা হইয়া থাকে। শক্তিকেও কার্য্য-স্থানীয় ধরিলে উহাও কারণ হইতে অনন্যই হইবে।

শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ—তন্ত্রাদ্বৈত-মতে সেরূপ সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় না—উভয়ের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধই উক্ত হইয়া থাকে। অতএব, ব্রহ্মশক্তি জগদাকারে পরিণত হইলে ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হন। অতএব, জগৎ যথার্থ পক্ষে ব্রহ্ম-শক্তি হইতে অভিন্ন—এ কারণে ব্রহ্ম হইতেও অভিন্ন। এহেতু উহা নামেই মাত্র জগৎ, কিন্তু বস্তুতঃ উহা মহাশক্তির (ও তদভিন্ন ব্রহ্মের) রূপান্তর মাত্র (৬)।

এই হেতু ছান্দোগ্য উপনিষদের—'এই সকলই ব্রহ্ম'—ইত্যাদি বাক্যে 'এই'-পদ-বাচ্য জগৎ ও ব্রহ্মের 'অভেদে সামানাধিকরণ্য' বুঝিতে হইবে—'বাধায় সামানাধিকরণ্য' নহে। কেবল ছান্দোগ্য শ্রুতি নহে, অপর সকল অদ্বৈত-শ্রুতিরই তাৎপর্য্য এইরূপ—ইহা বুঝিতে হইবে (৭)। সকল প্রমাণের শিরোমণি-ভূত শ্রুতি-প্রমাণ ও শ্রুত্যনুসারী তন্ত্র-প্রমাণ হইতে অদ্বৈতই যে তত্ত্ব, তাহা নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায়। এই অদ্বৈতের বিরোধিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে—কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণের, (ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির) ভেদাংশ মাত্র। পক্ষান্তরে, সমগ্র প্রপঞ্চই অদ্বৈত-বিরোধী নহে। 'ইহ (জগতে) নানা কিছুই নাই'—ইত্যাদি শ্রুতিতেও পূর্ব্বকথিত ভেদাংশেরই নিষেধ উক্ত হইয়াছে—প্রপঞ্চ-নিষেধ নহে। তবে যদি এ কথা বলা যায় যে, 'একই—অদ্বিতীয়' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে ভেদ-বিশিষ্ট প্রপঞ্চেরই অভাব বুঝাইতেছে, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যায় যে—এই ভেদ-বিশিষ্ট প্রপঞ্চের অভাব-প্রতীতিও বিশেষণের অভাব-প্রযুক্ত হইয়া থাকে (৮)। অতএব, ভামতী-গ্রন্থে যে স্থলে হাটক-মুকুটের ভেদ বিচার করা হইয়াছে, সে স্থলেও ভেদকেই স্বর্ণ হইতে ন্যূন-সত্তাক বলা হইয়াছে—মুকুটকে স্বর্ণ অপেক্ষা ন্যূন-সত্তাক বলা হয় নাই; কারণ, পরিণাম পরিণামীর সম-সত্তাক হইতে বাধ্য (৯)।

এইরূপ 'গৌড়পাদ-কারিকা'য় 'এই দ্বৈত মায়ামাত্র' ইত্যাদি কারিকায় 'দ্বৈত'-শব্দ-দ্বারা ভেদাংশকেই বুঝাইতেছে। উক্ত ভেদাংশই মিথ্যা—ভেদ-যুক্ত বস্তুটি (জগৎ) মিথ্যা নহে (১০)।

ইহার কারণ-স্বরূপে ভাস্কর রায় বলিয়াছেন—যদি বলা যায় যে, ভেদ-বিশিষ্টও মিথ্যা, তাহা হইলে নানারূপ দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, ভেদবত্তা-রূপ ধর্ম্মটি উভয়নিষ্ঠ। যাহার ভেদ ও যাহাতে ভেদ—এই উভয় বস্তুতেই ভেদ বর্ত্তমান থাকে। যাহার ভেদ, তাহাকে বলা হয় ভেদের 'প্রতিযোগী'; আর যাহাতে ভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে বলা হয় ভেদের 'অনুযোগী'। অথচ সাধারণ ভাবে এই ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়কেই ভেদবান্ বা ভেদ-বিশিষ্ট বলা চলে, অর্থাৎ এক কথায় ভেদবত্ত্ব ধর্ম্ম ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়েই বর্ত্তমান। ভাস্কর বলিতে চাহেন—ভেদবানের মিথ্যাত্ব বলিলে প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে যাহাতে ভেদ বিদ্যমান, সেই জগতের যেরূপ মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ অনুযোগিতা-সম্বন্ধে ব্রহ্মে ভেদ অবস্থান করায় ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্বও সম্ভব বলিয়া আশঙ্কার উদয় হইতে পারে। অতএব, ভেদবানের মিথ্যাত্ব স্বীকার না করিয়া ভেদের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে আর এ সকল আপত্তি উঠে না (১১)।

জগদুপাদানভূতা মায়াশক্তি ও তৎপ্রপঞ্চ এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে অনন্য। তবে তন্ত্রমতে মহাশক্তি মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন—ইহা পরে বলা হইবে। মহাশক্তি চিদ্রূপা, মায়া জড়।

(৬) "'বাচারম্ভণং বিকারঃ' (ছাঃ উঃ ৬।১।৪) ইত্যাদি শ্রুতীনাং তত্রৈব স্বারস্যাচ্চ। শক্তিশক্তিমতোরুপাদানোপাদেয়য়োরত্যন্তাভেদঃ, ন পুনরৌপনিষদাদিবদ্ভেদাভেদৌ।"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫

(৭) "অতএব 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১) ইতি সামানাধিকরণ্যমভেদে, ন পুনর্বাধায়াম্। অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ সর্ব্বা অপ্যেতদভিপ্রায়িকা এবাবিরুদ্ধাঃ"। সামানাধিকরণ্য- সমান (এক) অধিকরণে (আশ্রয়ে) বর্ত্তমান থাকার ভাব। ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি-বিশিষ্ট পদসমূহের একই অর্থে পর্য্যবসিত হওয়ার নাম সামানাধিকরণ্য। আলোচ্য স্থলে 'ইদং সর্ব্বং' (এই সব) বলিলে বুঝায় সমগ্র জগৎ-প্রপঞ্চ। আর 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ পরমাত্মা। 'জগৎ' অর্থে 'ব্রহ্ম' নহে, 'ব্রহ্ম' অর্থেও 'জগৎ' নহে। তথাপি উভয়ের সামানাধিকরণ্য (অর্থাৎ একার্থতা বা তাদাত্ম্য) কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? তাহার উত্তরে অদ্বৈত-সম্প্রদায়ের কোন কোন আচার্য্য বলিয়া থাকেন, 'ইদং'-পদ-বাচ্য জগৎ ও 'ব্রহ্ম'-পদ-বাচ্য পরমাত্মার মধ্যে যথাশ্রুত অর্থানুসারে সামানাধিকরণ্য না হইলেও 'ইদং'-পদের 'জগৎ' অর্থটি বাধিত হইয়া 'ব্রহ্ম'-অর্থেই পর্য্যবসিত হয়। ইহারই নাম 'বাধায় সামানাধিকরণ্য'। যে স্থলে পদদ্বয়ের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণে সামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে কোন একটি পদের যথাশ্রুত অর্থ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অন্য পদের অর্থের সহিত তাদাত্ম্য-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে—ইহাই বাধায় সামানাধিকরণ্য। আর যে ক্ষেত্রে এরূপ বাধা উৎপন্ন না হইয়াই উভয় পদের একার্থকতা-নিবন্ধন তাদাত্ম্য সম্ভব, সে স্থলে 'অভেদে সামানাধিকরণ্য'। ভাস্করের উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—যেহেতু জগৎ ব্রহ্ম-পরিণাম, অতএব জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। সেহেতু 'ইদং'-পদ-বাচ্য জগৎ আর 'ব্রহ্ম'-পদ-বাচ্য পরমাত্মা অত্যন্ত অভিন্ন। তাহাদের অভেদেই সামানাধিকরণ্য—কারণ, এরূপ স্থলে ইদং-পদের অর্থ জগৎ বাধা প্রাপ্ত না হইয়াই ব্রহ্মের সহিত উহার অভিন্নতা বুঝাইতেছে।

(৮) "সর্ব্বপ্রমাণমূর্দ্ধন্যয়া শ্রুত্যা তদনুসারিতন্ত্রৈশ্চাদ্বৈতে কথিতে তদ্বিরুদ্ধত্বেন ভাসমানঃ কার্য্যকারণয়োর্ভেদাংশ এব কল্পিত আস্তাং ন পুনঃ সর্ব্বোঽপি প্রপঞ্চঃ। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিষ্বপি ভেদাংশস্যৈব নিষেধো ন প্রপঞ্চস্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ উঃ ৬।২।১) ইত্যাদৌ শ্রূয়মাণো ভেদবৎপ্রপঞ্চাভাবোঽপি বিশেষণাভাবপ্রযুক্ত এব"।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫ (ইহা হইতে বুঝা যায়—ভাস্কর-মতে তন্ত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে—স্মৃতি-তুল্য শ্রুত্যনুসারী প্রমাণ।

(৯) "অতএব ভামত্যাং হাটকমুকুটগ্রন্থে ভেদস্যৈব হাটকন্যূনসত্তাকত্বং ন মুকুটস্যোক্তম্, পরিণামস্য পরিণামিসমানসত্তাকত্বাবশ্যকত্বাৎ"।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫

(১০) "'মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতম্' (গৌঃ কাঃ ১।১৭) ইত্যত্রাপি দ্বৈতশব্দেন ভেদস্যৈব মিথ্যাত্বমুচ্যতে ন পুনর্ভেদবতঃ"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫

(১১) "তথাত্বে তু প্রতিযোগিতাসম্বন্ধেন জগত ইবানুযোগিতাসম্বন্ধেন ব্রহ্মণো ভেদবত্ত্বস্য সত্ত্বাৎ সদসত্ত্বামভাবো নিরূপ্যত ইতি ন্যায়সিদ্ধত্বাবিশেষাদ্মিথ্যাত্বাপত্তেঃ"।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫ (ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদিগণ বলিতে পারেন যে—তাঁহারা প্রতিযোগি-সম্বন্ধেই হউক আর অনুযোগি-সম্বন্ধেই হউক, কোন সম্বন্ধেই ভেদ বা কোন ধর্ম্মেরই সত্তা ব্রহ্মে স্বীকার করেন না।

অতএব, মোটামুটি বুঝা যায় যে, শ্রুতির স্বারসিক সিদ্ধান্ত পরিণাম-বাদেরই অনুকূল (১২)।

ভগবান্ ব্যাসদেবও ব্রহ্মসূত্রে নিম্নোক্ত যুক্তিজালের সাহায্যে পরিণাম-বাদের সমর্থন করিয়াছেন। শ্রুতিতে একটি প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলা হইয়াছে—'সেই একটি বিষয়ের জ্ঞান জন্মিলেই সকল বিষয়ের বিজ্ঞান জন্মিবে'। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় যে—একটি মাত্র পরিণামী বস্তুর জ্ঞান হইলে ঐ বস্তু হইতে যত পরিণাম উৎপন্ন হয়, সে সকলেরই জ্ঞান স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, শ্রুতির উক্ত প্রতিজ্ঞা-বাক্য পরিণামবাদ-পক্ষেই সার্থক। তাহার পর শ্রুতিতে ইহার দৃষ্টান্তরূপে মৃত্তিকা ও ঘট প্রভৃতির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। একমাত্র মৃত্তিকার স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলে ঘটাদি যাবতীয় মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ঘট ত মৃত্তিকার বিকার বা পরিণাম—ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন (১৩)। অতএব, পরিণাম-পক্ষেই দৃষ্টান্তগুলি সার্থক। ইহা ব্যতীত তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'আমি বহু হইয়া জন্মাইতে ইচ্ছা করি,' ইত্যাদি। এই সকল উপদেশেরও তাৎপর্য্যানুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে—সূত্রকারের অভিপ্রেত পরিণামবাদই। কারণ, এক বহু হইলে একের বহুতে পরিণামই হইয়া থাকে। আবার প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ষড়্বিংশ সূত্রে সূত্রকার 'পরিণাম'-শব্দটিই ব্যবহার করিয়াছেন (১৪)।

ভাস্কর আরও বলিয়াছেন—কেবল শ্রুতি ও সূত্রকার নহেন, স্বয়ং ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্যও পরিণামবাদের সমর্থন করিয়াছেন। যদিও তিনি বিবর্ত্তবাদ-পক্ষেই (১৫) শ্রুতি-সূত্রাদি যোজনা করিয়াছেন, তথাপি স্ব-রচিত 'সৌন্দর্য্যলহরী' (বা আনন্দলহরী) নামক শক্তি-স্তোত্র-মধ্যে—'তুমি মন, তুমিই ব্যোম' ইত্যাদি শ্লোকে—'তুমি পরিণত হইলে'—এইরূপ উক্তি-দ্বারা শক্তি-পরিণামবাদ যে স্বাভিমত—ইহা স্বীকার করিয়াছেন (১৬)।

পরিণামবাদীও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের অভিমত মিথ্যাত্বের লক্ষণ—'নিজাতিরিক্ত রূপের অভাব'। রহস্যনাম-সহস্রে-'মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠানভূতা'—বলিয়া শক্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে এই তত্ত্বই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে বস্তু স্বরূপ ব্যতিরিক্ত রূপান্তরেও প্রকাশ পাইতে পারে, তাহাই সত্য; আর যাহা নিজ রূপ ব্যতীত অন্য কোন রূপে প্রকাশ পায় না, তাহা মিথ্যা। মৃত্তিকা ও ঘট—ইহাদিগের মধ্যে মৃত্তিকার পক্ষে স্বরূপ (মৃদ্রূপ) ব্যতীতও ঘটাদি-রূপ সম্ভব। অতএব, মৃত্তিকা সৎ বস্তু। পক্ষান্তরে, ঘটের নিজ ঘট-রূপ ব্যতীত রূপান্তরে প্রকাশের যোগ্যতা নাই—এ কারণে ঘট-রূপটি মিথ্যা। কারণ, মৃত্তিকার ঘট-রূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও উহার মৃদ্রূপ বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু ঘটের ঘট-রূপটি ধ্বংস হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। 'শাক্তবানন্দকল্পলতা'-গ্রন্থে ইহা সবিস্তরে উক্ত হইয়াছে (১৭)।

যে মহান্ প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মের কথা ভাস্কর প্রথমে বলিয়াছেন, তাঁহারই বিমর্শরূপিণী শক্তি বিদ্যমান—ইহার স্বভাব স্ফুরণ। তাঁহারই সংযোগে শিব (পরমাত্মা) জগৎ উৎপাদন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন (১৮)।

বরিবস্যা-রহস্যে ভাস্কর রায় বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতে অভিন্না এই ব্রহ্ম-শক্তির উপাসনা-পদ্ধতি মূলতঃ দ্বিবিধ—(১) বাহ্য উপাসনা ও (২) আন্তর উপাসনা। বাহ্য উপাসনায় প্রতিমা, চক্র (যন্ত্র) প্রভৃতি নানারূপ বস্তু উপাস্যের প্রতীক-রূপে ব্যবহৃত হয় ও নানাবিধ উপচার

---

(১২) "ততশ্চ শ্রুতেরপি পরিণামবাদ এব সম্মতঃ সিধ্যতি"।
—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫

(১৩) "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"
—ছাঃ উঃ (৬।১।৪)

(১৪) "ভগবতা ব্যাসেনাপি 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩) ইত্যস্মিন্নধিকরণে একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাং, মৃদ্‌ঘটনখনিকৃন্তনাদিদৃষ্টান্তম্, 'বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈঃ উঃ ২।৭) ইত্যভিধ্যোপদেশাদিকং চানুসন্দধানেন পরিণামবাদ এবাভিপ্রেতঃ, কণ্ঠরবেণোক্তশ্চ 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬) ইতি সূত্রে। বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৫-৬

(১৫) বিবর্ত্ত—নিজ স্বরূপের বা তত্ত্বের অন্যথা-করণ ব্যতিরেকে রূপান্তরে প্রতীয়মান হওয়ার নাম 'বিবর্ত্ত'। পরিণাম—নিজ স্বরূপের (তত্ত্বের) অন্যথাকরণ-দ্বারা রূপান্তরে প্রতীতি। রজ্জু তাহার নিজ স্বরূপটি অবিকৃত রাখিয়া সর্পাদি রূপান্তরে প্রতীয়মান হইলে সর্পকে রজ্জুর বিবর্ত্ত বলা হয়। আর দুগ্ধ নিজ স্বরূপের পরিবর্ত্তন সহকারে দধির আকারে রূপান্তরিত হইলে দধিকে দুগ্ধের বিকার বা পরিণাম বলা চলে। মৃত্তিকা ঘটাকার ধারণ করিলে মৃৎস্বরূপের পরিবর্ত্তন হয় না। এ কারণে ঘটকে মৃত্তিকার পরিণাম না বলিয়া বিবর্ত্ত বলাই সঙ্গত। তথাপি শ্রুতিতে যখন 'বিকার' পদটি রহিয়াছে, তখন অনেকে ঘট মৃত্তিকার বিকার—ইহাই বলিয়া থাকেন।" বস্তুতঃ, এ ক্ষেত্রে 'বিকার' পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই—সাধারণ ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(১৬) 'মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি, ত্বমাপস্ত্বং ভূমিস্ত্বয়ি পরিণতায়াং ন হি পরম্' (আনন্দলহরী—৩৫)। "ভাষ্যকারৈরপি তত্র বিবর্ত্তবাদানুসারেণ ব্যাচক্ষাণৈরপি সৌন্দর্য্যলহর্য্যাম্ 'মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং—' (৩৫) ইতি শ্লোকে 'ত্বয়ি পরিণতায়াম্' ইতি স্বাভিমতঃ পরিণামবাদ এব স্ফুটীকৃতঃ"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৬। এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, অদ্বৈতবাদিগণের মতে জগৎ ব্রহ্ম-শক্তির পরিণাম—ইহা স্বীকারে বাধা নাই—জগৎ ব্রহ্ম-পরিণাম—ইহা স্বীকারেই তাঁহাদিগের আপত্তি।

(১৭) "অস্মিন্ পক্ষে রহস্যনামসহস্রে 'মিথ্যাজগদধিষ্ঠানা' (৭৩৫) ইত্যাদৌ শ্রূয়মাণং মিথ্যাত্বং তু স্বানতিরিক্ত-রূপত্বং, ঘটাদিরূপেণানিত্যত্বং ব্রহ্মরূপেণ নিত্যত্বম্, মৃদ্‌ঘটয়োরভেদেঽপি ঘটরূপেণ ধ্বস্তত্বং মৃদ্রূপেণাধ্বস্তত্বং চেত্যাদিবদ্‌বিরুদ্ধধর্ম্মনিরাসাদিকমুহ্যমিত্যাদিকঃ শাক্তবানন্দকল্পলতায়াং বিস্তরঃ"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৬। শ্রীবিদ্যাপঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্রে ভাস্করের দীক্ষাদাতা গুরু-নৃসিংহানন্দনাথ শাক্তবানন্দকল্পলতার গ্রন্থকার।

(১৮) নৈসর্গিকী স্ফুরত্তা বিমর্শরূপাঽস্য বিদ্যতে শক্তিঃ।
তদ্যোগাদেব শিবো জগদুৎপাদয়তি পাতি সংহরতি"।
বঃ রঃ (১।৪)।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যও আনন্দলহরীর প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি চ শক্তঃ প্রভবিতুং ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি"।

প্রদান-পূর্ব্বক পূজাদি সাধন হইয়া থাকে। আন্তর উপাসনা-পদ্ধতির প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে; এই পদ্ধতির অনুসরণকারী সাধক দেবীর ত্রিবিধ রূপের অন্যতর রূপকে আলম্বনরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। আন্তর উপাসনায় স্থূল সূক্ষ্ম পর ভেদে দেবীর ত্রিবিধ রূপ। স্থূল রূপে দেবীর বিশিষ্ট আকৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট এই স্থূল রূপ মন্ত্রসিদ্ধ সাধকের দর্শনগোচর হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা যাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে, তিনিই যে পরম ভাগ্যবান্—এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই। তাঁহার এই স্থূল রূপ সাধকের হিতার্থ কল্পিত রূপমাত্র; উহাই তাঁহার স্বরূপ নহে। স্থূল ব্যতীত তাঁহার সূক্ষ্ম একটি রূপও বিদ্যমান। উহা মাতৃকাময়ী মূর্ত্তি—সংস্কৃত-বর্ণমালার অক্ষরগুলি-দ্বারা গঠিত—দেবীর এ সূক্ষ্ম রূপ নানা-মন্ত্রময়। যাঁহারা উচ্চতর স্তরের সাধক, তাঁহারা এই মন্ত্রময়ী মূর্ত্তির শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও তাঁহার যথার্থ স্বরূপ নহে। ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর পরমরূপে দেবী চিন্ময়ী কেবল মনোমাত্র-গম্যা। কিন্তু ইহাও তাঁহার কল্পিত রূপ—যথার্থ স্বরূপ নহে। এই রূপত্রয়াতীত দেবীর যে তুরীয় স্বরূপ—উহাই শ্রীদেবীর (বা শ্রীবিদ্যার) আনন্দাত্মিকা মূর্ত্তি। এই আনন্দচিন্ময়-স্বরূপানুভূতিই চরম পুরুষার্থ। ইহারই উদ্দেশ্যে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং ঈশ্বর চতুর্দ্দশ বিদ্যা লোকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা হইতেছে—চারি বেদ (ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব), ছয় বেদাঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ), ন্যায়, মীমাংসা, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র (১৯)। এই চতুর্দ্দশ বিদ্যার সার চতুর্ব্বেদ। চতুর্ব্বেদের সারভূতা গায়ত্রী (২০)।

গায়ত্রীর আবার দুইটি রূপ—(১) অপর ও (২) পর। অপর রূপটিরও দুইটি বিভাগ—(১) স্পষ্ট ও (২) অস্পষ্ট। স্পষ্ট রূপটি সকলেরই প্রায় পরিচিত। উহাই ব্রাহ্মণের নিত্য জপ্য ত্রিপদা গায়ত্রী। অস্পষ্টরূপে একটি চতুর্থ চরণ আছে, উহা সাধারণের বিজ্ঞাত নহে বলিয়াই 'অস্পষ্ট' নামে কথিত হইয়া থাকে (২১)।

গায়ত্রীর যে পর-রূপ—উহা চতুর্ব্বেদে অতি গোপনে রক্ষিত হইয়াছে—উহাই 'শ্রীবিদ্যা-পঞ্চদশাক্ষরী' মন্ত্র (২২)। এই মন্ত্র কেবল যে তন্ত্রেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহা নহে। স্বয়ং বেদপুরুষও সঙ্কেত-দ্বারা অত্যন্ত গোপনীয় রূপে এই মন্ত্রটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সাঙ্খ্যায়ন-শ্রুতিতে এই সঙ্কেত-গর্ভ শ্রীবিদ্যামন্ত্র কূট-ভাষায় উক্ত হইয়াছে (২৩)।

---

(১৯) "তজ্জ্ঞানার্থমুপায়াঃ বিদ্যা লোকে চতুর্দ্দশ প্রোক্তাঃ"। —বঃ রঃ (১।৬)। তন্ত্রাণাং ধর্ম্মশাস্ত্রেঽন্তর্ভাবঃ" ।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৭। ভাস্কর তন্ত্ররাজের ব্যাখ্যায় তন্ত্র যে স্মৃতি-মধ্যে গণ্য—তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন।

(২০) "তেষপি চ সারভূতা বেদাস্তত্রাপি গায়ত্রী"—বঃ রঃ (১।৬)।

(২১) "তস্যা রূপদ্বিতয়ং তত্রৈকং যৎ প্রপঠ্যতে (২) স্পষ্টম্"। —বঃ রঃ (১।৭)। "তস্যাঃ গায়ত্র্যাঃ। স্পষ্টমস্পষ্টং চেতি পদচ্ছেদ আবৃত্ত্যা। চরণত্রয়ং—'তৎসবিতুঃ' ইত্যাদি স্পষ্টম্। "পরোরজসে সাবদোম্" ইতি চতুর্থচরণং ত্বস্পষ্টমিত্যর্থঃ"। বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৭।

(২২) "বেদেষু চতুর্ষপি পরমত্যন্তং গোপনীয়তরম্"—বঃ রঃ (১।৭)। "পরং শ্রীবিদ্যাখ্যং দ্বিতীয়ং রূপম্"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৭।

"কামো যোনিঃ কমলেত্যেবং সঙ্কেতিতৈঃ শব্দৈঃ। ব্যবহরতি ন তু প্রকটং যাং বিদ্যাং বেদপুরুষোঽপি।"—বঃ রঃ (১।৮)। "কামো-যোনিঃ কমলা বজ্রপাণির্গুহাহসা মাতরিশ্বাঽভ্রমিন্দ্রঃ। পুনর্গুহাসকলা মায়য়া চ পুরুচ্যেষা বিশ্বমাতাদিবিদ্যা" ।—ইতি সাঙ্খ্যায়ন-শ্রুতিঃ"—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৮।

এই মহাবিদ্যা-মধ্যে ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ব ও তদতীত সপ্তত্রিংশত্তম এক মহাতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়—(১) শিব (২) শক্তি (৩) সদাশিব (৪) ঈশ্বর (৫) শুদ্ধবিদ্যা (৬) মায়া (৭) কলা (৮) বিদ্যা (৯) রাগ (১০) কাল (১১) নিয়তি (১২) পুরুষ (১৩) প্রকৃতি (১৪) অহঙ্কার (১৫) বুদ্ধি (১৬) মনঃ (১৭) শ্রোত্র (১৮) ত্বক্ (১৯) নেত্র (২০) জিহ্বা (২১) ঘ্রাণ (২২) বাক্ (২৩) পাণি (২৪) পাদ (২৫) পায়ু (২৬) উপস্থ (২৭) শব্দ (২৮) স্পর্শ (২৯) রূপ (৩০) রস (৩১) গন্ধ (৩২) আকাশ (৩৩) বায়ু (৩৪) তেজঃ (৩৫) অপ্ ও (৩৬) পৃথিবী। ইহাদিগের স্বরূপ ও উৎপত্তির ক্রম ভাস্কর 'সৌভাগ্যসুধোদয়ে' দেখিতে বলিয়াছেন (২৪)। ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বাতীত এক পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম। ইনিই ব্রহ্মশক্তি হইতে অভিন্ন। অতএব ব্রহ্ম-শক্তি শ্রীবিদ্যাই তত্ত্বাতীতস্বভাবা (২৫)।

ভাস্কর বলিয়াছেন যে, কোন মন্ত্রের ঋষি-ছন্দঃ-দেবতা-বিনিয়োগাদি জানিয়া উহার বীজ-শক্তি-কীলকাদি পরিজ্ঞাত হইয়া নানাবিধ ন্যাস-ধ্যান-নিয়মাদির অনুষ্ঠান-যুক্ত যে বহিরঙ্গ পূজা তাহা ত ইহলোকে প্রায়ই প্রসিদ্ধ (২৬)। প্রকাশ-বরিবস্যা-বিধিতে ভাস্কর স্বয়ং এ সকলের বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন (২৭)। পক্ষান্তরে, বিষয়ে অনাসক্ত অন্তর্মুখ জনগণই পূর্ব্বোক্ত সাধারণের দুর্লভ অন্তরঙ্গ-পূজার আদর করিয়া থাকেন। বরিবস্যা-রহস্যে এই অন্তরঙ্গ-পূজার বিধিই উক্ত হইয়াছে। এই অন্তরঙ্গ-পূজা পরিত্যাগ করিয়া জড়-বুদ্ধিগণ যে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ বহিরঙ্গ-পূজা করিয়া থাকে, তাহা প্রাণহীন দেহ ও বিগলিত-সূত্র পুত্তলিকার মতই অন্তঃসারশূন্য (২৮)—ইহা বলিয়া ভাস্কর কেবল বাহ্য-পূজার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। পরমদেবতা (ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা), শ্রীবিদ্যা-পঞ্চদশাক্ষরী মন্ত্র, চক্ররাজ (ত্রিপুরসুন্দরী যন্ত্র), শ্রীগুরু ও নিজ আত্মার অভিন্নার্থ-ভাবনাই এই রহস্য-বরিবস্যার সার মর্ম্ম। কারণ, এই পঞ্চতত্ত্বের প্রত্যেকটিই মূল ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন—ইহাই ভাস্কর তাঁহার শাক্তাদ্বৈত-বাদের চরম সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী (এম-এ, পি আর এস, অধ্যাপক)

---

(২৪) বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৬৫—৬৬।

(২৫) "স্বরব্যঞ্জনভেদেন সপ্তত্রিংশৎপ্রভেদিনী। সপ্তত্রিংশৎপ্রভেদেন ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপিণী। তত্ত্বাতীতস্বভাবা চ বিদ্যৈষা ভাব্যতে ময়া" ।—বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ৬৬।

(২৬) ঋষয়শ্ছন্দোদৈবতবিনিয়োগা বীজশক্তিকীলানি। ন্যাস-ধ্যানং নিয়মাঃ পূজাদীনি তু বহিরঙ্গানি। বাহ্যাঙ্গানি পুনঃ প্রায়ো লোকে প্রসিদ্ধকল্পানি" । বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ১১৩।

(২৭) তানি চ প্রকাশবরিবস্যাবিধৌ প্রপঞ্চিতান্যস্মাভিঃ। বঃ রঃ প্রঃ, পৃঃ ১১৩

(২৮) "দুর্লভমান্তরমঙ্গং প্রায়োঽন্তর্মুখজনৈস্তদাদৃত্যম্। তোষায়ৈষা তেষামতঃ প্রদিষ্টা রহস্যবরিবস্যা। এতামুৎসৃজ্য জড়ৈঃ ক্রিয়মাণা বাহ্যাড়ম্বরোপাস্তিঃ। প্রাণবিহীনেব তনুর্বিগলিতসূত্রেব পুত্তলিকা" । বঃ রঃ (২।১৬২—৬৩)। যতক্ষণ পুতুলের হাত-পা সূতায় বাঁধা থাকে, ততক্ষণই পুতুল জীবন্তের মত হাত-পা নাড়িয়া থাকে, ঐ সূত্র ছিন্ন হইলে উহা তখন আর খেলা দেখায় না।

মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ

[গল্প]

১

জাপান বৃটেনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করায় প্রথমেই কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে আলোক-নিয়ন্ত্রণের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। যে কলিকাতা "দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত" থাকিয়া রাত্রির অন্ধকারকে উপহাস করিত, সেই নগরে উজ্জ্বল আলোক বিকাশ অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। হাওড়া রেল ষ্টেশনে আলোকমালা অবগুণ্ঠনে আপনাদিগের দীপ্তি আবৃত করিয়াছে—ট্রেণের কামরায় আলোক আছে; কিন্তু তাহা জীবিত হইলেও জীবন্মৃত রোগীর জীবনের মত।

নির্ম্মলচন্দ্র রায় কলিকাতা হইতে যাইবেন। প্রথম শ্রেণীর কামরায় তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি ষ্টেশনে উপনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কয় জন ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যে কামরায় তাঁহার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, সে কামরাটি অধিকার করিবেন—বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা সামরিক প্রয়োজনে দিল্লীতে যাইতেছেন—পথে অনেক কায করিয়া লইতে হইবে, তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বে-সামরিক যাত্রীকে যাইতে দিবেন না। রেলের কর্ম্মচারীরা সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছুটাছুটি করিয়া শেষে এঞ্জিনের কয়খানি গাড়ীর পরেই একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরা পাইলেন এবং তাহাতেই নির্ম্মলচন্দ্রকে স্থান দিয়া—পাছে আবার কেহ তাহা অধিকার করে সেই ভয়ে, তাহাতে—সমগ্র কামরা ভাড়া করা হইয়াছে, এই মর্ম্মে কাগজ আঁটিয়া দিলেন।

নির্ম্মলচন্দ্র সেই কামরায় বসিলেন।

ট্রেণ ষ্টেশন ত্যাগ করিবার মাত্র ৫ মিনিট পূর্ব্বে যে রেল-কর্ম্মচারীটি তাঁহাকে শেষের কামরায় আনিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া কামরার দ্বার খুলিয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "প্রথম শ্রেণীর যে কামরা মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে এক জন মাত্র মহিলা—ভারতীয়া ছিলেন। সামরিক কর্ম্মচারীরা সেটিও চাহিতেছেন—কাযেই মহিলাটিকে এই কামরায় স্থান দিতে হইতেছে। আশা করি, আপনার কোন আপত্তি হইবে না—অসুবিধা হয়ত হইবে, কিন্তু উপায় নাই।"

নির্ম্মলচন্দ্র বিব্রত হইলেন। তাঁহার জীবনে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন ও যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কামরায় এক জন অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে গমনের কথায় তিনি আতঙ্কই অনুভব করিলেন। তিনি রেলের কর্ম্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি দ্বিতীয় শ্রেণীতেও স্থান দিতে পারেন না?"

কর্ম্মচারীটি বলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, আর কোথাও স্থান নাই।"

নির্ম্মলচন্দ্র জানিতেন, আইনতঃ তিনি আর এক জন যাত্রীর সে কামরায় ভ্রমণে আপত্তি করিতে পারেন না। তিনি দার্শনিকের মত ভাবে বলিলেন, "যাহার প্রতীকার করা যায় না, তাহা সহ্য করিতেই হইবে।" তিনি মনে মনে ভাবিলেন, পরবর্ত্তী কোন ষ্টেশনে আপনি নামিয়া অন্য কামরায় স্থান সন্ধান করিবেন।

যে মহিলাটি কর্ম্মচারীটির সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া কামরায় দ্বিতীয় বেঞ্চে বসিলেন। তিনি নির্ম্মলচন্দ্রের কথা শুনিয়াছিলেন—শুনিয়া যেন কেমন অন্যমনস্কা হইয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে কোথাও শ্রুত গানের সুর যদি বিস্মৃতির দূরত্বে ক্ষীণ হইয়া কর্ণে প্রবেশ করে, তবে মানুষের যেমন ভাব হয়, তাঁহার যেন তেমনই ভাব হইয়াছিল।

নির্ম্মলচন্দ্র ও কুমারী যূথিকা রায় উভয়েই কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন। নিশীথে—অপরিচিত স্থানে—অন্ধকারে মানুষের মনে যেরূপ অস্বস্তির উদ্ভব হয়—এ সেইরূপ অস্বস্তি। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে কিছুই পাওয়া যায় না; কিন্তু মনে হয় যেন অন্ধকার অশরীরী সম্ভাবনায় পূর্ণ।

দেখিতে দেখিতে ট্রেণ চলিবার সঙ্কেত-ধ্বনি শ্রুত হইল—ট্রেণ উগ্র বংশীধ্বনি করিয়া—যেন জড়ত্ব-শাপমুক্ত জীবের মত আপনার চলিবার শক্তি প্রাপ্তি সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রথমে মৃদু গতিতে অগ্রসর হইল; তাহার পর আপনার শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া—তাহারই আনন্দে মন্থর গতি ত্যাগ করিয়া দ্রুত-গতিতে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া যেন ছুটিয়া চলিল।

২

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছাড়াইয়া ট্রেণ অগ্রসর হইল এবং এক ঘণ্টা অতীত হইবার পর যখন প্রথম থামিবার ষ্টেশন—বর্দ্ধমানে উপনীত হইল, তখন ষ্টেশনে দীপ আর অবগুণ্ঠিত নহে; আর ট্রেণের কামরায় যে আলোক অতি মৃদু ভাবে জ্বলিতেছিল, তাহা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অন্য কোন কামরায় স্থান পাইতে পারেন কি না, দেখিবার জন্য নির্ম্মলচন্দ্র কামরা ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই সময় তাঁহার দৃষ্টি সহযাত্রীর উপর পতিত হইল। তিনি তাঁহার দিকেই চাহিয়া ছিলেন। কেহই দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। সহযাত্রীর দৃষ্টি যেন নির্ম্মলচন্দ্রকে নিশ্চল করিল—তিনি আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কমল!"

সহযাত্রী যেন আপনার চাঞ্চল্য সংযত করিয়া লইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ। কিন্তু সে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে।"

"কেন?"

"আজ আমি যূথিকা রায়।"

নির্ম্মলচন্দ্র ভাবিলেন, বিবাহের পর কোন কারণে—হয়ত শ্বশুরালয়ে কাহারও 'কমল' নাম থাকায় নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একা?"

"হাঁ। আমি কুমারী যূথিকা রায়, একা যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"কর্ম্মস্থান পঞ্জাবে।"

বিষয়টি রহস্যাচ্ছন্ন মনে হইতে লাগিল। তবে ৩০ বৎসর—সে জীবনের মধ্যাহ্ন, আর আজ অপরাহ্ণ। এই দীর্ঘকালে কি হইয়াছে, সে বলিতে পারে?

নির্ম্মলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বিবাহ হয় নাই?

কমল বলিলেন, "আমি বিবাহ করি নাই।"—তিনি মনে মনে ভাবিলেন, পুরুষের ভালবাসা কি এতই অসার ও অস্থির যে, সে নারীর ভালবাসাকে সেই আদর্শে বিচার করে ?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে তোমার স্ত্রীপুত্রাদি নাই ?"

নির্ম্মলচন্দ্র হাসিলেন—সে হাসি বেদনাকে আবৃত করিবার চেষ্টা। তিনি বলিলেন, "আমি বিবাহ করি নাই।"

"কেন ?"

"সে আজ ৩০ বৎসর আগের কথা। তুমি জান, তখন আমি বিবাহ করতেই চেয়েছিলাম—বিবাহ হয় নাই। তা'র পর আর বিবাহের কথা কল্পনা করতেও পারি নাই ; যা'র যে স্থানে ব্যথা, সে সেই স্থানটা স্পর্শ করতে ভয় পায়।"

নির্ম্মলচন্দ্রের মনে হইল, কমলের চক্ষুতে নূতন দীপ্তি বিকশিত হইল।

সেই দীর্ঘ ৩০ বৎসর পূর্ব্বের যে ঘটনা উভয়ের জীবনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছিল, তাহার বিষয় উভয়েই জানিতেন। তাহার পরবর্ত্তী ৩০ বৎসরের কথাই পরস্পরের অজ্ঞাত।

নির্ম্মলচন্দ্রের বয়স তখন ২২ বৎসর—কমলের ১৫ পার হইয়া ১৬ বৎসর। নির্ম্মলচন্দ্রের পিতা উত্তরবঙ্গে স্কুল-মাষ্টার—হেড মাষ্টার ; তিনি বিপত্নীক—এক কন্যা ও এক পুত্র রাখিয়া তাঁহার পত্নী লোকান্তরিতা হইলে তিনি তাহাদিগের মাতার ও পিতার কায করিয়াছিলেন—তাহার পর সুশিক্ষিত পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। পুত্র তখন কলিকাতায় পড়িতেছে—প্রাথমিক পরীক্ষায় ও তাহার পরবর্ত্তী সব পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে—পরীক্ষা শেষ করিয়া কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছে। সে তখন ছাত্রাবাসে থাকিয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করে। কমলের এক ভ্রাতা তাহার সতীর্থ। উভয়ে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং সেই ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া নির্ম্মলচন্দ্র বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বস্ব ধনী রামময় বসুর গৃহে যাইত। কমল তাঁহার কন্যা। রামময় তিনটি বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন—তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধি, প্রভূত ধন, দুর্জ্জয় ক্রোধ।

বহু দিন সতীর্থের গৃহে আসিয়া নির্ম্মলচন্দ্র সে বাড়ীতে কতকটা "ঘরের ছেলের" মত হইয়া গিয়াছিল। মাতৃহীন নির্ম্মলচন্দ্র সতীর্থের মাতার নিকট যে স্নেহ পাইত, তাহা সে তাহার জীবন-মরুভূমিতে স্রোতস্বতীর সলিলের মত মনে করিত। কমলের মাতার ইচ্ছা ছিল, সেই তীক্ষ্ণধী তরুণের সহিত কমলের বিবাহ দিবেন। প্রায় তিন বৎসরে তাঁহার সেই ইচ্ছা গৃহে প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। কেবল রামময় তাহা জানিতেন না। কথাটা বিস্ময়কর হইলেও সত্য। রামময় সংসারের কর্ত্তা হইলেও তাঁহার সংসারের কোন কাযে অগ্রণী হইবার অবসর বা আগ্রহ কিছুই ছিল না এবং তাঁহার পত্নীর গৃহিণীপণার কৃতিত্বে তাঁহার সে বিষয়ে আগ্রহের কোন কারণও ঘটে নাই। গৃহিণীর গৃহিণীপণায় সংসারের কায উপলবিহীন খাতে নদীর মত প্রবাহিত হইতেছিল। গৃহিণী স্বামীর প্রকৃতি অবগত ছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি নির্ম্মলের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব পূর্ব্বে স্বামীর নিকট করেন নাই। তিনি জানিতেন, সে প্রস্তাব করিলেই রামময় তাহাতে আপত্তি করিবেন—তাহা তাঁহার ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে আঘাত করিবে ; কিন্তু যাহাতে স্বামীর আপত্তি-সম্ভাবনা অনিবার্য্য, কিরূপে—ক্রমে সে বিষয়ে তাঁহার আপত্তি দূর করা যায় তাহাও কমলের মাতা জানিতেন। সেই জন্য তিনি সময় সময় স্বামীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে—বিশেষ পুত্রদিগের শিক্ষা-সংক্রান্ত কথার সময় নির্ম্মলের প্রশংসা করিতেন। তিনি যে ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সেই সময় একটি অতর্কিত ঘটনা ঘটিল—রামময়ের কোন পরিচিত ব্যক্তি কমলের সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব রামময়ের নিকট করিলেন। স্বামীর নিকট সেই প্রস্তাব শুনিয়া কমলের মাতা যখন নির্ম্মলের সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে স্বামীর মত জানিতে চাহিলেন, তখন রামময় সেই প্রস্তাব অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া উঠিলেন।

সাধারণতঃ স্বামীর এইরূপ মত প্রকাশে তাঁহার পত্নী বিশেষ বিচলিত হইতেন না। তিনি জানিতেন, স্বামীর মতের পরিবর্ত্তন তিনি ঘটাইতে পারেন—কেবল সে কায সময়সাধ্য। তাঁহার ক্রোধ যেমন "খড়ের আগুনের" মত সহসা জ্বলিয়া উঠে, তেমনই সহজেই নির্ব্বাপিত হয়, সাংসারিক ব্যাপারে তাঁহার মত সেইরূপ প্রথমে দৃঢ় হইলেও গৃহিণীর চেষ্টায় সহজে শিথিল হয়। কিন্তু এ বার অবস্থা অন্যরূপ হইল। দামোদরের বন্যা যেমন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়ে, ঘটনার পর ঘটনা তেমনই ভাবে আসিয়া কমলের মাতাকে বিব্রত করিল। রামময় স্ত্রীকে বলিলেন, তিনি যে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন তাহা যদি ভাল মনে না হয়, তবে তিনি অন্য সম্বন্ধ দেখিবেন—নির্ম্মলের মত "চালচুলাহীন" ছেলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবেন না ; কারণ, বিদ্যার এখন মূল্য কি ?—কেবল বিদ্যা থাকিলে ছেলে "রাঙ্গা মূলা" মাত্র হয়। তিনি শেষে বলিলেন, তিনি সাত দিনের মধ্যে মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবেন। এক দিকে এই—আর এক দিকে তিনি জানিতে পারিলেন, কন্যার মনে নির্ম্মলের চিত্র ভালবাসার বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। শেষোক্ত বিষয় অবগত হইয়া কমলের মাতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তিতা ও শঙ্কিতা হইলেন। তিনি মনে করিলেন, সে জন্য সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব তাঁহার। কারণ, তিনিই নির্ম্মলের সহিত কমলের বিবাহ দিবার কথা কেবল মনেই করেন নাই, পরন্তু প্রকাশও করিয়াছিলেন ; কন্যাও এই কয় বৎসর মনে করিয়াছে—নির্ম্মলের সহিতই তাহার বিবাহ হইবে। তিনি জানিতেন, এইরূপ সম্বন্ধে তাঁহার স্বামীর আপত্তি হইবে ; কিন্তু মনে করিয়াছিলেন—বিশ্বাস করিয়াছিলেন, বহু বিষয়ে তিনি যেমন আপনার মতের অনুকূলে স্বামীর মতের পরিবর্ত্তন করাইয়াছেন; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। সেই বিশ্বাসেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু এবার যেন আর তাহা হইল না—যেন দর্পহারী তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া দিতেছেন।

৩

কমলের মাতা প্রথমা পুত্রবধূর নিকটে প্রথম কমলের মনোভাবের কথা জানিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই নির্ম্মলের সতীর্থ ও বন্ধু। তাহার স্ত্রীর সহিতই কমলের অধিক ঘনিষ্ঠতা এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে সে-ই এই ভগিনীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করে। রামময়ের কথার বিষয় যখন প্রকাশ পাইল এবং তাহা পরিবারে ব্যাপ্ত হইল তখন কমলের বৌদিদিই সর্ব্বাপেক্ষা কমলের ভাবান্তর লক্ষ্য করিল—

কমলকে দেখিয়া মনে হইল, যেন অকাল-জলদোদয়ে বিকশিত কমল ম্লান হইয়া গেল! কারণ-সন্ধানের স্বাভাবিক আগ্রহে সে কমলকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহার সহানুভূতি তাহাকে সহজেই সে সন্ধান দিল—মনোভাব গোপনে অনভ্যস্তা তরুণী তাহার নিকট আপনার আতঙ্কের কারণ ব্যক্ত করিয়া ফেলিল।

কমলের বৌদিদি প্রথমে তাহাকে বুঝাইয়া তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না, কমল ক্রোধে ও দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "বৌদিদি, তুমি আমাকে কি বলছ? আমার পক্ষে কি বিবাহ করা সম্ভব? তা' হ'তে পারে না।" বৌদিদি তাহাকে বুঝাইবার যে চেষ্টা করিতেছিল, সে চেষ্টা তাহার সংস্কারে পদে পদে বাধা পাইয়া তাহাকেই পীড়িত করিতেছিল। শেষে সে সকল কথা প্রথমে তাহার স্বামীকে ও তাহার পর, স্বামীর পরামর্শে, শাশুড়ীকে বলিল। তখন মাতা ও পুত্র পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গৃহে যেন আসন্ন বিপদের ছায়া অস্বস্তির রূপ ধরিয়া পতিত হইল।

সে দিন শনিবার।—মধ্যাহ্নের পরেই গৃহে ফিরিয়া রামময় জানাইয়া দিলেন, পরদিন অপরাহ্নে কেহ কেহ কমলকে দেখিতে আসিবেন। শুনিয়া কমলের মাতার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, সব কথা স্বামীকে বলেন; কিন্তু তাহা করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না—কারণ, তিনি স্বামীর প্রকৃতি জানিতেন—সে সব কথা বলিলে, স্বামীর ক্রোধ যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, তাহাতে বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে।

তিনি আসিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডাকাইলেন। সে তখন তাহার বসিবার ঘরে নির্ম্মলের সহিত কি একটা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। সে আসিয়া দেখিল তাহার মাতা কাঁদিতেছেন। সে মা'র কাছে সব কথা শুনিয়া যে সঙ্কল্প করিল, তাহা সম্ভব কি না এবং সম্ভব হইলেও তাহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা সে সহসা বুঝিতে পারিল না। সে ফিরিয়া যাইয়া নির্ম্মলকে সকল কথা বলিল; প্রস্তাব করিল, নির্ম্মল কমলকে লইয়া তাহার পিতার নিকটে যাইবে এবং সে যাইয়া তথায় তাহাদিগের বিবাহ দিবে—সে-ই তাহার পিতাকে সব বুঝাইয়া বলিবে। তাহার সে কাযের ফলে তাহার অবস্থা কি হইতে পারে তাহা সে যে মনে করিতে পারিল না, তাহা নহে। কিন্তু সে তাহাতেও বিচলিত হইল না। যৌবন স্বভাবতঃ অসাধ্য-সাধনে উৎসাহ দেয়। জন্মাবধি সুখে, প্রাচুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যের পরিবেষ্টনে পালিত কমলের দাদার যে উৎসাহ প্রকাশ পাইল, তাহা যে মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন—মফঃস্বলের স্কুলের শিক্ষকের পুত্র নির্ম্মলের পক্ষে সংযত ছিল তাহা বলা বাহুল্য। কাযেই কমলের দাদার প্রস্তাবে নির্ম্মল এক কথায় সাগ্রহে সম্মতি দিতে পারিল না। কিন্তু সে-ও যুবক এবং সে কমলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার বিবেচনা সেই আকর্ষণে প্রভাবিত হইল এবং শেষে সে সেই প্রস্তাবে প্রায় সম্মতি দিল। সে জানিত, তাহার পিতা তাহার কথা কখন অবিশ্বাস করিবেন না—সে যাহা বলিবে তাহাতে কখন সন্দেহ করিবেন না।

নির্ম্মল যখন তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল, তখন কমলের দাদা মাতাকে তাহা জানাইবার পূর্ব্বে পত্নীকে জানাইয়া—কমলকে জানাইতে বলিল। কমলের কথায় সে প্রস্তাব ফুৎকারে জলবিম্বের মত নষ্ট হইয়া গেল। সে প্রস্তাবে কমলের সংস্কার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; সে বলিল, "বৌদিদি, তুমি কি বলছ! আমি আর কাউকে বিবাহ করতে পারি না—করব না; কিন্তু যাঁ'র সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই, তাঁ'র সঙ্গে আমি যেতে পারি না।" সে বিষয়ে সে বৌদিদির কোন যুক্তিতে কর্ণপাত করিল না।

পত্নীর নিকট সে কথা শুনিয়া কমলের দাদা ভাবিল, তাহাকে অন্য কোন উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

নির্ম্মল সে দিনের মত বিদায় লইল। সে ভাবিতে ভাবিতে বিচলিতচিত্তে ছাত্রাবাসে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার জীবন-নাটকে যে অঙ্কের অভিনয় হইল, তাহা সে কখন কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাহার সহিত কমলের বিবাহ তাহার স্বপ্নাতীতই ছিল। সে যে কমলকে ভালবাসিয়াছিল, তাহা সে আপনিও মনে করিতে পারে নাই—কেন না, সে ভালবাসা যে কখন কল্পনালোক অতিক্রম করিয়া বাস্তবরাজ্যে আসিতে পারে, তাহা সে কখন সম্ভব মনে করিতে পারে নাই। বাস্তবিক সে ভালবাসা তাহার হৃদয়পটে অদৃশ্য কালীতে লিখিত ছিল—কমলের দাদার কথায় ও প্রস্তাবেও হয়ত তাহা সপ্রকাশ হইত না; কিন্তু কমলের অভিপ্রায় যেন নূতন ভাবের উত্তাপে তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। আর সেই জন্যই সে কমলের দাদার প্রস্তাবে প্রায় সম্মতি দিয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া শেষে সে মনে করিল. পিতার নিকটে যাইবে এবং তাঁহাকে এ সব কথা বলিয়া মনের গুরুভার লঘু করিবার চেষ্টা করিবে।

৪

সেই পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর পূর্ব্বের—জীবনের মধ্যাহ্নের কথা। সে সব কথা উভয়েরই জানা ছিল। আজ জীবনের অপরাহ্ণ। দীর্ঘ ৩০ বৎসরের পরে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে উভয়ে সাক্ষাৎ। অল্প সময়ের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের কথা যেটুকু শুনিয়াছে, তাহাতে আরও জানিবার কৌতূহল উভয়েই অনুভব করিতেছিল।

কমলই প্রথম জিজ্ঞাসা করিল, "যে দিন তুমি চলে গেলে, তার পর এই ৩০ বৎসরে কি আর পূর্ব্বের কথা মনে পড়েছে।"

নির্ম্মল হাসিল,—"বোধ হয়, তুমি—তুমিও তা' বুঝতে পারবে না।"

"কেন?"

নির্ম্মল কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

কমল বলিল, "তা'র পর তুমি কি করলে?"

নির্ম্মল সেই দীর্ঘ কথা বলিতে লাগিল।

নির্ম্মল যে দিন শেষ কমলের পিতৃগৃহ হইতে চলিয়া আসে, তাহার পরদিন রবিবার। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে কমলের পিতৃগৃহের সরকার আসিয়া তাহাকে জানাইয়া যাইলেন—রামময় বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে যেন আর তাঁহার গৃহে না যায়। কথাটা তাহাকে অত্যন্ত পীড়িত করিল। যে নিরপরাধ, সে যদি অপরাধীর কশাঘাত লাভ করে, তবে যেমন হয়, তাহার তেমনই হইল। অবশ্য সে গৃহে যাইবার কোন অধিকার তাহার ছিল না। কিন্তু অপরাধীর দণ্ড-ভোগের কি কায সে করিয়াছে?

ক্রমে অপরাহ্ণ হইল। ছাত্রাবাসের অধিকাংশ ছাত্রই কেহ বা চলচ্চিত্র দেখিতে, কেহ বা বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। এক জন লোক আসিয়া ডাকিল, "নির্ম্মলচন্দ্র রায় আছেন?" শুনিয়া নির্ম্মল

বলিল, "আমি—আছি।" আগন্তুক গৃহের দ্বিতলে আসিলেন—তাঁহার সঙ্গে এক জন উর্দ্দীপরিহিত পাহারাওয়ালা। তিনি নির্ম্মলকে বলিলেন, তাহাকে তাঁহার সঙ্গে থানায় যাইতে হইবে। নির্ম্মল কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "সে ত আপনিই ভাল জানেন।" ততক্ষণে কয় জন ছাত্র তথায় আসিয়াছিল। অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া নির্ম্মল আগন্তুকের সঙ্গে থানায় গেল।

তথায় তাহাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইল—তিরস্কার, ভীতি-প্রদর্শন, শেষে প্রহারও হইল। তাহার সম্বন্ধে অভিযোগ, সে রামময় বাবুর অবিবাহিতা ও নাবালিকা কন্যাকে গৃহত্যাগ করাইয়াছে।

যে কয় জন সঙ্গী তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা অভিযোগের কথা শুনিয়া চলিয়া গেল। অনাহারে—দুই জন চোরের সঙ্গে নির্ম্মল সে রাত্রিতে গারদে বদ্ধ রহিল। সে যে অপবাদের কথা শুনিল, তাহাতে সে আপনার কাছে আপনি লজ্জানুভব করিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে আলোকপাতের মত একটি চিন্তা তাহাকে সান্ত্বনা দিল—কমল তাহার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহার তুলনায় তাহার সেই লাঞ্ছনা তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

পরদিন প্রভাতে কিন্তু পুলিস কোন কারণ না দেখাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। তখন সে তাহার কারণ অনুমানও করিতে পারিল না বটে, কিন্তু থানার বাহিরে আসিয়াই সে যখন কমলের দাদাকে দেখিতে পাইল, তখন তাহার নিকট শুনিল, কমল নিরুদ্দেশ হইবার পরে রামময়ের ক্রোধে গৃহে যেন ভূমিকম্প সৃষ্ট হয়। তিনি তখনই পুলিসে সংবাদ দিয়া নির্ম্মলকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সন্ধ্যার পরে যখন তাঁহার উকীল আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন—বিষয়টি গোপন রাখাই সুবুদ্ধির কায এবং তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন না হইলে নির্ম্মল তাঁহাকে অনেক টাকা খেসারতের জন্য দায়ী করিতে পারে, তখন রামময়ের ক্রোধের খড়ের অগ্নিতে বারিবর্ষণ হয় এবং তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহারাজীবের সহিত থানায় গমন করেন। তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করিলেন বটে, কিন্তু তখন গারদ ঘর বদ্ধ করিয়া চাবি লইয়া দারোগা তাঁহার হুদ্দায় সন্দেহজনক স্থানসমূহ পরিদর্শনে গিয়াছেন। কাযেই নির্ম্মল তখন মুক্তি পাইল না—পরদিন প্রাতে মুক্ত হইল।

মুক্তি পাইয়া সে ছাত্রাবাসে আসিল। তথায় আসিয়া সে সকলের ব্যবহারে বুঝিল, তাহারা তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করিতেছে—যেন সে অপরাধের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। সে অবস্থায় তথায় বাস করা যায় না।

কমল সে কথা শুনিতেছিল। নির্ম্মল যখন থানায় তাহার দৈহিক লাঞ্ছনার কথা বলিয়াছিল, তখনই কমলের দুই চক্ষুতে অশ্রু টলটল করিতেছিল—ছাত্রাবাসে তাহার অপমানের কথায় সেই অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল। নির্ম্মলের কথা শুনিবার আগ্রহে সে অশ্রু মুছিতেও ভুলিয়া গেল

নির্ম্মল বলিল, সে অবস্থায় তাহার গমনের একমাত্র স্থান—শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের তীর্থ পিতা। তাঁহাকে সকল বিষয় জানানও তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য। সে তাঁহার নিকটে গেল। পিতা পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেন; তাহার ব্যথায় কণ্টক সহানুভূতি দিয়া তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, "বাবা, মানুষের জীবন পরীক্ষাক্ষেত্র—য সাহস হারায়—সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। তুমি নিরপরাধ—তোমার সেই বিশ্বাসই তোমাকে সবল রাখুক। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এক দিন সুখী হ'বে।"

সে কি করিতে চাহে, তাহার পিতা তাহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আপাততঃ সে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া—সকল অপবাদগুঞ্জনের সীমার বাহিরে যাইতে চাহে। পিতা সম্মত হইলেন। তিনি তাহারই জন্য এবং কাযের আনন্দে চাকরী করিতে-ছিলেন; সে চাকরী ত্যাগ করিয়া পুত্রকে লইয়া প্রথমে জামাতার কর্ম্মস্থান বারাণসীতে কন্যা-জামাতার কাছে আসিলেন।

সে কি করিবে, নির্ম্মল কলিকাতা-ত্যাগের দিন হইতেই তাহা ভাবিতেছিল। কাশীতে উপনীত হইয়া সে স্থির করিল, রুড়কী এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইবে। পিতা তাহাতে আপত্তি করিলেন না। প্রথম বৎসর পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিল এবং বৃত্তি পাইল—পিতার নিকট হইতে আর অধিক অর্থ লইবার প্রয়োজন হইল না। তাহার পিতা সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকিবার অভ্যাসে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীতে আসিয়া তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে পরীক্ষায় পুরস্কার পাইয়া নির্ম্মল পিতার নিকট য়ুরোপে যাইয়া এঞ্জিনিয়ারিং শিখিয়া আসিবার প্রস্তাব করিল। পিতা তাহাকে তাঁহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয়ের পরিমাণ জানাইলেন—মাত্র ১০ হাজার টাকা। তাহার অর্দ্ধেক সে লইবে স্থির করিয়া নির্ম্মল য়ুরোপ যাত্রা করিল; সঙ্কল্প করিয়া গেল, যত অল্প ব্যয়ে সম্ভব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—যত অল্পকালে সম্ভব ফিরিয়া আসিবে। কারণ, পিতার অর্থ অল্প, আর তিনি তাহার প্রত্যাবর্ত্তন-পথ চাহিয়া থাকিবেন।

সে তাহাই করিল—তৃতীয় বৎসরে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সে স্বদেশে ফিরিল—সেচ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিল। সে আসিয়াই চাকরী করিতে আমন্ত্রিত হইল; কিন্তু চাকরী না করিয়া পরামর্শদাতা এঞ্জিনিয়ার হইল—এই দীর্ঘকাল সে সেই কাযই করিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহার অর্থ ও যশ কিছুরই অভাব হয় নাই। এখন সে অবসর গ্রহণ করিতে চাহে; কিন্তু যে সামন্ত রাজ্যে সেচের ব্যবস্থা করিয়া সে বহু "পতিত" জমি "উঠিত" করিতেছে, সে রাজ্যের রাজা যেমন তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেছেন না—তাহারও তেমনই কাযের শেষ দেখিতে আগ্রহ রহিয়াছে।" সেই জন্যই সে অবসর লইবে লইবে মনে করিলেও লইতে পারিতেছে না।

ইহাই তাহার জীবনের ইতিহাস। ইহাতে বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই—সবই যেন স্রোতোহীন জলের বিস্তার।

৫

কমল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি ত বিবাহ কর নাই; তোমার বাবা কি তোমাকে বিবাহ করিতে বলেন নাই?"

নির্ম্মল বলিল, "না। আমার ভগিনী দু' এক বার সে কথা বলেছিলেন। আমি অনিচ্ছা জানা'লে বাবা আমার পক্ষ সমর্থন ক'রে তাঁ'কে ব'লেছিলেন, 'তুই জিদ করিস না। মেয়েটির কথা এক বার ভেবে দেখ,—সে ওকে না পেলেও ওর প্রতি ভালবাসার মর্য্যাদা রাখবার সঙ্কল্পে বিপদের অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে। নির্ম্মল

যদি তা'র সেই ভালবাসার মর্য্যাদা রাখতে পারে, তবে আমি তা'তে ওর জন্ম গর্ব্বই অনুভব করব।"

কমলের মনে হইতে লাগিল, সে যেন তাহার অন্তরে আনন্দ ও বেদনার দ্বন্দ্বে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

আপনার অভিভূত ভাব সে দমন করিল—তাহার জীবনে অনেক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায় ?"

নির্ম্মল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল; বলিল, "দু' বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁর ছেলের গীতাপাঠ শুনতে শুনতে তাঁ'র সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। তা'র পর হ'তেই আর এ বৈচিত্র্যহীন জীবন ভাল লাগছে না ব'লে অবসর নেব নেব করছি।"

"কেন এমন ভাবে জীবন কাটা'লে'?"

"এ-ই আমার নিয়তি।"

"কেন ?"

"ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমার সঙ্গে তোমার আসবার কথা হয়েছিল, তখন তা' হ'লে কি হ'ত বলতে পারি না। তা' হয় নাই—সুতরাং যে জীবন যাপন করেছি, তা'-ই কি আমার নিয়তি নহে ?"

"সে অভিমান কি আজও ত্যাগ করতে পার নাই ?"

"আমার কথায় বিশ্বাস কর—সে জীবনের মধ্যাহ্নের কথা; সে দিনও আমি তোমার সমাজের ও সংস্কারের মর্য্যাদা রক্ষার তৎপরতার প্রশংসা করেছি, তা'কে শ্রদ্ধা করেছি; আজ জীবনের অপরাহ্ণেও তা'-ই করি। এ আমার অভিমান নহে।"

কমলের অন্তর আবার আনন্দে ও বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল—এ বার আনন্দে ও বেদনায় দ্বন্দ্ব নাই—উভয়ে নির্ম্মলের প্রতি প্রশংসার সঙ্গে—যেন ত্রিবেণী-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে।

৬

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল। ট্রেণ তখনও চলিতেছে।

নির্ম্মলকে কমল জিজ্ঞাসা করিল, "কলিকাতায় গিয়াছিলে কেন ?"

"বোধ হয়, তোমার সঙ্গে দেখা হ'বে বলেই। নহিলে এত দিন পরে এক বার পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান দেখবার জন্ম আগ্রহ হ'ল কেন ?"

"কি দেখলে ?"

"কিছুই আর চিনা যায় না—এত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। মনে হ'ল—যা' মনে আছে, তা'-ই রক্ষা করাই ভাল: কারণ, পুরাতনই ভাল লাগে। তোমাদের বাড়ীর অবস্থা দেখবার—তোমার দাদার সংবাদ ল'বার ইচ্ছা হয়েছিল—সাহস হ'ল না।"

"কেন ?"

"ভয় হ'ল—কি জানি, তোমার সম্বন্ধে কি সংবাদ শুনব।"

তাহার পরে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কলিকাতাতেই ছিলে ?"

কমল বলিল, "না।"

"তবে ?"

তখন কমল তাহার এই ৩০ বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলিল।

৭

যে দিন রামময় সরকারকে পাঠাইয়া নির্ম্মলকে তাঁহার গৃহে আর প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই দিনই তিনি বলেন, পরদিন প্রাতে কয় জন কমলকে দেখিতে আসিবেন—বলা বাহুল্য, সে বিবাহের জন্ম মনোনীত হইতে পারে কি না, তাহাই দেখা। পরদিন প্রভাতেই রামময় তাঁহার স্ত্রীকে বলেন, যেন কমলকে কয়খানি মূল্যবান্ অলঙ্কার পরাইয়া দেখান হয়; যে স্থানে রূপ ও গুণ আকর্ষণ হয় না, সে স্থানেও অর্থ লোককে আকৃষ্ট করিতে পারে—অন্ততঃ মানুষের বিচার প্রভাবিত করিতে পারে। পূর্ব্বরাত্রিতে কমল ঘুমাইতে পারে নাই এবং প্রভাতে তাহাকে দেখিয়া তাহার বৌদিদি তাঁহার শাশুড়ীকে বলিয়াছিল, "মা, কমলের যে চেহারা হয়েছে, তা'তে দেখাবেন কি করে ?" মা কি করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। তবে, বোধ হয়, তাঁহার মনে হইতেছিল, যাঁহারা দেখিতে আসিবেন, তাঁহারা যদি পসন্দ না করেন—তবে ভালই হয়। কারণ, কমল রাত্রিতে শুনিয়াছিল, তাহার মা ও দাদা বলাবলি করিতেছিলেন, যখন রামময় জিদ করিয়াছেন তখন কমলকে দেখাইতেই হইবে; তবে দেখাইলেই যে বিবাহ হইবে তাহা যখন নহে, তখন—দেখান হইবার পরে আবার কি করা যায় তাহা বিবেচনা করিতে হইবে।

কমল কিন্তু স্থির করিয়াছিল, সে কিছুতেই আপনাকে দেখাইবে না।

যখন গহনাগুলি লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া রামময়কে সংবাদ দেওয়া হইল, তখন তিনি আসিয়া কমলকে কোন্ কোন্ গহনা পরান হইবে, তাহা বলিয়া বৈঠকখানায় ফিরিয়া যাইলেন।

সেই সময় তাহার মাতা যখন যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদিগের আহার্য্য সাজাইবার জন্ম রৌপ্যের পাত্রগুলি বাহির করিয়া দিতে গমন করিলেন, সেই অবসরে কমল কয়খানি অলঙ্কার পরিধান করিল—সে পাথেয় হিসাবে। সে মনে করিয়াছিল, হাঁটিয়াই চলিয়া যাইবে। কিন্তু অঙ্গে একখানি চাদর জড়াইয়া সে যখন গৃহের পশ্চাদ্দিকের সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নামিয়া পশ্চাতের দ্বারে উপনীত হইল, তখনই দেখিতে পাইল, একখানি ভাড়াটিয়া মোটরযান সেই গলীতে যাত্রী নামাইয়া চলিয়া যাইবার জন্ম যাত্রা করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া বসিল; যে দাসী বাজারে কি আনিতে যাইতেছিল, তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলে সে কোন প্রশ্ন না করিয়া যানে উঠিল। যান চলিল। কোথায় যাইতে হইবে, তাহা কমলই বলিয়া দিল।

গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে তাহার ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল; কারণ, তাহার পরিচিত পরিবেষ্টনই অল্প। সে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের যে বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিল, তাহারই শিক্ষয়িত্রীদিগের বাসগৃহের নিকটে আসিয়া সে যান থামাইতে বলিল—নামিয়া যান-চালককে তাহার প্রাপ্য টাকা দিল এবং সে চলিয়া যাইলে দাসীকে একখানি দশ টাকার "নোট" দিয়া বলিল, "বাড়ী যা, হারার মা; আমার কোন কথা কাউকে বলিস্ না—বললে তোরই বিপদ হ'বে; পুলিসে দিবে।" সে যে পুলিসকে অত্যন্ত ভয় করিত, তাহা কমল জানিত।

কমল শিক্ষয়িত্রীদিগের আবাসে যাইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ দিয়াছিলেন, সেই "সিষ্টার" আগনেশের সন্ধানে গেল। সে তাঁহাকে সকল কথা বলিলে তিনি তাহাকে অভয় দিলেন বটে, কিন্তু আশ্রয় দিতে ভয় পাইলেন।

"সিষ্টার আগনেশ স্থির করিলেন, কমলের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য তিনি তাহাকে লইয়া আসানসোলে তাঁহাদিগের কেন্দ্রে বৃদ্ধা "মাদারের" নিকটে যাইবেন। উভয়ে মোটরে যাত্রা করিলেন।

তাহার পর—সব শুনিয়া "মাদার" তাহাকে গৃহে ফিরিতে বলিলেন এবং সে যাইতে অসম্মত হওয়ায় শেষে তাহাকে ছাত্রীদিগের আবাসে থাকিয়' পড়িবার অনুমতি দিলেন। গহনার জন্য অর্থের অভাব হইল না।

ছয় মাস পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা। কমল সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন বিদ্যাই তাহার একমাত্র আকর্ষণ—জীবনের অবলম্বন হইয়াছে। সে পিত্রালয়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে—তথায় আর তাহার ফিরিবার উপায় নাই; সে অন্য অবলম্বন পায় নাই। সে পড়িবে। কিন্তু কলিকাতায় যাইতে তাহার সাহস হইল না। "মাদারের" সহিত পরামর্শ করিয়া সে তাঁহার এক পরিচিতা মহিলার নিকট পঞ্জাবে যাইয়া তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে স্থির করিল। সেই মহিলাটি লাহোরে ডাক্তার—তাঁহার স্বামীও তাহাই।

তাহার পরে কয় বৎসর কাটিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যতীত সেই পাঁচ ছয় বৎসরে আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। প্রত্যেক পরীক্ষায় সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পদক সবই লাভ করিত। শেষ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবার পরেই সে শিক্ষা বিভাগে চাকরী পাইল। সে এখনও চাকরী করিতেছে। তাহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য নাই। তবে তাহার ভাগ্যে লাঞ্ছনা বা উৎপীড়ন হয় নাই—হইয়াছে—

কমল কথাটি বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহা দেখিয়া নির্ম্মল সেই কথাটি যোগাইয়া দিবার জন্য বলিল—"প্রলোভন?"

কমল হাসিল, বলিল, "তা' বলতে পার। মানুষের যেন বিশ্বাস, বিবাহই সংসারে মানুষের নিয়তি আর সেই জন্যই তা' অনিবার্য্য।"

নির্ম্মল বলিল, "তা'ই বটে, কমল! জীবনের মধ্যাহ্ন আজ স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই স্মৃতিই এই অপরাহ্ন পর্য্যন্ত আমাদের দু' জনেরই জীবন-পথ নির্দ্দিষ্ট করেছে। সেই মধ্যাহ্নে যে কারণে তুমি আমার বাবার কথায় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিলে আর আমি তোমার মত সাহসের পরিচয় না দিলেও তোমারই আদর্শ অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি—সেই কারণ স্মরণ করলেই ত তা' বুঝতে পারবে। তা'তেই কি আমাদের নিয়তির সন্ধান মিলে না?"

কমল ভাবিতে লাগিল। সে ভাবনা জীবন-মধ্যাহ্নের যে ভাবের সৌরভে আমোদিত, সে ভাব ত তাহার সমস্ত জীবন সৌরভে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে!

কিছুক্ষণ পরে নির্ম্মল বলিল, "সে-ই ত বিবাহ, কমল! সমাজের নিয়মের শেষ সাজটুকু তা'তে না পরান হ'লেও তা'তে যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে।"

কমল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

নির্ম্মল বলিল, তাহার পর কি হইয়াছে? কমল বলিল, যাহার সঙ্কল্প দৃঢ় থাকে, সে বিচলিত হয় না—যাহাকে নির্ম্মল প্রলোভন বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, তাহা তাহার নিকট রাজহংসের গাত্রে জলের মত পড়িলে গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যূথিকা রায় হ'লে কেমন ক'রে?"

কমল বলিল, "যখন আসানসোলে স্কুলে ভর্ত্তি হ'লাম, তখনই নাম-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন প্রথম বুঝলাম। কি নাম হ'বে। তখন মনে পড়ল, দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে এসে যে দিন প্রথম তুমি আমার নাম জানলে, সে দিন ব্যঙ্গ ক'রে দাদাকে বলেছিলে, "কমল কেন? কমলে ত কণ্টক থাকে; ও যেরূপ নম্র দেখছি, তা'তে ওর নাম যূথিকা হ'লেই ঠিক হয়। সেই কথা স্মরণ ক'রে ঐ নামই গ্রহণ করি।"

নির্ম্মল মনে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কলিকাতায় এসেছিলে কেন?"

চাকরীর কাযে অনেক বার কলিকাতায়—সম্মিলনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যা'বার কারণ হয়েছে বটে, কিন্তু যেতে সাহস হয় নাই। আমি যাই নাই। এ বার যখন কারণ হ'ল, তখন ভাবলাম, ত্রিশ বৎসর আগে ত কমলের মৃত্যু হয়েছে; আর ভয় কেন? ত্রিশ বৎসরে পরিচিত পুরাতনের কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, দেখবার কৌতূহলও আমাকে আকৃষ্ট করছিল।"

"কিন্তু কমল যে মরে নাই, তা' অন্ততঃ দেড় জন লোক ত জানে।"

বিস্মিত ভাবে কমল জিজ্ঞাসা করিল, "দেড় জন!"

নির্ম্মল বলিল, "হাঁ। আমি—এক জন। আমি কখন মনে করি নাই যে, কমলের মৃত্যু হয়েছে। আর তুমি—তুমি যূথিকা হ'বার চেষ্টা করেছ ব'লে তুমি আধখানা।"

কমল হাসিল।

নির্ম্মল বিস্মিত হইল—দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সে কমলের মুখে যে হাসি লক্ষ্য করিয়াছিল—যে হাসি তাহাকে মুগ্ধ করিত, এ সে সেই হাসি। তবে কি এই দীর্ঘ কালের কথা—স্বপ্নমাত্র? না—এই দীর্ঘ কাল তাহার প্রলেপে সেই হাসি আবৃত করিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াছি? কিন্তু সে জানিত না, তাহাকে দেখিয়া কমলের মনেও সেইরূপ ভাব উদ্রিক্ত হইতেছিল।

কমল বলিল, "নূতন নামে দোষই থা'ক আর গুণই থা'ক, তা'র দায়িত্ব তুমি অস্বীকার করতে পার না।"

নির্ম্মল বলিল, "হয়ত দু'জনে এই সাক্ষাতের জন্যই দু'জনই কলিকাতায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম।"

কমল বলিল, "তা অসম্ভব নহে। কারণ, আমাদের বুদ্ধির ও কল্পনার অগোচর ব্যাপারও পৃথিবীতে ও হয়ত অন্যত্র হয়।"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীতে কি গিয়াছিলে?"

"বাড়ীতে যাই নাই—বাড়ীর দিকে গিয়াছিলাম। বাড়ীর কাছেই গাড়ী রেখে নেমে গেলাম। দেখে চিনা যায় না। সম্মুখে যে বাগান ছিল—তা' আর নাই; সেই অরিওডরু গাছ, সেই চাঁপা আর করবীর গাছ, সে সব কেটে সেই জমিতে ঘর হয়েছে—তা'তে দোকান। বাড়ীর গেট আর মাঝখানে নাই—এক পাশে হয়েছে। দেখলাম, সেই গেটের মধ্যে সেই পুরাণ দ্বারবান বলবন্ত তেওয়ারী; খুব বুড়া হয়েছে। এগিয়ে গিয়ে তা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, তা'দের যে দিদিমণির সন্ধান পাওয়া যায় নাই—তিনি এখন কোথায়?

"গণেশ-শৈশব বিভূতি-বৈভব দিগম্বর।"

—ভারতচন্দ্র

[শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দ্বারবান যেন চমকে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কে? আমি বললাম, আমি তা'র সঙ্গে পাদরীদের স্কুলে পড়তাম—অনেক দিন পরে কলিকাতায় এসেছি। সে বলল, তা'র কথা যেন আর না ভুলি। সে তা'কে কোলে করে 'মানুষ' করেছিল—সে কত দিনের কথা। সে এখন আর চোখে দেখতে পায় না; দেশে ছিল—চোখ কাটাবার জন্য এসেছে। কথায় কথায় জানলাম, বাবা মা কেউই নাই—দাদারা ভিন্ন হয়েছেন—সে বাড়ীতে দাদা আর ছোট ভাই আছেন—বাড়ীর মধ্যে প্রাচীর উঠেছে। বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল—আমার কথা যেন অধিক মন দিয়ে শুনতে লাগল। আমার ভয় হ'ল—যা'দের দৃষ্টি থাকে না, তা'দের শ্রবণশক্তি অধিক তীক্ষ্ণ হয়। হয়ত সে আমার কণ্ঠস্বর চিন্‌তে পারছে। আর বিলম্ব না করে এসে গাড়ীতে উঠলাম—গাড়ী চালাতে বললাম। ভাবলাম, যা' সত্য ছিল, তা' স্বপ্ন হয়েছে।"

কমলের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

গাড়ী চলিতে লাগিল।

পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিয়া ছিল।

নির্ম্মল বলিল, "তুমি আমার জন্য জীবন ব্যর্থ করেছ—আমিই দায়ী।"

কমল বলিল, "আমি কিন্তু এক দিন—এক মুহূর্ত্তও তা' মনে করি নাই। কেন জান?"

কমল তাহার জামার নিয়ে আঙ্গুল দিল—একটি অত্যন্ত সরু সোণার হার বাহির করিল, তাহাতে একটি লকেট। সেটির একটি স্থান টিপিলেই ডালা খুলিয়া গেল। কমল সেটি হাতে লইয়া হাত খানি নির্ম্মলের দিকে বাড়াইয়া দিল। দূর হইতে ভাল দেখা যায় না—তাই নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর যে বেঞ্চে কমল বসিয়া ছিল, তাহাতে তাহার পার্শ্বে বসিয়া সেটি হাতে লইয়া দেখিল। উভয়ের হস্তে স্পর্শ হইল।

নির্ম্মল দেখিল, তাহারই প্রতিকৃতি—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের—যৌবনের। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছবি তুমি কোথায় পেলে?"

কমল বলিল, "দাদার ঘরে তোমাদের ক' বন্ধুর একখানি ছবি ছিল। আমি আসবার সময় সেখানি চুরী করে আনবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারি নাই! তাতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে—তবে আমি অপরাধী।"

পাশাপাশি বসিয়া উভয়েরই মনে হইতেছিল, ত্রিশ বৎসরের মিথ্যা আবরণ ঘটনার পবনে সরিয়া গিয়াছে—তাহারা সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের পরিবেষ্টনে পরস্পরকে দেখিতেছে।

নির্ম্মল বলিল, "কমল, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জীবনের মধ্যাহ্নে সংস্কার-সম্ভ্রমে শ্রদ্ধাহেতু যা' বলতে পারি নাই আজ জীবনের অপরাহ্নে যদি তা' বলি, তবে কি তুমি আমার উপর রাগ করবে?"

কমল বলিল, "তোমার কি মনে হয়, আমি তোমার উপর রাগ করতে পারি? আমার ত তা' মনে হয় না।"

"আমি যা' বলব তা' করতে সম্মত হ'বে?"

"আমার যে দৌর্ব্বল্য আমি এই ত্রিশ বৎসর দমিত ক'রে রেখেছিলাম, তা'-ই আজ আমাকে অভিভূত করছে—তা'-ই প্রবল হচ্ছে। আজ আমার মনে হয়—তুমি কিছু বললে তা'তে 'না' করবার ক্ষমতা আমার হ'বে না।"

"তবে চল—আমরা আমার ভগিনীর বাড়ীতে যাই; যে সংস্কারে আমরা সমাজে আপনাদের স্বামি-স্ত্রী পরিচয় দিতে পারি, সেই সংস্কার শেষ করে আসি। তা'র পর যূথিকা আবার কমল হয়ে পঞ্জাবে তা'র কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে তা'র নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে আসবে। কি বল?"

কমল বলিল, "চল।"

নির্ম্মলের একখানি বাহু কমলকে বেষ্টিত করিল। কমলের মস্তক নির্ম্মলের বক্ষের উপর আসিয়া পড়িল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

যাত্রা শেষ

আনন্দ-পিয়াসী মন অভিসারে বাহিরিল কবে
কল্পিত গৌরবে;
কিংশুক রক্তিমরাগ সায়াহ্ন-বেলায়
কিম্বা হায়,—
ছিন্ন করি' আঁধারের ঘন যবনিকা
সধীর সঞ্চারে যবে আলোক-লিপিকা
ধরণীর দ্বারে এলো সুবর্ণ অক্ষরে;
সে-কথা গিয়াছি ভুলে' চিরদিন তরে।
আছে শুধু মনে,—
যেই ক্ষণে,
সন্ধানী নয়ন মেলি' যেদিকে চাহি রে
আনন্দ! আনন্দ শুধু! তাহা ছাড়া কিছুই নাহি রে!

আনন্দ বিহীন নাহি ধরণীর লেশতম ঠাঁই।
পত্রে-পুষ্পে জলে-স্থলে যেদিকে তাকাই
অনন্ত আকাশ হতে
আনন্দের বন্যা নামে অনাবিল ধূলির মরতে!
সে-প্লাবনে
নিয়ত গাহন করে নর-নারী উল্লসিত মনে।
বিকাইনু সেই তীর্থে আপনারে নিঃশেষ করিয়া
একত্বের অনাহত বাণী যেথা ওঠে আন্দোলিয়া,—
"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ..." (বৃক্ষের সমান
মহাকাশে স্তব্ধ যিনি রাত্রি দিনমান)!
সেথা আমি ধীরে ধীরে
আনন্দের মধু স্পর্শে খুঁজে পাই আমার আমিরে!

শ্রীপ্রমথনাথ কুমার।

কথাশিল্পীর হত্যা-রহস্য

[উপন্যাস]

ত্রয়োদশ পল্লব

অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ঘটনা

ডেভিড গারসাইড সেই দিন রাত্রিকালে বিচারক মিঃ স্বার্থডেলের বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া পকেট হইতে একটি রিভলবার বাহির করিল। সে তাহা তাহার সম্মুখস্থ টেবলের উপর রাখিতেই মিঃ স্বার্থডেল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মিঃ গারসাইড, আজ আপনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াই আমার স্মরণ হইতেছে; সুতরাং আমার ধারণা, আপনাদের মামলার নাটকসুলভ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া আমি বিরক্তিবশতঃ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে।"

ডেভিড বলিল, "হাঁ মাই লর্ড, আমি তাহা শুনিয়াছিলাম; তবে এখন একটি কথা আমি জানিতে চাই। আমি আদালতের বাহিরে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; এখনও কি আপনাকে 'মাই লর্ড' বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রয়োজন হইবে?"

মিষ্টার স্বার্থডেল বলিলেন, "এখন আপনি আমাকে আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে পারেন; কিন্তু আপনি কি কারণে এই রাত্রিকালে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন তাহা আমাকে বলিবেন কি?"

ডেভিড ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ মিঃ স্বার্থডেল, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া এই কথা বলিতে আসিয়াছি যে, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক পিটার ট্রেনটন মিস্ ওলিভিয়া ডেন কর্ত্তৃক নিহত হন নাই, ইহার অকাট্য প্রমাণ আমার হস্তগত হইয়াছে।"

জজ বিরক্তিভরে বলিলেন, "আপনি কি আমার উপর প্রভাব-বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিতে আসিয়াছেন?

ডেভিড এই প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু এ কথা আপনার অজ্ঞাত নহে যে, আমাকে হত্যা করিবার জন্য পূর্ব্বে একবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। পুনর্ব্বার ঐরূপ চেষ্টা হইবে না—এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। পুনর্ব্বার ঐরূপ চেষ্টা হইলে আমি যাহা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশের আর সম্ভাবনা থাকিবে না এবং অপরাধী নরহত্যা করিয়াও শাস্তি পাইবে না। সে তখন আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইবে। এই কারণে আমি যথাসাধ্য চেষ্টায় যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন গুপ্তস্থানে সুরক্ষিত করিয়াছি, এবং আমার কৌঁশুলীকে এই উপদেশ দিয়াছি যে, যদি আগামী কল্য আদালতে উপস্থিত হওয়া আমার অসাধ্য হয়, তাহা হইলে পুরু লেফাফায় সংরক্ষিত সেই বিবরণ তিনি উক্ত গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া 'অয়ার' নামক দৈনিক পত্রিকার কার্য্যালয়ে লইয়া যাইবেন, এবং সংবাদ বিভাগের সম্পাদকের হস্তে তাহা প্রদান করিবেন। মিঃ স্বার্থডেল, মামলার নাটক-সুলভ বৈশিষ্ট্যের প্রতি আপনার উৎকট ঘৃণার কথা জানি বলিয়াই এই অসময়ে আপনার গৃহে আসিয়া এ কথা আপনার গোচর করিতে

মিঃ স্বার্থডেল গভীর বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না! দুই রাত্রি পূর্ব্বে আপনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কি আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? আপনার অদ্ভুত কথা (extraordinary words) শুনিয়া তাহার কারণ সম্বন্ধে ইহা ভিন্ন আর কিছু ধারণা করা যায় কি? যাহা হউক, আপনার বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে বলিবার জন্য আমি আপনাকে আরও পাঁচ মিনিট সময় দিতেছি; তাহার পর আমার খানসামাকে ডাকিয়া আপনাকে এই কক্ষের বাহিরে রাখিয়া আসিতে বলিব। আপনি আমার দয়ার অপব্যবহার করিতেছেন, এবং আমার ভদ্রতাজ্ঞানের অমর্য্যাদা করিতেও আপনার কুণ্ঠা নাই!"

ডেভিড বলিল, "বুঝিয়াছি। আমার এই রিভলবার আপনার আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া থাকিলে আমি অবিলম্বেই ইহা স্থানান্তরিত করিতেছি। কিন্তু যে কথা আপনাকে বলিয়াছি, তাহা প্রত্যাহার করিতে আমি প্রস্তুত নহি মহাশয়!"

মিঃ স্বার্থডেল ডেভিডের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি কি কারণে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে? তুমি এক মিনিটের মধ্যে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, নতুবা আমি তোমাকে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইব।"

ডেভিড এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিতে লাগিল, "ফরিয়াদী পক্ষের যে সকল বর্ণনার কিছু মূল্য আছে বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, আসামী পক্ষ হইতে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন হওয়ায় আমি আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি যে, আপনি জুরিদিগকে মামলা বুঝাইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই যেরূপ একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, প্রত্যেক বিজ্ঞ পুরুষ ও নারী তাহা অত্যন্ত অবজ্ঞা-জনক বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। এমন কি, আপনি এই মামলা সম্পর্কে যেরূপ আপত্তিজনক ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিয়াছেন, 'অয়ার' পত্রিকার অফিসে তাহার তীব্র প্রতিবাদসূচক বিস্তর টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। এই পত্রিকার সম্পাদক আমাকে বলিয়াছেন, এই সকল কথা আপনাকে জানাইবার সম্পূর্ণ অধিকার তিনি আমাকে প্রদান করিলেন।"

'মিঃ স্বার্থডেল উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, সংবাদপত্রসমূহে আমার সম্বন্ধে যদি কোন মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা গ্রাহ্য না করাই আমার অভ্যাস; তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়া থাকে, এবং আমি তাহা চিরদিনই অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি।"

ডেভিড বলিল, "ট্রেনটন-হত্যার মামলার আসামী যে নিরপরাধ, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু তাহা ব্যতীত এই মামলার অতীব চিত্তাকর্ষক ও অনন্যসাধারণ একটি দিক্ আছে, তাহার গুরুত্ব ও মৌলিকতার কথা চিন্তা করিয়াই আসামী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌঁশুলীকে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।"

"আসামী পক্ষের কৌঁশুলী তাঁহার মক্কেলের অনুকূলে যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন—তাহা অকাট্য ও অখণ্ডনীয় প্রতিপন্ন হওয়ায়

কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন—তাহা নির্দ্ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে। তাঁহার মক্কেল যে মিঃ ট্রেনটনকে হত্যা করে নাই, সে নিরপরাধ—ইহার সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং কেবল তাহাই নহে, কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত অপরাধী, অর্থাৎ কে স্বহস্তে মিঃ ট্রেনটনকে হত্যা করিয়াছে তাহাও তিনি সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। আমি অতি অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছি; আমি চলিয়া আসিবার সময় তিনি আমাকে জানাইয়াছেন—তাঁহাকে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের অভিমত জিজ্ঞাসা করায় এটর্ণী-জেনারেলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বলা হইয়াছে। আপনি দীর্ঘকাল ফৌজদারী আদালতে মামলা পরিচালিত করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা হইতে আপনি বুঝিতে পারিবেন—তিনি উপযুক্ত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।"

কিছুকাল চিন্তার পর মিঃ স্বার্থডেল বলিলেন, "তোমার ভাই উপদেশ গ্রহণের জন্য যদি এটর্ণী-জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন—তবে তাঁহার এই কার্য্য অসঙ্গত হইবে না বটে, কিন্তু এটর্ণী-জেনারেল যদি মনে করেন, অকারণে তাঁহার সময় নষ্ট করা হইয়াছে—তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারেন—এ কথাও স্মরণ রাখা তোমার ভ্রাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, তোমার ভাই বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব, তিনি তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবেন—এরূপ মনে করিতে পারি; কিন্তু তুমি যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছ—তাহা কি তুমি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে কর?"

ডেভিড দৃঢ় স্বরে বলিল, "হাঁ, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য; প্রকৃত অপরাধী তাহা হইতে কোন উপায়ে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; এবং প্রকৃত অপরাধী কে, জনসমাজ যখন তাহা জানিতে পারিবে, তখন তাহাদের মধ্যে কিরূপ আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছি না। অপরাধী আত্মসমর্পণে অক্ষম হইয়া কি উপায়ে সমাজে মুখ দেখাইবে—তাহাও আমার বুঝিবার শক্তি নাই।"

ডেভিডের কথা শুনিয়া বিচারক মিঃ স্বার্থডেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন; তাহার পর তিনি ঘণ্টাধ্বনি করিলে তাঁহার চাপরাসী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং তাঁহার ইঙ্গিতে ডেভিড গারসাইডকে বাহিরে লইয়া গেল।

চতুর্দ্দশ-পল্লব

জুরির অভিমত

বিচারক মিঃ স্বার্থডেল পঁয়ত্রিশ মিনিট ধরিয়া তাঁহার এজলাসের অদূরে উপবিষ্ট জুরিগণকে মামলা বুঝাইবার সময় সংবাদদাতাদের আসনের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বিচার-প্রণালী সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত অগ্রাহ্য করেন বলিয়া দম্ভ প্রকাশ করিলেও যে সকল ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার চঞ্চল চক্ষু এক ব্যক্তির মুখের উপর পুনঃ পুনঃ সন্নিবিষ্ট হইতেছিল; সেই ব্যক্তি 'অব্জার' নামক দৈনিক পত্রিকার প্রতিনিধি এবং অপরাধিগণের অপরাধের বিবরণ-সংগ্রহে সুদক্ষ ডেভিড গারসাইড।

মিঃ স্বার্থডেল এজলাসে উপবিষ্ট হইয়া জুরিগণকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের উপসংহার করিলেন। তিনি বলিলেন, "জুরিগণ, গতকল্য আমি আপনাদের নিকট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, আসামী পক্ষের কৌঁশুলী তাঁহার মক্কেলের অনুকূলে এই মামলা পরিচালিত করিবার সময় একবারও এ কথার অবতারণা করেন নাই যে, অন্য কোন ব্যক্তি পিটার ট্রেনটনকে হত্যা করিয়াছিল। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, তাঁহার মক্কেল নিরপরাধ। এ অবস্থায় আমি আপনাদিগকে এই শেষ উপদেশ দান করিতেছি যে, আপনারা এই মামলার প্রকৃত বিচার্য্য বিষয়ের (issue) প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবেন। তদতিরিক্ত কোন বিষয়ে (false issues) আপনাদের মন যেন আকৃষ্ট না হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, পিটার ট্রেনটনের হত্যার অভিযোগে অভিযুক্তা নারী প্রকৃতই নিরপরাধ, কি অপরাধী? এই প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারণের জন্য একযোগে পরামর্শ করিতে আপনারা আদালত-কক্ষের বাহিরে গমন করুন। আপনাদের কর্ত্তব্য কিরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ, তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র। আপনারা শপথ করিয়া যে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব আপনারা নিশ্চিতই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। এতদ্ভিন্ন নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশের জন্যই আপনারা দেশের জনসাধারণের নিকট এবং আইনের নিকটও দায়ী! সেই আইনে ইহা সুস্পষ্টরূপেই পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, নরহন্তা চরমদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য, সুতরাং তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।"

বিচারকের এই শেষ মন্তব্য শুনিয়া দর্শকগণের মধ্যে তুমুল গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "কি সর্ব্বনাশ! আসামীকে ফাঁসে ঝুলাইবার জন্য জজ জুরিদের আদেশ করিল! এই খুনে জজের কাছে কোন আসামীর পরিত্রাণ নাই! উহার মতলব পূর্ব্বেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল?"

* * * *

কয়েক মিনিট পরামর্শের পর জুরিরা একযোগে এজলাসে ফিরিয়া আসিলেন। দর্শকগণ কৌতূহলভরে প্রধান জুরির মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া কেহই তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না। প্রায় দশ মিনিট পরামর্শের পর তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়াছিলেন।

জজের পেস্কার জুরিদের দলপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে আসামী অপরাধী না নিরপরাধ?"

প্রধান জুরি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নিরপরাধ।"

তাঁহার অভিমত শ্রবণে আদালত-কক্ষে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। প্রহরী দর্শকগণকে নিস্তব্ধ থাকিতে আদেশ করিলেও কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না; আদালতে যেন হাট বসিল!

বিচারক মিঃ স্বার্থডেল ভ্রূভঙ্গি-সহকারে কঠোর স্বরে বলিলেন, "আদালত-কক্ষ গুণ্ডার আড্ডায় পরিণত হইবে, আমি ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। যদি তোমরা ভদ্র ব্যবহার করিতে না পার, তাহা হইলে আমি সকলকে এই কক্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হইব।"

অতঃপর তিনি তরুণী আসামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকে নরহত্যার অভিযোগ হইতে মুক্তি দান করা হইল।"

রায় প্রকাশ করিয়াই বিচারক মিঃ স্বার্থডেল দীর্ঘকালের কঠোর শ্রমে যেন ক্লান্ত হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ডেভিড গারসাইড অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ স্বার্থডেলের সম্মুখে উপবিষ্ট ব্যবহারাজীবগণকে লক্ষ্য করিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "উঁহার হাত ধরিয়া উঁহাকে বাধা দান করুন, ঐ ভয়ানক কার্য্য উঁহাকে করিতে দিবেন না; উনি যে এ চেষ্টা করিবেন— ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এই মুহূর্ত্তে উঁহাকে বাধাদান না করিলে—"

ডেভিডের কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই সকলে ভাবিল—লোকটা কি ক্ষেপিয়া গিয়াছে? উহার ঐরূপ প্রলাপের অর্থ কি?"—কেহই তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না, এবং তাহার এই আদেশেও কর্ণপাত করিল না। সকলকেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ডেভিড এক লম্ফে বিচারকের আসনের অভিমুখে ধাবিত হইল।

মুহূর্ত্তের জন্ত এই চাঞ্চল্যজনক নাটকের প্রধান নায়ক বিচারক মিঃ স্বার্থডেল ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ডেভিড গারসাইডের দৃষ্টি-বিনিময় হইল। যেন উভয়ে পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতে উদ্যত! অবশেষে এই গভীর রহস্তপূর্ণ ও চাঞ্চল্যজনক মামলার বিচারক—যিনি প্রথম হইতেই নাটক-সুলভ ঘটনার প্রতি আন্তরিক বিরাগ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন—তিনি দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলির ফাঁকের ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র বটিকা বাহির করিয়া মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিলেন! মুহূর্ত্তের জন্ত তাঁহার বিবর্ণ মুখ ঘৃণার হাস্যে অনুরঞ্জিত হইল।

বিচারক হোরেসিও স্বার্থডেলের প্রাণহীন দেহ মুহূর্ত্তমধ্যে চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল। সকলেই স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল—যেন কোন রঙ্গমঞ্চে বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয়ে যবনিকা-পাত হইল। ডেভিড গারসাইড ভিন্ন অন্ত কেহই বিচারাসনে উপবিষ্ট বিচারকের আত্মহত্যার কারণ বুঝিতে পারিল না।

[ক্রমশঃ।

দীনেন্দ্রকুমার রায়।

কথা

কথা কভু নয় শুধু কথার কথা—
কথাতেই আছে সুখ-দুঃখ-ব্যথা।

কথাতেই ভদ্রতা কথায় অধম
কথা আনে নিতি কত লজ্জা-সরম।
কথায় কথায় লোকে কত কথা কয়,
কথা দিয়ে কথা-ছলে কত কথা লয়।
কথা রাখিবারে কেহ হয় সব-হারা,
কথা ভেঙ্গে কেহ নীচ ছন্নছাড়া।
কথায় কথায় বাড়ে কথা-জঞ্জাল
কথাই তো বেড়ে হয় তিল থেকে তাল।
কথায় ভুলিয়া কেহ খায় দুরপাক,
কথা বেচে খায় লোক কত লাখ লাখ।
কথা ক্ষয় কথা ভয় কথা সংশয়
কথা স্নেহ প্রীতি মোহ জয়-পরাজয়।
নীরস মুখের কথা মরম দহে
সরস কথায় লোক সকল সহে,
মিষ্ট মধুর কথা হরে ব্যথা-মন,
ধরণীরে গ'ড়ে তোলে স্বরগ সমান।
বেশী কথা বলা যার বেশী অভ্যাস,
মূল্যহীন সেই জন—কথার সে দাস।
দুনিয়াটা বাঁধা শুধু কথা-বাঁধনে
কথা-বিশ্বাসে চলে জগত-জনে।
কথাতেই সংসারে শান্তি আসে,
ভাইয়ে ভাইয়ে দলাদলি কথারি ভাগে।
সংসার ভেঙ্গে চুরে কঙ্কালসার—
শতখান্ ক'রে তোলে কথা বার-বার।

বশীভূত হয় কেহ মুখের কথায়—
কেহ বা কাঁদিয়া মরে কথার জ্বালায়!
সকলেই সব পারে সব সহিতে,
কথা-সহা কারো নাহি হয় মহীতে।
সামান্ত মুখের কথা বাহিরিলে, হায়!
কভু তো তাহারে আর ফিরানো না যায়।
তা হতেই হতে পারে বিবাদ বিষম,
লাঠালাঠি খুনোখুনি, বংশ ধ্বংস জখম।
কান পাতি শুনে যাও যে যাহাই বলে,
সাবধানে রায় দিয়ো—যাইয়ো না গ'লে।
যতটুকু প্রয়োজন সংক্ষেপ সার—
মৃদু ভাবে ক'বে মন তুষি সবাকার।
বাক্-সংযমী সদা পায় সম্মান,
কথাধিক্যে নাহি রহে কোন কিছু দাম।
কথা দিয়ে কথা রাখে অচল অটল
ধরায় মহৎ সেই—হোক হীনবল।
কথা আর কাজ সদা সমান রাখি,
ক'রে যাও নিজ কাজ যা আছে বাকী।
কথার মতন কথা কহিয়ো সবে—
প্রাণ খুলে কাহারেও কিছু নাহি ক'বে।
যে কথা কহিতে হবে কহ নির্ভয়—
মিথ্যার কভু নাহি দিবে গো প্রশ্রয়।
ভাবিয়ো না কথা শুধু কথার কথা!
কথাতেই আনে সুখ-বেদনা-ব্যথা!

মহাকাল ট্যাঙ্ক

যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য শত্রু-নিপাত। এ উদ্দেশ্য আবহমান কাল ধরিয়া সমান রহিয়াছে। পৌরাণিক যুগে রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ; তার পর ঐতিহাসিক যুগে সেকন্দর শাহের বা রাজা পুরুর যুদ্ধ—সকল যুদ্ধেই বিপক্ষ-পক্ষের ধ্বংস-সাধনকল্পে অস্ত্রশস্ত্র বা ছলা-কলা-কৌশলের ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নাই! তার উপর নিজেদের যথাসম্ভব নিরাপদ্ রাখিয়া—সদলে বিপক্ষের উপর পড়িয়া আক্রমণে তাহাদের চূর্ণবিচূর্ণ করা; এবং সকল শক্তি যেন রণক্ষেত্রে না পর্য্যবসিত হয়—এ-সব দিকে রণোন্মত্ত সকল পক্ষের লক্ষ্য থাকিত। এ যুগের যুদ্ধেও এ কয় দিকে সকলের লক্ষ্য আছে; তার উপর এ
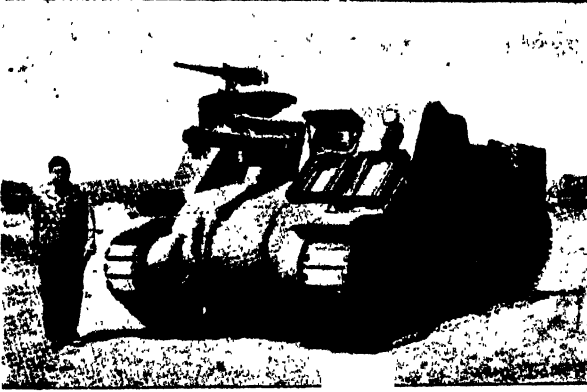
এম্-৭ মহাকাল-ট্যাঙ্ক

যুগে অগ্র-গতির বেগের দিকে লক্ষ্য ঘটিয়াছে। পদাতিক দলের গতি মন্থর, তার উপর তার গতি প্রতিপদে রুদ্ধ হয়; এ যুগে পদাতিক-শক্তির উপর নির্ভর না রাখিয়া শূন্যপথে প্লেন এবং স্থলপথে দুর্দ্ধর্ষ ট্যাঙ্ককে সহায়-স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ঘোড়ায়-ঘোড়ায়, গজে-গজে যুদ্ধ হইত,—এ যুগে যুদ্ধ হয় প্লেনে-প্লেনে, ট্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে! যে পক্ষের ট্যাঙ্ক যত দুর্দ্ধর্ষ হয়, তার বিজয়-লাভের আশাও হয় ততখানি অমোঘ এবং অব্যর্থ! মার্কিণ রণ-বিভাগ সম্প্রতি এম-৩ মিডিয়াম ট্যাঙ্কের উপর ১০৫-এম্ এম্ হাউইটজার চাপাইয়া যে নূতন ছাঁদের এম্-৭ ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিয়াছে, সে একেবারে বিশ্ববিজয়ী। সাত মাইল দূরে অবস্থিত সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্য—ট্যাঙ্ক, কামান, দুর্গ প্রভৃতিকে এ ট্যাঙ্ক নিমেষে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে; এবং ডাইভ-বমারের চেয়েও এ ট্যাঙ্কের গতি ক্ষিপ্রতর। এ ট্যাঙ্ক চলে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল রেটে; এবং গাছপালা খানা-ডোবার বাধাকে এ ট্যাঙ্ক বাধা বলিয়া মানিতে জানে না।

মহাকালের দোশর

আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনীয়ার লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল ফ্রাঙ্ক মিক্‌লু তৈয়ারী করিয়াছেন সর্ব্বজয়ী ট্যাঙ্ক। এ ট্যাঙ্কের নাম টি-এ-সি। এখানিকে এম্-৭ ট্যাঙ্কের 'যমজ-ভাই' বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এক-একখানি ট্যাঙ্ক তৈয়ারী করিতে প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন এঞ্জিন, চাকা এবং ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন অংশ লাগে সংখ্যায় প্রায় ৩০০০০ এবং যন্ত্র লাগে প্রায় ২০০। কোনো অংশ যদি ভাঙ্গে বা বিকল হয়, তাহা হইলে রণক্ষেত্রে সে অংশের পূরণ ঘটানো সম্ভব ছিল না। এ বিপত্তি-মোচনকল্পে টি-এ-সি ট্যাঙ্কের সৃষ্টি। এ ট্যাঙ্কের জন্য তৈয়ারী হইয়াছে এক-ছাঁদের এঞ্জিন
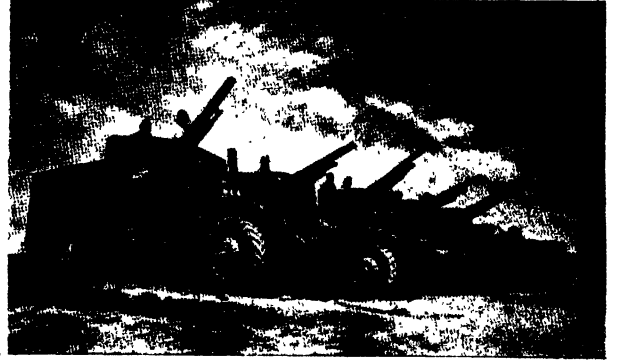
যমের দোশর

এবং অপর অংশগুলির সংখ্যাও কমানো হইয়াছে; এবং সে সব অংশে জটিলতা নাই। এ জন্য কোনো অংশ ভাঙ্গিলে বা অকর্ম্মণ্য হইলে ট্যাঙ্ককে সারাইয়া তুলিতে যেমন বিলম্ব ঘটে না, তেমনি অসুবিধাও এতটুকু ভোগ করিতে হয় না। এ ট্যাঙ্ক জলা-জঙ্গলেও চলে এবং চলে ঘণ্টায় ৫৫ মাইল রেটে। এ ট্যাঙ্কের শক্তি অসামান্য।

কামানবাহী গাড়ী

আমেরিকার সমর-বিভাগের আর এক কীর্ত্তি, কামান বহিবার জন্য বিশ্বম্ভর-ছাঁদের ট্রাক্টর। ঝোপ-জলা, জঙ্গল-পাহাড়, বিল—সর্ব্বত্রই
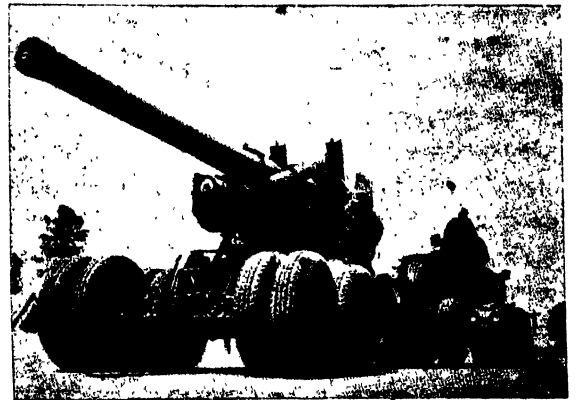
কামানবাহী ট্রাক্টর

এ ট্রাক্টরের গতি অবাধ এবং অব্যাহত। এ ট্রাক্টর চলে ঘণ্টায় ২৫ মাইল বেগে।

মশা-মারা গাড়ী

আমেরিকার পল্লীগ্রাম-সমূহের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে। বহু গ্রামে ম্যালেরিয়ার উৎপাত ঘটিয়াছিল। ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে এ্যানো-ফেলিশ-জাতীয় মশা। সে মশার বংশ নাশ করিতে আমেরিকা কামান
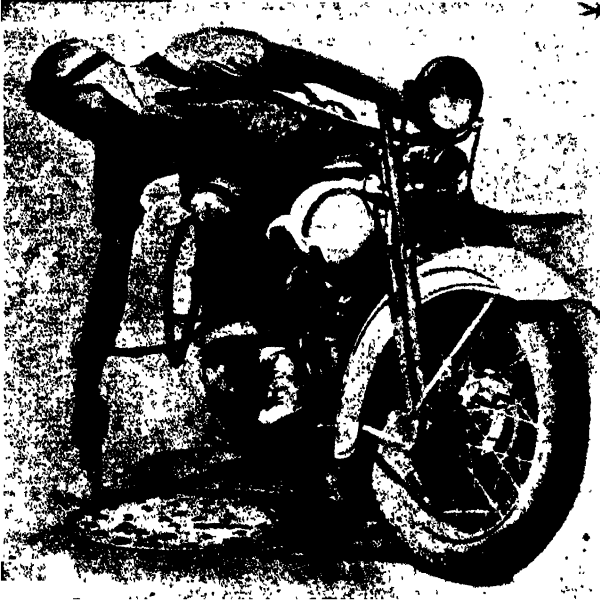
মশা-মারা

পাতে নাই,—তবে এক দল কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে। মোটর-বাইকে চড়িয়া এ সব কর্ম্মচারী স্প্রে করিয়া জলায়-নালায় ঝোপে-ঝাপে মশা-মারা আরক বর্ষণ করিয়া মশা মারিয়া বেড়াইতেছে।

প্লেনের রক্ষা-কবচ

প্লেন যদি ভাঙ্গে, প্লেনে যদি আগুন লাগে, কিম্বা অসমতল স্থানে প্লেন পড়িয়া যদি বিকল হয়, তাহা হইলে প্লেনের এঞ্জিনে তরল কার্বন-ডায়ক্সাইড বাষ্প গিয়া ঢোকে; তার ফলে সমস্ত প্লেন নিমেষে জ্বলিয়া ওঠে! এ ভাবে প্লেন জ্বলিয়া কত পাইলটের মৃত্যু ঘটিতেছে, তার সংখ্যা নাই। মার্কিণ সামরিক বিভাগের এঞ্জিনীয়ার ওয়াল্টার জিডি কোম্পানি সম্প্রতি এক রকম সুইচ বা রক্ষা-কবচ তৈয়ারী করিয়াছেন —সে সুইচ সংলগ্ন রাখিলে শত বিপাকেও প্লেন জ্বলিয়া লঙ্কাকাণ্ড ঘটিবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকিবে না। অঘটন ঘটিবামাত্র এ সুইচ আপনা হইতে সক্রিয় হয়; তার ফলে প্লেনের অগ্নিবারক বাষ্পরাশি এঞ্জিন-কামরার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি নিবারণ করে। পাইলট যদি অচেতন হইয়া পড়ে, তথাপি এ সুইচ আপনা হইতে ক্রিয়া করিবে। সুতরাং প্লেনে এ-সুইচ রাখিলে পুড়িয়া মরিবার আশঙ্কা আদৌ থাকিবে না।

রক্ষা-কবচ

ঝালাইকরের চশমা

মার্কিন চক্ষু-চিকিৎসক ডক্টর টিলিয়ার নূতন কাচের চশমা তৈয়ার করিয়াছেন। সে চশমা চোখে দিয়া ঝালাইয়ের কাজ করি

ঝালাইকরের চশমা

অসুবিধা ঘটিবে না, চোখেরও কোনোরূপ পীড়া হইবে না। রেল প্লেন, ট্যাঙ্ক, জাহাজ প্রভৃতি তৈয়ারী ও মেরামত করিতে লোহ প্রভৃতি ধাতু তাতাইয়া গলাইয়া তাহাতে বাঁধন বা জোড় দি হয়। তাতানোর সময় যে তীক্ষ্ণ তীব্র অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হ তাহার তেজে চোখ নষ্ট হয় জন্মের মত। এ চশমা চোখে দি ওয়েল্ডিং বা ঝালাইয়ের কাজ করিলে চোখের সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

পোষাকের মাপ-কল

আমেরিকার দর্জীরা যন্ত্র-যোগে মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের মা লইতেছে। যন্ত্রের সঙ্গে ইস্পাতের ফিতা সংলগ্ন আছে—এ যন্ত্র সাহায্যে গলা, ছাতি, হাত, কোমর প্রভৃতি সর্ব্ব অঙ্গের নিখুঁ

মাপের যন্ত্র

মাপ লওয়া যায়। এ যন্ত্রের মাপে ছাঁটকাট প্রভৃতিতে এতটুকু ভুল হইবার উপায় নাই—পোষাক গায়ে ফিট করিবেই—অব্যর্থ ভাবে।

অতিক্ষুদ্র প্লেন

শত্রুর অবস্থিতি-নির্ণয়ের জন্য টনি লেভিয়ার নামে এক জন মার্কিন শিল্পী অতি ক্ষুদ্রকায় প্লেন তৈয়ারী করিতেছেন। এ প্লেন আকারে মাত্র বারো ফুট—চলে ঘণ্টায় ২২৫ মাইল রেটে; এবং ১২ গ্যালন পেট্রোলে ৫২৫ মাইল

অতিক্ষুদ্র প্লেন

চলে। এ প্লেনে যে এঞ্জিন আছে, সে এঞ্জিনের শক্তি ৯০ অশ্ব-শক্তির সমতুল্য। আকাশের গায়ে মাছির মতো ওড়ে—নীচে হইতে সহজে কাহারো চোখে পড়ে না—কাজেই শূন্যপথ ধরিয়া এ প্লেন বিপক্ষ-ব্যূহমধ্যে ঘোরাফেরা করিলে কাহারো নজরে পড়িবার আশঙ্কাও নাই!

এরোপ্লেনে চেয়ার

মার্কিন শিল্পীরা প্লেনে বসিবার উপযোগী চেয়ার তৈয়ারী করিতেছেন,—এ চেয়ারের নাম বেলুন চেয়ার। প্লেনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট যতগুলি আসন থাকে, তার অতিরিক্ত আসনের প্রয়োজন হইলে এই বেলুন চেয়ার আসনের সে অভাব

খোলা চেয়ার

মোড়া চেয়ার

পূরণ করিবে। চেয়ারগুলি ফাঁপা রবারের তৈয়ারী; অপ্রয়োজনে ছোট ব্যাগের মত করিয়া হাতে ঝুলাইয়া যত্র-তত্র বহন করা চলে; এবং প্রয়োজন ঘটিলে বাঁধন খুলিয়া বাতাস ভরিয়া দিলে—নিমেষে বসিবার উপযোগী দিব্য আরামপ্রদ চেয়ার আত্মপ্রকাশ করিবে।

স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তি

আমাদের মনে এই যে দ্বিধা, ভয়, সংশয়, আনন্দ, ক্রোধ, হিংসা, দুঃখ প্রভৃতি নানা বৃত্তির উদয় হয়,—আমাদের স্বাস্থ্যের উপর এ সব বৃত্তির প্রভাব বড় সামান্য নয়। রাগ প্রকাশ করিলাম না, মনে চাপিয়া গেলাম; অত্যধিক আনন্দে নৃত্য করিলাম না, সংযত রহিলাম; হিংসার আগুন বাক্যে-আচরণে ফুটিল না, মনের মধ্যে প্রধূমিত রহিল; তবু এ সব বৃত্তি আমাদের স্বাস্থ্যকে বেশ গভীর ভাবে আঘাত দেয়। আজিকার এই যুদ্ধের সংবাদ, খাদ্য-সমস্যা এবং তাহার প্রতিকারের উপায় নাই—এ সব চিন্তা আমাদের স্বাস্থ্যকে রীতিমত বিক্ষুব্ধ করিতেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—এ সব মনোবৃত্তি আমাদের স্বাস্থ্যকে প্রতিনিয়ত ক্ষয় করিতেছে। ভয় হইলে গায়ে ছমছমানি ভাব, মাথায় রক্ত ছলাৎ করিয়া ওঠে! যেন গভীর দুঃখে মাথা ভারী হইয়া ওঠে, বুকের উপর যেন পাথরের ভার চাপানো মনে হয়। রসাল খাদ্য-পানীয় দেখিলে মুখে জল আসে, তার কারণ আমাদের লালাগ্রন্থি সক্রিয় হইয়া ওঠে। ভয়ে রক্ত শুকাইয়া মুখ শাদা হয়,—তার কারণ আমাদের

দেহের রক্তকোষগুলি (blood-vessels) সঙ্কুচিত হয়। মনের ভাব যতই চাপিয়া থাকি না কেন, এ সব বিভিন্ন ভাবের উদয়মাত্র আমাদের গ্রন্থিমূল, পেশী বা রক্তকোষে প্রতিক্রিয়া ঘটে। দীর্ঘকাল ব্যথা বেদনা বা দুশ্চিন্তা ভোগ করিলে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়; অনিদ্রা, যাতনা, ক্লান্তি, অনশন বা সুগভীর দুঃখ-শোকেও মস্তিষ্কের বিপর্য্যয় গোলযোগ ঘটে; এ সব উপসর্গে সুনিদ্রায় ও আহারে আবার আমাদের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাই। মনের এ সব বৃত্তির উদয়াস্তের সঙ্গে আমাদের দেহযন্ত্রের সর্ব্ব বিভাগ—অর্থাৎ একেবারে সেই লিভার, পাকস্থলী পর্য্যন্ত সহানুভূতির সূত্রে গাঁথা! এ সব বৃত্তির উদয়াস্তের সঙ্গে আমাদের ক্ষুধা, শ্বাস-প্রশ্বাস, নিদ্রা, পরিপাক-শক্তিতেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

কাচ কাটা

কাচের গায়ে, বোতলের গায়ে তেকোণা উকো দিয়া দাগ কাটিয়া লউন। তার পর ঐ দাগের উপর দাগা বুলাইয়া অগ্নিতপ্ত লোহার

উকায় কাচ কাটা

কাঠি টানুন। দেখিবেন, লাইন ধরিয়া কাচে চিড় খাইবে। তখন সাবধানে কঠিন কোনো পদার্থ দিয়া ঐ লাইনের পাশাপাশি আঘাত করুন—কাচ ঠিক ঐ দাগে-দাগে কাটিয়া যাইবে। বোতলের গলা যদি কাটিয়া বাদ দিতে চান, তাহা হইলেও ঠিক এই প্রণালী অবলম্বন করিবেন।

হাল্‌কা কোদাল

আমেরিকার কয়লার খনিতে কয়লা তোলার কাজ করেন টমাস টেলফোর্ড নামে এক জন শ্রমিক। দিনে তাঁহাকে কয়লা তুলিতে

এলুমিনিয়ামের কোদাল

হইত ১৫।২০ টন। ভারী কোদাল লইয়া এ কয়লা তুলিতে শ্রম হইত খুব বেশী। ভদ্রলোক তাই মাথা খাটাইয়া শ্রম-লাঘবের জন্য এলুমিনিয়ামের কোদাল তৈয়ারী করিয়া সেই কোদালে এখন কয়লা তুলিতেছেন। তাঁহার দেখাদেখি সে খনির অন্য শ্রমিকেরাও লোহার ভারী কোদাল ফেলিয়া এলুমিনিয়ামের কোদাল তৈয়ারী করিয়া কাজ করিতেছে।

লগ্ন

চূর্ণ তোমার অলকে লেগেছে ঘূর্ণী হাওয়ার দোলা
আননে ঝলকে মুক্ত উষার আলো

ফাগের বুকে রঙীন তোমার সুনীল কঞ্চুলিকা
নয়নে তোমার ভুবন লেগেছে ভালো!
জানি জানি তবু বক্ষে তোমার শত দাবানল জ্বলে
হৃদয়-গহনে শত সাহারার ক্ষুধা—
অধরে তোমার গুমরি মরিছে বিষের দহন জ্বালা
ব্যাধের বহ্নি আঁখিতে তোমার বাঁধা।
তুচ্ছ ধরারে বাঁধিবে ভেবেছ ঐ চরণের ছন্দে?
রূপদেউটিতে দহিবে দৃষ্টি মোর?
গতি দেবে বেঁধে মোহিনী তোমার দুঃখ-ভুলানো মন্ত্রে?
ঘিরে রবে মোরে প্রেমের তন্দ্রা ঘোর?
ভেবে থাকো যদি, আগে নেমে এসো অজন-তলে মোর
জীবন-দেবেরে দেখে নাও অপলকে—
অন্তরে তাঁর ছবি এঁকে নাও গভীর ব্যথার রঙে
তার পরে এসো আমার নয়নে তোমার নয়ন রেখে।
দৈন্ত থাকুক দু'পায়ে জড়ানো—কিসের দুঃখ বলো?
অমানিশা-রাতে জেগে রবে শত মৌন তারার আলো!

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এম-এ)।

কিরীটী

[গল্প]

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে কিরীটীর গাড়ীখানা হঠাৎ বিগড়াইয়া গেল। গাড়ী হইতে নামিয়া এঞ্জিনটা সে পরীক্ষা করিতেছিল, সহসা কাণে আসিয়া লাগিল তরুণী-কণ্ঠের সুমিষ্ট গীতধ্বনি—

'বন্ধু আমার আসবে ও সে আসবে জানি,
সোনার অরুণ-রথে—'

কিরীটী চকিত হইল! ছায়াচ্ছন্ন তরুবীথি-তলে মধ্যাহ্নের নিঝুমতা ভেদ করিয়া সুরের আকুলতা চিত্তকে ঈষৎ চঞ্চল করিয়া তুলিল। কিন্তু সে পলকের জন্য।

কাণে আসিল কতকগুলি নারী-কণ্ঠের উচ্চ হাস্য-রব। রেবা কহিল,—শান্তা, বন্ধু তোর এলো রে—ওই ভাঙ্গা মোটরে বুঝি!

কিরীটী নিমেষে মনের কৌতূহল দমন করিয়া এঞ্জিন-মেরামতি কাজে মনোনিবেশ করিল।

গানের দ্বিতীয় চরণ তখন চলিতেছে,—

'বরণ তারে করতে হবে
আলপনাবই পথে',

—উঁহু, ভুল হলো শান্তা। বল বটপত্র-বিছানো পথে।

—ভুল অমন হয় রে মীরা। এই তো ভুলের দিনই এলো!

মীরা কহিল,—আহা, বেচারা শান্তা!

আবার হাসির রোল উঠিল।

—এই সুপ্রভা, থাম্। বেহায়াপনা করিস্‌নে—ভদ্রলোক শুনতে পাবে।

—ভয় নেই! আমি নিশ্চয় জানি ভদ্রলোক কালা। না হলে শান্তার গানে ফিরে একবার চাইলে না!

শান্তা তখন গাহিতেছিল,—

'শিশির-জলে গাহন করি
শুভ্র শিশির বসন পরি,
জ্বালিয়ে রাখি সারা সকাল
গন্ধ-ধূপের শিখা।'

কিরীটীর গাড়ী এতক্ষণে ঠিক হইল। সোজা হইয়া সে দাঁড়াইল। পকেট হইতে রুমাল লইয়া কপালের ঘাম মুছিল; তাহার পর গাড়ীর ভিতর হইতে বড় একটা চামড়ার বাক্স বাহির করিয়া সে অগ্রসর হইল তাহাদের দিকে, এতক্ষণ যাহারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রঙ্গ-কৌতুকের শরাঘাতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিতেছিল।

শান্তা কহিল,—ব্যাগ হাতে আমাদের দিকে আসচে রে!

জ্যোতি কহিল,—কত বড় ব্যাগ! মা গো! ইন্‌সিওরের দালাল না কি?

কিরীটী আসিয়া ঐ ফুল্ল কমলদলের সম্মুখে দাঁড়াইল। হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বিনা ভূমিকাতেই কহিল,—আপনাদের একখানা গ্রুপ্ নিতে ইচ্ছা করি—পেতে পারি?

অযাচিত বর-প্রাপ্তির মত সকলের মুখ নিমেষে হর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সোল্লাসে কলরব তুলিয়া সকলে কহিল,—আপনি ক্যামেরা-ম্যান্—বেশ তো! আমাদের মনে হচ্ছিল একখানা গ্রুপ্ তোলাতে পারলে ভালো হতো! আমাদের খুব মত আছে।

—ধন্যবাদ! আপনারা সিটিং দিন্! আমি ততক্ষণ ক্যামেরা ফিট্ করি।

বড় চামড়ার বাক্স খুলিয়া কিরীটী ক্যামেরা বাহির করিয়া ষ্ট্যাণ্ডে চড়াইতে লাগিল।

তরুণীর দল অবাক্! স্যাণ্ডারসনের ফুল-সাইজ ক্যামেরা। ছবি তোলা বাতিকের মত পকেট-ক্যামেরা নয়। দস্তুরমত অর্থশালিতার পরিচয়।

বৈভবই মর্য্যাদা আদায় করে। এতক্ষণে তরুণীদলের মনে সম্ভ্রমের উদয় হইল। লোকটা তবে যে-সে নয়। হোমরা-চোমরা মানুষ হইতে পারে! চেহারাতেও আভিজাত্যের সৌন্দর্য্য যে জড়িত রহিয়াছে, সকলের চোখেই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

মীরার কাণে-কাণে দীপ্তি কহিল,—ঠিক দাদার মত ক্যামেরা। দাম দু'হাজারের উপর হবে।

কালো সার্জ্জে মাথা ঢাকিয়া কিরীটী কহিল,—আমি ফোকাস কচ্ছি। আপনারা রেডি?

—হ্যাঁ। বলিয়া বটবৃক্ষতলে উপবেশন, অর্দ্ধ উপবেশন ও দণ্ডায়মান থাকিয়া তরুণীর দল হরষিত মুখে বনমালার মত ছবি তুলাইতে প্রস্তুত হইল। সকলের অধরেই কৌতুকের হাসি।

পূরবী কহিল,—আমাদের একখানা করে কপি চাই।

কিরীটী হাসিল, বলিল—একখানা? না, প্রত্যেকের একখানা?

ব্যগ্র স্বরে মীরা কহিল,—একখানা পেলে একটা ধন্যবাদ দেব, আর প্রত্যেকে একখানা পেলে অজস্র ধন্যবাদ।

—ওঃ! মন্দ নয়! আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কে গান গাইছিলেন? ভারী মিষ্টি গলা তাঁর। কিরীটী হাসিল।

মীরা কহিল,—সে কোকিলকণ্ঠী এই আমাদের মিস্ শান্তা বোস—আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট।

—উনি আমায় কি দেবেন? কিরীটীর অধরে কৌতুকের হাসি—আমি ভাঙা মোটরে এসেছি।

তরুণীরা ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। চাঁদের উপর যেন এক-টুকরা পাতলা মেঘ আসিয়া জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিল।

কিরীটী কহিল,—এখন ছবি উঠুক। দেনা-পাওনার কথা পরে হবে।

সবাই বুঝিল সেইটাই সমীচীন।

ছবি তোলা শেষ হইল। ক্যামেরা খুলিতে খুলিতে কিরীটী কহিল—আপনাদের ফ্লাস্কে চা আছে,—পেতে পারি?

সাগ্রহে সমস্বরে সকলে উত্তর দিল,—নিশ্চয় পাবেন।

—ধন্যবাদ! এটা গাড়ীতে রেখে আসি।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কিরীটী ফিরিল।

ত্বরিত হস্তে ফ্লাস্ক খুলিয়া শান্তা কিরীটীর হাতে চা দিল। পাউরুটি দিতে যাইলে কিরীটী কহিল,—ধন্যবাদ, ওটা আমার দরকার নেই।

শান্তা কহিল,—শুধু চা!

—তা হোক, এইতেই খুশী।

মীরা কহিল,—আপনি কোন্ ষ্টুডিওর?

—ষ্টুডিও! ষ্টুডিও কেন? সবিস্ময়ে কিরীটী জিজ্ঞাসা করিল। তার পর মৃদু হাসিয়া কহিল,—বুঝেছি, আপনারা পর্দ্দার বুকে তুলতে চান। কিন্তু দুঃখিত—আমি কোন ষ্টুডিওরই ক্যামেরাম্যান নই।

শান্তা কহিল—আপনার সখ?

—ওই রকম! বলিয়া কিরীটী ফিরিল,—শান্তার দিকে, কহিল,—আপনার গানে খুব আনন্দ পেয়েছি! সে জন্ম আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি! ভাঙ্গা মোটরেই এসেছি। এবার বটপত্র-বিছানো পথে বরণ করতে হবে আপনাকে।

আবার হাসির উচ্চরোল উঠিল।

লেখা কহিল,—কথাগুলো আপনার কাণে গেছে বলে দুঃখিত।

—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে,—আপনারা তারই চেষ্টা কচ্ছিলেন। আমারও খুব আমোদ হচ্ছিল। বলিয়া কিরীটী শূন্য চায়ের কাপ মাটীতে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মীরা কহিল,—আপনি উঠ্ছেন?

—হ্যাঁ, অনিচ্ছাতেই! কাজের তাড়া আছে। নমস্কার! আপনারা কোন্ কলেজ থেকে আসছেন—জানতে পারি?

তরুণীরা কলেজের নাম বলিল।

সুপ্রভা কহিল,—আপনার নাম জানতে পারি?

—নিশ্চয় পারেন। কিরীটী পকেট হইতে নামের কার্ডখানা বাহির করিয়া সুপ্রভার প্রসারিত হাতে দিল, কহিল,—আসি, নমস্কার!

—আসুন।

* * * *

কিরীটীর মুখে গল্প শুনিয়া বন্ধুরা জেরা ধরিল।

কিরীটী কহিল,—হ্যাঁ, ছ'জন ছবি নিয়ে গেছে।

বিজয় কহিল,—রইলো বাকী এক—সে এলো না কেন?

কিরীটী কহিল,—ফলিত জ্যোতিষ জানি না।

ফাল্গুনী কহিল,—তুই না জানলেও আমি জানি। আমি দেখতে পাচ্ছি, লজ্জা তাকে আসতে দিচ্ছে না।

বিজয় কহিল,—লজ্জা আসে কখন?

—মানুষ যখন প্রেমে পড়ে!

সহাস্যে কিরীটী কহিল,—অট্ট না কি?

—নিশ্চয়! লভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট! এত দিনে তুই লাভে পড়লি, কিরীটী!

জ্যোতিষ কহিল,—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে!

কিরীটী কহিল,—অশেষ ধন্যবাদ! শুনে খুশী হলুম জ্যোতিষ।

—শুধু খুশী নয়! আহ্লাদে হাত তুলে নাচবি ধেই-ধেই করে! ইস্, কি আমোদই হচ্ছে কিরীটি! এত দিনে যা হোক—

ললিত কহিল,—জানিস্ না? কিরীটী যে মা-দুর্গার কাছে ডাব-চিনি মানত করেছে।

—তাই না কি রে? সর্ব্বজনীনের সেক্রেটারী! বেশ! বেশ!

বিজয় কহিল,—ও কথা যাক্। দেখি কিরীটী, গ্রুপ্‌খানা। তার পর সেই রাজকন্যার উদ্দেশ নেবো।

পাশের ঘর হইতে কিরীটী ছবিখানা লইয়া আসিল।

ললিত কহিল,—নাইটিঙ্গেল কোন্‌টি রে?

বিজয় কহিল,—তেমন ভালো দেখতে তো নয় কেউ।

ফাল্গুনী কহিল,—আজও বুঝলি না বিজয়, সোজা কথা পড়ে আছে, কেন, কি এদের অভাব?

—বাঃ! এই মেয়েটির চোখ দু'টি তো খাসা! দিব্বি মুখখানি!

ললিত কহিল,—তোর কথার উত্তর দিই! এরা নয় কেউ নাক চ্যাপটা, কেউ কপাল উঁচু বলে ম্যারেজ মার্কেটে সুবিধা পাচ্ছে না! কিন্তু এই মৃগাক্ষী?

—হুঁ! তা বটে! মেয়েটি সুন্দরী! বল্ না কিরীটি, কে গান গাইছিল?

সহাস্যে কিরীটী কহিল,—ওই মৃগাক্ষী!

—এ্যাঁ! বলিস্ কি! চমৎকার!

ফাল্গুনী কহিল,—এমন মেয়ে, আজও তার বর জোটেনি। নাঃ, পরিচয় নিতে হবে।

বিজয় কহিল,—ঘটকালি কর্। কিরীটীর মা তোকে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবেন।

ললিত কহিল—কিরীটীর ভারী অন্যায়! তোমার বাবা সে-দিন বললেন,—তোমরা বন্ধু-বান্ধব, তোমরা বোঝাও—অত রোজগার কচ্ছে, বিলেত থেকে অত বড় পাশ করে এলো, কি দুঃখে অমন করে আইবুড়ো থাকে? লোকের যে বউ মরে যায়! তা বলে তারা কি বিবাগী হয়?

বিজয় কহিল,—খাঁটী সত্য।

কিরীটী মুখ তুলিল। কহিল,—বৌ মারা গেলে বিয়ে করতে বাধে না! কিন্তু বাবাকে বলো, আবার বর সাজতে আমার বাধে। আমার ভায়েরা তো রয়েছে।

ললিত কহিল,—চিরকাল একটা কথা মনে রাখবি?

—শিলালিপি কি মুছে যায় ললিত? যুগ যুগ ধরেই সে বার্ত্তা বহন করে।

বন্ধুরা নীরব রহিল।

অতীতের এক আনন্দহীন স্মৃতি শরতের উল্লাস-মধুর প্রভাতকে আচ্ছন্ন নিরানন্দ করিয়া রাখিল।

* * * *

সে অনেক বছর পূর্ব্বেকার কথা। কিরীটী তখন সবে শিবপুর হইতে এঞ্জিনীয়ারীং পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে।

দীনেশ বাবুর খুব আনন্দ। পুত্রের বিবাহ দিয়া মস্ত দাঁও মারিবেন। গৃহিণীর সহিত তাহারই জল্পনা-কল্পনা চলে। বড়-বড় ঘর হইতে দশ-বিশ হাজার টাকার ডাক আসে,—দীনেশ বাবু সে ডাক কাণে তোলেন না। তাঁর আশা আরও উচ্চে। একটা বিষয়-সম্পত্তি-ওয়ালা মেয়ের সন্ধান তিনি গোপনে খুঁজিয়া ফেরেন। যদি একটা মিলে হয় তাহা হইলে—ছেলেটা—চিরকালের মত ধনী হইয়া যাইবে।

কিরীটীর বড় মামা আসিলেন দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণে। কিরীটীকে

কহিলেন,—দেখ, টাকা-কড়ি নিয়ে বিয়ে করিস্‌নি। বিনা-পণে গরীবের মেয়ে নিবি। অন্তরের আশীর্ব্বাদে জীবন তোর মধুময় হবে।

কিরীটী হাসিল।

বড় মামা কহিলেন,—না, না, ছাখ্ না, তোর বাপ যেন কসাইয়ের মত দর-কষাকষি কচ্ছে। সে-দিন শুনে অবাক্ হলুম,—কারা দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, তাদের ফেরত দিলে, বল্লে,—বিশ-তিরিশ হাজার নিয়ে লোকে আমার পায়ে ধরছে!

বড় মামা কহিলেন,—তোরা ইয়ং মেন্—মন অত ছোট করিস্‌নি! এই যে তোর মামীকে গরীবের ঘর থেকে এনেছিলুম,—আজ আমার কিসের অভাব!

কিরীটী কহিল,—আমিও তাই চাই। বিয়েয় টাকা-কড়ি নেওয়া—সে ভারী ইতরের কাজ।

একটা ঢোক গিলিয়া বড় মামা কহিলেন,—তোরও কি যথার্থ অন্তরের ইচ্ছা—

—আমি বড় লোকের মেয়ে চাই না।

—দেখ্, আমার শালীর মেয়ে আছে। মেয়েটি পরমা সুন্দরী—আর অতি লক্ষ্মী। কিন্তু—

—অবস্থার জন্ম চিন্তা করবেন না। শুধু দেখবেন যোগ্যতা—

—আশীর্ব্বাদ করি কিরীটি তুই বড় হ।

দীনেশ বাবুর কাছে কিরীটীর বড় মামা শিবচরণ প্রস্তাবটি আনিলেন; এবং অবশেষে ইঙ্গিতে জানাইলেন, কিরীটীর মত আছে।

নির্লিপ্ত সুরে দীনেশ বাবু কহিলেন,—এর চেয়ে কিছু ভালো কথা নেই। ওর যখন মত আছে, তখন তুমি বিয়ের আয়োজন অনায়াসে করতে পারো।

—আপনার সম্মতি—

কর্ত্তা হাসিলেন। কহিলেন,—ছেলের মা খুশী হলেই হলো।

কনে দেখা, আশীর্ব্বাদ হইতে শ্রাবণের একটা শুভ দিনে বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেল। মেয়ে যে সুন্দরী, সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিল। নির্ব্বাক্ রহিলেন শুধু দীনেশ বাবু। অভিমান-বশে যে উদারতা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইটাই এখন মনের মধ্যে ব্যথার সঞ্চার করিয়া ফিরিতে লাগিল।

তবু নির্দ্দিষ্ট দিনে বর-বরযাত্রী লইয়া দীনেশ বাবু চলিলেন অখ্যাত পল্লীগ্রামে পুত্রের বিবাহ দিতে। খান দুই বাস ও গোটা তিন মোটর গাড়ীতে সকলে উঠিয়াছিল।

কনের বাড়ী সমাদরের ত্রুটি নাই। গৃহস্থ মানুষ, বড় লোকের সহিত কুটুম্বিতা করিতে যত দূর সাধ্য আয়োজন করিয়াছে। কিছু নয় বলিয়া পঞ্চাশ ভরি সোনা দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। কিন্তু দীনেশ বাবু কেবলই প্রচার করিতেছিলেন যে, রাঙা সুতা দিয়া তিনি কন্যা লইতেছেন।

কথাটা কেমন করিয়া কন্যাপক্ষীয় কার মর্য্যাদায় হঠাৎ আঘাত করিল। মেজাজ গরম হইল। হাঁকিয়া সে শুনাইয়া দিল,—পঞ্চাশ ভরি গিনি সোনা, বেনারসীর জোড় ইত্যাদি—এর উপর আবার রাজত্ব চাই না কি?

দীনেশের ভগিনীপতির ছিল একটু গোলাপী নেশা। কথাটা কাণে আসিবামাত্র সে আঁতকাইয়া উঠিল। রুষ্ট স্বরে বুঝাইয়া দিল—শ্যালক-পুত্রের বিবাহ। পাঁঠার দরে নয়—জলের দরে ছেলে বিকাইতেছে।

এমনি কথা-ঠোকা-ঠুকিতে যে অগ্নি অকস্মাৎ দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল,—তাহার ইন্ধন সে আপনিই সংগ্রহ করিল।

অচিরাৎ দীনেশের ভগিনীপতি আসিয়া উপস্থিত হইল কিরীটীর কাছে। বরাসনে উপবিষ্ট চন্দন-চর্চ্চিত হাস্য-ফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া হৃদয়ে কোমলতার সঞ্চার হইল না! মনে মায়া জাগিল না! তীব্র স্বরে ভগিনীপতি কহিল,—উঠে আয় কিরীটি! এ চামারের বাড়ী কুটুম্বিতা নয়।

বিস্মিত কিরীটী পিসেমশায়ের পানে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিল। বিজয় কহিল,—কি বকছেন আপনি হরি বাবু?

—না, না, কখ্খনো না! এরা বাড়ী-শুদ্ধ ছোট লোক।

রুষ্ট স্বরে প্রত্যুত্তর হইল,—আপনারা কি রকম ভদ্রলোক মশাই, ব্যবহারেই তা বোঝা যাচ্ছে।

বিজয় হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—কি করেন? কি করেন?

উভয় পক্ষের রক্ত তখন গরম হইয়া টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

দীনেশ আসিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—যে অপমান পাওনা ছিল, হয়ে গেল। কিরীটি তুই যদি আমার ছেলে হোস্, তবে উঠে চল্। যারা আমায় কসাই বলে, সেখানে ছেলের বিয়ে আমি দেবো না! উঠে আয় কিরীটি।

মূঢ়ের মত কিরীটী চাহিয়া ছিল। মন্ত্রাবিষ্টের মত পিতৃ-আদেশে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কন্যার পিতা আসিয়া করজোড়ে কহিলেন,—একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি দেবেন না দীনেশ বাবু। আমার বারো বছরের মেয়ে, সে কি অপরাধ করেছে আপনাদের কাছে?

—ভয়ানক অপরাধ! এমন ছোট লোকের ঘরে সে জন্ম নিয়েছে, তার ভোগ আছে তো। ও কি কিরীটি, থমকে দাঁড়ালি যে? চলে আয়।

দীনেশ পুত্রের হাত ধরিলেন।

যূপকাষ্ঠে নীত জীবের মত অনিচ্ছুক-চরণে কিরীটী অগ্রসর হইল।

বিজয় মিনতি-ভরে কহিল,—দীনেশ বাবু—

—না বিজয়, কথা রাখবো না। বাপান্ত দিব্যি করে এসেছি।

কন্যাপক্ষীয়দের অনুরোধ-উপরোধ জোয়ারের জলের মুখে তৃণগুচ্ছের মত ভাসিয়া গেল।

কিরীটী গিয়া মোটরে উঠিল। মাত্র দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে যে গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিল মনে ভরপূর আনন্দ লইয়া, সেই পত্রপুষ্পে সজ্জিত গাড়ী—তেমনি চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে, সেই মনোহর বসন-ভূষণেই কিরীটী আরোহণ করিল। কিন্তু সে আনন্দদীপ্ত মুখে বিষাদের কালি লেপিয়া গেছে। যে মর্ম্মান্তিক লজ্জা তাহার অন্তস্তলকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল, কিরীটীর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা বুঝিল না।

ক্রোধই অনর্থকে ডাকিয়া আনে। বিপত্তি-সৃষ্টিতেই তার আনন্দ।

* * * *

অনেকগুলা বছর কাটিয়া গিয়াছে। কিরীটীর বিবাহের অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সবই বৃথা। শ্রাবণের তেইশে যে লগ্নে পুত্রের

বিবাহ নিশ্চিত দিবেন, দম্ভভরে দীনেশ প্রচার করিয়াছিলেন, সেই তারিখেই কিরীটী বোম্বাইয়ে পাড়ি দিল। উদ্দেশ্য বিলাত-যাত্রা। পাথেয়ের সন্ধান লইতে দীনেশ জানিলেন, বন্ধু বিজয়ের নিকট কিরীটী হাজার কয়েক টাকা ধার লইয়াছে।

—হুঁ! বলিয়া মনের সমস্ত ক্ষোভ শেষে তিনি দমন করিতে প্রয়াস পাইলেন।

দীর্ঘ ক' বৎসরের অবসানে শিক্ষা শেষ করিয়া কিরীটী বিলাতের বড় ডিগ্রীই শুধু নয়, চাকুরী লইয়া দেশে ফিরিল।

উল্লাসের সাড়া জাগিল।

পুত্রের বিবাহ দিবার নিমিত্ত দীনেশ আবার নূতন করিয়া কোমর বাঁধিলেন।

মাতৃ-সকাশে কিরীটী জানাইল, এ বাতুলতা পিতা যেন না করেন। পিতাকে নিবৃত্ত হইতে বলিল।

কমলা কহিলেন,—সে কি, তুই বিয়ে করবি না?

দৃঢ় স্বরে কিরীটী কহিল,—না।

—সে কি! ইহার বেশী কমলা আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

কিরীটী কহিল,—একটা বারো বছরের মেয়ের তোমরা যে ক্ষতি করেছ, মনে করে দেখো।

—ক্ষতি! দাদার শালীর মেয়ে? হাঁা, বিয়ে তার এখনও অবশ্য হয়নি। দাদার ভায়রাভাই মারা গেছে। মেয়ে আছে তার মামার বাড়ী। মামা ছোট আদালতের জজ্। মেয়ে কলেজে পড়ছে।

কিরীটী কোন সাড়া দিল না; বাহির হইয়া গেল।

স্বামীর কাছে কমলা কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। বৃত্তান্ত বলিল।

দীনেশ সংক্ষেপে শুধু কহিলেন,—হুঁ।

* * * *

দুর্গা ঘটক আসিয়া কহিলেন,—হলো না দীনেশ বাবু—মেয়ের মামার কি মুখ! চড়া চড়া সব কথা।

—বলেছিলে,—কিছু চাই না?

—তা আর বলিনি? বল্লুম, এখন সাতশ করে পাচ্ছে! তাতে কি বল্লে জানেন? বললে সাতশ পাক, আর সাতাশ-শই পাক, ওরা কসাই। হাঁকাই দশ-বিশ হাজার। আমি বললুম, স্বমুখে প্রতিশ্রুতি —বল্লেন, রাখো দুর্গা! হাকিমি করে ভাত খাই! বুদ্ধি একটু ঘটে আছে! ওরা সম্বন্ধ পাঠিয়েছে আমার বাড়ী, আমার গাড়ী দেখে। বিয়ের রাত্রে বলবে, এটা চাই, সেটা চাই! সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমার দিতেই হবে তখন ঘাড় হেঁট করে।

দীনেশ নীরব রহিলেন।

দুর্গা কহিল,—এই শ্যামবাজারে হরলাল বাবুর মেয়ে রয়েছে। বি-এ পাশ। দেবেও ঢের। সুন্দরী মেয়ে।

গম্ভীর কণ্ঠে দীনেশ কহিলেন,—জানি সব। কনের অভাব কি? আমার ইচ্ছে ছিল, সুরেশ্বর বাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা করি।

—কিন্তু তাঁর যে তা ইচ্ছা নয়।

—তাই তো।

* * * *

মাতুল যে সম্বন্ধ কাটিয়া দিলেন, মামাতো বোন মীরার মারফতে শান্তার কাণে তার সংবাদ আসিল।

সহাস্যে মীরা কহিল,—সেই সে রে। আহা, "কাছে হতে দূর হলো রে"! আচ্ছা, বাবার কি অনাছিষ্টি রাগ, বল দিকি?

শান্তাকে সত্যবতী কহিলেন,—দাদা বলে, ওদের বিশ্বাস করো না সত্য! আবার ফাঁদ পাততে এসেছে! কি উত্তর দেবো? উনি সেটা পারেননি, ওই শোকেই তো শরীর ভাঙলো। বলতেন, বড্ড পছন্দ হয়েছিল ছেলেটিকে! কপাল! দেখ না, ঘুরে সেই এলো! আজ নেবার ভরসা পাচ্ছি না! মন পেছু হঠছে।

শান্তা নীরব রহিল। কি উত্তর দিবে? তবু সেই উজ্জ্বল আয়ত চক্ষুর দৃষ্টিপাতে তার কুমারী-বুকে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। একটা নিশ্বাস ভারী হইয়া ওঠে।

যে-দিন সে সরল গ্রাম্য বালিকা ছিল, সে-দিন সৌভাগ্য অতি নিকটে আসিয়াও দৈব-বিড়ম্বনার মত অকস্মাৎ সরিয়া গেল। মনে হইল, সবটাই মরীচিকা! আজ শিক্ষাদৃপ্ত মনে, আত্মসম্ভ্রম-সচেতন অন্তরে যখন জগৎকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়ে চিত্ত-দুয়ারে এ কে আসিয়া দাঁড়াইল? যাচিয়া হাত পাতিল; অতীতে যে এক দিন অপমান করিয়াছিল, সে—

তবু এই সুমোহন মূর্ত্তি উজ্জ্বল দৃষ্টি তাহাকে বিবশ করিয়া ফেলে।

নিরুপায়! শান্তা সমর্থন করে, মাতুল ঠিক করিয়াছে! সে-ও মনকে সংযত করিবে। কিরীটী তার কেহ নয়! অতীত অপমানের স্মৃতিমাত্র!

গল্প হাতে মীরা সহাস্যে কহিল,—দেখ, মিষ্টার সেনের কাছে আমরা ছবি আনতে গেছলুম—কি খাতির আমাদের! তোর কথা জিজ্ঞেস করলেন। বল্লুম—আমার মামাতো বোন হয়—ভারী সে লাজুক, এলো না। বল্লেন, তবে রইলো তার ছবি। তাকে বলবেন,—তার অপেক্ষাতেই রইল। সত্যি শান্তা, অমন স্বামী পাওয়া ভাগ্য! বাবা যে কি বুঝেছে!

হাসিয়া শান্তা কহিল,—'কাছে গেলে চাঁদ সুধা নয়'! মামাবাবু ঠিকই করেছেন।

* * * *

নির্জ্জনে নীরদা স্বামীকে কহিল,—দেখ, অমন সম্বন্ধ তুমি ছাড়লে!

—পাগল! ভুলে গেছ আগেকার কথা।

—কিছু ভুলিনি। বেশ, শান্তাকে না দাও, মীরার সঙ্গে করতে আপত্তি কি?

—আশ্চর্য্য! যাকে ভাগ্নী দেব না, তাকে দেব মেয়ে!

—ভাগ্নীকে দেবে না, ভগ্নীপতির অপমান হয়েছিল বলে! কিন্তু তোমার তো তা নয়। স্বাধীন রোজগারী পাত্র, অমন চমৎকার দেখতে—এ কি ছাড়া যায়! আমি মীরার সঙ্গে কথা পাঠাব। আমি তার খবর রাখচি। শ্যামপুকুরের সর্ব্বজনীনের সেক্রেটারী ওই ছেলে! ছোড়দার সঙ্গে ভাব আছে।

সবিস্ময়ে সুরেশ্বর কহিল,—তাতে কি?

—কি, তুমি দেখতে পাবে।

* * * *

—ও কে রে মীরা, তোকে নমস্কার কল্লে? তুই নমস্কার কল্লি!

—ওই তো সেক্রেটারী এখানকার, মিষ্টার সেন।

কিরীটী মীরার নিকট আসিল।—আপনাদের কোন কষ্ট হয়নি?

—না! মা এসেছেন।

—মা! ও—নমস্কার!

নীরদা কহিল—তোমরা যে এই কাঙালীভোজনের ব্যবস্থা করেছ বাবা, খুব ভালো করেছ! আহা, এদের দয়া করা উচিত।

—দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় ধন্য হওয়া।

—তা খিচুড়ি ব্যবস্থা করোনি কেন? এই ভাত, মাছের ছ্যাঁচড়া! এত বেশী খরচ—এখন চার দিকে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছে।

—তা দিচ্ছে। কিন্তু আত্মতৃপ্তি নিয়ে সেবা করতে হয় তো।

নীরদা কহিল,—সুবিধাটাও দেখতে হয় বাবা!

কিরীটী জবাব দিল না।

নীরদা কহিল,—এই আমার ভাগ্নী নিজে রেঁধে রোজ পাঁচটি করে খাওয়াচ্ছে। বল্লুম, কেন অমন করিস্? যারা খাওয়াচ্ছে তাদের চাঁদা দে না। কিন্তু মামা-ভাগ্নী ওরাই জানে!

মীরা সহাস্যে কহিল,—সকলের বোধ এক নয় বলেই রক্ষে মা।

—জানি না, তোরা লেখাপড়া শিখে কি বুঝেছিস্?

কিরীটী কহিল,—আমার একটু কাজ আছে—যাচ্ছি। বলিয়া নমস্কার জানাইয়া চলিয়া গেল।

গাড়ীতে উঠিবার প্রাক্কালে কিরীটী আর একবার আসিয়া দেখা দিল।

নীরদার দৃষ্টির আড়াল করিয়া মীরার হাতে একটা চিরকুট দিল।

মীরা কিরীটীর পানে চাহিল। চোখের ইঙ্গিতে কিরীটী মিনতি জানাইল।

বাড়ী আসিয়া কাপড়-জামা খুলিবার পূর্ব্বে মীরা চিরকুটখানা বাহির করিল।

'মীরা' শরণাগত আমি,—শান্তাকে আমায় দাও। ব্যবস্থা কর। কিরীটী।'

চিরকুটখানা হাতে লইয়া মীরা ছুটিল শান্তার কক্ষে—দেখ্, দেখ্ পাষাণী—কার উপর তুই বিমুখ!

চিরকুটখানা বিছানার উপর ফেলিয়া শান্তা হাসিল।

* * * *

সে-দিন ছুটিয়া মীরা শান্তার ঘরে আসিল, কহিল,—খবর শুনেছিস্ শান্তা?

শান্তা চোখ তুলিয়া চাহিল।

—মিষ্টার সেনের খুব অসুখ।

চমকিত সুরে শান্তা কহিল,—কি অসুখ?

—ক'দিন ভয়ানক পরিশ্রম করেছেন—দশমীর দিন রাত থেকে কলেরা।

—এঁ্যা, তুই জানলি কি করে?

—বিজয় ডাক্তার দেখছে। সে বললে।

শান্তা উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

মীরা কহিল,—দেখতে যাবি? এত অসুখ।

—আমি! বিহ্বলের মত শান্তা জিজ্ঞাসা করিল।

—হ্যাঁ তুমি। তোমার না শত্রু সে?

—আমার শত্রু!

—এখনও অভিমান শান্তা? এমন অসুখ? আচ্ছা, যদি না বাঁচে?

মৃদু স্বরে শান্তা কহিল,—কি করে যাবো?

—সে ব্যবস্থা আমি করেছি। বিজয় ডাক্তার বাবাকে দেখতে এলো—তাকেই ধরেছি।

* * * *

কোজাগরী পূর্ণিমা। রজত-কিরণ-বন্যায় দশ দিক্ যেন ভাসিয়া যাইতেছে। প্রতিবেশি-গৃহে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ঘটা করিয়া হয়। নহবৎ বাজিতেছে।

রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কের মত কিরীটী সেই দিকে চাহিয়া ছিল। বাড়ীতে কেহ নাই। পূজা-উপলক্ষে সকলেই দেশে গিয়াছে। এবার তাহাদের পালা। যায় নাই শুধু কিরীটী। সর্ব্বজনীনের হাঙ্গামায়। দ্বারে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল।

কিরীটী চকিত হইল। আজ তো দেশ হইতে কাহারো ফিরিবার কথা নয়।

বিজয়ের গলা শোনা গেল,—কিরীটি!

—সোজা উঠে আয় বিজু!

বিজয় উঠিয়া আসিল। পশ্চাতে মীরা ও শান্তা।

বিজয় কহিল,—মিস্ বোস তোকে দেখতে এসেছেন, তুই কেমন আছিস্!

মীরা কহিল,—আপনার ভয়ানক অসুখ শুনলুম। দশমীর রাত থেকে কলেরার মত!

কিরীটী ব্যাপার বুঝিল। সহাস্যে কহিল,—নিশ্চয়। শান্তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—এসো দেখ, দুর্ব্বল শরীর নিয়ে তোমার জন্যে উঠে এসেছি!

শান্তা কিরীটীর পানে চাহিল। স্বাস্থ্যের পূর্ণ দীপ্তি-বিজড়িত কান্তিমান মূর্ত্তি।

মীরা কহিল,—শরণাগতকে উদ্ধার করা আমার ধর্ম্ম মিষ্টার সেন! কেমন শান্তা, আমার বকশীস্?

শান্তা বলিল,—এই লুকিয়ে আসার পরে মামীমা যদি—

—কি, মা যদি বাড়ী ঢুকতে না দেয়, এই তোর ভাবনা? তা অঘ্রাণ মাসে যার ঘরে আসতেই হোত, পিসিমা তার জন্য চণ্ডীপাঠ করাচ্ছে—কোজাগরী পূর্ণিমা থেকে তার ঘরেই থাকবি! বলিয়া সেনের দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনার আপত্তি আছে?

কিরীটী হাসিল। কহিল,—এই বারো বছর ধরে যার প্রতীক্ষা করে আছি, যাকে চাইছি—না শান্তা, এখনও তোমার অভিমান!

শান্তা কোনো জবাব দিল না—আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিরীটী কহিল,—এই নাও তোমাদের গ্রুপ্‌খানা! বলিয়া আর একখানা ফটো লইয়া কহিল,—একে চিনতে পারো?

বারো বছরের বালিকা-মূর্ত্তি। শান্তারই প্রতিকৃতি।

কিরীটী হাসিল। কহিল,—বড় মামা যে দিন তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ করে, সে দিন ওই ছবি আমায় দিয়েছিল। বোটানিক্যাল গার্ডেনে সেই মুখেরই প্রতিকৃতি পেয়েছিলুম। তিন্ত ভাড়া মোটরে গেছলুম! ফুল-সাজানো গাড়ীতে গিয়ে তোমায় আনি শান্তা!

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

রাশিয়ার শক্তি-সঞ্চয়

আজ দু'বৎসর ধরিয়া যে রাশিয়া শত্রুর বিপুল আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে, আঘাতে শত্রুকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে,—এত শক্তি রাশিয়া কোথায় পাইল?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গেলে পনেরো বৎসরে রাশিয়া কি বিপুল যান্ত্রিক সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় লইতে হয়। পনেরো বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ার বুক ছিল যেন রিক্ত প্রান্তর! পনেরো বৎসরে সে প্রান্তর কল-কারখানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

এশিয়ার সাইবেরিয়া এবং য়ুরোপের রাশিয়া—দু'য়ে মিলিয়া রাশিয়ার পরিপূর্ণ সমগ্রতা। দু'য়ে মিলিয়া আজ গড়িয়া উঠিয়াছে রাশিয়ান্ সোভিয়েট ফেডারেটেড সোশালিষ্ট রিপাব্লিক।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাশিয়ার যত কিছু কারখানা—সে সব ছিল পশ্চিম-রাশিয়ায় এবং উক্রেনে। এবারকারের মহাযুদ্ধে গোড়ার দিকে জার্ম্মাণরা উক্রেন ও পশ্চিম-রাশিয়া অধিকার করিয়া বসিল এবং সেগুলি এক বৎসর যাবৎ ছিল জার্ম্মাণ অধিকারে। তার পর পূর্ব্ব-রাশিয়ায় কল-কারখানা গড়িয়া সেই সব কল-কারখানার কল্যাণে রাশিয়া শত্রু-বিজয়ে সমর্থ হইতেছে।

মস্কো সহরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ষ্টালিন বলিয়াছিলেন, সামরিক এবং যান্ত্রিক দিক্ দিয়া পৃথিবীর অন্য পুরোবর্ত্তী জাতিদিগের বহু পিছনে আমরা পড়িয়া আছি। দশ বৎসরের মধ্যে এ দুই দিক্ দিয়া শুধু তাহাদের সমকক্ষ হওয়া নয়—সে সব জাতির মতই আমাদের অগ্র-গতি প্রয়োজন, নহিলে যে-কোনো সবল জাতির আক্রমণে আমরা বিধ্বস্ত হইয়া যাইব—পৃথিবীতে আমাদের জাতির চিহ্নও থাকিবে না! বক্তৃতা দিয়াই ষ্টালিন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; রাজস্ব হইতে আদায়ী-টাকায় যা-কিছু সঞ্চয়, সেই সঞ্চয় দিয়া ষ্টালিন গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন।

য়ুরোপীয় রাশিয়া

দিকে দিকে মিল এবং ফ্যাক্টরী খোলায় তাঁহার অধ্যবসায়ের সীমা রহিল না। জার্ম্মাণরা পূর্ব্বে একবার উক্রেন আক্রমণ করিয়াছিল, আবার করিতে পারে—এ জন্য তিনি সাইবেরিয়ায় এবং উরালে বহু মিল ও কারখানা গড়িয়া তুলিলেন। সীমান্ত দেশ হইতে লেনিনগ্রাড ক'মাইলেরই বা পথ! জার্ম্মাণরা রাশিয়া আক্রমণ করিলে লেনিনগ্রাডের যত ক্ষতিই হোক্ রাশিয়ান্ জাতিকে বাঁচানো চাই। তাই রাশিয়ার মধ্য দিয়া গিয়া দু'হাজার মাইল দূরে সাইবেরিয়া আক্রমণ সহজ হইবে না স্থির করিয়া ষ্টালিন সাইবেরিয়ায় ও উরালে মিল এবং কারখানা খুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জন স্কট নামে এক জন মার্কিন সুধী ১৯৩২ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাগনিতোগরস্কে ছিলেন। তিনি বলেন, পাঁচ বৎসরে তাঁর চোখের সামনে রাশিয়ার চেহারা বদলাইয়া গেছে! আলাদীন যেন প্রদীপ ঘষিয়া রাশিয়াকে কল-কারখানায় ভরিয়া তুলিয়াছে! আমেরিকায় চল্লিশ বৎসরে যাহা ঘটিয়াছে,—রেল-পথ নির্ম্মাণ হইতে সুরু করিয়া কল-কারখানা, ডক প্রভৃতি তৈয়ারী—রাশিয়ায় তাহা ঘটিয়াছে পাঁচ বৎসরে—যেন চক্ষুর নিমেষে!

লাল ফৌজের জন্য শুধু মাগনিতোগরস্কেই বছরে এখন দশ লক্ষ

টন ওজনের লৌহ এবং ইস্পাত হইতে অজস্র রেটে ট্যাঙ্ক এবং কামান প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে।

মাগনিতোগরস্কের অবস্থান রাশিয়ার মাঝামাঝি, আইদারলী পাহাড়ের কোলে। কল-কারখানা-নির্ম্মাণের বহু বৎসর পূর্ব্বে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে এখানে এক জন পূর্ত্ত-শিল্পী জমির মাপ-জোপ করিতে আসিয়াছিলেন। মাপ-জোপ করিতে গিয়া দেখেন তাঁর কম্পাশের কাঁটায় বার-বার গোলযোগ ঘটিতেছে! দেখিয়া বহু কুলী আনিয়া

সাইবেরিয়া

তিনি পাহাড়ের গা কাটাইতে সুরু করিলেন। পাহাড় কাটিতে পাহাড়ের বুকে পাওয়া গেল লৌহ-সমৃদ্ধ বিপুল খনি।

রাশিয়ান ব্যবসায়ী মিয়াশনিকভ রুশ সম্রাজ্ঞীর কাছ হইতে এ পাহাড় ইজারা লন; এবং এখানকার খনি হইতে তিনি প্রচুর লৌহ তুলিয়াছিলেন। তার পর এখানকার খনির লৌহ ফুরাইয়া গেলে রাশিয়ানদের খনি-আবিষ্কারের উৎসাহও সঙ্গে সঙ্গে গেল কমিয়া; কাজেই রাশিয়ার খনিজ-সম্পদ্ আবার তিমিরাবৃত হইল।

গতবারের মহাযুদ্ধে প্রয়োজনের তাগিদে আবার সকলের টনক নড়িল। রাশিয়া হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্বেতাঙ্গ রাশিয়ানরা দলে দলে লৌহের সন্ধানে পূর্ব্ব-রাশিয়ায় এবং সাইবেরিয়ায় আসিতে লাগিল। আইদারলী পাহাড় হইতে আবার তারা সংগ্রহ করিল অজস্র লৌহ। সে যুদ্ধ শেষ হইলে উরাল এবং সাইবেরিয়ার লোক-জন খনির কাজে উৎসাহী হইল। মস্কো হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এক দল ব্যবসায়ী আসিয়া মাগনিতোনিয়ায় আস্তানা পাতিল। বড় বড় ব্যারাক নির্ম্মাণ করিয়া সেই সব ব্যারাকে তারা বাসের ব্যবস্থা করিল; এবং ল্যাবরেটরি খুলিয়া সেই সব ল্যাবরেটরিতে নানা রকম পরীক্ষা চলিতে লাগিল। বৃষ্টিপাতের পরিমাপ কষা—সে জলের পরীক্ষা; উরাল নদীর জল পরীক্ষা; সে জলে লৌহ-চূর্ণ আছে কি না—থাকিলেও কি-জাতের লৌহ—এমনি নানা বিষয়ের তাঁরা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এ অঞ্চলে ছিল বাশ্‌খীর ও কিরঘিজি জাতির বাস। এত রাশিয়ানের আগমনে তারা বিরক্ত হইল।

ইহার এক বৎসর পরে কিন্তু পরিবর্ত্তনের ধারা বহিতে সুরু করিল। দেশের বুক জুড়িয়া রেল-লাইন পাতা হইল। এঞ্জিন আসিল, রেল-গাড়ী আসিল। বাশ্‌খীর ও কিরঘিজি জাতির বিস্ময় এবং আশঙ্কা বাড়িল; কিন্তু তাদের সে ভয় ও বিস্ময় ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইল না! রেল-লাইন পাতা ও গাড়ী আসার সঙ্গে সঙ্গে কারখানা-নির্ম্মাণে সমারোহ বাধিল। যন্ত্রপাতি, কাঠ, লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট, খাদ্য, পানীয় জল—ভারে ভারে আসিতে লাগিল। গ্রামের লোক চাকরি পাইল; তাদের অভাব ঘুচিল। মনের বিরক্তি ঘুচাইয়া তারা আসিয়া দলে দলে নির্ম্মাণ-কার্য্যে যোগ দিল। সঙ্গে সঙ্গে নবস্থাপিত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট নিরুপদ্রবে বিনা-রক্তপাতে দেশবাসীর হৃদয় জয় করিল; তাদের মনে চেতনা জাগাইয়া কর্ম্মোদ্দীপনায় তাদের বুকে আনিয়া দিল নূতন জীবন-প্রবাহ!

উরালে এবং সাইবেরিয়ায় শুধু লৌহের-খনি আবিষ্কার নয়—সেই সঙ্গে ১৫০০ মাইল দূরে পূর্ব্বে অবস্থিত কুজনেৎস্কে, মিলিল কয়লার বিপুল খনি। এবং বিদেশের যেখানে যে যন্ত্র পাওয়া যায়, সেখান হইতে সেই সব যন্ত্র আনিয়া সোভিয়েট রাশিয়া একবারে সহস্রবাহু

হইয়া যান্ত্রিকতা গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। যন্ত্রযুগে যতখানি সম্ভব অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই হইল সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য।

এই কর্ম্মোৎসাহের ফলে মার্কিন সুধী জন স্কট লিখিয়াছেন, উরাল নদীর উপর যে-বাঁধ তৈয়ারী হইল, সে বাঁধের দৈর্ঘ্য দশ মাইল; প্রস্থে এ বাঁধ দুই মাইল। এই নদীর জল লইয়া অভ্যন্তর-দেশে কাজ তেমন স্বচ্ছন্দ ভাবে চলিত না, জলের অভাব ঘটিত; সে জন্য দেশের বহু স্থানে বিরাট্ জলাশয় খনন করা হইল। এই নদীর জলে সে সব জলাশয় সারাক্ষণ পরিপূর্ণ রাখিবার সুব্যবস্থা হইল; এবং আই-দারলী পাহাড়ের কোল হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূর ব্যাপিয়া দিকে দিকে অসংখ্য মিল এবং কারখানা বসিল। এই সব কল-কারখানায় রাশিয়ান, উক্রেনিয়ান, তাতার, বাশ্খীর, কিরঘিজী, উজ্বেক, তুর্কি, মোঙ্গল, মার্কিন, চীনা, ফিন, হাঙ্গেরিয়ান, মর্দ্দভিনিয়ান—সর্ব্ব জাতির প্রায় লক্ষাধিক লোক কাজ করিতেছে।

অস্ত্র কারখানা—চেলিয়াবিনস্ক

নদীর ঘাট—আধুনিক স্বার্ডলভস্ক

তাদের বাসের জন্য আছে ব্যারাক, তাঁবু, মাটীর কুটীর। এক জাতের লোক—তাদের ভাষাও প্রায় ত্রিশ-রকম—অথচ কাজে যেমন কাহারো উৎসাহ অল্প নয়, তেমনি হিংসা-দ্বেষও এ দলে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।
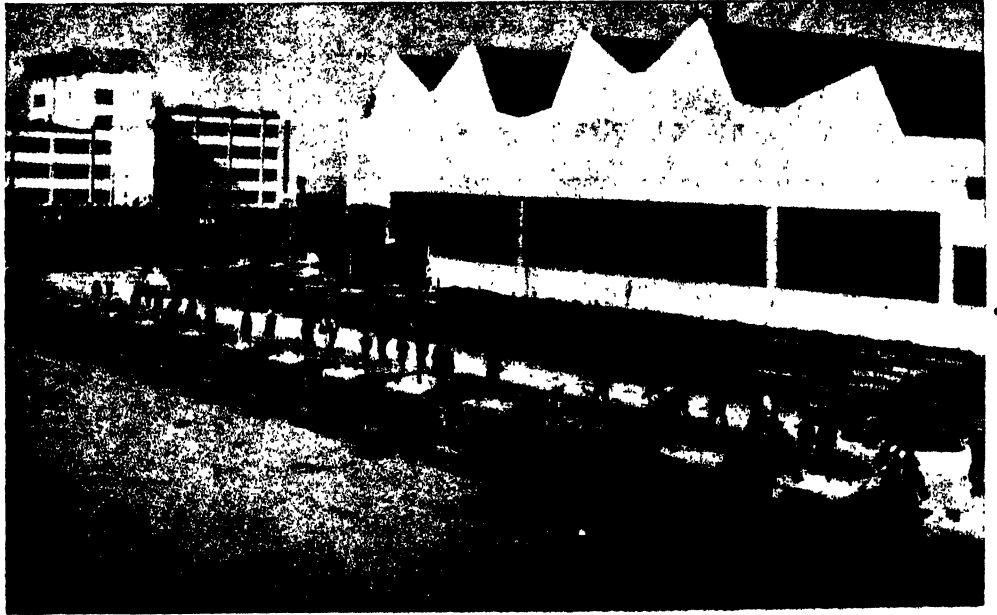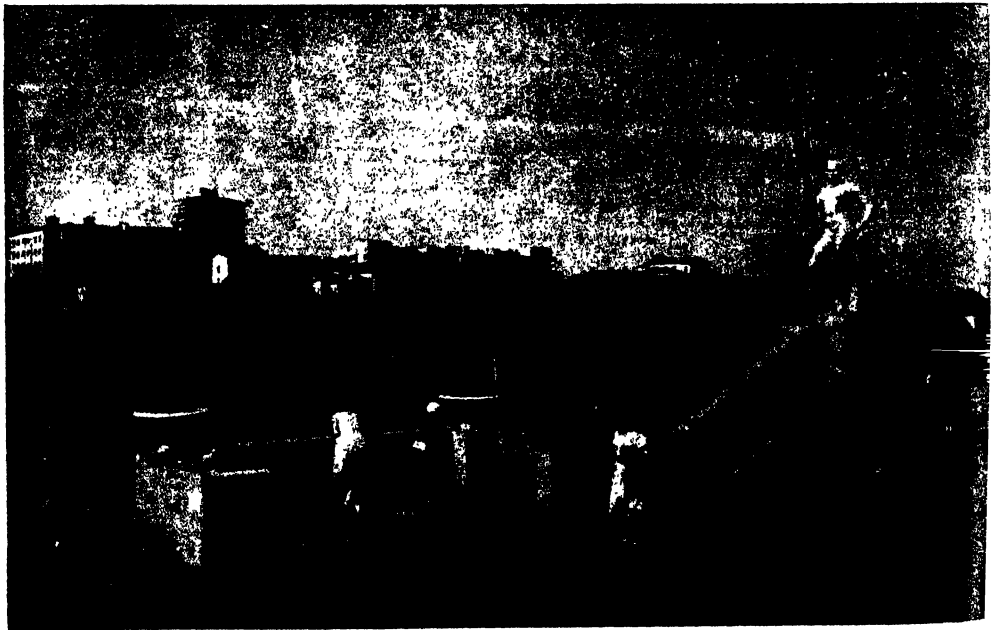
যে সব লোক চাষবাস ছাড়া আর কোনো কাজ জানিত না, পাঁচশো বৎসর ধরিয়া সনাতন সংস্কার-আচারের দাস্য করিয়া কষ্টে জীবন কাটাইয়াছে, আজ এই যন্ত্র-রাজ্যে কাজ করিতে তাদের অ[illegible] বসায়ের সীমা নাই! সাইমৎ নামে এক তাতার কুলি ১৯৩[illegible] খৃষ্টাব্দে কাজান্ গ্রাম হইতে এখানকার কারখানায় কাজ ক[illegible]

আসে। গ্রামে সে ভেড়া চরাইত। জীবনে বৈদ্যুতিক আলো, রেলগাড়ী বা দোতলা বাড়ী সে চক্ষে দেখে নাই! হাতুড়ির চেহারা মাত্র দেখিয়াছিল, কিন্তু হাতুড়ি লইয়া মানুষ কি কাজ করে, তাহা সে জানিত না। রাশিয়ান ভাষাও ছিল তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত! সে আসিয়া কারখানায় ইলেক্‌ট্রিসিয়ানের কাজে শিক্ষানবীশীতে ঢুকিল। তাকে দেওয়া হইয়াছিল দু'টি মোটর জেনারেটর। আনাড়ির হাতে এক সপ্তাহের মধ্যে সে দু'টি যন্ত্র বিকল হইল! সে জন্য তাকে খেশারতী দিতে হইল না বা তার চাকরিও গেল না—তাকে দেওয়া হইল আবার দু'টি নূতন জেনারেটর। এক সপ্তাহের মধ্যে সে-দু'টিও তার হাতে বিকল হইল! এইভাবে ছ'মাস ধরিয়া যন্ত্রপাতি নাড়িয়া সেগুলিকে সে শুধু বিকলই করিল—তবু কাজে তার যেমন উৎসাহ—গবর্ণমেণ্টও তেমনি তাকে জেনারেটর এবং নূতন নূতন যন্ত্র জোগাইতে এতটুকু কার্পণ্য করে নাই। এক বৎসরে সে রুশ ভাষা শিখিল, যন্ত্রপাতির বিজ্ঞান এবং কলা-কৌশল শিখিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সে হইয়াছে কারখানার চীফ ইলেক্‌ট্রিসিয়ান!
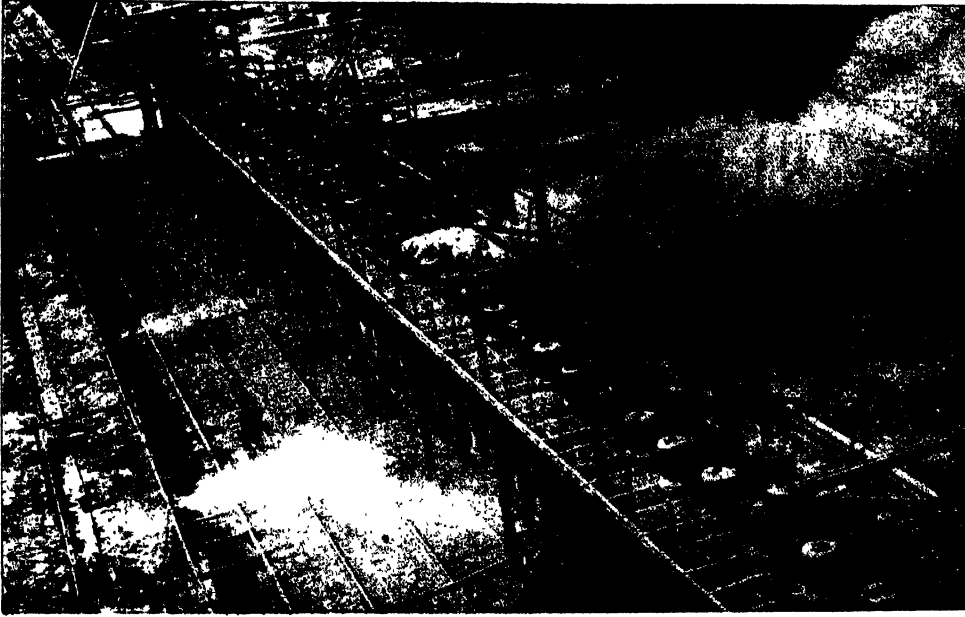
খনির কয়লা পুড়াইয়া কোক্‌-কয়লা ও কার্ব্বণ-বাষ্প-প্রভৃতি সৃষ্টি—কুজনেৎস্কের খনি
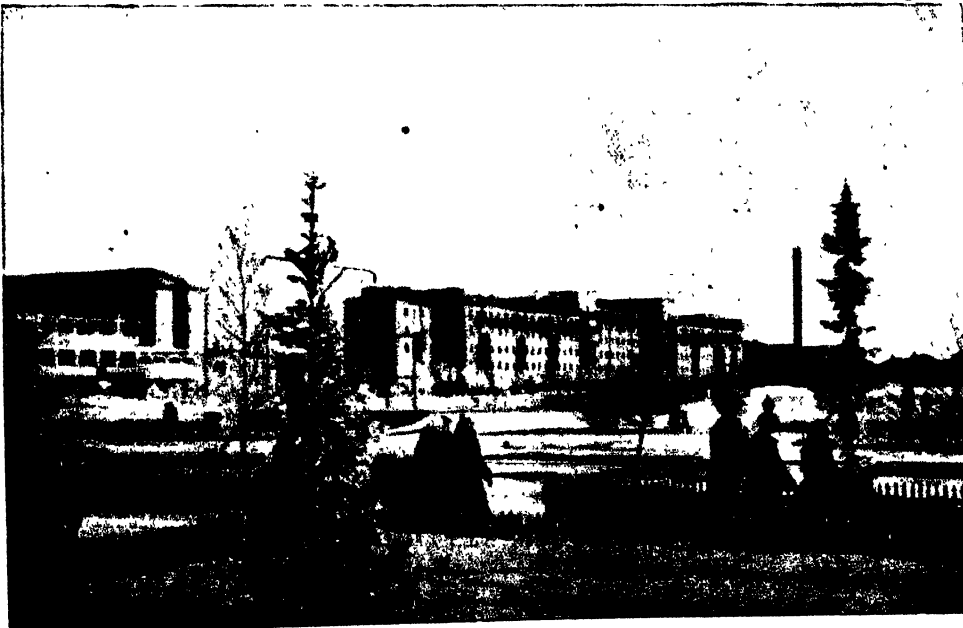
বরফ-ঢাকা সাইবেরিয়ার বুকে এ-কালের বাড়ী-ঘর—কুজনেৎস্ক

এই সব কল-কারখানা তৈয়ারী করিতে ভারা হইতে পড়িয়া কত লোক হাত-পা ভাঙ্গিয়াছে, মারা গিয়াছে; যন্ত্রপাতি নাড়া-চাড়া করিতে কত লোকের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়াছে,—তবু ভয়ে কেহ কারখানা ছাড়িয়া পলাইয়া যায় নাই! ষ্টালিনের যেমন শাসন, তেমনি দরদ। অতি তুচ্ছ নগণ্য কুলিও যাহাতে কাজের দাম বুঝিতে পারে, তার কাজের দাম কষিয়া তাকে তাহা বুঝাইবার জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষগণের বিপুল পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়

ষ্টালিনের প্রবর্ত্তিত নীতির গুণেই ঘটিয়াছে। কারিগরদের মধ্যে নগণ্য কেহ নাই। তারা আলস্য জানে না, ফাঁকিবাজী জানে না—কাজে কাহারো শৈথিল্য বা ঔদাসীন্তের কথা শুনা যায় না!

যে ভাবে সাইবেরিয়ার তুষার-প্রান্তরে ময়দানবের পুরীর অনুরূপ এই যন্ত্রপুরী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারি বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক জন কর্ম্মী লিখিয়াছেন:

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আমি মাগনিতোগরস্কের কর্ম্মশালায় যোগ দিয়াছিলাম। মাঠ-বাট হইতে লোক-জনকে আনিয়া যন্ত্রের কাজে লাগানো হয়। তারা যেমন আনাড়ি, তেমনি অপদার্থ—সকলে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া থাকে, কিন্তু পলাইবার নাম করে না।

অস্ত্র-কারখানায় কর্ম্মীদের কার্য্য স্যুচী-পাঠ

কিরঘিজের পল্লী-গীতি-প্রচার

অক্টোবর মাসে প্রচণ্ড তুষার-বর্ষণ সুরু হইল। শীতে হাড়-পাঁজরা ঝন্‌ঝন্ করে—তবু কাজে কাহারো কামাই নাই! নিয়ম ছিল, সপ্তাহে এক দিন করিয়া ছুটি। রবিবার বলিয়া ছুটির জন্য সেই দিনটিই নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ছ'দিন কাজ করিলে সাত দিনের দিন ছুটি! কিন্তু ছুটির দিনেও কারিগরের দল আপনা হইতে কাজ করিতে আসিত। আসিয়া তারা রেলের লাইন পাতে, আচে-বাজে জিনিষ সরায়, সে-ভারার কাজ চুকিয়াছে সে-ভারা খুলিয়া ফেলে। ছুটির দিনে তারা এই সব কাজ করিতে আসে। শীতে কাজ ও চলাফেরা করিবার জন্য কারখানায় হাজার হাজার বুট জুতা তৈয়ারী হই-

আমি যখন কাজ সুরু করিলাম, তখন তিন নম্বরের অতিকায় চিমনীর ভিদ উঠিতেছে। ইস্পাতের প্লেট, ড্রেনের পাইপ, ইলেক্ট্রিকের তার, গ্যাস-পাইপ—সব স্তূপাকারে আসিয়া জমিয়াছে! প্রান্তরের বুকে প্রত্যহ মাল গাড়ী-বোঝাই হইয়া পাইপ, সিমেণ্ট, ইট আসিতেছে। মালপত্রের স্তূপ যত আসিতে দেখি, এক বিরাট সম্ভাবনার আভাসে আমাদের মন উল্লাসে তত নাচিয়া ওঠে। আমাদের আগ্রহের সীমা নাই! দেহে শক্তি যতখানি আছে, সব দিয়া সকলে কাজ করি। সকলের মনে কৌতূহল—দিনের শেষে আমাদের সকলের সম্মিলিত শক্তিতে না-জানি কি নূতন মূর্ত্তিতে রূপ লইয়া গড়িয়া

লাল-ফৌজের জন্য আর্মার্ড ট্রেণ-নির্ম্মাণ

ক্রেমলিন রাজাদের আমলের দুর্গ—ঐ সব গির্জ্জা এখন মিউজিয়ম

ঝালাইকরদের মধ্যে শতকরা দশ জনের হইল অপঘাত-মৃত্যু। নূতন লোক আমদানি করা শক্ত—বাহিরে কোথায় লোক মিলিবে? পনেরো বয়সের উর্দ্ধ বয়সের কেহই বসিয়া নাই! কাজেই অন্য ঝালাইকরদের কাজের মাত্রা বাড়িল।
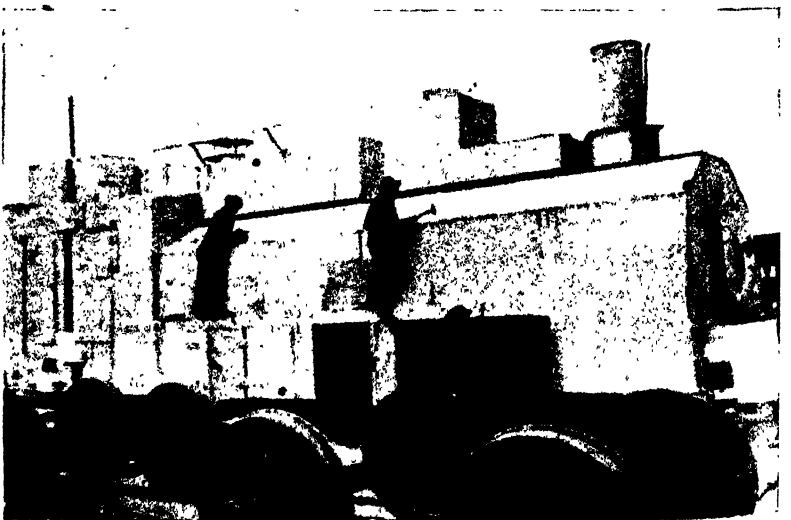
খাদ্যাভাবেরও সীমা ছিল না। প্রত্যেক কর্ম্মী বা কারিগরের জন্য ছিল খাবারের টিকিট। সেই টিকিট দেখাইয়া নির্দ্দিষ্ট রসুই-খানায় একবারের মাত্র আহার্য্য মিলিত। আহার্য্যের জন্য তাহাকে দাম দিতে হইত। কর্ম্মীদের মধ্যে সবলের টাকা-পয়সা ছিল প্রচুর, কিন্তু সে টাকা দিয়া খাদ্য কিনিবে কি, খাদ্যের অভাব! একবারের খোরাকে লাগিল—ফেল্টের বুট জুতা। শীতে হাত অবশ হয়—আগুন জ্বালিয়া সে আগুনে হাত তাতাইয়া লোক-জন কাজ করে! মেয়েরাও আসিয়া পুরুষদের সঙ্গে নানা কাজে যোগ দিয়াছিল। শীতের জন্য আপাদ-মস্তক শালে ঢাকিয়া মুড়িয়া এমন বেশে তারা আসিত যে কারো সাধ্য ছিল না, তাদের চিনিতে পারে!

যন্ত্রপাতির কাজে সকলেই প্রায় আনাড়ি, তার উপর প্রচণ্ড শীত এবং তুষার-বর্ষণ—যারা লোহার কাজ করিতেছিল, তাদের মধ্যে বহু দৈব-দুর্বিপাক ঘটিতে লাগিল।

গায়ে তুলার ও লোমের কোট চড়াইয়া শ্রমিকদের রেল-লাইন পাতা

মিলিবে একখানা রুটি, এক প্লেট সুপ এবং এক প্লেট তরকারী! তরকারী মানে চার-পাঁচটা আলু, আর তার সঙ্গে যা-তা এক টুকরা চারা-মাছ! দু'বারের খোরাক যাহাতে মেলে, সে জন্য আন্দোলন চলিত খুব, কিন্তু আন্দোলনেই তাহা পর্য্যবসিত হইত। এক বছর মাগনিতোগরস্কে চিনি, মাংস, মাখন, ডিম বা তৈল—কেহ চক্ষে দেখে নাই।

পোষাকেরও তেমনি অনটন! একটা প্যান্টের জন্য খরিদ্দার জুটিত দশ জন! কাজেই একটা প্যান্টের দাম ছিল একেবারে আগুন! এত দিকে এত যে অভাব তার কারণ—রাশিয়ান গভর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতে

কয়লা-খনির মধ্যে আলোর লহর—ষ্টালিনস্ক

অজস্র যন্ত্রপাতি কিনিতেছে,—সে সবের দাম দিবার মত অর্থ সরকারী তহবিলে ছিল না ; যন্ত্রপাতির দাম দেওয়া হইত ধান, চাল, গম, তুলা, চামড়া, পশুলোম এবং দুগ্ধ, পনীর ও মাখন বিনিময়ে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার রাজস্বের শতকরা ৫৬ ভাগ এই গঠন-কার্য্যে ব্যয়ের জন্ত বরাদ্দ ছিল। বিদেশী কোন ফার্ম্ম রাশিয়াকে ধারে একটা ছুচ পর্য্যন্ত বেচিতে রাজী হয় নাই! কাজেই রাশিয়ানদের ললাটের ঘর্ম্ম এবং দেহের রক্ত নিংড়ানো ভিন্ন গঠনকার্য্য-সম্পাদন ছিল অসম্ভব ব্যাপার!

এ জন্য বিরক্তি অসন্তোষ প্রধূমিত হইতেছিল। অনেকে নায়কতা করিয়া প্রতিবাদ তুলিয়াছিল। কিন্তু ষ্টালিন তাহাতে এক তিল

গলিত ইস্পাত তোলা

বিচলিত হন নাই। সকলে বলিতেছিল—আমাদের প্রচুর খাদ্য দাও—আমাদের সকলের পায়ের জন্য মজবুত জুতা দাও, তার পর কল-কারখানা গড়িতে সুরু করো! দিকে দিকে অবশেষে বিদ্রোহ-বিপ্লবের আগুন জ্বলিল ; কিন্তু তাহাতেও ষ্টালিন বিচলিত হইলেন না। তাঁহার বিধানে বিদ্রোহী বিক্ষুব্ধ দলের কাহারো হইল প্রাণদণ্ড, কাহারো বা নির্ব্বাসন। ১৯৩৬-১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ষ্টালিন ভ্রান্তপথে চলিয়াছেন বলিয়া বহু সুধী ও শিক্ষিত রাশিয়ান গর্জ্জন তুলিলেন —তাহার ফলে তাঁদেরো ঘটিল নির্ব্বাসন বা প্রাণদণ্ড। এ সময়ে রাশিয়ার ভাগ্য যেন সরু সূতায় ঝুলিতেছিল—কে থাকে, কে যায়,—

ষ্টালিন

অন্নবস্ত্রের এমন অভাব অথচ পকেটে টাকা থাকিতে পেট ভরিয়া আহার মেলে না,—শীতের দিনে শীত নিবারণ

ইস্পাতের কারখানা—কারিগরের চোখে চশমা

করিতে আচ্ছাদন জোটে না! তবু ষ্টালিনের কার্য্য-পদ্ধতি ছিল অচল অটল! স্নান-পানের জন্ত প্রত্যেককে জল আনিতে

উরাল নদীর বাঁধ

এলুমিনিয়ামের কারখানা—দনেপ্রোপেত্রোভস্ক

হইত বালতি ভরিয়া প্রায় আধ মাইল পথ হাঁটিয়া সুদূর জলাশয় হইতে। চাষীদিগকে ব্যারাক-বাড়ীতে থাকিতে হইত—এক এক ঘরে তিন জন করিয়া লোকের বাস। কাজের ছুটি হইলে ব্যারাকে ফিরিয়া রাত্রে রুটিন ধরিয়া লেখাপড়া শেখার বিধি ছিল। লেখাপড়া জানা চাই—নিরক্ষরতার অবসান চাই—ষ্টালিনের আদেশ। ওদিকে কাজেরও এক নিমেষ কামাই ছিল না—দিন-রাত কাজ চলিত। চব্বিশ ঘণ্টাকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া কর্ম্মীদের পালা-ক্রমে আট ঘণ্টা করিয়া এক-টানে কাজ করিতে হইত।

রাত্রি তিনটা হইতে দিনের রুটিন সুরু। এক দল কাজে বাহির হইত রাত্রি তিনটায়; তারা ফিরিত বেলা এগারোটায়। বেলা এগারোটায় দ্বিতীয় দল কাজে বাহির হইত—তারা ফিরিত সন্ধ্যা সাতটায়। তার পর আবার প্রথম দলের পালা—৭টায় গিয়া রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত কাজ। অর্থাৎ প্রত্যেককে ষোল ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হইত।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ব্যারাকে চিনির আমদানি হইল। সপ্তাহে প্রত্যেকে এক পোয়া করিয়া চিনি পাইবে, ব্যবস্থা।

এমনি করিয়া পাঁচ বৎসর কাটিল কঠোর কর্ম্ম-সাধনায়। পাঁচ বৎসরে যে সব কারখানা সতেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাদের প্রত্যেকটি হইতে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের তৈয়ারী মাল এবং বারো-চিমনী-ওয়ালা কারখানা হইতে দিনে ৫০০০ টন ওজনের ইস্পাত তৈয়ারী হইতে লাগিল। যে রাশিয়া পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দু'হাত রেল কিনিত বিদেশ হইতে, পাঁচ বৎসরে সে রাশিয়া তৈয়ারী করিতে লাগিল সর্ব্বরকমের সামগ্রী—লক্ষ-কোটি মাইলব্যাপী দীর্ঘ রেল; এ্যাঙ্গল-আয়রণ, লোহার পাত, জয়েষ্ট, বীম্, চ্যানেল প্রভৃতি।

বরফে-ঢাকা রাশিয়া পাঁচ বৎসরে শুধু যে লোহা-ইস্পাতের কর্ম্মক্ষেত্রে ভূষিত হইল তা নয়; রাশিয়ার চাষা-ধীবর প্রভৃতি নিরক্ষর লোক-জনের মন জ্ঞানে-বুদ্ধিতে বিকশিত, স্বদেশপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে সকলের হইল যেমন প্রখর দৃষ্টি, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানেও তেমনি সকলের আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি। ইহার ফলে মরু-প্রান্তরে যে-নগর দেখা দিল, সে-নগরে ঘর-বাড়ী রচিত হইল সুদৃশ্য স্বচ্ছন্দময়, পথ-ঘাট পরিষ্কার আবর্জ্জনাহীন; পথের দু'ধারে ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজির অভাব রহিল না। তার উপর পার্ক, দীর্ঘি—শোভা-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়!

লেনিন-স্তম্ভ—মস্কো। তরুণ দল প্যারেড করিতেছে
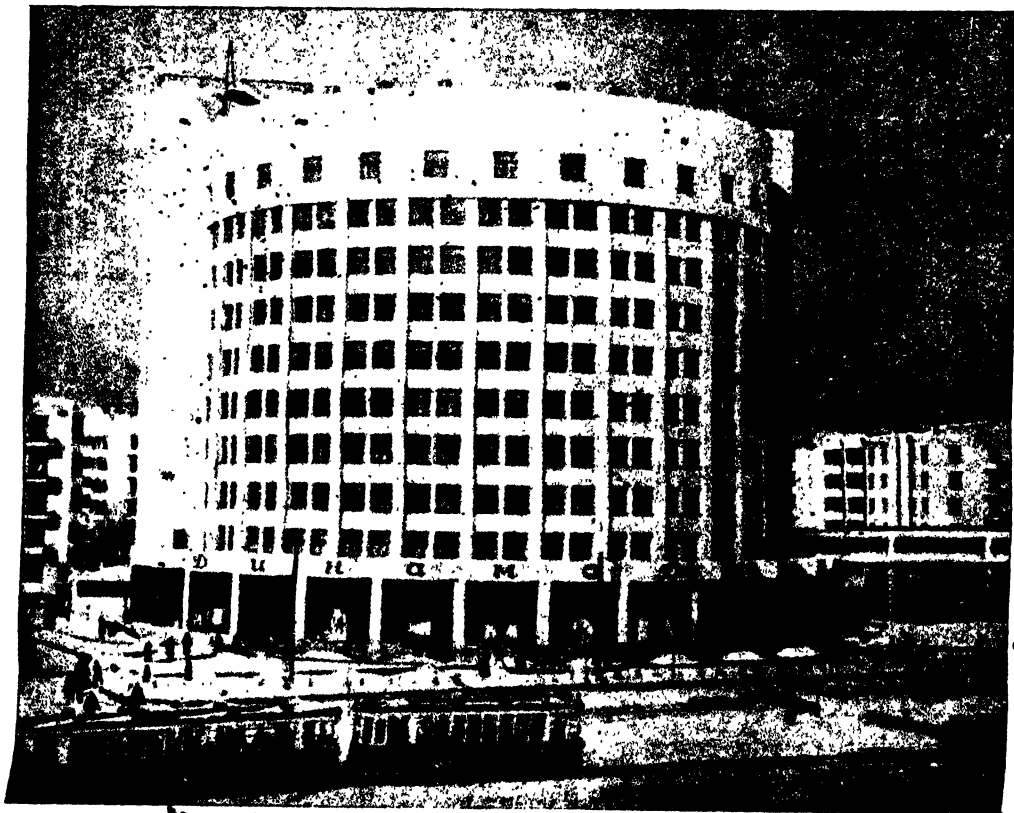
রাশিয়ার মেয়েরা এ যুদ্ধে পুরুষের কাজে সহায়

শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে রাশিয়া আজ সমুজ্জ্বল —শক্তিতে রাশিয়া আজ প্রায় অপরাজেয়; এবং অতি নগণ্য সামান্য নাগরিকও আজ শিক্ষার গুণে এতখানি নিয়মানুবর্ত্তী হইয়াছে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে রাশিয়ানের মুখের কথার দাম আজ প্রায় রেজিষ্ট্রী-করা ষ্ট্যাম্প-কাগজের একরার নামার মত নির্ভর-যোগ্য। পূর্ব্বে যে হাজার-হাজার লোক লাঙ্গল ধরা ছাড়া আর কোনো কাজই জানিত না, আজ তারা জনে জনে নিপুণ মেকানিক্। তাদের শ্রমশক্তি অসাধারণ এবং আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধ-রীতিতে সমস্ত জাতির কর্ম্ম-কুশলতাও আজ অসামান্য। মাগনিতোগরস্কের মতই চেলিয়াবিনস্ক, খালিলোভো, নোভোটাগিল—আজ বিপুল যন্ত্রাগারে পরিণত। উরাল, কুজনেৎস্ক, কারাগান্দার খনি হইতে অজস্র পরিমাণে কয়লা মিলিতেছে; পশ্চিম সাইবেরিয়া ও কাজাখ্ হইতে মিলিতেছে তামা, সীসা, জিঙ্ক, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট, ভানাডিয়াম, টুঙ্গষ্টেন, মাঙ্গানীজ। ভলগা নদীর তীর হইতে সারা উরালে খনিজ তৈলের অমর-অক্ষয় প্রস্রবণ মিলিয়াছে। উফা এবং অস্কে যে পেট্রোল মিলিতেছে—সেখানকার কারখানায় যে লুব্রিকেটিং বা মেশিনের তৈল মিলিতেছে, শুধু তাহারি উপর নির্ভর করিলে সোভিয়েট প্লেন এবং ট্যাঙ্কগুলি এ যুদ্ধে ক্ষণেকের

কারখানায় বিরাম-অবসরে

জন্য পেট্রোলের অভাব অনুভব করিবে না! কৃষি-সম্পদেও রাশিয়ার ভাগ্য ফিরিয়াছে। মার্কিণ ট্রাক্টর আনাইয়া সে ট্রাক্টরের সাহায্যে উষর প্রান্তরকে আজ উর্ব্বর করিয়া তোলা হইয়াছে। ডিজেল-মোটরযুক্ত অগণিত ট্রাক্টর রাশিয়ার মাটীকে আজ উর্ব্বর এবং শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

তার পর অস্ত্রাগার এবং বারুদখানা। মধ্য উরালের বুকে পার্ম বা আধুনিক মোলোটভে বিরাট্ বিশাল বারুদখানা এবং অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানা; তাছাড়া সর্ব্বত্র আজ বহু অস্ত্রশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। মধ্য উরালে বৃহত্তম অস্ত্রশালা-প্রতিষ্ঠার কারণ, কোনো বিদেশী শত্রু সারা রাশিয়া উত্তীর্ণ হইয়া চট্ করিয়া এখানে আসিতে

কারখানায় শিক্ষানবীশী—স্বার্ডলভস্ক

পারিবে না—কাজেই দুর্গমতার জন্ত এ প্রদেশ সবচেয়ে নিরাপদ। এ সব বারুদখানায় সর্ব্ব রকমের মারণাস্ত্র, প্রতিরোধাস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। তার উপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে নব নব মারণাস্ত্র-নির্ম্মাণেও কর্ম্মীদের এতটুকু শৈথিল্য বা ঔদাসীন্ত নাই।

নিজনি টাগিল দশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল জলা-জঙ্গলে পূর্ণ স্থান; এখন সৌধকিরীট এ-নগরটি হইয়াছে রেলোয়ের বহু-বিস্তীর্ণ কারখানা। এখানে চার-চক্র-দণ্ড-যুক্ত (four-axle) রেলগাড়ী তৈয়ারী হইতেছে বছরে ত্রিশ চল্লিশ হাজার করিয়া। এ সব গাড়ীর জন্ত যে লোহা ও ইস্পাত লাগে, সে লোহা এবং ইস্পাতও ঐ কারখানায় তৈয়ারী হয়।

স্বার্ডলভস্কে—পূর্ব্ব নাম একাতেরিণবুর্জ—ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্‌কে সপরিবারে গুলী করিয়া মারা হইয়াছিল। এ সহরটি আজ হইয়াছে বিরাট্ যন্ত্রশালা। রাশিয়ার সাতটি বড় বড় রেলোয়ে-লাইন আসিয়া স্বার্ডলোভস্কে মিশিয়াছে। এ প্রদেশটিকে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগ সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিয়াছে—এখানে ট্যাঙ্ক, প্লেন, কামান, বন্দুক, সাবমেরিন প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে।

কুজনেৎস্কের দক্ষিণে আলতাই পাহাড়ে মিলিতেছে অজস্র পরিমাণ সীসা, জিঙ্ক এবং রূপা। উত্তরে নরিলস্কে এবং কাজাখের বুকে যে বালখাশ হ্রদ, সেখানে—এ দুই জায়গায় তামা মিলিতেছে একেবারে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে

খনিজ-সম্পদে উরাল এবং সাইবেরিয়া সমৃদ্ধ—অথচ দশ বৎসর পূর্ব্বে এ সংবাদ সকলের অজ্ঞাত ছিল। দশ বৎসরে শুষ্ক রিক্ত রাশিয়া একেবারে রত্নমণির ভাণ্ডার হইয়া উঠিয়াছে—এ জন্ত ষ্টালিনের কৃতিত্বের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

হিটলার যখন যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ষ্টালিন তখনই নিজ-নীতি নির্দ্ধারণ করিয়া ফেলেন। তাঁর ইঙ্গিত ছিল—রাশিয়ার যে জায়গা শত্রুরা অধিকার করিবে, সে জায়গা খালি করিয়া চলিয়া যাও—যাহা সঙ্গে লইতে পারিবে লইয়া যাইবে, যাহা লইয়া যাইতে পারিবে না,
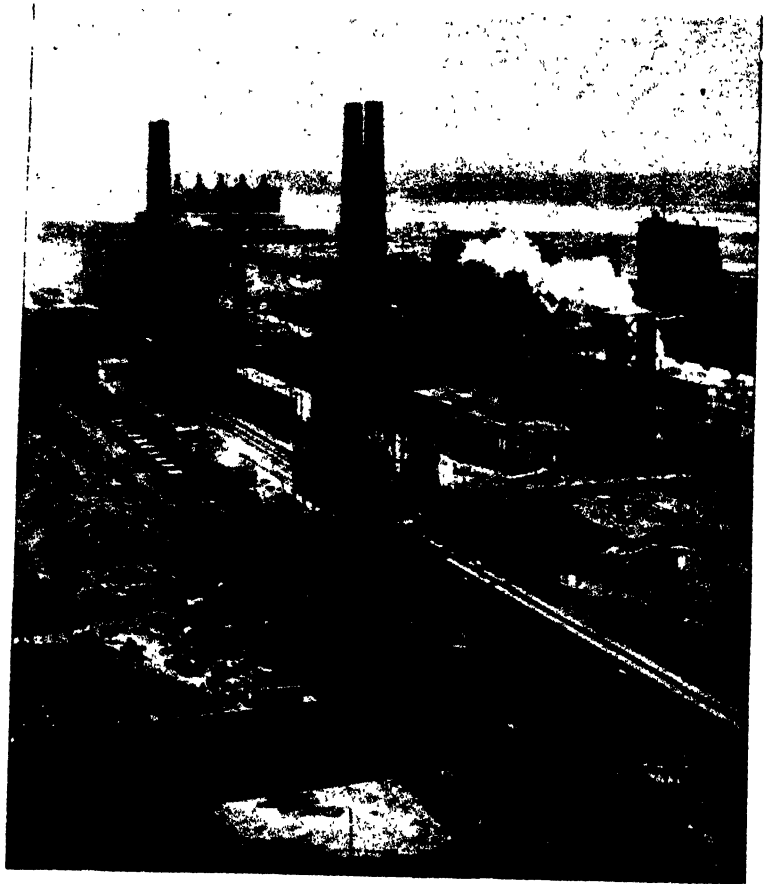
মাগনিতোগরস্কের কারখানা-শ্রেণী

কারখানার দেওয়ালে বোর্ডে লেখা কারিকরদের কাজের হিসাব—মাগনিতোগরস্ক

সমূলে তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়া যাইবে। মায়া-মমতা করিয়া সে-জায়গা আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিবে না বা সেখানে কিছু

বৈদ্যুতিক যন্ত্রে পাহাড় কাটা—উরাল
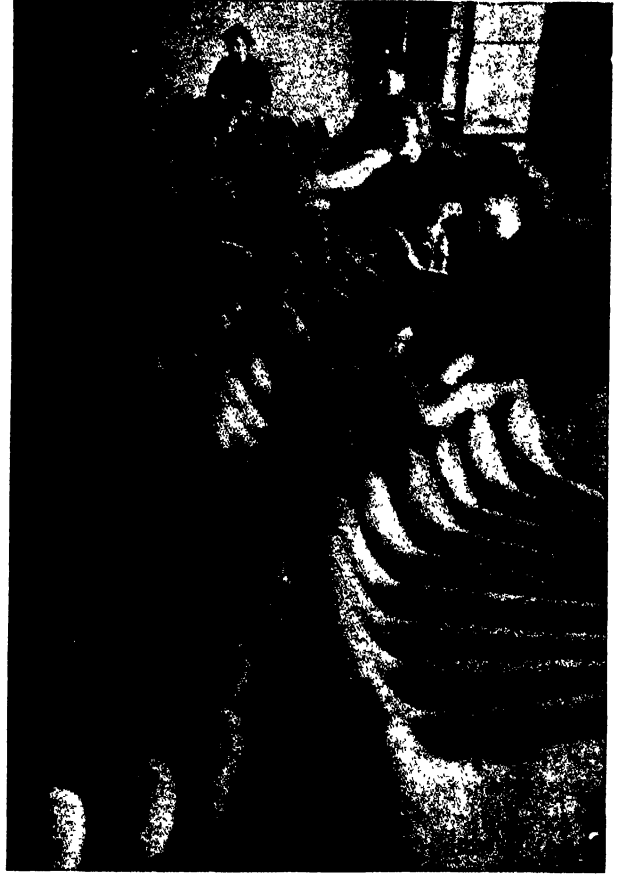
ফেল্ট-বুটের কারখানা

চিরচিক্ নদী—এ নদীর জলের শক্তিতে টাসখান্দের তুলার কল চলে

রাখিয়া যাইবে না। তাঁর এ-কথা রাশিয়ানরা শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেছে—সে জন্ম অশেষ দুঃখ-দুর্গতি সহিলেও রাশিয়া আজো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে—শত্রুকে সবলে প্রতিরোধ করিয়াছে এবং দু'দিন পরে অধিকৃত প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেছে।

রাশিয়া হইতে এ যুদ্ধে যন্ত্রপাতিসহ অসংখ্য কল-কারখানা সশরীরে এশিয়াটিক রাশিয়ায় টানিয়া আনিয়া রাশিয়ানরা সেগুলিকে নিরাপদ, অক্ষয় ও সজীব রাখিতে পারিয়াছে। লেনিনগ্রাডের পুটিলভ কারখানাটিকে তাঁর সমস্ত যন্ত্রপাতি মায় মালপত্রের স্তূপ, মজুত মাল প্রভৃতি অক্ষত অটুট ভাবে রাশিয়া হইতে সরাইয়া ভল্গা নদীর ওপারে আনিয়া নিরাপদে রাখা হইয়াছে। বিবিনিস্কের প্লেনের বিরাট্ কারখানাকেও টানিয়া আনিয়াছে। হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্ল্যান্ট একটা

অতিকায় বস্তু—তাকে নড়ানো সহজ নয়। সেটিকেও আনিয়াছে। যে-সব অংশ আনিতে পারে নাই, তোপের মুখে সে-সব ধ্বংস করিয়া দিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি এ দু'বৎসরে রাশিয়া হইতে উরালে ও সাইবেরিয়ায় লক্ষ লক্ষ রেলগাড়ী বহিয়া আনা হইয়াছে।

বড়-বড় কারখানাগুলির অধিকাংশই এমনি ভাবে সাইবেরিয়ায় ও উরালের নানা স্থানে আনা হইয়াছে। যেখানে আনা হইয়াছে, সে সব জায়গার নাম গোপন রাখা হইয়াছে।

ওদিকে যুদ্ধের বেগ যত বাড়িতেছে, কর্মশালাগুলিতে কর্মীদের শ্রমশক্তিও তত বাড়িতেছে। রাশিয়ান জাতি যেন এ যুদ্ধে সহস্র-বাহু হইয়া কাজ করিতেছে! অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটিতেছে, রাশিয়ান কর্মীদিগের সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই! বহু স্থানে শ্রমিকদল দিনে ৬০০ হইতে ৮০০ গ্রাম মাত্র ওজনের রুটি, তার সঙ্গে দু'টুকরা কাঁটা-মাছ খাইয়া খুশী-মনে কাজ করিতেছে।

শস্য ও খনিজ সম্পদে য়ুরোপীয় রাশিয়া হইতে এশিয়াটিক রাশিয়া বহুগুণ সমৃদ্ধতর; সাইবেরিয়ার বড় বড় নদীগুলি যাতায়াতের পক্ষে মস্ত বড় সহায়; তার উপর দক্ষিণ সাইবেরিয়ার জমির উর্ব্বরতা এত বেশী যে, এখানে যে প্রচুর খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার কল্যাণে সমস্ত রাশিয়ার অন্নাভাব ঘোচে। তার উপর আবার সাইবেরিয়া দুর্গম দুর্দ্ধর্ষ,—ষ্টালিন তাই সাইবেরিয়াকে সকল দিক্ দিয়া নিরাপদ রাখিয়া এ যুদ্ধে নামিয়াছেন। য়ুরোপীয় রাশিয়া যদি জার্ম্মানির হস্তে জর্জ্জরিত হয়, ষ্টালিন জানেন, সে আঘাতের বেদনা হইবে সাময়িক! সে জ্বালা সে বেদনা সাইবেরিয়ার কল্যাণে ঘুচিবে! সাইবেরিয়ার উপর নির্ভর রাখিয়াছেন বলিয়া ষ্টালিন দৃপ্তকণ্ঠে আজো রাশিয়ানদের অভয় দিতেছেন, আশ্বাস দিতেছেন। এবং সে আশ্বাস যে অলীক নয়, তাহা রাশিয়ার লাল ফৌজের বিজয়-দুন্দুভিনাদে সারা পৃথিবীতে বিঘোষিত হইতেছে।

স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য

মেরুদণ্ড

বাড়ী-ঘর মজবুত ও খাড়া রাখিতে হইলে যেমন তার ভিদ এবং দেওয়ালকে পাকা করা দরকার, আমাদের দেহের গড়নকে তেমনি সরল ও সুঠাম রাখিতে হইলে মেরুদণ্ডে জোর থাকা প্রয়োজন। মেরুদণ্ড যদি স্বচ্ছন্দ ও সরল থাকে, তবেই তার জোর! নচেৎ চলাফেরা বসা দাঁড়ানোর বেতালা ভঙ্গীতে আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়,—মেরুদণ্ড সরল স্বচ্ছন্দ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না—মেরুদণ্ড হয় পলকা ও বে-মজবুত। এ জন্ম সামান্য অসুখ-বিসুখ হইলে বা একটু বেশী পরিশ্রম করিলে আমাদের পিঠ টন্‌টন্ করিতে থাকে, শুইয়া বসিয়া পিঠের অস্বাচ্ছন্দ্য ঘুচাইতে অনেকখানি কশরৎ করিতে হয়!

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেন, মেরুদণ্ড যদি মজবুত থাকে, তাহা হইলে প্লুরিশি, নিউমোনিয়ার হাত হইতে যেমন রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেকখানি, তেমনি মেরুদণ্ডের অস্বাচ্ছন্দ্য বা বৈকল্য ঘটিলে প্লুরিশি, নিউমোনিয়া যক্ষ্মা বাত ও পক্ষাঘাত রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে অনেকখানি। মেরুদণ্ডের অস্বাস্থ্য-হেতু পরিপাক-শক্তির গোলযোগ ঘটিয়া ডিস্‌পেপসিয়ার কবলে পড়া অনিবার্য্য হয়।

মেরুদণ্ডকে সরল স্বচ্ছন্দ এবং মজবুত রাখিতে হইলে কয়েকটি বিশেষ ব্যায়াম-বিধির প্রয়োজন। যে সব বিদেশিনী নৃত্যকলায় বিশ্বজয়ী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, মেরুদণ্ডের ব্যায়াম-সাধনায় তাঁদের আন্তরিক অধ্যবসায়ের সীমা নাই। মেরুদণ্ডকে সরল স্বচ্ছন্দ রাখিতে পারিলে দেহে কখনো মেদ জমিবে না—দেহের গঠন থাকিবে চিরদিনের জন্ম যৌবন-সুকুমার; তার উপর স্বাস্থ্য হইবে অক্ষুণ্ণ, এবং পঞ্চাশ বছর বয়সেও দেহের তারুণ্য এতটুকু ক্ষয় পাইবে না। একটু পরিশ্রম করিলে যাঁদের সুগভীর ক্লান্তি ঘটে, যাঁরা হাঁফাইয়া ওঠেন, এ ব্যায়াম-সাধনায় তাঁদের সে উপসর্গ সম্পূর্ণ বিলোপ পাইবে।

এবারে মেরুদণ্ডের ব্যায়াম-বিধির কথা বলি।

১। সিধা খাড়া দাঁড়ান—তার পর হাঁটু মুড়িয়া উঁচু হইয়া বসুন। দুই পায়ের গোড়ালি তুলিয়া শুধু আঙুলের ডগাগুলির উপর ভর দিয়া ১নং ছবির ভঙ্গীতে বসিবেন। বুক যথাসম্ভব চিতাইয়া দুই হাত পিছন দিকে যত দূর পারেন ১নং ছবির মত প্রসারিত করিয়া

১। বুক চিতাইয়া দু'হাত পিছনে

দিন। তার পর বেশ দ্রুত তালে দুই হাত সামনে টানিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। দাঁড়াইবার পর ঠিক আবার এই ভাবেই বসিবেন,—এবং বসিয়া ১, ২, ৩, ৪, ৫ পর্য্যন্ত গণিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়ান। এই ভাবে পাঁচ মিনিটকাল বেশ দ্রুত ভাবে ওঠ্-বোস্ করিবেন। এ ব্যায়ামে সমস্ত অঙ্গ কমনীয়-নমনীয় ছাঁদে গড়িয়া উঠিবে—বুক, পিঠ, পেট জঘনদেশের গঠন হইবে সুকুমার।

২। এবার মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ুন। বুক হইতে মাথা পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া দুই হাত পিঠের উপরে আনিয়া ২নং ছবির ভঙ্গীতে দুই হাত দিয়া দুই হাত ধরুন। উঠিবার পর দুই

২। উপুড় হইয়া শুইয়া

হাত সংলগ্ন রাখিয়া উপরে-নীচে জোরে-জোরে দুলান—সঙ্গে সঙ্গে বুক হইতে মাথা পর্যন্ত পায়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া দুলাইতে হইবে—জলের ঢেউয়ে নৌকা যেমন দোলে তেমনি ভাবে দুলাইতে হইবে। এ ব্যায়ামে দেহ হইবে সুস্থ, সবল এবং স্বচ্ছন্দ।

৩। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইবেন—দাঁড়াইয়া হাঁটুর কাছে ডান পা মুড়িয়া তুলুন—পদ-তল বাঁকাইবেন ৩নং ছবির ভঙ্গীতে এবং

৩। ডান পা হাঁটুর কাছে মুড়িয়া

সেই সঙ্গে কাঁধও। এবার দুই হাত ৩নং ছবির ভঙ্গীতে পিছন দিকে ঝুলাইয়া বুক চিতাইয়া বেশ গভীর ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস লইবেন—দু'মিনিট কাল। তার পর দু'মিনিট ডান পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁটুর কাছে বাঁ পা মুড়িয়া তুলিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ।

৪। সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া দুই হাত ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া বাঁ দিকে একটু হেলিবেন; দুই পা পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে—কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত হেলিবে না—সুদৃঢ় রাখিতে হইবে। এই ভাবে দাঁড়াইয়া দুই হাত এমনি ৪নং ছবির ভঙ্গীতে সংলগ্ন রাখিয়া আবার ডান দিকে হেলিতে হইবে। কোমর হইতে পদতল পর্য্যন্ত না নাড়িয়া কোমর হইতে দেহের উপরার্দ্ধ ভাগমাত্র এই ভঙ্গীতে ডাহিনে-বাঁয়ে দুলাইতে হইবে। পাঁচ মিনিট ধরিয়া এ ব্যায়াম করা চাই।

৫। এবার সিধা খাড়া দাঁড়াইয়া ৫নং ছবির ভঙ্গীতে কোমর হইতে মাথা একবার সামনের দিকে ধনুকের মত নোয়াইয়া দিবেন—দুই হাত ঠিক ঐ ছবির মত সংলগ্ন থাকিবে—তার পর আবার এই অবস্থা
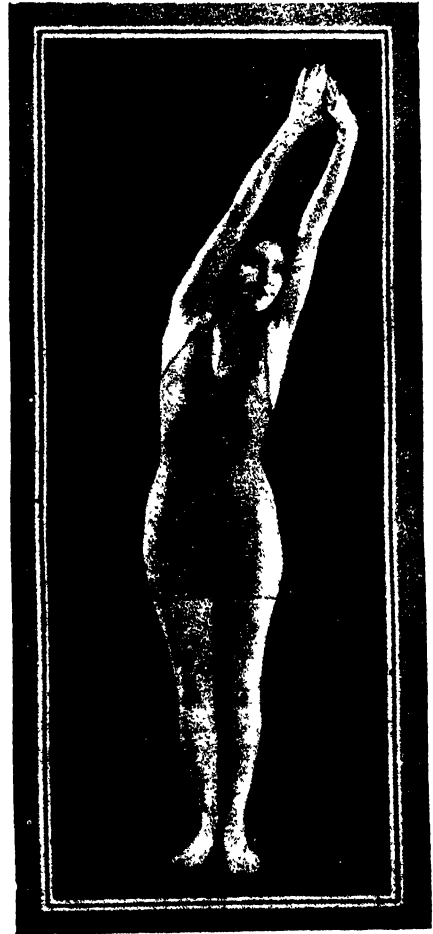
৪। বাঁ দিকে একটু হেলিবেন

হইতে খাড়া দাঁড়াইয়া পিছন-দিকে যথাসম্ভব উপরার্দ্ধ দেহ-ভাগ ৫নং ছবির ভঙ্গীতে হেলাইতে হইবে। বেশ দ্রুত তালে এ ব্যায়াম করা চাই পাঁচ মিনিট। এ ব্যায়ামে মেরুদণ্ড সরল, সবল ও স্বচ্ছন্দ হইবে।

৫। ধনুকের মত নোয়াইয়া

৬। দুই হাত মেঝেয়

। এবার ৬নং ছবির ভঙ্গীতে উপরার্দ্ধ দেহ-ভাগ সামনের দিকে ঝুঁকিবে—এমন ভাবে যে, দুই হাত যেন ঐ ছবির মত মেঝে স্পর্শ করে—দু'হাত আসিবে দুই পায়ের যতখানি কাছাকাছি সম্ভব। এ ব্যায়াম অভ্যাসে কিছু সময় লাগিতে পারে। ৫নং ব্যায়ামে কতকটা অভ্যস্ত হইলে তবেই এ ব্যায়াম-সাধনায় সামর্থ্য জন্মিবে। এ ব্যায়াম কিন্তু করা চাই-ই।

এ কয়টি ব্যায়ামে মেরুদণ্ড হইবে সুস্থ ও মজবুত; দেহ চিরকাল যৌবনবন্ধে রমণীয় ও কমনীয় থাকিবে।

পিতৃস্নেহ

আগে মনে হতো টাকা রাখিব সঞ্চয়
পঞ্চাশ হাজার—যদি লাখ নাহি হয়!
ছেলেমেয়েদের লাগি রেখে যাবো টাকা—
স্বচ্ছন্দে থাকিবে তারা—এ ব্যবস্থা পাকা।
নিজে খাটিয়াছি এত সে-টাকার লাগি
তিলেক বিরাম-শান্তি পাইনিকো মাগি—
আশায় নৈরাশ্য, কত সহেছি বেদনা—
ছেলেমেয়েদের তাহা সহিতে দিব না!

আমার সঞ্চয় লয়ে তাদের জীবন
আরামে-বিলাসে তারা করিবে যাপন!
দেখে-শুনে মনে হয়, হবে বিপরীত!
অপরে রাখিলে ভর হয় নাকো হিত!
চাহিতেই পেয়েছে যে কাম্য সব-কিছু,
শ্রমভারে মাথা যার হয় নাই নীচু,
কোনো কাজে মাথা-হাত খাটে নাই মূলে,
দিন কাটে হাসি-গল্পে, শুয়ে হাই তুলে—

মানুষ সে হয় নাকো—খেলার পুতুল!
ঝড়ে-জলে গলে যায়, নাহি তায় ভুল!
অন্ধ স্নেহ ভুলি সার বুঝিয়াছি তাই—
ছেলেদের দেহ-মন গড়ে দেওয়া চাই!
দেহে-মনে শক্তি চাই—কাজে লজ্জা নয়—
তাহলে জীবনে তার সুনিশ্চিত জয়!
টাকা রাখিবার মত শক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান
না রহিলে সে টাকার কতটুকু জ্ঞান!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

শক্তিপূজা

এই জগৎপ্রপঞ্চের মূলে যে এক অদৃশ্য শক্তি নিহিত আছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রগণ শক্তি-পরিচালিত। শুধু শক্তি-পরিচালিত নহে, নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত। সূর্য্য-চন্দ্র পর্য্যায়ক্রমে দিবাভাগে ও নিশাকালে কিরণ বিতরণ করেন। গ্রীষ্ম-বর্ষা প্রভৃতি ষড় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে আমাদিগকে তাপ, বারি, শিশির ও শীত প্রদান করে। পৃথিবীতে যাবতীয় জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-গুল্ম, লতা-পাদপ শক্তি-প্রভাবে জন্মগ্রহণ করে, বৃদ্ধি পায় এবং কালক্রমে শক্তি-হীন হইলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই প্রক্রিয়ার পশ্চাতে যে শক্তি কার্য্যকরী,—তাহা জড় শক্তি মাত্র নহে; তাহাতে চিৎশক্তিও ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি অথবা মূলপ্রকৃতি।

এই শক্তি কে? কোথা হইতে, কিরূপে উৎপন্ন এবং তাঁহার সামর্থ্যই বা কি প্রকার?—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রের মনে উদিত হয়। জ্ঞানিগণ বলেন এবং পুরাণ শাস্ত্রাদিতেও উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাতে সৃষ্টি-শক্তি, বিষ্ণুতে পালন-শক্তি, শিবে সংহার-শক্তি, সূর্য্যে প্রকাশ-শক্তি, বহ্নিতে দাহিকা-শক্তি, এবং সমীরণে সঞ্চালনী-শক্তি,—এ সকলই সেই একমাত্র আদ্যাশক্তির বিবিধ বিকাশ মাত্র। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি শিব, কি ইন্দ্র, কি অনল, কি সূর্য্য, কি বরুণ—সেই আদ্যাশক্তির সহযোগ ব্যতীত কেহই স্বয়ং স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ নহেন। এই আদ্যাশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। বিষ্ণুতে সাত্ত্বিকী শক্তি আছে বলিয়াই তিনি পালন-কার্য্যে সক্ষম। ব্রহ্মাতে রাজসী শক্তি বিদ্যমান, তাই তিনি সৃজন-পটু। মহেশ্বরে তামসী শক্তি প্রচুর, তাই তিনি সংহারকর্ত্তা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে যিনিই হউন, শক্তিহীন হইলে কেহই কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন। সেই আদ্যাশক্তিই স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও পালন করিতেছেন এবং তিনিই আবার প্রয়োজন-হেতু সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে সংহার করিতেছেন। বস্তুতঃ, শক্তিহীন হইলে সকলেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কি আহার, কি গমন, কি যুদ্ধ-বিগ্রহ কেহই কোন কর্ম্মে সমর্থ হয় না। এমন কি, শিবও শক্তিহীন হইলে শবত্ব প্রাপ্ত হন। দুর্ব্বল মনুষ্যকে লোকে শক্তি-হীন বলে। শক্তিমান্ পুরুষ জগতে পূজনীয়—শক্তিহীন নিন্দনীয়। এই পৃথিবী শক্তিযুক্ত হইয়া নিখিল বস্তু-জাতকে ধারণ করিয়া আছে। শক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের মূল। শক্তিই বরেণ্যা, শক্তিই পূজনীয়া। আমরা সকলেই শক্তির উপাসক।

যিনি শক্তি—তিনিই পরমাত্মা; যিনি পরমাত্মা—তিনিই শক্তি। সর্ব্বভূতে যে চৈতন্য ও সর্ব্বত্রগ নিত্য তেজ তাহাই পরমাত্মা। সেই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্রগ পুরুষ ও প্রকৃতি দুইয়ে এক—একে দুই। এই আদ্যাশক্তিই যোগমায়ারূপে অনন্ত শয্যায় বিষ্ণুকে নিদ্রাভিভূত রাখিয়াছিলেন। মায়াশক্তিরূপে তিনিই জীব-জগৎকে মোহিত রাখিয়াছেন। জ্ঞানিগণ এই সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিকেই ব্রহ্ম, বলিয়া বিবেচনা করেন। এই শক্তি দ্বিবিধা—সগুণা ও নির্গুণা। বিষয়-বিরাগী ব্যক্তিগণ নির্গুণা এবং বিষয়-অনুরাগী ব্যক্তিগণ সগুণার সেবা করেন। সেই চৈতন্যরূপিণী শক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গেরই অধীশ্বরী। তিনি যথাবিধি পূজিতা হইলেই সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করেন। এই মায়াশক্তিবিশিষ্ট ভগবতী নামে কথিত ব্রহ্মের দুই প্রকার রূপ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। তন্মধ্যে অন্তর্ম্মুখ, মায়াশক্তিযুক্ত নিরাকার জ্ঞানরূপ যে রূপ, তাহাই সূক্ষ্ম। জ্ঞানিগণ ঐ রূপকেই সকলের নিদান বলেন। উত্তমাধিকারী জ্ঞানিগণই ঐ রূপের উপাসনায় সক্ষম। আর মধ্যমাদি উপাসকগণের উপাসনার উপযুক্ত বহির্ম্মুখ, মায়াশক্তিযুক্ত যে স্থূল রূপ, তাহাই মধ্যমাধম উপাসকগণ ধ্যানাদিতে অনুভব করিতে পারেন। এই দ্বিবিধ সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপই পরমাত্মার শরীর বলিয়া কথিত হয়।

> কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
> পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥
> পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
> কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥
> উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
> পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥—গীতা।

পুরুষ ও প্রকৃতি কি এবং পুরুষ কেমন করিয়া ও কেনই বা প্রকৃতিস্থ হন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণ সকলই বা কেন ও কিরূপে ভোগ করেন এবং ঐ গুণত্রয়ের সঙ্গহেতু তাঁহার জন্মই বা কেন ও কিরূপে হয়, এই সকল বিষয় সদ্‌গুরুর উপদেশ দ্বারা সাধন-মার্গে উন্নতি লাভ করিলে সাধক ক্রমশঃ নিজেই বুঝিতে পারেন। তবে ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা প্রকৃতিস্থ ও গুণান্বিত হইয়া, মন উপাধি ধারণ পূর্ব্বক, সুখদুঃখ ভোগ করে এবং জীবভাবে সদসদ্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

এই দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতী মহাবিদ্যা মহামায়ারূপিণী অব্যক্ত পূর্ণা প্রকৃতি অল্পবুদ্ধিদের দুর্জ্ঞেয়া। যোগিগণ ইহাকে যোগবলে দর্শন করিয়া থাকেন। ইনি নিত্য (ব্রহ্ম) ও অনিত্য (মায়া) রূপিণী পরমাত্মার ইচ্ছাস্বরূপা। ইনি জগতের আদিভূতা ঈশ্বরী।

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
> এতদ্‌যোনী ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
> অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ গীতা।

যে পরমা আদ্যাশক্তি বেদমার্গে বিদ্যানামে অভিহিতা, যিনি সর্ব্বজ্ঞা, সকলের অন্তর্য্যামিনী এবং সংসার-বন্ধনচ্ছেদনে নিপুণা, দুরাত্মারা যাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু মুনিগণের ধ্যানমার্গে অধিষ্ঠিত হইয়া যিনি প্রত্যক্ষগোচর হন, তিনিই স্বীয় রজঃ সত্ত্ব এবং তমোগুণ দ্বারা যথাক্রমে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিয়া প্রলয়কালে একাকিনী বিরাজ করেন। তাঁহারই সত্ত্বগুণাবস্থায় সাত্ত্বিকী শক্তি মহালক্ষ্মী, রাজসী শক্তি মহাসরস্বতী এবং তামসী শক্তি মহাকালী। তাঁহারই ত্রিগুণ শক্তির পরিণতি ফলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি। মহাসরস্বতী ব্রহ্মার সহিত, মহালক্ষ্মী বিষ্ণুর সহিত এবং মহাকালী মহেশ্বরের সহিত লীলা-সহচরীরূপে সংযুক্ত। সেই সর্ব্বোত্তমা সর্ব্বপূজ্যা, আদ্যাশক্তি অখিল জগৎকে রজোগুণময়ী মহাসরস্বতীরূপে সৃজন ও পালন, সত্ত্বগুণময়ী মহালক্ষ্মীরূপে তমোগুণময়ী মহাকালীরূপে

সংহারকালে সংহার করেন বলিয়া মনীষিগণ তাঁহাকে ত্রিগুণময়ী আখ্যা দিয়াছেন। যিনি এই গুণত্রয়ের অতীতা সর্ব্বকামফলপ্রদা চতুর্থী পরমাশক্তি, তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ। যোগী ব্যতীত এই নির্গুণ শক্তিকে কেহই অবগত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত তাঁহার সগুণ মূর্ত্তিই সহজসাধ্য ও সুখসেব্য। বুধগণ সর্ব্বদা সেই সগুণ মূর্ত্তিকেই চিন্তা করেন। মানবগণ এই মহামায়া আদ্যাশক্তির অংশসম্ভূতা এই সর্ব্বকার্য্যসাধিনী শক্তিত্রয় এবং অন্যান্য সর্ব্বকামপ্রদা শক্তি সকলকে প্রতিমা-মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥

অর্থাৎ—

যে যে ভক্ত দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি।

সেই আদ্যাশক্তি এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর সমস্ত পদার্থেই বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বিবিধ শক্তিরূপে প্রকটিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি নিত্যা, সুতরাং এক রূপেই অবস্থিতা; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির জন্য কার্য্যগৌরব বশতঃ নানা রূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যেমন রঙ্গালয়ে একই নট লোকরঞ্জনহেতু নানা রূপ ধারণ করে, তদ্রূপ সেই আদ্যাশক্তি গুণাতীতা ও অরূপা হইলেও স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদি গুণময় বিবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কার্য্য-কর্ম্মানুসারে ধাতুর অর্থ ও গুণযুক্ত মুখ্যগৌণ ভেদে সেই লীলাময়ী বহুল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মুখ্যতঃ, এই মহামায়ার রূপ দ্বিবিধ,—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যা প্রভাবে জীব মুক্তিলাভ করে। অবিদ্যার প্রকোপে জীব বদ্ধ হয়। কিন্তু এই ভাগবতী মায়াতে নির্দ্দয় ভাব বা বৈষম্য কিছুই নাই। দেব, দৈত্য, মানব সকলেই এই মায়ার অধীন। তিনি জীবের মুক্তির জন্যই সর্ব্বদা প্রযত্নশীল, কারণ, আত্মার গতি সর্ব্বথা ঊর্দ্ধ দিকে। এই জগদীশ্বরী যদি চরাচর জগতের সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে এই জগৎ জড়বৎ হইয়া মায়ায় বিলীন হইয়া যাইত। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া নিখিল জগৎ ও জীবাদি সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মানুসারে সকলকে পরিচালিত করিতেছেন। জন্মজন্মান্তরে যাহার যেমন কর্ম্ম, পরব্রহ্মস্বরূপিণী মহামায়া তাহাদিগকে সেইরূপ ভাবে পরিচালিত করিতেছেন। প্রথমে গুরুমুখে, তাহার পর বেদান্ত-শ্রবণাদি দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া সেই আত্মরূপিণী ভগবতীর পূজার্চ্চনা ও ধ্যান-ধারণা করিলে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে; নতুবা কোটি কোটি কর্ম্ম করিলেও মুক্তি লাভ দুর্ঘট। নিষ্কলাশয় ঋষিগণ সেই আত্মরূপিণী ভগবতীকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ এবং গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরীর উপাসনা করিয়া থাকেন।

পূজা অথবা উপাসনা অধিকারি-ভেদে ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাধকগণের পক্ষে সাত্ত্বিক, বিষয়ীর পক্ষে রাজসিক এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসম্পন্ন লোকের নিমিত্ত তামসিক পূজা বিহিত। জীবন্মুক্ত জ্ঞানীদিগের পক্ষে ত্রিগুণবিহীন জ্ঞানময় মানস যজ্ঞই প্রশস্ত। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, যজমান ও মন্ত্র শুদ্ধ না হইলে, পূজা বা যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না। সকলেই জানেন, পাণ্ডবগণ বহুল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ রাজসূয় ভূরি-দক্ষিণাসহ সমাপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য বনবাস-ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের যজ্ঞে নিশ্চয়ই কোন বৈগুণ্য ঘটিয়াছিল; নতুবা তাঁহাদের ভাগ্যে এরূপ বিপরীত ফল ফলিবে কেন? যখন তাদৃশ শক্তিশালী ও গুণশালী মহাত্মগণের কর্ম্মে দ্রব্য, ক্রিয়া ও মন্ত্রের শুদ্ধিহানি ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সাধারণ বিশেষতঃ কলির ক্ষীণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মে যে বৈগুণ্য ঘটিবে, তাহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। মানব সচরাচর দ্রোহাদির দ্বারা অর্জ্জিত দ্রব্যাদির দ্বারা এবং ঈর্ষা, দ্বেষ ও হিংসা-কলুষিত মন দ্বারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাই সুফল লাভে বঞ্চিত হয়। মন নির্ম্মল না হইলে পূজার্চ্চনা ফলদায়ক হয় না। এমন কি, ঋত্বিক্ ও আচার্য্যের মনও বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যজমানের শুভাশুভ তাঁহাদের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে। যাহার মন যত নির্ম্মল, সে তত অধিক ফল প্রাপ্ত হয়। শত্রু বিনাশ অথবা আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থোন্নতির নিমিত্ত কোন কার্য্য করিলে প্রায়ই তাহা বিপরীত ফল প্রদান করে।

শাস্ত্রে আছে, সাত্ত্বিক যজ্ঞ অতি দুর্লভ, বৈখানস মুনিগণেরই উহা বিহিত, অন্যের পক্ষে নহে। যে সকল তাপস প্রতিদিন মুনিগণের হিতকর সুসংস্কৃত ফলমূলাদি সাত্ত্বিক বস্তু সকল ন্যায়-মার্গানুসারে সংগ্রহপূর্ব্বক ভোজন করেন, তাঁহারা পরম শ্রদ্ধাসহকারে যথাবিধি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পুরোডাশাদি দ্রব্য দ্বারা পশুহিংসাবিহীন যে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাহাই পরম সাত্ত্বিক যজ্ঞ। বিষয়ী ব্যক্তি অভিমানপূর্ণ হৃদয়ে বহুল উপকরণাদি সমন্বিত পশুহিংসাযুক্ত যে সুসংস্কৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহা রাজস; আর দুর্বৃত্তগণ ক্রোধ, অমর্ষ, ক্রুরতা, স্পৃহাদিপূর্ণ হৃদয়ে যে গর্ব্বোদ্দীপক যজ্ঞ করিয়া থাকে, তাহাই তামস যজ্ঞ। সংসারবিরাগী মোক্ষাভিলাষী মহাত্মা সাধকগণ মনে মনে সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক যে যজ্ঞ করেন, তাহার নাম মানস যজ্ঞ। এই মানস পূজা যেমন সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হয়, অন্য কোন প্রকার যজ্ঞই সেরূপ হয় না। কারণ, অন্যান্য সমুদয় যজ্ঞই যথাবিহিত দ্রব্যাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও উপযুক্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা সাধিত হইলেও, দেশ-কাল ও দ্রব্যাদি সমস্ত উপকরণেই পার্থক্যবশতঃ ন্যূন হইয়া থাকে।

এই মানস যজ্ঞের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমে চিত্তকে গুণবিহীন করিয়া পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে দেহও শুদ্ধ হয়। দেহ ও মন পবিত্র হইলে মানব এই মানস অম্বা-যজ্ঞের অধিকারী হয়। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ এইরূপ যে, দেহ ও মন শুদ্ধ হইলে যজ্ঞীয় পাদপস্বরূপ—চিত্তস্থৈর্য্যাদি সম্ভূত, সুবৃহৎ ও মসৃণ স্তম্ভসমূহ দ্বারা সুশোভিত, বহু যোজন বিস্তৃত মানস মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে মানসিক বিশদ বেদী কল্পনা পূর্ব্বক, মনে মনেই সেই বেদীমধ্যে যথাবিধি পঞ্চাগ্নি স্থাপন এবং ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, হোতা, প্রস্তোতা, উদ্গাতা, প্রতিহর্ত্তা ও সদস্যরূপে ব্রাহ্মণগণকে বরণান্তে, ঐরূপ মনে মনেই সেই দ্বিজবরগণকে যত্নাতিশয্য সহকারে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান নামক দেহমধ্যবর্ত্তী পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চাগ্নিরূপে বেদী মধ্যে

যথাবিধি স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে প্রাণ-বায়ুকে গার্হপত্যাগ্নি, অপান-বায়ুকে আহবনীয়াগ্নি, ব্যান-বায়ুকে দক্ষিণাগ্নি, সমান-বায়ুকে আবসথাগ্নি ও উদান-বায়ুকে সভ্যাগ্নিরূপে ভাবনা করিতে হইবে এবং ঐ অগ্নিপঞ্চককে সাতিশয় প্রজ্বলিত বোধ করিবে। এইরূপে মনে মনে নির্গুণ পরম পবিত্র উপকরণ দ্রব্যাদিও ভাবনা করিতে হইবে।

মনই এই মানস যজ্ঞের হোতা ও মনই যজমান এবং নির্গুণ সনাতন ব্রহ্মই উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর যিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আধার ও ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী এবং যিনি সর্ব্বগুণান্বিতা, সেই কল্যাণরূপিণী আদ্যাশক্তিই সেই যজ্ঞের ফলদাত্রী। অনন্তর দ্বিজ(সাধক)গণ মনঃকল্পিত দ্রব্যনিচয় সেই যজ্ঞফলদাত্রী ভগবতীর উদ্দেশে প্রাণাগ্নিতে হোম করিবেন। পরে চিত্তকে নিরাশ্রয় করিয়া সুষুম্না-রন্ধ্র দিয়া প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুরূপ পঞ্চ অগ্নিকেও শাশ্বত ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। এইরূপে সমাধি উৎপন্ন হইলে, সেই সমাধি যোগবলে নির্ব্বিকল্পক চিত্তে স্বীয় অনুভূতি দ্বারা আত্মস্বরূপিণী সাক্ষাৎ মহেশ্বরীকে নিরাকুল চিত্তে ধ্যান করিতে হইবে। অনন্তর যখন আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং অখিল ভূতগণকেই আপনাতে অবস্থিত দেখিবে, তখনই সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মঙ্গলময়ী দেবীর সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইবে।

মানস পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। কিন্তু মানস পূজা সকলের সাধ্য নহে। সাধারণ মানব সংসার-ধর্ম্মে লিপ্ত, বাসনা কামনায় লুব্ধ। সাত্ত্বিক পূজাও তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে; রাজসিক পূজাই তাহাদের পক্ষে প্রশস্ত। এই নিমিত্তই প্রতিমা মূর্ত্তিতে প্রতীক পূজা সাধন-পথের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন,—

> উপাসকানাং কার্য্যায়, পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
> গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্।

সাত্ত্বিক পূজা উৎকৃষ্ট, রাজসিক অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট; তামসিক পূজা নিকৃষ্ট হইলেও নিরর্থক নহে। সকলেই সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা করে এবং স্ব স্ব জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সামর্থ্যানুযায়ী ফললাভ করে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—অবিধিপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে পূজা করিলেও সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করা হয় এবং

> পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥—গীতা।

পার্থক্য এই যে, দেবার্চ্চনাকারী দেবলোক, পিতৃগণের অর্চ্চনাকারী পিতৃলোক এবং ভূতপূজাকারিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হয়। যে যেরূপে যে রূপ কামনা করিয়া পূজা করে, তাহার সেইরূপ ফল প্রাপ্তি ঘটে। সেই আদিভূত সনাতনী বাঞ্ছাকল্পতরু। ভক্তের বাঞ্ছা পূরণই তাঁহার স্বভাব; তবে প্রযতাত্মা অর্থাৎ সংযতাত্মা হইয়া প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতে হইবে এবং আকাঙ্ক্ষা ও স্ব স্ব শক্তি ও ভক্তির অনুকূল হইবে। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষায় আমাদের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্যহীন। আমরা এক নিশ্বাসে যাচ্ঞা করি,—

> আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
> পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥

আমরা প্রার্থনা করি,—

> রাজ্যং দেহি শ্রিয়ং দেহি বলং দেহি সুরেশ্বরি।
> কীর্ত্তিং দেহি ধনং দেহি যশঃ কান্তিঞ্চ দেহি মে॥
> কামং দেহি মতিং দেহি ভোগান্ দেহি মহেশ্বরি।
> জ্ঞানং দেহি চ ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সিতম্॥
> প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকারমেব চ।
> জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পুরমৈশ্বর্য্যমেব চ॥

এই যে "দেহি দেহি,"—এত দিলে তাঁহার কি থাকে? এবং এত পাইবার যোগ্যতাই বা কয় জনের আছে? ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ অনেক পাইয়াছিল, রাখিতে পারে নাই; হিরণ্যকশিপু প্রচুর পাইয়াছিল, রাখিতে পারে নাই; কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দুর্য্যোধন প্রভৃতি অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিল, রাখিতে পারে নাই। তাহার একমাত্র কারণ,—ঐশ্বর্য্য-লাভে ঘটে মদান্ধতা; ঐশ্বর্য্যকে সংযত ভাবে ভোগ করিবার এবং ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করিবার যোগ্যতার অভাব; ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্ব্বলের পীড়ন, নিরীহের নির্য্যাতন এবং নিরঙ্কুশ অনাচার ও অত্যাচার! পক্ষান্তরে, দেবী পূজা করিয়া সুরথ রাজা রাজ্যশ্রী লাভ করিয়াছিলেন, বৈশ্য সমাধি-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিল এবং শ্রীরামচন্দ্র বিজয় লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং চাই—আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ—প্রার্থনার সমতুল যোগ্যতা ও সাধনা।

আমাদের বাসনা কামনা ও আমাদের সাধনা ও সুকৃতি এবং সামর্থ্য ও সঙ্গতির অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। শক্তি-সাধনা কখনও বিফল হয় না। সাধনায় সিদ্ধি সুনিশ্চিত। কিন্তু সাধনা ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিয়ম, শুচিতা ও সংযম-সাপেক্ষ। শরণাগতি সাধনার মুখ্য উপায়।

> শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
> সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
> সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
> ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

তব লাগি কাঁদে মম স্বপনের সাধ

ফুল হয়ে কেন প্রিয়, ফুটিলে না বনে?
মালা গেঁথে পরিতাম বুকে সযতনে!
চাঁদ হতে তুমি যদি আমি হয়ে ভরা নদী
সারা নিশি রাখিতাম নয়নে নয়নে।

তুমি নহো ফুল—নহো আকাশের চাঁদ—
তব লাগি কাঁদে মম স্বপনের সাধ,
ভালোবাসে যে যাহারে—কভু সে পায় না তারে
চাতকী কাঁদিয়া মরে নিশীথ-শয়নে।

বন্দে আলী মিঞা।

রত্ন-ভাণ্ডার

অনেক দিন আগেকার কথা। এক দেশে ছিলেন রাজা। রাজার নাম নারায়ণচন্দ্র। তিনি যেমন সাহসী, তেমনই উদারচেতা ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মহারাণী লক্ষ্মীদেবী ছিলেন রূপে-গুণে লক্ষ্মী। রাজদ্বার থেকে অতিথি কখনও না খেয়ে ফিরে যেত না। রাজ্যে কার কি অভাব, রাজা-রাণী তার তত্ত্বাবধান করতেন। এত বেশী দান-ধ্যানের জন্য অনেক সময় তাঁদের থাকতে হতো সামান্য গৃহস্থের মত—সে জন্য কারও মনে এতটুকু দুঃখ ছিল না!

প্রাসাদের সংস্কার হয়নি অনেক দিন। দেয়ালের চুণ-বালি খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে, দু'-চার যায়গায় ফাট ধরেছে, ভাঙন সুরু হয়েছে। লক্ষ্মীদেবী মহারাজকে বল্লেন—"প্রাসাদটা ভেঙ্গে পড়ছে। সবটা ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করলে ভালো হয়। কি বলো?" নারায়ণচন্দ্র উত্তর দিলেন—"আমিও তো চাই তাই! কিন্তু একটা বাধা আছে। সেই জন্যই এত দিন সারাবো মনে করেও সারাতে আমার সাহস হয়নি।" লক্ষ্মীদেবী আশ্চর্য্য হয়ে জিগ্যেস করলেন—"কি এমন বাধা? কই, আমি তো কখনও শুনিনি!" মহারাজ বললেন—"কথাটা যত দূর সম্ভব আমরা গোপন রাখবার চেষ্টা করি। কেউ জানে না। বংশ-পরম্পরায় এক জনকে শুধু এ কথা জানানো হয়। বাবার কাছ থেকে আমি জেনেছি, বাবাকে বলেছিলেন আমার ঠাকুর্দ্দা, তাঁকে জানিয়েছিলেন তাঁর বাবা। প্রাসাদের নীচে ক'টি গুপ্ত কুঠরী আছে। সেখানে এক দল ব্রহ্মদৈত্য বাস করে। তারা ভারী ভালো! আমাদের কখনও কোন অপকার করেনি বরং উপকারই করেছে! বহু দিন থেকে তারা এইখানে রয়েছে। বাড়ী ভেঙ্গে ফেলে আবার নতুন করে তৈরী করলে হয়তো তাদের অসুবিধা হতে পারে। অতিথিকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। তাতে তারা রাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে হয়তো। আমাদের সৌভাগ্যও হয়তো তাদের সঙ্গে চলে যেতে পারে।"

সব শুনে মহারাণী লক্ষ্মীদেবী বললেন—"কথাটা ঠিক বলেছ। থাক্, তবে দরকার নেই! তার চেয়ে সে টাকায় গরীব-দুঃখীদের খাওয়ালে কাজ হবে।"

রাত্রে মহারাজ-মহারাণী ঘুমুচ্ছেন, এমন সময় অনেকগুলি পদ-শব্দে তাঁদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাঁরা উঠে বসলেন। একটু পরেই অর্গল-বদ্ধ দরজা আপনি খুলে গেল। ক'জন ক্ষুদে লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। তাদের মধ্যে এক জন ছিল বৃদ্ধ। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে সকলের মুখপাত্র হয়ে বলল—"তোমাদের কথা আমাদের কাণে গেছে। আমরা আদেশ দিচ্ছি, তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রাসাদ সংস্কার কর। আর আমাদের ঘরগুলি একটু ভাল করে সারিয়ে দিও, বড্ড স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। এর জন্য তোমাদের কোন অর্থ লাগবে না। তোমাদের অর্থে গরীব-দুঃখীদের খাইয়ো। বাড়ী তৈরী করবার অর্থ যা লাগে, সব আমরা দেব। সকালে উঠে দেখবে, মহারাণীর গহনার সিন্দুকে অর্থপূর্ণ একটি থলে রয়েছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখে থাক।" এই কথা বলে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

মহারাজ-মহারাণী দু'জনেই অবাক্ হয়ে বসে রইলেন। নিজেদের চোখকে তাঁরা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। এ কি স্বপ্ন! বাকী রাতটুকু তাঁরা জেগেই কাটালেন। ভোর হতেই মহারাণী গহনার সিন্দুক খুললেন। এ কি! সত্যিই যে প্রকাণ্ড থলে রয়েছে! মোহরে ভরা! তবে তো স্বপ্ন নয়। এ সত্য! ব্রহ্মদৈত্যদের উদ্দেশে দু'জনে প্রণাম জানালেন। এ কথা আর কারো কাছে প্রকাশ করলেন না।

সে দিন থেকেই প্রাসাদ ভাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে জীর্ণ পুরানো প্রাসাদের স্থানে নূতন সুদৃশ্য প্রাসাদ গড়ে উঠল। গৃহ-প্রবেশের দিন মহারাজ-মহারাণী রাজ্য-শুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। সমস্ত দিন ধরে যজ্ঞি—খাওয়া-দাওয়া চললো। সব চুকে গেলে মহারাণী বললেন—"যে এ-প্রাসাদে বাস করবে, প্রতি বছর এই দিনে রাজ্যশুদ্ধ লোকদের সে খাওয়াবে।"

তার পর থেকে প্রতি বৎসর গৃহ-প্রবেশের তারিখে রাজপ্রাসাদে রাজ্যশুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ হতো এবং সকলে হৈ-চৈ করে খেয়ে দেয়ে রাজপরিবারকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে বাড়ী ফিরত! কিছু-দিনের মধ্যে এই খাওয়ানোটা পূজা-পার্ব্বণের মত পবিত্র নিয়মে দাঁড়িয়ে গেল।

বছর দশেক পরে মহারাণী লক্ষ্মীদেবী মারা গেলেন। মরবার সময় একটা কাগজে তিনি লিখে দিয়ে গেছেন—"প্রতি বৎসর গৃহ-প্রবেশের তারিখে যে এই প্রাসাদে বাস করবে, রাজ্যশুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করে তাকে খাওয়াতে হবে।" মহারাজকে বললেন—কাগজটিকে রাজ্যের দরকারী কাগজের সিন্দুকে রাখতে আর যাতে কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি দিতে। মহারাণীর মৃত্যুতে দেশশুদ্ধ লোক যেন নিজের মাকে হারিয়েছে এমনি ভাবে হাহাকার করতে লাগল।

সময়ে সব ব্যথাই সয়ে যায়, মানুষ সব কষ্ট ভুলে যায়; কিন্তু সুনাম চিরকাল থাকে! মৃতা মহারাণীকে কেউ ভুলতে পারল না। লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর মহারাজ বছর ছয়েক বেঁচেছিলেন। তার পর ওপার থেকে তাঁরও ডাক এল। তিনি চলে গেলেন। তাঁদের একমাত্র পুত্র ভবানীপ্রসাদ রাজা হলেন। তিনি মহারাজের সকল সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। মায়ের কথামত তিনি প্রতি বৎসর সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন, তা ছাড়া প্রত্যেকের প্রত্যেক অভাব-অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

মহারাজ নারায়ণচন্দ্র মারা যেতে পাশের রাজ্যের রাজা ভীমসেন ঠিক করলেন, ভবানীপ্রসাদকে আক্রমণ করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নেবেন। কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রী বেঁচে থাকতে তা সম্ভব হয়ে উঠল না; কারণ, তিনি খুব চৌখস ব্যক্তি ছিলেন। মন্ত্রী মারা যেতেই রাজ্যের সেনাপতি অকৃতজ্ঞ রুদ্রপীড় বিপক্ষের দলে যোগদান করল। দেখতে দেখতে শত্রুসৈন্য দেশ ঘিরে ফেললে। ভবানীপ্রসাদ বীর, কিন্তু প্রজা-বৎসল ছিলেন। শত্রুদলে সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং যুদ্ধে জয়ের কোন আশা নেই, অনর্থক লোকক্ষয় হবে দেখে স্ত্রী-পুত্র সহ গোপনে তিনি দেশত্যাগ করলেন। বিপক্ষদলকে একটি চিঠি

লিখে পাঠালেন যে, তিনি বিনা-যুদ্ধে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, প্রজাদের ওপর যেন কোনরূপ অত্যাচার না করা হয়। প্রাসাদে একটি বৃদ্ধ ভৃত্য রইল। আক্রমণকারীরা বিনা ক্ষতিতে বিনা রক্তপাতে দেশ জয় হ'ল দেখে খুশীই হ'ল। রুদ্রপীড়কে তাঁরা রাজা করে দিলেন এবং প্রতি বৎসর আয়ের অর্দ্ধাংশ করস্বরূপ দেবার আদেশ দিয়ে ভীমসেন নিজরাজ্যে চলে গেলেন।

রাজা হয়ে রুদ্রপীড় ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগল। লোকদের পীড়ন করে রাজস্ব বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কারণ, অর্দ্ধাংশ কর দিলে তার আয় কমে যাবে। ক্রমে গৃহ-প্রবেশের তারিখ এল। বৃদ্ধ ভৃত্য প্রজাদের খাওয়াবার কথা বলাতে রুদ্রপীড় অট্টহাস্যসহ বললে,—"ও সব কথা ভুলে যাও। আগেকার রাজাদের মত পাঁচভূত খাইয়ে আমি অর্থ নষ্ট করতে ভালবাসি না। আমি রাজা, প্রজারা আমার ব্যয়ের জন্য অর্থ দেবে। ভবিষ্যতে এ রকম বেয়াদবির কথা আমার সামনে আর উচ্চারণ কোরো না।"

প্রজাদের নিমন্ত্রণ হলো না। রুদ্রপীড় বেশ খেয়ে দেয়ে শুতে গেল। রাত্রে হঠাৎ তার ঘুম গেল ভেঙ্গে! কার যেন পায়ের শব্দ! ধীরে ধীরে শোবার ঘরের বন্ধ-দরজা খুলে গেল। একটি মহিলা-মূর্ত্তি ঘরে ঢুকল! সে মূর্ত্তির এক হাতে একটি কাগজ আর এক হাতে জলন্ত প্রদীপ! রুদ্রপীড় ভয়ে কাঠ হয়ে গেল—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। খাটের কাছে এসে মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে পড়লো। কাগজের লেখাগুলি লক্ষ্মীদেবীর বাণী। ধীরে ধীরে সেগুলি প্রকাণ্ড হয়ে উঠল আর সেই লেখা থেকে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগল। রুদ্রপীড় ভয়ে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। যখন জ্ঞান হলো তখন সব নিস্তব্ধ। সকাল হয়ে গেছে।

রাত্রের কথা কাউকে সে বললে না। সে দিন সন্ধ্যা থেকে প্রাসাদের পাহারা দ্বিগুণ করে দিলে। রাত্রে নিজের বাছাই বাছাই কয়েক জন বন্ধুবান্ধব নিয়ে রুদ্রপীড় খেতে বসল—চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়। খাবার দেওয়া হয়েছে, সকলের পাতে সুগন্ধ পোলাও কালিয়া, কিন্তু রুদ্রপীড়ের পাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুলের অম্বল। তিনি তো মহা খাপ্পা! এ কি ব্যাপার! কার এত বড় স্পর্দ্ধা! স্বয়ং রাজার সঙ্গে চালাকী। তখনই পাচকের ডাক পড়ল! বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে পাচক এসে হাজির। রুদ্রপীড় প্রশ্ন করলে,—"আমার পাতে এ সব কি দিয়েছ?" পাচক উত্তর দিলে—"আজ্ঞে মহারাজ, সকলের পাতে যা দিয়েছি আপনার পাতেও তাই দিয়েছিলুম।" রুদ্রপীড় রেগে বললে,—"এখানে এসে সব বদলে গেল—কেমন? মিথ্যা কথার জায়গা পাও নি!" বৃদ্ধ ভৃত্য কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। গম্ভীর ভাবে সে বললে—"পাচকের কথা সত্য মহারাজ! আমার সামনে ও খাবার পরিবেষণ করেছে।" এক জন বন্ধু বললে—"বেশ তো, খাবার বদলে দিয়ে দেখা যাক না।" তখনই পাচক আবার সব সাজিয়ে নিয়ে এল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, রুদ্রপীড়ের সামনে রাখতেই সুগন্ধ পোলাও কালিয়া শুকনো ভাত আর তেঁতুলের অম্বলে পরিণত হ'ল। সকলে অবাক্! এ কি করে সম্ভব! আর এক জন বন্ধু বললে—"পাত বদলাবদলি করলে কেমন হয়?" তাই করা হ'ল; কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের কথা, রুদ্রপীড় যে পাত্রে বসেছিল সেই পাত্রে আবার সুগন্ধ পোলাও কালিয়া, আর যে পাত্রে গিয়ে বসল তাতে শুকনো ভাত আর তেঁতুলের অম্বল। রাগে এবং ভয়ে রুদ্রপীড় আসন ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। বললে—"আমার ক্ষিধে নেই। একটু সরবত খাব।" তাকে লাল সরবত দেওয়া হলো। কিন্তু মুখে দিতেই সরবত জলে পরিণত হলো। সকলে হাঁ হয়ে রইলো। নিশ্চয় এ ভৌতিক ব্যাপার! কোন মতে খাওয়া সেরে সকলে উঠে পড়ল।

পরদিন ভোর হতেই রুদ্রপীড় রটিয়ে দিলে, বিশেষ কাজে মহারাজ ভীমসেন তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কথাটা অবশ্য সর্ব্বৈব মিথ্যা। সকলেই বুঝল ব্যাপারটা কি—যদিও মুখে কেউ কিছু বললে না। রুদ্রপীড় তল্পিতল্পা গুটিয়ে সেই দিনই সরে পড়ল।

মহারাজ ভীমসেনকে গিয়ে রুদ্রপীড় বললে—"মহারাজ, আমার শরীরটা বড় খারাপ। আমায় ছুটী দিন।" তার ওপর মহারাজ অসন্তুষ্টই ছিলেন। প্রজাদের প্রতি তার অত্যাচারের কাহিনী তিনি শুনেছিলেন! তা ছাড়া, বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করতে তাঁর মন উঠছিল না। কিন্তু উপকারীর অপকার তো করতে পারেন না! এই সুযোগে তিনি রুদ্রপীড়কে রাজ্যচ্যুত করলেন এবং কিছু মাসহরা দিয়ে তার অন্যত্র থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। উভয় পক্ষই বেঁচে গেল। বলা বাহুল্য, আসল ব্যাপারটা রুদ্রপীড় মহারাজকে জানায়নি, পাছে তাকে কাপুরুষ মনে করেন!

ভীমসেন নিজের ছোট ভাই লক্ষ্মণসেনকে সেই দেশের রাজা করে দিলেন। লক্ষ্মণসেন সেই দিনই একমাত্র কন্যা মঞ্জুলিকাকে নিয়ে চলে গেলেন। সঙ্গে গেলেন তাঁর এক বিশেষ বন্ধু মোহনলাল।

লক্ষ্মণসেন লোক ভাল। অতি সরল এবং সহৃদয়, কিন্তু ভয়ানক কান-পাতলা। তাঁর বন্ধু মোহনলাল নিজেকে খুব বীর এবং যোদ্ধা বলে মনে করেন এবং তাই বলেই পরিচয় দেন, কিন্তু আসলে তিনি ভারী ভীতু। বিরাট দেহ, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, সর্ব্বদা রণসজ্জায় সজ্জিত—দেখলেই ভয় হয়। লক্ষ্মণসেন তাঁকে করে দিলেন সেনাপতি।

দু'জনেই দেশের প্রথার কথা শুনলেন। লক্ষ্মণসেনের ইচ্ছা ছিল, গৃহ-প্রবেশের তারিখে সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবেন। মঞ্জুলিকাও তাঁকে ধরে বসেছিল। কিন্তু মোহনলাল বললে—"ছিঃ ছিঃ, এও কি একটা কথার কথা! যত সব আজগুবি ব্যাপার!" ছোটলোকদের খাইয়ে অর্থ নষ্ট করা ভস্মে ঘী ঢালার সমান। মহারাজ কান-পাতলা লোক। অপরের মতেই তাঁর মত। তিনি বললেন—"তা কথাটা ঠিকই বলেছ। পয়সা নষ্ট তো বটেই। সে টাকায় অনেক কাজ করা যাবে। কিন্তু এই যে সকলে বলছে, রাজপুরীর সৌভাগ্য এর ওপর নির্ভর করে—তার কি করা যায়?" মোহনলাল খাপের মধ্য থেকে তরোয়াল বার করে আবার সেটা খাপে ঢুকিয়ে রেখে বললে—"যত সব বাজে কথা! মানুষে এ কথা বিশ্বাস করে? কে বলেছে, শুনি? ঐ বুড়ো চাকরটা তো? ও ব্যাটা এই খাওয়ানোর ব্যাপার থেকে কিছু পয়সা মারে, তাই এত টান!" মহারাজ মাথা চুলকে বললেন—"কিন্তু ভূতপূর্ব্ব মহারাণী লক্ষ্মীদেবীর কথা?" "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন।" মোহনলাল গর্জ্জে উঠল। "ও সব ভৌতিক ব্যাপার গল্পেই শোভা পায়। একবার বন্ধ করে দেখাই যাক না, কি হয়!" মহারাজ বললেন—"বেশ, যখন বলছ, তাই না হয় করছি। কিন্তু যদি কিছু হয়—" বুক ফুলিয়ে গোঁফে হাত বুলিয়ে মোহনলাল বললে—"কিছু ভাববেন না। আমি আছি।"

প্রজাদের নিমন্ত্রণের তারিখের সাত দিন পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের

শয়ন-কক্ষে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মধ্যরাত্রে কি এক শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চমকে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। একখানি জ্বলন্ত হাত ঘরের মধ্যে এসে হাজির হলো। তার পর দেওয়ালের উপর আগুনের অক্ষরে লিখে দিলে—"সাবধান! মহারাণী লক্ষ্মীদেবীর আদেশ-পালনে যেন অন্যথা না হয়।" ঘর থেকে হাত বেরিয়ে গেল! দরজা আপনা-থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে লেখাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। লক্ষ্মণসেন ভীত বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন!

সকাল হতেই মহারাজ তাঁর বন্ধু মোহনলালকে ডেকে নিভৃতে রাত্রের কথা জানালেন। মোহনলাল নাক সিঁটকে বললে—"ও-সব অতিভোজনের ফল! নিশ্চয় আপনি স্বপ্ন দেখেছেন! আজ অল্প খেয়ে দেখবেন, কিছুই হবে না।" মহারাজ সে রাত্রে অল্প খেলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। পরদিন একেবারে উপবাস করলেন, তাতেও সেই অগ্নিময় হাত আসা বন্ধ হলো না। মহারাজ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন।

নির্দিষ্ট তারিখের তিন দিন আগেকার কথা। সন্ধ্যার সময় মহারাজের সঙ্গে মোহনলালের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। মহারাজ বললেন—"প্রথমত প্রজাদের নিমন্ত্রণ করাই ভাল। ব্যাপারটা বড় সুবিধার ঠেকছে না। আমার রীতিমত ভয় হচ্ছে।" মোহন-লাল ঠাট্টা করে বললে—"ভয়! কি বলছেন আপনি? ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় হতে পারে, কিন্তু আপনি পুরুষ মানুষ—আপনার ভয়!" মহারাজ বিরক্ত হয়ে বললেন—"মুখে বলা খুব সহজ! আমার মত অবস্থায় পড়লে বুঝতে পারতে!" মোহনলাল হেসে বললে—"ও-সব ভৌতিক ব্যাপার আমি বিশ্বাস করি না। হয় চোখের ভুল, না হয় কোন দুষ্ট লোকের কারসাজি!" মহারাজ উত্তর দিলেন—"তুমি দেখনি তাই লম্বা-চওড়া কথা বলছ। একবার দেখলে বুঝতে পারতে, সে কি ভীষণ ব্যাপার।" মোহনলাল কোষ-বদ্ধ তরোয়াল নেড়ে বললে—"আমার সঙ্গে চালাকি করতে এলে এমন শিক্ষা দেব যে, ভবিষ্যতে আর জ্বালাতন করতে সাহস করবে না।" মহারাজ বললেন—"বেশ, এক কাজ কর।" মোহনলাল জিগ্যেস করলে—"কি কাজ বলুন?" মহারাজ বললেন—"তুমি এক রাত্রি আমার শোবার ঘরে থাকো। আর যদি পারো এই ভৌতিক ব্যাপারের হেস্তনেস্ত করে দাও।" মোহনলাল বললে—"বেশ। এক দিন করলেই হলো।"

এমন সময় প্রতিহারী এসে খবর দিলে, এক জন যুবক মহারাজের দর্শন-প্রার্থী। দেখে মনে হয় যেন রাজপুত্র। লক্ষ্মণসেন লোক ভাল ছিলেন, তা ছাড়া তাঁর মনে একটু ভয়ও ছিল। ভাবলেন, দরকার হলে যুবক হয়তো সাহায্য করতে পারবে! প্রতিহারীকে বললেন—"অবিলম্বে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।" প্রতিহারী চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরে যুবককে নিয়ে হাজির হলো।

অভিবাদন করে যুবক বললে—"মহারাজ, আমি বহু দূর থেকে আসছি। ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আজকের জন্য আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।" লক্ষ্মণসেন বললেন—"বেশ তো। কিন্তু তোমার পরিচয়?" যুবক উত্তর দিলে—"আমি এক জন সামান্য লোক—এমন কোন পরিচয় নেই যাতে আপনি আমায় চিনতে পারবেন।" মোহনলাল বললে—"কিন্তু এক জন অজ্ঞাত লোককে—" মহারাজ প্রতিধ্বনি করলেন—"বটেই তো! শাস্ত্রে বলেছে, অজ্ঞাত কুলশীলকে বিশ্বাস করবে না!" যুবক উত্তর দিলে—"আপনি উচিত কথাই বলেছেন। আমি যাচ্ছি।" যুবক গমনোদ্যত, ঠিক সেই সময়ে রাজকন্যা মঞ্জুলিকা ঘরে ঢুকলেন। এক জন অজানা লোককে দেখে তিনি একটু থমকে দাঁড়ালেন। যুবক মহারাজকে অভিবাদন করে বললে—"আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন। আমাকে যখন এক রাত্রির জন্য আশ্রয় দিতে আপনি অনিচ্ছুক, তখন অবিলম্বে আমার এই স্থান ত্যাগ করা উচিত। অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধান করবো।" মঞ্জুলিকা বলে উঠলেন—"বাবা, অতিথিকে কখনও তাড়াতে নেই। তাতে পাপ হয়। অতিথি নারায়ণ।" মহারাজ বললেন—"বটেই তো! যুবক, তুমি আজকের মত আমার আতিথ্য গ্রহণ কর।" নিকটেই দাঁড়িয়েছিল এক জন ভৃত্য। মহারাজ তাকে হুকুম দিলেন—"যাও, আমাদের খাবার দিতে বল! ইনিও আমাদের সঙ্গে খাবেন।" ভৃত্য চলে গেল।

খেতে খেতে আবার সেই কথা আরম্ভ হ'ল। সব শুনে যুবক বললে—"আর এক দিন কেন, আজ করলেই তো ভাল হয়!" মহারাজ খুশী হয়ে বললেন—"ঠিক বলেছ, আজই করা উচিত। শুভস্য শীঘ্রং।" মোহনলাল কটমট করে যুবকের দিকে চাইতে লাগল! যুবক সে দিকে দৃক্‌পাত না করেই বললে—"তবে খেয়ে উঠেই চেষ্টা করে দেখলে হয়।" মহারাজ বললেন—"নিশ্চয়ই। মোহনলাল তুমি খেয়ে নাও। আজ আমার শয়ন-কক্ষে রাত্রিযাপন করবে। দেখি, তুমি যা বলেছ তা করতে পার কি না?" মোহনলাল যুবকের ওপর অত্যন্ত চটে গিছল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে বললে—"আমার কথা-মত কাজ করতে আমি প্রস্তুত।" মহারাজ বললেন—"তুমি যদি কৃতকার্য্য হও, তবে যা পুরস্কার চাইবে, তাই দেব।" দুষ্টামীভরা হাসি হেসে মোহনলাল বললে—"ঠিক তো?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"আমার কথার নড়চড় নেই।" তখন মোহনলাল অতি গম্ভীর হয়ে বললে—"যদি পুরস্কারস্বরূপ আপনার কন্যার পাণিপ্রার্থী হই?" মহারাজ বললেন—"তাতেও আমার আপত্তি হবে না!" মঞ্জুলিকা কাছে বসে খাওয়ার তত্ত্বাবধান কর-ছিলেন। বলে উঠলেন—"বাবা"—বাধা দিয়া মহারাজ বললেন—"না মা, যা বলেছি তার নড়চড় হবে না। মোহনলাল, তুমি কৃতকার্য্য হলে তোমার হাতে আমি কন্যা দান করবো।" যুবক প্রশ্ন করলে—"উনি না পারলে যদি আর কেউ পারে তার জন্যও আপনার এই ব্যবস্থা?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়ই।" মোহনলাল রেগে ছিলেন। অত্যন্ত রূঢ় ভাবে বললেন—"এ কথার অর্থ! তুমি কি বলতে চাও যুবক, আমি পারবো না?" যুবক বিনীত ভাবে উত্তর দিলে—"আমি তো সে কথা বলিনি।" মোহনলাল চীৎকার করে উঠল—"বলিনি মানে? নিশ্চয় বলেছ! আমি না পারলে এমন আর কে আছে যে এ কাজে এগোবে, শুনি?"

যুবক দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলে—"আমি!"

একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটতে পারে দেখে মহারাজ বললেন—"সে পরের কথা। আগে মোহনলালের পালা! সে যদি পারে, তা হলে তোমার কথা উঠতেই পারে না!"

মোহনলাল সগর্ব্বে উত্তর দিলে—"সে তো বটেই। তবে আমার মনে হয়, মিথ্যা সময় নষ্ট করা হবে। আমি ঘরে থাকলে

ভূত কি প্রেত কেউ আসতে সাহস করবে না, তাদের বাবারাও পারবে না।"

যুবক হেসে বললে—"বলা যায় না, সাহস করতেও তো পারে।"

মহারাজ বললেন—"হাতে পাঁজী মঙ্গলবার। আজ রাত্রেই যা হবার হয়ে যাবে। আশা করি, মোহনলাল পারবে।"

ততক্ষণে আহার-পর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে। যুবক ও মোহনলালকে নিয়ে মহারাজ নিজের শয়ন-কক্ষে গেলেন। মোহনলালকে বললেন —"তুমি এই ঘরে আজ রাত্রে থাকবে। দেখা যাক, কত দূর কি করতে পার!" যুবক ও মহারাজ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। লক্ষ্মণসেন বাহির থেকে ঘরে তালা দিয়ে দিলেন এবং নিজ-নামাঙ্কিত শীল লাগিয়ে দিলেন।

ঘরের মধ্যে বদ্ধ হয়ে মোহনলালের মনে রীতিমত ভয় হতে লাগল। দরজা টেনে দেখলে, বন্ধ। জানালায় গরাদ দেওয়া। পালাবার কোন পথ নেই। চারিধারের দেয়ালে টোকা দিয়ে দেখলে, কোথাও ফাঁপা নেই অথবা গুপ্ত দরজা নেই। অগত্যা এক হাতে তরোয়াল নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বিছানার ওপর সে বসে রইল। আলোটা উজ্জ্বল করে দিলে, কিন্তু তবু এক অজানা ভয়ে বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল।

একটু ঢুলুনি—হঠাৎ খুট্ করে শব্দ—মোহনলালের ঘুম গেল ছুটে। চেয়ে সে দেখলে, দেয়ালের মধ্যে থেকে ক্ষুদে ক্ষুদে অনেক লোক পিলপিল করে বেরিয়ে মেঝেয় হাজির হ'ল। তার পর দলবদ্ধ হয়ে লাইন বেঁধে সকলে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মোহনলাল পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হয়ে এক-দৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল। হাত-পা ভয়ে এমন আড়ষ্ট যে নড়বার ক্ষমতাও ছিল না। লাইন থেমে গেল। এক জন বৃদ্ধ একটু এগিয়ে এসে বলল—"সেনাপতি মোহনলাল, তোমার মুখে বীরত্বের গল্প অনেক শুনতে পাই। বীরেরা মিথ্যা কথা বলেন না, অতএব ধরে নিতে হবে যে তুমি বীর। আমি তোমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করছি। আশা করি, ভয়ে পেছপাও হবে না। শুনেছি, তুমি আমাদের তাড়াবে বলে মহারাজকে কথা দিয়েছো। তোমার শক্তির পরিচয় দাও এখন!"

একটা দেড়-আঙুলে লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ! মোহনলালের লুপ্ত সাহস ফিরে এলো। হো হো করে হেসে সে বললে—"বেশ বেশ! হাতাহাতি লড়তে চাও? না, অস্ত্র নিয়ে?" রাজোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"বীরেরা মল্লযুদ্ধের চেয়ে অস্ত্র-যুদ্ধই বেশী পছন্দ করেন। তুমি তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করো।" মোহনলাল নিজের তরোয়াল একবার বার করে আবার কোষবদ্ধ করে বললে—"উত্তম কথা! কিন্তু তুমি কি অস্ত্র ব্যবহার করবে?" এক জন সঙ্গীর কাছ থেকে একটা প্রকাণ্ড লম্বা চাবুক নিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"এই চাবুক!" মোহনলাল আশ্চর্য্য হয়ে বললে—"চাবুক! অন্য কোন অস্ত্র নয়?" বৃদ্ধ উত্তর দিলেন—"না। আগে চাবুকের শক্তি ছাখো, তার পর অন্য অস্ত্রের কথা!"

কোষ থেকে তলোয়ার বার করে মোহনলাল উঠে দাঁড়াল, সামনে চাবুক হাতে দেড়-আঙুলে বুড়ো। তার ক্ষুদে সঙ্গীরা সব সরে গিয়ে যুদ্ধের জন্য জায়গা প্রস্তুত করে দিলে। রণবাদ্য বেজে উঠল। যুদ্ধ আরম্ভ হলো। মোহনলাল বৃদ্ধকে যতই আঘাতের চেষ্টা করে, কিছুতেই আর পারে না। আর বৃদ্ধ দূর থেকে চাবুকের আঘাতে আঘাতে মোহনলালকে জর্জ্জরিত করে ফেললেন। শেষে মোহনলাল প্রায় অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ স্বরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বৃদ্ধ বললেন—"এই তোমার বীরত্ব! এরই এত গর্ব্ব করতে! তুমি নারীরও অধম। মিথ্যা গর্ব্ব করবার জন্য আমি সাজা দিচ্ছি, তুমি নারী হও! কাল প্রাতে যদি মহারাজকে আজ রাত্রের সমস্ত ঘটনা অকপটে বল, তবেই আবার পুরুষ হবে; কিন্তু যদি একটা কথা গোপন করবার বা মিথ্যা সাজিয়ে বলবার চেষ্টা করো তাহলে নারী থাকবে। আচ্ছা নমস্কার। ভবিষ্যতে আর বীরত্বের বড়াই করো না।" ক্ষুদে মানুষগুলি একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। তার পর সকলে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই!

পরদিন সকালে মহারাজ নিজে এসে শীল ভেঙ্গে দরজা খুললেন। সঙ্গে যুবক, রাজকন্যা মঞ্জুলিকা ও কয়েক জন পার্শ্বানুচর। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখেন মোহনলাল নেই! তার বদলে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক! কি বিকট আর কিম্ভূতকিমাকার সে দেখতে! মহারাজ বিস্মিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলেন—"তুমি কে? মোহনলাল কোথায়?" নারী মূর্ত্তি হেঁড়ে গলায় উত্তর দিলে—"আজ্ঞে আমিই মোহনলাল"। সকলে অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"কিন্তু তোমার এ অবস্থা কেন?" মোহনলাল আবোল-তাবোল অনেক কথা বলতে লাগল। সত্য কথা কিছুতেই বলে না। তখন অদৃশ্য কোন ব্যক্তি বলে উঠল—"মিথ্যা কথা বলে কোন লাভ নেই। সম্পূর্ণ সত্য কথা না বললে মেয়ে হয়ে থাকবে, পুরুষ হতে পারবে না আর।" সকলে স্তম্ভিত! কে কথা কইলে? মোহনলাল কিন্তু গলার স্বর চিনতে পারল। রাত্রের সেই দেড়-আঙুলে প্রতিদ্বন্দ্বী। অগত্যা তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে হলো। বলা মাত্রই নিজদেহ ফিরে পেল। তখন সে ভাবলো, এইবার, একটু টীকা-টিপ্পনী দিয়ে ব্যাপারটাকে যুতসই করে দেওয়া যাক! এই ভেবে যেমন দু'-একটা মিথ্যা কথা বলেছে, অমনি আবার নারী-মূর্ত্তিতে পরিণত হলো! মহারাজ হেসে বললেন—"ভূতই হোক আর প্রেতই হোক, তারা রসিক লোক বটে! তোমায় আচ্ছা জব্দ করেছে। যাক, মিথ্যা কথা বন্ধ কর। নইলে এই কদাকার নারী-মূর্ত্তিতেই তোমাকে থেকে যেতে হবে।" মোহনলাল নিজের মিথ্যা কথা স্বীকার করে নিতেই আবার নিজ মূর্ত্তি ফিরে পেল। পাবামাত্র এক ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ জানতে পারলে না। লজ্জায় অপমানে হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! যাই হোক, মোহনলালকে কেউ কোন দিন সে রাজ্যে আর দেখতে পায়নি।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন তখন যুবককে বললেন—"যুবক, আজ রাত্রে তোমার পালা। এক জন নমুনা দেখালে, তাতে মনটা একেবারে দমে গেছে। তুমি এবার কি করতে পার দেখা যাক।" যুবক উত্তর দিলে—"চেষ্টা করে দেখব, ফল ভগবানের হাতে! কিন্তু আপনি যে কথা দিয়েছেন তা ঠিক থাকবে তো?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"নিশ্চয়। তবে একটা কথা তোমায় ভেবে দেখতে বলি। আমার কন্যার অনিচ্ছায় অথবা বংশের অমর্যাদা করে কোন কাজ করা কি উচিত হবে?" যুবক উত্তর দিল—"নিশ্চয় নয়।"

সে রাত্রে যুবককে মহারাজের শয়নকক্ষে বন্ধ করে দেওয়া হলো। নির্ভীক মনে ঘরে ব'সে 'সে অপেক্ষা করিতে লাগল। বহুক্ষণ কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। হঠাৎ তার পিছনে পদশব্দ হলো! কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল! যুবক ফিরে দেখল, ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি! মূর্ত্তি বললেন—"দেবকুমার, আমি তোমার আচার-ব্যবহারে আর শিক্ষায় খুশী হয়েছি। রাজপুত্রের যে সকল সদ্‌গুণ থাকা দরকার, তোমার সবই আছে। মনে রেখ, বিনয় এবং উদার-হৃদয় মনুষ্যত্বের সব চেয়ে বড় পরিচয়। গরীবের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে শেখা ও দূর করবার চেষ্টা করার চেয়ে বড় কর্ত্তব্য মানুষের আর কিছু নেই।" এই বলে তিনি একটা দেয়ালে টোকা মারলেন। দেখতে দেখতে দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল, আর সেই গহ্বরের মধ্যে দেখা গেল অসংখ্য ধনরত্ন। আগের রাত্রের দেড়-আঙুলে বুদ্ধ বেরিয়ে বললেন,—"বহু দিন থেকে আমি এই রাজপুরীতে বাস করছি, তোমাকে এই সব ধনরত্ন দেবো বলে এত দিন আগুলে ছিলুম। এই অর্থ দিয়ে তুমি গরীব প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। তুমি ছাড়া আর কেউ এ দেয়ালকে ফাঁক করতে পারবে না!"

দেয়াল তখনই আবার বেমালুম জোড়া লেগে 'গল।

পরদিন সকালে মহারাজ লক্ষ্মণসেন এসে দরজা খুললেন। দেখলেন, যুবক বসে রয়েছে। তার ওপর কোনরূপ অত্যাচার হয়নি বরং তাকে উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছে। মহারাজ বললেন—"যুবক, তোমার নাম দেবকুমার?" যুবক আশ্চর্য্য হয়ে বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন?" মহারাজ উত্তর দিলেন—"কাল রাত্রে লক্ষ্মী-দেবী আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। তুমি তাঁর নাতি। তোমার বাবা ছিলেন ভবানীপ্রসাদ।" দেবকুমার বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি যা স্বপ্ন দেখেছেন, তা সত্য। প্রমাণ-স্বরূপ দেখুন, এই দেয়ালের পিছনে কত ধন-রত্ন আছে! কেবল লক্ষ্মীদেবীর বংশধরেরাই তা নিতে পারে।" স্পর্শ করতেই দেয়াল ধীরে ধীরে দু'ফাঁক হয়ে গেল। মহারাজ লক্ষ্মণসেন বিস্মিত হয়ে দেখলেন, অসংখ্য হীরা মুক্তা চুনী পান্না—স্তূপাকার পড়ে আছে। আবার দেয়াল বেমালুম জোড়া লেগে গেল।

লক্ষ্মণসেন বললেন—"তুমিই এ রাজ্যের প্রকৃত মালিক। এ রাজ্য আমি তোমায় ফেরত দিচ্ছি; আর সেই সঙ্গে দক্ষিণা দিচ্ছি আমার একমাত্র কন্যা মঞ্জুলিকাকে!"

তার পর মহা সমারোহে দেবকুমারের সঙ্গে মঞ্জুলিকার বিবাহ হলো। সাত দিন ধরে রাজ্য জুড়ে সে কি ধুম-ধাম! প্রত্যেক প্রজাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হলো; আর সকলকে এক-জোড়া করে নতুন কাপড় দেওয়া হলো। এমন ধুমধাম না কি কেউ কোথাও চক্ষে কখনো দেখেনি!

শ্রীযামিনীমোহন কর।

—

বিনা-মাটীতে গাছপালা

আমাদের ছোটবেলায় এক ম্যাজিকওয়ালা ম্যাজিক দেখিয়েছিল—ক'টা গাছের বীজ টবের মাটীতে পুঁতে সে-টবকে পাঁচ মিনিট পর্দ্দায় ঢেকে তার পর সেই পর্দ্দা সুরিয়ে দেখিয়েছিল, সেই টবে ফুলের গাছ গজিয়েছে; তার পর সে গাছে ফুল ফুটিয়ে সে একেবারে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিল! ম্যাজিকওয়ালার সে-গাছ তবু ডালপালা নিয়ে মাটীকে আশ্রয় করে গজিয়ে উঠেছিল,—কিন্তু আমেরিকার বৈজ্ঞানিকের দল মাটীর সংস্পর্শ ব্যতিরেকে কাচের টেষ্ট-টিউবে গাছকে লালনে বাড়িয়ে তুলেছেন। তাঁদের হাতে এ সব গাছ শুধু বাড়ছে না, এ সব গাছে অজস্র ফুল-ফল গজাচ্ছে!
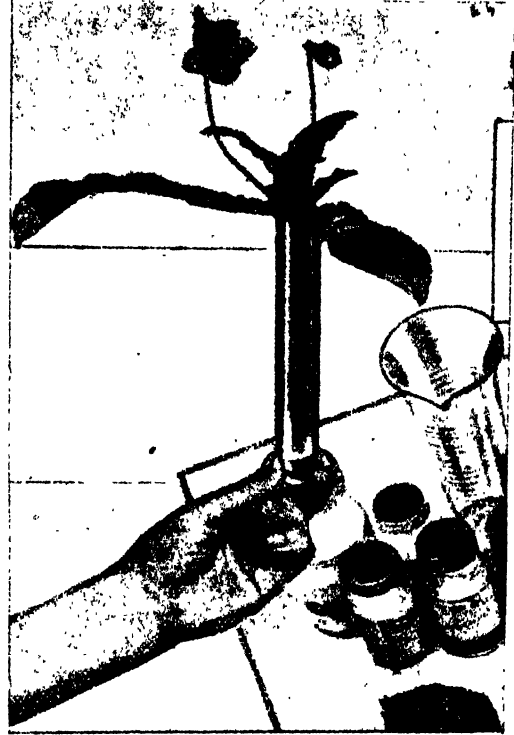
১। টিউবের মধ্যে গাছের খাদ্য

কি করে তাঁরা এমন অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন, বলি। মাটীর বুকে থাকে গাছের শিকড়—সেই শিকড় বয়ে মাটী থেকে গাছ তার খাদ্য বা প্রাণ-রসের যোগান পায়—তাতে হয় গাছের পুষ্টি, এবং ফলন। মাটী থেকে গাছ যে খাদ্য বা প্রাণ-রস পায়, বৈজ্ঞানিকেরা সেই খাদ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তাতে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফশফরাশ, পোটাসিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম্, ক্যালসিয়াম এবং লোহা। এগুলির মধ্যে এ অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন—তারা পায় বাতাস থেকে—জল এবং কার্বন ডায়ক্সাইড বাষ্পরূপে। বাকী ঐ নাইট্রোজেন ফশ-ফরাশ, পোটাসিয়াম প্রভৃতি—বৈজ্ঞানিকেরা সেগুলির যোগান দিতে কৃতসঙ্কল্প হলেন,—এবং সে সঙ্কল্প তাঁরা বিদ্যাবুদ্ধিবলে সিদ্ধ করতে পেরেছেন। তার ফলে মাটীতে না পুঁতেও গাছকে তাঁরা সজীব সতেজ রাখতে সমর্থ হয়েছেন।

বাঁচার জন্য এবং পুষ্টির জন্য ঐ সব গাছের প্রয়োজন খাদ্য। বৈজ্ঞানিকেরা সে-খাদ্য প্রস্তুত করেছেন; এবং এতটুকু মাটীর সংস্পর্শ না রেখে তাঁরা কি করছেন, জানো? রাসায়নিক উপায়ে গাছের ঐ সব প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করে সে-খাদ্য বোতলের মধ্যে কিম্বা কোনো পাত্রে রেখে তার মধ্যে রাখছেন খুব কচি চারা গাছ। এ-সব

কচি চারা গাছ রাখবার একটু কায়দা আছে। তারের জাল তৈরী করা হয়—মাটীর বুক থেকে কচি চারা তুলে নিয়ে জালে করে সাবধানে শিকড়গুলি ধুয়ে নিতে হবে—শিকড়ে যেন এতটুকু কাদা-মাটী না লেগে থাকে। তার পর শিকড়ের প্রত্যেকটি রেখা অতি সন্তর্পণে ঐ তারের জালের ফাঁকে-ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতে হবে—ঢোকানো হলে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে পাত্রের মধ্যে রাখা চাই। রেখে তারের উপরে এক ইঞ্চি পুরু শ্যাওলা এবং সে শ্যাওলার উপর খড় বিছিয়ে ঢাকা দিতে হবে—বাইরে থেকে যেন শিকড়ে আলো না লাগে। যে পাত্রে শিকড় এমনি ভাবে রাখা হবে, সে পাত্রের মধ্যে রাসায়নিক আরক দিয়ে তাতে শিকড়গুলি রাখা চাই। এ আরক তৈরী করার জন্য চাই,—এক গ্রাম করে' পোটাসিয়াম্ নাইট্রেট্, পোটাসিয়াম্ ফশফেট, ম্যাগনেসিয়াম্ সালফেট ; ৪ গ্রেণ ক্যালসিয়াম্ নাইট্রেট্ ;

২। বিনা-মাটীর গাছে ফুল

৩। তারের ফাঁকে ফাঁকে শিকড়

আলো-বাতাস যায়, এমন ঘরে ছায়ায় পাত্র বা শিকড়-ভেজানো বোতল রাখা চাই। শীতের মর্শুমী ফুল-গাছ যেমন ঠাণ্ডায়, তেমনি গ্রীষ্মের মর্শুমী ফুল-গাছ রাখা চাই একটু রৌদ্রতাপ মেলে, এমন জায়গায়। বেশী রৌদ্রে কদাচ রাখবে না।
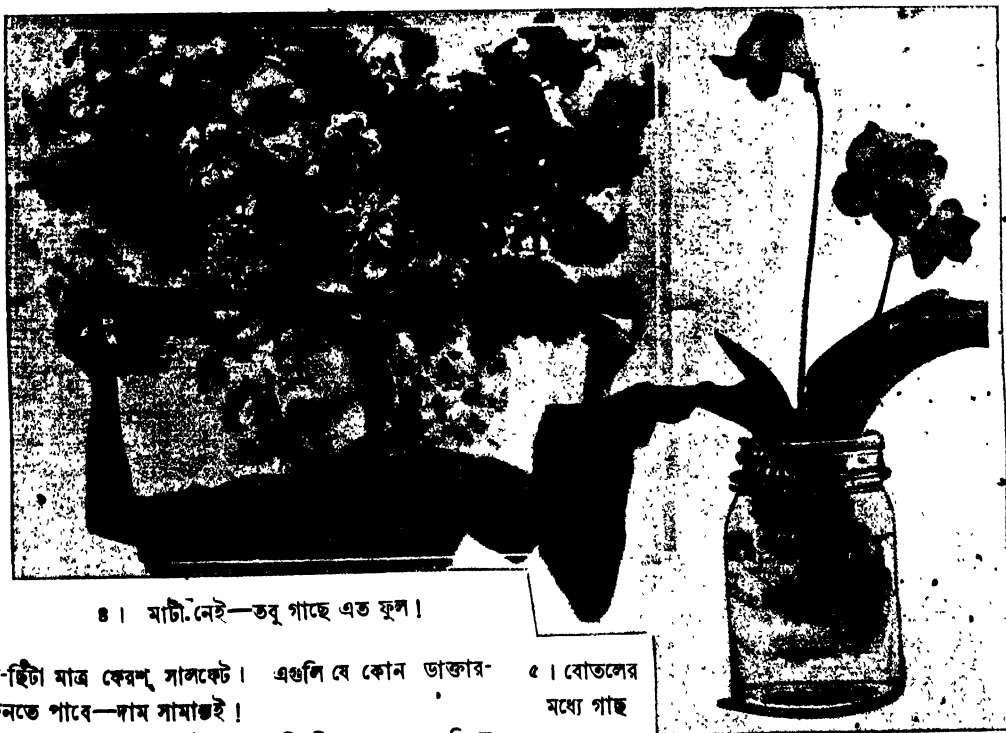
৪। মাটী নেই—তবু গাছে এত ফুল!

৫। বোতলের মধ্যে গাছ

এবং এক-ছিটা মাত্র ফেরশ্ সালফেট। এগুলি যে কোন ডাক্তার-খানায় কিনতে পাবে—দাম সামান্যই!

করকচ-লবণের টুকরোর আকারে এগুলি কিনতে হবে। কিনে এনে এগুলি গুঁড়িয়ে কলের জলে গুলে নিতে হবে—গুলে গেলে পাত্রে ঢেলে সে-পাত্রে গাছের শিকড় ডুবিয়ে রাখবে। যে ঘরে

পচা পুকুরের জলে গাছের পুষ্টি হবে না। কলের জলে অল্প-পরিমাণে মাঙ্গানীজ, জিঙ্ক, তামা, বোরোন, এলুমিনিয়াম, লিথিয়াম,

নিকেল, কোবাল্ট, আয়োডিন এবং সোডিয়াম আছে বলে এই জলই ভালো। বৃষ্টির জল পেলেও ভালো হয়। পোটাসিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি যে মেশাবে, তার ওজন নিক্তির ওজনে যেন এক চুল বেশী না হয়—সে সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা চাই!

সাত-আট দিন অন্তর এই রাসায়নিক দ্রাবক বদল করবে এবং যখনি বদল করবে, পোটাসিয়াম প্রভৃতির মাত্রাও খুব সামান্য ভাবে অমনি বাড়িয়ে বাড়িয়ে যেতে হবে। তিন মাস পর্য্যন্ত এই আরক বদলানো এবং তার মাত্রা বাড়ানো চাই।

এ প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকেরা গাছগুলিকে সতেজ করেছেন, তাদের সজীব রেখেছেন, এবং এ গাছের ফুল বর্ণে-গন্ধে ঢের বেশী উজ্জ্বল, প্রখর এবং আকারেও বড় হয়েছে। বেগোনিয়া ক্যানা প্রভৃতি যে সব গাছ গেঁড় (tuberous)-জাতের, সেগুলির শোভা-সমৃদ্ধিও হয়েছে একেবারে অতুলনীয়। তার উপর এ ভাবে লালিত গাছের পরমায়ুও খুব দীর্ঘ হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, ঠিক এই রীতিতেই আলু এবং টোমাটোর ফলনেও তাঁরা আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করেছেন!

সামনে পূজার ছুটী। ছুটীর দিনে তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পারো, বিনা-মাটীতে তোমাদের হাতে কি কি গাছের লালন হয়—আর সে সব গাছে ফুল-ফলের ফশলই বা ফলে কেমন!

ভারতে দুর্ভিক্ষ-প্রতিকার ব্যবস্থা

প্রাচীন কালে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইত কি? প্রশ্ন শুনিয়া অনেকেই হাসিবেন। কেন না, দুর্ভিক্ষ সকল কালে সকল দেশেই হইয়া থাকে। অতি অল্প দেশেই সকল বৎসর সমান ভাবে পর্জ্জন্যদেব বারিবর্ষণ করেন না। সেই বারি-বর্ষণের তারতম্যেই অজন্মা ও শস্যহানি ঘটে। অধিক বর্ষণেও শস্য-নাশ হয়,—অল্প বর্ষণেও শস্য অল্প জন্মায়। উভয় অবস্থাই দুর্ভিক্ষের কারণ। সুতরাং প্রাচীন ভারতে যে দুর্ভিক্ষ হইত না, এমন দুঃসাহসের কথা সহসা বলা যায় না। তবে এ-কথাও স্বীকার্য্য যে, এখন যেমন ভারতে প্রায় দুর্ভিক্ষ হয়,—সে কালে তাহা হইত না। যে দেশ নদীতট হইতে দূরে অবস্থিত, সে দেশেও প্রাচীন কালে কচিৎ কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তবে দুর্ভিক্ষ তখন বড় বিরল ছিল। প্রায় ঘটিত না। তখন অজন্মা এমন হইত না যে, দলে দলে লোক অনাহারে মরিত। যখন দেশে এরূপ অবস্থা হইত যে, ভিখারীকে সাধারণ গৃহস্থ ভিক্ষা দিতে পারিত না, তখনই দুর্ভিক্ষ হইয়াছে বলিয়া লোকে মনে করিত। অজন্মা অধিক হইলেই লোক মরিত, কিন্তু সেরূপ ঘটনা ঘটিত কচিৎ। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ভারতবাসীর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহাদের নিকট প্রাচীন ভারতের সম্বন্ধে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিসের কথা বেদবাক্য অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য। মেগাস্থেনিসের কথার উপর নির্ভর করিয়া ডিওডোরাস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, "অতএব এ-কথা দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে, ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই এবং সে দেশে কখনই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ঘটে নাই।" পাদটীকায় আমি ডিওডোরাসের কথার ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (১)। প্রায় সওয়া দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মেগাস্থেনিস মৌর্য্য রাজগণের রাজধানীতে বহু বৎসর ছিলেন এবং আপনাকে ভারতের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত সাক্ষ্যবাক্যে অবিশ্বাস করিবার কোন হেতুই নাই। তিনি যখন ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন,—তখন তাঁহার সময়ে মনুষ্যের স্মৃতির গোচর কোন জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। তিনি কেবল পাটলিপুত্রেই ছিলেন না, ভারতের তদানীন্তন পরিজ্ঞাত সকল স্থানেই তিনি পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছিলেন। অগত্যা আমরা এখন অনায়াসে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেও তিন চারি শত বৎসরের মধ্যেও কোন উল্লেখযোগ্য জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ ভারত-ভূমিতে আবির্ভূত হয় নাই।

প্রাচীন ভারতের কথা উঠিলেই আমরা আজকাল কথায় কথায় বেদের বাক্য উদ্ধৃত করি,—এবং বৈদিক সমাজে কি ছিল না ছিল, তাহা লইয়া গবেষণা করিতে বসি। দুর্ভাগ্যক্রমে বেদের ভাষা কেহই বুঝে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় ঋষিরা তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রকে সংস্কৃত ভাষায় অর্থাৎ মার্জ্জিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া উহা গুরুগম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উহার অধিকাংশ শব্দই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া বুঝিতে হয়।

এখানে আমি সেই অবান্তর প্রসঙ্গের আলোচনা করিব না। তবে এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক অসম্বদ্ধ এবং অসঙ্গত কথা বলেন বলিয়া বাধ্য হইয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিতে হইল। ঐ সকল পণ্ডিত বলেন যে, "ঋগ্বেদের সময় আর্য্য সমাজ গোষ্ঠীপতি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। তাহারা সামান্য একটু সেচের ব্যবস্থা করিত। তাহাদের সমাজে মানুষ অধিক ছিল না। দেশের চারি দিক্ নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। তখনও অজন্মা হইত,—তবে তখনকার লোক অজন্মা হইলে তদানীন্তন স্বচ্ছন্দ-বনজাত পুষ্পফল এবং মৃগাদি মারিয়া খাইত,—সুতরাং তখন অজন্মা হইলে এখনকার দুর্ভিক্ষের মত লোক মরিত না বা দেশ উজাড় হইত না।" ঋগ্বেদের সময়ের যে চিত্র পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা অঙ্কিত করিয়াছেন,—তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা বার-বার তাঁহাদের মতের যে ভাব পরিবর্ত্তন করিতেছেন, তাহাতেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। ভূগর্ভ হইতে হারাপ্পা এবং মোহেঞ্জোদোড়ো আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা

(১) It is accordingly affirmed that famine has never visited India and that there has never been a general scarcity of the supply of nou-

বলিতেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-নামধেয় কয়েক দল লোক ভারতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, এবং এখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া এই দেশে বাস করিয়াছিল। এ দেশের আদি বাসিন্দারা গারো, কুকী ও সাঁওতালদিগের ন্যায় অসভ্য ছিল। কাজেই তাহারা সহজেই আর্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইয়াছিল। পরে তাঁহারা বলেন, 'থুড়ি', ওটা ভুলই হইয়াছে! এ দেশে দ্রাবিড়ীদিগের একটা সভ্যতা ছিল। সে সভ্যতা আর্য্য-সভ্যতা অপেক্ষা কম নহে। তবে আর্য্যদল এই দ্রাবিড়ীদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল কেন? রোমের ন্যায় দ্রাবিড়ীরা ম্যালেরিয়া-নির্জ্জিতও হয় নাই,—বিলাসে ও আত্মকলহে আসক্ত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণাভাব। যাহা হউক, এই গোঁজামিলের পর মহেঞ্জোদোড়ো আবিষ্কারের পরবর্ত্তী প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তথাকথিত আর্য্য অভিযানের বহু পূর্ব্বেই ভারতের অন্ততঃ পশ্চিম প্রান্তে একটি অতি সভ্য জাতি বাস করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে তথাকার শীলমোহর প্রভৃতিতে যে অক্ষর উৎকীর্ণ আছে, তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই—হইবেও না। উহা যে আর্য্য সভ্যতার নিদর্শন, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। য়ুরোপীয় পণ্ডিত এবং তাঁহাদের এদেশী পোঁ-ধরারা তথাপি সেই সাবেক বুলি ধরিয়া বসিয়া আছেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন। অতএব ঐ সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা হইতে পারে না! এখানে আর্য্যদল যে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দেড় হাজার বৎসরে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এ-কথা যেন স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় মনীষীরা (যথা বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি) আর্য্যগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহা জ্যোতিষিক প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় চার-পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতে সভ্যতার আদিম স্তরে অবস্থিত লোকদিগের বাসস্থান ছিল না। তখন ছিল বহু স্থলে জনাকীর্ণ জনপদ। সুতরাং দুর্ভিক্ষ সংঘটনের সম্ভাবনা ছিল না,—ইহা মনে করা যায় না। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে কোন দুরন্ত দুর্ভিক্ষের আভাস পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকের ১৫শ সূক্তে সুবৃষ্টির জন্য জাপ্য মন্ত্র আছে। এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তখনকার লোক কৃষির দ্বারা সুফল লাভের জন্যই পর্জ্জন্যদেবের নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা করিতেন,—কিন্তু বৃষ্টির দ্বারা যে জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ দূর হয়, এমন কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই। উহার প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, "প্রাচ্যাদি দিক্-সমূহে সঞ্চিত বাষ্প-সমূহ বায়ু কর্ত্তৃক প্রচলিত হইয়া জলপূর্ণ মেঘে পরিণত হউক। ঋষভের নিনাদের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনকারী বায়ু-বিতাড়িত মেঘীয় জলরাশি ধরণীকে পরিতৃপ্ত করুক,—ধরণী ওষধিতে পূর্ণা হউক।"

উহার পঞ্চম মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—"সমুদ্র হইতে বৃষ্টির জল ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হউক। তাহাতে আকাশে দীপ্তিমান্ উদক (মেঘ) সঞ্চারিত হইয়া সেই জল ধরাপৃষ্ঠে পতিত হউক। ষণ্ডের ন্যায় গভীর গর্জ্জনকারী বায়ু বিতাড়িত মেঘস্থিত জলরাশি পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করুক,—পৃথিবী ওষধিতে পূর্ণা হউক।"

এখানে সর্ব্বত্রই বৃষ্টির দ্বারা কৃষিকার্য্যে সুফল প্রাপ্তির আশা করা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও এমন কথা বলা হয় নাই যে, হে পর্জ্জন্য, আমাদিগকে জনপদ-বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা কর। ইহাতে অনুমান হয়, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের কথিত বৈদিক যুগে লোকের প্রাণহারী মারাত্মক দুর্ভিক্ষ হইত না। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তাহা বলা কঠিন। তখন দেশ স্বাধীন ছিল। কৃষি ছিল উন্নতিশীল। অধিক বনভূমি উচ্ছিন্ন না হওয়াতে বৃষ্টি প্রায় হইত। ভূমি জঙ্গলে আকীর্ণ থাকাতে বর্ষায় জল অতি মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইত। নদী সকল শীর্ণ হইত না। তখন সেচের সুব্যবস্থা ছিল। মহেঞ্জোদোড়োর ব্যবস্থা তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ। বাণিজ্য দ্বারা এক দেশের খাদ্যশস্য দেশকে রিক্ত করিয়া অন্য দেশে নীত হইত না। সুতরাং দুই-এক বৎসর বর্ষণের বিপর্য্যয় ঘটিলে কখনই লোক দলে দলে অনাহারে মরিত না। সেই জন্য সেই সময়ের সাহিত্যে এইরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষের কোন প্রতিচ্ছবি পতিত হয় নাই।

তাহার পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে মহাকাব্যের যুগ—যে যুগে রামায়ণ এবং মহাভারত লিখিত হইয়াছে। এই কালে দেশের জঙ্গল উচ্ছিন্ন করিয়া জনপদ বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। লোকসংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। বাণিজ্যও বিস্তার লাভ করিতে দেখা যায়। কাজেই জঙ্গলের উচ্ছেদহেতু বারিবর্ষণের বিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ হয়। রামায়ণে এবং মহাভারতে বহু-বার্ষিকী অনাবৃষ্টি এবং দ্বাদশ-বার্ষিকী অনাবৃষ্টির কথা দেখা যায়। এই শব্দ দুইটির অর্থ কি? কেহ কেহ বলেন যে, বহু বর্ষ ব্যতীতে যে অনাবৃষ্টি হয়, তাহাকে বহুবার্ষিকী অনাবৃষ্টি এবং দ্বাদশ বৎসর অন্তর যে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তাহাকে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি বলে। এ অর্থ অসঙ্গত নহে। কালচক্রের আবর্ত্তনে নিয়মিত কিছু কাল অন্তর বারিপাতের একটা নির্দ্ধারিত ব্যতিক্রম চিরকালই ঘটিয়া আসিতেছে, এখনও তাহা প্রায় সকল দেশেই ঘটে। উহাকে এক একটা cycle বলে। প্রথমে বোধ হয় এই অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে, দশ বৎসর উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী দগ্ধ হইলে অত্রিপত্নী অনসূয়া গঙ্গাকে ঐ স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাবে ফলমূলের সৃষ্টি করিয়া ঋষিদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন (২)। এক এক অঞ্চলে এরূপ দুর্নিমিত্ত সে কালেও ঘটিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে দশ বৎসর কাল উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টি হইলে তবে লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, প্রকারান্তরে ইহা বলা হইয়াছে। এখনকার মত এক বৎসর বারি-বর্ষণের বিপর্য্যয়-ফলে লোক অনাহারে মরিত না। অবশ্য অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে করকাপাতে শস্য নষ্ট হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ হইত, লোক দেশত্যাগ করিয়া সন্নিহিত অন্য কোন দেশে যাইত'। ছান্দোগ্য উপনিষদে এরূপ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। হিমালয় হইতে কিছু দূরবর্ত্তী দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আর পঙ্গপালের আপতনে দুর্ভিক্ষ কখনও কখনও দেখা দিত। অন্য কারণে দুর্ভিক্ষ হইত না। মহাভারতেও এইরূপ দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ সকল আলোচনা করিলে সেই যুগে যে বড় লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ ঘটিত, ইহার

(২) দশ বর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্
যথা মূলফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্ত্তিতা।
ধর্ম্মেণাগ্রেণসংযুক্তো নিয়মশ্চাপ্যলঙ্কৃতঃ। রামায়ণ ২।১১৭ অধ্যায়

প্রমাণাভাব। মহাভারতে অনেক কথা পরবর্ত্তী কালে সংযোগ করা হইয়াছে,—এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে। সেই জন্ত মহাভারতে যে সামান্ত অজন্মার এবং দুর্ভিক্ষের কথা আছে, আমি এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। সে সময় অজন্মা এবং শস্তহানিজনিত যে দুর্ভিক্ষ ঘটিত, তাহা সঙ্কীর্ণ স্থান-মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত এবং পরবৎসরই সেই দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটিত। হিন্দুকুশের প্রত্যন্ত ভূমি হইতে ব্রহ্মদেশের পশ্চিম সীমাস্থিত সকল দেশেই দুর্ভিক্ষ কখনই উৎকট লোকসংহারক মূর্ত্তিতে দেখা দিত না। কারণ, তখন দেশও পরাধীন ছিল না, অন্ত দেশের জিগীষাপরায়ণ লোকদিগের জন্ত খাদ্যশস্ত উৎপাদন করিয়া প্রবাদ-কথিত বৈরাগীর ন্তায় গালে হাত দিয়া কাঁদিত না! কাজেই তখন আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে অথবা উহার কোন বিস্তীর্ণ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ-জনিত অনাহারে রাজপথে গণ্ডায় গণ্ডায় লোক মরিয়া পড়িয়া থাকিত না!

তাহার পর জাতক গ্রন্থের কথা। জাতক পালি ভাষায় লিখিত। উহা তদানীন্তন ভারতের চলিত ভাষায় লিখিত। বৈদিক এবং রামায়ণী যুগে লোক-সমাজে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাকৃত ভাষা। কাল সহকারে প্রাকৃত ভাষায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। শেষে সেই প্রাকৃত ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া পালিতে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা উহা রামায়ণী এবং মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী প্রচলিত ভাষা বলিয়া থাকেন। ঐ ভাষায় লিখিত জাতক গ্রন্থাবলিতে ঐ ভাষায় দুর্ভিক্ষের বর্ণনা আছে। সে দুর্ভিক্ষ কচিৎ ঘটিত সত্য,—কিন্তু তাহা সময় সময় বহু লোকের প্রাণসংহারক আকার ধারণ করিত। এই সময়ে ভারতের অনেক বনভূমি উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, লোকসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রায় তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ পালি ভাষা ভারতে চলিত ছিল। ঐ জাতক গ্রন্থে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক ঘটনাও বর্ণিত আছে। উহাতে অনেক দুর্ভিক্ষের কাহিনী উল্লিখিত এবং বর্ণিত আছে। তবে সে দুর্ভিক্ষ স্থানবিশেষে নিবদ্ধ থাকিত। জাতক পাঠে জানা যায় যে, শক্রের (ইন্দ্রের) কোপে এক বার কাশী অঞ্চলে তিন বৎসর বারিপাত হয় নাই, ফলে শস্যও জন্মে নাই,—যাহা জন্মিয়াছিল তাহাও পরিপক্ব হইতে পারে নাই। ঐ সময়ে লোক যে অধিক মরিয়াছিল তাহা মনে হয় না। আরও একবার কাশী অঞ্চলে অজন্মাজনিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে কাকগুলিও খাইতে না পাইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিল; এই শেষোক্ত বারে দুর্ভিক্ষ অধিক হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কলিঙ্গ দেশেও একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সে সময়ে লোক অন্নাভাবে চৌর্য্যবৃত্তি ধরিয়াছিল!

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর কথা আছে। এই অর্থশাস্ত্র কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া আধুনিক কালে অতি-পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। উহা খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর রচিত বলিয়া আমি মনে করি। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তেরই মন্ত্রী ছিলেন। এই গ্রন্থে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কথা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। ইহাতে দুর্ভিক্ষে অধিক লোকক্ষয় হয়, এ কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সময় বা তাহার দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব্বে যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, তাহা মেগাস্থেনিসের কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। আসল কথা, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাব ঘটে না। অবশ্য প্রাচীন কালে দুর্ভিক্ষ দমনের একটা ঘোর বাধা ছিল। যে সকল অঞ্চলে নদী নাই অথবা নদী নিদাঘে অত্যন্ত শীর্ণা হইয়া যায়, সে সকল অঞ্চলে অন্ত স্থান হইতে খাদ্য আমদানী করা কঠিন হইত। যে জন্ত ঐ সকল অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কোপ অত্যন্ত অধিক হইত। নদী-তীরস্থিত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রায় দেখা দিত না। ফলে পুরাকালে কোন কোন সময়ে কচিৎ কোন কোন অঞ্চলে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তবে তাহা মনে রাখিবার মত ভীষণাকার ধারণ করিত কি না সন্দেহ! এ কথা সত্য যে, প্রাচীন কালে ভারতীয় ভূপতিরা প্রায়ই অজন্মা হইলে প্রজা-রক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হইতেন এবং সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও প্রজা রক্ষা করিতেন। আবার কোন কোন একান্ত স্বার্থপর রাজা দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার দুঃখ-দারিদ্র্যের দিকে একান্ত উদাসীন থাকিতেন, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতে বিরল হইলেও যে একেবারে পাওয়া যায় না তাহা মনে হয় না। খৃষ্টীয় ৯১৭-১৮ অব্দে পঞ্চনদ প্রদেশের বিতস্তা নদীর জলপ্লাবনে বহু শস্তহানি হইয়াছিল। সেই সময় ঐ অঞ্চলে পার্থ নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন নাবালক। পঙ্গু নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অভিভাবক ছিলেন। এই সময়ে রাজপুরুষরা অতি উচ্চমূল্যে অনাহারক্লিষ্ট প্রজাদিগের নিকট খাদ্যশস্ত বেচিয়া প্রভূত অর্থলাভ করিয়াছিলেন। বলহনের রাজতরঙ্গিণীতে সেই পাপিষ্ঠ শাসকদিগের কথা বর্ণিত আছে। আবার ১০১১ খৃষ্টাব্দে হর্ষ নামধেয় রাজার শাসন-কালে রাজ-সরকারের কায়স্থগণ অর্থাৎ খাজানা-আদায়কারী কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে অতিশয় পীড়ন করিয়াছিল। এরূপ ঘটনা ভারতের ইতিহাসে যে একেবারেই নাই, আমরা সে কথা বলি না। আসল কথা, সুশাসন হইলে এদেশে কখনই দুর্ভিক্ষ ঘটিত না—ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বাঙ্গালায় প্রায় দুর্ভিক্ষ হইত না। বাঙ্গালার লোক কস্মিন্ কালে অন্নকষ্ট ভোগ করে নাই। বার্ণিয়ার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় এত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইত যে, বাঙ্গালার লোক ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে বহু দেশে খাদ্যশস্য চালান দিত। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের পূর্ব্বে বাঙ্গালার লোক কস্মিন্ কালেও জঠর জ্বালা অনুভব করে নাই। খাদ্যের জন্ত যে চিন্তিত হইতে হয়, বাঙ্গালার লোক তাহা কখনও জানিত না। চিরকালই একটা নির্দ্দিষ্ট কালান্তরে—বর্ষার অভাব ঘটে। কিন্তু সে জন্ত লোক মরিয়া যাওয়াতে দেশ উজাড় হয় নাই!

এই সাময়িক অজন্মার প্রতিকারকল্পে প্রাচীন কালে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত, এক্ষণে আমি তাহারই আলোচনা করিব। এখনকার বিদেশী শাসকগণ এই বলিয়া গর্ব্ব করেন যে, তখন আমরা অসভ্য ছিলাম,—এখন আমরা সুসভ্য হইয়াছি! আমি দেখাইব যে, সে কালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তখনকার রাজা এবং রাজপুরুষরা যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ-প্রশমনকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না—বরং কোন কোন বিষয়ে অধিক উন্নত ছিল। অত্রিপত্নী অনসূয়া দেবী যে তপস্যার দ্বারা দশবার্ষিক অনাবৃষ্টি-জনিত অজন্মার হস্ত হইতে মুনি-ঋষিদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি জাহ্নবীকে অর্থাৎ গঙ্গাজলকে সেই সেই অঞ্চলে লইয়া গিয়া ঐ স্থানকে উর্ব্বর

এবং ফল-পুষ্পে শোভিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি সেচের খাল কাটিয়া ঐ অঞ্চলে গঙ্গোদক লইয়া গিয়াছিলেন এবং শস্যাদি বপন পূর্ব্বক তথায় প্রচুর আহার্য্য উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন কি করিয়া? তপস্যার দ্বারা। অর্থাৎ আয়াস স্বীকার করিয়া। তিনি গঙ্গা হইতে খাল কাটিয়া আনিয়া ঐ তপস্বীদিগের বাসভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা করিয়াছিলেন,—ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার জল-সেচনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন কথা বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে নারদ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে দেখা যায় যে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "হে রাজা যুধিষ্ঠির, তোমার রাজ্যে কৃষাণগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে ত? বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকল জলপূর্ণ হইয়া বিভাগানুসারে স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে ত? কৃষিকার্য্যে বৃষ্টির নিতান্ত আবশ্যকতা নাই ত? কৃষিজীবীদিগের বীজ এবং অন্নের হানি হয় না ত? প্রত্যেক শতের প্রতি চতুর্থাংশ বৃদ্ধি লইয়া তাহাদিগকে সানুগ্রহ মনে ঋণদান কর ত?" ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়ে কৃষকদিগকে যাহাতে কেবল মেঘের দিকে জলের আশায় চাহিয়া থাকিতে না হয়, সে বিষয়ে রাজার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। প্রজারা অভাবে পড়িয়া বীজ-ধান প্রভৃতি খাইয়া না ফেলে, রাজার সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ছিল। ইহা ভিন্ন কৃষিঋণ দিবার ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রতি এক শত মাপ শস্য-বীজের এক মাপের সিকি পরিমাণ বৃদ্ধি লইয়া বীজ দিতে হইত। রামচন্দ্রও কোশল রাজ্যের এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন যে, কোশল দেশ দেবমাতৃক নহে,—উহা অদেবমাতৃক, অর্থাৎ ঐ রাজ্যের কৃষকদিগকে শস্যের জন্য কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয় না; তথাকার কৃষক সকল সেচের উপর অধিক নির্ভরশীল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও সুশাসিত দেশ সম্বন্ধে ঐরূপ কথাই আছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে সেচের (Irrigation) ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। ইহা কত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। ঋগ্বেদেও সেচের ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায় (৩)। রামায়ণে এবং মহাভারতে উহার কথা আছে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রেও সেচের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রের মধ্যে শুক্র-নীতি অতি প্রাচীন। বর্ত্তমান সময়ে যে গ্রন্থ 'শুক্রনীতিসার' বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা মূল শুক্রাচার্য্য-প্রণীত নহে। উহা অন্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত মূল শুক্রনীতির সংক্ষিপ্তসার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র তাহার পরবর্ত্তী। কৌটিল্যের পরে তাঁহার জনৈক শিষ্য বা মতাবলম্বী ব্যক্তি কামন্দকীয় নীতিসার রচনা করেন। উহাও অতি প্রাচীন। সার ষ্ট্যাম্‌ফোর্ড রাইফলস্‌ এবং ক্রফোর্ড বলেন যে, "যব দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্লাবন উপস্থিত হইলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে তথাকার হিন্দুরা তাহাদের পুরাতন পুস্তক, গৃহদেবতা প্রভৃতি লইয়া বালী দ্বীপে গমন করে। তাহার পর ভারতের সহিত তাহাদের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহারা বালী দ্বীপে কামন্দকীয় নীতিসার লইয়া আসিয়াছিল।" ইহাতে বুঝা যায় যে, কামন্দকের নীতিসার খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের বহু কাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যে অতি প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ছয় প্রকারে দৈব-পীড়ন হইয়া থাকে, যথা—অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, মহামারী বা সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ এবং মড়ক। তন্মধ্যে সংক্রামক ব্যাধিই অধিক লোকহানিকর; অন্য নীতিশাস্ত্রকারও এই কথা বলিয়াছেন। অনেকেই উহা বলেন। কৌটিল্য কিন্তু সে কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, মহামারী অল্প স্থানমধ্যেই নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ হয় ব্যাপক অর্থাৎ বহু দূর বিস্তৃত। ইহাতে অনুমিত হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকের পূর্ব্বেও কোন না কোন সময়ে অত্যন্ত ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ডিওডোরাস-কথিত ম্যাগেস্থেনিসের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, কৌটিল্যের সময়ের স্মৃতির মধ্যে ভারতে কোন প্রবল দুর্ভিক্ষ হয় নাই। সম্ভবতঃ কৌটিল্য উহা কল্পনা করিয়াই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যের মতের খণ্ডন করিয়া থাকিবেন। শুক্রনীতিসারে দুর্ভিক্ষের কথা আছে,—কিন্তু তেমন ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কথা নাই। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রজারা যদি কোন জলাশয়, তড়াগ, খাল বা ইঁদারা খনন করে, তাহা হইলে তাহারা ঐ বাবদ যত ব্যয় করিয়াছে, তাহার দ্বিগুণ যত দিন লাভ না করিতে পারিবে, তত দিন রাজা ঐ বাবদ কোন কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না। শুক্রনীতিসারে কূপ হইতে জল উত্তোলন করিবার জন্য তুলাযন্ত্র নির্ম্মাণের কথা আছে। কৃষিকার্য্যের সাফল্য কিসে হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া রাজা প্রজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। কৃষক কৃষির জন্য যে ব্যয় করিল, (ঐ ব্যয়ের যে সমস্ত রাজকর ধর্ত্তব্য) তাহার দ্বিগুণ অর্থ সে যদি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার কৃষিকার্য্য সফল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কৃষিকার্য্য সফল হইলে তবে রাজা কৃষকের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। অন্যথা নহে।

জনসংখ্যা-বৃদ্ধিই বর্ত্তমান কালে দুর্ভিক্ষ সংঘটনের কারণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু সে অনুমান সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে হয় না। পুরাকালে এ দেশে জনসংখ্যা কম ছিল সত্য,—কিন্তু সেইরূপ কৃষিক্ষেত্রও কম ছিল; কৃষি-প্রণালীও পশ্চাদ্‌পদ ছিল। এখন জনসংখ্যা বাড়িয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমিও বাড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-পদ্ধতিরও উন্নতি সাধিত হইতেছে। আসল কথা, পুরাকালে শাসন-পালনের ব্যয় অত্যন্ত অল্প ছিল। তখনকার রাজারা আপনাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অকারণ পাল-পাল দর্শনধারী মন্ত্রী রাখিতেন না। তখন মন্ত্রী এবং বিচারপতিরা আপনাদের সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বেতন বা ভৃতি লইতেন না। তাঁহাদিগের যাহা প্রয়োজন তাহা সরকার হইতে প্রদত্ত হইত। ইঁহারা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্ষত্রিয়রা প্রায়ই শাসন-বিভাগে এবং সমর-বিভাগে কাজ করিতেন। তাঁহারা জায়গীর পাইতেন। কেবল শিল্পী বণিক্‌ এবং শ্রমিকরাই ভৃতি বা বেতন পাইতেন। কাজেই তখন সর্ব্ববিধ শাসন-পালনের কাজই এখনকার তুলনায় অতি অল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহিত হইত। সেই জন্য লোককে অধিক কর দিতে হইত না। দ্বিতীয়তঃ, রাজারা তখন উৎপন্ন পণ্যে ও ফসলেও কর গ্রহণ করিতেন। ঐ সকল ফসল প্রত্যেক বিভাগে রাজ-সরকারের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইত; উহা হইতে বাজার-দরে, কর্ম্মচারীদিগের বেতন প্রভৃতিও প্রদত্ত হইয়া অবশিষ্ট কিছু থাকিত। দুর্ভিক্ষ বা অজন্মা হইলে জনসাধারণ সেই

(৩) ঋগ্বেদ (১০।৬১।১) ইত্যাদি

রাজ-ভাণ্ডারের শস্যাদি সাধারণ দরেই পাইত। সেই জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ হইতে পারিত না। অজন্মা হইলে প্রজারা শস্যের মূল্য অধিক দিতে বাধ্য হইত না। কাজেই তখন লোকের তেমন কষ্ট হইত না। তবে যদি রাজকোষের শস্যাদি ব্যয়িত হইয়া যাইত, তাহা হইলে হয়ত লোক কিছু মরিত। এরূপ হইলে লোক উহা 'রাজার পাপ' বলিয়া মনে করিত। জৈনদিগের সোমদেব-কৃত "নীতিবাক্যামৃত" গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, রাজা প্রজাদিগকে আপৎকালে সাহায্য করিবার জন্য নিজ ভাণ্ডারে শস্য সঞ্চিত করিয়া রাখিবেন। কৌটিল্য আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রজাগণের আপদ্‌-প্রতিকারার্থ রাজা তাঁহাদের শস্যভাণ্ডারের সঞ্চিত শস্যের অর্দ্ধেক রাখিয়া দিবেন। তখন সকলেই শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত। রাজকোষের অর্দ্ধেক শস্য প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই সঞ্চিত থাকিত। প্রজারাও অজন্মার জন্য শস্য সঞ্চিত রাখিত। প্রজার তক্তপোষের তলা হইতে কোন রাজপুরুষই শস্য টানিয়া বাহির করিবার কল্পনাও করিত না।

পূর্ব্বকালে দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে উহা রাজার পাপে হইয়াছে বলিয়া লোক মনে করিত! অর্থাৎ লোক দুর্ভিক্ষের জন্য রাজাকেই দায়ী করিত। এখনও সাধারণ লোক "রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট" এ-কথা বলিয়া থাকে। এবং সে জন্য শাসন-পদ্ধতির উপর অসন্তুষ্ট হয়। সাধারণের খাদ্য-শস্যের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, সে দিকে রাজগণের এবং রাজপুরুষগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত।

পূর্ব্বকালে দুর্ভিক্ষের প্রতিষেধ-কল্পে (Preventive measure) এইগুলি অবলম্বন করা হইত—

(১) খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা।

(২) রাজকোষে শস্য-সঞ্চয়।

(৩) যাগ-যজ্ঞাদি।

দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে (Remedial measure) নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইত। যথা :—

(১) প্রজাগণকে বীজধান প্রদান (বীজভক্তোপগ্রহম্)

(২) কৃষিঋণ দান। কৌটিল্য ইহাকে অপমিত্যক বলিয়াছেন। ইহা কৃষক এবং অকৃষক-নির্ব্বিশেষে সকলকেই বিনামূল্যে দেওয়া হইত।

(৩) ইষ্টাপূর্ত্তাদি কার্য্য দ্বারা লোক প্রতিপালন (Relief work)। কৌটিল্য সে কথা বলিয়াছেন।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে ধনী লোকদিগের দ্বারা দরিদ্রদিগকে সাহায্য প্রদান। কল্পদ্রুম অবদানে কথিত আছে যে, একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া অনশনক্লিষ্ট লোকদিগকে খাদ্যবস্ত্র দান করিয়াছিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। তবে তখন লোক দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকিমাত্রা খাদ্য দিয়া জীবিত রাখিবার কল্পনাও করিতে পারিত না। দুর্ভিক্ষ-প্রশমনকল্পে তখন যে সকল উপায় অবলম্বিত হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু হয় বলিয়া বোধ হয় না। তবে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে রাজা তাহা নিজেরই পাপজনিত বা ত্রুটীজনিত ঘটনা মনে করিতেন,—এখনকার রাজারা তাহা মনে করেন না। কারণ, তখন আমরা অসভ্য ছিলাম, এখন সভ্য হইয়াছি!

সে কালে এক দেশের সহিত অন্য দেশের যুদ্ধ বাধিলে কোন রাজাই শত্রু-রাজ্যের শস্য নাশ করিতেন না। শস্য নাশ করিয়া যে বিজয় লাভ হইত, তাহা অবশ্য বিজয় নামে নিন্দিত ছিল। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের চতুর্থ সর্গের ৩৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, "ভীমসেন রামের শাসন জানিতে পারিয়া ভয়ে বানরগণ নগর ও জনপথের নিকট দিয়া যাইতেও সাহস পায় নাই।" বানরসৈন্য-গমনের ফলে পাছে সাধারণ প্রজার ক্ষতি হয়, এই আশঙ্কায় রাম ঐরূপ শাসন বা নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। আর এখন সভ্যতার যুগে শত্রু-হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কামাত্রে দেশের শস্য-নাশই হইতেছে নিয়ম! ইহাই পোড়া-মাটি নীতি!

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)

তবু

ভালোবেসে কভু আসো নাই কাছে, হয়তো করেছো ঘৃণা—
তবু সেই মোর অনন্ত গৌরব!
চিরন্তন অনুরাগ, অনির্ব্বাণ, অমূল্য প্রতীক,—
যা' চেয়েছি, যা' দিয়েছি, যা' পেয়েছি—সব।
গরল অমৃত হোক্—দ্বিধাহীন ভালোবাসা দিয়ে;
প্রেমের উজ্জ্বল দীপ নিবায়ো না প্রভু।
কে বলে পাইনি কিছু? প্রেম-প্রীতি, অমৃত-গরল—
ঘৃণা করো, তুচ্ছ ভাবো, কিছু সে তো তবু!

শ্রীকানন রায়

প্রেম

তোমারে বাসিয়া ভালো প্রেমের স্বরূপ চিনিলাম!
মরি মরি কি মাধুরী! এ ধরণী এত মধুময়!
এত আলো এত প্রাণ কোনখানে নাহি ক্ষয়,
পূজার মন্দিরে তব আমারে হারায়ে ফেলিলাম।
হৃদয়ের রক্তপদ্মে তোমারে করিনু আবাহন—
নিঃশেষে করিনু তোমা তুচ্ছ করি লাজ-মান-ভয়!
প্রেমের মন্দিরে আমি পূজারী—এ চির-মৃত্যুঞ্জয়—
নয়নে তোমারি মূর্ত্তি—লুপ্ত সব—লুপ্ত ত্রিভুবন!

শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য

ললিত-কলা

[নক্সা]

ননীগোপাল স্বর্গীয় বড়লোক পিতার একমাত্র পুত্র এবং জীবিতা আরও-বড়লোক পিসীর পুষ্যি। অতএব ননীগোপালের আর্থিক অবস্থা যে বেশ ভাল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পিসীর তিন কুলে কেউ নেই। পিতৃমাতৃহীন একমাত্র ভাইপোই সব। স্নেহে এবং অর্থে ননীগোপালের কোনো অভাবই তিনি রাখেননি।

এহেন ননীগোপাল কেবল ননী খেয়ে গৃহে গোপাল সেজে বসে থাকলেও থাকতে পারত। কিন্তু সে আজকালকার ছেলে। চুপ করে বসে থাকা এ যুগের ধর্ম্ম নয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো হলো এ কালের ফ্যাশন। সিনেমা, মিটিং, লাঞ্চ, ডিনার লেগেই আছে। তা ছাড়া ননীগোপালের টেষ্ট একটু আর্টিষ্টিক। ললিত-কলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যে তার প্রবল অনুরাগ।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে—"ক্যালকাটা আর্ট এণ্ড কিউরীও মিউজিয়াম বহু দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বিক্রয় করছেন। আর্ট-কলেক্টরদের বিরাট্ এবং অভাবনীয় সুযোগ। কলাকামীরা তৎপর হোন। বিলম্বে হতাশ হবেন।" বড় বড় অক্ষরে ছাপা—অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কাগজ পড়তে পড়তে ননীগোপালের দৃষ্টিও সেই দিকে আকৃষ্ট হলো। সে ঠিক করলো, পরদিন ঠিক ন'টার সময় গিয়ে হাজির হবে। লোকের ভীড় কম থাকলে সুবিধামত কম দামে দাঁও মারতে পারবে!

কাগজে ঠিকানা ছিল। ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর ননীগোপাল দোকান আবিষ্কার করলে। ছোট এঁদো-পড়া একটা কুঠ্‌রী। ভিতরে অনেক পুরানো ছবি, কালো হাঁড়ী ভাঙ্গা বেড়ী ইত্যাদি। কোনটা বাবরের, কোনটা রিজিয়া বেগমের, কোনটা চন্দ্রগুপ্তের! একটি ছোট বুদ্ধমূর্ত্তি ননীগোপালের পছন্দ হল। প্রশ্ন করলে, "কত দাম?" দোকানী উত্তর দিলে—"পাঁচ টাকা। বৌদ্ধ যুগের তৈরী। পাঁচশ' টাকা হলেও কম হতো। নিলামে কত ডাক উঠতো বলা যায় না। কিন্তু এখন হাঁকবার লোক নেই। অতএব জলের দরে ছেড়ে দিতে হচ্ছে মশাই। দাঁড়ান, এখনই আসছি।"

এই কথা বলে দোকানী দোকানের পিছন দিকের ঘরে চলে গেল। একটু পরেই এক জন লোক বাহির থেকে এসে দোকানে ঢুকল। ময়লা কাপড়-জামার ওপর ফর্সা চাদর। ননীগোপালকে জিজ্ঞেস করলে—"এটা আপনি কিনেছেন মশাই?" ননীগোপাল উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, তা কিনেছি, বলতে পারেন।" ঠিক সেই সময় দোকানদার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। আগন্তুককে প্রশ্ন করলে—"কি চান?" আগন্তুক জবাব দিলে—"আমি এই বুদ্ধ মূর্ত্তিটা কিনতে চাই।" দোকানদার মাথা চুলকে বললে—"কিন্তু এ ভদ্রলোক মূর্ত্তিটা কিনবেন বলছিলেন। এঁকে আমি প্রায় কথা দিয়ে ফেলেছি—।" বাধা দিয়ে আগন্তুক বললে, "উনি কি দাম দিচ্ছেন?" দোকানী বললে—"এখনো দেননি, তবে দিতে যাচ্ছিলেন।" একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে আগন্তুক বললে—"তাহলে মূর্ত্তিটা এখনও বিক্রী হয়ে যায়নি। বেশ, উনি কত দিতে চেয়েছেন?" দোকানী উত্তর দিলে—"পাঁচ টাকা।" তিনি বললেন—"আমি দশ টাকা দেবো। বৌদ্ধ যুগের তৈরী মূর্ত্তি—পথে-ঘাটে মেলে না। যখন সন্ধান পেয়েছি, তখন ছাড়ছি না।" ননীগোপালের তখন রোখ্ চেপে গেল। কি! চোখের সামনে হাতের জিনিষ অপরে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে! ননীগোপাল হাঁক দিল—"আমি দেবো পনেরো।" আগন্তুক চেঁচিয়ে উঠল—"আমি কুড়ি।" দু'জনেরই জেদ বাড়লো, জেদ বাড়ার সঙ্গে দামও হু-হু করে বাড়তে লাগলো। শেষে ননীগোপাল হাঁকলো—"পঞ্চাশ টাকা।" তখন তার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। জোরে নিশ্বাস পড়ছে। বিরস বদনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আগন্তুক বললে—"নাঃ, আর বাড়বার ক্ষমতা আমার নেই।" দোকানদার ননীগোপালের দিকে চেয়ে হেসে বললে—"দেখলেন তো জিনিষটার দাম! আপনি খুব ভাগ্যবান্। বেশ সস্তায় অতি দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি পেয়ে গেলেন।"

অতগুলো টাকা! ননীগোপালের মনটা দমে গিয়েছিল। দোকানদারের কথায় মরা-মন একটু চাঙ্গা হলো। যাক, একটা রেয়ার জিনিষ! কত আর্ট-কলেক্টর যে লক্ষ টাকা দিয়ে মাটীর হাঁড়ি কিনছে! এ তো পঞ্চাশটি মাত্র টাকায় একটা বুদ্ধ-মূর্ত্তি! পকেট থেকে পাঁচখানা করকরে দশ-টাকার নোট বার করে দোকানদারের হাতে দিয়ে মূর্ত্তিটি নিয়ে ননীগোপাল বাড়ী এলো।

ক'দিন পরের ঘটনা। কি এক কাজে ননীগোপাল ক্যালকাটা আর্ট এণ্ড কিউরীও মিউজিয়মের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যাবেলা। দোকান বন্ধ হবার সময়। দোকানে কোন খরিদ্দার ছিল না। ভিতরে নজর পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। দেখতে পেল তারই বুদ্ধ-মূর্ত্তির অনুরূপ অনেকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি টেবিলের ওপর বসানো। এক জন চাকর ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। দরজার দিকে মুখ করতেই দেখলে, চাকরটা অন্য কেউ নয়—সেদিনকার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী—যার জন্য পাঁচ টাকার মেকী বুদ্ধ-মূর্ত্তির জন্য তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হয়েছে!

ননীগোপাল দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করল। সেই থেকে ননীগোপালের আর্টের নেশা একেবারে কেটে গেছে!

রোজই রেডিয়োর বাঁশী বাজে। তোড়ী, কানাড়া, কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী কত কি! ননীগোপালের ভারী সখ হলো, সে-ও বাঁশী বাজাবে। ইচ্ছা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাঁশী কিনে ফেললে। বাড়ী গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও বাঁশী থেকে কোন রকম আওয়াজ বার করতে পারলে না! মানুষ ঠেকে শেখে। আর্টের ব্যাপারে ননীগোপাল একবার বড় ঠকান্ ঠকেছিল। তাই বাঁশীটা সে ট্রায়ালে কিনেছিল। বলে এসেছিল, পছন্দ না হলে ফেরত দেবে। নীরব বাঁশীতে আর বাঁশে কোন তফাৎ নেই! সে বুঝতে পারল, দোকানদার তাকে একটা ভাঙ্গা বাঁশী দিয়েছে। তখনই দোকানে ছুটল। মহা খাপ্পা হয়ে দোকানীকে বললে—"বাঁশীর বদলে বাঁশ দেবার অর্থ কি? এটা তো একদম ভাঙ্গা। কোন আওয়াজ বার হয় না।" দোকানী বাঁশী নেড়ে-চেড়ে দেখে মুখে দিয়ে বিনা-আয়াসেই বাজাতে আরম্ভ করল। খাশা! ননীগোপাল বেবাক বেকুব বনে গেল। দোকানী হেসে বললে—"ক্ল্যারিওনেট বাজানো একটু শক্ত। অনেক দম লাগে, আর ফুঁ দেবার একটা কায়দা

আছে।" ভদ্রলোক অতি যত্নসহকারে ননীগোপালকে কায়দা বাতলে দিলে।

রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়বার পর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে ননীগোপাল বংশী-শিক্ষায় মনোনিবেশ করলে। কায়দা করে গাল ফুলিয়ে দম বন্ধ করে ফুঁ দিয়ে বাঁশী থেকে আওয়াজ বার করলে। মন প্রসন্ন। অনুশীলনে সকল কার্য্যই আয়ত্ত করা যায়। ননীগোপাল নিবিষ্ট চিত্তে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হল। আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল ফলতে বিশেষ দেরী হলো না। অল্পক্ষণ পরেই একটা বিগট্ রকম হৈচৈ শব্দ কানে গেল। বাঁশী বাজানো বন্ধ করে ননীগোপাল ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। কানে এল পিসীমার পরিত্রাহি চীৎকার—"ওরে ও ননে, ননে।" ব্যস্ত হয়ে ননীগোপাল ডাকলে—"পিসীমা, ও পিসীমা।" "কে? ননী? আঃ বাঁচালি!" পিসীমা ভয়ে কাঁপছেন! ননীগোপাল জিগ্যেস করলে—"কি হয়েছে পিসীমা? এত ভয় পেয়েছো কেন? ব্যাপার কি?" পিসীমা বললেন—"আর বলিস্ কেন? কিছুক্ষণ থেকে বিকট রকম একটা গোঙানী আওয়াজ পাচ্ছিলুম। হয়তো কেউ কাউকে খুন করেছে কিংবা আধমরা অবস্থায় কাছাকাছি কোথাও ফেলে রেখে গেছে। ভূতটুতও হতে পারে। তুই আসতেই কিন্তু আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল!"

ব্যাপারটা ননীগোপাল বুঝলে, কিন্তু পিসীমাকে কিছু বললে না। ওদিকে সদর দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। দরজা খুলে দিতেই লাঠি-সোঁটা নিয়ে পাড়ার ক'জন যুবক বাড়ীতে ঢুকল। বললে—"আপনাদের বাড়ী থেকে বিশ্রী একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ আসছিল। তাই শুনে আমরা ছুটে এলুম। বাড়ীতে ডাকাত পড়েনি তো?" ননীগোপাল কি আর বলবে!

পরদিন সকালে বাঁশী ভেঙ্গে গঙ্গার জলে সে ভাসিয়ে দিলে। সেই থেকে ননীগোপালের সঙ্গীতের নেশা একেবারে ছুটে গেল। রেডিয়োতে বাঁশী বাজলেই সে এখন সেট্ বন্ধ করে দেয়।

ননীগোপালের সাহিত্যিক হবার ঝোঁক চাপলো। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করেও নাটক, নভেল, গল্প, কবিতা কিছুই মনের মত লিখে উঠতে পারল না। তখন সে ঠিক করলে, সমালোচক হবে। সুবিধা বিস্তর। পরের লেখা সম্বন্ধে নিজের মত প্রকাশ। চিরকাল বাঙ্গালীর পরনিন্দা পরচর্চ্চা নিয়েই কাটছে। বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জাতে সমালোচনা-বীজ নিহিত। ননীগোপাল ক্রিটিক হয়ে পড়লো।

প্রথম প্রথম বই কিনে সমালোচনা করতো। দু'-চারটে কাগজে ধরে-কয়ে সমালোচনা বার করলে। তার পর সেই কাগজওলারা কোন নীরস পুস্তক হাতে এলেই ননীগোপালকে পাঠিয়ে দিতে আরম্ভ করলে। কোন লেখকের সম্বন্ধে কখনও সে কোন কটু কথা লিখত না। "বইটি সুলিখিত। ছাপা ভাল। বাঁধাই মনোরম। দামেও বেশ সস্তা"—এই ধরণের সমালোচনাই বেশী থাকত।

কিছু দিনের মধ্যে বইয়ে ঘর ভরে গেল। ননীগোপাল সব সময় বই পড়ছে। পিসীমা রাগ করেন—"সব সময় বই-বই-বই! চোখের মাথা খাবি শেষে! শরীর যাবে যে।" ননীগোপাল চুপ করে থাকে। শেষে এক দিন ননীগোপালের সামান্য একটু সর্দ্দি লেগে জ্বর হ'ল। পিসীমা বললেন—"পড়ে পড়ে জ্বর করে তবে ছাড়লি! বইগুলো যদি বিদায় না করিস্, তবে আমায় বিদায় করে দে।" পিসীমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ননীগোপাল ঠিক করলে, কিছু বই কমিয়ে ফেলবে আর পড়াশুনা একটু রয়ে-সয়ে করবে।

দু'দিন পরেই ননীগোপাল সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। এক দিন খানকয়েক বই বগলে করে সে এক পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে হাজির হ'ল। নতুন বই—কিন্তু নীরস প্রবন্ধ, ধর্ম্মকথা অথবা সমাজ-তত্ত্ব। দোকানদারের পছন্দ হলো না। আর এক দোকানে গেল। দোকানী বইগুলো নাড়া-চাড়া করে নাক সিঁটকে বললে—"কততে দেবেন?" ননীগোপাল ভয়ে ভয়ে এমন একটা দাম চাইলে, যে-দামে ও রকম আধখানা বইও হয় না! দোকানী তার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে—"চোরাই মাল আমরা কিনি না। বৌবাজারের চোরা-হাটে যান।" রাগে অপমানে ননীগোপাল বাড়ী ফিরে গেল।

বই কিন্তু বিদায় করতেই হবে, না হলে পিসীমা বিদায় নেবেন! সন্ধ্যার পর ননীগোপাল একটা চটের থলেয় কিছু বই ভরে রিক্সা করে টালার খালের দিকে গেল। তার পর রিক্সা ছেড়ে দিয়ে থলে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কেউ কোথাও নেই দেখে পুলের উপর থেকে টুপ করে থলেটা খালের জলে ফেলে দিলে। একটা পুলিশ-কনষ্টেবল ছিল পুলের একপ্রান্তে—দূর থেকে ননীগোপালের কার্য্যকলাপ সে দেখছিল। এ ব্যাপারের পর ননীগোপাল যে এক জন খুনী—থলেয় করে লাশ এনে খালের জলে ফেলেছে, এ বিশ্বাস তার বদ্ধমূল হলো। ননীগোপাল দু'পা যেতে না যেতে পুলিশ-পুঙ্গব ছুটে এসে তার হাত ধরে ফেললে। দেখতে দেখতে গোলমাল—লোকের ভীড়! শেষ পর্য্যন্ত ননীগোপালকে থানায় যেতে হলো। থানার ইন্সপেক্টর কনষ্টেবলের কথা শুনে বললেন—"তুমি যতই সাধু সাজবার চেষ্টা করো এখন আর পালাতে পারছ না। অমন লুকিয়ে-চুরিয়ে থলেয় করে বই নিয়ে মানুষ সন্ধ্যার সময় খালের জলে ফেলে না বাপু। ও সব খাটছে না।"

ননীগোপাল হাজতে বন্ধ রইলো।

পরের দিন সকালে জেলে আনিয়ে খালে জাল ফেলা হলো। অনেক মেহনতের পর থলেটা পাওয়া গেল। খবর হাওয়ায় ওড়ে! বহু লোক খালের ধারে এসে জড় হয়েছে। পুলিশ-ইন্সপেক্টর ধীরে ধীরে থলের সেলাই কাটছে। অধীর আগ্রহে বিস্ফারিত লোচনে দর্শকমণ্ডলী অপেক্ষা করছে—না জানি কি বীভৎস দৃশ্য নয়নগোচর হবে! সেলাই খোলা শেষ হতেই বেরিয়ে পড়লো জলে-ভেজা রং-ওঠা গাদাপ্রমাণ বই। ট্রাজেডী ফার্সে পরিণত হলো। ননীগোপালের স্বপক্ষে এবং পুলিশের বিপক্ষে বহু টীকা-টিপ্পনী বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হলো।

বলা বাহুল্য, ননীগোপাল ছাড়া পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার সাহিত্য-নেশাও গেল ছেড়ে। অবশিষ্ট বইগুলি জ্বালানি কয়লার এই অভাবের দিনে সংসারের কাজে লাগলো—পিসীমা সে-সব বই ছিঁড়ে দাসীর হাতে দিলেন উনুন জ্বালাতে।

শ্রীযামিনীমোহন কর।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

ইটালীর আত্মসমর্পণের কথা প্রকাশিত হইবামাত্র জার্ম্মাণী তাহার অভ্যস্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত উত্তর ও মধ্য ইটালীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার পর, নাটকীয় ভাবে মুসোলিনীকে উদ্ধার করিয়া ঐ অধিকৃত অঞ্চলে ফ্যাসিষ্ট-ইটালীর প্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন করিয়াছে।

ইটালী এখন ফ্যাসিষ্ট অঞ্চলে ও গণতান্ত্রিক অঞ্চলে বিভক্ত। দক্ষিণ ইটালীতে সেলারণোর উত্তর হইতে ফোগিয়ার দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রসারিত রেখার নিম্নে গণতান্ত্রিক ইটালী; তৃতীয় ভিক্টর ইমান্নুয়েল্ ইহার নিয়মানুগ নৃপতি বলিয়া পরিচিত, মার্শাল্ বাদোগলিও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী। ঐ রেখার উত্তরে সমগ্র অঞ্চল ফ্যাসিষ্ট-ইটালী; মুসোলিনী এই রাষ্ট্রীয় সৌধের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত, মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি তাঁহার প্রধান সহকারী।

সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, সেলারণোতে সম্মিলিত পক্ষের সেনার অবতরণের আয়োজন শেষ করিবার অন্যতম উদ্দেশ্যে ইটালীর আত্মসমর্পণের সংবাদ সপ্তাহকাল গোপন রাখা হইয়াছিল। এই সেলারণো হইতে সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করিবার জন্য জার্ম্মাণী যথাশক্তি প্রয়াস করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার সে প্রয়াস সফল হয় নাই; সেলারণো অধিকার করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাবাহিনী এখন নেপ্‌ল্‌সের অদূরে পৌঁছিয়াছে। সেলারণোর যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে—জার্ম্মাণী এখন তাহার প্রতিপক্ষের তুলনায় কত দুর্ব্বল! এই অঞ্চলে তাহার প্রতি-আক্রমণের সহিত দুই বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসে তাহার প্রত্যাঘাত তুলনীয়।

সেলারণোতে সম্মিলিত পক্ষের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানটি ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইলে তাঁহাদের সামরিক মর্য্যাদা ধূল্যবলুন্ঠিত হইত। এই অবমাননার হাত হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছেন; কিন্তু জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড প্রতিরোধ ভেদ করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের অগ্রগতিতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূল ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল—উভয় অঞ্চলে তাহাদের সাফল্যের গতি অত্যন্ত মন্থর। ফ্যাসিষ্ট-ইটালীর নূতন নূতন স্থানে সৈন্য অবতরণ করাইয়া জার্ম্মাণীকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করিবার চেষ্টাও আর হয় নাই।

ইটালীর সহিত সম্মিলিত পক্ষের যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুসারে তাঁহারা ইটালীর দ্বীপগুলিকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ঘাঁটারূপে ব্যবহারের অধিকারী। কিন্তু সার্ডিনিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিণ সেনার অবতরণের সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই; তবে, জার্ম্মাণরা না কি সার্ডিনিয়া ত্যাগ করিয়া কর্সিকায় অপসরণ করিয়াছে। কর্সিকার ফরাসী অধিবাসীরা পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণদিগের বিরোধিতা করিতেছিল; পরে, ফরাসী সৈন্য তথায় অবতরণ করে। জার্ম্মাণরা এখন না কি কর্সিকা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। ঈজিয়ান সাগরের প্রবেশ-দ্বারে ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জ ইটালীর। গ্রীসে ও ক্রীটে আক্রমণ-পরিচালনের জন্য এই দ্বীপাবলীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। যুদ্ধ-বিরতির সংবাদ সপ্তাহকাল গোপন থাকিলেও যথাসময়ে সম্মিলিত পক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই। তবে, সম্প্রতি তাঁহারা ডোডেকেনীজের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়াছেন।

ইটালীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করাইয়া সামরিক দিক্ হইতে সম্মিলিত পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়ে উপকৃত হইয়াছেন—প্রথমতঃ, ইটালীর নৌবহর লাভ করিয়া সমুদ্রবক্ষে তাঁহারা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়াছেন; ইটালীর নৌবাহিনী যদি ভূমধ্যসাগরের বাহিরে ব্যবহৃত না-ও হয়, তাহা হইলেও ইঙ্গ-মার্কিণী নৌবহর ঐ অঞ্চলের দায়িত্ব-মুক্ত হইয়া অন্যত্র অবহিত হইতে পারিবে। ইহাতে প্রাচ্য অঞ্চলে এবং আটলাণ্টিকে সম্মিলিত পক্ষের অবস্থা উন্নত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত পক্ষ ইটালীতে পাদভূমি লাভ করিয়াছেন; জার্ম্মাণীর সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছেন। এখানে তাহাকে বিশেষ ভাবে যুদ্ধে ব্যাপৃত করিতে পারিলে অন্যত্র শত্রুকে আঘাত করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, কর্সিকায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তথা হইতে সমুদ্রপথে সম্মিলিত পক্ষের ফ্রান্স-অভিযান সহজসাধ্য হইবে। সমুদ্রবক্ষে সম্মিলিত পক্ষ এখন একরূপ নিষ্কণ্টক; বিমান-শক্তিতেও তাঁহারা প্রবল; কাজেই, "লুফ্‌ৎওয়াফের" সাহায্যে এই অভিযান-প্রচেষ্টায় বাধা দান জার্ম্মাণীর পক্ষে সহজ হইবে না। চতুর্থতঃ, ডোডেকেনীজ হইতে বলকানে অভিযান-পরিচালনের সুবিধাও সম্মিলিত পক্ষ লাভ করিয়াছেন; একই সময়ে দক্ষিণ-ইটালী হইতে এবং ডোডেকেনীজ হইতে বলকানে আঘাত করিবার সুযোগ সৃষ্ট হইয়াছে।

অবশ্য, রাজনৈতিক কারণে সম্মিলিত পক্ষ এই সব সুবিধা গ্রহণে ইতস্ততঃ করিবেন কি না, সামরিক শক্তির অপ্রাচুর্য্য তাঁহাদিগকে এই সুবিধা গ্রহণে অশক্ত করিবে কি না, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে, তখন পর্য্যন্ত ইটালীর আত্মসমর্পণে সৃষ্ট সামরিক সুবিধাগুলির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি করিতে পারে নাই, অথবা ইচ্ছা করিয়াই তাহারা ইহা করে নাই।

রাজনীতি ক্ষেত্রে ইটালীর আত্মসমর্পণের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। অক্ষশক্তির শিবিরে এই বিপর্য্যয়ে জার্ম্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ কুপ্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে। হিট্‌লারের যে সকল ক্রীড়নক ঐ সব রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন। জার্ম্মাণীর অধিকৃত রাজ্যগুলিতে যাহারা চরম নির্য্যাতন সত্ত্বেও বিজয়ী শক্তির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত, তাহারা ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়াছে; জার্ম্মাণ ভূমিতেও ফ্যাসিষ্ট পক্ষের পরাজয়ের আশঙ্কা বর্দ্ধিত হইয়াছে। অবশ্য, রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর ক্রমবর্দ্ধমান পরাজয়ে পূর্ব্ব হইতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইতেছিল; ইটালীর আত্মসমর্পণে অক্ষশক্তির শিবিরে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আরও প্রবল হইল।

ইটালীয় ভূমি রণাঙ্গনে পরিণত হইয়া এই দেশটি আজ শ্মশান হইতেছে। কিন্তু এই বিরাট্ ধ্বংসকাণ্ডের মধ্য দিয়াই ইটালীর বিশেষ রাজনৈতিক কল্যাণও সাধিত হইতেছে। ইটালীয় গণ-শক্তি আজ গণতান্ত্রিক ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী উদ্দেশ্যে সমবেত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সামরিক তৎপরতায় এই শক্তিকে নিয়োজিত করা ইঙ্গ-মার্কিণ রাজনীতিকদের একান্ত প্রয়োজন! ফ্যাসিষ্ট তন্ত্রের প্রাক্তন সহযোগী বাদোগলিও আজ ঘটনাচক্রে এই গণশক্তিরই মুখাপেক্ষী। তাঁহার আহ্বানে ইটালীর জনসাধারণ যদি

ফ্যাসিষ্ট ইটালীর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা থাকিবে; নতুবা যুদ্ধ-বিরতির সময় তিনি যদি কোনরূপ ব্যক্তিগত আশ্বাস পাইয়াও থাকেন, তাহা হইলেও উহা কার্য্যতঃ বৃথা হইবে।

ফ্যাসিজম্ ও তাহারই নামান্তর নাৎসীবাদ গণশক্তির চরম শত্রু। ধনিকতন্ত্র হইতে সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি; এই সাম্রাজ্যবাদের শেষ রূপ ফ্যাসিজম্। গত ২১ বৎসর ফ্যাসিজমের এই জগদ্দল পাথর ইটালীর গণশক্তির বুকে চাপিয়া ছিল। আজ ঘটনাচক্রে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজমে সজ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে; এখন সেই সজ্ঘর্ষের একটি প্রধান ক্ষেত্র ইটালীয় ভূমি। ইটালীর জনসাধারণ যদি সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সহায়তায় ফ্যাসিজমের অবসান ঘটাইতে পারে এবং এই সামরিক তৎপরতার কালে ইটালীর প্রকৃত গণ-নেতারা যদি রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইটালী ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদ—উভয়ের কবল হইতেই মুক্ত হইতে পারিবে। মার্শাল বাদোগলিও আজ ইটালীর জনসাধারণকে নাৎসী জার্ম্মাণী ও ফ্যাসিষ্ট-ইটালীর বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। ইটালীর শ্রমিক ও কৃষক যদি গরিলা যোদ্ধার ত্যাগব্রত গ্রহণ করিয়া নিজ মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তরকালে তাহাদের যে সুসংগঠিত শক্তি প্রকাশ পাইবে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ইটালীতে বাদোগলিও-মার্কা দেশীয় ফ্যাসিজম্ অথবা বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদ কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। বিরাট্ ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে ইটালীয় গণশক্তির প্রতিষ্ঠিত হইবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ আজ উপস্থিত। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ইটালীয় জাতির পক্ষে ইহা আশীর্ব্বাদস্বরূপ।

রুশ-রণাঙ্গন—

মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর বিশালতম ঘাঁটী স্মলেনস্ক সোভিয়েট বাহিনী অধিকার করিয়াছে; রুশ-রণাঙ্গনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইহাই। রুশ সেনা তিন দিক্ হইতে এই সহরের দিকে অগ্রসর হওয়ায় জার্ম্মাণ সেনা দ্রুত পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছিল। এখন রুশ সেনার হোয়াইট্ রাশিয়ায় প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত; কিছু রুশ সেনা ইতোমধ্যে এই প্রদেশে প্রবেশও করিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে হোয়াইট্ রাশিয়ার রাজধানী মিনস্কই এখন জার্ম্মাণীর শেষ ঘাঁটী। দক্ষিণ অঞ্চলে রুশ সেনা এখন ইউক্রেণের রাজধানী কিয়েভে প্রবল আঘাত হানিতেছে। কিয়েভ হইতে নীপ্রোপেট্রভস্কের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে ৬টি স্থানে রুশ সেনা নীপার নদীর তীরে পৌছিয়াছে। কুবান অঞ্চল এখন সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণশূন্য; সোভিয়েট বাহিনী সম্প্রতি কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব-উপকূলবর্ত্তী নভরোসিস্ক ও আনাপা অধিকার করায় কুবানের শেষ পাদভূমি হইতে জার্ম্মাণ সেনাবাহিনী এখন বিতাড়িত। ক্রিমিয়া পূর্ব্ব দিক্ হইতে বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়াছে। যে রেলপথটি ক্রিমিয়াকে রুশিয়ার অবশিষ্টাংশের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, তাহার উত্তরাংশ বহু পূর্ব্বেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। বর্ত্তমানে রুশ সেনা ক্রিমিয়াকে বিচ্ছিন্ন-সংযোগ করিবার উদ্দেশে মেলিটোপোলে প্রবল আঘাত করিতেছে। মেলিটোপোল্ অধিকার করিয়া রুশ সেনা যদি খারসন্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে হয়ত বিনা যুদ্ধেই সেবাস্তোপোল, সিমফারোপোল্ তথা সমগ্র ক্রিমিয়া তাহাদের করায়ত্ত হইবে। পূর্ব্বাহ্ণেই জার্ম্মাণী যদি ক্রিমিয়া ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তখন সমুদ্র-পথে অপসরণ-প্রচেষ্টায় বহু জার্ম্মাণ সেনার সলিল-সমাধিও অবশ্যম্ভাবী।

জার্ম্মাণ সেনানায়করা এখন কোন স্থানে 'দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হইতেছেন না; সেনাবাহিনী বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিলেই দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। রুশ সেনাও এক একটি জার্ম্মাণ কেন্দ্রে এইরূপ সুকৌশলে সাঁড়াশী আক্রমণ প্রসারিত করিতেছে যে, সেনাবাহিনীকে বাঁচাইবার জন্য জার্ম্মাণ সেনাপতির দ্রুত পশ্চাদপসরণ ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকিতেছে না। সেনাবাহিনী বিপন্ন করিয়া কোন বিশেষ স্থান রক্ষায় প্রয়াসী হওয়া জার্ম্মাণ সেনাপতির পক্ষে আর বুদ্ধিমানের কাজও নহে; কারণ, রুশ-রণাঙ্গনের সামরিক অবস্থা জার্ম্মাণীর অনুকূল হইবার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও আর নাই। প্রতিপক্ষকে সমর-ক্ষেত্রে পরাভূত করিবার আশা জার্ম্মাণী ত্যাগ করিয়াছে; এখন প্রতিরোধমূলক সংগ্রামে কূটনৈতিক চাতুর্য্যে কোন প্রকারে টিকিয়া থাকাই তাহার উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণ রাজনৈতিকরা মনে করেন, প্রতিরোধ-সংগ্রামে সুদীর্ঘ কাল কাটাইতে পারিলে রাজনৈতিক অবস্থা তাঁহাদের অনুকূল হইবে; সম্মিলিত পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা ঘটিবে।

রুশ-রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর পুনঃ পুনঃ এই পরাজয় সত্ত্বেও তাহার সামরিক শক্তিতে চরম আঘাত লাগিতেছে না; কারণ, ষ্ট্যালিনগ্রাডের পুনরভিনয় আর সম্ভব হয় নাই। কিন্তু জার্ম্মাণীর সামরিক মর্য্যাদা এই ভাবে বিনষ্ট হওয়ায় অক্ষশক্তির শিবিরে প্রবল নৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে। ইটালীর আত্মসমর্পণের সহিত রুশ-রণাঙ্গনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই সম্পর্কে জনৈক বিশিষ্ট রাজনৈতিক মন্তব্য করিয়াছেন—"ইটালী আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে; কারণ, মার্শাল বাদোগলিও জানিতেন যে, জার্ম্মাণীর নিকট হইতে তাঁহার আর কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই; জার্ম্মাণীর সেনাবাহিনী এখন রুশ-রণাঙ্গনে বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত।" ফিন্‌ল্যাণ্ডের পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র সন্ধির আগ্রহ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়াছে। হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া—সকলেই এখন জার্ম্মাণীর সহিত গ্রথিত তাহাদের ভাগ্যসূত্র ছিন্ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

মিঃ চার্চ্চিল তাঁহার সাম্প্রতিক বক্তৃতায় আভাস দিয়াছেন যে, সত্বর পশ্চিম-য়ুরোপে তাঁহারা জার্ম্মাণীকে আঘাত করিবেন। ইটালীর যুদ্ধ যে প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন নহে, তাহা বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন। ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীকে সত্যই প্রবল আঘাত করিতে প্রয়াসী হইবেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে য়ুরোপে সামরিক অবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে; ১৯৪১ ও ৪২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণবাহিনী বিজয়গর্ব্বে পূর্ব্ব-য়ুরোপে অগ্রসর হইতেছিল, আর প্রতিরোধরত রুশ সেনাপতি নিজ সেনাবাহিনীকে বাঁচাইয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছিলেন। আর আজ সোভিয়েট বাহিনী প্রবল বিক্রমে অগ্রসর হইতেছে; জার্ম্মাণ সেনাপতি তাহার সৈন্য লইয়া পলায়নে ব্যস্ত! এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া রুশিয়ার প্রতি জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইবার প্রয়োজনীয়তা আর নাই। এখন য়ুরোপখণ্ডে অভিযান প্রসারিত করিয়া ভবিষ্যৎ য়ুরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে মাতব্বরি করিবার অধিকার বজায় রাখাই ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির স্বার্থ। পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসই যদি পূর্ব্ব-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর চাপ হ্রাস করাইতে

না দিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন সেই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্যই জার্ম্মাণীকে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির আঘাত করা প্রয়োজন হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী যদি তাহাদিগের নিজ ভূমি হইতে জার্ম্মাণদিগকে বিতাড়িত করিয়া মধ্য য়ুরোপে প্রবেশ করিতে পারে, অথচ ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি যদি জার্ম্মাণীকে প্রবল আঘাত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের চরম সামরিক ব্যর্থতা প্রকাশ পাইবে। ইঙ্গ মার্কিণ রাজনীতিকগণ এই সামরিক মর্য্যাদাহানি সহজে স্বীকার করিতে চাহিবেন না। সর্ব্বোপরি, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা যদি য়ুরোপখণ্ডে অভিযান আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য অঞ্চল জার্ম্মাণীর কবলমুক্ত করিতে না পারে, তাহা হইলে য়ুরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে সোভিয়েট রুশিয়া অপ্রতিহত অধিকার লাভ করিবে। এই সম্ভাবনা নিবারণের জন্য বিশেষ চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক।

সুদূর প্রাচী—

নিউগিনির সাল্যামুয়া ও লে অধিকারের পর সম্মিলিত পক্ষের সেনাবাহিনী ফিনস্‌হাফেনের নিকট উপনীত হইয়াছে ; ফিন্‌স্‌হাফেনের বহির্ব্যূহ ভেদ হইয়াছে। সুদূর প্রাচীর রণাঙ্গনে ইহাই উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা। তবে, ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে আঘাতের জন্য সম্মিলিত পক্ষের আয়োজন দ্রুত চলিতেছে? জাপানও যে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, তাহা সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। জাপান আশঙ্কা করে, এক দিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর হইতে জাপানী দ্বীপপুঞ্জে প্রত্যক্ষ আঘাতের প্রয়াস হইবে, অন্য দিকে ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে আক্রমণ পরিচালিত হইবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল হইতে জাপানকে প্রত্যক্ষ আঘাত করা আপাততঃ সম্ভব নহে বলিয়াই মনে হয়। তবে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের শ্রমশিল্পকেন্দ্রে ও অন্যান্য সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিমান-আক্রমণ পরিচালিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সত্বর এই আক্রমণ প্রবল ভাবেই চলিবে বলিয়া মনে হয়। জাপানের সহিত প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের প্রকৃত ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশ ও মালয়। এই অঞ্চলেই প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ হইবে।

আগামী শীতকালে সম্মিলিত পক্ষ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেছেন। ব্রহ্ম-চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া অবিলম্বে চীনের শক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘ ৬ বৎসরকাল চরম দুঃখ সহিয়া চীন শত্রুর সহিত সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। চীনের কম্যুনিষ্ট দলের এবং চিয়াং-কাই-সেকের অনুগত একটি শ্রেণীর জাপ-বিরোধী মনোভাব সন্দেহাতীত। তবে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই সমগ্র চীন গঠিত নহে। অবশিষ্ট চীনারা এই "অন্তহীন" যুদ্ধে নৈরাশ্য ও ক্লান্তি বোধ করিতে পারে। বিশেষতঃ জাপান এখন চীনকে স্বদলে আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিতেছে ; সে যে মাঞ্চুকো ব্যতীত সমগ্র চীন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহাও জানাইয়াছে। ইহা ব্যতীত, চীনের সংগঠনের জন্য ঋণ-দানের প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি ত আছেই। মাদাম্ চিয়াং-কাই-সেক কিছু দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—জাপানের সমর-যন্ত্র অপেক্ষা তাহার কূটনৈতিক অস্ত্র অধিকতর ভয়াবহ। কাজেই আশঙ্কা হয়, এই বৎসর শীতকালের মধ্যে ব্রহ্ম চীন পথ উন্মুক্ত করিয়া চীনকে শক্তিশালী করিয়া তোলা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জাপানের কূটনৈতিক কৌশল সফল হইবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। জাপান যদি চীনকে স্বদলে আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সে হয়ত অজেয় হইয়া উঠিবে।

২৭।৯।৪৩ শ্রীঅতুল দত্ত।

বিরহ ও অভিসার

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া আজ আর বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যকে সরাইয়া রাখা সম্ভব নয়, ইহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই স্বীকার করেন। বৈষ্ণব কবিতার রসই হইতেছে সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু ; ক্ষণিকের উল্লাসে মানুষ উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে সত্য, কিন্তু প্রিয়-বিরহের করুণ মূর্চ্ছনায় মানব হৃদয়ে যে সুরটি এক বার বাজিয়া ওঠে, তাহা জল-বুদ্‌বুদের মত ক্ষণেকে মিলাইয়া যাইতে চাহে না। তুষের আগুনের মত রহিয়া রহিয়া তাহা জ্বলিতে থাকে—বাহিরে তাহার প্রকাশ থাকে না সত্য, কিন্তু অন্তরের অন্তরে প্রাণ-মন পুড়াইয়া খাঁটি সোনা করিয়া তোলে।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে আমরা নানা রস-পর্য্যায়ের পদ দেখিতে পাই। কিন্তু সে পদগুলিকে আর আমরা ভুলিতে পারি না—যেগুলি পড়িতে পড়িতে মানস-চক্ষে বিরহিণী শ্রীমতীর ক্লান্ত-করুণ যে মুখখানি প্রতিভাত হইয়া ওঠে সে মুখে প্রসাধনের চিহ্ন নাই, অধরে অলক্তক নাই, নয়নের কাজল বেদনার অশ্রুতে ধুইয়া মুছিয়া ভাসিয়া গিয়াছে! দৃষ্টিতে আর সে চটুলতা নাই—বিরহিণী শ্রীরাধার সে দিন প্রতিষ্ঠা হয় ভক্ত-হৃদয়ে ব্যথার বেদীতে।

আর এক জাতের পদাবলী আছে, যাহা আমাদের অন্তরে বেদনা, বিস্ময় ও পুলকের সঞ্চার করে। সে হইতেছে অভিসারের পদাবলী। দয়িতের আহ্বানে শঙ্কিতা নায়িকা চলিয়াছেন জীবন-দেবতার অভিসারে। শ্রাবণের সঘন বারি-ধারায় কেশ-বাস সিক্ত, ক্ষণে ক্ষণে বিজলীর ঝলকে নয়ন-পথে সব-কিছু ঝলসিয়া উঠিতেছে—বিষধর হিংস্র সর্পকুল ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, কিন্তু শ্রীমতীর আর কিছুতেই ভয় করিলে চলিবে না! তাঁহাকে প্রাণবল্লভের বুকে আশ্রয় খুঁজিয়া লইতে হইবে! কোন কথা আর ভাবিলে চলিবে না—চিন্তা করিবার আর অবকাশ নাই! কোন্ মুখে কুল-কলঙ্কিনী হইয়া প্রভাতে তিনি লোক-সমাজে ফিরিয়া যাইবেন? কুটিলা-জটিলার জ্বালাময় বাক্যবাণ কি করিয়াই বা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিবেন?

আধ্যাত্মিকতার উপর বৈষ্ণব কবিতা সমগ্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত কিম্বা ইহাতে সাধারণ মানব-মনের ভাব-ধারার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে, তাহা কাহারও অনুশাসন মানিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা শক্ত। সাধারণ হোক আর অসাধারণই হোক, পাঠককে এই ধরণীর বর্ণগন্ধ-স্পর্শের

ভিতর দিয়া ইহা এক অরূপলোকের অভিসারে টানিয়া লইয়া যায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অভিসারের পদগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, শ্রীমতীর সহচরী-হিসাবে পদকর্ত্তা এবং পাঠক উভয়েই বুঝি সেই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে শ্যামসুন্দরের অভিসারে ছুটিয়াছেন! অভিসারের পদগুলি যে ভাবে পাঠকের মনকে তাহার ছন্দ, বিষয়-বস্তু ও ভাবধারার সহিত টানিয়া ছুটিতে থাকে, তাহা আর অন্য কোন সাহিত্যে কোন কাব্যে পারে কি না জানি না।

চারি দিক ঝাঁপিয়া প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, অন্ধকার নিশি, কর্দ্দমময় আশঙ্কাচ্ছন্ন পথ বাহিয়া শ্রীমতী চলিয়াছেন শ্যামদর্শনে, প্রিয়-সহচরীবৃন্দ বার বার শ্রীমতীকে নিষেধ জানাইতেছেন—

"ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে মরি যাত।
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।"

কিন্তু যে-বাণ একবার হাতের বাঁধন কাটিয়া ছুটিয়া গিয়াছে, তাহাকে যেমন আর ফিরানো যায় না, তেমনি কান্ত-বিরহ-ব্যাকুল মন আর কোন যুক্তি জানিতে চাহিল না! উত্তরে শ্রীমতী শুধু বলিলেন—

"কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরক আগি।"

ভণিতায় অভিসার-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতা গোবিন্দদাস বলিতেছেন—

"গোবিন্দদাস কহই অভিসর ধনি সহচরি পাওল বোধ।"

মিলনের পথ, জীবন-দেবতাকে লাভ করিবার সাধনা অত্যন্ত কঠিন, কঠোর। শুধু অভিসারে বাহির হইলেই চলিবে না, সে অভিসারকে সার্থক করিতে চাহিলে সর্ব্বপ্রথমে অতিক্রম করিতে হইবে মনের বাধা এবং পথের সমস্ত বিঘ্ন। তাই শ্রীমতী অন্ধকার পথে চলিবার অভ্যাস করিতেছেন। দুই হাতে নয়ন রোধ করিয়া কলসী-কলসী জল ঢালিয়া নিজের হাতে কাঁটা পুতিয়া কণ্টকাকীর্ণ পিচ্ছল অন্ধকার-পথে চলিবার অভ্যাস করিতেছেন। সর্পসঙ্কুল পথে চলিতে হইবে বলিয়া ওঝাকে হাতের কঙ্কণ পুরস্কার দিয়া সাপের মন্ত্র-তন্ত্র শিখিয়া লইতেছেন—কখনও কালা সাজিয়া, কখনও বোবা সাজিয়া সমাজের সকল উক্তিকে উপেক্ষা করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন।

আবার যে প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য এই কঠোর সাধনা, তিনি আপনি আসিয়া চোরের মত শ্রীমতীর হৃদয়-দুয়ারে ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। শ্রীমতী কহিতেছেন—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলা বাটে
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

কি বাঙ্গালা সাহিত্যে, কি বিশ্ব সাহিত্যে এই জাতীয় পদ একান্ত দুর্লভ। বৈষ্ণব কবি কখন বা বর্ষা-অভিসার, হিম-অভিসার, দিবা-অভিসার, জ্যোৎস্না-অভিসার, আবার কখনও উন্মত্তাভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি পদই কি ভাষার মাধুর্য্যে, কি রসের পরিবেশে, কি ভাবের ঐশ্বর্য্যে—সব দিক্ দিয়াই পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই আত্মবিহ্বলতা, আত্ম-নিবেদন, এই পূর্ণ-সমর্পণ যে সাহিত্যকে মহিমমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা যে বিশ্ব সাহিত্যের মণিকুটিরে কালজয়ী হইয়া আপন গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বিরহের পদগুলি বৈষ্ণব-পদাবলীর গর্ব্বের বস্তু। পদকর্ত্তাগণ তাঁহাদের আন্তরিকতাকে, তাঁহাদের তীব্র অনুভূতিকে, হৃদয়ের ব্যথাকে এই পদগুলির ভিতর দিয়া অতি নিপুণ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সখী গিয়া মথুরায় ব্রজনন্দনের নিকট কবিতার ভাষায় বিরহিণী শ্রীমতীর যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন জীবন্ত, তেমনি সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে! এ পদগুলির ভিতর দিয়া আমরা কেবল শ্রীমতীর বাহিরের নহে, অন্তরের রূপটিও দেখিতে পাই!

"পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি রেহা
কলেবর কমল কাঁতি জিনি কামিনি
দিনে দিনে খিন ভেল দেহা।"

এই ত গেল বাহিরে! আর অন্তরে—

"অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই
ও নিজ ভাব সভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই।
মাধব অপরূপ তোহারি সুনেহ
আপন বিরহে আপন তনু জর-জর
জিবইতে ভেল সন্দেহ।"

বৃন্দাবনের সব কিছু শ্রীমতীর চোখে শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। শ্যাম-স্নিগ্ধ নিকুঞ্জ, সুনীল যমুনা কিছুই আজ আর তাঁহার নয়ন-মনে তৃপ্তি দিতে পারিতেছে না। বিদ্যাপতি তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার যাদু-স্পর্শে মাত্র কয়েকটি পংক্তিতে কানু বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার ও কৃষ্ণ-বিহীন ব্রজপুরের যে মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়াছেন, সাহিত্যে তাহা দুর্লভ।

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কে হরি লেল।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল।
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী।
কৈসে হম যাওব যামুন-তীর।
কৈসে নিহারব কুঞ্জ-কুটীর।

আর অধিক উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। রসজ্ঞ পাঠক অনুভব করিবেন, ভক্ত পদকর্ত্তাগণের ভাব ধারা কত উচ্চস্তরে উঠিলে এমন পদ রচনা সম্ভব হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র (এম-এ)।

ভেক-কদলী বটিকা

[নক্সা]

ঘরে চাল নাই, চালে খড় নাই, তার উপর খরস্রোতা নদীর স্ফীতি। এতে স্ফুর্ত্তির দম-বন্ধ হয়। কাজেই ছুতোর ব'লে দাশরথি দেশ ছেড়ে সহরের দিকে রওনা হল। কিছু না হয় ধনী যজমানের প্রাসাদে নারায়ণের প্রসাদ খেয়ে দেহটাকে শুধরে নেবে। রায়েদের বাড়ী ঠাকুরের নিত্য সেবা হয়। তার গ্রাম থেকে সতর বারো মাইল দূরে বড় রাস্তার পথে। মাঠের উপর আল ধরে গেলে মাইল চার পথ কমে। কিন্তু সড়কে খড়ের গাড়ী যায়, মাঝে মাঝে টপ্পর-ছাওয়া। খালি গাড়ীও সহরে ফিরে যায়। তেমন গাড়ী এ-যাত্রা দাশু ভট্টাচার্য্যের ভাগ্যে জুটলো না। মিষ্ট কথা বলে দরদস্তুর ক'রে আঠারো পয়সায় খড়-বোঝাই এক গাড়ীতে সে সোয়ারী হলো। গাড়োয়ানের গো-ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা প্রকটিত হ'ল, যখন সে বলদের ভার কমাবার জন্য নিজে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে আরম্ভ করলে এবং দাদাঠাকুরকে এক বার তামাক সেজে খাওয়ালে।

বগ্‌লাডাঙ্গার চৌমাথায় ঠিক ভোরের সময় যখন গাড়ী দাঁড়ালো, মাথায় খানিকটে লাল সালু বাঁধা, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি, পায়ের হাঁটু অবধি ধুলা, এক বরকন্দাজ গাড়ী থামালো। বোঝাপড়ার ফলে প্রতীয়মান হল যে, লোকটার অভিপ্রায় অসৎ নয়। সে টিক্‌রার ঘোষাল বাবুদের লোক। বড়মার হুকুম, ভোরের বেলায় পথে যে ব্রাহ্মণকে দেখবে তাকেই ধরে আনতে হবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছেন।

দাশু ঠাকুর বল্লে—কি কাণ্ড বাবা বরকন্দাজ! স্বপ্নের বাকীটুকু যে আমিও দেখেছি। তা চল।

এখনও অর্দ্ধেক পথ বাকী। সে কিন্তু উদার। ক্যাম্বিসের ব্যাগে পয়সা খোঁজবার সময় যখন বরকন্দাজের প্রশ্ন তার কানে গেল, সে বল্লে—সিকি খুঁজছি বাবা। একে দিতে হবে।

সে বড়লোকের ভৃত্য। গিন্নিমার স্বপ্ন-দেখা ব্রাহ্মণকে পথ থেকে ঘরে নিয়ে যাচ্চে। ভাড়া দেবেন ঠাকুর? চার আনা পয়সা মাশুল দিয়ে দাশরথি ভট্টাচার্য্যকে সে খড়ের গাদা থেকে উদ্ধার করলে।

বগ্‌লাডাঙ্গা থেকে টিকরী ক্রোশ খানেক দূরে। কিন্তু বরকন্দাজ বল্লে—দাদাঠাকুর, যদি এখানে একটু বসেন তো আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি।

গ্রামের লোক তাকে বল্‌ত ফিচেল দাশু। ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টর প্রহসনে সে নায়ক হবার মত অল্পবুদ্ধি মানুষ নয়! সে বল্লে—মোড়লের পো, গিন্নিমার স্বপ্নটাকে কি মাটি করতে চাও। তিনি যে কাজের জন্য আমায় নিয়ে যাচ্চেন, গাড়ীতে চড়লে সেটি একেবারে বিফল হবে।

সে ভাবলে, স্বপ্নটা একটা খেয়াল। হঠাৎ বদলে গেলে, কিন্তু বরকন্দাজের গাড়ী আনতে যাওয়া হবে অগস্ত্য-যাত্রা। সে শুনেছিল ঘোষাল বাড়ীর পাচকের সুখ্যাতি। আজকের মত তো বিধি মাপালেন, তার পর যা আছে অদৃষ্টে!

মাদারতলায় ধোঁয়াযাত্রা করবার সময় দাশু জিজ্ঞাসা করলে, বাবুদের কুশল সমাচার।

—সবই তো জানেন দাদাঠাকুর, ছোট বৌমার রোগের কথা। বড় বড় ডাক্তার বলে, কি জানি কি ছাই অষ্ট্রেলিয়া না কি!

অষ্ট্রেলিয়া! হুঁ! ওঃ! হিষ্টিরিয়া!

কিনু কথা কয় কম। কিন্তু একবার তার মুখ খুললে কষ্ট করে শ্রীমুখ বন্ধ করতে হয়। মুখ বন্ধ তো কথার কথা! মানে কথা বন্ধ, কারণ, কিনুর দাঁতের পাটি অপেক্ষা ঠোঁট ছোট—মুখ একেবারে বন্ধ হয় না।

সে বল্লে—বড় ঘরের বড় কথা দাদাঠাকুর। ও অষ্ট্রেলিয়াও না, মিরগীও না।

তার পর নাক-কান মলে—কোদাল-কুড়ুল দাঁতে জিভ কামড়ে বল্লে—অপি-দেবতা দাদা ঠাকুর—অপিদেবতা।

হুঁ! ছোট বউকে ভূতে পেয়েছে! কিন্তু গৃহকর্ত্রী তাকে কেন স্বপ্ন দেখে? রোগটা তাহলে দু'পুরুষে!

কিনুর কাছ থেকে রোগের লক্ষণগুলো সব সে জেনে নিলে। ছোট বৌরাণীর আহারে অরুচি নাই, দেহও লাবণ্য-ভাণ্ড। কেবল মাঝে মাঝে তিনি গাছ-কোমর বেঁধে হুল্লোড় করেন। তার অট্টহাস্তে অট্টালিকা কেঁপে ওঠে। তার কারণ অষ্ট্রেলিয়া বা অপি-দেবতার কারসাজি!

কিনুকে ছেঁচে দাশু যখন সকল জ্ঞাতব্য আয়ত্ত করলে, তখন অকস্মাৎ মণ্ডলের আত্মগ্লানি সজাগ হ'ল। সে বল্লে—হেই দাদাঠাকুর। বড় ঘরের কথা বুঝলেন, আমরা মুরুখ্যু মানুষ।

—জলের মত বুঝেছি বাবা যে তুমি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পাশ করা পণ্ডিত নও। এই যে মুখ দেখছ মোড়লের পো, এ নট নড়ন-চড়ন, নট-কিচ্ছু! একেবারে স্পিকটি নট!

মোটামুটি কিনু বুঝলে যে দাদা ঠাকুর তার মনিব-চর্চ্চারূপ অপকর্ম্ম পেটের বাক্সয় তালা-বন্ধ করে রাখবে।

২

দাশরথি ভট্টাচার্য্য সুপুরুষ। কাজ-কর্ম্ম নাই, যজমান-বাড়ী থেকে মাঝে মাঝে নগদ কিছু প্রাপ্য আছে, নিষ্কর জমি আছে। কথায় আসর জমাতে পারে আহার, নিদ্রা, পরচর্চ্চা এবং কম-খরচায় দুঃখের ভাত সুখ করে খায়, ফিচেল-দাশু। এ বছর অজন্মায় কত ক্ষণ-জন্মাকে ঘায়েল হতে হয়েছে! তুচ্ছ ভট্টাচার্য্য গরীবের তো কথাই নাই। ঘোষাল-গৃহ যদি বধ্য-ভূমি না হয় তো কিছু একটা সুবিধার প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়—ভাবলে দাশু, যখন সে হাথি-ফটকের মধ্যে প্রবেশ কল্লে।

বড়বাবু ছোটবাবু, উভয়েই বসে ছিলেন বারান্দায়। মার স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা তাদের ভাল লাগেনি। যে রোগ সিবিল সার্জ্জনকে হিম্‌-সিম খাওয়াচ্ছে, স্বপ্নে-পাওয়া ব্রাহ্মণ এসে তাকে দেশ-ছাড়া করবে, এ দুঃস্বপ্ন কেবল জননীরাই দেখতে পারেন। তবে তাদের ভরসা ছিল এই যে, ভোরে বগলাডাঙ্গার চৌমাথায় ব্রাহ্মণ পাওয়া যাবে না। সুতরাং রাধাও নাচবে না, তিন মণ তেলও পুড়বে না। মাতৃ-আজ্ঞাও পালন হবে, বড় ঘরের কথা হাটে-বাজারে প্রসঙ্গেরও বিষয় হবে না।

কিন্তু গোছা-ভরা ধব্‌ধবে পৈতে ঝুলিয়ে মন্থর-গতিতে যখন দাশু ভট্টাচার্য্য তাদের সম্মুখস্থ হয়ে যুগপৎ হর্ষ এবং বিস্ময়ে তাদের অভিভূত করলে—তাইতো এক ব্রাহ্মণ যে সমাসীন! তার আরামের বন্দোবস্ত করে বড়বাবু কিমুকে জেরা করলেন—ঠাকুরকে কোথায় পেলি?

—আজ্ঞা হুজুর, ঠিক চৌ-মাথায়।

—কখন?

—ঠিক পিতৃযে।

বড়বাবু তাকালো ছোটবাবুর মুখের দিকে।

ছোটবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখলে দাদাকে। ঠিক্ ঐ রকম চোখ ঠিকরে দাশু দেখলে তাদের জননীকে কিছুক্ষণ পরে।

প্রকৃতিস্থ হয়ে দাশু বল্লে—আশ্চর্য্য মা! লীলাময়ীর লীলা! ওঃ! কি দেখালি মা মহামায়া! সেই মুখ সেই চোখ! ভাগ্যিমানী মা—স্বপ্নে আপনাকে হুবহু দেখেছি! কি কাণ্ড-কারখানা!

কর্ত্রী-ঠাকুরাণী ধীরে ধীরে কথা কন। বল্লেন—বাবা, আমিও স্বপ্নে তোমাকে দেখেছি। হ্যাঁ, এই মুখ-চোখ, তবে আর একটু গৌরবর্ণ।

—খেতে না পেয়ে, রোদে পুড়ে মা আমার রঙটা একটু মাটো হয়েছে।

—আহা, তা হবে বাবা। আর যেন একটু লম্বা।

ফিচেল দাশু যখন কথা কয়, উত্তর তার জিহ্বাগ্রে এসে জোটে।

সে বল্লে—তা যদি বল্লেন মা তো অন্ন খুঁজতে হেঁটে হেঁটে বেঁটে হয়ে গেছি। বড় দুর্দ্দিন মা, গরীবের ছেলের বড় দুর্দ্দিন।

তার পর সে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে মৃদু স্বরে যুক্তপাণি হয়ে বল্লে—অপরাধ নেবেন না মা। স্বপ্ন মিথ্যাই হয়। কি দারুণ স্বপ্ন দেখেছি! বললে পরে—বাবুধা এখনি ঘাড় ধরে বাড়ীর বার করে দেবেন।

তাদের কুতূহল হল। সমস্ত ব্যাপারটার পটভূমি যেন দেবতার একখানা বিশাল হাতের লীলার ছবি!

বড় রমেন্দ্র বল্লে—বলুন না, কি স্বপ্ন দেখেছেন?

ছোট বিমলেন্দ্র বল্লে—বলুন।

গৃহিণী বল্লেন—এতে আর দোষ কি? বলুন তা হলে বোঝা যাবে।

তিনি বাকীটুকু বল্লেন না।

দাশরথি বল্লে—মা, বলতে কাঠ মেরে যেতে হয়। আপনাদের নামই শুনেছি। কিন্তু ছোটবাবু কে, তার বৌ-রাণী আছেন কি না, পিছনের বাগানে কাঁটাল-গাছ আছে কি না কিছুই জানি না। এখনও জানি না। কিন্তু মা ভয় হয়—থাক্।

আর এক-দফা অভয়-বাণীর পর সে বল্লে—দেখলাম মা, ঐ কাঁঠাল গাছ থেকে একটা অপদেবতা নেমে মা-লক্ষ্মীর কাঁধে বস্‌লো। তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু মা, সে বাচ্ছা মেয়ে তো। পারে কি মা প্রবল অপদেবতার সঙ্গে যুঝতে?

রোগের সব লক্ষণগুলো মিলে গেল—যখন সে বাকী স্বপ্নটুকু বিবৃত করলে। এ ঘটনা ঘটেছিল তিন দিন পূর্ব্বে।

—কিন্তু বাবা উপায়?

—ব্যাপারটা কি মা সত্য? না, খালি পেটের স্বপ্ন? পেট গরমের স্বপ্ন নয়, কারণ, পেট শূন্য।

সত্যের খাতিরে ঘোষাল-পরিবারকে রোগ এবং তার লক্ষণের কথা স্বীকার করতে হল।

প্রশ্ন হল প্রতিকারের। স্বপ্নের দেবতা দাশরথিকে চিকিৎসাও শিখিয়েছেন।

৩

ছোট বৌ-রাণী মহামায়ার ব্যারাম বাড়তো এদের আধিক্যতায়। অসুখ করে অনেক তরুণ কুলবধূর। কিন্তু এদের চিকিৎসার ঘটায় তার মাথার ভিতর একটা হেলে সাপ প্রবিষ্ট করতো। সে যখন কিল্‌বিল্ করত, বেচারার মাথা হত গরম! সে ছিল সম্ভ্রান্ত দরিদ্রের কন্যা। এদের যত্নকে সে ভাবতো বড়মানুষী দেখাবার আয়োজন। তা ভাবলেই তার মগজের ঘী ঢেউ খেলত। সারা অঙ্গের অন্তরে মহামায়া একটা শিহরণ উপলব্ধি করত। তার পর সে কি করতো তার মনে থাকতো না! সুস্থ হলে কেবল শুনতো তাদের চিকিৎসার কথা, যত্নের কথা, অর্থব্যয়ের কথা।

অম্বিকা দাসী যখন তাকে চুপি চুপি বল্লে—বৌ-রাণী, তোমাকে দেখতে রোজা এসেছে—সে প্রথমে হাসলে, তার পর কাঁদলে, অবশেষে মাথার ভিতর স্পন্দন অনুভব করলে। তার পর—

—ঐ গো!—বল্লেন গৃহিণী।

অতঃপর দাশরথিকে তৎপর হতে হল।

সে নদীতে স্নান করে তাদের দেওয়া গরদের জোড় পরলে। কপালে সিঁদূরের কোঁটা লাগালে, আঠা মাখিয়ে যজ্ঞোপবীতকে খড়‌মড়ে করলে।

একখানা আসনে মহামায়া বস্‌লো। সে তখনও আধা-বিভোর। মাঝে মাঝে চীৎকার করছে। কিন্তু একটু জ্ঞান ফিরেছে ব'লে লজ্জায় আসন ছেড়ে ঘুরতে পারছে না।

তার সামনে একখানা রূপার বড় থালায় একরাশ ফুল, কতক গুলো সরিষা, একটা খোলে। অবশ্য ধূপ-ধূনা জ্বলছিল। একটা ঘণ্টা ছিল থালার ডান দিকে। আর একখানা থালায় ছিল কাটা ফল।

লোকে বলত, দাশু গণ্ডমূর্খ। সেটা অপবাদ। সে লক্ষ্মী-পূজা, শিব-পূজা, সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা প্রভৃতি নানা মন্ত্র জানতো। তার অনুরোধে গৃহিণী দুই পুত্র নিয়ে ঘরের বাহিরে রইলো। তাদের দিকে পিছন করে বসে দাশরথি সব রকম মন্ত্র মিলিয়ে বিড়-বিড় করে, আর মাঝে মাঝে বৌকে টিক্ ক'রে সরষে ছোঁড়ে। তাতে মহামায়া মহা কুপিত হয়ে চীৎকার করতে লাগলো।

তখন ধীরে ধীরে দাশরথি বল্লে,—মা, চেঁচিয়ে কি ফল? আমার বাপ, পিতামহ কেউ রোজা নয়। ভাল মানুষের মেয়ের মত বস্‌লো, সেরে গেছি, কিছু করব না,—আমিও সরে পড়ি।

যখন সে এ কথা বলছিল, তখন বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল। বাহিরে উৎসুক দর্শকরা কিছু শুনলো না। কিন্তু তার কথায় মহামায়ার ক্রোধ দ্বিগুণ হল। সে তার স্বরে চীৎকার করতে লাগলো।

—পাজি, বদ্‌মায়েস, দূর হ' জুয়োচ্চোর।

বাহিরে ওরা বুঝলে, কাঁটাল গাছের ভূতের সঙ্গে রোজা ঠাকুরের একটা বোঝাপড়া হচ্ছে।

এবার দাশু চীৎকার করে বল্লে—যাবিনি? আচ্ছা ভাখ তুই ভূতের বেটা ভূত—শাঁক-চুন্নীর বোন্‌পো।

তার পর মুখে ষষ্ঠী পূজার মন্ত্র বিড়-বিড় করতে করতে কাপড়ের

কসির ভিতর থেকে তিনটে ব্যাঙাচি বার করলে। একটা কলা চটকে তার ভিতর ভেক-শিশুদের পূরলে। পূরে তিনটে গোল-গোল বড়ি করলে।

মহামায়া নীরবে এ প্রক্রিয়া দর্শন করলে। আ মোলো! লোকটা পিশাচ-সিদ্ধ। কলার বড়ায় ব্যাঙাচির পুর!

দাশু বল্লে—বৌ-রাণী, মা-লক্ষ্মী, চুপচাপ মাথা ঠাণ্ডা করো তো মঙ্গল। না হলে দুধের অনুপান দিয়ে এই ভেক-কদলী বটিকা সেবন করতে হবে। তার বেগ প্রশমিত হয়েছিল। মহামায়া বুঝলে যে, এ পাষণ্ড যা বলবে শ্বশুর-বাড়ীর লোকেরা এখন তাই করবে।

সে বল্লে, দোহাই বাবা, যা বলবেন করব। ও সব খাওয়াবেন না। ছিঃ! ছিঃ! দোহাই বাবা রোজা কবিরাজ।

—দেখো। কথা রাখবে?

সে জোড় হাত করে বল্লে—হ্যাঁ বাবা। হাতটা একটু ধোও। ব্যাঙ্‌ ঘাঁটলে গরল হয়।

ঘোষাল পরিবার অভিজ্ঞ হ'ল। সে চীৎকার নাই। লক্ষ্মী মেয়ের মত মহামায়া গল্প করছে।

রোজা আর এক ট্যাঁক থেকে একটা কোলা ব্যাঙ্‌ বার করলে; সেটাকে থলিতে পূরলে। বল্লে—ওরা ভাবতো তোমায় ভূতে পেয়েছে। ওদের দেখিয়ে বলবো—সেই ভূত এই থলিতে ধরা পড়েছে। বল, লক্ষ্মী মেয়ে হবে? না ভেক-কদলী বটিকা—

সর্ব্বনাশ! লোকটা একের নম্বরের জালিয়াত! মহামায়া বল্লে—তুমি আমার ধরম বাপ্‌। যা বলবে করব, বাবা! কিন্তু ও ওষুধ নয়।

সে বল্লে—যখন হিষ্টিরিয়ার বেগ আসবে, তখন এই ভেক-কদলী বটিকার কথা মনে করবে। কেমন?

—হ্যাঁ বাবা।

—নাও, একটা খাও। রোগটা একেবারে সেরে যাবে। আচ্ছা, চিনি মাখিয়ে মিষ্টি ক'রে দিচ্চি।

সে কাতর হয়ে বল্লে—তোমার পায়ে পড়ি বাবা।

দাশরথি এবার ঘোষালদের ডাকলে। তিনটে বড়ী দেখালে।

তারা যখন দেখ্‌লে, ব্যাঙাচীরা একবার শেষ চেষ্টা করলে বাঁধন-মুক্ত হবার! কি কাণ্ড! মন্ত্র-পূত বড়ী নড়ে যে!

দাশু বল্লে—বৌমার ঘাড়ের অপদেবতা এই থলিতে।

সে একটু নাড়া দিলে। কারারুদ্ধ ভেক থলির মধ্যে একটা তুড়িলাফ্‌ দিলে!

ভয়ে সকলে সরে গেল।

আবার তাদের একত্র করে দাশু একটা রূপার পাণের কৌটো আনলে। ভেক-কদলী তার ভেতর পোরবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করলে—কি বৌমা, ঘাড়ে কিছু নেই তো?

—কিছু নেই বা-বাবা।

দাশু বল্লে—কাজ নেই ছোটবাবু, দাও একটা বড়ী খাইয়ে।

বউ কাকুতি-মিনতি করলে।

দাশু বল্লে—আচ্ছা, এই ওষুধ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখবেন। ভূতের লক্ষণ দেখা দিলেই রোগীকে একটা খাইয়ে দেবেন।

রোগী বল্লে—বাবা, এমন কথা কেন বলছেন? ভূত তো থলির ভিতর। আমায় ছেড়ে, আপনার হুকুমে, সুড়্‌-সুড়্‌ ক'রে থলিতে ঢুকেছে।

—আচ্ছা, চল। নিজের হাতে থলি খিড়কীর পুকুরে ফেলবে। থলির ওপর একটা সিঁদূরের স্বস্তিকা আঁকো।

সে মহা লক্ষ্মী মেয়ের মত তা-ই করলে।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত (এম-এ, বি-এল)

ডিমের সেন্‌সাস্‌

ব্রহ্মাণ্ডই অণ্ড যখন অখণ্ড এই বিশ্ব,
ডিম্ব এবং বিম্ব লয়েই এই চরাচর দৃশ্য,
হলো সভা রাক্ষুসে এক ছায়ার তলে নিম্বের,
অতি ত্বরিৎ করতে হবে সেন্‌সাস্‌ সব ডিম্বের।
যত রকম মুরগী আছে, যত রকম হংস,
পক্ষী, পশু, খেচর ভূচর জলচরের বংশ,
খুঁজতে হবে পগার-পাহাড় বন-বাদাড়ের গর্ত্ত,
নদীর চর ও পাঁকের তলার রাখতে হবে ফর্দ্দ,
তক্তাপোষের তলার বিবর, পোড়ো-বাড়ীর ভিত্তি,
দলে দলে সূক্ষ্মভাবে দেখতে হবে নিত্যি।
অণুর মত ডিম্ব আছে ঝোপের মাঝে উহ্য,
মাইক্রস্‌কোপ শক্তিশালী সঙ্গে নেবে বুঝছো।
বোজাবে না গর্ত্ত কেহ, কাটবে না কেউ কাঠ,
দেবে নাকো রৌদ্রে চাটাই মাদুর কিম্বা খাট
সকল স্থানে সকল জীবকে জানিয়ে দেবে বেশ,
হচ্ছে আদমসুমারী আর থাকবে নাকো ক্লেশ।
ধরলে পরে ডিম্ব সহ রুই কি ইলিশ মাছ,
ট্যাংরা, কই কি তপসে হতে মৌরলাদি—বাস্‌,
অবিলম্বে করবে হাজির হোক্‌ না যত সের,
সম্মুখেতে মাননীয় স্কোয়াড মাষ্টারের।

তৎপরতার নাইকো সীমা চৌদিকে আশ্বাস
সুলভ হবে ডিম্ব—চলে ডিম্বেরি সেনসাস্‌।
অঙ্কেতে আর কুলায় নাকো, দীর্ঘ দু'মাস পর
সাঙ্গ হল ধুকপুকানি গণকদের সফর।
অনেক হিসাব-নিকাশ করে স্থিরটা হলো ভাই,
ডিম্ব তেমন সুখাদ্য নয়, ডিম্ব বেশী নাই!
ডিম্ব খাওয়া ত্যাগ করিলেই ঘুচবে এ আপদ—
সব সমস্যা সমাধানের এইটি সোজা পথ।
আঙুর-ক্ষেতে হাসলো শৃগাল, বার হলো গর্দ্দভ,
ভাবলে, আহা জুটলো কোথায় আত্মীয়েরা সব?
সবাই মিলে সাবাস দিলে—বললে, চমৎকার!
কীর্ত্তি এমন হয়নি এবং হবে নাকো আর!
যুক্তিটাও যেমন সহজ তেমনি যে সরস।
আবিষ্কারে অদ্বিতীয় কৃষ্ণ কলম্বস!
বংশীতে হায় তবু যে চিড়—পায় না তরী কূল,
বাহির হোল তালিকাটায় বেজায় বড় ভুল।
ঘোড়ার ডিমের সংখ্যা লয়ে বাধলো বিসম্বাদ—
এত বড় ডিম্ব পড়ে কোন্‌ কারণে বাদ?
ডিম্ব থেকে ছুটলো ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবা-বৎ—
নেংটি ইন্দুর করলে প্রসব প্রকাণ্ড পর্ব্বত।

এই পৃথিবী

[উপন্যাস]

২১

উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া পিনাকী এক বার শুধু চাহিল কামাখ্যা সাহেবের দিকে। তার চোখে যেন আগুন জ্বলিতেছে! সে আগুনের সবটুকু বাপের উপর বর্ষণ করিয়া পিনাকী বাহির হইয়া গেল।

অফিসে নিজের কামরায় গেল না, একেবারে বাহিরে চলিয়া গেল। ভাবিল, কিসের জন্য বাপকে সমিহ করিবে?

কামাখ্যা সাহেব বসিয়া রহিল যেন কাঠ! পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বিবেক—ছেলেবেলায় এই যে কথাগুলা শুনিত, অজস্র বুদ্‌বুদের মতো সে কথাগুলা মনের মধ্যে তালগোল পাকাইয়া ফুটিতেছে, পরক্ষণে মিলাইয়া যাইতেছে! এ সবের ভিড়ে অস্থির হইয়া মন এক একবার যেন অস্ফুটে প্রশ্ন করিতেছিল—ওগুলা সত্য? ঐ ধর্ম্মের জয়···অধর্ম্মের পরাজয় বলিয়া যে-কথা শুনা যায়? মনকে তখনি দু'-পায়ে মাড়াইয়া কামাখ্যা সাহেব বলে,—না, না, ও-সব অলসের যুক্তি··· দুর্ব্বলের আশ্বাস!

যে-সব মানুষ কৃতিত্ব লাভ করিতে চায়, তাদের কাছে ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, পাপপুণ্য বলিয়া কোনো-কিছু নাই···তাদের আছে শুধু বুদ্ধি আর সে বুদ্ধির চাতুর্য্য-কৌশল! মন বলিল, কিন্তু এই যে তোমার বাড়ীর ছেলেরা এমন···মানুষের মতো হইতে পারিল না···প্রশ্রয়ের কোথায় তাদের অভাব ঘটিয়াছিল? তাদের কি না দিয়াছ···চিরদিন? তবু যে এমন···ইহা তোমার অধর্ম্মের ফল! কামাখ্যা সাহেব বলিল, না, না···কিসের অধর্ম্ম! এত বড় সুযোগ-সুবিধা পাইয়াও ছেলেরা যদি তাহা গ্রহণ করিতে না পারে, তারা নির্ব্বোধ···তাদের বুদ্ধির অভাব!

ব্যাপারটা অফিসে একেবারে গোপন রহিল না। ঘরের মধ্যে অমন রূঢ় ভর্ৎসনা! অফিসের বেয়ারাদের কৌতূহল স্বভাবতঃ একটু বেশী; এবং প্রকাশ্যে যত কুণ্ঠিত ভাবেই তারা মনিবের সম্মান রক্ষা করিয়া চলুক, নেপথ্যে মনিবের দুঃখ-দুর্বিপাকের রসালো বর্ণনায় একেবারে কবির মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে! যা দেখে বা শোনে, তার উপর চতুর্গুণ মিথ্যা রঙ চড়াইয়া দশ জনের সামনে সে ছবি ধরিয়া বাহবা লইয়া কৃতার্থ হয়! বেয়ারা নাথুর মারফৎ এ ব্যাপারের যে বিবরণ অফিসের কামরায়-কামরায় নিমেষে রটিয়া গেল, তাহাতে অফিসের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল!

অফিস হইতে পিনাকী আসিল গৃহে জননী জয়ার কাছে। পীড়নে জয়ার কাছ হইতে দেবকী সদ্য কিছু আদায় করিয়া চলিয়া গিয়াছে! জয়া দারুণ বিরক্তি-ভরে আলমারি বন্ধ করিতেছে···পিনাকী আসিয়া ডাকিল—মা···

জয়া ফিরিয়া চাহিল। চাহিয়া পিনাকীর মুখের যে-চেহারা দেখিল, তাহাতে বুঝিতে বাকী রহিল না, পিনাকী মস্ত কি একটা যেন কীর্ত্তি করিয়া আসিয়াছে!

ধনাঢ্য ঘরের অনেক মায়ের মনেই ছেলেদের মুখের এ-চেহারা গাঁথা আছে! জয়া ছেলের মুখের এ চেহারার মর্ম্ম জানে। জানে বলিয়াই ছেলের ডাকে সাড়া না দিয়া সে আলমারি বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি দিল। চাবি দিয়া চাবির রিঙ-বাঁধা আঁচলটা পিঠে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, পিনাকী পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

জয়া বলিল—সরো···

পিনাকী বলিল - সরবো···একেবারেই সরে যাবো। তবে যাবার আগে দু'টো কথা বলে যেতে চাই!

জয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল—কিন্তু তোমার কথা শোনবার মতো সময় এখন আমার নেই!

রাগে পিনাকী জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—তোমায় শুনতেই হবে। না শুনে এ ঘর থেকে তুমি যেতে পাবে না!

কণ্ঠ নয় যেন আকাশের বাজ!

দু'পা সরিয়া আসিয়া জয়া বলিল—এক মিনিটে তোমার কথা যদি বলে নিতে পারো তো বলো···তার বেশী আর এক সেকেণ্ড সময় আমি দিতে পারবো না।

পিনাকী হাসিল, কহিল,—দেবকী বাবু এসে কাজ গুছিয়ে গেল ···বুঝি?

ভ্রূকুটিপূর্ণ দৃষ্টিতে জয়া চাহিল পিনাকীর পানে; কোনো জবাব দিল না।

পিনাকী বলিল—দেখলুম হাসি-হাসি মুখ···হাতে কি একখানা গহনা! টাকার দরকার হয়েছিল নিশ্চয়···না হলে তিনি ইয়ারদের মজলিশ ছেড়ে এমন সময়ে বাড়ী আসবেন কেন?

জয়া বলিল—হয়েছে তোমার কথা?

পিনাকী বলিল—না,···এ তো সবে কথার উপক্রমণিকা! দায়ে পড়ে সে-দিন তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলুম, আমাকে তুমি হাঁকিয়ে দিয়েছিলে! বলেছিলে, তোমার পয়সা-কড়ি নেই! আর এখন দেবকীর বেলায় গহনা বার করে দেওয়া হলো! এর কারণ জানতে পারি?

জয়া বলিল,—গহনা তাকে আমি দিইনি···আমার হাত মুচড়ে ডাকাতি করে দু'গাছা চুড়ি সে খুলে নিয়ে গেল। তাই বাকী চুড়িগুলো খুলে তুলে রেখে দিলুম। হাতে আর চুড়ি নেই···শুধু এই সোনার লোহাগাছটা! বলিয়া পিনাকীর সামনে জয়া নিজের হাত প্রসারিত করিয়া ধরিল। হাতের মণিবন্ধ সিঁদুরের মতো রাঙা হইয়া আছে···তার উপর কাটা ছড়া দাগ! দেখিলে বুঝা যায়, জোর করিয়া হাতের গহনা খোলা হইয়াছে!

পিনাকী বলিল—জোর করে কেড়ে নিয়ে গেছে! তার মানে, ডাকাতি! রবারি! পুলিশে খবর দাও!

জয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। ক্ষোভে দুঃখে দু'চোখ সজল হইয়া উঠিল। কোনো মতে জয়া বলিল—নেহাৎ মা, তাই! না হলে পুলিশে দেওয়াই উচিত।

পিনাকী বলিল—ব্রেভো! বাবা কিন্তু এটুকু করতে নারাজ! এইমাত্র বেশ এক-পশলা হয়ে গেছে আমার সঙ্গে। টাকার জন্য বাবা আমাকে জেলে দেবে। সেই পোষাকের টাকা···তোমার কাছে চেয়ে-ছিলুম···দাওনি! ইজ্জৎ রাখতে বাবার চেক জাল করেছিলুম! সে জাল ধরা পড়ে গেছে। বাবা তা জানতে পেরে সাফ্ বলে দেছে, চেক্

জাল করেছো, জেলে যাও···টাকা আমি দেবো না। শুধু মুখের কথা নয়! আমাকে মেরেছে বাবা···চড়! আমার এই গালে!

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পিনাকী নিজের বাঁ গালে হাত দিল।

জয়া দেখিল, গালে লাল দাগ। পাঁচ আঙুলের রেখা।

জয়া কিছু বলিল না।

পিনাকী বলিল—নাটক-নভেলের কথা মানলে বলতে হয়, এ চড় যদি ছেলেবেলায় মারতে, তাহলে আজ আর বাপের হাত চড় মেরে ব্যথা পেতো না! কিন্তু তা যখন হয়নি, আমার এ দুর্গতির জন্য দায়ী বাবা। মানে, ও-চড়ের বদলে ছেলেরও উচিত বাপের গালে চড় মারা। আমি মারিনি···তার কারণ তেমন কুপুত্র আমি সত্যিই নই!···কিন্তু যাক্···এ কথা বলতে আসিনি। আমি বলতে এসেছি, এই ব্যবহার আর চড়ের পর এ বাড়ীতে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি এখান থেকে চলে যাবো। তারি জন্য কিছু টাকা চাইতে এসেছি। কিছু টাকা দাও··· শ'খানেক। এ টাকা দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য।

জয়া বলিল—কোথায় যাবে, জানতে পারি?

—তা এখনো ঠিক করিনি।

শ্লেষ-ভরে জয়া কহিল—বৈরাগ্য!

পিনাকী বলিল,—তাও ঠিক করিনি···তবু যদি বলি, বৈরাগ্যই?

জয়া বলিল—বৈরাগ্য নিতে পয়সার দরকার হয় না! শোনো পিনু, যা খুশী তুমি করতে পারো, পয়সা আমি তোমাকে দেবো না···দিতে পারবো না!···যদি ভেবে থাকো আমার মনে করুণা জাগাবে, তাহলে শোনো, বলি—তোমরা সকলে মিলে আমাকে এমন করেছো যে, আমার মনে স্নেহ দয়া মায়া কিছু আর নেই!··· তুমি যদি আমার সামনে পড়ে আত্মঘাতী হও, তাহলেও বোধ হয় আমার প্রাণ তাতে এতটুকু কাতর হবে না!···মিথ্যা তুমি আমার কাছে দরবার করতে এসেছো! চারি দিকে সব, দেখে-শুনে মন আমার পাথর হয়ে গেছে! পাথরের কাছে সব প্রত্যাশাই মিথ্যা হয়!

এ কথা বলিয়া জয়া গমনোদ্যত হইল। পিনাকী বলিল—দেবে না টাকা?

জয়া বলিল—না।

—দেবে না?

জয়া বলিল, না। মিছে চোখ রাঙাচ্ছো! তোমার ও চোখ-রাঙানিকে আমি গ্রাহ্য করি না।

জয়া অগ্রসর হইল; পিনাকী জয়ার হাত চাপিয়া ধরিল।

জয়া কহিল—মারবি না কি? মার্···ওটা আর বাকী থাকে কেন?

জয়ার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে! লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে মনে হইতেছিল, পৃথিবী যেন দুলিয়া পায়ের তলা হইতে সরিয়া নীচে নামিয়া চলিয়াছে!

পিনাকী জয়ার হাত ছাড়িয়া দিল। বলিল—না, মারবো না। তেমন কুপুত্র আমি সত্যি নই! তবে···না, তোমার কোনো দোষ নেই। বাবা···বাবাকে তুমি বলো, তাঁর কাছ থেকে যে ব্যবহার আজ পেয়েছি, তাতেই আমার পিতৃঋণ শোধ হয়ে গেছে। আজ থেকে আমি তাঁর ছেলে নই। তাঁর ওপর নির্ভর না রাখলেও আমার দিন কোনো মতে কাটবে। নিজের বাপের চেক্ জাল করলেও আমি পরের টাকা ভাঙ্গি না···তাঁর মতো!···মানে, তিনি কোনো অভাবে না পড়েও তোমার ভাইয়ের যে এই সর্ব্বস্ব গাপ করেছেন···আমি তা করিনি। বাপ্‌কা বেটা হয়ে পরের সম্পত্তি থোড়া-থোড়াও লুঠ করে মেরে দিইনি!

কথাগুলা তাতানো লোহার মতো জয়ার দেহ-মন স্পর্শ করিয়া তাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল! জয়ার মুখ পাণ্ডুর বিবর্ণ পাংশু।

পিনাকী বলিল—আমি জানি। রাজীব বলে তোমার জ্যাঠা-মশাইয়ের পুরোনো খানশামা···এ-কথা এখানে অনেকের কাছে সে বলে গেছে। বলে গেছে, সে ছেড়ে কথা কইবে না! দরকার হলে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে বাবার মনিব জানকী বাবুর কাছে না কি সব হাতে-নাতে প্রমাণ করে দেবে! আমিও মরবো না। বাবাকে তুমি এ-কথা বলো মা, বুঝলে? আমাকে তিনি চেক-জালের জন্য চড় মারেন···আমি সে-দিন দেখবো, তাঁর গালখানা কি রকম থাকে!···

জয়ার সহ্য হইল না! রূঢ় ভর্ৎসনার স্বরে বলিল—দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা যে মানুষ বলে, তুই সে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর! এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা হয়েছে, মা-বাপকে তুই করিস্ অপমান!

পিনাকী বলিল—অপমান নয়। ছেলে···তাই সত্য কথা বলে সাবধান করে দিচ্ছি। অপমান করবে এবার দেশের লোক···যাদের তুচ্ছ মনে করে চিরদিন তোমরা পায়ে মাড়িয়ে এসেছো! হুঁঃ! জাষ্ট লাইক্ এ ফিল্ম-ষ্টোরি···হা-হা-হা!

অট্টহাস্যে কথা শেষ করিয়া পিনাকী দাঁড়াইল না···গর্ব্ব-ভরে বাহির হইয়া গেল!

২২

পরের দিন সকালে রামহরি আসিয়া দেখা দিল কামাখ্যা সাহেবের গৃহে।

ফর্দ্দ দেখাইয়া বলিল—বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। এই দেখুন তারা ফর্দ্দ দেছে।

বলিয়া কামাখ্যা সাহেবের সামনে রামহরি মস্ত একখানা ফর্দ্দ রাখিল।

কামাখ্যা সাহেবের মনের অবস্থা শোচনীয়। পিনাকী চলিয়া গিয়াছে···জয়ার মুখে কামাখ্যা সাহেব সব কথাই শুনিয়াছে। শুনিয়াছে, রাজীব এখানে অনেকের কাছে সে-কথা লইয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছে···তার উপর পিনাকীর ঐ শাসনের ভঙ্গী! অফিসে জানকী বাবু কাল পিনাকীর সন্ধান করিয়াছিলেন···কেন, তা বলেন নাই! সে-ডাকের উত্তরে কামাখ্যা সাহেব জানাইয়া দিয়াছে, হঠাৎ তার শরীর খুব খারাপ হইয়াছে বলিয়া কামাখ্যা সাহেব ছুটী দিয়াছে ···পিনাকী বাড়ী গিয়াছে! কাল যেন এ কথা বলিয়া নিজের মান রক্ষা করিয়াছে···কিন্তু আজ? পিনাকী বাড়ী নাই। জয়াকে বলিয়া গিয়াছে, এ বাড়ীতে সে আর বাস করিবে না! গেল কোথায়? যে রকম হতভাগা, তার পক্ষে বাপের শত্রুতাচরণ মোটেই অসম্ভব নয়! তাই সকালে উঠিয়া বেয়ারাকে চুপি চুপি বলিয়া দিয়াছে, বড় দাদাবাবুর খোঁজ কর্। খুঁজিয়া যেখানে পাস্, সেখান হইতে তাকে ধরিয়া আনিবি। বলিবি, সাহেব ডাকিতেছেন···জরুরি প্রয়োজন!

টেবিলের উপর অফিসের একরাশ ফাইল···কোনোটা খোলা হয় নাই। বসিয়া বসিয়া কামাখ্যা সাহেব অনেক কথাই ভাবিতেছিল···

পদ-মদ-গর্ব্বভরে যা খুশী করিয়া আসিয়াছে···ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে, সে চিন্তা কখনো মনে জাগে নাই! কখনো মনে হয় নাই, পৃথিবীতে আমরা যা-কিছু করি, সবগুলা মিলিয়া এমন জাল রচিয়া তোলে! মনে হইতেছিল, সে-জালের বাঁধন কামাখ্যা সাহেবকে চারি দিক্ হইতে যেন চাপিয়া কষিয়া বাঁধিয়া ধরিয়াছে··· সে বাঁধনের চাপে দেহ-মন ব্যথায় টন্‌টন্ করিতেছে! এ বাঁধন কাটিয়া নিজেকে মুক্ত করিবার উপায়ও যেন নাই!···কামাখ্যা সাহেবের চিরদিনকার পৃথিবীর কোথায় যেন মস্ত ফাট ধরিয়াছে··· সে ফাটের মধ্য হইতে সহসা যেন রাজ্যের সাপ বাহির হইয়া ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়াছে!

এমনি দুশ্চিন্তা-উদ্বেগের মধ্যে রামহরির উদয়! চোখের সামনে রামহরির ধরিয়া-দেওয়া ফর্দ্দ! ফর্দ্দের রাশি রাশি অক্ষরগুলা কালো পোকার মতো গিজ্‌গিজ্ করিয়া উঠিল! ফর্দ্দ পড়িয়া দেখিবে কি, দুই চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে! কোনো মতে এ পাপ বিদায় করিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়, কামাখ্যা সাহেবের মনের ভাব এমনি ধারা!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—কত টাকা চাও রামহরি?

বিনয়ে অবনত হইয়া মৃদু হাস্যে রামহরি বলিল—আজ্ঞে, বরাবরই বলছি তো দু'হাজার! আপনিও বলেছেন, দু' হাজার দেবেন!

কামাখ্যা সাহেব আক্রোশে জ্বলিয়া উঠিল! স্পর্দ্ধা বটে! কহিল—মেয়ের বিয়ের জন্য ভিক্ষে করে দু'হাজার টাকা মেলে না রামহরি···মেলে বড় জোর দু'-পাঁচশো! তা'ও মানুষ দায়ে নেহাৎ কাবে পড়লে! দু'শো টাকা আমি দিচ্ছি···নিয়ে বিদায় হও!

রামহরির বুকের মধ্যে যেন কড়াৎ করিয়া বাজ পড়িল! এখানে দু'হাজার মিলিবে নিশ্চয় জানিয়া মনে-মনে সে রাজ্য গড়িতেছিল। এ দু'হাজারের এক-হাজার খরচ করিয়া বাকীটা···এখন কামাখ্যা সাহেবের কথায় মনের মধ্যকার সে-রাজ্য হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার জো! কোনো মতে সে বলিল,—আজ্ঞে, আপনিও আশা দিয়ে ছিলেন। সেই আশায় নির্ভর রেখে বড় মুখ করে' কথা দিয়েছি··· সব একেবারে পাকা···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—যেমন তোমার সামর্থ্য, এমনি ঘর দেখে মেয়ের বিয়ে দাও গে। তাঁদের বলো গে···ডার্বির স্বপ্ন দেখে কথা দিয়েছিলুম, মশাই···ডার্বির সে ঘোড়া পা মচ্‌কে পড়ে খোঁড়া হয়েছে!

রামহরির চোখের সামনে বিশ্ব-চরাচর যেন লাটিমের মতো ঘুরিতে লাগিল। রামহরি বলিল—কিন্তু আপনি তো জানেন সব···ভালো ঘরে আমার মেয়ের বিয়ে ভাঙ্গলো···কার অপরাধে!

কামাখ্যা সাহেব বলিল—অপরাধ তোমার! যেমন অবস্থা, তেমনি চালে থাকতে পারোনি! বড়লোকের বখাটে ছেলেকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে মেয়েকে মিশতে দিয়েছিলে কেন?··· ভেবেছিলে, দাঁও মারবে! পিনাকী বলবে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে···আর আমিও হবো রাজী···এক ফুঁয়ে তোমার কন্যাদায় উদ্ধার হবে! ভুল করেছিলে রামহরি! বড়লোকের ঘরের যে সব বখা ছেলে পরের বাড়ীতে ঢুকে সে-বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায়, সে সব মেয়েকে তারা বিয়ে করে না। বিয়ের কথা তাদের মনে জাগে না! তারা চায়···যাক, ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে সে সব কুবাক্য আর মুখে উচ্চারণ করতে চাই না!···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া কামাখ্যা সাহেব চেকের বই বাহির করিল; এবং দু'শো টাকার একখানা চেক কাটিয়া রামহরির হাতে দিয়া বলিল,—এই দু'শো টাকা···নিয়ে···যাও, চলে যাও! এ টাকাও তোমাকে দেওয়া উচিত নয়···দিলে তোমার মতো যে-সব মেয়ের বাপের মন, তারা প্রশ্রয় পেতে পারে। যাও···তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করবার সময় আমার নেই। নো ননসেন্স, প্লীজ!

কথা শেষ করিয়া কামাখ্যা সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইল। রামহরি যেন কাঠ···চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ দু'শো টাকার চেক লইবে?

একবার ভাবিল, না···

আবার মনে হইল, কেন লইবে না? ছাড়িয়াই বা দিবে কেন? দুরাত্মার কাছ হইতে খেশারতীর যতটুকু পাওয়া যায়···

রামহরি চেক লইল; এবং কামাখ্যা সাহেবের দিকে কুণ্ঠিত একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

রামহরি চলিয়া গেলে কামাখ্যা সাহেব চেয়ারে বসিল। বসিয়া তাড়া-বাঁধা ফাইলের মধ্য হইতে উপরকার ফাইলখানা লইয়া খুলিয়া দেখিল।

চাল্‌শা চা-বাগানের মস্ত ফাইল।

সেখানকার অফিসের সঙ্গে জানকী বাবুর যে সব চিঠিপত্র চলিয়াছিল, সেই সব চিঠিপত্র; তাদের বারো বৎসরের হিসাবের উপর অডিটরের সার্টিফিকেট; রেজিষ্ট্রী-করা এ্যাসাইনমেণ্টের দলিল···এবং এ সবের সঙ্গে জানকী বাবুর লেখা হুকুম—দিলীপকে সেখানকার অফিসের চার্জ্জে পাঠানো হইতেছে। কামাখ্যা সাহেব এখানকার অফিস-ম্যানেজার···তার অধীনে দিলীপ কাজ করে···তাই দিলীপকে এ নূতন পদে বাহাল করিতে কামাখ্যা সাহেবের মঞ্জুরী সহি চাই··· অফিসের দস্তুর!

সহি করিতেই হইবে। তার কারণ তারো যিনি মনিব, সেই মনিব এ ব্যবস্থা করিয়াছেন! কামাখ্যা সাহেব মঞ্জুরী নাম-সহি করিল। করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাস ফেলিয়া কামাখ্যা সাহেব চাহিল খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়া বাহিরের পানে।

মনে হইল···

অনেক কথা মনে হইল···

নিজের প্রথম জীবনের কথা! প্রথম বয়সে সেই ঘনঘোর দারিদ্র্য···অভাবের কি সে পীড়ন! তখন হইতে একমাত্র চিন্তা ছিল, বড় হইয়া দশ জনের এক জন হইবে! মেশের সামনের পথ দিয়া গর্ব্বভরে যারা ঐ জুড়ি হাঁকাইয়া যায়, টাকা-পয়সা লইয়া যারা ছিনিমিনি খেলে, উহাদেরি মতো অমনি করিয়া তা'রা জুড়ি-গাড়ীর ঘোড়ার পদ-তাড়নায় পথ-ঘাট এক দিন যেন কাঁপিয়া ওঠে! টাকার গদি তৈয়ারী করিয়া সেই গদিতে তাকে বসিতে হইবে!···কোথা দিয়া কি সুযোগই না মিলিয়াছিল!···উমাপ্রসন্নর প্রসন্ন দৃষ্টি-লাভ··· এবং তাহার পরে একটু-একটু করিয়া শুধুই উপরে উঠিয়াছে! নীচের দিকে চাহিবার প্রয়োজন হয় নাই! নীচের কি আছে, কারা আছে, কখনো চাহিয়া দেখে নাই!

হঠাৎ আজ তাকে টানিয়া নীচের দিকে তার দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছে···ঐ রাজীব! নীচের দিকে চাহিবামাত্র উপরের যে-আসনকে কায়েমি ভাবিয়া নির্ব্বিকার ছিল, সে আসন টলমল

করিয়া উঠিয়াছে! এমন টলিতেছে যে, সে-আসনকে উপরে ঠেকাইয়া রাখা দায়!···

মনে পড়িল পিনাকীর কথা! জয়ার কাছে পিনাকী যে-সব কথা বলিয়া গিয়াছে···

হতভাগা! বাপের সঙ্গে শত্রুতা সাধিতেছিস্! বাপ যদি যায়, কে দেখিবে তোকে? বাপের মানে তোর মান! এ বুদ্ধি যে-ছেলের ঘটে নাই···'

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, বড় দাদাবাবুর দেখা মিলিয়াছিল ষ্টেশনে। কলিকাতায় চলিয়াছে। অনেক বলা-কহাতেও বাড়ী ফিরিল না। বলিল, কলিকাতায় জরুরি কাজ আছে।

কামাখ্যা সাহেব বলিল—সঙ্গে লগেজপত্র আছে, দেখলি?

বেয়ারা বলিল—একটা স্যুটকেশ আছে আর বিছানা আছে।

—হুঁ···যা।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

কামাখ্যা সাহেব ভাবিল, কলিকাতায় চলিয়াছে! কার কাছে?

রাজীবের কাছে নয় তো? ছাত্র-জীবনে থিয়েটারে দেখিয়াছিল নাটকের অভিনয়···বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি রাজ্য ছাড়িয়া শত্রুর দলে গিয়া যোগ দিয়াছিল···তার পর শত্রুর সঙ্গে ফিরিয়া রাজ্য-জয়ে সিংহাসনে দখল পাইয়াছিল! পিনাকীও তেমনি···

কিন্তু এখানে কি-রাজত্ব জয় করিবে? অফিসে ঢুকানো হইয়াছিল···অফিসের নিয়ম মানিয়া যদি চলিত···একবার জানকী বাবুর নজর পড়িলে পিনাকীর ভবিষ্যৎ কে মারে?

জয়ার কাছে লেকচার দিয়া গিয়াছে, ছেলেবেলায় চড় মারিলে মানুষ হইত!···হতভাগা! নির্ব্বোধ আর কাহাকে বলে!

দু'দিন পরে।

অফিসে কামাখ্যা সাহেবের ঘরে জানকী বাবু আসিলেন। জানকী বাবুর হাতে ডাকে-আসা একখানা চিঠি।

কামাখ্যা সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মান-অভিবাদন জানাইল। তার পর দু'জনে চেয়ারে বসিল।

হাতের চিঠি কামাখ্যা সাহেবের হাতে দিয়া জানকী বাবু বলিলেন—পিনাকী লিখেছে। এখন পেলুম।

কম্পিত বক্ষে কামাখ্যা সাহেব চিঠি পড়িল। চিঠি পিনাকী লিখিয়াছে কলিকাতা হইতে। লিখিয়াছে, এখানকার অবিচার সহিতে না পারিয়া সে এখানকার কাজে রেজিগনেশন দিতে চায়। তাকে ঠেলিয়া মিস্ত্রী দিলীপকে চালশা অফিসের চার্জ্জ দেওয়া হইল—সুতরাং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে বাসন্তীর সিণ্ডিকেট-অফিসে সে কোনো আশা রাখিতে পারে না। তাকে যে এ্যালাউয়ান্স দেওয়া হয়, তা যেন নেহাৎ কৃপার দান! কামাখ্যা সাহেবের ছেলে বলিয়া কোনো মতে যেন তাকে প্রোভাইড করা···ছেলের হাতে মোয়া দেওয়ার মতো!···সে চায় বড় পোষ্ট···যে-পোষ্টে উন্নতির সম্ভাবনা। তার বয়স হইয়াছে, পয়সার জন্ম বাপের কাছে হাত পাতিতে লজ্জা হয়! জানকী বাবু যদি তার সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করেন, তবেই সে বাসন্তীতে ফিরিবে; নচেৎ এখানকার কাজে তার রেজিগ্‌নেশন যেন মঞ্জুর করা হয় ইত্যাদি।

চিঠি শেষ করিয়া কামাখ্যা সাহেব জানকী বাবুর মুখের পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না···নত দৃষ্টিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

জানকী বাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন, কহিলেন,—এর মধ্যে অনেক কথা আছে। আপনার ছেলে বলেই অফিসে তার চেয়ার। তাকে আমি অনেক বার অনেক রকমে বুঝিয়েছি, কিন্তু···

এ সব কথার সঙ্গে অপ্রীতিকর এত কথা বিজড়িত আছে···তার উপর কামাখ্যা সাহেব আর যাই হোক, তার বুদ্ধি আছে···বিচক্ষণ ব্যক্তি! এবং কামাখ্যা সাহেব জানে, পিনাকীর কি দাম!

বলিল—হতভাগা ছেলে! আমার কাছেও এ নিয়ে অনেক কাঁদুনী গেয়েছে। আমি বলছি, কাজ নিয়ে মানুষের দাম···বাপের খাতিরে অফিসের কাজে কারো দাম কষা হতে পারে না! বলেছি, কাজে তোমার যোগ্যতা আগে দেখাও, তার পর যদি তোমার দাবী অগ্রাহ্য হয় ছাখো, তখন জানিয়ো তোমার নালিশ!

জানকী বাবু বলিলেন—রেজিগ্‌নেশনের কথা···

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কামাখ্যা সাহেব জবাব দিল। বলিল—লিখে দিতে বলুন, রেজিগ্‌নেশন এ্যাকসেপ্টেড!

জানকী বাবু ক্ষণেকের জন্ম নীরব রহিলেন। তার পর বলিলেন—ছেলেমানুষ···রক্ত গরম···এ কথা লিখেছে বলে···

কামাখ্যা সাহেব বলিল—না, না···আমার ছেলে বলে' আপনি তাকে অনেক বেশী চান্স দিয়েছিলেন। আমিও ঢের বুঝিয়েছি···কিন্তু কাজের দাম সে কখনো বুঝবে না! সে বুঝেছে, সেজে-গুজে হুকুম চালানোই হলো কাজের সেরা পরিচয়!··· না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি জানি, ও একেবারে অপদার্থ!···অফিস থেকে চলে গেছে, এতে আমার বুকের ভার অনেকখানি হালকা হয়েছে! পিনাকী হলো যাকে বলে, অত্যন্ত বেয়াড়া···মানে, মোষ্ট ইরেসপন্সিব্‌ল্!

জানকী বাবু বলিলেন—কিন্তু···

তাঁর স্বরে অনেকখানি সঙ্কোচ!

কামাখ্যা সাহেব বলিলেন—আমরা জানি যে, উই হ্যাভ্ গট্ ট্রিউ অফ্ এ ওয়ার্থলেস্ ড্রোন্!

[ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সুজনের মেলে কম-ই সন্ধান

নিমগাছ দিকে-দিকে কতই তো দেখা যায়,
চন্দন-তরু দেখি অল্পই!
পাহাড়ে আর পাথরে তো বসুমতী ভরা হায়,
রত্ন-মনির দেখা পাই কই?

সর্ব্বদা কাণে আসে কাকের-ই তো কা-কা রব,
ক'দিন বা কোকিলের কুহু-তান?
ধরাতলে যত দেখি খলেরি তো উৎসব,—
সুজনের মেলে কম-ই সন্ধান!

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বস্ত্র-সমস্যা

অন্নের ন্যায় বস্ত্রের সমস্যাও বাঙ্গালায় ভদ্র সমাজের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। সরকারের নির্দ্দিষ্ট উচ্চতম দরের অর্থ লোকে ঠিক বুঝিতেছে না। কাপড়ের ও সূতার সর্ব্বোচ্চ দর সরকার বাঁধিয়া দিয়াছেন। ঐ দরও অত্যন্ত অসঙ্গত ভাবে ধার্য্য করা হইয়াছে। ২০ নম্বর সূতার সর্ব্বোচ্চ দর ধার্য্য হইয়াছে প্রতি পাউণ্ড পৌনে ২ টাকা। অথচ সর্ব্বোৎকৃষ্ট তুলা হইতে যে-সে কলে সূতা প্রস্তুত করিতে হইলেও এখন ১ টাকা ২ আনার অধিক খরচা পড়ে না। সুতরাং কলওয়ালাদের লাভ হইবে প্রতি পাউণ্ড সূতায় দশ আনা,—খরচার উপর প্রায় অর্দ্ধেক লাভ অর্থাৎ শতকরা ৫০ টাকা লাভ। ইহাতে গৃহস্থ খরিদ্দাররা মরিতে বসিয়াছে। পূজার বাজারে বস্ত্রের মূল্য কিছু কমিলে গৃহস্থ-পরিবার লজ্জা এবং সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া বাঁচিতেন! কিন্তু আমাদের মুখ চাহিয়া, আমাদের সুখ-দুঃখ বুঝিয়া এ সমস্যার সমাধান কে করিবে? বয়নবোর্ডের সিদ্ধান্তে মিলের মালিকরা আমাদের লজ্জার মূল্যে প্রভূত অর্থ লাভ করিবেন। এবারকার এই মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ফলে মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারবর্গ সকল দিকে পিষ্ট হইতেছে। এ সব ব্যাপার ভ্রান্ত কল্পনায় অনুসৃত নীতির ফল।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

বোম্বাই সহরের নিখিল ভারতীয় সংবাদপত্র-সম্পাদকের পরিষদে ভারত সরকারের সংবাদ-সরবরাহ এবং প্রচার বিভাগের সদস্য স্যর সুলতান আমেদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, "আপনারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যস্ত, আমার বিশ্বাস, আপনারা এখন তাহা পাইয়াছেন। সংবাদপত্রে যাহা ছাপা হয় তাহা পড়িয়া অন্ততঃ আমি তাহাই বুঝিয়াছি। তবে যুদ্ধের সময় সাময়িক ভাবে যে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতেই আপনারা আপনা-দিগকে অতিশয় পীড়িত বোধ করিতেছেন। যুদ্ধের সময়েও এ দেশের সংবাদপত্রগুলি স্বাধীনতা ভোগ করে,—ইহা আপনাদের সহিত আমারও ইচ্ছা। যদি আমি আপনাদিগকে সাহায্য করি,—আপনারাও আমাকে সাহায্য করিবেন।" স্যর সুলতানের মনে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির সম্বন্ধে শুভ বাসনা থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে সংবাদপত্রগুলি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, তাহা যে তিনি দেখিতে পাইতেছেন না, ইহাতেই আমরা বিস্মিত হইয়াছি! স্বাধীনতা অর্থে তিনি কি বুঝেন তাহা আমরা বুঝি না। যদি পাণ হইতে চূণ খসিলেই সংবাদপত্রগুলিকে অভিযুক্ত করা হয়, অথবা তাহাদের গচ্ছিত টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কি সেই স্বাধীনতাকে স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে? অথচ যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যাহাতে সাহায্য হইতে পারে বা সুবিধা জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহা কোন মতেই প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় সংবাদপত্রই সেরূপ সংবাদ জানিয়া শুনিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে ভুলের মার্জ্জনা নাই,—সেখানে স্বাধীনতারও কোন মূল্য নাই।

শিক্ষিত ছাত্রদিগের অজ্ঞতা

যে সকল ছাত্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞতার বিষয় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-সভায় সার মির্জ্জা ইস্মাইল বক্তৃতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়া-ছেন। তিনি বলেন যে, যাহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত, তাহাদের অজ্ঞতাও অত্যন্ত ভীষণ। কথাটা খুবই সত্য! কিন্তু সে জন্য দায়ী কে? বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই ত্রুটিযুক্ত যে, উহাতে চৌকোস জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। সেই জন্য এই সকল যুবক কতকগুলি বাঁধা বুলি শিখিয়া আসে,—এবং তাহাই ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচার করে। সেই জ্ঞান লইয়াই ইহারা আপনাদের বাহাদুরী দেখাইতে যায় এবং আপনারা মজে, দেশকেও মজায়। ইহার প্রতিকার কি?

সুবর্ণের মূল্য

ইদানীং সুবর্ণের মূল্য লইয়া সর্ব্বত্রই বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। সুবর্ণকে মৌদ্রিক ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করা হইলেও উহা এখনও মূল্যের ধারক হিসাবে লোকের বিশ্বাসভাজন হইয়া আছে। অর্থাৎ সোণা যাহার আছে তাহার পয়সা আছে, এ ধারণা এখনও প্রায় সকলেরই রহিয়াছে। সুতরাং সুবর্ণ কিনিবার জন্য লোকের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। সেই জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে খাঁটি সোণার ভরি এক শত আট টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এখন কমিয়া গিয়াছে। মধ্যে শুনা গিয়াছিল যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৩০শে ও ৩১ শ্রাবণ এবং ১লা ভাদ্র পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার তোলা বিদেশী সুবর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন। তাহার ফলে সুবর্ণ-মূল্য কমিয়াছে। এ দিকে ইংরেজ এবং মার্কিণ মিলিত হইয়া যুদ্ধের পর যে আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা প্রচলনের পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহাতে সুবর্ণকে একেবারে মুদ্রার আসন হইতে বিচ্যুত করা হইবে না। সে জন্যও সুবর্ণের সম্মান অনেকটা বজায় আছে। তবে সুবর্ণের মূল্য আরও কমিতে পারে। রূপার মূল্য সুবর্ণের মূল্য-বৃদ্ধি হেতুই বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ভারতীয় মুদ্রা-মূল্যের ধারক হিসাবে যে সুবর্ণ আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সেই জন্য বিদেশে ভারতের যে পাউণ্ড ষ্টার্লিং জমা আছে, তাহা সুবর্ণে পরিণত করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা রাখা আবশ্যক।

কলিকাতায় বুভুক্ষুদিগের মৃত্যু

সরকারী বিবরণে জানান হইয়াছে যে, ২৬শে ভাদ্র হইতে ৮ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ৩ হাজার ৪৩১ জন অনশন-শীর্ণ মরণাপন্ন নর নারীকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে ১১৪ জন হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং পুলিশ পথ হইতে ৬৮১ জনের মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় অনশনে মৃত্যুর যে অসম্পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই সময় মধ্যে ২২১৪ জন হতভাগ্য বাঙ্গালীর মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এ সকল বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, সরকারী ও

বেসরকারী কোন ব্যবস্থাই মৃত্যু-সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিতেছে না। কর্পোরেশন হেল্থ কমিটীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, কলিকাতার বিভিন্ন শ্মশানে যত মৃতদেহ দাহ করা হইতেছে, তাহার মধ্যে ৬০।৭০ জনই বুভুক্ষু দুঃস্থ ব্যক্তির। শ্মশানে মৃতদেহ প্রত্যহ স্তূপাকারে পড়িয়া পচিতেছে—দাহ করিবার স্থানাভাব! কলিকাতার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ম শ্মশানের প্রসার-বৃদ্ধি ও এই সব মৃতদেহ রাখিবার সুব্যবস্থা হওয়া অচিরে কর্ত্তব্য নয় কি?

ভারত সরকারের স্বস্তি-শ্বাস

বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনে সম্প্রতি মিষ্টার এডগার স্নো এক বেতার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—সামরিক দিক্ দিয়া ভারত এখন নিরাপদ, জাপানকে আক্রমণ করিবার সুযোগ এক্ষণে মিত্রপক্ষের মিলিয়াছে, আইন-অমান্ত আন্দোলন দমন করায় ভারত সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সমর-প্রচেষ্টায় বিশেষ কোন বাধা প্রদান করিবার শক্তি আর কংগ্রেসের নাই। ভারত এখন নিরাপদ এবং জাপানকে এখন ঠেলা সামলাইতে হইবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হউক। মিষ্টার স্নো কিন্তু স্বীকার করিয়াছেন যে, আইন-অমান্ত আন্দোলনের ফলে ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, আন্দোলন প্রদমিত হওয়ায় সে কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কর্ত্তৃত্ব কিসের? ভারতের সামরিক নিরাপত্তা এবং জাপানকে পাল্টা আক্রমণের সুযোগ-বার্ত্তার সহিত একই নিশ্বাসে আইন-অমান্ত আন্দোলনের নাম উচ্চারিত হইতে দেখিয়া মনে হয়, এ আন্দোলন ভারত সরকারের সমর-প্রচেষ্টা ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। এ আন্দোলনে ভারত সরকারের শক্তি কতটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল বা আন্দোলন দমনে সে শক্তি কতটা বাধামুক্ত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু ইহা আমরা ভাল করিয়াই জানি যে, কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবীও নীতি, ন্যায় ও সুবিচার-সঙ্গত। এই দাবী পূরণ না করিয়াই যদি ভারত সরকারের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে সে কর্ত্তৃত্ব স্বাধীনতাকামী ৪০ কোটি ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া,—আটলাণ্টিক চার্টারের গালভরা প্রতিশ্রুতি যে ভারতের জন্ম নয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া!

রাজাগোপালাচারির সুযোগ সন্ধান

মাদ্রাজের 'হিন্দু'পত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদ-দাতার নিকট মিষ্টার এডগার স্নো অভিমত প্রকাশ করেন যে, কতকটা ক্রিপ্স্ প্রস্তাবের অনুরূপ কোন প্রস্তাব কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের নিকট করা হইলে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, পণ্ডিত জওহরলাল এবং মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত হয়ত জাপানের বিরুদ্ধে আসন্ন অভিযানে মিত্রপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিবেন, বৃটিশ প্রচারকের এই কথাটি লুফিয়া লইয়া শ্রীযুত রাজাগোপালাচারি বলিয়াছেন—কথা যথার্থই। এইবার ছোট ছোট রাজনীতিক দলগুলি যদি এক-বাক্যে আপনাদের মত ব্যক্ত করেন, তাহা হইলেই সম্মিলিত জাতিবর্গের রাজনীতিক কর্ণধারগণ লজ্জায় জিভ কাটিয়া সে দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন! তলে তলে যে শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারি ও তাঁহার নবলব্ধ উদারনৈতিক বন্ধুগণ প্রাদেশিক সচিবত্বের গদী পাইবার জন্ম ইংরেজের শ্রীপদে তৈল নিষেক করিতেছেন, তাহা সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্টের এক প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে। ২৫ জন ভারতীয় প্রতিনিধি ঘটকালি করিবার জন্ম বিলাত পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিলেন। ফল যে কিছু ফলে নাই, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন!

এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব বলিয়াছেন—বাঙ্গালা দেশে চাউলের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণের পর যে বাঙ্গালা দেশের বাজার হইতে চাউল একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে,—সে সংবাদ ভারত-বিদ্বেষী ভারত-সচিব পান নাই। তিনি তাঁহার দেশের 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন' পত্রের অভিমত পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিতেন। 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখিয়াছেন—"কলিকাতার জনসাধারণের অবস্থার যে বিবরণ আমরা পাইতেছি, তাহা যেন মধ্যযুগের মহামারীর কলঙ্ক-কাহিনী। সরকার এই সর্ব্বনাশের প্রতিকারার্থ কি করিয়াছেন? ভারত শাসনের দায়িত্ব আজ প্রকৃত পক্ষে কাহার উপর অর্পিত? বড়লাটের শাসন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ভারতীয় হইলেও তাঁহারা বড়লাটেরই মনোনীত ব্যক্তি। ইঁহাদের কোন দল নাই। প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও অধিকাংশ প্রদেশে এ শাসন অচল। পঞ্জাব ব্যতীত যে সকল প্রদেশ সচিবসঙ্ঘ-নিয়ন্ত্রিত, সে সব প্রদেশেরও সচিবসভা প্রতিনিধি-মূলক নহে। ভারতের দুইটি বৃহৎ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি দল (মসলেম লীগ) হিন্দুস্থান হইতে মসলেম-প্রধান প্রদেশগুলিকে পৃথক্ করা লইয়া ব্যস্ত; অপর দলের (কংগ্রেসের) সকল নেতাই কারা-প্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ; সুতরাং অভিমত প্রকাশ সুযোগ-বর্জ্জিত।" ভারতের এহেন পরিস্থিতিতে নিরন্ন, বিপন্ন, মরণাচ্ছন্ন বাঙ্গালা তথা ভারতকে রক্ষা করিবার জন্ম কাহার প্রাণ কাঁদিবে? ইংরেজ সরকার যুদ্ধ লইয়াই ব্যস্ত। ভারতের এই আভ্যন্তরীণ সর্ব্বনাশের প্রতিকার-ভার যাঁহাদিগের উপর, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ শক্তি সমরায়োজনে ব্যাপৃত, সুতরাং ক্ষুধার্ত্ত দেশবাসীকে নিরন্ন দেশবাসীর অকিঞ্চিৎকর সাহায্য পাইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

বাঙ্গালার এই নিরন্ন অবস্থা কি দুর্ভিক্ষ? ৭ই আশ্বিন বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাবে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়া সরকারকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণকে অন্নদান করিবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাবটি অবশ্য নাজিমুদ্দীন-সুরাবর্দ্দী কোম্পানীর ভোট-প্রাবল্যে অগ্রাহ্য হয়। খাদ্য বিভাগের সচিব সুরাবর্দ্দী বলিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ হয় নাই, চাউলের মূল্য একটু বাড়িয়াছে মাত্র। নিরন্ন বাঙ্গালীর ছিন্ন ঝুলি হইতে তাহাদের শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া যাহারা মোটা বেতনভোগী মনসবদার হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট তণ্ডুলের ৮।১০ গুণ মূল্য বৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা শেষ সম্বলটুকুও সরকারের কোষাগারে সেলামী দেয়, তাহাদিগের অন্নাভাব নিশ্চয় অকিঞ্চিৎকর নয়। সার্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, সার জগদীশপ্রসাদ, বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যগণ, মার্কিণ সাংবাদিকগণ সকলেই বাঙ্গালার অবস্থাকে দুর্ভিক্ষই আখ্যা দিতেছেন। সরকারী কেমিন কোডে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ এই:—(১) খাদ্য-পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধি; (২) খাদ্য-শস্য

ব্যবসায়ে অতিরিক্ত চাঞ্চল্য; (৩) লোকের স্থান-ত্যাগের আধিক্য; (৪) অস্বাভাবিক ভাবে জনতার ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা; (৫) ভিক্ষার অভাবে স্থানীয় ভিক্ষুকদিগের দূর-দূরান্তরে গমন; (৬) সমাজের আভ্যন্তরীণ চাঞ্চল্যে অপরাধের সংখ্যা-বৃদ্ধি। খাদ্য-সচিব সুরাবর্দ্দী বোধ হয় এ সকল কেতাবের পৃষ্ঠাও উল্টান নাই! রাজনৈতিক ধুরন্ধর অবাঙ্গালী জিন্না এবং অর্থনৈতিক রসদ্দার অবাঙ্গালী ইস্পাহানী কোম্পানী এবং নিজস্ব বাঙ্গালী বৃত্তি, বুদ্ধি, সমাজিকতা ও স্বদেশিকতার অভাব না হইলে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর এমন সর্ব্বনাশে নির্ম্মম উপহাস করিতেন না!

হিন্দুরাই মরিতেছে

দুর্ভিক্ষের তাড়নে ও প্রহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম প্রায় এক লক্ষ নর নারী কলিকাতার গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে 'অন্ন দাও অন্ন দাও' করিয়া ফিরিতেছে। বেসরকারী ও সরকারী অন্ন-বিতরণের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয়। ফলে কলিকাতায় গড়ে অন্ততঃ প্রত্যহ ১ শত জনের মৃত্যু হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগ এ সকল নিরন্ন নরনারী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা বালীগঞ্জ, শ্যামবাজার, নিমতলা, শিয়ালদহ, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হাওড়ার পুলের সমীপবর্ত্তী অঞ্চল ও বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানের প্রায় ৫ শত অনশনক্লিষ্ট পরিবারের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐই ৫ শত পরিবারে লোকসংখ্যা ১৫৬৬ জন অর্থাৎ প্রতি পরিবারে—৩.১ জন। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৭১.১ জন ২৪ পরগণা, শতকরা ৯.৫ জন মেদিনীপুর, ৩.৭ জন নদীয়া, ২.৫ জন হুগলী, ২.৪ জন হাওড়া এবং ১.১ জন বর্দ্ধমান জিলার অধিবাসী। ইহাদিগের মধ্যে তপশীলভুক্ত হিন্দুদিগের সংখ্যা শতকরা ৫২.৭ জন, মুসলমান ৩০.১ জন, বর্ণ-হিন্দু ১৫.৪ জন, খৃষ্টান ১ জন। বিপন্নদিগের মধ্যে শতকরা ৫৫.৭ জন স্ত্রীলোক, ৪৪.৩ জন হিন্দু; পূর্ণবয়স্ক শতকরা ৪১.৬, বালক-বালিকা ২৭.৭, শিশু ২৬.৩ এবং বৃদ্ধ ৪.৪ জন। কলিকাতার সমাগত অন্নহীনদিগের মধ্যে শতকরা ৭২.৭ জন কৃষিজীবী, ২.৪ জন মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র দোকানদার শতকরা ৭ জন, ভিক্ষুক ৬.৬ জন, অন্যান্য ১০.৭ জন। অন্নের অভাবে হিন্দুরাই কেন বেশী মরিতেছে, হিন্দুরাই কেন অধিক বিপন্ন, ইহা হিন্দু সমাজের কল্যাণকামী সকলেরই সন্ধান করা কর্ত্তব্য।

অনাচারের অভিযোগ

গত ২৩শে ভাদ্র লাহোর হইতে এই মর্ম্মে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়—"জানা গিয়াছে, বাঙ্গালা সরকার কেনা দর অপেক্ষা বেশী দরে বাঙ্গালায় গম বিক্রয় করিয়া লাভ করিতেছেন। এই অভিযোগ সম্বন্ধে ভারত সরকার তদন্ত-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।" লাহোরে এক সাংবাদিক-বৈঠকে সার্ জগদীশপ্রসাদ শ্রীবাস্তব "কোন প্রাদেশিক সরকারের" বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং 'ভারত সরকারের তদন্তের কথা ব্যক্ত করেন। ১০ই আশ্বিন বঙ্গীয় পরিষদের অধিবেশনে খাদ্য-সচিব মিঃ সুরাবর্দ্দী স্বীকার করেন যে, বাহির হইতে যে গম আমদানী করা হইয়াছে, তাহার উপর সরকার কিছু লাভ করিয়াছেন। পঞ্জাবের সচিব স্যর ছোটু রাম এবং ফুড্-কনট্রোলার সার কলিন গার্বেটের হিসাবে এই লাভের পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ টাকা! এই অভিযোগ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা সরকারের এক অর্ডিনান্সে আটা-ময়দার দাম সহসা কমিয়া আটা ৵১০ সের এবং ময়দা ।১০ সের দরে বিক্রয় হইতেছে! 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বাঙ্গালার ব্যাপার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—কন্ট্রোলের উপর কন্ট্রোল বাড়িয়াছে। জাতিগত, সম্প্রদায়গত এবং নানা ভাবে অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ এজেন্ট ও দালাল নিযুক্ত হইয়াছেন। কৃত্রিম উপায়ে পণ্য-মূল্য বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও এ বিষয়ে তদন্তের জন্য নিরপেক্ষ এক ট্রাইবুনাল গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার খাদ্যসঙ্কট-সম্পর্কে বিতর্ক-কালে বাঙ্গালা সরকারের অব্যবস্থার অনেক কাহিনী প্রকাশ পায়। ১০ই আশ্বিনের অধিবেশনে ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক সরকারের খাদ্যাভিযানের পরও ঘাটাল মহকুমা হইতে নৌকা-বোঝাই ধান্য বাহিরে চালান যাইতেছে এরূপ ফটো স্পীকারের নিকট দাখিল করেন। মিঃ ফজলুল হক—ইস্পাহানী কোম্পানীকে খাদ্যশস্য ক্রয়ের একচেটিয়া এজেন্সী দিবার জন্য বাঙ্গালা সরকারের নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে সচিবসঙ্ঘ দোষী। ৮ই আশ্বিন পরিষদের অধিবেশনে বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগের এক এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর গ্রেপ্তারের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষি-সচিব বলেন যে, বিতরণের উদ্দেশ্যে বীজ ক্রয়ের জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। এই বিতরণ সম্পর্কে সরকারী কর্ম্মচারীটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কি না, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা অবগত হইয়াছেন যে, বাঙ্গালা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য সার গুথরি রাসেলের সভাপতিত্বে এক ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছে। এই ট্রাইবুনালে পঞ্জাবের এক জন এবং বাঙ্গালার এক জন বিচারক থাকিবেন। শুনা যাইতেছে, কেন্দ্রী সরকারের বাণিজ্য বিভাগের মিঃ এস এন রায়, লেবার ডিপ্রার্টমেন্টের মিঃ বি এল মজুমদার, সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের মিষ্টার সাইমনস্ এবং অপর পাঁচ জন আই-সি-এসকে অবিলম্বে বাঙ্গালায় আনয়ন করা হইবে।

বাঙ্গালায় প্রত্যহ ২ হাজার টন খাদ্যশস্য প্রেরণ করা হইলেও সে সকল শস্য কি ভাবে ব্যয় করা হইতেছে, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ বাঙ্গালা সরকার না কি কেন্দ্রী সরকারকে প্রদান করিতে পারিতেছেন না। আমরা ট্রাইবুনালের তদন্ত-ফলের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

মনুষ্যত্বের খাতিরেও এ সকল অনাচারের অবসান হওয়া আবশ্যক। বিপন্ন স্বজন ও স্বদেশবাসীর মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া শকুনি-বৃত্তি অবলম্বন সর্ব্বদা নিন্দনীয়। অভিযোগ যখন ব্যাপক তখন সরকার নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণ কোন মতেই তুষ্ট হইতে পারে না।

পুলিসের গুলীতে হতাহতের হিসাব

১১ই আশ্বিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে কারারুদ্ধ সদস্য শ্রীযুত প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে সার নাজিমুদ্দীন জানান যে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৭ই অগষ্ট হইতে ৩০শে নভেম্বর (৩ মাস ২৪ দিনে) মধ্যে বাঙ্গালায় পুলিসের গুলীবর্ষণে ৮৮ জন নিহত ও ৪৫৩ জন আহত হয়; কলিকাতায় ২০ জন নিহত ও ২৩৪ জন আহত; মেদিনীপুরে ৪৫ জন নিহত ও ৯০ জন আহত হয়। যে সকল স্থানে সৈন্যগণ গুলী চালায়, সে সকল স্থানের হতাহতের তালিকা দেওয়া হয় নাই। যাহারা নিহত ও আহত হইয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই দোষী, এ কথা খাজা সার নাজিমুদ্দীন বলেন নাই এবং ইহাও ব্যক্ত করেন নাই যে, কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হতাহত হইলে সরকার তাহাদিগকে বা তাহাদিগের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াছেন কি না!

বাঙ্গালার বাজেট—১৯৪৩-৪৪

১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দের বাঙ্গালা সরকারের বাজেটের কথা দেশবাসী বহু কাল মনে রাখিবে। গভর্ণর সার জন্ হার্বার্টের কৃপায় গত এপ্রিলে বাজেট সরাসরি ভাবে গৃহীত হয়। তবু নাজিমুদ্দীন সচিব-সঙ্ঘ দলগত ভোটের জোরে উহা পাশ করাইয়া লইয়া ইজ্জত রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। অর্থ-সচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এ বৎসরের বাজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের বহর দেখাইয়া আপনার স্বভাব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং ঘাটতি পূরণের জন্য কৃষি-আয়-কর স্থাপন ও ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। বাজেটে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দের তুলনায় আলোচ্য অভাব অনটনের বৎসরেও—১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ব্যয়-বৃদ্ধির বহর এইরূপ—

১। রাজস্ব—১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।
২। খাদ্যশস্য বিক্রয়ের লোকসান—সাড়ে তিন কোটি টাকা।
৩। দুর্ভিক্ষে সাহায্য—৩ কোটি টাকা।
৪। কৃষি—৬৬ লক্ষ টাকা।
৫। পূর্ত্ত—৫৫ লক্ষ টাকা।
৬। পুলিস—২৭ লক্ষ টাকা।
৭। সেচ—১১ লক্ষ টাকা।
৮। সুদ—১৫ লক্ষ টাকা।
৯। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ—৩১ লক্ষ টাকা।
১০। কলিকাতা কর্পোরেশনে সাহায্য—সাড়ে দশ লক্ষ টাকা।

কৃষিখাতে ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ, "আরও খাদ্য-শস্যের চাষ কর" আন্দোলন। গত বৎসর এ আন্দোলন ২১ লক্ষ টাকা গ্রাস করে, আলোচ্য বৎসরে ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। পুলিশ বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধির কারণ অতিরিক্ত ভাতা, সিভিক-গার্ড প্রভৃতির জন্য। অর্থ-সচিব কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—৭ কোটি টাকার ঘাটতি অভিনব। গত বৎসর সরকারী তহবিলে ২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা জমা ছিল। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের আয়ের সহিত ব্যয়ের পার্থক্য এত অধিক হইতেছে যে, আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উৎকণ্ঠিত হইতেছি। মনুষ্যকৃত এবং প্রকৃতিকৃত কার্য্যের ফলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। অর্থ-সচিবের অর্থনীতিক বিচক্ষণতার কোন পরিচয় বাঙ্গালা দেশ পূর্ব্বে কখন পায় নাই। সুতরাং মনে হইতেছে, সরকারী দপ্তরের মামুলি নীতি অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। অবশ্য এ কথা তিনি সরল ভাবে স্বীকার করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া মরণাহত বাঙ্গালার এই অতি দুর্দ্দিনে, ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাবের তিনি বাজেট সমর্থন করিয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ইতিহাস শ্রীযুত তুলসীচন্দ্রের মত বিদ্বানের যদি জানা না থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ' পাঠ করিতে বলি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-কালের রাজস্ব-সচিব রেজা খাঁ যে এ কালের শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামিরূপে বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা আমরা মনে করি না। মহম্মদ রেজা খাঁ সরফরাজ হইবার আশায় শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালাকে শ্মশান করিয়াছিল! আজ কোন্ পদ-লিপ্সায় বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাজস্ব-সচিব ব্যয় বৃদ্ধি, কর বৃদ্ধি ও ঋণের বহর দেখাইয়া পুনরায় বাঙ্গালাকে শিবা-শকুনির লীলা-স্থল করিতে চাহেন, জানিতে পারি কি?

রেশনিং-ব্যবস্থা

কলিকাতায় এবং সহরতলীতে পরিবার-প্রতি নির্দিষ্ট খাদ্যদানের সুব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল না। অবশ্য এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সরকারের খাদ্যবিভাগ বিবৃতি ও ইস্তাহারের বহুবিধ পাঁয়তাড়া ভাঁজিতেছেন। দুই একটি মহল্লায় "কণ্ট্রোল দরে" চাউল, আটা, চিনি দিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা যাহারা মধ্যরাত্রি হইতে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে তাহাদিগের জন্য। মধ্যবিত্ত পরিবারবর্গ, ভদ্র-মহিলা ও বিশেষতঃ যাঁহারা প্রাতে কার্য্যস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদিগের সুবিধার জন্য কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। জ্বালানী কয়লা পাওয়া যায় না, ময়দা, চিনি বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভদ্রজনের খাদ্য চাউল একসঙ্গে আধ মণ কোন দোকানে মিলে না। সরিষার তৈল, কেরোসিন তৈল পয়সা দিয়াও কিনিতে পাওয়া যাইতেছে না। বস্ত্র-সমস্যা ক্রমেই অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। 'গবর্ণমেণ্ট ষ্টোর্স' সাইনবোর্ড স্থানে স্থানে টাঙ্গানো হইলেও সে সকল "ষ্টোরে" এ পর্য্যন্ত কোন পণ্য আমদানী হয় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পুরাতন এ-আর-পি স্লিপের পরিবর্ত্তন করিয়া যে নূতন রেশন-স্লিপ দিবার কথা ঘোষিত হইয়াছিল, তাহাও সকল মহল্লায় কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ইহার পর ৫ই আশ্বিনের নূতন আদেশ অনুসারে তথ্য সংগ্রহের আয়োজন এখনও করা হয় নাই। পরিবার-হিসাবে এক দফা যে রেশন-স্লিপ দেওয়া হইয়াছিল, ষ্টোরে পণ্য না আসায় অনেকেরই পক্ষে তাহাতে আহার্য্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ইহার উপর মাথা-প্রতি গুণতির ব্যবস্থা করিয়া সুব্যবস্থা করিতে আরও যে কত কাল ব্যয় হইবে তাহা কে জানে! ইহা ধাপ্পাবাজির নামান্তর! রেশনিং কণ্ট্রোলার ও এ-আর-পি সার্ভিসের ওয়ার্ডেন্স শাখার কর্ম্মচারীদিগের কিন্তু নিয়মিত বেতন প্রাপ্তির এতটুকু ব্যাঘাত ঘটিতেছে না।

লর্ড হালিফাক্সের উপহাস

সম্প্রতি লর্ড হালিফাক্স (ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট) আমেরিকার 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিনে' লিখিয়াছেন—যাঁহারা বলিয়া থাকেন, "ভারতে অশান্তি ও বিদ্রোহ বিরাজ করিতেছে, তাঁহারা নিজেরাই এ প্রশ্নের উত্তর দিন যে, মাত্র কয়েক হাজার ইংরেজ বেসামরিক লোক এবং ৬০ হাজার ইংরেজ সৈন্য কি করিয়া ৪০ কোটি নরনারীকে তাহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরাধীন রাখিতে পারে ?" ইহার উত্তর ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভাল ভাবেই পাওয়া যায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতাক্ষুণ্ণকারী যে সকল বিধি ও ব্যবস্থা গত আড়াই শত বৎসর ভারতে প্রবর্ত্তিত, প্রসারিত ও কার্য্যকরী করা হইয়াছে, সেগুলিই ভারতের বৃত্তিভোগী এই ভূতপূর্ব্ব বড়লাটটির শ্লেষ প্রশ্নের উত্তর দিবে ! কোন্ থার্ম্মোমিটার দিয়া লর্ড হালিফাক্স ভারতবাসীর ইচ্ছার পরিমাপ করিলেন ?

পাকিস্থানের অর্থনীতিক সুবিধা

"ফরেন য্যাফেয়ার্স" পত্রে জনৈক মার্কিণ অধ্যাপক পাকিস্থানের অর্থনীতিক অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিলে হিন্দুস্থানেই বেশীর ভাগ কয়লা ও কাঁচা মাল থাকিবে, পাকিস্থান পাইবে মাত্র তৈল। ইহাতে বাঙ্গালার শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করা হইলে হিন্দু-রাষ্ট্র বিশেষ সম্পন্ন হইবে এবং মসলেম রাষ্ট্র অত্যন্ত [illegible]দ্র। প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ কয়লা, ১২ ভাগ কাঁচা মাল [illegible]শীর ভাগ কা[illegible] লৌহ ও আনুষঙ্গিক খনিজ দ্রব্য হিন্দুস্থান পাইবে।" [illegible] মার্কিণ অ[illegible]পক ভুল করিয়াছেন। পাকিস্থান গাছে না [illegible]ঠিতেই যখন মস[illegible]লেম লীগের পঞ্জাবী ও বাঙ্গালী পাণ্ডারা অনেক [illegible]দি লাভ করিয়াছেন—উজিরী—নকরি—সরকারী খাদ্য বিভাগের একচেটিয়া দালালী, তখ[illegible]ন পাকিস্থান শিমুল বৃক্ষে আরোহণ করিতে সমর্থ হইলে অনেক কিংশুক[illegible]ই তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন !

বৃটেন ও [illegible] আমেরিকা চঞ্চল

বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় এদে[illegible]গী শাসকগণ কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। ভারতের বড়লাট ওয়াভে[illegible]ল বাঙ্গালার দুর্দ্দশায় এ পর্য্যন্ত সহানুভূতির একটি বাণীও উচ্চা[illegible]ণ করেন নাই। বৃটেন তথা আমেরিকার বিশিষ্ট সংবাদপত্র[illegible]গুলি বাঙ্গালার এই দুরবস্থায় সামরিক দুর্ব্বলতার আভাস পাইয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' পত্র লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালার এই দুরবস্থার অবসান করিতে না পারিলে তাহাতে [illegible] বৃটিশ ও ভারতীয় রাজ-পুরুষদিগেরই অক্ষমতা প্রকাশ পাইবে তাহা নয়, উহাতে সমর-প্রচেষ্টারও প্রভূত ক্ষতি হইবে। কারণ, বাঙ্গালাকে শীঘ্রই এশিয়ার সামরিক কার্য্য-কলাপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে। "বিলাতের 'নিউজ ক্রনিকল', "ডেলী হেরাল্ড" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রগুলি বাঙ্গালাকে শীঘ্র রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহের ভারতস্থিত প্রতিনিধিগণ এদেশের দুর্দ্দশার বিবরণ প্রচার করিতেছেন। আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক পোষ্ট' লিখিয়াছেন—"ভারতে লক্ষ লক্ষ নর-নারী অনশনক্লিষ্ট। ব্রহ্মদেশ জয় না করিলেই নয়।" শিকাগো 'ডেলী নিউজের' সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"এখানেও বিপন্নদিগের সাহায্য-ব্যবস্থা মন্থর ও অকিঞ্চিৎকর। এখানে নারী ও শিশুরাই অধিকতর ক্লিষ্ট। দুর্দ্দশা হ্রাসের জন্য অতি বিলম্বে সরকারী ও বেসরকারী সাহায্য মিলিতেছে।" কলিকাতার মেয়রের আবেদন সম্বন্ধে মার্কিণ সরকার যে ভাবে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় রিলিফ কর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছে। এই সঙ্গে মার্কিণ সাংবাদিকগণ ভারতবাসীর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনের পরামর্শ দিয়াছেন। মার্কিণ 'লাইফ' পত্রে মিষ্টার জন জেসাপ লিখিয়াছেন—"ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রতি অবিশ্বাস-ভাব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। ভারতীয় সমস্যার মূল কথা, এই অবিশ্বাস। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা যে এই অবিশ্বাস হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তাহার কারণ, ফিলিপাইন্‌সে মার্কিণ সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত নগণ্য ; এবং আমেরিকা ফিলিপাইন্‌সকে স্বাধীনতা দানের আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল বলিয়া প্রাচ্যবাসীর নিকট এখনও মর্য্যাদা পাইতেছে। প্রাচ্য দেশবাসীরা আজ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমান অধিকার পাইবার দাবী করে। এশিয়ার এই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আগ্রহের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন না করিলে কোন শ্বেতাঙ্গ জাতি এশিয়ায় আর মর্য্যাদা পাইবে না। এশিয়া সম্বন্ধে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি ইহাই হওয়া কর্ত্তব্য। আমেরিকা এই নীতি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিলে বৃটেনকেও এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। বাঙ্গালার এই সঙ্কট-সমস্যার প্রসঙ্গে আমেরিকা বলিতেছে, বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যার মীমাংসাই শুধু নয়—ভারতের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া আমেরিকা সে দাবী পূরণ করিতে ব্যগ্র,—সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন কি ইহাতে সম্মত হইবে ?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলন

২রা আশ্বিন রামমোহন লাইব্রেরী-হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃতি সম্মেলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে প্রবীণ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ, সাংখ্যতীর্থ সুচিন্তিত অভিভাষণ-প্রসঙ্গে বলেন,—"জাতিই সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক ; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের সংস্কৃতি-রক্ষাকল্পে আমাদিগকে সমগ্র ভাবে জাতির সেবায় ও রক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ঔষধ ও পথ্য বিষয়ে আমাদিগের ঘৃণিত পরমুখাপেক্ষিতা, তৎ[illegible]ীয় নিশ্চেষ্টতা এবং অধিকাংশ দেশবাসীর আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ঐকা[illegible] শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অভাব।"

কারমাইকেল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-ডি ত্রিদোষতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ মৌলিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রসিদ্ধ প্রাচীন চিকিৎসক শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস তাঁহার বক্তৃতায় অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ষড়্‌দর্শনতীর্থ, শচীন্দ্রনাথ সার্ব্বভৌম, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও সভাপতি মহাশয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। বৈদেশিক ঔষধ আজ যখন দুষ্প্রাপ্য, তখন কবিরাজ মহাশয়েরা যদি বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রকরণ মতে ঔষধাদি প্রস্তুত-করণে অধ্যবসায়ী হন, তাহা হইলে [illegible] আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্যই উপলব্ধি করিবে না, রোগে সুলভে ঔষধ [illegible] অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মধ্যে হাসি তাঁহার নিকট ভীষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। ছাত্রদের মুখের হাসি বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহাইবার জন্য যে অমোঘ মুষ্টিযোগের প্রয়োজন, তাহার প্রয়োগে এই 'স্যার' সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। স্যার তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া অপেক্ষাকৃত কঠোর স্বরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত হাসি-ঠাট্টা চল্‌ছিল কেন বল ?"

আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে অতুলের সাহস ছিল অতুলনীয়। সে আমাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ধীরে ধীরে বলিল, "স্যার, আমাদের সেই বুড়ো পাঙ্খাওয়ালার নাম ছিল হর্‌জীবন, আর এই নূতন লোকটার নাম হরিজীবন; তাই শু'নে আমরা না হেসে কেউ—" অতুলকে কথাটা শেষ করিতে না দিয়া স্যার বলিলেন, "না হেসে কেউ স্থির থাক্‌তে পারলে না! কিন্তু এতে হাসির কথা কি আছে ? কারও নাম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে নেই, এ সোজা কথাটাও বুঝবার শক্তি নেই—এই গাধার দলের কারও ? সাবধান, আর যেন কখন এ রকম না হয়। Now take your books."

অতঃপর তিনি হরিজীবনকে বলিলেন, "এ দিকে আয় তো রে!"

হরিজীবন পাখার দড়ি ছাড়িয়া-দিয়া স্যারের সম্মুখে আসিল, এবং নমস্কার করিয়া তালগাছের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

স্যার বলিলেন, "তোর নাম কি রে কুলি ?"

"আজ্ঞে, শ্রীহরিজীবন রায়।"

"রায় ?—কি জাত ? বদ্দি, না কায়েৎ ?"

"আজ্ঞে না; আমরা হচ্ছি তিলি, ম্যাষ্টর মশায়!"

স্যার সুবর্ণ বণিক, তাই বোধ হয় সুবর্ণ বণিক ও তিলির মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের কথা চিন্তা করিয়া অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলেন, "এঁ্যা, তুমি তিলি? তিলির ছেলে হ'য়ে পাখা টান্‌তে—কুলিগিরি কর্ত্তে এসেছ! লেখাপড়া শেখনি বুঝি ?"

হরিজীবন নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞে, সে না শিখারই মধ্যে,—তেমন-কিছু শিখতে পারিনি; হরপ-টরপগুলো চিন্‌তে শিখেছিলাম। ভাল লেখাপড়া জান্‌লে কি আর এ কাজ করতে আসি ?"

"আচ্ছা যাও"—বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া স্যার আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ, ওদের মধ্যে কত বড় জমিদার, বড় বড় ব্যবসাদার আছে। ভাগ্যকুলের রায়েদের নাম শুনেছ ? লক্ষ্মী তাঁদের ঘরে বাঁধা। কিন্তু এই হরিজীবনকে দেখেই বুঝতে পারচো, জাতে ভদ্র হ'লেও লেখাপড়া না শিখলে তার কি দুর্দ্দশা হয়। পেটের দায়ে ওকে পাঙ্খাকুলির কাজ করতে হচ্ছে! সকলের একথা যেন মনে থাকে।" এই উপদেশ দানের পর স্যার আমাদিগকে বিদ্যা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। হরিজীবন দুঃখিত ভাবে পাখা টানিতে লাগিল।

লোকটার বোধ হয় মাথার একটু গোল ছিল; ছিট্‌গ্রস্ত আর কি ? আমরা প্রায়ই দেখিতাম, পাখা টানিতে টানিতে সে আপন-মনেই বিড়-বিড় করিয়া কি বলিত; মিট্ মিট্ করিয়া হাসিত! হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথাই বলিত না। সে স্যারের পশ্চাতে, দেয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া পাখা টানিত, এজন্য স্যার তাহার হাসি দেখিতে পাইতেন না; পাইলে নিশ্চয়ই তাহাকে সদুপদেশ দান করিয়া ঐ অভ্যাস ত্যাগ করিতে বলিতেন।

হরিজীবন পাঙ্খা-কুলীর কাজ করিলেও ভদ্রবংশের ছেলে। তাহার চেহারাও ছিল ভদ্রলোকের মতই। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, উজ্জ্বল চক্ষু, প্রশস্ত ললাট। কপালে একটা শুষ্ক ক্ষত-চিহ্ন। দেহ শীর্ণ, সম্ভবতঃ বেচারা দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইত না। মাথার চুলগুলা একটু বড়, রুক্ষ। সে প্রত্যহ ঠিক বেলা দশটার সময় ক্লাশে প্রবেশ করিয়াই, পাখার দড়ি হাতে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিত। দশটায় ঘণ্টা বাজিবামাত্র সে পাখা টানিতে আরম্ভ করিত। স্কুলে সে একটা বড় টিনের বাক্স লইয়া আসিত। বেলা একটার সময় দশ মিনিটের জন্য আমরা টিফিনের ছুটি পাইতাম; সেই সময়টা আমরা জিমন্যাষ্টিক গ্রাউণ্ডে গিয়া ছুটাছুটি, লাফালাফি করিয়া কাটাইয়া দিতাম। হরিজীবন সেই সময় তাহার বাক্সসহ একটা গাছতলায় আশ্রয় লইত। সেই বাক্সের মধ্যে শ্লেট-পেন্সিল, লেড-পেন্সিল, লজেঞ্জেস প্রভৃতি নানা জিনিষ থাকিত। সেখানে বসিয়া সে তাহা বিক্রয় করিত; কোনও দিন ক্রেতার অভাব হইত না। প্রয়োজন না থাকিলেও অনেক ছেলে তাহা সখ করিয়াই কিনিত।

আষাঢ় হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত এই ভাবে কাটিয়া গেল। হরিজীবন প্রত্যহ কলের মত কাজ করিয়া যাইত। শুনিতে পাই, টানা-পাখার দড়ির কি একটা মাদকতা-শক্তি আছে, পাখা টানিতে আরম্ভ করিলেই ঘুম পায়! হরজীবন বেচারা এই নিদ্রালুতার জন্য কত দিন গালি খাইয়াছিল। কিন্তু হরিজীবনকে একটি দিনের জন্যও দুর্ব্বাক্য শুনিতে হয় নাই। বেলা দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত, এবং টিফিনের পর হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত সে অক্লান্তভাবে পাখা টানিত। তাহার পশ্চাতেই দেয়াল, কিন্তু কোন দিন তাহাকে দেয়ালে ঠেস-দিয়া বসিতে দেখা যায় নাই। পাঁচ ঘণ্টা সমানভাবে সোজা হইয়া বসিয়া প্রত্যহ সে তাহার বৈচিত্র্যহীন কর্ত্তব্য পালন করিত। আমরা কোনও দিন তাহাকে ঢুলিতে দেখি নাই। অদ্ভুত লোক!

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি এক দিন, আমরা ক্লাসে বসিয়া আছি, এমন সময় কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ মাউয়েট, হেড মাষ্টার মিঃ ক্যাটোফার, এবং দুই জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক হঠাৎ আমাদের ক্লাসে প্রবেশ করিলেন। আমরা আগন্তুকগণকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া-দাড়াইয়া যথারীতি অভিবাদন করিলাম; আমাদের 'স্যার'ও দাঁড়াইয়া উঠিয়ে প্রিন্সিপাল সাহেবকে অভিবাদন করিলে সাহেব প্রত্যভিবাদন করিয়া হরিজীবনকে কাছে ডাকিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, "শুনিলাম, তুমি গ্রাজুয়েট, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন, ধনবানের সন্তান। তুমি এই হীন চাকরী লইয়াছ, ইহার কারণ কি?" অতঃপর প্রিন্সিপাল তাহার সঙ্গী প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিকে দেখাইয়া হরিজীবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভদ্রলোককে তুমি চেন?"

হরিজীবন আমাদের সকলকে স্তম্ভিত করিয়া বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় বিনীতভাবে বলিল, "হাঁ মহাশয়, উনি আমার পূজনীয় পিতৃব্য।"

সাহেব বলিলেন, "তুমি উঁহার সঙ্গে যাও। ভবিষ্যতে তুমি উঁহার মনে কষ্ট না দিলে আমি আনন্দিত হইব।"

হরিজীবনকে সঙ্গে লইয়া প্রিন্সিপাল যখন আমাদের ক্লাস হইতে বাহির হইতেছিলেন, সেই সময় আমাদের স্যার হরিজীবনকে ইংরেজীতে বলিলেন, "তোমার বাক্স লইয়া যাও।"

হরিজীবন ইংরেজীতেই বলিল, "প্রয়োজন নাই। আমার পরবর্ত্তী পাঙ্খাওয়ালাকে উহা আমি উপহার দিলাম। আপনি আমার হইয়া তাহাকে দিবেন।"

হরিজীবন স্যারকে নমস্কার করিয়া আমাদের ক্লাস ত্যাগ করিল।

শুনিয়াছিলাম, আমাদের 'স্যার' বি-এ ফেল; আর এই পাঙ্খাওয়ালা গ্রাজুয়েট! বি-এ পাশ করিলে গ্রাজুয়েট হয়, ইহা আমরা জানিতাম। কেন বলিতে পারি না, আমরা কেহই সে-দিন পড়াশুনায় মন দিতে পারিলাম না।

২

ঐ ঘটনার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি যথাসময়ে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলীতে ওকালতি আরম্ভ করি, এবং সেখানে দশ বৎসর ওকালতি করিবার পর হাইকোর্টে যোগদান করি। হাইকোর্টেও পশার মন্দ হয় নাই। কলিকাতায় মৃজাপুর ষ্ট্রীটে বাড়ী করিয়াছি। আমার বড় ছেলেটিও উকীল হইয়াছে; তাহাকে আমার পশারে বসাইয়া আমি এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছি বলিলেই চলে। বহু দিনের অভ্যাস, তাই এখনও মধ্যে মধ্যে হাইকোর্টে যাই, এবং পুরাতন উকীল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি। ছোট ছেলেটিকে ডাক্তার করিবার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছি। কয়েক ঘর পুরাতন জমিদার আমার মক্কেল ছিলেন, তাঁহাদের কাজ-কর্ম্ম দেখিতে হয় বলিয়া ওকালতি একেবারে ছাড়ি নাই; সে জন্যও মধ্যে মধ্যে কোর্টে যাইতে হয়। অন্য সকল মোকদ্দমা আমার পুত্রই করে। কোন কোন জটিল ও জিদের মামলায় তাহাকে আমার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়।

এক দিন প্রভাতে বৈঠকখানায় বসিয়া সংবাদ-পত্র পড়িতেছি, এমন সময় আমার প্রাচীন মুহুরি লক্ষ্মীকান্ত আসিয়া বলিল, "বাবু, হুগলী কমলপুরের রায় বাহাদুর বসন্তকুমার রায় চৌধুরী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

কমলপুরের জমিদার রায় চৌধুরী বাবুরা আমার মক্কেল; হাইকোর্টে তাঁহাদের সকল মামলা আমিই করি। বসন্ত বাবুর সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আমার চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় হয় নাই। তিনি সংবৎসর দেশেই

থাকিতেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎ বাবুই মামলা-মোকর্দ্দমা উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে আমার বাড়ীতে আসিতেন। শরৎ বাবু আমার অপেক্ষা প্রায় কুড়ি বৎসরের ছোট। আমি শরৎ বাবুর আমন্ত্রণে দুইবার কমলপুরে গিয়াছিলাম; কিন্তু কোনবারই বসন্ত বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনিয়াছিলাম, তিনি তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। শরৎ বাবুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার পিতার বয়স সত্তর বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও দেশভ্রমণে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ। কাশ্মীরে অমরনাথ, তিব্বতে মানস-সরোবর, নেপালে পশুপতিনাথ প্রভৃতি সকল দুর্গম তীর্থ-ই তিনি দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিতে চাহিতেন না। বসন্ত বাবু আজ সহসা কলিকাতায় আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী! মুহুরির মুখে এই সংবাদ পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম, এবং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তৎক্ষণাৎ বাড়ীর সদর দরজায় উপস্থিত হইতেই দ্বারের সম্মুখে একখানি সুবৃহৎ সেলুন-কারে এক জন স্থূলকায় বৃদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিলাম। আমি গাড়ীর নিকট গিয়া বলিলাম, "আসুন, আসুন; আমার কি সৌভাগ্য, আপনি আমার গৃহে উপস্থিত!"

বৃদ্ধ গাড়ীতে বসিয়াই বলিলেন, "আপনিই রাধিকা বাবু? প্রণাম। আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলাম, দেখা হ'ল, এ আমারই সৌভাগ্য।"

তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে আমি তাঁহার হাত ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলাম; তাহা দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে হাত ধ'রে নিয়ে যেতে হবে না। বয়স পঁচাত্তর বৎসর হ'লেও এখন আট-দশ মাইল হাঁট্‌তেও বসন্ত রায়ের ভয় হয় না, কষ্টও তেমন হয় না। মোটা হ'য়ে প'ড়েছি কি না, তা না হ'লে এ বয়সেও 'ওয়াকিং-কম্‌পিটিশনে' নাম দিতে আপত্তি ছিল না।" বলিয়াই তিনি হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। কি সরল হাসি! তাঁহার হাসি শুনিয়া আমার মনে হইল, বাঙ্গালী এই প্রাণখোলা উচ্চহাস্যে এখন বঞ্চিত! সে-কালের সেই বৈঠকখানা-ফাটানো প্রাণখোলা সরল উচ্চহাসি একালে আর প্রায়ই শুনিতে পাই-না। আমি তাঁহাকে লইয়া দ্বিতলের হল-ঘরে চলিলাম। তাঁহাকে একখানা ইজি-চেয়ার দেখাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, "না না, ও চেয়ার নয়, ওগুলো ঘুম-পাড়ানো চেয়ার, বসলেই যেন ঘুম আসে। এই চেয়ারই ভাল।" আমাকে প্রতিবাদের অবসর না দিয়া তিনি একখানা সাধারণ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম, "শরৎ বাবুর মুখে শুনেছি, কলিকাতায় আসতে আপনি রাজী ন'ন; তবে আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, "আর বলেন কেন? কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হ'লেও কি নিশ্চিন্ত থাক্‌বার যো আছে? আবার নাত্‌নী-দায় উপস্থিত! শরতের মেয়ে গৌরীর জন্য একটি পাত্র দেখতে কাল কল্‌কাতায় আসতে হয়েছে; কালই দেখাশুনার পর কথাবার্ত্তাও এক রকম স্থির হ'য়ে গেছে। আজই কমলপুরে ফিরবো। আজ সকালে মনে হ'ল, আপনি দু'-দু'বার আমার ওখানে পায়ের ধূলো দিয়েছেন,—আমার দুর্ভাগ্য, তখন আমি প্রবাসে; তা কল্‌কাতায় যখন আস্‌তেই হোলো, তখন আর আপনার চরণ-দর্শনে বঞ্চিত থাকি কেন? একালের কোন ইয়ং-ম্যান হ'লে ব'লতো 'রিটার্ণ ভিজিট'। কিন্তু আপনি দয়া ক'রে যে চরণ-রেণু দান ক'রেছিলেন, তার ত 'রিটার্ণ' হ'তে পারে না, এই সাম্যবাদের যুগে ইংরেজী-নবিশ 'ইয়ং বেঙ্গল' তা কি ধারণা ক'রতে পারে? দাশু রায়ের সেই গানটা "সে রোগের ঔষধি শুধু—" বলিয়াই তিনি আবার এমন উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন যে, আমার ভয় হইল, সে হাসিতে হয় ত বৈঠকখানার ছাদ উড়িয়া যাইবে!

আমি ভৃত্যকে তামাক আনিতে বলিলে বসন্ত বাবু বলিলেন, "আমার জন্যে প্রয়োজন নেই। আমি কোন নেশা-টেশার ধার ধারিনে।"

বসন্ত বাবুকে দেখিয়া মনে হইল, এক সময় তিনি সুপুরুষ ছিলেন। এত যে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি যৌবনের দেহ-সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। মাথার কেশ ও স্থূল গুম্ফ রজত-শুভ্র। বিস্তৃত ললাট, খড়্গাবৎ নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু —দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গালীর মধ্যে এক জন মানুষ বটে! তাঁহার কপালের এক পার্শ্বে একটা লুপ্তপ্রায় ক্ষত-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম। ক্ষত-চিহ্নটা দেখিয়া আমার মনে হইল, ইঁহাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি, স্মরণ করিতে পারিলাম না। বার্দ্ধক্যে স্মরণশক্তি স্বভাবতঃই হ্রাস হইয়া থাকে।

বসন্ত বাবুর সঙ্গে তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তির, মামলা-মোকর্দ্দমার কথাও হইল। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বলিলাম, "হুগলিতে যখন কলেজিয়েট স্কুলে পড়তাম, তখন আমাদের ক্লাসের এক জন পাঙ্খাওয়ালার কপালে ঐ রকম একটা ক্ষত-চিহ্ন দেখেছিলাম। তাই আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিল, আপনাকে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখেছি। আপনার কপালে ওটা কিসের ক্ষতচিহ্ন?"

"আমি ছেলেবেলায় খুব ভালমানুষ ছিলাম কি না; বিধাতা আমার কপালে তারই সার্টিফিকেট কায়েমি ভাবে এঁটে দিয়েছিলেন! পেয়ারা গাছে উঠেছিলাম, তার ডাল ভেঙ্গে একেবারে 'পপাত ধরণীতলে'। একখান খোলায় কপাল কেটে গিয়েছিল। আপনি কি হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার মামার বাড়ী চুঁচ্ড়োয়, কলেজের কাছেই; বয়স যখন দশ বৎসর, সেই সময় হ'তেই আমি মাতুলালয়ে প্রতিপালিত। হুগলি কলেজেই শিক্ষা সমাপ্ত। হুগলি কলেজ থেকেই এম-এ ও ওকালতি পাশ করি।"

"আমার ধারণা ছিল, আপনি কল্‌কাতার লোক, কল্‌কাতার স্কুল-কলেজেই পড়া-শুনা ক'রেছিলেন।"

আমি বলিলাম, "আমি হুগলি জেলারই লোক, তারকেশ্বরের কাছে একটা নগণ্য পল্লীগ্রামে আমাদের বাস। গ্রামে স্কুল ছিল না, তাই মামার বাড়ী থেকে পড়াশুনা করি।"

বসন্ত বাবু ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কলেজিয়েট স্কুলে যে বেয়ারা আপনাদের পাখা টানত, তার নাম জান্‌তেন কি? তার নাম মনে আছে আপনার?"

"না, নাম মনে নেই, অনেক কালের কথা কি না? আর সে লোকটাও বেশী দিন ছিল না; বোধ হয় দুই-তিন মাস চাকরী ক'রেছিল। তার নাম জিজ্ঞাসা ক'রচেন কেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বসন্ত বাবু বলিলেন, "তার নাম আপনি ভুলে' গিয়েছেন বটে, কিন্তু সে নাম আমার মনে আছে। তার নাম ছিল হরিজীবন রায়।"

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ক্ষণকাল পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "আপনি তার নাম জান্‌লেন কি ক'রে?"

বসন্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমিই যে সেই পাঙ্খা-ওয়ালা কুলি হরিজীবন রায়!"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না! কমলপুরের স্বনামধন্য জমিদার,—যিনি দয়া-দাক্ষিণ্য, উদারতা, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পুরস্কার-স্বরূপ সরকার হইতে রায় বাহাদুর খেতাব পাইয়াছেন, সেই বসন্ত বাবু স্কুলে পাঙ্খাওয়ালা কুলির কাজ করিতেন? আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া বসন্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমার কথা অসম্ভব মনে হ'চ্ছে? ভগবানের রাজ্যে কি অসম্ভব কিছু আছে? কর্সিকা দ্বীপের দরিদ্র গৃহস্থের পুত্র যদি ফ্রান্সের সম্রাট্ হ'তে পারেন, পল্লীগ্রামবাসী দরিদ্র গৃহস্থের পুত্র যদি বরোদা রাজ্যের অধীশ্বর সয়াজী রাও গায়কবাড় হ'তে পারেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রজনাথ যদি নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ হ'তে পারেন, তা' হ'লে এক জন নগণ্য, ইতর পাঙ্খাওয়ালার পক্ষে রায় বাহাদুর হওয়াটা এমন কি অসম্ভব ব্যাপার?"

আমি বলিলাম, "নেপোলিয়ানের কথা ছেড়ে দিন; বরোদা রাজ্যের অধীশ্বরই বলুন, আর নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথই বলুন, তাঁরা দত্তকরূপে গৃহীত হ'য়েছিলেন, সুতরাং তাঁদের ভাগ্যপরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বালককেই দত্তক লওয়া হয়, যুবককে নহে। কিন্তু পাঙ্খা-ওয়ালা কুলি হরিজীবনকে যখন দেখেছি, তখন সে যুবক। আর আপনিও যে আপনার পিতার দত্তক পুত্র ন'ন, আপনার ঘরের উকিলের এ সংবাদ অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়।"

"না, আমি দত্তক পুত্র নই। তবে কমলপুরের বসন্ত-কুমার রায় চৌধুরী কেন হুগলি-কলেজিয়েট স্কুলে পাখা টানতে গিয়েছিল, সে-সব কথা বিস্তারিত ভাবে বলতে হ'লে আজ আমাকে এখানে প্রসাদ পেতে হয়!"

তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আনন্দাপ্লুত হইয়া বলিলাম, "আপনি এখানে আহার করবেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য! হাঁ, আমার আশাতীত সৌভাগ্য!"

আমার কথায় বাধা দিয়া বসন্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন,

"আমি স্বজাতির বাড়ীতে ছাড়া অন্য কোন লোকের বাড়ীতে আহার না ক'রলেও ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে আজ প্রসাদ গ্রহণ করবো—এ আমার সৌভাগ্য বটে।"

৩

আহারের পর বসন্ত বাবুকে সঙ্গে লইয়া হল-ঘরে বসিলাম।

বসন্ত বাবু বলিলেন, "তবে আমার ইতিহাসটা সংক্ষেপে আপনাকে শুনিয়ে দিই। আপনি আমার ঘরের উকিল, আমার বৈষয়িক ব্যাপার সবই জানেন। সাবেক দলিল-পত্রে আমাদের পারিবারিক ব্যাপারেরও কিছু কিছু হয়ত জান্তে পেরেছেন। আমার বাবা আর জ্যেঠা—এই দুই ভাইয়ের সংসারে বাবাই ছিলেন ছোট। জ্যেঠা মশায় নিঃসন্তান ছিলেন। আমার বয়স যখন চার বৎসর, তখন ছ'মাসের মধ্যেই আমার বাপ-মা দু'জনকেই হারা'লাম। জ্যেঠা মশায় ও জ্যেঠাইমার স্নেহে ও যত্নে আমি একদিনও জানতে পারিনি—আমি পিতৃমাতৃহীন অনাথ। আমাদের তিলি সমাজে উচ্চশিক্ষিত, বিশেষতঃ, ইংরেজীতে সুশিক্ষিত লোকের বড়ই অভাব। কৃষ্ণ পান্তী, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র, বা রাজা প্রমথনাথের ন্যায় পরদুঃখকাতর, উদারচেতা, জনহিতৈষীর অভাব না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সমাজে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণদাস পাল এক শতাব্দীতে এই দুই জনের বেশী দেখা যায় নাই। সুতরাং আমার জ্যেঠা ম'শায় আমাকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছিলেন। আমার লেখাপড়ার জন্য তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় ক'রেছিলেন। আমি পনর বৎসর বয়সে কমল-পুর স্কুল হতে এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে দশ টাকা বৃত্তি পাই, ও ক'ল্‌কাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হই। যথা-সময়ে এল-এ পাশ ক'রে বি-এ পড়তে লাগ্‌লাম। আপনি জানেন, আমাদের সময়ে বি-এ ক্লাসের ছেলেরা একাধিক বিষয়ে 'অনার' নিতে পারত। এখন কোন ছাত্রই একটার বেশী বিষয়ে 'অনার' নিতে পারে না। আমি বি-এ ক্লাসে ইংরেজী সাহিত্য, ফিলজফি, এবং সংস্কৃত তিন বিষয়েই অনার নিয়েছিলাম; কিন্তু সংস্কৃতে অনার পাইনি, ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর, ও ফিলজফিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার নিয়ে বি-এ পাশ করি।

"এল-এ পাশ করবার পরেই আমার বিলেত যাবার ঝোঁক হয়। বিলেতে সিভিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হ'য়ে দেশে এসে একটা জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়াই ছিল আমার জীবনের চরম লক্ষ্য। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী গিয়ে জ্যেঠা ম'শায়ের কাছে আমার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রলাম; কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাব কাণেই তুল্‌লেন না। তিনি ব'ললেন, আমাদের তিলি-সমাজে আজ-পর্য্যন্ত কেউ বিলেতে যায়নি। আমি দেশে ফিরে এসে বাড়ী ঢুকলেই আমরা সমাজচ্যুত হব; অথচ একঘরে হওয়ার ভয়ে তিনি আমাকে ত্যাগ ক'রবেন—সে শক্তি তাঁর নেই। তিনি অন্য যুক্তিও দিলেন, ব'ললেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যই তিলির জাতীয় পেশা; ব্যবসায়েই তিলি ধনবান। দাসত্ব তিলি জাতির পেশা নয়। ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ছেলেরা চাকরি করে করুক, তিলির ছেলে চাকরিতে প্রবেশ ক'রলে বাণিজ্য লক্ষ্মী আমাদের প্রতি বিমুখ হবেন। আমাদের জমিদারীর বার্ষিক আয় প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা; তা'ছাড়াও পাটনা, মুঙ্গের, ভদ্রেশ্বর ও কল্‌কাতায় আমাদের আড়ত আছে। তার আয় জমিদারীর আয়ের চেয়ে অনেক বেশী। জমিদারী ও ব্যবসায় হ'তে বার্ষিক আয় যার ষাট-সত্তর হাজার টাকা, সে কোন্ দুঃখে পরের গোলামী ক'রতে যাবে? আর এই গোলামীর লোভে বিলেতে গিয়ে জাত-খোয়ানোর চেয়ে বেশী বোকামী আর কি হ'তে পারে?

"জ্যেঠা ম'শায়ের কাছে ডাল-গ'লাতে না পেরে শেষে বড়মার—(আমি আমার জ্যেঠাই-মাকে 'বড়মা' ব'লে ডাকতাম, তাঁকেই আশৈশব নিজের মা ব'লে জানতাম) শরণ নিলাম; কিন্তু সেখানেও কিছু সুবিধা হ'ল না। তিনি আমার সঙ্কল্পে বাধা দিবার জন্যে যুক্তি-তর্কের দিক দিয়েও গেলেন না, স্ত্রীলোকের অমোঘ অস্ত্র অশ্রু—তাই অজস্র ধারায় বর্ষণ করতে লাগলেন। জ্যেঠা ম'শায় ব'ললেন, আমি বিলেতে গেলে তিনি সংসার ত্যাগ ক'রে কাশীবাসী হবেন; বড়মা ব'ললেন, তিনি আফিং খেয়ে 'আত্মহত্যে হ'বেন'। জ্যেঠা ম'শায় কাশীবাসী হ'লে, পরে কখনও তাঁর হাতে-পায়ে ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে ফিরিয়ে আন্‌বার আশা ছিল; কিন্তু বড়মা যেখানে যাবার ভয় দেখালেন, সেখান থেকে তাঁকে স্বয়ং বিধাতা-পুরুষও ফিরিয়ে আন্‌তে পারেন না। কাজেই আমাকে বিলেত যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রতে হ'ল। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট আর হওয়া হ'ল না।

"বিলেতে যেতে না পেয়ে জ্যেঠা ম'শায় ও বড়মার ওপর ভয়ঙ্কর রাগ হ'ল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রলাম, যেমন ক'রে পারি ওঁদের জব্দ ক'রবো। একটা কথা বলতে ভুলেছি। আমার বয়স যখন সতের বৎসর, তখন আমার বিবাহ হয়; বিবাহের সময় আমার স্ত্রীর বয়স আট বৎসর। বিবাহের তিন বৎসর পরে আমি বি-এ পাশ করি; সুতরাং যখন আমি বিলেত যাবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলাম, তখন আমার স্ত্রীর বয়স বার বৎসরও পূর্ণ হয়নি। বিবাহের পর আমার উত্তমার্দ্ধ তার বাপের বাড়ীতেই পুতুল খেলা ক'রতো। আমার শ্বশুরবাড়ী বৈষ্ণবাটীতে; বৈষয়িক অবস্থা তাদের ভালই ছিল; কিন্তু বিয়ের পরে আমি কোন দিনও মথুরাপুরী পদার্পণ করিনি।

"জ্যেঠা ম'শায় ও বড়মাকে জব্দ ক'রবার জন্যে আমি নানা রকম মতলব আঁজতে লাগ্‌লাম। অবশেষে তাঁদের অজ্ঞাতসারে পলায়ন করাই শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে মনে হ'ল। আবার ভাবলাম, না জানিয়ে ফেরার হ'লে তাঁরা ভাববেন হয়ত আমি বিলেতে পালিয়েছি। অভিমানে জ্যেঠাইমা সত্যই যদি আত্মহত্যা করেন! মনে মনে অনেক গবেষণার পর স্থির ক'রলাম, আমি যে বিলেতে যাচ্ছিনে, এ কথা জানিয়ে স'রে-পড়াই ভাল। অবশেষে এক দিন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় একবস্ত্রেই গৃহত্যাগ ক'রলাম। যাবার সময় জ্যেঠাইমার নামে একখানা পত্র লিখে আমার টেবলের উপর রেখে দিলাম। লিখলাম, আমি গৃহত্যাগ ক'রলাম বটে, কিন্তু দেশত্যাগ ক'রব না,—বিলেতে যাব-না।

"গৃহত্যাগের তিন বৎসর পরে, ধরা প'ড়লাম হুগলিতে; এই তিন বৎসরে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সকল প্রদেশেই ঘুরে বেড়িয়েছি। ব্রহ্মদেশ তখন স্বাধীন ছিল। আমি ষ্টীমারে চ'ড়ে ব্রহ্মদেশে যাইনি, গিয়েছিলাম চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের ভেতর দিয়ে। এই দু'খানি শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এই তিনটি বৎসরে রেল কোম্পানী বা ষ্টীমার কোম্পানীকে একটি পয়সাও ভাড়া দিইনি; কাশ্মীর হ'তে দ্বারিকা, বেলুচিস্থান হ'তে ব্রহ্মদেশ সর্ব্বস্থান পদব্রজেই ঘুরেছি। এই দেশভ্রমণে আমার যে অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছে, তিন বৎসর বিলেতে থাকলে তা হ'ত কি? আমার ধারণা হ'য়েছে, দেশভ্রমণে অর্থের প্রয়োজন নেই; চাই শারীরিক ও মানসিক বল, চাই কষ্টসহিষ্ণুতা। এই তিন বৎসরের মধ্যে এক দিনও আমাকে উপবাসী থাকতে হয়নি; এক দিনের জন্যও পীড়িত হ'য়ে পড়ি-নি। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও দরিদ্র কৃষকরা আমায় খেতে দিয়েছে, পরণের কাপড়ও তারাই জুগিয়েছে। দেখেছি, ভারতের অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র হিন্দু স্বয়ং উপবাসী থেকেও প্রসন্ন মনে মুখের অন্ন দিয়ে অতিথির সেবা করে; অথচ আমি গেরুয়া পরে' সন্ন্যাসী সাজিনি। ধর্ম্মের জন্যও সংসার ত্যাগ করিনি।

"আপনি হয়ত মনে ক'রচেন, আমি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ঘুরতাম, অথচ স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তায় কোন অসুবিধা হো'ত না? অসুবিধা যে হো'ত না, তা নয়; তবে রেলপথে ভ্রমণে যত অসুবিধা, তত অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। পদব্রজে ভ্রমণে বেশ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়, কেমন ধীরে ধীরে ভাষার পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। সন্ধ্যার সময় হাওড়ায় ট্রেণে চেপে পরদিন পুরুষোত্তমে বা কাশীধামে উপস্থিত হ'লে মনে হয়—এক ভিন্ন ভাষা-ভাষীর দেশে উপস্থিত হ'য়েছি; কিন্তু মেদিনীপুর, বালেশ্বর, ও কটকের ভেতর দিয়ে পদব্রজে, যদি দু' মাসে পুরীতে যান, তাহ'লে দেখবেন, এই অল্প সময়ের মধ্যেই উড়িয়া ভাষাটা আপনার চলনসই গোছের শেখা হ'য়ে গেছে। আবার পুরী হ'তে পদব্রজে গঞ্জামের ভেতর দিয়ে মান্দ্রাজে যান, দেখবেন, সঙ্গে সঙ্গে মান্দ্রাজের ভাষাও আর আপনার কাছে দুর্ব্বোধ্য নয়।

"যা হো'ক, প্রথম যৌবনে জ্যেঠা ম'শায় ও বড়মার উপর অভিমান ক'রে সেই যে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরেছি, তার প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হ'তে পারিনি। এখনও দেশ-ভ্রমণের সে নেশা ছাড়েনি। পুরো দু'টি মাস কমলপুরে বাস ক'রলেই প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে, দেশ-বিদেশে ছুটোছুটি ক'রতে ইচ্ছা হয়। শরৎ বলে, পল্লীগ্রাম ভাল না লাগে; কল্‌কাতার বাড়ীতে গিয়ে বাস করুন। কিন্তু কল্‌কাতার চেয়ে পল্লীগ্রাম আমার খুব বেশী ভাল লাগে; তবে দীর্ঘকাল কোথাও আবদ্ধ হ'য়ে থাকা আমার ধাতে সহ্য হয় না। তাই বিদেশেই ঘুরে বেড়াই। বিদেশেও আমি সহরে বড় বেশী দিন থাকি-নে, একটা সহরে আড্ডা ক'রে, গ্রামে গ্রামে ঘু'রে বেড়াই। আপনি যে দু'বার আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, সে সময় আমি বোম্বাই অঞ্চলে ঘুরে' বেড়াচ্ছিলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বসন্ত বাবু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি কখনও বিদেশে—বাঙ্গালার বাইরে গিয়েছিলেন ?"

আমি বলিলাম—"মধুপুরে একখানা বাড়ী ক'রেছি, মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে দু'-এক মাস কাটিয়ে আসি। আর বিদেশের মধ্যে দক্ষিণে একবার পুরীতে গিয়ে মাসখানেক ছিলাম। পশ্চিমে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার ও আগ্রা পর্য্যন্তই আমার দৌড়।"

বসন্ত বাবু বলিলেন, "এ ত দেশভ্রমণ নয়, তীর্থ ভ্রমণ; এ সকল তীর্থ ত আমাদের দেশের মেয়েছেলেরাও আখছার দেখে আসে। চলুন না, গৌরীর বিবাহের পর একবার দু'জনে একটু ঘুরে আসি। বেশী দিনের জন্য নয়, তিন-চার মাসের জন্য।"

আমি বলিলাম, "গৌরীর বিবাহের পর আপনার কোন্ দিকে যাবার ইচ্ছা আছে ?"

"ইচ্ছা আছে, আসামের পূর্ব্বসীমা পার হ'য়ে ব্রহ্ম-দেশের ভেতর দিয়ে শ্যাম, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি ঘুরে আসব। ঐ সব দেশে এখনও না কি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনেক নিদর্শন আছে।"

আমি বলিলাম, "কি সর্ব্বনাশ! এই বৃদ্ধ বয়সে আসাম বর্ম্মার ভিতর দিয়ে শ্যাম যবদ্বীপে যাব আমি ? এখনও আমি ততখানি ক্ষেপিনি !"

বসন্ত বাবু বলিলেন, "এ কি ক্ষ্যাপার কাজ ? বছর-তিনেক আগে যে আমি কাশ্মীর থেকে তিব্বত ঘুরে দার্জ্জিলিং এসেছিলাম। আমি সঙ্গে থাকব, আপনার কোন অসুবিধা হবে না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনার নেশা আপনাতেই থাকুক, এই বয়সে আমাকে আর নূতন মৌতাতে মাতিয়ে তুলবেন না। তবে আপনার পৌত্রীর বিবাহে যে কমলপুরে যাব, এ প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে পারি।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখবেন, তখন যেন বয়সের দোহাই দিয়ে পায়ের ধুলোয় বঞ্চিত ক'রবেন না।"

রায়-বাহাদুর প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলে আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "ইনিই সেই পাঞ্জাওয়ালা! কি অদ্ভুত মানুষ! এ রীতিমত এড্ভেঞ্চার!"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিরঞ্জীব

ধরার মন্দির মাঝে অশ্রুধৌত পাদপীঠে রাখিয়া প্রণাম,
বিদায়-গুণ্ঠন পথে শত শত বরষের জাগে দৃষ্টি-দীপ।
সময়ের মহাস্রোতে কত যুগ ভেসে যায়,—ডুবে যায় নাম,
প্রাণের অক্ষরে যারা বিশ্বের বেদনা লিখে, তারা চিরঞ্জীব।

বিষ-দিগ্ধ নিঃস্বজনে বিতরিয়া অমৃতের স্নিগ্ধ শান্তি ধারা,
অসীমের অভিমুখে মৃত্যুরে মথন করি' চলে যায় তারা।
তাহাদের নামাবলী কালের কণ্ঠেতে শোভে মুক্তা-মাল্যরূপে,
তাহাদের স্মৃতি পুষ্প বিশ্বদেব-আয়তনে বিকশিত রহে।

প্রাণহীন কঙ্কালের নগ্নজীর্ণ রিক্ততায় চিতাবহ্নি স্তূপে,
দিনে-দিনে জাগিতেছে তাদের বিজয়কাব্য,—ভস্মমাখা দেহে।
যাহারা ধ্যানের জ্যোতি ছড়ালো ভুবনমাঝে জ্ঞান-নেত্র হ'তে
তাদের কীর্ত্তনধ্বনি শোনা যায় যুগে যুগে সংসারের পথে।

হৃদয়-মাধুর্য্য দিয়া বিদূরিল অবরুদ্ধ বেদনা বন্দীর,
তবু আজো সে বেদনা আত্মঘাতী মানবেরা করে আবাহন।
যে আলোকে ক'রে যায় প্রতিদিন আলোকিত ধরার মন্দির,
সে-আলোকে স্বার্থযাজী সাজায়ে তুলিছে আত্ম-প্রমোদ ভবন।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

গালার কাজ

গালা দিয়ে রঙ বেরঙের চিত্রাঙ্কন—যারা একটু-আধটু ছবি আঁকতে জানেন, কিম্বা আল্পনার কাজে পটু—সহজেই করতে পারেন। গালার নক্সাদার কাজে ঘরের সাজসজ্জায় চমৎকার বাহার খোলে। এ কাজও শক্ত নয়। এ কাজের জন্য সরঞ্জাম চাই,—

একখানি পাৎলা কাচ। বারো ইঞ্চি চওড়া, পনেরো ইঞ্চি লম্বা হ'লেই কাজ চলবে;

ঠাণ্ডা জল রাখবার জন্য একখানি এনামেলের পাত্র;

খানিকটা নরম ন্যাকড়া;

নানা রঙের কয়েকটি গালার ছড়ি;

স্পিরিট-ল্যাম্প;

শক্ত ছুঁচ দু'তিনটি। ছুঁচগুলি হবে দু'তিন রকমের অর্থাৎ কোনোটি সরু, কোনোটি বা একটু মোটা;

গালা রাখবার জন্য পাত্র;

পেষ্টবোর্ড;

স্পাচুলা বা চওড়া বে-ধার ছুরি। এ ছুরি বুলিয়ে মাখন বা মাখনের মতো নরম 'পেষ্ট' চালাচালি করা চলে।

২নং ছবি দেখলে এ সব সরঞ্জামের স্বরূপ বুঝতে পারবেন।

গালার কাজের নমুনা

কাচখানি কেন দরকার,—জানেন? গালা নিয়ে কাজ—গলা গালা টেবিলে বা মেঝেয় পড়লে টেবিলে দাগ ধরবে, তাছাড়া সে গালাটুকু নষ্ট হবে। তাতে কাজ চলবে না। কাচের গায়ে গালা পড়লে সেটুকু চেঁচে তাতিয়ে গালিয়ে নিলেই কাজে লাগবে। এই কারণেই কাচ-খণ্ডের প্রয়োজন।

স্পিরিট-ল্যাম্পের পল্‌তেয় যদি গালা বা ধূলা লাগে, তাহ'লে পল্‌তের ডগাটুকু কেটে নেবেন; কেটে নিলেই আর

কোনো গোলযোগ ঘটবে না। গালা গলাবার সময় ল্যাম্পের শিখাটুকু যেন বেশ পরিষ্কার সরল আর প্রদীপ্ত থাকে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। নাহ'লে গালা গলানোয় খুঁৎ থাকবে।
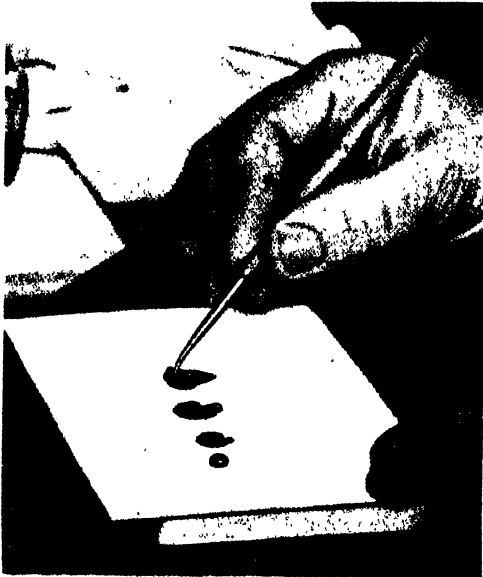
সরঞ্জাম

গালা নরম থাকতে-থাকতে

বাজারে নানা রঙের গালার ছড়ি কিনতে পাওয়া যায় —স্বচ্ছ (transparent) গালাও পাওয়া যায়। চিত্রকলার জন্য আলাদা গড়নের যে-গালা পাওয়া যায়, সেই গালা কিন্‌বেন। এক-একটি ছড়ির দাম লাগবে পাঁচ আনা কিম্বা ছ'আনা।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় করে' নিয়ে এবার কাজে বসুন। প্রথমেই যে-সব মূর্তি গড়বেন—ফুল, ফল, পাখী, বন, আকাশ, পাহাড়, নদী বা মানুষ —সেগুলো হয় তো তেমন সমঞ্জস হবে না—সেজন্য হতাশ হ'বার কারণ নেই। গড়তে গড়তে হাত খুলবে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হ'লে ছবির মূর্তি সমঞ্জস হ'য়ে আসবে। গালা গলাবার সময় দেখবেন, ল্যাম্পের শিখা যেন খুব দীর্ঘ না হয়; দীর্ঘ শিখায় গালা গলাতে সময় লাগবে বেশী। তাছাড়া তাতে সমানভাবে গালা গলানো যাবে না। শিখা দীর্ঘ না হ'লে গালা চটপট গলে' যাবে।

কাচখানি রাখবেন ল্যাম্পের পাশে একেবারে হাতের কাছে। গালা গল্‌বামাত্র সেই গলিত-গালা কাচের উপর বিন্দু বিন্দু অথবা লম্বালম্বি ভাবে ফেল্‌তে হবে। আগুনে বেশীক্ষণ গালা ধরবেন না, তাতে অপচয়ের মাত্রা বাড়বে।

গল্‌বামাত্র গালার সেই গলিত বিন্দু ফেলা চাই কাচের উপর, ৩ নং ছবি দেখুন। এইভাবে বিন্দু বিন্দু ধারায় গালা ফেল্‌তে হবে। অভ্যাসে এ-বিন্দু প্রয়োজনানুযায়ী ছোট-বড় করতে পারবেন। গালার যেদিকটা আগুনে ধরবেন, সে প্রান্তটুকু পেন্সিলের মতো যেন ছুঁচলো হয়, তাহ'লে সব-দিকে সুবিধা হবে। ডগাকে ছুঁচলো করা খুব সহজ। তাতিয়ে নরম থাক্‌তে-থাক্‌তে ডগাটুকু আঙুল দিয়ে টিপে নিলেই পেন্সিলের ডগার মতো ছুঁচলো করা চ'ল্‌বে। ছুঁচোলো-ডগা হ'লে গালার অপচয় হবে না।

কাচের বা পেষ্ট-বোর্ডের উপর গলা গালার বিন্দু

পাশাপাশি ফেলুন এবং নরম থাক্‌তে থাক্‌তে পাতার আকারে, পাপড়ির আকারে, গাছের ডালপালার আকারে অর্থাৎ গালার যে-ছবি আঁকতে চান, সেই ছাঁচে নরম গালা ঢেলে তাতে রূপ দিতে পারবেন।

৩ নং ছবি দেখলে বুঝতে পারবেন নরম থাক্‌তে থাক্‌তে গলা গালার উপর গালার ছড়ি বুলিয়ে পাতা, ফুলের পাপড়ি প্রভৃতির রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।
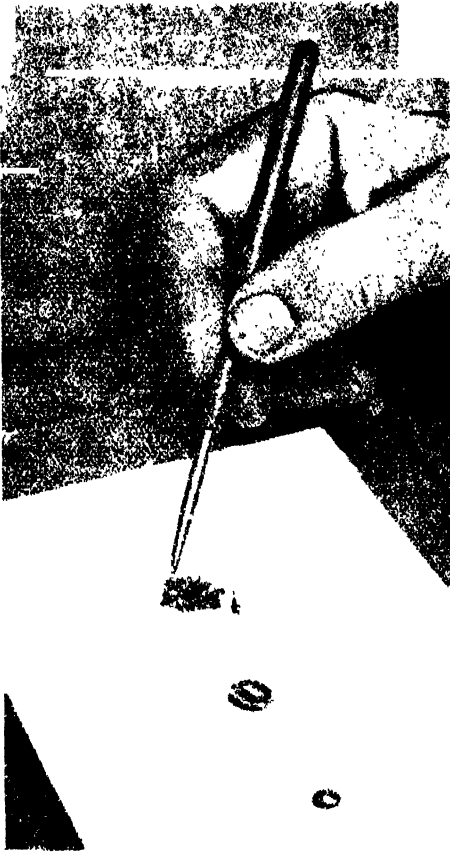
ফুলের গড়ন
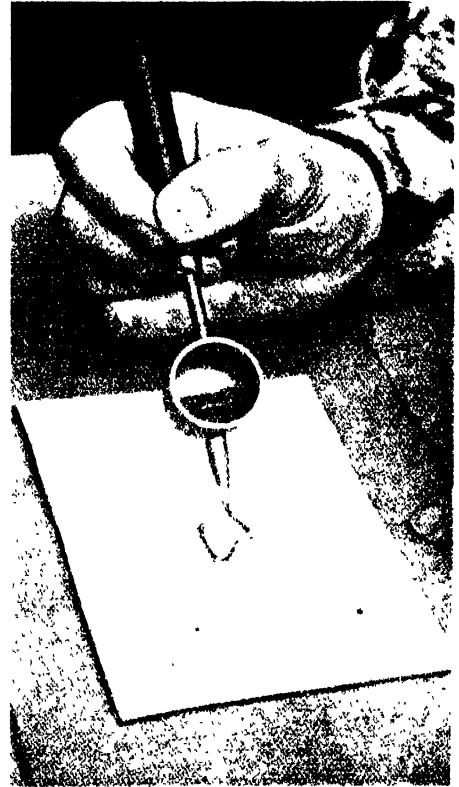
একটা পাতা, একটা ফুল আঁক্‌তে আঁক্‌তে হাত একটু পাক্‌লে বাগান, বাড়ী-ঘর, পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতি আঁক্‌বার চেষ্টা করবেন। পাতা ফুল ফল—যে প্রণালীর কথা বললুম,—ঐ প্রণালীতে গড়তে পার্‌বেন। তার পর তালপাতা, খেজুরপাতা, বা লিলির পাতা হয় দীর্ঘ; এই দীর্ঘ পাতা আঁক্‌বার সময় স্পাচুলার প্রয়োজন। গলা গালার উপর স্পাচুলা বুলিয়ে সন্তর্পণে তালপাতা, খেজুর-পাতা, লিলির পাতা গড়বেন। পেইণ্ট-ব্রাশ-তুলি নিয়ে যেভাবে আঁকা হয়, সেই ভাবে স্পাচুলা চালাতে হবে। স্পাচুলা-চালনার পটুতা নির্ভর করছে অভ্যাস আর অভিজ্ঞতার উপর।

গালার যে পাত্রের কথা সরঞ্জামের তালিকায় উল্লিখিত হয়েছে, এ পাত্র দেখতে ছোট সশ্‌-প্যানের মতো। এ পাত্রের হ্যাণ্ডেল আছে এবং একদিকে ছোট একটি ছিদ্র আছে। গালা চূর্ণ ক'রে প্যানে সেই চূর্ণ রেখে ল্যাম্পের শিখায় ধরে'

প্যান্ থেকে গালা ঢালা

তাতিয়ে নিলে পাত্রের চূর্ণ-গালা গলে যাবে। গলা-গালা কাং ক'রে এই প্যান ধরে' কাচের উপর প্যানের ছিদ্র-পথ দিয়ে ঐ গলা-গালার ধারা সন্তর্পণে রেখায়-রেখায় ঢাল্‌তে হবে (৫নং ছবিতে দেখুন)। এবং গালায় যে ছবি আঁক্‌তে চান, সে ছবির মূর্ত্তি-অনুযায়ী গলা-গালার রেখা ঢেলে নিতে হবে। গলাবার জন্ত এ গালা যখন শিখায় ধর্‌বেন, তখন হুঁশিয়ার থাক্‌বেন। গালা যেন না সিদ্ধ হয়ে যায় বা তাতে বুদ্‌বুদ না ফোটে। তাহ'লে

এ-গালা তরল ধারায় প্যানের ছিদ্রপথে নিঃসারিত করা যাবে না।

এ বিদ্যাটুকু আয়ত্ত ক'রে হাত পাক্‌লে নানা ছাঁচে গালা দিয়ে ইচ্ছামত নানা ছবি গড়ে তোলা মোটেই শক্ত হবে না। প্লেটে ডিশে বা গ্লাসে গালা দিয়ে নক্সাদার নানা

স্প্যাচুলা-চালনা

ছবি রচনা ক'রে শুধু যে গৃহসজ্জা বর্দ্ধন কর্‌বেন, তা নয়, এ কাজে পটুতা জন্মালে মনে তৃপ্তির সীমা থাকবে না।

গালার এ ছবি আঁকবার জন্য টিন, কাঠ, পেপিয়া-মেশ, কাচ, আয়না, ফটো-ফ্রেম, চিরুণী, ব্রাশ, পোষ্টকার্ড খুব যোগ্য পট-ভূমি হবে।

গালার যে-ছবি আঁকবেন, আগে যদি তার নক্সা এঁকে নেন, তাহ'লে সেই নক্সার লাইনে-লাইনে তরল গলিত গালা ধারায়-ধারায় ঢেলে ছবিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসমঞ্জস ক'রে তোলা খুবই সহজ হবে।

ঘুম-পাড়ানিয়া

দেহখানিকে সুঠামে সুছাঁদে গড়িয়া তুলিবার যোগ্য বিবিধ ব্যায়াম-লীলার কথা আমরা বার-বার আলোচনা করিয়াছি। এই ব্যায়ামের সঙ্গে আহার ও নিদ্রার সুব্যবস্থা করা চাই; নচেৎ শুধু ব্যায়াম-ছন্দে দেহকে সুঠাম ও তরুণ রাখা সম্ভব হইবে না। এবার তাই নিদ্রা-সাধনার কথা বলিতেছি।

নিদ্রার অর্থ, চেতনা লোপ করিয়া বিরাম-উপভোগ। নিদ্রা ভিন্ন খাদ্য পরিপাক হয় না। সারাদিন নানা কাজে আমাদের দেহ সক্রিয় থাকে; সেজন্য খাদ্য-পরিপাকে অসুবিধা ঘটে না। কিন্তু নিদ্রাকালে শরীর থাকে প্রায় নিশ্চল, নিষ্ক্রিয়; এজন্য রাত্রে গুরুভোজন করিলে খাদ্য-পরিপাকে অসুবিধা ঘটে। সুতরাং রাত্রে লঘু-আহার কর্ত্তব্য।

নিদ্রা-কালে আমরা নড়া-চড়া করি। দেহ সে-সময় নিথর থাকে না। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, নিদ্রাকালে আমরা পাশ ফিরি অন্ততঃ বিশ হইতে ষাট বার। দিনের তুলনায় এ নড়াচড়ার পরিমাণ খুবই সামান্য—তবু এ নড়াচড়া পরিপাকের সহায়ক।

ব্যায়াম-সম্বন্ধে যেমন বাঁধা-ধরা নিয়ম পালন করিতে হয়, নিদ্রারও তেমনি কয়েকটি বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে। সেগুলিকে তুচ্ছ করিলে নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে।

সেই বিধি-নিয়মের কথা বলি।

উত্তেজিত বা উদ্বিগ্ন মন লইয়া নিদ্রার প্রয়াস করিলে সে প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। নিদ্রার জন্য শয্যাসীন হইয়া মনে কদাচ চিন্তা রাখিবেন না। দিনে যদি সমস্যার উদয় হইয়া থাকে, শয্যাগ্রহণ করিয়া সে-সমস্যা মাথায় বা মনে ঘেঁষিতে দিবেন না। কোষ্ঠবদ্ধতা, আলস্য, পরিশ্রমের অভাব, অতিভোজন, উগ্র ঔষধাদি-সেবন এবং দুশ্চিন্তা নিদ্রার পক্ষে মহা বিঘ্ন!

তাছাড়া নিত্য যথাসময়ে শয্যাগ্রহণ করিতে হইবে। আজ রাত্রি ন'টায় শয়ন করিলাম, কাল শয়ন করিলাম রাত্রি বারোটায়—এ কদভ্যাসে নিদ্রা-সুখ মিলিতে পারে না।

নিদ্রার পরিমাণ সকলের পক্ষে সমান নয়। কাহারো সাত-আট ঘণ্টা নিদ্রা প্রয়োজন; কাহারো দশ ঘণ্টা; আবার কাহারো বা ছ'ঘণ্টা মাত্র! অল্প-নিদ্রায় স্বাস্থ্যহানি হইবে, এমন মনে করিবেন না। অল্প-নিদ্রায় শরীরে যদি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন, তাহা হইলে চিন্তার কারণ নাই। কাহার পক্ষে কতখানি নিদ্রা প্রয়োজন—সেটুকু নিজেরাই বুঝিতে পারিবেন।

অনেকে বলেন, ৩৫ বৎসর বয়স পার হইলে নিদ্রার মাত্রা কমিয়া আসে। এ-কথা অমূলক। স্বাস্থ্য ভালো

থাকিলে কোন বয়সেই চিরাভ্যস্ত নিদ্রাকালের ব্যতিক্রম ঘটে না। ঘটিতে পারে না।

আমাদের দেহ-মনের স্বাস্থ্যের জন্য নিদ্রা একান্ত প্রয়োজনীয়। মহাকবি সেক্সপীয়র নিদ্রার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, chief nourisher in life's feast অর্থাৎ খাদ্যের মতো নিদ্রাও আমাদের পুষ্টির পক্ষে মস্ত সহায়। নিদ্রা আমাদের ক্লান্ত দেহকে খোরাক জোগাইয়া তাহার পুষ্টিসাধন করে তা নয়, শ্রান্ত মস্তিষ্ক বা চিন্তাবেগকে গড়িয়া তোলে। শয্যায় শয়ন করিয়া আছি—চোখে ঘুম নাই, বিনিদ্র ভাবে রজনী যাপিত হইল—এমন দুর্ভাগ্য যিনি ভোগ করিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন, নিদ্রা আমাদের কতখানি সাধনার ধন!

১। বাঁ নাক টিপিয়া

২। মৃদু ফুৎকার

অনিদ্রায় দেহ-মন শুধু অস্বাচ্ছন্দ্য হয় না; অনিদ্রায় মানুষ উন্মাদ-রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এজন্য নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবামাত্র প্রতিকারে উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে কয়েকটি বিধি-পালনে সে ব্যাঘাতের অবসান ঘটে।

এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা ছয়টি বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

১। বিছানায় বসিয়া তর্জ্জনী-অঙ্গুলি দিয়া বাঁ নাসা টিপিয়া ধরুন। বাঁ নাসা দিয়া সুদীর্ঘ ও গভীর ভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করুন। ডান নাসা দিয়াই প্রশ্বাস ত্যাগ করুন। তার পর ডান নাসা টিপিয়া বাঁ নাসা দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া প্রশ্বাস ত্যাগ করুন। এমনি ভাবে একবার ডান নাসা ও পরের বার বাঁ নাসা দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে হবে। দশ বার এ ব্যায়াম করুন।

২। এবার দুই নাসা দিয়া সুদীর্ঘটানে গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করুন। শ্বাস গ্রহণের পর দুই ঠোঁট সঙ্কুচিত করিয়া (২ নং ছবির ভঙ্গীতে) মুখ দিয়া শ্বাস-বায়ু ত্যাগ করুন। দশটি ক্ষুদ্র ফুৎকারে এ শ্বাস-বায়ু ত্যাগ করিতে হইবে। এ ব্যায়ামও দশ বার করিবেন।

৩। শয্যায় বসিয়া দুই নাসা দিয়া নিশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করুন। শ্বাসবায়ু গ্রহণ করিয়া (৩নং ছবির ভঙ্গিতে) পিঠ ঝুঁকিয়া শ্বাস-বায়ু ত্যাগ করিতে করিতে চিবুক নামাইয়া দুই হাঁটু স্পর্শ করুন। শ্বাস-বায়ু ত্যাগ করিয়া আবার খাড়াভাবে বসুন। বসিয়া আবার এমনিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে হইবে। এ ব্যায়াম করুন দশ বার।

৩। হাঁটুতে চিবুক

৪। এবার বিছানার পাশে উঠিয়া দাঁড়ান। দুই হাত দু'পাশে শিথিলভাবে ঝুলাইয়া দিন। এবার মাথা ডাহিনে-বাঁয়ে হেলাইয়া নাড়িতে থাকুন। প্রায় একশোবার এই ভাবে মাথা নাড়িতে হইবে।

৫। মাথা পিছন দিকে হেলাইয়া উর্দ্ধমুখী থাকিবেন। সঙ্গে সঙ্গে বুক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত হেলাইতে হইবে। তার পর মাথা বুক ও চিবুক আবার সামনের দিকে হেলাইয়া দিন। এইরূপ একবার পিছন-দিকে, পরক্ষণে সামনের দিকে হেলাইতে হইবে। এ ব্যায়াম করা চাই অন্ততঃপক্ষে একশো বার।

৬। ৬ নং ছবির ভঙ্গীতে দাড়াইয়া মাথা ও কোমর পর্য্যন্ত দেহাংশ বাঁকাইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিন। একবার এদিকে, পরক্ষণে ওদিকে দেহ ও হাত দুলাইতে হইবে। এ ব্যায়ামও একশোবার করা চাই।

একশো-বার সংখ্যা শুনিয়া ভীত হইবেন না। ইহাতে সময় লাগিবে খুব অল্প। প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বে নিয়মিত ভাবে এ ব্যায়াম-বিধি পালন করিলে দেখিবেন, নিদ্রা হইবে গভীর এবং কখনো অনিদ্রা-কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। শয়নের সময় মনে সুচিন্তা পোষণ করিবেন। যে চিন্তায় আনন্দ পান, সে চিন্তা ভিন্ন মনে অন্য কোন চিন্তাকে ঘেঁষিতে দিবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া শুইতে হইবে। তর্কাতর্কি বকাবকি রাগারাগি করিয়া উগ্র বা বিরক্ত মনে কদাচ শয়ন করিবেন না।

৪। মাথা হেলাইয়া

৫। উর্দ্ধমুখী

৬। দু'হাত সামনে

উৎসব-মাঝে

দাক্ষিণ সমীরণে পুষ্পিত বনতল,
সজ্জিত শ্যামতনু যৌবন-উচ্ছল
বিহঙ্গ-সঙ্গীতে দিগন্ত মুখরিত,
বাঁশরীর ঝঙ্কারে বেণুবন কম্পিত।

মুকুলিত প্রণয়ের প্রস্ফুট সৌরভ,
মদালসা পাপিয়ার উচ্ছল কলরব।
অনাগত অতিথির বিরহের যাতনা,
ক্ষণে ক্ষণে ভরে' দেয় অন্তরে বেদনা।

ধরণীর অঙ্গনে উৎসব অতুলন,
অনাদরে করে শুধু ঝরা-পাতা ক্রন্দন।

শ্রীমতী নিভা দেবী
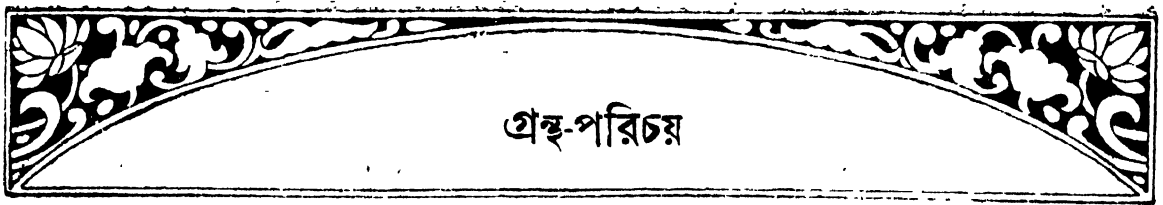
গ্রন্থ-পরিচয়

মহর্ষি বাদরায়ণ-প্রোক্ত উত্তরমীমাংসাদর্শন বা ব্রহ্ম-সূত্রের শক্তিভাষ্য—দুইখণ্ডে বিভক্ত—নানাদর্শনপরমাচার্য্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহোদয়-বিরচিত—বারাণসী রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ মহাশয়-কর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষায় লিখিত ভূমিকা সহ—প্রথম খণ্ড (প্রথমাধ্যায়)—পৃষ্ঠা ৩+৪+১০+৩২০—মূল্য এক টাকা—দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয়াধ্যায় হইতে চতুর্থাধ্যায়)—পৃষ্ঠা ৩+৪০+৪৬-মূল্য দেড় টাকা—কালীঘাট মহাশক্তিপীঠের অন্যতম সেবাইৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার সরস্বতী শাস্ত্রসাগর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে পূজ্যপাদ অভিনব-ভাষ্যকার মহোদয়ের সুযোগ্য তনুজ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়-তীর্থ এম্.এ মহাশয়-কর্ত্তৃক কালীঘাট সমিতির অনু-মত্যনুসারে প্রকাশিত—৪৭ নং হালদারপাড়া রোড কালীঘাট, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

প্রাচীন ভারতের অতুলনীয় গৌরবের উৎসস্বরূপ মন্ত্রদ্রষ্টা আর্য্য ঋষিগণের অপূর্ব্ব সাধনবলে আর্য্যাবর্ত্তের পুণ্যভূমিতে এক দিন যে পরিপূর্ণ অখণ্ডজ্ঞানের প্রকাশ হইয়াছিল, বেদান্ত তাহারই সারভূত। শ্রুতি-স্মৃতি-তর্ক—এই ত্রিবিধ প্রস্থানে বিভক্ত বেদান্ত বাঙ্ময় আজও পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের জ্ঞান-সমুদ্রের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিদ্বৎসমাজে একবাক্যে সমাদৃত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ প্রস্থানের * (বিশেষ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের) নানাবিধ ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী-প্রকরণ গ্রন্থাদির সমষ্টি বেদান্তদর্শন সম্প্রদায়ের গোত্রবর্দ্ধনে বহু সহায়তা করিয়াছে। অধুনা অপ্রাপ্য বৃত্তিকার-সম্প্রদায় প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমানে বেদান্তের যে কয়টি পরস্পর-ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষ্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাদিগের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদিগের মধ্যে ভগবৎপূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশঙ্করের অদ্বৈত-সম্প্রদায়-সম্মত ত্রিবিধ প্রস্থানের ভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বহুজনমান্য। তদ্ব্যতীত শ্রীভাস্করাচার্য্যের ভেদাভেদ-সম্প্রদায়, আচার্য্য শ্রীরামানুজের বিশিষ্টবিষ্ণ্বদ্বৈত-সম্প্রদায়, শ্রীনিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত-সম্প্রদায়, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈত-সম্প্রদায়, শ্রীকণ্ঠের বিশিষ্টশিবাদ্বৈত-সম্প্রদায় † শ্রীবল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈত-সম্প্রদায়, ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গণের অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্প্রদায়ের মত-বিবরণাত্মক ভাষ্যাদি গ্রন্থও বর্ত্তমানে বিশেষ প্রচলিত আছে। এই সকল আচার্য্যের কেহ কেহ ত্রিবিধ প্রস্থানের ভাষ্যরচনা না করিলেও ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন। আর কোন সম্প্রদায় না থাকিলেও ব্রহ্মসূত্রের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর বিজ্ঞানামৃতভাষ্য পণ্ডিতসমাজে অজ্ঞাত নহে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপী-নাথ কবিরাজ মহাশয় অশ্রুতপূর্ব্ব অথচ বর্ত্তমানে প্রকা-শিত আনন্দভাষ্য ও জানকীভাষ্য প্রাচীন বেদান্ত-সম্প্রদায়-ভুক্ত কি না—সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার তিনিই রেওয়ার কোন গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক লিখিত রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের একখানি ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি একবার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিতেও ছাড়েন নাই। শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামীও ব্রহ্মসূত্রের একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়; শ্রীধরস্বামী তাঁহারই পৃষ্ঠসেবী বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণের স্বামিকৃত-টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্সন্দর্ভে বাসনাভাষ্য ও হনুমদ্ভাষ্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ** এইভাবে ব্রহ্মসূত্রের শৈব-বৈষ্ণব-স্মার্ত্তাদি নানা সম্প্রদায়ানুযায়ী বহুবিধ ভাষ্যের দর্শন মিলিলেও এ পর্য্যন্ত উহার শাক্ত-সম্প্রদায়-সম্মত কোন ভাষ্য বা ব্যাখ্যার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

* (১) শ্রুতিপ্রস্থান—উপনিষৎ; (২) স্মৃতিপ্রস্থান—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষৎ; (৩) তর্কপ্রস্থান—মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র।

† সম্প্রতি বীর-শৈব-সম্প্রদায়ের শ্রীকরভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার গ্রন্থকার শ্রীপতি পণ্ডিতাচার্য্য ভেদাভেদবাদী

** কেহ বলেন যে, বাসনাভাষ্যই ভাস্কর-ভাষ্য ও হনুমদ্ভাষ্য মাধ্বভাষ্য। এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মসূত্রের শাক্ত-সম্প্রদায়-সম্মত ভাষ্য রচিত হওয়া সম্ভব কি না, তাহার আলোচনা করিতে যাইলে দেখা যায় যে—শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত আধুনিক আচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দভাষ্যে সূত্রকার-কর্তৃক শক্তিবাদ-খণ্ডন সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন। ‡ অবশ্য শক্তিবাদ ব্রহ্মসূত্র-কারের অনভিপ্রেত হইলে ব্রহ্মসূত্রের শাক্ত-সম্প্রদায়-সম্মত ভাষ্য রচিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না; কিন্তু শাক্তমত বস্তুতঃই ব্রহ্মসূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে কি না, তাহা বিস্তৃত আলোচনা-সাপেক্ষ। বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বা শাক্তমতবিরোধী বৈষ্ণবসম্প্রদায়সমূহের অধুনালভ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন আচার্য্য শ্রীরামানুজ অথবা ভেদাভেদ মতের অতি প্রাচীন প্রচারক আচার্য্য শ্রীভাস্কর—ইঁহারা কেহই শক্তিবাদকে বেদান্ত-বিরোধী বলেন নাই। আচার্য্য ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্কর ও শ্রীভাস্কর দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অন্তিম ("উৎপত্ত্যসম্ভব") অধিকরণটি পাঞ্চরাত্রাগম সিদ্ধান্ত-বিশেষ-খণ্ডনপর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর আচার্য্য শ্রীরামানুজ—যিনি পাঞ্চরাত্রাগমের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন—তিনিও এই অধিকরণটিকে পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত-সমর্থনপর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পক্ষান্তরে, শাক্তমতবিরোধী শ্রীনিম্বার্ক ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় ইহাকে শক্তিবাদ-খণ্ডনপর বলিয়া যোজনা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের এই অভিযোগের উত্তরে শাক্ত-সম্প্রদায়ের কি বলিবার থাকিতে পারে, তাহাও অবশ্যই সুধীগণের বিশেষরূপে বিচার্য্য। আর এই কারণে ব্রহ্মসূত্রের শাক্তসিদ্ধান্তানুসারিণী একটি ধারাবাহিক ব্যাখ্যা হিসাবে আলোচ্য "শক্তিভাষ্যে"র বিশেষ মূল্য আছে।

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে শক্তি-ভাষ্যকার পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়ের পরিচয় প্রদানের চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। বর্ত্তমান ভট্টপল্লী-পণ্ডিতসমাজের শিরোমণি স্বরূপ তর্করত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য কাব্য-অলঙ্কার-স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র দর্শন প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে সমভাবে পরিব্যাপ্ত। তদ্ব্যতীত বর্ণাশ্রমী হিন্দুসমাজের অবিসংবাদিত নেতৃশ্রেষ্ঠরূপে তিনি আজ সমগ্র ভারতে সম্মানিত। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপ- চারিদিকে সতত যে সকল অন্যায় আক্রমণ চলিতেছে সেগুলি নিরাস করিবার জন্য আজও পর্য্যন্ত (রোগজীর্ণ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকিয়াও) তিনি নানারূপে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহার উপর তিনি দেশমাতৃকার একজন বিশিষ্ট একনিষ্ঠ সেবক। একাধারে এরূপ নানা গুণের সমাবেশ বস্তুতঃ অতি দুর্লভ। পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও কঠোর শ্রম স্বীকার-পূর্ব্বক এই যে অভিনব "শক্তিভাষ্য" রচনা করিয়াছেন, তাহা সত্যই সুধীসমাজের অভিনন্দনার্হ।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি "সপ্তশতী দেবীভাষ্য" নামক শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয়চণ্ডীর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও একটি "শক্তিভাষ্য" তাঁহার লেখনী হইতে ইতঃপূর্ব্বে প্রসূত হইয়াছে। * কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের উপর এই "শক্তিভাষ্য"ই তাঁহার মৌলিক চিন্তাধারার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না শ্রীবিদ্যা-পূজাপদ্ধতি-প্রকরণে শাক্তদর্শন-সম্মত পূজার উল্লেখ দর্শনে প্রথমে তাঁহার মনে হয়—'বর্ত্তমানে 'শাক্তদর্শন' নামে প্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থ ত পাওয়া যায় না; অথচ শাস্ত্রে যখন শাক্তদর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন শাক্তদর্শন কোন না কোন সময়ে অবশ্যই প্রচলিত ছিল। অধুনালুপ্ত সে শাক্তদর্শনের স্বরূপ কি?—উহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব কি না?'—ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকিলে এক শুভ মহানিশীথে শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকা মহাদেবী স্বয়ং স্বপ্নে তাঁহার সমীপে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে শাক্তদর্শন-রহস্যের আভাসমাত্র প্রদান করেন ও তদুপদেশানুসারে এই গ্রন্থ রচনার সূচনা হয়। ঘটনার অলৌকিকত্বে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাও এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থখানির আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন—ইহা গ্রন্থকারের দীর্ঘদিনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনের অমৃতময় ফলস্বরূপ।

পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় বর্ত্তমানে 'শাক্তদর্শন' ন...

‡ ব্রহ্মসূত্র, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ, সূত্র ৪২—৪৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া প্রচার করিলেও শ্রীনিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতমতের সহিতই তাঁহাদিগের অধিক সাম্য লক্ষিত হয়।

* "মাসিক বসুমতী"র নিয়মিত পাঠকবর্গ তর্করত্নমহাশয়-লিখিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-তত্ত্ববিচারে' এ বিষয়ের কিছু কিছু ইঙ্গিত অবশ্যই পাইয়া থাকিবেন।

প্রসিদ্ধ কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না বলিয়াই স্বকীয় প্রতিভা ও সাধনবলে এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'শাক্ত দর্শন' নামে কোন গ্রন্থের সন্ধান বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না—ইহা অতি সত্য কথা। এমন কি, শাক্তসম্প্রদায়কে দার্শনিক সম্প্রদায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিতেও সম্ভবতঃ প্রাচীন দার্শনিকগণের কুণ্ঠা বোধ হইত। সেই কারণে বিদ্যারণ্যের "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ" বা তৎসজাতীয় গ্রন্থসমূহে শাক্তদর্শনের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। অথচ শাক্ত-সম্প্রদায়ে কোনরূপ দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয় নাই—ইহা বলিতে যাওয়া নিতান্তই দুঃসাহসের কথা। অগস্ত্যকৃত শক্তিসূত্র, মালিনীবিজয়, স্বচ্ছন্দতন্ত্র, পরা-ত্রিংশিকা, ত্রিপুরারহস্য, যোগিনীহৃদয় (দীপিকা ও সেতু-বন্ধ সহ) মাতৃকাচক্র-বিবেক, কামকলাবিলাস, বরিবস্যারহস্য, সুভগোদয়, সৌন্দর্য্যলহরী, প্রপঞ্চসার, সারদাতিলক, তন্ত্ররাজ তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে শাক্তদর্শনের বিচিত্র দুরূহ তথ্য সকল সবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু তর্করত্ন মহাশয়ের শক্তিভাষ্যোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্ব্বাংশে এই সকল প্রাচীন শাক্তাগমের সিদ্ধান্তানুকূল নহে। তাঁহার যে সকল সিদ্ধান্ত প্রাচীন শাক্তমতানুগ, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ স্থলেই তাঁহার মত তাঁহারই নিজস্ব সাধনলব্ধ—মৌলিক। এই হিসাবে তর্করত্ন মহাশয়কে অভিনব শাক্তসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য বলা যাইতে পারে।

তর্করত্ন মহাশয়ের শক্তিবাদকে "শাক্তাদ্বৈতবাদ" বা (তাঁহার নিজের ভাষায়) "সরূপাদ্বৈতবাদ" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রাচীন শাক্তাগম-সিদ্ধান্তের সহিত ইহার সর্ব্বাংশে সাম্য না থাকিলেও উক্ত প্রাচীন বা এই নবীন মতের কোনটিরই হেয়ত্ব-কল্পনা যুক্তিসঙ্গত হইবে না; কারণ, প্রাচীন তত্ত্বগুলিও যেমন হয় মহাদেব অথবা মহাদেবীর দ্বারা সবিস্তরে উপদিষ্ট, এই নবীন সম্প্রদায়টিও সেইরূপ স্বয়ং জগন্মাতার দ্বারাই সূক্ষ্মরূপে সূচিত। কিন্তু—"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ। ভিদ্যন্তে বহুধা লোক উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥"—অধিকারি-ভেদে ব্যবস্থাভেদ-নীতি স্বীকার করিলেই এই আপাতদৃষ্ট মতবিরোধাভাসের সমাধান সম্ভব হইতে পারে।

তর্করত্ন মহাশয়ের এই সরূপাদ্বৈত-শক্তিবাদ শঙ্করের নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বা কাশ্মীর-শৈবাগমের শিবাদ্বৈতবাদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। নিম্নে ইহার সারসংক্ষেপ প্রদত্ত হইল—

বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মমীমাংসার সিদ্ধান্তভূত সর্ব্বজগন্মূল-স্বরূপ ব্রহ্ম আর মহাশক্তি অভিন্ন। এই শক্তি বা ব্রহ্ম পর-সত্তাস্বরূপ। কিন্তু 'সত্তা' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, সেই ব্যাবহারিক সত্তা হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ নিত্য পারমার্থিক সত্তা-স্বরূপই এই মহাশক্তি বা ব্রহ্ম। এই শক্তি নিরাকারা ও পূর্ণানন্দময়ী। ইনিই মহাশক্তি, মূলশক্তি, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। এই অখণ্ড সত্তারূপা শক্তি চিৎ ও অচিৎ—এই দুইটি তত্ত্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এই দুইটি তত্ত্ব আপাততঃ বিভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ উহারা পরস্পর পরস্পরের পূর্ণতাবিধায়ক। একই মহাশক্তিরূপা সত্তা দ্বারা সমভাবে পরিব্যাপ্ত এই চিদচিৎ-তত্ত্ব পরা শক্তি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। উক্ত তত্ত্বদ্বয়মধ্যে চৈতন্যতত্ত্বই শিবতত্ত্ব বা পুরুষতত্ত্ব ও জড়তত্ত্বই শক্তিতত্ত্ব বা প্রকৃতিতত্ত্ব নামে কথিত হইয়া থাকে। * অতএব, সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, মহাশক্তি পুরুষ-প্রকৃতিরূপা। ইনি সনাতনী বলিয়া ইঁহার অন্তর্গত প্রকৃতিতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব উভয়ই নিত্য ও তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধও নিত্য। এই একরূপা অখণ্ডা নিরাকারা সনাতনী পূর্ণানন্দময়ী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ারূপা পরা শক্তি অবাঙ্মনস গোচরা; আর তৎকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত চিন্মাত্রসত্তা ও অচিন্মাত্রসত্তা—এই সত্তাদ্বয় তাঁহা হইতে পৃথক্ হইলেও অভিন্ন—ইহাই এই স্বরূপাদ্বৈত-শক্তিবাদের মূল রহস্য।

চিন্মাত্রকোটিতে কেবল শিব কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহাকেই 'বিম্ব' নাম দেওয়া হয়। আর দেবমনুষ্য-তির্য্যগাদি জীব তাঁহারই 'প্রতিবিম্ব'ভূত।†

অচিন্মাত্রকোটিতে মূলপ্রকৃতি 'ঈশ্বরী' সংজ্ঞায় অভিহিতা হইয়া থাকেন। তাঁহার দ্বিবিধ ভেদ—(১)

* এই জড়তত্ত্বকেই অদৃষ্টসমষ্টি, সহকারি-শক্তি, মায়া, প্রকৃতি, অব্যক্ত প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

† প্রকৃতির সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ পরিণাম—মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্বে কূটস্থ চৈতন্যের প্রতিবিম্বই যথাক্রমে সমষ্টি-জীব (হিরণ্যগর্ভ) ও ব্যষ্টি-জীব। এই হিরণ্যগর্ভই 'আদ্য'। ইহারই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু শক্তি—ইহা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্র, সূ, ১।১।২) সূত্রের শক্তিভাষ্যে উক্ত হইয়াছে।

শুদ্ধবিদ্যা' ও (২) মায়া (অবিশুদ্ধা)। প্রকৃতির পরিণামভূত মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চমহাভূতান্ত সাংখ্যসিদ্ধান্ত-সম্মত বিবিধ স্থূল তত্ত্ব—সবই এই অচিৎ-কোটির অন্তর্ভুক্ত।

মূলশক্তি নিরাকারা হইলেও উপাসকগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া সাকারভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর তখন তিনি উমা, দুর্গা, কালিকা প্রভৃতি দেবীরূপে উপাসিতা হইয়া থাকেন।

মূলশক্তিরূপ ব্রহ্মের নির্বিশেষ অপরোক্ষজ্ঞানই মোক্ষের কারণ। এই অপরোক্ষজ্ঞান পরা শক্তির কৃপা ব্যতীত জন্মিতে পারে না। আর তাঁহার কৃপা তদীয় উপাসনা-সাপেক্ষ। অতএব, শক্তির উপাসনাই পরম্পরাক্রমে মোক্ষকারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

নিম্বার্কভাষ্যে ও গোবিন্দভাষ্যে শক্তিবাদের উপর যে যে দোষ দেখাইয়া শাক্তমত খণ্ডন করা হইয়াছে, সে সকল দোষ বর্ত্তমান শক্তিভাষ্যে প্রতিপাদিতা শক্তির পক্ষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। উক্ত ভাষ্যদ্বয়ে বলা হইয়াছে—কেবল শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব নহে; কারণ, "দেবাত্মশক্তিম্" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায়—জগৎসৃষ্ট্যাদি কার্য্যে শক্তি ঈশ্বরের সহকারিণী মাত্র। সকল শ্রুতি-স্মৃতি ও যুক্তি হইতে প্রতিপাদিত হয় যে, ঈশ্বরই জগৎ-কারণ—শক্তি নহেন। এ বিষয়ে প্রমাণরূপে স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে—

"শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়শ্চৈব যুক্তয়শ্চেশ্বরং পরম্।
বদন্তি তদ্বিরুদ্ধং যো বদেত্তস্মান্ন চাধমঃ॥"

নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে শক্তিবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে, তন্মতে শক্তি ও ঈশ্বর বিভিন্ন তত্ত্ব—শক্তি জড়রূপা ও ঈশ্বর চিদ্রূপ। কিন্তু তর্করত্ন মহাশয় যে শক্তিবাদের প্রচার করিতেছেন, তদনুসারে শক্তি চিদচিদ্রূপা।* চিদ্রূপ ঈশ্বর ও জড়া প্রকৃতি—উভয়ই তাঁহার দ্বারা সমভাবে পরিব্যাপ্ত—তাঁহা হইতে ভিন্নাভিন্নরূপে অবস্থিত। অতএব নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সহিত এই অংশে সরূপাদ্বৈত-শক্তিবাদের অবিরোধই দৃষ্ট হয়। কেবল নিম্বার্ক বা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে পরমতত্ত্বের নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিষ্ণু'; আর তর্করত্ন-মহাশয়-প্রবর্ত্তিত সরূপাদ্বৈত শাক্ত-সম্প্রদায়ে পরমতত্ত্বের সংজ্ঞা 'ব্রহ্মরূপা শক্তি।' বস্তুতঃ, বৈষ্ণব ভেদাভেদমত যে সকল যুক্তিসহায়ে সূত্রকার-সম্মত বলিয়া প্রমাণ করা হইয়া থাকে, তর্করত্ন মহাশয়ের এই শাক্ত ভেদাভেদবাদও অনুরূপ যুক্তিবলে সূত্রারূঢ় বলিয়া প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

এইবার নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ ও সরূপাদ্বৈতশক্তিবাদ—এই দুইটি মতের কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনার পালা আসিয়া পড়িতেছে। উভয় মতেরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু কথা বলিবার আছে। তন্মধ্যে এ স্থলে বিশেষ প্রয়োজনীয় দুইটি মাত্র সন্দিগ্ধ বিষয়ের উত্থাপন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ—যদি ভেদ ও অভেদ উভয়কেই সমসত্তাক বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে একাধারে যুগপৎ ভেদাভেদের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?—এ সংশয় নিরপেক্ষ সমালোচকের বুদ্ধিতে উদিত না হইয়াই পারে না। দ্বিতীয়তঃ—মূলশক্তি নিত্যা নিরাকারা ও একরূপা হইলেও চিদ্রূপসত্তা ও অচিদ্রূপসত্তা—এই সত্তাদ্বয়কে সমভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত—এ রহস্যও কোনরূপেই সাধারণের বুদ্ধ্যারূঢ় হইতে পারে না। যাহা এক অখণ্ড নিরাকার ও নিরবয়ব, তাহা কোটিদ্বয়-পরিব্যাপ্ত কিরূপে হইতে পারে? হইলে তাহার একত্ব ও নিরাকারত্বের হানি হয় কি না? শক্তিতত্ত্ব—যুগপৎ এক ও সত্তাদ্বয়-ব্যাপ্ত—যুগপৎ নিরাকার ও সাকার—ইহাই মহাশক্তির মহিমা—এরূপ বলিতে ত যুক্তিকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, একত্বের জ্ঞান সংখ্যান্তর-জ্ঞান-নিরপেক্ষ কিন্তু দ্বৈতজ্ঞান একত্বজ্ঞান-সাপেক্ষ। সত্তাদ্বয়-ব্যাপ্তা একরূপ শক্তি মূলতত্ত্ব—ইহা স্বীকার করিলে হয় একত্বের জ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অথবা দ্বৈতবিশিষ্ট একত্বের জ্ঞানই একটি অখণ্ড মূল জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, অথচ, এতদুভয়ই অনুভব বিরুদ্ধ কথা। শত শত শ্রুতি স্মৃতি-আগমবচনও এতদ্বিষয়ক সংশয় কোনদিনই দূর করিতে সমর্থ হইবে না। কারণ, বাচস্পতি সত্যই বলিয়াছেন যে, শ্রুতি-সহস্র বলেও বস্তুস্থিতির অন্যথাকরণ কখনও সম্ভব হয় না।

আমরা বর্ত্তমান আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রগল্ভতাবশে পূজ্যপাদ ভাষ্যকারের মতের প্রতিকূলে যে কয়টি আক্ষেপের

* মীমাংসকগণের জড়-বোধ রূপ আত্মার সহিতও এই শক্তি-তত্ত্বের এতদংশে কিঞ্চিৎ সাম্য দৃষ্ট হয়।

অবধারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদ-ন্যায় প্রযুক্ত—ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি যেন নিজ নৈসর্গিক সহৃদয়তা-গুণে সে বাক্‌চাপল্য মার্জ্জনা করেন। আর এই আলোচনা যে পূজ্যপাদ তর্করত্ন-মহোদয়-প্রবর্ত্তিত অভিনব শাক্তদর্শন-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবিঘাত সূচিত করে, এরূপ আশঙ্কারও কোন কারণ নাই। ষড়্‌বিধ আস্তিকদর্শন-সম্প্রদায় যেরূপ পরস্পর-ভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও 'সোপান-প্রাসাদ-ন্যায়ে' অধিকারি বিশেষের নিমিত্ত ব্যবস্থা-বিশেষের বিধান করিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে, আলোচ্য শাক্তসিদ্ধান্তও সেইরূপ যোগ্য অধিকারি-গোষ্ঠী প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক অচিরেই নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া তুলিবে বলিয়া আশা করা যায়।* আর সেই সঙ্গে জগন্মাতৃস্বরূপিণী মহাশক্তিদেবীর শ্রীচরণসরোজোদ্দেশে অগণিত প্রণতি জানাইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, তাঁহারই নির্দ্দেশলব্ধ এই শাক্তমতের প্রবর্ত্তক—বঙ্গের তথা সমগ্র ভারতের গৌরব—পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহোদয় নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া দর্শনরসপিপাসু পাঠকবর্গকে সুচিরকাল মহাশক্তির অনন্তলীলারসামৃত" আস্বাদন করাইতে থাকুন।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

* পরমতত্ত্বনির্ণয়ের পক্ষে কেবল তর্ক অনুকূল নহে—"যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে"। অপরোক্ষ অনুভূতিই এরূপ তত্ত্বনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। আর সে অনুভূতির কারণ পরমতত্ত্বেরই অনুগ্রহ—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"। কিন্তু পরম সত্য সকল সাধকের নিকট সমভাবে আপনার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত করেন না। যিনি যে স্তরের সাধক, যেটুকু জ্ঞানে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে—ততটুকু জ্ঞানই তিনি লাভ করেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। এ কারণে অন্য স্তরের সাধক-কর্ত্তৃক লব্ধ জ্ঞানের সহিত তাঁহার জ্ঞানের সাম্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সেই হেতু উভয় সাধকের জ্ঞান যে পরস্পর বিরোধী এ কথাও বলা চলে না। এই সকল বিভিন্ন স্তরের জ্ঞানই সোপানাবলীর ন্যায় ধাপে ধাপে উঠিয়া এক পরমজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। ইহাই অধিকারিভেদে ব্যবস্থাভেদের মূল রহস্য। এই দৃষ্টিতে দেখিলে কোন দর্শন-সম্প্রদায়কেই ভ্রান্ত বলা যায় না; কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই যথাযোগ্য অধিকারীর জ্ঞানবিধানের সহায়ক মাত্র। পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞো হি পরমেশ্বরঃ স্বপ্রকাশিতবেদেন স্বপ্রবর্ত্তিতসম্প্রদায়বিশেষসম্মতব্যাখ্যাভেদেনাধিকারিবিশেষহিতমাতনোতি রহস্যম্"। অতএব, তর্করত্ন মহাশয়-প্রবর্ত্তিত শক্তিবাদ যোগ্যাধিকারীর নিকট সম্পূর্ণ সার্থক, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

ফিরে গেল আপন দেশে

পাখী মোর ছিল কোন্ অজানা দেশে,
না জানি কেমনে এল হেথায় ভেসে।
গান তার কি মধুর
স্বরগের সুধা সুর
দিন-ভোর গীত গেয়ে মন-হরষে
নাচিয়ে কাটাত কাল এ পর-দেশে।

কাননের ফুল যেন অচেনা পাখী,
চ'লে গেল ঝ'রে গেল সুরভি রাখি।
দেবতার ধনে বলে
বাঁধিতে চাহিনু ছলে
নিমেষে আকাশ তারে ফেলিল ঢাকি
অনন্ত অসীম মাঝে হারাল' পাখী!

সব সে যে নিয়েছিল আপন ক'রে,
চ'লে যেতে ফিরে চায় বেদন-ভরে।
রূপহারা সেই মুখ
স্মরি মোর ফাটে বুক
ধরণীর আলোরাশি আঁধারে ভরে
পাখী মোর চ'লে গেল আপন ঘরে।

কোন্ দেশ হ'তে উড়ে হেথায় এসে
প'শেছিল হৃদিপুরে মায়াবী-বেশে।
প্রাণভরা ভালবাসা
বুকভরা সব আশা
ফেলে রেখে যেতে তারে হ'ল যে শেষে
গান গেয়ে ফিরে গেল আপন দেশে।

শ্রীমতী সুখেন্দুমুখী রায়
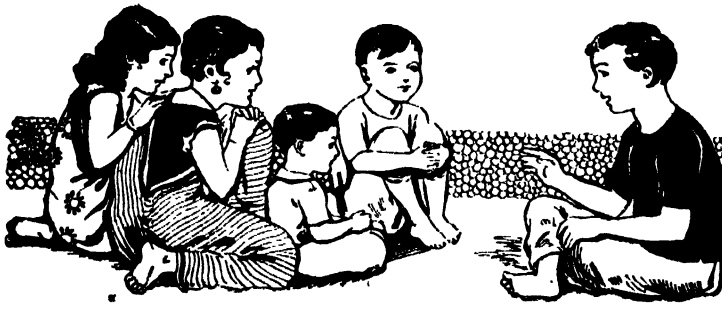
মৌ-পিপীলিকা

পিপীলিকার সম্বন্ধে অনেক কথাই তোমরা জানো। তাদের সম্বন্ধে আজ কয়েকটি নূতন কথা বলিতেছি।

হিট্লারী-মেজাজের পিপীলিকা

অতি-ক্ষুদ্র প্রাণী এই পিপীলিকা। পিপীলিকাকে জাপানী-জাতি সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করে। এত বড় স্বার্থত্যাগী, পরিশ্রমী আর কর্ম্মনিষ্ঠ প্রাণী না কি দুনিয়ায় আর নাই, জাপানীদের ইহাই ধারণা!

পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞেরা বলেন, পিপীলিকা জগতে এমন জাতের পিপীলিকা আছে, যারা সেই প্রাচীন হুন এবং মোঙ্গল-জাতির মতো পরস্বাপহরণে তৎপর, এবং হিটলারের মতোই পরের রাজ্য-অধিকার করিতে সর্ব্বক্ষণ উৎসুক থাকে। এ-সব জাতের প্রত্যেকটি দলে বিপুলকায় একটি করিয়া ডেয়ো-সম্রাজ্ঞী থাকে। এই সম্রাজ্ঞীই অনুচরবৃন্দসমেত অপর-পিপীলিকার রাজ্যে অকারণে এবং অকস্মাৎ মারমূর্ত্তিতে গিয়া উদয় হয়; উদয় মাত্রই তাদের সম্রাজ্ঞীকে হত্যা করিয়া তার রাজ্য দখল করিয়া বসে। সে রাজ্যে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন এবং বিজিত পিপীলিকাদের ক্রীতদাস করে। অর্থাৎ এ যুগের মুসোলিনি হিটলারের মতোই এ-জাতের পিপীলিকা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য মায়া-মমতা ন্যায়-অন্যায়—কোনো-কিছুর তোয়াক্কা রাখে না।

যে-সব জাতের পিপীলিকা অধিকতর সভ্য, তারা এমন পরস্বলোলুপ নয়। তারা ক্ষেতে-বাগানে-প্রান্তরে রাজ্যস্থাপনা করিয়া সেরাজ্য-পরিচালনার কাজেই পরিতৃপ্ত থাকে।

পিপীলিকার রাজ্যে গাভী আছে। এ গাভী আমাদের

পিপীলিকার পাখা

গাছ-পিপীলিকা

'গাভী' নয়,—দু'তিন জাতের কীটপতঙ্গ। এই কীট-পতঙ্গের দেহ নির্য্যাস পিপীলিকা-জাতি গো-দুগ্ধবৎ দুহিয়া পান করে। সে-নির্য্যাস-পানে তাদের পুষ্টি হয়। এই গাভী-কীটদের তারা পাতায়-পাতায় ঘুরাইয়া চরাইয়া আনে! অর্থাৎ মানব-সমাজের মতোই পিপীলিকা-সমাজ এই গাভী-কীট-পতঙ্গকে আদরে-যত্নে পালন করে। এই গাভী-কীট-পতঙ্গ তাদের ঘরের লক্ষ্মী! গাভী-কীট-পতঙ্গ ছাড়া পিপীলিকা-সমাজ মৌ ভাণ্ডারী কীট-পতঙ্গ পালন করে। এসব কীট পতঙ্গ উই-জাতীয়। উইটিপির মতো প্রকাণ্ড বাসা বা 'চাক' গাঁথিয়া সেই সব বাসায় বা চাকে তারা

আশ্রিত পতঙ্গ

দিনের পর দিন ধরিয়া মধু সঞ্চয় করে, এবং এ মধু লাগে পিপীলিকার ভোগে!

পিপীলিকাদের এক একটি রাজ্যে পিপীলিকা থাকে প্রায় এক-হাজার, দুই-হাজার, দশ-হাজার। কোনো

সজীব প্রাণী এই পিপীলিকার মতো বিরাট-সংসার পাতিয়া একসঙ্গে বাস করে না। তার উপর বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সারা পৃথিবীতে পিপীলিকা আছে প্রায় আট-হাজার বিভিন্ন জাতের।

পিপীলিকাদের কাহিনী গল্প-উপন্যাসের মতো উপভোগ্য। তাদের সম্বন্ধে বহু দেশের বহু বিশেষজ্ঞ বহু অনুশীলন করিয়াছেন—পিপীলিকার সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখা হইয়াছে। একমাত্র বেলজিয়ান্-কঙ্গো-প্রদেশের পিপীলিকা-জাতের কথা লইয়াই যে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, সে গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৩৯। লক্ষ-লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর মাটীতে যে-সব পিপীলিকার বাস ছিল, তাদের দেহ-কঙ্কাল আজো তাদের কাহিনীকে সজাগ রাখিয়াছে।

এ পিপীলিকারা হাতী নিপাত করে

আমাদের প্রতি গৃহে, প্রতি-উদ্যানেই পিপীলিকার বাস। সেজন্য পিপীলিকার সঙ্গে আমাদের সকলের অল্প-বিস্তর পরিচয় আছে। দেওয়ালের ফাটলে, ভাঁড়ার-ঘরে, কড়িবরগার ফাঁকে, রান্নাঘরের দেওয়ালে—যেখানে একটু রন্ধ্র রচিয়া বসতি-স্থাপনের সুবিধা পায়, পিপীলিকারা সেইখানেই এক-একটি রাজ্য গড়িয়া বাস করে। এক-এক রাজ্যে আট-দশ হাজার পিপীলিকার বাস।

অনেক সময় দেখিতে পাই, অতি গ্রীষ্মের পর যেমন এক-পশলা বৃষ্টি হইল, অমনি শুষ্ক রুক্ষ মাটী ফাটিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাটা মাটীর তলা হইতে রাশি রাশি পিপীলিকা ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাহির হইয়া আসিতেছে। ইহারা মিস্ত্রী-কারিগরের দল। ইহাদের সঙ্গে থাকে একটি করিয়া 'ডেয়ো'-পিপীলিকা। এই ডেয়োই দলের সম্রাজ্ঞী—সকলের অধিনায়িকা। বড়-বড় রাজ্য হইলে সে-রাজ্যে বহু 'ডেয়ো' দেখা যায়। বৃষ্টিতে নীড়ের আবরণ খশিয়া গিয়াছে বলিয়া এই সব মিস্ত্রী-কারিগর-সমেত 'ডেয়ো'র উদয় হয়, এবং বিপুল অধ্যবসায়ে নিমেষে সকলে খশা বা ঝরা আবরণ মেরামতির কাজে লাগে!

পিপীলিকার রাজ্যে হানা দিলে তাদের আস্তানায় নানা রঙের ফড়িং বা পতঙ্গ দেখা যাইবে। কোন কোন আস্তানায় একাধিক পতঙ্গ দেখা যায়। ইহারা অতিথি-অভ্যাগত—পিপীলিকাদের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে। এই সব আশ্রিত-প্রতিপালনে পিপীলিকাদের এত মমতা যে, অনেক সময় তাদের খাওয়াইতে শিশু-পিপীলিকাদের

...টান্ ধরে; সেজন্য অনেক সময় দলকে-দল মারা ...য়া পিপীলিকা-রাজ্য ছারখার হইয়া যায়। এই সব ...শ্রিত বা পরগাছার দল অনেকটা আমাদের মানব-...জের মামুলি "মোসাহেবে"র মতো! ইহাদিগকে কালনেমি বা শকুনি-মামা বলিলেও চলে। ইহারা পিপী-লিকা-সংসারকে ছন্নছাড়া করিয়া দেয়।

গাছের পত্রপল্লবে বা নবীন শাখা-প্রশাখায় পিপীলিকার আস্তানায় এ-সব পিপীলিকার সঙ্গে অন্য জাতের দু'চারিটা কীট-পতঙ্গকে থাকিতে দেখা যায়। এই কীট-পতঙ্গই পিপী-লিকা-সমাজের গাভী। এই কীট-পতঙ্গের গায়ে টোকা দিয়া পিপীলিকারা যে-নির্য্যাস পায়, তাহা তাদের পক্ষে ভিটামিনতুল্য পুষ্টিকর। এই পুষ্টিকর খাদ্যের জন্যই এ সব গাভী-কীট-পতঙ্গের লালনে পিপীলিকা-সমাজের যত্নের সীমা থাকে না। এই গাভীর জন্য পত্রাবরণে তারা নিরাপদ নীড় রচিয়া দেয়; কিশলয়-পল্লবে বা তরু-মূলে তাদের বহিয়া আনে, সেখান হইতে পল্লব বা তরুনির্য্যাস আকণ্ঠ পান করাইয়া সযত্নে ইহাদের লালন করে। পিপীলিকারা সে নির্য্যাস-...'দুহিয়া' পান করে।

পিপীলিকার যুদ্ধ

পিপীলিকার রাজ্য সূক্ষ্ম-ভাবে নিরীক্ষণ করিলে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি এক-জাতের পিপীলিকা দেখা যাইবে। এগুলা চোর-পিপীলিকা। ইহাদের গায়ের বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ। এই সব চোর-পিপীলিকা পিপীলিকা-রাজ্যের কাছাকাছি রন্ধ্র রচিয়া সদলে সেখানে আস্তানা পাতে; তার পর নিজেদের নীড় হইতে পিপীলিকা-রাজ্যের তলদেশ পর্য্যন্ত মাটীর মধ্য দিয়া 'টানেল' বা সুড়ঙ্গ রচিয়া সেই সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া নিঃশব্দে আসিয়া পিপীলিকা-রাজ্যে উদয় হয়। মাটীর সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে, ধরা পড়ে না! ধরা পড়িলে কিন্তু রক্ষা নাই! পিপীলিকারা তাদের ছিঁড়িয়া চূর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দেয়।

জীর্ণ বা অযত্নরক্ষিত কাষ্ঠ-খণ্ডের নীচে, স্যাঁতানো জমিতে পিপীলিকারা রাজ্য স্থাপনা করে। এ-সব রাজ্যে বহু-জাতের পিপীলিকাকে একত্র বাস করিতে দেখা যায়—যেন হোটেল বা মস্ত সহর! তাই নানা জাতের পিপীলিকা এখানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে! মাটীর উপর কাঠ বা পাথর ফেলিয়া রাখো, তার তলায় অচিরে পিপীলিকারা আসিয়া বসতি স্থাপনা করিবে। এ-জাতের পিপীলিকা চোখে আলো সহিতে পারে না। তারা আঁধারে ভালো থাকে। তাই এই সব আনাচ-কানাচ দেখিয়া সেইখানেই বাসা বাঁধে।

'ডেয়ো' বা রাণী-পিপীলিকাই এ-রাজ্যে সর্ব্বময়ী অধীশ্বরী। কর্ত্তা-পিপীলিকার পরমায়ু বড় ক্ষীণ। রাজ্য-স্থাপনা শিশু-পালন, যত দায় এই ডেয়োর। ডেয়োরা ডিম পাড়ে হাজার-হাজার, কাজেই সে সব ডিম হইতে

এককালে হাজার দু'হাজার করিয়া সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান-জন্মের সময় পর্য্যন্ত ডেয়োর পালক বা 'ডানা' থাকে। সন্তান-প্রসব হইবামাত্র এ ডানা খশিয়া-ঝরিয়া যায়।

শিশুরা একটু বল পাইবামাত্র 'কাজের' লায়েক হইয়া ওঠে—তখন হইতে তাদের কর্ম্মজীবন সুরু হয়।

পূর্ব্বে যে হিটলারী-মুসোলিনি মেজাজের পিপীলিকার কথা বলিয়াছি,—অপরকে ধ্বংস করিয়া নিজেদের যারা সুপ্রতিষ্ঠ করে—সে-জাতের পিপীলিকার বাস আমাজনে এবং উত্তর-আফ্রিকায়। ইহাদের বর্ণ হয় লাল। আমাদের দেশেও এ-জাতের পিপীলিকা দেখা যায়। তবে দেশের মাটী এবং জল-বাতাসের পার্থক্য হেতু এ-দেশের লাল পিপীলিকারা আমাজনিয়ানদের মতো অতখানি ক্রূর বা লোলুপ নয়। না হইলেও লাল পিপীলিকারা সাধারণতঃ হয় ক্রূর এবং স্বার্থপর। কালো পিপীলিকাকে ধ্বংস করিয়া ইহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়।

'কাঠ-পিঁপড়া'র দাঁতে বিষ আছে। তার মেজাজ খুব উগ্র। গাছের ডাল-পালায় ইহাদের বাস এবং গাছের নির্য্যাসে পরিপুষ্টি!

আমাদের বাড়ী-ঘরে যে-সব পিপীলিকার বাস, তারা মিষ্টির ভক্ত। চিনি-গুড়, সন্দেশ-রসগোল্লার গন্ধ পাই[illegible] কোথা হইতে আসিয়া জুটে, বুঝা দুষ্কর! এ জা[illegible] পিপীলিকা আকারে ছোট হয়, বড়ও হয়; তাদের গা[illegible] বর্ণ লাল বা কালো।

পিপীলিকা-রাজ্যে কাজের শ্রেণী বিভাগ লইয়া জা[illegible] ভেদের ব্যবস্থা আছে। কোনো পিপীলিকা জাতে রাজমিস্[illegible]; কোনো পিপীলিকা বা জাতে গোয়ালা। গাছের গায়ে লতায়-পাতায় আঁটা-মোড়া যে পিপীলিকার নীড় দেখিতে পাই, এ-নীড় পিপীলিকারা লালা-রস হইতে অতি[illegible] সুতা নিষ্কাশন করিয়া সেই সুতা দিয়া লতায়-পাতায় বেমালুম জুড়িয়া রচনা করে। এ নীড় মজবুত, তেমনি অ[illegible]নব। গাছের ছাল কাটিয়া তার নীচে পিপীলিকারা বসতি স্থাপনা করে। গাছের ছাল কাটে ছুতার-পিপীলিকারা। এ-সব পিপীলিকা রাত্রে কাজ করে। ইহাদের জ্বালায় কত ক্ষেত, কত গোলাপ-বাগ, বাগিচা যে শ্মশানে পরিণত হয়, সে পরিচয় অনেকে জানেনা। মিস্ত্রী-জাতের পিপীলিকা দ্বার জানলা বাক্স-আলমারি কাটিয়া ফোঁপরা করিয়া দেয়। এ জাতের পিপীলিকার বাস মার্কিণ যুক্তরাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে। ভাগ্যে এদেশে ও-পিপীলিকা নাই—থাকিলে দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না!

দোদুল-দেহে মৌ-ধারী

আমাদের দেশে ডেয়োর কামড় কেমন—তোমাদের মধ্যে অনেকেই তা জানো। অষ্ট্রেলিয়ার 'ডেয়ো' স[illegible] বড়; এবং মেজাজে এদেশী ডেয়োর চেয়ে ঢের [illegible] হিংস্র ও ক্রূর। সে-ডেয়োর নাম 'বুলডগ'-পিপী[illegible]। তারা যাকে ধরে, কাঁদাইয়া ছাড়িয়া দেয়।

দক্ষিণ-আমেরিকা ও আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে এক জাতের কালো পিপীলিকার বাস। তারা যখন এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় উপনিবেশ-স্থাপনে বাহির হয়, তখন দলে এত দীর্ঘ ও পুরু হইয়া দেখা দেয় সে যেন প্রোশেসন! এ পিপীলিকার কামড় বড় ভীষণ; সে-সময় সামনে মানুষ, ঘোড়া, সিংহ, হাতী যাহাকে পায়, সদলে তার অঙ্গ ছাইয়া দংশন সুরু করে। এ-পিপীলিকার দংশনে বহু মানুষ প্রাণ দিয়াছে—বহু ইতর প্রাণীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। এ পিপীলিকার অক্ষৌহিণী বাহির হইলে ভূচর জন্তু-জানোয়ার প্রাণের ভয়ে তাদের পথ হইতে সরিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়!

এক জন ইংরেজ শিকারী বলিভিয়ায় শীকার করিতে গিয়াছিলেন। বনে তিনি পিপীলিকাদের যে কীর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহা লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ছাউনির সামনে একটি শুষ্ক নালা ছিল। বৃষ্টির জলে এক দিন সে নালা ভরিয়া তাহাতে জলস্রোত বহিল। বৃষ্টি থামিলে দেখি, কালো রঙের মোটা ও সুদীর্ঘ ফিতা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কাছে আসিলে দেখি—ফিতা নয়, পিপীলিকার দল। পিপীলিকারা আসিয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল। তার-পর দেখি, গায়ে-গায়ে জড়াইয়া পিণ্ডাকৃতিতে পিপীলিকার দল জলে নামিল। এ পিণ্ড ক্রমে প্রসারিত দেহে নালার দুই তীর ছুঁইয়া সেতু রচনা করিল। তারপর সেই পিপীলিকা-সেতুর উপর দিয়া দলে-দলে পিপীলিকারা নালা পার হইয়া গেল। যে-পিপীলিকারা ছিল নীচে, তাহারা সদলে জলে ভিজিয়া প্রাণ হারাইল সত্য, কিন্তু তাদের উপস্থিত-বুদ্ধি দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না!

পিপীলিকার অধ্যবসায় ও বুদ্ধিকৌশলের অনেক গল্প তোমরা পড়িয়াছ বা শুনিয়াছ! কিন্তু জানো, ঘর দ্বার ও পুরী পরিষ্কার রাখিতে তাদের যত্ন অসাধারণ? নীড়ে আবর্জ্জনা ধুলা-মাটি জমে, এবং নিত্য তারা সে-আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে। পুরী রক্ষা করিতে, যুদ্ধ করিতে তাদের সাহস ও শক্তি অসাধারণ।

আমেরিকায় মৌ-পিপীলিকা নামে এক-জাতের পিপীলিকার বাস। ফুল-গাছের পাতা কাটিয়া তারা বাসা রচনা করে, ফুলের পাপড়ি আনিয়া নীড়ে জড়ো করে। পাপড়ির পর পাপড়ি সাজাইয়া প্রকাণ্ড আবাস গড়িয়া তোলে এবং তাহারি ভাঁজে-ভাঁজে এরা বাস করে। এই আবাসের খাঁজে-খাঁজে আছে মৌ-ভাণ্ডার! ভাঙ্গিয়া হাতে চাপ দিয়া পিষিয়া ধরো, মিষ্ট মধু মিলিবে।

মৌ-পিপীলিকার মৌ-ভাণ্ডার-রচনায় অসাধারণ নূতনত্ব দেখি। এ-জাতের মধ্যে এক দল পিপীলিকা আছে—তারা স্বাতন্ত্র্য বা প্রাণিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া নিজেদের মৌ-পেটিকায় রূপান্তরিত করে। মৌমাছির মতো এক-দল পুষ্প পল্লব হইতে মধু আহরণ করিয়া আনে; আর এক দল

পিপীলিকার মৌ-ঘর

পিপীলিকা পা দিয়া নীড়ের ছাদ আঁকড়াইয়া দোদুল্য ভাবে অবস্থান করে এবং সংগৃহীত মৌ-বিন্দু ইহারাই পায়ে-মুখে পুঞ্জিত রাখে। নীড়ের যে কক্ষে এই মৌ-ধারী পিপীলিকা অবস্থান করে, সে-কক্ষ বিশেষভাবে বিরচিত। এ-ঘরের কারিগরি দেখিলে পিপীলিকার এঞ্জিনীয়ারিং-বিদ্যার পরিচয়ে চমৎকৃত হইতে হয়। মধু রাখিয়া মৌ-বাহী পিপীলিকারা বাহির হইয়া যায়। মৌ-ধারী পিপীলিকাকে বহু সাবধানে এ-মধু সঞ্চিত রাখিতে হয়। তখন না পারে জোরে নিশ্বাস লইতে, না পারে পা নাড়িতে

নিশ্বাস লইতে বা পা নাড়িতে গেলে তাদের স্থানচ্যুতি ঘটিবে; সঙ্গে-সঙ্গে মধু পড়িয়া নষ্ট হইবে। জ্ঞান-বুদ্ধিহীন ক্ষুদ্র জীব পিপীলিকার এ কৃচ্ছ্র-সাধনা মানুষের অনুকরণ-যোগ্য নয় কি?

এমন নির্জীবভাবে অবস্থিতি করায় এ-সব পিপীলিকা পরে প্রাণহীন মধু-পেটিকায় পরিণত হয়। এক একটি পিপীলিকা এক-ঘণ্টায় মধু আহরণ করে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বিন্দু; এই ত্রিশ-চল্লিশ বিন্দু মধু সংগৃহীত হইলেই তারা সেই মধু বাসায় রাখিতে যায়, এবং রাখিয়া আবার মধু-সংগ্রহ করিতে বাহির হয়। বসন্তকালে ফুলের ফলন অজস্র হয়। সে সময় বনের গোলাপ-ফুলে এ-পিপীলিকার মেলা বসে। গোলাপের মধুই ইহাদের বেশী প্রিয়। পিপীলিকার এ-মধুতে যেমন সুবাস, উহা তেমনি মিষ্ট। এ-মধুর স্বাদ পাইয়া পিপীলিকারা চিনির পানে তাকায় না। তাদের কাছে এ মধুর আদরের সীমা নাই।

চোখের দেখা

চোখে আমরা যা দেখি, তা প্রত্যয় করি। কিন্তু চোখের দেখায় ভুল হয় না, মনে করা ঠিক নয়। চোখের দেখায় ভুল হয়—সে মারাত্মক ভুল! চোখে যা দেখি, তা সব সময়ে সত্য হয় না!

চোখে দেখার সঙ্গে আমাদের মনের যোগ থাকা চাই। উদাস-চোখে কোনো-কিছুর পানে চেয়ে আছি—সে-চাওয়ায় সে-কোনো-কিছুর সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই উপলব্ধি হয় না। দেখছি, পথে এক জন মানুষ চ'লেছে! এই দেখার সঙ্গে যদি মনের যোগ থাকে, অর্থাৎ মনও ও-লোকটির উপর নিবদ্ধ হয়, চিন্তা করে,—কে ও-লোকটি? যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে—তখন মনের এই সাগ্রহ-কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের চোখের দৃষ্টি সম্মিলিত হয়, এবং উভয়ের সহযোগিতায় অর্থাৎ চোখের দেখার সঙ্গে মনের যোগ-সাধনের ফলে আমরা ও-পথিককে নিমেষে চিনে ফেলি—তাই তো, ও-যে আমাদের হলধর!

চোখের দেখায় প্রত্যক্ষ-বস্তুর প্রতিচ্ছবি আমাদের মনের পটে প্রতিফলিত হয়। এ প্রতিচ্ছবি মনের পটে গাঢ় ভাবে মুদ্রিত থাকে, এবং মুদ্রিত থাকার ফলেই ঐ একই বস্তু দ্বিতীয় বার প্রত্যক্ষ করবামাত্র মস্তিষ্কে মুদ্রিত থাকে বলিয়াই আমরা তাকে চিনে-জেনে তার স্বরূপ নির্ণয় করি।

অনেক সময় কোনো-কিছুর পানে উদাস নয়নে চেয়ে থাকবার সময়—যদি সে-চাওয়ায় মনের যোগ না থাকে
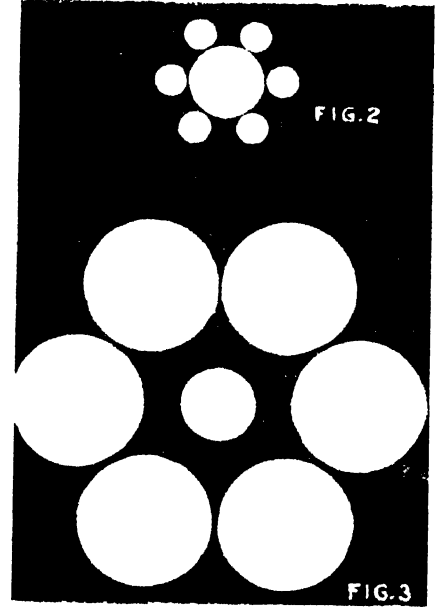
ছয়ের মধ্যে এক

তাহ'লে আমরা বিভ্রান্ত হই। এবং এই বিভ্রমের ফলে রজ্জুকে সর্পভ্রম করি, গাছকে দেখি দৈত্য, জলে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডকে কুমীর বলিয়া ভ্রম করি!

এ গেল বিভ্রমের কথা। পারিপার্শ্বিকতার ফলেও অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে। উপরের ঐ ছবিখানির পানে চাও। দু'খানি ছবিতেই মাঝখানে যে গোলকদু'টি দেখছো, এ-দুটি গোলক একই-মাপের, অর্থাৎ এর মধ্যে ছোট-বড়র পার্থক্য নেই! অথচ উপরকার গোলকটি অপেক্ষাকৃত বড় দেখাচ্ছে। উপরকার গোলকটি ছোট-আকারের ছ'টি গোলকের মাঝখানে থাকার জন্যই এই দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটছে—এবং তারই ফলে উপরকার গোলকটিকে আমরা চোখে দেখি নীচেকার চেয়ে যেন আকারে বড়!
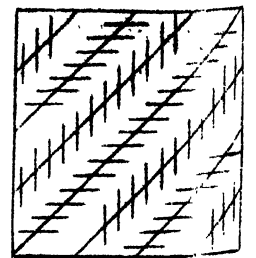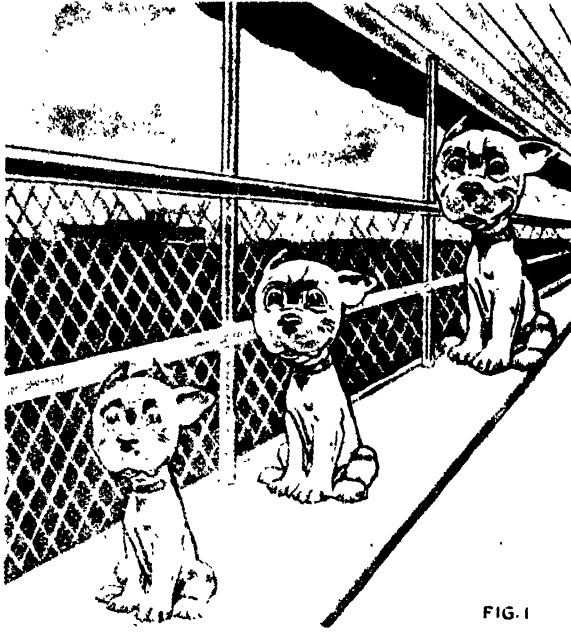
ট্যারচা রেখার বিভ্রম

আগে-পিছে

সম্বন্ধে আমরা নানা জনে নানা মত প্রকাশ করি এবং মতের সে পার্থক্য নিয়ে বহু বিরোধের সৃষ্টি হয়।

বায়োস্কোপের ছবিতে দেখি, ছবির জল নড়ছে;

কালো-সাদার বিভ্রম

তেমনি আবার ও-ছবির নীচে সুদীর্ঘ ঐ যে ক'টি রেখা ওগুলি সমান্তর ভাবে (Parallel) অবস্থিত, অথচ আরো ক'টি ট্যারচা রেখার সহযোগ থাকার জন্য ও ক'টি সরল সমান্তর রেখাকে আমরা ট্যারচা-রেখা অর্থাৎ unparallel দেখছি।

উপরের ছবিতে দেখছো, তিনটি কুকুর পর-পর ব'সে
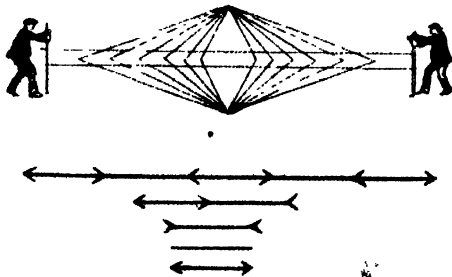
'রেখার ভুল

আছে। তিনটি কুকুরই আকারে সমান; অথচ আগে-পিছে বসানোর কায়দায় শেষের কুকুরটিকে দেখি আকারে সব-চেয়ে বড়; মাঝেরটিকে দে'খে মনে হচ্ছে, প্রথম কুকুরটির চেয়ে আকারে বড়!

চোখের এই বিভ্রমের জন্য আমাদের প্রত্যক্ষ বস্তু

ছবির জাহাজ স্থির নয়, চলছে; ছবির পাখী উড়ছে—এ-সব ঘটে শুধু দৃষ্টিবিভ্রমের ফলে। আসলে ছবির মানুষ, জল নড়ে না, চলে না; ছবির পাখী ওড়ে না। অতি দ্রুতভাবে পর-পর ছবি পরিচালনা করার ফলে এবং হাজার দু'হাজার ছবি পর পর বেগে চালিত হওয়ার ফলে আমাদের চোখে ঐ হাজার-হাজার ছবি অখণ্ড সমগ্ররূপে প্রতিফলিত হয়। বিভ্রমের বশে আমরা ছবির মানুষ-জলকে নড়তে দেখি— ছবির পাখীকে উড়তে দেখি!

কালো-সাদার ঘর

কালো রঙের এক-পীশ কাগজ কেটে একখানা বড় সাদা কাগ-জের গায়ে সেটা এঁটে নাও; নিয়ে কালো কাগজ-আঁটা সাদা-কাগজখানি ধরো বাঁ হাতে, এবং ডান

দুটি কৌটো
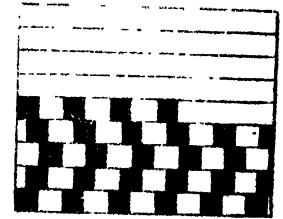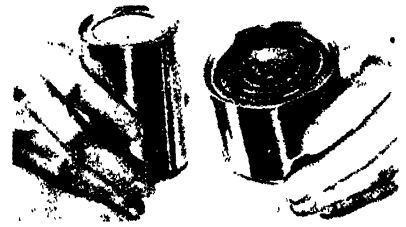
হাতে ধরো ঐ সাদা কাগজের মাপে কাটা আর একখানা সাদা কাগজ। দু'খানি কাগজ এবার চোখের সামনে ধরো—বাঁ হাতের কালো কাগজ-আঁটা সাদা কাগজখানি ডান হাতের কাগজের চেয়ে আকারে ছোট দেখবে! অথচ আসলে দু'খানি কাগজই সমান-মাপের! কাজেই দেখছো, চোখে আমরা সব সময়ে সঠিক প্রত্যক্ষ করি না—ভুল দেখি।

এ ছবিতে দু'টি লাইন—মোটা দু'টি কালো লাইন দিয়ে জোড়া। ও দু'টি লাইন সমান্তরালভাবে (parallel) অবস্থিত; কিন্তু চোখে তা দেখছি না। চোখে দেখছি ও দু'টি লাইন সমান্তরালবর্ত্তী নয়, যেন বাঁকাচোরা!

আগের পৃষ্ঠার ছবিতে চতুষ্কোণ গণ্ডীর মধ্যে সাতটি কালির রেখা আর তাদের গায়ে অসংখ্য লেখা-জোখা দেখছো! এ সাতটি লাইন parallel বা সমান্তরালভাবে সন্নিবিষ্ট; অথচ চোখে দেখছি তা নয়—বাঁকা-চোরা লাইন!

সমান্তরালবর্ত্তী তো?

ঐ পৃষ্ঠাতেই চতুষ্কোণ ঘরের মধ্যে যে সাদা-কালো অসংখ্য ঘর দেখছো—সাদা-কালোর এ ঘরগুলি সমান মাপের; অথচ চোখে তাই দেখছো কি? এ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, আমাদের চোখের-দেখায় কত ভুল ঘটে!

এ ছবি উল্টে দ্যাখো

ও-পৃষ্ঠায় আর-একখানি ছবিতে দু'টি কৌটো দেখেছো তো? একটি কৌটো মোটা-গড়নের আর একটি লম্বা-গড়নের। দু'টি কৌটোতে জিনিস ধরে সমান, অথচ দোকানে বার্লি, চা বা কোকো কিনতে গেলে যদি দোকানদার এই দু'রকম টিন তোমাদের দেখায়, তাহ'লে তোমরা নিশ্চয় নেবে ঐ ডানদিককার মোটা গড়নের টিন! চোখে দেখে মনে হবে, ঐটিতেই বেশী জিনিস আছে! এ-ও দৃষ্টি বিভ্রমের রকম-ফের!

বাঁয়ের ছবিখানিতে কি দেখছো? নির্ব্বাপিত একটি আগ্নেয়-গিরি। বইখানি উল্টে ছবিখানি উল্টো ক'রে গ্যাখো—দেখবে, চারি দিকে গোল-বাঁধের মধ্যে একটি বিশুষ্ক জলাশয়!
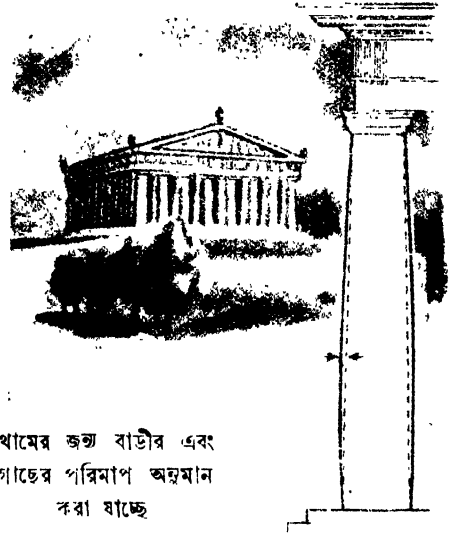
থামের জন্য বাড়ীর এবং গাছের পরিমাপ অনুমান করা যাচ্ছে

কেন এমন দেখি? ছায়া দেখে অনেক সময় আমরা আসল-বস্তুর কায়া অনুমান করি বলে' সত্য বস্তু প্রত্যক্ষ না ক'রলেও চোখের অভ্যাস বা অভিজ্ঞতার ফলে আমরা কাঠামো-মাত্র দেখে বাকী রূপটুকু অনুমানে গড়ে নিয়ে বহু বস্তুকে সমগ্ররূপে চোখের সামনে সমুদিত দেখি।

এই সব অতি-তুচ্ছ দর্শন-অভিজ্ঞতার ফলে এখন বুঝছো, আমাদের চোখ আমাদের সঙ্গে কতখানি ছলনা করে—চোখের দেখায় আমরা কত মারাত্মক ভুল করি!

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

য়ুরোপীয় যুদ্ধের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধরত পক্ষদ্বয় এখন পরস্পর প্রত্যক্ষ সজ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত। নয় মাস পূর্ব্বে তৃতীয় পক্ষকে অবলম্বন করিয়া এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়; পরে তৃতীয় পক্ষকে অবলম্বন করিয়াই যুদ্ধের পরিব্যাপ্তি ঘটিয়াছে। এই নয় মাসে পোল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হইয়াছে, নরওয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় ধুঁকিতেছিল—সেও আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ডেন্‌মার্ক জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে, হল্যাণ্ড ও বেল্‌জিয়াম্‌ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। আজ জার্ম্মাণী তাহার

গত য়ুরোপীয় মহাসমরের সময় ব্যাভেরিয়ান্‌ সেনাবাহিনীতে ল্যান্স-করপোর্যালবেশে হিটলার (× চিহ্নিত)

চিরন্তন প্রত্যক্ষ শত্রু ফ্রান্সের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিবার জন্য শাণিত তরবারি হস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইতেছে। এদিকে ইটালী পশ্চাদ্দিক হইতে ফ্রান্সকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পোল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হইবার পর যুদ্ধ-নিবৃত্তির জন্য জার্ম্মাণীর স্পষ্ট ইঙ্গিত যখন ব্যর্থ হইল, তখন হিট্‌লার প্রত্যক্ষ সজ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার কল্পনা সাময়িকভাবে ত্যাগ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রচণ্ড শীতে যুদ্ধ পরিচালনা সহজসাধ্য নহে; এই সময় চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া অর্থনীতিক সম্পদ আহরণে মনোযোগী হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাই, জার্ম্মাণী সুদীর্ঘ সাত মাস নিরপেক্ষ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে নানাভাবে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত রাখিয়া প্রধানতঃ অর্থনীতিক সম্পদ আহরণ করিয়াছে। "তড়িৎ গতি" যুদ্ধে যে এক সপ্তাহে এক বৎসরের গোলাগুলী ও খনিজ তৈলের প্রয়োজন হয়, ইহা হিট্‌লার বিস্মৃত হন নাই। আজ জার্ম্মাণীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করিয়া সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হইতেছে; জার্ম্মাণীর তথাকথিত নিষ্ক্রিয়তার সময় এই আক্রমণ শক্তি বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। শীতের অবসানে অর্থনীতিক সম্পদ আহরণের পথ অবরুদ্ধ হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনায় এবং প্রত্যক্ষ শত্রু বৃটেনের বিরুদ্ধে সামরিক সুবিধা লাভের আশায় জার্ম্মাণী ধূমকেতুর ন্যায় নরওয়েতে আবির্ভূত হয়, এবং তিন সপ্তাহের

ডিক্টেটার হিটলার

মধ্যে দক্ষিণ নরওয়েতে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া পশ্চিম য়ুরোপের প্রতি অবহিত হয়।

সম্প্রতি নরওয়ে-সরকার বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত সাহায্য না পাওয়ায় জার্ম্মাণ-বাহিনীর প্রতিরোধে বিরত হইয়াছেন। নরওয়ে হইতে মিত্র-শক্তির সৈন্য প্রত্যাহৃত হইয়াছে। নরওয়ের রাজা হাকন তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া বৃটেনে আগমন করিয়াছেন। নরওয়েতে প্রতিরোধ পরিত্যক্ত হইলেও নরওয়ে-সরকার অন্যত্র জার্ম্মাণীর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত থাকিবেন। এখন সমগ্র নরওয়েতে জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। নরওয়ে,

ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম অধিকার করায় বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণী বিশেষ সামরিক সুবিধা লাভ করিয়াছে—সে এই সকল অঞ্চল অধিকার করিয়া বৃটেনকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পরিবেষ্টিত করিয়াছে।

হল্যাণ্ড বিধ্বস্ত—

জার্ম্মাণীর হল্যাণ্ড বিজয়ের কাহিনী বিস্ময়কর; বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। ১০ই মে জার্ম্মাণী যুগপৎ হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গ আক্রমণ করে; তাহার পর পাঁচ দিনের মধ্যে হল্যাণ্ডের রাজপরিবার ও ওলন্দাজ-সরকার লণ্ডনে অপসারিত হয়,

হল্যাণ্ডের রাজ্ঞী উইলহেল্‌মিনা

এবং ওলন্দাজ বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। পোল্যাণ্ড বিধ্বস্ত করিতে জার্ম্মাণীর এক পক্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল; নরওয়েতে তাহাকে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় ব্যয় করিতে হয়; কিন্তু হল্যাণ্ডে পাঁচ দিনেই "সব শেষ"। হল্যাণ্ডের প্রধান বাহিনী আত্মসমর্পণ করিবার পর জীল্যাণ্ডে কিছুকাল সঙ্ঘর্ষ চলিয়াছিল, কিন্তু উহার গুরুত্ব তত অধিক নহে। জার্ম্মাণীর এই অস্বাভাবিক দ্রুত সাফল্যের কারণ চতুর্ব্বিধ। প্রথমতঃ, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জার্ম্মাণ-বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ; দ্বিতীয়তঃ, সৈন্যবাহী বিমানের সাহায্যে বিপুল সেনাবাহিনী ও সমরোপকরণ হল্যাণ্ডে প্রবেশ করায় ঐ দেশের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিফলতা; তৃতীয়তঃ, "পঞ্চম বাহিনী" নামক জার্ম্মাণ গুপ্তচরদিগের তৎপরতা; চতুর্থতঃ, আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে বেলজিয়ামের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং তজ্জন্য উত্তর-পূর্ব্ব বেলজিয়ামের পথে হল্যাণ্ড আক্রমণের সুযোগ। ইহা ব্যতীত, যান্ত্রিক সৈন্যের (mechanised army) বিপুলতা, ট্যাঙ্ক ও বিমানের সংখ্যাধিক্য এবং অভিনব রণকৌশলও জার্ম্মাণীর দ্রুত সাফল্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের অজ্ঞাত না থাকিলেও তাহারা অপ্রত্যাশিতভাবেই আক্রান্ত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে এই আক্রমণে জার্ম্মাণী প্রাথমিক সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই আক্রমণ এতদূর ব্যাপক, দ্রুত ও অভিনব যে, প্রতিরোধ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণ-বাহিনী প্রায় সমগ্র হল্যাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

এই আক্রমণে হল্যাণ্ডকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন করিয়াছিল—জার্ম্মাণীর সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী বিরাট বিমান-বাহিনী। হল্যাণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চল জলপ্লাবিত করিয়া শত্রুপক্ষকে বাধাদানের যে অনিন্দ্য-সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, এই অভূতপূর্ব্ব বিমান আক্রমণ নিবন্ধন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। লঘু অস্ত্রে সজ্জিত জার্ম্মাণীর যে "প্যারাস্যুট" বাহিনীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, হল্যাণ্ডে কেবল

হল্যাণ্ডের রাজকুমারী জুলিয়ানা

তাহারাই বিমান হইতে অবতরণ করে নাই—সহস্র সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্যও গুরুভার কামান সহ হল্যাণ্ডের বিভিন্ন অংশে অবতরণ করিয়াছিল। হেগ্‌স্থিত বৃটিশ-দূত স্যর নেভিল্ ব্লাণ্ড জার্ম্মাণীর এই সৈন্যবাহী বিমানগুলিকে "প্যারাস্যুট"-বাহিনী ও "পঞ্চম বাহিনী" অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "German troop-carrying planes landed thousands of men and howitzers in Holland." বিমানে হাওইজার কামান বাহিত হইবার সম্ভাবনা হয় ত তৎপূর্ব্বে কেহ কল্পনাও করে নাই।

তাহার পর জার্ম্মাণীর "পঞ্চম বাহিনী" নামক গুপ্তচর ও "প্যারাস্যুট বাহিনী"। হল্যাণ্ডে এই উভয় শ্রেণী পরস্পরের সহযোগিতায় কার্য্য করিয়াছে! "পঞ্চম বাহিনী" নামটির উৎপত্তি স্পেনে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় জেনারল ফ্রাঙ্কো যখন দক্ষিণ অঞ্চলে তাঁহার চারিটি বাহিনী লইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তিনি

…ক সময় বলিয়াছিলেন,—মাদ্রিদে তাঁহার "পঞ্চম বাহিনী" অবস্থান করিতেছে; মাদ্রিদ আক্রান্ত হইলে ঐ "পঞ্চম বাহিনী" আত্মপ্রকাশ করিবে। জেনারল ফ্রাঙ্কোর এই অসতর্ক উক্তির ফলে মাদ্রিদে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত জেনারল ফ্রাঙ্কোর আর এই "পঞ্চম বাহিনী"র প্রয়োজন হয় নাই—স্পেনের তৎকালীন সরকারপক্ষের মধ্য হইতেই "বিভীষণ" জুটিয়াছিল; জার্ম্মাণীর নরওয়ে অভিযানের পর সীনর আজানা প্রভৃতি হয় ত এই ব্যক্তিকে "কুইস্লিং" নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, হল্যাণ্ডে "পঞ্চম বাহিনী" নামক জার্ম্মাণীর গুপ্তচরগণ "প্যারাস্যুট বাহিনীর" সহযোগিতায় দারুণ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে; ইহাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হল্যাণ্ডের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অচিরে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। হল্যাণ্ড যখন য়ুরোপীয় যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল, সেই সময় বহু সংখ্যক জার্ম্মাণ বিভিন্ন বেশে হল্যাণ্ডে প্রবেশ করে। হল্যাণ্ড আক্রান্ত হইবার পর ইহারা "পাওয়ার হাউস্", "টেলিফোন্

নরওয়ের রাজা হাকন্

এক্চেঞ্জ" প্রভৃতি ধ্বংস করে, বিভিন্ন স্থানের সেতুগুলির বিলোপ সাধন করে, স্থানে স্থানে ওলন্দাজ সৈন্যগণকে পশ্চাদ্দিক্ হইতে আক্রমণ করে। প্যারাস্যুটের সাহায্যে যে সকল সৈন্য জার্ম্মাণ বিমান হইতে অবতরণ করিয়াছিল, তাহারা এই সকল গুপ্তচরদিগের সহযোগিতায় কার্য্য করে। বহু ওলন্দাজও এই "পঞ্চম বাহিনী"র অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে সকল প্যারাস্যুট সৈন্য ধৃত হয়, তাহাদিগের নিকট হইতে "পঞ্চম বাহিনী"র জার্ম্মাণ ও ওলন্দাজ সদস্যদিগের নামের তালিকা এবং সামরিক প্রয়োজনে কোন্ কোন্ স্থান ধ্বংস করা অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। "পঞ্চম বাহিনী"র সহযোগিতায় যেমন এক দিকে আক্রমণকারী জার্ম্মাণগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল, তেমনই অন্য দিকে ইহাদিগের ক্রিয়াকলাপ ওলন্দাজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়া দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছিল। গৃহদ্বারে শত্রু; গৃহের অভ্যন্তরেও কে শত্রু কে মিত্র, তাহা বুঝিবার উপায় নাই! এই অবস্থা যে কত দূর ভীষণ, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে কিরূপে বুঝিবে?

চতুর্থতঃ, বেলজিয়মের ম্যাস্ট্রিক্টের নিকটবর্ত্তী অতীব প্রয়োজনীয় সেতুটি দুর্ভাগ্য বশতঃ যথাসময়ে বিধ্বস্ত হয় নাই। ইহার ফলে জার্ম্মাণ বাহিনী অনায়াসে হল্যাণ্ডে এবং উত্তর বেলজিয়মে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে কর্ম্মচারীটির উপর এই সেতু ধ্বংস করিবার ভার ন্যস্ত ছিল, তিনি পূর্ব্বেই জার্ম্মাণীর বিমান-আক্রমণে নিহত হইয়াছিলেন। পরে, জনৈক বেল্জিয়ান্ এন্জিনিয়ারের আত্মোৎসর্গের ফলে সেতুটি চূর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন জার্ম্মাণ বাহিনীর গতিরোধ করিবার আর উপায় ছিল না। এই সেতুটি যথা-সময়ে ধ্বংস না হওয়ায় জার্ম্মাণ বাহিনী বেলজিয়মের অ্যাল্বার্ট খালের নিকটবর্ত্তী প্রতিরোধ-ব্যবস্থা বিফল করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তখন বেল্জিয়াম যে কেবল পূর্ব্ব দিকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত হইয়া পড়ে, তাহাই নহে, বেল্জিয়ামের সহিত হল্যাণ্ডের সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়, এবং জার্ম্মাণ বাহিনী এই পথে অনায়াসে হল্যাণ্ডে প্রবেশ করে।

প্রধানতঃ এই চারিটি কারণেই জার্ম্মাণী এত দ্রুত এবং নাটকীয়ভাবে হল্যাণ্ড-বিজয়ে সমর্থ হইয়াছে।

জার্ম্মাণ বাহিনী নরওয়েতে অভিযানের সময় যেমন নরওয়ে-রাজ হাকনকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, হল্যাণ্ডেও তাহারা তেমনই হল্যাণ্ডের সিংহাসনাধিষ্ঠিতা বৃদ্ধা রাজ্ঞী উইলহেল্মিনাকেও বন্দিনী করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল। তাহাদিগের এই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্যই রাজ্ঞী উইলহেল্মিনার কন্যা রাজকুমারী জুলিয়ানা এবং তাঁহার স্বামী প্রিন্স বার্ণহার্ড প্রথমে ইংলণ্ডে গমন করেন; তাহার পর রাণী উইলহেল্মিনা স্বয়ং ইংলণ্ডের রাজা ও রাণীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এদিকে জার্ম্মাণ বাহিনী ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া হল্যাণ্ডের প্রায় পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হওয়ায়, তৎপূর্ব্বে বিমান হইতে যে জার্ম্মাণ বাহিনী রটারডমে অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত যোগদানে সমর্থ হয়। তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকা নিরর্থক মনে করিয়া ওলন্দাজ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে; সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণীর হল্যাণ্ড অভিযান একপ্রকার শেষ হইয়া যায়। ইহার পর কিছুকাল জীল্যাণ্ডে মিত্রশক্তির সৈন্যের সহযোগিতায় ওলন্দাজ বাহিনী যুদ্ধে রত ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই।

সমগ্র হল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হইবার পূর্ব্বেই ওলন্দাজ সরকার ও রাজপরিবার দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করায় ওলন্দাজ নৌ-বাহিনী ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, এবং ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং গায়নায় ওলন্দাজ সরকারের কর্তৃত্ব এখনও পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধের চরম জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে প্রাচী অথবা প্রতীচীর কোন সাম্রাজ্যকামী শক্তি যদি ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি গ্রাস না করে, তাহা হইলে ওলন্দাজ সরকার আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে আপনার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

পূর্ব্ব-ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ—

হল্যাণ্ড জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় ওলন্দাজ-অধিকৃত পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে, এইরূপ

আশঙ্কা করা হইতেছিল। কিন্তু জাপান এখন পর্য্যন্ত আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে নাই; সে জানাইয়াছে যে, অন্য কোন শক্তি

একটি বিরাটকায় ট্যাঙ্ক, চালক ও তাহার সহকারীর কর্ণে বেতার-যন্ত্র সংযুক্ত রহিয়াছে

যদি ঐ দ্বীপপুঞ্জের বর্ত্তমান অবস্থা ক্ষুণ্ণ না করে, তাহা হইলে সে ও ঐ দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে তাহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন করিবে না। সম্প্রতি জাপানের পর-রাষ্ট্রসচিব মিষ্টার অরিত' পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন— জাপান ঐ দ্বীপপুঞ্জের সহিত তাহার অর্থনীতিক সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত। এই উক্তির বিশদার্থ এই যে, ঐ দ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতিক সম্পদ শোষণে জাপানের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হইলে উহার বর্ত্তমান রাজনীতিক ব্যবস্থায় সে হস্তক্ষেপ করিবে না। অর্থনীতিক সম্পদ শোষণের অপ্রতিহত অধিকার লাভ করিলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি যে সময় ঐভাবে শোষিত দেশের রাজনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করে, চীন দেশেই ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। চীনে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঐ দেশের অর্থনীতিক সম্পদ শোষণের সমান অধিকার সম্ভোগের উদ্দেশ্যে আটটি শক্তি ঐ দেশের রাজনীতিক স্বাধীনতা ও রাজ্যগত অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। ইহার কারণ, কোন একটি অথবা একাধিক প্রবল শক্তি ঐ অঞ্চলে রাজনীতিক অধিকার বিস্তার করিলে অন্য শক্তিগুলির অর্থনীতিক সম্পদ শোষণের অধিকার ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কেও মনে হয়, বিভিন্ন প্রবল শক্তির অর্থনীতিক সম্পদ শোষণের সমান অধিকার সম্ভোগের চেষ্টায় ঐ দ্বীপপুঞ্জের রাজনীতিক ব্যবস্থা হয় ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

হল্যাণ্ড অধিকার করিয়া জার্ম্মাণী বৃটেনের বিরুদ্ধে বিশেষ সামরিক সুবিধা লাভ করিয়াছে। হল্যাণ্ড বিজয়ের পর হিটলার জার্ম্মাণ বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, এই বিজয়ের সামরিক সুবিধা পরে উপলব্ধ হইবে। বস্তুতঃ, হল্যাণ্ড অধিকারের পর জার্ম্মাণ বিমানগুলির পক্ষে এক ঘণ্টার মধ্যে বৃটিশ উপকূলে পৌছিবার সুবিধা হইয়াছে; হল্যাণ্ডের উপকূলে জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ-ঘাঁটিও এতদিনে স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে। রটারডেম্ ও হেগের বিমানঘাঁটা এবং হল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের সাবমেরিণ-ঘাঁটা জার্ম্মাণীকে যে সামরিক সুবিধা দিয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতেছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। সামরিক সুবিধা ব্যতীত, জার্ম্মাণী হল্যাণ্ড অধিকার করিয়া অর্থনীতিক বিষয়ে যে সুবিধা লাভ করিয়াছে, তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। হল্যাণ্ড কৃষিপ্রধান দেশ; তথায় আলু, গম জুই প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বিভিন্ন দেশে রপ্তানী সম্বন্ধে হল্যাণ্ডের খ্যাতি বিশ্ববিদিত। ডেনমার্ক হইতে ডিম ও মাংস সংগ্রহের সুযোগ লাভের পর জার্ম্মাণীর হল্যাণ্ড অধিকারে তাহার সেনাবাহিনীর আহার্য্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে।
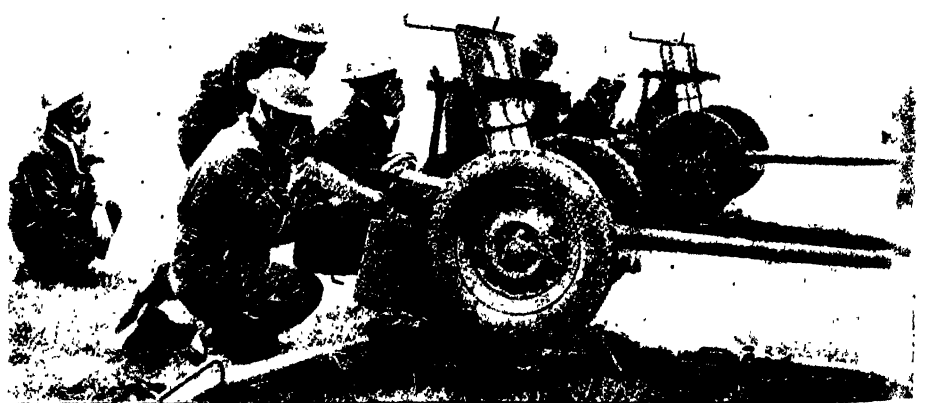
কয়েকটি ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান

বেলজিয়াম্ ও উত্তর ফ্রান্স—

ম্যাস্‌ট্রিক্টের সেতু ধ্বংস না হওয়ায় জার্ম্মাণ বাহিনী যেভাবে বেলজিয়ামে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, সেই কাহিনী পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ বাহিনী বেলজিয়ামে প্রবেশ

করিবার অব্যবহিত পরে আর একটি বাহিনী মিউস্ নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তর ফ্রান্সে প্রবেশের চেষ্টা করে। এই স্থানের সেতু যথাসময়ে ধ্বংস না হওয়ায় জার্ম্মাণ বাহিনী উত্তর ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া সেডানে ফরাসী বাহিনীকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করে। ফরাসী সামরিক বিভাগের কোন কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই হউক, অথবা কর্ত্তৃব্য-ক্তিগণের শৈথিল্য বশতঃই হউক, মিউস নদীর সেতু ধ্বংস না হওয়ায় জার্ম্মাণ বাহিনী [illegible] না জানে [illegible] ন ভেদ করিয়া ফ্রান্সের [illegible]য় পদার্পণ করে, এবং অল্প কালের মধ্যেই [illegible] নদী পর্য্যন্ত [illegible] বিস্তার করে। মিউস্ নদীর সেতু ধ্বংস না করা ফরাসী [illegible] যে কতদূর অমার্জ্জনীয় অপরাধ, তাহা ফরাসী প্রধান-মন্ত্রী মঃ রেণোর উক্তিতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। মঃ রেণো বলিয়াছেন—By reason of incredible mistakes which will be punished—the bridges over the Meuse were not blown-up. মিউস্ নদীর সেতু [illegible] সম্পর্কে ফরাসী সামরিক বিভাগের এই [illegible] ক্রটির সহিত প্রধান সেনাপতির পদ হইতে জেনারল গ্যামেলার অপসারণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান-সাপেক্ষ।

সম্মিলিত বাহিনার প্রধান সেনাপতি জেনারল ওয়েগা

জার্ম্মাণ বাহিনী বেলজিয়াম্ ও উত্তর ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া [illegible] রণনীতির সাহায্যে অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে, প্রথমতঃ, [illegible]গণের সহযোগিতায় তাহার গুরুভার ট্যাঙ্কগুলি পুরোভাগে [illegible] করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তাহার পশ্চাতে বিপুল [illegible] বাহিনী প্রচণ্ডবেগে অগ্রসর হইতে থাকে। এই রণকৌশলে জার্ম্মাণদিগের প্রভূত ক্ষতি হইলেও তাহাদিগের গতিরোধ করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়াছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর ফ্রান্সের আর্রা, এমিয়েঁ, রেথেল্ প্রভৃতি জার্ম্মাণদিগের অধিকারভুক্ত হয়; ২৪শে মে জার্ম্মাণ বাহিনী ফরাসী উপকূলবর্ত্তী বন্দর বোলোঁয় প্রবেশ করে; এদিকে বেল্‌জিয়ামেও জার্ম্মাণ বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হওয়ায় বেল্‌জিয়ামের রাজধানী ব্রুসেল্‌স্ হইতে অষ্টেণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। তাহার পর, ক্রমে ব্রুসেল্‌স্, লুভেন্, এণ্টওয়ার্প প্রভৃতি স্থান জার্ম্মাণ বাহিনীর পদানত হয়। বেল্‌জিয়ান্ ও ফরাসী ফ্লাণ্ডার্শে একটি ত্রিকোণ স্থানে বৃটিশ, ফরাসী ও বেল্‌জিয়ান্ সৈন্য জার্ম্মাণ বাহিনীর সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামে শক্তি পরীক্ষা করিতে থাকে।

জার্ম্মাণ বাহিনী ফ্রান্সে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ রেণো তাঁহার মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন করেন, এই নবগঠিত মন্ত্রিসভায় প্রবীণ সেনাপতি মার্শাল পিতেঁ সহকারী প্রধান সচিবের পদে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং মার্শাল ফসের যোগ্য শিষ্য জেনারল ওয়েগা সম্মিলিত সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র সেনাপতি নিযুক্ত হন। জেনারল ওয়েগা যখন জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণের কল্পনা করিতেছিলেন, সেই সময় এমন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল, যে জন্য ফ্লাণ্ডার্শে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীকে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন হইতে হইল।

রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণ—

বেল্‌জিয়াম্ আক্রান্ত হইবার পর হইতে বেল্‌জিয়ামের রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড রণক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে বেল্‌জিয়ান্ বাহিনী ১৮ দিন বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। ২৮শে মে প্রাতে বৃটিশ ও ফরাসী সহযোদ্ধৃগণকে কোন সংবাদ না জানাইয়াই রাজা লিওপোল্ড তাঁহার সমগ্র সেনাবাহিনী সহ অকস্মাৎ জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাজা লিওপোল্ড তাঁহার মন্ত্রিবর্গের সহিতও পরামর্শ করেন নাই। রাজা লিওপোল্ডের এই কার্য্যের ফলে এই অঞ্চলের সমগ্র বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হয়। রাজা লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ফ্লাণ্ডার্শে মিত্রশক্তির সৈন্য প্রায়

যুদ্ধে লিপ্ত গ্যাস মুখোস পরিহিত সৈন্য; যুদ্ধরূপী পাশবিক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইবার জন্য মানুষকে এইরূপ পশুর রূপ ধারণ করিতে হইয়াছে

জার্ম্মাণবাহিনী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিল; মাত্র একটি বন্দর—ডানকার্কের পথে তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তনের সুযোগ ছিল। এমিয়েঁর সহিত যোগদানের সকল চেষ্টা পূর্ব্বেই বিফল হইয়াছিল। ডানকার্কের পথেই সৈন্যদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ হইতেছিল। মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী ডানকার্কের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক রক্ষা করিতেছিল; উত্তর ও পূর্ব্ব দিক বেলজিয়ান্ বাহিনী

রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড

কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল। এই সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে রাজা লিওপোল্ড আত্মসমর্পণ করায় উত্তর ও পূর্ব্ব দিক অরক্ষিত হয়, এবং এই অঞ্চলের সমগ্র ফরাসী ও বৃটিশবাহিনীকে একপ্রকার নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়।

রাজা লিওপোল্ড কিরূপ অবস্থায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় নাই। তবে তাঁহার স্বদেশবাসী ও প্রতিবেশিগণ তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক, জার্ম্মাণীর চর প্রভৃতি সুমিষ্ট সম্ভাষণে অভিনন্দিত করিয়াছে। তিনি যেরূপ সঙ্কটজনক অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হউন, তাঁহার পরিচালনাধীন বেলজিয়ান্ সৈন্যমণ্ডলী ১৮ দিন বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। এই অল্পকালের মধ্যে ৮ লক্ষ বেলজিয়ান্ সৈন্যের ৫ লক্ষ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় দেহপাত করিয়াছিল। জার্ম্মাণ বাহিনীকে প্রতিরোধের আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় বৃথা সৈন্যক্ষয় নিবারণের জন্য যদি রাজা লিওপোল্ড আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার ঐরূপ সিদ্ধান্ত সহযোদ্ধৃগণকে না জানাইবার কারণ বুঝা যায় না। রাজা লিওপোল্ড কেন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, কেন তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত সহযোদ্ধৃগণকে জ্ঞাপন করেন নাই, সেই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য ভবিষ্যতে নিশ্চিতই উদ্ঘাটিত হইবে, বর্ত্তমান উত্তেজনার সময় এই সম্পর্কে কোন নিশ্চিত অভিমত গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। সে যাহা হউক, রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণে বেলজিয়ান্ সরকারের সমর-প্রচেষ্টার অবসান হয় নাই; বেলজিয়ান্ মন্ত্রিসভা রাজার এই কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই। তাঁহারা প্যারিসে প্রতিনিধি-সভার অধিবেশন আহ্বান

রাজা লিওপোল্ড তাঁহার সেনাবাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন

করিয়া অবশিষ্ট বেলজিয়ান্ সৈন্য ও বেলজিয়ান্ উপনিবেশের সাহায্যে বৃটেন্ ও ফ্রান্সের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিপন্ন সৈন্য অপসারিত—

রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণের ফলে যে বিরাট সঙ্কট নিশ্চিত বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, বৃটিশ নৌবিভাগ ও বিমান বিভাগের অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব অদ্ভুত তৎপরতায় সেই আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বৃটেনের ২৮খানি রণপোত এবং ৬৫০খানি অন্যান্য জাহাজ পাঁচ দিন দিবারাত্রি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। এই সময় মিত্রপক্ষের পশ্চাৎগামী সেনাবাহিনী প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে; জার্ম্মাণী তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা বিমান হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছে; চতুর্দ্দিক হইতে করকাঘাতের ন্যায় কামানের গোলা ছুঁড়িয়াছে। মাইন পাতিয়া সমুদ্রবক্ষ বিপদসঙ্কুল করিয়াছে। এইভাবে সর্ব্বপ্রকার মারণাস্ত্রের সম্মুখীন হইয়াও বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাদ্গমন

রয়াছিল। বিমানশক্তিতে জার্ম্মাণী সম্মিলিত পক্ষ অপেক্ষা প্রবল হইলেও জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীকে প্রতিরোধ করা যে সম্ভব, তাহা এই সময় বৃটিশ বিমান-বাহিনী প্রতিপন্ন করিয়াছে; প্রধানতঃ, তাহাদিগের দ্বারা জার্ম্মাণ বিমানবাহিনীর গতি ব্যাহত হওয়াতেই মিত্রশক্তির স্থল-সৈন্যের নিরাপদ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ সম্ভব হইয়াছিল। মিষ্টার চার্চ্চিল এই অপসারণ কার্য্যকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন - Wars are not won by evacuations, but there is victory inside deliverance. এই সৈন্য-অপসারণে বৃটিশ নৌবিভাগ ও বিমান বিভাগের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইলেও বেলজিয়ামের এই ঘটনা মিত্রশক্তির পক্ষে বিরাট সামরিক বিপর্য্যয়। ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার সৈন্য অপসারিত হইলেও বহু সৈন্য বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রায় ১০০০ কামান শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছে, এবং সেনাবাহিনীর সহিত বিভিন্ন প্রকারের যত যান ছিল, তাহাও প্রায় সকলই বিধ্বস্ত হইয়াছে। মিষ্টার চার্চ্চিল এই ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ফরাসী সেনাবাহিনী আজ দুর্ব্বল, বেলজিয়ান্ বাহিনী আর নাই; যে সকল সুরক্ষিত প্রতিরোধ-ব্যবস্থার উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল, তাহা গিয়াছে; বহু [illegible] খনি এবং কারখানা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে; ইংলিশ-চ্যানেলীর বন্দরগুলি (অষ্টেণ্ড, ডানকার্ক, ক্যালে ও বোলোঁ) আজ শত্রুর অধিকারভুক্ত।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার চার্চ্চিল

যুদ্ধের নূতন অধ্যায়—

ফ্লাণ্ডার্শের যুদ্ধের অবসান হইবার পর কালবিলম্ব না করিয়া জার্ম্মাণী ব্যাপকভাবে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। ৫ই জুন প্রান্তে দেড় শত মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রে এই আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে জার্ম্মাণ বাহিনী ক্রমেই অগ্রসর হইয়াছে। জার্ম্মাণ বিমানের অবিরাম বোমা বর্ষণের জন্ম ফ্রান্সের সরকারী দপ্তরখানা প্যারিস হইতে স্থানান্তরিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

হিটলার তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহার [illegible] তিনি জানেন—তাঁহার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা আটলান্টিকের অপর [illegible] শান্তিপ্রিয় জাতিটিকে বিচলিত করিয়াছে। অবিলম্বে যদি [illegible] রাইফেল-স্কন্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের পার্শ্বে সহযোগিতার জন্ম দণ্ডায়মান না-ও হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও আনুকূল্যে বৃটেন ও ফ্রান্সের শক্তি যে প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। সুতরাং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্বে অবস্থা আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই জন্য ফ্লাণ্ডার্শের যুদ্ধাবসানের পর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি জার্ম্মাণ বাহিনীকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছেন।

হিটলার এতদিন বৃটেন ও ফ্রান্সের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার কূটনীতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি এই উদ্দেশ্যে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে উত্তর অঞ্চলের চারিটি প্রধান বন্দর অধিকার করিয়া তিনি বৃটেন ও ফ্রান্সের সর্ব্বপ্রকার যোগসূত্র ছিন্ন করিয়াছেন। এখনও দক্ষিণ অঞ্চলে লা হেভের ও চারবুর্গ বন্দর ফ্রান্সের অধিকারে রহিয়াছে। এই পথ যাহাতে বৃটেনের সহিত সংযোগ-রক্ষার জন্ম ব্যবহৃত হইতে না পারে, তজ্জন্য এই সকল অঞ্চলে অবিরাম বোমা বর্ষিত হইতেছে। হিটলার বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিচালনা সম্পর্কে কূটনীতি ও সামরিক বিষয়ে ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বৃটেন ও ফ্রান্সের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফ্রান্সকে পৃথক্ভাবে নিষ্পেষিত করিবার উদ্দেশ্যে হিটলার ঠিক এই সময়ে মুসোলিনীকে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

ইটালীর যুদ্ধ-ঘোষণা—

১০ই জুন ইটালী বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। গত ৫ই জুন জার্ম্মাণী যখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ করে,

মুসোলিনী

সেই দিনই মুসোলিনীর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জনরব প্রচার হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, ইটালী ও জার্ম্মাণী একই সময়

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিবে, এইরূপ স্থির ছিল। পরে, হিটলার হয় ত কোন বিশেষ কারণে মুসোলিনীকে পাঁচ দিন অপেক্ষা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। আজ জার্ম্মাণ বাহিনীর আক্রমণে ফ্রান্স যখন বিপন্ন, তখন ইটালীর যুদ্ধ-ঘোষণার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। এই সময় দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে ইটালীর ব্যাপক আক্রমণে ফ্রান্সের ভাগ্যে কি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। তাহার পর, স্পেনেরও মনোভাব সন্দেহজনক। জেনারেল ফ্রাঙ্কো যে স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় ইটালীর সৈন্য ও সমরোপকরণ ব্যবহার করিয়াই জয়ী হইয়াছিলেন, তাহা কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন? বেলিয়ারিক্ দ্বীপপুঞ্জ এবং স্পেন যদি ইটালী ঘাঁটীরূপে ব্যবহার করিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ হওয়া বিচিত্র নহে।

ইটালী কেন যুদ্ধ ঘোষণা করিল—বৃটেন্ ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাহার কি অভিযোগ ছিল, তাহা বিশ্বের কেহ জানে না। বস্তুতঃ, যুদ্ধ ঘোষণার সময় ইটালীর পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট সিয়ানো এই প্রশ্নের কোন সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই। সুইয়েজ জিবুতি-টিউনিস্-কর্সিকাসংক্রান্ত ইটালীর দাবীর বিষয় হয় ত বিনা যুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারাও মীমাংসা করা সম্ভব হইত। যুদ্ধ ঘোষণার সময় রোমের প্যোলাজ্জো ভেনজ্বিয়ার অলিন্দ হইতে মুসোলিনী নাটকীয় ভঙ্গীতে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতেও যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গত কারণ তিনি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মুসোলিনী যতই অসার কথার জাল বয়ন করুন না কেন, প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইটালী ও জার্ম্মাণী বিশ্বজগৎকে জানাইতে চাহিতেছে—"পশুশক্তিতে আমরা যখন প্রবল, তখন জগৎকে সম্ভোগ করিবার পূর্ণ অধিকার আমরা পাইব না কেন?" বস্তুতঃ, ইটালী য়ুরোপের এই সঙ্কটের সময় তাহার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যেই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধে যদি জার্ম্মাণী ও ইটালী জয়ী হয়, তাহা হইলে "মানিকজোড়" হিটলার ও মুসোলিনী কিভাবে য়ুরোপীয় অঞ্চল ও উপনিবেশগুলি আপনাদিগের মধ্যে বাঁটিয়া লইবেন, তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এই যুদ্ধ হইতে ইটালী কখনও দূরে থাকিতে পারে না; বস্তুতঃ, সে কখনও দূরে ছিলও না। তথাকথিত নিরপেক্ষতার সময় সে সর্ব্বতোভাবে জার্ম্মাণীকে সাহায্য করিয়াছে; এই সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যেই হিটলার ইচ্ছা করিয়াই যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় ইটালীকে নিরপেক্ষ রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্ব্ব হইতে হিটলার ও মুসোলিনী ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, সেই অনুসারে তাঁহারা এখন কার্য্য করিতেছেন।

কাউণ্ট সিয়ানো

জেনারল ফ্রাঙ্কো

ইটালীর যুদ্ধ ঘোষণার ফলে তুরস্ক কিরূপ নীতি গ্রহণ করে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত তুরস্কের পূর্ব্বের চুক্তি অনুসারে ভূমধ্যসাগরে বর্ত্তমান ব্যবস্থা হইলে সে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য। ইটালীর যুদ্ধ ঘোষণা রুশিয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিবে বলিয়া মনে হয় না। গত কি কালের আন্তর্জ্জাতিক আবহাওয়া লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে বলকান্ অঞ্চল সম্পর্কে জার্ম্মাণীর মধ্যস্থতায় ইটালী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে হয় ত কোনরূপ মীমাংসা হইয়াছে। বলকান্ অঞ্চল সম্পর্কে ইদানীং সোভিয়েট রুশিয়া অথবা ইটালী কোনরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। ইটালীর যুদ্ধ ঘোষণায় আমেরিকা বিশেষ চঞ্চল হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মুসোলিনীকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সে যাহা হউক, আমেরিকার এই চাঞ্চল্য অদূর ভবিষ্যতে তাহার যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সূচনাও মনে করা যাইতে পারে। ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিজয় কখনও গণতান্ত্রিক আমেরিকার কাম্য হইতে পারে না; তাহার পর দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বহুদিন হইতে বিরোধ চলিতেছে। ঐ অঞ্চলে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলি গোপনে দল-গঠন ও প্রচারকার্য্য বহুকাল হইতেই চালাইতেছে। কাজেই, পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে ফ্যাসিষ্ট-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অদূর-ভবিষ্যতে পশ্চিম-গোলার্দ্ধেও ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারের আশঙ্কা প্রবল হইবে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সত্বর বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে অস্ত্রধারণ করা সম্পূর্ণ সম্ভব।

শ্রীঅতুল দত্ত।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট

বাঙ্গালার ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য সরকার যে কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সেই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া কেহ যে সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছেন, এরূপ ধারণা করা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কমিশনের সদস্যদিগের মধ্যে আলোচ্য বিষয় ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতের ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কমিশনের গঠনপদ্ধতিতে যে প্রকার অসঙ্গত ব্যবস্থা লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা বিস্ময়জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, কোন দেশের কোন কমিশনের গঠনে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কমিশন যখন তাঁহাদের তথ্যানুসন্ধান-কার্য্য শেষ করিয়া-ফেলিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট লিখিবার জন্য লেখনী ধারণে উদ্যতপ্রায়—সেই অন্তিম মুহূর্ত্তে বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ ঐ কমিশনের সঙ্গে আরও তিন জন অতিরিক্ত সদস্য জুড়িয়া দিয়াছিলেন। সব ... মাথার মুণ্ড চর্ব্বণ করিয়া অন্য কোন দেশের কোন সরকার যে এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, ইহা বিশ্বাস করা অসাধ্য। বিশেষতঃ, যে কয় জন ভদ্রলোককে এই কমিশনের সদস্যগণের সঙ্গে যে ভিড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের অন্য সব গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত নহেন।

অধিকাংশ সদস্যের রিপোর্টে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঐ তিন জন সদস্যের এক জন মাত্র হিন্দু ছিলেন,—তিনি মেজরিটী রিপোর্টের স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে একমাত্র হিন্দু; ... 'সবে ধন নীলমণি।' মেজরিটী রিপোর্ট লেখকদিগের একমাত্র মতলব এই যে, তাঁহারা চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত তুলিয়া দিতে চাহেন। তাঁহারা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য যুক্তিই দিতে পারেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িলেই মনে হয়, যেন উহা সযত্নপোষিত কাকাতুয়ার বাঁধা বুলির মত শিখানো বুলির প্রতিধ্বনি মাত্র! চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপসাধনে বাঙ্গালায় কৃষির এবং কৃষীবলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে কি না, তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে এই প্রসঙ্গের অবতারণা একেবারেই করেন নাই। মেজরিটী রিপোর্ট-লেখকগণ কৃষীবলকে তাহাদের যোতের জমির স্বত্বাধিকার দিবার প্রস্তাবও করেন নাই। তাঁহারা সরকারকেই জমিদারী স্বত্ব দিতে চাহিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে যে কৃষিক্ষেত্রে অধিক ফসল উৎপন্ন হইবে, অথবা কৃষীবলের অবস্থা উন্নত হইবে, তাহার স্পষ্ট কোন দৃষ্টান্তই তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই। ইহার ফলে কৃষকদিগের জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইবে,—ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন, "সরকার যদি ভূস্বামী হন, তাহা হইলে ভূমির রাজস্বের পরিমাণ বরাবর একরূপ থাকিবে, ইহা মনে করা ভুল।" সে কথা ... লোক স্বীকার করেন।

কৃষককে অধিক খাজনা দিতে হইবে; এবং তাহার ফলে কি দাঁড়াইবে, তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষভাবে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। ভারতে সরকার যেখানে ভূস্বামী, সেই স্থানের কথার আলোচনা উপলক্ষে দত্ত মহাশয় প্রায় ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে সরকারী ভূস্বামিত্বের অধীন প্রজাদিগের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—To screw up the land-tax to the "full" amount and then to allow remissions is to keep cultivators always on the brink of famines and starvation. ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, ভূমির খাজনা একেবারে পূর্ণমাত্রায় ধার্য্য করিয়া, যে বার শস্য হয় না, সেবার খাজনা মকুব করিলে, কৃষীবলকে সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষ এবং অনশনের কবল-সান্নিধ্যে স্থাপন করা হয়। (Vide the "Hindu" 29 March 1902)। এ কথা খুবই সত্য। তিনি ঐ সন্দর্ভে আরও বলিয়াছিলেন যে, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তীকৃত বঙ্গদেশে খাজনার হার অল্প, সেই জন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মারাত্মক বা লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালায় ঘটে নাই।" সে সকল কথার আলোচনার স্থান এখানে নাই,—প্রয়োজনও যে বিশেষ আছে, তাহাও মনে হইতেছে না। কারণ, এই কমিশনের অধিকাংশ সদস্য যুক্তিতর্কের, দৃষ্টান্তের, ও তথ্যের উপর নির্ভর না করিয়া যেন কেবল তাঁহাদের পূর্ব্বগঠিত সংস্কার-বলে চালিত হইয়াই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

তাঁহারা বলিয়াছেন, ক্ষেতের ফসল পাকিবার পরই প্রজার নিকট হইতে খাজনা তলব ও আদায় করা কর্ত্তব্য; এবং প্রজার জমা বিক্রয় করিয়া বাকী খাজনা আদায় করাই ঠিক। মেজরিটী রিপোর্টে স্বাক্ষরকারীরা স্পষ্টই বলিয়াছেন,—জমিদাররা খাজনা ফেলিয়া রাখেন বলিয়া প্রজাদিগের যত অসুবিধা ঘটে। কিন্তু তাঁহাদিগকে একথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, জমিদাররা কি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য খাজনা ফেলিয়া রাখেন? খাজনা দেওয়ার অসুবিধা হইলেই প্রজারা বলে, খাজনা পরে দিবে। জমিদার প্রজার সেই আবেদন গ্রাহ্য করেন বলিয়াই কি সকল দোষ তাঁহারই স্কন্ধে নিক্ষেপ করিতে হইবে? ইহা কি সঙ্গত? মেজরিটী রিপোর্টের ৮০ হইতে ৮৮ পারাগ্রাফে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ৯টি দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুই তিনটি ভিন্ন অন্য দোষ ন্যায়তঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া যায় না।

মেজরিটী রিপোর্ট-লেখকগণ লর্ড কর্জ্জনের সমালোচনার কথা তুলিয়াছেন—কিন্তু স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহা খণ্ডন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, সে কথার উপর তাঁহারা তেমন জোর দেন নাই। জমিদারদের অধিকাংশই হিন্দু; সুতরাং তাঁহাদের তহশিলদারদেরও অধিকাংশই হিন্দু। সমগ্র জমিদারী-সরকারে ৪৪ হাজার তহশিলদার ও অন্যান্য আদায়কারী কর্ম্মচারী আছেন; তদতিরিক্ত নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিসংখ্যাও প্রায় ৮ হাজার। উহাদিগের মধ্যে আদায়কারী মুসলমান কর্ম্মচারিগণের সংখ্যা অল্প—শতকরা ১৬ জন মাত্র; ইহার কারণ, ঐ সকল কার্য্যে পারদর্শী, যোগ্য মুসলমান কর্ম্মচারী অতি অল্পই পাওয়া যায়। জমিদারী খাসে আসিলে

ঐ সকল কর্ম্মচারীর চাকরী বজায় থাকিবে না; তাহারা পদচ্যুত হইলে তাহাদের পরিবর্ত্তে সম্প্রদায় হিসাবে মাথা গণ্তি ন্যূনকল্পে শতকরা ৫০ জন মুসলমান কর্ম্মচারী নিয়োগের দাবী করা চলিবে। কারণ, সচিবশ্রেষ্ঠ মৌলভী ফজলুল হক পূর্ব্বেই গাহিয়া রাখিয়াছেন যে, "মুসলমান কর্ম্মচারীরা মুসলমান চাষীদিগের সংস্রবে আসিবার অধিকতর যোগ্য।" পূর্ব্ববঙ্গের বার আনা অধিবাসী মুসলমান; সুতরাং ঐ অঞ্চলে আদায়কারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন মুসলমান নিয়োগের ধূয়া উঠিবে,—এ বিষয়ে কি সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে? অতএব বাতাস কোন্ দিকে বহিতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিতেছে কে? জমিদারী খাসে আসিলে সাবডেপুটী এবং কানুনগোর দ্বারাই বাকী খাজনার মামলা মীমাংসিত হইবে। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ এবং গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী যে স্বতন্ত্র রিপোর্ট লিখিয়াছেন, স্থানাভাবে আমরা তাহার আলোচনায় বিরত থাকিলাম।

—

পাটের অর্ডিনান্স

বাঙ্গালার গবর্ণর সার জন আর্থার হার্ব্বার্ট গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার কলিকাতা-গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় পাট এবং চট বিক্রয়ের ফাট্‌কা বাজারের সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বনিম্ন দর ধার্য্য করিয়া এক অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। ভারতশাসন আইনের ৮৮ ধারায় প্রথম উপধারাতে যে ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণরদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই ক্ষমতা অনুসারেই তিনি এই অর্ডিনান্স জারি করিতে পারিয়াছেন। অথচ এ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শদাতা তাঁহার সচিবমণ্ডলী। এই অর্ডিনান্স দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চারি শত পাউণ্ড (অর্থাৎ প্রায় ৪ মণ ৩৫ সের) ওজনের পাটের গাঁইট কেহই সর্ব্বনিম্ন মূল্য ৬০৲ টাকা অপেক্ষা অল্প দরে, এবং সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৯০৲ টাকা অপেক্ষা অধিক দরে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না। অর্থাৎ পাটের দরের সীমা প্রতিমণ প্রায় ১২৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত বাঁধিয়া দেওয়া হইল, পাটের ক্রয়-বিক্রয়ে এই সীমা অতিক্রম করা চলিবে না; এই সীমা লঙ্ঘন করিলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই ১ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড, বা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা এক যোগে এই উভয়বিধ দণ্ডই ভোগ করিতে হইবে। পাট ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব-পত্র ইন্‌স্পেক্টরদিগকে দেখিতে না দিলে উহাদের প্রতি পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডের বিধান হইয়াছে। পাট-অর্ডিনান্সের ইহাই স্থূল মর্ম্ম।

এই অর্ডিনান্স জারি হইলে এ দেশের পাটের হাটের জনসাধারণের ধারণা হইয়াছিল—কি মজা! মেহেরবান সরকার বাহাদুরের মেহেরবানিতে অতি জঘন্য পাটও প্রায় ১২৲ টাকা মণ-দরে কাটাইতে পারা যাইবে। অবশ্য আমরা টান এবং যোগানের (supply and demand) স্বাভাবিক গতিতে বাধাদানের পক্ষপাতী নহি। উহাতে অবান্তর ভাবে অনেক দোষ ঘটে। কিন্তু সরকারের সচিবমণ্ডলী "যা করেন তাই শোভা পায়।" এদিকে অদৃষ্টের এইরূপ পরিহাস যে, ফাট্‌কা বাজারে দর না চড়িয়া অর্ডিনান্স জারির পরেই নামিয়া যাইতে লাগিল। খরিদদারই নাই। কেহ দরও জিজ্ঞাসা করে না। বিক্রেতাদিগের বেচিবার আগ্রহ বেশ আছে,—ক্রেতাদিগের কিনিবার আগ্রহ আদৌ নাই। কলওয়ালারা পাট লইতে চাহে না। বিদেশী খরিদদাররা মোটে দরই জিজ্ঞাসা করে না। বাজার-দর যেন পড়িয়া যাইতে বসিল। আবার বাজারে এক গুজব রটিল যে, সরকার পাটের এবং চটের উৎপন্নের একটা গণ্ডী স্থির করিয়া দিবেন। যদি খুব কম সীমা ধার্য্য করিয়া দেন, অর্থাৎ চট, থলিয়া প্রভৃতি কত কম প্রস্তুত করা হইবে, তাহার হার স্থির করিয়া দেন, তাহা হইলে হয় ত পাটজাত চট ও থলিয়ার পরিবর্ত্তে রোসিলা, শণ, কার্পাস প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত চট এবং থলিয়াতেই বাজার পূর্ণ হইয়া যাইবে! ঢেড়সের ছাল হইতে প্রস্তুত আঁশ, নারিকেলের দড়ির বস্তা প্রভৃতি প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে! যেখানে পাট হয় না, সেখানে ঢেড়স হয়। যাহা হউক, এখন এক মাস যাইতে না যাইতে শুনা যাইতেছে যে, সরকার এখনই প্রথম শ্রেণীর পাট ৬০৲ টাকা গাঁইট দরে কিনিতে প্রস্তুত। সরকার যদি প্রথম শ্রেণীর পাট ৬০৲ টাকা গাঁইট কেনেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর পাট কি দরে বিকাইবে? হকাই সচিবমণ্ডলের আমলে সরকার এবার পাটের ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসিলেন কি? এখন পাট কিনিয়া সরকার কি করিবেন? সরকার কি পাটের কল খুলিবেন, না উহা য়ুরোপীয় কলওয়ালাদিগকে দিবেন? মতলবটা কি? অত্যুৎকৃষ্ট পাটই যদি ৬০৲ টাকা দরে গাঁইট বিকায়, তাহা হইলে কলওয়ালা অধিক দরে মাঝারি ও কাঁচা পাট কিনিবে কেন? প্রধান-সচিবের কণ্ঠ কি পাটচাপা পড়িল?

—

গণপরিষদ সংগঠন

ভারতের শাসনযন্ত্র গঠন করিবার অধিকার ভারতবাসীরই, একথা এখন অনেক য়ুরোপীয়ই স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে একথা স্বীকার করিলেও পরোক্ষভাবে ইহাতে অনেকে আপত্তি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, গণপরিষদ গঠন করিতে হইলে উহার সদস্যসংখ্যা হইবে এক হাজার বা তাহারও অধিক। এত-বড় গণপরিষদ গঠন দ্বারা কেবল হটগোলেরই সৃষ্টি হইবে,—অন্য কিছুই হইবে না। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গাওয়ার এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং কথাটা উপেক্ষণীয় নহে। 'অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' চিরকালই হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সকলে যদি দেশাত্মবোধে এবং ঐকান্তিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করেন,—উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকে যদি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া নিরপেক্ষ ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাহা হয় না। এ বিষয়ে চীনের স্পষ্ট নজীর আছে। কিন্তু আমাদের এই পোড়া দেশের সহিত চীনের পার্থক্যও অনেক। চীনেও নানা ধর্ম্মবিশ্বাসী লোক আছে; কিন্তু তথায় ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর বিবাদ বা বিদ্বেষ নাই। কাজেই তথায় সকল কাজ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে কতকগুলি স্বার্থপর লোক দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিরোধের বহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় দশে মিলিয়া কোন কাজ করিবার উপায় আর নাই। প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রায়ই অন্য সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজেদের অধিকার বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট। আমাদের দেশে যেমন পাকিস্থান আর হিন্দুস্থান গঠনের প্রস্তাব নির্ম্মমভাবে করা হইয়াছে, জগতে আর কোথাও এমন

হইয়াছে কি? উপনিবেশগুলিতে ঔপনিবেশিক এবং আদিম অধিবাসীদলের মধ্যে কতকটা ঐ ধরণের ব্যবস্থা আছে বটে,—কিন্তু শাসিত প্রজাসাধারণের সম্প্রদায়ভেদে ঐরূপ ব্যবস্থা কুত্রাপি আছে বলিয়া স্মরণ হয় না। কোন বিবেচক এবং মনস্বী মুসলমানই ইহার সমর্থন করেন না। ইহা সত্য হইলেও এই বিদ্বেষ দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। কাজেই এইরূপ গণপরিষদ গঠন করিলেই সহজে একটা শাসনযন্ত্রের পরিকল্পনা করা সম্ভব হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। তবে একথা সত্য যে, ভারতবাসীদিগের শাসনযন্ত্র ভারতবাসীরা গঠন না করিলে অন্যে তাহা গঠন করিয়া দিতে পারিবে না; দিলেও তদ্দ্বারা দেশের ইষ্টসাধনের আশা নাই। সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য বন্ধ তাহাতে থাকিবেই। সেই জন্য আমরা উপযুক্ত এবং উদারমতাবলম্বী ভারতবাসীকে লইয়া গঠিত ছোট গণপরিষদের দ্বারা শাসনযন্ত্রের পরিকল্পনা রচনা করিবারই পক্ষপাতী। একবারে যদি না হয়, বিভিন্ন গণ-পরিষদ গঠন দ্বারা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?' গান্ধীজীর 'জনাব' জিন্না ছাহেব ভারতীয় মুসলমানদিগকে যতই ইরাণী তুরাণী অভিজাত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করুন, এদেশের বিশিষ্ট মুসলমানগণ আপনাদিগকে ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়েরই বংশধর বলিয়া পরিচিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ঝিলাম জিলার অধিবাসী ভারতীয় ১২৯ নং রেজিমেণ্টের সুবেদার খদাবাদ খাঁ ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম 'ভিক্টোরিয়া ক্রশ' লাভ করেন। তিনি 'মুসলমান রাজপুত' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গর্ব্ব অনুভব করিতেন। ভারতের লণ্ডনস্থ বাণিজ্য-কমিশনার সার ফিরোজ খাঁ নুন গত দশেরার সময় এক সভায় বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃপুরুষরা যে হিন্দু এবং রাজপুত ছিলেন, ইহা মনে করিয়া তিনি গৌরববোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোক অজ্ঞতার ফলে স্বার্থপর ব্যক্তিদিগের প্ররোচনায় ভুলিয়া পরস্পর বিরোধে মত্ত হয়; ইহার প্রতিকারের কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার অভ্যাস আর কত কাল স্থায়ী হইবে?

অচল অবস্থার প্রতিকার

ভারতের রাজনৈতিক গতিপথে যে প্রবল বাধা বর্ত্তমান, তাহা অপসারিত করিবার কোন সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক সভাই একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন—পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনই তাঁহাদের লক্ষ্য। কংগ্রেসই বর্ত্তমান সময়ে সকল দলের রাজনীতিকদিগের সভা। ঐ সভাও প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা কামনা করেন; স্বাধীন মুসলমান সমিতি সাতটি স্বতন্ত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের সমবায়ে সংগঠিত হইয়াছিল। সেই সাতটি মুসলমান দলের এক-একটির সদস্য-সংখ্যা যত, মিঃ জিন্নার মুস্লিম লীগে সেই পরিমাণ সদস্য আছেন কি না, তাহা সকলের জানা না থাকিলেও উক্ত স্বাধীন মুসলমান সমিতি একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই তাঁহাদের লক্ষ্য। হিন্দু-মহাসভা একটি প্রবল দল। এই মহাসভা বলিতেছেন যে, তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন, ইহা সত্য; তবে আপাততঃ তাঁহারা ওয়েষ্ট মিনষ্টার প্রণালীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই খুসী হইবেন। উদারনৈতিক সঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা অধিক না হইলেও উঁহাদের দলের অনেকেই চিন্তাশীল রাজনীতিক। তাঁহারাও ওয়েষ্ট-মিনষ্টার-চিহ্নিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই সন্তুষ্ট। ভারতীয় খৃষ্টানদিগের প্রতিষ্ঠিত সভার সদস্যদের অনেকেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন (অবশ্য ওয়েষ্ট-মিনষ্টার-বৈশিষ্ট্যলাঞ্ছিত) চাহেন, আবার কেহ কেহ পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন। ইঁহাদের অনেকেই কংগ্রেসের দলভুক্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে—অধিকাংশ ভারতবাসীই পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিতেছেন। কেহ কেহ আপাততঃ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই পরিতুষ্ট হইবেন বলিতেছেন।

বৃটিশ সরকার ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদানের প্রতিশ্রুতি কতকটা দিয়াছেন বটে, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতির ভাব সুস্পষ্ট নহে; সুতরাং তাহার কতখানি মূল্য আছে, তাহা বলা কঠিন। কারণ, দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি বৃটিশ রাজনীতিক স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, ভারতের রাজপ্রতিনিধি (বড় লাট) হউন, আর বিলাতী মন্ত্রিমণ্ডলীতে অবস্থিত ভারতসচিবই হউন, কাহারও প্রতিশ্রুতি অবশ্যগ্রহণীয় নহে; কেবল পার্লামেণ্টের আইনই অবশ্যগ্রাহ্য। এখন ভারতবাসীর এই দাবী পূর্ণ করিবার কথা, এবং গণপরিষদ দ্বারা ভারতের শাসন-যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়া লইবার কথা লইয়া সরকারের সহিত ভারতবাসীর মতান্তর ঘটায় যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

সম্প্রতি মিষ্টার এল, এস, আমেরী বিলাতে ভারতসচিবের পদে উপবিষ্ট। তিনি মিষ্টার ওয়েজউড্ বেনের এবং মিষ্টার হার্ডির প্রশ্নের জবাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড যাহা বলিয়াছিলেন, উহা তাহারই হুবহু প্রতিধ্বনি। একই ধরণের উক্তি বারংবার বিভিন্ন রসনায় প্রতিধ্বনিত হইলে তাহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় না,—এবং উহা যুক্তিহীন উক্তিকে যুক্তিপূর্ণ করিবারও কৌশল লাভ করিতে পারে না। ইঁহাদের উক্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে বারংবার একই কথা বলিতে হয়। মিষ্টার আমেরী বলিয়াছেন যে, "ভারতবাসীর মধ্যে অতি দারুণ মত-বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই বিষম মুস্কিল ঘটিয়াছে।" ইহা লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। তিনি বলিয়াছেন, "এই মত-বৈষম্যের যে সমাধান সম্ভবে না, তাহা নহে।" কিন্তু এই মতভেদের সমাধান যে ভাবে সম্ভবে কর্ত্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিতে সম্মত নহেন। এই মতভেদের মীমাংসা করিতে হইলে তাহার একমাত্র পন্থা দেশবাসীকে অগ্রে স্বাধীনতা প্রদান। আজ ভারতে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, পৃথিবীতে তাহার আবির্ভাব নূতন নহে; যত দিন কানাডা পরাধীন রাজ্য ছিল, তত দিন তথায় ফরাসী ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে অতি তীব্র বিবাদ ও বিদ্বেষ বর্ত্তমান ছিল; মার্কিণেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে উত্তর আমেরিকার কানাডা এবং মার্কিণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাদের রাষ্ট্রের ক্ষতিকর সেই অন্তর্ব্বিবাদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত না হইলেও মোটের উপর কার্য্যতঃ শেষ হইয়াছে। কিন্তু ভারতের পক্ষে ভারত সরকার গাড়ীর সম্মুখে ঘোড়া না যুতিয়া ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ি যুতিতে চাহিতেছেন। কোন বিষয়ে অসম্ভব

দাবী করা সঙ্গত নহে। উহাতে মনের কপটতাই প্রকাশ পায়। লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং মিষ্টার আমেরী উভয়েই বলিতেছেন—ভারতবাসীরা অগ্রে তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিবাদের মীমাংসা করুক, পরে আমরা ভারতবাসীদিগকে ওয়েষ্ট-মিনষ্টারের ভণিতাযুক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন খয়রাৎ করিব। অগ্রে রোগ আরোগ্য কর, তাহার পর ঔষধ দিব—এই কথার ন্যায় তাঁহাদের ঐ উপদেশ কৌতুকজনক!

ভারতে সমর-সজ্জা

য়ুরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা দিন দিন ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে, এবং সমরানল ক্রমশঃ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। অতঃপর এই সমরাগ্নির স্ফুলিঙ্গ ভারত পর্য্যন্ত ছুটিয়া-আসিয়া সমগ্র দেশ অগ্নিময় করিবে কি না, তাহা অনুমান করা অসাধ্য। তবে ভয়ের কারণ, জার্ম্মাণী বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, এবং ভারত বৃটেনের খাস তালুক: সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য সকলেরই প্রস্তুত থাকা উচিত। সেই জন্য ভারত সরকার 'অনেক চিন্তার পর' ভারতে দেশরক্ষী সৈন্যদল সংগঠনে অবহিত হইয়াছেন। আমরা বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতরক্ষার্থ ভারতীয় সৈন্যদল সংগঠনের জন্য পুনঃ পুনঃ দাবী করিয়া আসিতেছি; সুতরাং আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতেছি। সকল দেশের লোকই যখন সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে, ভারতবাসীরাই বা তখন নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন? সম্প্রতি ভারত সরকার সিমলা হইতে এক ইস্তাহার জারী করিয়া বলিয়াছেন, "অদূর ভবিষ্যতে হয় ত পশ্চিম য়ুরোপের সমরাগ্নির শিখা ভারতে আসিয়া-পড়িতে পারে, ইহা মনে করিয়া ভারতবাসীদিগকে ভারত-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষের জন্য যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক দেশরক্ষী সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিবার প্রয়োজন হইবে। 'ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্শ' এবং ভারতের সামন্ত নরপতিগণের সৈন্যদলকে সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত—সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, অধিকন্তু ভারতের জন্য অবিলম্বে নূতন বিমানবাহিনীও প্রস্তুত করিতে হইবে। নূতন যে স্থল-সৈন্য গঠিত হইবে, তাহাতে যান্ত্রিক সৈন্য, পদাতিক সৈন্য, সঙ্কেতবাহী সৈন্য, ইঞ্জিনিয়ারীং-কার্য্যে সুদক্ষ সৈন্য, এবং চিকিৎসা-কার্য্যে সুনিপুণ সৈন্য ত থাকিবেই, অধিকন্তু সামরিক অস্ত্রশস্ত্র এবং মালপত্র বহনের জন্য মোটর লরী প্রভৃতিও থাকিবে। এক কথায়, বর্ত্তমান সমর-বাহিনীতে যে সকল উপকরণ থাকা আবশ্যক, তাহা সমস্তই থাকিবে। এই সৈন্যদলে ভারতবাসীকে উচ্চপদে (Commissione l and other ranks) নিযুক্ত করা হইবে। সৈন্যদল গঠনের জন্য সরকার যেরূপ সুযোগ প্রদান করিবেন, সেইরূপ সামরিক উপকরণও এদেশে যথাসম্ভব প্রস্তুত করাইবার জন্য তাঁহারা অবহিত হইবেন। ভারতবাসীরা ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের স্বদেশ রক্ষার এবং বিদেশে যুদ্ধ করিবার জন্য যাহা করিয়াছে—তাহার উপরও এই সকল উদ্যোগ করা হইবে।" এ প্রস্তাব আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক হইয়াছে। সরকারী ইস্তাহারের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে,—যাহারা স্বেচ্ছায় সৈন্যদলে যোগদান করিতে চাহিবেন, তাঁহাদিগকেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে; এবং ভারতের সকল প্রদেশ হইতেই লোক লইয়া এই সৈন্যদল সংগঠিত হইবে। সুস্থকায়, বলিষ্ঠ এবং শ্রমসহিষ্ণু ভারতবাসী মাত্রেরই এই সৈন্যদলে যোগদান করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস, ভারতবাসী এই সম্পর্কে মিত্রশক্তির পক্ষে সহায়তা করিবে; কিন্তু বৃটিশজাতি যদি ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দান করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর এই আগ্রহযুক্ত সহযোগিতা ও সহায়তা তাঁহাদের পক্ষে কত গৌরবজনক হইত, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন কি? কিন্তু কেবল একটা অলীক সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা সেই গৌরবলাভে বঞ্চিত হইলেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত। ভারতবাসী বিশ্বাসঘাতক নহে। যাহা হউক, ভারতবাসীরা যে স্বদেশরক্ষার অধিকার পাইল, এ জন্যও তাহারা আনন্দ এবং গৌরব অনুভব করিবে।

শর্করা-সঙ্কট

ভারতীয় শর্করা-প্রস্তুত শিল্পের সম্মুখে এক বিরাট সমস্যা সমুপস্থিত! কি কুক্ষণেই যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী ইক্ষুর নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন—সেই সময় হইতেই শর্করাশিল্পের উপর যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, এবং বিহার ও যুক্তপ্রদেশে এই সঙ্কট যেন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দুই প্রদেশের দুই সরকার একযোগে যে 'শর্করা-নিয়ন্ত্রক সঙ্ঘ' সংগঠন করিয়াছেন, সেই সঙ্ঘ শর্করা সমিতির (Sugar Syndi at) সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ক্ষেত্রস্থ ইক্ষু দণ্ড-সমূহ অল্প মূল্যে ক্রয় করিবেন এবং সেই ইক্ষু হইতে রস নিষ্কাষণ করিয়া শর্করা প্রস্তুত করাইবেন। তাহা না করিলে চাষীরা বিপন্ন হইবে, এবং তাহাদের মাঠের আখ মাঠেই শুকাইয়া নষ্ট হইবে। কাজেই পরদুঃখকাতর উদার শর্করা-সঙ্ঘ আপনাদের ক্ষতি করিয়াও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এদিকে দেখা যাইতেছে, চিনির কারখানা-ওয়ালাদের গুদামে সাড়ে তিন লক্ষ টন চিনি অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া মাটী হইতেছে। তাহার উপর চাষীরা এবার আরও অধিক জমিতে আখ বুনিতেছে। ইহার ফলে অবস্থা বড়ই বিষম দাঁড়াইতেছে। ভারতের ঘর-খরচের জন্য কেবলমাত্র সাড়ে ১০ লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন। ইহা কুলাইয়াও বিস্তর চিনি আগামী বৎসরে গুদামজাত থাকিবে; ব্রহ্মদেশ ভিন্ন অন্য কোন বিদেশে ভারতের পক্ষে চিনি চালান দিবার অধিকার নাই। এখন এই সংগ্রামের সময় ভারতবাসীকে কি অন্য দেশে চিনি চালান দিবার অধিকার দেওয়া হইবে না? সরকারের সেরূপ মনোভাব আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শুনা যাইতেছে, এই বিষয়ে শর্করার কারখানাওয়ালাদিগের এক সভা বসিবে। তাঁহারা বিদেশে ভারত-জাত চিনির রপ্তানী-সঙ্কোচক চুক্তি উঠাইয়া দিবার জন্য আবেদন-নিবেদন করিবেন। কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের খাদ্যবিভাগের মন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বিলাতের কমন্স সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, আগামী মরশুমে বিলাতের জন্য অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিসাস, ফিজি এবং বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপাবলি হইতে সমস্ত চিনি কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতেও যদি না কুলায়, তাহা হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহির হইতে চিনি খরিদ করিতে হইবে। কিন্তু ভারত হইতে চিনি লইবার কোন কথাই তিনি বলেন নাই! ভারতের কথাটা

কি তিনি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, না, ভারতের চিনি তাঁহারা খাইয়া 'চিনিহারামী' করিবেন না এই সঙ্কল্প করিয়া বসিয়া আছেন? ভারতীয় শর্করা-শিল্পের প্রসারসাধনে কি সরকারের আপত্তি আছে?

——

উধম সিংহের অপরাধের বিচার

উধম সিংহ ইংলণ্ড-প্রবাসী শিখ যুবক। লণ্ডনের ক্যাক্সটন হলের এক সভায় সমাগত সার মাইকেল ও'ডায়ারকে সে গুলী মারিয়া হত্যা করিয়াছিল। সেই স্থানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পরে লণ্ডনের ওল্ড-বেলীর ফৌজদারী আদালতে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল। জুরীর বিচারে তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সে শেষকালে আত্মসমর্থনের জন্য বলিয়াছিল, ঐ হত্যাকাণ্ড তাহার ইচ্ছাকৃত নহে। অসন্তোষ জ্ঞাপনের জন্য সে তাহার পিস্তলটা হলের অন্তশ্ছাদের দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কেহ তাহাকে ধাক্কা দেওয়ায় তাহার পিস্তলের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মাইকেল ও'ডায়ারকে ঘা'ল করে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার এই সাফাই নিতান্ত ভুয়া হইয়াছিল; কারণ, সে লর্ড জেটল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্য কয়েক জনকেও গুলী করিয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। তাঁহারা সকলেই সারিয়া উঠিয়াছেন। উধম সিং প্রথমে যাহা বলিয়াছিল, পরে তাহা প্রত্যাহার করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, সে কোন মুসলমান নারীকে বিবাহ করিয়া আজাদ নাম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সে শিখধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশ করে নাই। যাহা হউক, শেষে সে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাপুরুষের ন্যায় এইরূপ অতর্কিত আক্রমণ ঘোর অপকর্ম্ম; তাহা এদেশের কোন লোকের সমর্থন লাভ করিতে পারে না। উদ্‌ভ্রান্ত যুবক আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া এই অন্যায় কার্য্যে মনুষ্যত্ব কলঙ্কিত করিয়াছিল। তাহার স্বদেশবাসী—আমরা সেজন্য দুঃখিত; কিন্তু সে তাহার জীবন দিয়া এই অপকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। যাহাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি এইরূপ প্রবল, ধর্ম্মোপদেশ দানে তাহাদিগকে সাধু করিবার চেষ্টা কখন সফল হয় না।

——

আমদানীর সঙ্কোচন

সম্প্রতি 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র এক সংখ্যায় সরকার ইস্তাহার জারী করিয়া ভারতে প্রায় ৭০টি পণ্যের আমদানী সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল পণ্য লোকের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক নহে। যুদ্ধের সময় বৃটিশজাতিকে বিদেশ হইতে ভূরি পরিমাণে সামরিক পণ্য ক্রয় করিতে হইতেছে,—ঐ সকল পণ্য ক্রয় করিতে হইলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। এখন অন্য বাজে পণ্য লইয়ে ঐ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ না করিয়া সাম্রাজ্যের এই দুর্দ্দিনে নগদ মুদ্রায় সামরিক পণ্য খরিদ করিতে হইবে,—অতএব এই যুদ্ধের সময় ঐ সকল বাজে জিনিষ না কিনিয়া সেই দেশী মুদ্রা রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিদেশের চলিত মুদ্রা হাতে রাখাই এই ইস্তাহার জারী করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন সরকার হয় ত দেশের লোকের উপর ট্যাক্স বসাইয়া, অথবা দেশের লোকের নিকট হইতে ঋণ করিয়া ঐ বিদেশী মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা বিদেশ হইতে সামরিক পণ্য কিনিবেন। এই ব্যবস্থার যে ভাল-মন্দ দুইটা দিকই আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ, এই সকল পণ্যের আমদানী বন্ধ হইলে ভারতের কতকগুলি শ্রমশিল্পের সুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু আবার কতকগুলি শ্রমশিল্পের ক্ষতিও হইবে। সুতরাং উভয় দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে লাভের পাল্লা ভারি হইবে, কি ক্ষতির পাল্লা ভারি হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। চিনির, মিষ্টান্নের, মিছরির, ঔষধের, তামাকের, সাবানের, শুষ্ক ফলের, লেড-পেন্সিলের, সিনেমার, পাকা-চামড়া প্রস্তুতের কারবার প্রভৃতির ন্যায় কতকগুলি কারবারের ইহাতে সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল কারবারের সুবিধা ক্রমশঃই হইতেছিল; সুতরাং সে জন্য ঐ সকল পণ্য আমদানীর সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন ছিল না। আর কতকগুলি শিল্পের আবশ্যক উপাদানের অভাবে অসুবিধাও ঘটিবে, এবং ঐ শিল্পজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে। অধিকন্তু, ভারতের বাহির হইতে যাঁহারা এ দেশে আসিয়া কারবারের পত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের সুবিধাই হইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাতে পণ্য আমদানীর সঙ্কোচনফলে বাণিজ্যের পাল্লা ভারতবাসীর অধিক অনুকূল হইবে, অথচ রপ্তানী ঠিক থাকিলে এবং আমদানীর ক্ষয় ঘটিলে তাহা হইবে সত্য—কিন্তু অনেক পণ্য-প্রস্তুতের বাধা ঘটিলে রপ্তানী-বাণিজ্যও কমিতে পারে। তাহা হইলে ত বাণিজ্যের অনুকূল অবস্থা বৃদ্ধি পাইবে না। আসল কথা, বৃটিশ সরকার এখন ভারতের তহবিলে অধিক ডলার সঞ্চিত রাখিতে চাহেন,—তাহা হইলে তাঁহারা তাহার বিনিময়ে মার্কিণ হইতে সামরিক পণ্য প্রভৃতি কিনিতে পারিবেন।—তথাস্তু!

——

জমিদারদিগের কর্ত্তব্য

বাঙ্গালার অধিকাংশ জমিদারই হিন্দু। এই জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের জন্য এক দল লোক বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল ধর্ম্মের লোকই আছেন। আবার এদেশের লোক আছেন, য়ুরোপীয়ানও আছেন। সম্প্রতি ফ্লাউড কমিশনের অধিকাংশ সদস্য এই প্রথার মূলোৎপাটনের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই জন্য জমিদারদিগকে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছে। ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সম্প্রতি শিলং হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, জমিদারদিগের আর ভূ-সম্পত্তির খাজনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া-থাকা উচিত নহে। এখন হইতে বিশেষ ফসলের চাষে এবং শ্রমশিল্পের সেবায় তাঁহাদিগের আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। তিনি এ সম্বন্ধে সকলকে ময়মনসিংহের মহারাজার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ময়মনসিংহের এই জমিদার আসাম ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি। তিনি বলিয়াছেন, ঐ লিমিটেড কারবারে চা, ইক্ষু, কমলালেবু, সিঙ্কোনা এবং টাঙ্গের

চাষ ত করাই হয়. তদধিক চিটাগুড় হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিয়া তাহা আসাম সরকারকে সরবরাহ করা হয়। রায়চৌধুরী মহাশয়ের এই উপদেশ অতি সঙ্গত। জমিদারদিগের আর নিশ্চিন্ত থাকা সঙ্গত নহে। হিন্দু যুবকদিগের মধ্যেও যাঁহারা সবল, সুস্থ ও শিক্ষিত, তাঁহাদিগের সমবেতভাবে কৃষি এবং শিল্প-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। নতুবা বাঙ্গালায় উচ্চবর্ণের হিন্দুজাতি লোপ পাইয়া পরে অন্য জাতীয় হিন্দুরাও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে। অতএব তাকিয়া ঠেস-দিয়া বাইজীর গান শুনিতে শুনিতে স্ফূর্ত্তিতে রাত্রি কাটাইবার যুগ আর নাই, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

—

হীন আক্রমণ

কলিকাতা সহরে 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' নামক একখানা ইংরেজী ভাষার খবরের কাগজ আছে। সেই কাগজখানা বাঙ্গালার সচিব-মণ্ডলীর মুখপত্র বলিয়া বিদিত; কিন্তু তাহার সম্পাদক মুসলমান নহে, একটি ফিরিঙ্গী; সুতরাং খৃষ্টান। ইহা হিন্দুদিগের প্রতি প্রায়ই অশিষ্ট বিদ্রূপ ও কটূক্তি বর্ষণ করে, যেন তাহাই সম্পাদকীয় যোগ্যতার নিদর্শন! কিন্তু মুসলমান মালিকের কাগজের ভাড়াটে ফিরিঙ্গী সম্পাদকের এইরূপ হিন্দুবিদ্বেষের কারণ কি, বুঝিয়া উঠা কঠিন! সম্প্রতি এই কাগজে হিন্দুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন মনোবৃত্তিসূচক উক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই উক্তি এতই ইতরতা-পূর্ণ যে, তাহার মর্ম্মপ্রকাশেও লেখনী কলঙ্কিত হয়। সমগ্র হিন্দু সমাজ ইহাতে মর্ম্মাহত ও অপমানিত হইয়া গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার এলবার্ট-হলে এক প্রতিবাদ সভা করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে হিন্দুর মনে কিরূপ আঘাত লাগিয়াছে, সভায় শ্রোতার সংখ্যাধিক্যেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রকার অবমাননার একমাত্র প্রতিকার-ব্যবস্থা হিন্দু সমাজের হাতেই আছে; হিন্দুর আত্মসম্মানবোধ যদি বিন্দুমাত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে হিন্দুমাত্রেই এই কাগজখানির সহিত সকল সম্পর্ক বর্জ্জন করিবে—ইহা নিঃসন্দেহেই আশা করা যাইতে পারে। স্যর শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, সরকারের নিকট হইতে ইহার কোন প্রতিকারের আশা নাই। তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ জননায়ক এ কথা অকাশে বলিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন কোন হিন্দু যেন ইহাতে বিজ্ঞাপন না দেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, যে সকল হিন্দু এই কাগজে বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিবেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য যাহাতে ব্যর্থ হয়, হিন্দুমাত্রেরই তাহা করা কর্ত্তব্য। হিন্দুর আরাধ্য দেবতাকে হীন তুচ্ছ করিতে যাহার কুণ্ঠা নাই, হিন্দুকে শ্লেষবিদ্রূপ করা যাহার প্রকৃতিসিদ্ধ, হিন্দু কি কারণে তাহাকে বিষবৎ ত্যাগ না করিবেন? তবে একথাও সত্য যে, এই কাগজে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা হয় নাই,—কারণ তিনি সকল অবমাননার অতীত। অবমাননা করা হইয়াছে হিন্দুর,—হিন্দুর যদি আত্মসম্মান বোধ না জাগে, তাঁহারা স্বাধীনভাবে অনায়াসে যে প্রতিকার করিতে পারেন তাহা যদি না করেন, তবে তাঁহারাই যে অবমাননার যোগ্য, ইহা নিজ কার্য্য দ্বারা সপ্রমাণ করিবেন। সংপ্রতি বাঙ্গালা সরকার এই পত্রিকার যে দণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে'র প্রতি প্রযুক্ত দণ্ডের অনুরূপ; কিন্তু 'ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া'র অপরাধ গুরুতর!

—

ভয় নাই—ভয় নাই

একটা বড়-রকমের যুদ্ধ বাধিলেই লোকের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার হয়। ইহা যেন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের একটা উৎকট ব্যাধি! লোক সন্ত্রস্ত হইয়া পোষ্টাফিস্ ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে গচ্ছিত টাকা তুলিয়া লইতেছে। ইহাতে তাহাদিগেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। সেই জন্য গান্ধীজী গত ২৫শে তারিখের 'হরিজন' পত্রে সকলকে আশ্বাস দানের জন্য এক প্রবন্ধ লিখিয়া জানাইয়াছেন, আজকাল লোক সংবাদপত্র পড়িয়া এবং নানারূপ গুজব শুনিয়া বড়ই আতঙ্কিত হইতেছে। আতঙ্কগ্রস্ত হইলে মানুষ মুসড়াইয়া পড়ে। কিন্তু এখন আতঙ্কাভিভূত হইবার কোনও কারণ নাই। যাহাই হউক, 'কেন ভীরু ডর, কর সাহস আশ্রয়'। সংগ্রামটা অত্যন্ত দুরন্ত অমঙ্গল বটে, তবে তাহার এই একটা গুণ—ইহা ভয়কে বিতাড়িত করিয়া সাহস জাগাইয়া তুলে। পাশ্চাত্যখণ্ডের লোক এই যুদ্ধে আদৌ আতঙ্কিত হয় নাই; এবং যুযুধান দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মরিলেও তাহারা আতঙ্কাভিভূত হয় নাই; অতএব "মা ভৈঃ!" সকলে নিয়মিতরূপ স্ব স্ব কাজ করিয়া যাউন। কয়েকটা যুদ্ধে পরাজিত হইলেও যুদ্ধে লিপ্ত জাতিরা আতঙ্কিত হইতেছে না।—ইত্যাদি গান্ধীজীর উক্তি সমর্থনযোগ্য। ভয় করিয়া ফল কি? বিশেষতঃ আমরা যে সকল সংবাদ পাইতেছি, তাহা হইতেই ত বুঝিতেছি, বৃটিশ জাতিই গত যুদ্ধের ন্যায় এই যুদ্ধের শেষে জয়লাভ করিবে। আর যদি এই যুদ্ধের পরিণাম অন্য প্রকার হয়ই, তাহাতেই বা ভয় করিলে চলিবে কেন? সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া ত ঘরে রাখিবে; সে টাকা ঘরে থাকিলে কি ব্যাঙ্ক বা সরকারের আশ্রয় অপেক্ষা নিরাপদে থাকিবে? বরং তাহা চোর-ডাকাতের হাতে পড়িবার আশঙ্কাই প্রবল। অরাজকতায় দস্যু-তস্করের উপদ্রব বর্দ্ধিত হয়। তখন টাকা মাটীতে পুতিয়া রাখিলেও তাহা রক্ষা পায় না। নিজের মাথা বাঁচিলে ত তাহা ভোগে লাগিবে। সুতরাং ভয় পাইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান হইতে টাকা তুলিয়া লওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য; তাহাতে নিজেরই সর্ব্বনাশ হইবে। বৃটিশজাতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আমাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া-রাখিয়া সোনার ভারত ছাড়িয়া টুপী ও লাঠী লইয়া পলায়ন করিবে, এ কল্পনা উন্মাদের মস্তিষ্কেই স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত
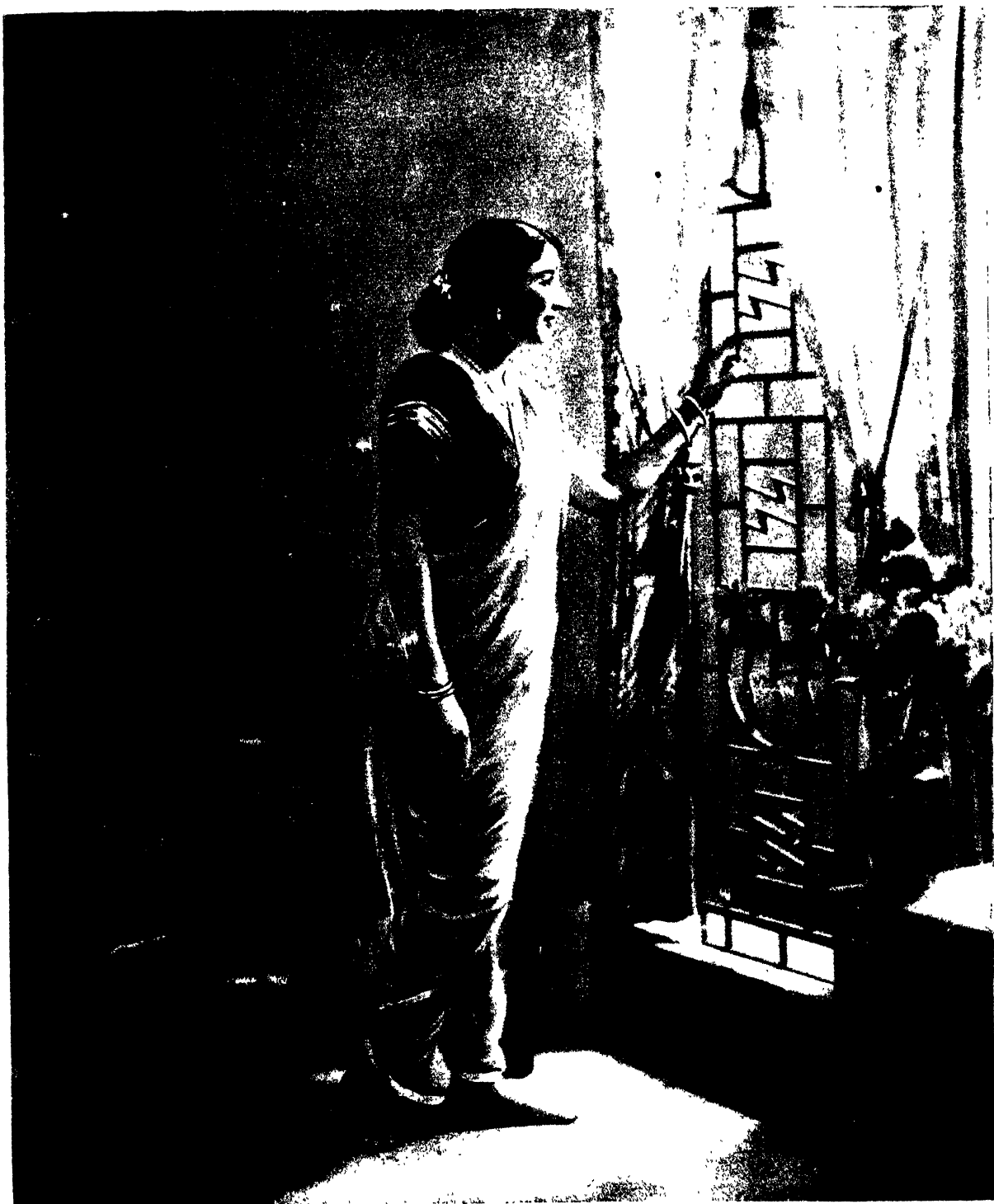
১৯শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩৪৭ [৪র্থ সংখ্যা

জন্মাষ্টমী

শ্রীমদ্ভাগবতে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট সূত ভগবানের সনৎকুমারাদি কল্কি পর্য্যন্ত দ্বাবিংশতি অবতার বলিয়া, পরে বলিয়াছিলেন—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।

... ...

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥

(১৩২৬-২৭)

বিশ্বব্যাপী পরম পুরুষের অসংখ্য অবতার আছে। ইঁহারা তাঁহার অংশ ও বিভূতি বা অংশের অংশ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। ঐ অসংখ্য অবতারের মধ্যে প্রধান দশাবতার পুরাণে কথিত হইয়াছে—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।

রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী দশ স্মৃতাঃ॥

মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

অনেকে শাক্যসিংহকেই ভগবদবতার বুদ্ধ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভ্রমাপনোদনের জন্য বক্তব্য এই যে, শাক্যসিংহ ছিলেন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। তাঁহার জন্মস্থান হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী কপিলবাস্তু। সুন্দরানন্দ-চরিতে উক্ত হইয়াছে—ইক্ষ্বাকুবংশীয় কতিপয় রাজপুত্র পিতার আদেশে বনবাসার্থ গোতমবংশীয় কপিল মুনির আশ্রমে শাকবনে বাস করিয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা শাক্য এবং গুরুর গোত্রানুসারে গৌতম সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

ভগবদবতার বুদ্ধের জন্মস্থান গয়া, তাঁহার পিতার নাম অঞ্জন। যথা—

বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।

(ভাগবত ১৩২৪)

শ্রীধরস্বামী—কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে (বেহারের মধ্যে গয়া প্রদেশে)।

এই জন্য অমরকোষে বুদ্ধ ও শাক্যসিংহের পর্য্যায় পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।

সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥

ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।

মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ॥

স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥

"তুন্তাথাদি ন পূর্ব্বভাক্" যে পদের অন্তে তু শব্দ বা আদিতে অথ শব্দ থাকে, পূর্ব্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না। এখানে শাক্য মুনির পর তু শব্দ থাকায়, উহা বুদ্ধপর্য্যায়ের অন্তর্গত নহে। শাক্যসিংহ বুদ্ধমতাবলম্বী ও জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া ভক্তেরা তাঁহাকে বুদ্ধ বলিতেন। অতএব বুদ্ধকে ভগবদবতার এবং শাক্যসিংহকে বুদ্ধের অবতার বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করি। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্, অংশাবতার নহেন বলিয়া দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম নাই। তৎপরিবর্ত্তে বলরামের নাম আছে। শ্রীজয়দেব গোস্বামীও গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রারম্ভে যে দশাবতারের স্তোত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণের পরিবর্ত্তে বলরামকেই ধরিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে যে লিখিয়াছেন—

শেতে স চিত্তশয়নে মম মীন-কূর্ম্ম-
কোলোহ্ভবন্ নৃহরি-বামন জামদগ্ন্যঃ।
যোহভূদ্ভূব ভরতাগ্রজ-কৃষ্ণ-বুদ্ধঃ
কল্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহবিষ্যতেহরীন্॥

তাহা দশাবতার রূপে নহে, অংশাবতার ও পূর্ণাবতার রূপে। এতদ্দ্বারা যাঁহারা বোপদেবকে ভাগবত-প্রণেতা বলেন, তাঁহাদের উক্তিও খণ্ডিত হইতেছে। অপিচ বোপদেব ভাগবত-প্রণেতা হইলে তিনি পাণিন্যাদি-মতাবলম্বী ও স্বয়ং ব্যাকরণকর্ত্তা হইয়া উহাতে অসংখ্য আর্ষ ও ছান্দস প্রয়োগ করিতেন না। তিনি স্বীয় গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধির জন্য দেবীভাগবতের ন্যায় ঐরূপ করিয়াছেন বলিলে মহাপাপভাগী হইতে হয়।

কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে শ্রীধরস্বামী যে বচনটি ধরিয়াছেন, তাহাতেও "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—

কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

কৃষ্ শব্দের অর্থ—যাহা কর্ষণ করা যায় এই অর্থে ভূ (সত্তা বা সৎ), ণ শব্দের অর্থ—সুখ (আনন্দ)। সৎ ও আনন্দের যে একত্ব, তাহাই পরব্রহ্ম; তজ্জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণ বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াই তিনি মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেও উহা সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় শুক্রশোণিত-সম্ভূত নহেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ—

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্॥
যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ॥
(১।১-২)

(শুকদেবের প্রতি রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন) হে মুনিবর, আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যের বংশ বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, উভয় বংশে উৎপন্ন রাজাদিগের অত্যাশ্চর্য্য চরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মশীল যদুরাজার চরিত্র বিশেষরূপেই কহিয়াছেন। এক্ষণে, ঐ যদুবংশে স্বীয় অংশ বলরামের সহিত যে বিষ্ণু (বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাব আমাদিগকে বলুন (অংশেন—সহার্থে তৃতীয়া; অব পূর্ব্ব তৄ ধাতুর অর্থ স্বধাম হইতে নামিয়া আসা)।

শুকদেব বলিলেন—বসুদেব কংসের পিতৃব্যকন্যা দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন স্বগৃহে আসিতেছিলেন, তখন দৈববাণী হইল যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে বধ করিবে। কংস উহা শুনিয়া দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, বসুদেব অনুনয়-বিনয় করিয়া অনেক বুঝাইয়া এবং প্রত্যেক গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই কংসকে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া তৎকালে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেবকীর প্রথম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সত্যসন্ধ বসুদেব তাহাকে কংসের নিকট লইয়া যাইলে, কংস বলিল—"উহা হইতে আমার ভয় নাই উহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও।" সেই সময় দেবর্ষি নারদ আসিয়া কংসকে বলিলেন—"ফিরাইয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। অষ্টম হইতে বিপরীত ক্রমে গণনা করিলে প্রথম গর্ভও অষ্টম হয়, সপ্তম হইতে ঐরূপ ক্রমে গণনা করিলে প্রথমটা সপ্তম এবং দ্বিতীয়টা অষ্টম হইবে

থাকে; এইরূপ ক্রমে প্রত্যেক গর্ভই অষ্টম হইতে পারে” ইত্যাদি। কংস বলিল—“তাই ত বটে!” তৎক্ষণাৎ সেই শিশুকে আনাইয়া বধ করিল, দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে রাখিল, তাঁহাদের ছয়টি পুত্রের বিনাশ সাধন করিল, এবং আপন পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া, স্বয়ং রাজা হইয়া যাদবদিগের ও সমস্ত ধার্ম্মিকগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। ব্রহ্মাদি দেবগণ তখন বিষ্ণুকে স্তব করিয়া, দুর্বৃত্তদিগের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক ভূভারহরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ স্বীয় যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—“আমার অংশ যে শেষ-নাগ, তাহার অংশ দেবকীর সপ্তম গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, তুমি তাহাকে সঙ্কর্ষণ করিয়া, বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণী কংসের অত্যাচার-ভয়ে তাহার পরম সখা নন্দগোপের গৃহে বাস করিতেছে, তাহার গর্ভে প্রবেশ করাইবে, আমি দেবকীর গর্ভে জন্মিব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্ম লইবে। যোগমায়া সেই আদেশ প্রতিপালন করিলে সকলে মনে করিল—দেবকীর গর্ভস্রাব হইয়া গেল। গর্ভসঙ্কর্ষণ হেতু ঐ বালকের নাম হইয়াছিল সঙ্কর্ষণ; এবং বলাধিক্য হেতু বল ও সর্ব্বলোকরমণ হেতু রাম নামে অভিহিত হইতেন।

এই বার ভগবানের পালা। মানুষ বিপদে পড়িলে ভগবানের স্মরণ করিয়া থাকে। বসুদেব মহাবিপদে পড়িয়া রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুকে একাগ্রচিত্তে নিরন্তর স্মরণ করিতেন। সেই অনুধ্যানের ফলে—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
প্রবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ (২।১৬)

ভগবান্ (অংশভাগেন) পূর্ণরূপে বসুদেবের মনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ বসুদেব স্বীয় হৃৎপদ্মে ভগবানের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি সুস্পষ্ট অনুভব করিতেন। (অংশভাগেন—অংশৈঃ শক্তিভিঃ ভজতে ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ সর্ব্বান্), যিনি স্বীয় শক্তিসমূহ দ্বারা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল পদার্থে অবস্থান করেন)।

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম
ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো
ভূতানাং সংবভূব হ॥ (২।১৭)

বসুদেব তৎকালে মহাপুরুষের তেজ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হইলেন। কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে ও পরাভব করিতে সাহসী হইত না।—জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিলে দেহে ব্রহ্মতেজ পরিস্ফুট হয়।

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ॥ (২।১৮)

তার পর বসুদেব জগতের প্রত্যক্ষ মঙ্গলস্বরূপ (অচ্যুতাংশ) সেই পূর্ণরূপ (স্বীয় শুক্র নহে) দেবকীতে সম্যকরূপে আধান (স্থাপন) করিলেন—দেবকীর নিকট বর্ণনা করিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করিলেন (ইহাই হইল দেবকীর গর্ভাধান)। দেবকী তাহা আপন মনে (গর্ভে নহে) ধারণ করিলেন অর্থাৎ ঐ শ্রীমূর্ত্তি নিরন্তর ধ্যান করিতে লাগিলেন (ইহাই হইল দেবকীর অষ্টম গর্ভের সঞ্চার)। কাহার ন্যায়? পূর্ব্বদিক্ যেমন পূর্ণচন্দ্রকে ধারণ করে তদ্রূপ; পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র উঠিলে দিক্ ও আকাশের সহিত সে যেমন নির্লিপ্ত, সেইরূপ ভগবান্ও জরায়ু, নাভিনাড়ী প্রভৃতির সহিত নির্লিপ্তই ছিলেন। (অচ্যুতাংশ—অচ্যুতা চ্যুতিরহিতা অংশা ঐশ্বর্য্যাদয়ো যস্য, যাঁহার ঐশ্বর্য্যাদির কখনও বিচ্যুতি ঘটে না)।

জ্ঞাতব্য—শ্লোকস্থ কতিপয় পদের যেরূপ অর্থ লিখিয়াছি, তাহা আমার কল্পিত নহে; শ্রীধরস্বামীর টীকায় দ্রষ্টব্য।

যথাকালে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে—

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ॥ (৩।৮)

যিনি সকলের হৃদয়-গুহায় অবস্থান করেন, সেই বিষ্ণু দেবরূপিণী অর্থাৎ হৃদয়ে শ্রীমূর্ত্তি ধারণে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবকীতে (দেবকীর একদেশে অর্থাৎ ক্রোড়ে) আবির্ভূত হইলেন। সে আবির্ভাব কিরূপ? পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্রো-দয়ের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে। (দেবক্যাং—ঐকদেশিক অধিকরণ, যেমন বনে সিংহ বাস করে ইত্যাদি)।

দেবকী ভগবানকে প্রসব করিলেন কিম্বা ভগবান্ দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন—এ কথা বলিলেন

না। সুতরাং প্রসবদ্বারের সহিতও তাঁহার সংস্পর্শ ছিল না। অতঃপর সেই বালকের রূপবর্ণনা—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদারকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥ (৩।৯-১০)

বসুদেব সেই অদ্ভুত বালককে দেখিলেন—তাঁহার চক্ষু পদ্মের ন্যায়, চারি হাত, হাতে শঙ্খ, গদা ও চক্র, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন (পদ্মাকৃতি জড়ুর), গলে কৌস্তুভ মণি, পরিধানে পীতাম্বর, নিবিড় মেঘের ন্যায় রূপলাবণ্য, মহামূল্য-বৈদূর্য্যমণিখচিত কিরীট ও কুণ্ডলের আভায় কেশরাশি উদ্ভাসিত, অঙ্গে স্থূলতর কাঞ্চী অঙ্গদ কঙ্কণ প্রভৃতি অলঙ্কার।

এখন ভাবিয়া দেখুন—চতুর্ভুজ মনুষ্য-বালক কচিৎ কদাচিৎ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হইলেও কাপড়-পরা, গয়না-ভরা, হেতিয়ার-ধরা বালক কস্মিন্ কালেও হয় নাই, হইতে পারেও না।

বসুদেব ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। দেবকী স্ত্রীস্বভাবসুলভ অজ্ঞতা বশতঃ বলিলেন—"তোমার এ মূর্ত্তি দেখিলে দুরাত্মা কংস আপন প্রাণহন্তা ভাবিয়া এখনই বধ করিবে। বহু পুত্রশোক সহ্য করিয়াছি, আর পারি না। তুমি এ রূপ সংবরণ কর।" ভগবান্ বসুদেবকে বলিলেন—"নন্দপত্নী যশোদা এইমাত্র গাঢ়নিদ্রাবস্থায় একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে। আমাকে লইয়া গিয়া তাহার নিকটে রাখিয়া সেই কন্যাকে লইয়া আইস।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সাধারণ সদ্যোজাত-শিশুমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তার পরের ঘটনা সকলেরই বিদিত। সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে ঐ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সময়ে সময়ে দেখাইতেন। তাই তিনি ভারতযুদ্ধারম্ভে বিশ্বরূপদর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥
(গীতা ১১।৪৪-৪৫)

এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি উৎফুল্ল হইয়াছি বটে; কিন্তু ভয়ে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি দয়া করিয়া আমাকে পূর্ব্ব রূপ দেখাও। তুমি বসুদেবকে যে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলে, সেই মূর্ত্তি দেখাও। সেই কিরীটধারী গদাচক্রহস্ত মূর্ত্তি দেখিতে এখন একবার ইচ্ছা হইতেছে।—সে মূর্ত্তি অনেক বার দেখিয়াছি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার ভয় হয় না।

ভগবান্ তখন সখার বাঞ্ছাপূরণের জন্য একবার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া পরক্ষণে তাহা সংবরণপূর্ব্বক মনুষ্যরূপ দর্শন করাইলে অর্জ্জুন বলিলেন—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

তোমার এই সুন্দর মানুষ-রূপ দেখিয়া এখন আমার মন সুস্থির হইল, আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম।

আর দুইটা কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনেকেই বলিয়া থাকেন—মহাভারতের উক্তির সহিত ভাগবতের এ উক্তির সামঞ্জস্য নাই। আন্দুলের সুপ্রসিদ্ধ মল্লিক-বংশের বাবু যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক মহোদয়ের অনুরোধে আমি কয়েক মাস ধরিয়া তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া ভাগবত শুনাইয়াছিলাম। তিনি সংস্কৃতভাষায় অনুরাগী ছিলেন এবং সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিতদিগকে আদর-আপ্যায়নে সন্তুষ্ট করিতেন। তজ্জন্য নানা প্রদেশের বহু সুপণ্ডিত প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। যখন ঐ ব্যাখ্যা চলিতেছিল, তখন এক প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত চারি-পাঁচ দিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ অসামঞ্জস্যের উল্লেখ করিয়া মহাভারতের এই শ্লোকটি বলিয়াছিলেন—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥
শেষস্যাংশশ্চ নাগস্য বলদেবো মহাবলঃ ।

(আদি ৬৭।১৫৯)

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম নারায়ণের অংশ বলা হইয়াছে। আমি বলিলাম—যখন উভয় গ্রন্থ একই বেদ-ব্যাসের প্রণীত, তখন সামঞ্জস্যরক্ষা করিতেই হইবে। না করিলে, ভাগবতের কথা দূরে থাকুক, মহাভারতের বহু উক্তিরও পরস্পর অসামঞ্জস্য ঘটে। ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে আছে—

অনুগ্রহার্থং লোকানাং বিষ্ণুর্লোকনমস্কৃতঃ ।
বসুদেবাত্তু দেবক্যাং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ ॥
অনাদিনিধনো দেবঃ স কর্ত্তা জগতঃ প্রভুঃ ।
অব্যক্তমক্ষরং ব্রহ্ম প্রধানং ত্রিগুণাত্মকম্ ॥

(৬৩।৯৯-১০০)

পূর্ব্বে তাঁহাকে অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া, পরে নারায়ণের অংশ বলা কিরূপে সঙ্গত হয় ? অতএব ৬৭।১৫৯ শ্লোকস্থ অংশ পদের ব্যাখ্যা—অংশাঃ সন্তি অস্য ইতি অংশঃ অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্। যাহার অংশসমূহ থাকে, তাহা অংশ। পূর্ণেরই অংশসমষ্টি থাকে, অতএব এখানে অংশ বলিতে পূর্ণ। 'তস্য' পদে রাহোঃ শির ইতিবৎ অভেদে ষষ্ঠী। তদ্ভিন্ন (তদ্রূপ) পূর্ণ। এতাবতা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণরূপ পূর্ণ—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—ইহাই বলা হইয়াছে।

আমার বয়স তখন অল্প। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া ধন্য করিয়াছিলেন। কেবল তিনিই নহেন ; কাশীর এক পণ্ডিত এবং মুর্শিদাবাদের এক সুবিজ্ঞ হেড্মাষ্টারও ঐ অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন।

অংশাবতার পূর্ণ হইতে পৃথক্। এই জন্য ভগবান্ বিষ্ণু অংশরূপে অবতীর্ণ হইলে তাঁহার পূর্ণরূপ বৈকুণ্ঠে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের তাহা ছিল না। তিনি ১২৫ বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন (তন্মধ্যে বৃন্দাবন-বাস ১১ বৎসর মাত্র)। এতাবৎকাল বৈকুণ্ঠ শূন্যই ছিল। ইহার প্রমাণ ভাগবতেই পাওয়া যায়। অন্তিম কালে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের প্রার্থনায় আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দুর্বৃত্তদিগের বিনাশপূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়াছেন।

নাধুনা তেঽখিলাধার দেবকার্য্যাবশেষিতম্
কুলঞ্চ বিপ্রশাপেন নষ্টপ্রায়মভূদিদম্ ।
ততঃ স্বধাম পরমং বিশস্ব যদি মন্যসে ॥

(১১।৬।২৬)

এখন আপনার দেবকার্য্য করিতে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। আপনি ব্রহ্মশাপ ঘটাইয়া নিজ বংশও প্রায় নষ্ট করিয়াছেন। অতএব যদি ইচ্ছা হয়, স্বধামে প্রবেশ করুন।

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

ব্রহ্মা ভবো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ।

(১১।৩১।৬)

ব্রহ্মা, শিব ও লোকপালেরা আমার বৈকুণ্ঠবাস ইচ্ছা করিতেছেন।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্ ।
যোগধারণয়াগ্নেয্যা দগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্ ॥

(১১।৩১।৬)

দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যাস্তং বিশন্তং স্বধামনি ।
অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুশ্চাতিবিস্মিতাঃ ॥

(১১।৩১।৮)

ভগবান্ পরমসুন্দর স্বীয় শরীর অগ্নিময় যোগধারণায় দগ্ধ করিয়া অর্থাৎ দেবকীর ক্রোড়ে যেমন বিষ্ণুমূর্ত্তিকে কৃষ্ণমূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যোগোত্থ অগ্নির মধ্যে অন্যের অলক্ষিতে কৃষ্ণমূর্ত্তিকে বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া স্বধামে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ অতি বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে স্বধামে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন।

৮

অভয়াবাবু জামাতা ও পৌত্রের পথ চাহিয়া বসিয়া ছিলেন ; তাঁহার মনে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সন্ধ্যার ট্রেণ আসিলে তাহার শব্দ শুনিয়া তিনি আরও অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। যদি সংবাদ অশুভ হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শেফালীর দেহে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতেছে বুঝিয়া শেফালী বলিল, "দাদু, আপনি এত অস্থির হবেন না ; মন স্থির করুন। শুভ সংবাদের আশা করবেন না ; সে-আশায় থাকলে বৃথা কষ্ট পাবেন যে! অশুভের জন্য প্রস্তুত থাক্‌লে, যদি আপনার দুরাশা ভাগ্য-ক্রমে সফল হয় তো সেই আনন্দ সহজেই সহ্য করতে পারবেন—কিন্তু অশুভ সংবাদে মনে যে আঘাত লাগবে, তা অসহ্য হবে।"

অভয়াবাবু পৌত্রীর মন্তব্য শুনিয়া তাহার সমর্থনের জন্য বলিলেন, "ঠিক বলেছিস্‌ দিদি, আঘাত সহ্য ক'রবার শক্তি সত্যই আমার আর নেই। কিন্তু আমাকে দিয়ে তোর সারা-জীবনটাই যে ব্যর্থ হ'য়ে গেল, এ কষ্টই বা সহ্য করি কি ক'রে? একবার কঠোর সামাজিক রীতির কবলে প'ড়ে প্রাণাধিক পুত্রকে চিরদিনের জন্য হারাতে হ'য়েছিল, শূন্য জীবন হাহাকারে পূর্ণ হ'য়েছিল ; আবার আমার এ কুমতি কেন হ'ল? কেন কাল আমি সন্তোষের সঙ্গত কথা শুন্‌লাম না? তার সৎ-পরামর্শ কেন উপেক্ষা ক'রলাম?"

শেফালী সহানুভূতি-ভরে বলিল, "কেন বৃথা নিজের দোষ দিচ্ছেন দাদু! বিধাতার বিধান খণ্ডন করা কি মানুষের সাধ্য? চেষ্টা ক'রলেই কি আপনি অন্য কোন ব্যবস্থা ক'রতে পারতেন? আমার কি শক্তি যে, আপনাকে সান্ত্বনা দান করি? আপনি মন স্থির করুন।"

অল্পকাল পরেই ঘরের বাহিরে পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, এবং পরক্ষণেই প্রতুলবাবু সন্তোষ সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়াই অভয়াবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমাদের কিছু বল্‌তে হবে না, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। তিনি শিক্ষিত লোক, আমাদের সঙ্কট হয় তো বুঝতে পারবেন ভেবেই আমি অত-বড় দুরাশাকে মনে স্থান দিয়েছিলাম!"
—বৃদ্ধ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, নিঃশব্দে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। শেফালী যথাসাধ্য চেষ্টায় অশ্রু সম্বরণ করিয়া, তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "দাদু, আপনি কাঁদ্‌তে পাবেন না ; আপনি কাঁদ্‌লে কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়। সকলেরই বিয়ে কি সুখের হয়? আমি যে অবস্থাতেই থাকি তাতেই সুখী হ'তে পারব। আমার জীবন অসুখে, অশান্তিতে কাটবে ভেবে আপনি কাতর হবেন না দাদু!"

অভয়াবাবু বলিলেন, "তুমি যা বল্‌লে, তাই হবে দিদিমণি! তোমার জন্য আমার যতটুকু সাধ্য আমি তাই ক'রব।"

শেফালী তখন আব্দারের সুরে বলিল, "তবে আমার মনের সাধ, আমার কামনা আপনি পূর্ণ করুন দাদামণি! আমি আরও পড়াশুনা ক'রব ; ডাক্তারী প'ড়ে আমি ডাক্তার হব। তা' হ'লে আপনার যে কামনা বাবা পূর্ণ ক'রে যেতে পারেন-নি, তা আমিই পূর্ণ ক'রব ; আমাকে দিয়েই আপনার সেই সাধ পূর্ণ হবে। আপনার সাধের সেবা-গৃহের পর্য্যবেক্ষণ আমিই ক'রব। দেশের ও দশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ ক'রে আমি শান্তি লাভ ক'রব। সেই সুখই এখন আমার প্রার্থনার বস্তু ; তার সঙ্গে অন্য কোন সুখের তুলনা হ'তে পারে না।"

পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার মুখে এইরূপ আত্মোৎসর্গের প্রস্তাব শুনিয়া, সেখানে উপস্থিত সকলেই বিস্ময়ে

অভিভূত হইলেন। এতটুকু বালিকার এইরূপ গভীর চিন্তাশক্তি, তাহার এই প্রকার কঠোর সংযম ও আত্মত্যাগের সংকল্পের পরিচয় পাইয়া সকলেরই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবার কথা বটে! অভয়াবাবু দীর্ঘকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে বিচলিত স্বরে বলিলেন, "সবই তো হ'তে পারে, কিন্তু তোমার মত সংসারজ্ঞানহীনা, সরলহৃদয়া তরুণীকে অপরিণামদর্শী যুবক-ছাত্রদের সঙ্গে মিলে-মিশে ডাক্তারী শিখ্‌তে পাঠাব কি ক'রে? তার ফল কি ভাল হবে?"

সন্তোষ এই বিষয়ে তাহার পিতামহকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য বলিল, "দিল্লীতে কেবল মেয়েদেরই ডাক্তারী শিখবার জন্য একটা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শেফালী দু' বৎসর পরেই আই, এস্‌-সি, পাশ ক'রে তো সেখানে ভর্ত্তি হ'তে পার্‌বে। এতে আর আপত্তি কর্‌বেন না দাদু! দেশের আর্ত্ত ও দরিদ্রগণকে সন্তানরূপে লাভ ক'রে শেফালী সুখী হোক, তার জীবন শান্তিপূর্ণ হোক, এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন।"

অভয়াবাবু দ্বিধাবিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "তোর কথা অসঙ্গত নয় সন্তোষ, কিন্তু এই প্রস্তাবে আমার এতকালের সংস্কারে যে আঘাত লাগ্‌ছে ভাই! কিন্তু সে যা-ই হোক, এ প্রস্তাবে আর আমি আপত্তি ক'রব না। আমার শেফালী দিদি জীবনে যা'তে সুখী হ'তে পারে, তোরা তারই ব্যবস্থা কর। সমাজের প্রথার বিরুদ্ধে চল্‌তে না-পেরেই তো দীর্ঘ জীবন ধ'রে এত দুঃখ পেয়েছি; এখন থেকে ও-সব আমি আর গ্রাহ্য ক'রব না। আমার দীর্ঘকালের সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাক।"

বৃদ্ধ আবার নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শেফালি, জীবনে যদি কখন বিন্দুমাত্রও পুণ্যের কাজ ক'রে থাকি, তবে তারই ফলের উপর নির্ভর ক'রে আজ প্রাণ খুলে বল্‌ছি, তুমি দিদি নিশ্চয়ই সুখী হবে; আমার এ-বাণী বিফল হবে না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, করুণাময় পরমেশ্বর আমার এই আশীর্ব্বাদ কখনও ব্যর্থ হ'তে দেবেন না।"

* * * *

তিন মাস পরে অভয়াবাবু শেফালিকাকে লইয়া কলিকাতায় চলিলেন, এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাহাকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ নিজেই গাড়ী করিয়া তাহাকে কলেজে পৌঁছাইয়া দেন, এবং ছুটী হইলে স্বয়ং কলেজ হইতে বাসায় লইয়া আসেন। পিতামহের ধন-প্রাণ সকলই যেন তাঁহার এই আদরিণী পৌত্রী।—বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মের জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কনকপুরে যাইতে হয়; এতদ্ভিন্ন, অন্য সকল সময় তিনি শেফালীর কাছেই থাকেন। এই ভাবে দুই বৎসর অতিবাহিত হইলে, শেফালী আই, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

কিন্তু শেফালীর দিল্লী-গমনের প্রস্তাবে তাহার পিতামহী শান্তিদেবী আপত্তি তুলিলেন। বৃদ্ধ-বয়সে দেশ-ত্যাগ করিয়া সুদূর প্রবাসে যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি বলিলেন, "শেফালী যখন ডাক্তারী পড়্‌বেই, তখন পুরুষদের সঙ্গে মেলা-মেশা তো ওকে কর্‌তেই হবে। মেয়ে-কলেজের খোঁজে মিছে অত দূরে গিয়ে কি হবে? ক'লকাতার মেডিকাল কলেজ তো ভালই শুনেছি; সেইখানেই ওকে ভর্ত্তি ক'রে দাও। তা' হ'লে আর আমাদের এই বুড়ো বয়সে দেশ ছেড়ে, অগঙ্গার দেশে—মোছলমানদের সহরে যেতে হয় না।"—অভয়াবাবু কিন্তু তাঁহার আজীবনের সুদৃঢ় সংস্কার ছাড়িতে পারিলেন না; তিনি ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিলেন, "পরে কি হবে, সে-কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তো যতদূর সম্ভব, পুরুষদের সংস্রব থেকে ওকে দূরে রাখা যা'ক। এই তো সবে সতের বছর বয়স, ছেলেমানুষ, বহুদর্শিতা কিছু লাভ করতে পারে-নি; এখন কি ও নিজেকে সাম্‌লিয়ে চল্‌তে পার্‌বে? আর আমার দিদিমণি যেখানে থাক্‌বে, সেই স্থানই হবে আমার পুণ্যতীর্থ।"—শান্তিদেবীও অগত্যা স্বামীর সহিত যাইতে বাধ্য হইলেন। ইহাও স্থির হইল যে, সন্তোষও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবে, এবং তাঁহাদের সহিত কিছু দিন সেখানে বাস করিয়া পরে বৈজ্ঞানিক 'রিসার্চ্চে'র জন্য ইংলণ্ডে গমন করিবে।

অভয়াবাবু সন্তোষকে বলিলেন, "তোমাকে বিয়ে ক'রে য়ুরোপ যেতে হবে ভাই!"

সন্তোষ হাসিয়া বলিল, "কেন দাদু, সে কার্য্যটি তো ফিরে এসেও করা যেতে পারে; বরং শিক্ষা শেষ ক'রে সাংসারিক হওয়াই ভাল। আর বছর-দুই পরেই তো ফিরে আসব, তখন ও-সব কথা ভাবা যাবে!"

অভয়াবাবু মাথা নাড়িয়া ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "না না, সে-সব হবে-টবে না। বিয়ে না দিয়ে আমি তোমায় বিলেতে পাঠাব না।"

অবশেষে শেফালীর আগ্রহে-অনুরোধে সন্তোষকে পিতামহের প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। রমাপ্রসাদবাবুও ব্যগ্র হইয়াছিলেন—তাঁহার কন্যা মঞ্জু সপ্তদশবর্ষীয়া ও বাগ্‌দত্তা! সন্তোষের মা তাহাকে পুত্রবধূ করিবেন বলিয়া, মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়া যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার সেই অন্তিম-কামনা পূর্ণ করিবার জন্য সন্তোষকে কন্যা-সম্প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

দিল্লী যাইবার পূর্ব্বেই সন্তোষের বিবাহ হইল। শেফালীর উৎসাহেই কনকপুরে আবার মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছে। অভয়াবাবুর সকল আপত্তিই শেফালী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। মহাসমারোহে দাদার বিবাহের আয়োজন করিয়াও সে যেন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছে না; কি করিয়া পিতামহের গভীর হৃদয়-বেদনা অপসারিত করিবে, সেই চিন্তাই তাহার প্রধান চিন্তা। সন্তোষের বিবাহ উপলক্ষে মিত্রবংশের আত্মীয়-বন্ধু সকলকেই সাদরে আহ্বান করা হইল; কেবল সুনীল ও তাহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করা হইল না। অভয়াবাবু সন্তোষকে বলিলেন, "এমন আনন্দের দিনে সুনীল যদি আসত, তবে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হ'ত। কিন্তু উপায় কি? মঙ্গলময়ের লীলা কে বুঝবে? চির করুণাময় তিনি, তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"—কেবল বাকি রহিলেন জ্ঞানেন্দ্রবাবু। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাবে সকলেরই আপত্তি হইল; কিন্তু অভয়াবাবু সকলের প্রতিকূল মন্তব্য শুনিয়া ধীর ভাবে বলিলেন, "তা হ'তে পারে না। আমার বিমলের ছেলের বিয়েতে তার বাল্যসহচর জ্ঞানেন্দ্র আসবে না, তা কি হয়? সে আমাদের শত্রুতা ক'রেছে বটে, কিন্তু তোমরা সকলেই তো জান, সে-বিয়ে ভেঙ্গে-যাওয়া ভালই হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্র নিজের মেয়েকে ও-ঘরে দিয়ে তো সুখী হ'তে পারে-নি। কুটুম্ব আদৌ ভাল হয়-নি। মেয়েটিকে তারা বাপের বাড়ী পাঠায় না। তা' ছাড়া, আমার শেফালীর যে ওখানে বিয়ে হয়-নি, সে তো বিধির বিধান, জ্ঞানেন্দ্র উপলক্ষ মাত্র। আমার জীবন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, বাকি ক'টা দিন সকলের সঙ্গে সদ্ভাবে শান্তিতেই কাটাতে চাই।"

শেফালীরও সেইরূপই ইচ্ছা ছিল; সাহস পাইয়া সে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সে বলিল, "তা' হ'লে মা-জননী আর আমি—দু'জনেই যাই নিমন্ত্রণ করতে। মা-জননী নিজে গেলে জ্ঞান কাকা কখন না এসে থাকতে পারবেন না।"

সন্তোষ সবিস্ময়ে বলিল, "বল কি শেফালি! তুমি যাবে ঐ বাড়ীতে! ওরা কি মানুষ? ওদের মত লোকের আত্মীয়তার মূল্যই বা কি? না, না; ও-ভাবে স্বেচ্ছায় তোমার অপমানিত হ'বার দরকার নেই।"

অভয়াবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষমাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,—এ-কথা যেন কোনও দিন ভুলে থেকো না দাদা! বিরোধ দ্বারা শত্রুকে জয় করা যায় না; ক্ষমা কিন্তু বিশ্বজয়ী।"

শেফালীর আগমনে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অনুতাপ যেন শত-গুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি যাহার জীবন ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে আজ তাঁহার সকল দোষ ভুলিয়া স্বয়ং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে! তিনি ক্ষোভ-বিজড়িত বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "মা, তুমি যখন নিজে এসেছ, তখন আমি কি আর না-গিয়ে থাকতে পারি? নিজের কর্ম্মফলে আমি যে কি কষ্ট পেয়েছি, সে আর কি বলবো মা! আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারি-নি। আজ তোমার ক্ষমা লাভ ক'রে আমার হৃদয়ে যেন অমৃত-সিঞ্চন হ'ল।" শেফালী লজ্জায় নতমুখে নীরব রহিল; সে তো আর আপনার উদারতা দেখাইতে আসে নাই।

মহানন্দে সুশৃঙ্খলার সহিত বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। মঞ্জুলেখাকে পাইয়া সকলেই সুখী হইলেন। রূপে-গুণে অতুলনীয়া মঞ্জুলেখা নিজের নাম সার্থক করিয়াছিল। সপ্তাহ কাল সকলেই মহানন্দে অতিবাহিত করিলেন। শেফালী মঞ্জুকে সঙ্গিনী পাইয়া নিজের সকল কষ্টই বিস্মৃত হইল; কিন্তু তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় অভয়াবাবুর হৃদয়-বেদনার উপশম হইল না।

দিল্লীতে একটি বৎসর বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। গ্রীষ্মের ছুটীতে অভয়াবাবু ও শান্তিদেবী শেফালীকে লইয়া দেশে ফিরিলেন; কিন্তু সন্তোষ তখন

প্রাচীনা। শেফালীও দাদা-শ্বশুরের সঙ্গে কনকপুরে আসিল ; অভয়াবাবু ও শান্তিদেবী পৌত্রবধূকে গৃহে পাইয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিলেন ; কিন্তু শান্তিদেবীর অদৃষ্টে সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। কয়েক মাস পরেই তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন ; তাঁহার চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার ত্রুটি হইল না ; কিন্তু তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছিল, বৃদ্ধ স্বামীর, স্নেহময়ী শেফালীর আপ্রাণ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। হিন্দুনারীর যাহা কামনা—বৃদ্ধ স্বামীকে রাখিয়া, হাতের 'নোয়া', সিঁথির সিঁদূর বজায় রাখিয়া তিনি সতীস্বর্গে যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু এত বৎসরের জীবন-সঙ্গিনীকে হারাইয়া অভয়াবাবু জীবনে বীতস্পৃহ হইলেন ; মনোকষ্টে তাঁহার স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইল। তথাপি তাঁহার মনে হইল, তাঁহাকে আরও কিছুকাল বাঁচিতে হইবে ; সন্তোষের দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে—শেফালীকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইবেন, এই চিন্তাই তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিল ; তিনি স্বাস্থ্যলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া কয়েক মাস অভয়াবাবু কিছু ভাল থাকিলেও অবশেষে তাঁহার দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল। তাঁহার স্বাস্থ্যহানির সংবাদ পাইয়া রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেন। রমাপ্রসাদবাবুর উপদেশ অনুসারে সন্তোষের নিকট তারে সংবাদ দেওয়া হইল। সেই সংবাদ পাইয়া সন্তোষ এক মাস পরেই দেশে আসিয়া পড়িল। তখন বৃদ্ধের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও মন্দ হইয়াছিল। মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিতে পারিয়া অভয়াবাবু কনকপুরে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু ডাক্তাররা সেই অবস্থায় তাঁহার দেশে প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা দিতে সাহস করিলেন না। তখন রোগীর ইচ্ছানুসারে কোনও রকমে তাঁহাকে বৃন্দাবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তার পাইয়া প্রতুলবাবু ও অপর্ণা দেবী সেখানে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। অন্তিম শয্যাপ্রান্তে সকলকে সমাগত দেখিয়া অভয়াবাবু সুখী হইলেও যেন আর কাহারও প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে চকিত ভাবে দ্বারের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, আবার মুহূর্ত্ত পরেই হতাশ ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন। অন্তর্যামী কি তাঁহার ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন ?

শেফালী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পিতামহের সেবা করিল। তিনিই তাহার আশৈশব অবলম্বন। সেই ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে সে তাঁহার ক্রোড়ে যে আশ্রয় পাইয়াছিল, সেই নির্ভরতাপূর্ণ, শান্তিময় আশ্রয়ই তাহাকে সকল দুঃখ-কষ্টে, শোকে, যন্ত্রণায় শান্তিদান করিয়াছিল ; তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার পিতামহের মধ্যেই সে তাহার মৃত পিতা-মাতার অস্তিত্ব অনুভব করিত। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলে সে সত্যই নিরাশ্রয় হইবে। অভয়াবাবুও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িতে চাহেন না ; নিজের কাছে বসাইয়া তাহাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করেন, মধুর বাক্যে তাহাকে কত আশ্বাস দান করেন ; কিন্তু তাহার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে থাকে।

বৃন্দাবনে আসিবার সপ্তাহকাল পরে অভয়াবাবু এক দিন সায়ংকালে সকলকে শয্যাপ্রান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি উইল করেছি, তাতে শেফালীকে আমার ষোল আনা সম্পত্তির চার আনা দিয়েছি। আর তা'কে দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের সকলের হাতে। আমার জেদে ও দেশাচারের নিয়ম বিধানে তার জীবনের সকল সুখ-শান্তি ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি। তাকে সুখী করবার জন্য তোমরা যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। যা'র হাতে তা'কে সমর্পণ করেছি সে তো এল না, গোবিন্দ তো আমাকে যুগল-মিলন দেখালেন না ; তবু এ বিশ্বাস নিয়ে যাচ্ছি যে, চিরমঙ্গলময় তিনি, তিনি মঙ্গলই করবেন।"

শেফালী ভিন্ন আর সকলেই তাঁহার ক্ষোভে শোকে অভিভূত হইলেন। শেফালী সেই জীবনোপান্তোপনীত মৃত্যু-পথযাত্রীকে শান্ত করিবার জন্য সংযত স্বরে বলিল, "দাদু, আমার জীবন আপনি বিফল করেন-নি,—বিফল হবেও না। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার হৃদয় গোবিন্দজীর করুণা-ধারায় প্লাবিত হয় ; দেশের ও দশের সেবাতেই যেন আমি শান্তি লাভ করি।"

অভয়াবাবুর মুখে শান্তির আভাস লক্ষিত হইল। তিনি পৌত্রীকে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ; কিন্তু কি কথা বলিলেন, তাহা স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল না।

তাহার পর গোবিন্দ-নাম জপ করিতে করিতে ভগবদ্ভক্ত বৃদ্ধ শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন।

বৃন্দাবনধামেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল; কিন্তু অভয়াবাবুর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার অস্থি কনকপুরধামে রক্ষিত হইল। আদ্যশ্রাদ্ধও কনকপুরেই সম্পন্ন হইল।

শ্রাদ্ধশান্তির পর সন্তোষ আবার প্রবাস-যাত্রা করিল। শেফালীও দিল্লীর ছাত্রী-আবাসে গমন করিল; কিন্তু ছুটীর সময় সে রমাপ্রসাদবাবুর পরিবারেই বাস করিত। এই ভাবেই দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

[ক্রমশঃ

শ্রীনীলিমা দেবী।

গঙ্গাতীরে

মনে পড়ে চাঁদনী রাতের কবিত্ব-যৌবন,
গঙ্গাতীরের বাঁধা ঘাটে রাত্রি জাগরণ।
দুরন্ত এক তৃষ্ণা নিয়ে উড়ন্ত পাখায়
কল্পনা মোর নীড় খুঁজিত নীল গগনের গায়।

গানের ধ্বনি আস্‌ত ভেসে পল্লীকুটীর হ'তে
ওপার থেকে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার স্রোতে।
রৌপ্যধবল বালুর পরে ছুটত কতই ছায়া
কায়া কোথায়? মনে হ'তো পরী লোকের মায়া।
তেঁতুলগাছে ঝটপটানি বাদুড়-জনতার
মনে হ'তো ছটফটানি তৃষিত আত্মার।
উল্কামুখীর আলোক মাঠে, উল্কা জ্বালা ব্যোমে
হাল্কা সুখের মতন তারা ঝল্‌কে যেত ক'রে।
চাঁদের লোভে মেঘ ছুটিত আকুল হ'তো মন
মেঘের দেশে কি লোভে সে ছুট্‌ত অকারণ?
কাক ডাকিত শিমুলগাছে দিন ভাবিয়া বুঝি,
একে একে ফুরিয়ে যেত দীন-জোনাকির পুঁজি।
নিশীথ-চর দস্যুপাখীর হঠাৎ উপদ্রবে
বটের নীরব কুলায়গুলি ভ'রত কলরবে।
নিভে যেত একে একে দু'টি পারের আলো,
একেশ্বরী শর্ব্বরীকে লা'গত বড়ই ভালো।
আসত থেমে ক্রমে ক্রমে নরনারীর সাড়া,
নীরব হ'তো ঘুমের ঘোরে সেনবাবুদের পাড়া।

থানার ঘড়ির ঘণ্টাগুলো স্পষ্ট যেত গোনা,
আস্তাবলের ক্ষুরের আওয়াজ আর যেত-না শোনা।
ব'সে ব'সে এমনি ক'রে দুপুর যেত বাজি',
ঘুমিয়ে যেত ছইএর পরে খেয়া-ঘাটের মাঝি।
ঘুমিয়ে যেত শ্মশান-শিয়াল দুপুর ডাকের পরে,
গিরগিটিরা ঘুমিয়ে যেত কোটরে কোটরে।
ফিরতে ঘরে মন ছিল না টান ছিল না তার,
তাহার চেয়ে অনেক ভালো মা-গঙ্গার ধার।
ছিল না ত জানা প্রিয়ে কোথায় তোমার ধাম,
তারায় তারায় জ্যোৎস্না ধারায় তোমায় খুঁজিতাম।
আজ মনে হয় এমনি কত জ্যোৎস্নাময়ী রাতি
বৃথাই গেছে গঙ্গাতীরে ধূলায় আঁচল পাতি।
চৈত্রী হাওয়া বইতে যদি আস্‌তে মধুকরী
হ'তো না হায় বিফল নব-যৌবন-মঞ্জরী।
সত্য কি সে বিফল প্রিয়ে? সেই উদাসী মন
করছিল না চাঁদনী মথি বরণ আয়োজন?
নাই কি কিছু সেই তিতিক্ষা সেই প্রতীক্ষার দাম?
না খুঁজিতেই ধরা দিলে মর্ম্ম বুঝিতাম?

আকাশ-কুসুম দিয়ে যদি না ভরিতাম সাজি,
কিসে তোমার কবরীদাম সাজিয়ে দিতাম আজি?

শ্রীকালিদাস রায়।

স্বচ্ছ মোটর-গাড়ী

আমেরিকার কোন মোটর-গাড়ীর কারখানায় নূতন ধরণের একখানি মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। এ গাড়ীর বডি আগাগোড়া মজবুত এবং অভঙ্গুর কাচ ও নকল প্লাষ্টিক ধাতুতে তৈয়ারী। কাজেই গাড়ীর এঞ্জিন এবং অঙ্গ-গঠন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ গাড়ীর সুবিধা এই যে, কলকব্জার কোথাও সামান্য বৈকল্য

নূতন স্বচ্ছ-দেহ মোটর গাড়ী

ঘটিলে বডির কোনো অংশ না খুলিয়া তাহা দেখা যাইবে, এবং দেখিয়া তখনি তাহার প্রতিকার করা চলিবে। এ গাড়ী চালাইয়া কোম্পানি এখন গাড়ীর জান্ পরীক্ষা করিতেছেন। পরীক্ষা সফল হইলে এ-গাড়ী হাজার-হাজার নির্ম্মিত হইয়া সারা পৃথিবীর পথে ছুটিয়া আবিষ্কারকের গৌরব বিঘোষিত করিবে।

——

জল-খেলা

জলের বুকে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিতে গিয়া মানুষ শ্রান্ত হয়, ক্লান্ত হয়, এবং সে শ্রান্তি ও ক্লান্তির ফল অনেক সময় মারাত্মক হইয়া থাকে। এ জন্য নিরাপদে সাঁতারের সুখ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকায় এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। সে উপায় সুকৌশলে তক্তা গড়িয়া সেই তক্তায় শুইয়া জলে ভাসা! এ তক্তার নাম সার্ফবোর্ড! এ বোর্ড এমন কৌশলে গঠিত যে, উত্তাল তরঙ্গ-বক্ষে বোর্ড-বাহীর পিছলিয়া বিপন্ন হইবার কোনো আশঙ্কা নাই। য়ুরোপে-আমেরিকায় যে পাইন-গাছ জন্মে, সেই গাছের কাঠ খুব হাল্কা এবং মজবুত। এদেশেও পাহাড়ের বুকে পাইন-গাছ মেলে। বোর্ড গড়িবার পক্ষে এই পাইন-কাঠ সব-চেয়ে উপযোগী! এ কাঠ কাটিয়া তার দু'পিঠে দুই পোঁচ শিরীষের আঠা মাখাইয়া লইলে জল লাগিয়া কাঠ পচিবে না; কাঠ মজবুত থাকিবে।

ভেসে যাবো রঙ্গে
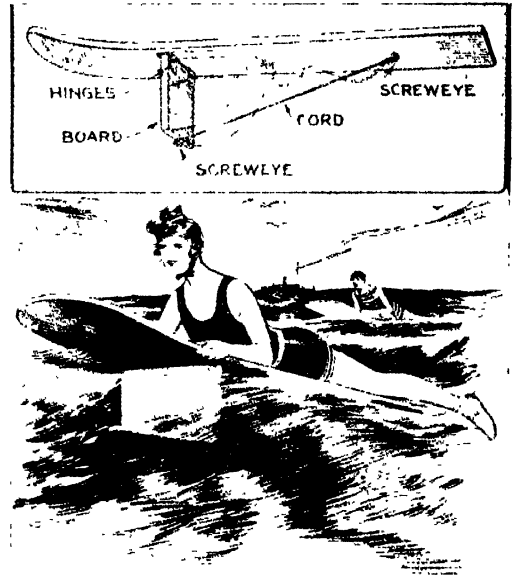
জলে ভাসাইবার পূর্ব্বে বোর্ডখানিকে ছবির নক্সার ছাঁদে গড়িয়া লইতে হইবে। ছবিতে যে দড়ি দেখিতেছেন, ঐ দড়ি টানিয়া বোর্ডকে এদিকে-ওদিকে ইচ্ছা-মতো ঘুরানো-ফিরানো চলিবে। বোর্ডখানির আকার যেমন-খুশী ছোট-বড় করা চলে। এই বোর্ডে শয়ন করিয়া বেল্ট দিয়া নিজেকে বোর্ডে আঁটিয়া লইতে হইবে—তাহা হইলে বোর্ডে টাইটভাবে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিতে পারা যাইবে। এ বোর্ডে শুইয়া সমুদ্র-বক্ষে পাড়ি দিলে সমুদ্র-তরঙ্গের সাধ্য হইবে না, বোর্ড-বাহীকে গ্রাস করে!

——

কাঠির ঘর

মনট্রিলের এক ভদ্রলোক দেশলাইয়ের দশ-হাজার পোড়া কাঠি দিয়া চমৎকার একখানি খেলা-ঘরের বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন ! এ বাড়ীর কোথাও একটি কাঁটা পেরেক বা আলপিন দিয়া জোড়া-তালি পড়ে

দেশলাইয়ের পোড়া-কাঠির ঘর

নাই। জোড়া-তালির কাজ সারা হইয়াছে শিরীষের আঠা দিয়া। বাড়ীর বারান্দায় যে চেয়ার-টেবিল দেখিতেছেন, ওগুলিও পোড়া কাঠি দিয়া তৈয়ারী। কথা আছে—যে খেলিতে জানে, সে কাণা-কড়ি লইয়া খেলে ! এই কাঠির বাড়াটি দেখিলে সে কথার সার্থকতা বুঝিতে পারি।

——

অন্ধকারের কার্পেট

আমেরিকার সিনেমা-গৃহ ও থিয়েটারের মেঝেয় প্রদীপ্ত উজ্জ্বল কার্পেট বিছানো হইতেছে। অভিনয়-কালে সিনেমা ও থিয়েটার-গৃহের আলো নিবাইয়া দিলে অন্ধকারে ঘর ভরিয়া যায়; তখন
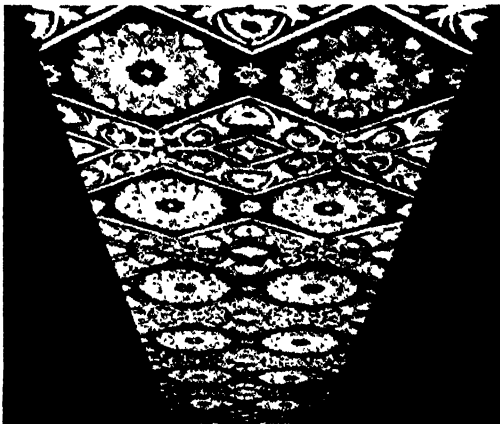
এ কার্পেট জ্বলে !

দর্শকদিগের পক্ষে আসন অধিকার করা কঠিন হয়। এ কার্পেট কিন্তু অন্ধকারেও দীপ্ত রেখায় জ্বল্‌-জ্বল্‌ করে। অভিনব রশ্মি-দীপ্ত নকল সুতায় এ কার্পেট বোনা হইয়াছে, তাহার ফলেই এমন দীপ্তি-বিকাশ ঘটে !

——

বধিরের শ্রুতি-যন্ত্র

কাণে যাঁরা কম শোনেন, ঘরে সহজেই তাঁরা অতি অল্প খরচে শ্রুতিযন্ত্র তৈয়ারী করিতে পারেন। সাঁতার কাটিবার সময় সন্তরণ-বীরের দল দুই কাণে যে রবারের "প্লাগ" আঁটিয়া লন, সে প্লাগের দাম সামান্য। এই প্লাগ দুটি কিনিয়া আনিয়া তার তলার দিকে দু'টি বিঁধ করিয়া লউন (ছবিতে ইঙ্গিত মিলিবে); বিঁধ করিয়া রবারের সেই প্লাগ কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিন। এ যন্ত্রে হাটের হট্টগোল ও গান-বাজনা হইতে শুরু করিয়া প্রেয়সীর প্রেমের মৃদু সোহাগ-বচন—সকলই অবাধে শুনিয়া কৃতার্থ হইবেন।
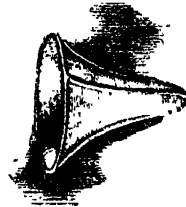
কাণের প্লাগ

——

ভিজা জামা কাপড়

ভিজা জামা-কাপড় শুকাইতে হইলে ঘরে-দালানে ও ছাদে অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি এক-রকম 'র‍্যাক' তৈয়ারী হইয়াছে; সে র‍্যাকে ভাঁজে-ভাঁজে সকল-মাপের জামা-কাপড়

র‍্যাক্

শুকাইতে দেওয়া চলে। এবং এজন্য খুব বেশী জায়গার প্রয়োজন নাই। র‍্যাকটি মুড়িয়া গুটাইয়া 'একরত্তি' করা চলে। র‍্যাকটি প্লাষ্টিক-ধাতুতে নির্ম্মিত। এ-ধাতুতে মরীচা বা 'রাষ্ট' পড়ে না।

——

দুর্ব্বলের বল

দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর দেহ দুর্ব্বল হয়। সেজন্য একটু নড়া-চড়া করিলে শ্রান্তির ভারে আমরা আচ্ছন্ন হই, অথচ সে-সময় একই ঘরে পড়িয়া থাকিলে মন অস্বাচ্ছন্দ্যের ভারে ভারী হইয়া ওঠে। এমন

সোফায় চাকা

উভয়-সঙ্কট অবস্থায় যদি সোফাতে তিনখানি চাকা আঁটিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে সোফায় বসিয়া ষ্টিয়ারিংয়ের সাহায্যে নিরাপদ-বিচরণে মুক্ত বায়ু ও আরাম-সুখ ভোগ করিতে পারিবেন; সঙ্গে সঙ্গে দেহকে অচিরে সুস্থ-সবল করা শক্ত হইবে না।

——

বাষ্পে ফল পাকানো

পুরাকালে চীনের লোক বন্ধ ঘরে কাঁচা ফল রাখিয়া বিচিত্র ধূপের ধোঁয়া দিয়া সে-ফল পাকাইয়া তুলিতেন। নকল-উপায়ে পাকানো এ ফলের স্বাদে বা গন্ধে এতটুকু বৈকল্য ঘটিত না; অথচ পাখীর দংশনে বা পচিয়া নষ্ট হইবার পূর্ব্বে ফলগুলিকে রক্ষা করা চলিত।
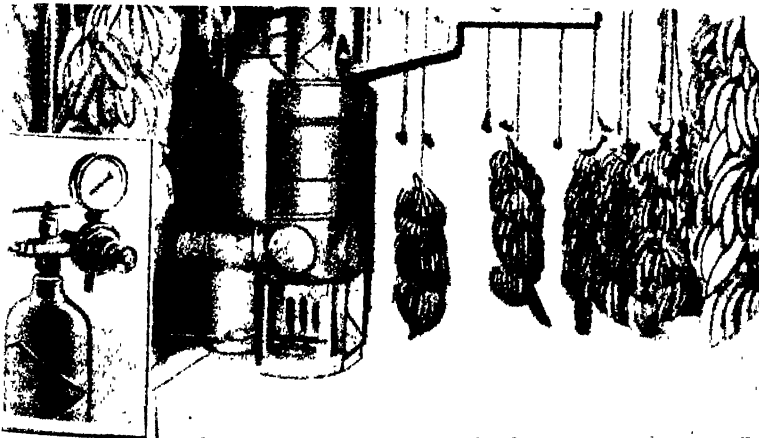
ফল-পাকাইবার যন্ত্র

কাজেই সকল দিক দিয়া লাভ হইত অনেকখানি। এ যুগে এথিলিন গ্যাসের (Ethylene gas) ছোঁয়াচ লাগাইয়া কাঁচা-ফলকে বৈজ্ঞানিকেরা নিখুঁত ভাবে পাকাইয়া তুলিতেছেন। মিনাসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হার্ডি অল্প ব্যয়ে একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছোট একটি সিলিণ্ডার; এই সিলিণ্ডারে এক কিউবিক্-ফুট এথিলিন গ্যাস ভরিয়া সেই গ্যাস সংযোগে এক-গাড়ী কাঁচা ফল তিনি পাকাইয়া তুলিয়াছেন। কলা, টোমাটো, নাসপাতি, আনারস, লেবু, কমলালেবু, আঙুর—এ যন্ত্রের কল্যাণে পাকিয়া রসনার তৃপ্তি-সাধন করিতেছে। অকাল-পক্কতার কটুতা এ ফলে আদৌ নাই!

ডাক-পিয়নের গাড়ী

আমেরিকার কলম্বিয়া প্রদেশে ডাক-পিয়নকে পায়ে হাঁটিয়া চিঠিপত্র

ডাক-পিয়নের গাড়ী

বিলি করিতে হয় না। স্কুটারে চড়িয়া তারা চিঠিপত্র বিলি করে। স্কুটার চার-চাকার; গ্যাসোলিন-মোটরে চলে। স্কুটারের উপর পিয়নের মেল-ব্যাগ থাকে। স্কুটারের গতিবেগ ঘণ্টায় বারো মাইল করিয়া। একটি স্কুটার তৈয়ারী করিতে ব্যয় পড়ে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা।

সাঁতারে আর্ট

ছবিখানি কাল্পনিক নয়। সাঁতারের চৌবাচ্চায় তিনটি কিশোরী ডুব-সাঁতার কাটিয়া পায়ের সাহায্যে নানা 'ফিগার'-গঠনে কতখানি পারদর্শিনী, তাহারি একটু নিদর্শন।

সাঁতারে আর্ট

বাতি-দানে বাতি ফিট

বাহারে নক্‌সা দার বাতি-দানে অনেক সময় বাতি ঠিক ফিট করে না। এজন্য ছুরি দিয়া বাতির প্রান্তভাগ কাটিয়া চাঁচিয়া-ছুলিয়া লইতে হয়। তাহাতে বাতির জান্‌ কমিয়া যায়, এবং অপচয়ও ঘটে। ছোট বাতি-দানে বাতি ফিট

গরম জলে বাতির তলা ডুবানো

করিবার সময় ফুটন্ত জলে বাতির প্রান্ত-ভাগ যদি বার-বার ডুবাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে জলের তাপে বাতির মোম গলিয়া যাইবে এবং বাতির প্রান্ত-ভাগ সরু হইয়া বাতি-দানে ঠিক ফিট করিবে।

ক্ষণ-মাধুরী

বিচিত্র সংস্থান-ক্ষণে মাঝে মাঝে লভিয়াছি প্রিয়!
প্রেমঘন স্পর্শ তব, প্রকৃতি আপন সুধা দিয়া
তারে করিয়াছে ধন্য। চরিতার্থ সেই ক'টি পল
এ মর্ত্ত্য-জীবনে সখি, অমৃত তা একান্ত সম্বল!
যৌবনের অবশেষ তোমা সহ করেছি যাপন
সুখে-দুখে সহভাগী সঙ্গী আর সঙ্গিনী যেমন।
সে-পলগুলির কথা গেছ তুমি হয় তো ভুলিয়া
অন্তরের পদ্মাসনে সেগুলিরে রেখেছি তুলিয়া
রত্নগণি! ভুলি নাই। ভুলিব না। পাছে ভুলে যাই,
দেশ-কাল-প্রকৃতিরে ডাকি সাক্ষ্য মানিয়াছি তাই।

একটি পলের কথা বলি হেথা—ব্রহ্মপুত্র-স্রোতে
আমরা চলিয়াছিনু তরী-বক্ষে কামরূপ হ'তে।
ঘুমায়ে পড়িয়াছিনু। স্নিগ্ধ কর পরশ-নবনী
লভি ললাটের পরে চমকিয়া জাগিনু তখনি।
আদরে বলিলে তুমি—"তরঙ্গের উন্মত্ত মিলন
জ্যোৎস্না-সনে দেখিবে না, কবি হয়ে ঘুমাবে এখন?"
ভুলি নাই। জ্যোৎস্না-রাত্রি, নদী-ধারা, কল-কল নাদ
ভুলিতে কি দিবে মোরে? ক্ষমিবে কি মোর অপরাধ?
সকলি বিষাক্ত তিক্ত এ জীবনে জ্বালা আর জ্বালা,
এ বক্ষে সম্বল শুধু সেই ক'টি মুহূর্ত্তের মালা।

শ্রীউপগুপ্ত শর্ম্মা।

যুদ্ধ এবং ভারত

য়ুরোপে যুদ্ধ চলিতেছে। ভারতবাসীকেও এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে; কারণ, এ যুদ্ধ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে; ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধেও ভারতকে এই ভাবে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধে মিত্র-পক্ষে ভারতের দান কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কিছু দিন পূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতী'তে আলোচিত হইয়াছে। যুদ্ধ ব্যাপারটা অতীব রহস্যময়। উহা যে ঠিক মানুষের ইচ্ছাতেই ঘটে, এ-কথা নানা কারণে বলা চলে না। অনেক সময় মানুষ একটা অদৃষ্ট-শক্তির দ্বারা উহাতে জড়াইয়া পড়ে। স্থূল-দৃষ্টিতে আমরা দেখিতে পাই যে, এই বিশ্ব-রচনার মূলে রহিয়াছে ধ্বংস-শক্তির এবং সংগঠন-শক্তির একটা বিচিত্র খেলা। মনুষ্য-সমাজেও তাহারই অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। সেই অভিব্যক্তিই সংগ্রাম বা সঙ্কট। সেই জন্য যুদ্ধ অনেক সময় সামান্য একটা সূত্র ধরিয়া আসে, এবং মানুষের স্কন্ধে চাপিয়া বসে। য়ুরোপের কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, "মানুষের প্রগতি এবং অধোগতি উভয়ই সঙ্ঘটিত হয় কতকগুলি শক্তির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সঙ্ঘর্ষ-নিবন্ধন,—সেই সকল শক্তি ক্ষুদ্র হইতে পারে, বৃহৎও হইতে পারে,—অল্প স্থানব্যাপী হইতে পারে—আবার বিশ্বব্যাপীও হইতে পারে। উহা আর্থিক ও রাজনীতিক উভয়বিধই হইতে পারে, অথবা উহা মনোভাবজনিত বা জীবধর্ম্ম-সম্পর্কিতও হইতে পারে। সেই কারণে প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞানের কার্য্যই হইতেছে উহাদের পরস্পরের বলাবল বিশ্লেষণ পূর্ব্বক উহা জাতীয় কল্যাণসাধনকল্পে যথাসম্ভব পরিচালিত করা, এবং যাহা স্পষ্টই বিপজ্জনক বলিয়া বিবেচিত হয় তাহার প্রতিরোধ করা।" * সংগ্রাম এইরূপ সঙ্ঘর্ষণেরই অভিব্যক্তি। ইহা মানবের মানস-শক্তির ঐরূপ একটা বিপ্লবেরই বিকাশ। সেই জন্য অনেক সময় দেখা যায় যে, এক একটা তুমুল যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনমাত্রই ঘটে না,—অধিকন্তু মানবসমাজে আর্থিক, রাজনীতিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক (অর্থাৎ ধর্ম্মগত) পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হইয়া থাকে।

বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর সিকি শতাব্দী অতীত না হইতেই য়ুরোপে পুনর্ব্বার রণদামামা বাজিয়া উঠিল! বিগত যুদ্ধের ফলে কেবল যে য়ুরোপে কতকগুলি নূতন রাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছিল এরূপ নহে; আর্থিক, রাজনীতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবেরও অনেক উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার আর্থিক এবং রাজনীতিক দিকটার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইতেছে। মহাযুদ্ধের পর দেখা গিয়াছে যে, বাণিজ্যের গতি স্থানে স্থানে নূতন পথ ধরিয়াছে। মার্কিণ ছিল দেনদার দেশ, হইয়াছে পাওনাদার দেশ। কৃষিমাত্র সম্বল করিয়া শিল্পী জাতিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। ইটালীও রাজনীতিক শক্তিতে এবং শিল্প-বাণিজ্যে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট। ভারতবাসীরাও বিগত যুদ্ধের পর হইতে শিল্প-চর্চ্চায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিষয়ে ভারতবাসীরা সরকারের নিকট যেরূপ সাহায্য লাভের আশা করিয়াছিল, তাহাদের সেই আশা অতি অল্পই সফল হইয়াছে। অটোয়া-চুক্তিতে লাঙ্কেশায়ারের তাঁতি-দিগের সহিত ভারতে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী-বিষয়ক চুক্তিতে, জাপান হইতে ভারতে কার্পাস পণ্য আমদানী সম্বন্ধে অস্থায়ী চুক্তিতে ভারতের জনমত গৃহীত হয় নাই,—ইহা ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণের প্রায় সকলেই

---

* The progress and retrogression of mankind is determined by the involved action and interaction of forces great and small, local and worldwide economic, political, psychological and biological. It is the essence of statesmanship to endeavour to analyse the strength of these forces, and direct them, so far as possible, into paths leading to the national good or fearlessly to oppose those that are plainly dangerous.

একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আয়কর বর্দ্ধন, অতিরিক্ত মুনাফা-কর, এবং আমদানী কার্পাসের উপর ধার্য্য শুল্ক প্রভৃতিও ভারতের জনমতের বিরোধী হইয়াছে। এই জন্য ভারত যে আর্থিক বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে, এরূপ ধারণা করা এদেশবাসী অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

যাহা হউক, এই যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করা ভারতবাসীর যে অবশ্যকর্ত্তব্য, দেশের শিক্ষিত সমাজকে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে। কারণ, ভারতবাসী কোন দিন নাজিবাদের সমর্থন করে নাই, করিবেও না; সুতরাং এই সংগ্রামে আমরাও লিপ্ত আছি,—কেবল ইংরেজের মুখের দিকে চাহিয়া নহে, নিজেদের কল্যাণের জন্যও ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

সম্প্রতি মিষ্টার ব্রক বিলাতী 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্রে লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেস আইনানুযায়ী স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অধিক জিদের সহিত দাবী করিতেছেন; ইহার শেষ ফল কি হইবে, তাহা এখন বলা সম্ভব নহে সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা লক্ষিত হইতেছে, তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পের যে বিশেষ প্রগতি ঘটিবে, তাহার যে কেবল সম্ভাবনাই সূচিত হইতেছে এরূপ নহে, বস্তুতঃ তাহা নিশ্চিত বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে।"—মিষ্টার ব্রক কি কারণে ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত এ-কথা বলিলেন, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। বৃটেন হইতে ভারতে আমদানী কার্পাস বস্ত্রের উপর ধার্য্য শুল্ক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহার ফলে এদেশের কার্পাস-কলওয়ালাদিগকে আমদানী বস্ত্রের সহিত কঠোরতর প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে। অবশ্য, এই যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে জলপথে ভারতে কার্পাস পণ্য প্রভৃতির আমদানী সঙ্কুচিত হইতে পারে; কিন্তু উহার এই প্রকার সঙ্কোচ আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা শান্তির ভিতর দিয়া প্রগতির পক্ষপাতী; কারণ, যুদ্ধ চিরস্থায়ী নহে; যুদ্ধাবসানে যখন রাশি রাশি কার্পাস পণ্য বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইতে থাকিবে, তখন সেই প্রতিযোগিতার তীব্রতা প্রতিহত করিয়া ভারতীয় কার্পাস-কলগুলির আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। সেই জন্য আমরা অশান্তি এবং বিঘ্নজনিত সুবিধা লাভজনক বলিয়া মনে করিতে পারি না; সুতরাং তাহা প্রার্থনীয় বলিয়াও মনে হয় না। বস্তুতঃ, উহা কখনও স্থায়ী হয় না। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতে কার্পাস-শিল্প, চর্ম্ম-শিল্প, লৌহ-শিল্প, ভেষজ-শিল্প প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; যুদ্ধের সময় উহার কিছু উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সত্য। যুদ্ধের পর কেবল শর্করা শিল্প এবং সিমেণ্ট-শিল্প প্রতিষ্ঠিত, এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় টাটার লৌহের কারখানা হইতে রেলওয়ের অনেক দ্রব্য ক্রয় করা হইত; এখনও তাহা লওয়া হয়। দেশের লোক কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংগঠন করিলে তাহা যদি সরকারের আনুকূল্য ও সহায়তা না পায়, তাহা হইলে তাহা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। শর্করা এবং সিমেণ্টের কারবার যুদ্ধের পর ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছে; কিন্তু শর্করা-শিল্প এখনও জাভাজাত শর্করার প্রতিযোগিতার ভয়ে সঙ্কুচিত। জাভা-চিনির কাট্‌তি আবার ধীরে ধীরে ভারতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর যদি শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ভারতের সহিত অটোয়া-চুক্তি যে ভাবে হইয়াছিল, তাহা কখনই হইতে পারিত না, এবং লাঙ্কাশায়ারের সহিত ভারতে কাপড় বিক্রয়ের যে সর্ত্ত করা হইয়াছে, তাহা কোন মতেই করা যাইত না। অতএব ভারতবর্ষ যে বিগত মহাযুদ্ধের পর শিল্প-ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই; কিন্তু তাহা হইলেও শিল্প-ব্যাপারে ভারত যে বিগত যুদ্ধের পর অতি সামান্য দূর অগ্রসর হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তাহার পর মিষ্টার ব্রক বলিয়াছেন, "আর একটা দিক দিয়াও ভারতবাসী আর্থিক বিষয়ে বিশেষ ভাবে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। সে দিকটা কেহ ভাবিয়া না থাকিলেও ভাবা উচিত। বিলাতে ভারতের অনেক টাকার ঋণ আছে। উহার পরিমাণ ৩০ কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং, বা ৪ শত কোটি টাকা! বৎসরে উহার সুদ দিতে হয়—শতকরা ৩ পাউণ্ড হইতে ৫ পাউণ্ড হারে। অধিকাংশ টাকার সুদের হার শতকরা সাড়ে ৪ পাউণ্ড (বিলাতের মত ধনাঢ্য দেশে এত উচ্চ হারে সুদ দিতে

হয় না,—কেবল ভারতকেই দিতে হয়)। ভারত প্রতি বৎসর পাই-পয়সা পর্য্যন্ত এই সুদ চুকাইয়া দিয়া আসিতেছে। এখন এই যুদ্ধের জন্য বিলাতী মাল ভারতে অল্প পরিমাণে রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু ভারতীয় মাল অধিক পরিমাণেই বিলাতে চালান যাইতেছে। ফলে ভারতের পক্ষে বাণিজ্যের পাল্লা সাধারণ সময় অপেক্ষা এখন অধিক ভারি হইতেছে। যদি এই যুদ্ধ তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ভারত তাহার বিলাতী ঋণ অনেকটা কমাইয়া ফেলিতে পারিবে ; যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীদিগকে সে দিকে অধিক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইবে।”

মিষ্টার ব্রকের এই কথাগুলিই ইহার পূর্ব্বে ‘ক্যাপিটাল’ পত্রে একটু বিশদ ভাবে বলা হইয়াছিল। উহাতে অধিকন্তু ইহাও বলা হইয়াছিল যে, এই যুদ্ধের সময় গ্রেট বৃটেন ভারত হইতে অনেক প্রধান এবং কাঁচা মাল কিনিবে। সে জন্য হয় ত অনেক জিনিষের মূল্যও চড়িতে পারে। সুতরাং ঐ ঋণের টাকাটা পরিশোধ করিবার সুবিধা আরও অধিক হইবে। এই ভাবে অনেক টাকা শোধ হইবে। ভারত সুদের দায় হইতেও বাঁচিয়া যাইবে।—কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার মত। বিদেশী ঋণ যে মর্ম্মান্তিক দুঃসহ, সে বিষয়ে ত সন্দেহ মাত্র নাই। উহাতে আর্থিক স্বাধীনতা বিশেষ ভাবেই বিলুপ্ত হয়। ঐ ৪ শত কোটি টাকা ঋণের জন্য ন্যূনকল্পে বার্ষিক আঠার কোটি টাকা সুদ দিতে হয়। সুদের হার গড়ে শতকরা সাড়ে চারি টাকাই ধরা গেল। কিছু কম হইলেও বাট্টার মাচ্কোফেরে তাহা পোষাইয়া যায়। সুতরাং ঐ ঋণ পরিশোধ হওয়া যে ভারতবাসীর পক্ষে প্রার্থনীয়, তাহা বালকেও বুঝিতে পারে। এখন যদি কিছুকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলে, তাহা হইলে এই পর্ব্বতপ্রমাণ ঋণের কিছু লাঘব হইতে পারে। যদি এক শত কোটি টাকা ঋণেরও লাঘব হয়, তাহা হইলে সুদ-বাবদ বার্ষিক সাড়ে ৪ কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। গৌরী সেনের টাকা হইলেও ইহা নিতান্ত অল্প নহে !

নানা কারণে আমাদের বিশ্বাস, গ্রেট বৃটেন বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। সম্ভবতঃ এই যুদ্ধ তিন বৎসর কাল স্থায়ী হইবে না। সুতরাং ভারতের পক্ষে এই সময়ের মধ্যে এই পর্ব্বতপ্রমাণ বৈদেশিক ঋণের একটা মোটা অংশ পরিশোধ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই যুদ্ধে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য বিশেষ সঙ্কুচিত হইবে। কারণ, প্রায় সমস্ত য়ুরোপই এখন ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণী এবং ইটালী ভারতের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের সহিত ভারত আর বাণিজ্য-সম্বন্ধ রাখিতে পারে না, এবং চাহেও না। তাহা যাউক, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ ও ফ্রান্স এখন অসহায় ভাবে শত্রুকবলিত ; স্পেনের অবস্থাও সন্দেহজনক। এদিকে বলকানে রুশিয়ার প্রভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। তথায় ভারতীয় পণ্যের পরিবর্ত্তে রুশিয়ার পণ্যই বেশী কাটিবে। কাজেই এখন ভারতের প্রধান খরিদদার হইল য়ুরোপে ইংরেজ, এবং আমেরিকায় মার্কিণ। মার্কিণ অনেক জিনিষ দক্ষিণ-আমেরিকাতেই পাইবে ; সুতরাং তাহারা আমেরিকা ছাড়িয়া সুদূর ভারতে পণ্য কিনিতে আসিবে, ইহা আশা করা যায় না। কাজেই এই যুদ্ধের গতি আপাততঃ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে উপস্থিত এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিশেষ অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা অল্প। তবে ব্যাপারটি কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসী এই যুদ্ধের সময়ে এবং তাহার কিছু কাল পর পর্য্যন্ত বিশেষ লাভ করিয়া বিলাতী ঋণ হালকা করিতে পারিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সত্য বটে, গত জানুয়ারী মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে ৪০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল। এত অধিক টাকার পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর আর কোন মাসেই হয় নাই। ঐ মাসে পণ্যের আমদানীর এবং রপ্তানীর অঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়েও এইরূপ আমদানী এবং রপ্তানীর বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। যুদ্ধের পর ভারতের সুবর্ণ রপ্তানী করিয়া বিদেশী দেনার টাকা দিতে হইয়াছিল। সেই সুবর্ণ ভারতের সঞ্চিত ধন। উহার রপ্তানী ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। যুদ্ধের পরে যে মন্দা দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে ভারতের ক্ষতি অল্প হয়

নাই। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় বাণিজ্য হিসাবে যে সুবিধা পাওয়া গিয়াছিল,—সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য ভারতবাসীর প্রতিকূলই হইয়াছিল; সুতরাং যুদ্ধকালীন স্বল্পকাল-স্থায়ী সুবিধা আদৌ সুবিধা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। বানের ঘোলা জল নদীতে প্রবেশ করিয়া পরে যদি নদীর স্বচ্ছ সুপেয় জল টানিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা স্থায়ী মঙ্গলের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যায় কি? ইহাতে অর্থের দিক দিয়া কিছু দিনের জন্য ভারতবাসীর হয় ত কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে,—কিন্তু সেই সুবিধা কত দিন স্থায়ী হইবে, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। সে বিষয়ে কাহারও স্থির-নিশ্চয়তা জন্মিতে পারে না।

মিষ্টার ব্রকের ন্যায় লোক মনে করেন যে, এই যুদ্ধের সময় কৃষিজ পণ্যের যে মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ভারতের কৃষিজীবিগণের হাতে অধিক টাকা আসিবে। মতের দিক দিয়া (Theoretically) কথাটা সত্য হইলেও বাস্তবপক্ষে উহা নির্ভরযোগ্য নহে। ভারতের কৃষক-দিগের জোতে জমি সাধারণতঃ অতি অল্পই থাকে। তিন বিঘা হইতে আট দশ বিঘার অধিক জমি অধিকাংশ কৃষকের জোতেই নাই। অথচ তাহাদের প্রায় সকলেরই পরিবারে পাঁচ-ছয় জন পোষ্য; সুতরাং তাহাদের চাষের জমিতে তাহাদের পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী সমস্ত পণ্য উৎপাদিত হওয়া সম্ভব নহে। অনেক কৃষিজাত দ্রব্যই তাহাদিগকে কিনিয়া খাইতে হয়; ইহা ভিন্ন তাহা-দিগকে বর্দ্ধিত মূল্যে কেরোসিন তৈল, ঔষধ, বস্ত্র ও অন্যান্য অনেক অত্যাবশ্যক পণ্য কিনিতে হইতেছে; কাজেই তাহাদের আয় এক দিকে যেমন কিছু অধিক হয়, অন্য দিকে ব্যয় তেমনই অনেক বাড়িয়া যায়। সুতরাং তাহাদের 'নুণ আনতে পান্তা ফুরায়, পান্তা আনতে নুণ!'—এ দেশের চাষীদিগের হাতে যদি মার্কিণ প্রভৃতি দেশের চাষীদিগের ন্যায় বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র থাকিত, তাহা হইলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে তাহাদের সুবিধা হইবার আশা ছিল। ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের অধিকারে অতি অল্প জমি থাকে বলিয়া তাহাতে উহাদের কিঞ্চিৎ লাভ হইলেও সেই লাভের গুড় পিপীলিকায় ভক্ষণ করে!

যাহা হউক, এই যুদ্ধের সময় বৈদেশিক ঋণভার কিঞ্চিৎ কমিতে পারে, সত্য। বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসার বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে কি না,—সে বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইতেছে। এই যুদ্ধে য়ুরোপের অনেক রাজ্যকেই দুর্দ্দান্ত নাজিদিগের প্রভাবাধীন হইতে হইয়াছে। বলকানে রুশীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবেই। ফলে য়ুরোপে আর ভারতবাসীর কৃষিজ পণ্য বিক্রয়ের বাজার মিলিবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। যুদ্ধের পর বৃটিশজাতি যে ভারত হইতে অধিক কৃষিজ পণ্য ক্রয় করিতে থাকিবেন, তাহাও দুরাশা বলিয়াই মনে হয়। মিষ্টার ব্রক বলিয়াছেন, "ভারত-বাসীরা আজ কুড়ি বৎসর যাবৎ বিশেষ ভাবে শিল্প-সাধনা করিয়া আসিতেছে; সুতরাং এই যুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে পণ্য আমদানী কমিয়া যাইলে তাহারা শিল্পকার্য্যে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিবে।"—কিন্তু এই অনুমান যুক্তিসহ নহে। গত কুড়ি বৎসরে ভারতবাসী শিল্পসেবায় কথঞ্চিৎ আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাহারা প্রয়োজনানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এই দরিদ্র দেশে মূলধন সংগ্রহ করিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত করাই কঠিন। তাহার উপর যুদ্ধের অবসান হইলেই পুনরায় যখন বিদেশ হইতে ভূরি পরিমাণে পণ্যের আমদানী হইতে আরম্ভ হইবে, তখন দেশীয় কারবার-গুলির শোচনীয় অবস্থা অপরিহার্য্য হইবে। বিগত মহা-যুদ্ধের পরও সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন বর্ত্তমান যুদ্ধ কত দিন চলিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এ যুদ্ধে লাভ হউক আর ক্ষতিই হউক, ইহার স্থায়িত্ব আমাদের কাম্য নহে। বৃটিশ জাতি অবিলম্বে বিজয়লাভ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। নরহত্যা এবং দস্যুতার ভিতর দিয়া যদিও কিঞ্চিৎ সুবিধা আসে, তাহা আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে। আর্থিক ব্যাপারে স্বাধীনতা আমাদের কাম্য বটে, কিন্তু এ-কথাও সত্য যে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে কতকটা স্বাধীনতা না থাকিলে আর্থিক স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে।

মিষ্টার ব্রক অনেক কথাই বলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাঁহার সকল কথার আলোচনা সম্ভব নহে, তাহার প্রয়ো-জনও নাই। বিশেষতঃ, তাঁহার আলোচিত অনেক কথাই

পুরাতন। তিনি ভারতের কৃষি-ঋণের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই কৃষি-ঋণ হয় কেন? তিনি মহাজনদিগের স্কন্ধেই সকল দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। মহাজনদিগের প্রদত্ত ঋণের সুদের হার যে অধিক, ইহা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু এদেশে কৃষিঋণ-আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়াও দেশের লোক মহাজনের দ্বারস্থ হয় কেন? এবং কৃষি-ঋণদান-প্রতিষ্ঠানগুলিরই বা এত দুর্গতির কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে কেন, তাহা তিনি চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছেন কি? দেশী মহাজনদিগের সুদের হার অধিক, কিন্তু চাষীদিগের নিকট হইতে তাহারা অধিক টাকা আদায় করিতে পারে না। তাহাদিগকে অনেক স্থলে বিশেষ আর্থিক ক্ষতি ও নানা অসুবিধাও সহ্য করিতে হয়; এবং ইহাও তাহাদের সুদের হার অধিক হইবার অন্যতম কারণ। কিন্তু কৃষকদিগের দুর্গতির প্রধান কারণ—তাহাদের জমির অল্পতা। মিষ্টার ব্রক হাতে-কলমেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৭০ হইতে ৮০ জন কৃষিজীবী। যে দেশ পুরাতন এবং যে দেশের লোকসংখ্যা প্রতি বর্গ-মাইলে প্রায় ৫ শত, (বাঙ্গালার ৬৪৫ জন) সে দেশের শতকরা ৮০ জন যদি কৃষিজীবী এবং কৃষির উপস্বত্ব-ভোগী হয়, তাহা হইলে সে দেশের কৃষকগণকে যে ঋণগ্রস্ত হইতেই হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? সে দেশের দারিদ্র্য ঘুচিবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে সে দেশ যদি শিল্প-বাণিজ্যসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে, তাহা হইলেই সে দেশের দারিদ্র্য কোনও দিন ঘুচিতে পারে। ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা শিল্পানুশীলনের যেরূপ অনুকূল, অনেক দেশের অবস্থাই সেরূপ নহে। জার্ম্মাণীতে ঔষধ প্রস্তুতের বড় বড় কারখানা আছে; কিন্তু ঔষধ প্রস্তুতের উপাদান ভারতে স্বচ্ছন্দ ভাবে যত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেরূপ আর কোন্ দেশে পাওয়া যায়? কেবল এই বিষয়ে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে, সাফল্য লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আর যদি নব-প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িকতার খাতিরে প্রকৃত যোগ্য লোক নিয়োগে বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে সকলই নষ্ট হইবে। সেই জন্য বহু লোকেরই ধারণা, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে অন্যান্য দেশ যত সুবিধাই লাভ করুক, ভারতের কোন স্থায়ী সুবিধা হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং অনেকেই মনে করিতেছেন যে, আর্থিক ব্যাপারে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে হইলেও রাজনীতি-ক্ষেত্রে অন্ততঃ উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠা এ দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। জাতির সত্তা বজায় রাখিতে হইলে আর্থিক ব্যাপারে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু কতকটা রাজনীতিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার না থাকিলে আর্থিক ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রণ করিবার সম্ভাবনা কোথায়? আমরা সেই জন্যই বলি, সরকারের এখন ভারতবাসীকে পূর্ণমাত্রায় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য;—অন্ততঃ পূর্ণমাত্রায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দান করাই একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা এই যুদ্ধের ফলে ভারতের প্রগতি হইবে,—এই মৌখিক কথা একান্ত অসার; এবং ঐ কথায় ভারতবাসীকে ভুলাইবার চেষ্টা করা নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

যেন বলা যায়

বসন্তের দখিন বাতাস যে-কথাটি বার-বার গিয়াছে শুধায়ে—
"ওগো বধূ কথা কও" বিহঙ্গ কাতর-কণ্ঠে ফিরিয়াছে গেয়ে।

কোকিলের কুহু-তানে অলির ঝঙ্কারে
তখন হয়নি বলা সরমে—
অধরে বাধিয়া পুনঃ ফিরেছে সে কথা-দু'টি
যাতনায় দহিবারে মরমে!

আজি নব-বরষার পূবালী হাওয়ায়
হারানো সে কথা-দু'টি যেন বলা যায়!
আজি আর নাই সেই সরমের ভার,
আজিকার দশদিশি—নিকষ-আঁধার!

শ্রীনিভা দেবী।

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর *

২

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশদ ভাবে দেখাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মহর্ষি জৈমিনি-প্রচারিত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টভাষায় স্বীকৃত বা অস্বীকৃত না হইলেও মহর্ষি স্বয়ং ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; অন্ততঃ মহর্ষি বাদরায়ণের উক্তিতে বিশ্বাস করিলে আর অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। জৈমিনি ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকার করেন না সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়াই যে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করেন—ইহা বলিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কথা। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে এ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা বিশ্ববিশ্রুত পাশ্চাত্য মনীষী অধ্যাপক ম্যাক্স্ মূলার মহোদয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত হইয়া থাকে। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত অধ্যাপক মহাশয়ের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি বলিতেছেন—'এই জগতে যে সকল ক্ষেত্রে অবিচারের জয় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, সেই সকল বৈষম্যের দায়িত্ব ঈশ্বরের উপর চাপাইয়া দিতে জৈমিনি ইচ্ছুক নহেন। এই কারণে, তিনি সকল বস্তুকেই কার্য্যকারণ-ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন; আর সেই হেতু তিনি বলিয়াছেন যে, জাগতিক বৈষম্য সুকৃত বা দুষ্কৃত হইতে সঞ্জাত অপূর্ব্বের ফল মাত্র (অর্থাৎ জগতে যে সকল বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা মানবের স্বকৃত পুণ্য বা পাপের চরম পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই নহে)। এরূপ সিদ্ধান্তকে কখনও 'নিরীশ্বরবাদ' নামে অভিহিত করা যায় না; বরং জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের উপর সাধারণতঃ যে নৈর্ঘৃণ্য ও বৈষম্য দোষের আরোপ করা হইয়া থাকে—এরূপ সিদ্ধান্ত সেই দোষদ্বয় খণ্ডনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এইরূপ সিদ্ধান্তের সাহায্যে মীমাংসকগণ ঈশ্বরের ন্যায়দর্শিতার সমর্থন করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন। জগতে অবিচার-পক্ষপাত-বৈষম্যের বহু দৃষ্টান্ত আপাততঃ প্রতীয়মান হইলেও সেগুলির জন্য যে ঈশ্বর কোন প্রকারেই দায়ী হইতে পারেন না—তাহা প্রতিপাদন করাই এই প্রাচীন মীমাংসামতের গূঢ় উদ্দেশ্য বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়। এ কারণে, জৈমিনি-সিদ্ধান্তকে অন্য যে কোন নামেই অভিহিত করা যাউক না কেন, উহাকে 'নিরীশ্বরবাদ' আখ্যা দেওয়া একান্তই অসম্ভব'। (১)

অধ্যাপক ম্যাক্স্ মূলারের উক্ত গভীরার্থক বিবরণটির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিলে চিন্তাশীল পাঠককে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অধ্যাপক কীথের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি নিতান্তই যুক্তিহীন ও অসার—'মীমাংসাদর্শনের নিরীশ্বরত্ব প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত—উহাকে উড়াইয়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব; অতএব, এ বিষয়ে ম্যাক্স্ মূলার প্রভৃতি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই বৃথা'—ইত্যাদি। (২)

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ে বহুকাল হইতে এই মস্যে

---

* প্রথম প্রবন্ধ—মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৪১।

(১) "Jaimini would not make the Lord responsible for the injustice that seems to prevail in this world and hence, reduced everything to cause and effect, and saw in the inequalities of the world the natural result of the continued action of good or evil acts. This surely was not atheism, rather was it an attempt to clear the Lord from the charges of cruelty or undue partiality, which have so often been brought against Him. It was but another attempt of justifying the wisdom of God, an ancient Theodicee that, whatever we may think of it, certainly did not deserve the name of atheism."—The Six Systems of Indian Philosophy, P. 277.

[Theodicee (Theodicy)—vindication of divine providence in view of existence of evil—জগতে বৈষম্য-দোষ দৃষ্ট হইলেও ঈশ্বর যে তাহার জন্য দায়ী নহেন—ইহা প্রতিপাদন।]

(২) The atheism of the true Mīmāṃsā is regarded with such unanimity as to render it impossible to explain it away." (Footnote—"as does Max Muller..........")—Keith, Karma-Mīmāṃsā, P. 61.

একটি লোকবাদ প্রচলিত আছে যে, জৈমিনির মীমাংসা-দর্শন নিরীশ্বরবাদের প্রচারক। এই লোকপ্রসিদ্ধির মূল কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, বেদান্ত-দর্শনের "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৪০) সূত্রটিই এবংবিধ লোকপ্রসিদ্ধির উৎপত্তিস্থল বলিয়া অনুমান করা হয় ত অসঙ্গত হইবে না; কারণ, উক্ত সূত্রেই বাদরায়ণ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জৈমিনি-মতে সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফলদাতা ধর্ম্ম—ঈশ্বর নহেন।

আর একটি কথা। "ফলমত উপপত্তেঃ" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩৮) সূত্রে বাদরায়ণ দেখাইয়াছেন যে, ঈশ্বরই পুণ্য ও পাপের ফলহেতু—অপূর্ব্ব বা ধর্ম্ম নহে (৩)। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর দুইটি বিভিন্ন পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন। উহাদিগের মধ্যে প্রথমটি এইরূপ—

'আচ্ছা, ইহা যদি বলা যায় যে,—(কর্ম্ম অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায় সত্য, কিন্তু) এই বিনাশোন্মুখ কর্ম্ম নিজ অবস্থিতিকালেই স্বানুরূপ ফল উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হয়, আর সেই ফল কালান্তরে কর্ম্মকর্ত্তা ভোগ করিয়া থাকেন। (এইরূপ বলিলেও দোষক্ষালন হয় না; কারণ, ভোক্তৃসম্বন্ধের পূর্ব্বে ফলের ফলত্বসিদ্ধিই হয় না; অর্থাৎ—ভোক্তা যখন কোন সুখ বা দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকেন, তখনই উহা 'ফল'রূপে লোকমধ্যে পরিগণিত হয়; তাহার পূর্ব্বে উহাকে 'ফল' নামে অভিহিত করা যায় না। সুখ বা দুঃখ আত্মার সহিত সম্বন্ধ না হইলে লোকে তাহাকে সুখ বা দুঃখ বলিয়াই স্বীকার করে না'।) (৪)

দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষটির ভাবার্থও নিম্নে প্রদত্ত হইল—

'আর যদি বলা যায় যে,—কর্ম্মের অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরক্ষণে ফলোৎপত্তি নাই বা হইল; কর্ম্মসঞ্জাত 'অপূর্ব্ব' হইতেই ভবিষ্যৎকালে এই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, (তাহা হইলে তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, অপূর্ব্ব কাষ্ঠ-লোষ্টের মত অচেতন পদার্থবিশেষ। কোন চেতনের দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইলে উহার পক্ষে স্বতন্ত্র-ভাবে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। শুধু তাহাই নহে; অপূর্ব্ব ত মীমাংসকগণের কল্পিত পদার্থবিশেষ। বাস্তবিক উহার অস্তিত্ব আছে কি না, সে সম্বন্ধেই প্রমাণাভাব'।) (৫)

প্রথম পূর্ব্বপক্ষটি সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে সবিস্তরে আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত আলোচনার ফলে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জৈমিনিমতে ফলহেতু ও জগৎকারণ সম্পূর্ণ পৃথক্; কারণ, তিনি ধর্ম্ম, কর্ম্ম বা অপূর্ব্বকে ফলহেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও অপূর্ব্ব যে জগৎকারণ—ইহা কুত্রাপি ইঙ্গিতেও স্বীকার করেন নাই। আবার তাঁহার সিদ্ধান্তে ঈশ্বর ফলহেতু (অর্থাৎ কর্ম্মফলদাতা) বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও তিনি যে জগৎকারণ নহেন,—ইহাও কোন স্থলে বলা হয় নাই। তাঁহার মতে ঈশ্বর ফলদাতা নহেন সত্য; কিন্তু সেই কারণে তিনি যে জগৎস্রষ্টাও হইতে পারেন না—এরূপ কথা বলা চলে না। অতএব, প্রথম পূর্ব্বপক্ষটি জৈমিনি-সিদ্ধান্তানুসারী হইলে

---

(৩) 'প্রাণিগণের সংসারে ভোগ্য কর্ম্মফল ত্রিবিধ—(ক) অবিমিশ্র সুখজনক স্বর্গরূপ ইষ্ট ফল, (খ) অবিমিশ্র দুঃখকর নরকভোগ্য অনিষ্ট ফল, ও (গ) মনুষ্যলোকে ভোগ্য ইষ্টানিষ্টমিশ্রিত ফল। বিচার্য্য এই যে, এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল কি কর্ম্ম হইতেই স্বতঃ উৎপন্ন হয়, অথবা ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে? উত্তরে বক্তব্য এই যে, কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বরই ফলহেতু; কারণ, ঈশ্বর সর্ব্বাধ্যক্ষ—বিচিত্র সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কর্ত্তা—দেশকালবিশেষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। এই হেতু তিনি কর্ম্মকারিগণকে নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল-প্রদানে সমর্থ—ইহা বলা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, কর্ম্ম অনুষ্ঠানের পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া কালান্তরে ফলোৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না; কারণ, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব'। "যদেতদিষ্টানিষ্টব্যামিশ্রলক্ষণং কর্ম্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তূনাং, কিমেতৎ কর্ম্মণো ভবত্যাহোস্বিদীশ্বরাদিতি ভবতি বিচারণা, তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে ফলমত ঈশ্বরাদ্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? উপপত্তেঃ। স হি সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধদ্দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্ম্মিণাং কর্ম্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়ত্যু-পপদ্যতে। কর্ম্মণস্ত্বনুক্ষণবিনাশিনঃ কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্য-নুপপন্নম্, অভাবাদ্ভাবানুৎপত্তেঃ।" ব্রঃ, সূ, শা, ভা, ৩।২।৩৮।

(৪) "কর্ম্ম বিনশ্যৎ স্বকালমেব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কর্ত্রা ভোক্ষ্যত ইতি। তদপি ন পরিশুধ্যতি; প্রাগ্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ ফলত্বানুপপত্তেঃ। যৎকালং হি যৎ সুখং দুঃখং বাত্মনা ভুজ্যতে, তস্যৈব ফলত্বং লোকে প্রসিদ্ধম্। ন হ্যসম্বদ্ধস্যাত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ"। শা, ভা, ৩।২।৩৮।

(৫) "অথোচ্যেত মা ভূৎ কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ। কর্ম্ম-কার্য্যাদপূর্ব্বাৎ ফলমুৎপৎস্যত ইতি, তদপি নোপপদ্যতে। অপূর্ব্বস্যাচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্টসমস্য চেতনেনাপ্রবর্ত্তিতস্য প্রবৃত্ত্যনু-পপত্তেঃ, তদস্তিত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ"। শা, ভা, ৩।২।৩৮।

বলিতে হয়, উহার মধ্যে নিরীশ্বরবাদের কোন ইঙ্গিতই নাই ; বরং ঐ প্রসঙ্গে ঈশ্বরকে নির্দ্দয়তা ও পক্ষপাত দোষ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টাই করা হইয়াছে।

কিন্তু দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষটির মধ্যে অন্য গভীরতর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই মতে অচেতন কর্ম্মকেই জগৎকারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এইরূপ কল্পনার ফলে ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকৃত হইয়া নিরীশ্বরবাদের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এই পূর্ব্বপক্ষটিও জৈমিনির সিদ্ধান্তানুসারে উত্থাপিত হইয়াছে—এরূপ ধারণা সাধারণের চিত্তে বদ্ধমূল হওয়া খুবই সম্ভব। আর তাহার পরিণামে—জৈমিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন—এরূপ লোক-বাদের উৎপত্তি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

এ প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষটি যে জৈমিনিসিদ্ধান্তানুসারে রচিত—এরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। যদি বাদরায়ণ জৈমিনিকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া বুঝিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব" (ব্রঃ সূঃ ৩।২।৪০) সূত্রটি অন্য আকারে রচনা করিতেন। বাদরায়ণ উক্ত সূত্রে জৈমিনি-মত যে ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে—জৈমিনিসিদ্ধান্তে ধর্ম্ম ফলদাতা (ফলহেতু), যে হেতু, শ্রুতিতে ঐরূপই উক্ত হইয়াছে। (৬) অতএব, কেবল শ্রুতিপ্রামাণ্য রক্ষার উদ্দেশ্যেই জৈমিনি ধর্ম্মকে ফলহেতু বলিতে চাহিয়াছেন ; কিন্তু ঈশ্বরের অভাববশতঃ তাঁহাকে ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হয় নাই—ইহাই বাদরায়ণের অভিপ্রায়। যদি বাদরায়ণের নিকট জৈমিনি নিরীশ্বরবাদী বলিয়াই প্রতিভাত হইতেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব" সূত্রটির পরিবর্ত্তে "ধর্ম্মং জৈমিনিরভাবাৎ" বা ঐরূপ কোন একটি সূত্র রচনা করিতেন। কিন্তু তাহা তিনি যখন করেন নাই, তখন বুঝিতে হইবে তাঁহার মতে জৈমিনি নিরীশ্বর-বাদী নহেন। অতএব, নিরীশ্বরবাদের ভিত্তিস্বরূপ উক্ত দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষটি যে জৈমিনির স্বরস সিদ্ধান্তানুগ নহে—ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠিবে, ইহা যদি জৈমিনিমতানুসারী না হয়, তাহা হইলে ইহার উত্থিতি সম্ভব হয় কিরূপে? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, উহা বাদরায়ণেরই কল্পিত পূর্ব্বপক্ষ মাত্র। বিষয়টি আরও একটু বিশদভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এ প্রসঙ্গে দুইটি ব্যাপার আমাদিগের আলোচ্য—(১) ফলহেতুত্ব ও (২) জগৎকারণত্ব। জৈমিনিমতে ফলদাতৃত্ব ধর্ম্মের বটে, কিন্তু জগৎকারণত্ব ঈশ্বরের। অতএব, তন্মতে ফলহেতুত্ব ও জগৎকারণত্ব এক নহে। পক্ষান্তরে, বাদরায়ণ-মতে ফলহেতুত্ব ও জগৎ-কারণত্বে কোন ভেদ নাই ; এ কারণে, যিনি জগৎকারণ, তিনিই ফলহেতু। বাদরায়ণ-সিদ্ধান্তে ঈশ্বর জগৎকারণ ; অতএব তিনি ফলহেতুও বটেন। অতঃপর বাদরায়ণ আশঙ্কা করিতেছেন যে, যদি মীমাংসক-মতানুসারে কর্ম্মকে ফলহেতু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ত কর্ম্মের জগৎকারণত্বও অবশ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে ; কারণ, তাঁহাদিগের মতে ফলহেতু ও জগৎকারণ অভিন্ন। বাদরায়ণ যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে জগৎকারণ ও ফলহেতুর অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইয়া যদি কেহ জৈমিনিসিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করিতে যান, তাহা হইলে ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে কর্ম্মই একাধারে ফলহেতু ও জগৎকারণ হইয়া দাঁড়ায়। বাদরায়ণ-কল্পিত এই শঙ্কাটিই দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষের ভিত্তিস্বরূপ। এই দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষটি মুখ্য পূর্ব্ব-পক্ষ নহে—ইহা একটি কল্পিত শঙ্কামূলক অবান্তর (বা গৌণ) পূর্ব্বপক্ষ মাত্র। প্রথম পূর্ব্বপক্ষটিই জৈমিনি-সিদ্ধান্তানু-সারে উত্থাপিত মুখ্য পূর্ব্বপক্ষ। ইহাতে স্পষ্টই জগৎকারণ ও ফলহেতুর ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। আর এই পূর্ব্ব-পক্ষটিকেই "ফলমত উপপত্তেঃ" সূত্রে বিশেষভাবে খণ্ডনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

উক্ত বিচার-বিশ্লেষণের পর নিঃসংশয়ে বলা চলিতে পারে যে, মহর্ষি জৈমিনির মতে ঈশ্বরই জগৎকারণ, কিন্তু তিনি কর্ম্মফলপ্রদাতা নহেন। এ হেতু জৈমিনিপ্রবর্ত্তিত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনকে 'নিরীশ্বর' আখ্যায় অভিহিত করা যায় না।

মহর্ষি জৈমিনি যে কেবল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন,

---

(৬) "জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যো ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। অতএব হেতোঃ শ্রুতেরুপপত্তেশ্চ। শ্রূয়তে তাবদয়মর্থঃ—"স্বর্গ-কামো যজেত" ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু।"—শা, ভা, ৩।২।৪০।

তাহা নহে—এই ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াও তিনি আলোচনা করিতে ছাড়েন নাই। অবশ্য পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্রের কুত্রাপি এ বিচার পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু বেদান্তসূত্রের দুইটি স্থলে বাদরায়ণ এ সম্বন্ধে জৈমিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত দুইটি সূত্র নিম্নে বিশ্লেষণের নিমিত্ত প্রদত্ত হইল।—

(১) বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চম অধিকরণের (কার্য্যাধিকরণের) প্রথম (অর্থাৎ আদি হইতে সপ্তম) সূত্র—"কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ" (৪।৩।৭)ও আদি হইতে দ্বাদশ সূত্র—"পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ" (৪।৩।১২) এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে অর্চ্চিরাদি-মার্গের বর্ণনাবসরে বলা হইয়াছে যে, 'ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত এক অমানব পুরুষ দেবযান-পথযাত্রীদিগকে বিদ্যুল্লোক হইতে ব্রহ্মে লইয়া যান'। (৭) এস্থলে সংশয় উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক—এই 'ব্রহ্ম' শব্দটির অর্থ কি—সগুণ অর্থাৎ কার্য্য বা অপর ব্রহ্ম, না নির্গুণ অর্থাৎ মুখ্য বা পর ব্রহ্ম? আচার্য্য বাদরি বলিয়াছেন যে, এই শ্রুতি-বাক্যটিতে গতি-সম্ভাবনার উল্লেখ থাকায় 'ব্রহ্ম' শব্দে 'কার্য্য-ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'হিরণ্যগর্ভ'কে বুঝিতে হইবে। (৮) কার্য্য-ব্রহ্ম জীবের উপাস্য—পরিচ্ছিন্ন কল্পিত রূপবিশিষ্ট। এ হেতু বিশিষ্ট উপাসনা দ্বারা তাঁহাতে গতি সম্ভব। পক্ষান্তরে, পরব্রহ্মে গতি কোন রূপেই সম্ভব নহে। কারণ, পরব্রহ্ম সর্ব্বগত ও জীবের প্রত্যগাত্মা হইতে অত্যন্ত অভিন্ন। অতএব, পরব্রহ্মে গন্তৃ-গন্তব্য-গতি-ভেদের সম্ভাবনাই নাই। (৯) এই সকল কারণে বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে, 'যিনি নিষ্কাম, তাঁহার প্রাণসমূহ (অর্থাৎ পঞ্চপ্রাণ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহের উপাদান) উৎক্রান্ত হয় না; তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন'। (১০) পরব্রহ্ম-স্বরূপাবাপ্তিতে উৎক্রান্তি-গতি প্রভৃতি একান্ত অসম্ভব বলিয়াই আচার্য্য বাদরি দেবযান-মার্গ-প্রকরণে উক্ত 'ব্রহ্ম' শব্দটির কার্য্যব্রহ্ম-পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহাই সপ্তম সূত্রটির তাৎপর্য্য।

কিন্তু জৈমিনি বলিয়াছেন, 'না তাহা নহে। এস্থলে 'ব্রহ্ম' বলিতে পরব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, 'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্যার্থ পরব্রহ্ম, ও গৌণার্থ অপর ব্রহ্ম। যদি কোন স্থলে এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, কোন শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণীয়, কিংবা গৌণার্থ গ্রহণযোগ্য—তাহা হইলে (বাধা না থাকিলে) শব্দের মুখ্যার্থই গ্রহণীয়'। (১১) অতএব, পরব্রহ্মেই গতি হইয়া থাকে ইহাই দ্বাদশ সূত্রটির ভাবার্থ।

এই সূত্রদর্শনে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, জৈমিনি পরব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। অন্ততঃ বাদরায়ণের উক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইলে জৈমিনিকে আর নিরীশ্বরবাদী বলা চলে না। জৈমিনি যে কেবল পরব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাহা নহে; তিনি কার্য্য-ব্রহ্ম ও পর-ব্রহ্মের ভেদও স্বীকার করিতেন। এমন কি, এই পরব্রহ্ম যে সকলের আত্মভূত—তাহাও তিনি বলিতে ছাড়েন নাই। অথচ তাঁহার সিদ্ধান্ত-সম্মত পরব্রহ্ম সুবর্ণময়ী অপরাজিতা পুরীতে বাস করিয়া থাকেন—ইহাও "ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ" (৪।৩।১৪) সূত্রে সূচিত হইয়াছে। (১২)

---

(৭) "তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি"—ছাঃ উঃ ৪।১৫।৫

(৮) হিরণ্যগর্ভ—সমষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। ইনিই ব্রহ্মের প্রথম মূর্ত্ত রূপ। ইহাকে সগুণ ব্রহ্ম, কার্য্য ব্রহ্ম, সূত্রাত্মা, বায়ু, প্রাণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ-লোকপ্রাপ্তিই পুণ্যোৎকর্ষের চরম ফল বলিয়া পরিগণিত হয়।

(৯) 'স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যত্র বিচিকিৎস্যতে কিং কার্য্যমপরং ব্রহ্ম গময়ত্যাহোস্বিৎ পরমেবাবিকৃতং মুখ্যং ব্রহ্মেতি। তত্র কার্য্যমেব সগুণমপরং ব্রহ্মৈনান্ গময়ত্যমানবঃ পুরুষ ইতি বাদরিরাচার্য্যো মন্যতে। কুতঃ? অস্য গত্যুপপত্তেঃ। অস্য হি কার্য্য-ব্রহ্মণো গন্তব্যত্বমুপপদ্যতে, প্রদেশবত্ত্বাৎ নতু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি গন্তৃত্বং গন্তব্যত্বং গতির্বাঽবকল্পতে; সর্ব্বগতত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ গন্তৃণাম্"—শাঃ ভাঃ ৪।৩।৭।

(১০) "যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—বৃহঃ উপঃ ৪।৪।৬।

(১১) "জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যঃ 'স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি' ইত্যত্র পরমেব ব্রহ্ম প্রাপয়তীতি মন্যতে। কুতঃ? মুখ্যত্বাৎ। পরং হি ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যমালম্বনং, গৌণমপরম্। মুখ্যগৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ো ভবতি।"—শাঃ ভাঃ ৪।৩।১২।

(১২) "অপি চ 'প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে' (ছাঃ উঃ ৮।১৪।১) ইতি নায়ং কার্য্যবিষয়ঃ প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ; 'নামরূপয়োর্নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম' (ছাঃ উঃ ৮।১৪।১) ইতি কার্য্যবিলক্ষণস্য পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রকৃতত্বাৎ, 'যশোঽহং ভবামি ব্রাহ্মণানাম্' (ছাঃ উঃ ৮।১৪।১) ইতি চ সর্ব্বাত্মত্বেনোপক্রমাৎ।...সা চেয়ং বেশ্মপ্রতিপত্তির্গতিপূর্ব্বিকা হার্দবিদ্যায়ামুদিতা 'তদপরাজিতা পূর্ব্রহ্মণঃ প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ম্' (ছাঃ উঃ ৮।৫।৩) ইত্যত্র"।...শাঃ ভাঃ ৪।৩।১৪।

(২) জৈমিনিসম্মত উক্ত পরব্রহ্মের স্বরূপ কি, তাহার আলোচনা করিতে হইলে বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের তৃতীয় অধিকরণের (ব্রাহ্মাধিকরণের) প্রথম (অর্থাৎ আদি হইতে পঞ্চম) সূত্রটি বিশেষভাবে বিচার্য্য। জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে স্বরূপে অবস্থিতি করে—ইহা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্বরূপটি কি প্রকার—তাহারই আলোচনাপ্রসঙ্গে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" (৪।৪।৫)। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে জীব 'স্বরূপে' অবস্থিত হয়। এই স্বরূপটি বিমুক্ত জীবের আত্মারই রূপমাত্র—উহা কোন আগন্তুক রূপ নহে। কিন্তু ইহা বলিলেও মুক্তাত্মার স্বরূপের কোন স্পষ্ট ধারণা হয় না। এ কারণে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে,—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।৭।১) আত্মার যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে—'অপহতপাপ্মা (অর্থাৎ পাপ-পুণ্য-সংশ্লেষরহিত), জরা-বিহীন, মৃত্যুহীন, শোকশূন্য, ক্ষুধা-তৃষ্ণাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প',—তাহার সহিত সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব ধর্ম্মদ্বয় যোগ করিলে যাহা দাঁড়ায়, তাহাই মুক্ত আত্মার স্বরূপ বা ব্রহ্ম-রূপ।" (১৩)

বাচস্পতি মিশ্রও ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 'মুক্ত জীব পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন; এ হেতু পরমেশ্বর-ভাব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের পারমার্থিক ধর্ম্মগুলিও তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ধর্ম্মগুলির কতকগুলি অভাবাত্মক, যথা—অপহতপাপ্মত্ব ইত্যাদি; কতকগুলি বা ভাবাত্মক, যথা—সর্ব্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি। ভাবাভাবাত্মক এই সকল ধর্ম্ম চিৎস্বভাব আত্মার অদ্বৈতহানি করে না; কারণ, ধর্ম্মী হইতে ধর্ম্ম কখনও ভিন্ন নহে—ইহাই আচার্য্য জৈমিনির অভিপ্রায়। (১৪)

অতএব, মহর্ষি জৈমিনির মতে পরমেশ্বরের স্বরূপ ব্রাহ্মৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট। আর মহর্ষি বাদরায়ণের মতে এই ব্রাহ্ম রূপ বা ঐশ্বর্য্যগুলি সবই কাল্পনিক। ব্যাবহারিক দশায় তাহাদিগের অস্তিত্ব থাকিলেও পারমার্থিক অবস্থায় তাহাদিগের কোন সত্তাই নাই। (১৫) এই আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ-কল্পনায় জৈমিনি ও বাদরায়ণের মতভেদ দৃষ্ট হয় মাত্র; কিন্তু পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উভয় মহর্ষিই সম্পূর্ণ একমত। এ কারণে অতঃপর মহর্ষি জৈমিনিকে নিরীশ্বরবাদী বলিতে যাওয়া—নিতান্ত দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে প্রাভাকর সিদ্ধান্ত ও ভাট্ট মতও বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। ভবিষ্যতে উক্ত আলোচনা করিবার বিশেষ ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

---

(১৩)…'স্বেন রূপেণ' (ছাঃ উঃ ৮।৩।৪) ইত্যত্রাত্মমাত্ররূপেণাভিনিষ্পদ্যতে নাগন্তুকেনাপররূপেণেতি; অধুনা তু তদ্বিশেষবুভুৎসায়ামভিধীয়তে স্বমস্তরূপং ব্রাহ্মমপহতপাপ্মত্বাদি সত্যসঙ্কল্পত্বাবসানং তথা সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং চ তেন স্বরূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে।" শাঃ ভাঃ ৪।৪।৫

(১৪) "ভাবাভাবাত্মকৈ রূপৈর্ভাবিকৈঃ পরমেশ্বরঃ। মুক্তঃ সম্পদ্যতে স্বৈরিত্যাহ স্ম কিল জৈমিনিঃ।" ("যো মুক্তঃ স ভাবিকৈঃ পরমার্থভূতৈর্ধর্ম্মৈঃ স্বৈঃ স্বস্যেশ্বরাভেদাৎ স্বকীয়ৈঃ সহ পরমেশ্বরঃ সম্পদ্যতে"—কল্পতরুঃ।) ন চ চিৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবাত্মানো-পহতপাপ্মত্বাদয়ো ভাবাত্মানশ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো ধর্ম্মা অদ্বৈতং ঘ্নন্তি। নো খলু ধর্ম্মিণো ধর্ম্মা ভিদ্যন্তে, মা ভূদ্গবাশ্ববদ্ধর্ম্মিধর্ম্মভাবাভাব ইতি জৈমিনিরাচার্য্য উবাচ।"—ভামতী ৪।৪।৫।

(১৫) আচার্য্য ঔড়ুলোমিও পরমেশ্বরকে চিন্মাত্রস্বরূপ বলিয়া থাকেন—"চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ" (৪।৪।৬)। কিন্তু বাদরায়ণের সহিত তাঁহার মতের পার্থক্য এই যে, তিনি ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্যগুলিকে "শব্দবিকল্পজ" অর্থাৎ শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অলীক বলিয়াছেন, উহাদিগের সাময়িক ব্যাবহারিক অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করিতে চাহেন না। মহর্ষি ঔড়ুলোমির এই "অতিশৌণ্ডীর্য্য" মহর্ষি বাদরায়ণের পূরাপূরি মনোমত নহে। তিনি বলেন যে, উক্ত ধর্ম্মগুলি ব্যাবহারিক—পারমার্থিক নহে—"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (৪.৪।৭)। আর মহর্ষি জৈমিনির মতে ধর্ম্মগুলিও পারমার্থিক—ধর্ম্মী (পরমেশ্বর) হইতে অভিন্ন। ইহা হইতে জৈমিনির নিরীশ্বরত্ব দূরে থাকুক, সেশ্বরত্বই দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

বন্ধুর বিয়ে

(নাটক)

অঙ্কুর
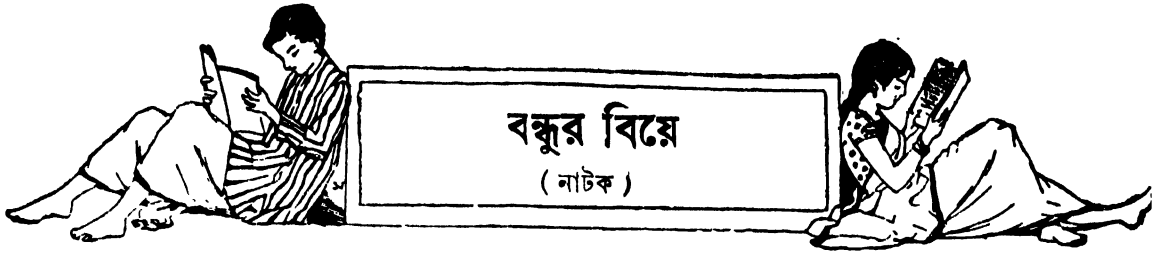
হোষ্টেলের ছেলেদের পরিচয়

১। রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—"নায়ক।" এইবার ইংরেজীতে এম,এ দিয়েছে। সুশ্রী বলিষ্ঠ চেহারা। কল্যাণপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট ছেলে। বয়স ২৬ হবে। অবিবাহিত।

২। অরুণপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়—ওর সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। এবার ল দিয়েছে। বড়লোকের ছেলে। রমেশদের বাড়ী আগেও বহু বার গিয়েছে।

৩। রঞ্জিৎকুমার সরকার—Economics-এ এম, এ দিয়েছে।

৪। বিমলেন্দু বোস্—Mathematics-এ এম, এ পড়ছে।

৫। সোমেন্দ্রনাথ মিত্র—B. Sc. পড়ে।

৬। নিমাইচরণ দত্ত—B. A. পড়ে। গাইয়ে। বয়সে অনেক বড়।

৭। বারীন রায়—ইংরাজীতে এম, এ পড়ে। অতিমাত্রায় সাহেব।

৮। শান্তি সেন—এম, এ পড়ছে—বাঙলা সাহিত্যে। কথা-বার্ত্তা মেয়েলী। সাজ গোজও তেমনি। কবিতা যখন তখন আওড়ায়।

কমন রুম

বিমলেন্দু, সোমেন্দ্র, নিমাই, বারীন ব্রীজ খেলছে।
একটা সোফায় বসে শান্তি কবিতা লিখছে।

বি। নিমাই—আবার তুই আড়াই trickএর কমে call-open করলি। Hopeless. কখনো ব্রীজ খেলা শিখবি না।

সো। আরে ভারী তো এক পয়সা stake, তাতে আবার মাথা গরম করা। নয় একটা rubber তোরা হারলিই, তাতে হয়েছে কি ?

বা। Not that it matters, কিন্তু principles must be correct. Bad play cards-এ habit হয়ে গেলে life-এও bad play চলবে।

নি। এ তো আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল রে বাবা ! তাস খেলবে তাতে আবার এ সব বড় বড় কথা কিসের ? আমার দ্বারা তোমাদের সঙ্গে তাস খেলা হবে না। তার চেয়ে গান গাই।

[উঠে গিয়ে অর্গ্যান বাজিয়ে গান গাইতে লাগল]-

গান

যেন না কভু প্রেমে পড়ি,
পড়লে পরে হে মা কালী, জুটিয়ে দিও কলসী দড়ি।
শুকনো মুখ রুক্ষ চুল
কথা-বার্ত্তা সবই ভুল—
এ দিন আসার আগে যেন লেকের জলে ডুবে মরি।

শা। (বুকে হাত দিয়ে) ব্যথা, ব্যথা ! প্রেমের এমন ভাবে অবমাননা করবেন না নিমাই বাবু। প্রেম স্বর্গীয় জিনিষ। পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায় প্রেমের জ্যোতিতে।

বা। You are right Mr. Sen.
I saw thee once only—years ago ;
I have lost my heart,
The world has lost its light
Only thine eyes remained, they would nc

[ল] আপনারা ...লছেন।

বি। না, তোমরা balance হারাচ্ছ। একেবারে fl... bodies. Metacentre সামলাও। তা না হলে ডুবে য...চ্ছ

(রঞ্জিতের প্রবেশ)

র। ডুবছে আবার কে ?

নি। আর বল কেন ? তাস খেলতে বক্তিমে, গান গাইতে বক্তিমে—সব তাতেই বক্তিমে। এ বাবা life একবারে miserable করে তুললে।

গান

বাঙলা দেশ তুই ভাবিস্ মিছে।
Whole-sale রেটে, ভরে graduate-এ,
সে দেশ কভু রয় কি পিছে
কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা
বক্তৃতা সব চালায় লম্বা
Fountain চ'ড়ে, আকাশেতে ওড়ে
ভুলেও কেউ চায় না নীচে।

র। ভাই সব ! এখন কাজের কথা হোক—

নি। আবার আরম্ভ করলে রে বাবা—

র। নিমাই, চুপ কর। আগে আমার কথাটা শেষ করতে দাও। ভাই সব ! কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে ; কেউ কাউকে মনে রাখতে পারব না। তার চেয়ে এস আমরা একত্র হয়ে একটা সঙ্ঘ করি। যে যেখানে থাকি পরস্পরকে চিঠি-পত্তর লিখে মনে রাখতে চেষ্টা করবে।

বা। A noble idea.

র। আরও প্রতিজ্ঞা করি যে, একঘেয়ে বাঙালী জাতটাকে পঙ্গু করে দেওয়া কেরাণীগিরি না করি।

নি। (গেয়ে)
সখি গো—আমার একি হোল !
কেরাণী-জীবন, অরূপ রতন, কেমনে ভুলিব বল ?

সো। No, no, it is a serious business. আমাদের এখন industry চাই। দেশকে উন্নত করতে হলে national industry ছাড়া চলবে না।

র। Co-operation ছাড়া এ জাতটার উন্নতি হবে না। Adventure, risk, enterprize এ সবের সাহস না হলে কখনও আমরা বড় হতে পারব না।

নি। (গেয়ে)

ঘরেতে বড়াই, বাহিরে ডরাই, সাহেব দেখিলে জুজু
মা, ভাইয়ের সাথে, সদা দড় মোরা, মামলা করিতে রুজু।
আমাদের সাহসের অভাব কে বলে ?

র। আমাদের দেশের টাকা মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ইংরেজ, মাদ্রাজী সকলে লুটে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা তাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছি। আমাদের এখন কর্ত্তব্য হচ্ছে—

পদ্য লেখা। আমাদের মনের দুঃখ, ব্যথা কবিতা লিখে কে জানান। এমন কবিতা লিখতে হবে যে, পড়তে পড়তে দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে। শুনুন, আমার আজকের টা। আপনারা একবার মন দিয়ে শুনুন। কি গভীর নুভূতি। সেকেলে কবিতা নয়। এ একেবারে হালফ্যাশানের ব্যাপার !

কাজলা সখি আঁজলা ভরে বাগিচায় ফুল
আনতে যায়।
তারে কাটল পিঁপু ঝরল আঁসু, ভাবি বুঝি
নজলা লাগল তায়।

বি। এখন এ সবের সময় নয়। Energy equation দিয়ে আমাদের জাতির movementএর যদি একটা Dynamical solution জোগাড় করতে পারি—

শা। আমার রচনা আগে সমস্তটা শুনুন। এমন জিনিষ নেই যা এতে পাবেন না।

গতি,
শুধু গতি।
ট্রাম বাস চলে যায় হু হু করে।
আমি বসে আছি
একলা
বাতায়নে—পথ চাহি।
খাঁ খাঁ করিছে দুপুর
ফিরিওয়ালা চলিছে হাঁক দিয়ে
পথ উঠিছে তেতে।
আমার মনও আজ হয়ে উঠেছে আগুন।
নর্দ্দমার পচা জল
আর রাস্তার ময়লায়
দুর্গন্ধে ভরেছে দশ দিক্।
সামনের বাড়ীতে
টক-টকে লাল, একটা কাপড় শুকোচ্ছে।
সেই কাপড়
বেষ্টন করেছিল কি বর তনু,
সেই ভেবে আমি হয়ে উঠেছি পাগল।

আর শুনে দরকার নেই, ঢের হয়েছে।
ব্যথা ব্যথা ! বাঙ্গালী বেঁচে আছে তার কবিতার জোরে।
কলাই হল বাঙ্গলার প্রাণ।

নি। কাঁচকলা। চারধারে এত কদলীর চাষ দেখে মনের সুখে সকলে আমাদের কদলী প্রদর্শন করছে।

শা। কলা-লক্ষীর এভাবে অপমান অসহ্য !

কলা—কলা
বাঙালীর সার
জীবন যৌবন ধন মান
না খেয়ে মরবে শুকিয়ে
তবু তোমার আরাধন
বাঙালী ছাড়বে না জীবনে।

বা। Art for Art's sake, Poetry is for the noble.

She tenderly kissed me
She fondly caressed
And then I fell gently
To sleep on her breast—
Deeply to sleep
From the heaven of her breast.

নি। এ তো ভ্যালা সাহেবের পাল্লায় পড়া গেল রে বাবা ! দু'টো বাঙলা কথা কও না ছাই ?

র। Pointএ ফিরে এ'স। ব্যবসাই আমাদের একমাত্র পথ।

নি। ভাল লাগে না রে বাবা। এই কাল পরীক্ষা শেষ হোল, কোথায় এখন দু'দিন ফূর্ত্তি মারবে, না যত সব বড় বড় কথা। তার চেয়ে বাবা দু'হাঁড়ী রসগোল্লা আনাও—

বি। ঠিক বলেছ ! Conservation of energy. রসগোল্লায় potential energy store করা আছে। পেটে গিয়ে kinetic energy-তে change হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা plan করে ফেলা যাবে।

সো। Carbo-hydrate, sugar—

নি। থাম রে বাবা থাম্ ! যা বলি তাতেই এক ঘণ্টাব্যাপী লেকচার। ম্যানেজার, রসগোল্লা আনাও।

র। All right. ওরে ও পঞ্চানন, পাঁচুগোপাল—

(চাকরের প্রবেশ)

প। এজ্ঞে—

র। যা, আমার নাম করে দু'হাঁড়ী রসগোল্লা নিয়ে আয়।

প। এজ্ঞে—

[প্রস্থান।

নি। তার চেয়ে আমি তোমাদের এক কাজের কথা বলি শোন। কাল-পরশুর মধ্যে সকলেই চলে যাবে। কাল একটা জবর feast কর। আর সকলে সকলের ঠিকানা নিয়ে রাখ চিঠিপত্র দেবার জন্য।

বা। A very good proposal indeed.

সো। সেই সঙ্গে একটু গান, বাজনা, Recitation—

র। উত্তম পরামর্শ—

(অরুণের প্রবেশ)

র। অরুণ এসেছে। ওর সঙ্গে বসে একটা plan ঠিক করা যাক্—

নি। (গেয়ে) কি সময়ে বঁধু এলে,
রসগোল্লা এল বলে
নরক হইবে গুলজার।

অ। কিসের পরামর্শ হে ?

বা। To-morrow we would like to have a farewell party. What do you think of the idea ?

অ। খুব ভাল।

বি। বিদায়ের আগে একসঙ্গে একটু হৈ চৈ—

অ। নিশ্চয়ই খুবই উচিত। অতি সৎ উদ্দেশ্য। হ্যাঁ হে কবি, তোমার কি মত ?

শা। বিদায় বেলায়
এক সাথে শেষ মিলনের গান
সব প্রাণ এক তারে বেঁধে
যে সুরের ঝঙ্কার
উঠিবে জাগিয়া—
বহু দিন ধরে
বাজিবে আপন মনে।
গোপন হৃদয়-বীণা
স্মৃতিকণা নিয়ে
রহিবে বাঁচিয়া।

বা। Bravo—How sweet ! Fare well, Fare well, fair Ines !

অ। হ্যাঁ হে শান্ত কবি—তোমার বউয়ের খবর কি ?

র। হঠাৎ বউয়ের খবর কেন ?

অ। জান না বুঝি ? আমাদের শান্ত কবি যে প্রেম করে বিয়ে করেছিল। বউ দেখতে যেমনি সুন্দরী, শুনেছি বিদুষীও তেমনি !

বা। On you lucky dog !

সো। অরুণদা তুমি দেখেছ না কি ?

অ। না, কবির মুখে শুনেছি। বল না এদের গল্পটা কবি।

বা। Yes, yes we must have the story.

শা। আপনারা শুনবেন—

নি। নিশ্চয়ই শুনব।

শা। তবে শুনুন।
দেখেছিনু তারে ফাগুন মাসে।
বেণীটি দুলায়ে
ফিরিতেছিল স্কুল থেকে
বাসে চড়ে।
আমি তখন যাচ্ছিলুম পথ দিয়ে।
সপ্তদশ বর্ষ ধরে
যে অপূর্ব্ব রতন
বিধি সৃজেছিল
তাহা পড়িল চোখেতে।
আমার মন-প্রাণ
তার চরণ-তলে
সঁপে দিনু সেইক্ষণ।

বি। তার পর ?

বা। It is getting exciting.

শা। সে রোজ যায় আসে, আমি পথের ধারে একলাটি থাকি তাদের বাড়ীর সামনে।

নি। তার পর এক দিন দরওয়ান ধরে ঠেঙালে—

শা। ব্যথা ব্যথা ! বাণীর কমলবনে বাঁশ নিয়ে প্রবেশ করবেন না নিমাই বাবু।

(পঞ্চাননের রসগোল্লা নিয়ে প্রবেশ)

নি। কয়েক কাপ চা করে নিয়ে আয়—

অ। ভজুয়াকে দিয়ে আজকের ডাকের চিঠিগুলো ওপরে পাঠিয়ে দে।

[চাকর চলে গেল]

সো। তার পর শান্তিবাবু, কি হোল—

শা। আমি বলব না। আমার প্রেমের কথা নিয়ে আপনারা বিদ্রূপ করছেন—কোমল হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। এক জন নারীর প্রেম নিয়ে আপনারা পরিহাস করছেন—

অ। নিমাই—এ তোমার ভারী অন্যায়। শান্ত কবির কাছে মাফ চাও।

নি। (গেয়ে) রেগ না রেগ না বঁধু
আমার ওপর রেগ' না।
যদি হয়ে থাকি দোষে দোষী
ক্ষমা কেন কর' না।

বি। এইবার বল।

শা। ধৈর্য্য ধরে
কত দিন কাটাইনু
হিসাব করিনি তার।
হঠাৎ এক দিন
দেখি মোর পানে আছে চেয়ে
বারান্দা হইতে।

(ভজুয়া কতকগুলো চিঠি দিয়ে গেল)

অ। রঞ্জিতের চিঠি—চাকরীর দরখাস্তের জবাব বোধ হয়।

নি। চাকরী—অ্যাঁ ! রঞ্জিত শেষে তুমি কি না চাকরীর দরখাস্ত করলে।

র। ও কিছু না। ক'টা জায়গা থেকে দরখাস্ত ফিরে আসে দেখে একটা article লিখব—"Unemployment Problem of Bengal."

অ। ওহে, তোমরা মন দিয়ে শোনো। আমাদের শান্ত কবির চিঠি এসেছে।

শা। দিন অরুণ বাবু—চিঠিটা দিয়ে দিন।

অ। আহা দাঁড়াও না, এদের পড়ে শোনাই।

শা। না না, কোনো দরকার নেই।

অ। ওহে, তোমরা শান্ত কবিকে অশান্ত হতে দিও না—ভাল করে ধরে থাক, আমি তোমাদের পড়ে শোনাই।

বা। Sure.

[সকলে মিলে কবিকে ধরলে]

অ। [চিঠি খুলে পাঠ]
শ্রীচরণ-কমলেষু,
আপনার চিঠি পাইয়াছি। আমি ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন ? আপনার কথা-মত নেড়ার কাছে

রোজ সন্ধ্যা বেলা ফার্ষ্ট বুক পড়ছি। আপনার চিঠির মানে বুঝতে পারি না। একটু সহজ করে লিখবেন। চারুপাঠ শেষ হয়ে গেছে। ধেঁদির শরীরটা ভাল নাই। মার হাঁপানি বেড়েছে। এখানে এবার কচুর শাক আর কাঁচকলা খুব হয়েছে। আসবার সময় আমার জন্ত একটু তরল আলতা, পাউডার, আর মুখে মাখবার হেজলীন আনবেন। বণ্টুর বাছুর হয়েছে। আমার প্রণাম জানবেন। একটা ভাল ছবি দেওয়া গল্পের বই আনবেন। ইতি—

আপনার চরণের সেবিকা

কাত্যায়িনী।

শা। (হাত ছাড়িয়ে) দিয়ে দিন আমার চিঠি। যত সব অসভ্যতা—indecent! পরের স্ত্রীর চিঠি পড়া—

[অরুণের হাত থেকে চিঠি নিয়ে বেগে প্রস্থান।

অ। উঃ, বড্ড রেগেছে!

নি। আচ্ছা মিথ্যে যাহোক—

[চাকর চা দিয়ে গেল। সকলে খেতে লাগল]

বা। Poet's fancy.

Beatrice, Oh Beatrice of my heart come to life!

নি। থাম বাবা, থাম, আর জালিও না।

অ। রমেশের চিঠি। শক্ত ঠেকছে। খুলে দেখতে হচ্ছে। দেখ ভাই, তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা কর, খুলে দেখবার পরে রমেশকে কেউ তোমরা এ-বিষয়ে কিছু বলবে না।

সকলে। প্রতিজ্ঞা করছি।

নি। (গেয়ে) শপথ করি

বলব না তা শপথ করি

চিঠির কথা রমেশেরে, বলব না তা শপথ করি।

তবুও যদি না মানে

কেমন করে ভোলাবে তা, মা গঙ্গাই জানে।

অ। (চিঠি খুলে) ওহে, এ একটা Photo দেখছি যে!

সকলে। তাই ত', দেখি দেখি।

(সকলে একে একে দেখিল)

বা। Lovely, exquisite!

বি। Perfecty balanced figure!

র। চমৎকার—মেয়েটি কে হে?

অ। চিঠিটা পড়ি শোন—

ভাই ঠাকুরপো—

বাবার বন্ধু শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের নাম নিশ্চয় তোমার মনে আছে। তাঁরই একমাত্র মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়েছে। সম্প্রতি তাঁরা এখানে এসেছেন। এখানে তাঁদের একটা বাড়ী আছে। বর্ম্মা High Court-এর তিনি জজ ছিলেন। দেখেছ, মনে নেই। প্রায় ১২ বছর দেশে আসেন-নি। হেনাকেও তুমি দেখেছ। তখন ওর চার বছর বয়স। এখন সে দেখতে অতি চমৎকার হয়েছে। পত্রপাঠ তুমি এখানে চলে আসবে। অরুণ ঠাকুরপোকেও আনবে। তার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে। এলে বলব। এই ছবি পাঠালাম। আশা করি, দেখে নিশ্চয় তোমার মাথা ঘুরে যাবে।

আমরা ভাল আছি। বিয়ের আয়োজন নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত। তোমার দাদা বল্লেন—"ওর আর মত নিয়ে দরকার নেই।" তবু আমি তোমায় লিখলুম। অরুণ ঠাকুরপোকে আনতে ভুলো না। পত্রপাঠ চলে আসবে। ইতি

তোমার বৌদি।

সো। এ তো ভারী জোর খবর। খাওয়া আদায় করতে হবে।

বা। রমেশ গেছে কোথায়?

বি। হয় ত Cinema গেছে। ন'টা নগাদ এসে পড়বে।

বা। Lucky old horse!

নি। কালকের feast-টা ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে চালাও।

অ। দাঁড়াও। একটু বদমাইশী করলে কি রকম হয়। Just a little bit of practical joke.

র। কি রকম শুনি?

অ। এই ছবিটা বদলে দি। তোমাদের কাছে কোন মেয়ের ছবি আছে।

বা। I have one. A photo of the daughter of a nepalee darwan. Timesএর Snapshot competitionএ পাঠিয়েছিলাম। তার একটা copy আছে।

অ। Right—O. এখুনি নিয়ে এস।

[বারীনের প্রস্থান।]

অ। এই ছবিটা বদলে দেব। তোমরা যেন ওকে কিছু বলো না। আমি তো সঙ্গে যাবই সুতরাং I wiil be able to set the affair right.

র। কোন গণ্ডগোলে বেচারী না পড়ে।

অ। Oh, no. কোন রকম গোলমাল হতে দেব না।

(বারীনের ছবি নিয়ে প্রবেশ)

অ। (ছবিটা বদলে খাম এঁটে, ছবিটা বদলে দিলুম। Original-টা আমার কাছে থাকবে। কল্যাণপুরে যখন ব্যাপারটা খুব ঘোরালো হয়ে আসবে, তখন ছবিটা ফেরত দেব আর সব খুলে বলব। Please don't disclose the secret now.

বা। Oh, you can be rest assured.

সো। চমৎকার রগড় হবে।

অ। যাই, ওর টেবিলের ওপর এটা রেখে আসি।

[প্রস্থান।

বি। অরুণের মাথায় যত রকম বদমাইশী খেলে।

বা। But he is a jolly good fellow.

নি। এমন অমায়িক ছেলে আজকাল দেখা যায় না। সেবারে মনে আছে রঞ্জিতের অসুখে—

র। Yes, দিন-রাত এক করে আমার সেবা করেছে।

সো। এত পয়সা অথচ কখনও গর্ব্ব করতে দেখিনি।

নি। মাথার ওপর বাপ নেই—পয়সা আছে, এমন ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই ছেলেরা বকে যায়—

বা। He is a noble exception.

[অরুণ ঢুকল]

অ। Every thing O. K. দেখ, কেউ যেন হেসে ফেল না !

সো। না অরুণদা—খুব serious হয়ে থাকব।

নি। ঝগড়ের খবরটা কবে পাব ?

অ। বিয়ের চিঠির সঙ্গে।

(রমেশের প্রবেশ ; টেনিস র‍্যাকেট হাতে)

অ। কি রে, এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?

রমেশ। সিনেমা গিছলুম। তোরা তো এদিকে খুব চালাচ্ছিস্।

নি। এস দাদা, তুমি আর বাদ যাও কেন। আজ চালাও মিষ্টি-মুখ। বিজয়ার তো আর দেরী নেই।

রমেশ। কাপড় জামা ছেড়ে এখুনি আসছি। [প্রস্থান।

অ। এইবার—হুশিয়ার ! কেউ হেস না।

র। পাগল।

সো। শান্তদাকে ডাকলে হোত না ?

নি। না, কবি ভয়ানক ক্ষেপেছে। যেও না, কামড়ে নেবে।

অ। কিছু একটা করা যাক্—যাতে natural দেখায়। নয় ত ওর মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

বা। You are perfectly right.

বি। Indeterminancy সম্বন্ধে একটা lecture দেব।

র। তার চেয়ে বল না কেন সকলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

অ। Best হচ্ছে নিমাই একটা গান করুক। আমরাও সঙ্গে থাকি—

বা। Yes, definitely the most appropriate suggestion.

নি। কোন্‌টা করব ?

অ। Graduates—

(নিমাই আর্গ্যানে গিয়ে বসল)

(আমরা) Graduatesএর দল।

Byron, Shelly, সব পড়ে ফেলি, শুধু মেলে না অন্নজল।

Mill, Locke, Lodge হোমরা-চোমরা

মস্তিষ্ক মোদের করেছে কোঁপরা,

চোখের মাথাটি সাফ্ খাইয়াছি, জনম করি সফল।

নামের পিছনে লেজ গজায়েছে,

জোগাড় করিতে ভিটে-মাটী গেছে

এবে সরিষার ফুল দেখি চারিধারে, ভাবিয়া না পাই তল।

চাকরী-বাজারে নাহি কোন দর

মেয়ের বাপের মাথাতে কামড়

দিতেছি সদাই, এ ছাড়া নাই, ডিগ্রীর কোন ফল।

(চিঠি ও ছবি হাতে রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। অরুণ, ভাই, সর্বনাশ হয়েছে।

অ। কেন ? কেন ? কি হোল ? কার চিঠি ? কোন খারাপ খবর না কি ?

রমেশ। আমার বিয়ে।

বা। এতো অতি Happy news.

রমেশ। Happy না ছাই ! দেখ, মেয়েটার ছবি দেখ।

(সকলে দেখিল)

অ। ছিঃ ছিঃ ! এই মেয়েকে বিয়ে করতে হবে ?

রমেশ। (মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে) হ্যাঁ। বৌদি লিখেছে। দাদা, বাবা কেউ আমার মত নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি। বিয়ের জোগাড় করছেন।

র। এটা ভারী অন্যায়। মেয়ে দেখালেন না, মত নিলেন না, অথচ বিয়ের জোগাড় করছেন।

বা। Barbaric ! এ সব আগেকার দিনে চলত'। প্রথম ছেলে মেয়েকে দেখবে, মেয়ে ছেলেকে দেখবে, দু'জনের পছন্দ হবে, তবে তো বিয়ে।

নি। বোধ হয় অনেক টাকা দিচ্ছে।

রমেশ। জানি না।

অ। দিলেও এমন একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আর টাকা-পয়সার তো অভাব নেই। এ কাকাবাবুর ভারী অন্যায়। বৌদি কিছু লেখেন-নি।

রমেশ। নিজের চোখেই দেখ না। (চিঠি দিল)

অ। অ্যা—তাই তো, বিয়ের একেবারে সব ঠিকঠাক। বৌদিও এতে সায় দিয়েছেন।

রমেশ। হুঁ। বৌদিকে চিরকাল আমি ভাল বলেই জানতুম, artistic taste আছে মনে করতুম।

অ। ভাই, তোমরা সব একটা পরামর্শ দাও এখন কি করা উচিত।

বি। গিয়ে সোজা ও বাবাকে বলুক—"না বাবা, আমি এ মেয়েকে বিয়ে করব না। একে বিয়ে করলে আমার জীবনের orbit disturbed হয়ে যাবে। Periodic law থাকবে না। কোথায় shoot out করব কে বলতে পারে।"

নি। না। ও-রকম ভাবে বল্লে সুবিধা হবে না। তার চেয়ে মেয়ের বাবাকে লিখুক—"আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে পারব না। অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

র। এও ঠিক হবে না। তার চেয়ে দাদাকে লিখুক—"আমি এখনও economically স্বাধীন হতে পারিনি। অবশ্য মাথার উপর বাবা আর তুমি থাকতে আমার ভাববার কিছু নেই, তবুও আজকালকার দিনে নিজে উপার্জ্জন করতে না শিখে বিয়ে করা আমি উচিত মনে করি না।"

বা। This won't do. আমার মতে বৌদিকে চিঠি লিখুক—"I can not marry the girl you have selected for me. আমি আর এক জনকে ভালবাসি। এ বিবাহেতে তিন তিনটে জীবন ruined হয়ে যাবে। Please save me !"

রমেশ। কোনোটাই কাজে লাগবে না। তোমরা বাবাকে চেন না। অরুণ জানে। তিনি যা ধরেন তাই করেন। কারুর বাধা মানেন না। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য, ঝগড়া, মুখ-দেখাদেখি বন্ধ, এ আমি করতে পারব না; বিশেষ করে বাবা আমায় বড্ড ভালবাসেন। বাবা যাতে অপমান বোধ করেন, তা আমি করতে পারব না।

অ। বটেই তো। কাকাবাবু যা একে ভালবাসেন, তাতে ওঁর কথার অমান্য করলে বড়ই দুঃখিত হবেন।

রমেশ। আমার একমাত্র উপায় হচ্ছে আত্মহত্যা করা। Suicide ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

সো। না, না। সেটা আরও খারাপ।

অ। তাতে কাকাবাবু মনে আরও বেশী কষ্ট পাবেন। Terrible shock, হয় ত বাঁচবেন না।

বা। And you will be the cause of his death.

রমেশ। তবে আমি কিছু দিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হই।

র। This is equally bad, পুলিশের হাঙ্গামা, কেলেঙ্কারী, পয়সার শ্রাদ্ধ—

অ। Eureka!

সকলে। কি হোল?

অ। একটা plan মাথায় এসেছে।

রমেশ। এসেছে?

অ। এমন একটা plan, যাতে সব দিকই বজায় থাকে।

রমেশ। বল—শীগ্‌গির বল্।

অ। আমাকে তোর সঙ্গে বৌদি যেতে লিখেছেন। আমরা কালকের গাড়ীতেই যাব। তুই গিয়ে মনের কথা কিছু বলবি না। তবে খুব গম্ভীর হয়ে থাকবি। তারপর বিয়ের ক'দিন আগে তোকে নিশ্চয় মেয়ের বাড়ী নিমন্ত্রণ করবে—হয় ত আমাকেও করবে। বন্ধু নিয়ে মেয়ে দেখবার জন্য। তুই আগে যাবি, আমি তোর একটু পরে যাব।

রমেশ। তারপর—

অ। সেখানে গিয়ে তুই পাগল সাজবি; নাচবি, হাসবি, কাঁদবি—আবোল-তাবোল বকবি। যাতে ওরা সকলে তোকে পাগল মনে করে। কিছুক্ষণ পরে আমি যাব। যতই আমাকে সকলে জিজ্ঞেস করবে, আমি ততই emphasise করব যে, তুই পাগল। এমন কি, তুই বল্লেও।

রমেশ। Wonderful! তারপর—

অ। পাগল দেখলে বিয়ে বন্ধ করে দেবে। For the time being তো রেহাই পাওয়া যাবে। পরে সময় বুঝে সব বৌদিকে খোলসা করে বলা যাবে।

রমেশ। চমৎকার! ভাই, তুই আজ আমাকে বাঁচালি।

অ। তোমাদের সকলের কি মত?

বা। It is perfect.

র। চমৎকার plan,

বি। Frictionless,

নি। [গেয়ে] এখন বাঁচিলে প্রাণ
মনের মতন, দেখিয়া রতন, হৃদয় করিও দান।
পাগল সাজ
For the time being পাগল সাজ
প্রাণ বাঁচাতে বঁধু আমার, for the time being পাগল সাজ
Politics মানেই duplicity (এতে) নাইক' কোনো লাজ।

দিবাগুণ

কল্যাণপুর

পরেশচন্দ্র মুখার্জ্জী—রমেশের বড় ভাই। প্রমথ বাবুর বড় ছেলে। জমীদারী দেখা-শুনা করে।

প্রমথনাথ মুখার্জ্জী—কল্যাণপুরের জমীদার। বৃদ্ধ, বিপত্নীক।

প্রতিভা—পরেশের স্ত্রী।

চলি—প্রমথ বাবুর মেয়ে।

ভিতরের বসিবার ঘর।

(পরেশ বসে বসে কি একটা লিখছে। প্রতিভা চিঠি হাতে ঢুকল)

প্র। ওগো শুনছ?

প। শুনছি বই কি। পায়ের আওয়াজ শুনছি, সাড়ীর খস-খস শুনছি, চুড়ির রিনি-ঝিনি শুনছি—

প্র। যাও, সব সময়েই ঠাট্টা।

[চেয়ারের হাতলে এসে বসল]

প্র। ঠাকুরপোর চিঠি এসেছে। বাবা এখুনি দিলেন। অরুণ ঠাকুরপোও আসছে। ন'টা দশের ট্রেণে। বেশ মজা হবে।

প। মেয়েদের শুধু বিয়ে দিতে পারলেই মজা হয়।

প্র। পুরুষদের বুঝি বিয়ে করলে খুব কষ্ট হয়।

প। হতেও তো পারে।

প্র। হুঁ। আচ্ছা আমি যাই—ওদের খাবার-দাবারের জোগাড় দেখি।

(উঠে দাঁড়াল)

প। (উঠে গিয়ে ধরে এনে কৌচে বসিয়ে) অমনি রাগ হয়ে গেল?

প্র। তোমাদের খুব কষ্ট হয়।

প। পাগলী! সকলে তো আর আমার মত ভাগ্য করে জন্মায়নি। আর প্রতিভা দেবীও পৃথিবীতে একটার বেশী নেই। তোমার মতন স্ত্রী পাওয়া যে কত বড় ভাগ্য, তা বলে প্রকাশ করা যায় না।

প্র। থামুন মশাই—

প। এক এক সময়ে ভাবি—যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে না হোত তবে আমার কি হ'ত।

প্র। একেবারে বোকা। তোমার সঙ্গে বিয়ে হবার জন্যেই ত আমি জন্মেছিলুম।

প। রূপে গুণে এমন স্ত্রী পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।

প্র। যাও, খালি ঠাট্টা। একটা কাজের কথা আমার শুনবে না।

প। তোমাকে দেখলে আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

প্র। (কৃত্রিম রেগে) আবার—চল্লুম তবে।

প। না না, বল। কি বলবে বল। এই আমি গম্ভীর হয়ে বসলুম।
[উঠে গিয়ে একটা চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসল]

প্র। ও রকম করলে আমি বলব' না।

প। কি রকম?

প্র। দূরে গিয়ে চেয়ারে বসে প্যাঁচার মত মুখ করে—

প। ওঃ, দাঁড়িয়ে থাকব দাঁত বার করে।

[তথাকরণ]

প্র। আঃ, কি কর! ওগো তাড়াতাড়ি শোন না কথাটা।

প। বলছ কই?

প্র। আগে বস।

[দূরে বসতে গেল]

প। হুঁ হুঁ। ওখানে নয়—এইখানে—আমার কাছে।

[কাছে এসে বসল]

প্র। অরুণ ঠাকুরপোকে এত করে আসতে কেন লিখেছিলুম জান?

প। কি করে জানব বল? ভগবানের কথা তবু জানতে পারা যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকের—

প্র। (রেগে) আমি চল্লুম। তুমি আমার কোন কথা মন দিয়ে শোন না। সব হেসে উড়িয়ে দাও। যাও, আমি তোমায় কিচ্ছু বলব না।

প। দেবী প্রসন্না হও। [হাঁটু গেড়ে বসল]

প্র। কি কর গা তুমি। যদি বাবা কি ডলি কেউ এসে পড়ে?

প। বাবা তো এখনি বেরিয়ে গেলেন দেখলুম। তারপর কি বলছিলে বল না গা!

প্র। অরুণ ঠাকুরপো ডলিকে দেখে মজেছে। আর ডলি মুখপুড়ীও বোধ হয় তদ্রূপ। এদের একটা হিল্লে করে দিতে হবে।

প। অরুণ ছেলেটি তো ভাল। আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেলা-মেশাও প্রায় দু'বছর করছে। এমন নির্ম্মল চরিত্র উদার স্বভাবের ছেলে আজকালকার বাজারে দেখতে পাওয়া যায় না; পয়সাকড়িও বিস্তর আছে। কিন্তু সে কি রাজী হবে?

প্র। বল্লুম যে, অরুণ ডলির প্রেমে একেবারে হাবুডুবু।

প। তোমায় সে কিছু বলেছে?

প্র। আচ্ছা বোকা তো। এ সব কথা কি কেউ বলে না কি?

প। তবে কি করে জানলে?

প্র। আমরা জানতে পারি। হ্যাঁ গা তুমি কি বল'—

প। যদি করতে পার তবে ত খুবই ভাল হয়। এর চেয়ে ভাল ঘর-বর কোথায় পাবে? ও তো তোমারই বোন। তুমি যখন আমার ভেতর বাড়ির আলো করে গৃহলক্ষ্মী হয়ে আমাদের ঘরে এলে, তখন ওর বয়স মাত্র দু'বছর। তুমি ওর যা করবে তার চেয়ে বেশী আমি কিংবা বাবা কখনও করতে পারব না।

[ডলির প্রবেশ]

ড। দাদা, নীচে সরকার মশাই এসেছেন। তোমায় ডাকছেন। কি এক জরুরী চিঠিতে তোমার দসখৎ চাই—

প। আচ্ছা যাচ্ছি। [প্রস্থান।

প্র। ওরে ডলু, সে যে আসছে—

ড। কে? ছোড়দা?

প্র। আরও এক জন।

ড। কে, জানি না বাপু।

প্র। তা জানবি কেন? এ ঘরে চোদ্দবার ছুতো-নাতা করে এসে ঐ ছবিটার (অরুণ ও রমেশের একত্র ছবি দেখিয়ে) দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকিস্, তা বুঝি আমি দেখিনি।

ড। ভাল হবে না বলছি বৌদি। আমায় তোমরা সবাই যা-তা ঠাট্টা কর।

প্র। মুখে তো ভাল লাগবেই না। অথচ মনে মনে ইচ্ছে, বার বার তার কথা বলুক।

ড। আঃ, কি করছ বৌদি। আমি চল্লুম।

প্র। আচ্ছা কিছু বলব না—বস্। আমি এখুনি ওদের রান্নার জোগাড়টা দিয়ে আসছি। না আসা পর্য্যন্ত এ ঘর থেকে নড়বি না। [প্রস্থান।

ডলি। (একটা বোনা নিয়ে বসে; একটু পরে) দূর ছাই, সব ভুল হয়ে গেল। (রেখে দিলে)

ডলি। (একটা বই নিয়ে বসে; একটু পরে) ভাল লাগে না—কি সব ছাই-পাঁস লেখা! (রেখে দিলে)

ডলি। ন'টা বেজে গেছে। সাড়ে ন'টা নাগাদ ওরা এসে পড়বে। এই আধঘণ্টা যেন আর কাটতে চাইছে না।

[অর্গ্যানের সামনে বসে]

গান

ওগো আমার প্রিয়।
তোমার বাঁশীর সুরে, সকল ব্যথা হরণ করে নিও।
যে সুর করে পাগল-পারা
পরাণ করে দিশেহারা
সেই সুরে তুমি, হে বঁধু আমার, ঘুম ভাঙ্গিও।

ড। কিছু ভাল লাগছে না।

(অরুণ ও রমেশের ছবির কাছে গিয়ে দাঁড়াল; পিছন থেকে পরেশ ও প্রতিভা ঢুকে পড়ল)

প্র। হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছিস্।

ড। (চমকে) কি?

প্র। আর কি। তাই বলি, মেয়েটা খাচ্ছে দাচ্ছে অথচ দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? ওদিকে যে রোগে ধরেছে।

ড। যাও, তোমরা ভারী অসভ্য। [বেগে প্রস্থান।

প্র। কি হ'ল ত'? এখন বিশ্বাস হল'?

প। বটেই তো। এখন তো দেখছি বিয়ে না দিলেই নয়। মেয়েটা নয় ত ভয়ানক কষ্ট পাবে।

প্র। ও ঠিক জোগাড় করে দেব। তুমি ভেব না।

প। ঐ বাবা আসছেন। হয় ত' তোমার সঙ্গে কোন কথা আছে, আমি নীচে চল্লুম, বুঝলে। ওরা এলে একেবারে ওপরে নিয়ে আসব।

প্র। রমেশ আর অরুণের একই ঘরে শোবার ব্যবস্থা করেছি দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায়।

প। বেশ। [প্রস্থান।

প্র। মাছটা খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে হবে। অরুণ ঠাকুরপোকে নিয়ে বেশ একটু রগড় করা যাবে।

[প্রমথ—(নেপথ্যে) বৌমা!]

প্র। আসুন বাবা—

[খবরের কাগজ হাতে প্রমথ বাবু ঢুকলেন]

প্রমথ। ওদের বড্ড দেরী হচ্ছে না, বৌমা?

প্র। না বাবা। ন'টা দশে গাড়ী আসে। সাড়ে ন'টা নাগাদ এসে পড়বে।

প্রমথ। হুঁ। দেখ মা, দু'টো বড মাছ ধরতে বল্লে হ'ত।

প্র। বলেছি বাবা।

প্রমথ। তুমি আমার মা'ই বটে। মনের সব কথা কি করে জানতে পার বল ত'?

প্র। আপনার জন্যে এক কাপ্‌ চা আনতে বলব ?
প্রমথ। ঐ। ঐটিই বলব অথচ ভুলে গেছি।
প্র। আমি আপনার চা নিয়ে এখুনি আসছি।

[প্রস্থান।

প্রমথ। ডলু, ওমা ডলু!

(ডলির প্রবেশ)

ড। বাবা ডাকছ' ?
প্রমথ। কি করছিলি মা ?
ড। বসেছিলুম।
প্রমথ। আজকের কাগজে একটা Railway সম্বন্ধে চমৎকার টিপ্পনী দিয়েছে দেখেছিস্‌ ?
ড। না, আজকে এখনও কাগজ পড়িনি। কি লিখেছে বাবা ?
প্রমথ। [কাগজ নিয়ে] শোন। লিখেছে—"So far as the first & second classes are concerned the passengers are rude to the gaurd ; when it comes to third class, the guard is rude to the passengers ; in the case of inter class, the passengers are rude to one another. হা হা—(উচ্চৈঃস্বরে হাস্য)
ড। একেবারে সত্যি কথা বাবা।
প্রমথ। সত্যি তো বটে, কিন্তু আমাদের দুঃখের কথা authorities-রা শোনে কই। সে-দিনের খবরটা মনে আছে ? এক মেম কুকুর নিয়ে female compartment-এ উঠেছে। আর কেউ সেখানে উঠতে গেলে, কুকুর 'খ্যাক খ্যাক' করে কামড়াতে আসে। কত মহিলা platform-এ এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। সমস্ত train শুদ্ধ যাত্রীরা নেমে এল—বল্লে, "এর বিচার না করলে আমরা ট্রেণে উঠব না।"
ড। তার পর কি হোল বাবা ?
প্রমথ। Gaurd এক Anglo Indian. সে বল্লে, "আপনারা একটা compartment খালি করে এঁদের বসতে দিন। আমি 'Reserved for Ladies' লিখে দিচ্ছি।" মেমকে কিছু বল্লে না। যে আইনী কাজ করে সে সাফ ভারতবাসীদের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল।
ড। এতো ভারী অন্যায়। Assembly-তে এ সব question করা উচিত।
প্রমথ। করবে কে ? আর করলেই বা এর সুবিচার আমরা পাব কোত্থেকে ? ওরে, পরাধীন জাতিকে সব সহ্য করতে হয়। We have to forget that we are human beings.

(চা নিয়ে প্রতিভা এল ; টেবিল এগিয়ে প্রমথ বাবুকে চা দিলে)

প্রমথ। বৌমা, আমি ওদের ওখানে একবার গেছলুম। অমর তো ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।
প্র। সে তো হবেই বাবা—এক মেয়ে।
প্রমথ। আমি বুঝিয়ে এলুম যে, তোমার ভাবনা কি ? আমরা সব ব্যবস্থা করে দেব। তোমার কাজ আর আমার কাজ কি আলাদা। বৌমা, ডলি গিয়ে সব সামলে দেবে। কি বল মা ?
প্র। নিশ্চয়ই। আপনি কাকাবাবুকে ভাবতে বারণ করবেন. তার ওপর আবার কাকীমার Blood pressure আছে ; শরীরের ওপর বেশী অত্যাচার করলে বেড়ে উঠবে।
প্রমথ। তোমরা মা কাল সকালে একবার যেও। রমেশকে ওরা নেমন্তন্ন করেছে। মেয়েও দেখাবে। অরুণকেও সঙ্গে যেতে বলেছে।
প্র। সে তো ভালই হবে।
প্রমথ। আমাদের সকলকে কাল সকালে ওখানেই খেতে বলেছে। তোমরা একটু সকাল সকাল গিয়ে জোগাড় টোগাড় করে দিও।
প্র। আচ্ছা বাবা।
প্রমথ। (চা খেতে খেতে) হেনা মা তো আর আমার সামনে বেরোতেই চায় না। লজ্জায় কোথায় যে লুকিয়ে থাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের মত বাচালতা নেই।
প্র। চমৎকার মেয়ে বাবা!

(পরেশ, রমেশ, ও অরুণের প্রবেশ)

প্রমথ। এই যে বাবা—

(রমেশ ও অরুণ তাঁকে প্রণাম করলে)

প্রমথ। তার পর পথে কোন কষ্ট হয়নি ?
অ। না কাকাবাবু—গাড়ীটা একেবারে ফাঁকা ছিল। দিব্যি ঘুমোতে ঘুমোতে আসা গেছে।
প্রমথ। এবার কিন্তু বাবা তোমায় মাস দু'য়েক এখানে থেকে যেতে হবে। এখন তো কলেজ বন্ধ।
অ। আপনি যা বলবেন।
প্রমথ। আচ্ছা তোমরা বস। বৌমা ওদের একটু চা-টা দাও।

[প্রস্থান।

প ডলি, যা, এদের মুখ-হাত ধোবার জলের যোগাড় করে দিয়ে আয়—আর ঠাকুরকে চায়ের জল চাপাতে বল।

[ডলির প্রস্থান।

প। তার পর পরীক্ষা কেমন হ'ল ?
র। ভাল।
প্র। অরুণ ঠাকুরপোর তো ফার্ষ্ট হওয়া একচেটিয়া। এবারও ফার্ষ্ট নিশ্চয়।
অ। না বৌদি। স্নেহ করে অতটা বাড়িয়ে তুলো না। যদি না হতে পারি তখন কষ্ট পাব।
প। তোমরা বস—জিরোও। আমি জমীদারীর কয়েকটা দরকারী কাজ সেরে আসি। [প্রস্থান।
প্র। তার পর তোমাদের খবর কি ?
র। ভাল।
প্র। বিয়ের নামে খুব আনন্দ হচ্ছে নিশ্চয় ?
র। হুঁ।
প্র। মেয়ে পছন্দ হয়েছে ?
র। জানি না। আমি মুখ-হাত ধুতে চল্লুম।

[প্রস্থান।

প্র। ঠাকুরপোর হঠাৎ মেজাজটা এমন গরম হয়ে গেল কেন ?
অ। Nervousness বৌদি nervousness. কত বড় বড় ষণ্ডা-গুণ্ডারাও বিয়ের নামে nervous হয়ে যায়।

প্র। কেন মেয়েরা কি বাঘ ?
অ। না ঘূর্ণী। সব ঘুরিয়ে দেয়।
প্র। তুমিও এবার একটা বিয়ে থা' কর' !
অ। না বৌদি। আমি চিরকাল bachelor থাকব। ও সব ঝঞ্ঝাট আমার পোষাবে না।
প্র। বিয়ের আগে অমন সকলেই বলে। দেখা যাবে।

[ডলির প্রবেশ]

ড। জল দিয়েছে বৌদি।
অ। অরুণ ঠাকুরপো—যাও, মুখ ধুয়ে এস, দেরী কোরো না। আমি তোমাদের জল-খাবারের ব্যবস্থা এই ঘরেই করে দিচ্ছি। [প্রস্থান।
অ। ভাল আছ ডলি ?
ড। হ্যাঁ—আপনি ?
অ। আমি ত চিরকালই ভাল আছি।
ড। আপনার পরীক্ষা কেমন হল ?
অ। ভালই তো মনে হচ্ছে—তবে result না বেরোন পর্য্যন্ত কিছুই বলা যায় না।
(দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আড় চোখে দু'জনে দু'জনকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। চোখাচোখি হতে—)
অ। তোমার পড়া-শুনা কেমন হচ্ছে ?
ড। ভাল না।

(আবার চুপ-চাপ...)

অ। গান-বাজনা চলছে তো।
ড। হ্যাঁ।

[প্রতিভার প্রবেশ]

প্র। ঠাকুরপো, এখনও মুখ ধুতে যাওনি—চা আনতে বল্লুম যে।
অ। এই যাই বৌদি। [প্রস্থান।
প্র। নড়তে চায় না।
ড। যাও !
প্র। লোকটাকে কি যাদুই করেছিস্। অমন রসিক ছেলে—মুখ দিয়ে যেন খই ফুটছে, সে কি না তোর সামনে একেবারে বোবা হয়ে যায়।
ড। ভাল হবে না বৌদি।
প্র। চেহারাটা যেন এবার আরও ভাল হয়েছে। কি বলিস্ ?
ড। জানি না।
প্র। চটিস্ কেন? সত্যি কথা বল তো, ওকে তোর বড় পছন্দ, না ?
ড। আঃ, কি জ্বালাতন কর।
প্র। (ডলিকে কাছে টেনে) ওকে তুই বড্ড ভালবেসে ফেলেছিস্, না ?

(ডলি মাথা হেঁট করে রইল)

প্র। একেবারে মরেছিস্। যাক্, যদি ওকে তোর হাতে সঁপে দিই, তবে কি দিবি ?
ড। কেন আমায় এমন করে কষ্ট দিচ্ছ বৌদি— (কেঁদে ফেললে)
প্র। পাগলি, কাঁদছিস্ কেন ? আমি থাকতে তোর ভাবনা কি ? ওর নাকে দড়ি বেঁধে তোর হাতে দেব—মনের সুখে চরিয়ে বেড়াস্।

(অরুণের প্রবেশ)

প্র। এর মধ্যে মুখ ধোওয়া হয়ে গেল। রেলের ময়লা কালি—
অ। মানে এখনি নাইব তো, তাই এখন—
প্র। থাক্, অরুণ ঠাকুরপো, আমার কাছে আর মিথ্যে কথা বলো না।
ড। আমি যাই ছোড়দাকে পাঠিয়ে দি'গে। [প্রস্থান।
প্র। তুমি ঠাকুরপো এইবার কলকাতায় গিয়ে assembly-র মেম্বার হতে চেষ্টা করো।
অ। কেন ?
প্র। এমন বেমালুম মিথ্যা কথা বলতে পার।
অ। মিথ্যে কথা মানে ?
প্র। এখানে মন পড়েছিল, তাই মুখ-হাত ভাল করে ধোবার সময় পেলে না।
অ। না না, বৌদি।
প্র। বেশ, তোমাদের বৌদিই মিথ্যাবাদী। বসো, আমি রমেশকে পাঠিয়ে দিই, আর তোমাদের জলখাবার নিয়ে আসি। [প্রস্থান।
অ। বৌদি কি সব জানতে পেরেছে। ছিঃ ছিঃ, কি মনে করবে ! আমাকে ওরা কত স্নেহ করে, বাড়ীর ছেলের মত দেখে আর আমি কি না—নাঃ, খুব শক্ত হতে হবে। এবার ডলিকে দেখলে কথাই কইব না। গম্ভীর হয়ে থাকব। যতখানি পারব এড়িয়ে চলব।

[ডলির চা ও খাবার নিয়ে প্রবেশ। অরুণ দেখেও দেখল না। কাগজ নিয়ে পড়তে লাগল]

ড। আপনার চা এনেছি।
অ। টেবিলে রেখে দাও।
ড। বৌদি এখুনি আসছে। আপনি আরম্ভ করুন।
অ। আচ্ছা।
ড। ছোড়দা একেবারে চান করে নিলে বলে দেরী হল'।
অ। বেশ।
ড। খান্, চা যে জুড়িয়ে গেল।
অ। ওঃ। (কাগজ রাখিল) বৌদি কোথায় ?
ড। আমি গিয়ে বৌদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি— [প্রস্থান।
অ। এই একেবারে ঠিক attitude. কোন রকম weakness দেখাব না। বিশ্বাস করে আমাকে ওর সঙ্গে মিশতে দিয়েছে—I must prove myself worthy of it.

[রমেশের প্রবেশ]

অ। কি রে এতক্ষণ কোথায় ছিলি ?
রমেশ। আর কোথায় ছিলি। Life একেবারে hell করে তুললে। বৌদি ডলি সবারই মুখে খালি এক কথা। বিয়ে বিয়ে বিয়ে। ইচ্ছে করছে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ি।
অ। দেখিস, যেন এখন কিছু ফাঁস্ করে ফেলিস্ নে। ছবির কথা মোটে উল্লেখই করবি না। ছবি কি রকম দেখলি জিজ্ঞেস করলে বলবি ভাল। Patience হারাসনি, সব plan তা হলে collapse হয়ে যাবে।
র। না। I am all right.

(প্রতিভার প্রবেশ)

প্র। ঠাকুরপো, কাল সকালে হেনাদের ওখানে তোমাদের নিমন্ত্রণ। অবশ্য আমাদেরও ঐখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

র। হুঁ।

প্র। কালই মেয়ে দেখাবে। তুমি আর ঠাকুরপো দেখে এসে বোলো কেমন লাগল।

র। আচ্ছা।

প্র। ভাল লাগলে কিন্তু ঘটকালির জন্য রসগোল্লা খাওয়াতে হবে।

র। বেশ।

অ। রমেশ excitement আর control করতে পারছে না। কিছু মনে কোরো না বৌদি, এ সব ব্যাপারে বড় বড় মহারথীরা কাত হয়ে যায়—রমেশ তো কোন ছার। আমার এক বন্ধুর বিয়ের দিন জ্বরই এসে গেল। ১০৫ টেম্পারেচার। বিয়ে পেছিয়ে দিতে হল'। আমার পিসতুতো ভাইয়ের শালা তো আসরে বসে ভেউ ভেউ করে কেঁদেই ফেল্লে। কিছু ভেব না বৌদি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্র। এখন তো খুব বড় বড় কথা ঝাড়ছ'—তোমার বেলা দেখা যাবে।

অ। আমার কি আর সে-দিন আসবে?

প্র। আসবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন? সময় তো আর পালিয়ে যায়নি।

অ। না না। ও-সব কি বলছ বৌদি? আমি একলাই জীবন কাটিয়ে দেব।

প্র। (হেসে) আহা—কি দুঃখ রে! পান খাবে?

অ। খাব। সঙ্গে একটু জরদাও দিও।

প্র। এটা আবার কবে ধরলে?

অ। কিছু দিন হল'। সকলেই তো আমাদের রমেশের মতন goody-goody হতে পারে না।

প্র। আচ্ছা—সেজে নিয়ে আসছি। [প্রস্থান।

অ। এখন অবধি খুব natural হচ্ছে। কাল নিমন্ত্রণ। তুই আগে যাবি, আমি মিনিট পনেরো পরে যাব।

র। কি বলব?

অ। যা খুসী। মোট কথা irrelevent হওয়া চাই। চেয়ার টেবিল উল্টে দেওয়া, জানলার পরদা ছেঁড়া, নাচা, গান গাওয়া, কাঁদা সব চলতে পারে। আমি যখন যাব, তখন আমাকে ওরা ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করবে। আমি ওদের ভাল ভাবে বুঝিয়ে দেব—তুই পাগল।

র। মেয়েটা এসে পড়বে না ত'?

অ। Impossible. তোর পাগলামী দেখে আর মেয়ে দেখাতে সাহসই করবে না। চল, ঘরে গিয়ে এ বিষয়ে একটা plan করা যাক্। মনে রাখিস সব খুব secretly করতে হবে। কেউ যেন মনের কথা না জানতে পারে।

র। আমি তো ভাই এর মধ্যেই হাঁফিয়ে পড়েছি। বৌদি, ডলি, সকলকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবার জন্ম প্রাণ ছটফট্ করছে।

অ। ধৈর্য্য বন্ধু, ধৈর্য্য। আজকের দিনটা বই ত নয়। কাল যা ইচ্ছে করিস্।

র। All right. [দু'জনের প্রস্থান।

[পানের ডিস্ হাতে প্রতিভা ও ডলির প্রবেশ]

প্র। ওরা গেল কোথায়?

ড। হয় ত' নিজেদের ঘরে গিয়ে গল্প করছে।

প্র। যা-না ডলি, পানটা অরুণকে দিয়ে আয়।

ড। আমি পারব না।

প্র। লক্ষ্মী বোন্—যা-না ভাই।

ড। না না, আমি যাব না, কখনও যাব না।

প্র। ঐ তো তোদের দোষ। ছবির দিকে দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার চাইবি—অথচ আসল মানুষ এলে তাদের সামনে যাবি না।

ড। সব সময়েই তোমাদের ঐ এক কথা। আমি কি করেছি তোমাদের, শুনি?

প্র। আমাদের ত্যাগ করেছিস্। মনের কোণ থেকে সাফ সরিয়ে দিয়েছিস্। কোথাকার কে, সে এসে সব মনটা ঘিরে বসল জুড়ে—আর আমরা সব গেলুম বাদ!

ড। যাও—আমি চল্লুম।

প্র। ওরে শোন্ শোন্!

ড। (যেতে যেতে) না, আমি তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না। [প্রস্থান।

প্র। শুনে যা—একটা ভয়ানক দরকারী কথা।

[পিছন পিছন প্রস্থান।

প্রস্ফুট

অমর বাবুর বাড়ী

অমরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী—প্রমথ বাবুর বন্ধু।
নির্ম্মলা—তাঁর স্ত্রী।
হেনা—তাঁর মেয়ে।

(হেনা একলা বসে গান গাইছে)

গান

দখিন দুয়ার ছিল খোলা।
কে এলে মম মন্দির-মাঝে, অজানা পথিক পথ-ভোলা।
নয়নে তোমার কি মাধুরী ছিল
নিমেষে আমার মন হরে নিল,
বসন্ত মোর, জীবনে আনিলে, হৃদয়ে দিলে যে তুমি দোলা।

[অমর বাবু গান হতে হতে ঢুকেছেন]

হে। (গান শেষ করে) তুমি বেড়িয়ে কখন ফিরলে বাবা?

অ। এই এখুনি আসছি মা। তোমার গান শুনছিলুম। বড় মিষ্টি লাগল।

হে। আজ তোমার এত দেরী হল' কেন বাবা?

অ। প্রমথর সঙ্গে একবার নদীর ওপারে ওর বাগানে গিছলুম।

(নির্ম্মলার প্রবেশ)

অ। হ্যাঁ গা, আজ কেমন আছ?

নি। ভালই তো মনে হচ্ছে। পোড়া শরীর কখন যে কেমন থাকে বলা শক্ত। এখন যেতে পারলেই হয়।

হে। মার খালি সব সময়ই ঐ সব কথা।

নি। হেনার এখন বিয়েটা ভালয় ভালয় চুকে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

হে। বাবা, তোমার জন্ম চা আনব না কোকো ?

অ। কোকোই নিয়ে এস মা।

[হেনার প্রস্থান।

অ। রমেশ ছেলেটি একটি রত্ন—আর তেমনি ওদের বাড়ীর সকলে।

নি। মেয়ের আমার কত জন্মের তপস্যা যে, এমন ঘর-বর পাচ্ছে। এখন চার হাত এক হ'লে বাঁচি।

অ। প্রমথর মতন বন্ধু আজকালকার দিনে দেখা যায় না। সেই কবে বলেছিল, তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব—সে কথা সে ভোলেনি। এমন ত' অনেকে বলে—কিন্তু কে রাখে বল ?

নি। প্রতিভার মত জা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি গুণ—অথচ কি সরল। ঐ তো বলতে গেলে আমাদের দেখা-শুনা সব করছে। আমি তো ছাই কিছুই পারি না।

(প্রতিভা ও ডলির প্রবেশ)

ড। কাকীমা—আমরা এলুম। ছোড়দা একটু পরে আসবে।

নি। তার বন্ধুকেও আসতে বলে'ছ তো ?

প্র। হ্যাঁ। সেও আসবে। বাবার আসতে একটু দেরী হবে।

নি। চল মা, আমরা ভেতরে যাই।

[অমর বাবু ছাড়া সকলের প্রস্থান।

অমর বাবু কাগজ পড়তে পড়তে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। কোকো নিয়ে হেনার প্রবেশ]

হে। কি হ'ল বাবা ?

(টেবিলে কোকো দিল)

অ। (খেতে খেতে) আদালতেও মধ্যে মধ্যে বড় funny সব ব্যাপার হয়। এক Negro ঘড়ি চুরি করেছে। তার উকিল তো অনেক কষ্টে তাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করলে। জজ বল্লে—"The prisoner is acquitted." Negro-টা ঠিক বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলে—"তার মানে ?" জজ বল্লে— "You are free." Negro উত্তর দিল—"যাক ঘড়িটা আর ফেরত দিতে হবে না'ত ?" হাঁ মা, প্রতিভা, ডলি এসেছে, দেখেছ ?

হেনা—কই না। আমি তবে যাই বাবা। [প্রস্থান।

[অমর বাবু খবরের কাগজ পড়তে আর চা খেতে লাগলেন ; আলু-থালু বেশে রমেশের প্রবেশ]

অ। এই যে, এস বাবা। তোমায় আমি শেষ দেখেছি বছর দশেক আগে—তখন তোমার বয়স প্রায় ১৪ বছর। চেহারাটা এখনও ঠিক সেই রকমই আছে, বস' বাবা বস'।

[রমেশ military salute করে—টেবিলের ওপর উঠে বসল]

অ। (অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। পরে) ভাল আছ ?

র। আপনার জানলা দরজার পর্দ্দা-গুলো লাল কেন ? নীল হওয়া উচিত—

(গিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলে)

অ। [আরও বিস্মিত হয়ে] পরীক্ষা কেমন দিলে ?

র। বর্ম্মায় তো বহুদিন ছিলেন। ওখানকার পোয়ে dance দেখেছেন।

(নাচতে লাগল)

অ। (স্তম্ভিত হয়ে) কলকতার সব খবর কি ?

র। Bengal Music Conference-এ একজন ওস্তাদ এমন মুহ বানিয়ে গান গাইলে যে তিন জন মহিলা ভির্মী গেলেন। চীজটা শুনুন—

(টেবিল চাপড়ে বিকট চীৎকার করে গান)

সাঁচি সাঁচি কহ হে বঁতিয়া
ঔ্যা পিয়া
ম্যায় তো সে নাহি বোলুঙ্গী।

হেনা। কি হয়েছে বাবা, এত চেঁচামেচি—

(বলতে বলতে হেনা ঢুকল। রমেশকে ঐ অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে একটু দাঁড়িয়ে দ্রুতপদে চলে গেল। রমেশের গান-টান সব বন্ধ হয়ে গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল)

র। (পরে) এ মেয়েটি কে ?

অ। আমার মেয়ে। ঐ আমার একটি মেয়ে—নাম হেনা।

র। (আশ্চর্য্য হয়ে) আপনার মেয়ে ?

অ। হ্যাঁ, কেন ?

র। দেখুন—মানে একটা ভুল হয়েছে। আমি বুঝলেন কিনা পাগল তো নই—

অ। না না, পাগল কেন হবে। (চেয়ারে বসিয়ে) বস বাবা, বস।

(অরুণের প্রবেশ)

র। এই যে অরুণ। আমি কি সত্যি করে পাগল যে—ইনি মনে করছেন আমি পাগল—

অরুণ। পাগল বই কি। নিশ্চয়ই পাগল।

র। কিন্তু আমি তো সত্যি করে পাগল নই—তুই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল না—

অরুণ—(অমর বাবুকে সরিয়ে এনে) মাথার দেখছি আবার গোলমাল হয়েছে।

অ। ক'দিন এমন হয়েছে।

অরুণ। এই ত মাত্র দিন-দশেক আমরা জানতে পেরিছি। Hostel-এ হঠাৎ একদিন রাত্রে দেখি কি রকম আবোল-তাবোল বকছে—তখনি ডাক্তার ডেকে আনলুম। দেখে বল্লে, Fits of insanity. সেরেও যেতে পারে।

অ। প্রমথ জানে ?

অরুণ। না, বাড়ীতে আমরা তখন খবর দিইনি। আর সেটা repeat-ও করেনি। আজ ভোর অবধি বেশ ছিল। হঠাৎ এখন দেখছি আবার একটা attack হয়েছে।

অ। এর বাবাকে এখুনি খবর দেওয়া উচিত—তুমি কি বল ?

অরুণ। নিশ্চয়—চলুন আমরা ডেকে আনি।

[উভয়ের প্রস্থান।

র। ছিঃ ছিঃ! এখন কি করি। এরা তো আমায় পাগল বলেই ভেবে নিয়েছে। কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না। সব explain করলেও বিশ্বাস করবে কি না সন্দেহ।

হেনা। বাবা,—মা একবার তোমায় ডাকছে—

(বলতে বলতে হেনা ঘরে ঢুকল)

র। শুনুন—আমার একটা কথা শুনুন—

(হেনা পেছোতে লাগল)

র। আমি সত্যি করে পাগল নই। একটা misunderstandingএর জন্য—

(রমেশ আরও কাছে গেল)

হে। (চীৎকার করে) ও মাগো—

(ছুটে ডলি ও প্রতিভার প্রবেশ)

ড। কি হয়েছে ভাই ?

হে। পাগল—

(রমেশের দিকে দেখালে। রমেশ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল)

প্র। ডলি, তুই হেনাকে নিয়ে ভেতরে যা।

[দু'জনের প্রস্থান।

প্র। কি হয়েছে ঠাকুরপো ? তোমারই বা অমন চেহারা কেন আর হেনাই বা অমন আঁৎকে উঠে চীৎকার করলে কেন ?

র। তোমার জন্যেই তো সব কেলেঙ্কারী হল।

প্র। আমার জন্যে ? কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না।

র। মিছিমিছি পাগল সাজলুম। এখন কেউ আর বিশ্বাস করে না যে, আমি পাগল নই। তুমি যে আমায় সকলের সামনে এমন ভাবে অপদস্থ করবে তা আমি আশা করিনি।

প্র। কেন, আমি কি করলুম ?

র। কি করলুম মানে ? (পকেট থেকে ছবি ও চিঠি বার করে) এই ছবিটা তুমি পাঠালে কেন ?

প্র। (ছবি দেখে) এ ছবি ! আমি এটা কেন পাঠাতে যাব। আমি তো হেনার ছবি পাঠিয়েছিলুম, এটা আবার কার ছবি ?

র। আমি কি জানি। চিঠি খুলে দেখি এই ছবি।

প্র। সত্যি বলছি, আমি হেনার ছবিই পাঠিয়েছিলুম।

র। তবে এটা এল কোত্থেকে ?

প্র। হোষ্টেলের ছেলেরা কোন বদমাইশী করেনি তো ?

র। ঠিক—নিশ্চয়ই এ অরুণের কাজ। Rascal, আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন।

[বেগে প্রস্থান।

(ডলি ও হেনার প্রবেশ)

ড। বৌদি, আমরা পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি। হেনা তো হেসেই বাঁচে না।

প্র। যাক্, তবু ভাল। যে-ভাবে মুষড়ে পড়েছিল। (ছবিটা দেখিয়ে) ঠাকুরপোরই বা দোষ কি ? এই ছবি দেখলে কে আর বিয়ে করতে রাজী হয় ?

ড। ছোড়দারও অন্যায়। আগে হেনাকে না দেখে ওর অমন করাটা উচিত হয়নি।

প্র। আগে ঐ ছবি দেখে পাগল সেজেছিল, এখন সত্যিকারের মানুষ দেখে পাগল হয়েছে—কি বলিস্ হেনা ?

হে। আঃ বৌদি।

প্র। বিয়ের পর তুই আচ্ছা করে এর শোধ নিবি বুঝলি ?

হে। যান্।

প্র। একটা শেকল কিনে দেব—বেঁধে রাখবি।

ড। শেকলের দরকার হবে না বৌদি—ও এম্নিই বেঁধে রেখে দিতে পারবে—

(ছুটে অরুণের প্রবেশ)

অ। বৌদি—আমায় বাঁচাও—

(হেনা ও ডলিকে দেখে থমকে দাঁড়াল। পরে চলে যেতে গেল)

প্র। এস না ; কি বলবে বল।

[হেনা ও ডলির প্রস্থান।

অ। বৌদি, বড় অন্যায় করে ফেলেছি—

প্র। কি করেছ ?

অ। রমেশ তো দেখি হন্নে হয়ে আমায় খুঁজতে ও-বাড়ী গেছে। আমি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

প্র। কি হয়েছে বল না।

অ। রমেশের চিঠি আমরা হোষ্টেলে খুলে পড়েছিলুম। ছবিটা আমি বদলে এক দারওয়ানের মেয়ের ছবি পুরে দিয়েছিলুম।

প্র। তার পর ?

অ। ও তো সেই ছবি দেখে মহাখাপ্পা। বলে আত্মহত্যা করব, নিরুদ্দেশ হব। অনেক কষ্টে ওকে বুঝিয়ে নিয়ে এসেছি। পরামর্শ দিয়েছিলুম পাগল সাজতে। এখন কেলেঙ্কারী। এঁরা কাকাবাবু সকলে ওকে পাগল মনে করছে। কি করি ? সকলের সামনে আমিই বা মুখ দেখাই কি করে ? রমেশ তো আমাকে দেখতে পেলে আস্ত রাখবে না।

প্র। তার আমি কি করব বল ?

অ। Please বৌদি, তুমি একটা কিছু উপায় করে দাও—

প্র। বেশ করতে পারি, যদি তুমি এক কাজ কর।

অ। যা করতে বলবে আমি তাই করব বৌদি।

প্র। যদি একটা বিয়ে কর—

অ। শুধু ঐটা বাদ। বিয়ের কথা বোলো না।

প্র। কেন ? বিয়েটা কি খুব খারাপ কাজ ?

অ। না, তা নয়। মানে—এই কি বলে—আমি বিয়ে করতে পারব না।

প্র। তবে ভাই তোমাদের কথা তোমরা বোঝ, আমি পারব না।

অ। বৌদি, তুমি বুঝছো না। মানে—আমি বিয়ে করতে হয় ত পারতুম, কিন্তু কি বলে এখন—

প্র। এখন কি হয়েছে শুনি। কাউকে ভালবেসেছ ?

অ। ঠিক ভালবাসা নয়—মানে—এখন একটা—

প্র। ডলির জন্য তবে অন্য সম্বন্ধই খুঁজতে হবে।

অ। অ্যাঁ ! কি বল্লে বৌদি—ডলি, মানে—

প্র। হাঁ। মানে তুমি ডলিকে বিয়ে করতে রাজী আছ কি না ?

অ। তুমি যা বল বৌদি—

(সলজ্জভাব)

প্র। সেধো ভাত খাবি, না, হাত ধুয়ে বসে আছি। এতক্ষণ তবে বিয়ে করব না করব না করছিলে কেন ? বল্লেই তো পারতে যে, ডলিকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

(অমর বাবু ও প্রমথ বাবুর প্রবেশ)

প্রমথ। এই যে বৌমা, তোমায়ই খুঁজছিলুম।

প্র। কেন বাবা ?

প্রমথ। বড়ই দুঃসংবাদ। রমেশ পাগল হয়ে গেছে।

অমর। এই তো অরুণের সামনেই কি রকম করছিল।

প্র। বাবা, সত্যি করে ঠাকুরপো পাগল হয়নি।

প্রমথ। অ্যাঁ—কি বলছ মা ! তবে সে এমন করতে যাবে কেন ?

প্র। (ছবিটা দিয়ে) এই ছবিটা দেখে।

(অমর ও প্রমথ দু'জনে ছবিটা দেখলেন)

প্রমথ। ছবিটা কার ? কিছু তো বুঝতে পারছি না।

অমর। আর এর সঙ্গে পাগলামীরই বা কি সংস্রব ?

প্র। আমি ঠাকুরপোকে একটা চিঠি লিখেছিলুম—এখানে তাড়াতাড়ি আসবার জন্য—সেই সঙ্গে হেনার একটা ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

প্রমথ। সে তো আমিই বলেছিলুম মা—

প্র। হ্যাঁ বাবা। হোষ্টেলের ছেলেরা সেই ছবি বদলে তার জায়গায় এই ছবি পুরে খামটা এঁটে দিয়েছিল।

অ। Just like them, তার পর ?

প্র। সেই দেখে তো ঠাকুরপো গেল চটে। বলে—বিয়ে করব না, আত্মহত্যা করব, নিরুদ্দেশ হব। তার পর অরুণ ঠাকুরপো তাকে পরামর্শ দিয়েছিল কাকাবাবুর বাড়ী এসে পাগলামী করতে, যাতে বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য এ সব plan-ই তার।

অমর। Very interesting, অরুণ, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন ? Young man-দের এই রকমই হওয়া উচিত। সুবোধ সুশীল গম্ভীর ছেলে নিয়ে আমাদের কোন লাভ নেই। We want men who can laugh and make others laugh.

অরুণ। আমার অন্যায় হয়ে গেছে ; আপনারা আমাকে মাফ করবেন।

অমর। Not at all, আমরা হোষ্টেলে থাকতে একবার কি করেছিলুম বলি—শোন। আমাদের পাড়ার এক ৭০ বছরের বুড়োর বিয়ের সখ হ'ল। আমরা সকলে তাকে অনেক বারণ করলুম, কিছুতে শুনলে না। তখন আমাদের হোষ্টেলের এক জন ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে তার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলুম। বিয়ের পরেই বাসরে যাবার সময় সেই ছেলেটা পেট কামড়াচ্ছে বলে শুয়ে পড়ল। আমাদের মধ্যেই এক জন ডাক্তার সেজে চিকিৎসা করতে এল। দেখে বল্লে, Asiatic Cholera. দেখতে দেখতে সে মারা গেল ! আমরা ক'জনে মিলে "হরিবোল" দিতে দিতে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলুম। বুড়ো কেঁদেই সারা। তার পর দিন আমরা আর সেই ছেলেটা বুড়োকে সান্ত্বনা দিতে এলুম। সে এক ভারী রগড় হোল।

প্র। আমি কিন্তু বাবা, ও অন্যায়ের একটা শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। আসামী মাথা পেতে নিতে স্বীকারও করেছে। এখন আপনি যদি মত দেন—

প্রমথ। কি শাস্তি শুনি ?

প্র। ডলিকে বিয়ে করতে হবে।

প্রমথ। এ তো খুব ভাল শাস্তি মা।

অমর। চিরকালের জন্য আমাদের কাছে বাঁধা থাকবে।

[অরুণ প্রমথ ও অমরকে প্রণাম করল]

প্রমথ। বেঁচে থাক বাবা।

অমর। চল প্রমথ, ওঁকে এই সুখবরটা শুনিয়ে দিয়ে আসি।

[দু'জনের প্রস্থান।

প্র। কেমন হোল তো ?

অরুণ। বৌদি, আমার আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে।

[বেগে রমেশের প্রবেশ]

র। (অরুণের গলা ধরে) তবে রে রাস্কেল ! তোমার জন্য আমার এই মুস্কিলে পড়তে হ'ল। এরা পাগল মনে করেছে ; এখন কি হবে ?

অ। আরে গলা ছাড়—মারা যাব যে ! (গলা ছেড়ে দিল)

র। ওকে না বিয়ে করতে পারলে আমি বাঁচব না বৌদি। ওরা আমায় পাগল ভেবে যদি বিয়ে না দেয় তখন কি হবে ?

প্র। কিছু ভাবতে হবে না ঠাকুরপো, সব সামলে দিয়েছি।

র। বৌদি, তুমি ভাই আমায় মাপ কোরো। কত রূঢ় কথা কাল থেকে তোমায় বলেছি। ঐ গাধাটার জন্যই এই সব কেলেঙ্কারী হল। ওরই শাস্তি পাওয়া উচিত।

প্র। সে কি আর দিইনি ভাবছ। ওর শাস্তি হল—চিরদিন আমাদের কাছে বাঁধা থাকা আর আমাদের সাধের বোন ডলির দাসত্ব করা। বাবা এখুনি মত দিয়ে গেলেন।

র। Really ! অরুণ, কিছু মনে করিসনি ভাই। তোকে যা' তা' বল্লুম।

প্র। মনে করবার মত মনের অবস্থা ওর নেই ঠাকুরপো। অবশ্য তোমার অবস্থাও তথৈব। কে কাকে সামলাবে। এক ট্যারার সঙ্গে এক কাণার রাস্তায় ধাক্কা লাগল। ট্যারা বল্লে, "যেদিকে হাঁট সেদিকে দেখতে পার না ?" কাণা বল্লে, "যেদিকে দেখ সেদিকে হাঁটতে পার না ?"

(হেনার হাত ধরে টানতে টানতে ডলির প্রবেশ)

ড। নাও ভাই, ভাল করে দেখে নাও। পাগল বলে তো খুব কান্না জুড়ে দিয়েছিলে ; ভাল করে দেখ, আমার ছোড়দা পাগল নয়। কি, বর পছন্দ হয় ?

(হেনা মাথা হেঁট করে রইল। অরুণের হাত ধরে প্রতিভা এগিয়ে এল)

প্র। শুধু ও কেন ? তুইও তোর বরকে ভাল করে দেখে নে। বাবা মত দিয়েছেন।

ড। (কৃত্রিম কোপে) যাও বৌদি, ভাল হবে না বলছি।

যবনিকা

শ্রীযামিনীমোহন কর এম, এ (অধ্যাপক)।

ক্রমে-ক্রমে

[গল্প]
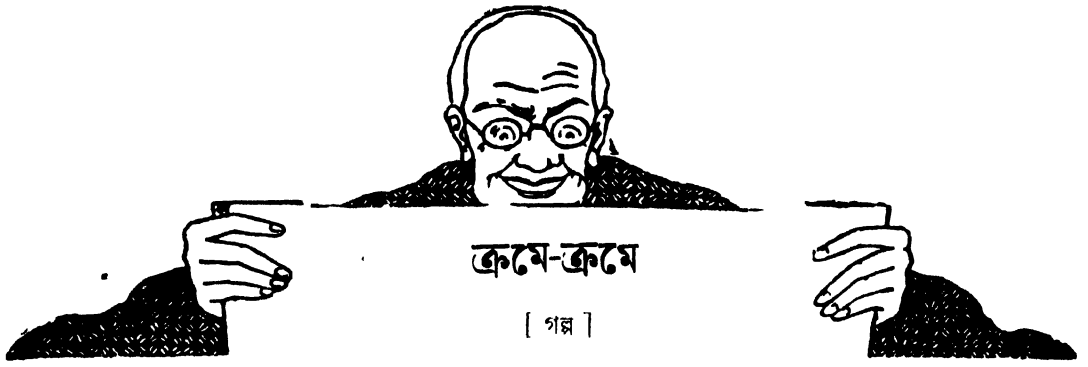
১

খাঁটী ৪৯ বৎসর ৭ মাস বয়সে পুলিসের চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, শ্রীযুক্ত নসীরাম সান্ন্যাল, তাঁহার সঞ্চিত বেতন, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, পুরস্কার এবং ইত্যাদি বাবদ মোট ৭১,৭৫৯৵৩ পাই নগদ, সরকার-প্রদত্ত 'রায়'-সাহেব খেতাব, এবং বিশ বছরের ভৃত্য বিষ্টুচরণকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং বৌবাজারে জ্ঞাতি-ভ্রাতা হরেকৃষ্ণের বাসায় অধিষ্ঠান করিলেন···

হরেকৃষ্ণ কহিল—"এইবার ত দাদা, বৌ-দিদিকে তা'হোলে আনতে হয়।"

নসীরাম চা পানের পর গড়গড়ায় ধূমপান করিতে-ছিলেন। সুখ-টান্; সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারিলেন না। একমুখ ধোঁয়া ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"আনতে ত হবেই। তবে এ-ক'টা দিন বাদে সামনেই চোত মাস পোড়চে; কাজেই সেই বোশেখ না হোলে আর আনা ঘটে উঠবে না।"

হরেকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ সভয়ে একটু ঢোক গিলিয়া কহিল—"এ মাসেরও ত এখনো পাঁচ-সাত দিন রয়েচে দাদা, এর ভেতর ত অনায়াসেই—"

হরেকৃষ্ণের মনোভাব যেন ইঙ্গিতে নসীরাম বুঝিয়া লইলেন। মৃদু এবং মোলায়েম ভাবে হাসিতে-হাসিতে কহিলেন—"ভায়ার বোধ হয় ভয় হচ্ছে যে, দাদার এই বিপুল দেহ-ভার এ-বছরের মধ্যে এখান থেকে আর অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে না। সে-সব কোন ভয় নেই, কেষ্ট। দু'চার দিনের মধ্যেই একটা বাসা-টাসা ঠিক কোরে ফেলচি।"

হরেকেষ্ট অত্যন্ত সাহস দেখাইয়া কহিল—"সে-সব কোন ভয়ের জন্য বলিনি দাদা; আপনি আমার এখানে ছ'মাস ধরে থাকুন না কেন—সে ত আমার সৌভাগ্য। তা'—আপনি বাসা ঠিক করার কথা বলচেন কেন; আপনার নিজের বাড়ী?"

"নিজের বাড়ী? তাতে ত এক ভদ্রলোক ভাড়া আছেন। হঠাৎ তাঁকে তুলে দেওয়াটা অনুচিত হবে না কি?" ভুড়ুক-ভুড়ুক করিয়া শ্রীযুক্ত নসীরাম কখনো মুদিত নেত্রে, কখনো চক্ষু চাহিয়া গড়গড়া টানিয়া যাইতে লাগিলেন। আর হরেকৃষ্ণ কিছু বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, কবে হইতে তাহার দাদার এই উচিত-অনুচিতের বিচার-বৃত্তি তাঁহার অন্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ পুষ্টিলাভ করিল।

ভৃত্য বিষ্টুচরণ একপাশে বসিয়া প্রভুর একটা ছেঁড়া-পাঞ্জাবীতে তালি লাগাইতেছিল। হরেকৃষ্ণ উঠিয়া গেলে নসীরাম তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—"বিদ্যেতে সব কাঁচকলা আর কি! হ্যাঁ রে বেষ্টা। বাড়ীটা থেকে মাসে ৭০টা কোরে টাকা ভাড়া উঠচে, আমি বাড়ীটা দখল ক'রে সেইটে নষ্ট করি! আমাদের ২।৩ জন থাকবার মত ছোট-খাটো একটা বাড়ী টাকা ২৫।৩০এর মধ্যে ভাড়া কোরে থাকলেই চলবে। তার জন্যে, অর্থাৎ যেস্থানে ২৫।৩০ টাকায় কাজ হবে, সেখানে ৭০টা কোরে টাকা খরচ করি কেন? কি যে বুদ্ধি!"

বিষ্টু কহিল—"এঁনাদের বুদ্ধি আর আপনার বুদ্ধি, বাবু, তফাত হোল আকাশ আর পাতাল! যাকে বলে সগ্‌গো আর নরোক! আপনার মত সুক্ষুখ্খু বুদ্ধি কটা মনিষ্যির আছে বাবু!"

"হ্যাঁ রে, বেষ্টা!"

"বাবু!"

"নতুন কলুকে কিনে এনেচো, ভাল কোরে এক

সিলিম সেজে আনো-নি বাপধন ! ছ্যাঁদাগুলো মস্তো বড় বড় ; হু-হু কোরে তামাক পুড়ে যাচ্চে আর গল্‌-গল্‌ কোরে ধোঁয়া বেরচ্চে।"

"ওর চেয়ে আর ছোট ছ্যাঁদা পেলুম না বাবা।"

"এক কাজ কোরো। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর, একটু এঁটেল মাটী লেপে, ছ্যাঁদাগুলোর ফাঁদ ছোট কোরে নিও।"

বৈকালের দিকে রায়সাহেব সকালের সেই তালি-মারা পাঞ্জাবীর উপর বহু কালের জীর্ণ এবং বিবর্ণ মটকার চাদর-খানা ফেলিয়া, মোটা লাঠিগাছটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য—ভ্রমণ এবং ভাড়াটে বাড়ীর সন্ধান করা।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উর্দ্ধদৃষ্টিতে ঘুরিয়া বহু 'টু-লেট্' তিনি আবিষ্কার করিলেন বটে, কিন্তু পছন্দসই বাড়ী পাইলেন না। হয়—ভাড়া বেশী, নয়—নানা অসুবিধা। বৈঠক-খানা লেনে একটা বাড়ী তাঁহার পছন্দ হইল বটে, কিন্তু সে বাড়ীতে থাকিতে তাহার জবরদস্ত পুলিস-হৃদয়ও একটু যেন বিচলিত হইয়া উঠিল। বাড়ীটি দ্বিতল। উপরে বাড়ীওয়ালা থাকেন, নীচের পার্ট খালি। বাড়ী-ওয়ালার পরিজন-সংখ্যাও কম। স্বামি-স্ত্রী এবং একটি ২৩।২৪ বছরের ছেলে। কিন্তু ওই 'একশ্চন্দ্র'ই—'তমোহন্তি'। যে মিনিট-পনের রায়সাহেব নীচের দালানে দাঁড়াইয়া বাড়ী-ওয়ালার সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহারই ভিতর সেই ঝাঁকড়া-চুল, লুঙ্গী-পরা, গলায় মালার আকারে পৈতা-ঝোলানো ছেলেটি অন্ততঃ বার-দশেক দেহ দোলাইয়া, মাথা নাড়িয়া এবং হাতে তুড়ি দিয়া গান গায়িতে গায়িতে তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে আসিয়াছে এবং গিয়াছে। তাহার সেই গানের কলিটি ছিল—'কে তুমি স্বপন-রাণী এলে মোর হৃদয়-তলে।'

রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছেলেটির বিবাহ দিয়েচেন কি ?

"চেষ্টা-চরিত্র, দেখা-শুনো চলচে।"

সেই সময় ছেলেটি আর একবার ট'ল দিয়া গেল। মুখে তাহার ঐ 'কে তুমি স্বপন-রাণী' এবং হাতে—তুড়ি।

রায়সাহেব তাহার আ-পাদ-মস্তক দেখিতে দেখিতে প্রস্থানোদ্যত হইলে, বাড়ীওয়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাড়ী পছন্দ হোল আপনার?"

লাঠি-গাছটায় ভর দিয়া রাস্তায় নামিয়া-পড়িয়া রায়সাহেব মৃদু-মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"বাড়ীর চেয়ে আপনার ছেলেটিকেই বেশী পছন্দ হোল। কিন্তু ভয় হচ্চে।"

"ভয়টা কিসের ?"

"স্বপন-রাণীকে স্বপ্ন দেখে হয় ত কোনো দিন তেড়ে এসে আঁচড়িয়ে-কাম্‌ড়িয়ে দিতে পারে।" প্রত্যুত্তরে বাড়ী-ওয়ালা কিছু-একটা গরম-গরম নরম-নরম বলিয়াছিল, কিন্তু রায়সাহেব তখন 'রেঞ্জের' বাইরে, সুতরাং তাহা আর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবার অবসর পাইল না।

যাহা হউক, প্রভু এবং ভৃত্য—রায়সাহেব এবং বিষ্টুচরণ—উভয়ের অনুসন্ধানের ফলে, নেবুতলায় ৩২ টাকা ভাড়ায় একটি বাটীর একাংশ পাওয়া গেল এবং দুই-চারি দিনের মধ্যেই হরেকৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিয়া এবং আপ্যায়িত করিয়া রায়সাহেব তাঁহার নূতন বাসায় উঠিয়া আসিলেন। উভয়ের আহারের বন্দোবস্ত হইল—বড় রাস্তার মোড়ে 'মডেল ভোজনালয়'-এ। রায়সাহেব বলিলেন—"বিষ্টু, চোত মাসটা এই রকমেই কাটুক্। একটা মাসের জন্যে আর বামুন-টামুনের হাঙ্গামা কোরে কি হবে। তার মাইনেও গুণতে হবে, অথচ চুরি কোরে ভূত ভাগাবে। কি বলিস ?"

"আজ্ঞে, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই হবে। এ মাসটা কাট্‌লেই ত মা-জননী আমার—

"হ্যাঁ, এসে পড়চে ; সুতরাং—"

সুতরাং এই ভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। রায়সাহেব সকালে নিকটস্থ চা-এর দোকান হইতে চা খাইয়া আসেন। বাড়ীতে আসিয়া স্বল্পছিদ্রযুক্ত কলিকাতে তামাক খান। তাহার পর বিষ্টুচরণ একবাটি তৈল লইয়া প্রথমে তাঁহার ভুঁড়ি এবং তৎপরে তাঁহার স্থূল শরীরের সর্ব্বাংশ উত্তমরূপে তৈল-লেপন এবং মর্দ্দন করিয়া দিলে তিনি স্নান সমাপন করতঃ—'মডেল' হইতে খাইয়া আসেন এবং মেজেয়-পাতা মাদুরের উপর তাকিয়ায় ভর করিয়া দেহ ঢালিয়া দেন। বৈকালে এক-এক দিন এক-এক দিকে বেড়াইতে বাহির হ'ন ;—কোন দিন পার্কে, কোন দিন বেলেঘাটার খাল-ধারে, কোন দিন বা পথে-পথে। এক দিন রায়সাহেব একটু লম্বা পাড়ি দিয়া,

বালীগঞ্জ 'লেকে' বেড়াইতে আসিয়া আচম্বিতে মন খারাপ করিয়া বসিলেন।

বসন্ত কাল। শেষা চৈত্র। 'লেকে'র বাগানে প্রচুর ফুল ফুটিয়াছে। মন্দ মন্দ দক্ষিণা বাতাস গায়ের উপর পড়িয়া সোহাগে প্রাণ-মন নাচাইয়া তুলিতেছে। অদূরের কোন-এক গাছের উপর হইতে একটা কোকিল ক্রমাগত নষ্টামী করিতেছে। রায়সাহেব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। বিষ্টুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ চোত' মাসের কত তারিখ হ'ল রে?"

"১৭ই বাবু।"

"১৭ই কি রে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু; পরশু ১৫ই গেছে, কাল ১৬ই, আজ ১৭ই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রায়সাহেব পাশ-ফিরিয়া পড়িয়া রহিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি কখন কড়ি-কাঠে, কখন দ্বার-জানালার চৌকাঠে।

২

শ্রীমতী ভ্রমরবালা আসিয়াছে। অর্থাৎ রায়সাহেবের স্ত্রী তাহার পিত্রালয় শান্তিপুর হইতে কলিকাতার নূতন বাসায় আসিয়াছে। আসিয়াই আবার ধূলাপায়ে শান্তিপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য জেদ ধরিয়াছিল। এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাড়াটিয়া বাসায় ভ্রমরবালা কিছুতেই থাকিতে রাজী নহে। রায়সাহেব অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, অনেক প্রকারে বুঝাইয়া, তবে ভ্রমরকে শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তা' হইলেও ভ্রমর-গুঞ্জন একেবারে স্তব্ধ হয় নাই।

রায়সাহেব কহিলেন—"বুঝেছি ভোমর, এক জন রায়-সাহেবের স্ত্রী হোয়ে ছোট-খাট এই রকম সামান্য বাসায় থাকাটা একটু লজ্জা-লজ্জা করে আর কি।"

ভ্রমর গুন্-গুন্ করিয়া উঠিল—"রায়সাহেবের স্ত্রী বোলে নয়, এক জন হাকিমের মেয়েও ত বটে! আমার চোদ্দ পুরুষের মধ্যে কেউ কখনো এ-রকম বাড়ীতে থাকে-নি।"

রায়সাহেব হি-হি করিয়া হাসিয়া কহিলেন—"থাকো-নি? মেদিনীপুরের বাসার কথা বুঝি ভুলে গেলে? রামপুরহাটের বাসা? মেমারীর সেই রাজপ্রাসাদের কথা না হয় না-ই বললুম; কিন্তু উলুবেড়ের বাসার কথাটা ত মনে আছে?"

"তোমাকে বোঝানো আমার সাধ্য নয়। সে সব মফঃস্বলের কথা ধরো কেন? মফঃস্বলে বাধ্য হোয়ে থাক্‌তে হয়। তা'ও থেকেচি—তোমার সঙ্গেই। কিন্তু বাবাও ত মুন্সেফ ছিলেন; সাত জায়গায় তাঁকে বাসা কোরে থাকতে হোত। কিন্তু তোমার বাসার মত ওঁচা বাসা কই কোথাও ত তাঁর ছিল না! আর তা ছাড়া, এখানে যখন নিজেদের বাড়ী রোয়েচে, তখন—"

"আহা-হা তাই হবে গো, তাই হবে। এ মাসটা কোন রকমে—। আমি যা ব্যবস্থা করেছিলুম, পাকা ব্যবস্থা। বাড়ীটা থেকে মাসে ৭০টা কোরে টাকা আসচে। নিজেরা এই দুটো প্রাণী—অত বড় বাড়ীটা থেকে অত-গুলো কোরে টাকা লোকসান্ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ?"

"তার চেয়ে কাশী চলো না, আরো খুব বেশী বুদ্ধি-মানের কাজ হবে। সেখানে পাঁচ সিকেতে একখানা ঘর পাওয়া যাবে'খন। আর খাবার খরচ মোটেই লাগবে না; দু'জনে হাত-ধরাধরি কোরে কোন-একটা ছত্রে গিয়ে রোজ বসলেই হবে। গভর্ণমেণ্ট তোমাকে রায়-সাহেবী না দিয়ে বরঞ্চ আমাদের বেষ্টাকে যদি দিত ত মানাতো! ছিঃ—ছিঃ—এমন কিরেট্‌———"

"ভোমর, আমাকে তুমি বুঝতে পার নি; আমি মোটেই কিরেট্ নই।"

"না, তুমি মস্ত বড় খোরচে; একেবারে দাতাকল্প!"

"একহিসেবে তাই বটে। তোমার কথার হিসেবেই বুঝিয়ে দি। যারা খুব এলো-পাতাড়ী খরচ করচে আর দু'হাত দিয়ে দান করচে, পরজন্মে কড়ায়-গণ্ডায় সব আবার বুঝে পাবে। আর আমি যদিই ধরো কিরেট্‌ই হই, তা হোলে ত পরজন্মে আর একটা কাণা কড়িও পাব না। তার মানে, সব খরচ-খরচা কোরে, দান কোরেই চোলে গেলুম। নয় কি না বল?"

ভ্রমর অবাক হইয়া রায়সাহেবের মুখের দিকে খানিক-ক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পর কহিল—"বেষ্টা যে বলে, 'বাবর আমাদের কুরুক্ষেত্র বুদ্ধি'—কথাটা ঠিকই। তা এ-সব

বাজে কথা থাক, এ-বাড়ীতে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

অগত্যা রায়সাহেবকে তাঁর পাকা হিসাব কাঁচাইতে হইল, দিন-পনর পরেই তিনি তাঁহার শ্যামবাজারের আপন বাড়ীতে ভ্রমরকে লইয়া উঠিলেন। যিনি ভাড়াটীয়া ছিলেন, তিনি শান্তপ্রকৃতির লোক। তা ছাড়া দেখিলেন, বাড়ীর মালিক যিনি, তিনি একে পুলিসের কর্ম্মচারী, তাহার—উপর—রায়সাহেব। সর্ব্বোপরি তাঁর বিপুল বপুখানিও তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়। সুতরাং রায়সাহেব তাঁহাকে উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেই, তিনি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, দুই-চার দিনের মধ্যেই অন্যত্র বাড়ী ঠিক করিয়া উঠিয়া গেলেন।

শ্যামবাজারের বাড়ীতে গিয়া ভ্রমর যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তাহার মুখে প্রফুল্লতা এবং হাসি দেখা দিল। রায়সাহেব বলিলেন—"তোমার মুখে হাসি দেখবার জন্যেই আমার সব, ভোমর। তোমাকে ভাল-বেসেই সুখ, আদর কোরেই তৃপ্তি।"

ভ্রমর জাঁতি লইয়া সুপারি কাটিতেছিল; কহিল—"ওই নাটকখানা বুঝি দুপুর বেলা পড়েছ?"

"দেখ, সংসারে ন মাতা, ন পিতা, ন পুত্র, ন পরিজন; তুমিই আমার হৃদয়-কাননের একমাত্র————"

"জাঁতিতে এক্ষুনি হাত কেটে ফেলবো, চুপ করো।"

সুতরাং রায়সাহেব চুপ করিলেন এবং নূতন দিয়া-শলাইয়ের বাক্স ও ছুরিখানা লইয়া তাহার প্রত্যেকটি কাঠি বারুদ সমেত লম্বালম্বি চিরিতে বসিলেন।

রায়সাহেবকে লুকাইয়া ভ্রমরবালা একটু হাসিল; জিজ্ঞাসা করিল—"একটা কাঠি চিরে ক'টা ক'রচ?"

"কোনটাকে দু'টো, কোনটাকে তিনটে।"

"যাক,—বাড়ীর দরুণ লোকসানটা দেশলাইয়ের কাঠির দৌলতেই পুষিয়ে গেল।"

"কি রকম?"

"অর্থাৎ বাড়ীভাড়া বাবত ৭০টা কোরে টাকা যেমন কমলো, তেমনি ৪০টা কাঠির দামে একশোটা কোরে কাঠি আসতে লাগলো। বড় সোজা কথা নয়! এক গুণের দাম দিয়ে আড়াই গুণ পাওয়া। অর্থাৎ এক হাজারে আড়াই হাজার, এক লাখে আড়াই লাখ;—টাকাতেই ধরো, আর জিনিষেই ধরো।"

হি-হি করিয়া হাসিয়া রায়সাহেব কহিলেন—"হিসেবে দেখছি তুমি একেবারে একাউন্ট্যান্ট জেনারেল।"

"দুঃখু করো না, তোমাকেও শিখিয়ে নোব। এত দিন ত নিতুম। ২৫ বছর ধোরে খালি চোর-ডাকাতের পেছনে পেছনে ছুটেছ, শিখিয়ে নেবার অবসর পাই-নি। এইবার নিতেই হবে।"—বলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রমর মুখ ও চোখের যে এক অপরূপ ভঙ্গী করিল, তাহাতে রায়সাহেব যদি বসিয়া না থাকিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতেন এবং দাঁড়াইয়া না থাকিয়া যদি শুইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ঘুমাইয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতেন। সুতরাং সে-রকম কোন পড়া না পড়িয়া,—যেন কেমন এক-রকম হইয়া পড়িলেন। ছুরিখানা হাত হইতে খসিয়া পড়িল, এবং দেশলাইয়ের কর্ত্তিত সূক্ষ্ম কাঠিগুলি বাতাসে এদিক্ ওদিক্ ছড়াইয়া পড়িল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রায়সাহেব অনিমেষ দৃষ্টিতে ভ্রমরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বিহ্বল স্বরে কহিলেন—"ভো—ভোমর!"

তেমনি মধুর অপরূপ মুখভঙ্গী সহকারে ভ্রমর কহিল—"কি হুকুম, বলো। চোখ দিয়ে একদৃষ্টিতে তুমি যে আমায় গিলতে সুরু ক'রে দিয়েছ!"

"আচ্ছা ভোমর, বয়স তোমার যত বাড়চে, রূপও কি ততই বাড়চে?"

উঠিয়া-আসিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের কাণের কাছে মুখ আনিয়া অস্ফুট স্বরে কহিল—"রূপ বাড়ে-নি গো, বেড়েছে তোমার—ভালবাসা।"

ভ্রমর ঘরের ভিতর হইতে পাণের বাটা আনিয়া পাণ সাজিতে বসিল। রায়সাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টি সমভাবেই ভ্রমরের মুখের উপর আবদ্ধ। নিজের মনে তিনি কহিলেন,—"পরিপূর্ণ—ভরা নদী! প্রথম-জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস এ সৌন্দর্য্য পাবে কোথা!"

"তোমার ভাব লেগেচে; ঠিকই ভাব লেগেচে! একটু বেশী কোরে চুণ দিয়ে একটা পাণ সেজে দি, খাও; ভাব-লাগা সেরে যাবে।" বলিয়া ভ্রমর একটা সাজা-পাণ রায়-সাহেবের মুখের মধ্যে আদরে ও সোহাগে গুঁজিয়া দিল।

রায়সাহেব গভীর তৃপ্তিতে পাণ চিবাইতে চিবাইতে কহিলেন,—"ভোমর, তোমায় আমি দু'টো বর দেব'; কি চাও বল।"

হাসিতে হাসিতে ভ্রমর কহিল—"আমার ত একটা ছেলে নেই যে, তাকে রাজ-সিংহাসনে বসাতে বোল্‌বো; আর সতীন-পোও নেই যে, তাকে বনবাসে পাঠাতে বোল্‌বো।"

"সত্যি বলচি ভোমর, তুমি কি চাও বল—আমি দেবো।"

"ঠিকই দেবে?"

"ঠিকই।"

"সত্যি-ই-ই?"

"সত্যিই।"

"তা হোলে এই দাও যে, তোমাকে যে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তা বাসতে দিও।"

প্রবল আনন্দের স্রোতকে সামলাইয়া লইয়া রায়সাহেব কহিলেন—"এ ত গেল একটা; আর একটা?"

"আর একটা? বোলবো?—ঠিক দেবে ত?"

"ঠিক দোবো।"

সহাস্য মুখে, দুই হাত দিয়া রায়সাহেবের গলা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মুখখানাকে নিজের মুখের কাছে আনিয়া ভ্রমর কাণে কাণে কি বলিল। রায়সাহেব কহিলেন—"দোবো ভোমর, ঠিকই দোবো। তোমার জন্যেই আমার সব। এই মাসের মধ্যেই আমি তোমাকে মোটর একখানা কিনে দোবো।"

ভ্রমর চায়ের জন্য ষ্টোভ ধরাইতে উঠিয়া গেল।

৩

মোটর কেনা হইয়াছে। সুন্দর একখানি মোটর। ভ্রমরই পছন্দ করিয়া লইয়াছে।

রাস্তার দিকে খানিকটা ফাঁকা জমী পড়িয়াছিল, তাহারি এক পার্শ্বে গ্যারেজ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে।

সকালে রায়সাহেব বিষ্টুকে লইয়া বাজারে গেলে, রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে ভ্রমরের বহুক্ষণ ধরিয়া চুপি চুপি কি-সব কথা-বার্ত্তা এবং পরামর্শ হইল। রায়সাহেব বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে, রাজমিস্ত্রী কহিল—"একধারে গ্যারেজ বানালে, রাস্তার টানে বরাবর রেলিং বসিয়ে ফটক না করলে, বাড়ীর খোল্‌তাই হবে না বাবু।"

রায়সাহেব কথাটাকে আমলই দিলেন না। বলিলেন—"খোলতাই-এর আর দরকার নেই, কাজ চল্লেই হোল।"

ভ্রমর দেখিল, কোন-কিছু প্রস্তাবের পক্ষে উপযুক্ত সময় এখন নয়। সকালে ভ্রমর মাথা ঘসিয়াছিল। বৈকালে সেই হাল্‌কা, ঝর্‌-ঝরে, পরিচ্ছন্ন কেশদামে সামান্য-কিছু গন্ধ-তৈল মাখাইয়া, বহুকাল পরে ভ্রমর অতি সূক্ষ্ম সোণালী-জরি দিয়া সযত্নে বেণী রচনা করিয়া পৃষ্ঠে দোলাইয়া দিল। তাহার পর সাবান দিয়া গা ধুইয়া আসিয়া একখানা সুদৃশ্য চেক্‌-নীলাম্বরী সাড়ী বাহির করিয়া পরিল। কপালে একটি ভাটিয়া-টিপ এবং পায়ে আল্‌তা লাগাইল। পুরাতন কাণের টপ দুইটি খুলিয়া তৎস্থানে পিতৃদত্ত পান্নার দুল দুইটি দোলাইল। সাজ-সজ্জা শেষ করিয়া আরসীর সামনে দাঁড়াইয়া ভ্রমর নানাভাবে একবার নিজেকে দেখিয়া লইল। তাহার পর ষ্টোভ জ্বালাইয়া চা প্রস্তুত করিয়া চায়ের বাটি-হাতে রায়সাহেবের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, তিনি নিমীলিত-নেত্রে অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় তাকিয়ায় দেহ-ভার ন্যস্ত করিয়া কথঞ্চিৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন।

মেজের উপর চায়ের বাটি রাখিয়া, স্বামীর সম্মুখে হাঁটু-গাড়িয়া বসিয়া ভ্রমর তাঁহার কাঁধ দুইটিতে মৃদু নাড়া দিয়া কহিল—"ঘুমুচ্ছ! চা এনেছি যে।"

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া-পড়িয়া রায়সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন। ভ্রমরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এ কি! আজ এ কি রূপ!"

"আজ নব রূপ। চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।" বলিয়া ভ্রমর চায়ের কাপটা রায়সাহেবের হাতে তুলিয়া দিল।

হাতের চা রায়সাহেবের হাতেই রহিল; কহিলেন—"এ-বয়সে এ-রকম সাজ সকলকে মানায় না, কিন্তু তোমাকে যে কত সুন্দর দেখাচ্ছে ভোমর, তা আর কি বোলবো!"

"পরে বোলো এখন; চা-টা আগে খেয়ে নাও; আমি তামাক সেজে আনি।"

ব্যস্ত হইয়া রায়সাহেব বলিলেন—"কর কি! এই রূপ নিয়ে তুমি সাজবে তামাক! বেটাকে সাজতে বলো।"

"তোমার তামাক সাজতে পেলে, এ রূপ আমার

সার্থক হবে”—বলিয়া ভ্রমর বাহির হইয়া গেল, ও কিছু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ফুঁ দেওয়ার ফলে ভ্রমরের মুখ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল এবং সেই মুখের উপর আগুনের আভা আসিয়া পড়িতে লাগিল।

রায়সাহেব বলিলেন—“কি সুন্দর, ভোমর, কি সুন্দর! এটা যদি রাতের অন্ধকারে হোত, তা হ’লে এ-সৌন্দর্য্য হাজার গুণ ফুটে উঠ্‌তো।”

গড়গড়ার উপর কলিকাটা বসাইয়া দিয়া ভ্রমর কহিল —“চাকরী ছেড়ে দিয়ে তোমার দেখছি মাথার দোষ ঘট্‌বার উপক্রম হ’ল।”

“তুমি বোসো ভোমর, বোসো; এখন ত আর কোন কাজ নেই। আমার কাছে খানিক বোসে থাকো।”

“দাঁড়াও, বসচি”—বলিয়া ভ্রমর বাহির হইয়া গেল এবং ও-ঘর হইতে একটা মলিন ছেঁড়া ব্লাউজ হাতে-করিয়া আনিয়া রায়সাহেবের সম্মুখে আসিয়া বসিল; কহিল—“তুমি তামাক খাও, আমি বোসে বোসে এইটে সেলাই কোরে ফেলি।”

“কি ওটা?”

“একটা পুরোণো ব্লাউজ। পিঠের দিক্‌টায় ছিঁড়ে গেছে। সেলাই কোরে গায়ে দোবো।”

“তোমার এই সাজ-সজ্জার সঙ্গে ঐ ছেঁড়া ব্লাউজ!”

“তাতে কি; কাজ চোল্লেই হ’ল। অমন সুন্দর মোটর-গাড়ী যদি এই অ-ভব্য বাড়ীতে বে-মানান্ না হয়, তা হ’লে এই সাজ-সজ্জার সঙ্গে এ-ও বে-মানান্ হবে না।”

রায়সাহেব হাঁ করিয়া ভ্রমরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ভ্রমর কহিল—“তোমার পেট্‌টা মোটা হ’বার সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটাও কিঞ্চিৎ মোটা হ’য়েচে। বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে ভোঁতা হ’য়ে আসচে; একটু শাণ দিয়ে না নিলে আর চ’লচে না।”

“তোমার প্রেমের শাণ-চক্রেই ত আমার কায়-মন-প্রাণ”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, রসিকতাটা বেশ গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াও রায়সাহেব আর শেষ রক্ষা করিতে পারিলেন না; শুধু হি হি শব্দে খানিক হাস্যরস ঢালিয়া কহিলেন—“তা হ’লে আমায় নিয়ে তোমার মুস্কিল হ’লো দেখচি; হ্যাঁগা ভ্রমরবালা?”

“মুস্কিল কিছুই নয়। একটু পড়িয়ে-শুনিয়ে নিতে হবে আর কি; কষ্ট কোরে আমাকে দিন-কতক মাষ্টারী কোর্‌তে হবে।”

“তাই করো।”

“দাঁড়াও, বেত্ আনি”—বলিয়া ভ্রমর বিছানা হইতে হাত-পাখাটা তুলিয়া লইয়া কহিল—“আপাততঃ বেতের বদলে পাখার বাঁটের দ্বারাই কাজ চ’ল্‌তে থাকুক।”

রায়সাহেব তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় গড়-গড়ার নল টানিতেছিলেন আর দারুণ গ্রীষ্মজনিত উত্তাপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিতেছিল। ভ্রমর সম্মুখে বসিয়া পাখার দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে তাঁহার মাষ্টারী সুরু করিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া বাতাস করিতে করিতে ভ্রমর পাঠদান করিল আর ছাত্র তামাক টানিতে টানিতে পাঠগ্রহণ করিল। এই পাঠদান ও পাঠগ্রহণের ফলে ইহাই স্থির হইল যে, রাস্তার টানে বরাবর রেলিং বসানো হইবে, মধ্যে লোহার ফটক হইবে। বাহিরের দিকের জানালা-দরজাগুলির বেশীর ভাগই খুলিয়া ফেলিয়া হাল-ফ্যাসানের লাগাইতে হইবে; উপর ও নীচের দালানে মার্ব্বেল পাথর দেওয়া হইবে। এ-সব ছাড়া তেতালায় এক কোণে রাস্তার দিকে একটা ছোট গোলাকার ঘর তৈয়ার হইবে, যাহার মাথাটা হইবে গম্বুজের মত গোল। বলা বাহুল্য যে, সমস্ত কাজের পর, সমস্ত বাড়ী চুণ-কাম ও রং-কাম হইবে।

ভ্রমর বলিল—“বাইরের দেওয়ালে কি রং দেবে? সাদা চুণকাম?”

রায়সাহেব কহিলেন—“না না, গোলাপী কি হলদে।”

“রাম-রাম! বাইরেটায় সব সবুজ রং হবে।”

জোড়-হাতে বিষ্টুচরণ আসিয়া কহিল—“মা!”

ভ্রমর কহিল—“কি রে বিষ্টু?”

“বলচি কি মা, এমন রাজ-পরিসদ্ বাড়ী হবে, ফটকে বাবুর নাম নেকা থাকবে না? সেটা মা নিক্‌তেই হবে। আমার তা’হলে কি কাজ থাকবে? আমি যে রোজ ভিজে গামচা দিয়ে তা পরিষ্কার করব মা!”

কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে। ভ্রমর কহিল—“ঠিক বলিচিস্ বিষ্টু। বিষ্টুর আমাদের বুদ্ধি খুব সুরুখখু। সত্যি, তোমার নামের ট্যাবলেট্ একখানা মারতে হবে।”

রায়সাহেব কহিলেন—"শুধু আমার নয়; তোমার আমার দু'জনের নাম একসঙ্গে থাকবে।"

"পাগল আর কি! ভালোবাসা পাথরের গায়ে ঐ-রকম ছড়ালে, সব যে গড়িয়ে রাস্তায় প'ড়ে যাবে।"

অতএব স্থির হইল, দুই পাশে দুইখানি ট্যাবলেট্ বসিবে। একখানিতে লেখা থাকিবে—'ভ্রমর-ভিলা'; অপর খানায় থাকিবে—'রায়সাহেব নসীরাম সান্ন্যাল'।

৪

দুই মাস পরের কথা।

নব-কলেবরপ্রাপ্ত 'ভ্রমর-ভিলা' সৌন্দর্য্যে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। কিন্তু রায়সাহেবের শরীর ভাল নয়। তিনি যেন বড্ডই মন-মরা। তাঁহার আহার কমিয়াছে, ঘুম কমিয়াছে। সর্ব্বদাই যেন একটা চিন্তায় মগ্ন থাকেন আর মধ্যে মধ্যে কাগজ পেন্‌সিল লইয়া কি সব হিসাব করেন।

ভ্রমর কহিল—"আমার মাষ্টারীর ফলে কিন্তু তোমার লেখাপড়ায় চাড় বেড়েচে। দিন-রাতই ত দেখি অঙ্ক কষচো।"

একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া রায়সাহের কহিলেন—"দশটি হাজার গেল ভোমর!"

"কিসের দশটি হাজার?"

"এই তোমার গিয়ে, মোটর কেনা থেকে আরম্ভ কোরে গ্যারেজ, ফটক, বাড়ী-মেরামত, গম্বুজ-ঘর—সব নিয়ে। দশ হাজার All ready গেছে, তবু এখনো ফার্ণিচারের সব—দাম শোধ হয়নি।"

"টাকা থাকলেই খরচ হয়। কি-বাড়ী ছিল আর কি হোয়েচে দেখ দেখি। কোথায় এর জন্যে মনে আহ্লাদ করবে, না—মন গুমিয়ে দিনরাত খালি বোসে থাক! মনের আনন্দে আমার অম্বলের অসুখ সেরে গেল আর তোমাকে যে দেখছি অসুখে ধোরলো। খাওয়া ত তোমার একেবারেই গিয়েছে।"

"আহারটা কমেছে সেটা ভালই হোয়েচে। খাওয়া বেশী—মানেই বেশী খরচ।"

"নাঃ, তোমার সঙ্গে আর আমি পারলুম না।" ভ্রমর রাগ করিয়া ও-ঘরের নতুন সোফাখানার উপর গিয়া বসিল। রায়সাহেব পিছু-পিছু আসিয়া সম্মুখের একখানা চেয়ার-এ বসিয়া-পড়িয়া কহিলেন—"তুমি রাগ করলে ভোমর?"

"আমার পাশে এসে বোসো; তবে তোমার কথার জবাব দোবো।"

সোফার উপর ভ্রমরের পাশে গিয়া বসিলে, ভ্রমর তাঁহার হাতখানা নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—"তোমার ওপর—কি কখনো রাগ করতে পারি? মানুষের বাঁচা-মরার কথা ত বলা যায় না; কবে হয় ত টপ করে মরে যাব। যে কটা দিন আছি, সিঁথেয় সিঁদুর পরে, তোমার সেবা কোরে সুখে-আনন্দে কাটাতে পাল্লেই বাঁচি।"

রায়সাহেব কাতর হইয়া কহিলেন—"অমন অ-লক্ষুণে কথা মুখে এনো না ভ্রমর! তুমি গেলে কি আমি থাকবো মনে কর? সব পুড়িয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী সেজে লোটা-কম্বল নিয়ে তা হোলে হিমালয়ে চলে যাব। আমার আগেও কেউ কেউ গিয়েছিল কি না কেতাবে পড়নি? তোমার জন্যেই ত সব।"

"তবে মন-খারাপ কর কেন? টাকা-পয়সা ক'দিনের জন্যে? কিন্তু তুমি-আমি যে চিরদিনের—চিরকালের—জন্ম-জন্মান্তরের। মন-খারাপ কোরে থাকতে আছে কি? বাবা বোলেছিলেন, ঠিকুজিতে আমার এই ৪১ বছর বয়সে—"

একটু যেন আশ্চর্য্য হইয়া রায়সাহেব কহিলেন—"বয়স তোমার ৪১ বছর হ'ল?"

"তা হ'ল বৈকি। তোমার চেয়ে ত আমি আট বছরের ছোট। তবে আমার আঁট-সাঁট গড়নের জন্য কেউ বয়স ঠাওরাতে পারে না। তাই আমার বেণী ঝোলানও খাটে, নীলাম্বরী পরাও সাজে। সবাই মনে করে, বয়স আমার সাতাশ কি আটাশ। তোমারও অনেকটা তাই।"

"আমাকে কি উনপঞ্চাশের মত দেখায় না?"

"না। তোমার মত সুন্দর চেহারা ক'টা বেটা-ছেলের আছে। যেমন চোখ, তেমনি নাক, তেমনি কপাল, তেমনি—"

"কপাল নিশ্চয়ই ভালো; নইলে তোমার মত এমন ভ্রমরকে পেয়েছি।"

"তোমার মাথার টাকটা যদি একটু ছোট হোত, আর ভুঁড়িটা যদি অন্ততঃ আর্দ্ধেক হোত, তা হ'লে ত তোমার মত—যা'ক, যা বলছিলুম, আমার এই ৪১ বছর বয়সে নাকি একটা ফাঁড়া আছে। তা তার জন্যে—"

বাধা দিয়া, একটু ভীত হইয়া রায়সাহেব কহিলেন—"ফাঁড়া! তোমার?"

"হ্যাঁ। তা' সেই জন্যেই ত এটা-ওটা নিয়ে আমোদে-আহ্লাদে থাকি। গান গাইতে জানি না, তবু মনের আনন্দে গুন্-গুন্ কোরে যখন-তখনই গুঞ্জন করি।"

"ভ্রমর—গুন্-গুন্ ত করবেই।"

"ঐ ওদের বাড়ীর 'রেডিও'তে দিন-রাত্তিরই ত গান হোচ্চে, তাই শুনি আর মনটায় ভারি আরাম পাই। তা, এতটা দূর থেকে কি ছাই আর শোনা যায়! তবুও বারান্দার ঐ কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে—"

"দাঁড়িয়ে থেকে—?"

"ঐ 'রেডিও'রই একটা গানের মত—'আমি কাণ পেতে রই—আমি কাণ পেতে রই! ও আমার আপন হৃদয়-গহন-দ্বারে—"

"ঐ গানটাই ত গুন্-গুন্ কোরে তুমি প্রায়ই গাও—'ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগী, নিভৃত-নীর-পদ্ম লাগি'—তাই না? দেখো, যেন কোন দিন তুমি বিবাগী হোয়ে চোলে গিয়ে আমায় প্রাণে মেরো না।—গানটা তার পর কি?"

"কি জানি ছাই! ঐ যে বললুম, শুনতে এত ভালবাসি, তা এত দূর থেকে কি আর ভাল শোনা যায়! রেডিওর গান শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। তখন আমার ফাঁড়া-টাঁড়ার কথা কিচ্ছু আর মনে থাকে না।"

সোজা হইয়া গা-ঝাড়া দিয়া বসিয়া রায়সাহেব কহিলেন—"মনে রেখোও না। আমি এই ঘরে তোমার জন্যে ভাল রেডিও-সেট্ বসিয়ে দোবো ভোমর। তোমার সুখের জন্যেই আমার সব। এই হপ্তার ভেতরই আমি——"

ভ্রমর বাধা দিয়া বলিল—"না না, ও-সব এখন থাক্; ওর চেয়ে বরং যেটা বেশী দরকারী—তার মানে, 'টেলি-ফোন'টা নিলে খুবই ভাল হয়। একটা রায়সাহেবের বাড়ী ত; 'টেলিফোন্' না থাকলে যেন——তুমি বোসো; এক কলকে তামাক সেজে নিয়ে আসি।"—বলিয়া ভ্রমর উঠিয়া দাঁড়াইল।

রায়সাহেব ভ্রমরের হাত ধরিয়া, মরিয়া-হইয়া কহিলেন—'রেডিও' 'টেলিফোঁ'—দুই-ই আমি এনে ফেলচি। তোমার সুখের জন্যেই আমার—। তুমি বোসো ভোমর।"

তথাপি ভ্রমর এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

৫

ভ্রমরের শয়নঘরে অপরাহ্নবেলায় 'রেডিও'তে কিসের একটা বক্তৃতা হইতেছিল। কি একটা সেলাই করিতে করিতে ভ্রমর তাহা শুনিতেছিল—

'......তথাপি ভারতের মনীষিগণ ভারতের নারী-কেই শ্রেষ্ঠ আসন দান করিয়াছেন। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, পুরুষের অপেক্ষা, উদারতায় নারী-হৃদয় হীনতর হইলেও, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষকে পরাজিত করিয়াছে। সুতরং দেখা যাইতেছে——'

ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং—

ভ্রমর তাড়াতাড়ি দালানে আসিয়া টেলিফোনের রিসিভার হাতে তুলিয়া লইল।

—"হাল্লো; কে আপনি?...আমি হ্যাঁ, আমি ভ্রমর। খোঁড়া হয়নি ভাই; খোঁড়া হোলে যাওয়া আট্‌কাতো না; মোটর ত আর খোঁড়া হয়নি।......কি আর বোলবো, যা' বলো তাই।......এসো; না এলে দুঃখিত হব।......নিশ্চয়ই; আমার মাথার দিব্যি থাকলো।......হাঃ হাঃ হাঃ! সে-কথা তোমাদেরই খাটে; আমরা ত এখন বুড়ীর দলে।......ঘুমুচ্চেন।......মনে যদি করি, ঘরের ভাত না হয় বেশী করেই খাব।......আচ্ছা।...আচ্ছা, আচ্ছা।"

রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া সেলাই-এর কাজটা হাতে লইয়া বসিতেই, বিষ্টুচরণ ব্যস্ত ভাবে আসিয়া কহিল—"মা, বাবু নেই!"

"নেই মানে?"

"বাবুকে কোথাও পাচ্চি না যে।"

"ও-ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্চেন না?"

"না।"

"তা হ'লে অন্য কোন ঘরে ত্থাখ গিয়ে।"

"সব ঘর দেখেছি মা, কোথাও নেই তিনি।"

"নীচেও নেই।"

"না।"

"তা হ'লে বোধ হয় পাইখানায় গেছেন।"

"সব দেখেচি মা।"

"তা হ'লে কি বাইরে—কোথাও গেলেন ?"

"সদর দরজা ত ভেতর থেকে খিল দোয়া রয়েচে।"

তখন ভ্রমর উপরের ও নীচের সব ঘর দেখিল। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বৈঠকখানা, সিঁড়ীর নীচে, আশে-পাশে, তক্তাপোষের তলায়, খাটের নীচে, কয়লা-রাখার জায়গায়, ঘুঁটের মাচায়, দেরাজের পিছনে—তন্ন-তন্ন করিয়া কোনওখানে আর খুঁজিবার বাকী রহিল না! কিন্তু রায়সাহেবকে পাওয়া গেল না। ভ্রমর একটু ভীত হইয়া পড়িল। বিষ্টুকে, বামুনঠাকুরকে, ননীর-মা ঝিকে এবং 'সোফার'কে চারি দিকে সন্ধানের জন্য পাঠানো হইল।

পাঠাইয়া, ভ্রমর ছাদের উপরটা দেখিবার অভিপ্রায়ে তে-তালায় আসিল। আসিয়া দেখিল—অদ্ভুত ব্যাপার! গম্বুজ-ঘরের ভিতর মাল-কোঁচা আঁটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম-দেহে রায়সাহেব দাঁড়াইয়া হাঁপাইতেছেন।

ভ্রমর চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল—"এ কি ব্যাপার ?"

"একটু ডন্ দিচ্ছিলুম। তুমি সে-দিন ভুঁড়ি কমাবার কথা বোল্লে, তাই—"

প্রবল একটা হাসির উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ভ্রমর মুখে আঁচল চাপিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

"পারি না ভোমর; দেহটা একটু ভারি কিনা, হাঁপিয়ে যাই"—বলিয়া রায়সাহেব মাল-কোঁচা খুলিয়া ফেলিলেন। ভ্রমর কহিল—"বুক আর পেট ত ধুলোয় একেবারে ধূসরিত!" আঁচল দিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের ধুলো ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল—"বুকের এখানটা ছোড়ে গেল কি কোরে ?"

"ঐ যে বললুম, পারি না আর; কব্জিতে ভর রাখতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিলুম; ঐখানটায় ধ্যাসড়ানী লেগে—"

"নাঃ, তোমাকে নিয়ে আমার মরণ! ইস্! অনেকটা ছড়ে গিয়েছে। চলো, একটু টিঞ্চার আইডিন দিয়ে দিই-গে"—বলিয়া ভ্রমর রায়সাহেবের হাত ধরিয়া দোতালায় নামিয়া আসিল।

পরদিন রায়সাহেব তাঁহার বুকে ও পেটে একটা ব্যথা অনুভব করিলেন। ভ্রমর কহিল—"ঐ ডন্ দেবার জন্য হোয়েচে। বিষ্টু বেশ ভাল ক'রে তেল মালিস কোরে দিক। আর না হয় নেপেন ডাক্তারকে একবার ডেকে আসুক।"

নেপেন ডাক্তার আসিয়া রায়সাহেবকে দেখিলেন; কহিলেন—"ও কিছু নয়; একটু সরসের তেল গরম কোরে মালিস করলেই যাবে'খন। ক্খিধে-টিধে, ঘুম-টুম বেশ হয় ত ?"

রায়সাহেব বলিলেন—"না। ক্খিধেও নেই, ঘুমও নেই, মাঝে মাঝে বুকটা যেন খালি-খালি ঠেকে।"

"কোন-কিছু বেশী ভাবেন কি ?"

"না—তা—এমন বিশেষ কিছু—"

বাধা দিয়া ভ্রমর কহিল—"হ্যাঁ, ভাবেন বই কি। বারণ কোল্লেও শুনবেন না।"

নেপেন ডাক্তার আবার রায়সাহেবের বুক প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"বিশেষ কিছু ত পাচ্চি না। তবে খুব weak। একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্চি, সেইটে দু'বেলা খাবার পর খাবেন। আর কোলকাতা ছেড়ে দিন-কতক যদি একটু ফাঁকায় গিয়ে থাকবার সুবিধে হয়, তা হ'লে খুবই ভাল হয়। বেশী দূরে নয়, এই কাছাকাছি কোথাও—বরানগর, দম-দম, বারাকপুর, কি বেহালার ঐদিকে। কোলকাতার জলহাওয়াটা বড্ড খারাপ হোয়ে উঠেছে।"

নেপেন ডাক্তার চলিয়া গেলে, ভ্রমর কহিল—"এত বলি যে, টাকার জন্যে ভেবে-ভেবে মন-খারাপ কোরো না, তা ত কিছুতেই শুনবে না।"

"টাকার জন্যে ত ভাবি না ভোমর; তোমার কাছে আবার টাকা!"

"মুখে ত বল, কিন্তু ভেতর-ভেতর ভাবতেও ত ছাড় না।"

সহাস্য বদনে রায়সাহেব কহিলেন—"সত্যি কথা বোলবো ? বেশী ভাবি না; একটু-একটু ভাবি। তা আর ভাবব না। তুমি যখন বারণ কোচ্চো, তখন আর কিছুতেই ভাববো না—একদম্ না।"

"আমার গায়ে হাত দিয়ে বল।"

প্রফুল্লবদনে রায়সাহেব ভ্রমরের কাঁধ ধরিয়া বলিলেন—"আর ভাববো না, ভাববো না।" সঙ্গে সঙ্গে মস্তক আন্দোলন; যেন কালবৈশাখার ঝড়ে তালগাছের মাথা দুলিতে লাগিল।

ইহারই দিন দুই-চার বাদে, এক দিন ভ্রমর মোটরে করিয়া বেড়াইয়া-ফিরিয়া রায়সাহেবকে কহিল—"সব শুদ্ধু এ পর্য্যন্ত কত টাকা আমাদের খরচ হ'ল?"

রায়সাহেব একটু ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন—"সে যতই হোক্; তোমার সুখের জন্যই ত টাকা! তুমি যে সুখী হোয়েছ, মনের আনন্দে আছ, সেই আমার সব।"

স্বামীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া ভ্রমর বলিল—"তবু, কত টাকা খরচ হোয়েচে বলো না, আমার দরকার আছে।"

"তা প্রায় ১১ হাজার হবে।"

"এগারো হাজার? এ টাকাটা আমি তুলে ফেলচি। ঠিকই উঠে আসবে।"

"তুমি কোথায় গিয়েছিলে বল ত?"

"কেষ্ট ঠাকুরপোর বাড়ীতে। ঠাকুরপো ৩ কাঠা জমী কিনেছিল ও-বছর চার হাজার টাকায়, সেটা ৭২০০ টাকায় বেচে ফেল্লে। জমীর কেনা-বেচাতেই ত মোটা লাভ।"

"তা তুমি কি……"

"শোন; ১১ হাজার টাকা ঠিক তুলে ফেলবো। একটা চমৎকার বাগান-বাড়ী বিক্রী আছে বেহালায়। টাকার খ্যাঁচ্; শীগ্গীর কিনতে পাল্লে খুব সস্তায় হ'বে। বোধ হয় হাজার বারোর মধ্যেই হবে। পাঁচ বছর পরে তিন গুণ দামে বিক্রী হবে।"

"পুরোণো বিল্ডিং ত?"

"একেবারে নতুন; ঝক্-ঝক্ করচে। ঠাকুরপো যে দেখিয়ে নিয়ে এল। সাড়ে ৭ বিঘে জমীর ওপর বাগান। নীচে ওপরে ৭ কামরা ঘর, দিগ-দৌড় বারান্দা, তক্-তক্ কোচ্চে পুকুর, সান-বাঁধানো ঘাট। আর কত ফল-ফুলের গাছ! ফুল ফুটে বাগান হ'য়ে আছে যেন একেবারে নন্দন কানন।"

রায়সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

ভ্রমর তাঁহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—"এটা কিনতেই হবে। বছর পাঁচেক আমরা একটু ভোগ কোরে তারপর বেচে ফেললেই হবে। বেহালার ওদিকে ক্রমেই জায়গা-জমীর যে-রকম দাম বাড়চে, ওটা তখন ঠিক ৩০ হাজার টাকায় বিক্রী হ'বে।"

তত্রাচ রায়সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

দুই হাতে তাঁহার কাঁধ জড়াইয়া ধরিয়া ভ্রমর বলিল—"আরজির একটা রায় দাও গো রায়সাহেব, নইলে ছাড়চি-নে।"

মৃদু হাসিতে হাসিতে রায়সাহেব বলিলেন—"তোমার আনন্দের জন্যেই ত আমার সব ভোমর! তা, সেই বাগান তোমার পছন্দ হোয়েচে?"

"খু-উ-ব,—চুড়োন্তো রকম পছন্দ হোয়েচে।"

"তা হোলে কেনা হোক।"

অতঃপর ভ্রমর স্বামীর মুখ নিজের মুখের কাছে টানিয়া-আনিয়া যে কার্য্যটি করিল, ও-বয়সে কাহারও তাহা মানায় না।

যাহা হউক, তড়ি-ঘড়ি ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিয়া দিন পনেরর মধ্যেই বেহালার সেই বাগান কেনা হইয়া গেল। ভ্রমর বলিল—"ডাক্তার তোমাকে কিছুদিন বাইরে থাকবার জন্যে ব'লেছিলেন; চল, মাসখানেক বাগানে গিয়ে থাকি।

তার পর প্রথম যে-দিন বাগানে আসিয়া রায়সাহেব দোতালার দক্ষিণের বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসিয়া গড়গড়ায় ধূম পান করিতেছিলেন, তখন ভ্রমর একরাশ ফুল তুলিয়া আনিয়া কহিল—"কত সুন্দর বল ত শুনি!"

রায়সাহেব কহিলেন—"ও ত সুন্দর; আর ফুলের মাঝখানে ভ্রমর—আরও সুন্দর। আজ তোমাকে খুব চমৎকার দেখাচ্চে।"

"দেখাবেই ত; আজ যে আমি রায়সাহেবের বউ!"

বোধ হয় মানেটা রায়সাহেব ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। ভ্রমর কহিল—"বুঝতে পাচ্চ না? বাড়ী, গাড়ী রেডিও, টেলিফোঁ, কাপড়-চোপড়, গয়না-পত্তর—কিছুই ত বাকী ছিল না; কেবল বাকী ছিল—এই রকম একখানা বাগান। তা'ও হ'ল শেষে; সুতরাং আজই ত আমি যথার্থ রায়সাহেবের বউ।"

প্রফুল্ল দৃষ্টিতে রায়সাহেব ভ্রমরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু-যুদ্ধের নীতি

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে, এবং প্রলয়ের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত চলিবে। নিরবচ্ছিন্ন শান্তি জগতে সম্ভব নয়, বিধাতারও বোধ হয় তাহা অভিপ্রেত নয়; কারণ, তাহা হইলে সৃষ্টির লীলা-বৈচিত্র্য থাকে না। সর্ব্বকালেই যুদ্ধ অনিবার্য্য—অপরিহার্য্য।

আমাদের হিন্দুর পুরাণ অনুসারে সেই আদিম যুগে সুরাসুরের বিরোধ হইতে যুদ্ধের সৃষ্টি,—জ্ঞাতিবিরোধের সূত্রপাত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কোন যুগেই ইহার অবসান ঘটে নাই; সুতরাং এই ঘোর কলি যুগেও যে তাহা ঘটিবে, সে আশা দুরাশা।

ভগবান স্বয়ং বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অসুরকে সংহার করিয়াছেন। দেবতারাও অসুরদের সহিত যুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার মারণাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া শত্রু নিধন করিয়াছেন; সুতরাং যুদ্ধ অপরিত্যজ্য।

পুরাকালে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তুল্যভাবে যুদ্ধ চলিত;—এ ঘটনা প্রমাণ-প্রয়োগে প্রতিপন্ন হইলেও, বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব-পর্য্যন্তও অনেকে অমূলক বলিয়া মনে করিতেন। এখন আর এরূপ ঘটনায় সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই;—আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, নূতন নূতন মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও প্রয়োগের সহিত জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সমভাবে ভীষণ ধ্বংসলীলা চলিতেছে।

প্রাচীন কালে—হিন্দু-যুগে এই যে ক্রূর হিংসা-কর্ম্ম, ইহারও অন্তরালে অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল। তখন "মারি অরি পারি যে কৌশলে"-নীতির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। হিংসারও একটা বিধি-নির্দ্ধারিত প্রণালী বর্ত্তমান ছিল। প্রচলিত রীতি ও নীতি উল্লঙ্ঘন করিলে জনসমাজে নিন্দাভাজন হইতে হইত। তখন অবশ্য নিন্দার ভয় ছিল,—লজ্জাও ছিল; এখন আর সে বালাই নাই। নিন্দা, লজ্জায় ভ্রূক্ষেপ না করাই এখন তেজস্বীর লক্ষণ। এখন নিরীহ, নিরস্ত্র গ্রামিক, শ্রমিক ও নাগরিকের উপর অজস্র বিস্ফোরক বর্ষণ নিত্য-নিয়মিত ঘটনা,—নারীর নিস্তার নাই,—অপোগণ্ড শিশুরও অব্যাহতি নাই। বীরের ধর্ম্ম, সন্দেহ কি!

সে-কালে ছিল বলের পরীক্ষা,—এখন হইয়াছে, যন্ত্রে যন্ত্রে—অস্ত্রে অস্ত্রে বুদ্ধির লড়াই। তখন ছিল, সমানে সমানে সম্মুখ যুদ্ধ, এখন হইয়াছে অন্তরাল হইতে অলক্ষ্যে থাকিয়া অবিচারিত ভাবে অতি নিষ্ঠুর, নির্ম্মম, নৃশংস হত্যাকাণ্ড। যুদ্ধের নামে কশাইগিরি অপেক্ষাও ঘৃণিত, গর্হিত—এই নরনারী-শিশু-হত্যা।

এই যে যুদ্ধরূপ নিতান্ত নিকৃষ্ট হিংসা-কর্ম্ম, হিন্দু-যুগে ইহারও একটি সুনির্দ্দিষ্ট রীতি এবং সুপরিচালিত নীতি ছিল। রামায়ণ মহাভারতে সযত্নে অনুসন্ধান করিলে আমরা এই রীতি ও নীতির সম্যক্ পরিচয় পাই। এই অনাচার, অবিচার ও পাশবিক অত্যাচারের দ্বিধাহীন যুগে সেই রীতি ও নীতির কিঞ্চিৎ আলোচনায় হিন্দু-সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দৃঢ়মূল হইতে পারে।

পূর্ব্বতন হিন্দুদের সকল কর্ম্মই ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধের ন্যায় অতীব নিষ্ঠুরাচরণও ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। উভয় পক্ষই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কতকগুলি সাংগ্রামিক নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত দুর্ব্বিষহ কষ্ট তাঁহারা কিরূপ আনন্দের সহিত অবলীলাক্রমে সহ্য করিতেন, ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রাণ পরিত্যাগও কিরূপ তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন, কি প্রকারে সেনাপতি-নিয়োগ, সেনাবিভাগ, যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহ নির্ম্মাণ, যুদ্ধ আরম্ভ, যুদ্ধ পরিচালন কালেও নিরুদ্বেগে বিশ্রাম করিতেন এবং যুদ্ধে মৃত ও আহত ব্যক্তিদিগের কিরূপ সৎকার ও শুশ্রূষা করিতেন, তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ ও পরিচয়াদি মহাভারতের ভীষ্ম ও দ্রোণ-পর্ব্বে পাওয়া যায়।

তৎকালে যেরূপ কৌশলে ব্যূহ প্রস্তুত হইত, তাহা অতি-আধুনিক সুসভ্য য়ুরোপীয় সেনাপতিদিগের পক্ষেও অতীব বিস্ময়াবহ। মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার ব্যূহ-রচনার অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন এবং তন্নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বনে কিছুকাল পূর্ব্ব-পর্য্যন্তও য়ুরোপে ও অন্যান্য দেশে ব্যূহরচনার রীতি প্রচলিত ছিল। ঐ সমস্ত ব্যূহ-রচনার রীতি আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে

যে, ভারতবর্ষ হইতেই উহা পরিগৃহীত হইয়াছিল, এবং দেশকালানুযায়ী কোন কোন অংশ পরিবর্জ্জিত, কোন কোন অংশ পরিবর্দ্ধিত, ও কোন কোন অংশ অপরিবর্ত্তিত ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল। ফলতঃ, পূর্ব্বতন হিন্দুরাই যে ব্যূহরচনাপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এবং এ বিষয়ে সন্দেহেরও কোন কারণ লক্ষিত হয় না।

প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল বর্ণই সৈন্যশ্রেণী-ভুক্ত হইত। তাহারা একযোগে পর্ব্বত, অরণ্য, দেশ ও নদ-নদী অধিকার করিয়া বিস্তৃত মণ্ডল রচনা করিত। নৃপতিগণও সকল বর্ণকে অত্যুৎকৃষ্ট ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিতেন, এবং সংগ্রামকাল সমুপস্থিত হইলে সৈন্যগণকে অনায়াসে চিনিয়া লইবার জন্য তাহাদিগকে বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া, বিবিধ আখ্যা, অভিজ্ঞান, ও অলঙ্কার প্রদান করিতেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভকালে কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা সময়-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। তুল্য যোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও প্রতারণা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এবং আরব্ধ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলেই পুনর্ব্বার পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা ছিল।

বাক্‌যুদ্ধও সে-কালে একটা যুদ্ধের অঙ্গ ছিল। এ-কালেও মসিযুদ্ধ যুদ্ধের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। সেনাদল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কাহাকেও প্রহার করা নিষিদ্ধ ছিল। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতি সৈনিক পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুযায়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। অতর্কিত অথবা বিষম আক্রমণ-প্রথা অতীব গর্হিত ছিল। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাৎ আঘাত করিতে হইত। বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকেও আঘাত করা নিষিদ্ধ ছিল। যে ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষীণশস্ত্র, বর্ম্ম-বিরহিত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইত, তাহাকে আঘাত করিবার রীতি ছিল না। সারথি, ভারবাহক, শস্ত্রোপজীবী শস্ত্রোপজীবী, ভেরী ও শঙ্খবাদক প্রভৃতিকে কখনও আঘাত করিবার রীতি ছিল না।

ফলতঃ, প্রাচীন হিন্দুরা ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা হয় জয়, না হয় স্বর্গলাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, জিগীষুগণ সত্য, দয়া ও একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারা যে প্রকার জয়লাভ করিতে পারিতেন, বলবীর্য্য দ্বারা তাহা আয়ত্ত করা সেরূপ সম্ভব ছিল না। যদিও সকল বর্ণই যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তথাপি যুদ্ধই ক্ষত্রিয় মাত্রের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া গৃহে প্রাণত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত; শস্ত্র-ব্যবহারের ফলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই তাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। সংগ্রামই ছিল স্বর্গ-গমনের প্রশস্ত পথ। এই পথ অবলম্বন করিয়া সকল বর্ণের লোকই ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকে গমনের আশা করিতেন।

তথাপি শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক প্রার্থিত সন্ধি বা ধনদান দ্বারা ক্ষতিপূরণের ফলে জয়লাভ করা শ্রেষ্ঠ উপায়, ভেদ-নীতি সাহায্যে জয়লাভ করা মধ্যম উপায়, ও যুদ্ধ দ্বারা জয়লাভ করা নিকৃষ্ট উপায় বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইত। নিরর্থক যুদ্ধ করা অনুচিত বলিয়া গণ্য হইত। যুদ্ধ যখন অপরিহার্য্য হইত, তখন হিন্দুরাজগণ শুভদিনে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ব্বাচিত করিয়া শুভ লগ্নে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক শুভ মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করিতেন।

পূর্ব্বাহ্নের প্রারম্ভ হইতে সায়াহ্নের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিত। সূর্য্যোদয় হইলে সৈন্যগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিত এবং রাজন্যবর্গ যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদির শেষে পূজা-পাঠ, দান-ধ্যানাদি কার্য্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অরাতি সৈন্যগণ সমরোদ্যত হইলে তাহাদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে অর্জ্জুন পবিত্র ও সংগ্রামাভিমুখ হইয়া দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। এ-কালে ও-পাঠ নাই; হিটলার ত এখন খৃষ্টের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, জগৎগুরু এবং পরমেশ্বরকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য হইতে তিনি নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।

সে-যুগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয় পক্ষভুক্ত গুরুজনদিগকে অভিবাদনের রীতি ছিল। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসাবসান কালে দুর্য্যোধন মৎস্য দেশে গমন করিয়া বিরাটের অনুপস্থিতিসময়ে তাঁহার ষষ্টিসহস্র গোধন হরণ করিয়াছিলেন। একাকী অর্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে সারথি করিয়া, কৌরব-বীরগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং এইরূপে আক্রান্ত গোধনসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আত্মপ্রকাশার্থ অর্জ্জুন শর-বর্ষণে আচার্য্য দ্রোণকে প্রণিপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব শর-পরিচালনকৌশলে দুইটি তীর একযোগে আচার্য্য দ্রোণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে; এবং অপর দুইটি শর তাঁহার শ্রবণ-যুগল স্পর্শ করিয়া প্রবল বেগে অতিক্রান্ত হইলে দ্রোণাচার্য্য বুঝিয়াছিলেন, অর্জ্জুন প্রথমে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এই উপায়ে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা আচার্য্যের কর্ণগোচর করিলেন। অর্জ্জুন দ্রোণের সম্মুখীন হইয়া, রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, বিধানানুসারে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি প্রথমে আঘাত না করিলে, আপনাকে কদাচ আঘাত করিব না।" দ্রোণাচার্য্য সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। কৃপাচার্য্যের সন্নিধানে গমন করিয়াও অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

যুদ্ধান্তে কুরুবীরগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া অর্জ্জুন বিচিত্র শরসন্ধানে পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও অন্য পূজ্য কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া দুর্য্যোধনের মহার্ঘ্য মুকুট ছেদন করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির উভয় পক্ষের সাগরতুল্য বিশাল সৈন্যগণকে সংগ্রামে সমুদ্যত দেখিয়া কবচ ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি, সংযতবাক্ ও পূর্ব্বমুখীন হইয়া, শত্রুসৈন্যমধ্যস্থ পিতামহ ভীষ্মের সমীপে পদব্রজে গমন করিয়া, তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অনুমতি ও জয়াশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তার পর পর্য্যায়ক্রমে গুরু দ্রোণ, আচার্য্য কৃপাচার্য্য, এবং মাতুল শল্যকে যথাবিধি অভিবাদন পূর্ব্বক অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশেষে রিপুসৈন্যমধ্যে যে-কেহ তাঁহার হিতসাধনে অভিলাষী তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং এই আমন্ত্রণের ফলে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র যুযুৎসু তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

ভগবান্ তপনদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে এবং যোদ্ধৃবর্গকে শ্রান্ত ও ভীত দেখিলেই উভয়পক্ষীয় সেনাপতিগণ সৈন্যগণকে বিশ্রামের আদেশ প্রদান করিতেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিশাকালে প্রথমে একত্র মিলিত হইয়া, পরে স্ব স্ব শিবিরে প্রতিগমন পূর্ব্বক, পরস্পর যথাবিহিত সম্মান-প্রদর্শন, শূরগণের রক্ষা, যথা-বিধি গুল্ম সংস্থাপন, গাত্রের শল্য অপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান করিয়া গীত-বাদ্যাদি দ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের স্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ স্তব করিতেন। প্রধান প্রধান সেনাপতি ও নরপতি ব্যতীত বীরপুরুষগণ কেহ তখন অকারণ যুদ্ধ-বিষয়ক কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেন না। ক্ষণকাল এইরূপ আমোদ-প্রমোদ করিয়া হস্ত্যশ্ব সকল প্রসুপ্ত হইলে, উভয়পক্ষীয় বীরপুরুষগণ নিদ্রাসুখে রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতেন।

সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রদীপে সমুজ্জ্বল শিবিরমধ্যে উভয়-পক্ষীয় সৈন্য ও বাহনাদি একান্ত বিশ্বস্তভাবে রাত্রিযাপন করিত। বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অতর্কিত আক্রমণের কল্পনাকে কেহই মনে স্থান দিতেন না। এমন কি, আহারের পর যুদ্ধক্ষেত্রেও যখন তাঁহারা শ্রান্তি অপনোদনার্থ ক্ষণকাল অবস্থান করিতেন, তখনও কেহ কাহারও প্রতি বৈরিভাব প্রকাশ করিতেন না। কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যু-বধের পরদিন জয়দ্রথ-বধ হয়। সে-দিন সমস্ত দিনই অতি ভীষণ যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের চিত্ত সে-দিন এরূপ বিভ্রান্ত ছিল, এবং প্রতিহিংসা-প্রদীপ্ত যুদ্ধোদ্যম এতাদৃশ প্রবল ছিল যে, যামিনীর অধিকাংশ ভাগেও সে-দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল। সেই ঘোর রজনীতে মহাবীর কর্ণ বাসব-প্রদত্ত এক অমোঘাস্ত্র দ্বারা রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে বধ করিয়া অর্জ্জুনবধের একমাত্র উপায় বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই প্রাণনাশিনী ত্রিযামার মধ্যভাগে সৈন্যগণ ক্ষত-বিক্ষত ও বধ্যমান হইলে উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গকে বাহনগণের সহিত অন্ধকার ও ধূলিপটলে সমাবৃত এবং নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ অবলোকন করিয়া মহামতি অর্জ্জুন তাহাদিগকে কিয়ৎক্ষণ সমরে নিবৃত্ত হইয়া সেই রণভূমিতেই নিদ্রা যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। ক্রূরকর্ম্মা কৌরবনাথ দুর্য্যোধনও সৈন্যগণকে বিশ্রামের আদেশ দিয়াছিলেন। সৈন্যগণ নিদ্রান্ধ হইয়া

নিশ্চেষ্টভাবে কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথোপরি, কেহ কেহ ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়াছিলেন। অনেকে বাণ, গদা, খড়্গ, পরশু, প্রাস ও কবচ ধারণ করিয়াই পৃথক্ পৃথক্ স্থানে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। এইরূপে সেই সংগ্রাম-স্থলে অশ্ব, হস্তী ও যোধগণ নিতান্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত ও যুদ্ধে বিরত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে, বিশ্বস্ত ভাবে, নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। সেই বিরামকালে কোন পক্ষ অপর পক্ষের প্রতি ক্রূর দৃষ্টিপাতমাত্রও করেন নাই।

অনন্তর নিশানাথ সমুদিত হইলে, যখন ত্রিযামার এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট ছিল, সেই সময় কৌরব ও পাণ্ডবগণ পুনরায় হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আবার সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই উভয়পক্ষীয় যোধগণ রথ, অশ্ব, গজ ও নরযান সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দিবাকরের অভিমুখে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন পূর্ব্বক পুনরায় ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

সর্ব্বকালের সমগ্র জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃশ্য ও দৃষ্টান্ত অদ্বিতীয়।

কিরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত জয়, অথবা মৃত্যুপণ করিয়া প্রাচীন হিন্দুরা যুদ্ধ করিতেন, তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায় মহাভারতের সংশপ্তকবধ পর্ব্বে।

দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি-পদে বৃত হইয়া দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কি প্রিয়কার্য্য তিনি সাধন করিবেন? কুরুরাজ রথিশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার অভিলাষ জানাইয়াছিলেন। আচার্য্য দ্রোণ দুর্য্যোধনের কুটিল অভিপ্রায় অবগত হইয়া সীমাবদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—যদি বীর্য্যশালী অর্জ্জুন সংগ্রামস্থলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলেই তিনি কুরুরাজের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

শ্রীমান্ অর্জ্জুনের নিয়ম ছিল, কোন বীর তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে তিনি তাহাকে পরাজয় না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন না। অমিত-পরাক্রম অর্জ্জুনকে অপসারিত করিয়া, যুধিষ্ঠির হইতে দূরে অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখিবার নিমিত্ত তাঁহার চিরবৈরী ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া রণক্ষেত্রের বহির্ভাগে তাঁহাকে সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। পঞ্চ ভ্রাতা ও পাঁচ অযুত রথ ও তদুপযোগী সৈন্য-সামন্ত এবং যুদ্ধসম্ভার লইয়া, অতি কঠোর শপথ গ্রহণের পর তিনি এই অসমসাহসিক কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সকলে হুতাশন আনয়ন ও পৃথক্ পৃথক স্থানে স্থাপিত করিয়া কুশচীর ও বিচিত্র কবচ ধারণ করিলেন, এবং পৃথক পৃথক্ নিষ্ক, ধেনু ও বস্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন, পরস্পর সম্ভাষণ ও সমরব্রত ধারণ পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। পরে তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে সেই হুতাশন স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনবধে প্রতিজ্ঞা করতঃ শপথ করিলেন, যদি তাঁহারা অর্জ্জুনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হন, অথবা তাঁহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে গোহন্তা, ব্রহ্মঘাতক, মিথ্যাবাদী, মদ্যপায়ী, অর্থিঘাতী, গৃহদাহী প্রভৃতি পাপানুষ্ঠানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের জন্য যে লোকের ব্যবস্থা আছে, তাহাই প্রাপ্ত হইবেন।

এইরূপে সেই অকুতোভয় বীরগণ অতি কঠোর শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক অমিত-বিক্রম অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া স্বেচ্ছায় শূরের ন্যায় নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন।

জীবিত-নিরপেক্ষ, যশ ও বিজয়লাভার্থী হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ করাই ছিল তখন সনাতন নিয়ম। কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত, কিন্তু সেরূপ ব্যতিক্রম সর্ব্বথা নিন্দনীয় ছিল। কেহই তাহার প্রশংসা বা সমর্থন করিতেন না।

যুদ্ধে প্রয়োজনানুযায়ী, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া, বলের সহিত ছল ও কলের সহিত কৌশল প্রয়োগ এ-কালেও যেমন, সে-কালেও তেমনি অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য ছিল। উপায় সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। দেবরাজ উপায়-বলেই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়া স্বর্গরাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন।

কৌশল প্রভাবেই বলিরাজা বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের বধসাধন হইয়াছিল। ত্রেতা-যুগে শ্রীরামচন্দ্র উপায়-প্রভাবেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছিলেন। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের উপায়-প্রভাবেই মহাবল-পরাক্রান্ত বিপ্রচিত্তি ও তারকাসুর নিপাতিত হইয়াছিল। উপায়-প্রভাবেই বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ নিহত হইয়াছিল।

ক্ষেত্রবিশেষে কূট-যুদ্ধেরও ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ

প্রসিদ্ধি আছে যে, শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগকে কূট-যুদ্ধে বিনাশ করিবে। সুরগণ কূট-যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরবৃন্দকে নিহত করিয়াছিলেন।

চিত্র যোধীর সহিত মায়াযুদ্ধের বিধান ছিল। শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধের বিবরণ লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বুধগণ নীতিতে ঐ সমুদয় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

প্রসুপ্ত, ন্যস্তশস্ত্র, রথহীন, বাহনবিহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বধ করা তখন নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ ছিল। তথাপি কোন কোন তত্ত্বদর্শী ধার্ম্মিক কহিয়া গিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্রবিদীর্ণ, নায়কহীন, অর্দ্ধরাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে বিনাশ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য। এ নীতি দুর্নীতি। প্রাচীন হিন্দুদিগের শাস্ত্রসম্মত নিয়ম ছিল যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কদাচ শস্ত্রপ্রয়োগ করিবে না।

হিন্দুদিগের প্রতি কর্ম্মের মূলে ধর্ম্মের অবলম্বন ছিল। যুদ্ধ যে এমন নৃশংস হিংসামূলক হত্যাকাণ্ড, তাহাতেও প্রাচীন হিন্দূদের একটি ন্যায়ানুগত রীতি এবং ধর্ম্মানুগত নীতি নির্দ্ধারিত ছিল, এবং তদনুসরণে তাঁহারা সতত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ, তাঁহাদের আদর্শ অতি উচ্চ—অতি উদার—অতি মহান্ ছিল। এইখানেই হিন্দু-সভ্যতার উৎকর্ষ। কিন্তু এ-কালে পাশ্চাত্য সমাজে তাহা মূঢ়তা বলিয়াই বিবেচিত, সুতরাং তাঁহাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষার যোগ্য; কারণ, 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।'

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্নেহময়ী

ভাবিয়া পাইনে আমি কূল রে,
ভালবাসা সত্য অতুল রে।
কার স্নেহ কার প্রীতি
সজ্জিত করে নিতি?
সাগর ভূধর তৃণ ফল রে!

এ কি সুধা-সুন্দর দৃষ্টি,
নিয়ত শোভন করে সৃষ্টি!
জীর্ণ যা খসাইয়া,
শীর্ণ যা রসাইয়া,
নিতি করি নবীনতা বৃষ্টি।

কি বিপুল কি বিশাল পৃথ্বী
সাজানই কি বিরাট কীর্ত্তি!
দৈন্য ও মলিনতা
মুছিছে দেখিছে যেথা,
সংযত করি হ্রাস বৃদ্ধি।

অতি ছোট কীট ও পতঙ্গ,
তাহারি দেহেতে কত রঙ্গ!
অলক, তিলক, দাগ,
কি পুলক, অনুরাগ
মাধুরীর মধুর তরঙ্গ।

ভাবি মনে দেখি এ সমস্ত
সাজানোর ভার কোথা ন্যস্ত।
করিয়া রেখেছে মাটী
অপরূপ পরিপাটী
রমণীর রমণীয় হস্ত।

তনয়ের রাখিতে লাবণ্য
পারে না জননী বই অন্য
তাঁহারি আদর মিঠা
দেয় অমৃতের ছিটা
করে শ্যাম শুষ্ক অরণ্য।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সুনন্দার বয়স এক এক করিয়া পঁচিশের কোঠা পার হইয়া গেল, তথাপি সে সন্তানের জননী হইতে পারিল না! পনরে বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। এই দীর্ঘ দশটা বৎসর আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া শ্বশুর কালিকাচরণের তৃষিত আশা তাঁহার অধীর বক্ষে যেন নৈরাশ্যের তিমিরে বিলীন হইল।

পুত্রবধূ বন্ধ্যা। হতাশ ভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কালিকাচরণ বলিতেন, "গোবিন্দের ইচ্ছা!"

মন কিন্তু কোন প্রবোধ বাক্যেই সান্ত্বনা মানিত না; একটা অভাবের তীব্র বেদনা তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টকের মত অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেবলই খচ্-খচ্ করিত। সর্ব্বদাই মনে হইত, আহা, জল-পিণ্ডের অধিকারবঞ্চিত বংশটা এত দিনে সত্যই লোপ পাইল! অবশেষে আর মন স্থির করিতে না পারিয়া কালিকাচরণ ব্যাকুল অন্তরের উগ্র চিন্তাধারাটা পুত্রের গোচর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কোন মহৎ কার্য্যই এক দিনে সম্পন্ন হয় না। এক দিন তাহার প্রতিষ্ঠা হইলেও বহু দিন ধরিয়াই তাহার আয়োজন চলিতে থাকে।

কালিকাচরণও তেমনি তাঁহার ইচ্ছার বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে মাটীটাকে যথানিয়মে উর্ব্বর করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক ভাল ভাল বীজও যে মাটীর দোষেই অঙ্কুরিত হয় না, কালিকাচরণ সেটা বিশেষরূপেই জানিতেন ও মানিতেন।

আভাস ইঙ্গিত কিছু দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। মানুষের ইহকাল পরকাল সম্বন্ধে অনেক বিচার-বিতর্ক তিনি বড় বড় পণ্ডিত ডাকাইয়া আরম্ভ করিয়া দিতেন। তাঁহার আদেশে একমাত্র বংশধর পুত্রকেও সেই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর বাক্-বিতণ্ডা শুনিতে হইত, —যদিও সে তাহার প্রয়োজনটা ঠিক বুঝিতে পারিত না।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে তর্কবাগীশ মহাশয় জরৎকারু মুনির উপাখ্যানটার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ইহার মধ্যে গোপন কোন ইঙ্গিত ছিল কি না তাহা তিনিই জানেন; তবে জল-পিণ্ডের অধিকারচ্যুত বংশের পিতৃগণ যে পরলোকে বসিয়া কতখানি উৎকণ্ঠিত চিত্তে সঙ্কট ভোগ করিতে থাকেন, তাহাই তিনি বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহযোগে সাড়ম্বরে বিবৃত করিলেন।

সে রাত্রে কালিকাচরণের ভাল নিদ্রা হইল না। মুদিত নয়নসমক্ষে জরৎকারুর পিতৃপুরুষগণের মত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পরলোকের বিড়ম্বনাটা দপ্‌দপ্ করিতে লাগিল।

দিন-কয়েক তিনি গম্ভীরমুখে জটিলতর ভাবনা ভাবিয়া অবশেষে পুত্রকে এক সময়ে কহিলেন, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—'

কথাটা সমাপ্ত হইতে পাইল না। বারুদস্তূপের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সমীর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পিতার আভাস-ইঙ্গিতে সমস্তই সে উপলব্ধি করিত; তথাপি পিতা বলিয়া যে শ্রদ্ধা তাঁহার একান্ত প্রাপ্য, তাহারই অনুরোধে এই অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর আলোচনাগুলা নিঃশব্দে সে সহ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। জনকের এই সুস্পষ্ট উক্তিটা আর সে কোনমতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না।

ঈষৎ রুষ্ট-মুখে, তিক্ত-কণ্ঠে সে কহিল, তাহ'লে কি করতে হবে? পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ? কিন্তু যে শাস্ত্র নিজের স্বার্থটাকেই বড় করতে শিখায়, অপরের

সুখ-দুঃখকে বুঝতে চেষ্টা করে না, তাকে আমি মানি না নয়, অত্যন্ত ঘৃণা করি।—বলিয়া সে উঠিয়া গেল।

কালিকাচরণ বিমূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। স্ত্রৈণ পুত্র এক-কথায় কিছু বিবাহে সম্মত হইবে না, অনেক বাক্-বিতণ্ডা উঠিবে; অসন্তোষের তপ্ত বাতাস বহিতে থাকিবে।

এ সকলের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু ঝড়ের মত ভীষণ-কিছু তাহার মধ্যে থাকিবে না—এটাও তিনি নিশ্চিত জানিতেন। কারণ, দালালী করিয়া তাঁহাকে লক্ষপতি হইতে হইয়াছে; কমলাকে গৃহে বন্দিনী করিতে পারিয়াছেন। নিজের ইচ্ছাটাকে কিরূপে অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া ইষ্টসিদ্ধি করিতে হয়, সেই নিগূঢ় রহস্য তাঁহার জানা আছে।

সমীর তর্ক করিল না; পিতার সম্মুখে বসিয়া দুই-একটা কথা কাটাকাটি অবধি করিল না। একেবারে দুঃসহ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কেবল যে উঠিয়া গেল, তাহাই নহে, যে শাস্ত্রানুশাসনের উপর কালিকাচরণের অবিচল নিষ্ঠা, তীব্র শ্লেষের সহিত তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াই সে প্রস্থান করিল। ইহা কালিকাচরণের বুকে অপমানের আঘাতের মত বাজিল। পুত্র যদি তাঁহার সহিত বচসা করিত, কলহ বাধাইত, তাহা হইলে বোধ করি তিনি এমন করিয়া ক্রোধে চঞ্চল হইয়া, শাসনবজ্র উত্তোলনের জন্য বদ্ধমুষ্টি হইতেন না। কালিকাচরণের মুখমণ্ডল জ্বলন্ত লৌহের ন্যায় লোহিত হইয়া উঠিল। ঘন ঘন তামাক টানিতে টানিতে তিনি দুর্বিনীত পুত্রকে সমুচিত শিক্ষাদানের চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাবণের রথে যেমন সীতার কাতর মুখচ্ছবি দেখিয়া জটায়ুর আর রথ গ্রাস করা হয় নাই, নিজের মৃত্যুকেই সে বরণ করিয়াছিল, তেমনি কালিকাচরণের উদীপ্ত চিত্ত সন্তানকে শাস্তিদানের নিমিত্ত যতবারই কঠোর হইয়া উঠিল, ততবারই একখণ্ড সজল মেঘের ন্যায় পুত্রবধু সুনন্দার মুখখানা তাহার অন্তরমধ্যে ভাসিয়া-উঠিয়া সমস্ত প্রখরতাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ছায়াস্নিগ্ধ করিতে লাগিল।

কালিকাচরণ মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিলেন। তালবৃন্তের পাখাখানা হাতে লইয়া সুনন্দা নিকটে বসিয়া শ্বশুরকে ব্যজন করিতে লাগিল। বাতাসের প্রয়োজন ছিল না; কারণ মাথার উপর বিজলী-পাখা ঘুরিতেছিল। কিন্তু শুধু-হাতে সুনন্দা বসিতে পারিত না; এবং শাশুড়ী-হীন সংসারে পিতৃতুল্য শ্বশুরের পরিচর্য্যার ভার তাহারই উপর ন্যস্ত ছিল। বধুর আন্তরিক সেবা-যত্নটুকু কালিকাচরণের একান্ত আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী ছিল।

অন্য দিন আহারে বসিয়া কালিকাচরণ বৌমার সহিত হাসি-গল্প করিতেন; সস্নেহ সম্ভাষণে নানা কথা কহিতেন; আজ কিন্তু অত্যন্ত উন্মনা হইয়া, গম্ভীর মুখে আচমন শেষ করিয়া নিঃশব্দে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্বশুরের জলদজাল-সমাচ্ছন্নবৎ আঁধার মুখের পানে চাহিয়া সুনন্দাও কোনও কথা কহিতে পারিল না: অপরাধীর মত কুণ্ঠিত ভাবে হাত-পাখাখানা দ্রুত সঞ্চালনে বাতাসটা একটু জোরে জোরে দিতে লাগিল।

কালিকাচরণ কহিলেন, থাক।

সুনন্দা পাখা নামাইল।

নীরবতার মাঝে ভোজনটা শীঘ্র শেষ হইয়া যায়। আহার প্রায় সমাধা হইয়া আসিয়াছিল; কালিকাচরণ হঠাৎ মুখ তুলিয়া-চাহিয়া কহিলেন, জান বৌমা! আমাদের হিঁদুর মেয়ের বৈশিষ্ট্য কোন্‌খানে? স্বামীর জন্য তারা যত ত্যাগস্বীকার করে, এমন আর কোন জাতির মেয়ে পারে না। পারে কি? সমীর তো মস্ত পণ্ডিত, অনেক ইতিহাস পড়েছে; তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো। আর এত দুঃখের—দুর্ভাগ্যের মধ্যেও আমাদের এই গৌরবের বস্তুটা আজও অটুট আছে—উজ্জ্বলই আছে। কেন, জান মা? বিবাহটাকে আমরা একটা জন্মের বন্ধন ধরি না; জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ ব'লেই মেনে থাকি।—সেই কথাই বলছি, মা!—বলিয়া তিনি ভোজনের অবশিষ্ট দুই-এক গ্রাস শেষ করিতে লাগিলেন।

এইটুকু সময় যে পুত্রবধূর নিকট হইতে একটা উত্তরের প্রত্যাশায় তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, সুনন্দা তাহা বুঝিল; কিন্তু মুখ দিয়া তাহার একটা শব্দও বাহির হইল না: কণ্ঠ হইতে তালু অবধি যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল! শ্বশুরের কথার অন্তরালে যে ইঙ্গিতটা ছিল, তাহার অতি প্রচ্ছন্ন আভাসেই সুনন্দার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হইয়াছিল। ললাটের স্বেদবিন্দু স্থূল মুক্তাদলের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল! অবনত-মুখেই সে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নির্ব্বাক বসিয়া রহিল।

কালিকাচরণের আহার শেষ হইয়া গেল। ভোজন-পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলিয়া তিনি আচমন করিতে চলিলেন; একটু পরেই চটীজুতার শব্দে বুঝা গেল—তিনি বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলেন। সুনন্দার কিন্তু সে-দিকে হুঁস রহিল না; আড়ষ্টের মত সেইস্থানেই সে বসিয়া রহিল। মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল; শীতের দিবালোক ম্লান হইয়া আকাশ হইতে যেন একটা দুঃসহ বিষণ্ণতা ঢালিতে লাগিল।—সে দিকেও সুনন্দার লক্ষ্য ছিল না।

দাসী উচ্ছিষ্ট স্থানটা পরিষ্কার করিতে আসিয়া অবাক হইয়া গেল! সবিস্ময়ে গালে হাত দিয়া কহিল, হ্যাঁ বৌমা! তুমি মাটীর ঢেলার মত এমন চুপটি ক'রে বসে' আছ! বলি, লক্ষ্মীর দানা-দুটো কখন্ পেটে যাবে? বেলা যে গড়িয়ে গেল, মা!

সুনন্দার চমক ভাঙ্গিল। 'যাই'—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে-সঙ্গেই মাথাটা তাহার ঘুরিয়া সারা দেহটা ঝিম্-ঝিম্ করিয়া উঠিল; পা আর সে বাড়াইতে পারিল না। 'ধপ্' করিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল।

ও কি—ও কি! বৌমা, প'ড়ে গেলে না কি?—ভয়ে দাসী চেঁচাইয়া উঠিল। অন্য পরিচারিকারা শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিল। সমস্বরে সকলেই প্রশ্ন করিয়া উঠিল, কি হলো? বৌমা, কি হলো?

নিষ্প্রভ মুখে, ক্লান্ত কণ্ঠে সুনন্দা কহিল, না! ও কিছু নয়! মিছে তোরা গোল করিসনি—

কুমুর-মা কহিল,—মাথাটা বুঝি ঘুরচে—একটু জল দেব?

—হ্যাঁ, তাই দে—বলিয়া সুনন্দা তাহার হাত হইতে খানিকটা জল লইয়া মাথায় চাপড়াইয়া দিল।

সরী কহিল,—তা আর ঘুরবে'নি মাথা? বলে, চক্ষে মানুষ শরসে-ফুল দ্যাখে! মেয়ে-মানুষের সব চেয়ে বড় ভয় সতীনের ভয়—

কুমুর-মা কহিল, কথায় বলে, সোয়ামী যমকে দেয়া যায় তো সতীনকে নয়—

নিদারুণ অপমানে সুনন্দার চোখ-মুখ নিমেষে জলন্ত কয়লার ন্যায় লোহিত হইয়া উঠিল; গাত্রে কে যেন জল-বিচুটী ঘষিয়া দিল! রুক্ষস্বরে সে কহিল,—চুপ্ কর হারামজাদীরা!—বলিয়া কোন-মতে উঠিয়া সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

পাচক আসিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইল; কহিল,—বৌমা খাবে কখন? অনেকটা বেলা—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া সুনন্দা তাহাকে ধমকাইয়া উঠিল।

অপ্রত্যাশিত বকুনীতে সেই নিরীহ উৎকলবাসী ভীত হইয়া আমতা-আমতা করিয়া কহিল, এতটা বেলা অবধি আপনি যদি না খাও বৌমা, অসুখ-বিসুখ—

এবারও তাহার বক্তব্য শেষ হইতে পাইল না; গম্ভীর কণ্ঠে সুনন্দা কহিল, এইখানেই দিয়ে যাও—

ঝি আসিয়া আসন পাতিয়া ভোজনের স্থান করিয়া দিল। আহারে বসিয়া সুনন্দা প্রত্যেক ব্যঞ্জনের দোষগুণ, ত্রুটি-বিচার করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়া খাইল। তাহাকে এমন গভীর পরিতৃপ্তির সহিত খাইতে ঝিয়েরা ইতিপূর্ব্বে কখন দেখে নাই।

নির্ব্বোধের দল এ-কথা ভাবিলেও, যাহার এতটুকু বুদ্ধি আছে, সে-ই বুঝিবে, দম-দেওয়া কলের পুতুল যতই হাত-পা নাড়িয়া খেলা করুক না কেন, তাহাতে যেমন প্রাণের স্পন্দন থাকে না, এ উল্লাসের মাঝেও তেমনি আনন্দের অনুভূতি ছিল না।

অবশ্য, ইদানীং আহারে সুনন্দার অগ্নিমান্দ্যের লক্ষণ দেখা যাইত; তাহা লইয়া কেহ অনুযোগ করিলে, অল্প একটুখানি হাসির সুরে সে উত্তর করিত, কত আর খাব—খেয়ে-খেয়ে, কি রকম মোটা হ'য়ে উঠচি দিন দিন—

কথাটার ভিতর অতিরঞ্জনের দোষ কিছু-বা থাকিলেও মিথ্যা উক্তি ছিল না; এবং সুনন্দার মনের আকাশ যে আনন্দের দীপ্তালোকে সমুজ্জ্বল নহে, পরন্তু একটা দুঃখের মেঘই ছায়াপাত করিয়াছে—সেটুকু সকলে মনে মনে বুঝিলেও এই সুতীব্র আত্মমর্য্যাদাসম্পন্না বধুটির কাছে মুখে কেহ কদাচ তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইত না।

কিন্তু সুনন্দার অন্তরের মেঘখানা, বাহিরেও যে তাহার কাল ছায়া ফেলিতেছিল, সে-কথা সে স্বয়ং জানিতে না পারিলেও পাঁচ জনের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। আশু জল-ঝড় যে অনর্থের মতই সৌভাগ্যবতী বধুটির ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটাইবে, তাহার সঙ্কেত কাজলা আকাশের

বিদ্যুৎ-দ্যুতির মত রহিয়া রহিয়া সকলের চিত্তে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

সরী-ঝিএর মুখ দিয়া সর্ব্বপ্রথম সেই আভাসই সুনন্দার কর্ণগোচর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পাইল, তাহার ভাবনা লইয়া সে একাই পীড়িত নহে, অনেকেই দুঃখিত; কিন্তু সৌভাগ্যের কোলে যাহারা লালিত, অপরের ঈর্ষ্যা তাহাদের গায়ে বাজে না; কেবল তাহারা আঘাত পায় অন্যের সহানুভূতিতে। ব্যথিত চিত্তকে সেইটাই যেন আঘাত করে নির্য্যাতনের মত।

সন্ধ্যায় সমীরের সহিত সাক্ষাৎ হইতেই সুনন্দা কাঁদিয়া ফেলিল। হাত-জোড় করিয়া কহিল, তুমি বিয়ে কর, যা কর, এমন ক'রে দাসী-চাকরের কাছে আমাকে হীন ক'রে তুলো-না।

সমীর হতভম্ব হইয়া সুনন্দার অশ্রু-ভারাক্রান্ত চক্ষুর দিকে চাহিয়া কহিল;—বিয়ে কর! তার মানে?

আর্দ্রস্বরে সুনন্দা কহিল, মানে যাই থাক, সে আমার অদৃষ্ট; কিন্তু পাঁচ জনের সামনে—না, কখন না—তুমি আমাকে করুণার পাত্রী করতে পাবে না।

সমীর হাসিয়া ফেলিল। পত্নীর হাত-ধরিয়া তাহাকে টানিয়া নিজের পাশে বসাইয়া কহিল, দেখ্‌চি, বাবার মত তোমারও মাথা খারাপ হ'য়ে উঠেছে!

প্রভাতের মুক্ত আলোক-ধারার মত এই স্নিগ্ধ হাস্য-ধারা কিন্তু সুনন্দাকে শান্ত করিতে পারিল না। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর কণ্ঠে সে কহিল, কিন্তু—তুমি তো এক দিন আমায় বিয়ে করতে চাওনি—

সবিস্ময়ে সমীর কহিল, তার জন্যে এই বছর-দশেক পরে হঠাৎ এ মাথাব্যথা কেন?

সুনন্দা কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, সকলে বলে—তুমি আবার বিয়ে করবে—

বিরক্ত-স্বরে সমীর কহিল, আমি বলেছি কিছু?

কিন্তু তুমি তো ওদের জেদের কাছে না বলতে পারবে না। না বলতেও তোমায় কেউ দেবে না। সে-দিন পিসীমা স্পষ্টই তো ব'লে গেলেন, বাপের বংশ মুছে যাবে, —এ কি কেউ সইতে পারে?

সমীর অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিল, সেই আতঙ্কে ঝি তোমার ফিটের মত হ'য়েছিল দুপুর-বেলা?

নত নেত্রে অঞ্চলের একটা সুতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সুনন্দা কহিল, হ্যাঁ, তাই!

পত্নীর দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া সমীর কহিল, না নন্দা, তোমার কোন ভয় নেই। আমার এ-কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার।

কালিকাচরণের বহুমূত্র-ব্যাধি আচম্বিতে প্রবল হইয়া উঠিল। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন, পূর্ণ বিশ্রাম—দৈহিক, মানসিক উভয় দিকেই; উগ্র চিন্তা হইতে সাংঘাতিক অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

অপরাহ্নে পরিশ্রান্ত তপনের আলোর মত একটা নিষ্প্রভ হাসি কালিকাচরণের ওষ্ঠপ্রান্তে গড়াইয়া পড়িল।

সে-দিন কথায়-কথায় কালিকাচরণ বধূকে গল্পচ্ছলে বলিলেন, আমার প্রপিতামহের দুই সংসার ছিল। প্রথমার কোন সন্তানাদি না হওয়াতে দ্বিতীয়াকে তিনি এনেছিলেন বংশ-কামনায়; কিন্তু জান বৌমা, ঠাকুর্দ্দামশাই আমাদের গল্প করতেন, বড়মাকেই তাঁরা গর্ভধারিণীর চেয়ে বেশী ভাল-বাসতেন। সংসারে কর্ত্রী ছিলেন বড়মা। আমার প্রপিতামহ তাঁর পরামর্শ-ছাড়া একটি সামান্য কাজও কখন করতেন না। বলতেন, ক্রিয়া-কর্ম্মে, উৎসবে, ব্যসনে, পূজা-অর্চনাতে সহধর্ম্মিণীর আসন তো বড়-গিন্নীর; ছোটমা চিরকালই বধূ র'য়ে গেলেন। মরণকালে আক্ষেপ ক'রে ব'লেছিলেন, বড়গিন্নীকেই মা-করতে আমি সংসারে এনেছিলুম।—গল্প শেষ করিয়া কালিকাচরণ সহসা তন্ময় শ্রোতাকে সচকিত করিয়া ডাক দিলেন, বৌমা!—কালিকাচরণের স্বর গাঢ়।

জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে বধূ চাহিতেই তিনি কহিলেন, বৌমা, আমার সমস্ত বিষয়-বৈভব তোমায় লিখে দিচ্ছি—তুমি শুধু একটি অনুমতি আমায় দাও—

কালিকাচরণ থামিলেন।

প্রস্তর-পুত্তলীর ন্যায় নির্নিমেষ নেত্রে রুদ্ধনিঃশ্বাসে সুনন্দা চাহিয়া রহিল।

মিনতিপূর্ণ স্বরে কালিকাচরণ কহিলেন, সমীরের বিয়েতে তুমি অনুমতি দাও। আমাদের এই প্রাচীন বংশে জল-পিণ্ডের অধিকারী যেন লুপ্ত না হয়। বৌমা, তোমার কাছে আমি এইটুকু ভিক্ষা চাই;—তুমি সম্মতি দাও, মা!

একটা প্রচণ্ড ক্রন্দনকে বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া অবিচলিত স্বরে সুনন্দা কহিল, না।

সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে সে কক্ষ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল।

কালিকাচরণের ওষ্ঠ হইতে আর কোন শব্দ নিঃসারিত হইল না। ফুঁ দিয়া আলো নিবাইয়া দিলে চক্ষুর পলকে যেমন কক্ষের চেহারাটা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তেমনি উদ্দীপ্ত আশায় সমুজ্জ্বল মুখখানা তাঁহার পলকে যেন মসীলিপ্ত হইয়া গেল।

অবশেষে কালিকাচরণ তাঁহার উইলে লিখিলেন, পুত্র ও পুত্রবধূ যত দিন জীবিত থাকিবে, এই দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উপসত্ব সমস্তই তাহারা ভোগ করিবে। কিন্তু উভয়ের অবর্ত্তমানে এই সম্পত্তি দুই অংশে বিভক্ত হইবে, এবং তাহার এক অংশ যাইবে যক্ষ্মানিবারণী ধন-ভাণ্ডারে, অবশিষ্ট অংশের অধিকারী হইবে তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র।

উইলের খসড়া লেখা হইলে কালিকাচরণ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কিছু বলবার আছে?

মাথা নাড়িয়া সমীর কহিল, না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন কতকটা জবাব-দিহির ভঙ্গিতেই কালিকাচরণ কহিলেন, সবটা দেশের কার্য্যে দান না ক'রে ওদেরও কিছু দিয়ে যাচ্ছি, তার কারণ, ওদের গায়ে তবু ছিটে-ফোঁটা রক্ত আমাদের আছে। লোকে বলবে এক গোত্র, একই বংশ! মরলেও অশৌচ ওরা পালন করবে।

সুনন্দা শ্বশুরের কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। তাহার পানে চাহিয়া কালিকাচরণ কহিলেন, বৌমা, তোমার কিছু বলবার আছে? যদি কিছু বল্‌তে ইচ্ছা হয়, সঙ্কোচ ক'রো না—বল মা!

সুনন্দা একটা উদ্‌গত নিঃশ্বাসকে কোনমতে চাপিয়া-রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, না, আমার কিছুই বলবার নেই।

কালিকাচরণ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। নিমীলিত নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—অতীতের কত অসংখ্য ছবি, নিরালা মনের কত আকাশ-কুসুম রচনা!

নিঃশব্দে অন্তরের উচ্ছ্বাসটাকে সম্বরণ করিয়া কালিকা-চরণ শান্তকণ্ঠে পুত্রকে কহিলেন, তা হ'লে তোমাদের কোন অসম্মতি নেই বুঝলুম।—রজত, তুমি তাহ'লে ওটাকে পাকা ক'রেই এনো।

রজত কালিকাচরণের আংশিক সম্পত্তির ভবিষ্যৎ অধিকারী, দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র;—'যে আজ্ঞে' বলিয়া সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই দিন রাত্রি হইতেই কালিকাচরণের অসুস্থতা বাড়িয়া উঠিল। উইল স্বাক্ষর করিবার পরও তিনি তিন দিন বাঁচিয়া ছিলেন। অর্দ্ধ-আচ্ছন্ন চৈতন্য, তথাপি যখনই সংজ্ঞা আসিয়াছিল, তখনই পুত্র ও পুত্রবধূকে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, উইল তিনি বদল করিবেন কি না? অন্তিমকালে ভগবানের নাম অপেক্ষা এই প্রশ্নই যেন তাঁহার অধিকতর আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়াছিল। হায়, স্নেহমুগ্ধ বৃদ্ধ!

কিন্তু সেই একই উত্তর পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়েরই ওষ্ঠ ভেদ করিয়া প্রত্যেক বারই বাহির হইয়াছে;—না, আবশ্যক নাই।

কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে কালিকাচরণের শেষ নিঃশ্বাস নিঃসারিত হইল, এবং তাঁহার নিমীলিত নয়ন-পল্লব মহানিদ্রার আশ্রয়ে চিরশান্তি লাভ করিল, হৃৎপিণ্ড দেহের সকল যন্ত্রণার অবসানে নিস্পন্দ হইয়া গেল—মৃত্যুর সেই ভয়াবহ চিহ্নাঙ্কিত পিতৃ-মুখখানি সমীর যতবারই অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে আকুল হৃদয়ে দেখিতে লাগিল, ততবারই সেই নিদারুণ ভ্রম সুতীক্ষ্ণ শরের মতই তাহার মর্ম্ম ভেদ করিতে লাগিল; সেই ভয়ঙ্কর ভুলটার জন্য কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল,—সে এ কি করিল? প্রচণ্ড আত্মাভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া, স্নেহপূর্ণ বক্ষে আঘাত করিয়া আত্মঘাতী হওয়ার মত এ কি কঠিনতম দুর্বুদ্ধি তাহাকে গ্রাস করিল? কেন সে বলিল না, আমায় যা দিয়ে যেতে চাও বাবা, নিঃস্বত্ব হ'য়েই দিয়ে যাও? এমন ক'রে দানের মাঝে গ্রহণের ব্যবস্থা রেখ না। পুত্র সে; দাবীর জয়ধ্বজা তুলিবার অধিকার তাহারই ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

কালিকাচরণের পরলোকে প্রস্থানের পর সুনন্দার মনটা দিনে দিনে ক্রমশঃই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। শ্বশুর যে প্রশান্ত চিত্তে অন্তিমের শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিলেন না, এই ক্ষোভই তাহার ব্যথিত চিত্তে অঙ্কুশের

মত বিঁধিয়া অহরহ অসহ্য যন্ত্রণা দিতে থাকিত। এই বিপুল বিষয় বৈভব, স্বামী তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পাইল না! কিন্তু কার জন্য এমন হইল? সেই চিন্তাটাই অনুক্ষণ সুনন্দার বুকের মাঝে খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকিত। একটা নিদারুণ মনস্তাপ নিঃশব্দে তাহার অন্তরের পরদায় পরদায় ভরিয়া উঠিত। থাকিয়া থাকিয়া সুনন্দার মনে হইত—সে লোভী, বড্ড লোভী; সে প্রচণ্ড স্বার্থপর! নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সংসারে সে কাহারও মুখের দিকে চাহিল না, বিন্দুমাত্র মমতা করিল না। নির্ম্মম নিষ্ঠুরের মত অবিচলিত চিত্তে নিজের পণই দৃঢ় করিয়া রাখিল। কিন্তু এই এতখানি চিন্তার সঙ্গে সুনন্দা আপনিই ভয়ানক অবাক হইয়া যায়; চিত্তের এই অত্যদ্ভুত ভাবনারাশি, বিবেকের এই অত্যাশ্চর্য্য ভর্ৎসনা—এ সকল শ্বশুরের অন্তিম নিঃশ্বাস-পতনের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত অবধি কোন্ অজ্ঞাত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল? সুনন্দা যে এই অতীব বিস্ময়াবহ বৃত্তিরাশির অস্তিত্ব অবধি জানিত না!

সুনন্দা কি ভাবে নাই? সে অনেক ভাবিয়াছিল। নিজের অন্যায়ের—সুস্পষ্ট না হউক, অস্পষ্ট ছবিও তাহার মানস-নেত্রে একটিবারও প্রতিভাত হয় নাই। তন্ন তন্ন করিয়া অন্তর সে বহুবার বিশ্লেষণ করিয়াছে। কিন্তু আজ যে বস্তুটা কেবলই স্বার্থের কালিতে লিপ্ত ও অচ্ছিদ্র মসিময় ঠেকিতেছে, সে-দিনের চিন্তার মাঝে তাহা এতটুকু ঔজ্জ্বল্য হারায় নাই! সংসারে প্রত্যেক নারীই যাহা করিয়া থাকে, সে তাহাই করিয়াছিল। সুনন্দা উপন্যাসের নায়িকা নহে, বাস্তব জগতেরই সে এক জন রমণী। তবে কেমন করিয়া সে সপত্নী আনিবার অনুমতি দিবে? ভিক্ষা যতই আকুলতামাখা হউক, মিনতি যতখানিই দুঃসহ কাতরতাপূর্ণ হউক না কেন, তবুও সেই প্রার্থনা-পূরণের জন্য কেহ হাসিমুখে নিজের মস্তকচ্ছেদ করিতে পারে না। যে চাহিতে আসে তাহাকেই বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ ভাবিতে চিত্ত মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু আজ মনের আকাশে চিন্তার রং পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; একটি মানুষের অস্তিমের চিরশান্তি গ্রহণের সঙ্গে সুনন্দার ভাবনারাশিও যেন পরিবর্ত্তিত হইল। যে পুরী আঁধারে আবৃত ছিল, সূর্য্য যেন সেই দিকেই উদিত হইতেছে! সেই বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটার পানে চাহিয়া অন্য দিক্ সন্ধ্যার আঁধারে মলিন, ম্রিয়মাণ প্রতীত হইল।

সুনন্দার মনে পড়ে, ফেলে-আসা দিনগুলা! শ্বশুর কনে দেখিয়া তাহাকে বুকের নিকট টানিয়া লইয়া স্নেহভরে পিঠ চাপড়াইয়া মমতার্দ্র কণ্ঠে কহিয়াছিলেন, মা লক্ষ্মী, আমার মা হবে; আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে। —বলিয়া কতই আদর করিলেন!

সে-দিন সুনন্দাদের গৃহে কি আনন্দ! তার পর আশীর্ব্বাদের দিন স্থির হইল; কিন্তু সুনন্দার সেজকাকা আসিয়া সংবাদ দিলেন, বর শুনেছে মেয়ের রং ময়লা। বিয়ে সে করবে-না বলেছে। কালিকা বাবু ছেলের উপর তাই ভয়ানক চটে গেছেন।

জননী বসিয়া পড়িলেন; অশ্রু-প্লাবিত রুদ্ধনেত্রে কহিলেন,—নন্দা কি আমার কালো? বেশ তো, বর এসে নিজের চোখে মেয়ে দেখুক।

সারাটা দিন তাঁহাদের গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিল। পিতা সন্ধ্যায় সংবাদ লইয়া আসিলেন; কহিলেন,—কালিকা বাবুর ওখানে গেছলুম! সদাশয় ব্যক্তি বটে,—আর বুঝতেই পারচ মেজবৌ, এত লোক থাকতে ভগবান ওঁর মাথাতেই বা ছাতি ধরেছেন কেন? এই তো আমি ডবল এম, এ,—কি কত্তে পেরেছি এ-নাগাত? আর উনি একটা পাশও করেননি!

ব্যস্ত হইয়া মা কহিলেন,—সে কথা যাক; কি বললে বল শুনি।

হাসিয়া পিতা কহিলেন,—একখানা কলিজা দেখালে। বললে, দেবেন বাবু অত ভয় পাচ্ছেন কেন? সমীরের ইচ্ছা নেই। ওর কলেজের বন্ধু,—ওর মামার পার্টনারের মেয়ে, তাকেই ওর বিয়ে করবার ইচ্ছা! মামাকেও মুরুব্বি ধরেছিল। আমি আজ বিকেলে ডেকে স্পষ্ট ব'লে দিয়েছি, ও-সব নভেলীআনা-ঢং ছাড়! কালিকা-চরণ দত্ত যাকে বৌমা করবে বলেছে, তার গলাতেই তোমায় লক্ষ্মী-ছেলের মত মালা দিতে হবে। দেবেন বাবু, আশীর্ব্বাদের ব্যবস্থা আপনি করুন গে।

জননী ঠাকুর-ঘরে পূজা দিলেন। তথাপি মনের

কোণের ভয়টা ঘুচিল না; কহিলেন,—হ্যাঁ গা, বাপের ভয়ে বিয়ে না হয় করলে; কিন্তু তার মনে না-ধরায় শেষে যদি আমার মেয়ের অযত্ন করে—

পিতা সহাস্যে কহিলেন,—পাগল হ'য়েছ? ভদ্রলোকের ছেলে সে; অমন উঁচু যাঁর মন, তাঁর ব্যাটা কি ইতর হ'তে পারে? তাই যদি হবে, সে তো বাপকে স্পষ্ট জবাব দিতে পারত। তবে বয়স-ধর্ম্ম একটা আছে বটে! একসঙ্গে পড়ে, মেয়েটাও শুনলুম ভারী সুন্দরী। তাই যদি একবার কিছু মনে হ'য়েই থাকে—সেটা পাকা কালির লেখা ব'লে ধরবে না কি তুমি?

বাসি-বিবাহের দিন জামাতার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জননী কহিলেন,—বাবা, নন্দা আমার বড় আদরের ধন! তোমার হাতে দিলুম, তুমি দেখো—

কথাটার মাঝে যে উহ্য অংশটা ছিল, সেটুকু সুনন্দা যেমন বুঝিতে পারিল, সমীরও বোধ করি তা বুঝিতে পারিয়াছিল; তাই নত দৃষ্টি উন্নত করিয়া কুণ্ঠাহীন কণ্ঠেই সে প্রত্যুত্তর করিল—আপনার কোন ভয় নেই।—সেই স্বরের মধ্যে এমন একটা আশ্বাস ধ্বনিত হইয়াছিল, যাহাতে নবপরিণীতার সমস্ত লজ্জাটুকু বিস্মৃত হইয়া সুনন্দা সচকিতে স্বামীর মুখপানে তাকাইলে চারি পাশ হইতে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। প্রগল্ভ হাস্যে কেহই তাহাদিগকে লজ্জিত করে নাই। কিন্তু স্বামীর মুখ-নিঃসৃত সেই অভয় বাণীটা একান্ত নির্ভরতা সহকারে সুনন্দা বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। দুর্ভাগ্যের কুজ্‌ঝটিকা চক্ষুর সম্মুখটা আঁধার করিয়া অতি নিকটের বস্তুও যেন দৃষ্টির আড়ালে ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই ক্ষণেকের আঁধার ক্ষণেকেই বিলীন হইয়া, দীপ্ত দিবালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রীতিভোজনের দিন মামাতো ননদ রহস্যচ্ছলে কহিয়াছিল—সমীর-দার চোখে ধাঁধাঁ লেগেছিল, না? বেলাকে ফেলে—এঁ্যা, সমীর-দা, কি দেখে—

কথাটা সমাপ্ত হইতে না দিয়াই সমীর কহিয়াছিল, আমার চোখ দুটো দিয়ে দেখ না, প্রভা—

এই কথাটা স্মরণে আসিলেই সুনন্দার অন্তরটা বেদনায় টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠে। যে স্বামী এমন করিয়া বর্ম্মের মত তাহাকে আচ্ছাদন করিতেন, স্নেহ-মমতা-করুণা ঢালিয়া সুনন্দাকে আপদে-বিপদে রক্ষা করিতেন, তাহার প্রতি-দানে সুনন্দা কতটুকু কি দিতে পারিয়াছে? বিরোধী-চিত্ত রাঙা চোখে কেবলই তাহার জবাবদিহি চাহিত।

সুগভীর কন্যাস্নেহে শ্বশুর তাহাকে সংসারের কর্ত্রীপদ দিয়াছিলেন। সুনন্দা ছিল আত্মীয়-পরিজনের সকলেরই অধীশ্বরী। সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে সে ছিল বিধানদাত্রী রাজ্ঞী। এতখানি প্রতিপত্তি এতটুকু বেলা হইতে যিনি তাহাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ সাধ, অন্তিম কামনা সুনন্দা পূর্ণ করে নাই, আত্মাভিমানী চিত্ত নিজের দিক্‌টাই বড় করিয়া দেখিয়াছিল; দেবতার মত শ্বশুরের মনোবেদনা সে বুঝিতে চাহে নাই!

যে মন অহরহ পুড়িতে থাকে, ক্রমে ক্রমে তাহা তুষের আগুনের উত্তাপে সমস্ত দেহটাকে শুষ্ক, নির্জীব করিয়া তোলে। বাঁচিবার জন্য যে প্রাণশক্তির প্রয়োজন, তাহাকে সে তিলে তিলে নষ্ট করে।

সুনন্দার সুস্থ সবল দেহ একটা প্রচণ্ড বিরুদ্ধশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তাহার ক্ষমাহীন হৃদয়ের কঠোর আঘাতে ক্রমেই মোচড়াইয়া, দুমড়াইয়া শেষে খান-খান হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

যে মানুষ দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া শেষে মৃত্যুর রাজ্যে চলিয়া যায়, বাস্তব জগতের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য সকলই তাহার নিকট এমন উগ্র ও ভীষণ হইয়া উঠে যে, ইহলৌকিক সমস্ত স্বার্থ-বন্ধনকে তুচ্ছ করিয়া সে দেহাতীত জগতের জন্য নিজেকে সুদৃঢ় ভাবে প্রস্তুত করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

সুনন্দা একদিন সমীরকে কহিল,—দেখ, একটা কথা তোমায় বলব—রোজ ভাবি।

সবিস্ময়ে সমীর কহিল,—কি কথা?

একটা ঢোক-গিলিয়া সুনন্দা কহিল,—আমি মরবার পর তুমি আবার বিয়ে কোরো।

মেঘে-ঢাকা রৌদ্রের মত ম্লান হাস্যচ্ছটায় ওষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া সমীর কহিল,—এ কথা কেন?

সুনন্দা একটু চুপ করিয়া রহিল; অস্তগামী তপনের ম্লান আলোর মত মুখে তাহার অপ্রতিভতার ছায়াপাত হইল। সত্যই যেন সে অনুরোধ তাহাকে মানায় না!

নিঃশব্দে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুনন্দা কহিল,—যাবার দিন যত ঘনিয়ে আসচে, নিজের স্বার্থটাকে কত বড়-ক'রে দেখেছিলুম, চোখে সেইটাই বড্ড বেশী ফুটে উঠছে!—বলিয়া শেষে মাথা নাড়িয়া কহিল,—না, আমার বলার ভুল! বাবা যে-দিন চ'লে গেলেন, সেই দিনই আমি দেখতে পেলুম—জানতে পারলুম, আমি কত বড় স্বার্থপর! সেই অনুশোচনাই লোহার হাতুড়ীর মত বুকের ভিতর অহর্নিশ ঘা' মেরে-মেরে আমার এমন শক্ত দেহটাকে এমনি জীর্ণ ক'রে চূর্ণ ক'রে দিলে।

সমীরের বুকের ভিতরটা একটা বেদনায় মোচড় দিল। সস্নেহে সুনন্দার কপালের চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে কহিল, এতে তোমার এতটুকু দোষ নেই নন্দা! সংসারে স্ত্রীমাত্রেই যা' করে, তুমি তার অতিরিক্ত এতটুকু করনি। সপত্নীর জ্বালা কোন মেয়েমানুষই কখনো সহ্য করতে পারে না; তবে কেন মিছে তুমি এ আত্মগ্লানি ভোগ কর?

কুয়াসাবৃত জ্যোৎস্নার মত একটু পাণ্ডুর হাসি সুনন্দার ওষ্ঠপুটে ফুটিয়া উঠিল। আর্দ্রস্বরে সে কহিল, ঐ বিশ্বাস আমারও ছিল; তাই এতটুকু বিচলিত হইনি। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তেই আমার চোখের সামনে থেকে পর্দ্দা সরে গেল, আর সেই আবরণের আড়ালে যে এত-সব লুকান ছিল,—তা আমি কোন দিন ভাবতেও পারিনি! —সত্যি, আমি দেখতে পাচ্ছি—

অস্ফুট স্বরে সমীর কহিল,—কি?

অত্যন্ত ক্লান্ত কণ্ঠে সুনন্দা কহিল,—বাবার বুকের বেদনা! শুধু একটি জল-পিণ্ডের অধিকারী তাঁর কামনা ছিল। দেখ, তুমি আবার বিয়ে কর। ও কি! অমন চুপ ক'রে কি ভাবচো? সে কি পাবে? ছেলে-মেয়েভরা সেই সংসারটাকে তুমি কি দেবে? কিন্তু আমি বলি, তোমার স্নেহ, বাবার আশীর্ব্বাদ—তাদের মাথায় বর্ষিত হবে। সেই হবে রক্ষাকবচ,—স্বর্গে ব'সে বাবা দেখতে পাবেন, তাঁর আশা তুমি পূর্ণ করেছ। না, না, তুমি না বলো না—আমার এই অন্তিম অনুরোধকে নিষ্ফল করো না।

সমীর চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও উত্তর তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। যেন বাক্‌শক্তি লোপ পাইল। কেবল দুই বিন্দু অশ্রু তাহার ম্লান চক্ষুর প্রান্ত হইতে নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল।

চল্লিশ বছর বয়সে বর সাজিয়া ছাঁদলাতলায় দাঁড়াইতেই সমীরের সমস্ত অন্তর যেন লজ্জায় কুঞ্চিত হইয়া পড়িল। কিন্তু সুনন্দার শেষ প্রার্থনা যেন ছাপা-অক্ষরের মত অন্তর-মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; ধুইয়া ফেলিলেও লেখা মুছিয়া যায় না। কেবলই মনে হইত, পিতৃদেব পরলোক হইতে যথার্থই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন!

অলকা আসিল। সে বয়স্থা মেয়ে। নব-পরিণীতা হইলেও স্বামীর সংসারে বধূর পদে সে বসিতে আসে নাই। গৃহিণীর আসন লইতেই সে আসিয়াছে। পতি-গৃহে পা দিয়াই এ-কথা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। নবোঢ়ার লজ্জা-কুণ্ঠাকে বিসর্জ্জন দিয়া কর্ত্রীর গাম্ভীর্য্য লইয়াই সে বিশৃঙ্খল সংসারটার হাল ধরিল।

কৃতজ্ঞতায় সমীরের চিত্ত ভরিয়া উঠিল। যৌবন-সায়াহ্নে তরুণী পত্নীর সহিত অন্তরঙ্গতা স্থাপনের একটা সঙ্কোচ, একটা দ্বিধা যখন পদে-পদে জড়াইয়া কেবলই তাহাকে পিছনের দিকে ঠেলিতেছিল, সেই সময়ে এই তরুণী নিঃসঙ্কোচে নিজের অধিকার-জ্ঞান লইয়া, সকল বাধা-বিঘ্ন দূরে ঠেলিয়া-ফেলিয়া আপনার স্থানটাকে অনায়াসে দখল করিয়া লইল। তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সমীরকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল; অথচ ইহাকে প্রগল্‌ভতা বা নির্লজ্জতা বলা চলে না।......

সমীর 'অলকা' বলিয়া ডাকিতে গিয়া নন্দা বলিয়াই কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। অলকা কিন্তু সে জন্য অভিমান করে না; সহজ কণ্ঠেই কহে, যে নামটা এতদিন ব'লে এসেচ, অভ্যাসের মত সেটা তো মুখ দিয়ে বার হবেই গো!

কথাপ্রসঙ্গে এক দিন সমীর কহিল,—অলকা সেই তো তোমায় পেলুম, যদি—

অলকা সবিস্ময়ে চক্ষুযুগল তুলিয়া, আয়ত নেত্রের প্রসন্ন দৃষ্টি সমীরের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল, যদি কি গো! তখন আমি আসব কেন?

অপ্রতিভ হইয়া সমীর কহিল,—না, না, আমি সে কথা বলচি না! বাবা যদি তোমায় দেখ্‌তে পেতেন—

অলকা হাসিয়া ফেলিল। কহিল,—এই?—বিজ্ঞের মত সে মাথা নাড়িয়া কহিল,—যখন যার পূজো শেষ হবে, তখনই তো সে বর পাবে। আমি যে তখন 'তপিস্যে' করছিলুম—

কচ ও দেবযানী

[শিল্পী—শ্রীবাদল ধর

সমীরও হাসিয়া ফেলিল। কৌতুক-উদ্বেলিত কণ্ঠে কহিল,—আমিই তোমার তপস্থার ফল? তা হ'লে কোনও মেয়ে এমন তপস্থা না করে যেন।

অলকার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল, তবে কি? তুমি আমার দুষ্কৃতির ফল না কি?—বলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—এমন ক'রে নিজেকে ছোট মনে করতে, তুচ্ছ ভাবতে আমার শুধু লজ্জাই করে না, সম্ভ্রমেও বাধে। তুমি ভাব, অনেক পরে আমি এসেছি। কিন্তু আমি জানি, আমার আসার লগ্নেই আমি এসেছি। ক্ষণ আমার বোয়ে যায়নি, আরম্ভেই এসেছি; সমাপ্তে নয়। তোমার অন্তরের ছবিটা আমি দেখ্তে পাচ্ছি—

সমীর অবাক হইয়া গেল। শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ-অন্তরে নিজেকে যেন সে নিঃশেষে এই বিচিত্র আশ্চর্য্যময়ীর চরণে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। জগতের একটা সুদুর্লভ অভিজ্ঞতা, পরিপূর্ণ প্রশান্তির মত দেহ-মনে একটা মধুর আবেষ্টন দিয়া সমাধি-লোকের আনন্দের মত কিছুক্ষণ তাহাকে যেন পুলক-প্রবাহে নিমগ্ন রাখিল। এ অব্যক্ত তৃপ্তিরাশি অনুভবেরই বস্তু; ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার নহে।

একদা কথায়-কথায় সমীর কহিল,—যার আগমনের সম্ভাবনাতেই আনন্দের বন্যা বইবার কথা—দুঃখের পাহাড় সে মাথায় ক'রে আস্‌চে!

রহস্যের সুরে অলকা কহিল,—ভাগ্য-দেবতার আসনে কত দিন হোলো বসা হয়েছে?

গম্ভীর মুখে সমীর কহিল, এ তো সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ; এই যে বৈভব, এই যে খাওয়া-পরা, দাসদাসী, ঐশ্বর্য্য—এতো আমার শেষ-নিঃশ্বাসের সঙ্গেই যাদুকরের বাজীর মতই নিঃশেষিত হ'য়ে যাবে। তার পর—অথচ কত কামনার ধন সে? কত যাচ্‌ঞার বস্তু সে, যে আস্‌বে!—সমীরের দুই নেত্র সজল হইয়া উঠিল।

অলকা একটু হাসিল, পরে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, যে পৃথিবীতে আসে, নিজের অদৃষ্ট সে গ'ড়ে নিয়ে আসে; এতে ভাববার কি আছে?

সমীর প্রতিবাদ করিতে কৌচখানার উপর সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। উত্তেজিত স্বরে কহিল, ভাববার কিছু নেই? তুমি কি বলচ অলকা? সত্যি সত্যি সংসারটা বেদান্তের মায়া নয়—লাখপতির বংশধর আস্‌চে পথের কাঙাল হ'য়ে! কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে?

স্বামীর উত্তেজনা-রক্তিম মুখের দিকে অলকা ক্ষণকাল নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। তার পর তাহার স্বভাব-মধুর হাসিটুকু হাসিয়া রহস্যের সুরে কহিল,—না, বেদান্তের মায়া-টায়া কিছু নয়! ক্ষিদে পেলেই খাবারের জন্য যখন ছুট-ফটানি ধরে, তখন ওটা আমাদের জানবার আবশ্যক নেই। বাবা হাতে তুলে অন্যকে দিয়ে গেছেন বলেই তো এত খেদ তোমার! কিন্তু দান না হ'য়ে দুনিয়াতে ওঠা-নামার সংঘাতে ভাগ্য যদি তরিডুবি হতো—তখন কি তোমার এমন ক্ষোভ হতো? সে তো দান করা নয়, ছেড়ে যাওয়া! আমিও দেখি, যা আসবার পূর্ব্বে অন্তর্হিত হয়েছে, তাকে আমার ব'লে ক্ষোভ করা কেন? আমার তো এইটুকুই—যা পেয়েছি।

পত্নীর তর্কের ধারা, উত্তাপ-লেশহীন কণ্ঠস্বর, প্রবোধ-বাক্য, কোনটাই সমীরের অন্তরের বিক্ষোভরাশিকে অপসারিত করিতে পারে না। মুখে সে কিছু প্রকাশ না করিলেও, অন্তর তাহার নিয়ত কাঁদিয়া ফিরিত। হঠাৎ মনে হইল, উপার্জ্জনের চেষ্টা করিবে। এমন করিয়া শুইয়া-বসিয়া পুস্তক-পাঠে সময় অতিবাহিত করিয়া পিতৃদায়িত্ব সে অবহেলা করিবে না।

কাগজে একটা অধ্যাপকের শূন্যপদের সন্ধান পাইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির জৌলুস সমীরের ছিল। সংগোপনে সে একটা দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল, এবং কয়েকটা সপ্তাহ কাটিবার পর সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে সে পুনরায় সন্ধানী-দৃষ্টি বুলাইয়া একখানা খ্যাতনামা দৈনিকের সহকারী সম্পাদকের পদটার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল।

কোন্ মুরুব্বিকে ধরিলে চাকরীটা মিলিতে পারে, তাহার খোঁজ লইতে গিয়া খবর মিলিল, রজত দত্ত 'সলিসিটর' সংবাদপত্রখানার প্রধান একটি অংশীদার, এবং পত্রিকাখানির পরিচালনায় তাহার কর্তৃত্বও অল্প নহে।

সমীর উৎসাহিত হইল। তাহার ধারণা হইল, রজতকে ধরিয়া চাকরীটা সে জুটাইয়া লইতে পারিবে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, এতদিন পরে স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জনের একটা উপায় হইবে। কালবিলম্ব না করিয়া সমীর রজতের সহিত দেখা করিতে চলিল।

সকাল বেলা। মক্কেলপরিবৃত রজত মহা ব্যস্ত,—সমীরকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আগ্রহভরে কহিল,—এস! এস সমীর! অনেক দিন পরে আমার দরজায় পায়ের ধূলো পড়লো। তার পর, খবর সব ভাল? বৌদি'—ভাল আছেন?

—হ্যাঁ, সব এক রকম ভাল! একটু দরকারে তোমার কাছে হঠাৎ—

—ওঃ! তা, আমায় ডেকে পাঠালেই পারতে—বলিয়া প্রয়োজনটা শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া কহিল,—বেহারী বাবু, আমি তা'হলে আফিস হ'তেই ওদের ফোন করে দেব। কি বলেন?

মাথা চুলকাইয়া বেহারী বাবু কহিলেন,—না, আপত্তি ঠিক নয়! তবে কথাটা হচ্ছে—

কথাটা কহিবার আর অবকাশ হইল না।—বেশ তো, ভেবে দেখুন—বলিয়া অন্য ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রজত কহিল,—সোরাবজীর কেসটা এ-মাসের থার্ড উঠবে, আজ ফার্ষ্ট! কিন্তু বোস সাহেব বলে দিয়েছেন—সমস্তটাই নির্ভর করবে ওই দুখীরামের কথায়; দেখুন, ওকে আর চোখের আড়াল করবেন না।—খাঁ সাহেব, তা হ'লে পেসারতি ধরা হচ্ছে আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা।—এমনি ভাবে বাক্য-ধারা বর্ষণ করতে করতে রজত সমীরের পানে একবার তাকাইয়া কহিল,—কৈ, তোমার কথা তো কিছু বললে না সমীর!

কুণ্ঠিত স্বরে সমীর কহিল,—তুমি এখন বড ব্যস্ত রজত!

—ব্যস্ত!—রজত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, আমার বলে মরবার ফুরসৎ নেই; তোমাদের মত টাকার গদীর ওপর জন্মাইনি ভাই! মুখ-নেড়ে তবে পাত পাততে হয়। পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চারও তো ব্যবস্থা ক'রে রেখে যেতে হবে। দাদা, বরাত নিয়ে জন্মেছিলে তোমরা, আর দেখ, যেখানে লক্ষ্মীর অভাব, সেখানেই ষষ্ঠী ঠাকরুণের অযাচিত করুণা! সাতটা ছেলের ইস্কুলের, কলেজের মাইনে জোগাতে জিব বেরিয়ে পড়ে হে! তার ওপর মেয়েদের শুধু আজকাল—

সমীরের কেবল একটা নিঃশ্বাস পড়িল।

ঘড়ির কাঁটাগুলা যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া নয়টার ঘরে আসিয়া পড়িতেই ঘরময় একটা বিচিত্র মধুর শব্দরোল উঠিল। প্রতি-দেওয়ালেই ঘড়ি সাজাইয়া রাখা রজতের একটা মস্ত বাতিক ছিল। ঘাড় ফিরাইয়া সে ঘড়ি দেখিবে না, যে দিকেই দৃষ্টিপাত হইবে সময়টা জানিতে পারিবে।

তাহাদেরই একটাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সমীর বসিয়াছিল। রজত চকিত হইল।—ইস্, ন'টা বাজল—আজ আর নয়, উঠতে হলো—

শুষ্কস্বরে সমীর কহিল,—তাহ'লে আজ উঠি রজত!

—কই, তোমার দরকারটা তো এখন বললে না সমীর?

সমীর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—হ্যাঁ, বলছিলাম কি, এই গিয়ে,—সমীর থামিল—বক্তব্যটা যেন মনের ভিতর গুলাইয়া ভাষাটাকে এলো-মেলো করিয়া দিতে লাগিল।

প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে কৌতুকের ছায়া ফুটিয়া উঠিল। রজত কহিল, কি বলচো?

সমীর মাথা চুলকাইয়া কহিল,—রজত, তোমাদের কাগজের একটা সাব-এডিটরের পোষ্ট খালি আছে,—মানে, ওখানকার সেই অবিনাশ বাবু—

সহাস্যে রজত কহিল,—এই?—আমি মনে কচ্ছি, না জানি কি!—বলিয়া রহস্যের সুরে কহিল,—বড়-কুটুম্বটির জন্য বোধ হয়? তা ভায়া,—কথাটা শেষ না করিয়াই সে আর এক চোট হাসিয়া উঠিল।

সমীরের সুগৌর মুখে কে যেন একমুঠা আবীর নিক্ষেপ করিল; ব্যগ্র ভাবে কহিল—না না, শালার জন্য নয়—

—ওঃ! তবে ভায়রা-ভাই বুঝি? তা তোমার সুপারিশের অবিশ্যিই দাম আছে আমার কাছে। সে কথা যাক্, ভদ্দরলোকের কোয়ালিফিকেসন কি?

সমীরের ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল; কহিল,—ডবল এম, এ—সে, ইকনমিক্স আর ফিলজফিতে—

ছোকরার নাম কি?

সমীর কহিল,—নাম যাই হোক—কাজটা তুমি দিতে পারবে কি না?

রজত কহিল,—খবরের কাগজের ব্যাপার—মানে একটা দলাদলি আছে; তবে তুমি যখন নিজে ধরতে এসেছ সমীর, তখন কোন আপত্তিই টেকে না। আমার

যতদূর সাধ্য কাজটা দেবারই চেষ্টা করব; কিন্তু ছোক্‌রার নাম কি? মানে, আর কোন কাগজে কাজ-টাজ করেছে কি? কেবল পাশ করলেই ও-কাজে পটুত্ব জন্মায় না।

সমীর কহিল,—না, করেনি।

—কদ্দিন এম, এ, পাশ-করেছে?

গম্ভীর মুখে সমীর উত্তর দিল,—এই বছর-ষোল—

চকিত কণ্ঠে রজত কহিল,—এঁ্যা! এতদিন—তবে সে কি করছিল? অন্য কোন আফিসে কাজ-কর্ম্ম, না উকিল?

একটা ঢোক গিলিয়া সমীর কহিল,—না, কিছু না,—কোন আফিসে সে চাকরী করেনি—

রজত কহিল,—তাই তো! মুস্কিল এইখানেই,—চাকরী সম্বন্ধে তা হ'লে বলতে হবে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। আচ্ছা তুমি যখন ধরেছ—কিন্তু ষোল বছর পূর্ব্বে যে এম, এ, পাশ করেছে, গোটা চল্লিশ বছর বয়েস ত তার পার হ'য়ে গেছে; কি বল? ছোকরা বলা চলে না। তা ভদ্রলোকটি এত দিন কি করছিলেন?

মৃদু হাস্যে সমীর কহিল,—পরীর রাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন, অলকাপুরীর কথা ভাবতেন! মানে, কেতাব ঘেঁটেই দিন কাটাতেন।

রহস্যের সুরে রজত কহিল,—তা' এতকাল পরে হঠাৎ এ দুর্ব্বুদ্ধি?

—অদৃষ্টের খেয়াল!

রজত কহিল,—আচ্ছা, সব কথা পরে হবে, এখন উঠি: সন্ধ্যের পর আস্‌চো তো?

—হ্যাঁ—বলিয়া সমীর প্রতি-নমস্কার দিয়া নিজের মোটরে আসিয়া বসিল।

অলকা স্বামীকে একচোট খুব বকুনী দিয়া কহিল, সারা সকালটা কোথায় আড্ডা দিয়ে কাটালে?—চা না খেয়েই বেরিয়েছিলে—

সমীর হাসিল। কহিল,—আমার দূর-সম্পর্কের এক ভাই রজত দত্ত—এটর্ণী; তার বাড়ী গিছলুম।

অলকার মুখে সমীরের হাসির ছোঁয়াচ লাগিল; কহিল, সকালে এটর্ণী-বাড়ী—মতলব কি? আমার নামে মামলা-মকর্দ্দমা করবে না কি?

রহস্যের সুরে সমীর কহিল,—তা করা উচিত। কি চার্জ্জ আন্‌বো জান?

চক্ষু তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া অলকা কহিল,—কি চার্জ্জ?—তাহার অপাঙ্গে কৌতুকের বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ—

সমীর কহিল,—শান্তিভঙ্গের—

দপ্‌ করিয়া অলকার মুখের উজ্জ্বলতা যেন নিভিয়া গেল। এক খণ্ড কালো মেঘ যেন নিমেষের জন্য চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল! মুহূর্ত্ত পরেই ওঃ, বলিয়া অলকা একটুখানি হাসিল।

পত্নীকে গমনোদ্যত দেখিয়া সমীর হাত-বাড়াইয়া তাহার অঞ্চল ধরিল। কহিল,—যাচ্ছ যে বড়?

অলকা ফিরিয়া দাঁড়াইল; কহিল,—আমার বুঝি কোন কাজ নেই—

সমীর কহিল,—সে জন্যে যাচ্ছ না।

সবিস্ময়ে অলকা কহিল,—তবে?

আমার উপর রাগ করেছ? আমার কথাটা দোষের হয়েছে।

—ইস্, তা বই কি! কিন্তু আমার এখন অত দোষ ধরবার সময় কোথা?

অলকা চলিয়া গেল।

খোলা বাতায়ন-পথে সাদা মেঘের টুকরাগুলার পানে চাহিয়া সমীর সহসা ভাবিতে লাগিল—অলকার আসিবার আগেকার দিনগুলার কথা। বাণ্ডিলের সূতার একটা মুখ ধরিয়া টানিতে থাকিলে, সে যেমন ধীরে ধীরে কেবলই নিজেকে মুক্ত করিয়া দিতে থাকে,—বাধা না দিলে নিজে সে থামিতে পারে না, তেমনি এই বিস্মৃত-অবিস্মৃত, ভুলিয়া-যাওয়া, ঝাপসা-ধরা অসংখ্য দিনের অগণ্য যত কথা, যত সুখ, সবই যেন অন্তরের কোন গুপ্ত গুহা হইতে বাহির হইয়া সমীরকে প্লাবিত করিতে লাগিল।

সুনন্দার চিরবিদায়ের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দিনের বিস্মৃত সহাধ্যায়িনী বেলার মুখখানা পর্য্যন্ত মানসে ভাসিয়া আসিয়া তাহাকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। আহারের সময়টাও যে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, সে-দিকেও তাহার খেয়াল রহিল না!

চমক ভাঙিল অলকার কণ্ঠস্বরে। তাড়া দিয়া সে কহিল, কি হয়েছে বল ত? আজ এখনও নাইতে গেলে

না! ঘড়ির কাঁটার পানে চেয়ে দেখেছ? ভাই ধেয়ান করতে শিখাল না কি?

সোফাটা ছাড়িয়া সমীর উঠিয়া পড়িল; সহাস্তে কহিল,—ভাই নয়, ধ্যান করতে শিখালে তুমি।

কিন্তু তখন আর প্রেম-কোন্দলের সময় ছিল না।

•

সন্ধ্যার পর সমীর উপস্থিত হইল রজতের বৈঠকখানায়।

রজত সাদর-সম্ভাষণের পর কহিল, কই, তিনি কোথায়?

সমীর প্রশ্ন করিল,—কে?

রজত কহিল,—যিনি চাকরী করবেন।

স্বল্প একটু হাসিয়া সমীর কহিল,—তোমার সামনেই তো হাজির!

রজত কথাটা ঠিক বুঝিয়া-উঠিতে পারিল না। ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—ঠাট্টা রাখ সমীর, মোনা চাটুয্যের সঙ্গে কথা কইতে হবে।

সমীর কহিল,—বেশ তো, বাধা কি? দেখা করতে প্রস্তুত আছি রজত!

কাজের কথা লইয়া সমীরের এই রঙ্গ-কৌতুকটা রজতের ভাল লাগিল না। সকালে অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও নামটা জানিতে পারে নাই। সন্ধ্যাতেও সাক্ষাৎ মিলিল না; অথচ সেই অপরিচিত ব্যক্তিটির জন্য রজতকে যথাসাধ্য আন্তরিকতার সঙ্গে সুপারিশ করিতে হইবে!

নীরস স্বরে রজত কহিল,—কি সব বাজে কথা বল্‌চো সমীর?

সহজ সুরেই সমীর কহিল,—বাজে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই রজত! আমি অবাক হচ্ছি, তুমি কেন বিশ্বাস করতে পার না,—আমি চাকরী করব?

ভয়ানক বিস্মিত হইয়া রজত সমীরের মুখপানে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল,—দৃষ্টি তাহার তীক্ষ্ণ! যেন একটা নিগূঢ় রহস্য; তীব্রতম পরিহাস—সমীরের ঈষৎ গম্ভীর মুখের আড়ালে দুর্ব্বোধ্য হইয়া বাধিয়া আছে। যেন রজতের সামান্য বোকামীর আঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহা শতধারে মুখরিত হইয়া উঠিবে।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে মানুষ কেমন আপনা-হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শুষ্কস্বরে সমীর কহিল,—এ কথার উপর অবিশ্বাস করা চলে না।

কিন্তু অনেক সময় মানুষ চোখ দিয়া যাহা দেখে, কাণ দিয়া যাহা শুনে, তাহা সমস্তই নিজের মোহাবিষ্ট অন্তরের ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস করে; তাহা না হইলে, নিজেকেই যে পাগল বলিয়া ভাবিতে হয়! কারণ, বাজীকর যখন চক্ষুর সম্মুখে ধারাল অস্ত্র দিয়া মানুষটাকে দ্বিখণ্ডিত করে, রক্তে চারিপাশ রাঙা হইয়া উঠে, তখন অভিভূত অন্তর ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উঠিলেও তাহা যে ক্রীড়ামাত্র, সেইটা বুঝিতে বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকিলেও—সেই মুহূর্ত্তে সেটাকে সে অস্বীকার করিতে পারে না। রজতেরও মুখের চেহারা যেন তেমনি হইয়া উঠিল।

তাহার বিস্ময়-বিহ্বল মুখের পানে চাহিয়া সমীর কহিল,—বাস্তবিক রজত, চাকরীটা আমিই করব—

—চাকরী?—ঝাঁকানী খাইয়া যেন তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। চমকিয়া উঠার মত রজত কহিল,—তুমি করবে? ঐ চাকরী?—তার পর কি ভাবিয়া গম্ভীর মুখে কহিল,—আমায় মাপ কর ভাই,—আমি পারব না।

আহত কণ্ঠে সমীর কহিল,—কেন পারবে না?

অকুণ্ঠিত স্বরেই উত্তর হইল,—তোমার মত লোকের চাকরী আমার নেই,—মানে আপিসে সোফা, কৌচ পাতা থাকবে না। হাতের কাছে উর্দ্দিপরা চাপরাশিও বই এগিয়ে দিবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না। তোমরা অন্য জগতের লোক ভাই,—দুঃখ সহ্য করবার জন্য তোমরা দুনিয়াতে আসনি।

রজত টেবিলের উপর সংরক্ষিত মামলার কাগজগুলার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে চাহিয়া থাকিয়া সমীর কহিল,—হলো না রজত?

মুখ না তুলিয়াই রজত কহিল,—না,—বলিয়া একটু থামিয়া কহিল,—চাকরী অভাগা দরিদ্রের জন্য; দুঃখী লোকের জন্য। ও-বড় কষ্টের বস্তু। বড়-লোকেরা ওর মর্ম্ম বোঝে না, দরদও জানে না।

—ওঃ—বলিয়া সমীর উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—আসি তবে রজত!

এস সমীর—বলিয়া রজত যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া নমস্কার জানাইল।

ক্লান্ত-চরণে মোটরে উঠিয়া সমীর দেহভার গাড়ীর কোমল গদীর উপর এলাইয়া দিল। অনেকখানি আয়াস-সাধ্য চিকিৎসার পর রোগীর মৃত্যু ঘটিলে, চিকিৎসক যেমন উদাস চোখ-মুখ লইয়া অন্যমনস্কের মত গৃহে ফেরে, দুঃখ-উৎকণ্ঠারহিত মনের অবস্থা হয় নির্ব্বিকার; তেমনি-তর একটা ভাবনারহিত অবসন্নতা যেন সমীরের দেহ-মন আচ্ছন্ন করিল।

কতবার যে-কথা সমীরের কণ্ঠদ্বারে ঠেলিয়া আসিয়াছিল, তাহা গুছাইয়া লইয়া যেন সে বলে—রজত, ওই চাকুরীটার উপর আমার ভবিষ্যতের অনেক-কিছু নির্ভর কচ্ছে ভাই!—কিন্তু যতবারই কথাটা সে বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, ততবারই কে যেন সবলে গলা টিপিয়া তাহার কণ্ঠদ্বার রোধ করিয়া দিয়াছে; এ দীনতাকে কোন মতেই প্রকাশ করিতে দেয় নাই। রক্তের ধারায় যে আভিজাত্য লুক্কায়িত আছে, তাহাকে দেখিতে না পাইলেও, তাহার সম্মুখে নিজেকে ক্ষুদ্র করা সহজসাধ্য নয়! দুঃখের পাষাণস্তূপও উন্নত মস্তক অবনত করিতে পারে না।

এক বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ, ও দশ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হইবার পর প্রত্যূষ আশ্রয় পাইল—মাতুলালয়ে। কন্যা-জামাতা-হারা সুখদা এই সর্ব্বহারা ছেলেটার কাছেই বোধ করি জন্মান্তরে ঋণী ছিলেন! সুদে-আসলে তাহাই পরিশোধ করিতে এই ষাট বৎসরের বৃদ্ধা পঁচিশ বৎসরের চাপা-পড়া অভ্যাসগুলোকে অপটু হস্তে পুনর্ব্বার সজাগ করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

রাগ হইলেই শ্রীপদ কহে,—হাড়-হাবাতে ছেলে, মা-বাপকে পেটে পুরে সিংহাসন নিয়েছেন; আমাকে গ্রাস ক'রে সম্রাট্ হবেন!

সুখদা কহেন,—পদু, অমন করে বলিসনি রে!—আহা, জগতে ওর আছে আর— কথাটা তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন না; ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠেন।

শ্রীপদ কিন্তু শান্ত হয় না। ফুঁশিয়া কহে,—বলি কি আর সাধে? ছোঁড়াটার পানে চাইলে বুকটা আমার জ্বলে ওঠে! কালিকাচরণ দত্তের নাতি—মানুষ হচ্ছে আমায় ছেঁচে,—এর চেয়ে বড় ক্ষোভ আর কিছু আছে?—বলিয়া প্রত্যূষের পানে চাহিয়া কহিল,—প্রত্যূষ, গরীব মামার ক্ষুদ-কুঁড়ো খেয়ে তুই মানুষ হ। কিন্তু বাবা, দেখিস্, এমন মানুষ হবি যে, স্বর্গ-থেকে তোর ঠাকুর্দ্দা হাত কামড়ে যেন বলে, কাকে বঞ্চিত ক'রে এলুম রে!

প্রত্যূষ সাড়া দেয় না। গণিতের পুস্তকখানার উপর ঝুঁকিয়া-পড়ে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা তার আসন্ন।

প্রত্যূষের বড় সাধ সে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করিবে—দুইটা পাশ করিবার পর মাতুলের কাছে সেই প্রস্তাবই উত্থাপন করিল।

শ্রীপদ কহিল,—ঐ ইচ্ছে আমারও আছে রে! বাবা ডাক্তার ছিলেন, যদি প্র্যাকটিস্ জমবার মুখে হঠাৎ মারা না যেতেন,—আমাদের পয়সা আজ খায় কে? ঐ যে অত বড় 'চাটুয্যে ফার্ম্মাসী'—নন্দ চাটুয্যে যার মালিক,—ওটা কি ওদের ছিল? বাবারই হাতে-গড়া জিনিষ! তখন ওর ছেলে কর্ণেল চাটুয্যে বিলেতে।

হাসিয়া প্রত্যূষ কহে,—সে-সব মহাভারত ভুলে যাও না মামাবাবু!

শ্রীপদ মাথা চুলকাইয়া কহে,—ঠিক বলেছিস্ বাবা! দুর্ব্বলের ভুলে যাওয়াতেই শান্তি;—তা না হ'লে, তোর ডাক্তারী পড়ার খরচটার কথা আজ আমায় ভাবতে হ'তো?

পাশের ঘরে বসিয়া সুখদা সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন। বোধ করি চক্ষু মুদিয়া ইষ্ট-দেবতারই ধ্যান করিতেছিলেন। কিন্তু নাতি ও ছেলের কথোপকথনগুলা কর্ণে পশিবার সঙ্গেই তিনি ঠিক উঠিয়া আসিয়া কহিলেন,—খরচের কথা কি বলছিস্ পদু!—রজত দত্ত তো এখনও বেঁচে থেকে ওর বাপের বিষয়টা ভোগ কচ্ছে,—সে দিতে পারে না একটা ছেলের পড়ার খরচ? কথায় বলে, 'ন্যায়ের দড়িতে হাতী বাঁধা যায়।' পদু তুই গিয়ে স্পষ্ট বলবি—ভগবান ব'লে একজন উপরে আছেন! আজও চন্দ্র-সূর্য্যি উঠছে,—ওর ঠাকুরদার পয়সাতেই তো তুমি বড় লোক—তোমার তিনটে ছেলে তিনখানা মোটর চড়ছে; কিন্তু চোখ বুজলেই এক জায়গাতেই গিয়ে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রত্যূষ রাগিয়া উঠিল। উদ্দীপ্ত স্বরে কহিল,—

দিদি-ভাই, তোমায় একশ'বার বারণ করে দিয়েছি, তোমার আরব্য উপন্যাস আমার কাছে বলতে পাবে না। কিন্তু ফের সেই কথা! বেশ, যেদিন সকালে উঠে চলে যাব একদিকে, সেদিন বুঝবে—

সুখদা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেলেন। মুখ কাচুমাচু করিয়া কহিলেন,—ঘাট হয়েছে দাদা! এ পর্য্যন্ত অনেকেই ফাঁকি দিয়েছে, তুই আর দিস্‌নি।

আরও গোটা-কতক বছর কাটিয়া গিয়াছে। ডাক্তারীর শেষ-পরীক্ষাটা প্রত্যূষ সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল।

শ্রীপদ মহা-আনন্দে ভাগিনেয়ের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল,—তোর মামীমার সঙ্গে কতদিন ধরে কথা কইচি, হাজার-দুই টাকাতে ছোট্ট একটা ডিস্‌পেন্সারী—

বাধা দিয়া প্রত্যূষ সবিস্ময়ে কহিল,—অত টাকা কোথা পাবেন হঠাৎ এখন?

মাতুল বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া কহিল,—চেষ্টা থাকলেই হয় বাবাজি!—বাড়ীটা "মর্টগেজ" দেব—'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ', একথাটা কি আর—

প্রত্যূষ আবার বাধা দিয়া কহিল,—ভেবে দেখি।

কয়েক দিন পরে প্রত্যূষ উৎসাহিত ভাবে আসিয়া কহিল,—একটা সুখবর মামাবাবু, বাঁচা গেল!—

প্রফুল্ল মুখে মাতুল কহিল,—কি খবর রে! চাকরী-বাকরী কিছু জুটল না কি?

—হ্যাঁ, যুদ্ধের জন্য এক জন বড় ডাক্তার নিযুক্ত হয়ে যাচ্ছি।

শ্রীপদ ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল; মুখ দিয়া বাক্‌স্ফুরণ হইল না।

প্রত্যূষ সেইরূপ উৎসাহেই কহিয়া চলিল,—বেশ মোটা মাইনে দেবে।

তথাপি শ্রীপদর মুখের কালো মেঘখানা ফিকা হইল না; বরঞ্চ আঁধারটা আরও ঘনাইয়া আসিল।

প্রত্যূষ বলিতে লাগিল,—ফিরে এলে ও-লাইনে উন্নতির আশাও ঢের।

শ্রীপদ কিছুকাল নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—যুদ্ধে যাবি প্রত্যূষ?

মাতুলের বেদনা কোথায়, প্রত্যূষ তাহা বুঝিয়া হাসিয়া কহিল,—আমায় তো মানুষ হ'তে হবে মামাবাবু!

শ্রীপদ আবার কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, মা—থাক্ মামাবাবু!—সংসারে এত হারিয়েও দিদি-ভাই যদি এখনো কোথাও আশা রাখে, তবে চোখের জলে সমুদ্রই সৃষ্টি হবে।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া শ্রীপদ কহিল,—দেখি ভেবে। —আফিসের কাপড় পরিবার জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীপদর কনিষ্ঠ পুত্র দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল,—বাবা, শীগ্‌গীর এস! কে এক জন তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। তাঁর খুব বড় মোটর-গাড়ী—একদম ঝক্‌ঝক্ করছে; কিন্তু তাঁর খালি পা! প্রত্যূষ-দাকে আর তোমাকে ডাকচেন।

পুত্রের কথা শুনিয়া শ্রীপদ ত্রস্ত ভাবে নামিয়া আসিল। সে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল,—এ কি, রজতবাবু যে!

হ্যাঁ ভাই, মার ৺গঙ্গালাভ হয়েছে। তোমাদের দ্বারস্থ হলুম—মাতৃদায় আমার উদ্ধার ক'রে দাও তোমরা পাঁচ জনে। দানসাগর কচ্ছি কি না; তাঁর ইচ্ছা ছিল। প্রত্যূষ কোথায়? সে তো নাতি—

ডাকে বাহির হইবার পরিচ্ছদে মণ্ডিত প্রত্যূষ মাতুলের আহ্বানে নামিয়া আসিল।

শ্রীপদ কহিল,—তোমার কাকাবাবু হন উনি।

রজত কহিল,—হ্যাঁ প্রত্যূষ, আমি—

কথাটা তার সমাপ্ত হইল না। পদপ্রান্তে উদ্যতফণা সর্প দেখিলে পথিকের যে অবস্থা হয়, সেই ভাবে চমকিত হইয়া সে কয়েক পদ পশ্চাতে হঠিয়া গেল; তাহার পর ঈষৎ গম্ভীর স্বরে কহিল,—তুমি অশৌচ গ্রহণ করনি প্রত্যূষ?

গম্ভীর ভাবে প্রত্যূষ উত্তর দিল,—না।

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া রজত কহিল, মানুষ কি অমন লক্ষ্মীছাড়া হয় প্রত্যূষ? যে কুলের যে আচার, তা মানতে হয় বৈ কি? আমরা হিঁদুর ছেলে—কালি কাকা—মানে তোমার ঠাকুর্দ্দা যখন মারা গেলেন,—তখন সারা-মাসটাই আমি হবিষ্যান্ন করেছি—মালসা পুড়িয়েছি।

প্রত্যূষ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল; মনের কথা মুখে বাহির হইল না; তাহার প্রয়োজন ছিল না।

শ্রীপদ কহিল,—আজকালকার ছেলেরা—

রজত কহিল,—যাক্, যার যা অভিরুচি। তবে তুমি যখন স্বগোত্র, আপনার জন, তোমায় বাদ দিয়ে তো কাজ করা যায় না। অন্ততঃ, নিয়মভঙ্গের দিনেও উপস্থিত থেকো। শ্রীপদবাবু তোমাকে আর বিশেষ কি বলব—সমীর না থাকলেও দাবী তোমার ওপর আমরা করতে পারি,—মাতৃদায়ে হাজির হওয়া চাই তোমার।

আনন্দে গলিয়া শ্রীপদ কহিল,—নিশ্চয়! সে কথা আবার বল্‌তে? একশোবার দাবী তোমাদের আছে। হ্যাঁ, ওই বালিগঞ্জের বাড়ীতেই তো কাজ হবে?

—না, না! সারকুলার রোডে।

—ওঃ! এখন তা হ'লে সমীর বাবুর—

—হ্যাঁ! আমার সারকুলার রোডের বাড়ীতেই হবে। বালিগঞ্জের বাড়ীতে তেমন উঠান, দালান নেই।

শ্রীপদর মুখ দিয়া আর কথা ফুটিল না। যন্ত্রচালিতের মত সে কেবল নমস্কারটা সারিল।

শ্রীপদ কয় দিন ধরিয়া বিষম বকাবকি করিল। মাকে হাজার বার সাক্ষী মানিল। রাগ করিয়া স্বপক্ষে দুই শত নজীর বাহির করিল; কিন্তু পাথরে বীজ নিক্ষেপবৎ সকলই বিফল হইল! প্রত্যূষ শ্রাদ্ধবাড়ীতে যাইতে সম্মত হইল না।

অবশেষে শ্রীপদ কহিল,—সমাজ তো আমায় রাখতে হবে; অত বড় মানী লোকটা, অমন ক'রে ব'লে গেল। আচ্ছা, শ্রাদ্ধের দিন সকালে আমি হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যাব তোকে—দেখি, তোর একগুঁয়েমি কোথায় থাকে!

প্রত্যূষ সাড়া দিল না।

এতখানি আস্ফালন সত্ত্বেও শ্রাদ্ধ-সভাতে কিন্তু শ্রীপদকে একাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইল। সারা পথ অন্তরটা তাহার আড়ষ্ট হইয়া রহিল। যেন একটা মস্ত জবাবদিহি তীক্ষ্ণধার খড়্গের মতই সেখানে উদ্যত হইয়া আছে!

রজত মহা সমাদরে শ্রীপদর অভ্যর্থনা করিল; কিন্তু সে যখন প্রত্যূষের নামও উচ্চারণ করিল না, তখন এত সমারোহপূর্ণ সভামণ্ডপ এক নিমেষে যেন শ্রীপদর চোখের সম্মুখে কুয়াশামাখা চাঁদের আলোর মত শ্রীহীন, নিষ্প্রভ দেখাইতে লাগিল।

কীর্ত্তনীয়া তখন গায়িতেছিল,—

"বৃন্দাবনচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার"—

অজ্ঞাতে শ্রীপদর দুই চোখের কোণে জল জমিয়া উঠিল। এই বাড়ী, ঘর-দ্বার, প্রাঙ্গণ, দালান, এই যে ঐশ্বর্য্যের লীলা-নিকেতন—মর্ম্মরমণ্ডিত সুবিশাল পুরী—ভাগ্যচক্রের ক্রূরতা এই বিপুল বৈভবে কাহাকে বঞ্চিত করিল?

শ্রীপদর চমক ভাঙিল, রমণীর কণ্ঠস্বরে। তাড়াতাড়ি রুমালে সে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া-চাহিয়া কহিল,—আমায় কিছু বলছেন?

শুভ্র সিল্কের থানপরিহিতা প্রবীণা মহিলাটি কহিলেন, —হ্যাঁ, আপনাকেই বল্‌ছি,—আপনি কি সমীরবাবুর কোন আত্মীয়?

শ্রীপদ কুণ্ঠিতভাবে লজ্জিত স্বরে কহিল,—তিনি আমার ভগিনীপতি হ'তেন।

মহিলাটি মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—আমার অনুমান ঠিকই তা হ'লে; মনে হচ্ছিল—সমীরবাবুর আপনি কোন নিকট-আত্মীয়ই হবেন। আচ্ছা, তাঁর একটি ছেলে ছিল; শুনেছি, সে ডাক্তার হয়েছে?

—হ্যাঁ, প্রত্যূষ ডাক্তার হয়েছে—

মহিলাটি কহিলেন,—তাকে দেখছি না তো! আমি তাকেই খুঁজছি।

—সে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য ডাক্তার নির্ব্বাচিত হয়েছে।

চমকিয়া রমণী কহিলেন,—সার্ভিসে কি সে জয়েন করতে চ'লে গেছে?

—সার্ভিসে জয়েন সে ঠিক এখনও করে-নি,—মানে, ওদের চুক্তিনামায় এখনও সই করেনি; তবে বম্বে চ'লে গেছে। সেখান থেকেই তাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে যেতে হবে।

রমণী কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—তাকে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন। রজতবাবু বলেছিলেন,—এইখানেই দেখা হতে পারে।—হ্যাঁ, তাকে আমি দু'খানা চিঠি লিখে আমার অভিপ্রায়ও জানিয়েছিলুম।

অস্ফুট স্বরে শ্রীপদ কহিল,—আপনি তাকে চিঠি লিখেছিলেন?

সুদৃঢ় স্বরে মহিলাটি কহিলেন,—সার্টেনলি। তাকে আমার ভয়ানক প্রয়োজন। বিলেতে আই, এম, এস,

পড়বার সাহায্য আমি তাকে করব জানিয়েছিলুম ; কিন্তু কোন উত্তরই সে দিলে না !

শ্রীপদ কেবল ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল।

রমণী কহিতে লাগিলেন, তার জন্যে অপেক্ষা করাই আমার ভুল হয়েছিল। রজতবাবু আমায় আশ্বাস দিয়েছিলেন—এইখানেই সাক্ষাৎ হবে। তা না হ'লে আমি নিজেই আজ দেখা করতে যেতুম।

অনেকখানি চেষ্টায় শ্রীপদর বাক্‌নিষ্পত্তি হইল। সে কহিল,—সবটাই যেন অদ্ভুত ধাঁধাঁর মতন ঠেক্‌চে !

রমণী মাথাটা নাড়িয়া ও কথার সমর্থন করিয়া কহিলেন, ঠিক ব'লেছেন,—অনেক আশ্চর্য্যকে সহজ ভাবে গ্রহণ করা যায় ; আবার অনেকখানি সোজাও যথেষ্ট বিকৃতির মতই দেখায়,—যেমন প্রত্যূষের অদৃষ্ট ! কিন্তু আমি তার মাতৃস্থানীয়া ; কেন সে আমার সাহায্য নেবে না ? আমি প্লেনে উড়ে' গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব ;—দেখি, সে কেমন করে আমায় উপেক্ষা করে?

অস্ফুট স্বরে শ্রীপদ কহিল,—সবটাই কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকচে !—আপনার পরিচয়টা—

—ওঃ ! এখনও সেটা দেওয়া হয়নি বটে ! ভুল হ'য়ে গেছে।—আমার নাম মিসেস্‌ বেলা চাটার্জ্জি—ডাঃ কর্ণেল চাটার্জ্জি আমার স্বামী ছিলেন। আসি তবে।

শ্রীপদ যেন এক নিমেষে পাষাণবৎ নিস্পন্দ, অসাড় হইয়া গেল।

প্রত্যূষ বোম্বাই সহরে একটা হোটেলের ছোট একখানা কামরায় খোলা বাতায়নের সম্মুখে বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। চঞ্চল নীলাম্বুরাশি সম্মুখে, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ ; কি এক বিরাট মহিমার আকর্ষণে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ।

প্রত্যূষ বহির্জগতের সেই অপরূপ দৃশ্যের পানে চাহিয়া যেন অন্তর্জগতের ছবিখানিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। জীবনের একটা দিকে তাহার এমন বিক্ষোভময় অশান্তি, কিন্তু আর একটা দিক ঐ আকাশের মতই স্থির, উদার, স্বচ্ছ, বিশালতাপূর্ণ।

মাতামহীকে প্রণাম অবধি করা হয় নাই। শুধু পত্রের একটি ছত্রে নিজের বিদায়-বার্ত্তাটা লিখিয়া, সেখানি সে সুখদার শয্যার উপর ফেলিয়া আসিয়াছে। সেই সংক্ষিপ্ত বাণী যে কত বড় নির্ঘাত শেলের মত সুখদার বুকে বাজিবে, প্রত্যূষ তাহা একবার ভাবিবারও চেষ্টা করে নাই! মনকে কেবল একটি বাক্যে সে দৃঢ় করিয়াছিল। বজ্রের কঠোর আঘাতে যে অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কোন প্রচণ্ড দুঃখই সেই দুঃসহ মর্ম্ম-জ্বালাকে ছাপাইয়া উঠিতে পারিবে না।

বয় আসিয়া কার্ড দিল,—মিসেস্‌ বেলা চাটার্জ্জি।

প্রত্যূষের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইয়া মুখমণ্ডলে একটা সঙ্কল্পের ছাপ ফুটিয়া উঠিল। আসিবার সম্মতিটা সে বাতাসে মাথা ঠুকিয়া জানাইল।

মিসেস্‌ চাটার্জ্জি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র প্রত্যূষ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া কহিল,—আমি আপনার পত্র পেয়েছিলুম

একখানা আসনের উপর বসিয়া-পড়িয়া মিসেস্‌ চাটার্জ্জি কহিলেন,—কিন্তু আমি তার জবাব পাইনি ; তাই তোমার মুখ হ'তে সেটা নিতে এলুম।—আর তুমি উত্তরটা দেবার পূর্ব্বে এই কথাটা স্মরণ রেখ যে, যার সামনে ব'সে তুমি কথার উত্তর দিচ্ছ, সে তোমার মাতৃস্থানীয়া

মিসেস্‌ চাটার্জ্জির কথার শেষ অংশটায় প্রত্যূষের ওষ্ঠাগ্রে উত্তরটা সহসা কেমন বাধিয়া গেল! নীরবে অধোবদনে সে নিজের সুকঠিন মন্তব্যটাকে একটা কোমল আবরণে ঢাকিবার ভাষাটাকে ভাবিয়া-লইবার চেষ্টা করিল।

এই নীরবতার ফাঁকটাই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া মিসেস্‌ চাটার্জ্জি কহিলেন,—আমার পত্রে আমি তোমার কাছে আমার মনের কথাই ব্যক্ত করেছি। তথাপি আমার আরও কিছু বলবার আছে।

প্রশ্নপূর্ণ চক্ষু তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে প্রত্যূষ চাহিল।

মিসেস্‌ চাটার্জ্জি কহিলেন,—অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম কর্ত্তে চাইচ ব'লেই তুমি আমার সাহায্য নিতে অসম্মত ; কিন্তু অদৃষ্টের সুকঠিন বন্ধনকে মানুষ শত চেষ্টাতেও বিন্দুমাত্র শিথিল করতে পারে না। অচিন্তনীয় এর আনাগোনার পথ, কোন মানুষই

কোন দিন তা চোখে দেখতে পায় না। প্রত্যূষ, আজ তুমি আমার সংস্পর্শে আসতে অনিচ্ছুক; কিন্তু তোমাকেই পুত্ররূপে পেতে একান্ত আমার বাসনা কেন তা জান?

এ কথার উত্তরে প্রত্যূষ শান্তস্বরে কহিল,—আমার বিচিত্র অদৃষ্টটা দারুণ দুর্ভাগ্য-বোধেই বোধ করি আপনার স্নেহ-কোমল অন্তরে করুণার উদ্রেক হয়েছে; কিন্তু যার জন্যে সকলের এতখানি আফ্‌শোষ, তার জন্যে আমি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত নই। ঐশ্বর্য্য নিয়ে সকলেই জন্মগ্রহণ করে না; কিন্তু বিধাতার কাছে সকলেরই আপনাকে মানুষ ক'রে তুলবার দাবী চলে। জন্মগত এই একটি মাত্র অধিকারকেই আমি মানি,—তা ভিন্ন বেদনা পাওয়ার কিছু নেই; আছে কেবল সুতীব্র প্রেরণা, আর অজস্র উৎসাহ,—অতএব আমায় আপনি ক্ষমা করবেন। কারও করুণা অবলম্বন ক'রে আমি মানুষ হ'তে চাইনে।

প্রত্যূষ দুই হাত জোড় করিল।

মিসেস্ চাটার্জ্জি প্রত্যূষের প্রত্যেক কথাই গভীর মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিলেন; সে থামিবামাত্র তিনি ধড়-মড় করিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া একেবারে প্রত্যূষের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—না, প্রত্যূষ, না! নিদারুণ আত্মাভিমানে লোক অনেক সময়ে কঠোর কর্ত্তব্যের পদে আত্মবলি দেয়। এ নতুন নয়, প্রথমও নয়। আমি কিন্তু তা তোমায় করতে দিতে পারব না; না, কোনমতে নয়।

একান্ত স্নেহাস্পদের অকল্যাণ আশঙ্কায় চঞ্চল হওয়ার মত মিসেস্ চাটার্জ্জির আর্ত্তস্বরে বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া প্রত্যূষ তাঁহার মুখের দিকে নির্ব্বাক্ ভাবে চাহিয়া রহিল।

মিসেস্ চাটার্জ্জি কহিতে লাগিলেন,—চিঠিতে অনেক কথা লিখলেও একটা অংশ উহ্য রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, সেটা বলবার প্রয়োজন হবে না; কিন্তু প্রত্যূষ, তাও তোমার কাছে বলছি—তার পর তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কো'র।

মিসেস্ চাটার্জ্জি এক মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রত্যূষ, তুমি ত জান, কর্ণেল চাটার্জ্জি কত বড় অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন;—মেডিকেল কলেজের সার্জ্জারী বিভাগে তিনিই তখন প্রধান। তোমার বাবার "গল-ব্লাডার" অপারেসন তিনিই করেন; কিন্তু সামান্য একটু ত্রুটি—যেটা আর কেউ ধরতে পারেনি, তাতেই তোমার বাবার জীবন শেষ হ'লো! সেই ভুলের জন্য কর্ণেল এতই মর্ম্মাহত হ'য়েছিলেন যে, সেই ঘটনার পরই চিকিৎসা-ক্ষেত্র হ'তে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। স্বামি-স্ত্রী আমরা য়ুরোপ চ'লে গেলুম; কিন্তু কর্ণেলের মনঃপীড়ার আর উপশম হ'ল না। তারই ফলে তাঁর দেহ-মন একটা কঠিন অবসাদে আচ্ছন্ন হ'ল। কিন্তু হঠাৎ দৈব-দুর্ঘটনায় ঘোড়া হ'তে প'ড়ে-গিয়ে তাঁর একখানা পা' সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হ'ল! সেই সময়ে তিনি প্রায়ই আমার কাছে গল্প করতেন, সমীর দত্ত যখন অপারেসন্-টেবলে উঠল, তখন এক বছরের শিশু-সন্তানটিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে, তাকে চুমো খেতে-খেতে তার সে কি ভীষণ কান্না! পুরুষ মানুষকে অমন ব্যাকুল ভাবে কাঁদতে দেখে মনে মনে না হেসে আমি থাকতে পারিনি।—বুড়ো বয়েসে ছেলে হ'লে তার জন্যে কি মানুষ ঐ রকম ক্ষেপে যায়? কিন্তু পরে জান্‌তে পারলুম—কত-বড় পিতৃস্নেহের কাতরতা তার দু'চক্ষু ব'য়ে অঝোর-ধারায় ঝ'রে পড়েছিল! বেলা, এখন একটা অসম্ভব চিন্তা থেকে-থেকে আমার মনে জাগে। যদি সেই পিতৃমাতৃহারা পরানুগ্রহ-পালিত, স্নেহবঞ্চিত ছেলেটাকে নিকটে পাই তো অজস্র-ধারায় স্নেহ-মমতা ঢেলে তার বেদনাটা ধুয়ে দিই। আমারও এই দুর্ব্বিসহ গ্লানির বোঝা অনেকটা লঘু হ'য়ে আসে; অনুতাপের আগুনটা নিবে যায়। কিন্তু এত দূরে সমুদ্রের অন্য পারে ব'সে তার সন্ধান পাই কি ক'রে? তুমি যদি কখন পার তো সেই কাজটি কোরো,—তুমিও তো নিঃসন্তান।

স্বামীর উক্তি বলিতে বলিতে মিসেস্ চাটার্জ্জির কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। তিনি একটু থামিয়া আর্দ্রস্বরে কহিলেন,—প্রত্যূষ, আমার স্বর্গগত স্বামীর অনুতপ্ত চিত্তের বোঝাটাকে লঘু করবার ইচ্ছায় ও-দেশ থেকে ফিরে-এসেই তোমার সন্ধান করেছিলুম। অত ক'রে তোমায় কাছে পেতে চেয়েছিলুম। কিন্তু এ সকল কথা বলা যায় না ব'লেই—তোমার পিতার সঙ্গে আমার এক দিন যে

বিশেষ সখ্যতা ছিল, সেই বন্ধুত্বের দিক্‌টা দেখিয়েই আমি তোমাকে সাহায্য করবার প্রস্তাব ক'রেছিলুম; কিন্তু সে তো সত্য নয়, তাই বুঝি তোমায় পেলুম না! বুঝতে পারলুম, মিথ্যার সাহায্যে কোন বড় কাজ করা সম্ভব নয়; তাই যা আন্তরিক, যা সত্য, তাই অকপটে আজ তোমার কাছে ব্যক্ত করলুম। আমার স্বামীর শেষ ইচ্ছা স্মরণ ক'রেই, দু'বাহু বাড়িয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি বাবা! এখন তোমার দয়ার উপর, করুণার উপর, আমার অবশিষ্ট জীবনের শান্তি নির্ভর করছে!

প্রত্যূষ স্তব্ধ ভাবে সকলই শুনিল। আত্মনির্ভরশীল সুদৃঢ় অন্তরের, পাহাড়ের মত উচ্চ যে অভিমান বুকে চাপিয়া সে ভাগ্য-দেবতাকে চিরদিন উপহাসভরে তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছে—সেই রহস্যময় দেবতাই আজ এক অদ্ভুত খেলাচ্ছলে প্রত্যূষের কর্ত্তব্যের পথরোধ করিয়া, কিছু-কালের জন্য তাহার বুদ্ধির প্রখরতাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত করিয়া ফেলিল। রথচক্র-গ্রাসের মুহূর্ত্তে কর্ণের যেমন সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি, রণ-কৌশল কুয়াশাচ্ছন্ন হইয়া অবলুপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ দিগ্‌ভ্রান্তের মতই বিমূঢ় দৃষ্টিতে প্রত্যূষ স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া রহিল।

সময় মাত্র এক ঘণ্টা! তাহারও কুড়ি মিনিট এই ভাবে অতিবাহিত হইল। প্রত্যূষ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিতে উদ্যত! জাহাজে প্রথম শ্রেণীর একটি কেবিন তাহার জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অভাবনীয় ভাবে কি বিপত্তি তাহার সম্মুখে সমুপস্থিত! সে বহু বিবেচনার পর অটুট পণ লইয়াই স্বীয় কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছে। মাতুলের ক্ষোভ, মাতামহীর অশ্রুপ্রবাহ তাহার পাষাণ-চিত্তকে কোন দিনও এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই, সঙ্কল্পবিচ্যুত হইবার কোন সম্ভাবনা কোথাও কোন দিকে ছিল না, এবং যাত্রার উল্লাসেই তাহার চিত্ত অধীর আগ্রহে উন্মত্তপ্রায়! সে জানিত, পার্থিব কোন মায়াপাশই কোন দিন তাহাকে শৃঙ্খলিত করিতে পারিবে না; সে চিরমুক্ত! এমনি একটা স্বাধীনতার গর্ব্ব লইয়া সে সোনার বাঙ্গালা ছাড়িয়া আসিয়াছে। আচম্বিতে কিন্তু এ কি অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত নিগড় তাহার বন্ধনের জন্য রচিত হইল? তাহার সম্মুখে উপবিষ্টা এই অপরিচিতা প্রৌঢ়া মহিলার এ কি মোহ-মন্ত্র তাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিল। প্রত্যূষ যেন নিজের কাছে নিজেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিল! তথাপি এই স্নেহময়ী মহিলার বিগলিত অশ্রুধারা এক অনাস্বাদিত স্নেহের পরশ দিয়া তাহার কঠিন চিত্তকে যেন দ্রব করিয়া ফেলিল!

প্রত্যূষ যেন চক্ষুর সম্মুখে একটি শ্মশ্রুগুম্ফহীন ছায়াময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহার সকরুণ দৃষ্টি প্রত্যূষ নিজের মুখের উপর সন্নিবিষ্ট দেখিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি মুখের প্রতিবিম্ব কল্পনা-মুকুরে ভাসিয়া উঠিল। মৃত্যুর মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার ভিতর অন্তিমের শেষ-নিঃশ্বাসের মধ্যেও কি আকুলতা তাহার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে? যে পিতার অস্পষ্ট ছায়াও সে কখন কল্পনা করিতে পারে নাই, তাঁহারই মমতা প্রত্যূষ সহসা সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

মিসেস্ চাটার্জ্জি কহিলেন,—প্রত্যূষ, তুমি কি আমায় নিরাশ করবে বাবা!

প্রত্যূষের যেন চমক ভাঙ্গিল। নত হইয়া সে মিসেস্ চাটার্জ্জির পদধূলি লইয়া কহিল,—মা, আমার বাবা-মার আকুলতা আজ আমাকে স্পর্শ করছে,—বলিয়াই প্রত্যূষ স্তব্ধ হইল। উদ্গত অশ্রুরাশি চাপিবার জন্য সে জোর করিয়া ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সেই অশ্রু দুঃখের কি আনন্দের, তাহা জানিলেন কেবল তাঁহারই অন্তর্য্যামী। ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আন্দোলনে মাটীর বুক চিরিয়া সলিলধারা উদ্গত হইবার মত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে প্রত্যূষের সমগ্র জীবনব্যাপী বিদ্রোহের যে সাধনা, যে সংগ্রাম-সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইয়াছিল,—তাহারই নিদারুণ পরাভব এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের কারণ কি না, কে বলিতে পারে? তাই কেবল তাহার সমগ্র অন্তর মথিত করিয়া শুধু এই একটি কথাই জাগিয়া উঠিল,—বিধাতার খেলায় মানুষ ক্রীড়নক মাত্র!

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী।

কালিম্পং ও গ্যাংটকের গিরিশিখরে

পূজার পরেই খেয়াল হ'ল দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে কাছাকাছি কোথাও যাওয়া চাই। আমার ভ্রমণের চির-সঙ্গী বন্ধুবর সরোজকুমারের সঙ্গে পরামর্শ আরম্ভ হ'ল—কোথায় এবার যাওয়া যায়? দার্জ্জিলিং, পুরী পুরানো হ'য়ে গেছে, এসব আর চ'লবে না। শেষে স্থির হ'ল, —কালিম্পং যাওয়া যাক। বৃথা তর্ক-বিতর্কে আর সময় নষ্ট না ক'রে, এক মধুর সন্ধ্যায় দার্জ্জিলিং মেলের আরোহী হওয়া গেল। আমাদের সঙ্গে রইলেন স্নেহভাজন একটি তরুণ যুবক।

নিশাবসানের সঙ্গে আমাদের ট্রেণ শিলিগুড়ির যতই কাছে আসতে লাগল, শীতের আতিশয্যে আমাদের সর্ব্বশরীর ততই শির্-শির্ ক'রতে লাগল। তিন জনে একে একে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করলাম। সুতির সাদা জামা-কাপড় ক্রমশঃ অচল হওয়ায় সুটকেস থেকে গরম সোয়েটার বা'র ক'রে গায়ে চাপাতে হ'ল।

শিলিগুড়িতে গাড়ী থা'মলে আরোহীরা সেখানে নেমে গেলেন। আমাদেরও নামতে হ'ল। কালিম্পং-যাত্রীদের এখানে গাড়ী বদল ক'রে, দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের ছোট গাড়ীতে চেপে প্রায় বাইশ মাইল দূরবর্ত্তী গিল-খোলা ষ্টেশন পর্য্যন্ত যেতে হয়; সেখান থেকে ট্যাক্সিতে অথবা মোটর-বাসে বারো মাইল গেলেই কালিম্পং। রেলপথে না গিয়ে শিলিগুড়ি থেকে টানা মোটরেও কালিম্পং যাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাতে প্রায় বিয়াল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রতে হয়; তথাপি ট্রেণের পূর্ব্বেই পৌঁছান যায়। সব-দিক বিবেচনা ক'রে শেষোক্ত পথে যাওয়াই সঙ্গত মনে হ'ল।

অনেক দরকষাকষির পর একটা 'ফোর-সিটার' ট্যাক্সি ভাড়া করা গেল। প্রত্যেক সিটের ভাড়া স্থির হ'ল দু'টাকা। ড্রাইভারের পাশের সিটটি পাচক শ্রেণীর এক জন বিহারী আরোহী পূর্ব্বেই দখল করেছিলেন। ভালই হ'ল; পশ্চাতের সিটে আমরা তিন জন একত্র ব'সলাম। এই প্রসঙ্গে ব'লে রাখি, প্রত্যেক সিটের দু'টাকা ভাড়া খুব সস্তাই হ'য়েছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক সিটের জন্য তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা দিতে হয়। তারপর 'ঝোপ বুঝে কোপ' যখন মারে, তখন পাঁচ ছ' টাকাও হাঁকে, এবং ভোজনহস্তেই অগত্যা তাই দিতে হয়।

ড্রাইভারটি স্থানীয় লোক। আমরা গাড়ীতে ব'সে আছি তো আছিই; তা'র কিন্তু গাড়ী ছাড়বার বিন্দুমাত্র চাড় দেখা গেল না! অদূরে দণ্ডায়মানা পার্ব্বত্য তরুণীর সঙ্গে রসালাপেই সে মজ্‌গুল! অনেক অনুরোধ উপরোধ, অবশেষে ভয়-প্রদর্শনের পর সে গাড়ী ছাড়ল। ষ্টেশন পশ্চাতে ফেলে শিলিগুড়ির বাজারের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ী অগ্রসর হ'ল।

বাজার ছাড়িয়ে মোড় ঘুরতেই সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ সুন্দর সমতল পথ। পথের দু'পাশে মুক্ত প্রান্তর। রৌদ্র-সমুদ্ভাসিত নীলাকাশ তা'র প্রান্ত-সীমা আলিঙ্গন ক'রছে। তা অতীব উপভোগ্য ব'লেই মনে হ'চ্ছিল। দেখতে দেখতে বায়স্কোপের ছবির মতন প্রান্তর ক্রমশঃ অদৃশ্য হ'ল, এবং আমরা গহন অরণ্য-মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন পথে এসে প'ড়লাম। তরুশাখার অন্তরালে সুলোহিত তপন তখন অস্তমিত। বিশাল পাদপশ্রেণী আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সমগ্র প্রকৃতি সুগম্ভীর নীরবতায় বিলীন হয়ে যেন থম্‌থম্ করছে; আর ঝিল্লীর অশ্রান্ত ধ্বনি সেই নীরবতা ভঙ্গ করবার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে মন্থর গতিতে চলেছে—কাঠ-বোঝাই গরুর গাড়ী। শুনলাম, পথের দু'ধারের এই অবণ্যানী সরকারের 'রিজার্ভ ফরেষ্ট'।

এই ভাবে আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে কিছুকাল যাওয়ার পর উদরে ক্ষুধার সঞ্চার হ'ল। আহার্য্যও রয়েছে সঙ্গে; অভাব কেবল পানীয় জলের। ড্রাইভার সে কথা শুনে বললে, একটু অপেক্ষা করলেই পানীয় জল মিলবে; সুতরাং ধৈর্য্যধারণ ক'রতে হ'ল।

কিছুকাল পরে আমাদের গাড়ী তিস্তা নদীর সম্মুখেই এসে দাঁড়াল। পথের পাশেই ছিল চায়ের দোকান; ড্রাইভার সেইখানে আমাদের প্রাতরাশ সম্পন্ন করবার পরামর্শ দিলে। নিজেও সে গাড়ী থেকে নেমে দোকানে প্রবেশ ক'রলে। কিন্তু সেই পার্ব্বত্য আবেষ্টনের মধ্যে তিস্তার অপরূপ মূর্ত্তি যেন ক্ষণেকের জন্ম আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়ে দিলে! সম্মুখে পর্ব্বতের পটভূমি, তা'রই কোলে কোলে স্বচ্ছসলিলা চঞ্চলা স্রোতস্বিনী নৃত্য-লীলায় প্রবাহিত হ'য়েছে—অদূরবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলনের আকুল আগ্রহে। ক্ষণেকের জন্ম তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলাম; সে তন্ময়তা ভঙ্গ হ'ল বন্ধুর বাক্যে। তিনি বললেন,—"সূক্ষ্মভাবে বিভোর হ'য়ে গেলে যে! কিন্তু আমার এই স্থূল অরসিক উদরে যে আগুন জ্বলছে; সে অনল নির্ব্বাণ করা দরকার, অতএব চল।"

গাড়ীর মধ্যেই ভোজনকার্য্য সমাধা করা হ'ল। দোকান থেকে চা' আনিয়ে নিলাম। বন্ধুবরের স্থূল উদর সুগোল উপাধানের আকার ধারণ করলে। আবার আমরা অগ্রসর হ'লাম। 'সিভোক' নামক ছোট্ট গ্রামটিকে আমাদের পশ্চাতে ফেলে এলাম। স্থানীয় লোকদের ছোট দু'-চা'রখানা বস্তি মাত্র সেই গ্রামের সম্বল; আর আছে সরকারের অরণ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্ম একখানি বাঙলো।

এইখান থেকেই তিস্তার উপত্যকা আরম্ভ; শিলিগুড়ি থেকে এই ছ'সাত মাইল পথ সমতল ছিল; কিন্তু এইবার ক্রমোন্নত চড়াই সুরু হ'ল, অর্থাৎ এতক্ষণে প্রকৃত পার্ব্বত্য পথের আরম্ভ। কার্টরোড তিস্তার পাশ দিয়ে বরাবর বিসর্পিত গতিতে এঁকে-বেঁকে অগ্রসর হয়েছে। মনে হ'ল, কৌতুকময়ী তিস্তার সঙ্গে যেন আমাদের অবিরাম লুকোচুরি খেলা চলেছে। তিস্তা কখনও নয়নের অগোচর হচ্ছে, কখনও বনান্তরাল থেকে চকিতে আত্মপ্রকাশ ক'রছে; ক্ষণে ক্ষণে তা'র অপরূপ রূপের পরিবর্ত্তন! এই দেখি, পুঞ্জীভূত বনচ্ছায়াতলে তিস্তা যেন গভীর আলস্যে তা'র শিথিল মন্থর

দেহ প্রসারিত ক'রে স্থির হ'য়ে আছে ; আবার পরক্ষণেই সবিস্ময়ে দেখি, রবিকরোজ্জ্বলা, উপলব্যাহতা, কলস্বনা, বেগবতী স্রোতস্বিনী তা'র অপূর্ব্ব নর্ম্মনৃত্যে পথিকজনের মন মুগ্ধ ক'রছে। সহসা মনে হ'ল, তিস্তার উদ্দেশে রচিত একটি কবিতায় পড়েছিলাম,—

"..................নর্ত্তন-নিপুণ,
তন্বী মেনকার মত, অজস্র প্রলাপে,
উচ্চকি পাইন বন, নামো ধাপে ধাপে।"

সম্মুখে উন্নত পর্ব্বত, নিম্নে স্রোতস্বিনী, আর চতুর্দ্দিকে গহন কাননশ্রেণী, এই তিনের মিলনে যে অবর্ণনীয় নৈসর্গিক শোভার বিকাশ হ'য়েছে, তা' দেখে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ হ'ল,—"মনে হয় এ মহাসৃষ্টির কাছে কি ছার মানবের তুচ্ছ অস্তিত্ব, কি ক্ষুদ্র মানুষের জীবন !"

শিলিগুড়ি থেকে ষোলো মাইল এসে একটি চড়াইএর মুখে মোড় ঘুরতেই আমাদের দক্ষিণে—পথের পার্শ্বেই দেখলাম, কালিঝোরা পূর্ত্তবিভাগের বাঙলো। নিকটেই কালিঝোরা নাম্নী একটি পার্ব্বত্য তটিনীর সঙ্গে তিস্তার মিলন হয়েছে ; সেই জন্য এই অঞ্চলটির নাম কালিঝোরা। বাঙলো পশ্চাতে ফেলে কার্টরোড দিয়ে এঁকে-বেঁকে আমরা এগিয়ে চ'ললাম। নিম্নে দৃষ্টিপাত ক'রে মধ্যে মধ্যে দেখতে পাচ্ছি—তিস্তার তট-ঘেঁসে রেলপথ অগ্রসর হয়েছে। ভুলের জন্য একটু আক্ষেপ হ'ল ; মনে হ'ল, ট্রেণে এলে ভ্রমণটা আরও অধিক উপভোগ্য হ'ত।

পথ স্থানে স্থানে এমন সঙ্কীর্ণ যে, ড্রাইভারের মুহূর্ত্তের অনবধানতায় আমাদের পরিণাম কি হ'তে পারে, তা চিন্তা ক'রে শরীরের রক্ত বোধ হয় বরফের মতন জমে যেত, যদি-না তিস্তার অপরূপ লীলাচাঞ্চল্য আমাদের আত্মবিস্মৃত ক'রে রাখত। কত যত্নে ও কৌশলে এই পার্ব্বত্য পথ নির্ম্মিত হ'য়েছে, তা চিন্তা করলে সত্যই বিস্মিত হ'তে হয় ! সরকারী পূর্ত্তবিভাগকে এই পথের তত্ত্বাবধানের জন্য সততই সতর্ক থাকতে হয় ; কারণ, স্থানে স্থানে গিরিদেহ থেকে প্রবহমান জলধারা পথের ক্ষতিসাধন ত' করেই, তদুপরি বর্ষার সময় তিস্তা যখন উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে ছুটে চলে 'আকুল পাগলপারা,'—"হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
তালে তালে দিয়া তালি,"
তখন সেই বেগবতী তিস্তার প্রকোপ থেকে ছোট ছোট সাঁকো-গুলিকে রক্ষা করতে পূর্ত্তবিভাগকে যথেষ্ট কষ্টস্বীকার করতে হয়।

কালিঝোরা বাঙলোকে পশ্চাতে রেখে পাঁচ মাইল আসতেই পথিপার্শ্বে দর্শন মিলল—বিরিক বাঙলোর। আমরা তখন সাগর-তল (Sea-level) থেকে ন'শ ফিট ঊর্দ্ধে উঠেছি। আরও কিছু দূর গমনের পর দেখলাম—পথে কতকগুলি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। সম্মুখেই তিস্তার ওপর ঝোলা-সাঁকো (Suspension bridge)। ড্রাইভার বললে, এখানে সকল আরোহীকে অবতরণ করতে হয়, কারণ, আরোহীসহ গাড়ীর এই সাঁকো পার হওয়া নিষিদ্ধ। এই সতর্কতার বাণী সেখানে লেখাও আছে ; সুতরাং গাড়ী থেকে নেমে, পদব্রজে সেতু পার হ'য়ে তিস্তার অপর পারে উপস্থিত হ'তে হ'ল। বন্ধু ক্যামেরা বা'র ক'রে তাড়াতাড়ি সেই ব্রিজের একখানি 'স্ন্যাপ' নিলেন। গাড়ী ব্রিজ পার হ'য়ে এলে আবার তাতে উঠে ব'সলাম। আট মাইল দূরবর্ত্তী 'গিলখোলা' ছাড়িয়ে আরও দু' মাইল যাওয়ার পর তিস্তা-ব্রিজ পাওয়া গেল। প্রায় এই দশ মাইল পথের মধ্যেই প্রকৃতির যে অভিনব শোভা সন্দর্শন ক'রলাম, তা'তেই সকল অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম সার্থক মনে হ'ল।

তিস্তা ব্রিজের কাছে বহু লোকের সমাগম হ'য়েছে। শুনলাম, অদূরে একটি বাজার আছে। বর্ত্তমান তিস্তা-ব্রিজ ফেরো-কংক্রীট দিয়ে আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লাট স্যার জন এণ্ডারসনের নাম অনুসারে এর নাম হয়েছে—"এণ্ডারসন্ ব্রিজ।" ব্রিজে উঠবার মুখেই একটি পোষ্টসংলগ্ন সাইন-বোর্ডে অঙ্কিত পথ-নির্দেশ পাঠ ক'রে জা'নলাম, আমরা যে পথে আসছি,
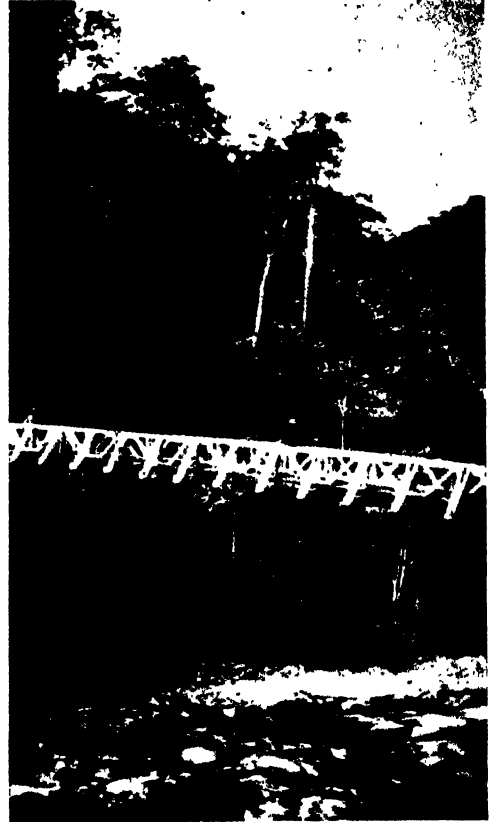
তিস্তার উপর একটি ঝোলা পুল—কালিম্পং

এই পথেই সাড়ে বাইশ মাইল গেলে দার্জ্জিলিং। আর আমাদের দক্ষিণে ব্রিজ পার হ'য়ে দশ মাইল দূরে কালিম্পং। ব্রিজ পার হ'বার সময়ে নিকটেই আর একটি ব্রিজের ভগ্নাবশেষ দে'খলাম। নূতন তিস্তা-ব্রিজ নির্ম্মিত হওয়ার পূর্ব্বে ঐখানে যে ঝোলা-ব্রিজ ছিল, সেটা তারই ধ্বংসাবশেষ।

সাগরতল থেকে কালিম্পঙের উচ্চতা চার হাজার তিন শ' ফিট। আমরা উঠেছি কেবল কিঞ্চিদধিক সাত শ' ফিট উঁচুতে ; অবশিষ্ট প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফিট ঊর্দ্ধে উঠতে আমাদের মাত্র দশ মাইল পথ অতিক্রম ক'রতে হবে। এতেই বুঝতে পারা যায়, এই দশ মাইল পথ কিরূপ খাড়াই !

অর্দ্ধ মাইল মাত্র পথ যেতেই দে'খলাম, আমাদের বামে একটি

অনতিপ্রশস্ত পথ চ'লে গেছে, তা'রই মুখে একটি কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত—গ্যাংটক,—৩৮½ মাইল, রংপো,—১৪ মাইল।" কিন্তু আপাততঃ আমরা গ্যাংটকের পরিবর্ত্তে আমাদের গন্তব্য স্থানেই এগিয়ে চ'ললাম। যতই উপরে উঠতে লাগলাম, ক্রমে ততই বেশী শীত করতে লাগল। এদিকের পথ অতি সুন্দর, এঁকে-বেঁকে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠেছে। গিরিদেহে স্থানীয় চাষীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে
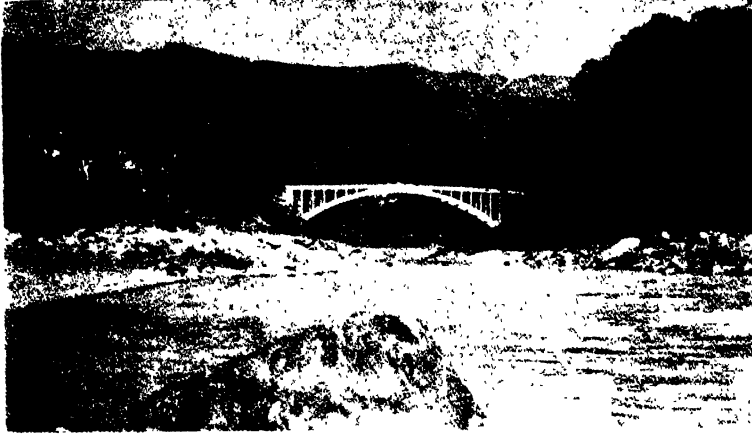
তিস্তা বা এণ্ডারসন ব্রিজ,—কালিম্পং

সোনা ফলিয়েছে; থাকে-থাকে সুসজ্জিত ধান-গাছ; বাতাসে শীষগুলি আন্দোলিত হ'চ্ছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটীর; পথের ধারে কত অপরিচিত গাছে নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে। ক'লকাতার যে-কোন নার্শারীতে সে-সব ফুল বোধ করি ভাল দরেই বিক্রয় হ'তে পারে। সহসা দূরে দেখা গেল, ছোট ছোট বাঙলো-ধরণের বাড়ী—যেন চিত্রপটাঙ্কিত। ড্রাইভার ব'ললে, ঐ ত কালিম্পং; আর কয়েক মাইল মাত্র বাকি। সেই পথটুকু অতিক্রম ক'রে এসে প্রথমেই পথিপার্শ্বে সাইনবোর্ডে একটি হোটেলের নাম দেখলাম—"শৈলাবাস।" যাত্রারম্ভে ক'লকাতা থেকে দু'-তিনটি হোটেলের খোঁজ নিয়ে এসেছিলাম; যেখানে সুবিধা হবে, উ'ঠব। এই হোটেলটিতে যেতে হ'লে, পথ থেকে একটু চড়াই এ উঠতে হয়। এজন্য গাড়ী নীচে রেখে দু'জনে উপরে উঠলাম। হোটেলের নব-নির্ম্মিত সুদৃশ্য বাড়ীটি ও তা'র রমণীয় আবেষ্টন দেখে চমৎকার মনে হ'ল। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের অভিবাদন ক'রে ভিতরে নিয়ে-গিয়ে হোটেলের সকল অংশই সযত্নে দেখালেন; দেখে আমরা এতই খুসী হ'লাম যে, আর কোন হোটেল পরীক্ষা না ক'রে, তারই তিন-সিটওয়ালা একটি কামরা ভাড়া ক'রে ফেললাম। আমরা পোষাক খুলতে-খুলতেই হোটেলের ভৃত্য "বাহাদুর" গাড়ী থেকে মাল নামিয়ে এনে, শয্যাদি রচনা ক'রে, অবিলম্বে ঘরটিকে বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজিয়ে ফেললে। তার পরই ম্যানেজার বামাচরণ বাবু এসে ব'ললেন,—"আপনারা দীর্ঘভ্রমণে ক্লান্ত হ'য়ে এসেছেন, বেলাও হয়েছে; গরম জল তৈয়ারী, আপনারা বাথরুমে যান। আমি আহারের ব্যবস্থা করছি।"

আহারে ব'সে বুঝতে বিলম্ব হ'ল না,—ভোজ্যদ্রব্যগুলি বাড়ীর মেয়েদের তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুত হয়েছে। বামাচরণ বাবুও সবিনয়ে সে কথা স্বীকার ক'রলেন।

আহারের পর বাড়ীর বাইরে একটু রৌদ্র উপভোগ ক'রবার ইচ্ছা হ'ল। বাড়ীটির চারিধারে প্রশস্ত হাতা। সেই হাতার মধ্যে মনোরম উদ্যান রচনা করা হ'য়েছে। কত বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে অপরূপ শোভা বিকাশ করেছে যে, তা' দেখে ম্যানেজার বাবুর সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের তারিফ করতে হ'ল। বাগানের এক প্রান্তে বাগানের বেঞ্চিতে ব'সে সম্মুখে চেয়ে দেখলাম, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত উপত্যকা, আর সেই উপত্যকাকে বেষ্টন ক'রে তরঙ্গাকার শৈল-শিখরশ্রেণী! বিমুগ্ধ নয়নে নির্ব্বাক্ হ'য়ে বহুক্ষণ সেই দিকেই চেয়ে রইলাম।

দিবাবসানে সহর-পরিভ্রমণে বা'র হওয়া গেল। কালিম্পং সহর খুব বড় নয়। দার্জ্জিলিঙের মতন জাঁকজমক এবং আড়ম্বরেরও এখানে অভাব। বেশ নিরাড়ম্বর শান্তিপূর্ণ আব্‌হাওয়া; অবকাশ-যাপনের উপযুক্ত নিভৃত স্থান বটে। পিচঢালা রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত; দার্জ্জিলিঙের রাস্তার অপেক্ষা চড়াইও অনেক কম। যান-বাহনের মধ্যে এখানে ট্যাক্সি ও মোটর-বাস ভিন্ন আর কিছু নেই। বাজার যে পল্লীতে অবস্থিত, সেই দিক্‌টাই খুব অপরিষ্কার; বসতিও সেখানে ঘনসন্নিবিষ্ট। বড় বড় দোকান সবই যথারীতি মাড়োয়ারীদের। বাঙালীদের দোকান-কয়টি আঙ্গুলে গণনা করা যায়। বাঙালী-পরিচালিত ঔষধালয় আছে মাত্র দু'টি;—একটি এ্যালোপ্যাথিক, অন্যটি হোমিওপ্যাথিক। তদ্ভিন্ন একটি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিছুদিন পূর্ব্ব-পর্য্যন্তও কালিম্পঙে সিনেমা-গৃহ ছিল না। প্রায় দু'বৎসর হ'ল 'নভেলটি সিনেমা' প্রতিষ্ঠিত

হোটেল শৈলাবাস—কালিম্পং

হওয়ায় স্থানীয় লোকদের আনন্দদানের ব্যবস্থা হ'য়েছে। আনন্দের বিষয়, সিনেমাটি দু'জন বাঙালী ভদ্রলোক কর্ত্তৃক পরিচালিত। বাজারে সাধারণতঃ তরি-তরকারী বিশেষ-কিছু পাওয়া যায় না; সপ্তাহে মাত্র দু'দিন, বুধবার ও শনিবার হাট বসে। সেই সময় বহু

জন্ম প্রায় সকল কাজই তা'দের স্বহস্তে ক'রতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এরূপ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান, অথচ এর পরিচালন-ব্যয়ের প্রায় সমস্তই জনসাধারণ প্রদত্ত চাঁদা থেকে নির্ব্বাহ হচ্ছে।

আশ্রম দেখা শেষ হ'লে মিঃ কেন্সিকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে ও আশ্রমের জন্য যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা প্রদান ক'রে আমরা বাজারে ফিরে এলাম। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বাজার-সন্নিহিত 'মিসেস্ ক্যাথরিন গ্রেহাম্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুল'টি দেখতে যাওয়া গেল। এই স্কুলটিতে স্থানীয় অধিবাসিগণকে কার্পেট, পর্দ্দা, সুজনী প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প-দ্রব্যের নির্ম্মাণপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে মাত্র দু'জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আছেন,—বয়ন বিভাগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ কুশারী ও মুদ্রণ বিভাগে শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। স্কুল দেখে ফিরে আসার সময় পথের ধারে দেখলাম, "কালিম্পং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক।"—এইটিই কালিম্পঙের একমাত্র ব্যাঙ্ক।

বাজারের অদূরে অবস্থিত সরকারী কৃষি-প্রদর্শন ক্ষেত্রের (Government Agricultural Demonstration Farm) নাম পূর্ব্বেই শুনেছিলাম। দোকানীদের জিজ্ঞাসা ক'রতে ক'রতে

কালিম্পং কৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ফলন্ত কমলালেবুর গাছ—পার্শ্বে লেখকের বন্ধু

বাজারের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ নোংরা রাস্তা দিয়ে প্রায় এক মাইল নীচে নেমে-গিয়ে কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া গেল। সেই বিশালায়তন ক্ষেত্রটিতে কপি, কড়াইশুঁটি, স্কোয়াশ, সিম, টোম্যাটো, শালগম, বিট, ওলকপি, লেটুস, পেয়ারা, আলু, রাস্পবেরী, মালবেরী, ষ্ট্রবেরী, চেরী প্রভৃতি বহুবিধ শাক-সজী, ফল মূলের চাষ হ'য়েছে দেখে আমরা বিস্মিত হ'লাম। এক স্থানে মাত্র মানুষ-প্রমাণ উচ্চ সারি সারি কমলালেবুর গাছগুলির শাখায় প্রচুর পরিমাণে বড় বড় কমলা শোভা পাচ্ছে। স্থানীয় বহু গৃহস্থের বাটীতে এই সকল ফল-মূল, শাক-সজী সরবরাহ করা হয়; মাস কাবারে তাঁরা তাঁদের দেয় মূল্য পরিশোধ করেন। কৃষিক্ষেত্র দেখে যখন হোটেলে ফিরলাম, শরীর তখন পথশ্রমে অবসন্ন।

আহারাদির পর সেদিন হোটেলের হাতায় গার্ডেন-বেঞ্চে ব'সে বিশ্রাম ক'রছি, ম্যানেজার বামাচরণ বাবু এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"আপনারা কি গ্যাংটক যাবেন? আর এক জন ভদ্রলোক আছেন, তিনি সঙ্গী খুঁজছেন।" বলা বাহুল্য, আমরা সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রলাম। সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হ'তেও বিলম্ব হ'ল না। পরিচয়ে জানলাম, তিনি ক'লকাতার বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়দারঞ্জন রায়। অমায়িক, নিরহঙ্কার, উৎসাহী ভদ্রলোক। ঠিক হ'ল, পরদিন প্রভাতে স্নান ও প্রাতর্ভোজন শেষ ক'রে বেলা ন'টার মধ্যেই আমরা যাত্রা ক'রব। ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে; সে-জন্ম বামাচরণ বাবু আমাদের অভয় দিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে প্রচুর ভোজ্যদ্রব্য প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি এক জন বাঙ্গালী ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে এনে হাজির ক'রলেন। স্থির হ'ল, যাতায়াতের জন্ম সর্ব্বসমেত তা'কে পঁচিশ টাকা দিতে হবে।

সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে যেতে হবে, এই কথা স্মরণ ক'রে উৎসাহের আতিশয্যে সারা-রাত্রি সুনিদ্রা হ'ল না। রাত চারটার সময় আমরা ক'জনে শয্যাত্যাগ ক'রলাম; আমাদের কোলাহলে হোটেল মুখরিত হ'য়ে উঠল। বেলা প্রায় পৌনে-ন'টায় স্নান ও প্রাতর্ভোজন সমাপ্ত ক'রে, যথাযোগ্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত হ'য়ে চার জনেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত; এমন সময় ট্যাক্সির বংশীধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করল। বামাচরণ বাবু সযত্নে সদ্য-প্রস্তুত লুচি, তরকারি, মিষ্টান্নাদিপূর্ণ টিফিন-কেরিয়ার ট্যাক্সিতে

রংপো ব্রিজ—কালিম্পং

তুলে দিলেন। আমাদের ট্যাক্সি নেমে চ'লল পূর্ব্বপরিচিত পথে,—যে পথে আমরা কালিম্পং এসেছিলাম। সাড়ে ন'মাইল গিয়ে আমাদের দক্ষিণে গ্যাংটকের রাস্তা বা'র হ'য়ে গেছে; সেই পথ ধ'রে আমাদের ট্যাক্সি আলোছায়ার ভিতর দিয়ে, তিস্তার ধারে ধারে ছুটে চ'লল। অল্পকাল পরেই দেখলাম, রঙ্গিত নামে আর একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দুই নদীর এই সঙ্গম-স্থানটি হিন্দুদের নিকট খুব পবিত্র ব'লে বিবেচিত হয়; আর প্রতি-বৎসর জানুয়ারী মাসে এর নিকটবর্ত্তী তীরে একটি মেলা বসে; তার নাম "বেণী মেলা"। দার্জ্জিলিং জেলার শত সহস্র হিন্দু অধিবাসী সেই মেলায় যোগদান করেন। বাঙ্গালী ড্রাইভারের মুখে শুনলাম, এই রঙ্গিত নদীর এক পারে সিকিম রাজ্য, অপর পারে ব্রিটিশ রাজ্য; ইহা উভয় রাজ্যের সীমানির্দ্দেশ ক'রচে।

কালিম্পং থেকে সাড়ে তেইশ মাইল এসে রংপু-ব্রিজে পৌঁছান গেল। আমাদের ট্যাক্সি এখানে এসে থামতেই স্থানীয় পুলিশের লোক এসে খাতা খুলে' দাঁড়া'ল;—তা'তে আমাদের প্রত্যেকের নাম, ধাম, সিকিম রাজ্যে গমনের উদ্দেশ্য, সেখানে কোথায় এবং কত দিন থাকা হ'বে—প্রভৃতি লিখিয়ে দিতে হ'ল।

খাতায় অধিকাংশই দে'খলাম ইংরেজদের নাম; আর তাঁ'দের অনেকেই দু'তিন রাত্রি মাত্র সিকিমে অবস্থান ক'রবেন লিখেছেন। এত কড়াকড়ির কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, রংপুএর এই ঝোলা-সাঁকো পার হ'য়েই আমরা সিকিম রাজ্যে প্রবেশ করব; সুতরাং সতর্কতার প্রয়োজন। রংপু-ব্রিজের এদিকে ব্রিটিশ এলাকা, ওদিকে সিকিম রাজ্য। পূর্ব্বে সিকিম রাজ্যে প্রবেশ ক'রতে হ'লেই দার্জ্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনারের নিকট থেকে সকলকেই পাস্‌-পোর্ট সংগ্রহ ক'রতে হ'ত। শুনে বিস্মিত হ'লাম, ইদানী নাকি কেবল য়ুরোপীদেরই পাস্‌-পোর্ট নিতে হ'ত। সম্প্রতি পুনরায় পূর্ব্বের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, সিকিম রাজ্য-প্রবেশার্থী সকলকেই এখন পাস্‌-পোর্ট সংগ্রহ ক'রতে হচ্ছে। ব্রিজ পার হ'য়ে রংপু-বাজারে এসে পড়া গেল। দক্ষিণ সিকিমের কমলালেবুর ব্যবসা-কেন্দ্র এই রংপুতেই। সেই জন্য লেবুর সময়ে এখানে খুব সস্তায় প্রচুর লেবু কিনতে পাওয়া যায়; এবং গিলখোলা হ'য়ে ক'লকাতায় চালানও যায় বিস্তর লেবু।

ভূগোলে-পড়া সিকিম রাজ্যের ভিতর দিয়ে সশরীরে চ'লেছি,—এ কল্পনা নয়, সত্য,—তাই মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হ'ল। প্রায় সাত মাইল যাওয়ার পর এল' সিংটাম বাজার; দেখলাম, মাড়োয়ারীরাই এই জনবহুল বাজারের প্রায় সর্ব্বময় কর্ত্তা! বাজারের অদূরে সিংটাম নদীর সহিত তিস্তার মিলন হ'য়েছে।

বাজার পিছনে রেখে আমাদের গাড়ী এঁকে-বেঁকে অগ্রসর হ'ল। আমরা ক্রমে যত উঁচুতে উঠছি, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের ততই পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। খাদ গভীর থেকে গভীরতর হ'চ্ছে; মাঝে মাঝে বহু দূরে ও নীচে পার্ব্বত্য নদী দেখে মনে হ'চ্ছে যেন উজ্জ্বল বর্ণের গতিহীন সরীসৃপবৎ বক্রদেহ স্তব্ধ ভাবে প'ড়ে আছে। কোথাও অপ্রশস্ত নদীর ওপর কাঁচা বাঁশ দিয়ে দেশীয় প্রথায় নির্ম্মিত সাঁকো; ক্রমোচ্চ গিরিদেহে থাকে থাকে শ্যামলের সমারোহ; কোথাও ধানের চাষ, কোথাও বা চায়ের। আবার কোথাও গাঢ় পীতবর্ণ শর্ষপ-পুষ্পে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র যেন হাস্যময়ী। মাঝে মাঝে কমলাকুঞ্জে শাখায় শাখায় অসংখ্য লেবু শোভা পাচ্ছে। পাইন ও রডোডেনড্রনের অস্তিত্বও দুর্লভ নয়।

পথ স্থানে স্থানে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; তা'ছাড়া, ক্রমাগত পাহাড় বেষ্টন ক'রে চলার জন্য সেই সঙ্কীর্ণ পথে ঘন ঘন এমন ভীষণ বাঁক যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হয় বিপরীতগামী গাড়ীর সঙ্গে আমাদের গাড়ীর সংঘর্ষ না হওয়াটাই বুঝি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়াবহ দৃশ্য!

তিব্বত থেকে ঐ দেশীয় নারী ও পুরুষরা বহু অশ্বতরের পিঠে বোঝাই-দিয়ে পশম নিয়ে চ'লেছে; উদ্দেশ্য, কালিম্পঙের বাজারে তা বিক্রয় করবে। কারণ কালিম্পংই মধ্য ও পূর্ব্ব-তিব্বতের পশম-বিক্রয়ের অন্যতম কেন্দ্র। মাড়োয়ারী বণিকরাই পশমের বাজার নিয়ন্ত্রিত করে। শীতকালের মধ্যেই পশমগুলি কালিম্পঙে আনীত ও গুদামজাত হয়; যেহেতু, গ্রীষ্মকালে তিব্বতীরা নিম্নভূমির গরম সহ্য ক'রতে পারে না, সুতরাং নীচে নামতে চায় না। বর্ষাকালে ঘন বর্ষণের জন্য ওখানে পশম রপ্তানী ক'রবার সুযোগ হয় না; জলে ভিজে নষ্ট হয়। তিব্বতী নারী ও পুরুষের সুগঠিত, পেশীপুষ্ট দেহে তাঁ'দের দৈহিক শক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের ট্যাক্সির আকস্মিক আবির্ভাবে অশ্বতরগুলি সভয়ে পলায়নোদ্যত হওয়ায়, এক একটি তিব্বতী নারী একাই যে-ভাবে চার পাঁচটি পশুকে বশীভূত করছিল, তা' তাদের পক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তিব্বতীরা যতই বলিষ্ঠ হোক, যেমন কদাকার, তেমনি নোংরা! জন্মাবধি কোন দিন তা'দের দেহ জল স্পর্শ ক'রে কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু তবু শীতপ্রধান দেশের লোক ব'লেই এত মলিনতা সত্ত্বেও তা'দের গালে রক্তিমাভা ফুটে উ'ঠেছে। অধ্যাপক রায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"এ সবই ত' তিব্বতী দেখছি,—কিন্তু সিকিমের আদিম অধিবাসী লেপচারা কোথায়?" কিছু দূর যাওয়ার পর ড্রাইভার পথের ধারে কথোপ-কথনে রত কয়েকটি লেপচাকে দেখিয়ে দিল। তাদের বর্ণ গৌর, চেহারাও সুশ্রী; কিন্তু তিব্বতীদের চেয়ে তারা খর্ব্বকায়। মুখ, চোখ, নাকের গঠন মানানসই। সিকিমের আদিম অধিবাসী এই লেপচারা সাধারণতঃ অলস ও শান্তিপ্রিয়; এই জন্যই জীবনের যুদ্ধে নেপালী, ভূটানী, তিব্বতী প্রভৃতি অধিকতর সাহসী ও উৎসাহী পার্ব্বত্য জাতির নিকট এরা পুনঃ পুনঃ পরাভূত হ'য়েছে। পার্ব্বত্য জাতিগুলির মধ্যে এরাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দরিদ্র। কালক্রমে এরা স্বকীয় জাতিধর্ম্ম বিস্মৃত হওয়ায়, এদের বিবাহাদি ক্রিয়াও এখন আর স্বজাতির গণ্ডীতেই আবদ্ধ নয়। বস্তুতঃ, লেপচারা এদে'শের ধ্বংসোন্মুখ জাতিসমূহের অন্যতম।

বহুক্ষণ বাক্যালাপে ব্যাপৃত থাকায় কিছু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। সহসা দেখলাম, আমাদের গাড়ী একটা তেমাথা রাস্তার মোড় ঘুরে খাড়াইয়ের দিকে উঠে যাচ্ছে। সাইনবোর্ড দেখে বুঝলাম, সেই পথে আর তিন মাইল গেলেই গ্যাংটক। এখান থেকে আর একটি পথ বা'র হ'য়ে গেছে পাকিয়ঙের দিকে। শুনলাম, ঐ পথে কয়েক মাইল নেমে গেলে বোরো, টাকচাম, আর রোংনি নামক তিনটি পার্ব্বত্য নদী পর পর দেখতে পাওয়া যায়। পাকিয়ঙে একটি রেষ্ট-হাউস আছে; তা'র অদূরে কার্ত্তিক গোম্ফা নামক একটি দর্শনযোগ্য গোম্ফাও অবস্থিত।

সুপ্রশস্ত ও সুপরিচ্ছন্ন পথ দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে আমরা শীঘ্রই গ্যাংটকে উপনীত হ'লাম। পথের ধারে ধারে বৈদ্যুতিক আলোক-স্তম্ভ পা'ব, ইহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল—ওটা যখন একটা রাজ্যের রাজধানী, তখন স্থানটি তাচ্ছিল্যের যোগ্য নয়। যাক্, সহরে প্রবেশ ক'রে প্রথমেই একটি ক্ষুদ্র পশু-চিকিৎসালয় দৃষ্টিগোচর হ'ল। কয়েকটি সাধারণ বিদ্যালয়, একটি শিল্প-বিদ্যালয়, এবং স্থানীয় রাজ-কর্ম্মচারীদের কতকগুলি সুদৃশ্য বাসভবনও দেখতে পেলাম। আরও খানিকটা চড়াই উঠে, ডাকবাংলোর ঠিক সম্মুখেই আমাদের গাড়ী থামলে আমরা সকলেই নেমে প'ড়লাম। পাশেই দেখা গেল, আধুনিক প্রথায় নব-নির্ম্মিত একটি দ্বিতল ক্লাব-গৃহ; ইংরেজীতে লেখা আছে—"White Memorial Hall." শুনলাম, মিষ্টার হোয়াইট পূর্ব্বে সিকিমের 'পলিটিকাল অফিসার' ছিলেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যই এই ক্লাব-গৃহটি নির্ম্মিত হ'য়েছিল। কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ যুবককে দ্বিতলের একটি কক্ষে বিলিয়ার্ড খেলায় রত দেখলাম। এরা যেখানেই যাক, আহার ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থাটা এদের সর্ব্বাগ্রে করা চাই।

হলের ঠিক পাশেই একটি অতি সুন্দর ছোট পার্ক। সেই পার্কের ধারে ঝাউগাছের তলায় দু'খানি গার্ডেন-বেঞ্চে ব'সে বামাচরণবাবু-প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করা গেল। দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে, আর বোধ হয় সিকিমী হাওয়ার গুণেও ক্ষুধাগ্নির

তেজ প্রবল হওয়ায় সুপ্রচুর ভোজ্যদ্রব্যগুলি অল্পকাল-মধ্যেই ক্ষুধানলে আহুতি প্রদত্ত হ'ল। সেই অপূর্ব্ব মনোহর আবেষ্টনের মধ্যে আহার ক'রতে ক'রতে মনে হচ্ছিল, যেন রূপকথার কোন পক্ষীরাজ ঘোড়া আমাদিগকে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব কল্পরাজ্যে এনে ফেলেছে! সম্মুখে পশ্চাতে মাইলের পর মাইল গিরিনিম্নস্থ উপত্যকা; ক্রমনিম্ন পর্ব্বতগাত্রে স্তরে স্তরে নয়নরঞ্জন শস্য-রাজির শ্যামল শোভা; সেই অপরূপ পটভূমি ক্ষণে রৌদ্রকিরণে সমুদ্ভাসিত, ক্ষণে দূরব্যাপী মেঘচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। কখন নিবিড় কুহেলিকার যবনিকা, পরক্ষণেই নবীন মেঘের বিচিত্র লীলা! গাছ-পালা, মানুষ, সকলই যেন অপরূপ! নিম্নোত্থিত কুজ্ঝটিকা-রাশির বিলাস দেখে মনে হ'ল বুঝি এক বিশাল তপ্ত তাওয়া থেকে ধূমকুণ্ডলী ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

ঠিক্ আমাদের বেঞ্চের পশ্চাতে পথের মধ্যস্থলে ছিল তিব্বতীয় প্রথায় গঠিত ও বহু বর্ণের চিত্রশোভিত সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি স্মৃতি-হর্ম্ম্য। হর্ম্ম্য-মধ্যে সম্রাট এডোয়ার্ডের প্রস্তর-মূর্ত্তি সংস্থাপিত। কালিম্পং বাজারের কাছে রাণী ভিক্টোরিয়ারও একটি স্মৃতি-সৌধ আছে। তা'র সঙ্গে এই হর্ম্ম্যের সাদৃশ্য তুলনীয়।
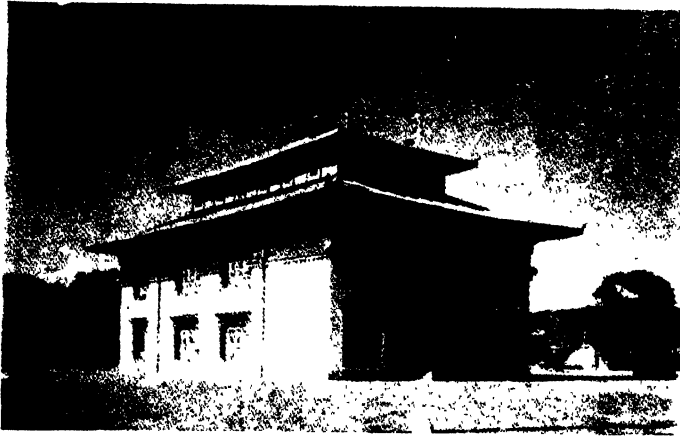
বৌদ্ধ গোম্ফা—গ্যাংটক

ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে-এলে সকলেই উঠে-পড়া গেল। ডাক-বাংলো, হোয়াইট মেমোরিয়াল হল, এডোয়ার্ড স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি পশ্চাতে রেখে আমরা প্রশস্ত পথ ধ'রে সম্মুখে অগ্রসর হ'লাম। সিকিমের রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটক অদূরে দৃষ্টিগোচর হ'ল। এটিও তিব্বতীয় প্রথায় নির্ম্মিত ও চিত্রিত। শুনলাম, সম্প্রতি বড় লাট এখানে আগমন করায় তাঁ'র অভ্যর্থনার জন্য এই ফটক নূতন নির্ম্মিত হ'য়েছে। এই ফটকের পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে আমরা এখানকার বিখ্যাত গোম্ফার অদূরে নেমে প'ড়লাম। গোম্ফাটি রাস্তার চেয়ে উচ্চতর সমভূমিতে অবস্থিত। সেই জন্য গুটিকতক সোপান অতিক্রম ক'রে গোম্ফার হাতায় উঠতে হ'ল। তীর্ব্বতীয় আদর্শে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড ত্রিতল গোম্ফাটির আগাগোড়া দারুময়। বন্ধুবর অতি সন্তর্পণে ক্যামেরাটি বাগিয়ে ধ'রলেন। গোম্ফার একটি ফটো তোলা হ'ল খুব ভয়ে ভয়ে! কারণ, আশপাশে অনেকগুলি তিব্বতী আমাদের ক্যামেরার দিকে যে রকম সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, তাতে ভয় হ'ল, কি জানি, ফটোতোলা নিষিদ্ধ ব'লে ক্যামেরাটিই হয়ত তারা বাজেয়াপ্ত ক'রে ব'সবে! কিন্তু শীঘ্রই বুঝলাম, আমাদের ঐরূপ সন্দেহ অমূলক। আনন্দের বিষয়, কতকগুলি তিব্বতী লামা আমাদের নিরীক্ষণ ক'রে সাদরে গোম্ফার ভিতর নিয়ে-গিয়ে সমস্ত জিনিষ সযত্নে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন। ভিতরের হল-ঘরগুলিতে বুদ্ধদেবের জীবনের বহু ঘটনা নানা বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত র'য়েছে। ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের মূর্ত্তিও দেখা গেল। একতালা হলের প্রধান মূর্ত্তিটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় এক জন লামা বললেন, ওটি গুরু নানকের মূর্ত্তি! একথা শুনে বিলক্ষণ বিস্ময়ের উদ্রেক হ'ল—এই কথা চিন্তা ক'রে যে, শিখ-গুরু নানক তিব্বতী লামাদের দেবমন্দিরে এমন উচ্চাসন লাভ ক'রলেন কবে ও কেমন ক'রে? বাঙ্গালার গভর্ণরের অভ্যর্থনার জন্য গোম্ফাটি নানা বর্ণের সাটিনের নিশান প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হ'য়েছিল; সে সব তখনও বর্ত্তমান ছিল। শুনলাম, এ গোম্ফাটি তেমন প্রাচীন নয়। আদি গোম্ফাটি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হওয়ায় এটি পরে নির্ম্মিত হ'য়েছে। বোধ হয়, সেই জন্যই, এর সর্ব্বাঙ্গে আধুনিকতার ছাপ; তা-দেখে তেমন তৃপ্তি পাওয়া গেল না। গোম্ফা-দর্শন শেষ হ'লে লামাদের অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে, ও গোম্ফার উদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য ক'রে বিদায় গ্রহণ করলাম। প্রশস্ত সমতল ভূমির শেষে অদূরে রাজপ্রাসাদ দেখা যাচ্ছিল; তা'রও একটি ফটো লওয়া হ'ল। রাজপ্রাসাদে প্রাসাদোচিত আড়ম্বর কিছুই নেই; কেউ ব'লে না দিলে ওটি যে একটি প্রাসাদ, তা বোধগম্য হয় না। শুনলাম, প্রাসাদে কেবল রাজাই বাস করেন, রাণীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য বশতঃ রাণী স্থানান্তরে ভিন্ন প্রাসাদে বাস করেন। গোম্ফার অপ্রশস্ত হাতার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ পৃথক পৃথক অনেক-গুলি কক্ষ দেখা গেল। দূরাগত যাত্রীরা গোম্ফায় এসে এই সকল কক্ষে বাস ক'রতে পায়; তা'দের জন্য পৃথক রন্ধনগৃহও বর্ত্তমান।

ডাক-বাংলো থেকে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত এই অংশটি একটি উচ্চ শৈলপৃষ্ঠে (Ridge) অবস্থিত। ডাক-বাংলোর পশ্চাদ্ভাগে উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গে বৃটিশ রেসিডেন্টের বাসভবন। কেবল সিকিম নয়, তিনি ভুটান ও তিব্বতেরও তত্ত্বাবধায়ক। গ্যাংটক থেকে তুষার-কিরীটি কাঞ্চন-জঙ্ঘার অনুপম সৌন্দর্য্য নয়নগোচর হয়, শুনেছিলাম; কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সৌন্দর্য্য-দর্শনে আমাদিগকে বঞ্চিত হ'তে হ'ল। বস্তুতঃ, ওদেশের একটি বৈশিষ্ট্যই এই যে, ওখানকার আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন থাকে। এ-স্থানের বাতাসও আর্দ্র। গ্যাংটক থেকে নেপাল, ভুটান, ও তিব্বত গমনের যে-সকল পথ আছে, অনেক পর্য্যটক সেই সকল পথে ঐ সব দেশ-পর্য্যটনে গমন করেন।

শৈল-পৃষ্ঠ থেকে নেমে অনতিদূরবর্ত্তী নিম্নতর ভূমিতে অবস্থিত গ্যাংটক-বাজারে যাওয়া গেল। দেখে বিস্মিত হ'লাম—সেই বাজারের শ্রেণীবদ্ধ দোকানগুলির প্রায় সমস্তই মাড়োয়ারীদের। সেখানে যে নরসুন্দরটি তিব্বতী ও নেপালীদের চুল কাটছে সে বিহারী।

ভা'বলাম, এই সব নির্ভীক, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু জাতি যে এই দূরদেশে, নানা প্রতিকূলতাসত্ত্বেও জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবে, এতে বিস্মিত হ'বারই-বা কি আছে? অনুসন্ধান ক'রে জানা গেল, গ্যাংটকে বাঙ্গালী আছেন মাত্র চার-পাঁচ জন; বলা বাহুল্য, তাঁদের সকলেই চাকুরীজীবী। তাঁদের এক জন নাকি সিকিমের ষ্টেট-ইঞ্জিনিয়ার।

পূর্ব্ব-দিন দেওয়ালি উৎসব ছিল; তা'র আনন্দ-প্রবাহ তখনও লুপ্ত হয়নি। পত্রে পুষ্পে, রঙ্গিন কাগজের পতাকায় বাজার সাজান' র'য়েছে! পার্ব্বত্য জাতির নারী-পুরুষ সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। বাজারের একপাশে নাগরদোলায় অনেকেই পাক খাচ্ছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভিড় মদের দোকানে, আর জুয়ার আড্ডায়! রামকৃষ্ণমিশনের ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠান এই কদভ্যাস রহিত ক'রবার চেষ্টা ক'রলে এদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে; তবে খ্রীষ্টান মিশনরীরাও এজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন।

বাজারের সন্নিকটেই পোষ্ট আফিস; ডাকবাহী মোটর-যান একধারে দাঁড়িয়ে আছে। এই গাড়ী গিলখোলা থেকে ডাক নিয়ে আসে; সুযোগ হ'লে আরোহী বহন ক'রেও কিঞ্চিৎ উপরি উপার্জ্জন দ্বারা 'শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং' এই নীতিবাক্য সফল করে।

গ্যাংটকে আর বিশেষ-কিছু দ্রষ্টব্য ছিল না। তা'ছাড়া রাস্তাও বিপদসঙ্কুল; সন্ধ্যার পূর্ব্বে কালিম্পং পৌঁছানই সমীচীন। সুতরাং আর বৃথা কালহরণ না ক'রে, আমরা গাড়ীতে উঠে ব'সলাম। আবার সেই সিংটাম, রংপো, তিস্তা বাজার প্রভৃতি পার হ'য়ে সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান ক'রে প্রথমেই স্মরণ হ'ল, সেদিন কালিম্পং থেকে বিদায় নিতে হবে। সারাদিন মন বড় বিষণ্ণ হ'য়ে রইল। ফিরবার সময় তিস্তার তীরে তীরে ট্রেণে যাওয়ার লোভ হ'লেও বুঝলাম তাতে কোন লাভ হবে না; কারণ, অন্ধকারে তিস্তার সৌন্দর্য্য উপভোগের আশা ছিল না। সেই কথা বিবেচনা ক'রে সকালেই বাজারে গিয়ে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য একখানি ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে এলাম। অনেক দর-কষাকষির পর ঠিক্
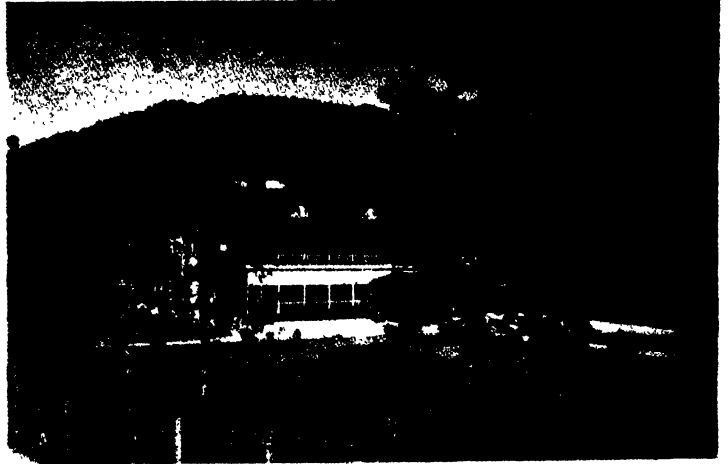
সিকিমের রাজপ্রাসাদ—গ্যাংটক

হ'ল, আমাদের তিনটি সিটের জন্য দিতে হবে সাড়ে ন' টাকা। অপরাহ্ণে ট্যাক্সি এলে, অধ্যাপক রায় ও বামাচরণ বাবুর নিকট বিদায় নিয়ে ভাবাক্রান্ত মনে গাড়ীতে উঠে ব'সলাম; অতঃপর অভিযান সমাপ্ত।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

নব পরিচয়

অলস আঁখিতে ঘুমের আলস কাটেনিক' ভালো ক'রে,
সেদিন সকালে ডাকিলে কে তুমি পরিচিত নাম ধ'রে॥
চায়ের পেয়ালা উষ্ণ তখনও 'তরলিত সুধা ধরি'
ততোধিক মিঠে হালকা হাসিয়া সুমুখে আসিলে পরী!

ছোট-বেলাকার সেই চেনা-মুখ গোলগাল হাত দু'টি,
ঢলঢলে মুখে হাসির মলয় করিতেছে লুটোপুটি!
সেই চারুগ্রীবা আজি চারুতর মাধুরীর ছোঁওয়া-পেয়ে,
নব নব রূপে আসিয়া দাঁড়ালে চির-পরিচিতা মেয়ে;

আসিয়া দাঁড়ালে মহিমা-আসনে অভিনয় সে তো নয়;
নূতন বাঁধনে নিবিড় করিতে আমাদের পরিচয়!
কল্যাণীরূপে গেহাগার মম উজ্জ্বল করিতে এলে,
মাধুরীমাখানো মূরতি তোমার কোথায় তুলনা মেলে?

দীনতা আমার ব্যথা-গ্লানি মোর পলকে টুটিবে সব,
সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করিবে হৃদয়ের কলরব।

শ্রীদীনেন্দুসুন্দর দাস।

একাদশ পর্ব্ব

প্রকৃতির প্রতিশোধ

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

অতঃপর কি ভাবে আমাদের দিনগুলি অতিবাহিত হইতে লাগিল, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিবাভাগে আমরা প্রচণ্ড ঝটিকালোড়িত, উদ্দাম তরঙ্গ-সঙ্কুল ক্রুদ্ধ আটল্যান্টিকের বিস্তীর্ণ বক্ষে পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে রত থাকিতাম, এবং রাত্রি গভীর হইলে নিবিড় নৈশ অন্ধকারে আমরা ধীরে ধীরে সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিয়া তাহার নিরাপদ নিভৃত অন্তর্দ্দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। কিন্তু কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ কয়েক দিনে বিভিন্ন দেশের আরও আটখানি জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে চূর্ণ ও সমুদ্র-গর্ভে সমাহিত করিয়াছিলেন। এই সকল জাহাজের যে সকল আরোহী বা নাবিক কোন উপায়ে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার-লাভে সমর্থ হইয়াছিল, এই নিষ্ঠুর কাপ্তেন তাহাদের কাহাকেও নিরাপদ স্থানে প্রেরণের জন্য বিন্দু-মাত্র চেষ্টা করেন নাই। ভাগ্যে নির্ভর করিয়া তাহারা অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া গিয়াছিল। মনুষ্য-জীবনের প্রতি কাপ্তেনের এই প্রকার অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্যের পরিচয় পাইয়া আমার হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হইত ; এবং অশ্রু রোধ করা তখন অসাধ্য হইয়া উঠিত। 'ইউ'-বোটের জার্ম্মাণ কর্ম্মচারিগণের হৃদয় অত্যন্ত কঠিন হইলেও তাহাদের অনেকে কাপ্তেনের নিষ্ঠুর ব্যবহারে সময়ে সময়ে ক্ষোভে-দুঃখে বিচলিত হইয়া উঠিত ; কিন্তু কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ তাহাদের কাহারও প্রতিবাদে কর্ণপাত করিতেন না, বরং তাহাদের মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন, এবং বলিতেন—এই সকল কর্ত্তব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত কাপুরুষ 'ইউ'-বোটের দায়িত্বভার বহনের সম্পূর্ণ অযোগ্য !

অবশেষে আমাদের 'ইউ'-বোটসঞ্চিত পেট্রল প্রভৃতির, ও জাহাজধ্বংসোপযোগী টর্পেডো সমূহের অভাব হইলে কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ আমাদের দ্বীপে যাইবার জন্য তাঁহার 'ইউ'-বোট উত্তরাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। সেই দিন আমরা চলিতে চলিতে প্রভাত ছয় ঘটিকার সময় আমাদের 'ইউ'-বোটের পেরিস্কোপের সাহায্যে একখানি প্রকাণ্ড জাহাজ দেখিতে পাইলাম ; তাহা ডেনমার্কের পতাকা উড়াইয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ পেরিস্কোপ হইতে মাথা তুলিয়া তাঁহার সহকারী লেফটেনাণ্ট স্কুলারকে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ঐ জাহাজ আমার পরিচিত ; উহা ড্যানিস্ জাহাজ 'পিলাউ', কোপেনহেগেন হইতে জলের 'ব্যালাষ্ট' ও আরোহী লইয়া নিউইয়র্কে যাইতেছে। আমি এখনই উহাকে ডুবাইয়া দিব।"

কাপ্তেন এরূপ অবিচলিত স্বরে দৃঢ়তার সহিত এই কথাগুলি বলিলেন যে, তাহা শুনিয়া আমার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। লেফটেনাণ্ট স্কুলার তাঁহার এই পৈশাচিক প্রস্তাব শুনিয়া কি বলেন, তাহা শুনিবার প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

লেফটেনাণ্ট স্কুলার আতঙ্ক-বিহ্বল স্বরে বলিলেন, "উহাকে ডুবাইয়া দিবেন ! আপনি বলিতেছেন কি ? উহা সম্পূর্ণ নির্ব্বিরোধ জাহাজ, কোনরূপ অনিষ্ট করিবার অভিসন্ধিও উহার নাই। তবে উহার কোন্ অপরাধে উহাকে ডুবাইবেন ?"

ভন্ জাওয়ার্জ কঠোর স্বরে বলিলেন, "আমি জানি, এই জাহাজ মধ্যে মধ্যে নিষিদ্ধ পণ্য বহন করে। কাপ্তেন এরিক জোহানসেনকেও আমি বিলক্ষণ চিনি ; সে ইংরেজ

জাতির ভয়ঙ্কর গোঁড়া। তাহাদের জন্য কোনও অপকর্ম্ম করিতে উহার আপত্তি নাই স্কুলার! আমি কয়েক মাস হইতেই উহার সন্ধানে ফিরিতেছিলাম; এতদিন পরে উহাকে হাতে পাইলাম, আর কি এ সুযোগ ছাড়ি?"

অতঃপর তিনি 'ভয়েস্ পাইপে'র সম্মুখে ঘুরিয়া-দাঁড়াইয়া দৃঢ় স্বরে আদেশ করিলেন, "সম্মুখস্থ প্যাসেঞ্জার-লাইনারকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। পাশের ও পশ্চাতের টর্পেডো-টিউবগুলি ঠিক করিয়া রাখ।"

তাঁহার এই আদেশ শুনিয়া লেফটেনাণ্ট স্কুলারের মুখ বিবর্ণ হইল; তিনি আবেগভরে কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জের বাহু আকর্ষণ করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "না, না, ও-কাজ আপনি করিতে পারিবেন না; ঐ জাহাজের আরোহি-গণের মধ্যে বিস্তর স্ত্রীলোক ও শিশু আছে। তাহা-দিগকেও আপনি হত্যা করিবেন? ইহাই কি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা? এ কি মানুষের কাজ?"

কাপ্তেন জাওয়ার্জ দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "হাঁ, উহাদের সকলকেই হত্যা করিব। তাহারা মরিলে আমাদের কি ক্ষতি? যুদ্ধ চিরদিনই যুদ্ধ; ঐ জাহাজের আরোহীরা বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহাদের ভাগ্যফল ভোগ করিতে বাধ্য।"

লেফ্টেনাণ্ট স্কুলার কাপ্তেনের এই কঠোর মন্তব্য শুনিয়া বিবর্ণ মুখে ও বিচলিত হৃদয়ে পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ পুনর্ব্বার পেরিস্-কোপের দিকে চাহিয়া আদেশ করিলেন, "২২৬ ডিগ্রীতে গতি পরিবর্ত্তন কর।—উভয় মোটর অর্দ্ধবেগে চলুক।"

অতঃপর 'ইউ'-বোটে স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। প্রত্যেক কর্ম্মচারী নিস্পন্দ, অসাড় ভাবে স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান রহিল। মিনিটের পর মিনিট অতিবাহিত হইতে লাগিল। আমাদের বোট নিঃশব্দে শিকারের অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহার পর সহসা কাপ্তেন ভন্ জাওয়ার্জের সুতীব্র আদেশ আমাদের কর্ণগোচর হইল।

কাপ্তেন বলিলেন, "আমরা অত্যন্ত দ্রুত অগ্রসর হইতেছি! ২৬০ ডিগ্রীতে গতি-পরিবর্ত্তন কর। উভয় মোটর অত্যন্ত ধীরে চালাও। পার্শ্বের ও পশ্চাতের টর্পেডো-টিউব উদ্যত রাখো।"

পুনর্ব্বার সর্ব্বত্র নিস্তব্ধতা বিরাজিত! অল্পকাল পরে কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জের গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি নিঃসারিত হইল, "প্রথম টর্পেডো-টিউব—ফায়ার!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রথম টর্পেডো আমাদের শিকার লক্ষ্য করিয়া সবেগে ধাবিত হইল।

পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদবৎ ধ্বনি হইল, "দ্বিতীয় টর্পেডো-টিউব—ফায়ার!"

পুনর্ব্বার রজতপ্রবাহবৎ সুতীব্র অগ্নি-শিখা পূর্ব্বপ্রেরিত টর্পেডোর অনুসরণ করিল।

"তৃতীয় টর্পেডো-টিউব—ফায়ার!"

"চতুর্থ টর্পেডো-টিউব—ফায়ার!"

সর্ব্বসমেত চারিটি টর্পেডো সেই জাহাজ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইল। আমাদের 'ইউ'-বোটে এই চারিটি মাত্র টর্পেডোই অবশিষ্ট ছিল, আর সমস্তই পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়াছিল। আমরা রুদ্ধ-নিশ্বাসে এবং উদ্যত-কর্ণে ইহার ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। পর পর চারিবার চাপা বিস্ফোরণ-ধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হইল।

কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ পেরিস্কোপ হইতে মুখ ফিরাইয়া নীরস স্বরে বলিলেন, "চারিটি আঘাতই জাহা-জের মধ্যস্থলে হইয়াছে; উহার পশ্চাদ্ভাগ তাড়াতাড়ি সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। সকল ট্যাঙ্ক খালি করিয়া উপরে চল। ডেকের গোলন্দাজগণ স্ব স্ব স্থানে প্রতীক্ষা কর।"

আমরা সমুদ্রগর্ভ হইতে উপরে উঠিলাম। মগ্নোন্মুখ জাহাজের আরোহীরা কি ভাবে মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিতেছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিষ্ঠুর কাপ্তেনের আগ্রহের সীমা ছিল না!

জাহাজখানি কিরূপ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা সহকারে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছিল, তাহা সন্দর্শন করিয়া আতঙ্কে আমার মুখ বিবর্ণ হইল; বক্ষের স্পন্দনও যেন রহিত হইল। জাহাজের আরোহিগণের চোখে-মুখে যে আতঙ্ক, প্রাণ-রক্ষার জন্য যে অন্তিম ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিলাম, তাহা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমার স্মরণ থাকিবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে জাহাজের লাইফবোটগুলি আরোহীবর্গে পূর্ণ হইল। বালক-বালিকাগণের হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। নারীরা প্রাণভয়ে কিরূপ ব্যাকুল হইল, তাহা দেখিলে পাষাণও বোধ হয় বিদীর্ণ হইত!

যাহা হউক, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল! ‘পিলাউ’ জাহাজ দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিল। জাহাজখানি অদৃশ্য হইলে কাপ্তেন ভন্‌ জাওয়ার্জ ‘ইউ’-বোটের উচ্চ টাওয়ারের উপর দাঁড়াইয়া, দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার রেল ধরিয়া কিছুকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর লেফ্‌টেনাণ্ট স্কুলারের মুখের দিকে চাহিয়া আদেশ করিলেন, “এবার হেব্রাইডিস অভিমুখে বোট চালাও। লাইফবোটে আশ্রয় লইয়া যাহারা বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে, আমরা তাহাদিগকে কোন-রকম সাহায্য করিব না।”

* * * *

পরদিন রাত্রিকালে আমরা আমাদের দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। ‘ইউ’-বোট কিছু দূরে রাখিয়া কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ একখানি ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিলেন; তাহার পর আমাকে সঙ্গে লইয়া তীরে চলিলেন। সেই সময় আমাদের দ্বীপ হইতে কিছু দূরে আর একখানি ‘ইউ’-বোট দেখিতে পাইলাম। আমরা ব্ল্যাকগল ফার্ম্মের পাকশালায় প্রবেশ করিয়া সেই দ্বিতীয় ‘ইউ’-বোটের পরিচালক লেফ্‌টেনাণ্ট আল্‌ব্রেট লেহানকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিলাম।

কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট লেহানকে আমি দেখিয়াও দেখিলাম না। মেরী তখন সেই কক্ষেই বসিয়া ছিল; আমার দৃষ্টি তাহার মুখমণ্ডলে আকৃষ্ট হইল। দীর্ঘকাল পরে আমার প্রিয় সঙ্গিনীকে দেখিতে পাওয়ায় আমার মন কি আনন্দে পূর্ণ হইল, তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। মেরী আমাকে দেখিবামাত্র দৌড়াইয়া আসিয়া দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। তাহার কোমল করস্পর্শে আমার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সন্তাপ মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল।

মেরী আবেগভরে বলিল, “পিটার, ভাই পিটার! তোমাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আমার কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। তোমার জন্য আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছিল; সর্ব্বদাই মনে হইত, জীবনে আর বুঝি তোমাকে দেখিতে পাইব না! তোমাকে লইয়া কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জের ‘ইউ’-বোট আর যে এখানে ফিরিয়া আসিবে, এ আশাকে মনে কোনও দিন স্থান দিতে পারি নাই। কিন্তু পরমেশ্বর দয়া করিয়া তোমাকে আবার আমার নিকট আনিয়া দিলেন। তিনি দয়াময়! আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।”

আমি বলিলাম, “সে কথা সত্য; এখানে ফিরিয়া-আসিয়া আমি সত্যই আনন্দিত হইয়াছি।”

মেরীর সাহচর্য্যে বহু দুঃখ-কষ্টের স্মৃতি-মণ্ডিত সেই পাকশালা আমার বড়ই প্রীতিকর বলিয়া মনে হইতেছিল।

লেফ্‌টেনাণ্ট লেহান অন্যান্য কথার পর কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জকে বলিল, “উইলহেম্‌সাভেন হইতে আমি আপনার অনুসরণ করিয়াছিলাম। আপনার নামে কয়েকখানি পত্র আসিয়াছিল; এখানে আসিয়া আপনার দেখা পাইব, এই আশায় আপনার সেই পত্রগুলি আমি লইয়া আসিয়াছি।”

ভন জাওয়ার্জ বলিলেন, “ধন্যবাদ লেহান!”—অনন্তর তিনি লেফ্‌টেনাণ্ট লেহানের হাত হইতে পত্রের বাণ্ডিলটি গ্রহণ করিয়া আমস্‌কে বলিলেন, “তুমি যে ভয়ে পিটারকে আমার সঙ্গে নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছিলে, তাহার ফল কিরূপ হইয়াছে ক্রোবি? সেই স্ত্রীলোকটা—হানা ফার্গস্‌ কি আর এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল?”

কাপ্তেন জাওয়ার্জ আমসের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাণ্ডিলের চিঠিপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমস্‌ কাপ্তেনের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, “হাঁ, সে আসিয়াছিলই ত! তাহার সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার বিরোধ চলিয়াছিল। সে আমাকে নানা ভাবে জেরা করিতে লাগিল; কিন্তু আমি এরূপ নির্ব্বোধ নহি যে, জেরায় সে আমার মুখ হইতে সত্য কথা বাহির করিয়া লইবে। আমি তাহাকে বলিলাম, তাহার ভাইকে কোন দিন এখানে আসিতে দেখি নাই। তাহার পর তাহাকে জানাইলাম—আমার কথা বিশ্বাস না হওয়ায় যদি সে এখানে বেশী গোলমাল করে, তাহা হইলে ঘাড় ধরিয়া তাহাকে এই দ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দিব; মেয়েমানুষ বলিয়া খাতির করিব না।”

কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ একখানা লেফাপা ছিঁড়িয়া তাহার ভিতর হইতে চিঠিখান বাহির করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার পর স্ত্রীলোকটা আর বেশী গোলমাল না করিয়াই চলিয়া গেল ত?”

আমস্ বলিল, "হাঁ, চলিয়া গেল বটে, কিন্তু যাইবার সময় আমাকে এই কথা বলিয়া শাসাইয়া গেল যে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জের মুখের দিকে চাহিয়া আমসের মুখের কথা আর শেষ হইল না। সে বিস্ফারিত নেত্রে দুই-এক মিনিট কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া-থাকিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "ব্যাপার কি কাপ্তেন! পত্রে কি আপনি কোন দুঃসংবাদ পাইলেন ?"

কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ যে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতেছিলেন, তাহার কিছু দূর পাঠ করিয়াই তাঁহার মুখ বিবর্ণ এবং চক্ষু নিষ্প্রভ হইল; তাঁহার হাত দুইখানি থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং যেন তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল! তিনি পত্রখানি সম্মুখে ফেলিয়া-রাখিয়া, দুই হাতে টেবলের কিনারা ধরিয়া নিতান্ত অবসন্ন ভাবে টেবলের উপর মাথা রাখিলেন।

তাঁহার মনোভাবের এই প্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট লেহান উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পত্রে কোন দুঃসংবাদ আছে কি কাপ্তেন ?"

কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ তথাপি নিরুত্তর; তিনি টেবলের উপর হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন। তাঁহার চক্ষুতে গভীর নিরাশা এবং মর্ম্মভেদী ক্ষোভ ও দুঃখ পরিস্ফুট হইল; যেন তাঁহার জীবনের সকল আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া তাঁহার হৃদয় প্রলয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল!

লেফ্‌টেনাণ্ট লেহান কিছু দূরে বসিয়া ছিল। সে কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জের অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল ভাবে উঠিয়া আসিল, এবং কাপ্তেনকে অধীর স্বরে বলিল, "ব্যাপার কি মহাশয়! পত্রখানা পড়িয়া কি কারণে আপনি এত বিচলিত হইলেন ?"

কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ টেবলের উপর হইতে খোলা চিঠিখান কম্পিত-হস্তে তুলিয়া-লইয়া বিকৃত স্বরে বলিলেন, "পত্রে কি সংবাদ পাইলাম তাহাই শুনিতে চাও? তবে শোন—"

অতঃপর তিনি সেই পত্রে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে, ভগ্নস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন—

"প্রিয় রডলফ, আমি জানি, আমি যখনই তোমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছি, তুমি বিনা-প্রতিবাদে তাহারই সমর্থন করিয়া আসিয়াছ; এই জন্য আমি স্থির করিয়াছি—বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ না-হওয়া পর্য্যন্ত আমি আমেরিকায় গিয়া আমার ভগিনীর নিকট বাস করিব; জানি, আমার এই সিদ্ধান্তে নিশ্চিতই তোমার কোন আপত্তি হইবে না। আশা করি, তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, আমি অনেক চেষ্টার পর আমেরিকা-গমনের জন্য প্রয়োজনীয় 'পাস্‌পোর্ট' সংগ্রহ করিয়াছি; এবং তাহা লইয়া আমাদের প্রিয় পুত্র আর্ণেষ্ট সহ আমি আগামী বৃহস্পতিবার কোপেন্‌হেগেন হইতে 'পিলাউ' নামক জাহাজে নিউইয়র্কে যাত্রা করিতেছি। যখন তুমি আমার এই পত্র পাইবে, তখন আমরা আটলাণ্টিক-বক্ষে।"

কাপ্তেন বলিলেন, "আমার স্ত্রীই এই পত্র লিখিয়াছেন; এবং আমিই টর্পেডো মারিয়া 'পিলাউ' জাহাজ আটলাণ্টিক-গর্ভে ডুবাইয়া দিয়া আসিয়াছি! উঃ, উঃ, উঃ!"

দ্বাদশ পর্ব্ব

গুপ্তচর

অতঃপর কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ টেবলের উপর মাথা রাখিয়া অবসন্ন ভাবে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন; মুদিত নেত্রে ভগ্নস্বরে আর্ত্তনাদ করিলেন, "উঃ, কি কষ্ট! টর্পেডোর আঘাতে আমার স্ত্রীকে, আমার প্রাণাধিক পুত্রকে স্বহস্তে হত্যা করিলাম! হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ করিলাম! বিধাতার বিচার কি অমোঘ, দণ্ড কি কঠোর!"

লেফ্‌টেনাণ্ট লেহান অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। তাহার নির্ব্বাক্ প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া আমি সঙ্ক্ষেপে বলিলাম, "হাঁ মহাশয়, উঁহারই আদেশে 'পিলাউ' জাহাজ আমার চক্ষুর উপর আটল্যাণ্টিক-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। জাহাজে নারী ও বালক-বালিকা আরোহী অনেক ছিল; বোধ হয়, তাহাদের কাহারও প্রাণরক্ষা হয় নাই।"

সকল কথা শুনিয়া মেরীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল। সে কম্পিত হস্তে আমার হাত চাপিয়া-ধরিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "পিটার,—উনি বোধ হয় জানিতেন না যে—"

মেরীর মুখের কথা শেষ হইল না। আমসের মুখের দিকে হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়িল। সে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে

একখান চেয়ারে জড়-সড় হইয়া বসিয়া ছিল। কাপ্তেন ভন জাওয়াজ তাঁহার 'ইউ'-বোটের সাহায্যে এ-পর্য্যন্ত যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্য-দেবতা কি-ভাবে তাহার প্রতিফল প্রদান করিয়াছেন, আমস্ তাঁহার কথা শুনিয়া তখনও তাহা বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারে নাই; এই জন্য সে বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাপ্তেন ও-ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন কেন? উঁহার কি কোন বিপদ হইয়াছে?"

তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমরা সকলেই কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য একটি কথাও কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না। অতঃপর আমরা কি করিব, তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ভন জাওয়ার্জ আর দীর্ঘকাল সেখানে বসিয়া না থাকিয়া হঠাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিচলিত স্বরে লেফ্‌টেনাণ্ট লেহানকে বলিলেন, "লেহান, আমি এখনই বোট লইয়া চলিয়া যাইব।"

লেফ্‌টেনাণ্ট লেহান বলিল, "বেশ, চলুন।"—সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভন জাওয়ার্জ লেহানকে সঙ্গে লইয়া আমসের পাকশালা ত্যাগ করিলেন। তাঁহারা নৈশ অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে মেরী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আবেগকম্পিত স্বরে আমাকে বলিল, "পিটার, কাপ্তেন কি পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই যে—"

আমি বলিলাম, "না মেরী, উনি জানিতেন না যে, সেই জাহাজখানি ডুবাইয়া দিলে—"

আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "এ সব কি ব্যাপার? কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ কি শারীরিক অসুস্থ, না কোন কারণে মনে সে আঘাত পাইয়াছে? লোকটা ভারী দুর্ম্মুখ!"

আমি বলিলাম, "কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ 'পিলাউ' নামক একখান জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে; জাহাজখানা আমেরিকায় যাইতেছিল। কাপ্তেনের স্ত্রী এবং পুত্রটি সেই জাহাজেই আমেরিকায় যাইতেছিল; যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিবে, তত দিন তাহারা আমেরিকায় নিরাপদে বাস করিতে পারিবে—এইরূপই তাহাদের আশা ছিল।"

আমার কথা শুনিয়া আমস্ মুখ হইতে তামাকের পাইপটা বাহির করিয়া লইল; তাহার পর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "উহার স্ত্রী-পুত্র সেই জাহাজে ছিল—ইহা জানিতে না পারিয়া টর্পেডো মারিয়া সেই জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে?—বেশ হইয়াছে, চমৎকার হইয়াছে! যাহারা পরের অনিষ্ট করে, তাহাদের ঐ রকম শাস্তি হওয়াই উচিত। এই কাপ্তেনটার ভারী অহঙ্কার, মানুষকে সে মানুষ জ্ঞান করে না! যাহা হউক, কাপ্তেন জাওয়ার্জের সঙ্গে এত দিন কোথায়—কত দূর ঘুরিয়া বেড়াইলে বল শুনি।"

আমি তাহাকে ও মেরীকে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলাম। মেরী আগ্রহের সহিত আমার বর্ণনা শুনিতে লাগিল; কিন্তু আমস্ কয়েক মিনিট পরেই অধীর হইয়া উঠিল, এবং তাহার হাতের পাইপটা কোটের পকেটে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "যাহা শুনিলাম তাহাই যথেষ্ট; রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আমি শুইতে চলিলাম।"

অতঃপর সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শোন পিটার, একটা কথা তোমাকে বলা হয় নাই। ফার্গসের সেই ভগিনীটাকে আর ভয় করিবার কারণ নাই; আমি তাহাকে জব্দ করিয়া ছাড়িয়াছি। সে আর এখানে আসিতে সাহস করিবে না; কিন্তু মাগী ভারী বজ্জাত, তাহাকে বিশ্বাস নাই। যদি সে আবার কোন দিন এখানে আসে, তাহা হইলে—তাহা হইলে তোমাকে কি করিতে হইবে জান?"

আমি কোন কথা না বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমস্ বলিল, "সে এখানে আসিলে তুমি তাহার সম্মুখে যাইবে না, লুকাইয়া থাকিবে।—বুঝিয়াছ?—তুমি এখানে আছ, তাহা যেন সে জানিতে না পারে।"

আমি বলিলাম, "বুঝিয়াছি।"—ইহাও বুঝিলাম যে, আমস্ মুখে যতই বীরত্ব প্রকাশ করুক, তখনও তাহার ভয় দূর হয় নাই।

আমস্ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "সে জানে, তুমি সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছ; আমি তাহাকে তাহাই

বলিয়াছিলাম। সে হঠাৎ এখানে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলে মনে করিবে, আমি তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছি। তাহার ধারণা হইবে—তোমার সম্বন্ধে যে মিথ্যা কথা বলিতে পারে—তাহার ভাই সম্বন্ধেও তাহার সকল কথা মিথ্যাই; অর্থাৎ আমার কোন কথাই সত্য বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইবে না। সুতরাং আবার সে আসিয়া হাঙ্গামা আরম্ভ করিবে; মাগী ভয়ঙ্কর দজ্জাল!"

এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমস্ দোতালায় চলিয়া-গেল। আমি ও মেরী পাকশালায় বসিয়া রহিলাম। অনেক দিন পরে মেরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ; আমাদের অনেক কথা বলিবার ছিল। আমরা উভয়ে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বসিয়া দীর্ঘকাল নানা কথার আলোচনা করিলাম।

মেরী বলিল, লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন সম্বন্ধে সে আর কোনও কথা শুনিতে পায় নাই; কিন্তু তাহার আশা, সে শীঘ্রই তাহার সংবাদ পাইবে। সে আরও বলিল, বড়-দেশে গমন করিয়া ডোনাল্ডসন-পরিবারের সাহচর্য্যে সে সুখেই ছিল। তাহার নিকট ইহাও জানিতে পারিলাম যে, হানা ফার্গস্ তাহার ভ্রাতার সন্ধানে দ্বিতীয় বার আমাদের দ্বীপে আসিবার পূর্ব্বেই সে এখানে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের এই সকল কথার আলোচনার পর মেরী মৃদুস্বরে বলিল, "কিন্তু পিটার, বাবা যাহাই বলুক, হানা ফার্গস্ সহজে নিরস্ত হইবে না; সে আবার এখানে আসিবে। হাঁ, নিশ্চিতই আসিবে; আমি ইহা সুস্পষ্ট-রূপেই অনুভব করিতে পারিতেছি। তাহার সন্দেহ এখনও দূর হয় নাই। তাহার ভাই এখানে আসিয়াছিল, এবং এখান হইতেই অদৃশ্য হইয়াছে, এ ধারণা সে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না!"

আমি বলিলাম, "এ-সব কথা থাক মেরী! সেই স্ত্রীলোকটার প্রসঙ্গ বড়ই অপ্রীতিকর; এ-সব কথার আলোচনা বন্ধ করাই ভাল।"

মেরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কাবোর্ডের নিকট উঠিয়া গেল, এবং তাহার ভিতর হইতে একটা চেপ্‌টা বাক্স বাহির করিয়া-লইয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিল। সে সেই বাক্সের ভিতর হইতে একটি বাহারে ফ্রক বাহির করিয়া আমাকে তাহা দেখাইয়া বলিল, "বড়-দেশ হইতে আমি কি কিনিয়া আনিয়াছি দেখ! জিনিসটি বেশ সুন্দর নয় কি?"

আমি তাহাকে খুসী করিবার জন্য বলিলাম, "হাঁ, খাসা জিনিস। কে তোমার পছন্দের নিন্দা করিতে পারে মেরী! তোমার অঙ্গে ওটি চমৎকার মানাইবে।"

আমার কথায় মেরী ঈষৎ হাসিয়া ফ্রকটি পরিধান করিল; তাহা পরিধান করায় তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইতে লাগিল।

ফ্রকটি আমার পছন্দ হইয়াছে বুঝিয়া মেরী বলিল, "আমি অনেক দিন ধরিয়া আমার হাত-খরচের টাকা কিছু কিছু বাঁচাইয়া এটি কিনিয়াছি; এখানে ত ইহা সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল না; ইচ্ছা থাকিলেই বা পছন্দমত জিনিস এখানে কিরূপে পাইব?"

মেরী আরও কোন কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সে হঠাৎ নীরব হইল; তাহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, মুখ বিবর্ণ হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন নিস্পন্দ!—সে অসাড় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেরী আতঙ্কবিহ্বল স্বরে ডাকিল, "পিটার!"

সে বাহিরের বাতায়নের দিকে চাহিয়া ঐ ভাবে আমাকে আহ্বান করায় আমি তৎক্ষণাৎ মাথা-ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিলাম, এবং মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও শ্বেতবর্ণ মুখ দেখিতে পাইলাম; তাহা বাতায়নের শার্শি-সংলগ্ন বলিয়াই মনে হইল! আমি সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সেই মুখ অদৃশ্য হইল। আমি আতঙ্ক-বিহ্বল চিত্তে লাফাইয়া উঠিলাম; কারণ, উহা যে হানা ফার্গসের মুখ—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না।

আমি ভগ্নস্বরে মেরীকে বলিলাম, "হাঁ মেরী, আমিও দেখিয়াছি; উহা তাহারই মুখ বটে!"

মেরী তাড়াতাড়ি তাহার নূতন ফ্রকটি অঙ্গ হইতে অপসারিত করিয়া পাকশালা ত্যাগ করিল, এবং দৌড়াইয়া সিঁড়িতে উঠিল। অতঃপর সে দোতালায় উঠিয়া আমসের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। সে নিম্নস্বরে কিন্তু আবেগ-ভরে আমস্‌কে কি-সব বলিল; তাহার পরই আমসের নীরস কঠোর হুঙ্কার শুনিতে পাইলাম। সে উত্তেজিত স্বরে কি বলিয়া উঠিল! মেরী তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া সিঁড়ি দিয়া দ্রুতবেগে নীচে নামিয়া আসিল।

মেরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাকে বলিল, "বাবা উঠিয়া আসিতেছে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এই গভীর রাত্রিতে হানা ফার্গস্ কি উদ্দেশ্যে এই দ্বীপে আসিয়াছে? সে কি চায়?"

মেরী রুদ্ধ নিশ্বাসে বলিল, "সে বোধ হয় গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছে! আমি ত তোমাকে বলিয়াছিলাম, সে আবার এখানে আসিবে, নিশ্চিতই আসিবে। তাহার ধারণা, তাহার নিরুদ্দিষ্ট ভাই সম্বন্ধে আমরা তাহাকে যাহা বলিয়াছি—তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কথা তাহার নিকট গোপন করিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু এখানে সে নূতন-কিছুই জানিতে পারিবে না। যদি সে প্রতি-রাত্রিতে গোপনে এখানে আসিয়া গোয়েন্দাগিরি করে, তাহা হইলেও নূতন কোন কথা জানিতে পারিবে না—এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি।"

মেরী বলিল, "তোমার ও-কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু সে এখানে এ-ভাবে আসিলে কোন দিন জার্ম্মাণদের সন্ধান পাইবে। ইহাও অল্প বিপদের কথা নয়!"

মেরীর এ-কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। কথাটা প্রথমে আমার মনে হয় নাই; কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না যে, হানা ফার্গস যদি প্রতি-রাত্রি এই ভাবে আমাদের দ্বীপে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসে, তাহা হইলে কোন-না-কোন দিন সে জার্ম্মাণদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিবেই; এবং তাহার কি ফল হইবে, তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি মেরীকে বলিলাম,— "কাপ্তেন ভন জাওয়ার্জ এবং লেফ্‌টেনাণ্ট লেহান আজ রাত্রিকালে, কিছুকাল পূর্ব্বেই এখানে আসিয়াছিল; হানা ফার্গস্ এখানে আসিয়া বোধ হয় তাহাদিগকে ফিরিয়া-যাইতে দেখিয়াছে!"

আমস্ অল্পকাল পরে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে নামিয়া-আসিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিল; তাহার মাথার চুলগুলি তখন পারিপাট্যহীন, বিশৃঙ্খল, এবং তাহার ভাল চোখটি আরক্তিম; তাহা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসারিত হইতেছিল! তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলাম—যে সন্দেহ আমাদের মনে স্থান পাইয়াছিল, তাহাই তাহাকে ঐরূপ বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। —ক্রোধে ও আতঙ্কে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল।

আমস্ পাকশালার কোণ হইতে শিকারের দো-নলা বন্দুকটা তুলিয়া লইয়া আবেগভরে বলিল, "ঐ জানালার শার্শির বাহিরেই কি তাহার মুখ দেখিতে পাইয়াছিলে? স্ত্রীলোকটা এখানে আসিবার সময় যদি কাপ্তেন জাওয়ার্জ ও লেফ্‌টেনাণ্ট লেহানকে দেখিয়া থাকে—তাহা হইলে আর আমাদের রক্ষা নাই! আমাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।"

মেরী ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কিন্তু এখানে আসিয়াই তুমি ঐ বন্দুকটা টানিয়া বাহির করিলে কেন? উহা সতর্ক ভাবে ব্যবহার করিও। তুমি আলেন্ ফার্গস্‌কে হত্যা কর নাই, এবং ইহা সপ্রমাণ করাও তোমার পক্ষে কঠিন হইবে না; কিন্তু যদি তুমি ধরা-পড়িবার ভয়ে ঐ স্ত্রীলোকটাকে গুলী করিয়া হত্যা কর, তাহা হইলে তোমার নিষ্কৃতি নাই, তোমাকে নিশ্চিতই গ্রেপ্তার হইতে হইবে; কারণ, হানা ফার্গস্ এখানে একা আসে নাই। তুমি হানাকে গুলী করিলেই তাহার অনুচররা তোমাকে বাঁধিয়া ফেলিবে।"

মেরীর কথা যে অসঙ্গত নহে—আমস্ তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু তথাপি সে মেরীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া বন্দুকটা হাতে লইয়াই হানা ফার্গসের সন্ধানে পাকশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করায় আমাকেও তাহার সঙ্গে যাইতে হইল।

পাকশালার বাহিরে আসিয়া আমস্ দ্রুতপদে সাগর-বেলার অভিমুখে ধাবিত হইল। আমি তাহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলে সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আজ রাত্রিতে তুমি লণ্ঠন লইয়া সমুদ্রতীরে পাহারা দিতে যাও নাই কেন? তুমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে স্ত্রীলোকটাকে সমুদ্রতটেই দেখিতে পাইতে।"

আমি বলিলাম, "তুমি ত আজ আমাকে পাহারা দিতে বল নাই।"

আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমার আদেশ পাও নাই বলিয়া যাও নাই? প্রত্যহই তোমাকে আদেশ দিতে হইবে—এরূপ কথা ছিল কি? আমার আদেশ পাও

বা না পাও প্রত্যহ রাত্রিকালে তোমাকে সমুদ্রতটে পাহারায় থাকিতে হইবে।"

অতঃপর আমরা সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া সকল স্থান পরীক্ষা করিলাম ; কিন্তু কোন স্থানে হানা ফার্গসের বা তাহার বোটের সন্ধান পাইলাম না।

আমস্ হতাশ ভাবে বলিল, "এখান হইতে সরিয়া-পড়িয়াছে—তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ? স্ত্রীলোকটা সমুদ্র-তটের এই অংশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে নৌকা হইতে নামে নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ; কিন্তু যদি সে সমুদ্রকূলে নামিয়া কাপ্তেন জাওয়ার্জ বা লেফ্‌টেনাণ্ট লেহানকে দেখিতে পাইয়া থাকে, তাহা হইলে উপকূলের ইংরেজ রক্ষী-সৈন্য কালই আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি !"

আমস্ হঠাৎ নীরব হইল, এবং তাহার হাতের বন্দুকটা বাগাইয়া-ধরিয়া অন্ধকারপূর্ণ সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল !

এইভাবে দুই তিন মিনিট দাঁড়াইয়া-থাকিয়া সে বিচলিত স্বরে বলিল, "আমার মনে হইতেছে, হানা ফার্গস এই স্থানেই তাহার বোট হইতে নামিয়াছিল, তাহার পর গোয়েন্দাগিরি করিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। সে তাহার নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতা সম্বন্ধে কোন সংবাদ না-পাওয়া পর্য্যন্ত যে এখানে যাতায়াত বন্ধ করিবে—এ বিশ্বাস আমার নাই। হয় ত সে দীর্ঘকাল এখানে থাকিবে।"

আমি বলিলাম, "কোথায় থাকিবে ?"

আমস্ বলিল, "নৌকায় তাম্বু আনিয়া কোথাও সেই তাম্বু-খাটাইয়া"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে আমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, "শীঘ্র আমার সঙ্গে চল, সে হয় ত 'ডেভিল্‌স কেভে' লুকাইয়া আছে।"

সে আমাকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ডেভিল্‌স কেভ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; সেই অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি হরিকেন লণ্ঠনটা সঙ্গে আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম ; আমস্ আমাকে তাহা লইয়া আসিতে আদেশ করিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকটা হয় ত অন্ধকারে লুকাইয়া আছে, লণ্ঠনের আলোকে এই গুহার সকল অংশ পরীক্ষা না করিয়া আমি বাড়ী ফিরিব না।"

আমি তাড়াতাড়ি পাকশালায় ফিরিয়া হরিকেন লণ্ঠনটা হুক হইতে নামাইয়া লইলাম। মেরী তখনও জাগিয়া বসিয়া ছিল। সে উঠিয়া কোট পরিধান করিতে করিতে বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব পিটার! আমার আশঙ্কা, হানা হয় ত হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িবে।"

মেরীর চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

মেরীকে সঙ্গে লইয়া আমি ডেভিল্‌স কেভে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আমাদের বাড়ীর আঙ্গিনার প্রত্যেক অংশ সতর্ক ভাবে অনুসন্ধান করিলাম ; কিন্তু হানাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি মেরীকে সঙ্গে লইয়া ডেভিল্‌স কেভে উপস্থিত হইয়া সে-কথা আমসের গোচর করিলে সে খুসী হইয়া বলিল, "খুব ভাল কাজ করিয়াছ পিটার, বাড়ীর আঙ্গিনার চারি ধার খুঁজিয়া দেখিতে আমার ভুল হইয়াছিল। তাহাকে সেখানে দেখিতে পাও নাই, এখানে সে শয়তানী লুকাইয়া আছে কি না দেখা যাক।"

অতঃপর হরিকেন লণ্ঠনের আলোকে আমরা ডেভিল্‌স কেভের প্রত্যেক অংশ সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিলাম ; কিন্তু হানা ফার্গসের সন্ধান মিলিল না।

ডেভিল্‌স কেভ হইতে আমরা সাগরবেলায় প্রত্যাগমন করিলাম। আমস্ আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি প্রভাত পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিব। মেরী, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, পিটার আমার কাছে থাকিবে ; আমরা উভয়ে পাহারায় থাকিব।"

মেরী মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আমি একা বাড়ী যাইব না।"

মেরী আমাদের সঙ্গে সাগরবেলায় বসিয়া রহিল। আমরা তিন জনে সারারাত্রি জাগিয়া পাহারা দিলাম ; অবশেষে পূর্ব্বাকাশে ঊষালোক পরিস্ফুট হইল। প্রত্যূষে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইলে আমরা সমুদ্রতীর পরীক্ষা করিয়া এক স্থানে স্ত্রীলোকের জুতার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইলাম।

আমস্ সেই দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে বলিল, "দেখিতেছ ? স্ত্রীলোকটা বোট হইতে নামিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, পরে আবার নামিয়া গিয়াছে ;

তাহার যাতায়াতের চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে। সে জোয়ার আরম্ভ হইবার পর এখানে আসিয়াছিল; কিন্তু কাপ্তেন জাওয়ার্জ ও লেফ্‌টেনাণ্ট লেহান জোয়ার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই এই স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। হাঁ, তাহারা চলিয়া যাইবার পর হানা আসিয়াছিল, এ বিষয়ে আর আমার সন্দেহ নাই।"

আমসের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, হানা ফার্গস্ এখানে আসিয়া জার্ম্মাণদ্বয়কে দেখিতে পায় নাই।

আমস্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "কিন্তু হানা কি কারণে আসিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!"

আমরা বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলাম; মেরী চলিতে চলিতে আমস্‌কে বলিল, "সে কেন আসিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? তাহার নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতার সম্বন্ধে আমরা তাহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলাম, তাহা সে বিশ্বাস করে নাই; এই জন্য রহস্যভেদের আশায় গোপনে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছিল।"

আমস্ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "সে এখানে আসিয়া পিটারকে দেখিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, পিটার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছে; সুতরাং পিটারকে দেখিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে, আমার সে-কথা মিথ্যা। ইহাতে তাহার ধারণা হইয়াছে, আমি পূর্ব্বে তাহাকে যে-সব কথা বলিয়াছি তাহা সত্য নহে।"

মেরী বলিল, "সে যাহাই হউক, এখন হইতে আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ সমুদ্রকূলে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।"

আমসের সঙ্কল্প অনুসারে আমরা তিন জনে পালা করিয়া সর্ব্বক্ষণ সমুদ্রকূলে পাহারা দিতে লাগিলাম; কিন্তু আর এক দিনও হানা ফার্গস্‌কে আমাদের দ্বীপে আসিতে দেখা গেল না। ইহাতে আমসের আতঙ্ক ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল।

আমস্ আশ্বস্ত চিত্তে বলিল, "সে বুঝিয়াছে, তাহার এখানে আসিয়া আর কোন লাভ নাই। আমরা তাহার ভাইকে এখানে আসিতে দেখিয়াছি—ইহা সে সপ্রমাণ করিতে পারিবে না; আমরা তাহাকে সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছি, ইহা প্রতিপন্ন করা ত দূরের কথা!"

কিন্তু আমি ও মেরী তাহার এই সিদ্ধান্তের সমর্থন না করিলেও তাহার কথার প্রতিবাদ করিলাম না। আমাদের উভয়েরই ধারণা হইল, হানা ফার্গস্ গোয়েন্দাগিরি করিতে শীঘ্রই আবার আমাদের দ্বীপে উপস্থিত হইবে। এ কয় দিন ক্রমাগত ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়াই সে বড়-দেশ হইতে আমাদের দ্বীপে আসিতে সাহস করে নাই, আমাদের উভয়ের এইরূপই ধারণা হইয়াছিল।

কিন্তু সেই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও 'ইউ'-বোটগুলির যাতায়াতের বিরাম ছিল না। কাপ্তেন লড্‌উইগ ভন রথভেন এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন ইংলিস চ্যানেলের পথে স্বদেশে ফিরিয়াছিল; কিন্তু কোন 'ইউ'-বোটের কাপ্তেনের নিকট তাহাদের সম্বন্ধে একটি কথাও শুনিতে পাইলাম না।

মেরী যখন একাকিনী সমুদ্র-বেলায় পাহারায় থাকিত, সেই সময় আমি ও আমস্ পাকশালায় বিশ্রাম করিতাম। আমস্ মধ্যে মধ্যে লড্‌উইগ ভন রথভেনের ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী বাহির করিয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেগুলি নিরীক্ষণ করিত; তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া উৎসাহভরে বলিত, "আমি কি তোমাকে বলি নাই—উহাদের কেহই ইংলিস চ্যানেল পার হইয়া স্বদেশে ফিরিতে পারে নাই? যদি তাহারা স্বদেশে ফিরিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই তাহাদিগকে তাহাদের 'ইউ'-বোটে এখানে দেখিতাম। তাহারা ইংলিশ চ্যানেলেই ডুবিয়া মরিয়াছে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর বা না কর—তাহাদের উভয়েই ঠিক হাঙ্গরের পেটে গিয়াছে।"

অবশেষে এক দিন আমসের এই অনুমান সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। এক দিন রাত্রিকালে একখানি 'ইউ'-বোট আমাদের দ্বীপে আসিলে তাহার কাপ্তেন ষ্টীনম্যান তাহার কাজ-কর্ম্ম শেষ করিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রামের জন্য আমাদের পাকশালায় আসিল।

আমস্ তাহাকে প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "কাপ্তেন ভন রথভেনের বোট এখন কোথায়? আর ত তিনি আমাদের এখানে তাঁহার বোটের খোরাক লইতে আসেন না!"

কাপ্তেন ষ্টীনম্যান মাথা নাড়িয়া বলিল, "আর সে আসিবেও না; তাহার বোট সাগর-গর্ভে সমাহিত হইয়াছে। তাহার একটি নাবিকেরও প্রাণরক্ষা হয় নাই।"

আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার মুখ মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া গেল ! আমস্ যথাসাধ্য চেষ্টায় আগ্রহ গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভন রথ্‌ভেনের 'ইউ'-বোট কোথায় ডুবিল কাপ্তেন ?"

কাপ্তেন ষ্টীনম্যান মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিরূপে বলি ? তাহার 'ইউ'-বোট শত্রুপক্ষের জাহাজ আক্রমণের উদ্দেশ্যে উইলহেম্‌সাভেন ত্যাগ করে ; তাহার পর এ-পর্য্যন্ত আর ত তাহাকে ফিরিতে দেখিলাম না ! কাপ্তেন রথ্‌ভেন জীবিত থাকিলে কি আর দেশে ফিরিত না ? আমার বিশ্বাস, তাহার বোট শত্রুর আক্রমণে সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।"

আরও দুই একটি কথার পর কাপ্তেন পাকশালা ত্যাগ করিল। আমস্ তাহার সঙ্গে সমুদ্রতীরে চলিল। আর বেচারা মেরী ?—সে সিঁড়ি দিয়া দ্রুতবেগে দোতালায় উঠিল। সে তখন শোকাবেগে এমন ফুঁপাইতেছিল যে, আমার মনে হইল, তাহার বুক বুঝি ফাটিয়া যাইবে !

কাপ্তেন ষ্টীনম্যান তাহার বোট সহ দ্বীপ ত্যাগ করিলে আমস্ পাকশালায় ফিরিয়া আসিল; আনন্দ-উৎসাহ তাহার চোখ-মুখে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

আমস্ অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত চেয়ারে বসিয়া পকেট হইতে ভন রথ্‌ভেনের ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী বাহির করিয়া আমার মুখের উপর সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; তাহার পর তাহা নাড়িতে-নাড়িতে বলিল, "এগুলির মূল্য আশি পাউণ্ডের এক ফার্দ্দিং কম নয় ! যদি তেমন ক্রেতা জোটে ত এগুলি আশি পাউণ্ডেরও অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব। যদি কাপ্তেনটার অনুরোধে এগুলি তাহার ভাইকে দিয়া-ফেলিতাম, তাহা হইলে কি বোকামীই হইত ! কিন্তু আমি ত আর সত্যই তত বোকা নই, তাই এ-সব আমারই হইল।"

অতঃপর সেগুলি একটি ছোট কাঠের বাক্সে পুরিয়া-রাখিয়া সে তাহার চেয়ারে পুনর্ব্বার বসিয়া পড়িল ; তাহার পর কয়েক খণ্ড রুটি ও পনীরের পাত্রটা টানিয়া লইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মেরী কোথায় ?"

আমি বলিলাম, "দোতালায়।"

আমস্ বলিল, "হাগেনের ভাগ্যের কথা শুনিয়া মেয়েটা বোধ হয় ভারী দমিয়া গিয়াছে ! জাহাজের কর্ম্মচারীদের প্রেমে-পড়ার মত বোকামী আর কিছুতেই হইতে পারে না ; বিশেষতঃ, এই সঙ্কটকালে—"

কিন্তু তাহার কথা শেষ হইল না। সে পাকশালার দ্বারের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "বাহিরে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি ! এ সময় কে এখানে আসিতেছে ?" [ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ক্ষমা ও দান

ক্ষমা করে' করে' এতো লোককেই করেছি ক্ষমা,—
আমাদের আজ ক্ষমা করে কে যে ঠিক নেই !
দান করে' করে' এত দান-ই দিনু—ফুরালো জমা,
আমরাই দান চেয়ে মরি হায়—ভিখ্ নেই !

এর পরও যদি ক্ষমার ক্ষমতা না হারাই,
মুখ দেখাবার জগতেতে আছে স্থান কৈ ?
এর পরও যদি দানের দৈন্য—না সারাই,
আমাদের মাঝে আছে আর জ্ঞানবান কৈ ?

বীরের-ই তো সাজে ক্ষমাগুণ আর দানের নেশা,
দুর্ব্বল যারা তাদের এ সান্ত্বনা কি ?
সব-কিছু দিয়ে হ্যাংলামী হল' যাদের পেশা
তারকারে ক্ষমা করে শেষে সে কি জোনাকী ?

অবিচার আর গালি-গালাজ তো গণি না ক্ষতি,
ক্ষমা আর দান অহিংসকের কাজ বেশ ;
কবে হাতে ছিল ঘিয়ের গন্ধ—সে বিস্মৃতি
বিস্ময় মানে,—ক্ষমা কি হবে না নিঃশেষ !

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

ইতিহাসের অনুসরণ

তক্ষশিলা

ভারতের ইতিহাসে 'তক্ষশিলা'র স্থান অতি উচ্চে। এদেশে যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শনের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার কেন্দ্রই ছিল তক্ষশিলা। তক্ষশিলা মহানগরীটি রাউলপিণ্ডির দশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, "সরাই-কলার" সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। এই নগরীই ছিল ভারতে বিদ্যাপ্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এই শিক্ষাকেন্দ্র হইতে নিঃসারিত জ্ঞানের আলোকে কেবল যে নিখিল ভারতবর্ষই উদ্ভাসিত হইয়াছিল এরূপ নহে; ভারতের বাহিরেরও বহু দেশের ছাত্রগণ এখানে বিদ্যার্জ্জন করিত;—বিশেষতঃ, চিকিৎসা, গণিত, এবং সঙ্গীতবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিতে আসিত। সেই জন্য তক্ষশিলা ভারতীয় সভ্যতার শক্তিকেন্দ্র ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ অশোকের রাজত্বকালে তক্ষশিলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "সকল উচ্চবর্ণের সন্তানগণ,—বিশেষতঃ, রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, এবং বৈশ্যের সন্তানরা ভারতীয় কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, এবং প্রধানতঃ চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য দলে দলে তক্ষশিলায় অধ্যয়ন করিতে আসিতেন।" অশোকের সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবতঃ বৌদ্ধপ্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই স্থান ব্রাহ্মণ্য বিদ্যারই আদি-কেন্দ্র ছিল। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণের জন্য ভারতসীমান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তিনি এবং তাঁহাব অনুচরবর্গ তক্ষশিলায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ফা-হিয়ান্, হুয়েন্-সাং প্রভৃতি চৈনিক-পরিব্রাজক তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ, এই সকল কারণে ভারতের ইতিহাসে তক্ষশিলার স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত।

তক্ষশিলা ছিল ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন-কেন্দ্র; সুতরাং এই স্থানের প্রদত্ত শিক্ষায় ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্মস্থল স্পন্দিত হইত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কোন্ স্মরণাতীত যুগ হইতে এই স্থানটি ভারতের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক তাহা আলোচিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে না কি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। তাঁহাদের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত সহস্র বৎসরকাল তক্ষশিলা প্রাচ্যখণ্ডে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; এবং ইহা প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন-ক্ষেত্র ছিল। বস্তুতঃ, উহা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছিল; তবে ইহার প্রাচীনতা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকরা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। আলেকজাণ্ডার খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পশ্চিম-ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তক্ষশিলার যশোভাতি তখন চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। সেই সুপ্রাচীন যুগে কোন প্রতিষ্ঠান যথাযোগ্য ভাবে গড়িয়া উঠিতে দীর্ঘকাল লাগিত। এই কারণে তক্ষশিলা নগরীকে তেমন আধুনিক বলিয়া মনে করা যায় না। ইহা কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বিস্মৃতির তমসাচ্ছন্ন গর্ভে তাহার স্মৃতি বিলীন হইয়াছে। সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকপ্রবর স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় একবার লিখিয়াছিলেন যে—"অবশ্য, 'তক্ষশিলা' এই নামটি আদি বৈদেশিক। ভারতীয় তক্ষশিলা নামটি বৈদেশিক কর্ত্তৃক অপভ্রষ্ট হইয়াছে।" সে ত সকল নামে এবং সকল শব্দেই হয়। পাটলিপুত্রের নাম পাণিবোথ্রা, কলিকাতার নাম ক্যালকাটা, মেদিনীপুর মিড্নাপোর প্রভৃতি দৃষ্টান্তের অভাব নাই; বরং তক্ষশিলা নামটির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

তক্ষশিলা নগরীর প্রতিষ্ঠার কাহিনী অজ্ঞাত নহে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে উহার বিশেষ উল্লেখ আছে। সূর্য্যবংশের জনপ্রিয় নৃপতি রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন, তখন সিন্ধুনদের উভয় তীরে গন্ধর্ব্বদিগের দেশ ছিল। গন্ধর্ব্বগণ সংখ্যায় তিন কোটি, এবং যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিল। তাহাদিগকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। দেশটি ছিল উর্ব্বর ও সমৃদ্ধ। * সেই সময়

---

* অয়ং গন্ধর্ব্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ।
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ।

কেকয় দেশে যুধাজিৎ নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। যুধাজিৎ ছিলেন রামের বিমাতা কেকয়ীর ভ্রাতা। যে কারণেই হউক, যুধাজিৎ গন্ধর্ব্বদিগকে শাসিত করিবার জন্য রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইবার উদ্দেশ্যে গর্গ মুনিকে দূত করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। রাজা রামচন্দ্র যুধাজিতের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ভরতকে সৈন্য-সামন্তসহ ঐ গন্ধর্ব্বদেশে অভিযান করিতে পাঠাইয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ভরতের সপ্তাহব্যাপী অতি ভীষণ যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে কোন পক্ষেরই জয় হইল না। শেষে ভরত একটি বিশিষ্ট অস্ত্র প্রয়োগে গন্ধর্ব্বদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ভরত ঐ দেশ জয় করিয়া তথায় তক্ষ এবং পুষ্কল নামক দুই পুত্রের নামে দুইটি নগরী স্থাপিত করিয়াছিলেন। তক্ষের নামে যে নগর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নাম রাখা হয় তক্ষশিলা ; আর পুষ্কলের নামানুসারে যে নগর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নাম হইয়াছিল পুষ্কলাবত। † যে ভাবে এই নগর-দুইটি গঠিত হইযাছিল, রামায়ণে তাহা কতকটা বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এ কালের অনেক ঐতিহাসিক রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডটি প্রক্ষিপ্ত জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া অনেক জটিলতা হইতে মুক্তি লাভ করেন। তবে এ কথা সত্য যে, উহার অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ আছে। ভরত-কর্ত্তৃক গান্ধার-বিজয়ের কথা হয় ত কিছু কাল পরে রামায়ণের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। রামায়ণে রাম-কথার পরবর্ত্তী কোন ঘটনার কথা নাই। ভরত কর্ত্তৃক গান্ধার দেশ-জয় রাম-রাজত্বের শেষাংশে ঘটিয়াছিল ; সুতরাং বাল্মিকীর রামায়ণে তাহা না-থাকিবারই কথা। তবে এ ধারণাও সত্য যে, উক্ত ঘটনার বিবরণ নিতান্ত আধুনিক সময়ে রামায়ণে সংযোজিত হয় নাই ; কারণ, কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে লিখিয়াছেন,—"ভরত সিন্ধুতীরস্থ গন্ধর্ব্বদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করাইয়া বীণা-গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার অভিষেক-যোগ্য দুইটি পুত্র তক্ষ এবং পুষ্কলকে তক্ষশিলায় এবং পুষ্কলাবতী নগরীতে অভিষিক্ত করিয়া রামের নিকট প্রত্যাগমন করেন। (রঘুবংশ ১৫।—৯০-৯১)

কালিদাস কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের তর্কের এখনও বিরাম নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে কালিদাস সংবৎ-প্রবর্ত্তক মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস ঠিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ জনে জনে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন ; তবে কালিদাস খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ কথা তাঁহাদের কেহই বলেন নাই। যাহা হউক, ইহার কোন মত গ্রহণ না করিয়াও বলা যায় যে, কালিদাস যখন রঘুবংশে ঐ কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তখন রামানুজ ভরত কর্ত্তৃকই তক্ষশিলা নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ ধারণা দেশের সকলেরই ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দেও তক্ষশিলার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। যখন তক্ষশিলার প্রতিষ্ঠা-সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণ নাই, তখন রামায়ণের এবং রঘুবংশের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। রঘুবংশে সূর্য্যবংশীয় রাজা রঘুর বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। উহা অন্যূন দেড় হাজার বা পৌনে-দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তখন উহা যে ভরতের পুত্র তক্ষের রাজধানী ছিল, এবং ভরত কর্ত্তৃকই উহা স্থাপিত হইয়াছিল,—তাহা সকলেই জানিত। তবে কাল সহকারে সেই প্রাচীন তক্ষশিলার স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত এরূপ নগর বারংবার নানা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তনও স্বাভাবিক।

রাউলপিণ্ডি এবং হাজরা জিলায় প্রাচীন নগরের ধ্বংস আবৃত করিয়া তিনটি মৃন্ময় স্তূপের অস্তিত্ব আছে। এই

তক্ষ রক্ষন্তি গন্ধর্ব্বা সায়ুধাঃ যুদ্ধকোবিদাঃ।
শৈলূষস্য সুতা বীর তিস্র কোট্যো মহাবলাঃ।
তান্ বিনির্জ্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্ব্বনগরং শুভম্।
নিবেশয় মহাবাহো স্ব পুরে সুসমাহিতে।
রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড। ১১৩। ১০-১৩

† হতেষু তেষু সর্ব্বেষু ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তম।
তক্ষং তক্ষশিলায়াস্তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ।
ঐ ১১৪। ১০-১১

স্তূপ তিনটি পরস্পর দেড় ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। এই স্তূপত্রয়ের নাম বীর স্তূপ, সিরকপ, এবং শীর্ষুক। তন্মধ্যে প্রথমটির গর্ভে প্রাচীনতম তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ সঞ্চিত আছে, ঐতিহাসিক সার জন মার্শাল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিরকপ এবং শীর্ষুক নগর বিদেশী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত; প্রথমোক্ত নগরটি ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীকগণ কর্ত্তৃক, এবং শেষোক্ত নগরটি কুন্ধন নৃপতিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সার জন মার্শালের এই সিদ্ধান্ত কোন্ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

ভরত কি ভাবে ঐ দুইটি পুরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন রামায়ণে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। নগর-দুইটি ধন-রত্নে সমৃদ্ধ, এবং বনরাজি দ্বারা পরিশোভিত করা হইয়াছিল। তথায় নানা বিপণি স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সপ্তকক্ষবিশিষ্ট বহু সৌধে নগরটি সুশোভিত হইয়াছিল। বহু দেবায়তনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহা তমাল, বকুল, তিলক প্রভৃতি তরুদলে পরিবেষ্টিত হইয়া শোভা পাইত। ইহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়, সে-কালের লোক নগর-রচনায় (town planning) অভিজ্ঞ ছিল। তক্ষশিলায় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহার স্মৃতি কালজয়ী হইয়া অম্লান গৌরবে বিরাজ করিতেছে। এখন পুষ্কলাবত বা পুষ্কলাবতী নগরের আর কোন সন্ধানই মিলিতেছে না; অথচ ভরত উক্ত নগরদ্বয় সমান ভাবেই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, খাইবার গিরিসঙ্কটের সান্নিধ্যেই ভরত পুষ্কলাবত বা পুষ্কলাবতী নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; উহাই বর্ত্তমান পেশোয়ার। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র; তবে পুষ্কলাবতী হইতে পেশোয়ার নামের উদ্ভব সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইতেও পারে। 'ল' বর্ণের সহিত 'র' বর্ণের পার্থক্য নাই। পুষ্কলাবত ও পুষ্করাবত অভিন্ন শব্দ। উহা নানা বিদেশীর কণ্ঠে সমুচ্চারিত হইয়া অবশেষে 'পেশারয়ার' শব্দে পরিণত হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। কথিত আছে, বর্ত্তমান পেশোয়ার এক সময়ে গান্ধার প্রদেশেরই অন্তর্ভূত ছিল; উহা খাইবার গিরিসঙ্কটের অপর দিকে কান্দাহার অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এরূপ ধারণাও অসঙ্গত না হইতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনায় অনুমানের কোন মূল্যই নাই; কেবল কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়। যাহা হউক, এখন পুষ্কলাবত নগর সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাওয়া নিষ্ফল। বিস্মৃতিতে যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, এত দিন পরে তাহার উদ্ধার-সাধন অসাধ্য; তবে তক্ষশিলা বাণীর পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উহার কীর্ত্তি বিলুপ্ত হয় নাই। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সমকালে, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে তক্ষশিলা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। সেই সময় ইহার বিদ্যাপীঠের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে পারস্যরাজ মহিয়ান্ সাইরাস (Cyrus the Great) বিদ্যোৎসাহী ও উদারপ্রকৃতি নরপতি ছিলেন; সুতরাং সেই সময়ে ইহার বিদ্যাপীঠের অবস্থা যে উন্নত ছিল,—এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে। বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসও লিখিয়া গিয়াছেন, এই স্থান পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিরকপ-স্তূপের গর্ভে সঞ্চিত পুরাবস্তুর মধ্যে একটি ক্ষোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার অক্ষর দেখিলে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে প্রচলিত বর্ণলিপির অভিন্ন বলিয়াই ধারণা হয়। উহার যথাযোগ্য পাঠোদ্ধার হয় নাই; সুতরাং উহা হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উপায় নাই। ঐরূপ কতকগুলি বিক্ষিপ্ত বস্তু হইতেই প্রত্নতত্ত্ব-বেত্তারা স্থির করিয়াছেন যে, তক্ষশিলা কিছুকালের জন্য পারস্যের একিমেনিড (Achemenid) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব; উহা অনেকটা আনুমানিক। যদি খাইবার গিরিসঙ্কটের পূর্ব্বদিকে পারস্যের প্রভাব বর্ত্তমান থাকিত, তবে তাহা অল্প-স্থায়ী হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এই সময় পারস্যের রাজনীতিক অবস্থা অতীব অবনত হইয়াছিল; সুতরাং ভারতের এই সুদূর প্রত্যন্তদেশে রাজ্যরক্ষা করা পারসিকদিগের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যে সময়ে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তক্ষশিলায় অম্ভি নামক এক জন ক্ষত্রিয় নরপতি ছিলেন। এই নরপতির সহিত পুরুরাজের বিরোধ চলিতেছিল। অম্ভি পুরুরাজের সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়া আলেকজাণ্ডারের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ

করিয়াছিলেন, তখন তক্ষশিলায় পারস্যদিগের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল না। আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় এক সপ্তাহ কাল তক্ষশিলায় স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় ভারতের পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশে পারস্যের অল্পস্থায়ী অধিকারের প্রভাব এরূপ প্রবল ছিল না যে, পারসিকদিগের চিন্তার ধারা তদানীন্তন কালে ভারতের উপর কোন দিকে যৎসামান্য প্রভাবও বিস্তার করিবে।

আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণ-ফলে তক্ষশিলা গ্রীক-দিগের শাসনাধীন হইয়াছিল। গ্রীক বীরের সহিত তক্ষশিলা-পতির সম্বন্ধ কিরূপ হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না; তবে উহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ করিবার স্বল্পকাল পরেই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত (৩০৪ খৃঃ-পূঃ অব্দে) গ্রীক রাজা সেলিউকাস নিকেটারকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া প্রায় সমস্ত গন্ধর্ব্ব বা আফগান রাজ্যটি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বড় জোর বাইশ বা তেইশ বৎসর কাল ভারতের ঐ অঞ্চলে গ্রীক-প্রভাব অব্যাহত ছিল। সুতরাং তক্ষশিলার বিদ্যা-কেন্দ্রে গ্রীক অধিকারের প্রভাব কতটুকু ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই প্রতীতি হয়।

চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, এবং অশোকের রাজত্বকালে এই অঞ্চলে কোন বিদেশীই রাজ্যস্থাপন করিতে পারে নাই। অশোকের পুত্রের শেষ আমল হইতে বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু তখনও তক্ষ-শিলা স্থায়িভাবে কোন বিদেশীর কর-কবলিত হয় নাই। মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের আমলে তাঁহার সেনাপতি পুষ্পমিত্র বহ্লিক-গ্রীকদিগকে পশ্চিম-ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বৃহদ্রথ বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার আমলে পশ্চিম-ভারতে বহ্লিক-গ্রীকদিগের কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এসিয়াস্থিত অন্য জাতির সহিত শোণিত সংমিশ্রণে এই বহ্লিক গ্রীকগণের উৎপত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সার জন মার্শাল ইহাদিগকে য়ুরোপীয়ান বলিয়াছেন। ইহারা মধ্যে মধ্যে ভারতের পশ্চিম-প্রান্তে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিত। এখন এই প্রভাব কেবল শিল্পকলার দিক্ দিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল অথবা মানব-চিন্তার অন্য ধারা ধরিয়া ভারতে প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান হয় নাই।

শিল্পকলার দিক হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প এবং চিত্র-শিল্পের উপর গ্রীক্-পারসিক-শিল্পের প্রভাববিস্তারের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ, তক্ষশিলার এবং পশ্চিম-ভারতের স্থাপত্যশিল্পে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন মিলিয়াছে। আলেখ্য-শিল্পে উহার প্রভাব অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় নাই। তাহার কারণ, হিন্দুজাতির দৃষ্টি কোন কালেই সৃষ্টির বহিরঙ্গের দিকে নিবদ্ধ হয় নাই; অন্তরঙ্গের দিকেই উহা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট ছিল। সেই জন্য হিন্দুর চিত্র-শিল্প প্রথম হইতেই গ্রীক্ চিত্র-শিল্পের সহিত সংস্রব-বিরহিত, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সার জন মার্শাল সেইজন্য বলিয়াছেন যে, "ইটালীতে এবং পশ্চিম-এসিয়াতে গ্রীক-শিল্প যেরূপ প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল, ভারতীয় শিল্পে উহা সেরূপ প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে নাই; গ্রীক্‌রা মানুষ, মানুষের সৌন্দর্য্য, এবং মানুষের বুদ্ধিই তাহার সর্ব্বস্ব বলিয়া গণ্য করিত; কিন্তু ভারতবাসীরা কখনই তাহা মনে করিতে পারেন নাই, বা করেন নাই। তাঁহারা মানুষের নশ্বরতার দিক লক্ষ্য না করিয়া অবিনশ্বর দিক্‌টাই লক্ষ্য করিতেন। সসীমের দিক্ চিন্তা না করিয়া অসীমের দিক্ লইয়াই অনু-শীলন করিতেন। গ্রীক্‌দিগের দৃষ্টি নৈতিক দিকে, ভারতবাসী-দিগের দৃষ্টি আধ্যাত্মিকতার দিকে। গ্রীকরা বুদ্ধিপ্রধান, ভারতীয়রা ভাবপ্রধান। বস্তুতঃ, গ্রীকরা ছিলেন সৌষ্ঠবতার সেবক, আর ভারতীয়রা আধ্যাত্মিকতার পূজারী।

কিন্তু রাম-রাজত্বের কাল হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রভাব ভারতীয় সভ্যতাকে কিরূপ রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহার নির্ণয়োপযোগী উপাদান এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। ভারতের যে-স্থানে এই বিদ্যা-মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে-স্থানে একে একে ভারতের, পারস্যের, গ্রীসের, শকদিগের, এবং কুষাণদিগের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। যে স্থান বহু জাতির মিলন-ক্ষেত্র হইয়াছিল, সে স্থানের বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান যে

কেবলমাত্র একই সভ্যতার বা একই ভাবের সভ্যতার বিকীরণ-যন্ত্র হইয়াছিল, এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নহে। তবে এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত যে, এই স্থানে, এই বিদ্যামন্দিরের প্রসাদাৎ ভারতীয় এবং গ্রীক-সভ্যতা পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছিল, এবং সেই সম্মেলনের ফলে উভয় সভ্যতারই সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। পিথাগোরাস প্রভৃতি গ্রীক দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তে যে ভারতীয় দর্শনের আংশিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহা এই বাণীকুঞ্জের নিনাদিত কুহুস্বরেরই প্রতিধ্বনি কি না, কে বলিতে পারে? পিথাগোরাসের জন্মান্তর-বাদই যে কেবল পাশ্চাত্য-দর্শনে ভারতীয় চিন্তার ফলন মাত্র এরূপ নহে,—তাঁহার গণিতাঙ্ক দর্শনেও (mathematic school) ভারতীয় চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়াই মনে হয়। পিথাগোরাস যে সময়ে তাঁহার মত প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইলেও তাঁহার মত আদৌ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। সুতরাং এই জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফল-বাদ যে হিন্দুর দর্শন হইতে গৃহীত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়াই উচিত। সর্ব্বত্যাগী ডায়োজিনিসের জীবনের আদর্শ ভারতের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের আদর্শেরই অনুরূপ ছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এরিস্টটলের (Aristotle) প্রভাবেই যে আলেকজাণ্ডার ভারত-বিজয়ে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন,—তাহার অনুকূলে প্রবল কোন প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও এরূপ অনুমান যে একেবারেই অমূলক,—ইহা কেহই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন না। পাশ্চাত্য গণিত এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি যে প্রাচীন কালে ভারতীয় প্রভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, এই তক্ষ-শিলার বিদ্যাপীঠই তাহার কারণ, ইহা সহজেই প্রতীতি হয়। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রেও পাশ্চাত্য প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ, যে সারস্বতায়তন স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের প্রান্তদেশে ভারতীয় চিন্তাজ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল, মানব জাতির ইতিহাসে তাহার স্থান বহু ঊর্দ্ধেই অবস্থিত। যে বিদ্যাকেন্দ্রে বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্ঘাত এবং সংলাপ হইয়াছিল,—তাহাতে যে অন্য সভ্যতার চিন্তার ধারা সম্মিলিত হয় নাই,—তাহা কোন মতেই ধারণা করিতে পারা যায় না। বিদ্যানিকেতনের অধ্যাপকগণও রাজনীতিক কারণে ভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য প্রচার করিতে বাধ্য হইতে পারেন। এই তক্ষশিলার শিক্ষাগুণে অনেক গ্রীক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন,—তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মিনাণ্ডর বা মনিন্দ নামক গ্রীক রাজা যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই তক্ষশিলার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এ পর্য্যন্ত তক্ষশিলায় যে সকল পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হইয়াছে যে, বৈদেশিকরা ভারতীয় প্রভাবে যত প্রভাবিত হইয়াছে, ভারতীয়রা বিদেশী প্রভাবে ততটা প্রভাবিত হন নাই। সার জন মার্শাল পর্য্যন্ত সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষ পরীক্ষা-ফলে ঐ স্থানে আবিষ্কৃত বহু পুরাবস্তু হইতে ঐ তথ্যই অবগত হওয়া যায়। এমন কি, গ্রীকরা তাঁহাদের দেবতাদিগের সহিত ভারতীয় দেব-দেবীর একত্ব প্রকটিত করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। সার জন মার্শাল সে-কথা স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গ্রাক দেবতা ইটালীয় চিন্তা-প্রভাবে ইটালীয় দেবতার সহিত একত্ব লাভ করিয়াছিল। গ্রীসের বিদ্যাদেবী এথেনা, এবং রোমকদিগের মিনার্ভা, ডিয়োনিসাস ও বেক্কাস অভিন্ন, ইহা যেমন ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল, সেইরূপ হিন্দুর সূর্য্যকে গ্রীকরা তাহাদের এপলো, এবং হিন্দুর কন্দর্পকে তাহারা গ্রীকের ইরাসের (Eros) সহিত অভিন্ন মনে করিত। ঐ অঞ্চলের গ্রীকরা হর-পার্ব্বতীর এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। * সুতরাং বিভিন্ন ভাবের সংঘর্ষে তখন হিন্দুর ভাবধারা আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিল।

The Greeks with their very elastic pantheon readily identified Indian gods with their own deities; and just as in Italy they identified Minerva with Athena or Bacehus with Dionyesus, so in India, they identified the Sungod Surja with Apollo, or Kama, the God of love with their own Eros and they had no hesitation therefore in paying their devotion to Shiva and Parbati, to Bisnu or to Lakshmi.—Guide to Taxila, p 96.

পারসিকগণই হউন, আর আলেকজাণ্ডারই হউন, অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রীকগণই হউন, কেহই তক্ষশিলার কোন ক্ষতি করেন নাই। মৌর্য্যবংশীয় এবং শুঙ্গবংশীয় রাজগণ উহার সহায়তাই করিয়াছিলেন। ভারতীয় ভাবধারা গোমুখী-নিঃসৃত ভাগীরথী-প্রবাহের ন্যায় তক্ষশিলা হইতে নিঃসারিত হইয়া কত দেশকে ভারতীয় রসধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিল, এখন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। যদি তক্ষশিলা থাকিত, তাহা হইলে হয় ত তাহার ইতিহাসও থাকিত। শক, প্যার্থিয়া এবং কুষাণদিগের আক্রমণ সহিয়াও ইহা স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূণদিগের বহু অত্যাচারে ইহার দীর্ঘকালস্থায়ী অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। এই স্থানের ভূগর্ভে যে সকল পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে,—তাহা ভারতের অতীত গৌরবের নির্ব্বাক সাক্ষিস্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

তক্ষশিলার পতনের পর গুপ্ত রাজগণের চেষ্টায় নালন্দায় অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চীন-পরিব্রাজক হুয়েনসাং ও ফাহিয়ান তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

শ্রীগৌরাঙ্গ

বিষয়-বিভব সম্ভোগে যবে মত্ত হইল দেশ,
রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্মে যে-দিন ছিল না গ্লানির শেষ,—
সে-দিন তোমার শ্রবণে পশিল ধরণীর ক্রন্দন,
মর্ত্ত্যের বুকে মানুষের বেশে এলে তুমি, নারায়ণ!
পতিতপাবন হে মহাপুরুষ! অবতরি' ধরাতলে
জগতের যত কলুষকালিমা ডুবা'লে চোখের জলে।
নীচ অশুচিরে হেরি' ঘৃণাভরে সবে গেছে যবে চলি,'
তুমি তা'রে কোল দিয়েছ তখন নর-নারায়ণ বলি'!
মানুষের মাঝে লুকায়ে আছে যে পতিতের ভগবান্
সে-কথা স্মরিয়া আর্ত্তের তরে কাঁদিল তোমার প্রাণ।
বিশ্বের ব্যথা সিক্ত করিল তোমার চিত্ত-ভূমি,—
জায়া-জননীর মায়া কাটাইয়া সন্ন্যাস নিলে তুমি।

হে মহামানব! অন্তরে তুমি নিত্য করিলে ধ্যান—
মানবের চির-মুক্তি মন্ত্র, শান্তি ও কল্যাণ!
ভগীরথসম প্রেমের গঙ্গা বঙ্গে আবার আনি'
বুদ্ধের মত প্রচার করিলে ভক্তি ও প্রেমবাণী।
ভাব-যমুনায় মাতাইলে তুমি প্রচার-সঙ্গিগণে
একদা যেমন ব্রজের দুলাল মাতালো বৃন্দাবনে।
শুষ্ক জীবন-মরুর মাঝারে বিতরি' স্বর্গসুধা
হে নর-দেবতা! মিটালে জীবের অন্তর-ভরা ক্ষুধা।
ধ্রুবতারাসম আঁধার গগনে দেখায়ে প্রেমের আলো
হে মহাপ্রেমিক! নাশিলে সবার বুকের বেদনা কালো।
দুর্ভাগা হীন পাতকীর তরে নয়ন-সলিলে ভাসি'
লাঞ্ছনা কত সহিলে নীরবে বরষি মধুর হাসি!

পতিতের চোখে আবার দেখি যে অঝোরে অশ্রু ঝরে,
কে ঘুচাবে তা'র হৃদয়ের ভার আদরে করুণা ক'রে?
সংসার-ভরা হিংসা ও দ্বেষ, আর্ত্তের হাহাকার;—
পাপী তাপী পুনঃ ডাকিছে তোমায়, এস প্রেম-অবতার!
বেদনার ভার বহিতে পারে না বিশ্বের নরনারী,
সবাই কাতরে আহ্বান করে, এস হে দুঃখহারী!
যুগে যুগে তুমি এসেছ ধরায় বাজা'য়ে শঙ্খভেরী,
ত্রিতাপ নাশিতে এবার আসিতে আর কেন প্রভু দেরী?

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)।

গল্প-দাদুর বৈঠক

(রূপ-কথা)

৩

সে-দিন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিবামাত্রই গল্প-দাদু তাঁহার গল্প বন্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,—

সন্ধ্যের প্রদীপ জ্বললো—
দাদুর কথাও ফুরোলো ;
এখন এলো পড়ার পালা,
দাদুর গল্প বিকেল-বেলা ।

সুর করিয়া ছড়াটি কাটিয়াই দাদু বলিলেন—বুঝলে তো ?

রমা সঙ্গে সঙ্গেই হাসিয়া উত্তর দিল,—বুঝিছি, আপনার ছড়ার মানে হচ্ছে—'যখনকার যা, তখনকার তা !'

জ্যোতির্ম্ময় রমার মুখের কথাটা যেন লুকিয়া-লইয়া বলিল,—আমরাও তাই ক'রে থাকি দাদু ! পড়ার সময় পড়ি, খেলার সময় খেলি, খাবার সময় খাই, আর—গল্প শোনবার সময় মনের আনন্দে গল্প শুনি ।

দয়াময় বলিল,—তবে আপনার রূপকথার তোতা-পাখীর দুঃখে আমাদের মন বেদনায় টন্-টন্ করছে, এ কথা লুকোবো না দাদু !

রমা বলিল,—তবে এ-ও ঠিক দাদু, পড়বার সময় আপনার তোতাপাখীকে মনের কোণেও ঘেঁসতে দেব না, কিন্তু শোবার সময় তো ভুলতে পারবো না তাকে ;—সাধ ক'রে কি বিপদই টেনে আনলে সে বেচারা ! আর ঐ পোড়ারমুখো পেটেলটা কি বিশ্বাসঘাতক !—কাল যেমন ছুটী হবে আর তখনই আসবো দাদু, শেষটুকু শুনতে ।

কাজেই এ-দিন একটু আগেই গল্প-দাদুকে তাঁর বৈঠক বসাইতে হইয়াছে । বালক-বালিকারা তাড়াতাড়ি দাদুর সেবার কাজগুলি সারিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে । সকলের মন পড়িয়া আছে—রূপকথার রাজা দীপঙ্কর আর তাঁর বিশ্বাসঘাতক অনুচর পেটেলের উপর ! তোতা-পাখীর দেহ ধরিয়া রাজা কোথায় উড়িয়া চলিলেন, আর ফন্দীবাজ পেটেলই বা রাজার মূর্ত্তি ধরিয়া কি করিল—তাহা জানিবার জন্য বৈঠকের সব ছেলে-মেয়েরই চক্ষু কৌতূহলে চিক্-চিক্ করিতে লাগিল ।

গড়গড়ার নলটি মুখে তুলিয়া আস্তে আস্তে 'অম্বুরী' তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে, দাদু তাঁর নানা বয়সের শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের আগ্রহভরা মুখগুলির দিকে চাহিতেছিলেন ; শেষে নলটি নামাইয়া-রাখিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

তোতাকে উড়ে-যেতে দেখেও পেটেল কিন্তু দ'মলো না—তাড়াতাড়ি উড়ন্ত পাখীকে নিশানা ক'রে পর পর তিনটে গুল্ ছুঁড়লো—তার সাংঘাতিক বাঁটুল থেকে ; কিন্তু তোতা এমনি এঁকে-বেঁকে ওপরের দিকে উড়ে যাচ্ছিলো যে, একটি গুলও তার গায়ে লাগলো না । পেটেল তখন হতাশ মনে বাঁটুলটা ছুঁড়ে ফেলে-দিয়ে নিজের মনেই ব'লে উঠলো—একেই বলে—কৈ মাছের প্রাণ ! মরেও মরলো না—পাখী হ'য়ে উড়ে পালালো ! চুলোয় যাক, আমার রাস্তা ত এখন খোলসা !

পিছন থেকে ভারি গলায় উত্তর এলো,—খোলসা কোথায় ? কাঁটা ফেলেছো নিজের হাতে ; না সরালে পরে কিন্তু পস্তিয়ে মর'বে ।

কথাগুলো শুনে চমকে-উঠে পিছনে চাইতেই পেটেল দেখলে—রাজার দুই ঝুনো মন্ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে শিং নাড়ছেন ! দুই স্যাঙাতের চেহারা আজ একেবারে বদলে গেছে । দু'জনেরই আধখানা মুখ আহ্লাদে হাসছে, আর আধখানা মুখ—যেন আফশোষে কাঁদছে !

পেটেল এঁদের দেখেই এক-মুখ হেসে ব'লে উঠলো,—

আপনাদের কথাই ভাবছিলুম, এসেছেন দেখে বাঁচলুম! এখন কি করা যায় বলুন ত।

গোঁফ-যোড়াটি ফুলিয়ে কৃষ্ণ সিং বললেন,—ঐ পাখীটাকে যাতে ধরা যায়, তাই করতে হবে আগে। বুদ্ধিমানের মত সব কায ক'রে—একটু ভুলেই সব মাটি ক'রে বসলে! পাখীটাকে আগেই নিকেশ করা তোমার উচিত ছিল।

পেটেল বললে, কে জান্‌তো ওটা অমন ক'রে আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবে? এক গুলেই যে তোতাকে কাত করলুম, তিন তিনটে গুল্ এড়িয়ে সে দিব্যি উড়ে পালালো!

প্রসাদ সিং বললেন,—পালাবে না? ঐ উড়ন্ত তোতার ভেতরে যে রাজা দীপঙ্করের প্রাণ—সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? দুঃখ এই—শক্রর শেষ র'য়ে গেল!

পেটেল এবার একটু শক্ত হ'য়েই বললে,—তাতে কি হয়েছে? রাজা দীপঙ্কর ত এখন আপনাদের সামনেই। ঐ তোতার এখন কি ক্ষমতা? ও আর করতে পারে কি?

কৃষ্ণ সিং বললেন,—তবুও ওকে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না। শাস্ত্রকাররা ব'লে গেছেন—ঋণ, আগুন আর শত্তুর—এদের শেষ না-ক'রে ছাড়বে না। কাজেই যেমন ক'রে হোক, ঐ তোতাকে ধরাই চাই।

পেটেল জিজ্ঞাসা করলে,—কেমন ক'রে ধরবেন? ও যদি ঝাঁকে মিশে যায়! তার গায়ে ত আর কোন নিশানা নেই—যে, দেখলেই চিনতে পারা যাবে!

প্রসাদ সিং বললেন,—তারও উপায় আছে। এখনই ব্যাধ-পাড়ায় এই ব'লে ঢেঁড়া দিতে হবে—রাজা দীপঙ্করের জন্য এক লাখ তোতা পাখী চাই। যে যত তোতা ধ'রে আনতে পারবে—এক একটি পাখীর জন্যে দশটি ক'রে টাকা সে বক্‌শিস্ পাবে।

পেটেল আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বললে,—খাসা মতলব বার করেছেন! বাছাধনের আর নিস্তার নেই, যেখানেই থাকুক লাখের মধ্যে এবার ধরা পড়তেই হবে।

এদিকে পেটেলের গুল্ থেকে দেহটাকে বাঁচিয়ে তোতা-রাজা রাজপ্রাসাদের দিকেই উড়ে চললেন। পাখীর দেহ হ'লেও, তাঁর আত্মা, মন, বুদ্ধি ত আর পাখীর নয়,—রাজ-বুদ্ধি তখন তোতাকে চালাচ্ছে। তোতার ছোট দেহটির ভেতরে থেকে রাজার মন কত কি ভাবছে! এক জনকে পরম অনুগত ভেবে বিশ্বাস ক'রে নিজের কি বিপদই তিনি ডেকে আনলেন! তাঁর পরম সুন্দর দেহ ধ'রে সেই বিশ্বাসঘাতক আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে নাচছে, আর তিনি পাখী হ'য়ে অনাথার মত আকাশে উড়ে চ'লেছেন! কোন শক্তিই আজ তাঁর নেই! তিনিই যে রাজা দীপঙ্কর—তোতার ক্ষুদ্র দেহটির ভিতর ঢুকেছেন—কে এ-কথা বিশ্বাস করবে? আর ঐ ভণ্ড যে দীপঙ্কর নয়—বিশ্বাসঘাতক পেটেল—তিনি সারা জীবন-ধ'রে চেঁচিয়ে বললেও—কেউ তা কাণে তুল্‌বে না। তবু তাঁর ইচ্ছা হ'ল—পেটেলের আগেই রাজবাড়ীতে যাবেন, রাজকন্যার মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেবেন। রাজকন্যা বুদ্ধিমতী, করুণা-ময়ী; ব্যাপারটা বিশ্বাস না করলেও শরণাগতকে তিনি নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবেন।—এই আশায় তোতা-রাজা রাজ-বাড়ীর দিকে উড়তে উড়তে ছুটলেন।

খানিক দূর গিয়েছেন, এমন সময় শোঁ-শোঁ ক'রে উঠলো একটা বিশ্রী শব্দ! তোতা-রাজা শব্দটা শুনেই সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখলেন, তাতে তাঁর গায়ের পালকগুলো কাঁটার মত খাড়া হ'য়ে উঠলো, ডানা জোড়াটা অবশ হ'য়ে পড়লো। বনের নিরীহ পশুরা বাঘের গায়ের গন্ধ পেলে যেমন ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে যায়, আকাশে পাখিদেরও তেমনি ভয়ঙ্কর এক শক্র আছে; সে হচ্ছে—পাখীর যম বাজ! রাজবাড়ীর ওপরে দুটো ভীষণাকার বাজপাখীকে চক্কর দিয়ে ঘুরতে দেখেই তোতা-রাজার পাখীদেহটা ভয়ে ঐ ভাবে আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। তবে মানুষের চেহারা হারালেও বুদ্ধিটুকু ত তিনি হারান-নি; তাই, তখনি তিনি রাজবাড়ীর রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে এমন কৌশলে উড়ে চললেন—যাতে তাঁর দিকে যোড়া বাজের নজর না পড়ে।

অনেকক্ষণ পরে তোতা-রাজা যখন জঙ্গলের ভেতর ঢুক্‌লেন, তখন রাত হয়েছে। ঝিঁঝির ডাকে সারা জঙ্গল যেন ঝাঁ-ঝাঁ করছে; জোনাকিগুলো সার-বেঁধে এমন বাহার দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে—হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তারা বুঝি রাশি রাশি ডেল্‌কো জেলে বনদেবীর আরতি করছে। তোতা-রাজা আস্তে আস্তে কাণ পেতে

ক্রমেই এগিয়ে চললেন—যদি পাখীদের কোন সন্ধান পান, তাদের কথাবার্ত্তা কাণে আসে; কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য, জঙ্গলের ভিতর অনেক দূর গিয়েও পাখীর কোন সাড়াশব্দই তিনি পেলেন না! অবাক হয়ে ভাবলেন,—ব্যাপার কি? মানুষ আজ পাখী হ'য়েছে বলে, পাখীরা সব মানুষ হ'য়ে নগরে চ'লে গেল না কি? কত রকমের পোকা-মাকড় মনের আনন্দে চেঁচাচ্ছে, বনের জন্তুদেরও গলার শব্দ জানিয়ে দিচ্ছে তারা কেউ বন ছেড়ে পালায়-নি,—শুধু পাখীদের কোন পাত্তাই নেই! এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার?

তোতা-রাজা জোনাকীর আলোয় পথ দেখে গাছের ডালের ভেতর দিয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে চললেন। হঠাৎ একটি ঝোপ থেকে পাখীর গলার এমন করুণ স্বর তাঁর কাণে ঢুকলো—কান্নার মতনই তা শুনাচ্ছিল। তিনি চুপ ক'রে একটি ডালের ওপর চেপে বসলেন, আর কাণ-দুটি পেতে রাখলেন ঝোপের দিকে—যেখান থেকে পাখীর কান্নার মত সেই আওয়াজ উঠছিলো।

কিছুক্ষণ এই ভাবে থেকে তিনি যা শুনলেন, তাতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ বুঝি হিম হ'য়ে গেল!—এই ঝোপের ভেতর এক পাল তোতা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাসা বেঁধে অনেক দিন থেকেই নির্ব্বিঘ্নে বাস করছিল, কিন্তু বিদেশের এক রাজা এসে এমনই উপদ্রব বাধিয়েছেন যে, আর তাদের নিস্তার নেই! সেই রাজার নাম হচ্ছে—দীপঙ্কর। সে ব্যাধপাড়ায় আজ বিকেলে এই ব'লে ঢেঁড়া দিয়েছে—তার চাই তোতা পাখী, একটি দুটি নয়, এক লাখ! যে যত পারে দিক। এক একটি তোতার জন্যে সে দেবে দশ দশ টাকা বকশিস্! ঢেঁড়া শুনেই ব্যাধেরা সারা জঙ্গল জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। সমস্ত পাখীই জঙ্গল ছেড়ে পালিয়েছে, শুধু এরাই পালাতে পারেনি, পালাবার সময় পায়নি—তাই। এখন কি হবে?

পাখীর ভাষা ভাল জানা ছিল ব'লেই তোতা-রাজা কাণ পেতে এদের কথা সব শুনেই বেশ বুঝতে পারলেন—কি বিপদে এরা পড়েছে। আর বনের তোতাদের এই সর্ব্বনাশ যে তাঁকেই নিয়ে—এই বিপদের গোড়া যে তিনিই নিজে, এই ভেবে দুঃখে, বেদনায় তাঁর বুকের ভিতরটা টন্-টন্ ক'রতে লাগলো। তাঁর মনে জাগলো মানুষের রাগ; ইচ্ছা হ'ল—উড়ে গিয়ে সেই বিশ্বাস-ঘাতক পেটেলের বুকে ব'সে তার চোখদুটো ঠুকরিয়ে তুলে নেবেন; কিন্তু তখনই মনে প'ড়ে গেলো—সেই পাপিষ্ঠের দেহও যে তাঁর নিজের! আর কি তিনি সে দেহের ভেতরে কোন দিন প্রবেশ করতে পারবেন?

তখন তোতা-রাজা বুদ্ধি খাটিয়ে এক কাজ করলেন; তোতাদের বাসের ঝোপটির পাশে গিয়ে বললেন,—ভাই সব! আমিও তোমাদের মতই বিপদে পড়েছি।

ঝোপের তোতাগুলো এক সঙ্গে কপচে উঠলো ভয়ে। তোতাদের সর্দ্দার শুধু সাহস ক'রে একটু এগিয়ে এসে দেখলে—তাদেরই একটি জাত-ভাই! সর্দ্দার-তোতা জিজ্ঞাসা করলে,—এত রাত্তিরে তুমি কোথা থেকে আসছো ভাই? তুমি থাক কোথায়?

তোতা-রাজা বললেন,—আমার দুঃখের কথা আর কি ব'লবো ভাই! এমন বিপদে কোন দিন পড়িনি এর আগে। থাকতুম রাজবাড়ীর দেয়ালের একটা ফাটলের মধ্যে। রোজ বিকেলে সহরের বাইরে চরতে বেরুই, আর সন্ধ্যের পর বাসায় ফিরি। আজও সহরের দিকে ফিরে চলেছি, এমন সময় দেখলুম—দুটো বাজ টহল দিচ্ছে সেই পথে! ভয়ে পাখা-জোড়াটা বন্ধ হ'বার জোগাড়! তাদের নজর এড়িয়ে পিছিয়ে পড়লুম; তার পর এসে পড়লুম এই বনে। সারা বন নিশুতি বললেই হয়, একটা পাখীরও সাড়াশব্দ নেই। তার পর আরো এগিয়ে এখানে আসতেই তোমাদের কথা শুনতে পেলুম। কথাটা তাহ'লে সত্যি? বিদেশের ঐ রাজাটা হাজার হাজার তোতাপাখী কেনবার জন্য ঢেঁড়া দিয়েছে! কিন্তু ভাই, বলতে পারো, তার এ সখ কেন?

তোতা-সর্দ্দার বললে,—তুমি যা-যা শুনেছ আমাদের মুখে, সে-সবই সত্যি কথা। কিন্তু রাজাটার মগজে এ খেয়াল যে কেন ঢুকেছে, তা কি ক'রে বলবো বল। যা হোক, তুমি যখন আমাদের বাসায় এসেছ, তখন আমাদেরই দলের এক জন হয়েছ। বাইরে থেকো না ভাই, ভেতরে এসো। খাওয়া-দাওয়া তোমার হয়েছে কি?

তোতা-রাজা পাতার ফাঁক দিয়ে ঝোপের ভেতরে গেলেন, দেখলেন, নানা বয়সের অনেকগুলি তোতা

দিব্যি সেখানে সংসার পেতে বাস করছে। তিনি গুণে দেখলেন—তারা সংখ্যায় পঞ্চান্নটি। তাঁকে নিয়ে তা'দের সংখ্যা হ'ল—ছাপ্পান্ন। তোতা-রাজাকে দেখে পাখীরা ঝাঁক বেঁধে এগিয়ে এসে—তাঁকে ঘিরে ব'সে তাঁর কথা মন দিয়ে শুনতে লাগলো।

তোতা-রাজা বললেন,—আমার খাবার জন্য ভাবতে হবে না, সে কাজ চুকিয়ে এসেছি। এখন ত দেখছি আমাদের মরা-বাঁচার সমস্যা চলেছে। আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়,—আমরা রাতারাতি এ মুলুক ছেড়ে যদি অন্য এলাকায় পালাই ?

তোতাদের সর্দ্দার বললে,—এ যুক্তি মন্দের ভালো। তাহ'লে ভয়-ভাবনা আর থাকে না। কিন্তু ব্যাধগুলো যে আগেই জঙ্গল ঘিরে ফেলেছে বেড়া-জাল দিয়ে, কি ক'রে সেই জাল এড়িয়ে বেরিয়ে যাব ?

তোতা-রাজা বললেন,—কিন্তু এই ঝোপের ভেতর যে ভাবে তোমরা ঝাঁক-বেঁধে ব'সে আছ, তাতে ধরা প'ড়তে কতক্ষণ? তার চেয়ে এই অন্ধকারেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়াই ভালো।

এ-কথা নিয়ে তোতাদের ভেতর পরামর্শ চল্‌তে লাগল্। অনেক শলা-পরামর্শের পর তারা বললে,—সেই ভালো, চলো আমরা দল-বেঁধে রাতারাতি এই জঙ্গল ছেড়ে উড়ে পালাই।

তখন ছাপ্পান্নটি তোতা ঝাঁক-বেঁধে বেরুলো সেই ঝোপের ভেতর থেকে ; তার পর রাতের অন্ধকারে তারা উড়ে চললো অন্য এলাকার উদ্দেশে।

কিন্তু ব্যাধেরা তার আগেই জঙ্গলের পথে এমন কায়দায় জাল পেতে রেখেছিল যে, পাখী ত দূরের কথা, একটি ফড়িঙেরও পালাবার জো নেই! জঙ্গলের শেষে এই দলের ছাপান্নটি তোতাই এক সঙ্গে ব্যাধের জালে আট্‌কা পড়লো। সে জাল এত শক্ত যে, কিছুতেই ছিঁড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই।

তোতা-সর্দ্দার কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বললে,—সর্ব্বনাশ! যে ভয় করেছিলুম, শেষে যে তাই ঘটলো! এখন উপায়?

তোতা-রাজা চাপা-গলায় পরামর্শ দিলেন,—চুপ! কেউ চেঁচিও না, তাহ'লেই মুস্কিল হবে। এখন আমি যা বলি শোনো ;—ব্যাধকে আস্‌তে দেখেই তোমরা সকলে মড়ার মতন আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে থাকবে; নড়বে-চড়বে না, পালাবার জন্যেও ছট্‌-ফট্ করবে না; ব্যাধ যেন বুঝতে পারে—তার জালে-বেধে আমরা সকলেই প্রাণ হারিয়েছি। তার পর যেমনই মরে-গেছি ভেবে সে আমাদের বাঁধন খুলে ফেলে দিতে যাবে, আর তখনই আমরা তাকে কলা দেখিয়ে, পাখা মেলে আকাশে উড়ে যাবো।

তোতা-রাজার এ যুক্তি পাখীদের মনে ধরলো; তারা চেঁচামেচি বন্ধ ক'রে দিনের আলোর প্রতীক্ষায় রইলো। ভোর হ'তেই ব্যাধ এগিয়ে এলো তার বেড়া-জালের কাছে। ব্যাধকে দেখেই তোতা-রাজা চাপা-আওয়াজে দলের সকলকে জানিয়ে দিলেন,—হুঁসিয়ার! ব্যাধ আসছে। আমি যেমন বলেছি, ঠিক সেই ভাবে সকলে মড়ার মতন প'ড়ে থাকো।

এক সঙ্গে এক ঝাঁক তোতা জালে আটকা প'ড়েছে দেখে, ব্যাধের মুখে হাসি আর ধরে না। সে আহ্লাদে নাচতে-নাচতে জাল নামাতে সুরু ক'রে দিলে; কিন্তু পাখীদের কোন সাড়াশব্দ নেই, পালাবার জন্যে ঝটাপটিও কেউ করছে না! তাই দেখে ব্যাধ ত একবারে অবাক! এমন কাণ্ড সে জীবনে কখনো দেখেনি! কিন্তু একটু পরেই সে বুঝলে—হায়, তার সকল আশাতেই ছাই পড়েছে; একটি তোতাও যে বেঁচে নেই, —সবগুলোই ম'রে আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে!

ব্যাধের দুঃখ তখন দেখে কে! তার মনে হ'তে লাগলো—সে ডাক-ছেড়ে কাঁদে। এতগুলো পাখী যদি সে রাজার কাছে এনে দিতে পারতো, তাহ'লে কত টাকাই আজ সে বকশিশ্ পেতো! তার বরাত মন্দ, তাই জালে আটকা পড়েও পাখীগুলো সব মরে গেলো! ভাবলে, মরা পাখীগুলো নিয়েই সে রাজার কাছে যাবে, —সে ত আর চেষ্টার কসুর করেনি; ওগুলো দেখে যদি রাজা দয়া ক'রে কিছু দেন!

এই কথা ভাবতে ভাবতে সে মরা পাখীগুলোকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই জাল থেকে ছাড়াতে লাগলো। জাল থেকে এক-একটি ক'রে তাদের খু'লে মাটিতে ফেল্‌তে ফেলতেই সে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তোতা-রাজা ছিলেন জালের সব শেষে। শুধু তাঁকেই জাল থেকে যখন ছাড়াতে

বাকি, সেই সময় এক কাণ্ড ঘট্‌লো। পাখীগুলো মস্ত একটা ভুল ক'রে ব'সলো! ঝাঁকের যে পঞ্চান্নটি তোতা খালাস পেয়েও এতক্ষণ মড়ার মতন অসাড় দেহে মাটিতে প'ড়েছিল, তারা ভাবলে সকলেই জাল থেকে খালাস পেয়েছে; এবার ব্যাধকে কলা দেখিয়ে আকাশে স'রে পড়াই ভালো! তাই সঙ্গে সঙ্গে ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ ক'রে সেই পঞ্চান্নটি পাখীই দল-বেঁধে উড়লো আকাশে।—তাদের পাখার তেজ তখন দেখে কে?

ব্যাধ তখন তোতা-রাজাকে জালের বাঁধন থেকে ছাড়াবার জন্য হাতখানি কেবল বাড়িয়েছে, শব্দ শুনেই ফিরে চেয়ে যা দেখলে—তাতে তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সারা দেহটা রাগে রী-রী ক'রে উঠলো। পাখীর পেটে এত বুদ্ধি! তার মতন জবরদস্ত ব্যাধের সঙ্গে বজ্জাতি, তাকে এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে ফন্দী ক'রে উড়ে পালানো! হায়, হায়—কি লোকসানটাই তার হ'ল,—আজ সে কত টাকাই পেত! দশ দশ টাকা—এক একটা তোতার দাম,—সোজা কথা? ব্যাধের পোর মনের যত-কিছু রাগ এবার পড়লো গিয়ে তোতা-রাজার ওপরে। মনে মনে বললে—ভাগ্যিস্ এটাকে জাল থেকে খুলিনি, তবু ত দশটি টাকা হাতে আসবে। সঙ্গে সঙ্গে সে তোতা-রাজার দেহটি মুঠোর ভেতর জোরে চেপে এই ব'লে তাকে শাসালে,—ভারি চালাকী শিখেছ বটে! আজ তোমার এক দিন, কি আমারই এক দিন!

তোতা-রাজা বুঝলেন—তাঁর অদৃষ্টের কষ্ট এখনো ঘোচেনি। নইলে—তাঁর বুদ্ধি নিয়ে ওরা সবাই পালালো, আর তাঁর বরাতে হায়, এ কি দুর্ভোগ! এদিকে মনের ঝালটুকু তাঁরই ওপর ঝাড়তে, রাগের মাথায় ব্যাধ এমনি জোরে তাঁকে চেপে ধরেছে যে—দমবন্ধ হয় আর কি! তাই তিনি আর চুপ ক'রে না থেকে, মানুষের মতই দিব্যি স্পষ্ট কথায় বললেন,—ভাই ব্যাধ! যে জোরে আমাকে চেপে ধরেছ তুমি, পাখার প্রাণ—তাতে আর কতক্ষণ টিকবে বল! আর সত্যিই যদি আমি মরে যাই, তাতে তোমার কোন লাভই হবে না ভাই! কিছুই তো তোমার হাতে আসবে না।

পাখী মানুষের মত কথা বলছে, শুনে ব্যাধ বিস্ময়ে যেন হতভম্ব আর কি! কি আশ্চর্য্য—পাখী এমন স্পষ্ট কথা বলে! তাহ'লে ত এই পাখীটাকে বেচে সে অনেক টাকাই পেতে পারে! হাতের মুঠোটা একটু আলগা ক'রে সে পাখীটিকে ভালো ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে,—তুমি ত দেখছি অদ্ভুত পাখী! মানুষের মতনই কথা বলতে পারো? মানুষের কথা তাহ'লে বুঝতেও পারো?

তোতা-রাজা ব'ললেন,—পারি। এখন আমি যা বলি, তা যদি শোনো, তা হ'লে তোমার বরাত ফিরে যাবে।

ব্যাধ বললে,—পাখী হ'লেও তুমি যে খুব ফন্দীবাজ, তোমার হাড়ে-হাড়ে বজ্জাতি, তা আমি বেশ বুঝেছি। তোমার কাছে শলা পেয়েই ঐ পাখীগুলো মড়ার মতন প'ড়েছিল, তার পর ফুরসৎ পেয়েই উড়ে পালালো। তুমি ধরা পড়ে গেছ, এখন পালাবার পথ খুঁজছো—এই ত? কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়ছি-নে।

তোতা-রাজা বললেন,—তুমি আমাকে বিশ্বাস কর ব্যাধ ভাই! আমি পালাবার ফন্দীতে এ-কথা বলিনি। আমি তোমার মনের কষ্ট বুঝতে পেরেছি। অতগুলো তোতা হাতছাড়া হ'তে তুমি একেবারে মুস্‌ড়িয়ে গিয়েছ। কিন্তু আমি বলছি—তোমার সমস্ত লোকসান উসুল হ'য়ে যাবে—শুধু আমাকেই বেচে।

তোতার কথায় ব্যাধের মন লোভে নেচে উঠলো; সে ব'ললে—ভাল, তোমার কথাটা বল—আগে তাই শুনি।

তোতা-রাজা বললেন,—তুমি আমাকে দীপঙ্কর রাজার কাছে বেচো না।

ব্যাধ জিজ্ঞাসা করলে,—কেন?

তোতা-রাজা বললেন,—বুঝতে পারছো না ব্যাধ ভাই, সেখানে নিয়ে গেলে ওরা ত তোমাকে দশ টাকার বেশী কিছুই দেবে না। তাতে তোমার কি লাভ হবে? কিন্তু আমাকে যদি ভিন্ দেশের কোন রাজা বা সদাগরের কাছে নিয়ে যাও—আমি বলছি—তুমি আমাকে হাজার টাকায় বেচতে পারবে। আমার মুখে মানুষের কথা শুনে এ-দাম দিতে কেউ পেছপাও হবে না, হাসিমুখে ঠিক হাজার টাকাই দেবে।

ব্যাধ হেসে বললে,—অত ফ্যাসাদে আমার দরকার? আমি তোমাকে দীপঙ্কর রাজার কাছেই নিয়ে যাবো।

আত্ম-সমর্পণ

[শিল্পী—শ্রীমণি ভাদুড়ী

বাজে তোতার দাম দিয়েছেন তিনি দশ টাকা ; কিন্তু তোমার মতন বোল-চালওয়ালা তুখোড় তোতা পেলে, তিনিই আমাকে হাজার টাকা দিয়ে তোমাকে লুফে নেবেন।

তোতা-রাজা বললেন,—কিন্তু তুমি যে গোড়াতেই গলদ ক'রে বসলে ব্যাধ ভাই! তোমার কাছে আমি মুখ খুলিছি বলে, তার কাছেও যে খুলবো, তার কোন মানে আছে? আমি মানুষের মতন কথা কইতে পারি—এই ব'লে রাজার কাছে তুমি যেই টাকার দাবী করবে, রাজা তখন অবশ্যই দেখতে চাইবেন—তোমার আজগুবি কথাটা কতখানি সত্যি! কিন্তু আমি যদি মুখ না খুলি,—তখন? তখন লাভের গুড় যে পীপড়েয় খাবে!—টাকা দেওয়া ত দূরের কথা, দমবাজি করার জন্যে তোমাকে তখন শূলে চড়াবে; আর কেটে আমাকে দু'খান করলেও আমার মুখ থেকে মানুষের কথা বেরুবে না, এ ঠিক জেনে রেখো। তবে ভিন্-মুলুকের কোন রাজার কাছে যদি আমাকে নিয়ে যাও—তখন তাঁর সামনে এমনি ক'রেই মুখ খুলবো। আমার এ-কথার নড়-চড় হবে না, তা ঠিক জেনো ব্যাধ ভাই!

ব্যাধ তখন ভেবে দেখলে, তোতার কথা মিছে নয়। এর মুখে মানুষের মত কথা শুধু সে একাই শুনেছে। যদি রাজার কাছে সত্যই মুখ না খোলে—তখন? ভেবে-চিন্তে ব্যাধ তখন তোতা-রাজার যুক্তিই নিলে; কিন্তু তা ব'লে তাঁকে বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিলে না। একটা খুব শক্ত খাঁচার ভেতর তোতা-রাজাকে আটক ক'রে রাখ্‌লে।

খাঁচার ভেতর থেকে তোতা-রাজা চাপা-সুরে ব্যাধকে বললেন,—আমাকে খাঁচায় পুরেছো তাতে দুঃখু নেই ব্যাধ ভাই, কিন্তু একটি বিষয়ে তোমাকে খুব হুঁসিয়ার থাকতে হবে। আমি যে খাঁচায় ভেতরে আছি, পথে তা যেন কেউ জানতে না পারে। কেন না, আমাকে এই খাঁচায় দেখলেই রাজার লোক তোমাকে মুস্কিলে ফেলতে পারে। হাঁ, তুমি বিপদে প'ড়ে যাবে।

ব্যাধ হেসে বললে,—তুমি ভারি চালাক পাখী! আমি হচ্ছি ব্যাধ, ফিকির ক'রে উড়ন্ত পাখী ধ'রে খাঁচায় পুরি, কিন্তু দেখ্‌ছি, ফন্দীতে তুমি আমার চেয়েও এককাঠী সরেশ! ভালো কথাই তুমি বলেছ।

ব্যাধ তখন তোতা-রাজার খাঁচাটি একখানা চাদর দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে নিয়ে চ'ল্‌লো, যাতে পথের লোকের মনে কোন রকম সন্দেহই না জাগে।

ব্যাধের মনটি তখন টাকার লোভে নেচে-নেচে উঠছিলো; আর কাপড়ে-ঢাকা খাঁচায় বসে—তোতা-রাজার বুকটির মধ্যে সাত-সাগরের ঢেউ বুঝি আছড়িয়ে পড়ছিল!—নিজের রাজ্য—বৃদ্ধ পিতা—এই রাজ্যের রাজকন্যা,—আর সেই ফন্দীবাজ পেটেল—তাঁর দেহখানা চুরি ক'রে তার ভেতরে ঢুকে আজ যে রাজা দীপঙ্কর হ'য়ে ছলনার জাল পেতেছে! কি হবে? কেমন ক'রে তিনি রাজকন্যাকে ঐ বিশ্বাসঘাতক, নরপশুর কবল থেকে উদ্ধার করবেন?

ঠিক এই সময় ভোঁ-ভোঁ শব্দে চা'র দিকে সাঁঝের শাঁক বেজে উঠলো। গল্প-দাদুও সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললেন, —আমার কথাটি আজকের মত ফুরোলো,—বাকিটুকু আবার কাল শুনতে পাবে।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বানর

নাম দেখে তোমরা হাসছো! কিন্তু বানর-তত্ত্ব ঠিক হাসির ব্যাপার নয়! এক দিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দল বলছেন, এই বানর ছিল নর-জাতির পূর্ব্বপুরুষ! আর এক দিকে আমাদের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের সেনা ছিল এই বানরের দল! এবং এই বানর-সেনার সাহায্যেই মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার দুরন্ত রাবণ-রাজাকে বিনাশ করে' সীতাদেবীর উদ্ধার-সাধন করেছিলেন! কাজেই বানরের কথা তুচ্ছ নয়!

বানরকে কে না ভালোবাসে? চিড়িয়াখানায় গেলে কোন্ ঘরটিতে বেশীক্ষণ থাকো? কাদের জন্য চিড়িয়াখানার ফটক থেকে ছোলা-কলা কিনতে ছোটো? চিড়িয়াখানায় কে বেশী আনন্দ দেয়? অতএব বানরের উপর আমাদের মমতা আছে, এ-কথা বললে তা মিথ্যা হবে না!

বানরের বুদ্ধি, বানরের ফন্দী-অভিসন্ধি, বানরের দুরন্ত-পণার কত গল্পই না নিত্য শুনতে পাই! সেই বানরের সমগ্র-পরিচয় কতখানি উপাদেয়, বলো তো?

প্রথমে ধরা যাক, বানরের স্বভাব! দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ! বাড়ীর পোষা-বানরটিকেও বিশ্বাস নেই! কখন তার মেজাজ বিগড়ুবে, জানি না! মেজাজ বিগড়ুলে কামড় দিতে সে এতটুকু চক্ষুলজ্জা বা দ্বিধা-বোধ করবে না! আদর করে ডাকো, বাড়ীর

মার্ম্মাশেট্

মাকড়শা-বানর

পশমী

পোষা বানর তখনি লাফিয়ে এসে তোমার ঘাড়ে চড়ে বসবে।

অতি প্রাচীন যুগ থেকেই এই বানরকে মানুষ মমতার চোখে দেখে আসছে। তার সঙ্গে ভাব করবার জন্য মানুষের আগ্রহ কোনো কালে শিথিল হয়নি! আমাদের দেশে মহাবীর-হনুমানকে অনেকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন; প্রাচীন মিশরেও এমনি বানর-পূজা প্রচলিত আছে।

ছেলেমেয়েদের কাছে বানরের যেমন আদর, এমন আদর আর-কোনো পশুপক্ষীর নেই! বয়স হয়ে গেলে বানর পোষ মানে না। এজন্য পুষতে হলে শিশু-বানর পোষা উচিত। তবে বানরের স্বভাবের কথা বলেছি, যতই পোষ মানুক, সতর্ক থেকো। কামড় দিতে কোনো কালে তার লজ্জাবোধ হবে না!

যাঁরা বানর পুষতে চান্, বানরকে কি-ভাবে পালন করবেন, সে-খপর তাঁদের জানা দরকার। বানরকে রাখতে হবে শুকনো গরম জায়গায়; স্যাঁতানে বা খোলা জায়গায় রাখলে তার স্বাস্থ্য খারাপ হবে। বানরকে এমন জায়গায় রাখতে হবে, তার গায়ে যেন ঠাণ্ডা বা ঝড়ে

বাতাস না লাগে! সে-জায়গায় সে যেন একটু লাফালাফি করতে পারে! তাকে খেতে দিতে হবে ফলমূল। মাছ-মাংস বানরে খায় না, তা নয়! একটু-আধটু মাংসও বানরকে খেতে দেবেন। তাছাড়া বানরে পোকা-মাকড় খায়। সে-দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—সে যেন পোকা-মাকড় খেতে পায়।

কুকুরের মতো বানরের গায়ে পোকা হয়। এ-পোকার

হাউলার

উৎপাত থেকে নিরাময় রাখবার একমাত্র উপায়—পোকা মেরে ফেলা। গা খুঁটে বানর নিজে গায়ের পোকা ধরে' মারে। তবে নজর রাখতে হবে—খুঁটে পোকা মারার জন্য নখরাঘাতে অনেক-সময় তারা নিজেদের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে' ফেলে। নখের এ-ঘায়ে বানরের মৃত্যু ঘটতে পারে।

ঠাণ্ডা লাগলে বানরের নিউমোনিয়া হয়। বেশীর ভাগ বানর নিউমোনিয়া-রোগেই মারা যায়। বনে অসুখ হলে নিজে থেকে গাছগাছড়া দেখে বানর ঔষধ সংগ্রহ করে, তার দৌলতে রোগ সারে। লোকালয়ের পোষা বানরের এ-সুযোগ ঘটে না বলেই রোগ হলে অনেক সময় তাদের বাঁচিয়ে তোলা দায়!

পৃথিবীর নানা দেশে কত রকমের বানর আছে, শুনলে আশ্চর্য্য হবে! সব দেশে বানর আছে; নেই শুধু অষ্ট্রেলিয়ায়। য়ুরোপে বানর আছে শুধু জিব্রালটারে। এখন চালানীর কৃপায় য়ুরোপের নানা দেশে বানরের দেখা মিলছে। আসলে, বানর হলো গরম-দেশের জীব; শীতের দেশে বানর বাঁচে না।

বানররা গোষ্ঠী-পরিবারে দল বেঁধে থাকে। বানরের আকারে বহু পার্থক্য আছে। মূনিকের মতো ছোট আকারের বানর যেমন আছে, তেমনি আবার অতিকায় বানরেরও অভাব নেই। গরিলা, বনমানুষ, গিবন—এরাও বানর-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত!

এশিয়া আর আমেরিকা—পৃথিবীর এ দুই মহাদেশের বানর-জাতের আকারে-গঠনে একটু তফাৎ আছে। এ তফাৎ সব-চেয়ে বেশী লক্ষ্য হয় তাদের নাকের এবং ল্যাজের গড়নে। আমেরিকার বানরের ল্যাজ তার পঞ্চম-পদ পূরণ করে—গাছে চড়তে বা দুলতে দুলতে এবং জিনিষ-পত্র হাতাতে ল্যাজটিকে তারা পায়ের মতো ব্যবহার করে; এশিয়ার বানর ল্যাজের সাহায্যে ব্যালান্স রক্ষা করে।

আদিম-জাতের বানর আকারে কাঠবিড়ালীর মতো ছিল। এখনো এ বানর দেখা যায় আমেরিকার

মান্‌ড্রিল্‌

বনে-জঙ্গলে। এর নাম হলো মার্ম্মাশেট। মার্ম্মাশেটের আঙুল-গুলো থাবার মতো। দেহের তুলনায় ল্যাজ অনেক বেশী লম্বা। এরা ফলমূল খায়। কিন্তু ফলমূলের চেয়ে লোভ বেশী আর্স্‌লা, মাকড়সা এবং পোকা-মাকড়ের উপর। মার্ম্মাশেটের রঙ কালো—মুখে সাদা গোঁফ আছে। সে-গোঁফ বাবু-হাঁটের।

কাঠবিড়ালীর আকারে আর-এক জাতের বানর আছে। সে বানরের নাম টিটি। টিটির বাস দক্ষিণ-আমেরিকায়। এদের হাতের নীচের দিককার গড়ন মানুষের হাতের মতো। গায়ের সর্ব্বত্র লোম আছে; নেই শুধু নীচের হাতে। টিটি-বানরের রঙ বাদামী, মাথায় কালো চুল, মুখ সাদা এবং সাদা মুখে কালো গোঁফ।

ছত্রধর

দক্ষিণ-আমেরিকার বানর-সমাজে 'টিটি' হলো অতি-ক্ষুদ্র জীব। এখানে যে অতিকায় বানর বাস করে, তার নাম হাউলার। হাউলারের দেহ বিরাট এবং ওজনে বেশ ভারী। গায়ে ঘন লোম। ল্যাজটি বিরাট এবং সে ল্যাজে প্রচণ্ড শক্তি। এ ল্যাজের আঘাতে মানুষের হাড় ভেঙ্গে যায়। হাউলারের রঙ লালচে। মুখখানি কালো। মুখে দীর্ঘ দাড়ি আছে। দাড়ির রঙ লালচে। হাউলারের চীৎকার এত তীব্র যে, জঙ্গলে ডাকলে তার সে-ডাক চার-পাঁচ মাইল দূর থেকে শোনা যায়। এ-বানরও পোষ মানে। কিন্তু বন ছেড়ে লোকালয়ে এলে যত আদর-যত্ন করো, বেশী-দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। লোকালয়ের বাতাসে কি যে আছে, হাউলারের ধাতে সে-বাতাস সয় না। পোষ মানলে এরা এমন হয় যে, সারাক্ষণ মনিবের গলা জড়িয়ে থাকবে! নামিয়ে দাও, এমন চীৎকার তুলবে যে, হয় বাড়ী ছেড়ে পালাবে, না হয় আবার তাকে
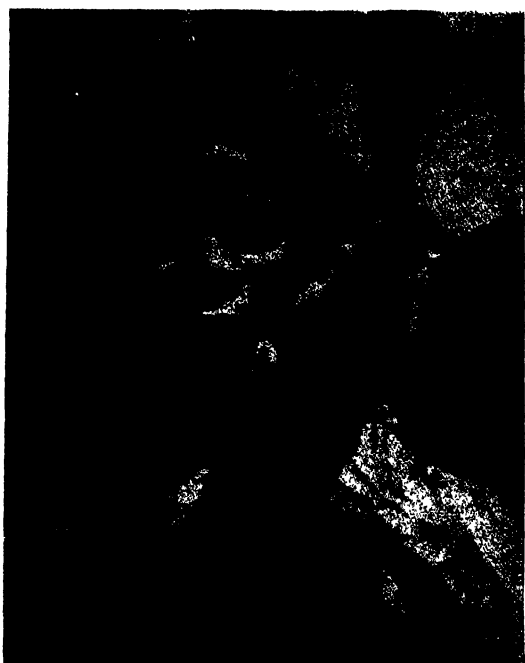
কাঠবিড়ালী-বানর

টিটি

কোলে নিতে হবে! দক্ষিণ-আমেরিকার আদিম-ইণ্ডিয়ান জাত বানরের মাংস খায়; এজন্য মানুষ দেখলেই এখানকার বানর প্রাণভয়ে পালাবার পথ খুঁজে পায় না। এদের এই বানর-মাংস-লোলুপতার

হুরোকুলিশ

কাকাতুয়ার খেলার-সাথী
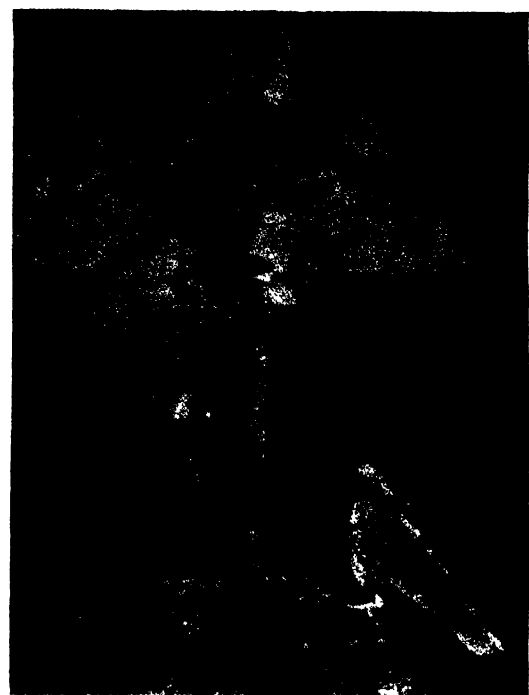
জন্য বহু-জাতের বানরবংশ লোপ পেতে বসেছে।

দক্ষিণ-আমেরিকায় আরো দু'-জাতের বানর আছে। এক-জাতের নাম মাকড়সা-বানর; আর-এক জাতের নাম পশমী-বানর (wooly)। পশমী-বানর শুধু পত্রপল্লব আর ফল খায়। এদের দেহ এত নধর-কোমল যে, ইণ্ডিয়ানরা এদের পেলে আর কোনো পশু-পক্ষীর মাংস খেতে চায় না! মাকড়সা-বানর সদা-চঞ্চল—গাছের ডাল ধরে ঝুলন-লীলাতেই বিভোর থাকে।

আর-এক জাতের বানর আছে—দুরোকুলিশ। এরা প্যাঁচার মতো নিশাচর। অর্থাৎ দিনের বেলায় গাছের নিভৃত কোটরে পড়ে ঘুমোয় এবং রাত হলে বাহির হয়! এরা খায় মাকড়শা, আর্সুলা, কেঁচো এবং বিছা! এ-বানর অতিশয় ভীরু-প্রকৃতির; মানুষের সাড়া পেলে চকিতে পালিয়ে বৃক্ষকোটরে আশ্রয় নেয়।

বানর-সমাজে এক-দল বানর আছে—আকৃতি-প্রকৃতির নানা পার্থক্য-বশতঃ প্রাণিতত্ত্ববিদেরা তাদের নাম দেছেন, বেবুন। বেবুনের সঙ্গে বানরের প্রকৃতিগত পার্থক্য হলো—১। বেবুন গাছের শাখা-প্রশাখায় বাস করে না,—তারা বাস করে বনের মাটীতে। ২। বেবুনদের কারো ল্যাজ আছে, কারো ল্যাজ নেই। যাদের ল্যাজ আছে, তাদের সে-ল্যাজ আকারে খুব ছোট। ৩। বেবুনের গালে থলি আছে; এই থলির মধ্যে এরা খাবার জমিয়ে রাখে—খুশীমতো সে-খাবার নিয়ে খায়। ৪। বেবুনের

গোয়েরেজার লোম-ঝালর

ও আমার পুও
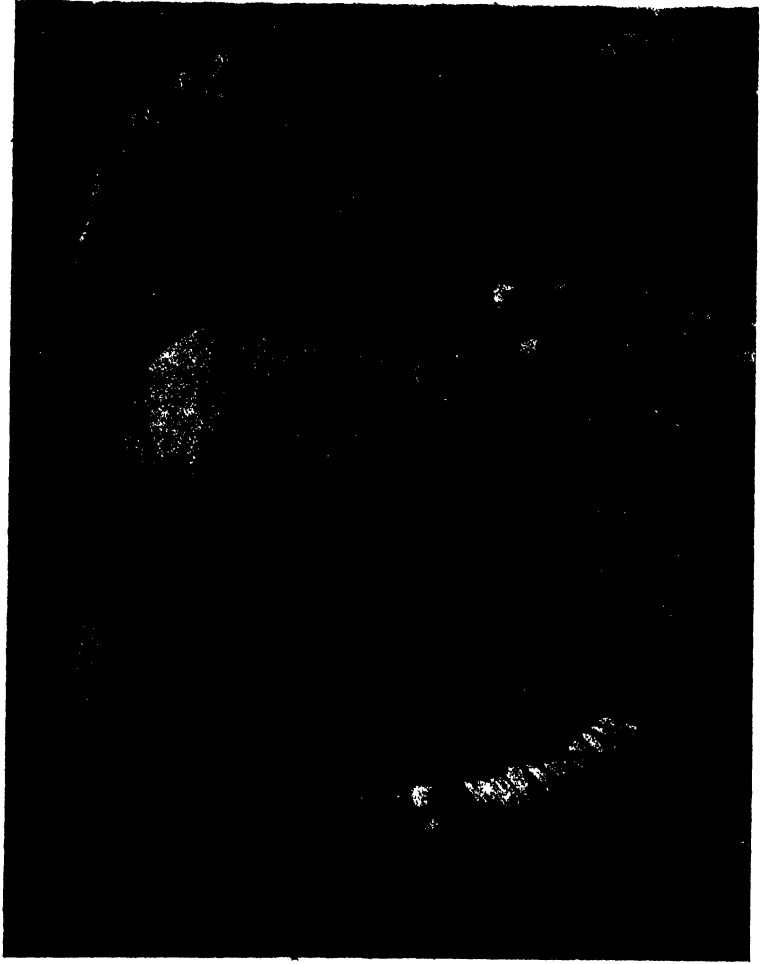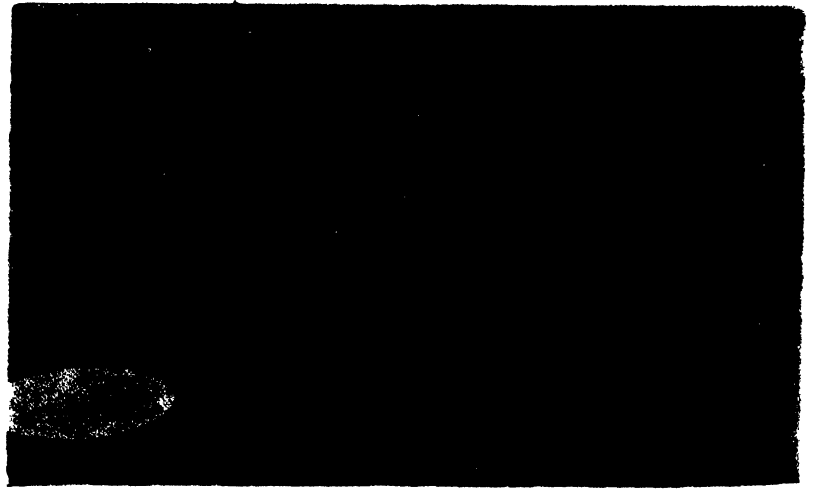
পাছার দিকে গদির মতো রঙীন এবং লোমশ মাংস-পিণ্ড আছে; এ-পিণ্ডকে আসন করে' তার উপর এরা বসে।

৫। বেবুন আকারে বড় এবং এদের দেহে প্রচণ্ড শক্তি।

বেবুনরা বড় বড় গোষ্ঠী-পরিবারে মিলিত হয়ে বাস করে। এদের সঙ্গে টক্কর দেবার সামর্থ্য মানুষের নেই।

নারিকেল-পাড়া

বেশীর ভাগ বেবুনের বাস আফ্রিকায়। ক্ষেতে ফশল ফল্‌লে সে-ফশল রক্ষার জন্য শক্ত-রকম ব্যবস্থা করতে না পারলে বেবুনের উৎপাতে সে-ফশল নষ্ট হবেই! সদলে এরা এসে ক্ষেতে উপদ্রব করে এবং সব ফশল উজাড় করে দ্যায়। এদের হাত থেকে নিস্তার-লাভের উপায় থাকে না। বেবুনের গায়ে খুব জোর; এদের তীব্র তীক্ষ্ণ নখ ও দাঁতের ধারের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য মানুষের নেই!

বেবুনের পরম-শত্রু হলো চিতা-বাঘ। চিতার সঙ্গে বেবুনের যুদ্ধ—আফ্রিকায় নিত্য-ঘটনা। কিন্তু সে-যুদ্ধে বেবুনের জয়-লাভ বড়-একটা ঘটে না।

বেবুন নামটির উৎপত্তি প্রাচীন মিশরী-দেবতা 'বেবন' থেকে। বেবুন সেই বেবন-দেবতার বংশধর। সেজন্য এ দেশের মিশরীদের কাছে হনুমানের মতো বেবুন গণ্যমান্য প্রণম্য জীব।

রাগ্‌লে বেবুনের লোম খাড়া হয়ে ওঠে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কতকগুলি বেবুন আছে। সে-সব বেবুন আনা হয়েছে সুডান থেকে।

আলিপুরে 'মানড্রিল্' বলে' যে-বেবুন আছে, তার বাস পশ্চিম-আফ্রিকায়।

আবিসিনিয়ায় এক স্বতন্ত্র জাতের বেবুন আছে। তার নাম গেলাডা। এরা বাস করে সেখানকার পাহাড়ে-পর্ব্বতে। এদের দাঁত ভীষণ তীক্ষ্ণ।

দক্ষিণ-আফ্রিকার চাকমা-বেবুন সব-চেয়ে দুর্দ্ধর্ষ। এদের সঙ্গে লড়াইয়ে সিংহ-হাতীও নিপাত যায়! একটি চাকমা-বেবুন আমেরিকার চিড়িয়াখানায় বহু-কষ্টে আনা হয়েছিল। এ-জাতের বেবুন হিম-শীত সহ্য করতে পারে; হিমে-শীতে কষ্ট বা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। আবিসিনিয়ায় এক জাতের বানর আছে—তার নাম গোয়েরেজা। এ বানরের গায়ে পরদেশী-পাখীর পালকের মতো চমৎকার লোম-ঝালর আছে। সে ঝালরের রঙ রামধনুর মতো বিচিত্র। পারিসের বিলাসিনী মহিলাদের বিলাস-ভূষণের সখ মেটাতে ব্যবসায়ীর দল এ-বানর ধরে নিয়ে যায়। তার ফলে এ বানরের বংশ প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

সুমাত্রার লোকজন বানরকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেয়। গাছ থেকে নারিকেল পাড়ার কাজে সুমাত্রার বানর আশ্চর্য্য পটুতা লাভ করেছে।

বানরের বুদ্ধি অসাধারণ এবং শিক্ষায় অনুরাগ প্রবল। তার কতক পরিচয় আমাদের দেশের মূর্খ বানর-নাচওয়ালাদের বানর-নাচ দেখে বুঝতে পারি। শিক্ষিত ব্যক্তির সযত্ন-শিক্ষার গুণে বনের বানর কত দিকে কত কুশলতা লাভ করছে, সে-পরিচয় নিশ্চয় তোমাদের অজ্ঞাত নয়। চা-পান, অঙ্ক-কষা, বন্দুক-ছোড়া, মানুষের রীতিনীতির বিবিধ নকলিয়ানায় বানরের পটুতা অসাধারণ।

বানরের মনে প্রীতি-ভালোবাসা আছে, দরদ-যত্ন আছে। ঘরে যাঁরা বানর পুষেছেন, তাঁরা নিশ্চয় দেখেছেন, বাড়ীর পোষা বিড়াল বা পাখীর সঙ্গে তারা ঠিক ছেলে-মেয়েদের মতো খেলা করে। কখনো তাদের বিরক্ত করে, কখনো তাদের নিয়ে মজা করে। খেলায় তাদের মনের যে-পরিচয় পাই, তাতে বিস্মিত হতে হয়!

ডরথি লামুর ও বনমানুষ

মানব-শিশুকে বানর বড় ভালোবাসে। তোমাদের মধ্যে যারা সিনেমায় Jungle Princess ছবি দেখেছো, তারা দেখেছো তো—ডরথি লামুরের সঙ্গে একটি শিক্ষিত শিম্পাঞ্জী কি চমৎকার অভিনয় করেছে! তার অভিনয় দেখে কে বলবে, বনের বানরের বুদ্ধি এবং শেখবার ক্ষমতা মানুষের চেয়ে কম!
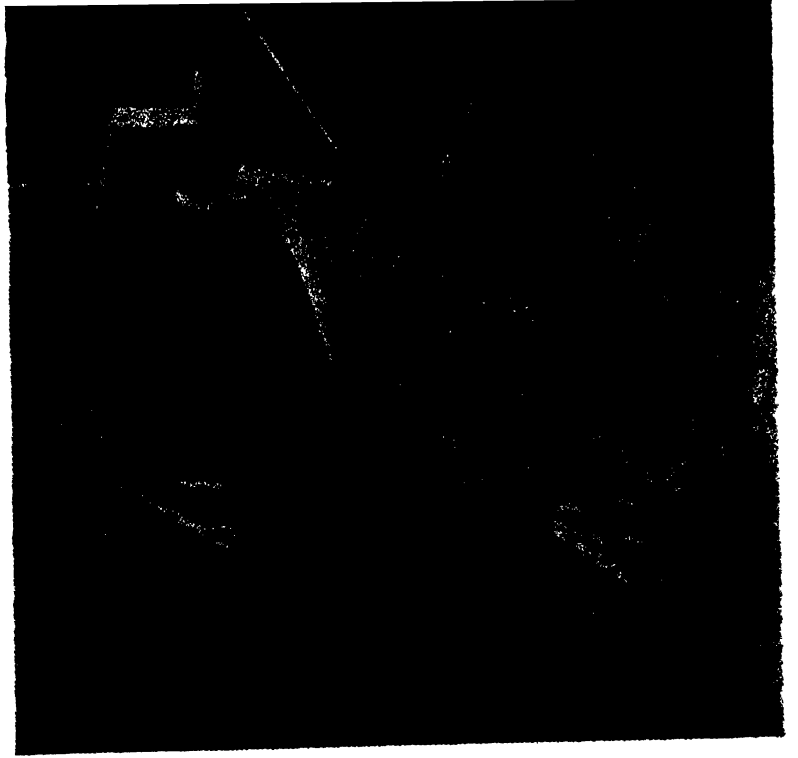
এ দেশের বানরের কথা আর বললুম না। তাদের অনেক কথাই তোমরা অনেকে জানো।

মৃত্যু-বরণ

এস হে, আমার সাধনার বঁধু
এস হে, আমার হৃদয়-মাঝে
আপনার হ'তে আপন যে জন
দূরে থাকা কভু তা'রে কি সাজে?
এস, এস, তুমি হে বঁধু আমার
এস মনোহর মূরতি ধরি'
নয়নের জলে বেদনা-কুসুমে
তুষিব তোমারে বরণ করি'।

তব পথ চাহি' এ জীবন বহি
অধীর হৃদয়ে সময় গণি—
ভাবি কবে পা'ব শুনিতে তোমার
রাতুল-চরণ-নূপুর-ধ্বনি।
হৃদয়ের মাঝে যে জ্বালা জ্বলিছে
জুড়াবে যখন তোমারে পা'ব,
সব দুঃখ শোক ভুলিয়া আবার
চিতার বাসর-শয়নে যা'ব।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী (মহারাণী—নদীয়া)

সাথী

কি একটা আকস্মিক ঘটনায় কলেজের ছুটি হইল। চৈত্রের দ্বিপ্রহর,—প্রখর রৌদ্রে চারিদিক যেন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সরু গলির ভিতর দিয়া সোজা রাস্তায় বাসায় ফিরিতেছিলাম। একটা মোড়ের নিকটে, এক ভগ্নপ্রায় জীর্ণ বাড়ীর দ্বারে একটি বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া ছিলেন। বৃদ্ধা মহিলাটির কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল—এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বটে!

গলির মোড় ঘুরিতেই কে যেন ডাকিল,—কেষ্ট!

থম্‌কিয়া দাঁড়াইলাম। ডাক-নাম আমার 'কেষ্ট,'—কিন্তু আজ আমি অন্য নামে পরিচিত। আমাকে কে ডাকিতে পারে? বাড়ীর চাকরের নাম সাধারণতঃ এইরূপই—অতএব আমাকে নয় মনে করিয়া পা বাড়াইয়াছি,—পুনরায় ডাক শুনিলাম—'কেষ্ট'! আর এক বার সেই আহ্বান-ধ্বনি!

একটু অগ্রসর হইতেই পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধা মহিলাটি সহাস্যে বলিলেন,—কি, চলে যাচ্ছিলে যে বড়?

আশ্চর্য্য হইয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিলাম; কোন দিন সে মুখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না! তিনি এবার প্রশ্ন করিলেন,—বলাই কোথায়?

—এখানে।

—কি করে?

—রেলে চাকুরী।

—পট্‌লা কোথায়?

—ভাগলপুর, চাকুরী করে।

—পুতুল? তার ছেলেপুলে?

—চারটি, দু'টি ছেলে, দু'টি মেয়ে।

—প্রতিমা?

—গত বছর বিয়ে হয়েছে।

—তুমি এম, এ পাস ক'রেছ?

—হ্যাঁ।

আর যাই হোক, বৃদ্ধা যে আমাদের পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম। ভাই-বোনদের ডাক-নাম সবই এঁর জানা। অতঃপর বলিলেন, —এসে ব'স। চিন্‌তে পারোনি নাকি?

এ প্রশ্নের পরেও 'পারিনি' বলা সম্ভব নয়। ঘাড় নাড়িয়া ভিতরে গিয়া একখানা চেয়ারে বসিলাম।

বৃদ্ধা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—সরোজ কেমন আছে?

অবাক হইয়াছিলাম। সরোজিনী আমার মায়ের নাম। মায়ের এই নাম বহু কাল হইল আত্মীয়-স্বজনের কণ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে; মা আজ 'পুতুলের মা' না হয় 'পট্‌লার মা' নামেই পরিচিত। যিনি আমার মাকে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছেন, তিনি পরিচিত ত বটেই, পরন্তু বহু পুরাতন প্রীতির সাক্ষী সন্দেহ নাই।

তিনি আবার বলিলেন,—সরসী সে-দিন দোতলা থেকে তোমায় ডাকলে, তুমি শুন্‌লেই না! একতলা পর্য্যন্ত আস্‌তে আস্‌তে ছাখে—গলির শেষ মুড়োয় চ'লে গেছ। চিন্‌তে পারলে না বলে সে কত দুঃখ ক'র্‌লে!

চিনিতে আমি এখনও পারি নাই। ভাবিতেছিলাম, —সরসী কে?

—দাঁড়াও, তাকে ডেকে দি।

বৃদ্ধার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত অতীতের পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলাম; কিন্তু কোন সরসীর স্মৃতি মিলিল না! সরসী নামটির সঙ্গেই যেন এই প্রথম পরিচয়। বৃদ্ধা সংবাদ দিলেন—সরসী দৌড়িয়ে আসছে। আমার সঙ্গে দেখা করিতে যে ছুটিয়া আসিতেছে, তাহাকে আমি জানি না, চিনি না, এ-কথা কেমন করিয়া স্বীকার করি?

কুড়ি-বাইশ বৎসরের একটি মহিলা। সুন্দরী বটে, তবে রুগ্ন, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর-রেখা। ক্ষীণাঙ্গী সরসী সামনের বিছানায় বসিয়া, অসঙ্কোচে হাসিয়া বলিল,—তুমি ত বেশ লোক কেষ্ট-দা! সে-দিন আমার মুখের পানে চেয়েও আমাকে চিনতে পারলে না?

হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম,—মানুষ অনেক সময় চোখ দিয়ে যা দেখে, মন দিয়ে তা দেখতে পায় না।

কথাটা ভাববাচ্যেই বলিলাম। বুঝিতেছি, 'তুমি' বলা প্রয়োজন; কিন্তু অপরিচিতা মহিলাকে 'তুমি' বলিতে সঙ্কোচ হওয়াই স্বাভাবিক।

সরসী অভিমানের সুরে বলিল,—ডাকৃটাও শুনতে পেলে না!

—মন যখন ব্যস্ত থাকে, তখন চোখ-কাণ সবই থাকে ঘুমিয়ে।

সরসীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। একটি ছোট ছেলে হামাগুড়ি দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা পরিচয় করিয়া দিলেন,—সরসীর ছেলে,—দু'টি সন্তান চ'লে যাওয়ার পর এখন এইটুকুই সম্বল।

যে সরসী আমার সহিত দেখা করিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, তাহার পুত্রকে আদর করা আমার অবশ্যকর্ত্তব্য, অতএব ছেলেটিকে কোলে লইয়া বলিলাম,—বেশ ছেলেটি ত!

সরসী প্রতিবাদ করিল,—বোঁচা নাক, খাঁদা ছেলে!

—না, না, খাসা ছেলে।

দুরন্ত বালক নামিয়া গেল। সরসী বলিল,—তোমার ত খুব পরিবর্ত্তন হ'য়েছে দাদা! আগে তুমি এত কথা ব'লতে আর কি দুরন্তই ছিলে!

সত্য কথা, বাল্যকালে আমি দুরন্তই ছিলাম।

—তোমার জন্যেই ত আমার বিয়ের দিনেও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল।

বৃদ্ধা অনুযোগটির অনুমোদন করিয়া কহিলেন,—জামাই ত এখনও তাই ব'লে ঠাট্টা করে।

অজানিত পাপের অপরাধ, তবুও অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার কারণ আমি যে কেন হইয়াছিলাম, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল,—রাজলক্ষ্মীর তাঁবুতে শ্রীকান্তের অসহায় অবস্থায় কেবল বার বার সরসীর মুখখানিই দেখিতেছিলাম। সরসী বলিল,—বিশ্বাস হয় না?

কপালের স্খলিত কুন্তলগুচ্ছ সরাইয়া সে বলিল,—এই ত্যাখো—সেই দাগ এখনও মিলায়-নি।

গভীর ক্ষতচিহ্ন! অতীতের ভুলে-যাওয়া পাপের জন্য অনুশোচনা বোধ করিতেছিলাম; সরসীর সুন্দর মুখখানা আমিই সৌন্দর্য্যহীন করিয়াছি!

সরসী আবার অভিযোগ করিল,—আমার উপরেই ছিল ত তোমার যত আক্রোশ। পুকুরে সাঁতরাতে গেলে চুবুনি দিয়ে জল খাইয়ে দিতে—

জীবনে যে এত পাপ করিয়াছি তাহা কে জানিত? আর একটি মহিলা আসিয়া দাঁড়াইলেন—সরসীর মতই বয়স তাঁর—আঠার-উনিশ।—ত্যাখ্ ত একে চিনিস্?

মহিলাটি আমার মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে চাহিয়া জবাব দিলেন,—না।

আমি বলিলাম,—ওরা তখন ছোট ছিল।

সরসী সমর্থন করিয়া কহিল,—হ্যাঁ, পাঁচ-ছ' বছর বয়স হবে তখন। যা ত ঘেন্না, দাদাকে পান এনে দে।—বিকেলে চা-টা খাইয়ে তবে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কেবলমাত্র একটি কথায় অতীতের সমস্ত স্মৃতির দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া গেল! 'ঘেন্না' নামটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে এই অপরিচিতা সহসা পরিচয় লাভ করিল। শিশুর অনাড়ম্বর নির্ভীক আনন্দে মনটা উল্লসিত হইয়া সরসীকে যেন শত বাহু মেলিয়া ঘিরিয়া ধরিল,—শৈশবকে আজ যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি।

আমার পিতা ছিলেন কোনও এক ক্ষুদ্র সহরের উকীল। আমাদের পাশের বাসাটি ছিল এক মোক্তারের। মোক্তারের প্রথম পত্নীবিয়োগের পর তিনি এক বিধবার কন্যাকে বিবাহ করিয়া শাশুড়ীকেও আশ্রয় দেন। তাঁহার শাশুড়ী অল্প বয়সেই বিধবা হন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী ছিল যে গ্রামে, আমার মায়ের মামাবাড়ীও সেই গ্রামে। মা মামাবাড়ীতেই প্রতিপালিত, এবং উভয়েই সমান-বয়সী

বলিয়া তাঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ় ; এবং বাকী জীবনেও তাঁরা সেই পাশাপাশি বাসায় বাস করিয়াছেন দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরিয়া। এই মোক্তার মহাশয়ের পর-পর সাত কন্যা হয়, তাঁর ষষ্ঠ কন্যার নাম ছিল 'আর-না' বা আন্না, এবং সপ্তমের নাম ছিল ঘেন্না।

বাবার মৃত্যুর পর আমরা আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছিলাম ; তাহার পর দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সরসীর খুব অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের পর আজ এই প্রথম দেখা।

অতীতের পুঞ্জীভূত স্মৃতি সহসা অন্তরকে বেগবান করিয়া তুলিল। প্রগল্‌ভের মত বলিলাম,—সরসী, আজ যেন সহসা আমাদের শৈশবকে ফিরে পেলাম, না ?

সরসী ব্যথিত কণ্ঠে জবাব দিল,— তোমাদের কর্ম্মময় জীবনে শৈশবকে ভুলে যাওয়া যত সোজা, আমাদের অবরোধ-রুদ্ধ বৈচিত্র্য-বঞ্চিত জীবনে তাকে ভুলে যাওয়া তত সোজা নয়। শৈশবের স্মৃতিই আমাদের একমাত্র সুখ-স্মৃতি—

—ডাণ্ডাগুলী খেল্‌তে খেল্‌তে তোমার কপালে যে ক্ষতচিহ্ন—

সরসী ম্লান হাসিয়া বলিল,—অক্ষয় হ'য়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথাটাও—

আমার কথাটা মনে আছে এতে আমি আনন্দিত নিশ্চিতই ; কিন্তু যে ঘটনাটার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে আছে, সে ঘটনাটার জন্যে আমি নূতন ক'রে লজ্জা পাচ্ছি—

সরসী আবার হাসিয়া বলিল,—কেন, আমগাছে আমাদের দোলনা বেঁধে দিয়েছিলে তা বুঝি মনে নেই ? তুমি ত আমার চেয়ে সবে এক বছরের বড়, কিন্তু আমি ছিলাম তোমার যেন আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সেবিকা। সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে কেন ? ওই ক্ষতচিহ্ন ত সেই সেবারই প্রতিদান !

সরসী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল,—যাক্, সে-সব কথা। তোমাদের বাসা কোথায় ! কে কে আছে ! তোমার ছেলে-মেয়ে ?

এক নিশ্বাসে জবাব দিলাম,—বাসা ৩ নং পেয়ারা-বাগান, থাকি আমি, দাদা, বৌদি', আর অপগণ্ড শিশু এক গণ্ডা।

—তুমি বিয়ে কর-নি ?

—করিনি নয়, বিয়ে হয়-নি।

—তার মানে ?

—আমাকে বিয়ে করবে স্বেচ্ছায়, এমন মেয়ের সঙ্গে এখনও পরিচয় ঘটে ওঠে-নি।

সরসী অভিমানের সুরে কহিল,—তোমাকেও তবে দেখছি আজ-কালকার রোগে ধরেছে ! বিয়ে তোমাকে ক'রতেই হবে। আমার জানা চমৎকার একটি মেয়ে আছে,—এইবার আই, এ দেবে সে।

—শুনে যথেষ্ট খুসী হ'লাম।

সে দাবী জানাইয়া বলিল,—না, না, ও-সব বাজে কথা চলবে না। ভবঘুরে বাউণ্ডুলে হ'য়ে তুমি ঘুরে বেড়াবে—সে আমি কিছুতেই সইতে পারবো না।

—বল কি ? চাকরী কচ্ছি, টাকা উপার্জ্জন ক'র্‌ছি তবুও—

—হ্যাঁ, তবুও। তোমাকে আমি নতুন দেখছি কি না ! কাল ফিরবার মুখে তোমাদের বাসায় যাবো, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

হঠাৎ সরসী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আমাদের হাতের রান্না তরি-তরকারী খাবে ত ?

সরসীরা কায়স্থ আর আমরা ব্রাহ্মণ···তাই এই প্রশ্ন !

জলযোগান্তে বাসায় ফিরিতেছিলাম—কৈশোরের অনাবিল আনন্দের স্মৃতি আজ সহসা যেন উন্মনা করিয়া দিয়াছে—আনন্দের কোমল পেলব স্পর্শে অন্তর যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে—

এই সরসী ছিল আমার বাহন—আমি যখন ক্রিকেট অভ্যাস করিতাম, ও তখন ন্যাকড়ার বল দৌড়াইয়া গিয়া কুড়াইয়া আনিত—এই সেবার মাঝেই সে খেলার আনন্দ পাইত, তৃপ্তিলাভ করিত। ও ছিল আমার শৈশবের সহচরী। জীবনের শ্রেষ্ঠ তেরটি বৎসর আমরা একই সঙ্গে ধূলামাটী ঘাঁটিয়া বড় হইয়াছিলাম—সেই স্নেহের আকর্ষণে সে আজ আপনার। এই দীর্ঘকালে আমার চেহারার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু তবু সরসী নিঃসংশয়ে আমাকে চিনিয়াছে, নিঃসঙ্কোচে রাস্তা হইতে ডাকিয়া কাছে

আনিয়াছে; অথচ আমি চিত্তপট হইতে তাহাকে একেবারেই মুছিয়া ফেলিয়াছি!

শৈশবের শত স্মৃতি মনটাকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। আজ আমি অধ্যাপক; সরসীর জীবনের সঙ্গে আমার জীবন-পথের কি সুদূর ব্যবধান তবুও শৈশবের দাবী লইয়া সে আসিয়াছে আমার কাছে—তাহার সাহচর্য্যে, তাহার নির্ভীক স্নেহার্দ্র ব্যবহারে যৌবনের মন দিয়া আজ শৈশবকে উপভোগ করিয়া লইয়াছি।

পরদিন আমার ফিরিবার মুখে সরসী প্রস্তুত হইয়াই ছিল, সঙ্গে করিয়া তাহাকে লইয়া আসিলাম। পথে চলিতে চলিতে সে প্রশ্ন করিল,—এত দিনও বিয়ে করনি, না করাই কি ঠিক করেছ?

—সে জবাব ত আমি দিয়েছি; কোন মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি।

সরসী উষ্মা প্রকাশ করিয়া কহিল,—মেয়েরা কি বিয়ের জন্য তোমার বাড়ীতে গিয়ে ধরণা দেবে?

—আমি ধরণা দিয়েও কিছু করতে পারিনি, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল।

ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিল,—কাউকে ভালবেসেছিলে নাকি?

কোন মহিলার পক্ষে এমন নগ্ন প্রশ্ন করা স্বাভাবিক বা শোভন নয়, তাই স্তব্ধ হইয়া কেবল ভাবিতেছিলাম—হঠাৎ এমন প্রশ্ন সে করিল কি করিয়া!

সরসী হাসিয়া বলিল,—দীর্ঘকালের খেলার সাথীকেও যদি এ-সব না বলবে ত আর বলবে কার কাছে? আমার ত মনে হয়, মেয়েরা যে কথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করে না, তা-ও আমি তোমাকে ব'লতে পারি।

সরসী খেলার সাহচর্য্যের দাবী লইয়াই এ প্রশ্ন করিয়াছে! এই দাবীতে কতখানি নির্ভর করিলে মেয়েরা এমনই ভাবে শ্রীহীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে? সরসীকে তাই আজ বড় আপনার বলিয়া মনে হইতেছিল। বলিলাম,—তুমি যা ব'লছ তা সম্ভব হয়নি, অর্থাৎ পড়াশুনাতেই তন্ময় ছিলাম, ভালবেসে হাহুতাশ ক'রবার অবসর ঘ'টে ওঠেনি কোন দিন।

—তবে বিয়ে করনি কেন?

—মানুষ বুঝি এই একটিমাত্র কারণেই বিবাহ করে না।

সরসী হাত আন্দোলিত করিয়া বলিল,—আর যে কি হ'তে পারে, তা ত ধারণা হয় না।

বাসায় আসিয়া পৌছিলে সরসী দাদাকে প্রণাম করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল,—দাদা, কেষ্টদার এখনও বিয়ে দেননি কেন?

দাদা অভিমানের সুরে বলিলেন,—বাবুর মত নেই। আমি আর তোমার বৌদি নাকের-জলে চোখের-জলে এক হ'লে তবে ছেড়েছি!

সরসী কহিল, আমি যদি মত করে দিতে পারি,—আমার জানা একটি মেয়ে আছে—তবে আপনাদের মত হবে কিনা জানিনে।

অমত কক্‌খন হবে না; এক পয়সা চাইনে, চাই কেবল ওটা মানুষ হোক। যার নিজের কাপড়-জামা, টাকা-পয়সা ঠিক রাখবার ক্ষমতা নেই, তার কেন এ-সব বাহাদুরী? বাবু বই নিয়েই মত্ত, কথা ব'ললেই হেঁয়ালী!

পাশের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম; সেখানে বসিয়া এ-সব আলোচনা স্পষ্টই শুনিতেছিলাম—নিজের বাহাদুরীর ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রসন্ন মনেই কাপড়-জামা ছাড়িতে উপরে চলিয়া গেলাম।

সরসী কি বলিল জানি না—তবে বৌদি আমাকে জানাইলেন—সরসী খাসা মেয়ে, কলিতে এমন মেয়ে হয় না।

সরসী চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।

যথাসময়ে যাইয়া দেখি, পূর্ব্ব-পরিকল্পনানুযায়ী তাহার বান্ধবীও আসিয়া জুটিয়াছেন।

সরসী পরিচয় করিয়া দিয়া কহিল,—এই আমার বন্ধু অঞ্জলি মজুমদার! বয়সে অনেক ছোট, তবুও বন্ধু—এবার আই, এ দিচ্ছে।

অঞ্জলির সহিত পরিচয়ের কারণ ও অর্থ সবই আমি জানি, সুতরাং তাহার সহিত আলাপ-আলোচনায় আগ্রহই ছিল না। তবুও শিষ্টাচারের অনুরোধে আলাপ করিতে হইল। সরসী অত্যন্ত উৎসাহের সহিত চা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

অঞ্জলি সম্ভবতঃ জানিত না, এ নিমন্ত্রণের অর্থ কি। সে বলিল,—সরসীদির মুখে আপনার যে সব ইতিহাস শুনতে পাই, তাতে ত বিশ্বাসই হয় না যে, আপনি প্রফেসরী ক'রতে পারেন—কোন ছেলের কি এত দুষ্ট-বুদ্ধি থাক্‌তে পারে?

প্রশ্ন করিলাম—মানে?

—সে-দিন ত সরসীদি' ব'ললে, ঘাটের পথে মৌমাছির একখানা চাক ছিল, মেয়েরা যখন ঘাটে যাবে, তার ঠিক পূর্ব্বেই আপনি তাতে ঢিল মেরে মৌমাছি-গুলোকে ক্ষেপিয়ে দিতেন আর তারা সকলের গালে-মুখে হুল ফুটাতো।

—মনে পড়ে না, তবে সরসী যখন ব'লেছে, তখন নিশ্চিতই ঐ রকম কাণ্ড ঘটেছিল।

সরসী চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল,—বেশ, মা, দিদিমা সকলে একদিন নাক-মুখ ফুলিয়ে এসে তোমার বাবাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন; তুমি মারের ভয়ে পালিয়ে একটা আমগাছের মাথায় উঠে লুকিয়ে ছিলে—

আমি হাসিয়া বলিলাম,—তোমার স্মরণ-শক্তির তারিপ করতে হয়, এত সব মনে থাকে কি ক'রে!

—অত সব বইএর কথাই বা তোমার মনে থাকে কি ক'রে?

চা-সম্মিলনীতে সরসীর স্বামীও উপস্থিত ছিলেন, তিনি কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করেন নাই বরং সরসীর সঙ্গে সমান ভাবেই তাহা উপভোগ করিতেছিলেন, এবং বিবাহ-বাসরে ক'নের মাথায় ব্যাণ্ডেজ ছিল, এ-কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি যেন কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদই লাভ করিয়াছিলেন।

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া দেখি, সরসী আমাদের বাড়ীতেই উপস্থিত। চা-পানান্তে সে প্রশ্ন করিল,—অঞ্জলিকে কেমন দেখ্‌লে?

—ভাল।

—তবে কথাবার্ত্তা পাকাপাকি ক'রে ফেলি?

—বেশ, ভাল মেয়ে হ'লেই তাকে বিয়ে ক'রতে হবে! এমনও ত হ'তে পারে, আমি মন্দ মেয়েই বিয়ে ক'রতে চাই।

—বাজে কথা ব'লছো কেন? সত্যি কথা ব'লতে কি, শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেক মেয়ের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে, কিন্তু অঞ্জলি ছাড়া আর কারও হাতে তোমাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারব ব'লে মনে হয় না।

—তার মানে!

সরসী প্রগল্‌ভের মত হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—তার মানে এই যে, আমি তোমাকে সুখী দেখ্‌তে চাই—ভবঘুরে জীবন থেকে মুক্তি দিতে চাই।

—তা'তে তোমার লাভ?

সরসী সহসা চুপ করিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল,—আমার লাভ? লাভ-লোকশান যে কি, তা তুমিও বুঝবে না, আমিও বুঝিয়ে দিতে পারবো না, অতএব সে চেষ্টা না করাই ভাল।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—তোমার কথা ও কাজ ধীরে ধীরে হেঁয়ালীর মত রহস্যময় হ'য়ে উঠ্‌ছে। আমার জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটু চাহিয়া থাকিয়া সে কহিল,—কি সম্পর্ক? আচ্ছা, আমাকে সুখী দেখ্‌লে—স্বামি-পুত্র নিয়ে সুখে আছি দেখ্‌লে তোমার কি আনন্দ হয় না?

—অবশ্যই হয়।

—যদি দেখ, আমি রোগে-শোকে মৃতপ্রায়, তা হ'লে কি দুঃখ হবে না?

—নিশ্চয়ই হবে।

—তবে তোমাকে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখী দেখ্‌তে আমি কেন চাইব না?

—মানুষ কি স্ত্রী-পুত্র ছাড়াও সুখী হ'তে পারে না?

—নিশ্চয়ই না।

—কেবল স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আমাকে সুখী দেখ্‌তে চাও—এই ইচ্ছা কি কেবলমাত্র ইচ্ছাই—

সরসী কৌতুক দৃষ্টি হানিয়া সহাস্যে কহিল,—তবে আবার কি?

সরসীর সঙ্গে এবং তাহার বান্ধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়মিত ভাবেই চলিতেছিল। তিন মাস ধরিয়া সরসী আমার সহিত অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়াছে, কিন্তু আমি জানি,

এ তাহার পণ্ডশ্রম! বিবাহে আমাকে সম্মত করাইবার জন্য তাহার এ জিদই বা কেন, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেবলমাত্র শৈশবের খেলার সাথীর দাবী লইয়াই মানুষ যে এতখানি পরিশ্রম করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস হয় না। সরসী আর যাই হোক্, নতুন এক ধরণের মেয়ে, এ-কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

সরসীর আন্তরিকতা ও অনুরোধের কাছে আমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল—কিন্তু সরসীর সেই দিনকার ব্যবহার ও কথার অর্থ আমি আজও বুঝিতে পারি নাই—এবং তাহার অন্তর আমার কাছে চিরদিন রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র সে শৈশবের পরিচয়, না মনের অন্তরালে আরও কিছু সংগুপ্ত আছে, জানি না।

সরসী এক রবিবারের দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ আমার কক্ষে আসিয়া উপস্থিত। বিছানার পাশে বসিয়া-পড়িয়া বলিল,—আজ তোমাকে একটা মত দিতেই হবে।

আমি হাসিয়া জবাব দিলাম—মত ত আমি প্রথম থেকেই দিয়ে আসৃছি।

—আমিও তা শুনে আসছি, কিন্তু বিয়ে ক'রবে না কেন?

—বিয়ে ক'রবার আমার প্রয়োজনটা কি? খাওয়া-দাওয়া, কোন ব্যাপারেই আমার কোন অসুবিধে নেই। আর—

—কেবল সেই জন্যেই কি লোকে বিয়ে করে? তোমার জীবন কি নিঃসঙ্গ, একা ব'লে মনে হয় না?

—তা' মাঝে মাঝে হয়, তবে আমি ত আর সত্যই একা নই। দাদারা আছেন, ছেলেপুলে সব আছে, আমারও কোন অভাব নেই।

—যে-দিন বুড়ো হবে, কে তোমাকে দেখ্‌বে?

—যদি চাকরী থাকে, দেখবার লোকের অভাব হবে ব'লে ত মনে হয় না।

—একটি প্রেয়সী নারীর সাহচর্য্যে জীবনকে আনন্দময় ক'রে তুল্‌তে ইচ্ছে হয় না?

—ভাখো সরসী, মানুষ আদি-কাল থেকে জীবনকে এইভাবে আনন্দময় ক'রে তুল্‌বারই চেষ্টা ক'রেছে, কিন্তু এক জনও বোধ হয় এ-কথা স্বীকার ক'রবে না যে, তার জীবন সত্যই আনন্দময় হ'য়েছে—

সরসী তৎক্ষণাৎ কৈফিয়ৎ দিল,—তবুও আদি-কাল থেকেই লোকে বিয়ে ক'রে আসৃছে, এ-কথা ত তুমি অস্বীকার ক'রতে পারবে না।

—দু'চার জন বিয়ে না ক'রেও জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছে।

—যারা তা দিয়েছে, তারা কেউ সুখী হয়নি; কারণ, জীবনের অর্দ্ধেকই তাদের পঙ্গু।

আমি হাসিয়া বলিলাম,—পঙ্গু মানুষও ত থাকে।

সরসী সহসা থামিয়া গেল। ক্ষণিক দূরের চারতলা বাড়ীটার দিকে তাকাইয়া-থাকিয়া বলিল,—ভাখো দাদা, এ-সব তর্কের বিষয় নয়। আমার ইচ্ছা, দেখে সুখী হই যে, তুমি সুখে ঘর-সংসার ক'রছো; তাই ত অঞ্জলিকে খুঁজে খুঁজে বের ক'রেছি।

আমি চুপ করিয়াই ছিলাম।

সহসা প্রশান্ত স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—কেবলমাত্র আমাকে সুখী ক'রবার জন্যেই কি তুমি বিয়ে ক'র্‌তে পারো না?

চমকিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিলাম, সে তেমনি স্থির শান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকেই চাহিয়া আছে। আমি ধীরে ধীরে জবাব দিলাম,—তোমাকে সুখী ক'রতে পারলে আমি নিশ্চয়ই ক'রতাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তোমার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রতে বাধ্য হচ্ছি।

সরসী আমার হাতখানা তাহার কোলের উপর তুলিয়া-লইয়া অনুনয়ের সুরে বলিল,—লক্ষ্মীটি, আর একবার ভেবে দেখ।

কিঞ্চিৎ অস্বস্তির সঙ্গে দূরের বাড়ীগুলির পাণ্ডুর, নিষ্প্রভ বর্ণের সমাবেশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম—আমি কেমন করিয়া সরসীকে 'না' বলি!

অকস্মাৎ হাতের উপরে উষ্ণতা অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, সরসীর নয়নপ্রান্ত-নিঃসৃত একবিন্দু অশ্রু আমারই হাতের উপর ঝরিয়া পড়িয়াছে! আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, সরসীর এই ব্যবহারের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। কি বলিব কেবল তাহাই খুঁজিতেছিলাম।

বলিলাম,—আমাকে সুখী ক'রবার জন্যে তোমার চোখে জল কেন—বলতে পার ?

সরসী অঞ্চল-প্রান্তে স্খলিত অশ্রুবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া কহিল,—সে-কথা আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবো না, তুমি নিজে যদি না বুঝতে পারো,—চোদ্দ বৎসর পরেও তোমার জন্যে এই ব্যাকুলতা স্বাভাবিক নয়, এ-কথা তোমার মনে হতে পারে—

আমি বলিলাম,—তোমার স্বামি-পুত্র—

সরসী হাসিয়া বলিল,—আমার স্বামি-পুত্র আছে ব'লেই আমি জানি স্বামি-পুত্র কতখানি দরদের সামগ্রী, আর সেই জন্যেই তোমাকে আমি স্ত্রীপুত্র দিয়ে সুখী ক'রতে চাই।

—কেবল মাত্র এই ?

সরসী আর একটু হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁ তাই,—বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে হয় না ?

যথাসময়ে আমি বিবাহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

সরসীর উৎসাহ কোন সময়েই এতটুকু হ্রাস হয় নাই। কিন্তু বৌভাতের দিনে দুইবার গাড়ী পাঠাইয়াছিলাম, সেই দুইবারই খালি-গাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছিল—সরসী জানাই য়াছে, তাহার শরীর অত্যন্ত খারাপ।

অঞ্জলি বলিল,—সরসীদি' আসে-নি কেন—জানো ?

আমি কৌতূহলী হইয়া বলিলাম,—না।

—সে তোমাকে ছেলে-বেলা থেকেই হয় ত ভালবাসে।

আমি জবাব দিলাম,—সম্ভব নয়; বাঙালী মেয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কি, জানো ? প্রিয়জনকে সুখী করাই তাদের সব-চেয়ে বড় গর্ব্বের বিষয়,—সরসীর কাজ শেষ হ'য়েছে, তাই সে আর আসবার প্রয়োজন বোধ করে-নি।

কয়েক দিন পরে সরসী আসিয়া বলিয়াছিল,—বৌভাতে আসিনি ব'লে রাগ ক'রো না দাদা, শরীরটা সত্যিই ভাল ছিল না।

একটু থামিয়া ব্যঙ্গের সুরে সে আবার বলিল,—বিয়ে ত ক'রতে হ'ল। আমার কাছে হার মানতেও হ'য়েছে তাহ'লে, সেটা বুঝ্‌ছো ? আমার কপালে তুমি চিহ্ন ক'রে দিয়েছিলে, আমি তোমার জীবনে যে চিহ্ন এঁকে দিলাম—ভগবান করুন, তা যেন আজীবন স্থায়ী হয়।

তার পর সরসী অকারণেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নারী-চরিত্র দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা !

শ্রীপৃথ্বিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (এম-এ)।

প্রেম-সমাধি

স্বপ্নসম নেমে এলো বক্ষে মোর শান্তি অপরূপ
প্রেমিকের অধর-চুম্বনে,
চাঁদের রূপালী ছায়া বিগলিত হ'য়ে
অন্তরের মাঝে মোর লভিল সমাধি।
সহজ কোমল এ কি সুন্দর মিলন—
এক হ'য়ে গেল সব নীরবতা নিঃসঙ্গতা রাখি ;
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি—
সমস্ত পৃথিবী
অন্ধকার গুটাইয়া যেন
মসৃণ সর্পের মত
মোর মাঝে লভেছে আশ্রয়।
বর্ষার প্রভাত বেলা—
বাধাহীন ছুটিয়াছে চিন্তার মেখলা
মেঘে ভর করি
কত বিস্মৃতির দেশে—কত ঘুমন্ত পুরীতে
থেকে থেকে মনে হয় শুধু
এ কি মোহ !
এ কি ঘুমঘোর—
আমি কিবা জেগে
বিরাট ধ্বংসের বুকে
মিলন-শয্যায়।

শ্রীউমানাথ সিংহ

মেঘমালা

বর্ষার মেঘ সকল দেশের নর-নারীর চিত্তে সকল-কালেই স্পন্দন তুলিয়াছে। সে স্পন্দনের বেগে কবি কাব্য লিখিয়াছেন; বিরহীর চিত্ত ব্যাকুলতায় ভরিয়া উঠিয়াছে! এই বর্ষার মেঘ কালিদাসের কল্পনায় যে কাব্য-ছন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, ভাগীরথী গঙ্গার মতো সে কাব্য-ধারা ধরণী-বক্ষে শুধু অমরত্বই লাভ করে নাই, সুধী-চিত্তকেও আনন্দ-রসে চির অভিসিঞ্চিত রাখিয়াছে!

কোনো কবি মেঘকে দেখিয়াছেন বাস্তব রূপে, কোনো কবি দেখিয়াছেন অন্য রূপে!

মহাকবি বাল্মীকি মেঘের বিচিত্র বাস্তব ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্ব্বতসন্নিরুদ্ধং
যথা শান্তমহার্ণবস্য ॥

মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, —ধূমজ্যোতিঃ-স লি ল-ম রু তাং সন্নিপাতঃ ক্ব মেঘঃ! সে-মেঘ যে সে বস্তু নয়, জাতং বংশে ভুবন-বিদিতে পুষ্করাবর্তকানাং; জা না মি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ! —মহাকবির এ-বিশেষণ এতটুকু অত্যুক্তি নয়।

বিদ্যাপতির মেঘে ঝলকই দামিনী
দহন সমান।
ঝন্-ঝন্ শব্দ কুলিশ জনমান্ ॥

এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ! তাঁর তুলিতে মেঘ সহস্র রূপে উদয় হইয়া আমাদের বিমোহিত করিয়াছে!

কিন্তু এ-মেঘ কি শুধু কবিকে ভাব-ভাষা-ছন্দ এবং কল্পনার খোরাক জোগাইতেছে?

শ্রাবণের আকাশে ঐ যে মেঘমালার অপরূপ লীলা দেখি, ও-মেঘ লাখ-লাখ যুগ ধরিয়া ধরণীকে

মেঘের মাতৃভূমি
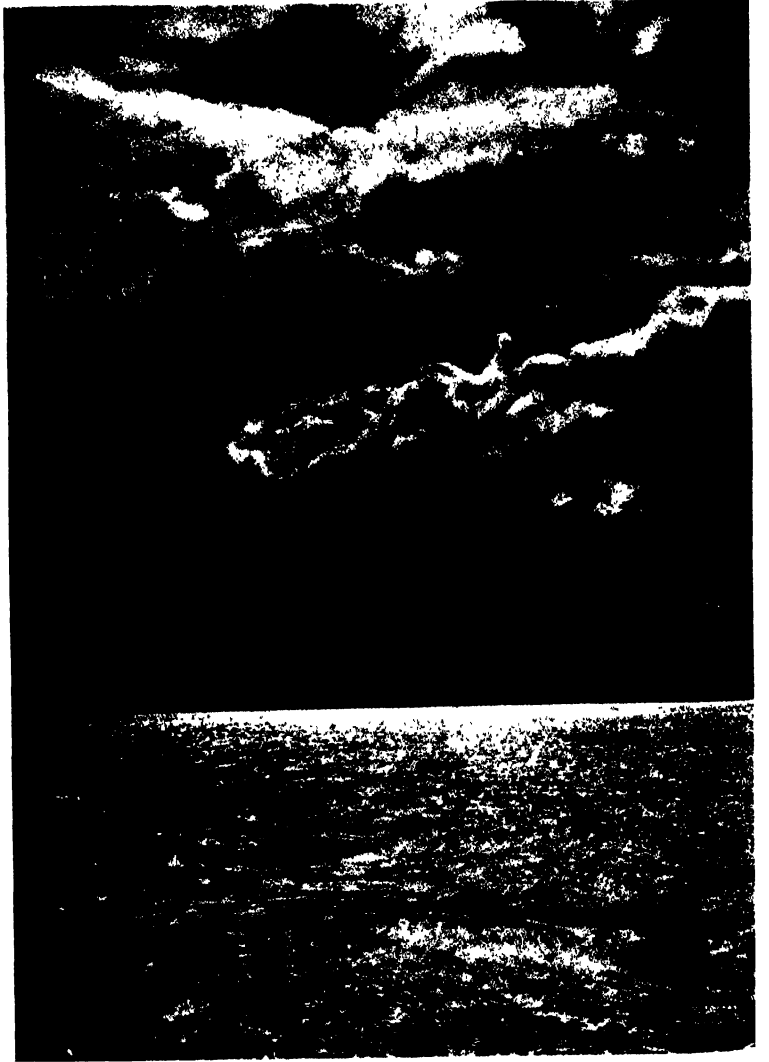
ভাঙ্গিয়া-গড়িয়া গড়িয়া-ভাঙ্গিয়া কি খেলা খেলিতেছে, সে-খেলার পরিচয় আমরা কতটুকু রাখি! ঐ মেঘ লাখ-লাখ যুগ ধরিয়া কত সাগর-মহাসাগরকে মাটীর বুকে তুলিয়া

জল-কণার বাষ্প-রূপ

আকাশের পটে চিত্র-রচনা

দিল, মাটীর বুকে কত সাগর-মহাসাগর রচিয়া তুলিল! কত পাহাড়-পর্ব্বত ঐ-মেঘের অমিত-বিক্রমে ধূলায় পরিণত হইয়া গেল! মেঘের সে-কাহিনী শুনিলে মেঘের উপর ভয়ে-শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিবে।

আকাশের ও-মেঘ হিমালয়ের চেয়েও তুঙ্গতর গিরিকে ধুইয়া-মুছিয়া পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে! ধরণীর বুকে বহু আটলাণ্টিক-মহাসাগরের সৃষ্টি করিয়াছে!

আমরা যদি পৃথিবীর বুকে হাজার দু' হাজার ফুট, এক মাইল, দু' মাইল, পাঁচ মাইল গভীর রন্ধ্র রচনা করি, তাহা হইলে সে রন্ধ্রে কত শিলা-মহাশিলার স্তূপ, কত চূর্ণ শিলা দেখিতে পাইব! এ শিলা-মহাশিলাকে পৃথিবীর বুকের গোপন গহনে গুঁজিয়া দিয়াছে ঐ আকাশের মেঘ! বড় বড় উপত্যকা, বড় বড় খাদ—মেঘমালা হইতেই এ-সবের সৃষ্টি! তুষার-গিরির মাথায় যে শুভ্র মুকুট, ও-মুকট ঐ আকাশের মেঘ বাষ্পের পর বাষ্প-বিন্দু বহিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে! ধরিত্রীর বুকের কোঠায় আজ যে এত ধন-রত্ন, এত লোহা, কয়লা, লবণ, তামা, সোনা, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতু; যে-মাটী দিয়া ইট তৈয়ারী করিয়া আমরা আরাম-নীড় রচনা করিতেছি, সেই মাটী; যে লোহা-ইস্পাতের কল্যাণে আজিকার এ-পৃথিবী শিল্প-বাণিজ্য-সম্পদ-লাভে কৃতার্থ হইয়াছে, সেই সব মণিরত্ন-লোহা-ইস্পাত, তামা-মাটী—ঐ আকাশের মেঘমালার দান!

এ-দানের ভারে পৃথিবীর অতীত ইতিহাস ভরিয়া আছে। এখনো এ-দানে মেঘের এতটুকু কৃপণতা নাই! মেঘের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-প্রলয়-লীলার এখনো বিরাম নাই! আজও পৃথিবীকে লইয়া সমান তালে মেঘের ভাঙ্গা-গড়া চলিয়াছে।

আকাশের মেঘমালা নিজেদের নিঃশেষ করিয়া নদী-সাগর রচনা করিতেছে—শস্যভারে ধরণীর বুক ভরিয়া দিতেছে—এখনো এ-মেঘ পৃথিবীর প্রাণ রক্ষা করিতেছে! মেঘের পর মেঘের আবির্ভাব—নিজেকে নিঃশেষে ঝরাইয়া আবার নব-নব মেঘের সৃষ্টি—ইহার বিরাম নাই, একতিল বিচ্ছেদ নাই।

ঐ যে কুয়াসার বাষ্প—ও কুয়াশার বাষ্পে মেঘের জীবন-ধারা পুঞ্জিত প্রস্ফুরিত রহিয়াছে!

মেঘের উদয়—আমাদের কাছে আজো পরম বিস্ময়! এই দেখিতেছি, আকাশ নির্ম্মল স্বচ্ছ পরিষ্কার—কোথা হইতে তূলার পাঁজের মতো এক-টুকরা মেঘ

আকাশে-সাগরে মেলামেশা

আসিয়া অতর্কিতে দেখা দিল! খালি টুপির মধ্য হইতে যাদুকর যেমন হাঁস, খরগোস বাহির করিয়া চোখের সামনে ধরিয়া দেয়—প্রকৃতি যেন তাহারি মতো ঐ মেঘের টুকরাটুকুকে শূন্যপথে ছাড়িয়া দিয়াছে!

যেখানে জলবিন্দু, সেইখানেই সে জলবিন্দু হইতে মেঘ-বাষ্পের উদয় ঘটে। গোলাপের পাপড়ির উপরে এতটুকু নীহার-কণা—ঘরের বধূ ভিজা কাপড় মেলিয়া শুকাইতে দিতেছে, সে-কাপড়ের আর্দ্রতা—শ্রান্তি-ভরে আপনার-আমার ললাটে এই যে ঘর্ম্মবিন্দু—মালী

বাগানে ঝারি কাৎ করিয়া গাছে জল ঢালিতেছে—চায়ের কেট্‌লিতে জল ফুটিতেছে—কাল রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার ফলে পথে-ঘাটে জল জমিয়া আছে—নদী-দীঘি-নালা-সাগর—এ-সব হইতে মেঘ-বাষ্পের উদয়-আবির্ভাবে এক-তিল বিরাম নাই!

মেঘমালার আদি-জন্ম সাগর-বক্ষে। সাগরের তরঙ্গ-দোলায় জলরাশি বিক্ষুব্ধ আলোড়িত হয়। সে জলের অতি-সূক্ষ্ম কণিকাগুলি বাতাস বা রৌদ্রের স্পর্শে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ধূম-বাষ্পে পরিণত হয়। শক্তিমান দূরবীণ-যন্ত্রে দেখিব, এই জল-কণিকার আকার খেলার-বেলুনের মতো! সাগর-বক্ষের এই বিক্ষুব্ধ উৎক্ষিপ্ত জলরাশির মধ্যে কতক সাগরের বুকে লুটাইয়া পড়ে; কতকগুলি আবার জলের মায়া ত্যাগ করিয়া বাতাসে মিশিয়া লঘু দেহে ঊর্দ্ধে, বহু-ঊর্দ্ধে উঠিয়া শূন্য-পথে জমা হয়।
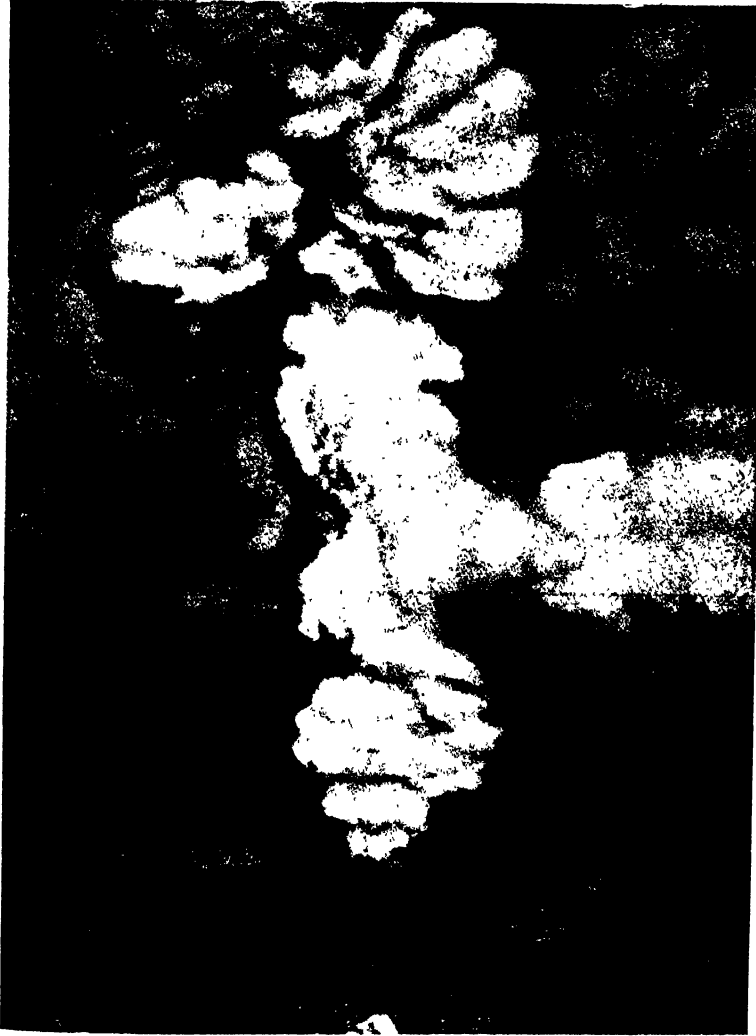
আগ্নেয়-গিরি হইতে মেঘের সৃষ্টি

নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অণু-কণিকা লইয়া বায়ু-মণ্ডলের সৃষ্টি। সাগর-বক্ষ হইতে উৎক্ষিপ্ত মেঘ-বাষ্প ঊর্দ্ধে উঠিয়া এই বায়ু-কণিকার সহিত মিশিয়া যায়। জল-সম্পর্ক হারাইলেও মেঘ-বাষ্প আর্দ্রতা হারায় না। আর্দ্রতা-হেতু শূন্য-বিহারী বায়ু-কণিকার চেয়ে ওজনে তাহা ভারী হয়; এবং ভারী হওয়ার ফলে বায়ু-মণ্ডলে নবাগত এই বাষ্পরাশি ত্রিশঙ্কু-রাজার মতো মন্থর ভাবে থমকিয়া থামিয়া থাকে! সে না পারে বায়ুকণিকা ঠেলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে, না পারে নীচে নামিতে! এ মেঘ-বাষ্পের স্পর্শে উপরকার বায়ু-কণিকা শীতল হয়, আর্দ্র হয়; এবং বাতাসের চাপে লঘু হইয়া চারি দিককার আবহাওয়াকে স্নিগ্ধ-শীতল করিয়া তোলে।

কিন্তু বাতাস তো সুশীল গোপালের মতো শান্ত সুবোধ নয়! সে চির-দুরন্ত! এক-মিনিট তার চপল দুরন্তপনার বিরাম নাই। কাজেই এই গতিহীন মন্থর বাষ্প-ভারকে নাড়িয়া ঠেলিয়া ধাক্কা দিয়া তাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, তার আর্দ্রতা ঝরাইয়া শুকাইয়া বাতাস এ-মেঘবাষ্পকে নিজের অঙ্গে মিলাইয়া-মিশাইয়া একাকার করিয়া দেয়। মিশিয়া বায়ু-কণিকার সঙ্গে একাকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মেঘ-বাষ্প শূন্যপথে বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়।

পৃথিবীর কাছাকাছি আমরা যে মেঘ-বাষ্প দেখি, সে মেঘ কুয়াশারু বাষ্প। যে মেঘে বৃষ্টিধারার সৃষ্টি, সে মেঘকে বহু ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়—কবিরা যাকে বলেন মেঘমালার

রাজ্য, সেই রাজ্যে গিয়া পৌছাইতে হয়। তবেই সে মেঘ বৃষ্টি-সৃষ্টির শক্তি লাভ করে। বাতাস যদি গরম হয় তো সে গরম বাতাসের ধাক্কায় মেঘমালা উর্দ্ধে ওঠে।

এ-মেঘের রাজ্যে দেশভেদে অবস্থান-পার্থক্য দেখা যায়। মার্কিন মুলুকে এ মেঘের রাজ্য মাটীর বুক হইতে সাত মাইল উর্দ্ধে; আমাদের এ গরম দেশে মেঘ-রাজ্যের অবস্থান আরো উর্দ্ধে; আবার হিম-মেরু প্রদেশে এ-মেঘমালার রাজ্য পৃথিবীর বুকের কাছে।

আর্দ্র মেঘমালার উর্দ্ধে উঠিবার যে-শক্তি, সে-শক্তির সীমা আছে। এ সীমা ছাড়াইতে গেলে মেঘ আর মেঘ থাকে না—শীতলতার চাপে সে মেঘের মরণ নিশ্চিত। এ সীমার উর্দ্ধে মেঘের চিহ্ন দেখা যাইবে না! এ সীমার এ-দিকেই মেঘমালার যা-কিছু বিক্রম, সংগ্রাম, তাণ্ডব-নৃত্যের লীলা চলে; তার উর্দ্ধে নয়!

বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যে অণু-কণিকা আছে, সে-কণিকার চেয়ে এ মেঘ-বাষ্প হাল্‌কা। এজন্য বায়ুমণ্ডল ছাড়াইয়া মেঘ-বাষ্প অনায়াসে উর্দ্ধে শূন্যলোকে উঠিতে পারে।

যে-বাতাস যত গরম হইবে, সে-বাতাসে মেঘ-বাষ্প তত বেশী থাকিবে। কিন্তু বাতাস যদি একটু শীতল হয়, তাহা হইলে সে আর মেঘ-বাষ্পকে বুকে ধরিয়া রাখিতে পারে না; সে-বাষ্প তখনি বায়ুমণ্ডল হইতে খশিয়া ঝরিয়া নামিয়া আসে।

শীতল হইবামাত্র যে-বাষ্প বাতাসের

রৌদ্র-মেঘের খেলা

মেঘের বুকে বজ্রাগ্নির মালা

সাগরের মেঘ

বুকে ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন তার গত্যন্তর নাই। কিন্তু কোথায় তার আদি-মাতা সাগরিকা? বাষ্প-কণিকায় রূপান্তরিত হইয়া বাতাসের বেগে সাগরের বুক ছাড়িয়া মেঘ কোথায় কত দূরে আসিয়াছে! অথচ জল হইয়া ঝরা ভিন্ন যখন অন্য গতি নাই, তখন এই কণিকারাশি অজস্র বৃষ্টিধারায় ফাটিয়া মাটীর বুকে ঝরিয়া পড়ে। একসঙ্গে যত বেশী বাষ্প-কণিকা মিশিয়া থাকে, মেঘ তত জমাট হয়, এবং সে মেঘ ফাটিয়া বৃষ্টিও তত মুষলধারে ঝরিতে থাকে।

আমাদের মানব-সমাজে যে-শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেই শিশুই যে বড় হইয়া মানুষ হইবে, এমনটি যেমন ঘটে না, অর্থাৎ লক্ষ-লক্ষ শিশুর জীবন-দীপ যেমন জ্বলিতেছে, লক্ষ-লক্ষ শিশুর জীবন-দীপ তেমনি নিবিতেছে, জল-বাষ্প-সমাজেও ঠিক এমনি ঘটে। এই জন্যই দেখি আকাশের সব মেঘে বৃষ্টি হয় না, এবং বৃষ্টিই মেঘমালার একমাত্র পরিণতি বা মেঘ-জন্মের চরম-সার্থকতা নয়!

শিলাবৃষ্টি—এক-একটি শিলা যেন টেনিশ-বল্!

তূলার পাঁজের মতো আকাশে ঐ যে দেখি শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, যে-মেঘে কবলচ্যুত হয়, সে বাষ্পই ক্রমে মেঘ-রূপে দেখা দেয়! বাতাসের কবল-চ্যুত এ-মেঘ তখন আর তার বাষ্পাবরণে অবরুদ্ধ থাকে না; চক্ষের নিমেষে সে-মেঘকে জল হইয়া ঝরিয়া পড়িতে হয়। এবং জল হইয়া সেই সাগরের

আকাশের শোভা হইয়াছে—ও-মেঘমালাকে বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বর্ষণ-বীর মেঘের উদ্যত-অভিযানে সশস্ত্র অনুচর-বাহিনী!

জলভার-বাহী সকল মেঘেই বৃষ্টি হয় না। কোনো

মেঘ শূন্যপথে দীর্ঘ দিন ধরিয়া হা-হা শ্বাসে ঘুরিয়া বেড়ায়; কখনো নামিয়া থামিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; আবার এক সময়ে বাতাসের দোলায় বহুদূরে চলিয়া যায়। কোনো মতে জল-ধারায় ফাটিয়া আদি-মাতা সাগরিকার বক্ষে সে আশ্রয় লইতে চায়!

সিরাশ্‌, বা আষাঢ়ের প্রথম-মেঘ

আব-হাওয়ার ফলে শুকাইয়া রুদ্ধ-গতি মেঘ-ভার হয় তো দিনের পর দিন চুপচাপ পড়িয়া-থাকে—তার পর একদা বাতাসের বেগে উড়িয়া বিচ্ছিন্ন ও অদৃশ্য হয়! কখনো বা রৌদ্রের তাপে দু'চার বিন্দুমাত্র বারি-বর্ষণেই তার মেঘ-জন্মের অবসান!

পাতলা মেঘ

মেঘ ফাটিয়া জল-ধারায় পরিণত হইলে সে জলের ধারা পরস্পরকে অণু-পরমাণু দিয়া বাঁধিয়া থাকে। বাতাসে ধূলি থাকিলে সে-ধূলিকেও চাপিয়া আঁকড়িয়া ধরে; এজন্য কখনো-কখনো আমরা কর্দ্দম-বৃষ্টি পাই।

ভীম-গম্ভীর জমাট মেঘের স্তূপ ফাটিয়া যখন জল-ধারায় ঝরিয়া পড়ে, তখন সে-ধারার প্রথম-মুখে বৃষ্টি-বেগ যত তীব্র বা প্রচণ্ড হোক, বৃষ্টি-বিন্দুর আকারে বড় তারতম্য ঘটে না। বৃষ্টিকণাগুলি আকারে ছোট। মুষলধারে বৃষ্টি বা ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি বা টিপিটিপি বা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি—বৃষ্টির নানা রূপের আমরা বর্ণনা করি। এ সব বৃষ্টিতে জল-ধারায় যে পার্থক্য, সে পার্থক্য শুধু মেঘ-পুঞ্জের ঘনত্ব বা লঘুত্ব-হেতু ঘটে। ঝাড়া-বৃষ্টির ফোঁটা খুব
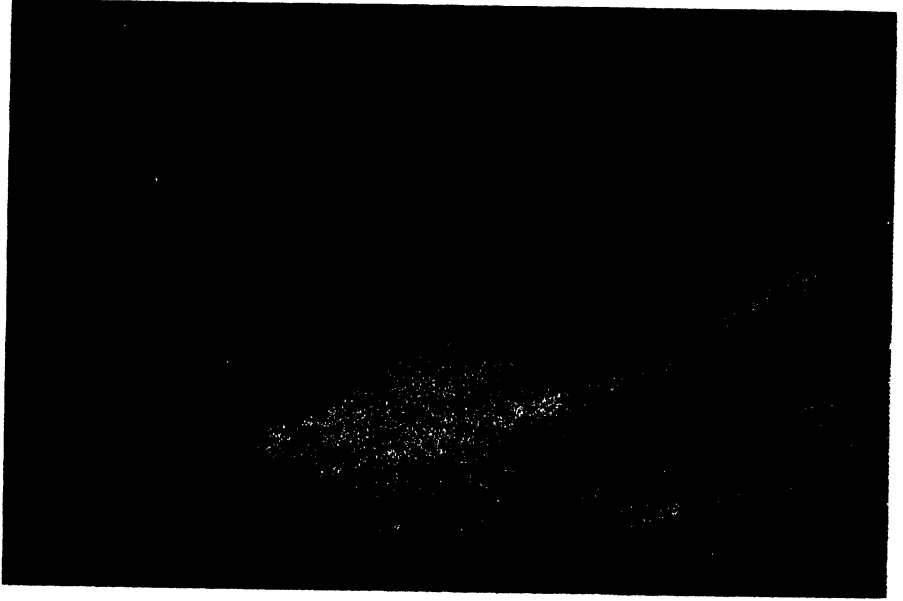
যেন তূলার পাঁজ

হিম-শীতল মেঘ

ঘন মেঘে বহু উর্দ্ধদেশ হইতে অজস্র জলবিন্দু মাটীর বুকে ঝরিয়া পড়িলেও সে বৃষ্টির বেগ সেকেণ্ডে তিন ফুটের চেয়ে কখনো বেশী হয় না। অর্থাৎ চার-তলার ছাদ হইতে যদি একটা মার্ব্বেলের গুলী নীচে নিক্ষেপ করি, সে মার্ব্বেল যে-বেগে নীচে গিয়া পড়িবে—ভীষণ তীব্র তীক্ষ্ণ বৃষ্টির বেগও ঠিক তাহারি অনুরূপ।

বৃষ্টিহীন দিনেও আকাশে কালো কালো মেঘ দেখা যায়। এক-একখণ্ড মেঘের আকার বেশ বড়,—প্রায় হাতীর দেহের মতো অতিকায়। এ মেঘে জল থাকে হয়তো দু' চামচ! আকাশের ঐ মেঘপুঞ্জকে ধরিয়া বারো-ফুট লম্বা, আট-ফুট চওড়া এবং দশ-ফুট উঁচু ঘরে ভরিয়া সে-মেঘ নিঙড়াইলে তাহা হইতে জল মিলিবে বড়-গ্লাসের এক-গ্লাস মাত্র!

আকাশের এ মেঘের শক্তি অমোঘ এবং প্রচণ্ড।
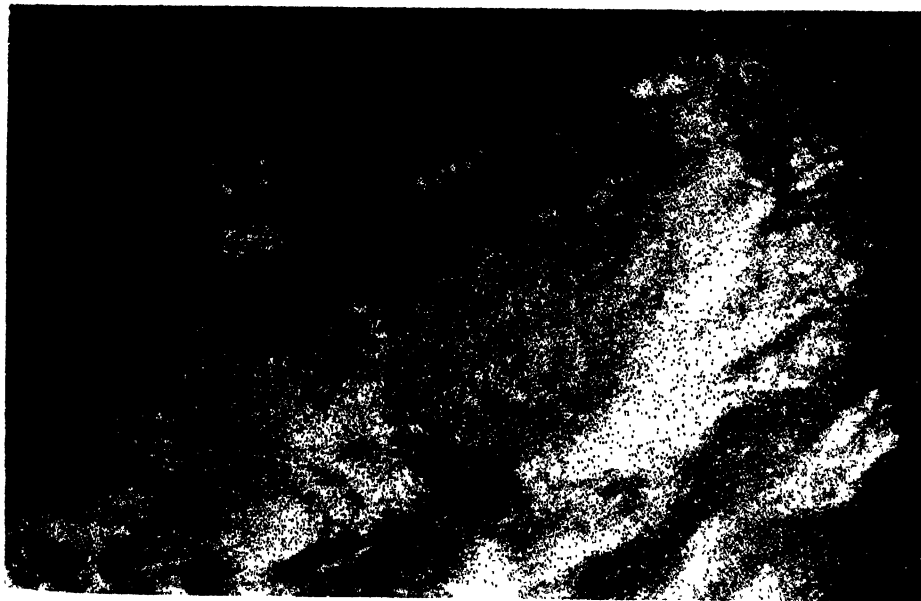
বড় মনে হয়। মনে হয়, ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি-বিন্দুর চেয়ে আকারে বড়! আসলে কিন্তু তা নয়; বেগের তীব্রতা-হেতু এ বৃষ্টি-বিন্দুকে বড় বলিয়া মনে হয়! এ শুধু ঐ মনে হওয়া—আসলে, বৃষ্টি-বিন্দু আকারে ছোট-বড় হয় না।

ভাগ্যে আকাশের ও-মেঘ অবিচ্ছিন্ন পুঞ্জাকারে জমিয়া না থাকিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে, নহিলে সমগ্র মেঘপুঞ্জ যদি এককালে বৃষ্টিধারায় ঝরিয়া পড়িত, তাহা হইলে পৃথিবীতে মানুষ বা গাছপালা তৃণ-শস্যের

চিহ্নও থাকিত না; সব ধুইয়া-মুছিয়া সাফ হইয়া যাইত! এবং ভাগ্যে আকাশের মেঘ ঐ নদী, তুষার-গিরি এবং সাগর-মহাসাগরের বুকে অবিরাম-ধারায় জল জোগাইয়া চলিয়াছে, নহিলে সূর্য্যের প্রখর-তাপে কবে ঐ সাগর-মহাসাগর বারিহীন বিশুষ্ক হইয়া যাইত! বিশেষজ্ঞেরা বলেন, পৃথিবীর বুকে যত নদ-নদী সাগর-মহাসাগর আছে, সে-সবের যে-জলরাশি প্রতিদিন বাষ্পাকারে জলাধার ত্যাগ করিয়া শূন্যে উঠিতেছে—সে বাষ্পরাশি যদি মেঘ-মালায় ভরিয়া বৃষ্টি-ধারায় বর্ষিত না হইত, তাহা হইলে এই-সব নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর ২৭০০ বৎসরে বিশুষ্ক বারি-হীন হইত! পৃথিবী যে ফলে-ফুলে শস্যসম্ভারে ভরিয়া আছে, ইহা সম্ভব হইয়াছে শুধু ঐ মেঘ-মালার কল্যাণে!

কুয়াশা-মেঘ

ঢেউ-খেলানো মেঘ

মেঘ-মালার সাধের দেশ হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ গায়ে। ভারত-মহাসাগরের বুক হইতে জলরাশি বাষ্পাকারে বাতাসের বেগে উড়িয়া চলিয়াছে। তার আসা-যাওয়ার সহজ-পথ চেরাপুঞ্জি! তাই চেরাপুঞ্জিতে সব-চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়। তার পর এ মেঘমালা যায় ব্রহ্মদেশে, ষ্ট্রেট্‌স-সেট্‌লমেণ্টস্ এবং ইষ্ট-ইণ্ডিজের অভিমুখে।
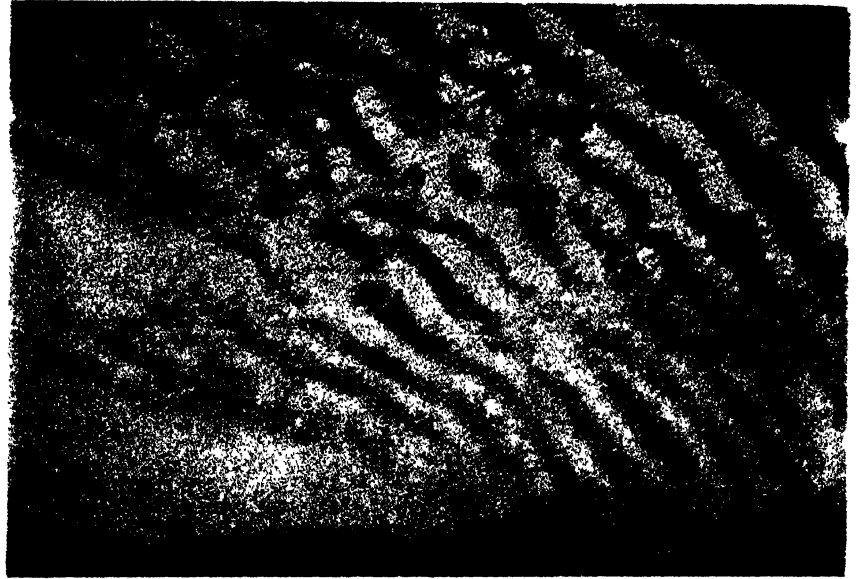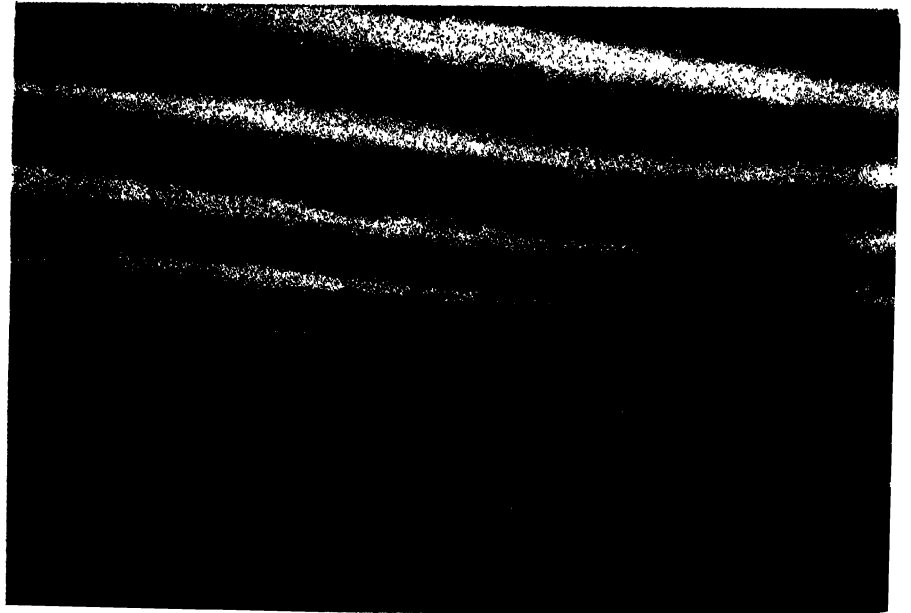
পাশ্চাত্য জগতে মেঘমালার সাধের অবস্থান ব্রেজিলে —এ মেঘ আমাজনের বিরাট বক্ষ-কন্দর হইতে প্রাণবাষ্প সংগ্রহ করে।

উত্তর-আমেরিকার আলাস্কা-অঞ্চলেও মেঘমালার মায়া অপরিসীম। মেঘমালা যায় না শুধু বালুকাময় মরু-প্রদেশে। সাহারার আকাশ বিরাট দাহ-যাতনায় ভরিয়া খাঁ-খাঁ করিতেছে। সেখানে সরস আর্দ্র মেঘের ছায়া দেখা যায় না! বৃষ্টির বিন্দু কস্মিনকালে সেখানে ঘেঁষ দেয় না!

বিধাতার বিশ্ব-সৃষ্টিকে বজায় রাখিতে মেঘমালাকে হাজার কাজ করিতে হয়! মেঘ-রূপে সে যেমন কল্যাণ সাধন করে, বৃষ্টি-রূপেও তেমনি! দিনের বেলায় সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝখানে মেঘমালা পর্দ্দা রচিয়া তোলে। এ পর্দ্দার গুণে প্রখর রৌদ্র-তাপে পৃথিবী ঝলশিয়া যায় না—পৃথিবীর বুকে শ্যামল তৃণশস্য জন্মায়; পৃথিবী ফশলের ডালা সাজাইতে পারে। এ-মেঘ-পর্দ্দা না থাকিলে পৃথিবী জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইত! রাত্রে আবার এই মেঘ সমস্ত পৃথিবীকে তপ্ত রাখে; হিমানীর মৃত্যু-জড়তা হইতে পৃথিবীর প্রাণটুকুকে সযত্নে রক্ষা করে।

তার পর ঐ বিচ্ছিন্ন বিচিত্র পুঞ্জ-মেঘ—আলো-ছায়ার সম্পাতে আকাশে বিবিধ বর্ণ-বিন্যাসে ধরণীকে অপরূপ শোভায় বিকশিত করিয়া তোলে। শরৎ-আকাশের বুকে মেঘমালা কত বিচিত্র ছবি আঁকে—প্রাসাদ রচে—মন্দির-মসজিদের আদ্‌রা গড়ে—দৈত্য-দানব, অতিকায় জীব-জন্তুর বিচিত্র চিত্রমালায় আকাশকে নয়ন-মন-বিমোহন করিয়া তোলে। আকাশের পানে চাহিয়া দেখুন—দেখিবেন, শরতের মেঘমালা যেন আর্ট-গ্যালারি সাজাইতেছে!

মেঘ আছে তিন শ্রেণীর। Cirrus মিহি-তন্তুবৎ; Cumulus ঢেউ-খেলানো ছায়া-হীন; এবং Stratus সমান, টানা, পাতের মত, সরু; বাকী-সব মেঘ এই তিন-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এ মেঘ থাকে আকাশের অনেক উর্দ্ধে

বাতাস যে-বাষ্পরাশিকে মেঘে পরিণত করিতে পারে না, সে-বাষ্প কুয়াশার বেশে জমিয়া ওঠে। পৃথিবীর মাটীর উপরে তিন শো হইতে ছয় শত ফুট উর্দ্ধে কুয়াশার অবস্থান; তার উর্দ্ধে কুয়াশার জমিবার বা থাকিবার অধিকার ও শক্তি নাই।

অনেক সময় আমরা দেখি, আকাশের বুকে ধূসর-বিচ্ছিন্ন মেঘরাশি পাগলের মতো ছুটাছুটি করিতেছে! এ ছুটাছুটির অর্থ,—মেঘেরা চায় নিজেদের মধ্যে বাঁধন অটুট রাখিতে! পূর্ব্বে মেঘের এ ছুটাছুটির অর্থ বুঝিবার জন্য মানুষের মাথা-ব্যথা ছিল না; মানুষ এখন বিমান-পথে বিমান-রথে পাড়ি দিতেছে বলিয়া মেঘমালার এ ছুটাছুটির অর্থ বুঝিবার তার প্রয়োজন হইয়াছে।

সবচেয়ে দুরন্ত মেঘ—টর্ণেডো বা ঝড়ো-মেঘ। এ মেঘ নিবিড়-কালো জমাট অতিকায় বেশে দেখা দেয়—যেন বিরাট দৈত্য! প্রচণ্ড আঘাতে পৃথিবীকে সমূলে টানিয়া উপ্‌ড়াইয়া ছিঁড়িয়া যেন চূর্ণ করিয়া দিবে! এ মেঘ ঘূর্ণীবেগে ছোটে। বাতাস সবেগে এ-মেঘের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢুকিয়া যেমন তাহাকে ছিঁড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়, সঙ্গে-সঙ্গে মেঘেরাও সেই ছিন্ন রন্ধ্র ভরিয়া তোলে! রন্ধ্র ভরার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আরো বেগে আরো বিক্রমে মেঘ-ভার ছিঁড়িয়া দেয় এবং মেঘরাশিও সে-রন্ধ্র ভরিয়া তুলিতে প্রচণ্ড প্রয়াস করে। তার ফলে বাতাসের সঙ্গে মেঘের প্রবল যুদ্ধ চলে! রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয়, এবং এ-যুদ্ধে উলুখড়ের মতো স্থল-জল-ভরা পৃথিবীর প্রাণ-সংশয় ঘটে! এ ঘূর্ণীবেগে পৃথিবীতে ওলট-পালট ঘটিয়া যায়! এই টর্ণেডোর তাণ্ডব-লীলা সবচেয়ে বেশী দেখা যায় আমেরিকায়।

ঝড়ো মেঘ

সকালে এবং সন্ধ্যায় লীলাময়ী নায়িকা-সাজে সাজিয়া মেঘ আকাশে বসে। সে-সময় ক্ষণে-ক্ষণে তার গায়ে রঙের যে বাহার খোলে, সে বর্ণ-সুষমার তুলনা নাই! বাতাসে যত ধূলি থাকিবে, মেঘের গায়ে রঙের বাহার তত বিচিত্র বেশে দেখা দিবে! পৃথিবীর বুকের চিরদিনের লাঞ্ছিত তুচ্ছ এই ধূলি—আকাশের মেঘমালাকে সাজাইতে তার কলা-কৌশলের অন্ত নাই!

মেঘমালার দৌলতেই সূর্য্যাস্ত-কালে প্রতিক্ষণে আমরা আকাশের গায়ে নব-নব মাধুরীর বিচিত্র বিকাশ দেখি! সূর্য্যাস্ত-শোভা সব-চেয়ে নয়ন-মনোহর দেখি, যখন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে অস্ত-রবির রশ্মিকণা প্রতিবিম্বিত ও প্রতিস্ফুরিত হয়!

যাঁরা দার্জ্জিলিংয়ে গিয়াছেন, মেঘের কত লীলাখেলাই না তাঁরা দেখিয়াছেন! সেখানে মেঘমালা যেন বিরাট ফ্যাক্টরি খুলিয়াছে! সূর্য্যের কিরণে মেঘবাষ্প হাসির প্রদীপ্ত উচ্ছ্বাসের মতো খোলা দ্বার-জানলা দিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে—এবং মিহি-ধারায় আর্দ্র-বাষ্প ঝরাইয়া সরিয়া যায়!
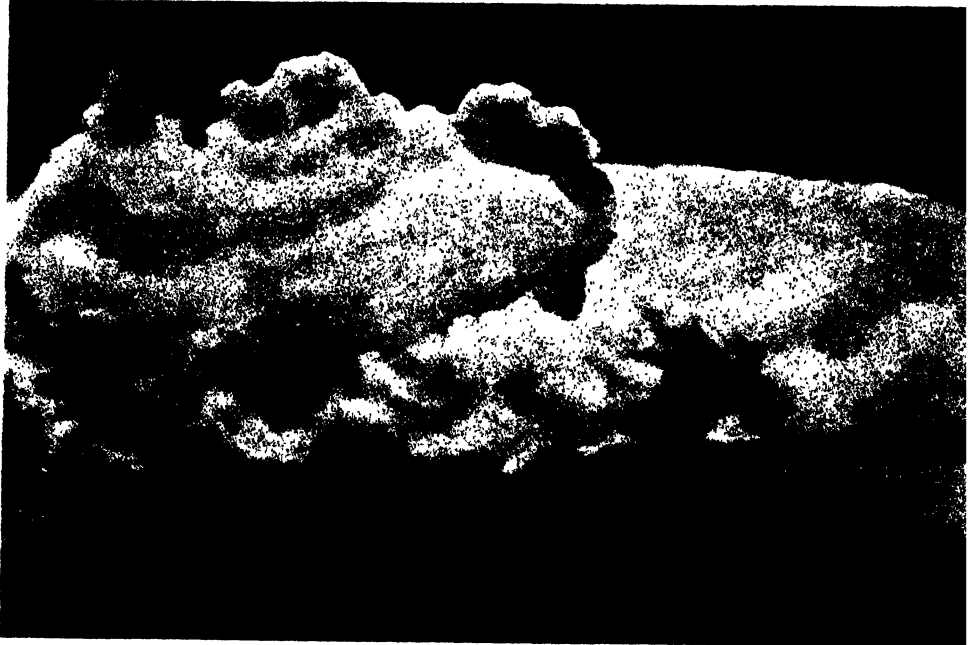
তুষার-কিরীটিনী কাঞ্চনজঙ্ঘা নিকটে—তার সে-আবরণ ভেদ করিয়া শিশু-মেঘের চপল লীলাখেলা সব সময়ে দেখা সম্ভব হয় না; তবু যেটুকু খেলা দেখা যায়, সে খেলায় কি অপরূপ মনোহারিতা!

তার পর ঐ রামধনু। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মায়া-মরীচিকা—রামধনুর বাস্তব রূপ নাই! রামধনু আকাশের গায়ে রচা মেঘের কাব্য! **It is a phantom of the skies.**

মেঘলা-দিনে যদি আকাশে রামধনু দেখেন, জানিবেন, ও-মেঘে বৃষ্টি ঝরিবে না! তবে মেঘ কখনো নিষ্ফল হয় না। মেঘ দেখিলে বুঝিবেন, তপ্ত ধরণী শীতল হইবেই! বৃষ্টি-ধারায় ও-মেঘ কোথাও-না-কোথাও মানুষের বুকে বহু তৃপ্তি বহু আরাম বহিয়া আনিবেই। মেঘমালা এক-দিকে যেমন কবির কল্পনার উৎস, তেমনি বাস্তবের দিক দিয়া মেঘমালা আমাদের জীবনের আশা-ভরসা—আমাদের জীবন—the ever-redeemed promise of our daily bread.

যাত্রা সুরু

নীরব নিশীথ রাতি—
ঝরে ঝর-ঝর বাদলের ধারা কুটীরে জ্বালিনি বাতি।
কৃষ্ণা রজনী ঢালিয়া দিয়াছে হৃদয়ের যত কালি,
ঝঞ্ঝার বায়ু মিলাইয়া সুর তালে-তালে দেয় তালি।
বিজলী চমকে, বজ্র গরজে, কাঁপিতেছে ধরাতল,—
প্রেতিনী মেলিয়া দিয়াছে আকাশে ঘন কালো কুন্তল।

তাণ্ডব-নাচ সুরু হলো বুঝি রুদ্রের মহা-তালে,
ডমরু-নাদ মিশিয়া গিয়াছে ঝঞ্ঝার কলরোলে।
হিংসার দ্বার মেলিয়া সর্প বাহিরিছে রাজপথে,
মহাকাল আজ এলো কি নামিয়া প্রলয়ের মহারথে?
পেচক করিছে কর্কশ রব, শৃগাল ডাকিছে ঘন,
মৃত্যু-মথন-তাণ্ডব-তালে মাতিয়া উঠেছে বন।

আঁধারে ঢেকেছে চারিধার—
নিরালা কুটীরে বসে আছি একা, কেহ কোথা নাহি আর।
অন্ধ দৃষ্টি নাহি পায় পথ সুদূর আকাশ-পানে,
অজানার লাগি অন্তর মোর মেতেছে প্রলয়-গানে।
এসো হে ঝঞ্ঝা, এসো হে বজ্র,—তোমারে নাহিক ভয়,
তোমাদের সুরে মিলাইব সুর,—আজি আমি দুর্জ্জয়।

ওগো প্রলয়ের গুরু!
তোমার লাগিয়া বন্ধুর-পথে যাত্রা করিব সুরু।
পথের পাথেয় কিছু নাই মোর,—তাহাতে নাহিক ডরি।
স্মরি তব নাম অকূল পাথারে ভাসাবো আমার তরী।
শমনের সাথে পাতায়ে মিতালি চলিব দিবস-রাতি,
দুর্ব্বার বেগে ছুটিয়া চলিব ঝঞ্ঝারে ক'রে সাথী।
যদি তাহা নাহি পারি—
অসময়ে হায় ডুবে যায় যদি অকূলে-ভাসানো তরী,
এলাইয়া দিব সারা দেহ-মন মরণের পারাবারে;
জানি আমি নাথ, পাইব তোমারে জীবনের পর-পারে।

শ্রীস্নেহরঞ্জন আচার্য্য (বি-এ)।

বৈষ্ণবমত-বিবেক

শ্রীল রাধাদামোদরের প্রতিষ্ঠা

শাস্ত্র-অধ্যয়নে, শাস্ত্রসংগ্রহে, শাস্ত্রসঙ্কলনে, শাস্ত্ররচনায়, শাস্ত্রের অধ্যাপনে, বৈষ্ণবসেবায়, বিগ্রহসেবায়, ও ভজন-সাধনে শ্রীজীবের অনুপম কৃতিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরূপ-সনাতন পরিতৃপ্ত হইলেন। তখন শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের আদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীজীবের জন্ম শ্রীবৃন্দাবনে একটি স্বতন্ত্র শ্রীবিগ্রহ-সেবার ব্যবস্থা করিবার সংকল্প করিলেন। এই বিগ্রহের নাম শ্রীশ্রীরাধাদামোদর। *

ভক্তিরত্নাকর এ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবেই বলিতেছেন—

"স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধাদামোদরে।
স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে॥"

ভঃ রঃ—৪র্থ তরঙ্গ ১৩৮ পৃঃ।

শ্রীরূপ স্বহস্তে এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকিলে তিনি যে ভাস্কর্য্যবিদ্যায়ও সুপটু ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। শ্রীজীবের এই বিগ্রহসেবায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া—শ্রীরাধাদামোদর নিজেই শ্রীরূপকে আদেশ করায় শ্রীরূপ শ্রীজীবের হস্তে ইহাকে অর্পণ করেন। যমুনাতীরে শৃঙ্গারবটের সন্নিকটে শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীজীবের জন্ম এই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্ত আচার্য্য। ইঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী। ইনি শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরের সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীল রাধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী ইঁহারই শিষ্য। ইনি সাধনদীপিকা নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। ঐ গ্রন্থ হইতে কয়েকটি স্থল ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহারই একটি স্থলে আছে:—

রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ।
জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥

ভঃ রঃ—৪র্থ তরঙ্গ, ১৩১ পৃঃ।

শ্রীরাধাদামোদর শ্রীজীবের ঐকান্তিক সেবায় কি প্রকারে শ্রীজীবের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীভক্তিরত্নাকরে আছে—

"নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস।
দেখিয়া শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস॥
মধ্যে মধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে।
শ্রীজীব দেখায় প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে॥
একদিন বাজায় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া।
শ্রীজীবে কহয়ে মোরে দেখহ আসিয়া॥
কৈশোর বয়স বেশ ভুবনমোহন।
দেখিতেই শ্রীজীব হইল অচেতন॥
চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে।
ভাসয়ে দীঘল দুটী নয়নের জলে॥
প্রসঙ্গে কহিনু কিছু ঐছে বহু হয়।
রাধাদামোদর সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥"

ভঃ রঃ—৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৯ পৃঃ।

শ্রীরাধাদামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে শ্রীজীব শ্রীগোবিন্দ-মন্দির হইতে শ্রীরূপকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া তাঁহার অবস্থানের জন্ম একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেন, এবং নিজেও পূজ্যপাদ পিতৃব্যের গ্রন্থলিখন ও অন্যান্য সেবাসৌকর্য্যের জন্ম তাঁহার কুটীরের সন্নিকটে একখানি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই মন্দিরনির্ম্মাণে কোনও শিল্প-পারিপাট্যের বাহুল্য নাই। অত্যন্ত সরলভাবে প্রীতির সহিত এই সেবা শ্রীজীব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে। এই স্থানেই শ্রীসনাতনের, শ্রীরূপের, শ্রীজীবের ও অন্যান্য গোস্বামিগণের স্বহস্ত-লিখিত গ্রন্থাবলী সযত্নে রক্ষিত হইত। * দেশ-বিদেশ হইতে অন্যান্য

---

* শ্রীল সনাতনের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনমোহন, শ্রীরূপের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেব ও শ্রীজীবের সেবিত শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীমধু পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীল গোবর্দ্ধননাথ গোপাল-বিগ্রহপ্রমুখ শ্রীবৃন্দাবনের অসংখ্য বিগ্রহ পরবর্ত্তীকালে ১৪৯২ শকে আওরঙ্গজেবের অত্যাচার-নিবন্ধন শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল মদনমোহন করৌলীতে করৌলীর রাজা কর্ত্তৃক, শ্রীল গোবিন্দদেব, শ্রীল রাধা-দামোদর ও শ্রীল গোপীনাথ জয়পুরে জয়পুরাধিপ কর্ত্তৃক, এবং শ্রীগোবর্দ্ধননাথ গোপাল শ্রীনাথদ্বারে শ্রীনাথ নামে শ্রীবল্লভ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের দ্বারা সেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ জয়পুরাধিপতি সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিংহের সাহায্যে শ্রীবৃন্দাবনের বর্ত্তমান প্রতিনিধি বিগ্রহ-মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত করেন। বর্ত্তমানে তাঁহারাই বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণাস্থ বহড়ুর নন্দকুমার বসুর নির্ম্মিত শ্রীবৃন্দাবনের মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। এই প্রতিনিধি বিগ্রহগুলির মন্দির প্রথমে সওয়াই দ্বিতীয় জয়সিংহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে সে মন্দির ভগ্ন হইলে বহড়ুর দেওয়ান নন্দকুমার বসু প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

* দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তীকালে এই হস্তলিখিত অমূল্য গ্রন্থগুলি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। প্রায় ১১ বৎসর পূর্ব্বে আমি ও আমার শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ শ্রীল কানুপ্রিয় গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইয়া শ্রীল রাধাদামোদরের মন্দিরের মহান্তের নিকট এই পুঁথিগুলির সঠিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্ম বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি বলেন, "মন্দির লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার সময় পুঁথিশালার গৃহ দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। ঐ সময়েই কীটদষ্ট হইয়া পুঁথিগুলি নষ্ট

সম্প্রদায়ের গ্রন্থ ও বেদ পুরাণ পাঞ্চরাত্রাগমাদি গ্রন্থ শ্রীজীব সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহাও তিনি এই গ্রন্থমন্দিরে রক্ষা করিতেন। শ্রীজীব এই স্থানে থাকিয়াই ছাত্রগণের অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এই সময় হইতেই এই গ্রন্থমন্দির শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তকালয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। শ্রীজীব এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে যে বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপন করেন, পরবর্ত্তীকালে তাহার প্রভাব ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল।

শ্রীরূপসনাতনের তিরোভাবের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই শ্রীল-রাধাদামোদরের মন্দিরই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অধ্যয়নের ও অধ্যাপনার সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল। শ্রীজীব এখানেই তাঁহার ছাত্রগণের ও অভ্যাগত পূজনীয় বৈষ্ণবগণের অবস্থানের ও প্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

——

ষষ্ঠ অধ্যায়

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও সিদ্ধান্ত

শ্রীজীবের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য—শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ-নির্ম্মাণ। শ্রীরূপ-সনাতন পরতত্ত্বরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি সিদ্ধান্ত তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া কনীয়ান্ শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীই শ্রীল বিষ্ণুস্বামী ও তৎসম্প্রদায়ী শ্রীধর স্বামী, রামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রমুখ প্রাচীন বৈষ্ণবগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া প্রমাণ, প্রয়োগ ও বিচারাদির দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য একখানি গ্রন্থবিরচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অশেষ শাস্ত্রদর্শী, পরম প্রতিভাবান্ শ্রীজীবকে দেখিয়া উদারহৃদয় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীজীবই এই কার্য্যের উপযুক্ত। এইজন্য তিনি তাঁহার সংগৃহীত প্রমাণাবলী-সমন্বিত করচা * (note book) শ্রীজীবের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীরূপ-সনাতনও তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিলেন, এবং শ্রীজীবকে ঐ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রয়াসী ভক্তগণের তৃপ্তির জন্য সুপ্রণালীবদ্ধ ভাবে একখানি গ্রন্থ লিখিতে আদেশ করিলেন। শ্রীজীব তাঁহাদের পরিতৃপ্তির জন্য শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর "ক্রান্ত, ব্যুৎক্রান্ত ও খণ্ডিত" প্রকরণগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া—শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ, শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ নামে ছয়খানি সন্দর্ভগ্রন্থ রচনা করেন। এই সন্দর্ভগ্রন্থগুলির একসঙ্গে নাম 'শ্রীষট্-সন্দর্ভ' বা 'শ্রীভাগবত সন্দর্ভ।' এই সন্দর্ভ গ্রন্থাবলীতে শ্রীজীবের লিপিচাতুর্য্য, বিচারকৌশল ও নানাশাস্ত্র হইতে প্রমাণ সংগ্রহের অসামান্য কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীভাগবতে সুবিখ্যাত একটি শ্লোক এই,—

> "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।"

ভাঃ, ১।২।১১

অনুবাদ—তত্ত্ববিদ্‌গণ যে অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটিকে বীজভাবে অবলম্বন করিয়া প্রধানতঃ এই ছয়টি সন্দর্ভ প্রপঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীজীবের শ্রীবৃন্দাবনে আগমনের পর হইতে এইরূপ একখানি গ্রন্থরচনার জন্য তাঁহার আগ্রহ ছিল। তাহার পরে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী তাঁহাকে এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করায় ও শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীজীব অত্যন্ত বিনয়সহকারে এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ইহার ইতিহাস এইভাবে প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

> জয়তাং মথুরাভূমৌ শ্রীল রূপসনাতনৌ
> যৌ বিলেখয়তস্তত্ত্বং জ্ঞাপকৌ পুস্তিকামিমাম্।
> কোঽপি তদ্বান্ধবো ভট্টো দক্ষিণ-দ্বিজবংশজঃ।
> বিবিচ্য ব্যলিখদ্‌গ্রন্থং লিখিতাদ্ বৃদ্ধবৈষ্ণবৈঃ।
> তস্যাদ্যং গ্রন্থনালেখ, ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতম্।
> পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ।

তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ৩-৫ শ্লোক

অনুবাদ—মথুরাভূমিতে অধ্যক্ষরূপে বিরাজমান আমার গুরু এবং পরমগুরু শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন জয়যুক্ত হউন। ইঁহারাই পরতত্ত্বজ্ঞাপক এই সন্দর্ভাখ্য পুস্তিকা লিখিতে আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপসনাতনের বান্ধব দক্ষিণদেশবাসী বিপ্রবংশীয় শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল বিষ্ণুস্বামী, শ্রীধর স্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমন্মধ্ব-প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত বিষয় হইতে বিচার করিয়া ও সার সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত উক্ত গ্রন্থ কোথাও ক্রমভঙ্গে ও কোথাও ক্রমনিবন্ধে লিখিত ছিল, এবং উহার কোন কোনও স্থান খণ্ডিত বা ছিন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বের ঐ গ্রন্থখানির পূর্ব্বাপর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আমি জীব নামক অতিক্ষুদ্র ব্যক্তি এই গ্রন্থ-খানিকে পর্য্যায়বদ্ধ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীজীব অতীব বিনয়সহকারে এই গ্রন্থরচনার কৃতিত্ব শ্রীল রূপসনাতন ও গোপাল ভট্ট গোস্বামীর উপর অর্পণ করিতে চাহিলেও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের সর্ব্বত্র ইহাই সুবিদিত যে, এই গ্রন্থে তাঁহারই কৃতিত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে।

হইয়া গিয়াছে।" সম্প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু পূর্ব্বাশ্রমের কলেজের অধ্যাপক পদ পরিত্যাগ করিয়া বিরক্ত বৈষ্ণববেশে শ্রীহরিদাস বাবাজী নাম গ্রহণে শ্রীনবদ্বীপধামে প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করিয়া তাহা প্রকাশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইনি শ্রীল দাস গোস্বামীর "দানকেলি চিন্তামণি", প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শ্রীবৃন্দাবন শতক প্রমুখ কয়েকখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

* 'করচালনাৎ জাতা—ইয়ং' ইতি করচা, আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীল রাধারমণের গোস্বামিবংশের শিরোমণি নিত্যধামগত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামিপাদ 'করচা' শব্দের এই শোভন ব্যাখ্যাটি আমাকে দান করেন।

শ্রীজীবের এই ষট্সন্দর্ভগ্রন্থ সম্বন্ধে বিচার করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন আছে। সন্দর্ভ শব্দে সাধারণতঃ রচনা বা প্রবন্ধ বুঝাইয়া থাকে। * কিন্তু শ্রীজীব এখানে পারিভাষিক অর্থে সন্দর্ভ কথাটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই পারিভাষিক 'সন্দর্ভ' শব্দের দ্বারা কি বুঝায়, তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

প্রথম—তত্ত্বসন্দর্ভে, তত্ত্ববিদ্গণ যাঁহাকে তত্ত্ব বলিয়াছেন—সেই পরতত্ত্ব কি ও তাহা জানিবার উপায় যে শাস্ত্র, তাহাই বা কি, এই সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বপ্রথমে শাব্দপ্রমাণকে বা শ্রুতি ও তদনুগত মহাভারত ও পুরাণাদিকে সর্ব্বপ্রমাণের শিরোমণিরূপে স্থাপন করা হইয়াছে। অতঃপর বেদের সংহিতাদি কর্ম্মকাণ্ডমূলক অংশ অপেক্ষা সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব বা সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানের তত্ত্বনির্দ্দেশমূলক উপনিষদাদি জ্ঞানকাণ্ডমূলক অংশের শ্রেষ্ঠতা খ্যাপন করা হইয়াছে। সেই উপনিষদের মর্ম্ম শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে ন্যস্ত করিয়াছেন। দুর্ব্বোধ্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপেই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতরূপ মহাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। অতএব ঐ ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, প্রসঙ্গতঃ পঞ্চমবেদস্বরূপ পুরাণ ও ইতিহাস শাব্দপ্রমাণরূপে গণনা করা যাইতে পারে; কারণ, উহাতে বেদার্থেরই বিস্তৃতি সংসাধিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, তাহা প্রধানতঃ শ্রীভাগবতের প্রমাণের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই ভগবানই আশ্রয়তত্ত্ব, জীব ও মায়া এই পরমতত্ত্বের অধীন আশ্রিত তত্ত্ব। শ্রীভাগবতে আছে—শ্রীব্যাসদেব সমাধি অবলম্বনে এই পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানকে তদপাশ্রয়া মায়াকে এবং আশ্রিত জীবকে দর্শন করিলেন। তত্ত্ব-সন্দর্ভের উপসংহারে বলা হইয়াছে, এই পরমতত্ত্বই সম্বন্ধী, এবং তাহা শাস্ত্রবাচ্য, ষড়্বিধ লিঙ্গ দ্বারা যে শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়, উহা এখানে বিবৃতরূপে বলা হইল, এবং এই সন্দর্ভই তদ্ধেতু পরমতত্ত্বের বাচক।

দ্বিতীয়—শ্রীভগবৎসন্দর্ভে—শক্তিবর্গের প্রকাশ না ঘটায় ব্রহ্ম ভগবানের অসম্যগাবির্ভাব এবং পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব হেতু শ্রীভগবৎস্বরূপই যে পূর্ণতম, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীভগবান্ ও তাঁহার শক্তিবর্গের সম্বন্ধ, শক্তির অচিন্ত্যত্ব, অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তটস্থা এই ত্রিবিধ শক্তির নির্ণয়, অন্তরঙ্গশক্তির স্বরূপ, অন্তরঙ্গ বা স্বরূপশক্তির দ্বারা মায়াশক্তির নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য, ভগবদ্বিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব ও বিভুত্ব এবং শ্রীবিগ্রহের ষড়্বিধরাহিত্য ও নিত্যত্বাদি ও ভগবদ্রূপের পরতত্ত্বত্ব শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতঃপর ভগবল্লোকাদির প্রপঞ্চাতীতত্ব ও সচ্চিদানন্দময়ত্ব, ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর শ্রীভগবান্‌কে জানিবার উপায়স্বরূপ বেদবিদ্সচ্ছাস্ত্রের স্বরূপ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীভগবৎপরতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীভগবৎস্বরূপের দুরধিগম্যতা শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরিশেষে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই যে ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে—ইহার উল্লেখ দ্বারা এই সন্দর্ভ শেষ করা হইয়াছে।

তৃতীয়—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে—সর্ব্বপ্রথমে, পুরুষাবতার ও অন্যান্য অবতারের বিচার করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্ব-অবতারের অবতারী স্বয়ং ভগবান্, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণই যে পরম উপাস্য তাহা নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহার ধামাদির মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন ও গোলোকের অভিন্নত্ব ও সর্ব্বোৎকর্ষত্ব বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণপরিকরের নিত্যত্ব ও মাহাত্ম্য, প্রকটাপ্রকট লীলাসমন্বয় ও অপ্রকটলীলাগত ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীব্রজগোপীদিগের পরমোৎকর্ষ ও তাঁহাদের ভজনমাহাত্ম্য তন্মধ্যে শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণযুগলের পরম স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ—শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে—প্রথমতঃ, জীবপ্রকরণে জীবের স্বরূপাদির বিচার, অহংপ্রত্যয়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, জীবের অণুত্ব, জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের বিচার, জীবচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের সম্বন্ধ, ব্রহ্মের চিদচিৎ শরীরত্বের বিচার, ভগবৎস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপের বৈশিষ্ট্য, জগৎসৃষ্টিব্যাপারে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও উপাদানত্ব, পরিণামবাদে শ্রুতিসারস্য রক্ষা ও তদ্ধেতু অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, চতুর্ব্ব্যূহতত্ত্ব ও পাঞ্চরাত্রমতের শাস্ত্র-সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্চম—শ্রীভক্তিসন্দর্ভে—ভক্তির স্বরূপ, ভক্তিই যে ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাহা, ভক্তির লক্ষণ, ভক্তিপ্রাপ্তির উপায়, ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি বিচারের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতঃপর সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির প্রকার-ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি ও ভক্তি-সাধনার সোপান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভক্তিই যে অভিধেয় এবং প্রেমই যে প্রয়োজন, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ষষ্ঠসন্দর্ভ বা প্রীতিসন্দর্ভে—শ্রীজীব পুরুষার্থ কি, তাহার বিচার করিয়া প্রথমে মুক্তির পুরুষার্থতার শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধার করিয়া প্রেমই যে পরমপুরুষার্থ তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে মুক্তির যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণিত আছে, তাহার উল্লেখ ও আলোচনায় ভগবৎপ্রীতির দ্বারা যে সর্ব্বপ্রকার মুক্তি তিরস্কৃত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর ভগবৎপ্রীতির লক্ষণাদি, প্রীত্যাবির্ভাবের ক্রম, প্রীতির তারতম্য ও ভেদ, ভক্তভেদে প্রীতির সীমানির্দ্দেশ ও পরিকরগণের ভাবতারতম্য ও ক্রমোৎকর্ষ দেখাইয়া শ্রীজীব গোপীদিগের প্রীতির চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে প্রীতির রসাবস্থা কি, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীজীব ভাব, বিভাব ও অনুভাব এবং ভিন্ন ভিন্ন রসের সহিত ভগবদ্ভক্তির বিকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশেষে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসের স্বরূপ বর্ণনার পর উজ্জ্বলরসে গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

এই উজ্জ্বল রসের বিচার আরম্ভ করিয়া শ্রীজীব উজ্জ্বলনীলমণির প্রতিপাদিত মধুর ভাবের উপাসনার সারভাগ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভাগণের মধ্যে সাধারণী নায়িকা কুব্জা প্রভৃতির, অনন্তর পুরলীলার মহিষীগণের এবং ব্রজদেবীগণের প্রেমের তারতম্যবিচার পূর্ব্বক স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাবের বিচার করিয়া শ্রীজীব ব্রজলীলারূপা প্রকটলীলায় নিত্যকান্তা গোপীদিগের পরকীয়াত্ব স্বীকার করিয়া বলিতেছেন—

"অথ বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মানা শ্রীব্রজদেব্যঃ। যা এবাসমোর্দ্ধং স্তুতাঃ।

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।

* সন্দর্ভ—রচনা ইতি হলায়ুধঃ। প্রবন্ধঃ। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। গ্রন্থনম্ যথা সন্দর্ভো রচনাগুম্ফঃ গ্রন্থনং, গ্রন্থনং সমাঃ।

রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্ ।

শ্রীভাঃ, ১০।৪৭।৫৩

অর্থাৎ—"শ্রীব্রজদেবীগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমান্তরঙ্গা স্বকীয়া নিত্যাশক্তি হইলেও প্রকটলীলায় (লীলার উৎকর্ষ সাধনের জন্যই) তাঁহারা পরকীয়ারূপে প্রতীয়মানা ও পরকীয়াত্বের অভিমানযুক্তা। এই জন্যই তাঁহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কেহ নাই, এবং তাঁহাদের সমানও আর কেহ নাই বলিয়া—তাঁহাদিগের স্তব করা হইয়াছে। যথা—

"রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠ আলিঙ্গিত হওয়ায় ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ জন্য সুখোল্লাসরূপ যে প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, নলিনগন্ধরুচিশালিনী স্বর্গীয়া দেবীগণের মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথে যে লক্ষ্মীদেবীর নিতান্ত আসক্তি, তাঁহার এই প্রকার প্রসাদ-প্রাপ্তি ঘটে নাই, অন্য রমণীর কথা বলাই বাহুল্য।"

শ্রীজীবই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতকে ভিত্তি করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রণালীবদ্ধভাবে বিন্যস্ত করেন, এবং উহার উপরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উপাসনা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমন্মহা-প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ ও অভিমত অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রীজীবের ষট্সন্দর্ভগ্রন্থ প্রকাশে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যে শ্রৌতমার্গসম্মত, তাহা তিনি বিশেষভাবেই প্রদর্শন করিয়াছেন।

সর্ব্ব-সম্বাদিনী—ষট্সন্দর্ভগ্রন্থ প্রণয়নের বহু পরে সম্ভবতঃ অন্যান্য গ্রন্থরচনার পরে, শেষ জীবনে শ্রীজীব ষট্সন্দর্ভের প্রথম চারিটি সন্দর্ভের প্রপূর্ত্তি ব্যাখ্যারূপে "সর্ব্ব-সম্বাদিনী" গ্রন্থ রচনা করেন। * অনেকে মনে করেন, শ্রীজীব শেষ বয়সে চারিটি সন্দর্ভের ব্যাখ্যা শেষ করিয়া আর দুইটি সন্দর্ভের ব্যাখ্যা শেষ করিবার সময় পান নাই। এই গ্রন্থখানিতে শ্রীজীবের যে অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি প্রকাশিত হইয়াছে—সাধারণতঃ অন্য কোনও দার্শনিক-গ্রন্থে এইরূপ স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীজীবের 'ষট্সন্দর্ভ' গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক-গ্রন্থ—আর এই সর্ব্ব-সম্বাদিনী গ্রন্থ সেই ষট্সন্দর্ভের পরিশিষ্ট বা সম্পূর্ত্তি-বিশেষ। ষট্সন্দর্ভের যে যে চারিটি সন্দর্ভ বিচারবহুল—সেই চারিটি সন্দর্ভের বিচার ও প্রমাণমূলক সিদ্ধান্ত এই সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি অতীব উপাদেয় ও সুলিখিত দার্শনিক সিদ্ধান্তে পূর্ণ। এই গ্রন্থখানি সুন্দররূপে বুঝিতে না পারিলে বাঙ্গালার দার্শনিক প্রতিভা যে কত উচ্চ ধীশক্তির ও সূক্ষ্ম অনুভূতির শিখরে আরোহণে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের একটি তালিকা না দিলে শ্রীজীবের জীবন-কথার প্রধান কথাই বলা হয় না; এজন্য আমাদিগকে সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

প্রথম সন্দর্ভের বা তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শ্রীজীব সর্ব্ব-প্রথমে মঙ্গলাচরণ শ্লোকের শাস্ত্র-প্রমাণমূলক ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের দুইটি শ্লোকের বিচার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-বিশেষ, এবং যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই চতুর্যুগের অন্তর্ব্বর্ত্তী কলিযুগেই শ্রীচৈতন্য-দেব অবতীর্ণ হন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অতঃপর শ্রীজীব মূল গ্রন্থের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া শব্দ-প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে নববিধ প্রমাণের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভাবনা, ঐতিহ্য, চেষ্টা ও আর্ষ—এই নয় প্রকার প্রমাণ শব্দ-প্রমাণের অনুগত হইলেই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে, অন্যথা তাহাদের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই। শব্দপ্রমাণ বলিতে অনাদিসিদ্ধ অপৌরুষেয় বেদবাক্য বুঝিতে হইবে। এই প্রমাণকেই বেদান্ত শাস্ত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ-রাজচক্রবর্ত্তীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শব্দ-প্রমাণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য স্ফোটবাদ নিরাসপূর্ব্বক শব্দ-প্রামাণ্যের বর্ণাত্মকার্থত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। শ্রীজীব এই স্থানে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অভিমত গ্রহণ করিয়াই স্ফোটবাদ নিরাস করিয়াছেন।—স্ফোটবাদ নিরসন করিবার পরই শ্রীজীব শব্দের ত্রিবিধ বৃত্তির বিচার করিয়াছেন। ঐ ত্রিবিধ বৃত্তি—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যা বৃত্তি আবার দ্বিবিধ—রূঢ় ও যোগরূঢ়। লক্ষণা অজহৎস্বার্থা জহৎস্বার্থা ও জহদজহৎস্বার্থা—এই তিন প্রকারে বিভক্ত।

এতদ্ব্যতীত শব্দের ব্যঞ্জনা নাম্নী আর একটি বৃত্তি আছে। * এই সকল বৃত্তি পদত্ব ও বাক্যত্ব-প্রাপ্ত শব্দের দ্বারাই অর্থ-বোধ হয়। আবার পদ সকল বাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষার্থ-বোধক হয়। সাহিত্যদর্পণকারের মতে "যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমূহই বাক্য।" এইরূপ বাক্যগুলি আবার মহাবাক্যের অন্তর্গত। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস (পৌনঃপুণ্য), অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ (প্রশংসা), উপপত্তি (যুক্তিমত্তা) এই ছয়টির দ্বারা মহাবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। †

কি প্রকারে মহাবাক্যরূপ বেদের অর্থনির্ণয় করিতে হয়, শব্দ-শাস্ত্রানুসারে তাহার বিচার করিয়া কুশাগ্রধী শ্রীজীব তত্ত্বসন্দর্ভে বেদার্থনির্ণয় প্রসঙ্গে—বেদান্তরূপ ব্রহ্মসূত্রের ও তাহার ভাষ্যস্বরূপ শ্রীভাগবতের প্রামাণিকতা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

'তত্ত্বসন্দর্ভে' শব্দ-শাস্ত্রের আলোচনায় যে অভাব ছিল, সর্ব্বসম্বাদিনীতে তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শ্রীজীব সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। ভগবত্তত্ত্ব স্থাপন করিতে গেলে প্রথমেই শক্তিবাদের

---

* অনুমান নির্ভরযোগ্য না হইলেও মনে হয়, এই গ্রন্থখানি সর্ব্বশেষে রচিত বলিয়া শ্রীজীবের গ্রন্থাবলীর নামের মধ্যে ইহার নাম পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু "প্রেমবিলাস"কার এই গ্রন্থখানি শ্রীজীবের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা ও সংবতভাবে আলোচনার ধারা দেখিলে এই গ্রন্থখানি যে শ্রীজীবের রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

* লৌগাক্ষি ভাস্করের মতে শব্দবৃত্তি ষড়্বিধা যথা—
যৌগিকঃ যোগরূঢ়শ্চ শব্দস্যাদৌপচারিকঃ।
মুখ্যো লাক্ষণিকো গৌণঃ শব্দঃ ষোঢ়া নিগদ্যতে।

† উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলং।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।
সর্ব্বসম্বাদিনী—২১ পৃঃ সাহিত্যপরিষদ্ সংস্করণ।

প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। উপনিষদে ব্রহ্ম শব্দে সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ শক্তির একমাত্র সমাশ্রয় সর্ব্বগুণ-মহোদধি সর্ব্বব্যাপক পরম তত্ত্বকে বুঝাইত। কিন্তু অদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীশঙ্কর 'ব্রহ্ম' পদার্থের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাতে শক্তির লীলা-খেলা-বর্জ্জিত এক নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকেই লোকে বুঝিল। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই জন্যই সর্ব্ব বৈভবাস্তর্ভাবিত সর্ব্বশক্তিমান্ তত্ত্বকে ভগবৎ শব্দে অভিহিত করিলেন। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব বুঝিতে হইলে তাঁহার শক্তিতত্ত্ব সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে এই শক্তিবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সর্ব্বসম্বাদিনীতে এই সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শক্তিবাদের বিরোধী উক্তিগুলি যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করিয়া ব্রহ্ম বা ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব স্থাপিত করা হইয়াছে। এই স্থলে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীল রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে ভাবে নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, শ্রীজীব সেই যুক্তিগুলি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ যেমন অন্তরঙ্গ শক্তি বা স্বরূপ শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীজীবও তাহা করিয়াছেন। শ্রুতি-শিরোভাগ উপনিষদ্‌বাক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গেলে ব্রহ্মকে 'সগুণ' ও 'নির্গুণ' উভয়ই—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয় রূপই স্বীকার করিতে হয়, নতুবা শ্রুতিবাক্যের সারস্য কিছুতেই রক্ষিত হইতে পারে না। শ্রীজীব এই জন্যই শ্রীভগবানে সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ শক্তির সমাবেশ হইতে পারে ইহা দেখাইয়াছেন। ইহাই শ্রীভগবানের শক্তির অচিন্ত্যত্ব। শ্রীভগবানে ঐকান্তিক নির্ব্বিশেষবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে না—পরন্তু ব্রহ্মের একটি সামান্য নির্ব্বিশেষ ভাবও শ্রীজীব অস্বীকার করেন নাই;—কিন্তু উহাই যে ব্রহ্মের পরিপূর্ণ স্বরূপ, শ্রীজীব ইহা স্বীকার করেন নাই। উপনিষৎ প্রমাণ-মূলে শ্রীজীব এই স্থলে যে ভাবে ঐকান্তিক নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ ধীশক্তির ও শাস্ত্রনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্তর শ্রীজীব শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যত্ব, প্রতীয়মান পরিচ্ছিন্নত্ব সত্ত্বেও অপরিচ্ছিন্নত্ব, অলৌকিকত্ব, ও অচিন্ত্য শক্তিমত্তা স্থাপন করিয়া শ্রুতিবাক্যের সারস্য রক্ষা করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"ইনি পৃথিবী হইতেও মহান্ ও অন্তরীক্ষ হইতেও মহান্" (৩।৪।৩) অথচ "এই অন্তরাকাশেও স্বর্গ ও পৃথিবী, অগ্নি ও বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সকলই আছে। ইহসংসারে ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক যে কিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই অন্তরাকাশে সমাহিত আছে।" (৮।১।৩)। শ্রীজীব বলিতেছেন, এই সকল ব্যাপার ভগবানের যোগ-মায়াখ্যা অচিন্ত্য শক্তির বলেই সম্ভব। যথা "তস্মাদচিন্ত্যৈব শক্তি-র্যোগমায়াখ্যা তত্রাভ্যুপগমনীয়া" (সর্ব্বসম্বাদিনী ৮৪ পৃঃ)। এইরূপে শ্রীভগবানের পূর্ণতমত্ব স্থাপন করিয়া শ্রীভগবানেই যে সগুণ নির্গুণ সমস্ত শ্রুতির ও সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয় হইতে পারে, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি-বলে প্রমাণ করিয়াছেন। অতঃপর পরব্রহ্ম যে শ্রুতিবাক্যের বাচ্য, ইহা দেখাইয়াই তিনি শ্রীভগবৎসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন।

পরমাত্মসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় শ্রীজীব সর্ব্বপ্রথমে জীবের বা অহংপ্রত্যয়ের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে চিদংশে শ্রীভগবানের সহিত অভেদ থাকিলেও জীব যে অণুচৈতন্য, জীবের জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি যে স্বয়ংসিদ্ধ নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; এক জীববাদ খণ্ডন করিয়া পরমাত্মার একত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

অতঃপর 'বিবর্ত্তবাদ'—যে ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রায়সঙ্গত নহে, তাহা দেখাইয়া অবিচিন্ত্য পরিণামবাদ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্মের বিন্দুমাত্র ক্ষয়োদয় বা পরিবর্ত্তন হয় না। চিন্তামণি যেমন বিবিধ রত্ন প্রসব করিয়াও বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না, ব্রহ্মেরও তদ্রূপ। ফলতঃ, এই পরিণামবাদে ব্রহ্মে কোনও বিকার সাধিত হয় না।

তদনন্তর চতুর্ব্ব্যূহবিচার ও তৎপ্রসঙ্গে পাঞ্চরাত্রাগমের প্রামাণিকতা স্থাপন করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বেদান্তভাষ্যে (২।২।৪২) চতুর্ব্ব্যূহবাদের ও পাঞ্চরাত্রমতের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন—এই স্থলে তাহার বিশেষভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে, এবং পাঞ্চরাত্র মত যে শ্রুতিসম্মত, তাহা সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ, বিষ্ণুপুরাণে, মহাভারতে, ভাল্লবেয় শ্রুতিতে, ভবিষ্যপুরাণে ও ব্রহ্মসূত্রের শ্রীব্যাসপ্রণীত ভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে পাঞ্চরাত্রের যখন প্রশংসা করা হইয়াছে, তখন এ মত কোনওরূপে বেদবিরোধী হইতে পারে না।

ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায়—শ্রীমদ্ভাগবতে যে চতুর্ব্বিংশতি অবতার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই স্থলে তাহার স্বরূপ ও তৎপ্রসঙ্গে অবতারতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অগ্নিবংশজ কপিল নিরীশ্বর সাঙ্খ্যশাস্ত্রের বক্তা; এই সাঙ্খ্যশাস্ত্র বেদবিরোধী; পরন্তু সেশ্বর সাঙ্খ্যশাস্ত্র কর্দ্দম ঋষির পুত্র কপিলের দ্বারা প্রকাশিত। এই কপিলই ভগবান বাসুদেবের অবতার এবং এই সাঙ্খ্যশাস্ত্র বেদের অবিরোধী বলিয়া তাহার সিদ্ধান্ত বেদসম্মত। এই সাঙ্খ্যমতানুসারে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই, সুতরাং তিনি ভগবৎ-শক্তিরূপে গৃহীত হইতে পারেন। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। কল্পাবতার মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, পুরুষাবতার গুণাবতার, লীলাবতার-প্রমুখ অবতারের ও ভগবানের স্বয়ংরূপ, প্রকাশ, বৈভব ও প্রভাবাদির আলোচনা করিয়া তাহার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া এই সকলই যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও কলা তাহা দেখান হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের কেশাবতারত্বাদি কুব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান এবং সেই শ্রীকৃষ্ণই যে নন্দনন্দন, তাহা স্থাপন করা হইয়াছে। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীবৃন্দাবনধামই যে তাঁহার পরমধাম, এবং গোপীদিগের অনুষ্ঠিত ভজনপদ্ধতিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনপথ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ফলতঃ, শ্রীজীব এই সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যাতৃগণের সকলেরই ব্যাখ্যা লইয়া উপনিষৎবাক্যের ও পুরাণাদির বাক্যের প্রমাণের দ্বারা এমন তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন যে, ইহার পূর্ব্বে এরূপ আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীব সর্ব্বদর্শনের সমালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম্-এ, বি-এল্)।

উলের হাত-ব্যাগ

নিত্য ব্যবহারে কাপড়ের তৈয়ারী ভ্যানিটী-ব্যাগ বড় শীগ্‌গির ময়লা হ'য়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়। অথচ আজকাল বাইরে বেরুতে হ'লে খুঁটি-নাটি জিনিষের জন্য মেয়েদের হাত-ব্যাগেরও দরকার। এক্ষেত্রে কম খরচে ঘরে যদি এমন ব্যাগ তৈয়ারী করা যায়, যে-ব্যাগ দরকার-মতো কাচিয়ে-নেওয়া চলে, তাহ'লে সুবিধা হয় অনেকখানি।

ছবির হাত-ব্যাগটি তৈয়ারী করতে ১৪৷৷০ ইঞ্চি লম্বা এবং ৮ ইঞ্চি চওড়া লিনেন্‌-কাপড় লাগবে। তার পর
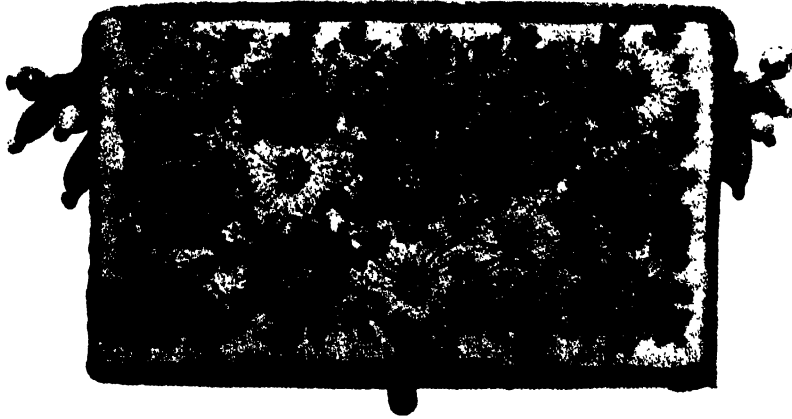
উলের হাত-ব্যাগ

লাইনিংয়ের জন্য ঐ একই-মাপের পাতলা যে-কোনো রকম একটা কাপড় নেবেন। আরো এক-টুকরা কাপড় চাই লাইনিংয়ের জন্য। ব্যাগের কাপড়ের রঙে রঙ মিলিয়ে এ-কাপড় নেবেন। এ কাপড় নেবেন ১০ ইঞ্চি লম্বা ; ৮ ইঞ্চি চওড়া।

ব্যাগের উপরের কাজটুকু মোটা উলে করা হ'য়েছে—তা বোধ হয় ছবি দেখেই বুঝতে পারছেন। এ-উলকে বলে ট্যাপেস্ট্রী (Tapestry) উল। এ-উল্‌ নেবেন দু'লচ্ছি গাঢ়-সবুজ ; দু'লচ্ছি ফিকে-সবুজ ; এক-লচ্ছি হলদে ; এক-লচ্ছি নীলচে-গোলাপী ; এক-লচ্ছি বেগুনে-গোলাপী। এই সঙ্গে চাই নীল আর হলদে রঙের দু'লচ্ছি এমব্রয়ডারি রেশমী-সুতো—ব্যাগে ধারি দেবার জন্য। গোটা-কতক কাঠের খিড—যেমন ব্যাগের ধারে আছে—পেলে ব্যাগটিকে আরো বাহারে করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় ছবিতে ডিজাইন দেওয়া আছে। কি-ভাবে এ ডিজাইন কাপড়ে ট্রেস ক'রে নিতে হবে, আগে তা বলা হয়েছে।

কাপড়টি ভাঁজ ক'রে-নিয়ে এক দিকে ডিজাইন তুলে নেবেন। তার পর ফুলগুলি তৈয়ারী করতে হ'বে। সব ফুলই লেজি-ডেজি ষ্টীচ (Lazy-daisy stitch) দিয়ে করতে হবে (৩নং ছবিতে দেখুন)। ফুলের পাপড়িগুলির মাঝে-মাঝে কাপড় না দেখা যায়, সে-দিকে হুঁশিয়ার থাকবেন।

ফুলগুলি—গোলাপী রঙের যে-দু'টি শেড আছে, তাই দিয়ে করবেন। পাশাপাশি দুটো ফুল যেন একই রঙের না হয় ; তাহ'লে বাহার খুলবে না। ফুলের মাঝের রেণুগুলি হবে হলদে উলের ফ্রেঞ্চ-নটে (French Knot)। ফুলের পাশের পাতাগুলি লেজি-ডেজি ষ্টীচ দিয়ে করবেন—কোনোটা গাঢ়-সবুজ উলে, কোনোটা বা ফিকে-সবুজে। পাতার ডাঁটিগুলো আউট-লাইন ষ্টীচ (৪নং ছবি দেখুন) দিয়ে করবেন। এ-ছাড়া ব্যাগের ধার মুড়বেন এই আউট-লাইন ষ্টীচে—নীল রঙের উলে।

হলদে সুতো দিয়ে এই নীল-ধারির উপর হেম (Hem) সেলাই দেবেন।

এমব্রয়ডারি করা হ'য়ে-গেলে কাপড়টি উল্টো করে পেতে, তার উপরে অল্প-ভিজে একখানি কাপড় চাপা দিন।

ট্রেশ করিয়া এ ডিজাইন কাপড়ে তুলিবেন

এইবার আস্তে-আস্তে ইস্ত্রী চালান্। বেশী চাপ দেবেন না ; বেশী চাপে উল চেপে যাবার আশঙ্কা আছে। এইবার লাইনিংয়ের জন্য আনা যে সেই কাপড়টি আছে, তার উপরেও সেটি বিছিয়ে মাপে মাপে ইস্ত্রী ক'রে নিন।

একটা কথা বলা হয়নি, বলি। ব্যাগটির জন্যে আট ইঞ্চি লম্বা দু'টি হাড়ের কাঁটা চাই। এই হাড়ের কাঁটা দু'টি এখন ব্যাগের দু'মুখে লাইনিংএর ভেতর দিয়ে চালিয়ে ব্যাগের ধারটি মুড়ে নিন আউট-লাইন ষ্টীচে। নীল রঙের উল নেবেন। উলের কাজ শেষ হ'লে ঐ নীল-ধারির ওপর হলদে সুতোর 'হেম' সেলাই দেবেন।

লেজি ডেজি ষ্টীচ

একটু ছাড়া-ছাড়া ভাবে দেবেন। একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন, সেলাই যেন সোজা দিকে উঁচুভাবে থাকে। কাপড়ের আর একটি যে-টুকরো ছিল (১০ইঃ × ৮ইঃ), সেটি এখন দু'পাট

আউট-লাইন ষ্টীচ
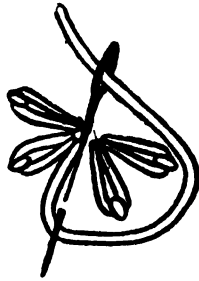
করে' পকেটের মতো ব্যাগের ভিতর জুড়ে নিন। সাধারণতঃ হাত-ব্যাগে যেমন খোপ থাকে, সেই ভাবে জুড়বেন। এই দু'ভাঁজ কাপড়ের মাঝখানে যদি একটি পেষ্টবোর্ড লাগিয়ে নিতে পারেন, তাহ'লে ব্যাগ শক্ত হবে। তবে কাচবার সময় পেষ্টবোর্ডের এ টুকরোটুকু বার ক'রে নেবেন। ব্যাগের ভিতরে খোপ হ'য়ে গেলে কাজ-করা দিকটা অপর-দিকের সঙ্গে মুখোমুখি করে' দু'কোণে দু'টি সেফ্টী-হুক লাগিয়ে এঁটে নিন।

এখন বাকী রইলো ব্যাগের হাতল। ন'দশ ফেরতা যে-কোনো রঙের তিন্-ফেরতা উল নিন। তার পর সেগুলিকে রশির মতো পাকিয়ে নিন। তবে তার মুখে ঐ কাঠের বিডগুলো—ছবির মতো ক'রে—দিতে ভুলবেন না। এখন দু'টি মুখ দু'ধারে সেলাই করে নিন।

ক্ষীণ-কটি

কোমর মোটা হইয়া বুক ও পেটের সঙ্গে একাকার হইলে মেয়েদের চেহারার শ্রী-ছাঁদ থাকে না! এদেশে এবং পাশ্চাত্য দেশেও নারীর ক্ষীণ-কটি চিরদিনই সৌন্দর্য্য-পিপাসু পুরুষের নয়ন-মনে তৃপ্তি দান করিয়া আসিতেছে।

মেয়েরা ক্ষীণ-কটির কদর জানেন ; জানেন না শুধু সে-কটিদেশকে বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া কি কৌশলে ক্ষীণ রাখা যায়, তার কৌশল! এ কৌশল আয়ত্ত করিতে কোনো কঠিন সমারোহ-আয়োজনের প্রয়োজন নাই ; প্রয়োজন শুধু কয়েকটি বিধি মানিয়া নিয়মিত ব্যায়াম।

যে-সেকালকে আমরা বর্ব্বর-বিমূঢ় বলিয়া আজ অবজ্ঞা করি, সেকালের যে-মেয়েদের গো-বেচারী বলিয়া আমরা নিশ্বাস ফেলি, সেই-সেকালের সেই-মেয়েরা দশ-বারো বৎসর এমন কি তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সেও দড়ি-ডিঙ্গাডিঙ্গি খেলা করিতেন। বিলাতী-ষ্টাইলে

স্কিপিংয়ের আমরা তারিফ করি—অথচ এই স্কিপিং বা দড়ি-ডিঙ্গানো আমাদের দেশের মেয়েদের অজানা ছিল না! দড়ি-ডিঙ্গানোর ফলে তাঁদের কটি সুছাঁদে গড়িয়া উঠিত; কিন্তু সে ক্ষীণ-কটি চিরকাল বজায় থাকিত না শুধু গৃহিণী-পদাভিষিক্ত হইয়া এদিকে তাঁদের বিরাট ঔদাস্যবশতঃ।

একালের বহু পরিবারে মেয়েরা ব্যাটমিণ্টন ও টেনিশ-খেলা সুরু করিয়াছেন। এ খেলায় কটিদেশকে ক্ষীণ ও সুছাঁদে বাঁধা চলে। কিন্তু সে খেলা খেলিবার সুযোগ বা অবকাশ গৃহস্থ-ঘরে ক'জন মেয়ের আছে?

তাই আমরা ক্ষীণ-কটি-গঠনের উপযোগী কয়েকটি ব্যায়াম-প্রণালীর কথা বলিতেছি। এ ব্যায়াম প্রত্যহ দু'বার করা চাই। সকালে পাঁচ মিনিট; এবং সন্ধ্যায় পাঁচ মিনিট করিয়া। তার পর একটু রপ্ত হইলে ব্যায়াম-কাল বাড়াইয়া পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট করিতে হইবে। এ-ব্যায়ামে পনেরো দিনে সুফল পাইবেন; কটিদেশ পনেরো দিনে অন্ততঃ দু'ইঞ্চি ক্ষীণ হইবে। এ-ব্যায়ামে স্বাস্থ্যের কোনো দিকে কোনো অনিষ্ট হইবে না। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ-ব্যায়াম নিয়মিত অভ্যাস করিলে কটি-দেশের স্থূলতা ২৪ হইতে ২৭ ইঞ্চি কমিবেই! যাঁরা স্থূলাঙ্গী, তাঁদের কটি ক্ষীণ হইতে কিছু দিন বেশী সময় লাগিবে; তবে সুফল-লাভে তাঁরাও বঞ্চিত হইবেন না।

এবার ব্যায়ামের কথা বলি,—

এ ব্যায়ামের প্রথম-মুখে দু'পা ঈষৎ ফাঁক করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে দাঁড়ান। তার পর সবেগে দু'হাত মাথা ছাড়াইয়া উপরে তুলিয়া অঞ্জলি-বদ্ধ করুন (১নং ছবি)। বুক, হাঁটু ও ঘাড় খাড়া সিধা রাখিবেন, এবং বরাবর সামনের দিকে চাহিয়া থাকিবেন। তার পর দুই হাতের অঞ্জলি পুটবদ্ধ করিয়া বাঁ পা বাঁ দিকে প্রসারিত করিবেন; অঞ্জলিবদ্ধ দু'হাত চক্রাকারে ঘুরাইবেন। বাঁ দিক হইতে ডান দিকে ঘুরাইবেন। বাঁ পা প্রসারিত করিবার সময় মাথা বাঁ দিকে (২নং ছবি) হেলাইয়া রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে এক হইতে ষাট পর্য্যন্ত গণিবেন। গণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকে মাথা হেলাইয়া বাঁ হাত পূর্ব্ববৎ সিধা রাখিয়া এমনি-ভাবে অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত আবার চক্রাকারে ঘুরান। এবারে পূর্ব্ব প্রণালী মতো হইতে বাঁ দিকে হাত ঘুরাইতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে ষাট পর্য্যন্ত গণিবেন। তার পর কোমর হইতে সামনের দিকে দেহ বাঁকাইয়া মাথা নীচু করিবেন। মাথা প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত নীচু করিতে হইবে—দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ থাকিবে। এই অবস্থায় এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণিতে-গণিতে অঞ্জলিবদ্ধ হাত একবার উর্দ্ধে পরক্ষণে নীচে নামাইবেন। (৩নং ছবি)। এ ব্যায়াম তিন মিনিট কাল করা চাই।
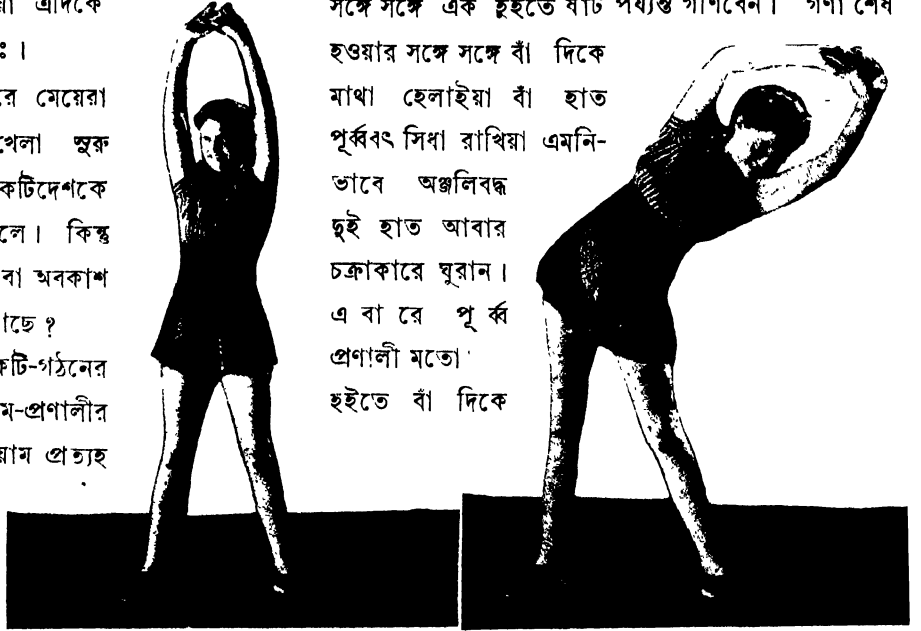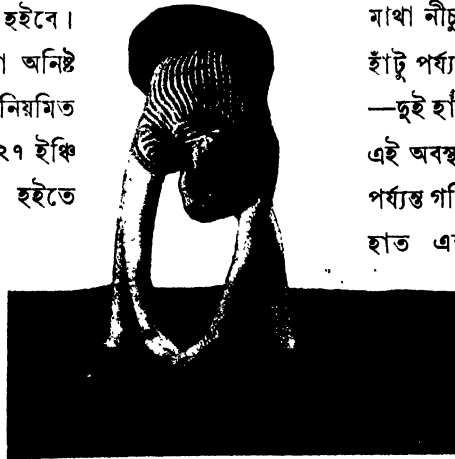
দু'হাত মাথার উপরে

মাথা বাঁ-দিকে

মাথা নীচু

তার পর আবার সিধা হইয়া দাঁড়ান। দু' পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইবেন। দাঁড়াইয়া ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া দুই হাত সামনে

প্রসারিত (৪নং ছবি) করিয়া পুটবদ্ধ হাত ডাহিনে-বাঁয়ে সবেগে নাড়িবেন। এ সময়ে দেহকে যথাসাধ্য দৃঢ় ও কঠিন (stiff) রাখিতে হইবে। এক হইতে আট পর্য্যন্ত গণিতে গণিতে ব্যায়ামের এ-অঙ্ক শেষ করিবেন।
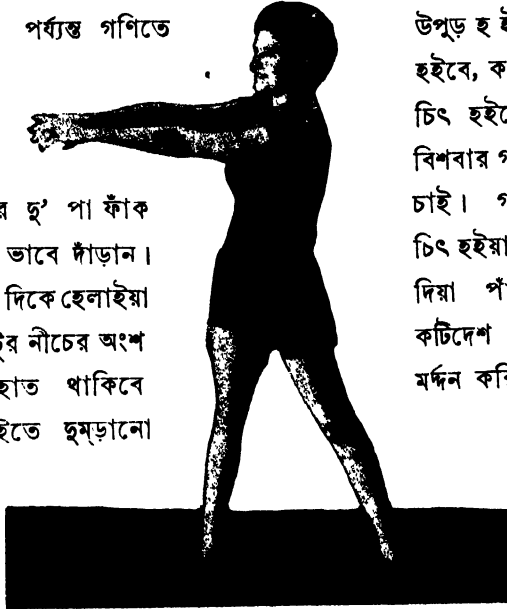
তার পর আবার দু' পা ফাঁক করিয়া খাড়া সিধা ভাবে দাঁড়ান। দাঁড়াইয়া মাথা ডান দিকে হেলাইয়া ডান হাত দিয়া হাঁটুর নীচের অংশ স্পর্শ করুন; বাঁ হাত থাকিবে কনুইয়ের কাছ হইতে দুমড়ানো (৫নং ছবির ভঙ্গী) মতো। হাঁটু স্পর্শ করিবার জন্য ডান হাত নামাইবার

দু'হাত সামনে

সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত তুলিতে হইবে; পরক্ষণে আবার বাঁ দিকে মাথা হেলাইয়া বাঁ হাত দিয়া বাঁ পায়ের হাঁটু

মেঝের শুইয়া গড়াগড়ি

স্পর্শ এবং ডান হাত উর্দ্ধে কাঁধের উপর তুলিতে হইবে। এ ব্যায়াম উপর্য্যুপরি এবং অবিরাম ভাবে তিন-চার মিনিট-কাল করা চাই।

তার পর মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ুন (৬নং ছবির ভঙ্গীতে)। শুইয়া একবার ডান দিকে, পরক্ষণে বাঁ দিকে মেঝেয় গড়াগড়ি দিবেন। বেশ জোরে-জোরে গড়াগড়ি দেওয়া চাই। গড়াগড়ি দিবার সময় কখনো উপুড় হইতে হইবে, কখনো চিৎ হইবেন। বিশবার গড়াগড়ি দেওয়া চাই। গড়াগড়ির পর চিৎ হইয়া শুইয়া দু'হাত দিয়া পাঁচ-মিনিট-কাল কটিদেশ সবলে ঘর্ষণ ও মর্দ্দন করিবেন।
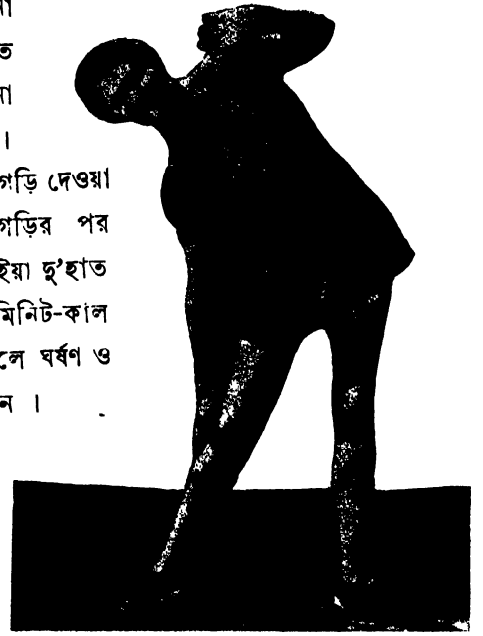
ডান-হাত হাঁটুর নীচে

এ ব্যায়াম-অভ্যাসের ফলে ক্ষীণ-কটির অধিকারিণী হইবেন—তাহাতে সন্দেহ নাই!

ব্যায়ামের সঙ্গে কয়েকটি স্বাস্থ্য পালন করা চাই।

১। দিনে-রাতে এক পেয়ালার বেশী চা পান করিবেন না।

২। রাত্রে প্রচুর নিদ্রা চাই। রাত্রি-জাগরণ নিষিদ্ধ।

৩। ভোজন-সম্বন্ধে সময় বাঁধা থাকিবে। অতি-ভোজনও চলিবে না।

৪। সকালে-সন্ধ্যায় মুক্ত বাতাসে অন্ততঃ বিশ মিনিট-কাল বিচরণ। পথে বাহির হইতে না পারেন, বাড়ীর ছাদে বা উঠানে বিচরণ করিবেন।

শিশুপালন

শিশুর প্রয়োজনীয়তা—

"শিশুই ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের প্রধান বল ও ভরসা।" শিশু ভিন্ন অন্য কেহই বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাই শিশুর এত প্রয়োজন। কিন্তু যদি সেই শিশু সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা বংশরক্ষা—জাতিরক্ষা—বা দেশরক্ষার কোন কাজই হয় না। যদি সে চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক—জাতির কলঙ্ক—দেশের কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়।

শিশুর শিক্ষা—

যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতেই আহার-বিহার ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে সৎশিক্ষা পায় না, সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে 'পালন' করা হয় না, তাহাকে যথারীতি 'পালন' করিতে হইলে, তাহার স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-গঠনের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজে সৎ হইয়া সদ্‌দৃষ্টান্ত না দেখাইলে সন্তান সৎ হয় না—হইতে পারে না। আবার বলি —গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু 'মা' হওয়া সহজ নয়। "জননি, তুমি যদি সন্তানের 'মা' হইতে চাও, প্রথমে নিজেকে সংশোধিত করিয়া পরে তোমার কোলের শিশুর শিক্ষা বিধানে যত্নবতী হও। বাল্যে মাতৃক্রোড়ে শিশুর যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তোমার সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে; কিন্তু যদি সে জীবনের প্রথম দিন হইতে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা—সুশৃঙ্খলতা—শিক্ষা না পায়, কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। যদি তোমার সন্তানকে বংশের গৌরব—জাতির গৌরব—দেশের গৌরবস্বরূপ দেখিতে চাও,—তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও। তুমি ধন্য হও! তোমার বংশ ধন্য হউক! সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমির প্রতি গৃহ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পূর্ণ হউক।"

শিশুর শিক্ষারম্ভের প্রকৃষ্ট কাল ও স্থান—

আঁতুড়ে জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃমাতৃ-সন্নিধান ও পরিজনবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। বাল্যকালের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাস হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তত সহজে অভ্যাস হয় না। ভাল বা মন্দ, বাল্যের শিক্ষা যত দীর্ঘস্থায়ী হয়, পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা তত দীর্ঘস্থায়ী হয় না—হইতে পারে না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যায়। সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। স্কুল-কলেজে অর্থকরী বিদ্যা ও সাধারণ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, কিন্তু তথায় 'মনুষ্যত্ব' লাভ হয় না। বাল্যকাল হইতে শিশুকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে। দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি তাহার বিভিন্ন সৎপ্রবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে; এবং লোভ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে তাহার হৃদয়ে উদিত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পাঠশালাতে শিশুর 'গুরুকরণ' আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'উপযুক্ত' মাতৃগুণলাভ করিবার পূর্ব্বেই যেমন অনেকে 'মা' হইয়া পড়েন, দুঃখের বিষয়, যথোপযুক্ত গুরুগুণবিহীন হইয়াও সেইরূপ অনেকে 'গুরুপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ান। কেবলমাত্র মৌখিক উপদেশ-দানে অপরের চরিত্র-গঠন করা যায় না অপরের চরিত্র গঠন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—নিজের চরিত্র গঠিত করিয়া সেই চরিত্র অপরের সম্মুখে স্থাপন করা। পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি বাল্যের শিক্ষকগণের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের চরিত্রই—তাঁহাদের শিক্ষাই দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ শিশুতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়।

শিশুর স্বাস্থ্য—

শাস্ত্রে আছে—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" আমাদের যতগুলি কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে শরীর অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা করা চাই সর্ব্বাগ্রে। কেন না, শরীরই ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার প্রধান সহায়। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার সম্পূর্ণ ভার মায়ের উপরই বিশেষভাবে ন্যস্ত। শিশু সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। তখন তাহার শরীর-রক্ষার জন্য যাহা কিছু করা দরকার, তৎসমস্তই মায়ের হাতে! "সন্তানের রক্ষার্থই ভগবান্ একাধারে মাতৃহৃদয়ে বুকভরা স্নেহ, প্রাণভরা ভালবাসা ও অপার্থিব আত্মত্যাগ পূর্ণমাত্রায় ঢালিয়া রাখিয়াছেন।" কিন্তু শিশু কাঁদিলেই অনভিজ্ঞা মা মনে করেন যে, শিশুর ক্ষুধা পাইয়াছে। তাই, শিশু যখনই কাঁদে, তখনই তিনি তাহাকে স্তন্যপান করান বা দুধ খাওয়ান। এরূপ করা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এ কথা সকল মায়েরই সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার। কেন না, শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য 'মা' যত দায়ী, তত দায়ী আর কেহই নয়। তাহাকে সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া গঠিত করিতে হইলে মায়ের হৃদয় 'করুণ' অথচ 'দৃঢ়' হওয়া চাই। কথায় বলে—"ছেলে 'মানুষ' করিতে হইলে, তাহাকে হাতের আন্দাজে খাওয়াও, আর বাঘের নজরে দেখ।"

যিনি মাপে মাপে খাওয়ান তিনিই প্রকৃত মা। যে মায়ের হৃদয় কেবলমাত্র করুণ কিংবা কেবলমাত্র কঠোর, বুঝিতে হইবে, শিশুপালন করিবার যোগ্যতা তাঁহার নাই। শিশু যাহাতে 'অমানুষ' না হইয়া 'মানুষ' হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা সকল পিতামাতারই একান্ত কর্ত্তব্য। জাতীয়তা-সংগঠনের জন্যই 'খাঁটী মানুষ' আজ একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ দেশের ও জাতির উন্নতির কোনই আশা নাই। দেশের দিকে তাকাইয়া আজ মনে পড়ে স্বর্গীয় ডি, এল রায়ের সেই অমর গীতি—

"ওরে আবার তোরা মানুষ হ।"

"কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ'।" ইত্যাদি

শিশুর নৈতিক শিক্ষা—

শিশুকে নিয়ম-মত খাওয়ান ও পোষাক পরান, অর্থাৎ সুস্থ ও বলিষ্ঠ করা যত সহজ, তাহাকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করা তত সহজ নয়। সন্তানকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করিয়া গঠিত করিতে

না পারিলে 'মা' হওয়ার দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থাকে। তাই প্রারম্ভেই বলিয়াছি, "গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু 'মা হওয়া সহজ নয়'।"

মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোগে নয়—ত্যাগে; প্রবৃত্তি-মার্গে নয়—নিবৃত্তি-মার্গে। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবলমাত্র ভোগ, আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতেই রত, তাহারা পশুর সমান।

সন্তানকে চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।'

সৎসঙ্গ—

সন্তানকে সর্ব্বজনপ্রিয়রূপে গঠিত করিতে হইলে তাহাকে কখনও কুসংসর্গে মিশিতে দিবে না। সৎসঙ্গ—সাধুসঙ্গই—চরিত্র-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব সদ্‌বংশের ছেলেদের সহিতই শিশুকে সর্ব্বদা মিলিতে-মিশিতে দিবে।

শিশুর সম্মুখে সৎ বা অসৎ যে কোন কর্ম্মই কর না কেন, সেই সেই কর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি তাহার নির্ম্মল কোমল অন্তঃকরণে সংস্কার-আকারে, বীজ-আকারে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়। মাত্র মুখের কথায় বা কাগজ-কলমের শিক্ষায় অপরকে সংশিক্ষা দেওয়া যায় না। নিজে সৎ হইয়া, 'হাতে কলমে' সংকার্য্য করিয়া ও করাইয়া, অপরকে সৎশিক্ষা দিতে হয়। ইহাই সৎশিক্ষা দিবার প্রকৃত পন্থা।

সহবৎ—

শিশুর সহিত 'তুই-তো-কারী' ভাবে কথা বলিলে সে-ও সকলের সহিত 'তুই-তো-কারী ভাবে কথা বলে। তাহার সাক্ষাতে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিলে, সে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে। শিশু মায়ের পোষা পাখী; মা তাহাকে যে বুলি শিখান, সে তাহাই শিখে।

সত্যবাদিতা—

মনুষ্যত্বের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ—সত্যবাদিতা। যাহার চরিত্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে চরিত্রবান হইতে পারে না। নিজে সর্ব্বদা সত্যকথা বলিয়া অপরকে সত্য বলা শিক্ষা দিতে হয়।

সরলতা—

শিশুর প্রকৃতি স্বভাবতঃই সরল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে যতই কুসংসর্গে মিলিত হয়, ততই প্রকৃতি তাহার কুটিল হয়। প্রাণান্তেও শিশুকে কুসংসর্গে মিশিতে দিবে না। সচ্চরিত্র ছেলে-দের সহিতই তাহাকে খেলাধূলা করিতে দিবে।

অহিংসা—পরপীড়াবর্জ্জন—

হিংসাপ্রবৃত্তি মানবকে পশুর অধম করে।

জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, অপরকে দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ দেওয়া কখনই উচিত নয়। জীব যেমন নিজের কষ্ট-ভোগ চায় না, তেমনি পরকেও কষ্ট দেওয়া তাহার উচিত নয়। পরপীড়ন মনুষ্যত্ববিরুদ্ধ।

ক্ষমা—

এই গুণ মহৎ অন্তঃকরণেরই লক্ষণ। শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গল-কামনায় তাহাকে বাল্যকাল হইতেই ক্ষমাগুণ শিক্ষা দিতে হয়।

পরের ছেলের দোষ থাকিলেও তাহাকে ক্ষমা করিয়া নিজের ছেলেকে শিখাইতে হইবে যে, প্রতিশোধে শান্তি নাই—ক্ষমাতেই শান্তি।

সহিষ্ণুতা—

ইহসংসারে অজস্র দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ আছে। সে সকলের ভোগ অবশ্যম্ভাবী। জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই এই সকল সহ্য করা অভ্যাস করিলে সংসারে প্রবেশ করিয়া পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না।

দানশীলতা—

এই গুণ যাঁহাতে যত বেশী আছে, তাঁহার মনুষ্যত্বও তত বেশী। বাল্যকাল হইতেই শিশুকে দানধর্ম্ম শিক্ষা দিতে হয়। শিশুর সাক্ষাতে নিজে উপযুক্ত-পাত্রে দান আচরণ করিয়া শিশুকে দানশীলতা শিক্ষা দিবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা গরীব-দুঃখী, অন্ধ-আতুরকে ভিক্ষা দেওয়ান শিশুদিগকে দানশীলতা শিক্ষা দিবার সহজ উপায়।

অন্য দেশের নীতি যাহাই হউক্-না কেন, ভারতের নীতি—ভারতের শিক্ষা গ্রহণ নয়—দান; মাত্র বিষয়-সম্পত্তি দান নয়—'নিজ'কে পর্য্যন্ত দান—আত্মদান। যে ভারতে এক দিন দাতা-কর্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল—যে ভারতে অতিথিসৎকারহেতু নিজ-হস্তে অম্লানবদনে আত্মজের মস্তকচ্ছেদন করা হইয়াছিল, সেই ভারতে আজ এ কি দেখিতেছি! আজ দাতার অভাব, কিন্তু ভিখারীর প্রাদুর্ভাব। এখন দেবতার আবির্ভাব নাই—কেবল দানবদলের প্রাদুর্ভাব। পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিতে উদ্যত। ইহার ফলে আজ, ভাই-এ ভাই-এ বিরোধ—পিতাপুত্রে বিরোধ—আত্মীয়স্বজনে বিরোধ—পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যে বিরোধ—গ্রামে গ্রামে বিরোধ—সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ। সর্ব্বত্রই কেবল বিরোধ—বিরোধ—বিরোধ। কাজে কাজেই অনন্ত দলাদলির সৃষ্টি। ইহার ফল অধঃপতন! পরিণাম নিধন। যে ভারত 'অতি-মানবে'র লীলাক্ষেত্র, সেই ভারতে আজ 'অমানুষে'র তাণ্ডব লীলা সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান।

সংযম—

এ সংসারে ছোট-বড় সকলেরই ইচ্ছা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দভোগ। চঞ্চল মনকে স্থির রাখিতে না পারিলে সদানন্দভোগ হয় না—হইতে পারে না। মন স্বতঃই চঞ্চল। তাহার উপর, আমাদের অবিরত ভোগাকাঙ্ক্ষা চঞ্চল মনকে আরও চঞ্চল করে। সংযম অভ্যাসই আত্মোন্নতির প্রধান সোপান। সংযম অভ্যাস না হইলে, 'যোগ' বা মনঃস্থির হয় না। মনঃস্থির না হইলে নিত্যানন্দ লাভ হয় না। যোগের প্রথম সোপান—'যমঃ' অর্থাৎ সংযম।

অধুনা, এ দেশের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার এত যে বাড়াবাড়ি, তাহার মূল-কারণ বাল্যে শিশুদিগের সংযম শিক্ষা বিষয়ে পিতামাতার অবহেলা।

সংসারে পদে পদে প্রলোভন। এই প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া তাহা সতত দমন করিতে হইবে। শিশুর সম্মুখে প্রলো-ভনের কারণ সাধ্যপক্ষে আসিতে দিবে না। যতদূর সম্ভব, তাহাকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবে। অজ্ঞাতসারে যদি কোন প্রলোভনের

কারণ শিশুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাকে সে প্রলোভন দমন করাইতে শিখাইবে।

যাহা স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নহে, শিশু যতই কাঁদুক যতই 'ঝোঁক' ধরুক, কিছুতেই তাহাকে সে জিনিষ দিবে না। এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে প্রভূত মঙ্গল করা হইবে।

শুদ্ধাচার—

ভগবৎ-প্রাপ্তিই সকল ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ঈশ্বর পরম মঙ্গলময়; পবিত্রতার আধারস্বরূপ। তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে সর্ব্ববিষয়েই পবিত্র হইতে হয়। নচেৎ ভগবৎপদ লাভ হয় না। আত্মোন্নতি করিতে হইলে, সর্ব্বাবস্থায় বাহ্যাভ্যন্তরশুচি একান্ত প্রয়োজন। আত্মশুদ্ধি না হইলে হৃদয়ে দেবত্বভাবের উদয় হয় না। এই আত্মশুদ্ধি শিক্ষা করিবার প্রথম সোপান বেশভূষায় ও আচার-ব্যবহারে সর্ব্বদা বাহ্যশুচি অভ্যাস করা। এই জন্য শিশুকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিধান ব্যবহার করাইবে। মুখ ও হস্তপদাদি সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা অভ্যাস করাইবে। আহার ও মলমূত্র ত্যাগের পর হস্তপদাদি উত্তমরূপে ধৌত করা এবং বাল্যকাল হইতেই যাহাতে শিশুর বাহ্যশুচি অভ্যাস হয় সে ব্যবস্থা করিবে। শিশুকে সর্ব্ববিষয়ে শুচি অভ্যাস করান পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য।

পিতৃমাতৃভক্তি—ভগবদ্ভক্তি—

স্থূলদেহ সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য নিয়ম মত দৈনিক আহার বিশ্রাম ইত্যাদি যেমন প্রয়োজন, সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ মনোময়-কোষ প্রাণময়-কোষ ও বিজ্ঞানময়-কোষ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে নিয়মমত দৈনিক ভগবৎ আলোচনা একান্ত করণীয়। কেন না, সূক্ষ্মদেহ সবল না হইলে আত্মোন্নতি হয় না—হইতে পারে না। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" আমরা দৈনন্দিন যেরূপ আহার, বিহার—মলমূত্রত্যাগ ইত্যাদি শারীরিক কর্ম্ম করিয়া থাকি—মানসিক উন্নতিকল্পে তদ্রূপ দৈনিক সৎসঙ্গ—সৎআলোচনা—সৎ-চিন্তা একান্ত করণীয়। ইহার ফল প্রকৃত জ্ঞানোদয়—আত্মপ্রকাশ; জ্ঞানোদয় না হইলে 'পরাভক্তি'র উদয় হয় না। পরাভক্তি না হইলে, জীবের একান্ত বাঞ্ছনীয় "আনন্দময়-কোষে"র সন্ধান পাওয়া যায় না।

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের আদিস্বরূপ আনন্দময়ত্ব লাভ হইলে ভগবৎ-আরাধনাই সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যাঁহার ঔরস ও যাঁহার গর্ভ হইতে আমার জন্ম, সেই পিতৃদেব ও মাতৃদেবীকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে সেবা করিলে ভগবৎ সেবারই ফল হয়—তাঁহাদের আশীর্ব্বাদেই ভগবদ্-ভক্তির উদয় হয়—অন্তর্চক্ষু উন্মেষিত হয়।

পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনবর্গকে সকালে-সন্ধ্যায় দুই বেলা প্রণাম করা বাল্যকাল হইতেই শিশুকে শিক্ষা দিবে। শিশুকে নিত্য ধর্ম্মকাহিনী শুনান ও ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করান একান্ত প্রয়োজন। বয়স্ক শিশুদিগকে প্রত্যহ গীতা-পাঠ ও গীতার উপদেশ মত জীবন-গঠন অভ্যাস করাইলে তাহাদের জীবনে মনুষ্যত্ব সহজে ফুটিয়া উঠিবে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। এরূপ করিলে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ভগবদ্ভক্ত হইয়া উঠে। ধ্রুব ও প্রহ্লাদকে তাঁহাদের জননীগণ বাল্যাবধি ভগবৎ-কথা শুনাইতেন। ইহার ফলে ধ্রুব-প্রহ্লাদের কত দূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা কে না জানে?

পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি বাল্যের শিক্ষকগণ পূর্ব্বোক্ত উপদেশগুলি যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, তাহা হইলে শিশুকে সহজেই চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করা যায়।

শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার এম, আর, সি, ও, জি, লণ্ডন)।

বরষা-বিদায়

বরষা কাঁদিয়া কয়, আমি যাই আমি যাই গো,
শারদ হাসির মধু-বনে আমি নাই আমি নাই গো!
　　জাগিবে কুমুদ জাগিবে কমল
　　হবে দশদিশি রজত-উজল,
হেথা, আঁধারের কোথা ঠাঁই কোথা ঠাঁই গো!
　　মোর নিবিড় আঁধার কায়া
　　বহে বেদনার ঘন ছায়া,
বিজলি আঘাতে হৃদয় যাহার পুড়ে হ'য়ে গেছে ছাই গো,
সেথা উৎসব হাসি সঙ্গীত কোথা পাই গো।
　　নদীর বক্ষ ভরি কূলে কূলে
　　রাখিয়া গেলাম মোর আঁখিজলে,
নাচিবে চাঁদিনী দুলে দুলে সেথা বাধা নাই বাধা নাই গো!

　　নীপ-নিকুঞ্জে উঠেছিল হাসি
　　ঘন বেজেছিল দাদুরীর বাঁশী,
বাহিরে আসিয়া ভেবেছিল কেয়া কারে চাই কারে চাই গো!
　　নিঃশ্বাসে নীপ দিয়েছি ঝরায়ে
　　রেখেছি কেয়ারে আঁধারে সরায়ে,
আজিও স্মরণে জাগিলে সে কথা
　　　　ব্যথা 'পরে ব্যথা পাই গো!
　　আপনি কাঁদিয়া কাঁদায়ে সবায়
　　সরম জাগিছে মাগিতে বিদায়,
তাই কুয়াশার আড়ালে লুকায়ে যাই আমি চ'লে যাই গো,
শারদ হাসির মধু-বনে মোর কোথা ঠাঁই কোথা ঠাঁই গো!

শ্রীনিভা দেবী।

১২

ওদিকে তিন ছেলেকে লইয়া ক্ষীরোদাময়ী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন; ফিরিয়া দেখেন, বাড়ীর দ্বারে তালা বন্ধ।

দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। বীণা? বীণা কোথায়? ও-বাড়ী হইতে সেই চলিয়া আসিয়াছে কোথা হইতে কে দাদু আসিয়াছে বলিয়া…দাদুর জন্য খাবার-দাবার পাঠাইয়া দিলেন, তার পর আর বীণা ও-বাড়ীতে যায় নাই! ক্ষীরোদাময়ী ভাবিয়াছিলেন, মেয়ে বুঝি বাড়ীতেই আছে…দাদু হয় তো অনেক রাত্রে চলিয়া গিয়াছে, তাই বীণা আর কাতুদির বাড়ী ফেরে নাই!

এখন বাড়ী তালা-বন্ধ দেখিয়া তিনি রাগ করিলেন। চাবি দিয়া মেয়ে নিশ্চিন্ত-মনে কোথায় গেল? ক'দিন ও-বাড়ীর যজ্ঞি ঠেলিয়া শরীর যা হইয়া আছে…উহাদের সাধ্য-সাধনা না মানিয়া এত-রাত্রে ঘুমন্ত ছেলে-তিনটাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন, কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া বিছানায় দেহ-ভার ঢালিয়া বিশ্রাম করিবেন…না, মেয়ে এদিকে দ্বারে তালা লাগাইয়া দাদুর সঙ্গে দাদুর বাড়ী গিয়াছে আমোদ করিতে!

ছেলেদের বলিলেন—দোরে তালা বন্ধ…ডাক্ তোর বীণাদিদিকে…

ঘুমের ঘোরে তিন ছেলে রীতিমত ঢুলিতেছে…যে করিয়া এতখানি পথ চলিয়া আসিয়াছে, তারাই জানে!

মিণ্টু ডাকিল—বীণাদি…ও বীণাদি…

পিণ্টু দ্বারের কড়া নাড়িল…

সিণ্টু রাগিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল…ডাকিল—বীণাদি, বেশ মেয়ে তুমি! দরজা দিয়ে ঘুম হচ্ছে…আর আমরা পথে দাঁড়িয়ে…

এ-কোলাহলে মহাদেও বাহির হইয়া আসিল। ঘুমাইবে না বলিয়া সে তুলসীদাসের রামায়ণ খুলিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়াছিল, তার পর দু'চোখে কখন ঘুমের ঘোর জড়াইয়া আসিয়াছে…

মহাদেও আসিয়া কহিল—চাবি আমার কাছে মা-জী …বীণাদিদি বোলিয়ে গেছে, তাঁর দাদু আসছে…বুড়া বাবু…বীণাদিদি তাঁর সঙ্গে তাঁর কোঠীতে গেছেন…

চাবি লইয়া ক্ষীরোদাময়ী মন্তব্য করিলেন,—বেশ মেয়ে তো! এই রাত্রে কোথাকার কে দাদু এলো… আর তার সঙ্গে অমনি চলে গেল…

চাবি খুলিয়া ছেলেদের লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিলেন…

বিছানা করা ছিল। মিণ্টু-সিণ্টু কোনোমতে গায়ের জামা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিণ্টু চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল…চাহিবামাত্র ক্ষীরোদাময়ীর বিছানায় বালিশের উপর দেখিল ভাঁজ-করা একখানা চিঠি।

চিঠি লইয়া মিণ্টু পড়িল। তার পর ডাকিল—মা…

ও-বাড়ী হইতে চ্যাঙড়ায় করিয়া যে খাবার-দাবার আনিয়াছেন, হাত ধুইয়া ক্ষীরোদাময়ী সযত্নে সেগুলি গুছাইয়া রাখিতে ছিলেন…মিণ্টুর ডাক কাণে গেল; তিনি কোনো সাড়া দিলেন না।

মিণ্টু আবার ডাকিল—ও মা…শুনচো?

মা বলিলেন—এই রাত্রে এখন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন? শুয়ে পড়ো না! কাল আবার ইস্কুল আছে…সকালে উঠে পড়াশুনা করতে হবে তো! না, পড়াশুনা না করলেও চলবে?

মিণ্টু বলিল—বীণাদির চিঠি…

চিঠি! ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—বীণার চিঠি?

মিণ্টু আসিল ক্ষীরোদাময়ীর কাছে, বলিল—বীণাদি

যাবার সময় চিঠি লিখে রেখে গেছে। তোমার নামে চিঠি···

—কি চিঠি? পড়ো···

মিণ্টু চিঠি পড়িল।

চিঠি শুনিয়া ক্ষীরোদাময়ী ক্ষণেকের জন্য কাঁটা হইয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—কোথায় সে দাদুর বাড়ী, তা লিখেছে?

মিণ্টু ভালো করিয়া কাগজখানার এ-পিঠ ও-পিঠ দেখিল; দেখিয়া বলিল,—না···

বিরক্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—ভ্যালা মেয়ে যা হোক!···এ্যাদ্দিন খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলুম···এখন পাখা উঠেছে কি না···কে দাদু এলো, আমাকে বলা নেই, কওয়া নেই···ধেই-ধেই নেচে মেয়ে তার সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল এই রাত্রে···

মিণ্টু বলিল—এলে তুমি বীণাদিকে খুব বকো মা।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—তার জবাব তোমাকে দিতে পারছি না বাপু এখন এই রাত্রে! ভালো জ্বালা হয়েছে আমার!···তুমি এখন যাও, দয়া করে শোও গে··· আমি কৃতার্থ হবো'খন···

মিণ্টু দাঁড়াইল না···শুইতে গেল।

ও-বাড়ীর খাবার-দাবার গুছাইয়া রাখিয়া ক্ষীরোদাময়ী বাহিরে গেলেন। ডাকিলেন—মহাদেও···

মহাদেও সাড়া দিল,—মা-জী···

—একবার এসো তো বাবা···

মহাদেও আসিল।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—যে-লোক এসেছিল, তাকে তুমি দেখেছো মহাদেও?

মহাদেও জবাব দিল, দেখিয়াছে···বুড়া বাবু···কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। বীণা দিদি ও-বাড়ীতে যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল, কোনো ভদ্রলোক আসিলে মহাদেও যেন খপর দেয়; তাই সে তার বৌকে পাঠাইয়াছিল। বুড়া বাবু অনেকক্ষণ তার দোকানে বসিয়া ছিলেন,—কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। সেই কথাবার্ত্তায় মহাদেওকে বলিয়াছিলেন, কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন দিদিকে লইয়া যাইবার জন্য। দিদির কে দাদু আছেন কলিকাতায়—তাঁর কাছ হইতে বুড়া বাবু কাশীতে আসিয়াছেন···

এ-কথা শুনিয়া ক্ষীরোদাময়ী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কলিকাতায় কে-দাদু থাকেন, তাঁর কাছ হইতে এ-বুড়া বাবু কাশীতে আসিয়াছিলেন বীণাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য!···ও-বাড়ীতে যাইবার সময় মহাদেওকে বীণা বলিয়া গিয়াছিল, কোনো ভদ্রলোক আসিলে ও-বাড়ীতে মহাদেও যেন খপর দেয়!···

আগে হইতেই এ-ব্যবস্থা ছিল···

তাই মহাদেওয়ের বৌ গিয়া খপর দিবামাত্র মেয়ে তিড়বিড় করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া আসিল!···

তার পর ও-বাড়ীতে বীণার আবার সেই ছুটিয়া যাওয়া···গিয়া তাঁকে বলিল, কাশীতে আসিয়াছেন··· দাদু হন্···বীণা কাশীতে আছে খপর পাইয়া দেখিতে আসিয়াছেন···

কাশীতে বীণা আছে, এ খপর তিনি কোথায় পাইলেন? তার পর বীণার আচরণে, বীণার কথায় কেমন এক-রকম ভাব···

বিস্ময়ে কৌতূহলে ক্ষীরোদাময়ীর মন ভরিয়া উঠিল! তিনি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মহাদেও বুঝিল, ব্যাপারখানা তাহা হইলে খুব সরল নয়···সে বলিল—কি ভাবছো মা-জী?

নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—কিছু নয়।

তার পর মনের উপর একটা প্রশ্ন কলরব তুলিল। ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—সে বাবুর বয়স কত হবে, মহাদেও?

মহাদেও বলিল,—তা পঞ্চাশের উপর···

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—হুঁ···

মহাদেও বলিল,—কোনো গোলমাল আছে মা-জী?

ক্ষীরোদময়ী বলিলেন,—না।···আচ্ছা, গাড়ী করে গেল? না, হেঁটে?

মহাদেও বলিল—তা আমি দেখিনি মা-জী। আমি তখন দোকানের হিসেব-পত্তর দেখছি···আর এ-গলিতে গাড়ী আসে না তো···

ক্ষীরোদাময়ী আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, শ্রীপতি? না, তার কোনো চর?

কিন্তু না, তাহা হইতে পারে না। শ্রীপতিকে বীণা বাঘের মতো ভয় করে! তার সঙ্গে যাইবে না। শ্রীপতির চর? তাই বা কি করিয়া হইবে? বীণা তো কাহারো সঙ্গে মেলামেশা করে না···তাছাড়া শ্রীপতির বাতাস প্রাণপণে সে এড়াইয়া চলে!

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—তুমি এসো মহাদেও···অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোওগে···

মহাদেও বিনা-বাক্যে চলিয়া গেল।

ক্ষীরোদাময়ী দ্বার বন্ধ করিয়া ভিতরে আসিলেন। আসিয়া জিনিষপত্রগুলা দেখিলেন। একটা ট্রাঙ্ক শুধু নাই···আর সব যেমন, তেমনি আছে।·· বুঝিলেন, একটা ট্রাঙ্কই লইয়া গিয়াছে···

কিন্তু গেল কোথায়? যেখানে যাক, তাঁকে না বলিয়া যাওয়ার অর্থ কি?···কি বলিয়া এত রাত্রে গেল?

আগে হইতে পরামর্শ ছিল···নহিলে তিনিও ছেলে-দের লইয়া বাড়ী-ছাড়া, আর ঠিক সেই ক্ষণটিতে কোথা হইতে কোন্ সম্পর্কের দাদু আসিয়া দেখা দিল এবং দাদুর সঙ্গে চকিতে এমন চলিয়া গেল···

সত্যকার দাদু আসিয়া যদি লইয়া যাইবে তো এত রাত্রে না লইয়া গেলে চলিত না?···এত রাত্রে এমন অধীর-আকুলতা জাগিল···

সকালে তাঁকে বলিয়া লইয়া গেলে কি ক্ষতি ছিল? দাদু আসিয়া যদি তাঁকে বলিত, বীণা আমার আপন-জন···আমি তাকে আমার ওখানে লইয়া যাইতে চাই, তাহা হইলে ক্ষীরোদাময়ী কোনো আপত্তি করিতেন না! বীণা তাঁর কেহ নয়। তাঁর গৃহে ছিল ভাড়াটিয়া সন্তোষ বাবু···সেই সন্তোষ বাবুই বীণাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আজ সন্তোষ বাবু নাই, সন্তোষ বাবুর স্ত্রী নাই, কেহ নাই—এদিকে বীণারও কোনো কূলে কেহ নাই! আছে বরং ঐ আপদ শ্রীপতি! সেই শ্রীপতির হাতে অসম্ভব পীড়ন-অত্যাচার সহিত বলিয়াই মমতা-বশে বীণাকে তিনি এমন করিয়া নিজের সংসারে মেয়ের মতো স্থান দিয়াছেন···আর সেই বীণা নিঃশব্দে এমন করিয়া চলিয়া গেল? তাঁকে ঘুণাক্ষরে এ-যাওয়ার পূর্ব্বাভাস না দিয়া?···কি প্রয়োজন ছিল এ-লুকাচুরির?

শুইয়া এ-পাশ ফিরিলেন, ও-পাশ ফিরিলেন। দু'চোখ সবলে বুজিয়া রহিলেন, তবু ঘুম আর আসে না! যত মনে করেন, ও-কথা আর ভাবিবেন না, তবু এই ভাবনাই দুনিয়াকে চাপিয়া মনের উপর উত্তাল হইয়া ওঠে! এ যে কি অস্বস্তি···কতখানি অশান্তি!

সহসা এ-চিন্তার ফাঁকে একটা চিন্তা বিষাক্ত সাপের মতো ফণা তুলিয়া ফোঁশ করিয়া উঠিল!

যদি তাই হয়?

কাশীতে মা-অন্নপূর্ণার পায়ে মুক্তি-কামনায় বহু লোক যেমন মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে, তেমনি মায়ের পিছনে কত দুরভিসন্ধি বুকে লইয়া কত দুর্বৃত্ত···

বীণা যদি তাদের কারো হাতে পড়িয়া থাকে? বীণার কি-বা বয়স···দুনিয়ার কতটুকু সে জানে! যদি কোনো দুরাত্মার ছলনায় ভুলিয়া···

মনের মধ্যে সে-সাপটা ফণা আরো বিস্তার করিয়া বলিল, কেমন মায়ের পেটে জন্মিয়াছে···

ক্ষীরোদাময়ীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া রোমাঞ্চরেখায় ভরিয়া উঠিল!···

সবলে সে-সাপের ফণা ধরিয়া তিনি তাকে মাটীতে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, না, না, বীণা তেমন হইতে পারে না!

প্রাণপণে মা-অন্নপূর্ণাকে ডাকিলেন। বাবা-বিশ্বনাথকে ডাকিলেন। ডাকিয়া মিনতি জানাইয়া বলিলেন, আমি তাকে চাই না মা, ফিরে আর চাইনে বাবা···শুধু এইটুকু দয়া করিয়ো, এ যেন না হয়! যে-মেয়েকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম, এমন অপমান-লাঞ্ছনার বিস-বাষ্প যেন তার দেহে-মনে না লাগে! এ-সর্ব্বনাশ হইতে তাকে রক্ষা করিয়ো···

চিন্তার বিরাম নাই। চোখে ঘুম আসিল না! শুইয়া বৃশ্চিক-যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন···

শেষে এ যাতনা অসহ্য বোধ হইল। উঠিয়া শয্যা ছাড়িয়া, ঘর ছাড়িয়া ক্ষীরোদাময়ী বাহিরের ছোট ছাদে আসিলেন।

জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরিয়া আছে। ক্ষীরোদাময়ী আকাশের পানে চাহিলেন···কালো মেঘের কটা টুকরা চাঁদের দিকে অগ্রসর হইতেছে···চাঁদকে ধরিবার জন্য। ···ভয়ে চাঁদ যেন তাই কাঁপিতেছে···

ক্ষীরোদাময়ীর মনে হইল, প্রাণপণে একবার আকাশ-বাতাস চিরিয়া তিনি ডাকেন, বীণা, বীণা,—কোথায় আছিস্? যেখানে থাকিস্, একবার একটি কথা বলিয়া শুধু জবাব দে, তুই নিরাপদ-আশ্রয়ে আছিস্!

১৩

পরের দিন ভোরের আলো ফুটিবামাত্র ক্ষীরোদাময়ী স্থির থাকিতে পারিলেন না, বেণীবাবুর গৃহে ছুটিলেন।

দাসী-চাকর ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া কাজ-কর্ম্মে লাগিয়াছে ··আর উঠিয়াছে জ্যোতি। বাড়ীর আর-কাহারো ঘুম ভাঙে নাই।

এই ভোরে ক্ষীরোদাময়ীকে আসিতে দেখিয়া জ্যোতি আশ্চর্য্য হইল। বলিল—ব্যাপার কি মাসিমা? এই ভোরে?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—বিপদে পড়েছি মা···বড্ড বিপদ!

জ্যোতি শিহরিয়া উঠিল। কহিল,—কারো অসুখ-বিসুখ করেছে না কি?

—না মা···অসুখ-বিসুখ নয়···তার চেয়েও ভারী বিপদ!

দু'চোখ কপালে তুলিয়া জ্যোতি বলিল,—কি হয়েছে, শুনি?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—তোমার মা এখনো ওঠেন-নি?

—না। মাকে ডাকবো?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—পরে ডেকো। আগে তুমি শোনো মা···তোমাকে সব বলি···

জ্যোতি বলিল,—বসো মাসিমা, তুমি কাঁপছো!

—কাঁপছি! এখনো বেঁচে আছি, পথে আসতে হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে যাইনি কেন ··ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি!

জ্যোতি কহিল,—বলো মাসিমা ··

ক্ষীরোদাময়ী তখন বীণার কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁকে যে-চিঠি লিখিয়া বীণা চলিয়া গিয়াছে, সে-চিঠি দেখাইলেন; তার সম্বন্ধে মনে যত রকম দুশ্চিন্তার কথা ভাবিয়া ক্ষীরোদাময়ীর রাত্রি কাটিয়াছে, তাহাও বলিলেন।

সুদীর্ঘ কাহিনী শেষ করিয়া ক্ষীরোদাময়ী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—দুর্ভাবনায় আমার হাত-পা পেটের মধ্যে গেছে জ্যোতি ··এখন কি করি বলো তো মা?

কাহিনী শুনিয়া জ্যোতি একেবারে কাঠ! সে কোনো জবাব দিতে পারিল না!

বীণা ··তার বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা মনে জাগে না! তবে ক্ষীরোদাময়ী যে বলিলেন,—কাশী জায়গা, মা ·· কত লোক কত ফন্দী নিয়ে এখানে ঘুরছে ··তাছাড়া সেই লক্ষীছাড়া শ্রীপতি···তার দুরভিসন্ধি কোন্ দিক দিয়ে কি বেশে দেখা দেবে, তার কোনো ধারণা তুমি করতে পারবে না, মা··

জ্যোতি বলিল,—কিন্তু সে তো আর অনেক দিন তোমাদের জ্বালাতন করতে আসেনি মাসিমা ··

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—বাড়ীতে না এলেও পাড়ায় ঘুরচে বৈ কি! এই কিছু-দিন আগে মন্দির থেকে বীণা একা ফিরছিল···তাকে ধরে টানাটানি। বলে, আমার মেয়ে হয়ে তুই করবি সভাপণ্ডিতী ··আর আমি না খেয়ে মরবো?···তুমি জানো না মা, তার ভয়ে আমি কতখানি কাঁটা হয়ে থাকি! ··অনেকে বলে, তোমার কেন এত মাথা-ব্যথা? পরের জন্য কেন এমন চোব হ'য়ে থাকো? তারা তো বোঝে না, একটা পাখী পুষলে তার উপরে মানুষের কত মায়া হয় ··আর এ একটা রক্ত-মাংসর জীব···মেয়ে! তাকে এত-বড়টি করলুম···

জ্যোতি বলিল,—সে-কথা ঠিক বৈ কি!···তা এক কাজ করি, বাবাকে-মাকে বলি। বাবা পুলিশে খপর দিন···যদি শ্রীপতির কাজ হয়, তাহ'লে ওঁদের না বলে চুপ করে থাকা উচিত হবে না মাসিমা···

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—আমার মাথায় কিছু আসছে না মা! তোমরা যা ভালো বোঝো, করো।···তোমরা ছাড়া আমার কে-বা আছে? তাই তোমাদের কাছে সব-তাতেই ছুটে আসি।···কাল সারা রাত দুর্ভাবনায় আমার চোখে এক-ফোঁটা ঘুম আসেনি জ্যোতি···সত্য কথা বলছি তোমায়···

জ্যোতি বলিল,—ঘুম এতে আসে না, মাসিমা।··· তুমি ভেবো না···বসো। আমি দেখছি, বাবা উঠলেন কিনা···

ঘুম ভাঙিলে উঠিয়া বেণী-বাবু সব কথা শুনিলেন; শুনিয়া তখনি থানায় একটা চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন এবং বেলা দু'টার সময় পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল আসামী শ্রীপতিকে গ্রেফ্‌তার করিয়া।

শ্রীপতি গর্জ্জন তুলিল—আমার মেয়েকে বড়লোকের হাতে তুলে দিয়ে টাকার রাশ আঁচলে বেঁধে আমার নামে নালিশ। আচ্ছা, আমিও আইন জানি···আমিও দিচ্ছি এক-নম্বর ফৌজদারী জুড়ে। আমার মেয়ে এখনো সাবালক হয়নি···আইনের চোখে নাবালক···যাকে বলে, **minor girl**···

পুলিশ জোর-তদারক চালাইল···কিন্তু না পাওয়া গেল বীণাকে, না শ্রীপতির বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রমাণ! কাজেই সাত-আট দিনের পর পুলিশের হাত হইতে শ্রীপতি খালাশ পাইল।

খালাশ পাইয়া শ্রীপতি চুপ করিয়া রহিল না··· মহাদেও পুলিশের কাছে যে-সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাতে বলিয়াছিল—কলিকাতা হইতে এক বুড়া বাবু আসিয়া-ছিল; বীণা তার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে···রাত্রে···

শ্রীপতি নালিশ করিল ক্ষীরোদাময়ীর নামে। নালিশ, ক্ষীরোদাময়ী বীণাকে বেচিয়া দিয়াছেন···

শ্রীপতির বহু ইতিহাস আদালতের নথীপত্রে লেখা ছিল; হাকিম তার এ-নালিশ মঞ্জুর না করিয়া প্রমাণা-ভাবে ডিসমিস্ করিয়া দিলেন।

শ্রীপতি তখন রুখিয়া উঠিল···কোথায় গেছে বীণা, তাহারি সন্ধান সংগ্রহ করিতে···

তদারকীর সময় পুলিশের কাছে মহাদেও আরো বলিয়াছে, রাত্রে চলিয়া যাইবার সময় ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া সে-চাবি মহাদেওয়ের হাতে দিয়া বীণা বলিয়াছিল, মা-জী বাড়ী ফিরিলে তাঁকে চাবি দিয়ো; আর বলিয়ো, বীণা গিয়াছে তার দাদুর সঙ্গে দাদুর বাড়ীতে। তার উপর ক্ষীরোদাময়ীকে চিঠিতে লিখিয়া গিয়াছে—হয় তো দু'দিন পরে আসিব। আর তাঁরা যদি না ছাড়েন, জানি না, কবে আসিব!···

দু'দিনের জায়গায় দশ-বারো দিন কাটিয়া গেছে, তবু বীণা ফেরে নাই। শুধু ফেরে নাই নয়—তার কোনো সংবাদ নাই। কাশীতে বীণা নাই···কাশীতে থাকিলে বারো দিনে বীণার সন্ধান মিলিত। পুলিশের কাছে এ-মামলা লইয়া কাশীতে এমন হুলস্থূল বাধিয়া গেল, আর কাশীতে থাকিলে বীণা এ-মামলার বিন্দুবাষ্প জানিবে না?···অসম্ভব!

শ্রীপতির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। বিশেষ, দুরভিসন্ধি-রচনায় তার পটুতা অসাধারণ। বুদ্ধি খাটাইয়া সে অনুমান করিল, বীণা কাশীতে নাই···কাশী ছাড়িয়া কোথাও যদি সে গিয়া থাকে তো কলিকাতায় গিয়াছে!

কিন্তু কলিকাতায় কোথায় যাইবে? কার কাছে? ···দাদু!

দাদু তার কেহ নাই, এ-সংবাদ শ্রীপতি ভালো করিয়া জানে!···

এ-দাদুটি তবে কে?···

মহাদেও মিথ্যা বলে নাই। বলিয়াছে, এক জন বুড়া বাবুর সঙ্গে গিয়াছে! বুড়ার কি স্বার্থ, পরের ঘরের কিশোরী কন্যাকে বাড়ীর কাহাকেও না বলিয়া না কহিয়া নিঃশব্দে এখান হইতে লইয়া যাইবে?···

এ স্বার্থ হয় শুধু একটি কারণে। এবং সে-কারণ··· নিজের বুদ্ধিতে 'কারণ' অনুমান করিয়া শ্রীপতি পণ করিল, যেমন করিয়া হোক, বীণার সন্ধান করা চাই। সন্ধান পাইলে বীণাকে না পাক, মোটা টাকা আদায় করা অসম্ভব হইবে না!

১২

মাসখানেক পরের কথা।

সে-দিন মৃন্ময়ের জন্মতিথি। হিরণ্ময়ের গৃহে রীতিমত উৎসব। এ-উৎসবে তারাচরণ রায় আসিয়াছেন হিরণ্ময়ের গৃহে সপরিবারে···মানে, দাক্ষায়ণী, বিরজা প্রভৃতিকে লইয়া।

হারা-মণি ফিরিয়া পাইয়াছেন—তারাচরণের একটি-মাত্র অবলম্বন! হিরণ্ময় সন্তোষের চিরদিনের বন্ধু-বীণা তার কন্যা। কাজেই এ-বাড়ীতে বীণার আদরের সীমা নাই!

রাত্রি তখন ন'টা। আহারাদি শেষ হইয়াছে। হিরণ্ময়ের স্ত্রী প্রতিমা বলিল তারাচরণকে—ছেলেমেয়ের

মোটরে একটু বেড়িয়ে আসবে কাকাবাবু।···সলিলাকে ওরা সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। তার পর আপনার ওখানে ওকে পৌঁছে দেবে ফেরবার সময়; ছেলে-মেয়েরা ওকে ছাড়তে চাইছে না···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বেশ মা···সলিলা যাক ওদের সঙ্গে···

মৃন্ময়ের বোন্ কিরণ্ময়ী বলিল—আপনার মন কেমন করবে না ছোটদাছ ?

তারাচরণ রায় হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে থাকলে মন কেমন করবে না দিদি···

তারাচরণ রায় গৃহে ফিরিলেন···দাক্ষায়ণীও ফিরিলেন বিরজাকে লইয়া। বীণা গেল এ-বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মোটরে বেড়াইতে···

রাত্রি প্রায় এগারোটা। মৃন্ময় ড্রাইভ করিতেছিল···রেড রোড পার হইয়া গাড়ী উত্তর-দিকে আসিতেছিল···হঠাৎ সেনোটাফের কাছে ওদিক্ হইতে একটা মোটর নক্ষত্র-বেগে আসিয়া মৃন্ময়ের গাড়ীর উপরে পড়িল···মৃন্ময়ের গাড়ী গেল উল্টাইয়া···সঙ্গে সঙ্গে বিপর্য্যয় কাণ্ড!

সকলের দেহে অল্পবিস্তর চোট্ আর জখম, বীণার জখম সকলের চেয়ে বেশী! তার গলার হাড় ভাঙ্গিয়া সে একেবারে অজ্ঞান!

হাসপাতাল···

ডাক্তাররা বলিলেন,—বীণার কলার-বোন্ ভাঙ্গিয়াছে, মাথাতেও চোট্···

সকলে ফিরিল রাত তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে···ফিরিল হিরণ্ময়ের গৃহে।

হিরণ্ময় যেন কাঠ! বলিল—সলিলাকে এ-অবস্থায় আর ওখানে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই···এ-বাড়ীতেই থাকবে। আমি গিয়ে ওঁকে খপর দিয়ে আসি।

সেই রাত্রে হিরণ্ময় ছুটিল তারাচরণ রায়ের কাছে। তারাচরণের চোখে ঘুম নাই···এত রাত্রি হইতেছে, এখনো সলিলা ফিরিতেছে না! কোথায় সব বেড়াইতে গেল? অজানা দুশ্চিন্তার ভারে থাকিয়া-থাকিয়া তাঁর নিশ্বাস কেমন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল! এমন সময়···

হিরণ্ময় আসিয়া যে-সংবাদ দিল···

তারাচরণ রায় তখনি ছুটিলেন হিরণ্ময়ের গৃহে।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বীণা পড়িয়া আছে বিছানায়···পাশে আছেন একজন ডাক্তার। দু'জন নার্শ আসিয়াছে। পরিচর্য্যার আয়োজন যতখানি করা যাইতে পারে, এ রাত্রে তার কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই।

বীণা বিছানায় পড়িয়া আছে—অবসন্নের মতো! তার মাথার কাছে বসিয়া কিরণ্ময়ী। কিরণ্ময়ীর মুখ মলিন, ম্লান, অশ্রু-বাষ্পে দু'চোখ ভরিয়া আছে!

তারাচরণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হিরণ্ময় বলিল—জ্বর হবে···এবং কিছু দিন ভুগবে···

প্রতিমা বলিল—মেয়েটাকে নিয়ে-গিয়ে আছড়ে আধমরা ক'রে নিয়ে এলো, কাকাবাবু···

তাঁর স্বর অশ্রু-গদ্গদ্ গাঢ়।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—অদৃষ্ট!···তিনি চাহিলেন ডাক্তারের পানে, বলিলেন,—বাঁচবে?

ডাক্তার বলিলেন—বাঁচবে বৈ কি। মাথায় তেমন injury পাইনি···দু'চারটে ছড়া-কাটা-ছাড়া। মাথায় তেমন চোট্ লাগলে এ-চেহারা দেখতেন না। তা ছাড়া জ্ঞান হ'য়েছে। এখন ঘুমোচ্ছেন!

প্রতিমা বলিল—কলার-বোন্ জুড়বে?

ডাক্তার বলিলেন,—নিশ্চয়।···কলার-বোন্ আখ্চার ভাঙ্গছে, আখ্চার জুড়ছে···বেমালুম হ'য়ে···

হিরণ্ময় বলিল—কোনো রকম permanont disfiguration কিম্বা deformity?

ডাক্তার বলিলেন—কোনো ভয় করবেন না। একটা অঙ্গ যদি বাদ যায়, তাহ'লে সে-অঙ্গও অন্য লোকের গা থেকে কেটে এনে বেমালুম এখন তা জোড়া দেওয়া হ'চ্ছে; ···সার্জারির কি-উন্নতি যে হয়েছে!···তা ছাড়া এ-কেশে তার কোনো সম্ভাবনা নেই!···আজ যখন ড্রেশ করা হ'য়েছে, তখন বেশ এগজামিন ক'রেই তা করা হ'য়েছে!···তার পর এক্স'রে ক'রবো···

তারাচরণ রায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিলেন।

হিরণ্ময় বলিল—এখন এই বাড়ীতেই সলিলা থাকুক কাকাবাবু! এঁরা বলচেন, এ-অবস্থায় নাড়াচাড়া করা ঠিক হবে না।

ডাক্তার বলিলেন—হ্যাঁ। এইটেই আমাদের বিশেষ অনুরোধ···

তারাচরণ রায় বলিলেন—এ-বাড়ীতে থাকার কথা হচ্ছে না ডাক্তার বাবু···ওকে বাঁচিয়ে তোলা চাই! জানেন ডাক্তার বাবু···

তারাচরণ রায়ের কণ্ঠ বাষ্পভারে বিজড়িত হইল··· এ-বয়সেও দু'চোখের পিছনে একরাশ অশ্রু ঠেলিয়া আসিল।

হিরণ্ময় বুঝিল···কোথায় এ-ব্যথা কতখানি বাজিতেছে··· কেন বাজিতেছে!

হিরণ্ময় বলিল—জানেন ডাক্তার বাবু, এটি ওঁর নাৎনী ···ছেলে সন্তোষ ছিল আমার বন্ধু। সে নেই···মেয়েটির মা-ও নেই। কাকাবাবু ঐ নাৎনীটিকে নিয়েই কোনোমতে···

ডাক্তার বাবু বলিলেন—আপনাদের কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। উনি সেরে উঠবেন···তবে কষ্টভোগ করতে হবে কিছু দিন। তাছাড়া জ্বর হবে···এবং বেশী জ্বর। এত বড় শক্···জ্বর না হ'য়ে তো উপায় নেই। আমরা আছি, ···আমাদের উপর ভার রইলো ওঁকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ রেখে সারিয়ে তোলবার।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—দেখুন। আমি আর ভাববো না···এ-ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছি···আবার নতুন ক'রে ভাবনা করবো, মনকে সে-রকম গ'ড়ে-তুলতে এ-বয়সে বোধ হয় পারবো না! ···তবে একটা মায়া প'ড়েছে···তা ছাড়া এ শাস্তি আমার পাওয়া উচিত ছিল।···আপনি জানেন না ডাক্তার বাবু ···সেই জন্যই আমার যা-কিছু ভয়!

হিরণ্ময় বুঝিল, এত দিন ধরিয়া যে-ব্যথা মনে জড়ো করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজ এ-বিপদে···

তাড়াতাড়ি তিনি বলিলেন—আপনি শোবেন আসুন কাকাবাবু···পাশের ঘরে। মাঝের দরজা খোলা থাকবে ···আমি এ-ঘরে আছি···আপনার বৌমা আছেন··· আপনি ও-ঘরে চলুন।

প্রতিমা বলিলেন—আসুন কাকাবাবু···

তারাচরণ রায় বলিলেন—থাক বাবা···আমি শোবো না। ঘুম আমার আসবে না। ঘুমোতে আমি পারবো না···

প্রতিমা কহিল,—না ঘুমোন, পাশের ঘরে ব'সবেন চলুন। সলিলা ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ এখন জেগে-উঠে' ও যদি আপনাকে দ্যাখে, হয় তো খুব কাতর হ'য়ে প'ড়বে···

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কিরণ্ময়ী বলিল—জ্ঞান হ'তেই চার-দিকে চেয়ে ডাকলো—দাদু! চোখে কি সে দৃষ্টি···

বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে কিরণ্ময়ীর কথাটা শেষ হইল না, রুদ্ধ হইয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

অমন কথা বোলো না

না না না অমন কথা বোলো না
দেবতা আসিবে না;
যদি না আসিবে তবে কেন
আকাশ হ'তে ঝরিছে জোছনা?
কুলু-কুলু ক'রে গান গেয়ে যায় ঝরণা?
তবে কেন ব্যাকুল সমীরণ বহিবে
গাছে গাছে আলো ক'রে অত ফুল ফুটিবে?
গাহিবে বিহগ বিহগিনী
নিখিল দেবতার আগমনী,
সে যে জানে সে-বিনা আমি
তিলেক বাঁচিব না।
না না না অমন কথা বোলো না
দেবতা আসিবে না॥

শ্রীঅমিতা বসু-চৌধুরী।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

অনিশ্চিয়তা ও উৎকণ্ঠায় প্রায় দুই মাস অতিবাহিত হইয়াছে। জুন মাসের মধ্যভাগে ফ্রান্সের সামরিক অঙ্কে যবনিকাপাত হইবার পর হইতে প্রতিদিন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর প্রত্যক্ষ আক্রমণ আশঙ্কা করা হইয়াছে। অবশ্য জার্ম্মাণী এত দিন নিষ্ক্রিয় থাকে নাই—আকাশপথে ও সমুদ্রবক্ষে সে প্রচণ্ডভাবে শত্রুতা সাধন করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেই যে সে তাহার সামরিক-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখিবে না, ইহা যেন সকলে নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছেন; তাই বৃটেনের উপকূলে জার্ম্মাণ বাহিনীর অবতরণ আশঙ্কায় সমগ্র বৃটিশ জাতি ।

জার্ম্মাণীর তৎপরতা—

এত দিন বৃটেনের বাণিজ্য জাহাজ, বিভিন্ন বন্দর, মধ্য-ইংলণ্ডের শিল্পকেন্দ্র প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া জার্ম্মাণ বিমানগুলি প্রচণ্ড বেগে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। সমুদ্রবক্ষে তাহার সাবমেরিণগুলির তৎপরতাও অল্প ছিল না। জলপথে ও গগনমার্গে জার্ম্মাণীর এই সামরিক উদ্যম হয় ত বৃটেনের বিরুদ্ধে স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণের পূর্ব্বাভাস। জার্ম্মাণীর লক্ষ্যস্থলগুলির বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয়, বৃটেনের প্রতিরোধশক্তি ক্ষুন্ন করিবার আশায় ইহাই তাহার প্রাথমিক অনুষ্ঠান। জার্ম্মাণীর সমরবিশেষজ্ঞগণ সম্ভবতঃ মনে করিয়াছেন যে, বিভিন্ন বন্দরে, শিল্পকেন্দ্রে এবং বাণিজ্য জাহাজে অশ্রান্ত ভাবে বোমা বর্ষণের ফলে বৃটেনের শ্রমশিল্প পঙ্গু হইবে, ক্রমে তাহার সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্ধ হইবে—যে অবরোধের সম্ভাবনায় জার্ম্মাণী স্বয়ং আতঙ্কাভিভূত, সেই অবরোধে বৃটেনকে বিপন্ন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। এইভাবে বৃটেনের প্রতিরোধ-শক্তি বিনষ্ট হইলে বৃটেনের উপকূলে সৈন্য অবতরণ করাইবার স্বপ্নই হয় ত হিটলার দেখিতেছেন।

সম্প্রতি জার্ম্মাণীর অন্তর্গত বার্ণস্উইকের টেক্‌নিক্যাল কলেজের সামরিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক হার এওয়াল্ড বেন্‌স্ লিখিত একখানি পুস্তকে বৃটেন আক্রমণের পরিকল্পনা আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাপক বেন্‌স্ তাঁহার পরিকল্পনায় প্যারাশুট-বাহিনী ও সেনাবাহী বিমানশ্রেণীর সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার ধারণা—ইংলিস্ চ্যানালের দক্ষিণ পার হইতে অবিরাম কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া চ্যানালের ভিতর বৃটিশ রণপোতের প্রবেশ বন্ধ করা যাইতে পারে। তাহার পর, এই গোলা বর্ষণের সময় সেনাবাহিনীকে ইংলিস্ চ্যানাল অতিক্রম করাইয়া পূর্ব্ব-এংলিয়া উপদ্বীপে অবতরণ করান যাইতে পারে; এইভাবে কেণ্ট ও সাসেক্স আক্রান্ত হইলে রাজধানী লণ্ডন বিপন্ন হইবে। জার্ম্মাণ সৈন্য যখন পূর্ব্ব এংলিয়া হইতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবে, তখন প্রতিরোধকারী বৃটিশ সৈন্যকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে আর একটি জার্ম্মাণ বাহিনী ডাব্‌লিন, লিভারপুল অথবা ওয়েলস্ হইতে অগ্রসর হইবে। এইভাবে England would be gripped as in a forceps from the West and South

পর্য্যবেক্ষণকারী বৃটিশ বিমান যাত্রা করিতেছে

East—ইংলণ্ড পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে যেন সাঁড়াসীর দুই দাঁড়ার ভিতর আটক পড়িবে।

অধ্যাপক বেন্‌সের পরিকল্পনা অনুসারেই বৃটেন আক্রান্ত হইবে কি না, তাহা বলা দুষ্কর। তবে, ইতোমধ্যে উপকূল অভিমুখে জার্ম্মাণ-বাহিনীর অগ্রগতি ও উপকূলে জার্ম্মাণীর কামানশ্রেণী সংস্থাপনের কথা শ্রুত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা বৃটেন করিয়াছে। ইংলিশ চ্যানালের উপকূলে সে-ও কামান সাজাইয়াছে। বৃটেনের বিমান ও রণপোত চতুর্দ্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত, জার্ম্মাণীর প্যারাসুট-বাহিনীর সহিত যুঝিবার জন্য বৃটেনে "প্যারাসুট-বাহিনী" গঠিত হইয়াছে; জার্ম্মাণীর সেনাবাহী বিমান যাহাতে অবতরণ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে বৃটেনের প্রত্যেক সমতল ভূমিতে বিমান-বিধ্বংসী কামান স্থাপিত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে জার্ম্মাণীর বিমান আক্রমণের প্রাবল্য অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৮ই আগষ্ট জার্ম্মাণীর বিমান-আক্রমণে তাহার ৪ শত বিমান নিয়োজিত হইয়াছিল। তদবধি এইরূপ আক্রমণ প্রত্যহই চলিতেছে। জার্ম্মাণীর বিমানগুলি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইংলণ্ডেই বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়াছে, পশ্চিম ইংলণ্ডের প্রতিও তাহারা অমনোযোগী নহে। এই বিমান আক্রমণের প্রাবল্য ও লক্ষ্যস্থলগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, জার্ম্মাণী হয় ত বৃটিশ সেনাপতিদিগকে উপকূলের নিকটবর্ত্তী সৈন্ত ও সমরোপকরণ অপসারণে বাধ্য করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। ঠিক এই সময় ফ্রান্সের উপকূলস্থিত জার্ম্মাণীর কামান হইতে গোলা বর্ষণের কথাও শুনা যাইতেছে। কাজেই মনে হয়, প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে বৃটেনের উপকূলের সমরায়োজন যদি বিফল করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে অধ্যাপক বেন্‌সের পরিকল্পনা অনুযায়ী গোলাবর্ষণরত কামান ও বোমাবর্ষণরত বিমানের সাহায্যে বৃটেনে জার্ম্মাণ-সৈন্ত অবতরণ করাইবার চেষ্টা হইবে।

সামরিক বিমান হইতে ফটো গ্রহণ

হিটলারের সন্ধির প্রস্তাব—

১৯শে জুলাই রাইখষ্ট্যাগের বিশেষ অধিবেশনে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে হিটলার যাহা বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে তাহাকে সন্ধির প্রস্তাব বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বক্তৃতার ভাষা ও ভাব প্রকৃত শান্তিকামীর ভাষা ও ভাব হইতে পৃথক্। এই বক্তৃতায় হিটলার বলিতে চাহিয়াছেন, যুদ্ধের দশ মাসের ফলাফলে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,—জার্ম্মাণী অজেয়, বৃটেনের রাজনীতিজ্ঞগণ সেই জার্ম্মাণীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া বৃটিশ জাতির সর্ব্বনাশ কামনা করিতেছেন; তাঁহাদিগের যদি এখনও চৈতন্যোদয় না হয়, তাহা হইলে অতঃপর যে বিরাট ধ্বংস সাধিত হইবে, তাহার জন্য জার্ম্মাণীর কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকিবে না। হিটলার এই বক্তৃতায় সন্ধির কোন সর্ত্ত উপস্থাপিত করেন নাই। তবে, তিনি এইরূপ আভাষ দিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন অনিষ্ট তিনি করিবেন না—য়ুরোপে তিনি যে প্রভুত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। ভার্শাই সন্ধির কথা এই বক্তৃতায় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছিল; ইহা হইতে বোধগম্য হয় যে, ঐ সন্ধির ফলে জার্ম্মাণী যে উপনিবেশে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার দাবী সে এখনও ত্যাগ করে নাই। য়ুরোপে লব্ধ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, হৃত উপনিবেশ পুনরায় লাভ হইবে—সন্ধি স্থাপন সম্পর্কে হিটলার জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে প্রকারান্তরে এই দাবীই উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

সাধারণ বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদনের অজুহাতে হিটলারের এই প্রচ্ছন্ন ভীতি-প্রদর্শনে বৃটিশ জাতি শঙ্কিত হয় নাই; সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে পরোক্ষ প্রলোভনেও তাহারা প্রলুব্ধ হয় নাই। সমগ্র য়ুরোপে জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ভূমধ্য সাগরে ইটালীর প্রতিপত্তি স্থায়ী হইবে, আর বৃটেন তাহার "কালা-আদমী"-অধ্যুষিত সাম্রাজ্য লইয়া য়ুরোপীয় রাজনৈতিক আসরে অপাংক্তেয় শ্রেণীর ন্যায় অবস্থান করিবে—এই প্রস্তাবে বৃটিশ সরকার প্রলুব্ধ হন নাই। "ঝুনো" সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন জানে, অন্যের অনুগ্রহে সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায় না; বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিতে হইলে বিশ্বের রাজনৈতিক দরবারে মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন, সাম্রাজ্যের সহিত অবাধ সংযোগরক্ষার জন্য

সমুদ্রপথে অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকাও একান্ত আবশ্যক; য়ুরোপীয় রাজনীতিক আসরে যে "পারিয়া," সে বিশ্বের কোথাও "ব্রাহ্মণের" মর্য্যাদা পাইবে না, ইটালী ও জার্ম্মাণীর অনুগ্রহে সাম্রাজ্যের সহিত সংযোগ-রক্ষায় বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, হিটলারের তথাকথিত শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে; পরোক্ষ প্রলোভনও উপেক্ষিত হইয়াছে।

ইটালীর তৎপরতা—

আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে আফ্রিকায় ইটালীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি ইটালী তিন দিক হইতে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়া বন্দর জিলা, হারগিসা ও ওডেইনা অধিকার করিয়াছে। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড তিন দিক হইতে ইটালী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। ইটালীর অধিকৃত এরিত্রিয়া হইতে জিলা অভিমুখে অগ্রসর হইতে ইটালীয় সৈন্যের কোন অসুবিধা হয় নাই; কারণ, মধ্যবর্ত্তী ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডে তাহারা কোন প্রকার বাধা পায় নাই। ইটালীয় সৈন্য এখন তিন দিক হইতে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী বারবারা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে; পথিমধ্যে বৃটিশ-বাহিনী তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতেছে। ক্ষুদ্র বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের অর্থনীতিক গুরুত্ব তেমন অধিক নহে, রাজ্য হিসাবে ইহা জয় করিয়া বর্ত্তমান যুগের কোন যোদ্ধা গর্ব্ব অনুভব করিবেন না। তবে, এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। উত্তরে যেমন এডেন, তেমনই দক্ষিণে বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড লোহিত সাগরের দ্বাররক্ষী। এই অঞ্চলে যুদ্ধের ফলাফল কি হইবে, তাহা এখন বলা যায় না। ইটালী যদি এই অঞ্চলে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়, তাহা হইলে এডেন্ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা এবং তাহার পর ইহার ফলাফল কত দূর গড়াইবে, তাহা হয় ত এখন কল্পনা করিতে চেষ্টা করা উচিত নহে।

এই সম্পর্কে আর একটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। আরব নৃপতিদিগের সহিত মুসোলিনীর বর্ত্তমান সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা জানা যায় না। তবে, পূর্ব্বে মুসোলিনী আরব নৃপতিদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেনের ইমামের সহিত ইটালী বাণিজ্য-চুক্তি করে; ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এই চুক্তি পুনরায় নূতন করিয়া স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইটালী হেজাজের সহিতও বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। আরব রাজ্যগুলির সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া মুসোলিনী কত দূর কূটনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় প্রকাশ পাইয়াছিল। সুদীর্ঘ আট মাসব্যাপী এই যুদ্ধে কোন আরব নৃপতি আবিসিনিয়াকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় নাই; রাজ্যচ্যুত হাইলে সেলাসী কোন আরবরাজ্যে আশ্রয় পান নাই।

আরব রাজ্যের সান্নিধ্যে ইটালীর অবস্থিতিতে এই সকল পুরাতন কথা আজ স্মরণ হইতেছে। এই সঙ্গে মনে পড়িতেছে, প্যালেষ্টাইনে আরব-বিদ্রোহের সহিত ইটালীর সংযোগের কথা শ্রুত হইয়াছিল; ইটালী বহু কাল বহু ভাবে আরব জাতির মধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল। আরব রাজ্যগুলির সহিত ইটালীর প্রকাশ্য ও গোপন সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতে মধ্য-প্রাচীতে কোন নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষের বিচার করে না। বামে—বোমা বর্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন-দেহ একটি বালিকা ধরাশায়িনী। দক্ষিণে—বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটি বৃদ্ধ আত্মগোপন করিতেছে

আবিসিনিয়ার ইটালীয়-বাহিনী সম্প্রতি বৃটিশ সুদানের সীমান্তেও তৎপরতা প্রদর্শন করিতেছে; কেনিয়ার মরেল্ অঞ্চলে কিছু-দিন পূর্ব্বে তাহাদিগের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফ্রান্সের আত্ম-সমর্পণের পর উত্তর-আফ্রিকায় ইটালীর বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। লিবিয়ায় ইটালীর আড়াই লক্ষ সৈন্য আছে। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর টিউনিসের দিকে ইটালীয়-বাহিনীর আর মনোযোগ প্রদানের প্রয়োজন নাই; তাহারা তখন অনন্যমন হইয়া মিশর ও সুদান আক্রমণ করিতে পারিবে। লিবিয়ার সীমান্তে বিপুল ইটালীয়-বাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সত্বর তাহারা প্রবল আক্রমণে প্রবৃত্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

বৃটেনের প্রতি জার্ম্মাণীর আক্রমণের প্রাবল্য এবং ইটালীর এই

তৎপরতা সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত নহে। একই সময় হিটলার ও মুসোলিনী বৃটেনকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ফ্রান্সে সামরিক এক-নায়কত্ব—

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ফ্রান্সে মার্শাল পিতেঁর নেতৃত্বে সামরিক এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্শাল পিতেঁ প্রধান মন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্টের সম্মিলিত ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছায় মন্ত্রিগণ নিযুক্ত অথবা পদচ্যুত হইবেন; তিনি সন্ধির আলোচনা পরিচালিত করিতে ও তাহা অনুমোদন করিতে পারিবেন; রাজ্যে অবরোধের অবস্থা ঘোষণা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার থাকিবে। অবশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইলে তাঁহাকে আইন সভার সম্মতি লইতে হইবে।

মার্শাল পিতেঁ ফরাসী রাষ্ট্রের নায়ক (Chief of the French State) নামে অভিহিত হইয়াছেন। এক দিন হিটলার ঠিক এই ভাবে প্রেসিডেণ্ট ও চেন্‌সেলারের সম্মিলিত ক্ষমতা লাভ করিয়া "ফুরার" অর্থাৎ একনায়ক হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীতে

বন্ধুরপথে জার্ম্মাণ পদাতিক সৈন্য অগ্রসর হইতেছে

"ওয়েমার" শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া চেন্‌সেলার ও তাঁহার মন্ত্রিসভাকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাহার পর চেন্‌সেলার হিটলারকে "ফুরার" পদ লাভের জন্য ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবর্গের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ভাগ্যবান মার্শাল পিতেঁকে প্রেসিডেণ্ট লেব্রাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় নাই—তিনি এক সঙ্গেই সকল ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

মার্শাল পিতেঁর এক-নায়কত্বকে "ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের" সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভার্দ্দুন বিজয়ী মার্শাল পিতেঁ সমর-বিশেষজ্ঞ, তিনি রণক্ষেত্রে ও সৈন্য-শিবিরেই তাঁহার খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজনীতিজ্ঞ নহেন, রাজনীতির চর্চ্চা জীবনে কখনও করেন নাই। পক্ষান্তরে হিটলার, তাঁহার রাজনীতিক মতবাদ যাহাই হউক না কেন, নিজের চেষ্টায় একটি রাজনীতিক দল গঠন করিয়াছেন এবং ছলে বলে কৌশলে স্বীয় দলের রাজনীতিক প্রভুত্ব জার্ম্মাণীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি সেই রাষ্ট্রের একনায়ক হইয়াছেন। হিটলারের নাজীদলের রাজনীতিক আদর্শ আছে; তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে ও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে কিছু বলিতে চাহে, কিছু করিতে চাহে। মার্শাল পিতেঁ ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা অন্ধ অনুকরণকারী মাত্র।

পিতেঁ সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সংবাদাদি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতোমধ্যে ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী দালাদিয়ার, রেণো, ব্লুম প্রভৃতি ফ্রান্সের বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া শুনা গিয়াছে। জেনারল ডি গলের অনুপস্থিতিতেই তাঁহার বিচার হইয়াছে এবং তিনি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পাইয়াছেন।

বল্‌কানে চাঞ্চল্য—

রুশিয়া ও রুমানিয়ার বিরোধের মীমাংসা হইলেও বলকানের চাঞ্চল্য এখনও হ্রাস পায় নাই। বেসারেবিয়া ব্যতীত রুমানিয়া আরও দুইটি রাজ্যের অংশ কুক্ষিগত করিয়া স্ফীতোদর হইয়াছিল। গত মহাসমরে মিত্রপক্ষে যোগদানের উৎকোচস্বরূপ সে হাঙ্গেরির ট্রান্‌সীলভেনিয়া প্রাপ্ত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে রুমানিয়ার দোবরুজা অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। তাহার পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই অধিকৃত অঞ্চলের আয়তন আরও বর্দ্ধিত হয়। রুশিয়ার বেসারেবিয়া পুনরধিকারে হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়া অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে; হাঙ্গেরি ট্রান্‌সীলভেনিয়া ফিরাইয়া পাইতে চাহে, বুলগেরিয়া তাহার দোবরুজা—অন্ততঃ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সে ঐ অঞ্চলের যে অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহা ফিরাইয়া পাইবার জন্য দাবী করিতেছে।

বলকান অঞ্চলের এই সমস্যার আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট তিনটি রাষ্ট্রের মন্ত্রিগণ সম্প্রতি জার্ম্মাণীর স্যাল্‌জবার্গ সহরে এবং রোমে আহূত হইয়াছিলেন। ঐ দুইটি তীর্থে তাঁহারা কিরূপ নির্দ্দেশ

পাইয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তবে, রুমানিয়া সরকার অধিবাসী-স্থানান্তরের ভিত্তিতে হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়ার সহিত মীমাংসা করিতে চাহিতেছেন—কিন্তু ভূখণ্ড প্রত্যর্পণ করিতে তাঁহারা নারাজ। ট্রান্‌সীলভেনিয়া যাহাতে হাঙ্গেরিকে প্রদান করা না হয়, তদুদ্দেশ্যে রুমানিয়ায় কৃষক দলের নেতা মঃ মনিউর নেতৃত্বে বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

বল্‌কান সমস্যার সমাধান কিরূপে হইবে, তাহা অনুমান করা দুষ্কর। তবে, জার্ম্মাণী ও ইটালী এই অঞ্চলে কোনরূপ অশান্তির সৃষ্টি হইতে দিবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রুমানিয়া হইতে তৈল এবং দানীয়ুবের তীরের গোধূমপ্রাপ্তিতে যাহাতে

রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ গিগুর্ত্তু

কোন বিঘ্ন না হয়, ইহার প্রতি হিটলার বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। বল্‌কান অঞ্চলে অশান্তির সৃষ্টি হইলে এই দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ গিগুর্ত্তু সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করিবার নির্দ্দেশই তিনি স্যালজবার্গে পাইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, হাঙ্গেরির সহিত প্রতিবেশী স্থানান্তরের ভিত্তিতে মীমাংসা হওয়াই সম্ভব। এই পদ্ধতিতে হিটলার একাধিক ক্ষেত্রে সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন—দক্ষিণ টাইরল সম্পর্কে ইটালীর সহিত এবং বাল্টিক অঞ্চল সম্পর্কে রুশিয়ার সহিত এইভাবেই মীমাংসা হইয়াছিল। রুমানিয়া সরকার বুলগেরিয়াকে দোবরুজার দক্ষিণ অংশ প্রদানে বাধ্য হইতে পারেন। হাঙ্গেরি যেরূপ নাজী-ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের প্রভাবাধীন, বুলগেরিয়া সেরূপ নহে। কাজেই তাহার দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব না-ও হইতে পারে।

সম্প্রতি রুমানিয়ার সহিত বৃটেনের বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মাণীর নিকট আশ্রয়প্রার্থী হইবার পর রুমানিয়া বস্তুতঃ নব-লব্ধ অভিভাবকের নির্দ্দেশেই কার্য্য করিতেছে। সম্প্রতি রুমানিয়া সরকার বৃটিশ ও ওলন্দাজ-পরিচালিত "অষ্ট্রো-রোম্যান" নামক বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন; ইহার পর তাঁহারা দানীয়ুব নদীতে কতকগুলি বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজ আটক করিয়াছেন। অবশ্য বৃটেনও পোর্ট সৈয়দে রুমানিয়ার কতকগুলি বাণিজ্য-জাহাজ আটক করিয়াছে। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, রুমানিয়া পরিপূর্ণভাবে জার্ম্মাণীর প্রভাবাধীন হওয়ায় বৃটেনের সহিত তাহার স্বাভাবিক বাণিজ্য-সম্বন্ধও ছিন্ন হইল।

রুশিয়ার লাভ—

গত জুন মাসে সোভিয়েট রুশিয়া বাল্টিক তীরবর্ত্তী লিথুনিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্থোনিয়াকে তাহাদিগের চুক্তির সর্ত্ত পালনে বাধ্য করিয়াছিল; ঐ সময় ঐ তিনটি রাষ্ট্রে চরমপন্থীদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জুলাই মাসে ঐ তিনটি রাষ্ট্র সোভিয়েট-প্রথা প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত করে এবং সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে। তদনুসারে আগষ্ট মাসে সোভিয়েট পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে লিথুনিয়া, ল্যাটভিয়া ও এস্থোনিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার পর জার-শাসিত রুশ সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত যত দূর বিস্তৃত ছিল, সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্তও তত দূর বিস্তৃত হইল। উত্তরে ফিনল্যাণ্ড এখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান ভাগ্যনিয়ন্তাদিগের প্রতি সোভিয়েট রুশিয়া সন্তুষ্ট নহে। কাজেই এই রাষ্ট্রটি অধিক কাল আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ উত্তর-য়ুরোপে সম্প্রতি জার্ম্মাণীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; সুতরাং ঐ অঞ্চল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষে সম্ভব নহে।

সোভিয়েট রুশিয়ার গত কয়েক মাসের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সমগ্র পশ্চিম সীমান্তে সে বিরাট "রক্ষা-প্রাচীর" রচনায় তৎপর হইয়াছে। যদিও মঃ মলোটভ সম্প্রতি সোভিয়েট পার্লামেণ্টে বক্তৃতায় জার্ম্মাণীর সহিত রুশিয়ার অচ্ছেদ্য মৈত্রী-বন্ধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তবু রাজনীতিক্ষেত্রে কাহাকেও বিশ্বাস করা যে মূর্খতা, তাহা সোভিয়েট নেতৃবর্গের অজ্ঞাত নহে। হয় ত য়ুরোপ ও য়ুরোপের বাহিরের ভবিষ্যৎ বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সোভিয়েট রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে পূর্ব্বাহ্নে কোনরূপ মীমাংসা হইয়াছে, কিন্তু যদি কোন কারণে এই ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিতে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তখন জার্ম্মাণী যাহাতে সোভিয়েট রুশিয়ার কোন দৌর্ব্বল্যের সুযোগ পাইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন।

আমেরিকার সিদ্ধান্ত—

জুলাই মাসে হাভানায় সর্ব্ব-আমেরিকা সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। এই সম্মিলনীতে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, য়ুরোপীয় যুদ্ধজনিত বিপদ এবং আভ্যন্তরীণ বিপদের প্রতীকারের জন্য পশ্চিম গোলার্দ্ধের রাষ্ট্রগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সমবেত হইবে। আরও স্থির হইয়াছে যে, য়ুরোপের রাজনীতিক বিপর্য্যয়ের ফলে বিভিন্ন য়ুরোপীয় শক্তির পশ্চিম-গোলার্দ্ধের অধিকৃত অঞ্চলগুলি হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই হস্তান্তর নিবারণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র পশ্চিম-গোলার্দ্ধের কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ বহু দিন হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রভাব বিস্তারের জন্ত প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে চেষ্টা করিতেছিল। এই চেষ্টা যে কিয়ৎ পরিমাণে ফলবতী হয় নাই, তাহাও নহে; কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিষয়ে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান জার্ম্মাণী ও ইটালী যদি বিজয়ীর অধিকারে পশ্চিম-গোলার্দ্ধের ফরাসী ও ওলন্দাজ-অধিকৃত স্থানগুলিতে অধিকার-প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ঐ গোলার্দ্ধের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বিপন্ন হইবে।

হাভানা সম্মিলনীর পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, বিনা অনুমতিতে ভবিষ্যতে খনিজ তৈল এবং ভাঙ্গা লৌহ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে রপ্তানী হইবে না; বিমানে ব্যবহারোপযোগী পেট্রোল পশ্চিম-গোলার্দ্ধের বাহিরে যাইবে না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি কার্য্য হয়, তাহা হইলে উহার ফল সুদূরপ্রসারী হইবে। বহু মার্কিণী ধনিক ব্যবসায়ের সুবিধার জন্ত যে কত হীন কার্য্য করিতে পারেন, তাহার পরিচয় একাধিক বার পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের নীতিজ্ঞান নাই, জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দূরদৃষ্টি নাই—তাঁহারা চাহেন মোটা লাভ; এই লাভের আশায় তাঁহারা করিতে পারেন না এরূপ কাজ অল্পই আছে। জাপানের চীন আক্রমণে সমগ্র মার্কিণ জাতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছে; অথচ মার্কিণী ধনিকের প্রেরিত পেট্রোলে চালিত বিমানই বোমার আঘাতে চীনের নিরীহ জনসাধারণকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রুশিয়ার ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়াছে; অথচ ঐ যুদ্ধের সময় ফিন্‌ল্যাণ্ড দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল—Finland gets sympathy and Soviet Russia gets ammunitions—অর্থাৎ ফিন্‌ল্যাণ্ডকে শুষ্ক সহানুভূতি এবং রুশিয়াকে সমর-সরঞ্জাম প্রদান করা হইতেছিল। সম্প্রতি 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, য়ুরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর সোভিয়েট রুশিয়া হইতে জার্ম্মাণী যে পরিমাণ তৈল পাইয়াছে বা পাইবার আশা রাখে, তাহা অপেক্ষা অধিক তৈল আমেরিকা হইতে জার্ম্মাণীতে গিয়াছে। ইহা ব্যতীত, গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর আমেরিকা হইতে স্পেনে অধিক পরিমাণ তৈল ও তৈলজাত পণ্য রপ্তানী হইয়াছে; উহার অধিকাংশ জার্ম্মাণী ও ইটালীতে পুনরায় রপ্তানী হওয়াই সম্ভব। তৈল রপ্তানী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই লক্ষ ব্যারেল তৈলপূর্ণ দুইখানি স্পেনগামী মার্কিণী জাহাজ আটক করা হইয়াছিল। এত তৈল যে নিরপেক্ষ স্পেনের প্রয়োজন হইতে পারে না, ইহা জানিয়াও মার্কিণী ধনিক উহা স্পেনে প্রেরণে ইতস্ততঃ করে নাই। সম্প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মার্কিণী ধনিক যদি আইনের চক্ষে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উহা বিফল করিতে না পারে, তাহা হইলে ইটালী ও জার্ম্মাণী কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইবে জাপান।

ব্রহ্মের পথ অবরুদ্ধ—

ব্রহ্মদেশের পথে চীনে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করিবার জন্ত জাপান বৃটেনের নিকট যে দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করা চার্চ্চিল-মন্ত্রিসভার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৭ই জুলাই হইতে তিন মাসের জন্ত ব্রহ্মদেশের পথ অবরুদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমা[ন] আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায়—বিশেষতঃ বৃটেনের এই দুর্দ্দিনে জাপানে[কে] অসন্তুষ্ট করিতে চার্চ্চিল-মন্ত্রিসভা সাহসী হন নাই। মিষ্টার চার্চ্চি[ল] এই সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ এই—"বৃটিশ সরকারে[কে] বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে; বৃটে[ন] যে বর্ত্তমানে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত, তাহাও তাঁহারা বিস্মৃ[ত] হইতে পারেন নাই।"

দক্ষিণ-চীনের পথগুলি অবরুদ্ধ হওয়ায় চীন ক্রমে সোভিয়ে[ট] রুশিয়ার প্রতি নির্ভরশীল হইতেছে। ইন্দো-চীনের পথ পূর্ব্বেই ব[ন্ধ] হইয়াছে; হংকংএর পথ বহু দিন হইতেই অবরুদ্ধ। কাজে[ই] চীনের পক্ষে তাহার উত্তরাঞ্চলের প্রতিবেশীর শরণাপন্ন হও[য়া] ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক্ সোভিয়ে[ট] রুশিয়ার প্রভাবাধীন হইতে চাহেন নাই; এত দিন চীনে সোভিয়ে[ট] প্রভাব সম্পর্কে জাপান যে অভিযোগ করিয়াছে, তাহা মিথ্যা কিন্তু এইবার জাপানের উক্তি সত্যে পরিণত হইতেছে—চী[নে] সোভিয়েট-প্রভাব বৃদ্ধি সত্যই পাইতেছে। সোভিয়েট রুশিয়া য়ুরোপ[ীয়] যুদ্ধে নিরপেক্ষ; তাহাকে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করিয়া চীনের স[হিত] তাহার ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। ব্লা[ডি]ভোষ্টকের পথে মার্কিণী পণ্যও হয় ত চীনে প্রবেশ করিবে। অঞ্চলে জাপানের মৎস্তশিকার সম্পর্কিত যে "চাবিকাঠি" সোভিয়ে[ট] সরকারের নিকট আছে, তাহা স্মরণ করিয়া জাপান অধিক অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না।

বৃটেন্ ব্রহ্মদেশের পথ অবরুদ্ধ করায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট নাই। পেট্রোল ও ভাঙ্গা লোহা রপ্তানী সম্পর্কে মার্কিণ যু[ক্ত]রাষ্ট্রে যে লাইসেন্সের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে জাপানের বি[শেষ] অসুবিধা হইবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সময় জাপানকে বি[পন্ন] করিবার ইচ্ছা মার্কিণী সরকারের থাকা সম্ভব। জাপ[ানে] লৌহ এবং খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় না বলিলেই চ[লে]; এই দুইটি বস্তু এবং তুলা ও রবারের জন্ত তাহাকে সম্পূর্ণ[রূপে] অন্ত দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। মার্কিণ যুক্ত[রাষ্ট্র] হইতে বিমানে ব্যবহারোপযোগী পেট্রোল রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়া[ছে]; ইহা জাপানের পক্ষে আশঙ্কার বিষয়। প্রধানতঃ মার্কিণ যুক্ত[রাষ্ট্র] ও পূর্ব্ব-ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতেই জাপানের প্রয়োজ[নীয়] খনিজ তৈল রপ্তানী হইয়া থাকে। এই জন্ত মার্কিণ যুক্তরা[ষ্ট্রের] সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার পর জাপানের পক্ষ হইতে পূর্ব্ব-ভার[তীয়] দ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতে[ছে]; এদিকে ঐ সকল দ্বীপ হইতে আমেরিকায় প্রচুর রবার র[প্তানী] হইয়া থাকে; কাজেই এই অঞ্চলে জাপান ও মার্কিণ যুক্তরা[ষ্ট্রের] অর্থনৈতিক স্বার্থ-সঙ্ঘাতের ফলে ঐ দুই দেশের রাজনীতিক সঙ্ঘ[র্ষ] হয় ত আসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

জাপানের নূতন মন্ত্রিসভা—

জুলাই মাসের মধ্যভাগে জাপানের ইয়োনাই-মন্ত্রিসভা পদ[ত্যাগ] করেন। সামরিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতার অভাবই তাঁহাদি[গের] পদত্যাগের কারণ। প্রিন্স কনোয়ীর নেতৃত্বে জাপানে [ন]ূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

গত বৎসর আগষ্ট মাসে হিরানুমা-মন্ত্রিসভার পতনের

জাপান যে নীতি ত্যাগ করিয়াছিল, সেই নীতি পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যেই জাপানের মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হইয়াছে। গত বৎসর রুশো-জার্ম্মাণ অনাক্রমণাত্মক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর হিরানুমা-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন। ঐ সময় যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তাঁহারা চীন যুদ্ধের অবসান এবং বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সদ্ভাব স্থাপনের নীতি গ্রহণ করেন। জার্ম্মাণী কর্তৃক হল্যাণ্ড ও বেল্‌জিয়াম্‌ আক্রান্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নীতি অল্পাধিক সাফল্যের সহিত অনুসৃত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ওয়াঙ্গ-চেঙ্গ-উ'র নেতৃত্বে নান্‌কিংএ নূতন সরকার স্থাপিত হইয়াছে; মাঞ্চুকো-সীমান্ত সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত জাপানের চুক্তি হইয়াছে; তিয়ানসীন সংক্রান্ত বিরোধের অবসান হইয়াছে; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও এত দিন কোন

ওয়াঙ্গ-চেঙ্গ-উই

বিরোধ ছিল না। কিন্তু পশ্চিম-য়ুরোপে জার্ম্মাণীর প্রভাব বিস্তৃতির পর জাপানের সামরিক নেতৃবৃন্দ অধীর হইয়া উঠেন; জাপানের সংবাদপত্রগুলি অভিসন্ধি সিদ্ধির "সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। সামরিক নেতৃবৃন্দের চক্রান্তে "সুবর্ণ সুযোগ" লাভের চেষ্টায় এই নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। সামরিক নেতৃবৃন্দ জানেন যে, বৃটেন্‌, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধিতাই সুদূর প্রাচীতে তথাকথিত নব-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রধান অন্তরায়। কাজেই ঐ তিনটি রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধ বর্জন করিয়া ইটালী ও জার্ম্মাণীর অনুরক্ত হইবার নীতি বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই মন্ত্রিসভা ঘোষণা করিয়াছেন, যে সকল রাষ্ট্র জাপানের সহিত সহযোগিতা করিবে না, তাহাদিগের সহিত তাঁহারা সম্বন্ধ বর্জ্জন করিবেন; য়ুরোপীয় যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিবার নীতিই সাময়িক ভাবে অনুসৃত হইবে; বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া গঠনের জন্ত চেষ্টা হইবে। জার্ম্মাণী ও ইটালীর প্রতি বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার আনুরক্তির কথা স্মরণ করিলে য়ুরোপীয় যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিবার নীতির "সাময়িক অনুসরণ" সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইবে। ইটালীও প্রথমে য়ুরোপীয় যুদ্ধ হইতে সাময়িক ভাবে দূরে ছিল। জাপানের নূতন পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকী ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাপান, মাঞ্চুকো ও চীনকে ভিত্তি করিয়া বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া গঠনের কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং ইন্দো-চীন, পূর্ব্ব-ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ সাগরের দ্বীপগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়ার নামে সুদূর প্রাচী হইতে অন্যান্য শক্তিকে বিতাড়িত করিয়া ঐ অঞ্চলে স্বীয় প্রভাব বিস্তারের জন্ম জাপানের এই উত্তম ক্রমে প্রশান্ত মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য অঞ্চলেও প্রয়োগের চেষ্টা হইবে কি না, তাহা বলা যায় না।

ইন্দো চীন—

জাপান সম্প্রতি ইন্দো-চীন লক্ষ্য করিয়া সৈন্ত সমাবেশ করিতেছে। হাইনানে বহু সংখ্যক জাপানী সৈন্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; বহু সৈন্যপূর্ণ জাপানী জাহাজ না কি হাইনানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইন্দো চীনের মধ্য দিয়া চীন আক্রমণই জাপানের উদ্দেশ্য। চীন এই আসন্ন বিপদের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে; ইন্দো-চীনের সীমান্তে বহু চীনা-সৈন্তও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শুন যাইতেছে, ইন্দো-চীন বিনা প্রতিরোধে জাপানী সৈন্তকে ঐ অঞ্চলে অবতরণ করিতে দিবে না; পির্তে সরকার না কি জাপানকে প্রতিরোধ করিবার জন্ত ইন্দো-চীনের কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইন্দো চীনের ফরাসী কর্তৃপক্ষ বাস্তবক্ষেত্রে কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহা বলা দুষ্কর। জার্ম্মাণীর চাপে জাপানের দাবীতে ফরাসী কর্তৃপক্ষের সম্মত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু উহার ফল ভয়াবহ হইবে; কারণ, জাপানী সৈন্ত ইন্দো-চীনে অবতরণ করিবামাত্র চীন ঐ অঞ্চল আক্রমণ করিবে। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ ফলাফল যাহাই হউক, আপাততঃ যুদ্ধের ফলে ঐ অঞ্চল যে শ্মশানে পরিণত হইবে, ইহা নিশ্চিত।

সম্প্রতি বৃটেন্‌ চীন হইতে তাহাদিগের সৈন্ত সরাইয়া লইয়াছে। এই সকল সৈন্ত কোথায় গিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু মনে হয়, পশ্চিম অভিমুখে জাপানের এই ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতিতে চিন্তিত হইয়াই বৃটেন্‌ ঐ সকল সৈন্ত সরাইয়া আনিয়াছে। চীনে এই সামান্ত সৈন্ত প্রকৃত বিপদে কোন কাজে লাগিত না। তাহাদিগের দ্বারা যদি ব্রহ্ম-সীমান্ত ও সিঙ্গাপুর রক্ষার ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা চার্চ্চিল মন্ত্রিসভার কূটনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক বলিতে হইবে।

শ্রীঅতুল দত্ত।

পণ-প্রথা নিবারক আইন

গত ১০ই শ্রাবণ শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে কোয়ালিশন দলের মিষ্টার আফতাব হোসেন জোয়াদ্দার বঙ্গীয় বিবাহে পণ-গ্রহণ নিবারক আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়া উহা সিলেক্ট কমিটির হস্তে দিতে চাহেন। এই বিলের প্রধান কথা এই যে, যাঁহারা বিবাহে পণ দিবেন এবং লইবেন, তাঁহারা এই আইন মতে অপরাধী সাব্যস্ত হইবেন, এবং তাঁহারা ৫ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডেই এক সঙ্গে দণ্ডিত হইবেন। ইহাতে কিন্তু বিবাহের সময় বা পূর্ব্বে বাড়ীর পিছনে বেড়ার ধারে হাতী বিক্রীর ব্যবস্থা বন্ধ হইবে না। পাঠক জানেন কি না জানি না, হাতীবিক্রেতা প্রকাশ্যে হাতীর দর হাঁকে না, ক্রেতার করতলে অঙ্গুলী চালাইয়া মূল্যের পরিমাণ জানায়। এখন এ নিয়ম আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ছিল। যাহা হউক, স্থির হইয়াছে, আপাততঃ জনমত সংগ্রহের জন্য বিলখানি প্রচার করা হইবে। জনমত গৃহীত হইবার পর এই ধরণের তিনখানি অথবা একখানি বিল সিলেক্ট কমিটীর হস্তে ন্যস্ত করা হইবে।

——

এক টাকার নোটের পুনঃপ্রচার

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এদেশে রূপার টাকা ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, পল্লী অঞ্চলে পাঁচ টাকার নোটের বিনিময়েও রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করা কঠিন হইয়াছে! যুদ্ধারম্ভের পর দশ মাসের মধ্যে জনসাধারণ ৪৩ কোটি টাকার নোটের বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করিয়াছে—এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই কারণেই বাজারে টাকার অভাব হওয়ায় জনসাধারণের এত কষ্ট ও অসুবিধা হইয়াছে। 'ক্যাপিটাল' পত্রিকায় "ডিচার" নাম দিয়া কোন লেখক লিখিয়াছেন, তিনি শুনিয়াছেন, রাশি রাশি রৌপ্যমুদ্রা কলিকাতা প্রভৃতি বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতে সম্ভবতঃ বিকানীর, জয়পুর প্রভৃতি বিভিন্ন সামন্তরাজের রাজ্যে প্রেরিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া প্রভৃতি বিদেশীরাই কারেন্সি আফিস হইতে অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়াছে; সুতরাং রৌপ্যমুদ্রার অসচ্ছলতাবশতঃ সরকার এক টাকার নোট বাজারে বাহির করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে জনসাধারণের অসুবিধাই অধিক হইল। ক্ষুদ্রাকৃতি, ও পাতলা কাগজে ছাপা এই সকল এক টাকার নোট বহু হাত-ঘুরিয়া ময়লা হইয়া শীঘ্রই ছিঁড়িয়া যাইবে, এবং লোকে নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই অত্যন্ত অনিচ্ছায় উহা গ্রহণ করিবে। মেছুনীদের বা তৈল-বিক্রেতার হাতে ঐ সকল নোট যাইবেই; তখন নোটগুলির চেহারা কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অথচ তাহাই সকলে অগত্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। ইহার প্রতিবিধানের একমাত্র উপায় এই যে, কারেন্সি আফিসকে ব্যবহারের অযোগ্য নোটের পরিবর্ত্তে নূতন নোট বা টাকা দিতে হইবে। বিগত যুদ্ধের সময় এই ভাবে রূপার টাকায় টান পড়ায় এক টাকার যে নোট চলিয়াছিল, তাহা লইয়া মুদী, মেছুনী ও তরকারী-বিক্রেতারা সহজে জিনিষ দিতে চাহিত না;—তাহারা বলিত, "এ নোট ছিঁড়িয়া নষ্ট হইবে,—আমরা গরিব লোক কি করিয়া সে ক্ষতি সহিব?" যাহা হউক, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বাজারে হঠাৎ টাকার কমতি পড়ায় সরকার কতক গুলি এক টাকার নোট ছাপিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু তখন আর প্রয়োজন না হওয়ায় সেগুলি সঞ্চিত ছিল। এখন তাহাই প্রচারিত হইল। পরে সরকার নূতন ছাপা নোট বাজারে বাহির করিবেন। নূতন ছাপা নোটে রাজ-মস্তকের জলছাপ থাকিবে না; তাহা জাল হইলে জাল-নিবারণের কি ব্যবস্থা হইবে? উহা মজবুত পার্চমেণ্ট কাগজে ছাপা হওয়াই সঙ্গত; নচে .. নোটের প্রচলনে দেশের অতি-দরিদ্র ব্যক্তিরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া যত শীঘ্র রৌপ্যমুদ্রা পুনঃপ্রচলিত হয়, তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। রৌপ্য না .. সরকার যথেষ্ট পরিমাণেই সঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাহা হইলে .. টাকা তৈয়ারী করা কি অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ? রৌপ্যমুদ্রার অভাবে জনসাধারণের ক্ষোভ হওয়াই স্বাভাবিক; বিশেষতঃ, .. যুদ্ধের সময় কাগজের মুদ্রার অতিপ্রচলনে জনসাধারণ খুসী হইতে পারিবে কি? তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা উচিত।

——

মাশুল বৃদ্ধি?

সরকার কি ডাকমাশুলের হার আরও বাড়াইতেছেন? গত .. শ্রাবণ শিমলা হইতে প্রাপ্ত এই মর্ম্মের একটি সংবাদ দৈনিক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, যুদ্ধের জন্য সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হওয়ায় সরকার চিঠি এবং টেলিগ্রামের মাশুল আরও বৃদ্ধি করিবেন, এবং এই বিষয়ে একটি সরকারী হুকুমনামা (Ordinance) শীঘ্রই জারি করা হইবে। এই সংবাদে এদেশের গৃহস্থগণের স্বস্তি না হওয়াই আশ্চর্য্য! যদি ভারত সরকার সত্য সত্যই এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিবেচনা যে অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতে চিঠির এবং টেলিগ্রামের মাশুল বর্দ্ধিত হইয়া যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাই চরম। তাহার পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত করিলে সাধারণের কষ্ট ও অসুবিধার সীমা থাকিবে না। বৃটেন ও মার্কিণের ন্যায় ধনাঢ্য দেশেও ডাকমাশুলের হার এত অধিক নহে। জাপানে এবং চীনে ডাকমাশুলের হার অপেক্ষাকৃত অল্প। ব্রহ্মদেশে ত সংবাদ-পত্রের সর্ব্বনিম্ন মাশুল এক পাই হিসাবে ধার্য্য করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। কেবল আমাদের দেশেই চিঠির মাশুলের হার অতিরিক্ত রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক ভি, পি, পার্শেল রেজিষ্ট্রী করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার উপর এক মাশুলের হার বর্দ্ধিত করায় এক মুরগী দুইবার জবাই করিবার কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, ডাকযোগে পুস্তকাদি প্রে

বা জনসাধারণের অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার ফলে লোক-শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। সুতরাং এই মাশুলের ভার হ্রাস করাই উচিত; তাহা না করিয়া পুনর্ব্বার চিঠির ও টেলিগ্রামের মাশুলবৃদ্ধি হইলে জনসাধারণের সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিবে, চিঠিপত্র টেলিগ্রামের সংখ্যা হ্রাস হইবে, সুতরাং লাভের পরিমাণ-বৃদ্ধির আশাও সুদূরপরাহত হইবে। আমরাই কেবল যুদ্ধে লিপ্ত নহি; বৃটেনও যুদ্ধে লিপ্ত, কিন্তু সেই আসল মোকামে নানাভাবে শুল্ক বর্দ্ধিত হইলেও চিঠিপত্র এবং টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছে কি?

—

রেলওয়ে দুর্ঘটনা

মাঝদিয়ার রেলওয়ে-দুর্ঘটনার কথা লোক বিস্মৃত হইবার পূর্ব্বেই আবার ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথে আর এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এবারও সেই ঢাকা মেলই চূর্ণ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই চিরদিনই অত্যন্ত অধিক থাকে। সে হিসাবে যত লোক মরিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা অনেক অল্প। গত বৎসর মাঝদিয়ায় যে রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে মোট ৩৮ জন নিহত হইয়াছিল। এবার ৪০ জনের মৃত্যুর পর এখন আরও মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে কি না, কে বলিতে পারে? হাসপাতালেও কয়েক জন আহতের অবস্থা উদ্বেগজনক। শুনা যাইতেছে, ঐ স্থানে নাকি একখানা রেলওয়ের পাটি অপসারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটিবার অল্পকাল পূর্ব্বেই নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেণখানি ঠিক ঐ পাটির উপর দিয়াই চলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং নিঃসন্দেহেই তখন পাটির কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা মেল চূর্ণ করিবার দুরভিসন্ধিতে দুষ্কৃতেরা এই কার্য্য করিয়াছিল, এরূপ অভিযোগ করা কত দূর সঙ্গত, তাহা অবশ্যই বিবেচ্য। তবে এই জবাবদিহি দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি-লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বটে।

খাঁ বাহাদুর আব্দুলাদ হোসেন সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিকে
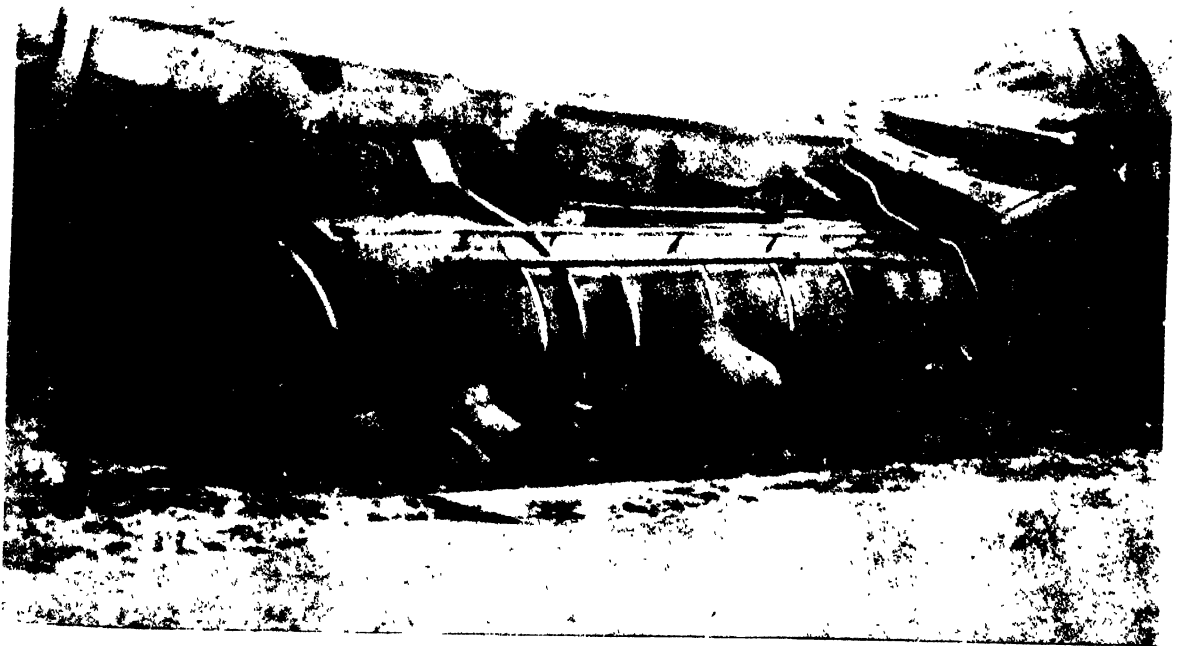
মেল-দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত এঞ্জিন [আলোক-চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুদিন রায়।

এই উভয় দুর্ঘটনার স্থানই পরস্পরের অদূরবর্ত্তী। গতবার ... সঙ্ঘটন হইয়াছিল মাঝদিয়ায়, এবার রেল-দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ...ঙ্গা ও জয়রামপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, কলিকাতা হইতে প্রায় ...ইল দূরে। কি করিয়া এ দুর্ঘটনা ঘটিল, তাহা এখনও রহস্য-আবৃত। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে-... এই দুর্ঘটনার ফলে ৪০ জন আরোহী ও রেলের কর্ম্মচারী ..., এবং প্রায় ৯০ জন আহত হইয়াছে। ঢাকা-মেলে যাত্রীসংখ্যা বলিয়াছেন,—ট্রেণখানি চুয়াডাঙ্গা ছাড়িয়া অতি প্রচণ্ড বেগে ছুটিতেছিল বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, ইহার উপর অত্যন্ত ঝাঁকুনি লাগিয়াছিল।—এডভোকেট চিন্তাহরণ রায় বলেন, রাত্রি দুইটার সময় হইতে ট্রেণখানির গতি কেমন যেন অসাধারণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, ট্রেণখানি অতিশয় দ্রুত বেগে ছুটিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে লাফাইয়া উঠিতেছিল। 'দৈনিক বসুমতী'তে ঐ ট্রেণের আরোহী শ্রীযুত অনাদিনাথ

পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর গাড়ী অত্যন্ত ঝাঁকুনি দিতেছিল এবং মনে হইল, উহা খুব দ্রুত চলিতেছে। আরও কিছু দূর যাইয়া বাঁক ঘুরিয়া পুলে উঠিবার সময় আমার মনে হইল, এঞ্জিন ট্রেণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভীষণ
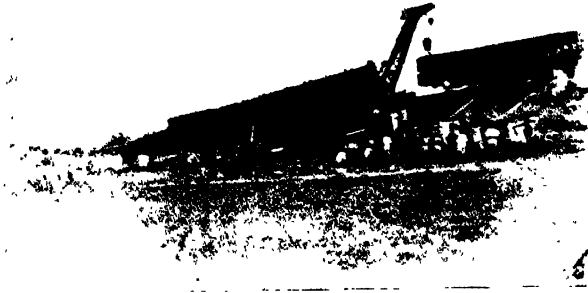
মেল-দুর্ঘটনার একটি দৃশ্য
[আলোক-চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুদিন রায়।

শব্দে নীচে চলিয়া যাইতেছে, এবং আমাদের কামরা ঘুরিয়া নীচে পড়িতেছে।"

অনেক আরোহীর উক্তিতেই প্রকাশ, রাত্রি দুইটা আড়াইটার পর হইতে ট্রেণখানির গতি কেমন অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইয়াছিল; সুতরাং পাটি অপসারিত করিবার কৈফিয়তের সহিত এই সকল উক্তির সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধানের

এঞ্জিনসহ চূর্ণবিচূর্ণ কামরা
[আলোক চিত্র-শিল্পী—শ্রীসুদিন রায়।

ফলে প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হইবে, জনসাধারণ এইরূপই আশা করিতেছে। ট্রেণখানি ঠিক সময়েই আসিতেছিল বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে; সুতরাং ইহার গতিবেগ বর্দ্ধিত করিবারও কারণ ছিল না। এই দুর্ঘটনায় যত লোক হতাহত হইয়াছে, ইদানীং কোনও রেল-দুর্ঘটনায় তত অধিক সংখ্যক লোক হতাহত হয় নাই। গত বৎসর হাজারীবাগের নিকট যে রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে ৪০ জন আহত হইলেও এক জনও নিহত হয় নাই দিল্লী-দেরাদুন এক্সপ্রেস ট্রেণে ৮ জন নিহত এবং ২২ জন আহত হইয়াছিল বলিয়াই জানিতে পারা গিয়াছিল। দেশের লোক এই শোচনীয় দুর্ঘটনার কারণ জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে। এই দুর্ঘটনার ফলে যাঁহারা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আত্মীয়-স্বজনকে এবং আহত ব্যক্তিগণকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি কিন্তু তাঁহাদের এই নিদারুণ ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা কোথায়?

সৈন্য-সরবরাহে বাঙ্গালা ও মাদ্রাজ

মাদ্রাজের গভর্ণর সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম আমলে মাদ্রাজী সিপাহিরাই (লাল কুর্ত্তি তেলেঙ্গা?) বৃটিশ সেনানায়কদিগের অধীনে চালিত হইয়া অনেক বীরত্বসূচক কার্য্য সাধন করিয়াছিল; এবং ইহাদের সাহায্যে বৃটিশ সৈন্যমণ্ডলী কতকগুলি প্রদেশও জয় করিয়াছিল। তাঁহার এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্য। সম্প্রতি বৃটিশ সরকার ভারতের কতকগুলি জাতিকে সামরিক, আর কতকগুলি জাতিকে অসামরিক আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এরূপ করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা হইতে সরকার সৈন্য সংগ্রহ করেন না; কিন্তু বিগত যুদ্ধে এই বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্য হইতেই অনেক সৈনিক যথেষ্ট রণ-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা বিজয়ের পর মেদিনীপুরের সান্নিধ্যে ভাস্কর পণ্ডিতের বহু গুণ অধিক বর্গী সৈন্যের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া কিরূপ সাহসের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ঐ সকল সৈনিকের অধিকাংশ বাঙ্গালী বাগদী, গোয়ালা, উগ্রক্ষত্রী প্রভৃতি জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন সমর বিভাগে সরকারের বাঙ্গালী গ্রহণে বিমুখতা সম্পূর্ণ অহেতুক। তবে রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বলিতে পারিব না।

হায়দারাবাদে হিন্দু সমিতি

বর্ত্তমান শ্রাবণের ১০ই তারিখে হায়দারাবাদ রাজ্যে সামন্ত রাজন্য-শাসিত ভারতের হিন্দুদিগের সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। ডাক্তার বি, এস, মুঞ্জে এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। হায়দারাবাদের অধিপতি তাঁহার রাজ্যে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনে সচেষ্ট হওয়ায় ডাক্তার মুঞ্জে সভাপতির অভিভাষণে তাঁহাকে ধন্যবাদ সহকারে এই অনুরোধ করিয়াছেন, ঐ শাসন-সংস্কার যেন প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম সোপানে পরিণত হইতে পারে। হায়দারাবাদ রাজ্যকে মুসলমান রাজ্য বলা হয়; সেজন্য সভাপতি বলেন, ইহার দুই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। এই রাজ্যটি মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে মুসলমান রাজ্য বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বৃটিশ-ভারতকে খৃষ্টান-ভারত বলা যেরূপ হাস্যোদ্দীপক, ইহাকে মুস্লিমরাজ্য বলাও সেইরূপ হাস্যোদ্দীপক। দেশের প্রজাবর্গকে উপেক্ষা করিয়া কোন দেশকেই অভিখ্যাত করা যায় না। ডাক্তার মুঞ্জে বলিয়াছেন, এখন হায়দারাবাদ

শাসন-কার্য্য পরিচালনভার যাঁহার হস্তে, সেই সার আকবর হায়দারী বিবেচক ব্যক্তি। তাঁহার রাজনীতিক জ্ঞানও অসাধারণ বলিয়া শ্রীযুত মুঞ্জে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া দুই কুলই বজায় রাখিয়াছেন। সার আকবরকে বিপুল হিন্দু-প্রজার শাসন-কার্য্যে রত থাকিতে হয়; কিন্তু হায়দারাবাদ রাজ্যে হিন্দুর দুর্দশা দূর করিবার কিরূপ ব্যবস্থা হইতেছে?

—

হিন্দু লীগের বৈঠক

গত ১১ই শ্রাবণ শনিবার লক্ষ্নৌ সহরে হিন্দু লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। সার জে, পি, শ্রীবাস্তব উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং মিষ্টার এম, এস, আলি মূল সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। সার শ্রীবাস্তব পাকিস্থান প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এবং মিষ্টার আলি পাকিস্থান গঠনের ও লক্ষ্নৌ প্যাক্টের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, যদি ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহারা সকলেই যে এক জাতি, ইহা মনে রাখিতে হইবে। কিন্তু কতকগুলি লোক উপস্থিত সুবিধা লাভের জন্যই ব্যস্ত। সকল ভারতবাসী এক জাতি নহে, একথা বলিলে যদি তাহারা উপস্থিত সুবিধা পায়, তাহা হইলে সে কথা তাহারা বলিবেই। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির বশে উহারা যুক্তি-তর্ক এবং উচিত সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে। আলি মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের কতকগুলি নেতৃস্থানীয় লোক সমাজতন্ত্রবাদের সেবক হওয়ায় দেশীয় রাজন্যগণের অনাস্থাভাজন হইয়াছেন; কথাটি অসঙ্গত নহে। বর্ত্তমান যুগে সমাজতন্ত্রবাদের নানা রূপ প্রকাশমান; কিন্তু উহার কোনটাই কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের যোগ্য নহে। সকল সামন্ত রাজ্যেরই শাসন-ব্যবস্থা যে বৃটিশ শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা মন্দ, তাহা নহে। দেশীয় রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ভালও আছে, মন্দও আছে। যে সব রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা মন্দ, সেখানে রাজন্যদিগকে শাসন-পদ্ধতির সংস্কার-সাধনের পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য। জোর করিয়া কোন কাজ করিতে যাওয়া উচিত নহে। মিষ্টার আলির কথাগুলি মোটের উপর সমর্থন-যোগ্য।

যুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের দান

শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ এবং তাঁহার পণ্ডিচেরীর আশ্রমের শ্রীমতী আল্‌ফাসা (Alfassa) যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ এক সহস্র টাকা বড়লাটের হস্তে দান করিয়াছেন। ভারতের সংসারত্যাগী উদাসীন-গণও এই যুদ্ধের জন্য কত দূর উদ্বিগ্ন হইয়াছেন,—এই ব্যাপার হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়; অধিকন্তু, শাসকদিগের এই উপলক্ষে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষই বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালার অগ্নিযুগে ভারতীয় জাতীয় দলের নেতা ছিলেন, এবং মহারাজা গায়কবাড়ের শত শত টাকা বেতনের চাকরী তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়া নামমাত্র পারিশ্রমিকে জাতীয় দলের মুখপত্র 'বন্দে মাতরমে'র সম্পাদন-কার্য্যে যোগদান করেন। সেই সময় তিনি রাজরোষে পড়িয়াই পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় লইয়া নির্ব্বাসনে জীবন-যাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তথায় তিনি এখন আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; এখন তিনি পার্থিব মায়া-মোহের বহু ঊর্দ্ধে বিরাজিত। তাঁহার মনোভাব হইতে ধারণা হয়, বৃটিশ জাতির সহিত সংস্রব রহিত করা জাতীয়তাবাদীদেরও অভিপ্রেত নহে; সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের এই দানের নৈতিক মূল্য কত অধিক, সরকারও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন কি?

—

দিল্লীর প্রস্তাব গৃহীত

বর্ত্তমান শ্রাবণের দ্বিতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ের পুণা সহরে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির, এবং নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইয়াছিল। এই উভয় সমিতিতেই ওয়ার্দ্ধার প্রস্তাব এবং দিল্লীতে গৃহীত প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির এক দল লোক বলেন যে,—"হিংসা দ্বারা কখনই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে না, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ডেনমার্ক, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, এবং ফ্রান্স ব্যাপকভাবে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সফল লাভ করিতে পারে নাই। অতএব এতদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে হিংসার সহায়তা গ্রহণ করিলেও জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত হয় না। সুতরাং এই যুক্তি অনুসারে হিংসার পথ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; ওয়ার্দ্ধায় এই প্রস্তাবেরই আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু আর এক দল বলেন যে, উহা কাজের কথা নয়। মানব জাতির সভ্যতার অবস্থা এখনও এরূপ হয় নাই যে, হিংসা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা যাইতে পারে; অতএব উভয়েরই প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস-স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভারতবাসী অহিংস থাকিবে, কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং অন্তঃশত্রুর নিবারণ কল্পে হিংসার প্রয়োজন হইবে। য়ুরোপের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন। বর্ত্তমান শ্রাবণের ১১ই তারিখে পুণায় কংগ্রেস-কার্য্যকরী সমিতির বৈঠকের অবসানে ঐ দিনই তথায় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর বৈঠক আরম্ভ হইয়াছিল, এবং পরদিন পর্য্যন্ত উহার কার্য্য চলিয়াছিল। ওয়ার্দ্ধার প্রস্তাব লইয়া উভয় পক্ষেই বিলক্ষণ বাদানুবাদ চলিয়াছিল। অবশেষে দিল্লীতে গৃহীত কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবই অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়; অর্থাৎ কংগ্রেস জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে সম্পূর্ণ অহিংস থাকিবে,—কিন্তু বহিঃশত্রুর ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে হিংসার পথ অবলম্বনে কুণ্ঠিত হইবে না। আসল কথা, কংগ্রেসের অহিংসা-নীতি উহার অমোঘতার উপর নির্ভরশীল নহে,—উহা রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুবিধাজনক বলিয়াই জাতীয় সংগ্রামে গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসের কথা এই যে, জাতির মুক্তি-সংগ্রামে কংগ্রেস অহিংসা-ব্রতে অবিচলিত থাকিলেও, কংগ্রেস কমিটী বর্ত্তমান যুগের মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্মরণ করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ সম্ভাবিত বিপদের প্রতিরোধ-কল্পে অহিংস থাকিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, গান্ধীজী তাঁহার অহিংস নীতিতে সর্ব্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠ থাকিবেন; তিনি এখন উহা পরিত্যাগ করিবেন না। তবে তিনি কংগ্রেসের সহিত একেবারে সম্পর্কশূন্য হইবেন না। কংগ্রেসের নেতারাও বলিতেছেন, প্রয়োজন হইলেই তাঁহারা গান্ধীজীর পরামর্শ লইবেন, এবং গান্ধীজীও তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিবেন।

—

বড়লাটের ঘোষণা

বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসের ২২শে তারিখে ভারতের বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো শিমলা শৈল হইতে ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া এদেশের সকল লোক সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, ভারতবাসীরা পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন, অভাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন চাহে,' কিন্তু বড়লাট স্পষ্ট ভাষায় উহা প্রদানের অনুকূলে কোন কথাই বলেন নাই। তিনি তাঁহার ঘোষণায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উপস্থিত ব্যাপারটা ধামাচাপা দিবার কথামাত্র; আসল ব্যাপারের দিকে অগ্রসর হইবার মত কোন কথা উহাতে নাই।

বড়লাট বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার শাসন পরিষদে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতবাসীকে যোগদানের জন্য আহ্বান করিতে পারিবেন, বিলাতী সরকার তাঁহাকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন। এই ব্যবস্থা কিছু ভাল বটে, কিন্তু ইহা ভারতবাসীকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পথে অগ্রসর করিবে না। যদি কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদকে জাতীয় ভাবে গঠিত করিয়া, উহা হইতে কতকগুলি প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিকে শাসন পরিষদে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে ভারতবাসীরা বরং কতকটা লাভ হইল বলিয়া মনে করিতে পারিত। কিন্তু কেন্দ্রী পরিষদকে তাহার বিনির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কালের দ্বিগুণ সময় স্বৈর-ক্ষমতার দ্বারা সঞ্জীবিত রাখা হইয়াছে বলিয়া উহার প্রয়োজনীয়তা লোপ পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতী সরকার বড়লাটকে আর একটা প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দিয়াছেন। সে ক্ষমতাটি এই—"বড়লাট একটি সমর পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এই পরিষদ ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্মিলিত হইবেন, এবং ইহাতে সর্ব্বপ্রকার স্বার্থে স্বার্থবান ব্যক্তিরা সদস্যরূপে বিরাজ করিবেন।" ইহা সমরকালীন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা মোটের উপর ভালই বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে ত মূল সমস্যার সমাধান হইল না।

তাহার পর লর্ড লিন্‌লিথগো বলিয়াছেন;—"বিলাতী সরকার বড়লাটকে একথা ঘোষণা করিতে বলিয়া দিয়াছেন যে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধ যখনই শেষ হইবে, প্রায় তখনই সরকার ভারতে নূতন শাসন-পদ্ধতির কাঠামো প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতের জাতীয় দলের প্রধান প্রধান নেতাকে লইয়া সমিতি গঠনে সম্মতি দিবেন, এবং যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সত্বর মীমাংসা হয়, সে জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।" এই ব্যবস্থাটি রাজনৈতিক চাতুরীরই নিদর্শন। কতকগুলি লোককে সরকার জাতীয় দল এবং তাহাদের তথাকথিত নেতাদিগকে জাতীয় দলের নেতা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কি তাঁহাদের কোন দল আছে? তাঁহারা কি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের অবশ্য-প্রতিপাদ্য নিয়ম অনুসারে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন? তাহা যে তাঁহারা হন না, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু তাঁহারা যেন পর্দ্দার আড়ালে অবস্থিত কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তির পরামর্শে চালিত হইয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের কাজ ও ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের সহিত আলোচনার ফলে বড়লাট বুঝিয়াছেন যে, "বিভিন্ন দলের মধ্যে যে মতভেদ রহিয়াছে বলিয়া জাতীয় একতা স্থাপিত হয় নাই, সেই মতভেদ এখনও বিদ্যমান।" উহা সহজে বা কস্মিনকালেও লুপ্ত হইবে না। বড়লাট বলিয়াছেন—"বৃটিশ সরকার ভারতে শান্তি এবং মঙ্গলসাধনের যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, কোন শক্তিশালী দল দ্বারা সেই শান্তি এবং মঙ্গল ব্যাহত হইতে পারে এরূপ বুঝিলে বৃটিশ সরকার তাঁহাদের হাতে উহাদিগকে দিবার কথা মনেও স্থান দিতে পারেন না—ইহা বলাই বাহুল্য। ঐরূপ সরকার কাহারও উপর বলপূর্ব্বক প্রভুত্ব স্থাপন করেন, ইহাতেও তাঁহারা সম্মত নহেন।" কিন্তু এই প্রকার সাম্প্রদায়িক বিবাদ, অনৈক্য এবং সঙ্ঘাত উপস্থিত হইয়াছে কোন্ সময় হইতে? উহা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল! মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টেও সে কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে।

—

ম্যালেরিয়ায় সপ্তপর্ণী

ম্যালেরিয়া-জ্বরে লোকের মৃত্যুসংখ্যা বাঙ্গালাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার এত অধিক নহে। প্রতিবৎসর ভারতে গড়ে ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। সরকারী বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়—সাগর-তল (sea-level) হইতে ৫ হাজার ফুট উচ্চ ভূমিতে ম্যালেরিয়ার প্রবেশ-নিষেধ, বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে, আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের তটভূমির উত্তর-পূর্ব অংশে ম্যালেরিয়ার প্রভাব লক্ষিত হয় না। আমরা জানি, একমাত্র কুইনাইনই এই ম্যালেরিয়ার প্রধান প্রতিষেধক। কিন্তু সম্প্রতি সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, সপ্তপর্ণী বা ছাতিম গাছের ছালে 'ভিটাইন' নামক যে উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা কুইনাইনের ন্যায় বা কুইনাইন অপেক্ষাও ম্যালেরিয়ার অধিকতর প্রতিষেধক, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে; অথচ কুইনাইনের ব্যবহারে রোগীর দেহে বিষক্রিয়ার যে সকল লক্ষণ, অর্থাৎ কাণ ভোঁ-ভোঁ করা মাথা-ভার হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়, এই নবাবিষ্কৃত ঔষধের প্রতিক্রিয়া-ফলে সেরূপ কোন উপসর্গ লক্ষিত হয় না। মানিক[illegible] হাসপাতালে এই ভিটাইন ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়াছে। সপ্তপর্ণী বা ছাতিম গাছ পূর্ব্বে আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন আগাছা-বোধে ধ্বংস করায় ক্রমশঃ উহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও এদেশের বন বাদাড় হইতে একেবারে অদৃশ্য হয় নাই; পল্লী অঞ্চলে একটু খুঁজিলেই পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশের জনসাধারণ নিমছাল, ছাতিমের ছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া নিসিন্দা, নাটাফল, কণ্টিকারী প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা পাচন প্রস্তুত করিয়া তাহা পান করিত, এবং তাহাই জ্বর-রোগের প্রধান প্রতিষেধক ছিল। এজন্য বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে প্রবাদ ছিল,—"নিম নিসিন্দে যেথা মানুষ মরে না সেথা।" কিন্তু এখন সে পাঠ উঠিয়া গিয়াছে। এখন কুইনাইনের বড়ি কেন, আর মুখে ফেলিয়া গেলো; বিদেশী [illegible] দেশের দুর্গতির সীমা নাই। যাহা হউক, বাঙ্গালায় আবার যেন পাচনের প্রচলন করিলে অনেক রোগী অল্পব্যয়ে জ্বর-রোগের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। আবিষ্কারটি বাঙ্গালার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

রবীন্দ্রনাথকে নূতন উপাধি দান

বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতীচীর সারস্বত প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা সাহিত্যিক সাধনার প্রকৃষ্ট

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেন্দ্র। ইহা য়ুরোপীয় প্রাচীন সাহিত্যানুশীলনের প্রধান পীঠস্থান-গুলির অন্যতম। এদেশের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তির সমক্ষে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ভারতের প্রধান বিচারপতি সার মরিস গাওয়ার, বিচারপতি মিঃ হেণ্ডারসনের সহিত বোলপুর শান্তিনিকেতনে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ডক্টর অব লেটার্স' এই সম্মানজনক উপাধিদান করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বে রাজদত্ত 'সার' খেতাব প্রত্যাখ্যান করিলেও মনীষার কেন্দ্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত এই খেতাব প্রসন্ন চিত্তেই গ্রহণ করিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গুণের সম্মান করিতে জানেন, এই অনুষ্ঠান তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করিয়া যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন, তাহাতে কেবল রবীন্দ্রনাথই সম্মানিত হইলেন এরূপ নহে, ইহাতে ভারতের সংস্কৃতি, বিশেষতঃ বাঙ্গালার প্রতিভাও সম্মানিত হইল। রবীন্দ্রনাথ যে এই সম্মানের যোগ্য, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভার প্রশংসাকীর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন।

সমবায় সমিতি বিল

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় সমবায় সমিতি-সম্পর্কিত বিলখানি আট দিন ধরিয়া আলোচনার পর ৫০ ভোটের প্রতিকূলে ৮১ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। বিলখানিতে যে অনেক দোষ এবং ত্রুটি ছিল, তাহা বাঙ্গালা সরকারের প্রধান সচিবটিকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে। কংগ্রেস এবং কৃষক প্রজাদলের পক্ষ হইতে এই বিলখানির অনেকগুলি ধারার প্রতিকূলে তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হয় নাই। যে ক্ষেত্রে কেহ কোন যুক্তি মানিতে চাহে না, বা তাহাতে কর্ণপাত করে না, দলের মতের খাতিরে বা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে দেশের লোকের প্রতিনিধির্গই পরিচালিত হয়, সে ক্ষেত্রে সঙ্গত কথা সমাদৃত হইবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এই বিলখানির বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, ইহার বিভিন্ন ধারায় সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রারের হস্তে যে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে—তাহার ফলে তিনি বাঙ্গালার সমবায় বিভাগের 'ডিক্টেটরের' আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহার অথবা রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের কোন কর্ম্মচারীর দোষে যদি সমবায় সমিতির কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সে জন্য তাহাদের প্রতি দণ্ডবিধানের কোন ব্যবস্থাই এই বিলে নাই। বস্তুতঃ, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্ণমাত্রায় সরকারী ব্যাপারে পরিণত করা হইয়াছে। সচিবমণ্ডলের পক্ষ হইতে জবাব দেওয়া হইয়াছে যে, রেজিষ্ট্রারের হস্তে অত্যধিক (চামৎকার?) ক্ষমতা না দিলে কাজ অচল হইবে। সমবায় বিভাগের অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রেজিষ্ট্রারের হাতে ঐরূপ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে! উহাদের মতে সরকারী কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে সমবায় সমিতির কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। আরও চমৎকার যুক্তি এই যে, বিলখানি আইনে পরিণত হইলে, কার্য্যক্ষেত্রে যদি উহার সুফল দেখিতে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তখন আবার এই আইনের পরিবর্ত্তন করিলে শ্যাম এবং কুল উভয়ই বজায় রাখিবার ব্যবস্থা হইবে। কৃষক প্রজাদলের নেতা মিঃ সামসুদ্দীন বলেন, সমবায় আন্দোলন উপলক্ষে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় এবং গুরু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, বিলে তাহার প্রসঙ্গ মাত্র নাই!

এই বিলখানির প্রতিবাদ উপলক্ষে বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যাহা বলিয়াছেন,—তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত হইলেও তাহা গ্রাহ্য হয় নাই; কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কথা যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইবে, এমন আশা কে মনে স্থান দিতে পারে? শ্রীযুত বসু মহাশয় বলিয়াছেন, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যাহাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি স্বতঃই বিকশিত হয় তাহারই ব্যবস্থা করা হইবে; নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থল ব্যতীত এই ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত হইবে না। বিলখানিতে ভারত সরকারের সেই সতর্কবাণী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। যে ভাবে এই বিল রচিত হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে সমবায় আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হইবে। ইহার ৬০টি ধারাতে রেজিষ্ট্রারের হস্তে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবং ৭০টি উপধারায় সরকারকে সমবায় সমিতিগুলির কার্য্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ম করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই বিল আইনে

পরিণত করা হইলে ইহা একটা দুনিয়া-ছাড়া ব্যাপারে পরিণত হইবে। ইহার অধিক আর কিছুই বলিবার নাই।

কৃষি-ঋণ-লাঘব আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে কৃষি-ঋণ লঘু করিবার জন্য পূর্ব্ব আইনের এক সংশোধক বিল উপস্থিত করা হইয়াছে। কৃষি-ঋণ হ্রাসের জন্য এই আইন অধিক দিন পূর্ব্বে রচিত হয় নাই,—কিন্তু ইহার মধ্যেই উহার ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবার এক পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করা হইয়াছে।—ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, আইনটি প্রথমে যাঁহারা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐরূপ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের উপযুক্ত জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই। যেখানে উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ উভয় পক্ষেরই স্বার্থ সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা না হয়, সেখানে আইনে বিশেষ ত্রুটি থাকিবে, এবং তাহার কুফল কোন না কোন দিক দিয়া ফুটিয়া বাহির হইবেই। বর্ত্তমান সংশোধক বিলখানিতে বিস্তর ত্রুটি আছে। বিলখানি সিলেক্ট কমিটির হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। সিলেক্ট কমিটিতে ১৪ জন সদস্য ছিলেন; সুতরাং অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইবারই সম্ভাবনা ছিল। কংগ্রেসী-দলের সদস্য ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জনমত সংগ্রহের জন্য বিলখানি প্রচারিত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পরিষদের তাহা গ্রহণ করাই উচিত ছিল। রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীও ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। এখন সিলেক্ট কমিটী কি ভাবে বিলখানির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন,—তাহা জানিতে পারিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যাইতে পারে না। ঋণের মীমাংসা করিবার অর্থ—উত্তমর্ণের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা নহে। নোয়াখালিতে কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরী গত জুলাই মাসের 'ফাইনান্সিয়াল রিভিউ' পত্রে বিবৃত করিয়াছেন। সালিসী-বোর্ডসমূহ কি ভাবে কার্য্য করিতেছে ইহাতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্যত্র কি এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে না? সংশোধক বিলখানিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা হ্রাস করিবার প্রস্তাব নূতন বটে!

মহীশূরের মহারাজা পরলোকে

মহীশূরের মহারাজা কৃষ্ণরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার গত ১৮ই শ্রাবণ শনিবার রাত্রি প্রায় ঃ ঘটিকার সময় বাঙ্গালোর-প্রাসাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হৃদরোগই তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। তিনি পূর্ব্ব-রবিবারে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা হইতে আর মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

মৃত্যুকালে মহারাজার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ার বিবিধ রাজগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; এবং আদর্শ নরপতির ন্যায় তিনি মহীশূর রাজ্যে বহুবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে জয়লাভ করায় মহীশূর রাজ্য টিপু সুলতানের উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া এই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারীর বংশধর তৃতীয় কৃষ্ণরাজ ওয়াদিয়ারের হস্তে অর্পণ করেন, ও তাঁহাকেই মহীশূরের সিংহাসনে স্থাপন করেন; কিন্তু রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়া ইংরেজ মহীশূর রাজ্যের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পরে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ইহার শাসন-ভার মহারাজা যম ওয়াদিয়ারের হস্তে অর্পণ করি[illegible] মহারাজা দক্ষতার সহিত ইহার শাসন-কার্য্য পরিচালিত করিয়া রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র [illegible] বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া মহারাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজা কৃষ্ণরাজেন্দ্র মহীশূর-সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৮[illegible] খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া

মহীশূরের মহারাজা স্বর্গীয় কৃষ্ণরাজেন্দ্র ওয়াদিয়া র

রাজ্যের উন্নতি ও সংস্কার সাধন করেন; পরে তাঁহারই চেষ্টায় মহী[শূর] ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল। তি[নি] প্রজাহিতৈষী নরপতি ছিলেন, এবং রাজ্যের প্রজাবর্গের নিরক্ষ[রতা] দূর করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নানা[বিধ] শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা রাজ্যের সমৃদ্ধি নানাভাবে বর্দ্ধিত কর[িয়া]ছিলেন। মহারাজা নিষ্ঠাবান হিন্দু ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, এবং সঙ্গীতে সুনিপুণ ছিলেন। মহারাজা নিঃসন্তান ছিলেন; তাঁহার ভ্রাতাই সিংহাসনের ভবি[ষ্যৎ] অধিকারী ছিলেন; কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে তাঁ[হার] মৃত্যু হওয়ায় ভ্রাতৃ-শোকে মহারাজার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছি[ল]। মহারাজার পরলোকগত ভ্রাতার এক পুত্র আছেন; তিনিই এ[খন] মহীশূরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"চন্দনচর্চ্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী"

১৯শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৪৭ [৫ম সংখ্যা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকা
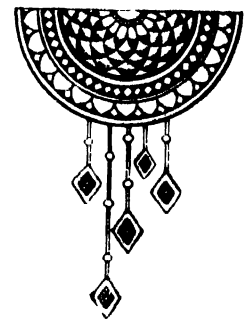
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের সার সংকলন। গীতা-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে যে, উপনিষৎ সমূহ কামধেনু, অর্জ্জুন সেই কামধেনুর বৎস, এই বৎসকে উপলক্ষ করাইবার জন্য গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদ-কামধেনু দোহন করিয়া সুধীজনের জন্য গীতামৃত আহরণ করিয়াছিলেন।(১) সমুদ্রমন্থনে যেমন সুধা উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ নিখিল রসাগর-মথিত হইয়া এই গীতা-সুধা উত্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে গীতার সার্ব্বভৌমিকতা ও সার্ব্বজনীনতাই যথেষ্ট প্রমাণ। গীতা-কুসুমে কোন সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ নাই। সকল সাধকই গীতাকে সমান প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলের পক্ষেই গীতামৃত পরম উপাদেয়। গীতা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও গীতার মত বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ জগতের সাহিত্যে দ্বিতীয় আছে বলিয়া আমরা জানি না। গীতায় সত্য-স্বরূপ ভগবান্ অখণ্ড মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। গীতায় শ্রীভগবানের সার্ব্বভৌম রূপের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াই গীতাকে সকল শাস্ত্রের সার বলা হইয়াছে। শাস্ত্র বলিলে একমাত্র গীতা শাস্ত্রকে বুঝায় এবং দেবতা বলিলেও—সর্ব্ব-দেবোত্তম দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়—"একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব"। গীতা ভগবানের বাসগৃহ এবং গীতাই সর্ব্ব-বিদ্যাসের ব্রহ্মবিদ্যা, এ কথা শ্রীভগবানের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় মত ও পথ বিভিন্ন। গীতা ঐ সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয়-সাধক রহস্য গ্রন্থ। এইরূপ গ্রন্থের মর্ম্মোদ্ধার করা অতি দুরূহ। এই জন্যই গীতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা"—ব্যাসদেব হয় তো জানেন, অথবা তিনিও জানেন না। এইরূপ উক্তিকে অতিশয়োক্তি বলিয়া ধরিয়া লইলেও ঐ উক্তি হইতেই গীতার রহস্য উদ্‌ঘাটন যে দুঃসাধ্য তাহা বুঝা যায়। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যে গান গাহিয়াছিলেন এবং যে গানের সঞ্জীবনী শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করতঃ সত্যদ্রষ্টা অর্জ্জুন

(১) সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধী ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।
গীতা-মাহাত্ম্য।

পরিত্যক্ত গাণ্ডীব গ্রহণ করিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে গুরুবধ ও জ্ঞাতিবধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই গানের সুরমূর্চ্ছনা গীতার শ্লোকলহরীর মধ্য দিয়া আজও ভাসিয়া বেড়াই-তেছে ; কিন্তু কে সেই শক্তিমান্ মহাপুরুষ, যে আমাদিগকে সুরতরঙ্গের মর্ম্মভঙ্গি বুঝাইয়া দিবে ? আচার্য্য শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি বৈদান্তিক আচার্য্যগণ ও তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ নানা প্রকার ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি রচনা করিয়া গীতার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরস্পর নানা বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রত্যেক আচার্য্যই স্বীয় বেদান্ত-চিন্তার অনুকূলে গীতারহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রতিকূল মত খণ্ডন করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐরূপ খণ্ডন ও মণ্ডনের ফলে গীতার ভিত্তিতে বিবিধ দার্শনিক সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ১

—কিন্তু গীতার্থ-জিজ্ঞাসুর নিকট কতখানি সুগম হইয়াছে তাহা বলা দুরূহ। ঐরূপ সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক শিক্ষা ও সংস্কারবশে গীতাকে তাঁহাদের সংস্কারের রঙিন কাচের মধ্য দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ফলে, সত্য-সূর্য্য-গীতার শুভ্র জ্যোতিঃ রঙিন হইয়াই উহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে গীতার রহস্য উদ্‌ঘাটন দুঃসাধ্য নহে কি পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন চিন্তার বন্ধুর-পথে জিজ্ঞাসু যত অগ্রসর হইবেন, গীতারহস্য ততই তাঁহার নিকট দুর্জ্ঞে বলিয়া প্রতিভাত হইবে, চিত্ত ক্রমে নানারূপ সংশয়ে ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইবে। এই অবস্থায় কোথ পথ তাহা জানিতে হইলে শ্রীভগবানের অ চরণেই শরণ লইতে হয়। গীতা যাঁহার মুখপদ্ম বিনিঃসৃত বাক্যসুধা, সেই পরম কল্যাণ-নিদান শ্রীকৃ যাঁহাকে ঐ সুধা পান করিবার অধিকার দেন, কে সেই ভাগ্যবানই তাহা পান করিয়া ধন্য হইতে পারে।

র্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিশ্বরূপ পরিদর্শন ক জন্য প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে দিব্য-চক্ষুঃ দিয়াছিলেন ভগবদ্দত্ত ঐ দিব্যচক্ষুর সাহায্যে অর্জ্জুন বিশ্বের বিচার বিশ্বরূপমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যাঁহাকে দিব্যচক্ষুঃ দান করেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

- - - - -

(১) গীতার ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বিরচিত হইয়াছে।

গীতার যে সকল টীকা বর্তমানে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্‌গীতাভাষ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শঙ্করাচার্য্যের গীতাভাষ্যের উপর আনন্দজ্ঞানের ভগবদ্‌গীতাভাষ্য-বিবরণ ও রামানন্দের ভগবদ্‌গীতাভাষ্য-ব্যাখ্যা নামে টীকা আছে। ঐ টীকা ব্যতীত রামানন্দ গীতাশয় নামে স্বতন্ত্র ভাবেও গীতার ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। গীতার উপর যামুনাচার্য্যের দুইটি টীকা পাওয়া যায়—একটি গদ্যে অপরটি পদ্যে রচিত। এই টীকাদ্বয় এক জনের লিখিত বলিয়া মনে হয় না। দুই জন যামুনাচার্য্য দুইখানি টীকা রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। দুই জনই বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী আচার্য্য। রামানুজাচার্য্যের গুরু বিখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য্যের শ্লোকে রচিত গীতা-ব্যাখ্যা কাঞ্জিবরম্ সুদর্শন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যামুনাচার্য্যকৃত ঐ শ্লোকাত্মক গীতা-ব্যাখ্যার নাম গীতার্থসংগ্রহ। গীতার্থসংগ্রহের উপর নিগমান্তমহা-দেশিক কৃত গীতার্থসংগ্রহ রক্ষা নামে এক টীকা আছে। এই সংগ্রহ রক্ষা ব্যতীত যামুনাচার্য্যের গীতার্থসংগ্রহের উপর বরবরমুনির গীতার্থসংগ্রহ দীপিকা ও প্রত্যক্ষ দেবাচার্য্যের গীতার্থসংগ্রহ টীকা নামে দুইখানি টীকা পাওয়া যায়।

যামুনাচার্য্যের মত বিবৃত করিয়া খৃষ্টীয় একাদশ শতকে আচার্য্য রামানুজ (1017 A. D.) বিশিষ্টাদ্বৈত মতানুসারে গীতার টীকা রচনা করেন। রামানুজের টীকার উপরে বেঙ্কটনাথের তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা নামে টীকা আছে। দ্বৈতবেদান্ত-মতাবলম্বী মধ্বাচার্য্য বা আনন্দতীর্থ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে দ্বৈত মতানুসারে গীতাভাষ্য রচনা করেন, রাঘবেন্দ্র স্বামী সপ্তদশ শতকে গীতার উপরে গীতাবিবৃতি, গীতার্থসংগ্রহ, গীতার্থবিবরণ নামে তিনখানা গ্রন্থ রচনা করেন। বল্লভাচার্য্য ও বিজ্ঞান ভিক্ষু গীতার ভাষ্য র করিয়াছেন, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেশব ভট্ট গীতা-তাৎপ প্রকাশিকা নামে গীতার টীকা রচনা করেন। হনুমৎকৃত হনুমদ্ কল্যাণভট্টের রসিকরঞ্জিনী জগদ্ধরের ভগবদ্ গীতা-প্র জয়রামের গীতাসারার্থ-সংগ্রহ নামে টীকা আছে। বলদেব বি ভূষণের গীতা-ভূষণ-ভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীর গূঢ়ার্থ-দীপিকা গী বিশেষ প্রসিদ্ধ টীকা। ব্রহ্মানন্দ গিরির ভগবদ্‌গীতা-প্র দত্তাত্রেয়কৃত প্রবোধচন্দ্রিকা, রামকৃষ্ণ, মুকুন্দদাস, রামনারায়ণ বিশ্বেশ্বর, শঙ্করানন্দ ও শিবদয়ালুকৃত টীকা, শ্রীধর স্বামীর সুবোধি টীকা, সদানন্দ ব্যাসের ভাবপ্রকাশিকা টীকা ; নীলকণ্ঠের দীপিকা গীতার বিশেষ প্রসিদ্ধ টীকা। এতদ্ব্যতীত অভিনব —ভগবদ্‌গীতার্থসংগ্রহ, গোকুলচন্দ্রের ভগবদ্‌গীতার্থসার— রাজের—ভগবদ্‌গীতালঙ্কাভরণ—কৈবল্যানন্দের ভগবদ্‌গীতাস নৃসিংহ ঠাকুরের ভগবৎগীতার্থসংগ্রহ, নরহরির ভগবদ্‌গীতা সংগ্রহ, বিঠ্‌ঠল দীক্ষিতের ভগবদ্‌গীতা-হেতু-নির্ণয় নামে টীকা হইয়াছিল। অধিকাংশ টীকাই শঙ্কর মতের এবং কতকগুলি রাম মতের ও অন্যান্য বৈষ্ণব ও শৈব মতের—বিবরণে বিরচিত হইয়া

[illegible]ত্বাময়ী ভাগবতী তনু বুঝিতে হইলে শব্দব্রহ্ম গীতারই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একান্ত আবশ্যক।

গীতা মহাভারতের অংশ। মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যে গীতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উদ্‌যোগপর্ব্ব শেষ হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বে বিমনাঃ অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ গীতা-উপদেশ শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই—যুদ্ধের দামামা যখন বাজিয়া উঠিয়াছে, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষা, করীর বৃংহনে রণস্থল যখন ভীষণতর হইয়াছে তখন উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেওয়া, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া অশোভন মনে হয় না কি? রণভূমি তো গীতোক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশ করিবার উপযুক্ত স্থান নহে; সুতরাং কোন কোন মনীষী মনে করেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধের প্রারম্ভে ভীষ্মপর্ব্বে এই গীতার উপদেশ দেওয়া হয় নাই। কোন সময়ে কোন ব্যক্তি এই গীতোক্ত উপদেশ মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের মধ্যে যোজনা করিয়া দিয়া থাকিবে। মহাভারত অতি বিশাল—বিষয়বৈচিত্র্যেও যেমন মহাভারত মহান্, কলেবর বিশালতায়ও উহা সেইরূপই মহান্। এইরূপ গ্রন্থে পরবর্ত্তীকালের বস্তু যোজনা খুবই স্বাভাবিক। গীতাও হয়ত সেইরূপ পরবর্ত্তীকালেরই যোজনা, মূল মহাভারতের অঙ্গ নহে।

এই মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ গীতা মহাভারতের অংশ কি না? দ্বিতীয়তঃ ভীষ্মপর্ব্ব গীতোপদেশ দেওয়ার উপযুক্ত স্থান কি না? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, গীতায় যেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার অনুরূপ উপদেশ মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, কর্ণপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব, উদ্‌যোগপর্ব্ব, বনপর্ব্ব ও অশ্বমেধপর্ব্ব প্রভৃতিতেও প্রসঙ্গতঃ দেওয়া হইয়াছে। গীতার শ্লোকের অনুরূপ বহু শ্লোকও ঐ সকল বিভিন্ন পর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়।১ তার পর, ঐ সকল শ্লোক ব্যতীত বিভিন্ন পর্ব্বের বিভিন্ন প্রস্তাবেও গীতার অনুরূপ বহু উপদেশ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বনপর্ব্বের ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদ, মার্কণ্ডেয় প্রশ্ন, উদ্‌যোগপর্ব্বের বিদুরনীতি, সনৎ-সুজাতীয় উপদেশ, শান্তিপর্ব্বের বশিষ্ঠ-করাল-সংবাদ, জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, তুলাধার-জাজলি-সংবাদ, বলিবাসব-সংবাদ, মনু-বৃহস্পতি-সংবাদ, শুকানুপ্রশ্ন, নারায়ণীয় ধর্ম্ম, অশ্বমেধ-পর্ব্বোক্ত অনুগীতা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সকল প্রস্তাবে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, গীতার উপদেশের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল আছে। এই মিল যে কেবল শব্দসাদৃশ্য, অর্থসাদৃশ্য বা প্রতিপাদ্য তত্ত্ব-সাম্য দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে। বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, গীতার যে ভাবে কাঠামো বাঁধা হইয়াছে, ঐ সকল মহাভারতোক্ত প্রস্তাবের কাঠামোর সহিতও তাহার পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। গীতার প্রথম অধ্যায়ে দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্যের নিকট যে ভাবে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের বর্ণনা করিয়াছেন, ভীষ্মপর্ব্বের ৫১শ অধ্যায়েও দুর্য্যোধন ঠিক ঐরূপেই পুনরায় আচার্য্যের নিকট সৈন্যগণের বর্ণনা করিয়াছেন। অর্জ্জুনের যেরূপ বিষাদ ও বিকলতা উপস্থিত হইয়াছিল, শান্তিপর্ব্বের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠিরেরও অনুরূপ বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন

১ গীতা	মহাভারত	গীতা	মহাভারত
[illegible]	ভীষ্ম পর্ব্ব ৫১।৪		
[illegible]	" ৫১।৬	৫।১৮	শান্তি ২৩৮।১৯
[illegible]-১৯	" ৫১।২২-২৯	৬।৫	উদ্‌যোগ ৩৩।৬৩,৬৪
[illegible]	দ্রোণপর্ব্ব ১৯৭।৫০	৬।২৯	শান্তি ২৩৮।২১
২।১১	শান্তিপর্ব্ব ২২৪।১৪	৬।৪৪	" ২৩৫।৭
২।১৮	স্ত্রীধর্ম্মপর্ব্ব ২।৬,২।১১	৮।১৭	" ২৩১।৩১
২।৩১	ভীষ্মপর্ব্ব ১২৪।৩৬	৮।২০	" ৩৩৯।২৩
২।৩২	কর্ণপর্ব্ব ৫৭।২	৯।৩২	অশ্বমেধ ১৯।৬১,৬২
২।৪৬	উদ্‌যোগ ৪৫।২৬	১৩।১৩	শান্তি ২৩৮।২৯
২।৫৫	শান্তি ২০৪।১৬		অশ্ব ১৯।৪৯ এবং
২।৬৭	বন ২১১।২৩		শুকানুপ্রশ্ন ও অনুগীতা দ্রষ্টব্য
২।৭০	শান্তি ২৫০।৯	১৩।৩০	শান্তি ১৭।২৩
৩।৪২	" ২৪৫।৩,২৪৭।২	১৪।১৮	অশ্ব ৩৯।১০ ও অনুগীতা
৪।৭	বন ১৮৯।২৭	১৬।২১	উদ্‌যোগ ৩২।৭০
৪।৩১	শান্তি ২৬৭।৪০	১৭।৩	শান্তি ২৬৩।১৭
৪।৪০	বন ১৯৯,১১০	১৮।১৪	শান্তি ৩০৭।৮৭
৫।৫	শান্তি ৩০৫।১৯,৩১৬,৪।		

উপরে গীতার ও মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব্বের শ্লোকসমূহের মধ্যে যে তুলনা প্রদর্শিত হইল, তাহাতে কোথায়ও মহাভারত ও গীতার শ্লোকের সম্পূর্ণ মিল পাওয়া যায়, কোথায়ও বা শব্দের এক আধটু পরিবর্ত্তন দেখা যায়, ভাবের মিল সর্ব্বত্রই আছে।

যেমন গীতায় বলিয়াছেন যে, যাঁহাদের জন্য রাজ্যৈশ্বর্য্য-ভোগ বাঞ্ছনীয়, তাঁহাদিগকে বধ করিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াই বা লাভ কি? যুদ্ধে যখন সমস্ত কৌরবগণ নিহত হইলেন, তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধনের মুখেও শল্যপর্ব্বে (শল্য ৩১, ৪২-৫১) অর্জ্জুনের অনুরূপ উক্তিই শুনিতে পাওয়া যায়; গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে যেমন সাংখ্যযোগ এবং কর্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ যোগ-নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, সেইরূপ নারায়ণীয় ধর্ম্মে এবং শান্তিপর্ব্বের জাপকোপাখ্যান ও জনক-সুলভা সংবাদেও উক্তরূপ দ্বিবিধ নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিচার করা হইয়াছে, বনপর্ব্বের প্রারম্ভে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের নিকটও অনুরূপ কর্ম্মতত্ত্বের রহস্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। ঐরূপ কর্ম্মতত্ত্বের উল্লেখ অনু-গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাগ-যজ্ঞবহুল শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ধর্ম্মের যে সকল উপদেশ গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে, ভারতোক্ত নারায়ণীয় ধর্ম্মেও ঐ সকল উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। স্বীয় ধর্ম্ম নিন্দনীয় হইলেও তাহাই অনুষ্ঠেয়, স্বধর্ম্মসাধনে পাপ নাই, গীতার এই মহা-উপদেশই শান্তি-পর্ব্বে তুলাধার-জাজলি-সংবাদে এবং বনপর্ব্বের ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদে বর্ণিত হইয়াছে। গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জগদুৎপত্তির যে বর্ণনা আছে, অনুরূপ বর্ণনা শান্তি-পর্ব্বের শুকানুপ্রশ্নেও দেখা যায়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জলোক্ত আসনাদির যে বর্ণনা দেখা যায় তাহাও শুকানুপ্রশ্নেই পাওয়া যায়। গীতার দশম অধ্যায়ে যে বিভূতির বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সহিত অনুগীতার গুরু-শিষ্য-সংবাদের মধ্যম উত্তম বস্তু সমূহের বর্ণনার মূলতঃ কোন বিভেদ নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, সন্ধির প্রস্তাবের সময় দুর্য্যোধন-প্রমুখ কৌরবগণকে এবং পরে যুদ্ধশেষে দ্বারকায় ফিরিবার পথে উতঙ্ককেও শ্রীকৃষ্ণ ঐ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গীতার চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের লক্ষণ ও গুণ-বৈচিত্র্য নিবন্ধন জগতের বৈচিত্র্য যেভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অনুরূপ গুণবর্ণনা ও ব্যাখ্যা শান্তিপর্ব্বে ও অনুগীতায় প্রদত্ত হইয়াছে। গীতায় কোন কোন বিষয়ের আলোচনা বিস্তৃত ও সুগভীর এবং গীতার বিচারপদ্ধতির কিছু নবীনতা ও বিচিত্রতা আছে সত্য, কিন্তু সার কথা এই যে, যে সকল ভাব-কুসুমে গীতামালা রচিত হইয়াছিল, সহস্রশাখ ভারত-বনস্পতির বিভিন্ন শাখায় ঐ সকল জ্ঞান-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। ভাষাসাদৃশ্যই বল, ভাবসাদৃশ্যই বল, বা তত্ত্বসাদৃশ্যই বল, যেভাবে বিচার কর না কেন, গীতা যে মহাভারতেরই অংশ এবং মহাভারত যিনি রচনা করিয়াছেন, গীতাও যে তিনিই রচনা করিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। গীতা যে মহাভারতেরই অংশ, তাহা মহাভারতের আভ্যন্তরীন প্রমাণ হইতেও সমর্থিত হয়। মহাভারতের স্থানে স্থানে শ্রীমদভগবদগীতার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমগ্র মহাভারতের অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে পর্ব্ব গণনা এবং পর্ব্বোক্ত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা পরিগণনায় ভগবদগীতার দুই বার উল্লেখ করা হইয়াছে।১ আদিপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন প্রভৃতির জয় সম্বন্ধে নিজ নৈরাশ্যের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "যখনই শুনিলাম যে অর্জ্জুনের মনে মোহ উৎপন্ন হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তখনই আমি বিজয় সম্বন্ধে নিরাশ হইলাম।" ধৃতরাষ্ট্রের এই উক্তি স্পষ্টতঃ গীতারই উল্লেখ সূচনা করে। শান্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীয় ধর্ম্মের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতেও দেখা যায় যে, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন যে, এই ধর্ম্মরহস্যই হরিগীতা বা ভগবদগীতায় বর্ণিত হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বে ৩৪৮ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধেও বিমনস্ক অর্জ্জুনকে ভগবান শ্রীমদ্ভগবদগীতার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।২ ভারতীয় যুদ্ধের অবসানে যুধিষ্ঠিরের

১। (ক) পর্ব্বোক্তং ভগবদ্গীতা পর্ব্ব ভীষ্মবধস্তথা।
মহাঃ আদি ২।৭০

(খ) কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্ম্মোক্ষদর্শিভিঃ॥
আদিঃ ২.২৪৮-৪৯

২। সমুপোঢ়েষ্বনেকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্ম্মৃধে।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্॥
শান্তি ৩৪৮।৮

রাজ্যাভিষেকের পর অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ এক সময় একত্র বসিয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন যে, "যুদ্ধের প্রারম্ভে আমাকে যে গীতার উপদেশ দিয়াছিলে আমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছি, তুমি পুনরায় আমাকে গীতার উপদেশ প্রদান কর," উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি যোগারূঢ় হইয়া যে গীতার উপদেশ করিয়াছিলাম, সেই উপদেশ পুনরায় আমার পক্ষেও এখন করা অসম্ভব। তুমি দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা বিস্মৃত হইয়াছ। আমি তদনুরূপ কোনও উপদেশ তোমাকে প্রদান করিতেছি" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অনুগীতার উপদেশ দেন। ঐরূপ উপদেশ যে অনেক অংশে গীতারই তুল্য হইবে তাহা নিঃসন্দেহ। ঐ অনুগীতা ভগবদ্গীতারই প্রতিচ্ছবি, তাহাতেও ভগবদ্গীতার উল্লেখ আছে। এইরূপে গীতা মহাভারতের অঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। এই গীতা মহাভারতের অংশ নহে, ইহা পরবর্ত্তীকালে মহাভারতের বিশাল অঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এই মত কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নহে।১

তার পর, গীতা মহাভারতের অংশ ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে মহাভারতে গীতার যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহাই গীতার উপযুক্ত স্থান নহে কি? কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে গুরুবধ ও জ্ঞাতিবধের ভয়ে বিমনা অর্জ্জুন যখন গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" বলিয়া ভগবানের পায়ে পড়িয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন, তখন দেখা গেল যে, অর্জ্জুনের অহমিকা বিচূর্ণ হইয়াছে, সুদৃঢ় ভগবৎশরণাপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, ফলে অর্জ্জুন তত্ত্বজিজ্ঞাসার যথার্থ অধিকারী হইয়াছেন বলিয়াই পার্থসারথি তাঁহার প্রিয়শিষ্যকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরহস্যের উপদেশ দিয়া স্বধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। অবশ্যই যে আকারে সপ্তশত-শ্লোকী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমরা দেখিতেছি, ঐ শ্লোকগুলিই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে শুনাইয়াছিলেন, এইরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। স্থান ও কাল বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, সপ্তশত-শ্লোকী গীতার রহস্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাভারত রচনা কালে শ্রীভগবানের ঐ রহস্য উপদেশ বেদব্যাস সপ্তশত শ্লোকে গ্রথিত করিয়া বর্ত্তমান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষৎ আমাদিগকে শ্রবণ করাইয়াছেন। মহাভারত শুধু কাব্য বা ইতিহাসই নহে, উহা ধর্ম্মসংহিতা, এবং "পঞ্চম বেদ" বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। ঐরূপ ধর্ম্মসংহিতায় ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম রহস্য কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি যোগরহস্য আলোচিত বা ব্যাখ্যাত না হইলে ধর্ম্মসংহিতার অঙ্গহানি হইয়া পড়ে, এইরূপক্ষেত্রে মহাভারতই যে গীতার্থ পর্য্যালোচনার উপযুক্ত স্থান, ইহা নিঃসন্দেহ। এইজন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গীতাকে বলা হইয়াছে উপনিষৎ এবং ব্রহ্মবিদ্যা, সুতরাং বিভিন্ন উপনিষদের সহিত গীতার সম্বন্ধ কি, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিচার করা আবশ্যক। গীতা যে উপনিষদেরই সার সঙ্কলন তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রস্তাবে গীতার উপদেশের সহিত উপনিষদের উপদেশের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা গীতার উপনিষদ্ আখ্যা যে সমীচীন ও সার্থক, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। গীতা এবং বিভিন্ন উপনিষদ্ পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গীতার উপদেশের সহিত উপনিষদের উপদেশের সম্পূর্ণ মিল আছে। এমন কি, ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত প্রভৃতিতে "সহস্রশীর্ষ" পুরুষের যে বর্ণনা আছে তাহার সহিতও গীতার সাম্য বিদ্যমান। ইহা হইতে বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব-শাস্ত্রে যে একই সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। গীতা বেদব্যাসের স্বাধীন রচনা, সুতরাং ইহা "পৌরুষেয়" বা পুরুষ-রচিত; বেদের ন্যায় "অপৌরুষেয়" নহে। এই জন্যই গীতা "স্মৃতি"

(১) ভাষা-তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলেও গীতা যে মহাভারতের অংশ তাহাই প্রমাণিত হয়। অবশ্যই মহাভারতের ভাষা সকল স্থলে একরূপ নহে। মহাভারত বিপুলায়তন গ্রন্থ। এ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভাষা এবং রচনা বিভিন্ন প্রকার হইবে ইহা বিচিত্র নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ভাষাগত প্রমাণকে মুখ্য প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করিতে না পারিলেও ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, গীতার বিশ্বরূপের বর্ণনা যেরূপ আর্ষছন্দ রচিত ঐরূপ রচনা মহাভারতে দেখা যায়, কোন পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থে দেখা যায় না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, আর্ষবৃত্ত প্রচলিত থাকা কালেই গীতা রচিত হইয়াছিল। গীতার মধ্যে অনেক অপাণিনীয় প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন নমস্কৃত্বা, শক্যঃ অহং, সেনানীনাম্ প্রভৃতি) ইহা দ্বারাও গীতার প্রাচীনতাই প্রমাণিত হয়। "ব্রহ্ম," "যোগ" প্রভৃতি শব্দ গীতায় যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, ঐ অর্থে কালিদাস প্রভৃতির গ্রন্থে উহাদের প্রয়োগ পাওয়া যায় না, সুতরাং গীতা যে প্রাচীন নিবন্ধ তাহা নিঃসন্দেহ।

আর বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি "শ্রুতি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপনিষদের মধ্যে কতকগুলি পদ্যে ও কতকগুলি গদ্যে রচিত। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি অতিপ্রাচীন উপনিষৎ সমূহ গদ্যে রচিত। ঐ সকল গদ্যাত্মক ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ্ বাক্যের সহিত পদ্যময়, গীতা বাক্যের হুবহু মিল থাকা সম্ভবপর নহে। তবুও বিচার করিলে দেখা যায় যে, গদ্য-পদ্যের পার্থক্য ছাড়িয়া দিলে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকের উপদেশের সহিত ও গীতার শ্লোকের অনেক অংশে মিল পাওয়া যাইবে। গদ্যে রচিত উপনিষৎ ছাড়িয়া পদ্যে রচিত উপনিষৎ সমূহ গ্রহণ করিলে এই মিল আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কঠ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বহু শ্লোক অক্ষরশঃ কিংবা অল্পবিস্তর শব্দ ভেদে গীতায় গৃহীত হইয়াছে।১ স্থানান্তরে ও মহাভারতে ঐ সকল উপনিষদের উক্তি গৃহীত হইয়াছে। কেবল উক্তি বলিয়াই নহে, উপনিষদের রূপক, উপমা প্রভৃতিও অনেক স্থলে যথাযথ ভাবেই গীতা ও মহাভারতে গৃহীত হইয়াছে। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের অশ্বত্থ বৃক্ষের রূপকটি কঠোপনিষৎ হইতে গৃহীত। প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের

(১) গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই শ্লোক ছান্দোগ্য উপনিষদের সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি উক্তির অনুরূপ। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি গীতা ৯।২১, জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে, গীতা ১৩। ৭, মাত্রাঃ স্পর্শাঃ ইত্যাদি গীতা বাক্যের অনুরূপ বাক্য ও বিচার বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি ইত্যাদি শ্লোক কঠ উপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর আশ্চর্য্যো বক্তা ইত্যাদি শ্লোকের অনুরূপ। ন জায়তে ম্রিয় তে বা কদাচিৎ, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্য চরন্তি প্রভৃতি গীতা বাক্য কঠ উপনিষদে ঠিক এইরূপেই দেখিতে পাওয়া যায় (কঠ ২।৯, ২।২৫) নতদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদি গীতার শ্লোক কঠ ও শ্বেতাশ্বর উপনিষদের নতত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্ ইত্যাদি শ্লোকেরই প্রতিচ্ছবি। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য এইরূপে যে যোগাভ্যাসের স্থান বর্ণিত হইয়াছে তাহার অনুরূপ বর্ণনা সমে শুচৌ ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সমংকায় শীরোগ্রীবম্ ইত্যাদি গীতা বাক্য, ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম এই শ্বেতাশ্বতর বাক্যেরই অনুরূপ। সর্ব্বতঃ পাণিপাদম্ ইত্যাদি শ্লোক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অক্ষরশঃই পাওয়া যায়। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পুরস্তাৎ, এই পদও গীতা এবং শ্বেতাশ্বর উপনিষদে তুল্যরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষেপে ইহাই প্রদর্শিত হইল, এইরূপ আরও অনেক উক্তি উদ্ধার করিয়া গীতা ও উপনিষদ্ বাক্যের সাম্য প্রদর্শিত হইতে পারে। প্রবন্ধের বিস্তার ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না।

যে যুদ্ধবৃত্তান্ত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব[র্ণিত] হইয়াছে, অনুরূপ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের যুদ্ধবর্ণনা অনুগীত দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যে কৈকেয় অশ্বপ[তি] রাজার মুখে "আমার রাজ্যে চোর নাই, মদ্যপা[য়ী] নাই"- (ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্য[প] ছাঃ ৫।১১।৫) এইরূপে যে কথা শুনিতে পাওয়া যা[য়] মহাভারতের শান্তিপর্ব্বেও (শান্তি ৭৭।৮)—উ[ক্ত] অশ্বপতি রাজার কথা বলিয়া ছান্দোগ্যের উক্তি[র] আবৃত্তি করা হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বের জনক-প[ঞ্চ]শিখ-সংবাদে "মৃত্যুর পর আর কোন জ্ঞান থাকে [না] (ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি) কারণ, সেই মৃতব্যক্তি ব্রহ্মে [লী]ন হইয়া যায়" এইরূপে বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রতিপাদ্য বিষয়েরই যথাযথ অবতারণা ক[রা] হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গেরই শেষভাগে নামরূপ বিবর্জ্জিত মু[ক্ত] পুরুষের উদ্দেশ্যে নদী ও সমুদ্রের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া[ছে] ঐ দৃষ্টান্তই প্রশ্ন ও মুণ্ডক উপনিষদেও (প্রশ্ন ৬, ৫, মু[ণ্ডক] ৩।২।৮) প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদে ও অনুগ[ীতা]য় ইন্দ্রিয় সমূহকে অশ্ব ও বুদ্ধিকে ঐ অশ্বের সারথি বলিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কঠোপনিষদেরই দৃষ্টা[ন্ত]। সংক্ষেপে ইহাই প্রদর্শিত হইল। এতদ্ব্যতীত উপনিষদে আরও অনেক দৃষ্টান্ত, উপমা প্রভৃতি গীতা ও মহাভার[তে] বহু স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহা হইতে গী[তা ও] মহাভারতের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান যে উপনিষদের ভিত্তি[তে] আলোচিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায়।

উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত।—বেদান্ত প্রস্থানত্র[য়ে] বিভক্ত, উপনিষৎ বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থান। গীতা শ্রুতি ন[হে] উহা স্মৃতি ; সুতরাং গীতা বেদান্তের স্মৃতিপ্রস্থান। শ্র[ুতি] ও স্মৃতির মর্ম্ম যুক্তিতর্কের সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রে আলোচি[ত] হইয়াছে সুতরাং ব্রহ্মসূত্র বেদান্তের তর্কপ্রস্থান ব[লিয়া] প্রসিদ্ধ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বে[দা]ন্তের প্রস্থান হিসাবে গীতার সহিত উপনিষদের যে[মন] ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গেও গীতার ঘ[নিষ্ঠ] যোগ আছে। গীতার ত্রয়োদশ সর্গের চতুর্থ শ্লোকে "ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব" বলিয়া স্পষ্টতঃ ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ ক[রা]

(১) ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্র পদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ। গীঃ ১৩।৪

হইয়াছে। অবশ্যই এই ব্রহ্মসূত্রই বেদব্যাসের বেদান্তসূত্র কি না, এ বিষয়ে সুধীগণের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈতগুরু স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যই উক্ত ব্রহ্মসূত্র পদে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রকে গ্রহণ না করিয়া ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি এবং উপনিষদ্-বাক্যকেই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু শঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি এবং রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বেদান্ত-ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মসূত্রপদে বেদান্তসূত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বহু ভাষ্যকার-সম্মত বলিয়া আমরাও ব্রহ্মসূত্র বলিয়া ব্যাস-কৃত বেদান্তসূত্রকেই গ্রহণ করিলাম। আমাদের এইরূপ গ্রহণের হেতু এই যে, বর্ত্তমান বেদান্তসূত্র ব্যতীত অন্য কোন ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় আমরা কোথায়ও পাই না। তার পর গীতার শ্লোকে স্পষ্টতঃ যেমন ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইরূপ ঐ সূত্রকে হেতুযুক্ত (হেতুমদ্ভিঃ) ও বিনিশ্চয়াত্মক (বিনিশ্চিতৈঃ) বলিয়া বিশেষ করা হইয়াছে। "হেতুমৎ" কথাটি মহাভারতে অন্যান্য কয়েক স্থলেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই সকল স্থলে ন্যায় বা যুক্তিযুক্ত বিচারপদ্ধতিকেই "হেতু" বলা হইয়াছে। ন্যায়োক্ত রীতি অনুসারে বিচার করিলে সেখানে কুতর্ক বা অসৎ তর্কের কোন অবকাশ থাকে না, যেখানে সাধক ও বাধক প্রমাণ বিচারের ফলে যথার্থ জ্ঞানের (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের) উদয় হয়, এইরূপ ক্ষেত্রেই হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ এই বিশেষণ পদের সার্থকতা পরিস্ফুট হয়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, বেদান্ত-চিন্তা বিভিন্ন উপনিষদে নানা ছন্দে, বিক্ষিপ্ত আকারে সত্যদর্শী ঋষিদিগের মনশ্চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, সেইরূপেই তাহা উপনিষদে নিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল বিভিন্ন বাক্যসমূহের মধ্যে কোন ক্রম বা বিশেষ পদ্ধতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সমন্বয় দৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত উপনিষদ্ বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার না করিলে উপনিষদের দার্শনিক রহস্য জানা যায় না। এই জন্যই উপনিষদের বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশিকে তর্কের সূত্রে গ্রথিত করিয়া বর্ত্তমান ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন রচিত হইয়াছে। বেদান্তসূত্রকে এই জন্যই বেদান্তের তর্কপ্রস্থান বলা হয়। উল্লিখিত দৃষ্টিতে গীতার শ্লোকের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে গীতোক্ত ব্রহ্মসূত্র পদে যে বেদান্তসূত্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায় এবং গীতা যে ব্রহ্মসূত্রের পরবর্ত্তী তাহাও বুঝা যায়। গীতায় যেমন ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ পাওয়া গেল, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্রেও গীতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অবশ্যই গীতায় যেমন ব্রহ্মসূত্রের নাম পাওয়া যায়, ব্রহ্মসূত্রে সেইরূপ গীতার নাম নির্দ্দেশ দেখা যায় না, তবে 'স্মৃতি' বলিয়া বিভিন্ন সূত্রে অল্পাধিক আট স্থলে গীতার উল্লেখ করা হইয়াছে।১ উহার মধ্যে কোন কোন স্থলে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও (অপি চ স্মর্য্যতে ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫ যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে ব্রঃ সূঃ ৪।২।২১) দুইটি সূত্রে যে গীতারই উল্লেখ করা হইয়াছে, এ বিষয়ে শঙ্কর রামানুজ, মাধ্ব, বল্লভ প্রভৃতি সকল বেদান্ত-ভাষ্যকারই একমত। ভাষ্যকারদিগের এই ঐকমত্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি যে, ব্রহ্মসূত্রেও গীতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ দুইটি স্থলকে আমরা নিঃসন্দেহ বলিয়া ধরিয়া লইলাম, তাহার কারণ এই যে, ঐ দুই সূত্রে যে বিষয়ের বিচারের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে গীতাকে সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ-রূপে উপন্যাস করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। প্রথম সূত্রটির (অপিচ স্মর্য্যতে ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৫) পূর্ব্ব পূর্ব্ব দুইটি সূত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ (অংশো নানা ব্যপদেশাৎ ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৩) এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া প্রথমতঃ ঐ সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রুতি প্রমাণ উপন্যাস করা হইয়াছে (মন্ত্রবর্ণাচ্চ ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪৪) পরে স্মৃতিতেও ঐরূপ উক্তি শুনা যায় বলিয়া (অপিচ স্মর্য্যতে ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৫) সকল বেদান্তভাষ্যকারই স্বীয় সিদ্ধান্তের পোষক প্রমাণ হিসাবে "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" গীতা ১৫।৭, এই গীতা বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্থলটি আরও স্পষ্ট। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ বলিলে যে দক্ষিণায়নের ছয় মাস ও উত্তরায়ণের ছয় মাস কালকে বুঝায়। এই কালই যোগিদিগের দেহত্যাগের উপযুক্ত কাল। এই কালে

(১) স্মৃতেশ্চ, ব্রহ্মসূত্র ১।২।৬। অপিচ স্মর্য্যতে ১।৩।২৩, উপপদ্যতে চা প্যুপলভ্যতে চ ২।১।৩৬, ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে গীতা ১৫।৩, অপিচ স্মর্য্যতে ২।৩।৪৫, দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ৩।২।১৭, অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্। ৩।৩।৩১, স্মরন্তি চ ৪।১।১০। যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে ৪।২।২১

দেহ ত্যাগ করিলে তাঁহারা প্রসিদ্ধ দেবযান এবং পিতৃযান মার্গে উর্দ্ধলোকে গমন করেন। গীতায় কথিত হইয়াছে যে, যে সকল কর্ম্মযোগী দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা কর্ম্মফল ভোগের পর পুনরায় চন্দ্র-কিরণকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ফিরিয়া আসেন, আর যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয় না।১ এই গীতোক্ত উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন কালের কথাই "যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে।" ব্রহ্মসূত্র ৪।২।২১, এই ব্রহ্মসূত্রে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এ বিষয়ে বেদান্তভাষ্যকারগণ সকলে একমত। ভাষ্যকারদিগের ব্যাখ্যাকে সূত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া মানিয়া লইলে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ব্রহ্মসূত্রেও শ্রীমদ্ভগবদগীতার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ থাকায় গীতা যে ব্রহ্মসূত্রের পরবর্ত্তী তাহা বুঝা যায়, আবার ব্রহ্মসূত্রে গীতার উল্লেখ থাকিলে ব্রহ্মসূত্র গীতার পরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। একবার ব্রহ্মসূত্র গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী, আর একবার গীতা ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, মহাভারত, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র একই বেদব্যাসের রচিত। যিনি ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত করিয়াছেন, তিনিই গীতার বর্ত্তমান ছন্দোময় রূপ দান করিয়াছেন। গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের এক হস্ত লিখিত দুইটি বিভিন্ন প্রস্থান। একের লিখিত প্রস্থানদ্বয়ে যে পরস্পরের উল্লেখ থাকিবে তাহাতে অসামঞ্জস্য কোথায়?১ [ক্রমশঃ।

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী (অধ্যাপক, এম, এ, পি, আর, এস্, পি, এইচ ডী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

(১) যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ। ৮।২৩ গীতা।
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্মবিদো জনাঃ। ৮।২২ গীতা
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম।
তত্র চন্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে। ৮।২৫ গীতা

(১) গীতা রচনার কাল—মহাভারত রচনার কালই আমাদের মতে—গীতা রচনার কাল। মহাভারত খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ কি পঞ্চম শতকে বিরচিত হয়, গীতা রচনার কালও সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ কি পঞ্চম শতক মনে করিতে হইবে। স্যার রামগোপাল ভাণ্ডারকরের মতে গীতা রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক। কালিদাস, বাণভট্ট, ভাস প্রভৃতি কবিগণ গীতা ও মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন কবি ভাসের কবি-কর্ণপুরে গীতার শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভাসের আবির্ভাব কাল অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতক হইতে চতুর্থ শতক, সুতরাং গীতাও যে ঐরূপ কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ। বোধায়ন আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থে ভারত ও মহাভারতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বোধায়ন খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং মহাভারত ও তদন্তর্গত গীতা যে তাহা হইতে প্রাচীন ইহা বুঝা যায়।

শেষ সুর

সান্ধ্য-তপন বিদায় চাহিয়া
কহিল কমলে ডাকি।
"আজিকার রাতি ঘুমাও সজনি!
প্রভাতে মেলিও আঁখি।"

ম্লান হাসি হেসে কহিল কমল—
"এই তো পড়িনু ঘুমি'।
প্রভাতে আসিয়া জাগাইও মোর
নিমীলিত আঁখি চুমি॥"

শ্রীনিভা দেবী

ভ্রম-সংশোধন

১

সরমা যত বড় হইতে লাগিল, সে তাহার মাতার ও পিতামহীর তত আনন্দের ও উৎকণ্ঠার কারণ হইতে লাগিল। সে বাড়ীর একটি মাত্র সন্তান—সংসারের সুখ ও আনন্দ। কিন্তু তাহার পিতা মহেশচন্দ্রের অতিরিক্ত আদরে তাহার মনে যে ভাব সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া তাহার ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করিত, সে ভাব যে সংসারে সুখের অন্তরায় হয় তাহা বুঝিয়া তাহার মাতা ও পিতামহী তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া উৎকণ্ঠিতা হইতেন। কিন্তু মহেশচন্দ্র তাহা কিছুতেই বুঝিতেন না; বরং স্ত্রী বা মাতা তাঁহাকে সে কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে বিরক্ত হইতেন—সর্প তাহার গমন-পথে বাধা পাইলে যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া ফণা উত্তোলিত করে, কন্যার প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত আদর তেমনই বাধা পাইলে আরও প্রবল হইত। মহেশচন্দ্রের পত্নী স্বামীর বৈশিষ্ট্য বিশেষ জানিয়াও—কয় দিন ইতস্ততঃ করিবার পর এক দিন—কন্যার কল্যাণ-কামনায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সরমা যত দুরন্তপনা করে, তুমি তত প্রশ্রয় দেও! ওকে কি পরের ঘর করতে হ'বে না?" শুনিয়া মহেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "না।" পত্নী সুমতি বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "সে ভাবনা ভেবে রক্ত জল করার কোন প্রয়োজন তোমার নাই। আমি জীবনে কোন দিন কোন বিষয়ে কারও পরামর্শ নিই নি—নেবও না।" কথাটা সত্য। সুমতি আর কিছু বলিতে সাহস করেন নাই। মা-ও এক দিন বলিয়াছিলেন, "মহেশ, সরমা আদরের জিনিষ—আদর পা'বে। কিন্তু এ কথাও ত ভাবতে হ'বে যে, ও মেয়ে—ওর ভাগ্য ভবিষ্যৎ পরের অধীন।" তাহাতে মহেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "কা'র ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ কা'র অধীন, তা বলা যায় না।" বলিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন—"মা, তোমার কি আজ পূজার্চ্চনা নাই?" মা পুত্রকে বিশেষ চিনিতেন। তিনিও আর সে কথার উত্থাপন করেন নাই।

কন্যার কথায় মহেশচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে ও মাতাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান—অল্পবয়সে পিতৃহীন। সহায় ও সম্পদ তাঁহার কিছুই ছিল না; বরং যাঁহাদিগকে আত্মীয় ও স্বজন বলা হয়, তাঁহারা সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে যে ভাবে বঞ্চিত ও প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে বাল্যকাল হইতেই তিনি মনে করিতেন, সংসারে আত্মীয়-স্বজন না থাকাই বাঞ্ছনীয়—কারণ, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল—শক্রপুরী অপেক্ষা মরুভূমিতে বাস শ্রেয়ঃ। তিনি আপনার চেষ্টায় দারিদ্র্য হইতে প্রাচুর্য্যে উপনীত হইবার পর যে সকল আত্মীয়-স্বজন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই—মধুচক্র হইতে মধু সংগ্রহপ্রয়াসী মধুমক্ষিকার দংশনে যেমন অবস্থায় পতিত হয় তেমনই অবস্থা ভোগ করিয়াছেন। মহেশচন্দ্র রুক্ষ ভাবেই তাঁহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, তিনি বাল্যে বিদ্যালাভের সুযোগ লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা তাঁহার বিদ্যালাভে সহায় না হইলেও তিনি, কেবল মা'র আগ্রহে ও ত্যাগের ফলে, যে সামান্য লিখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহাতেই শিখিয়াছিলেন—

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,—
অসময়ে হায়! হায়! কেহ কার(ও) নয়।"

বাল্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই মহেশচন্দ্রকে অর্থার্জ্জনের উপায় চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার ভাগ্যে ভাবনা যেমন ছিল সিদ্ধিও তেমনই হইয়াছে।

কথায় বলে, লক্ষ্মী যখন আসেন তখন তিনি কোন্ পথে আসিবেন, কেহ পূর্ব্বে তাহার সন্ধান পায় না। সে দিন গ্রামের পার্শ্বে রেলপথ সংস্কার হইতেছিল। কৌতূহলবশে—অন্য কোন কায না থাকায় তরুণ মহেশচন্দ্র তাহা দেখিতে গিয়াছিল। সে সময় য়ুরোপীয় এঞ্জিনিয়ার কায দেখিতে আসিয়াছিলেন। এঞ্জিনিয়ার প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী রেল বাঙ্গলো হইতে ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন—সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও শিশু কন্যা। এঞ্জিনিয়ার যখন টমটম হইতে নামিয়া কুলীদিগের কায পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন একখানি মাল-গাড়ী সেই পথে যাইতেছিল। সম্মুখে লাইন সংস্কার হইতেছে দেখিয়া, কুলীদিগকে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে এঞ্জিন-চালক হুইসল বাঁশী বাজাইল। সহিস অসতর্ক ছিল। হুইসল শুনিয়া যানের তেজস্বী অশ্ব ভয় পাইল এবং সহসা মুখ তুলিয়া শব্দের কারণ লক্ষ্য করিবার চেষ্টায় যখন দেখিল, সহিসের হস্ত হইতে বল্গা ছাড়াইয়াছে, তখন ছুটিয়া বাহির হইল। এঞ্জিনিয়ার "পাকড়ো! পাকড়ো!" বলিয়া চীৎকার করিলেন—কুলীরা তাহার প্রতিধ্বনি করিল—"পাকড়ো! পাকড়ো!"—কিন্তু কেহই ঘোড়া ধরিতে গেল না। সহিস প্রাণপণে দৌড়িল। আর এক জন গাড়ীর আরোহীদিগের বিপদ উপলব্ধি করিয়া ছুটিল। সে মহেশচন্দ্র। মহেশচন্দ্রই ঘোড়ার রাশ ধরিয়া ফেলিল—ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল। ঘোড়াটি দুষ্ট নহে, ভয় পাইয়া দৌড়াইয়াছিল—বাধা পাইয়া দাঁড়াইল—মহেশচন্দ্র পড়িতে পড়িতে দাঁড়াইয়া গেল।

এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী ভয়ে পুত্রকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন; আকস্মিক বিপদে কি করিবেন, স্থির করিতে পারেন নাই।

সহিসও আসিয়া পড়িল। সে-ই ঘোড়ার রাশ ধরিয়া গাড়ী ফিরাইয়া এঞ্জিনিয়ারের নিকট লইয়া গেল। কৌতূহলবশে মহেশচন্দ্রও সঙ্গে গেল।

স্বামীর কাছে আসিয়াই এঞ্জিনিয়ারের পত্নী রুদ্রমূর্ত্তি হইয়া সহিসকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। যুবক মহেশচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, সে যদি জানিত, তিনি বিনা দোষে লোককে গালি দেন, তবে সে কখনই আপনার জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইত না।

তাহার সাহসের পরিচয় পাইয়া আর তাহার কথা শুনিয়া এঞ্জিনিয়ার-পত্নী স্তম্ভিতা হইলেন।

এঞ্জিনিয়ার যুবককে বলিলেন, "তুমি উত্তম বালক আছ।"

মহেশচন্দ্র চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া দুইটি টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলেন। যুবক বলিল, মানুষ মরে দেখিয়া সে ঘোড়া ধরিয়াছে—সে জন্য সে পুরস্কার লইবে কেন?

অর্থের অন্যায় আদান-প্রদানের পরিবেষ্টনে থাকিয়া এঞ্জিনিয়ার যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এই অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য নাই। তিনি এইরূপ লোক অধিক দেখেন নাই। তিনি যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কর?"

যুবক উত্তর দিল, সে করিবার কোন কায পায় নাই।

এঞ্জিনিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাও কি?"

যুবক উত্তর দিল, "ভাত। ডালও সব দিন জুটে না।"

"পাও কোথায়?"

"সকল দিন পাই না।"

"তোমার বাবা আছেন?"

"না।"

"ভাই?"

"না।"

"কে আছেন?"

"মা।"

"তুমি কায করবে?"

"যদি পাই।"

এঞ্জিনিয়ার সেই দিন—সেই স্থানেই তাহাকে কুলী খাটাইবার কাযে নিযুক্ত করিয়া অপরাহ্নে বাঙ্গলোয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন—গাড়ী চালাইলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে মহেশচন্দ্র বাঙ্গলোয় যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন এঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার পত্নী বাঙ্গলোর বাগানে অতিথিদিগের সহিত বসিয়া ছিলেন। অতিথি—এক জন বড় এঞ্জিনিয়ার, তাঁহার পত্নী ও সহকারী। একটা বড় টেবলের উপর একখানা নক্সা কাগজ রাখিয়া বড় এঞ্জিনিয়ার আর সকলকে কি বুঝাইতেছিলেন। তাঁহার যাহা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, তিনি তাহা উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তাহার কারণ যুবক মহেশচন্দ্র সে দিন বুঝে নাই, পরে বুঝিয়াছিল—তিনি ক্ষীণশ্রবণশক্তি।

বড় এঞ্জিনিয়ার মিষ্টার গেল্ পূর্ব্বেই মহেশচন্দ্রের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি তখন যাঁহার অতিথি তিনি তাহার উপস্থিতির কথা জানাইলে গেল্ তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে চল।"

যুবক বলিল, "কোথায়?"

"সাড়া—যেখানে পদ্মার উপর পুল হইতেছে।"

সাড়ায় যে সেতু নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা যুবক শুনিয়াছিল এ দেশে কোন বিরাট সেতু নির্ম্মাণের সময় নানা জনরব প্রচারি[illegible] হয়—নদীর দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য সেতুর ভিত্তিস্তম্ভে মানু[illegible] প্রোথিত করিতেছে—ইত্যাদি।

কায না পাইয়া এবং অভাবহেতু মহেশচন্দ্র বিব্রত হইয়াছিল সে বিবেচনা না করিয়াই বলিল, "যা'ব।"

গেল্ বলিলেন, "উত্তম। আমি কল্য যাইব—তুমি তাহা[illegible] পরদিন যাইবে।"

"কেমন ক'রে যাব?"

স্থানীয় এঞ্জিনিয়ারকে দেখাইয়া গেল্ বলিলেন, "ইঁহার কাছে আসিও; ইনি টিকিট লিখিয়া দিবেন। রেলে যাইতে হয়।"

"সেখানে থাকব কোথায়?"

গেল্ হাসিয়া বলিলেন, "উত্তম বাড়ী আছে; তুমি স্ত্রী পরিবার লইয়া থাকিবে।"

"আমার স্ত্রী নাই।"

গেল্ হাসিলেন, বলিলেন, "এখনও তোমার স্ত্রী হয় নাই! তবে ত বাঙ্গালা দেশের সুলক্ষণ দেখিতেছি। তোমার কে আছেন?"

"মা।"

"তিনি যাইতে পারিবেন।"

২

গৃহে ফিরিয়া মহেশচন্দ্র মাতাকে সব কথা বলিল। মা যেমন আনন্দিতা, তেমনই চিন্তিতা হইলেন। পুত্র কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প তিনি পুত্রকে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গ্রামে ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন ভ্রাতা আসিয়া ভাগিনেয়ের মতেরই সমর্থন করিলেন।

নারায়ণী ভ্রাতাকে বলিলেন, "যে দু'চারখানা বাসন আর তক্তা, সিন্দুক আছে—তা' কি করা যা'বে? গেলে কি আর হ'বে? জান ত—

'সাত পুরুষে সঞ্চয়
এক পুরুষে ক্ষয়।'

কি করা যায়?"

সে সমস্যার সমাধান পুত্রই করিয়া দিল—জিনিষ মামা বাড়ীতে লইয়া যাইবেন; ঘর তালাবদ্ধ থাকিবে।

তাহাই হইল। সমস্ত দিন সেখানে জিনিষ পাঠান হইল। মহেশচন্দ্রের জ্ঞাতিরা বলাবলি করিতে লাগিলেন—"এইবার মা আর ছেলে না খেয়ে মরবে। কথায় বলে, 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।' যা' কিছু ছিল বাপের বাড়ীতে পাঠাচ্ছেন। ভাই যে দু'দিন পরে দূর ক'রে দেবে, তা' ভাবছেন না।" কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে অপমানিত মনে করিলেন—কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

পুরুষরা যে কৌতূহল সম্বরণ করিলেন, মহিলারা কিন্তু তাহা সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতে স্নানের ঘাটে এক জন নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা মহেশের মা, বাপের বাড়ী যাচ্ছ?"

নারায়ণী বলিলেন, "না।"

প্রশ্নকারিণীর সে কথায় বিশ্বাস হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "জিনিষপত্র ত সবই পাঠালে, দেখলাম।"

"মহেশের একটা কায হয়েছে—সেখানে যা'বে।"

"কোথায় ?"

"তা' ত আমি জানি না ; শুনছি, পদ্মার ধারে।"

"ভাল ক'রে না জেনে ছুট বল্‌তে বিদেশে যাচ্ছ ?"

"কি করব, বল ? আমার দেশ বিদেশ—ইহকাল পরকাল সবই ঐ ছেলে ! ও যখন যা'বে, তখন আমি আর কি বলব ?"

"পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করেছ ?"

এই প্রশ্নের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন অনুযোগ ছিল, তাহা যেন তিনি বুঝিতেই পারেন নাই, এমনই ভাব দেখাইয়া নারায়ণী বলিলেন, "দাদাকে আনিয়েছি।"

"গ্রামের পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা কর।"

"আর ত যাত্রা করেছি—এখন আর জিজ্ঞাসা ক'রে ফল কি ?"

নারায়ণী চলিয়া যাইলে প্রশ্নকারিণী বলিলেন, "ছেলের কায না হ'তেই দেমাকে ধরাকে সরা দেখছেন ; বিদেশে কায, দেখ্‌বেন 'কত ধানে কত চাল'।"

আর এক জন স্নানার্থিনী বলিলেন, "বড় দুঃখেই দিন কেটেছে ; তাই আশা ক'রে যাচ্ছে। আহা ! দোষ দিও না।"

"দোষ কে-ই বা দিচ্ছে ; আর দিলেই বা কে শুনছে ? তবে জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করলে সেটা ভাল ছাড়া মন্দ দেখাত না।"

"কোন দিন দু'মুঠো জুটল কি না, তা' কোন্ জ্ঞাতি কবে দেখেছে ?"

ঢিলটি মারিয়া পাটকেলের আঘাত পাইয়া প্রথমা নিরস্তা হইলেন। তিনি সম্পর্কে মহেশচন্দ্রের পিতৃব্যপত্নী।

তাহার পর স্নানার্থিনীদিগের মধ্যে কেহ মহেশচন্দ্রের কাযের সমর্থন, কেহ বা নিন্দা করিলেন।

সেই দিন মহেশচন্দ্র তাহার মাতাকে লইয়া যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই পল্লীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল, সে একটা কি কায পাইয়াছে। কাযটা কি তাহা কেহ জানিতে পারিলেন না ; তাহার মাতুলই তাহা বলিতে নিষেধ করিলেন। সে "জ্ঞাতিশত্রুদিগের ভয়ে।"

৩

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সেকাল ও একাল বিষয়ক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন, সেকালে কোন রহস্যরসিক—

"অহল্যাদ্রৌপদীকুন্তীতারামন্দোরদীস্তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

শ্লোকের ব্যঙ্গোক্তি করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

"হেয়ার কল্‌ভিন পামারশ্চ কেরী মার্শম্যানস্তথা।
পঞ্চ গোরাস্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম॥"

পামার তৎকালে কলিকাতায় অন্যতম প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবসায়ী ছিলেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা পুলিসের প্রধান কার্য্যালয় যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে তাঁহার গৃহ ছিল ; সে গৃহ আর নাই। লোক বলিত, "পামার সাহেবকে যে ছুঁইতে পারে, সেই বড় মানুষ হয়।" গল্প আছে, কোন বালক সেই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য মনে করিয়া এক দিন সুযোগ সন্ধান করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল। সেকালে যেমন একালেও তেমনই যাঁহারা কোন বড় ঠিকার কায স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাতে কাযের ভার পাইয়াছেন, তাঁহারাই বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে জানিলে—ধনসঞ্চয় করিয়াছেন। এঞ্জিনিয়ার গেলের অনুগ্রহে সাড়া সেতুর কায ছুঁইতে পাইয়া মহেশচন্দ্রের ভাগ্য ফিরিল।

প্রথম মাসের বেতন পাইয়াই সে একটি কায করিল, আফিসের কেরাণীবাবুদিগের মধ্যে এক জনকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালা ও ইংরেজী পড়িতে ও লিখিতে আরম্ভ করিল। তাহার এই কার্য্যের কারণ—মা'র সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ ছিল, তাহাকে লিখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি অত আক্ষেপ কেন করেন পুত্র তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "কায়স্থের ছেলের মূর্খের বাড়া গাল নাই। ব্রাহ্মণের ছেলে যদি শাঁকে ফু দিতে না পারে (অর্থাৎ দেবপূজা করিবার মত বিদ্যার্জ্জনও না করে) তবে উনানের চোঙ্গায় ফু দিতে পারে ; কায়স্থের ছেলে মূর্খ হ'লে তা'র দুঃখের অন্ত থাকে না।"

মহেশচন্দ্র অল্প দিনেই অনেক শিখিল। তাহার কারণ, সে আপনি সঙ্কল্প করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছিল—আর তাহাকে বাধ্য হইয়া বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সকল বিষয়—প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক—পড়িতে হইত না।

কয় বৎসরে সাড়া সেতুর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বাঙ্গালা ও ইংরেজী ভালরূপই শিখিল এবং তাহার কার্য্যনিষ্ঠায় মিষ্টার গেলও প্রীত হইয়া তাহাকে শেষে একটা ছোট ঠিকার কায দিলেন। যখন সাড়া সেতুর কায শেষ হইল, তখন মহেশচন্দ্র যে টাকা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা যে সে জীবনে কখন সঞ্চয় করিতে পারিবে, তাহা ঘটনাক্রমে রেললাইনের এঞ্জিনিয়ারের সহিত সাক্ষাতের দিনও সে কখন কল্পনা করিতে পারে নাই।

সেতুর উদ্বোধন শেষ হইলে এঞ্জিনিয়ার স্বদেশে যাইবার পূর্ব্বে মহেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি করিবে ? মহেশচন্দ্র যখন বলিলেন, তিনি তাহাই ভাবিতেছেন, তখন তিনি বলিলেন, মহেশচন্দ্র যুবক—ভবিষ্যৎ তাহার সম্মুখে—সে কায করিলে আপনার অনেক অধিক উন্নতি করিতে পারিবে। তিনি বলিলেন, কলিকাতায় তিনি তাহাকে কয়টি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের এঞ্জিনিয়ারদিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দিবেন—সে কায পাইবে।

মহেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন এবং স্বাধীনভাবে কায আরম্ভ করিলেন। এত দিন তিনি যেমন কায লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, এখন আবার তেমনই তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইলেন। কেবল এখন তিনি কাহারও নির্দ্দেশে বা উপদেশে কায করেন না—আপনার বিবেচনানুসারে তাহা করেন!

এই সময়ের মধ্যে মহেশচন্দ্র কেবল কায করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। সংসারের সব ভার মা বহন করিয়াছেন। কিন্তু কয় বিষয়ে পুত্র কিছুতেই মাতার কথা রক্ষা করেন নাই—তিনি বিবাহ করেন নাই, এক বারও গ্রামের গৃহে গমন করেন নাই। যে আত্মীয়-স্বজন দরিদ্র মহেশচন্দ্রের সংবাদও লইতেন না, তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা কেহ কেহ পুত্রের বা ভ্রাতার বা ভাগিনেয়ের বা শ্যালকের কায করিয়া দিবার অনুরোধ লইয়া তাঁহার নিকট গিয়াছেন বটে, কিন্তু গমন সার্থক হয় নাই। সজারু বিরক্ত হইলে যেমন আপনার কাঁটাগুলি

উচ্চ করে—কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনই মহেশ-চন্দ্রের ব্যবহারে তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "ধরাকে যেন সরা দেখে—অত বাড়াবাড়ি ভাল নহে।" মা আগন্তুকদিগকে যত্ন করিতেন বটে, কিন্তু পুত্র যেন পূর্ব্বলব্ধ ব্যবহার—সুদসহ—শোধ করিতেই কৃত-সঙ্কল্প ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, যে স্থানে বিনাবিচারে স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতির আদান-প্রদান হয়, সেই গার্হস্থ্য জীবনের বাহিরে মানুষের জীবনে ভাবাবেগের স্থান নাই- তিনি একাধিক বার কোন কোন কুলী বা কেরাণীকে কিছু সাহায্য করিয়া আশানুরূপ ব্যবহার লাভ করেন নাই। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, বাহিরের লোকের সঙ্গে ব্যবহার টাকা আনা পাই কসিয়া করিতে হইবে। মাতুলের সদ্ব্যবহার তিনি অনুভব করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন; মা তাঁহাকে কত স্নেহ করেন, তাহা তিনি জানিতেন—সেই জন্য মাতার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় এতটুকু দৈন্য ছিল না। কিন্তু তাহার বাহিরে তিনি আর কোন কর্ত্তব্য স্বীকার করিতেন না; তথায় তিনি যেন যন্ত্র, মানুষ নহেন।

৪

কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই মা নারায়ণী পুত্রকে দুইটি কায করিতে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—বিবাহ আর পৈত্রিক ভিটায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ। পুত্র তাঁহার সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি সেই বিষয়দ্বয়ে জিদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিতেন, ভগিনীর অনুরোধে তিনিও মহেশচন্দ্রকে ঐ অনুরোধ করিতেন। প্রথম প্রথম মহেশচন্দ্র বলিতেন—"মা, আপনি শুতে যায়গা পায় না—শঙ্করাকে ডাক! সংসার বড় হ'লে খা'ব কি?" কিন্তু শেষে আর তাহা বলা চলিত না; কারণ, মহেশচন্দ্রের একটি অভ্যাস তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল, তিনি যখন যে টাকা পাইতেন—মা'কে রাখিতে দিতেন, সিন্দুকের চাবি মা'র কাছে থাকিত। মা তাঁহার আর্থিক অবস্থা অনবগত ছিলেন না। বর্ষার পূর্ব্বে মাতুল আসিয়া বলিলেন, বর্ষা আসিতেছে, ঘর সারাইয়া রাখিতে হইবে। সেই কথায় মা আবার পুত্রকে তাঁহার সেই কথা বলিলেন। মাতুলও মহেশচন্দ্রকে বলিলেন, কথায় বলে, যাহার আপনার গৃহ নাই, সংসার নাই, স্ত্রীপুত্র পরিবার নাই—সে গৃহী নহে। শেষে মা অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া মহেশচন্দ্রের মতের পরিবর্ত্তন হইল; যে মা তাঁহার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহার অশ্রুপাতের কারণ হইলেন দেখিয়া তাঁহার মনে হইল—তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইতেছেন। শেষে তিনি বলিলেন, "মা, তোমার দুই অনুরোধই আমি রাখতে পারব না—তুমি কোন্‌টি রাখতে বল?" মা ভাবিয়া বলিলেন, তিনি বিবাহ করুন। তিনি সম্মতি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "শ্বশুরের ভিটায় বাড়ী করবার তোমার যে সাধ, তা' আমি জানি। কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, আমাকে কাযের জন্য কলিকাতায় থাকৃতেই হবে—দেশে বাড়ী করলে কে তা'তে বাস করবে? বিশেষ যেখানে আমি আর তুমি কেবল লোকের অবজ্ঞা পেয়েছি, সেখানে গিয়ে আজ তাদের হিংসার—ঈর্ষ্যার কেন্দ্র হ'তে চাহি না। আমি চাহি, শান্তিতে থাকি।"

মা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ঘর কি রাখবি না?"

"তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যে কাযটা করছি সেটা ভালয় ভাল[illegible] শেষ হ'ক, তা'র লাভের টাকায় আমি ঐ ভিটায় যা'তে বাবার না[illegible] স্মরণীয় হয় তা' করব—ডাক্তারখানার বাড়ী করে, তা[illegible] চালাবার টাকা জমা ক'রে দেব।"

শুনিয়া মা বিশেষ আনন্দিতা হইলেন।

তাহার পর মহেশচন্দ্র বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা[illegible] নামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—আপনি[illegible] কলিকাতায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

সরমা তাঁহার একমাত্র সন্তান।

সরমার জন্মে তাহার পিতামহীর আনন্দের অন্ত ছিল না[illegible] যে দিন তিনি স্বামীর রোগ-চিকিৎসায় একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়[illegible] বিধবা হইয়াছিলেন, সে দিন তিনি কেবল পুত্রকে অবলম্বন করিয়া[illegible] দাঁড়াইয়াছিলেন। অর্থাভাবে তিনি পুত্রকে কোন ভাল জিনি[illegible] —অনেক সময় ইচ্ছামিত আহার্য্যও দিতে পারেন নাই; সে সক[illegible] অপেক্ষাও তাঁহার বড় দুঃখ ছিল—তিনি তাহাকে লিখাপ[illegible] শিখাইবার ব্যয় করিতে পারেন নাই। ভ্রাতার সাহায্যে কোনরূপে মাতাপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। তাহার প[illegible] পুত্র বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে—বহু-জন-প্রতিপালক হইয়াছে[illegible] তাঁহার বড় দুঃখের কারণ সে দূর করিয়াছে—নিজ চেষ্টায় সুশিক্ষিত হইয়াছে। সরমা তাহার সন্তান—একমাত্র সন্তান। যদি কখন তাঁহার মনে হইত, মহেশচন্দ্রের একটি পুত্র সন্তান হইল না!—তবে তিনি আপনাকে আপনি তিরস্কার করিতেন, ভগবান যাহ[illegible] দিয়াছেন, তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে[illegible] করিতে হয়—অত্যধিক আশা লোভের প্রকারভেদ; পুত্র হইলে[illegible] সে মহেশচন্দ্রের সন্তান হইত—কন্যা সরমাও তাহাই, ইহা মনে[illegible] করিয়া তিনি শিশুর মুখচুম্বন করিতেন। সরমার প্রতি মাতা[illegible] অতিরিক্ত স্নেহ লক্ষ্য করিয়া মহেশচন্দ্রই সময় সময় বলিতেন "মা, আমাকে কিন্তু কখন তুমি এমন আদর দাও নি।" ম[illegible] বলিতেন, "বাবা, তখন যে ছেলেকে আদর করবার সময়টুকু[illegible] পাইনি।" সে কথা কত সত্য তাহা মহেশচন্দ্র জানিতেন।

নারায়ণী যখন সরমাকে অঙ্ক বা বক্ষ হইতে নামাইতেন[illegible] তখন সে মাতার অঙ্কে বা বক্ষে থাকিত। প্রথম সন্তানটিকে ইচ্ছানুরূপ আদর করিতে তাহার মাতার একটু সঙ্কোচ অনুভূত হয়—লোক কি বলিবে! সুমতির তাহা ছিল না; কারণ, তিনি জানিতেন, শাশুড়ী কিছুই মনে করিবেন না; আর তদপেক্ষাও প্রবল কারণ ছিল—অপ্রাপ্তকে পাইবার আগ্রহ।

সুমতি যেন এই সন্তানকে লাভ করিয়া নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছিলেন—যেন তাঁহার জীবনের শূন্য পূর্ণ করিয়াই কন্যা আসিয়া-ছিল। তিনি কিছুতেই তাঁহার জীবনের পরিপূর্ণতা তাহার পূর্ব্বে অনুভব করিতে পারেন নাই। স্বামীর ব্যবহারে তিনি ত্রুটি [illegible] পারিতেন না; তাহা কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল না। অর্থাৎ তাহাতে বাহুল্য ছিল না। অথচ যৌবন অনেক ক্ষেত্রে বাহুল্য-বিলাসী—সে হিসাবে বা পরিমাপে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে না, সেরূপে বদ্ধ হইলে ব্যথিত হয়। নদী যখন তাহার পর্ব্বতগৃহ হইতে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার জলরাশি সোচ্ছাসে বহিয়া যায়—সে প্রবাহ অনেক স্থানে কূল অতিক্রম

করে—তাহাই কিন্তু স্বাভাবিক। ফল দান করাই বৃক্ষের সার্থকতা হইতে পারে, লতায় ফুলের জন্যই লোক অপেক্ষা করে—কিন্তু বৃক্ষ ও লতা যদি পত্রশূন্য হইত, তবে তাহার সৌন্দর্য্যহানি হইত এবং সেই কারণেই ফলের ও পুষ্পের উদ্গম অসম্ভব হইত। সে ক্ষেত্রে পত্রের যেমন প্রয়োজন আছে, মানুষের স্নেহে—ভক্তিতে—বিশেষ প্রেমে তেমনই বিকাশ বাহুল্যের প্রয়োজন আছে। বসন্তাগমে যে পক্ষীর অঙ্গে নূতন বর্ণবিকাশ হয়—কণ্ঠে যে নূতন বিরাব উছলিয়া উঠে, প্রকৃতির সেই বাহুল্য-বিলাস অনর্থক বা অকারণ নহে। বিহগীকে আকৃষ্ট ও তুষ্ট করিবার জন্যই তাহার প্রয়োজন। সুমতি স্বামীর ব্যবহারে সেই বাহুল্য কখন লাভ করেন নাই। কিন্তু কন্যাকে লাভ করিয়া তিনি অনুভব করিলেন—বন্যার জল নদীতে পতিত হইলে যেমন তাহার সব অপূর্ণতা দূর হয়—অপত্যস্নেহে তেমনই তাঁহার মনের সব অভাব দূর হইল।

সুতরাং সুমতির অপত্যস্নেহের আধিক্যে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু কন্যার প্রতি মহেশচন্দ্রের স্নেহের প্রাবল্যই বিস্ময়কর ছিল। মানুষের মন স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ—যে সকল প্রবৃত্তিকে আমরা কোমল প্রবৃত্তি বলি, সে সকল মানুষের সহজাত সংস্কারেরই মত। কিন্তু প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও শিক্ষক সক্রেটেস যেমন বলিলেন, তিনি স্বভাবতঃ ক্রোধপ্রবণ—কেবল প্রবল চেষ্টায় ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন, তেমনই কোন কোন মানুষ ইচ্ছা করিয়া—বিশেষ চেষ্টায় কোমল মনোভাব জয় করিবার চেষ্টা করে! অধিকাংশ স্থলেই সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দুঃখ-দারিদ্র্যের পরিবেষ্টনে বড় হইয়া মহেশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, দুঃখদারিদ্র্য জয়েই তাঁহার সকল চেষ্টা প্রযুক্ত করিবেন। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। কোমল মনোভাব তিনি দৌর্ব্বল্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং সন্ন্যাসী যেমন ভোগলালসা দলিত করিতে চেষ্টা করেন, সে সকল সেই ভাবে দলিত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু উৎসমুখ হইতে যে জল উৎসারিত হইবে তাহা যখন বাহির হইবার পথ না পাইয়া সঞ্চিত হইতে থাকে, তখন তাহার বল-বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং এক দিন সে সেই বলেই বাধা দূর করিয়া প্রবল বেগে বহির্গত হয়। মহেশচন্দ্রের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি দুঃখদারিদ্র্য জয়-চেষ্টার যে প্রস্তরে কোমল মনোবৃত্তির প্রবাহের উৎসমুখ বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার আর যখন কোন সার্থকতা ছিল না, সেই সময় কন্যার জন্মে তাঁহার স্নেহ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আর সেই জন্যই তাহা আপনার আতিশয্যবেগে অনিষ্টসাধনও করিয়াছিল। নারায়ণীর ও সুমতির স্নেহে যে বিচার ছিল মহেশচন্দ্রের স্নেহে তাহার স্থান ছিল না। যেরূপ স্নেহের বিকাশে লোক বলে—"আদর দেওয়া ত নয়—ছেলের পরকাল খাওয়া" —কন্যার প্রতি তাঁহার স্নেহ সেইরূপ ছিল। কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার উপায় ছিল না - কিছু করা ত কল্পনাতীতই ছিল। এমন কি নারায়ণী বা সুমতি তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার কোন কাযে বাধা দিলে মহেশচন্দ্র তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে তাঁহাদিগকেও নিরস্ত হইতে হইত।

এইরূপ অন্যায় আদরে যে শিশু বর্দ্ধিত হয়—সে শিশু যখন যাহা চাহে তখনই তাহা পাইবে এ ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হয়। সে অনেকগুলি অবাঞ্ছনীয় ভাবের অনুশীলন করে। সে "আলালের ঘরের দুলালের" সব বৈশিষ্ট্য লাভ করে; সে মনে করে, সংসারের উপবনে স্বচ্ছন্দে সব ফুল তুলিবার অধিকার তাহার আছে, কিন্তু প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল তুলিবার সময় যদি ঘটনাক্রমে—তাহারই অসতর্কতায়—তাহার অঙ্গুলীতে কণ্টক বিদ্ধ হয় তবে সে এমন ভাবে ক্রন্দন করিতে থাকে যে, মনে হয়, পৃথিবী দ্বিধা হইয়াছে এবং বিভাগের স্থান হইতে অগ্নিশিখা উদ্গত হইয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।

সরমার তাহাই হইতেছিল এবং সেই জন্যই তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহার পিতামহীর ও মাতার চিন্তার ও উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। তাঁহারা উভয়ে অনেক সময় সেই বিষয়ের আলোচনা করিতেন; কিন্তু মহেশচন্দ্রের সহিত তাহার আলোচনার চেষ্টা সর্ব্বদাই ব্যর্থ হইত। তিনি সে কথাকে আমল দিতেন না। অথচ সময় স্তম্ভিত ছিল না—সে বহিয়া যাইতেছিল এবং মহেশচন্দ্রের মাতার ও পত্নীর বিবেচনায় সরমা বিবাহের বয়সে উপনীত হইতেছিল। সেই সময়ের এক দিনের ঘটনার উল্লেখ এই গল্পের প্রারম্ভে করা হইয়াছে।

৫

মহেশচন্দ্রের মত বুদ্ধিমান এবং সংসারজ্ঞানসম্পন্ন লোক যে কন্যার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবাহের বিষয় চিন্তা করেন নাই, এমন মনে করিবার কারণ থাকিতে পারে না। তিনি সে কথার আলোচনা আপনার মনে বহুবার করিয়াছিলেন এবং অনেক বিবেচনার পর পাত্রও মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীনভাবে কায করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় কার্য্যব্যপদেশে তাঁহার সহিত যে বহু লোকের পরিচয় হয়, সরোজকুমার বসু তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি সে সময় কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টে ওভারশিয়ারের কায করিতেন। তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া অল্পবেতনে ট্রাষ্টে চাকরী লইয়াছিলেন এবং নিজের চেষ্টায় ও কার্য্যক্ষমতায় চাকরীতে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দক্ষতার তুলনায় তাঁহার পদোন্নতি হয় নাই এবং তাঁহার সাধুতাই তাহার কারণ। এই সাধুতার জন্য কোন কোন উপরওয়ালা য়ুরোপীয় তাঁহাকে ভয় করিতেন।

মহেশচন্দ্রের ব্যবসা যখন বিস্তারলাভ করে এবং কাযের জন্য তাঁহার উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন অনুভূত হয়, তখন তিনি মানুষ চিনিবার অসাধারণ দক্ষতায় বসু মহাশয়কেই আপনার কাযে সাহায্যার্থ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। উভয়ে ব্যবসার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয় এবং মহেশচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন, তাঁহারা উভয়ে একযোগে কায করিলে উভয়েরই যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইবে। বসু মহাশয় যেমন মহেশচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, মহেশচন্দ্র তেমনই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বসু মহাশয় পোর্ট ট্রাষ্টের কায ত্যাগ করিয়া মহেশচন্দ্রের কাযে যোগ দেন—লাভলোকসান সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা লিখাপড়া হয়। ট্রাষ্টের কায ছাড়িবার সময় বসু মহাশয়ের যে সামান্য সঞ্চয় ছিল, তাহার সহিত "প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের"

টাকা যোগ করিয়া তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করান। গৃহের জন্য মহেশচন্দ্র অগ্রিম টাকা দিতে চাহিলে বসু মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন। তিনি একটি স্কুলে শিক্ষকের কায করিতেন। তিনি পুত্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, পুত্র তাহা পালন করা তাঁহার কর্ত্তব্যই মনে করিয়া আসিয়াছেন—সযত্নে চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিবে, উহা এক বার মলিন হইলে আর উহার মর্য্যাদা থাকে না; ক্রোধ জয় ও লোভ সংযত করিবে; অঋণী ও অপ্রবাসী হইবার চেষ্টা করিবে। বসু মহাশয়ের দুই পুত্র ও এক কন্যা। তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রমেই অকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন। তখন তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছেন—পুত্রদ্বয় বিদ্যালয়ে। তাঁহার সন্তান তিনটিই দেখিতে সুন্দর—তিন জনই পিতার শিক্ষায় নানা গুণে গুণী হইয়াছেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুবীর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্ব-পরিচয় দিয়া একটি কলেজে অধ্যাপকের কায করিতেছিল; সে বলিত, ছেলে-পড়ান তাহার কৌলিক কায। কনিষ্ঠও তীক্ষ্ণবুদ্ধি। বসু মহাশয় স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহারা যেন মহেশচন্দ্রকেই অভিভাবক মনে করিয়া সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শে চালিত হয়েন। তাঁহারা সে উপদেশ নিষ্ঠা সহকারে পালন করিয়া আসিয়াছেন। বসু মহাশয় যে স্থানে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া গিয়াছিলেন মহেশচন্দ্রই তথায় তাহার বিবাহ দিয়াছেন। কনিষ্ঠ সুধীর তখনও কলেজে পড়িতেছিল—তাহার ইচ্ছা ছিল, সে আইনব্যবসায়ী হইবে। এই সুধীরকেই মহেশচন্দ্র কন্যার জন্য পাত্র মনোনীত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকালের পরিচয়ে বসু পরিবারের পুত্রদ্বয়কে উত্তমরূপে জানিতেন এবং তাহারাও তাঁহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার পরিবারের সহিত সেই পরিবারের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল। বসু মহাশয় তাঁহার মাতাকে "মা" বলিয়া ডাকিতেন এবং নারায়ণীও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন—তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ ব্যথিতা হইয়াছিলেন। সুবীর ও সুধীর তাঁহাকে "ঠাকুরমাই" বলিত। বাল্যকালাবধি তাহারা "বাড়ীর ছেলেরই" মত মহেশচন্দ্রের গৃহে আসিয়াছে এবং এখনও মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে। তাহাদিগের মাতাও পূর্ব্বে প্রায়ই মহেশচন্দ্রের গৃহে আসিতেন; কিন্তু বিধবা হইয়া তিনি আর কোথাও যাইতে চাহেন না; কেবল একান্ত প্রয়োজনে—সম্পদে নহে—বিপদে কন্যার গৃহে যাইতেই হয়। সেই জন্য নারায়ণী কখন কখন যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আইসেন। মহেশচন্দ্রের গৃহ হইতেই সুবীরের বিবাহ হইয়াছিল। আর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণী যখন তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বিশেষ জিদ করিয়া বসুগৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে মহেশচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"খুব কষ্ট পেয়েছ ত?" তখন নারায়ণী উত্তর দিয়াছিলেন, "যে বৌ সঙ্গে ছিল—এতটুকু কষ্ট হ'তে দেয় নি।"

মহেশচন্দ্র সুধীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। সরমা যখন পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করিল, তখন তিনি এক দিন মাতাকে ও পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি সুধীরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে চাহেন—তাহাতে কি তাঁহাদিগের কোন আপত্তি আছে? কন্যাপক্ষ হইতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না—সুমতি কো[ন] আপত্তি করিলেন না। কিন্তু পাত্রপক্ষ হইতে যে আপত্তির কার[ণ] থাকিতে পারে—থাকাই সম্ভব, তাহা নারায়ণী প্রস্তাবটি শুনিয়া মনে করিলেন। তিনি সে আপত্তি প্রকাশ করিবেন কি না ভাবিলেন; কিন্তু যখন সরোজকুমারের কথা তাঁহার মনে হই[ল] এবং তিনি তাঁহার পত্নীর ব্যবহার স্মরণ করিলেন, তখন তিনি সে আপত্তি প্রকাশ না করাই অন্যায় মনে করিলেন। পুত্রে[র] বুদ্ধি-বিবেচনায় তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল; তাই তিনি স্থি[র] করিলেন, সে আপত্তি প্রকাশ করিবেন—তাহার পর পুত্র যাহ[া] ভাল বিবেচনা করেন, করিবেন। তিনি বলিলেন, "আপত্তি[র] কোনই কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু বিধবার সংসার—দু'টি মাত্র ছেলে ও ছেলে লাখে একটি; কিন্তু বৌমা'র কি বড়[র] মত ছোট বৌটিকেও কাছে রাখতে আগ্রহ হ'বে না?" সরমা তাঁহার নাতিনী হইলেও তিনি জানিতেন—মধ্যবিত্ত গৃহস্[থ] সরোজকুমারের সংসারের সহিত তাহার সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে না। সে সংসার শান্তিস্নিগ্ধ—বড় বধূ ছায়া সেই পরিবেষ্টনে তাহারই উপযুক্ত হইয়াছে; সরমা অন্যরূপ। বিশেষ বসুপত্নী পুত্রদ্বয়কে ও কন্যাকে যেরূপ ভালবাসেন, তাহাতে তিনি যে সুধীর তাহার শ্বশুরের গৃহে বাস করিলে সুখী হইবেন, সে বিশ্বাস নারায়ণী করিতে পারিলেন না।

মাতার কথা মহেশচন্দ্রকে একটু চিন্তিত করিল। ট্রেণ যখন বেগে অগ্রসর হয়, তখন সম্মুখে লাইনের উপর স্থাপিত কোন বাধা দেখিলে চালক যেমন সহসা ট্রেণ থামাইয়া ফেলে এবং ট্রেণটি কাঁপিয়া উঠে তেমনই তিনি বাধা পাইয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন।

কিন্তু কন্যার সম্বন্ধে তাঁহার স্নেহ যেমন অন্ধ—কন্যার ভবিষ্যৎ সুখের জন্য তাঁহার আগ্রহও তেমনই অত্যন্ত অধিক। সেই অন্ধত্ব ও সেই আগ্রহ তাঁহার মাতার দ্বারা প্রদর্শিত বাধা দূর করিতেই সাহায্য করিতে লাগিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন—তাঁহার ঐশ্বর্য্য অর্জ্জনে সরোজকুমারের কার্য্য উপেক্ষণীয় নহে-কাযেই সরোজকুমারের পৌত্ররা যদি তাহা পায়, তাহা সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়ই হইবে। তাহার পর—কত লোকের পুত্রগণ ত বিদেশে কায করে, সুতরাং সুধীর যদি তাঁহার নিকটেই থাকে, তাহাতে তাহার মাতার কেন বিশেষ আপত্তি হইবে? বিশেষ সে-ও যেমন যখন ইচ্ছা যাইয়া মাতাকে ও ভ্রাতাকে দেখিয়া আসিতে পারিবে, সরমাও যে কখন কখন যাইবে না, তাহাও নহে। আর সরমার পুত্রকন্যা হইলে সুধীরের মাতাও কি তাঁহার গৃহে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন? তিনি কত স্নেহশীল তাহা মহেশচন্দ্র জানিতেন—তিনি পুত্রদিগকে "বাবা" ও কন্যাকে "মা" ব্যতীত অন্য সম্বোধন করিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সরমা কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করিবে না। তিনি তাহার কোন ত্রুটি দেখিতে পাইতেন না।

মনের মত "কাপুরুষ" আর নাই, তাহাকে যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়, সে তাহাই বুঝে এবং বুঝিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। মহেশচন্দ্রের মনও বিশ্বাস করিতে লাগিল, সরমার সহিত সুধীরের বিবাহ হইলে বসু মহাশয়ের পরিবারের কোন অসুবিধা হইবে না।

সুমতিকে তিনি যখন তাঁহার যুক্তি জানাইলেন, তখন সুমতি তাহার ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ, স্বামীর

ব্যক্তিত্বের বিরাটত্বে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইতে পারে নাই বলিলেই হয়—বড় গাছের ছায়ায় যে গাছ অবস্থিত থাকে, তাহারই মত দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু নারায়ণী অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন, যে রঞ্জিত কাচের মধ্য দিয়া পৃথিবী দর্শন করে, সে যেমন পৃথিবী সেই কাচের বর্ণে রঞ্জিত দেখে, মহেশচন্দ্র তেমনই আপনার স্বার্থের মধ্য দিয়া বিষয়টি দেখিয়া ভুল করিতেছেন। সরমার সুখ তাঁহার একান্ত কাম্য হইলেও তিনি সহজে এই বিবাহে সম্মতি দিতে পারেন না; কারণ, সরোজকুমারের পত্নীকে ও পুত্রকন্যাদিগকেও তিনি ভালবাসিতেন; তাহারা যে এই বিবাহে অসুখী হইতেও পারে এ চিন্তা তিনি কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। সরোজকুমারের বিধবা যখন তাঁহার সহিত তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলেন, সেই সময়ের কথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। সুধীর ও সুধীর যে বার বার তাঁহাকে বলিয়াছিল, "ঠাকুরমা, আপনি মা'কে দেখবেন। মা কখন আমাদের ছেড়ে কোথাও যা'ন নি—উনি কখন আপনার দিকে চেয়ে দেখেন না।" হাওড়া ষ্টেশনে মা'কে ট্রেণে তুলিয়া দিয়া বিদায় কালে সেই প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদ্বয় অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। আর তাহাদিগের মাতা? পুত্রদ্বয়ের ও কন্যার কল্যাণ ব্যতীত যে তাঁহার আর কোন কামনা ছিল না, তাহা প্রত্যেক স্থানে দেব-মন্দিরে দেবতার নিকট তাঁহার প্রার্থনায় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর পুত্রদিগের কথায় তিনি বহু বার বলিয়াছেন, স্বামীকে হারাইবার পর তাহারা কোন দিন তাঁহার নিকট কোন আব্দার করে নাই, পাছে কোন বিষয়ে তাঁহার কোন অসুবিধা হয়, তাহারা কেবল সেই চিন্তাই করিত। শিশুরা যেমন মা'কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—তেমনই ভাব তাহাদিগের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত। এই বিবাহে তাঁহাকে যে পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে, তাহা মাতা ও পুত্র কাহারও পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইবে না। আর সরমা যে মাতার প্রতি সুধীরের মনোভাবের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আপনার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে, সে সম্ভাবনার সুদূরপরাহতত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। এই সকল বিবেচনা করিয়া নারায়ণী পুত্রকে বলিলেন, সরোজকুমার জীবিত থাকিলে তিনি এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেন না—কিন্তু তাঁহার বিধবা যদি কেবল মহেশচন্দ্রের প্রস্তাবে আপত্তি করিতে না পারিয়া—অনিচ্ছায় তাহাতে সম্মতি দেন, তবে তাহা কি বাঞ্ছনীয় হইবে? তিনি পুত্রকে সেইটুকু চিন্তা করিয়া কাষ করিতে বলিলেন।

কথার গুরুত্ব তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—কে তাহা বলেন, কখন তাহা বলা হয়, আর কি বলা হয়। এ ক্ষেত্রে মা তাহা বলিলেন বলিয়াই মহেশচন্দ্র তাহাতে কিছু গুরুত্ব আরোপ করিলেন। কিন্তু মা যখন সে কথা বলিলেন, তখন মহেশচন্দ্রের মন প্রস্তাবের দিকে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। আর যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা মহেশচন্দ্রের স্বার্থবিরুদ্ধ। কাযেই পাল্লা কোন্ দিকে ভারী হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মহেশচন্দ্র মাতাকে বলিলেন, তিনি বসু মহাশয়ের পত্নীর নিকট প্রস্তাবটি করিয়া দেখিবেন—তিনিই বা কি মত প্রকাশ করেন।

শুনিয়া নারায়ণী আর কোন কথা বলিলেন না; তিনি পুত্রের প্রকৃতি জানিতেন—তিনি কোন বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলে বাধা পাইলে তাঁহার সঙ্কল্প শিথিল না হইয়া কেবল দৃঢ়তর হয়। বসু মহাশয়ের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করা যে কেবল তাঁহার সম্মতি পাওয়া তাহা তিনি বুঝিলেন; কারণ, তিনি জানিতেন, মহেশচন্দ্র কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বসু পরিবার তাহাতে অসম্মতি দিবেন না। তাঁহারা মহেশচন্দ্রকে অভিভাবক বলিয়াই বিবেচনা করিতেন এবং অভিভাবকের সম্মানই প্রদান করিতেন। তিনি সরমার সহিত সুধীরের বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাহাতে সুধীরের মাতার যত আপত্তিই কেন থাকুক না, তিনি মুখ ফুটিয়া সে আপত্তি ব্যক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রস্তাবটি তাঁহার মনঃপুত হইল না—সরমার জন্য নহে, সুধীরের জন্য। তিনি আপত্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

নারায়ণী যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই সত্য—মহেশচন্দ্রের বসু মহাশয়ের পত্নীকে জিজ্ঞাসা কেবল মাতার আপত্তি খণ্ডন করা—তিনি জানিতেন, তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইবে না। সুতরাং সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি বিবাহের উদ্যোগ আয়োজনের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন—অপেক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিলেন না।

৬

মহেশচন্দ্র আপনিই সরোজকুমারের গৃহে গমন করিলেন। সুধীর ও সুধীর তাঁহার কণ্ঠস্বর পাইয়াই আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহাদিগের ভগিনী ও তাহার স্বামী, পুত্র, কন্যা কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "বৌদিদিকে বল, আমি একটা পরামর্শ করতে এসেছি।"

সুধীর মা'কে সংবাদ দিতে গেল। সেই সময় ভৃত্য সুধীরের শিশু পুত্রকে লইয়া যাইতেছিল; মহেশচন্দ্র তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। সুধীর আসিয়া সংবাদ দিল, তাহার মাতা দ্বারের অপর পার্শে আসিয়াছেন।

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "বৌদিদি, চিত্রা যেমন আপনার মেয়ে, সরমাও তাই। আপনি তা'কে নিন। আমি প্রস্তাব করতে এসেছি, আপনি সুধীরের সঙ্গে তা'র বিয়েয় মত দিন।"

সুধীর স্থানত্যাগ করিয়া যাইয়া দাদাকে পাঠাইয়া দিল। সুধীরকে মহেশচন্দ্র তাঁহার প্রস্তাবটি জানাইলে সে দ্বারের অপর পার্শ্বে গেল এবং আসিয়া বলিল, "মা বলছেন, বাবা ত আপনাকেই আমাদের অভিভাবক ক'রে গেছেন। আপনি আমাদের হিতই দেখবেন। মা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আপনাকে সংবাদ দিতে আমাকে পাঠাবেন।"

মহেশচন্দ্র "ভাল" বলিয়া গমনোদ্যত হইলে সুধীর বলিল, "মা বলছেন, একটু কিছু খেয়ে যা'ন।"

"আর এক দিন এসে বৌদিদির হাতের রান্না খেয়ে যা'ব। সরমাকেও আনব?"

সুধীর বলিল, "মা বলছেন, কবে আসবেন?"

"সে আমি তোমাকে ব'লে দেব"—বলিয়া মহেশচন্দ্র বলিলেন, "বৌদিদি, আমার ব্যবসা—টাকা সবই আমি আর বসু মহাশয় দু'জনে করেছি; সে সব আমার দৌহিত্র—তাঁর পৌত্র পা'বে জেনে যদি মরতে পারি, তবে সুখে মরব।"

মহেশচন্দ্র চলিয়া যাইলে মা বাহিরের ঘরে আসিয়া পুত্রদ্বয়কে বলিলেন, "শুনলি ত? এখন কি করা যা'বে?"

উভয় ভ্রাতার মুখই চিন্তা-গম্ভীর—সুধীরের মুখে তাহার সঙ্গে যেন আতঙ্কের ভাব। কেহই কোন কথা বলিল না।

মা বলিলেন, "ওঁর কথা আমরা কোন দিন অমান্য করি নাই। এখন কি করবি?"

সুধীর বলিল, "মা, আমি বিবাহ করব না; যদি কখন করি, 'বড় মানুষের' ঘরে নহে।"

"বাবা, আমি ধনীর মেয়েও নই, ধনীর ঘরেও পড়ি নাই; ধনীর মা হ'বার সাধও আমার নাই। আমি কেবল ভাবছি, ঠাকুরপো কেন এ প্রস্তাব করলেন—আর যদি করলেন,তবে আমরা কি করব?"

"মা, এ অনুগ্রহ যে আমাদের একান্তই নিগ্রহ হ'বে।"

"সে ভয় কি তোর চেয়ে আমার কম হচ্ছে, বাবা?" যাহাদিগকে লইয়া তিনি সংসারে স্বর্গসুখ লাভ করেন—বিধবা হইয়া সংসারে আশক্তি বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহাদিগের মধ্যে সুধীর আর তাঁহার কাছে থাকিবে না—এ চিন্তাও যেন তাঁহার পক্ষে দুঃসহ। আর সুধীরই কি সুখে থাকিবে? যে পরিবেষ্টনে সে অনভ্যস্ত সেই পরিবেষ্টনে কি সে সুখী হইবে? তাহার পর সরমার সহিত তাহার বিবাহ! সরমাকে তিনি শৈশবাবধিই দেখিয়া আসিতেছেন; তাহার পিতামহী ও মাতাও বহু বার বলিয়াছেন, মহেশচন্দ্রের অতিরিক্ত আদরে সে যে ভাবে গঠিত হইতেছে, তাহাতে সে কিরূপে স্বামীর ঘর করিবে, তাহাই তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয়। সে কি তাঁহার ঘরে আসিয়া সুখী হইতে পারিবে? সর্ব্বোপরি কথা—তাহাকে বিবাহ করিয়া কি সুধীর সুখী হইতে পারিবে?

এই সব চিন্তা মা'কে ব্যাকুল করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি কিরূপে মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন?

মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব বসু পরিবারের পক্ষে বিশেষ চিন্তার কারণ হইল। এইরূপ প্রস্তাব অন্য কেহ করিলে তাঁহারা যে দৃঢ়তা সহকারে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মহেশচন্দ্রকে তাঁহারা সেরূপ ব্যবহারে ব্যথিত করিতে পারেন না।

মা'র নিয়ম ছিল, তিনি সংসারের সুখ-দুঃখের—আপদ-সম্পদের কোন কথা পুত্র কন্যা পুত্রবধূর নিকট গোপন রাখিতেন না। তিনি মনে করিতেন, কোন বিষয় গোপনে রাখিলে যদি কাহারও মনে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের উদ্ভব হয়, তবে সেই সন্দেহ বর্দ্ধিত ও বিকৃত হইয়া পরিবারের শরীর বিষাক্ত করে; সুতরাং কোন বিষয় গোপন না করিলেই স্বাভাবিক অবস্থা আর অস্বাভাবিক হইতে পারে না। সংসার যাহাদিগের তাহাদিগের নিকট সংসারের কথা গোপন রাখিবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে?

তাঁহার নির্দ্দেশে সুধীর যাইয়া ভগিনীকে ও ভগিনীপতিকে লইয়া আসিল। সকলে মহেশচন্দ্রের প্রস্তাবের আলোচনা করিলেন। চিত্রা বাল্যাবধি বহুবারই মহেশচন্দ্রের গৃহে গিয়াছে, সুধীরের স্ত্রীও কয়বার তথায় গিয়াছে। সরমার সহিত সুধীরের বিবাহের প্রস্তাবে উভয়েই শঙ্কিতা হইল। তাহার ব্যবহারে উদ্ধত ভাবই নম্রতার স্থান অধিকার করিয়া আছে; সে যেন কাহাকেও সম্মান দেখান অপমান মনে করে। তাহার সহিত সুধীরের বিবাহ!

মা জামাতার বিষয়-বুদ্ধিতে বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন—সে তাহার পিতার ছোট ব্যবসা বড় করিয়া তাহা সুচারুরূপে পরিচালিত করিতেছে। তিনি বলিলেন, "বাবা, তুমি কি বল? সুধীরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই ও ত বলে—যদি বিশেষ বিচার-বিবেচনাই করবে, তবে অধ্যাপকের কথা গ্রহণ করবে কেন?"

জামাতা প্রভানাথ প্রস্তাবে সত্য সত্যই বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল। সে বলিল, এ বিবাহের প্রস্তাবে যখন কাহারও আগ্রহ নাই, তখন ইহা না করাই ভাল—কিন্তু মহেশচন্দ্র এই পরিবারের অভিভাবকস্থানীয়—তিনি ধনী—সরমা তাঁহার একমাত্র কন্যা; বিশেষ তিনিও বুদ্ধিমান ব্যক্তি—তিনি কি না বুঝিয়াই এই প্রস্তাব করিয়াছেন?

মা বলিলেন, "বাবা, আমি কেবলই ভাবছি, তোমার শ্বশুর মহাশয় বেঁচে থাকলে তিনি কি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন?"

প্রভানাথ বলিল, "সে কথাও আমাদের ভেবে দেখা উচিত। আপনারা যিনি মহেশ বাবুর কন্যাটিকে যতই কেন জানুন না, তিনি তা'র বাবা—তিনি যেমন জানেন, তেমন কেহই জানেন না। তিনি ইচ্ছা করলে দীন-দরিদ্রের ঘরের মূর্খ ছেলের সঙ্গে এ বিবাহ দিতে পারতেন; সে জামাতার পক্ষে এ বিবাহ এতই অপ্রত্যাশিত হ'ত যে, সে বিশেষ পোষ মানত। মহেশ বাবু যে তা' করেন নাই, তা'র কারণ, বোধ হয় এই যে, তিনি বুঝেছেন, সরমার যে চাপল্য আমরা চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য মনে করছি, তা' চরিত্রগত নহে—বয়সের সঙ্গে তা' দূর হয়ে যাচ্ছে—গিয়েছে। এমন দেখা যায় যে, যে মেয়ে অল্পবয়সে খুব চঞ্চল ও দুষ্ট থাকে, সে তা'র পর শান্ত শিষ্ট সুগৃহিণী হয়।"

মা যেন এই কথায় একটু আশ্বস্তা হইলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা যা' হয় স্থির কর।"

তিনি সকলের জন্য আহার্য্য আনিতে গমন করিলেন।

মা'র উপস্থিতিহেতু চিত্রা এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিল—কেবল ভ্রাতৃবধূ ছায়ার সঙ্গে মৃদুস্বরে দুই চারিটি কথা বলিতেছিল। মা চলিয়া যাইলে সে বলিল, "এই ত দু' বছর আগেও আমরা দেখে এসেছি—পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্নই পাই নি। ও ঘোড়ায় চড়া মেয়ে—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রভানাথ বলিল, "তোমরা যত দিন স্বামীর ঘাড়ে আসন না পাও, তত দিনই ও সব চলে। ঘোড়ায় চ'ড়ে যদি স্বামীকে রেহাই দেও—বেচারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

ইহাই প্রভানাথের স্বরূপ। সে কার্য্যস্থলে যেমন গম্ভীর ও "রাসভারী"—গৃহে তেমনই সদাপ্রফুল্ল—রঙ্গব্যঙ্গপরায়ণ।

ছায়া বলিল, "জামাই বাবু, দিদিমণি বলছেন, ওঁর ভাইয়ের ঘাড় অত ভারসহ নহে।"

প্রভানাথ গম্ভীর ভাবে বলিল, "এটা অভ্যাসেই হয়। আমার, কি তাঁ'র বড় ভাইটির ঘাড় কি আগে ভারসহ ছিল? 'স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে, অভ্যাসও কম প্রবল নহে।'—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ কথা ভুললে চলবে কেন?"

সুধীর বলিল, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নজির কিসে খাটল?"

"তা'ও বুঝতে পারলে না? সেই জন্যই ত বলে—পণ্ডিতের গুণই সব, কেবল দোষ এই যে তিনি মূর্খ। আমাদের স্বভাব—

এক জনকে ঘাড়ে বহন করি—এক জন ক্রমে একটি সংসারে দাঁড়ায়। আর বহন করাটা যখন অভ্যাসে দাঁড়ায়, তখন ভার বেশী হ'লেও কষ্ট হয় না—বরং মনে হয়, বড় হালকা।"

সুধীর বলিল, "চমৎকার মানবচরিত্র-বিচার!"

"তবে মহেশ বাবুর মেয়েটির সম্বন্ধে তোমরা সব যা' বলছ, তা'তে ওটি বড় বাবুর ঘাড়ে দিলে খুবই ভাল হ'ত।"

সুধীর বলিল, "আবার 'বড় বাবুর' ঘাড়ে কেন?"

"কেন না, তুমি সুধীর। জানই ত—

"বীর বিনা হায় রমণী-রতন
কা'রে আর শোভা পায় রে?"

কিন্তু সে কথা এখন আর ভেবে কায নাই—পরের জন্য শোক করিয়া লাভ নাই। বিশেষ ছায়া রাগ করবেন। ছোট বাবু সুধীর—উনিও অপাত্র ন'ন; কারণ, বীর্য্য অপেক্ষাও ধৈর্য্য—হিংসা অপেক্ষা অহিংসার মত—অধিক কার্য্যকরী। ধৈর্য্য সর্ব্বজয়ী—মহেশ বাবুর কন্যা ত তুচ্ছ।"

সুধীর বলিল, "ও সব প্রচারকার্য্য ছেড়ে এখন এই বিপদ হ'তে উদ্ধারের উপায় কি, তা'ই বল।"

এই সময় মা "জল খাবার" লইয়া আসিলেন।

প্রভানাথ বলিল, "এ প্রস্তাব বিপদ ব'লেই মনে করছ কেন?"

সুধীর বলিল, "মেয়েটির কথা ত শুনলে। আমাদের সঙ্গে কি কখন তা'র মিল হ'তে পারে?"

"কেন পারে না? বাপ-মা'র আদরে যে চাঞ্চল্য ছেলেমেয়েকে 'পেয়ে বসে, তা' কি চিরস্থায়ী হয়? তা'র পর একটি কথা, মহেশ বাবু যে তাঁ'র বন্ধুপরিবারের কল্যাণকামী, তা' ত আমরা অস্বীকার করতে পারি না।"

মা বলিলেন, "সে কথা অস্বীকার করলে অধর্ম্ম হ'বে, বাবা।"

"তবে কেনই বা মনে করব, তিনি বিচার বিবেচনা না ক'রে সুধীরের সঙ্গে তাঁ'র মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করেছেন?"

সুধীর কি বলিতে যাইতেছিল—বাধা দিয়া প্রভানাথ বলিল, "তুমি বলবে, তিনি অচল চালাচ্ছেন? তা' বলা যায় না—মেয়েটি রূপে অচল নয়; আর মহেশ বাবুর বিপুল সম্পত্তির জন্য মেয়ের ভাল সম্বন্ধের অভাব—এই কালে—হ'বে না। কেন না এটা এখন কাঞ্চন-কৌলিন্যের কাল। তবে যে তিনি সুধীরকেই জামাই কর'তে চাইছেন, সেটা খুব সম্ভব তাঁ'র পুরাণ কথা স্মরণ ক'রে—তাঁ'র ঐশ্বর্য্যের সৃষ্টিতে তাঁ'র বন্ধুর সাহায্যের কথা যে তিনি মনে রেখেছেন, তা'র প্রমাণও ত আমরা তাঁ'র ব্যবহারে পেয়ে আসছি।"

সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

প্রভানাথ তখন মা'কে বলিল, "তবে, মা, একটা কথা বলি—হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না। পরের মেয়ে, আপনার বড় বৌটির মত যে সে আপনার ছায়াই হ'বে—নাম সার্থক করবে, তা' না হ'তেও পারে। সেজন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন।"

মা বলিলেন, "আমার কথা কেন বলছ, বাবা? আমার ত যা'বার সময় হয়েছে। এখন তোমাদের সব সুখী দেখে যেতে পারলেই আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করব।"

"সে কি হয়, মা? আপনি গেলে 'শ্বশুর বাড়ী' আর থাকবে না। সরমা ত সরমা, ছায়াও তখন আর খোঁজ নেবে না। আপনার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"তোমরা কি স্থির করলে?"

"আর সকলে ভয় পেলেও আমি ভয় পাই না। তবে যখন আর সকলেরই এ বিবাহে আগ্রহ নাই, তখন প্রথমে যা'তে এ বিবাহ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, সেই জন্য বলা হ'ক, সুধীর এখন বিবাহ করতে অসম্মত—উকীল হয়ে তবে বিবাহ করবেন বলছেন; মহেশ বাবু যদি তবুও জিদ করেন, তখন কি করা কর্ত্তব্য আর এক দিন পরামর্শ করা যা'বে।"

আর কেহ অন্য কোন পথের সন্ধান পাইলেন না। কিন্তু কাহারও এই বিবাহ-প্রস্তাবে আগ্রহ দেখা গেল না।

প্রভানাথ ও চিত্রা যাইবা'র পূর্ব্বে সুধীর প্রভানাথকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কি সত্য সত্যই এই প্রস্তাবে সম্মত?

প্রভানাথ সুধীরের আশঙ্কা উপলব্ধি করিল এবং বলিল, সে মহেশ বাবুর সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া মনে করিতেছে, তাঁহার এই একটি অনুরোধ রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা সমীচীন হইবে না। সে সত্য সত্যই মনে করে, মহেশ বাবু অনন্যোপায় হইয়া এ প্রস্তাব করেন নাই—তাহার প্রতি স্নেহ ও তাহার সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ধারণাহেতুই করিয়াছেন। আর তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালী হিন্দু-কন্যা—চিরাগত সংস্কারের জন্যই পরিবর্ত্তিতা হইবে। তাহার পর সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "কথায় বলে স্পর্শ-মণি লোহাকেও সোণা করে; তোমার ভালবাসা এই মেয়েটিকে তোমার মনের মত করতে পারবে না?"

সুধীর মুখে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু মনে করিল, কোন কোন বস্তু কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হয় না।

সকলেরই মনের ভাব—যদি মহেশ বাবু জিদ না করেন, তবে ভাল হয়। কারণ, সকলেই বুঝিল—সরোজকুমার জীবিত থাকিলে তিনি কখন মহেশ বাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন না।

৭

সকলে যেরূপ স্থির করিলেন, তদনুসারে সুধীর যাইয়া মহেশচন্দ্রকে বলিল, সুধীর ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছে না।

শুনিয়া মহেশচন্দ্র বলিলেন, সে জন্য ভাবিতে হইবে না। তিনি বলিলেন, তিনি যাইয়া তাহার মাতার সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন।

সেই দিনই অপরাহ্নে মহেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সুধীরের দ্বারা তাহার মাতাকে জানাইলেন, সুধীরের পক্ষে কাযের ভার পাইলে আর ওকালতী পরীক্ষার জন্য পাঠের সময় থাকিবে না। তিনি বলিলেন, "বৌদিদিকে বল, আমি কি চিরকাল যুবকের মত খাটতে পারব? আমি সুধীরকে কায বুঝিয়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করব।"

সুধীরের মাতা কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। এক বার তাঁহার মনে হইল, বলেন, ছেলের মত নাই। কিন্তু তিনি তাহা বলিবেন কি করিয়া ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই মহেশচন্দ্র বলিলেন, তাঁহাকে এখনই এক স্থানে যাইতে হইবে; তিনি পরদিন পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়া দিনস্থির করিয়া জানাইবেন।

তিনি চলিয়া যাইলেন এবং গমনপথে প্রভানাথের গৃহে যাই-লেন। প্রভানাথ গৃহে ছিল না। তিনি চিত্রাকে ডাকাইয়া

বিবাহের কথা বলিয়া, বলিয়া যাইলেন, "মা, প্রভানাথকে বলিস, কাল এক বার আমার সঙ্গে দেখা করে। তা'কেই সব ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

চিত্রার এই বিবাহে বিশেষ আপত্তি থাকিলেও সে আর কিছু বলিতে পারিল না। বাল্যকালাবধি সে ও তাহার ভ্রাতারা মহেশচন্দ্রকে পিতৃবোর মতই মনে করিয়া আসিয়াছে। তাহাদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহারও স্নেহশীল আত্মীয়ের ব্যবহারের মত হইয়াছে। তাহার বিবাহাবধি প্রতি বৎসর তিনি দুর্গাপূজার সময় ও জামাই-ষষ্ঠীতে সমভাবে ব্যয়বহুল তত্ত্ব করিয়া আসিতেছেন। প্রতি বার তাহার ও ছায়ার প্রসবকালে সংবাদ পাইলেই নারায়ণী উপস্থিত থাকিয়াছেন এবং তাহার পর মূল্যবান অলঙ্কার দিয়া শিশুকে "দেখিয়াছেন"। প্রভানাথ বলিত, মহেশচন্দ্র তাহার "more than father-in-law" চিত্রা কি তাঁহার প্রস্তাব রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতে পাবে ?

প্রভানাথ গৃহে ফিরিয়া যখন স্ত্রীর নিকট মহেশচন্দ্রের কথা শুনিল, তখন মুখে হাসিয়া বলিল বটে, "এ যে সেই—আমি এলাম, আমি দেখলাম, আমি জয় করলাম!"—কিন্তু মনে মনে ভাবিল, কাযটা অকারণ শীঘ্র হইতে চলিল। এ বিবাহে সুধীরের যে আপত্তি আছে তাহা জানিয়া সে চিন্তিত হইয়াছিল। সেই চিন্তা বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু সে-ও অব্যাহতিলাভের কোন উপায় সন্ধান করিতে পারিল না।

পরদিন সে মহেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি দিন-স্থির করিয়া বলিয়া দিলেন, "বাবা, তোমাকেই সব ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

প্রভানাথ যখন শ্বশুরালয়ে যাইয়া সেই কথা জানাইল, তখন সে গৃহে যেন অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য বিরাজ করিতে লাগিল।

অভিযুক্ত ব্যক্তি নিরপরাধ হইয়াও দণ্ডিত হইলে যে ভাবে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করে, সুধীর সেই ভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিল।

৮

নির্দ্দিষ্ট দিনে সুধীরের সহিত সরমার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে বরপক্ষে কাহারও আগ্রহ বা আনন্দ ছিল না—কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কার অন্ত ছিল না। কন্যাপক্ষেও সরমার পিতামহীর ও মাতার আশঙ্কা ছিল। কেবল মহেশচন্দ্রের আগ্রহেই বিবাহ হইয়া গেল। যে সৌভাগ্যহেতু আকাশে লোক যে স্থানে নিবিড় অন্ধকার দেখে, তিনি সেই স্থানে তারকা দেখিতে পাইতেন সেই সৌভাগ্য যে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে না, তাঁহার তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। নারায়ণী চেষ্টা করিয়াও সরমার মনোভাব বুঝিতে পারেন নাই। বাহিরের লোক কিন্তু বলাবলি করিল—সুধীর অসাধারণ ভাগ্যবান—"একেই বলে পাতা-চাপা কপাল। সৌভাগ্য বটে! কি সম্পত্তিরই অধিকারী হ'ল!"

বিবাহের পর বরবধূ বসু মহাশয়ের গৃহে আসিল বটে, কিন্তু তাহার পর সরমার তথায় আগমন একরূপ বন্ধই হইল। সরমার পিতামহী ও মাতা যে তাহার মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে গমনে আপত্তি করিতেন তাহা নহে—বরং তাঁহারা তাহার পক্ষপাতীই ছিলেন; মহেশচন্দ্রেরও তাহাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু সরমার তাহা ভাল লাগিত না। সে যে ভাবে পালিতা হইয়াছিল, তাহাতে সে কোনরূপে অধীনতা সহ্য করিতে চাহিত না—স্নেহের অধীনতা তাহার বিবেচনায় সম্ভ্রমহানিকর মনে হইল।

বিবাহের পরই মহেশচন্দ্র তাঁহার ব্যবসার ভার সুধীরকে [illegible] আপনি তাহাতে পথিনির্দেশ করিতে লাগিলেন। অসাধা[illegible] কার্য্যতৎপরতায় ও কার্য্যে নিষ্ঠাহেতু সুধীর অল্প দিনের মধ্যে সে ভার বহনের উপযুক্ত হইল। মহেশচন্দ্র বলিতেন, "[illegible] মহাশয়ের পুত্র—এ কাযে তোমার অশিক্ষিত পটুত্ব আছে।

কিন্তু সুধীর কর্ত্তব্য মনে করিয়াই কায করিত—ক[illegible] কার্য্য সুসম্পন্ন করায় যে আনন্দ তাহার মনে, তা[illegible] অধিক আনন্দ লক্ষিত হইত না। সে সর্ব্বদাই স্বগৃহে যাই[illegible] সুযোগের অপেক্ষায় থাকিত। মাতা ও ভ্রাতা তাহাকে [illegible] ভালবাসেন—তাহার সঙ্গচ্যুতি তাঁহাদিগের কত বেদনার কা[illegible] হইয়াছে, তাহা সে জানিত। সে জন্য তাহার বেদনা দিয়াই তাঁহাদিগের বেদনা বিচার করিয়া বঝিত। ছায়ার ভ্রাতা [illegible] না—সে সুধীরকে পাইয়া ভ্রাতার অভাব ভুলিয়াছিল। তা[illegible] পুত্রটিও সুধীরের বিশেষ অনুগত ছিল। সুধীর নিজগৃহে যাই[illegible] —তাহার মোটর যানের বাঁশীর শব্দ শুনিয়া সর্ব্বাগ্রে তা[illegible] পালিত কুকুর দ্বারে ছুটিয়া আসিত; আর—যেন সেই সঙ্কেতে[illegible] তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সমীর "কাকা! কাকা!"—ডাকিতে ডাকি[illegible] আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহারা যেন তাহার আগমন-প্রতীক্ষ[illegible] থাকিত।

সে যে এই বিবাহে সুখী হয় নাই, তাহা তাহার মাতা, ভ্রা[illegible] ভ্রাতৃজায়া, ভগিনী ও ভগিনীপতি সকলেই জানিতেন এবং জানিতে[illegible] বলিয়াই—তাহার প্রতি স্নেহহেতু—সে কথার উত্থাপন করিতে[illegible] না। তাহার মাতা সর্ব্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতে[illegible] —তাহার এই দুঃখী পুত্রটি যেন সুখী হয়।

সুধীর যখনই পারিত যাইয়া ভগিনীকে ও তাহার পু[illegible] কন্যাদিগকে দেখিয়া আসিত। তাহার সদাপ্রফুল্ল মুখে বিষাদ[illegible] গাম্ভীর্য্যলেপ দিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া চিত্রা অশ্রু সম্ব[illegible] করিতে পারিত না। প্রভানাথ আপনার কাযের মধ্যেও সম[illegible] করিয়া মধ্যে মধ্যে মহেশচন্দ্রের গৃহে সুধীরকে দেখিতে যাইত কিন্তু সে সরমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাব করিলে সুধীর [illegible] ভাবে বলিত, "সে ভাগ্য ত কর নাই"—তাহাতে যে বেদনা থাকি[illegible] তাহা প্রভানাথকে ব্যথিত করিত। এক বার সে বলিয়াছি[illegible] "মহেশ বাবুর কন্যাকে দেখিবার ভাগ্য না পেয়ে থাকি—চিত্রা ভাজকে দেখে যা'বে না? তোমার স্ত্রীকে দেখে না গেলে চিত্র[illegible] কি ভাববে?" সুধীর উত্তর দিয়াছিল, "আমার স্ত্রী! এ যে আমা[illegible] শ্বশুরবাড়ী—এখানে আমি তাঁ'র স্বামীমাত্র।" সে দিন গৃহে ফিরিয়া প্রভানাথ যখন চিত্রাকে সে কথা বলিয়া বলিয়াছি[illegible] "আমরাই সুধীরের জীবনটা সুখহীন করেছি"—তখন চিত্রার দুঃ[illegible] অবিরল অশ্রুধারায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

চিত্রা ও ছায়া বহু বার পরামর্শ করিয়াছে—তাহারা যাই[illegible] সরমাকে বুঝাইবে—তাহাদিগের সম্বন্ধেও তাহার কর্ত্তব্য আছে[illegible] সুধীর তাহাদিগকে সে কাযে বাধা দিয়াছে। যে কারণে সে প্রভানাথকে সরমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিত, সে[illegible] কারণেই চিত্রার ও ছায়ার প্রস্তাবে সে বাধা দিত—পাছে তাহা[illegible] আপনাদিগকে অপমানিত মনে করে।

শ্বশুরালয়ে অন্য সকলের সহিত ব্যবহার অপেক্ষাও স্ত্রীর সহিত ব্যবহারে সুধীর অধিক সতর্কতাবলম্বন করিত—যাহাতে কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহারের উদ্ভব না হইতে পারে, তাহাই করিত। পরিশুদ্ধ জলে যেমন জলের কায নির্ব্বাহ করা যায় বটে, কিন্তু কোন স্বাদ থাকে না, তেমনই স্ত্রীর সহিত তাহার ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে যথাযোগ্য হইলেও তাহাতে উচ্ছ্বাস বা আবেগ থাকিত না। সেইরূপ ব্যবহারের সীমায় আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখা যে অসাধারণ চেষ্টার ফল তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, বর্ষাকালে নদী যেমন স্বভাবতঃই কূল অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত ও উদ্বেল প্রবাহে সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়, যৌবনে ভালবাসা তেমনই আবেগের আতিশয্য লইয়া প্রেমাস্পদকে বেষ্টিত করিতে চাহে।

সুধীর আপনাকে মহেশচন্দ্রের পরিবারের এক জন মনে করিত না—সে পরিবারে সে পর। প্রথম জামাই সুধীর তত্ত্ব মহেশচন্দ্র সুধীরের পৈত্রিক গৃহেই পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরবার তিনি—পূর্ব্বপূর্ব্ববারের মত প্রভানাথের জন্য তত্ত্বই তথায় পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাই পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিলেন; আর সুধীরের বস্ত্রাদি তাঁহার গৃহেই জামাতাকে দিয়াছিলেন। সে সব তাহার আলমারীতেই রক্ষিত হইয়াছিল—সে কখন ব্যবহার করে নাই। বিলাসবিমুখ সুধীর তাহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পিত্রালয় হইতে আনিত।

এ সব নারায়ণী ও সুমতি লক্ষ্য করিতেন এবং লক্ষ্য করিয়া দুঃখিতা ও শঙ্কিতা হইতেন। কিন্তু তাঁহারা সুধীরের ব্যবহারে এমন কোন ত্রুটি পাইতেন না যে, তাহা অবলম্বন করিয়া তাহার সহিত এ বিষয়ের কোন আলোচনা করিবেন।

মহেশচন্দ্র তাহার কার্য্যে আগ্রহ ও নিষ্ঠা দেখিয়া প্রীত হইতেন—সময় সময় বলিতেন, সুধীর বসু মহাশয়ের পুত্র—যেন সহজাত সংস্কারে কায বুঝিয়া লইয়াছে, তাঁহাকে আর কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেন না, পাছে কোথাও কোন ত্রুটি হয়, সেই ভয়ই সুধীরকে কার্য্যে অত্যধিক মনোযোগী করিত। সে সব কায কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই সম্পন্ন করিত।

৯

সুধীরচন্দ্রের ব্যবহারে যদি স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস চেষ্টায় ক্ষুণ্ণ না হইত, তবে হয় ত স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়মে প্রবর্ত্তিত হইত। কারণ, ভালবাসাই স্বামিস্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং সেই আকর্ষণ অনেক অভ্যাস, অনেক ত্রুটি সংশোধনের কারণ হয়। তাই তাহার ব্যবহারে সরমার প্রেমও তাহার অভ্যাসের ত্রুটি দূর করিতে পারে নাই।

যখন সরমার প্রথম সন্তান পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, তখন নারায়ণী ও সুমতি আশা করিলেন, এই বার স্বামিস্ত্রীর ভাবের বাহ্যিক পরিবর্ত্তন হইবে। সে সময় দিনকয়েক সুধীরের মাতা, ছায়া ও [illegible] পুনঃ পুনঃ মহেশচন্দ্রের গৃহে আসিলেন এবং তাঁহারা সরমা[illegible]কে যেরূপ আদর করিলেন, তাহাতেই বুঝা গেল, তাঁহারাও যেন স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করিলেন।

সুধীর শিশু ভালবাসিত—সুবীরের ও প্রভানাথের পুত্র-কন্যারা তাহার একান্ত আদরের ছিল। সে যখনই সুবিধা পাইত, তাহাদিগকে দেখিতে যাইত। আপনার পুত্রের প্রতি তাহার স্নেহও স্বভাবতঃ বিকশিত হইল। কিন্তু সে তাহার সেই স্নেহও সংযত করিত—পাছে সরমা তাহাতে বিরক্ত হয়।

নারায়ণী ও সুমতি তাহার ভাব লক্ষ্য করিতেন—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলাবলি করিতেন "কি অদৃষ্ট! মেয়েটা নিজেও সুখী হ'ল না—সুধীরের জীবনও সুখহীন হ'ল!"

মা বা স্ত্রী কেহই সে কথা সম্পূর্ণভাবে মহেশচন্দ্রকে বলিতেন না। তাঁহারা মনে করিতেন, যাহা ফিরাইবার নহে, তাহার কথা বলিয়া মহেশচন্দ্রকে দুঃখিত করা কেবল আর এক জনের দুঃখ বৃদ্ধি করা। কোন দিন যদি তাহাদিগের কোন কথায় মহেশচন্দ্র সে বিষয়ের আভাস পাইতেন, তাহা হইলে তিনি তাহাতে গুরুত্ব আরোপ করিতেন না। যে জীবনে কখন কোন কালে ঠকে নাই, সে কি সহজে মনে করিতে চাহে, সে ঠকিয়াছে? তিনি বলিতেন, "তোমাদের সব ভ্রান্ত ধারণা। আমার এত বড় কায যেন মুঠার মধ্যে এনেছে। ছেলে বটে! কায নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তোমরা ভুল বুঝ।" তিনি স্বয়ং যাহাকে "কায-পাগল" বলে তাহাই ছিলেন; সুধীরের কার্য্যে একাগ্রতা তাহাকে বিশেষ প্রীত করিত। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেন না, তাহার সেই একাগ্রতা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং তাহার নিকট সেই কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য মাত্র, তাহাতে আনন্দ নাই।

এইরূপে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। মাতৃত্ব সরমার প্রকৃতিতে যে কোন পরিবর্ত্তন করিল না, তাহা নহে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন দুই কারণে পুষ্ট হইতে পারিল না। প্রথম কারণ, তাহার দীর্ঘ দিনের যে অভ্যাস যেন ধাতুগত হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তনের কোন কারণ ঘটিল না। দ্বিতীয় কারণ, স্বামিস্ত্রীর মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইল না।

কিন্তু সুধীর সর্ব্বদাই মনে করিত, পুত্রের সম্বন্ধে তাহার বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে॥ সেই জন্য পুত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে অবহিত ছিল, তাহাকে কেহ অন্যায় কার্য্যে বাধা না দিলে সে বিরক্ত হইত। পুত্র সত্যব্রত পিতার প্রতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল। কে ভালবাসে, তাহা শিশুরা সহজাত সংস্কারবশে বুঝিতে পারে।

পুত্রের বয়স যখন দুই বৎসর অতিক্রম করিয়া তিনের শেষ সীমার সন্নিহিত হইল, সেই সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বৈশাখ মাস—কয় দিন বৃষ্টি হয় নাই—গরম দুঃসহ। সে দিন কয়টা কাযের জন্য ঠিকার আবেদন দিতে হইয়াছিল—বেলা দশটা হইতে সুধীর এঞ্জিনিয়ার, মিস্ত্রী প্রভৃতির সহিত হিসাব করিয়া যখন কায শেষ করিল, তখন অপরাহ্ণও অতিক্রান্ত। শরীর অবসন্ন মনে হইতে লাগিল। সে বাড়ীর বাগানে বেড়াইয়া আসিবে বলিয়া বাহির হইল।

বারান্দায় বাড়ীর বৃদ্ধ ভৃত্য তাহার পুত্রকে লইয়া বসিয়া ছিল—মোটর আসিলে তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইবে। সে সময় সে দিকে কাহারও আসিবার সম্ভাবনা ছিল না। ভৃত্য বিড়ি টানিতেছিল আর ধূম শিশুর মুখের উপর দিতেছিল—সত্যব্রত চক্ষু মুদ্রিত করিতেছিল। শিশু তাহার বিড়িটি কাড়িয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলে পাছে হস্তে অগ্নিস্পর্শ হয় সেই ভয়ে ভৃত্য বিড়িটা সরাইয়া ফেলিয়া বলিল, "এখন নয়, বাবু—বড় হও, তা'র পর চুরুট খা'বে।"

দেখিয়া ও কথা শুনিয়া সুধীর অত্যন্ত বিরক্ত হইল। সে বলিল, 'ছেলেকে ঐ সব শিখাচ্ছ ?"

ভৃত্য বলিল, "আমি ত কিছু করি নি।'

"আমি ত ব'লে দিয়েছি, ওকে নিয়ে কেউ ধূমপান করিবে না।"

"আমি ত তা করিনি।"

মিথ্যায় সুধীর আরও বিরক্ত হইল, বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইয়া অভ্যস্ত সংযমসীমা অতিক্রম করিল। সে বলিল, "আবার মিথ্যা কথা বলছ ? আমি ব'লে দিচ্ছি, তুমি কাল থেকে আর ওকে নেবে না।"

সেই সময় গাড়ী আসিল। সুধীর আর এক জন ভৃত্যকে বলিল, "তুমি সত্যব্রতকে বেড়িয়ে নিয়ে এস।"

সে বাগানে গেল।

বৃদ্ধ ভৃত্য বহু দিন এই গৃহে ছিল—সরমাকে "মানুষ" করিয়াছিল। সুধীরের ব্যবহারে ভয় পাইয়া সে যাইয়া—আপনার দোষক্ষালনের চেষ্টায়—সরমার কাছে কান্দিয়া বলিল, জামাইবাবু বিনা অপরাধে তাহাকে গালি দিয়াছেন—খোকাবাবুকে লইতে নিষেধ করিয়াছেন। সে ক্রন্দনের বহর অত্যন্ত বাড়াইয়া দিল। সরমা তাহার মিথ্যার আবরণ ভেদ করিতে পারিল না; বলিল, "তুমি যাও। সে হ'বে।" সে বিশ্বাস করিল, বৃদ্ধ ভৃত্যের সম্বন্ধে সুধীর অবিচার করিয়াছে।

বাগানে একটু বেড়াইয়া সুধীর এক জন ভৃত্যকে তাহার জন্য এক গ্লাস শীতল জল আনিতে বলিয়া হাতমুখ ধুইয়া বস্ত্র-পরিবর্তন করিতে দ্বিতলে গেল।

তাহাকে দেখিয়া সরমা বলিল, "তুমি বুদ্ধকে শুধু শুধু বকেছ—বুড়া মানুষ কেবল কাঁদছে।"

সুধীর বলিল, "কিন্তু ও যে ছেলেকে কুশিক্ষা দিচ্ছিল।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সরমা বলিল, "কুশিক্ষা বল্‌লেই হ'ল ? ও আমাকে 'মানুষকরা' চাকর—ওকে শুধু শুধু অপমান করা চলবে না।"

সুধীরের মনে হইল, তাহার মস্তকের মধ্যে যেন অগ্নি জলিয়া উঠিল। "ভাল"—বলিয়া সে আর ঘরে প্রবেশ না করিয়া সিঁড়ির দিকে গেল।

ভৃত্য জল লইয়া আসিয়াছিল। সে "জল এনেছি"—বলিলে "থাক্‌" বলিয়া সুধীর নিম্নতলে গেল এবং আফিস-ঘরের রোলটপ টেবলের মধ্য হইতে টাকার ব্যাগ লইয়া ডালা টানিয়া দিয়া চাবিটা লইয়া গেটের কাছে গেল। তথায় দ্বারবানকে রোলটপ টেবলের চাবিটা দিয়া পরদিন—তাহা মহেশচন্দ্রকে দিতে বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সে পথে একটু অগ্রসর হইয়া সম্মুখে প্রথম যে ট্যাক্সী পাইল, তাহাতে উঠিয়া চালককে তাহার পৈত্রিক গৃহের দিকে যাইতে বলিল।

[আগামী বারে সমাপ্য।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভালোবাসা

দিয়েছো,—নিয়েছি তব প্রাণঢালা ভালোবাসা—
পাওনি,—দিইনি কিছু, তবু এত ভালোবাসা !
আমারে বাসিয়া ভালো
কেবলি পেয়েছো দুখ,—
কিছুই পাওনি তুমি
দিয়েই পেয়েছো সুখ !

প্রতিদান চাহো নাই, শুধু ভালো বাসিয়াছ
কেঁদেছো,—কাঁদায়েছি—ভালোবেসে সুখে আছো !
আমার যে ভালোবাসা
সে শুধু আপন লাগি'—
তুষিতে আপন প্রাণ ;
তুমি যে সকল-ত্যাগী !

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
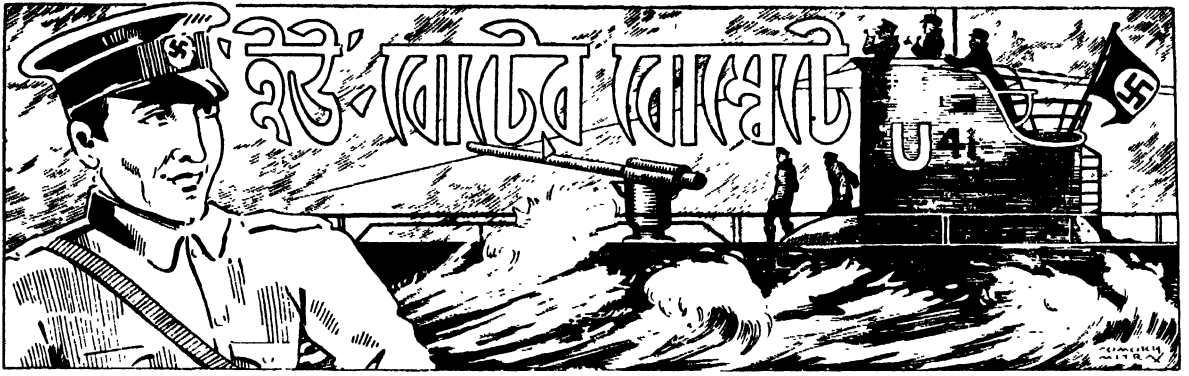
ত্রয়োদশ পর্ব্ব

বিপন্ন পলাতক-সৈনিক

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

পাকশালার দ্বারের বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া আমিও বিস্মিত ভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দুই-এক মিনিট পরে এক জন জার্ম্মাণ নৌ-সৈনিক দ্বার ঠেলিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিল।

নবাগত সৈনিক কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমস্ বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "হাল্লো! কে তুমি? কোথা হইতে আসিতেছ?"

জার্ম্মাণটার মুখের দিকে চাহিলাম, তাহার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলাম। লোকটার দেহ ক্ষীণ, মুখখানা লম্বাটে; তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দু'টিতে উদ্বেগ ও আতঙ্ক প্রতিফলিত! সে আমসের মুখের দিকে মিট্-মিট্ করিয়া চাহিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে ব্যাকুল স্বরে বলিল, "যে 'ইউ'-বোটখানা অল্পকাল পূর্ব্বে এই দ্বীপ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আমি সেই 'ইউ'-বোটের সৈনিক।"

আমস্ বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও, তোমার সঙ্গীরা তোমাকে ফেলিয়া-রাখিয়াই চলিয়া গিয়াছে? তুমি কি তীরে নামিয়া আর বোটে উঠিতে পার নাই?"

আগন্তুক পাকশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদের নিকট অগ্রসর হইল; তাহার পর টেবিল-সন্নিহিত একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সে দুই-এক মিনিট সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, শেষে আতঙ্কবিহ্বল নেত্রে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "হাঁ, আমি বোটে উঠিতে পারি নাই; ইচ্ছা করিয়াই বোটে উঠি নাই। বোট হইতে নামিয়া আমি সমুদ্রতটে লুকাইয়া ছিলাম। বোট চলিয়া যাইবার পর এখানে আসিলাম।"

আমস্ বলিল, "তবে কি তুমি বলিতে চাও, তুমি তোমাদের সৈন্যদল ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছ?"

আগন্তুক বলিল, "আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে পলাতক-সৈন্য বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমি নিজেকে পলাতক বলিয়া মনে করি না।"

আমস্ এবার কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি নিজেকে পলাতক বলিয়া মনে কর না—এ কথার অর্থ কি? তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহার কি ফল হইবে জান? তুমি ধরা পড়িলে নৌ-সামরিক আদালতে তোমার অপরাধের বিচার হইবে; তাহার পর এই অপরাধে গুলী করিয়া তোমাকে বধ করা হইবে। পলাতক-সৈনিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডেরই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। তুমি স্বেচ্ছায় বোট হইতে পলায়ন করিয়াছ; তোমাকে পলাতক-সৈনিক ছাড়া আর কি বলিতে পারি?"

আমসের কথায় লোকটা আতঙ্কাভিভূত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "যে ব্যক্তি জীবন-রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে পলাতক বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে। আমি নিজের ইচ্ছায় ঐ 'ইউ'-বোটে আসি নাই; এই যুদ্ধে যোগদান করিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। 'ইউ' বোটের আরোহী হইয়া সমুদ্রে সমুদ্রে বিচরণ করা, শত্রু-জাহাজ আক্রমণের চেষ্টায় ঘুরিয়া-বেড়ান, কি ভীষণ বিপজ্জনক ব্যাপার, আপনি তাহা ধারণা করিতে পারিবেন না। 'ইউ'-বোট লক্ষ্য করিয়া আকাশ হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সমুদ্র-গর্ভে মাইন, জাল, ডেপ্থ চার্জ্জ; প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন সঙ্কটসঙ্কুল!—ইহার উপর গত রাত্রিতে

আমাদের 'ইউ'-বোট সমুদ্রের তলায় বাধিয়া গিয়াছিল, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে এক ইঞ্চি নড়াইতে পারি নাই; শেষে ঘণ্টা-দুই পরে সে মুক্তিলাভ করে। আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, এবার বুঝি সমুদ্র-গর্ভেই সমাহিত হইলাম!"

এই সকল কথা বলিয়া লোকটা দুই-এক মিনিট স্তব্ধ-ভাবে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল; তাহার পর আত্ম-সংবরণ করিয়া, আমসের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "হাঁ, আপনি আমাকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, অবজ্ঞা করিতে পারেন; কিন্তু স্বদেশে—আমার বাসস্থান এসেনে (Essen) আমার স্ত্রী আছে, আমার পুত্রকন্যা আছে; আমি প্রাণ লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে দেখিতে চাই, তাহাদিগকে লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাই; কারণ আমি মানুষ, এবং মানুষের পক্ষে এই কামনা স্বাভাবিক। এ যুদ্ধ হিটলারের, আমার নহে।" (This is Hitler's war, not mine!)

আমস্ স্তব্ধভাবে তাহার সকল কথা শুনিয়া নীরস স্বরে বলিল, "স্থির হও বাপু, স্থির হও! তোমার কি বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান নাই?"

সৈনিক যুবক উত্তেজিত স্বরে বলিল, "না, আমার আত্মসম্মান নাই। ঘরে যাহার স্ত্রী, যাহার পুত্রকন্যা অনা-হারে মরিতেছে, তাহার আত্মসম্মানের মূল্য কি? আমি কাপুরুস—সত্যই আমি কাপুরুষ; কাপুরুষের আত্মসম্মান থাকিতে পারে না। যখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি আমি কাপুরুষ, তখনই আত্মসম্মানে বঞ্চিত হইয়াছি। এজন্য আমাকে তিরস্কার করা নিষ্ফল।"

আমস্ তাহার ভাল চোখের তীব্র দৃষ্টি আগন্তুকের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা বেশ, শীঘ্রই তোমার সকল কষ্টের অবসান হইবে। অন্য 'ইউ'-বোট শীঘ্রই এখানে আসিবে; যে পর্য্যন্ত তাহা না আসিতেছে—সেই কয়েক দিন এখানেই থাক। সেই 'ইউ'-বোট আসিলে তোমাকে তাহার কাপ্তেনের হস্তে অর্পণ করিব, তিনি তোমাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া যাইবেন; সেখানে—সামরিক বিচারে পলাতক-সৈনিকের প্রতি যে দণ্ডের বিধান আছে, সেই দণ্ডই তুমি লাভ করিবে; তোমাকে গুলী করিয়া বধ করা হইবে, এবং তোমার সকল দুঃখ-কষ্টের অবসান হইবে।"

সৈনিক যুবক আমসের কথা শুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "না, না, আমি জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া যাইব না; যদি যাই তাহা হইলে এই যুদ্ধ শেষ হইবার পরে যাইব। আমি সেই কথাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। আপনি দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিলে—"

আমস্ তাহার কথায় বাধা দিয়া সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি! কি বলিলে তুমি?—সাহায্য করিব আমি তোমাকে? যে সৈনিক পল্টন ছাড়িয়া পলাইয়া আসে—তাহাকে আমি সাহায্য করিব—এইরূপ তুমি আশা করিতেছ? না, আমি সেরূপ নির্ব্বোধ, সেরূপ অবিবেচক নহি; আমার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছে বলিতে পার?"

সৈনিক যুবক কাতর ভাবে বলিল, "যদি আপনি আমার কথাগুলি মন দিয়া শুনেন—"

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া ক্রুদ্ধ আমস্ উত্তে-জিত স্বরে বলিল, "না, তোমার কথা আমি শুনিতে চাহি না; তাহা শুনিব না। তুমি কাপুরুষ, প্রাণভয়ে তুমি সৈন্যদল ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছ; তোমার কোন কথা শুনিবার যোগ্য নহে। আমি তোমাকে কোন-রকম সাহায্য করিব না; নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য ত করিবই না, যদি তুমি এ জন্য আমাকে এক শত পাউণ্ড দিতে চাও,—তাহা হইলেও তুমি আমার নিকট এক বিন্দু সাহায্য পাইবে না। তোমাকে সাহায্য করিয়া আমি জার্ম্মাণ সরকারের নিকট অপরাধী হইতে চাহি না। তোমার আত্ম-সম্মান, কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই বলিয়া কি আমিও তাহা ত্যাগ করিব—এইরূপ তুমি আশা করিতেছ? তা নয়। এবার যে 'ইউ'-বোট আসিবে, তাহার কাপ্তেনের হস্তে তোমাকে অর্পণ না করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। এ কথা স্থির জানিও।"

আমসের কথা শুনিয়া সৈনিক যুবক ক্ষণকাল নতমস্তকে কি চিন্তা করিল; তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিল, "আমি ঠিক ঐ কথাই আপনাকে বলিতে যাইতেছিলাম, অর্থাৎ আপনি আমাকে সাহায্য করিলে আমি

আপনাকে পঁচিশ পাউণ্ড উপহার প্রদান করিব—এইরূপই আমার সঙ্কল্প ছিল।"

আমস্ তাহার কথা শুনিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি! কি বলিলে স্পষ্ট করিয়া আবার বল শুনি।"

জার্ম্মাণটা আগ্রহ ভরে বলিল, "আমি বলিতেছিলাম—আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে আপনাকে আপনার পরিশ্রম বাবদ পঁচিশ পাউণ্ড প্রদান করিব। আমি চাকরী করিয়া এত দিনে এই অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি, এবং তাহা আমার সঙ্গেই আছে।"

সৈনিক যুবকের কথা শুনিয়া আমস্ ক্রোবির কণ্ঠস্বর হঠাৎ অত্যন্ত মলায়েম হইল! কাণার ভাল চক্ষুর ভিতর হইতে দুর্জ্জয় লোভ যেন ফুটিয়া বাহির হইল; তাহার কণ্ঠস্বরের তীব্রতাও যেন কুহক-মন্ত্রে মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইল! সে কোমল স্বরে বলিল, "তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য যে ঝুঁকি আমাকে ঘাড়ে লইতে হইবে, তাহার মূল্য স্বরূপ তুমি আমাকে পঁচিশ পাউণ্ড দিবে বলিতেছ? যদি তুমি আমাকে টাকা দিতে পার, তাহা হইলে আমার সাহায্য লাভ তোমার পক্ষে অসম্ভব না হইতেও পারে; কারণ টাকায় অনেক ত্রুটি ঢাকা পড়ে। কিন্তু পঁচিশ পাউণ্ড নিতান্তই অল্প টাকা; তবে আমার দয়ার শরীর কি না, তাহার বেশী যখন তোমার কাছে নাই, তখন তাহা লইয়াই তোমাকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু আমার নিকট তুমি কিরূপ সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেছ?"

জার্ম্মাণ যুবক বলিল, "অধিক কিছু নয়; আপনি দয়া করিয়া আমাকে বড় দেশে রাখিয়া আসিলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব। আপনি দয়া করিয়া আমাকে এই সাহায্যটুকু করুন।"

আমস্ সংক্ষেপে বলিল, "বটে?"

যুবক বলিল, "হ্যাঁ, আমি আপনার নিকট এইটুকু সাহায্যের প্রার্থী। আপনাকে অধিক কিছু করিতে হইবে না; আপনি কেবল আমাকে সঙ্গে লইয়া বড় দেশের (main land) সমুদ্রকূলে নামাইয়া দিয়াই চলিয়া আসিবেন। আমি সেখানে ইংরেজদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিব।"

আমস্ বলিল, "কিন্তু তাহাতে তোমার কি সুবিধা হইবে? তুমি ইংরেজদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে তাহারা তোমাকে কারা-শিবিরে (Prison camp) কয়েদ করিয়া রাখিবে। তুমি নিরেট আহাম্মুক না হইলে এ-রকম প্রস্তাব করিতে না। অত্যন্ত বোকার মত কথা বলিলে!"

জার্ম্মাণ যুবক বলিল, "হাঁ, আমি জানি, শত্রু-সৈনিক বলিয়া তাহারা আমাকে কারারুদ্ধ করিবে। যুদ্ধের সময় ইহাই দস্তুর। কিন্তু এই ভাবে আমি ইংরেজদের কারাগারেই বন্দী হইতে চাই; তাহা হইলে যুদ্ধের পর যখন সন্ধি হইবে, তখন আমি মুক্তিলাভ করিব। কিন্তু যদি আমি জার্ম্মাণদের হাতে পড়ি, তাহা হইলে আমার প্রাণ-রক্ষার আশা থাকিবে না; আমাকে তাহারা গুলী করিয়া হত্যা করিবে। তা ছাড়া ইংরেজের কারাগার জার্ম্মাণ 'ইউ'-বোট অপেক্ষা নিরাপদ স্থান। বস্তুতঃ আমি জার্ম্মাণের হাতে পড়িতে চাহি না, এই জন্যই আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা।"

আমস্ বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে। আমি তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিব। এ জন্য যে-কিছু আয়োজন করিতে হইবে, তাহা আমি অবিলম্বেই শেষ করিব।"

আমসের কথা শুনিয়া আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। এত সহজে সে এই প্রস্তাবে সম্মত হইবে ইহা আমি ধারণা করিতে পারি নাই। আমার মনে হইল, আমস্ তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই টাকাগুলির লোভে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল; কিন্তু সে তাহার আশ্রিত লোকটিকে কি ভাবে বিপন্ন করিবার ফন্দি করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না! লোকটির জীবন বিপন্ন হইবে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকায় আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল।

চতুর্দ্দশ পর্ব্ব

সাগর-গর্ভে সমাহিতের আবির্ভাব!

আমস্ ক্রোবি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনের ভাব বোধ হয় বুঝিতে পারিল! বস্তুতঃ তাহার ন্যায় অর্থপিশাচ জার্ম্মাণটার টাকাগুলি আত্মসাৎ করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে—এ বিষয়ে

আমি যে নিঃসন্দেহ হইয়াছি, ইহা বুঝিতে পারায় সে ভ্রূভঙ্গি করিয়া পুনঃ পুনঃ আমার মুখের উপর এরূপ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে, মনের ভাব গোপন করিবার জন্য আমাকে মুখ ফিরাইতে হইল। আমি মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলাম না।

আমস্ জার্ম্মাণটাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাহাকে বলিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই; আমার কাজে-কথায় কখন ব্যতিক্রম হয় না। আমি কাল সকালেই তোমাকে বড় দেশে লইয়া গিয়া সমুদ্রকূলে নামাইয়া দিয়া আসিব।"

জার্ম্মাণটা আগ্রহভরে বলিল, "আপনার এ কথা ঠিক ত?"

আমস্ বলিল, "আমি ত তোমাকে আগেই বলিয়াছি, আমার কথার ব্যতিক্রম হয় না; কথারই যদি খেলাপ করিব—তাহা হইলে মানুষ হইয়া জন্মাইয়াছি কেন? আমার গুণের পরিচয় না পাইলে কি জার্ম্মাণ সরকার আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার হাতে এত-বড় একটা কাজের ভার দিত? আমিই বা প্রথমে তোমাকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইয়া শেষে রাজী হইলাম কেন? যদি সকালে বাতাসের গতি অনুকূল থাকে, তাহা হইলে তোমাকে সেখানে লইয়া-গিয়া ঠিক নিরাপদ স্থানে নামাইয়া দিব। তুমি যে পঁচিশ পাউণ্ড আমাকে দিতেছ, তাহা আমার বাক্সে সঞ্চিত থাকিবে, এরূপ মনে করিও না; তোমাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে নানা অসুবিধা, সেই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য টাকাগুলি আমাকে খরচ করিতে হইবে। উহার একটি পেণীও বাঁচিবে না।"

জার্ম্মাণ যুবক বলিল, "আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে আপনার বিশেষ-কিছু খরচ হইবে বলিয়া ত মনে হয় না। বড় দেশে যাইবার জন্য বোট ভাড়া করিতে হইলে কিছু টাকা খরচ হইত বটে; কিন্তু আপনার ত নিজেরই বোট আছে, সেই বোটে যাতায়াত করিতে আর খরচ কি?"

যুবকের কথা শুনিয়া আমস্ হঠাৎ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল; সে ভ্রূভঙ্গি করিয়া ভাল চোখটা হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "ওঃ, তুমি বুঝি সেই-রকম মনে করিয়াছ? ভাবিয়াছ, তোমার টাকাগুলি আমি ফাঁকি দিয়া লইতেছি! তোমাকে বড় দেশে লইয়া যাইতে আমার কি খরচ হইবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শোন। আমার বোটের প্রধান পা'লখানা এমন জীর্ণ হইয়াছে যে, তাহাতে আর কাজ চলিতেছে না। যদি বা সেই পা'ল খাটাইয়া কোন-রকমে বড় দেশে পৌছিতে পারি, কিন্তু সেই পা'ল লইয়া ফিরিয়া আসা অসাধ্য হইবে; এজন্য সেখান হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে আমাকে যে নূতন পা'ল সংগ্রহ করিতে হইবে—তাহা অল্প টাকায় পাওয়া যাইবে না। তাহার উপর বোটের দাঁড়ও কোন কোনখানি বদল করিবার দরকার হইবে। তবে যদি টাকাগুলি হাতছাড়া করিতে তোমার কষ্ট হয়, তাহা হইলে সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলাই উচিত। তোমার মনে কষ্ট দিয়া ও-টাকা আমি লইতে চাহি না; তুমি অনেক কষ্টে ঐ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছ, উহা তুমি রাখিয়া দাও। তাহার পর যে-পর্য্যন্ত অন্য 'ইউ'-বোট এখানে না আসে, তত দিন এখানে থাক। ছেঁড়া পা'ল খাটাইয়া আর আমার দেশান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই, ততখানি সাহসও আমার নাই। দয়ার শরীর আমার, তাই তোমার বিপদে তোমাকে সাহায্য করিবার জন্যই আমার আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু দেখিতেছি, প্রাণ অপেক্ষা টাকাই তুমি বেশী মূল্যবান মনে কর, বেশ, তাহাই হউক।"

আমসের বাঁকা সুর শুনিয়া জার্ম্মাণটা ব্যগ্রভাবে বলিল, "না, না, ও-টাকা আপনি গ্রহণ করুন। আপনাকে টাকাগুলি দেওয়ার জন্য সত্যই আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি; ইহা আমার অন্তরের কথা। আমি এখনই উহা আপনাকে দিতেছি।"

আমস্ তৎক্ষণাৎ জার্ম্মাণটার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া বলিল, "তুমি টাকাগুলি আমাকে দেওয়ার জন্য যখন এত ব্যাকুল হইয়াছ—তখন তাহা না লওয়া ভাল দেখায় না। আমার দয়ার শরীর, তোমার মনে কি আমি কষ্ট দিতে পারি? ও-টাকার কথা আর তুমি মুখেও আনিও না। তুমি কখন মনে করিও না, আমি নিজের লাভের জন্য এ-টাকা লইতেছি। সেরূপ অভিসন্ধি আমার নাই। আমার টাকার অভাব কি? আমার মন বড় কোমল এজন্য কেহ কোন কারণে আমার মনে কষ্ট দিলে আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না। আমার কথা বুঝিয়াছ?"

জার্ম্মাণ যুবক যে তাহার কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল, ইহার প্রমাণস্বরূপ তাহার বহু দিনের

কষ্ট-সঞ্চিত টাকাগুলি বাহির করিয়া আমসের প্রসারিত হস্তে প্রদান করিবামাত্র আমস্ তাহা গণিয়া পকেটে ফেলিল ; তাহার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া আদেশ করিল, "তুমি খুব সকালে আমার বোটখানি সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখিবে পিটার ! যদি বাতাস অনুকূল থাকে তাহা হইলে আমরা খুব সকালেই রওনা হইব। আর এখন পর্য্যন্ত তুমি এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছ কোন্ বিবেচনায় ? এখনই সমুদ্রকূলে যাও। বসিয়া থাকিতে পাইলে আর তুমি উঠিতে চাও না ; তোমার কুড়েমি দেখিলে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় !"

আমি নিঃশব্দে উঠিয়া আমার অয়েল-স্কিনের পোষাকটা পরিয়া লইলাম, তাহার পর টেবল হইতে লণ্ঠনটা তুলিয়া-লইয়া সমুদ্র-বেলার অভিমুখে ধাবিত হইলাম ; কিন্তু আমার মন নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অর্থগৃধ্নু আমস্ ক্রোবি জার্ম্মাণ সৈনিকটাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া টাকাগুলি আত্মসাৎ করিল, এবং বড় দেশে যাইবে বলিয়া প্রভাতেই তাহার বোটখানা সজ্জিত রাখিবার জন্য আমাকে আদেশ করিল বটে, কিন্তু জার্ম্মাণটাকে সঙ্গে লইয়া সে যে বড় দেশে যাত্রা করিবে না, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, এই জার্ম্মাণটাকে সে বড় দেশের সমুদ্রকূলে নামাইয়া দিলে সে যখন সেখানে ইংরেজ উপকূল-রক্ষীদের হাতে পড়িবে, তখন তাহারা তাহাকে নানা-প্রকার প্রশ্ন করিবে : সে কে, সে কোথা হইতে বড় দেশে আসিল, কেনই বা স্বেচ্ছায় সেখানে গমন করিয়া শত্রু-হস্তে ধরা দিল, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সে যে আমসের বিপদের আশঙ্কায় কোন কথা গোপন করিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। জার্ম্মাণরা যে আমাদের দ্বীপে 'ইউ'-বোটের আড্ডা স্থাপন করিয়াছে—এ সংবাদ তাহার মুখ হইতে নিঃসন্দেহে বাহির হইয়া পড়িবে। এতদ্ভিন্ন, ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জনের জন্য এ সকল কথা প্রকাশ করিতে সে যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবে না—ইহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম। আমস্ ক্রোবি জার্ম্মাণটাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে এ সকল কথার আলোচনা করে নাই—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

কিন্তু এ কথাও আমার মনে হইল, আমস্ ভয়ঙ্কর লোভী, টাকার লোভে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, পলাতক জার্ম্মাণ সৈনিকের নিকট পঁচিশ পাউণ্ড পাইয়া এই সকল বিপদের কথা সে হয় ত চিন্তা করে নাই। ঐ রণভেনের ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী আত্মসাৎ করিবার জন্য সে যেরূপ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, পরের সোণা হাতে পাইলে তাহা ত্যাগ করিতে তাহার বুক ফাটিয়া যায় ! টাকার জন্য সে সকল বিপদেরই সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত, ইহার যথেষ্ট পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছি ; এ জন্য সে সকল কু-কর্ম্মই করিতে পারে। তথাপি এই জার্ম্মাণটা আমাদের আশ্রয়ে আসিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে—আমস্ যে সেই সুযোগ তাহাকে প্রদান করিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না। আমস্ তাহার টাকাগুলি হস্তগত করিয়াছে, এখন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিবে—এ ধারণা আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমি সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমস্ ক্রোবি যদি এই জার্ম্মাণটাকে বড় দেশের উপকূলে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে বৃটিশ সৈন্যদল অবিলম্বে 'ব্ল্যাক গল-ফার্ম্মে' উপস্থিত হইয়া আমস্‌কে বাঁধিয়া ফেলিবে ; তাহাকে তাহারা গুলী করিয়া মারিবে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন ও মেরীর কথা আমার মনে পড়িল। আমি তাহাদের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছি—সেই সময় পশ্চাতে কাহারও মৃদু পদধ্বনি শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম ; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই মেরী আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে একাকী আমার নিকট আসিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম ; কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, "পিটার, আমি ঘুমাইতে পারিলাম না ; সেই জন্য তোমার কাছে চলিয়া আসিলাম।"—তাহার মৃদু কণ্ঠস্বরে দারুণ অন্তর্ব্বেদনা ফুটিয়া বাহির হইল।

আমি নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার গভীর দুঃখে সান্ত্বনা দান করি—এরূপ কোন কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইল না।

আমাকে নীরব দেখিয়া মেরী উদ্বেগ-বিজড়িত স্বরে বলিল, "ঐখান হইতে সে চলিয়া গিয়াছে, স্বদেশ যাত্রা করিয়াছে; কিন্তু চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে! আর সে আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে না, পিটার!"

আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলাম, "ও-সব কথা তুমি বলিও না মেরী, দোহাই তোমার, তুমি এই সকল চিন্তা ত্যাগ কর। তুমি আমার ভগিনীর মত, তোমার মনের কষ্ট আমি সহ্য করিতে পারি না। তোমারই মুখের দিকে চাহিয়া আমি সকল লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করি—তাহা কি তুমি জান না মেরী!"

আমার কথা শুনিয়াও মেরী মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল না; সে তরঙ্গ-সঙ্কুল, উদ্বেলিত সমুদ্র-বক্ষে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমি তাহার চিন্তাস্রোত অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য বলিলাম, "কাপ্তেন ষ্টীনম্যানের 'ইউ'-বোট হইতে যে জার্ম্মাণ সৈনিকটা পলাইয়া আসিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইয়াছে মেরী!"

মেরীকে কথাটা জিজ্ঞাসা করা অনর্থক—ইহা জানিতাম; কিন্তু অন্য কোন কথা আমার মুখে বাহির হইল না। মেরী আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু আমি এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনা ত্যাগ করিলাম না। সেই সৈনিকটি আমাদের পাকশালায় প্রবেশ করিয়া আমস্‌কে যে সকল কথা বলিয়াছিল, এবং আমস্ তাহাকে যে ভাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, মেরী তাহা জানিত না বলিয়া সে সকল কথা তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম; অবশেষে বলিলাম, "আমস্ আমাকেও বলিয়াছে, প্রভাতে বাতাসের গতি অনুকূল থাকিলে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বড় দেশে রাখিয়া আসিবে।"

আমার কথা শুনিয়া মেরীর মন কৌতূহলে পূর্ণ হইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"উহারা বড় দেশে পৌছিবার পর কিরূপ ব্যবস্থা করিবে?"

আমি বলিলাম, "সেখানে পৌছিয়া তোমার বাবা উহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবে তাহা আমি জানিতে পারি নাই; তবে শুনিয়াছি, পলাতক জার্ম্মাণটা ইংরেজ ফৌজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে।"

মেরী এবার বিস্মিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বল কি? বাবা তাহাকে ইংরেজ ফৌজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে দিতে রাজী হইবে?"

আমি বলিলাম, "রাজী হইবে কি না কিরূপে বলিব? তবে আমার বিশ্বাস, সে উহাতে রাজী হইবে না; তোমার কিরূপ মনে হয়?"

মেরী মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি উহা বিশ্বাস করি না। বাবা এত নির্ব্বোধ নহে যে, ইচ্ছা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিবে। না, ও-কোন কাজের কথা নয়!"

কিন্তু আমসের প্রকৃত মনোভাব কি, তাহা আমাদের জানিবার উপায় ছিল না। হতভাগ্য জার্ম্মাণ সৈনিকটার ভবিষ্যৎ কিরূপ বিপদসঙ্কুল, এবং সে ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে আমাদেরও কিরূপ সর্ব্বনাশ অপরিহার্য্য, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা এরূপ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতেছিলাম যে, উষালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইলেও তাহা আমরা জানিতে পারি নাই!

প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া আমরা গল্প বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিতে উদ্যত হইলাম; কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হইল, আমস্ বড় দেশে যাত্রা করিবে বলিয়া প্রভাতেই আমাকে তাহার বোটখানি প্রস্তুত রাখিতে আদেশ করিয়াছিল। এজন্য আমি বাড়ী না ফিরিয়া তাহার বোটে গিয়া জিনিস-পত্র গুছাইতে লাগিলাম। মেরী একাকিনী বাড়ী চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে আমস্ তাহার বোটের নিকট উপস্থিত হইল। সে আমাকে দেখিয়া নীরস স্বরে বলিল, "তোমাকেও আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। এখন বাতাসের আর তেমন জোর নাই; আমার আশঙ্কা, এই সুযোগে সেই বজ্জাত মাগী তাহার ভাইয়ের সন্ধানে খানিক পরেই আবার এখানে আসিয়া পড়িবে! তুমি এত দিন আমার কাছে থাকিয়াও পাকা মিথ্যাবাদী হইয়া উঠিতে পার নাই, মিথ্যা কথা বলিতে এখনও তোমার মুখে বাধিয়া যায়! সেই মাগী এখানে আসিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলেই তাহার ভাই সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার জন্য তোমাকে খুঁচাইতে আরম্ভ করিবে। তা ছাড়া আরও একটা ভয়ের সম্ভাবনা আছে, সে জানে তুমি কিছু দিন এখানে ছিলে না, দেশান্তরে গিয়াছিলে;

এজন্য তুমি কাহার সঙ্গে কোথায় গিয়াছিলে, কোথায় এত দিন কাটাইয়া আসিলে, এই সকল কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি তাহার জেরায় পড়িয়া সত্য কথা প্রকাশ করিলেই আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এই জন্যই আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে আমস্ তাহার বোটে উঠিয়া বসিল, এবং আমাকে তাহার পাশে বসাইয়া নিম্ন-স্বরে বলিল, "দেখ, আমি এখান হইতে বোট ছাড়িয়া দিলে যদি আমাকে বড় দেশের বিপরীত দিকে বোট চালাইতে দেখ, তাহা হইলে তুমি বিস্ময় প্রকাশ করিবে না, বা সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবে না; মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিয়া আমি কি করি তাহাই দেখিবে। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ? বোটে বসিয়া যদি তুমি একটা কথাও মুখ হইতে বাহির কর, তাহা হইলে বোটের দাঁড় দিয়া তোমাকে এমন পিটুনি দিব যে, তোমার পিঠের হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে; দীর্ঘকাল সেই গুঁতার কথা ভুলিতে পারিবে না। তুমি ত জান, আমি মুখে যাহা বলি, কাজেও তাহাই করি।"

তাহার মনের কথা এবার সুস্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিলাম। আমস্ সেই জার্ম্মাণ সৈনিককে আশ্রয় দান করিয়া এবং তাহার সঞ্চিত অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহাকে বড় দেশে লইয়া যাইতেছে বলিয়া তাহার জীবন বিপন্ন করিবে, এ বিষয়ে এবার আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

যাহা হউক, কয়েক মিনিট পরে আমস্ সেই জার্ম্মাণ সৈনিককে বাড়ী হইতে সঙ্গে আনিয়া বোটে উঠিল। তাহার পর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বাদামী পা'লখানি আমার সাহায্যে মাস্তুলে খাটাইয়া দিল। এইবার সে বোট ছাড়িয়া দিল। আমি জানিতাম, সেই স্থান হইতে বড় দেশে যাইতে হইলে পূর্ব্ব দিকেই বোট পরিচালিত করিতে হইত; কিন্তু আমস্ সে-দিকে বোট না চালাইয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, আমি ইহাতে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলাম না, একটি কথাও বলিলাম না। তথাপি আমস্ আমাকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিবার জন্য আমার মুখের দিকে চাহিয়া ইসারা করিল; আমি জার্ম্মাণ সৈনিকের মুখের দিকে চাহিলাম। তাহার দৃষ্টি তখন সমুদ্রের দিকে। তাহার আশা হইল, তাহাকে বড় দেশেই লইয়া যাওয়া হইতেছে! আহা বেচারা, তাহার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া ক্ষোভে-দুঃখে আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। হেব্রাইডিসের এই অঞ্চলের সহিত তাহার পরিচয় ছিল না; সুতরাং স্কটিস্ উপকূলে উপস্থিত হইতে কোন্ দিকে বোট পরিচালিত করিতে হইবে, তাহা তাহার ধারণা করিবার শক্তি ছিল না।

আমি দুই একবার আমসের মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। সে কালো পাইপটা মুখে গুঁজিয়া হা'ল ধরিয়া উদ্বেলিত তরঙ্গরাশির উপর দিয়া বোটখানা পরিচালিত করিতে লাগিল। আমস্ দুই একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। বোট লইয়া সে কোথায় যাইতেছে, তাহা আমার জানিবার সুযোগ হইল না।

আমাদের দ্বীপ হইতে বোট চলিতে আরম্ভ করিবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমরা সমুদ্রের যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, সেই স্থান হইতে অদূরে দৃষ্টিপাত করিয়া তৃণগুল্ম-বর্জ্জিত, কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতাকীর্ণ একটি নির্জ্জন দ্বীপ দেখিতে পাইলাম; দ্বীপটি অতি ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হইল। পরে আমসের নিকট জানিতে পারি, উহা মনুষ্যের বাসের অযোগ্য মরুময় রুইস্ দ্বীপ (utterly barren Isle of Ruish)।

সমুদ্রকূলে এই দুরারোহ, দুর্গম দ্বীপের এক স্থানে জেটির মত পাহাড়ের একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছিল। আমসের বোট তাহার নিকট ভিড়িলে আমস্ তাড়াতাড়ি পা'ল নামাইয়া-ফেলিয়া তাহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট জার্ম্মাণ সৈনিক যুবকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "একটা দরকারী জিনিস বোটে তুলিয়া-লইবার জন্য এই দ্বীপে একবার আমাকে বোটখানা ভিড়াইতে হইতেছে; এখানে আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না। জিনিসটা একটু বেশী ভারী কি না, আমি একা তাহা বোটে টানিয়া তুলিতে পারিব না; এ জন্য তোমার একটু সাহায্য চাই। পিটার হা'ল ধরিয়া বোটেই বসিয়া থাকুক, তুমি আমার সঙ্গে নামিয়া চল।"

জার্ম্মাণ সৈনিক যুবক আমসের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বোটের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলে আমস তাহাকে

পাহাড়ের সেই ঝিঁকের উপর প্রথমেই নামাইয়া দিল। যুবক সেই ঝিঁকের উপর পদার্পণ করিয়া উপরে উঠিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই সুযোগে বিশ্বাসঘাতক নিষ্ঠুর আমস্ চক্ষুর নিমিষে এক ভীষণ কার্য্য করিল! সে তাড়াতাড়ি বোটের একখান দাঁড় তুলিয়া-লইয়া বোট হইতে নামিয়া পড়িল, এবং সৈনিক যুবক পাহাড়ের উপর কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র, সে সেই দাঁড়টি উভয় হস্তে মাথার উপর তুলিয়া তদ্দারা সৈনিক যুবকের মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল। সেই এক আঘাতেই যুবক আর্ত্তনাদ করিয়া মুখ গুঁজিয়া পাহাড়ের উপর পড়িয়া গেল। সেই সাংঘাতিক আঘাতে তাহার হাত-পা কয়েক বার আন্দোলিত হইল, তাহার পর সব স্থির!

আমস্ মুহূর্ত্তকাল সেই হতভাগ্যের মুখের দিকে চাহিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "ওরে বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ! তুই 'ইউ'-বোট হইতে পলায়নের উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছিস; আর তোকে জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া সামরিক আদালতের বিচারে সৈনিকের গুলীতে মরিতে হইবে না। তোকে সেই অপমান হইতে রক্ষা করিয়া তোর উপকারই করিলাম।"—এই কথা বলিয়া নরপশু আমস্ উন্মাদের ন্যায় হী-হী করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অতঃপর সে আর পশ্চাতে না চাহিয়া পাহাড়ের সেই ঝিঁকের উপর ফিরিয়া আসিল, এবং এক লম্ফে বোটে আরোহণ করিয়া কঠোর স্বরে আমাকে আদেশ করিল, "বোট ছাড়িয়া দাও।"

কিন্তু আমি তাহার এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়াছিলাম; আমি তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ পালন না করিয়া, সেই হতভাগ্য যুবকের অসাড় দেহের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আমস্‌কে বলিলাম, "লোকটা কি মরিয়া গিয়াছে? উঃ, কি ভীষণ কাণ্ড!"

আমার প্রশ্ন শুনিয়া আমস্ রোষ-কষায়িত নেত্রে আমার মুখের দিকে কট্‌-মট্‌ করিয়া চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তোমার যে ভারী দরদ! না, ও মরে নাই, আমি আর এক ঘা মারিয়া উহাকে সাবাড় করিতে পারিতাম, কিন্তু নরহত্যা করিবার ইচ্ছা আমার নাই; কিছুকাল পরে ক্ষুধা-তৃষ্ণার আক্রমণেই উহার জীবন শেষ হইবে, আমাকে আর সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না। আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছি, শীঘ্র বোট ছাড়িয়া দাও; তবে কেন বিলম্ব করিতেছ? আমার হাতে হা'ল দিয়া পা'ল তুলিয়া দাও। বাতাসের জোর হইয়াছে, শীঘ্র আমরা বাড়ী ফিরিতে চাই। সেই দজ্জাল মাগী এই সুযোগে আসিয়া মেরীকে জেরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না! যত শীঘ্র সম্ভব, বাড়ী ফিরিতে হইবে।"

আমি তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ পালন করিলাম। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, হিংস্র বন্য পশুর ন্যায় তখন তাহার মনের অবস্থা! আমি আর একটি কথা বলিলেই সে সবেগে আমাকে পদাঘাত করিবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া আমি নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া রহিলাম। বোট চলিতে আরম্ভ করিলে আমি পুনঃ পুনঃ সেই দ্বীপের দিকে চাহিতে লাগিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, আমসের প্রচণ্ড আঘাতে সেই হতভাগ্যের মৃত্যু না হইলেও নির্জ্জন দ্বীপে অনাহারে ও পিপাসায় শীঘ্রই তাহার ইহজীবনের অবসান হইবে।

হা'ল ধরিয়া বোট চালাইতে চালাইতে আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ঐ হতভাগা জার্ম্মাণটা আমাকে এতই নির্ব্বোধ মনে করিয়াছিল যে, তাহার আশা হইয়াছিল—আমি উহাকে বড় দেশে পৌঁছাইয়া দিয়া আমার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিব! ইংরেজরা উহাকে হাতে পাইলে আমাদের দ্বীপে আসিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিতে কি অধিক বিলম্ব করিত মনে কর?"

আমি তাহার এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া আমস্ আমাকে শুনাইয়া শুনাইয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল, "হতভাগা জার্ম্মাণটার সম্বন্ধে কি করা উচিত, তাহা কি আর আমি ভাবিয়া দেখি নাই? কয়েক দিনের মধ্যেই অন্য একখানা 'ইউ'-বোট তাহার খোরাক লইতে আসিবে তাহা জানি; কিন্তু যদি উহাকে সেই সময় পর্য্যন্ত আমার 'ব্ল্যাক গল-ফার্ম্মে' লুকাইয়া রাখিতাম, তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, তাহার পঁচিশ পাউণ্ড আমার হাত-ছাড়া হইত। তা ছাড়া, যদি আমি উহাকে আটক করিয়া রাখিয়া কোন 'ইউ'-বোটের কাপ্তেনের হাতে সঁপিয়া দিতাম, তাহা হইলে তাহারা উহাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া গিয়া পলায়নের অপরাধে সামরিক আদালতের বিচারে গুলী করিয়া মারিত; কিন্তু

তাহাতে আমার কি লাভ হইত? হয় ত তাহারা আমাকে ধন্যবাদ দিত বা দিত না, কিন্তু ফাঁকা ধন্যবাদের মূল্য কি? উহাদের দু'টো মুখের কথার চেয়ে নগদ পঁচিশ পাউণ্ড অনেক শাঁসাল চীজ্। নগদ টাকা হাতে পাইয়া তাহা আমি ছাড়িয়া দিব, পরমেশ্বর আমাকে ততখানি নির্ব্বোধ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই; পরমেশ্বর বেচারার একটু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে ত।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল; সে আমার মুখের উপর মর্ম্ম-ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি রকম ঘুঘু! বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছ কি? আমি, ছোকরা, তোমার মনের ভাব ঠিক বুঝিয়া ফেলিয়াছি। তুমি ভাবিতেছ, জার্ম্মাণটা আমার কোঁৎকা খাইয়া যখন মরে নাই, তখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে খানিক পরে উঠিয়া বসিবে, তাহার পর ঐ দ্বীপের নিকট দিয়া কোন জাহাজ-টাহাজ যাইতে দেখিলেই তাহাতে তাহাকে তুলিয়া লইতে বোট পাঠাইবার জন্য ইসারা করিবে; কিন্তু উহার সে ফন্দী খাটিবে না। আমি যখন উহাকে ঐ রুইস দ্বীপে বিসর্জ্জন দেওয়াব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সেই সময়েই ও-কথা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছিলাম। সমুদ্রের এই অংশে প্রায় কোন জাহাজই আসে না; বিশেষতঃ, এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ত কথাই নাই। জাহাজগুলি এই দ্বীপের এত তফাৎ দিয়া যায় যে, ইসারায় তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উপায় নাই। তাহার পর আরও কথা এই যে, কোন জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইলে আগুন জ্বালিতে হইবে ত! কিরূপে সে আগুন জ্বালিবে? তা' ছাড়া ঐ দ্বীপে একটি ঘাস, কি খড়-কুটো পর্য্যন্ত নাই; তবে আগুন ধরিবে কিসে? পড়িয়া থাকিয়া অনাহারেই উহার প্রাণ বাহির হইবে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমস্ নীরব হইল, তাহার পর কি ভাবিয়া উত্তেজিত স্বরে আমাকে বলিল, "কিন্তু একটা কথা তুমি স্মরণ রাখিবে; ভবিষ্যতে যে সকল 'ইউ'-বোট আসিবে, তাহাদের কোন লোককে যদি এ সম্বন্ধে তুমি কোন কথা বল, একটি কথাও তোমার মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা হইলে আমি প্রহারে তোমার হাড় গুঁড়া করিয়া দিব; তোমার জিভ পর্য্যন্ত টানিয়া ছিঁড়িব, এ কথা যেন তোমার স্মরণ থাকে।"

আমি জানিতাম, তাহার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, সে যাহা বলিল, তাহা করিতে মুহূর্ত্তের জন্য কুণ্ঠিত হইবে না; সুতরাং আমি সঙ্কল্প করিলাম, এ-সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। কিন্তু লোকটা আমাদের শত্রুর দেশের লোক হইলেও আহারাভাবে, পানীয় জলের অভাবে, দিবারাত্রি খোলা পাহাড়ের উপর পড়িয়া-থাকিয়া তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, প্রতি মুহূর্ত্তে হতাশ-ভাবে মৃত্যুর চিরবিস্মৃতিপূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হইবে!—এ চিন্তা অসহ্য। আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এই হতভাগ্যের জীবন রক্ষার কি কোনও উপায় নাই? আমি বুঝিতে পারিলাম অনাহারে, পিপাসায়, ক্রমশঃ উত্থানশক্তি রহিত হইয়া সে মৃত্যুকবলে আত্মসমর্পণ করিবে। সত্যই তাহার প্রাণরক্ষার উপায় নাই। মৃত্যুর পর তাহার শুভ্র অস্থিগুলি সেই পাহাড়েই পড়িয়া থাকিবে; সমুদ্র অশ্রান্ত মর্ম্মর ধ্বনিতে তাহার শোকগাথা গাহিবে; কিন্তু কি ভাবে তাহার দুঃখময় জীবনের অবসান হইল—জন-প্রাণীও কোন দিন তাহা জানিতে পারিবে না।

আমি কিছু কাল স্তব্ধভাবে আমসের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া আমস্ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ও-রকম হা করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছ? ও-ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলে আমি ঘুসি মারিয়া তোমার নাক-মুখ ভাঙ্গিয়া দিব। আমি উহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহাতে যথেষ্ট দয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহাকে এক দল সৈনিকের রাইফেলের গুলীতে ঝাঁঝরা হইয়া মরিতে হইত; সেইরূপ ভীষণ মৃত্যুর কবল হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়াছি। সৈনিকের দল, জার্ম্মাণ সরকার বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ বলিয়া উহার নিন্দা করিত, সেই নিন্দা হইতে উহাকে উদ্ধার করিয়াছি—ইহা কি অল্প দয়ার কার্য্য? এই দয়ার বিনিময়ে আমি তাহার টাকাগুলি গ্রহণ করিয়াছি। টাকাগুলি ত উহার ভোগে লাগিত না; 'ইউ'-বোটের লোকরা উহাকে ধরিতে পারিলে জার্ম্মাণ সরকার উহার টাকাগুলি

বাজেয়াপ্ত করিত। তাহা না হইয়া টাকাটা আমার ভোগে লাগিল; ইহাতে উহার অর্থের সদ্ব্যবহার হইল না কি? যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাক, আমার কার্য্যের কোন ত্রুটি লক্ষিত হইবে না। তোমার কিরূপ ধারণা?"

আমার কিরূপ ধারণা, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে সেই মুহূর্ত্তেই আমার নাকে-মুখে তাহার ঘুসি পড়িত! কিন্তু তাহা জানিয়াও আমি নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিলাম না; আমি বলিলাম, "হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহার মাথায় দাঁড়ের-বাড়ি মারিয়া তাহাকে তুমি অজ্ঞান করিয়া ফেলিলে; ইহা ভয়ঙ্কর দয়ার কাজ বটে!"

আমস্ তাহার ভাল চোখটা ঘুরাইয়া, বাঁ হাতে হাল ধরিয়া ডান হাত নাড়িয়া, এবং দাঁত বাহির করিয়া বিকট মুখভঙ্গিসহকারে বলিল, "কেন? অসঙ্গত কাজ কি করিয়াছি? তুমি কি বলিতে চাও—উহা করিবার প্রয়োজন ছিল না? উহার সঙ্গে আমার তর্ক-বিতর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল না; আর যদি আমি হঠাৎ আক্রমণ করিয়া এক আঘাতে উহাকে অজ্ঞান করিয়া না ফেলিতাম —তাহা হইলে সে কি আমার সঙ্গে ধস্তাধস্তি না করিয়া, সেই স্থানে তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া আমাকে সহজে বাড়ী ফিরিতে দিত? তুমি কি আমাকে এতই নির্ব্বোধ মনে কর যে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমি তাহার সঙ্গে বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করিব?"

তাহার সহিত আর তর্ক-বিতর্ক করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া সে স্থির ভাবে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। অবশেষে আমরা আমাদের দ্বীপে বোট ভিড়াইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বোটের পা'ল নামাইয়া যথাস্থানে বোটখানি বাঁধিয়া-রাখিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়া বোট হইতে নামিয়াই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বাড়ী চলিয়া গেল।

আমি বোটের পা'ল নামাইয়া বোটখানি যথাস্থানে বাঁধিয়া রাখিতেছি, সেই সময় মেরী সমুদ্র-বেলায় আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। মেরী প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জার্ম্মাণ সৈনিকটিকে লইয়া গিয়া কোথায় রাখিয়া আসিলে?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমসের পৈশাচিক ব্যবহারের বিবরণ তাহার নিকট প্রকাশ করিলাম।

আমার সকল কথা শুনিয়া মেরী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "জানোয়ার! দেখ পিটার, লোকটা আমার বাপ কি না, এ বিষয়ে এক এক সময় সন্দেহ হয়! মনে হয়, আমার বাবা কখন এ-রকম নর-পশু হইতে পারে না; তোমার মত আমাকেও ও কুড়াইয়া-আনিয়া প্রতিপালন করিতেছে কি না জানিতে আগ্রহ হয়। উহার ব্যবহারে এক এক সময় মনে হয় আর উহার মুখদর্শন করিব না; উহাকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি না।"

মেরী এক-নিঃশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়া প্রবল উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিল।

আমি তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলাম, "কিন্তু মেরী, আমরা উহার আশ্রিত; আমরা কি করিতে পারি বল?"

মেরী বলিল, "কিন্তু কিছু করিতেই হইবে; এই হতভাগ্য সৈনিক যুবক আমাদের শত্রু হইলেও রুইস দ্বীপে ও ভাবে তাহাকে মরিতে দেওয়া সঙ্গত হইবে না।"

আমি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমরা চেষ্টা করিলেই কি তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব? যদি সে কোন উপায়ে জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে সামরিক আদালতের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে; আর যদি সে ইংলণ্ডে গমন করে, তাহা হইলে ইংরেজরা জানিতে পারিবে—তোমার বাবা কি ভাবে জার্ম্মাণদিগকে সাহায্য করিতেছে। এই সংবাদ পাইলেই তাহারা তোমার বাবাকে গুলী করিয়া মারিবে। কিন্তু এই উভয় স্থান ভিন্ন তাহার যাইবার আর স্থান কোথায়? আর কোথায় সে আশ্রয় পাইবে?"

আমার যুক্তি শুনিয়া মেরী এই হতভাগ্য যুবকের অনুকূলে আর কোন কথাই বলিতে পারিল না। অতঃপর আমরা বাড়ী ফিরিলাম; মেরী আমস্কে কোন কথা বলিল না। কিন্তু মেরীর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া আমস্ বুঝিতে পারিল, সকল কথাই সে জানিতে পারিয়াছে। আমি তাহাকে সব কথা বলিয়াছি।

আমস্ মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "পিটার বুঝি সকল কথাই তোমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে? এ-সব কথা তুমি জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি অন্য কাহারও নিকট এ সকল কথা

প্রকাশ কর—তাহা হইলে তুমি যে আমার কন্যা, এ কথা আমি ভুলিয়া যাইব, এবং আমার নিকট যে ব্যবহার পাইবে, তাহা তোমার পক্ষে সুখকর হইবে না। আমি যাহা করিয়াছি তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, এ বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে তর্ক করিও না। যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে; সে কথার আলোচনায় লাভ নাই।"

দেখিলাম, আমসের মেজাজ অত্যন্ত উগ্র। সে মদের 'জার' বাহির করিয়া নির্জ্জলা মদ্য পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিল। মেরী যদিও তাহাকে ভয় করিত না, তথাপি তখন তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিল না!

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এবং ঝটিকাবেগ ক্রমশঃ প্রবল হইতেছিল। সন্ধ্যার পর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ বর্দ্ধিত হইল, মেঘের অন্ধকার নিবিড়তর হইল, এবং দূরস্থ পর্ব্বতে পুনঃ পুনঃ বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। পাকশালার বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে হইল, শীঘ্রই প্রলয়ের ঝঞ্ঝা আরম্ভ হইবে। সমগ্র প্রকৃতি অতি ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল।

আমস্ মদ্যপান করিতে করিতে বলিল, "এই দুর্য্যোগে যে কোন 'ইউ'-বোট আসিবে তাহার সম্ভাবনা নাই; তা ছাড়া বড় দেশ হইতে সেই দজ্জাল মাগীও এখানে আসিতে সাহস করিবে না; সুতরাং আজ রাত্রিকালে সমুদ্রকূলে আমাদের পাহারায় থাকিবার প্রয়োজন নাই।"

সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে আমাকে সমুদ্র-বেলায় যাইতে হইবে না শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; বিশেষতঃ, আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বসিয়া নির্জ্জন পার্ব্বত্য দ্বীপে নির্ব্বাসিত হতভাগ্য জার্ম্মাণ সৈনিকের বিপদের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে মেরীও আমার পাশে আসিয়া বসিল; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে হ্যাগেনের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল।

মদ্যপান শেষ করিয়া আমস্ একটি ছোট কাঠের বাক্স আনিল, এবং তাহার ভিতর হইতে ভন্ রথভেনের সোনার ঘড়ি, চেন, ও অঙ্গুরী বাহির করিয়া, তাহাতে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ইহার সঙ্গে সেই জার্ম্মাণ সৈনিকটার পঁচিশ পাউণ্ড সঞ্চিত হইল। পরের সোণা কিরূপে সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে তাহা সঞ্চয় করা অতি সহজ।"

তাহার পর সে হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সেই জার্ম্মাণ শূয়ারটা—লড্‌উইগ ভন্ রথভেন এগুলি তাহার ভাইকে দেওয়ার জন্য যখন আমার কাছে রাখিয়া গিয়াছিল, সেই সময় সে কি কথা বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল—তাহা তোমার স্মরণ আছে কি পিটার! সে আমাকে বলিয়াছিল, 'যদি তুমি আমার এই আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে যদি আমাকে সমুদ্র-গর্ভস্থ সমাধি-শয্যা হইতে উঠিয়া আসিতে হয়, তাহাও আসিয়া তোমাকে শায়েস্তা করিব।'—এই কথা সে আমাকে সেই সময় বলিয়াছিল কি না?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, বলিয়াছিল।"

আমস্ অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিল, "আজ এই ভীষণ দুর্য্যোগের রাত্রিটা সমাধি-গর্ভ হইতে তাহার উঠিয়া আসিবার মতই রাত্রি বটে! এই রাত্রে তাহার মত নিহত নাবিকের শুভ্র অস্থিরাশি সমুদ্র-গর্ভেও স্থির থাকিবে বলিয়া মনে হয় না; সমুদ্র-গর্ভেও তাহা চঞ্চল হইয়া উঠিবে।"

আমি মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, গভীর উদ্বেগে তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছিল; কারণ, হ্যাগেন ভন্ রথভেনের সহিত স্বদেশ-যাত্রা করিয়া সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছিল—এইরূপ জনরবই প্রচারিত হইয়াছিল।

কিন্তু আমস্ মেরীর মনোভাব লক্ষ্য না করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে বলিতে লাগিল, "ইহা মৃত ব্যক্তির স্বর্ণ। এরূপ একটা প্রবাদ আছে, মৃত ব্যক্তির স্বর্ণ যাহার দখলে আসে, তাহা তাহার ভোগে লাগে না, এবং তাহাকে বিস্তর বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু আমস্ ক্রোবি-সম্বন্ধে এই প্রবাদ বিফল হইবে; আমি ইহা পরম সুখেই—"

আমস্ তাহার মুখের কথা শেষ না করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি পুনঃ পুনঃ ও-ভাবে দ্বারের দিকে চাহিতেছ কেন? ব্যাপার কি?"

আমি অস্ফুট স্বরে বলিলাম, "দ্বারের বাহিরে আমি যেন কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইতেছি! কিন্তু এই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে কে এখানে আসিতেছে?"

আমার কথা শুনিয়া আমস্ মাথা-ফিরাইয়া পাকশালার দ্বারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মুহূর্ত্ত পরে পাকশালার দ্বার সবেগে খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা দম্‌কা ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা মুক্ত দ্বার-পথে আমাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন লড্‌উইগ ভন্ রথভেন আমাদের সম্মুখে আসিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইল! তাহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, মস্তকের কেশরাশি হইতে জল ঝরিতেছিল, তাহার তীব্র দৃষ্টি আমস্ ক্রোবির মুখের উপর সন্নিবিষ্ট; তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বর্ষিত হইতেছিল! আমার মনে হইল, তাহার প্রেতাত্মা সেই মুহূর্ত্তে সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিল!

[ক্রমশঃ

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

আনন্দের বৈরাগ্য

মায়াজাল ছিন্ন করি' রাজৈশ্বর্য্য পরিহরি'
শাক্যসিংহ হ'লো বনবাসী,
বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোধন করে অশ্রু বিমোচন
শোকের সাগরে সদা ভাসি'।
বার্দ্ধক্যে লভিতে সুখ আশায় বাঁধিয়া বুক
পৌত্রে রাজা দিল সিংহাসন,
রাহুল বৈরাগ্য ভরে সত্যের সন্ধান তরে
পিতৃপথ করিল শরণ।
একে একে দুই জন রাজ্য দিয়া বিসর্জ্জন
কাটাইল সংসারের মায়া,
নৃপতির মনোমাঝে নিরন্তর শেল বাজে,
রাজ্যময় বিষাদের ছায়া।
ভ্রাতুষ্পুত্রে আপনার সমর্পিতে রাজ্যভার
রাজার হইল অভিলাষ,
মহারাজ শুদ্ধোধন 'আনন্দে' ডাকিয়া ক'ন—
"পুরাইতে হ'বে মম আশ;
কপিলার সিংহাসন করি বাছা আরোহণ
বংশের গৌরব তুমি রাখ,—
রাজত্বের গুরু ভার বহিতে পারি না আর
তুমি সদা সঙ্গে মোর থাক।"
এত বলি' নরপতি করিলেন দ্রুত অতি
উৎসবের সব আয়োজন,
রাজ্য পুনঃ অবশেষে সাজিল উজ্জ্বল বেশে
পুরবাসী পুলকে মগন।
পুণ্য অভিষেক ক্ষণে আনন্দ বিষণ্ণ মনে
বোধিসত্ত্বে করে নিবেদন:—

"ঐশ্বর্য্য বিলাস কভু সুখ-শান্তি দেয় প্রভু?
করে কি তা' চিত্তবিনোদন?
নতুবা আমারে কেন মোহের শৃঙ্খলে হেন
বাঁধিবার এত সমারোহ!
যদি তাহে সুখ মিলে তুমি কেন তেয়াগিলে?
সত্য কহি দূর কর মোহ।"
অমিতাভ মনে মনে ভাবিয়া প্রমাদ গণে,
'যদি করি সত্যের প্রকাশ—
আনন্দ বিরাগী হ'বে গৃহে কভু নাহি র'বে,
পিতা পুনঃ হবেন নিরাশ।'
নাহি দিয়া সদুত্তর তথাগত অনন্তর
মৌনভাব করেন ধারণ;
আনন্দের নাহি ক্ষোভ, ত্যজি' রাজ্যসুখ-লোভ
বনবাস করিল বরণ।
তা'র মত আর কেবা বুদ্ধের চরণ-সেবা
করিয়াছে জগৎ-মাঝার?
ছায়াসম আজীবন সাথে থাকি' অনুক্ষণ
বুদ্ধ-বাণী ক'রেছে প্রচার?
আজি হায়! মনে পড়ে অগ্রজ রামের তরে
ভরতের বৈরাগ্যের কথা,
রামানুজ লক্ষ্মণের স্বার্থ ত্যাগ সকলের
অন্তরে জাগায় ঘন ব্যথা।
হে আনন্দ! তব নাম জাগে চিতে অবিরাম,
তোমার তুলনা নাহি মিলে,
ত্যজি রাজ্য সিংহাসন কোন্ সে অমূল্য ধন
চিদানন্দে তুমি খুঁজেছিলে?

শ্রীনীলরতন দাশ (বি-এ)

শিক্ষা-সংস্কার ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে শিক্ষার যেরূপ প্রসার হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অবিশ্বাসীরও মনে বিস্ময় জন্মাইতে পারে। শুধু যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা অনেক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা নহে; উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেকগুলি কলেজও অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যখন স্মরণ করি যে, বঙ্গদেশ চিরদারিদ্র্য-প্রপীড়িত, তখন শিক্ষার এই অভাবনীয় প্রসারে আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি না। এই শিক্ষা-প্রসারের একটি আরও বিস্ময়কর ব্যাপার স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার। সহরে নগরে, গ্রামে ও পল্লীতে মেয়েদের জন্য বহু বিদ্যালয়ের আবির্ভাব হইতেছে। ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ব্যবসাদার, চাষী—সকল বাঙ্গালীর মধ্যেই যেন শিক্ষা সম্বন্ধে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

দেশের মধ্যে এই যে জাগরণ, এই যে চেতনা—ইহার ফল শুভ বই অশুভ হইতে পারে না। অবস্থার বৈগুণ্যে হয়ত সব সময়ে অভীপ্সিত ফললাভে বাধা এবং সময়ে সময়ে বিলম্বও ঘটে, কিন্তু তাহাতে নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। স্কুল স্থাপন করা যেখানে একান্ত আবশ্যক বলিয়া অনুভূত হয়, সেখানে অবস্থার চাপে পড়িয়া সে অনুষ্ঠান বহুদিন বিলম্বিত হইতে পারে না। অবস্থার প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া, অসুবিধার পাষাণ-কারা ভাঙ্গিয়া মানুষ তাহার মানসিক অভাব পূরণ করিবার জন্য অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। কর্তৃপক্ষের তর্জ্জনী-হেলন, প্রতিপক্ষের যুক্তিহীন বাধা, অর্থের অনটন—কিছুই সে অনুষ্ঠানকে অধিক দিন প্রতিহত করিয়া রাখিতে পারে না; ইহা আমরা নিত্য নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। হয়ত কোনও কোনও স্থানে অবস্থার প্রতিকূলতা এক-আধটি অঙ্কুরিত প্রতিষ্ঠানকে বিনষ্ট না করিয়া ছাড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের উদ্যমই জয়ী হয়।

অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া টিকিয়া থাকাই যদি মানব-জীবনের প্রকৃতিগত লক্ষণ হয়, তবে এরূপ উদ্যমকে শাসন করিব কেন? মানুষের সৃষ্ট সবগুলি প্রতিষ্ঠান একই উপাদানে, একই ছাঁচে, একই রকম গঠিত হইবে,—ইহা কখনও প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। অনেক সময়ে উপাদানের অপ্রাচুর্য্য, গঠন-কৌশলের অনভিজ্ঞতা মানুষের আপ্রাণ চেষ্টাকেও বিফল করে। সেজন্য কাহাকে দোষ দিব? যে শিক্ষালয় এইরূপ সংগ্রাম করিয়া পল্লীর জ্ঞানপিপাসা কিয়ৎ পরিমাণে মিটাইতেছে, সমাজের কিছু কল্যাণ করিতেছে,—যে সব প্রদীপ অল্প তৈলে মিট-মিট করিয়া জ্বলিয়া অন্ধকার অল্লাধিক দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেগুলিকে ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেই কি দেশ একদিনে উন্নত হইবে?

শিক্ষা-সংস্কার-কামীরা এমনই একটি কল্পনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন বলিয়া শুনা যায়। জানি না, ইহা কতদূর সত্য। কিন্তু মনে হয়, ইহা সংস্কার নহে, সংস্কারের নামে শক্তির অপপ্রয়োগ। হস্তের অঙ্গুলিগুলি সব দৈর্ঘ্যে প্রস্থে একরূপ নহে, এজন্য যদি কেহ অসমান অঙ্গুলি নির্ম্মূল করিতে প্রয়াসী হয়েন, তবে তাঁহার রুচি সম্বন্ধে যাহাই বলি না কেন, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা কোন মতে করা চলে না।

যে সকল উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিকূল আবহের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া কোনওরূপে জীবন ধারণ করিতেছে, তাহাদের অপরাধ কি? দেশের লোকের ঔদাসীন্য কি এসম্বন্ধে দায়ী নহে? যদি রাজস্ব আদায় করা সরকারের একমাত্র কার্য্য হয়, তাহা হইলে কিছু বলিবার নাই। যদি শিক্ষাদান দেশের রাজপুরুষগণের একটি প্রাথমিক কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলেও কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু সরকার যদি জনসাধারণের নিকট তাহার দায়িত্ব স্বীকার করে, তাহা হইলে শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে সরকার বাধ্য। যে সরকার তাহাতে কৃপণতা করে, সে সরকার কখনই জনমতের সুপ্রসর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করিতে পারে না।

যে সকল বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান দুর্ব্বল, রক্তশূন্যতার জন্য যেগুলি ধ্বংসের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাতে রক্ত সঞ্চার করা, তাহার বলাধান করা সরকারের ন্যায়সঙ্গত দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্বের পালন করিতে হইলে চাই অর্থ। অর্থ সুদুর্লভ সামগ্রী। বড় বড় কর্ম্মচারী, বড় বড় বণিক্‌কোম্পানী, সৈন্য বিভাগ, পুলিশ বিভাগ যেখানে রাশি রাশি অর্থ টানিয়া লইতেছে, সেখানে অর্থ কোথা হইতে আসিবে? সুতরাং সংস্কার অর্থে সংহার, পোষণ নহে শোষণ, বিকাশ নহে বিনাশ। গণতান্ত্রিক সরকার কখনও এমন জীর্ণ শীর্ণ দেহের উপর বিপুল মস্তক বহন করে না। মস্তকের অস্বাভাবিক বিশালতা না কমাইলে স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিলেও তাহা অভিসম্পাত স্বরূপ হইবে ইহা নিশ্চিত।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষায়তন যে আশানুরূপ নহে, তাহার কারণ উৎসাহের অভাব নহে, উপযুক্ত লোকেরও অভাব নহে। তাহার কারণ দেশের চিরন্তন দারিদ্র্য এবং জনমতের বংশানুক্রমিক দৈন্য। জগতে তাহারাই দীন, যাহারা কি চায় তাহা জানে না, এবং জানিয়াও জন্মগত মৃদু স্বভাবের জন্য মুখ ফুটিয়া বলে না। কিন্তু এরূপভাবে আধুনিক জগতে টিকিয়া থাকা যায় না, নিশ্চিত। যে জাতির জনমত প্রবল নহে সে জাতি অচিরাৎ বিলুপ্ত হয়। এ দেশে জনমত যে দিন প্রবল হইয়া উঠিবে, সে দিন প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কোষাগার উন্মুক্ত হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন সংস্কারের নামে ধিক্কার বর্ষিত হইবে।

ইহা একটি মৌলিক সত্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার সাধন করিতে হইলে, প্রথমেই চাই অর্থ। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষক অর্দ্ধাশনে কাজ করেন, কাজেই ছাত্রেরা তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষার পারিপাট্য আশা করিতে পারে না। বস্তুতঃ, আমাদের দেশের শিক্ষকেরা অভাবের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়া যেরূপ ভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যান, তাহা অন্য দেশে কল্পনারও অগোচর! সহরের শিক্ষকেরা হয়ত এ বিষয়ে তাঁহাদের পল্লীবাসী সহযোগিগণ অপেক্ষা কিছু পরিমাণে মুক্ত, কিন্তু সহরের দুর্ম্মূল্যতার বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায় যে দুর্ভাগ্য বিষয়ে উভয় শ্রেণীর শিক্ষকগণের মধ্যে যথেষ্ট সাজাত্য আছে।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এরূপ অবস্থা স্থায়ী হইতে দেওয়া দেশের পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না। অতএব শিক্ষার সংস্কারের আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিবে না। সেইজন্য শিক্ষার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হাটে মাঠে সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংস্কার-প্রয়াসীদের অনেকেরই হয়ত ধারণা নাই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এবং কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সফল

হইতে পারে। একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যায় যে, কোনও জাতির উন্নতির মূলে থাকে একটা সহুদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা যেখানে ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট বা উদ্দেশ্য যেখানে কোনও সংকীর্ণ স্বার্থ-সাধন, উন্নতির পথ সেখানে নিরুদ্ধ হইতে বাধ্য। আজকাল আমাদের দেশের জনমত একটু-আধটু সচেতন হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং আগেকার মত ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লোকের দৃষ্টিকে ঝাপসা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন যদি লোকে বুঝিতে পারে যে, তাহাদের হিতের জন্য কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, তাহা হইলে তাহারা নতমস্তকে তাহা সমর্থন করিবে, অন্যথা নহে। ষোল আনা না পাইলেও তাহারা ক্ষুব্ধ হইবে না। কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যেখানে গোলযোগ, সেখানে স্তোকবাক্যে কাজ হাসিল করিয়া লইবার চেষ্টা ব্যর্থই হইবে।

পার যদি বুঝাও। সংস্কারের কষ্ট স্বীকার করিবার পূর্ব্বে পার যদি বুঝাইয়া দাও যে, তোমার এই নববিধান জাতি-গঠনে সহায়তা করিবে; বুঝাইয়া দাও যে, তোমার এই সংস্কারের ফলে মানুষ যাহা কিছু জীবনে পরম হিতকর বলিয়া মনে করে তাহার প্রাপ্তি নিকটতর, নিশ্চিততর হইবে; তাহা হইলেই এই সংস্কারের সার্থকতা দেশ একবাক্যে স্বীকার করিবে। মাকাল ফলে কেহ ভুলিবে কি? জীবন-সংগ্রামে যখন আমরা ক্ষুধিত, ক্লান্ত, ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছি, তখন জনকয়েকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই যে সংস্কারের ধূয়া উঠিয়াছে, ইহাতে যোগদান করিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি কোথায়? গ্রীস্ দেশের কঠোর শিক্ষাপ্রণালীও লোকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কারণ সে শিক্ষা মানুষ গড়িয়াছিল, জাতি গড়িয়াছিল। এই শিক্ষার ফলে গ্রীক্‌রা এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। তাহার স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া বিধান করিলে কখনও এমনটি হইতে পারিত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা চূর্ণ করিতে হইবে, সম্প্রদায়-বিশেষকে প্রাধান্য প্রদান করিতে হইবে,—এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া যে সংস্কারের আরম্ভ, তাহা সংস্কার নহে, কুসংস্কার। বস্তুতঃ, এই বিলের দ্বারা কোন্ উপকার সাধিত হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। দেশের মেরুমজ্জাস্বরূপ তরুণগণের শিক্ষা লইয়া খেলা করা উচিত নহে। তাহাতে সকলেরই ক্ষতি। শিক্ষা-প্রণালীর সংস্কারের নামে যদি ইহার দুর্ব্বলতা ঘটাও, যদি সুসংবদ্ধ প্রণালীতে ছাত্রেরা শিক্ষা না পায়, তবে ক্ষতি কাহার? দিনকতক স্বচ্ছন্দে নবাবী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, হাতে ক্ষমতা পাইয়া তাহার যথেচ্ছ অপব্যবহারও করা না যাইতে পারে এমন নহে। কিন্তু পরিণামের চিন্তাও ত করিতে হয়? আমাদের ছেলেরা যে সুশিক্ষা পাইবে, তাহা কেমন করিয়া বলা যায়? আমরা না হয় মরিলাম, কিন্তু তোমরাও বাঁচিবে না। সুতরাং এমন একটি তন্ত্র বাহির কর, যাহাতে সকলেই তুল্যরূপে বাঁচিতে পারে।

কিন্তু এই বিলে তাহা হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ কি, তাহা বলিতেছি। বহুদিন ধরিয়া এই মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটি বোর্ড স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে। কতবার কত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল, কতবার তাহা আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হইল! আবার এই এক বিলের খসড়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। ইহার পরিণতি যাহা হইবে, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। সংখ্যাধিক্য শাসননীতির বলে অনায়াসে দেশের বুকের উপর দি ষ্টিম-রোলার চালাইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে শুধু বু ভাঙ্গে, দেশ জাগে না। যাঁহারা মাধ্যমিক শিক্ষা লইয়া জীব কাটাইয়া দিতেছেন, সেই প্রবীণ, অভিজ্ঞ, দূরদর্শী শিক্ষকদে সঙ্গে একবার পরামর্শ করিলে হইত না? এই চিন্তা যাঁহারা দি রাত করিতেছেন, হাতে-কলমে যাঁহারা ইহার প্রয়োগ লই বিব্রত, যাঁহাদের চোখে ইহার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়িতেছে তাঁহাদের কেহ ডাকিয়া শুধাইল না, অথচ বিস্ফোরকের মত এক বিলের খসড়া সহসা নিক্ষিপ্ত হইল জনসাধারণের মস্তকের উপর আর কোনও দেশে এমন ঘটনা ঘটিতে পারিত? ব্যাধির প্রত কার সম্বন্ধে বৈঠক বসিবে, কিন্তু চিকিৎসকদের সেখানে প্রবে নিষেধ! ভোট পাইয়া যাঁহারা সদস্য হইয়াছেন—তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ কেন না তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান। কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে এই শিক্ষ সমস্যা ক্ষুধার অন্ন, গায়ের রক্ত, জীবনমরণের সমস্যা, তাঁহাদিগে একবার জিজ্ঞাসা করিলে কি ক্ষতি হইত?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যাহা করিয় ছেন, তাহা প্রচুর না হইতে পারে, তাহার উন্নতির যথেষ্ট অব কাশ থাকিতে পারে—থাকিতে পারে কেন, আছে। এত দি পর্য্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই যাহারা করিয়া আসিয়াছে তাহারা কেহ নহে, তাহাদের অভিজ্ঞতা, কর্ম্মকুশলতা, পরিশ্রম— কিছুই গণনার মধ্যে আসিল না? এ কেমন কথা? কোনও কোন রাজপুরুষের মনে হয়ত এইরূপ একটি ধারণা আছে যে, বিশ্ব বিদ্যালয় বিশাল দৈত্যের মত দেশের শিক্ষাপ্রণালী কুক্ষিগত করিয় বসিয়া আছে, তাহারা কিছুতেই তাহার কোন অংশ সহসা ছাড়িয় দিতে চাহিবে না। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ধারণা ভুল। শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কিত ব্যবস্থায় ভারতের সক শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাধা দিবে, এরূপ ধারণ একান্তই নীচ এবং অশ্রদ্ধেয়। তবে যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপর্য্যস্ত করিয়া, সংকীর্ণ করিয়া, ক্ষমতাচ্যুত করিবার চেষ্টা হই তেছে, তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্মত হইতে পারে না, দেশবাসী সম্মত হইতে পারে না।

এক্ষণে যে ব্যবস্থা আছে তাহা যে অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষ-জনক, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ হাড়ে হাড়ে বুঝেন। কোনও বিদ্যালয়কে যোগ্যতা প্রদান করিবার কর্ত্তা বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্ তাঁহারা নির্ভর করেন সরকারী পরিদর্শক-সম্প্রদায়ের উপর। স্কুলের পরিচালন-সমিতি অনুমোদন করিবার ভার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপর, কিন্তু জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত নাকচ করিয়া দিবার দৈ শক্তি রাখেন। দৈব শক্তির ন্যায় ইহা রহস্যপূর্ণ ও দুর্জ্ঞেয়। স্কুলের কর্ম্মপদ্ধতি বাঁধিয়া দিবেন বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু অর্থ সাহায় দিবেন সরকার। তাঁহারা যাহাকে খুসী ইচ্ছামত সাহায্য দিতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত দিবা ক্ষমতা নাই! বিশ্ববিদ্যালয়েরও এমন কোনও অর্থসামর্থ্য নাই, যাহার দ্বারা শত শত উপযুক্ত স্কুলের কণামাত্র সাহায্যও করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব শুধু পরীক্ষা গ্রহণ নহে, এতদুদ্দেশ্যে তাঁহা দিগকে পাঠ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন করিতে হয়, এমন কি, শিক্ষকের যোগ্যতাও নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সরকারী স্কুলে এবং সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে সরকারী

পাঠ্য পড়িতে হয়, সরকারী নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়—এমন কি, শিক্ষকের নিয়োগ, অপসারণ প্রভৃতিও অনেক সময় তাঁহাদের দ্বারা বিহিত হয়। সরকার বাহাদুর এক টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটী করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারাই অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হয়। সম্প্রতি অবশিষ্ট দুই শ্রেণীর পাঠ্যও তাঁহারা করতলগত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটী যে কি ভাবে, কি দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত পুস্তকের বিচার করেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। তাঁহাদের বিদ্যার দৌড় কতদূর তাহা আমরা অবগত নহি। তবে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি যে, গ্রীক্ বর্ণমালায় তাঁহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে—অন্ততঃ প্রথম কয়েকটি বর্ণের জ্ঞান অসাধারণ!

যাহা হউক, এই নানা কারণে—বর্ত্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নহে বলিয়া প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু তাহার প্রতীকারকল্পে বিলের নির্ম্মাতাগণ যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা আরও চমৎকার! তাঁহাদের সুব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় করিবেন পরীক্ষা গ্রহণ, বিদ্যালয়ের যোগ্যতা স্থির করিবেন বোর্ড, শিক্ষা বিভাগ বোর্ডের সহযোগিতা করিবেন। খাসা বন্দোবস্ত। দ্বৈত শাসন দোষদুষ্ট বলিয়া ত্রিকাণ্ড শাসন প্রবর্ত্তিত হইবে। এখন আছে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী পরিদর্শন-বিভাগ; বিলের প্রসাদে হইবে বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড ও সরকারী পরিদর্শন-বিভাগ।

এই ত্রিত্বই একমাত্র কাম্য নহে, বিলের আর একটি উদ্দেশ্য হইতেছে বোর্ডকে সরকারী সদস্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত করা। এতদিন আমাদের শিক্ষাপ্রণালী যে রীতিতে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সরকারী প্রভাব বড় বেশী নাই। এই বে-সরকারী আবহাওয়ার মধ্যেই যে আমাদের শিক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু নবযুগের নববিধান পাছু হটিয়া আবার ঊনবিংশ শতকে ফিরিয়া যাইবার জন্য নানা অলিগলি খুঁজিতেছে। ইহা একটি গুরুতর রহস্য। বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রের ঋষি যে স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত করিলেন, যে বাণী হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র দেশকে এক দিন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এত দিনে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে চলিল। সংস্কার অর্থে যদি স্বাধীনতার বিসর্জ্জন হয়, তবে দেশ কি তাহা সহ্য করিবে? আমরা কি বৃথাই শিখিলাম যে, স্বাধীনতা-বর্জ্জিত শিক্ষা শিক্ষাই নয়?

কালনেমি কি ভাবে লঙ্কা ভাগ করিয়াছিল, এখন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু শিক্ষার এই কালনেমির বাটোয়ারায় সুফল হইবার আশা বড় বেশী নাই। বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবেন প্রবেশিকা পরীক্ষা ও তাহার পরবর্ত্তী শিক্ষাস্তর লইয়া, আর মাধ্যমিক বোর্ড থাকিবেন, প্রবেশিকাপূর্ব্ব স্তর লইয়া—এরূপ ভাগাভাগি আমার মতে হইতে পারে না। কারণ, পরিণতির দিক্ দিয়াই সমস্ত জিনিষের গঠনপ্রণালী নিরূপিত হইয়া থাকে। ফুল তুলিবার জন্য সাজি চাই, তাহা সেই ফুল তুলিবার মত করিয়া, তদুপযোগী উপাদানে প্রস্তুত করিতে হয়। উহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য টাটা কোম্পানীর ষ্টেড্, ষ্টিল খুঁজিলে চলিবে কেন? সেইরূপ যে প্রবেশিকা পরীক্ষা উচ্চশিক্ষার প্রবেশদ্বার, তাহাকে সেই উচ্চশিক্ষার উপযোগী করিয়া তৈয়ারী করিতে হইবে। যাহারা উচ্চ শিক্ষা চাহে না, তাহাদের জন্য যদি অন্য ব্যবস্থা করা হয়, তবে ক্ষতি নাই। বিলে তাহারও একটা আভাস আছে। কিন্তু প্রবেশিকার প্রতিযোগী একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই হয় না। সে পরীক্ষা দিয়া ছাত্রদের কি উপকার হইবে তাহাও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। মনে করুন, একটি ছাত্র চাষবাসের দিকে যাইতে ইচ্ছুক, অপরটি রেশমের চাষ করিতে উৎসুক—অন্য ছাত্রদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির প্রতি ঝোঁক জন্মাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে সেই সব বিষয়ের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা দরকার। হাতে-কলমে তাহার প্রয়োগবিজ্ঞান শিখানো দরকার। আমেরিকা ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। যদি বর্ত্তমান বিলের পৃষ্ঠপোষকদের মনে সেরূপ কোনও কল্পনা থাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল ছিল না কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শিক্ষা-সংস্কারের প্রথম সর্ত্ত হইতেছে এই যে, হয় তাহার দ্বারা কোনও গুরুতর জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে, নয় ত দেশবাসীর পক্ষে জীবিকা-অর্জ্জনের পন্থা সুগম হইবে। তবেই সে সংস্কারের সার্থকতা আছে। কিন্তু প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষা আইনে সেরূপ কোনও ইঙ্গিত আছে কি? কোথাও বৃত্তি-সৌকর্য্যের একটি কথাও পাই নাই।

পাইয়াছি সরকারী শাসনের অর্থাৎ কর্ম্মচারি-বিভাগের 'বেগে প্রবেশ'। ইহার একটি ফল হইবে এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র পড়ে, তাহাদিগকে কড়া শাসনে রাখা হইবে। আমরা শাসনের বিরোধী নহি, বরং পক্ষপাতী। ছেলেরা বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া দলে দলে রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের পশ্চাতে ছুটিবে, ইহা আমরা প্রাচীনের দল কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। কিন্তু এখানে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় লোকেরা যাহাই বলুন, বন্যার স্রোত কেহ রোধ করিতে পারে না। তরুণদের মানসিক ধাতুদ্রাব যখন সহসা গলিয়া অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে, তখন আমরা সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার গতিরোধ করিতে পারি না। বহুকাল সরকারী চাকরি করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, সময় সময় প্রাকৃতিক বিপ্লবের মত মানসিক চঞ্চলতা যখন ব্যাপক ভাবে উপস্থিত হয়, তখন যুক্তিতর্কের জালে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিতে পারা যায় না। এ শুধু আমাদের দেশের ইতিহাস নহে, জগতের সমস্ত সভ্য দেশেই এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য পশ্চিমের জগতে তরুণদের আন্দোলন (Youth movement) এত প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিবিদেরাও এখন আর তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছেন না। জগতে এই যে ভাববন্যা ছুটিতেছে, তাহার ঢেউ আমাদের দেশেও পৌঁছিয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে আমরা যে চাঞ্চল্য, যে সঙ্ঘবদ্ধতা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা বিশ কি পনেরো বৎসর পূর্ব্বে দেখি নাই—এমন কি কল্পনা করিতেও পারি নাই। এখন অবস্থার চক্রে যে নূতন দৃষ্টি লাভ করিয়াছি, তাহার ফলে এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, পুলিশের সাহায্যে, আইনের সাহায্যে ছাত্রদিগকে দমন করিবার চেষ্টা সফল হইবে না। বিদ্যালয়ের পরিচালকদের, শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করুন, দেখিবেন, ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহার করা আজকাল অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

অনেকের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, একটু কড়াকড়ি করিলেই ছাত্রদের উৎসাহ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। আমার বোধ হয় সরকারী বোর্ডের পরিকল্পনা সেই ধারণা হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। বেশত, একবার দেখাই যাক্ না। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ইহাতে ফল হইবে না কখনই। যত বাধা পাইবে, তরুণের মন তত বাঁকিয়া বসিবে—ইহাই মনস্তত্ত্বের অব্যভিচারী নিয়ম। সুতরাং বাধা না কমাইয়া দিলে, ছাত্রদের শিক্ষা দীক্ষা সব মাটী হইবে এবং দেশের মহা অনর্থ ঘটিবে। অবশ্য, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি ইহা বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি যে যেখানেই দমননীতি অনুসরণ করা হইয়াছে, সেখানেই পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়াছে। ব্যাধির উপশম করিতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষ প্রাণান্তকর দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি আমার ভূতপূর্ব্ব মনীবদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সহকারে জানাইতে চাই যে, সরকারী আমলাতন্ত্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে মাধ্যমিক শিক্ষা কখনও উন্নতিলাভ করিবে না, বরং এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে যে, শিক্ষা-সমস্যা দুরপনেয় জটিলতাপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

যদি প্রকৃত সদুদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষার সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, শিক্ষানিপুণ ব্যক্তিদিগকে লইয়া পরামর্শ কর, সেই সকল লোককে আহ্বান কর—যাহাদের কোনও স্বার্থাভিসন্ধি নাই, যাহারা কাহারও গ্রামোফোন হইয়া কথা কহিবে না, তাহারাই বস্তুতঃ শিক্ষার সংস্কার-বিষয়ে কথা কহিবার অধিকারী। এখানে সম্প্রদায় হিসাবে, জাতিবর্ণ হিসাবে সকলকে জড়ো করিয়া কোনও লাভ হইতে পারে না। সে-সবের জন্য ব্যবস্থা-পরিষদ্ আছে। ট্যাক্স ধার্য্য করিবার সময়ে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সম্মতি আবশ্যক। চাকরীতেও সর্ব্বজাতির লোক যাহাতে সংখ্যার অনুপাতে লওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পার—যদিও তাহাতে সরকারী কার্য্যের সব দিকে পারিপাট্যের লাঘব হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষাসংস্কার-ব্যাপারে এইরূপ ভাবে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার কি সার্থকতা আছে? ইহাতে ব্রাহ্মণেরও দরকার নাই, ছুতারেরও দরকার নাই, হিন্দুরও দরকার নাই, মুসলমানেরও নাই—এখানে তাহাদিগকেই আমরা বরণ করিব যাহারা শিক্ষা দীক্ষা যোগ্যতা ও বহুদর্শিতা-গুণে এ বিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বিলের গোড়াতেই সাংপ্রদায়িক ভাগাভাগির ব্যবস্থা দেখিতে পাই। কিন্তু কেন? মুসলমান ভ্রাতৃগণের মধ্যে আজকাল যোগ্য লোকের অভাব নাই—যোগ্যতার গুণে তাঁহারা আসুন, সকলে তাঁহাদিগকে মাথায় করিয়া লইবে। কিন্তু ভোটাধিক্যের জোরে প্রবেশ করিতে গেলে সুফলের সম্ভাবনা কোথায়?

বর্ত্তমানে শিক্ষা বিভাগের দশা দেখিলে আশার অবকাশ থাকে না। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ফলে শিক্ষা বিভাগে যোগ্যতার আদর কমিয়া গিয়াছে, ফল সেখানে ভাল হইয়াছে কিনা, তাহা আপনারাই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আমার পক্ষে বেশী বলা শোভা পাইবে না। আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে, শিক্ষা আমাদের জাতির মেরুদণ্ড। জাতিধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ইহা সকলেরই একান্ত অপরিহার্য্য প্রয়োজন। আহার এবং পানীয়ের মত ইহা সকলের পক্ষেই পরম হিতকর। কাজেই এখানে অন্ত সকল ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ব্যাপারকে উপেক্ষা করিয়া দেশের মঙ্গল—সমগ্র জাতির কল্যাণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আমাদের কি প্রয়োজন, তাহা অগ্রে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। যে শিক্ষা জাতির মঙ্গলের নিদান, যে শিক্ষায় আমাদের আদর্শ উন্নত করিয়া তুলিবে, যে শিক্ষায় বর্ত্তমান জীবিকাসঙ্কটের প্রতীকার হইবে, পৃথিবীর সভ্য জাতির দরবারে আমরা একটি সম্মানজনক স্থান লাভ করিতে পারিব, তাহারই নাম সুশিক্ষা। এই মাধ্যমিক বিলে যদি ইহার কিছুমাত্র ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহা গৃহীত হওয়া উচিত নহে। কেবল শাসন-কর্ত্তৃত্বের ব্যবস্থা করিলে হইবে না। দৃষ্টিভঙ্গীর সুদূর প্রসার আবশ্যক। হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, আগে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হইতে দাও, তাহার পরে তাহারাই সমস্ত ব্যবস্থা করিবে। এ উক্তির মূলে কোনও যুক্তি নাই। কারণ—কোনও বস্তুর গঠনপ্রণালী দেখিয়া অনেকটা অনুমান করা যায় যে, তাহার দ্বারা কি কাজ হইবে। ছুরির দ্বারা কলম, পেনসিল্ কাটা চলে—কিন্তু যুদ্ধ করিবার জন্য ধারালো ছুরিও যথেষ্ট নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিক্ষার উন্নতিবিধান করিতে হইলে শুধু মুখের কথায় হইবে না, শুধু একটি বোর্ড খাড়া করিলেও হইবে না, চাই প্রচুর অর্থ। সে অর্থ কোথায়? যদি অর্থই না থাকে, তবে এ বনহংসীর পশ্চাতে ধাবিত হওয়ার সার্থকতা কি? যেখানে মুষ্টিমেয় পর্দানশীন তরুণীর শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা যাইতে পারে, সেখানে এত বড় একটি ব্যাপারের জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকার বরাদ্দ হাস্যাস্পদ নহে কি?

যাহা হউক, যদি ব্যয়-সংক্ষেপই বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে এই নূতন স্কীম ফাঁদিবার আবশ্যকতা কি? শিক্ষার যে বিশাল প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সহিত সংযোগিতা করিলে অনেক কম খরচেও হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার অনর্থক আড়ম্বর না করিয়া, ইহার সহিত একটি যোগসূত্র রক্ষা করিলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হইতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত যে সকল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কন্ধে গুরুভাররূপে পতিত হইয়াছে, বোর্ড সেই ভার গ্রহণ করিতে পারেন। পাঠ্য পুস্তক-নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের দ্বারা বোর্ড সহজেই করাইয়া লইতে পারেন, কাজও অশেষ গুণে ভাল হইতে পারে। বোর্ড এবং সেনেট একযোগে কাজ করিতে করিতে যখন অর্থের স্বচ্ছলতা হইবে, তখন ক্রমশঃ শিক্ষাবোর্ডকে আরও অনেক কাজের ভার দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ হইলে দেশের শিক্ষা প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একই যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মাধ্যমিক হইতে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার একই নিয়মে, একই শাসনের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। অতএব আমার বক্তব্য এই যে, কর্ত্তৃত্ব লইয়া কাড়াকাড়ি না করিয়া সত্যের অনুসরণ করিলে এখনও সুফল হইতে পারে। *

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ (অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়)।

* কলিকাতা শিক্ষক-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

আমি অনিমেষ আর জয়ার কথা বলছি। ওরা দু'জনে বেশ সুখেই ছিল। ওদের পরস্পরের বোঝা-পড়াটা যখন একটা মধুর পরিণতির প্রায় সীমা-ঘেঁষে চলছিল, ঠিক সেই সময় ঘটলো এক অসমঞ্জ অঘটন! তবে অঘটনটা একমাত্র অনিমেষের অদৃষ্টেই মূর্ত্ত হয়ে উঠল, অথচ জয়ার দিকের মধুর পরিণতি কোথাও ব্যাহত হ'ল ব'লে মনে হ'ল না; বরং দেখা গেল, মাধুর্য্যের ধারা ওর দিকে একটু অপর্য্যাপ্ত পরিমাণেই বর্ষিত হ'তে থাক্‌লো। কিন্তু অনিমেষ ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, এবং সেটা স্বাভাবিক; কেন না, ঠিক সাত দিন আগেও জয়ার সমস্ত আকর্ষণকে সে একাই সম্পূর্ণ দখল ক'রে রেখেছিল, এবং যে জয়া সাত দিন পূর্ব্বেও ভাব-ভঙ্গিতে অনিমেষের প্রেমকে সামাজিক দাবীর চাপ্‌রাসে আবদ্ধ করতে একরূপ সম্মতিদানই করেছিল, এবং যে সম্ভাবনাকে অবলম্বন ক'রে ও কত সুখ-কল্পনায় নিজেকে প্রশ্রয়দান করেছিল, আজ মাত্র সাতটি দিনের ব্যবধানে সেই জয়াই কোথাকার এক অননুমোদিত বিলেতফের্ত্তার খপ্পরে প'ড়ে অনিমেষকে ভাল ক'রে চিনতেও চাইছে না। জয়ার চায়ের টেবিলে অনিমেষের মৌন উপস্থিতিও জয়া আজকাল আর পছন্দ করে না! অনিমেষের অনুপস্থিতিতে যে জয়ার একদিনের সন্ধ্যাও দুঃসহ মনে হ'ত, এখন সেই জয়ারই প্রতিদিনের সন্ধ্যা যেন অনিমেষ-কেই বিশেষ ক'রে প্রত্যাখ্যান ক'রতে চাইছে। অনিমেষ বোকা নয়, কিন্তু সে আশাবাদী, জয়ার প্রকৃতিকে সে যতটুকু চিনেছে, তাতে ক'রে বেশ বুঝ্‌তে পারলে, এই নবাগত বিলেতফের্ত্তা শ্রীকণ্ঠ লোকটা খুব বেশী দিন জয়ার চোখে মোহ মাখিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু এই মোহমুক্তির আগেই যদি ওদের মধ্যে মিলনের পাকা-পাকি কোন ব্যবস্থা হ'য়ে যায় তা হ'লে জয়া যে সুখী হবে না, হ'তে পারে না—সেটা অনিমেষের সুবিদিত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের জীবনটাও ব্যর্থ হবে। নাঃ—জয়াকে এ রকম একটা ভুল করতে দেওয়া কখন কর্ত্তব্য নয়, ওর নিজের কথা বাদ দিয়ে শুধু জয়ার দিক্ থেকে বিবেচনা করলেও তাকে বাধা দেওয়া উচিত।

অনিমেষ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েই জয়াদের বাড়ী এল। জয়া তখন শ্রীকণ্ঠের চায়ের বাটিতে চা ঢালছিল, অনিমেষকে দেখে বললে, "এসো অনিমেষ,—কিন্তু তুমি এ সময় আসবে এজন্যে প্রস্তুত ছিলাম না কি না, তাই তোমার জন্যে চায়ের জল নেয়া হয়নি। কিন্তু তাতে অসুবিধে হবে না, এক্ষুনি চা' হ'য়ে যাবে; বোস'।"

"তাই ত জয়া, বড্ড অসময়ে এবং ভারী অকস্মাৎ এসে তোমাকে বিব্রত ক'রে তুললাম দেখছি"—বেশ সরস হাসির সঙ্গেই অনিমেষ উত্তর দিল, "কিন্তু গত দু'বছর ধ'রে প্রতি-দিন ঠিক এই সময়ে এখানে উপস্থিত থেকে-থেকে অভ্যাসটা এমন খারাপ হ'য়ে গেছে যে, আজকের উপস্থিতিটা অপ্রত্যাশিত ব'লে তোমার যে মনে হতে পারে, তা বুঝেই উঠতে পারিনি। কিন্তু তবু এক পেয়ালা চা সত্যিই দরকার,—তার প্রধান কারণ, চা আমি খেয়ে আসিনি।"

জয়ারও পরিপাক-শক্তি নিন্দনীয় নয়; রহস্যজনক ভাবে সে তার ঠোঁট হাসির ব্যঞ্জনায় একটু বক্র ক'রে বললে, "শোন অনিমেষ, আজ আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি, শ্রীকণ্ঠ বাবুরই নেমন্তন্ন;—তা তুমিও চল-না না হয় আমাদের সঙ্গে, কি বলো?"

"আমরার মধ্যে কে কে আছেন?"

"আমি আর শ্রীকণ্ঠ বাবু—আর কেউ যেতে পারলেন না"—তার পর যেন একটু কৈফিয়ৎএর ধরণেই জয়া

আবার বললে, "ফার্ষ্ট শো'তে যাব, রাত ন'টার মধ্যেই শেষ হ'য়ে যাবে, হ্যাঁ—তা তুমিও চল না।"

আন্তরিকতাহীন সাধারণ ভদ্রতার আহ্বান, হয় ত একটু সঙ্কোচ কোথাও রয়েছে, এবং এই আমন্ত্রণ তাহারই প্রতিক্রিয়া। অনিমেষ উত্তর দিল, "আজ আর হয় না জয়া, বরং চল কাল, বেশ ভাল একটা ফিল্ম এসেছে ম্যু সিনেমায়।"

"কিন্তু কাল যে শ্রীকণ্ঠ বাবুকে কথা দেয়া হ'য়ে গেছে তাঁর সঙ্গে ষ্টীমারট্রিপে যাবার?"

"তবে পরশু?"

"পরশুই না আপনাদের স্পোর্টস্, শ্রীকণ্ঠ বাবু?" তার পর অনিমেষের দিকে ফিরে জয়া আবার বললে, "কি করে যাই অনিমেষ? পরশু যে শ্রীকণ্ঠ বাবুদের স্পোর্টস্!"

"তবে আর এক দিন তোমার সময়-মত দেখা যাবে"—বলেই মুখ আঁধার ক'রে অনিমেষ উঠে প'ড়লো, "তোমাদের থিয়েটারের দেরী হয়ে যাচ্ছে জয়া, আমি তবে আসি"—অনিমেষ আর প্রতীক্ষা না ক'রে সোজা বেরিয়ে গেল।

জয়ার ঠোঁটে আবার সেই রহস্যজনক পরিবেশ!

আরো পাঁচ-সাত দিন কাটল। অনিমেষ পূর্ব্বের মতই প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে জয়াদের বাড়ী আসে, কিন্তু প্রায়ই জয়ার দর্শন মেলে না। কোন দিন জয়া তার আসবার আগেই শ্রীকণ্ঠের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, কোন দিন-বা তার আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরুবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। যে দিন নিতান্তই বাড়ীর বাইরে বেরুবার কোন অজুহাত না জোটে, সে দিন অনিমেষকে যতটা সম্ভব সে এড়িয়ে চলে।

অনিমেষ বুঝতো সবই, কিন্তু তবু জয়ার এখানে একবার ক'রে না এলে ওর মন ছোঁ-ছোঁ ক'রতো—এখানে আসাটা ওর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে এক দিন অনিমেষ এক বন্ধুর বাড়ীর পার্টিতে উপস্থিত হ'য়ে দেখলে—জয়া এবং শ্রীকণ্ঠও সেখানে হাজির। অনিমেষ ধীরে ধীরে তাদের দিকে এগিয়ে এল, এবং তাদেরই পাশের একখানা চেয়ারে বসে পড়ে, দুই-একটা সাধারণ কথার পর জয়াকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাওয়ার নেমন্তন্ন ক'রে বললে, সে দিন ত আগে থাকতেই কথা দিয়ে রেখেছিলে ব'লে আমার সঙ্গে যেতে পারলে না জয়া, আজ চল না সিনেমায়।"

উত্তর এল শ্রীকণ্ঠের মুখ থেকে; শ্রীকণ্ঠ বললে, "কিন্তু আপনার সঙ্গে একা একা সিনেমায় যাওয়াটা জয়ার পক্ষে আর তেমন সঙ্গত নয়; বিশেষতঃ, আমারও তাতে ইয়ে—কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে।"

"অথচ এমন এক দিন ছিল, আমি যখন সঙ্গে না থাকলে জয়ার সিনেমা দেখার আনন্দটা সম্পূর্ণ অনর্থক হয়ে যেত; সে বিষয়টা কি সত্যই উপেক্ষণীয়?"

"সেই এক দিনের সঙ্গে আজকের দিনের অনেক তফাৎ আছে অনিমেষ বাবু!—তখন জয়া ছিল একা; আর আজ জয়ার প্রত্যেক ব্যবহারই আর এক জনের সম্মান-অসম্মানের সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়েছে।"—শ্রীকণ্ঠ অসঙ্কোচেই এই ইঙ্গিতটুকু ক'রে বসলো।

"তার মানে?"

"মানেটা জয়াকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

"সত্যি, জয়া, আমার সঙ্গে একা সিনেমায় যাওয়া কি তোমার পক্ষে আর সম্মানজনক নয়?"—অনিমেষ ব্যথিত স্বরে প্রশ্ন করল

"তুমি বড্ড জ্বালাতন করতে পার অনিমেষ," জয়া উত্তর দিল, "কেন বৃথা আমার পাশে সব সময় ঘ্যান্-ঘ্যান্ ক'রে বেড়াও? যাও না—আর কাউকে নিয়ে সিনেমায়; তা সে যা-ই কর, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি তোমায়।"

এর পর কি যে তার করা উচিত, অনিমেষ তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না! তার মনে হ'লো, এখানে তার এক মিনিটও থাকা সঙ্গত নয়; অথচ শিষ্টাচার বজায় রেখে কি অজুহাতে উঠে যেতে পারে, তাও অনিমেষ খুঁজে পেলে না। কিন্তু অনিমেষকে এই বিশ্রী সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেন ওরই ভগিনীপতি, তিনিও এখানে নিমন্ত্রিত ছিলেন, এবং সস্ত্রীক ও সভগিনী এইমাত্র এসে উপস্থিত হ'লেন।

ভগিনীপতি অনিমেষকে দেখতে পেয়ে বললেন, "এই যে অনিমেষ! কত দিন যাওনি বল ত আমাদের ওদিকে, আজই ফেরবার পথে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আর শোন—এটি আমার বোন মণি; গত সোমবার ও জব্বলপুর

থেকে এসেছে, ওকে ত তুমি খুব ছোটবেলায় দেখেছিলে, অনেক দিন পরে এসেছে কি না, ওর কথা মনেও হয় ত নেই তোমার।"

অনিমেষ উঠে দাঁড়িয়ে, বললে, "না না, মনে আছে বৈ কি, মন্টিকে আর মনে নেই? কি যে বলেন আপনি! তবে মন্টি বোধ হয় আমাকে ভুলে গেছে, কি বল মন্টি?—আমাকে তুমি চিনতে পারবে ব'লে আশা করিনি।"

"খুউ—ব চিনতে পেরেছি। সে কথা মনে আছে, অনুদা,' সেই যে সে-বার কৎবেল গাছ থেকে তুমি ধপাস্ ক'রে প'ড়ে গিয়েছিলে, ছি—ছি—ছি!"—মন্টির সরল হাসি বড় মিষ্টি!

"হাঁ, তোর মনে আছে দেখছি" এবার অনিমেষের ভগিনী বললেন, "শোন দাদা—সঙ্গী অভাবে মন্টির মন কোলকাতা থেকে পালাই পালাই করছে। ওর দাদারও সময় নেই যে, ওকে নিয়ে রোজ খানিকটে ঘোরাঘুরি করেন, এবার তোমাকেই ওর ভার গ্রহণ করতে হবে।"

"নি—শ—চ—য়।" মন্টি আবার বীনাস্বরে খুব মিষ্টি ক'রে বলল, "আর ছাড়চি না কি? কত দিন পর কোলকাতায় এলাম, তা কিচ্ছু দেখা হয়নি এখনো। এ ক'দিন আর তোমাকে ছাড়চি নে বুঝেচ অনুদা!"—কথার সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা সবেগে আন্দোলিত হ'ল।

এ সব কথা বুঝতে অনিমেষের কোন দিনই বাধে না। কথায় কথায় ওরা এগিয়ে গেল।

শ্রীকণ্ঠ জয়ার কাছে মন্তব্য প্রকাশ করল,—"খাসা মেয়েটি ত।"

"হুম্", জয়া অকস্মাৎ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল।

দু'-চার দিন পরের কথা।

থিয়েটারে দর্শকের আসনে ব'সে জয়া আর শ্রীকণ্ঠ তখন বেশ হাল্কা মনেই গল্প করছিল, সেই সময় একটি মেয়ে প্রবেশদ্বার দিয়ে দর্শকমঞ্চের দিকে এগিয়ে এল। গাঢ় জর্দ্দা রঙের শাড়ীখানা মেয়েটির সোনার বর্ণে এমন একটা দীপ্তি ফুটিয়ে তুলেছিল যে, সকল দর্শকের সমবেত দৃষ্টি স্বাভাবিক ভাবেই সে-দিকে আকৃষ্ট হ'ল। জয়ার প্রশংসমান দৃষ্টিও মেয়েটির শাড়ী পরবার বিশেষ ভঙ্গী ও রুচিনৈপুণ্যের সমর্থন করল। মেয়েটির নিবিড় পল্লবে ঢাকা টানা টানা চোখ দু'টির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেই জয়ার মনে হ'ল, মেয়েটিকে যেন পূর্ব্বে কোথাও দেখেছে। মেয়েটির সঙ্গে যে লোকটি সেখানে প্রবেশ করল, তাকে দেখেই মেয়েটিকে চিনতে জয়ার আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'ল না; মেয়েটি মন্টি, তার সঙ্গী অনিমেষ!

উভয়ে তাদের সিটের দিকে অগ্রসর হ'তেই জয়া অনিমেষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মন্টিকে তার আসনে বসিয়ে দিয়ে অনিমেষ জয়ার কাছে আসতেই জয়া বলল, "তাহ'লে তোমার সিনেমা-সঙ্গী পেয়েছ অনিমেষ!"—জয়ার মুখে হাসি, কিন্তু সে সম্পূর্ণ কাষ্ঠ-হাসি।

আর এক দিন ওদের দেখা বটানিকেল গার্ডেনে, জয়া তখন একটু আন্তরিকতা দেখিয়ে বলল, "কই অনিমেষ, আজকাল ত আর আমাদের ও-দিকে যাও-টাও না—অভ্যাসটা একবারেই ছেড়ে দিলে না কি, যেও এক দিন।"

হাঁ, অনিমেষ আজকাল জয়াদের বাড়ী যাওয়া একবারেই ছেড়ে দিয়েছে; জয়া বলেছিল, 'আমাকে ছেড়ে দাও অনিমেষ' জয়া আরো বলেছিল, 'তুমি বড্ড জ্বালাতন করতে পার অনিমেষ'—এর পর অনিমেষ কি ক'রে আর জয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে যেতে পারে? বিশেষতঃ, শ্রীকণ্ঠ ত স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছিল—জয়ার প্রতি ব্যবহারের সঙ্গে তার মান-অপমান জড়িয়ে আছে। এই ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝতে না পারবার মত বুদ্ধির অভাবও অনিমেষের ছিল না। জয়া শ্রীকণ্ঠের এই ইঙ্গিতটার এক রকম সমর্থনও করেছিল—তবে, তবে সে কেন যে এখনো ঘনিষ্ঠতার জের টেনে চলবে, অনিমেষ তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। এই গেল সাধারণ বিচার, তবে অনিমেষের মনের কথা অবশ্যই জানা যায়নি—হয় ত মন্টির মত মেয়ের সাহচর্য্য জয়ার সাহচর্য্যের চেয়েও তার অধিকতর লোভনীয় বলেই মনে হয়েছিল। মন্টির ঋজু দেহসৌষ্ঠব, তার সহজ স্বাভাবিক আচরণ, তার পটুতা, উজ্জ্বল বুদ্ধি, এবং রুচির বৈশিষ্ট্য ও তার প্রকাশভঙ্গি—সব কিছুই অনিমেষের দৃষ্টিতে আজ হয় ত জয়ার চাইতে অনেক বেশী রমণীয় ব'লে প্রতিভাত হয়ে থাকতে পারে, এবং তারই ফলে জয়ার প্রতি অনিমেষের মনযোগে হয় ত শৈথিল্য ঘটেছে। জয়াও সেটা অনুভব করল এবং তার মনে হ'ল, এটা তার পরাজয়। অনিমেষের পরিবর্ত্তে আর কারো সম্পর্কে জয়া এ

ব্যাপারটাকে কৌতুকের সঙ্গেই উপভোগ করতে পারত ; কিন্তু যে অনিমেষকে একদা সে সামান্য ইঙ্গিতে পরিচালিত করেছে, আজ সেই অনিমেষই তার প্রতি সম্পূর্ণরূপ অমনোযোগী হয়ে উঠেছে, এবং সব চাইতে বড় লজ্জার কথা যে, এই অমনোযোগিতার কারণের মূলে র'য়েছে তারই মত আর একটি মেয়ে। এই মেয়েটির প্রাধান্য জয়ার ব্যক্তিত্বকে করেছে ক্ষুণ্ণ, ওর আকর্ষণী-শক্তিকে করেছে পরাজিত। এই পরাজয়ের লজ্জা জয়াকে যে কি তীক্ষ্ণ ভাবে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ ক'রছিল, তা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছিল।

এ-দিকে অনিমেষের সঙ্গে গায়-প'ড়ে আলাপ করা এবং আমন্ত্রণ করাটা শ্রীকণ্ঠ বেশ উদার চিত্তে গ্রহণ করল না। এই সামান্য ব্যাপারটা উপলক্ষ ক'রে শ্রীকণ্ঠ আর জয়াতে ছোটখাট একটু মতান্তরও ঘটে উঠল। যদিও জয়ার এই আমন্ত্রণটা মিনিট কয়েক পরে অনিমেষের মোটে মনে থাকল কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করা চলতে পারে ; তবু জয়া আশা করেছিল অনিমেষ নিশ্চয় আসবে। যেখানে প্রত্যাশা সেখানেই দুঃখ,—জয়াকেও দুঃখ পেতে হল ; তার আশা পূর্ণ হ'ল না, অনিমেষ এল না।

আর এক দিন দেখা হ'ল চৌরঙ্গীর একটা রেস্তোরায়। মন্টি অনিমেষের পেয়ালায় চা ঢালছিল এমনি সময় জয়া আর অনিমেষে মুখোমুখি দেখা। জয়া অত্যন্ত আগ্রহে অনিমেষের একটা হাত নিজের হাতের ওপর তুলে নিল, কিন্তু অনিমেষ হাতটা ছাড়িয়ে নিবার চেষ্টা করলে জয়া তা না ছেড়ে বলল, "আশ্চর্য্য ! অনিমেষ, খুব অবাক হ'য়ে যাচ্ছি, এমন এক দিন ছিল যখন একটি সন্ধ্যাতেও আমার অনুপস্থিতি তুমি সহ্য করতে পারতে না ; আর এখন কত দিন তোমার দেখা পর্য্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না, তোমাকে নেমন্তন্ন করেও তোমার দর্শন পাওয়া যায় না।—আশ্চর্য্য ! শোন অনিমেষ, কালকে তুমি আমাদের বাড়ীতে আসবেই ; এক দিন সিনেমা দেখাবে ব'লেছিলে, নেমন্তন্নটা পাওনা রয়েছে, কালই চল একবারে আমাদের ওখান থেকেই বেরিয়ে পড়া যাবে, কি বল ?"

"কিন্তু কাল কি ক'রে হবে ? কাল যে মন্টিদের বাগান-বাড়ীতে আমাদের গার্ডেন-পার্টি র'য়েছে। সব নেমন্তন্ন-পর্য্যন্ত করা শেষ ; এখন ত আর দিনটা পিছিয়ে দেওয়া চলে না"—অনিমেষ এক-নিশ্বাসেই এ কথাগুলি ব'লল।

অপমানের গ্লানি জয়াকে পরিপাক করতে হ'ল ! সে কুণ্ঠিতভাবে ব'লল, "তবে পরশু, কেমন ? পরশুই ঠিক রইল তাহ'লে।"

"পরশু ত তোমার বন্ধুদের থিয়েটার না মন্টি ? আমরা ত প্রথম 'শো'রই টিকেট কিনে রেখেছি মনে হচ্ছে"—তার পর জয়ার দিকে ফিরে অনিমেষ আবার ব'লল, "তাই ত জয়া, পরশু যে মন্টির বন্ধুদের থিয়েটার, আর আমরা তার টিকিট আগে-থাকতেই কিনে রেখেছি কি না, কাজেই এর পর আর এক দিন তোমার সঙ্গে যাওয়া যাবে।—কি বল ?"

"তাই যেয়ো" ব'লে অনিমেষের হাতটা ছেড়ে দিয়ে জয়া আস্তে আস্তে ফিরে এল। মুখটা তার অকস্মাৎ অনেক বেশী ফ্যাকাসে দেখাতে লাগল—অবশ্য ঔজ্জ্বল্যহীন ফর্সা।

পরদিন প্রভাতে ঘুম ভেঙ্গে চোখ খুলে প্রথমেই চোখের সামনে যাকে দেখতে পেলে—তার চেয়ে অপ্রত্যাশিত অতিথি অনিমেষ কোন দিন কল্পনাও করতে পারেনি ; অনিমেষ দেখ্‌ল তার খাটের ওপর এবং তারই হৃদয়ের সন্নিকটে—যেখান থেকে একদা পাঁজরের অস্থি ভেঙ্গে-নিয়ে শয়তান প্রথমা নারীকে সৃষ্টি করেছিল—সেই ভগ্ন অস্থিখানার সংলগ্ন-প্রায় হ'য়ে ব'সে আছে তার জীবনের প্রেয়—একমাত্র আরাধ্যা দেবী।

জয়াকে দেখে অনিমেষ যেন আবিষ্ট হ'য়ে প'ড়ল। ধীরে ধীরে জয়ার সুগোল হাতখানাকে নিজের হাতের মধ্যে টেনে-নিয়ে অনিমেষ আরো কতক্ষণ চোখ বুঁজে প'ড়ে রইল। তার কাণে ভেসে এল জয়ার কণ্ঠস্বর : জয়া ব'লছে—"খুব অসময়েই এসে প'ড়েছি অনিমেষ, কিন্তু তোমার পক্ষে অসময় হ'লেও আমার পক্ষে এইটেই সব-চাইতে শ্রেষ্ঠ অবসর। কারণ, তোমাকে আজ না পেলে আমার চলত' না। শোন অনিমেষ, তোমার সঙ্গে আজ শেষ বারের মত বোঝাপড়া করতে এসেছি, এখন থেকে তোমার সঙ্গে কি ভাবে আমার চলা উচিত সেটাই স্পষ্ট্ জানতে চাচ্ছি আমি।"

"কিন্তু তার আগেই শ্রীকণ্ঠ বাবুর সঙ্গে তোমার ব্যবহারের সীমাটাও জানা আমার দরকার হয়েছে।" —অনিমেষ চোখ বুজেই এই মন্তব্য ক'রল।

"শ্রীকণ্ঠ বাবুর সঙ্গে সকল রকম ঘনিষ্ঠতাই শেষ ক'রে ফেলেছি"—জয়া বল্‌তে লাগল, "সে-দিন নেমন্তন্ন-বাড়ীতে তোমাকে আঘাত দেওয়ার পর থেকেই তোমার ব্যবহারের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ বাবুর প্রত্যেক কাজের প্রত্যেকটি আচরণের তুলনা চলতে লাগ্‌ল—অবশ্য মনে মনে; ইচ্ছা সত্ত্বেও এই প্রতিক্রিয়াকে আমি প্রতিহত করতে পারিনি—এবং বলতে সঙ্কোচ নেই, সকল বিষয়ে তোমারই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হ'তে লাগ্‌ল। বিনা-দ্বিধায় শ্রীকণ্ঠ বাবু ধীরে-ধীরে নেমে তলিয়ে যেতে লাগলেন, এবং কাল বাড়ী ফিরেই সব পরিণতির ওপর শেষ-যবনিকা আবেগের মতই টেনে দিয়েছি—এবং শ্রীকণ্ঠ বাবু অবশেষে নেমে গেছেন সাধারণের স্তরে।"

জয়াকে ধীরে ধীরে নিজের আরো কাছে আকর্ষণ ক'রে অনিমেষ ব'লল, "তবে শ্রীকণ্ঠ বাবুর সঙ্গে পরিচয় ঘনিয়ে উঠবার আগে আমার সঙ্গে তোমার যে অমায়িক ব্যবহার অক্ষুণ্ণ ছিল, তুমি আবার ঠিক তেমনি ক'রেই আমার কাছে চলে এস জয়া, এই আমার অনুরোধ।"

"কিন্তু মন্টি?" জয়া অন্য হাতে অনিমেষের কপালের চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে এই প্রশ্ন ক'র্‌ল।

"মন্টি"—অনিমেষ আবার চোখ খুলে তাকাল, এবার তার ঠোঁটে রহস্যপূর্ণ হাসি, "মন্টিকে নিয়ে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই; যেহেতু মন্টির বিয়ে হ'য়ে গেছে।"

—অত্যন্ত সহজ উত্তর। "বিয়ে হ'য়ে গেছে!" জয়ার কণ্ঠস্বরে পুঞ্জীভূত বিস্ময়!

"হ্যাঁ, প্রায় বছর-চারেক হ'ল তার বিয়ে হ'য়ে গেছে; বছর দুয়ের একটি ছেলেও আছে।"

"ছেলে? মন্টির ছেলে—কি আশ্চর্য্য!"

"হ্যাঁ, মন্টির ছেলে, মাষ্টার বিলু চমৎকার ছেলে। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, দেখবে কি স্ফূর্ত্তি তার।" —অনিমেষ মন্টির ছেলের প্রশংসা যেন দশ-মুখেও শেষ করতে পারে না!

কিন্তু মন্টির সঙ্গে ত কালও সন্ধ্যাকালে দেখা হ'ল, স্পষ্ট দেখেছি সিঁথিতে তার সিঁদূর ছিল না।"—জয়া মন্তব্য ক'রল।

"সেটা সাময়িক ব্যবস্থা, এবং আমারই অনুরোধে।" প্রচ্ছন্ন কৌতুক এবার অনিমেষের চোখে স্পষ্ট হ'য়ে বেরিয়ে এল; উচ্ছ্বসিত হাসির ভেতর দিয়ে অনিমেষ হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল, "সত্যি, কি রকম ঠকে গেলে! আচ্ছা ঠকিয়েছি তোমাকে জয়া! একেবারে বোকা ব'নে গেছ!"

জয়া বোধ হয় লজ্জাটাকে ঢাকবার জন্যই অনিমেষের বুকের ওপর মুখখানা লুকিয়ে ফেল্‌ল, এবং তার বুকের ভেতর থেকে জয়াকে ব'লতে শোনা গেল, "একটুও ঠকিনি আমি, আমি খুব জিতেছি, আমারই জিত হল।"—তার পর আবেশমাখা তৃপ্ত চোখদুটি আস্তে আস্তে তুলে, অনিমেষের চোখের দিকে তাকিয়ে জয়া আবার তেমনি ধীরে ধীরে ব'লল, "কিন্তু তুমি দেখতে যতটা সরল, আসলে মোটেই তত সরল নও! সরলতাটা তোমার ছলনামাত্র, কপটতার আবরণ; প্রকৃতপক্ষে তুমি ভয়ঙ্কর কপট!"

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার ফল

ফল চিরকালই উৎকৃষ্ট আহার্য্য বলিয়া পরিগণিত। বস্তুতঃ আদিম মানব জীবনধারণের জন্য মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষীর মাংসে নির্ভর করিলেও সহজ লভ্য বন্য ফলমূলই অনেক সময় তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির অন্যতম উপাদান ছিল। যখন খাদ্য-প্রাণ সমূহ (Vitamines) আবিষ্কৃত হয় নাই, সে সময়েও লোকে নিজ নিজ দেশজাত ফল, সহজ সংস্কার-বশে নিত্য খাদ্যরূপে ব্যবহার করিত। কৃষি দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপাদনের পূর্ব্বেও ফলের খাদ্যমূল্য মানুষ বিশেষরূপে অবগত ছিল। সেই জন্য আবহমান কাল হইতে কৃষিকার্য্যের ন্যায় উদ্যানরচনাও সকল দেশেই প্রচলিত আছে। সুখাদ্য ফল উৎপাদনের জন্য এক সময় বঙ্গদেশও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে ও বৃটিশ অধিকারের প্রারম্ভ সময়েও ফল সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই—অনেক সমসাময়িক গ্রন্থকারের রচনা হইতেই তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে বাঙ্গালাদেশে ক্রমশঃই ফলচাষের অবনতি লক্ষিত হইতেছে। যাঁহারা কলিকাতায় ফলের বাজারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন তাঁহারা নিশ্চিতই দেখিতেছেন—যে, এই বৃহৎ বাজারে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ফলই ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিতেছে, এবং বঙ্গদেশজাত ফলের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে। ইহার আর্থিক গুরুত্বও নিতান্ত সামান্য নহে। উত্তরবঙ্গের দু'একটি জেলা ভিন্ন বাঙ্গালার জল-হাওয়া মেওয়া ফল উৎপাদনের উপযোগী না হইলেও অন্যান্য প্রকার ফল এই প্রদেশে উৎকৃষ্টরূপ জন্মাইতে পারে এবং বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে ফলের ব্যবসায় ও শিল্প দ্বারা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন। কি কারণে তাহা সম্ভবপর হইতেছে না, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ফল-চাষে শিক্ষা ও উৎসাহের অভাব

ইহা অকুণ্ঠিত চিত্তেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ফল-চাষ এ পর্য্যন্ত এদেশে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তথাপি ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও অনেক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও জমিদারের দশ পনের বিঘা জমিতে নানা সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ রোপণের যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষিত হইত, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালার কতিপয় প্রসিদ্ধ ফল-জাতির বংশরক্ষাও হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে অনেক জমিদার ও অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়, পল্লীগ্রামস্থ নানাবিধ ফলের বড় বড় বাগানসমূহ তাঁহাদের ঔদাসীন্যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য, কোন কোন স্থলে পল্লীর উদ্যানস্বামীরা বাগানগুলি ফলকর জমা দিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট ফলের বাগানের প্রকৃত আয়ের তুলনায় তাহার পরিমাণ নিতান্তই অল্প। সহরের উপকণ্ঠে ধনাঢ্য লোকের নব-প্রতিষ্ঠিত বাগান দুই-চারিটি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বাগান-বাড়ীসংলগ্ন সখের বাগান। ব্যবসায়ের জন্য ফল উৎপাদনের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ফলতঃ, সকল দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, একালে এদেশে ফল উৎপাদন, পরিমাণে ও গুণে, উভয় প্রকারেই অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই প্রকার শোচনীয় অবস্থার প্রতীকার করিতে হইলে সরকার ও জনসাধারণকে ফলচাষের আর্থিক গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। কোন দেশেই কৃষির উন্নতি সরকারী সাহায্য ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত সম্ভব নহে। রাজকীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে ভারতের ক্ষেত্রজাত ফসল চাষে কতক কতক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ফলের চাষ সম্বন্ধে সেরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দুই-এক স্থানে ফলপরীক্ষা-ক্ষেত্র স্থাপিত হওয়ায় কয়েক বৎসর হইতে ফলশিল্প-পরিপুষ্টির চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গদেশে তাহাও কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Imperial Council of Agricultural Research বঙ্গদেশে ফল ও উদ্যান-তত্ত্ববিষয়ক গবেষণার জন্য সাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। সেই সাহায্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে বাঙ্গালা সরকারেরও প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত সরকার সেরূপ ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, বঙ্গদেশে ফলের উন্নতিসাধনের কার্য্য এক রকম স্থগিতই আছে! যে প্রদেশের ১৩ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে মাত্র ১৭ লক্ষ টাকা কৃষির কল্যাণকল্পে ব্যয় করা হয়, সে প্রদেশে ফল উৎপাদনের গুরুত্ব যে এখনও বিশেষরূপে অনুভূত হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

ব্যবসায় ও শিল্পোপযোগী ফল

অর্দ্ধ-বন্য ও রোপিত, প্রবর্ত্তিত ও অন্তর্জ্জাত ফল-বৃক্ষাদির হিসাব করিলে আমাদের বাঙ্গালায় প্রায় পঞ্চাশ প্রকার ফল দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, সকলগুলির ব্যবহারিক প্রাধান্য সমান নহে। কতকগুলি ফল কিন্তু বহুকাল হইতে ব্যবসায়ের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই শ্রেণীর মধ্যে আম, আনারস, কমলালেবু, পাতি, কাগজী ও অন্যান্য লেবু, নারিকেল, কদলী, টেঁপারি, ও তেঁতুল অগ্রগণ্য। এই সকল ফল আপাততঃ প্রধানতঃ টাটকা ফল রূপেই বিক্রয় হয়, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটি একাধিকরূপে সংরক্ষণোপযোগী। জাতি-নির্ব্বাচনে ও চাষের তদ্বিরের অভাবে বঙ্গদেশে আম্র উৎপাদনের মাত্রা ও ফলের উৎকর্ষতা অনেক পরিমাণে

হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে এই বিষয়ে বৃদ্ধির লক্ষণই দেখা যায়। এমন কি, বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশে, বিশেষতঃ, লণ্ডনের 'কভেণ্ট-গার্ডেন' ফল-বাজারে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় আম্র চালান যাইতেছিল। য়ুরোপের বড় বড় ফল বাজারে ভারতীয় আম্রের প্রসার লাভের সম্ভাবনাও দেখা গিয়াছিল। আম্র এদেশের বিশিষ্ট ফল; ইহা লইয়া বিস্তৃত বহির্ব্বাণিজ্য পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু টাটকা ফলরূপে দূরদেশে চালান দেওয়ার উপযোগী আম্রজাতির সংখ্যা কম। বোম্বাই হইতে যে সকল বণিক আম বিদেশে চালান দিতেন, তাঁহারা আম্রপ্রদর্শনী আহ্বান করিয়া চালানের উপযুক্ত আম বাছিয়া লইতেন। বাঙ্গালায় যে সেরূপ জাতি নাই কিম্বা জন্মাইতে পারা যায় না তাহা নহে, কিন্তু বঙ্গদেশে এ বিষয়ে সামান্য প্রচেষ্টাও হয় নাই। বস্তুতঃ, বিদেশে চালান দেওয়ার প্রয়াস ত দূরের কথা, বৎসরের পর বৎসর ভারতের সুদূর স্থানসমূহ হইতে বহু আকারের ভাল-মন্দ নানা জাতীয় আম আসিয়া বাঙ্গালার বাজার হইতে বাঙ্গালার আম বিতাড়িত করিতেছে, তাহা আমরা লক্ষ্যই করিতেছি না। কেহ কেহ এরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী বলিয়াও ধরিয়া লইতেছেন। ইহার প্রকৃত কারণ, বঙ্গদেশ যে উৎকৃষ্ট ও পর্য্যাপ্ত আম্র ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী তাহা নহে; ইহা বরং শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন বঙ্গবাসীর ফলচাষে উদ্যমের অভাবেরই সূচনা করে। আধুনিক প্রথায় সংরক্ষিত হইলেও আমের অনেক অপচয় নিবারণ করা যায়, বৎসরের সব সময় একটি সুখাদ্য ফল সুপ্রাপ্য হয়, এবং সর্ব্বোপরি দেশে ও বিদেশে আম্রব্যবসায়-ক্ষেত্রের পরিসরও সমধিক বর্দ্ধিত হইতে পারে। এ বিষয়েও কোন ব্যাপক চেষ্টা এখন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

দার্জ্জিলিং-অঞ্চল ব্যতীত বাঙ্গালায় কমলালেবুর বাগিচা অন্য কোথাও নাই। কিন্তু শ্রীহট্ট ও খাসিয়া পাহাড়ের কমলালেবুর সাহায্যে বৃহৎ কমলালেবু-কারবার পরিচালিত হইতে পারে। কমলালেবু চালানের ব্যবস্থায় আরও উন্নতি সাধিত হওয়া আবশ্যক। শুষ্ক কমলালেবুর খোসার যথেষ্ট দর আছে; কিন্তু উহা বহুল পরিমাণে আপাততঃ বৃথা নষ্ট হয়। খাদ্য প্রাণ বহুল ঘনীভূত সংরক্ষিত কমলালেবু-রস উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা হইলে উহাও জনপ্রিয় পানীয়রূপে চালাইতে পারা যায়। সমরূপে কাগজী, পাতি ও অন্যান্য প্রকার লেবুর প্রচুর ব্যবসায়িক সম্ভাবনা বর্ত্তমান। লেবুর রস ও তৈল, সাইট্রেট্ অব্ লাইম ও অন্যবিধ লেবুজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ যথেষ্ট অর্থ লাভ করিয়া থাকে। ভারতের নানা স্থানে লেবু সুলভ; কিন্তু বড় ব্যবসায় এবং লেবুজাত শিল্পাদি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎপাদন ও সদ্ব্যবহার উভয় বিষয়েই প্রথমতঃ সংগঠন-কার্য্য আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে বর্ত্তমান পত্রিকায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। (মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩, জম্বীর-শ্রেণীয় ফলমূলক শিল্প)। লেবুর ন্যায় কদলীও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের একটি বিশিষ্ট রপ্তানির ফল। ইহার ব্যবসায়ের যে অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহাও কিছু দিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছিল। (মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৪২, ভারতে কদলী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা)। দুঃখের বিষয় যে, আম্রের মতই বাঙ্গালার কদলী ব্যবসায়-ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে। কলিকাতার বাজারে কয়েক বৎসর হইতে অন্য প্রদেশীয় কদলী ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আমদানি হইতেছে; অথচ এদেশের মর্ত্তমান, চাঁপা, কানাই-বাঁশি, অনুপম প্রভৃতি কদলীর চাষ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়। খাদ্যরূপে কদলীর প্রসার বৃদ্ধি পাওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ইহার পুষ্টিকর গুণ অত্যন্ত অধিক। কাঁচকলার' আটা পোষকগুণে প্রায় চাউলের সমতুল্য। বস্তুতঃ, আফ্রিকার কয়েক স্থানে ইহা প্রধান খাদ্যের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে। Jelly ও Figরূপে সংরক্ষিত কদলী য়ুরোপীয় বাজারে দেখা দিলেও এদেশে উক্ত প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতের কোন চেষ্টা দেখা যায় না।

নারিকেলের ন্যায় ব্যবহারিক প্রাধান্য প্রায় অন্য কোন ফলের নাই। খাদ্যরূপে ইহার শাঁস ও জলের ব্যবহার ব্যতীত, ইহার তন্তু, তৈল, রস ও বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ কতিপয় ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিল্পের ভিত্তি। নারিকেলের কয়লারও বিষাক্ত বাষ্পশোষক গুণের জন্য আজকাল যুদ্ধের বাজারে চাহিদা বাড়িয়াছে। কিন্তু এদেশে খাদ্যের জন্য নারিকেলের ব্যবহার কমিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। নানাবিধ নারিকেলমূলক মিষ্টান্নের চলন পূর্ব্বের মত আর নাই এবং আধুনিক রান্নাতেও নারিকেলের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে Dessicated Coconut অর্থাৎ বিশেষরূপে প্রস্তুত শুষ্ক শাঁস হইতে পাশ্চাত্যের সভ্য দেশসমূহ নানা প্রকার প্রস্তুতী খাদ্য পাক করিতেছে। কিছুদিন হইতে সিংহলজাত এইরূপ শুষ্ক শাঁস বাঙ্গালার বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা চলিতেছে। যে দেশে পুষ্টিকর খাদ্য সাধারণের পক্ষে দুর্লভ, সে দেশে নারিকেলের প্রতি ঔদাসীন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ কি ?

আনারস, টেঁপারি, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি মরসুমের সময় প্রচুর আমদানি হয় ও স্বল্পকালের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। সামান্য পরিমাণ ফল চাটনি, মোরব্বা, জেলি প্রভৃতির আকারে সংরক্ষিত হয়, কিন্তু সংরক্ষণ-প্রণালী সম্পূর্ণ ভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাসম্মত না হওয়ায় ফল সেরূপ সন্তোষজনক হয় না। বস্তুতঃ, ফল-শিল্পের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে এবং ফল-উৎপাদনকে বাস্তবিক লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিতে হইলে অবিলম্বে Canning Industry অর্থাৎ বায়ুবদ্ধ টিনে ফল-সংরক্ষণ শিল্প এদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, এবং এ বিষয়ে সরকারেরই অগ্রণী হওয়া আবশ্যক।

বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত ফল

ভারতের যে অল্পসংখ্যক ফল রপ্তানি হয়, তন্মধ্যে তেঁতুল একটি। তেঁতুল গাছ ক্বচিৎ সযত্নে রোপিত হইয়া থাকে; অর্দ্ধ-বন্য ও বন্যগাছ হইতেই প্রায় ফল সংগৃহীত হয়। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক বীজ থাকিবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি (guarantee) দিয়া তেঁতুল বিদেশে চালান দেওয়া হয়। এ স্থলেও ব্যবসায়ের উন্নতির অবসর আছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-জাত তেঁতুল প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় তেঁতুল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর না হইলেও চালান দেওয়ার পদ্ধতির গুণে বিদেশের বাজারে তাহার মূল্য অনেক অধিক পাওয়া যায়। এদেশের তেঁতুল বস্তা বা পেটী-বন্দী করিয়া পাঠান হয়; পক্ষান্তরে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের তেঁতুল পিপার মধ্যে স্তরে স্তরে ছড়াগুলি সজ্জিত করিয়া এবং সর্ব্বশেষে সস্তা চিনির রস দিয়া পিপা ভর্ত্তি করিয়া চালান

যায়। তাহাতে তেঁতুলের গুণ ও চেহারা উভয়ই অবিকৃত থাকে, এবং ব্যবহারকারীরা তাহার জন্য স্বভাবতঃই অধিক মূল্য প্রদান করেন। বঙ্গদেশের কয়েক স্থানে অম্লমধুর, শাঁসাল তেঁতুল পাওয়া গেলেও অনেক স্থানের শুষ্ক তেঁতুলে শাঁস কম ও অম্ল স্বাদ সুতীব্র। যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রসিদ্ধ 'লাল ইমলি' জাতি প্রবর্ত্তন করিলে কতক পরিমাণে ইহার প্রতীকার হইতে পারে। তেঁতুল হইতে টাটারিক অম্ল প্রস্তুত যে লাভজনক হইতে পারে তাহা Bangalore Institute of Science ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থায় ইহার সম্ভাবনা আরও অধিক, কিন্তু এ সম্বন্ধে যে কোন চেষ্টা হইতেছে, তাহা শুনা যায় নাই।

পক্ব ও অপক্ব পেপের খাদ্যরূপে ব্যবহার সুপরিচিত; কিন্তু কাঁচা পেঁপের আঠা হইতে পেপেন নামক পদার্থ পাওয়া যায়। ঔষধার্থ উহার চাহিদা নিতান্ত অল্প নহে। সিংহল হইতে পেপেন রীতিমত রপ্তানি হয়। পেপে চাষে আয়াস অধিক নয়, এবং ইহার জন্য উৎকৃষ্ট জমিও দরকার হয় না। জল বসে না, এরূপ সাধারণ জমিতে ব্যাপকভাবে পেপের চাষ করিয়া পেপেন সংগ্রহ ও ফল বিক্রয় উভয় কার্য্যই চলিতে পারে। প্রায় পুষ্ট ফলের গা চিরিয়া আঠা বাহির করিয়া লইলে ফল নষ্ট হয় না; উহা পরে বিক্রয় করা চলে,—যদিও মূল্য কিছু কম হইতে পারে।

হিজলী বাদাম (Cashew nut) লইয়া পর্ত্তুগীজ-ভারতে ও সিংহলে বড় ব্যবসায় চলে। বাদামের শাঁস পুষ্টিকর, সুখাদ্য; খোসা-ছাড়ান শাঁসের (Blanched Kernel) কয়েক প্রকার আহার্য্য প্রস্তুতের উপকরণরূপে যথেষ্ট চাহিদা আছে। শাঁসের তৈল গুণে প্রকৃত বাদামতৈলের অর্থাৎ Sweet almond তৈলের সমকক্ষ, অথচ মূল্যে সুলভ। হিজলী বাদামের খোসার তৈল উৎকৃষ্ট কীটাক্রমণ-নিবারক। Cardole নামে ইহা মার্কিণ-বাজারে পরিচিত। বঙ্গদেশের উপকূলাংশে চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলে হিজলী বাদামের বন্য গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আপাততঃ ইহার ফল স্থানীয় ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু সামান্য চেষ্টাতেই উহার উৎপাদন-মাত্রা বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং তাহা লইয়া বড় ব্যবসায়ও চালাইবার অসুবিধা নাই।

অন্য দেশীয় বা প্রদেশীয় ফল এদেশে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বড়-বেশী দেখা যায় না। অথচ এরূপ প্রবর্ত্তন দ্বারা বাঙ্গালার ফল-সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দু'-একটি ফলের উল্লেখ করা গেল। আমেরিকার Grape fruits যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি-সহায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা বাতাবী লেবুর প্রকারভেদ মাত্র, এবং বাতাবীলেবুও যেমন অন্য দেশ হইতে আসিয়া এখন সাধারণ উদ্যান-বৃক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, Grape fruitও প্রবর্ত্তিত হইলে সেইরূপ হইতে পারে। Sweet lime বা মিষ্ট লেবু প্রায় নারাঙ্গীর ন্যায়। পঞ্চনদ ও যুক্তপ্রদেশের কতিপয় স্থানের মিষ্ট লেবু কমলালেবুর ন্যায় সুস্বাদু। বৎসরের যে সময়ে কমলালেবু মহার্ঘ্য, সে সময়ে মিষ্ট লেবু পাওয়া যায় বলিয়া ইহার মূল্যও অধিক হয়। কলিকাতার হগ-সাহেবের বাজারে যে Sweet lime বিক্রয় হয়, তাহা প্রায়ই অন্য দেশজাত। এদেশে উহা উৎপাদনের চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

টাটকা ফল

এদেশীয় অধিকাংশ ফল তাহাদিগের স্ব স্ব ঋতুতে কেবল-মাত্র টাট্‌কা ফলরূপেই ব্যবহৃত হয়। এগুলি হয় সংরক্ষণোপযোগী নয়, কিম্বা এ পর্য্যন্ত তৎসমুদয় সংরক্ষণের চেষ্টাও করা হয় নাই। এরূপ ফলকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়—যথা, কৃষিজাত এবং স্বয়ং-জাত। লিচু, গোলাপ-জাম, জামরুল, কাঁটাল, বাতাবী লেবু, তরমুজ, খরমুজ, আতা, লকেট প্রভৃতির গাছ প্রায় উদ্যানে বা বাড়ীর সান্নিধ্যে রোপণ করা হয়। পক্ষান্তরে অন্য কতকগুলি ফলের গাছের জন্য বিশেষ কোন যত্ন করা হয় না, এবং অধিকাংশ স্থলে ইহাদের গাছ দৈবক্রমে যেখানে সেখানে বীজ পড়িয়াই জন্মিয়া থাকে। বেল, নোনা, কুল, পানিফল, করমচা, কামরাঙ্গা, চালতা, গাব, কালজাম প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমোক্ত শ্রেণীর ফল সমূহের মধ্যে কাঁটাল অন্যতম। পক্ব ও অপক্ব (ইঁচোড়) কাঁটাল লইয়া বৎসরে ২।৩ মাস বেশ ব্যবসায় চলে। ইহার কোন অংশই সংরক্ষিত হয় না; কিন্তু বীজ সংরক্ষণযোগ্য। ভারতের অন্যত্র ও সিংহলে অসময়ে ব্যবহারের জন্য লোকে কাঁটাল-বীজ রাখিয়া দেয়, এবং ইহা হইতে একরূপ মোটা আটাও প্রস্তুত করে। অযত্নসম্ভূত ফলসমূহের মধ্যে কতকগুলির টাটকা ফল ব্যতীত অন্যরূপেও ব্যবহার আছে। বেলকে ঠিক পুষ্টিকর ফল বলা যায় না; ইহার সরবতের প্রচলনই অধিক; কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিসার প্রভৃতি রোগে ইহার প্রকৃষ্ট উপকারিতা থাকায় ঔষধার্থ ব্যবহৃত বেলের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। বেল শুঠের অল্প বিস্তর রপ্তানিও আছে। পানিফল আর একটি উল্লেখযোগ্য ফল। কাঁচা পানিফলের কাটতি সমধিক। বর্ত্তমান সময়ে পানিফলের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে যে গবেষণা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা অন্যান্য প্রকার শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য অপেক্ষা বিশেষ হীনতর নহে। কাশ্মীরে বহু সংখ্যক লোক সিঙ্গারা বা পানিফলের আটা আনুষঙ্গিক খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। চীনেও পানিফল সাধারণ খাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। এ প্রদেশে পানিফলের পালোর যৎসামান্য ব্যবহার আছে; কিন্তু ইহার উৎপাদন ও প্রচলন বৃদ্ধি পাইলে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের সময় একটি সহজপ্রাপ্য খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা হইতে পারে। বঙ্গদেশে পানিফলেরও উন্নততর জাতি, বিশেষতঃ চীনা পানিফল প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উন্নতির উপায়

বাঙ্গালার ফল-ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে দুই দিক্ হইতে ধারাবাহিক চেষ্টা হওয়া প্রয়োজনীয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বহু দিন হইতে এই প্রদেশে ফলের চাষ উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সেইজন্য প্রথম দরকার—ফল বিষয়ক গবেষণা। প্রত্যেক ফলের উৎকৃষ্টতম জাতি, উপজাতি নির্ব্বাচন করিয়া তৎসমুদয়ের চাষ বৃদ্ধি করিবার প্রচেষ্টা সর্ব্বাগ্রে হওয়া উচিত। ইহার জন্য একাধিক পরীক্ষাক্ষেত্র আবশ্যক হইতে পারে; সে সম্বন্ধে সরকারের কার্পণ্য প্রকাশ করা আদৌ সমীচীন হইবে না। দেশের অন্তর্জাত ফলসমূহের চাষের জন্য ভাল জাতিগুলি বাছিয়া লওয়া যেমন দরকার, অন্য দেশ হইতে উৎকৃষ্ট ফল-জাতি আনিয়া প্রবর্ত্তন করাও ফল-সম্পদ্ বৃদ্ধির তেমনিই প্রকৃষ্ট

উপায়। ফল-বৃক্ষের রোগাদিও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন; কারণ, ইহাও কতক পরিমাণে বাঙ্গালা দেশে ফল-চাষের অবনতি সংঘটিত করিয়াছে।

কিন্তু শুধু গবেষণা-পরিচালনের ব্যবস্থা হইলেই চলিবে না; ইহাও দেখা আবশ্যক যে, গবেষণা-লব্ধ তথ্যাদি সাধারণের মধ্যে প্রচার হয়, এবং ফল-উৎপাদন, ব্যবসায় ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তিবর্গ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোন কোন স্থলে গবেষণা-ক্ষেত্রের শিক্ষায়তনের সহিত সংযুক্ত থাকায় ফল-চাষ ও শিল্পের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তদ্রূপ ব্যবস্থা এদেশেও আবশ্যক। ফলতঃ, আধুনিক প্রথায় ব্যবসায়িক হিসাবে ব্যাপক ফল উৎপাদনের ব্যবস্থার সহিত উৎপাদিত ফল যে সকল উপায়ে ব্যবসায়ে ও শিল্পে লাভের সহিত প্রযুক্ত হইতে পারে সাধারণকে তাহা শিক্ষা দান না করিলে ফল হইতে দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির কোন চেষ্টা সফল হইতে পারে না।

অন্যান্য দেশে ফল ব্যবসায় ও শিল্পের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী নানারূপ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তৎসমুদয়ের সাহায্যে এক দিকে যেমন উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই অন্য দিকে ফল-ব্যবসায় ও শিল্প ক্রমশঃ অধিক লাভজনক হইয়া উঠিতেছে। তাহার ফলে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই সমস্ত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। এ প্রদেশেও সেইরূপ সংঘবদ্ধ চেষ্টা অবিলম্বে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। Marketing Board ও Co-oprative Society-র মধ্য দিয়া ফল-ব্যবসায়ের অনেক উন্নতি সাধন সম্ভবপর। ফল-উৎপাদক সমিতি পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদর্শে সংগঠন করিয়া সাধারণেও ফল-বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে দ্রুত অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে জাপানের দৃষ্টান্ত বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। সে দেশে এই প্রকারের সমিতি সমূহ এক দিকে যেমন খাদ্যরূপে ফলের প্রয়োজনীয়তা বিস্তৃত ভাবে প্রচার করে, অন্য দিকে জনসাধারণ যাহাতে সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট ফল পাইতে পারে, তাহারও উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

ভারতীয় শিল্প-পরিকল্পনা

"নদী আর কালগতি একই সমান,"—জলের স্রোত আর কালের স্রোত কাহারও প্রতীক্ষা করে না। কাল যখন যে সুযোগ আনিয়া দেয়, তৎক্ষণাৎ তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে, সে সুযোগ কদাচিৎ পুনরায় ফিরিয়া আসে।

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে যে শিল্প সমুন্নয়নের সুবর্ণ-সুযোগ আসিয়াছিল, আমরা তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করি নাই। কর্ত্তৃপক্ষের অনবধানতা এবং আমাদের দেশের শিল্পানুরাগী ধনিক ও বণিকের উৎসাহের অভাবই সেজন্য প্রধানতঃ দায়ী।

১৯১৪-১৯১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পরিচালনাকল্পে শিল্প-জগৎ যে অসীম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল, একমাত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশই তৎপরতার সহিত তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া আজ শিল্পোন্নতির সমুচ্চ শিখরে সমারূঢ়। কিন্তু, "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!" সুতরাং সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ-পরেও আমরা প্রায় "যে তিমিরে সে তিমিরেই" পড়িয়া আছি।

বিগত মহাযুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই অবসাদগ্রস্ত না হইয়া যদি আমাদের শাসনকর্ত্তৃগণ এবং স্বদেশীয় ধনী ও শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় সেই সুবর্ণ-সুযোগের সুবিধা লইয়া নূতন নূতন শিল্প-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়াসী হইতেন, তাহা হইলে আজ ভারত বৃটিশ-শক্তিকে বহুল পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ দ্বারা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করিতে পারিত।

কালচক্রের আবর্ত্তনে, আবার এক মহৎ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিলে আমরা যে অপরাধে অপরাধী হইব, তাহা আত্মহত্যা পাপের তুল্য।

প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে শিল্প-সমুন্নয়নের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা কল্পনাবিলাসী ছিলাম। এক বোম্বাই ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে যে কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্ভব হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল বিদেশী উদ্যম, বিদেশী মূলধন, এবং বিদেশী পরিচালনা। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ-বিক্ষোভ-প্রসূত স্বদেশী আন্দোলন হইতেই ভারতে সমগ্র ভাবে শিল্প-পরিকল্পনা স্বদেশী অর্থে ও সামর্থ্যে কার্য্যে পরিণত করিবার ব্রত আরব্ধ হয়। বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে সেই প্রচেষ্টা বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে; কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয়, সেই প্রচেষ্টা আমাদের এই বিশাল দেশের বিপুল শক্তি, সুযোগ ও সুবিধার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই।

তথাপি বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে এই পঞ্চবিংশতি বৎসর মধ্যে আমরা অনেক শিল্পে অল্পবিস্তর অগ্রসর হইয়াছি। বস্ত্র-বয়ন, লৌহ ও ইস্পাৎ, বিলাতী মাটী (সিমেণ্ট), চিনি, দিয়াশলাই, কাচের বাসন প্রভৃতি কয়েকটি শিল্পে আমরা প্রগতিশীল। কিন্তু এই সকল শিল্পেও আমরা এখনও আত্মনির্ভরশীল নহি। তবে অধিকতর উদ্যমসহকারে এই সকল শিল্পে আমরা আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া বর্ত্তমানে বিদেশী পণ্যের শোচনীয় অবস্থার সুযোগ লইয়া বহির্ব্বাণিজ্যের বিশাল ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে পারি। রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক শিল্পেও আমরা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছি; কিন্তু যন্ত্রপাতি, কলকব্জা এবং আধুনিক জলযান, স্থলযান ও বায়ুযান প্রভৃতি শিল্পে আমরা সম্পূর্ণ পশ্চাৎপদ—অজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

যে সকল শিল্পে আমরা আমাদিগকে প্রগতিশীল মনে করি, সে সকল শিল্পেও আমাদের উন্নতি-প্রচেষ্টার অভাব অত্যন্ত শোচনীয়। কিন্তু সে জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া লাভ নাই।

বস্ত্রবয়ন-শিল্পে ভারত অধুনা সমধিক উন্নতিশীল; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের আমদানী-রপ্তানীর সংখ্যা তালিকা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি—ভারতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল শিল্পেও আমরা এখনও কত দূর পরমুখাপেক্ষী!

গত ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে আড়াই মিলিয়ন পাউণ্ড কার্পাস-সূতা আনিতে হইয়াছিল। অথচ এই প্রকার সূতা অল্পায়াসেই এ দেশে উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে। কয়েক প্রকারের সূতা অবশ্য এ দেশে একেবারেই প্রস্তুত

হয় না। উপরোক্ত বৎসরে ঐ প্রকার সুতা আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিলাম—তাহার পরিমাণ পনর মিলিয়ন পাউণ্ড।

কেবলমাত্র সুতা নহে। বয়নশিল্পোৎপন্ন অন্যান্য যে সকল পণ্য আমাদিগকে ঐ বৎসর আমদানী করিতে হইয়াছিল, তাহার মূল্য প্রায় বার কোটি টাকা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সাদা ও রঙ্গীন বস্ত্রাদিও অধিকতর পরিমাণে আমদানী করিতে হইয়াছিল।

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে সকল রকম মোজাই আমরা আমদানী করি ২১ লক্ষ টাকার। এতদ্ভিন্ন, সেলাই করিবার সুতা আনিয়াছিলাম ৪৩ লক্ষ টাকার। ফিতা প্রভৃতি এবং মস্তকাবরণ-বস্ত্রাদি আনিয়াছিলাম সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার। কৃত্রিম রেশম ও রেশমী বস্ত্রাদির আমদানী বাড়িয়াছিল। তাহার মূল্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এক কোটি এগার লক্ষ টাকা অধিক। পশমী কাপড়, শাল, কার্পেট, গালিচা প্রভৃতিও আসিয়াছিল প্রায় আড়াই কোটি টাকা মূল্যের।

কোন বিশেষ শিল্পের প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী-সম্ভার স্বদেশে প্রস্তুত করা কোন জাতির পক্ষেই সম্ভব নহে; কিন্তু যে সকল শিল্পে ভারতবর্ষ সমধিক উন্নতিশীল, সে সকল শিল্পে আমরা আমাদের চাহিদা অনায়াসেই মিটাইতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ শর্করা-শিল্পের কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে শর্করা সম্বন্ধে ভারত সম্পূর্ণরূপে পর-মুখাপেক্ষী ছিল; কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে আমরা মাত্র ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের চিনি আমদানী করিয়াছিলাম, এবং তাহাও প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানী করিবার নিমিত্ত।

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, আমরা কিরূপ শোচনীয় ভাবে কাগজ, চলচ্চিত্রের ফিল্ম, এবং কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক উপকরণের জন্য ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষী।

বিগত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া যদি আমরা এই দেশেই কাগজ, বিশেষতঃ সংবাদপত্র ছাপিবার উপযুক্ত কাগজ প্রস্তুত করিবার শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশায় পড়িয়া দশ দিক অন্ধকার দেখিতে হইত না। কাগজ-শিল্পের যৎকিঞ্চিৎ যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড দেশের পক্ষে লজ্জার ভিন্ন গৌরবের বিষয় নহে।

এই শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ কি? মুসলমান রাজত্বকালে, বৈদেশিক আততায়ীরা দেশ জয় করিয়া এই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা হিন্দুস্থানকেই তাঁহাদের বাসভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই দেশে স্থায়িভাবে বসবাস করিয়া, এদেশের বিবিধ উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, এজন্য মুসলমান রাজত্বকালে ভারতে বহুবিধ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

ঘটনাচক্রে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে এদেশে আসিয়া যখন রাজ্যলাভ করিলেন, তখন বণিকসুলভ মনোবৃত্তিবশতঃ এবং অন্য নানা কারণে ভারতকে তাঁহাদের বৃত্তিভূমি ব্যতীত স্থায়ী বাসভূমিরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিলেন না। যথা-সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিত্ত সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক, তাহার উন্নতিসাধন করাই তাঁহাদের মুখ্য ব্রত হইয়াছিল।

বৃটেন শিল্প-প্রধান দেশ। সুতরাং স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি দ্বারা স্বজাতি-পরিচালিত বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি তাঁহাদের প্রশংসাজনক মনোবৃত্তি ছিল। ফলে, এ দেশের স্বচ্ছন্দ-জাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রভৃতির প্রতি প্রয়োজনানুরূপ সানুরাগ মনোযোগ প্রদান না করিয়া প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন এ দেশের কাঁচা মাল (যাহা এ দেশবাসী আবশ্যকানুযায়ী ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক অথবা অসমর্থ ছিল) স্বদেশে প্রেরণ করিতেন। স্বদেশের ধনিক ও শ্রমিক নিজেদের কল-কারখানায় সেই সকল কাঁচা মাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবহারোপযোগী করিয়া পাকা মালে পরিণত করিত, এবং স্বদেশী বণিকের সাহায্যে, স্বদেশী জাহাজে সেই সকল দ্রব্যসম্ভার এ দেশে পাঠাইয়া এবং এ দেশের হাটে-বাজারে বিক্রয় করিয়া তদ্বিনিময়ে প্রচুর অর্থ স্বদেশে লইয়া যাইত। আমরা কাঞ্চন বিনিময়ে কাচ ক্রয় করিয়া বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিতাম।

আমাদের এই অবহেলা এবং অপরিণামদর্শিতার ফলে, আমাদের দেশের গ্রাম্য এবং নাগরিক শিল্প একে একে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; আর আমাদের দেশ হইতে বিদেশীয় বণিকগণ ভারে ভারে জাহাজ বোঝাই করিয়া, কাঁচা মাল লইয়া যাইয়া, স্বদেশের পণ্যশিল্পের প্রসার ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ফলে, ভারতের বয়নশিল্প উৎসাহের অভাবে দিন দিন অবনত হইয়া অবশেষে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

তার পর এমন এক বেদনাদিগ্ধ দিন আসিল, যে দিন আমরা বুঝিলাম, স্বদেশে স্বচ্ছন্দজাত দ্রব্য-সামগ্রীকে স্বহস্তে কলে ও হাতে ব্যবহারোপযোগী পণ্য-সম্ভারে পরিণত করিতে পারিলে, দেশকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না; পরন্তু, স্বদেশের অর্থ স্বদেশে নিবদ্ধ রাখিয়া দারিদ্র্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আমরা হয় ত কালে লক্ষ্মী-শ্রী লাভ করিতে পারি।

আমরা বুঝিলাম, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক এখানে কৃষিজীবী; কিন্তু কৃষিলব্ধ দ্রব্যজাত বিক্রয় করিয়া কৃষকরা উদরান্নের সংস্থান ও লজ্জা-নিবারণ করিতে পারে না। বৎসরের পর বৎসর ঋণভারে পীড়িত হইয়া তাহাদের দুঃখময় জীবন নিঃশেষিত হয়।

সুতরাং কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত এবং স্বভাবজাত ভূরি ভূরি কাঁচা মালকে হাতে ও কলে শিল্প-কৌশলে পণ্যসম্ভারে পরিণত করিতে পারিলে, লুপ্ত শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার হয়; নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমরা আমাদের অন্নবস্ত্রের কষ্ট অনেক পরিমাণে লঘু করিতে পারি। চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা কৃষি-প্রধান ভারতকে শিল্প-প্রধান না হউক, অন্ততঃ শিল্পকুশল করিতে পারিলে, আমরা বাঁচিবার অধিকার লাভ করিতে পারি।

এই জাগরণের ফলে, অধুনা শিল্প-পরিকল্পনার একটি উদ্দাম আলোড়ন আমাদিগকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিক শিল্প-পরিকল্পনা হইতে এই শিল্প-পরিকল্পনা বৃত্তির সূত্রপাত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শিল্প-সঙ্কটে উদ্বুদ্ধ হইয়া, একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গভীর চিন্তা-প্রসূত পুস্তকে মহীশূরের প্রবীণ এঞ্জিনিয়ার এবং ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান স্যার এম. বিশ্বেশ্বরয়া ভারতের শিল্প-সম্পদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি একটি শিল্প-সমুন্নয়ন সমিতির সংগঠন দ্বারা ভারতের শিল্প-সম্ভাবনার প্রতি মনোযোগ

আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত করেন। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা হেতু তখন এই অত্যাবশ্যকীয় শিল্প-সংস্কার, সংস্থাপন ও সমন্বয়নের প্রতি দেশের শাসক ও নেতৃবর্গের মনোযোগ যথাযোগ্য ভাবে আকৃষ্ট হয় নাই।

পরিশেষে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠায় প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রসমূহ প্রদেশান্তর্গত শিল্পসমূহের পরিচালন, পরিবর্দ্ধন ও নিয়ন্ত্রণের যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করিয়া এই বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। অচিরে প্রাদেশিক শিল্প-মন্ত্রীদের একটি বৈঠক বসে, এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু সরকার এবং আসাম সরকার প্রাদেশিক শিল্পোন্নতি সম্ভাবনার অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের বাঙ্গালা সরকারও একটি শিল্প-পর্য্যবেক্ষণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন।

অধুনা শিল্প-পরিকল্পনা প্রবৃত্তির এতাদৃশ আতিশয্য ঘটিয়াছে যে, ইহা যেন ব্যসনে পরিণত হইয়াছে; এবং বহু ভ্রান্ত ধারণা সর্ব্বসাধারণে সংক্রামিত হইতেছে। অনেকে মনে করেন, শিল্প-পরিকল্পনার নিগূঢ় উদ্দেশ্য—সমাজতন্ত্রবাদ। কেহ কেহ মনে করেন, শিল্প-পরিকল্পনার ফলে দেশের দারিদ্র্য সমূলে উৎপাটিত হইবে, এবং সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিবে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পকে সমুন্নত করিতে পারিলেই আমাদের সকল আধি-ব্যাধি প্রশমিত হইবে।

বর্ত্তমানে চারিটি উদ্দেশ্য লইয়া আমাদিগকে শিল্প-পরিকল্পনা পরিপুষ্ট করিতে হইবে। প্রথমতঃ, ভারতের বাহিরে যে সকল দেশ আমাদের নিকট হইতে মাল লয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মাল লইতে পারিবে না। কেহ বা সামান্য পরিমাণে লইবে। এই উদ্বৃত্ত মালের নিমিত্ত নূতন ক্রেতা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং উহার যথাসম্ভব কাটতি দেশের মধ্যে বাড়াইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা বিদেশ হইতে যে সকল মাল আমদানী করি, বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহার অধিকাংশই আমরা আমদানী করিতে পারিব না, সুতরাং সেই সকল দ্রব্য স্বদেশে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধার্থ যে সকল বাণিজ্য-দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়াছে, তাহা তৎপরতার সহিত প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার প্রচেষ্টা। চতুর্থতঃ, যুদ্ধের জন্য সঙ্কুচিত বিদেশী পণ্যসম্ভারকে স্বদেশোৎপন্ন পণ্য দ্বারা অপসৃত করিয়া বিদেশে রপ্তানীক্ষেত্র প্রসারিত করা, এবং নূতন প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক লুপ্তের উদ্ধার ও নূতনের সৃষ্টি।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির নিয়মিত এবং পরিমিত উৎপাদনই শিল্প-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে, তৎপ্রতি আমাদের অখণ্ড মনোযোগ প্রথম প্রয়োজন। কৃষিজ, বনজ, এবং খনিজ কাঁচামালের উৎকর্ষ এবং মূলধন, শ্রমিক, কলাকুশলবিৎ কারিকর ও যন্ত্র-পরিচালনোপযোগী শক্তির অপ্রতিহত এবং যথোপযুক্ত সরবরাহ হইবে—আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন দ্রব্যের অবাধ চলাচল, বাজারে প্রচলন, এবং প্রতিযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির প্রতি সদা সতর্ক-দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং কৃষির পরিপোষক উটজ ও কুটীর-শিল্পসমূহের প্রতি আমাদিগের প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ এরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ড, ইহার কৃষিজ, বনজ, এবং খনিজ উৎপন্ন সামগ্রীর সংখ্যা এবং পরিমাণ এত অধিক, ইহার লোকসংখ্যা এত বেশী, এবং ইহার বিভিন্ন কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরিধি এতাদৃশ সুদূর-প্রসারিত ও বহু শাখা-সমন্বিত যে, এই সর্ব্বোপকরণে সমৃদ্ধ, অথচ অর্থবিত্তে ও শক্তি-সামর্থ্যে অতি দরিদ্র এই দেশের সম্পদ্ যেরূপ বিপুল, প্রচেষ্টাও সেইরূপ বিপুল হওয়া প্রয়োজন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উপকরণ-সম্পদ, অর্থাৎ কাঁচা মালের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। সমস্ত শিল্পের প্রথম ও প্রধান উপকরণ এই কাঁচা মাল। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া প্রতিবর্ষে ভারতবর্ষ হইতে ভূরি ভূরি কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী হইতেছে; তাহার মুখ্য কারণ এই যে, আমরা সে-সকলের সদ্ব্যবহার জানিতাম না, এবং তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি, উৎসাহ, অর্থ এবং সামর্থ্যও আমাদের ছিল না। এখনও কি কি কাঁচা মাল এ দেশে লভ্য, এবং বৈদেশিক সাহায্য ব্যতীত তাহাদের কতগুলির সদ্ব্যবহার আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য, সে বিষয়েও আমাদের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ।

১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে আমরা ১৮১ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়াছিলাম। তন্মধ্যে মাত্র ৫৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ছিল পাকা মাল। ২৯ কোটি টাকার পাট দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি, ৯ কোটি টাকার কার্পাস তুলা নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ২ কোটি টাকার পশমী দ্রব্যাদি, ৯ কোটি টাকার চা এবং ৫ কোটি টাকা মূল্যের অন্যান্য দ্রব্যাদি। বাকী ১২৭ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা মাল আমরা রপ্তানী করিয়াছিলাম, এবং এই কাঁচা মালের তালিকা অতি সুদীর্ঘ। ইহাতে ছিল, কাঁচা পাট, কার্পাস তুলা, পশম, ধাতু ও খনিজ পদার্থ, শস্যদানা, মসলা, আটা ও ময়দা, কাঠ ও কাঠের গুঁড়ি, রবার, ফল এবং শাক-সব্জী, সার, শণ, চামড়া, মাছ, তৈল-বীজ, খইল, গালা, অভ্র, কফি এবং নারিকেলের ছোবড়া।

ঐ বৎসর আমরা আমদানী করিয়াছিলাম ১৭৪ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য; তন্মধ্যে কাঁচা মাল অতি সামান্যই ছিল। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যে সকল কাঁচা মাল দেশের বাহিরে পাঠাই, তাহাই পুনরায় পাকা মালের আকারে দশ-বিশ গুণ অধিক মূল্যে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। অতি সুলভ মূল্যে আমাদের কাঁচা মাল সংগ্রহ করিয়া, বিদেশী বণিক তদ্দেশীয় ধনিক ও শ্রমিকের সাহায্যে পাকা মাল বানাইয়া, অত্যধিক মূল্যে আমাদের নিকট বিক্রয় করিয়া ধনসম্পদ ভোগ করে। আমরা সর্ব্বস্ব ব্যয়ে তাহা কিনিয়া বাবুগিরি করি!

কি পরিমাণ কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত-দ্রব্যাদি আমরা বিদেশীর নিকট হইতে ক্রয় করি, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট হইতে পারে। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে আমরা ৩০ কোটি টাকা মূল্যের তুলা বিদেশে পাঠাইয়াছিলাম, এবং ২১ কোটি টাকা মূল্যের তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিলাম। ৮৪ লক্ষ টাকা মূল্যের রবার বিদেশে পাঠাইয়া, ১৮৯ লক্ষ টাকার রবার নির্ম্মিত দ্রব্যাদি কিনিয়াছিলাম। ২০০ লক্ষ টাকার তামাক পাতা বিদেশে চালান দিয়া আমরা ৮৫ লক্ষ টাকার

চুরুট, সিগারেট কিনিয়া ভস্মে পরিণত করিয়াছিলাম। ৫ কোটি টাকার চামড়া বিদেশে বেচিয়া আমরা ২২ লক্ষ টাকার জুতা, বুট ইত্যাদি কিনিয়া বাবুগিরি করিয়াছিলাম।

যে সকল কাঁচা মালকে আমরা হাতে অথবা কলে পাকা মালে পরিণত করিতে এখনও অসমর্থ, সে সকল মাল, উৎপাদকের কল্যাণার্থে, বিদেশে বিক্রয় করা অতীব প্রয়োজনীয়। উৎপাদকের ইহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কিন্তু আমাদের প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে আমরা আমাদের দেশে সমুৎপন্ন সমস্ত কাঁচা মালকে স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠানে স্বদেশী শিল্পী ও কারিকর-সাহায্যে ব্যবহারোপজীবী করিয়া লইতে পারি। সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে তাহা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু যতটুকু সম্ভব, তাহাতেই বা উদাসীন থাকিব কেন?

ফলতঃ, শিল্পোন্নয়নের প্রধান উপকরণ, কাঁচা মাল সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ প্রথম প্রয়োজন। কোন্ কাঁচা মাল কোথায়, কি পরিমাণে জন্মে, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উৎপাদকের ন্যায্য দাবী মিটাইয়া, কল-কারখানাতে তাহার অবাধ সরবরাহ চলে, এবং কিরূপেই বা তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা যায়, তাহাই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমরা বস্ত্রবয়ন ও শর্করা-শিল্পে সম্প্রতি যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছি; কিন্তু এই দুইটি শিল্পের কাঁচা মাল সরবরাহের ব্যবস্থাও যথেষ্ট সন্তোষজনক নহে। আমাদের দেশে যেরূপ তুলা উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষা দীর্ঘতর আঁশযুক্ত তুলা এ দেশে উৎপাদন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে, কয়েক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা চলিতেছে বটে, কিন্তু সে পরীক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই।

শর্করা-শিল্পের উন্নতি লক্ষ্য করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি চিনির কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু যে পরিমাণ এবং যেরূপ রসসম্পন্ন ইক্ষুদণ্ডের নিয়মিত সরবরাহ ব্যতীত এই শিল্পকে সুপরিচালিত করিতে পারা যায় তাহার একান্ত অভাব। ফলে, অনেকগুলি শর্করা-কারখানা অসমঞ্জস অবস্থায় উপনীত। সুতরাং কেবল মাত্র কাঁচা মাল সরবরাহের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না। কিসে তাহার পরিমাণ ও গুণ বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, শিল্প-পরিকল্পনার মধ্যে তাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ অতি বিস্তৃত ভূখণ্ড; বহুল পরিমাণে কাঁচা মাল এখানে উৎপন্ন হয়; এ দেশে বহু লোকের বাসস্থান, সুতরাং ক্রেতার অভাব নাই, ধনিক ও শ্রমিকেরও অভাব নাই, তথাপি আমরা অতি অসহায় ভাবে বহু বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। গত শতকে যে সকল শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে, দেশের বিস্তার ও প্রয়োজনানুপাতে তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারও অধিকাংশ উপযুক্ত মূলধন, উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম, উপযুক্ত কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত কলা-কুশলী কারিকর ও কর্ম্ম-কুশল পরিচালকের অভাবে অকালে বিলুপ্ত হইয়াছে। উপযুক্ত পরিকল্পনানুসৃত নিয়ম-তন্ত্রের অভাবে বহু শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই। এবং সেই পরিণাম ফলে, শত বর্ষের শিল্প-সমুন্নয়ন-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, অসংখ্য শিল্পপ্রসূ ভারতভূমি অদ্যাপিও বিদেশী পণ্যসম্ভারের উপর অসহায় ভাবে একান্ত নির্ভরশীল!

সুতরাং শিল্প-পরিকল্পনার অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও দ্বিধা সংশয় নাই। কিরূপে ইহাকে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ রূপ দিতে পারা যায়, তাহাই সমস্যা। শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ, অথচ অর্থ-সম্পদে দরিদ্র এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রাচুর্য্য ও অভাবের মধ্যে পরিসর এত ক্ষীণ ও ক্ষণ-ভঙ্গুর যে, যদি কোন বৎসর কোন বিস্তৃত অংশে বারিপাতের অভাব হয়, তাহা হইলেই মন্বন্তরের সৃষ্টি করে। এই নিমিত্ত আমাদের কৃষি-সম্পদকে সহকারী শিল্প-সম্পদে সমৃদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অখণ্ডনীয়।

কিন্তু শিল্পোন্নয়ন-পরিকল্পনার ফলোৎপাদন শক্তি যাহাতে ক্রেতার পক্ষে কুফল প্রসব না করে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন। যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের পরিকল্পনাগুলি সর্ব্বত্র সুফলপ্রসূ হয় নাই। তত্রত্য জাতীয় সমুত্থান-বিধি (National Recovery Act) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে একাধিপত্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিল; কৃষি-বন্দোবস্ত বিধি (Agricultural Adjustment Act) উৎপন্ন দ্রব্যের খর্ব্বতা সাধন এবং গতিশীলতার পরিবর্তে নিশ্চলতার আনুকূল্য করিয়াছিল; তাঁহার স্বর্ণ নীতি (Gold Policy) যে উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহার ফলে স্বর্ণের অপ্রতুলতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং বিশ্বব্যাপী অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ভারতবর্ষেও শিল্প-পরিকল্পনার আনুসঙ্গিক এবম্প্রকার অসুবিধা পরিহারের উপায় উদ্ভাবিত না হইলে অল্প-বিস্তর অনিষ্টকর উপসর্গ অবশ্যম্ভাবী। শিল্প নীতি কেন্দ্র হইতেই প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং সেখানকার মুষ্টিমেয় ধুরন্ধরগণের পক্ষে ভ্রম-প্রমাদও অসম্ভব নহে; বিশিষ্ট হইলেও, অল্পমাত্র কয়েক ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর কার্য্যতৎপরতার ফলে, এরূপ পরস্পর-বিরোধী অর্থনৈতিক শক্তির উদ্ভব হইতে পারে, যাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনাই অনেক অধিক। সুতরাং শিল্প-পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় শাসন ও নিয়ন্ত্রণ যথাসম্ভব খর্ব্ব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিল্প-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাধাবিঘ্ন দূর, তথ্যপ্রকাশ, এবং উপায় উদ্ভাবন ও নির্দ্ধারণকল্পে এরূপ ভাবে নিবদ্ধ থাকিবে, যাহার ফলে শিল্প-পরিচালক ও পরিবেশকগণ উপকৃত হইবেন। কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র নিয়ম-নির্দ্ধারণ ও গতি-নিয়ন্ত্রণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তাহাদের সাহায্য অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য; কিন্তু পরিচালক বা পরিবেশকের মর্য্যাদা চুক্তিকারক ও নির্ম্মাণকারকের প্রাপ্য। জাপান এই নীতি অনুসরণ করিয়া উন্নতির সৌধ-শিখরে আরোহণ করিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

গল্প-দাদুর বৈঠক

[রূপকথা]

গল্পদাদুর বৈঠক ক্রমশঃই গুলজার হইয়া উঠিতেছিল। দিনের পর দিন দাদুর শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতেছিল। ছেলে-মেয়েদের মুখে কেবলই এখন গল্প-দাদুর গল্পের কথা; তোতা-রাজার কথাটা মুখে মুখে কয় দিনেই পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়াছে, কাজেই ব্যাধের খপ্পরে পড়িয়া তাঁর পরিণামটা কি হইল, তাহা শুনিবার জন্য দাদুর বৈঠকে এ-দিন আর লোক ধরিতেছিল না।

গল্প-দাদু আজ লোকের রীতিমত ভীড় দেখিয়া নাতী-নাতনীদের সহিত আর রসিকতা করিলেন না, আসরে বসিয়াই তাঁহার গল্পটি সুরু করিয়া দিলেন। অবশ্য, দাদুর জন্য সটকায় তাওয়ায় চড়ানো তামাক আর পিয়ালা-ভরা চা তৈয়ারীই ছিল। চা আর তামাক পর পর দু'টির তোয়াজ শেষ করিয়া দাদু বলিতে লাগিলেন,—

ব্যাধ ত তোতা-রাজাকে খাঁচায় পু'রে চাদর-ঢাকা দিয়ে নিয়ে চ'ললো; আর তোতা-রাজার মনটি তখন কত জায়গাতেই ছুটোছুটি ক'রছিলো। খাঁচার ভেতরে ব'সে চোখ-দু'টি মুদে তিনি যেন ভাবনার সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রাণের দায়ে মিথিলা ছেড়ে পালাচ্ছেন বটে, সেই ফন্দীই ব্যাধকে দিয়েছেন তিনি নিজে, কিন্তু তাঁর মন কি যেতে চাচ্ছে মিথিলা ছেড়ে? রাজকন্যার কথা মনে হলেই তিনি যেন পাগল হ'য়ে যান, বিশ্বাসঘাতক পেটেল যদি রাজকন্যাকে বিয়ে ক'রে বসে! হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—এই জন্যই কি রাজার মন্ত্রীরা বিয়ের দিনটা পেছিয়ে দিয়েছিল? হায়—হায়! যদি রাজকন্যার সঙ্গে বিয়েটা তাঁর হ'য়ে যেত, তাহ'লেও তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। ও-দিকে তাঁর বাবাকে আনবার জন্য রাজা দূত পাঠিয়েছেন, তিনি এলেই বিবাহ হবে। মাঝে আর পাঁচটা দিন। এরই মধ্যে যদি তিনি নিজের দেহ ফিরে না পান—তাহ'লে পেটেলই রাজকন্যাকে বিয়ে ক'রে তাঁরই সিংহাসনে বসবে, আর তিনি—ওঃ!

তোতা-রাজা আর ভাবতে পারলেন না, তাঁর গলার ভেতর দিয়ে কান্নার মত একটা স্বর ঠেলে যেন বেরিয়ে এল।

ব্যাধ সেই শব্দ শু'নে চমকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে তার পা-দু'খানা থেমে গেলো। তাড়াতাড়ি খাঁচার ঢাকাটা একটু সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলো,—হ'ল কি? অমন ক'রে চেঁচালে কেন?

তোতা-রাজার অমনি মনে হ'ল, তিনি পাখী, তার ওপর খাঁচায় বন্দী; চেঁচাবার স্বাধীনতাটুকুও তাঁর এখন নেই! মানুষের স্বরেই আস্তে আস্তে বললেন,—বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাবো, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

ব্যাধ চার দিকে চেয়ে-দেখে বললে,—কাছেই একটা ইঁদারা র'য়েছে দেখছি। জল খাবার আর ভাবনা কি? আমার কাছে লোটা আছে, দড়ি আছে, আর তোমার খাঁচার ভেতরেও জলের বাটি আছে।—বলতে বলতেই সে এগিয়ে চললো। একটু পরেই ইঁদারাটির বাঁধানো পাড়ের ওপর খাঁচাটি নামিয়ে বললে—ক্ষিদে-টিদে পেয়েছে না কি? ফড়িং-টড়িং ধ'রে আনব গোটা-কতক?

তোতা-রাজা বললেন,—ক্ষিদে আমার পায়নি, তা-ছাড়া ফড়িং আমি খাই-নে।

ব্যাধ অমনি হেসে বললো—তুমি তাহ'লে পক্ষি-কুলে পেল্লাদ বলো! একবারে বোষ্টোম! আচ্ছা, তাহ'লে এখন জলই খাও; এর পর পথে বাজার পেলে না হয় আধ্‌লার ছাতু কিনে দেব।

ব্যাধের সঙ্গেই ছিল লোটা আর দড়ি। কাযেই ইঁদারা থেকে জল তুলতে তাকে একটুও বেগ পেতে হ'ল না। খাঁচার ভেতরে দু'-ধারে ছাতু ও জল রাখবার দু'টি বাটি তার দিয়ে বাঁধা ছিল। জলের বাটিতে জল ঢেলে দিয়ে, ব্যাধ নিজেও লোটার বাকি জলটুকু ঢোঁকে ঢোঁকে খেয়ে নিলে।

তোতা-রাজার তেষ্টাও পায়নি, জল খাবার ইচ্ছাও হয়নি; তবু একটু জল চঞ্চু দিয়ে শুষে নিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন,—আমরা কত দুর এলুম ব্যাধ ভাই?

ব্যাধ ব'ললে,—মেঠো রাস্তা ধ'রে এসেছি কি না, ঠিক ঠাহর হ'চ্ছে না—কতটা পথ এসেছি। তোমার যা ভয়—পাছে রাজার লোকের নজরে পড়ো, সেই জন্যই না আঁদাড়-পাঁদাড় দিয়ে ছুটে এসেছি।

তোতা-রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—তাহ'লে এখন কোথায় চলেছ? আর—কার কাছেই বা আমাকে বেচবে ঠিক ক'রেছ?

ব্যাধ মুখখানা একটু বেঁকিয়ে ব'ললে,—তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে? যে-দিকে মন চায় আর চোখ-দুটো পথ দেখায়—সেই দিকেই ত চলেছি। গঙ্গার কিনারা পর্য্যন্ত ত আমাদের রাজার মুলুকের সীমানা। কিন্তু সে এখনও তিন দিনের পথ।

তোতা-রাজা ব'ললেন,—তাহ'লে ত তোমার বড় কষ্ট ব্যাধ ভাই! তিন তিনটে দিন ধরে খালি পথই চ'লবে! তার চেয়ে আর একটা কায কর না ব্যাধ ভাই,—এই মুলুকেই কি এমন কোন বড় লোক নেই—যাঁর টাকা আছে আর পাখী পোষবার সখ আছে?

ব্যাধ ব'ললে,—থাক্‌বে না কেন, কিন্তু ভয় হয় যদি জানাজানি হ'য়ে পড়ে। রাজা ঢেঁড়া দিয়ে জানিয়েছে শোনোনি, এ রাজ্যে যত তোতা আছে সমস্ত তাঁর চাই-ই। রাজার মুলুকে আর কারুর কাছে তোমাকে বেচতে নিয়ে গিয়ে ফঁ্যাসাদে পড়ি আর কি! আমার ভুল হ'য়েছে গোড়ায় তোমার কথা মেনে নিয়ে। রাজার কাছে নিয়ে গেলেই ল্যাটা চুকে যেত; দশ টাকা—দশ টাকাই সই; তাই বা দেয় কে!

তোতা-রাজা ব'ললেন,—এক কায কর ব্যাধ ভাই, কষ্ট ক'রে ভীন্ মুলুকে গিয়ে আর কায নেই; তুমি এই দিকেই কোনো সদাগরের কাছে আমাকে নিয়ে চলো। তারা আমার কদর বুঝবে, তোমার আশাও মিটবে—ফঁ্যাসাদে প'ড়তে হবে না।

তোতা-রাজার এই যুক্তিটি শুনে ব্যাধের পো'র সারা মন আহ্লাদে যেন নেচে উঠলো। সে একমুখ হেসে ব'ললে,—তুমি একটা ভারি দামী কথা মনে করিয়ে দিলে। নতুন এক সদাগর এ তল্লাটে এসেছে শুনিছি। হরেক রকমের পাখী কেনা-বেচাই তার কারবার। তার লোক হামেসাই আমাদের মহল্লায় আসে চিড়িয়ার সন্ধানে। কথাটা আমার মনেই ছিল না। ভাগ্যিস্ তুমি ব'ললে।

তোতা-রাজা মনে মনে খুশী হ'য়ে জানতে চাইলেন, সে সদাগর কোথায় থাকে?

ব্যাধ এবার খপ ক'রে কথাটার জবাব দিতে পারলে না, চুপ ক'রে মাথা চুলকুতে চুলকুতে, ভাবতে লাগলো,—তাই ত! ভুলে মেরে দিয়েছি। জায়গার নামও নেই মনে, আর লোকটি যে কে, তাও ত জানিনে—

তোতা-রাজা ব'ললেন—কি হ'ল, চুপ ক'রে রইলে যে?

ব্যাধ ব'ললে,—ভাবছি, মনে পড়ছে না—

ঠিক এই সময় ব্যাধের নজরে পড়লো—যে-দিকে সে যাচ্ছিলো, সেই দিক থেকে ভীন্ গাঁয়ের এক দল ব্যাধ আসছে, সবারই হাতে এক একটি খাঁচা। ব্যাধ চাপা গলায় ব'ললে,—চুপ! লোক আসছে। কিন্তু, ভালো হ'য়েছে, ওদের কাছেই সন্ধান নিচ্চি—লোকটা কোথা থাকে আর কি তার নাম!

ব্যাধের দল কাছে আসতেই চাদরে ঢাকা তোতা-রাজার খাঁচাটির দিকে আগেই তাদের নজর পড়লো। ব্যাধের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—ক'তগুলো বাগিয়েছ ভায়া, খোলই না খাঁচার ঢাকাটা—দেখি ক'গণ্ডা তোতা ওতে ভ'রে রেখেছো।

ব্যাধ ব'ললে,—এর ভেতরে তোতা নেই—চন্দনা, তাও কুল্‌লে—একটি। এর চোখে আবার আলো সয় না।

ব্যাধ চেয়ে চেয়ে দেখছিল—দলে আছে পাঁচ জন, সবারই হাতে এক একটি খাঁচা, আর তার ভেতরে তোতার পাল কিচির-মিচির করছে। অমনি ব্যাধের মনে জেগে উঠলো—ভগবান্ তাকেও কি দিয়েছিল কম!

দলের এক জন ব'ললে,—চন্দনা ত রাজা কিনবে না, তাঁর চাই খালি তোতা ; মাথা-পিছু দশ দশ টাকা। তোমারটি যদি চন্দনা না হ'য়ে তোতা হ'ত,— তবু দশটি টাকা পেতে।

ব্যাধ ব'ললে, তাই ভাবছি, কি করি—কাকে এটা গছাই,—কার কাছে নিয়ে যাই।

দলের আর এক জন ব'ললে,—নেবার লোকের ভাবনা কি ? ছুনিয়ায় সখওলা মানুষ যদি না থাকবে, ত আমাদের পেট চ'লবে কিসে! কেন, শোনোনি দীপঙ্কর রাজার মতন আর একটা খেয়ালী মহাজন এসেছে এ-তল্লাটে, তার এক বেটী আছে, চিড়িয়া চিড়িয়া ক'রে সে পাগল। চোখে লাগলে আর কথা নেই—অমনি কিনবে! দামও দেয় ভালো।

ব্যাধ জিজ্ঞাসা ক'রলে,—কোথায় সে মহাজন থাকে ? তার নামটাই বা কি ভাই ?

ব্যাধের দল হো হো ক'রে হেসে ব'লে উঠলো—চিড়িয়ার ব্যাপার কর, আর চিরঞ্জীলাল ব্যাপারীর নাম জান না ? ঐ মাঠের রাস্তা ধ'রে সোজা পশ্চিম দিকে খানিকটা চ'লে যাও, সামনেই তার ডেরা দেখতে পাবে। মস্ত কুঠী, জবর বাগিচা, আর বাগিচা ঘিরে খালি চিড়িয়া-খানা।

ব্যাধ ব'ললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে। নামটা ভারি বেয়াড়া কি না! তা ছাড়া, এ-তল্লাটে ত থাকি নে ভাই, তাই জানা-শোনা নেই।

ব্যাধের দল রাজধানীর পথ ধ'রে চ'লে গেলো।

ব্যাধ ব'ললে,—শুনলে ত সব কথা ? ভয় নেই, ওরা চ'লে গেছে।

তোতা-রাজা ব'ললেন,—শুনিছি। তুমি এবার চিরঞ্জী-লালের ডেরাতেই আমাকে নিয়ে চলো।

ব্যাধ ব'ললে,—তাই ত চলেছি। এখন দেখি অদেষ্টে কি মেলে! তুমি ত বলেছো—হাজারখানেক টাকা পাইয়ে দেবে।

তোতা-রাজা ব'ললেন,—কিন্তু একটি কথা তোমাকে ব'লে রাখি ব্যাধ ভাই, যার তার কাছে যেন কথাটা পেড়ো না, আর বুঝে-সুঝে বেশ হিসেব ক'রে কথা ব'লো। ওরা ব'ললে না,—চিরঞ্জীলালের এক মেয়ে আছে—পাখী পাখী ক'রে সে পাগল! বুদ্ধি-খাটিয়ে যদি সেই মেয়েটার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো—তাহ'লে কিন্তু তোমার বরাত খুলে যাবে—তা তোমাকে আগেই ব'লে রাখছি।

ব্যাধ ব'ললে,—বলো কি! আচ্ছা—সেই চেষ্টাই না হয় ক'রবো। কিন্তু দেখো, শেষটা তুমি যেন ভরা ডুবিও না!

তোতা-রাজা ব'ললেন,—পাখী হ'লেও মানুষের মতো আমি মিছে কথা বলি নে।

ব্যাধের পো তোতা-রাজার খাঁচাটি নিয়ে হন্-হন্ ক'রে চিরঞ্জীলালের ডেরার দিকে চ'ললো।

খানিকদূর যেতেই প্রাচীর-ঘেরা মস্ত একটা বাগিচা আর সেই সঙ্গে বাগিচার ভেতরের বাড়ীখানার উঁচু গম্বুজটা দেখে ব্যাধ যেন চমকে উঠলো। সে নিজের মনেই ব'লতে লাগলো—আমি যেন কি! এত বড় বাগিচা এখানে বানিয়েছে, এত বড় বাড়ী উঠেছে, আর আমি কিচ্ছুই জানি নে! কেবল বন-জঙ্গলে ঘুরে ফাঁদ পেতে পাখী ধরতেই শিখিছি!

খাঁচার ভেতর থেকে তোতা-রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—দেখতে কিছু পেলে ব্যাধ ভাই,—কোন বাগিচা, কি বাড়ী-টাড়ি ?

ব্যাধ উত্তর দিলে,—হুঁ, মস্ত বাগিচা, পেল্লাই বাড়ী ; দেখেই তাক লেগে গেছে! এখন ভাবছি—কি ক'রে ওখানে ঢুকি ?

তোতা-রাজা ব'ললেন,—ভয় কি ? তুমি যখন ব্যাধ, পাখা-ধরা আর বিক্রী-করা তোমার ব্যবসা, তখন তোমার যেতে আর বাধা কি ?

ব্যাধ ব'ললে,—বুঝতে পারচো না, চেনা নেই, জানা নেই, কি ধাতের লোক সে, কে জানে! যদি কোন ফ্যাঁসাদে প'ড়ে যাই!

তোতা-রাজা ব'ললেন,—ফ্যাঁসাদে যাতে না পড়ো, সে যুক্তি আমি তোমাকে দেব। তুমি ত আমাকে বউটির মত ঢেকে-ঢুকে নিয়ে চ'লেছো, খাঁচার ভেতরে কি আছে, কেউ ত দেখছে না ; আগে তো বাগিচায় ঢুকে পড়ো—খবর নাও, হাল-চাল সব ছাখো—তার পর ত কেনা-বেচার কথা ? আগে থাকতেই অতো ঘাবড়াচ্ছ কেন ?

তোতা-রাজার কথা শুনে ব্যাধের ভাবনা-চিন্তা সব সেই দণ্ডেই যেন উড়ে গেলো, খুব খুসী হয়ে, এক গাল হেসে ব'ললে,—সত্যি! তোমার কথা শুনলে বুদ্ধি যেন বাড়ে, সেয়ানা মানুষেও এমন জুৎসই শলা-পরামর্শ দিতে পারে না। তোমার কথাই সই—চল, তোমাকে নিয়ে দুগ্‌গা ব'লে ত ঢুকে পড়ি—

ব'লতে ব'লতে ব্যাধ এগিয়ে চ'ললো সেই বাগান-বাড়ীটার দেউড়ীর দিকে। খানিক পরেই দেউড়ীর সামনে এসে ভেতরে ঢুক্‌বার জন্য যেমন পা বাড়িয়েছে, অমনি হাঁ-হাঁ কোরে দু'টো দরোয়ান ছুটে এসে তাকে দিলে বাধা,—হুমকী দিয়ে ব'লে-উঠলো—কে হে বাপু তুমি, বলা নেই কওয়া নেই—চলেছ কোথায়?

ব্যাধের ত ভয়ে ভির্মী লাগ্‌বার যো আর কি! কিন্তু কোন রকমে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে গলা কাঁপিয়ে আস্তে আস্তে ব'ললে,—আমি চলেছি শেঠজীর কাছে, ভারি জরুরী দরবার আছে।

টিনে পাথরের ঘা দিলে যেমন একটা বেসুরো আওয়াজ বেরোয় গলা থেকে—তেমনই খন্‌খনে সুর বের ক'রে এক জন দরোয়ান জানিয়ে দিলে,—কায-টাজ আজ বন্ধ সব—ভাগো জল্‌দী।

আর এক জন দরোয়ান একটু নরম স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রলে—কাযটা কি, শুনিই আগে?

ব্যাধের বুকের ভেতরটা তখন ঢিপ্‌-ঢিপ্‌ করছিল ভয়ে আর ভাবনায়; দ্বিতীয় দরোয়ানটার কথায় একটু ভরসা পেয়ে ব'ললে,—একটা চিড়িয়ার খবর আছে দরোয়ানজী! ভারি খুপ্‌সুরুত পাখী। শেঠজী তার কথা শুনলে বহুৎ খুশী হবেন। তাই ত তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছি।

দুই দরোয়ানই মাথা নেড়ে ব'ললে,—দেখা হবে না, কোন কথাও হবে না।

ব্যাধ তখন হাত-যোড় ক'রে ব'ললে,—দোহাই তোমাদের দরোয়ানজী, ফিরিও না আমাকে। শেঠজীর সঙ্গে দেখা না হয় ত, তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দাও, তাহ'লেও আমার কায হবে।

দরোয়ানরা তখন আসল কথাটি খুলে ব'ললে। কথাটা হচ্ছে—শেঠজীর খুব দামী একটা হীরেমন পাখী একটু আগেই হঠাৎ মারা গেছে। শেঠজীর এত-বড় চিড়িয়াখানার ভেতরে সেইটিই ছিল সবার সেরা পাখী! এ রাজ্যের রাজকন্যার জন্যে পাখীটা পালা হয়, কাল পাঠাবার কথা। শেঠজী আর শেঠ-কন্যে দু'জনেই একেবারে মুসড়ে প'ড়েছেন। এখনো পাখীটার সৎকার হয়নি। কাযেই এ অবস্থায় কি ক'রে তারা ব্যাধকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাবে, আর নিয়ে গেলেও কোন কাযের কথা আজ কি ক'রে হ'তে পারে?

কথাগুলো শুনে ব্যাধ যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো! কত আশা ক'রে 'বলিয়ে-কহিয়ে' তোতাকে নিয়ে সে ব্যাপার করতে এসেছে—কত টাকা নিয়ে কোথায় নাচতে নাচতে বাড়ী যাবে,—কিন্তু তার বরাতে শেঠজী পাখীর শোকে অস্থির; দেখা হবে না, কষ্ট ক'রে আসাই কেবল সার হ'ল!

মুখখানা কাঁচু-মাচু ক'রে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে ব্যাধ ফের ফিরে চ'ললো—যে পথে এসেছিল সেই পথ ধরে। কিন্তু পা দু'খানি তার আর যেন এগুতে চাচ্ছিল না। হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গলো তোতার কথায়। খাঁচার ভেতর থেকে তোতা-রাজা সবই শুনেছিলেন, ব্যাধ ফিরে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই হঠাৎ ব'লে উঠলেন,—ফিরে চললে যে ব্যাধ ভাই- হোল কি?

ব্যাধের মনটা একেই মুসড়ে ছিল, এবার রাগে যেন জ্বলে উঠলো তোতার এই কথাগুলো শুনে। মুখখানা খিঁচিয়ে কড়া স্বরে সে বললে,—ন্যাকামী হচ্ছে বটে! কাণে বুঝি তুলো গুঁজে বসেছিলে—শুনতে পাওনি কিছু—না? আমার ঢের হয়েছে শিক্ষে, লোভে আর কায নেই, দশ টাকাই আমার ভালো, চলো এখন দীপঙ্কর রাজার কাছে।

তোতা-রাজা ব'ললেন,—মিছে তুমি আমার উপর রাগ করছ ব্যাধ ভাই! আমার কথাটি তুমি বুঝতে পার-নি! শেঠজীর দেউড়ি থেকে তুমি ফিরে চলেছ বলেই ও-কথা বলিছি; আমার আসল কথাটাই হচ্ছে—তোমার ফেরা হবে না—শেঠজীর কাছেই ফের তোমাকে যেতে হবে।

ব্যাধের রাগ এ-কথায় আরও চড়ে গেলো, গলা ঝাঁঝিয়ে ব'লে উঠলো, তুমি আমাকে কি ঠাউরিয়েছ—শুনি? মরা হীরেমনকেনিয়ে বাপে-ঝিয়ে শোক করছে—

এই কথা জানিয়ে দরোয়ান-তুটো ফিরিয়ে দিলে আমাকে, আবার কোন্ মুখে ওখানে গিয়ে দাঁড়াবো? আমি ত আর ক্ষেপিনি!

তোতা-রাজা ব'ললেন,—এখন আমি যা বলি শোনো ব্যাধ ভাই, গোঁসা ক'রে মিছিমিছি বেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। তুমি ঐ দরোয়ান তু'টোকে বলো—আমাকে তোমাদের শেঠজীর কাছে নিয়ে চলো, আমি তাঁর মরা হীরেমনটাকে বাঁচিয়ে তুল্‌বো।

তোতা-রাজার মুখে এই অদ্ভুত কথাটা শুনে ব্যাধ ত হেসেই খুন! ব'ললে,—এত তুঃখেও না হেসে পারছিনে। তোমার মাথায় যে এমন ছিট আছে, তা কি আগে জান্‌তুম?

তোতা-রাজা ব'ললেন,—দেখো ব্যাধ ভাই! যে পাখী মানুষের মতো কথা কয়, সে পাখীর কথা-গুলোও বিশ্বাস করতে হয়। আমি তোমাকে মিছে কথা বলিনি, মরা পাখীকে আমি সত্যিই বাঁচাতে জানি। কেমন ক'রে বাঁচাবো, আর তোমাকে এখন কি করতে হবে, কিসেই বা তোমার আশা পূর্ণ হবে—চুপি চুপি তোমাকে বলছি—কাণতুটো খাড়া ক'রে শুনে নাও; আমি যেমন-যেমন বলবো—ঠিক ঠিক যদি তা করতে পারো—দেখবে তখন তোমার কত খাতির হয়—আর কে-ই বা তখন তোমাকে পায়।

ব্যাধ ব'ললে,—ভালো, কাণ আছে বলো: মনকে আমি এবার সত্যি সত্যিই বশ ক'রে ফেলেছি, যা থাকে বরাতে হবে!

তোতা-রাজা আস্তে আস্তে ব'ললেন,—খাঁচার গায়ে কাণ তুটি লাগিয়ে ব'সো,—জোরে ত বল্‌বো না, গুপ্ত-কথা কি না,—এখন শোনো। কিন্তু নজর রেখো—কেউ যেন না এসে পড়ে, বা জানতে না পারে যে, খাঁচার পাখী তোমার সঙ্গে মানুষের মতো কথা কইছে।

ব্যাধ তখন চার দিকে চেয়ে—খাঁচাটা নিয়ে একটা গাছের তলায় ব'সলো, আর কাণটা তার খাঁচায় গায়ে লাগিয়ে দিয়ে তোতা-রাজার কথা মন দিয়ে শুনতে লাগলো।

পাখীর সদাগর চিরঞ্জীলাল আর তাঁর মেয়ের কথা তোমরা শুধু ব্যাধের মুখেই শুনেছো। তাঁদের সঙ্গে তোমাদের দেখা-শোনা ত হয়নি এ পর্য্যন্ত। কিন্তু এবার হবে।

পুরন্ত মুখ, দোহারা-চেহারা, নাতুস-নুতুস মানুষটি; বয়েস আর কতো—বড় জোর পঞ্চাশ বছর। কিন্তু এই বয়সে পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে এসে—প্রায় বছর-খানেক আগে তিনি মিথিলার কাছাকাছি এই নিরেলা অঞ্চলটা ইজারা নিয়ে, বিস্তর টাকা খরচ ক'রে নিজের পছন্দমত এই বাগান-বাড়ী গ'ড়ে তুলেছেন। বাড়ীখানি ছোট হ'লেও, বাগানটি মস্ত বড—যেন একখানি গ্রাম! চার দিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, ভেতরে রকম রকম গাছপালার বাহার, আর হাজার রকম পাখীর কিচির-মিচিরে অত-বড় বাগানটি যেন দিবারাত্রি গুলজার! সারা বাগানের ওপরে সরু তারের জাল,—পাখীরা উড়ে পালাবে সে যো নেই; অথচ তার ভেতরেই তাদের রাত কাটাবার, আহার-বিহারের, ডিম-পাড়বার, ছানাগুলোকে রাখবার এমনই সব চমৎকার ব্যবস্থা যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, পাখীগুলোই যেন তাদের মনের মতন ক'রে এগুলো বানিয়ে নিয়েছে!

চিরঞ্জীলালের ছেলেবেলা থেকেই পাখীর দিকে ঝোঁক। পাখী পেলে তিনি যেন স্বর্গ হাতে পেতেন। বনের পাখীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে পোষ মানাতে তাঁর ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা। বড় হ'য়ে তিনি এই পাখীর ব্যবসাই সুরু করেন। এ-দেশের পাখী ও-দেশে পাঠিয়ে আর ও-দেশের পাখী এ-দেশে এনে, তিনি এমনি চুটিয়ে ব্যবসা চালাতে থাকেন যে, তাতেই বছর-কতকের ভেতর মস্ত ধনী হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর ধন-দৌলত ভোগ করতে একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। তাই বিদেশে ঘোরাঘুরি ছেড়ে দিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে এইখানে এই ভাবে বাস করছেন। চিরদিন পাখী নিয়ে কারবার করেছেন, কারবার ছেড়ে সংসারী হ'য়েও তাদের ছাড়তে পারেন-নি। সংসারখানার সঙ্গে চিড়িয়াখানা সাজিয়েছেন; জায়গাটির নাম দিয়েছেন পক্ষিপুর,—আর আদর ক'রে মেয়েটির নাম রেখেছেন—পক্ষিরাণী।

মেয়ের এই অদ্ভুত নাম শুনে লোকে বলাবলি করে—

পাখী-পাখী করে সওদাগরের মনটা পাখীর মতই হ'য়েছে, তাই এমন মেয়ের এই নাম রেখেছেন! এর নাম পরি-রাণী রাখলে বরং সাজতো। সত্যি কথা বলতে কি, সওদাগর-কন্যার রূপ যেন তার গায়ে ধরে না; তার পানে চাইলে চোখের পলক যেন আর পড়তে চায় না—কন্যার রূপের জলুস যেন চক্ষু ধাঁধিয়ে দেয়। রূপের মতন তার স্বভাবটিও এত সুন্দর যে, বাড়ীর দাস-দাসী থেকে বাগানের পাখীটি পর্য্যন্ত তাকে প্রাণের সমান ভালোবাসে—তার ইসারায় ফেরে। বাগানের উড়ন্ত-পাখী তার পালকদের কাছে ধরা দিতে নারাজ হ'য়ে যখন ছুটোছুটি করে, পক্ষিরাণী সে সময় পাখীর পানে চেয়ে একটি চুমকুড়ি দিতেই অমনি উড়ে-এসে তার হাতের ওপর বসে। সদাগর চিরঞ্জীলাল হেসে বলেন—সাধে কি আর তোমার নাম আমি পক্ষিরাণী রেখেছিলুম, মা!

পক্ষিরাণীই বাবাকে বুঝিয়ে বলেন,—এত দিন ত পাখাদের নিয়ে খালি ব্যবসাই করেছো বাবা, সস্তায় কিনে পোষ মানিয়ে একশো গুণ বেশী দামে বেচেছো। এখন থেকে আর বেচবার ফিকির মাথায় এনো না বাবা, শুধু পোষবার সখটুকুই রাখো। এত পয়সা তোমার, খাবে কে? ভেবো—এরাও তোমার পুষ্যি!

মেয়ের কথা চিরঞ্জীলাল ঠেলতে পারেন-নি। এখানে এসে অবধি পাখী আর তিনি বেচেন না, তবে কেনার কায ছাড়েন-নি; ভালো পাখী পেলেই কেনেন, আর শিখিয়ে-পড়িয়ে বাগানজাত ক'রে-রেখে তাতেই আনন্দ পান। পক্ষিরাণীর তাতে আপত্তি নেই, তার বারণ শুধু বেচায়।

বাগান-বাড়ী করবার আগে চিরঞ্জীলাল এই পোড়ো অঞ্চলটা মিথিলার রাজার কাছ থেকে এই কড়ারে বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছিলেন যে, টাকা-পয়সার বদলে প্রতি-বছর তিনি রাজকর হিসাবে বাছা-বাছা পঞ্চাশটি পাখী রাজ-সরকারে উপহার দেবেন।

চিরঞ্জীলাল ফি-বছর এই কড়ারেই পঞ্চাশটি ক'রে পাখী রাজাকে পাঠিয়ে খুসী ক'রে আসছেন। চিরঞ্জীলালের পাখীর সুখ্যাতি আর রাজার মুখে ধরে না। অন্দরমহলের বাগানে এই সব পাখী থাকে, রাজকন্যা নিজেই তাদের আদর-যত্ন করেন।

একবার রাজকন্যার সখ হ'ল, ভালো একটি হীরেমন্ পাখী পুষবেন। তিনি রাজাকে ব'ললেন, বাবা, চিরঞ্জীলাল ত বছর-বছর আমাদের সরকারে পঞ্চাশটা ক'রে পাখী দেন, ক-বছরে অনেক রকম পাখীই তিনি দিয়েছেন, কিন্তু হীরেমন্ পাখী আমরা কখনো পাইনি, এবার যে পঞ্চাশটা পাখী তিনি পাঠাবেন, তার ভিতরে একটা হীরেমন থাকলে বড় ভালো হয় বাবা!

রাজা মেয়ের ইচ্ছামত তখনি চিরঞ্জীলালকে জানালেন, —রাজকন্যার ভারী সখ হয়েছে, ভালো একটি হীরেমন পুষবেন। এবার যে পঞ্চাশটি পাখী পাঠাবে, তার ভেতরে যেন একটা হীরেমন থাকে—তা থাকা চাই-ই। আর সেটি এমন সরেস হবে—যেন রাজকন্যার মনের মতো হয়।

চিরঞ্জীলাল জানতেন, রাজকন্যাই রাজ্যের রাজা, রাজা তাঁর ইচ্ছাতেই চলেন। কাযেই তাঁর মন রাখবার জন্যে তিনি রাজকন্যার মনের মতন হীরেমন খুঁজতে উঠে-পড়ে লাগলেন। তাঁর বাগানে লাখে লাখে পাখী, কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য, তার ভেতরে একটিও হীরেমন নেই! যে ক'টি ছিল, ছোঁয়াচে রোগে এক হপ্তার মধ্যেই সে ক'টি মরে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মগধের এক ব্যাপারীর কাছে চমৎকার একটি হীরেমনের সন্ধান তিনি পেলেন। দাও বুঝে ব্যাপারী জানালে, হাজার টাকার কমে সে সে-পাখী কিছুতেই বেচবে না। পাখীর জন্যে চিরঞ্জীলাল তখন ক্ষেপে উঠেছিলেন, টাকার দিকে তাঁর তখন দৃক্‌পাত ছিল না। হাজার টাকা দিয়েই সেই হীরেমন তিনি কিনলেন। কি সুন্দর পাখী! দেখলেই মন যেন নেচে ওঠে। কি তার স্পষ্ট বুলি—কত কথাই বলে! পক্ষিরাণী ত পাখী দেখে একবারে পাগল,— তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর যেন ঢেলে দিলেন। পাখীও বুঝলে, তোয়াজ করবার ঠিক লোকই পেয়েছে।

দেখতে দেখতে একটি মাস কাটলো,—রাজবাড়ীতে পাখী পাঠাবার দিনটিও এসে পড়লো। পক্ষিরাণীর মন কিন্তু মুসড়ে পড়লো হীরেমনকে ছাড়তে! কোথাকার কে রাজকন্যা, তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে একে? চিরঞ্জীলালকে বললেন,—এ পাখী আমি দেব না বাবা, একে ছাড়তে আমার মন কেমন করছে!

মেয়ের আব্দার শুনে চিরঞ্জীলাল শিউরে উঠে ব'ললেন,—অমন কথা কি বলতে আছে মা! হীরেমনের কথা তাঁকে জানিয়েছি, রাজকন্যা দিন গণছেন; আর শুনেছ ত তাঁর বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেছে। আর পাঁচ দিন পরে তাঁর বিয়ে হবে। ভালই হয়েছে, আমাদের আর আলাদা ভেট দিতে হবে না। পঞ্চাশটি পাখীর ওপর হীরেমনকে পেলে রাজা কত খুসীই হবেন। আর আমার ইচ্ছে—তুমি নিজের হাতেই ওটাকে রাজকন্যাকে দেবে।

মুখখানি ভার ক'রে পক্ষিরাণী ব'ললে,—দিতে হয় তুমি নিজে দিও বাবা, আমি হীরেমনকে কিছুতেই তাঁর হাতে দিতে পারবো না।

চিরঞ্জীলাল মেয়ের মাথায় হাতখানি রেখে আশ্বাস দিলেন,—তুমি এর জন্যে দুঃখ করো না, মা, এর চেয়ে ভালো একটা হীরেমন তোমার জন্যে আমি শীগ্‌গীরই আনাচ্ছি।

হীরেমন এই সময় সোনার দাঁড়ে বসে দোল খাচ্ছিল; হঠাৎ একটা বিশ্রী চীৎকার তুলে দাঁড় থেকে সে ঝুলে পড়লো। পক্ষিরাণী ছুটে গিয়ে তাকে তুলে ধরলে, দাঁড়ের উপর বসিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রলে, কিন্তু হীরেমন আর তাতে বসতে পারলো না,—নেতিয়ে প'ড়ে দাঁড়েই ঝুলতে লাগলো।

পক্ষিরাণী চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন—হীরেমন বুঝি আমাদের ছেড়ে পালালো বাবা! রাজকন্যার কাছে যাবার ভয়েই এ চোখ বুজ্‌লো জন্মের মত!

চিরঞ্জীলালও পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন—তাই ত এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল! এখন রাজাকে কি ব'লবো—কেমন ক'রে তাঁকে মুখ দেখাবো!

লোক-জন সব ছুটে এলো এঁদের চীৎকার শুনে। সোনার দাঁড়টি নামিয়ে সবাই দেখলে—সত্যিই হীরেমন ম'রে দাঁড়ে ঝুলছে!

চিরঞ্জীলাল ব'ললেন,—ওকে ফেলো না, ঐ-রকমই থাক, রাজাকে দেখিয়ে ব'লবো—আমার তরফ থেকে কসুর কিছু হয়নি হুজুর!

এরই খানিক পরে তোতা-রাজাকে নিয়ে ব্যাধ দেউড়ীতে আসে, আর দরোয়ানরা এই জন্যই তাকে চিরঞ্জীলালের কাছে আসতে দিতে সাহস করেনি। এমন দুর্দ্দিনে তিনি কি আর পাখীর সওদা ক'রতে পারেন?

দাঁড়শুদ্ধ মরা পাখীটার সামনে ব'সে বাপ ও মেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছেন। পক্ষিরাণীর দুঃখ হীরেমনের জন্যে, ঘণ্টা-দুই আগেও সেটা জ্যান্ত ছিল, তাঁর হাত থেকে আঙ্গুর, ক্ষীরের নাড়ু খেয়েছিল!—বাপের দুঃখ একটি হাজার টাকাও গেল, রাজার কাছে মুখ-দেখানোরও পথ রইলো না! আর দিনও নেই যে, নতুন একটা পাখী যোগাড় ক'রে রাজার জন্যে নিয়ে যাবেন।

এমন সময় দেউড়ীর বড় দরোয়ান তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে কোন কথা নেই, শুধু দেহখানা ধনুকের মত বেঁকিয়ে দু'জনকেই কুর্ণিস ক'রলে, তার পিছনে ছিল সেই ব্যাধ, হাতে তার চাদরে-ঢাকা খাঁচা। দরোয়ানের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও মাথা নুইয়ে প্রণামটা সেরে নিলে।

চোখের ভুরু দু'টি কুঁচকিয়ে চিরঞ্জীলাল ব'লে উঠলেন,—কি ব্যাপার! এ লোককে এখানে কেন এনেছ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিল সেই ব্যাধ। হাতের খাঁচাটি নামিয়ে রেখে হাত দু'খানি জোড় ক'রে ব'ললো—দরোয়ানজীর কোন দোষ নেই শেঠজী, আমার কথা শুনলেই তা বুঝতে পারবেন। মরা পাখী আমি বাঁচাতে পারি শুনেই ও আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

কথাটা শুনেই বাপ ও মেয়ে দু'জনে এক সঙ্গে ধড়মড় ক'রে সোজা হ'য়ে বসলেন। চিরঞ্জীলাল চোখদুটো পাকিয়ে ব্যাধের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি ব'ললে তুমি! মরা পাখী বাঁচাতে পারো তুমি?

ব্যাধ অমনি মরা পাখীটার দিকে তাকিয়ে ব'ললো, আজ্ঞে হাঁ, পারি। হুজুর যদি হুকুম করেন, ঐ যে অমন দামী পাখীটা ম'রে দাঁড়ের ওপর ঝুলছে, এক্ষুনি ওটাকে বাঁচিয়ে দেব, সে ক্ষ্যামতা আমার আছে।

পক্ষিরাণী অবাক হ'য়ে চোখদুটি তুলে বাপের মুখের পানে শুধু চাইলো। তার দৃষ্টি যেন ব'লছিলো—এ লোকটা কি বলে বাবা! বেশ ত—বল না ওকে, মরা হীরেমনটাকে বাঁচিয়ে দিতে।

চিরঞ্জীলাল ব'ললেন,—মরা পাখী কেউ যে বাঁচাতে পারে, এমন অসম্ভব কথা ত কখনো শুনিনি।

ব্যাধ ব'ললে,—এর আর শোনা-শুনি কি, এক্ষুনি দেখিয়ে দিতে পারি—চোখের ওপর। কিন্তু তার আগে ব'লে রাখছি, যদি বাঁচে করকরে হাজারখানি টাকা গুণে ছাড়তে হবে। যদি এতে রাজী থাকেন, বলুন, আমার হিম্মতটা দেখিয়ে দিই।

চিরঞ্জীলাল আর কথা না বাড়িয়ে একটু গম্ভীর হ'য়েই বললেন,—বেশ, আমি রাজি; তুমি তোমার হিম্মত দেখাও।

ব্যাধের পো তখন আর দ্বিরুক্তি না ক'রে খাঁচাটি নিয়ে মরা পাখীটাকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো, তার পর খাঁচার চাদরখানা একটু উঁচু ক'রে বিড়্ বিড়্ ক'রে আপন-মনেই কি সব মন্তর আওড়ালো, চিরঞ্জীলাল বা তাঁর মেয়ে তার একবর্ণও বুঝ্তে পারলেন না; কিন্তু তার পর ব্যাধ একটু স'রে দাঁড়াতেই তাঁরা অবাক হ'য়ে দেখলেন—মরা হীরেমন পাখা ঝাপ্টা দিয়ে দাঁড়ের ওপর উঠে ব'সেছে।

হীরেমনকে ম'রতে দেখে পক্ষিরাণী যেমন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল, বাঁচতে দেখেও আহ্লাদে তেমনি চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্লো,—বেঁচে উঠেছে—হীরেমন বেঁচে উঠেছে!

আবার লোক-জন সব ছুটে এলো চারি দিক থেকে, এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে সবাই বিস্ময়ে হতভম্ব হ'য়ে গেল। আর ব্যাধের তখন খাতির দেখে কে!

চিরঞ্জীলাল তখনি ব্যাধের সামনে করকরে একটি হাজার টাকা গুণে, কিংখাপের একটা দামী থলিতে ভ'রে তার হাতে দিলেন। ব্যাধের পো তখন আহ্লাদে আট-খানা হ'য়ে এক-হাতে টাকার তোড়া, আর এক-হাতে পাখীর খাঁচাটা নিয়ে নাচতে নাচতে রাস্তার পানে ছুটলো।

দেউড়ী পার হয়ে খানিক দূরে এসে যখন সে দেখলে, কাছে কেউ নেই, তখন চাপা-গলায় হাতের খাঁচাটার পানে চেয়ে ব'লে উঠলো—তুমি ত দেখছি অদ্ভুত পাখী হে! যা মুখ দিয়ে ব'ললে, তাই-ই ক'রলে! মরা পাখীটা ঝটপট ক'রে ডানা মেলে উঠে ব'সলো দাঁড়ে! যাক্, এখন কি করি বল ত?

ব্যাধ ব'লেই যাচ্ছিলো, কিন্তু খাঁচার ভেতর থেকে তার কথার কোন জবাবই এলো না। ব্যাধ এবার গলায় একটু জোর দিয়েই বললে,—ঘুমিয়ে পড়লে না কি? রা-কাড়ছো না যে,—এক-দম চুপ? কথার জবাব দাও।

কিন্তু জবাব দেবে কে? তোতা-রাজার প্রাণটিই যে তোতার দেহের ভেতর থেকে মরা হীরেমনের দেহের ভেতরে ঢুকে তাকে জ্যান্ত ক'রে তুলেছে, ব্যাধ ত তা জানে না; আর তোতা-রাজাও এই গুপ্ত-রহস্যটা তার কাছে ভাঙ্গেন-নি। ব্যাধকে তিনি শুধু বলেছিলেন,—'মরা পাখীটাকে আড়াল ক'রে, খাঁচার কাপড়টি একটু তুলে তুমি খালি বিড়্ বিড়্ ক'রে একটা কিছু মন্তর আওড়াবার ভাণ করবে; তখুনি আমি মরা পাখীকে বাঁচিয়ে দেব। কিন্তু খবরদার, খাঁচার ভেতরে ভুলেও চাইবে না, বা খাঁচার ভেতরে কি আছে সে-কথা কাউকে বলবে না। কায উদ্ধার ক'রে টাকা আর খাঁচা নিয়ে চটপট চ'লে আসবে।' ব্যাধ কথামত সব কায শেষ ক'রে চটপটই চ'লে এসেছে বাইরে। তার মনে আরো আহ্লাদ যে—টাকাকে টাকাও এলো, অথচ কহিয়ে-বলিয়ে এমন মজাদার তোতাকেও ছেড়ে আসতে হ'ল না।

কিন্তু খাঁচার ভেতর থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ব্যাধের মনে কেমন সন্দেহ হ'ল। সে তখনই খাঁচাটা নামিয়ে নিজেও উপুড় হ'য়ে ব'সে, খাঁচার ঢাকা চাদর-খানা তুলে ধ'রলো। কিন্তু যা দেখলে, তাতে চোখ দুটো তার ঠিকরে বেরিয়ে প'ড়বার মতো হ'লো। আশ্চর্য্য! খাঁচার ভেতরে সেই সৃষ্টিছাড়া রকমের তোতা পাখীটা ম'রে কাত হ'য়ে পড়ে রয়েছে!

চাদরখানা ঢাকা দিয়ে ব্যাধ ভাবতে ব'সলো, এখন করা যায় কি? ভাবতে ভাবতে তার মাথায় এক ফন্দি এলো। আচ্ছা, পাখীটা যখন ম'রেই গেছে, তখন একে দিয়ে আর কিছু কামালে দোষ কি? দীপঙ্কর রাজা তোতা পিছু দশ-দশ টাকা দিচ্ছেন ত, মরা পাখীটাই যদি নিয়ে যাই তাঁর কাছে, আর এর জন্যে যদি অর্দ্ধেকও পাই, তাই বা মন্দ কি? বলবো না হয়—ধ'রে খাঁচায় পুরে আনতে আনতে পথেই মরে গেছে। কিছু যে পাবোই, তাতে ভুল নেই। থলের টাকাগুলা মজুত থাক না, ওগুলো থেকে কিছু নাই বা ভাঙলুম।"

ব্যাধের মন আবার নতুন উৎসাহে মেতে উঠলো। খাঁচাটা তুলে নিয়ে সে এবার ছুটলো—রাজবাড়ীর দিকে।

রাজকন্যা সীপ্রাদেবী হীরেমনের থাকবার জায়গাটি নিজের হাতেই সাজাচ্ছিলেন। পক্ষিপুরের সদাগর চিরঞ্জীলাল লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন, রাজকন্যার মনের মতন হীরেমন তিনি অনেক কষ্টে যোগাড় করেছেন, তাঁর মেয়ে পক্ষিরাণী নিজের হাতেই সে'টি রাজকন্যার হাতে দেবেন।—খবরটি শুনেই রাজকন্যার মন এতই আনন্দে ভ'রে উঠেছে যে, আঁচলখানি কোমরে জড়িয়ে তিনি নিজেই যোগাড়-যন্ত্র ক'রতে লেগে পড়েছেন।

সখীরা খবর নিতে এসে রাজকন্যার কাণ্ড দেখে একেবারে 'থ' আর কি! সমবয়সী ছাব্বিশটি মেয়ে ছায়ার মত যার সহচরী, আর যার মুখের হাইটুকু ধরবার জন্যে এবংশো দাসী হাঁ ক'রে আশে-পাশে বসে থাকে, তিনি কি না কোমরে কাপড় বেঁধে একলাই খাটছেন!

সখী কমলা ব'ললে,—আমরা কি মাথা খুঁড়ে মরবো? লোকে শুনলে বলবে কি?

রাজকন্যা তাদের কথার মানে বুঝে হেসে ব'ললেন,—তা'তে হয়েছে কি! আমার কি খাটতে ইচ্ছে হয় না? রাজকন্যা হ'লে কি কায-কর্ম্ম কিছু করতে নেই?

সখী চপলা ব'ললে,—তা বেশ! দু'জনের পেছনেই পাখী; সখে মিল আছে।

রাজকন্যা চপলার দিকে চেয়ে ব'ললেন,—এ কথার মানে ত বুঝলুম না!

চপলা একটু হেসে ব'ললে,—মানে সোজা—তোমার প্রাণের রাজা তোতা নিয়ে পড়েছেন, আর তোমার মনে নাচছে হীরেমন। এখন আমাদের অবস্থা—'বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা'?

রাজকন্যা ব'ললেন,—আমি যে একটা হীরেমন চেয়েছি আর তা যে পাবো, এ কথা সবাই ত জানে। কিন্তু রাজ্যের তোতাগুলো জড়ো করবার সখ ওঁর মনে হঠাৎ চাগলো কেন, সে খবর তোরা কেউ জানিস্?

সখীরা ব'ললে—রাজা রাজড়ার মনের খবর আমরা কি ক'রে জানবো রাজকন্যা! তিনি আবার পণে তোমাকে জিতেছেন, তাঁর জোর কত! রাজ্যশুদ্ধ সবাই শুনছে, এ রাজ্যের সমস্ত তোতা তিনি উজোড় করতে চান, কিন্তু কেন, এ কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে কারুর সাহস হয়নি।

রাজকন্যা মুখখানা শক্ত ক'রে ব'ললেন,—আচ্ছা, আমিই ও-কথা জিজ্ঞাসা ক'রছি।

হাতের কাযও তাঁর এতক্ষণে শেষ হয়েছিল, কথাটা বলেই তিনি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন। সখীরা জানে, রাজকন্যা যখন যা ধ'রবেন, তার শেষ না ক'রে ছাড়বেন না। কাপড়খানা ছেড়ে হয় ত এখনি বেরিয়ে পড়বেন রাজা দীপঙ্করের সন্ধানে—কথাটা জিজ্ঞাসা করতে। কাযেই তারাও সকলে হন্তদন্ত হ'য়ে রাজকন্যার পিছু পিছু ছুটলো।

রাজসভার সেই ঘটনার পর মাঝে একটি দিনমাত্র রাজা দীপঙ্করের সঙ্গে রাজকন্যার দেখা-সাক্ষাৎ আর কিছু কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছিল। রাজকন্যা সে-দিন তাঁকে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—শুনেছি পেটেল না কি আপনার ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছে?

দীপঙ্কর বলেছিলেন,—হ্যাঁ। আমি ওকে ভারি ভালবেসে ফেলেছি। স্থির করেছি—ওকে বাঙ্গালা দেশে নিয়ে যাবো। আর—আমার ওপর ওর যা ভক্তি—

রাজকন্যা তাতে মুখ টিপে হেসে ব'লেছিলেন,—অতি ভক্তি কিন্তু চোরের লক্ষণ। দেখবেন, শেষে যেন সর্ব্বস্ব চুরি না যায়। ও-লোকটাকে দেখে-অবধি আমার মন কিন্তু বিষিয়ে উঠেছে।—আমার মনে হয়, ওর মতলব ভাল নয়—কখনো ভালো হ'তেও পারে না।

দীপঙ্কর কথাটা এই বলে তখন উড়িয়ে দিয়েছিলেন,—আগে ও যাই থাকুক, এখন কিন্তু ভালোই হয়েছে।

কথাটা কিন্তু রাজকন্যার ভালো লাগেনি, তবুও তিনি এ-কথা নিয়ে দীপঙ্করের সঙ্গে আর কথা-কাটাকাটি করেননি।

এর পরই তোতার দেহের ভেতর ঢুকে দীপঙ্কর হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন, পেটেল তাঁর কেমন প্রিয় ভক্ত, আর রাজকন্যার কথাগুলো কত-বড় সত্য। কিন্তু তখন তাঁর আর প্রতিকারের কোন শক্তিই নেই।

এ-দিকে পেটেল দীপঙ্করের দেহের ভেতর ঢুকে রাজবাড়ীতে এসেও রাজকন্যার সঙ্গে আলাপ করবার একটুও ফুরসৎ পায়নি। তোতার হাঙ্গামায় মাথা তার এমনি

গুলিয়ে গিয়েছিল যে, রাজ্যের সমস্ত তোতা মুঠোর ভেতর না-আনা পর্য্যন্ত তার আর সোয়াস্তি ছিল না। মন্ত্রীরাও তাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত রাজকন্যার ছায়াও যেন মাড়িয়ো না, সে ভারি তুখোড়, যদি কোন রকমে সন্দেহ করে—তা'হলে সবই গুলিয়ে যাবে।

মন্ত্রীদের ইচ্ছা ছিল, তোতা-ধরার ব্যাপারটাও লুকিয়ে রাখবেন, কিন্তু সেটা আর হ'য়ে উঠলো না, এক দিনেই সব জানাজানি হ'য়ে গেল। ঢেঁড়া যখন দিতে হয়েছে, তখন আর কি ক'রে তা চেপে রাখবেন? চার দিক থেকে ব্যাধের দল খাঁচা ভ'রে তোতা নিয়ে আসে, আর গেঁজে ভ'রে টাকা নিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে যায়। ছোট-বড় সকলেই অবাক হ'য়ে ভাবে—হবু-জামাই রাজার এ আবার কি খেয়াল! টাকা অবশ্য রাজার কোষাগার থেকেই এখন দেওয়া হচ্ছে, দীপঙ্কর বলছেন—দেশ থেকে টাকা এলে হিসেব ক'রে সব মিটিয়ে দেবেন। কথাটা রাজার কাণেও গিয়েছে। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, বাঙ্গালী জাতটাই হচ্ছে ভারি খেয়ালী, হাতও এদের খুব দরাজ, তাই এই ছুতো ক'রে টাকা উড়াচ্ছে। শুধু রাজকন্যার মনে ধোঁকা লেগেছে—হঠাৎ এ খেয়াল ওঁর মাথায় কেন ঢুক্‌লো? সে-দিন ত অনেক কথাই হ'ল, কিন্তু তোতার কথা ত মোটেই তোলেন-নি! তবে?

রাজবাড়ীর বাইরের দিকে অমরাবতীর মত একটা সাজানো মহলে দীপঙ্করের থাকবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। চার দিকে কড়া পাহারা, একটি লোকের সেবার জন্য পঞ্চাশ জন লোক যোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক জন ওপরওয়ালা এসে তদারক ক'রে যায়—রাজার সেবার কোন ত্রুটি বা কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে কি না! পেটেল দীপঙ্কর হয়ে ভাবে—কি ছিলুম আর কি হলুম! এখন ভালোয় ভালোয় বিয়েটা হ'য়ে গেলে আর আমার ভাবনা কি?

এ-দিন পেটেলের মনটা বেশ স্ফুর্ত্তিতে ছিল। মন্ত্রীরা এইমাত্র এসে চুপি চুপি ব'লে গেছেন—কাছাকাছি অঞ্চলের বিলকুল তোতাই ধরা পড়েছে, আর রাজ্য জুড়ে যে-রকম ধর-পাকড়ের বেড়াজাল ফেলা হয়েছে, একটি তোতাও বাদ যাবে না। তবুও বিয়েটা না হওয়া পর্য্যন্ত সাবধানে থাকা ভালো।

এই খোস-খবর পেয়ে পেটেল মনে মনে হেসে ভাবতে লাগলো—আর কি, বরাত ত খুলেই গেছে; রাজকন্যার সঙ্গে এ রাজ্য ত অদৃষ্টে নাচছেই, তার ওপরে দীপঙ্করের রাজ্যটা পাওয়া যাবে ফাউ!

এই সময় রাজকন্যা আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকলেন, অমনি ঘরখানা যেন তার রূপের প্রভায় ঝলমল ক'রে উঠলো।

পেটেল প্রথমটা চমকে উঠেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটুকু সামলিয়ে নিয়ে একমুখ হেসে বলে উঠলো,—তবু ভালো, দয়া করে খোঁজ নিতে এসেছেন!

রাজকন্যা ঘরে ঢুকেই এক-দৃষ্টিতে ঘরের মানুষটির পানে তাকিয়েছিলেন। চোখোচোখি হ'তেও তিনি চোখ নামান-নি, ঠায় তাকিয়ে দেখ্‌ছিলেন, সত্যিই মানুষটির মনের কোন অদল-বদল হয়েছে কি না! কিন্তু চেহারায় তেমন-কিছু ধরতে না পারলেও, কথাগুলো ত তাঁর কাণে যেন কেমন-কেমন ঠেক্‌লো। এ-ভাবে রাজা ত কোন দিন তাঁর সঙ্গে কথা কননি! মনের ভাবটুকু মনেই চেপে রাজকন্যা ব'ললেন,—আপনি ত তোতার পেছনই ঘুরছিলেন, আপনার মন কি এখানে ছিল? আচ্ছা, আমাকে বলবেন—নিরীহ তোতা বেচারীদের পেছনে এমন ক'রে লেগেছেন কেন, আর খোলামকুচির মত দু'হাতে টাকা ছড়িয়েই বা কি লাভ?

পেটেল এবার হাসতে হাসতে উত্তর দিলো,—তা বুঝি জানেন না, আমার রাজ্যে তোতার বড় অভাব, আর এটা যেন তোতার রাজত্ব; তাই কতকগুলোকে ধ'রে চালান দিচ্ছি সেখানে। আপনিও ওখানে গিয়ে, ও-রাজ্যের পাখী এ-রাজ্যে যা নেই—মনের সাধে পাঠিয়ে দেবেন। তাতে শোধ-বোধ হ'য়ে যাবে।

রাজকন্যা কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রিয় সখী চপলা চঞ্চলা-চপলার মতই হঠাৎ এমনি ছুটে সেই ঘরে ঢুকলো যে, রাজকন্যার মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেলো।

চপলা একমুখ হেসে বললে, সুখবর এনেছি সখি, তোমার কষ্ট সার্থক হয়েছে, পক্ষিপুরের সদাগর তোমার

সাধের হীরেমন ভেট পাঠিয়েছেন। নিয়ে এসেছেন সদাগর-কন্যা নিজে।

হীরেমনের নামেই রাজকন্যার মনটি বুঝি আহ্লাদে নেচে উঠলো, তাড়াতাড়ি তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সদাগর-কন্যা কোথায়?

চপলা ব'ললে, তুমি এ-মহলে আছো ব'লে তাকে সঙ্গে ক'রেই এনেছি। হুকুম হ'লে এইখানেই আনি।

রাজকন্যা নিজেই দরোজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, পরীর মত সুন্দরী একটি মেয়ে দরোজার পাশ-টিতে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে ঝুলছে সোনার একটি সুন্দর দাঁড়, আর তা'তে ব'সে আছে তাঁর বড় সাধের হীরেমনটি।

রাজকন্যাকে দেখেই পক্ষিরাণী মাথাটি নুইয়ে নমস্কার করলো, রাজকন্যাও হাসিমুখে হাত দু'খানি কপালের দিকে তুলে তাঁকে কাছে টেনে নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হীরেমনও ডানা-দুটো ঝাপটা দিয়ে আহ্লাদে চেঁচিয়ে মানুষের মত ব'লে উঠলো—রাজকন্যা! রাজকন্যা!

রাজকন্যা ত অবাক! পাখীর মুখে এমন স্পষ্ট আর মিষ্ট কথা! তিনি সদাগর-কন্যার হাতখানি ধ'রে ঘরের ভেতর নিয়ে এলেন, তার পর পেটেলের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—দেখুন ত কেমন সুন্দর পাখী! ইনি হচ্ছেন সদাগর চিরঞ্জীলালের মেয়ে, পাখীটি এনেছেন আমার জন্যে।

পক্ষিরাণী এতক্ষণ পাখীর দাঁড়টি ধ'রে রাজকন্যার পিছনে ছিলো, এই সময় মাথাটি নীচু ক'রে রাজকন্যার দিকে চেয়ে ব'ললো,—কথা ছিল, কাল আমরা পাখী নিয়ে আসবো, কিন্তু আপনার হীরেমন আপনাকে দেখবার আগেই 'রাজকন্যা' 'রাজকন্যা' ক'রে এমনি অতিষ্ঠ ক'রে তুললো যে, আজই না এনে পারলুম না। এখন আপনার পাখী আপনি বুঝে নিন: পাখীও বাঁচুক, আমরাও বাঁচি—

কথাটি শেষ ক'রেই পক্ষিরাণী দাঁড়টি রাজকন্যার দিকে এগিয়ে দিতে, তিনি যেমন এসে সেটি হাতে নিলেন, ঠিক সেই সময় পেটেলও এগিয়ে এসে পাখীর দিকে চেয়ে ব'লে উঠলো—বাঃ! দিব্যি পাখী ত!

পেটেলকে দেখে আর তার মুখের এই ক'টি কথা শুনেই হীরেমন যেন একেবারে হন্যে হ'য়ে উঠলো রাগে। চোখ দুটো পাকিয়ে পেটেলের দিকে চেয়ে মানুষের ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো,—বিশ্বাসঘাতক, ফন্দিবাজ, প্রতারক! মার ওকে মার! মার!!

সঙ্গে সঙ্গে ডানা-দুটো মেলে দাঁড়শুদ্ধ পেটেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! রাজকন্যা দু'হাতে দাঁড়টি সজোরে চেপে ধ'রে কোন রকমে সামলিয়ে নিলেন।

এই কাণ্ড দেখে, ঘরে যে ক'টি প্রাণী ছিল, সবাই একেবারে আড়ষ্ট! রাজকন্যা তখনি আড়-চোখে রাজা দীপঙ্করের মূর্ত্তিধারী মানুষটির পানে চাইতেই দেখলেন—তাঁর অমন সুন্দর মুখখানা এক নিমেষে যেন কালো হ'য়ে গেছে!

ঠিক এই সময় বাইরের খাজাঞ্চিখানা থেকে একটি ছোট ছেলে হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘরের ভেতরে ঢুকলো, আর মেঝেয় বিছানো গালিচাখানার ওপর মাথাটি ঠেকিয়ে রাজাকে খবর দিল, একটা ব্যাধ এসে খাজাঞ্চিখানায় ভারী গোল বাধিয়েছে রাজা! মরা একটা তোতা এনে সে তার দাম চাইছে, ব'লছে, নিদেন অর্দ্ধেকও চাই। খাজাঞ্চি-মশাই তাই জানাতে চান—কি করবেন? মরা তোতা কি কেনা হবে?

ছেলেটির মুখের এই খবর শুনেই রাজা দীপঙ্করের দেহধারী মানুষটির ফ্যাকাসে মুখখানা এবার যেন মরা মানুষের মুখের মতই বিবর্ণ হ'য়ে গেল।

এমন সময় চার দিক থেকে শঙ্খ-ঘণ্টা বেজে উঠে গল্পদাদুর শ্রোতাদের মনগুলোও বুঝি মুসড়িয়ে বিশ্রী ক'রে দিলে। গল্পদাদুও অমনি সুর ক'রে ব'ল্‌লেন,—

আমার কথাটি আজ—এখানেই ফুরালো
কালকে শুনো এর পর কাণ্ড কি ঘোরালো!

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কশরতি

রঙ্গমঞ্চে এবং সার্কাসের তাঁবুতে বল, বোতল, ছাতা, টুপি নিয়ে কশরতির কত লীলাই আমরা দেখি! এ কশরতিকে ইংরেজীতে বলে juggling. এই juggling খুব কঠিন ব্যাপার নয়। একটু মন দিয়ে সাধনা করলে

তোমরাও এ কশরতিতে রপ্ত হতে পারো। কি করে', তারি দু'-চারটে ধারা বলছি।

এ কশরতির গোড়ায় balancing বা তাল-রাখা অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রথমে মোটা

লাঠি নিয়ে

একটি বেঁটে লাঠি নিয়ে প্রাকটিশ করো। হাতের চেটোয়—শুধু চেটোয় কেন, হাতের দু'পিঠে এ-লাঠি সিধা খাড়া রেখে তার তাল রক্ষা বা balancing করতে হবে। হাতে [illegible] রপ্ত হলে কপালে বা চিবুকের উপর লাঠি রেখে তাল বজায় রাখা প্রাকটিশ করা কঠিন হবে না। চিবুকে বা কপালে বা নাকের উপর লাঠি রেখে তার তাল বজায় রাখার অভ্যাস-অনুশীলনের সময় দু'-চোখের দৃষ্টি রাখতে হবে ১নং ছবির বিন্দুরেখায়-রচা ঐ লাইনটির অনুসরণ করে' ঠায় এবং ঠিক ঐ লাঠির ডগায়। লাঠি কোন্ দিকে হেলছে-দুলছে, তা প্রত্যক্ষ করে' নিজেও নড়ে-চড়ে কায়দা করে' লাঠির তাল বজায় রেখে লাঠিকে সিধা রাখতে হবে।

এ ব্যাপার অভ্যাস হলে লাঠির বদলে বোতল নাও। বোতলকে সোজা বা উল্টো ভাবে রেখে তার তাল-রক্ষা প্রাকটিশ করো। বোতলের তাল-রক্ষা অভ্যাস হলে বোতলের মুখের দিকটা চিবুকের উপর রেখে বোতলের উল্টো দিকে থালা চাপাবে। এ-থালার সম-তাল রক্ষা করে' থালার উপর আর-একটি বোতল এবং কাচের ক'টি গ্লাস রাখো। অভ্যাসের ফলে বোতলের ও গ্লাসের সম-তাল অনায়াসে রক্ষা করতে সমর্থ হবে। থালার উপর বোতলটি বসাবে থালার ঠিক মাঝখানে। অর্থাৎ উপরের ও নীচের বোতলের তলায়-তলায় যেন ঠিক পিঠোপিঠিভাবে থাকে—২নং ছবির ভঙ্গিতে। গ্লাস-চারটি এমন ভাবে রাখবে যেন গ্লাসগুলির মধ্যে ব্যবধান সমান মাপে থাকে। [illegible]লের মুখের দিকটা ছিপি-আঁটা থাকবে। বোতলের মুখ [illegible] ছিপি উঁচু হয়ে থাকবে না। ছিপি আঁটা হলে কাগজ কেটে সেই কাগজে আঁঠা মাখিয়ে বোতলের গায়ে বোতলটির মুখ থেকে তলা পর্য্যন্ত সে-কাগজ এঁটে দিয়ো। নাহ'লে কাচের বোতল পিছলে পড়ে যেতে পারে। কাগজ আঁটা থাকলে বোতল পিছলে সরে বা পড়ে যাবে না।

বোতলের তলায় তলায়

কাগজের ঠুলি

থালা বোতল ও গ্লাস অভ্যাসের পর ছাতা এবং টুপি নিয়ে অভ্যাস করতে পারো। ছাতাটি মুড়ে নিতে হবে। নাকের উপর ভ্রূর কাছে টুপি এবং টুপির উপর ছাতাটি সরাসরি-ভাবে রেখে ৪নং ছবির

সাগরের ডাক

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভঙ্গীতে অভ্যাস করো। একটি কথা সব-সময় মনে রাখবে, যখনি কোনো জিনিষ কপালে বা চিবুকে বা হাতে রেখে তার balancing রক্ষা করবে, তখনি দু'চোখের দৃষ্টি একাগ্রভাবে সেই দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে। একাগ্র দৃষ্টির সঙ্গে তন্ময়তার প্রয়োজন আছে।

তার পর বল-লোফার কশরতি। এ খেলা সব-চেয়ে মজার। যখন ছাখো, ওস্তাদ খেলোয়াড় একসঙ্গে দু'টি সাতটি আটটি বল নিয়ে দু'হাতে সমানে লোফালুফি করছেন, একটি বলও পড়ে যাচ্ছে না, তখন কতখানি

ছাতা ও টুপি

আশ্চর্য্য বোধ করো, বলো তো! এই বলকে তোমরা কি করে' আয়ত্ত করবে, বলি।

প্রথমে দু'টি বল নিয়ে প্রাকটিশ স্থুরু করো। দু'টি বলই ডান হাতে নেবে। একটি ছুড়ে দাও উপর-দিকে। এমন ভাবে ছুড়তে হবে, বলটি যেন অন্ততঃ পাঁচ ফুট উঁচুতে ওঠে। এ-মাপ আগে থেকে কষে হিসাব করে রাখবে। বল্ পাঁচ ফুটের কম উঠলে চলবে না। কারণ, বলটি একটু উঁচুতে না উঠলে ছোড়বামাত্র নেমে আসবে—দ্বিতীয় বলটি নিক্ষেপ করবার আগেই। এজন্য মাপ যেন পাঁচ ফুটের চেয়ে কম না হয়! অবশ্য অভ্যাস হলে নীচু করে বল ছুড়ে সে-বল লোফা কঠিন হবে না। মাপ-কষার জন্য ফিতা ধরে দেওয়ালে পাঁচ ফুট মাপ কষে পেন্সিলে দাগ কেটে রাখতে পারো। বল যেন সে-দাগ পর্য্যন্ত ওঠে—সে-দিকে লক্ষ্য রাখবে।

একটি বল ছুড়ে উপর-দিকে দেবে—পাঁচ ফুট উর্দ্ধে। এ বলের উপর নজর রাখবে। ছোড়া-বলটি যখন দেখবে নামবার

বলের খেলা

উদ্যোগ করছে, তখন ঠিক সেই-মুহূর্ত্তে অপর বল উপর দিকে ছুড়বে। এটিকেও অন্ততঃ পাঁচ-ফুট উঁচু

একটু ঘুরণ-বেগ দিয়ে

তোলা চাই। তার পর প্রথম বলটি লুফে নিতে হবে। যেমন এ-বল হাতে পড়বে, অমনি এক-সেকেণ্ড বিলম্ব না করে আবার এটিকে উপরে ছোড়ো—ততক্ষণে দ্বিতীয় বলটি নেমে আসবে—সেটিকে লুফে নেবে। বহুবার-অভ্যাসে

ছোড়া ও লোফা এমন সড়গড় হয়ে উঠবে যে, তখন আর ভুল হবার বা হাত থেকে বল ফশ্‌কে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না। চোখ বুজে বল ছুড়তে এবং লুফতে পারবে। দু'টি বলের খেলা বেশ সড়গড় হলে' তিনটি বা চারটি বল নিয়ে অনায়াসে লোফালুফি করতে পারবে।

এবার আর-একটি খেলার কথা বলি। সে-খেলা প্লেট নিয়ে। কাচের প্লেট নিয়ো না—এনামেলের বা এলুমিনিয়ামের

ছড়ি ও প্লেট

প্লেট নিয়ে প্রাকটিশ করবে। তার কারণ, কাচের প্লেট হাত ফশকে মেঝেয় পড়লে ভেঙ্গে চুরমার হবে! তাতে প্রচুর লোকসান হবে। প্লেটের সঙ্গে খাটো মাপের একটি ছড়ি নাও। ছেলেদের যে রঙচঙে ছড়ি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, সেই ছড়ি নাও। একটি এই ছড়ি এবং একটি এনামেলের প্লেট নাও। ডান-হাতে দু'টি ধরো। উপরের ছবির ভঙ্গীতে ধরতে হবে। তার পর হাত তুলে আগের পাতায় ছাপা ছবির ভঙ্গীতে একটু ঘুরণ-বেগ দিয়ে প্লেটখানি উপর-দিকে ছুড়ে দাও। ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়ি-গাছি সিধা-ভাবে ধরবে—প্লেটখানি নীচেয় এসে একদম তোমার এই ছড়ির মুখে পড়বে। ছড়ির যে-দিকটা সরু, সেই দিকে প্লেট পড়া চাই। যেমন পড়া, ছড়িটি অমনি ঘুরুতে থাকবে। প্লেট যে-দিকে ঘুরবে, সেই-দিকে ছড়ি ঘোরাও। প্লেটটি হেলবে, দুলবে,—তার হেলা-দোলার উপর নজর রেখে হাতের ছড়িটিও তারি তালে-তালে হেলাতে দুলোতে পারলে দেখবে, প্লেটখানি ছড়ি থেকে খশে পড়বে না—ছড়ির মুখে প্লেটটি ঘুরবে।

এবারে এই সহজ ধারাগুলির কথা বললুম। দু'তিন মাস এগুলি নিয়ে হাত-মস্কো করো। তার পরে বলবো চার-পাঁচটি বল এবং দু'তিনটি প্লেট ও দড়ির কশরতির কথা! এই juggling-এ বাঙালী ৺সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছড়ির মুখে

এবং ৺কৃষ্ণ বসাক মশায় এক-কালে আশ্চর্য্য পটুতা দেখিয়ে সকলের বিস্ময়-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। ছেলেবেলায় আমরা তাঁদের সে-কশরতি দেখেছি। এ-যুগে juggling-এর দিকে বাঙালীর অনুরাগ দেখি না। দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই! আশা করি, সাধনার বলে বসাক মশায়ের মতো তোমরা এ-খেলায় পারদর্শী হবে।

বিপ্লবী

[গল্প]

১
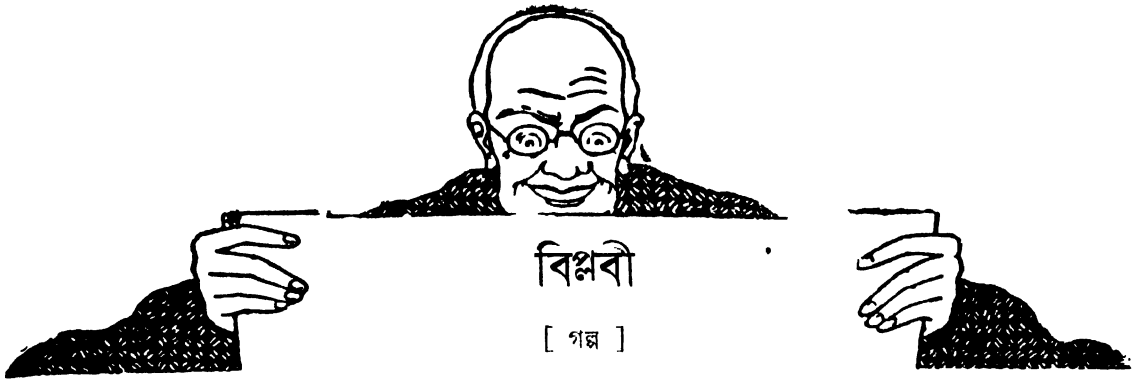
ব্যারিষ্টার অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় ওরফে মিঃ এ, কে, রে, বাল্যকাল হইতে সকল বিষয়েই তাঁহার নামের সার্থকতা সপ্রমাণ করিয়া আসিয়াছেন। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান কৈশোর এবং যৌবনে সামাজিক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অপূর্ব্বত্ব প্রতিপাদন দ্বারা আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদিগকে বিস্মিত করিলেও সে জন্য অল্প লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই।

অপূর্ব্বর এই অপূর্ব্বত্ব প্রথম প্রকাশ পায় স্কুলে ছাত্রাবস্থায়। অপূর্ব্ব তখন নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্র—বালক মাত্র। শিক্ষক মহাশয় সে-দিন ছাত্রদিগকে গণিতে যোগ করিবার কৌশল শিখাইয়া ছাত্রগণকে নিজ নিজ শ্লেটে, চারি পাঁচটা রাশি যোগ করিতে বলিলেন। প্রথম শিক্ষা, প্রায় সকল ছাত্রই যোগ করিতে ভুল করিয়া বসিল; অপূর্ব্ব ভুল না করিলেও অঙ্কটা কষিল উল্টা করিয়া! সে শ্লেটে রাশিগুলি লিখিয়া তাহার নিম্নে রেখা না টানিয়া রাশিগুলির উপরে রেখা টানিয়া তাহারও উপরে যোগফল লিখিয়াছিল। শিক্ষক মহাশয় দেখিলেন যে, অপূর্ব্বর অঙ্ক ভুল হয় নাই, যোগফল ঠিকই হইয়াছে, তবে যোগফলটা নীচে না লিখিয়া উপরে লিখিয়াছে। তিনি অপূর্ব্বকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "যোগফল উপরে লেখে না, নীচে লিখিতে হয়।"

অপূর্ব্ব বলিল, "উপরে লিখলে ভুল হবে কেন সার? আমার ঠিকে ত ভুল হয় নি?"

শিক্ষক বলিলেন "না, তোমার ঠিক নির্ভুল হইয়াছে। কিন্তু যোগফল নীচে না লিখিয়া উপরে লিখিলে কি দোষ হয় জান? উপরে যোগফল লিখিতে গেলে বারংবার হাত লাগিয়া নীচের সংখ্যাগুলি মুছিয়া যাইতে পারে, সেই জন্যই নীচে লিখিলেই কি সুবিধা হয় না?"

শিক্ষকের সুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অপূর্ব্ব বলিল, "তা'হলে নীচেই লিখ্‌ব।" অপূর্ব্বকৃষ্ণ প্রতি বৎসরই পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিত। তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে শিক্ষকের আদেশে ছাত্রদিগকে বাড়ী হইতে ম্যাপ আঁকিয়া লইয়া যাইতে হইত। এক দিন শিক্ষক মহাশয় ছাত্রগণকে বাড়ীতে য়ুরোপের মানচিত্র আঁকিয়া পরদিন স্কুলে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। পরদিন ছাত্রগণ ম্যাপ আঁকিয়া স্কুলে লইয়া গেল; ভুগোল পড়াইবার সময় শিক্ষক মহাশয় ছাত্রগণকে বলিলেন—"হোল্ড্ আপ্ ইয়োর ম্যাপস্"। (তোমাদের ম্যাপ তুলিয়া ধর)।

ছাত্রগণ ম্যাপ তুলিয়া ধরিলে শিক্ষক মহাশয় নিজের আসন হইতে প্রত্যেক ছাত্রের ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অপূর্ব্বকে বলিলেন, "ম্যাপ সোজা করিয়া ধর, তুমি উল্টা করিয়া ধরিয়াছ।"

অপূর্ব্ব বলিল, "না সার্, আমি সোজা করিয়াই ধরিয়াছি।"

শিক্ষক তাহাকে ম্যাপ লইয়া তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলে অপূর্ব্ব ম্যাপ লইয়া তাঁহার নিকটে গেল, এবং তাঁহার সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর নিজের অঙ্কিত ম্যাপখানি রাখিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। শিক্ষক মহাশয় তাহার ম্যাপখানি হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, ম্যাপ অতি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, কিন্তু উল্টা হইয়াছে—অর্থাৎ উত্তর দিক্‌কে নীচের দিকে, এবং দক্ষিণ দিক্‌কে উপর দিকে করিয়া আঁকা হইয়াছে। শিক্ষক বলিলেন, "উল্টা করিয়া আঁকিলে কেন?"

অপূর্ব্ব বলিল, "উল্টা আঁকিব কেন? আমি ঠিকই আঁকিয়াছি।"

"উল্টা নয়? মাথা উপর দিকে থাকে, না নীচের

দিকে থাকে? তুমি নরোয়ে, সুইডেন নীচে আঁকিয়াছ, আর ইটালী, গ্রীসকে উপর দিকে আঁকিয়াছ, উল্টা হয় নাই?"

অপূর্ব্ব বলিল, "বিদ্যা-বুদ্ধি ত মাথাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। য়ুরোপের বিদ্যা-বুদ্ধির আকর গ্রীস, রোম না সুইডেন, নরোয়ে? বাড়ীতে ঠাকুরমা উত্তর দিকে মাথা করিয়া শুইতে বারণ করেন। সকলেই ম্যাপে উত্তর দিক্‌টাকে উপরে করিয়া আঁকে বলিয়া আমাকেও যে তাই আঁকিতে হইবে, তার মানে কি?"

শিক্ষক মহাশয় অপূর্ব্বর সহিত বৃথা তর্ক অনাবশ্যক মনে করিয়া বলিলেন, "তোমার মতে তাহা হইলে পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যোদয় না হইয়া পশ্চিমে উদয় হইবে ত? যাও, পরে যখন ম্যাপ আঁকিবে, তখন উত্তর দিক্‌টাকে উপরে রাখিয়া আঁকিও।"

অপূর্ব্বকৃষ্ণ সুযোগ পাইলেই প্রচলন রীতি ও প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে করিতে অবশেষে রীতিমত সমাজ-দ্রোহী হইয়া উঠিল। তবে তাহার এই একটা গুণ ছিল যে, তাহার কার্য্য যে অন্যায় বা অযৌক্তিক, ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিত, এবং ভবিষ্যতে সেরূপ কার্য্য আর করিত না।

অপূর্ব্বর পিতা সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন পল্লীগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। কলিকাতার কোন সওদাগরী আফিসে মাসিক এক শত কুড়ি টাকা বেতনে চাকরী করিতেন। সংসারে অধিক লোক ছিল না; পত্নী শৈলবালা, বিধবা ভগিনী বিশ্বেশ্বরী এবং একমাত্র পুত্র অপূর্ব্ব—এই তিন জনকে লইয়াই তাঁহার সংসার। গ্রামে কুড়ি-পঁচিশ বিঘা ধান-জমি, তিন-চারি বিঘা বাগান, দুইটা পুষ্করিণী এবং একতলা পাকা বাড়ী, ইহাই ছিল তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি; এই সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও বার্ষিক দুই-তিন শত টাকা উদ্বৃত্ত হইত। এই উদ্বৃত্ত টাকা এবং বেতনের টাকা তিনি ব্যাঙ্কে জমা রাখিতেন। অপূর্ব্ব গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, আফিসের ছোট সাহেবকে ধরিয়া অপূর্ব্বকে নিজের আফিসে একটা চাকরী জুটাইয়া দিবেন, এইরূপই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তাঁহার সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কারণ, অপূর্ব্ব প্রবেশিকা পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পাওয়াতে আফিসের বড় বাবু অপূর্ব্বর পিতাকে বলিলেন, 'ওহে রায়, তোমার অপূর্ব্ব দশ টাকা স্কলার্শিপ পেয়েছে শুনে বড়ই আনন্দ হ'ল। সে যদি দু'কুড়ি সাত রেখে কোন-রকমে পাশ করত, তা'হলে তাকে একটা চাকরীতে ঢুকিয়ে দেওয়া যেত, কেন না, সাধারণ বুদ্ধির ছেলেদের জন্য কলেজে অর্থব্যয় করা বিড়ম্বনা; কেবল পয়সা আর সময় নষ্ট। অপূর্ব্বর মতন বুদ্ধিমান ছেলেদের উচ্চ-শিক্ষা দেওয়াই উচিত, তোমার সংসারে এমন কি অভাব যে, একমাত্র ছেলেকে এরই মধ্যে লেখাপড়া ছাড়িয়ে গোলামিতে জুতে দেবে?"

অপূর্ব্ব কলিকাতায় রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া এফ, এ, পড়িতে লাগিল। দুই বৎসর পরে প্রথম বিভাগে এফ, এ, পাশ করিয়া বি, এ, পড়িতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব্ব এফ, এ, পাশ করিবার পর হইতেই তাহার পিতার নিকট কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের দরবার আরম্ভ হইল; এবং অবশেষে ডাক্তার রামনাথ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা, মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী পঞ্চদশবর্ষীয়া উমার সহিত অপূর্ব্বর বিবাহ হইল। এক বৎসর পরে অপূর্ব্বর বি, এ, পাশের খবর বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাহার পিতৃবিয়োগ হইল। তাহার পিতা দেখিয়া যাইতে পারিলেন না যে, অপূর্ব্ব ইংরাজী সাহিত্যে 'অনার' লইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

২

সে-কালে বি, এ, পাশ করিবার পূর্ব্বেই বি, এল্‌-এর পাঠ আরম্ভ করা চলিত। অনেক মেধাবী ছাত্র এফ, এ, পাশ করিয়া এক সঙ্গেই বি, এ, এবং বি, এল, পড়িত। অপূর্ব্ব বি, এ, পাশ করিবার এক বৎসর পরে এম, এ, এবং বি, এল, পরীক্ষা দিয়া উভয় পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইল। সে সময়ে বি, এ, পরীক্ষার পর দুই বৎসর ধরিয়া এম, এ, পড়িতে হইত না; বি, এ, পাশ করিবার এক বৎসর পরে অনেকেই এম, এ, পরীক্ষা দিত; এমন কি, কোন কোন প্রতিভাশালী ছাত্র বি, এ, পাশ করিবার ছয় মাস পরেই এম, এ, পরীক্ষা দিয়াও তাহাতে উত্তীর্ণ হইত। সে-কালের আর একটা নিয়ম এ-কালে উঠিয়া গিয়াছে—

তাহা একাধিক বিষয়ে 'অনার' লইবার ব্যবস্থা। এ-কালে কোন ছাত্রকে বি, এ, পরীক্ষায় একাধিক বিষয়ে 'অনার' লইতে দেওয়া হয় না, সে-কালে যে কোন ছাত্র বি, এ, পরীক্ষায় দুইটি বা তিনটি বিষয়েও 'অনার' লইতে পারিত। অপূর্ব্ব ইংরেজী সাহিত্যে এবং সংস্কৃতে 'অনার' লইয়াছিল। সে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেও সংস্কৃতে অনারের নম্বর রাখিতে পারিল না। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ মনে করিলেন যে, অপূর্ব্ব যখন ইংরেজী সাহিত্যে 'অনারে' প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন ইংরেজী সাহিত্যেই এম, এ, পরীক্ষা দিবে। কিন্তু অপূর্ব্ব তাহার অপূর্ব্বত্বে সকলকে বিস্মিত করিয়া ইতিহাসে এম, এর জন্য প্রস্তুত হইল, এবং ইতিহাসের এম, এ, পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। সে বি, এল, পরীক্ষাতেও যথাসময়ে প্রথম বিভাগেই উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

বিবাহের পর হইতেই উমার স্কুলে শিক্ষালাভ বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু পাঠ বন্ধ হয় নাই; অপূর্ব্ব তাহাকে ঘরে বসাইয়া ইংরেজী পড়াইতে লাগিল। অপূর্ব্ব কলিকাতায় কলেজে পড়িবার সময় একটা মেসে থাকিত, তাহার পিতা ছিলেন 'ডেলি প্যাসেঞ্জার'। পিতার মৃত্যুর পর অপূর্ব্বকেও বাধ্য হইয়া 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' করিতে হইল; কারণ, বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেহই ছিলেন না। ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া অপূর্ব্ব প্রাতঃকালের ট্রেণে কলিকাতায় গিয়া প্রথমে 'ল' ক্লাসে হাজিরা দিত। দশটার সময় 'ল' ক্লাসের ছুটী হইলে সে পুরাতন মেসে স্নান আহার সারিয়া মধ্যাহ্নকালে এম, এ, ক্লাশে পড়িতে যাইত, এবং অপরাহ্নকালে ট্রেণে বাড়ী ফিরিত। এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের পর সে প্রত্যহ রাত্রিকালে নিয়মিত-ভাবে উমাকে শিক্ষাদান করিত।

উমা মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী, শিব-পূজা, স্তোত্র, বন্দনা প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মে সে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সে 'কলিকাতার মেয়ে' হইলেও হিন্দুধর্ম্মে তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা থাকায় তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী, বিশেষতঃ বিধবা পিস্‌শাশুড়ী বিশ্বেশ্বরী তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। উমা অল্প দিনের মধ্যেই শাশুড়ী এবং পিস্‌শাশুড়ীর নিকট শিক্ষা পাইয়া সাংসারিক কাজ-কর্ম্মে, বিশেষতঃ রন্ধন-বিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিল। পিতা প্রতিমাসে কলিকাতায় ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতেন, অপূর্ব্ব ইহা জানিত, কিন্তু ব্যাঙ্কে কত টাকা জমিয়াছিল তাহা সে জানিত না; তাহার ধারণা ছিল, যদি খুব-বেশী হয় ত সেই সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ পনের-ষোল হাজার টাকা হইতে পারে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর অপূর্ব্ব ব্যাঙ্কের হিসাব-বহি দেখিয়া জানিতে পারিল, ব্যাঙ্কে চব্বিশ হাজার টাকারও অধিক জমা আছে। ইহার উপর অপূর্ব্বের পিতা দশ হাজার টাকার জীবন-বীমা করিয়াছিলেন, সেই দশ হাজার টাকাও তুলিয়া লইয়া অপূর্ব্ব ব্যাঙ্কে জমা রাখিল।

অপূর্ব্ব আইন-পরীক্ষায় পাশ করিলে সকলে মনে করিল যে, অপূর্ব্ব এইবার ওকালতী করিবে, কিন্তু অপূর্ব্বের সে-দিকে আগ্রহ ছিল না। অবশেষে এক দিন সকলে শুনিয়া বিস্মিত হইল যে, অপূর্ব্ব বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে! অপূর্ব্বের বাল্যবন্ধু এবং আত্মীয় হরমোহনের কাছে অপূর্ব্ব তাহার এই সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিলে হরমোহন বলিল, "বি, এ, পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম হইয়াও এম-এ-তে ইতিহাস লইলে; এখন বিলাতে গিয়া গণিত-চর্চ্চা করিয়া 'র‍্যাংলার' হইবে, না ডাক্তারি পাশ করিয়া দেশে আসিয়া স্কুল-মাষ্টারিতে ভিড়িয়া যাইবে?"

অপূর্ব্ব হাসিয়া বলিল, "তোমার অনুমান ঠিক হইল না, আমি ব্যারিষ্টারি পড়িতে যাইব। তবে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া স্কুল-মাষ্টারি করিব, কি, ষ্টেশন-মাষ্টারি করিব, তাহা এখনও স্থির করি নাই। হয় ত দুইটার একটাও না করিয়া ঘরে বসিয়া চাষ-আবাদ করিব।"

"সংসারের কি ব্যবস্থা করিবে?"

"সংসারে ত মা আর পিসি-মা। দুই জন বিধবার সংসারই বা কি, আর তার ব্যবস্থাই বা কি?"

"উমা কি বাপের বাড়ীতে থাকিবে?"

"তাহাকে লইয়া যাইব।"

"এ্যাঁ, বল কি! উমাকে বিলাতে লইয়া যাইবে? সে মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী, সে প্রতিদিন সকালে শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করে না, সে জাত খোয়াইতে তোমার সঙ্গে বিলাতে যাইবে?"

"উমা মহাকালী পাঠশালার ছাত্রী বলিয়াই সে আমার

সঙ্গে যাইবে। সে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়াছে, রাম-সীতা, নল-দময়ন্তী, শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী সে জানে। আর শিবপূজা? পতিদেবতার পূজাতেই সকল দেবতার পূজা হয়, এ শিক্ষা উমা মহাকালী পাঠশালাতেই পাইয়াছে; সুতরাং পূজা-অর্চ্চনায় তাহার কোন বাধা হইবে না।"

"তোমার মা, পিসিমা আপত্তি করিবেন না?"

"মা আপত্তি করিবেন না; পিসিমা হয় ত করিবেন, সে আপত্তি কাটাইয়া দিতে পারিব।"

"তাঁহাদিগকে দেখাশুনা করিবে কে?"

"তুমি।"

অপূর্ব্বর শ্বশুরবাড়ী হইতে একটু আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু সে আপত্তি তেমন অকাট্য নহে। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "তুমি যাইতে চাও, আপত্তি নাই; কিন্তু উমাকে লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? অনর্থক তোমায় দ্বিগুণ খরচ হইবে, আর তাহাকে লইয়া যাইলে তোমার পড়াশুনারও ব্যাঘাত হইতে পারে।"

অপূর্ব্ব বলিল, "না, তা হইবে না।"

ব্যাঘাত হইবে না, অপূর্ব্বর শ্বশুরও তাহা জানিতেন। ব্যাঘাত হইলে, অপূর্ব্ব এম, এ, এবং বি, এল,—ও-ভাবে পাশ করিতে পারিত না।

বিলাত-যাত্রার দিন, ডাক্তার বাবু কন্যা-জামাতাকে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণে তুলিয়া দিতে গিয়া দেখিলেন, অপূর্ব্ব ধুতি ও পাঞ্জাবী পরিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, "প্যাণ্ট-কোট ছাড়িলে কেন?"

অপূর্ব্ব বলিল "ছাড়ি নাই, আছে; যখন নিতান্ত দরকার মনে হইবে, তখন বাহির করিব।"

প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, বিদায়-গ্রহণের পর অপূর্ব্ব সস্ত্রীক বোম্বাই যাত্রা করিল।

৩

ডাক্তার রামনাথ চক্রবর্ত্তীর দুই কন্যা—রমা ও উমা, তাঁহার অন্য কোন সন্তান ছিল না। জ্যেষ্ঠা কন্যা রমার স্বামী প্রভাতকুমারও ডাক্তার, ডাক্তার শ্বশুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ডাক্তারীতে ইদানীং তাঁহার কিছু পশার হইয়াছিল। চাল-চলন ও বেশভূষায় প্রভাতকুমার ষোল আনার উপর আঠার আনা 'সাহেব'! ডাক্তারি পাশ করিবার পর হইতেই প্রভাতকুমার 'ডাক্তার সাহেব' বনিয়া গিয়াছিলেন, বাড়ীতেও ঢিলা পায়জামা পরিয়া থাকিতেন, বাটীর পুরাতন ভৃত্য জগন্নাথকে কখন "বেয়ারা" কখন "বয়" বলিয়া ডাকিতেন। টেবিল-চেয়ার এবং কাঁটা-চামচে ব্যবহার না করিলে ভাত খাইয়া তাহার তৃপ্তি হইত না! তাঁহার শিশু পুত্রের লালন-পালনের জন্য পাড়ার প্রৌঢ়া হরিদাসীকে দাসী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সে জাতিতে কামার; রমা তাহাকে "কামার-বৌ" বলিয়া ডাকিলেও 'ডাক্তার সাহেব' তাহাকে "আয়া" বলিয়া ডাকিতেন, এবং জগন্নাথ ও হরিদাসীর সঙ্গে বাঙ্গালা-মিশানো হিন্দীতে কথা কহিতেন। সেই জন্য তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর সকলে তাঁহাকে "গোরা জামাই" বলিতেন। রামনাথ বাবুর স্ত্রী এক দিন কথায় কথায় স্বামীকে বলিয়াছিলেন, "আমাদের প্রভাত বিলেত না গিয়েই ত পুরো সাহেব, অপূর্ব্ব বিলেত থেকে কি মূর্ত্তি ধ'রে দেশে ফিরবে, তা কে জানে? হয় ত ফিরে এ'সে আমার সঙ্গেও ইংরিজীতে আলাপ করবে!"

রামনাথ বাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "ফোঁপ্‌রা ঢেঁকিরই আওয়াজ বেশী! অপূর্ব্ব ফোঁপ্‌রা নয়, তার ভিতর সার আছে।"

অপূর্ব্ব বিলাত যাইবার পথে বোম্বাই, এডেন, সুয়েজ, ব্রিণ্ডিসি প্রভৃতি বন্দর হইতে শ্বশুর মহাশয়কে এবং দেশে জননী ও হরমোহনকে পত্র লিখিয়াছিল। তাহার পর লণ্ডনে অবস্থানকালে প্রতি সপ্তাহেই পত্র লিখিত; সকল পত্রই সে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত; এমন কি, পত্রের ঠিকানাতেও সে "বেঙ্গল" ও "ইণ্ডিয়া" এই দুইটি শব্দ ভিন্ন শিরোনামায় ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিত না। শ্বশুরের পত্রের লেফাপার উপর লিখিত—"পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীচরণেষু—" পত্রের ভিতরে পাঠ লিখিত—"শতকোটি প্রণাম পুরঃসর শ্রীচরণে নিবেদন"—এবং পত্রের শেষে "সেবক" লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিত।

লণ্ডন হইতে প্রথম তিন চারি মাস অপূর্ব্বই পত্র দিয়াছিল; তাহার পত্রের মধ্যে উমাও পত্র দিত। শেষে উমাই অধিকাংশ পত্র লিখিত, অপূর্ব্ব কখন কখন লিখিত।

হরমোহনকে অপূর্ব্বই পত্র লিখিত। উমার পত্রে তাহার জননী এবং শাশুড়ী জানিতে পারিলেন যে, উমা সেখানে সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। মিসেস্ হপ্‌কিন্স নাম্নী এক প্রৌঢ়া ইংরেজ মহিলার বাড়ীতে অপূর্ব্ব তিনখানি ঘর ভাড়া লইয়াছে; একখানি শয়ন-কক্ষ, একখানি বসিবার ঘর বা বৈঠকখানা, আর একখানি রন্ধন, ভাণ্ডার, এবং ভোজন-কক্ষ। উমাই দুই বেলা রন্ধন করে, ঘুঁটে কয়লার হাঙ্গামা নাই, ইলেকট্রিক-ষ্টোভে রন্ধন হয়। মিসেস্ হপ্‌কিন্স বিবাহের পর প্রায় পনের বৎসর স্বামীর সহিত ভারতবর্ষে কাটাইয়া গিয়াছেন; তাঁহার স্বামী ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-আফিসে কার্য্য করিতেন। মিসেস্ হপ্‌কিন্সের একমাত্র কন্যা ডোরথি কলিকাতাতেই জন্মিয়াছিল। ডোরথি উমার অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড়। মাতা-পুত্রী উভয়েই চলনসই হিন্দী ও বাঙ্গালা জানেন। তাঁহারা বাঙ্গালা কথা বেশ বুঝিতে পারেন, তবে কথা কহিবার সময় আধা-হিন্দি আধা-বাঙ্গালায় কথা কহিতেন। ডোরথি অল্প দিনের মধ্যেই স্নেহ, যত্ন ও ভালবাসায় প্রবাসী তরুণ-দম্পতীর একান্ত আত্মীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। উমা ডোরথির নিকট কয়েক প্রকার ইংরেজী 'ডিস্' প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল; ডোরথিও উমার নিকট হইতে খিচুড়ি, পোলাও, সিঙ্গাড়া, কচুরি, নিম্‌কি ও কয়েক প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে। বিলাতে বেগুন, পটোল, ঝিঙ্গা, উচ্ছে পাওয়া না গেলেও, আলু, কপি, কড়াইসুঁটি, মাছ ও মেষ মাংসের অভাব নাই; ছাগ-মাংস সব সময় পাওয়া যায় না। প্রচুর মাখন পাওয়া যায়। উমা মাখন গলাইয়া ঘি করিত। বিলাত যাইবার সময় উমা যথেষ্ট পরিমাণে হলুদ, লঙ্কা, জিরা, মরিচ, তেজপাতা প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল; বিলাতে গিয়া দেখিল, সেখানেও কয়েকপ্রকার মশলা কিনিতে পাওয়া যায়। উমা প্রত্যহ ডোরথির সঙ্গে বাজার করিতে যাইত।

অপূর্ব্ব কলিকাতায় তাহার পরিচিত বিলাতফেরতা-দের মুখে শুনিয়াছিল, বিলাতে এক জন লোকের পক্ষে মাসিক দুই শত টাকার কমে থাকা ও খাওয়া চলে না। সেই জন্য সে মনে করিয়াছিল, দুই জনের তিন বৎসর বিলাতে থাকিতে প্রায় পনের হাজার টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু উমা স্বয়ং রন্ধনের ভার গ্রহণ করায় সেখানে তাহা-দের দুইজনের ঘরভাড়া সমেত মাসে তিন শত টাকার অধিক খরচ হইত না।

অপূর্ব্ব বোম্বাইয়ে ষ্টীমারের আরোহী হইয়া দেখিতে পাইল, সেই ষ্টীমারে দুই জন বর্ম্মি যুবকও উচ্চশিক্ষার জন্য য়ুরোপে যাইতেছে; তাহাদের পরিধানে জাতীয় পরিচ্ছদ ছিল। অপূর্ব্ব স্থির করিল, একান্ত আবশ্যক না হইলে সে তাহার দেশীয় পরিচ্ছদ—ধুতি-পাঞ্জাবী ব্যবহার ত্যাগ করিবে না। ষ্টীমারের খানসামা তাহাকে জানাইল, ডিনার-টেবিলে সাহেবলোকের সঙ্গে খাইবার সময় সাহেবী পোষাক পরিতে হইবে; তবে তাঁহার স্ত্রী শাড়ী পরিয়াই ডিনার-টেবিলে বসিতে পারেন! অপূর্ব্ব বলিল, "আমরা ডিনার-টেবিলে খাইব না, আমার সঙ্গে ষ্টোভ আছে, আমাদের খানা আমরাই বানাইয়া লইব; তুমি চা, দুধ ও ফলমূল আমাদের কেবিনে দিয়া যাইও।"

বিলাতে গিয়াও অপূর্ব্ব ধুতি ছাড়িল না; সে ধুতির ভিতরে গেঞ্জির ট্রাউজার ব্যবহার করিত। যখন কলেজের ভোজে বা কোন ভোজ-সভায় যাইত, তখন বাধ্য হইয়া প্যাণ্ট-কোট পরিতে হইত, কিন্তু হ্যাট মাথায় না দিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিত। এক দিন তাহার এক ইংরেজ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, "বাঙ্গালীরা কি দেশে এইরূপ মস্তকা-বরণ ব্যবহার করে?" অপূর্ব্ব বলিল, "বাঙ্গালীরা কোন-রূপ মস্তকাবরণ ব্যবহার করে না। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লোক পাগড়ী ব্যবহার করে। আমার মাথায় পাগড়ী দেখিলে লোকে আমাকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে না পারিলেও ভারতীয় বলিয়া চিনিতে পারিবে; আমাকে দেখিয়া কেহ অ-ভারতীয় বলিয়া মনে করিবে না। আমি অগ্রে ভারতীয়, তাহার পর বাঙ্গালী।"

লণ্ডনে এক বৎসর অবস্থানের পর এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব উপায়ে অপূর্ব্বর কিছু কিছু অর্থাগম হইতে লাগিল। একটা ভোজ-সভাতে মিঃ উইলিয়াম ডেভিড নামক কোন ইংরেজের সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হইল। সে-দিন সেই সভায় প্রাচ্য দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল। এক জন প্রৌঢ় ইংরেজ কোন কোন ভারতীয় প্রথার নিন্দা করায় অপূর্ব্ব অতি

ধীর ভাবে বিচক্ষণতার সহিত তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিলে সকলে অপূর্ব্বর যুক্তিসঙ্গত উক্তির সারবত্তা স্বীকার করিলেন। মিঃ ডেভিড অপূর্ব্বকে বলিলেন, "আমি 'লণ্ডন-ভয়েস' সংবাদপত্রের পরিচালক। আপনি আমাদের কাগজে আপনাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে এ-দেশের লোক আপনাদের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারে। আপনার প্রবন্ধ পাইলে আমি আনন্দ লাভ করিব।"

অপূর্ব্ব দুই-তিন দিন পরে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সেই সংবাদপত্রের আফিসে পাঠাইয়া দিল। দুই দিন পরে সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল; অপূর্ব্ব পারিশ্রমিকস্বরূপ একখানা পাঁচ পাউণ্ড বা প্রায় সত্তর টাকার চেক পাইল। এইরূপে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া মাসে তাহার কুড়ি পঁচিশ পাউণ্ড আয় হইতে লাগিল।

যে উদ্দেশ্যে অপূর্ব্ব বিলাতে গিয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যের প্রতি তাহার লক্ষ্য স্থির ছিল; তিন বৎসর বিলাতে থাকিয়া অপূর্ব্ব ব্যারিষ্টার তালিকাভুক্ত হইল। লণ্ডনে দেড় বৎসর অবস্থানের পর উমার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে অপূর্ব্ব সস্ত্রীক হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, জার্ম্মাণী, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে মাস-ছয়েক বেড়াইয়া ফ্রান্সের মার্শেই বন্দরে ভারতগামী ষ্টীমারে আরোহণ করিল। সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সে যে টাকা পাইয়াছিল, সেই টাকাতেই তাহাদের য়ুরোপ ভ্রমণের খরচ কুলাইয়া গেল।

৪

ডাক্তার প্রভাতকুমার প্রাতঃকালে সংবাদপত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মধ্যে মধ্যে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার "বয়" জগন্নাথ একটা ট্রের উপর এক-খানা পত্রসহ সেই কক্ষে আসিয়া ডাক্তার সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল; ডাক্তার সাহেব পত্রখানি লইয়া খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার শ্বশুর ডাক্তার চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"এইমাত্র তার পাইলাম, অপূর্ব্ব ও উমা আজ সাড়ে-ন'টার সময় হাওড়ায় পৌঁছিবে। আমি তোমার শাশুড়ীকে লইয়া ষ্টেশনে যাইতেছি। তুমিও রমাকে লইয়া ষ্টেশনে যাইলে ভাল হয়। আজ তোমরা দুই জনে মধ্যাহ্নে আমার এখানেই আহার করিবে।"

শ্বশুরের পত্র পাইয়া প্রভাতকুমার রমা এবং পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র প্রদোষকে লইয়া হাওড়া-ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ডাক্তার চক্রবর্ত্তী সস্ত্রীক প্ল্যাটফরমে আসিয়া ট্রেণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের এগার মিনিট পরে ট্রেণ হাঁপাইতে-হাঁপাইতে প্ল্যাট্ফর্ম্মে প্রবেশ করিতেই ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর দল গাড়ীর নিকট গিয়া দেখিলেন,—ধুতি, পাঞ্জাবী, চটি-জুতাপরিহিত অপূর্ব্বকৃষ্ণ তাহাদের কামরা হইতে প্ল্যাটফর্ম্মে অবতরণ করিল। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীও কল্পনা করেন নাই যে, বিলাত হইতে সদ্য-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার অপূর্ব্বকৃষ্ণকে জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিবেন। অপূর্ব্বর পশ্চাতে উমাও খোকাকে কোলে লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আসিল। উমার পরিধানে একখানা লালপাড় সাদা সাড়ী, অলক্তক-রঞ্জিত পদে স্যাণ্ডেল, সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর-রেখা শোভা পাইতেছে। অপূর্ব্ব শ্বশুর ও শাশুড়ীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রভাতকুমার অপূর্ব্বর সহিত 'শেকহাণ্ড' করিবার জন্য হাসিমুখে অগ্রসর হইলে অপূর্ব্ব সহাস্যে বলিল, "দাদা, বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, আমি বাঙ্গালী। আমি কিন্তু ভুলি নাই যে, আপনারা আমার প্রণম্য।"—বলিয়াই সে প্রভাতকে ও রমাকে প্রণাম করিল।

ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর পত্নী উমার ক্রোড় হইতে খোকাকে কোলে লইয়া উমাকে বলিলেন, "উমা, তোর খোকা হয়েছে, আমাদিগকে ত তা লিখিস্ নি? কদ্দিনের হ'ল?"

উমা হাসিয়া বলিল, "দেড় বছরের।"

অপূর্ব্ব বলিল "আমি খবর দিতে চেয়েছিলেম; উমাই বারণ করেছিল। আমার মা এ খবর জানেন; তাঁকে শুভ অশৌচ পালন করতে হ'য়েছিল কি না?"

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী তাঁহার সরকারকে বলিলেন, "তুমি অপূর্ব্বর জিনিষপত্রগুলা লইয়া একখানা ট্যাক্সি করিয়া এস, আমরা আগেই যাই।"

অপূর্ব্ব বলিল, "সরকার মশাই, এই তিনটা ট্রাঙ্ক আপনি লইয়া যান; বাকীগুলা" 'লেফ্‌ট্ লগেজ' আফিসে জমা ক'রে দিন। আমি বৈকালের ট্রেণে বাড়ী যাব।"

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী বলিলেন "ট্রেণে যাবে কেন? আমার বড় মোটরখানা নিয়ে যেয়ো, এখানে আর জিনিষ-পত্র রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।"

সকলে ষ্টেশন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

* * * *

তের বৎসর পরের কথা।

বালিগঞ্জে লেকের ধারে, একটি সুন্দর অনতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকায় সন্ধ্যার পর সহসা লাল, নীল, পীত, সবুজ প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের তাড়িতালোকমালা জ্বলিয়া উঠিল। অট্টালিকার সম্মুখস্থ পথের এক পার্শ্বে চল্লিশ-পঞ্চাশখানা ছোট, বড়, বিবিধ গঠনের মোটর-গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।—গৃহস্বামী ব্যারিষ্টার এ. কে. রে সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অনিলকুমার রায়ের উপনয়ন উপলক্ষে আজ প্রীতিভোজ।

এই তের বৎসরে ইঁহাদের সংসারের বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ডাক্তার চক্রবর্ত্তী প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার উইলে বড় জামাতা প্রভাতকুমারকে তিনি তাঁহার বসত-বাড়ী, এবং কনিষ্ঠ জামাতা অপূর্ব্বকে নগদ চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই টাকাতে অপূর্ব্ব বালিগঞ্জে জমি কিনিয়া নিজ ব্যয়ে তাহার উপর এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অপূর্ব্বর পিসি-মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবীরও ৺গঙ্গালাভ হইয়াছিল। অপূর্ব্বর জননী একাকিনী দেশের বাড়ীতেই বাস করিতেন; অপূর্ব্ব প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে সপরিবারে জননীর নিকটে গিয়া সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেন; মোটর-গাড়ীতে যাইতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিত। অনিলকৃষ্ণের উপনয়ন গ্রামস্থ বাড়ীতেই হইয়াছিল, এবং যথোচিত সমারোহে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়-কুটুম্বগণের ভোজ হইয়াছিল। অতঃপর বন্ধু-বান্ধবগণের জন্য কলিকাতার বাড়ীতে প্রীতিভোজের আয়োজন হইয়াছিল। পৌত্রের উপনয়নের পর অপূর্ব্বর জননীও কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া পাঁচ-সাত দিন বাস করিতেন।

অপূর্ব্বকৃষ্ণের বন্ধুরা সকলেই সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের অধিকাংশই ব্যারিষ্টার, কয়েক জন ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারও ছিলেন। বলা বাহুল্য, পুরুষরা সকলেই নৈশভোজের পরিচ্ছদ—প্যাণ্ট-কোট প্রভৃতি পরিহিত; আর মহিলারা সকলে শাড়ী পরিয়াই আসিয়াছিলেন। একতলার দুইটি পাশাপাশি বড় হলে নিমন্ত্রিত পুরুষ ও মহিলারা সমবেত হইয়া গান, গল্প, হাস্য, কৌতুক প্রভৃতিতে রত ছিলেন। অপূর্ব্বর বন্ধু ও বান্ধবীরা তাঁহার পুত্র নবীন ব্রহ্মচারী অনিলকৃষ্ণের জন্য পুস্তক, খেলনা, আংটি প্রভৃতি নানা প্রকার উপহার আনিয়াছিলেন; সেগুলি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উমা আগন্তুক মহিলাগণের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন। রমা মাঝে মাঝে আসিয়া উমার সহিত দুই-একটা কথা কহিতেছিলেন।

রাত্রি নয়টার পর রমা আসিয়া উমাকে বলিলেন, "উমা, তোমার শাশুড়ী তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

কথাটা প্রায় সকলেরই কর্ণগোচর হইল। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "চলুন, আমরা সকলে গিয়ে মাকে নমস্কার করে আসি।"—অপূর্ব্ব তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিলেন, "আসুন, আমরা এই দিক দিয়ে উপরে যাই।"

রমা ও উমা মহিলাদিগকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে, এবং অপূর্ব্ব নিমন্ত্রিত পুরুষদিগকে লইয়া অন্য দ্বার দিয়া অগ্রসর হইলেন।

৩

উমা মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির হাত ধরিয়া অন্তঃপুরের সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতেছিলেন; তাঁহাদের পশ্চাতে মিসেস্ মিটার, মিসেস্ স্যাণ্ডেল, মিসেস্ ডাউস্, মিসেস্ সিন্হা, মিসেস্ ডাট্, মিসেস্ রেকিট্ প্রভৃতি মহিলারা উপরে উঠিতে লাগিলেন। সিঁড়ি হইতে শাশুড়ীকে দেখিতে পাইয়া উমা বলিলেন, "মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি, উনি আমার শাশুড়ী, আর ওঁর ডান দিকে আমার মা।"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি দেখিলেন, সিঁড়ির উপরে, দীর্ঘাঙ্গী, উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, ঈষৎ স্থূল, প্রায় ষাট বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই বৃদ্ধার অলোক-সামান্য লাবণ্যদর্শনে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। প্রৌঢ়ার পরিধানে সাদা থান-ধুতি, মাথার চুল পুরুষের মত ছোট করিয়া ছাঁটা। তাঁহার পার্শ্বে উমার

মাকে যেন কতকটা নিষ্প্রভ দেখাইতেছিল, অথচ সুরূপা তিনিও বড় কম ছিলেন না। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি সিঁড়িতে উঠিবার সময় মনে করিয়াছিলেন যে, উমার শাশুড়ীকে করযোড়ে ললাট স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিবেন; কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া পড়িল। তিনি সেই মহিমময়ী প্রাচীনার চরণ স্পর্শ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উমার জননীকেও সেইভাবেই প্রণাম করিলেন। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জিই ছিলেন মহিলাগণের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা, নেতৃস্থানীয়া; বিশেষতঃ, তিনি একবার স্বামীর সঙ্গে য়ুরোপে গিয়া প্রায় ছয় মাস কাটাইয়া আসিয়াছিলেন। এ-হেন মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি অপূর্ব্বর জননী ও শাশুড়ীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে, তাঁহার অনুগামিনী অন্যান্য মহিলাকেও অগত্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে হইল। উমা প্রত্যেক বান্ধবীকে শাশুড়ী ও জননীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে তাঁহারা প্রত্যেক তরুণীর চিবুক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। নিম্নতলে, পুরুষদিগের সম্মুখেও যে সকল মহিলা অবাধে চপলতা প্রকাশ করিতেছিলেন, অপূর্ব্বর জননীর সম্মুখে তাঁহাদের সেই চপলতা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল, প্রণাম করিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অপূর্ব্বর জননী উমাকে বলিলেন, "বৌমা তোমার বান্ধবীদের খাবার জায়গায় নিয়ে যাও; খাবার দেওয়া হয়েছে।"

ভোজন-কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি দেখিলেন, কক্ষমধ্যে দুই সারিতে প্রায় চল্লিশখানা পুরু গালিচার আসন পাতা; প্রত্যেক আসনের সম্মুখে কাঁসার থালাতে পোলাও এবং লুচি, ছোট-বড় বিবিধ বাটীতে নানা প্রকার ব্যঞ্জন, গ্ল্যাসে সুবাসিত পানীয় জল। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির দল, নৈশভোজে চেয়ারে বসিয়া টেবিলস্থিত চিনামাটির প্লেটে খানা খাইতেই অভ্যস্তা, এখানে আসনের ব্যবস্থা দেখিয়া অগত্যা তাঁহাদিগকে ঘরের বাহিরে স্যাণ্ডেল খুলিয়া রাখিয়া আসনে উপবেশন করিতে হইল। উমা তাঁহাদের সহিত উপবেশন করিলেন না দেখিয়া মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "মিসেস্ রে, আপনিও বসুন।"

উমা বলিলেন, "আপনারা আজ নিমন্ত্রিত, আপনাদের ভোজনের পর আমি বসিব। নিমন্ত্রিতদিগের ভোজনের পূর্ব্বে বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণীকে ভোজন করিতে নাই।"

তাঁহার শাশুড়ী বলিলেন, "সে কথা সত্য, কিন্তু আজ তুমি ত গৃহিণী নও, আমিই যে গৃহিণী। আমি যখন এখানে না থাকব, তখন তুমি গিন্নীপনা করিও, এখন উঁহাদের সঙ্গেই বসিয়া খাও মা! তোমার মা আছেন, রমা আছেন, আমি আছি, আমরা পরিবেশন করিব।"

মিসেস্ স্যাণ্ডেল বলিলেন, "পরিবেশন আপনারা করিবেন?"

গৃহিণী সহাস্যে বলিলেন, "তোমরা আমোদ ক'রে খাবে ব'লে আমরা দুই বেয়ানে রাঁধলেম, এখন আবার পরিবেশন করতে ডাকতে যাব কাকে মা।"

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি মোচার ঘণ্ট মুখে দিয়া বলিলেন, "আপনারা এমন চমৎকার রেঁধেছেন! এ যেন অমৃত, এমন রান্না অনেক দিন খাইনি।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "মা-মাসীর হাতের রান্না অমৃত হবে না ত কি উড়ে-ঠাকুরের আর বাবুর্চ্চির হাতের রান্না অমৃতের মতন হবে?—স্বামি-পুত্রের জন্য নিজের হাতে রেঁধে নিজে পরিবেশন ক'রে খাওয়ানোতে যেমন তৃপ্তি, পরকে দিয়ে রাঁধিয়ে, বাইরের লোক দিয়ে পরিবেশন করিয়ে স্বামি-পুত্রকে খাওয়ালে কি তেমন তৃপ্তি পাওয়া যায় মা?"

মিসেস্ ডাট্ বলিলেন, "আমরা ত খেতে বসলেম, পুরুষরা কখন খাবেন?"

গৃহিণী বলিলেন, "তাঁরা দক্ষিণ দিকের হলে খেতে বসেছেন। তাঁরা সব সাহেবী পোষাকে এসেছেন, টেবিল-চেয়ার না হ'লে তাঁদের ব'সবার সুবিধা হবে না ত, তাই তাঁদের জন্যে টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করেছি! তোমরা মা সব বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মী, তোমরা কি দুঃখে ভাঁড়ে ব'সে খাবে? উমার মুখে শুনেছি—ওঁরা যখন বিলেতে ছিলেন, তখনও ওঁরা দু'জনে আসন-পেতেই খেতে বসতেন। যাঁর বাড়ীতে ওঁরা বাসা নিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ে তাই দেখে এক দিন জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, 'তোমরা চেয়ারে ব'সে টেবিলে খাও না কেন?' উত্তরে অপূর্ব্ব বলেছিলেন, 'আমরা বাঙ্গালী, এজন্য বাঙ্গালীর মত আসনে-ব'সে খাই। আমি ত অল্প দিনের জন্য আপনাদের দেশে এসেছি,

আপনার মা ত বছর-পনের আমাদের বাঙ্গালা দেশে ছিলেন, আপনিও বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়ে চোদ্দ-পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মাটীতেই মানুষ হ'য়েছিলেন, আপনি কি বাঙ্গালীর মেয়ের মত ঘরের মেঝেতে আসন-পেতে ব'সে থাবায় থাবায় খানা খান্?' তাই শু'নে তাঁরা মায়ে-ঝিয়ে ভারি খুসি হয়েছিলেন; উমাদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা আরও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তোমরা বোধ হয় গল্প শুনে থাকবে যে, অপূর্ব্ব ষ্টীমারে ধুতি প'রে থাকতেন, বিলেতেও তিনি বেশী সময়েই ধুতি পরতেন। প্রথম প্রথম সেখানকার লোক তাঁকে ধুতি প'রতে দেখে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকত, অনেকে ঠাট্টা-তামাসাও ক'রত; অপূর্ব্ব তা গ্রাহ্যও করতেন না। ব'লতে লজ্জা হয়, যারা ঠাট্টা তামাসা ক'রত, তাদের বেশীর ভাগ আমাদেরই বাঙ্গালার লোক! এখানে ত অপূর্ব্ব কেবল হাইকোর্টে যাবার সময় সাহেবী পোষাকে যান, আর সব-সময় ধুতি-জামা প'রে থাকেন।"

উমার মা বলিলেন, "অপূর্ব্বর ধুতি-পরা দেখে আমার বড় জামাই প্রভাতও ধুতি আর পাঞ্জাবী প'রতে ধরেছেন।"

মিসেস্ ভউস্ বলিলেন, "সেই জন্যই ওঁরা সকলে মিষ্টার রায়কে বল্লেন বিপ্লবী।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "যে পুরাতন সমাজ ভেঙ্গে সম্পূর্ণ নূতন একটা বিদেশী সমাজ গড়তে চায়—সে বিপ্লবী, না, যে পুরণো সমাজ বজায় রেখে তার দোষ সংশোধন করতে চায়—সে বিপ্লবী? আমরা সেকেলে লোক মা, আমাদের চোখে ওটা ঠিক উল্টো দেখায়।"

বিদায়-গ্রহণ কালে নিমন্ত্রিতা মহিলারা পুনরায় অপূর্ব্বর জননী ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে অপূর্ব্বর জননী বলিলেন,—

"আশীর্ব্বাদ করি—ঈশ্বর তোমাদিগকে বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মী করুন! স্বামি-সোহাগিনী হও, স্বামীর সহ-অধর্ম্মিণী না হ'য়ে প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হও। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

লাভালাভ

আজিকে হাটের ঘাটে জীবনের করিতে হিসাব,
সন্ধ্যাতারা পানে চাহি ভাবি বসি কি হইল লাভ?
কি মূল্য দিয়াছি এর পাইয়াছি বিনিময়ে তার
কতটুকু কি এমন? দেখি খুঁজে প্রাণের ভাণ্ডার
তৃপ্তি দিতে নাই কোন আনন্দের স্মৃতি-ও সম্বল।
মুদি যদি আঁখিযুগ হেরি শুধু অক্ষরের দল,
তমিস্রার মসীদন্ত। যৌবনের সন্ধ্যাগুলি মিছে
কেটে গেল বিদ্যারূপ অবিদ্যার আলেয়ার পিছে।

গভীর নিশীথে শাস্ত্র-পাঠক্লান্ত চকিত বিহ্বল
'চন্দ্রশেখরের' চোখে জ্যোৎস্নাসুপ্ত সুবর্ণ কমল
'শৈবলিনী' তনুসম—এ প্রকৃতি নয়নে আমার
লাগে আজ মনোরম। সহসা করিনু আবিষ্কার
হ্রদনদে এত শোভা, গগনে পবনে এত সুধা,
গহনে নয়নে মধু। রুদ্ধ করি হৃদয়ের ক্ষুধা
ত্যজি বিশ্ব-মহোৎসব, নিয়ে অর্দ্ধ-বৈরাগ্যের যোগ,
বিধিদত্ত সৌভাগ্যেরে স্পর্দ্ধা-ভরে করি নাই ভোগ।

উড়ন্ত পুষ্পের মত প্রজাপতি ঘুরিতেছে বনে,
মধুচক্র রচিতেছে ভৃঙ্গগণ মধুর গুঞ্জনে,
ভরিয়া রসের কুঞ্জ। তরুশির করিয়া মঞ্জুল
দীপান্বিতা-মহোৎসবে মাতিয়াছে খদ্যোতিকাকুল।
সবাই জীবন ভুঞ্জে। আর আমি গ্রন্থকীটরূপে
জীবন-বসন্ত ব্যর্থ করিলাম হায় অন্ধকূপে!

শ্রীকালিদাস রায়।
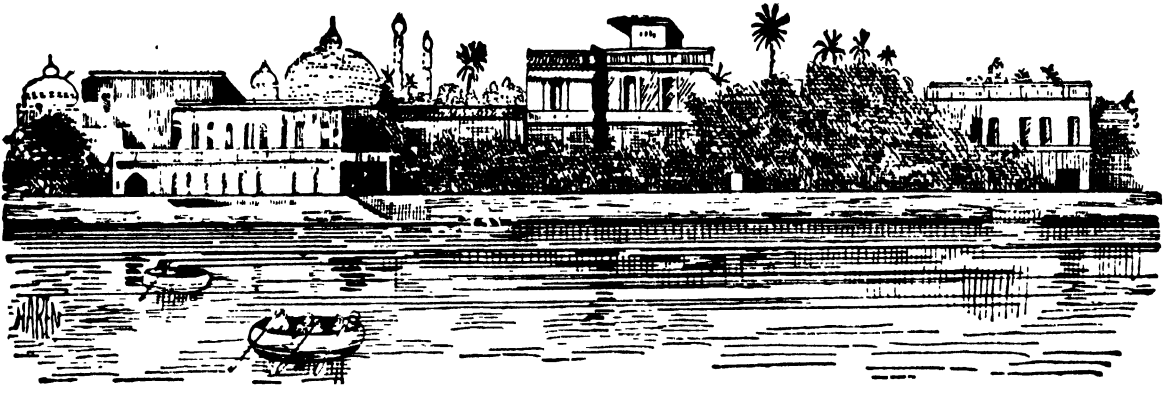
সিঙ্গাপুর

সর্পাকৃতি মলয়-অন্তরীপের দক্ষিণে ছোট একটি দ্বীপ—সিঙ্গাপুর। দ্বীপটি আকারে ডিমের মতো ; লম্বে ছাব্বিশ মাইল। দ্বীপের বুকে ছোট ছোট অসংখ্য পাহাড়, তালী-বন, লঙ্কা-মরীচের বিপুল ক্ষেত এবং রবারের আবাদ—এ সবের ফাঁকে-ফাঁকে পথ-ঘাট বাড়ী-ঘর। বাহির হইতে দেখিলে কে বলিবে, এ দ্বীপটি দারুণ দুর্ভেদ্য! অথচ এই দ্বীপটিকে ঘিরিয়া জলমধ্যে বহু 'মাইন্‌' রক্ষিত আছে। শত্রুর আক্রমণ-সম্ভাবনা জাগিবামাত্র এই ছোট দ্বীপ হইতে যে মারণাস্ত্র ছুটিবে, সে একেবারে কালান্তক-যমের মতো!

যাঁরা সিঙ্গাপুরে বেড়াইতে যান, তাঁরা অবশ্য এ অস্ত্র-সজ্জার কোনো আভাস চোখে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। কাণে শুধু শুনিবেন মুহুর্মুহু কামান-গর্জ্জন আর চোখে দেখিবেন ভাসমান গভীর ডক, জলের বুকে কামান-দার বড়-বড় যুদ্ধ-জাহাজ এবং বেতারের আকাশচুম্বী চূড়া! সিঙ্গাপুর যেন বারুদখানা! প্রাচ্য ভূখণ্ডে এই সিঙ্গাপুর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য শক্তিমান যুদ্ধ-ঘাঁটী Strongest military base in the East.

সিঙ্গাপুর বন্দর

সমুদ্র-তীরে প্রাসাদ-তুল্য র‍্যাফল্‌স্‌ হোটেল।

হোটেলের ঘরে বসিয়া শুনিবেন বাহিরে সর্ব্বদা কোথায় বন্দুক-ছোড়া চলিয়াছে। এই ব্যারাকে বন্দুক-ছোড়ার প্রাকটিশ চলে সর্ব্বক্ষণ; এ শব্দ সেই সব বন্দুকের। আকাশে নিত্যক্ষণ বড় বড় বিমানপোত উড়িতেছে। রাত্রে এই সব বিমানপোতের তীব্র দীর্ঘ আলোক-রশ্মি কত দূর পর্য্যন্ত যে আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া তোলে, তার আর সীমা নাই! এই আলোক-রশ্মি-পাতে সমুদ্রবক্ষে এবং আশেপাশে সর্ব্বক্ষণ পাহারাদারী চলিয়াছে—কোথাও শত্রু কোন্ গোপন রন্ধ্রপথে প্রবেশের উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছে কি না!

পথে-ঘাটে তরুণ সেনা-বাহিনী। কোনো ফৌজ রহিয়া গিয়াছে। এখানে ফৌজ আছে কয়েক হাজার মাত্র; বাকী লোক-জন এখানকার কায়েমি বাসিন্দা। তাহারা সকলেই প্রাচ্য-জাতীয়। চীনা আছে এক লক্ষ; তা'ছাড়া আছে পারসী, শিখ, তামিল, তিব্বতী এবং যবনীজ।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরের ভাগ্যোদয় ঘটে। স্যর ষ্টানফোর্ড র‍্যাফল্‌স্ সিঙ্গাপুরের এ-ভাগ্য গঠন করেন; এবং সে-দিন হইতেই সিঙ্গাপুরের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি! পুরাকালে টোলেমির আমোলে সিঙ্গাপুরের নাম ছিল জাবা; তার পর ইতিহাসে দেখি, ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে যবনীজরা আসিয়া সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে এবং এখানকার
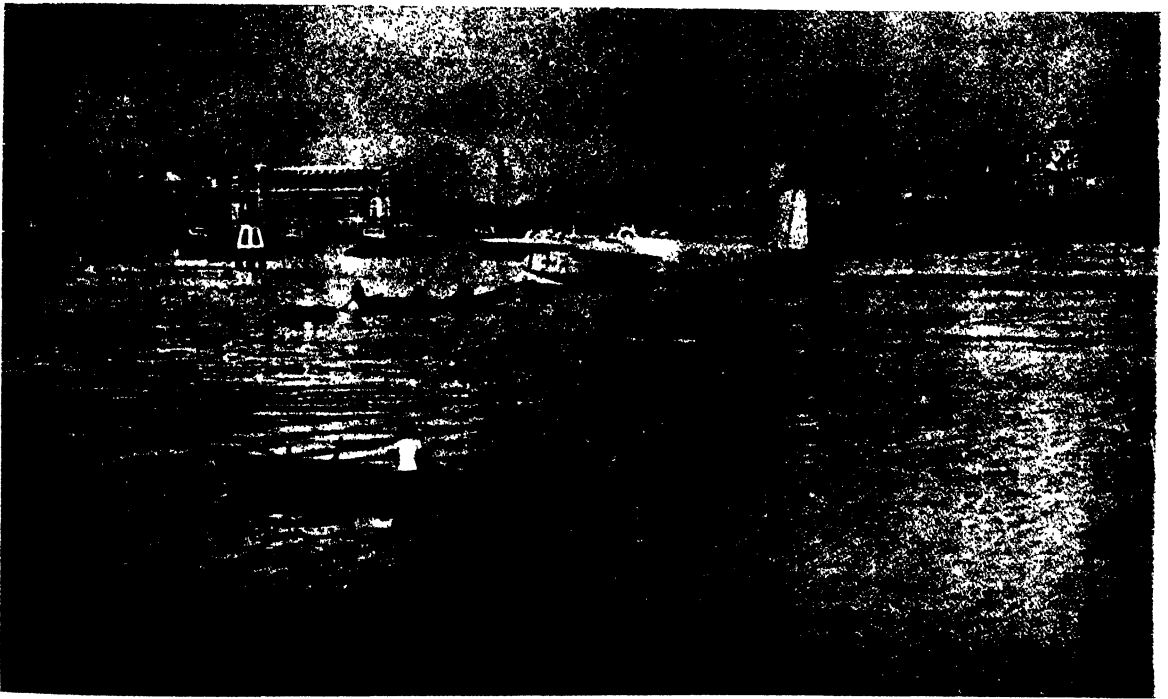
সিঙ্গাপুর

আসিয়াছে বৃটেন হইতে, কোন ফৌজ ভারতবর্ষ হইতে। তালী-বনের ফাঁকে-ফাঁকে, রবার-কুঞ্জের মাঝে মাঝে অসংখ্য ফৌজের ছাউনি,—চারিদিকে ফৌজের লোক!

তাই বলিয়া মনে করিবেন না, সিঙ্গাপুরের ছয় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে সকলেই ফৌজের সহিত সংশ্লিষ্ট! এখানে স্থল ও জল দু'দলের ফৌজের বিরাট ব্যবস্থা থাকিলেও সিঙ্গাপুর আসলে কিন্তু বণিক-ব্যাপারীর দেশ

আদিম-অধিবাসীদের নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া জাতিটাকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। সে কুরুক্ষেত্র-পর্ব্বে সিঙ্গাপুরের মাটী নর-রক্তে ভিজিয়া গিয়াছিল। এজন্য কথা আছে, সে রক্তপাতের অভিশাপে সিঙ্গাপুরের মাটীতে ধান-চাল জন্মাইবে না! সিঙ্গাপুরে ধানের ক্ষেত নাই, সত্য!

১৫১১ খৃষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীজরা আসিয়া মলক্কা অধিকার করিয়া বসে; এবং ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ পর্য্যটক

স্যর ফ্রানসিশ ড্রেক আসেন এই প্রাচ্য ভূখণ্ডে; এবং তাঁর পর আসেন ক্যাভেণ্ডিশ ও লাঙ্কাষ্টার।

সিঙ্গাপুরে লঙ্কা-মরীচের বিরাট ক্ষেত। য়ুরোপীয়-জাতিরা এখানকার লঙ্কা-মরীচের স্বাদ পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল,—এবং লঙ্কা-মরীচের ব্যবসা-বাণিজ্যে দারুণ উদ্যোগী হইল।

শিখ যোদ্ধা

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পত্তন; এবং ভারতবর্ষকে কবলিত করিবার পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এই লঙ্কা-মরীচের লোভে সিঙ্গাপুরের উপর বৃটিশ-জাতির ভালো রকম নজর পড়িল।

বোমা-বর্ষণের বিরুদ্ধে চীনা কিশোরীর দল

ও-দিক দিয়া আমেরিকার জাহাজ প্রাচ্য মহাদেশে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছিল; তার পর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খালের সৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক—দু'দিক দিয়া বাণিজ্যের পথ মুক্ত হইল এবং হাজার-হাজার বাণিজ্য-তরী উভয় জল-পথ বহিয়া আসিয়া প্রাচ্য জগতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক নিবিড় ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিল। তার পর হইতে আজ প্রায় এই এক শত বৎসরের মধ্যে

হিন্দু হোটেলে
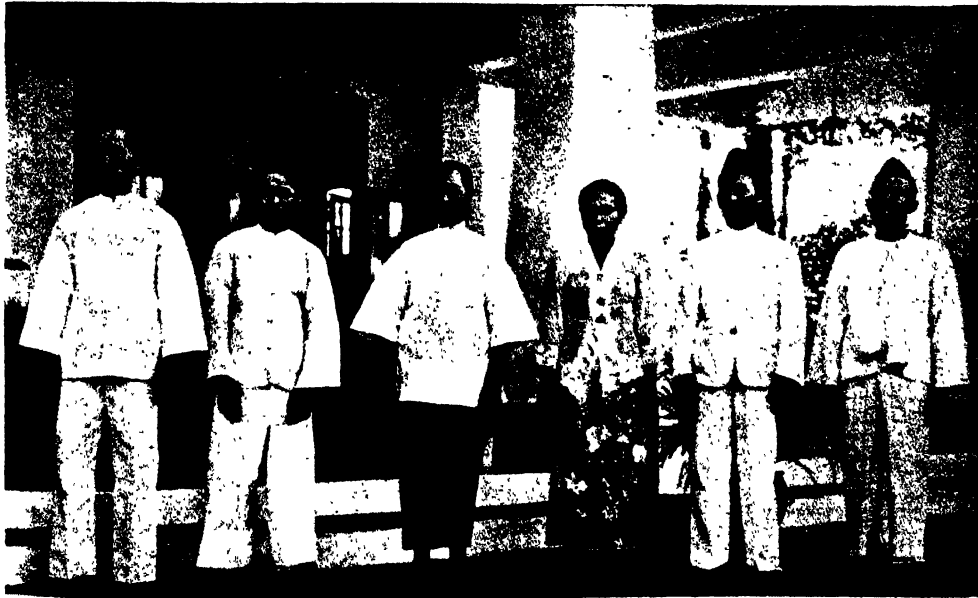
চীনা ভৃত্য-খানশামা

আসিয়াছিল বহু দীর্ঘকালে বহু বিঘ্ন-বিপদ অতিক্রমান্তে সেই উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া।

সিঙ্গাপুর তখন ছিল চোর-ডাকাতের আস্তানা। হঙ্‌কঙ্‌ হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত সমগ্র জল-পথ ছিল বোম্বেটেদের অবাধ পীড়ন-লুণ্ঠনের পীঠস্থান! সমুদ্রতীরে সকলে দেখিত, হাজার হাজার মানুষের মাথা! কোনোটা পুরাতন, কোনোটা সদ্য-মৃতের—মাথার কেশ ঝরিয়া যায় নাই, দাঁতের পাটি তখনো মুখে লাগিয়া আছে!

যাত্রী সাজিয়া বোম্বেটের দল জাহাজে চড়িয়া বসিত; তার পর সুবিধামত জায়গায় জাহাজ আসিবামাত্র বন্দুক-পিস্তল বাহির করিয়া অতর্কিত আক্রমণ! সকলকে সচকিত ও নিহত করিয়া জাহাজ লুঠ করিত, দখল করিত। শুধু তাই নয়—বেতারে বন্দরে সংবাদ পাঠাইত, 'জাহাজ নিরাপদ'! বোম্বেটে-দলের ব্যবস্থা এমন

সিঙ্গাপুর একটি প্রধানতম বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে আজ বছরে ত্রিশ হাজার বড় বড় জাহাজ আসিয়া দাঁড়াইতেছে। একশো বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন হইতে প্রথম যে-জাহাজ সিঙ্গাপুরে আসে, সে-জাহাজ

ইংরেজ-পাড়া
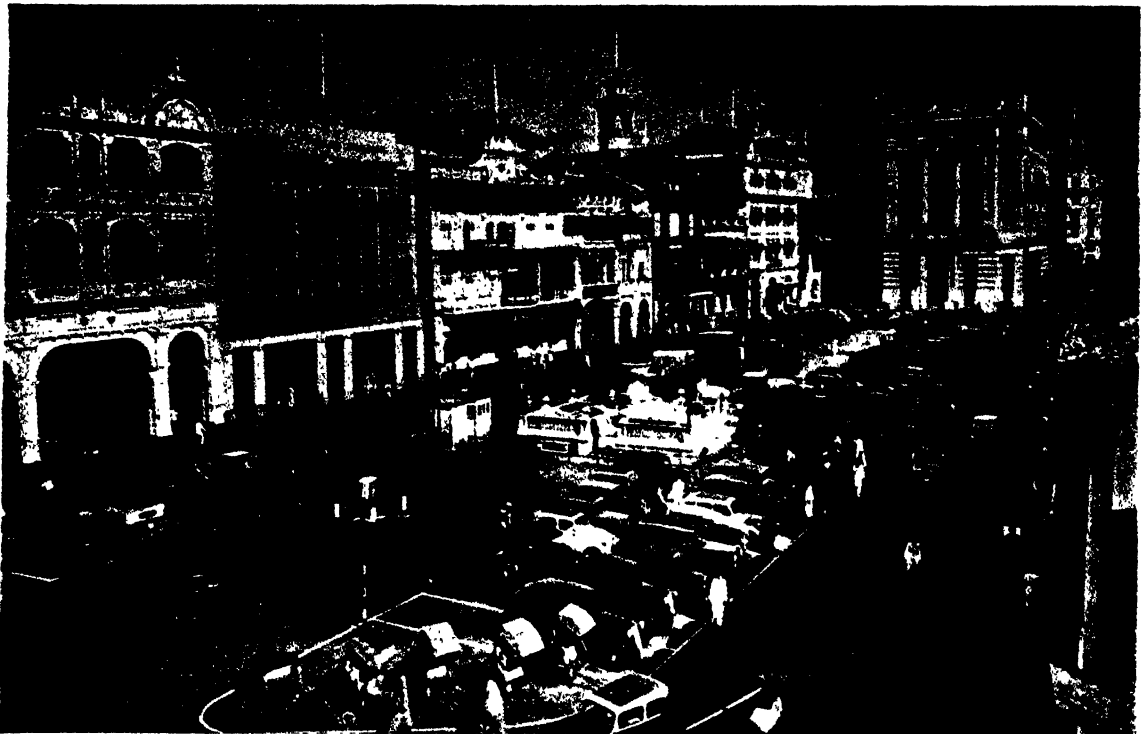
বোমা-ব্যাখ্যা

রঙ্গালয়ের দর্শক

বৌদ্ধ শ্রাদ্ধ-বাসর

কায়েমি-পাকা ছিল যে, বড় বড় চীনা-বণিকের দল ইহাদিগকে মোটা টাকা দাদন দিত; এবং বহু ক্ষেত্রে এই চীনা বণিকদের অর্থে-ই বোম্বেটের দল প্রশ্রয় পাইত—প্রতিপালিত হইত।

চুরি-ডাকাতি হঙকঙে আজও চলিতেছে; সিঙ্গাপুরে কিন্তু এ-গলদ আর নাই।

তবে সিঙ্গাপুরে চীনাদের অন্য রকমের বহু উৎপাত-উপদ্রব আছে। তাদের আছে বহু গুপ্ত-সমিতি, জাল-জালিয়াতী ও গুণ্ডার আড্ডা। জাল পাশ-পোর্টের সাহায্যে নানা রকমের বদ-মায়েসী এখানে বেশ সমারোহে চলিতেছে। তার উপর শ্বেতাঙ্গিনী-বিক্রয়, নারী-নিগ্রহ, আফিম-চালানী — এ সবও পুরা দমে চলে।

সিঙ্গাপুরের পুলিশ-কোর্টে গেলে এখানকার আবহাওয়ার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার পুলিশকোর্টে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার উপর মলয়-ভাষা, হিন্দুস্থানী, চীনা এবং বর্ম্মীজ ভাষার প্রচলন আছে। চোখের জলে বন্যা বহাইয়া অনেক সুচতুর মেয়ে-আসামী যেমন হাকিমের করুণা জাগাইয়া মার্জ্জনা পায়, তেমনি আবার কোনো মেয়ে-আসামীর সাজা হইলে রুদ্র-চীৎকারে এজলাস-ঘরে সকলের কাণে সে তালা লাগাইয়া দেয়; পুলিশ-প্রহরী শান্ত করিতে গেলে প্রহরীর উদরে সবলে মাথা ঠোকে, না হয় কিল-চড় মারে এবং পায়ের জুতা খুলিয়া সে-জুতা ছুড়িয়া হাকিমকে মারে,—এমন ঘটনা সিঙ্গাপুরে বিরল নয়!

বিচারের সময় উভয়-পক্ষীয়েরা অনেক সময় যাদুকর সঙ্গে আনে। এই যাদুকর হাকিমের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়ায়। সে মন্ত্রে না কি হাকিম বশীভূত হয় এবং যে-পক্ষের যাদুকরের তুকের জোর বেশী, সে-পক্ষ মামলা জিতিয়া খুশী-মনে না কি বাড়ী ফিরিয়া যায়! এই যাদুকরকে ইহারা বলে, পাওয়াং।

এখানে যে-সব চীনার বাস, তারা বৃটিশের প্রজা।

নদী-তীরে নগর-সমৃদ্ধি

কাজেই বৃটিশ-পাশপোর্ট লইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র তারা বিচরণ করিতে পারে। এবং এ-বিচরণে এত গোলযোগের সৃষ্টি হয় যে, তাহা নিবারণের জন্য স্বতন্ত্র একটি সরকারী বিভাগ আছে। এ বিভাগের নাম চাইনীজ্ প্রোটেক্‌ট্‌রেট অর্থাৎ চীনা-রক্ষা-বিভাগ। এ বিভাগের সেক্রেটারী এখন অনারেবল্ শ্রীযুত এ, বি, জর্ডান। সেক্রেটারীর অধীনে মস্ত অফিস আছে, আদালত আছে: সে আদালতে জজ আছেন, সালিশী-সদস্য আছেন।

ইঁহাদের কাজ গৃহহীন চীনা চীনা-শ্রমিক, স্বামী-পরিত্যক্তা চীনা-নারী, চীনা দাসী, বিদেশিনী চীনা-যাত্রিণী প্রভৃতি চীনা নর-নারীর অভাব-অভিযোগ শুনিয়া সে-অভিযোগের প্রতিকার করা। চীনা গুপ্ত-সমিতি, চীনা বদমায়েসদের আড্ডা—এগুলির উপর নজর রাখিয়া তাদের শাসন করেন; শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট, বেতন-পারিশ্রমিক সম্বন্ধে বিরোধ-গোলযোগ মিটান। চাইনীজ্ প্রোটেকটরেট কর্ত্তৃক এ সবের যেমন সুমীমাংসা হয়, তেমনি আবার অনাথ-আতুর নিরাশ্রয় চীনা নারীদের দুঃখ-মোচনেও প্রোটেক্-টরেটের সাধনার অন্ত নাই।

বৃটিশ-অধিকারভুক্ত হইলেও সিঙ্গাপুরের চীনা অধিবাসীদের সম্বন্ধে বহু চীনা-আচার-বিধি আজও মানিয়া চলা হয়। চীনা-সমাজে দাসী-বাঁদী-বিক্রয়ের প্রথা আজও বিদ্যমান আছে। যে-সব ক্রীতদাসীর বিবাহ হয় নাই এবং বয়স আঠারো বৎসরের নীচে, তাহাদের বলে, "মুই তাই।" ক্রয়, দান, বন্ধকী এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে ইহাদের উপর গৃহস্থের মালিকানী-স্বত্ব দাঁড়ায়। সুতরাং অপরে যদি এ দাসীকে চুরি করিয়া কিম্বা ফুশলাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে চীনা-আইনে সে অপরাধে তার শাস্তি হইবে। মালিকের বিনানুমতিতে এ-দাসীকে যদি কেহ বিবাহ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও শাস্তি পাইবে। অপরাধী যদি চীনা হয়, তাহা হইলেও এ-শাস্তির ব্যতিক্রম হইবে না। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট চীনাদের এ আইন মানিয়া চলিতেছে। অনেক সময় এ সব ক্রীত-দাসীর উপর নানারূপ পীড়ন-অত্যাচার চলে; সে পীড়ন-অত্যা-চার হইতে রক্ষা করা প্রোটেক্-টরেটের কাজ। গণিকাবৃত্তি-দমনেও প্রোটেক্টরেটের প্রয়াসের সীমা নাই! নানা গুপ্ত-সমিতি সিঙ্গাপুরের বুককে আজও যেন ঝাঁজ্রা করিয়া রাখিয়াছে! এ সব গুপ্ত সমি-তিতে শয়তানীর নানা ফন্দী-অভি-সন্ধি চলে। ইহা-দের জন্যই এক দিন তিপিং যুদ্ধ এবং সম্প্রতি এই মাঞ্চু-বিরোধের সৃষ্টি!
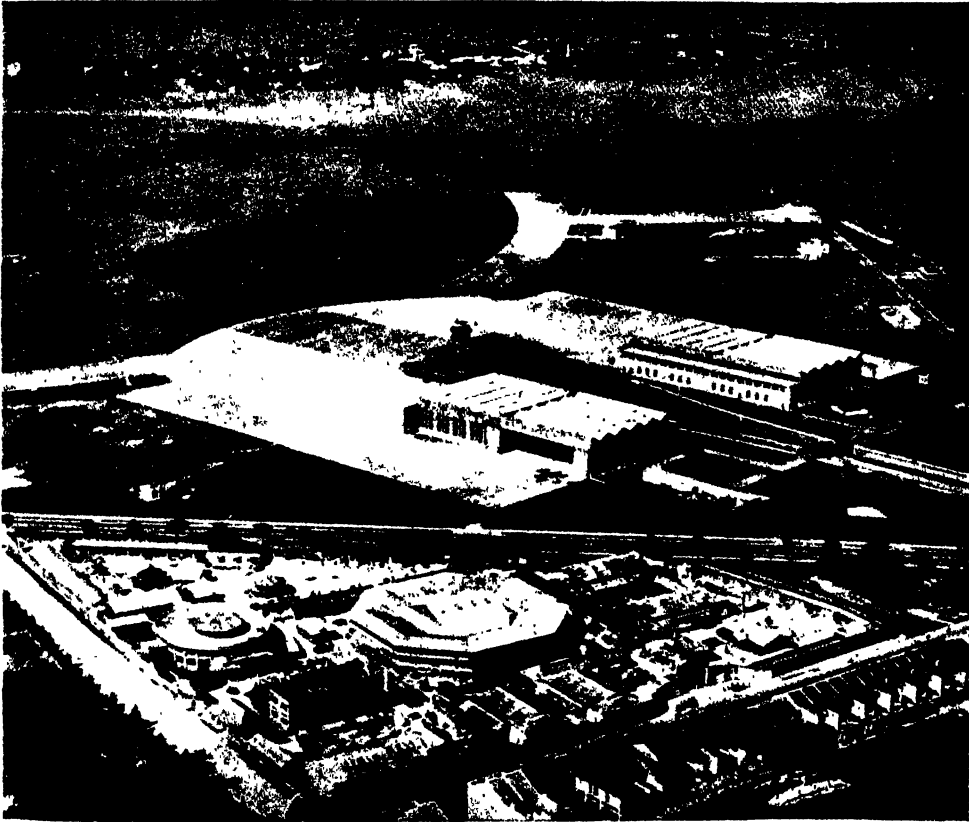
কোনি দ্বীপে পার্ক ও এরোড্রোম্

সিঙ্গাপুরে বদমায়েস চীনার প্রাচুর্য্য বলিয়া এ-কথা যেন কেহ মনে করিবেন না, সকল চীনাই এমনি এক গোত্রের! সিঙ্গাপুরে ভদ্র সম্ভ্রান্ত এবং কৃতী চীনার সংখ্যা অল্প নয়। ইঁহারাই সিঙ্গাপুরের মেরুদণ্ড—সমৃদ্ধির হেতু! দয়া-দাক্ষিণ্যে ইঁহারা মুক্তপাণি,—ইঁহাদের বেশ-ভূষা,

আচার-রীতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কলুষহীন। এখানকার তরুণ চীনা-সমাজকে দেখিলে গর্ব্বে-গৌরবে বুক ফুলিয়া উঠে।

শিক্ষিতা চীনা-কিশোরীরা পাশ্চাত্য আচার-রীতি গ্রহণ করিতেছেন,—চীনা আচারে তাঁদের অরুচি এবং বিরাগ। বৃটিশ ও মার্কিন ফ্যাশনকে ইঁহারা দেহে-মনে বরণ করিয়া লইতেছেন। এ-মেয়েরা টেনিশ খেলেন, বাস্কেট-বল খেলেন, বাইকে চড়েন, হাই-হীল জুতা পায়ে দিয়া খট্ খট্ করিয়া হাঁটিয়া পথে চলেন। সিনেমা এবং নৃত্যশালা আজ ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট।

সিঙ্গাপুরে অনেকগুলি নৃত্যশালা আছে। এগুলির মধ্যে ওরিয়েণ্ট-নৃত্যশালা সবার সেরা। হংকঙে যেমন টাকা দিলে ট্যাক্সি-বিহারিণী প্রমোদ-সঙ্গিনী মিলে, এখানেও তেমনি। এই ট্যাক্সি-বিহারিণী চীনা-রঙ্গিণী—পৃথিবীতে এক অপরূপ জীব! প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-ভাবের মিশ্রণে এ নব-রঙ্গিণী যেন রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী,—নহে মাতা, নহে ভগ্নী, নহে কন্যা, নহে বধূ,—অর্থ পাইলে হাস্যে-লাস্যে রূপের উচ্ছ্বাসে প্রমোদের ঝর্ণা বহাইয়া দেয়!

সিঙ্গাপুরে যামিনী-আলয় (night clubs) আছে অনেকগুলি। "হ্যাপি ওয়ার্ল্ড" নামে 'আলয়'টি সব-চেয়ে ভালো। কোনি দ্বীপ অঞ্চলে এ আলয়টি অবস্থিত। এখানকার প্রমোদ-সঙ্গিনীর দল জাতে মলয়। এ আলয়ে নাচ হয়। নাচের সে-আসরে বহু লোক আসিয়া জমে। সকলেই নাচিতে আসে না; কেহ আসে নাচিতে, কেহ আসে নাচ দেখিতে। নর্ত্তকীদের সঙ্গে হাসি-গল্প করুন, বাধা নাই; কিন্তু তাদের স্পর্শ করিতে পারিবেন না! স্পর্শদোষ এ-সব আলয়ে মস্ত দোষ! নাচ দেখিতে বসিয়া পান-ভোজন চলে। সুরা-পান নয়,—ফলের রস পান এবং পাকা পেঁপে খাওয়া।

সিঙ্গাপুরে নানা জাতের থিয়েটার-গৃহ আছে। কোন থিয়েটারে হিন্দু নাটক-গীতিনাটকের অভিনয় হয়; কোনটায় হয় চীনা-নাটক, কোনটায় হয় মলয় নাটক! নাটকের প্রচার-পত্রাদি ইংরেজী ভাষায় ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে—Sunlight Pills for Men...
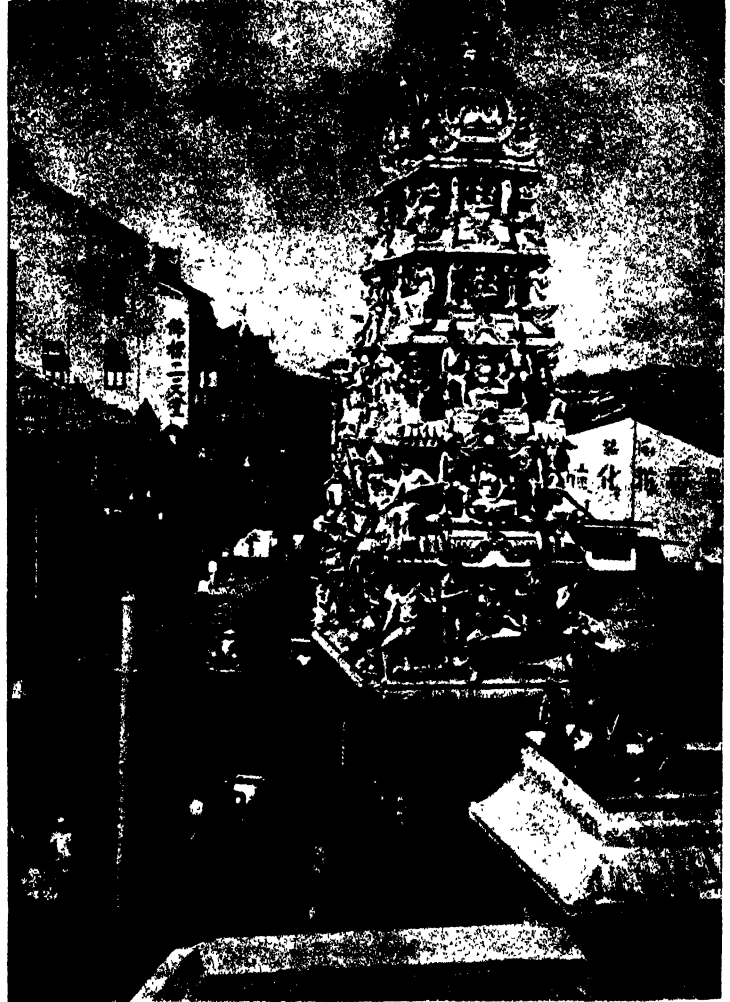
শ্রীমারিয়াম্মান্ মন্দির

Moonlight Pills for women অর্থাৎ এ নাটকে পাইবেন—"পুরুষদের জন্য রৌদ্রের বড়ি; আর মেয়েদের জন্য জ্যোৎস্নার বড়ি!"

এই সব আসর আর বিপণী—তরুণ সেনাদের পক্ষে দারুণ প্রলোভন! সে-প্রলোভনে পাছে সর্ব্বনাশ করিয়া বসে, এজন্য সেনা-বাহিনীর নীতি-রক্ষার জন্য সিঙ্গাপুরে স্বতন্ত্র পুলিশের ব্যবস্থা আছে। এ-পুলিশের কাজ

রাত্রে এই সব আসর-বিপণীর পাহারাদারী করা—কোনো সেনা যেন এখানে আসিয়া 'বহিয়া' না যায়!

সিঙ্গাপুরে গ্রীষ্ম-বর্ষা শীত-বসন্ত বলিয়া ঋতু-পর্য্যায়ের বালাই নাই! গ্রীষ্ম এদেশে নিত্য বিরাজিত। দিনের বেলায় রৌদ্রে যেন আগুন ঝলে! তবু এত উত্তাপ-সত্ত্বেও এখানকার লোক-জনের স্বাস্থ্য বেশ ভালো,—অসুখ-বিসুখের উৎপাত তেমন নাই!

ঝড় এদেশে বহিতে জানে না,—তবে বৃষ্টিপাত হয়।

২। কামরা ভাড়া। ছোট হইলেও এ-কামরায় সত্তর জন লোক অনায়াসে শুইয়া ঘুমাইতে পারে!

৩। একটি ডাক-পিয়ন সম্প্রতি খালি-পায়ে ডাক বিলি করিয়াছিল বলিয়া তার এক সেণ্ট জরিমানা হইয়াছে। মাসে সে মাহিনা পায় চার সেণ্ট।

৪। হলিউড হইতে 'তার' আসিয়াছে, ছবির জন্য তারা দু'টি অল্পবয়সী হস্তিনী চায়।

৫। স্থানীয় জাপানী-দলের সঙ্গে সিঙ্গাপুর মার্কিন দলের বেশবল-ম্যাচ হইয়া গিয়াছে, জাপানী-দল সে খেলায় হারিয়াছে। এ খেলায় আমেরিকান কনশাল-জেনারেল প্যাটন আম্পায়ার ছিলেন।

এখানে মাছ-ধরার ব্যাপারে খুব সমারোহ দেখা যায়। অনেকে তাগ্ করিয়া করিয়া গভীর জলমধ্যে ডুব দেয়; এবং ডুব দিয়া জল-মধ্য হইতে মাছ ধরিয়া আনে। এখানকার মলয়-জাত এ-কাজে বিশেষ পটু। তারা বলে, জলের দিকে চাহিয়া তারা মাছের ভাষা শুনিতে পায় (they can hear fish); বলে, যারা ওস্তাদ, তারা সে ভাষা শুনিয়া বলিয়া দিতে পারে, কি-জাতের মাছ কি কথা বলিতেছে!

অনেকে মাছ ধরিবার জন্য চোখে গগল্‌স্-চশমা আঁটিয়া জলে ডুব দেয়—টানা-জাল সঙ্গে লইয়া যায়।
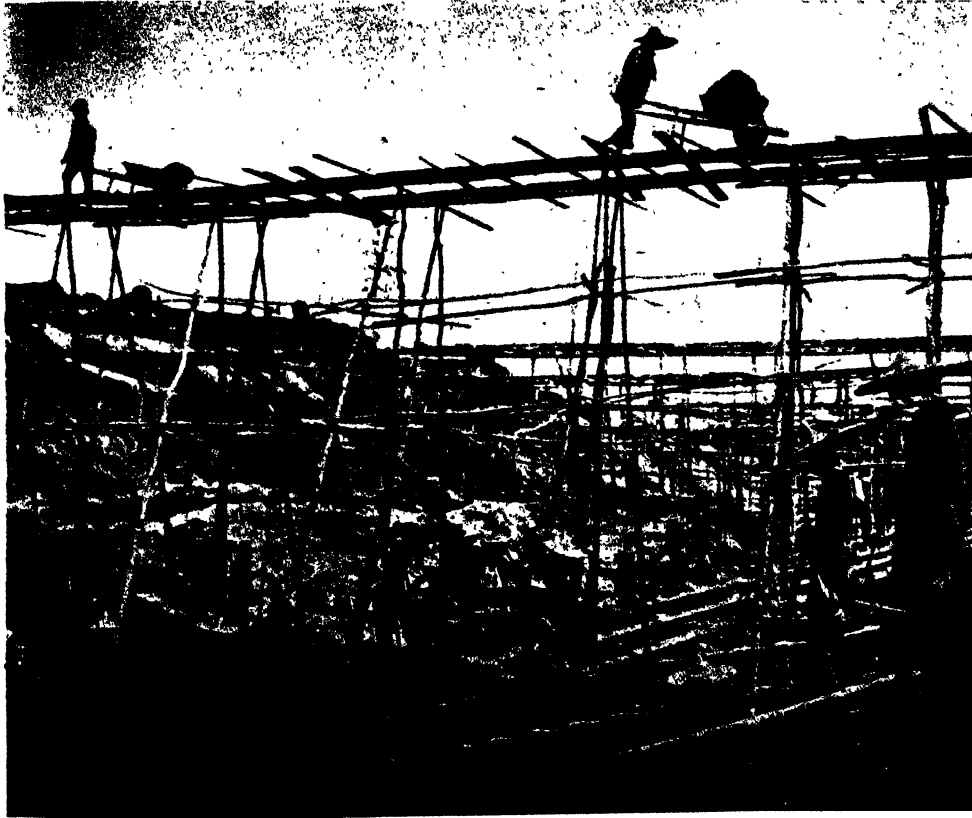
টিনের খনিতে

সিঙ্গাপুরের খপরের কাগজে স্থানীয় যে-সব সংবাদ নিত্য প্রকাশিত হয়, সে সব খপর রীতিমত কৌতুককর। বিজ্ঞাপন যা ছাপানো হয়, তাহাতেও বেশ মজা আছে! খপরের কাগজে ছাপা কয়েকটি সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের নমুনা দিতেছি—

১। প্রাচ্যজগতের মল্ল-বীর উয়োংচিয়াং শীঘ্র সিঙ্গাপুরে আসিবেন।

ফৌজ-খরিদদার
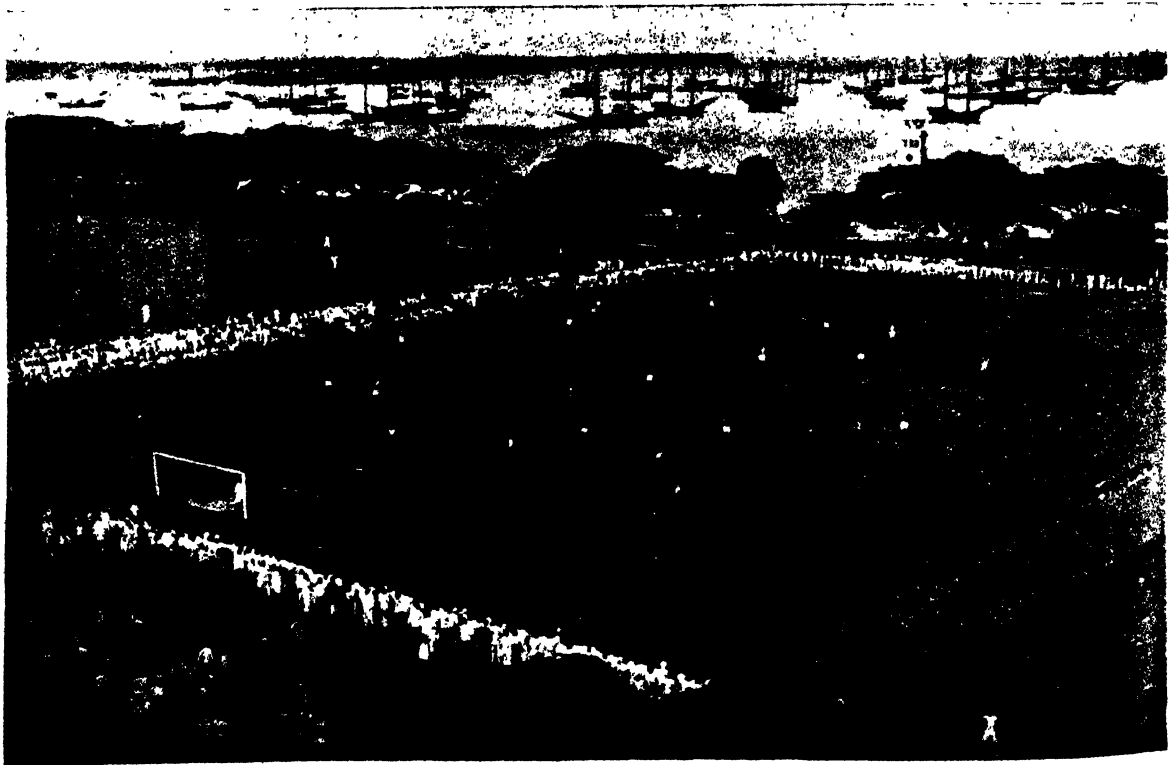
ফুটবল-খেলার মাঠে

খোকার প্রথম চুল ছাঁটা

চীনা চিত্রশিল্পী

বাজারে কি না পাওয়া যায়!

জলে নামিয়া আধ মাইল দূরে গিয়া তীরে ওঠে; হাতে জালের দড়ি; এবং ডাঙ্গায় উঠিয়া দড়ি টানিয়া জাল গুটায়; জালে অনেক মাছ ওঠে।

সিঙ্গাপুরে দোকানে যে-সব পরিচয়-ফলক আঁটা থাকে, সেগুলিতে বেশ বৈচিত্র্য আছে। কর্ম্মপ্রার্থীরাও নানা ছাঁদে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া উমেদারীর নিবেদন জানায়! বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, কেহ লিখিয়াছেন—মহিলা কেশ-রচয়িত্রী ব্যাঙকক্ হইতে আসিয়াছেন,—চাকরি চাহেন।

ভাই-বোন

—ব্রিটিশার—মলয়-ভাষায় কথা কহিতে দক্ষ। চাষ-আবাদের কাজে ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতা,—চাকরি চায়। যেখানে বলিবেন, যাইতে প্রস্তুত।

—ভাড়া চাই—ব্যাডমিণ্টন-কোর্ট।

—প্রাইভেট ডিটেকটিভ চাই—এখনি।

—এক জন মহিলা দেশে চলিয়াছেন—একটি পুরানো ফারকোট্ কিনিতে চান।

—ইংরেজ সেনা—বয়স একুশ বৎসর! মার্কিন কিশোরীর সঙ্গে পত্রে প্রেমালাপ করিতে চান—বিবাহ-উদ্দেশ্যে। ফটো-আদান-প্রদানের পর আলাপ-পরিচয়।

—নাম নাইডু—বয়স ২০ বৎসর। স্বাধীন, উপার্জ্জন-শীল। পাত্রী চাই। যে-জাতের হয়, হৌক! চিরদিনের জন্য বিবাহে যদি ইচ্ছা না থাকে, সাময়িক বিবাহ বন্ধনে রাজী।

—শিক্ষিত ভারতীয় ভদ্রলোক, বয়স ৪০—শান্ত-শিষ্ট

ফ্যাশন-বিলাসিনী

মেজাজ। বিধবা বিবাহ করিতে চান। পত্র-মারফৎ কথাবার্ত্তা…

খৃষ্টান পুরুষ—যে কোনো জাতের ধনাঢ্য বিধবাকে বিবাহ করিতে চায়। বয়স-সম্বন্ধে বাছবিচার নাই।

সিঙ্গাপুরকে অনেকে বলেন, দোকান-পত্রের দেশ। কথাটা এক হিসাবে সত্য। পথে বাহির হন, দেখিবেন, পথের দু'ধারে ছোট-বড় দোকান; নানা জিনিষ বিক্রয় হইতেছে, নানা জিনিষ তৈয়ারী হইতেছে। সাবান,

আসবাবপত্র, রবারের জুতা, সিগারেট, সরবৎ, মাটীর তৈজস, খেলনাপত্র, বিস্কুট, বাক্স, মিছরী, নারিকেল তৈল —এ সবের কারখানা প্রায় সর্ব্বত্র। এখানে শ্রমিক-কারিগর মেলে হাজার হাজার; সকলের কর্ম্মপটুতা অসাধারণ, অথচ মজুরী খুব শস্তা। শ্রমিকদলে তামিল ও চীনা মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়া কাজ করিতেছে। একবার ৮০০০ রিক্সওয়ালা ধর্ম্মঘট করিয়া গাড়ী-টানা বন্ধ করিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে দু'হাজার চীনা মেয়ে আসিয়া হাজির! তারা রিক্‌শ গাড়ী টানিবে।

সাপুড়েদের এখানে খুব পশার। বিষধর গোখুরা কেউটে লইয়া তারা নানা রকমের খেলা দেখাইয়া বেড়ায়। বানরওয়ালা আছে; বানর নাচাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করে।

টিনের গাদা

সিঙ্গাপুরে টিনের খনি আছে। সেজন্য সমৃদ্ধির সীমা নাই।

সিঙ্গাপুরে সকল জাতির যেমন সমন্বয় দেখা যায়, তেমনি এই ছোট দ্বীপটি আবার সকল ধর্ম্মের মিলন-তীর্থ। চার্চ্চ আছে, মসজিদ আছে, প্যাগোডা আছে, চীনা ভজনালয় আছে, আবার হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরও আছে। সবচেয়ে বড় মন্দিরের নাম শ্রীমারিয়াম্মান্ মন্দির। এ মন্দিরের চূড়া সমুদ্র-বক্ষে-জাহাজ হইতে দেখা যায়। এ মন্দিরের গায়ে আগাগোড়া বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি, গাভীর মূর্ত্তি। সব মূর্ত্তিই বেশ বড় প্রমাণ-সাইজের। মূর্ত্তিগুলির কতক আবার নানা রঙে রঙীন। বালিকা দাঁড়াইয়া আছে, তার হাতে একটি সবুজ রঙের টিয়াপাখী; হাতে দীপমালা লইয়া কিশোরীরা মন্দির-পথে চলিয়াছে, তাদের গলায় ফুলের মালা; কোথাও নীল রঙের চতুর্ভুজ দেবতার মূর্ত্তি—এমনি নানা মূর্ত্তি মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত আছে। মূর্ত্তিগুলির গঠনে শিল্পাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। এ মন্দিরে বিশেষ তিথি-উপলক্ষে অগ্নি-পূজা হয়। সে সময় বহু নর-নারী ভক্তি-ভরে জ্বলন্ত অগ্নির উপর দিয়া খালি-পায়ে বিচরণ করিয়া দেবতার প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা নিবেদন করেন।

একটি চীনা মন্দির আছে—সে মন্দিরে করুণা দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। চীনা নারীরা এ মন্দিরে আসিয়া দেবীর কাছে পুত্র-কামনা নিবেদন করে। মন্দিরের সামনে একটি ঢাকা-দালান আছে। পুত্র-কামনায় মেয়েরা এ দালানে শিশুর পায়ের মাপের ছোট ছোট জুতা রাখিয়া যায়। মানত করে, শিশু জন্মিলে এ-জুতা লইয়া এ-জুতার বদলে নূতন জুতা দেবীকে দান করিয়া যাইবে!

সিঙ্গাপুরে মক্কার বহু পাণ্ডা বাস করে। এখান হইতে বহু মুসলমান মক্কায় তীর্থ করিতে যায়। সে তীর্থ-যাত্রায় এই সব পাণ্ডা হয় তাদের সহযাত্রী এবং গাইড।

সিঙ্গাপুরে বন আছে, জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে। বনে-জঙ্গলে বড় বড় বাঘ আছে, হাতী আছে, পাহাড়ী সাপ আছে। সাপ এখানে প্রচুর। সহরের আশেপাশে যে-সব বস্তী, সে সব বস্তীতে যে-সব নালা-নর্দ্দামা আছে, সেই নালায়-নর্দ্দামায় বড় বড় ময়াল সাপ বাস করে। তারা নালা-নর্দ্দামায় আস্তানা পাতিয়াছে ইঁদুরের লোভে।

টাইগার-মন্দিরে বুদ্ধ-মূর্ত্তি

জোঁকের সংখ্যা এখানে গণিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

দিনের বেলায় যে সিঙ্গাপুর টাকা-পয়সার লোভে উন্মত্ত গর্জ্জনে ভরিয়া থাকে, সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে সিঙ্গাপুরের চেহারা আগাগোড়া বদলাইয়া যায়! অফিস অঞ্চলের পথ তখন জনহীন হয়, এবং মহল্লায়-মহল্লায় আকাশ-বাতাস বিচিত্র বাদ্য-নিক্কণে ও নারী-কণ্ঠের সুর-লহরীতে ভরিয়া যেন মায়াপুরী রচিয়া তোলে! আমোদ-পিপাসু নর-নারীর জটলা—হোটেলে-নৃত্যশালায় উল্লাসের উৎস-ধারা—আমোদের লহর বহিতে থাকে! এ আলোর পিছনে কিন্তু ছায়া! যেখানে অন্ধকার, সেইখানেই ফন্দীবাজদের নিগ্রহ-অভিসন্ধির ছুরি! আলো-ছায়ার এ-লীলায় এক দিকে জীবন যেমন উল্লাসে মত্ত-মাতোয়ারা হয়, তেমনি অন্য দিকে আবার দুরন্ত দুর্বৃত্তের নৃশংস আক্রমণে কত লোক ধনে-প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে! সিঙ্গাপুর যেন আরব্য রজনীর কাহিনী-বর্ণিত পুরী! সুকঠিন সমর-সজ্জার গায়ে-গায়ে নাচ-গান-প্রমোদ—কোমল-কঠোরে এমন বিসদৃশ সংযোগ পৃথিবীর অন্য কোনো প্রদেশে বোধ হয় দেখা যাইবে না!

অবশেষ

গান আমাদের নাই রহিল সুর তো আছে প্রিয়,—
তারই মালা দিলাম গেঁথে কণ্ঠে তুমি নিয়ো।
এ পথ দিয়ে অনেক লোকের নিত্য-আনাগোনা,
অনেক কথার জাল-রচনা অনেক স্বপ্ন-বোনা।
অনেক কালো চোখের তারায় সকাল বেলার আলো
ঝলমলিয়ে উঠ্‌লো জলে বাসলে তা'দের ভালো।

বুকের মাঝে তুফান তুলে অনেক কান্না-হাসি
এই জীবনের নীল যমুনায় বাজিয়ে গেল বাঁশী।
রচেনি কেউ আসন তাদের কভু তোমার মনে,
ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেল সুদূর বিস্মরণে।
শুধু তাদের যাওয়া-আসার ছন্দ চরণখানি,
জীবন-মরুর মর্ম্মে সুরে ফুল ফোটাবে জানি।

সকল-পাওয়ার সর্ব্বনেশে নিবিড় আলিঙ্গনে
চাইনে মোরা পড়তে বাঁধা—এইটুকু রয় মনে।
এই পৃথিবীর চক্রপাকে অনেক পাওয়ার ভিড়ে
কখন যেন হারিয়ে ফেলি আমার আমিটিরে!
তার চেয়ে এই আধেক হাসি আধেক ভালোবাসা,
সুরের কমল ফুটলো প্রাণে রইল শুধু আশা।

শ্রীকালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

ইতিহাসের অনুসরণ

ক্লাইভ ও মীরকাশিম

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে দুই জন অসাধারণ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের কার্য্য-ফলে বাঙ্গালার ভাগ্য যে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই দুই জনের জীবনকথা আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা উভয়েই অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইলেও উভয়েই যেন কোন অদৃষ্ট-শক্তির প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার ভাগ্যফল বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্লাইভ পর পর উন্নতির শীর্ষদেশে আরূঢ় হইয়াছিলেন,—মীরকাশিম দুর্ভাগ্যের রসাতল-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন,—নিতান্ত হতভাগ্যের ন্যায় শোচনীয় মৃত্যু-কবলে নিপতিত হইয়াছিলেন। প্রতিকূল ভাগ্যের প্রভাব মীরকাশিমের জীবনে যেমন নির্ম্মম ফল প্রদান করিয়াছিল, ক্লাইভের জীবনে তেমনই অনুকূল ভাগ্যের করুণা অযাচিত ভাবে বর্ষিত হইয়া তাঁহার জীবনকে সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাল্যকালে ক্লাইভ দুরন্ত বালক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালে পাঠশালার ছাত্র-জীবনে তিনি এরূপ অসমসাহসিক এবং অকুতোভয় ছিলেন যে, তাঁহার দুর্জ্জয় সাহস ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া তাঁহার স্বদেশে অতিসাহসিক ব্যক্তিরাও বিস্মিত হইতেন। তিনি যখন পাঠশালার সাধারণ ছাত্র তখন এক দিন তিনি নিকটস্থ পল্লীর ভজনালয়ের শীর্ষদেশস্থ নর্দ্দামার মুখে নিপতিত একখণ্ড পাথর দেখিতে পান, পাথরখানির প্রতি ক্লাইভের লোভ হইল; কিন্তু সেই স্থানে আরোহণ করা অসম্ভব এবং উঠিয়া অবতরণ করা আরও কঠিন। ক্লাইভ সেই স্থানে উঠিয়াছেন দেখিয়া পাঠশালার গুরুমহাশয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। গ্রামশুদ্ধ লোক ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ বালকের পিতাকে সংবাদ দেওয়া হইল। কিন্তু সেই অকুতোভয় বালক নির্ব্বিঘ্নে সেই সামান্য পাথরখানা লইয়া উচ্চ ভজনালয়ের চূড়া হইতে নামিয়া আসিল। কেবল তাহাই নহে। এইরূপ কতবার যে ক্লাইভ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে তিনি যে ভাগ্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তাঁহার জনক-জননী দেখিলেন যে, সেই অশিষ্ট বালককে দেশে রাখা অত্যন্ত কঠিন। তাঁহারা যোগাড়-যন্ত্র করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে একটি কেরাণীগিরি জুটাইয়া দিয়া তাঁহাকে ভারতে পাঠাইলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ পিতা তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া-দিয়া আসিলেন। জাহাজ বন্দর হইতে অধিক দূর যাইতে না যাইতে সাগরে ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হইল। জাহাজ নির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ-যাত্রা করিল। ক্রমে আটল্যাণ্টিক মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া জাহাজ শত শত মাইল দূরবর্ত্তী ব্রেজিলের পার্ণামবিউকো প্রদেশের উপকূলে উপনীত হইয়া এক স্থানে চড়ায় বাধিল। সাগর বক্ষ তখন তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণ। নিকটে অগাধ জল। জাহাজের এক অংশ মাত্র মগ্নশৈলে বাধিয়া ছিল। কতক-গুলি যাত্রী প্রাণভয়ে ব্যাকুল, কিন্তু ক্লাইভের সে দিকে ক্ষেপ ছিল না। তিনি সেই অবস্থাকে বিশেষ বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করেন নাই। তখন ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তিনি জাহাজের সর্ব্ব-পশ্চাদ্ভাগ হইতে এমন ভাবে জলে পড়িলেন যে, তাহাতে মনে হইল, তিনি টাল-সামলাইতে না পারিয়াই সাগরে পড়িলেন। তিনি জাহাজ হইতে দেখিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানে জলে পাক-খাওয়ায় ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া জাহাজের লোক ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। কাপ্তেন ষ্টীমারের পাটাতন হইতে একটি বালতি দড়ি বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। তখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছিল। ক্লাইভ তাহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন,—তিনি ভাগ্যক্রমে বালতি এবং দড়ি ধরিতে পারিয়াছিলেন। কাপ্তেন যদি তাঁহার সম্মুখেই দড়ি-বাঁধা বালতি না ফেলিতেন, তাহা হইলে

তাঁহার প্রাণরক্ষা হইত না। তাঁহার জুতা, রূপার বকলস, একটি টুপি, এবং পরচুলা ভাসিয়া গিয়াছিল।—এরূপ অবস্থায় মানুষের জীবন-রক্ষা হওয়া বড়ই কঠিন। কেবল তাহাই নহে; ভারতে আসিবার পরও তিনি দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পিস্তলে রীতিমত গুলীভরা থাকিলেও একাধিকবার সেই পিস্তল হইতে গুলী বাহির হয় নাই! ইহা অদ্ভুত ঘটনা। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনে এইরূপ অসাধারণ ঘটনা ঘটে। বোহেমিয়ার সেনাপতি আলব্রেচ ভন্ ওয়ালেসষ্টীনের জীবনও আত্মহত্যার চেষ্টা হইতে বিস্ময়জনক ভাবে রক্ষা পাইয়াছিল।

কিন্তু লর্ড ক্লাইভের জীবনে বিপদ হইতে এইরূপ বিস্ময়জনক ভাবে উদ্ধারলাভের যত অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত অধিক দৃষ্টান্ত অন্য লোকের জীবনে অতি বিরল। নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের জীবনেও এইরূপ ঘটনা কয়েক বার ঘটিয়াছিল। ফরাসীরা যখন মাদ্রাজ অধিকার করিয়াছিল, তখন তাহারা মাদ্রাজস্থ সমস্ত য়ুরোপীয়কে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পণ্ডিচেরীর রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ক্লাইভ এক জন ভারতবাসীর বেশ ধরিয়া মাদ্রাজ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি ফোর্ট সেণ্ট-ডেভিডে গমন করেন। সেখানেও তিনি নিস্তারলাভ করেন নাই। এক দিন তাস খেলিতে খেলিতে তিনি এক জন লোককে বলেন যে, সে তাস খেলায় প্রতারণা করিয়াছে। লোকটা বড়ই দুর্দ্দান্ত। সে ক্লাইভের মস্তকের উপর গুলীভরা পিস্তল উদ্যত করিয়া বলিল,—"কি বলিলে আবার বল।" নির্ভীক ক্লাইভ যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই পুনরুক্তি করিলেন। কিন্তু সেই দুর্দ্দান্ত আততায়ীর আর গুলী করিবার ইচ্ছা হইল না। সে অনায়াসেই গুলী করিতে পারিত,—কারণ সেই অরাজকতার সময় তাহার শাস্তি পাইবার আশঙ্কা ছিল না। ক্লাইভের জীবনচরিত-লেখক আর. জে. মিন্নে (Minney) তাঁহার রচিত "ভাগ্য-নিয়ন্ত্রিত ক্লাইভ" নামক সন্দর্ভে লিখিয়াছেন, ভাগ্যদেবীই ক্লাইভকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। ক্লাইভের এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই আত্মরক্ষার জন্য তিনি কখন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেন না। পণ্ডিচেরীতে অভিযান-কালে যখন আক্রমণ চলিতেছিল, তখন এক জন য়ুরোপীয় সেনানায়ক তাঁহার নিন্দাসূচক কি একটা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বেত্রহস্তে তাঁহাকে প্রহার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আর একবার তিনি বাজারের রাস্তায় এক জন ইংরেজ পাদ্রীকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন।

দেবীকোটার যুদ্ধে ক্লাইভ কেবলমাত্র ত্রিশ জন সৈনিক লইয়া শত্রুপক্ষের দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ত্রিশ জন সৈনিক নিহত হইয়াছিল; তথাপি তিনি যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার চারি দিকে গুলী চলিতেছিল, এবং তিনি পুনঃ পুনঃ যেন মৃত্যুমুখেই নিপতিত হইতেছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি অক্ষত দেহেই ফিরিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তিনি দস্যু প্রভৃতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও পলায়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার একটা বিশেষ-রকমের আত্মপ্রত্যয় বা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা না থাকিলে তিনি কখনই এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। আর্কটে যখন রাজপথে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন শত্রুপক্ষের সৈন্যগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রায় সকল জানালা হইতে গুলী-বর্ষণ করিতেছিল; কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া গৃহেমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছিলেন। তাঁহার চারিপার্শ্বে মৃত এবং মুমূর্ষু ইংরেজের দেহ পড়িয়া ছিল, এমন সময় দেখা গেল, শত্রুপক্ষের এক জন ভারতীয় সৈনিক জানালার ভিতর দিয়া একটি বন্দুক তুলিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিতেছে। বন্দুকের নলের মুখ তাঁহার মস্তকের কয়েক ইঞ্চি মাত্র দূরে ছিল! সৈনিকটি বন্দুকের ঘোড়া টিপিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় এক জন ইংরেজ লেফটেনাণ্টের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। লেফটেনাণ্ট ক্ষিপ্রহস্তে আঘাত করিয়া বন্দুকের নলের মুখ ফিরাইয়া দিলেন। ক্লাইভের কাণের পাশ দিয়া সেই বন্দুকের গুলী সশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছিল। তখন ক্রোধোন্মত্ত সিপাহী সেই লেফটেনাণ্টকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলে, লেফটেনাণ্টের মৃতদেহ ধরায় লুণ্ঠিত হইল।

এই ভাবে ক্লাইভ যে কতবার অতি ভীষণ এবং বিপদসঙ্কুল অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। ক্লাইভ যখন মাদ্রাজের সন্নিহিত ভোরামের শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়

ফরাসী-সৈন্যরা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার শিবির আক্রমণ করে। রাত্রিকালে তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে-ই তাঁহার একটি ভৃত্য নিদ্রিত ছিল। গভীর রাত্রিতে সুগম্ভীর বন্দুক-নির্ঘোষে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার দেহের ঠিক পাশ-দিয়া একটি গুলী সবেগে একটি বাক্সের উপর নিপতিত হইল। বাক্সটি সেই আঘাতে চূর্ণ হইল; ভৃত্যটিও গুলীর আঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। ক্লাইভ নৈশ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াই বাহিরে আসিলেন। শত্রুপক্ষ সকল দিক হইতেই তাঁহার উপর গুলী বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহার দেহের তিন চারি স্থান তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিল। অতিরিক্ত শোণিত-স্রাবে তিনি ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। সেই তমোময়ী নিশিথিনীর নিবিড় অন্ধকারে তাঁহার দেহ হইতে ক্রমাগত রক্তস্রাব হওয়ায় তিনি পলে পলে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুই জন সার্জ্জেণ্টকে তিনি ইঙ্গিতে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া-লইতে বলিলে তাহারা দুই জন তাঁহার দুই স্কন্ধ ধরিয়া তাঁহাকে একটি নিরাপদ স্থানে লইয়া যায়। প্রভাত কালে তিনি জানিতে পারেন, আক্রমণকারী ফরাসী সৈন্যগুলীর অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কেহ কেহ মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত আছে, এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিয়াছে।

এইরূপ ঘটনাবলী দেখিয়া ক্লাইভের মনেও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অদৃষ্ট-দেবতা যেন তাঁহার দ্বারা কোন কাজ করাইবার জন্যই তাঁহার জীবন-রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। মাদ্রাজের রাইটার্স-বিল্ডিংএ কিশোর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করিবার জন্য সাবধানে পিস্তলে গুলী পুরিয়া দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দুইবারই পিস্তলের ঘোড়া পড়িল অথচ গুলী বাহির হইল না, তখন এক জন সহকর্ম্মী ইংরেজ আসিয়া গবাক্ষ-পথে সেই পিস্তল চালাইলে তাহা হইতে সেই গুলী সশব্দে বাহির হইয়া গিয়াছিল; তাহা দেখিয়া ক্লাইভ বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "কোন একটা উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই আমাকে রক্ষা করা হইল। ভাগ্যদেবীর ভবিষ্যতে কোন উদ্দেশ্য আছে।" সেই সময় হইতেই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, কোন একটা মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তিনি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থাতেও মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা পাইতেছেন; এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইতেন। ঐ ধারণা তাঁহাকে যে অদ্ভুত সাহস প্রদান করিয়াছিল, তাহার ফলেই তিনি অনেক প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও কেবলমাত্র স্বয়ং রক্ষা পাইয়াছিলেন এরূপ নহে, তিনি প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই জয়লাভ করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক থর্ণটন বলিয়াছেন, "তিনি যুদ্ধ-বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া জয়লাভ করেন নাই, তিনি সৌভাগ্যের ফলেই জয়লাভ করিয়াছিলেন।"

ঠিক ঐ সময়ে বাঙ্গালায় আর এক জন ভাগ্যবান্ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা ছিল, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও ছিল; ছিল না কেবল সৌভাগ্যযোগ। তিনি অদৃষ্ট-শক্তির আনুকূল্য পাইলেও সে আনুকূল্য স্থায়ী হয় নাই। তাহা কেবল তাঁহার মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া তাঁহার মনকে বিফলতার জন্য নিরতিশয় ক্লিষ্ট করিয়াছিল। এই ব্যক্তিই মীরকাশিম। ইঁহার পিতার নাম ছিল রজী খাঁ। রজী খাঁ বিহার অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র জায়গীরদার ছিলেন। রজী খাঁর পিতা ইম্‌তিয়াজ খাঁ (Imtiaj Khan) কবি ছিলেন। মীরকাশিমের পিতা রাজ-নীতিক ব্যাপারে আদৌ লিপ্ত হইতেন না। তবে তিনি পারস্যের একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্তবংশের সন্তান বলিয়া সম্ভ্রান্তসমাজে সম্মানিত হইতেন। পাটনার নিকটস্থ কোন স্থানে রজী খাঁর জায়গীর ছিল। গোলাম হোসেন বলেন যে, পাটনার নিকট লোহানীপুরে মীরকাশিমের পিতার সমাধি ছিল। এই লোহানীপুর কোথায়, তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে সম্ভবতঃ রজী খাঁ লোহানীপুরেই বাস করিতেন, এবং ঐ স্থানেই মীরকাশিম তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বাল্যকালে মীরকাশিম তৎকালোচিত উচ্চশিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। গণিত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে মীর-কাশিমের বিশেষ বুৎপত্তি ছিল, এ-কথা তাঁহার শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করিতেন। গণিত-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল বলিয়া তিনি রাজস্ব-সম্পর্কিত কার্য্যে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহার

কোন জ্ঞানই ছিল না ; সেই জন্য উত্তর কালে তাঁহার সেই সামরিক জ্ঞানের অভাবই তাঁহার দুর্ভাগ্যের প্রবল কারণ হইয়াছিল। ক্লাইভের পক্ষে তাহা হয় নাই।

সৌভাগ্যক্রমে মীরকাশিম নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সুনজরে পড়িয়াছিলেন। তিনি পারস্যের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর, সুশিক্ষিত, এবং সুদর্শন ছিলেন বলিয়াই তিনি গুণগ্রাহী আলিবর্দ্দীর স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর আগ্রহেই মীরজাফরের কন্যা ফতিমা বেগমের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু এই বিবাহে মীরজাফরের সম্মতি ছিল না। কারণ, মীরজাফর লোকের গুণ বুঝিতেন না ; গুণের আদরও করিতে জানিতেন না। মীরজাফর মনে করিয়াছিলেন, এক জন অখ্যাতনামা ক্ষুদ্র জায়গীরদারের পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেওয়া সঙ্গত হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দ্দীর অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার অসাধ্য হইয়াছিল। আলিবর্দ্দী মীরকাশিমের বিবাহে অনেক ধনরত্ন যৌতুক, এবং মাসিক ২ শত টাকা বৃত্তি দিয়াছিলেন। এই বিবাহেই মীরকাশিমের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা হইলেও আলিবর্দ্দীর এবং সিরাজউদ্দৌলার আমলে মীরকাশিম নবাবের নিকট হইতে কোন বিশিষ্ট পদ লাভ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র নবাব-দরবারে থাকিয়া তিনি বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজনীতিক অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন।—এইটুকুই তাঁহার লাভ হইয়াছিল।

যাহা হউক, ভাগ্যলক্ষ্মী তখনও মীরকাশিমের উপর বিমুখ হয়েন নাই। মীরজাফর বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হইলেন ; ইহাতে পরোক্ষভাবে তাঁহার জামাতা মীরকাশিমের কিঞ্চিৎ সুবিধা ঘটিয়াছিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, মীরকাশিম কোনও দিন তাঁহার শ্বশুরের প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই, বা মীরজাফরও জামাতাকে উচ্চপদে স্থাপিত করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু অদৃষ্টের সহায়তায় রাজসভায় থাকিয়াই মীরকাশিম সুবা বাঙ্গালার সকল বিষয়েই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। মীরকাশিমের প্রতিভা ছিল, সেই জন্য নির্ব্বোধ মীরজাফর এবং তাঁহার পুত্র মীরণ অকারণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বদা সন্দেহ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে মীরকাশিম মীরজাফরের বিরাগভাজন ছিলেন।* মীরণ ত তাঁহার ভগিনীপতিকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন, এবং তাঁহার পিতার বিদ্বেষানলে ইন্ধন যোগাইতেন। ফলে বাঙ্গালার নবাব-সংসারে মীরকাশিমকে সাহায্য করিবার কেহই ছিল না ; ছিলেন একমাত্র আলিবর্দ্দী খাঁ। তাঁহার তিরোধানে মীরকাশিম একেবারে যেন সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু তাহা হইলেও মীরকাশিমের সকল দিকে দৃষ্টি ছিল। অযোগ্য শাসকের হস্তে বাঙ্গালা প্রদেশের কি কিরূপ দুর্গতি হইতে বসিয়াছিল, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সে-জন্য তাঁহার মনে অতিশয় উদ্বেগেরও সঞ্চার হইত বলিয়া মনে হয়। মীরকাশিম মনে করিতেন, তিনি যদি বাঙ্গালার মসনদে বসিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু সে অভিপ্রায় তিনি কাহারও নিকট কখনও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করেন নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজউদ্দৌলা পলায়ন করিলে মীরজাফর মীরকাশিমকে পলায়িত নবাবকে ধরিবার জন্য প্রেরণ করেন। সিরাজ জনৈক মুসলমান ফকিরের সান্নিধ্যে আশ্রয় লইলে সেই ফকিরই তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। সিরাজউদ্দৌলাকে ধরিবার জন্য মীরকাশিমকে কেহ পুরস্কৃত করে নাই। মীরকাশিম সিরাজ এবং সিরাজের নারীগণের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি যে ভাবে তাঁহাদের ধনরত্ন কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের হীনতাই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল মহাপাপের কার্য্য যে তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাগ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই, একথা বলা যায় না। এ সময়েও তিনি কিরূপ নিষ্ঠুর ভাবে অপরাধী এবং নিরপরাধ ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাসে বর্ণিত আছে। যদি স্বীকার করা যায় যে, তিনি নিতান্ত দায়ে পড়িয়া দেশের কার্য্যে বা দেশের সামরিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ অর্থ লইয়াছিলেন, তাহা

---

* সৈয়রমুতাক্ষরীণ (লক্ষ্ণৌএর পাঠ) ৬১১ পৃষ্ঠা।

হইলেও তাঁহার অনুষ্ঠিত ঐরূপ পৈশাচিক কার্য্যের সমর্থন করা অসম্ভব।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের দেবীপক্ষের একাদশীর দিন মীরকাশিম বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করেন। তিনি তিন বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করেন। এই সময়ে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সুদৃঢ় ভিত্তিতে সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তিনি বাঙ্গালার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন না। তাঁহার রাজত্বকালের তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের বহু লক্ষ টাকার ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছিল; এবং সমর-বিভাগের ত্রুটি সংশোধনের জন্যও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য দিকে অনেক ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া অত্যন্ত হীনাবস্থায় পতিত সমর-বিভাগের সংস্কার-সাধনের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সম্যক্‌ভাবে এই কার্য্যে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের অসঙ্গত ব্যবহারে তাহাদের সহিত তাঁহার বিবাদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। ইহার ফলে কাটোয়া, উদয়নালা (উধুয়ানালা) এবং ঘেরিয়ার যুদ্ধে নবাব-সৈন্য পরাজিত হইলেও তাহারা যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল,—তাহা এক কিম্বা দেড় বৎসরব্যাপী চেষ্টার ফল মনে করিলে তাঁহাকে প্রশংসাই করিতে হয়। তিনি যদি কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে আর কিছু কাল বিলম্ব করিতেন, তাহা হইলে তাহা বোধ হয় তাঁহার অনুকূল হইত; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ক্লাইভের যেরূপ বুদ্ধির স্থিরতা, মনের দৃঢ়তা এবং কর্ম্মকুশলতা ছিল, মীরকাশিমের তাহার কিছুই ছিল না। তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা থাকিলে তিনি উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া তাঁহার হস্তে পতিত ইংরেজ-বন্দীদিগকে হত্যা করিতে কখন ব্যাকুল হইতেন না। এই নৃশংস কার্য্যে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন, এরূপ ধারণা অসঙ্গত নহে।

বন্দী ইংরেজদিগকে হত্যা করিবার পর মীরকাশিমের ভাগ্য তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইয়াছিল। বক্সারের যুদ্ধের পূর্ব্বেই তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বক্সারের যুদ্ধের পূর্ব্বে সুজাউদ্দৌলারই আদেশে মীরকাশিম অপমানিত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গের অনেকেই রাজ-দরবারের পদস্থ ব্যক্তিদিগের আশ্রয়ে মাথা বাঁচাইবার জন্য তাঁহার আশ্রয় ছাড়িয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। (১) সুজাউদ্দৌলা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে নিঃসম্বল করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। সেই কাহিনী অতীব মর্ম্মভেদী এবং লজ্জাজনক। তাঁহার নারী, খোজা, এবং ভৃত্যবর্গকে নিদারুণ উৎপীড়ন করিয়া তাঁহার কি আছে, তাহার সন্ধান লওয়া হইয়াছিল। তাঁহার যাহা ছিল, সুজাউদ্দৌলা তাহা সমস্তই কাড়িয়া-লইয়া অদ্ভুতভাবে আতিথেয়তার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন! তাঁহাকে তখনই একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইতে হইত; তবে ভাগ্যক্রমে তিনি জনৈক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত তাঁহার কতকগুলি জহরৎ নাজিমউদ্দৌলার রাজ্যে পাঠাইয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর মীরকাশিম ভাগ্যক্রমে সুজাউদ্দৌলার কবল হইতে পলায়ন করিয়া এলাহাবাদে গমন করেন, এবং তথা হইতে তাঁহার বন্দী পরিবারবর্গকে কৌশলে উদ্ধার করিয়া বেরিলীতে গমন করিয়া রোহিলা-আফগানদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তখনও মীরকাশিম তাঁহার হৃতরাজ্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাকে সুজাউদ্দৌলা একেবারে নিঃস্ব করিয়াছিলেন। অর্থ না হইলে ত আর বাঙ্গালায় ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান করা সম্ভব হইতে পারে না; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতিকূল হইয়াছিলেন। রোহিলা-আফগানদিগের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছিল; তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারে নাই। তিনি বিশ্বাস করিয়া যাহার নিকট যাহা ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অসহায় অবস্থা দেখিয়া কেহই তাঁহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করে নাই। বালকদাস নামক এক জন পোদ্দারের নিকট তিনি ১২ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সেই ব্যক্তি কেবল তাঁহাকে আশী

(১) সাবর-উল মুতাক্ষরীণ, ২য় খণ্ড।

হাজার টাকা ফেরত দিয়াছিল। (২) এ-দিকে সুজা-উদ্দৌলার সহিত ইংরেজরা সন্ধি করিবার সময় মীর-কাশিমকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য অত্যন্ত জিদ করিতেছিলেন। সুজাউদ্দৌলা মুখে বলিয়াছিলেন বটে যে, তিনি তাহাতে সম্মত হইতে পারেন না, কারণ, তাহা হইলে সমগ্র মুসলমান সমাজ কলঙ্কী বলিয়া চিরকাল তাঁহার নিন্দা করিবে। কিন্তু বোধ হয়, কার্য্যতঃ মীরকাশিম সে সময়ে তাহার হাত-ছাড়া হইয়া রোহিলা-সর্দ্দার ডুণ্ডি (Dundi) খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইভ সেই জন্য সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধির এইরূপ একটা সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি কখনই মীরকাশিমকে কোনরূপে তাঁহার রাজ্যে স্থান দিতে কিম্বা সাহায্য করিতে পারিবেন না।

কিন্তু তাহা হইলেও মীরকাশিম একেবারে বাঙ্গালার গদী উদ্ধারের আশা ত্যাগ করেন নাই। বিশ্বস্ত ভৃত্যের মারফৎ যে কয়েকখানি মূল্যবান রত্ন তিনি সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন,—তাহাই ছিল তাঁহার সম্বল। সেই সম্বলে সুবা বাঙ্গালার অধীশ্বর ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইবার আশা তাঁহার পক্ষে তখন বাতুলতা মাত্র।

মীরকাশিম এইরূপ অসহায় এবং নির্ব্বাসিত অবস্থায় পতিত হইয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালার মসনদ উদ্ধারের আশায় রোহিলা-আফগান, জাঠ, নাজিবউদ্দৌলা, আমেদশাহ আবদালি, শিখ্, মারহাট্টা, ফরাসী এবং হাইদার আলির নিকট সাহায্য-প্রার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু সকল দিকে এক-একটা প্রবল বাধা উপস্থিত হইয়াছিল। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে যখন আমেদ-শাহ আবদালি ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, তিনি মীর-কাশিমকে সাহায্য করিবার জন্য আসিতেছেন। মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সীতাব রায় গবর্ণরকে বলেন যে, মীর-কাশিমই আবদালির অভিযানের কারণ। সে জন্য ইংরেজরাও প্রস্তুত ছিলেন। আমেদশাহও রঘুনাথ রাওকে লিখিয়াছিলেন, মীরকাশিমকে বন্দী করিবার এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণের অপরাধে সুজাউদ্দৌলাকে শাস্তি দিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছেন। সে জন্য ইংরেজরা সিরাজপুর, এলাহাবাদ এবং বাঁকিপুরে সৈন্য রাখিয়াছিলেন; কিন্তু একটা না একটা প্রচণ্ড বাধা অদৃষ্টের ফুৎকারের ন্যায় মীরকাশিম আলির আশার দীপ নির্ব্বাপিত করিয়াছিল। মীরকাশিম প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইলেও চেষ্টায় বিরত হন নাই; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল।

অবশেষে উদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, তিনি দিল্লীর রাজপথে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুন তারিখে সাজাহানাবাদে উদরী রোগে পরলোক গমন করেন। তিনি তাঁহার সন্তানের জন্য কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

মীরকাশিম প্রতিভাশালী, বুদ্ধিমান, এবং কর্ম্মকুশল ছিলেন! প্রথম জীবনে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কিছু প্রসন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি বাঙ্গালার নবাব হইতে পারিয়াছিলেন। অদৃষ্টফলেই তিনি আলিবর্দ্দীর প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। অদৃষ্ট-বলেই তিনি মীরজাফরের কন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহের ফলে তাঁহার যেরূপ সৌভাগ্য হওয়া উচিত ছিল, সেরূপ সৌভাগ্য এবং সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। ভাগ্যবশে এবং বুদ্ধি-কৌশলে শেষে তিনি নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও নিজ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন না। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন রাজকোষে অর্থের অত্যন্ত অভাব ছিল। তিনি টাকা তুলিবার আগ্রহের আতিশয্যে জমিদার, সওদাগর প্রভৃতির অর্থ শোষণ করিয়া তাঁহার শত্রু-সংখ্যা অত্যন্ত বর্দ্ধিত করেন; তাহাও তাঁহার অধঃপতনের অন্যতম কারণ। তাঁহার ভাগ্যফলে তাঁহার চরম দুর্দ্দশা এবং ক্লাইভের ভাগ্যফলেই বাঙ্গালায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

---

(২) Original Secret Consultation, 7-Sept. 1775, No 10.

টবের গাছে সার

গাছের জমির পক্ষে লোহাচুর উৎকৃষ্ট সার। এ সার দিবার জন্ম অনেকে টবের মাটিতে পেরেক বা লোহার কুচি গুঁজিয়া রাখেন। তাহাতে লোহাচুর হইতে সার-গ্রহণে মাটীর তেমন সুবিধা ঘটে না। তার চেয়ে বাড়ি তৈয়ারী করিবার জন্ম যে লোহা-চুর আমরা ব্যবহার করি, টবের মাটীতে সেই লোহা-চুর আলগা-ভাবে মিশাইয়া দিলে জমিতে চমৎকার সার হইবে।

টবের মাটীতে লোহাচুর

—

মাঠ ও বাগিচা সাফ করা

বাগানকে যাঁরা বেশ সাফ রাখিতে চান, তাঁদের জন্ম এক-রকম লন-সুইপার তৈয়ারী হইয়াছে। এটি গ্যাসের সাহায্যে চলে।
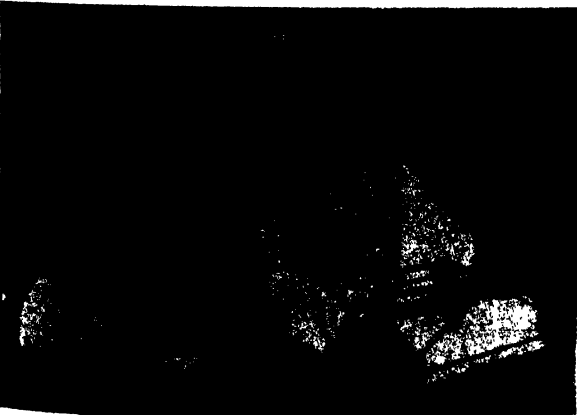
লন্ সাফ

টেনিশ খেলার লনে ঘাস-ছাঁটা যে "মোয়ার" ব্যবহার করা হয়, এ সুইপার-যন্ত্রটি সেই ছাঁচে তৈয়ারী; অধিকন্তু ইহার সঙ্গে পুরু কাপড় লাগানো আছে। যন্ত্রটি মাঠে বা বাগানে চালাইবার সময় ঘাস ও আগাছা-পত্র কাটিয়া একেবারে ঐ কাপড়ের মধ্যে তাহা জমা হয় এবং এ কাপড় ভরিয়া উঠিলে সে সব আগাছার আবর্জ্জনা জড়ো করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিন।

—

হাঁচ্চো

একটি হাঁচি কতখানি অনর্থের সৃষ্টি করে, ভাবিয়া দেখিয়াছেন? সম্প্রতি মাশাচুশেট্সের ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজির অধ্যক্ষ প্রোফেসর মার্শাল খুব তীব্র আলোক-রশ্মিপাতে হাঁচির ফটো তুলিয়াছেন। ফটো লইয়া তিনি বৈজ্ঞানিক ভাবে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, একটি হাঁচিতে যে জলীয়-বাষ্প নির্গত হয়, তাহা

হ্যাঁচ্চো

মিনিটে দু' মাইল-রেটে শূন্তপথ পরিব্যাপ্ত করিয়া তোলে। তার অর্থ, এ দু' মাইলের মধ্যে যে সব লোকজন থাকে, ঐ একটি হাঁচির আর্দ্র-বাষ্পে যত রোগ-বীজাণু আছে, সে বীজাণুর দল সেই সব লোকজনকে আক্রমণ করে। হাঁচির যে জলীয়-বাষ্প আমরা সাদা চোখে দেখিতে পাই না; মার্শাল সাহেবের আলোক-চিত্রে সে হাঁচির বেগটুকু প্রত্যক্ষ করিয়া সকলের সতর্ক হওয়া উচিত!

—

নূতন টাইপ-রাইটার

যাঁরা কাজের মানুষ, কাজের খাতিরে নিত্য যাঁদের বাহিরে ছুটা-ছুটি করিতে হয়, সহজে যাহাতে টাইপ-রাইটার যন্ত্রটিও তাঁরা সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে পারেন, এজন্ত নূতন ধরণের 'পোর্টেব্‌ল্‌'

নূতন-ষ্ট্যাণ্ডে টাইপ রাইটার

টাইপ-রাইটার-যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। এ টাইপ-রাইটারের জন্ত যে বাক্স আছে, সে-বাক্সে টাইপ-রাইটার ধরিবে, কাগজপত্র ধরিবে এবং সেই সঙ্গে ধরিবে ক্যামেরার তেপায়া-ষ্ট্যাণ্ডের মতো ষ্ট্যাণ্ড। যখন যেখানে প্রয়োজন, ষ্ট্যাণ্ড খুলিয়া তার উপর বাক্সটি অাঁটিয়া দিন। বাক্সটি টেবিলের কাজ করিবে এবং এই বাক্স-টেবিলের উপর টাইপ-রাইটার-যন্ত্র রাখিয়া লেখা-পড়ার কাজ করুন। বাক্সে টাইপ-রাইটার-যন্ত্র ভরিয়া রাখিলে বহিতে অসুবিধা হইবে না; বাক্সটিকে বেশ হাল্‌কা করা হইতেছে।

কার্ড-বোর্ডের চেয়ার-টেবিল

কাঠের চেয়েও দামে শস্তা অথচ কাঠের মতো মজবুত—কার্ড-বোর্ডের চেয়ার টেবিল তৈয়ারী হইতেছে। এ চেয়ারে অফিসের বড় সাহেব বসিতেছেন; এ টেবিলে কাগজপত্র খাতা রাখিয়া লিখিতেছেন; এ চেয়ারে বসিয়া এবং এ টেবিলে টাইপ-রাইটার-যন্ত্র রাখিয়া টাইপিষ্ট টাইপিংয়ের কাজ করিতেছেন। অথচ কাঠের চেয়ার-টেবিলের চেয়ে কার্ডবোর্ডের এই চেয়ার-টেবিলে সুবিধা

পাখা নয়—চেয়ার-টেবিল

এই যে, কাজের শেষে এ চেয়ার-টেবিল মুড়িয়া ভাঁজ করিয়া যেখানে খুশী রাখুন। কোণের জোড়গুলি ডাভ্‌টেল্‌-ছাঁচে রচিত।

উড়ন-পায়রার বাঁশী

পায়রা পোষার সখ অনেকেরই আছে। পোষা পায়রাগুলিকে নিত্যদিন সকালে উড়াইয়া তাঁরা যে আনন্দ পান তাহা অপার, সন্দেহ নাই! নিউ-জার্শির এক ভদ্রলোক অনেক পায়রা পুষিয়াছেন। তিনিও নিত্য পায়রা উড়ান। সম্প্রতি কচি-বাঁশে পপলিন জড়াইয়া ছোট-ছোট বাঁশী তৈয়ারী করিয়া সেই বাঁশী তিনি পায়রার পালকের সঙ্গে রেশমী-সূতায় বাঁধিয়া আকাশে পায়রা ছাড়িতেছেন। এ সব পায়রা আকাশে ওড়ে, আর পালকে-বাঁধা বাঁশী-গুলিতে বাতাস ঢুকিয়া বিচিত্র মধুর বংশী রব তোলে। তাঁর বাঁশী-বাঁধা পায়রা আকাশে উড়িলে আকাশ-বাতাস সুরে সুরময় হইয়া ওঠে!

ঐ বাঁশী বাজে !

মাথার কেশে স্বাস্থ্য-সঞ্চার

মাথার চুল ওঠা, মাথায় টাক পড়া, মাথায় মরামাস হওয়া—এ-সব রোগের প্রতিকারের প্রকৃষ্ট উপায় মাথার ঘর্ষণ-মর্দ্দন ! আমাদের দু'হাতে দশটিমাত্র আঙুল; দশ আঙুলে ঘর্ষণ-মর্দ্দন কতটুকু বা হয় ! এজন্ত মাথার ঘর্ষণ-মর্দ্দন কল্পে ৪৮০টি অঙ্গুলিযুক্ত হালকা 'মেশাজ-যন্ত্র' নির্ম্মিত হইয়াছে। এ যন্ত্রটি টুপির মতো মাথায় আঁটিয়া

মেশাজ-টুপি

বাল্ব্‌, টিপুন্‌—চারশো-আশি আঙুলে এ-যন্ত্র মাথা ডলিয়া-মলিয়া মাথার ও-সব রোগ-বালাই সারাইয়া দিবে।

রূপ-প্রসাধন

যাঁরা মুখের ও গায়ের রঙ উজ্জ্বল এবং ত্বক মসৃণ করিতে চান, তাঁদের জন্ত এক রকম ভ্যাকুয়াম ক্লীনার নির্ম্মিত হইয়াছে এ যন্ত্রটির আকার মোচার মতো। তলায় রবারের আবরণ আছে—আবরণে ছোট ব্রাশ আঁটা। যন্ত্রটির মুখাগ্রে আছে ছোট-ছোট কয়েকটি বিঁধ। তলায় রবারের চাপ দিয়া ডগার দিকটি মুখে-গায়ে লাগাইয়া চালনা করুন, মুখে-গায়ে যত ক্লেদ বা ধূলা-বালি ময়লা জমিয়া থাকিবে, ভ্যাকুয়াম-সৃষ্টির ফলে সে গুলি উবিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে। মুখে-গায়ে কোনো রকম পরিষ্কার-কারক (cleansing) ক্রীম বা সর্-ময়দা লাগাইয়া তারপর এ যন্ত্রটি ব্যবহার করিতে হয়। ঘাড়ে গলায় বাহুমূলে, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে এ যন্ত্র পরিচালনা করা চলে। এ যন্ত্রের গুণে অঙ্গের মলা-মাটী উঠিয়া যাইবে; গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল এবং চামড়া কোমল ও মসৃণ হইবে।

রূপসীর বন্ধু

আলোর দীপ্তি

রিফ্লেক্টরের সংযোগ ঘটিলে বাতির আলোক-রশ্মি বহুগুণ বাড়ে।

রিফ্লেক্টর
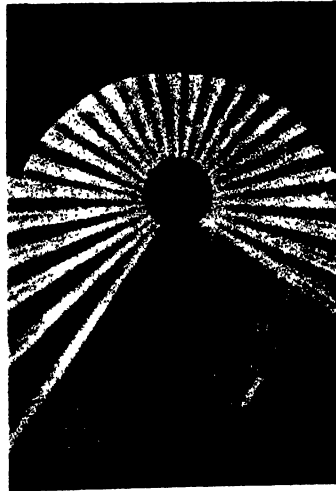
আর এক রকম

এজন্ত প্রাচীন যুগ হইতে মানব-সমাজে রিফ্লেক্টরের নির্ম্মাণে নানা আয়োজন চলিয়াছে। সম্প্রতি আঁকা-বাকা ছাঁদের নানা রিফ্লেক্টর নির্ম্মিত হইতেছে। এগুলির সাহায্যে ঘরে-বাহিরে আশ্চর্য্য কৌশলে আলোক-সম্পাত নিয়ন্ত্রিত করা যেমন সম্ভব হইয়াছে, তেমনি সে আলোর তীব্রতা এবং দীপ্তিও বহুগুণ বর্দ্ধিত করা যাইতেছে

ব্যথায় সেঁক

বাতের ব্যথায় কিম্বা ফিক-ব্যথায় কিম্বা অন্য রকম শারীরিক ব্যথা-বেদনায় গরম জলের সেঁক দিলে ব্যথা সারে, আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। সম্প্রতি এক রকম প্যাড তৈয়ারী হইয়াছে—টর্চ-ল্যাম্পের মতো এ প্যাডের সঙ্গে

জুতা নয়—সেঁক্ দিন্!

ছোট ব্যাটারির সংযোগ আছে। দেহের যেখানে ব্যথা, সেখানে এ প্যাড চাপাইয়া রাখুন,—ষ্ট্র্যাপ দিয়া এ প্যাড দেহাংশে বাঁধা চলে। বিনা-আয়াসে গরম সেঁক-উপভোগের এ ব্যবস্থার তুলনা নাই!

——

উভ-চর মোটর-গাড়ী
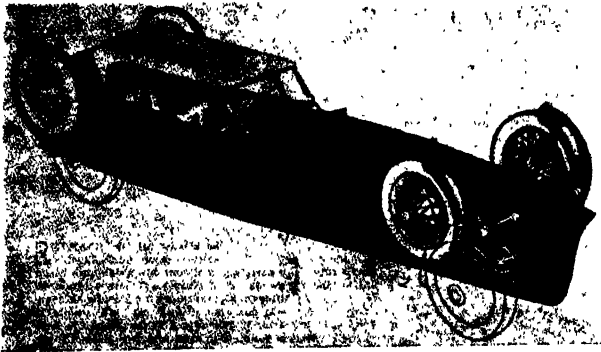
নৌকা-গাড়ী

আমেরিকার মিয়ামিতে বোটের ধরণে মোটর-গাড়ীর বডি তৈয়ারী হইতেছে। এ মোটরে এমন কৌশলে চারখানি চাকা সংলগ্ন করা হইয়াছে যে, স্ক্রুপের প্যাঁচ ঘুরাইয়া চাকা-চারখানিকে গাড়ীর চার প্রান্তে উঁচু করিয়া রাখা চলে; আবার প্রয়োজন-বোধে সে চাকা চারখানিকে গাড়ীর চাকার মতো ভূমিস্পর্শী করা যায়। কৌশলে নির্ম্মিত গাড়ীর চাকা চারখানি উর্দ্ধে তুলিয়া রাখিলে এ-গাড়ী বোটের মতো জলে ভাসিবে; আবার জল হইতে তুলিয়া চাকা নামাইয়া পথে ছাড়িয়া দিন, মোটর-গাড়ীর রূপ ধরিয়া এ-গাড়ী তখন পথে চলিবে!

——

বৈদ্যুতিক ঝর্ণা

যাঁরা সৌখীন, কত রকমের জিনিষ কিনিয়া তাঁরা ঘরের সজ্জা-সাধন করেন। সম্প্রতি আমেরিকান্ শিল্পীরা এলুমিনিয়াম দিয়া এক রকম নকল ঝর্ণা তৈয়ারী করিয়াছেন। ঘরের টেবিলে, টুলে বা আলমারির মাথায় এটি রাখা চলে। এ ঝর্ণা প্রাণ পায় বৈদ্যুতিক প্রবাহে। প্রয়োজন শুধু একটি প্লাগের। যে প্লাগের সাহায্যে টেবিল-ফ্যান চলে এবং টেবিল-ল্যাম্প জ্বলে, এ ঝর্ণাও ঠিক সেই প্লাগের সংযোগে চলিবে। পাত্রটি একবার শুধু জলে পূর্ণ করুন; তার পর অবিরাম ঝর্ণা-ধারে সে জল উৎসারিত হইবে। গ্রীষ্মকালে পাত্রে দিন গোলাপ জল; কিম্বা জলে কোনো রকম সুরভি-এসেন্স মিশাইয়া দিন, উৎসারিত ঝর্ণাধারার সুমিষ্ট গন্ধে

ঝর্ণা ধারা

ঘর ভরিয়া থাকিবে! পাত্রে রঙীন জল দিন, ঝর্ণার উৎসারিত জল-ধারায় রামধনুর বাহার খুলিবে!

দ্বিতীয় খণ্ড

১

মার্সেই বন্দরে মহা কোলাহল ও ব্যস্ততার বিরাম নাই ; কারণ Overland Express আসিয়া পড়িয়াছে। কিছুকাল পরেই ভারতগামী জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিবে। একটি বাঙ্গালী যুবক জাহাজের ডেকের উপর রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া অন্যমনস্ক ভাবে এই জনতার হুড়াহুড়ির দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। সে কত জাতির কত ধরণের যাত্রী জাহাজে উঠিতে দেখিল, কিন্তু কিছুই যেন তাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। যুবকের ঔদাস্যপূর্ণ প্রাণ কি যে চায়, তাহা সে যেন জানে না! অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্দেশ্যহীন জীবনে সে যেন কোন আলোকের সন্ধান করিতেছে। এমন সময় সে নবাগত যাত্রীর দলে একটি ভারতীয়া যুবতী আসিতেছে দেখিতে পাইল ; আরও দেখিল, একটি প্রৌঢ় ইংরেজ ও এক জন প্রৌঢ়া ইংরেজ-মহিলা তাহার সঙ্গে ছিলেন। যুবতীর চক্ষুতে আনন্দের দীপ্তি, ওষ্ঠে মৃদু হাসি, মুখে শান্তি ও প্রসন্নতা পরিস্ফুট। সমস্ত অঙ্গ লীলায়িত ভঙ্গিমায় মনোরম, এবং তাহার প্রসন্ন মুখখানি যেন একটি সদ্য-বিকশিত শতদল। যুবকের অকস্মাৎ মনে হইল, রাফায়েলের অঙ্কিত "ম্যাডোনা"-মূর্ত্তি যেন জীবন্ত হইয়া মরালের ন্যায় গতিভঙ্গিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ যেন সত্য নহে, একটা স্বপ্নের ছবি!

যুবক কি ভাবিয়া চমকিয়া উঠিল। কোন যুবতীর দিকে লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তাহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে লাভের আকাঙ্ক্ষা করিবার তাহার কি অধিকার? যদিও সর্ব্বত্র সে অবিবাহিত বলিয়াই পরিচিত, তবু সে ভুলিতে পারে না, সে অবিবাহিত নহে। যদিও সেই বন্ধন এক-রাত্রির জন্য, তথাপি নয় বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া সে যে বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছে, ইহা অতি কঠোর সত্য যে, সে তাহার ধর্ম্মপত্নী। সে তাহাকে দেখে নাই, মন্ত্রোচ্চারণের সময় মনে মনে সকলই অস্বীকার করিয়াছিল, বিবাহটাও তাহার স্বেচ্ছাকৃত নহে, তথাপি পূর্ব্বরাত্রির স্বপ্নের মত সকল বিষয় তাহার মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এত দিন সে তাহার পরিণীতা পত্নীর সন্ধান লয় নাই, সে জন্য তাহার মনে ক্ষোভ ছিল না ; কিন্তু এই মানস-প্রতিমাকে দেখিয়া সে বিচলিত হইল। নয় বৎসর ধরিয়া সে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার সকল অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ; কেন, তাহা সে জানে না,—বোধ হয়, মনের মত কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। আজ বুঝি তাহার জীবনে প্রথম বসন্ত আসিয়াছে ; বুঝি এই অপরিচিতা যুবতীরই প্রতীক্ষায় সে এত দিন ঔদাসীন্যে কাটাইয়াছে। কিন্তু আজই আবার কেন পুরাতনের স্মৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল?

এই যুবক সুনীল দত্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। সে এখন ভারতীয় রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়ার, ছুটীতে য়ুরোপ-ভ্রমণে আসিয়াছিল ; এখন দেশে ফিরিতেছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহার পিতা তখন তাহাকে কলিকাতায় আফিস খুলিয়া স্বাধীন ভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে বলেন। সুনীল কিন্তু তাহা করে নাই ; সে রেল-বিভাগের কর্ম্মচারী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। পিতার সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায়, অশান্তির ভয়ে সে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিল। পিতার উদ্ধত আচরণ ও কঠোর প্রকৃতি সুনীলের অসহ্য হইয়াছিল, এবং বিবাহ

বিষয়ে পিতার প্রচণ্ড জেদ্‌ও তাহার বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

সুনীল আত্মহারা হইয়া অতীতের কথা ভাবিতেছে, এমন সময় একটি যুবতীর কণ্ঠে তাহার নাম শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। যুবতী তাহাকে বলিতেছিল, "কি সুনীলদা, এত তন্ময় হ'য়ে কি ভাব্‌চো ?"—পিছন ফিরিয়া নিনার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখিয়া বিস্মিত ভাবে সুনীল বলিল, "আরে! তুমি এলে কোথা থেকে? আর কখনই-বা জাহাজে উঠ্‌লে ?"

সহাস্যে নিনা বলিল, "তোমার সাম্‌নে দিয়েই তো উঠ্‌লাম। কতবার তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবার চেষ্টা ক'র্‌লাম, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না! ঐ দিকেই চেয়ে ছিলে, কিন্তু বিভোর হ'য়ে কি যে ভাব্‌ছিলে কে জানে? কোন প্রেয়সীর কথা না কি ?"

সুনীল বলিয়া ফেলিল, "লাজুক নিনা ক'মাস বিলেতে থেকেই বুলী আওড়াতে শিখেছে! প্রেয়সী আবার আমার কে ?"

"নিনা মাথা নাড়িয়া বলিল, "কেন? আমি কি কচি খুকী যে, একটুও রসিকতা করতে পারবো না? বল না, তোমার প্রেয়সীটি কে? কার জন্যে এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে কর-নি ?"

সুনীল। যদি তেমন কেউ থাক্‌ত, তা'কে তো সঙ্গেই নিয়ে যেতাম। এবার আর রেখে যাব কোন্ দুঃখে? আমি তো এখন উপার্জ্জনক্ষম।

নিনা সংক্ষেপে বলিল, "তবে প্রেমিকের মত তন্ময় হ'য়ে কি ভাব্‌ছিলে ?"

সুনীল এবার গম্ভীর হইয়া বলিল, "প্রেমের কথাও যে কইছ? মেশো মহাশয়ের উচিত তোমার এইবার বিয়ে দেওয়া। এত ছেলে তোমাদের লণ্ডনের বাড়ীতে যেত; কাউকে তোমার পছন্দ হ'ল না ?"

ভ্রূভঙ্গি করিয়া নিনা বলিল, "বেশ যা'হোক, একেবারে উল্টো চাপ! যাও, আমি চল্লাম। তোমায় দেখে কোথায় ভাব্‌লাম, জাহাজে একটা সঙ্গী পাওয়া গেল, ছুটে এলাম সব আগে তোমারই কাছে, তা তুমি ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ ক'রে দিলে!"

সুনীল মুরুব্বির সুরে বলিল, "আরে চটো কেন? তোমার মত সুন্দরী এই বুড়োর সঙ্গ চায়, এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু যা'ক ও-সব কথা। তোমরা যে এত আগেই চল্লে? আমি তো জান্‌তাম, তোমরা অক্টোবরের শেষে যাবে।"

নিনা বলিল, "বড় দিদির ছেলেদের জন্য মা'র মন কেমন কর্‌ছিল, যাব যাব করছিলেন; এমন সময় বাবার কি চিঠি এল, বল্লেন যে, এই মেলেই যেতে হবে।"

সুনীল। তোমার তো বড় বিপদ হ'ল তা' হ'লে।

নিনা। না গো না! বাঙ্‌লা দেশের মেয়েরা ছেলেদের মত নয়, তারা স্বদেশ ছেড়ে বেশী দিন দূরে থাক্‌তে ভালবাসে না।"

সুনীল। দেশ-ভক্তি উছ্‌লে উঠেছে যে!

এমন সময় দেখা গেল, ব্যারিষ্টার বিনয় সিন্‌হা ও তাঁহার স্ত্রী সেই দিকেই আসিতেছেন।—দেখিয়া সুনীল নিনাকে বলিল, "চল, তোমার বাবা-মা এই দিকেই আস্‌ছেন।"

সুনীল প্রণাম করিয়া উঠিতেই বিনয় বাবু বলিলেন, "এই যে সুনীল! তুমিও এই জাহাজেই যাচ্ছ? ভালই হ'ল। নিনা তো জাহাজে ওঠ্‌বার আগেই তোমায় দেখ্‌তে পেয়েছে।"

বিনয় বাবু বেশ জানিতেন, সুনীল এই জাহাজেই দেশে ফিরিবে। বীরেন্দ্র বাবুর চিঠিতে খবরটা পাইয়াই তাঁহাদের যাওয়া স্থির হইয়াছে। পাঁচ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা দুই বন্ধুতে চেষ্টা করিতেছেন—সুনীলের সহিত যাহাতে নিনার বিবাহ হয়। প্রথমে সুনীল বলিয়াছিল, "ব্যস্ত কি? নিনা তো এখনও ছোট আছে, সবে পনের বছরের। ওর পড়াশুনায় এরই মধ্যে ব্যাঘাত দিয়ে কি হবে ?"

তাহার পরে যতবারই কথাটা উঠিয়াছে, সে একটা না একটা ওজর করিয়াছে। একবার দত্ত সাহেব অত্যন্ত জেদ্ করায় সে বলিয়াছিল, "আমার পূর্ব্বের বিয়ের সব কথা ওঁদের না ব'লে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌ব না।" আবার ছুটীতে য়ুরোপে আসিবার ঠিক আগে ও-কথা উঠিলে সুনীল বলিয়াছিল, "ধর্ম্মপত্নীকে কি দোষে ত্যাগ কর্‌ব? তা'র তো কোনও দোষ নেই।"—বীরেন্দ্র বাবু ইহাতে কষ্ট হইয়া বলেন, "তুমি যদি তা'কে ফিরে নেবার কথা তোল

তো তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না।" —তিনি এই প্রকার দম্ভ প্রকাশ করায় সুনীলেরও জেদ্ বাড়িল; বলিল, "আমি কিছুতেই আর কাউকে বিয়ে কর্‌ব না।"—বিনয় বাবুরা এ সব কথা জানিতেন না। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, জাহাজে সুনীল ও নিনার একসঙ্গে কয় দিন কাছাকাছি থাকা ভাল। পরস্পরের নিকট থাকিলে হয় তো উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। বৈষয়িক বৃদ্ধরা বোধ হয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবকদের নিষ্ঠাকে উপেক্ষা করেন!

অল্প পরে বিনয় বাবু ও তাঁহার স্ত্রী কেবিনে প্রবেশ করিলেন। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। সুনীল ও নিনা ডেকে দাঁড়াইয়া তটভূমির শোভা দেখিতে লাগিল। বন্দর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে দৃষ্টিপথে পড়িল—পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে স্থাপিত একটি সুদৃশ্য ভজনালয়। যাত্রীরা সকলেই সমুদ্রতটের সুন্দর পাহাড় ও তাহাতে নির্ম্মিত এই ভজনালয়টির মনোরম দৃশ্য দেখিতেছে, সেই সময় হঠাৎ নিনা বলিল, "দেখ সুনীলদা, কি সুন্দর একটি মেয়ে!" সুনীল ফিরিয়া দেখিল—এ সেই সুন্দরী, ইহাকেই সে বন্দরে দেখিয়াছিল। তবে তো সে দেবী নহে, কল্পনারাজ্যের ম্যাডোনাও নহে, মানবী! আবার নিনা বলিল, "ও কি বাঙ্গালী, সুনীলদা? দেখ না, পোষাক দেখে তাই তো মনে হয়।"

সুনীল। আমি কি ক'রে বলুব? তবে আমাদের বাঙ্গালীর মেয়ে ব'লেই তো মনে হয়।

নিনা। আমায় ওর সঙ্গে ভাব করিয়ে দাও না; —বড় সুন্দর মেয়েটি!

সুনীল অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, "আমি কোথেকে ভাব করিয়ে দোব? তুমি নিজে থেকেই ভাব করতে যাও।"

সুনীলের হৃদয় আলোড়িত হইল। কে ঐ স্বপ্নময়ী? যেমন স্নিগ্ধ রূপ, তেমনই সুন্দর প্রকৃতির পরিচয় যেন তাহার চলনে ও ভঙ্গীতে। যেরূপ তন্ময় ভাবে সে পর্ব্বতশৃঙ্গের দিকে চাহিয়া আছে, দেখিয়া মনে হয়, তাহার প্রাণের কোন গুপ্ত বেদনা যেন জগন্মাতাকে জ্ঞাপন করিতেছে। সে কি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী? তাহার নিবেদন কি খৃষ্টজননী মেরীর নিকট? সুনীল কত কথাই ভাবিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কি করিয়া তাহার পরিচয় পাইবে, এই চিন্তায় সে ব্যাকুল হইল।

২

তিন দিন বড়ই দুর্য্যোগ গিয়াছে। পবনের প্রচণ্ড তাণ্ডবের নিবৃত্তি নাই। সমুদ্রবক্ষ সর্ব্বদা উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল, উদ্বেলিত তরঙ্গরাশি তুষার-ধবল ফেনকিরীট-মণ্ডিত। যাহাদের চক্ষু ছিল—তাহারা সমুদ্রের এই বিরাট সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিল।

সুনীল নিজের কামরার নিভৃত কোটরে ব্যাকুল হৃদয়ে এই তিনটি দিন কাটাইয়া দিয়াছে। দিবারাত্রি সেই অসামান্য রূপসীর ছবিখানি তাহার হৃদয় ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কে সে? কোথায় থাকে? যাত্রীদিগের তালিকায় এক ডাক্তার মিস্ এস্. মিত্রের নাম সে দেখিয়াছে—নিঃসন্দেহে সেই তরুণীরই এই নাম। তাহাকে দেখিয়া অবধি সুনীল মনের দৃঢ়তা হারাইয়াছে। যদি তাহাকে পায় তো সুনীল জীবনের চিরসঙ্গিনীরূপে তাহাকে বরণ করিয়া সুখী হইবে। কিন্তু কি ভাবে তাহাকে পাইবে, সেই চিন্তা সুনীলের হৃদয়ে যে ঝড় তুলিল, তাহা বোধ হয় বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা প্রবলতর।

তিন দিনের পর অতি প্রত্যুষেই ঝড় থামিল। সুনীল কেবিন হইতে ডেকের খোলা হাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। উষাদেবী নিশীথিনীর কৃষ্ণাবরণ অপসারিত করিয়া হাসিতে হাসিতে অরুণোদয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছেন। পূর্ব্বাকাশে আরক্তিম আভার মেঘমালা যেন সুবর্ণমণ্ডিত, আর অর্ণবপোত পাগলের মত ছুটিয়াছে সেই সুবর্ণপুরীর অভিমুখে। কিন্তু যতই যায়, ততই সেই শোভাময় নিকেতন যেন দূরে সরিয়া যায়! দেখিতে দেখিতে সমুদ্রবক্ষে যেন বরুণের স্বর্ণসিংহাসনের আভাস পাওয়া গেল। ক্রমে তপ্তকাঞ্চন-প্রায় বিন্দু বিস্তৃত হইয়া নীলবক্ষে ভাসিয়া উঠিল। আরও ভাল করিয়া নবারুণের উদয়-শোভা দর্শন করিতে সুনীল ডেকের সামনের দিকে সরিয়া গেল। সেই দিকে গিয়া যে শোভা দেখিতে আসিয়াছিল তাহা ভুলিল, অন্য যে দৃশ্য দেখিল, তন্ময় হইয়া তাহাতে সে ডুবিয়া গেল।

নিভৃত নির্জ্জনে সদ্যস্নাতা যুবতী নবোদিত রবির বন্দনা

করিতেছে। যুবতীর খালি পা, পরণে শুভ্র পট্টবস্ত্র, সিক্ত তরঙ্গায়িত কেশদাম পৃষ্ঠদেশে বিস্তৃত, দুই একটি অলক অনিল-হিল্লোলে সঞ্চালিত; প্রণতার গ্রীবাদেশ হংসীকণ্ঠের ন্যায় মনোহর, আর তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভক্তিরসের ধারায় আপ্লুত। সুনীল মুগ্ধ-নেত্রে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে এই অপরূপ রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুকাল পরেই সমুদ্রবক্ষ হইতে তপনদেব আত্ম-প্রকাশ করিলেন ও কিরণমালা তরঙ্গশীর্ষ চুম্বন করিয়া হীরকজ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিল। যুবতীর পূজা সমাপ্ত হইয়াছে; সে সূর্য্য-অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দেখে, সুনীল নির্নিমেষ নেত্রে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে! সে থমকিয়া দাঁড়াইল, সুনীলও তাড়াতাড়ি লজ্জা ঢাকিবার জন্য বলিল, "আপনি হিন্দু! কি অপূর্ব্ব আপনার নিষ্ঠা!"

এই কণ্ঠস্বর যুবতীকে আকুল করিল। এ যে চির-পরিচিত, কিন্তু বহু দিনের বিস্মৃত! সে লজ্জা-বিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমি হিন্দু।" বলিয়া সে একবার সুনীলের মুখপানে চাহিতেই তাহার সমস্ত শরীরে যেন এক আনন্দ-শিহরণ হিল্লোলিত হইল। কিন্তু আনন্দ কিসের? স্মৃতি যদি সত্যই হয়, তাহাতে আশার কি আছে?

সুনীল। আপনার সৎসাহস ধন্য। এই বিধর্ম্মীদের পোতে বিধর্ম্মী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে নির্ভীক হৃদয়ে আপনি স্বধর্ম্মের কর্ত্তব্যপালন করছেন!

যুবতী। সাহস কোথায় দেখলেন? পাছে কেউ দেখতে পায়, আমাদের ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করে, তাই তো এত ভোরে এই আড়ালে এসে সূর্য্যবন্দনাটা সেরে নিচ্ছি। এ-বেশে অন্য সময় তো ডেকে আসতে আমার সাহস হয় না।

এই বলিয়া সে কেবিনে ফিরিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইল। সুনীল একবার ইতঃস্তত: করিয়া বলিল, "আবার কখন দেখা হবে? আমার একটি বান্ধবী আপনার সঙ্গে ভাব করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে আছে।"

যুবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি এখনই আবার আসব। কেবিনে থাকা আমার ভাল লাগে না। আপনি কি কোন বাঙ্গালী মেয়ের কথা বলছেন?"

সুনীল। হ্যাঁ, সে আমার ছোট বোনেরই মত।

যুবতী। মেয়েটি দেখতে ভারি সুন্দর, আর মুখখানি হাসিমাখা। আমিও তো তা'র সঙ্গে ভাব করতে চাই। আমি মনে মনে তার নাম দিয়েছি 'প্রফুল্লনলিনী'। সে বুঝি ভারি লাজুক?

সুনীল। লাজুক সে মোটেই নয়।

যুবতী। তবে মার্সাই ছাড়বার পর এতবার কাছাকাছি ঘুরেও সে কথা কইলে না কেন? আমি তো সেই অবধি আশা ক'রে আছি যে, কবে তা'র লজ্জা ভাঙ্গবে, আর আমাদের আলাপ হবে। তা' হ'লে এ পথে আমার একটি সঙ্গী জোটে।

সুনীল। ক'দিন সে বড় sea-sick হ'য়েছিল, উঠ্‌তে পারেনি। আজ নিশ্চয় ডেকে আসবে।

যুবতী "পরে আসব" বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যতই সেই কণ্ঠস্বর সে শুনে, ততই তাহার অন্তরে বহু দিন পূর্ব্বের এক রাত্রের কথা জাগিয়া উঠে। তাহার বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিতে লাগিল। কিন্তু এ মুখ তো সেই অন্তরের ছবির মত নয়! বিংশতি-বর্ষীয় সেই কিশোর কি আজ এইরূপ দেখিতে হইয়াছে? যদি তাই হয় তো শেফালী কি করিবে? যে কয় দিন এক জাহাজে আছে, কি করিয়া সে আত্ম-গোপন করিবে? সুনীল তো তাহাকে দেখে নাই, সে জানিবে না; কিন্তু শেফালীর চঞ্চল হৃদয় যদি তাহার ব্যবহারে পরিচয়ের ইঙ্গিত জ্ঞাপন করে? সে কিছুতেই তাহা হইতে দিবে না; তাহাকে সংযত হইতেই হইবে। সুনীল নিশ্চয় নয় বৎসর পূর্ব্বের সেই অদ্ভুত ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছে, সে স্মৃতিতে তাহাকে কেন আবার কাতর করিবে? শেফালীও তো সকলের কাছে নিজেকে কুমারী বলিয়াই পরিচয় দিতেছে; ললাটের সিন্দূর-চিহ্নও এমন সূক্ষ্ম ভাবে অঙ্কিত করে যে, তাহা সহজে দৃষ্টি-গোচর হয় না। সে তো কুমারী শেলী মিত্র নামে এখানে পরিচিত; স্বামীর পদবী তো গ্রহণ করে নাই। স্বেচ্ছায় যখন সুনীল তাহাকে গ্রহণ করে নাই, তখন আত্মগোপনই সে করিবে। এইরূপ নানা চিন্তা ও মনের আন্দোলনে শেফালী দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিল। সে নিজেকে সংযত করিয়া যখন ডেকে ফিরিল, তখন সুনীল ও লিনা তাহারই প্রতীক্ষায় ছিল। তাহাকে দেখিয়া সুনীল বলিল,

"এত দেরী ক'রে এলেন? নিনা যে অস্থির হ'য়ে উঠেছিল।"

নিনার পরিচয় দিতেই সে বলিল, "বাঃ, এ যে নতুন ধরণের introduction হ'ল; আমার পরিচয় দিলে, কিন্তু ওঁর বিষয় তো কিছুই জান্‌লাম না!"

শেফালী তখন নিজের পরিচয় সংক্ষেপে দিয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গের কথা উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিল। নিনা তখন বলিল, "আপনারা দেখ্‌ছি কেউ কাউকে জানেন না। আমার এই দাদাটির নাম মিষ্টার সুনীল দত্ত।"

এবার শেফালীর সন্দেহ ভঞ্জন হইল; তবু ঐ নাম শুনিয়া তাহার সর্ব্বশরীর একবার কম্পিত হইল। সে আত্ম-সংযমের দুরূহ চেষ্টায় একবার চক্ষু মুদিত করিল। তাহার মুখ নিমেষের জন্য বিবর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া সুশীল ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অসুস্থ বোধ করছেন কি?"

নিনা। সমুদ্র তো বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। আপনি কি সহজেই sea-sick হ'ন?

শেফালী মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, আমার কিছুই হয়-নি। মাথাটা একটু ঘুরে উঠেছিল কেন জানি না। sea-sicknes তো আমার কখনও হয় না। আস্‌বার সময় তো খুব ঝড়ের মধ্যেই আসতে হ'য়েছিল। ও কিছু না, এখুনি সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

নিনা তখন নিজেদের deck-chair-এর কাছে শেফালীকে লইয়া গিয়া বসাইল। সুনীলও নিজের চেয়ার কাছে আনিয়া বসিল।

নিনা বলিল, "সুনীলদা লোক বড় সুবিধার নয়। আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে।"

সুনীল। কে ঝগড়ার মূল, তার পরিচয়টা বোধ হয় কার্য্যতঃ প্রমাণ ক'রে দিতে চাও।

নিনা। তা' জান্‌তে শেলীদি'র বেশী দিন লাগবে না। আমি কিন্তু আপনাকে "শেলীদি" বলে ডাকব।

শেফালী। সে তো বেশ ভাল কথা। কিন্তু আপনাদের মধ্যে এত ঝগড়া হয় কি নিয়ে?

সুনীল। ঝগড়া আর হবে কি নিয়ে? ও নিনার ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়। ও আমার ছোট বোনের মত, ছেলেবেলায় কত ওকে কোলে ক'রে খেলেছি, ওর সঙ্গে কি আমি ঝগড়া করতে পারি?

নিনা। ইঃ! কি আমার বড়-দাদা রে! মোটে ঝগড়া করতে জানে না! এইবার আর কে তোমার ভাবনা ভাব্‌বে, আমি এখন শেলীদি'কে পেয়েছি, তোমার সঙ্গ না হ'লেও আমার চল্‌বে। অত আর গুমোর করতে হবে না। আমি আমার চেয়ে বড়দের সঙ্গে মিশতে চাই নে।

শেলী। আমিও তো তোমার চেয়ে অনেক বড়।

নিনা। কখনই না, সামান্য বড় হ'তে পারেন— তাই তো দিদি বলে ডেকেছি। তাই ব'লে বেশী বড় কিছুতেই নয়। সুনীলদা, তোমার কি মনে হয় বল তো?

সুনীল। এই যে বললে, আমার সঙ্গে কথা কইবে না?

শেলী। কেন বেচারাকে ক্ষ্যাপাচ্ছেন?

নিনা। ক্ষ্যাপাক্ গে। ও-সব বাজে কথা রেখে এখন একটু আপনার কথা বলুন। আপনার বাবা-মা কোথায়?

শেলী। আমার বাবা-মা কেউ নেই, বাড়ীতে শুধু দাদা-বৌদি আছে।

নিনা। তবে আপনি একা একা বিলেতে এসেছিলেন যে?

শেলী। শিক্ষার জন্য। দু'বছর হ'ল, মিসেস্ গ্রেহামের সঙ্গে আসি, আবার মিষ্টার ও মিসেস্ গ্রেহামের সঙ্গেই ফিরছি।

সুনীল। আপনি তো ডাক্তার, না?

শেফালী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আপনাকে কে বল্লে?"

নিনা। সুনীলদা' ধরা প'ড়ে গেছ। জানেন, দিদি, আপনাকে দেখে অবধি আলাপ করবার জন্য অস্থির হয়েছিল। তাই নিশ্চয় সব খোঁজ নিয়েছে।

সুনীল। আর তুমি যেন ওঁর পরিচয় জান্‌বার জন্য আমাকে পাগল করনি?

মিনা। হ্যাঁ—তা' আমিও ব্যস্ত হয়েছিলাম বটে। তা' দিদিকে দেখ্‌লে কে না আলাপ করতে চায়? জাহাজ-শুদ্ধ সকলেই তো ওঁর দিকে চেয়ে থাকে।

শেলী। আমার দিকে লোক চেয়ে থাকে, না তোমার দিকে? আমি তো দেখি যে, তোমার আনন্দময়ী রূপে সকলেই মুগ্ধ।

তাহার পর শেফালীকে তাহার পরিচয় বিশেষ ভাবে দিতে না হয়, এজন্য সে তাড়াতাড়ি নিনাদের বাড়ীর কথা তুলিল। তদুত্তরে নিনা বলিল, "আমার বাবা-মা এই জাহাজেই আছেন। আমি তো তাঁদেরই সঙ্গে ইংলণ্ডে বেড়াতে এসেছি। তাঁরা উপরে এলেই তোমাকে চিনিয়ে দোব।"

সেই সময় হইতে নিনা শেফালীর নিত্য-সঙ্গিনী হইয়া উঠিল। তাহার পিতামাতাও পিতৃমাতৃহীনা কোমল-স্বভাবা এই যুবতীকে স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। কিন্তু তাহার বংশ-পরিচয় কেহই জানিতে পারিল না,—সকল প্রকার প্রশ্নেরই সে এমন উত্তর দিত যে, কেহ ঠিক না বুঝিতে পারে। তাহার ভয়, পাছে সুনীল জানিতে পারে—সে কে। তাহার পিতামহের বা ভ্রাতার নাম সে প্রকাশ করিল না। পিতার নাম বলিল, ডাক্তার বি, মিত্র। নিজ গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, সে একটি নগণ্য স্থান—নাম দিত না। অভিভাবকের নাম দিল—রমাপ্রসাদ বাবুর, ও শিক্ষাক্ষেত্র যে দিল্লী, তাহা জানাইল। সকলেরই ধারণা হইল যে, শেলী পশ্চিম প্রদেশের মেয়ে। গ্রেহামরাও তাই জানিতেন।

[ক্রমশঃ

শ্রীমতী নীলিমা দেবী।

ভরা-গঙ্গা

বর্ষার এই ভরা-গঙ্গার রূপের পাই না তুল,
বক্ষ আমার যেন উল্লাসে হয় তরঙ্গাকুল।
স্বরগের প্রেম গলিয়া নেমেছে গৈরিক উচ্ছ্বাস—
দুই কুল-প্লাবী পুণ্য-পাথার, দেখিয়া মিটে না আশ।
জননীর স্নেহ জলরূপ ধরি ছুটিছে দেখিতে পাই
নয়নাভিরাম এ শোভার আমি শত বলিহারি যাই।

আনে নাক' ভীতি আনে সান্ত্বনা ওই প্রচণ্ড দোল
জীবনে মরণে আনে আশ্বাস অমৃত হিল্লোল।
স্বরগে নরতে আমাদের এই সলিলের সংযোগ,—
বিশ্ব তৃপ্তি-তর্পণ করে এক সাথে দুই লোক।
জল নয় এ ত', এ যে আমাদের জলময়ী পৃথ্বী,
ওই আমাদের বিশ্বাস, আশা, তপস্যা, কীর্ত্তি।

দুই তীরে বসে দেবতার হাট কি তার উপমা দিব?
চৌদিকে হেরি জ্যোতির্মূর্ত্তি সকল গোত্রাধিপ।
শ্যাম বনরাজি প্রাণ লভিয়াছে হেরি লীলা অভিরাম,
প্রতি-তরঙ্গ ভগীরথ-টানে হইয়াছে উদ্দাম।
অতি পবিত্র এ তটভূমিতে চরণ ফেলা যে ভার,
সবঠাঁই বেদী, সব ঠাঁয়ে লেপ গঙ্গা-মৃত্তিকার।

সকল অভাব, দৈন্য, দুঃখ, সব গ্লানি দূরে যায়,
ভাগ্যবন্ত হেন প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে পায়।
এই কি গঙ্গা! পূত-তরঙ্গা কিছুতে মানে না বাধা—
চণ্ডীদাসের পদাবলী ভাঙি ছুটে বিরহিণী রাধা।
এ যে অপূর্ব্ব সুধার সরণি ধরা হ'তে সুরলোক
মোদের তরল রামায়ণ বহে, বহে বাল্মীকি-শ্লোক।

যুগ যুগ ধরি এই নীর সাথে আছে মোর পরিচয়
আসি আর যাই পরমানন্দে নাহিক আমার ক্ষয়।
খরস্রোতধারা ভেদিয়া আমার উজান ছুটিছে মন,
কত দূরে গিয়া পাবে হরি-পাদ-পদ্মের পরশন।
কাজ কি আমার রবি-শশী-তারা কাজ কি স্বর্ণদীপে
গঙ্গা-মায়ির কোলে ফিরি আমি অশীতি দাঁড়ের ছিপে

ভরা-গঙ্গার সঙ্গে আমার দোলে রে হৃদয় দোলে,
মনোহরসাহী কীর্ত্তন শুনি' গম্ভীর কল্লোলে।
চির-শিশু আমি জানি না, নাহিক আমার মৃত্যু-জরা
মোর দেওয়া ফুল লয় দু'টি কর স্বর্ণ কাঁকণ-পরা।
জাগে কল-কলে ভক্ত ঋষি ও কবিদের বন্দনা
ছল-ছল করে নেত্র আমার হ'য়ে যাই আনমনা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বৈষ্ণবমত-বিবেক

সপ্তম অধ্যায়

শাস্ত্রসঙ্কলন ও অধ্যাপনা

শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াই শ্রীসনাতনের ও শ্রীরূপের পরম স্নেহময় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অতি প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতনকে যে যে কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজে যত দূর পারিলেন তাহা বহন করিলেন, এবং তাঁহাদের পরে শ্রীজীব যাহাতে সেই ভার বহন করিতে পারেন, তজ্জন্য উভয় ভ্রাতা শ্রীজীবকে শিক্ষাদান করিয়া তাঁহাকে সেই ভার-বহনের উপযুক্ত শক্তিদান করেন।

শ্রীজীব সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর কাল ধরিয়া পিতৃব্য-যুগলের সর্ব্ববিধ সেবা করিলেন। শ্রীল সনাতনের আদেশে তিনি তাঁহার বৃহত্তোষণীর ব্যাখ্যা করিয়া লঘুতোষণী রচনা করিলেন। এই জন্য লঘুতোষণী নামে লঘু হইলেও আকারে বিলক্ষণ গুরু। শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকা রচনা করিয়া তাঁহার যোগ্যতা প্রমাণ করিবার পরেই শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণ তাঁহাকে ষট্সন্দর্ভ রচনা করিবার আদেশ প্রদান করেন। ষট্সন্দর্ভের রচনা শেষ হইলে তিনি শ্রীরূপসনাতনের কৃপাদেশ গ্রহণ করিয়া সপ্তম সন্দর্ভস্বরূপ শ্রীভাগবতের টীকা ক্রমসন্দর্ভ রচনা আরম্ভ করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী যাহাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবার সহিতই ভক্তগণ শ্রীহরিনামামৃত আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, তজ্জন্য একখানি ব্যাকরণ রচনা করিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি সূত্র রচনা করিয়াছিলেন।* কিন্তু শ্রীজীবের কৃতিত্ব দেখিয়া তিনি শ্রীজীবের হস্তেই "শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ" নামে এই ব্যাকরণ রচনার ভার প্রদান করিলেন। ইহার পরেই শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীমাধব-মহোৎসব ও শ্রীগোপাল-বন্ধু নামক সুবৃহৎ গ্রন্থদ্বয়ের রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরূপসনাতন বৃদ্ধ হইলে শ্রীজীব এইরূপে গ্রন্থরচনার দ্বারা ও ভক্ত শিষ্যগণকে অধ্যাপনার দ্বারা তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়ের সেবা করিয়া তাঁহাদের পরিতৃপ্তি সাধন করিলেন। সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থ তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়ের জীবনকালে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। মনে হয়, শ্রীজীবের শেষ বয়সে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবার পরই ঐ গ্রন্থ রচনা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীজীব শ্রীগোপালবিরুদাবলী, শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ, শ্রীল ভাবার্থসূচক চম্পূ শ্রীল রসামৃত-শেষ, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রী ভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, শ্রীল ব্রহ্মসংহিতার টীকা, শ্রীল পদ্মপুরাণস্থ শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন ও শ্রীরাধার কর-পদচিহ্ন সংগ্রহ করেন।

কালক্রমে শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। শ্রীরূপেরও বার্দ্ধক্যে চলৎশক্তির হ্রাস হইল। এরূপ অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় তত্ত্বাবধানের ভার শ্রীজীবের উপর অর্পিত হইল! শ্রীল গোপালের সেবার তত্ত্বাবধানের ভার অনেকাংশে শ্রীবল্লভাচার্য্য-নন্দন বিঠ্ঠলেশই গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শ্রীল মদনমোহনের, শ্রীগোবিন্দের ও শ্রীল গোপীনাথের সেবার যাবতীয় ব্যাপারের ভার গোস্বামিগণের পরামর্শ লইয়া শ্রীজীবই নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল ত্যাগী বৈষ্ণব আসিতেন, তাঁহাদের বাসস্থান নির্দেশ, ছাত্রগণের অধ্যাপনা, দেবমন্দিরাদিতে নিত্য পর্ব্বোৎসবের বন্দোবস্ত ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেরই তত্ত্বাবধান শ্রীজীবকেই করিতে হইত।

কালক্রমে শ্রীল সনাতনের আহ্বান আসিল। ১৪৯০ শকের আষাঢ়ী পূর্ণিমা—গুরু-পূর্ণিমার দিনে শ্রীল সনাতন গোস্বামী নিত্য-লীলায় সমাগত হইলেন। ইহার এক বৎসর পরে শ্রীরূপও শ্রাবণী শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে গুরুর ও অগ্রজের অনুসরণ করিলেন। শ্রীজীব এই গুরুশোকে বিহ্বল না হইয়া, শুভক্ষণে শ্রীরূপের নিত্য চিন্ময় দেহকে শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যধামে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরে সমাহিত করিয়া এবং তাঁহাদের শক্তিতেই শক্তিমান্ হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ত্তব্যসম্পাদনরূপ সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গৌড়দেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণ যে ভাববন্যা বহাইয়াছিলেন—শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীল নিত্যানন্দ, ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অপ্রকটে সে ভাববন্যার প্রবাহ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। ভাবসাধনার মূল বস্তু প্রেমসিন্ধু শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য সম্মুখে থাকায় এত দিন সে সর্ব্বপ্লাবী ভাবধারা বিপথগামী হইতে পারে নাই, কিন্তু ইঁহাদের অভাবে ভাবধারা বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। সরলপ্রাণ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অনধিকারী ব্যক্তিগণকে বিপথগামী করিবার জন্য ঐ সময়ে কোন কোন দুষ্ট লোক শ্রীকৃষ্ণের অবতার, কেহ বা শ্রীরামের অবতার সাজিয়া যথেচ্ছাচারে রত হইতেছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাহার

---

* শ্রীল হরিনামামৃত ব্যাকরণের সুবিখ্যাত টীকাকার শ্রীল হরেকৃষ্ণ আচার্য্য এই গ্রন্থের টীকার প্রারম্ভেই বলিতেছেন—

"শ্রীমচ্ছ্রীল সনাতন গোস্বামিনাং সূত্রানুসারেন শ্রীজীবগোস্বামিনামা গ্রন্থকারঃ পরমমঙ্গলরূপ মনোহর সূত্রাবলিভিঃ সঙ্কেতো কুর্ব্বন্ শ্রীহরিনামামৃতাখ্যবৈষ্ণবব্যাকরণমারভমাণঃ স্বপ্রয়োজনোদ্ঘাটন পূর্ব্বক বস্তুনির্দ্দেশাশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলমাচরতি।" অর্থাৎ "শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বিরচিত সূত্রানুসারে শ্রীজীব গোস্বামী নামক গ্রন্থকার পরমমঙ্গলরূপ মনোহর সূত্রাবলীর দ্বারা সঙ্কেতাচরণপূর্ব্বক শ্রীহরিনামামৃতনামক বৈষ্ণবব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজ প্রয়োজন প্রকাশপূর্ব্বক বস্তুনির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন।"

ইহা দ্বারা শ্রীল সনাতন গোস্বামীই যে প্রথমে এই ব্যাকরণ রচনা করিবার সঙ্কল্পে সূত্ররচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা বুঝা যাইতেছে।

উল্লেখ লক্ষিত হয়। যাহাতে বঙ্গদেশে, গৌড়দেশে বা উড়িষ্যাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্ম্মের সরল সিদ্ধান্ত ভক্তগণের মধ্যে প্রচার হয়, তজ্জন্য এই সময় গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে তিন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইঁহারা পরবর্ত্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বা ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর নামে বিখ্যাত হন। ইঁহারা তিন জনেই শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া শ্রীজীবের নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থ পাঠ করিয়া সেই সকল গ্রন্থ আনিয়া গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে প্রচার করেন, এবং নিজ নিজ জীবনের উদাহরণের দ্বারা সদাচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া যান। আমরা এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের জীবন-কথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদের আগমন ও শ্রীজীব কি প্রকারে তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া আচার্য্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

শ্রীনিবাস আচার্য্য

এই তিন জনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ—শ্রীনিবাস আচার্য্য। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য, মাতার নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া, নিবাস গঙ্গাতীরবর্ত্তী চাকন্দিগ্রামে। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। পরম পণ্ডিত—রূপে-গুণে অনুপম নিমাই পণ্ডিত যখন কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তথায় গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধা মাতা ও তরুণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণের এই করুণ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া শোকে উন্মত্তবৎ হইয়া কয়েক-দিন গঙ্গাতীরে অনশনে কান্দিয়া বেড়াইলেন। এই সময়ে অনবরত তিনি শ্রীচৈতন্যনাম লইতেন; লোকে ঐ সময় হইতে তাঁহাকে চৈতন্যদাস বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর পুত্রকামনা করিয়া, পতিপত্নী উভয়েই নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাদের মনের বাসনা জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক ভক্ত পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া তাঁহাদিগকে পুত্রলাভের বর প্রদান করেন। তাঁহারা গৌড়দেশে চাকন্দিতে প্রত্যাগমন করিলে (সম্ভবতঃ ১৪৪২ শকের) বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁহাদিগের একটি সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। শিশুটি দেখিতেও যেমন সুন্দর, প্রকৃতিও সেইরূপ মধুর, এবং বুদ্ধিও সেইরূপ তীক্ষ্ণ। পুত্রটি অল্প বয়সেই বিদ্যা-শিক্ষায় আগ্রহের পরিচয় দিতে লাগিল। গর্ভাষ্টমবর্ষে উপনয়নের পর চাকন্দির ধনঞ্জয় বাচস্পতির নিকট শ্রীনিবাস ব্যাকরণ ও কাব্যাদি এবং তৎকালের পাণ্ডিত্যের প্রধান সম্বল ন্যায়শাস্ত্রও কিয়ৎ পরিমাণে পাঠ করেন। কৈশোরেই ভক্ত পিতার মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের ও তাঁহার পরিকরবর্গের অপূর্ব্ব অলৌকিক চরিত্র-কথা শুনিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি পরম ভক্তিমান হইয়া উঠেন। ঐ সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর তিনি মাতাকে লইয়া মাতামহের আলয় যাজিগ্রামে বাস করেন। ঐ সময়ে তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীমন্ নরহরি সরকার ঠাকুরের করুণা লাভ করেন, এবং তাঁহার আদেশে মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলের উদ্দেশে ধাবিত হন। শ্রীনরহরি ঠাকুরই শ্রীনিবাসের নীলাচলে যাইবার পাথেয়াদি প্রদান করেন।

উন্মত্তের ন্যায় শ্রীনিবাস নীলাচলে চলিয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের কথা শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। স্বপ্নে মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দান করিয়া প্রবোধ দেন। অতঃপর শ্রীনিবাস নীলাচলে আসিয়া শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর, শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের, শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ও শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইঁহারা শ্রীপুরীধামের অন্যান্য ভক্তের সহিত শ্রীনিবাসের মিলন করিয়া দেন। অবশেষে শ্রীনিবাস শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট শ্রীভাগবত পাঠ করিতে চাহেন। পণ্ডিত গোস্বামী তখন অধিকাংশ সময়ে অন্তর্দ্দশায় বিমনা—বাহ্যদশায় আসিলে মহাপ্রভুর বিয়োগ-ব্যথায় চোখের জলে ভাসিয়া যান। শ্রীভাগবতের যে পুঁথিখানি ছিল, চোখের জলে তাহার অনেক স্থলের অক্ষর ধুইয়া গিয়াছে। শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী বালক শ্রীনিবাসের এই আগ্রহ দেখিয়া কিছু কিছু শ্রীভাগবতের শ্লোক মুখে মুখে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীনিবাসে শক্তিসঞ্চার করিলেন, এবং তাঁহাকে গৌড়দেশ হইতে পুঁথি আনয়ন করিবার ছল করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, তাঁহাকে শীঘ্রই লীলাসম্বরণ করিতে হইবে। শ্রীনিবাস গৌড়দেশে ফিরিয়া শ্রীখণ্ড হইতে পুঁথি লইয়া পুনরায় পুরীধামে যাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন সময় তিনি শুনি-লেন যে, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী লীলাসম্বরণ করিয়াছেন। তখন তিনি গৌড়দেশের প্রায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ব ভক্তজনের কৃপা শীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিলেন,—নবদ্বীপে যাইয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আশীর্ব্বাদ লইলেন। শ্রীল মহাপ্রভুর লীলাভূমি শ্রীগৌড়মণ্ডপ দর্শন করিলেন। খড়দহে যাইয়া শ্রীনিত্যানন্দের সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রী বসুধা জাহ্নবীর আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করিলেন। শান্তিপুরে যাইয়া শ্রীল সীতামাতার ও অন্যান্য ভক্তগণের কৃপাশীর্ব্বাদভাজন হইলেন। এবং অবশেষে খানাকুল কৃষ্ণনগরে যাইয়া শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ও শক্তি সংগ্রহ করিয়া তিনি মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের প্রায় ৩০ বৎসরেরও অধিককাল পরে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবার পথেও তিনি শ্রীগয়াধাম হইতে আরম্ভ করিয়া বারাণসী, প্রয়াগ প্রমুখ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে কিছু কিছু কাল অবস্থান করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর ও তাঁহার পরিকরগণের অনুগের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে শ্রীবৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইবার সময় পথেই তিনি শ্রীল সনাতনের, শ্রীল রঘুনাথ ভট্টের, অবশেষে শ্রীরূপের তিরোভাবের সংবাদ পাইয়া দুঃখে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহারাই অলৌকিক উপায়ে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দের মন্দিরে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিলেন। তথায় শ্রীজীব তাঁহাকে খুঁজিয়া-পাইয়া শ্রীল রাধাদামোদরের মন্দিরে আশ্রয় দিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে নরোত্তম দত্ত নামক একটি তরুণ কায়স্থ যুবকও বঙ্গ-দেশ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীজীবের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীল নরোত্তম

নরোত্তমের পিতার নাম—কৃষ্ণানন্দ রায়—উপাধি দত্ত। ইনি বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার গরানহাটী পরগণার জমিদার ছিলেন। পদ্মা-তীরবর্ত্তী খেতুরী গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইঁহার

নবাবদত্ত উপাধি ছিল মজুমদার। এই কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম দুই ভাইয়ে জমিদারীর কার্য্য পরিচালিত করিতেন; ইঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক ছিলেন। ইঁহারা উত্তর-রাঢ়ীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুল-সম্ভূত; নরোত্তমের মাতার নাম ছিল—রাণী নারায়ণী। শ্রীচৈতন্যদেব রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত গোবর্দ্ধন ও হরিশ মজুমদারের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইঁহারা "শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়।" নরোত্তমের মাতাপিতা ও খুল্লতাত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবকে যথেষ্ট অর্থ দান করিতেন ও উপযুক্ত জাঁক-জমকে ঠাকুরসেবা করিতেন। অতএব তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব না হইলেও বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন স্বয়ং রামকেলিতে আসিয়া তাঁহার প্রিয় রূপ-সনাতনকে কৃপা করেন, তখনই একদিন সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দেব খেতুরীর দিকে তাকাইয়া "নরোত্তম" নাম ধরিয়া কয়েকবার ডাকিয়াছিলেন। তাহারই কয়েক বৎসর পরে খেতুরীতে শ্রীনারায়ণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণানন্দের ঔরসে মাঘী পূর্ণিমায় শ্রীল নরোত্তমের আবির্ভাব হইয়াছিল। কথিত আছে, অন্নপ্রাশনের সময় যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ না দেওয়া হইয়াছিল, ততক্ষণ নরোত্তম মুখ ফিরাইয়াছিলেন। কিছুতেই অনিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেন নাই। পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ দিলে তাহা ভোজন করিয়াছিলেন। নরোত্তম শিশুকাল হইতেই রূপবান, সৌম্যমূর্ত্তি। তিনি রাজপুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং রাজপুত্রেরই উপযুক্ত রূপ এবং ততোধিক গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন।

নরোত্তমের যেমন রূপ-গুণ, বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার সেইরূপ অসাধারণ নিষ্ঠা ছিল। অল্পকালেই তিনি ব্যাকরণ কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। বিষয়-সম্পদে তাঁহার আদৌ স্পৃহা ছিল না; পরন্তু শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনে, ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়নে তাঁহার প্রবল আগ্রহ লক্ষিত হইত। পার্থিব সম্পদে অল্পবয়সেই তাঁহার বৈরাগ্য ও শ্রীগোবিন্দে প্রীতি দর্শনে তাঁহার পিতামাতা বড়ই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পরম সুকুমার নরোত্তম পাছে সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, এই ভয়ে তাঁহারা তাঁহাকে একরূপ বন্দী করিয়াই রাখিলেন। ঐ সময়ে খেতুরীতে একজন জিতেন্দ্রিয় গৌর-ভক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নরোত্তমের মহাপ্রভুর প্রতি এইরূপ আকর্ষণ দেখিয়া আপনা হইতে যাইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের ও তাঁহার ভক্তগণের জীবনেতিহাস শুনাইয়া আসিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ও তাঁহার পার্ষদগণের অলৌকিক মধুর চরিত্র-কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ, শ্রীল রূপসনাতন, লোকনাথ ও অন্যান্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী ও গোস্বামিদিগের ইতিহাস অবগত হইয়া কিশোরকাল হইতেই তিনি শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি তখন গৃহে একরূপ বন্দী। যাঁহার জন্য নরোত্তমের প্রাণ ব্যাকুল, তিনিই একদিন সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে একদা গৌড়ের রাজধানীতে গমন করিলে নরোত্তম তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে একদিন গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে পলায়ন করিলেন। তিনি মথুরায় আসিয়া শ্রীল শ্রীরূপসনাতনের, শ্রীল শ্রীরঘুনাথ ভট্টের ও শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামীর তিরোধানের সংবাদ শুনিয়া ক্ষোভে দুঃখে ব্যাকুল হইলেন। মথুরায় একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ভগবৎ প্রসাদ দানে তৃপ্ত করিয়া ও সান্ত্বনা দান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের পথে উঠাইয়া দিলেন। নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া গোবিন্দের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু এই পরম সুন্দর যুবককে দেখিয়া শ্রীগোবিন্দের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিত গোস্বামী বিশেষ স্নেহ-ভরে শ্রীগোবিন্দের প্রসাদাদি দানে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। এমন সময় শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে উপনীত হইয়া নরোত্তমকে আশ্রয় দান করিলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। লোকনাথের আদেশ লইয়া তিনি নরোত্তমকে নিজের নিকট রাখিয়া ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ করাইতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যও তরুণ যুবককে সহকর্ম্মিরূপে পাইয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীল দুঃখী কৃষ্ণদাস (শ্যামানন্দ)

ইহার কিছু দিন পরেই শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীল দাস গোস্বামী আর একটি তরুণ যুবককে শ্রীজীবের নিকট পাঠাইলেন; ইঁহার নাম দুঃখী বা দুঃখিয়াকৃষ্ণ দাস, পরবর্ত্তীকালে ইনি শ্যামানন্দ ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দুখীর পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। ইনি জাতিতে সদ্গোপ। গৌড় মণ্ডলের অন্তর্গত ধারেন্দা-বাহাদুর পুরে ইঁহার পূর্ব্বনিবাস। তিনি নানা কারণে উৎপীড়িত হইয়া সপরিবারে উড়িষ্যার অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীর নাম দুরিকা। এই দুরিকার গর্ভে ধারেন্দা-বাহাদুরপুরেই শ্যামানন্দের জন্ম হইয়াছিল।* সম্ভবতঃ ১৪৫৬ শকে চৈত্র পূর্ণিমায় দুঃখী জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই দুঃখী ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন; কিন্তু শিশুকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অনন্ত ভক্তি। পিতা তাঁহার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে দীক্ষা লইবার অনুমতি প্রদান করেন। দুঃখী সুপ্রসিদ্ধ ভক্তশ্রেষ্ঠ গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের শিষ্য অম্বিকার হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। দুঃখীকে পিতামাতা অগত্যা অম্বিকা-কালনায় আসিতে আদেশ দিলেন। হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর দুঃখীর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, এবং শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমায় তাঁহাকে দীক্ষা দান করিয়া 'কৃষ্ণদাস' নামে অভিহিত করিলেন। সেই অবধি দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত। শ্রীল হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পরে গুরুর আদেশ লইয়া তিনি তীর্থদর্শনে বহির্গত হইলেন। তীর্থদর্শন শেষ হইলে দুঃখী কৃষ্ণদাস পিতা-মাতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। কিছু দিন গৃহে অবস্থান করিয়া পুনরায় দুঃখী কৃষ্ণদাস অম্বিকা-কালনায় গুরুর নিকট গমন করিলে গুরুদেব তাঁহাকে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিতে আদেশ করিলেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শন করিয়া প্রাণের আবেগে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরণ-প্রান্তে উপনীত হইলেন। শ্রীদাস গোস্বামী তাঁহাকে বিশেষ স্নেহভরে একদিন কাছে রাখিলেন, এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সহিত মিলন করাইয়া শ্রীবৃন্দাবনে

* ধারেন্দা বাহাদুরপুরে পূর্ব্ব স্থিতি।
শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি।
—শ্রীভক্তিরত্নাকর।

শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন। দুঃখী শ্রীজীবকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, শ্রীজীবও শ্রীনিবাসের ও নরোত্তমের সহিত ইঁহার মিলন সংঘটন করাইয়া শ্রীরাধাদামোদরের আশ্রয়ে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, ও শ্যামানন্দের মধ্যে প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হইল।

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমদনমোহনের, শ্রীগোবিন্দের, শ্রীগোপীনাথের ও শ্রীরাধাদামোদরের এই চারিটি দেবাশ্রয়ে ঐ সময়ে শ্রীজীবের তত্ত্বাবধানে সুশিক্ষিত ত্যাগী ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবভক্তে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। যাঁহারাই শ্রীবৃন্দাবনে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসিতেন, এই দেবায়তনগুলির কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শ্রীজীব তাঁহাদিগের অবস্থানের ও অধ্যয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রাধ্যয়ন শেষ করিয়া অধ্যাপকের পদ গ্রহণে সেই শাস্ত্রের আলোচনায় ও প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিবেন, শ্রীজীব তাদৃশ ছাত্রগণকেই বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাস দ্বারা গৌড়বঙ্গে ও উৎকলে শ্রীমহাপ্রভুর বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শাস্ত্র প্রকাশ করিবেন এই সংকল্পে শ্রীজীব তাঁহাদিগের সকল ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি শ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীর নিকট শ্রীনিবাসের দীক্ষা দেওয়াইলেন—এবং নিজেই তাঁহাকে সকল ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীভাগবত অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

প্রতিভাসম্পন্ন নরোত্তম গোস্বামী শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করিলে তাঁহার কার্য্যে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী তাঁহাকে প্রথমে হরিনাম দিলেন; কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা দানে সম্মত হইলেন না। নরোত্তমও প্রতিজ্ঞা করিলেন, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকটই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। মনের এই অশান্তির জন্য নরোত্তমের অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হওয়ায় কিছুতেই তিনি শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি প্রাণপণ করিয়া গোপনে গুরুদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেরও পূর্ব্বে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া গুরুদেব যেখানে শৌচে গমন করিতেন, সে স্থানটি পরিষ্কার করিয়া, তথায় মৃত্তিকা ও জল রাখিতেন; এবং একান্ত ব্যাকুল অন্তরে অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রার্থনা করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না।

'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' গুরুলক্ষণ ও শিষ্যলক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। সদ্‌গুরুর যে যে লক্ষণ, তাহা গুরুতে থাকিলেও শিষ্য গুরুদেবকে এক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিবেন, এবং গুরুদেবও শিষ্যে সর্ব্বসুলক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলেও এক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে দীক্ষা দিবেন এইরূপ ব্যবস্থা। শ্রীলোকনাথও নরোত্তমকে উপযুক্ত শিষ্য মনে করিলেও এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। অবশেষে নরোত্তমের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সুদৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাইয়া লোকনাথ পরিতুষ্ট হইলেন। একদিন তিনি প্রায় একপ্রহর রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে শৌচের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া নরোত্তমকে সেখানে উপস্থিত দেখিলেন; এবং কেন তিনি এইভাবে তাঁহার সেবা করিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। নরোত্তমের আত্মসমর্পণসূচক বিনীত উত্তর শুনিয়া লোকনাথ তৃপ্তি লাভ করিলেন।

সেই দিন হইতে তিনি প্রত্যক্ষভাবেই নরোত্তমের সেবা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নরোত্তমও এখন ছায়ার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ লোকনাথের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অবশেষে লোকনাথ সেবাপরায়ণ নরোত্তমের ভক্তির আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম নিষ্ঠার গভীরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন, এবং এইরূপ কঠোর পরীক্ষান্তে তাঁহাকে দীক্ষা-দানে সম্মত হইলেন। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে নরোত্তমকে তিনটি বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইতে হইল। প্রথম প্রতিজ্ঞা, তিনি জীবনে বিবাহ করিবেন না, অর্থাৎ সংসারী হইবেন না; দ্বিতীয়, জীবনে কোন দিন আমিষ ভোজন করিবেন না। তৃতীয়, তিনি বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে শ্রীহরির সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। অন্যের পক্ষে এই তিনটি প্রতিজ্ঞা পালন করা অতি দুরূহ হইলেও নরোত্তমের পক্ষে ইহা পালন করা আদৌ কঠিন হইবে না বুঝিতে পারিয়া তিনি পরমাগ্রহে এই তিনটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন।

অবশেষে শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীলোকনাথ প্রভু নরোত্তমকে দীক্ষা-দান করিলেন। নরোত্তমের চিরপোষিত আশা এত দিনে সফল হইল। তিনি শ্রীমহাপ্রভুর সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিকট ভক্তি-দুর্গের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নূতন জীবন লাভ করিয়া তিনি "বৃষভানুপুরে আহীরি গোপের তনয়ারূপে" জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং সিদ্ধদেহে নিত্য লীলায় শ্রীরাধারাণীর অন্তরঙ্গ সেবায় নিযুক্ত হইলেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ এবার তাঁহার নিকট নূতন অর্থ ব্যক্ত করিতে লাগিল। আচার্য্যবান্ পুরুষের নিকট শ্রুতিসার শ্রীভাগবত আত্মপ্রকাশ করিলেন। অনধীত দুরূহ শাস্ত্রাদির নিগূঢ় অর্থ তাঁহার নিকট সুপরিস্ফুট হইল। তিনি শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে ও শ্রীরাধাগোবিন্দে ক্রমে অভেদ-বুদ্ধি লাভ করিয়া কায়মনোবাক্যে গুরুদেবের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু (এম-এ, বি-এল)।

গান

আমি যে বসিয়া আছি—
প্রভাত হইতে একাকী এ পথে
ল'য়ে মোর মালাগাছি।
আমার আকাশ ভরা তোমার বাঁশীর সুরে,
তোমার গায়ের গন্ধ পাই যে, নহ তুমি—নহ দূরে;
আছ তুমি কাছাকাছি।

সন্ধ্যা যখন হ'বে, সকল কাজের শেষে,
দাঁড়া'ও তখন—দাঁড়া'ও দেবতা আমার এ-পথে এসে,—
সকল কাজের শেষে।
যদি না পারি গো হায়, মালাটি পরা'তে গলে,
যদি কাঁপে হাত, না পাই নাগাল, দিব তবে পদতলে—
নিও প্রভু মালাগাছি।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

পতঞ্জলি-বিরচিত ব্যাকরণ-মহাভাষ্য

(পস্পশাহ্নিক—অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)

৪

এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য ;—

উহ তিন প্রকার ; তাহাদের মধ্যে মন্ত্রের উহ এখানে প্রদর্শন করা হইল। এই মন্ত্রের "উহে" ই ব্যাকরণের অপেক্ষা আছে।

ইহা ব্যতীত যজ্ঞের অঙ্গভূত সংস্কার কর্ম্ম এবং সাম-মন্ত্রের উহ হইয়া থাকে।

এই শেষোক্ত দুই প্রকার উহে ব্যাকরণের কোন অপেক্ষা নাই ; এই জন্য এস্থলে এই দুই প্রকার উহের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। অনুসন্ধিৎসুগণ মীমাংসাদর্শনের নবম অধ্যায় পর্য্যালোচনা করিলে উহবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন।

মূল—আগমঃ খল্পপি। "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চে" তি। প্রধানং চ ষট্‌স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি।

অনুবাদ—আগমও (ব্যাকরণাধ্যয়নের একটি প্রয়োজন)। ব্রাহ্মণের (পক্ষে) ছয়টি অঙ্গের † সহিত বেদের অধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান কর্ত্তব্য—ইহা নিষ্কারণ ধর্ম্ম। ছয়টি অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান ; প্রধানে যে যত্ন সম্পাদিত হয়, তাহা সফল হইয়া থাকে। (এই জন্য ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত)।

মন্তব্য—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো-জ্ঞেয়শ্চ" এইটি একটি শাস্ত্রবাক্য।

এই বাক্যটি শ্রুতি-বাক্য, ইহা পদমঞ্জরীকার হরদত্ত-প্রমুখ বৈয়াকরণগণের মত ; ইহা শ্রুতি নয়, কিন্তু ইহা স্মৃতিবাক্য—ইহা কুমারিলপ্রমুখ মীমাংসকগণের মত। ‡

এই উদ্ধৃত আগম-বাক্যে যে বেদ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ সমগ্র বেদ নহে ; কিন্তু নিজ নিজ শাখা মাত্র,—ইহা মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোতে বলা হইয়াছে। নাগেশ-ভট্ট "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২।১৫।১) এই শ্রুতিবাক্যের সহিত মহাভাষ্যে প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত আগম-বাক্যের একবাক্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ"—এই বাক্যের স্বাধ্যায় শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে সমগ্র বেদ গৃহীত হয় নাই, কিন্তু এই স্থলে "স্বাধ্যায়" শব্দের দ্বারা নিজ নিজ শাখারূপ বেদই বুঝিতে হইবে, ইহা মীমাংসকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।*

ব্যাখ্যা।—আগম অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটি প্রয়োজন, ইহা বলা হইয়াছে। এখানে প্রয়োজন শব্দটি করণে ল্যুট্ (— অন) প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় নাই কিন্তু এখানে কৃত্যল্যুটো বহুলম্ (৩।৩।১১৩) এই সূত্র অনুসারে কর্ত্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা প্রয়োজন শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ প্রয়োজক ; শাস্ত্র ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজক অর্থাৎ হেতু। পূর্ব্বে ভাষ্যের যে সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—"রক্ষোহাগম-লঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্"—এই বাক্যটির সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক ;—"রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ" এই স্থলে পুংলিঙ্গের বহু বচন আছে,—প্রয়োজনম্—এই স্থানে নপুংসক লিঙ্গের এক বচন আছে। এইরূপ লিঙ্গ ও বচনের ব্যত্যয়ের কারণের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—রক্ষা উহ, লঘু (লাঘব) এবং অসন্দেহ (সন্দেহাভাব)—এই চারিটি ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রয়োজন অর্থাৎ ফল ; কিন্তু আগম অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যাকরণ অধ্যয়নের ফল নহে, কিন্তু উহা ব্যাকরণ অধ্যয়নের প্রবর্ত্তক। ফল-বাচক প্রয়োজন শব্দ নিত্য নপুংসক লিঙ্গ ; কিন্তু প্রবর্ত্তক-বোধক প্রয়োজন-শব্দ কর্ত্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, ইহা নিয়তলিঙ্গ শব্দ নহে,—ইহা বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে লিঙ্গ গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রবর্ত্তক অর্থে যে প্রয়োজন শব্দটি,—সেটি "আগমে"র বিশেষণ ; "আগম" শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ ; অতএব পূর্ব্বোক্ত রক্ষা, উহ, লঘু ও অসন্দেহের বিশেষণ যে ফল-বাচক প্রয়োজন শব্দ, সেটি নপুংসক লিঙ্গ ; এই চারিটির বিশেষণ চারিটি নপুংসকলিঙ্গ প্রয়োজন শব্দ এবং এক আগমের বিশেষণ একটি পুংলিঙ্গ প্রয়োজন শব্দ, এই পাঁচটি প্রয়োজন শব্দের এক শেষ হইয়াছে। এখানে নপুংসক লিঙ্গ প্রয়োজন শব্দেরই এক শেষ হইবে ; এরূপ স্থলে এক বচন বৈকল্পিক সুতরাং পক্ষান্তরে 'প্রয়োজনানি' এরূপ প্রয়োগও হইতে পারে। নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাস্যান্যতরস্যাম্ (১।২।৬৯)—

---

† শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং ছন্দঃ শাস্ত্র—এই ছয়টি বেদের অঙ্গ—ইহা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে (মাসিক বসুমতী—ভাদ্র, ১৩৪৬, ৭৬২ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করা হইয়াছে।

‡ শ্রুতিরেবেতি হরদত্তাদয়ঃ। স্মৃতিরিতি তু ভট্টাচার্য্যাঃ। তত্র যদি স্মৃতিরেবেতি প্রামাণিকম্, তর্হি "আগমঃ খল্পপী"তি ভাষ্যেঽপ্যাগমমূলকত্বাদাগমঃ স্মৃতিরেবেতি ব্যাখ্যেয়ম্।

শব্দকৌস্তুভ ১।১।১

আগমপদেন শ্রুতিঃ। মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোত ১।১।১

ইয়ং চ শ্রুতিঃ, আগমপদস্য বেদে রূঢ়ত্বাদিতি শাব্দিকাঃ। স্মৃতিরিতি মীমাংসকাঃ।—বিশ্বেশ্বরপণ্ডিতকৃত ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধা-নিধি ১।১।১

* গাগাভট্ট-প্রণীত ভাট্টচিন্তামণি গ্রন্থে প্রথমাধিকরণে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ;—অত্র স্বাধ্যায়ত্বং স্বশাখাত্বম্। স্বত্বঞ্চ পরম্পরয়াঽধ্যয়নবিষয়ত্বমনুষ্ঠানবিষয়ত্বং চ। তেন বেদত্রয়ান্তর্গতৈ-কৈকশাখাপরঃ স্বাধ্যায়শব্দঃ।

এই সূত্রের অর্থ এই—অনপুংসক লিঙ্গ শব্দের সহিত প্রয়োগে নপুংসক লিঙ্গ শব্দের শেষ (অর্থাৎ অক্ত শব্দের নিবৃত্তি পূর্ব্বক স্থিতি) হয় এবং বিকল্পে ইহার একবদ্ভাব হয় অর্থাৎ বিকল্পে এক বচন হইয়া থাকে। অতএব "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্"—এই স্থলে বিশেষ্যপদে বহুবচন থাকিলেও "প্রয়োজনম্"—এই বিশেষণ পদে এক বচন অনুচিত হয় নাই।

বেদের ছয়টি অঙ্গ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—(১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) জ্যোতিঃশাস্ত্র এবং (৬) ছন্দঃশাস্ত্র। এখানে সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে ;—

(১) যে শাস্ত্রের সাহায্যে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত প্রভৃতি স্বর-যুক্ত বেদ-মন্ত্রের শুদ্ধভাবে উচ্চারণ-প্রণালী জানিতে পারা যায়, সেই শাস্ত্রের নাম শিক্ষা; তৈত্তিরীয় উপনিষদের আরম্ভে এবং গোপথ ব্রাহ্মণে শিক্ষার সূচনা করা হইয়াছে *। পাণিনি-প্রণীত শিক্ষা সাধারণভাবে সকল বেদের উপযোগী হওয়ায় ইহাকে সর্ব্ব-বেদ-সাধারণী শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করা হয়। পাণিনি ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, লোমশ প্রভৃতি অনেক ঋষি শিক্ষা প্রণয়ন করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল শিক্ষায় বিভিন্ন বেদের বর্ণোচ্চারণের পদ্ধতি বর্ণিত আছে, এইগুলি সর্ব্ব-বেদ-সাধারণ শিক্ষা নহে। শৌনক, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের রচিত "প্রাতিশাখ্য" নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহও শিক্ষার মধ্যে পরিগণিত। এই সকল প্রাতিশাখ্য গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখার উপযোগী উদাত্তাদি স্বরের ব্যবস্থা এবং উচ্চারণ-পদ্ধতি বিবৃত আছে। এই জন্যই এই গ্রন্থসমূহকে প্রাতিশাখ্য নামে অভিহিত করা হয়।

(২) আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, সাংখ্যায়ন এবং লাট্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের প্রণীত সূত্র-গ্রন্থকে "কল্প" বলা হয়; পূর্ব্ব-মীমাংসার শাবরভাষ্যে মাশক, হাস্তিক, কৌণ্ডিন্যক—এই তিনখানি কল্পসূত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে মাশক কল্পসূত্র কাশীর সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত অবস্থায় আছে। শবরস্বামী আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি প্রচলিত কল্পসূত্রের উল্লেখ করেন নাই। এই কল্পসূত্রে স্বাধীনভাবে কোন প্রকার অনুষ্ঠান-প্রণালী বলা হয় নাই। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত আছে; আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রাহ্মণ ভাগ হইতে সেই সকল শ্রুতি-বাক্য আহরণ করিয়া এবং সেই সকল শ্রুতিবাক্যের অভিপ্রায় মীমাংসা-দর্শনে প্রদর্শিত বিচার-পদ্ধতির দ্বারা স্থির করিয়া কল্পসূত্রে যজ্ঞের অনুষ্ঠান-পদ্ধতির উপদেশ করিয়াছেন।

(৩) যে শাস্ত্রে প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ দ্বারা সাধু (শুদ্ধ) শব্দের উপদেশ করা হইয়াছে,—সেই শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ শাস্ত্রের আরম্ভ বৈদিকযুগ হইতেই হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় * *। ঋষিযুগের সূত্রকার বৈয়াকরণগণের মধ্যে পাণিনি সকলের অন্তিম। পাণিনির পূর্ব্বে আপিশলি, গার্গ্য, শাকল্য, সেনক, স্ফোটায়ন, চাক্রবর্ম্মণ, গালব, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন (ইনি ঋষি শাকটায়ন, জৈন শাকটায়ন নহেন) প্রভৃতি বৈয়াকরণ ঋষি ছিলেন; ইহাদের গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায় না। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে এই সকল বৈয়াকরণ ঋষির নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত আছে †। পাণিনি ইহাদের গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিয়া অষ্টাধ্যায়ী প্রণয়ন করিয়াছেন। পাণিনির পরে দুর্গসিংহ, চন্দ্রগোমী প্রভৃতি আরও অনেকে ব্যাকরণের সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সূত্র-গ্রন্থ পাণিনির সূত্রের ন্যায় আদর লাভ করিতে পারে নাই। পুরুষোত্তমদেব ‡ জিনেন্দ্রবুদ্ধি ‡ ‡ প্রভৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ বৈয়াকরণগণ পাণিনি-সূত্রের উপাদেয়তা লক্ষ্য করিয়া, পাণিনীয় ব্যাকরণেরই ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ-বহুল তিব্বতদেশেও তিব্বতী ভাষায় পাণিনীয় ব্যাকরণের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছিল। পাণিনির পরে, কাত্যায়ন পাণিনিব্যাকরণের অসম্পূর্ণতা পরিহারের উদ্দেশে পাণিনি-সূত্রের উপর প্রায় ৪০০০ বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়াছেন; এই বার্ত্তিকের পরেও যে অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহার নিরাকরণের জন্য মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ব্যাখ্যা-রচনাই ভাষ্যকারের কর্ত্তব্য হইলেও, পতঞ্জলির দৃষ্টিতে পাণিনীয় ব্যাকরণে যেটুকু ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তাহার সমাধানে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই *। ভাষ্যকারের প্রবর্ত্তিত এই সকল বিধি-নিষেধের নাম "ইষ্টি,"—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

---

* তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১।১।২; গোপথব্রাহ্মণ—পূর্ব্বভাগ ১।২৪, ১।২৭।

* * তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৫।২—এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে ব্যাকরণ-প্রতিপাদিত বিভক্তির উল্লেখ আছে। গোপথ ব্রাহ্মণেও ব্যাকরণের প্রসঙ্গ আছে।—দ্রষ্টব্য—গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বভাগ ১।২৪, ২৬,২৭

ইহা ব্যতীত বেদের অন্যান্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও স্থল-বিশেষে শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

† পাণিনির সূত্রে যে সকল স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী বৈয়াকরণদের নামের উল্লেখ আছে, এখানে সেই সকল স্থলের মধ্যে কয়েকটি স্থলের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে ;—

আপিশলি—৬।১।৯২; গার্গ্য ৭।৩।৯৯, ৮।৩।২০, ৮।৪।৬৭; শাকল্য ১।১।১৬, ৬.১।১২৭, ৮।৩।১৯, ৮।৪।৫১; সেনক ৫।৪।১১২; স্ফোটায়ন ৬।১।১২৩; চাক্রবর্ম্মণ ৬।১।১৩০; গালব ৬।৩.৬১; ভারদ্বাজ ৭।২।৬৩; শাকটায়ন ৮।৩।১৮, ৮।৪।৫০; ইত্যাদি।

‡ পাণিনিসূত্রের ভাষাবৃত্তিকার।

‡ ‡ কাশিকার ব্যাখ্যান্যাসকার।

* আজকালকার অনেকে প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান না করিয়াও সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও প্রাচীন হিন্দুদের স্থিতিস্থাপকতা লইয়া উপহাস করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না। পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিদের গভীর জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াও প্রাচীন সময়ের অভিজ্ঞগণ স্থলবিশেষে তাঁহাদের বিচ্যুতি অস্বীকার করেন নাই। পদমঞ্জরীকার হরদত্ত মিশ্র লিখিয়াছেন ;—

যদ্ বিস্মৃতমদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তৎস্ফুটম্।
বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাষ্যকৃৎ ॥

পদমঞ্জরী ১।১

—সূত্রকার পাণিনি যাহা বিস্মৃত হইয়াছেন অথবা লক্ষ্য করেন নাই, বাক্যকার অর্থাৎ বার্ত্তিককার কাত্যায়ন যে সকল বিষয় বলিয়াছেন এবং বার্ত্তিককার যাহা লক্ষ্য করেন নাই, ভাষ্যকার পতঞ্জলি সে সকল বিষয় বলিয়াছেন।

(৪) নিরুক্ত,—নিরুক্তকে একটি স্বতন্ত্র বেদাঙ্গরূপে গণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই নিরুক্তশাস্ত্রে ব্যাকরণের অত্যন্ত অপেক্ষা থাকায় নিরুক্তকে ব্যাকরণের পরিশিষ্ট বলিলেও কোন দোষ হয় না। পদের সাধনের জন্ত ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সূত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে। ব্যাকরণের সূত্রে যে শব্দের সুস্পষ্টভাবে সাধন-প্রণালী বলা হয় নাই —অথচ সাধনের ইঙ্গিতমাত্র আছে, নিরুক্তে অনেক ক্ষেত্রে সেই সকল শব্দের সাধন-প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে †; এই জন্ত নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন, এই নিরুক্তশাস্ত্র ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতার পরিহার করিয়া তাহার পূর্ণতার সম্পাদন করিয়াছে **। যাহার ব্যাকরণ-জ্ঞান নাই, তাহার নিরুক্তে ব্যুৎপত্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই; এই কারণে যাস্ক অবৈয়াকরণকে নিরুক্তের উপদেশের অযোগ্য বলিয়াছেন ††।

যদিও ব্যাকরণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত নিরুক্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তথাপি ব্যাকরণ-শাস্ত্রের সহিত নিরুক্তের কোন অংশে বৈলক্ষণ্য নাই, একথা বলিতে পারা যায় না। এই বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়া যাস্ক বলিয়াছেন, নিরুক্ত শাস্ত্রের স্বতন্ত্ররূপেও প্রয়োজন আছে; সেই প্রয়োজনটি যাস্ক স্পষ্টভাবে বলেন নাই কিন্তু নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—নিরুক্ত-শাস্ত্রে পদসমূহের অর্থ স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, ব্যাকরণে কেবল সূত্র আছে,—সেই সূত্রের ইঙ্গিত হইতে পদের অর্থ জ্ঞাপিত হইলেও প্রত্যেক পদকে স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিয়া সুস্পষ্টভাবে তাহার অর্থ প্রদর্শন করা হয় নাই; ব্যাকরণ শাস্ত্র সূত্র-প্রধান কিন্তু নিরুক্ত শাস্ত্র সেরূপ নহে; এইটুকুই ব্যাকরণ হইতে নিরুক্তের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই নিরুক্ত শাস্ত্রকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে গণনা করা হয়।

পাণিনির পূর্ব্বে আপিশলি প্রভৃতি বৈয়াকরণ ছিলেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ রচনা করিয়াছেন; এইরূপ যাস্কের পূর্ব্বে শাকপূণি, ঔর্ণনাভ, ক্রৌষ্টুকি, প্রচর্ম্মশিরা প্রভৃতি নিরুক্তকার ছিলেন; যাস্ক তাঁহাদের অনুসরণে নিজের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল ঋষিদের গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না; যাস্কের নিরুক্তে অনেক স্থলে ইঁহাদের মত উদ্ধৃত হইয়াছে।*

(৫) জ্যোতিষ—বেদের অধ্যয়ন-কাল এবং বেদে বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-কালের নির্ণয়ের জন্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের আবশ্যকতা আছে। এই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রথমে ঋষিগণ প্রণয়ন করেন। পরবর্ত্তী কালে ইহার অনেক বিস্তার সাধিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের, অথর্ব্ববেদের এবং যজুর্ব্বেদের অঙ্গ জ্যোতিষের কথা এখন পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে।

(৬) ছন্দ:—বেদে তিন প্রকার মন্ত্র আছে;—ঋক্, যজুঃ এবং সাম। যে সকল মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ, তাহাদের নাম ঋক্; যে সকল মন্ত্রের ছন্দঃ নাই—গদ্যরূপে পঠিত আছে, তাহাদের নাম যজুঃ। যে সকল মন্ত্র ঋক্ ও যজুঃ হইতে ভিন্নজাতীয়—গানরূপে উচ্চারিত হয়, তাহাদের নাম সাম। এই সামমন্ত্রগুলি ঋগ্‌মন্ত্রেরই গানরূপে পরিবর্ত্তিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ঋগ্‌মন্ত্রের ছন্দোজ্ঞানের জন্ত ছন্দঃশাস্ত্রের অপেক্ষা আছে। এখন অন্য ঋষি-প্রণীত ছন্দঃশাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল পিঙ্গলের ছন্দঃশাস্ত্র এখন প্রচলিত আছে।

এই ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই বেদের প্রধান অঙ্গ। পাণিনীয়-শিক্ষায় বলা হইয়াছে;—

ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।† (৪১ ৪২)

—ছন্দঃশাস্ত্র বেদের দুইটি পদ; কল্প অর্থাৎ শ্রৌতসূত্র বেদের দুইটি হস্ত; জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদের চক্ষুঃস্বরূপ; নিরুক্ত-শাস্ত্র বেদের কর্ণ; শিক্ষা বেদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অর্থাৎ নাসিকা এবং ব্যাকরণ বেদের মুখস্বরূপ।

মানুষের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মুখই প্রধান অঙ্গ; সকল অঙ্গ থাকিয়াও মুখ না থাকিলে আহার গ্রহণ সম্ভব হইত না; আহার গ্রহণ না করিতে পারিলে শরীরের বল রক্ষিত হইতে পারিত না;

এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়, ঋষিগণের আর্যজ্ঞানের মধ্যে সকল বস্তুই প্রতিভাত হয়—তাঁহাদের কোন কিছু অলক্ষিত থাকিতে পারে না, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও সকল বিষয়ে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রাচীন সময়েও গ্রহণ করা হয় নাই।

† নিরুক্তং তু ব্যাকরণস্যৈব পরিশিষ্টপ্রায়ম্, বাহুলকাদি-সাধ্যানাং লোপাগমবিকারাদীনাং প্রায়শস্তত্র সংগ্রহাৎ।—শব্দ-কৌস্তুভ ১।১।১

** তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যম্।—নিরুক্ত ১।১৫।১; পদমঞ্জরীকার হরদত্ত মিশ্র যাস্কের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন;—নিরুক্তং তু ব্যাকরণস্যৈব কার্ৎস্ন্যম্।—পদমঞ্জরী ১।১

†† নাবৈয়াকরণায়।—নিরুক্ত ২।৩।৫

যস্তাবদবৈয়াকরণঃ, তস্মৈ ন নির্বক্তব্যোঽয়ং সমাম্নায়ঃ, ন হ্যসাবলক্ষণজ্ঞত্বাদ্ ব্যুৎপাদ্য নিরুচ্যমানমেতদ্ বুধ্যেত, ততো ব্যর্থ এব শ্রমঃ স্যাদিতি।—দুর্গাচার্য্যটীকা।

* দ্রষ্টব্য—নিরুক্ত; শাকপূণি ৩।১১।২, ৮।১০।৩; ঔর্ণনাভ —২।২৬।১, ১২।১।৪; ক্রৌষ্টুকি—৮।২।১, প্রচর্ম্মশিরাঃ—৩।১৫।১ ইহা ব্যতীত আগ্রয়ণ, ঔদুম্বরায়ণ, কৌৎস, কাথক্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী বহু নৈরুক্ত আচার্য্যের উল্লেখ যাস্কের নিরুক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্তে শাকপূণির নাম সর্ব্বপেক্ষা অধিক স্থলে উল্লিখিত আছে।

† শব্দকৌস্তুভের পম্পশাহ্নিকে এই উদ্ধৃত অংশের অন্যরূপ পাঠ গৃহীত হইয়াছে;—

মুখং ব্যাকরণং তস্য জ্যোতিষং নেত্রমুচ্যতে।
নিরুক্তং শ্রোত্রমুদ্দিষ্টং ছন্দসাং বিচিতিঃ পদে।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য হস্তৌ কল্পান্ প্রচক্ষতে।

বিশ্বেশ্বরপণ্ডিত-প্রণীত ব্যাকরণসিদ্ধান্তসুধানিধিতেও এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে। শব্দকৌস্তুভকার ভট্টোজিদীক্ষিত বলিয়াছেন, অঙ্গ যেরূপ অঙ্গীর উপকার করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্যাকরণ প্রভৃতি ছয়টি শাস্ত্র বেদের উপকারক হওয়ায় ইহাদিগকে বেদের অঙ্গ বলা হয়;—উপকারকত্বাদঙ্গত্বম্।—শব্দকৌস্তুভ ১।১।১

শরীরের বল না থাকিলে হস্ত, পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় কোনরূপ ব্যাপার করিতেই সমর্থ হইত না; তাহাদের সত্তা নিরর্থক হইত। এইরূপ, ব্যাকরণ শাস্ত্র না থাকিলে বেদের কোনরূপ অর্থজ্ঞান সম্ভব হইত না। অর্থ-জ্ঞান না হইলে বেদের দ্বারা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইত না; সুতরাং বেদ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইত। ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বারাই আমরা বেদের অর্থ-জ্ঞান করিতে পারি এবং সেই অর্থ-জ্ঞান হইতে যজ্ঞাদিকার্য্যে বেদের যথাযথ উপযোগ করিতে সমর্থ হই। অতএব ব্যাকরণই বেদের প্রধান অঙ্গ। বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান হওয়ায়, পূর্ব্বোদ্ধৃত—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ"—ইত্যাদি আগম (শাস্ত্র) অনুসারে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য; কারণ, প্রধানের প্রতি যে যত্ন সম্পাদিত হয়, সেই যত্নই ফলের জনক হইয়া থাকে। এখানে "ফলবান্" এই শব্দের অন্তর্গত "ফল" শব্দটির অর্থ বাক্যার্থজ্ঞান। এই ব্যাকরণ শাস্ত্র পদ এবং পদের অর্থজ্ঞানের দ্বারা বাক্যার্থবোধের উপযোগী; অতএব বেদের প্রধান অঙ্গ ব্যাকরণের অধ্যয়ন হইতে বাক্যের অর্থ বোধরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।

"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" এই আগম বাক্যের অন্তর্গত "নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ" এই অংশের দ্বারা ইহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে যে, কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদের অধ্যয়ন এবং তাহার অর্থজ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য *।

মীমাংসকগণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহকে নিত্য এবং কাম্যভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে সেই কর্ম্মের অধিকারীর প্রত্যবায় (পাপ) জন্মে, সেইগুলি "নিত্য" কর্ম্ম; যাহাদের অনুষ্ঠান না করিলে সেই কর্ম্মের অধিকারীর কোনরূপ প্রত্যবায় জন্মে না, কিন্তু কোনও কাম্যফলের লাভ হয়, তাহাদের নাম কাম্য কর্ম্ম। উপনীত দ্বিজাতি সন্ধ্যাবন্দন না করিলে, তাহাতে তাহার পাপ জন্মে; এই জন্য সন্ধ্যাবন্দন দ্বিজাতির পক্ষে "নিত্য" কর্ম্ম। এইরূপ আরও যে সকল কর্ম্ম যে সকল অধিকারীর জন্য শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে,—যাহাদের অনুষ্ঠানে কোন ফল নাই কিন্তু অনুষ্ঠান না করিলে সেই অধিকারীর পাপ জন্মে, সেই সমস্ত কর্ম্মই "নিত্য" কর্ম্মের অন্তর্গত। "বাজপেয় যজ্ঞ" প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিলে, যাহারা সেই সকল কর্ম্মে অধিকারী, তাহাদের কোনও পাপ হয় না, কিন্তু অনুষ্ঠান করিলে বিশিষ্ট ফলের লাভ হয়; এই জন্য এই শ্রেণীর সমস্ত কর্ম্মই "কাম্য" কর্ম্মের অন্তর্গত।

শাস্ত্রে এরূপ অনেক কর্ম্মের বিধান আছে, যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে, সেই কর্ম্মের যিনি অধিকারী, তাঁহার পাপ জন্মে, অথচ অনুষ্ঠান করিলে বিশিষ্ট ফলেরও লাভ হয়,—সেই সকল কর্ম্ম একাধারে "নিত্য" এবং 'কাম্য' এই উভয়ই; ব্রাহ্মণের পক্ষে ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন ফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই করা উচিত, এরূপ উপদেশ থাকায় ষড়ঙ্গ-সহিত বেদের অধ্যয়ন "নিত্য" কর্ম্ম, ইহা সূচিত হইয়াছে। ব্যাকরণ একটি বেদাঙ্গ হওয়ায় ইহার অধ্যয়নও ব্রাহ্মণের পক্ষে "নিত্য" কর্ম্মরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে; ব্যাকরণাধ্যয়নের সাধুশব্দ জ্ঞান ও বেদরক্ষাদি ফল আছে—এরূপ বলাতে ইহা যে "কাম্য" কর্ম্ম, ইহাও বলা হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ,"—এই আগম-বাক্যের দ্বারা বেদের অধ্যয়নের ন্যায় ব্যাকরণাধ্যয়নও ব্রাহ্মণের পক্ষে "নিত্য" কর্ম্মরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায়, ইহার অনুষ্ঠান না করিলে ব্রাহ্মণের প্রত্যবায় জন্মিবে, ইহা সূচিত হইয়াছে; অতএব এইরূপ যে প্রত্যবায় জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, সেই প্রত্যবায়ের যাহাতে উৎপত্তি না হয়, সেই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যাকরণাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য,—ইহাই এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মহাভাষ্যকার প্রতিপাদন করিয়াছেন।

যদিও পূর্ব্বোদ্ধৃত "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ"—এই বাক্যের দ্বারা ছয়টি বেদাঙ্গের অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি মহাভাষ্যকার অন্যান্য অঙ্গের অধ্যয়ন অপেক্ষা ব্যাকরণের অধ্যয়নের অধিক আবশ্যকতা প্রতিপাদনের উদ্দেশে, বেদের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া, তাহার অধ্যয়নের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন;—

"প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু * ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি।" (বেদের ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণই প্রধান; প্রধানবিষয়ে যে যত্ন সম্পাদিত হয়, তাহা ফলবান্ হয়।)

এখানে মহাভাষ্যকারের অভিপ্রায় এইরূপ প্রতীয়মান হয়;—ব্যাকরণের অধ্যয়ন না করিলে দুইটি দোষ হয়,—(১) ব্রাহ্মণের পক্ষে যে ব্যাকরণের অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না করায় একটি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা হয় না; (২) ব্যাকরণের অধ্যয়ন না করায়, বেদের অর্থজ্ঞান—যাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য—তাহাও হয় না।

মূল।—লঘ্বর্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ব্রাহ্মণেনাবশ্যং শব্দা জ্ঞেয়া

---

* এই বাক্যের অন্তর্গত "কারণ" শব্দটির অর্থ ফল, ইহা বুঝিতে হইবে; কারণশব্দঃ ফলপরঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত। কারয়তেঃ করণল্যুটা প্রবৃত্তিজনকেচ্ছাবিষয়ত্বসম্বন্ধেন প্রবৃত্তিজনকস্য ফলস্য কারণপদেন লাভাৎ।—ব্যাকরণ-সিদ্ধান্ত-সুধানিধি।

* কাশী প্রভৃতি সকল স্থানের মুদ্রিত পুস্তকেই "প্রধানং চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্" এইরূপ পাঠ আছে। ডাঃ কীলহর্ণের প্রকাশিত মহাভাষ্য বিভিন্ন স্থানের বহু হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়াছে। এই পুস্তকে "প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্" এই পাঠ আছে; এই পাঠই যুক্তিযুক্ত হওয়ায় এখানে গৃহীত হইয়াছে; "ষড়ঙ্গেষু" এই পাঠ স্বীকার করিলে বহু বচনান্ত এই "ষড়ঙ্গ" শব্দটির সমর্থন দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে; এখানে দ্বিগু সমাস স্বীকার করিলে স্ত্রীলিঙ্গ এবং একবচন হইয়া "ষড়ঙ্গী" এইরূপ হইবে এবং তাহার সপ্তমী বিভক্তিতে "ষড়ঙ্গ্যাম্" এইরূপ প্রয়োগ হইবে; "পাত্রাদি" আকৃতিগণ হওয়ায়, যদি তাহার মধ্যে "ষড়ঙ্গ" শব্দ আছে—এরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে স্ত্রীলিঙ্গ না হইলেও সমাহার দ্বিগু হওয়ায় এক বচন হইবে,—"ষড়ঙ্গম্" এইরূপ প্রয়োগ হইবে এবং তাহার উত্তর সপ্তমীর বহুবচন না হইয়া এক বচন হইবে,—"ষড়ঙ্গে" এইরূপ প্রয়োগ হইবে; "ষড়ঙ্গেষু" এইরূপ ঋষসিক প্রয়োগ কোন রূপেই সিদ্ধ হইবে না। এই জন্য ডাঃ কীলহর্ণের পাঠই সঙ্গত।

ইতি। নচান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা জ্ঞাতুম্ * *।

অনুবাদ।—লঘুর (= লাঘবের) নিমিত্ত ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের (পক্ষে) শব্দসমূহ অবশ্য জ্ঞাতব্য। ব্যাকরণ বিনা লঘু উপায়ের দ্বারা শব্দসমূহ জানিতে পারা যায় না।

মন্তব্য।—এস্থলে মহাভাষ্যে পঠিত "লঘ্বর্থম্" এই পদের অন্তর্গত "লঘু" শব্দটির অর্থ—লাঘব। "লঘু" এই শব্দটির দ্বারা যে বস্তু লাঘব-বিশিষ্ট—তাহাই বুঝায়, কেবল লাঘব বুঝায় না। যেমন ঘটশব্দের দ্বারা ঘটত্ব-বিশিষ্ট বস্তু বুঝায়, কেবল ঘটত্ব বুঝায় না। এখানে "লঘু" শব্দটি নিজের স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া "লাঘব" অর্থকে প্রকাশ করিতেছে। এরূপ প্রয়োগকে ভাবপ্রধান নির্দ্দেশ (ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ) বলা হয়। এরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই,—যে শব্দটি ধর্ম্ম-বিশিষ্টের (ধর্ম্মীর) বাচক, সেই শব্দটিকে তাহার মুখ্য অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই, তাহার মুখ্য অর্থ ধর্ম্মী, সেই মুখ্য অর্থ টিকে পরিত্যাগ করিয়া "ধর্ম্ম" রূপ অর্থে তাহার লক্ষণা করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে একটি মাত্র বস্তু (ধর্ম্ম)ই প্রকারতা (বিশেষণতা) ও বিশেষ্যতা—এই উভয় রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা নাগেশভট্ট লঘুমঞ্জুষার স্ফোট-প্রকরণে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।—ব্রাহ্মণের বৃত্তি অধ্যাপনা; যাহার শব্দ-জ্ঞান নাই, তাহাকে অব্যুৎপন্ন মনে করিয়া ছাত্রগণ তাহার নিকট অধ্যয়নের জন্য উপস্থিত হয় না; ছাত্র উপস্থিত না হইলে অধ্যাপনা হইতে পারে না। এই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দ-জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যাকরণ ব্যতিরেকে শব্দ-জ্ঞানের অন্য কোন রূপ লাঘব-যুক্ত উপায় নাই; এই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শব্দজ্ঞানার্থ ব্যাকরণের অধ্যয়ন অবশ্য করণীয় ‡।

এখানে একটি আশঙ্কা উপস্থিত হয়;—এখানে লাঘবকে ব্যাকরণাধ্যয়নের ফলরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে; কিন্তু লাঘব ব্যাকরণাধ্যয়নের ফল হইতে পারে না। ব্যাকরণে লোক-ব্যবহারে অপরিজ্ঞাত নানা প্রকার সংজ্ঞা ও পরিভাষা অবলম্বন করিয়া সূত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে; এই সকল সংজ্ঞা ও পরিভাষার অর্থজ্ঞান সহজসাধ্য নহে। ব্যাকরণে যে সকল বার্ত্তিক সন্নিবিষ্ট আছে, তাহাদের অর্থ অত্যন্ত গভীর হওয়ায় সেই সকল বার্ত্তিকের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া সাধারণ বুদ্ধির মনুষ্যের পক্ষে অতি কঠিন। এই সকল সূত্র ও বার্ত্তিকের অর্থ জ্ঞানের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে ঋষিগণ যে সকল ভাষ্যাদি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে সকল গ্রন্থের অর্থও অতিশয় গভীর। এই সকল কারণে ব্যাকরণের দ্বারা শব্দ-জ্ঞানে কোন প্রকার লাঘব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল গ্রন্থের অধ্যয়ন করিয়া যদি শব্দজ্ঞান সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাতে যে অত্যন্ত গুরুতর আয়াস স্বীকার করিতে হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের অধ্যয়নে যে লাঘব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ গৌরবে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য,—শব্দরাশি অনন্ত; এই জন্য প্রত্যেকটি শব্দকে পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে পাঠ করিয়া, তাহা হইতে কাহারও সমস্ত শব্দের জ্ঞান হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কারণ, সমগ্র শব্দ-রাশির প্রত্যেকটি শব্দের পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে পাঠ (প্রতিপদপাঠ) করা অসম্ভব; আর এই ভাবে পঠিত প্রত্যেকটি শব্দ পৃথগ্ ভাবে জানিয়া কাহারও সমগ্র ভাষায় ব্যুৎপত্তি হইবে,—ইহাও অসম্ভব। বহু আয়াস স্বীকার করিলে অনন্ত শব্দরাশির কতকগুলি শব্দের জ্ঞান হইতে পারে—এই মাত্র। ব্যাকরণের সাহায্যে শব্দ-জ্ঞানে অত্যন্ত লাঘব পরিলক্ষিত হয়; সামান্যসূত্র (উৎসর্গশাস্ত্র) এবং সামান্য সূত্রের বাধক বিশেষ সূত্রের (অপবাদশাস্ত্রের) সাহায্যে অনন্ত শব্দরাশির জ্ঞান-লাভ কিছু আয়াসসাধ্য হইলেও অসাধ্য বা অত্যন্ত দুঃসাধ্য নহে। এই কারণে মহাভাষ্যকার বলিয়া-ছেন, ব্যাকরণ বিনা লঘু উপায়ে শব্দ-জ্ঞান সম্পাদিত হইতে পারে না ("ন চান্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা জ্ঞাতুম্")।

মূল।—অসন্দেহার্থং চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি "স্থূলপৃষতীমাগ্নিবারুণীমনড্বাহীমালভেত"—ইতি। তস্যাং সন্দেহঃ, স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ স্থূলপৃষতী, স্থূলানি বা পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতী। তাং নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ততো বহুব্রীহিঃ। অথান্তোদাত্তত্বং * ততস্তৎপুরুষ ইতি।

অনুবাদ।—সন্দেহের অভাব—এই প্রয়োজনটির জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়নবিধেয়। যাজ্ঞিকরা পাঠ করেন ("স্থূলপৃষতী আগ্নিবারুণী-মনড্বাহীমালভেত") অগ্নি এবং বরুণ দেবতার উদ্দেশে স্থূলপৃষতী অনড্বাহী (স্ত্রী গো) কে আলম্ভন (বধ) করিবে। তাহাতে (অর্থাৎ স্থূলপৃষতী এই স্থলে) সন্দেহ (হয়), যে স্থূলা সেই পৃষতী—স্থূলপৃষতী (স্থূলা চাসৌ পৃষতী চ—স্থূলপৃষতী) (এইরূপ বিগ্রহে কর্ম্মধারয় নামক তৎপুরুষ সমাস) অথবা স্থূল পৃষৎ (বিন্দু) সমূহ যাহার (গাত্রে) সেই স্থূলপৃষতী (স্থূলানি বা পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূল-পৃষতী) (এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাস)? যিনি বৈয়াকরণ নহেন, তিনি তাহাকে (সেই স্থূল পৃষতীকে) (উদাত্তাদি) স্বরের দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারেন না (অর্থাৎ নিশ্চয় করিতে পারেন না)। যদি পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হয়, ("বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্" ৬।২।১। এই সূত্র অনুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি স্বর হয়), তাহা হইতে বহুব্রীহি (বুঝিতে হইবে), যদি (সমাসনিমিত্ত) অন্তোদাত্ত ("সমাসস্য" ৬।১।২২৩ এই সূত্র অনুসারে সমাস-পদটির অন্তস্বর উদাত্ত) হয়, তাহা হইলে তৎপুরুষ (কর্ম্মধারয় নামক তৎপুরুষ) (বুঝিতে হইবে।)

ব্যাখ্যা।—("পৃষৎ" শব্দের দুইটি অর্থ,—বিন্দু এবং শ্বেতবিন্দুযুক্ত *।

** এখানে "জ্ঞাতুম্" এইরূপ পাঠ ডাঃ কীলহর্ণের পুস্তকে আছে; অন্যান্য পুস্তকে "বিজ্ঞাতুম্" এইরূপ পাঠ আছে।

‡ কৈয়টকৃত প্রদীপ, শব্দকৌস্তুভ এবং ব্যাকরণসিদ্ধান্ত-সুধানিধি দ্রষ্টব্য।

* "অথান্তোদাত্তত্বং" এই স্থলে কাশীর পুস্তকগুলিতে "অথ সমাসান্তোদাত্তত্বং" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

*…"পৃষতস্তু মৃগে বিন্দৌ সরোহিতে। পুংসি শ্বেতবিন্দুযুতেঽপি স্যাৎ"……অমরকোষেগত হইয়াছে ভানুজীদীক্ষিতের টীকার উদ্ধৃত এই সমগ্র বাক্যটির

'শ্বেতবিন্দুযুক্ত' এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে "উগিতশ্চ" (৪।১।৬) এই সূত্রের দ্বারা 'ঙীপ্‌' প্রত্যয় হইলে 'পৃষতী' শব্দটি সিদ্ধ হয়। 'স্থূলা চাসৌ পৃষতী' এই বিগ্রহ বাক্যে কর্ম্মধারয় সমাস করিলে তাহার অর্থ এই হয়, যে নিজে স্থূল এবং যাহার শরীরের শ্বেতবর্ণ বিন্দু বর্ত্তমান আছে। 'স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ'—এইরূপ বিগ্রহবাক্যে বহুব্রীহি সমাস করিলে 'স্থূলপৃষৎ' এই শব্দ সিদ্ধ হয়; এই শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে "উগিতশ্চ" (৪।১।৬) এই সূত্র অনুসারে ঙীপ্‌ প্রত্যয় করিলে 'স্থূলপৃষতী' এই পদ সিদ্ধ হয়, তাহার অর্থ হয়,—যাহার (শরীরে) স্থূল বিন্দু সকল বিদ্যমান আছে। এখানে কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের অর্থভেদ প্রণিধান যোগ্য ;—কর্ম্মধারয় সমাসে 'স্থূলপৃষতী' যে গো, সে নিজে স্থূলা হইবে ; তাহার শরীরের বিন্দু স্থূল (বড়) হইবে, কি সূক্ষ্ম (ছোট) হইবে, সে বিষয়ে কোন কিছু নিয়ম বুঝায় না ; বহুব্রীহি সমাস স্থলে সেই গোর শরীর স্থূল হইবে কি কৃশ হইবে, সে বিষয়ে কোন কিছু নিয়ম বুঝায় না, কিন্তু তাহার শরীরে যে বিন্দু সকল আছে, সেগুলি স্থূল, ইহা বুঝায়। যাহারা যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মের যথাযথভাবে নির্ব্বাহ করার নিমিত্ত 'স্থূলপৃষতী' শব্দটির অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। এখানে কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি এই উভয় সমাসেই 'স্থূলপৃষতী' এই শব্দের আকার সমভাবে থাকে বলিয়া উদাত্তাদি স্বরের ‡ দ্বারাই ইহার অর্থ নির্ণয় করিতে হইবে।

মহাভাষ্যকারের উক্তির তাৎপর্য্য এই,—যাহারা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করে নাই, তাহারা উদাত্তাদি স্বরের সহায়তায় এইরূপ সন্দিগ্ধ স্থলে শব্দের অর্থ-নির্ণয় করিতে পারে না ; অথচ, বেদগত এই সকল সন্দিগ্ধ শব্দের অর্থ নির্ণয় না হইলে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিতে পারে না। এই সকল সন্দিগ্ধ শব্দের উদাত্তাদি স্বরের দ্বারা অর্থ-নির্ণয়ের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা উচিত ; অতএব দেখা যাইতেছে, ইহাও ব্যাকরণ অধ্যয়নের একটি প্রয়োজন।

মন্তব্য—এখানে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি স্বর অর্থাৎ সমাসের পূর্ব্বে যে স্বর ছিল, সেই স্বর থাকায় 'স্থূলপৃষতী' এই শব্দটির বহুব্রীহি সমাস অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায়, সেই অর্থটি গ্রহণ করিতে হইবে *। এখানে 'স্থূল' শব্দটির অন্ত্যস্বর সমাসের পূর্ব্বে উদাত্ত ছিল ; এখন সমাস হওয়ার পরেও তাহাই আছে ; এই জন্য এটি বহুব্রীহি সমাস—ইহা বুঝিতে হইবে।

এখানে কৈয়ট একটি ভাল কথা বলিয়াছেন,—এখানে মহাভাষ্যের 'অসন্দেহ' এই শব্দটির দ্বারা সন্দেহের অভাব বুঝাইতেছে ; এই অভাবটি সন্দেহের ধ্বংসাভাব ইহা বলা যায় না ; যিনি বৈয়াকরণ, তাঁহার কখনও এইরূপ ক্ষেত্রে সন্দেহের উৎপত্তিই হয় না। যে ব্যক্তির যে শব্দের বিষয়ে সন্দেহ আছে, তিনি বৈয়াকরণ হইলেও সেই শব্দের বিষয়ে বৈয়াকরণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারেন না ; সেই শব্দটির বিষয়ে তিনি বৈয়াকরণ নহেন,—অবৈয়াকরণ ; এই জন্য এস্থলে 'সন্দেহাভাব' অর্থে সন্দেহের প্রাগভাব বুঝিতে হইবে। বৈয়াকরণের সন্দেহের প্রাগভাব থাকিতে পারে। উৎপত্তিশালী বস্তুর উৎপত্তির পূর্ব্বে উপাদান কারণে তাহার যে অভাব থাকে, তাহাতে প্রাগভাব বলা হয় ; ঘটাদির স্থলে এই প্রাগভাব হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয়। এখানে এই যে সন্দেহের প্রাগভাব, ইহা হইতে বৈয়াকরণের অন্তঃকরণে কখনও সন্দেহের উৎপত্তি হয় না। ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি, এই প্রাগভাবকে সর্ব্বদা সন্দেহের উৎপাদন হইতে নিবৃত্ত করিয়া রাখে।

এখানে মহাভাষ্যে আছে—"যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি" নাগেশভট্ট ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যজ্ঞকাণ্ডভবাঃ শব্দাঃ যাজ্ঞিকাঃ" (মহাভাষ্য-প্রদীপোদ্দ্যোত) ইহার তাৎপর্য্য—বেদের যজ্ঞপ্রকরণের যে সকল

---

‡ সমাসস্য (৬।১।২২৩) সমাসস্যান্ত উদাত্তো ভবতি।—কাশিকা।

অর্থ,—সমাসের অন্ত উদাত্ত হয়।

এই সূত্রটি সামান্য সূত্র ; কোন বিশেষ সূত্র না থাকিলে এই সূত্রটির প্রবৃত্তি হইবে। সমাসস্থলে সমাসের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের বিভিন্ন স্বর হইবে না। কিন্তু সমুদায়ের অন্ত্যস্বরটি উদাত্ত হইবে, ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য। "স্বরবিধৌ ব্যঞ্জনমবিদ্যমানবৎ"—স্বরবিধিতে ব্যঞ্জন অবিদ্যমানের তুল্য হয়—এই পরিভাষা অনুসারে সমাস পদটি হলন্ত হইলেও তাহার স্বরের মধ্যে যেটি অন্তিম স্বর, সেইটি উদাত্ত হইবে ; তাহাকেই সমাসের অন্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।

এখানে একটি বিশেষ বক্তব্য আছে—যদি কোন পদের কোন একটি স্বর উদাত্ত অথবা স্বরিত হয়, তাহা হইলে সেই পদের অবশিষ্ট সমস্ত স্বর অনুদাত্ত হইয়া যায়—

"অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্" (৬।১।১৫৮)

"পরিভাষেয়ং স্বরবিধিবিষয়া। যত্রান্যঃ স্বর উদাত্তঃ স্বরিতো বা বিধীয়তে তত্রানুদাত্তং পদমেকং বর্জ্জয়িত্বা ভবতীত্যেতদুপস্থিতং দ্রষ্টব্যম্। অনুদাত্তাচ্‌কমনুদাত্তম্। কঃ পুনরেকো বর্জ্জ্যতে ? যস্যাসৌ স্বরো বিধীয়তে।"—কাশিকা।

এই নিয়ম ত্রিপাদীতে (অর্থাৎ অষ্টাধ্যায়ীর অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ হইতে চতুর্থপাদ পর্য্যন্ত অংশে) যে সকল স্বর বিহিত আছে, তাহাদের বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। যথা—"উদাত্তাদনুদাত্তস্য স্বরিত" (৮।৪।৬৬) এই সূত্রের দ্বারা বিহিত যে স্বরিত, সেই স্বরিত-স্বর হইলে, "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্" এই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র অনুসারে পদের অন্তর্গত অন্ত স্বরের স্থানে অনুদাত্ত স্বর হইবে না।

বহুব্রীহিস্থলে সমাসের পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হওয়ার সূত্রটি এই—

"বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্ব্বপদম্" ৬।২।১

ইহার অর্থ,—বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হয় অর্থাৎ সমাস হওয়ার পূর্ব্বে সেই পূর্ব্বপদটির যে স্বর ছিল, সমাস হওয়ার পরেও সেই স্বরই থাকে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

পূর্ব্বপদের এই প্রকৃতিস্বর হইলেও পূর্ব্বোক্ত "অনুদাত্তং পদমেকবর্জ্জম্" এই সূত্রের দ্বারা সমগ্র সমাস-পদটির অবশিষ্ট স্বরগুলি অনুদাত্ত হইবে। এখানে সূত্রস্থিত "পূর্ব্বপদ" শব্দটির দ্বারা উদাত্ত অথবা স্বরিত-স্বরযুক্ত পূর্ব্বপদ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যেস্থলে বহুব্রীহি সমাসের পূর্ব্বপদে উদাত্ত অথবা স্বরিত স্বর থাকিবে, সেই স্থলেই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বর হইবে ; যদি পূর্ব্বপদের সমস্ত স্বর অনুদাত্ত হয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে এই সূত্রের প্রবৃত্তি হইবে না ; সেস্থলে পূর্ব্বোক্ত "সমাসস্য" এই সামান্য সূত্র অনুসারে সমগ্র সমাস পদটির অন্ত্য স্বর উদাত্ত হইবে—দ্রষ্টব্য মহাভাষ্য ও কাশিকা।

* "পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরাদ্বহুব্রীহ্যর্থাবসায় ইত্যর্থঃ।—"মহাভাষ্যপ্রদীপ।

শব্দ আছে, সেই শব্দকেই এখানে 'যাজ্ঞিক' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। "যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি"—নাগেশের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহা অর্থ হইতেছে,—'বেদের মন্ত্রকাণ্ডের যে শব্দ, তাহারা জ্ঞাপন করিতেছে।' নাগেশভট্ট বেদের নিত্যতা রক্ষার উদ্দেশে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে প্রণিধান-যোগ্য একটি বিষয় আছে;—"তেন প্রোক্তম্" (৪।৩।১০১) এই সূত্রে মহাভাষ্যকার স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—বেদের প্রতিপাদ্য অর্থবস্তু নিত্য হইলেও তাহার শব্দ-রচনার কর্ত্তা ঋষিগণ। তাহা হইলে আমরা এখানে ইহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, মহাভাষ্যে নির্দ্দিষ্ট এই 'যাজ্ঞিক' যজ্ঞ-প্রতিপাদক শব্দ-সমষ্টি নহে, যজ্ঞকর্ম্মের জ্ঞাতা বা উপদেষ্টা ঋষিগণ। এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আমরা একটা কষ্টকল্পনার হাত হইতে অব্যাহতি পাই।

মূল—ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি। তেঽসুরাঃ। দুষ্টঃ শব্দঃ। যদধীতম্। যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে। অবিদ্বাংসঃ। বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি। যো বা ইমাম্। চত্বারি। উত ত্বঃ। সক্তুমিব। সারস্বতীম্। দশম্যাং পুত্রস্য। সুদেবো অসি বরুণেতি।"

অনুবাদ।—এইগুলি পুনঃ শব্দানুশাসনের (ব্যাকরণের) প্রয়োজন;—"তেঽসুরাঃ," "দুষ্টঃ শব্দঃ," "যদধীতম্","যস্তু প্রযুঙ্‌ক্তে", "অবিদ্বাংসঃ", বিভক্তিং কুর্ব্বন্তি," "যো বা ইমাম্", "চত্বারি," "উত ত্বঃ," "সক্তুমিব" "সারস্বতীম্," "দশম্যাং পুত্রস্য," "সুদেবো অসি বরুণ"।

মন্তব্য।—এখানে মহাভাষ্যে "ভূয়ঃ" এই শব্দটি 'পুনঃ'শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে *।

প্রথমে "অথ শব্দানুশাসনম্"—এইরূপে মহাভাষ্যের আরম্ভ করায় ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় যে সাধুশব্দ—তাহার সূচনা করার সঙ্গে সঙ্গে, অশুদ্ধ শব্দ হইতে সাধু (শুদ্ধ) শব্দের পৃথগ্‌ ভাবে যে জ্ঞান, তাহাই ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন ইহাও সূচিত হইয়াছে। ইহার পরে "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" এই বাক্যের দ্বারা সাধুশব্দ-জ্ঞানের যাহা ফল, তাহা বলা হইয়াছে। "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ" এই বাক্যে আগম অর্থাৎ শাস্ত্রকে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়নের প্রবর্ত্তকরূপে প্রতিপাদন

"ফিষোঽন্ত উদাত্তঃ" (ফিট্‌সূত্র ১।১) "প্রাতিপদিকং ফিট্, তস্যান্ত উদাত্তঃ স্যাৎ।"—

সিদ্ধান্তকৌমুদী স্বর-প্রকরণ ইহার অর্থ—প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হয়।

এই সূত্র অনুসারে স্থূল শব্দটি প্রাতিপদিক হওয়ায় ইহার অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়া থাকে। সমাস হওয়ার পরেও এই স্থূল শব্দের অন্ত্যস্বরের উদাত্ততা লক্ষিত হয়; ইহার দ্বারা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি যে, এই স্থূলপৃষতী শব্দটি বহুব্রীহি সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।

"তত্র লকারাকারে উদাত্তত্বং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ বহুব্রীহিং বৈয়াকরণো নিশ্চিনোতি।"—শব্দকৌস্তুভ—পস্পশাহ্নিক।

"তত্র পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং দৃষ্ট্বা পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ বহুব্রীহিত্বনিশ্চয়ঃ।"

—ব্যাকরণ-সিদ্ধান্তসুধানিধি—পস্পশাহ্নিক।

* ভূয় ইতি। পুনরিত্যর্থঃ।—মহাভাষ্যপ্রদীপ।

করা হইয়াছে। পূর্ব্বে, যে আগমে (শাস্ত্রে) ব্যাকরণের অধ্যয়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ধ্যাবন্দনাদির ন্যায় নিত্যকর্ম্মরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, কেবল সেই আগমই প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন অপর কতকগুলি শাস্ত্রবাক্য প্রদর্শিত হইতেছে—যে সকল শাস্ত্রবাক্যে ব্যাকরণের অধ্যয়ন কর্ত্তব্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে;—পূর্ব্বে যখন "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" ইহা বলা হইয়াছে, এবং তাহার বিবৃতিকালে "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি" এই শাস্ত্রবাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহার সঙ্গেই এই পরবর্ত্তী সময়ে প্রদর্শিত শাস্ত্রবাক্যগুলির উল্লেখ করিলেই, এই বিষয়ে যাহা কিছু শাস্ত্রবাক্য আছে, সকল গুলির এক সঙ্গেই উল্লেখ হইয়া যাইত; তাহা না করিয়া ভাষ্যকার পৃথগ্‌ ভাবে দুইবার শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ কেন করিলেন? ইহার উত্তরে কৈয়ট বলিয়াছেন,—পূর্ব্ববর্ত্তী বেদ-রক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি প্রয়োজন, প্রধান প্রয়োজন; পরবর্ত্তী প্রয়োজন-গুলি আনুষঙ্গিক প্রয়োজন; অতএব প্রথমে প্রধান প্রয়োজনগুলির উল্লেখ করিয়া, তাহার পরে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে।

এখানে 'প্রধান' ও 'আনুষঙ্গিক' এই দুইটি শব্দের অর্থ স্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যাহা কাহারও অধীন নহে, যেটি স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, সেইটিই প্রধান; এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, 'শব্দানুশাসন'—ব্যাকরণের এই সার্থক নাম হইতে সাধু-শব্দ-জ্ঞানই ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাক্ষাৎ প্রয়োজন, ইহা সূচিত হইয়াছে, কৈয়ট এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রয়োজনের যাহা ফল বেদ-রক্ষা প্রভৃতি, তাহা পরে বর্ণিত হইয়াছে। এই বেদ-রক্ষা প্রভৃতি পাঁচটি ফলের উদ্দেশে সাধুশব্দ জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন করিলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও যেগুলি ফল সিদ্ধ হয়, সেই গুলিই আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাহার উদ্দেশে লোক কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, সেইটি তাহার মুখ্য ফল বা প্রধান প্রয়োজন; সেই প্রধান ফলের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল ফল সিদ্ধ হয়, তাহাকে আনু-ষঙ্গিক প্রয়োজন বলা হয়। ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—যদি কেহ কৃষির উদ্দেশে কূপ বা খাল খনন করে, তাহা হইলে সেই কূপ বা খালের প্রধান প্রয়োজন হইতেছে—কৃষি; আর সেই কূপ বা খালের জলের দ্বারা যে স্নান পানাদি ক্রিয়া সাধিত হয়, এই স্নানপানাদি আনুষঙ্গিক প্রয়োজন। এখানেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

আমরা এখানে ভাষ্যকারের এইরূপ দুই ভাগে প্রয়োজন প্রদর্শনের অন্য অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিতে চাই; দ্বিতীয় বারে যে সকল শাস্ত্র-বাক্য প্রদর্শন করা হইয়াছে, সে স্থলেও 'প্রয়ো-জন' শব্দের অর্থ প্রবর্ত্তক=প্রবৃত্তিজনক বাক্য; ব্যাকরণের অধ্য-য়নে আরও কতকগুলি প্রবর্ত্তক বাক্য আছে এবং সে গুলি এখন প্রদর্শিত হইতেছে,—এইরূপ পতঞ্জলির অভিপ্রায় আমাদের মনে হয়। পূর্ব্বে একটি মাত্র আগম-বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, যে আগম-বাক্যের দ্বারা ব্যাকরণের অধ্যয়ন নিত্যকর্ম্মরূপে প্রতি-পাদিত হইয়াছে। সে স্থলে বেদরক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনের সঙ্গে 'আগম' এই অংশের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাই প্রদর্শিত হইয়াছে "রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" এই সমগ্র বাক্যটির

ব্যাখ্যার পরে, ভাষ্যকার উক্ত বাক্যের অন্তর্গত 'আগম' এই অংশটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদর্শনের উদ্দেশে—"ইমানি চ ভূয়ঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি"—ইত্যাদি ভাষ্যের অবতারণা করিয়াছেন। অন্য প্রয়োজনগুলির সঙ্গে 'আগম' এই অংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলে শিষ্যগণের বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটিত; যেহেতু, বেদ-রক্ষা প্রভৃতি অন্য চারিটি প্রয়োজনের বিষয়ে অধিক বক্তব্য ছিল না; তাহাদের সঙ্গে 'আগম' এই অংশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলে শিষ্যগণ সেই অল্প বক্তব্যগুলির প্রতি মনোযোগ হারাইয়া ফেলিত। পতঞ্জলি শিষ্যদের অনায়াসে বোধের উদ্দেশে প্রথমে অল্পবক্তব্য প্রয়োজনগুলির সঙ্গে 'আগম' এই অংশের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া, 'আগম' অংশে যাহা অধিক বক্তব্য, তাহা পরে বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাকৌশলই প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমরা এস্থলে যদি ইহা বলি যে, পরবর্ত্তী প্রয়োজনগুলি পৃথক্ প্রয়োজন নহে এবং ব্যাকরণের অধ্যয়নের ফল যে সাধুশব্দজ্ঞান—তাহার পাঁচটিই প্রয়োজন, তাহা হইলে বোধ হয় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের সহিত উত্তরবর্ত্তী গ্রন্থের একবাক্যতা সিদ্ধ হওয়ায় লাঘবেই পর্য্যবসান ঘটে। আমাদের ব্যাখ্যা অনুসারে 'ভূয়ঃ' শব্দটি এখানে 'আরও' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র বাক্যটির অর্থ এইরূপ হইতেছে,—ব্যাকরণের অধ্যয়নে প্রবৃত্তিজনক আরও শাস্ত্রবাক্য আছে। সেই শাস্ত্র-বাক্যগুলির প্রত্যেকটির প্রথম অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের সমগ্র অংশ সূচিত করা হইয়াছে।

মূল। "তেঽসুরাঃ"। তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ-পরাবভূবুস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। "তেঽসুরাঃ।"

অনুবাদ।—"তেঽসুরাঃ (এই 'প্রতীকে'র দ্বারা যে শাস্ত্রবাক্য সূচিত করা হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে) সেই অসুররা 'হেলয়ঃ' 'হেলয়ঃ' এইরূপ উচ্চারণ করিয়া পরাভূত হইয়াছিল, সেই জন্য ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছন করিবে না—অপভাষণ করিবে না; যাহা অপশব্দ (অশুদ্ধ শব্দ) তাহাই ম্লেচ্ছ। 'তেঽসুরাঃ' (এই 'প্রতীকে'র দ্বারা যে শাস্ত্র-বাক্য সূচিত হইয়াছিল, তাহা সমাপ্ত হইল।)

মন্তব্য।—"তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি বাক্য বেদের ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত কোন গ্রন্থ হইতে ভাষ্যকার উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাল-বশে বেদের বহু ভাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাদের কোন স্থানে এইরূপ পাঠ নাই। মাধ্যন্দিন শাখার শতপথব্রাহ্মণে উক্ত বাক্যের "হেলয়ো হেলয়ঃ" এই অংশে "হেলবো হেলবঃ" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য—শব্দকৌস্তুভ ও ব্যাকরণসিদ্ধান্ত-সুধানিধি)

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার "শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" গ্রন্থে এই শ্রুতির অন্য প্রকার পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"সাধু-র্ভির্ভাষিতব্যং নাপভ্রংশিতবৈ ন ম্লেচ্ছিতবৈ।" (শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ২০) তিনি এই স্থলে "ম্লেচ্ছিতবৈ" শব্দটিকে তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্তরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—ম্লেচ্ছিতবৈ ম্লেচ্ছমাত্রসংকেতিতৈঃ।" বলা বাহুল্য, ঠিক এই রূপ পাঠ-যুক্ত কোন শ্রুতি নাই। "ম্লেচ্ছিতবৈ" শব্দটি 'তব্য' প্রত্যয়ের সমানার্থক তবৈ প্রত্যয়ের (কৃত্যার্থে তবৈকেন্‌কেন্যত্বনঃ।—অষ্টাধ্যায়ী ৩।৪।১৪) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং ইহার অর্থ—'ম্লেচ্ছমাত্রসঙ্কে-তিতৈঃ'—'যাহা কেবল ম্লেচ্ছ-সম্প্রদায়ে অর্থ বিশেষের প্রতিপাদক-রূপে নির্দ্দিষ্ট'—এরূপ হইতে পারে না।

"তেঽসুরাঃ" ইত্যাদি বাক্য বেদের ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অনুচিত হইবে না।

মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" (আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্র ১।৩৩)—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের নাম বেদ। পূর্ব্ব সময়ে বেদের স্বরূপ বিষয়ে মতভেদ ছিল, ইহা আপস্তম্ব যজ্ঞপরিভাষাসূত্রের হরদত্তাচার্য্য-প্রণীত বৃত্তি হইতে জানিতে পারা যায়;—"কৈশ্চিন্মন্ত্রাণামেব বেদত্বমাখ্যাতম্। কৈশ্চিৎ কল্পসূত্রাণা-মপি। উভয়নিরাসার্থোঽয়মারম্ভঃ।" 'কোন কোন ব্যক্তি কেবল মন্ত্রভাগকেই বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; আবার, কেহ কেহ শ্রৌতসূত্রকেও বেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই উভয় মতের নিরাসের জন্য আপস্তম্ব পূর্ব্বোক্ত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

ছন্দঃশাস্ত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে মন্ত্রের স্বরূপ বলা হইয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠে না। কেবল একটি প্রশ্ন উঠে যে, ব্রাহ্মণ বলিতে আমরা কি বুঝিব? তাহার উত্তরে আপস্তম্ব বলিয়াছেন, যে বাক্যগুলি যজ্ঞাদিকর্ম্মের বিধি, সেইগুলি ব্রাহ্মণ ("কর্ম্মচোদনা ব্রাহ্মণানি" ১।৩৪)। এই কর্ম্মবিধির সহিত সম্বন্ধ যে অর্থবাদ, তাহাও ব্রাহ্মণেরই অংশ; তাহা বিধিরই উপকারক (ব্রাহ্মণশেষোঽর্থবাদঃ ১।৩৮)। এই অর্থবাদগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতি এবং পুরাকল্প (নিন্দা প্রশংসা পরকৃতিঃ পুরাকল্পশ্চ ১।৩৬)। নিন্দা'—যে অর্থবাদ কোন একটি নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা প্রতিপাদন করে, তাহার নাম নিন্দা; যথা—যজ্ঞের দক্ষিণারূপে রজতদানের নিন্দা করা হইয়াছে—"যো বর্হিষি দদাতি পুরাঽস্য সংবৎসরাদ্‌গৃহেরুদন্তি"—এইটি 'নিন্দার্থবাদ।" এই বাক্যের অন্তর্গত বর্হিষি শব্দটির অর্থ যজ্ঞ; বর্হিঃশব্দের মুখ্য অর্থ কুশ; কিন্তু এখানে লক্ষণার দ্বারা তাহার অর্থ কুশ-সাধ্য যাগ গ্রহণ করিতে হইবে; ("বর্হিষি বর্হিঃ সাধ্যে যাগে"—বেদান্তকল্পতরু ১।৩।৪)। প্রশংসা—যে অর্থবাদ কাহারও প্রশংসার উদ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার নাম প্রশংসা অর্থবাদ; যথা—"যজমানো বৈ প্রস্তরঃ" (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ৬।৭) এখানে দর্শপূর্ণমাসাদি যাগে বেদিতে আস্তীর্ণ প্রস্তরনামক কুশ-সমূহকে যজমানের (যজ্ঞকর্ত্তার) তুল্য বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। পরকৃতি—যে অর্থবাদ এমন কোন উপাখ্যানকে অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে—যে উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার কর্ত্তা এক জন, তাহাকে পরকৃতি বলে (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।৩৩)। পুরাকল্প—যে উপখ্যানে বর্ণিত ঘটনার কর্ত্তা এক নহে,—অনেক, এইরূপ উপাখ্যানের প্রতিপাদক অর্থবাদকে পুরাকল্প বলে (তন্ত্রবার্ত্তিক ২।১।৩৩)। আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রের কপর্দ্দিস্বামিপ্রণীত ভাষ্যে (১।৩৫-৩৬) পরকৃতি ও পুরাকল্প নামক শেষোক্ত অর্থবাদের বিষয়ে কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়;—কপর্দ্দিস্বামী বলিয়াছেন,—কেহ কেহ মনে করেন—যে উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার কর্ত্তা বহু-সংখ্যক ব্যক্তি সেইরূপ উপাখ্যানের প্রতিপাদক অর্থবাদের নাম 'পুরাকল্প'। এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই,—তন্ত্রবার্ত্তিকে

'অনেক কর্ত্তা'র কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার দ্বারা দুই কর্ত্তাও আমরা গ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু কপর্দ্দিস্বামীর উল্লিখিত এই মতে যে ঘটনার কর্ত্তা দুই, সেইরূপ ঘটনার প্রতিপাদক বৈদিক উপাখ্যান (অর্থবাদ) কে পুরাকল্প বলা চলে না; ইহাকে পরকৃতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করিতে হয়। কপর্দ্দিস্বামীর নিজের মতে যে উপাখ্যানে বর্ণিত ঘটনার কোন পুরুষ কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট নাই, সেইরূপ উপাখ্যানপ্রতিপাদক অর্থবাদকে 'পুরাকল্প' বলা উচিত; কপর্দ্দিস্বামী এই 'পুরাকল্পে'র উদাহরণ দিয়াছেন, 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সলিলাকারে ছিল'—"আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ।"

উক্ত চারি প্রকার অর্থবাদ ব্যতীত অন্য প্রকার অর্থবাদও আছে, ইহা কপর্দ্দিস্বামী স্বীকার করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী অংশে অর্থবাদের প্রসঙ্গ আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সংক্ষেপে অর্থবাদের পরিচয় দেওয়া হইল।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, যজ্ঞাদিকর্ম্মের বিধি এবং অর্থবাদভেদে ব্রাহ্মণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এখানে "যেহসুরাঃ" ইত্যাদি অর্থবাদরূপ ব্রাহ্মণ একাধারে নিন্দা ও পুরাকল্প (মতান্তরে পরকৃতি)।

শ্রীতারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

যক্ষ-প্রিয়ার নিবেদন

ওগো প্রিয়তম বিরহী যক্ষ! কোথায় সে রামগিরি,
মেঘ-মুখে যা'র বার্ত্তা পাঠালে ব্যথিত বক্ষ চিরি?
সেথা কি আষাঢ়ে নেমেছে বরষা অলকাপুরীর মত
ঘূর্ণিত বায়ু প্রলয়-বারতা ঘোষিতেছে অবিরত?
কত দিনে প্রিয়! বরষভোগ্য শাপ হ'বে অবসান,
কত দিনে স্বামি! ল'বে বুকে টানি' এ বিরহী দেহখান!

ওগো ওই এল নামিয়া বাদল; কোথায় বিজন পথে
রহিয়াছ প্রিয় দেবতা আমার! কল্পনা-মনোরথে!
সেথা তরুতলে তব সুকোমল দেহ ধূলি 'পরে রাখি
প্রাসাদের শত অভাব কেমনে রেখেছ হৃদয়ে ঢাকি?
আমি যে অলকাপুরীর মাঝারে নিজেরে রাখিতে নারি,
তুমি প্রিয়তম! গৃহহারা আজি আমি কি ভুলিতে পারি?

ওগো মেঘ! হান কঠিন বজ্র এ মোর অলকাপুরে,
ঘোর ঝঞ্ঝায় উড়াও তাহার প্রতি গৃহশির-চূড়ে;
কর ধূলিসাৎ প্রমোদ ভবন, বিরাম শয্যাগেহ
ওগো আজ আমি রোধিব না তোমা, আজি মোর নাহি স্নেহ;
প্রিয়তম মোর ধূলির শয়নে আমি কি ভুলিতে পারি?
ভাঙ্গ গৃহদ্বার হে বিরাট বায়ু! ঢাল মেঘ! ঢাল বারি,

আমারেও কর গৃহহারা সবে ধূলিতে বসাও টানি'
ধূলিতে আমার পরম শান্তি, নহি অলকার রাণী।
তরুতলে দাও কঠিন শয্যা আনন্দে যাব নামি'
ওগো আজ আমি ভুলিতে কি পারি ধূলিতে আমার স্বামি!

এস মেঘদূত! প্রিয়তমবাণী আমার তৃষিত প্রাণে,
ঢেলে দাও প্রিয়বন্ধু আমার! বিরহীর ব্যথা-গানে!
ফিরে যাও পুনঃ সেথা পথ চেয়ে আমার বিরহী স্বামী
কাঁদিছে বিষাদে আমারে স্মরিয়া বেদনায় দিবাযামী।
পার কি বন্ধু! নিয়ে যেতে মোরে বিরহী দয়িত পাশে?
পার কি ডুবাতে কুবের আলয় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে?
বিপুল বজ্র হানিয়া চকিতে কর আজি খান-খান,
নিষ্ঠুরা ধরা—চিরতরে হো'ক বিরহের অবসান।

যাও প্রিয় সাথি! ক'রো না'ক দেরি পথে একটিও বার,
আমার বার্ত্তা দিও প্রিয়তমে, থামাইও হাহাকার;
ব'লো, 'ধূলিতলে পাতিয়া আসন তোমার বিরহী রাণী
আছে বসি' তব পথ চেয়ে প্রিয়! শেষ অভিশাপ-বাণী।"

শ্রীসুধীররঞ্জন ঘোষ।

চান্স

(গল্প)
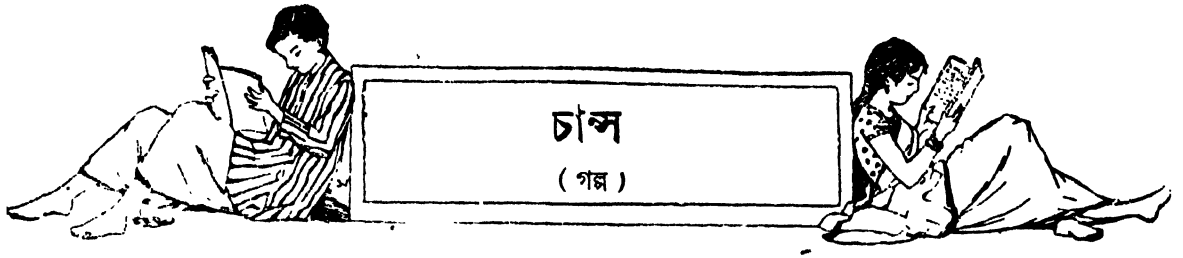
কথায় বলে, স্ত্রী-ভাগ্যে ধন! বসে' বসে' সেই কথাই আমি ভাবি! কথাটা বোধ হয়, সত্য! মন হু-হু করে। নাহ'লে আমার স্বামী···এত বুদ্ধি, এমন শক্তি··· কোনো চাকরি তাঁর কায়েমি হয় না কেন? শ্রীবৎস-রাজার গল্প মনে পড়ে। পোড়া শোল্-মাছ প্রাণ পেয়ে তাঁর হাত থেকে পালিয়ে ছিল! স্বামী ভালো-ভালো কাজ পেলেন কত-বার! কোনোটা যে রইলো না, এ শুধ্ আমার ভাগ্যে!

ক্ষিতীশবাবু···তাঁর অঢেল পয়সা···ওঁর এক বন্ধু।

সে-বারে এসে ওঁকে ধরলেন, ধরে বললেন,— ফিল্মের ব্যবসা করবো, ফিল্ম তুলবো। তুমি এসো,— তুমি হবে আমার কোম্পানির ম্যানেজার। যত দিন না ষ্টুডিয়ো তৈরী হয় আর যন্ত্রপাতি আসে, তত দিন মাসে একশো টাকা করে' পাবে; তার পর কাজে নামার সঙ্গে সঙ্গে পাবে তিনশো!

মহা-সমারোহে রমনায় ষ্টুডিয়ো-তৈরীর কাজ সুরু হলো। স্বামীর কি উৎসাহ! চব্বিশ ঘণ্টা সেইখানে পড়ে থাকেন, কাজ দেখেন। হু-হু বেগে ঘর-দোর তৈরী হচ্ছে·হঠাৎ হলো বিনামেঘে বজ্রাঘাত! ষ্টুডিয়ো-বাড়ী তৈরী হবার আগেই ক্ষিতীশবাবুর ক্যাপিটাল গেল ফুরিয়ে। ভেবেছিলেন, ষ্টুডিয়ো তৈরী হলে হুণ্ডিতে টাকা নেবেন নাছোড়দাসের গদী থেকে। তারা বেঁকে বসলো, বললে—না, গুরুজীর মানা, নাচ-গানের ব্যবসায় পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না! দেনার দায়ে ক্ষিতীশবাবু দেশত্যাগী হলেন! ষ্টুডিয়ো-বাড়ীর সে কাঠামো পুরানো দিল্লীর বুকে পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থের জীর্ণ কঙ্কালের মতো আজো দাঁড়িয়ে আছে· যেন হতভম্বের মূর্ত্তি!

তার পর কে এক সাহেব এলো ঢাকা-সহরে সাবানের কারখানা খুলতে। খুঁজে খুঁজে সাহেব ধরলো ওঁকে। বললে,– তুমি হবে কারখানার ম্যানেজার। কথাবার্ত্তা ঠিক—হঠাৎ টাকা-দেনেওয়ালা মাড়োয়ারী-পার্টনার সাহেবকে বললে, উঁহু, সাবানের কারখানা খোলা হবে না। এতে মাড়োয়ারীর মন লাগছে না। সে খুলবে দেশলাইয়ের কারখানা! আর সে-কারখানা ঢাকায় নয়, হবে কলকাতার কাছে দমদমায়।

এমন ঝড় কত-বার বয়ে গেছে! এ ঝড়ে স্বামীর মন আঘাত পেলেও মচ্‌কায়নি! সমান-উৎসাহে নব-নব আশায় নব-নব স্বপ্ন রচনা করেছে!

আজ দু'মাস স্বামীর চাকরি নেই। দু'একখানা গহনা যা ছিল, বন্ধক পড়েছে। যে ক'রে সংসার চালাই, জানেন শুধু মা-কালী···

সে-দিন সন্ধ্যা হয়-হয়···দোতলার ঘরে খোলা জান্‌লার ধারে বসে আকাশের পানে চেয়ে আছি, দিনের আলো মুছে সন্ধ্যার তুলি পৃথিবীর দিক্‌প্রান্ত কালোয়-কালো ক'রে তুলছে! ভাবছি, আমার পৃথিবীও কালোয়-কালো হয়ে এলো! পৃথিবীর এ-কালো দিনের তুলির পরশ পেয়ে কাল আবার আলোয়-আলো হবে, কিন্তু আমার এ-কালো কোনো দিন আর আলোর মুখ দেখবে না!

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে ওঁর গলা শুনলুম। ডাকলেন,—ওগো···

সে স্বরে আশ্বাসের দমকা আভাস! আমার মন সে-স্বরে জেগে উঠলো।

গায়ে আঁচল তুলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। স্বামী এলেন ঘরে।

বললুম—আজ কিছু সুরাহা হলো?

উল্লসিত উচ্ছ্বসিত স্বরে স্বামী বললেন,—মস্ত চান্স! কুমার বাহাদুর বিলেত যাচ্ছে সামনের মেলে—স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। কাল চলেছে কলকাতায়—গোটা ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করেছে ঢাকা টু ক্যালকাটা! আমাকে

বিভোর

ভাদ্র ১৩৬৭ | [শিল্পী—শ্রীবিশ্বনাথ সে

বলছে, আমাদের সী-অফ্ করতে তোমরাও এই সঙ্গে কলকাতায় চলো। বলছে, সেখানে যাই যদি তো ওঁর বালিগঞ্জের একতলা বাগান-বাড়ীতে দু'-এক মাস থাকতে পারি। আমি বলে এসেছি, অল্-রাইট!

স্বামীর মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি!

আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো। এ-সব কথায় ওঁর মনে এখনো এত আনন্দ জাগে!

ওঁর এতখানি আনন্দে আঘাত দিতে প্রাণে মমতা হলো! চাকরির প্রত্যাশায় হা-হা ক'রে বেড়াচ্ছেন! আহা! এজন্য কোন দুশ্চিন্তা বইতে আমি কাতর হবো না···ওঁর মন এমনি সহজ পুলকে ভরে থাকুক, নাহ'লে কিসের জোরে উনি ছুটোছুটি করবেন!

স্বামী বললেন,—আমাদের এক-পয়সা ভাড়া লাগবে না। ফাষ্ট ক্লাশে যাওয়া···তাছাড়া আমি কেন রাজী হয়েছি, জানো?

দু'চোখে একরাশ আগ্রহ জাগিয়ে ওঁর পানে চেয়ে ছিলুম। বললেন—কলকাতায় কত বড় বড় লোকের সঙ্গে কুমার-বাহাদুরের দৌলতে আলাপ হতে পারে···মস্ত চান্স···বুঝছো লাইফ্স্ চান্স!

বললুম—এখানে আশা আছে বলছিলে···ঈশ্বর সাহার ফার্ম্মে···

বললেন,—হুঁঃ, পাগল হয়েছো! জানো তো, এ-সব ছোট-খাট গণ্ডীতে আমার মন বন্দী হয়ে আরাম পাবে না কোনো দিন! কোনো চাকরিতে টেঁকতে পারি না, তার কারণ, আমার মত হচ্ছে, মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার! আমার মনকে খুশী করবে, এমন সম্ভাবনা এখানে কোন্ চাকরিতে মিলবে?

কোনো জবাব দিতে পারলুম না···অপলক দৃষ্টিতে ওঁর পানে চেয়ে রইলুম! মনে হচ্ছিল, ভাণ্ডার লুট কবে হবে, জানি না; নিজের ছোট ভাণ্ডার যে এদিকে লুট হয়ে গেল সংসারের ছোট-খাট দাবী মেটাতে!

বললেন,—নজর বড় করো, নিরু! আমার নজর যদি ছোট হতো, তাহ'লে এই যে কুমার-বাহাদুর, আমার ছেলেবেলার বন্ধু, ওকে বললে কি আর আমার সমস্ত ছোট-খাট অভাব ঘুচতো না? কিন্তু না, কুমার বাহাদুরের বন্ধু আমি,—তার স্নেহ নেবো, প্রীতি নেবো অজস্র-ভাবে; দয়া কোনো দিন নিতে পারবো না!···জানো তো, কত বড় ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমি দেখি! এ স্বপ্ন আমার জীবনে আমি সফল করতে চাই···তুমি শুধু আমার শক্তির উপর বিশ্বাস রাখো!, যে intellect নিয়ে জন্মেছি, এ intelle·t-এর জোরে মানুষ দুনিয়া rule করে, কারো দাস্য করে না!

স্বামীর মুখে-চোখে কি দীপ্ত ছটা! আমার মন এমন দুর্ব্বল অসার হয়েছে যে, এ-সব কথায় মন আজ কোনো অবলম্বন পায় না!

এ নিঃসহায়তায় আমার বুকে যেন অশ্রুর পাথার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো! এখনো···এখনো তুমি এত আশা মনে জাগাও কি ক'রে ··ওগো, কি ক'রে?

কতবার ওঁকে বলেছি, ওগো, ও-সব বড়র আশা ত্যাগ করো; ক'রে ছোট থেকে সুরু করো! ছোট থেকেই ক্রমে বড় হবে!···বি-এ পাশ করেছো···চেষ্টা করলে একটা স্কুল-মাষ্টারী কি জোটে না?

হেসে উনি জবাব দেন,—স্কুল-মাষ্টারী তারা করে, যারা নিরীহ বেচারা লোক···যাদের মনে সাহস নেই, আশা নেই,···ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে যাদের পৃথিবী আবদ্ধ আছে। বুঝলে?

আমার ভাগ্য—কাকে কি বলবো? তাই বলা ছেড়ে দিয়েছি।

কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে কলকাতায় আসা হলো। নিষেধ তুলিনি। জানি, সে-নিষেধ নিষ্ফল হবে! মনে মনে ভাবি, উনি কি ক'রে এত শিখলেন! এত উনি জানেন বলেই তো সকলে ওঁর কাছে ছুটে আসে! ভেবে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না! দুঃখ তাই হয় যে, এত জেনে, এত শিখেও সব ওঁর মিথ্যা হলো! কচের বিদ্যা নিষ্ফল হয়েছিল দেবযানীর অভিশাপে! ওঁর জীবনে কোনো দেবযানী এসে কোনো দিন অভিশাপ দিয়ে গেছে না কি?

শেয়ালদা ষ্টেশন! যেন আর এক পৃথিবী!

ষ্টেশনের বাইরে এলুম। কুমার-বাহাদুর বললেন—আমরা যাবো থিয়েটার রোডে 'আমার শ্বশুর-বাড়ীতে। সেখানে তোমাদের নিয়ে গিয়ে কুণ্ঠিত করি কেন? তার

চেয়ে তোমরা যাও আমার বালিগঞ্জের বাড়ীতে। কোনো অসুবিধা হবে না। পুরানো দরোয়ান আছে, মালী আছে—ও-বেলার মধ্যে তারা একটা চাকর আর বামুন ঠিক ক'রে দিতে পারবে। সন্ধ্যার সময় আমরা গিয়ে দেখে আসবো'খন !···

সামনে প্রকাণ্ড মোটর। কুমার-বাহাদুর সে মোটরে উঠ্‌বেন, হঠাৎ সাহেবী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক এসে কুমার-বাহাদুরের হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললেন,—হ্যালো কুমার ··

কুমার-বাহাদুর বললেন,—আরে, নান্‌ডী! তুমি এখানে! কাকেও নিতে এসেছো, বুঝি?

নান্‌ডী বাঙালী! বয়সে তরুণ। নান্‌ডী বললে,—না। বাইরে গাড়ী পড়ে আছে নিশ্চল-নিথর। রোল্‌স্‌-কার! কি যে হলো···এখানে এসেছি ট্যাক্সিওলাদের মধ্যে সন্ধান নিতে, কেউ যদি কল-কব্জার মর্ম্ম বোঝে!

কুমার-বাহাদুর চাইলেন স্বামীর পানে; বললেন—আমার এই বন্ধুটিকে ধরো···ও জানে না, এমন কাজ দুনিয়ায় নেই! আমার গাড়ী-বিভ্রাট ঘটলে আমি ওর শরণাপন্ন হই।

নান্‌ডী বললে,—বটে! বাঃ! তার পর স্বামীর হাত ধরে নান্‌ডী বললে,—আমি আপনার শরণ নিচ্ছি··· দয়া ক'রে যদি একবার মানে, আমার গাড়ী আছে ঐ মোড়ে!

আমার পানে চেয়ে স্বামী বললেন—একটু অপেক্ষা করো···

কুমার-বাহাদুরের স্ত্রী বললেন—আমার গাড়ীতে এসে উনি বসুন ততক্ষণ···

তাই হলো।

স্বামী ফিরে এলেন বিশ মিনিট পরে। কুমার-বাহাদুর বললেন — O.K.?

স্বামী বললেন,—O.K. পেট্রোল পাশ করছিল না··· তার উপর এক-জায়গায় একটু শর্ট হচ্ছিল···ঠিক হয়ে গেছে।

কুমার-বাহাদুর বললেন—নান্‌ডী গেল কোথায়?

স্বামী বললেন—গাড়ী নিয়ে আসছে। আমাকে ছাড়বে না···বলে, দুর্দ্দিনের বন্ধু! আমাকে বালিগঞ্জের বাড়ীতে পৌছে দেবে বলে আসছে। বলে, ট্যাক্সিতে যাওয়া হবে না।

কুমার-বাহাদুর হাসলেন, হেসে বললেন—খুব বড়-ঘরের ছেলে। শুনেছি স্যর বজ্রবরণ পাল—merchant prince···তিনি নাকি ছিলেন ওর মাতামো!···বাপ মার্ত্তণ্ড নন্দী ছিলেন না কি শীপার। ওর নাম ইন্দ্রজিত নন্দী—ক্যালকাটা সোসাইটিতে নামজাদা এ্যারিষ্টো-ক্রাট!

ইন্দ্রজিত নন্দী এলেন তাঁরা রোল্‌স্‌-মোটর চালিয়ে। সে-মোটরে স্বামীর সঙ্গে আমাকে বসতে হলো। কুমার-বাহাদুর সস্ত্রীক বিদায় নিলেন।

বালিগঞ্জের বাড়ী।

ইন্দ্রজিত নন্দী বললেন—এ-বেলা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা?

আমাকে কথা কইতে হলো। বললুম,—সে-ব্যবস্থা আমি করবো। আপনি ব্যস্ত হবেন না।

স্বামী সেই রোল্‌স্‌-কার নিয়ে মত্ত! বনেট খুলে, এটা নেড়ে, ওটা ঘুরিয়ে কি-সব দেখছিলেন···

নান্‌ডী বললেন—গাড়ীখানা ছিল হাপাগড়ের রাজার। চালাতে পারতো না। গেল-বছর বড়দিনে তার কাছ থেকে কিনেছি। জলের দামে! তিনশো পঁচিশ টাকা· সত্যি!···বডি আর এঞ্জিন ফেলে নতুন বডি আর এঞ্জিন বসিয়েছি। মোটর যদি কিনতে চান, হুঁঃ, আমাকে বলবেন, যে-দরে কিনে দেবো, সে-দামে এক্কা-গাড়ী পাওয়া যায় না!

স্বামী বললেন—বলবো আপনাকে···কেনবার সময়।

নান্‌ডী বললেন—বলবেন। মোটর-গাড়ী ঘেঁটে-ঘেঁটে তার নাড়ী-নক্ষত্র জানতে আমার আর বাকী নেই!

নান্‌ডী বিদায় নিলেন। বলে গেলেন, আবার আসবেন।

মালীকে দিয়ে খাবার-দাবার কিনে আনালুম। সে-বেলার মতো ব্যবস্থা হলো।

স্বামী বললেন—একটা বামুন আনতে বলি?

বললুম—তার মাইনে দেবে কোথা থেকে? বামুন আনতে হবে না। আমি নিজের হাতে রান্নাবান্না

করবো। পুঁজি যা আছে, বুঝে না চললে এখানে তোমার চান্স মিলবে না, মনে রেখো!

স্বামী কোনো জবাব দিলেন না। বোধ হয়, কথাটা বুঝলেন।

কুমার-বাহাদুর সস্ত্রীক বিলেত চলে গেছেন।

আমরা বাস করছি তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে। আমি রান্নাবান্না করি; স্বামী ঘুরে বেড়ান। নিত্য এসে আমাকে নানা কথা বলেন। বলেন,—লক্ষ্মী এখানে লোকের দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন…তাঁকে চিনে ডেকে আনা শুধু…বুঝলে নিরু!

আমি বলি,—তার মানে?

স্বামী বলেন—লোকের বাড়ীতে নিত্য ঐ যে ছেঁড়া কাগজের পাহাড় জমে, জানো, সেই কাগজ যদি রোজ জড়ো ক'রে আনি, তা হলে সেই ছেঁড়া কাগজের জঞ্জাল বেচে লক্ষপতি হতে পারি!…তাছাড়া ঐ ঘোড়-দৌড়ের মাঠে…বুঝে-সুঝে যদি ঠিক ঘোড়াটি ধরতে পারি তো এক দিনে ঐ ঘোড়ার ক্ষুরে দু' হাজার টাকা রোজগার!… মানে, দু' পাঁচশো টাকা মূলধন নিয়ে যে-কাজে এখানে বসবে, সোনা ঝরবে!…সোনার সহর কলকাতা! শুধু চোখ থাকা চাই সে-সোনা দেখবার আর কৌশল জানা চাই সে সোনা সংগ্রহ করবার!

সে-দিন বিকেলে বাড়ী ফিরে স্বামী বললেন,—সিনেমায় চলো। খুব একখানা ভালো ছবি এসেছে…

সিনেমার সখ ছিল এক দিন। পয়সার দুশ্চিন্তায় সে সখ আজ আর নেই! বললুম,—না, ছবি দেখে না!

স্বামী বললেন,—তার মানে?

আমি বল্লুম,—তুমি ভেবেছো ট্যাক্সি-ভাড়া ক'রে যাবে, সেখানে বসবে ভালো সীটে…তা হবে না! যেতে হয় ট্রামে চড়ে যাবো…আর সীট…

হেসে স্বামী বল্লেন,—তাই হবে…কিন্তু এক টাকা দু' আনার নীচে বসা যাবে না।

তাই হলো। সিনেমা দেখে বেরিয়ে আসবো, হঠাৎ দেখা নান্‌ডীর সঙ্গে। নান্‌ডী বল্লেন,—হ্যালো…

নান্‌ডী ছাড়লেন না। দু'জনকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চললেন তাঁর বাড়ী।

বরানগরে মস্ত বাড়ী। গেট থেকে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত কাঁকর-ফেলা পথ। কাঁকরের সে রঙ নেই। বাড়ীর সঙ্গে বাগান…জঙ্গল হয়ে রয়েছে। দেখলে মনে হয়, একশো বছর আগে এ বাগান আর এ বাড়ীর ছিল অন্য মূর্ত্তি…এখন শুধু কঙ্কাল! তাই এমন মলিন মূর্ত্তি!

হল-ঘরে এলুম। সোফার উপরে জামা-কাপড় ডাঁই হয়ে রয়েছে। পাথরের টেবিলের উপরে পোড়া সিগারেট, ধূলো, ছাই, চড়াই পাখীর মুখ-থেকে-ঝরে-পড়া কাঠি-কুটো…কি না নেই!

নান্‌ডী ডাকলেন,—উমাপদ…

এক জন বৃদ্ধ ভৃত্য এসে সাম্‌নে দাঁড়ালো। নান্‌ডী বল্লেন,—চা তিন পেয়ালা…আর টোষ্ট। শীগ্‌গির…

আমরা চেয়ারে বসলুম।…

ঘরের দেওয়ালে ছিল তেলের রঙ…মাঝে মাঝে সে রঙ খশে গেছে। কোণে-কোণে ঝুল, মাকড়শার জাল… কড়ির গায়ে চড়াইয়ের বাসা। দেওয়ালে মস্ত একটা অয়েলপেণ্টিং। এক জন ভদ্রলোক শালের জামিয়ার গায়ে কৌচে বসে আছেন, তাঁর হাতে গড়গড়ার নল।

নান্‌ডী বল্লেন,—আমার মাতামহর বাবা কালোবরণ পাল।

স্বামী বল্লেন,—প্যালেশ!

আমি বল্লুম,—বাড়ীতে মেয়েরা নেই বুঝি?

নান্‌ডী বল্লেন,—না। মা গেছেন তীর্থ করতে। আমি একা থাকি।

বল্লুম,—আপনার স্ত্রী?

নান্‌ডী বল্লেন,—তাঁর পিত্রালয়ে। আমার শ্বশুরের পক্ষাঘাত হয়েছে…তাঁর ঐ একটি মেয়ে…আর ছেলে পিলে নেই কিনা…

চা এলো…টোষ্ট-রুটি এলো।

নান্‌ডী বল্লেন,—লোকালয়ের বাইরে বাস। ছুঁ বলতে কোনো জিনিষ পাবো, সে উপায় নেই! খাওয়া দাওয়া আমি হোটেলে সারি। কাজ কি ও-হাঙ্গামে বাড়ীর চেয়ে it costs cheaper. সত্যি, বাড়ীতে একদম

বামুন-চাকর রাখার মানে, জার্ম্মাণ-ওয়ার চালানো! বেজায় ঝক্কি!

তিনি চাইলেন স্বামীর পানে; বল্লেন,—আজ একখানা থার্ডহ্যাণ্ড হিলম্যান বেচেছি···সাড়ে সাতশো টাকায়। কমিশন-বাবদ আমার পকেটে এসেছে একশো। মন্দ কি! হ্যাঁ, ভালো কথা, গাড়ী নেবেন? আছে একখানা উল্‌স্‌লি···ড্যাম চীপ্। পাঁচশো বলছে··· চারশো পেলেই ছায়। আমার কমিশনের দরকার নেই। আপনি বন্ধুলোক··ঢাকায় এ-গাড়ী বারোশো টাকায় বেচতে পারবেন!···পরশু এক জনকে একখানা সিক্স-সিলিণ্ডার ফোর্ড কিনিয়ে দিছি···হাজার মাইল মাত্র রান্ করেছে···জানেন, কত দামে? Just guess.

একটু থেমে নান্‌ডী বললেন,—ছ'শো পঁচিশ টাকা।··· তাজ্জব ব্যাপার! নয়? হুঁঃ, আমার হাত দিয়ে যে-রেটে গাড়ী চলা-ফেরা করে, বলেছি তো, যে-মেক্ গাড়ী চাইবেন, দেবো···এবং জলের দামে। আমার ঐ রোল্‌স্-গাড়ী···জানেন, ওর চ্যাসিস্ তৈরী হয়েছে নাইনটিন-থার্টিনে, এঞ্জিন টেয়েনটি-টুতে। পার্ট্‌স্ বদলালেও রোল্‌স্-ছাড়া অন্য গাড়ীর পার্ট্‌স্ সাবষ্টিটিউট্ নয়! কথায় বলে মরা-হাতীর দাম লাখ টাকা।···রোল্‌স্···শুধু ঐ নামটুকুর দাম কত! হুঁঃ, দেখুন, আছে খদ্দের? নতুন একখানা বুইক্ দিতে পারি···বারোশো টাকা চাইছে···এগারোশো পেলে ছেড়ে ছায়। ঘোড়-দৌড়ের নেশার ফল! হুঁঃ!

কথার বহর দেখে আমার বুকের মধ্যে কাঁপন সুরু হয়েছিল···বালিগঞ্জ থেকে অনেক-দূরে এসেছি···যদি ট্যাক্সিতে ফিরতে হয়, অনেক খরচ হবে!

কিন্তু নান্‌ডী ভদ্রতা করলেন, বললেন,—এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না। চলুন, আপনাদের পৌছে দিয়ে আসি!

পরের দিন থেকে নান্‌ডী আমাদের গৃহে নিত্য আস্‌তে লাগলেন। নিমন্ত্রণ করলেন থিয়েটারে, সিনেমায়, হোটেলে। তার জবাবে স্বামীও তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন।

পয়সায় টান পড়ছে দেখে আমার মন আতঙ্কে ভরে উঠছিল!

স্বামী বললেন—এ খরচ না করলে নয়। লাভের কড়ি-সমেত এ খরচ উশুল হয়ে আসবে। নান্‌ডী যা মতলব দিচ্ছে, যদি লাগে···ওঃ!

স্বামীর উৎসাহ দেখে আমার ভয় হলো। যখনি কোনো কাজে ওঁর উৎসাহ প্রবল দেখেছি, তার পরক্ষণেই ঘটেছে দারুণ প্রমাদ!

নান্‌ডীর কথায় আমার মনের আতঙ্ক কাটতো। বড় বড় লোকদের মধ্যে কাকে না জানেন! এক দিন স্বামীকে নিয়ে তিনি রেশে গেলেন। স্বামী ফিরলেন প্রায় আড়াই-শো টাকা নিয়ে···বললেন—নান্‌ডীর পয় আছে গো।

মনটা কর্‌কর্ করতে লাগলো। রেশের নেশা! শুনেছি, মানুষ এতে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যায়!

পরের সপ্তাহেও স্বামী রেশ থেকে আনলেন প্রায় তিনশো টাকা। বললেন,—বলেছিলুম তোমাকে, চান্স! দেখছো তো!

দু'দিন পরে স্বামী এলেন মোটরে চড়ে। একখানা পুরানো মরিশ। বললেন,—নান্‌ডীর হাত দিয়ে কিনেছি ···দেড়শো টাকা দাম। এর উপর একশো টাকা খরচ করলে এর শ্রী যা হবে! হুঁঃ! বড়-বড় লোকদের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হলো এবার···গাড়ীর অভাবে মিশতে পারছিলুম না!

খুব আনন্দ হলো! মোটরের সখ এ-কালে কোন্ মেয়ের মনে নেই? আমারো ছিল···তবে এ-আনন্দের সঙ্গে মনে খচ্-খচ্ করতে লাগলো দুশ্চিন্তার কাঁটা! রেশের ঘোড়ার উপর নির্ভর ক'রে থাকলে এ-মোটর কি রাখা যাবে?

সে-দিনের কথা বলি।

উনি বললেন,—শেলে যাবো, চলো! ভালো ভালো শাড়ী বিক্রী হচ্ছে। জলের দামে। ডিক্রীর দায়ে একটা কোম্পানির যা-কিছু ছিল···

দু'জনে শেলে গেলুম। যেন এগজিবিশন! এত রকমের শাড়ী···দেখলে দোকান ছেড়ে আসতে ইচ্ছা হয় না!

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তিনশো শাড়ী ঘেঁটে দু'খানা উনি বেছে নিলেন! শাড়ী দু'খানি চমৎকার! দু'খানার দাম শুনলুম দেড়শো টাকা!

শিউরে উঠলুম। বললুম,—এত দামের শাড়ী··· থাক্ গে, কেনে না!

উনি বললেন,—কিন্‌তে হবে। এগুলো হচ্ছে লক্ষ্মীর ঘরের পাশপোর্ট! চান্স যখন ফিরেছে···সব দিক থেকে আয়োজনটুকু জুগিয়ে যাওয়া চাই!···তা'ছাড়া এ-শাড়ীর আসল-দাম দুশো পঁচাত্তর···দেড়শো হচ্ছে শেল্-প্রাইস্! ভাবো তো, কত লাভ!

লোভ ছিল খুব; তার উপর এতখানি লাভ! বললুম,—মন কিন্তু খুঁৎখুঁৎ করছে!

উনি বললেন,—ও খুঁৎখুঁতুনি গ্রাহ্য করলে চলে না!

শাড়ী কিনে বাড়ী এলুম। উনি বললেন,—কাল ঐ শাড়ী পরে এম্পায়ারে চলো লাস্য-নাচ দেখতে! ভারী সাকসেস্‌ফুল শো···

এম্পায়ারে দেখা হলো নান্‌ডীর সঙ্গে। উনি বললেন, —ক'দিন যান্‌নি ও-ধারে!

নান্‌ডী বললেন,—না। মানে, বড্ড দূর পড়ে কি না··· তার চেয়ে আপনারা এ-দিকে চলে আসুন···নর্থ-সাইডে···

আমি কোনো জবাব দিলুম না। ও-দিকে যাবার মানে, বাড়ীর ভাড়া দিতে হবে! বিনা-পয়সায় আস্তানা মিলবে না তো!

উনি বললেন—কিন্তু ও-দিকটায় ভারী ধূলো আর হট্টগোল!

মনে-মনে ওঁর বুদ্ধির প্রশংসা করি চির-কাল! ওঁর এ-উত্তরে মান বাঁচলো।

নান্‌ডী বললেন,—এক কাজ করুন···সামনের হপ্তায় আমি বোম্বাই যাচ্ছি···একটু জরুরি কাজ আছে। প্রায় মাসখানেক সেখানে থাকবো। আপনারা এ-একমাস বরানগরে আমাদের বাড়ীতে এসে থাকতে পারেন·· আপনারা দুটি মাত্র প্রাণী···তা'ছাড়া যে-ব্যবসা করবেন ভাবছেন···

'স্বামী বললেন,—মন্দ নয়। বাড়ীখানি সত্যি বেশ···

নান্‌ডী বললেন—কাল সকালে একবার আসুন আমার ওখানে। দেখে-শুনে বুঝতে পারবেন'খন···

পরের দিন সকালে বরানগর-যাত্রা। ঘর-দোর দেখিয়ে নান্‌ডী বুঝিয়ে দিলেন, আরামে থাকবো; তার উপর স্বামী যে-ব্যবসা ধরছেন···শেল থেকে পুরোনো গাড়ী কেনা···বরানগরে অঢেল জায়গা···ক'খানা বাঁশের খুঁটী তার উপরে দরমা বা হোগলার চাল বসিয়ে নিলে তোফা শেড্ হবে···গাড়ীগুলো এনে সেই শেডে রাখবেন। ছোট-খাট মেরামতী বা রঙ দেওয়া—মিস্ত্রীরা এসে ক'রে দেবে; তারপর ছব্বা ফিরিয়ে সে-গাড়ী যে-দামে বিক্রী হবে···হুঁঃ, সে আর দেখতে হবে না··· দু'দিনে লাল!

মাথা নেড়ে স্বামী প্রত্যেকটি কথায় উৎসাহ-ভরে সায় দিতে লাগলেন।

দেখে আমার বুকের মধ্যে যেন মোটর-গাড়ীর প্রোসেশন সুরু হলো···রাজ্যের ভাঙ্গা মোটর-গাড়ী, সে যেন মস্ত পাহাড়! মনে হলো, বুকখানা যেন সে মোটরের পাহাড়ের তলায় পড়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে!···

দু'জনে নানা পরামর্শে বেলা প্রায় বারোটা বাজিয়ে দিলেন; তারপর নান্‌ডী বললেন,—ইঃ, বড্ড বেলা হয়ে গেল তো! খাবার সময়···

স্বামী বললেন—না, না, তাতে কি। আমাদের খাওয়ার বাঁধা-ধরা সময় নেই।

নান্‌ডী বললেন—চলুন আমার হোটেলে। পথেই মিলবে। মানে, ওয়েলেশলি ষ্ট্রীট।···এ্যাঙলো-ইণ্ডিয়ান হোটেল···দেশী হোটেলগুলো ভারী নোংরা। সেখানে খেতে আমার প্রবৃত্তি হয় না···

আমার পানে নান্‌ডী চাইলেন, বললেন,—আপনার আপত্তি আছে?

বললুম—ও-দিক দিয়ে আপত্তি নয়। তবে আমি এখনো স্নান করিনি···

নান্‌ডী বললেন,—বিলক্ষণ! এতক্ষণ বলতে হয়। এখানে সব পাবেন—তেল, সাবান, তোয়ালে, জল··· হ্যাঁ, তবে শাড়ীর অভাব।

স্বামী বললেন—ওঁর একখানা ধুতি পরে না হয় স্নান সেরে নাও।

নান্‌ডী বললেন,—হুঁ···

হোটেলে খাওয়া-দাওয়া চুকলে বিল এলো···ন'টাকা চার আনা। পেণ্টুলেনের দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে

চোখ কপালে তুলে নান্‌ডী বললেন—ঐ যাঃ! পার্শ ফেলে এসেছি···

স্বামী পার্শ বার ক'রে হোটেলের বিল মেটালেন।

তার পর বরানগরে আসতে হলো। স্বামী বললেন—মোটরের কারবারে যখন নামলুম—গাড়ীগুলো নজরে রাখা যাবে; গ্যারাজ-ভাড়া লাগবে না; মাসে প্রায় দু'শো টাকা বাঁচবে···সে-দিক দিয়ে মস্ত লাভ!

আমি বললুম—কিন্তু রাজ্যের এই ভাঙ্গা গাড়ী কিনে কি কারবার যে করবে···

স্বামী বললেন—বুঝছো না? ঐ সব ভাঙ্গা গাড়ীকে জোড়া দিয়ে তার যে-চেহারা গড়ে' তুলবো···হুঁঃ, তখন বুঝবে···

ও-সব বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার কোনো দিন নেই। তাই বোঝবার চেষ্টাও করিনি কোনো দিন!···

নান্‌ডী ক'দিন খুব ব্যস্ত,—তার পর যে-দিন বোম্বাই যাবেন, সন্ধ্যার সময় একখানা চেক্ দিয়ে বললেন—একটু জ্বালাতন করছি···মানে, ভুল ক'রে ব্যাঙ্কে যাইনি ···অথচ নগদ কিছু টাকার দরকার ছিল···একশো টাকা ···তা চেক্ দিয়ে যাচ্ছি, কাল সকালে ব্যাঙ্কে পাঠালেই টাকা পাবেন···বেয়ারার-চেক!···আমাকে নগদ একশো-খানি টাকা দিতে হবে!

উৎসাহ-ভরে স্বামী বললেন,—এর জন্য ভূমিকা করছেন! হুঁঃ!

চেক নিয়ে নান্‌ডীকে দিলুম একশো টাকা নগদ।

নান্‌ডী বোম্বাই গেছেন। আমরা বরানগরে আছি। ···লরি-বোঝাই ভাঙ্গা লোহা-লক্কড়, মোটরের চাকা, টায়ার, টিউব আসছে নিত্যদিন এবং তাগাড় হয়ে জমছে।···মিস্ত্রী আসে, কামার আসে, লোকজন আসে। স্বামী তাঁর দেড়শো-টাকায়-কেনা মরিশে চড়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছেন···কি হচ্ছে, কে জানে!

আমার আতঙ্কের সীমা নেই। ভাঙ্গা গাড়ীগুলোর পানে তাকাবামাত্র মনে হয়, ও-সবের নীচে সব আশা গুঁড়িয়ে বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে!

দু'মাস কেটে গেছে। কোনো গাড়ী দেহ খাড়া ক'রে প্রাণের সাড়া তুলে সামনে এসে দাঁড়ালো না! স্বামী রাগ ক'রে মিস্ত্রী বদল করলেন তিন বার। তবু কোনো গাড়ী চলবার কোনো আগ্রহ দেখালো না! রেশে-পাওয়া টাকার পুঁজি এ-দিকে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে···

ওঁকে বলি—হ্যাঁ গা, তোমার নান্‌ডী যে বলেছিল, এক মাস পরে ফিরবে···

বললেন,—হ্যাঁ! তার তো কোনো চিঠি-পত্তরও নেই! বেঁচে আছে, কি, না···

শিউরে উঠলুম! বললুম—বলো কি!

উনি চুপ ক'রে কি ভাবতে লাগলেন! বললুম,—কি ভাবছো?

বললেন—একবার স্মিথের কাছে যাই। কাল রেশ।

বারণ করলুম,—না···আর রেশ নয়।

বললেন,—রেশে না গেলে টাকা আর কোথায় পাচ্ছি? মিস্ত্রীরা কিছু না পেলে হয় তো মারধোর করবে!

বললুম,—চলো, ঢাকায় ফিরে যাই। ঈশ্বর সাহার দোকানে···

উনি বললেন,—ঈশ্বর সাহার দোকান!

বললুম,—হ্যাঁ। তারা বলেছিল···

উনি বললেন,—পাগল হয়েছো!

—পাগল হইনি···

দু'দিন পরে কিন্তু পাগল হবার মতো ব্যবস্থা পাকা হয়ে উঠলো।

সে-দিন উনি এলেন, এসে বললেন,—শেলে পঞ্চাশ-খানা গাড়ী ডেকেছিলুম, সেগুলো আজ আসছে! কত দাম লেগেছে, জানো?

আমি শিউরে উঠলুম! এত টাকা কোথায় পাচ্ছেন? ধার করছেন না কি? আমি কোনো জবাব দিতে পারলুম না।

আমাকে নিরুত্তর দেখে উনি বললেন—তিনশো টাকায় কিনেছি। ব্যাঙ্কে যা-কিছু জমিয়েছিলুম···মানে, ব্যাঙ্কে পড়ে রইলো শুধু তেরো আনা তিন পয়সা।

বললুম—এ-গাড়ী চলে?

—এখন চলে না—পরে চলবে। মানে, পঞ্চাশখানার

ভাঙচুর বাদ দিয়ে জোড়া-তালি লাগিয়ে পনেরো-ষোলখানা গাড়ী খাড়া করা যাবে···পার্টস্ বুঝে নিয়েছি। পার্টসের যেগুলো ভালো আছে, লাগাবো। এ-যুগে মোটর চায় সকলে···দাম হবে শস্তা, পথে গাড়ী চলবে,—মাসে পাঁচ দিন যদি চলে, পঁচিশ দিন অচল পড়ে থাকে, তাতেও খুশী! গাড়ীর মান-ইজ্জৎ! বুঝলে কি না, মানুষের এই weak point নিয়ে আমার মোটরের কারবার!

বললুম—তার পর?

বললেন—এই পনেরোখানা গাড়ী যদি বেচে দি··· এক-একখানায় যদি দু'শো ক'রে নি—তা হলে পনেরো ইন্টু দু'শো তার মানে পাবো তিন হাজার টাকা!·· বুঝছো না, এ হলো clean and sure.

বললুম,—বুঝি সব। তবে ভয় হয়, তোমার এ investmentএর জন্য শেষে পথে গিয়ে না দাঁড়াই···

বললেন,—তা'ছাড়া জানো, রমনা ট্রান্সপোর্টের ম্যানেজারকে লিখেছিলুম, যদি মোটর-গাড়ী চাও লিখো, শস্তায় দেদার গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারবো! তারা লিখেছে—কিনবে। আজই তাদের টেলিগ্রাম ক'রে দেবো···গাড়ী মজুত, এ্যাডভান্স পাঠাও···

এ-কথার উপর আর কথা চলে না।

চুপ করে রইলুম। তবে বুকখানার উপর দিয়ে যেন দু'চারশো কামানের গাড়ী কারা ঠেলে নিয়ে চললো!

সন্ধ্যার সময় উনি বললেন—চলো, সিনেমায় যাই। রোজ একলাটি বসে থাকো!

বললুম—কতকগুলো পয়সা খরচ না করলে নয়? বড্ড বেশী পয়সা হয়েছে, না?

বললেন—তা নয়। সিনেমা দেখতে যাওয়ার মানে ছবি দেখা নয়—পাঁচ জন লোকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ···

বললুম—সিনেমার ঘরে বসে কার সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হবে, শুনি?

বললেন—কৌশল যে জানে, সে ওরি মধ্যে···বুঝলে কি না···

যে-উৎসাহ বুকে নিয়ে উনি কথা বলেন, পারি না সে উৎসাহকে কঠিন-কথায় দমিয়ে ভেঙ্গে দিতে! নিজের বুকে মেয়ে-জাতের হাজার-যুগের সেই চির-দুর্ব্বল মন···

এক সপ্তাহ কেটে গেল। সে-দিন ওঁকে কেমন মন-মরা দেখলুম···

বললুম—রমনার চিঠি পেলে?

বললেন—রমনা! কি-চিঠি?

—সেই যে কোন্ মোটর-কোম্পানির ম্যানেজার··· বলছিলে?

নিশ্বাস ফেলে উনি বললেন—না। বোধ হয়, রমনায় সে নেই···না হলে চাঁদমোহন চিঠিপত্র লিখতে কখনো দেরী করে না···

—তা'হলে এতগুলো টাকা যে ভাঙা-গাড়ীতে ঢালছো ··

বললেন—গাড়ী মেরামত হচ্ছে···

—ওতে খরচ আছে তো?

—নিশ্চয় আছে···

—যদি তারা গাড়ী না নেয়?

বললেন—তা'হলে অন্য খদ্দের দেখতে হবে। খদ্দেরের অভাব হবে না। সহর কলকাতা·· এখানে পাঁচ হাজার ট্যাক্সি আছে, তা জানো? কোনো ড্রাইভার যদি খপর পায়··হুঁঃ!

নান্‌ডীর কোনো খপর নেই। সেই যে চলে গেছে···

উনি রেশে যান প্রতি শনিবার···ফেরেন কোনো দিন হাসি-মুখে, কোনো দিন দেখি মুখ দারুণ গম্ভীর···

সংসার চলেছে···যে-দিকে স্রোত, সেই দিকে! স্রোতে ভেসে!

তার পর এক দিন···

সে-দিন ভোরে উঠে দেখি, খুব বৃষ্টি! আকাশ অন্ধকার ···ভাঙ্গা মোটরের জঞ্জাল পাহাড়ের মতো জমে আছে। মনের উপরেও নিবিড় অন্ধকার। উনি এসে বললেন,—খিচুড়ী চড়াও আজ।

একটা নিশ্বাস ফেলে ওঁর দিকে তাকালুম। খাশা আছেন···নির্ব্বিকার! কতকগুলো টাকা রোজগার করেছিলেন, রেশে হোক, আর যে ক'রেই হোক···

বুঝে চললে ভাবনার কিছু থাকতো না! কিন্তু কি দুর্গ্রহ···

হঠাৎ একটি ভদ্রলোক এসে দেখা দিলেন, আমি ঘরে চলে এলুম। ওঁর সঙ্গে তার কথা হতে লাগলো। পাশের ঘর থেকে সে কথা শুনছিলুম।

লোকটি বললে,—এ-বাড়ী বিক্রীর কথা আছে! শাঁখুড়ীর জমিদার-বাবুদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁরা নাকি কলকাতায় আসছেন কথাবার্ত্তা পাকা করতে ইত্যাদি।

তার পর আরো নানা কথার পরে ভদ্রলোক বলে গেলেন, বহু ফার্ণিচার পড়ে আছে মেরামত হয়ে; সেগুলি এখানে পাঠাবেন। ও-বেলা যদি বৃষ্টি না থাকে, তা'হলে ও-বেলায় সে-ফার্ণিচার আসবে; না'হলে যত শীগ্‌গির সম্ভব···

দুপুর বেলায় বৃষ্টি থামলো। ওঁকে বললুম—আমাদের তা'হলে থাকা হবে কোথায়?

উনি বললেন,—তার মানে?

বললুম,—এ-বাড়ী বিক্রী হবে···ওদের জিনিষ-পত্র আসছে···আমরা কোথায় থাকবো?

উনি বললেন,—সে পরে হবে···কেন মিছে ভাবছো? চলো, একটু ঘুরে আসি। বসে বসে বুদ্ধি যেন কমে আসছে! না বেরুলে বুদ্ধি খুলবে না!

সেই মরিশ-গাড়ী···দু'জনে বেরুলুম।

এলুম মার্কেটে। নামলুম।

বললুম—কি কিন্‌বে, শুনি? টাকাকড়ি নেই!

বললেন—কেনবার দরকার নেই। শুধু কতকগুলো দোকানে নেমে জিনিষপত্র দেখা···

—শুধু-শুধু?

—তাই।

—তার মানে?

বললেন,—কিনি না কিনি, বড়-বড় দোকানে দামী জিনিষ দেখা এবং মুখখানা সকলকে মাঝে-মাঝে দেখিয়ে রাখা দরকার···না কিনি, জিনিষপত্র দেখতে ক্ষতি কি?

কি যে উনি ভাবেন! কোনো দিন মনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলুম না!···অথচ ছায়ার মতো আমি সব কাজে সঙ্গে সঙ্গে আছি চিরদিন!

জানি, স্ত্রী স্বামীর ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়! বিশেষ এ বাঙলা দেশে!

মার্কেটে শাড়ীর দোকান, জুয়েলারির দোকান ঘুরে সময় কাটলো—তা প্রায় দু'ঘণ্টা। ফেরবার মুখে দেখি, বাহিরে অঝোরে বৃষ্টি সুরু হয়েছে···

দক্ষিণ-দিককার ফটকের কাছে সুট-পরা একজন ভদ্র-লোককে দেখে উনি বললেন—মিষ্টার দাস!···এখানে?

ভদ্রলোক বললেন—হ্যাঁ, এসেছিলুম। তার পর বৃষ্টি নামলো···

উনি বললেন—আপনার গাড়ী আনেননি?

—না! এখানে ক'দিনের জন্যই বা আসি,—নিজের গাড়ী কলকাতায় আনি না!

উনি বললেন—আমার গাড়ীতে যদি আসেন···মানে, আমি আর আমার স্ত্রী আছি। আমারো বাড়ী ঢাকায়। আমাকে চিনতে পারচেন না?

স্বামী পরিচয় দিলেন।

ভদ্রলোক বললেন—ও···গঙ্গাপদ তোমার মামা? বটে! তা আমাকে চিনলে কি ক'রে?

উনি বললেন—আপনাকে কে না চেনে! দেশের এক জন কত-বড় কৃতী পুরুষ···তা এখানে আপনি কোথায় আছেন?

ভদ্রলোক বললেন,—কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে।

—আমি থাকি বরানগরে। ঐ পথেই তো যাবো ···আসুন আমাদের গাড়ীতে।

ভদ্রলোক এলেন। গাড়ীতে নানা কথাবার্ত্তা হলো। ভদ্রলোক বললেন, তিনি হোটেলে উঠেছেন···কিন্তু খাবার দারুণ কষ্ট! রান্না যা···মুখে দেওয়া যায় না! সাদাসিধে ভাত-ডাল চাইলে যা দেয়, তাতে স্বাদ নেই! কালিয়া-পোলাও চাইলে যে জিনিষ দেয়, তা খেলে তিন দিন হাসপাতালে গিয়ে থাকতে হয়! বললেন, তাঁর শরীর ভালো যাচ্ছে না। যে-কাজে এসেছেন··· আটকে পড়েছেন!

দুম্ করে উনি বলে বসলেন,—কাল আমার ওখানে চলুন স্যর! আমার ওখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন। আমার স্ত্রী নিজের হাতে রান্না-বান্না করবেন···তাছাড়া যে-ক'দিন এখানে থাকতে হয়, যদি আমার ওখানে থাকেন!

মানে, মস্ত বাড়ী, বাগান, পুকুর···দেশে যে-বাড়ীতে বাস করেন, কলকাতার হোটেলে আপনার খুব কষ্ট হবে, জানা কথা! খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট···সত্যিই তো, আপনাদের লাইফ কত দামী···তার উপর বলছেন, শরীর সুস্থ নয়···

স্বামীর জিদে ভদ্রলোককে সায় দিতে হলো···

মিষ্টার দাশ নেমে গেলেন তাঁর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের হোটেলে।

আমি বললুম,—তুমি যে নেমন্তন্ন ক'রে বসলে! বলে, নিজের থাকবার ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে!

উনি বললেন—মস্ত লোক! যাকে বলে Merchant prince···লাগে তাক, না লাগে তুক! দেখা যাক না, চিরদিন কি এমন নেই-নেই দশা চলবে, ভাবো? আমার মন বলছে···এই-সব লোককে যদি একটু যত্ন, একটু খাতির ক'রে চলতে পারি, বুঝলে···

বাড়ী ফিরে দেখি, কানাতে-ঢাকা দু'লরী-বোঝাই ফার্ণিচার এসেছে। ফার্ণিচারের সঙ্গে সেই ভদ্রলোক।

আমি ভিতরে চলে গেলুম।

ফার্ণিচারের লোকের সঙ্গে ওঁর কথা হচ্ছিল। উনি বললেন,—ফার্ণিচার তো রেখে গেলেন···তাঁরা আসবেন কবে?

ভদ্রলোক বললেন,—শুনছি, দার্জ্জিলিং গেছেন···দিন দশ-বারোর মধ্যে আসবেন। তা, আপনারা আর ক'দিন আছেন এখানে?

উনি বললেন,—তার মানে? আমাকে নান্‌ড়ী রেখে গেছে বাড়ীর চার্জ্জে। সে না ফিরলে আমার যাবার উপায় নেই তো!···মানে, আমি ছিলুম বালিগঞ্জে···কুমারের বাড়ীতে। সেখান থেকে টেনে এনে আমাকে এ-বাড়ীর চার্জ্জে রেখে গেল···

এ কথা শুনে সে-ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন; তার পর বললেন,—নান্‌ড়ী···নান্‌ড়ী মানে?

উনি বললেন,—নান্‌ড়ী মানে নন্দী! এ বাড়ীর যিনি মালিক···

এ কথার পর আর কোনো কথা শুনলুম না···

উনি এলেন ভিতরে। বললুম,—লোকটি চলে গেছে?

উনি বললেন,—হ্যাঁ। ফার্ণিচারগুলো চমৎকার! যাক, ভালোই হলো···হাতাহাতি ক'রে সাজিয়ে ফ্যালা যাক। কাল মিষ্টার দাশ আসছেন। তিনি দেখবেন··· ফার্ণিচার দেখে তাঁর তাক লেগে যাবে'খন।

বুঝলুম, ওঁর মনে ফন্দীর চাকা চলেছে! বললুম,— তাতে তোমার লাভ?

বললেন,—লাভের হিসাব এখনো কষে দেখিনি! তবে লোকসান এতে নেই, তা বুঝছি।

আমি বললুম,—কিন্তু ও-লোকটি বলছিল যে, বাড়ী ছেড়ে দেবার কথা?

উনি বললেন,—বলুকগে···নান্‌ড়ী বসিয়ে গেছে এ-বাড়ীতে! ভাড়া লাগে না, লাভ আছে! বললেই আমি অমনি উঠবো! হুঃ! তুলতে চায়, কোর্টে যাক্! গিয়ে ইজেক্‌শন্‌-স্যুট্‌ ফাইল্‌ করুক!···সে মামলা চলবে অমন দু'এক বছর···

কিছু না বুঝে আমি কেমন হতভম্ব হয়ে রইলুম।

চমক ভাঙ্গলো ওঁর কথায়। উনি বললেন,—এসো, ফার্ণিচারগুলো হাতাহাতি ক'রে,···দেখছি এনেছে সব জিনিষ। সোফা-কৌচ থেকে সুরু করে খাট, ড্রেশিং টেবিল···সব!

সকালে উনি বেরুলেন। বললেন,—এখানকার মালীদের কাছ থেকে আনাজ-তরকারী যা পাই, দেখি··· মাছ পাবো ও-দিকে একটা পুকুর আছে···বড় মাছ হবে অথচ দাম শস্তা!···মিষ্টার দাশকে নেমন্তন্ন করেছি। তুমি বোঝো না গো···এ-যুগে চালেই চান্স! চাল যদি খারাপ হয়, নো চান্স!···দাশের কোনো কন্‌সার্ণে যদি একবার ধাঁ ক'রে ঢুকে যেতে পারি···

এ-সব কথা অনেক শুনেছি···কাজেই ও-কথায় আর মনোযোগ দিলুম না!

উনি বললেন—চাকরির কথা আমি মুখে বলবো না··· চাকরি চাইলে তা পাওয়া যায়; কিন্তু না চাইতে যে-চাকরি মেলে, তাকেই বলি চাকরি। অর্থাৎ দাশকে আমি জানতে দিতে চাই না যে, পয়সার অভাবে প্রাণ আমাদের কণ্ঠাগত!

বললুম—এ পাগলামি ছেড়ে আমার কথা শোনো,

দেশে চলো। সাহাকে বললে চাকরি মিলবে। দুর্ভাবনার অন্ত হবে···

—হুঃ! বলে উনি গেলেন চলে'।

বেলা দশটায় এলেন মিষ্টার দাশ।

ওঁরা দু'জনে কথা কচ্ছিলেন···বসবার ঘরে বসে। দু'-চারটে কথা কাণে গেল।

দাশ বললেন,—তোমার নিজের বাড়ী! তুমি এ বাড়ী কিনেছো!

উনি বললেন—হ্যাঁ···

আমি চমকে উঠলুম!

দাশ বললেন—কলকাতা থেকে এত দূরে···

উনি বললেন—মানে, মোটরের কারবার করি কি না ···এখানে থাকা-কে-থাকা হয়···তার উপর কারখানা···

দাশ বললেন—হুঁ, আমিও এধারে বাড়ী খুঁজছিলুম ···কিনবো বলে।···মণ্ডলদের বাগান আছে, বাগানের সঙ্গে মস্ত বাড়ী···

যথাসময়ে আহারাদি শেষ হলো। বললে অহঙ্কার হবে কিন্তু সত্যের অপলাপ হবে না, মানে, আমার হাতের রান্না খেয়ে দাশ খুব খুশী হলেন! বার-বার সে-কথা বললেন। বললেন—চমৎকার রান্না হে··· সত্যি, চমৎকার! ভাবছি, যে ক'দিন এখানে থাকতে হয়, তোমার বাড়ীতেই এসে থাকিবো না কি? এ বয়সে খাওয়া-দাওয়ার উপর কেমন একটু বেশী মায়া··· কি বলো?

উনি বললেন—আমরা তা'হলে সৌভাগ্য বলে' মনে করবো···

দাশ বললেন,—তা'হলে কাল আসছি···কি বলো? সন্ধ্যার সময়···কেমন?

উনি বললেন,—বেশ!···

দাশ চলে' গেলেন বেলা তখন পাঁচটা। দাশ গেলেন ট্যাক্সিতে। উনি বললেন,—আমরাও বেরুচ্ছিলুম··· সিনেমায় যাবো। এই গাড়ীতেই···

দাশ বললেন—না, না, কষ্ট ক'রে টু-সীটারে তিন জনে নাই গেলুম! আমাদের কষ্ট না হোক, তোমার স্ত্রীর কষ্ট হবে···

সিনেমা থেকে বাড়ী ফিরে এসে দেখি, বিপর্য্যয় ব্যাপার! ঘরের সামনে কতকগুলো বাক্স-তোরঙ্গ···

ঘরে ঢুকে দেখি, বিছানায় এক জন মহিলা শুয়ে ঘুমোচ্ছেন···আমার বিছানায়! মহিলাটির বয়স হয়েছে!

উনি তখন গেরাজে গেছেন গাড়ী তুলতে!

আমার গা ছম্-ছম্ করে উঠলো! নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি গেলুম গেরাজের দিকে। ওঁকে বললুম এ-কথা।

উনি বললেন—কিন্তু কে ইনি?

আমি বললুম—কি ক'রে জানবো? কখনো দেখিনি তো···

আমি হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলুম। নিশ্বাস ফেলে উনি বললেন,—হুঁ! একটা গোলযোগ কোথাও ঘটেছে! এ নান্‌ডী যে কি করলে!···আচ্ছা, একটু অভিনয় করতে পারো?···মানে, উনি যেন নিমন্ত্রিতা···এমনি ভাবে ওঁকে খাতির-যত্ন করা···বুঝলে! পুরুষ-মানুষ হলে তার সঙ্গে তর্ক চলে, যুদ্ধ চলে, সব করা চলে! কিন্তু উনি মহিলা···কাজেই, বুঝছো!

ছাই বুঝছিলুম! নান্‌ডীর উপর রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলে উঠলো! হঠাৎ মনে পড়লো সেই চেকের কথা··· বললুম,—হ্যাঁ গা···

উনি বললেন—কেন?

—তোমার নান্‌ডী যাবার সময় যে-চেক দিয়ে গিয়েছিল, তার টাকা পেয়েছ?

উনি বললেন,—না···

—তার মানে?

—সে চেক ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এসেছে···সঙ্গে মেমো ছিল account closed.

বললুম,—এ কথা তো আমায় বলোনি!

বললেন,—বললে তুমি দুঃখ পেতে···চিন্তিত হতে, তাই বলিনি।

হুঁ!

ঘরে এলুম। না এসে কোথায় থাকবো? বিশেষ রাত্রি-কাল! এসে দেখি, মহিলাটি উঠে বসেছেন···

আমাকে দেখে বললেন,—কি চাই?

বললুম,—আপনার কি চাই, তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি···

মহিলা বললেন,—ও! রাজু তোমাকে পাঠিয়েছে?

রাজু?

রাজুর পরিচয় জানবার বাসনামাত্র না জানিয়ে আমি বললুম,—হ্যাঁ।

মহিলা বললেন,—রাজুকে বলে দিয়েছি, সিকদার-বাগানে আমার মামার-বাড়ী থেকে লুচি ভাজিয়ে নিয়ে আসবে, আর দোকান থেকে রাবড়ি, মিষ্টি কিনে আনবে। সেই সঙ্গে বলেছিলুম, যদি একটি মেয়ে-মানুষ পাও—ভদ্রঘরের মেয়ে···মানে, দু'-একদিন যদি থাকতে হয় এখানে, আমাকে রেঁধে-বেড়ে দেবে!

চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল···এর মধ্যে নিশ্চয় গভীর রহস্য আছে···কিন্তু কি সে-রহস্য?

মনে-মনে মা-কালীকে ডেকে বললুম, মান-সম্ভ্রম রক্ষা করো মা! নান্‌ডীর কোন অনিষ্ট করিনি, মা! মনের কোনোখানটা তোমার অগোচর নেই মা! তুমি অন্তর্য্যামিনী···ওঁকেও বাঁচাতে হবে, মা!

মহিলাকে বললুম,—আমি এসেছি আর আমার স্বামী এসেছেন। একজন লোক এসেছিল ফার্ণিচার নিয়ে। সেই লোক আমাদের এখানে রেখে গেছে। বলে গেছে, ফার্ণিচার চৌকি দিতে হবে। আপনি কবে আসবেন, তা বলে যায়নি। তাই এখানে এসে আমাদের আপনি পাননি!

বললুম,—আমার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী···স্বামী ওকালতি করতেন,—পশার হলো না মোটে।

শুনে বললেন,—ও! তা বেশ, আমার কাছে ক'দিন থাকো। মানে, এ বাড়ীতে আয় দিচ্ছে না। যত ভাড়াটে আসে, ভাড়া মেরে পালায়। এর আগে ছিল প্রায় দু' বছর বংশীধর সিঙ্গী—তার কাছ থেকে একটি পয়সা পাইনি!···তাই এ-বাড়ী বিক্রী করতে চাই। খদ্দের এসেছে···আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে চায়! তাই কাশী থেকে আসতে হলো।

বললুম—নান্‌ডী আপনার ছেলে?

তিনি যেন চমকে উঠলেন! বললেন,—নান্‌ডী! নান্‌ডী কে? আমরা হলুম মণ্ডল। এ-বাগানকে লোকে বলে মণ্ডলদের বাগান।

মণ্ডলদের বাগান! দাশের কথা মনে পড়লো! দাশ এ-দিকে বাগান-বাড়ী কিনবে বলে' কলকাতায় এসেছেন! বলছিলেন, কোন্ মণ্ডলদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল!

তা'হলে নান্‌ডী? সেই হতভাগা নান্‌ডী? সে···?

পরের দিন সব রহস্য প্রকাশ হলো! আমার মুখে কে যেন কালির তুলি বুলিয়ে দিলে! মহিলার কাছে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করলুম, বালিগঞ্জ থেকে নান্‌ডী আমাদের এ-বাড়ীতে এনে রেখে গেছে। সে গেছে বোম্বাই।

সে ভদ্রলোকটির পরিচয় পেলুম। তাঁরি নাম রাজু। এ-বাড়ীতে আমাদের দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন!

ভৃত্য উমাপদ বললে,—নান্‌ডীবাবু এসে বলেছিলেন,—মা-ঠাকরুণের বোন-পো হন্;···মা-ঠাকরুণ এ-বাড়ীতে থাকবার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন। মিথ্যা কথা বলে' পরের বাড়ী মানুষ দখল করবে, এমন দুঃসাহস মানুষের হতে পারে, বুড়ো হলেও তার মনে এ ধারণা···

রহস্য আর-এক-দিক দিয়ে আর-এক মূর্ত্তি ধরে···অর্থাৎ···

পরের দিন ওঁকে ডেকে দাশ বললেন,—তোমার কথায় এতটুকু অবিশ্বাস হয়নি। তার পর যখন এ-বাগানে ঢুকলুম, তখন ভাবলুম—এ-বাড়ী তো দালাল আমাকে দেখিয়েছিল! মণ্ডলদের বাগান! মণ্ডলরা বেচতে চায়। তুমি বললে, এ-বাড়ী তুমি কিনেছো··

এমনি নানা প্রশ্নোত্তরে ব্যাপার যা দাঁড়ালো···আমাদের পক্ষে মাথা তোলবার সামর্থ্য রইলো না।

স্বামীর যে-মুখ কখনো বিবর্ণ মলিন দেখিনি, সে-মুখের যে-চেহারা দেখলুম···আমার চোখ ফেটে জল এলো!

ওঁকে বললুম,—চলো, তোমার ঐ মরিশ-গাড়ীতে চড়ে। আর কোথাও না পারো, বনবাসে অন্ততঃ···

স্বামীর দেহ ঘর্ম্মাক্ত! মস্ত নিশ্বাস ফেলে স্বামী বললেন,—হুঁ···

আমি ছাড়লুম না। সবার অলক্ষ্যে নিজেদের দু'-চারটে জিনিষপত্র যা ছিল, নিয়ে ফেরবার উদ্যোগ করলুম···

উনি বললেন—একবার সেই নানুডীকে যদি পাই···

দাশ বাড়ী ছিলেন না···মহিলা নিজের ঘরে দিবা-নিদ্রার আয়োজন করছিলেন, আমরা গেরাজে এলুম।

মরিশ গাড়ী নিয়ে ফটকের কাছে এসেছি, দাশ ফিরলেন ট্যাক্সি ক'রে! স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন,—কোথায় চলেছো লগেজপত্তর নিয়ে?

উনি বললেন,—নানুডীর সন্ধানে। কখনো কোনো গুণ্ডামি করিনি, কিন্তু তাকে যদি পাই···

দাশ হাসলেন, বললেন,—নানুডীটি কে, চিনেছি। এই মণ্ডলদেরই আত্মীয়-ছোকরা···মোটরে খুব ওস্তাদ ···আজীবন ফন্দীবাজী ক'রে ফিরছে। সাহেব! ওর নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছিল। তার পর হুলিয়া···তাই সে ফেরার! রাজুর মুখে শুনলুম।

স্বামী বললেন,—ও···

দাশ বললেন—কিন্তু তোমার বুদ্ধিবৃত্তিতে আমি চমৎকৃত হয়েছি! তা'ছাড়া মা-লক্ষ্মীর হাতের যে-রান্না খেয়েছি···শোনো, আমি যা স্থির করেছি···

উনি নামলেন গাড়ী থেকে···দাশ নামলেন ট্যাক্সি থেকে।

দাশ বললেন—আমি এ-বাগানে খাঁটী সর্ষের তেলের কল্ খুলবো···তোমাকে চাই আমার সে-কারবারে পাব্লিসিটি-ম্যান্ হতে! মানে, তোমার মতো undaunted spirit এবং নির্ভীক সাহস···এর দাম আছে। মাইনে পাবে আপাততঃ দেড়শো টাকা···তার উপর কমিশন···যা বিক্রী হবে, তার টেন-পারসেণ্ট!···কারবার যদি বাড়ে, মাইনেও বাড়বে!···এবং এই বাড়ীতে বিনা-ভাড়ায় বাস!

সেই বাড়ীতেই বাস করছি, দাশ মাঝে মাঝে আসেন ···এই বাড়ীতেই থাকেন। বলেন,—মা-লক্ষ্মীর হাতের রান্নার উপর কি যে আমার লোভ। স্ত্রী মারা গিয়ে অবধি এমন রান্না কারো হাতে আর খাইনি!

উনি বলেন—বুঝলে তো, চাকরি চাইলে চাকরি মেলে না···না চাইতে যে-চাকরি মেলে, তারি নাম চাকরি! ···নো চাল, নো চান্স! ভাগ্যে চাল রেখে বরাবর চলে আসছি, তাই আজ এমন চান্স···

এ-কথার জবাব দিই না। বুকখানা শুধু দুলে ওঠে! ভাবি এ-চান্সে জেলের পথও পাকা হয়!···তাই মা-কালীকে ডাকি···বলি, অসহায়কে তুমি রক্ষা করেছো মা! ভদ্র-ঘরের মেয়ে···স্বামীর মান রাখতে কি মিথ্যা-অভিনয়ই না করেছিলুম সে-রাত্রে সেই মণ্ডল-গৃহিণীর কাছে!···

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিস্ময়-চকিত কেন?

উড়িছে খ-পোতশ্রেণী, খ-ধূপের উন্মাদনা আনে বিপর্য্যয়,
দামিনী চমকে হের দিগন্তের চক্রবালে দুরন্ত পবনে।
বিস্ময়-চকিত কেন? প'ড়ে রবে যাহা কিছু করিলে সঞ্চয়,
বসন্তের গানখানি রেখে দাও অশ্রুভরা বিষণ্ণ ভবনে।

চেয়ে দেখ লক্ষ প্রাণী মৃত্তিকার স্তরে স্তরে হয়েছে পাষাণ,
আর না উঠিবে চাঁদ, প্রাণের নিকুঞ্জে হের আঁধার ঘনায়।
জীবন-সৌরভ নাহি, প্রেম-লব্ধ আনন্দেরই হোলো অবসান,
অত্যাচারে অবিচারে বিদায় মাগিছে বিশ্ব দুঃখে বেদনায়।

তোমার বসন্ত-দিনে সঙ্কট দুর্দ্দিন আসে ঘন অন্ধকারে,
দুর্য্যোগের পথপ্রান্তে মরণের দুনির্ব্বার ওঠে ছায়া দুলে।
বিরলে বসিয়া বালা আশার স্বপন বৃথা গাঁথো ছন্দহারে।
বয়ে যায় দীর্ঘশ্বাস সংসারের মায়াচ্ছন্ন মৌন উপকূলে।

মুছে ফেল অশ্রু তব—দুঃখ কেন? এ ধরণী হয় ধ্বংস হোক্—
আত্মার মরণ নাহি, জীবনের বিড়ম্বনা বৃথা করি ভোগ।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীনত্ব

হিন্দু ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবত জ্যোতির্ম্ময় ভাস্বর। ইহা শুধু ভাগবত ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, ইহা সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ। প্রমাণস্বরূপ পদ্মপুরাণের "শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যোঽয়ং প্রত্যক্ষঃ কৃষ্ণ এব হি" ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহা মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত শ্রেষ্ঠতম মহাপুরাণ। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ অবলম্বনে ভক্তিসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কোন লেখক 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকায় "ভাগবত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণান্তর্গত নহে। পণ্ডিত বোপদেব গোস্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ কিম্বা আংশিক ভাবে ইহা রচনা করিয়াছেন; অথবা রামানুজের পরবর্ত্তী কালে দক্ষিণাপথের শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত কোন বৈষ্ণব দ্বারা ইহা বিরচিত। লেখকের এই মত ভ্রমাত্মক। বৈদেশিক মনীষিগণের অনুকরণে গবেষণা-হিসাবে এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধান উপভোগ্য হইলেও ইহার অন্য একটা দিক্ আছে; কিন্তু লেখক আদৌ তাহা লক্ষ্য করেন নাই। লেখক লোক-শিক্ষক আচার্য্য-শ্রেণীভূক্ত; লেখকের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া স্বল্পানুভূতিসম্পন্ন, কোমল হরিভক্তি সাধন-পথের পথিক-গণের মধ্যে স্বল্পবিদ্যাবুদ্ধিশ্রদ্ধাবিশ্বাসিগণের একমাত্র পথপ্রদর্শক, পথের সাথী ভাগবতশাস্ত্রে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ক্ষুণ্ন হইবার আশঙ্কা আছে। লেখকের মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন আছে; এই জন্যই কতকগুলি স্থূল উক্তি, প্রমাণ ও যুক্তিস্বরূপ নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

(১) শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতি স্কন্ধের প্রতি অধ্যায়ের শেষ ভাগে "শ্রীমদ্ভাগবতে...বৈয়াসিক্যাং "(অর্থাৎ বেদব্যাস-রচিত) বলিয়া উল্লেখ আছে। এই প্রকার স্পষ্ট নিদর্শন সত্ত্বেও যদি গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে হয়, তবে তো প্রত্যেক শাস্ত্রেরই গ্রন্থ-কারের নাম সন্দেহের বিষয় ভাবিয়া তর্কজাল বিস্তার করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে শুকের উক্তিতে আছে—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥"

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত নামক সর্ব্ববেদতুল্য পুরাণ আমি দ্বাপরের শেষভাগে আমার পিতা বেদব্যাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

(২) পদ্মপুরাণে ভাগবত-মাহাত্ম্যে পার্ব্বতীর নিকট মহা-দেবের উক্তিতে আছে—

"সপ্তদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
নাপ্তবান্ মনসস্তোষং ভারতে নাপি ভামিনি॥
জ্ঞাত্বাস্য হৃদয়ং খিন্নং নারদো দেবদর্শনঃ।
সমাজগাম ভগবান্ ব্যাসস্যাশ্রমমুত্তমম্॥

* * * *

অতো বৈ কলিজাতানামুদ্ধারার্থং নৃণাং ভবান্।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং বর্ণয়োত্তমম্॥
যেন প্রবর্ত্তিতো নাথ ভবতো মানসং ধ্রুবম্॥
তোষমেষ্যতি লোকাশ্চ প্রাপ্স্যন্তি কৃতকৃত্যতাম্॥"

অর্থাৎ বেদব্যাস ১৭খানি পুরাণ ও মহাভারত রচনা করিয়া মনে সন্তোষলাভ করিতে না পারায় তাহার কারণ চিন্তা করিতে-ছিলেন, এমন সময় নারদ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন— তুমি যে সকল পুরাণ ও ইতিহাস রচনা করিয়াছ, তাহাতে হরি-কথা সবিস্তর বর্ণনা কর নাই; তজ্জন্যই তোমার চিত্ত প্রসন্ন হই-তেছে না। আমি পিতার নিকট হইতে সে তত্ত্ব অবগত হইয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি; তদবলম্বনে তুমি শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ রচনা কর। শ্রীমদ্ভাগবতেও ঠিক এইরূপ কথাই আছে,—কেবল কয়খানা পুরাণের পর মহাভারত রচিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। সুতরাং বেদব্যাস যে প্রকার মানসিক ভাব লইয়া ও যে তত্ত্ব নারদ-মুখে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কি পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন না যে, পূর্ব্ব-রচিত পুরাণসমূহ ও মহাভারত হইতে শ্রীমদ্ভাগবত সম্পূর্ণ পৃথক্ ছাঁচে গড়িয়া উঠিবে, ও উহাতে পৃথগ্‌ভাবে উপাখ্যান বর্ণিত হইবে? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে কথিত প্রবন্ধ-লেখক যে বলিতেছেন মহাভারতে পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপশ্রবণনান্তর "এক এক স্তম্ভ সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া, তথায় সুরক্ষিত ভাবে অবস্থান করিয়া মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।" কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে তিনি গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়া সপ্তাহকাল শুকমুখে ভাগবত শ্রবণ করিলেন। ইহা একই গ্রন্থকারের পরস্পরবিরোধী ঘটনার সমাবেশ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের গ্রন্থকার ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু এইরূপ প্রতিকূল মন্তব্যের কি সন্তোষজনক উত্তর নাই? শ্রীমদ্ভাগবতে বেদব্যাস নারদমুখ-নিঃসৃত উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট করিয়া-ছেন। মহাভারতেই আছে যে, পরীক্ষিৎ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র ও ভক্ত ছিলেন। মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া তাঁহার কি ভগবৎকথা শ্রবণ করাই বেশী সম্ভবপর নয়? ভাষা সম্বন্ধেও

লেখকের আপত্তি এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত (যাহাকে লেখক বিষ্ণু-ভাগবত আখ্যা দিয়াছেন—যে আখ্যা নীলকণ্ঠ-টীকা ছাড়া অন্ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না) কর্কশ শব্দে পূর্ণ এবং মহাত্মারা গ্রন্থে কর্কশ শব্দ ব্যবহার করেন না। ভাষা স্থানে স্থানে কঠিন হইলেও কর্কশ শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন বোধ হয় না। মহাত্মারা শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষাকে কঠিন হইলেও সুললিত ও মধুর বলিয়াই প্রশংসা করিয়া থাকেন। আমি নিম্নে এ সম্বন্ধে একটি মত উদ্ধৃত করিতেছি—

"The tilt of the verse in the Bhagaba a has a peculiar charm of its own; it varies with the occasion as its gay or grave, from the lighter and swift-moving measure of the madrigal and pastoral song to the slow and solemn measure of the hymn. There is a solemnity and grandeur in the devotional songs which attunes the mind to the high theme."—(Dr. Sir. P. S. Sivaswamy Aiyer.)

(৩) শ্রীমদ্ভাগবত রচনার হেতু ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে পদ্মপুরাণ-বচন উপরে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে উহা যে বেদব্যাসবিরচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। রচনার পরেও উহা যে বেদব্যাস-কৃত শীর্ষ-স্থানীয় মহাপুরাণ, তাহা কতিপয় অবিতর্কিত মহাপুরাণে স্বীকৃত, ঘোষিত ও প্রশংসিত হইয়াছে, যথা—

(ক) পদ্মপুরাণে—

"পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম।
যত্র প্রতিপদং বিষ্ণুর্গীয়তে বহুধার্ষিভিঃ।
কালব্যালমুখালীঢ় জগত্ত্রাণবিধায়কম্।
শ্রীভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কৃষ্ণেন ভাবিতম্।
....
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ দ্বাদশস্কন্ধসংযুতঃ।
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।
....
ইতি সংকল্য মনসা শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
জন্মাদ্য স্য যতশ্চেতি ধীমহ্যন্তং উপাবদৎ।"

পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১৯৩ হইতে ১৯৮ পর্য্যন্ত ভাগবত-মাহাত্ম্যনামীয় ৬ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতেরই মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, ও উহাকে বেদব্যাসরচিত বলিয়াছে। পদ্মপুরাণ যে বেদব্যাস-রচিত মহাপুরাণ তাহা সম্পূর্ণ অতর্কিত। কাযেই শ্রীমদ্ভাগবতও যে বেদব্যাসরচিত মহাপুরাণ, পদ্মপুরাণের রচনানুসারে তাহার কোনই সন্দেহ থাকে না। উপরে চারিটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, কিন্তু এতাদৃশ বহু শ্লোক পদ্মপুরাণে আছে। "কৃষ্ণেন ভাবিতম্," এখানে, কৃষ্ণ—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। "কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ কৃষ্ণঃ। কৈষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুং। কোহন্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষান্মহাভারতকৃদ্ভবেদিতি বিষ্ণুপুরাণবচনাৎ—" শঙ্করাচার্য্য।

(খ) স্কন্দপুরাণে—

"পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদো যোঽসৌ ব্যাসেন বর্ণিতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ সোঽসৌ ভাগবতাভিধঃ।"

অর্থাৎ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসমন্বিত পরীক্ষিৎশুকসংবাদ যাহা ব্যাসবর্ণিত (শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ) তাহাই 'ভাগবত' নামে অভি-হিত।

(গ) নারদীয়পুরাণে—

"ব্রহ্মোবাচ। মরীচে শৃণু বক্ষ্যামি বেদব্যাসেন যৎ কৃতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
তদষ্টাদশসাহস্রং কীর্ত্তিতং পাপনাশনম্।
সুরপাদপরূপোঽয়ং স্কন্ধৈর্দ্বাদশভির্যুতঃ।
তত্র তু প্রথমে স্কন্ধে সুতর্ষীনাং সমাগমঃ।
ব্যাসস্য চরিতং পুণ্যং পাণ্ডবানাং তথৈব চ।
পরীক্ষিতমুপাখ্যানমিতীদং সমুদাহৃতম্।
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদে স্মৃতিদ্বয়-নিরূপণম্।
ব্রহ্মনারদসংবাদেঽবতারচরিতামৃতম্।" ইত্যাদি

এই নারদীয় পুরাণে অষ্টাদশ পুরাণের নামের তালিকায় শ্রীমদ্ভাগতের নাম স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া উহার কোন কোন স্কন্ধে কি কি বিষয় বর্ণিত আছে তাহারও উল্লেখ আছে। উক্ত প্রথমশ্লোকেই বলা হইল যে, শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসকৃত।

(ঘ) গরুড়পুরাণে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।"

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের অর্থ বা অকৃত্রিম ভাষ্য; ইহাতে মহাভারতের অর্থ বিশিষ্টরূপে নির্ণীত হইয়াছে; ইহা গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ; ইহা হইতে সমগ্র বেদের অর্থ পরিবৃংহিত বা বিস্তারিত হইয়াছে; সামবেদ যেমন সর্ব্ববেদের শ্রেষ্ঠ, এই মহাপুরাণও সেইরূপ সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ; ইহা স্বয়ং ভগবানেরই কথিত; ইহাতে দ্বাদশটি স্কন্ধ, আর শততম বিচ্ছেদ বা প্রকরণ (অথবা পঞ্চত্রিংশদধিক ত্রিংশততম অধ্যায়) আছে, ইহা অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ।

(৪) উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যের বর্ণিত প্রমাণ বাদ দিলেও অতর্কিত অন্যান্য চারিটি মহাপুরাণবাক্য হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে যে 'ভাগবত' নামীয় পুরাণটির উল্লেখ আছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত, তাহা বেদব্যাসরচিত, এবং তাহা শ্রেষ্ঠতম মহাপুরাণ। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগতের টীকার প্রারম্ভে "শ্রীমদ্ভগবদ্গুণবর্ণন-প্রধানং শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং প্রারীপ্সুর্বেদব্যাসঃ" ইত্যাদি লিখিয়া বেদব্যাসকেই উহার রচয়িতা বলিয়াছেন। সকল মহাপুরাণেই এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম আছে, তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই 'ভাগবত' নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক মহাপুরাণেই সমস্ত পুরাণের নাম, এবং "সূত উবাচ" "ব্যাস উবাচ" ইত্যাদি বাক্য সন্নিবিষ্ট থাকায় বুঝিতে হইবে যে, পুরাণের সূচীগুলি রচনার ক্রমানুসারে হয় নাই, এবং উহা শুধু সংখ্যা-নির্দ্দেশক মাত্র। "ভাগবত" বলিতে লোকে শ্রীমদ্ভাগবতই বুঝিয়া থাকে, 'দেবী-ভাগবত' বোঝে না। পণ্ডিতগণও তাহাই বোঝেন, এবং কোনও কোনও স্থানে উহা বঙ্গানুবাদে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াই লেখা হয়।

(পণ্ডিতবর শ্রীমৎ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের অনূদিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।) কোনও মহাপুরাণেই উপপুরাণের তালিকামধ্যে দ্বিতীয় ভাগবত দেখা যায় না। তবে 'দেবী-ভাগবতে'র স্থান কোথায়? 'উদ্বোধনে'র প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, পদ্মপুরাণে দেবীভাগবতকে উপপুরাণ বলিয়াছেন; তাহাও ঠিক নয়; কারণ, পদ্মপুরাণের বর্ণিত উপপুরাণের তালিকায় দেবী-ভাগবত বা কোনও দ্বিতীয় ভাগবতের নাম নাই (পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ড, ১১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তাই দেবীভাগবতের পক্ষপাতিগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে 'আধুনিক' বলিয়া সরাইয়া দিয়া সেই স্থানে দেবী-ভাগবতকে মহাপুরাণশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। দেবীভাগবত-গ্রন্থ কিন্তু উপপুরাণের যে তালিকা দিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় একটি ভাগবতের উল্লেখ করিয়া, নিজকে উপপুরাণের তালিকামধ্যে ফেলিতে চান বলিয়াই মনে হয়। পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ও স্কন্দ পুরাণ-গ্রন্থ অষ্টাদশ মহাপুরাণগুলিকে ৩।৪ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাতেও শ্রীমদ্ভাগবতই "ভাগবত" নামীয় মহাপুরাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কথিত লেখকের মতে মৎস্যপুরাণকে প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণে মহাপুরাণগুলিকে সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, সঙ্কীর্ণ—এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বলিতেছে—

"সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যা পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥
অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্॥"

অর্থাৎ সাত্ত্বিক পুরাণে হরির, রাজস পুরাণে ব্রহ্মার, তামস পুরাণে অগ্নির ও শিবের এবং সঙ্কীর্ণ পুরাণে সরস্বতীর (শব্দব্রহ্ম বেদের) ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য প্রধানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই বিভাগানুসারে দেবীভাগবতের কোনই স্থান মিলিতেছে না।

(৫) এখন কোন্ কোন্ যুক্তির বলে দেবীভাগবতের পক্ষপাতিগণ দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চান তাহার আলোচনা করি। 'উদ্বোধনে'র কথিত প্রবন্ধে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শিবপুরাণে আছে—ভগবতী দুর্গার চরিত-কথা যাহাতে আছে তাহাই ভাগবত—দেবী সম্বন্ধে কোনো উপপুরাণ নাই। দেবী সম্বন্ধে উপপুরাণ থাকিবে না কেন? কালিকাপুরাণ ও দেবীপুরাণ নামক দেবীর দুইখানি প্রসিদ্ধ উপপুরাণ আছে। এদিকে দেবীভাগবত কিন্তু শিব-পুরাণের প্রামাণিকতা মানেন না, যেহেতু, দেবীভাগবত শিব-পুরাণকে উপ-পুরাণের তালিকায় ফেলিয়াছেন। পুনঃ এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে, 'যেহেতু মৎস্যপুরাণ দৃষ্টে দেখা যায় যে, উপপুরাণগুলি মহাপুরাণ অবলম্বনে লিখিত, এবং কালিকাপুরাণের হেমাদ্রি প্রস্তাবে লিখিত আছে "যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্" অতএব বলিতে হইবে কালিকাপুরাণ দেবীভাগবত অবলম্বনে রচিত, সুতরাং দেবী-ভাগবতখানি মহাপুরাণ'! শ্রীমদ্ভাগবতকে স্থানচ্যুত করিয়া দেবী-ভাগবতকে সেইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা লেখকের আন্তরিক অভিসন্ধি হইলেও তাহার সমর্থনের কোন উপায় না থাকায় কি এই প্রকার বক্রযুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে? বচনটি সাক্ষাৎ কালিকা-পুরাণ হইতে উদ্ধৃত না করিয়া হেমাদ্রি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল কেন? সুতরাং কালিকাপুরাণের ঐ বচন প্রকৃত কি না, তাহাই প্রথম বিবেচ্য। মৎস্যপুরাণ অবলম্বনে যুক্তির অবতারণা। আমি মৎস্যপুরাণে লিখিত মহাপুরাণ-বিভাগানুসারে দেখাইয়াছি যে, তথায় দেবীভাগবতের কোনই স্থান হয় না। পদ্মপুরাণের "সপ্তদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ" ইত্যাদি শ্লোকের আপত্তি করা হইয়াছে যে 'যেহেতু মার্কণ্ডেয় পুরাণে ক্রৌষ্টুকি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট মহাভারতের তত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন, অতএব মহাভারতের পর মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচিত, সুতরাং শ্লোকে "সপ্তদশ পুরাণানি" স্থানে 'ষোড়শ' পুরাণানিই দাঁড়ায়; কিন্তু একথা যখন পুঁথিতে নাই তখন সিদ্ধ হইল 'শ্রীমদ্ভাগবত—অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত নয়'। যুক্তিটা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অপেক্ষাও মূল্যহীন এবং অসার। এই প্রকার তর্কের সাহায্য গ্রহণ করিলে মৎস্যপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটি দাঁড়ায় কোথায়?

"অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্॥"

দেবীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটিই বা দাঁড়ায় কোথায়?

"অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতী-সুতঃ।
ভারতাখ্যানমতুলং চক্রে তদুপবৃংহিতম্॥"

ছিদ্রান্বেষণের বাগাড়ম্বরে যুক্তির অভাব পূর্ণ হয় কি? এই প্রকার ভুয়ো তর্ককে যুক্তি বলিয়া চালাইতে পারা যায় না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কোনও পুরাণই রচনার সমকালে গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় নাই। প্রথমতঃ মুখে মুখে রচিত ও অধ্যাপিত হইয়াছিল। তৎপরে গ্রন্থাকারে লিখিত হয়। মহাভারত সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। ইহা হইতেই উক্ত প্রকার কূট তর্কের মীমাংসা হইয়া যায়। বস্তুতঃ ক্রৌষ্টুকির নিকট মার্কণ্ডেয়ের উক্ত যে পুরাণ, তাহা মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলিয়া প্রচলিত নহে। বেদব্যাস কর্ত্তৃক সেই সকল উক্তি অবলম্বনে যে পুরাণ গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাই মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তাহা ক্রৌষ্টুকির প্রশ্ন নয়; তৎস্থলে "ব্যাসশিষ্যো মহাতেজা জৈমিনিঃ পর্য্যপৃচ্ছত" (মার্কণ্ডেয়পুরাণ দ্রষ্টব্য)।

(৬) বস্তুতঃ, দেবীভাগবতের নীলকণ্ঠ টীকা হইতেই এই সকল কূট তর্কের উৎপত্তি; সুতরাং ঐ টীকার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন কোন কথার আলোচনা অনাবশ্যক নহে। এই নীলকণ্ঠ টীকাকার যদি মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ হন অর্থাৎ এই দুই নীলকণ্ঠ টীকাকার যদি অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তাহা হইলেই টীকার মূল্য আছে, নচেৎ তাহা মূল্যহীন। প্রমাণে কিন্তু এই দুই নীলকণ্ঠ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্দ্ধরবংশাবতংস গোবিন্দ সূরির পুত্র এবং দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ রঙ্গনাথের পুত্র ও শৈবোপনামক বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের টীকাকার শ্রীমদ্ভাগবতকে কোথায়ও 'বিষ্ণু-ভাগবত' নাম করিয়া উল্লেখ করেন নাই, শ্রীভাগবত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তর্কস্থলে এই দুই টীকাকার একই ব্যক্তি ধরিয়া লইলেও দেখা যায় যে, মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ

গীতাব্যাখ্যার প্রারম্ভে, শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামী গীতার ভাষ্য ও টীকা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে গুরুজ্ঞানে প্রণাম করিয়াছেন। যথা—

"প্রণম্য ভগবৎপাদাঞ্, শ্রীধরাদী°শ্চ সদগুরূন্।
সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে।"

শ্রীধরস্বামী নীলকণ্ঠ অপেক্ষাও প্রাচীন ছিলেন এবং নীলকণ্ঠের গুরুস্থানীয়। এমতাবস্থায় পাঠকবর্গ কি নীলকণ্ঠের মতামত প্রামাণ্য বলিয়া ধরিবেন, না শ্রীধরস্বামীর মতামত প্রামাণ্য বলিয়া ধরিবেন? নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। কারণ, টীকাকার নীলকণ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত ত্রিপদা গায়ত্রী ছন্দে আরব্ধ নয় বলিয়াও তাহার মহাপুরাণত্বটিকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—

"ধীমহীতি গায়ত্র্যা প্রারম্ভেন গায়ত্র্যাখ্যব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণমিতি দর্শিতম্। যথোক্তং মৎস্যপুরাণে পুরাণদান প্রস্তাবে—"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে। লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং পদম্। অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্।" পুরাণান্তরে চ "গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ। হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুরিতি।" পদ্মপুরাণে চ—অম্বরীষং প্রতি গৌতমবচনম্—অম্বরীষ শুক-প্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখে নাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়মিতি। অতএব ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্।"

মর্ম্ম এই, মৎস্যপুরাণে ও পুরাণান্তরে (বামনপুরাণে) কথিত ভাগবতের লক্ষণাগুলি অর্থাৎ গায়ত্রী দ্বারা প্রারম্ভ ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ত্তমান আছে, এবং পদ্মপুরাণেও ইহাকেই 'ভাগবত' নামীয় মহাপুরাণ বলিতেছে, অতএব ভাগবত নামক অন্য কোনও পুস্তক আছে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোনও কারণ নাই।

"গায়ত্র্যা চ সমারম্ভঃ" ইত্যাদি বচনে গায়ত্রী পদের অর্থ যদি গায়ত্রী ছন্দ ও গায়ত্রী শব্দ ধর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে 'গায়ত্রীর অর্থ' বলিতেই বা আপত্তি কি? বরং তাহা বলাই অধিকতর সঙ্গত। "সত্যং পরং ধীমহি"তে গায়ত্রীর অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সমগ্র মন্ত্রটি লেখাই যুক্তিযুক্ত নহে। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকাতেও এই মত সম্পূর্ণ সমর্থিত হইয়াছে। যেহেতু, তিনি বলিতেছেন "তং ধীমহীত্যাদি প্রমাণ বচনেন গায়ত্রী শব্দেন তৎ সূচক—তদব্যভিচারি—ধীমহি পদসম্বলিত—তদর্থ এবেষ্যতে। সর্ব্বেষামপি মন্ত্রাণামাদি রূপায়াস্তস্যাঃ সাক্ষাল্লিখনানর্হত্বাৎ।" সুধী পাঠক! পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভাগবতচূড়ামণি শ্রীধরস্বামী ও জীব গোস্বামীর মতের বিরুদ্ধে টীকাকার নীলকণ্ঠের মত কি উদিত সূর্য্যের রশ্মিজালের তুলনায় খদ্যোতের পুচ্ছদ্যুতির ন্যায় নিষ্প্রভ নহে?

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক শ্রীধর স্বামীর টীকাকে প্রামাণ্য ধরিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং "ভাগবতে প্রক্ষেপ" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, "ভাগবতের মহাপুরাণত্ব নষ্ট করিবার মত সাহস আমাদের নাই এবং বাংলার আপামর কেহই উহা চায় না," অথচ আলোচ্য প্রবন্ধেই বলিতেছেন, "আমরা দেবী ভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, দেবী-ভাগবতখানা মহাপুরাণ এবং বিষ্ণু-ভাগবতখানা উপপুরাণ।" ইহার কোন্ কথাটি নির্ভরযোগ্য?

(৭) শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি বোপদেব গোস্বামী সংস্কার করিয়াছেন, কিম্বা সম্পূর্ণ বা আংশিক রচনা করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার আগ্রহাতিশয্যে লেখক বাংলা ভক্তমাল গ্রন্থ (যাহা ভক্তপ্রবর নাভাজি-রচিত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থের অনুবাদ বলিয়া প্রকাশ) হইতে কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই,- "শ্রীশঙ্করাচার্য্য কলিকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন করিয়া, কৃষ্ণভক্তি গোপন করিয়া, ত্রিবর্গের সেবাজন্য দেবদেবীর উপাসনা প্রকাশ করিয়া, মায়াবাদ স্থাপন করিলেন। তিনি সুর নামক অসুর স্বভাব কাশীরাজকে তমধর্ম্ম বামাচারের পথে লইলেন। এবং সেই সুর নামক কাশীরাজ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের নিন্দুক দ্বেষী হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে ভাগবত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন। তার পর সুধীগণের কাতর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান বোপদেব গোস্বামীকে আকাশবাণী দ্বারা গঙ্গা হইতে ঐ গ্রন্থ এই বলিয়া উঠাইতে আদেশ দিয়া বলিলেন যে—গ্রন্থের কিছুই হানি হয় নাই, পূর্ব্ববৎ শুষ্কভাবেই গ্রন্থ উঠিয়া আসিবে; তদনুসারে বোপদেব গঙ্গা হইতে গ্রন্থ উঠাইয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলেন ও মুক্তাফল নামে গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া প্রচার করিলেন।"

লেখক যে ভাগবতের গঙ্গা-সমাধি ঘটনাটি প্রমাণস্বরূপ লিখিয়াছেন, তিনি কি ভক্তমালের ঐ উদ্ধৃতাংশ, ভাগবতের গঙ্গাসমাধিকারণের ঐ সব গল্প, শ্রীশঙ্করের ঈদৃশ নিন্দাবাদ এ সব বিশ্বাস করেন? আর গঙ্গা-নিমজ্জিত ভাগবত শাস্ত্রগুলি (ভগবদাদেশ পাইয়া) বোপদেব গঙ্গা হইতে তুলিলেন (বাংলা অনুবাদকের বর্ণিত) এত দূর দৈবী ঘটনাতেই যদি লেখকের বিশ্বাস থাকে, তবে ভগবৎ আদেশ ও কৃপায় ভাগবত অক্ষত ও শুষ্ক কলেবরে গঙ্গা-গর্ভে ছিলেন (বাংলা অনুবাদকের বর্ণিত) এই দৈবী ঘটনাটি বিশ্বাস করিতেই বা লেখকের আপত্তি কেন? তবে কি তিনি উদ্ধৃতাংশের যতটুকু নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূল, ততটুকুই বিশ্বাস করিয়া বাকীটা করেন না? ভক্তশ্রেষ্ঠ নাভাজির মূলগ্রন্থে "বোপদেব লুপ্ত ভাগবত উদ্ধরয়িতা" ইহা ছাড়া বাংলা বইএর উদ্ধৃতাংশে ঐসব কথাগুলির কিছুই নাই। মূল ভক্তমাল-কাহিনী ছাড়িয়া বাংলা অনুবাদকের বর্ণনা আনিয়া (প্রমাণ দানার্থে) লেখক কেন যে হাজির করিয়াছেন তাহাও বুঝা যায় না! অবশ্য, কেহ যদি বোপদেব ভাগবতের নবকলেবর দাতা, ইহা প্রমাণ করিতে আগ্রহান্বিত হন, তবে তাঁহার পক্ষে মূল ছাড়িয়া অনুবাদকে আনিলেই কার্য্যের সুবিধা হয়। কারণ, পূর্ব্ব ভাগবত-কলেবর সলিল-সমাধিস্থ দেখাইতে পারিলে উহার বিনাশ সম্ভাবনা ও বোপদেবের তাহাকে নবকলেবর দান সম্ভাবনা লোককে অনুমান করানো খুব সহজ হয়। নাভাজি-প্রণীত মূলগ্রন্থে যাহা আছে তাহা এই,—

"সম্প্রদায়-শিরোমণি সিন্ধুজারচ্যো ভক্তি বিতান।
বিষ্বকসেন মুনিবর্য্য সপুনিষ্ট কোপ প্রণীতা।
"বোপদেব" ভাগবত লুপ্ত উধর্যো নবনীতা।
মঙ্গলমুনি শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ পরমজশ।
রাম মিশ্র রস রাশি প্রগট পরতাপ পরাঙ্কুশ।

যামুন মুনি রামানুজ তিমিরহরণ উদৈভান।
সম্প্রদায় শিরোমণি সিন্ধুজারচ্যো ভক্তিবিতান।"

অর্থাৎ মূল ভক্তমালে 'শ্রী'সম্প্রদায়-প্রণালী বর্ণনা উপলক্ষে বোপদেব গোস্বামী লুপ্ত ভাগবত উদ্ধার করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। গঙ্গাগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন কোথাও বলা হয় নাই। ভারতবর্ষে হিন্দু দেববিগ্রহ ও হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থ বিধর্ম্মীর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য লুকায়ন, শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া সন্ন্যাসিগণের অরণ্যে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ, এবং সে সকল গুপ্ত শাস্ত্র ও শ্রীবিগ্রহের পরে (অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক) পুনঃ-প্রকাশ করিবার দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। এ স্থলে লুপ্ত ভাগবত গ্রন্থ বোপদেব কর্ত্তৃক উদ্ধার করিবার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এই প্রকার (রক্ষার্থ) লুক্কায়িত গ্রন্থ বাহির করিয়া দেশে প্রচার করা। ইহা ছাড়া অন্য অর্থ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। বোপদেব টীকাকার মাত্র, রচয়িতা নহেন, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ।

বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের সময় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ এই প্রকারে গুপ্তভাবে রক্ষিত থাকা নিবন্ধন শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যাদিতে কোথাও শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত দেখা যায় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নৃসিংহপুরাণ ইত্যাদি আরও কতিপয় পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভাষ্যাদিতে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। পদ্মপুরাণ মানিয়া লওয়াতেই প্রমাণ হইল যে, শঙ্করাচার্য্যের সময়েও শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসকৃত মহাপুরাণ বলিয়াই জানা ছিল; কারণ, আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, পদ্মপুরাণই উহার স্বাধীন শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের জীবনীতে শঙ্কর বেদব্যাস সম্মিলন সময়ে শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাসের যে অভ্যর্থনা ও স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলিও আছে, "আপনি ব্রহ্ম পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, লৈঙ্গ, গারুড়, নারদীয়, ভাগবত আগ্নেয়, স্কন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মাৎস্য, কৌর্ম্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড এই বেদার্থগর্ভ অষ্টাদশ পুরাণ সঙ্কলন করিয়াছেন; অথচ এই জগতে পরস্পর অর্থসঙ্গত দু'টি শ্লোক রচনা করিতেও অনেকে সক্ষম নহে। আপনি বেদ-সমুদ্র ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদয়ই অবগত আছেন। আপনার অবিদিত এ জগতে কিছুই নাই।" (শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক এম, এ প্রণীত 'শঙ্করাচার্য্য' পৃঃ ৩৮ দ্রষ্টব্য), অতএব ভাগবত (শ্রীমদ্ভাগবত) শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী সময়ে রচিত কিম্বা রামানুজের পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, কিম্বা উহা বেদব্যাস-রচিত নহে, এই প্রকার উক্তি অজ্ঞতার লক্ষণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

(৮) বোপদেব গোস্বামী কেশব কবিরাজের পুত্র, ধনেশ্বর পণ্ডিতের ছাত্র, এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন অমর সিংহেরও পরবর্ত্তী। বোপদেব নিজেই মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষে আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্।"

সুতরাং তিনি ঋষি ছিলেন না। পরন্তু অর্থপ্রার্থী ছিলেন, যথা মুগ্ধবোধের ২২০ সূত্রের উদাহরণে বলিয়াছেন, "পুষ্ণাতু বো নোঽপি হরির্ধনং বো, দদাতু নো হস্তগুভানিবো নঃ।" শ্রীমদ্ভাগবত-রচয়িতা কিন্তু তদ্বিপরীত, অর্থকে নানা অনর্থের মূল ও ভগবদ্ভজনের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া বহুস্থানে নিন্দা করিয়াছেন। এতাদৃশ বোপদেব গোস্বামীর যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীমদ্ভাগবত নামক শাস্ত্র রচনা করিবার শক্তি থাকিতে পারে, তাহা অবিবেচনার কথা ভিন্ন অন্য কিছুই হইতে পারে না। যে স্থলে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে স্বয়ং মহাদেব বলিতেছেন, "অহং বেদ্মি, শুকো বেত্তি, ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা" সে স্থলে ব্যাসের আসনে বোপদেবকে স্থাপন করা কি বালোচিত প্রগল্‌ভতাপূর্ণ প্রয়াস নহে? বোপদেব রচয়িতা হইলে পরমহংসতুল্য শ্রীধরস্বামী কি গ্রন্থের টীকাকার হইতেন? "ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা" এই কথার অর্থ এই যে, শ্রীনারদের কৃপা না পাইলে বেদব্যাসেরও এই প্রকার ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নের শক্তি হইত না। শ্রীনারদের কৃপায় বিশুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা বেদব্যাসের কর্ম্মজ্ঞান যোগাবৃত ভক্তিপরচিত্ত পরিমার্জ্জিত হইয়া পরম নির্ম্মল শুদ্ধ ভক্তিরসময় হইলে তিনি সেই নির্ম্মল হৃদয়ে পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেন, এবং অখিল-রসামৃত-সিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাকথা-সমন্বিত পারমহংস্যসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন।

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ। আশা করি, আমার সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া সুধী পাঠকবর্গের এখন আর কোনও প্রকার সন্দেহই নাই যে, শ্রীমদ্ভাগবত নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ বেদব্যাসেরই রচিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহাপুরাণ, এবং ইহা বোপদেব কিম্বা অন্য কোনও লোক দ্বারা আংশিক ভাবেও রচিত নহে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন (এম, এ, বি, এল)।

---

* উদ্বোধন পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ এই প্রতিবাদ প্রবন্ধটি উদ্বোধনে প্রকাশ করিতে সম্মত হইতে না পারিয়া লিখিয়াছেন—"প্রবন্ধটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত কিন্তু উদ্বোধন পত্রে এই সম্বন্ধে বাদানুবাদ প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই প্রবন্ধটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে বিশেষ সুখের বিষয় হইবে।"

উদ্বোধন পত্রিকার এই প্রবন্ধে তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত যে বেদব্যাস বিরচিত নহে—ইহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; অথচ তাহার প্রতিবাদ ছাপিতে অসম্মত। শ্রীমদ্ভাগবত স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুসমাজে চিরসম্পূজিত আরাধ্য মহাগ্রন্থ। এজন্য এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইল। উদ্বোধনের প্রবন্ধ লেখকের এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকিলে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া উদ্বোধন পত্রিকায় তাঁহার প্রতিবাদ প্রকাশ করেন।

—মাসিক বসুমতী সম্পাদক।

খেলার গহনা

কুমড়া-বীচি, লাউয়ের বীচি—তা দিয়ে দামী জুয়েলারি-নেকলেশের ছাঁদে নেকলেশ-গড়ার কথা বলছি। খেলা-ঘরের নেকলেশ, সখের নেকলেশ!

এ কাজের জন্য চাই বড় এবং মাঝারি সাইজের

দু'হালি হার ও ব্রেশলেট
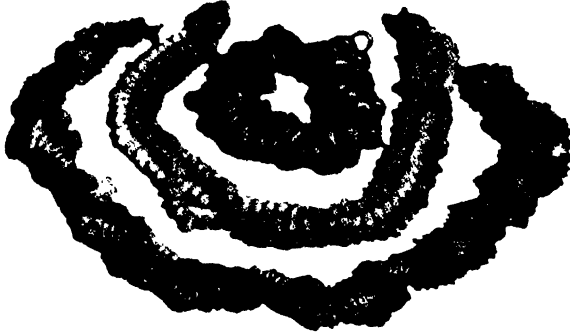
দু'খানি ধারালো কাঁচি; খানিকটা তার; বড় সাইজের একটি ছুঁচ; এবং ক'রকম রঙ।

কুমড়া এবং লাউয়ের বীচিগুলি রৌদ্রে ভালো ক'রে
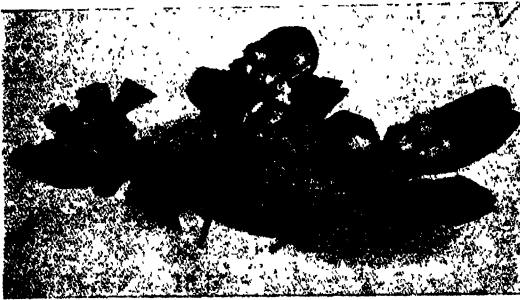
ফুল-পাতা

প্রথমে শুকিয়ে নেবেন। বেছে বেশ বড়-বড় বীচি দেখে নেবেন। এই বীচিগুলিতে ছুঁচ দিয়ে বিঁধ ক'রে সেই বিঁধের মধ্য দিয়ে তার চালিয়ে নিলেই হার তৈরী হবে। নানা ছাঁদে এক-হালি, দু-হালি, চার-হালি, পাঁচ-হালি হার তৈরী করতে পারেন। হার তৈরী করবার আগে বীচিগুলি কাঁচি দিয়ে সমান-মাপের ক'রে কেটে নেওয়া চাই।

তার পর হার তৈরী হলে বীচিগুলিকে মানানসই-ভাবে যেমন-খুশী রঙে রাঙিয়ে নিলে হারে চমৎকার বাহার খুলবে। মনে হবে, যেন মণি-মুক্তার হার!

শুধু কুমড়া-বীচি, লাউয়ের বীচি কেন, পাকা-শসার
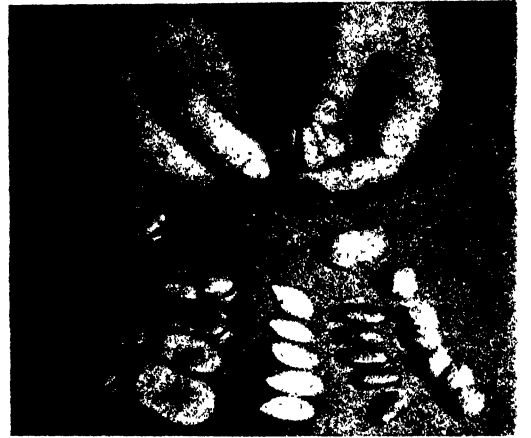
ছুঁচ দিয়ে বিঁধ

বীচি, সীমের শুঁটি—এ-সব দিয়েও এমনি মজার হার, কাঁকন, তাগা, বালা, মটুক, আরো রকমারি গহনা তৈরী করতে পারেন। এ-কাজে খরচ নেই বললে অত্যুক্তি হবে না! ঘরের সজ্জা-হিসাবে এ-সব গহনা বেশ ভালোই হবে।

হার ছাড়া এ-সব বীচি দিয়ে বটন-হোল্ এবং বো তৈরী করতে পারেন। তারে সবুজ ন্যাকড়া জড়িয়ে প্রথমে তিনটি পাতা (বাঁয়ের ছবির মতো) তৈরী ক'রে

নিন; তার পর বীচিগুলিতে রঙ মাখিয়ে ন্যাকড়া-জড়ানো ঐ তারের ত্রিপত্রে যদি সমঞ্জসভাবে বসাতে পারেন, তা'হলে চমৎকার বোকে কিম্বা বটন-হোল তৈরী হবে।

— —

বাহারে ট্রে

কাঠের সাধারণ ট্রে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া মনে করলে ভেনেস্তা বা এমনি-কোনো রকম পাতলা এবং মজবুত কাঠ কিনে (কাঠের মাপ হবে ॥× ১৬"× ১৬") ঘরে মিস্ত্রী ডাকিয়ে নিজের খুশী-মতো
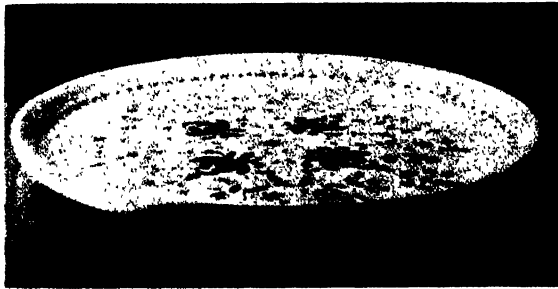
নক্সার ছাপ

সাইজের ট্রে তৈরী করিয়ে নিতে পারেন। মিস্ত্রী ডাকিয়ে ঘরে ট্রে তৈরী করালে সে-ট্রে পছন্দসই হবে।

ট্রে তৈরী হলে কাঠের গায়ে সাদা পেইন্ট-রঙ মাখাবেন। এ সাদা রঙ শুকিয়ে গেলে তার উপর আলুতোভাবে খুব মিহি শিরিষ-কাগজ ঘষতে হবে। ফলে জমি হবে মসৃণ এবং সমতল। তার বাজার থেকে এনামেল-পেণ্ট নে কাঠের গায়ে সে-পেণ্ট লাগান। র কোট লাগাবেন। এনামেল যা নবেন, ভালো দেখে কিনবেন। তার খুলবে চমৎকার। বড় বড় সরে সে-ট্রে বার করলে খাতির বেন, লজ্জা পাবেন না!

ট্রের উপর যদি আরো বাহার করতে চান, তা'হলে আঁকবার জন্য বাজারে যে অয়েল-কলার (রঙ্) ওয়া যায়, সেই রঙ আর ট্রান্সফার-কাগজে-আঁকা ক-রকম ফুল-পাতা বা পাখী-প্রজাপতির ডিজাইন

এনামেল-করা ট্রে

কিনে এনে ট্রের গায়ে তার ছাপ তুলে সেই ছাপ-মারা আদ্রার উপর তুলি দিয়ে রঙ্ ক'রে নিন, ট্রের বাহার এবং দাম তাতে বহু-গুণ বাড়বে।

কাঠের বারকোষেও এমনি ক'রে বাহার ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

—

কাটিমের জীব-জন্তু

সুতার খালি কাটিম—ছোট-বড় নানা সাইজের সংগ্রহ করুন। সেই সঙ্গে খানিকটা মোটা তার নিন। তারের

তারে ন্যাকড়া-জড়ানোর ভঙ্গী

গায়ে সুতা বা ছেঁড়া-পাড় জড়িয়ে পুরু ক'রে সেই পাড়-জড়ানো তার দিয়ে কাটিমগুলি বড়-ছোট-হিসাবে পর-পর গেঁথে নিন। যদি ঘোড়া তৈরী করতে চান, তা'হলে চারটি কাটিম ঘোড়ার পায়ের মতো খাড়াভাবে ঘোড়ার গায়ে

এঁটে নেবেন (নীচের ছবি দেখুন)। যদি কুমীর তৈরী করতে চান, তা'হলে কুমীরের পাগুলি নীচেকার ছবির ভঙ্গীতে এঁটে নেবেন। আঁটতে হবে কাঁটা পেরেক দিয়ে। একটু অভ্যাস হলে নানা ছাঁদের জীব-জন্তু ঐ কাটিম দিয়েই তৈরী করা শক্ত হবে না। ছবিতে যে-কুমীর দেখছেন, ওর মতো মুখ তৈরী করতে হলে ছুতোর-মিস্ত্রী ডেকে মুখ তৈরী ক'রে নিতে পারেন। নিজের হাতে ছোট করাত

ঘোড়া
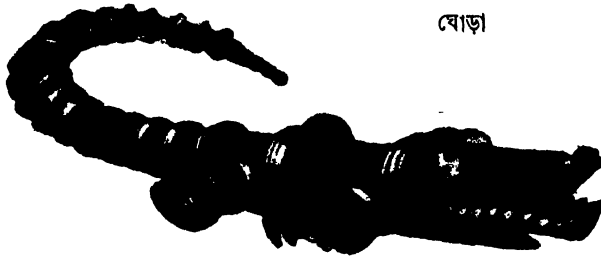
কুমীর

এবং ধারালো ছুরি দিয়ে ও-মুখ তৈরী করা খুব শক্ত হবে না! হাত পাকলে মূর্ত্তিগুলি সমঞ্জস হয়ে উঠবে। তার আগে যদি একটু ভ্যাড়া-বাঁকা মূর্ত্তি হয়, তাতে নিরাশ হবেন না। জীবজন্তুর চোখের জন্য পুঁতি, বীড, বীচি—যা হোক এঁটে নেবেন। চোখ আঁটবেন শিরিষের আঠা দিয়ে কিম্বা কাঁটা-পেরেক মেরে। মুখে বিকট বা হাস্যকর ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তুলতে হ'লে রঙ-তুলি বা কালি-কলম ধরবেন।

মৃণাল-ভুজ

গ্রীবা এবং বাহু দেখিলেই মেয়েদের দেহ-মনের স্বাস্থ্য কেমন, অনায়াসে বলিয়া দেওয়া যায়। যে-ভাবে মেয়েরা ঘাড় তোলেন, সে-ভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশ পায়। ঘাড় যদি কারো ঝুঁকিয়া থাকে, বুঝিতে হইবে, শ্রান্তিভারে দেহে-মনে দারুণ অবসাদ। ঘাড় যদি সিধা থাকে; তাহা হইলে জানিবেন, দেহ-মন সুস্থ। যাঁদের মাথা সর্ব্বদা হেলিয়া আছে, বুঝিতে হইবে আলস্য তাঁদের মজ্জাগত।

ঘাড়, কাঁধ এবং বাহুতেই দেহ-মনের স্বাস্থ্য সুষমার বিকাশ।

সুগোল গ্রীবা এবং মৃণালের মতো সুছাঁদে গড়া সুগোল বাহুতে নারীকে অনেকখানি সুশ্রী দেখায়। সুগঠিত দেহের প্রধান সহায় রম্ভোরু, মৃণাল-ভুজ এবং সরল সুগোল গ্রীবাদেশ।

পান-ভোজনে বা নিদ্রায় যাঁরা অমিতাচারী,—অর্থাৎ যখন-খুশী ভোজন করেন, বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকেন, তাঁদের বাহু সরল, মসৃণ, কোমল থাকে না, ঘাড়ও সর্ব্বদা ঝুঁকিয়া হেলিয়া থাকে। ঘাড় যদি এমনভাবে নিত্য ঝুঁকিয়া হেলিয়া থাকে, তাহা হইলে ঘাড়ের পিছনে মেদ-মাংস জমিয়া ঢিপির মতো হয়! সে-ঢিপিতে অতি-বড় রূপসীর সৌন্দর্য্যও ঢাকা পড়িয়া যায়!

ঘাড়-কাঁধ এবং বাহুকে সুছাঁদে রাখিতে চাহিলে আলস্য চলিবে না,—খেলাধূলা বা ব্যায়াম করিতে হইবে। সাঁতার কাটা বা দাঁড়-টানায় ঘাড়, কাঁধ ও বাহু সুশ্রী-ছাঁদে গড়িয়া ওঠে। কিন্তু বাঙালীর ঘরে মেয়েদের পক্ষে এ-দু'টি কাজ করা কঠিন। এ-কাজে কাহারো সুবিধা মিলিবে বলিয়া মনে হয় না! ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় ঘাড়, কাঁধ এবং বাহুর সুছাঁদ-শ্রীর জোরে গরীবের ঘরের বহু কিশোরী ধনীর ঘরে ঘরণী হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। শুধু তাই নয়! বাহু, কাঁধ এবং ঘাড়ের শ্রীসৌন্দর্য্যের জোরে রূপ-পিয়াসী বহু স্বামী বাহিরের প্রলোভন দমন করিয়া স্ত্রীর প্রেমে চিরদিন বিমুগ্ধ-বিভোর হইয়া আছেন!

খেলা-ধূলায় এবং ব্যায়ামে নারীর দেহের লাবণ্য ও সুষমা-শ্রী যেন উথলিয়া ওঠে! খেলাধূলা ও ব্যায়ামের বিধি মানিয়া চলিলে নারীর রূপযৌবন অনন্ত অক্ষয় থাকে।

ঘাড়ের ব্যায়ামে ঘাড়ের সৌন্দর্য্য এমন হয় যে, তাহার গুণে চল্লিশ বৎসর বয়সের নারীকেও তরুণী বলিয়া মনে হইবে! Neck exercises keep women looking youthful, তার কারণ, মেয়েদের মেরুদণ্ডের পুরোভাগে যে শিরা-কেন্দ্র (nerve-centres) আছে, সেগুলি

নিত্য-কাজে অবরুদ্ধ (congested) হইয়া পড়ে; ঘাড়ে যে-পেশী আছে, সে-পেশী কর্ম্মক্লান্ত হয়, দুর্ব্বল হয়।

এই দু'টি কারণে ঘাড়ের ব্যায়াম অত্যাবশ্যক। সে ব্যায়ামে শ্রান্তি-ভরে অবসাদ উপলব্ধি হইবে না। ক্লান্ত হইলে নিজের হাতে ঘাড় এবং কাঁধ 'ডলাই-মলাই' করিয়া দেখিবেন, অস্বাচ্ছন্দ্য ঘুচিয়া কতখানি আরাম পান!

গভীর-ভাবে নিশ্বাস-গ্রহণে শুধু যে ফুশ্‌ফুশের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তাহা নয়; দেহের ভঙ্গিমা বা postureও

১। পায়ে-পায়ে

২। যেন প্রতিপদের চাঁদ খুঁজি

সুছাঁদে গড়িয়া ওঠে। যিনি ঠিকভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন, ঘাড় তাঁহাকে সিধা রাখিতেই হইবে। তার ফলে ঘাড় এবং মাথা কোনো দিন ঝুঁকিয়া হেলিয়া পড়িবে না, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যাইবে না; কোলকুঁজা দশা ঘটিবে না।

আলস্যে এবং অবহেলায় মেয়েদের হাত বিশ্রী কদর্য্য হইয়া ওঠে। ব্যায়ামে সে-কদর্য্যতা ঘুচিয়া ঐ হাতই আবার 'মৃণাল-ভুজে' পরিণত হইবে; অর্থাৎ কাঠের মতো কঠিন এবং আঁকা-বাঁকা হাত বেশ সমঞ্জসভাবে ভরিয়া ভরাট হইবে, কোমল হইবে। মোটা হাতের মেদ ঝরিয়া তাহাও কণ্ঠমাল্যের মতো রমণীয় শ্রীতে বরণীয় হইয়া উঠিবে!

ঘাড়ের পিছনে যদি পিণ্ডের মতো মেদ-মাংস জমিয়া থাকে, চিবুক যদি ঝিঁকের মতো উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে এ-ব্যায়ামে ঘাড়ের পিণ্ড খশিবে, চিবুক কমনীয় হইবে।

এ জন্য আজ যে ব্যায়াম-বিধির কথা বলিতেছি, সে ব্যায়াম প্রত্যহ দশ হইতে পঁচিশ বার করিয়া করিতে হইবে। বাহুর ব্যায়ামে 'ঘাড়ে-গর্দ্দানা'-ভাব কাটিবে, এ-কথা বলা বাহুল্য।

ব্যায়ামের উপর যখনি সুবিধা পাইবেন, ঘাড়ের পিছন-দিক এবং দুই বাহু আগাগোড়া মর্দ্দনে massage করিবেন। এক মাসে যে-ফল পাইবেন, দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন! যাঁদের বয়স বেশী হইয়াছে, তাঁরাও এ ব্যায়াম-বিধি পালন করুন, কোষ্ঠীর আসল বয়স পিছাইয়া না গেলেও দেহে যৌবনের শ্রী-ছাঁদ ফিরিয়া আসিবেই!

এবার ব্যায়ামের কথা বলি।

'ডবল-চিন্' বা 'ডবল চিবুক' এবং ঘাড়ের পিছনের মেদ-পিণ্ড যদি সারাইতে চান, তাহা হইলে ১নং ছবির ভঙ্গীতে পায়ে-পায়ে জুড়িয়া প্রথমে সিধাভাবে দাঁড়ান; তার পর দুই হাত আলগোছে-ভাবে রাখুন। কোমরের দু'দিকে হাত রাখিবেন; রাখিয়া সামনের দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া গলার নীচে বুকের উপরে—যত নীচে পারেন—চিবুক রক্ষা করুন। পরক্ষণে ২নং ছবির

ভঙ্গীতে—আকাশে যেন প্রতিপদের চাঁদ খুঁজিতেছি,—এমনি ভাবে উপর-দিকে মাথা তুলিয়া চান্। মাথা এখন পিছন-দিকে হেলাইয়া দিন। যতখানি পারেন, পিছনে মাথা হেলাইবেন। এইভাবে এক-বার সামনের দিকে মাথা হেলাইয়া বুকে চিবুক সংযোগ করিতে এবং পরক্ষণে চিবুক-সমেত মাথা তুলিয়া পিছন-দিকে মাথা হেলাইতে হইবে। এ ব্যায়াম নিত্য-দিন গণিয়া দশ হইতে পঁচিশ বার করিবেন।

বাহু এবং কাঁধের শ্রী-ছাঁদ-সম্পাদন, ঘাড় এবং গলার টোল (hollowness) সারাইবার জন্য দ্বারের পাশে সিধা হইয়া দাঁড়ান। অবলম্বন-স্বরূপ দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দ্বার হইতে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইবেন। দাঁড়াইয়া দু'হাত বাড়াইয়া দু'হাতে দ্বার ধরুন (৩নং ছবির ভঙ্গীতে)। ধরিবার পর মাথা হইতে প্রায় বুক পর্য্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকুন (৫নং ছবির ভঙ্গীতে)। পিঠের মেরুদণ্ড যেন সিধা থাকে, না বাঁকে, এমন-ভাবে ঝুঁকিতে হইবে; এবং দু'হাত মুখের কাছে ঠেকিবে। তার পর সবলে নিজেকে চাড়া দিয়া আবার সিধা খাড়া-ভাবে দাঁড়ান। এই ভাবে একবার দ্বারে ঝোঁক দিয়া পরক্ষণে নিজেকে সবলে খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। যতক্ষণ না ক্লান্ত হন, ততক্ষণ এ-ব্যায়াম করিবেন।

৩। দ্বার হইতে একটু দূরে

৪। সিধা-খাড়া

৫। সাম্নে ঝুঁকুন

তার পর ৫নং ব্যায়াম। মেঝের উপর সিধা-খাড়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিতভাবে সামনে ঘুরান। ৫নং ছবির ভঙ্গীতে দু'হাত যেন বরাবর প্রসারিত থাকে। ঘুরাইবার সময় ঘূরণ-বেগ প্রথমে হইবে ধীরে-ধীরে; তার পর এ বেগ যত দূর পারেন দ্রুত ও ক্ষিপ্র করা চাই। আট-দশ মিনিট এ ব্যায়াম করা চাই।

তার পর ৬নং ব্যায়াম। ৬নং ছবির ভঙ্গীতে দুই কাঁধ একটু সঙ্কুচিত করিয়া দাঁড়ান। অর্থাৎ দু'কাঁধকে যতখানি-সম্ভব সামনের দিকে সঙ্কুচিত রাখিতে হইবে; তার পর বুক চিতাইয়া দু'কাঁধ পিছন-দিকে সঙ্কুচিত রাখিবেন। এইভাবে একবার সামনের দিকে, পরক্ষণে পিছন-দিকে দু'কাঁধ সঙ্কুচিত করিতে হইবে ৬নং ছবির ভঙ্গীতে। এ ব্যায়াম বেশ জোরে-জোরে করিতে হইবে। এ-ব্যায়ামও আট-দশ মিনিট-কাল করা চাই।

৬। সামনের দিকে সঙ্কুচিত

অঙ্গের বাস

কথাটা হয় তো রূঢ় বা বর্ব্বরের মতো শুনাইবে। কিন্তু বড় সত্য কথা—তাহা অস্বীকার করা চলে না।

মানুষের অঙ্গে বাস আছে। কাহারো অঙ্গ-বাস সহা যায়, কাহারো যায় না। এমন অবস্থা ঘটিলে সমাজে বড় লজ্জা পাইতে হয়!

গায়ে সুরভি-সাবান মাখিলে এ-বাস যায় না, জামা-কাপড়ে সেণ্ট ঢালিলেও সব সময়ে সুফল মিলে না! অভিশাপের মতো এ দুর্গন্ধ দেহ-মনকে সর্ব্বক্ষণ পীড়িত জর্জ্জরিত করে! এ দুর্গন্ধ হইতে মুক্তিলাভের উপায় আছে।

বিশেষজ্ঞেরা এই (bo ly-odour) গায়ের গন্ধ মোচনের সম্বন্ধে বলেন, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে দেহে ক্লেদ জমিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়। এ গন্ধ নানা রকমের। এ দুর্গন্ধ দূর করিতে হইলে খাদ্য-সম্বন্ধে খুব বাছবিচার করিয়া চলিতে হইবে। এজন্য বেশী করিয়া ফল, শাক-পাতা খাইতে হইবে। দুধ এবং প্রচুর জল পান করা চাই। মাছ-মাংস খাইবেন, তবে তার মাত্রা যেন অতিরিক্ত না হয়; এবং গরম-মশলা যত দূর সম্ভব বর্জ্জন করিবেন। প্রত্যহ বাঁধা রুটীনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন করা চাই। গুরুপাক খাদ্য কদাচ গ্রহণ করিবেন না। রাত্রি-জাগরণ এবং অতি-ভোজন সর্ব্বদা বিষবৎ বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রত্যহ শয়ন করিবার পূর্ব্বক্ষণে এবং নিদ্রাভঙ্গ-মাত্র এক-গ্লাশ জল পান করিবেন। কোষ্ঠ যেন নিত্য পরিষ্কার হয়—এজন্য সপ্তাহে এক দিন করিয়া জোলাপ-গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন।

এই সঙ্গে চাই প্রত্যহ দু'বেলা সর্ব্বাঙ্গে তেল মাখিয়া ভালো করিয়া স্নান। গামছা দিয়া সবলে গা-রগড়াইয়া গায়ের তেল তুলিয়া ফেলুন; তার পর ভালো-সাবান মাখুন। স্নানের পর সুগন্ধি কোনো পাউডার ব্যবহার করিবেন। সপ্তাহে একবার মাথা শাম্পু করিবেন। ব্যাশম দিয়া শাম্পু প্রশস্ত। ব্যবহারের পর প্রত্যহ জামা-কাপড় বাতাসে বহুক্ষণ মেলিয়া দিবেন; ছাড়া জামা-কাপড় কদাচ রৌদ্রে দিবেন না। সেমিজ-বডিস নিত্য ব্যবহারের পর সাবান-জলে কাচিয়া লইতে হইবে; এবং কদাচ আলস্যে কাল কাটাইবেন না। কাজ করা চাই—যে-কাজে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম হয়, এমন কাজ!

সুগন্ধি টয়লেটে গায়ের দুর্গন্ধ কখনো ঘোচে না; সুগন্ধির সঙ্গে অস্বাস্থ্য-জনিত গায়ের দুর্গন্ধ মিশিয়া লজ্জার মাত্রা আরো বাড়াইয়া তোলে।

তার পর মুখের দুর্গন্ধ। ইহাও দারুণ অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ! কথা কহিব, আর আমার মুখের দুর্গন্ধে যত লোক নাকে কাপড় গুঁজিয়া আমাকে মনে মনে ঘৃণা করিবে—তার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর নাই! কোষ্ঠবদ্ধতায় মুখে দুর্গন্ধ হয়। এ জন্য সে-দিকে সচেতন হইবেন। যখনি কিছু খাইবেন, খাওয়ার পর ভালো রকম কুলি করিয়া মুখ ধুইবেন। সকালে উঠিয়া এবং রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে মাজন ও টুথ-ব্রাশ দিয়া দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইবেন।

নিষ্ঠা-ভরে এ-বিধিগুলি মানিয়া চলিলে সর্ব্বাঙ্গের দুর্গন্ধ ঘুচিবে – লোকালয়ে আর লজ্জা পাইতে হইবে না!

চির-উপেক্ষিতা

১

দুই যমজ বোনের একটির নাম আলো, অপরটির নাম কালো। আলো মিনিট পাঁচ-ছয়ের বড়। কিন্তু আশ্চর্য্য ইহাই, আলো যেমন নিরুপমা সুন্দরী, কালো তেমনই নিরুপমা কুৎসিত। যে দেখিল, সেই বলিল, এ যেন চাঁদের কলঙ্ক। মা-বাপ নাম দিলেন আলো ও কালো, পোষাকী নাম হইল উজ্জ্বলা ও মলিনা।

সামান্য জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেই কালো বুঝিল, সে সংসারের আবর্জ্জনা, আর আলো পরিবারের অলঙ্কার। আলো একটু অভিমান করিলে মা-বাপ চোখে অন্ধকার দেখেন, তাহার অভিমান ভাঙ্গাইবার জন্য তাঁহাদের কি ব্যাকুলতা! আর কালোর অভিমান করিবারও সাহস ছিল না। যদি বা কখন ভয়ে ভয়ে কোন কাজে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে, মা পিঠে গুমাগুম কিল মারিয়া বলিতেন,—"মুখে আগুন, মুখে আগুন, মরণ নেই তোর? পোড়ারমুখীর যেমন রূপ, তেমনি গুণ! মর তুই, আমার হাড় জুড়োক।"

অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না হইলেও মা-বাপ যথাসাধ্য অর্থব্যয় করিয়া সুন্দরী আলোর জন্য ভাল জামাকাপড় আনিতেন, সেজন্য কালোর ভাগ্যে ও-সব প্রায় কিছুই জুটিত না। দেখিয়া শুনিয়া চাহিবার সাহসও কালোর ছিল না, দুর হইতে চাহিয়া-দেখিয়াই সে তার কচি মনকে শান্ত করিত। খেলনা বেচিতে আসিয়া ফিরিওলা যখন খেলনাগুলি খুলিয়া দেখাইত, আলো ইচ্ছামত খেলনা, পুতুল বুকে তুলিয়া লইত, আর কালো কাতর দৃষ্টিতে সে-দিকে চাহিয়া থাকিত। যদি বা কোন দিন বালিকা-সুলভ লোভে পড়িয়া বলিয়াছে, "মা, আমায় একটা পুতুল কিনে দেবে?" মা তৎক্ষণাৎ তাহার ঝুঁটি ধরিয়া ঠাস্-ঠাস্ করিয়া চড় কসাইয়া দিয়া বলিতেন, "রাক্কুসী! আলোর হিংসেয় জ্বলে মরছে! ও নিয়েছে, অমনি তোরও চাই, না?"—কোন দিন হয় ত বা কি ভাবিয়া তিনি সস্তা খেলনা একটা কিনিয়াও দিতেন।

কালো মেয়েটার কুৎসিত দেহে যে 'মন' বলিয়া একটা পদার্থ আছে, এবং সেটাও যে আলোর সমানই আকাঙ্ক্ষা করিতে পারে, এ-কথা বাপ-মা দু'জনেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কালোর কুরূপের ভারে তাহার হৃদয় চাপা পড়িয়াছিল। আলো হয় ত কালোকে ভালবাসিতে পারিত, কিন্তু অল্প বয়স হইতেই তাহার প্রতি মা-বাপের ব্যবহার দেখিয়া সে-ও আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও কালোকে হীন ভাবিতে শিখিয়াছিল। বোন বলিয়া সে তাহাকে চিনে নাই, চিনিয়াছিল সেবিকা বলিয়া। তাই কালো তাহার খেলনায় হাত দিলে সে চীৎকার করিয়া মা'র নিকট নালিশ করিত। মা গর্জ্জন করিতেন; আর আলো বর্ষণ করিত—দুমদাম কিল-চড়। কিন্তু উল্টাইয়া চড়-চাপড় মারবার সাহস কালোর ছিল না, মাকে বলিয়াও লাভ ছিল না; কারণ, সে জানিত, তাহাতে 'বোঝার উপর শাকের আটি' চাপিবে মাত্র। কাঁদিবার পর্য্যন্ত তার অধিকার ছিল না। মা বলিতেন, "রূপের ধুচুনীর অভিমান ছাখো, শত্তুর মরেও না গা!"

এমনই করিয়া আদর ও অনাদরের ভিতর দিয়া তাহারা আট বছরে পড়িলে মা বলিলেন, "আলোকে এবার স্কুলে দিতে হবে।"

কালো ভয়ে ভয়ে বলিল, "আমিও যাব মা!"

পিতা বলিলেন, "ঐ রে! আলো স্কুলে যাবে কি না অমনি কালোরও সেই আবদার!"—মা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "আবদার কল্লেই ত আর হয় না। দু'দুটো মেয়েকে পড়াবার পয়সা কোথায়? আলোর জন্যেই কত খরচ বেড়ে যাবে দেখো। আর কেলো গেলে

আমার চলবেই বা কি ক'রে? একা কত খাটবো?" —কাজেই কালোর যাওয়া হইল না, আলো একাই স্কুলে গেল।

আলো স্কুলে গেলে কালোর কাজ অনেক বাড়িয়া গেল। স্কুল হইতে ফিরিয়া জুতা-মোজা জামা-বই ইত্যাদি যেখানে-সেখানে ফেলিয়া দিয়া আলো ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল। কালো প্রত্যেকটি গুছাইয়া রাখিল; না রাখিলে তাহার পিঠে চামড়া থাকিবে না। কাজ-কর্ম্ম সারা হইয়া গেলে কালো আলোর কাছে গিয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, ইস্কুলে আজ কি হ'ল, বল্ না ভাই!"

আলো গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বলিল, "ওঃ, দিদিমণিরা ত যেন আমায় লুফে নিলে! একে দেখায়, ওকে দেখায়, বলে, এমন সুন্দর মেয়ে আর একটিও নেই। সত্যি, কালো, ভাগ্যে মা তোকে স্কুলে দেননি,—তা'হলে লজ্জায় আমি মুখ দেখাতে পারতুম না। তুই যা কুৎসিত, তুই আমার বোন এ-কথা শুনলে তারা হয় ত আমায় শুদ্ধ ঘেন্না করত!"

২

এমনই করিয়া বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া গেল—দু'জনেই যৌবনে পদার্পণ করিল।

আলোর বিনা চেষ্টাতেই সুপাত্র মিলিয়া গেল। কে এক জমীদার-পুত্র স্কুলের প্রাইজের দিন নিমন্ত্রিত হইয়া বালিকাদের অভিনয় দেখা-কালে আলোকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া স্বয়ংই আলোর পাণিপ্রার্থনা করিয়াছেন। বাবা তার মাকে বলিলেন, "রূপের কদর দেখলে ত! অত বড় জমীদার, দোরে ওদের তিনটে হাতী বাঁধা, সে উপযাজক হ'য়ে আমার মত গরীবের মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে!" কালো উঠান ঝাঁট দিতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আর ওকে পার করতে শেষে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে! অদৃষ্ট! এক-পেটে এমন দু'রকম দু'টো জন্মাল কেন?"

স্বামীর কথা শেষ না হইতেই গৃহিণী বলিলেন, "পোড়া-কপাল! না ছিরি, না ছাঁদ! কার আর ঐ রূপের ডালিকে পছন্দ হবে! আমাদের সন্তান, আমাদেরই গায়ে জ্বর আসে ওকে দেখ্‌লে,—তা পরের চোখে কি আর ভাল লাগতে পারে?"

পিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমাদের বরাত! এত লোকের ছেলে-মেয়ে দেখি, কালীর মত কুচ্ছিত কারুর চেহারা দেখিনি।"

কালোর রূপ যে তাহার ইচ্ছায় হয় নাই, এ-কথাটাও বোধ হয় তাহার মনে হইত না; বরং কাহারও কোন কৃত দোষের আলোচনা হইতে শুনিয়া সেই ব্যক্তি যেমন সঙ্কুচিত হয়, কালোও তেমনই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত।

ক্রমে আলোর বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। কালোর কাজের আর অন্ত নাই, দিবানিশি আলোকে সর-ময়দা, বেসন, সাবান মাখাইতে মাখাইতে তাহার হাত ব্যথা হইয়া গেল। তাহার সেবায় খুসী হইয়া আলো এক দিন বলিয়াছিল, "আমার সঙ্গে ত মা একটা ঝি দেবেন, তুই না হয় চল কালো!" উত্তরে কালো শুধু করুণ হাসি হাসিয়াছিল। জীবনে সে একটি কথা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিয়াছিল,—সে শুধু পৃথিবীতে আসিয়াছে সকলের পরিচর্য্যা করিতে ও লাঞ্ছনা সহিতে। কাহারও কাছে তাহার দাবী করিবার যে কিছু নাই, তাহা সে শৈশব হইতেই বুঝিয়াছিল। তাই আলো যখন পুনরায় বলিল, "কি রে যাবি?" তখন ইহাকে পরিহাস বলিয়া কল্পনা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাবা-মাকে জিজ্ঞেসা করিস, —যেতে বলেন, যাব।"

আলো উচ্চ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তুই কি ক্ষেপেছিস? তোকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কি আমি মুখ দেখাতে পারবো? অমন যে বুড়ো ননীবাবু, কাল বাবা ওর হাতে-পায়ে ধরেছিলেন—তোকে বিয়ে করবার জন্তে, তা রাজী হ'ল না ত সে! তোর আর বর জুটবে না বোধ হয়।" আলো খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কালো কিছু বলিল না, শুধু তাহার বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল। মাথা হেঁট করিয়া সে আলোর পায়ে সর-ময়দা মাখাইতে লাগিল।

বিবাহের পূর্ব্বদিনে মা কালোকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুই জামাইয়ের সামনে খবর্দ্দার বেরুসনি।"

কালো সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "একবারও দেখব না মা?"

"না, দেখে কাজ নেই আর! তোর ঐ পোড়া মুখখানা লোকের সামনে না বের করলেই নয়?"

কালো মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আলোর বর একবারও দেখব না?"

"দেখতে হবে না। তুমি পুজোর ঘরে দোর দিয়ে থাকবে। বড় না রূপসী তুমি; আরও দেশে দেশে ঢাক পিটে যাক! কুটুমবাড়ীর লোকজনের সামনে খবর্দার বেরিও না—ব'লে রাখলুম।"

কালো ঘাড় হেলাইয়া জানাইল, সে মায়ের আদেশ পালন করিবে।

গাত্রহরিদ্রার তত্ত্বে আলো অনেক জিনিস পাইয়াছিল, মনটা সেজন্য তাহার তখন অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে; সে নিজের পুরাতন দুই-চারিটা জামা-কাপড় বাছিয়া কালোকে উপহার দিয়া বলিল, "আমার অনেক জিনিষ হয়েছে, এগুলো তুই পরিস কালী—"

এতটুকু স্নেহও কালো জীবনে কোন দিন কাহারও নিকট হইতে পায় নাই; তাহার দু'টি চোখ সজল হইয়া আসিল, চাপা-গলায় আলোকে বলিল, "আবার তুমি কবে আসবে ভাই?"

সেই মাত্র কুটুম্ব-বাড়ীর লোকজন বিদায় হইয়াছে, আলো মায়ের সহিত তাহাদের আলোচনা শুনিয়াছিল; বলিল, "বেশি আসতে পাব না, ওরা খুব বড়লোক কি না, বউকে বাপের বাড়ী পাঠালে ওদের অপমান হয়।"

একটু থামিয়া কালো প্রশ্ন করিল, "তত্ত্বে তুমি কি পেলে ভাই?"

"ওঃ! ঢের জিনিষ! কাপড়, জামা, সুট-মিলিয়ে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটা; কত খেলনা, কত গহনা, হীরের যা একটা কণ্ঠি দিয়েছে যদি দেখিস! পিসিমা তাই মাকে ব'লছিলেন, কালোকে না দেখতে দিয়ে ভালই করেছ বউ, দেখলেই তার হিংসের নিঃশ্বেস প'ড়ত।"

প্রতিবাদ করিবার মত সাহস কালোর কোন দিন হয় নাই, সে নীরবে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল,—মা বসুমতী তাহারই মত সর্ব্বংসহা বলিয়া কি?

৩

আলো শ্বশুরবাড়ী গেল। কালোর অর্দ্ধেক কাজ কমিয়া গেল, তাহার চারিদিক্ ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। সে প্রতীক্ষায় রহিল—কবে আলো আসিবে। এক দিন মায়ের নিকট শুনিল, আলো আর আসিবে না; ধনী-গৃহের বধূ দরিদ্র পিত্রালয়ে আসিতে পারে না। কালো শুনিয়া বেদনার নিঃশ্বাস ফেলিল। দ্বিতীয় বৎসর সংবাদ আসিল, আলোর খোকা হইয়াছে। কিন্তু সে আসিতে না পারায় বাড়ীতে একটা ক্ষোভের ঢেউ বহিয়া গেল। দিন কাটিতে লাগিল। চতুর্থ বৎসরে সংবাদ আসিল, আলোর আর একটি খোকা হইয়াছে। এবারেও আলো আসিতে পাইল না। ইহারই পর-বৎসর সংবাদ আসিল, আলো অসুস্থ। পিতা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া গেলেন। আশ্চর্য্য! যাহারা সুস্থ বধূকে এক দিনের জন্য পিত্রালয়ে পাঠায় নাই, তাহারা পীড়িতা বধূকে অবলীলাক্রমে বিদায় করিয়া দিল। আলোর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বের লাবণ্যের অর্দ্ধেকও অবশিষ্ট ছিল না; মুখখানিও ম্লান, বিমর্ষ। আলো মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া জানাইল, সে স্বামিপ্রেম হইতে ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইতেছে। তাহার পিস-শাশুড়ীর বিধবা পুত্রবধূ তাহার শ্বশুরবাড়ী আশ্রয় পাইয়াছে। সেই যুবতী বিধবাই উপলক্ষ। মা শুনিয়া ক্ষোভে-দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। আলো বলিল, "তুমি চুপ করো মা, কালো না টের পায়। ও চিরদিন আমার হিংসে করে, জানতে পারলে ও বড্ডই খুসী হবে।"—মা বুঝিলেন, কথাটা মিথ্যা নহে, তিনি নীরবে চক্ষু মুছিলেন।

কিন্তু এত সতর্কতা বৃথা হইল, কালো আলোর জন্য দুধ আনিতেছিল, বাহির হইতে সকল কথা শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আলোর জন্য সমবেদনায় তাহার চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল। চির-আদরিণী সোহাগী আলো এ আঘাত সহিতে না পারিয়াই যে পরলোকের পথে পা বাড়াইয়াছে, তাহা কালো সহজেই বুঝিতে পারিল। সে চোখ মুছিয়া দুধ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে আলো তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, কালোটা যে মস্ত ধিঙ্গী হ'য়ে উঠল, এক সঙ্গেই ত জন্মেছি, কিন্তু আমাকে ওর চেয়ে কত ছোট দেখায়!" কথাটা মিথ্যা নহে, কালোর অটুট স্বাস্থ্যের পাশে রোগশীর্ণা আলোকে ছোটই দেখাইতেছিল। আলো তাহার আপাদ-মস্তক বার-কয়েক চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, সত্যি কি ওর বর জন্মায়নি মা? কানা-খোঁড়ারও ত বিয়ে হয়, ও ত তা নয়, তবু ওর বর মিললো না! তোমরা বোধ হয় ওর

জন্যে খুব ভাল ঘর-বর খুঁজছ। তা কিন্তু ওর কপালে নেই মা, তা বলে দিচ্ছি।"

আলোর দুর্ভাগ্য শুনিয়া মায়ের মনটা জ্বালা করিতেছিল, কালোর প্রসঙ্গ শুনিয়া তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ, রাজপুত্তর খুঁজছি; পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে কুঁচবরণ কন্যেকে নিয়ে যাবে।"

আলো হাসিয়া উঠিল, বলিল, "কি রে প'ড়ে মরবি না ত? তা জুটছে না কেন তাই ত জিজ্ঞেসা করছি। কি রকম খুঁজছ?"

মা বলিলেন,"দোজবরে, তেজবরে, বুড়ো-হাবড়া সবই ত দেখলুম, কেউ ত রাজী হয় না। আমার যা অপ্সরী মেয়ে!"

আলো হাসিয়া বলিল, "তা যা বলেছ, একটু চেহারা ফিরল না; কথায় বলে, যৌবনে কুকুরীও রূপবতী, কিন্তু কালোর তাও যে হ'ল না!"

মা ক্রুদ্ধ-নেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "আমার বুকে ভাতের হাঁড়ি ভাঙবেন ব'লে বসে আছেন। মুখে আগুন!"

তাহার পর আলো ভুগিতে লাগিল। দরিদ্র পিতা-মাতা সাধ্যমত চিকিৎসা করাইতে লাগিল, বড়লোক জামাতা বিশেষ তত্ত্ব লইল না; তাহার এই অবহেলায় রোগশয্যায় আলো অধিক শুকাইতে লাগিল। শেষে এক দিন অনাদরের বেদনা বুকে লইয়া আলো পরলোকে যাত্রা করিল।

৪

আলোর মৃত্যুর মাস-তিনেক পরে কালো শুনিতে পাইল, আলোর স্বামী অতুলের সহিত না কি তাহার বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে! কালো কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। আলোকে পাইয়াও যে রূপলুব্ধ ধনী-সন্তান তৃপ্ত হইতে পারে নাই, কালোকে সে গ্রহণ করিবে? অসম্ভব! কিন্তু অসম্ভবই শেষে সম্ভব হইল। কালো ভাসা-ভাসা ভাবে যেটুকু শুনিল, তাহাতে বুঝিল, তাহার বোনপো দু'টিকে মানুষ করিবার জন্যই অতুল তাহাকে বিবাহ করিতেছে। অতুলের পুনরায় বিবাহের কোন প্রয়োজন বা আগ্রহও ছিল না। কনে-দেখা প্রভৃতি প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলিও বাদ পড়িল। অবশেষে বিনাড়ম্বরে এক দিন বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

শ্বশুরবাড়ী যাত্রার প্রাক্কালে মা জীবনে প্রথমবার তাহাকে বুকে লইয়া বলিলেন,"আলোর ছেলেদু'টো তোর হাতেই সঁপে দিলুম মা, ওদের জন্যেই তোকে ও-বাড়ীতে দেওয়া; ওদের যত্ন-আত্তি করিস্ বাছা! যে ডাইনী এসে অতুলের ঘাড়ে চেপেছে, ওদের বাঁচতে দিলে হয়।"

কালো গুম হইয়া বসিয়া রহিল; মায়ের কথাগুলি যেন তাহার বুকে সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বিঁধিতেছিল। মা-বাপ তাহার কল্যাণ চিন্তা করিলেন না; অতুলকে ডাকিনী মুঠায় পুরিয়াছে, ইহা জানিয়াও শুধু আলোর সন্তানদু'টির মঙ্গলকামনায় তাহাকে তাদের স্বার্থের হাড়ি-কাঠে বলি দেওয়া হইল! ক্ষোভে বেদনায় তাহার বুকের ভিতর টন-টন করিতে লাগিল। মায়ের এই উপদেশের উত্তরে সে কিছুই বলিল না।

কালো শ্বশুরবাড়ী পৌঁছিলে যথারীতি বরণের পর সে যখন ঘরে আসিয়া বসিল, তখন দুয়ারের নিকট হইতে কে বলিয়া উঠিল, "ও ঠাকুরপো, এ যে দেখছি ঘোর অমাবস্যা!"—এই রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য শুনিয়া উপস্থিত সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিল। কালো অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে চোখ তুলিয়া সেই প্রগল্‌ভা মহিলাটির দিকে চাহিল। তাঁহার গায়ের রং বেশ ফর্সা, মুখশ্রীর অভাব, চোখে সোণার ফ্রেমের চশমা, কুঞ্চিত কেশের স্তবকে বাঁকা-সীথি, সীমন্তে সিন্দুর-রেখা নাই, হাতে প্লেন বালা, গলায় সরু হার, কালপেড়ে গরদ হাল ফ্যাসানে ঘুরাইয়া পরা।—কালো অনুমান করিল, ইনিই হয় ত তিনি!

মহিলার ঠাকুরপো হাসিয়া বলিলেন, "কবিতার ভাষা-ছাড়া তুমি কথাই বলতে পার না মালতী! কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য ব্য'পার এই যে, যে চলে গেছে তারই যমজ বোন ইনি! নামই শোন না—আলো আর কালো—পোষাকী নাম উজ্জ্বলা আর মলিনা। আচ্ছা, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর বিশ্বরূপ দর্শন করতে হবে না, আমার সঙ্গে এসো।"—তাহারা উঠিয়া গেল।

পথে এক দিন কাটিয়া গিয়াছিল, সেই দিনই ফুলশয্যা। ফুলশয্যা শেষ হইবার পর কালো যখন একান্ত কুণ্ঠিতভাবে খাটের এক পাশে শুইয়া ছিল, তখন অতুল বলিল, "আর এখানে কেন তুমি? উঠে স'রে পড়ো গো! তোমাকে পাশে নিয়ে রাতটুকু কাটিয়ে-দিতে পারি, এত বড় দুঃসাহস আমার নেই বাপু! ভেতো বাঙ্গালীর-

প্রাণে অত সাহস জন্মায় না। তোমায় ছেলেদের জন্যে আনা হয়েছে, যাও তাদের কাছে। ঐ পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকো-গে।”

এ-সব কথা কালোর অজ্ঞাত নয়, কিন্তু যে ভাবে অতুল তাহাকে তাড়াইতে চাহিল, এতখানি কঠোর ব্যবহার মিলনের প্রথম রাত্রে সে প্রত্যাশা করে নাই। তাই সে বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে তাহার নবীন ভাগ্যবিধাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অতুল একটু থামিয়া বলিল, “দেখ, অযথা অবাধ্য হওয়ার চেষ্টা করো না। যা বলছি, এক-কথায় শোন। আমার বিয়ে করবার কোনই দরকার ছিল না, তোমার বাপ-মা'ই জোর ক'রে তোমায় গছিয়ে দিয়েছেন। কাজেই রাগ যদি করতে হয়, তাঁদের একখানা চিঠি লিখে রাগ প্রকাশ কো'র, আমার কাছে ও-সব আব্দার খাটবে না। আজকের দিনটায় আর কতকগুলো অপ্রিয় কথা শুনবার লোভ কো'র না।—যাও এখুনি।”—সে দ্বারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল।

অন্য মেয়ে হইলে হয় ত অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিত বা রাগ করিয়া দু'কথা শুনাইয়া দিত, অন্ততঃ একবার দুঃখও করিত। কিন্তু জন্মাবধি কালোর অস্থি-মজ্জায় সহিত অবহেলা, উপেক্ষা, অপমান মিশিয়া গিয়াছিল, তাই সে কোন কথাই বলিল না, নিঃশব্দে ফুলশয্যার খাট হইতে নামিয়া, গায়ের ফুলের গহনাগুলি লঘুহস্তে খুলিয়া-ফেলিয়া একে একে খাটের বাজুতে ঝুলাইয়া রাখিল। তাহার পর এক মুহূর্ত্ত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মুখীন পাষাণ-দেবতার পায়ে নিঃশব্দে মাথা ঠেকাইল।

ইহা তাহার প্রেম নয়, হিন্দু-নারীর আজন্মের সংস্কার।

অতুল নির্ব্বাক্-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এই কুরূপা নারী কি সত্যই মানবীর মনোবৃত্তি-বঞ্চিত মাটীর পুতুল? এইমাত্র অতুল যাহা বলিয়াছে, তাহার পরও তাহার পায়ে মাথা ঠেকাইতে ইহার প্রবৃত্তি হইয়াছে? আশ্চর্য্য বটে!

কালো একটা চাপা-নিঃশ্বাস ফেলিয়া নতমুখে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। পাশের ঘরে আলোর শিশুদ্বয় শুইয়া ছিল, কালো তাহাদের পাশে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। শুইয়া শুইয়া তাহার মনে হইল, এই শিশু-দুইটিই তাহার এখানে আগমনের উপলক্ষ। তাহার পিতা-মাতা ইহার অপেক্ষা তাহার নারী-জীবনের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করেন নাই। স্বামীও দেখিলেন না। সকলেরই স্থির ধারণা হইয়াছিল, তাহার জীবনে অন্য কোন বাসনার স্থান থাকিতে পারে না। অতুল বিবাহের মন্ত্রের ভিতর দিয়া তাহাকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছে—দাসী-গিরিতে বাহাল করিবার জন্য, পত্নীব্রত গ্রহণের জন্য নহে; ইহাই তাহার বিবাহ! দাসত্বপ্রথা নিবারিত হইয়াছে, এ-কথা সে কিরূপে বিশ্বাস করিবে? তাহার জন্মদাতা বাপ-মা একবার মনেও করিলেন না, কদাকার হইলেও ইহারও মানুষের প্রাণ,—সুখ-দুঃখের অনুভূতি তাহাতেও আছে। যেখানে স্নেহের একটুখানি অভাবে, সামান্য উপেক্ষা-অনাদর সহ্য করিতে না পারিয়া আলো পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে, সেখানে আসিয়া শত অনাদরে, অযত্নে, অবহেলায় সে কি করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিবে? কুরূপা বলিয়া কেহ তাহাকে বিন্দুমাত্র দয়া করিল না, সহানুভূতি প্রকাশ করিল না।

কালোর মনে পড়িল, তাহার পিতার প্রতিবেশিনী খৃষ্টানের মেয়ে ডোরাকে। ডোরা ডোমের মেয়ে, খুবই কুৎসিত;—সে এক দিন কালোকে বলিয়াছিল, “মলিনা, আমাদের যা রূপ, এতে যে কোন ভদ্রলোক আমাদের পছন্দ ক'রে বিয়ে ক'রবে বা ভালবাসবে, এ-রকম আশা করা অন্যায়,—অথচ পেট আছে ত। আমি বলি, তুমিও আমার মত এই কাজ করো, বিয়ের মোহ কাটিয়ে স্বাবলম্বিনী হও। এতে আর কিছু না হোক, কারুর অবহেলা সইতে হয় না।”—সে কথা স্মরণ করিয়া কালোর কপোল বহিয়া দু'ফোঁটা জল বালিসে পড়িল; সে ক্ষিপ্রহস্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল। শৈশব হইতে অবিচার অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহার চোখের জল ফেলিবারও হুকুম ছিল না; সে স্বভাব তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

সহসা কালোর মনে হইল, তাহার স্বামীর শয়ন-কক্ষ হইতে কথার শব্দ আসিতেছে। সে জীবনে যে কাজ করে নাই তাহাই করিল; সে কৌতূহল দমন করিতে না না পারিয়া জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, খড়খড়ির ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল, তাহারই পরিত্যক্ত ফুলের ভূষণে মালতী সুসজ্জিতা, সে অতুলের কোলের উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে থাকিয়া হাসিমুখে গল্প করিতেছে।

কালো মিনিট-খানেক সেইখানেই বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যেমন নিঃশব্দে সেখানে উঠিয়া গিয়াছিল, তেমনই নিঃশব্দে শয্যায় ফিরিয়া আসিল। তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল; তাহার এ-স্বামীর ঘরের মানের ভাতের অপেক্ষা ডোরার কথিত 'প্রসূতি-শুশ্রূষাগারই' সহস্র গুণ অধিক প্রার্থনীয় বলিয়া তাহার মনে হইল।

৫

এমনই বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দ স্নেহ-সহানুভূতিবর্জ্জিত জীবন লইয়া কালোর বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিতে লাগিল। কালোর ধারণা হইয়াছিল, সে যখন মাসী, তখন অরুণ তরুণের সব-ভার সে ইচ্ছামত বহন করিতে পারিবে—তাহাতে কেহ বাধা দিবে না। দুই-চারি দিনের মধ্যেই তাহার সে ভ্রমও দূর হইল। ছেলেদের খাওয়া-পরা, বেড়াইতে যাওয়া, সমস্তই মালতীর হাতে। মালতী যখন তাহাকে যে আজ্ঞা করিবে, তখনই তাহা সে করিতে পারিবে, নিজের ইচ্ছা পরিচালনের কোন শক্তি তাহার নাই! মালতী খাবার দিলে ছেলেদের খাইতে দিবে, কাপড় বাহির করিয়া দিলে পরাইয়া দিবে, মালতী অনুমতি দিলে ছেলেদের বেড়াইতে পাঠাইবে,—এমনই তার কড়া শাসন। সংসারের কর্ত্রী মালতী; তার হাতে ভাঁড়ার, রান্না, সংসারের টাকা-পয়সা, দাস-দাসীর তত্ত্বাবধান—সবই ন্যস্ত, তা ছাড়া অতুলের নিজস্ব যা-কিছু কাজকর্ম্ম, সবই মালতীর জিম্মায়। মালতী কালোকে গ্রাহ্যও করিত না, তার চোখের উপরেই শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিত, একত্র বেড়াইতে যাইত, হাসি-তামাসা করিত। কালোর যে অতুলের উপর কোন দাবী আছে,—তাহা যেন মালতীর মনেই নাই! এইভাবে কালোর দিন কাটিতেছিল। মালতী মধ্যে মধ্যে তার নামে অতুলের কাছে এটা-ওটা লাগাইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিতেও ছাড়িত না।

এক দিন দ্বিপ্রহরে মালতী কালোকে ডাকিয়া পাঠাইলে সে সভয়ে তখনই সেখানে হাজির হইল। মালতী কবিতা লিখিতেছিল, বলিল, "এসেছ? আচ্ছা একটু বোস।"—কালো দ্বারের কাছে সসঙ্কোচে বসিল।

মালতীর লেখা শেষ হইলে সে আলমারী খুলিয়া কাপড় বাহির করিয়া কালোর কাছে ফেলিয়া-দিয়া বলিল, "নতুন কাপড়খানা সবে কাল পরেছি আর স্থতো সরে গেছে। দেখ দেখি, রিপু করতে পার কি না। ঐ থেকে স্থতো তুলে করবে। পছন্দ ক'রে কিনে একটা বেলা পরতে পেলুম না।"

কালো সেইখানে বসিয়াই ঢাকাই কাপড়খানির রিপু করিতে লাগিল। তরুণ কালোর সঙ্গেই এ-ঘরে আসিয়াছিল, স্থচের উপর আসিয়া-পড়ে দেখিয়া কালো কনুই দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিল, "আহা, স্থচ বিঁধে যাবে।" অরুণ তাহার কাঁধ ধরিয়া আলগা ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, কনুই গায়ে লাগিতে সে কাঁদিয়া উঠিল। চকিতের ভিতর ঘরের মধ্যে যেন একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিয়া গেল! মালতী তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া "রাক্ষুসী, ছেলেটাকে খেলি তো!" বলিয়া তরুণকে কোলে তুলিয়া লইয়া কালোকে সজোরে এক ধাক্কা দিল। ছেলে যত না কাঁদিল, মালতী তার অপেক্ষা পঞ্চাশগুণ করুণ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে শুষ্ক নেত্র মার্জ্জনা করিয়া বলিতে লাগিল, "ওমা, মনে ক'রেছিলুম, মাসী! লোকে কথায় বলে, 'মা মরুক মাসী জিউক।' এখন দেখছি, বাছাদের কপালে মাসী নয় রাক্ষুসী!"

অদূরে অতুলকে আসিতে দেখিয়া অধিক স্বর চড়াইয়া শুষ্ক নেত্র পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিল, "কচি ছেলে গায়ে হাত দিয়েছে, তা'তে কি সোনার অঙ্গ ক্ষয়ে গেছে? অমনি ক'রে ঠেলে দিলে? আহা, মরে যাই বাছা রে, কতই না-জানি লেগেছে!"

অতুল ভিতরে আসিয়া বলিল, "কি হ'ল?"

মালতী এবং তরুণ উভয়েই বলিল, কালো তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে মালতী ছিল, নহিলে হয় ত তাহাকে প্রাণেই মারিয়া ফেলিত। ও মাসী নয় রাক্ষুসী, ও সব পারে।"

অতুল ক্ষেপিয়া গেল; কর্কশ স্বরে বলিল, "আমার স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে কাল-পেঁচাকে ঘরে এনেছিলুম—শুধু ঐ দুটো ছেলের জন্যে। তা যদি ওদের মেরে-ধরে কেবল খাবার চেষ্টায় এখানে পোড়ে থাক—তা'হলে যাও,—এই দণ্ডে এখান থেকে বেরোও! তোমার আর মুখ দেখতে চাই-নে!"

কালো অভিভূতের মত বসিয়াছিল, এবার আস্তে

আস্তে উঠিয়া গেল। একবার এমন ইচ্ছাও হইল, ইহাদের অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লয়; স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে। কিন্তু তখনই মনে পড়িল, তার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এই ক্ষুদ্র গৃহ-কোণ। স্বামিগৃহের এই প্রাঙ্গণ-ছাড়া সর্ব্বত্রই তাহার কাছে শুধু অচেনাই নয়,—বড় অন্ধকার, বড় বিপজ্জনক!

৬

দশ বৎসর কাটিয়া গেল। অরুণ তরুণ এখন বড় হইয়াছে। কালোর মনে আশা হইয়াছিল, স্বামী তার আপন হইলেন না, এই ছেলেদু'টিই তাহাকে সুখী করিবে;—কিন্তু অচিরেই সে স্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিয়া গেল। ছেলেরা অতুল ও মালতীর নিকট প্রশ্রয় পাইয়া কালোর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিত; সামান্য ত্রুটি হইলে প্রহার পর্য্যন্ত না করিত এমন নয়। কালোর প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য ছিল না; শৈশবে যেমন আলোর প্রহার নিঃশব্দে সহ্য করিত, যৌবনে তাহার সন্তান-দু'টির প্রহারও তেমনই নিঃশব্দে সহ্য করিতে লাগিল।

পূর্ব্বদিন কি একটু মনোমত না হওয়ায় অরুণ তাহার মাসীকে যথেষ্ট প্রহার করিয়াছিল; তাহা দেখিয়া মালতী হাসিয়াছিল। অতুল বলিয়াছিল, "কুশিক্ষা দিলে তার ফল এমনই হয়।"

কালোর শরীরটা কয়-দিন হইতে ভাল নাই। সে খোলা জানালার কাছে বসিয়া অরুণ তরুণের জামায় বোতাম সেলাই করিতেছিল। তাহার সম্মুখে একখানা পোষ্টকার্ড, সেখানা সেই দিন মাত্র আসিয়াছে। মা পীড়িতা। পিতা তিন-চার বৎসর হইল স্বর্গে গিয়াছেন, কালো তখন যাইবার অনুমতি পায় নাই। আজ মায়ের অসুস্থতার সংবাদে তাহার মনটা ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে পত্রখানি লইয়া মালতীর কক্ষাভিমুখে চলিল।

মালতী ঘরের মেঝেয় টাকা ছড়াইয়া খাতায় হিসাব লিখিতেছিল। টাকা ছড়ান আছে দেখিয়া কালো ভিতরে ঢুকিতে সাহস করিল না—দুয়ারের বাহির হইতে ডাকিল, "দিদি!"

মালতী মুখ তুলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কি? কি হুকুম?"

কুণ্ঠিতস্বরে কালো বলিল, "মায়ের বড় অসুখ, আমার একটি বন্ধু তাঁর সেবা করছে। সে আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছে,—এই যে!" বলিয়া সে পত্রসহ হাতখানি প্রসারিত করিল।

মালতী খাতায় অঙ্কপাত করিতে করিতে বলিল, "তা, আমি কি করব?"

কালো একটু থামিয়া বলিল, "সে পরের চাকরী করে, মায়ের সেবা করাতে তার ক্ষতি হচ্ছে—আমাকে যেতে লিখেছে।"

মালতী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আহা, বক-বক ক'রে হিসেব গুলিয়ে দিলে; যেতে ইচ্ছে হয় যাও না, আমায় জ্বালাবার দরকার কি? আমি কি তোমার পা বেঁধে রেখেছি?"

কালো একটু থামিয়া বলিল, "তুমি যদি যেতে বলো দিদি, তবেই যাওয়া হয়। বন্দোবস্ত তুমি ক'রে দেবে না?"

মালতী রুষ্টমুখে বলিল, "আমি বাড়ীর কর্ত্তা না কি? আমার দ্বারা কিছু হবে না বাপু! পরিষ্কার ব'লে দিলুম তোমায়।"

কালো চিঠিখানা লইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিল; ভাবিল, একবার অতুলকে বলিয়া দেখিবে। সে স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। বৈকালে অতুল কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া কালো দালানেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। চিঠিখানা আগাইয়া-দিয়া সে বলিল, "মার বড় অসুখ।"

অতুল বলিল, "আমি কি করব? আমি ত ডাক্তার নই।"

কালো ভয়ে ভয়ে বলিল, "সেখানে সেবার লোক কেউ নেই। আমার এক বন্ধু তাঁর সেবা করছে, সে চাকরী করে। মায়ের কাছে থাকায় তার ক্ষতি হচ্ছে ব'লে আমায় যেতে লিখেছে।"—এক-নিঃশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া ভয়ে কালোর বুক টিপ-টিপ করিতে লাগিল।

অতুল বিরক্তিভরে বলিল, "তা এত ভূমিকার কি দরকার? যেতে ব'লে থাকে—যাও। কে তোমায় মাথার দিব্বি দিয়ে এখানে থাক্‌তে ব'লেছে? মালতীকে

না' ব'লে সোজা আমাকে বলার মানে ? 'ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া' আমি পছন্দ করিনে।"

কালো চলিয়া গেল। দু'ফোঁটা চোখের জল তাহার বাধা মানিল না। কালো একবার শেষ চেষ্টা করিল। অরুণ খেলা দেখিয়া ফিরিলে তাহার একখানা হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "বাবা অরু, তোর দিদিমার বড় অসুখ, তোর মা-মণিকে আর বাবাকে ব'লে আমার যাবার বন্দোবস্ত করে দে বাবা !"

কাল হইতে অরুর রাগ পড়ে নাই, সে মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "পোড়ারমুখী, তোর দরকারের বেলায় বাবা অরু,—না ? মরুক তোর মা,—ভুগে ভুগে পচে মরুক। আমার বাবাকে মা-মণিকে ব'লতে দায় পড়েছে ! অরু দুম-দুম করিয়া চলিয়া গেল।

কালো ম্লান-মুখে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, এক দিন ইহাদের কল্যাণ-চিন্তায় পিতা-মাতা তাহাকে যূপকাষ্ঠে সঁপিয়া দিতেও দ্বিধা করেন নাই,—আর আজ সেই কি না মাতামহীর পচিয়া-মরা প্রার্থনীয় মনে করিল !

৭

আরও চার বৎসর পরের কথা। অতুল মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাহার কার্ব্বঙ্কলে অস্ত্রোপচার হইয়াছে। ডাক্তাররা জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছেন। কালো সর্ব্বক্ষণই সেবা করে, রক্ত-পূঁজ মলমূত্র অহোরাত্রি সে পরিষ্কার করিতেছে, কিন্তু ঔষধ-পথ্যে হাত দিবার তাহার অধিকার নাই। মালতী নিষেধ করে। এক দিন মালতীর অনুপস্থিতিতে কালো স্বামীকে ঔষধ খাওয়াইতে গেলে অতুল চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "মালতী, আমায় আর এ লক্ষ্মীছাড়ী বাঁচতে দেবে না ! ওর হাত দিয়ে আমায় ওষুধ খাওয়াবে ?"

মালতী ব্যগ্রভাবে দৌড়াইয়া-আসিয়া তাহাকে শুধু মারিতেই বাকি রাখিল। সে-দিন সকাল হইতেই অতুলের অভিভূত ভাব ! সে বড়-একটা কথা বলে নাই, বিপদ যেন ঘরের দুয়ার হইতে কালো ছায়া ফেলিয়াছে ! কালো আজ কাহারও নিষেধ শুনে নাই, কাহারও আদেশে কর্ণপাত করে নাই, স্বামীর হিম-শীতল পা-দু'খানি কোলে লইয়া অশ্রুধারায় তাহা সিক্ত করিতেছে। কোন দিন যদিও সে স্বামীর নিকট হইতে এক বিন্দু স্নেহ পায় নাই, যত্ন পায় নাই, কোন অধিকার পায় নাই, তবু তার পূর্ব্ব-মাতৃকাদের পবিত্র শোণিত তাহাকে স্বামীর প্রতি অনুরক্ত করিয়াছিল, স্বামীকেই পৃথিবীতে একমাত্র অবলম্বন ভাবিতে শিখাইয়াছিল। হিন্দুর মেয়ে,—এ সহজাত-সংস্কার কাটাইবার উপায় নাই ! স্বামীর প্রতি প্রেম তাহাদের মজ্জাগত স্বভাব, ইহাকে অতিক্রম করিবার সাধ্য কালোর ছিল না।

মালতীও মাথার কাছে বসিয়াছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ, মানুষটা একটু স্থির হ'য়ে আছে, তোমার আর এমনি ক'রে অলুক্ষণে কান্না কাঁদতে হবে না। ওকে অস্থির করো না।"—অরুণও বসিয়াছিল ; সে-ও বিরক্ত হইয়া বলিল, "উঠে যাও—এখান থেকে ওঠো ! ও-রকম ঘ্যান-ঘ্যানানি আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে।"

গোলমালের শব্দেই বোধ হয় অতুলের মোহভঙ্গ হইল। জমীদারের আঠার বছরের ছেলে বিষয়-সম্পত্তি বোঝে ভাল। অরু পিতার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া বলিল, "বাবা, বিষয়ের কি ব্যবস্থা করেছেন ? উইল করবেন কি ?"

অতুল নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "করেছি। রেজেষ্ট্রী করা আছে। সবই তোমাদের ; শুধু হালবেড়ের সম্পত্তিটা আমি নিজে করেছি, ওটা মালতীর। ওর বাৎসরিক আয় দু'হাজার টাকা ; ওটা মালতীর রইল।" পায়ের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতে বলিল, "তোমাদের সেবার জন্যে ওকে এনেছিলুম, কোন দিন কারুর কাছে স্নেহ-যত্ন পায়নি ও, তোমাদের কাছেও পায় না। ওর দশ টাকা ক'রে মাসোহারা দেবার ব্যবস্থা উইলে আছে, দিও ; পেটের জ্বালায় যেন পথে না দাঁড়ায়। মাসিক দশ টাকায় ওর এক-মুঠো ভাত আর একজোড়া কাপড়ের সংস্থান হবে।"

অরুণ এত-বড় বিষয়টা হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। পিতা মৃত্যুশয্যায়, সে-কথা তাহার চিন্তায় স্থান পাইল না। অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি !

* * * * *

ইহার পরদিন হাতের শাঁখা খুলিয়া সীঁথির সিন্দুররেখা মুছিয়া কালো থান পরিয়া সধবাবেশের নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিল। শ্রাদ্ধ হইয়া গেলে সে অরুণকে জানাইল, সে কাশীবাস করিবে। অরুণ তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল। লক্ষপতির চিরধৈর্য্যময়ী সাধ্বী পত্নী মাসিক দশটি মুদ্রা সম্বল করিয়া কাশীধামে যাত্রা করিল। ইহাই নিয়তি !

শ্রীমায়াদেবী বসু।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে নাজী জার্ম্মাণীর বিরাট পেষণ-চক্র পূর্ব্ব সীমান্ত যখন অতিক্রম করিয়া প্রতিবেশীকে নিষ্পিষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বৃটেন্ ও ফ্রান্স নাজী-ঔদ্ধত্যের বিলোপ-সাধনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করে। তাহার পর, দ্বাদশ মাস অতিবাহিত হইয়াছে। রাষ্ট্র ও জাতির জীবনের পক্ষে এই তুচ্ছ মুহূর্ত্তের মধ্যে সমগ্র য়ুরোপে বিরাট বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইয়াছে। নাজী-পেষণচক্রের আবর্ত্তনে পাঁচটি এশিয়াতে উহার তীব্র তাপ অনুভূত হইতেছে। আট্‌লাণ্টিকের অপর পারে বিরাট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি নাজী ধ্বংসশক্তির ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। সুদূর প্রাচীর অপরিপক্ক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র য়ুরোপের এই বিপর্য্যয়ের সুযোগে ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয়াছে। য়ুরোপ ও এশিয়ার প্রায় অর্দ্ধাংশব্যাপী বিরাট কমুনিষ্ট রাষ্ট্রটি এই এক বৎসরে তাহার পশ্চিম সীমান্ত প্রসারিত করিয়াছে; য়ুরোপের অবশিষ্টাংশের সমরানল যাহাতে
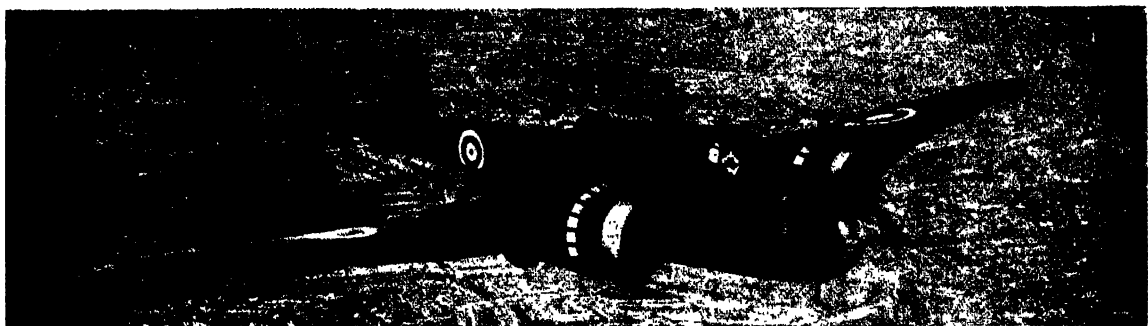
বোমাবর্ষী বিমান; গতিবেগ ঘণ্টায় ২১২ মাইল; প্রত্যেক বারে ইহা ১৭২৫ মাইল উড়িতে পারে

রাষ্ট্র আজ বিপর্য্যস্ত, নিষ্পিষ্ট; অন্যূন আরও পাঁচটি রাষ্ট্র 'প্রাণ-ভয়ে' সন্ত্রস্ত। বৃটেন্ তাহার যে মিত্রের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নাজী-ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তিন মাস পূর্ব্বে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে। পক্ষান্তরে নাজী জার্ম্মাণীর ভাগ্যান্বেষী ফ্যাসিষ্ট মিত্র ইটালী নিরপেক্ষতার কপটাবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে সুমেরু মহাসাগর হইতে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত বিরাট "রক্ষা-প্রাচীর" নির্ম্মিত হইয়াছে।

আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ—

গত জুন মাসে ফ্রান্স পর্য্যুদস্ত হইবার পর বৃটেন-আক্রমণের
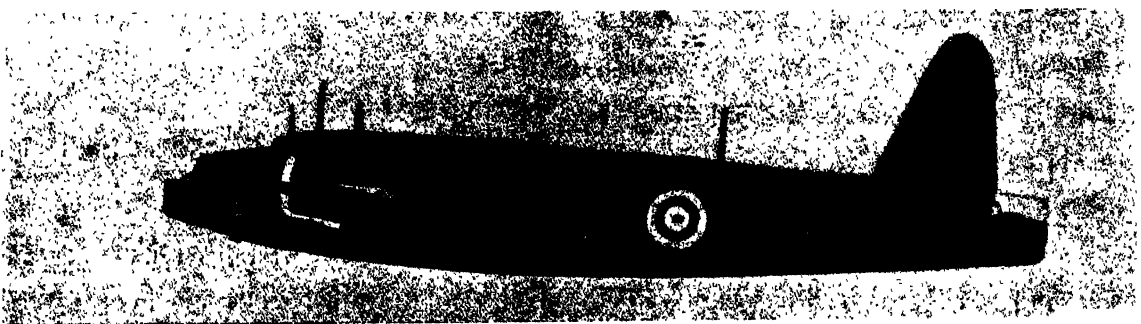
দ্রুতগামী বোমাবর্ষী বিমান; ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় ২৬০ মাইল; প্রতি বারে ইহা ৩২০০ মাইল উড়িতে পারে

নাজী-ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরতা হইতে য়ুরোপকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে বৃটেন্ আজ একাকী জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে প্রবৃত্ত।

সমরানল এখন আর য়ুরোপের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে; উত্তর আফ্রিকা মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং পশ্চিম প্রাথমিক আয়োজনের জন্য জার্ম্মাণী কিছু কাল অপেক্ষা করিয়াছিল। তাহার পর, গত আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে জার্ম্মাণী প্রচণ্ডবেগে সমগ্র ইংলণ্ডে বিমান আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। কখনও কখনও সাময়িকভাবে আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইলেও উহা এখনও এক

প্রকার সমানভাবেই চলিতেছে। ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূল, রাজধানী লণ্ডন, শ্রমশিল্প কেন্দ্র, বিমান-ঘাঁটী, বিভিন্ন বন্দর—জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর ইহাই সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য।

জার্ম্মাণীর এই অবিশ্রান্ত বিমান আক্রমণের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রত্যেকটি আক্রমণে জার্ম্মাণীর বহুসংখ্যক বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে, এক মাস কাল প্রচণ্ড আক্রমণ

ক্ষুদ্রাকৃতি পর্য্যবেক্ষণ-বিমান; গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮৮; প্রতি বারে ইহা ৭১০ মাইল উড়িতে পারে

পরিচালিত হইবার পরও বৃটেনের প্রতিরোধ-শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। গত ৫ই সেপ্টেম্বর মিষ্টার চার্চ্চিল বৃটিশ কমন্স সভায় এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে এই আক্রমণের ফলাফলের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, বিমান আক্রমণে বৃটেনের তুলনায় জার্ম্মাণীর তিন গুণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে; জুলাই ও আগষ্ট মাসে বৃটেনের মোট ৫ শত ৫৮খানি বিমান

বিরাটাকৃতি বোমাবর্ষী বিমান; ইহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ২৪৫ মাইল; ইহা প্রতিবারে ১২৫০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারে

ধ্বংস হইয়াছিল। বৃটিশ বৈমানিকের মৃত্যু-সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প। আক্রমণের প্রচণ্ডতার তুলনায় বৃটেনের এই ক্ষতি অধিক নহে। বৃটেনের অপেক্ষা তিন গুণ বিমান ধ্বংস হওয়া প্রবল বিমানশক্তিসম্পন্ন জার্ম্মাণীর পক্ষে নিশ্চয়ই নৈরাশ্যজনক। আগষ্ট মাসে জার্ম্মাণীর বিমান আক্রমণের ফলে বৃটেনের বেসামরিক অধিবাসীর মধ্যে মোট ১৩ শত ৩৮ জন পুরুষ, ৭ শত ৮১ জন স্ত্রীলোক এবং ২১৫টি শিশু হতাহত হইয়াছে। আক্রমণের প্রাবল্যের তুলনায় এই ক্ষতিও অত্যধিক নহে।

বিমান-ঘাঁটি, বন্দর এবং শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা মিষ্টার চার্চ্চিল বলেন নাই। এই সম্পর্কে তাঁহার এই নীরবতা ব্যতীতও যুদ্ধের সময় সকল সংবাদ জানা দুষ্কর; ইহার কারণ, অসঙ্গত বিবেচনায় বিস্তারিত সংবাদ প্রায়ই প্রকাশ করা হয় না। কাজেই জার্ম্মাণীর আক্রমণে বৃটেনের কত দূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সঠিক অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে মাসাধিক কাল ভীষণতম আক্রমণ চলিবার পরও বৃটেনের প্রতিরোধশক্তি যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

জার্ম্মাণী এই বিমান-আক্রমণেই তাহার সমগ্র সমর-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখিবে কি না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ফরাসী উপকূল হইতে কয়েক দিন তাহার কামান চলিয়াছিল; কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তাহা নীরব হয়। সম্ভবতঃ বৃটিশ বিমানের প্রতি-আক্রমণই এই নীরবতার কারণ। জার্ম্মাণী ইতঃপূর্ব্বে শত্রুদেশে সৈন্যবাহী বিমান প্রেরণ করিয়াছে; তথাকথিত "প্যারাসুট-বাহিনী" ব্যবহার করিয়াছে। বৃটেনের বিরুদ্ধে সে এখনও এই রণনীতি অবলম্বন করে নাই; বৃটেনের ব্যাপক প্রতিরোধ-ব্যবস্থাই ইহার কারণ কি না কে বলিবে?

হিটলার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, জার্ম্মাণীর অন্যান্য শত্রুর ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, বৃটেনের ভাগ্যে তাহা না ঘটিবার কারণ—তাহার পশ্চাদপসরণের অসাধারণ দ্রুততা এবং তাহার

সৌভাগ্যজনক ভৌগোলিক অবস্থিতি। এই উক্তিতে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ থাকিলেও, বৃটেনের "সৌভাগ্যজনক ভৌগোলিক অবস্থিতির" জন্য জার্ম্মাণীর অভিসন্ধি যে কার্য্যে পরিণত হইতেছে না, ইহা হিটলার পরোক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য এই স্বীকারোক্তি হিটলারের নূতন ধরণের আক্রমণের সূচনা হইতেও পারে। পূর্ব্বে হিটলার ফ্রান্স আক্রমণের অসম্ভাব্যতার বিষয় একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছিলেন; ফরাসীদিগকে নিরুদ্বিগ্ন রাখাই যে এই উক্তির উদ্দেশ্য ছিল, তাহা পরে বুঝিতে পারা গিয়াছে। তেমনই বৃটেন সম্পর্কে হিটলারের এই বিফলতা স্বীকারে উল্লসিত হইবার কারণ নাই; ইহা তাঁহার কৌশলপূর্ণ চালবাজী হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব।

গত কয়েক সপ্তাহ জার্ম্মাণীতে ও জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলে বৃটিশ বিমান-বহরের আক্রমণের বিবরণও প্রকাশ করা হইতেছে। কিন্তু

মোসনগান-সহ জার্ম্মাণীর প্যারাসুট সৈন্য অবতরণের দৃশ্য

মিষ্টার চার্চ্চিল ৫ই সেপ্টেম্বর কমন্স সভায় যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে বৃটিশ বিমান-বহরের এই প্রতি-আক্রমণের উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই; তিনি বৃটেনের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ও প্রতিরোধ-শক্তির বিষয়ই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পর এই অনুমানই অনিবার্য্য হয় যে, বৃটেনের প্রতি-আক্রমণ গুরুত্বহীন; বৃটেন্ এখন প্রধানতঃ জার্ম্মাণীর আক্রমণ প্রতিরোধেই প্রবৃত্ত।

আফ্রিকায় যুদ্ধ—

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর হইতে আফ্রিকায় যুদ্ধের অবস্থা বৃটেনের পক্ষে উৎসাহজনক নহে। ইহার কারণ, আফ্রিকায় ফ্রান্সের সহিত একযোগে বৃটেনের সমর-পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল; ঐ অঞ্চলে ফরাসী-সৈন্যের সংখ্যাই অধিক ছিল। সে যাহাই হউক, ইটালী আগষ্ট মাসের প্রথমে বৃটিশ-সোমালিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দুই সপ্তাহের মধ্যেই—১৯শে আগষ্ট ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণরূপ অধিকার করিয়াছে। রাজ্য হিসাবে এই অঞ্চলের গুরুত্ব তত অধিক না হইলেও ইহার সামরিক মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। এই অঞ্চল হইতে এডেন্ এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বিমান আক্রমণ পরিচালন সহজসাধ্য। বস্তুতঃ, এডেনে সম্প্রতি বিমান আক্রমণের প্রাবল্য বৃদ্ধিই পাইয়াছে।

কেনিয়া অঞ্চলে ইটালী কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছে; সম্প্রতি ইটালীয় সৈন্য বুনা নামক স্থানটি অধিকার করিয়াছে। বৃটিশ সমর-বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ইটালীর এই সাফল্য সামরিক গুরুত্ব-হীন। কিন্তু অপর পক্ষ কি ইহা স্বীকার করিবে?

অবশ্য পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ইটালীর সাফল্যের মূল্য যে আপাততঃ তত অধিক নহে, ইহা সত্য; ইহার প্রধান কারণ, সুইয়েজ খাল ও লোহিত সাগরে বৃটেনের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় এই অঞ্চলটির সহিত ইটালীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন।

মিষ্টার চার্চ্চিল তাঁহার ৫ই সেপ্টেম্বরের বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মধ্য-প্রাচীতে তুমুল যুদ্ধ আসন্ন; ঐ অঞ্চলে সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইতেছে, পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ রণপোতের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। বৃটিশ রণপোত ইতোমধ্যেই ভূমধ্য সাগরে কিঞ্চিৎ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে; স্থানে স্থানে তাহারা ইটালীর অধিকৃত অঞ্চল ও ইটালীয় রণপোত আক্রমণ করিয়াছে।

ইটালীর অভিসন্ধি—

ইটালীর ভাবগতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, সে আগামী শীতকালে ব্যাপকভাবে সামরিক-প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ঐ সময় জার্ম্মাণীর পক্ষে, প্রাকৃতিক কারণে, বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ পরিচালন অসম্ভব হইবে। কাজেই, সে-ও হয় ত তখন মধ্য-প্রাচীতে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ করিয়া ইটালীর শক্তি বৃদ্ধি করিবে। তাহাদিগের সম্মিলিত শক্তি তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইটালী হয় ত এই শীতকালীন অভিযানের জন্যই এখন বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটীগুলি অধিকার করিতে প্রয়াস পাইতেছে। বৃটিশ-সোমালিল্যাণ্ড ভবিষ্যতে মূল্যবান ঘাঁটীরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। গ্রীসের সহিত ইটালী যে এখন ইচ্ছা করিয়া বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে, ইহার কারণও হয় ত সে কয়েকটি মূল্যবান ঘাঁটী অধিকার করিতে চাহে। সে যদি ক্রীট্ দ্বীপ অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে তথা হইতে মিশরের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা সহজসাধ্য হইবে। উত্তর-গ্রীসে স্যালোনিকা পর্য্যন্ত পৌঁছান যদি তাহার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঈজিয়ান সাগরে তাহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে; ঐ অঞ্চলে তাহার অধিকৃত

ডোডোকেনীজ দ্বীপপুঞ্জে সে পূর্ব্বেই নৌ ও বিমানঘাঁটী নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঈজিয়ান্ সাগরে প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে সুইয়েজ অভিমুখে নৌ-অভিযান পরিচালন তাহার পক্ষে সহজ হইতে পারে। সম্প্রতি সীরিয়ায় ইটালীর তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে; ঐ অঞ্চল ভবিষ্যৎ অভিযানে অতি উত্তম ঘাঁটীরূপে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব।

অবশ্য বৃটেন্ ইটালীর প্রতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিয়াছে। ইটালীর এই অভিসন্ধি জানিয়াই বৃটেন্ বোধ হয় ভূমধ্য সাগরে তাহার রণপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আফ্রিকায় সৈন্য-সংখ্যা বাড়াইতেছে। ইটালী যদি গ্রীস্ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে বৃটেন্ও গ্রীসে সৈন্য অবতরণ করাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গত বৎসর বৃটেন্ যে তিনটি রাষ্ট্রকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়াছিল, তাহার মধ্যে পোল্যাণ্ড নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, রুমানিয়া আজ সম্পূর্ণভাবে জার্ম্মাণীর প্রভাবান্বিত; একমাত্র গ্রীস্ এখনও অক্ষতদেহ এবং বৃটেনের প্রতি অনুরক্ত আছে।

ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ-চুক্তি—

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেনের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে বৃটেন্ মার্কিণ সরকারের নিকট হইতে ৫০খানি ডেষ্ট্রয়ার পাইয়াছে। পক্ষান্তরে, বৃটেন্ ইহার পরিবর্ত্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তর-আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের বাহামাস্, জামাইকা, সেণ্ট লিউসিয়া, ত্রিনিদাদ, এণ্টিগুয়া ও বৃটিশ-গায়নার নৌঘাঁটীগুলি প্রদান করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, ক্যানাডার নিকটবর্ত্তী নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড এবং বারমুডা নৌঘাটীগুলিও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল স্থানে মার্কিণী সরকার বিমানঘাঁটী স্থাপন করিতে পারিবেন; নিকটবর্ত্তী সমুদ্রাংশেও তাঁহাদিগের অধিকার থাকিবে। বৃটেনের পক্ষ হইতে মার্কিণী সরকারকে এই মর্ম্মে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, বৃটিশ নৌবহর কখনও আত্মসমর্পণ অথবা আত্মনিমজ্জন করিবে না।

এই নৌচুক্তির গুরুত্ব অসাধারণ; ইহার ফল হয় ত সুদূরপ্রসারী হইবে। প্রথমতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে আত্মরক্ষার নামে বৃটেনের সহিত ঘনিষ্ট সহযোগে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহা এই চুক্তিতে সুপ্রকাশ। পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বৃটেন্ ও ফ্রান্সকে মুক্তহস্তে সাহায্যদানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে 'ইতস্ততঃ ভাব' লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এত দিনে যে সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। তাহার পর, বৃটিশ সরকারের সহিত মার্কিণী সরকারের ঘনিষ্ঠতা কেবল এই নৌচুক্তিতেই নিবদ্ধ থাকিবে না বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; ইহা ক্রমে অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হওয়া সম্ভব।

বৃটেনের সহিত মার্কিণী সরকারের ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে আগ্রহের প্রথম কারণ, দক্ষিণ-আমেরিকার ব্যাপক নাজী-ফ্যাসিষ্ট চক্রান্ত পশ্চিম-গোলার্দ্ধের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, সুদূর প্রাচীতে "বৃহত্তর এশিয়া" স্থাপনের জন্য জাপানের ব্যগ্রতা মার্কিণী সরকারকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইটালী ও জার্ম্মাণী দক্ষিণ-আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে নাজী-ফ্যাসিষ্টবাদের বারুদ-স্তূপ সঞ্চিত করিয়াছে; যে কোন মুহূর্ত্তে উহা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই, এই সম্ভাবিত বিপদ সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত প্রয়োজন। এই চুক্তিতে পানামা খাল ও দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরাংশের নিকটবর্ত্তী আটলাণ্টিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে পাঁচটি নৌঘাঁটি লাভ করিয়াছে, তাহার দ্বারা পশ্চিম-গোলার্দ্ধের আভ্যন্তরীণ বিপদ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হইতে পারিবে। তাহার পর, সুদূর প্রাচীতে "বৃহত্তর এশিয়া"র নামে জাপান ঐ অঞ্চল হইতে প্রতীচ্য শক্তিবর্গের বহিষ্কারে উদ্যত হইয়াছে। আমেরিকার তৈল হইতে বঞ্চিত হইয়া জাপান আজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতিক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে চাহিতেছে; কারণ, আমেরিকার পর এই দ্বীপপুঞ্জই জাপানের প্রধান তৈল-সরবরাহকারী। অথচ, মার্কিণ

বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভূগর্ভে প্রবেশ

যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রবার হইতে বঞ্চিত হইলে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; সে তথায় জাপানের প্রতিপত্তি উদাসীন ভাবে লক্ষ্য করিতে পারে না। তাহার পর চীন, ইন্দো-চীন, শ্যাম—এই সকল অঞ্চলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থ রহিয়াছে; জাপানের তথাকথিত "বৃহত্তর এশিয়া"র এলাকার মধ্যেই মার্কিণ অধিকৃত ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। কাজেই, জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষুধার বহর দেখিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উৎকণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। জাপানকে প্রতিরোধ করিতে হইলে প্রশান্ত মহাসাগরে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা প্রয়োজন। অথচ, আটলাণ্টিক সম্পর্কে কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত না হইতে পারিলে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ প্রদান অসম্ভব। বৃটেন্ আজ তাহার

অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আটলাণ্টিকে প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। কাজেই নৌশক্তিতে সে যদি আরও প্রবল হয়, তাহা হইলে আটলাণ্টিকের নিরাপত্তা সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই মার্কিণী সরকার সাগ্রহে বৃটেনের নৌশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন।

বৃটেনের পক্ষেও জাপানের মনোভাব আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার নাজী-ফ্যাসিষ্ট-প্রীতি, পশ্চিমাভিমুখে তাহার শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতি, "বৃহত্তর এশিয়া" গঠনের জন্য তাহার বাহ্বাস্ফোট বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞদিগকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছে। অথচ বৃটেন্ আজ তাহার গৃহরক্ষার কার্য্যে এত অধিক বিব্রত যে, সুদূর প্রাচীতে একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তির সম্মুখীন হওয়া তাহার পক্ষে দুষ্কর। এইজন্য জাপানকে প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে নিশ্চয়ই অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান চুক্তির বিষয় উত্তমরূপে চিন্তা করিলে মনে হয়, জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান দুরাকাঙ্ক্ষা হইতে আপনার সুদূর প্রাচীর স্বার্থরক্ষার জন্য বৃটেন্ ক্রমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবে।

বৃটেন এই সময় ৫০খানি ডেষ্ট্রয়ার লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। জার্ম্মাণী ও তাহার অধিকৃত অঞ্চলের অবরোধ তাহার সমর-প্রচেষ্টার একটি প্রধান অঙ্গ। কাজেই সমুদ্রে তাহার শক্তি যত বৃদ্ধি পাইবে, তাহার সমর-প্রচেষ্টার প্রাবল্যও তত বাড়িবে। ইতঃপূর্ব্বে জার্ম্মাণীর কবল হইতে ফ্রান্সের নৌবহর লাভ করিয়া বৃটেন বিশেষ লাভবান হইয়াছে। এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এতগুলি ডেষ্ট্রয়ার লাভ করায় সমুদ্র-বক্ষে তাহার শক্তি দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল সন্দেহ নাই।

বোমাবর্ষী বিমানে লঘু বোমা সজ্জিত করা হইতেছে

বল্‌কান-সমস্যা ও রুমানিয়া—

রুমানিয়ার নিকট বুলগেরিয়ার দোবরুজা সংক্রান্ত দাবী ও হাঙ্গেরির-ট্রান্‌সীলভেনিয়া সংক্রান্ত দাবী এত দিনে পূর্ণ হইয়াছে এবং তাহার ফলে রুমানিয়ায় বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বুলগেরিয়ার দোবরুজা সংক্রান্ত দাবী সহজেই পূর্ণ হইয়াছিল; রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া সরকারের আপোষ আলোচনার ফলেই বুলগেরিয়ার দক্ষিণ-দোবরুজা প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়। গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়ার সীমান্ত যত দূর বিস্তৃত ছিল, নব-ব্যবস্থায় বুলগেরিয়ার সীমান্ত পুনরায় তত দূর বিস্তৃত হইবে। ঐ সময় দোবরুজা প্রদেশের ৩ হাজার ৩ শত ২০ বর্গ মাইলব্যাপী অঞ্চল রুমানিয়ার কুক্ষিগত হয়। হাঙ্গেরির দাবী-পূরণ সম্পর্কেই রুমানিয়ায় মহা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আপোষ-আলোচনায় এই দাবীর পূরণ সম্ভব হয় নাই। ইটালী ও জার্ম্মাণীর পক্ষ হইতে কাউণ্ট সিয়ানো ও হার ভন্ রিবেন্‌ট্রপ্ ভিয়েনায় এক বৈঠকে সমবেত হইয়া রুমানিয়াকে আদেশ দেন যে, ট্রান্‌সীলভেনিয়া প্রদেশের ১৯ হাজার বর্গ-মাইল স্থান হাঙ্গেরিকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। রুমানিয়ান্ সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেও ঐ দেশের জনসাধারণ ইহাতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, ইহার ফলে চারিদিকে অশান্তির সৃষ্টি হয়; এই সুযোগে 'আয়রণ গার্ড' দল বিপ্লব সঙ্ঘটনে সচেষ্ট হয়। ক্রমে অবস্থা এত দূর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে যে, রুমানিয়ার শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিয়া তথায় এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রুমানিয়ার তথাকথিত শক্তিশালী ব্যক্তি জেনারল এণ্টোনেস্কু এই এক-নায়কের পদ লাভ করিয়াছেন। রাজা ক্যারলকে রুমানিয়ার সিংহাসন ত্যাগ করিতে হইয়াছে; তাঁহার পুত্র মাইকেল্ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

গত যুরোপীয় মহাসমরে মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া রুমানিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধের অবসানে রুশিয়ার ১৭ হাজার বর্গ-মাইলব্যাপী বেসারেবিয়া প্রদেশ রুমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়; অষ্ট্রো-হাঙ্গেরি সাম্রাজ্যের বুকোভিনা, ট্রান্‌সীলভেনিয়া, ব্যানাট্ ও ক্রিসানা-মারামুরেশ—এই চারিটি প্রদেশে প্রায় ৪৪ হাজার বর্গ-মাইল স্থান রুমানিয়া লাভ করে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ট্রান্‌সীলভেনিয়া প্রদেশের এক-চতুর্থাংশ হাঙ্গেরি ফিরাইয়া পাইয়াছে।

স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে রুমানিয়ার অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও চলে। রুমানিয়ার অর্থনীতিক্ষেত্রে আজ জার্ম্মাণীর প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত; রাজনীতিক বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর পদানত। নব-ব্যবস্থায় রাজা মাইকেল্ রাজোচিত আড়ম্বরে সিংহাসন ও মন্ত্রণা-কক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিবেন, আর জেনারল এণ্টোনেস্কু সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর আজ্ঞাবহ হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন। এদিকে হাঙ্গেরিও জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ প্রভুত্বাধীন। কাজেই, এই নূতন

ব্যবস্থায় জার্ম্মাণীর পক্ষে হাঙ্গেরির কৃষিসম্পদ এবং রুমানিয়ার তৈল-সম্পদ প্রাপ্তির পথ যেমন নিষ্কণ্টক হইল, তেমনই তাহার কৃষ্ণসাগরে প্রবেশের পথও উন্মুক্ত রহিল। ভবিষ্যতে যদি পূর্ব্ব-য়ুরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ-পথ কার্য্যকরী হইবে। ইহা ব্যতীত, অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম-এশিয়ায় ও পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে অভিযান চালাইবার জন্ত এই পথ ব্যবহৃত হইতে পারে। বুলগেরিয়ায় প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব অত্যন্ত অধিক; সে যদি সমগ্র দোবরুজা প্রদেশ লাভ করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার সীমান্তে পৌছিতে পারিত, তাহা হইলে কৃষ্ণসাগরের প্রায় সমগ্র পশ্চিম-উপকূলে তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত এবং দানীয়ুবের পথে জার্ম্মাণীর কৃষ্ণসাগরে প্রবেশে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারিত। ইহা যাহাতে না ঘটে, জার্ম্মাণী তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হওয়াই ঐ অঞ্চলে বৃটিশ রণপোতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অন্ততম কারণ হইতেও পারে।

অগ্ন্যুৎপাদক বোমা বর্ষিত হইবার পর

রাজা ক্যারলের সিংহাসনত্যাগে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। তাঁহার দশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকাল অত্যন্ত উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে রুশিয়া বেসারেবিয়া ফিরাইয়া পাইতে চাহে, দক্ষিণে বুলগেরিয়া দোবরুজা দাবী করে, পশ্চিমে হাঙ্গেরি ট্রান্‌সীল্‌ভেনিয়া পাইবার জন্ত আগ্রহান্বিত। ও-দিকে রুমানিয়ার কৃষি ও তৈল-সম্পদের প্রতি জার্ম্মাণী বহুকাল হইতে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। রাজ্যের অভ্যন্তরে জার্ম্মাণীর সাহায্যপুষ্ট 'আয়রণ গার্ড' দল সর্ব্বদা অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল অবস্থার মধ্যে দশ বৎসর কাল রাজা ক্যারল্ স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে কোন প্রকারে আপনাকে সামলাইয়া চলিতেছিলেন। সিংহাসন-ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রুমানিয়াকে অবনমিত করিয়াছেন। রুশিয়া তাহার দাবীর অতিরিক্ত পাইয়াছে, বুল্‌গেরিয়ার দাবীর কিয়দংশ পূর্ণ হইয়াছে, হাঙ্গেরির প্রায় সম্পূর্ণ দাবীই পূরণ হইল। রাজা ক্যারল নিজেই জার্ম্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন; আজ রুমানিয়া জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অংশ-বিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'আয়রণ গার্ড' এখন কেবল প্রবল নহে; তাহারাই রাজা ক্যারলকে সিংহাসনত্যাগে বাধ্য করিল।

বল্‌কান্ অঞ্চলে ইটালী আজ সামরিক প্রয়োজনে গ্রীসের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি-পাত করিয়াছে। বল্‌কান্ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের রুমানিয়া এক্ষণে জীবন্মৃত; বুল্‌গেরিয়া নাৎসী-ফ্যাসিষ্ট শক্তির দ্বারা উপকৃত; তুরস্কের মনোভাব দুর্ব্বোধ্য। কাজেই, ঐ সঙ্ঘের অন্ততম সদস্য গ্রীসের বিপদে ইহারা সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। অবশ্য, বৃটেন্ তাহার নিজের প্রয়োজনে গ্রীসকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে। ইটালী আলবেনিয়ায় যুগোশ্লোভিয়ার সীমান্তে সৈন্তসমাবেশ করিয়াছে—এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যুগোশ্লোভিয়ার কৃষিসম্পদ লাভই তাহার আকাঙ্ক্ষা। এই রাষ্ট্রটি ইটালীর প্রভাবাধীন; আলবেনিয়ার বন্দর ব্যতীত ইহার সমুদ্রে নির্গমনের আর দ্বিতীয় পথ নাই; কারণ, ইহার সুদীর্ঘ সমুদ্রোপকূল পার্ব্বতসঙ্কুল। কাজেই ইটালী অতি সহজেই ইহার নিকট হইতে অর্থনীতিক সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। অবশ্য, যুগোশ্লোভিয়ার রাজনীতিক স্বাধীনতা অথবা রাজ্যগত অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ করা যদি ইটালীর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অশান্তির সৃষ্টি হইতে পারে।

ইন্দো-চীন ও জাপানের অভিসন্ধি—

চীন আক্রমণের অধিকতর সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে জাপান ইন্দো-চীনে সামরিক সুযোগ পাইতে চাহে। এই সম্পর্কে এখনও মীমাংসা হয় নাই। শুনা যাইতেছে, ফরাসী কর্তৃপক্ষ ইন্দো-চীনের উত্তরাঞ্চলের টংকিং প্রদেশের পথে জাপানী সৈন্যকে চীন সীমান্তে পৌঁছিবার সুযোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন; তবে, ইন্দো-চীনে জাপানী বিমানঘাঁটী স্থাপনের অধিকার প্রদানে তাঁহারা সম্মতি প্রদান করেন নাই।

জাপান যে কেবল চীনের সহিত যুদ্ধ-পরিচালনের উদ্দেশ্যে সামরিক সুবিধা লাভের জন্য ইন্দো-চীনের প্রতি মনোযোগী হইয়াছে তাহা নহে, সে ঐ রাজ্যের কৃষি ও খনিজ সম্পদ পাইবার আকাঙ্ক্ষাও রাখে। ভবিষ্যতে সমগ্র মালয় উপদ্বীপে প্রভুত্ব বিস্তারও হয় ত তাহার আকাঙ্ক্ষার বিষয়। জাপান এখনই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রু করিতে চাহে না বলিয়াই বোধ হয়, ধীরে ধীরে অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য অগ্রসর হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাপানের দুরভিসন্ধির জন্য উৎকণ্ঠিত এবং সে জাপানের নিকট প্রতিবাদও জ্ঞাপন করিয়াছে।

ফরাসী সরকার এখন সম্পূর্ণরূপে জার্ম্মাণীর প্রভাবাধীন। কাজেই, জাপানের অভিসন্ধি সিদ্ধিতে বিঘ্ন উপস্থাপিত করা ফরাসী সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইবে। অবশ্য, চীন প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; ইন্দো-চীনে জাপানী সৈন্য অবতরণ করিবামাত্র ঐ অঞ্চলে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

গত জুলাই মাসে ওরাণে 'ডান্‌কার্ক' নামক যে ফরাসী জাহাজখানি বৃটেনের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার কন্‌ট্রোল টাওয়ার

জাপানের ইন্দো-চীনে প্রবেশের আশু উদ্দেশ্য চীন অভিযান হইলেও ইহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। জাপানের এই পশ্চিমাভিমুখী অগ্রগতির সহিত জার্ম্মাণীর আগামী শীতকালীন সমর-পরিকল্পনার পরোক্ষ যোগ থাকা সম্ভব। আগামী শীতকালে জার্ম্মাণী ও ইটালী যখন বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে, তখন সেই অপকার্য্যে জাপান সুদূর প্রাচীতে তাহাদিগের সহায়ক হইতে পারে। ইন্দোচীনের পর সমগ্র মালয় উপদ্বীপ, এমন কি, ভারতবর্ষের প্রতিও জাপানের 'কৃপাদৃষ্টি' পতিত হওয়া অসম্ভব নহে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটেনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাপান ও ইটালী-জার্ম্মাণীর মৈত্রী-বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়া সম্ভব। জাপান তাহার য়ুরোপীয় বন্ধুদ্বয়ের ন্যায়ই সাম্রাজ্য ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের আশা করে; প্রধানতঃ বৃটেন ও মার্কিণ রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়াই তাহাদিগকে এই সুবিধা পাইতে হইবে। কাজেই এই তিনটি রাষ্ট্রের স্বার্থ যেমন সমান, তাহাদিগের প্রতিপক্ষও অভিন্ন। এই অবস্থায় বৃটেন্ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য যত দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইবে, ইহারাও তাহাদিগের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ততই ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবে।

তাহার পরে, নৌশক্তিরূপে জাপান নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের অত্যন্ত উপকারী মিত্র। জার্ম্মাণী নৌশক্তিতে অত্যন্ত দুর্ব্বল; ইটালীর নৌশক্তিও প্রবল নহে। পক্ষান্তরে, বৃটেন্ নিজে প্রবল নৌশক্তিসম্পন্ন; ইহা ব্যতীত সামুদ্রিক সমরায়োজনে সে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত মিলিত হইতেছে। নৌশক্তিতে দৌর্ব্বল্য যে বৃটেনের সহিত যুদ্ধ-পরিচালনায় কত অসুবিধা-জনক, জার্ম্মাণী ক্রমে তাহা বুঝিতেছে। ফ্রান্সের নৌবহর লাভের যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, তাহাও বিফল হইয়াছে। সুতরাং প্রবল নৌশক্তিসম্পন্ন জাপানের সহিত দৃঢ় মৈত্রী বন্ধন নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের পক্ষে আজ অত্যন্ত লোভনীয়।

অবশ্য, এই প্রসঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার কথা বিস্মৃত হওয়া চলিবে না। এই রাষ্ট্রটির বিরাগভাজন হওয়া নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয়ের পক্ষে অসম্ভব। অথচ, সুদূর প্রাচীতে সোভিয়েট রুশিয়া ও জাপানের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। কাজেই, নাজী-ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রদ্বয় একই সময় কিরূপে জাপান এবং সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

লণ্ডনে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ—

৭ই সেপ্টেম্বর হইতে জার্ম্মাণী প্রচণ্ডবেগে লণ্ডনে বোমা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। প্রতিদিন শত শত বিমান লণ্ডনে ৮।১০ ঘণ্টা অবিচ্ছিন্নভাবে বোমা নিক্ষেপ করিতেছে। এই বোমা বর্ষণের লক্ষ্যস্থল অনির্দ্দিষ্ট; যথেচ্ছভাবে সমগ্র লণ্ডনে আক্রমণ চলিতেছে। ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে আক্রমণের প্রচণ্ডতা হ্রাস পাইয়াছে—ইংলণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূল শ্মশানে পরিণত করিয়া ঐ অঞ্চলে সৈন্য অবতরণ করানই তাহার অভিসন্ধি। ইহা ব্যতীত লণ্ডন ধ্বংস হইলে তথা হইতে যদি রাজধানী অপসারিত করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অধিবাসীর প্রতি উহার যে প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা জার্ম্মাণীর অনুকূল হইতে পারে, ইহাও বোধ হয় হিট্‌লারের ধারণা। এই আক্রমণের ভবিষ্যৎ ফলাফল যাহাই হউক না কেন, আপাততঃ সমৃদ্ধিশালী লণ্ডন মহানগরী বিপর্য্যস্ত

পরিখায় যুদ্ধ-রত বৃটিশ সৈন্য

জার্ম্মাণী যেন তাহার সমগ্র বিমান শক্তি লণ্ডন ধ্বংসের কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে। এই আক্রমণে বে-সামরিক অধিবাসী—শিশু, বৃদ্ধ, নারী, হাসপাতালে রোগী নির্ব্বিচারে মরিতেছে; কেহ বা বিকলাঙ্গ হইয়া জীবন্মৃত হইতেছে। এক ৭ই সেপ্টেম্বরের আক্রমণেই প্রায় ১৭৮০ নর-নারী হতাহত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর এই আক্রমণের প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জার্ম্মাণী জানে, শীতকালে বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযান চালান দুষ্কর। বিশেষতঃ শীতের সময় বৃটেনের অবরোধ ব্যবস্থার জন্য জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চলকে বিপন্ন হইতে হইবে। ভৌগলিক অবস্থার জন্য ইংলণ্ডে সৈন্য ও রণসম্ভার অবতরণ করান অসম্ভব বুঝিয়া হিট্‌লার এখন এইরূপ নৃশংস ভাবে বোমাবর্ষণে দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

শ্রীঅতুল দত্ত।

বাসনা

আমি পথের ভিখারী হব—
এ-পথে ও-পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবহেলা যেচে লব!
পদাঘাত মোরে করে যদি কেউ মাথাটি করিব নীচু
আঘাত যেন গো, হে আমার প্রভু, লাগে নাক' তার কিছু!
আপাত মধুর গৌরব মান কেন বৃথা শুধু খুঁজি
শত জ্বালা সয়ে কি হেতু রাখিব যতনে সে মম পুঁজি।
বেড়ে যাবে হায় লোলুপ দৃষ্টি অবশেষে করি ভান
দেখাব জগতে মান যশঃ মোর বিধি-প্রদত্ত দান!
তার চেয়ে ঐ চরম পথের পথিক হইব আমি,
আর যদি কেউ নাই থাকে সেথা তুমি আছ মোর স্বামী!
জীবের হৃদয়ে আসন তোমার চিরতরে পাতা প্রভু;
লাঞ্ছনা যদি পাই কারো কাছে দান সে তোমারি তবু!

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।

ভাওয়ালের কুমার-সন্ন্যাসীর মামলা

ঢাকার অতিরিক্ত জিলা-জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু, ভাওয়ালের সন্ন্যাসীই যে ভাওয়ালের মধ্যম-কুমার রমেন্দ্র-নারায়ণ ইহা সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিয়া তাঁহার অনুকূলে যে রায় দিয়াছিলেন, সেই রায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার পত্নী 'মেজ-রাণী' শ্রীমতী বিভাবতী দেবী, ছোট তরফের রাণী আনন্দকুমারী দেবী এবং তাঁহার দত্তক-পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টে যে আপীল দাখিল করিয়া-ছিলেন, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তাহার বিচারভার বিচারপতি সার লিওনার্ড কষ্টেলো, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ও সিভিলিয়ান জজ মিষ্টার লজের বেঞ্চে অর্পণ করায়, এই তিন জন বিচারপতির এজলাসে দীর্ঘকাল যাবৎ এই আপীলের শুনানী চলিয়াছিল। এই আপীলের শুনানীর পর বিচারপতি কষ্টেলো দীর্ঘ অবকাশ লইয়া স্বদেশ-যাত্রা করেন। বহু দিন পরে তিনি স্বদেশ হইতে তাঁহার সুচিন্তিত রায় কলিকাতা হাইকোর্টে প্রেরণ করিলে, বিচারপতি মিষ্টার বিশ্বাস প্রথমে তাঁহার নিজের সুদীর্ঘ রায় পাঠ করেন। অনন্তর বিচারপতি লজ তাঁহার রায় পাঠ করিলে, বিচারপতি বিশ্বাসই সার লিওনার্ড কষ্টেলোর প্রেরিত রায় পাঠ করেন। বিচারপতি বিশ্বাস তাঁহার সুদীর্ঘ রায়ে নিম্ন আদালতের রায়ের সমর্থন করিয়া বলেন, বাদীই ভাওয়ালের মধ্যম-কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, দার্জ্জিলিংএ তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। বিচারপতি কষ্টেলোও বিচার-পতি বিশ্বাসের সহিত একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বাদীই কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। কিন্তু এই উভয় বিচারপতি একমত হইলেও তৃতীয় বিচারপতি মিঃ লজ তাঁহার রায়ে বলেন—বাদী এক জন প্রতারক, এবং সে পাঞ্জাবী; কুমারের ভগিনী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাহাকে প্রতারক জানিয়াই তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বিচারপতি লজ বাদীর বিরুদ্ধে আপীলে ডিক্রী দিয়া বাদীকে সমগ্র খরচা প্রদানের আদেশ করেন। কিন্তু বিচারপতি কষ্টেলো ও বিশ্বাস উভয়েই একমত হওয়ায় বিচারপতি লজের এই রায় কার্য্যকরী হইবে না।

বিচারপতি লজ যে রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সুদীর্ঘ ৮৯১ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইলেও তাহাতে বিচার প্রণালীর কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় নাই। প্রধানতঃ তিনি বিবাদী পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌসিলীর যুক্তি-প্রমাণাদি

ভাওয়ালের মধ্যম-কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়

গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু বিচারপতি বিশ্বাসের সহস্রা-ধিক পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ রায়ে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার-নৈপুণ্য, অনন্যসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; এবং বিচারপতি কষ্টেলোর রায় আকারের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও তিনি ঘটনা-বৈচিত্র্যের ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণের বিশ্লেষণ দ্বারা বাদীই যে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ, ইহা

প্রতিপন্ন করিয়াছেন; তাহাতে তাঁহার সুযুক্তি ও বিচার-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিচারপতি বিশ্বাস তাঁহার রায়ে বাদী ও রমেন্দ্রনারায়ণ যে অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিয়াছেন, দুই ব্যক্তির দৈহিক আকারে সাদৃশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু দুই জন লোকের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ অভিন্ন হইতেই পারে না। এই অখণ্ডনীয় যুক্তিতে তিনি উভয়ের মনোভাবের অনুসরণ করিয়া চিত্তবৃত্তির যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহা অনুপম; ইহা তাঁহার মানবচরিত্রজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে ভবিষ্যতে তিনি হয় ত অনেক জটিল মামলার বিচার করিবেন, কিন্তু তাঁহার এই রায় তাঁহাকে হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রধান ও প্রসিদ্ধ বিচারপতিগণের সহিত একাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবে। এই রায় তাঁহার বিচার-নৈপুণ্যের অতুলনীয় নিদর্শন। এই প্রকার সূক্ষ্ম বিচারের জন্য তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর ধন্যবাদভাজন। বিচারপতি মিষ্টার কষ্টেলো বিলাত হইতে তাঁহার 'রায়' পাঠাইয়া-দেওয়ায় তাহা তাঁহার 'রায়' বা 'অভিমত' বলিয়া বিবেচিত হইবে—এ সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এই মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। পূজার দীর্ঘ অবকাশের পর বিচারপতি কষ্টেলো এ দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলে শেষ আদেশ প্রদান করা হইবে; আর যদি তিনি এ দেশে প্রত্যাগমন না করেন, তাহা হইলেও পূজাবকাশের পর আপীলের শেষ সিদ্ধান্ত হইবে। দেশের জনসাধারণ এই সুবিচারে সন্তোষলাভ করিয়াছে, এ কথার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। জগতের কোন আদালতে এরূপ রহস্যপূর্ণ এত বড় মামলার বিচার পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

এই বিচারকার্য্যের সহায়তার জন্য প্রবীণ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেরূপ ত্যাগস্বীকার করিয়া প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ নিয়তির অমোঘ বিধানে দীর্ঘকাল সন্ন্যাসীর কঠোর জীবন অতিবাহিত করিয়া সুবিচারের গুণে স্বপদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য কামনা করিয়া এই জয়ে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সিন্ধুদেশে অরাজকতা

সিন্ধুদেশের অরাজকতার আর নিবৃত্তি নাই! সিন্ধুদেশের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিষ্টার গোলাম আলি পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পদত্যাগের কারণ-সমূহের প্রসঙ্গে এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক মন্ত্রীরা সিন্ধু প্রদেশের অরাজকতা দূর করিতে অসমর্থ, ইহাও তাঁহার পদত্যাগের অন্যতম কারণ। সক্কর-দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে বিচারপতি ওয়েষ্টনের সিদ্ধান্ত ত সাধারণের নিকট প্রকাশ করাই হয় নাই; কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী অরাজকতা নিবারিত হইতেছে না বলিয়া শ্রাবণের প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক বসিলেও, তাহার পূর্ব্বেই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব সার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল ঐ প্রদেশের রাজনীতিক অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন। সিন্ধু প্রদেশকে স্বতন্ত্র মুসলমান-প্রধান প্রদেশে পরিণত করিবার পর হইতে তাহার এই প্রকার উন্নতি হইয়াছে! ইহা কি কাকতালীয় ন্যায়? অথবা ইহার কোন গভীর এবং গূঢ় কারণ বর্ত্তমান? সরকারী আমলাদের মুখে প্রায়ই এইরূপ মন্তব্য শুনিতে পাওয়া যায় যে, মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে শাসনকার্য্য অতি সুন্দর ভাবে পরিচালিত হইতেছে! কিন্তু শাসনকার্য্য-পরিচালনে দক্ষতার নিদর্শন কি এইরূপ? ইহার পরিণাম কি, ভারত সরকারের তাহা বোধগম্য হওয়া কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

ভারত-রক্ষা আইনের বিনিয়োগ

ভারত-রক্ষা আইনের বিধান-ভঙ্গের অভিযোগে নিত্য বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা-বিচারে কারাগারে আবদ্ধ করা হইতেছে। দেখা যাইতেছে—যাঁহারা এইভাবে কারাগারে প্রেরিত হইতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই জাতীয়তাবাদী,—অনেকে কংগ্রেসের দলভুক্ত,—কেহ বা কংগ্রেসীদলের বহির্ভূত। অন্তঃশত্রু বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে এই ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই ভারত-রক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, দেশের লোক এইরূপই শুনিয়াছিল; কিন্তু তাহাই যদি এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রায় প্রতিদিনই দুই-এক জন, বা ততোধিক-সংখ্যক জাতীয়তাবাদী,

কর্ম্মীকে ধরিয়া জেলে আটক করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বস্তুতঃ, ইহার সদুত্তর পাওয়া কঠিন। যাহা হউক, দেশের অনেক লোক স্থানে স্থানে সভা করিয়া এবং সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া সরকারের অনুষ্ঠিত এই আচরণের প্রতিবাদ করিতেছেন। কিন্তু সকল প্রতিবাদই অরণ্যে রোদনবৎ নিষ্ফল হইতেছে; কোন প্রতিবাদেই সরকার কর্ণপাত করিতেছেন না।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, 'গোবধে খুড়া কর্ত্তা' হইলেও এই কাযের কর্ত্তা—সরকার কে? হাইকোর্ট ত রায় দিয়াছেন—মন্ত্রীরা—যাঁহারা সচিবত্ব করিতেছেন, সরকার নহেন। তবে কি এই সকল ধর-পাকড়ের জন্য গবর্ণর বা বড়লাট দায়ী? জাতীয়তাবাদীরাই যদি ভারত-রক্ষার অন্তরায় হয়, তাহা হইলে দেশের সমস্ত জাতীয়তাবাদীকে আটক করিলেই ত সকল মুস্কিলের আসান হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের প্রায় কেহই বৃটিশ সরকারের উচ্ছেদ কামনা করেন না, ইহা ত সরকারের অজ্ঞাত নহে; তবে কেহ বক্তৃতার ঝোঁকে দুই-একটা অসংযত কথা বলিয়া-ফেলিলে, তাহাতে ভারত বিপন্ন হইতে পারে এরূপ ধারণা বুদ্ধির কতখানি প্রকৃতিস্থতার পরিচয়? দেশকে বিপন্ন করিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিতে কাহারই বা ইচ্ছা? কোন জাতীয়তাবাদীই স্বদেশের শত্রু নহে। তবে তাহাদের দুই-চারিটি অসংযত উক্তির ত্রুটি ধরিয়া তাহাদিগকে জেলে পুরিয়া জনসাধারণের মনে একটা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়া কি লাভ?

অকারণ অপমান

যোগ্য এবং সম্ভ্রান্ত লোককে যাহারা সুযোগ পাইলেই অকারণ অপমানিত করে,—তাহারা আপনাদের হীন মনোবৃত্তিরই পরিচয় দিয়া থাকে। হিংস্র স্বভাব-বশতঃ নেকড়ে বাঘও মানুষকে ক্ষত-বিক্ষত করে,—যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু তাহাতে নেকড়ের সম্মান লাভ হয় না। সেইরূপ মানুষ যদি সুযোগ পাইলে কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে বিনা কারণে উৎপীড়িত করে, তাহা হইলে ঘৃণিত হয়—যাহারা অবমাননা করে তাহারাই; যাহার অপমান করে বা যাহার প্রতি অত্যাচার করে, তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। ঐভাবে নির্য্যাতিত ব্যক্তিকে লোকে হেয় মনে করে না। ডাক্তার লোহিয়াকে এক জেল হইতে অন্য জেলে হাতকড়ি দিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ঐরূপ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল না। বস্তুতঃ তাঁহার হাত খোলা থাকিলে তিনি যে প্রহরীদিগকে প্রহার করিয়া চম্পট-দানের চেষ্টা করিতেন, ইহা কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। পুলিশও সেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে অকারণ এই প্রকার ব্যবহারের উদ্দেশ্য কি? এরূপ কার্য্যে লোকের মনে অত্যাচারীর প্রতি বিতৃষ্ণারই সৃষ্টি হয়।

বাঙ্গালা ভাষায় আপত্তি

ভাঙ্গা-বাঙ্গালা জোড়া দেওয়ার সময়ে বাঙ্গালা প্রদেশকে কাটিয়া-হাঁটিয়া ছোট করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা; সুতরাং যাঁহারা খাঁটি বাঙ্গালী, তাঁহাদের কতক বিহার প্রদেশের, কতক বা আসাম অঞ্চলের অন্তর্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা কি ভাষায়, কি আচার-ব্যবহারে পূরা বাঙ্গালীই আছেন। এ-দিকে এই কাটাই-হাঁটাইয়ের ফলে বাঙ্গালা প্রদেশটি মুসলমান-প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালাকে যে-ভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা যে অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাঁহারা খাঁটি বাঙ্গালার কাটা-হাঁটা অংশগুলি পাইয়াছেন, তাঁহাদের উহা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই, অথচ এই অন্যায় ব্যবস্থার চিহ্নগুলিতেও স্থায়িত্ব দানের ইচ্ছা নাই; তাঁহারা উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতে চাহেন। সেই জন্য বিহারের কংগ্রেসী সরকারও বাঙ্গালার ঐ সকল অঞ্চল চিরকাল খাস-দখলে রাখিবার জন্য বাঙ্গালীদিগকে বিহারী ভাষা ব্যবহার করাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি আসাম প্রদেশের গবর্ণর সার রবার্ট রীড নওগাঁ বাঙ্গালী-সম্মেলনে বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালা ভাষা ছাড়িয়া অসমিয়া বা আসামী ভাষা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এইরূপ পরামর্শ দানের কারণ কি, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালী মাত্রেরই মনে হইবে, ঐ সকল বাঙ্গালীকে তাঁহাদের ভাষা এবং তাঁহাদের কৃষ্টি ত্যাগ

করিতে অনুরোধ করা নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত; উহাতে পরিণামে তাঁহাদের দারুণ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। আসাম প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন বাঙ্গালী; তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় কথা কহিয়া থাকেন। আর শতকরা সাড়ে ২১ জন মাত্র আসামী ভাষায় কথা বলে; অর্থাৎ আসামে বাঙ্গালা-ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা যত, আসামী-ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক। এই অবস্থায় এই সংখ্যালঘিষ্ট লোকদিগের ভাষা সংখ্যাগরিষ্ট লোকদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাদের প্রতি এই প্রকার অবিচার করিবার কারণ কি? আসামে অবশ্য অন্য ভাষাভাষী লোকও অনেক আছেন। কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় অল্প এবং তাঁহাদের পরস্পরের ভাষা বিভিন্ন। ভাষার বিরুদ্ধে এইরূপ যুদ্ধ-ঘোষণার কথা পূর্ব্বে কখন শুনিতে পাওয়া যায় নাই। দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্রই যেন একযোগে ধারাবাহিক অভিযান চলিতেছে!

মাধ্যমিক শিক্ষা সঙ্কট

গত ৫ই ভাদ্র বুধবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মৌলভী ফজলুল হক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা-বিষয়ক বিলখানি পেশ করেন। অন্য দিন অপেক্ষা পরিষদে ঐ দিন অধিক সংখ্যক সদস্য, এবং দর্শক-মঞ্চেও অধিক সংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ, এই বিল সাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকর্ষণ করে।

প্রধান-সচিব এবং শিক্ষা-সচিব মৌলভী ফজলুল হক বিলখানি উপস্থাপিত করিয়া সিলেক্ট-কমিটীতে পেশ করিবার প্রস্তাব করেন। জাতীয় দলের কোন সভ্যকেই সিলেক্ট-কমিটীর সদস্যপদ গ্রহণে সম্মত হইতে দেখা যায় নাই; সুতরাং তাঁহাদের কেহই সিলেক্ট-কমিটীতে থাকিবেন না। এই বিলখানি সম্বন্ধে কিছুকাল হইতে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিতেছে। সকলেই জানেন, কতকগুলি য়ুরোপীয় বণিক বহু দিন হইতেই এ দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্কোচ-সাধনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষা বিভাগের মিষ্টার জেঙ্কিন্স মাধ্যমিক শিক্ষাকে নূতন ছাঁচে ঢালিবার জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে এক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, বাঙ্গালা প্রদেশে বড় জোর চারি শত মাধ্যমিক উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ই যথেষ্ট। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালায় প্রায় ১৪ শত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। উহাতে এখন প্রায় পৌনে-২ লক্ষ ছাত্র ও ছাত্রী শিক্ষালাভ করে। তন্মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্রদিগের সংখ্যা প্রায় সওয়া লক্ষ, মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ৫০ হাজারেরও কম, এবং তফশীলভুক্ত হিন্দু ছাত্রদের ঊর্দ্ধ-সংখ্যা সাড়ে ৮ হাজার হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাত্ররাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভ করে।

এই বিলখানির বিরুদ্ধে সর্ব্বসাধারণের আপত্তি এই যে, ইহা আইনে পরিণত হইলে বাঙ্গালায় মাধ্যমিক শিক্ষা অতিমাত্র সঙ্কুচিত, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে ঠুঁঠো করা সম্ভব হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিলখানির আলোচনায় ইহার এই বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হইয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা ৫০ জন সদস্য-পরিচালিত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে। তন্মধ্যে মুসলমান সদস্য ২২ জন; ১৩ জন সরকার অর্থাৎ সচিবমণ্ডলী কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ইঁহারা যে সরকারের ধামার জিম্মাদার, ও তাঁহাদেরই মতাবলম্বী হইবেন—ইহা গণিয়া দেখিবার জন্য খড়ি পাতিবার প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং উক্ত ৫০ জনের মধ্যে ৩৫ জন হইবেন ব্যবস্থা পরিষদের সরকারী দলের মতানুবর্ত্তী। সরকারী দল অবশ্যই এক সম্প্রদায়ের য়ুরোপীয়দিগের সমর্থন পাইবেন; কারণ তাঁহারা এ দেশে শিক্ষাবিস্তারটা সুনজরে দেখেন না—লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। বাঙ্গালা দেশের ১৪ শত উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে বার তেরটি মাত্র মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত, প্রায় ৫০টি সরকারী বিদ্যালয়; অবশিষ্ট সকলগুলিই হিন্দু-প্রতিষ্ঠিত এবং হিন্দুদ্বারা পরিচালিত। বিলখানিতে মাধ্যমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত সকল ক্ষমতাই এই বোর্ডের হস্তে অর্পণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিলখানিতে বলা হইয়াছে, ম্যাট্রিকুলেশন শিক্ষার সমাপ্তি-পর্য্যন্ত যে শিক্ষা—তাহাই প্রাথমিক শিক্ষা। কিন্তু তাহার উপরও বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকার ইস্তাহার দ্বারা যে-কোন শিক্ষাকে মাধ্যমিক শিক্ষা বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন। এখন সরকারের অধীন এই বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি রাখিতে বা নির্ম্মূল করিতে পারিবেন। বোর্ড কার্য্যনির্ব্বাহক কাউন্সিলের মারফতে তাঁহাদের কার্য্য পরিচালিত করিবেন। এই কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী যেভাবে গঠিত হইবে, তাহাতে শিক্ষাবিরোধীদলের ভোটই অধিক হইবে বলিয়া বহু লোকেরই আশঙ্কা। যে সম্প্রদায় হইতে ছাত্র-দত্ত বেতন অধিক আদায় হয়, যাহারা শিক্ষা-বিস্তারকল্পে অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করে, তাহাদিগকে অপক্ক কদলী প্রদর্শন করিয়া যাহারা চিরদিন শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে পশ্চাৎপদ, এবং যে সম্প্রদায় কেবল টাকার বোঁচকা বাঁধিবার জন্যই এ দেশে প্রবাসী, তাঁহাদিগের প্রাধান্য রক্ষার জন্য যে বোর্ড গঠিত হইবে, কোন্ ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার সমর্থন করিতে পারেন?

এই পাণ্ডুলিপিখানি আইনে পরিণত হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জবাইএর ব্যবস্থা করা সহজ হইবে। তখন পাঠ্য বিষয়ের (syllabus) নির্দ্ধারণ, পাঠ্য-পুস্তক

নির্ব্বাচন, পরীক্ষা-গ্রহণ প্রভৃতির ক্ষমতা আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থাকিবে না। পাঠ্য-পুস্তকাদি প্রণয়নের ক্ষমতা বোর্ডই স্বহস্তে লইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থীদিগের 'ফি' হইতে এবং পাঠ্য-পুস্তক বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ করিতেন তাহা আর তাঁহাদের হাতে থাকিবে না। সুতরাং হকাই সচিব-সঙ্ঘের সুকৌশলে নিক্ষিপ্ত একই লোষ্ট্রের নির্ঘাত আঘাতে দুইটি পক্ষী ধরাশায়ী হইবে। অর্থাভাবে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে শীর্ণ হইতে হইবে, এবং উচ্চ শিক্ষাকেও সঙ্কুচিত হইতে হইবে; কারণ ঐ ক্ষতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থসাহায্য করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণের কোন ব্যবস্থাই পাণ্ডুলিপিতে নাই। বরং মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ডকে ২৫-২৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা!

বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইয়া দিলে আরও একটা ব্যাপার ঘটিবে। এই ১৪ শত মধ্যশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে আনুমানিক ১৩ হাজার শিক্ষক চাকরী করিতে-ছেন। তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ ১০-১১ হাজার উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু। বিদ্যালয়-সংখ্যা কমিয়া যদি তিন-চারি শতে দাঁড়ায়, তাহা হইলে ত আর অত অধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে না। তখন বড় জোর তিন-চারি হাজার শিক্ষক হইলেই চলিবে। ইহাদের মধ্যে 'মিনিমাম কোয়ালি-ফিকেশনের' মুসলমান শিক্ষক অনেক মিলিবে। সুতরাং অমুসলমান শিক্ষিত বেকার অনেক বাড়িয়া যাইবে; তাহাতে অবশ্য সচিব-সঙ্ঘের শান্কিতে ঝোলের পরিমাণ হ্রাস হইবার আশঙ্কা নাই; এ অবস্থায় বিলখানির জন্য অমুসলমান বাঙ্গালীর মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কি কোন কারণ থাকিতে পারে?

বাঙ্গালায় মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা

প্রকাশ, বাঙ্গালা সরকার এবার বাঙ্গালার মেছো-হাটায় জোর দেওয়ার মনস্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ একটা জেলে-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিবেন মনে করিয়াছেন। প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকারের 'ফিসারী' বিভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে বাঙ্গালার ক্ষতি ভিন্ন উপকার হয় নাই। বাঙ্গালার মৎস্য-সম্পদ নিতান্ত অল্প নহে;—ইহার নদী, বিলে, খালে, দামসে এবং সমুদ্রের খাঁড়িতে (Estuary) নানাবিধ মৎস্য পাওয়া যায়। এই সকল মৎস্যের চাষ করিতে পারিলে বাঙ্গালীর খাদ্য-সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পাইবে। কর্ত্তাদের মা কি এই প্রকার ইচ্ছা যে, বাঙ্গালা দেশকে মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্য ছয় টুকরা করা হইবে, এবং প্রত্যেক টুকরা এক এক জন বিশেষজ্ঞের হাতে দেওয়া হইবে। বাঙ্গালার মৎস্য-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইবে। কেহ কেহ বলেন, হাজা-মজা নদীগুলির উদ্ধার-সাধন করিতে পারিলে ভাল হয়; ইহাতে মৎস্য-চাষের সুবিধা হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এতখানি জিহ্বা বাহির করিয়া লাভ নাই; বরাদ্দ ত এক লক্ষ! আমাদের ক্ষেত্তর মালো বিবাহের বাড়ী দুই মণ মৎস্যের বায়না লইয়া এক টাকায় কোন ভাল পুষ্করিণীতে ছিপ জমা লইত, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দুই মণ মাছ ধরিয়া দিত! প্রত্যেক বিভাগের পর্য্য-বেক্ষণের জন্য এরূপ দক্ষ লোক পাওয়া যাইবে না? বাঙ্গালা সরকার 'মালদহিয়া আমের' ব্যবসায়ের চূড়ান্ত করিয়া এখন বাঙ্গালার মৎস্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিবেন? দেখা যাউক, এই সরকারী খেয়ালে মেছো-হাটার অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়; কিন্তু আমের ব্যবসায়ের নমুনার মত হাস্যোদ্দীপক না হয়!

পরলোকে পণ্ডিত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দৌহিত্র পণ্ডিত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৪৮ বৎসর বয়সে ১৫ই ভাদ্র কাশীলাভ করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তিনি সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ছিলেন; মানস-সরোবর, কৈলাস, তুষারতীর্থ, অমরনাথ, গঙ্গোত্রী যমুনোত্তরী, পশুপতিনাথ, ত্রিযুগীনারায়ণ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থস্থান পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রাণপাত আয়াসের ফলে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার বিরচিত "মানস-সরোবর কৈলাস" "হিমালয়ে পাঁচধাম" প্রভৃতি সচিত্র ভ্রমণ-বিবরণ দেশবাসীর আদর লাভ করিয়াছে—বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার সদা-হাস্য রঞ্জিত সৌম্যকান্তি স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহ—মাধুর্য্যপূর্ণ সরল ব্যবহার, শক্তিসঞ্চয়ের জন্য নিয়মিত সাধনার কথা স্মরণ করিয়া আমরা বন্ধুবিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি। কে জানিত, এত শীঘ্র তাঁহার জীবন-যাত্রার চির অবসান হইবে?

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিদেশিনী

[শিল্পী—মিষ্টার টমাস্

১৯শ বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৪৭ [ষষ্ঠ সংখ্যা

মাতৃকা-পঞ্চাশিকা

অক্ষরাং ক্ষরণাভাবাৎ অম্ভোভাবাৎ তৃষাপহাম্।
অমৃতং মৃত্যুদানাচ্চ অভয়াং শারদাং ভজে ॥১॥

এই শরতের শুভমুহূর্ত্তে শারদা দেবীর ভজনা করিতেছি। তিনি অমৃতস্বরূপা,—অমৃত সুধা, জল ও মোক্ষ—এই ত্রিবিধ স্বরূপই তাঁহার, ('সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে'—'অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে কৃৎস্নম্' 'যা মুক্তিহেতুঃ') জলের স্বভাব ক্ষরিত হওয়া (গড়াইয়া যাওয়া) কিন্তু তাঁহার ক্ষরণ (পরিণামাদি বিকার) নাই, এজন্য তিনি অক্ষরা, অথচ তাঁহাতে জলস্বরূপতা আছে—কেন না তিনি তৃষ্ণানিবারিণী, বিষয়ানুরাগ অপেক্ষা গুরুতর তৃষ্ণা ত' আর নাই, সে তৃষ্ণা তিনিই দূর করেন। অমৃত—মোক্ষস্বরূপা অথচ তিনি মৃত্যু দান করেন, এ দান অর্থে খণ্ডন, ('দো ছেদে') তাই তিনি অভয়া,—('হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ')।

আদ্যাপি নিত্যং প্রত্যগ্রা আকৃত্যাপি নিরাকৃতিঃ।
আহিতাগ্নেরিবাগ্নির্মে দীপ্রা ত্বং শরণে ভব ॥২॥

তুমি মা আদ্যা—পুরাতনী হইয়াও নিত্য নবীনা (নবযৌবনসম্পন্না), সাকারা হইয়াও নিরাকারা। অগ্নিহোত্রীর গৃহে অগ্নি যেমন দীপ্ত হইয়া উঠে—মা, তুমি আমার রক্ষণে তেমনই দৃষ্টি রাখিও।

ইন্দুং প্রবর্দ্ধ্য নখরৈঃ ভালেন চ ধৃতাঃ কলাঃ।
ইদ্ধয়ন্তী স্বতেজোভিঃ ইন্দুভূষাস্তু মে হৃদি ॥৩॥

মা, তোমার এত কৃপা যে, ইন্দুকে তোমারই নখ-প্রভায় বর্দ্ধিত করিয়াছ এবং ইন্দুকলাকে তোমার ললাটে স্থান দিয়াছ—তুমি নিজ তেজেই জাজ্জ্বল্যমানা—ইন্দু তোমার অলঙ্কার মাত্র—তুমি আমার তমোময় হৃদয়ে বিরাজ কর মা!

ঈহমানাননীহাংশ্চ ঈরয়ন্তী যথোচিতম্।
ঈড়ানান্ কল্পবল্লীব ঈশানী সা প্রণম্যতে ॥৪॥

'ঈশানী' তোমার এই নাম সার্থক, কেন না তুমি ক্রিয়ারত ও নিষ্ক্রিয় উভয়বিধ স্তুতিপরায়ণ অধিকারীকেই যথাযোগ্য প্রেরণা দিয়া থাক। আর তুমি মা, ভক্তদিগের মনোবাঞ্ছাপূরণে কল্পলতারূপিণী—তোমাকে প্রণাম করি।

উমাপ্রণববর্ণানাং ব্যাত্যাসেনাপি সঙ্গতা।
সমর্থা শোষবৃদ্ধিভ্যাং গঙ্গেব হৃদয়েঽস্তু মে ॥৫॥

'উমা'—এই নামে উ+ম+অ এই তিনটি বর্ণ আছে আর প্রণবেও আছে—অ+উ+ম, এই তিন বর্ণ, প্রণবের বিপরীতক্রমে উমানামে ঐ বর্ণ কয়টি সাজান থাকিলেও—উভয়ই তুল্যার্থবাচক। জোয়ার-ভাটায় স্রোত বিপরীত মুখে বহিলেও গঙ্গা সমানই থাকেন। সেই উমা আমার হৃদয়ে আবির্ভূতা হউন।

ঊর্দ্ধাধোদিগ্ বিদিগ্ ব্যাপ্তেঃ ঊহিতুং যা ন শক্যতে।
ঊনাপি বপুষা লোকে সূচ্যা দ্যৌরিব তাং ভজে ॥৬॥

ঊর্দ্ধ ও অধঃ, দিক্ (পূর্ব্বাদি) ও বিদিক্ (ঈশানাদি) সমস্তই ব্যাপিয়া রহিয়াছ, অথচ (ব্যাপ্তিসত্ত্বেও) তোমাকে অনুমান করা যায় না। তোমার শরীর নাই, অথচ আকাশের মত তোমার নির্দ্দেশ করা যায়। এমনই অদ্ভুত মহিমা তোমার! মা, তোমাকে ভজনা করিতেছি।

ঋগ্বেদ-গীতা ঋভুভিঃ ঋষিভিশ্চ ঋতা শিবা।
ঋতুরাজ ইবাটব্যা জগতাং শ্রীঃ পুনাতু মাম্ ॥৭॥

ঋগ্বেদে ঋভুগণ কর্ত্তৃক তোমার মহিমা গীত হইয়াছে, তুমি ঋষিগণ-পূজিতা—শিবা, বসন্ত যেমন অরণ্যের শোভা তুমিও তেমনি জগতের শ্রী, তুমি আমায় পবিত্র কর।

ৠতি-নির্জ্জিতমাতঙ্গহংসে মে মানসং সরঃ।
ৠত্যালঙ্কুর্ব্বতী ক্রীড় হংসীব সহবল্লভা ॥ ৮ ॥

ৠতি অর্থে গতি—তোমার গতিভঙ্গীর এমনই মাধুরী, যে গজরাজ বা হংসের গতি কোথায় লাগে? সেই গতি দ্বারা আমার মানসরূপ মানস-সরোবর শোভিত করিয়া হংসীর মত দয়িতসহ ক্রীড়া কর, ইহাই প্রার্থনা।

ঌকারভ্রাতৃবর্ণোত্থ-সতী-নাম ধৃতং যয়া।
ঌমাতৃজতনুত্যাগাৎ চক্রেঽন্বর্থং নমামি তাম্ ॥৯॥

ঌকারের উচ্চারণ-স্থান—দন্ত। স ও ত দন্ত হইতেই উচ্চারিত, সুতরাং স ও ত ঌ-কারের সহোদর, সেই স-কার ও ত-কার লইয়াই 'সতী' এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে, মা, তোমার একটি নাম 'সতী', এই সতী নাম তখনই সার্থক হইয়াছে, যখন দেবমাতা অদিতির জননী প্রসূতি (দক্ষ পত্নী) হইতে জাত নিজ শরীর ত্যাগ করিয়াছিলে! তোমাকে প্রণাম করি। ঌ বর্ণের অর্থ দেবমাতা।

ৡলোচন-সহস্রাশ্রুধারা-শীতলিতাখিলাম্।
দৈত্য-সম্ভব-সন্তাপ-হারিণীং তারিণীং ভজে ॥১০॥

ৡকারের অর্থ দৈত্যপত্নী, দৈত্যপত্নীদিগের নয়ন হইতে সহস্র সহস্র অশ্রুধারা পাতিত করিয়া তুমি সমস্ত বিশ্বকে শীতল করিয়াছ, দৈত্যদিগের দ্বারা বিশ্ব যখন সন্তপ্ত হইয়াছিল, তখন তারারূপে সেই সন্তাপ তুমিই হরণ করিয়াছ—তাই তুমি জগত্তারিণী, তোমাকে ভজনা করি।

এক এণাক্ষি এণাঙ্কমৌলে রূপং প্রপূর্য্যতে।
গঙ্গয়াব্ধেরিব যয়া ত্বয়া তাং শান্তয়ে ভজে ॥১১॥

হে অদ্বিতীয়স্বরূপে, হে মৃগনয়নে, এক হইলেও তুমি চন্দ্রমৌলি মহাদেবের রূপটি পূর্ণ করিয়া আছ। শিব-গৌরী মিলিত হইলেই শিবরূপের পূর্ণতা ঘটে, যেমন সমুদ্রের রূপ গঙ্গা দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে; মা! শান্তিলাভের নিমিত্ত তোমাকে ভজনা করিতেছি।

ঐশশক্তিং ত্বমেবাদৌ ঐরয়ো দ্রুহিণাদিষু।
পূষেব প্রাতরালোকং লোকে ত্বাং তাং
নতোঽস্ম্যহম্ ॥১২॥

যেমন সূর্য্য প্রাতঃকালে জগতে প্রথম আলোক সঞ্চার করেন, সেইরূপ ব্রহ্মাদির যে ঈশ্বরীশক্তি তাহা তোমার দ্বারাই প্রথমে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেই তোমাকে প্রণাম করিতেছি। (প্রাণতোষিণী-ধৃত নির্ব্বাণ-তন্ত্রবচনে ইহার প্রমাণ আছে)।

ওষধীশ-কলাং ভালে বিভূষে ভৃশমুজ্জ্বলে।
বামদৃগ্ জ্যোতিষা ধ্বস্তম্লানিং যা ত্বং নমামি তাম্ ॥১৩॥

তোমার অত্যুজ্জ্বল ললাটদেশে চন্দ্রকলা ধারণ করিয়া আছ। অথচ মাতৃকাভেদতন্ত্রে আছে যে, সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিনটি তোমার তিন নয়নে বিরাজিত—বাম নেত্রে চন্দ্র থাকায়—সেই চন্দ্রপ্রভায় জগতের মালিন্য দূর করিতেছ—লীলাময়ি! তোমাকে নমস্কার করি।

ঔষধং ভবরোগস্য পদং তে মম মাতৃকে।
ঔড্ররাগারুণং ভাতু রক্তপদ্মমিবাম্বিকে ॥১৪॥

মা, তোমার চরণযুগল আমার ভবরোগের ঔষধ। সেই চরণযুগল জবাপুষ্পের রক্তিমায় অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া কোকনদের ন্যায় আমার নয়ন সম্মুখে প্রকাশিত হউক।

অংকার ইব যাঽবাচ্য-কেবলাত্মা পরাশ্রয়ঃ।
জলবিন্দুরিবাধত্তে বীজশক্তিং নমামি তাম্ ॥১৫॥

অনুস্বার সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চদশ স্বরবর্ণ। কেবল অনুস্বারকে উচ্চারণ করা যায় না—কাজেই তাহা বাক্যের অতীত, অন্য স্বরের আশ্রয়ে উচ্চারিত হয় বলিয়াই ইহাকে পরাশ্রয় বলা যায়। মা তুমিও ত' অনুস্বারসদৃশ,—তোমার শুদ্ধস্বরূপ বাক্যের অতীত, (জগতের) তুমি পরম আশ্রয়, তন্ত্রে যত বীজমন্ত্র আছে তাহার অধিকাংশই অনুস্বারযোগে নিষ্পন্ন হয়, জলবিন্দু যেমন বৃক্ষ-বীজ-শক্তিকে উদ্বোধিত করে, তুমিও মা সেইরূপ বীজমন্ত্রের শক্তিকে ধারণ করিয়া থাক।

অঃশব্দবদ্ বিসর্গার্থ-স্বরাবসিত-সংস্থিতিম্।
বর্ণাগ্রিয়-পুরস্কার-জাতব্যক্তিং শিবাং ভজে ॥১৬॥

সংস্কৃত ভাষায় বিসর্গ ষোড়শ স্বর; বিসর্গকে বুঝাইতে 'অঃ' এইরূপ লিখিতে হয়। বিসর্গ স্বরবর্ণের অন্তিম বর্ণ, কাজেই সমস্ত স্বরবর্ণের অবসানে তাহার স্থান, আর অকারকে অগ্রে করিয়া (অঃ) নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে। মা, তোমারও ইহার সহিত সাদৃশ্য আছে। তুমি বিসর্গ কি না পুনঃ সৃষ্টির জন্য যখন স্বর্গেরও অবসান ঘটে, তখন নিজ মহিমায় অবস্থিতা হও, বর্ণ—চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ—সেই দক্ষ—কত—অম্ভৃণ প্রভৃতি ঋষিদিগের প্রতি পুরস্কার (আদর) বশতঃ তাহাদের নিকট দাক্ষায়ণী, কাত্যায়নী, আম্ভৃণীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলে—মঙ্গলময়ি মা, তোমাকে বন্দনা করিতেছি।

করুণাময়ি কল্যাণি কালি কল্মষনাশিনি।
কঞ্জকান্ত ইব ধ্বান্তং মোহং পাদেন মে জহি ॥১৭॥

হে করুণাময়ি—মঙ্গলদায়িনি—কলুষনাশিনি কালি! সূর্য্য যেমন নিজ (পাদ) কিরণ দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করেন—তেমনই তুমি তোমার (পাদ) চরণ দ্বারা আমার মোহ দূর কর।

খড়্গ-খেটক-খট্বাঙ্গায়ুধান্ পাণিষু বিভ্রতীম্।
পদ্মষণ্ড ইব ব্যালান্ দুর্গে ত্বাং প্রণমাম্যহম্ ॥১৮॥

মা, তুমি হস্তে খড়্গ, চর্ম্ম, খট্বাঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়া আছ—সেগুলি পদ্মসমূহের উপর সর্পের মত দেখাইতেছে, তোমাকে প্রণাম করি।

গণেশমঙ্কে দধতী গৌরী যা রাজতে পরম্।
মেরুভূরিব মন্দার-পুষ্পচ্ছন্না নমামি তাম্ ॥১৯॥

(রক্তবর্ণ) মন্দার পুষ্প সমাবৃত মেরুপর্ব্বত-স্থলী যেমন শোভা পায়, গণেশকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গৌরী তেমনই বিরাজ করেন—গণেশ-জননি! তোমায় নমস্কার।

ঘোরঘণ্টোত্থঘোষেণ যস্যা দৈত্যা ভ্রমাকুলাঃ।
ঘূর্ণ্যন্তে শুষ্কপত্রাণি বাত্যয়েব ভজামি তাম্ ॥২০॥

বাত্যাবেগে শুষ্ক পত্রসমূহ যেমন ঘূর্ণিত হয়—যাঁহার ঘোরঘণ্টাধ্বনিতে দৈত্যকুল সেইরূপ বিভ্রান্ত হইয়া থাকে,—সেই দুর্গাকে ভজনা করি।

ঙুতি-নির্জ্জিত-সাপত্ন্য-বলপৌরুষগর্জ্জিতে।
বজ্রাধিকক্রমে হিংস্যা মদঘাসুরমম্বিকে ॥২১॥

ঙুতি-অর্থে—শব্দ, হে অম্বিকে—তোমার সিংহনাদে শত্রুদিগের বল-পৌরুষ-গর্জ্জন সমস্তই থামিয়া যায়, বজ্র অপেক্ষা ভীষণ পদবিক্ষেপে আমার পাপরূপী অসুরকে নিহত কর, মা!

চণ্ডীং চণ্ডাংশু-কোটিভ্যশ্চণ্ডতাং তেজসোঽরিষু।
চান্দ্রীং তৃপ্তিং কিঙ্করেষু কিরন্তীং সততং ভজে ॥২২॥

কোটি সূর্য্য অপেক্ষা প্রচণ্ড রৌদ্রতা শত্রুদিগকে যিনি প্রদান করেন, অথচ নিজ ভক্ত—দাসগণের প্রতি চন্দ্রকিরণোচিত স্নিগ্ধতা বিতরণ করেন, সেই চণ্ডীকে সর্ব্বদা ভজনা করিতেছি।

ছাদয়ত্যখিলং বিশ্বং মাতা ভ্রূণমিবাত্মনঃ।
ছত্রং যা মোহবর্ষে চ ছন্দতঃ সাস্তু মে হৃদি ॥২৩॥

মাতা যেমন গর্ভস্থ শিশু (ভ্রূণ)কে আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন, তেমনই এই সমগ্র বিশ্বকে যিনি আবৃত করিয়া থাকেন (ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্) এবং মোহরূপ বৃষ্টিধারায় যিনি ছত্রস্বরূপ—সেই বিশ্বজননী আমার হৃদয়ে লীলাবশে আবির্ভূতা হউন।

জগজ্জননি জাত্যন্ধো জন্মনীক্ষণবঞ্চিতঃ।
জাতোঽজাতবৎ সোঽহং তব ত্রায়েয় শঙ্করি ॥২৪॥

হে জগজ্জননি, জন্মান্ধ যেমন জন্মের মত দৃষ্টিবঞ্চিত হয়, তদ্রূপ আমিও (তোমা হইতে) জন্মলাভ করিয়াও চিরদিন অজাতবৎ থাকিলাম। তোমাকে মাতৃরূপে কোন দিনই জানিতে পারিলাম না, মা শঙ্করি, যেন তোমার অহেতুককৃপায় পরিত্রাণ পাই, ইহাই প্রার্থনা।

ঝঞ্ঝাবাত ইবাসহ্যাঘাতঃ সংসারচণ্ডিমা।
ঝটিত্যুৎসার্য্য তং মাতঃ পাহি মাং শরণাগতম ॥২৫॥

সংসারের প্রচণ্ডতা—ঝঞ্ঝাবাতের মত, তাহার আঘাত অসহ্য। মা, আমি তোমার শরণাগত—সেই প্রচণ্ড সংসার ভাব সত্বর দূরীভূত করিয়া আমাকে রক্ষা কর।

ঞবরৈর্নারদহাহাহূহূতুম্বুরুভিঃ শিবা।
বীণেব সুস্বরোদ্গীতা সদা শ্রুত্যাস্তু মে হৃদি ॥২৬॥

ঞ শব্দে গায়ক, শ্রেষ্ঠ গায়ক নারদ, হাহা হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব এবং তুম্বুরু মুনি যাঁহার মহিমা গান করিয়া থাকেন—সুস্বরে উদ্গীত বীণার ন্যায় সেই শিবা শ্রুতি (বেদ) মূর্ত্তিরূপে আমার হৃদয়ে সদা বিরাজ করুন। বীণাও শ্রুতি (স্বরগ্রাম) মূর্ত্তি।

টঙ্কায়সে যমত্রাসগ্রাবণি জ্যাটঙ্কৃতীয়সে।
নাম্না টঙ্কারঘশ্রোত্রে টেকেয় হৃৎপদং শিবে ॥২৭॥

মা, টঙ্ক যেমন প্রস্তর বিদীর্ণ করে, তেমনই তোমার নামে যম-ভয় চূর্ণ হইয়া যায়, আর পাপ নিজেই বিহ্বল হয়, কেন না, পাপের কর্ণে তোমার নাম জ্যাটঙ্কারবৎ কষ্টদায়ক—হে শিবে, যেন তোমার পাদপদ্ম পাইতে পারি।

ঠার্দ্ধকায়হরায়াস্তেঽত্রাস্তি নিষ্ঠুরতা শিবে।
সৌষ্ঠবং ত্বস্তি কারুণ্যে তৎ ত্বাহং শরণং গতঃ ॥২৮॥

মা, তুমি শিবের অর্দ্ধকায় (বামাঙ্গ) হরণ করিয়াছ (এবং তাহাতে নিজ অর্দ্ধাঙ্গ যোজনা করিয়াছ) এ বিষয়ে তোমার নিষ্ঠুরতা থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার কারুণ্য-বিষয়ে সৌষ্ঠবও প্রকাশিত। আমি অধম, তোমার করুণার অযোগ্য হইলেও তুমি যে আমায় করুণা কর, তাহার কারণ,—তোমার করুণায় সৌষ্ঠব আছে—সর্ব্বত্র যোগ্যা-যোগ্যনির্ব্বিশেষে সমান ভাবে করুণা বিতরণ কর, তাই আমি তোমার শরণাপন্ন। বর্ণপক্ষে নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি পদে—ঠকার অর্দ্ধমাত্র, তাই সৌষ্ঠবেও ঠকারের অভাব নাই।

ডমরুধ্বনিনা প্রীতে ডামরোদিতসাধনে।
ডমরোত্থমমাধেহি যমে চাস্তিকগে শিবে ॥২৯॥

ডামর-তন্ত্রে তোমার সাধনার কথা উক্ত হইয়াছে—মা, তুমি ডমরুধ্বনি বড় ভালবাস, আমার সমীপস্থিত যমের উদ্দেশে ডমরুধ্বনি কর, যাহাতে যম ভীত হইয়া শৃগালের ন্যায় পলায়ন করে।

ঢক্কানাদেন যা প্রীতা বীণয়েব সরস্বতী।
ঢৌকতে কিঙ্করং ভৃঙ্গো যথা পদ্মং নমামি তাম্ ॥৩০॥

বীণারবে যেমন সরস্বতী, তেমনই তুমি ঢক্কারবে পরিতুষ্টা, ভৃঙ্গ যেমন পদ্মমধ্যে প্রবেশ করে, তুমিও মা সেইরূপ কিঙ্করের অন্তঃপ্রবিষ্ট হও, তোমায় নমস্কার।

ণকার ইব মূর্দ্ধন্যা ণদানাৎ যা হৃদম্বুজে
স্বয়ঞ্চার্কদ্যুতির্ভাতি তমোনাশায় তাং ভজে ॥৩১॥

ণ (জ্ঞান) দান করেন বলিয়া যিনি ণ কারের মতই মূর্দ্ধন্যা (বর্ণপক্ষে মূর্দ্ধদেশে উচ্চারণীয়, দেবীপক্ষে শ্রেষ্ঠা), এবং হৃৎপদ্মে স্বয়ং রবিপ্রভার মত প্রতিভাত, তমোনাশ করিবার জন্য তাঁহাকে ভজনা করি।

অথচ জ্ঞানদান হেতু গুরুভাবে তিনি শিরঃস্থ সহস্র দলপদ্মে অবস্থিতা, এজন্য মূর্দ্ধন্যা, আর দেবতাভাবে হৃৎপদ্মে বিরাজিতা, পদ্মের বিকাশক সূর্য্য তিনিও স্বয়ং সূর্য্যতুল্যা, এইজন্য তমঃ (অন্ধকার ও অজ্ঞান) নাশের জন্য প্রার্থনা।

তারা ত্বমসি সংসারতারণাৎ তে পদং তরিঃ।
তৎ সোপায়া তারয়িতুং তোকং মাং ত্বরসে
ন কিম্? ॥৩২॥

সংসারের তারণ কর বলিয়া মা তোমার নাম তারা, তোমার পদ হইল তরি, সুতরাং তোমার নিকটেই তারণের (উপায়) সাধন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান, তবে মা, এই তনয়টিকে তারণ করিতে ত্বরা নাই কেন ?

প্রুড়ন্তীং পরতেজাংসি থুর্ব্ববন্তীং সন্ততং তমঃ।
থুৎকৃত্যাঞ্চিতকামোর্হর্কনিভাং বন্দেয় সুন্দরীম্ ॥৩৩॥

শত্রুতেজঃ বা পরের তেজঃ যিনি সূর্য্যবৎ আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন এবং বহুল (তমঃ অজ্ঞান ও অন্ধকার) দূর করেন, যিনি থুৎকারের দ্বারা কামকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে বন্দনা করিতেছি।

দেবেষু দক্ষিণাং বন্দে দুর্গাং দানবদারিণীম্।
দয়াহিংসে শ্রিতাং সাধুদস্যু বিন্ধ্যাটবীমিব ॥৩৪॥

দেবগণের প্রতি চির অনুকূলা—দানবঘাতিনী দুর্গা, সাধু ও দস্যুর আশ্রয়স্থল বিন্ধ্যবনভূমির মত, দয়া ও হিংসা উভয়েরই আশ্রয়,—সেই দুর্গাকে বন্দনা করি।

ধনদাং ধন্যধেয়াঙ্ঘ্রিং ধৈর্য্যযোগোচিতগ্রহাম্।
ধরেয় হরিণীং দুর্গাং ধ্যানস্খলনদুর্লভাম্ ॥৩৫॥

ধৈর্য্য ও একাগ্রতাযোগে যাঁহাকে জানিতে পারা যায়, ধন্য পুরুষগণেরই ধারণযোগ্য যাঁহার চরণকমল, ধ্যান-ভ্রংশ হইলে যাঁহাকে আর জানা যায় না, (হরিণী) মরকত-বর্ণা সেই ধনদা দুর্গাকে যেন (জ্ঞানযোগে) লাভ করিতে পারি। পক্ষান্তরে, লক্ষ্যে একাগ্রতা থাকিলে যেমন হরিণীকে ধরা যায়—লক্ষ্যভ্রংশ হইলে আর তাহাকে পাওয়া যায় না, কৌশলী ব্যক্তি পদেই বন্ধন দিয়া হরিণীকে ধরিয়া ফেলে। (লক্ষ্যবেধের সহিত সাধনার তুলনা—ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। 'ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রম্' ইত্যাদি (মুণ্ডক ২।২)।)

নিতান্তসুখসংস্পর্শাৎ নিস্পন্দে নীললোহিতে।
নিদধানাং পদাম্ভোজং নিত্যমাদ্যাং নমাম্যহম্ ॥৩৬॥

মা, তোমার পদকমলস্পর্শের সুখাতিশয্যে শিব শববৎ নিস্পন্দ হইয়া আছেন, সেই শিবের উপরে যিনি পাদপদ্ম নিহিত করিয়াছেন, সেই তুমি কালী, তোমায় নিত্য নমস্কার করি।

প্রথমং প্রকটাং বিশ্বপ্রপঞ্চনপটীয়সীম্।
প্রেতাখ্যপদ্মজাদিভ্যঃ প্রত্তশক্তিং পরাং ভজে ॥৩৭॥

মা, সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমিই প্রথমে প্রকটিত হইয় বিশ্বপ্রপঞ্চরচনায় নৈপুণ্য দেখাইয়াছ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে তুমিই শক্তি প্রদান করিয়াছ বলিয়া তাঁহারা জীবন্ত হইয়াছেন, নতুবা তাঁহারা ছিলেন প্রেতরূপী। সেই পরা—পরব্রহ্মময়ী তোমাকে ভজনা করিতেছি। [প্রাণ-তোষিণীধৃত কুব্জিকাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন চ ব্রহ্মা কদাচন। অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ইত্যাদি]

ফুল্লকোকনদারোহফলদ্বৈগুণ্যধীপদাম্।
ফণিযজ্ঞোপবীতেষু স্ফারাং দুর্গাং পরাং ভজে ॥৩৮॥

প্রস্ফুটিত কোকনদে স্থাপিত করার ফলে—মা তোমার চরণকমল যেন দ্বিগুণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, যজ্ঞোপবীতাকারে তোমার অঙ্গে সর্প বিরাজিত—সেই তোমার জগদ্ধাত্রী দুর্গামূর্ত্তিকে ভজনা করিতেছি।

বিভ্রত্যব্জারিচাপেষূন্ বাহুভির্বেদমানিভিঃ।
বোধয়ন্তী বলারাতিং ব্রহ্ম সা ত্বং নমস্যসে ॥৩৯॥

বেদবৎ মাননীয় চারি হস্তে তুমি শঙ্খ-চক্র ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া আছ—তুমি যে মূর্ত্তিতে ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলে—সেই দুর্গামূর্ত্তিকে নমস্কার।

ভবপ্রিয়া ভবাপায়া ভূতিভূরপ্যভূতি-ভূঃ।
ভয়দা ভয়হন্ত্রী ত্বং ভূতযোনিশ্চ ভাব্যসে ॥৪০॥

তুমি ভব (শিব) প্রিয়া—অথচ ভব (সংসার) বিনা-শিনী, তুমি ভূতি (সম্পৎ) প্রদায়িনী অথচ অভূতির (পুনর্জন্ম না হওয়ার) স্থান—মোক্ষ-ভূমি, তুমি ভয়ঙ্করী (কালী বা তারা মূর্ত্তিতে) অথচ ভয়নিবারিণী (হস্তে বরাভয় প্রদর্শন হেতু) এবং সমস্ত জগৎ প্রাণী তোমা হইতেই উদ্ভূত।

মনাগপি মতির্যস্য মহোরূপে পদে তব।
মুচ্যতে স ক্রমাৎ প্রাতর্ধ্বান্তাদ্বেতি ত্বমেহি মাম্ ॥৪১॥

হে তেজোময়ি, তোমার পদে নিমেষের জন্যও যাহার মতি থাকে, সে ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করে, যেমন প্রাতঃকাল

অন্ধকার হইতে ক্রমশঃ মুক্ত হয়, সেইরূপ। তাই মা! তুমি আমার নিকটে আগমন কর!

যাতুং নালং হৃদাপি ত্বাং যত্নহীনোঽস্মি সর্ব্বথা।
যদি তে করুণা দাসে যাচে ত্বামেহি শঙ্করি ॥৪২॥

আমি হৃদয়ের দ্বারাও তোমার নিকট যাইতে অক্ষম; কেন না, সর্ব্বপ্রকারে আমি যত্নহীন। যদি দাসের প্রতি তোমার করুণা হয়, মা শঙ্করি, তুমি এস, ইহাই প্রার্থনা করি।

রমসেঽনিশমন্তঃস্থা রসাভাবান্ন লক্ষ্যসে।
রাগোন্তাব্যা হি সর্ব্বত্র রূঢ়া বিদ্যুৎ তথেহি মাম্ ॥৪৩॥

তুমি ত দূরে নও—অন্তরে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছ—কিন্তু আমি তোমায় দেখিতে পাই না—অনুরাগের অভাবে; বিদ্যমান থাকিলেও তড়িৎ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষ হয় তখনই—যখন রাগ (অনুরাগ, রক্তিমা) যুক্ত হয়; আমাকে তোমার প্রতি সেই অনুরাগ দাও—তাহা হইলেই তোমার আগমন সিদ্ধ হইবে।

লূতেব তন্তুভির্বদ্ধা লীনাদৎসেঽজ্ঞজন্মিনঃ।
লতেব গহনাস্যন্ব লীলৈষা তে নমামি তাম্ ॥৪৪॥

উর্ণনাভের মত মা তুমি গোপনে থাকিয়া অজ্ঞ জীবকে তন্তু দ্বারা বদ্ধ করিয়া গ্রহণ কর, অথচ তুমি লতারাজির ন্যায় দুর্গম (দুষ্প্রবেশ, পক্ষান্তরে দুর্জ্ঞেয়)—হইয়া আছ—লীলাময়ি! তোমায় প্রণাম করিতেছি। সেই তন্তু কি?

বাসনাস্তন্তবস্তে হি ব্যাপ্তং তাভির্মনো নৃণাম্।
বিসৃজ্যতে ত্বদীয়ানাং বরদে মাং নিজং কুরু ॥৪৫॥

বাসনাই তন্তু, তাহার দ্বারাই মানব-মন আবদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তোমার নিজ জন, তাহাদের মন বাসনামুক্ত হয়, বরদে! আমায় তোমার নিজ জন করিয়া লও!

শমাদিমন্তস্তত্ত্বজ্ঞাঃ শুদ্ধাস্ত্বৎসাধনাশ্রয়াঃ।
শাম্যন্ত্যর্ক ইবাভাসা শ্যামে ত্বয়ি নমোঽস্তু তে ॥৪৬॥

মা শ্যামা, তোমায় প্রণাম করিতেছি,—তোমার তত্ত্ব যাহারা জানে এবং শমদমাদি গুণসম্পন্ন পবিত্রচেতাঃ হইয়া যাহারা তোমার সাধনা অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা সূর্য্যে প্রভালয়ের মত তোমাতেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। জীব ত' তোমার চিদংশের আভাসমাত্র।

ষড়িন্দ্রিয়জয়ী ধীরঃ ষোড়শি ত্বৎপদপ্লবঃ।
ষড়ূর্ম্মীঃ সংসৃতের্লঙ্ঘন্ পারং যাতি নমোঽস্তু তে ॥৪৭॥

হে মা ষোড়শি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে যিনি জয় করিয়াছেন—এরূপ ধীর ব্যক্তি তোমার পদকমলকে ভেলা করিয়া এই সংসার-সমুদ্রের ছয় উর্ম্মি (শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ ও পিপাসা) অতিক্রম করিয়া পরপারে চলিয়া যায়।

সোঽহং সাহং পরে ত্বাহুস্তদ্রূপস্বাত্মভাবনে।
সর্ব্বভূতমহস্ত্বাং তু সেবেয় ত্বৎপদানতঃ ॥৪৮॥

তোমার স্বরূপের সহিত অভেদজ্ঞানে আত্মচিন্তা বিষয়ে কেহ বলেন,—'সোঽহম্' কেহ বা বলেন 'সাহম্'। আমি কিন্তু, সর্ব্বভূত-তেজঃস্বরূপা তোমার পদানত হইয়া যেন তোমাকে সেবা করিতে পারি, এই প্রার্থনা।

হানায় ভববন্ধস্য হন্তুমান্তরবৈরিণঃ।
হেতিং সর্ব্বৈরখণ্ড্যাং ত্বাং হেতুং বিশ্বস্য সংশ্রয়ে ॥৪৯॥

মা! ভববন্ধনচ্ছেদের জন্য ও অন্তঃশত্রুনাশের জন্য অখণ্ডনীয় অস্ত্ররূপা তুমি এবং সমস্ত বিশ্বের হেতুভূতা তুমি, আমি তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম।

ক্ষমস্ব জগতাং মাতঃ ক্ষীণস্য মম দুর্দ্ধিয়ঃ।
ক্ষান্তিহীনস্যাপরাধং ক্ষমারূপে নমোঽস্তু তে ॥৫০॥

হে ক্ষমারূপিণি জগজ্জননি! ক্ষীণ—ক্ষমাগুণবর্জ্জিত—দুর্ম্মতি—আমি—আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কর—তোমায় নমস্কার।

লীলামূর্ত্তিবিশেষমীপ্সিততয়া ভক্তৈঃ স্বয়ং গৃহ্নতী
ভেদং সাধনমন্ত্রযন্ত্রঘটিতং শ্রুত্বা স্ফুটং কুর্ব্বতী।
'একাপি প্রতিভাসি নৈকবিষয়া গঙ্গা যথাম্বুস্তয়ো-
স্তীর্থৈর্নৈকপদাঙ্কিতৈরভিহিতা
স্তোত্রেঽত্র তৎসূচিতম্ ॥৫১॥

ভক্তগণের অভীপ্সিত বলিয়া মা তুমি স্বেচ্ছায় এক

একটি লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া থাক, সাধকের মন্ত্র ও যন্ত্রভেদে—অধিকারানুসারে রূপভেদ—তুমিই পরিস্ফুট করিয়া দাও। কিন্তু তুমি স্বরূপতঃ অদ্বিতীয়া, গঙ্গা যেমন হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত এক হইলেও নানাতীর্থ ভেদে সেই সকল তীর্থনামের সহিত সংযুক্ত হইয়া পৃথক্‌রূপে পরিচিতা হ'ন, 'যেমন কাশীর গঙ্গা, হরিদ্বারের গঙ্গা' ইত্যাদি, তদ্রূপ তুমিও অধিকারি-ভাবনা ভেদে রূপভেদ দেখাইয়া থাক, এই স্তবে তাহাই সূচিত হইয়াছে।

কালী দুর্গা ষোড়শী তারিণীতি
প্রাপ্তৈর্নানানামভির্বোধিতা সা।
মাসে মাসে নামভেদো হি ভানো-
রেকস্যৈব শ্রাবিতঃ শাস্ত্রবাচা ॥৫২॥

কালী তারা দুর্গা ষোড়শী এইরূপ নানা নামে মা তুমি কথিতা হইয়া থাক। যেমন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, একই সূর্য্য মাসে মাসে পৃথক্ নামে অভিহিত হ'ন। বৈশাখ মাসের সূর্য্যের নাম—বিবস্বান্, জ্যৈষ্ঠের—অর্য্যমা, ইত্যাদি। সেইরূপ তুমিও ভিন্ন নামে কথিতা হইলেও—স্বরূপতঃ এক—অদ্বিতীয়।

যা প্রত্যক্ষরমুচ্যমানমহিমা যা যোনিরেষাং পরা
খ্যাতানাং খলু মাতৃকেতি জননাদ্
বাঙ্-মন্ত্র-নাকৌকসাম্।
শব্দব্রহ্মময়ীত্যধিশ্রুতি পরব্রহ্মেতি যা চোচ্যতে
কিং সাবর্ণ্যনুমাতৃকাক্রমমুখং শ্লোকৈর্ম মাগঃ
পরম্ ॥৫৩॥

যাঁহার মহিমা প্রতি অক্ষরে কথিত হইল—তিনিই সমস্ত অক্ষরের উৎপত্তি-স্থান, এবং বাক্য—মন্ত্র ও দেবতার উৎপত্তিহেতু বলিয়া তাঁহার নাম মাতৃকা। যিনি শব্দ-ব্রহ্মময়ী বেদে পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিতা, তাঁহার স্বরূপ-বর্ণনা—অকারাদি বর্ণক্রমে কি কখনও সম্ভবপর হয়? বস্তুতঃ ইহাতে আমার অপরাধই ঘটিয়াছে।

অথবাসুরবিদ্ধপাপ্মনঃ পরিমোক্ষায় গিরাং
মমোদ্যমঃ।
প্রহিতস্তু মতিস্থয়া ত্বয়া যদি বা তন্ময়ি
কাপরাদ্ধতা ॥৫৪॥

অথবা ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।২) কথিত হইয়াছে যে, বাক্য যদি অসুরভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহা পাপস্বরূপে পরিণত হয়, সেই পাপনাশের জন্য মা আমার এই স্তোত্ররচনায় উদ্যম,—এখন ত' অসুরভাবের বিস্তারে সর্ব্বদাই বাক্য ও মন অপবিত্র হইতেছে। অথবা যদি তুমি স্বয়ংই আমার বুদ্ধিস্থিত হইয়া এই স্তোত্ররচনায় প্রবর্ত্তিত করিয়া থাক, তাহা হইলেই বা আমার অপরাধ কি?

ধৃষ্টোক্তিরেষা মূঢ়োঽহমপরাধশতৈর্যুতঃ।
ক্ষম্যোঽস্মি মাতা পুত্রত্বাদ্ নিসর্গকৃপয়াথবা ॥৫৫॥

কিংবা সব কথাই আমার ধৃষ্টতার পরিচায়ক; আমি মূঢ়, মা তোমার নিকটে শত অপরাধে অপরাধী; কিন্তু আমি তোমার পুত্র বলিয়াও ত' ক্ষমার যোগ্য? অথবা পুত্র বলিয়া যদি গ্রহণ না কর—করুণাময়ি! তোমার স্বভাবসিদ্ধ করুণা দানে আমাকে ক্ষমা করিও।

স্তব—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।
অনুবাদ—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।

'মাতৃকা'র একটি অর্থ বর্ণমালা; সংস্কৃত ভাষায় বর্ণ পঞ্চাশটি; ষোলটি স্বরবর্ণ এবং চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ। আধুনিক বঙ্গভাষা হইতে দীর্ঘ ঌ ও ৠ উঠিয়া গিয়াছে এবং অনুস্বার ও বিসর্গ ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণীতে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণের মধ্যেই। শব্দই ব্রহ্ম, শব্দ হইতেই জগৎ সৃষ্টি, শব্দের যে সূক্ষ্মতর অবস্থা আছে, তাহাকে ব্যবহার জগতে আনিতে পারা যায় না, প্রথম স্থূলাবস্থাই মাতৃকারূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়; যিনি শব্দ-মাতৃকা তিনিই জগন্মাতৃকা—এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে প্রত্যেক বর্ণকে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মময়ী জগজ্জননীর স্তব রচনা করা হইয়াছে। রচয়িতা কাশীধামে জাহ্নবীতটে শয়ান হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় এই স্তব করিয়াছেন। এই স্তবের ভাব সাধারণের বুঝিবার জন্য অনুবাদ দেওয়া হইল—প্রকৃত পক্ষে সংস্কৃতভাষার সম্পূর্ণ-ভাব অনুবাদে সম্যক্ প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।—অনুবাদক।

সেনাট্-রয়

[গল্প]
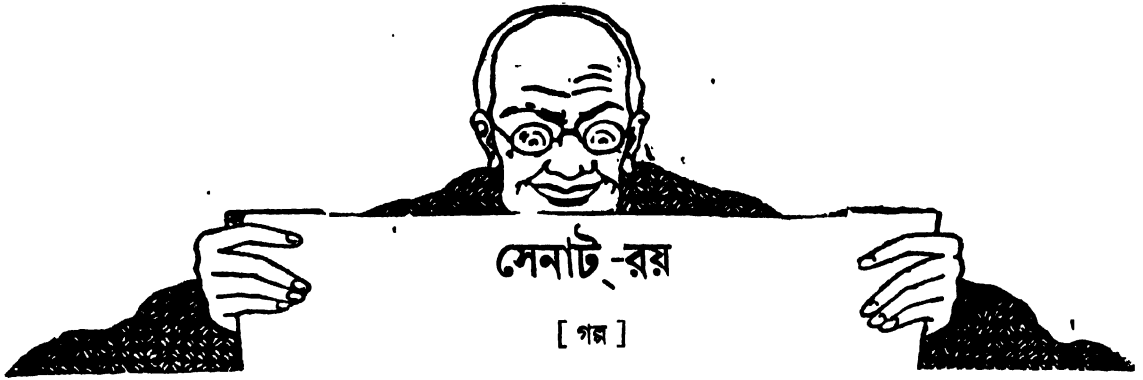
সরিষার তৈল	...	/১।০	...	॥/১০
লবণ	...	/॥৵০	...	৻১৭॥
আটা	...	/২॥০	...	।৵০
লঙ্কা	...	...	...	৻১৫
মিছরী	...	...	...	/১৫
মিঠে-কড়া তামাক		...	...	৻১০
গুড়	...	/১।০	...	৶/১৫
				১।৶ ২॥

পাঁচকড়ি নন্দীর মুদীখানা দোকান হইতে শ্রীনাথ উক্ত দ্রব্যগুলি লইল এবং হিসাব জুড়িল, দেখিল, মোট ১।৶২॥ হইয়াছে। কহিল—“৮॥৻১৭॥ আমায় ফেরত দিতে পারবি ত রে হলা? আমি দশ টাকার নোট্ দোবো।”

হলধর—পাঁচকড়ি নন্দীর মেজ ছেলে। সকালবেলায় সে-ই দোকানে বসে। হলধর কহিল—“নোটের চেঞ্জ! তা হোলেই মুস্কিলে ফেল্‌লেন ঠাকুর মশাই। মোটে তিনটা টাকা ত’বিলে আছে; চেঞ্জ ত হয় না।”

একটু বিজ্ঞের মত শ্রীনাথ কহিল—“খুব হয়। ঐ তিনটেই এখন দে, বাকী ৫॥১৭॥ সন্ধ্যাবেলা দিলেই হবে; আমার ত আর এখনি সব চাই না—” বলিয়া টাকা তিনটা হলধরের কাছ হইতে লইয়া সোজা-পাকে ট্যাঁকে গুঁজিল। কিন্তু উল্টা-পাকে নোট্ খুলিতে গিয়া দেখিল, নোট্‌খানা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং হলধরের উদ্দেশ্যে কহিল—“নোট্‌খানা আন্‌তে ভুলে গেছি রে হলা, এগুলো রেখে আসি, আর নোটখানা নিয়ে আসি।”

হলধর কহিল—“বেশী যেন দেরী করবেন না, ঠাকুর মশায়; সকাল বেলাটা খদ্দেরের সময়, টাকাকড়ি...”

বাধা দিয়া শ্রীনাথ জিনিষগুলা হাতে তুলিয়া লইতে লইতে কহিল—“বলি, আমার বাড়ী ত লক্ষ্ণৌ-দিল্লী নয়, আর দশ-বিশ কোশ তফাতেও নয়। এইটুকু যাবো, জিনিষ ক’টা রাখবো, আর নোটখানা...।” দোকান হইতে নামিয়া হন্‌হন্ করিয়া শ্রীনাথ গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল; তাহার মুখের বাকী কথাগুলা সুতরাং হলধরের কর্ণ-গোচরই হইল না।

খরিদ্দারের ভীড়ে আর কাজের গোলমালে হলধরের মনেই পড়ে নাই যে, শ্রীনাথ ঠাকুর নোট দিয়া যায় নাই। অনেক বেলায়, দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় কথাটা তাহার মনে পড়িল, এবং বরাবর শ্রীনাথের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল; শ্রীনাথ তখন স্নানান্তে পূজায় বসিয়াছিল। সুতরাং বার-কতক বৃথা ডাকাডাকির পর হলধরকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

সন্ধ্যার সময় শ্রীনাথ একটু যেন রুষ্ট হইয়াই নন্দীদের দোকানে আসিল। এ-বেলা স্বয়ং পাঁচকড়িই দোকানে ছিল। শ্রীনাথ কহিল—“হলাটার কি আক্কেল বল দেখি, পাঁচু! পুজোয় বসিচি, সেই সময় গিয়ে কি না...। আরে, আমি কি ভিন্‌-গাঁয়ের লোক, না—গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্চি। নোটখানা বালিসের তলায় রেখেছিলুম, আর খুঁজেই পেলুম না। কোথায় যে গেল; দশ-দশটা টাকা! কতটা লোকসানের বরাত দেখ্ দেখি। তার ওপর, হলা গিয়ে চীৎকার সুরু কোরে দিলে! পুজোটাই আজ ভাল ক’রে হ’ল না। ঝাড়া দু’টি ঘণ্টা যেখানে আমার পুজোয় লাগে, সেখানে...”

পাঁচকড়ি বেশ নম্রভাবে, মিষ্টি করিয়া কহিল—“হলার কথা ছেড়ে দাও, ছিনাথ ঠাকুর; ওর কি কিছু, তোমার গিয়ে সুদ্ধি-বুদ্ধি আছে তা নোটখানা এনেছ ত?”

“আনব কি ক’রে খুঁজে কি আর পেলুম, যে

আনবো। কাল একবার ভাল কোরে খুঁজবো। তোর কোন চিন্তা নেই, পাঁচু; না পেলে, লোকসান্ আমারই; তোর টাকা আর যাবে কোথা বল্। শ্রীনাথ রায় যদি হঠাৎ ম'রেও যায় তা হোলে ভূত হোয়েও তার পাওনাদারদের সে…"

পাওনাদারদের সে ঘাড় মট্‌কাইবে, না,—পাওনা শোধ করিয়া দিবে, সেটা ঠিক বুঝা গেল না; যেহেতু, বাকী কথাগুলা অস্পষ্টভাবে বলিতে বলিতে শ্রীনাথ ও-পাড়ার পথ ধরিয়া হন্-হন্ করিয়া চলিয়া গেল। ও-পাড়ার যুবকেরা শ্রীনাথের উৎসাহে মাসখানেক হইল থিয়েটারের ক্লাব বসাইয়াছিল। হরি-সভার পাশে যে খালি ঘরখানা পড়িয়াছিল, সেইখানে প্রত্যহ আখড়া বসে। শ্রীনাথ সেইখানে গেল।

পরদিন প্রভাতে দোকানে আসিবার সময় হলধর নোটের জন্য তাগাদা করিতে শ্রীনাথের বাড়ীতে আসিয়া শ্রীনাথের স্ত্রী উষাবতীর মুখে শুনিল যে, শ্রীনাথ রাত থাকিতে উঠিয়া পাঁচটা দশের ট্রেণে হুগলী গিয়াছে; সন্ধ্যার ট্রেণে বাড়ী ফিরিবে।

সন্ধ্যার ট্রেণে ষ্টেশনে নামিয়া শ্রীনাথ বরাবর ও-পাড়ার ক্লাবে গিয়া হাজির হইল, এবং সমবেত সকলের চিন্তা ও উদ্বেগপূর্ণ মুখ হইতে সংবাদ শুনিল যে, গতরাত্রে ক্লাবের হার্ম্মোনিয়মটি চুরি হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনাথ চমকাইয়া উত্তর করিল—"কি কোরে চুরি হ'ল ?"

"তালা ভেঙ্গে।"

শ্রীনাথের মুখে বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল। হার্ম্মোনিয়ম কিনিবার টাকার জন্য তাহাকে যদিও কোনও চাঁদা দিতে হয় নাই বটে, কিন্তু আর সকলকেই ত চাঁদা দিতে হইয়াছে। পঁয়ষট্টি টাকার অমন সুন্দর হার্ম্মোনিয়মটা! …এখনো একটা মাসও হয় নাই…আহা-হা…!

পরদিন প্রভাতে শ্রীনাথ, নন্দীদের দোকানে আসিয়া হলধরকে কহিল—"নোটখানা খোয়াই গেল হলধর; অনেক খোজা-খুঁজি কোরেও আর পেলুম না!" সঙ্গে সঙ্গেই একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ট্যাঁক হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল, এবং তাহা হলধরের হাতে দিয়া কহিল—"লোকসানের বরাত, নইলে আর এমনটা হয়! এই দু'টো টাকা এখন নে হলা, বাকীটা দিয়ে দোবো এখন।"

হলধর গতকল্য পূজার ব্যাঘাত জন্মাইয়া অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং আজ আর কোনরূপ উচ্চ-বাচ্য না করিয়া, হাত পাতিয়া টাকা দুইটি লইয়া নমস্কার করিল।

হার্ম্মোনিয়ম চুরি হওয়ার পর ও-পাড়ার ক্লাব উঠিয়া গিয়াছিল। সে-দিন সকালে সুরেন সরকারের বৈঠক-খানায় শ্রীনাথ ও এ-পাড়ার যুবকগণের একটা বৈঠক বসিয়াছিল।

শ্রীনাথ কহিল—"ও-পাড়ার ওরা ক্লাবটা তুলে দিয়ে ভাল করলে না, আর একটা হার্ম্মোনিয়ম অল্প-স্বল্প দিয়ে কিনলেই ত হোত।"

প্যারী কহিল—"ওদের কথা ছেড়ে দাও, ছিনাত দা'! তা হোলে এস, আমাদের এ-পাড়াতেই থিয়েটার ক্লাব বসানো যা'ক। অতুল চাটুয্যের কাপড়ের দোকান-ঘর-খানা ত শুধু-শুধু পড়ে র'য়েছে, ওঁদের বোলে-কোয়ে ঐ ঘরখানাতেই…।"

এককড়ি কহিল—"বসাতে হয়, শীগগির বসাও বাবা! 'প্রফুল্ল' বই ধরা হ'বে, আমি যোগেশের পার্ট নোবো; দেখবি সব, ফার্ষ্ট ক্লাশ প্লে কাকে বলে, হুঁ।"

কিঙ্কর কহিল—"ও-সব বই পাড়াগাঁর 'অডিয়েন্সে'র কাছে চলবে না; কেউ বুঝবে না। এখানে পৌরাণিক ধরতে হবে,—সীতার বনবাস, কি কর্ণার্জ্জুন, কি জনা, কি আর-কিছু।"

যাহা হউক, মোটের উপর স্থির হইল, অচিরেই অতুল চাটুয্যের কাপড়ের দোকান-ঘরে ক্লাব বসানো হইবে।

এবং হইলও তাই। অতুল চাটুয্যের মত লইয়া এবং আবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম—কতক কিনিয়া এবং কতক যোগাড় করিয়া ক্লাব বসাইয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে-সঙ্গেই বিপুল উদ্যম এবং উৎসাহে ক্লাবের কাজ চলিতে লাগিল। বই সিলেক্‌সান্ হইয়া গেল; যাহাকে যে পার্ট দিবার তাহা দেওয়া হইল; হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে গানের মহলা চলিতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ—

হঠাৎ এ-পাড়ায় ইনফ্লুয়েঞ্জার এপিডেমিক্ দেখা দিল এবং তাহার ফলে ক্লাবের মেম্বররা অসুস্থ ও অনুপস্থিত হইতে লাগিল। এবং ঠিক এই সময়ে আরও একটা এপিডেমিক্ দেখা দিল। এ এপিডেমিক্—হার্ম্মোনিয়ম চুরি! অর্থাৎ এ পাড়ার ক্লাবের হার্ম্মোনিয়মটিও হঠাৎ এক রাত্রে চুরি হইয়া গেল।

সন্তোষ কহিল—"এ নিশ্চয়ই বাইরেকার চোর নয়, এ চেনা-চোর; গাঁয়ের লোকেরই কাজ।"

শ্রীনাথ কহিল—"দাঁড়াও, চুরি করা এবার দেখাচ্চি। এ চোর ধোরবো, তবে আমার নাম—ছিনাথ রায়।"

প্যারী কহিল—"ফের সব পাঁচ টাকা কোরে চাঁদা দিয়ে আর একটা কেনা যাক্। কিন্তু এবার থেকে এক জন লোক ক্লাবে শোয়াবার বন্দোবস্ত ক'রতে হবে।"

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হইল না। পাচ টাকা করিয়া চাঁদাও উঠিল না, হার্ম্মোনিয়মও কেনা হইল না। যত দিন যাইতে লাগিল, সকলের উৎসাহও কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে ও-পাড়ার ন্যায়, এ-পাড়ার ক্লাবেও গণেশ উল্টাইয়া, লালবাতি জ্বলিল।

সকালবেলা তোয়াজ করিয়া চা খাইতে খাইতে শ্রীনাথ স্ফূর্ত্তিযুক্ত মনে গুন্-গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল; একটু গম্ভীর মুখে ঊষাবতী আসিয়া কহিল—"ভারি স্ফূর্ত্তি দেখচি যে! কিন্তু এই রকম হার্ম্মোনিয়ম চুরির টাকায় কত দিন সংসার চলবে? যদি⋯"

"চুপ্—চুপ্; আস্তে বল। কি করব বল না, দু'বেলা দু'টি ভাত খেতে হ'বে ত?"

"তাই বোলে চুরি কোরে—

"আহা-হা! আস্তে কথা কও না! বলচি যে, কোনো দিকে কোনও উপায় না পেয়ে, তবেই ত তোমার গিয়ে⋯। তবে কথা হোচ্চে যে, শীগ্‌গিরই আমি ব্যবস্থা একটা করচি। এ-রকম পেটের ভাবনা নিয়ে বারো মাস এ-ভাবে দিন কাটাতে পারবো না। হয় এস্পার—নয় ওস্পার। আসচে মাসেই সরবো এখান থেকে।"

কুঞ্চিত চোখের চাহনিতে ঊষা কহিল—"কোথায় সরবে?"

"কোলকাতায়।"

শ্রীনাথ সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছে। শ্যাম-বাজারের এক বস্তীতে পাঁচ টাকায় একখানা টীনের ঘর ভাড়া লইয়াছে। দেশ থেকে আসিবার সময় তাহার হাতে গোটা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা ছিল। তাহাতেই কোন প্রকারে এ-কয়দিন চলিয়াছে এবং আরও কয়েকটা দিন চলিবে।

দুপুর বেলা একটু দিবা-নিদ্রার পর, শ্রীনাথ গলির দিক্‌কার জানালার ধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল। সামনে, গলির ও-পারের ঘরখানায় এক জন অনুচ্চ কণ্ঠে গান গাহিতেছিল, আর এক জন বাঁয়া-তবলায় মৃদু সঙ্গত করিতেছিল। শ্রীনাথ একটু উচ্চকণ্ঠে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"হোচ্চে না, কালীবাবু; একতালায় মিলবে না, কার্‌ফা বাজাতে হবে।"

মেদিনীপুরের দুইটি যুবক ওই ঘরে থাকিত। কোন একটা কাপড়ের দোকানে উহারা কাজ করিত। কোন দিন সকালে যাইয়া বেলা দুইটায় বাসায় আসিত, কোন দিন দুইটায় বাহির হইয়া রাত দশটায় আসিত। নিজেরাই পালা করিয়া রাঁধিত, এবং এক বেলার রান্নায় দুই বেলা চালাইয়া লইত।

কালীবাবু কারফা বাজাইতে লাগিল; কিন্তু শ্রীনাথের তাহা মনঃপুত না হওয়ায়, সে উঠিয়া কালীবাবুদের ঘরে গিয়া হাজির হইল, এবং বাঁয়া-তবলাটা নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বাজাইতে সুরু করিল। কালীবাবু কহিল—"আপনার হাতটা ত সুন্দর!"

শ্রীনাথ বাজনা বন্ধ করিয়া বলিল—"খাসা। যাই হোক, আপনারা আছেন বেশ দু'টিতে। বিদেশে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থাকতে হোলে এই রকম একটু-আধটু আনন্দ নিয়ে না কাটালে চলে না।—আচ্ছা, কালীবাবু, একটা হার্ম্মোনিয়ম্ কেনেন্ না কেন? সুরের সঙ্গে বেশ সুন্দর সঙ্গত চলে তা' হোলে।"

এই সময়ে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে দরজার বাহির হইতে বলিল—"মা বল্লে, এই নাক্‌ছাবিটা রেখে আট আনা কি চার আনা দিতে পারবেন?"

কালীবাবু বলিল—"আজ আমাদের হাত একেবারেই খালি; বলগে। তোমার বাবা আজ কেমন আছেন?"

মেয়েটি ছল্ ছল্ দৃষ্টিতে কহিল—"বাবার আজ আর

জ্বর হয়নি।” বলিয়া একপা-একপা করিয়া সে চলিয়া গেল।

শ্রীনাথ কালীবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ব্যাপার কি কালীবাবু ?”

কালীবাবু কহিল—“এরা ওদিক্‌কার একখানা ঘর নিয়ে আছে। স্বামী, স্ত্রী আর ঐ মেয়েটি। একটি বছর তিনেকের ছেলে ছিল। সেটি আজ মাস-দুই হোল মারা গিয়েচে। ভদ্রলোকের কাজ-কর্ম্ম নেই, কিছু উপায়-সুপায়ও নেই।”

শ্রীনাথ কহিল—“কোলকাতা সহরে তা হোলে ত বড় বিপদে পড়তে হোয়েচে !”

“বিপদ বোলে বিপদ ! ভাল থাকতে, তবু রোজ কোথাও বেরিয়ে দু’চার আনা নিয়ে আসতো—তাইতে কোন রকমে কষ্টে-স্বষ্টে চল্‌ছিলো। কিন্তু আজ দিন-পনের অসুখে পোড়ে, কষ্টের আর সীমা-পরিসীমা নেই। দু’-একদিন আমরা কিছু-কিছু সাহায্য কোরেছিলুম, কিন্তু আমরাও ত ভিকিরীর সামিল। বোধ হয়, কাল থেকে ওদের হাঁড়ী চাপেনি।”

“বলেন কি ? অভুক্ত !—মেয়েটিও ?”

“খুকীকে আমি একটা পয়সা দিয়েছিলুম; তাই দিয়ে একটু আগে ও মুড়ী কিনে খেয়েচে। ভদ্রলোক আজ পনের দিন বিনা চিকিৎসায়—”

কালীবাবুর শেষ কথাগুলি শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া শ্রীনাথ তাহার নিজের ঘরে চলিয়া গেল এবং মিনিট পনরর মধ্যে কিছু চাল, দাল, তেল, নুণ, তরকারী এবং পাঁচ টাকার একখানা নোট আনিয়া কালীবাবুর হাতে দিয়া কহিল—“ভদ্রলোকের ঘরে দিয়ে আসুন, কালীবাবু! আমার নাম করবেন না। মেয়েটির মাকে শীগ্‌গীর উনান্ ধরাতে বলুন।”

কালীবাবু কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল; কহিল—“ওদের ভারী উপকারটা করলেন আপনি। ওরা আপনাদেরই ব্রাহ্মণ; সুতরাং এ অবস্থায় ব্রাহ্মণকে—”

বাধা দিয়া শ্রীনাথ কহিল—“অভুক্ত; অন্নহীন; বিনা-চিকিৎসা; কচি মেয়ের ছল্ ছল্ চোখ!—এখানে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নেই কালীবাবু! যান্, আপনি এগুলো দিয়ে আসুন আগে।”

জিনিষগুলি ও নোটখানা হাতে লইয়া কালীবাবু খুকীদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

“আপনি সেদিনকার অতি-বড় দুর্দ্দিনে আমাদের যে কি সাহায্য করেচেন, তা আর কি বোলবো ! এ পুণ্য আপনার—”

“বিজয়বাবু, পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচারজ্ঞান কিছুই আমার নেই, কিছুই ও-সব বুঝিও না । তবে এইটুকু বুঝি যে, জীব হোয়ে যখন জন্মগ্রহণ করতে হোয়েচে, তখন সেই জীবনধারণের জন্যে একমুঠো ডাল-ভাত আমায় পেতেই হ’বে। শুধু দু’টি ডাল-ভাত। আর তার বদলে আমার যা-কিছু সামর্থ্য, যা-কিছু শক্তি, তা আমি দিতে প্রস্তুত। ক্ষীর-সর, ঘি-মাখন, পোলাও-কাবাবও চাই না, মোটর-জুড়ীও চাই না। চাই দু’টি অতি-সাধারণ অন্ন, তা যেমন-কোরেই হোক।”

এক দিন বিকালে শ্রীনাথের ঘরে বসিয়া শ্রীনাথ ও খুকীর বাবার মধ্যে ঐরূপ কথা হইতেছিল।

“আচ্ছা বিজয়বাবু, সে চাকরী আপনার গেল কেন ?”

“রিডাক্‌সানে।”

“তার পর থেকেই বরাবর বেকার ত ?”

“না। এক জন ‘ম্যাজিসিয়ানে’র কাছে বছর-তিনেক কাজ কোরেছিলুম।”

“ম্যাজিসিয়ানে’র কাছে ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ ! আমার ‘ভেন্‌টিলোকুইজিম্’ জানা ছিল, তাই—

বাধা দিয়া শ্রীনাথ জিজ্ঞাসা করিল—“ওটা কি ব্যাপার ?”

“মুখ বুজিয়ে বা যৎসামান্য খুলে, কণ্ঠ থেকে একটা অদ্ভুতভাবে কথা কোয়ে যাওয়া। মনে হবে, যেন অনেকটা দূর থেকে কে এক জন কথা কইচে। ম্যাজিসিয়ানরা এই ‘ভেন্‌টিলোকুইজিমে’র সাহায্যেই দর্শকদের ধাঁধা লাগিয়ে দেয় যে, তারা যেন প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা কইচে।”

“ঠিক ঠিক; শুনিচি বটে ! বর্দ্ধমানে এক জায়গায় ম্যাজিক দেখেছিলুম। সে লোকটা আকাশের দিকে চেয়ে ভূতকে ডাকলে আর ভূত অনেক দূর থেকে ‘যাচ্চি,

যাচ্চি' বলতে বলতে এলো আর কথা কইতে লাগলো। যাক্, ব্যাপারটা এইবার বোঝা গেল। ওটা বুঝি আপনার অভ্যাস আছে। আচ্ছা, একটুখানি করুন ত, দেখি।"

বিজয়বাবু তখন একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া গলাটাকে একটু সানাইয়া লইল। তাহার পর মুখখানাকে অল্প একটু ফিরাইয়া লইয়া কণ্ঠমধ্য হইতে অপূর্ব্ব কৌশলে কথা বাহির করিতে লাগিল। প্রথমে মনে হইল, যেন কোন লোক অনেকটা দূর হইতে কথা কহিতেছে। সেই স্বর ক্রমেই নিকটে আসিতে লাগিল। অবশেষে মনে হইল, সেই ঘরেরই একটা কোণ হইতে কে যেন কথা কহিতেছে।

খানিক পরেই বিজয়বাবু চলিয়া গেল। শ্রীনাথ সেইখানেই তেমনিভাবে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। উষা কহিল—"কি গো, চুপ্-চাপ্ এতক্ষণ ধোরে বোসে আছ যে?"

শ্রীনাথ নিরুত্তর।

"বলি, হোল কি তোমার? ভাব লাগ্‌লো না কি?"

এইবার শ্রীনাথ নড়িয়া উঠিল; কহিল—"গভীর!"

"কিসের ভাব?"

"প্রেমের।"

"কা'র সঙ্গে?"

"টাকা, পয়সা, নোট, মোহর······"

"তা হোলে ভাব নয়কো, স্বপ্ন বল।"

"স্বপ্ন যা'তে সত্য হয়, তা'রির ভাবনাই ভাবছি উষা; দেখা যা'ক, কদ্দূর কি কোরতে পারি।" বলিয়া শ্রীনাথ উঠিয়া পড়িল, এবং ভাব-ই হউক আর ভাবনা-ই হউক—তাহারই মধ্যে ডুবিয়া ঘরের ভিতর ধীরপদে পায়চারী করিতে লাগিল।

পরদিন সকাল বেলা শ্রীনাথ বিজয়বাবুকে ডাকিয়া আনিল এবং প্রায় ঘণ্টা-দুই ধরিয়া উভয়ে কোন-একটা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিবার পর, শ্রীনাথ উৎসাহের সহিত কহিল—"টাকার বন্যা আমাদের ঘরে বইবে, বিজয়বাবু! দু'টি পেটের ভাতের জন্যে আর এমন কোরে দগ্ধে মরতে হবে না। তবে, শ'-খানেক টাকার যোগাড় না করলে, কাজে বসা যাবে না। দেখা যাক, কোত্থেকে যোগাড় হয়।"

বিজয়বাবু উঠিয়া গেলে, উষা রান্নাঘর হইতে এ-ঘরে আসিয়া কহিল—"দেখ, এ-বেলাটা কোন রকমে হোলো, কিন্তু ও-বেলার জন্যে আর চা'ল নেই, ডাল নেই, তেল নেই; মশলাও সব আনতে হবে,—কিছুই নেই।"

শ্রীনাথ কহিল—"উষা, দুঃখের এই নিশাকে ঠেলে দিয়ে, শীগ্‌গিরই বোধ হয় এমন সুখের উষা এনে ফেলবো, যে-দিন তোমায় বলতে হবে যে, চা'ল, ডাল, তেল, ঘি,—মাখন রাখবার আর জায়গা নেই!"

উষা মৃদু হাসির সহিত কহিল—"কোনও হার্ম্মোনিয়মের আড়তের বাবুর সঙ্গে ভাব্-সাব্ হোয়েছে না কি?"

শ্রীনাথ আর কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বদিনের মত ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিল।

উষা কহিল—"বাড়ী-ওলার বৌয়ের অসুখের না কি খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা।"

"কে বল্লে?"

"ঐ ও-ঘরের ওরা বলছিলো। একবারটি আজ গিয়ে খবরটা নিয়ে এসো।"

এই সময়ে বাড়ী-ওয়ালার এক জন লোক শ্রীনাথের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল—"রায় মশাই আছেন কি?"

শ্রীনাথ বাহিরে আসিতেই লোকটি কহিল—"গামচাটা কাঁধে ফেলে চলুন একবার। ছোট গিন্নী ত······।"—লোকটি মুখ-চোখ ও হাতের একটা ভঙ্গী করিল।"

শ্রীনাথ বিস্ময়ের ভাবে কহিল—"কখন?"

"এই আধ ঘণ্টা আন্দাজ। কর্ত্তা ত পাগলের মত হোয়েছেন। আসুন শীগ্‌গির; ব্রাহ্মণ চার জন ত চাই-ই। তিন জন হোল; দেখি, আর এক জন কা'কে পাই। আপনি আর দেরী করবেন না। শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ুন!"

লোকটি চলিয়া গেল।

শ্রীনাথ তখনি গামচাখানা কোমরে বাঁধিয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীওয়ালা মন্মথ চক্রবর্ত্তী বহুকাল আগে বাঁকুড়া জেলা হইতে কলিকাতায় আসিয়া ১২৲ টাকা মাহিনায় বেলেঘাটার কোন আড়তে কয়াল-গিরি করিতে করিতে, লক্ষ্মীর কৃপায় বেশ-দু'পয়সার সংস্থান করেন।

লেখা-পড়ার জ্ঞান কিছু না থাকিলেও, সুতরাং তখন বেশ পণ্ডিত এবং মান্য-গণ্য হইয়া উঠিলেন। এই স্ত্রীটি তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিল। পর-পর প্রথম দুই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে, ৪৮ বৎসর বয়সে চৌদ্দ বৎসরের এই মেয়েটিকে তিনি পুনরায় কোথা হইতে বিবাহ করিয়া আনেন। দশ বৎসর ধরিয়া মন্মথের ঘর করিবার পর আজ সেই স্ত্রীও তাঁহার মন খালি করিয়া, প্রাণে শেলাঘাত করিয়া পরলোকে চলিয়া গেল!

এই অল্প দিন তাঁহার টীনের বাড়ীর ভাড়াটীয়ারূপে থাকিয়াই শ্রীনাথ তাঁহার সহিত খুব আলাপ জমাইয়া লইয়াছিল।

শ্রীনাথ ও-বাড়ীতে গিয়া দেখিল, মন্মথ সত্যই পাগলের মত হইয়াছেন। শ্রীনাথ শাস্ত্র ও নীতি-কথা আওড়াইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে সুরু করিল।

মৃতদেহ যখন বাঁধা হয়, তখন কে এক জন বলিল—"গলার হারছড়াটা খুলে নাও, ওটা আর ঐ সঙ্গে বৃথা…"

দুঃখমিশ্রিত একটা ধমকের ভঙ্গীতে শ্রীনাথ কহিল—"সবই ত বৃথা! যে সোণার প্রতিমা আজ মন্মথবাবুর গলা থেকে খসে গেল, সে-গলা থেকে কি ঐ তুচ্ছ হার ছিনিয়ে নিতে আছে! ও ওঁরই সঙ্গে যা'ক।"—বলিয়া শ্রীনাথ খাটের সঙ্গে মৃতদেহ বাঁধিয়া ফেলিল।

মন্মথ বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কহিলেন—"ছিনাথবাবু, খাঁটি কথা বোলেছেন! সোণার প্রতিমা—সোণার প্রতিমা! বুক আমার ধ্বসিয়ে দিয়ে গেল! উঃ!"—শ্রীনাথেরও চোখে জল ভরিয়া আসিল; আর কথা কহিতে পারিল না।

মৃতদেহ সৎকার করিয়া সন্ধ্যার পর ভিজা কাপড়ে শ্রীনাথ যখন ঘরে আসিল, উষা জিজ্ঞাসা করিল—"হোয়ে গেল? আহা, বৌটা…"

"বেঁচে গেল!—বেঁচে গেল!—বৌটা বেঁচে গেল, উষা!—ধর ত এইটে, ভিজে কাপড়টা ছাড়ি।"—বলিয়া শ্রীনাথ ট্যাকের পাক খুলিয়া কি একটা দ্রব্য উষার হাতে দিল। উষা চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—"এ কি! সোণার হার কোত্থেকে…?"

"চুপ্—চুপ্!…উঃ! বড্ড ভাবছিলুম শ'খানেক টাকার জন্যে! ভরি তিন-চার হবে বোধ হয়,—না?"

উষা বিস্মিত হইয়া শ্রীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে কালীঘাটের 'সেনাট্-রয়' সম্বন্ধে খুব একটা হৈ-চৈ লাগিয়া গিয়াছে। যেখানে-সেখানে সকলের মুখে 'সেনাট্-রয়' লইয়া আলোচনা—আন্দোলন চলিতেছে।

বৌবাজারের 'বিশ্ব-বার্ত্তা' খবরের কাগজের আফিসে সে-দিন বাবুদের মধ্যে 'সেনাট্-রয়' সম্বন্ধে জোর আলোচনা চলিতেছিল। সুরেশবাবু কহিলেন—"অদ্ভুত ব্যাপার! এ আর তোমাদের জ্যোতিষ-ফোতিষ, হস্তরেখা, সামুদ্রিক—ও-সব কিছু নয়। এ হোলো খাঁটি 'স্পিরিট্'-এর ব্যাপার! 'স্পিরিটে'র মুখ দিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ বোলে দিচ্ছে।"

কালিপদ কহিল—"অনেক সময় 'স্পিরিট্' আসতে রাজি হয় না; শেষকালে ওঁর খুব ধমক খেয়ে, 'যাচ্চি-যাচ্চি' বলতে বলতে অনেক দূর থেকে ছুটে আসে।"

নিতাই বাবু কহিলেন—"লোকও হোচ্চে খুব। বাঙালী আর মাড়োয়ারীই বেশী। তা ছাড়া পাঞ্জাবী আছে, মাদ্রাজী আছে, উড়িয়া আছে, বেহারী আছে। যদি ধর গিয়ে…"

বাধা দিয়া রামবাবু কহিলেন—"আরে, হ'বে না কেন? ভূতের মুখ দিয়ে সব বার করাচ্চে ত! বাহাদুরী আছে। ভূতকে এ-ভাবে পোষ-মানানো, এ বড় সোজা কথা নয়!"

ভূতনাথ কহিল—"সে-দিন আমাদের পাড়ার দীনুবাবুর সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম। তাঁকে স্পিরিট্ খুব এক চোট ধমক দিয়ে বোলে দিলে—'চোলে যাও, আফিং না ছাড়লে, রোগও তোমায় ছাড়বে না'।"

ও-ঘরে বসিয়া নরেনবাবু কাজ করিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না; এ-ঘরে আসিয়া কহিলেন—"ওর সব ব্যাপার আমি জানি। ঐ লোকটির নাম—শ্রীনাথ রায়। তাই থেকে ওঁর আফিসের নাম 'সেনাট্-রয়' হোয়েচে নর্ম্মদা পাহাড়ে ভুলু-বাবা নামে ওঁর এক সিদ্ধ গুরু থাকতেন। আড়াই-শো বছর বয়সে

তিনি দেহ-রক্ষা করেন। উনি তখন সেইখানেই ছিলেন ;—"

ভূতনাথ চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিল—"আড়াই-শো ব-চ্ছ-র!"

"হ্যাঁ, চুপ কর। তার পর তাঁর মৃতদেহ যখন দাহ করা হয়, তখন তাঁর একখণ্ড হাড় উনি লুকিয়ে-ফেলেন। সেইটা নিয়ে উনি পালিয়ে আসেন। এখন সেই হাড়টুকুর জন্যে ভুল্লু-বাবার মুক্তি হোচ্চে না। ঐটুকু ফিরে পাবার জন্যে ভুল্লু-বাবার প্রেতাত্মা দিনরাত ওঁর পেছন-পেছন ঘুরচে ; আর তাকে দিয়ে উনি সকলের সব প্রশ্নের জবাব বা'র কোরে নিচ্চেন। আরো কত-কি সব কোরে নিচ্চেন।"

নিতাইবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"কাজ সব হচ্চে অদ্ভুত! আমাদের বেহারীদা'র সঙ্গে বৌদিদি'র ছিল—আদায়-কাঁচকলায়। কিন্তু———"

হঠাৎ এই সময় বড় বাবু আসিয়া পড়ায় আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

যখন এখানে আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল, তখন কালীঘাটে 'সেনাট্‌-রয়'-এর নীচের বড় ঘরখানার মধ্যে বহু লোক সমাগম। দ্বিতলের ঘরখানির একধারে পুরু তোষকের উপর কার্পেট পাতা। তাহার উপর বসিয়া—শ্রীনাথ ; সম্মুখে একটু দূরে চেয়ারে বসিয়া—একটি বাবু। এক কোণের দিকে সতরঞ্চ পাতা, তাহার উপর বিজয়বাবু বসিয়া, খাতাপত্র-হিসাব প্রভৃতি লইয়া লেখা-পড়ায় ব্যস্ত।

শ্রীনাথ বাবুটির মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেচি ; ফিল্ম্‌-য়্যাক্‌ট্রেস্‌ ঐ 'ছায়া'র পেছন-পেছন আপনি ছায়ার মত ঘুরচেন, কিন্তু তার মনের ভাব-গতিক কিছু বুঝতে পারচেন না। সে আপনাকে চায় কি না ; সেইটা জানতে চান। আচ্ছা, জানিয়ে দিচ্চি।—ভুল্লু বাবা! ভুল্লু বাবা!"

অনেক দূর হইতে সাড়া আসিল—"যাচ্চি, যাচ্চি।"

স্বর ক্রমে কাছে আসিল। কহিল—"কি বোলবে বল।"

শ্রীনাথ বিনীতভাবে বলিল—"এঁর খবরটা দয়া ক'রে বোলে দিন।"

"হবে না, হবে না। ছায়া ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ঐ যে আর একটা লম্বা-চুলো লোক আছে, ছায়া তাকেই ভালবাসে। এর মুখে এইবার এক দিন লাথি মারবে।"

বাবুটি পাগলের মত হইয়া গেল ; কহিল—"উঃ! তা হোলে আমি মারা পড়বো ; বিষ খাবো ; লেকের জলে—নাঃ, লেকের জলে লোকে ডুবে-ডুবে জল ঘোলা কোরে ফেলেচে—লালদীঘির জলে গিয়ে ডুববো! ছায়াকে যাতে পাই, তা আপনাকে কোরে দিতেই হবে।"

শ্রীনাথ কহিল—"তা, সে হবে। কিন্তু সে কাজ ত আলাদা। এ 'ফী'তে ত তা হবে না। তার জন্যে বেশী ফী লাগবে। ভুল্লু বাবাকে ভাল রকম সন্তুষ্ট কোরে তবে···। অন্ততঃ পঞ্চাশটা টাকা···"

অত্যন্ত অধীর হইয়া বাবুটি পঁচিশটা টাকা শ্রীনাথের পায়ের কাছে রাখিয়া কহিল—"এইতেই দয়া করতে হবে। ছায়ার পেছনে আমার সব গেছে, আর আমার বেশী কিছু নেই।"

"আচ্ছা ; হবে। ৭ দিন পরে আসবেন।" বলিয়া বাবুটিকে বিদায় দিয়া শ্রীনাথ নীচে হইতে এক মাড়োয়ারীকে ডাকাইল। ভিঙ্গারমল্‌ আসিয়া শ্রীনাথকে নমস্কার জানাইয়া কহিল—"ভুল্লু বাবাকো বাত্‌ একদম্‌ ঠিক্‌-সে-ঠিক্‌ হোইয়ে গেলো বাবুসাব! বেলকুল্‌ ঘিউ-উও কন্‌টাকটার সাব্‌ লিয়া লইলো।"—অতঃপর গলার স্বর একটু নামাইয়া ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া কহিল—"বেল্‌কুল্‌ চর্ব্বি অউর ভোজ্জিটব্‌ল্‌ থা ; তেয়াল্লিস্‌মে বিক্‌ গেলো।"

"আচ্ছা হইলো। আজ কেয়া কাম্‌ হায়, বোলিয়ে।"

একখানি দশ টাকার নোট শ্রীনাথের হাতে দিয়া ভিঙ্গারমল্‌ কহিল—"সোনেকা ভাও, বাবুসাব। এ মাহিনামে তেজি রহে গা, কি জেরাসে কোম্‌তি হোবে?"

শ্রীনাথ ডাকিল—"ভুল্লু বাবা! ভুল্লু বাবা!"

বাহিরের আকাশের এক কোণ হইতে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

'ত্রাহি মাং দেবদেবেশত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতা।
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে যচ্চ বার্দ্ধক্যে,
তৎপুণ্যং বৃদ্ধিমাপ্নোতু······"

স্বর ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আসিতে লাগিল। বুঝা গেল, ভুল্লু বাবা আসিতেছেন।

অবশেষে ভুল্লু-বাবা ঘরের মধ্যে আসিলেন। কড়ি-কাঠের কাছ থেকে তিনি কহিলেন—"কি জিজ্ঞাসা করবে?"

যাহা জিজ্ঞাসা করিবার, জিজ্ঞাসা করা হইল। ভুল্লু-বাবা উত্তর দান করিয়া—'ত্রাহি মাং·' ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে আবার বহু দূরে চলিয়া গেলেন।

তার পর নীচে হইতে যাহাকে ডাকা হইল, তিনি যুবক; খদ্দরের পোষাক-পরিহিত। তিনি 'ফী' জমা দিয়া প্রশ্ন করিলেন। তিনি কয়েক জনের নাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এঁরা সকলেই কি খাঁটি দেশ-সেবক, না এর ভেতরে ভেজাল আছে? আমার সন্দেহ হোয়েচে যে, এঁদের ভেতর জনকতক দেশ-সেবার নামে দেশের ও দশের উপর অত্যাচার কচ্চেন। এঁরা নিজেদের সামান্য স্বার্থের জন্য, আমার মনে হয়, যত-কিছু অপকর্ম্ম—সবই করতে পারেন এবং করেন। এই সন্দেহটা আমার ভঞ্জন কোরতে হবে।"

এই সময় বিজয়বাবু লেখা বন্ধ করিয়া বাহিরের বারান্দায় উঠিয়া গেল। শ্রীনাথ ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া বাবুটিকে কহিল—"আপনার প্রশ্নের উত্তর কাল পাবেন। আজকে ভুল্লু-বাবার অনেকটা পরিশ্রম হোয়েচে, আজকে আর তাঁরে খাটাবো না।"

'ফী'য়ের রসীদখানি হাতে লইয়া বাবুটি সে-দিন চলিয়া গেলেন।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

এই এক বৎসর কাল 'সেনাট্-রয়'-এর কাজ খুব জোরে চলিয়া বর্ত্তমানে দিন পাঁচ-সাত বন্ধ আছে। বন্ধ থাকিবার কারণ—শ্রীনাথ রায়ের অসুস্থতা। আসলে কিন্তু শ্রীনাথ অসুস্থ নহে। অসুস্থ—বিজয়বাবু। বিজয় বাবুর এক বৎসরকাল সমানে 'ভেন্‌ট্রিলোকুইজিম্' করার ফলে গলার মধ্যে একটা অসুস্থতা বোধ করিতেছেন। ডাক্তার কণ্ঠ পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, ও কথা কহিতে একেবারেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীনাথ কহিল "বিজয়বাবু, 'সেনাট্-রয়' একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়ে কাগজে-কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক্।"

"কি বিজ্ঞাপন দেবেন?"

"বিজ্ঞাপন দেবো এই বোলে যে, ভুল্লু-বাবার হাড় ভুল্লু-বাবার প্রেতাত্মাকে ফেরত দেওয়া হোয়েচে, সেহেতু আর অধিক কাল এভাবে তাঁকে আটক রাখা ও খাটান ন্যায়-ধর্ম্মবিরুদ্ধ।"

তাহাই হইল। 'সেনাট্-রয়'-এর সাইনবোর্ডখানা খুলিয়া লইয়া, আফিস্ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীনাথ কহিল—"বিজয়বাবু, আর চালানও উচিত হ'ত না। কেন না, এই এক বছরে আমাদের সংসার-খরচ চালিয়ে, আর আমাদের মত গরীব-দুঃখীদের কিছু কিছু সাহায্য কোরেও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা জমে গেছে। আমাদের বাকী জীবনের জন্যে এই যথেষ্ট। আপনি পনর হাজার নিয়ে দেশে যান, আর আমিও পনর হাজার নিয়ে দেশে যাই।"

এই সময় এক দিন ভৃত্য ভজহরি আসিয়া খবর দিল যে, এক জন লোক তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে চায়। লোকটা নাছোড়বান্দা। সে একবার দেখা না করিয়া কিছুতেই যাইবে না। শ্রীনাথ তাহাকে আনিতে বলিল।

একখানা মলিন, ছিন্ন কাপড়-পরা, গায়ে একটি তালি দেওয়া হাফ্-সার্ট, পায়ে একটি কার্দ্দমাক্ত স্যাণ্ডেল, চেহারা শুষ্ক-শীর্ণ, মাথায় বিরল রুক্ষ কেশ—একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল—"আপনারা বন্ধ কোরে দিয়েছেন জানি, কিন্তু আমার একটি প্রশ্নের উত্তর আজ দিতেই হবে। এ দয়া করতেই হবে, নইলে আমি আত্মহত্যা করবো। দু'-একখানা থালা-বাসন ছিল পুঁজি, আজ তাই বিক্রী কোরে আপনার ফী-এর টাকা এনেছি। কিন্তু তাও পাঁচ টাকা; তার বেশী আর হোলো না।"

শ্রীনাথ লোকটির আপাদমস্তক ভাল করিয়া বার বার দেখিয়া কহিল,—"আপনার কি প্রশ্ন?"

"প্রশ্ন আমার এই যে, গুষ্টিশুদ্ধ, খেতে পাচ্চি না। অনাহারে বড়-লোকের দোরে হেঁটে হেঁটে পায়ের নড়া ছিঁড়ে ফেলেছি, গালাগালি দিয়ে তারা সব তাড়িয়ে দেয়। উদয়াস্ত ঘুরে ঘুরে একমুঠো অন্নের জোগাড় কোরতে

পারি না। সকলে ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌-ফট্‌ করছে। আঠার আনা খেটে দু'আনার পারিশ্রমিকও যদি পাই, তাই যথেষ্ট ব'লে মনে করি, কিন্তু তা-ও পাই না। তাই জানতে চাই, এ পেটের জ্বলুনি আমাদের থামবে, কি থামবে না। যদি জানতে পারি, থামবে না, তা' হোলে বিষ খেয়ে ম'রবার ব্যবস্থা করবো। দয়া কোরে এইটে আমায় শুধু জানিয়ে দিন।"

শ্রীনাথের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি বলুন তো?"

"ভবানী বিশ্বাস।"

"ও! আপনি ভবানী বিশ্বাস? আপনার প্রশ্নের উত্তর ভুলু-বাবা আগেই দিয়ে চলে গেছেন। ক্ষিধের জ্বালা আপনাদের শীগ্‌গিরই ঘুচবে। একটু বসুন, আমি আসচি।" বলিয়া শ্রীনাথ বাহির হইয়া গেল, এবং মিনিট-দশেক পরে পুনরায় আসিয়া ভবানী বিশ্বাসের হাতে এক-তাড়া নোট দিয়া কহিল—"ভুলু-বাবা এই একশো টাকা আপনাকে দিয়ে গেছেন।"

ভবানী বিশ্বাস কাঠের পুতুলের ন্যায় শ্রীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল!

শ্রীনাথ দেশে আসিয়াছে।

কলিকাতায় থাকা-কালে তাহার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। এই মাসেই তাহার 'অন্নপ্রাশন' হইবে।

সে-দিন খোকাকে বুকে করিয়া পায়চারী করিতে করিতে শ্রীনাথ উষাকে কহিল—"উষা, চাল, দাল, তেল, ঘি—মাখন রাখবার জায়গা হ'চ্ছে ত?"

অনেক দিনের পুরাণো কথা উষার আজ মনে পড়িয়া গেল। উত্তর দিবার কিছুই ছিল না; মুখ টিপিয়া উষা শুধু একটু হাসিল; তাহার পর কহিল—"খোকার 'ভাতে' কিন্তু গাঁয়ের ক'ঘর ব্রাহ্মণ-বাড়ী 'সামাজিক' বিলোতে হ'বে।"

খোকাকে ধরিয়া দুই হাতে নাচাইতে নাচাইতে শ্রীনাথ কহিল—"কি 'সামাজিক' দিতে চাও, বল।"

"একখানা কোরে কাঁসার বড় থালা, আর সেই থালা-ভরা সন্দেশ।"

"এ আর বেশী কথা কি? গোটা চার-পাঁচ থিয়েটারের আকড়ায় যাতায়াত আরম্ভ কোরলেই হোয়ে যাবে।"

এ-গাঁয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া লইয়া ঘর-তিরিশেক ব্রাহ্মণের বাস। কলিকাতা হইতে শ্রীনাথ খুব বড় বড় উৎকৃষ্ট খাগড়াই কাঁসার ত্রিশখানা থালা আনাইল। সেই সঙ্গে আর একটা জিনিষ ত্রিশটি আসিল। তার পর অন্নপ্রাশনের দিন যখন সেই থালা ভরিয়া এক-থালা করিয়া সন্দেশ ও একটা করিয়া সেই দ্রব্য প্রত্যেক ব্রাহ্মণবাড়ী পাঠানো হইল, তখন এক দিকে যেমন সকলে আনন্দিত হইল, সেই সঙ্গে কিছু বিস্মিতও হইল। বৈকালের দিকে গাঁয়ের কয়েক জন আসিয়া শ্রীনাথের সহিত দেখা করিয়া কহিল—"বড় আনন্দের কথা শ্রীনাথ! ভগবান তোমাকে আরও সুখে রাখুন; খোকাকে দীর্ঘজীবি করুন। কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা কেউ কিছু বুঝতে পাচ্চি-নে।"

"ঐ একটা কোরে হার্ম্মোনিয়ম দিয়েছি, ঐ কথা ত? কথাটা হোচ্চে এই যে, আমি গাঁ থেকে চলে যা'বার আগে গাঁয়ের ভেতর দু'দুটো হার্ম্মোনিয়ম চুরি গেল। নিশ্চয়ই গাঁয়ের লোকই নিয়েছিল। আর পেটের জ্বালাতেই বোধ হয় সে এ-কাজ কোরেছিলো। সুতরাং এ-চুরিতে আমার মনে হয় তার পাপ হয়নি; কিন্তু বলতে পারি না, যদি পাপ হোয়েই থাকে, তা'হলে তা'র হোয়ে আজ আমিই সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরলুম। কেন না, সে যে-ই হোক, সে আমারই গাঁয়ের এক জন ত বটে!"

সকলের এক দিকের বিস্ময় যেমন কমিল, অপর দিকে তেমনি আবার নূতন করিয়া বিস্ময় জমিয়া উঠিল।

শ্রীনাথ কহিল—"ভগবান যখন এত দিনে আমায় দয়া কোরেচেন, তখন………। আর ওতে আমার এমন কিছু বেশী খরচও যে হোয়েচে, তা'ও নয়।"

"তিরিশটাতে কত ব্যয় পড়লো?"

"পাইকারী দামে পেয়েছি কি না; হাজারখানেকেই হোয়েচে।"

কিছুক্ষণের জন্য অবাক হইয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীনাথের মুখের দিকে সকলে তা'কাইয়া রহিল।

শ্রীশশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীমহাশক্তি-তত্ত্ব

দেবীমাহাত্ম্য-প্রকাশক শাক্তাদ্বৈতবাদ-মূলক আগম-পুরাণাদি গ্রন্থে একমাত্র উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য নির্গুণ চিন্মাত্র ব্রহ্ম ও জগন্মাতা শ্রীশ্রীমহাশক্তির অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রী৺সপ্তশতী চণ্ডী সুস্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মহাদেবী চিন্মাত্রস্বরূপে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন (১)। এ বিষয়ে দেবী-ভাগবতের উক্তি আরও স্পষ্টতর। পার্ব্বতী দেবী হিমাচল-সুতা-রূপে দ্বিতীয় বার জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিজ তত্ত্ব-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"হে অমরবৃন্দ ও নগাধিপ, পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বর্ত্তমান ছিলাম, আর কিছুই ছিল না। আমার সেই আত্মস্বরূপ 'চিৎ', 'সংবিৎ' ও 'পরব্রহ্ম' নামে প্রসিদ্ধ। আমার এই স্বরূপ তর্কের দ্বারা বুঝা যায় না—শব্দাদির দ্বারা উহার নির্দ্দেশ অসম্ভব—উহার সহিত অন্য কোন পদার্থের উপমা দেওয়াও চলে না—উহা সর্ব্ববিধ বিকারবিবর্জ্জিত। আমার এই স্বরূপের একটি স্বতঃসিদ্ধ শক্তি আছে—উহা 'মায়া' নামে বিশ্রুত। এই মায়াকে সতী, অসতী বা সদসদুভয়াত্মিকা বলা চলে না—অথচ উহা সর্ব্বদা বস্তুভূতা। অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা, সূর্য্যের যেমন রশ্মিজাল, চন্দ্রের যেরূপ কৌমুদী, আমারও সেইরূপ এই মায়া—সহজাতা ও ধ্রুবা।...ইঁহাকে কেহ 'তপঃ' নাম দিয়া থাকেন; কেহ বা বলেন, ইঁহার নাম 'তমঃ'। অপরে ইঁহাকে 'জড়রূপা' বলিয়া থাকেন। আবার অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণ ইঁহাকে 'জ্ঞান,' 'মায়া,' 'প্রধান,' 'প্রকৃতি,' 'শক্তি,' 'অজা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। শৈবশাস্ত্র-বিশারদগণ ইঁহার নাম দিয়াছেন 'বিমর্শ' আর বেদতত্ত্বার্থ-চিন্তকগণ 'অবিদ্যা'-রূপে ইঁহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া নিগমাদিতে ইঁহার আরও বহু নাম দৃষ্ট হয়। দৃশ্য বলিয়া এই মায়া জড়রূপা।...চৈতন্য দৃশ্য নহে, কারণ দৃশ্য হইলেই তাহা জড় হইতে বাধ্য। স্বপ্রকাশ চৈতন্য পরপ্রকাশ্য নহে; কারণ, তাহা হইলে অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা। আবার ইঁহাকে নিজের দ্বারা প্রকাশিত বলাও চলে না; কারণ, তাহা হইলে একই বস্তুর কর্ত্তৃকর্ম্মরূপতা আসিয়া পড়ে ও তাহাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব, চৈতন্য দীপবৎ স্বপ্রকাশ ও অন্যের প্রকাশক। এই চৈতন্যই আমার শরীরস্বরূপ—ইহা নিত্য।...কেবল নিত্য নহে, ইহা আনন্দস্বরূপও বটে।...এই চৈতন্য বা জ্ঞানকে আত্মার ধর্ম্ম বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে আত্মার জড়ত্ব সম্ভাবনা। অতএব আত্মাই জ্ঞানরূপ ও আনন্দস্বরূপ। (অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপা মহাদেবীই আত্ম-রূপিণী।) এই আত্মা সত্য, পরিপূর্ণ, অসঙ্গ, দ্বৈতজাল-বর্জ্জিত।...আমার এই যে অলৌকিক রূপ, উহাই আবার অব্যাকৃত, অব্যক্ত, মায়াশবলও হইয়া থাকে। সর্ব্বশাস্ত্রে আমার এই রূপকেই সর্ব্বকারণ কারণ, সকল তত্ত্বের আদিভূত ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বলা হইয়াছে। ইহা সর্ব্বকর্ম্মের ঘনীভূত অবস্থা—ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়ার আশ্রয়—হ্রীঁকারমন্ত্রের বাচ্য—ইহাই আদিতত্ত্ব।" (২)

উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বের সহিত দেবী-ভাগবতোক্ত এই মহাদেবী-তত্ত্বের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে, উপনিষদ অদ্বৈতমতেও মায়া সদ্রূপে বা অসদ্রূপে নির্ব্বচনের যোগ্য নহে—পরন্তু তথায় উহা 'বস্তুভূতা,' বা ব্রহ্মের 'সহজাতা' অথবা 'ধ্রুবা' (অর্থাৎ নিত্যা) বলিয়া কদাপি স্বীকৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে, পুরাণে মহাদেবী-তত্ত্বকে যে চৈতন্যময় আত্মস্বরূপ ও 'দ্বৈতজাল-বিবর্জ্জিত' বলা হইয়াছে—তদ্বিষয়ে শ্রুতি ও পুরাণের বিশেষরূপ সামঞ্জস্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে মহাশক্তিকে জড়রূপা বলিতে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসেরই কার্য্য হইবে।

'সপ্তশতী-রহস্যত্রয়'-মধ্যে জগন্মাতা চণ্ডিকা দেবীর সগুণ ও নির্গুণ এই দ্বিবিধ রূপের উল্লেখই পরিদৃষ্ট হয়। এ দিক্ দিয়াও উপনিষদ্-বর্ণিত ব্রহ্মের সহিত তাঁহার বহু

---

(১) "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ"—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮৫ অধ্যায় (শ্রীশ্রীচণ্ডী সপ্তশতী, ৫ম অধ্যায়)।

(২) দেবীভাগবত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৭ম স্কন্ধ, ৩২ অঃ (২-২৬ শ্লোক)।

সাদৃশ্য আছে। উপনিষদেও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের দুইটি রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। অবশ্য ইহার মধ্যে তাঁহার পারমার্থিক রূপ একটিই (অমূর্ত্ত)—অপরটি ব্যাবহারিক কল্পিত রূপ মাত্র। রহস্যত্রয়েও সুরথ রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি সুমেধাঃ বলিয়াছেন যে, পরমৈশ্বর্য্যশালিনী ত্রিগুণাত্মিকা দেবী মহালক্ষ্মীই সৃষ্টির আদিভূতা। কিন্তু কল্পারম্ভের পূর্ব্বে তিনি ত্রিগুণাতীত তুরীয় অবস্থায় অনভিব্যক্ত থাকেন ও কল্পকালে গুণময়ী হইয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তখন তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়া মহাশূন্যকে নিজ তেজে পরিপূর্ণ করেন। ইনি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই গুণত্রয়ের সমষ্টিরূপা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, ও কনকাভরণে ভূষিতাঙ্গী। তাঁহার শিরোদেশে (ব্রহ্মচিহ্ন) নাগ, (রুদ্রচিহ্ন) লিঙ্গ ও (বিষ্ণুচিহ্ন) যোনি বিরাজিত। আর করচতুষ্টয়ে দাড়িম্ব ফল, গদা, চর্ম্মফলক ও পানপাত্র শোভমান। ইনিই নির্গুণা চণ্ডিকা দেবীর আদ্যা প্রকৃতি।

সৃষ্টির প্রাক্কালে যখন মহালক্ষ্মী দেখিলেন যে, কোথাও কোন জীবের প্রকাশ নাই, তখন তিনি তাঁহার স্বরূপভূত গুণত্রয় হইতে তমোগুণের সারাংশ আকর্ষণপূর্ব্বক এক অভিনব মূর্ত্তির সৃষ্টি করিলেন। ইঁহার দেহবর্ণ প্রভিন্ন অঞ্জনের ন্যায় গাঢ় নীল, নয়নগুলি সুবিশাল ও বিস্ফারিত, বদনবিবর দংষ্ট্রাকরাল ও কটিদেশ অতি ক্ষীণ। ইঁহার শিরোদেশ মুণ্ডমালা-মণ্ডিত, বক্ষস্থলে কবন্ধহার বিলম্বিত ও ভুজচতুষ্টয়ে খড়্গ, চর্ম্ম, ছিন্নমুণ্ড ও খর্পর বিরাজিত। ইনি চণ্ডিকা দেবীর দ্বিতীয়া প্রকৃতি 'মহাকালী'। মহামায়া মহাকালী, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, একবীরা, কালরাত্রি ও দুরত্যয়া—এই দশটি তাঁহার নাম।

মহাকালীর আবির্ভাবের পর দেবী মহালক্ষ্মী নিজ অতি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা আর একটি মূর্ত্তি প্রকাশিত করিলেন। ইনিই 'মহাসরস্বতী'। শারদীয়া রাকাচন্দ্র-কৌমুদীর ন্যায় স্নিগ্ধ শুভ্র ইঁহার দেহকান্তি। হস্তচতুষ্টয়ে অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তক বিশোভিত। মহালক্ষ্মী তাঁহাকে নিম্নোক্ত নামগুলিও প্রদান করিয়াছিলেন—মহাবিদ্যা, মহাবাণী, (মহা-) ভারতী, (মহা-) বাক্, আর্য্যা, ব্রাহ্মী, কামধেনু, দেবগর্ভা ও ধীশ্বরী। ইঁহাকে চণ্ডিকা দেবীর তৃতীয়া প্রকৃতি বলা যাইতে পারে।

এই প্রকারে তামসী মহাকালী ও সাত্ত্বিকী মহাসরস্বতীর অভিব্যক্তির পর মহালক্ষ্মীতে কেবল রজোগুণই অবশিষ্ট রহিল। ত্রিগুণের সমষ্টিস্বরূপা মহালক্ষ্মী তখন ব্যষ্টিভাবে রজোগুণমাত্র আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিতা রহিলেন। এই ব্যষ্টিরূপা মহালক্ষ্মীকে মহাশক্তির চতুর্থী প্রকৃতি বলা চলে।

অনন্তর তিনি নিজ অনুরূপ দুইটি দিব্য নর-নারী সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারা উভয়েই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, মনোহর কান্তিযুক্ত ও পদ্মাসনে সমাসীন। পুরুষটি ব্রহ্মা, বিধি, বিরিঞ্চি ও ধাতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন; আর নারীটির নাম হইল—শ্রী, পদ্মা, কমলা ও লক্ষ্মী।

মহালক্ষ্মীর অনুজ্ঞায় মহাকালী ও মহাসরস্বতীও নিজ নিজ অনুরূপ দিব্য স্ত্রী-পুরুষযুগ্মের সৃষ্টি করিলেন। মহাকালী কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুরুষটির কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, বাহু রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ ও শেখরদেশ শশিকলা-শোভিত; তাঁহার নাম—রুদ্র, শঙ্কর, স্থাণু, কপর্দ্দী, ত্রিলোচন প্রভৃতি। আর তাঁহার সহজাতা নারীটি শুভ্রবর্ণা ও তাঁহার নাম—ত্রয়ী, বিদ্যা, কামধেনু, ভাষা, অক্ষরা, স্বরা ইত্যাদি।

মহাসরস্বতী যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম—বিষ্ণু, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ, বাসুদেব, জনার্দ্দন প্রভৃতি। তিনি যে নারীটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি গৌরাঙ্গী। নাম তাঁহার—উমা, গৌরী, সতী, সুন্দরী, চণ্ডী, সুভগা, শিবা ইত্যাদি।

এইরূপ সৃষ্টির পর দেবী মহালক্ষ্মী, ত্রয়ীর সহিত ব্রহ্মার, গৌরীর সহিত রুদ্রের ও লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর বিবাহকার্য্য সম্পাদিত করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও স্বরার মিলনে একটি দিব্য অণ্ডের উৎপত্তি হইল। গৌরীর সহযোগে ভগবান্ রুদ্র ঐ অণ্ডটিকে স্ফুটিত করিলেন। তখন সেই অণ্ডের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বের পরিণতি হইতে হইতে অবশেষে মহাভূতাত্মক এই চরাচর বিশ্বের উৎপত্তি হইল। এ বিশ্ব পালনের ভার গ্রহণ করিলেন বিষ্ণু ও লক্ষ্মী। আর অন্তকালে উহা সংহারের অধিকার রহিল রুদ্র ও গৌরীর উপর।

'সপ্তশতীর প্রাধানিক-রহস্যে' শক্তির ত্রিমূর্ত্তি-রহস্যের উক্তরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিত্রয়ের

ধ্যানে ও 'বৈকৃতিক-রহস্যে' উহার যে অল্পবিস্তর অন্যথা-ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যে ত্রিগুণময়ী মহালক্ষ্মী দেবী তামসী মহাকালী ও সাত্ত্বিকী মহাসরস্বতীর অভিব্যক্তি করাইয়া স্বয়ং ত্রিধা প্রকাশমানা হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যবতী ভগবতী জগন্মাতা শর্ব্বা, চণ্ডিকা, দুর্গা, ভদ্রা প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত। তাঁহার তমোগুণ হইতে নিঃসৃতা মহাকালীই বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী। সপ্তশতীর প্রথমচরিত-মাহাত্ম্যে মধুকৈটভ-বিনাশার্থ বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করাইবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাকে যাঁহার স্তব করিতে দেখা যায়, তিনিই এই মহাকালী। এই সময়ে তিনি কজ্জল-সুন্দরবর্ণা, দশমুখী, দশভুজা ও দশপদা হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মুখে তিনটি করিয়া বিশাল লোচন বিরাজিত ছিল, অর্থাৎ তিনি তখন ত্রিংশল্লোচনবিশিষ্টা ছিলেন। তাঁহার বদনগুলি করাল দন্তরাজির প্রভায় ভয়ঙ্কর হইলেও তিনি রূপের ছটায় ও লাবণ্যে সকল সৌন্দর্য্যের আধারভূতা বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার দশভুজে—খড়্গ, বাণ, গদা, শূল, চক্র, শঙ্খ, ভুশুণ্ডী, পরিঘ, কার্ম্মুক ও গলদ্রক্ত ছিন্নমুণ্ড (ধ্যানানুসারে—খড়্গ, চক্র, গদা, বাণ, ধনুঃ, পরিঘ, শূল, ভুশুণ্ডী, ছিন্নমুণ্ড ও শঙ্খ।) দেবী নীলাশ্মদ্যুতি—সপ্তশতীর প্রথম চরিতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রথমচরিতের ঋষি ব্রহ্মা, নন্দা শক্তি, ও বীজ রক্তদন্তিকা। ইনিই বৈষ্ণবী মায়া। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর ইয়ত্তাবচ্ছেদিকা। ইঁহার শক্তি অনিবার্য্য। সৃষ্টির প্রারম্ভে ইনি মহত্তত্ত্ব হইতে সমগ্র বিশ্ব সঙ্কলন করেন; আবার প্রলয়ারম্ভে ইনিই সর্ব্বসংহারক মহাকালের দুরত্যয়া শক্তিরূপে প্রকাশ লাভ করেন। এই কারণেই ইঁহার অপর নাম—দুরত্যয়া ও মহামায়া। ইঁহার আরাধনায় চরাচর সমগ্র বিশ্ব সাধকের বশীভূত হইয়া থাকে।

যে অমিতপ্রভা মহিষমর্দ্দিনী দেবী দেববৃন্দের তেজঃ-সার হইতে জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া সপ্তশতীর মধ্যমচরিত-মাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে, তিনিই ত্রিগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীর রজোগুণময়ী ব্যষ্টিভূতা অপরা মূর্ত্তি। তাঁহার বদনমণ্ডল ও কুচযুগ শুভ্রবর্ণ; হস্তসমূহ, জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় নীলবর্ণ; আর কটিদেশ ও পাদপল্লবদ্বয় রক্তবর্ণ। তাঁহার জঘনদেশ সুচিত্র, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচিত্র অনুলেপনে বিলেপিত ও নানা অলঙ্কারে বিভূষিত। তাঁহার পরিধানে সুন্দর বস্ত্রযুগল; গলদেশে মনোহর মাল্যশোভা, ও সুধাপানে বদনকমল ঈষৎ আরক্ত ও মদাবেশযুক্ত। যুদ্ধকালে ইনি প্রয়োজন অনুসারে কখনও বা সহস্রভুজা আবার কখনও বা অষ্টাদশ-ভুজা-রূপে প্রতীয়মানা হইয়া থাকেন। এই কমলাসনা দেবী অষ্টাদশ ভুজে (দক্ষিণের নিম্ন হইতে উর্দ্ধক্রমে ও বামের উর্দ্ধ হইতে নিম্নক্রমে) তিনি অক্ষমালা, কমল, বাণ, অসি, বজ্র, গদা, চক্র, ত্রিশূল, পরশু, শঙ্খ, ঘণ্টা, পাশ, শক্তি, দণ্ড, চর্ম্ম, ধনুঃ, পানপাত্র ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন। (ধ্যানানুসারে—ইনি পদ্মাসনা, প্রবাল-প্রভা ও মহিষমর্দ্দিনী। ইঁহার অষ্টাদশ করে—অক্ষমালা, পরশু, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনুঃ, কুণ্ডিকা (কমণ্ডলু), দণ্ড, শক্তি, অসি, চর্ম্ম, শঙ্খ, ঘণ্টা, সুরাভাজন, শূল, পাশ ও সুদর্শন চক্র।) ইনি মধ্যমচরিতের অধিদেবতা। এই মধ্যমচরিতের ঋষি বিষ্ণু, শাকম্ভরী শক্তি ও দুর্গা বীজ। এই সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বদেবময়ী মহালক্ষ্মীর উপাসনায় সাধক স্বর্গাদি সকল লোকের অধীশ্বর হইতে পারেন।

যিনি হিমাচলশিখরে জাহ্নবীতটে দেবী পার্ব্বতীর শরীরকোষ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভাদি নানা দৈত্য বধ করিয়াছিলেন, তিনি সত্ত্বগুণাশ্রয়া মহাসরস্বতী দেবীর অপরা প্রকৃতি। ইনি অষ্টভুজে—বাণ, মুসল, শূল, চক্র, শঙ্খ, ঘণ্টা, লাঙ্গল ও ধনুঃ ধারণ করিয়া থাকেন। (ধ্যানানুসারে—ইনি শরতের সিতাংশুতুল্যপ্রভা ও ত্রিনয়না; ইঁহার অষ্ট করে—ঘণ্টা, শূল, হল, শঙ্খ, মুসল, চক্র, ধনুঃ ও বাণ শোভমান।) উত্তমচরিতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই মহাসরস্বতী, ঋষি রুদ্র, ভীমা শক্তি ও ভ্রামরী বীজ। এই শুম্ভ-নিশুম্ভ-ঘাতিনী দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে মনুষ্যের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকে।

উক্ত ত্রিমূর্ত্তি ব্যতীত মহাদেবীর আরও কয়েকটি বিশিষ্ট অবতারের কথা সপ্তশতী গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে। নন্দা, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা ও ভ্রামরী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দেবী অবতীর্ণা হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কোন্ কোন্ যুগে

কোন্ কোন্ অবতারের আবির্ভাব ঘটিবে, তাহারও উল্লেখ আছে। (৩)

সপ্তশতীর একাদশ অধ্যায়ে (মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৯১ অধ্যায়) দেবী যে সকল নিজ অবতার সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে 'নন্দা' সর্ব্বপ্রথম। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি মহাযুগে দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে এই নন্দা দেবীর আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে। ইনি নন্দগোপগৃহে তদীয়া ভার্য্যা যশোদার গর্ভে মহালক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কংস ইঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ইনি তাহার হস্তচ্যুত হইয়া বিন্ধ্যাচলে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বিন্ধ্যবাসিনীরূপে অবস্থানপূর্ব্বক (প্রসিদ্ধ শুম্ভ-নিশুম্ভ হইতে পৃথক্) শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করেন। ইনি কনকবর্ণা, কনকোত্তমকান্তি-বিশিষ্টা, কনকভূষণ-ভূষিতা ও কনকোজ্জ্বল-বস্ত্রপরিহিতা। ইঁহার হস্তচতুষ্টয়ে অঙ্কুশ, পাশ, ও কমলদ্বয় বিরাজিত। ইঁহারই নামান্তর—ইন্দিরা, কমলা, লক্ষ্মী, শ্রী, রুক্মা, অম্বুজাসনা প্রভৃতি।

বর্ত্তমান কলিযুগেই দেবীর দ্বিতীয় অবতার হইবে 'রক্তদন্তিকা'-রূপে। ইনি রক্তবর্ণা, রক্তনয়না, রক্তকেশা, রক্তরসনা, রক্তদশনা ও রক্তাম্বরা। ইঁহার নখরগুলি তীক্ষ্ণ ও রক্তাভ। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ ও আয়ুধসমূহ রক্তাক্ত। ইনি বসুন্ধরার ন্যায় গুরুনিতম্বিনী ও সুমেরুর ন্যায় পীনস্তনী। ইঁহার চারি করে—খড়্গ, চর্ম্ম, ছিন্নমুণ্ড ও পানপাত্র বিরাজিত। বিপ্রচিত্তি-বংশজাত দানবগণকে সংহারের নিমিত্তই দেবী এই রক্তচামুণ্ডা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইবেন। অসুরভক্ষণে তাঁহার দন্তগুলি দাড়িমীকুসুমের ন্যায় ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে, তাই তাঁহার নাম হইবে রক্তদন্তিকা। ইঁহার নামান্তর—রক্তচামুণ্ডা ও যোগেশ্বরী।

ভগবতীর প্রতিজ্ঞাত তৃতীয় অবতারের আবির্ভাবকাল চত্বারিংশ মহাযুগ। শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী জলশূন্যা ও শস্যহীনা হইয়া পড়িলে অনশনক্লিষ্ট মুনিগণের স্তুতিতে প্রসন্না হইয়া দেবী অযোনিসম্ভবা মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইবেন। শত নেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক সন্তপ্ত মুনিগণের উপর কৃপাদৃকপাত করিতে থাকিলে লোকে তাঁহার নাম দিবে 'শতাক্ষী'। তাহার পর সেই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকসমূহকে তিনি নিজ দেহসমুদ্ভূত শাকাদি উদ্ভিজ্জ ভোজন করাইয়া পুনরায় বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রাণরক্ষা করিবেন। ইহাতে তাঁহার নূতন নাম হইবে 'শাকম্ভরী'। ইনি নীলবর্ণা ও নীলোৎপললোচনা। ইঁহার কুচযুগ সুবৃত্ত, ঘন ও পীনোতুঙ্গ; উদর কৃশ ও ত্রিবলী-বলয়োপেত; নাভি সুগভীর। ইঁহার চারি হস্তে—ধনুঃ, শরসমূহ, কমল ও বিবিধ ফল-পুষ্প-পল্লব-মূল-শাকাদি উদ্ভিজ্জ শোভমান। এই সকল উদ্ভিজ্জ অতি রমণীয়, অশেষ প্রকার আস্বাদযুক্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা-জরা-মৃত্যু-নিবারক।

এই শাকম্ভরী অবতারেই দেবী দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিয়া 'দুর্গাদেবী' এই সুপ্রসিদ্ধ নাম ধারণ করিবেন।

---

(৩) ১ দৈব বর্ষ = ১২ পৈত্র বর্ষ = ৩৬০ মানব বর্ষ।

	যুগ	দৈব বর্ষ	মানব বর্ষ
	সত্য	৪৮০০	১৭২৮০০০
	ত্রেতা	৩৬০০	১২৯৬০০০
	দ্বাপর	২৪০০	৮৬৪০০০
	কলি	১২০০	৪৩২০০০
	চতুর্যুগ	১২০০০	৪৩২০০০০
১০০০	চতুর্যুগ	১২০০০০০০	৪৩২০০০০০০০

= ১কল্প = ব্রহ্মার একদিন বা এক রাত্রি = ১৪মন্বন্তর।

১মন্বন্তর—এক এক মনুর রাজত্বকাল—কিঞ্চিদধিক ৭১ চতুর্যুগ। ব্রহ্মার আয়ু = ব্রহ্মার শতবর্ষ = ৭২০০০কল্প (২কল্প × ৩৬০ × ১০০)। যে এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন, তাহা সৃষ্টি-কল্প; আর যে কল্পে ব্রহ্মার এক রাত্রি তাহা প্রলয়-কল্প। অতএব ব্রহ্মার আয়ুষ্কালে ৩৬০০০ সৃষ্টি-কল্প ও ৩৬০০০ প্রলয়-কল্প বর্ত্তমান। (মতান্তরে ব্রহ্মার পরমায়ু দ্বিপরার্দ্ধ বৎসর। বিষ্ণু ও অগ্নিপুরাণ মতে পরার্দ্ধ ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ বৎসর।)

বর্ত্তমানে ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের প্রথম পরার্দ্ধ (অথবা তাঁহার ৫০ বর্ষ) অতীত হইয়াছে। এই কালের মধ্যে ১৮০০০বার সৃষ্টি ও ১৮০০০ প্রলয় সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম ব্রাহ্ম দিন চলিতেছে। ইহার পারিভাষিক নাম 'শ্বেতবরাহ কল্প'। এই কল্পে যে চতুর্দ্দশ জন মনু রাজত্ব করিবেন, তাঁহাদিগের নাম—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য (বা দৈব) সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। সপ্তশতীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সুরথ রাজা উক্ত অষ্টম মনু সাবর্ণিরূপে সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিবেন। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রথম ছয় জন মনু গত হইয়াছেন। এক্ষণে সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকারকাল চলিতেছে। তাঁহারও সপ্তবিংশতি চতুর্যুগ অতীত হইয়া অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের অন্তর্গত কলিযুগের ৫০৪১ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে। আর শ্বেতবরাহকল্পের ১৯৭২৯৪৯০৪১ বর্ষ গত হইয়াছে।

এই দুর্গারই নামান্তর—পার্ব্বতী, উমা, গৌরী সতী, চণ্ডী ও কালিকা। ইনি বিশোকা, দুষ্টদলনী ও পাপ-বিপদের শমনী।

তাহার পর পঞ্চাশত্তম মহাযুগে মুনিগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত দেবী যে ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক হিমাচলে রাক্ষসগণকে ভক্ষণ করিতে থাকিবেন, আনম্রমূর্ত্তি মুনিগণ ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে তাঁহার স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার সেই ভীষণ রূপের অভিনব নামকরণ করিবেন—'ভীমা' দেবী ইনি নীলবর্ণা। ইঁহার তীক্ষ্ণ, করাল দন্তপঙ্‌ক্তি সমুজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, লোচনত্রয় বিশাল ও স্তনযুগ পীন-বর্ত্তুল। ইঁহার ভুজচতুষ্টয়ে—চন্দ্রহাস, ডমরু, ছিন্নমুণ্ড ও পানপাত্র বিরাজমান। ইঁহার নামান্তর—একবীরা ও কালরাত্রি।

দেবীর প্রতিজ্ঞাত সর্ব্বশেষ অবতার 'ভ্রামরী' দেবী ষষ্টিতম মহাযুগে অবতীর্ণা হইবেন। (৪) যখন অরুণ নামক মহাসুর ত্রিলোক প্রপীড়িত করিতে থাকিবে, তখন দেবী এই অত্যদ্ভুত ভ্রামরী-রূপ ধারণ করিবেন। তখন তাঁহার দেহ অসংখ্য ভ্রমরে প্রায় আচ্ছাদিত থাকিবে। এবংবিধ মূর্ত্তিতে অরুণাসুরকে বধ করিলে তাঁহার নূতন নাম হইবে ভ্রামরী। ইনি অতীব তেজঃপুঞ্জ-কলেবরা, দুর্নিরীক্ষ্যা, ও বিচিত্র কান্তিযুতা। ইঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র অনুলেপনে ও বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত। আর ইঁহার হস্তগুলি বিচিত্র ভ্রমররাজিতে সমাকীর্ণ। ইঁহার নামান্তর মহামারী।

জগন্মাতার চিন্ময়ী-স্বরূপ ও তাঁহার বিবিধ রূপ-পরিগ্রহের এই অদ্ভুত বিবরণ জগতের অশেষ কল্যাণকর।

(৪) এই ভ্রামরী দেবীর একটি অভিনব উপাখ্যান দুই বৎসর পূর্ব্বে 'মাসিক বসুমতীতে' প্রকাশিত করিয়াছিলাম। "দেবী ভ্রমরবাসিনী"—মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৪৫, দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রী৺শারদীয়া মহাপূজার প্রাক্কালে তাঁহার এই বিচিত্র পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিয়া মহাদেবীর শ্রীচরণো-দ্দেশে অসংখ্য প্রণতি নিবেদন করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি—

"নমো বিরাট্‌স্বরূপিণ্যৈ নমঃ সূত্রাত্মমূর্ত্তয়ে।
নমোঽব্যাকৃতরূপিণ্যৈ নমঃ শ্রীব্রহ্মমূর্ত্তয়ে॥
যদজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি রজ্জুসর্পস্রগাদিবৎ।
যজ্‌জ্ঞানাল্লয়মাপ্নোতি নুমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্॥
নুমস্তৎপদলক্ষ্যার্থং চিদেকরসরূপিণীম্।
অখণ্ডানন্দরূপাং তাং বেদতাৎপর্য্যভূমিকাম্॥
পঞ্চকোষাতিরিক্তাং তামবস্থাত্রয়সাক্ষিণীম্।
পুনস্ত্বম্পদলক্ষ্যার্থাং প্রত্যগাত্মস্বরূপিণীম্।
নমঃ প্রণবরূপায়ৈ নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে"॥ (৫)

যিনি স্থূলরূপে বিরাট্ ও সূক্ষ্মরূপে সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ শরীর ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন, কারণ-রূপে যিনি অব্যাকৃত ঈশ্বরাত্মিকা—সেই তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য-স্বরূপিণীকে প্রণতি করি। যাঁহার স্বরূপজ্ঞানের অভাবে এই রজ্জুসর্পস্থানীয় জগতের সাময়িক প্রতীতিমাত্র হইয়া থাকে, আবার যাঁহার স্বরূপজ্ঞান উদিত হইলেই এই প্রতিভাসমান প্রপঞ্চের প্রবিলয় হয়, সেই ভুবনেশ্বরীর স্তুতিকীর্ত্তন করি। যিনি 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যান্তর্গত 'তৎ'পদের লক্ষ্যার্থভূত—চিন্মাত্রস্বরূপিণী, অখণ্ডানন্দরূপা, সমগ্র শ্রুতির একমাত্র তাৎপর্য্যভূতা, অন্নময়-মনোময়-প্রাণময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়রূপ পঞ্চকোষের অতীত-রূপা, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিভূতা, আবার 'ত্বম্'পদেরও লক্ষ্যার্থভূত প্রত্যগাত্মরূপিণী,—সেই প্রণবরূপা হ্রীঙ্কারমূর্ত্তিময়ী জগন্মাতাকে স্তুতিপূর্ব্বক নতি জ্ঞাপন করি।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

ঘরের ধুলা সাফ

ঘরের দেওয়ালে রঙ করিবার পূর্ব্বে কিম্বা ঘরের আসবাব-পত্র এনামেল বা পালিশ বার্ণিশ করিবার পূর্ব্বে ঘরখানিকে ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া লওয়া প্রয়োজন—কোথাও যেন একবিন্দু ধুলা-বালি না থাকে! ঘর সাফ করার জন্ম বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সাধারণ স্প্রেতে জল ভরিয়া সেই স্প্রে চালাইয়া ঘরের দেওয়াল

স্প্রে-চালনা

ধুইয়া সাফ করিয়া লউন—দেওয়াল ধোওয়া হইলে স্প্রে চালাইয়া ঘরের বাতাসকেও এমনিভাবে ধূলিমুক্ত করিয়া লউন; তার পর ঘরের দেওয়ালে রঙ দিন, আসবাব-পত্র পালিশ করুন, এনামেল করুন, বার্ণিশ করুন—দেখিবেন, কাজ খুব ভালো হইবে!

জল-বিহারীর আরাম

মজবুত এবং হালকা কাঠ দিয়া এক রকম বোট তৈয়ারী হইয়াছে। ছ'জন, চার জন, ছ'জনের বসিবার মতো বোট মিলে। এ বোট দশ ফুট লম্বা। বোটে হাল আছে। বোটে বসিয়া সহজে হাল চালাইয়া বোটকে যে-দিকে খুশী চালনা করা যায়। ঢেউয়ে ডুবিবার ভয় নাই। জল হইতে তুলিয়া ছ'মিনিটে আবার বোটখানি মুড়িয়া রাখুন। হালকা বলিয়া মোড়া-বোট বহিতে কষ্ট হইবে না। মোটরে তুলিয়া বোট লইয়া জলবিহারে বাহির হৌন, আবার

জল-বিহার

জলবিহার সারিয়া বোট তুলিয়া বাড়ী ফিরিয়া চলুন—এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য সহিতে হইবে না।

আলোর বন্যা

শিকাগো-নিবাসী শ্রীমতী কাথলিন কীলার ফটোগ্রাফারদিগের ফটো তুলিবার সহায়তা-কল্পে অভিনব ফ্লড-লাইট বা আলোক-বন্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বন্যার জন্ম তিনি তৈয়ারী করিয়াছেন

আলোর বন্যা

তিনখানি রিফ্লেক্টর—স্ট্র্যাপ দিয়া তিনখানি রিফ্লেক্টর গায়ে গায়ে আঁটা থাকে। মাঝেরখানি মাথায় আঁটিতে হয় টুপির মতো, অপর ছ'খানি রিফ্লেক্টরের সঙ্গে সুইচ, ও আলোর বাল্ব

সংযুক্ত আছে। মাথায় টুপি আঁটিয়া চিবুকের নীচে দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। তার পর বোতাম টিপিবামাত্র পাশের দু'টি বাল্‌ব জ্বলিয়া রিফ্লেকটর-সাহায্যে আলোর বন্যা সৃষ্টি করে। সে আলোয় যেখানে যেমন খুশী ফটো তুলুন।

ঠাণ্ডা ঘর

বিজ্ঞানের দৌলতে গ্রীষ্মের তপ্ত মধ্যাহ্নেও ঘরকে আজ চমৎকার স্নিগ্ধ-শীতল রাখা সম্ভব হইয়াছে! এ সম্ভাবনার মূলে যন্ত্রের সম্পর্ক আছে। যন্ত্রযোগে এই cooling system-এর ব্যবস্থা আজ সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। এখন আবার বৈজ্ঞানিকেরা এমন
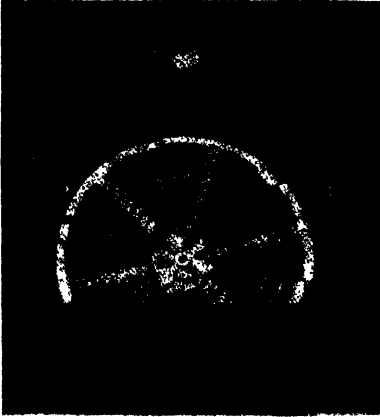
পিতলের জলপাত্রে পাখা

এইভাবে মুড়িয়া রাখিতে হয়

ব্যবস্থা করিয়াছেন যে আপনি-আমিও মনে করিলে নিজেদের ঘরকে গ্রীষ্মের দিনে স্নিগ্ধ-শীতল রাখিতে পারিব। এজন্য সাড়ে ছ'সের ওজনের বায়ু-নিয়ামক একটি যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। যন্ত্রটিতে আছে পিতলের জল-পাত্র এবং তার পিছনে একখানি বৈদ্যুতিক পাখা। বৈদ্যুতিক প্রবাহযোগে এই পাখা চলে; পাখা চলিলে পাত্রের জল বাষ্পরূপে বাহির হইয়া ঘরের বাতাস ভরিয়া তোলে; সেই জলবাষ্পকণার সংযোগে ঘরের বাতাস স্নিগ্ধ-শীতল হয়। যন্ত্রটির দুই মুখে আছে কাচের সুতায় তৈয়ারী দু'খানি জাফরি-কাটা আবরণ। যন্ত্রটির হাতল আছে—সে হাতল ধরিয়া যন্ত্রটিকে যে ঘরে খুশী লইয়া যান, কোনো অসুবিধা ঘটিবে না। পাশের ছবিতে যন্ত্রটির ব্যবস্থা-কৌশল এবং কর্ম্মরহস্য বুঝিতে পারিবেন।

মাছের কাঁটা বাছা

কাঁটা বাছিয়া মাছ খাওয়া—সে যেন মস্ত এ্যাডভেঞ্চার! গলায় পাছে কাঁটা ফোটে, এই ভয়ে লোভ থাকিলেও অনেকে ইলিস মাছ খাইতে পারেন না। নিখুঁতভাবে মাছের কাঁটা ছাড়ানোর জন্য সম্প্রতি

কাঁচিদার কাঁটা

একরূপ কাঁচিদার কাঁটা (fork) তৈয়ারী হইয়াছে। এ কাঁচি-কাঁটায় মাছের কাঁটা নিখুঁতভাবে বাছা যায়; মাছের গায়ে ছোট একটি কাঁটাও লাগিয়া থাকিবে না।

রক্ষা-কবচ

এ্যালবামের ফটোগ্রাফ, দলিল-পত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় লেখা সর্ব্বধ্বংসী কালের

রবারের স্বচ্ছ আচ্ছাদনী

নিপীড়ন হইতে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য নিউ জার্সির এক জন বৈজ্ঞানিক গন্ধহীন অদাহ্য এবং আর্দ্রতা-নিবারক (waterproof)

এক-রকম আবরণী তৈয়ারী করিয়াছেন। পাৎলা স্বচ্ছ রবার দিয়া এ আবরণী তৈয়ারী হইয়াছে। এ্যালব্যাম ও দলিল-পত্রাদির উপরে এ রবার-আবরণী চাপিয়া রাখিলে তাহার তলায় ফটো, লেখার হরফ প্রভৃতি চিরকাল অক্ষয় অটুট থাকিবে; ফটোর রঙ জলিয়া যাইবে না,—লেখার অক্ষর বা ছাঁদ অস্পষ্ট হইবে না।

নূতন বর্ষাতি

বৃষ্টির সময় ঝুল-দার বর্ষাতি-কোট গায়ে দিয়া আমরা বর্ষার জলসেক হইতে নিস্তার লাভ করি। কিন্তু তাহাতে মুস্কিল ঘটে এই যে, ট্রাউজার বা ধুতি পরা থাকিলে পায়ের দিকটা বাঁচাইতে পারি না—ট্রাউজার ও ধুতি ভিজিয়া যায়। এজন্ত বর্ষাতি-কোটের

পা-ঢাকা বর্ষাতি-কোট

সঙ্গে হাঁটু হইতে পায়ের তলদেশ পর্য্যন্ত—ট্রাউজারের-ছাঁদে দু'টি খোল পুশ্-বোতামের সাহায্যে আটকাইয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ষাতি-কোট গায়ে চড়াইয়া এ দু'টি খোল ট্রাউজারের ভঙ্গীতে পায়ে আঁটিয়া লউন, পায়ে জল লাগিয়া ট্রাউজার বা ধুতি ভিজিবে না।

ক্র্যাশ-বোটে হাসপাতাল

এবারকার এ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সকল দিকেই উল্টা-রকমের ব্যাপার। মাইন আর সাবমেরিন—সাবমেরিন আর মাইন। এ যুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্ত ইংরেজ ক্র্যাশ-বোট তৈয়ারী করিয়াছে। মাইন ও সাবমেরিনের আঘাতে জাহাজ ভাঙ্গিলে ক্র্যাশ-বোট অচিরে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যথাসময়ে জলমগ্ন যাত্রীদিগের উদ্ধার সাধন করে। প্রত্যেকটি বোটে চার-জনের উপযোগী হাসপাতালের পূর্ণ সরঞ্জাম বিদ্যমান আছে। তার
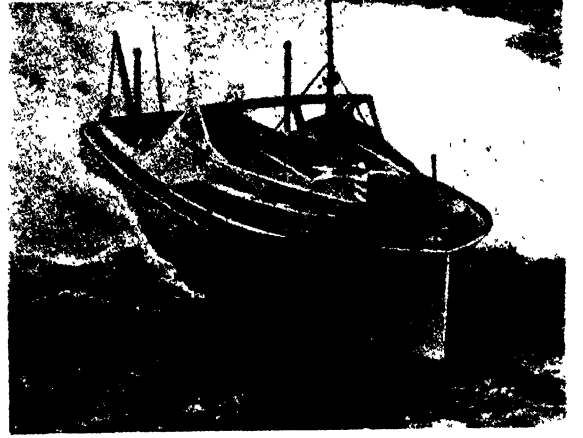
ক্র্যাশ্-বোট্

উপর বোটে আছে বেতার-বার্ত্তার তীর-বাহী সংযোগ। বোটগুলি লম্বে চল্লিশ ফুট এবং চলে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে।

পকেট-করাত

নানা কাজে যখন-তখন আমাদের করাত বা অন্ত অস্ত্রশস্ত্রে প্রয়োজন হয়। বনে-জঙ্গলে বা ক্যাম্পে-ক্যাম্পে ঘুরিয়া যাঁদে দিনাতিপাত করিতে হয়, তাঁদের জন্ত পকেট-করাত প্রভৃতির সরঞ্জা

খোলা করাত

তৈয়ারী হইয়াছে। এ করাত ইস্পাতের তৈয়ারী। বহু খ এ করাত বিভক্ত। প্রয়োজন-মতো ব্রকচেন্ দিয়া খণ্ডগুলি সংযু করিয়া লওয়া চলে; প্রয়োজন মিটিলে আবার করাতের খণ্ড স্বতন্ত্রভাবে খুলিয়া মুড়িয়া ছোট কেসে ভরিয়া রাখা যায়।

শক্তিপূজা

জগজ্জননী মহাশক্তির পূজা করিতে হইলে প্রথমে মহাশক্তির স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। এই মহাশক্তি শিবমহিষীরূপে বর্ণিত হইলেও শিব হইতে শক্তির কোনরূপ ভেদ শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। শিবকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তির কোন সত্তা নাই, শক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া শিবেরও কোন সত্তা থাকিতে পারে না; এই জন্য শিব ও শক্তির মধ্যে বাস্তব কোন ভেদ থাকিতে পারে না (১)। অগ্নির উষ্ণতা যেমন তাহার স্বাভাবিক বস্তু—আগন্তুক ধর্ম্ম নয়, সেইরূপ শক্তিও শিবের স্বাভাবিক বস্তু,—আগন্তুক কোন ধর্ম্ম নয়; পরন্তু শিব যেরূপ নিত্য বস্তু, এই শক্তিও সেইরূপ নিত্য বস্তু (২)। বাস্তব পক্ষে যে চিন্ময় বস্তুকে শিব বলা হয়, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোধান এবং অনুগ্রহ—এই পঞ্চকৃত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই নিত্য চিন্ময় বস্তুকেই শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে (৩)। একই চিন্ময় বস্তুর বিভিন্ন রূপকে লক্ষ্য করিয়া শিব ও শক্তি, এই দুইটি বিভিন্ন নাম নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে;—শুদ্ধ স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ যে চিন্ময় স্বরূপ, তাহাকে শিব বলা হইয়াছে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় প্রভৃতির কারণরূপে তাহাকেই আবার শক্তি বলা হইয়া থাকে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই দুইই এক বস্তু, ইহাদের মধ্যে বস্তুগত কোন ভিন্নতা নাই।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, একমাত্র নিত্য চিন্ময় ব্রহ্ম বস্তু,—যে ব্রহ্মকে জগতের কারণরূপে নির্দ্দেশ

---

(১) ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
ন তত্ত্বতস্তয়োর্ভেদশ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব।—
শারদাতিলক-রাঘবভট্টটীকায় উদ্ধৃত (১।২)

শিব ও শক্তির পরস্পর ভেদ নাই, ইহা যে কেবল অদ্বৈতবাদী শাক্তগণের সিদ্ধান্ত, তাহা নহে; দ্বৈতবাদী শৈবগণও শিব ও শক্তির অভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন;—"শক্তিশক্তিমতোর্ভেদাসিদ্ধেঃ।" রামকণ্ঠ-প্রণীত পরমোক্ষনিরাস-কারিকা-বৃত্তি (১০)

(২) পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবা।—সূতসংহিতা (শিবমাহাত্ম্যখণ্ড) মাধবাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্যদীপিকায় উদ্ধৃত (৫।১-২)।

(৩) যথা দণ্ড-চক্রাদয়ঃ স্বরূপেণ তথা ব্যপদিশ্যমানা অপি কার্য্যঘটাদিপ্রতিযোগিনিরূপ্যেণ রূপেণ কারণানীত্যুচ্যন্তে, এবং পরশিবস্বরূপেণ তথোচ্যমানোঽপি কৃত্যপঞ্চকলক্ষণশক্ত্যেন নিরূপ্যমাণঃ পরা শক্তিরিত্যুচ্যতে। উক্তং হি (তত্ত্বপ্রকাশিকা) ৭ তস্য কৃত্যপঞ্চকম্—
পঞ্চবিধং তৎ কৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিতিরোভাবাঃ।
তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্যাস্য।

আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদের অনুসরণে শক্তির স্বরূপের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে,—সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই শিব এবং জগৎ কারণরূপে বর্ণিত সগুণ ব্রহ্ম—যাঁহাকে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ঈশ্বর বলা হয়,—তিনিই শক্তি। আগমশাস্ত্রের অনুগামী আচার্য্যগণের এ বিষয়ে একটু মতভেদ আছে। প্রত্যভিজ্ঞামতের অনুগামী অভিনবগুপ্ত-প্রমুখ আচার্য্যগণ পরমেশ্বর ব্যতীত নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া কোন কিছু স্বীকার করেন নাই; ইঁহাদের মতে পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যরূপা যে ইচ্ছাশক্তি, তাহাই তাঁহার শক্তি (ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসন্দোহ ২)। ত্রিপুরারহস্যে (জ্ঞানখণ্ড ১৪।৫৮) চিতি স্বয়ং নির্বিকল্প চৈতন্যরূপা হইলেও তাঁহাতে স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে; এই স্বাতন্ত্র্যই পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তিরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (ত্রিপুরারহস্য-জ্ঞানকাণ্ড-তাৎপর্য্যদীপিকা ১৪।৬০)। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ; তাঁহাতে যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দাংশই তাঁহার শক্তি, ইহা ভাস্কররায়ের মত (বরিবস্যারহস্য-প্রকাশ ১।৩)। ভাস্কররায়ের প্রশিষ্য রামেশ্বর তাঁহার পরশুরাম-কল্পসূত্র-বৃত্তিতে পরমেশ্বরে 'শান্তা' নাম্নী শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এই শক্তিকে পরমেশ্বরে স্বরূপের অন্তর্গত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পরমার্থতস্তু সা শক্তিঃ শক্তিমতঃ শিবাদভিন্নৈবেত্যাগমেষু প্রপঞ্চিতম্।—সূতসংহিতা (শিবমাহাত্ম্যখণ্ড) মাধবাচার্য্য-কৃত তাৎপর্য্যদীপিকা (৫।১·২)

আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি তাঁহার বাক্যপদীয়ে (১।৩) ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়া তাহার 'কালশক্তি' এই নাম দিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই অদ্বৈতবাদী এবং শক্তি ও শক্তিমানের কোন ভেদ স্বীকার করেন না।

শৈবাচার্য্যগণ দ্বৈতবাদী হইলেও পরমেশ্বরের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং শক্তি ও শক্তিমান্ পরমেশ্বরের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন নাই, ইহা পূর্ব্বে (১নং পাদটীকায়) বলা হইয়াছে।

ইঁহাদের সকলের মতেই, শক্তি চিন্ময়ী এবং সেই শক্তি পরমেশ্বরের স্বরূপেরই অন্তর্গত, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণবগণের পরমমান্য পাঞ্চরাত্র আগমের অন্তর্গত অহির্বুধ্ন্য-সংহিতাতেও এই কথা বলা হইয়াছে;—

করা হইয়াছে (৪),—আমরা সেই ব্রহ্মকেই জগজ্জননীরূপে পূজা করিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মকে (শিবকে) জগতের কারণরূপে বুঝিতে গেলে মহাশক্তিরূপেই বুঝিতে হয়। আমরা অজ্ঞানী জীব; আমরা স্থূল জগৎকে নিজের সমক্ষে দেখিতে পাই; এই স্থূল জগতের ভিতর দিয়াই পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্ম বস্তুর কথঞ্চিৎ ধারণা হইতে পারে, অন্য প্রকারে সেই চিন্ময় সূক্ষ্ম বস্তুর কোনরূপ ধারণা আমাদের বুদ্ধিতে আসিতে পারে না। এই জন্য আমাদের ন্যায় উপাসকের উপাসনা স্থূলের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার উপায়রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; আমরা স্থূলের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মে পৌঁছিবার উদ্দেশেই জগন্মাতার অর্চ্চনা করিয়া থাকি।

এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু,—ইহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই; সূক্ষ্ম বস্তুই স্থূল বস্তুগুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত অথবা সূক্ষ্ম বস্তুই স্থূলবস্তুরূপে আমাদের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া আছে। কিন্তু তাহা হইলেও বহির্মুখ উপাসক স্থূলের মধ্যে সেই সূক্ষ্ম বস্তুর উপলব্ধি করিতে পারে না; এমন কি, কোন কিছুর অবলম্বন না পাইলে জগজ্জননীরূপেও মহাশক্তির ধারণা করা তাহার সামর্থ্যের অতীত। এই জন্য তাহার পক্ষে 'প্রতীকে'র সাহায্যে মহাশক্তির উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই 'প্রতীক' আমাদের এই দশভুজা মূর্ত্তি।

প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জগজ্জননীর এই দশভুজা মূর্ত্তির মধ্যেও তাঁহার সূক্ষ্মস্বরূপের আভাস আছে। দশ দিকে প্রসারিত মৃণালায়ত দশ বাহু দশ দিকে তাঁহার ব্যাপ্তি সূচিত করিয়া মহাশক্তির সর্ব্বব্যাপকতা ঘোষিত করিতেছে। ত্রিনয়নার তিনটি নয়ন—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের প্রতি তাঁহার অব্যাহত দৃষ্টির সূচনা করিয়া চিন্ময়ীর সর্ব্বসাক্ষিত্বের পরিচয় দিতেছে। যে বস্তুর মধ্যে দোষ থাকে, তাহার সৌন্দর্য্যের হানি ঘটে। পরমেশ্বরী স্বতঃ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত; তাই তাঁহার স্বরূপ স্বভাব-সুন্দর। দশভুজা মূর্ত্তির এই যে বিশ্ব-বিমোহন রূপ, এই রূপ সেই মহাশক্তির সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত স্বাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্যের পরিচয় দেয়। মহাশক্তি যেমন জগতের উৎপত্তির কারণ বলিয়া জগজ্জননী, সেইরূপ স্থিতি এবং লয়েরও তিনিই একমাত্র কারণ; তাই তাঁহার দশ বাহুর দশটি অস্ত্র, শিষ্টের পালনের উদ্দেশে দুষ্টের বিনাশের সামর্থ্যের পরিচায়ক-রূপে দেখিতে পাই। জগতে দুই প্রকার বলের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সাত্ত্বিক বল এবং আসুর বল। এই দুই প্রকার বলই মহাশক্তির আয়ত্ত। মহাশক্তির কৃপায় সাত্ত্বিক বল লাভ হয় এবং আসুর বল—যাহা জীবের অকল্যাণের কারণ—তাহা মহাশক্তির কৃপা-লব্ধ সাত্ত্বিক বলের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বিলীন হইতে থাকে। সত্ত্বগুণ শুভ্ররূপে কল্পিত হয়। মহাশক্তির পদতল-গত বাহন মহাসিংহ, এই সাত্ত্বিক বলের 'প্রতীক'; এই জন্য এই সিংহ শুভ্রকায়। অপর দিকে কৃষ্ণবর্ণ অসুরকে আসুর বলের 'প্রতীক'রূপে মহাশক্তির প্রভাবে নিগৃহীত অবস্থায় দেখা যায়। সাত্ত্বিক বলের 'প্রতীক' মহাসিংহ মহাশক্তির অনুকূলতায় আসুর বলকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিতেছে।

মহাশক্তির এই 'প্রতীক'—এই দশভুজা মূর্ত্তি—যেন

উদধেরিব চ স্থৈর্য্যং মহত্ত্বেব বিহায়সঃ।
প্রভেব দিবসেশস্য জ্যোৎস্নেব হিমদীধিতেঃ।
বিষ্ণোঃ সর্ব্বাঙ্গসংপূর্ণা ভাবাভাবানুগামিনী।
শক্তির্নারায়ণী দিব্যা সর্ব্বসিদ্ধান্তসম্মতা॥
দেবাচ্ছক্তিমতোঽভিন্না ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। ৩।২৩-২৫

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আমরা স্বয়ং প্রকাশমান আত্মার শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাই;—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ। (১।২)

শ্বেতাশ্বতরের এই মন্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে (১।১) ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের জগতের কারণ সম্বন্ধে যে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বর্ণিত আছে। সেই সংশয়ের নিরাকরণের জন্য তাঁহারা ধ্যানস্থ হইয়া স্বয়ং প্রকাশমান পরমাত্মার শক্তিকে দেখিতে পাইলেন। যে শক্তিকে তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিলেন, সেই শক্তি গুণময়ী। ঋষিগণ আপাতদৃষ্টিতে যে সকল বস্তুকে জগতের কারণ বলিয়া সংশয় করিয়াছিলেন,—তাঁহারা দেখিলেন,—সেই সমস্ত কারণ, কাল এবং আত্মা (জীব) এই সমস্তই সেই গুণময়ী শক্তির আশ্রয় যে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা—তাঁহার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া আছে!

যাঁহারা শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা এই মন্ত্রটিকে শক্তির প্রতিপাদক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরে অন্য মন্ত্রেও (৬।৮) পরমেশ্বরের শক্তির উল্লেখ আছে।

(৪) তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ (২।১)

মহাশক্তির বাস্তব স্বরূপের পরিচয় দিয়া অসুর বলের বিধ্বংসের জন্য জগৎকে তাঁহার শরণাগত হইতে আহ্বান করিতেছে।

দশভুজার চাল-চিত্রে আমরা সৃষ্টি-দেবতা ব্রহ্মা, পালন-দেবতা বিষ্ণু এবং সংহার-দেবতা রুদ্রের মূর্ত্তি দেখিতে পাই; আমাদের উপাস্যা মহাশক্তি যে একাধারে এই ত্রিমূর্ত্তির সমবায়, তাহাই এখানে প্রকাশিত হইয়াছে।

লক্ষ্মী এবং সরস্বতী—সম্পদ্ এবং বিদ্যা,—এই দুই বস্তু মহাশক্তির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত আছে। মহাশক্তির সেবা না করিলে এই দুই বস্তু লাভ করা যায় না, দশভুজা মূর্ত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি ইহাই সকলকে বুঝাইয়া দিতেছে।

সিদ্ধি এবং পরাক্রম যে মহাশক্তিরই সন্তান,—মহাশক্তিই যে ইহাদের জন্মদাত্রী,—সিদ্ধি-দেবতা গণেশ এবং পরাক্রমের 'প্রতীক' কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি দশভুজামূর্ত্তির সান্নিধ্যে থাকিয়া ইহার পরিচয় দিতেছে; নিজের মধ্যে যে সর্ব্বব্যাপিনী মহাশক্তি বিরাজমান আছেন, সেই মহাশক্তির উদ্বোধনই সিদ্ধি এবং পরাক্রম-লাভের একমাত্র সাধন,—এই সত্য এখানে প্রকটিত হইয়াছে।

নবপত্রিকার পূজা এবং বিল্ববৃক্ষের পূজা গীতার দশমাধ্যায়ে বর্ণিত ভগবানের বিশ্বব্যাপিনী বিভূতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় (৫)।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দশভুজামূর্ত্তির আরাধনার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন,—সেটি মাটীর পুতুলের পূজা নহে,—মাটীর পুতুলের অন্তরালে যে সর্ব্বব্যাপক চিন্ময় দেবতা অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, ইহা তাঁহারই পূজা।

মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময় দেবতার উদ্দেশে গঙ্গাজল-বিল্বদল-প্রভৃতির দ্বারা যে পূজা, এই পূজা বাহ্য পূজা; যাঁহারা বহির্ম্মুখ উপাসক—যাঁহারা বাহ্য জগতের কোলাহলময় ব্যাপারে নিরন্তর আসক্ত—তাঁহাদের বাহ্য ব্যাপারের মধ্যেও চিন্ময় দেবতার স্মৃতি অব্যাহত রাখার জন্য এই বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান (৬)।

মৃন্ময়ীর অন্তরালে চিন্ময়ীর স্বরূপ যেমন প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের বাহ্যপূজার লক্ষ্যরূপে নিয়মিত হইয়াছে, সেইরূপ দেবীমাহাত্ম্যের (চণ্ডীর) দেবাসুর-সংগ্রামের অন্তরালে আর একটি সংগ্রাম বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে মহাশক্তির আরাধনায় উদ্‌বুদ্ধ করিতেছে।

আমরা উপনিষদে (৭) দেবাসুর-সংগ্রামের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। উপনিষদ্ অধ্যাত্মশাস্ত্র; সুতরাং সে স্থলে দেবাসুর-সংগ্রামের তাৎপর্য্য আধ্যাত্মিকভাবেই গ্রহণ করা হয় (৮)। চণ্ডীতে মহাশক্তির মাহাত্ম্যব্যঞ্জক যে দেবাসুর-সংগ্রাম বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যেও আধ্যাত্মিক ভাবের অস্তিত্ব আছে, বিচার করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়।

চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে মধুকৈটভ-বধ বর্ণিত আছে। সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়,—জগতের পালন-কর্ত্তা যোগনিদ্রায় অভিভূত আছেন; সেই সময়ে মধুকৈটভ অসুর উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে সময়ে ব্রহ্মা

---

(৫) অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥
ভগবদ্গীতা ১০।৪২

(৬) ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশই দিয়াছেন,—
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।—
ভগবদ্গীতা ৮।৭

—সকল সময়েই আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর।

জাগতিক সকল কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানের মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি অব্যাহত রাখিতে হইবে,—ইহাই এই উপদেশের তাৎপর্য্য।

কেহ কেহ মনে করেন,—যাঁহারা একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষেই সর্ব্বদা ভগবানের স্মৃতি অব্যাহত রাখার আবশ্যকতা আছে; যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতির অপেক্ষা বাহ্য জগতের মধ্যে উন্নতি-লাভের কামনা অধিক মাত্রায় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে সকল ব্যাপারের মধ্যেই নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করার কোন অর্থ নাই। একটু বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয়, এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সাংসারিক ব্যবহার-ক্ষেত্রের ব্যাপারগুলির মধ্যে তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত বিদ্যমান আছে। মানুষ কোন একটি দৃঢ় বস্তুর অবলম্বন প্রাপ্ত হইলে যেমন প্রবল স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়াও অবসাদগ্রস্ত হয় না, সেইরূপ যিনি সাংসারিক ব্যাপারের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন, কোন সময়েই তাঁহার অবসাদ আসিতে পারে না।

(৭) বৃহদারণ্যক ১।৩।১

(৮) দ্রষ্টব্য—বৃহদারণ্যক—শাঙ্করভাষ্য ১।৩।১

মহাশক্তির স্তুতি করিলে পর, মহাশক্তির আনুকূল্যে বিষ্ণু উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সেই দুই অসুরকে (মধু ও কৈটভকে) বধ করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন।

এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মধুকৈটভের স্বরূপ বিচার করিলে আমরা ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবের সন্ধান পাইতে পারিব।

বিষ্ণু পালন-দেবতা বলিয়া সত্ত্বগুণপ্রধান; ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা বলিয়া রজোগুণপ্রধান। সেই অনুসারে আমরা এখানে বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণরূপে এবং ব্রহ্মাকে রজোগুণরূপে গ্রহণ করিতে পারি। বিষ্ণুর যোগনিদ্রাকে 'তামসী শক্তি'রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, এস্থলে যে অবস্থায় তমোগুণের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়া সত্ত্বগুণকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই অবস্থায় সত্ত্বগুণ নিজের সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিল। তমোগুণের দুইটি স্বভাব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে,—গুরুত্ব এবং আবরণ; তমোগুণের এই দুইটি সামর্থ্য এখানে মধু এবং কৈটভ নামক দুই অসুররূপে প্রকটিত হইয়াছে। যখন সত্ত্বগুণ 'তামসী-শক্তি'র প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়া সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে—যখন অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণের বিকাশ তমঃশক্তির প্রভাবে নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে—সেই সময়ে তমোগুণ অধিক প্রভাবিত হইয়া রজোগুণকে (ব্রহ্মাকে) অভিভূত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। জগতের সকল শক্তিই মহাশক্তির অন্তর্নিবিষ্ট; 'তামসী শক্তি'ও মহাশক্তির একটি বিকাশ; যখন সেই 'তামসী-শক্তি'রূপে বিদ্যমান মহাশক্তি রজোগুণের 'প্রতীক' ব্রহ্মার প্রার্থনায় নিজের আচ্ছাদন-ব্যাপারকে সঙ্কুচিত করিলেন, তখনই সত্ত্বগুণ তাহার স্বাভাবিক অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়া তমোগুণকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। চণ্ডীর মধু-কৈটভ-বধের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এইরূপ। আমাদের অন্তরের 'সাত্ত্বিক বৃত্তি' ও 'তামস বৃত্তি'র দ্বন্দ্ব, এই আখ্যায়িকায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত মহিষাসুর-বধ। এখানে মানুষের সমস্ত সদ্‌বৃত্তিগুলি দেবতারূপে বর্ণিত হইয়াছে (১)। মহিষাসুর হইতেছে অহঙ্কারের 'প্রতীক'। যখন অহঙ্কার চিত্তে অত্যন্ত প্রবলভাব প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থায় সমস্ত সদ্‌বৃত্তিগুলি ম্লান হইয়া যায়; ক্রোধ, দ্বেষ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অহঙ্কারের সহচরগুলি সে সময়ে স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা দেখিতেছি, চণ্ডীর মহিষাসুরবধের উপাখ্যানে সেই কথাই বর্ণিত হইয়াছে;—মহিষাসুরের প্রভাবে সমস্ত দেবতা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন; আর মহিষাসুর সেই সময়ে দেবতাদের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। তাহার পরে, যখন সমস্ত দেবতা সমবেতভাবে মহাশক্তির উদ্বোধন করিলেন, তখন মহাশক্তি আবির্ভূতা হইয়া মহিষাসুর এবং তাহার সহচরগণের বিনাশ করিলেন; দেবতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এখানেও আমরা দেখিতে পাইতেছি, সমস্ত সদ্‌বৃত্তিগুলি যে সময় বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত ছিল, তখন তাহারা অহঙ্কারের প্রভাবে অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহাদের সেই বিচ্ছিন্নভাবের অবসান ঘটিলে, তাহাদের মধ্য হইতেই মহাশক্তি আবির্ভূতা হইয়া অহঙ্কারকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল।

ইহার পরে তৃতীয় পর্য্যায়ে শুম্ভনিশুম্ভের উপাখ্যান চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে।

এখানে দেখা যায়, অসুরগণ দেবতাগণকে অভিভূত করিয়া তাঁহাদের সকল অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছে। সেই অবস্থায় দেবতাগণের সমবেত আরাধনার ফলে মহাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন; সেই ক্ষেত্রে অসুরগণ এরূপ প্রবলভাব প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহারা মহাশক্তিকেও নিজের আয়ত্তে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিল না; অবশেষে তাহারা মহাশক্তির প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া বিনষ্ট হইল। তখন দেবতাগণ নিজ নিজ অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এই উপাখ্যানের মধ্যেও সেই অন্তঃকরণের সদ্‌বৃত্তি ও অসদ্‌বৃত্তির দ্বন্দ্ব,—যাহা নিরন্তর আমাদের অন্তরে সংঘটিত হইতেছে,—তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকরণে রক্তবীজ অসুরের বধের অধ্যায়ে দেখিতে পাই রক্তবীজের রক্ত ভূমিতে পতিত হওয়ামাত্র তাহা হইতে

(১) বৃহদারণ্যকের (১।৩।১) শাঙ্করভাষ্যে সদ্‌বৃত্তিগুলি দেবতারূপে এবং অসদ্‌বৃত্তিগুলি অসুররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আর একটি রক্তবীজ উৎপন্ন হইতেছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অসদ্‌বৃত্তি যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে তাহারই সমান-শক্তি-সম্পন্ন নূতন নূতন অসদ্‌বৃত্তি সকল উৎপন্ন হইতে থাকে। এই জন্য যে কোন প্রকারেই হউক, অসদ্‌বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করাই একান্ত আবশ্যক।

আমরা চণ্ডীর উল্লিখিত তিনটি উপাখ্যান হইতে তিনটি তত্ত্ব জানিতে পারি। ইহার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে বীজরূপে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী দুইটি উপাখ্যানে সেই কথাই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের মধ্যে আচ্ছাদন-শক্তি তমোগুণেই আছে; সেই তমোগুণের প্রভাবে সত্ত্বগুণ অভিভূত হইলেই অন্তরে অসদ্‌বৃত্তির প্রাবল্য ঘটে, ইহা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় উপাখ্যানে অসদ্‌বৃত্তির মূল কারণ যে তমোগুণের প্রভাব, তাহার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাই; কারণ, তাহার স্বরূপ-পরিচয় প্রথম উপাখ্যানেই দেওয়া হইয়াছে। এই দ্বিতীয় উপাখ্যানে ইহাই বলা হইয়াছে,—অহঙ্কার সকল অসদ্‌বৃত্তির পোষক, সকল সদ্‌বৃত্তিকে অভিভূত করিবার সামর্থ্য তাহার আছে। তৃতীয় উপাখ্যানে দেখা যায়, শুম্ভের মধ্যে কামভাবের প্রাবল্য ছিল; সুতরাং এই উপাখ্যানে শুম্ভ কামভাবের 'প্রতীক'রূপে বর্ণিত হইয়াছে; অন্তরে কামভাবের প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে, তাহার দ্বারা সমস্ত সদ্‌বৃত্তি অভিভূত হইয়া যায় এবং অভিমান প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তিগুলি প্রবল হইয়া উঠে—ইহাই তৃতীয় উপাখ্যানের প্রতিপাদ্য।

এই সকল অসদ্‌বৃত্তিকে উচ্ছেদ করিয়া সদ্‌বৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের অভ্যন্তরে যে মহাশক্তি সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান আছেন, তাঁহার উদ্বোধন করিয়া বলসঞ্চয় করিতে হইবে, ইহা তিনটি উপাখ্যানেরই তাৎপর্য্য।

সংসারে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। কেহ সাংসারিক অভ্যুদয় কামনা করেন, আবার এরূপ লোকও আছেন, যাঁহারা সাংসারিক অভ্যুদয় কামনা করেন না; সমস্ত সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তি কামনা করেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক হইলেও দ্বিতীয় প্রকারের লোক যে একেবারেই নাই, এ কথা বলা চলে না। এই দুই শ্রেণীর লোকই মহাশক্তির অনন্যভাবে আরাধনা করিলে নিজের অভীপ্সিত ফল লাভ করিতে পারেন—ইহা চণ্ডীর অন্তিম অধ্যায়ে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সাংসারিক উন্নতি, এই উভয়বিধ উন্নতির মূল হইতেছে, অন্তর হইতে অসদ্‌বৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিয়া সেখানে সদ্‌বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করা; ইহা না করিতে পারিলে কোন প্রকার উন্নতিরই যোগ্যতা অর্জ্জিত হয় না। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য প্রথমে দেবাসুর-সংগ্রামের অবতারণা করিয়া, পরে সকলের শেষে ঐশ্বর্য্যকামী সংসারাসক্ত সুরথ রাজার রাজ্য-প্রাপ্তি এবং সংসার-বিরক্ত মুমুক্ষু বৈশ্যের মোক্ষলাভ বর্ণিত হইয়াছে (১)।

চণ্ডীতে মহাশক্তির প্রভাব বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে;

---

(১) এখানে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, চণ্ডীর যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইল, তাহার দ্বারা তাহার আধিভৌতিক ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করা হয় নাই। একই বেদমন্ত্রের অনেক ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সেই স্থলে সেইরূপ সকল ব্যাখ্যাই যে বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্যের অনুকূল,—ইহা যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে প্রদর্শন করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য—নিরুক্ত ৫।১২)। এই ক্ষেত্রেও সেই যুক্তির প্রয়োগ করিতে কোন বাধা দেখা যায় না। সুতরাং আমরা অনায়াসে বলিতে পারি—আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীর উপাখ্যানের দ্বারা আপাততঃ প্রতীয়মান দেবাসুর-সংগ্রামেও চণ্ডীর তুল্যরূপ তাৎপর্য্য আছে।

ম্যাক্‌ডোনেল-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্যগণ এবং তাঁহাদের অনুযায়ী ভারতীয়গণ মনে করেন, যাস্কের পূর্ব্বেই বেদের পরম্পরাগত ব্যাখ্যা-পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহারা নিজের উদ্ভাবিত অভিনব পদ্ধতি অনুসারে বেদের ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে বিচারশীল সুধীগণের চিন্তা করিবার যোগ্য একটি বিষয় আছে,—প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞ যাস্কের ব্যাখ্যাপদ্ধতির মূলে পরম্পরাগত কোন অবলম্বন না থাকায় তাঁহার ব্যাখ্যা যদি আদরণীয় না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পাশ্চাত্ত্যগণের স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা-পদ্ধতির উপর কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যাইবে? বস্তুতঃ যাস্কের ব্যাখ্যার অবলম্বনরূপে পূর্ব্বপরম্পরাগত কোন পদ্ধতি ছিল না, ইহার পক্ষে কোন নির্দ্দোষ এবং সুদৃঢ় যুক্তি নাই; বরং ইহার বিপরীত পক্ষে প্রমাণ আছে;—যাস্ক তাঁহার ব্যাখ্যার মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী নিরুক্তকারগণের নাম এবং মতের বহুবার বহু প্রকারে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ের বিচারের ক্ষেত্র ইহা নহে, এই জন্য আমরা এখানে এই প্রসঙ্গের বিস্তার করিলাম না।

এই জন্য শক্তিপূজার সহিত চণ্ডীপাঠের প্রথা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা মহাশক্তির বাহ্য পূজা এবং তাহার সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের যোগাযোগের আলোচনা করিলাম। এই আধ্যাত্মিক ভাবের 'অনুশীলনের সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ উপাসক আভ্যন্তর পূজার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। সাধারণ উপাসকের পক্ষে আভ্যন্তর পূজার অনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে; যে উপাসক উপাসনার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই আভ্যন্তর পূজার অধিকারী।

যে উপাসকের আন্তর পূজার যোগ্যতা জন্মিয়াছে, তাঁহার পক্ষে বাহ্য পূজার অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই; তিনি বাহ্য পূজা পরিত্যাগ করিয়া আন্তর পূজায় মনোনিবেশ করিবেন।

আন্তর পূজা দুই প্রকার,—সাধারা পূজা এবং নিরাধারা পূজা; এই দুই প্রকার আন্তর পূজার মধ্যে নিরাধারা পূজাই শ্রেষ্ঠ (১০)।

বর্ণমালার অপর নাম মাতৃকা; এই মাতৃকা-কল্পিত মহাশক্তির যে মানসমূর্ত্তি (বর্ণময়ী প্রতিমা) (১১), সেই মূর্ত্তিতে মনে মনে চিন্ময়ীর আবাহন করিয়া মানস উপচারের দ্বারা যে পূজা, সেই পূজার নাম সাধারা পূজা। এই সাধারা পূজাও নিজের রুচির অনুসরণ করিয়া যে কোন প্রকারে সম্পাদন করিলে, তাহা হইতে উপাসক কল্যাণ-লাভ করিতে পারিবেন না; এই সাধারা পূজা গুরুর উপদিষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে যথোচিত-ভাবে সম্পাদন করিতে পারিলে (১২), তবেই তাহা হইতে নিরাধারা পূজার যোগ্যতা অর্জ্জিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে এই শব্দময়ী মূর্ত্তিতে শক্তিপূজার যথাযথ অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

সাধারা আন্তর পূজার অভ্যাস পরিপক্ক হইলে, যখন উপাসকের চিত্তের একাগ্রতা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, সেই অবস্থায় তিনি নিরাধারা পূজার অধিকারী হ'ন।

চৈতন্য-স্বরূপিণী শক্তিই সকল জীবের শরীরে আত্মরূপে ব্যাপ্ত আছেন; তিনিই অখিল প্রপঞ্চের সাক্ষিণী; স্থূল দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বপ্রপঞ্চ চিন্ময়ী শক্তিতে কল্পিত হইলেও, পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই প্রপঞ্চের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। বিশ্বপ্রপঞ্চের পারমার্থিক কোন সম্বন্ধ মহাশক্তিতে নাই; এই জন্য মহাশক্তি বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত—এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উল্লাস বাস্তব পক্ষে তাঁহাতে নাই,—তিনি 'প্রপঞ্চোল্লাস-বর্জ্জিতা'। মহাশক্তির এই চিন্ময়-শুদ্ধ-স্বরূপে চিত্তের যে লয়—সকল প্রকার ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া একাকার ভাবনা—যাহাকে তন্ময়তা বলা হয়—তাহাই নিরাধারা পূজা। এই পূজার আলম্বনরূপে স্থূল কি সূক্ষ্ম—মৃন্ময়ী কি মাতৃকা (বর্ণ)-ময়ী, কোন রূপ প্রতিমাই থাকে না; জন্মিলে এই সাধারা আন্তর পূজার অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

---

(১০) পূজা বাহ্যাভ্যন্তরা সাঽপি দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।
সাধারা চ নিরাধারা নিরাধারা মহত্তরা।—সূতসংহিতা (শিবমাহাত্ম্যখণ্ড) ৫।১১

(১১) তন্ত্রাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসারে' মাতৃকান্যাসপ্রকরণে মহাশক্তির মাতৃকাময় (বর্ণময়) মূর্ত্তির ধ্যান উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাং চ হস্তাম্বুজৈ—
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে।

শব্দ ও অর্থ—নাম এবং রূপ—এই দুইটিই মহাশক্তির সৃষ্টি,—এই উভয়ের মধ্যেই মহাশক্তি অনুস্যূত আছেন। অর্থাৎ জাগতিক পদার্থগুলি স্থূল হওয়ায়, সেই স্থূলমূর্ত্তিতে (মৃন্ময় প্রতিমাদিতে) মহাশক্তির পূজা করা যেরূপ সহজ-সাধ্য, শব্দময় সূক্ষ্মমূর্ত্তিতে তাঁহার আরাধনা করা সেরূপ সহজ-সাধ্য নহে; চিত্তের বিশেষ একাগ্রতা না জন্মিলে শব্দময়ী মূর্ত্তিতে শক্তির আরাধনা করা সম্ভবপর হয় না। এই জন্য প্রথমে স্থূল মৃন্ময় প্রতিমাদিতে মহাশক্তির বাহ্য পূজার অভ্যাস পরিপক্ক হইলে, তাহার পরে চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে এই সাধারা আন্তর পূজার অনুষ্ঠানের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(১২) আধারে বর্ণসংক্ৢপ্তবিগ্রহে পরমেশ্বরীম্।
আরাধয়েদতিপ্রীত্যা গুরুণোক্তেন বর্ম্মনা।—সূতসংহিতা (শিবমাহাত্ম্যখণ্ড) ৫।১২—১৩

এইরূপ আধার সাধকের উপকারের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইলেও, বাস্তব পক্ষে চিন্ময়ীর পারমার্থিক স্বরূপের কোন আধার নাই; তিনি সর্ব্বাধার, তাঁহার অন্য আধার হইতেই পারে না। তাঁহার সেই নিরাধার স্বরূপের যে ধ্যান,—যে ধ্যানের মধ্যে অন্য বস্তুর কোন স্থান নাই, কেবল চিন্ময় স্বরূপেরই প্রকাশ হইয়া থাকে—সেই ধ্যানই নিরাধারা পূজা; এইরূপ ধ্যানই উপাসনার উত্তম অবস্থা। এই অবস্থায় 'প্রপঞ্চোল্লাস-বর্জ্জিতা' চিন্ময়ী পরমেশ্বরীর ধ্যান করিতে করিতে উপাসক নিজেও প্রপঞ্চের সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যা'ন; তিনি নিজের উপাস্যা চিন্ময়ী মহাশক্তির সহিত নিজের ঐক্যের অনুভব করিয়া কৈবল্য লাভ করেন (১৩)।

শ্রীহারাণচন্দ্র শাস্ত্রী।

---

(১৩) সাধারা যা তু সাধারে নিরাধারা তু সংবিদি। (১২)
যা পূজা সংবিদি প্রোক্তা সা তু তস্যাং মনোলয়ঃ। (১৩)
সংবিদেব পরা শক্তির্নেতরা পরমার্থতঃ।
অতঃ সংবিদি তাং নিত্যং পূজয়েন্মুনিসত্তমাঃ।
সংবিদ্রূপাতিরেকেণ যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে।
স হি সংসার আখ্যাতঃ সর্ব্বেষামাত্মনামপি।
অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীং পরমেশ্বরীম্।
আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাস-বর্জ্জিতাম্। (১৪-১৬)
স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীম্।
পূজয়েদাদরেণৈব পূজা সা পুরুষার্থদা। (১৭)—সূতসংহিতা (শিবমাহাত্ম্যখণ্ড) ৫ অধ্যায়।

শরতের রাণী এসেছে শেফালি-বনে

শরতের রাণী এসেছে শেফালি-বনে
মেঘে আর রোদে লুকোচুরি তাই
আনমনে ক্ষণে ক্ষণে।

আলোয় ভরেছে নীল নভ-তল,
আরতির সুরে হৃদি বিহ্বল
স্নিগ্ধ উতল 'উত্তুরে' বায়
বাউল গাহিছে মনে—
শরতের রাণী এসেছে শেফালি-বনে।
আ'ল-পথে পথে আলিপনা তাই
কোমল দুর্ব্বামূলে;
নদীর বাঁকেতে দাঁড়ায়ে কে যেন
কাশের চামর তু'লে।
কল কুলু-কুলু বন্দনা-গানে
তটিনী চলেছে নমিতে উজানে,
ফুলে ফুলে আজ কানাকানি কত—
মেতেছে ভ্রমর সনে
শরতের রাণী এসেছে শেফালি-বনে।

শরতের রাণী এসেছে শেফালি-বনে
মেঘে আর রোদে লুকোচুরি তাই
আনমনে ক্ষণে ক্ষণে।
দিকে দিকে তাই আহ্বান-ধ্বনি
গগনে পবনে উঠিতেছে রণি,
বাউল বাতাস আগমনী গান
শুনাইছে জনে জনে।
শরতের রাণী এসেছে শেফালি-বনে।
বিশ্ব আজিকে পুলকে জেগেছে
ছুটেছে ভাবের বন্যা
বঙ্গ-জননী ফুল-ডালা বহি'
হ'য়েছে আজিকে ধন্যা।
কাশের প্রদীপে দীপ জ্বলে ওঠে,
বন-কুসুমের পরিমল ছোটে,

বিহগ-বিহগী আরতির সুরে
ডেকে যায় ক্ষণে ক্ষণে—
শরতের রাণী এসেছে শেফালি-বনে।

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব

১

শ্রীনগরে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের আয়োজন স্থির করিবার জন্য গ্রামে সভাধিবেশন হইবে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের কেবল প্রচলন হইয়াছে। পুলিনবিহারী রায় দীর্ঘকাল পরে গ্রামে আসায়—প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে গত বৎসর হইতে গ্রামে এই পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঠিক এই দ্বিতীয় বৎসরেই পূজা লইয়া দলাদলির সূচনা দেখা দিয়াছে।

শ্রীনগর কলিকাতা হইতে উত্তরে ১৫।১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রাম গঙ্গার কূলে। এককালে এই সব গ্রাম সত্য সত্যই শ্রীসম্পন্ন ছিল। সযত্নরচিত ও রক্ষিত উপবন যত্নের অভাবে যে দশা প্রাপ্ত হয়, ইহারও সেই দশা ঘটিয়াছে। অনেক গৃহ জনহীন—কতকগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; পুষ্করিণী শৈবালদলে আচ্ছন্নসলিল; পথ কর্দ্দমাক্ত। গ্রামের ঘাটের চাঁদনী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—সোপানের এক পার্শ্বও নদীগর্ভগত। গ্রামের দেবালয়ে সেবক নিত্যসেবার আয়োজন অতি কষ্টে করেন—দেবায়তনের সঙ্গে যে ভূমি ছিল, তাহা প্রায় পরহস্তগত হইয়াছে, আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা উদ্ধার করিবার ধনবল বা জনবল বহুপরিবার সেবায়েৎদিগের নাই—তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে গ্রাম হইতে অন্যত্র যাইয়া অন্নার্জ্জন করিতেছেন। যে ঘাটের পার্শ্বে পূর্ব্বে সর্ব্বদা দ্রব্যাদি ও যাত্রীর জন্য নৌকা বদ্ধ থাকিত, সে ঘাটে আর নৌকা দেখা যায় না। ঘাট যে কোন দিন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। অথচ গ্রামখানি কলিকাতা হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত যে সুরক্ষিত রাজপথ আছে, তাহা হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরবর্ত্তী। এই ৩ মাইল রাস্তা বৎসরে ৪ মাস কর্দ্দমে প্রায় অনতিক্রমণীয় থাকে—আর ৪ মাস ধূলায় পূর্ণ দেখা যায়।

গ্রামের ধনী ও বিদ্বান লোকরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—পুরাতন জমিদার-বংশের এক জন—শ্রীপতি চট্টোপাধ্যায়—গ্রামের হাট ও পার্শ্বের একখানি গ্রামের স্বামিত্ব লইয়া আপনাকে "বনগ্রামের শৃগাল রাজা" মনে করেন। গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থ দারিদ্র্যে ও রোগে জীর্ণ হইয়া নমিতমেরুদণ্ডই হইয়াছে—শ্রীপতির সব অত্যাচার ও অনাচার বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে; আর সেই জন্যই তাঁহার অত্যাচারের ও অনাচারের সাহস ও মাত্রাও বাড়িয়া যায়।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল বিদেশে—অর্থার্জ্জনের কার্য্যে ব্যয় করিয়া পুলিনবিহারী গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুলিনবিহারীর শৈশবে তাঁহার পিতা সেনাদলের রসদ বিভাগে চাকরী লইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন। এই বিভাগে তখন আয়ের যে বহু উপায় ছিল, সে সব "সাধু" না হইলেও সর্ব্বজনবিদিত। কোথাও পার্ব্বত্য নদীর স্বল্প জল পার হইতে হইবে—মৃত্তিকাপূর্ণ বস্তা ফেলিয়া—ময়দার বস্তা খরচ লিখা চলিত—ইত্যাদি। পিতা একটি অভিযানে যাইয়া পার্ব্বত্য জাতির গুলীতে নিহত হইলে তাঁহার একমাত্র পুত্র পুলিনবিহারীকে সেনাপতি চাকরী দেন। পিতা যথেষ্ট অর্থও রাখিয়া গিয়াছিলেন। পুলিনবিহারী ১৮ বৎসর বয়সে চাকরী পাইয়া ২০ বৎসর চাকরী করেন। তাহার পর এক দিন যে নূতন ইংরেজ কর্ম্মচারী তাঁহার "মনিব" হইয়া আইসে, তাহার উদ্ধত ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হইতে থাকেন। পঞ্জাবী কর্ম্মচারীরা জুতা খুলিয়া "সাহেবের" ঘরে প্রবেশ করিত,

পুলিনবিহারী তাহা করিতেন না—তাহারা অত্যন্ত নত হইয়া "সেলাম" করিত, তিনি বলিতেন, "গুড ডে, সার।" এক দিন একটা কাগজ দেখাইবার সময় ইংরেজ কর্ম্মচারীটি অকারণে তাঁহাকে অভদ্রজনোচিত ভাষায় গালি দিল। পুলিনবিহারী বলিলেন, "যদি ভদ্রলোকের মত কথা বলিতে না পারেন তবে কথা বলিবেন না।" ইংরেজটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ঘুঁসি মারিবার চেষ্টা করিল; পুলিনবিহারী দৃঢ়ভাবে তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার পর তাহাকে এমন প্রহার করিলেন যে, সে রক্তাক্ত মুখে ভূপতিত হইয়া বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে—ক্ষমা করুন।"

পুলিনবিহারী চাকরী ত্যাগ করিলেন। তাহার পর কিরূপে তিনি কাথিয়াবাড়ে যাইয়া ঠিকাদারী করিয়া প্রভূত অর্থার্জ্জন করেন—সে সুদীর্ঘ কথা উপন্যাসের মত বিস্ময়কর। তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

পুলিনবিহারীর একমাত্র সন্তান কন্যা—সুরবালা। তাহার অদৃষ্ট তাহাকে রূপ দিতে কার্পণ্য করে নাই বটে, কিন্তু সৌভাগ্য দেয় নাই। কন্যা যখন প্রাপ্তবয়স্কা হইল, তখন পুলিনবিহারী এক বার কলিকাতায় আসিয়া কন্যার বিবাহ দিলেন। তিনি বাঞ্ছিত পাত্রেই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবাহের পর এক বৎসর না যাইতেই কন্যা বিধবা হয়। কন্যার সঙ্গে তাহার পিতামাতাও হিন্দুবিধবার মত আচার অবলম্বন করেন। মাতার পক্ষে এই শোক অসহনীয় হয় এবং তিনি এই দারুণ দুর্ঘটনার পর দুই বৎসরের মধ্যে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

তখন পুলিনবিহারীর কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব ঘটে এবং তিনি কন্যাকে লইয়া বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালী সাধু সন্তদাস (তারাকিশোর) তাঁহাকে উপদেশ দেন, কন্যাকে গোপাল দেবতা দিয়া তিনি তাহাকে গোপাল সেবার শিক্ষা দিউন; আর নানা স্থানে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া আপনার গ্রামে যাইয়া গঙ্গার কূলে বাস করুন; তথায় দেবতা তাঁহাকে অনেক কায করিবার অবসর দিবেন।

সাধুর উপদেশ পুলিনবিহারী শিরোধার্য্য করিলেন। তিনি দীর্ঘকাল বাঙ্গালার বাহিরে কাটাইয়া বুঝিয়াছিলেন, সর্ব্বত্র বাঙ্গালীবিদ্বেষবিষ সমাজে বিসর্পিত হইতেছে। তাঁহার যথাসাধ্য তিনি বাঙ্গালার জন্যই করিবেন—স্বজনের মধ্যেই কন্যাকে রাখিয়া গঙ্গার কূলে দেহরক্ষা করিবেন।

তাহার পরই পুলিনবিহারী শ্রীনগরে আসিয়াছেন। জীর্ণ গৃহের আবশ্যক সংস্কার করাইয়া তিনি কন্যার গোপালের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন।

২

গ্রামে আসিয়া পুলিনবিহারী গ্রামের অভাব পরীক্ষা ও অভাব মোচনের উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার গৃহের পশ্চাতস্থ পুষ্করিণীটি পরিষ্কৃত ও গৃহ-সংলগ্ন জমির কতকাংশ ফুলের বাগানে ও কতকাংশ সব্জীবাগানে পরিণত করিয়া তিনি দেখিলেন, ইংরেজীতে যে একটি কথা আছে—যদি প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার কুটীরের দ্বারদেশ পরিষ্কৃত রাখে, তবে গ্রাম পরিচ্ছন্ন হয় ("If every man swept his cottage door, the village would be clean")—সকলে তাহা মনে না করিলে কিছু হয় না। তিনি বুঝিলেন, গ্রামের অভাব অনেক—অভাব দূর করিবার পথ বিঘ্নবহুল; কিন্তু তিনি গ্রামের সেবা করিবেন, এই সঙ্কল্প লইয়া আসিয়াছিলেন—বিঘ্ন বিবেচনা করিয়া নিরস্ত হইলেন না। তিনি প্রথমে গ্রামের দুইটি প্রধান অভাব দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—ঘাটের সংস্কার বা পুনর্গঠন, বড় রাস্তা পর্য্যন্ত গ্রাম্য পথ সর্ব্বদা যান-যাত্রীর গমনযোগ্য করা। প্রথমোক্ত কাযের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় কাযের জন্য স্বয়ং অর্দ্ধেক ব্যয় দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়া জিলা বোর্ডের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন।

তাঁহার এই সকল প্রস্তাবে গ্রামের প্রবীণরা কেবল দ্বিধা প্রকাশ করিলেন—বাধার বিষয়ই অতিরঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু গ্রামের যুবকরা তাহাদিগের এই নবাগত "জ্যেঠামশায়ের" সমর্থক ও সহ-কর্ম্মী হইল। এই যুবকরা যখন গ্রামে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎ-সব করিবার প্রস্তাব করিল, তখন পুলিনবিহারী সোৎ-সাহে তাহাতে সম্মতি দিলেন। সে জন্য সমিতি গঠিত হইল এবং শ্রীপতি বাবুকেই তাহার সভাপতি করিয়া

যুবকরা পুলিনবিহারীর অর্থ-সাহায্যে সব আয়োজন করিতে লাগিল। ওদিকে পুরাতন ঘাটের সংস্কারের নামে নূতন ঘাট নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইল।

গ্রামের যুবকদিগের চেষ্টায় দুর্গোৎসব বিশেষ নিষ্ঠায় সাফল্যমণ্ডিত হইল; ঘাটের কাষ যে ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহাতে পুলিনবিহারী লোককে আশ্বাস দিতে পারিলেন, চৈত্র মাসে গ্রামের লোক ঐ ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই দুইটি কাযের জন্য তিনি বিব্রত হইলেন।

তিনি—এক জন "সামান্য ঠিকাদার" এতকাল পরে আসিয়া সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে গ্রামের ঘাট নূতন করিয়া গঠিত করিলেন—গ্রামে তাঁহারই প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতেছে, গ্রামের যুবকরা তাঁহার আজ্ঞাবহ—শ্রীপতি বাবুর তাহাতে ঈর্ষ্যার উদয় হইল। তিনি গ্রামের কোন উপকার কখন করেন নাই, "মনের অগোচর পাপ নাই"—বুঝি এই বার তাঁহার অকারণ প্রাধান্য লুপ্ত হইবে। তাঁহার তোষামোদকারীরা তাঁহাকে প্রবোধ দিল—"মুড়কীর রস শুকা'লেই যা'বে"—কত টাকাই পুলিনবিহারী করিয়াছেন?

এক দিকে এই—আর এক দিকে পূজার সময় সুরবালা যখন তাঁহার অসাধারণ স্বাস্থ্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য লইয়া প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিতা ছিলেন, তখন গ্রামের ছেলেদিগের সেই "দিদিকে" দেখিয়া শ্রীপতির নিষ্কর্ম্মা জ্যেষ্ঠপুত্র ভূপতি ভাবিয়াছিল—মানুষের এত সৌন্দর্য্য হয়! শ্রীপতির তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভূপতি পিতারই মত আপনাকে উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রামের প্রধান মনে করিত। দ্বিতীয় পশুপতি শ্বশুরের কাষ্ঠের কারবারে অংশী হইয়া ব্রহ্মে গিয়াছিল। সে সপরিবারে তথায় বাস করিত—"কালে ভদ্রে" গ্রামে আসিত; ব্রহ্মে প্রবাসীদিগের প্রধান ত্রুটি হইতে সে আপনাকে মুক্ত রাখিতে পারে নাই—সে সচ্চরিত্র ছিল না। শ্রীপতির কনিষ্ঠ পুত্র নৃপতির বিবাহ গ্রামেই হইয়াছিল। তিনি যে গঙ্গার পরপারে কতকগুলি ইটখোলার অধিকারীর কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, সেজন্য শ্রীপতি প্রভূত মূল্য লইয়াছিলেন। জামাতাকে বিদেশে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের সকল ব্যয় তাহার শ্বশুরকে বহন করিতে হইবে, এই সর্ত্তে বিবাহ হইয়াছিল এবং নৃপতির শ্বশুর সেই সর্ত্ত পালন করিয়াছেন। নৃপতি জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া জমশেদপুরে বড় চাকরী পাইয়াছে। পিতার ও ভ্রাতাদিগের ব্যবহার সে অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবে লক্ষ্য করিত।

চৈত্র মাসের শেষ ভাগে ঘাট নির্ম্মাণ শেষ হইল। গঙ্গায় গতায়াতকালে নৌকা হইতে এবং পরপার হইতে তাহা লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে লাগিল। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন ঘাট সাধারণের ব্যবহারার্থ মুক্ত হইল—গ্রামের লোক পুলিনবিহারীকে আশীর্ব্বাদ করিল; গ্রামের বৃদ্ধারা সুরবালাকে বলিলেন, "মা, তোমার বাবার কাযে আমরা নিরাপদে গঙ্গাস্নান করতে পেলাম। তিনি শতায়ু হ'ন।"

সমগ্র বৈশাখ মাস পুলিনবিহারী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নান করিলেন। ইতোমধ্যে তিনি কয় জন দূর-সম্পর্কীয়া নিঃসহায়া বিধবা আত্মীয়া-কুটুম্বিনীর সন্ধান লইয়া তাঁহাদিগকে গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন—তাঁহারা দেবসেবাদি কার্য্যে সুরবালাকে সাহায্য করিবেন।

বৈশাখ মাসের পর সুরবালা কোন কোন দিন আত্মীয়া বা কুটুম্বিনীদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইত। আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে এক দিন সে পিতাকে বলিল, সে আর গঙ্গাস্নানে যাইবে না—বাড়ীতে পুষ্করিণীতেই স্নান করিবে। পুলিনবিহারী বলিলেন, "কেন? এ বার ত এখনও বর্ষা নামে নি!"

সুরবালা বলিল, "সে জন্য নহে।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কন্যার কথায় পিতার মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি কারণ অনুসন্ধান করিলেন; জানিতে পারিলেন—যে দিন কন্যার গঙ্গাস্নান যাত্রাকালে তিনি সঙ্গে থাকেন না, সে দিন পথিপার্শ্বে তোষামোদকারীতে বেষ্টিত ভূপতির বৈঠকখানা হইতে যে সব উক্তি শুনা যায়—তথায় যে সব সঙ্গীত গীত হয়, সে সকল অশিষ্ট—কখন বা কুৎসিত ইঙ্গিতদুষ্ট।

জানিয়া পুলিনবিহারী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; ভাবিলেন, ভগবানের রাজ্যে এত পাপ কেন? তিনি ইহার প্রতীকারোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন—ভাবিলেন উপায় মিলিবে।

৩

বিষয়টির কথা পুলিনবিহারী যতই ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ভাবনা ততই বাড়িতে লাগিল। তাঁহার কন্যা না হয় গঙ্গাস্নানে যাইবে না; কিন্তু যাহারা তাহা পারে না—যাহাদিগকে ঐ পথেই নিত্য গঙ্গায় যাইতে হইবে, তাহাদিগের ত বিপদ ঘটিতে পারে, বিপদ না ঘটিলেও তাহাদিগকে অসম্মান সহ্য করিতে হইতে পারে। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা—যে গ্রামে এইরূপ উপদ্রব সম্ভব হইতে পারে, সেই গ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিতে ও তথায় তাঁহার কন্যাকে রাখিয়া শেষ শ্বাস ত্যাগ করিতে আসিয়াছেন!

তিনি অপরাধী যুবকদলের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের ঘৃণ্য স্বভাবের বিষয় জানিতে পারিলেন। তাহার পর তিনি সর্ব্বাগ্রে শ্রীপতি বাবুর নিকটে যাইয়া —তাঁহাকে একক অবস্থায় অভিযোগ জানাইলেন। শ্রীপতি পুত্রের ব্যবহারে দুঃখ ও বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "এ হ'তেই পারে না। আমার ছেলে শিশু নহে। তা'র সম্বন্ধে এমন কথা ত কেহ কখন বলে নি! এ সত্য হ'তে পারে না। আপনি নূতন এসেছেন, গ্রামের নিষ্কর্ম্মা ছেলেদের নিয়ে আপনি দল গড়ছেন। মনে স্থির জানবেন, আমার ছেলের সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদ দিলে আমি তা' সহ্য করব না।"

পুলিনবিহারী বিশেষ চেষ্টায় ক্রোধ সংযত করিলেন। তিনি বুঝিলেন, পিতা "কীর্ত্তিধ্বজ" পুত্রের স্বভাবের বিষয় জানিয়াও তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার নিকট প্রতীকারের আশা দুরাশা মাত্র। তিনি ভাবিলেন, সত্যই কোন কোন পিতা পুত্রের শত্রু হইতে পারে।

তাহার পর তিনি দুই তিন জন প্রবীণের নিকটে গমন করিলেন। কোথাও আশানুরূপ সহানুভূতি পাইলেন না অর্থাৎ যে সহানুভূতি প্রয়োজনে সক্রিয় হইতে পারে, তাহার পরিচয় পাইলেন না। কেহ বলিলেন, "দেখুন, শ্রীপতি বাবু গ্রামের মানী লোক—ওঁর অপ্রীতি-ভাজন হওয়া নিরাপদ নহে।" কেহ বলিলেন, "জানেন ত, উঁনি গ্রামে 'বড়লোক,' তা'তে আবার পাশের গ্রাম ওঁর পত্তনী তালুক—সে গ্রামে বাগ্দী প্রজাদের বাস, তা'রা ওঁর কথায় না করতে পারে এমন কায নাই।" পুলিনবিহারী বলিলেন, "কিন্তু সেই ভয়ে কি অনাচার অত্যাচার সহ্য করতে হ'বে?" উত্তর হইল, "তা ছাড়া উপায় কি? জানেন ত, কোন কোন অবস্থায় 'কীল খেয়ে কীল চুরী' করাই সুবুদ্ধির কার্য্য।" পুলিনবিহারী মনে মনে বলিলেন, "আপনার সুবুদ্ধি আপনারই থা'ক—আমার তা'তে প্রয়োজন নাই।" কিন্তু তিনি মুখে আর কিছু বলিলেন না। এক জন সব শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বাঙ্গালায় ছিলেন না, বাঙ্গালার হালচাল জানেন না। এ সব বিষয় নিয়ে জানাজানি না ক'রে, ঘর সাবধান করাই ভাল; যা'র মান তা'র কাছে।" পুলিনবিহারী তাঁহার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন, "তা' হ'লে বলি, আপনার মেয়ে যে ভাবে দুর্গোৎসবে গ্রামের সব ছেলেদের সামনে বেরিয়েছেন—তা'দের সঙ্গে এক সঙ্গে কায করেছেন, তা'তে নিন্দা হ'তে পারে। বাঙ্গালায় ওরকমটা নাই।"

পুলিনবিহারী গৃহে ফিরিলেন—কে যেন তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, এই বাঙ্গালা! —"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"! যে বাঙ্গালায় গ্রামের লোক প্রতিবেশীর উপর পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে বিদেশে কায করিতে যাইত; জানিত, আপদে বিপদে তাহারা সহায়হীন হইবে না—এ কি সেই বাঙ্গালা? যে বাঙ্গালায় নিশীথে প্রতিবেশিগৃহ দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রতিবেশীরা দস্যুর লাঠি ও শড়কী তুচ্ছজ্ঞান করিয়া লাঠি ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া আক্রমণ প্রতিহত করিয়া প্রাণ-দানও করিত—এ কি সেই বাঙ্গালা? তবে কি তিনিই মা'র ডাক শুনিতে ভুল করিয়াছেন—তিনি কি বুঝেন নাই দূরত্বই সৌন্দর্য্যের কারণ হয়—"Tis distance lends enchantment to the view?"

তিনি যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদনুসারে গ্রাম হইতে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত রাস্তা "পাকা" হইতেছিল। যাহাতে সে কায যথাসম্ভব শীঘ্র শেষ হয়, তিনি সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুবকরা লক্ষ্য করিল, তিনি যে উৎসাহে বলিয়াছিলেন, রাস্তা শেষ হইলেই তিনি গ্রামে ছয়টি নলকূপ দিবেন, তাঁহার সে উৎসাহের জোয়ারে

ভাঁটার টান লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহারা তাহার কারণ সহজেই অনুমান করিতে পারিল। যে কথা পুলিনবিহারী কোন দিন তাহাদিগকে বলেন নাই, তাহারাও সাহস করিয়া সে কথা কোন দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই; কারণ, তিনি অবাধে তাহাদিগের সহিত মিশিতেন বটে—কিন্তু তাঁহার এমন স্বাতন্ত্র্য ও গাম্ভীর্য্য ছিল যে, তাহা দুর্ভেদ্য বর্ম্মের মতই বোধ হইত।

যুবকরা এই ব্যাপারে বিশেষ ব্যথিত হইল। গ্রাম-সম্বন্ধে তাঁহার কল্পিত কার্য্য-পদ্ধতি পুলিনবিহারী তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন—নলকূপের কায শেষ হইলে তিনি তাঁহার মাতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও পিতার নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন, স্থির করিয়া সেই দুই প্রতিষ্ঠানের জন্য দুই লক্ষ টাকা রাখিয়াছিলেন। গ্রামের দেবালয়ের যে সম্পত্তি সেবায়েতদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তিনি আদালতের সাহায্যে তাহার উদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। গ্রামে তাঁহার কন্যার গোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দেবসেবার ব্যবস্থা করা যেমন তাঁহার সঙ্কল্প ছিল, তেমনই গ্রামের নানারূপ উন্নতিসাধন—ঘাটরক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন-ব্যবস্থা, অনাথভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা এই সকলও তাঁহার কল্পিত কার্য্য-পদ্ধতিতে ছিল।

তাঁহার কথা শুনিয়া তাহারাও তাঁহার সহিত শ্রীনগর আবার শ্রীনগর—আদর্শ গ্রাম করিবার স্বপ্ন দেখিত। সে স্বপ্ন কি সফল হইবে না?

তাহারা তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিল।

৪

আশ্বিন মাসের মধ্যভাগে পূজা। গ্রামের যুবকরা পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য সভা আহ্বান করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং পুলিনবিহারীকে পুনঃ পুনঃ সে কথা বলিতে লাগিল। তাহাদিগের এই অতি-ব্যস্ততার প্রকৃত কারণ তিনিও বুঝিতে পারিলেন না—পর্ব্বত হইতে যে খরস্রোতা নদী বাহির হয়, তাহার উৎস অনেক সময় সহজে লক্ষিত হয় না।

শেষে একটি "ভাল দিন" বাছিয়া পুলিনবিহারী সভার আয়োজন করিতে বলিলেন। পূর্ব্ববার শ্রীপতি বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে প্রাথমিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল, যুবকরা এ বার নূতন ঘাটের চাঁদনীতে সভার ব্যবস্থা করিল।

শ্রাবণের শেষভাগে এক মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে চাঁদনীতে সভা হইল। শ্রীপতি বাবুই সভার সভাপতি। সভায় প্রথম প্রস্তাবে স্থির হইল, পূজা হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব সভাপতি, সম্পাদক, ধনাধ্যক্ষ, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য প্রভৃতি নির্ব্বাচন। প্রবীণদিগের মধ্যে এক জন প্রস্তাব করিলেন, পূর্ব্ববারের মত এ বারও গ্রামের "প্রধান ব্যক্তি" "গ্রামের সকল কাযে সহায়" শ্রীপতি বাবু সভাপতি হইবেন—ইত্যাদি। প্রস্তাবটি সমর্থিত হইবামাত্র প্রস্তাবকের ভ্রাতুষ্পুত্র যুবক প্রশান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতেছে; কারণ, শ্রীপতি বাবুর দ্বারা গ্রামবাসীরা কখন কোনরূপে উপকৃত হয় নাই; তাহার প্রস্তাব, যে পুলিনবিহারী বাবুর গ্রামকে উপহার চাঁদনীতে তাহারা সভায় সমবেত হইয়াছে—যিনি গ্রামের প্রধান পথটির সংস্কার-ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং যিনি গ্রামের আরও নানারূপ উন্নতি করিবেন, তাঁহাকেই সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির সভাপতি করিয়া তাঁহার প্রতি গ্রামবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হউক। সভায় যুবকরাই সংখ্যায় অধিক ছিল। তাহাদিগের মধ্যে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল—"বন্দে মারতম" ধ্বনি গঙ্গার বক্ষে পবনে ভাসিয়া গেল।

গ্রামের প্রাচীনরা যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অপমানের আঘাতে বিচঞ্চল শ্রীপতি বাবু সভাস্থল ত্যাগ করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাঁহারা এক দিন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, পুলিনবিহারীর "মুড়কীর রস" শুকাইয়া যাইবে, তাঁহাদিগের মনে হইল, এ যেন মোয়া পাকাইতেছে!

পুলিনবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীপতি বাবুকে সভা ত্যাগ করিতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। উদ্ধত ভূপতি বলিল, "কেন, আরও অপমান করবেন না কি?"

ধীর ও স্থির ভাবে পুলিনবিহারী বলিলেন—"না।"

তাহার পর তিনি আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, গ্রামের কাহারও মনে ব্যথা প্রদান করা তাঁহার

অভিপ্রেত নহে—কাহাকেও অপমান করা ত পরের কথা। তাহার কারণ, তিনি গ্রামের সেবা করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াই জীবনের সায়াহ্নে গ্রামে আসিয়াছেন। তিনি প্রায় সমস্ত জীবন নানা স্বাস্থ্যকর বড় সহরে বাস করিয়া আসিয়া গ্রামে অনেক অসুবিধা দেখিয়াছেন, কিন্তু সেবার সঙ্কল্পহেতু তিনি সে সব তুচ্ছ মনে করিয়াছিলেন। তিনিই প্রস্তাব করিতেছেন, শ্রীপতি বাবু গ্রামের সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হউন। তিনি এ বার সমিতিতে কোন পদ গ্রহণ করিতে পারেন না—কারণ, পূজার সময় তিনি গ্রামে থাকিবেন না—কেবল নামের জন্য কোন পদ গ্রহণ করিলে আত্মপ্রবঞ্চনা করা হইবে।

যুবকরা তাঁহার কথা শুনিয়া বিষণ্ণ ভাবে এ উহার দিকে চাহিল।

শেষে পুলিনবিহারী বলিলেন,—"মা যদি আমার পূর্ব্বানুষ্ঠিত উপেক্ষার পাপের জন্য আমার সেবা গ্রহণ না করেন, তবুও আমি মনে করি, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, প্রায়শ্চিত্তের পর আমার সেবা তিনি গ্রহণ করবেন। আমি যে লাঞ্ছনা ভোগ করলাম—তা'তেও যদি আমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ না হয়, তবে জন্মান্তরেও আমি তাঁ'কে সেবা ক'রে ধন্য হ'বার সৌভাগ্য লাভ করব। তিনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।"

বলিতে বলিতে পুলিনবিহারীর গলা "ধরিয়া আসিল" —তাঁহার শেষ কথাগুলি যেন গঙ্গার জলকল্লোলে মিলাইয়া গেল। তিনি এক বার গ্রামের দিকে ফিরিয়া প্রণাম করিলেন—তাহার পর গঙ্গার দিকে ফিরিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন।

নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে পুলিনবিহারীর সংযম ও ধৈর্য্য সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল। তবুও তাঁহার কণ্ঠস্বর অশ্রুবাষ্পজড়িত হইয়া আসিয়াছিল। যুবকদিগের অনেকেরই চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু অশ্রুপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সঙ্কল্প করিতেছিল—আজ তাহাদিগের যে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তাহাদিগকে সেই চেষ্টা সফল করিতেই হইবে—"যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে সেই ধরে।" সে শিক্ষাও তাহারা পুলিনবিহারীর কাছেই পাইয়াছে—গ্রামের উন্নতিসাধনকালে যখনই বাধা পাইয়া তাহাদিগের উৎসাহ মলিন হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়াছেন—কাহারও আন্তরিক চেষ্টা কখন ব্যর্থ হয় না—হইতে পারে না, চেষ্টার ব্যর্থতা পরীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সভা ভঙ্গ হইলে পুলিনবিহারী আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া—কেবল মনে মনে গ্রামের যুবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া—স্বগৃহে গমন করিলেন। তাঁহার মুখ নিদাঘের মেঘাচ্ছন্ন পশ্চিম দিগন্তের মত বোধ হইল।

শ্রীপতিও স্বগৃহে গমন করিলেন—কিন্তু তাঁহার জয় যেন তাঁহার পরাজয়কে আরও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছিল —যেন তাঁহার ক্ষতে ক্ষারক্ষেপই করিয়াছিল।

কেবল ভূপতি বলিল, সে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবে। তাহার সঙ্গীরা সেই সঙ্কল্পে তাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

৫

যে দিন ঘাটের চাঁদনীতে সভা হইয়া গেল, সেই দিন রাত্রিতে শ্রীনগরে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল।

সন্ধ্যার পর শ্রীপতি বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা তাঁহার বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া তাঁহার অপমান-ক্ষতে প্রবোধ-ভেষজলেপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক জন বলিলেন, "দৌড় কতদূর তা' ত দেখা গেল। ঐ ঘাট ক'রে আর রাস্তার জন্য কিছু টাকা দিয়েই 'ভাঁড়ে মা ভবানী'; তবে লোকটা চালাক তা'ই মানে-মানে স'রে পড়ছে।" এক জন বলিলেন, "ঘাটে আর রাস্তায় গ্রামের লোকের উপকার হয়েছে—স্বীকার করি; কিন্তু অত লম্বা কথা কেন? সেবা করবেন—যে সেবা করে, সে বুঝি আপনার কথাই দশ কাহন করে! কিছু টাকা খরচ করেছে বটে—" তাঁহাকে বক্তব্য শেষ করিবার সুযোগ না দিয়াই এক জন বলিলেন, "তা'তে আর বাহাদুরীটা কি? তিন কুলে ত কেউ নাই—আছে একটা মেয়ে, সে-ও বিধবা। যদি দু'চারটা ছেলে-মেয়ে থাকত—আত্মীয়স্বজনকে ভাতকাপড় দিতে হ'ত—তবে বুঝা যেত।"

কিন্তু এই সব কথায় শ্রীপতি কোনরূপ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি মুখে যাহাই কেন বলুন

না, পুলিনবিহারীর প্রভাবের কারণ যে তিনি বুঝিতেন না, তাহা নহে। পুলিনবিহারী গ্রামের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন—তিনি তাহার বিনিময়ে কিছুই চাহেন নাই; সুতরাং লোকের প্রশংসা তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য। কিন্তু ইহা বুঝিয়াও তিনি কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছিলেন না—কারণ, পুলিনবিহারীর যে ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহার নাই এবং তিনি এতকাল যে প্রভুত্ব সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত।

যে যাহার গৃহে ফিরিবার সময় শ্রীপতি বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীরাও বলাবলি করিলেন,—"লোকটা গ্রামের ভালই করেছে। ভূপতির ব্যবহার ও সহ্য করবে কেন ?"

সেই দিন সন্ধ্যার পর গ্রামের যুবকরা পুলিনবিহারীর গৃহে সমবেত হইল—তাঁহাকে গ্রামত্যাগের সঙ্কল্পে বিরত করিবে। তাহারা বলিল, যে বিষয় লইয়া তিনি গ্রাম ত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, তাহা তাহারা সাহস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই; তাহারা তাহার প্রতীকার করিবে—দুষ্টকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে। পুলিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা যে শিক্ষা দিতে চাইছ—সে শিক্ষা দিবার মত শক্তি হয়ত এখনও এ বুড়ার আছে। কিন্তু আমি সে শিক্ষা দিতে চাহি না। আমাদের পুরাণে আছে, মহাদেবের দৃষ্টিতে পাপ ভস্মসাৎ হয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম, গ্রামে কেহ যদি কোন অন্যায় কায করে, তবে আর সকলে তা'রি দিকে এমন ভাবে চাহিবে যে, তা'তেই সে লজ্জিত হ'বে—আর কখন অন্যায় করতে সাহস করবে না।" এক জন যুবক বলিল, "গ্রামের লোক কি তাহা পারে না ?" পুলিনবিহারী বলিলেন, তিনি গ্রামের প্রবীণদিগের নিকট সে প্রকৃতির ও সেই সাহসের কোন পরিচয় পায়েন নাই। যুবকদিগের মধ্য হইতে ভাবপ্রবণ বিভূতি বলিল, "প্রবীণরা যা' পারেন নি—আমরা তা' পারব। আমরা আপনার ছেলে—আপনার কাছে শিক্ষা পেয়েছি।" পুলিনবিহারী বলিলেন, "হাঁ, বাবা, তোমরাই আমার ছেলে—ছেলের অভাব আমি কখন অনুভব করিনি, সুরবালাই আমার ছেলে—আমার মেয়ে। কিন্তু ছেলেদের দ্বারা কত কায করান যায়, তা' আমি তোমাদের পেয়ে বুঝেছি। আমি যেখানেই কেন যাই না, তোমাদের কখন ভুলতে পারব না। তোমাদের যে সঙ্ঘশক্তি বিকাশ পাচ্ছে, তার অনুশীলন কর—গ্রাম আবার শ্রীনগরই হবে।" বিভূতি বলিল, "আপনি কি বলেন, আমরা আমাদের মা-বোনের সম্মান রক্ষায় অগ্রসর হ'ব না।" পুলিনবিহারী বলিলেন, "নিশ্চয়ই অগ্রসর হ'বে। সে জন্য সকলকে প্রস্তুত কর।" বিভূতি বলিল, "আপনার যাওয়া হ'বে না।" পুলিনবিহারী বলিলেন, "না, বাবা সকল, আমাকে যেতেই হ'বে। ভগবান আমাকে হয়ত পরীক্ষা করছেন। আমি গ্রামে এসেই গ্রামের উন্নতি করবার বহু অন্তরায় লক্ষ্য করেছিলাম; কিন্তু তা'তে হতাশ হইনি। কারণ, এই গ্রাম আমার তীর্থ—'দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার।' আমার মেজ জ্যেঠামহাশয় ছেলের বিবাহে মলিনবর্ণ বধূ আর মেয়ের বিবাহে মলিনবর্ণ বর কিছুতেই পশন্দ করতেন না। কিন্তু তাঁ'র মা কাল ছিলেন। তাই তাঁহার এক দৌহিত্র তাঁ'কে ঠাট্টা করায় তিনি বলেছিলেন—'তোরা কি বোকা! মা কি কখন কাল হ'তে পারেন ?' আমি সেই কথাই স্মরণ করেছি।" এক জন যুবক বলিল, "তবে আপনি গ্রাম ছেড়ে যা'বেন কেন ?" পুলিনবিহারী বলিলেন, "তা'র কারণ ভগবান আমাকে ঐ একটি সন্তান দিয়েছেন—ওর বৈধব্যে ওর মা ভগ্নহৃদয়ে জীবন ত্যাগ করেছেন। তিনি আমাকে ওর বাপ-মা উভয়ের কর্ত্তব্যভার দিয়ে গেছেন। ওর কোন অপমান আমি সহ্য করতে পারি না।"

যুবকরা আপনাদিগের মধ্যে পরামর্শ করিল—তাহার পর এক জন পুলিনবিহারীকে বলিল, "দিদি, কোথায় ?"

পুলিনবিহারী ভৃত্যকে বলিলেন, "তোমার দিদিমণিকে ডাক।"

সুরবালা আসিয়া একটি দ্বারের নিকট দাঁড়াইলে এক জন বলিল, "দিদি, জ্যেঠামহাশয় তাঁ'র ভাইদের উপর রাগ ক'রে তাঁ'র ছেলেদের ছেড়ে যেতে চাইছেন। তাঁ'র কথার বিরুদ্ধে কোন কথা বলবার সাধ্য আমাদের নাই। তাই আমরা আপনাকে বলছি, যদি আমাদের ত্যাগ ক'রে যান, আপনি তাঁ'কে এক বৎসর কোথাও স্থায়ী হয়ে বাসের ব্যবস্থা করতে দিবেন না। আমরা

আপনাদের ফিরিয়ে আনবই। আপনি আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।"

সুরবালা ভ্রাতাদিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিল।

বিভূতি বলিল, "দিদির আশীর্ব্বাদ কখন ব্যর্থ হবে না।"

সেই রাত্রিতে গ্রাম যখন সুপ্তিমগ্ন, তখন পুলিনবিহারীর ভৃত্য কলিকাতা হইতে দুইখানি ট্যাক্সি লইয়া আসিল। একখানিতে কিছু জিনিষ লইয়া সে ও অপরখানিতে পুলিনবিহারী কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিলেন। সুরবালার ক্রোড়ে তাহার গোপাল।

তিনি যাঁহাদিগকে গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুলিনবিহারী গৃহেই রাখিয়া তাঁহাদিগের সব ব্যবস্থা করিয়া যাইলেন, পরে ঘটনা বুঝিয়া যথাকর্ত্তব্য করিবেন।

গাড়ী চলিল। পুলিনবিহারীর চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল; সুরবালা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না—যে শেষ আশ্রয় রচিত হইয়াছিল, আজ তাহাই ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। কেবল সুরবালার গোপালের দেবমুখে স্নিগ্ধ মধুর হাসি। তিনি কি মানুষের দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছিলেন?

৬

পরদিন রবিবার। সেই দিন গ্রামের সব পুষ্করিণীতে মশক-নিবারক ঔষধ প্রদত্ত হইল। যুবকরা যথারীতি পুলিনবিহারীর গৃহে ঔষধ ও তাঁহাকে লইতে আসিল। সরকার ঔষধ দিল, আর বলিল, "বাবু কাল রাত্রিতে চ'লে গেছেন।" এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি?"

উত্তর হইল, "তিনি সঙ্গেই গেছেন।"

যুবকদিগের মনে হইল, কে যেন তাহাদিগকে বিশেষ আঘাত দিয়াছে।

সরকার বলিল, "বাবু বলে গেছেন, আপনারা যেন নিরুৎসাহ হ'য়ে কাযে শিথিল-প্রযত্ন না হ'ন।"

সেই আদেশ অবশ্যপালনীয় মনে করিয়া যুবকরা ঔষধ লইয়া কার্য্যে গেল। উৎসাহিত আনন্দের অভাব তাহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। পুলিনবিহারীর অর্থসাহায্যে ও চেষ্টায় রচিত রাজপথে মোটর যানের চক্রচিহ্ন দেখিয়া তাহাদিগের মনে হইল, সেই যান-চক্র যেন গ্রামের বক্ষ পিষ্ট করিয়া গিয়াছে।

সে দিন পথে-ঘাটে-গৃহে সর্ব্বত্র পুলিনবিহারীর গ্রাম ত্যাগের বিষয় আলোচিত হইল।

পরদিন প্রভাতে জাগিয়া গ্রামের লোক দেখিল—বহু গৃহপ্রাচীরে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত প্রাচীরপত্র—

এ বার গ্রামের দুর্গোৎসবে
যোগদান
গ্রামের, মনুষ্যত্বের, দেবীর
অপমান।

সকলেই বুঝিল, যুবকরা কলিকাতায় যাইয়া এই সব প্রাচীরপত্র মুদ্রিত করিয়া আনিয়াছে।

যখন বিভূতি প্রভৃতি এক দল যুবক স্নান করিতে যাইতেছিল, তখন তাহারা শ্রীপতি বাবুর গৃহের সম্মুখে আসিলে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ভূপতি বাহির হইয়া আসিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তোমরা সব ভেবেছ কি?"

এক জন যুবক বলিল, "কি বল্‌ছেন?"

"দেওয়ালে ও সব কি?"

"যা' ভেবেছি, তাই।"

"তোমরা কি মনে করেছ, যা' ইচ্ছা করতে পার?"

"না। তবে আপনিও তা' মনে করবেন না।"

ভূপতি চীৎকার করিয়া বলিল, "এর ফল পেতে হবে।"

বিভূতি বলিল, "আমাদের না আপনাকে?"

ভূপতি গৃহে প্রবেশ করিল। সে স্থির করিল, যে প্রকারেই কেন হউক না, যুবকদিগকে বিপন্ন করিবে।

যুবকরাও সেই দিন হইতে সঙ্কল্প করিল, এ বার গ্রামের দুর্গোৎসব বর্জ্জন করিবে—কিছুতেই তাহা সার্ব্বজনীন হইতে দিবে না।

তাহারা সর্ব্বপ্রথম প্রতিমা-নির্ম্মাতা কুম্ভকারের নিকট যাইয়া বলিল, "এ বার শ্রীপতি বাবুর পূজা—টাকা ঢোলের সময় কায করলে ঢাকের সময় নিতে হ'বে।" তাহার পর তাহারা তাহাকে কুড়ীটি টাকা দিয়া অন্যত্র কাযের চেষ্টায় পাঠাইয়া দিল। কয় দিন পরে

শ্রীপতি বাবুর লোক তাহাকে ডাকিতে যাইয়া শুনিল, সে কোথায় গিয়াছে। শুনিয়া শ্রীপতি বাবু বলিলেন, "এ সব ঐ নিষ্কর্ম্মা ছেলেগুলার কায। কিন্তু তা'রা দেখবে—ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। না হয় কলকাতা কুমারটুলী থেকেই প্রতিমা আনাব।"

৭

উভয় পক্ষই জয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কায করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীপতি বাবু সঙ্ঘশক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, তিনি যাহা মনে করিবেন, তাহাই করিতে পারিবেন, বুঝিলেন না—পুরাতনের পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়মে হয়, এবং যে সে পরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারে, সে পরাভূত হয়।

গতবার গ্রামের যুবকরা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত করিয়া চাঁদা সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া মণ্ডপসজ্জা পর্য্যন্ত—পূজার ফুল আহরণ হইতে ভোগ বিতরণ প্রভৃতি সব কায করিয়াছিল। এ বার ভূপতির সঙ্গী ব্যতীত আর স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেল না এবং যে সামান্য চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগের খাবার ও সিগারেটের ব্যয়েই ফুরাইয়া গেল। কিন্তু শ্রীপতি জিদ করিয়া পূজার ভার লইয়াছিলেন, তিনি হাটের বিক্রেতাদিগের উপর পড়তা করিয়া পূজার ব্যয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—ফলে তাহারা বিশেষ বিরক্ত হইল—বিশেষ তাঁহার পুত্র ও তাহার সঙ্গীদিগের ব্যবস্থায় পড়তার দ্বিগুণ চাঁদা আদায় হইতে লাগিল এবং আদায়ে নানারূপ অত্যাচার দেখা দিল।

শ্রীপতি বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীরাও তাঁহাদিগের পুত্রদিগকে স্বেচ্ছাসেবক করিতে পারিলেন না—শ্রীপতি বাবুর নিকট কবুল জবাব দিলেন—"ঘোর কলি, ছেলেরা কথা শুনে না। জোর ক'রে কিছু বল্‌তেও সাহস হয় না—কি জানি কি ক'রে বসে।"

শ্রীপতি বাবু কিন্তু এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

ভূপতিকে ঘন ঘন গ্রাম হইতে যাইতে দেখিয়া যুবকদিগের মনে সন্দেহের উদয় হইল। তাহারা তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। শেষে এক দিন তাহার সঙ্গে পুলিসের এক জন সাব-ইনস্পেক্টারকে আসিতে দেখিয়া তাহারা সন্ধানের সূত্র পাইল। কিন্তু তাহারা সে কথা প্রকাশ করিল না—পাছে, তাহাদিগের অভিভাবকরা ভয় পাইয়া শ্রীপতি বাবুর পূজার আয়োজনে যোগ দেন—পাছে তাহাদিগের গৃহের মহিলারা ভয় পায়েন। তবে তাহারা একটা কায করিয়া রাখিল—ওকালতনামার কাগজে স্বাক্ষর দিয়া কাগজগুলি পুলিনবিহারীর গৃহে সরকারকে দিয়া আসিল—বলিয়া দিল, যদি কোন হাঙ্গামা হয়, তবে সেগুলি যেন তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে দেওয়া হয়।

যথাকালে কলিকাতা কুমারটুলী হইতে প্রতিমা নৌকায় আনা হইল। সে নৌকা পুলিনবিহারীর দ্বারা নির্ম্মিত ঘাটেই ভিড়িল। কিন্তু প্রতিমা নৌকা হইতে তুলিবার লোক পাওয়া গেল না। মাঝীরা ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল—এক ভাড়া লইয়া তাহারা সারা দিন থাকিতে পারে না। অনন্যোপায় হইয়া শ্রীপতিবাবু পার্শ্বস্থ গ্রামের বাগ্দীদিগকে আনিতে লোক পাঠাইলেন।

এ দিকে আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। শ্রীপতি বাবু ব্যস্ত হইতে লাগিলেন এবং কয় জন বাগ্দী আসিলে তাহাদিগকে বলিলেন, "বেটারা যেন নবাব হয়েছিস্—এত দেরী! হয়ে যা'ক পূজাটা তা'র পর মজা দেখাব। যা' শীঘ্র ঠাকুর তোল।" বাগ্দীরা যখন দড়ী ও বাঁশ আনিয়া প্রতিমা তুলিবার ব্যবস্থা করিল, তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিমা ঢাকিবার জন্য চট আনিতে লোক শ্রীপতি বাবুর বাড়ীতে ছুটিল—ততক্ষণে বৃষ্টিতে প্রতিমার রং ধৌত হইয়া গিয়াছে। চট চাপা দিয়া কোনরূপে প্রতিমা মণ্ডপে আনিয়া বেদীর উপর স্থাপিত করা হইল বটে, কিন্তু প্রতিমার অবস্থা দেখিয়া এ উহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। শেষে স্থির হইল, কুমারটুলী হইতে পটুয়া আনিয়া প্রতিমার সংস্কার করিতে হইবে। ততক্ষণ প্রতিমা কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু পটুয়ারা সহজে আসিতে সম্মত হইল না। তাহারা কেহ সাত দিন রাত্রি, কেহ তাহারও অধিক দিন প্রতিমা গঠনে কায করিয়াছে, এখন আর বাহিরে যাইবে না।

শেষে অধিক অর্থ কবুল করিয়া তাহাদিগকে শ্রীনগরে লইয়া যাইয়া প্রতিমা-সংস্কারের ব্যবস্থা হইল এবং বোধনের পূর্ব্বে কোনরূপে সে কায সম্পন্ন হইল।

শ্রীপতি বাবুর মনে হইল, তিনি কি আপদেই পড়িয়াছেন! এ ত দুর্গোৎসব নহে—একেবারেই দুর্গা দায়। জিদ করিয়া ভার লইয়া তাঁহাকে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইতেছে।

বোধনের বাদ্য বাজিলেও গ্রামের ছেলেমেয়েরা ছুটিয়া পূজামণ্ডপে আসিল না। মণ্ডপ শূন্য বলিলেই হয়। কেবল শ্রীপতি বাবুর কয় জন অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী ও ভূপতির কয় জন সঙ্গী তথায় উপস্থিত হইল—আর শ্রীপতি বাবুর আদেশে বাগ্দীরা কেহ কেহ ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া আসিল।

শ্রীপতি বাবু মুখে স্বীকার না করিলেও মনে বুঝিলেন—যুবকদিগেরই জয় হইয়াছে, আর সে জয় পুলিনবিহারীর। সেই জয় তাঁহার মুখে পরাজয়ের কালী মাখাইয়া দিয়াছে।

শ্রীপতি বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীরাও আপনাদিগের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ছেলেরা করেছে খুব! একেই বলে অহিংস অসহযোগ। এমন যে করতে পারবে, তা' ভাবি নি।"

স্বেচ্ছাসেবকরা নাই—প্রতিমা-দর্শনের পূর্ব্ববারের মত ব্যবস্থা হয় নাই, এই কথা বলিয়া গ্রামের মহিলারাও দেবীদর্শনে আসিলেন না। গ্রামের মহিলারা যে "পূজা" দিলেন, মহাষ্টমীর দিন কয় জন ব্রাহ্মণ যুবক সে সব উপকরণ লইয়া কলিকাতায় এক জনের আত্মীয়গৃহে পূজায় দিয়া আসিল। গ্রামে কেহ "পূজা" দিলেন না।

দশমীর দিন প্রভাত হইল। গ্রামের যুবকরা হর্ষোৎফুল্লভাবে বিসর্জ্জনের ব্যবস্থা প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মধ্যাহ্নে কয় জন কনষ্টেবল লইয়া এক জন সাব-ইন্সপেক্টার গ্রামে প্রবেশ করিল। প্রবীণরা মনে করিলেন, পাছে যুবকরা বিসর্জ্জনের সময় কোন হাঙ্গামা করে, সেই ভয়ে শ্রীপতি বাবু পুলিসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যুবকরা বুঝিল, তাহারা যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই সত্য হইল।

ক্ষুদে দারোগা শ্রীপতি বাবুর গৃহ হইতে ভূপতির দুই জন সহচরকে সাক্ষী লইয়া খানাতল্লাসে ও গ্রেপ্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। সাতটি গৃহে খানাতল্লাস ও সাত জন যুবক গ্রেপ্তার হইবার পর ভূপতি যখন দারোগাকে পুলিনবিহারীর গৃহে যাইতে বলিল, তখন দারোগা বলিল, "থাক, মশাই। শুনেছি লোকটি প্রবীণ ও ধনী। এ দিকে কোন বাড়ীতেই আপত্তিকর কোন জিনিষ, এমন কি পুস্তক বা পত্র পাওয়া গেল না। শেষে কি বিপদে পড়ব?"

তখন প্রকাশ পাইল—ভূপতি থানায় সংবাদ দিয়াছে, গ্রামের এই যুবকরা—পুলিনবিহারীর নেতৃত্বে—বিপ্লববাদি-সঙ্ঘ গঠিত করিয়াছে—বিস্ফোরক প্রস্তুত করিতেছে। দিনের পর দিন ভূপতি ও তাহার সঙ্গীরা যুবকদিগের কার্য্য সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ থানায় দিত এবং দারোগা পূর্ব্বে যে দিন গ্রামে আসিয়াছিলেন, সে দিন শ্রীপতি বাবুও তাহাদিগের কথার সমর্থন করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দারোগা গ্রাম হইতে সাত জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। তখন বিজয়ার বাজনার করুণ সুর বাজিতেছে—

"এই যে ছিল কোথায় গেল
কমলদলবাসিনী?"

পুলিস চলিয়া যাইলে পুলিনবিহারীর সরকার যুবকদিগের অভিভাবকদিগকে যুবকদিগের দত্ত কাগজগুলি দিল।

গ্রামে যেন কাল বৈশাখীর মেঘ ব্যাপ্ত হইল। সে মেঘ বজ্রগর্ভ। এ দিকে লোকের মনে আগুন জ্বলিল।

৮

পুলিনবিহারীর কাছে সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হইল। তিনি তখন আপনার সামান্য আহার্য্য আহার করিতে যাইতেছিলেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহার আর আহার হইল না। সুরবালা গোপালের ঘরে যাইয়া কাতর প্রার্থনা জানাইল, "ঠাকুর, আমি দুর্ভাগ্য। যে দুঃখ দিতে হয়, তুমি তাহা আমাকে দাও—আমি তাহা তোমার দান বলিয়া সানন্দে মাথা পাতিয়া লইব। কিন্তু—এই সব যুবক, আমার জন্য যেন ইহারা লাঞ্ছনা ভোগ না করে।"

পুলিনবিহারী ট্যাক্সী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন—পরদিন যত শীঘ্র সম্ভব ধৃত যুবকদিগের দুই তিন জন অভিভাবক তাঁহার নিকট আইসেন।

বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যে কয় জন—ওকালতনামা-গুলি লইয়া—পুলিনবিহারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি নবাগত—জানি না, কোন উকীল বা ব্যারিষ্টারকে যুবকদের খালাস করবার জন্য ভার দেওয়া যায়। কা'কে নিযুক্ত করবেন ?"

দুই তিন জন দুই তিন জনের নাম করিলেন।

পুলিনবিহারী বলিলেন, "ছুটীর সময় কে আছেন, কে নাই জান্‌তে হ'বে।"

তখন এক জন বলিলেন, "নরেন বাবু আছেন—আজ তিনি এক সভায় যোগ দিবেন—কাগজে দেখেছি।"

"কে—নরেন বাবু ?"

"নরেন বসু।"

পুলিনবিহারী বলিলেন, "ক্ষুদীরামের উকীল ?"

"সে কি ?"

"জানেন না ? বাঙ্গালায় প্রথম বোমা ক্ষুদীরাম নামক যুবক মজঃফরপুরে ছুড়েছিল। তা'র প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'লে হাইকোর্টে আপীলে উকীল পাওয়া দায় হয়। নরেন বসু তখন যুবক—তিনি বিশেষ যোগ্যতাসহকারে তা'র পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। তা'তেই তাঁ'র প্রথম 'নাম' হয়।"

সকলে উকীল বাবুর বাড়ীতে গমন করিলেন। তিনি তখন বসিবার ঘরে দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত অবস্থায় চেয়ারে বসিয়া খুরসীতে ধূমপান করিতেছিলেন; পৌত্র "বুড়ো" পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিন বিজয়ায় যাহা দেখিয়াছিল, তাহার বর্ণনা দিতেছিল। সম্মুখে টেবলের উপর এক পেয়ালা চা—পেয়ালাটা পেয়ালা না বলিয়া খোরা বলিলেই ঠিক হয়।

পিতামহ-পৌত্রের আলাপের মধ্যে আগন্তুকরা ঘরে প্রবেশ করিলেন—"বুড়ো" অসমাপ্ত বর্ণনা বন্ধ করিল।

আগন্তুকদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া উকীল বাবু বলিলেন, "আপনাদের কি দরকার ?"

পুলিনবিহারী বলিলেন, "আপনার নাম অনেক দিন থেকেই জানি—ক্ষুদীরামের মামলায়—"

বাধা দিয়া নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "সে ত দরকারের এলাকায় পড়ে না।"

তখন যুবকদিগের অভিভাবকদিগের মধ্যে এক জন—সকল কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, নরেন্দ্র বাবুর বৈশিষ্ট্য বড় বড় চোক তত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে যখন তিনি যুবকদিগের গ্রেপ্তারের কথা বলিলেন, তখন সেই চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইল। আপনাকে "সামলাইয়া" লইয়া তিনি বলিলেন, "বিজয়ার দিন—ছেলে ক'টি বিনা দোষে হাজতে রইল! আজ তা'দের ছাড়িয়ে আন্‌তেই হ'বে। আমি এক জন 'জুনিয়ারকে' দিচ্ছি—ওকালতনামা আন্‌তে হ'বে।"

আগন্তুকরা ওকালতনামাগুলি টেবলের উপর দিলে তিনি বলিলেন, "তবে আর কি ?"

পুলিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ফী কত টাকা দিতে হ'বে, বলুন।"

নরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ভাবনায় ফেল্‌লেন—টাকা নেয় আমার মুহুরী, সে বাড়ীতে চলে গেছে। কি বল 'বুড়ো' ?"

"বুড়ো" গম্ভীরভাবে বলিল, "নিশ্চয়।"

নরেন্দ্র বাবু উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লেন ত 'বুড়ো'ও তা'ই বলছেন।"

পুলিনবিহারী বলিলেন, "আমি চেক রেখে যাই।"

"আরে মশাই, টাকা কোথাও নিতে হয়—কোথাও দিতে হয়। এটা নেবার নয়। আমি ধড়াচূড়া পরে আসি।"—তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "ওরে—গাড়ী বা'র করতে বল।"

আগন্তুকদিগের মধ্যে এক জন বলিলেন, "ট্যাক্সী আছে।"

"আমারই কি গাড়ী নাই।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্র বাবু বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য চলিয়া যাইলেন।

ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুলিনবিহারীকে বলিলেন, "আপনি সঙ্গে যা'বেন না; বরং বাড়ী গিয়ে সাত হাজার টাকা আনিয়ে রাখুন—যদি জামিনের জন্য লাগে।"

তিনি আগন্তুকদিগের মধ্যে দুই জনকে সঙ্গে লইয়া আপনার মোটর গাড়ীতে যাত্রা করিলেন।

পুলিনবিহারী গৃহে ফিরিবার সময় সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "দেখলেন, মানুষে মানুষে কি প্রভেদ ?"

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে যাইয়া যুবকদিগকে ব্যক্তিগত জামিনে খালাসের আদেশ লইয়া স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া নরেন্দ্র বাবু যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন বেলা প্রায় দুইটা।

মুক্তি পাইয়া যুবকরা গ্রামে গেল। গ্রামে যাইবার রাস্তার মোড়ে বহু যুবক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তাহারা উচ্চরবে ধ্বনি তুলিল—"বন্দে মাতরম।" তাহার পর তাহাদিগকে লইয়া সকলে ঘাটের চাঁদনীতে চলিল। পথে শ্রীপতি বাবুর গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহারা আবার জয়ধ্বনি করিল। ভূপতি সঙ্গীদিগকে বলিল, "জানেন না ত, 'কত ধানে কত চাল।' এখন জামিনে খালাস পেলে কি হয়—মামলার সময় বুঝবেন।"

যুবকদিগকে ঘাটের চাঁদনীতে লইয়া যাওয়া হইলে তথায় গ্রামের মহিলারা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর তাহারা যে যাহার গৃহে গেল।

তাহারা পুলিনবিহারীকে ও স্থরবালাকে প্রণাম করিতে যাইবে বলিলে, অভিভাবকদিগের মধ্যে এক জন বলিলেন, "তোমরা কাল রাত্তিরে কষ্ট পেয়েছ ব'লে পুলিন বাবু বলেছেন, আজ তোমরা যা'বে না, কাল সকালে তিনি গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।"

বিভূতি এক জনকে বলিল, "তুই 'বাসে' চলে যা'—দিদিকে ব'লে আসবি, কাল আমরা প্রসাদ পা'ব।"

৯

যে দিন যুবকরা জামিনে মুক্তি পাইয়া ফিরিয়া আসিল, সে দিন হাটবার। গ্রামের এক জন লোকও শ্রীপতি বাবুর হাটে গেল না; অন্যান্য গ্রামের যে সব ক্রেতা আসিয়াছিল, তাহারাও যত শীঘ্র পারিল স্থান-ত্যাগ করিল। পরবর্ত্তী হাটবারে বিক্রেতারা অতি অল্প দ্রব্যই বিক্রয়ার্থ আনিল। সে দিন অবস্থা পূর্ব্ববৎ। তৃতীয় হাটবারে হাটখোলা প্রায় শূন্য রহিয়া গেল। শ্রীপতি বাবু তাঁহার বাগ্দী প্রজাদিগকে টাকা দিয়া হাটে জিনিষ আনিতে বলিলেন—তাহারা কিছু পয়সা আত্মসাৎ করিয়া অবশিষ্ট পয়সায় জিনিষ কিনিয়া হাটে আসিল বটে, কিন্তু জিনিষ কিনিবে কে? তাহারা ফিরিবার পথে জিনিষ শ্রীপতি বাবুর গৃহে ঢালিয়া দিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য পথ পাইল না।

আদালতে যুবকদিগের বিরুদ্ধে মামলা উঠিবার পূর্ব্বেই শ্রীপতি বাবুর হাট ভাঙ্গিয়া গেল। গ্রামের উত্তর দিকে অনেকটা "পতিত" জমি ছিল—তাহাতে আসশ্যাওড়া, কালকাসন্দা, বিছুটী প্রভৃতির জঙ্গল শৃগাল হইতে সর্প পর্য্যন্ত নানা জীবের বংশবৃদ্ধির এবং গ্রামের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিবার স্থানে পরিণত হইয়াছিল। দুই উদ্দেশ্যে পুলিনবিহারী সেই জমি ক্রয় করিয়া জঙ্গল কাটাইয়াছিলেন—গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে এবং গ্রামের বালক ও যুবকরা তথায় খেলা করিয়া স্বাস্থ্যচর্চ্চা করিতে পারিবে, আর ভবিষ্যতে—তাঁহার কল্পিত কার্য্য সম্পন্ন হইলে—যদি বাহির হইতে লোক আসিয়া গ্রামে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে জমি দেওয়া যাইবে। তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া যুবকরা সেই জমিতে হাটচালা তুলিয়া দিল। বিনাচেষ্টায় তথায় হাট "জমিয়া" গেল। তাহার আয় যুবকরা জমা করিয়া রাখিতে লাগিল; কারণ, পুলিনবিহারী সে টাকা লইলেন না—বলিলেন, গ্রামের কাযে উহা ব্যয়িত হইবে।

এই হাট ভাঙ্গা শ্রীপতি বাবুর পক্ষে কিরূপ বিপদের ও ক্ষতির কারণ হইল, তাহা গ্রামের লোক অনুমান করিতেও পারিল না। তাঁহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল—তাঁহার মজুদ টাকা ছিল না। এখন আয়ের প্রধান উপায় গেল। আবার দুর্গোৎসবের ভার গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাট রক্ষার চেষ্টা পর্য্যন্ত তাঁহাকে জলের মত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। তিনি বিপন্ন হইলেন। গ্রামেও তিনি যেন "একঘ'রে" হইয়া রহিলেন—তাঁহার গৃহে কেহ আইসে না,—সে পথেও যেন লোক চলিতে চাহে না। তিনি এখন কি করিবেন? ভূপতি ব্যতীত অন্য পুত্রদ্বয়কে পত্র লিখিলে তিনি কিছু অর্থ সাহায্য পাইতে পারেন—কিন্তু তাহারা, বিশেষ নৃপতি, কি তাঁহার কার্য্য সমর্থন করিবে? তিনি কোন দিন পুত্রদিগের নিকট অর্থ চাহেন নাই, আজ কি তাঁহাকে তাহাও করিতে হইবে? তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এদিকে পূজার ছুটীর পর যুবকদিগের মামলার শুনানী আরম্ভ হইল। নরেন্দ্র বাবু মামলায় বিশেষ মনোযোগ দিয়া কায করিতেছিলেন। তাঁহারই আগ্রহে আরও কয় জন উকীল তাঁহার সহযোগিতা করিতে অগ্রসর

হইলেন। তাঁহারাও সব শুনিয়া অর্থগ্রহণে অসম্মত হইলেন।

মামলায় বিশেষ কিছু ছিল না। ভূপতি যে সব সাক্ষী "সাজাইয়াছিল" তাহারা কার্য্যকালে—"পিতলক কাটারী কামে নাহি আওল"—হইল। ঝড় উঠিতে না উঠিতে যেমন কোন কোন গাছের শাখা ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহারা তেমনই জেরায় বিব্রত হইতে না হইতে উকীলের ধমকে "ভাঙ্গিয়া পড়িল।" অবশিষ্ট কেবল—পুলিসের ক্ষুদে দারোগা। সে দেখিল ও বুঝিল, সে চোরাবালুর উপর মামলা উপস্থাপিত করিয়াছিল; এখন তাহার পক্ষে চাকরী রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিতে পারে। তখন অনন্যোপায় হইয়া সে স্বীকার করিল, সে ভূপতির কথায় বিশ্বাস করিয়া তদন্ত আরম্ভ করিয়াছিল এবং গ্রামের যে কয় জন লোক তাহার অনুসন্ধানকালে ভূপতির কথার সমর্থন করিয়াছিল, তাহারা যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, তাহা সে তখনও বুঝিতে পারে নাই। বিশেষ সে গ্রামে তদন্তে যাইলে শ্রীপতি বাবুর মত গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভূপতির কথারই পুনরুক্তি করিয়াছিলেন। তখন সে মনেও করিতে পারে নাই, তিনি হিংসাপরবশ হইয়া মিথ্যা কথা বলিতেছিলেন।

মামলার অবস্থা ঘুরিয়া গেল। পুত্রের সঙ্গে পিতারও বিপদ ঘটিতে পারে বুঝিয়া ভূপতির পক্ষ হইয়া এক জন উকিল উঠিয়া বলিলেন, তাঁহার মক্কেল এই মামলায় ফরিয়াদী বা সাক্ষী কিছুই নহে—সে দারোগার আত্মরক্ষার চেষ্টায় কথিত মিথ্যা অস্বীকার করিতেছে—তবে সে দৃঢ় ভাবে বলিতেছে, তাহার পিতা তাহার কথায় নির্ভর করিয়া দারোগাকে যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছিলেন; কতকগুলি লোক হয়ত তাহাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া প্রতারিত করিয়াছে—সে রাজভক্ত প্রজা, গ্রামে বিপ্লবীর দল গঠিত হইতেছে বিশ্বাস করিয়াই সে—কর্ত্তব্যবোধে —পুলিসকে সংবাদ দিয়াছিল।

নরেন্দ্র বাবু উকিল বাবুকে বলিলেন, "এসব সাফাই দিবার প্রয়োজন ত এখনও হয় নাই—পরে হইবে। "রাজ ভক্তি may be used to cover a multitude of sins—কিন্তু সে চেষ্টা কি সর্ব্বত্র সফল হয়?" আদালতে হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার "পরে হইবে" কথায় শ্রীপতি বাবুর পক্ষ হইতে যে সকল উকীল মামলা তদ্বির করিতেছিলেন, তাঁহারা পরস্পরের দিকে চাহিলেন —তাঁহাদিগের দৃষ্টি অপূর্ব্ব—শ্রাদ্ধ কি তবে গড়াইবে?

বিচারক রায়ে সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া যুবকদিগকে বেকসুর খালাস দিলেন।

আদালত হইতে বাহির হইয়া যুবকরা সর্ব্বাগ্রে পুলিন-বিহারীর নিকটে গেল এবং তাঁহার গৃহে আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া ও তাঁহাকে গ্রামে ফিরিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া গ্রামে ফিরিল।

১০

যুবকদিগকে গ্রামে পাঠাইয়া দিবার পূর্ব্বে পুলিনবিহারী তাহাদিগকে লইয়া নরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া বলিলেন—"আপনার ঋণ আমরা কখন শোধ করতে পারব না।" শুনিয়া তিনি যেন অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন, "বলেন কি? নবমীর দিন বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাচ্ছেন কেন?"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "এই যে ছেলেরা লাঞ্ছনা পেলে—এর প্রতীকার চাই; মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে মামলা করানর জন্য শ্রীপতি ও ভূপতিকে মামলা-সোপর্দ্দ করতে হ'বে।"

পুলিনবিহারী বলিলেন, "আর—এই কি যথেষ্ট হয় নি?"

"না। দেখুন, গান্ধীবাদে আমার আস্থা নাই। আমি বলি, সাপকে মারলে তা'কে একেবারে পুড়িয়ে শেষ করতে হয়।"

তিনি যুবকদিগকে বলিলেন, "তোমরা কি বল?"

তাহারা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়।"

তাহা শুনিয়া "বুড়ো" বলিল, "নিশ্চয়"—তখন নরেন্দ্র বাবু উচ্চ হাস্য-ধ্বনিতে কক্ষ মুখরিত করিয়া বলিলেন, "বাস। এর উপর আর কথা নাই।"

তিনি পুলিনবিহারীকে বলিলেন, "আপনি কাল সকালে আসবেন, সব ঠিক ক'রে দেব। তবে আপনার যদি একান্ত আপত্তি থাকে, তবে না হয় একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা করা যা'ক—কেবল ভূপতিকে মামলা-সোপর্দ্দ করা যা'ক।"

পুলিনবিহারী বলিলেন, "আপনি যা' বলবেন, তা'ই হ'বে।"

তাহাই হইল—মিথ্যা সংবাদ দিয়া যুবকদিগকে বিপন্ন করিবার অপরাধে ভূপতি মামলা-সোপর্দ্দ হইল।

১১

শ্রীপতি দেখিলেন, বিপদ ঘনীভূত হইতেছে। হাটটি উঠিয়া যাওয়ায় তাঁহার আয়ের পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছিল —তাহার পর ব্যয়ও অল্প হয় নাই। তিনি কেবল যে রিক্ত-হস্ত, তাহাই নহেন—ঋণগ্রস্তও বটে। পুত্রের বিরুদ্ধে যে মামলা আরম্ভ হইল, তাহাতে—পুত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টায়—তাঁহাকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতেই হইবে। আর তাহার পর যদি পুত্র দণ্ডিত হয়? তবে তিনি কি আর গ্রামে মুখ দেখাইতে পারিবেন? এখনই তিনি গ্রামের লোকের দ্বারা বর্জ্জিত হইয়াছেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন—সত্যই পরের মন্দচেষ্টা করিলে আপনার মন্দই হয়। পুলিনবিহারী তাঁহার কোন অনিষ্ট করেন নাই; তিনি গ্রামের উন্নতিচেষ্টাই করিয়াছেন—পুলিনবিহারী গ্রামে আসিয়া কত কায করিয়াছেন, আর তিনি গ্রামে থাকিয়া কিছুই করেন নাই। অন্যায়াচারী পুত্রের সমর্থনেই বুঝি তাঁহার অপরাধের ভরা পূর্ণ হইয়াছে।

পার্শ্বের এক গ্রামে এক কর্ম্মকার কাঠের ব্যবসায় অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়া সম্পত্তি ক্রয়ে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। শ্রীপতি পার্শ্বের গ্রামে তাঁহার পত্তনী স্বত্ব তাঁহার নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন এবং মামলা তদ্বির করিতে হইবে ছল ধরিয়া সপরিবারে কলিকাতায় যাইয়া বাস করিলেন। তিনি তথায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মামলা চালাইবার টাকা সংগ্রহ করিলেন।

মামলায় অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও শ্রীপতি পুত্রকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিচারে ভূপতির তিন মাস সশ্রম কারাবাসের ও পাঁচ শত টাকা জরিমানার আদেশ হইল।

সাত দিনের পর সর্ব্বোচ্চ আদালতে ভূপতির জামিন মঞ্জুর হইল। কিন্তু ভূপতির মত লোক কাপুরুষ হয়—কয়দিন কারাবাসে ও পরে কি হইবে সেই আশঙ্কায় তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল।

আপীলে ভূপতির পক্ষসমর্থনকারী ব্যারিষ্টার সে যে সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান এবং তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে ইহা বলিয়া আদালতের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে বিচারক তাহার দণ্ড হ্রাস করিয়া সাত দিন কারাবাসের ও পাঁচ শত টাকা জরিমানার আদেশ করিলেন। তাহার সাত দিন কারাবাস হইয়াছিল, এখন পাঁচ শত টাকা জরিমানা দিয়া সে অব্যাহতি লাভ করিল।

কিন্তু শ্রীপতির আর গ্রামে যাইবার উপায় রহিল না। সম্পত্তি ও সম্ভ্রম উভয়ই গিয়াছে—কেবল অপমান প্রক্ষালিত হইবে না। তিনি স্থির করিলেন, তিনি কাশীবাসী হইবেন। তিনি অপর পুত্রদ্বয়কে তাঁহার আর্থিক অবস্থার কথা ও সঙ্কল্প জানাইলে উভয়েই মাসিক টাকা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

তিনি গ্রামের গৃহ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিনিবে কে? একে লোক পল্লীগ্রাম হইতে সহরে আসিতেছে, তাহাতে গৃহ বৃহৎ। সংবাদ পাইয়া পুলিনবিহারী প্রথমে শ্রীপতি বাবু যাহাতে গ্রামে যায়েন সেই চেষ্টা করিলেন এবং সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে এক জন এঞ্জিনিয়ারকে গৃহটি ভাল করিয়া দেখিতে বলিলেন। এঞ্জিনিয়ার আসিয়া যখন মতপ্রকাশ করিলেন, ঐ গৃহের নিম্নতলে দাতব্য চিকিৎসালয় ও দ্বিতলে হাসপাতাল হইতে পারে এবং পার্শ্বেই ডাক্তারের থাকিবার গৃহ নির্ম্মাণের স্থান আছে, তখন তিনি—পাছে শ্রীপতি বাবু মনে ব্যথা পায়েন সেই জন্য—অপরের নামে ঐ গৃহ কিনিয়া লইলেন এবং তাহার কার্য্যোপযোগী সংস্কারের ব্যবস্থা করিলেন।

গ্রামের যুবকরা তাঁহাকে কেবলই গ্রামে ফিরিয়া যাইতে বলিলেও তিনি তখন যাইতে সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি সংবাদ পাইলেন, শ্রীপতি বাবু সপরিবারে কাশীযাত্রা করিয়াছেন। তখন তিনি গ্রামে ফিরিবার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু কবে যাইবেন, তাহা যুবকদিগকে বলিলেন না; তাহাদিগকে বলিলেন—"যা'ব। যেমন এক রাত্রির অন্ধকারে এসেছিলাম, তেমনই এক রাত্রির অন্ধকারে ফি'রে যা'ব—কেউ টের পা'বে না।"

এক দিন প্রাতে যুবকরা যখন পুষ্করিণীতে মশক-নিবারক ঔষধ দিবার জন্য ঔষধ লইতে পুলিনবিহারীর

গৃহে আসিয়া সরকারের নিকট ঔষধ চাহিল, তখন পার্শ্বের কক্ষ হইতে পুলিনবিহারী বলিলেন, "এই যে, আমি তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।"

তখন কে অগ্রে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে যাইবে, তাহার জন্য হুড়াহুড়ী আরম্ভ হইল। তাহার পর তাহারা তাঁহাকে পুরোভাগে লইয়া পুষ্করিণীগুলিতে ঔষধ দিতে বাহির হইল। দেখিতে দেখিতে যুবকদিগের আনন্দ সমগ্র গ্রামে ব্যাপ্তিলাভ করিল।

সেই দিন পুলিনবিহারী যুবকদিগকে বলিলেন, "ডাক্তারখানার কাযটা শীঘ্রই আরম্ভ হ'বে। এই বার সকলে স্থির কর—কোথায় কোথায় নলকূপ হ'বে, আর স্কুলবাড়ী কোথায় হ'বে।"

১২

পুলিনবিহারী গ্রামে আসিবার পর প্রায় সাত মাস কাটিল। ডাক্তারখানা ও হাসপাতালের জন্য শ্রীপতি বাবুর বাড়ীর আবশ্যক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন শেষ হইয়াছে এবং ডাক্তারের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রদান করা হইয়াছে। কেবল পুলিনবিহারী মধ্যে মধ্যে বলেন, "যদি গ্রামের কোন ছেলে ডাক্তার পাওয়া যেত!" নলকূপ বসান হইয়া গিয়াছে এবং দুইটি বড় পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়া সেই দুইটির মৃত্তিকায় কয়টি ডোবা ভরাট করা হইয়াছে। স্কুলের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। রবিবারে পুষ্করিণীগুলিতে ঔষধ দিয়া আসিয়া পুলিনবিহারী আপনার গৃহসংলগ্ন বাগানে বেঞ্চে বসিয়া ছিলেন। যুবকরা ত কাছে ছিলই—গ্রামের প্রবীণরাও কয় জন আসিয়াছিলেন। একখানি ট্যাক্সী তাঁহার গৃহের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইল এবং এক যুবক নামিয়া চালককে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহের উদ্যানে লোকসমাগম দেখিয়া তথায় উপনীত হইল। পুলিনবিহারী কে জানিয়া লইয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

পুলিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি কলিকাতা হ'তে আসছেন?"

যুবক হাসিয়া বলিল, "আমাকে আপনি বলবেন না। আপনি যখন গ্রামের ছেলেদের 'জ্যেঠামশাই' তখন আমারও তাই। আমি এই গ্রামের ছেলে।"

"তুমি কার ছেলে, বাবা?"

"আমার ঠাকুর্দ্দা প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্য পঞ্জাবে চাকরী করতে গিয়েছিলেন; বাবা ও জ্যেঠামশাই বাঙ্গালার বাইরেই চাকরী ক'রে গেছেন—গ্রামে কেউ তাঁ'দের চিনবেন না।"

প্রবীণদিগের মধ্যে এক জন পুলিনবিহারীকে বলিলেন, "সে দিন ভট্‌চাজ্জি পাড়ায় যে বড় ভিটা দেখে আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, কা'র ভিটা—সে-ই প্রাণনাথের ভিটা।"

যুবক বলিল, "কথায় বলে ভিটায় ঘুঘু চরে। আমাদের ভিটায় যদি ঘুঘু চরত সে-ও ভাল হ'ত; কারণ, ঘুঘু পরিষ্কার জায়গায় চরে। আমাদের ভিটাগুলো কেবল জঙ্গল হয়—মানুষ মারার বিষ উদ্গীর্ণ করে।"

পুলিনবিহারী বলিলেন, "ফিরে এস, ভিটার ব্যবহার কর।"

"তাই করব মনে করেই এসেছি।"—বলিয়া যুবক ডাক্তারের জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির করিল।

"তুমি ডাক্তার?"

"আজ্ঞা—হাঁ।"

"এখন কি করছ?"

"যুক্তপ্রদেশের সরকারে অস্থায়ী চাকরী পেয়েছি। শেষ কাশীতে কায করছি।"

"সে চাকরী ছেড়ে তুমি আসবে—আমরা ত বেশী টাকা দিতে পারব না।"

যুবক হাসিল, বলিল, "এ গ্রামের ছেলেদের রক্তে যে ত্যাগের 'বিষ' আছে, তা' ত আপনি নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারেন।"

যুবকরা হাসিয়া উঠিল; এক জন বলিল, "খুব জবাব দিয়েছেন, জ্যাঠামশাই।"

আগন্তুক যুবক বলিল, "বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর টিকা দায় হয়ে উঠেছে—আরও হ'বে। তাই যখন ভবিষ্যতে কি হ'বে সে কথা আমিও ভাবছিলাম, মেজদাও ভাবছিলেন, তখন গ্রামের কথা শুনলাম।"

"কা'র কাছে—শুনলে?"

"প্রথম—শ্রীপতি বাবুর কাছে।"

"শ্রীপতি বাবুর কাছে?"

সকলেই বিস্মিত হইলেন।

ডাক্তার বলিল, "হাঁ। কাশীতে তিনি যখন খুব পীড়িত, তখন আমি তাঁ'র চিকিৎসা করি। তিনিই প্রথম আপনার কথা বলেছিলেন; আপনার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি অনেক কথা বলেন—অনেক অনুতাপ করেন।"

পুলিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি ফিরে আসতে চা'ন?"

"না। কারণ, কাশীতে তিনি দেহরক্ষা করেছেন।"

কিছুক্ষণ সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।

যুবক বলিল, "তা'র পর শুন্‌লাম, আমার শালার কাছে। সে এই গ্রামে বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায় মশাইয়ের জামাই। তা'র পরে যখন কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখলাম, তখন মনে হ'ল, কি সুযোগ! তাই সাত দিনের ছুটী নিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে ডাক্তারখানার ভার দিলেই আমি চ'লে আসব। তা'র পর গ্রামেই বাড়ী করব। মেজদা ছাপরায় উকীল—তিনিও, বোধ হয়, আসবেন।"

পুলিনবিহারী বলিলেন, "বেশ ত, বাবা। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমি অনেক বার বলেছি, গ্রামের ছেলে ডাক্তার পেলে বড় ভাল হয়। ভগবান, ঠিক তা'ই তোমাকে মিলিয়ে দিলেন। স্কুলে মাষ্টার সম্বন্ধেও আমরা গ্রামের ছেলে পা'বার চেষ্টাই করব।"

"তা' হ'লে কখন আপনি—আপনারা আমার 'সার্টিফিকেট' প্রভৃতি দেখবেন?"

"আজই। তুমি গ্রামের ছেলে তোমার ত আজ না খেয়ে যাওয়া হ'বে না। তোমার ট্যাক্সী বিদায় ক'রে দাও।"

যুবক যাইয়া তাহাই করিয়া আসিল।

পুলিনবিহারী ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করতে হ'বে, দিদিমণিকে ব'লে এস।"

বিভূতি বলিল, "দিদিকে ব'লে এস, আর এক জন ভাই এসেছেন।"

সকলে হাসিতে লাগিলেন।

১৩

বিজয়া দশমীর পর ত্রয়োদশীতে দাতব্যচিকিৎসালয়ের কায আরম্ভ হইল। গ্রামের ছেলে ডাক্তারই আসিয়া তাহার ভার গ্রহণ করিল।

পরবৎসর যখন দুর্গোৎসব তখন গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—বিজ্ঞাপন দিয়া ও পত্র লিখিয়া গ্রামত্যাগী গ্রামের লোকের মধ্য হইতেই শিক্ষক সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রামের শ্রী ফিরিয়াছে—গ্রাম সত্য সত্যই শ্রীনগর হইয়াছে। গ্রামের দেবালয়ের নষ্ট সম্পত্তির উদ্ধার সাধিত করিয়া তাহা সেবায়েতদিগকে—দান-বিক্রয়ের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া—প্রদান করা হইয়াছে; আর সুরবালার গোপালের বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

যুবকদিগকে লইয়া পুলিনবিহারী গ্রামে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। কতকগুলি ত্যক্ত ভিটায় গ্রামত্যাগীরা ফিরিয়া আসিয়া আবার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

পুলিনবিহারীর আরও কতকগুলি কাযের কল্পনা আছে। তিনি সেগুলির বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ইতোমধ্যে তিনি হাট, স্কুল, চিকিৎসালয়—এ সব গ্রামের এক মণ্ডলী গঠিত করিয়া যথারীতি মণ্ডলীকে অর্পণ করিয়াছেন। ঘাট, স্কুল ও বিদ্যালয় রক্ষার জন্য তিনি বহু অর্থ দিয়াছেন। তিনি জীবদ্দশাতেই এই সব দিলেন, তাহাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক এক দিন এক জন আমেরিকান বিখ্যাত দাতা ধনীর কথা বলেন—তিনি বলিতেন, ধনী থাকিয়া মরা অপমান। তাহাতে পুলিনবিহারী বলেন—"কেন আমাদের আদর্শ কি আরও সমুচ্চ নহে? দধীচী কি জগতের কল্যাণকল্পে দেহাস্থি দেন নি?" তাহার পর তিনি বলেন, "আমি কোন দিন ধনী ছিলাম না। এখন—আমি আর সুরবালা—পিতা আর পুত্রী—দুই-ই হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। টাকার কি প্রয়োজন? যদি অভাব ঘটে—গ্রামের লোকই দু'মুঠা দিবে।"

আবার দুর্গোৎসব।

গ্রামে অধিবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূজার আনুষঙ্গিক আয়োজনও বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্রীপতি বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র নৃপতি তাহার স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। নৃপতি গ্রামের সব সংবাদ তাহার

স্ত্রীর নিকট অবগত হইত। সে যাহা শুনিয়াছে—তাহা দেখিবার আগ্রহেই সে এ বার শ্বশুরালয়ে আসিয়াছে। সব দেখিয়া ও শুনিয়া সে তাহার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে এবং তাহা তাহার শ্বশুর মহাশয়কে জানাইয়াছে।

ষষ্ঠীর দিন সে তাহার স্ত্রীকে পূজা দেখিতে যাইতে বলিলেও আপনি তথায় যায় নাই। সপ্তমীর দিন প্রাতে সে সস্ত্রীক পুলিনবিহারীর অর্থে নির্ম্মিত ঘাটে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছে। তাহার পর তাহার শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে উভয়ে দেবীর নিকট অঞ্জলী দিতে আসিয়াছে।

পূজার জন্য যে মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার প্রবেশ-পথেই পুলিনবিহারী বসিয়া ছিলেন। নৃপতির শ্বশুর কন্যা-জামাতাকে তথায় লইয়া যাইলে উভয়ে প্রণাম করিল—তিনি পরিচয় দিলেন—তাঁহার কন্যা আর তাঁহার জামাতা—শ্রীপতি বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র। পুলিনবিহারী বলিলেন—"এস মা, এস; এস বাবা, এস।"

নৃপতি বলিল, "জ্যেঠামশায় আপনাদের বধুর কাছে আমি আপনার আর গ্রামের ছেলেদের কাযের বিবরণ পাই। সেই বর্ণনাই আমাকে টেনে এনেছে। গ্রামে এসে সব দেখে আমি স্থির—আমরা স্থির করেছি, গ্রামেই বাড়ী করব। এবার 'বোনাসের' যে চার হাজার টাকা পেয়েছি—তা'র হাজার টাকা মাকে কাশীতে পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশিষ্ট তিন হাজার টাকায় কায আরম্ভ করতে হ'বে। শ্বশুর মহাশয়কে বলৃলে তিনি বলেছেন, 'তোমার জ্যেঠামশায়কে দিও।' আপনার বৌমা টাকাটা আঁচলে বেঁধে এনেছেন—আপনাকে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনারা দু'জনে আমার জন্য জমি কিনে বাড়ী করবেন, বাড়ীর প্ল্যান আমি জমশেদপুরে এঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে দিয়ে ক'রে পাঠাব। আমার দুই সর্ত্ত—আগামী বৎসর পূজায় এসে যেন বাড়ীতে উঠতে পারি; আর আমার বাড়ীর বাগানে যেন আপনার বাগানের মত ফুল ফুটে থাকে।"

নৃপতির স্ত্রী অঞ্চল হইতে নোট বাহির করিয়া বড় মেয়ের হাতে দিল; বলিল, "দাদুকে প্রণাম ক'রে দিয়ে আয়।"

কন্যাটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নোট কয়খানি দিলে পুলিনবিহারী তাহাকে আদর করিয়া টাকা লইয়া নৃপতির শ্বশুরকে বলিলেন, "এই টাকাটা রাখুন—জমা থাকল।" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

পাকের ঘরের কাছে যাইয়া নৃপতি উচ্চকণ্ঠে বলিল, "দিদি, আপনার আর এক ভাই আর ভাজ ছেলেমেয়ে নিয়ে প্রসাদ পেতে এসেছে।"

বলিয়া সে ঘরের দ্বার হইতে সুরবালাকে প্রণাম করিল। গ্রামের এক জন তাহার পরিচয় দিলেন।

নৃপতির স্ত্রী কায করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। সে পাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া সুরবালাকে বলিল, "আমাকে কি কায দেবেন—দিন।"

"এস। এস। কাযের কি অভাব আছে"—বলিয়া সুরবালা তাহার প্রণাম গ্রহণ করিয়া তাহাকে কায দেখাইয়া দিল।

* * * * *

পুলিনবিহারী সমাগত সকলকে বলিলেন, "আজ কি আনন্দ! মা'র আশীর্ব্বাদে আজ আমাদের গ্রামের সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবে আর কোন অঙ্গ ক্ষুণ্ণ রহিল না।"

এক জন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া জানাইল—পুরোহিত ঠাকুর বলিতেছেন, সকলে অঞ্জলী দিবার জন্য প্রস্তুত হউন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সেই পুরানো ইতিহাস! স্বামি-স্ত্রীতে ঝগড়া বাধিয়াছে!

কথায় বলে, তিল হইতে তাল হয়! এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটিয়াছে! সামান্য ব্যাপার…

রথ-তলায় মেলা বসিয়াছে। লক্ষ্মীর সখ, পড়শীদের সঙ্গে মেলা দেখিতে যাইবে! পরাণের তাহাতে মত নাই!

সে বলে, রাঁধা-বাড়া, ঘরের কাজ…তা'ছাড়া রোগা ছেলেকে একা ফেলিয়া এ-ভাবে মেলা দেখিতে যাওয়া লক্ষ্মীর সাজে না!

লক্ষ্মী ঝঙ্কার দিয়া ওঠে, বৎসরান্তে এই একবার মেলা বসে—সে যাইবে না? তা'ছাড়া সে-দিন পুকুর-ঘাটে জল আনিতে গিয়া শুনিয়া আসিয়াছে, মেলায় এবার না কি সহর হইতে কেমন এক কলের ছবি আসিয়াছে…সে-ছবি না কি কথা কয়…গান গায়! ও-বাড়ীর বিন্দুর বড়-ননদ নিজের কাণে শুনিয়া আসিয়াছে!

পরাণ বুঝাইয়া বলে,—সংসার আগে, না, এই সব যত ছেঁড়া-ল্যাঠা…হুজুগ…?

লক্ষ্মী তীব্র-কণ্ঠে জবাব দেয়,—চুলোয় যাক্ সংসার! চোপোর দিন হাঁড়ি ঠেলে, জল তুলে, হাড়-মাস আমার ভাজা-ভাজা হয়ে গেল! আর পারিনে…এতটুকু সুখ-সাধ…তাও কোনো দিন মিটবে না?

পরাণ দেখিল, লক্ষ্মী বাঁকিয়া বসিয়াছে! সে কহিল,—ছেলেটার এই জ্বর…

লক্ষ্মী আরো ঝাঁজিয়া ওঠে! বলে,—ছেলের জ্বর তা আমি কি করবো? আমি পাশে বসে থেকে কি তোমার ছেলের জ্বর ভালো করবো? পয়সা খরচ করবার মুরোদ নেই…ওষুধ কেনার সাধ্যি নেই…আমার যত দায় পড়েছে! দিন নেই, রাত নেই, ওঁর ঐ রোগা ছেলের পাশে বসে বসে অষ্টপ্রহর খালি সেবা করো! হুঁঃ!

পরাণ শাসাইয়া ওঠে,—লক্ষ্মী…

লক্ষ্মী জবাব দেয়,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সংসার আবার টান কিসের? নিজের পেটের নয়…কিছু নয়…পরের কাঁটা…তার জন্য আবার এত?

পরাণ আবার বকে, বলে,—লক্ষ্মী…মুখ সাম্‌লে কথা ক' বল্‌ছি!

লক্ষ্মী ঝঙ্কার দেয়,—বেশ করছি বলছি! ওঃ…ভাত-কাপড় দেবার কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই! একশো-বার বলবো…

কথাটা পরাণের গায়ে বিঁধিল! বিঁধিবার কথা! …সেবার পাট-কলে ডান হাতখানা কাটা যাইবার পর হইতে পরাণ এক-রকম লক্ষ্মীর মুখাপেক্ষী হইয়া বাঁচিয়া আছে! আজ লক্ষ্মীর বালা দুই গাছা বেচিয়া—কাল আড়াই ভরির অনন্ত জোড়া বন্ধক দিয়া এ-যাবৎ কোনো-মতে সংসার চলিতেছে! সুতরাং লক্ষ্মীর এ-কথাগুলো তাহার গায়ে লাগিবার মত!

ক্ষতস্থানে আচম্‌কা আঘাত লাগিলে জ্বালা যেমন চতুর্গুণ বাড়িয়া ওঠে, ঠিক তেমনি-ভাবে ফুঁশিয়া পরাণ বলে,—সাপের পাঁচ-পা দেখেছিস্, না? দিন-দিন তোর আস্কারা বেড়ে যাচ্ছে! যত কিছু না বলি…

লক্ষ্মী গর্জ্জাইয়া ওঠে,—কি তুই বলবি, শুনি? কি বলবি? আমার যা-খুশী আমি করবো। তুই বলবার কে? তোর খাই, না, তোর পরি যে, তুই এত কথা শোনাতে আসিস্ আমাকে! আমার খুশী আমি যাবো—দেখি তুই কি করতে পারিস? মেলায় আমি যাবোই…কার সাধ্যি আছে, দেখি আমায় রুখতে পারে!

এইভাবে দু' কথা চার কথা উঠিতে উঠিতে ঝগড়া ক্রমে বাড়িয়া ওঠে! শেষে পরাণ দেওয়ালের কোণে

টাঙানো দড়ির আলনা হইতে ময়লা চাদরখানা টানিয়া লইয়া গায়ে জড়াইতে জড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া যায়! যাইবার সময় লক্ষ্মীকে শুনাইয়া দিয়া যায়,—ভগবান নেহাৎ মেরেছেন—তাই আজ তোর মুখ থেকে এত-সব ছোট-বড় কথা শুনতে হয়! এই বেরুলুম আমি ···খেটে হোক্, ভিক্ষে ক'রে হোক, চুরি ক'রে হোক, যে ক'রে হোক্ নিজে আজ পয়সা জোগাড় ক'রে আনবো, তবেই আমার নাম পরাণ মণ্ডল! ছেলেটা এ-দিকে মরে যাক্, হেজে যাক্, চুলোয় যাক্,—তবু তোর মত ডাইনীর হাতের সেবা যেন ওকে না পেতে হয়! আমার ছেলে···আমিই তাকে দেখবো। খবর্দ্দার, তুই ওর কাছে ঘেঁষিস্‌নে বলছি। যদি ঘেঁষিস্ তো দিব্যি রইলো···

মুখখানা ভেঙাইয়া লক্ষ্মী জবাব দেয়,—বেশ তো! মরতে বিয়ে আমায় তবে করেছিলি কেন? নিজের ছেলে নিজেই দেখাশুনা কর্ না···আমার হাড় জুড়োয়।

একটা কঠিন দিব্য গালিয়া পরাণ বাহির হইয়া যায়!

ঘরের ভিতর হইতে রুগ্ন শিশুর একটা কাতর-ধ্বনি ভাসিয়া আসে,—ও মা—মাগো···

লক্ষ্মী গুম্ হইয়া ঘরের দাওয়ায় পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে।

শিশু আবার ডাকে,—মাগো—ও মা—মা···

লক্ষ্মী এবারও কোনো জবাব দেয় না! যেমন গুম্ হইয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া থাকে!

বাহিরের সদর-দরজা হাঁ-হাঁ খোলা পড়িয়া রয়!

বেলা বাড়িয়া চলে। দুটো···তিনটে···চারটে বাজিয়া যায়! পরাণের দেখা নাই!

রুগ্ন শিশু এতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

লক্ষ্মী এখনও গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে! সে আজ কোনো কাজ করিবে না পণ করিয়াছে। রান্না চড়ায় নাই···ঘর নিকায় নাই···জল আনিতে যায় নাই···এমন কি, গরুটার জাব-দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিয়াছে।

রাগ হইবারই কথা! কার না রাগ হয়!···কাল বিকালে পুকুর-ঘাটে জল আনিতে গিয়া বড়-মুখ করিয়া জোর-গলায় সে পড়শীদের কাছে বলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে মেলা দেখিতে যাইবে! এখন ··কোন্ মুখে তাহাদের কি বলিবে সে?···ছেলের অসুখ? সে তো নিত্যই তাহারা শুনিয়া আসিতেছে! হাতে পয়সা নাই···তাই? সে-কথাও লক্ষ্মী বলিতে পারিবে না···ছি! অভাব যতই হোক্···লজ্জার মাথা খাইয়া নিজের মুখে সকলের কাছে ··না-না-না···সে-কথা মুখ ফুটিয়া বলা অসম্ভব! বিশেষ দ্বারিক মণ্ডলের মেয়ে হইয়া···লোকে বলিবে কি? তা'ছাড়া পরাণ এখন বাড়ীতে নাই···ছেলেটা একা···

এই রকম কত কথা মনের চারিপাশে ভিড় করিতে থাকে! ও-দিকে বেলা পড়িয়া আসে। পড়শীর দল সাজিয়া গুজিয়া মেলায় যাইবার পথে লক্ষ্মীর উঠানে আসিয়া ডাক দেয়,—চ' লো, মেলায় যাবিনে?···

লক্ষ্মী কোনো জবাব দেয় না।

বিন্দীর মা আগাইয়া আসিয়া বলে,—কি হলো লা লক্ষ্মী? কলের ছবি দেখতে যাবি·· চ'।

লক্ষ্মী গম্ভীর-ভাবে জবাব দেয়,—তোরা যা···

পুঁটি জিজ্ঞাসা করে,—কেন লো, তুই যাবিনে?

লক্ষ্মী বলে,—না।

বিন্দীর মা বলে,—কেন? কি হলো তোর আবার?

লক্ষ্মী কোনো জবাব দেয় না—চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বিন্দীর মা ব্যঙ্গ করিয়া বলে,—বুঝেছি! ধনীর আমার মান হয়েছে···তাই! তা ব্যাপারখানা কি? পরাণ বুঝি কিছু ··

লক্ষ্মী এবারও চুপ করিয়া থাকে!

বিন্দীর মা আবার ব্যঙ্গ করে···সুর করিয়া বলে,—রাইয়ের আমার হলো কি? এত মান! বলি, সদয় হও গো বিনোদিনী···মুখ তুলে চাও!

বিন্দীর মায়ের রসিকতায় পড়শীর দল হাসিয়া ওঠে!

বিরক্তিতে লক্ষ্মী মুখ ফিরাইয়া লয়···কোনো জবাব দেয় না!

পড়শীর দল চলিয়া যায়। লক্ষ্মী যেমন চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া থাকে!

আকাশের পথে পাড়ি জমাইয়া পাখীরা ঘরে ফিরিতে সুরু করিয়াছে।

লক্ষ্মী উঠিয়া পড়ে। সে আর ভাবিতে পারে না! এ-ভাবে একা-একা ঘরে বসিয়া থাকা অসহ্য হইয়া ওঠে। ঘরের কোণ হইতে মাটির কলসীটা তুলিয়া লইয়া সে জল আনিতে বাহির হইয়া যায়!

ঘোষেদের দিঘীর ঘাটে লক্ষ্মী যখন আসিয়া হাজির হয়, তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে! পাশের ঐ বড় বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে বৈকালের রঙীন সূর্য্য বহুক্ষণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! ত্রয়োদশীর চাঁদ তখনো ওঠে নাই···আধো-অন্ধকার আকাশের কোলে তারাগুলা সবেমাত্র ফুটিতে সুরু করিয়াছে!

দিঘীর ঘাট নির্জ্জন···কেহ নাই! সন্ধ্যার আগেই মেয়েরা জল লইয়া যে-যার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে!

কলসী লইয়া লক্ষ্মী একা জলে নামিল। উপরে ঘাটের রোয়াকে বসিয়া কে বাঁশীতে সুর বাঁধিয়াছে! কীর্ত্তনের সুর···রাধা-কৃষ্ণের গান! কেমন একটা মিঠা উদাস-ভাব! লক্ষ্মীর প্রাণে কি যেন হিল্লোল জাগিতেছিল···কত পুরানো কথা···কত স্মৃতি···

দিঘীর কালো জলের শীতল পরশ···জল ছাড়িয়া উঠিতে লক্ষ্মীর মন সরে না! জলে গা-ডুবাইয়া সে বসিয়া থাকে! দূরের বনে জোনাকির পাঁতি দীপালি রচিয়াছে! সন্ধ্যার বাতাসে বাঁশীর সুর ভাসিয়া আসে··· লক্ষ্মী বিভোর হইয়া শোনে!

···বাঁশী বাজিতে থাকে! সুরে কি মাদকতা··· কত মায়া···

লক্ষ্মী সহসা শিহরিয়া ওঠে! এ বাঁশী সে আগে শুনিয়াছে!···রাশুদা বাজাইত। এমনি মিঠা সুরে···এমনি দরদ ঢালিয়া!

কেমন একটা সঙ্কোচ···অজানা ভয় চারি পাশ হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। লক্ষ্মী জল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে।

সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে—চারি পাশে অন্ধকার আরো নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে!

ভিজা কাপড়ে কলসী কোমরে লইয়া লক্ষ্মী ঘাটের সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া আসে। বাঁশী তখনো বাজিয়া চলিয়াছে! লক্ষ্মী মনে মনে ধিক্কার দেয়···ছি-ছি, রাত হইয়া গিয়াছে···একা এই পুকুর-ঘাটে···কেহ যদি দেখিয়া ফেলে?

সে ঘরের দিকে আগাইতে থাকে! কোথাও কেহ নাই! দূরের রোয়াকে বসিয়া শুধু কে এক জন ঐ বাঁশী বাজাইতেছে!

বাঁশীওয়ালাকে পার হইয়া লক্ষ্মী আগাইয়া চলে। বাঁশী সহসা থামিয়া যায়···পিছন হইতে কে যেন এক জন ডাকিয়া ওঠে,—লক্ষ্মী না কি?

আচম্কা এই ডাকে লক্ষ্মী শিহরিয়া ওঠে! সে আর চলিতে পারে না···তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া যায়!

পিছন হইতে আবার ডাক আসে,—লক্ষ্মী···

রাশুদার গলা না?···

লক্ষ্মী চকিতের জন্য একবার ফিরিয়া তাকায়। দেখে, আগন্তুক তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ভয়ে তাহার গলা শুকাইয়া যায়···সারা অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়···চলিতে পা ওঠে না! লক্ষ্মী চুপ করিয়া ঘাটের এক পাশে দাঁড়াইয়া থাকে—সারা দেহ-মন আতঙ্কে আকুল!

আগন্তুক আরো কাছে আগাইয়া আসে···আবার ডাকে,—লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী ফিরিয়া দেখে···

রাশুদাই বটে! বহু দিন দেখা নাই···তবু বিশেষ বদ্‌লায় নাই তো···সেই আগেকার মতই অনেকটা··· রংটা একটু যেন ময়লা হইয়াছে! চাঁদের ম্লান আলো পড়িয়া তাহার সেই সুঠাম যৌবন-পুষ্ট সারা দেহ চক্‌-চক্ করিতেছে!

লক্ষ্মীর একে-একে মনে পড়িতে থাকে—সেই পুরানো কথা···শৈশবের সেই রঙীন দিন···

এই দিঘীর ঘাটেই দু'জনে বসিয়া কত গল্প, কত হাসি-গান, খেলা, ছুটোছুটি, কত মান-অভিমান···

লক্ষ্মীর মন ভরিয়া উঠিতেছিল।

সহসা পিছন হইতে রাশু লক্ষ্মীর কাছে আসিয়া

কহিল,—এই তো! বেশ মেয়ে তুই লক্ষ্মী! আমি এ-দিকে ডেকে ডেকে হায়রাণ হয়ে গেলুম, আর তুই একটা সাড়া দিতে পারিস না?

লক্ষ্মী কোনো কথা কহিতে পারে না! সঙ্কোচে তাহার গলার স্বর কেমন বাধিয়া যায়!

হাসিয়া রাশু বলে,—তুই আচ্ছা মেয়ে যা হোক্! আমি ও-দিকে তোর কোনো সাড়া না পেয়ে ভয়ে অস্থির হচ্ছি—বুঝি বা গাঁয়ের অন্য কারো বৌ-ঝিকে ডেকে বস্‌লুম···

লক্ষ্মীর ভারী ভালো লাগে—রাশুর এই স্বচ্ছ-সহজ ভাব! সে যেন সেই অতীতের হারানো দিনগুলিকে আবার ফিরিয়া পায়!

রাশু বলে,—তুই কিন্তু তেমন বদ্‌লাস্‌নি লক্ষ্মী···প্রায় আগের মতনই আছিস! একটু যা গম্ভীর হয়েছিস!··· তা বিয়ে-থা হলো···তার ওপর ঘর-সংসারে গিন্নী হয়েছিস···তাই, না?

লক্ষ্মী মনে-মনে হাসে। হাঁ,—সংসারে গৃহিণী হইয়াছে বটে! কিন্তু···

সে আর ভাবিতে পারে না! রাশু প্রশ্ন করে,—কি রে কথার জবাব দিচ্ছিস না যে? আমাকে চিনতে পাচ্ছিস্ না বুঝি?

লক্ষ্মী কোন কথা বলে না! সে বিভোর হইয়া অতীতের পুরানো স্বপ্ন দেখিতে থাকে।

সেই রাশুদা···

সেই রাস-পূর্ণিমার দিন···

সন্ধ্যায় সদু-পিসি আসিয়া কথা পাড়িলেন,—তোমার লক্ষ্মী তো এবার ডাগর হলো বৌ···তা আমার রাশুর সঙ্গে বে দিলে কেমন হয়! দু'টিতে ভাব যেমন, মানাবেও তেমনি। ঠিক যেন রাধা-কৃষ্ণ···

হাসিয়া লক্ষ্মীর মা বলেন,—আমার কি তাতে অমত হতে পারে ঠাকুরঝি···রাশুর মত অমন ছেলে পাওয়া··· কার না সাধ হয়?

পাকা-দেখার দিন স্থির হইয়া যায়!

দরজার আড়ালে লুকাইয়া লক্ষ্মী সব কথা শোনে। মনে-মনে সে কল্পনার জাল বুনিতে থাকে! কত রঙীন সূতায়···লাল, নীল, সোনালী···

কিন্তু লক্ষ্মীর এ-স্বপ্ন স্বপ্ন রহিয়া যায়! রঙীন সূতায় গাঁথা ভবিষ্যতের সেই আশা-আনন্দের জালখানা শত-ছিন্ন হইয়া মনের এক পাশে নিভৃতে পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে থাকে!

বিবাহের সব বন্দোবস্ত ঠিকমত চলিয়া আসে,—বাধে কেবল বিবাহের দিন!

অতর্কিতে ও-পাড়ার চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আসিয়া সব-কিছু ভাঙ্গিয়া দেন। তুষের ভিতরকার আগুন জ্বলিয়া জ্বলিয়া সহসা কোনো দাহ্য-পদার্থের পরশ পাইলে যেমন দপ্ করিয়া সেটাকে পুরোপুরি গ্রাস করিয়া বসে, ঠিক তেমনি-ভাবে দ্বারিক মণ্ডলের উপরে সে-বারের জমির মকর্দ্দমা-হারার চাপা আক্রোশ আজ সুযোগ পাইয়া চূড়ান্ত ভাবে ষোলো আনা তিনি মিটাইয়া লন।

ব্রাহ্মণ-পুরোহিত না হইলে বিবাহ হয় না! চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ব্রাহ্মণ এবং তার উপর গ্রামের সমাজপতি! কাজে কাজেই সমাজের মাথার উপর দুই-পায়ে দাঁড়াইয়া তিনি সদর্পে জানাইয়া দিলেন যে, কোনো বামুনের ছেলে এ-বিবাহে পুরোহিতের কাজ করিবে না! সাধারণ লোকে পাছে গোলযোগের সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় তিনি একটা ক্ষীণ কারণও দেখাইলেন। প্রচার করিলেন যে, নীচু-ঘরের ছেলের সঙ্গে উঁচু-ঘরের মেয়ের বিবাহ না কি শাস্ত্রের অনুমোদিত নয়! কাজে কাজেই···

আপত্তি যে হয় নাই, এমন নয়! লোকে আজকাল ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করে না যে, মিথ্যা-আজগুবী যাহা বলিবে, তাহাই বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লইবে···বিশেষ এ-ক্ষেত্রে আবার পয়সাওয়ালা লোক বলিয়া গ্রামের মধ্যে দ্বারিক মণ্ডলের নাম আছে! কিন্তু দুই-চারি জনের ক্ষীণ-আপত্তির সে-ঝড় ভাসিয়া গেল—সমাজে একঘরে হইবার ভয়ে! চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সাদা কথায় জানাইয়া দিলেন যে, গ্রামের যারা এ-বিবাহে সহায়তা করিবে, তাহাদের প্রত্যেককে একঘরে করিয়া সমাজের গণ্ডীর বাহিরে এক-কোণে ফেলিয়া রাখা হইবে!

দ্বারিক মণ্ডল কিন্তু বাঁকিয়া বসিল! গলায় একগাছা ঐ পৈতার সূতো ঝুলাইয়াছ বলিয়াই কি সমাজের মাথায় বসিয়া এমনি যা-নয়-তাই পায়ে দলিয়া চলিবে! কিছুতেই নয়···একঘরে করো, মিথ্যা অপমান করো, যাই করো···এ বিবাহ আমি দিবই!

আবদার

দ্বারিক জিদ ধরিয়া বসিল। এমন কি শেষে তিন কুড়ি পনেরো টাকা খরচ করিয়া অন্য গ্রাম হইতে এক জন পুরোহিতকেও ঠিক করিয়া আসিল!

কিন্তু রাশুর মা শেষ মুহূর্ত্তে পিছাইয়া পড়িলেন! তিনি ধর্ম্মভীরু লোক···চক্রবর্ত্তী-ঠাকুরের হুঙ্কারে সশঙ্কিত হইয়া দ্বারিককে জানাইয়া দিলেন,—কাজ নেই বাপু এমন বিয়েয়! বিধবা মানুষ—শেষে কি অন্তিম কালে গঙ্গাজল-টুকু পাবো না! দরকার কি বাপু বামুন-দেবতাকে চটিয়ে দিয়ে···

দ্বারিক বুঝাইল···লক্ষ্মীর মা বুঝাইল···

রাশু নিজেও কত করিয়া বুঝাইল,—বিয়ে ক'রে তল্পী-তল্পা সব তুলে নিয়ে অন্য গাঁয়ে চলে যাবো মা··· এ-দিকে জন্মেও আর আসবো না কোনো দিন···

রাশুর মা কিন্তু অবুঝ···কিছুই বোঝেন না! তিনি বলেন,—ও-সব বুঝিনে···আমার আর ক'টা দিনই বা আছে! শ্বশুরের, স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথায় বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে আবার নতুন ক'রে ঘর বাঁধবো? না বাপু, ও-সব আমার দরকার নেই···নিজের এই ঘরখানিতে মরতে পারলেই আমার শান্তি···

রাশু আরো বুঝাইতে থাকে···বৃদ্ধার মন কিন্তু তাহাতে টলে না!

বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়!

রাগে, অপমানে, লজ্জায় দ্বারিক কোথা হইতে চাল-চুলোহীন দোজবরে পরাণকে টানিয়া আনিয়া লক্ষ্মীকে তাহারই হাতে সঁপিয়া সস্ত্রীক বৃন্দাবনে চলিয়া যায়!

রাশুও গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায় সহরে!

তার পর···

লক্ষ্মীর কাছে আগাগোড়া সব যেন কেমন স্বপ্নের মত লাগে!

এমন সময় রাশু বলিতে থাকে,—তোর কি হয়েছে রে, লক্ষ্মী···এমন চুপ ক'রে রয়েছিস্···একটা কথার জবাব দিচ্ছিস না যে?

রাশুর গলার স্বরে লক্ষ্মীর স্বপ্ন-ঘোর কাটিয়া যায়—সে আবার এই মাটির জগতে বাস্তবতার মধ্যে ফিরিয়া আসে!

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে···বাতাসে জুঁই-ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসে···

রাশু আবার জিজ্ঞাসা করে,—লক্ষ্মী, তোর কি হয়েছে বল্ দেখি? পরাণের সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে বুঝি? সে তোকে বকেছে?

লক্ষ্মী এ-প্রশ্নে সহসা কেমন সচকিত হয়! কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটা সঙ্কোচ! ··ও-সব কথা রাশুদার কাছে···না-না-থাক্···

লক্ষ্মী চুপ করিয়া থাকে!

তাহার মৌন-ভাব দেখিয়া রাশু জিজ্ঞাসা করে, —যা ভেবেছি, তাই···না?

লক্ষ্মীর মনের ভিতর সব-কিছু কেমন যেন গোলমাল হইয়া যায়! সহসা সে ঘাড় নাড়িয়া সলজ্জ-ভাবে জানাইয়া বসে,—হ্যাঁ!

রাশু হাসিয়া বলে,—তাই বল্! আমার এতক্ষণ ও-কথাটা মনেই আসেনি! কেন বক্‌লো তোকে শুনি?

লক্ষ্মী চুপ করিয়া মাটির দিকে তাকাইয়া থাকে!

হাসিয়া রাশু বলে,—ও···আমায় বলবি না বুঝি? বেশ!

সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করে।

লক্ষ্মী আর থাকিতে পারে না···সব কথা খুলিয়া বলে। পরাণ, তার রোগা ছেলে, সংসার···সব কিছু! একে একে সব কথা সে রাশুকে বলিতে থাকে!

দু'জনে অনেক কথা হয়!

কত কথা···

হাল-ভাঙা-নৌকার মত অনির্দ্দিষ্ট-ভাবে রাশুর দিন-গুলা কোনোমতে কাটিয়া চলিয়াছে। সুখ নাই··· স্বাচ্ছন্দ্য নাই···আগেকার মত প্রাণের সে স্পন্দন আর নাই···মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! বিবাহ সে করে নাই···কোনো দিন করিবে না! সেই পুরানো স্মৃতির ভাঙা টুকরোগুলা লইয়াই সে জীবনের বাকী দিন ক'টা কাটাইয়া দিবে, স্থির করিয়াছে!

লক্ষ্মীরও সঙ্কোচ ক্রমশঃ কাটিয়া আসে! মনের ভিতরকার ছোট-বড় বহু কথা রাশুকে আজ সে একের

পর একে খুলিয়া বলিতে থাকে! জীবনে তাহারও কত সাধ···কত আশা ছিল···কিন্তু সে-গুলার কোনোটাই মিটিল না! সারাক্ষণ সে যেন একটা ভারী বোঝা বহিয়া মরিতেছে! কেহ তার মুখের পানে একবার এতটুকু তাকাইয়া দেখে না!

রাশু প্রশ্ন করে,—আচ্ছা লক্ষ্মী, একটা কথা তোকে জিগ্‌গেস করবো···তুই ঠিক ক'রে বলবি?

লক্ষ্মী জবাব দেয়,—বলো।

রাশু বলে,—পরাণ তোকে ভালোবাসে?

লক্ষ্মী এ-কথার কোনো জবাব দেয় না! চুপ করিয়া থাকে!

রাশু বুঝিতে পারে! সে বলে,—আমি ঠিক বুঝেছিলুম লক্ষ্মী···বিয়ে ক'রে তুই সুখী হতে পারিস নি!

আচম্‌কা বন্যার স্রোত নামিলে নদীর বাঁধ সামলাইয়া রাখা যেমন একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া ওঠে, আজ রাশুর এই কথায় লক্ষ্মীর মনের কঠিন বন্ধন-দ্বারও অর্গল ভাঙ্গিয়া একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে!

রাশুর হাতখানা নিজের হাতের মুঠার মধ্যে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া লক্ষ্মী আকুল-ভাবে বলে,—তুমি আমায় বাঁচাও রাশুদা···এমন ক'রে বাঁচতে আমি পারবো না···

কথাটা রাশু মন দিয়া শোনে। সে বলে,—কিন্তু লক্ষ্মী ··

আরো কাছে সরিয়া আসিয়া লক্ষ্মী জানায়,—না-না, কিন্তু নয় রাশু-দা। তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না আমি···তুমি আমায় বাঁচাও! আমায় বাঁচাও রাশুদা···আমি আর পারিনে···

রাশু স্তব্ধ হইয়া কি যেন ভাবে! ক্ষণেক পরে লক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া বলে,—কিন্তু লক্ষ্মী···উপায় যে নেই কিছু···

লক্ষ্মী বলিয়া ওঠে,—না-না, উপায় আছে···উপায় আছে রাশুদা।

রাশু লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে!

লক্ষ্মী বলে—চলো···দু'জনে এখান থেকে পালিয়ে যাই।

রাশু জিজ্ঞাসা করে,—কোথায় যাবো?

লক্ষ্মী বলে,—যে-দিকে দু'চোখ যায়! সে যেখানেই হোক্!···এখান থেকে দূরে···বহু দূরে···যেখানে কেউ আমাদের জানবে না···চিনবে না···সন্ধান করবে না···

রাশু ভাবে! বলে,—কিন্তু··· সে তো হয় না লক্ষ্মী·

লক্ষ্মী চমকিয়া ওঠে! প্রশ্ন করে,—কেন?

রাশু জবাব দেয়,—এই ঘর-সংসার ছেড়ে···পরাণ··

লক্ষ্মী উত্তেজিত ভাবে জানায়,—আমার ও-সব কিছু নেই!···ঘর আমায় চায় না···সংসার আমায় চায় না·· পরাণ আমায় চায় না!···তুমি আমায় নিয়ে চলো এখা থেকে···তোমার পায়ে পড়ি···আমাকে নিয়ে চলো···

রাশু চুপ করিয়া শুনিতে থাকে।

মনের আবেগে লক্ষ্মী বলে,—এখান থেকে অনেক দূ ···লোকের চোখের আড়ালে চলে গিয়ে আমরা দু'জ ঘর বাঁধবো···আর কেউ থাকবে না সেখানে! তু হবে স্বামী আর আমি হবো তোমার স্ত্রী!

রাশুর চোখের সামনে একখানা রঙীন ছবি ভাসি ওঠে···মনের মধ্যে কি যেন একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব আন্দোলন সুরু হইয়া যায়···সে আর ভাবি পারে না! সহসা বলিয়া ফেলে,—বেশ, তাই চলো লক্ষ্ম ···আজ রাত্তিরেই তাহ'লে আমরা পালিয়ে যাই···

লক্ষ্মীর মন উৎসাহে, উত্তেজনায় ভরিয়া ওঠে! বলে,—হ্যাঁ, তাই চলো···আজ রাত্তিরেই···

শেষে স্থির হয়, রাত্রি সাড়ে দশটার গাড়ীতে তাহার আজ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইবে!

ও-পারের মন্দির হইতে কাঁশর-ঘণ্টার আওয়া ভাসিয়া আসে। আরতি সুরু হইয়াছে!

দু'জনের চমক ভাঙ্গে।

রাশু বলে,—লক্ষ্মী···তুই এবার যা···আরতি শে হলো। এখনি এ-ঘাটের পথে লোকের ভীড়-জমতে সুর হবে! আমাদের গাড়ীর এখনো অনেক সময় আছে·· তুই বরং ভিজে কাপড় বদলে নিয়ে তৈরী হয়ে এ ইষ্টিশানের পাশে সেই যে কেষ্টচুড়ো গাছটা আছে, তা তলায় অপেক্ষা করিস···আমি আসবো সেখানে···

লক্ষ্মী বুঝিতে পারে!···হুঁশিয়ার হওয়া খুব প্রয়োজন যদি কেহ আভাসে-ইঙ্গিতে এতটুকু আঁচ পায়···

মাটি হইতে কলসী তুলিয়া লইয়া সে বলে,—বেশ ···তাই হবে'খন।

দু'জনে দুই পথে চলিয়া যায়। উত্তেজনায়, আগ্রহে, অধীরতায় তাহাদের বুক দুলিতে থাকে!

আরতির ঘণ্টার রেশ বাতাসে তখনো ভাসিয়া আসে!

ঘরে ফিরিয়া লক্ষ্মী দেখে—পরাণ তখনো ফেরে নাই, ছেলেটা বোধ হয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে··· তার চোখের কোলে জল শুকাইয়া রহিয়াছে!···মা-মরা ছেলে···

লক্ষ্মী ও-দিকে মন দেয় না···এ-সব সে ভুলিতে চেষ্টা করে! গৃহের এক কোণে মাটির কলসী নামাইয়া রাখিয়া ঘরের আলোটাকে বেশ একটু বাড়াইয়া দেয়! তার পর লাল-রঙের টিনের বাক্স হইতে একখানা নীলাম্বরী শাড়ী টানিয়া বাহির করে আর সেই গোলাপী রঙের জামা ·· ভবিষ্যতের কোনো এক স্মরণীয় দিনের বিশেষ আভরণ হিসাবে এগুলিকে সে অতি-যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল! আজ সে-দিন আসিয়াছে···

লক্ষ্মী রাঁধিবার কোনো আয়োজন করে না, নিত্যকার মত তুলসী-তলায় সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া দেয় না···আপন-মনে সে কেবল আয়নার সুমুখে দাঁড়াইয়া পরিপাটি-ভাবে নিজেকে সাজাইয়া তোলে! ভালো করিয়া চুল বাঁধে, ···খোঁপায় ফুল আঁটে, ··কপালের উপরে ছোট্ট লাল টিপ আঁকিতে ভোলে না···গহনার বাক্স হইতে সামান্য যে-দুই-চারিটা গহনা অবশিষ্ট রহিয়াছে, সেগুলাও সযত্নে পরিয়া লয়!

পরাণ তখনো ফেরে না!

রাত বাড়িয়া চলে। লক্ষ্মী অধীর হইয়া ওঠে! আরতির ঘণ্টা বহুক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। দূরের ঐ তাল-বনের মাথা ছাড়াইয়া চাঁদ আকাশের আরো উপরে উঠিয়া বসিয়াছে! ঘরের জান্‌লা দিয়া এক-ফালি চাঁদের আলো আসিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িয়াছে! লক্ষ্মী চঞ্চল হইয়া ওঠে! আরো কতক্ষণ···

রোগা-ছেলেটা বোধ হয় ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখে! কি যেন সে বকিতে থাকে···কত কথা!···কিছু বোঝা যায় না! লক্ষ্মী বাহিরে দাওয়ায় আসিয়া বসে!

দূরের বাঁশ-ঝাড় হইতে পাপিয়ার কণ্ঠ ভাসিয়া আসে! উঠানের পশ্চিম দিকের বকুল-গাছটা ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে···তার গন্ধে সারা আঙিনা মদির!

লক্ষ্মী ভাবিতে থাকে, এই ঘর···এই সংসার···এ-সব ছাড়িয়া···

সহসা দূরে কাছারী-বাড়ীর ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া দশটা বাজে!

লক্ষ্মী উঠিয়া পড়ে। সময় হইয়াছে! সে আর অন্য কোনো কথা ভাবিতে চায় না···এখানকার সব কিছু সে ভুলিতে চায়!···এ-সব তাহাকে চিরদিনের মত মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে!

ঘরে রোগা ছেলেটা তখনো বেহুঁশ হইয়া স্বপ্ন দেখে ·· বকিতে থাকে···

লক্ষ্মী উঠানে নামিয়া আসে। উঠানের কোণে গোয়াল-ঘরের দিকে নজর পড়িয়া যায়...সেখানে গাভী-মাতা গভীর স্নেহ-ভরে তাহারি শিশুটিকে চাটিয়া আদর করিতেছে ··

লক্ষ্মীর কি যেন মনে হয়! সে তাকাইয়া দেখে··· ভাবে, এই রোগা ছেলে ফেলিয়া···?

চকিতের জন্য কেমন একটা মায়া তাহার মনকে দোলা দেয়! লক্ষ্মী নিজেকে সামলাইয়া লয়!

ঘরের ভিতরে রুগ্ন-শিশু কাঁদিয়া ডাকে,—মা · মা ·· মাগো!

বোধ হয় কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখিয়া ভয় পাইয়াছে! রোগা ছেলে·· একা···

লক্ষ্মী মনকে আরো কঠিন করিয়া বাঁধে। না, কোনো দিকে সে কাণ দিবে না! আঙিনার দরজার দিকে সে আগাইয়া যায় · সময় নাই!

শিশু আবার কাঁদিয়া ডাকিতে থাকে,—মা···মা··· ও মা···

লক্ষ্মী আর পারে না! মনের মধ্যে কি যেন একটা সাড়া তোলে···

নিজের পেটের নয়···সতীনের কাঁটা···

তবু···

সে আর পারে না! তাহার যত কিছু সঙ্কল্প···যত কিছু বাসনা···আজ এই বানের মুখে খড়-কুটোর মত ভাসিয়া যায়!

সে ছুটিয়া আসিয়া রুগ্ন শিশুকে বুকে তুলিয়া লয়! নিজের বুকের ভিতরে নিবিড়-ভাবে চাপিয়া ধরিয়া শিশুকে আদর করিয়া বলে,—না সোনা, না···ভয় পায় না···ছি! এই তো আমি এসেছি···মা···তোমার মা···

শিশু জল-ভরা চোখে দুই হাতে লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে থাকে—আমি ভয় পেয়েছিলুম বড্ড··· তুমি কোথাও যেয়ো না মা···

চুমায় চুমায় শিশুর সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া দিয়া লক্ষ্মী বলে,—না মাণিক···আমি আর কোথাও যাবো না···কোনো দিন যাবো না···

মায়ের বুকের উপর মাথা রাখিয়া শিশু আবদার করে,—আমাকে একটা গল্প বলো মা···সেই যে রাজপুত্তুর···

লক্ষ্মী প্রাণ ভরিয়া শিশুকে গল্প শুনাইতে থাকে··· সেই রাজকন্যা···রাজপুত্তুর···পক্ষীরাজ ঘোড়া···ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমী···

···বহু দূরে···ষ্টেশনের দিক হইতে এঞ্জিনের বাঁশীর একটা তীব্র আওয়াজ ভাসিয়া আসে!···রেলগাড়ী চলিতে সুরু করিয়াছে···এতক্ষণে বোধ হয় গ্রাম ছাড়াইয়া গেল! রুগ্ন শিশুকে আরো নিবিড়-ভাবে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া লক্ষ্মী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। খোঁপার ফুল ছুড়িয়া ধূলায় ফেলিয়া দেয়!

শিশু অধীর-আগ্রহে প্রশ্ন করে,—তার পর কি হলো মা?

খোঁপার ফুল ধূলায় পড়িয়া লুটায়! লক্ষ্মী আবার বলিতে সুরু করে,— তার পর? তার পর রাজকন্যাকে না পেয়ে রাজপুত্তুর আবার তার নিজের দেশে ফিরে গেল···রাজকন্যা তার সঙ্গে গেল না···

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ।

সংসার-জননী

বুঝি বুঝি হে জননি, তব মাতৃ-মর্ম্মের মহিমা
খুব জানি পুত্র তরে দরদের নাহি তব সীমা।
ভুলায়ে রাখিতে চায়, শিরে তার অঙ্গুলি বুলায়ে
তব পক্ষ-পুট-তলে স্নেহ তব সন্ধ্যার কুলায়ে।
কেমনে তবু সে ভুলে জীবনের ধ্রুব লক্ষ্যখানি?
হায় মা, কেমনে ভুলে বিশ্ব তারে দেয় হাত-ছানি?

যাত্রাপথ টানে তারে—সত্য তারে করিছে শাসন,
উদ্‌যাপন লাগি হায় ব্রতগুলি করে আকিঞ্চন।
হায়—তাই যেতে হয়। স্নেহডোরে তোমার অঞ্চল
বাঁধিয়া রাখিতে নারে। বৃথা তব ঝরে আঁখিজল।

মায়া-মূঢ়া হা জননি, তুমি ভাব নিষ্ঠুর সন্তান
কেমনে বুঝিবে মাতৃহৃদয়ের ব্যথার সন্মান।
কেমনে বুঝাবো মা গো—সত্য তাতে নাহি এক কণা,
সহে পুত্র মর্ম্মকোষে কি দুঃসহ দারুণ যাতনা।

ভাঙ্গা বুক হস্তে চাপি—ঠোঁটে চাপি অশ্রুর তুফান,
কাতর বিদায় লয় যুগে যুগে তোমার সন্তান।
জান না তোমার অশ্রু করে তার পন্থারে পিছল,
তব হাহাকার তার হ'রে লয় চরণের বল।

পথ পানে চেয়ে তব ছলছল কাতর চাহনি
পথেরে বন্ধুর করে পদে পদে, জান না জননি!
তবু তারে যেতে হয় জননীর চরণে প্রণমি'।
ঘরে ঘরে মূর্চ্ছাহতা শচীমাতা, যশোদা, গৌতমী।

শ্রীকালিদাস রায়

পঞ্চনদের রাজধানীতে

ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে কয়টি নগরের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে, তা'দের মধ্যে দিল্লী, আগ্রা আর লাহোরই বোধ করি অন্যতম। দিল্লী ও আগ্রা পূর্ব্বেই দেখা ছিল, সেবার কাশ্মীর যাওয়ার পথে লাহোর দেখবার সুযোগ ত্যাগ করা সঙ্গত বোধ হ'ল না। সিমলায় দু'টি দিন স্থানীয় কালীবাড়ীর প্রাসাদোপম অট্টালিকাতে আরামে কাটিয়ে কাল্‌কায় দিল্লীগামী ট্রেণ ধ'রলাম—রাত্রি প্রায় এগারটায়। পুনরায় রাত্রি প্রায় দেড়টায় আম্বালায় গাড়ী বদল ক'রে পঞ্জাব মেল ধ'রে লাহোর-সিটি ষ্টেশনে পৌঁছলাম পরদিন প্রত্যুষে।

নবনির্ম্মিত লাহোর-ষ্টেশন আকারে যেমন বৃহৎ, তেমনই সুদৃশ্য। বৃহৎ হওয়ারই কথা; কারণ, এখান থেকে তিনটি লাইন চ'লে গেছে দিল্লী, করাচী আর পেশোয়ারের দিকে। এই তিনটি লাইনের সংযোগস্থলে লাহোর-সিটি ষ্টেশন। ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে ষ্টেশন-প্ল্যাটফরম অতিক্রম ক'রে বাহিরে এসে দে'খলাম, টোঙ্গার ষ্ট্যাণ্ডে সারি সারি টোঙ্গা দাঁড়িয়ে—আরোহীর আশায়। আমাদের দু'জনকে দেখেই এক জন টোঙ্গাচালক অগ্রসর হ'য়ে এল। সিমলা থেকেই জেনে এসেছিলাম, 'হীরামণ্ডি' নামক পল্লীতে অবস্থিত "বাঙ্গালী কালীবাড়ী"ই এখানে নবাগত ও নিরাশ্রয় বাঙ্গালীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়। সে কথা স্মরণ ক'রে গাড়োয়ানকে খুব সপ্রতিভভাবে, সবজান্তার মত আমার নিজস্ব মৌলিক হিন্দুস্থানী ভাষায় 'হীরামণ্ডির' বাঙ্গালী কালীবাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা জানালাম। ভাড়া ঠিক্ হ'লে কুলি মালপত্র গাড়ীতে তুলে দিলে। পাশেই ছিল চুঙ্গী আফিস; বুঝলাম, তা'রা আমাদের মালপত্রের দিকে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছে; কিন্তু আমাদের সঙ্গে আপত্তিজনক তেমন কিছু না থাকায়, তা'রা কিছু বললে না। আমরা উঠে ব'সতেই টোঙ্গা ছুটে চ'লল।

পঞ্জাবের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহুবিশ্রুত রাজধানী লাহোরের রাস্তা দিয়ে চলেছি, এই কথা মনে ক'রে সত্যই আমরা রোমাঞ্চিত হ'তে লা'গলাম। মনের পর্দ্দার উপর ছায়াছবির মত কত ঐতিহাসিক চিত্র ভেসে উ'ঠল। স্মরণ হ'ল সেই কিম্বদন্তীর কথা, সত্য মিথ্যা জানি না—এই লাহোরই না কি পূর্ব্বে 'লাহোরাওনা' নামে পরিচিত ছিল ও শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। লবের নাম থেকেই না কি লাহোর, আর তাঁর ভ্রাতা কুশের নাম থেকে পঞ্জাবের আর একটি প্রধান সহর 'কাশুর' নামের উৎপত্তি। তার পর এই প্রাচীন সহরের বক্ষের উপর কত বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা, কত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে—কালে কালে। কখনও কোন প্রতাপান্বিত শাসকের সুশাসনে দেশ সমৃদ্ধ হ'য়েছে, দেশে শান্তি ফিরে এসেছে, জনাকীর্ণ সহরের বুকে উঠেছে—আকাশচুম্বী অট্টালিকা, বিশাল ধর্ম্মমন্দির, সুরক্ষিত দুর্গ; আবার কখনও রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রবল ঝঞ্ঝা ব'য়ে গেছে এর ওপর দিয়ে টাইফুনের মত সমস্ত বিধ্বস্ত ক'রে, ধ্বংস করে। যাহা হউক, পর্য্যায়ক্রমে শান্তি ও অশান্তি ভোগ ক'রে অবশেষে মোগলদের হাতে আসার পরই লাহোরের অধিবাসীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। বিশেষতঃ, আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের রাজত্ব কালকেই লাহোরের শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ বলা যেতে পারে। আকবরের রাজত্বকালেই লাহোরের আয়তন ও জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধিলাভ ক'রেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকাল থেকেই লাহোরের জনসংখ্যা হ্রাস পেতে আরম্ভ হ'ল ও সঙ্গীত, স্থাপত্য প্রভৃতি যাবতীয় চারুকলার অবনতির সূত্রপাত হ'ল। তাঁর ধর্ম্মান্ধতাই শিখদের জাগরণ ও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রধানতম কারণ।

লাহোরের উপর নাদির শা, আহম্মদ শা প্রভৃতির আক্রমণ ও অত্যাচার চলেছিল তত দিন,—যত দিন না

পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ এখানে তাঁ'র প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন।

এই সব কথা চিন্তা ক'রতে ক'রতে মনটা সেই বিগত যুগের স্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। সহসা টোঙ্গা-চালকের 'বাঁচো, বাঁচো, বাঁচ যাও' চীৎকার-ধ্বনিতে চমক ভেঙে গেল। দে'খলাম, আমাদের দক্ষিণে একটি প্রাচীন বাড়ীর ফটকে কতিপয় শিখ কৃপাণ-হস্তে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রহরায় নিযুক্ত। জনকতক পুলিশ-প্রহরীও বন্দুক-হস্তে সন্নিকটে দণ্ডায়মান। বাড়ীটিতে তেমন উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব না থাকলেও প্রহরীদের দাঁড়াবার সতর্ক ভঙ্গীর অভিনবত্বই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য গাড়োয়ানকে প্রশ্ন ক'রে জানলাম, ঐটিই বিখ্যাত সহিদগঞ্জের গুরুদ্বার, যা'কে উদ্দেশ ক'রে
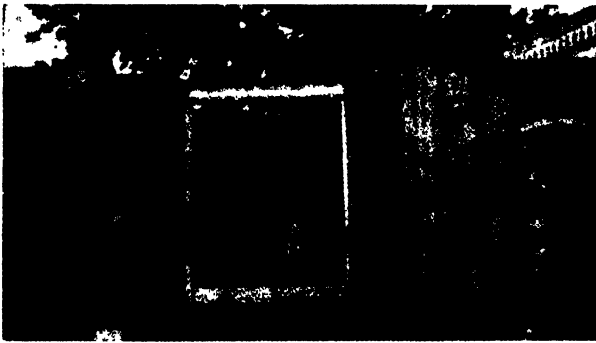
সহিদগঞ্জ গুরুদ্বার—লাহোর

নিখিল ভারতের শিখ ও মুসলমান এই সে-দিনও শক্তি-পরীক্ষায় উদ্যত হ'য়েছিল।

কলকাতা থেকে লাহোরের খুব নাম-ডাক শুনে-ছিলাম। তাই, এখন সেখানকার সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কৃত রাস্তার দিকে চেয়ে,—সত্য কথা বলতে কি, মনটা বিলক্ষণ দমে গেল। নৈশ সুষুপ্তি উপভোগের পর সহর তখন জেগে উঠছে মাত্র। দু'পাশের দোকানের ঝাঁপ খোলা আরম্ভ হ'য়েছে; পথে লোকচলাচলও ক্রমে বৃদ্ধিলাভ করছে। আমাদের সম্মুখেই দেখলাম, এক প্রকাণ্ড প্রাচীর, আর তার মধ্যভাগে পথের উপর সু-উচ্চ ফটক। সেই উন্মুক্ত ফটকের মধ্য দিয়েই সমস্ত জন ও যান যাতায়াত করছে। প্রাচীন সহরকে এই প্রাচীর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ক'রে আছে; আর তা'রই মধ্যে মধ্যে দিল্লী গেট, কাশ্মীরি গেট, আকবরী গেট, প্রভৃতি বিভিন্ন নামের তেরটি বিরাট ফটকের ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, প্রাচীন সহরের আয়তন বর্ত্তমান লাহোরের আয়তনের ন্যায় এত বিস্তৃত ছিল না। প্রাচীন সহরের রাস্তাগুলি স্বল্প-পরিসর, নোংরা; বাড়ীগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট। পথে দাঁড়ালে মনে হয়—যেন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'চ্ছে। সেকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিত্যকার ঘটনা; সেই জন্য শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ থেকে সহরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রণজিৎ সিংহের আজ্ঞায় এই নগর-প্রাচীর ও ফটক নির্ম্মিত হ'য়েছিল। সহরের সমস্ত ফটক বন্ধ ক'রে দিলে বহিঃশত্রুর পক্ষে সহরে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজ হ'ত না। প্রাচীর নির্ম্মাণের পরিকল্পনা প্রথম মাথায় আসে সম্রাট আকবরের; তিনি সে কল্পনা বাস্তবে পরিণতও করেন। তাঁর সেই প্রাচীন প্রাচীরের উপরেই রণজিৎ সিংহ পুনরায় প্রায় তিরিশ ফুট উচ্চ প্রাচীর তোলেন। ইংরেজ-রাজত্বে সেই প্রাচীরের উচ্চতা হ্রাস ক'রে বর্ত্তমান আকারে রূপান্তরিত করা হ'য়েছে; এখন এর উচ্চতা মাত্র ষোল ফুট।

প্রাচীর অতিক্রম করার কিছুক্ষণ পরে একটি প্রাচীন বাড়ীর দরজায় আমাদের গাড়ী দাঁড়াল। শুনলাম, সেইটিই স্থানীয় বাঙালী কালীবাড়ী। গাড়ী থেকে নেমে ভিতরে প্রবেশ ক'রে সম্মুখেই দেখলাম, পুরোহিত ঠাকুর দেবীর পূজায় নিযুক্ত রয়েছেন। ভৃত্য টোঙ্গা থেকে মালপত্র নামিয়ে একতলায় একটি ঘরের দরজা খুলে ভিতরে রেখে দিলে।

তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে-নিয়ে কালীবাড়ীটিকে একবার ভাল ক'রে দেখা নেওয়া গেল। প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে দেবীর মন্দিরের পশ্চাতে পুরোহিত ঠাকুর সপরিবারে বাস করেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা গেল।

আনারকলি নামক পল্লীতে অবস্থিত 'খালসা হোটেলে'র নাম এক ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাম। তা'রই সন্ধানে বা'র হচ্ছি, এমন সময় পুরোহিত ঠাকুর বললেন, সে-বেলার মত আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা কালীবাড়ীতেই হবে। এ প্রস্তাবে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

তখন সহর বেশ জেগে উঠেছে। পথের জনতা ভেদ ক'রে আমাদের গাড়ী চ'লল ছুটে। জনবহুল সঙ্কীর্ণ

রাস্তা ছাড়িয়ে ক্রমে আমরা এক প্রশস্ত রাজপথে এসে পড়লাম। ঘোড়ার গতিও হ'ল দ্রুততর। সে দিক্‌টা বেশ ফাঁকা ; আশে-পাশে এ্যাস্‌ফাল্‌টাম দেওয়া পরিচ্ছন্ন রাস্তা। হীরামণ্ডির দিকে পথের চেহারা দেখে লাহোরের বিষয়ে যে মন্দ ধারণা হ'য়েছিল, এখন ক্রমেই তার পরিবর্ত্তন হ'তে লা'গল। পথের ধারে ধারে বড় বড় দ্বিতল ত্রিতল পাকা বাড়ী ; বাড়ীর প্রাঙ্গণে ভেড়ার লোম স্তূপীকৃত রয়েছে। গৃহস্বামীরা সকলেই মুসলমান ; পশমের ব্যবসা ক'রে এরা ধনী হয়েছে। আমরা চলেছি সিটি থেকে পূর্ব্বদিকে। মাঝে মাঝে জনপূর্ণ মোটরবাস আমাদের পাশ দিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছে, অমৃতসর অভিমুখে। আমাদের বামে প'ড়ল "মাক্‌লাগেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।" আমাদের বাঙলায় যেমন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, এখানে এটিও সেই রকম। বহু দূরদেশ থেকেও অনেক ছাত্র এখানে পূর্ত্ত-বিজ্ঞান শিক্ষা করতে আসে। শু'নলাম, বাঙালী অধ্যাপক ও ছাত্র জনকতক আছেন। এখান থেকে আরও কিছু দূর যাওয়ার পর অর্থাৎ—সিটি থেকে ন্যূনাধিক চার

ম্যাক্‌লাগেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

মাইল দূরে "শালামার বাগ" পাওয়া গেল। "শালামার বাগে"র শব্দগত অর্থ,—"প্রমোদ-উদ্যান" ; এই বাগ বা উদ্যান লাহোরের একটি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। উদ্যান-রচনায় মোগলদের কৃতিত্বের পরিচয় লাভ ক'রতে হ'লে, এই বাগানটি দেখা একান্ত প্রয়োজন। এটি নির্ম্মিত হয় "সম্রাট্‌-কবি" "ভারত-ঈশ্বর সাজাহানের" ইচ্ছাক্রমে, তাঁ'র প্রসিদ্ধ স্থপতি (Engineer) আলিমর্দ্দন খাঁর দ্বারা ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে। তৎপূর্ব্বে সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে নিজ পরিকল্পনানুসারে এক "শালামার বাগ" রচনা করিয়েছিলেন। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীরের সেই বাগের অনুকরণেই লাহোরের শালামার বাগ পরিকল্পিত হয়। সাজাহান না কি স্বপ্নে এক দিন 'বেহস্ত' অর্থাৎ স্বর্গদর্শন করেন ; তা'র পরেই তাঁ'র খেয়াল হয়,—এই ধূলির ধরায় তাঁ'র স্বপ্নদৃষ্ট স্বর্গকে রূপ দান ক'রবার। সেই খেয়ালেরই পরিণতি 'শালামার'। মুসলমানদের কল্পিত স্বর্গ সাতটি স্তরে বিভক্ত। সেই কারণে শালামার বাগেও প্রথমে ক্রমোন্নত সাতটি স্তর ছিল। কিন্তু আমরা মাত্র তিনটি স্তর দে'খতে পেলাম ; অবশিষ্ট চারটি উচ্চতর স্তর না কি ধ্বংস হ'য়ে গেছে। প্রায় দু'শ' পঞ্চাশ বিঘা আয়তনের সুবিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে শত শত কৃত্রিম ফোয়ারা, জলাশয়, শ্বেতমর্ম্মর নির্ম্মিত বেদী, চাঁদনী প্রভৃতির অপূর্ব্ব শোভা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যই সম্ভব নয়। এই অনুপম আবেষ্টনের মধ্যে সাজাহান এক সময়ে বেগমদের সঙ্গে অবসর-বিনোদন করতেন। সমস্ত ভারতের মধ্যে এরূপ মনোমুগ্ধকর উদ্যান দ্বিতীয় আছে ব'লে আমার মনে হয় না। এমন অতুলনীয় সুন্দর যে শালামার, তা'র উপরও

শালামার উদ্যান—লাহোর

কিন্তু অনেক অত্যাচার হ'য়ে গেছে। আহম্মদ শা'র আমলে যথোপযুক্ত যত্নের অভাবে এর অনেক ক্ষতি হয়েছিল ; সেই সময়ে অনেক কারুকার্য্য নষ্ট হ'য়ে গেছে। পরবর্ত্তী কালে রণজিৎ সিংহ অনাদৃত বাগের অনেক সংস্কার ক'রলেন বটে, কিন্তু কোন কোন স্থান থেকে শ্বেত-মর্ম্মর তুলে নিয়ে অমৃতসর রামবাগের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন ক'রতে দ্বিধা বোধ ক'রলেন না ; আর শালামারের সেই সকল প্রস্তরের স্থানে ইঁট গেঁথে চুণকাম করা হ'ল। তা'

হ'লে বুঝুন, তৎপূর্ব্বে শালামারের কিরূপ অপরূপ শোভা ছিল।

বেলা হয়েছিল; সুতরাং আর বিলম্ব না ক'রে বাসার দিকে ফেরা গেল। আহারান্তে কিছুক্ষণ শয্যা আশ্রয়

য়ুনিভার্সিটি হল—লাহোর

করার পর আবার পথে বা'র হ'লাম। মলরোডে প'ড়ে চমৎকৃত হ'লাম আধুনিক লাহোরের অভিনব মূর্ত্তি দেখে, আর প্রাচীন লাহোরের সঙ্গে তা'র তুলনা ক'রে। সুন্দর সুপ্রশস্ত রাজপথ। যত দূর দৃষ্টি যায়, সোজা চ'লে গেছে সহরের বক্ষ ভেদ ক'রে। এ-দিকটাকে বলে "আনারকলি।" মলরোডের যে অংশ আনারকলির দিকে, তা'কে 'ওল্ড মল্' বলে। এই ওল্ড মলের উভয় পার্শ্বে আধুনিক প্রথায় নির্ম্মিত বিরাট অট্টালিকাশ্রেণী:—পঞ্জাব য়ুনিভার্সিটি,

এড্ওয়ার্ড মেডিক্যাল কলেজ—লাহোর

সিনেট হল, লাইব্রেরী, টাউন হল্, কিং এডোয়ার্ড মেডিকেল কলেজ, ও মেয়ো হাসপাতাল, য়ুনিভার্সিটি কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি, মেয়ো আর্ট স্কুল প্রভৃতি। মেয়ো আর্ট স্কুলের পার্শ্বেই লাহোর ম্যুজিয়ামের গম্বুজওয়ালা বাড়ী—যা'কে স্থানীয় লোকেরা বলে, "আজব-ঘর।" এটিকে ভারতের অন্যতম ম্যুজিয়াম বলা হয়। বহু দর্শনীয় দ্রব্য আছে এর মধ্যে। কিন্তু সে-সব দেখার আমাদের সময় হ'ল না। ম্যুজিয়ামের সম্মুখে পথের অপর পার্শ্বে য়ুনিভার্সিটি হল্। নিকটেই পথিপার্শ্বে একটি অনতি-উচ্চ পাটাতনের উপর এক বৃহৎ কামান দে'খলাম। কামানের গায়ে ইংরেজীতে লেখা,—"Zam Zamah or Bhangian-wali Top. Made at Lahore in 1761, A. D." এই কামানের ইতিহাস বেশ চিত্তাকর্ষক। আহম্মদ শা' দুরানির আজ্ঞায় প্রত্যেক হিন্দু-গৃহস্থের নিকট হ'তে একটি ক'রে পিতলের অথবা তামার পাত্র সংগ্রহ ক'রে, সেই মিশ্রধাতুর দ্বারা না কি এই কামান প্রস্তুত

"জমজমা" কামান—(বামে লেখক)

হ'য়েছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে আহম্মদ শা' এই কামান ব্যবহার করেছিলেন। সে-কালে এত বড় কামান না কি আর ছিল না। "জমজমা" কথাটির অর্থ "হাতুড়ি!" আহম্মদ শা' এই কামানটির বিষয়ে এত উচ্চ ধারণা পোষণ ক'রতেন যে, তাঁর বিশ্বাস ছিল, জমজমা নিয়ে আক্রমণ ক'রলে মানব ত' তুচ্ছ, দেবসৈন্য-দেরও পরাজয় সুনিশ্চিত। পাণিপথ যুদ্ধের পর এই কামান বহু বার হস্তান্তরিত হয়। অবশেষে মহারাজা রণজিৎ সিংহের নিকট হ'তে অমৃতসরের বুঙ্গীদের হস্তগত হয়। সেই জন্যই এর অপর নাম "বুঙ্গীওয়ালী তোপ।" এই তোপ পুনরায় লাহোরে আনীত হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। তদবধি এ'টি এখানেই রাজপথের উপর জনসাধারণের দর্শনীয় বস্তু হিসাবে বিরাজ ক'রছে।

"জমজমা"র অনতিদূরে একটি পার্ক; তা'র মধ্যে

লালা লাজপত রায়ের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি শোভা পাচ্ছে।

ম্যুজিয়ামের নিকটেই "টলিংটন মার্কেট" নামক মিউনিসিপ্যালিটির বাজার। লাহোরের এক জন ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনারের নাম থেকেই এর নামকরণ হ'য়েছে। বাজারটির উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব কিছু বুঝলাম না। শুনলাম, পূর্ব্বে যাদুঘর এখানেই ছিল; পরে বহু অর্থব্যয়ে যাদুঘরের জন্য নূতন সৌধ নির্ম্মিত হ'লে, উহা স্থানান্তরিত হ'য়েছে। তদবধি এই পরিত্যক্ত স্থানটিতে বাজার ব'সছে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক, পঞ্জাব ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, গ্রিণ্ডলে ব্যাঙ্ক, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি অধিকাংশ ব্যাঙ্কই মল্-রোডের উপর। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সম্মুখেই জেনারেল পোষ্ট আফিস। ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিসও রয়েছে অনেক, আমাদের হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সের বাড়ীও র'য়েছে দে'খলাম। লাহোর চীফ্-কোর্টের বিশাল ভবনটিও এই রাস্তার উপর। ৺প্রতুলকুমার চট্টোপাধ্যায় এই চীফ্-কোর্টেই বহু বৎসর অতি কৃতিত্বের সহিত জজিয়তী ক'রে প্রবাসে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন। চ্যাটার্জ্জি রোডের সঙ্গে তাই তাঁ'র স্মৃতি জড়িত র'য়েছে।

লাহোর ম্যুজিয়ম

মলে বেড়াতে বেড়াতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি,—পঞ্জাবী তরুণীদের স্বাধীনভাবে স্বচ্ছন্দ পথ-বিহার। তাঁদের আচরণে না আছে অস্বাভাবিক লজ্জার অশোভন আড়ষ্টতা, না আছে উদগ্র স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে চরম বেহায়াপানা। বেশ শিষ্ট, শোভন, স্বাভাবিক আচরণ। অধিকাংশ মেয়েই স্বাস্থ্যবতী; বাঙ্গালী মেয়েদের মত নিতান্ত "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা" নয়। একাধিক তরুণীকে সাইকেলে যেতে দে'খলাম; অথচ তা'র জন্য পথচারী পুরুষরাও কৌতুক বোধ ক'রে সহসা দাঁড়ায় না। আমাদের বাঙলা দেশে ঠিক্ এ-রকমটা হ'তে এখনও বোধ করি কিছু বিলম্ব আছে।

মল্ রোডেরই এক পার্শ্বে দে'খলাম, স্যার জন্ লরেন্সের সেই কুখ্যাত প্রস্তরমূর্ত্তি,—এক হাতে তাঁ'র অসি, আর এক হাতে লেখনী; তেজোদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। এক সময়ে এই মূর্ত্তিটাকে কেন্দ্র ক'রেই শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা হ'য়েছিল,—সে-কথা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ আছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিমন্দির পেলাম মল্ রোডের উপর। মন্দিরের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার প্রস্তর মূর্ত্তি। এই স্মৃতিমন্দিরের অদূরে নবনির্ম্মিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার বিরাট সৌধ।
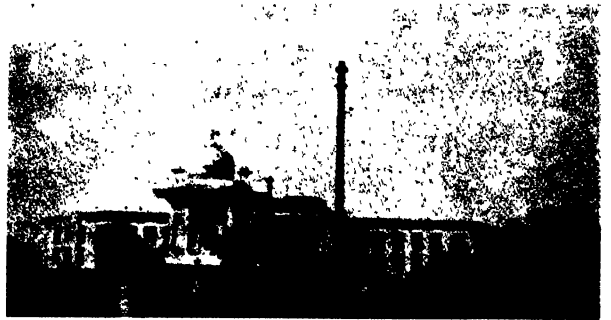
ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দির—পশ্চাতে পঞ্জাব প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নবনির্ম্মিত অট্টালিকা

লরেন্স গার্ডেন আমাদের দক্ষিণে প'ড়ল। এই বাগানটির মধ্যে দে'খলাম একটি পশুশালা র'য়েছে। আমাদের ক'লকাতার চিড়িয়াখানার মত তত বড় নয়। চিড়িয়াখানার নিকটে বোটানিক্যাল গার্ডেন; এটিও ছোট। কিন্তু লরেন্স গার্ডেনের মত এরূপ সুবিস্তৃত, সুপরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত উদ্যান ক'লকাতায় একটিও নেই, এ-কথা স্বীকার ক'রতেই হবে। প্রায় সাড়ে তিন শত

বিঘা আয়তনের এই উদ্যানটির মধ্যে মধ্যে কোথাও তৃণাচ্ছাদিত ভূমি, কোথাও নানাবর্ণের ফুলের কেয়ারি, কোথাও কোন ক্লাবের ক্রীড়াক্ষেত্র—দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল। এক স্থানে একটি বৃহৎ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করা হ'য়েছে। স্তূপটির সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ প্রস্ফুট কুসুমের প্রাচুর্য্যে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করেছে। পুষ্পবীথিকার মধ্য দিয়ে স্তূপের গা-বেয়ে ঘুরে ঘুরে উঠেছে পথ; তার মাঝে মাঝে বেঞ্চে ব'সে মনোরম আবেষ্টনের মধ্যে বহু নরনারী বিশ্রাম ক'রছেন। লরেন্স গার্ডেনের মধ্যে লরেন্স হল্, ও মণ্টগোমারী হল নামে দু'টি বড় য়ুরোপীয় ক্লাবও আছে। পঞ্জাবের প্রথম ও দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর স্যার হেন্‌রি লরেন্স, কে, সি, বি ও সার রবার্ট মণ্টগোমারী কে, সি, বি, জে, সি, এস্, আই-র স্মৃতির উদ্দেশে ক্লাবের প্রাসাদোপম বাড়ী দু'টি নির্ম্মিত হ'য়েছিল ও তাঁদের দু'জনের নামেই নামকরণও হ'য়েছিল।

লরেন্স গার্ডেনের উত্তরে মলের বিপরীত পার্শ্বে গভর্মেণ্ট হাউস্। যে সুবিস্তীর্ণ ভূমির উপর বর্ত্তমান গভর্মেণ্ট হাউস অবস্থিত, পূর্ব্বে ওখানে একটি সমাধিক্ষেত্র ছিল। এখনও "কুস্তিওয়ালা গম্বুজ" নামে মহম্মদ কাশেম খাঁর একটি সমাধি-মন্দির রয়েছে—গভর্মেণ্ট হাউসের সন্নিকটে। কাশেম খাঁ ছিলেন সম্রাট আকবরের এক জ্ঞাতি-ভাই। তিনি খ্যাতনামা কুস্তিগীরদের উৎসাহ-দাতা ও বন্ধু ছিলেন। সেই জন্যই তাঁর সমাধি-মন্দিরের নামকরণে এই বৈচিত্র্য।

মলরোড এদিকে প্রশস্ততর হ'য়েছে। ওল্ড মল্ আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি। এ-দিক্‌টাকে বলে আপার মল্। বড় বড় য়ুরোপীয় দোকান এই অঞ্চলে।

এচিসন্‌স কলেজটিও (Aitchison's College) এই মলের ধারে। এ কলেজ আমাদের মতন সাধারণ লোকদের জন্যে নয়; দেশীয় নৃপতিদের পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়-স্বজনরাই কেবল এ কলেজে পড়তে পায়,—নিজেদের আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রেখে।

এর মধ্যে না কি নানা রকম খেলার ব্যবস্থা, স্নান ও সাঁতারের জন্য প্রকাণ্ড দীঘি প্রভৃতি আছে। আর আছে, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র উপাসনা-গৃহ।

এচিসন্‌স কলেজের অদূরেই একটি খাল (Bari Doab canal); এই খাল লাহোরকে বহু বিষয়ে সমৃদ্ধ ক'রেছে। শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের অসুবিধার জন্য পূর্ব্বে পঞ্জাবে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হ'ত। সেই জন্য রাভী নদী থেকে এই খালটি কেটে লাহোর, অমৃতসর ও গুরুদাসপুরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। বলা বাহুল্য, এই সব অঞ্চলে এই কারণে চাষ-আবাদের অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হ'য়েছে।

কিন্তু আর নয়। চরণযুগল কাতরভাবে বিশ্রামের

সাহাদারার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য
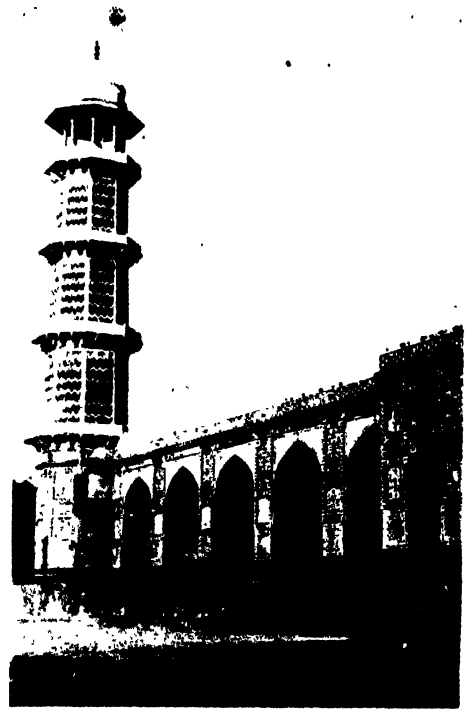
প্রার্থনা জানাচ্ছিল। সুতরাং, একটি টোঙ্গা ভাড়া ক'রে এবার চ্যাটার্জ্জি রোড অভিমুখে ফিরে চ'ললাম।

সারাদিন পথ-বিহার, ও তার পর গুরু আহারের পর শয্যাগ্রহণ ক'রতেই নিদ্রাকর্ষণ। রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল, জা'নতেও পা'রলাম না।

পরদিন নিদ্রাভঙ্গের পর প্রাতঃকৃত্য ও প্রাতরাশ সেরে নিতেই, বাড়ীর টোঙ্গা প্রস্তুত হ'ল; প্রশস্ত রাজপথে এসে গাড়ী ছুটে চ'লল সাহাদারার দিকে। লাহোর সহর থেকে সাহাদারা প্রায় তিন মাইল; রাভি নদীর

পরপারে। নদীর উপর একটি লৌহ-সেতু আছে। আমাদের গাড়ী সেই সেতুর উপর আসিতেই, নীল আকাশের পট-ভূমিতে যেন ফুটে উ'ঠল সাহাদারার চারটি মিনার। যেন পটে-আঁকা একখানি অপরূপ ছবি! নদী পার হ'য়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহাদারার প্রধান তোরণের সম্মুখে

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি-সৌধ

গিয়ে টোঙ্গা থেকে নামলাম। এরই নাম সাহাদারাবাগ একে দিলখুশাবাগও বলে। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর শেষ-নিশ্বাস ফেলেন কাশ্মীরের অন্তর্গত রাজাউরি নামক স্থানে; তাঁ'র অন্তিম ইচ্ছা ছিল—মৃত্যুর পর তাঁ'র শবদেহ যেন লাহোরে সমাহিত করা হয়। সেই ইচ্ছানুসারেই তাঁ'কে এই স্থানে সমাধিস্থ করা হ'য়েছিল। এই অপূর্ব্ব সমাধিসৌধটি নির্ম্মিত হ'য়েছিল তাঁ'র মহিষী সাম্রাজ্ঞী নূর-জাহানের উদ্যোগে। প্রধান তোরণ পার হ'য়ে আমরা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ ক'রলাম। সুবিস্তৃত উদ্যান; তা'র মধ্যে গাছে গাছে নানাবর্ণের ফুলের মেলা। দীর্ঘ-প্রসারিত উদ্যান-বীথিকার সমান্তরালে লহর, তা'র মধ্যে ফোয়ারার সারি। উদ্যানের মধ্যে লালবর্ণের প্রস্তরনির্ম্মিত স্মৃতি-মন্দির। মন্দিরের চতুষ্কোণে চারটি কারুকার্য্যখচিত সমুচ্চ মিনার—যা' রাভীর উপর থেকে আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'য়েছিল। গৃহ-চত্বরে বিবিধ বর্ণের প্রস্তরের নক্সার কাজ দেখা গেল। গৃহরক্ষক সযত্নে আমাদের সম্রাটের সমাধি দেখিয়ে দিলে। মর্ম্মর-নির্ম্মিত সমাধির উপর ফারসী অক্ষরে কি সব লেখা, কিছুই বুঝলাম না; তবে সেই লোকটি উৎসাহভরে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করলে বটে। তা'র মধ্যে একটি কথার তাৎপর্য্য এই যে, স্মৃতিসৌধের চারটি মিনারের মধ্যে যে কোনটির উপর থেকে দেখলে লাহোরের বাদশাহী মস্-জিদের চারটি মিনারের মধ্যে তিনটি মাত্র দৃষ্টিপথে প'ড়বে, ও পক্ষান্তরে বাদশাহী মস্‌জিদের মিনার থেকেও সাহা-দারার তিনটি মিনারের অধিক দৃষ্টিগোচর হবে না। সমাধি-দর্শন শেষ হ'লে সমাধি-গৃহ থেকে বা'র হ'য়ে সৌধের ছাদে উ'ঠলাম। ছাদটি মর্ম্মরমণ্ডিত। ছাদের মধ্যস্থলে পূর্ব্বে না কি একটি গম্বুজ ছিল; কিন্তু আওরঙ্গজেবের খেয়ালে সেটিকে স্থানচ্যুত করা হ'য়েছে। মহারাজা রণজিৎ সিংহ এখান থেকে অনেক মর্ম্মর খুলে-নিয়ে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের শোভা বৃদ্ধি ক'রেছিলেন। মিনা-রের উপর উঠে, সেখান থেকে লাহোরের দৃশ্য সত্যই উপভোগ্য। সমাধি-গৃহের রক্ষকের বাক্যের সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশে আমরা পর্য্যায়ক্রমে চারটি মিনারেই আরোহণ ক'রলাম; কিন্তু সত্যই, আশ্চর্য্য! বাদশাহী

নূরজাহানের সমাধিগৃহ—লাহোর

মস্‌জিদের চূড়া তিনটির অধিক কিছুতেই দেখতে পেলাম না।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি-সৌধ দেখা হ'ল। এবার চ'ললাম তাঁ'র মহিষী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নূরজাহানের সমাধি দেখতে। এটি সাহাদারার অদূরেই অবস্থিত। দেখে

দুঃখে ও বিস্ময়ে অভিভূত হ'লাম। এই কি ভারতেশ্বরী নুরজাহানের উপযুক্ত সমাধি! অপরিসর পতিত জমির মধ্যে একটি অতি সাধারণ, জীর্ণ শ্রীহীন গৃহ—যা' সম্রাটের বাঁদীরও উপযুক্ত নয়! নুরজাহানের সমাধির পার্শ্বে আর একটি সমাধি দে'খলাম; সেটি না কি তাঁ'র কন্যা লাড্‌লি বেগমের সমাধি।

সমাধি-দর্শন-পর্ব্ব শেষ হ'লে আবার লৌহ-সেতুর উপর দিয়ে রাভী অতিক্রম ক'রে গৃহাভিমুখে ছু'টল টোঙ্গা। এ-বেলা আর নয়। আহারাদির পর, একটু বিশ্রাম করা প্রয়োজন বোধ হ'ল।

সূর্য্য পশ্চিম-গগনে যেই হেলে প'ড়ল, আমরাও বা'র হ'লাম। ম্যুজিয়মের অদূরবর্ত্তী আনারকলির উদ্যানের মধ্যে দে'খলাম আনারকলির সমাধি। আনারকলির ইতিহাস শুনে মনটা ব্যথায় টন্‌টন্ ক'রে উ'ঠল। সম্রাট আকবরের প্রাসাদে সে ছিল এক 'ইরাণী বাঁদী; বাঁদী বটে, কিন্তু রূপ ছিল তা'র রাণীর উপযুক্ত। যুবরাজ সেলিম প'ড়লেন সেই সুন্দরী বাঁদীর প্রেমে। কিন্তু সে গোপন প্রেম আকবরের অগোচর রহিল না। তাঁ'র আভিজাত্যে লাগল আঘাত। নিজের প্রিয় সন্তানকে আর কি ব'লবেন? হুকুম হ'ল, আনারকলিকে জীবন্ত কবর দেওয়ার। বলা বাহুল্য, সেই অভিশপ্তা বাঁদীর কোন সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য আকবরের বিন্দুমাত্র গরজ ছিল না। এটি নির্ম্মিত হয়, সম্রাট জাহাঙ্গীরেরই উদ্যোগে,—তাঁর সিংহাসনা-রোহণের পর। সমাধির উপর ফারসী অক্ষরে যা' লেখা র'য়েছে, শুনলাম, তা'র বাঙ্‌লা অর্থ,—"একটি বার, যদি একটিবার মাত্রও—আমার সেই প্রিয়তমার মুখখানি দে'খতে পেতাম, তা'হলে ইহকালে ও পরকালে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে খোদাকে ধন্যবাদ জানাতাম।"—তা'র নীচে আছে, "আকবরপুত্র প্রণয়মুগ্ধ সেলিম।"

আনারকলির সমাধি-সৌধের দক্ষিণে অনতিদূরে "চৌবুরুজী ফটক।" পূর্ব্বে এ'টি ছিল চমৎকার একটি উদ্যানের ফটক—যে উদ্যানের অস্তিত্ব বহু দিন পূর্ব্বেই লুপ্ত হ'য়েছে। আওরঙ্গজেব-দুহিতা জেব-উন্নিসার সখের জন্য উদ্যানটি নির্ম্মিত হ'য়েছিল; কিন্তু পরে তিনি এ উদ্যান মিয়ানবাঈ নাম্নী তাঁর প্রিয় পরিচারিকাকে দান ক'রে, নওয়ানকোটে আর একটি সুদৃশ্য বাগান নির্ম্মাণ করিয়ে-ছিলেন।

আনারকলির বাজারই লাহোরের মধ্যে বৃহত্তম বাজার। এ অঞ্চলে লাহোর যে কত বড় ব্যবসায়-কেন্দ্র, তা' আনারকলির বাজার দে'খলে বোঝা যায়। দোকানগুলি বিবিধ পণ্যে পূর্ণ। তা'র মধ্যে বিশেষ ক'রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল,—নানা রকম উৎকৃষ্ট শাল, সূক্ষ্ম পশমিনার গাত্রাবরণ, রেশমী বস্ত্র, কাচের, পাথরের এবং এনামেলের বিবিধ দ্রব্য, আর কারুকার্য্যখচিত কাঠের আস্‌বাবপত্র। এখানকার জরীর কাজও খুব ভাল। আনারকলিতে পঞ্জাবী-পরিচালিত বৃহৎ বৃহৎ দোকান দেখে, আর বাঙলাদেশে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙালীর আগ্রহের অভাবের কথা স্মরণ ক'রে—পরশ্রী-কাতরতায় নয়, নিজেদের অক্ষমতায় ও দৈন্যে—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

বেশ মৃদুমন্দ স্নিগ্ধ বাতাস বইছিল। বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না। ঘু'রতে ঘু'রতে গিয়ে পড়লাম ম্যাক্‌লিয়ড্ রোডে; এ্যাস্‌ফালটাম্ দেওয়া দিব্য প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন আলোকিত রাস্তা;—ক'লকাতার চৌরঙ্গীও বোধ করি পরাজয় মানে। লাহোরের বড় বড় সিনেমাগৃহ অধিকাংশই এই রাস্তার উপর।

বাড়ী ফিরলাম তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। পরদিন সকালে অমৃতসর যাওয়া স্থির। সুতরাং আহারাদি সেরে-নিয়ে একটু তাড়াতাড়ি নিদ্রার ব্যবস্থা করা গেল।

অমৃতসর থেকে ফিরলাম সেই দিনই। লাহোরের অবশিষ্ট দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে-নিয়ে পরদিনই পেশোয়ার অভিমুখ হইতে রওনা হ'তে হবে।

সুতরাং সকালে উঠে প্রাতরাশ সেরে নিয়েই তিন মূর্ত্তিতে চ'ললাম লাহোর-ফোর্ট দেখতে। ফোর্টের প্রবেশ-পথের সন্নিকটে একটি আফিসে এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁর কাছে,—যত দূর স্মরণ হচ্ছে,—মাথা-পিছু দু'আনা হিসাবে দর্শনী দিয়ে প্রবেশ-পত্র নেওয়া হ'ল। আমাদের সঙ্গে চ'লল এক জন গাইড্। তা'র কাছেই শু'নলাম, এই ফোর্টটি বহু প্রাচীন। অবশ্য আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান ও পরে শিখদের দ্বারা এটি

সংস্কৃত হ'য়েছে বহুবার। পূর্ব্বে এই ফোর্টের পরিবেষ্টক যে গড়খাই ছিল, তা' জলে পূর্ণ করা থাকত। ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধীর কাছে আদর লাভের উপযুক্ত অনেক ভগ্ন ও ভগ্নোন্মুখ বাড়ী-ঘর আছে ফোর্টের মধ্যে। তা'দের প্রত্যেকটির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রলে

শিবমহলের অভ্যন্তর

একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হ'তে পারে। সুতরাং আমি ওদের মধ্য হ'তে নির্ব্বাচিত মাত্র গুটিকতক অট্টালিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ্‌ছি।

শিষমহল—কতকগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত কক্ষের সমষ্টি; তন্মধ্যে কোন কোন কক্ষের দেওয়াল ছোট ছোট অনেক

শিবমহলের বহির্দৃশ্য

আয়না-সংলগ্ন। গৃহের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বা'ললে, সেই সব আয়নায় প্রদীপালোকের শত শত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হ'য়ে, যেন এক অপূর্ব্ব মায়ালোকের সৃষ্টি করে। সম্মুখে অনুরূপ দালানও আছে একটি। দেওয়াল-গাত্রে নানা রকম ছবি অঙ্কিত আছে; যাঁরা আগ্রা, দিল্লী, অথবা জয়পুরের ফোর্টে শিষমহল দেখেছেন, তাঁ'রা বুঝতে পা'রবেন। শিষমহলের সংলগ্ন সুপরিসর দরবার-গৃহ। এই কক্ষে ব'সেই দলিপ সিংহ দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর ইংরেজদের হাতে পঞ্জাবের রাজ্যভার অর্পণ ক'রেছিলেন। দরবার-গৃহে অনেকগুলি স্তম্ভ আছে। একটি স্তম্ভের উপর প্রস্তরফলকে লেখা আছে, "Scene of the transfer of the sovereignty of the Punjab to the British Government, 1849."

নৌলাখা—শিষমহলের সংলগ্ন একটি কক্ষ। এক কালে এই কক্ষটিতে নানা মূল্যবান্ রঙীন প্রস্তরের সাহায্যে নিপুণ শিল্পীরা যে-সব ফুল ফুটিয়ে তু'লেছিলেন, তা'দের দে'খলে অকৃত্রিম ফুল্ল কুসুম ব'লেই ভ্রম হ'ত। এখন কিন্তু সে-সকলই কালের কবলে কবলিত হ'য়েছে। এই কক্ষটি নির্ম্মাণ ক'রতে ন'লাখ টাকা ব্যয়িত হ'য়েছিল, তাই বুঝি এর নাম "নৌলাখা।"

মতি মস্‌জিদ প্রথম নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন সম্রাট্ জাহাঙ্গীর। অবশেষে কেল্লা যখন শিখদের হস্তগত হ'ল,

লাহোর ফোর্টের মধ্যে "নৌলাখা" কক্ষ

তখন তাঁ'রা এই মস্‌জিদটিকে অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহার ক'রতে লা'গলেন। পরে লর্ড কার্জ্জনের আদেশে এটিকে পুনরায় প্রাচীন মসজিদ্ হিসাবেই রক্ষা করা হ'য়েছে।

এ-সব ভিন্নও দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, বারদুয়ারী প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য।

একটি স্বতন্ত্র গৃহে বিবিধ প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র সজ্জিত ক'রে রাখা হ'য়েছে। গৃহরক্ষক সেগুলি আমাদের সযত্নে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলে। প্রাচীন কাল হ'তে অদ্যাবধি অস্ত্রশস্ত্রের ক্রমোন্নতির ধারাটি বেশ চিত্তাকর্ষক। লাহোর-ফোর্টে

গিয়ে এগুলি না দেখে ফিরে এলে, পরে অনুতাপ ক'রতে হ'ত।

দুর্গ হ'তে বা'র হ'তেই সম্মুখে প'ড়ল "হজুরিবাগ" নামক উদ্যান; মাহারাজা রণজিৎ সিংহ এ'টি নির্ম্মাণ
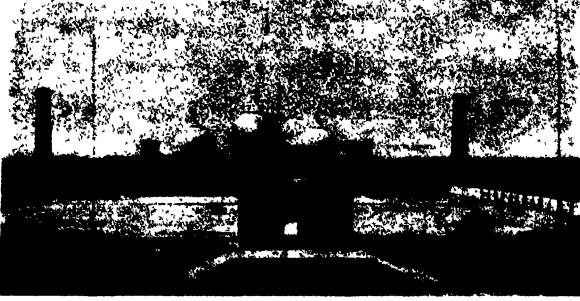
বাদশাহী (জুম্মা) মসজিদ্—লাহোর

ক'রেছিলেন। উদ্যানের মধ্যে মার্ব্বেলে প্রস্তুত "বার-দুয়ারি"; বারদুয়ারির পশ্চাতে, দুর্গের বিপরীত দিকে বাদশাহী মসজিদ। প্রকাণ্ড মস্‌জিদ্; লাহোরের মধ্যে নাকি বৃহত্তম। মস্‌জিদের তিনটি বৃহৎ গম্বুজ কেবল শ্বেত পাথরে নির্ম্মিত, আর-সব লাল পাথরে প্রস্তুত। আওরঙ্গ-জেবের আদেশে ফিদা খাঁ কোকা কর্ত্তৃক এ'টি নির্ম্মিত হ'য়েছিল ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে। বাদশাহী মস্‌জিদের অপর নাম জুম্মা মস্‌জিদ। সংবাদপত্র - পাঠ-কেরা বোধ হয় অবগত আছেন যে, এই মস্‌জিদটির সংস্কারের জন্য পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট অনেক চেষ্টা ক'রেছেন। মস্‌জিদের লাল পাথরের মিনার চারটির মাথায় গম্বুজ নেই; সেই জন্য কেমন যেন অঙ্গহীন ব'লে মনে হচ্ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মিনারগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিল; তার পর হ'তে সাধারণের নিরাপত্তার জন্য গম্বুজগুলি নামিয়ে রাখা হ'য়েছে। শিখদের রাজত্বকালে এই মস্‌জিদ বারুদখানারূপে ব্যবহৃত হ'ত। পরে পঞ্জাব ইংরেজদের হস্তগত হ'লে, তাঁরা ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এটি মুসলমানদের প্রত্যর্পণ করেন।

বাদশাহী মস্‌জিদ দেখা শেষ ক'রে আমরা হুজুরীবাগ-সংলগ্ন মহারাজা রণজিৎসিংহের সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ ক'রলাম। মন্দিরের সম্মুখ-দ্বারদেশে ও অভ্যন্তরে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখে বিস্মিত হ'তে হ'ল। গম্বুজের নীচে শিষমহলের মত ছোট ছোট বহু আয়নার কাচ বিন্যস্ত র'য়েছে। সমাধি-সৌধের ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রস্তরবেদী। সেই বেদীর ওপর প্রস্তরক্ষোদিত একটি বৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম। এই পদ্মের নীচেই রণজিৎ সিংহের ভস্ম সমাহিত আছে। মহারাজার সঙ্গে তাঁ'র চার রাণী ও সাতটি উপপত্নীও সহমৃতা হ'য়েছিলেন; তাঁ'দের চিতা ভস্মও এই বৃহৎ পদ্মের চারিধারে সমাহিত করা হ'য়েছিল। সেই সব সমাধির উপর এগারটি প্রস্তর-ক্ষোদিত ক্ষুদ্রতর পদ্ম র'য়েছে
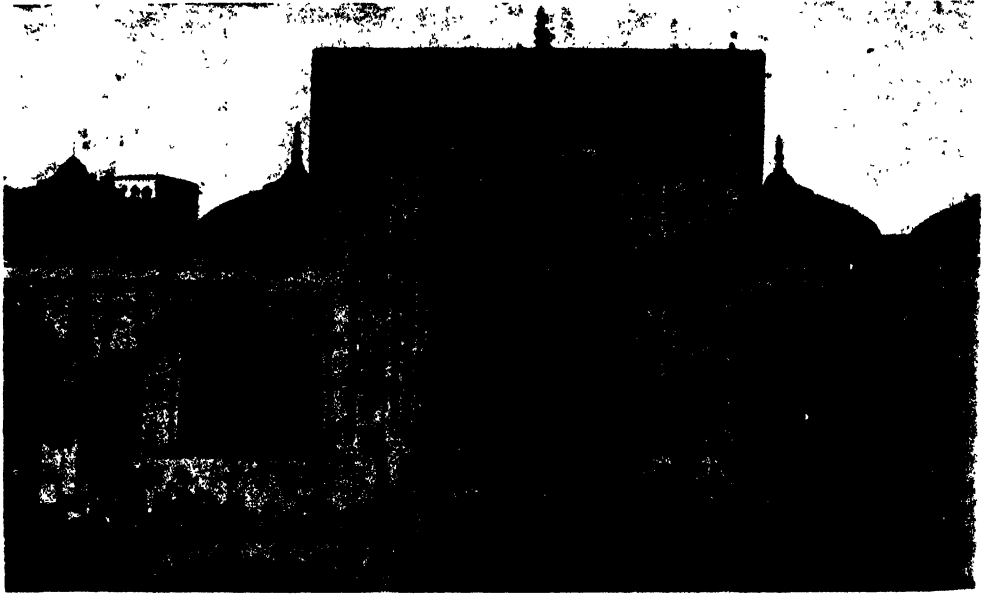
ওয়াজির খাঁর মস্‌জিদ

দেখলাম। বলা বাহুল্য, শিখরা এই সমাধি-ভবনটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন। রণজিৎ সিংহের
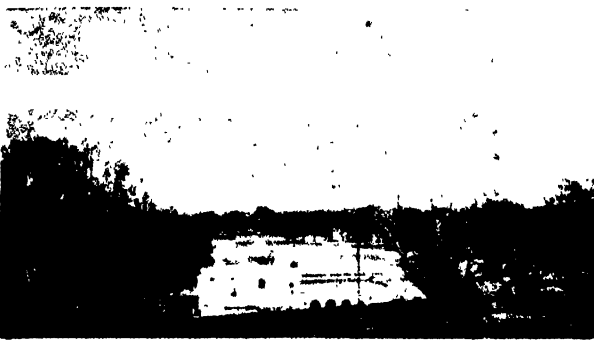
অর্জ্জুনসিংহের সমাধি-মন্দির
(লাহোর ফোর্টের উপর হইতে গৃহীত চিত্র)

সমাধির দক্ষিণেই চতুর্থ শিখগুরু অর্জ্জুন সিংহের সমাধি। জাহাঙ্গীরের সিংহাসন-প্রাপ্তির পরই বিদ্রোহী যুবরাজ খসরু লাহোরের দুর্গ অবরোধ করেন। সেই বিদ্রোহে অর্জ্জুন সিংহ সাহায্য ক'রেছিলেন। সেই জন্য সম্রাট্ কেবল বিদ্রোহী যুবরাজকে দমন ক'রেই ক্ষান্ত হ'লেন না, তাঁকে বিদ্রোহে যা'রা সাহায্য ক'রেছিল, তা'দেরও অতি নির্দ্দয়-ভাবে হত্যা ক'রলেন। অর্জ্জুন সিংহের কারাগারেই মৃত্যু হ'ল; কিন্তু শিখদের বিশ্বাস, তাঁ'র মৃত্যু হয়-নি, তিনি অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে রাভীর গর্ভে অন্তর্হিত হ'য়েছিলেন।

সব শেষে ওয়াজির খাঁর মস্‌জিদ দে'খতে চ'ললাম। যেখানে এ মস্‌জিদটি অবস্থিত, তার নাম কাশ্মীরি-বাজার। ওয়াজির খাঁর মস্‌জিদটিও নিতান্ত ছোট নয়। মস্‌জিদগাত্রে বিবিধ বর্ণের মিনার ছবি; তা'র মধ্যে মধ্যে কোরাণের বয়েৎ লেখা। সাজাহানের এক জন স্থানীয় মন্ত্রী, ওয়াজির খাঁ এটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে।

লাহোরের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি দেখা মোটামুটি শেষ হ'ল।

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়।

আগমনী

আজি, বনভবনের ঘন পবনেরে নবীন অতিথি ছুঁয়েছে!
তাই, শ্রাবণের কালো ধুয়ে মিঠা আলো আকাশে শরৎ থ'য়েছে।
স্তব্ধ গগনে সঘন মাদল,
বিদায় লয়েছে ব্যাকুল বাদল,
দিক্‌বালা চোখে সজল কাজল সোণালী আলোয় ধুয়েছে!
দেখ, স্থলকমলের সুকুমার শাখা কুসুমের ভারে নুয়েছে।

আজ কেয়ার গন্ধ ফুরায়েছে, তাই, এল কি শিউলী-সুরভি?
শোনো, আলোক-বীণায় পূরিয়া উঠেছে ভৈরবী টোড়ী পূরবী!
উজ্জ্বল মিঠা অলস দুপুরে
নীল নভোরঙ্গে আঁখি ওঠে পুরে,
উদাস চিলের সকরুণ সুরে রৌদ্রে ফুটিল করবী।
অই মৃণালে কোরক খুলিল নলিনী, তুলিল কুমুদ গরবী।

দূরে, অস্তগগনে গোধূলিলগনে সিঁদুরের হোলি ফুটেছে!
মরি, শত বরণের বরণোচ্ছ্বাস আকাশ প্লাবিয়া ছুটেছে।
পলকে পলকে লাল, নীল, সোণা,
রূপ পালটিয়া করে আনাগোনা,
কিশোরী সন্ধ্যা সোণাজরী-বোনা আঁচলায় সেজে উঠেছে!
আজ বাতাবীর বনে মৌমাছি সনে ছেলে-বুড়ো সব জুটেছে!

দেখ, বিরহিণী বধূ ম্লান আঁখি দু'টি আশায় উজলি তুলিলো,
সারা বরষের ব্যথা প্রিয় আগমনে এক নিমিষেই ভুলিলো।
আকাশের নীলে শরৎ-লক্ষ্মী
মেলেছে স্বপন-জড়িত অক্ষি,
কাননে বিহগ ভ্রমর মক্ষি মহা উৎসব খুলেছে!
আজ সারা ধরণীর হৃদয় যেন গো আপনি পুলকে দুলেছে।

ওঠে ভিখারী-কণ্ঠে গ্রাম্য সরল আগমনী সুর মিষ্টি!
পশি শ্রবণ-কুহরে মনোমন্দিরে করিছে অমৃত সৃষ্টি!
ধান্যের ক্ষেতে কমলার হাসি,
কৃষাণের গান রাখালের বাঁশী,
বন-অঙ্গনে ফলফুলরাশি করে আনন্দ বৃষ্টি!
ওগো, আজি চণ্ডীর মণ্ডপতলে ধাইছে সবার দৃষ্টি।

শ্রীরাধারাণী দেবী।

হৈমবতী

সেদিন মহাষ্টমী তিথি। চাটুয্যেদের বড়-গিন্নী নীরদা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'কুমারী মেয়েটি এলো সারদা ?'

সারদা এই চাটুয্যে-পরিবারেই পালিতা এবং তাহাদের দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়া। হোমের বেলপাতা বাছিতে বাছিতে সে মুখ তুলিয়া কহিল,—'না বৌদি, এখনও তার দেখা নেই ভাই !'

বড়-গিন্নী বিরক্ত হইলেন। শরতের উজ্জ্বল আকাশে ভাসমান একখণ্ড অভ্র-শুভ্র মেঘের ঈষৎ ছায়াপাত হইল। তিনি নীরস স্বরে কহিলেন, 'আশ্চর্য্য বাপু! এ-দিকে সবাই এসে বলবে,—আমার মেয়েটিকে কুমারী কর; আর ঠিক পূজোর সময়টিতে দেখা নেই!'

মেজ-গিন্নী অমলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারীপূজার বহু উপচারে তাঁহার হাত দু'খানি পূর্ণ; গন্ধ-দ্রব্য, নববস্ত্র, পুষ্পমাল্য ইত্যাদি। বড়-জা'কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'তোমার কুমারীপূজো সারা হ'ল বড়-দি!'

মুখখানা বাঁকাইয়া নীরদা কহিলেন, 'সব হয়েছে! নীলুর মা'র কি পাত্তা আছে ?'

সারদা করবী ফুলগুলা তাম্র-পুষ্পপাত্রে গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিল,—'দরোয়ানকে একবার পাঠালে না কেন বউদি—নীলুর মা'র বাড়ী ?'

নীরদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'আমার গরজ! বছর-বছর পূজো করি জানে না সে ? এসে বড্ড নাছোড় হ'য়ে ধরে, তাই তার হাত এড়াতে পারি-নে; তা নৈলে দেশে কুমারীর ভারী অভাব কি না!'

হাসির সুরে অমলা কহিলেন,—'বলে আমাদের বাড়ী কুমারী-পূজো পেলে সব বর্ত্তে যায়। তা তুমি যদি বলো বড়-দি, তা' হ'লে আমি নন্দ পণ্ডিতের ওখান থেকে হারাণীকে ডাকতে পাঠাই!'

সারদা কহিল, 'কিন্তু নীলুর মা'র মেয়ে?' কথাটা সমাপ্ত হইতে পাইল না, বড়-গিন্নী কহিলেন, 'তুমি থাম সারদা, বেলার দিকে চেয়ে দেখচো ? আমি নিশ্চয় বলচি, সে আর পাঁচ বাড়ীতে এখন মেয়ে নিয়ে ঘুরচে! আর দেরী করা যায় না; মেজ বৌ, তুই হারাণীকেই ডেকে পাঠা।'

প্রিভি কাউন্সিলের রায়; তার আর আপীল নাই। তৎক্ষণাৎ মেজ-গিন্নী ডাকিয়া কহিলেন, 'রামুর মা, যা তো, নন্দর বউকে বলগে, আমাদের মেজ-মা বল্লেন, হারাণীকে পাঠিয়ে দিতে, কুমারীপূজো করবে।'

রামুর মা অমলার ঝি। কহিল, 'কিসে আনবো মেজ-মা! মোটর নিয়ে যাব কি ? ড্রাইভার বাবুকে—'

অমলা কহিলেন, 'জ্বালালে বাপু! সব তাতেই তোর সদ্দারী! একখানা রিকসা ভাড়া ক'রে নিয়ে আসবি। শ্যামবাজার ত আর দশ ক্রোশ দূরে নয়।'

রামুর মা'র বড়ই ইচ্ছা মোটরে চাপিয়া সে কুমারী আনিতে যায়; কিন্তু তাড়া খাইয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, 'তা কেন পারব না—তবে ঘরের মোটর থাকতে—'

প্রণতি, দেবীর চামরটা নাড়িয়া-চাড়িয়া তাহার রূপার বাঁটের নক্সাটা দেখিতেছিল—মুখ তুলিয়া কহিল, 'কাকে গো কাকীমা, আনতে মোটার যাবে—'

—'মহারাণী' হারাণীকে গো, হারাণী মহারাণীকে—'

সবিস্ময়ে প্রণতি কহিল, 'তাদের বাড়ী নেমন্তন্ন হয়নি ?'

নীরদা কন্যার কথার জবাব করিলেন! 'নেমন্তন্ন আবার কোন্ বাড়ীর আমরা বাদ দিই! তবে সে কি এখন অমনি ধেয়ে আসবে ? এখন যে আমরা তার পূজো করব; ল্যাজে একটু তেল দিতে হবে না ?'

অসিত আসিয়া কহিল,—'মা-মণি, তোমার ও ই

ফরমাসি হাজার-আট পদ্ম, অপরাজিতা, জবা যা যা বলেছিলে সব নার্শারী হ'তে পাঠিয়ে দিয়েছে! অর্ডার দিয়েছিলুম! দেখে নাও।'

দুই জন ভৃত্য বড় বড় ফুলের ঝুড়িগুলা নামাইয়া রাখিল। প্রণতি ছুটিয়া গিয়া উপরের পাতলা কাগজের আচ্ছাদন খুলিয়া কহিল, 'বাবা, এত ফুল!—'

নীরদার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জায়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'ফুলগুলো একবার দেখ তো মেজ-বৌ!'

সুপ্রভা গালে হাত দিল,—'এ তুমি কি করেছ জ্যাঠাই-মা, বাগানের অত ফুল! আবার নার্শারী হ'তে এত ফুল আনালে—'

প্রণতি কহিল,—'কি হবে মা-মণি?'

'তোর বড়-দার নামে পূজা দেব।'

দীপ্তি আশ্চর্য্য স্বরে কহিল, 'বড়-দার কি হয়েছে মা-মণি?'

নীরদা রাগিয়া উঠিলেন,—'হবে আবার কি?'

মেয়েরা মায়ের রাগ দেখিয়া ভীত না হইয়া সমস্বরে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, 'ওঃ বুঝেছি! বুঝেছি! বড়-দার বিয়ের মানতের জন্যে! তাই না বড়-দা নিজেই নার্শারীতে ছুটেছিল—হ্যাঁ।'

অসিতকে তাহারা ঘিরিয়া ধরিল,—'ইস্, বড়-দা, তুমি মেয়েদেরও ছাড়িয়ে উঠ্‌লে!'

কুমারী-পূজার অসঙ্গত বিলম্বে যে অপ্রসন্নতার মেঘখানা শরতের সোণালী রৌদ্রকে আড়াল করিতেছিল, হাসির মধুর হিল্লোলে সেখানা নিমেষে অপসারিত হইয়া সম্মুখে পরিস্ফুট হইল—সোণালী আলোক-সমুজ্জল আনন্দোচ্ছ্বসিত দিন।

গৃহিণীরা বধূরা সকলেই হারাণীকে 'কুমারী-পূজা' করিলেন; দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 'কুমারী' ভোজনে রতা, কুমারী পূজনে প্রীতা—মহামায়ার এ কুমারী-মূর্ত্তি! এই জীবন্ত প্রতিমাকে ভক্তিভরে সানন্দ-চিত্তে পূজা করিলে শ্রী, সৌভাগ্য, মনোভিষ্ট সব কিছু লাভ হয়!

এইবার চাটুয্যে মশাই গরদের জোড় পরিয়া স্বয়ং দেবীর দালানে উপস্থিত হইলেন। সারদা ব্যগ্রভাবে একখানা উৎকৃষ্ট পশমের আসন আনিয়া কুমারীর সম্মুখে পাতিয়া দিল। থালা ভরিয়া, ডালা ভরিয়া, পিতলের ট্রেতে সাজাইয়া কত কি পূজার দ্রব্যসম্ভার আনিল। সাজি ভরিয়া বাছা-বাছা ফুল আনিয়া পুরোহিতের নিকট রাখিয়া দিল। পলকের মধ্যে যেন একটা ত্রস্ত ভাব সেই সুবৃহৎ দেবায়তনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। কর্ত্তা স্বয়ং পূজা করিবেন, হাতে তাঁহার পূজার পুথি।

প্রশান্ত মূর্ত্তি চাটুয্যে মশায় আসনে উপবেশন করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতকে প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, 'মেয়েটির বয়স কত ভশচায?'

পুরোহিত মাথা চুলকাইলেন। 'আজ্ঞে, আজ্ঞে, "ক্ষেত্রজ্ঞা কি অম্বিকা"—'

চাটুয্যে মশাই কুমারীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—'তোমার বয়স কত মা?'

নতমুখী বালিকা জড়িত স্বরে উত্তর দিল, 'তের—'

কর্ত্তাকে পুরোহিত কহিলেন, 'তাহ'লে মহালক্ষ্মী! নিন্ আরম্ভ করুন।'

হারাণী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে সে,—এত ঐশ্বর্য্য বৈভব আড়ম্বর জীবনে কোনও দিন দেখে নাই! এই মর্ম্মর-মণ্ডিত হর্ম্ম্যতল, সুসজ্জিত পূজামণ্ডপ, বেদীর উপর স্থাপিত এই মহিমময়ী দশভুজার মূর্ত্তি! লোক-জনের এত সমারোহ কোলাহল - সকলই এই ত্রয়োদশী বালিকার পূজার জন্য ব্যস্ত, ব্যাকুল! বিস্ময়মুগ্ধ নেত্রে সে এই সম্পদের লীলা-নিকেতন দেবায়তনের অপরূপ সজ্জা, চতুর্দ্দিকের শোভা চাহিয়া দেখিতেছিল। কিন্তু চাটুয্যে মশায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই একটা স্বাভাবিক সন্ত্রস্ততা চারিধারে ফুটিয়া উঠিল, এবং এই চাঞ্চল্য হারাণীকেও অত্যন্ত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। শঙ্কিত হরিণ-শিশুর মত আয়ত নেত্রের চকিত দৃষ্টিতে সে একবার গৃহস্বামীর শান্ত গম্ভীর মুখকান্তি চাহিয়া দেখিল। সে সৌম্য মুখমণ্ডলে ভয়ের কিছু না থাকিলেও, বালিকার অন্তর কিছুতেই নিঃশঙ্ক হইল না।

একখানি আলিপনা-শোভিত চৌকিতে কুমারী বসিয়া ছিল।

কর্ত্তা রূপার থালার উপর তাহার ক্ষুদ্র চরণযুগল স্থাপন করিলেন; পুরোহিত তন্ত্র ধরিলেন।

পূজা আরম্ভ হইল।

হারাণীর বুকের ভিতরটা কিন্তু দুরু-দুরু করিতে লাগিল। সাক্ষাৎ মহামায়ার মত গরীয়সী হইয়া পূজিতা হইলেও মুখখানি তাহার পাংশু দেখাইতে লাগিল। প্রস্তর-পুত্তলীর মত নিস্পন্দ হইয়া, ভিতরে ভিতরে সে কাঁপিতে ও ঘামিতে লাগিল।

কর্ত্তা মুখ তুলিলেন। আশ্বিনের এই স্নিগ্ধ প্রভাতে বালিকার ললাটে স্বেদবিন্দু দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, কহিলেন,—'হরে, মা'কে আমার বাতাস কর।'

ভক্তি, আরতি দাঁড়াইয়া পূজা দেখিতেছিল! ব্যগ্র-কণ্ঠে কহিল, 'বাবা, আমরাই চামর করব—কুমারী দেবীকে'—এই লোভটা তাহাদের মনে অনেকক্ষণ ধরিয়াই জাগিতেছিল।

'কর মা, তোরাই কর'—বলিয়া কর্ত্তা রজত-কোশায় অর্ঘ্য সাজাইতে লাগিলেন।

সুপ্রভা কহিল, 'ভাল ক'রে কুমারী দেবীকে সাজিয়ে দেয়নি! দাও না জ্যাঠামণি, তোমার কুমারী দুর্গাকে আমরা ভাল ক'রে সাজিয়ে দিই।'

—'দাও তবে এইখানেই'—

দীপ্তি ত্বরিতে চন্দনের বাটি তুলিয়া লইয়া হারাণীর ললাট চন্দনে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিল। সুপ্রভা, মণ্টু, শুভা, সকলেই হারাণীকে কুসুমে, চন্দনে, বসনে মনোমত দেবী-প্রতিমার মত সাজাইয়া দিতে লাগিল; এবং চাটুয্যে মশায়ের প্রদত্ত রক্তবর্ণ বেনারসী শাড়ীখানা পরাইলে, বালিকাকে যথার্থই যেন প্রভাত-গায়ত্রীর মত নয়নমোহন সমুজ্জ্বল-কান্তিময়ী দেখাইতে লাগিল।

স্নেহাপ্লুত নেত্রে সেই সজীব আলেখ্যখানির দিকে চাহিয়া সহর্ষ কণ্ঠে কর্ত্তা কহিলেন, 'বাঃ! দিব্যি সাজিয়েছিস্ তোরা! মা আমার হিমালয় ছেড়ে ছেলের ঘরে পূজা নিতে এসেছে!—কি নামটি তোমার মা?'

অবনতমুখী সলজ্জ বালিকা কহিল, 'হৈমবতী।'

প্রসন্নমুখে কর্ত্তা কহিলেন,—'বাঃ, দিব্যি নামটি তো! হৈমবতীই তো মা দুর্গা।'

সুপ্রভা সবিস্ময়ে কহিল, 'তোমার নাম না হারাণী?'

—'না, মাসীমাকে হৈমবতী বলতে নেই কি না, তাই আমাকে তিনি হারাণী ব'লে ডাকেন।'

সায় দিয়া কর্ত্তা কহিলেন, 'ঠিক, ঠিক! নন্দ ভশ্চায্যির মায়ের নাম হৈমবতীই ছিল বটে। বউ হ'য়ে শাশুড়ীর নাম ধ'রবে কি ক'রে?'

বড়-গিন্নী আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাতে একজোড়া সোণা-বাঁধান শাঁখা। স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'কুমারীর গয়না—'

কর্ত্তা মুখ তুলিলেন। 'অলঙ্কার—কই এনেছ? দাও।' বলিয়া শাঁখা দুইগাছি হাতে লইয়া কহিলেন, 'দেখি মা, তোমার হাতখানা—'

হৈমবতী হাতখানা বাড়াইয়া দিল। সুডৌল শুভ্র সুন্দর করপল্লব! নবনীর মত চম্পক-অঙ্গুলী! গিরি-কুমারী যেন শঙ্খবলয় ধারণের মানসে মৃণাল-কোমল কর প্রসারিত করিলেন।

চাটুয্যে মশায় সযত্নে সন্তর্পণে একরাশ ফুলের মত কোমল কর ধরিয়া ধীরে ধীরে শাঁখা-জোড়া পরাইয়া দিয়া স্মিত কণ্ঠে কহিলেন, 'শাঁখা তোমার হাতেই মানায় মা! আশীর্ব্বাদ করি, হীরের বালা পর।'

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। গৃহিণীও হাসিয়া ফেলিলেন। সকৌতুক হাস্যচ্ছটায় কর্ত্তার আনন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গভীর বাৎসল্য-রসে নিষিক্ত অন্তর যাহাকে আশীর্ব্বচনে অভিষিক্ত করিল, সেই যে আরাধ্য মূর্ত্তিতে তাঁহার সমীপে পূজা গ্রহণ করিতে বসিয়াছে! অঞ্জলি পাতিয়া যেখানে বর গ্রহণ করিবেন, সেইখানে আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনিই বরদান করিতেছেন!

কুমারী-পূজা শেষে কর্ত্তা স্বহস্তে কিছু ফল, মিষ্টান্ন লইয়া হৈমবতীকে কহিলেন, 'খাও তো মা!'—স্বর তাঁহার ভক্তি-গদগদ।

সকলের হাতেই হৈমবতী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়াছিল; কিন্তু কর্ত্তার হাতে সে কোনমতে খাইতে পারিল না। কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল! একটা তীব্র সঙ্কোচ তার সমস্ত চিত্তটাকে কেমন কুঞ্চিত করিয়া গুটাইয়া রাখিল! দুঃসহ লজ্জা এমন সবলে তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল, যাহার অ-দৃশ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার সাধ্য তাহার হইল না। সরম-রাঙা মুখে সে অতি মৃদুস্বরে কহিল, 'আমার হাতে দিন।'

হৈমবতী হাত পাতিল।

চাটুয্যে মশায় আর বাক্যব্যয় করিলেন না। কিন্তু মনের মধ্যে, বোধ করি, গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের উষ্ণ বায়ুর একটা হিল্লোল বহিয়া গেল। তাঁহার বোধ হইল, মেয়েটি অবাধ্য! তাঁহার সরস মুখশ্রী ঈষৎ গম্ভীর দেখাইল! ভ্রূদ্বয় অল্প কুঞ্চিত হইল। ফল, মূল, মিষ্টান্নের রেকাবীখানা তিনি কুমারী দুর্গার হাতে ধরিয়া-দিয়া প্রণিপাত সারিয়া উঠিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন, 'এগুলো সব ওর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিস্।'

পিতা প্রস্থান করিতেই ভক্তি, প্রণতি চামর ফেলিয়া কহিল, 'তোমাকে ভাই আমাদের ঘরে যেতে হবে, কুমারী দেবী!'

সলজ্জ স্বরে হৈমবতী কহিল, 'আমায় হৈমবতী বলুন।'

'বাঃ! পা-দু'খানা পেতে বাবার কাছে পূজো নেবার বেলা মনে ছিল না?'—বলিয়া দুই বোনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভক্তি কহিল, 'মা গো, আমি হ'লে এক-ছুটে দৌড়িয়ে পালাতুম। তোমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে, না?'

আবীরের মত মুখখানা লাল করিয়া হৈমবতী কহিল, 'না, আমার এই প্রথম।'

সুপ্রভা গালে হাত দিল। 'ইস্, তোমার ত খুব ধৈর্য্য দেখচি! আমায় কেউ হাজার টাকা দিলেও এ-কাজে রাজি হতুম না! যে আসবে, পা-দু'খানা টেনে নিয়ে পূজো করবে!—এ আমি কিছুতে সইতে পারতুম না।"

সুভা কহিল, 'নীলুর মা'র মেয়েরাই আমাদের বাড়ী কুমারী হয়। বাবা, মেয়ে নয় তো—যেন ঝিঙের বিচি! কত কথা! এটা দাও, সেটা দাও, কুমারীর মাথায় ভাল জরি-ফিতে কই? নিজেরাই সব চাইবে—নাক-চোখ ঘুরিয়ে! আর বছর বাবাকে বলেছিল, "চাটুয্যে মশায়,— আমিই তো জ্যান্ত দুর্গা, আমায় বেনারসী দিন।"—তাই ওই বেনারসী বাবা কিনে এনেছিল, শাঁখাও গড়িয়ে রেখেছিল! মেয়েটা পেলে 'বর্ত্তে' যেত।'

টুনু মাথা নাড়িয়া কহিল, 'না গো! সে সব 'বর্ত্তে যাবার' মতো মেয়েই নয়। অমনি আর কিছু-একটা চেয়ে ব'সত!'

ভক্তি কহিল, "যার কপালে যা লেখা আছে, সেই তো তা পাবে! তুমিই ভাই সত্যি কুমারী দুর্গা! দেখ মেজ-দির ফুলের মুকুটে মুখখানা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!'

এ-সব বাক্য-স্রোতের উত্তরে হৈমবতীর কিছুই বলিবার ছিল না; কেবল লজ্জায় ডগ্‌ডগে লাল মুখখানা সে আর একটু হেঁট করিল।

প্রণতি তাড়া দিল, 'এইখানে দাঁড়িয়ে গল্পই করবি, না ওপরে যাবি? চল ভাই হৈম!' বলিয়া সে হৈমবতীর হাতখানা ধরিল।

এক সঙ্গে গুটি-সাতেক কিশোরী তরুণী বালিকা হৈমবতীকে ঘিরিয়া বসন্তের বায়ু-হিল্লোলের মত আনন্দ-চঞ্চল পদে উপরে চলিয়া গেল।

প্রণতি হৈমবতীর সহিত আলাপটা খুব জমাইয়া লইল। একখানা সোফার উপর হৈমবতীকে বসাইয়া বিজলী-পাখার বেগটা সে বাড়াইয়া দিল। সখী-প্রীতি তাহার সকলের চেয়ে বেশী। আলমারী খুলিয়া নিজের একখানা নতুন ডুরে-শাড়ী বাহির করিয়া দিয়া কহিল, 'ও বেনারসীর বাহার ছাড়ো ভাই! আটপৌরে কাপড়ে দুটো গল্প চলুক—অসোয়াস্তি বোধ হবে না।'

—'আমায় ভাই শীগ্‌গিরই বাড়ী যেতে হবে; তবে মাসীমা আসতে পারবেন।'

সুপ্রভা সকলের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। কৃত্রিম ধমকের সুরে কহিল, 'জানি গো জানি দুর্গা পিরতিমে! আগে চোব্য-চোষ্য সব রকম ভোগ ত শেষ হোক।'

হৈমবতী হাত-দু'টি জোড় করিল! 'না ভাই দিদি—' কণ্ঠে তার মিনতির সুর!

উচ্চস্বরে তাহার নবীন বন্ধুর দল হাসিয়া উঠিল। সুপ্রভা কহিল, 'ঠিক বলেছ! আমি দিদি, প্রণতি মেজ-দি, সুভা সেজ-দি, আর তুমি, তুমি—'

কনক পশ্চাত হইতে ঝাঁ-করিয়া পাদ-পূরণ করিল, 'বৌদি—'

আবার একটা হাসির রোল উঠিল।

অসিত গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, 'কি রে, এত হাসি কিসের? কনক্রিটের ছাত যে ফেটে যাচ্ছে!'

সুভা হাত নাড়িয়া কহিল, 'হাঁ গো, তোমার উল্লাসে যে মজাঙ্কের দেয়াল ফেটে চৌচির হচ্ছে—'

অসিত একটা আরাম-কেদারা টানিয়া বসিয়া পড়িল; হাসিমুখে কহিল, 'তাই না কি? তা এমন ভয়ঙ্কর আনন্দ আমার কিসে হলো শুনি।'

প্রণতি কহিল, 'দেবীর পায়ে হাজার-আট পদ্ম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়দার একেবারে বধূ-প্রাপ্তির বর—'

ছদ্ম-বিস্ময়ে ব্যগ্র-কণ্ঠে অসিত কহিল, 'সত্যি না কি? ব'লতে হয় এতক্ষণ। কোথায় রে কোথায়? ঠিকানাটা ব'লে দে না ভাই! পূজাবাড়ী থেকে নেমন্তন্ন ক'রে আনি—'

ভক্তি হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল; কহিল, 'তোমায় রথ নিয়ে ছুটতে হবে না দাদা, লক্ষ্মী আপনি এসেছেন। কিন্তু তুমি,—তুমি এখানে কেন?'

রঙ্গ করিয়া অসিত কহিল, 'নারায়ণ কি লক্ষ্মীহীন থাকে রে!' কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকের মাঝেও পূর্ব্ব গগনের অরুণিমার মত সুগৌর মুখে রক্তিম-চ্ছটা ফুটিয়া উঠিল।

সমস্বরে ভগিনীর দল কহিয়া উঠিল, 'কি—কি বললে?'

সকলের মুখই কৌতুক-দীপ্ত!

অসিত কিন্তু আর তাহাদের রহস্যালাপে ভিড়িল না; নিতান্ত ভাল-মানুষটির মত ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, 'সকাল থেকে খেটে খেটে মরছি; একটু বসতে এলুম—'

কথাটা সমাপ্ত হইবার অবসর পাইল না। দ্বিতল হইতে অমলার উচ্চ কণ্ঠস্বর ত্রিতলের হাস্যমুখরিত কক্ষের একটা ভাবান্তর ঘটাইয়া দিল।

অমলা বকাবকি করিয়া কহিতেছিলেন, 'ওরে ফাজিলের দল, হারাণীকে পাঠিয়ে দে না; তার যে রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে। জানিনে বাবা, একটা উত্তর নেই, কাণে সব ছিপি-দিয়ে ব'সে আছে।'

অসিত সুপ্রভার দিকে চাহিয়া কহিল, 'রিক্সাতে যাবে কে রে?'

প্রণতি কহিল, 'কুমারী দেবী। এদিকে সব পা-দু'টো টেনে নিয়ে পূজো করা হলো; আর পাঠাবার বেলায় রিক্সায় তু'লে বিদেয়—এমনি ভক্তি!'

অসিত উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, 'দূর—তা কি হয়? আজকের এত ভিড়ে সেই শ্যামবাজার, পথ তো আর কম নয়! আচ্ছা, আমি মোটর দেখছি—'

ভক্তি কহিল, 'মোটর দেখবে কি গো? সুরেশ, রামসিং কাউকেই এখন বাবা ছাড়বে না; সবাই ছাতে লোক খাওয়াতে উঠেছে।'

'সে আমি বাবাকে ব'লে ব্যবস্থা করছি!'—বলিয়া অসিত বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময়ে চকিতে সে একবার হৈমবতীর মুখের দিকে তাকাইয়া গেল। একখানা বড় আয়নার দিকে মুখ-করিয়া হৈমবতী বসিয়া আছে। তাহাতে সে নিজের অপরূপ প্রতিবিম্বখানা নিরীক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু কুমার-প্রতিম যে মূর্ত্তি বিপরীত দিকের আসনে উপবিষ্ট ছিল—তাহার মনোহর তনুর যে অংশটা মুকুর-গাত্রে প্রতিফলিত, সেটা কে দেখিতেছিল তাহা ঠিক বুঝা গেল না! কিন্তু অসিতের মুখের গোলাপাভাটা অকস্মাৎ গাঢ় রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল।

কিছুক্ষণ পরে অসিত ফিরিয়া আসিল; কহিল, 'সুপ্রভা তোদের এ—কই, গাড়ী বার ক'রেছি—'

বোনেদের দল খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমোদের কণ্ঠে সবাই কহিয়া উঠিল, 'বড়-দা 'এ' কি গো? এর পর তো ঐ—'

—'আচ্ছা! আচ্ছা! খুব ডেঁপোমি শিখেছিস্! এক্ষুনি আসতে হবে।'

—'ওঃ, তুমি বুঝি নিয়ে যাচ্ছ?'—কৌতুকদীপ্ত চক্ষে শুভা চাহিয়া রহিল।

মুখখানাকে ভয়ানক গম্ভীর করিয়া অসিত কহিল, 'আর কি উপায় আছে? যত ঝঞ্ঝাট আমার মাথায়,—ড্রাইভারদের এখন ছাড়া চলবে না—কাকাবাবু ব'ললেন! আর তাদের সঙ্গে তো একা পাঠান যায় না।'

মুখটি বুজিয়া অল্প একটু হাস্য করিয়া মণ্টু কহিল, 'এসো গো হৈমবতী বৌদি'!'

হৈমবতী তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল, 'ওকি ভাই!'—আনন তাহার সিন্দুর-রঞ্জিত।

মণ্টু সে ক্রোধ দেখিয়া অপ্রতিভ হইল না। অধিকতর আমোদের সুরে কহিল, 'কেন কি দোষ হ'য়েছে! তোমার যে বর হবে, আমি তাকে দাদা ব'লব। আমি

তো বলিনি, আমাদের ওই দাদার গলাতেই তুমি মালা দিয়েছ।'

সহাস্যে অসিত কহিল, 'দূর বাঁদরী!'

নীরদা ও অমলা হৈমবতীকে দেখিয়া কহিল, 'চল্‌লে মা! মাসীমাকে পাঠিয়ে দিও। গাড়ীতে খাবার দিতে বলেছি।'

অমলা কহিলেন, 'হ্যাঁ রে, হারাণীর রিকসাতে যাচ্ছে কে?'

প্রণতি কহিল, 'সে ভাবনা তোমার নেই গো কাকী-মা! আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে।'

অমলা কহিলেন, 'সাবধানে যেন যায়! যে গাড়ী-ঘোড়ার ভীড়!'—বলিয়া বক্তব্য শেষ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই জানিলেন না—মনেও আনিলেন না, কোটিপতি রামশরণ চাটুয্যের একমাত্র বংশধর এই শুক্লা ত্রয়োদশীর শশীকলা-সদৃশী বালিকার তত্ত্বাবধানের ভার স্বয়ং লইয়া তাহার সহগামী হইয়াছে!

* * * * *

নূতন ক্যামেরা কিনিলে, ছবি তোলার সখটা বাতিকের মতোই কিছু দিন কি ভাবে কাঁধে চাপিয়া থাকে, সেই ভুক্তভোগীর দলই তাহা বুঝিতে পারেন—নূতন ক্যামেরা কিনিয়া যাঁরা ছবি তোলার শিক্ষানবিশী আরম্ভ করেন।

অসিত ভগিনীর হাতে কার্ড-বোডে আঁটা একখানা ছবি দিয়া কহিল, 'চিন্‌তে পারিস?'

প্রণতি সবিস্ময়ে কহিল, 'ও মা, এ কে বড়-দা? ও হরি, এ যে হৈমবতী! বাঃ! দিব্যি মুখখানা দেখাচ্ছে তো! বাবা পায়ে অর্ঘ্য দিচ্ছেন।'

সুভা ছুটিয়া আসিল। 'দেখি, দেখি—ও মা, চমৎকার হয়েছে! দেখ প্রণতি, চামর-হাতে তোকে আর ভক্তিকে যেন জয়া-বিজয়ার মত দেখাচ্ছে।'

সুপ্রভা অসিতের বৎসর-দুই মাত্র পরে জন্মিয়াছে। দলের ভিতর সেই বিবাহিতা। বিজ্ঞতার গাম্ভীর্য্যও তাহার সকল বিষয়েই কিছু কিছু পরিলক্ষিত হইত। অসিতের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল 'তোমার বুঝি হৈমবতীকে খুব মনে ধরেছে বড়-দা?'

অসিতের মুখে অস্তগামী সূর্য্যালোকের একটা ঝলক আসিয়া পতিত হইল। সজোরে প্রতিবাদ করিয়া সে কহিল, 'ছবি তুললেই বুঝি মনে ধরা হলো? তা হ'লে যত ছবি তুলেছি, সবাইকেই আমার মনে ধ'রেছে। তোদের ছবির বিচার করতে দিয়েছি।'

প্রণতি প্রথম হইতেই হৈমবতীর তরফে ছিল। কহিল, 'ও তর্ক থাক না বাপু! ছবিখানা তুমি কখন তু'ললে বড়-দা? মা গো, আমরা জানতেও পারিনি। কিন্তু যাই বল, চমৎকার উঠেছে!—আমায় একখানা এন্‌লার্জ্জ ক'রে দিও; পড়বার ঘরে টাঙাব।'

ভক্তি ভাল-মানুষটির মত ছবিখানা এতক্ষণ দেখিতে-ছিল। অকস্মাৎ তাহার মাথায় কি একটা দুষ্টবুদ্ধি আসিয়া জুটিল! চিলে যেমন অন্যমনস্ক পথিকের হাত হইতে খাবারের ঠোঙাটা খপ্ করিয়া ছিনাইয়া লইয়া হুস্ করিয়া উড়িয়া যায়, তেমনি করিয়া সে হৈমবতীর ছবিখানা বোনের হাত হইতে ছোঁ-মারিয়া কাড়িয়া লইয়া চোখের পলকে ছুটিয়া পলাইল।

অসিত এই অতর্কিত অবস্থাটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। 'হাঁ, হাঁ' করিয়া উঠিল। 'এই ভক্তি, কোথা যাচ্ছিস—এই ভক্তি'—বলিয়া সে-ও পিছনে পিছনে ছুটিল। কিন্তু বোনটি তখন একেবারে হাতের বাহিরে—ত্রিতলের এলাকা ছাড়িয়া দ্বিতলের কোঠাতে নামিয়াছে।

চাটুয্যে মশায় পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অম্বুরী তামাক সেবন করিতেছিলেন। গৃহিণী নিকটে বসিয়া পান-দোক্তা মুখে পুরিয়া, পূজার ক'টা দিনের মধ্যে কি কেমন হইল, মুখে মুখে তাহারই একটা ফিরিস্তী কর্ত্তার নিকট দাখিল করিতেছিলেন, এবং কোজাগরী পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন কিরূপ হইবে, তাহারই আলোচনা করিতেছিলেন।

ভক্তি হাঁপাইতে হাঁপাইতে পিতৃসন্নিধানে হাজির হইল; সাহ্লাদে কহিল, 'বাবা, একটা জিনিষ দেখবে?'

মৃদু হাস্যে চাটুয্যে মশায় কনিষ্ঠা কন্যার দিকে চাহিলেন, কহিলেন, 'কি রে পাগলী, অত হাঁপাচ্ছিস কেন?'

আঁচলে কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে ভক্তি কহিল, 'ইস্, যা ছুটে এসেছি! আর একটু হ'লেই বড়-দা কেড়ে নিয়েছিল আর কি!'

নীরদা কহিলেন, 'কি আবার কেড়ে আনলি অসিতের কাছ থেকে?'

—'তোমার বৌমার ছবি গো! এমন দুষ্টু ছেলে, কিছুতে দেবে না! কিন্তু আমার সঙ্গে আর পারতে হয় না।'—বলিয়া যেন একটা মস্ত কীর্ত্তি করিয়াছে এই গর্ব্বে ভক্তি হাসিতে লাগিল। দাদাকে সে আজ ভয়ানক জব্দ করিয়াছে!

সহাস্য মুখে নীরদা কহিলেন, 'কই দেখি!'—তিনি ভাবিয়াছিলেন, কোন একটা বুড়ীর ছবি বা কোন কুৎসিত সাঁওতালনীর ফটো লইয়া মেয়েরা কৌতুক করিতেছে! এমন কৌতুক পরিহাস-রহস্য তাহারা অনুক্ষণই করে। এবং পুত্রও প্রতিশোধ-গ্রহণে কখন পশ্চাৎপদ নয়; আর এই রঙ্গ-ব্যঙ্গ সংগ্রামে তাঁহারা নিরপেক্ষ দর্শকের মতই আনন্দ উপভোগ করেন। কালই যে একটা দাড়িওলা মুস্কিল-আসানের ছবির উপর বড় বড় অক্ষরে অসিত লিখিয়াছিল, প্রণতির বর! একটা ধাঙ্গড়ের ছবির উপর লিখিয়াছিল, ভক্তির পরম পূজনীয় স্বামী দেবতা। তাহা লইয়া প্রচণ্ড কোলাহল চলিয়াছিল।

এখনও তেমনি একটা নিছক তামাসা-বোধেই তাঁহার মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইল। কারণ, পুত্রকন্যাগণের এই কলহে কৃত্রিম মান-অভিমানের ভিতর দিয়া যে নিবিড় স্নেহ-ভালবাসা বিকাশ লাভ করে, নীরদার তাহা অমৃতের ন্যায় মধুর মনে হয়।

কিন্তু ভরা-জোয়ারের পিছনেই থাকে ভাঁটার টান। ফটোখানা হাতে করিয়াই নীরদা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, 'এ যে হারাণীর ছবি—'

চমকিত হইয়া কর্ত্তা কহিলেন, 'কই দেখি—' বলিয়াই তিনি হাতটা বাড়াইয়া দিলেন; বাধ্য হইয়া নীরদাকে স্বামীর হস্তে ফটোখানা প্রদান করিতে হইল!

পরীক্ষিতের উপাখ্যানে যেমন আছে, কুসুম-স্তবকের ভিতর হইতে বিষধর বাহির হইয়াছিল, ঠিক তেমনি এই অনাবিল রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে যে একটা দুঃসহ অনিষ্ট ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, ইহা সকলেরই কল্পনাতীত কঠোর সত্য।

ফটোখানার উপর দৃষ্টিপাত করিতেই চাটুয্যে মশায়ের প্রফুল্ল মুখখানা কালবৈশাখীর অশনি-গর্ভ কালো মেঘের মত ভীষণ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবাইবার মত ভক্তির মুখের কৌতুক-দীপ্তি পলকে আঁধারে ঢাকিয়া গেল।

পত্নীর পানে দৃপ্ত চক্ষে চাহিয়া চাটুয্যে মশায় তীব্র স্বরে কহিলেন, 'অসিতকে ব'লে দিও, যে মেয়েকে তার বাপ পূজো করে, তাকে নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করা বেল্লিকের কাজ।'

আসন্ন প্রমাদের আশঙ্কায় গৃহিণী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। প্রতিবাদ করিয়া সতেজ স্বরে কহিলেন, 'কি এমন মহাভারত-অশুদ্ধ কাজ হয়েছে! ঠাকুর-দেবতার ছবি যদি তুলতে পারে, তবে এও তো ঠিক তেমনি—'

উষ্ণ স্বরে বাধা দিয়া কর্ত্তা কহিলেন, 'না, ঠিক তেমনি নয়, যথেষ্ট তফাৎ আছে। তুমি জান, সে-দিন নিজে গাড়ী হাঁকিয়ে অসিতই মেয়েটাকে পৌছে দিতে গেছিল; এত মাথা-ব্যথা তার কিসের?'

—'তুমি তো মত দিয়েছিলে। তোমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে তো নিয়ে যায়নি।'

'তা জানি। তখন মাথ'য় আমার অতটা আসেনি। ও এমন কৌশল ক'রে কথাটা পেড়েছিল; যে সময় সোজা ভাবেই সেটা নিয়েছিলুম; কিন্তু হরির কথায় আমার হুঁস্ হলো। দেখ, আমি সব বুঝি।'

গৃহিণী এবার কমলহীরার নাকছাবি সমেত চাকাপানা মুখখানা ঘুরাইয়া ছেলের তরফে যে ওকালতী আরম্ভ করিলেন, জ্যাকসন সাহেব তেমন পারিতেন? কহিলেন, 'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! হরি তোমায় সব বোঝায়, আর কেন বুঝায় তা আমিও বুঝি; নেহাৎ ঘাস খেয়ে মানুষ হইনি।'—বলিয়া তিনি বক্তব্যের গূঢ়ার্থটা উহ্য রাখিয়া কথার জোয়ার ঘুরাইয়া আরম্ভ করিলেন, 'নিজেদের দু'খানা গাড়ী ঘরে মজুত, আর যাকে পূজো কল্লুম, সে যাবে রিক্সাতে! দেখ, আমার ছেলের নামে অমন ক'রে তোমরা দু'ভাইয়ে কথা কয়ো না; অনর্থ হবে তা ব'লে রাখ্‌চি—বলিয়া তিনি মহা ক্রোধ-ভরে দুম্ দুম্ করিয়া স্থানত্যাগ করিলেন।

উৎসব-দিনে শোকাশ্রুপাতের মত একটা বেমানান বিসদৃশ অবস্থার আবির্ভাবে ভক্তি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। দাদার সহস্র নিষেধকে নিঃসঙ্কোচে অবহেলা করিয়া বিমল আনন্দ বিতরণ উদ্দেশ্যেই সে ছুটিয়া আসিয়াছিল।

সেই স্বচ্ছ সলিলরাশিকে গুলাইয়া কেহ যে তাহার তলা হইতে পাঁক তুলিবে, তাহা সে-বেচারার স্বপ্নাতীত! মুখখানা কাঁচু-মাঁচু করিয়া অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবেই সে ফটোখানা হাতে লইয়া আস্তে আস্তে পিতার শয়ন-কক্ষ হইতে সরিয়া পড়িল।

*　*　*　*　*

হৈমবতীকে দেখিয়া আনন্দিত মুখে কমলা কহিলেন, 'খোকাবাবুর সঙ্গে এলি হারাণী?'

'তা জানি না, মাসীমা! ওই যাঁকে ওরা বড়-দা ব'লছিল, চাটুয্যে-মশায়ের ছেলে। ড্রাইভাররা লোক খাওয়াচ্ছিল, আসতে পারবে না! আমায় রিক্সা ক'রেই পাঠিয়ে দিচ্ছিল; উনি মানা ক'রে বল্লেন, আমি দিয়ে আসচি।'

কমলা কহিলেন, 'হ্যাঁ, আমি মুখখানা দেখেই চিনতে পেরেচি—ছাতের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে ছিলুম কি না! ইনি বললেন, খোকাবাবু লোক খুব ভাল! অত বড়-মানুষ, এতটুকু দেমাক নেই। আহা হারাণী, মা দুর্গা যদি তোকে চাটুয্যে-বাড়ীর বৌ করে'—

—'ধ্যেৎ, মাসীমা কি যে বলো?' হৈমবতীর মুখে কে যেন একমুঠা আবীর নিক্ষেপ করিল।

মাসীমা হাসিলেন; কহিলেন, 'ভাল কথাই তো বল্লুম। ওই কাপড় দিয়েছে?'

—'হ্যাঁ, এই শাঁখা-জোড়া দিয়েছে।'

কমলা বিস্ময়ে গালে হাত দিলেন। 'এ যে সোনা-বাধান রে!' পরে সহর্ষ কণ্ঠে কহিলেন, 'কর্ত্তার খুব ভক্তি-নিষ্ঠা আছে। দেখ হারাণী, ওরা এখান থেকে কখন কুমারী নেয় না। শুধু তোর বরাতে ছিল ব'লে, এবার ডেকে পাঠালে।'

মাসীমা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। হৈমবতী কাপড় ছাড়িয়া চুলবাঁধা শেষ করিয়া মুখ-হাত ধুইতে নীচে নামিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চলিল, ছায়াচিত্রের মত চাটুয্যে বাড়ীর সকল ঘটনাবলী, অদৃষ্টপূর্ব্ব বৈভব! সমস্তই যেন মনের ভিতর ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং ফাল্গুনের দিনে দখিনা বাতাসের মত একটা অজানা পুলকে তাহার সারা চিত্ত যেন থাকিয়া-থাকিয়া মাতোয়ারা হইয়া উঠিতে লাগিল। চাটুয্যে মশায়ের পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রণতি, ভক্তি, সুপ্রভা, সুভা—সব সঙ্গিনী আবেষ্টন, সেই কয়েক ঘণ্টার সদ্ভাব, সখীত্ব, সারা অন্তর জুড়িয়া শরতের স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের মত শুধু একটা গভীর আনন্দ বিতরণ করিতে লাগিল। অবস্থার আকাশ-পাতাল দুঃসহ ব্যবধান নৈকট্যের কোন সম্বন্ধই কোনমতে স্থাপিত করিতে পারিবে না। একেবারে এ অলীক আকাশ-কুসুম রচনা! এই অতি সহজ বিষয়টা অস্ফুট কুসুমকলির মত বালিকা-চিত্তের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় রহিয়া, তাহার মনের মালঞ্চে কেবলই কল্পনার রঙ্গীন ফুল ফুটাইয়া বিচিত্র শোভায় মানস-দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ করিতে লাগিল এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে রহিয়া রহিয়া মনে পড়িতে লাগিল, অসিতের সলজ্জ চক্ষের সপ্রশংস দৃষ্টি! তাহা হইতে একটি লহমার মাঝে যে মুগ্ধতা ঝরিয়া পড়িয়াছিল, কুমারী-বুকের পাত্রখানা সে সুধাতে নিমেষে ভরিয়া গিয়াছিল। এই কথাটা স্মরণ হইতেই গৃহকর্ম্মের মাঝেও হৈমবতীর মুখখানা সিঁদুর-রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল।

কমলা এক সময়ে কহিলেন,—'হারাণী, একটু জিরুতে ছাতে হাওয়াতে যা। মুখটা তোর রাঙা হ'য়ে আছে। বড্ড খাটুনী হয়েছে।'

কাশীনাথ কহিলেন,—'পাগল হ'য়েছ বৌমা? এমন হয়? চাঁদে হাত কি বামনে দিতে পারে!'

অন্নপূর্ণা কহিলেন, 'কিন্তু বাবা, ভবিতব্য—'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাস্য করিলেন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, 'পাগলী বেটী, ওটার দোহাই আমরা পেড়ে থাকি সত্য; কিন্তু মা, যুগধর্ম্ম বড় প্রবল! বিধাতাকেও এখন গা-ঢাকা দিতে হ'য়েছে। খামখেয়ালী আর চল্‌বে না।'

অন্নপূর্ণা অধোবদনে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

বিধবা বধূর বিমনা মুখখানার দিকে তাকাইয়া কাশীনাথ একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; কহিলেন, 'বৌমা, পাঁজিখানা আন দেখি, যাত্রাটা কখন শুভ?'

আহ্লাদে অন্নপূর্ণার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। 'যাবেন বাবা! এই যে পাঁজি আনচি।' বলিয়া এক রকম ছুটিয়াই তিনি অন্য ঘর হইতে পাঁজি আনিতে চলিলেন।

কিছুক্ষণ পঞ্জিকাখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া কাশীনাথ একটা শুভক্ষণের নির্ণয় করিলেন, কহিলেন, 'এই যে কাল

সোমবার সকালে মহেন্দ্রযোগ রয়েছে, তখনই যাওয়া যাবে।'

অন্নপূর্ণার আয়ত নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। পাছে সেই শিশির-কণা শ্বশুরের সম্মুখে ঝরিয়া পড়ে, সেই ভয়ে তিনি একটু দ্রুতপদেই সরিয়া গেলেন।

কমলা অন্নপূর্ণাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন,—

'দিদি, তুমি রামশরণ চাটুয্যের ছেলের সঙ্গে হারাণীর সম্বন্ধ কর। আমি বলচি, চেষ্টা কর্লে হ'তে পারে; আর সেই সম্ভাবনাই বেশী! অবহেলা ক'রে ফেলে রেখ না! তোমার শ্বশুরমশাইকে খুব জিদ ক'রে ধরবে। তিনি পণ্ডিত মানুষ! যখন পাঁচ জনের কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠা আছে, তাঁর একান্ত অনুরোধ এড়ান সকলের সাধ্য না হ'তেও পারে, ইত্যাদি—'

এই পত্রখানা হাতে-আসা অবধি অন্নপূর্ণা ভয়ানক উতলা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কমলার মুখে বহু বার তিনি রামশরণ চাটুয্যের ঐশ্বর্য্যের গল্প, বৈভবের কাহিনী শুনিয়াছেন। যেটুকু অশ্রুত ছিল, হৈমবতীর নিকট তাহাও শোনা শেষ করিয়াছেন। একটা দুরন্ত আশা সেই হইতে নিয়ত তাহাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। হৈম কি তবে যথার্থই রাজরাণী হইবে?

পরদিন যথানিয়মে কাশীনাথ গঙ্গাস্নান সারিলেন; সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপ্ত করিলেন। হৈমবতী তাম্রপাত্রে করিয়া কয়েকটা জবাফুল পিতামহের সমীপে রাখিল।

কাশীনাথ কহিলেন, 'কি রে?'

—'আমার গাছটাতে ফুলগুলো আজ ফুটলো দাদু।' কথাটা বলিয়া জবাফুলের মতই তাহার মুখ লোহিতাভা ধারণ করিল।

কাশীনাথ হাসিলেন। রহস্যের সুরে কহিলেন, 'তবে বুঝি তোর বিয়ের ফুল ফুটলো রে! দে, মা সিদ্ধেশ্বরীর পায়ে দিয়ে আসি, সব কাজ সিদ্ধ হোক! না রে দিদি?'

—'যাও, আমি জানি না!' হৈমবতী ছুটিয়া পলাইল।

কাশীনাথ ঘড়ির দিকে চাহিয়া পঞ্জিকার শুভক্ষণটায় এক শত-আট দুর্গা নাম লিখিয়া শুভ-যাত্রা করিলেন। অবশ্য আকাশ-কুসুম চয়নের আশা তাঁহার ছিল না। মন একটি বারও সায় দেয় নাই! কিন্তু বিধবা বধূর নির্ব্বন্ধাতিশয্যকে কোনমতেই তিনি এড়াইতে পারিলেন না।

ট্রামে বসিয়া কাশীনাথের মনে পড়িতেছিল—কত কথা! যে দুঃসহ স্মৃতি এই জ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ আমলে আনিতে চাহিতেন না, আজ যেন অন্তর উৎসুক দৃষ্টিতে সেই পিছনে পড়িয়া-থাকা অতীতটাকে কেবলই ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। রজনী ফার্ষ্ট-ক্লাস এম-এ পাশ করিল, শুধু নহে, একেবারে প্রথম হইয়াই বৃত্তি লইল। কত টাকাওয়ালা মানুষের মোটর তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইত, দশ-বিশ হাজার টাকা হাঁকাহাকি করিত! দর-দস্তুরের সে কি চাতুরীপূর্ণ বাক্যজাল রচনা!

কাশীনাথ কিন্তু একদিনের তরেও এই লোভনীয় প্রস্তাবে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন নাই! দুই হাত জোড় করিয়া সেই গর্ব্বী আগন্তুকের দলকে বলিয়াছিলেন, 'ছেলেকে তো আমি নীলামে তুলিনি, যে মেয়েটি পছন্দ হবে'— পছন্দ হইল, পিতৃমাতৃহীনা অন্নপূর্ণাকে। মাতুলালয়ে পালিতা মেয়েটির আয়ত চক্ষের সকরুণ দৃষ্টিটুকু কাশীনাথের অন্তর স্পর্শ করিল। গৃহিণীর ক্ষুণ্ণতা নিবারণ করিতে কাশীনাথ প্রবোধ বচনে কহিলেন, 'টাকাটাই কি সব বড়-বৌ! একটা মা-বাপহারা মেয়ের মা হওয়া কি কিছুই নয়? করলেই বা রাঙা সুতা দিয়ে মেয়ে পার,— ওই তোমার লক্ষ্মী।'

উড়ানীর প্রান্তে কাশীনাথ নেত্র-মার্জ্জনা করিলেন। এতখানি বাৎসল্যরসে নিষিক্ত স্নেহ-কোমল অন্তরেই ভগবান শক্তিশেল হানিয়াছেন। ব্যথাহারীর দুঃসহ বিচারের সমালোচনা করিতে যাওয়া যে মানব-বুদ্ধির সাধ্যাতীত! আধিব্যাধি-পীড়িত ভগ্নদেহটা সত্তরের কোটা পার হইয়াছে। এখন পৌত্রীটিকে যদি সৎ-পাত্রস্থ করিতে পারেন—আঃ! হতভাগী মেয়ে যেন বাপের রূপ সবটাই নিয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছে!

ট্রাম আসিয়া গন্তব্য স্থানে থামিল। ছাতা-হাতে কাশীনাথ নামিয়া পড়িলেন। দু'কদম চলিতেই বৃহৎ ফটকওলা বধূমাতার নির্দ্দিষ্ট সেই প্রাসাদোপম অট্টালিকা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। গোটা-তিনেক সেপাই বন্দুক-ঘাড়ে দ্বারে পাহারা দিতেছে। কাশীনাথের বুকটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। এই ঐশ্বর্য্যশালীর সহিত কুটুম্বিতা-স্থাপন-প্রস্তাব তাঁহার মত প্রবীণ ব্যক্তি বহিয়া আনিয়াছেন! এ যে বাতুলের মত হাস্যাস্পদ হইবার কথা!

ফটকের কাছে ফুটপাথে কাশীনাথ একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল ফিরিয়া যান। পাঁচ জনের সম্মুখে এমন অর্ব্বাচীনের মত তুচ্ছ হইতে এ-বয়সে তিনি পারিবেন না; কিন্তু পুত্রবধূর ব্যগ্রব্যাকুল চক্ষের মিনতি-ভরা দৃষ্টিটা মানস-নেত্রে ভাসিয়া উঠিল।

অচল চরণদ্বয়কে সচল করিয়া কাশীনাথ সেই সুরম্য নিকেতনের দিকেই অগ্রসর হইলেন।

সুদৃশ্য মোটর গুটিচারেক সুবেশা, সুদর্শনা, বালিকা কিশোরীকে লইয়া গেটের ভিতর হইতে বাহির হইল। প্রিয়দর্শন এক তরুণ মূর্ত্তি প্রফুল্ল বদনে গাড়ী চালাইতেছে। কাশীনাথ চালকের মনোহর মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিলেন; এ কি? এ কে? সেই না কি? দিদিমণি, কেন এ দুর্লভে তোমার লোভ? কাশীনাথ মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

পাঁচটা কথা কহিয়া, কিছু শাস্ত্রালোচনা করিয়া, বার দুই কাসিয়া কাশীনাথ অবশেষে নিজের আগমনের উদ্দেশ্যটা রামশরণ চাটুয্যের সমীপে ব্যক্ত করিলেন।

কিছু পূর্ব্বে যাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া, যাঁহার অসাধারণ শাস্ত্র-ব্যুৎপত্তি শুনিয়া চাটুয্যে মশাই শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন,—তাঁহার চিত্ত প্রীত হইয়াছিল;—সেই প্রবীণ ব্যক্তিটির মুখে এই অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া বাতাসে উবিয়া-যাওয়া কর্পূরের ন্যায়, তাঁহার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা-সম্মান চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া—দেখা দিল একটা উৎকট বিরক্তি। এতখানি পাণ্ডিত্যের মাঝেও এই বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ লোভকে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই; এই নিশ্চয়টা মনের মধ্যে গ্রথিত হইয়া গেল। চাটুয্যে মশায়ের মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

কিন্তু নীরবতাকেই কাশীনাথ বিরক্তির মৌনতা না বুঝিয়া শুনিবার আগ্রহ বলিয়া ভ্রম করিলেন। হৃদয়-দ্রাবী ভাষায় নিজের অবস্থার আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বর্ণনা করিয়া, নিবেদনটা অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাবে আর একবার প্রকাশ করিলেন।

পাষাণকে সহজে উর্ব্বরা করা যায় না। দীনের প্রার্থনা যতই সকাতর হো'ক, দাতার চিত্তকে তাহা সহজে বিগলিত করে না। এ পৃথিবীতে যাহাকে দিতে হয়, তাহার মনটাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—প্রস্তরময় হইয়া উঠে; কিন্তু এ দোষ তাহার নহে। কারণ, প্রার্থনার নিত্য আঘাত সহিয়া অন্তরের মমতার স্থানটা পক্ষাঘাত-গ্রস্তের মত অসাড় হইয়া পড়ে।

কাশীনাথ থামিতেই চাটুয্যে মশাই নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, 'সব শুনলুম! প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনি যখন কন্যাদায়গ্রস্ত শোকার্ত্ত বৃদ্ধ স্বজাতি, তখন আমাদের উচিত, আপনার দায় উদ্ধার করা।' চাটুয্যে মশায় থামিলেন।

আনন্দের আতিশয্যে কাশীনাথ উঠিয়া-দাঁড়াইলেন; অন্তরের নিগূঢ় উল্লাস এমন তীব্রবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে, সংযমের বাঁধনে তাহাকে ধরিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইল! গদগদ কণ্ঠে কাশীনাথ কহিলেন,—'আপনাকে আমি একান্ত আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, আপনার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হো'ক। বাস্তবিক আপনি ভগবৎপ্রেরিত মানুষ!' তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

নিকটে স্থাপিত একটা হাত-বাক্স খুলিয়া চাটুয্যে মশায় ব্যাগটা বাহির করিলেন। তাহার একটা খাপ হইতে একখানি এক শত টাকার নোট বাহির করিয়া তিনি কাশীনাথের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

কিছু বুঝিতে না পারিয়া কাশীনাথ কহিলেন, 'কি?'

বিনীত কণ্ঠে রামশরণ কহিলেন, 'ওটা একখানা একশ' টাকার নোট—'

অবাক হইয়া কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'টাকা আমি কি করব?'

ঈষৎ হাস্য করিয়া চাটুয্যে মশায় কহিলেন, "এই বস্তুটা না থাকলে মেয়েকে পাত্রস্থ করা যায় না। আপনার পৌত্রীর—'

হাত তুলিয়া কাশীনাথ কহিলেন, 'চুপ করুন! আপনি কি আমাকে অর্থ সাহায্য ক'চ্ছেন?"

—'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

উদ্দীপ্ত স্বরে কাশীনাথ কহিলেন, "রসিক বাঁড়ুয্যের পৌত্র, অনাথ বাঁড়ুয্যের পুত্র কাশীনাথ বাঁড়ুয্যে কখন ভিক্ষা গ্রহণ করে না!"

অল্পহাস্যে চাটুয্যে মশায় কহিলেন, 'বার্দ্ধক্যের জন্য ভুলটা আপনার হ'য়েছে; আর তামসী প্রকৃতিতে ওইটাই স্বাভাবিক। আপনার মুখ দিয়েই ওই শব্দটা বার হ'য়েছিল।'

ঐশ্বর্য্যের অহমিকা মানুষকে কতখানি অমানুষ করিয়া তুলিতে পারে, এই সত্তর বছর বয়েসে কাশীনাথ সেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইল না।

* * * *

অনন্ত প্রবাহমান কালস্রোত, অখণ্ড নিয়মে আবদ্ধ নিত্য উদয় অস্ত, অনেকগুলা বৎসরকে অতিক্রম করিয়া দিল।

কাশীনাথ এখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে উপস্থিত! সংসারে এখন দু'টি মানুষ, আপনি আর পৌত্রী। কাশীনাথ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, 'ভাবনা কারুর জন্য নয়; চিন্তামণি আমার সব চিন্তা কেড়ে নিয়েছেন। তবে মেয়েটা—'

প্রতিবেশী বা আত্মীয় কেহ কেহ হিতার্থে অযাচিত সৎ-পরামর্শ দিয়া থাকেন, 'বাঁড়ুয্যে মশাই, আর বাচ-বিচার নয়! মেয়ে যে আঠার পার হ'য়ে গেল।'

কমলা এক দিন আসিয়া বলিলেন, 'সকলকে খেয়ে হারাণী যেন কলাগাছের মত ফুলে উঠছে! তালুই মশায়, আপনি ওকে যেখানে পারেন, পার করে দিন।'

মৃদু হাস্যে কাশীনাথ উত্তর দিলেন, 'আমি কি পারের কর্ত্তা, মা? কাণ্ডারীর যে দিন ইচ্ছা হবে—'

কমলা ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিলেন। সতেজে প্রতিবাদ করিলেন, না, না, তালুই মশায়! ও আপনি কি ব'লছেন? ওর বয়সটা হিসেব ক'রেছেন, এই ফাল্গুনে যে উনিশে পড়লো বলে, "কুড়ি পারে বুড়ি!" আর আপনার তো ডাকের সময় হ'য়ে এলো—'

প্রসন্ন কণ্ঠে কাশীনাথ বলিলেন, 'ডাকের সময় অসময় নেই; তাঁর প্রয়োজন যখন যাকে। রজনীর ডাকই বা আটাশে এলো কেন? বৌমাই বা গেল কেন? ও-সব চিন্তা করি নে। হৈমর জন্যে ভাবনা নেই। চিন্তাহারী যা' করবেন।'

কমলা মুখখানা ভার করিয়া প্রস্থান করিলেন। মনে মনে শঙ্কিত হইলেন, 'ধেড়ে মেয়ের পারের ভারটা শেষে তাঁরই কাঁধে চাপিবে। ঠাকুর্দ্দাটা আর ক'দিন? অথচ তিনিও ছা-পোষা। এক দিন বটে বিশ্বাস ছিল, রূপের মূল্যেই এই রূপার বাজারে হারাণীকে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। আজ যৌবন-মধ্যাহ্নে সেই রূপ প্রস্ফুটিত শতদলের মত নয়নমোহন হইয়া বিকশিত! তবু কমলা নিশ্চিত বুঝিয়াছেন, কেবল রূপে চলিবে না, চাই রূপ-চাঁদ! ক্ষমতা তাহারই বেশী।

অনেক হাঁটাহাঁটি বকাবকি করিয়া অবশেষে কমলা হারাণীর জন্য একটি পাত্র স্থির করিতে সমর্থ হইলেন। পাত্র দ্বিতীয় পক্ষ; কিছু বয়েস না হইয়াছে এমন নহে; তবে পঞ্চাশের কোঠা পার হয় নাই, এটা নিশ্চিত। যদিচ একটা দৌহিত্রও দুইটি জামাতা হইয়াছে, এবং অচিরেই পুত্রবধূ হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান; তথাপি এ-কথা ভুলিলেও চলে না যে, সে এক জন বিশিষ্ট জমিদার, আর মেয়েটিও কচি খুকী নহে! দ্বিতীয় পক্ষের সংসারে স্বাধীন ভাবে চলিতে পারিবে। ইত্যাদি অনেক প্রকার অখণ্ডনীয় যুক্তি দেখাইয়া কমলা হৈমবতীর বিবাহের আয়োজনে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। শুভ কাজ শ্রাবণ মাসেই সম্পাদন করিবেন।

কাশীনাথ নীরব। হৈমবতী নিস্পন্দ। উৎসাহ কেবল কমলারই।

পাত্র বলিয়া পাঠাইলেন, শ্রাবণে তাঁহার সুবিধা হইবে না; কারণ, দেশের বাড়ীতে দুর্গোৎসব করিতে হয়। শ্রাবণ মাস হইতে তিনি সেখানে বসবাস করেন; দার-পরিগ্রহ অগ্রহায়ণে হইবে।

কমলা কহিলেন, 'কথা তো মিথ্যে নয়, তোর মেসো বিদেয় আনতে যান, তাই শুনতে পাই! সে কি ধুমধাম! বলেন, নন্দপুরের জমিদার-বাড়ীতে মহামায়ার পূজো—পূজো বটে! যাত্রা থিয়েটার সব কলকাতা হ'তে যায়! পাঁচখানা গ্রামের লোক খায়,—সে কি বিরাট ব্যবস্থা!'

মাটীর পুতুলের মত বসিয়া হৈমবতী সব শুনিয়া গেল।

হঠাৎ এক সময়ে কমলা কহিলেন, 'হ্যাঁ রে হারাণী! তোর সেই চাটুয্যেদের মনে আছে? ওরা বাপু তোর কথা জিজ্ঞেসা করে! সেই যে,—যারা কুমারী পূজো করতে তোকে নিয়ে গেছলো—'

হৈমবতী রুদ্ধ-নিশ্বাসে মাসীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বোনঝির প্রশ্নভরা নেত্রযুগলের দিকে চাহিয়া কমলা গল্প জুড়িলেন, 'ও বছর সধবা কর্ত্তে আমাকে

নিয়ে যায়। তাই গিন্নীর সঙ্গে কথা হোলো, বল্লে—"বোন: সুখ পাব বল্‌লেই কি সুখ পাওয়া যায়? এ বিয়েতে ছেলের তেমন মত ছিল না; কেবল কর্ত্তার জেদ! বলেন, ভদ্দর লোককে কথা দিয়েছি। আমার কথা খেলাপ হ'লে আমি ওকে তেজ্যপুত্তুর করব। এত রাগ কখন দেখিনি, আমি তো ভয়ে কাঠ ভাই! পঞ্চাশ হাজার টাকা তো কম নয়! কর্ত্তা বলেন,—কিছুতেই ছাড়ব না। কেমন যেন গোঁ ধরলেন—ওই মেয়েই বউ করব। আমি কত ঠাকুর-দেবতা মানত করতে রইলুম, শেষে ছেলে মত দিলে। এখন সেই ছেলের মুখের দিকে চাইলে বুকটা আমার ফেটে যায়। কিন্তু, অসি আমার মহাদেব। ভক্তি সে-দিন আমায় বলছিল,—মা, মন অন্তর্যামী, তাই দাদার মনটা এ-বিয়েতে এত বেঁকেছিল।"—বলিয়া পানের পিচ ফেলিয়া কমলা কহিলেন,—আমি বল্লুম, "কেন, বউটি বুঝি তেমন সুন্দর নয়?"

'গিন্নী বল্লে,—"সে সব কিছু নয় বোন! নাতনীটি হবার পরই বৌমার বড্ড ভারী ব্যামো হলো। তাইতে পা'দুটো প'ড়ে গেছে। মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে। শুনলুম, ওর দিদিমা পাগল ছিল। এক মাসীর মাথার ছিট আছে। খোকা কত দেশ-বিদেশ বৌমাকে নিয়ে ঘুরছে; কিন্তু ভাল হচ্ছে কই" ?'

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হৈমবতী কহিল, 'আহা!'

'তাই ওর কাকী বল্লে, "ছেলের বিয়েতে বড়বাবু পঞ্চাশ হাজার টাকা নিলেন; কথায় বলে কুটুমের ধন! অসিত তো লাখ টাকা বৌমার চিকিৎসায় খরচ কর্ল্লে! ব'লেছিল, আবার সুইজারল্যাণ্ডে নিয়ে যাবে। তাই নিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে রাগারাগি কাণ্ড! বড়বাবু বলেন, এ রাজসূয় কি অশ্বমেধ নয়। এ তো জ্যান্ত শনি ঘাড়ে চাপা! সর্ব্বস্বান্ত হবি না কি?—অসি উত্তর দেয়, নারায়ণ সাক্ষী ক'রে যার ভার গ্রহণ করেছি; নিজের শেষ কপর্দ্দক দিয়েও তাকে ভাল করবার চেষ্টা করব। সেই আমার ধর্ম্ম। সিমলে, মুসৌরী, নৈনিতাল—সব ঘুরছে। যুদ্ধ বেধেছে ব'লে আর ওদিকে যাওয়া হয়নি"।'

'দাদুকে মকরধ্বজটা দিয়ে আসি মাসীমা!' বলিয়া হৈমবতী উঠিয়া গেল।

সে-দিন সকল কাজ-কর্ম্মের মাঝে হৈমবতী কেমন বারে বারে অন্যমনস্ক হইতে লাগিল। একটা অপরিচিতা, রুগ্না, অর্দ্ধ-উন্মত্তা বধূকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মনের চিন্তার স্রোত এক অজানা পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে জীবনযাত্রার সহিত সে কস্মিন কালেও পরিচিত নয়; মাসীমার মুখশ্রুত গল্পটির মধ্য দিয়া তাহার কল্পনা যেন সে সকলই প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। অন্তরমধ্যে যেন নূতন স্বপ্ন জাগিয়া উঠিল। হৈমবতীর কেবলই মনে হইতে লাগিল—একবার ছুটিয়া গিয়া সে সেই জ্ঞানহীনা পঙ্গু বধূটিকে দেখিয়া আসে। এক দিন হয় তো তাহার দেহে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মণিমাণিক্য ধরিত না! আজ হয় তো কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ন্যায় সে সকল ক্ষয়প্রাপ্ত—মলিন; তবু গর্ব্ব করিবার মত এক অমূল্য সম্পদ ভগবান তাহাকে দিয়া রাখিয়াছেন; দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তাহার অপূর্ব্ব সৌভাগ্য যেন দীপ্ত প্রোজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় তাহাকে বিভূষিত করিতেছে। কতখানি তপস্যার জোরে এত বড় সৌভাগ্য নারী লাভ করিতে পারে!

ভাদ্র মাস কাটিতেই, বরপক্ষ হইতে পত্র আসিল,—অগ্রহায়ণের প্রথমে বিবাহের সুবিধা হইবে না। কারণ, মধ্যম কন্যার প্রসব-সম্ভাবনায় তাহাকে লইয়া তিনি পূজার ত্রয়োদশীতে ভুবনেশ্বর যাইবেন; কিন্তু উদ্বেগের কোন প্রয়োজন নাই। অগ্রহায়ণের শেষভাগেই নিশ্চিত শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

সংবাদটা শুনিবামাত্র একটা দায় অব্যাহতির মত হৈম হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কাশীনাথের অন্তর মথিত করিয়া একটা নিশ্বাস পড়িল।

* * * * *

শরতে সোণালী আলোর ছোপ আকাশে লাগিয়াছে। পূজার উল্লাস বাংলার কুটীরে—প্রাসাদে সর্ব্বত্রই সোণালী রংএর তুলি বুলাইয়া দিয়াছে।

হৈমবতী পিতামহের বিছানাটা পূবের বারান্দাতে পাতিয়া দিল।

কাশীনাথের আজ ক'দিন জ্বর, উঠিতে পারেন না। হৈমবতী হাত ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে সেই শয্যায় শোয়াইয়া কাছে বসিল।

কাশীনাথ কহিলেন, 'আজ দুর্গা অষ্টমী; একখানা নতুন কাপড় পরিসনি দিদি!'

হৈমবতী হাসিল, 'হবে এখন দাদু'—

—"না, না রে দিদিমণি তা হবে না। তুই এক্ষুনি নূতন কাপড় প'রে আয়! আমি যে নগেনকে তোর শাঁখা, রুলী, আল্‌তা সব আনতে দিয়েছিলুম—আনেনি?'

নতমুখে হৈম কহিল, 'এনেছে দাদু, তোমার যে অসুখ!'

'হোক না অসুখ; তুই সেজে আয়; আলতা প'রে, কাপড় প'রে আয়, আমি দেখি।'

হৈমবতী উঠিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে পিতামহের নির্দ্দেশমত শাঁখা, রুলী, নববস্ত্র, আলতা প্রভৃতিতে সাজিয়া কাশীনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; মৃদু হাসিয়া কহিল, 'দেখ দাদু।'

—'দেখি দিদি।'—কাশীনাথ নীমিলিত চক্ষু মেলিলেন। স্নেহাপ্লুত নেত্রে হৈমবতীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'এই তো আমার মা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি! ওরে, এবার আমি উঠে গিয়ে মহামায়াকে দেখতে পাব না; সেই গিরিকন্যা হ'য়ে তুই আমাকে দেখা দিয়েছিস!'

নিম্নতল হইতে আহ্বান আসিল, 'কাশীনাথ বাবু!'

হৈমবতী চমকিয়া উঠিল,—'কে ডাকে দাদু!'

কাশীনাথের কর্ণে সে কথা পশিল না। অর্দ্ধ আচ্ছন্নের মত মৃদুস্বরে তিনি আবৃত্তি করিতেছিলেন,

'তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নব-যৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্।
সুচারুদর্শনাং—'

কপালে হাত দিয়া হৈমবতী কহিল, 'দাদু, তোমায় কে ডাকচে!'

কাশীনাথ চক্ষু মেলিয়া কহিলেন, 'কোথা দিদি!'

নিম্নতল হইতে পুনর্ব্বার ডাক আসিল, 'কাশীনাথ বাবু বাড়ী আছেন?'

হৈমবতী রেলিঙের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিল, 'দাদু অসুস্থ; আপনার কি প্রয়োজন?'

তুষার-কীরিটশোভিত হিমালয়ের মত শুভ্রকেশ ভদ্রলোক কহিলেন, 'আমি রামশরণ চাটুয্যে! তাঁর সঙ্গে কি দেখা হবে না?'

হৈমবতী চমকিয়া উঠিল! 'দাদু! সেই চাটুয্যে মশায় যে! ও মা, এরই মধ্যে এত বুড়ো হ'য়েছেন! চিন্‌তে পারিনি।'

কাশীনাথ সবিস্ময়ে কহিলেন, 'তিনি? তিনি কেন গরীবের কুঁড়েতে! যা দিদি, তাঁকে নিয়ে আয় এখানে।'

দ্বিধা-জড়িত স্বরে হৈমবতী কহিল, 'আমি?'

—'তা হোক দিদি, সঙ্কোচ কর না! অতিথি নারায়ণ—'

কম্পিত পদে দুরু-দুরু বুকে হৈমবতী নিম্নতলে নামিয়া আসিল। চাটুয্যে মশায়ের সম্মুখে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই, তিনি কহিলেন, 'হয়েছে, হয়েছে মা! আমায় তোমার দাদুর কাছে নিয়ে চলো।'—বলিয়া তিনি হৈমবতীর হাতটা ধরিলেন।

হৈমবতীর হাত ধরিয়া রামশরণ চাটুয্যে—যাঁহাকে কোটিপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তিনিই আসিয়া এক অশীতিবর্ষ জীর্ণতনু ব্রাহ্মণের অর্দ্ধমলিন শয্যার একপ্রান্তে উপবেশন করিলেন; বিনীত কণ্ঠে কহিলেন,—'বাঁড়ুয্যে মশায়, আজ আপনার নিকট আমি একটি ভিক্ষার জন্য এসেছি।'

কাশীনাথ ব্যস্তভাবে উঠিয়া বসিলেন। তাকিয়াটিকে আশ্রয় করিয়া কহিলেন, 'ও কি কথা? ও কি বলছেন! আপনি ধনী মানী কমলার বরপুত্র—'

বাধা দিয়া রামশরণ কহিলেন, 'না, না, ও কথা নয়। এক লহমায় আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলেছে! আমি সুস্পষ্ট উপলব্ধি ক'রেছি,—আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ভিন্ন মানুষের বড় রক্ষা-কবচ আর কিছুই নেই। আর সেই আশীর্ব্বাদ উত্থিত হয়—অনাবিল তৃপ্তি, অকলুষ আনন্দের আকর থেকে। জানেন, আমি কত বড় ধাক্কা খেয়েছি?'

অবাক হইয়া কাশীনাথ চাহিয়া রহিলেন।

চাটুয্যে মশায় কহিলেন, 'জয়রামপুর ষ্টেশনের কাছে ঢাকা মেলের দুর্ঘটনার সংবাদ জানেন? হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলুম, জগৎ আমার অন্ধকার হ'য়ে গেছে। আনন্দের সূর্য্য চির-অস্তমিত!'—তিনি কপালের ঘাম মুছিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, 'আমার ছেলে বউ সেই ট্রেণেই ঢাকা থেকে আসছিল। ওঃ! আমি পাগল হয়ে গেছলুম।'

রুদ্ধ-নিশ্বাসে কাশীনাথ চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বাক-নিষ্পত্তি হইল না।

হৈমবতীর মুখখানা শোণিত-লেশহীন মৃতের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গেল।

চাটুয্যে মশায় সেই পাংশু বদনমণ্ডলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'ভয় নেই মা! এক দিন তোকে পূজো করেছিলুম, সে পূজো মহামায়া যথার্থই গ্রহণ ক'রেছিলেন! তাই আমার নয়ন-মণি রক্ষা পেয়েছে। গাড়ীখানা ভেঙে চূর্ণ হ'লেও, দৈববলে অসি নিরাপদ; কিন্তু বৌমা আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন।'

কাশীনাথ ব্যাকুল স্বরে কহিলেন, 'মারা গেছেন?'

চাটুয্যে মশায় কহিলেন, 'হ্যাঁ, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। অসিত ভয়ানক শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু সতী-হারা শিবকে হৈমবতীই সংসারী করতে পেরেছিলেন। আমি ভিক্ষা চাইচি সেই হৈমবতীকে—'

* * * *

রাস্তায় তখন এক ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিয়া যাইতেছিল,—

—'তোর কনকচাঁপা-বরণ গৌরী,
ক্ষ্যাপায় করে সংসারী—'

শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী

আগমনী

বাজে বাঁশী বাজে কাঁসী ঢোল,
বাঙ্গালার পূজাঙ্গনে বোধন-শানাই সনে
উঠে আজ রোদনের রোল।
কেহ হারায়েছে পতি কেহ সুত, কেহ সতী,
কেহ ভ্রাতা বছর ভিতর।
কারো বা খাটিয়ে-ছেলে ভুল ক'রে গেছে জেলে,
জ্বরে কারো স্বামীটি কাতর।
কোথাও বা বন্যা এসে ফসল গিয়াছে ভেসে,
তার সাথে সব আশা সাধ,
কোথাও পড়েনি বৃষ্টি পড়েছে শনির দৃষ্টি,
শ্রাবণেও হয়নি আবাদ।

যত দাবি পূজার সময়,
চারিদিকে দেনাদায় সবাই পাওনা চায়,
তবু পূজা করিতেই হয়।
আনন্দময়ীর পূজা বলিয়া যায় না বুঝা,
আয়োজন অতি সাধারণ।
দুঃখিনী সংবরি শোক এক হাতে মুছি চোখ
অন্য হাতে ঘসিছে চন্দন।
আলিপনা দিতে তার হাত কাঁপে বার বার,
দীর্ঘশ্বাস নৈবেদ্যের 'পরে।
চাহিতে প্রতিমা পানে কাঁপে বুক অভিমানে,
রুদ্ধ ক্ষোভে আঁখি জলে ভরে।

জিজ্ঞাসি মা তোরে দশভূজা,
কত কাল এইরূপে বেদনার দগ্ধ ধূপে
নিবি তুই দুঃখীদের পূজা?
মহোৎসবে মাতোয়ারা সুখী যারা, পূজে তারা
নিজেদেরি ষোড়শোপচারে,
তারা ত পূজে না তোরে, পূজা নিস্ জোর ক'রে
শুধু তুই দুঃখীদের দ্বারে।
যারে তুই দুঃখ দিস্ সম্বল কাড়িয়া নিস্,
তারই পূজা পাস্ তুই এসে;
হয় দুঃখ দূর কর নয় তুই এর পর
আসিস্ না এ অভাগা দেশে।

শ্রীকালিদাস রায়।

আর কিছুকাল পরে

(নক্সা)

১

"নারীশক্তি" মাসিক কাগজের আফিসে সম্পাদিকা বেলা দেবী একটা প্রবন্ধের প্রুফ-সংশোধন করিতেছিলেন ; এমন সময়ে বাইশ তেইশ বৎসর বয়স্কা একটি যুবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রৌঢ়া সম্পাদিকা যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "কি চান ?"

যুবতী সবিনয়ে বলিল, "সম্পাদিকা বেলা দেবীর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

"বসুন। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি হাতের এই কাজটা সেরে নিয়ে আপনার কথা শুনব।" এই বলিয়াই তিনি প্রুফ-সংশোধনে মনোনিবেশ করিলেন ; যুবতী একখানি চেয়ার টানিয়া-লইয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিল। প্রায় সাত মিনিট পরে বেলা দেবী হাতের কাজ শেষ করিয়া কলিং-বেল্ টিপিবামাত্র "হুজুর" বলিয়া এক জন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক পর্দ্দা সরাইয়া কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইল। বেলা দেবী তাহার হাতে প্রুফের কাগজগুলি দিয়া বলিলেন, "প্রিন্টার বিবিকো দেও, আউর পুছো, আজ আউর প্রুফ হোগা কি নেহি ?" সে "যো হুকুম" বলিয়া প্রুফ লইয়া প্রস্থান করিলে বেলা দেবী তাঁহার 'সিগার-কেস' হইতে চুরুট বাহির করিয়া মুখে দিলেন, এবং দাঁত দিয়া চুরুটটি চাপিয়া-ধরিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিতে করিতে যুবতীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন, "আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন ?"

যুবতী কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "একটা লেখা এনেছিলেম, যদি অনুগ্রহ ক'রে আপনার কাগজে ছাপেন।"—এই বলিয়া পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিল।

বেলা দেবী কাগজখানা লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "কি করেন আপনি ?"

যুবতী বলিল, "আমি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়ি।"

যুবতী ছাত্রাবস্থা এখনও অতিক্রম করে নাই জানিয়া বেলা দেবী তাহাকে "তুমি" বলিয়াই সম্বোধন করিলেন ; বলিলেন, "তোমার নাম কি ?"

যুবতী বলিল, "কুমারী বীরাঙ্গনা সেনাপতি।"

"সেনাপতি ? বাঙ্গালীর পদবী সেনাপতি ত শুনিনি ! তোমার বাড়ী কোথায় ?"

"আমাদের আদিবাস উড়িষ্যায়। পাঁচ-ছয় পুরুষ আমরা কলিকাতাতে বাস করিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছি।"

বেলা দেবী, যুবতীর হাত হইতে কাগজখানা লইয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! এ যে কাব্যি ! প্রেমের কবিতা ! তোমার বয়স ত বোধ হয় কুড়ি কি বাইশ ; এরই মধ্যে প্রেমে প'ড়েছ না কি ?"

যুবতী নীরবে বসিয়া রহিল। বেলা দেবী মনে মনে কবিতাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, "তোমার লেখা ত মন্দ নয় ! একটু মেজে-ঘষে নিলে চ'লতে পারে।"

উৎসাহিত হইয়া যুবতী বলিল, "আমার লেখা কবিতা 'পথের ধুলো' 'ঝরাপাতা' 'চন্দ্রিকা' প্রভৃতি মাসিক কাগজে মাঝে মাঝে ছাপা হয়। আমার কয়েক জন বন্ধু ও বান্ধবী গত কয়েক মাস ধ'রে "নারীশক্তিতে" লেখা

দেবার জন্য বড়ই অনুরোধ ক'রে আস্‌ছেন; সেই জন্যই সাহস ক'রে আপনার কাছে এসেছি।"

"তা বেশ করেছ, লেখাটা আমার কাছে থাকুক। দেখি, একটু-আধটু অদল-বদল ক'রে যদি আগামী মাসের কাগজে দিতে পারি। তোমার কবিতা যা দেখলেম, তাতে মনে হয়, তোমার পার্ট্‌স আছে, চর্চ্চা রাখলে ভবিষ্যতে নাম করতে পারবে।"

"আপনার কাছে আমার আর একটা নিবেদন আছে।"

"কি বল।"

"ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকার দিকে আমার খুব ঝোঁক আছে। ইস্কুলে ম্যাপ আঁকাতে আমি প্রতি বৎসর ফার্ষ্ট হ'তেম। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজেও ড্রয়িংএ আমি সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পাই। আপনার "নারীশক্তিতে" যে সকল ছবি ছাপা হয়, তার মধ্যে "সবিতার" আঁকা ছবি আমার বড় ভাল লাগে। আমার বড় ইচ্ছা, সেই সবিতার সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু তাঁর পুরা নাম বা ঠিকানা জানি না। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে তাঁর পুরা নাম ও ঠিকানাটা..."

"জানতে চাও? কিন্তু নাম-ঠিকানা জান্‌লেও তুমি তাঁকে ধরতে পারবে না। তিনি সর্ব্বদা আপনাকে গোপনে রাখতে চান, কারও কাছে ধরা দিতে চান না। অবশ্য "সবিতা" তাঁর প্রকৃত নাম নয়, তাঁর ছদ্মনাম। তুমি যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রতে চাও, তাহ'লে আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে এক দিন তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিতে পারি। তবে দু'-এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সময় ক'রে উঠতে পারব না। এ মাসের কাগজটা বেরিয়ে যাক্, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এক দিন যাওয়া যাবে। তোমার লেখা যদি এই রকম ছোট ছোট কবিতা আরও থাকে, আমাকে দেখিয়ো, যদি সম্ভব হয়, তা' থেকে দুই-একটা সিলেক্ট ক'রে কাগজে দেব। তোমাকে বোধ হয় কলেজের বোর্ডিং-এ থাক্‌তে হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কলেজের কম্পাউণ্ডের বাইরে যাবার হুকুম নেই।"

"আজ কি ক'রে এলে তবে?"

"এখন লং-ভেকেশনে কলেজ বন্ধ। এখন বাড়ীতেই আছি।"

"তোমার বাড়ীতে কে আছেন?"

"মা, বাবা, বৌদি, দাদা, আর আমার ছোট বোন নৃমুণ্ডমালিনী।"

"তোমার মা কি করেন?"

"মা পূর্ব্বে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, বছর-দুই হ'ল পেন্সন নিয়েছেন। বৌদি' আলিপুরে ওকালতি করেন।"

বেলা হাসিয়া বলিলেন, "তাহ'লে তুমি বেশ রেস্পেক্‌টেব্‌ল্ ফ্যামিলির মেয়ে। তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে খুসী হলেম। মাঝে মাঝে, সুবিধা হ'লে, এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে আনন্দিত হব।"

বীরাঙ্গনা দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে বলিল, "আপনার কাছে এতটা অনুগ্রহ পাব, আমি আশা করিনি। আচ্ছা, আমি তাহ'লে এখন যাই।"—এই বলিয়া নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

বীরাঙ্গনা প্রস্থান করিলে, বেলা সেই কবিতার কাগজখানা লইয়া আর এক বার মনে মনে পাঠ করিয়া দুই এক স্থানে একটু-আধটু পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কলিং-বেল টিপিলেন। "হুজুর" বলিয়া সেই হিন্দুস্থানী রমণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে বেলা বলিলেন, "প্রিণ্টার বিবিকো সেলাম দেও।"

ক্ষণকাল পরে "নারীশক্তির" প্রিণ্টার শ্রীমতী সত্যভামা চক্রবর্ত্তী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে বেলা বলিলেন, "দেখুন ত, এই কবিতাটা এ-মাসে যেতে পারে? যায়গা হবে?"

প্রিণ্টার কবিতাটার লাইন গণিয়া বলিলেন, "তা হ'তে পারে।"

"তবে এটা কম্পোজ করতে দিন। আর কোন কাপি চাই কি?"

"না, আর দরকার হবে না। শেষে যদি কম পড়ে, সেই ক্রমশঃ উপন্যাসটা থেকে খানিকটা দিয়ে দেব।"

"তাই করবেন। আমি এখন উঠলেম, পাঁচটার সময় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'ভেল্-দিগ্-দিগ্' ফাইন্যালে আমাকে প্রিজাইড ক'রতে হবে।"

প্রিণ্টার বলিলেন, "আমারও একখানা কার্ড আছে। দেখি, যদি পারি ত আমিও যাব।"

"যদি যান্ ত আর দেরী করবেন না, চারটে বেজে গেছে।"—এই বলিয়া বেলা দেবী আর একটা চুরুট ধরাইয়া ওভার-কোট ও ছড়ি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে প্রিণ্টার অন্য দ্বার দিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

২

শ্রদ্ধানন্দ পার্ক লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণের স্থান নাই, হাজার হাজার বালিকা বালক, যুবতী যুবক, প্রৌঢ়া প্রৌঢ়, সকলেরই চেষ্টা ভিড় ঠেলিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রের পার্শ্বে উপস্থিত হয়। পার্কের চতুর্দ্দিকে যে সকল অট্টালিকা আছে, তাহার ছাদে এবং দ্বিতল, ত্রিতল ও চতুর্থ তলের প্রত্যেক বাতায়নে শত শত পুরুষ সমবেত হইয়া আগ্রহসহকারে পার্কের দিকে চাহিয়া আছে। পথের পার্শ্বে সারি সারি ঘোড়ার গাড়ী, তাহার ছাদে শত শত নিম্ন-শ্রেণীর যুবতী-যুবক ও কিশোরী-কিশোর দাঁড়াইয়া আছে।

আজ এই খেলা দেখিবার জন্য এত আগ্রহের কারণ, অদ্যকার এই খেলায় এক দল তরুণ তরুণীদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বিশ-পচিশটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে একে একে পরাস্ত করিয়া ভবানীপুরের "যুবা-সপ্তক" দল, এবং বহুবাজারের "নারীবাহিনী" দল ফাইনাল বা শেষ-প্রতিযোগিতায় পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। "নারী-বাহিনী" এ বৎসর ফুটবল খেলায় একটা গোরা দলকে পরাস্ত করিয়া "শিল্ড" পাইয়াছে। আজিকার খেলা যদিও ফুটবল নয়, ভেল-দিগ-দিগ, তথাপি, পাছে পরাজয় হয়, সেই আশঙ্কায় নারী-বাহিনীর প্রত্যেক খেলোয়াড়ই তাহাদের অর্জ্জিত গৌরব রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া খেলার মাঠে উপস্থিত হইয়াছে। ও-দিকে "যুবা-সপ্তকের" খেলোয়াড়গণও, পুরুষেরা যে শারীরিক শক্তিতে ও ক্রীড়ানৈপুণ্যে নারীর সমকক্ষ হইতে পারে,—তাহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য জীবন পণ করিয়াছে।

পাঁচটা বাজিতে দশ মিনিটের সময় অদ্যকার নির্ব্বাচিত সভানেত্রী "নারীশক্তি" সম্পাদিকা শ্রীমতী বেলা দেবী ধীর-গম্ভীর পদক্ষেপে ক্রীড়াক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পার্কের প্রবেশদ্বার হইতে চন্দ্রাতপের নীচে সভাপতির আসন পর্য্যন্ত পথের দুই পার্শ্বে স্বেচ্ছাসেবিকা-গণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিল; তাহারা সভানেত্রীকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিল। সভানেত্রী সভাস্থলে উপস্থিত হইবামাত্র, সভায় উপবিষ্ট ভদ্রমহিলারা ও পুরুষেরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পরিচিত কয়েক জন প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলে বেলা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ পূর্ব্বক রিষ্টওয়াচের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রীড়াক্ষেত্রের সেক্রেটারীকে বলিলেন, "এখনও তিন মিনিট সময় আছে।"

ইত্যবসরে উভয় পক্ষের খেলোয়াড়েরা নিজ নিজ দলের নির্দ্দিষ্ট ক্রীড়া-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া মাঠের মধ্য-স্থলে সমবেত হইল। পুরুষ খেলোয়াড়দের পরিচ্ছদ—কৃষ্ণবর্ণ হাফপ্যাণ্ট ও শ্বেতবর্ণের গেঞ্জি। নারীবাহিনীর পরিচ্ছদ—লাল হাফপ্যাণ্ট, কালো-সাদা ডোরা-কাটা গেঞ্জি। পুরুষ খেলোয়াড়দের মাথায় দুই পার্শ্ব ও ঘাড়ের দিক কামানো, কপালের উপরে সম্মুখে প্রায় আধ হাত লম্বা চুল। নারীবাহিনীর অনেকেরই 'বব্ হেয়ার' কয়েক-জনের কুঞ্চিত অলকের মুকুট! খেলোয়াড়দিগের বয়স অন্যূন আঠার এবং অনধিক তেইশ।

উভয় দল নিজ নিজ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে রেফারি মিস্ মা-থিন (বর্ম্মিজ) একটা টাকা লইয়া "টস্" করি-লেন, এবং হাত-ঘড়ির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বংশীধ্বনি করিবামাত্র খেলা আরম্ভ হইল।

যুবা-সপ্তকের শেফালী ওরফে শেফালীন্দু খাস্তগীর যেমন শক্তিশালী তেমনই কৌশলী, সে যে-কোন যুবতীর সহিত সকল প্রকার ক্রীড়ায় প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। যুবা-সপ্তকের অন্যান্য খেলোয়াড়দিগকে নারী-বাহিনীর অধিকাংশ খেলোয়াড় গ্রাহ্যই করে না। খেলা আরম্ভ হইলে, শেফালীই সর্ব্বাগ্রে নারী-বাহিনীর কোটে খেলা দিতে গেল। নারী-বাহিনীর রমেশ-নন্দিনী, সহসা শেফা-লীর উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল; কিন্তু শেফালী বিদ্যুদ্বেগে তাহার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের কোটে প্রবেশ করিল, রমেশ 'মরিয়া' বসিয়া রহিল।

তাহার পর নারী-বাহিনীর বীরেন্দ্রকুমারী খেলা দিবার জন্য বিপক্ষের কোটে প্রবেশ করিল। সে শত্রু-পক্ষের কোটে বাঁ-দিক চাপিয়া খেলা দিতেছিল; তাহার

ডান দিকের তিন-চারি জন যুবা তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য সতর্কভাবে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাদের দলের এক জন বীরেন্দ্রের পশ্চাৎ হইতে উভয় হস্তে তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহাকে উল্টাইয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। সে মুক্তিলাভের চেষ্টায় উঠিবার পূর্ব্বেই আর দুইটি যুবক তাহাকে সবলে আটকাইয়া রাখিল। কুমারী বীরেন্দ্র প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও

নারী-বাহিনীর বীরেন্দ্রকুমারী খেলা দিবার জন্য বিপক্ষের কোটে প্রবেশ করিল

তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না; তাহাকেও নিজের কোটে আসিয়া 'মরিয়া' বসিয়া থাকিতে হইল!

বীরেন্দ্রকুমারী 'মোর' হইল দেখিয়া যুবা-সপ্তকের উৎসাহ প্রবল হইল; তাহারা বে-পরোয়া ভাবে খেলিতে লাগিল। নারী-বাহিনীর অনঙ্গমোহিনী একটু স্থূলাঙ্গী; সেই জন্য খেলার সময় বিশেষ ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিতে পারিত না বটে, কিন্তু সে কাহারও ঘাড়ে পড়িয়া তাহাকে একবার জাপটাইয়া ধরিলে ধৃত খেলোয়াড় প্রাণপণ চেষ্টাতেও আপনাকে মুক্ত করিতে পারিত না। অনঙ্গ ভল্লুকের মত সুদৃঢ় আলিঙ্গনে প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়কে আবদ্ধ করিত বলিয়া সকলে তাহাকে "অনি-ভালুকো" নামে অভিহিত করিত। অনঙ্গ বিপক্ষের কোটে খেলা দিতে যাইত না, নিজের কোটে থাকিয়া সমাগত প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়কে আটক করিতে তাহার সমকক্ষ আর কেহই ছিল না। বীরেন্দ্রকুমারী 'মরিয়াছে' দেখিয়া অনঙ্গর রোখ বাড়িয়া গেল; সে উপর্য্যুপরি বিপক্ষ দলের তিন জন খেলোয়াড়কে নিজেদের কোটে ভূতলশায়ী করিয়া 'মারিয়া' রাখিল। রমা ও বীরেন্দ্র 'বাঁচিয়া' উঠিল। যুবক-সপ্তকের তিন জন 'মরিয়া' খেলিবার অধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় অবশিষ্ট চারি জন খেলোয়াড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

খেলা শেষ হইয়া আসিল। নারী-বাহিনী দুই বাজি জিতিয়াছিল; যুবা-সপ্তক অনেক কষ্টে শেষ মুহূর্ত্তে একটা বাজি শোধ দিল, নারী-বাহিনীর কাছে তাহাদের এক বাজি পরাজয় হইল। খেলার নির্দ্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইলে রেফারি বংশীধ্বনি করিয়া খেলা বন্ধ করিয়া দিলেন; তখন স্বেচ্ছাসেবিকারা সভানেত্রীর মঞ্চের দিকে জনতার অগ্রগমনে বাধা দিবার জন্য মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিল। সেই ব্যূহের মধ্যে উভয় দলের খেলোয়াড়, কাপ্তেন এবং রেফারি ব্যতীত আর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিল না। সভানেত্রীর সম্মুখস্থ টেবিলের উপর একটা বড় ও একটা ছোট রৌপ্যদণ্ডে বিলম্বিত বিজয়-পতাকা, সাতখানা বড় ও সাতখানি মাঝারি মেডেল, এবং একখানা অক্ষ-

আকৃতির বড় মেডেল ছিল। জনতার কোলাহল কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে সভানেত্রী দণ্ডায়মান হইয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, অদ্যকার এই ভেল্-দিগ্-দিগ্ প্রতিযোগিতায় নারীবাহিনী জয়লাভ করিয়া আপনাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আপনারা সকলেই জানেন যে, এ বৎসর এই নারীবাহিনী একাধিক গোরা সেনাদলকে ফুটবল খেলায় পরাস্ত করিয়া সুবিখ্যাত 'শিল্ড' লাভ করিয়াছে। শিল্ড-বিজয়ী নারীবাহিনী যে 'ভেল্-দিগ্-দিগ্' খেলাতেও জয়ী হইয়াছে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। যুবা-সপ্তক দল যে পুরুষ হইয়াও এই খেলার শেষ প্রতিযোগিতা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা তাহাদের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। তাহাদের এই কৃতিত্ব হইতেই সপ্রমাণ হইয়াছে যে, পুরুষরা চেষ্টা করিলে সকল প্রকার শ্রমসাধ্য খেলায় রমণীর সমকক্ষ হইতে পারে। অদ্য যে খেলা আপনারা দেখিলেন, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, সুযোগ ও উৎসাহ পাইলে পুরুষরা শারীরিক শক্তিতে, সাহসে এবং ক্ষিপ্রকারিতায় মহিলাদের সমকক্ষ হইতে পারে। বোধ হয় আপনারাও আমার এই অভিমতের সমর্থন করিবেন। কিছু দিন পূর্ব্বে, শ্যামবাজারে একটা মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায়, এক জন যুবককে, এক যুবতীর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। আমি আশা করি যে, এইরূপ ক্রীড়ার দ্বারাই পুরুষরা অদূর ভবিষ্যতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গুণ্ডানীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে। আমি দেখিতে পাই, এখনও কলিকাতার পথে-ঘাটে ভদ্র যুবকরা এক জন নারী অভিভাবিকার সঙ্গ না হইলে বিচরণ করিতে সাহস করে না। পুরুষদিগের এই সঙ্কোচ, এই নির্ভরশীলতা ত্যাগ করিতে হইবে। আমি য়ুরোপে দেখিয়া আসিয়াছি, পুরুষরা ঠিক নারীর মতই স্বাধীন ভাবে রেলে, ষ্টীমারে, বাসে, এরোপ্লেনে বিচরণ করে। তাহাদের ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই। আমাদের দেশের পুরুষদিগকে, বিশেষতঃ, যুবক ও কিশোরদিগকে আমি তাহাদের পাশ্চাত্য ভ্রাতাদিগের ন্যায় স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল দেখিতে চাই। আমি আশা করি, আগামী বৎসরে এই যুবা-সপ্তক এই প্রতিযোগিতায় নারীদিগকে পরাস্ত করিয়া শিল্ড লাভ করিবে!

সভানেত্রী দণ্ডায়মান হইয়া ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ……"

ঘন ঘন করতালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ করিয়া সভানেত্রী মহাশয়া নারীবাহিনীর সাত জন যুবতীকে সাতখানা বড় মেডেল, তাহাদের কাপ্তেনকে 'কাপ', এবং যুবক-সপ্তককে সাতখানা ছোট মেডেল প্রদান করিলেন; পরে উভয় পক্ষের কাপ্তেনের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক নারীবাহিনীর কুমারী বিজয়বালা চৌধুরীকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের বিশেষ মেডেল ও ক্লাবের জন্য বিজয়-নিশান প্রদান করিলেন।

—বিজয় আজিকার খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

৩

"নারীশক্তির" পরবর্ত্তী সংখ্যাতেই বীরাঙ্গনার কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় সে আনন্দে আত্মহারা হইল। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্র, যে পত্রে খ্যাতনামা লেখিকা ও লেখক ব্যতীত অন্য কাহারও লেখা প্রকাশিত হয় না, সেই "নারীশক্তিতে" ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের একটি নবীনা ছাত্রীর কবিতা প্রকাশিত হইবে, ইহা বীরাঙ্গনার কল্পনারও অতীত ছিল। কবিতার পাণ্ডুলিপির নিম্নে বীরাঙ্গনার নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। কবিতাটি ছাপা হইলে, বেলা দেবী বীরাঙ্গনার বাটীর ঠিকানায় একখণ্ড "নারীশক্তি" পাঠাইয়া দিলেন। কবিতাটি যে সেই মাসের কাগজেই প্রকাশিত হইবে, বীরাঙ্গনা সে আশা করে নাই; তাই যখন সে "নারীশক্তি" খুলিয়া তাহার কবিতাটি দেখিতে পাইল, তখন আনন্দে অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার বৌদিদিকে দেখাইতে গেল। বৌদিদি—প্রেমকুমারী তখন আহারান্তে আদালতের পোষাক পরিয়া সিগারেটের ধূমপান করিতেছিলেন: বীরাঙ্গনা হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহার কাছে গিয়া বলিল —"বৌদিদি, এই দেখ। তুমি বলেছিলে "নারীশক্তি"তে আমার লেখা ছাপা হবে না—এই দেখ, ছাপা হ'য়েছে।"

প্রেমকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "সত্যি না কি? "নারীশক্তি"র কবিতার এমন দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে যে, শেষে তোর কবিতা ছেপে কাগজ পুরাতে হ'ল?"

বীরাঙ্গনা সেই দিনই আহারাদির পর তাহার কবিতার খাতা লইয়া "নারীশক্তি" কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বেলা দেবী সহাস্যে বলিলেন, "কাগজ পেয়েছ? তোমার কবিতা ছাপা হ'য়েছে ব'লে খুব আহ্লাদ হ'য়েছে, কেমন?"

বীরাঙ্গনা বলিল, "আমি আশা করিনি যে, এই মাসেই ছাপা হবে।"

"দেখলেম, রচনাটা মন্দ হয়নি। প্রিণ্টার বল্লেন, এ-মাসে যেতে পারে, জায়গা হবে। তাই ভাবলেম, ছেলেমানুষ আশা ক'রে এসেছে, এই মাসেই যাক! আর কিছু লেখা এনেছ না কি?"

বীরাঙ্গনা তাহার কবিতার খাতা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "এইটাতে অনেকগুলা লেখা আছে, যদি সময়-মত প'ড়ে ছাপবার মত কিছু দেখতে পান—"

"আচ্ছা, বইটা আমার কাছে রেখে যেয়ো, যেগুলা ছাপবার মত মনে হবে, আমি নীল পেন্সিলে দাগ দিয়ে দেব, তুমি সেইগুলা আলাদা কাগজে কাপি ক'রে আমাকে দিয়ে যেয়ো। এই বই থেকে দেখে কম্পোজ ক'রলে, কম্পোজিটারদের হাতের কালিতে এমন সুন্দর বই একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে।"

এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। বেলা দেবী টেলিফোন ধরিয়া বলিলেন, "হ্যালো!" তাহার পর বেলা দেবী, বীরাঙ্গনার অবোধ্য এক ভাষাতে টেলিফোনে কথা কহিতে লাগিলেন। বীরাঙ্গনা তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তিন-চার মিনিট পরে বেলা দেবী টেলিফোন ছাড়িয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আমার কথা কিছু বুঝতে পারলে?"

"না। আপনি ও কোন ভাষাতে কথা কইলেন?"

"ইটালীয়ান ভাষাতে।"

"আপনি ইটালীয়ান জানেন? কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন? কোন ইটালীয়ানের সঙ্গে বোধ হয়?"

"ইটালীয়ান নয়, বাঙ্গালী! শিল্পী 'সবিতা'। আমি ইটালীয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, স্পানিশ, পর্টুগীজ—জানি। সাত বৎসর ধ'রে য়ুরোপে ঐ ক'রে বেড়িয়েছি কি না!"

"সবিতা দেবীও ইটালীয়ান জানেন না কি?"

"তিনি ত ছবি আঁকা শেখবার জন্য দু'বৎসর ফ্রান্সে আর তিন বৎসর ইটালীতে ছিলেন।"

ক্ষিয়ৎক্ষণ পরে বীরাঙ্গনা একটু কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "একটা কথা জানতে আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে। আপনি আমাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন ব'লেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সাহস করছি···"

"বল না, তাতে আর সঙ্কোচ কি?"

"আজ-কাল অধিকাংশ মাসিক কাগজে নগ্ন বা অর্দ্ধ-নগ্ন পুরুষ-মূর্ত্তির ছবি দেখতে পাওয়া যায়। নৈতিক দৃষ্টিতে এটার সমর্থন করা চলে কি?"

"চলে। শিল্প আর নীতি এক স্তরের জিনিষ নয়।

তুমি এক জন কবি, অর্থাৎ কথাশিল্পী। চিত্রশিল্পীরা রং আর তুলি দিয়ে যা করেন, তুমি শব্দ আর কালি-কলম দিয়ে তাই কর। তুমি যুবতী, অবিবাহিতা; অথচ তুমি প্রেমের কবিতা লেখ। নীতিবাগীশদের মতে এটা দূষ্য, কিন্তু তোমার মতে নয়! কারণ তুমি শিল্পী। এক কালে পুরুষ শিল্পীরা নগ্ন নারী-মূর্ত্তি অঙ্কিত ক'রে সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করতেন, কেহ প্রতিবাদ করলে বলতেন—"এস্থেটিক কল্‌চার" অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা। সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা না করলে সৌন্দর্য্যবোধ পরিণতি লাভ করে না। সে-কালে পুরুষ-শিল্পীরা নারী-মূর্ত্তি এঁকে সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করতেন; কিন্তু পুরুষদের মত নারীদেরও সৌন্দর্য্য-বোধ আছে, নারীদেরও সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করা উচিত, এ-কথা সে-কালের পুরুষ শিল্পীরা মনে কর্ত্তেন না; সেই জন্য তাঁরা শিল্পের একটা দিক্—অর্থাৎ পুরুষের উপভোগ্য দিকটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। সেই জন্য সে-কালের অধিকাংশ মাসিক কাগজে নারীর শারীরিক সৌন্দর্য্যের চিত্রই প্রকাশিত হ'ত। নারী তাহার প্রেমাস্পদের জন্য বিষণ্ণ বদনে চিন্তা ক'রছে, কোন নারী তাহার প্রণয়ীর সংবাদ পাবার জন্য আগ্রহ সহকারে বাতায়নে প্রতীক্ষা ক'রছে, কোন নারী বা দয়িতের চিত্ত-রঞ্জনের জন্য অপরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে বসে রয়েছে, কোন রমণী স্নানান্তে সূক্ষ্ম সিক্তবস্ত্রে জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে,—এই রকম বিভিন্ন ভঙ্গীর নারী-চিত্রই সে-কালে পুরুষশিল্পীরা আঁকতেন, এবং মাসিক-পত্রে সেই সকল চিত্রের প্রতিলিপিই প্রকাশিত হ'ত। তার প্রধান কারণ, সে-কালে পুরুষেরই সমাজে প্রাধান্য ছিল, তাদের মনো-রঞ্জনের জন্য পুরুষশিল্পীরা যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রতেন। নারী তখন সমাজে প্রগতিবিহীন, সজীব জড়পদার্থের মতো বিরাজ ক'রত। তোমরা—অর্থাৎ এ-কালের মেয়েরা শুনলে হয় ত বিস্মিত হবে যে, এক কালে, এই কলিকাতাতে তোমাদের মত তরুণীরা একাকী পথে বের হ'তে সাহস করত না; যদি কখনও কোন কারণে কোন তরুণীকে বাড়ী থেকে বাইরে যেতে হ'তো, তাহ'লে, এক জন পুরুষ আত্মীয় রক্ষকরূপে তার সঙ্গে থাকত।"

বীরাঙ্গনা সবিস্ময়ে বলিল, "সত্য না কি? এই রকম হ'তো?"

"সত্য বৈ কি। আমার মাতামহীর মুখে শুনেছি, তাঁরা তাঁদের বাল্যকালেও এইরূপ ব্যাপার দেখেছিলেন! ভাল কথা, তুমি না সে-দিন ব'লছিলে, সবিতা দেবীর সঙ্গে আলাপ করতে চাও? কাল বেলা চারটার সময় আমি তাঁর ওখানে যাব। যদি তুমি পার, চারটার পূর্ব্বে এখানে এস, এক-সঙ্গে যাওয়া যাবে।"

"যে আজ্ঞে। আমি নিশ্চয়ই আসব।"

২

বালীগঞ্জে, ঢাকুরিয়া রোডের উপর একখানি সুন্দর অনতিবৃহৎ অট্টালিকা। বাড়ীর সম্মুখে একটি ছোট ফুল-বাগান, ফুল-বাগানের পরেই রাজপথে পাশাপাশি দুইটি ফটক; একটি ফটকের পার্শ্বে "In" লেখা, অপর ফটকের পার্শ্বে "Out" লেখা। বাড়ীর সম্মুখে একটি ছোট গাড়ী-বারান্দা।

অপরাহ্ণ চারিটা পনের মিনিটের সময় একখানি মোটর-গাড়ী সেই গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বেলা দেবী ও বীরাঙ্গনা গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে এক জন দ্বারবর্তী সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া বলিল, "মেম-সাব এষ্টাডিমে হ্যায়।"

বেলা দেবী বলিলেন, "সেলাম দেও।" এই বলিয়া বীরাঙ্গনাকে বলিলেন, "সবিতা এখন তাঁর ষ্টুডিওতে আছেন, এস, বসা যাক্।"—এই বলিয়া সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া একটা কৌচে উপবেশন করিলেন, এবং বীরাঙ্গনাকে একখানা চেয়ার দেখাইয়া উপবেশন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। বেলা দেবী একটা চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন, বীরাঙ্গনা গৃহ-প্রাচীরের চিত্র-গুলি দেখিতে লাগিল। প্রায় তিন মিনিট পরে, সবিতা একটা পর্দ্দা সরাইয়া "হ্যালো" বলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বেলা দেবীর সহিত করমর্দ্দন করিলেন। বীরাঙ্গনাকে তিনি দেখিতে পান নাই, পরে তাহার উপর দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র বেলার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বেলা বলিলেন, "এস, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি। ইনি আমার কাগজের নূতন লেখিকা—কুমারী বীরাঙ্গনা সেনাপতি, তোমার এক জন ভক্ত। ইনিই বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী 'সবিতা' ওরফে অংশুমালী চট্টরাজ—আমার বান্ধবী।"

সবিতা বীরাঙ্গনার সহিত করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া সহাস্যে বলিলেন, "তুমি ত ছেলেমানুষ, এই বয়সে এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পার? "নারীশক্তিতে" তোমার "প্রেম-তরঙ্গ" কবিতাটি আমার বড় ভাল লেগেছে। আমি মনে করেছিলাম যে, কবি বীরাঙ্গনা বোধ হয় আমাদেরই বয়সী লেখিকা হবেন।"

বেলা দেবী বলিলেন, "ছেলেমানুষ বৈ কি, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়েন। আমার কাগজে তোমার আঁকা ছবি দেখে, ইনি তোমার এক জন পরম ভক্ত হ'য়ে উঠেছেন।"

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, "আমিও ওঁর কবিতা পড়ে ওঁর ভক্ত হয়ে উঠেছি।"—বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন।

বীরাঙ্গনা সবিনয়ে বলিল, "আপনার ছবির ভাব বড় চমৎকার! আমি যত বার দেখি, তত বারই তার মধ্যে নূতনত্ব পাই।"

সবিতা বলিলেন, "তোমার ছবি দেখবার চোখ আছে।"

বেলা বলিলেন, "বীরাও যে এক জন শিল্পী। ড্রয়িংএ ও বরাবর ফার্ষ্ট হয়।"

সবিতা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তাই না কি? তাহ'লে তোমাকে আমার ষ্টুডিও দেখাব। শিল্পী ছাড়া আর কাউকে আমার ষ্টুডিও দেখাইনে।"

বীরাঙ্গনা বলিল, "কিন্তু আমি ত ছবি আঁকতে পারি না।"

"তা না পারলেও তোমার চোখ আছে,—তুমিও শিল্পী।"

এমন সময়, যে পর্দ্দার অন্তরাল হইতে সবিতা বাহির হইয়াছিলেন, সেই পর্দ্দা সরাইয়া এক জন পরম রূপবান যুবক তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া সবিতাকে বলিলেন, "কাল কি আসতে হবে?"

সবিতা বলিলেন, "আসবেন, আজ যেমন সময় এসেছিলেন; ঐ রকম সময়ে আসবেন।"

যুবক সকলকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলে বেলা দেবী বলিলেন, "ভদ্রলোকটি কে?"

সবিতা বলিলেন, "মডেল।"

বেলা বলিলেন, "মডেল হবার মত চেহারা বটে! কি সুন্দর চেহারা, যেন গ্রীসদেশের মার্ব্বেলের মূর্ত্তি!"

সবিতা যে ভদ্রলোককে 'মডেল' বলিয়া উল্লেখ করিলেন, সেই ভদ্রলোক বাস্তবিকই সুপুরুষ। তাঁহার বয়স বোধ হয় পঁচিশ বৎসর হইবে। বিস্তৃত ললাট, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল আয়ত বুদ্ধিব্যঞ্জক চক্ষু, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর, বীরত্বব্যঞ্জক মাংসল উন্নত শরীর—তাঁহাকে একটা যেন বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে। হাজার লোকের মধ্যে তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, এক জন মানুষের মত মানুষ! যুবক যতক্ষণ সেই কক্ষে ছিলেন, বীরাঙ্গনা তাঁহার প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল।

বেলা দেবী বলিলেন, "এঁর নাম কি? এঁকে কোথায় পেলে?"

সবিতা বলিলেন, "ওঁর নাম ফাল্গুনী দত্ত, বাড়ী বরিশাল জেলা। আমি মডেলের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম; উনি তাই দেখে, আমার পরিচিত এক শিল্পীর কাছ-থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। পরিচয় নিয়ে জানলেম, ওঁর মা পুলিশ-ইন্সপেক্টর ছিলেন, ওর এক বড়-দিদি আর একটি ছোট ভাইকে রেখে ওঁর মা মারা যান। ওঁর বাবা অনেক কষ্টে ওকে মানুষ ক'রে তোলেন। ওর দিদি ক'লকাতায় মাউণ্টেড্ পুলিশে একটা কাজ যোগাড় ক'রেছেন, এখনও চাকরী পাকা হয়নি। ছোট ভাই টাইপিষ্ট।"

বেলা বলিলেন, "তুমি যে তোমার মডেলের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর নিয়েছ দেখছি, কিছু মতলব আছে না কি?"

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, "মতলব যে নেই, তা হলফ করে ব'লতে পারিনে। এস ভাই, আমার নবীন বন্ধুকে আমার ষ্টুডিও দেখাইগে।"—এই বলিয়া বেহারাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চা আউর খানা ষ্টুডিওমে দেনে বোলো, তিন আদমিকো—"

ষ্টুডিয়োতে প্রবেশ করিয়া বীরাঙ্গনা দেখিল, সে কক্ষটিও ড্রয়িং-রুমের মত সুবৃহৎ, তবে তাহার সাজ-সজ্জা অন্য প্রকার। চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে, ছোট বড়, সমাপ্ত অসমাপ্ত নানা প্রকার চিত্র। দুই-চারি জন খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি, পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, জলপ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র, কয়েকখানা নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন

পুরুষ-মূর্ত্তি। কক্ষের এক পার্শ্বে, ইজেলের উপর ফাল্গুনী দত্তের রঞ্জিত চিত্র—তখনও অসমাপ্ত। চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তি যেন মুষ্টিযুদ্ধ করিবার জন্য উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিত্রের মুখ এবং বাহুদ্বয়ের অঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে, অন্যান্য অবয়বে এখনও রং পড়ে নাই।

বীরাঙ্গনা কক্ষমধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুগ্ধ নেত্রে ছবি দেখিতেছিল, এমন সময় বেলা দেবীর আহ্বানে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, একটা ছোট টেবিলের উপর তিন কাপ চা ও তিন প্লেট খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে, সবিতা এবং বেলা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বীরাঙ্গনা একখানা চেয়ার টানিয়া-লইয়া তাঁহাদের কাছে উপবেশন পূর্ব্বক বলিল, "আপনার এই সব ছবি বাস্তবিকই অমূল্য।"

সবিতা বলিলেন, "এ দেশের লোকে ছবির আদর জানে না, দামও দিতে পারে না। আমার এক একখানা ছবি য়ুরোপে ও আমেরিকায় একজিবিশনে দশ-বার হাজার টাকায় বিক্রী হয়।"

চা-পান করিতে করিতে বেলা দেবী সহসা বলিলেন, "ভাল কথা, তোমার সেই মামলার কি হ'ল ?"

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, "আগেকার সেই মডেলের মামলার কথা বলছ ? সে বেটা হাড়-হারামজাদা, আমার কাছ থেকে একটা মোটা দাঁও মারবার চেষ্টায় ছিল, তাই আমার নামে violation of modestyর একটা চার্জ্জ এনেছিল ; ভেবেছিল, পুলিশ-কোর্টে জিতলেই একটা ড্যামেজ সুট নিয়ে আসবে। চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিস্ ব্যাটাভেল আই, সি, এস, সে মামলা with cost ডিস্‌মিস্ ক'রে দিয়েছেন।"

কক্ষের এক পার্শ্বে ইজেলের উপর ফাল্গুনী দত্তের রঞ্জিত চিত্র—তখনও অসমাপ্ত

* * * *

মাস-খানেক পরে, বেলা দেবী সবিতার একখানা পত্র পাইলেন। সবিতা লিখিয়াছেন, "ভাই বেলা, আমার মতলবটা তুমি ঠিকই অনুমান করিয়াছিলে। আগামী শনিবার ফাল্গুনীকে ষ্টুডিও হইতে বেড-রুমে ট্রান্সফার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। শিখাইয়া লইলে, আশা করি, সে পুরুষসুলভ সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আমার যোগ্য সহধর্ম্মী হইতে পারিবে। যাহা হউক, আমাদের নবীন কবিকে সঙ্গে করিয়া আনিও। তোমাদের কার্ড পৃথক্ পাঠাইলাম। ইতি—

তোমার সবিতা।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

প্রাচীন মিশরে শক্তিপূজা এবং ভারতীয় সভ্যতা

অতি পূর্ব্বকালে আফ্রিকায় এবং আমেরিকায় ভারতীয় সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ দিন দিন স্ফুটতর হইতেছে। সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে, আমেরিকার মায়া জাতি ভারতবাসীদিগেরই বংশধর। উহারা কোন্ স্মরণাতীত কালে আমেরিকার পেরু প্রভৃতি দেশে যাইয়া বসবাস করিয়াছিল, এবং তথায় ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। উহারা যে এত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আপনাদের বৈশিষ্ট্য কতকটা রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। মিষ্টার চমনলাল প্রণীত 'Hindu America' নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে বহু তথ্য বিশেষরূপেই জানিতে পারা যায়। আফ্রিকায় অতি প্রাচীন কালে ভারতীয় সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ অতি প্রাচীন কালে মিশরে ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারের কথা স্বীকার করিতেন। পোকক নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক তৎপ্রণীত 'India in Greece' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "আমি ইহার পূর্ব্বেই স্পষ্ট ভাষাতে বলিয়াছি যে, প্রাচীন মিশরীয় গ্রীক এবং ভারতবাসীদিগের যে জাতীয় সমতা (Unity) ছিল, তাহা স্মরণ রাখা উচিত" (১২২ পৃষ্ঠা)। তিনি ঐ পুস্তকে আরও বলিয়াছেন, মিশরের মেনেস নামধেয় রাজা এবং ভারতের বৈবস্বত মনু একই ব্যক্তি। (১) Cook Tayler তাঁহার প্রণীত 'Ancient History' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"ইহা অনুমিত হইয়াছে যে, প্রাচীন মিশরবাসীরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় জাতির প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত বিস্ময়কর মিল ছিল। কিন্তু হিন্দু জাতির যখন বড় নৌবহর ছিল না, তখন এত অধিক লোক ভারত হইতে মিশরে কি প্রকারে গিয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না।" (২) সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-কথাও বলিয়াছেন যে, "সিন্ধু নদের সাগরসঙ্গম স্থান হইতে আগত কতকগুলি লোক আফ্রিকার সাগর-কূলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে।" এখন প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে ভারতবাসীর বড় নৌবহর ছিল। সুতরাং টেলার সাহেবের ঐরূপ সন্দেহ ভিত্তিহীন। সার উইলিয়ম জোন্সেরও অনুমান এই যে, হিন্দুরাই মিশরীয় সভ্যতার বনিয়াদ পত্তন করেন।

কিন্তু ইদানীং কতকগুলি বৃটিশ ঐতিহাসিক কয়েকটি অবান্তর কারণ দেখাইয়া মিশরের সভ্যতা অধিকতর প্রাচীন এবং ভারতীয় সভ্যতা উহা অপেক্ষা আধুনিক, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। অল্প দিন পূর্ব্বে অতি প্রাচীন কালের মিশরীয় ধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ধর্ম্ম-দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক সি.পি. টিয়েল (C P. Tiele) বলিয়াছেন, "প্রাচীন মিশরীয় ধর্ম্মে সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদের সহিত অত্যন্ত হীন এবং বর্ব্বরোচিত বহু অতিপ্রাকৃত দেববাদ বিজড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীন মিশরের ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে শ্যামিকাশূন্য একেশ্বরবাদ। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে তাহার অনুষ্ঠানগুলি নির্ব্বুদ্ধিতাসূচক বর্ব্বরতা-দ্যোতক এবং বহু দেববাদবিজৃম্ভিত বহু মূর্ত্তিযুক্ত দেববাদ বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সেই একেশ্বরবাদ যেন অপরিস্কৃত আবরণের মধ্যে নিহিত অতি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় যাদুবিদ্যার এবং রূপক ভাবের অপকৃষ্ট আবরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে।" তাহার পর তিনি আবার বলিয়াছেন,—"এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, ইতিহাসে যেরূপ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, (প্রাচীন) মিশরীয় ধর্ম্ম দুইটি বিভিন্ন ভাবের উপাদানের এবং বিভিন্ন প্রকার শক্তিসম্পন্ন জাতির মিশ্রণ হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন মিশরের জাতীয় ধর্ম্ম ছিল নিগ্রোদিগের বহু অতিপ্রাকৃতিক শক্তিবাদের সহিত সংখ্যাল্প

(১) India in Greece, p, 178

(২) Ancient History, p, 10

শাসক জাতি কর্ত্তৃক তাহাদের নির্ম্মল ধর্ম্মের প্রভাব প্রদানের চেষ্টার ফল। এই সংখ্যাল্প শাসক জাতি প্রাগৈতিহাসিক যুগে এসিয়া হইতে আসিয়াছিল, এবং তাহারা ঐ সকল বহু অতিপ্রাকৃত শক্তিবাদজনিত অনুষ্ঠান-গুলিকে দুর্ব্বোধ্য সাঙ্কেতিক ভাবে ব্যাখ্যা করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অধ্যাপক টিয়েল সকল দিক্ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মিশরে স্মরণাতীত কোন কালে এসিয়া হইতে এক দল শাসক গিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই আদি মিশরীয় ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহারা কে? একটু অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, উঁহারা ভারতবাসী। ভারত হইতে উঁহারা স্মরণাতীত কোন যুগে মিশরে যাইয়া তথায় শক্তিবাদ প্রচারিত করিয়াছিলেন।

মিশরীয় ধর্ম্মে দেখা যায় যে, রবিই দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রবিই পরব্রহ্ম। প্রাচীন মিশরীয়রা এই রবিকেই "রে" বা "রা" বলিত। উচ্চারণ দ্বিবিধ ছিল। ভারতীয় রবি নাম মিশরে যাইয়া একাক্ষর র হইয়াছিল,—ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। রবির সহিত মিশরের রে বা রা (Ra) সম্বন্ধে কতকগুলি স্থানীয় কিম্বদন্তী জুটিয়াছে,—ভারতে তাহা নাই। কিন্তু রবিই যে পরব্রহ্মের প্রতীক ইহা প্রাচীন হিন্দুদিগেরও ধারণা। হিন্দু বলেন, সবিতা সর্ব্বজীবের এবং সমগ্র ভাবের প্রসবিতা। তিনি সকল দেবতার সমষ্টিস্বরূপ এবং স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থের আত্মা; মিশরীয় ধর্ম্মেও তাহাই বলা হয়। ঐরূপ চন্দ্রও মিশরীয়দিগের দোদ, তিনি বিদ্যা এবং বুদ্ধির দেবতা, ইহার আর একটি নাম ধুতি (Dhuti), হিন্দুরাও চন্দ্রকে মন এবং জ্ঞানের দেবতা বলেন। ধুতি শব্দটা সংস্কৃত দ্যুতি হইতে গিয়াছে কি না বুঝা কঠিন। যাহা হউক, এইরূপ বহু দেবতা যে ভারত হইতে মিশরে গিয়াছেন, তাহা মিশরের দেবতাদিগের তালিকা দেখিলেই বুঝা যায়।

তন্মধ্যে তান্ত্রিক দেবতার এবং মহাশক্তির পূজার বিষয়ই আমাদের বিশেষ আলোচ্য। ভারতীয় তন্ত্র-শাস্ত্রের মতে প্রকৃতি এবং পুরুষের সংযোগ-ফলেই এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। মিশরীয় মতেও ঠিক তাহাই। ভারতীয় শক্তিসাধকদিগের মতে পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। তিনি কোন কার্য্য করেন না। তাঁহার ইচ্ছায় প্রকৃতির আবির্ভাব হইল। এই প্রকৃতিই নৃত্য-পরায়ণা এবং কার্য্যশীলা। ইনি মহাকালের বক্ষে বিরাজিতা। "মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরা।" এই প্রতীক এবং তাহার কল্পনা ভারতবাসীর সম্পূর্ণ নিজস্ব। ভারতীয় অতি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেও এই কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন মিশরেও শিব-শক্তির কল্পনা অবিকল এইরূপ। মিশরের শিবের নাম শিবু (Sibu)। শিব এবং শিবু একই কথা। আমাদের দেশে যাহার নাম শিব তাহাকে লোকে শিবু বলিয়াই ডাকে। কিন্তু মিশরীয় শক্তির নাম নুট (Nut) বা নুইট (Nuit)। এখন ইঁহাদের সম্বন্ধে মিশরীয়দিগের মধ্যে দুইটি মত চলিত ছিল। আমাদের মতে যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বে একার্ণব বা কারণ-সলিল ছিল, মিশরীয় পুরাণ-মতে সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে একার্ণব বা কারণ-সলিল ছিল। তখন ছিল বর্ণ চিহ্ন রেখাশূন্য নিবিড় অন্ধকার। মনু বলিয়াছেন:—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই নিবিড় অন্ধকারময় ছিল; তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার মত ছিল না। সে অবস্থা কোন লক্ষণার দ্বারা অনুমেয় নহে। তখন এই বিশ্বসংসার তর্ক এবং জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাসপেরো, রলিনসন প্রভৃতি মিশরীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, মিশরীয় প্রাচীন বার্ত্তায় সৃষ্টির পূর্ব্বে ঠিক এইরূপ অবস্থা ছিল বলা আছে। এ ধারণা হিন্দু ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। মিশরীয় পুরাণে কথিত আছে যে, শিবু বা শেব সেই একার্ণব অবস্থার ভিতর নুটের সহিত গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অবস্থিত ছিলেন। মিশরীয় ভাষায় সেই অবস্থার ভাষার নাম ছিল নু (Nu)। তখন কোন দেব-দেবীর সৃষ্টি হয় নাই। মাসপেরো (Maspero) তাহার 'Dawn of Civilization' নামক গ্রন্থে এই অবস্থার কথা লিখিয়াছেন যে, In the beginning earth and sky were two lovers lost in the Nu fast

lost in each other's embrace, the God lying beneath the Goddess. পাঠক দেখুন, শিবু বা শেব এবং নুট তখন "মহাকালেন সমং" মহাকালীর ন্যায় কি না? দেবের উপরে দেবীর এই লীলা বহু কাল চলিতেছিল। তাহার পর সু হইতে র বা রবির উদ্ভব হয়। রার পুত্র সু (shu)। সু-র ভার্য্যা তুকণুটা অর্ব্বাচীন অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী মিশরীয় পুরাণমতে এই রবিসুত সু-ই এই নিবিড় তমসাবৃত কারণ-সলিলে ভাসিয়া আসিয়া আলিঙ্গনাবদ্ধ শিবু এবং নুটের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দুই হস্ত দিয়া নুটকে উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া ধরিলেন। শিবু নিম্নেই ছিলেন, নিম্নেই থাকিয়া গেলেন। নুটের চরণ দুইখানি শিবুর চরণের নিকট এবং হস্ত দুইখানি শিবুর মস্তকের নিকটই থাকিল। তাঁহার দেহটি কেবল বাঁকিয়া ধনুকাকৃতি হইয়া উর্দ্ধে রহিল। তাঁহার দুই চরণ এবং দুই হস্ত যেন স্তম্ভরূপে অবস্থিত হইল। দেবীর মস্তক রহিল পশ্চিম-দিকে এবং চরণদ্বয় রহিল পূর্ব্বদিকে গুপ্তরূপে। আমাদের মহাকালের বক্ষে যেমন মহাকালীর চরণ দুইটি আছে ইহা ঠিক সেরূপ নহে। ইহা হইল পরবর্ত্তী মত। এই মতে শিবু ক্ষিতি, নুট আকাশ। আমাদের মতেও শিবের অষ্ট মূর্ত্তি, তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তি ক্ষিতি। প্রাচীন মিশরের প্রাচীনতম যে মত, তাহা আমাদেরই মতের মত। সু-র পূর্ব্বে শিবু এবং নুট ছিলেন। কাল-সহকারে মতের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। দুইটি মত পরস্পর পরিবর্ত্তিত এবং বিকৃত হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যে, তাহারা গোড়ায় যে অভিন্ন ছিল, তাহা বুঝা কঠিন। এ-স্থানে সম্পূর্ণ না হউক, কতকটা যে সেই অবস্থা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক, সু যখন নুটকে শিবুর বক্ষ হইতে বিযুক্ত করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন, তখন শিবু যেন নিদ্রাভঙ্গ হইয়া অলসভাবে উঠিবার চেষ্টা করিলেন। উঠিবার চেষ্টা করিবার সময় তিনি তাঁহার দক্ষিণ পদ সঙ্কুচিত ও বাম পদ প্রসারিত করিয়া এবং বাম হস্তের কনুইয়ের উপর দেহের ভার রাখিয়া যেমন উঠিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার দেহ পড়িয়া গেল। তিনি বাম হস্তের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। সু তখন তাঁহাকে উত্থানশক্তি রহিত করিয়া মৃতবৎ ফেলিয়া রাখিলেন। শিবুর দেহ শবের ন্যায় নুটের নিম্নেই পড়িয়া রহিল। সুতরাং নুট রহিলেন যেন শবরূপ মহাদেবের হৃদয়ের 'উপরি সংস্থিতা।' প্রাচীন মতে শিবু আদি দেবতা, নুট বা নুইট মহাপ্রকৃতি। ঠিক ভারতীয় মতেরই অনুরূপ, মহাপ্রকৃতি আকাশরূপিণী; সেই জন্য নক্ষত্র-শালিনী এবং শশিসূর্য্যভালিনী। আমাদের কালিকা মূর্ত্তিও মহাপ্রকৃতি এবং শশিসূর্য্যভালিনী। তবে প্রাচীন কালের মধ্যে মিশরের অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীনদিগের মতে শিবু বা শেব ধরণী, নুইট বা নুট মহাপ্রকৃতি নিশারূপী। এই উভয় পরিকল্পনায় বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। শিবু এবং নুট দুই জনই দিগম্বর এবং দিগম্বরী।

কেবল তাহাই নহে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে গাভীই ভগবতী বলিয়া পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। মিশরেও তাহাই; মিশরে পয়স্বিনী গাভীই পূজিতা হইতেন। এই গাভীরূপিণী দেবীর নাম হাথর (Hathor)। হাথর র বা রবির আলয়। ইহার স্বামীর নাম বিশু (Bisu) অথবা বাসিস (Bacis)। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিশু বা বাসিসের বাঘাম্বর বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম-বসন। (৩) বিশু করালবদন। এ ক্ষেত্রেও উভয়ের অদ্ভুত মিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয় মতে নুট পৃথিবীর উপরিস্থিত আকাশ, হাথর পৃথিবীর নিম্নস্থিত আকাশ বা রসাতল। উভয়ে একও বটেন, পৃথকও বটেন। নুটই হাথর মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে মিশরের মন্দিরে মন্দিরে নুট এবং হাথরের পূজা হইত, এবং পূজায় পশু-বলি প্রভৃতিও দেওয়া হইত। নুট বা মহাপ্রকৃতি কোথাও হাথর মূর্ত্তিতে, কোথাও আইসিস্ মূর্ত্তিতে পূজিতা হইতেন। আমাদের দেশে মহাশক্তি যেমন দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি রূপে পূজা পাইয়া থাকেন, প্রাচীন মিশরেরও সেইরূপ মহাশক্তি নুট, হাথর, আইসিস্ প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে পূজা পাইতেন। আইসিসের (Isis) পূজার সহিত দুর্গাপূজার বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা এবং পঞ্চশস্যের প্রয়োজন। অতি প্রাচীন কালে মিশরে আইসিসের পূজায় তেমনই বৃক্ষের শাখা এবং যব, গোধূম আদির প্রয়োজন হইত। মিশরে অতি প্রাচীন কালে প্রতিমা পূজা করা হইত।

(৩) Dawn of Civilization by Maspero, Chap II

আমাদের দেশে যেমন প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইত, মিশরের পূজকগণও ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি এবং নানারূপ মুদ্রা, করন্যাস এবং অঙ্গন্যাস করিতেন। পূজা করিবার পূর্ব্বে রাজা এবং পুরোহিতরা স্নান করিয়া শুচি হইয়া তবে পূজায় বসিতেন। পূজামণ্ডপে ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া বায়ুশোধন করা হইত। প্রতিমার সমক্ষে নৈবেদ্য দেওয়া হইত, এবং হোম করা হইত। আমাদের দেশের তান্ত্রিক পূজার ন্যায় মিশরীয় পুরোহিতরা আসনশুদ্ধি এবং ভূতশুদ্ধি করিতেন। আজ যদি ভারতবাসীর সেই পূজা দেখিবার সুযোগ ঘটিত, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে, ঐ পূজা ভারতীয় শক্তিপূজার অনুরূপ। তথায় আমাদের দেশের শক্তিপূজার ন্যায় দেবীকে আবাহন করা হইত, বিসর্জ্জনও করা হইত। পূজার সময় ঢক্কানিনাদে দশ দিক্ মুখরিত হইয়া উঠিত। অতি প্রাচীনকালে মিশরে দেবীপূজার সময় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এবং দরিদ্র লোকদিগকে ভূরি ভোজন করান হইত। অতি প্রাচীন কালে মিশরে যে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ ছিল, তাহা অনেক ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তখন মিশরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের লোক ছিল। কেবল মিশরে কেন, পারস্যেও ছিল। এই পরাধীন ভারত যে স্মরণাতীত কালে পৃথিবীর নানা দেশে স্বীয় সভ্যতার আলোক এবং সংস্কৃতি বিস্তৃত করিয়াছিল, সে কথা এখন অনেক বিদেশী আত্মগর্ব্ব খর্ব্ব হইবার আশঙ্কায় স্বীকার করিতে সম্মত নহেন,—কিন্তু সে কথা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। যে জাতি ঐ সুদূর অশ্বক্রান্তা দেশে যাইয়া তথায় আপনাদের প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও ভারতে ম্রিয়মাণ অবস্থায় বাস করিতেছে। তাহারা দুর্গোৎসবও করিতেছে। কিন্তু এক-কালে তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যে এই পূজার এবং সংস্কৃতির প্রভাব কত দূর বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধান তাহারা করিতে চাহে না। অধ্যাপক টিয়েল বলিয়াছেন, পরবর্ত্তী কালে যে এই উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের কি কারণে অধোগতি হইয়াছিল তাহা বুঝা কঠিন। কিন্তু আমাদের নিকট উহা বিশেষ কঠিন বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক টিয়েল বুঝেন নাই যে, আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন জাতি মিশরে যাইয়া তথায় তাঁহাদের প্রচারিত শক্তিবাদে শক্তিসঞ্চার, এবং উহার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেছিলেন, কোন কারণে তাঁহাদের সহিত মিশরীয়দিগের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। কাজেই যে সকল ভারতবাসী মিশরে ছিলেন, মূল কেন্দ্রের সহিত তাঁহাদের যোগভঙ্গ হওয়াতে তাঁহাদের অবনতি ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় ধর্ম্মের অবনতি ঘটে। অধ্যাপক রলিনসন সেই জন্য লিখিয়াছেন, প্রাচীন মিশরের সর্ব্বসাধারণের প্রীতিকর ধর্ম্মের দেবদেবীগণ হয় ত পরব্রহ্মের মূর্ত্তিমতী বিভূতি মাত্র, অথবা তাঁহারই সৃষ্ট চৈতন্যময়ী প্রকৃতির অংশমাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু কালক্রমে সে ধারণার অবনতি ঘটিয়াছিল।

প্রাচীনপন্থীদিগের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর ভারতে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে ভারতের ক্ষত্রিয়কুল প্রায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল। মুনি-ঋষিরাও তিরোহিত হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং রাজা পরীক্ষিতের সময় কলি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় বাহিরের দেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক গবেষণাকারীরা এ মতকে বিশেষ আমল দেন না। তাঁহারা চাহেন—পাথুরে প্রমাণ; কিন্তু সেই পাথুরে প্রমাণের পাঠোদ্ধারে ভ্রম-প্রমাদ ঘটাতে ইতিহাসও অনেকটা বিকৃত হইয়া যাইতেছে।

কয়েক বৎসর মাত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপে একটি প্রস্তরে ক্ষোদিত দুর্গা-দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐ দুর্গা-প্রতিমার মূর্ত্তিগুলি ঠিক আমাদের দেশের দুর্গা-প্রতিমার মত, প্রভেদের মধ্যে এই যে, মূর্ত্তিগুলি সমস্তই ব্যাঘ্রমুখ। এ-দেশের পণ্ডিতরা বলেন, অতি প্রাচীন কালে দেবীর ব্যাঘ্রমুখই কল্পনা করা হইত। ক্রীট দ্বীপ মিশর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং এই ব্যাপার হইতে সপ্রমাণ হয় যে, অতি প্রাচীন কালে এসিয়া মাইনর ও তাহার পশ্চিম অঞ্চলে 'শক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? ক্রীট এবং তাহার সন্নিহিত স্থানগুলি কিছু কাল তুর্কীদিগের অধিকারে ছিল। তুর্কীরা মুসলমান

ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক প্রতিমা-পূজার বিরোধী হইয়া উঠে, এবং বহু স্থানে প্রতিমাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহাদের হস্ত হইতে কোন-রূপে রক্ষা পাইয়া ঐ ক্ষুদ্র প্রতিমাটি অতীত কাহি-নীর প্রমাণ-স্বরূপ রহিয়াছে। ক্রীট দ্বীপটি শৈল-সমাকুল এবং বনানী-সমাচ্ছন্ন। তাই এই প্রতিমাটি কোন মতে রক্ষা পাইয়াছিল। এসিয়ার মধ্যে ভারতেই এই মূর্ত্তির পূজা হইত। বৌদ্ধযুগে বহু স্থানে সে পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল রাজা গণেশনারায়ণ ভাদুড়ীর চেষ্টায় বাঙ্গালায় এবং বিহারে এই পূজার পুনঃপ্রবর্ত্তন হইয়াছে।

এ-কথা সত্য যে, স্মরণাতীত কালে যখন ভারতের সহিত মিশরের সম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহার পর হইতেই মিশরীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং পূজাপদ্ধতি কতক অংশে ভিন্ন ভাব ধরিতে থাকে। হিন্দুর দেবদেবীগুলির কল্পিত মূর্ত্তি মনুষ্যাকার। কিন্তু প্রত্যেকের একটি করিয়া পশুবাহন আছে। যথা, দুর্গাদেবীর বাহন সিংহ, গণেশের বাহন মূষিক, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর, শীতলার বাহন গর্দ্দভ, শিবের বাহন বৃষ, লক্ষ্মীর বাহন এক জাতীয় পেচক সরস্বতীর বাহন মরাল, ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল—ইত্যাদি। বাহন দেবতা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও দেবতার নিত্যসঙ্গী। মিশরের দেবতাদিগের দেহই নরাকার এবং পশ্বাকারের মিশ্রণ। মিশরের দেবতাগুলির মধ্যে রে অর্থাৎ রবিই প্রধান। সূর্য্যের সহস্র নামের ন্যায় মিশরীয় রবিরও অনেক নাম ছিল। যথা র, রে, হোরাস, হরআক্‌টে, খেপ্রে, অতুম প্রভৃতি। মিশরীয় সূর্য্যদেবের আকার সাধারণতঃ এইরূপ। রে বা রবির রূপ মানুষবৎ দেহ, কিন্তু ঈগল কিম্বা বাজপক্ষীর ন্যায় মুখমণ্ডল। হোরাসের রূপ কোথাও ঐরূপ, কোথাও বা অন্য শিকারী পক্ষীর ন্যায়। অতুম অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য। ইঁহার আকার বৃদ্ধের ন্যায়। খেপ্রের আকার কতকটা ঝিল্লীর মত, উহার চক্ষু সূর্য্যাভিমুখী। কিন্তু সাধারণতঃ সূর্য্যদেবতার আকার মনুষ্য ও শিকারী পক্ষীর মিশ্রণ। মিশরীয় চন্দ্রের নাম দোদ। থিবে সহরে তাহার নাম খোন্‌ও। তাহার বিগ্রহ কতকটা সূর্য্য-বিগ্রহের ন্যায়। তবে তাহার মস্তকটি বক জাতীয় পক্ষীর ন্যায়। হাথরের গাভী-মূর্ত্তি কিন্তু প্রায়ই নারীর দেহ, কেবল কর্ণ দুইটি গাভীর কর্ণের মত। অনুবীস নামক প্রেতাত্মাদিগের অধিপতি দেবীর মুখ শৃগালের মুখের ন্যায়। সেখমেট মিশরের রণচণ্ডী, তিনি সিংহমুখী। ফলে মিশরীয় সমস্ত দেবমূর্ত্তিই নরাকার এবং পশ্বাকারের মিশ্রণ। ভারতের তাহা নহে। কেন এমন হইল? তাহার কারণ এই যে, প্রাচীন মিশরে হিন্দুরা যখন তাঁহা-দের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি প্রবর্ত্তিত করেন, তখন তাঁহারা তথাকার উপাসকদিগের উপাস্য দেবতাকে একেবারে বর্জ্জন করেন নাই। তাহাদিগকে বহাল রাখিয়া তাহার পূজা অনুষ্ঠানে ভারতীয় ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিয়া-ছিলেন। নতুবা পূজাপদ্ধতি ঠিক ভারতীয় ভাবের আর দেববিগ্রহ অনেক স্থলেই কতকটা স্বতন্ত্র ভাবের হইয়াছিল, ইহার কারণ কি? মিশরে শাক্তধর্ম্মের প্রচারেই তাহা পরিস্ফুট।

পূর্ব্বে মিশরে বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন আকারে একই দেবতার পূজা হইত। রাজা চতুর্থ আমলোফিসের রাজত্ব-কালে তিনি সর্ব্বত্র একই ভাবে দেবপূজা বহাল করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া প্রাচীন মিশরে উপাসনায় একতা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। সে বহু সহস্র বৎসরের পুরাতন কাহিনী। তাহার নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অন্যান্য অনেক দিক হইতে ভারতের উপাসনা-পদ্ধতির সহিত মিশরীয় উপাসনার বিস্ময়জনক মিল আছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (বিদ্যারত্ন)।

প্রাণধর্ম্ম

(গল্প)

১

বর্ষাকাল। বৈকালের দিকে ঝিম্-ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৃষ্টিধারা হইতে মাথা বাঁচাইবার চেষ্টায় পথিকরা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

স্বপ্নার বাঁ হাতে সাদা ন্যাকড়া-বাঁধা পুঁটুলী, সে পুঁটুলী-সমেত হাতের ছাতাটা তাড়াতাড়ি খুলিতে গেল। কিন্তু তাহার কপালে ছিল দুঃখ; পায়ের কাছে পাকা কলার খোসা পড়িয়াছিল, সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। তাহার উপর পা পড়িতেই হীলওলা জুতায়-মোড়া পা তৎক্ষণাৎ মচকাইয়া যাইতেই সে আছাড় খাইল; সঙ্গে সঙ্গে বাধিল একটা হৈ-চৈ ব্যাপার!

পথচারীরা 'আহা' 'আহা' শব্দে দৌড়াইয়া আসিল। পাশের দোকানদারগুলা হা-হা করিয়া উঠিল—কয়েক জন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটেও আসিল। বয়স্থা মেয়ে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে—কেহ সত্যই সাহায্য করিতে আসিল, কেহ কেহ বা আসিল মজা দেখিতে। উহাদেরই দলের এক জন বুড়া-গোছের দোকানী কাছে আসিয়া বলিল, 'আমি বুড়ো মানুষ মা! আমার হাত ধরে তুমি ওঠো। আহা, বড্ড লেগেছে।'

স্বপ্নার কনুই ও মাথার একপাশ কাটিয়া ঝর-ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতেছিল; অসহ্য যন্ত্রণায় যেন তাহার চোখের সামনে কালো একখানা পর্দ্দা নামিয়া আসিল, তথাপি চারিদিকে চাহিয়া গভীর লজ্জায় অভিভূত হইয়া সে উঠিয়া বসিল। প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল তার হাতের পুঁটুলীটা পথের পাশের নর্দ্দমায় পড়িয়া আছে, এবং কয়েকটা সন্দেশ পুঁটুলী হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া তাহার পাশে গড়াইতেছে। দেখিয়া স্বপ্নার মনের অবস্থা যা' হইল, তা' জানিলেন শুধু সর্ব্বান্তর্য্যামী। তিনি ভিন্ন এই বিপন্না দরিদ্রা যুবতীর অন্তর্ব্বেদনা আর কে অনুভব করিবে?

কাল অম্বুবাচী আরম্ভ হইয়াছে। বিধবা মাতার জন্য স্বপ্না সন্দেশগুলি কিনিয়া-লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল।

ক্রমশঃ ভীড় জমিতেছে; শেষে একখানা মোটরও আসিয়া সেখানে থামিল। মোটরের আরোহী য়ুরোপীয় পরিচ্ছদধারী একটি বাঙ্গালী যুবক। স্বপ্নার রক্তসিক্ত বস্ত্রের একাংশ তাহার চোখে পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি মোটর হইতে নামিয়া পড়িল। সাহেবী পোষাক-পরা মোটরারোহীকে দেখিয়া পথের জনতা দুই পাশে সরিয়া-গিয়া পথ করিয়া দিল। যুবক কাছা-কাছি আসিয়া শিহরিয়া বলিল, "ইস্! এ যে রক্তের নদী! আপনারা হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন না কি? একটু সাহায্য করতে পারেননি? সরে দাঁড়ান আপনারা, আমি দেখি"—বলিয়া যুবক অগ্রসর হইল।

যুবকটি ডাক্তার। পথের কাদার উপর সে জুতার ডগায় ভর দিয়া বসিয়া স্বপ্নার ক্ষত পরীক্ষা করিল; তার পর সোফারকে ডাকিয়া বলিল, "হরিহর, ব্যাগটা আনো।" দেখিতে দেখিতে স্বপ্নার আহত কনুইয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইলে ডাক্তার তাহার মাথার দিকে চাহিয়া সমবেদনাভরে বলিল, "আহা!"

আঘাত-যন্ত্রণায় স্বপ্নার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিতে-ছিল, দেখিয়া অনেকেই সমবেদনা জ্ঞাপন করিল। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ দোকানী বলিল, "মা, একটু জল খাবে?"

স্বপ্নার মুখে কথা ফুটিল না, সে শুধু একটু ঘাড় হেলা-ইয়া সম্মতি জানাইল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জনতার ভিতর হইতে এক জন দৌড়াইয়া গিয়া পানের দোকান হইতে এক গ্লাস জল আনিলে বৃদ্ধ দোকানী আগ্রহভরে তাহা স্বপ্নার মুখে ধরিয়া পান করাইল।

স্বপ্নার পিপাসা নিবৃত্ত হইলে নরেন ডাক্তার কোমল

স্বরে বলিল, "আপনি সঙ্কোচ করবেন না, আমি ডাক্তার; আমার হাঁটুতে মাথাটা রাখুন তো।"

স্বপ্না কুণ্ঠায় এতটুকু হইয়া গেল! হইলই বা ডাক্তার, কিন্তু কি করিয়া সে এই অপরিচিত যুবকের জানুতে মাথা রাখিয়া বসিবে—পথের মাঝে এই এত লোকের সম্মুখে! কি লজ্জার বিষয়!

ডাক্তার কিন্তু বিন্দুমাত্র সময়ের অপব্যয় করিল না, স্বপ্নার মাথা নিজের হাঁটুর উপর রাখিয়া খোঁপাশুদ্ধ চুল এক জনকে ধরিতে বলিল; তাহার পর পরিচর্য্যা আরম্ভ হইল।

স্বপ্নার চোখের জলে ডাক্তারের জানু ভিজিয়া গেল।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইলে কে এক জন ডাক্তারের হাতে জল ঢালিয়া দিলে, হাত ধুইয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে ডাক্তার স্বপ্নাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে লোক-জন কেউ আছে?"

স্বপ্না নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

"আপনি কোথায় যাবেন?"

স্বপ্না ঠিকানা বলিলে ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "৬১নং বাড়ী? ওটা রজনী রায়ের বাড়ী নয়? তিনি এখন বেঁচে নাই বটে।"

স্বপ্না স্বীকার করিল।

ডাক্তার বলিল, "আপনার অভিভাবকের নামটা বলবেন কি?"

স্বপ্না বলিল, "পুরুষ অভিভাবক ত কেউ নেই; মা আর আমি সেখানে থাকি।"

ডাক্তার প্রশ্ন করিল, "আপনি কি উৎপলবাবুর বোন স্বপ্না?"

স্বপ্না ডাক্তারের মুখের দিকে একটু আশ্বস্তভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনি দাদাকে চিনতেন তাহ'লে?"

"উঠুন আমার গাড়ীতে। আমি রজনীবাবুরই বড় ছেলে নরেন।"—সে স্বপ্নার হাত ধরিয়া তুলিতে গেল। কিন্তু স্বপ্না উঠিতে পারিল না, পা-খানি একেবারে অসাড়, কোমরও নাড়িবার শক্তি ছিল না। সে "উঃ" বলিয়া কোমরে হাত দিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

নরেন বলিল, "আপনি উঠতে পারবেন না, না? বৃষ্টি ত বেশ জোরেই এলো। হরিহর, শোনো।"

সে কোটটা খুলিয়া শোফায়ের হাতে দিল, এবং স্বপ্নার ঘাড়ের নীচে একটি ও দুই জানুর নীচে অপর হাতখানি দিয়া, শিশুকে অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইবার ভঙ্গিতে তাহাকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "শক্ত ক'রে আমার গলা ধরুন, বড্ড কাদা, আপনাকে নিয়ে যদি পা পিছলে যায়, আপনাকে হয় তো বাঁচানো কঠিন হবে। ধরুন আপনি; এতে লজ্জা করবার কিছু নেই।—প্রাণটা আগে।"

স্বপ্নাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নরেন তাহার পাশে বসিল, এবং তাহার ব্যথিত মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোমরেই বুঝি খুব বেশি লেগেছে?"

স্বপ্না কাতর স্বরে বলিল, "হাঁ, আর পায়েও বড্ড লেগেছে। পা মোটে পাত্‌তে পাচ্ছিনে।"

"বটে! দেখি।"—বলিয়া চক্ষের পলকে হেঁট হইয়া ডাক্তার স্বপ্নার জুতার ষ্ট্র্যাপটা খুলিয়া ফেলিল, এবং তাহার সুগঠিত পা-খানি হাতে তুলিয়া লইল। তাহার পর একটু নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, "খুব বেশি মোচড় লেগেছে দেখ্‌ছি! একটু কষ্ট দেবে।"

দেহে যন্ত্রণা ত ছিলই, তাহার উপর মায়ের মুখের সন্দেশগুলি নষ্ট হইল, এই কষ্টই তাহার মর্ম্মান্তিক হইল। স্বপ্না একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হেঁট হইয়া ডাক্তারের জুতার ডগায় আঙুল ঠেকাইয়া তাহা কপালে স্পর্শ করিল।

নরেন বলিল, "ও কি, আমার পায়ে হাত দিলেন কেন?"

স্বপ্না ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিল, "আপনিই ত আগে আমার পায়ে হাত দিলেন!"

"আমি ডাক্তার যে!" বলিয়া নরেন একটু হাসিল; তাহার পর বলিল, "এই বৃষ্টিতে আপনি গিয়েছিলেন কোথায়?"

স্বপ্নার মুখে কথাটা প্রথমে বাধিলেও সে তাহা গোপন না করিয়া সত্য কথাই বলিল। বলিল, "কাল অম্বুবাচী লেগেছে কি না, তাই মায়ের জন্যে সন্দেশ আনতে গিয়েছিলুম।"

—ইহার পর উভয়েই নীরব রহিল।

স্বপ্না চিরদিন এমন ছিল না—এক দিন সে ধনীর দুলালী ছিল, পিতার বাড়ী, গাড়ী, দাসদাসী সবই

ছিল। তার পর কুক্ষণে তিনি শেয়ার-মার্কেটে প্রবেশ করেন; তার ফলে বাড়ী, জমি-জমা যেখানে যা ছিল সর্ব্বস্বই তিনি খোয়াইলেন; সর্ব্বস্বান্ত হইবার পর মনের দুঃখে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইলেন।

স্বপ্নার দাদা উৎপল, নরেনের সহপাঠী ছিল—বাপের মৃত্যুর পর একটা চাকুরী লইয়া সে সিঙ্গাপুরে গিয়াছে—আর দেশে আসে নাই। কিছু কিছু টাকা পাঠায়, তাহাতেই মাতা-কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন চলে। অর্থাভাবে স্বপ্নার বিবাহ হয় নাই, সে দুইটা 'টিউশন' জুটাইয়া লইয়া অতি কষ্টে বি-এ পড়িবার খরচ চালাইতেছে।

২

নরেনের মনে পড়িতেছিল—আট বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন স্বপ্নাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। উৎপলের সঙ্গে নরেন তখন আই, এস-সি পড়িত। তাদের বাড়ী যখন যাইত—স্কুলের ছাত্রী সদাহাস্যময়ী স্বপ্নাকে তা'র বড় ভাল লাগিত; নবযৌবনের রঙিন চশমার ভিতর দিয়া স্বপ্নাকে কেন্দ্র করিয়া সে তখন কত মধুর কল্পনার জালই বুনিয়াছিল। তার পর ভোজবাজীর মত কোথায় গেল স্বপ্নাদের ঐশ্বর্য্য, আর সেই সঙ্গে কোথায় ভাসিয়া গেল তাহার কল্পনার ছবি স্বপ্না!

স্বপ্নার প্রতি তার যে একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল উৎপল তাহা জানিত; তাই পিতার মৃত্যুর পর দিশাহারা হইয়া সে নরেনকে বলিয়াছিল, "স্বপ্নাকে তুই নিবি ভাই? আমি যে কূল-কিনারা খুঁজে পাচ্ছি না!"

নরেন সবে সেই বৎসর মেডিকেল কলেজে ঢুকিয়াছে। সে বলিল, "বাবাকে বলে দেখ না, ওঁকে রাজী করতে পারলেই সব ঠিক হ'য়ে যাবে। মা কোন আপত্তি করবেন না। আমাকে সুখী দেখলেই তিনি সুখী হবেন।"

কিন্তু উৎপলের সাহস হইল না, অতখানি রাশভারী রজনী রায়ের সম্মুখে দাঁড়াইতেই সে ভরসা পাইল না।

তার পর এক দিন উৎপল নরেনকে ম্লানমুখে তাহার সিঙ্গাপুর গমনের সংবাদ জানাইল; মা-বোনের কি ব্যবস্থা করিল, তাহা নরেনকে বলিল না; নরেনও সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। কেমন কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিল।

তার পর কত বৎসর অতীত হইয়াছে। নরেনের বিবাহ হইয়াছিল; কিন্তু একটি পুত্র রাখিয়া সেই স্ত্রী আজ তিন বৎসর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পর যখনই সে স্বপ্নাদের পুরাতন বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, তখনই মনে পড়িয়া যায়—সেই আনন্দময়ী হাস্য-চঞ্চলা বালিকা—স্বপ্নাকে! সংপ্রতি কয়েক দিন পূর্ব্বে সে তাহার ছোট ভাই মণির নিকট জানিতে পারিয়াছে, স্বপ্না তাহার সহাধ্যায়িনী এবং তাহাদেরই একটা ভাড়া-বাড়ীতে মাতার সহিত বাস করে।—তাহার পর আজ ঐরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে উভয়ের সাক্ষাৎ।

নরেন মুখ ফিরাইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনীর দিকে চাহিল, বিষণ্ণ, ক্লান্ত মুখ; সে যেন অতলে ডুব দিয়া কি খুঁজিতেছে!

নরেন বলিল, "আপনি আমায় চিনতে পারেন নি?"

স্বপ্না আয়ত চোখের সকরুণ দৃষ্টি তাহার মুখে নিবদ্ধ করিল। নরেন বলিল, "উৎপলের সঙ্গে সর্ব্বদা আপনাদের বাড়ী যেতুম। তখন আপনার বাবা বেঁচে ছিলেন। ফুলদানী ভাঙ্গার কথা আপনার মনে নেই? আমি সেই নরেন।"

স্বপ্না একটা নিশ্বাস চাপিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, ঠিক করতে পারিনি। আপনি রজনী বাবুর ছেলে, তাও আমরা জানতুম না।"

"মণি আপনার সঙ্গে পড়ে, না? সে আমার ছোট ভাই।"

স্বপ্না ঘাড় হেলাইল।

নরেন প্রশ্ন করিল, "উৎপল আর দেশে ফেরেনি?"

স্বপ্না নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না। দাদা একটা ডাচ মেয়েকে বিয়ে করেছে, একটি ছেলেও হয়েছে। আর সে বোধ হয় দেশে আসবে না। আর এলেই বা কি?" তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর বেদনা ঝঙ্কৃত হইল।

কথা বলিতে বলিতে গাড়ী আসিয়া স্বপ্নাদের দুয়ারে দাঁড়াইল। অপরিচিত যুবকের সহিত মায়ের সামনে যাইতে স্বপ্নার অত্যন্ত লজ্জা করিতেছিল। পা নাড়িতে গিয়া দেখিল, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষাও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে এবং রীতিমত ফুলিয়াও উঠিয়াছে। অপরিচিত লোকের সম্মুখে নরেন তাহাকে কোলে তুলিয়া গাড়ীতে

উঠাইয়াছে, কিন্তু পরিচিতের সম্মুখে সে কেমন করিয়া সে-ভাবে নামিবে ?

নরেন ততক্ষণে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে : হাত বাড়াইয়া বলিল, "আসুন।"

স্বপ্না আরক্ত মুখে বলিল, "না, বোধ হয় আমি হাঁটতে পারব।"

কিন্তু হাঁটা দূরের কথা, সে নড়িতেই পারিল না। নরেন তাহার ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেখিয়া হাসিল, এবং সন্তর্পণে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া পুনরায় বলিল, "ভাল ক'রে আমার গলাটা ধরুন। আঃ, আপনার কি ভয়ঙ্কর লজ্জা!"

অগত্যা স্বপ্না দুই হাতে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার আদেশ পালন করিল; কারণ, রাস্তার উপর চারিটা সিঁড়ি বাহিয়া তবে বাড়ীতে উঠিতে হয়। কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, পৃথিবী দ্বিধা হইলে তাহার লজ্জা নিবারণের উপায় হইত।

সদরের দুয়ারের পাশেই স্বপ্নাদের দু'খানা ঘর, বেশি দূর যাইতে হইল না, স্বপ্নার মা কমলা তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া দিয়া কন্যার অবস্থা দেখিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পোড়াকপালী মেয়েটা নিশ্চয়ই মোটর-চাপা পড়িয়াছে!

স্বপ্নাকে বিছানায় শয়ন করাইয়া নরেন বলিল, "সব বলচি মা, আগে ওঁর কাপড়টা ছাড়িয়ে দিন্, ভিজে কাপড় অনেক ক্ষণ গায়ে রয়েছে।"

সে বাহিরে গিয়া দালানে বেড়াইতে লাগিল। রক্তে, ধূলা-কাদায় তার নিজের কাপড়ের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না! ট্রাউজারের জানুটা তো রক্তে লাল হইয়াছিল।

কন্যাকে কাপড় ছাড়াইতে ছাড়াইতে মা তাহার নিকট হইতে সকল কথা শুনিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া নরেনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি উৎপলের বন্ধু, আজ আমার উৎপলের কাজই করেছ। পথে-ঘাটে প'ড়ে যদি প্রাণটাই বেরিয়ে যেত, কি ক'রেই বা আমি জানতে পারতুম?" তাঁহার দুই চোখ দিয়া দর-দর ধারে জল পড়িতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ ধরিয়া সুখ-দুঃখের কথা বলিয়া নরেন উঠিল; বলিল, "ওঁর ওষুধ আমি গিয়েই পাঠিয়ে দিচ্ছি। পিঠে-কোমরে মালিশ ক'রে সেঁক দেবেন; পা-টা লোশনে ভিজিয়ে রাখবেন। কাল এসে আমি ব্যাণ্ডেজ খুলব।"

রাত্রে খানিকটা মালিশ করিয়া দিয়া কন্যার গায়ে হাতখানা রাখিয়া দিয়া কমলা ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বপ্না ঘুমাইতে পারিল না, দেহে যন্ত্রণাও যথেষ্ট হইতেছিল, তা' ছাড়া তার মনকে অধিকতর প্রপীড়িত করিল—তাহার পূর্ব্বস্মৃতি।

নরেন ফুলদানীর কথা বলিয়াছিল, স্বপ্না তাহাও ভোলে নাই। তাহার বুক ভেদিয়া একটা নিশ্বাস পড়িল। উৎপলের একটা খুব পছন্দসই ফুলদানী স্বপ্নার আঁচল জড়াইয়া-পড়িয়া হঠাৎ চূরমার হইয়া গিয়াছিল,—মূল্যবান পোর্সিলেনের ফুলদানী। ভয়ে স্বপ্নাকে কাঁদিতে দেখিয়া নরেন বলিয়াছিল, "তুমি পালিয়ে যাও, আমি বলব, আমার হাত লেগে ভেঙে গেছে।" নরেন যে স্বপ্নার অপরাধ স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তাহা বুঝিয়া স্বপ্না একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল।

আজ ছেলেবেলাকার সে-কথা মনে করিয়া অন্ধকারে স্বপ্না একটু হাসিল। আট বৎসর পরে দেখা হইয়াছে, কিন্তু কত পরিবেষ্টনের মধ্যে; কেহ কাহাকেও চিনিতেই পারে নাই। চিনিয়াও স্বপ্না শান্তি পায় নাই।

৩

পরদিন সকালেই নরেন আসিল, একা নয়, ছোট ভাই মণি এবং পুত্র হীরেনসহ। ফুট-ফুটে ছোট্ট ছেলেটি।

স্বপ্না হাত বাড়াইয়া ডাকিল, "খোকাবাবু এস!"

হীরু গেল না, কাকার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। নরেন তাহার রকম দেখিয়া হাসিল; বলিল, "ও পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে মণিকে। ও-ই পৃথিবীতে সব চেয়ে ওর আপন। আমার কাছেও বড় ঘেঁসে না।"

মণি বলিল, "সেটা কি ওর খুব বেশি দোষ? ছ' মাসের ছেলে যখন, তখন তুমি বিলেত গেলে, এসেছ মোটে তিন-চার মাস, এর মধ্যে আর কতই বা চিনবে?"

নরেন স্বপ্নার মাথার ফেটি খুলিতেছিল, হাসিতে লাগিল; বলিল, "তা ছাড়া অত আব্দার দেওয়াও আমার সাধ্য নয়। আজ ব'লে নয়, দু'-তিন মাস বয়েস থেকে মণি ওকে নিয়ে শুচ্ছে। মা কত বলেছেন, মা'র কাছেও দেয়নি। আমি ত একটা দিনও পারিনি!"

স্বপ্না বিস্মিত ভাবে বলিল, "কেন, ওর মা ?"

মণি হীরুর দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "অসুখ করেছিল, বিদেশে আছেন, না হীরু ?"

হীরু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

নরেনের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল।

স্বপ্না লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া জিহ্বার অগ্রভাগ দংশন করিল। বাহিরের কাহারও খবর সে রাখে না, হয় তো মা জানিলেও জানিতে পারেন, কিন্তু কি মূঢ় আচরণই সে করিয়া ফেলিল !

মিনিট-কয়েক কেহই কথা বলিল না ; স্বপ্না যে লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছে, তাহা অনুমান করিয়া নরেনই প্রথমে কথা বলিল। বলিল, "মাত্র আট বছরের তফাৎ ; কিন্তু কেউই আমরা চিনতে পারিনি। মণির মুখে সে-দিন শুনেছিলুম, আর আপনিও বাড়ীর ঠিকানাটা বললেন, তাই ; না হ'লে কিছুতেই মনে ক'রতে পারতুম না।"

কমলা বলিলেন, "ওকে তো ছোট থেকেই দেখছ বাবা, আজ না হয় বড়ই হয়েছে ; কিন্তু তুমি 'আপনি' ব'লে কথা ব'ললে অন্যায় হয়।"

নরেন হাসিমুখে স্বপ্নার মাথার ক্ষত পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর সরু কাঁচি দিয়া পাশের চুলগুলি কাটিয়া দিল। স্বপ্না ক্ষুব্ধ চক্ষে কাটা চুলের গোছার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "এত লেগেছে তার জন্যে দুঃখ নেই ; আর ঐ ক'টা চুলের জন্যে মুখ শুকিয়ে গেল !"

স্বপ্না অপ্রতিভ হইয়া হাসিয়া ফেলিল।

তাহার পর হাত ধুইয়া নরেন আসিয়া বসিল, অনেক ক্ষণ গল্প করিবার পর পুত্র ও ভ্রাতাসহ বিদায় লইল, এবং কল্য পুনরায় আসিয়া ব্যাণ্ডেজ খুলিবে জানাইয়া দিল।

নরেন চলিয়া গেলে কমলা একখানি রেকাবীতে কিছু ফল, মিষ্টি, ও মাখন মাখাইয়া পাঁউরুটী আনিয়া, ছোট টুলখানি টানিয়া তাহার উপর রাখিলেন। স্বপ্না দেখিয়া বলিল, "ও কি ক'রেছ মা ? আমার ত কিছু দুরারোগ্য ব্যাধি হয়নি, এত আড়ম্বর ক'রেছ কেন ? এর পর ?"

মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি কোথায় পাব মা, আর কি সে-দিন আছে আমার ? এ-সব নরেন গাড়ী ক'রে এনেছিল, যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে গেল। ও-বেলা থেকে ওদের ঘরের গাইয়ের দুধ পাঠাবে বলেছে।"

স্বপ্নার মুখের আনারস বিস্বাদ হইয়া গেল, এ তবে ভিক্ষার দান ! বিরস মুখে বলিল, "এ ভিক্ষে কেন নিতে গেলে মা ? আমরা গরীব, গরীবের মতই না হয় রইলুম। বড়লোকের অত দয়া না নিলেই পারতে !"

মা হতবুদ্ধি হইয়া মেয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন ; মাত্র কাল যে তাহাকে অতখানি বিপদে বুক দিয়া সাহায্য করিয়াছে, আজ তাহার বিরুদ্ধে অতখানি বিষোদ্গার করিল কেমন করিয়া ? একটু পরে তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, "হাঁ রে, কৃতজ্ঞতা ব'লে কি কোন পদার্থ তোর হৃদয়ে নেই ? তুই যে এত বেইমান, তা তো আমি জানতুম না ! কাল তোকে পথ থেকে বুকে তুলে নিয়ে এসে ঘরে শুইয়ে গেল—আজ সকাল না-হ'তেই এসে কত যত্ন ক'রে তোর সেবা ক'রে গেল, আর তোর মুখ থেকে এমন কথা বেরুল ?"

স্বপ্নার মুখ মলিন হইয়া গেল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু মায়ের একটা কথা হঠাৎ যেন হৃদয়ের কোন একটা সুরবাঁধা তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া মিঠাসুরে বাজিয়া উঠিল। হাঁ, সত্যই নরেন তাহাকে বুকে তুলিয়াই আনিয়াছিল, কত সাবধানে, কত সন্তর্পণে, পাছে সে ব্যথা পায় ! স্বপ্নাকে গলা ধরিতে বলিয়াছিল, স্বপ্নাও ধরিয়াছিল ; তার হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ স্বপ্না নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিল। সে স্মৃতি মনে পড়িতেই স্বপ্নার মুখ-চোখ উত্তপ্ত রক্তের উচ্ছ্বাসে আরক্ত হইয়া উঠিল।

* * * *

সেই দিনই সন্ধ্যায় নরেনের কাণে গেল, বারান্দায় খুড়া-ভাইপোতে আলাপ চলিতেছে—"ঐ যাঁর মাথায় পটি-বাঁধা উনি কে, কাকু ?"

মণি বলিল, "উনিই তোমার মা।"

সোৎসাহে হীরু বলিল, "সত্যি ? উনিই আমার মা ?"

মণি বলিল, "হাঁ, তোমায় বলিনি, তোমার মায়ের অসুখ ? দেখলে তো ?"

হীরু একটু ভাবিয়া বলিল, "মায়ের ঘা শুকিয়ে গেলে বাবা মাকে আনবেন তো কাকু ? আর লাগিয়ে দেবেন না ? ভাল বাসবেন ?"

মণি হাসি চাপিয়া বলিল, "আনবেনই তো; লাগিয়ে দেবেন কেন? কত ভালবাসবেন!"

হীরু আবার একটু ভাবিল, বলিল, "কি ক'রে ভাল-বাসবেন? চুমো করবেন?"—মণি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নরেন আর সহ্য করিতে পারিল না, বাহিরে আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! তুই গাধা, কি সব ওকে বোঝাচ্ছিস? মা'র কাছে যদি বলে, তিনি কি মনে করবেন?"

মণি হাসিমুখে বলিল, "ভাববেন, লক্ষ্মীছাড়া সংসারের এইবার শ্রী ফিরবে!"

নরেন রাগিয়া বলিল, "দিন-দিন তুই আস্তো বাঁদর ব'নে উঠ্‌ছিস্ দেখছি! দশ বছর আগে হ'লে এই রকম বাঁদরামির জন্যে মার খেয়ে ম'রতিস।"

মণি তাহার রাগ গায়ে মাখিল না, হাসিয়া বলিল, "দশ বছর আগে হ'লে আমি মার খেতুম কি তুমি খেতে সেটা ভেবে দেখবার কথা! কখন যে মারামারি ক'রে তুমি আমার কাছে জিতেছ তা তো মনে পড়ে না। আর দশ বছর আগে তুমি এমন কি-ই বা ছিলে যে, বি-এ ক্লাশের মেয়ে তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিতে চাইতাম? আজ তুমি একটা কেষ্ট-বিষ্টু হ'য়েছ ব'লেই বলছি!"

আলোচনা ঐখানেই থামিয়া গেল।

৪

মাস-দেড়েক পরের কথা।

স্বপ্না টিউশন সারিয়া ঘরে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িতে-ছিল। এই বাড়ীর দোতলায় যে ভাড়াটিয়া থাকেন, তাঁহার একটি অবিবাহিতা মেয়ে আছে—স্বপ্নারই বয়সী। খুব ভাব না থাক, স্বপ্নার সহিত তাহার রহস্যালাপ চলিত। সে ঘরে ঢুকিয়া হাসিমুখে স্বপ্নার পিঠে ফুলো হাতে একটা চড় মারিয়া বলিল, "ভাগ্যি ভাল তোমার ভাই, খুব বাগিয়ে নিলে বটে! আমরা অমন রাস্তা-ঘাটে আছাড়ও খেতে পারব না, নরেন ডাক্তারের কোলে উঠে বাড়ী আসাও অদেষ্টে নেই! সে রোজ দেখতেও আসবে না, আর বাড়ী ভাড়াও কমে যাবে না।—খাসা!"

স্বপ্না নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া-ছিল। কথাটার অর্থ যেটুকু সে বুঝিতে পারে নাই, রূপালীর চোখে-মুখে হাসির অন্তরালে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত ফুটিতে দেখিয়া তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না; তবু শুষ্ক-স্বরে বলিল, "তুমি যে ভাই, অনেক কথাই ব'লে ফেল্‌লে, কিন্তু ও হেঁয়ালীর ভাষা বুঝি, তত বুদ্ধি আমার নেই।"

রূপালী কুটিল হাস্যে বলিল, "নে নে, আর ন্যাকামি করিসনি ভাই! আমরা বি-এ, এম-এ পড়িনি ব'লে কি এত উজবুক? পাড়াশুদ্ধ লোক গা-টেপাটিপি ক'রে হাসছে! কেউ তো কাণা নয়, অত বড় গাড়ীখানা নিত্যি দোরে এসে দাঁড়াচ্ছে, দেখতে পাবে না? আর আমরা তো এক-বাড়ীতেই আছি, চক্ষুও আছে, দেখতে পাচ্ছি সবই।"

স্বপ্না তীব্রস্বরে বলিল, "দেখ রূপালী, ঠাট্টা ততক্ষণই ভালো লাগে, যতক্ষণ তার হুল না থাকে। তুমি এ-সব কি ব'লচ?"

রূপালী হাত নাড়িয়া বলিল, "কি বলচি জানো না? একটু আগে নরেন ডাক্তারের দরোয়ান এসে চিঠি দিয়ে গেল, এই মাস থেকে বাড়ীভাড়া তোমাদের অর্দ্ধেক কমে গেল! চিঠিখানা দরোয়ান বাবার হাতে দিলে ব'লেই জানতে পারলুম।—এ-সব কি অমনি হয়?" বলিয়া সে চোখের একটা কদর্য্য ইঙ্গিত করিয়া হাসিতে লাগিল।

স্বপ্না ইহার কিছুই জানে না, প্রথমটা সে স্তম্ভিত হইয়া গেল; তাহার পর সহজ সুরে বলিল, "তা আমি জানব কি ক'রে? আমি তো এইমাত্র বাড়ী ফিরচি। আর যদিই দিয়ে থাকেন, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? উনি আমার দাদার বন্ধু ছিলেন, সেই জন্যেই এতটা করেন।"

রূপালী খিল-খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "ওঃ, দাদার বন্ধু! আর দিদির? ডুব দিয়ে জল খেলেও ধরা এক-দিন পড়তেই হয় স্বপ্না!"—বিষ ছড়াইয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

স্বপ্নার চোখে বিশ্ব-সংসার ঘুরিতে লাগিল; কোন মতে শিথিল বসন টানিতে টানিতে সে গিয়া শুইয়া পড়িল। কি সর্ব্বনাশ তার করিল নরেন!—কেন সে এ দয়া দেখা-ইতে আসিল? তার গায়ে যে কালি মাখাইয়া গেল, এ কালি সে ধুইবে কি করিয়া? পাড়ার লোকে গা-টেপা-টেপি করিয়া হাসে! স্বপ্নার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণা ও আতঙ্কে

কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এক একটা শিক্ষিতা মেয়ের ব্যবহারে হয় তো দোষ থাকে, কিন্তু অপরাধী হয় প্রায় সকলেই। হয় তো প্রতিবেশীরা তাহার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিল; এত দিন তাহাকে লইয়া কোন আলোচনার সুযোগ পায় নাই, এইবার বাঘ রক্তের গন্ধ পাইয়া দাঁত বাহির করিয়াছে!

সে মেয়ে পড়াইয়া নিজের পড়া বজায় রাখিয়াছে: রূপালী যে-ভাবে বলিল, যদি সত্যই পাড়ায় সেই ভাবে আলোচনা উঠিয়া থাকে, তবে সেখানেও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইবে না।···কি লজ্জা,—কি ঘৃণা! তার ছাত্রী দু'টিও শুনিবে! হয় তো পাঠ্য পুস্তকের আড়ালে মুখ ঢাকিয়া হাসিতে থাকিবে। অভিভাবক হয় তো বলিবেন. আর তাহার কাছে মেয়েরা পড়িবে না।···

ক্ষোভে সে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তার যত রাগ পড়িল নরেনের উপর। তাহারা অভাব জানায় নাই, দয়া চাহে নাই, তবে দরোয়ানের হাতে চিঠি দিয়া সে কেন ভাড়া কমাইতে আসিল? দয়া!···আজ নরেন দয়া দেখাইতে আসিয়াছে? এক দিন উৎপল যখন দয়া চাহিয়াছিল, তখন সে তাহা করে নাই;—করিলে চিরদিনের মত উৎপল তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত না। দয়া নয়, এ ধনীর ঐশ্বর্য্যমত্ততা, তার ধনগর্ব্ব! স্বপ্নার বুকের ভিতর জ্বালা করিয়া উঠিল। নিরুপায়ের একমাত্র সান্ত্বনা চোখের জল!—স্বপ্না ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমলা পাশের ঘরে আহ্নিকে বসিয়াছেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না।

৫

স্বপ্নার মানসিক অবস্থা যদি ঠিক থাকিত, তবে সে জানিতে পারিত, পুরুষের ভারী জুতার শব্দ তাহার কক্ষদ্বারে আসিয়া থামিয়াছে।

নরেন ঘরে উঁকি-মারিয়া অবাক হইয়া গেল! কমলা ঘরে নাই, আর স্বপ্না বালিসে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছে, কোমরে কাপড় বাঁধা আছে, সাড়ীর অবশিষ্ট অংশটা ঘরের মেঝেতে লুটাইতেছে। সাদা গুল্ফ দু'টি অনাবৃত, শিথিল বাহু দুইখানি বালিসের উপর পড়িয়া আছে। ঘরের ভিতর ঈষৎ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল; তথাপি স্বপ্নার এই অস্বাভাবিক মূর্ত্তি দেখিয়া সহজেই নরেন বুঝিল. কোন মর্ম্মান্তিক বেদনা তাকে এমন বিবশ করিয়াছে।

নরেন সুইচটা টিপিতে হাত তুলিল; আবার কি ভাবিয়া আলো জ্বালিল না। এক মিনিট স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সম্মুখে অগ্রসর হইল। অশ্রুমুখী স্বপ্নার মাথার উপর হাতখানা রাখিয়া আদরের সুরে ডাকিল, "স্বপ্নময়ী!"

বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইলে স্বপ্না অধিক চমকাইত না, অধিক ভয় পাইত না। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া-বসিয়া অসম্বৃত বস্ত্র গায়ে জড়াইতে জড়াইতে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলিল, "আপনি আলো জ্বালুন—আলো জ্বালুন।"

নরেন হতভম্ব হইয়া বলিল, "কেন, কি হ'য়েছে? তুমি অমন কোচ্ছ কেন?"

স্বপ্না আর্ত্তস্বরে বলিল, "আপনি আলো জ্বালুন।"

নরেন আর কথা বলিল না, আলো জ্বালিয়া দিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল; উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "কি হ'য়েছে স্বপ্না? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি-নে।"

স্বপ্না ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কেন আপনি আসেন? কেন ভাড়া কমান? আমরা কি ব'লেছি? আপনার তো আরও কত ভাড়াটে আছে—কেন আপনি আসেন, কেন দয়া ক'রতে চান,—আমরা তো তা চাইনি।"

তাহার অসংলগ্ন কথার ভিতর হইতে বিশেষ-কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিল না; বিমূঢ় কণ্ঠে নরেন বলিল, "কি হয়েছে স্বপ্না, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

স্বপ্না উত্তেজিত—অস্থির ভাবে বলিল, "আপনার পায়ে পড়ি, আপনি যান, দোহাই আপনার! আপনি যান। পাড়ার লোকে গা-টেপাটেপি ক'রে হাসছে। আমি যে লজ্জায় মরে যাচ্ছি।"—বলিতে বলিতে সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পুনরায় বসিল। বলিল, "এতক্ষণে বুঝেছি! কিন্তু তাহ'লে তো আমি মোটেই তোমায় ছেড়ে যাব না। যদি আমার জন্যেই তোমার গায়ে কালি ছিটিয়ে থাকে, তবে আমিই তা মুছিয়ে দেব।"—এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া বলিল, "আমার ব'লতে ভরসা হ'ত না, নইলে অনেক দিন পূর্ব্বেই তোমার মত

চাইতে পারতুম। আমি একবার বিয়ে করেছি, ছেলেও আছে,—আমার পক্ষে তোমার কাছে এ-কথা তোলাও লজ্জার বিষয়! যদিও আমার মনে এটুকু ভরসা আছে—হীরুকে তোমার নিজের সন্তান বলে মনে করতে তুমি পারবে।"

এত দিনের পুঞ্জীভূত বেদনা ও অভিমান এবার ভাঙিয়া পড়িল; স্বপ্না রুদ্ধস্বরে বলিল, "কেন হয়? হীরু আপনার ছেলে,—আমার কে? আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আপনি কেন দয়া করতে আসেন? এক দিন দাদা আপনার দয়া চেয়েছিল,—বড়লোক আপনি,—সে দয়া করেননি। আমিও সেই,—আপনিও সেই,—আজ যেচে দয়া করতে এসেছেন কেন?"

নরেনের হাতের মুঠা কঠোর হইয়া উঠিল, তবে সে-কথা স্বপ্না জানে? ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিবার পর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "তুমি আমার ওপর অবিচার কোচ্ছ স্বপ্না! যখনকার কথা ব'লছ, তখন আমি ছোট ছিলুম, নিজের ইচ্ছায় কিছু করবার স্বাধীনতা ছিল না। বাবার সামনে আমরা কখন মুখ তু'লে একটা কথা বলার সাহস করিনি। উৎপলকে বাবাকে বলতে বলেছিলুম, সে-ও ব'লতে সাহস করেনি। বিশ্বাস হয় তো করবে না, স্বপ্না, কিন্তু আমিও তাতে যথেষ্ট ব্যথা পেয়ে-ছিলুম। তুমি তখন ছেলেমানুষ ছিলে, হয় তো বুঝতে পারতে না,—কিন্তু উৎপল আমার মনের কথা জানতো।"

স্বপ্না অধীর ভাবে বলিল, "সে কথা আজ আর আমার কোন উপকারে আসবে না,—দাদা আর ফিরবে না,—তার জানা না-জানায় কি আসে যায়?"

নরেন বলিল, "সে না ফিরুক, কিন্তু তখন সে যা জানতো, আজ কি তুমি তা জানো না? আমার ব'লতে সঙ্কোচ হয়, কারণ, এক দিন আর এক জনকেও এমনি ক'রেই রিক্ত হ'য়ে ভালবেসেছিলুম। সে চলে গেছে, কিন্তু আমি অপরাধ স্বীকার ক'রেই বলছি, তার স্মৃতির মর্য্যাদা আমি রাখতে পারিনি। আমার ভেতর যৌবন বেঁচে আছে,—ভালবাসা তার প্রাণধর্ম্ম; আমি স্মৃতিকে আঁকড়ে প্রাণধর্ম্মকে অবহেলা করতে পারিনি। আমি তোমায় ভালবাসি—নিষ্কাম প্রেম নয়,—আমি তোমায় কামনা করি। উৎপল যা জানতো, তুমি বোধ হয় আজ তার চেয়েও বেশি জান স্বপ্না!"

স্বপ্নার সমস্ত দেহের ফুটন্ত রক্ত মাথায় উঠিয়া গিয়াছিল; দুই রগের উপরের দু'টি শিরা বুঝি এখনই ছিঁড়িয়া যাইবে! সে ক্ষিপ্তস্বরে বলিল, "আমি কিছুই জানতে চাই না নরেন-বাবু! আমি হাতজোড় কচ্ছি, আপনি যান, দয়া ক'রে আর আসবেন না। আমি পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখাব কি ক'রে?"

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইল, স্বপ্নার মাথার উপর একবার ডান হাতখানি রাখিল, তাহার পর সরাইয়া লইয়া বলিল, "তাই যাচ্ছি। এখন তুমি ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে রয়েছ, তোমার বিচার করবার শক্তি নেই। যখন শান্ত হবে তখন ভেবে দেখো, আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলুম কি না? আমার দোষ কোন্‌খানে? আট বছরের আগের আমাতে, আর আজকের আমাতে কত প্রভেদ ভুলে গেলে কেন?"—সে ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেল।

বাড়ীভাড়া স্বপ্না পূরাই দিল। মাতা-কন্যায় ইহা লইয়া খুব বচসা হইয়া গেল; কিন্তু স্বপ্নার জেদই শেষ পর্য্যন্ত বজায় রহিল।

নরেন আর আসে না। কমলার মনে যে আশার প্রাসাদ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কন্যা স্পষ্টভাবে তাহাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছে, ইহার পর কোন অছিলা—কোন ওজর দিয়া তাহাকে ডাকা যায় না। বাড়ীর অন্যান্য অধিবাসীরা তাঁহাকে ঠেস দিয়া দুই-চারিটা কথাও বলিয়াছে;—তাহারা যেন কি একটা কদর্য্য পরিণতি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। মনের কষ্টে বিধবা গোপনে চক্ষু মুছেন। নির্ব্বোধ মেয়েটা কেন যে নরেনকে আসিতে বারণ করিল? লোক-পরম্পরায় শুনা যাই-তেছে, নরেনের মা ছেলের বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন; না হইবেনই বা কেন? মাত্র দেড় বৎসর ঘর করিয়া বউ মরিয়া গিয়াছে। ঐ তো এক ফোঁটা একটি ছেলে। এত দিন নরেন বিলাতে ছিল তাই,—কিন্তু এমন সুবর্ণ সুযোগ পোড়াকপালী মেয়েটা নষ্ট করিয়া ফেলিল! নরেনের হাতে স্বপ্নাকে যদি দিতে পারিতেন, তবে শেষ জীবনটা তাঁর শান্তিতে কাটিত।

এক দিন রবিবারের ছুটীতে স্বপ্না নিজের জন্য কল চালাইয়া জামা সেলাই করিতেছিল। কমলা কাছে আসিয়া বসিলেন; দুই-একটা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, মণির সঙ্গে কলেজে দেখা হয় ?"

স্বপ্না মুখ তুলিয়া বলিল, "মণিবাবুর কথা বলছ ? হাঁ।"

কমলা বলিলেন, "তোর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে ?"

স্বপ্না ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কলেজের ছেলেদের সঙ্গে আমার কথা বলার দরকার কি ? আমি কইতেই বা যাব কেন ?"

মা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেলেন। একটু পরে বলিলেন, "শুনচি, নরেনের জন্যে ওর মা ক'নে খুঁজছে।"

স্বপ্নার বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল; সে নিঃশব্দে নতমুখে কল ঘুরাইতে লাগিল।

কমলা বলিলেন, "আরতির মা ব'লছিল, ডাগর মেয়ে দেখতে শুনতে ভাল হবে, লেখাপড়া জানবে—এমনি চায়।"

স্বপ্না এবার মায়ের মুখপানে চাহিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "তুমি বাড়ীওলাদের ঘরের খবরে অত জড়িয়ে থাক কেন মা ?"

কমলা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনূঢ়া কন্যা জননীর মর্ম্মবেদনা কেমন করিয়া বুঝিবে ? ক্ষণপরে বলিলেন, "ও কি জামার ছিরি হচ্ছে ? বালিসের খোলের মত ! কেন একটু কুঁচি দিয়ে কি বাহার ক'রে করতে ইচ্ছে করে না ? জানিস তো অনেক রকম।"

স্বপ্না ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "থাকগে মা, অত খেটে জামা পরতে আমার আর ভাল লাগে না।" বলিয়া সে সমান করিয়া জামার মুহরী সেলাই করিতে লাগিল।

কমলা রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। স্বপ্না কোন দিনই বেশভূষায় বা প্রসাধনে উৎসাহী নয়, তবু যেন মায়ের মনে হইতে লাগিল, সে পূর্ব্বাপেক্ষাও উদাসীন হইয়াছে। মুখে একটা ব্যথিত শুষ্ক ভাব, যেন অহরহ কি একটা অব্যক্ত বেদনা তাহাকে পীড়া দিতেছে। সামান্য একটা কথার উপর কথা বলিলে ঝর্-ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে; একাকী থাকিতে পাইলে যেন খুসী হয়; সর্ব্বদা যেন কি ভাবে। মা বোঝেন, বয়স্থা অনূঢ়া কন্যার মনে নরেন ছায়া ফেলিয়াছে। কিন্তু স্বপ্নাই তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে; ফিরাইবার কোন সূত্রই মায়ের হাতে রাখে নাই। এখনকার ছেলে-মেয়েরা নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ভাবিয়া জীবনে জটিলতা আনিয়া ফেলে, মা-বাপের অভিজ্ঞ বুদ্ধির উপর আস্থা রাখে না। কন্যার বিষণ্ণ মনের গোপন-ব্যথা মায়ের অজ্ঞাত নাই: কিন্তু যে অর্গল সে স্বহস্তে রুদ্ধ করিয়াছে, তাহা মুক্ত করিবার উপায়ও তাঁহার কিছু নাই।

এমনই করিয়া পূজা আসিয়া পড়িল। মা-মেয়ের নিরানন্দ বিমর্ষতার মধ্য দিয়া ষষ্ঠী, সপ্তমী কাটিয়া গেল। অষ্টমীর দিন সকালে কমলা ম্লানমুখী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ তোর খোলসটা ছাড় তো স্বপ্না ! একটা ভাল জামা গায়ে দে, নতুন নীল কাপড়খানা পর, একটু পরিষ্কার হ'য়ে নে। চল, সার্ব্বজনীন দেখে অঞ্জলি দিয়ে আসি।"

বৎসরের দিনটা মা'কে মনঃক্ষুণ্ণ করিতে স্বপ্নার ইচ্ছা হইল না; সে ক্লান্ত ভাবে মায়ের আদেশ পালনে রত হইল। প্রসাধন শেষ করিয়া দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইতেই, নিজের অজ্ঞাতেই তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল; এত প্রসাধনেও তাহার পাণ্ডুর মুখের ম্লানিমা কাটে নাই। সে গামছাখানা লইয়া ঘসিয়া মুখখানা মুছিয়া ফেলিল। কেন যে সে এমন করিল, তাহার কোন কৈফিয়ৎ নিজের কাছেও সে দিতে পারিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু ভাসাইয়া বন্যা নামিল। স্বপ্নার মনের ভিতর কি একটা অব্যক্ত বেদনা যেন গুমরাইতেছিল, আজ আনন্দের দিনে বুকের কোন্‌খানটায় যেন একটা বিষাক্ত কাঁটা বিঁধিয়া থাকিয়া তাহাকে মর্ম্মান্তিক ব্যথা দিতেছিল। এই অনাহূত অশ্রুজলে বুঝি তাহার যন্ত্রণা একটু লাঘব হইল। পাছে মায়ের চোখে ধরা পড়ে, তাই সে প্রাণপণে অশ্রু-প্লাবিত মুখখানাকে মুছিয়া মুছিয়া লাল করিয়া তুলিল।

কিন্তু মায়ের চক্ষুকে কি সন্তান ফাঁকি দিতে পারে ? কমলা মিনিট-খানেক তাহার মুখ-পানে অনিমেষে চাহিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মুখে কিছু মাখলি নে ?"

স্বপ্না কথা কহিতে ভরসা করিল না; ঘাড় নাড়িল মাত্র।

কমলা হাত ধরিয়া বলিলেন, "আয়। একটা টিপ পরলেই পারতিস !"

একখানি রিক্সা করিয়া তাঁহারা বারোয়ারীতলায় গেলেন। ভীড়-নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে রত মণিকে দেখা গেল। সে-ও দেখিতে পাইয়া হাসি-মুখে বলিল, "মা, এসেছেন! এই যে স্বপ্নাদি!" বলিয়া সে যেন কতকটা বিস্ময়ের সহিতই স্বপ্নার মুখপানে চাহিয়া রহিল। স্বপ্না আর চোখ তুলিতে পারিল না, তাহার ক্রন্দনের চিহ্ন এখনও মুখের উপর বিদ্যমান আছে না কি?

দেবীর তখন আরতি হইতেছে; ভীড়ের মধ্যে মাতা-কন্যা একটু স্থান করিয়া লইলেন।

আরতির শেষে ফিরিবার সময় স্বপ্নার চোখ পড়িল—একটি বিধবা মহিলার উপর। তাঁর কোলে হীরু। স্বপ্না চাহিয়া রহিল। উনিই তবে কি নরেনের মা? একটিবার হীরুকে কোলে লইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কেমন করিয়া লইবে? নরেনের মা তাহাকে চিনেন না, আর গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার প্রবৃত্তিও স্বপ্নার নাই।

হীরুর প্রফুল্ল কচি মুখখানির দিকে চাহিয়া স্বপ্নার অন্তরের মাতৃত্ব জাগিয়া উঠিল। ঐ শিশুকে নরেন একান্ত ভাবে তাহাকে সঁপিয়া দিতে চাহিয়াছিল,—একান্ত ভাবেই তাহার বিশ্বাস ছিল, স্বপ্না তার সন্তানকে নিজের বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে। কিন্তু কি রূঢ় ভাবে তাহার বিশ্বাসে সে আঘাত দিয়াছিল! কঠোর হইয়া বলিয়াছিল, হীরু আপনার ছেলে,—আমার কে?—আজ সেই নির্ম্মম কথাটা ফিরাইয়া লইবার জন্য যদি তার বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেও হয়, সে তাহাতেও পশ্চাদ্‌পদ নয়। উহা কি করিয়া যে সে এই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা স্বপ্না ভাবিয়াই পাইল না! ঐ শিশুর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গিরণ করিবার মত নীচতা তবে কি তার মধ্যেও আছে? আজ যদি একবারও হীরুকে বুকে করিতে পায়, একবার তার প্রাণময় পবিত্র স্পর্শ তার এই বিশ মণ পাথর-চাপান বুকটাতে অনুভব করিতে পায়, একবার যদি ভাবিতে পারে, হীরু তার পর নয়, তার জীবনাধিক প্রিয়!

ভীড়ের মধ্যে স্বপ্না হীরুকে আর দেখিতে পাইল না। উঁকি মারিয়া দেখিল, মা একটি পাশে দাঁড়াইয়া স্তব পাঠ করিতেছেন। স্বপ্না ভীড়ের ভিতর হইতে সরিয়া আসিয়া বেড়ার কাছে দাঁড়াইল। অন্যমনস্ক চক্ষু উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা চোখোচোখী হইয়া গেল নরেনের সহিত! সে-ও তাহার পানেই চাহিয়া আছে। —কি স্নেহ-বিমুগ্ধ দৃষ্টি!

এক মুহূর্ত্ত চারি-চক্ষু স্থির হইয়া রহিল, তাহার পর স্বপ্না চক্ষু ফিরাইয়া লইল; লইল বটে, তবু মনে হইতে লাগিল, ঐ মুগ্ধ স্নেহদ্রাবী দৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিষিক্ত হইতেছে। বুকের ভিতর রুদ্ধ ক্ষোভ গুমরিয়া উঠিল, কিন্তু কাহারও বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ কিছুই নাই! এ বেদনা প্রকাশেরও ভাষা নাই।

বিজয়ার রাত্রে মণি হীরুকে লইয়া আসিল। হীরু কমলাকে প্রণাম করিয়া স্বপ্নাকেও করিল, এবং স্বপ্না হাত বাড়াইতেই লাফাইয়া তার কোলে গেল। স্বপ্না তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল, "বাঃ, এবার তো বেশ আমার কাছে এসেছ! তুমি লক্ষ্মী ছেলে, না হীরু?" সে তাহাকে লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার পর তাহাকে আদর করিয়া, বুকে চাপিয়া, কথা কহিয়া সে যেন তৃপ্তি পাইতেছিল না। হীরুকে খাওয়াইয়া, মুখ মুছাইয়া, হাতে একটা বড় পুতুল দিয়া কোলে লইয়া এ-ঘরে আসিল।

কমলা মণির জন্য একটু মিষ্টান্ন আনিতে উঠিয়া গেলেন। মণি স্বপ্নাকে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "স্বপ্নাদি, বড় আশা ক'রেছিলুম, আমাদের শূন্য ঘর এইবার পূর্ণ করবেন আপনি। কি যে হ'ল মাঝ থেকে—জানি না; কিন্তু দু'জনকে দেখলেই মনে হয়, কেউ-ই শান্তিতে নেই। যাই হ'য়ে থাক, যদি দাদার দিক্ থেকে কোন ভুল বা ভ্রান্তি হয়ে থাকে,—আমি তার অনুজ লক্ষ্মণ, হাতজোড় ক'রে তার হ'য়ে আপনার কাছে মাপ চাইছি।"—বলিয়া সে হাসিমুখে সত্যই হাতজোড় করিল।

স্বপ্না লজ্জা পাইয়া বলিল, "আঃ, কি যে আপনি বলেন মণিবাবু! আপনার দাদার অবস্থা কি হ'য়েছে জানি না, কিন্তু আমাকে কেন তার সঙ্গে জড়াচ্ছেন?"

মণি মুখ টিপিয়া হাসিল, তাহার পর বলিল, "যাক্ গে, দাদার তাহ'লে একটু অনিদ্রাই বোধ হয় বৃদ্ধি পেয়েছে; বারান্দায় অর্দ্ধেক রাত ঘুরে বেড়ায় দেখি! কিন্তু কাল যদি সে মা'কে প্রণাম করতে আসে, তাড়িয়ে দিবেন না তো?—চট-পট উত্তর দিন, মা এসে পড়লেন ব'লে।"

স্বপ্নার মুখ লাল হইয়া উঠিল; সহসা উত্তর দিতে পারিল না, তাহার পর বলিল, "বাঃ, বাড়ী আপনাদের, আমি তাড়াতে যাব কেন? আমি কে?"

মণি এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আপনার কথাটা প্রতিবাদ করবার যোগ্য, কিন্তু মা এসে প'ড়ছেন, কাজেই আমি আজকের মত এটা স্বীকার করে নিচ্ছি।"

মণির জলযোগ হইয়া গেলে সে হীরুকে বলিল, "আয় হীরু।"

হীরু স্বপ্নার কোলে ছিল, একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া মণিকে বলিল, "আর একটু থাকি না কাকু!"

মণি বলিল, "না, কাল বরং দাদার সঙ্গে এসো, আজ চলো। অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।"

হীরু বুদ্ধি করিয়া বলিল, "তবে ঘুরে এসে আমায় নিয়ে যেও, আমি ততক্ষণ গল্প শুনি! কেমন?"

মণি বলিল, "না, আজ চলো, এখুনি ঘুমিয়ে প'ড়বে।"

ক্ষুণ্ণ হীরু স্বপ্নার মুখ চুম্বন করিয়া নামিয়া আসিল।

গাড়ীতে উঠিয়া হীরু বলিল, "মা অত কাঁদছিলেন কেন কাকু?"

মণি বিস্মিত হইয়া বলিল, "দূর, কাঁদবে কেন!"

হীরু তর্ক করিয়া বলিল, "হাঁ কাঁদছিলেন,—তুমি দেখোনি তাই—"

মণি বলিল, "কি জানি, কেন কাঁদছিলেন।" তাহার পর আত্মগত ভাবে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভাঙ্গবে, তবু মচকাবে না! এই বুঝি এদের প্রগতি!"

৭

পরদিন সর্ব্বক্ষণ কমলা নরেনের প্রত্যাশা করিলেন, স্বপ্নাও যে করিতেছে, মায়ের অন্তর তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছিল। কিন্তু সে আসিল না। রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত এটা-ওটা নানা অছিলায় দু'জনেই জাগিয়া রহিলেন, দু'জনেই যেন মনোভাব গোপন করিতে সচেষ্ট! অবশেষে উপবাসী মাতার বুকের কাছে আসিয়া স্বপ্না নিঃশব্দে শুইল। যে বেদনা লোকের কাছে ব্যক্ত করা যায়, তার দাহ কম; কিন্তু যে বেদনা নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিতে হয়, তাহা পলে পলে মানুষকে জীর্ণ করিয়া ফেলে। স্বপ্না ভিতরে ভিতরে একেবারে ক্ষয় হইয়া যাইতেছিল।

মধ্যরাত্রে মা একবার উঠিলেন, আলো জ্বালিতেই নিদ্রিতা কন্যার মুখে চোখ পড়িল; নিকটে সরিয়া আসিয়া নির্নিমেষ নয়নে তিনি চাহিয়া রহিলেন। বালিসের উপর একটা ভিজা দাগ তখনও শুকায় নাই! কন্যার গূঢ় মনোবেদনার নিদর্শন! কমলা গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন, নিজের এই বয়সের ছবি মানস-নেত্রের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল। স্বামী নিয়মিত সময়ের অপেক্ষা দুই-চারি ঘণ্টা যদি কোন দিন বাহিরে থাকিতেন, তবে তাঁর উদ্বেগের সীমা রহিত না, এবং ঘরে ফিরিলে তাঁর অভিমান ভাঙ্গাইতে ও চোখের জল মুছাইতে অর্দ্ধেক রাত্রি কাটিয়া যাইত। সেই বয়স স্বপ্নার;—সেই অনুরাগ তারও মনে জাগিয়াছে, কিন্তু আধুনিকতার বাতাস গায়ে লাগিয়াছে বলিয়া ইহারা প্রেমাস্পদের বিচার করিতে শিখিয়াছে, তাহাতে লীন হইতে শিখে নাই। কি মঙ্গল হইয়াছে ইহাতে, এই নৈশ উপাধান সিক্ত করা ছাড়া? চঞ্চল-চিত্ত পুরুষের বিচার যদি স্থিরমতি নারীও করিতে বসে, তবে এই বিশ্বসংসার অচল হইয়া যাইবে না কি? এই চুলচেরা বিচারের মানদণ্ডই বুঝি অতি আধুনিক গালভরা শব্দ—'প্রগতি'? বিচার করিয়া আবার যদি তাহারই জন্য কাঁদিতেই হইল,—তবে আর প্রগতির মাহাত্ম্য কি? সে ত যাচিয়া লওয়া দুর্গতি! কি আর ইহা এতে আত্ম-সম্মান রহিল?

ক্ষুণ্ণ মনে তিনি কন্যার গায়ে একটা হাত রাখিয়া শুইলেন।

সকালে রূপালীর মা দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিলেন, "আমরা আজ কালীঘাট যাচ্ছি দিদি, আপনি যাবেন?"

কমলা স্বপ্নার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "যাব?"

স্বপ্না বলিল, "যাও না মা, তোমার তো সুবিধা হয় না।—রূপালী যাবে না?"

রূপালী বলিল "না, আমি-শুদ্ধ গেলে হবে কেন? বাবার আজ আফিস আছে।"

স্বপ্না ঘরে আসিয়া মায়ের যাওয়ার গোছগাছ করিয়া দিতে লাগিল। তাহার পর মা গেলে রান্না চাপাইয়া দিল।

তখন বোধ হয় এগারটার কাছাকাছি, মা তখনও আসেন নাই। স্বপ্নার রান্না সারা হইয়া গিয়াছিল।

হাত-মুখ ধুইয়া চুলটা পিঠে মেলিয়া দিয়া সে গামছায় মুখ মুছিতেছিল, জুতার শব্দ পাইয়া চাহিয়া দেখিল, হীরুর হাত ধরিয়া নরেন আসিতেছে! সেই সে-দিনের পর এমন কাছাকাছি এই প্রথম দেখা। কমলা তো এখনও ফিরেন নাই। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল; তাহার পর সামলাইয়া-লইয়া হীরুর হাত ধরিয়া নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া নরেনকে বলিল, "আসুন!"

নরেন ঘরে বসিয়া বলিল, "মা কোথায়? এখনও কি পূজো কচ্ছেন?"

স্বপ্না বলিল, "না। ঐ ওপরের ওঁদের সঙ্গে কালীঘাটে গেছেন।"—সে গলায় অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল। তাহার পর ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বলিল, "বসুন, মা নেই, কিন্তু তা ব'লে কিছু না খেয়ে আজকের দিনে পালালে চলবে না।"—বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। পাশের ঘর হইতে দুইখানি রেকাবীতে করিয়া সন্দেশ আনিল। হীরুর হাতে একখানি দিয়া অন্যখানি নরেনের দিকে দিতেই সে বলিল, "সবিনয় নিবেদন, ও আর চলবে না। তবে শ্রীমতী স্বপ্নাদেবী যদি শ্রীহস্তে এক পেয়ালা চা ক'রে দেন,—তা বরং চল্‌বে, সন্দেশ থাক।"

স্বপ্না স্মিত মুখে বলিল, "সন্দেশ অন্তত: একটা খান, চা আমি দিচ্ছি।"

কমলা চা খান না, স্বপ্নাই খায়; এ-ঘরের তাকেই ষ্টোভ ও চায়ের সরঞ্জাম থাকে। স্বপ্না ক্ষিপ্রহস্তে ষ্টোভ জ্বালিয়া জল চড়াইয়া দিল।

"এমন সময় চা করছো যে?" রূপালী ঘরে উঁকি মারিল; এবং পরক্ষণেই নরেনকে দেখিয়া "ও:!" বলিয়া পিছু-হটিয়া চলিয়া গেল।

এক মুহূর্ত্তের একটা তুচ্ছ ব্যাপার! কিন্তু কালি ছড়াইয়া গেল যেন সে অনেকখানি। চকিতে একবার নরেনের দিকে চাহিয়া স্বপ্না দাঁতে ঠোঁট কামড়াইল।

ব্যাপারটার কদর্য্যতা অনুভব করিয়া নরেনও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "এ কি অজ্ঞাতে আসা,—না, গোয়েন্দাগিরি?"

স্বপ্নার চোখ জ্বালা করিতেছিল; নিম্নস্বরে বলিল, "জেনেই এসেছে, আপনার গাড়ী তো বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে।"

নরেন বলিল, "জেলাসী, না সখীত্ব?"

স্বপ্না বিষণ্ণ মুখে বলিল, "জেলাসী করবার মত আমাদের কি আর আছে? এমন দুর্ভাগ্য যেন কারুর না হয়।"

শেষের দিকটা তাহার গলা ভারী হইয়া আসিল। চা হইয়া গেলে সে এক পেয়ালা নরেনের হাতে দিতে গেল। নরেন বাঁ হাতে চা লইয়া ডান হাতে স্বপ্নার হাত ধরিয়া নিজের পাশের স্থানটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "বোসো।" পিতাপুত্রের মাঝখানে যেটুকু ব্যবধান ছিল—সেখানে হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল। এমন করিয়া নরেনের গা ঘেঁসিয়া বসিতে স্বপ্নার সঙ্কোচ হইতেছিল, তাই সে হীরুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল; মনে হইল, একটু বুঝি সঙ্কোচ কমিল।

নরেন সকৌতুক হাস্যে বলিল, "ওকে কোলে নিলে কেন? ও আমার ছেলে,—তোমার কে?"

সে-দিনের সেই রূঢ় বাক্যের প্রতিশোধ লইল নরেন। স্বপ্না মাথা হেঁট করিয়া রহিল। স্বপ্না যদি আজ একবার স্পষ্ট করিয়া জানাইতে পারিত, হীরু তার কে! নরেন তাহার একখানা হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "সে অভিমান গেল? আমার তখনকার অবস্থাটা ভেবে দেখেছ? উনিশ-কুড়ি বছর বয়স তখন আমার, জোর ক'রে নিজের পছন্দ-মত বিয়ে করবার সাহস আমার ছিল না।"

স্বপ্না মাথা হেঁট করিয়া রহিল, চোখে জল ভরিয়া আসিতেছিল।—অভিমান! হাঁ, তা ছাড়া আর কি? নরেনের বিরুদ্ধে তাহার অন্য অভিযোগ নাই তো?

নরেন তাহার হাতের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কেন একটা গত-কথা মনে রেখে মিছে কষ্ট পাচ্ছ? তুমি যতই অস্বীকার করো, তুমি আমাকে ছোটবেলা থেকে ভালবাস, তাকে রোধ কর—এত শক্তি তোমার নেই। সেই অসম্ভব চেষ্টা করতে গিয়েই এই দেড় মাসে তুমি এমন শুকিয়ে উঠেছ। আর যদিই মনে ক'রে থাক, আমি তখন প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলুম, তাহ'লেও আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় নিজেকে দিচ্ছি, তুমি আমায় নাও।"

সে স্বপ্নার হাতখানি দুই হাতে ধরিয়া নিজের কোলে টানিয়া লইল।

হীরু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "বাবা, মা যে কাঁদছেন!"

স্বপ্না চমকিয়া উঠিল, একবার হীরু ও একবার নরেনের মুখ পানে পর্য্যায়ক্রমে চাহিয়া নতমুখী হইল। এক অপরূপ লাবণ্যে তার মুখখানি বিকশিত হইয়া উঠিল! পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তাহার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে নরেন হাসিমুখে বলিল, "যা আমি পারিনি, তা সমাধান করে দিলে হীরু—ওর মা তুমি, ওকে ছেড়ে থাকা তোমার চলে না। ওর বাবার দাবীটা উহ্যই রাখলুম।—কেমন তো?"

স্বপ্না লজ্জারক্ত মুখখানি নরেনের বাহুমূলে লুকাইল।

এই সময় সদর দুয়ারের নিকট হইতে কলরব উঠিয়া জানাইয়া দিল—কালীঘাটের যাত্রীরা গৃহে ফিরিতেছেন।

নরেন হীরুকে ফিস্-ফিস্ করিয়া কি শিখাইয়া দিল; স্বপ্নাকে বলিল, "শীগ্গীর চোখ মোছ, মা আসছেন।"

স্বপ্না তাহার কাঁধের উপর চোখ-দুটি ভাল করিয়া ঘসিয়া মুছিয়া লইয়া হীরুকে কোলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

উঠানে পা ধুইয়া কমলা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। বলিলেন, "বাইরে গাড়ী দেখেই বুঝেছি বাবা এসেছ। তুমি এখন আসবে ভাবতে পারিনি। ওদের সঙ্গে কালীদর্শনে গেছলুম। কতক্ষণ এসেছ বাবা?"

নরেন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আধ ঘণ্টা হবে।"

হীরু স্বপ্নার কোল হইতে নামিয়া পিতার দেখা-দেখি কমলাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "দিদিমণি, আমি আমার মাকে নিয়ে যাব।"

কমলা চকিত দৃষ্টিতে একবার স্বপ্না ও একবার নরেনের দিকে চাহিলেন, দু'জনের মুখেই সলজ্জ পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি; দু'জনের দৃষ্টিই ভূমিসংলগ্ন। কমলা বলিলেন, "যাবে বৈ কি দাদু! তোমার মা, তুমি নিয়ে যাবে বৈ কি ভাই! ঠাকুরমাকে বোল, তিনি যে-দিন হুকুম দেবেন, সেই দিনই তোমার মা তোমাদের ঘরে যাবে।"

হীরু বিজ্ঞ ভাবে বলিল, "আচ্ছা।"

শ্রীমতী মায়াদেবী বসু।

কাশ-কুসুম

নহ পঙ্কজ, নহ কো শেফালী, কারো চেয়ে তবু নহ কো কমি'
শরৎশোভার শুভ্র চামর! হে কাশ-কুসুম, তোমারে নমি।
নদী-সৈকতে মরু-প্রান্তরে উত্তরী তব হাওয়ায় নাচে,—
কালিদাস দিল অমৃত দৃষ্টি, আভিজাত্যের বাকি কি আছে?

পুলকোয় তব বাঁধিয়াছে বাসা মুক্ত মাঠের পুলক রাশি,
আকাশ হইতে সাদা মেঘ যেন
খেলাতে জমেছে ভূতলে আসি।
বলিবার নাই তবু বলা-কথা,
উল্লাস গান অসংযত,—
উপছিয়ে-পড়া আনন্দ-ধারা, তুমি যেন ঠিক তাদেরি মত।

দুধ-সাগরের ফেনা দিয়ে বোনা বিনিসুতা-হার তোমার গলে
আকার লুকানো আকাশ-কুসুম
অবাধে তোমারে বলাই চলে।
ধূ ধূ করে এই রুক্ষ বেলাভূমি,
মানায় না মোটে তোমায় বিনে
সবুজের ঘরে তোজে ডেকে আন, তুমি যেন মেরু-পেন্‌গুইনে।

হাস্য শরৎ-লক্ষ্মীর যেন তোমাতে হ'য়েছে পুঞ্জীভূত,
শত কোজাগর নিশির সিতিমা প্রান্তরে হ'ল মঞ্জুরিত।
চন্দ্রাতপেতে ঝোলে চাঁদমালা, সজ্জিত সবে সাজে ও তাজে
চামরহস্তা শবরীরে ল'য়ে এসো তুমি রাজ-সভার মাঝে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।
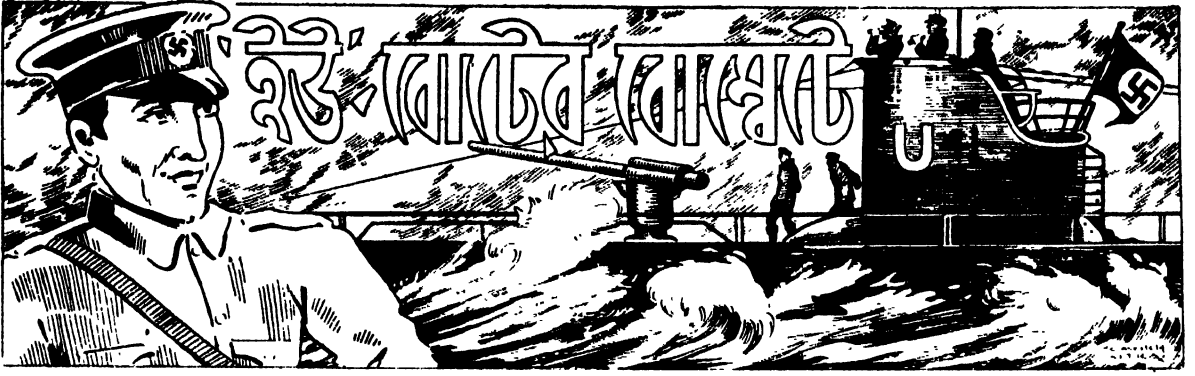
পঞ্চদশ পর্ব্ব

আমসের উভয়-সঙ্কট

(বক্তা—ইংরেজ যুবক পিটার)

কাপ্তেন লড্‌উইগ ভন্ রথভেনকে সিক্তদেহে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া আমস্ তাড়াতাড়ি টেবিলের অন্য পার্শ্বে সরিয়া গেল ; তাহার ভাল চক্ষুটা আতঙ্কে বিস্ফারিত হইল, এবং ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী তাঁহার ভয়-কম্পিত শিথিল হস্ত হইতে মেঝের উপর খসিয়া পড়িল।

আমস্ কাপ্তেনের মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "তু-তুমি, তুমি এখানে ?"

কিন্তু কাপ্তেন ভন্ রথভেন তাহার প্রশ্ন গ্রাহ্য না করিয়া ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল ; তাহা দেখিয়া আমস্ কম্পিত হস্তদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া আড়ষ্ট স্বরে পুনর্ব্বার বলিল, "দয়া কর, দয়া করিয়া তুমি এ-দিকে আর—" কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাপ্তেন প্রসারিত হস্তে আমসের জ্যাকেটের এক মুড়া দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

আমস্ কাপ্তেনের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য জ্যাকেটের সেই মুড়া ধরিয়া সবলে টানাটানি করিতে লাগিল ; সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ হইতে কাতর আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল।

কিন্তু কাপ্তেন লড্‌উইগ আমস্‌কে মুক্তিদান না করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "পিটার, আমাকে দেখিয়া এই পাজী বদমায়েসটার ঐরূপ ভয়ের কারণ 'কি ?"

আমি কাপ্তেনের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহার মূর্ত্তি প্রেতের ছায়াময় মূর্ত্তি নহে ; সে জীবিত আছে, এবং সশরীরে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। এ জন্য ভয় ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "আমস্ মনে করিয়াছিল—সমুদ্রে ডুবিয়া আপনার মৃত্যু হইয়াছে, আপনি সমুদ্রের সমাধি-শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রেতের ছায়াময় মূর্ত্তিতে এখানে আবির্ভূত হইয়াছেন ! আপনি জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসিয়াছেন, আমস্ ইহা ধারণা করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ, আপনি জীবিত আছেন—ইহা আমরা কেহই বিশ্বাস করিতে পারি নাই !"

কাপ্তেন রথভেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি ডুবিয়া মরিয়াছি—তোমাদের এরূপ ধারণার কারণ কি ?"

আমি বলিলাম, "শুনিয়াছি, আপনার জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল ; সেই সঙ্গে আপনিও ডুবিয়া মরিয়াছেন, এইরূপই আমাদের ধারণা হইয়াছিল।"

কাপ্তেন বলিল, "হাঁ, 'ইউ'-বোটখানা ডুবিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আমি ডুবিয়া মরি নাই ; আমি ডুবিয়া মরিলে আজ আমাকে এখানে দেখিতে পাইতে না।"

কাপ্তেন আমসের জ্যাকেট হইতে হাত সরাইয়া-লইয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তোমাকে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা পরে বলিতেছি।"

মেরী কাপ্তেনের অদূরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল ! তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছিল—তাহার বাহ্যজ্ঞান তখন বিলুপ্তপ্রায়।

কাপ্তেন আমার ও মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না, আমি ডুবিয়া মরি নাই। আমরা এই স্থান হইতে চ্যানেলের ভিতর দিয়া আমাদের বোটসহ নিরাপদে উইল্‌হেম্‌সাভেনে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তাহার পর আমি অন্য একখানি বোটের পরিচালন-ভার পাইয়াছিলাম। সেই বোটেই আমি এখানে আসিয়াছি। তবে এ কথা সত্য যে, যে বোটের পরিচালন-ভার আমার হস্তে

পূর্ব্বে ন্যস্ত ছিল, আমি সেই বোট হইতে বদলী হইবার পর, সেই বোট পুনর্ব্বার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল; এবং প্রথম যাত্রাতেই তাহা ডুবিয়া গিয়াছিল। এ সকল সংবাদ তোমরা জানিতে না; এই জন্যই তোমাদের ধারণা হইয়াছিল—সেই বোটের সঙ্গে আমিও ডুবিয়া মরিয়াছি!"

এইবার মেরী উদ্বেগ-কম্পিত হস্তে আগ্রহভরে কাপ্তেন রথভেনের বাহু জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আর লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন! তাঁহার কি হইল?"

কাপ্তেন রথভেন কোমল দৃষ্টিতে মেরীর মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল, "আর একটু-পরেই সে এখানে আসিয়া পড়িবে মেরী! হ্যাগেন এখন আমারই প্রধান সহকারী, প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট। আমরা যে ডিঙ্গী লইয়া 'ইউ'-বোট হইতে সমুদ্র-কূলে আসিতেছিলাম, সেই ডিঙ্গী তীরের কিছু দূরে থাকিতেই ঝড়ে উল্টাইয়া গিয়াছিল। হ্যাগেন ডিঙ্গীখানা কূলে ভিড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই এখানে আসিয়া পড়িবে।"

কাপ্তেন রথভেনের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম—কি কারণে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ও-ভাবে জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। হ্যাগেন নিরাপদে আছে এবং কাপ্তেন রথভেনের সঙ্গে আসিয়াছে শুনিয়া, মেরীর মুখ প্রফুল্ল হইল; তাহার চক্ষু দু'টি আনন্দে হাসিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে পাকশালার বাহিরে ভারী বুট-জুতার শব্দ শুনিতে পাইলাম; তাহার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেন পাকশালার দ্বার ঠেলিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সে মেরীকে সম্মুখে দেখিয়া আবেগভরে ডাকিল, "মেরী!"—তাহার কণ্ঠস্বরে নিখিল বিশ্বের বেদনা পুঞ্জীভূত, যেন তাহা ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের শোণিত-রাগে রঞ্জিত!

চক্ষুর নিমেষে মেরী ব্রীড়া-রঞ্জিত মুখে হ্যাগেনের বক্ষ-সংলগ্ন হইল। কোন দিকে তাহার দৃষ্টি রহিল না। হ্যাগেন যে মৃত্যুকবল হইতে তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে—মেরী যেন এ আনন্দ রাখিবার স্থান পাইতেছিল না! হ্যাগেন জার্ম্মাণ, সে আমাদের মহাশত্রু; কিন্তু সে মানুষ, এবং আমাদের প্রতি তাহার যে স্নেহ ছিল, তাহা গভীর, অকৃত্রিম; এই দিক্ দিয়াই তাহার সম্বন্ধে আমরা বিচার করিতেছিলাম। শত্রুতার কত ঊর্দ্ধে বন্ধুত্বের স্থান—তাহা আমি ও মেরী মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিতে পারিলাম না! আমরা যে স্থানে বাস করিতেছিলাম—সেই ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা করিবার শক্তি ছিল না, বা আমার স্বজাতি স্বদেশের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষার জন্য বর্ব্বর নাজী-নীতির বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে যে সংগ্রাম করিতেছিল—তাহার মূল্য কি, তাহাও আমাদের বুঝিবার উপায় ছিল না!

কাপ্তেন ভন্ রথভেন এবং হ্যাগেনকে সেখানে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া আমরা যতই আনন্দলাভ করি, আমস্ যে ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছিল, তাহা তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। এতক্ষণে তাহার ভয় হ্রাস হইয়াছিল; সে আড়চোখে উভয় জার্ম্মাণের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিত-হস্তে ধীরে ধীরে ঘাড় চুলকাইতে লাগিল।

কাপ্তেন ভন্ রথভেন আমসের মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ শ্লেষের সহিত বলিল, "তুমি আমাকে হঠাৎ দেখিয়া ভূত মনে করিয়া আঁতকাইয়া উঠিয়াছিলে! কেমন, এ কথা কি সত্য নয়?—যাহা হউক, আমার যে ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী আমার ভাইকে দেওয়ার জন্য তোর নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, তাহা হস্তগত করিয়া, সেগুলির কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিস্—শয়তানের ধাড়ি? বেটা শূয়ারের বাচ্চা!"

আমস্ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "ওঃ, সেগুলার কথা আমি একদম্ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম কাপ্তেন! সত্যই বলিতেছি, ঐ কয়টা তুচ্ছ জিনিসের কথা আমার স্মরণই ছিল না। আমার কথা যে খাঁটি, এ-কথা তুমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার। যাহা হউক, ভবিষ্যতে সে এখানে আসিলেই আমি সেগুলি তাহাকে দিয়া ফেলিব। পরের ঐ তুচ্ছ জিনিস আমার রাখিবার দরকার কি? উহাতে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নাই।"

আমস্ তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার পদপ্রান্তস্থিত 'তুচ্ছ' জিনিসগুলি তুলিয়া-লইয়া সকলকে তাহা দেখাইল, এবং সাধুতা প্রকাশের জন্য বলিল, "জিনিসগুলি আমার বাক্সে পড়িয়া-থাকিয়া একটু অপরিষ্কার হইয়াছিল বলিয়া এগুলি হাতে লইয়া একটু পালিশ করিতেছিলাম; সেই সময় তুমি আসিয়া

পড়িয়াছিলে! মিষ্টার রথভেন, আমাকে অসজ্জন মনে করিয়া ও-রকম ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিও না। যদি আমার কথা সত্য বলিয়া তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে তুমি মেরী ও পিটারকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহাদের নিকট শুনিতে পাইবে—এগুলি তোমার ভাইকে দেওয়ার জন্য আমি কি রকম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম!"

আমস্ আত্মসমর্থনের জন্য এই ভাবে আমাদিগকে সাক্ষী মানিল; কিন্তু ইহা তাহার চালাকি মাত্র, কাপ্তেন ভন্ রথভেনও তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল। এ জন্য সে আমস্‌কে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণাভরে বলিল, "তুমি যে কিরূপ ইতর মিথ্যাবাদী, তাহা আমার জানা আছে। তোমার মত ঘৃণিত তস্কর পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেহ আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। টাকার জন্য তুমি না করিতে পার, এ-রকম কুকর্ম্ম জগতে নাই আমস্ ক্রোবি! নির্লজ্জ চোর তুমি, কি বলিয়া তোমাকে ঘৃণা করিব, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না!"

আমস্ বিনা-প্রতিবাদে তাহার সকল কথাই শুনিতে লাগিল। তাহার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না। তখন তাহার অবস্থা লগুড়াহত কুকুরের মত অত্যন্ত শোচনীয়; এবং কাপ্তেন ভন্ রথভেনের জিহ্বা সুশাণিত ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ!

এবার কাপ্তেন ভন্ রথভেন আমস্‌কে বলিল, "তুমি শীঘ্র সমুদ্রতীরে গিয়া আমার 'ইউ'-বোটের খোরাক্ আনিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও—যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনিতে পাই, তাহা হইলে চাব্‌কাইয়া তোমার পিঠের চামড়া তুলিয়া লইব।"

আমস্ তাহার আদেশে কোট দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া সমুদ্রকূলে প্রস্থান করিল। কাপ্তেন ভন্ রথভেন হ্যাগেনকে বলিল, "কাজটা শীঘ্র যাহাতে শেষ হয়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতে যাইতেছি; তোমাকে এখন আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না, তুমি এখন এখানেই বিশ্রাম কর। কাজ শেষ হইলে তুমি সংবাদ পাইবে, তখন সেখানে যাইলেই চলিবে।"

অনন্তর কাপ্তেন আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "পিটার, তুমিও আমার সঙ্গে চল।"

আমি অয়েল-স্কিনের পোষাকটা পরিয়া কাপ্তেনের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। মেরী পাকশালায় বসিয়া হ্যাগেনের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল।

ঘরের বাহিরে আসিয়া, ঝড়-বৃষ্টিতে বিব্রত কাপ্তেন ভন্ রথভেন অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া আমাকে বলিল, "দেখিতেছ পিটার, কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! কিন্তু আমাকে শীঘ্রই বোটের কাজ শেষ করিয়া লইতে হইবে,—এখন আমরা দেশে চলিয়াছি কি না!"

রাত্রি অত্যন্ত দুর্য্যোগময়ী বলিয়া কাপ্তেন রথভেন তাহার বোট কূলের খুব নিকটে আনিয়া রাখিয়াছিল; দ্বীপের আড়ালে থাকায় সেই দারুণ দুর্য্যোগে বোট কতকটা নিরাপদেই ছিল। কিন্তু সেই ভয়ানক রাত্রিতে বোটে মাল-পত্র উত্তোলন করা ভয়ানক কঠিন ও বিপজ্জনক ব্যাপার বলিয়াই মনে হইল; বুঝিতে পারিলাম, সেই কার্য্য শেষ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইবে। গুদাম হইতে সেই সকল জিনিস-পত্র বহন করিয়া 'ইউ'-বোটে আনিতে আমসের নৌকাখানা একাধিকবার ডুবিবার উপক্রম করিল!

আমি সাধ্যানুসারে কাপ্তেন রথভেনকে সাহায্য করিতেছিলাম। সেই সময় হঠাৎ আমার মনে হইল, যে পলাতক জার্ম্মাণ নাবিকটাকে আমস্ অদূরবর্ত্তী নির্জ্জন দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়াছে—তাহার সম্বন্ধে সকল কথা কাপ্তেনকে বলাই উচিত। সেই ভীষণ রাত্রে রুইস দ্বীপে সেই হতভাগ্যের জীবন কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে—তাহা চিন্তা করিয়া আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, কাপ্তেন রথভেনের চেষ্টায় তাহার প্রাণরক্ষা হইতে পারে। কাপ্তেন তাহার 'ইউ'-বোট সেই দ্বীপের নিকট লইয়া-গিয়া একখানা ডিঙ্গীর সাহায্যে তাহাকে বোটে তুলিয়া লইতে পারিবে; তবে একটা কথা ভাবিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম। কাপ্তেন রথভেন আমার নিকট তাহার কথা শুনিয়া, আমস্‌কে সেই পলাতক নৌ-সৈনিক সম্বন্ধে সকল কথাই জিজ্ঞাসা করিবে। আমিই যে সে-কথা কাপ্তেনের নিকট প্রকাশ করিয়াছি—আমস্ ইহা সহজেই জানিতে পারিবে; এবং কাপ্তেন রথভেন প্রস্থান করিলে সে চাবুক মারিয়া আমার পিঠ রক্তাক্ত করিবে। আমার নির্য্যাতনের সীমা থাকিবে না!

তথাপি নির্য্যাতনের ভয়ে বিপন্ন লোকটির জীবন-রক্ষায় উদাসীন বা নিশ্চেষ্ট থাকা আমি সঙ্গত মনে করিলাম না। কিন্তু আমি চেষ্টা করিলেই কি তাহার জীবনরক্ষা করিতে পারিব? কাপ্তেন রথভেনকে তাহার বিপদের কথা বলিলে, কাপ্তেন তাহাকে নির্জ্জন দ্বীপ হইতে উদ্ধার করিয়া জার্ম্মাণীতে লইয়া যাইবে; সেখানে সামরিক আদালতের বিচারে তাহার অপরাধ সপ্রমাণ হইবে। তাহার পর গুলী করিয়া তাহাকে হত্যা করা হইবে—আমস্ আমাকে এই কথাই বলিয়াছিল, এবং ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল।

অতঃপর কি করিব—সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। তাহাকে দেশে লইয়া গিয়া গুলী করিয়া হত্যা করা হয়—ইহা আমি প্রার্থনীয় মনে করিলাম না বটে, কিন্তু অনাহারে তাহাকে রুইস দ্বীপে মরিতে দেওয়াও সঙ্গত মনে হইল না। বিশেষতঃ, আমস্ তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহাই বা কি করিয়া বুঝিব? আমসের অধিকাংশ কথাই মিথ্যা। পলাতক জার্ম্মাণটাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া গিয়া গুলী করিয়া হত্যা করা না হইতেও পারে।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া আমি কাপ্তেন ভন্ রথভেনকে পলাতক জার্ম্মাণটার সম্বন্ধে সকল কথা বলাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া স্থির করিলাম, আমি এ-কথা বলিয়াছি তাহা যেন কাপ্তেন আমসের নিকট প্রকাশ না করে, তাহাকে এজন্য অনুরোধ করিব। আমার ধারণা হইল—কাপ্তেন আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে।

কাপ্তেন রথভেন সমুদ্র-সৈকতে আমার অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। আমি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, "আমার একটা কথা আছে, আপনি দয়া করিয়া তাহা শুনিবেন কি?"

কাপ্তেন আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই শুনিব; তোমার কি বলিবার আছে বল।"

আমি বলিলাম, "আপনি আমার সঙ্গে ঐ উঁচু স্তূপটার আড়ালে চলুন। আমি যে আপনার সঙ্গে কথা কহিতেছি আমস্ তাহা দেখিতে পায়—ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

এ-কথা শুনিয়া কাপ্তেন রথভেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ, স্তূপের আড়ালেই চল।"

কাপ্তেনের মুখ দেখিয়া মনে হইল, আমার কথা শুনিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইয়াছিল।

অনন্তর আমি সেই পলাতক জার্ম্মাণটা সম্বন্ধে সকল কথাই সংক্ষেপে কাপ্তেনের গোচর করিলাম। তাহাকে বড়-দেশে রাখিয়া আসিবার জন্য তাহার সঞ্চিত অর্থরাশি সে আমস্‌কে প্রদান করিলে, আমস্ তাহাকে বড়-দেশে লইয়া না গিয়া রুইস দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়াছে; সেই নির্জ্জন দ্বীপে অনাহারে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।—কাপ্তেনের নিকট আমি কোন কথা গোপন করিলাম না।

কাপ্তেন স্তব্ধভাবে আমার সকল কথা শ্রবণ করিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। অন্ধকারে তাহার মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম না বটে; কিন্তু আমার মনে হইল, আমার কথা শুনিয়া তাহার মুখকান্তি অতি ভীষণ হইয়াছে! ক্রোধে তাহার চক্ষুতারকা অগ্নি-গোলকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বিনীত ভাবে বলিলাম, "আপনি যে এই সংবাদ আমার নিকট জানিতে পারিয়াছেন, দয়া করিয়া আমস্‌কে তাহা বলিবেন না; যদি আপনি বলেন, তাহা হইলে আপনি এই দ্বীপ ত্যাগ করিবার পরই সে আমাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিবে; আমার নির্য্যাতনের সীমা থাকিবে না!"

কাপ্তেন ভন্ রথভেন বলিল, "সে যদি বেত্রাঘাতে তোমাকে জর্জ্জরিত করে, তাহা হইলে তাহারও লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। কিন্তু আমি ভাবিতেছি—লোকটা কি ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতক! অর্থলোভে কোনও দুষ্কর্ম্মেই সে পশ্চাৎপদ নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই প্রকার নরপশুর সাহায্য আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য; কিন্তু তাহার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।"

অতঃপর কাপ্তেন দুই-এক মিনিট কি চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল, "উত্তম, আজ রাত্রিতে আমি তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না; আর বলিয়াই বা লাভ কি? সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবে না, কেবল খানিক সময় নষ্ট হইবে মাত্র; কিন্তু আমার সময় মূল্যবান।"

কাপ্তেন মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "সেই পলাতক জার্ম্মাণটা কি এখনও রুইস্ দ্বীপেই আছে?"

আমি বলিলাম, "না থাকিলে আর কোথায় যাইবে ? তাহার ত অন্য কোন স্থানে পলায়নের উপায় নাই।"

কাপ্তেন বলিল, "তাহা হইলে সে এখনও সেখানে আছে বলিয়াই মনে হয়। উত্তম, আমি তাহাকে সেই দ্বীপ হইতে উদ্ধার করিব। যাহা হউক, এখনই তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও; মিঃ হ্যাগেনকে সংবাদ দাও যে, আমাদের কাজ শেষ হইয়াছে, আমরা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত।"

আমি তৎক্ষণাৎ আমসের পাকশালায় প্রত্যাগমন করিলাম। হ্যাগেন তখন মেরীর সম্মুখে বসিয়া তাহার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছিল। কাপ্তেন দ্বীপ ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে শুনিয়া হ্যাগেন ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! এত শীঘ্রই সকল কাজ শেষ হইল ?"

হ্যাগেন উঠিয়া দাঁড়াইলে মেরীও সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল; তখন হ্যাগেন মেরীকে সম্মুখে আকর্ষণ করিয়া উভয় হস্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

অতঃপর হ্যাগেন মেরীর গলা ধরিয়া পাকশালা ত্যাগ করিল; আমি তাহাদের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রকূলে চলিলাম। তখনও ঝড়-বৃষ্টির বিরাম হয় নাই। সেই অবস্থায় হ্যাগেন মেরীকে বৃষ্টিধারা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হ্যাগেনকে 'ইউ'-বোটে লইয়া যাইবার জন্য ডিঙ্গীখানি জলের ধারে অপেক্ষা করিতেছিল। হ্যাগেন তাহাতে উঠিয়া বসিলে ডিঙ্গী 'ইউ'-বোটের অভিমুখে পরিচালিত হইল। আমি ও মেরী সাগর-বেলায় দাঁড়াইয়া ডিঙ্গীখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নৈশ-অন্ধকারে তাহা অদৃশ্য হইল। মেরী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ নামাইল; আমার মনে হইল, হ্যাগেনকে বিদায় দান করিয়া তাহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। হ্যাগেনের প্রতি তাহার প্রেম কি গভীর, কি আন্তরিক! কিন্তু এই প্রেমের পরিণাম কি ?—বিধাতার মনে কি আছে—তাহা তিনিই জানেন।

সমুদ্র-তট হইতে আমরা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে পাকশালায় প্রত্যাগমন করিলাম; কিন্তু আমার মনে হইল, কাপ্তেন ভন্ রথভেন ও লেফ্‌টেনাণ্ট হ্যাগেনকে বিদায় দান করিয়া আমস্ নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে পাকশালায় ফিরিয়া তাহার সিক্ত পরিচ্ছদ ও জুতা খুলিয়া ফেলিল। আমার মনে হইতেছিল—সে রথভেনের ঘড়ি, চেন ও অঙ্গুরী সম্বন্ধে কোন কোন কথার আলোচনা করিবে; কিন্তু সে আর কোন কথাই বলিল না। সে সেই রাত্রে কাপ্তেন ভন্ রথভেনকে হঠাৎ তাহার গৃহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া যে ভয় পাইয়াছিল, সেই আতঙ্ক হইতে সে তখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নাই বলিয়াই আমার মনে হইল। সে চেয়ারে বসিয়া নিঃশব্দে ধূমপান করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল—তাহাকে আর কখনও সেরূপ নিরুৎসাহ ও হতাশ দেখি নাই।

আমস্ অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসিয়া কিছুকাল গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অস্ফুট স্বরে কি বলিল—তাহা বুঝিতে পারিলাম না! মনে হইল, সে ঐ কথা বলিয়া আমাদের নিকট রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিল। সে পাকশালার দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়িতে উঠিল। বুঝিলাম, সে শয়ন করিতে চলিল।

আমস্ পাকশালা ত্যাগ করিলে আমি আগ্রহভরে মেরীকে বলিলাম, "মেরী, আমি কাপ্তেন ভন্ রথভেনকে সেই পলাতক জার্ম্মাণটার কথা বলিয়াছি। কোন কথা গোপন করি নাই।"

মেরী হাসিয়া বলিল, "সত্যই সব কথা বলিয়াছ ? আমিও হ্যাগেনকে সে-কথা বলিয়াছি; সুতরাং বাবার কাছে আমরা উভয়েই সমান অপরাধী! এবার তাহার উভয়-সঙ্কট!"

মেরী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, চেয়ার হইতে আমার দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আমাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে—তাহা জানিতে পারিয়াছ কি ?"

আমি আগ্রহভরে বলিলাম, "না। তুমি কিরূপ ব্যবস্থার কথা বলিতেছ ?"

মেরী বলিল, "আমরা শীঘ্রই এই স্থান ত্যাগ করিব; তুমি এবং আমি—দুই জনেই।"

আমি বলিলাম, "কখন ?"

মেরী বলিল, "একখান জার্ম্মাণ জাহাজ 'ইউ'-বোটের

জন্য বিস্তর খোরাক লইয়া শীঘ্রই এখানে আসিবে। মিঃ হ্যাগেন কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সেই জাহাজেই আমরা জার্ম্মাণীতে যাত্রা করিব।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু তোমার বাবার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে মেরী! সে যদি আমাদিগকে জার্ম্মাণীতে যাইতে না দেয়? সে আপত্তি করিলে কিরূপে আমাদের যাওয়া হইবে?"

মেরী ঈষৎ হাসিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "পিটার, সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। বলিয়াছি ত, তাহার উভয়-সঙ্কট! সে আমাদের গমনে বাধা দিতে পারিবে না।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

সূর্য্যস্তুতি

সূর্য্য, তুমি কি মগন রয়েছ ঘুমে—
টেনে চারিদিকে ধোয়ার কুজ্ঝটিকা?
অথবা তুমি মরে গেছ বহু দিন,—
হারায়ে ফেলেছ তোমার দীপ্তশিখা?

তোমার সমুখে চলে ধ্বংসের লীলা,
আকাশের বুকে শোনো না আর্ত্তনাদ?
হাজারো কামান গর্জ্জে চতুর্দ্দিকে,
কাটিবে না তবু তোমার এই অবসাদ?

আগ্নেয় ধূম তোমারে মলিন করে!
বিমানের পাখা তোমারে লুকিয়া নেয়;
স্তিমিত চোখের নিষ্প্রভ চাহনি যে;—
কামানের শিখা তাহারে লজ্জা দেয়।

হে ভাস্কর! পার যদি একবার—
তরল অনলে গলিয়া গলিয়া পড়;
নূতন জগতে উঠিবে নূতন রূপে,
পুরানো পৃথিবী নূতন করিয়া গড়।

শ্রীস্নেহরঞ্জন আচার্য্য (বি-এ)

হিসাবে ভুল

'নীতি, ও নীতি, একবার এদিকে এস।'—নীতির কাকিমা ডাকিলেন।

নীতি উত্তর দিল না। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে কাকিমার কক্ষে আসিল। কাকিমা বলিলেন, 'সোমবারে না তোমার পরীক্ষা?—'

নীতি বাক্যব্যয় না করিয়া তাহার পড়িবার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কাকিমার কথায় এমন কিছু ছিল না, যাহাতে তাহার মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা টলাইতে পারে। কিন্তু কথার মধ্যে যে স্বরের রেশটি ছিল, তাহা তাহার অভ্যস্ত কানকে এড়ায় নাই। কাজেই তাহার পরীক্ষার সম্বন্ধে কাকিমার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়া সে একটুও বিস্মিত হইল না।

শেফালী নীতির খুড়তুতো বোন। সে নীতির সমবয়সী, এবং দু'জনে একসঙ্গেই পড়ে। তাহার পরীক্ষার জন্য কিন্তু কাকিমার একটুও উদ্বেগ দেখা গেল না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে,—আজ প্রভাতকিরণ আসিয়াছে। প্রভাতকিরণ ছেলেটি মন্দ নয়। কাকিমার ইচ্ছা যে, তাঁহার কন্যাটি প্রভাতকিরণকে লাভ করিতে পারিলে ভাল হয়। শেফালী যাহাতে একাকী প্রভাতের সঙ্গ পায়, সেই জন্যই নীতিকে সরাইয়া দেওয়া আবশ্যক হইল।

নীতির কাকা কলিকাতার পসারওয়ালা ব্যারিষ্টার। নীতির পিতাই তাঁহাকে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। আজ কয়েক বৎসর হইল তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী অর্থাৎ নীতির মা তাঁহার পূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়াছিলেন। কাজেই নীতিকে কাকার কাছে 'মানুষ' হইতে হইতেছে।

কাকিমা লোক মন্দ নয়। কিন্তু শেফালীর প্রতি স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব-হেতু নীতির প্রতি সব সময়ে সুবিচার করা সম্ভব হইত না। কাকা মিষ্টার গুপ্তভায়া নিজের কাজ-কর্ম্ম লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। সংসারের খুঁটিনাটিতে মন দিবার মত অবসর বা প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তথাপি তিনি সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

শেফালীর সাজ-পোসাকের একটু বেশী রকম জাঁকজমক দেখিলে, তিনি চশমাটা খুলিয়া হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করিতেন; তার পরে মিসেস্‌কে বলিতেন, 'মিনি, নীতির জন্যে একটা ভাল ক্রেপ শাড়ী এনে দিও, আমি টাকা দেব।' মিসেস্ গুপ্তভায়ার নাম মৃণাল, স্বামী সোহাগ করিয়া 'মিনি' বলিয়া ডাকিতেন।

মিসেস্ চোখ মাটীতে নামাইয়া বলিতেন, 'সে কি হবার জো আছে রবিন?—নীতি ভাল কাপড়, ভাল জামা পরতে মোটেই ভালবাসে না—ও যা মেয়ে!'

'ওঃ, তাই না কি? তা ভাল, তা ভাল।' তিনি বুঝিয়া লইলেন যে, সাংসারিক ব্যারোমিটার ঠিকই আছে; ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মিসেস্ গুপ্তর চোখে যে একটু বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, তাহা কেবল শেফালীই দেখিল।

বেশ-বিন্যাসের প্রতি স্ত্রীজাতির যে আবেশ, তাহা স্বাভাবিক। শেফালী যত পাইত, ততই তাহার লোভও বাড়িয়া যাইত। তাহার মাতার পক্ষেও ইহাতে সহায়তা হইত, কারণ তিনি সকলকেই বলিতেন—'আমার শেফালী একটু সাজতে ভালবাসে।' অতএব তাহার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি করা মায়ের অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু নীতি?—নীতিও সাজিতে ভালবাসিত। কিন্তু সে কাকিমার মনের ভাব ইঙ্গিতেই বুঝিয়া লইয়াছিল। কাজেই সে প্রকাশ্য ভাবেই বলিত যে, সাজ

পোষাকে তাহার কাজ নাই। কাকিমাও তাহাতে বেশ সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইহার একটু ব্যতিক্রম হইত যখন প্রেমনীহার আসিত। প্রেমনীহার সম্প্রতি বিপত্নীক হইয়াছে। দিন-কতক হইল, সে খুব উৎসাহ সহকারে গুপ্তভায়ার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিতেছে। তাহার পৈতৃক বৈভব কিছু না থাকিলেও সে কয়লার কারবারে যথেষ্ট অর্থ করিয়াছে। সিঙ্গাপুর, সিংহল প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া সে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, এবং চটপটে হইয়াছে,—যাহাকে ইংরেজিতে বলে 'স্মার্ট'।

সাহেবি-পোষাক ছাড়া সে ব্যবহার করিত না। কাজেই বিলাত-ফেরত দলে যাতায়াতের অধিকার হইয়াছিল। স্বাভাবিক স্ফূর্তিপ্রিয়তা যাহা স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতেও দমাইতে পারে নাই—এবং অর্থসচ্ছলতার জন্য প্রেমনীহার গুপ্তভায়ার পরিবারে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

মিসেস্ গুপ্তভায়া সংসারিক বিষয়ে দক্ষ; ভাব-প্রবণতা তাঁহার ধাতুতে বড় স্থান পাইত না। তিনি দেখিলেন যে, নীতির সঙ্গে প্রেমনীহারের বে-মানান হয় না। চোখের কোণে তিনি একটু দেখিয়াওছেন যে, নীতির সম্বন্ধে প্রেমনীহার উদাসীন নহে। তবে নীতি বড় বোকা। সে সাজিতে বলিলে যে সাজে না, শুধু তাই নয়; পুরুষ মানুষকে বশ করিবার যে সকল অস্ত্র-শস্ত্রে বিধাতা রমণীকে সজ্জিত করিয়াছেন, তাহার প্রয়োগবিজ্ঞানও নীতির জানা নাই। এমন হাবা মেয়ে কে কোথায় দেখেছে? কাকিমা নীতির সামনেই কতবার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নীতির তাহাতে যে কিছু চৈতন্য হইল, এমন বোধ হইল না।

কথা এই যে, প্রেমনীহার এ পর্য্যন্ত কোনওরূপ পক্ষপাতিত্ব দেখায় নাই। শেফালী হউক আর নীতিই হউক, কোনও ক্ষতি নাই। যে হয়, এক জন হইলেই হইল। উভয়েই এক বয়সী। উভয়েই সুন্দরী। নীতি অপেক্ষা শেফালী কিছু উজ্জ্বল; তাহার স্বাস্থ্য ও গঠন কিছু ভাল।

২

নীতি হঠাৎ চলিয়া যাওয়ায় আসর জমিবার পক্ষে কিছু বাধা হইয়াছিল। শেফালী কি বলিবে খুঁজিয়া পায় না। প্রভাতকিরণ দুই একখানা ছবিওয়ালা ইংরেজি মাসিকপত্রের ছবি উল্টাইতে লাগিল। শেষকালে শেফালী বলিয়া ফেলিল,—'আজকাল আপনার কি হয়েচে বলুন ত?'

—'কেন, বলুন দেখি?'

—'মনে হয়, যেন আগেকার মত আপনার আর তেমন স্ফূর্তি নেই। সত্যি কি না বলুন?'

—'ঠিক বলেছ! প্রাণে যেন বলছে কি যেন চাই, কি যেন পাইনি। কি যেন হারিয়েছি, কি যেন ভুলে গেছি—ওঃ।'

শেফালী হাসিয়া উঠিল। বলিল—'ও কি? আপনি যে বঙ্কিমবাবু হ'য়ে উঠ্‌লেন, দেখ্‌চি। বিষবৃক্ষের অভিনয় আপনি খুব চমৎকার করতে পারেন, না?'

প্রভাত বলিল—'আপনি বুঝতে পারবেন না। প্রেমে না পড়লে বিরহীর অবস্থা বুঝা যায় না। প্রেমের গতি দুর্ব্বার।—ওঃ।'

প্রেমের কথায় তরুণীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় প্রেমনীহার ঘরে প্রবেশ করিল।

উভয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রেমনীহার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'ক্ষমা করবেন, মিস্ গুপ্তভায়া! ক্ষমা করবেন,—প্রভাতবাবু! আমি খবর না দিয়েই উঠে এসেছি। মনে করছিলাম, আজ ছুটির দিন হয় ত মিসেস্ গুপ্তভায়াকে বসবার ঘরেই দেখ্‌তে পাব। আপনাদের মধ্যে যে প্রেমের আলোচনা হচ্চে, তাতে বাধা দেবার কোনও মন্দ অভিপ্রায় আমার একেবারেই ছিল না।'

শেফালী আপনাকে সামলাইতে ব্যস্ত হইল। প্রভাত প্রেমনীহারকে বাধা দিয়া বলিল, 'না না! এ প্রেমের চর্চায় আপনারও যোগদান করিবার অধিকার আছে। আমরা একাডেমিক ভাবে প্রেমের আলোচনা করছি, মিস্ গুপ্তভায়ার মতটা এ সম্বন্ধে কি প্রকার, তা এখনও জানতে পারিনি।—'

—'জানা উচিত বই কি? এই ত প্রেমের বয়েস—This is just the age আপেলে রঙ ধরেছে—দেখুন না প্রভাতবাবু—সেই যে বিদ্যাপতিতে আছে—'

শেফালী চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রভাতকিরণ অপেক্ষা

করিয়া যখন দেখিল যে, বিদ্যাপতিতে যাহা আছে, তাহার উপস্থিত কোনও হদিস্ পাওয়া যাইতেছে না, তখন বলিল, 'মিষ্টার গুহঠাকুরতা, আপনি কষ্ট করবেন না। তার চাইতে আপনি প্রেম সম্বন্ধে কি মনে করেন, তা যদি কৃপা ক'রে বলেন, তা হ'লে আমরা উপকৃত হবো।'—

প্রেমনীহার—'অবশ্য, অবশ্য' বলিয়া কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল। তার পরে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া বলিতে লাগিল—

'আপনারা বিশ্বাস করবেন? আমি আমার জীবনে প্রেমের এমন আশ্চর্য্য গতি দেখেছি যে, আমারই অনেক সময়ে বিশ্বাস করতে ভয় হয়। সিঙ্গাপুরে এক দোকানে একটি তরুণীকে দেখেছিলাম—তার চোখ দু'টি অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় গভীর, তার অধর বোখারার খোবানীর মত, তার কেশপাশ অসংখ্য সর্প-শিশুর গুচ্ছের মত—সে কি রূপ! বর্ণনা হার মানে, প্রভাতবাবু, সে রূপ না দেখলে বিশ্বাস হয় না'—

প্রেমনীহার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে সেই রূপ প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

'আমাকে দেখিয়া সে হাসিল'—প্রেমনীহার চোখ বুজিয়াই বলিতে লাগিল—'সে ছিল এক শেলাইয়ের দোকানে শিক্ষানবীশ। দোকানের মালিক বোধ হয় সব সময়ে ভাল ব্যবহার করতেন না। তাই যখন আমি একটা ফীটন্ গাড়ী নিয়ে-এসে তার দোকানের কাছে সন্ধ্যাবেলা হাজির হ'লাম, তখন সে তার কাজ ফেলে ছুটে এল আমার গাড়ীতে। গাড়ীকে বলে' দিলাম—চালাও মিরপনালে। তখনকার অনুভূতি—সে কি অনুভূতি! জীবনে প্রথম প্রেমের যাদুস্পর্শ পেলাম। চন্দ্রকিরণে চ'লেছি দু'জনে, সমুদ্রের ধারে ধারে—এঁকে-বেঁকে রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের দিকে—মিরপনালে।—'

প্রেমনীহার পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। এমন সময় মিসেস্ গুপ্তভায়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি খুব আস্তেই পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহ কিঞ্চিৎ বিপুলতা প্রাপ্ত হওয়াতে সতর্কতা সত্ত্বেও কার্পেটের উপর পায়ের শব্দ কিছু জোরেই হইল।

প্রেমনীহার সোফা ছাড়িয়া এক লাফে দূরে সরিয়া গেল—ঐ সোফাতেই মিসেস্ গুপ্তভায়া সাধারণতঃ বসেন। ঠিক ঐ সময়ে বেয়ারা চায়ের ট্রেতে পেয়ালা ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছিল। প্রেমনীহার তাহার উপর গিয়া পড়িল। পেয়ালা, পিরিজ সশব্দে তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল— মিসেস্ গুপ্তভায়া চক্ষু কপালে তুলিলেন। প্রভাতকিরণ একটু হাসির আমেজ দিল। প্রেমনীহার তৎপরতা দেখাইবার জন্য নিজেই চায়ের পাত্র ও পেয়ালা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইল। 'অত্যন্ত দুঃখিত,—অত্যন্ত দুঃখিত!'

মিসেস্ গুপ্তভায়া বলিলেন,—'ও কি কচ্চেন আপনি? ঐ বেয়ারা এখনি সব ঠিক ক'রে নেবে'খন। আপনি বসুন দেখি।'

প্রেমনীহার 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।' বলিতে বলিতে রুমালে চা-সিক্ত অঙ্গুলি ও ঘর্ম্মসিক্ত বদন-মণ্ডল পুনঃ পুনঃ মুছিতে লাগিল।

নীতি বাসন-পড়ার শব্দে ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল, এবং পর্দা সরাইয়া প্রেমনীহারের দিকে একবার ও শেফালীর দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কাকিমা ডাকিলেন, 'নীতি!'

নীতি আসিয়া দূরে একখানি চেয়ারে বসিল। যেন সে এই যাত্রার আসরে নিতান্তই এক জন দর্শক—এমনি নির্লিপ্ত ভাব!

মিসেস্ গুপ্তভায়া বলিলেন—'কি গল্প হচ্ছিল আপনাদের? বড্ড বাধা পড়ে' গেল, না?—'

প্রভাতকিরণ সপ্রতিভ ভাবে বলিল, 'কিছু না। আমরা যেটুকু শুনবার, বেশ শুনে নিয়েছি। মিঃ গুহঠাকুরতা তাঁহার সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা বলছিলেন—'

'ওঃ' আমার এই দেশভ্রমণ বড় ভাল লাগে। রবিন (Robin) ত বেরুতে চান না কিছুতে। উনি বুঝেন না যে, ঘরে ব'সে থাকলে শরীর ভাল থাকে না—কেবল ভারী হ'য়ে উঠে।—নীতি আপনার গল্প শোনেনি মিঃ গুহঠাকুরতা! ওকে একবার বলুন।—ওঃ, এরা শুনেছে। আচ্ছা, এক কাজ করুন। আপনি ওঁর লাইব্রেরীতে গিয়ে বলুন। আমি আসছি। আমিও শুনবো'—

প্রভাতকিরণ একটু মজা করবার জন্যে বললে—'ভারি মজার গল্প, মাসিমা, ভারি মজার গল্প—আপনিও শুনবেন।'

প্রেমনীহার ঘামিতে লাগিল। শেষে নীতির শরণাপন্ন

হওয়াই সে শ্রেয়ঃ মনে করিল। নীতি এবং প্রেমনীহার উঠিয়া গেল। কাকিমা বলিলেন, 'তোমাদের চা লাইব্রেরীতেই দেবে। কেমন?'

নীতি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতকিরণ এবং প্রেমনীহার দুই জনই যাতায়াত করিতেছেন। গুপ্তভায়ার বাড়ীতে উভয়েরই অবারিত-দ্বার। কিন্তু প্রভাতকিরণের প্রতি গৃহিণীর কিছু নেক্‌-নজর থাকিলেও প্রেমনীহার তাহার জন্য কখনও অনুযোগ করিত না। কারণ, জানিত, সুয়োরাণী দুয়োরাণী শুধু রূপকথায় নয়, সংসারের সকল ব্যাপারেই আছে। এখানে শেফালী সুয়ো এবং নীতি দুয়ো-রাণী। ভাগ্যে সুয়ো অথবা দুয়ো জুটিবে, তাহা যতক্ষণ চূড়ান্ত ভাবে স্থির না হইতেছে, ততক্ষণ একটু সহিষ্ণুতা নহিলে চলিবে কেন?

প্রেমনীহার সহিষ্ণুতায় প্রভাতকিরণকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার বয়স প্রভাতের অপেক্ষা কিছু বেশী। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, প্রেমনীহারের যৌবন-মধ্যাহ্ন সূর্য্যকিরণের ন্যায় উজ্জ্বল। প্রভাত কিছু লাজুক। সব জিনিষ খতাইয়া দেখিলে প্রেমনীহারকে পছন্দ করিবার অনেক হেতু বিদ্যমান ছিল। অন্ততঃ প্রেমনীহার তাহাই মনে করিয়া সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত ছিল। সেই জন্য প্রভাতকিরণের সঙ্গে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব বেশী ঘনীভূত হইতে পারে নাই। তবে সাংসারিক অভিজ্ঞতার ফলে প্রেমনীহারের তুলাদণ্ডে শেফালীর ওজন ছিল ভারী; কারণ, তাহার পিতা সমৃদ্ধ ব্যবহারাজীব। বিবাহের কন্যা কাঞ্চনেই শোভা পায় বেশী। প্রেমনীহার যে পণপ্রথার পক্ষপাতী ছিল তাহা বলা যায় না। তবে বিবাহিত জীবনের সুরু থেকেই ব্যয়বাহুল্য, সুতরাং একটা safe margin নিয়ে আরম্ভ করায় ক্ষতি কি?—এই ছিল তাহার অভিমত।

কিন্তু প্রেমনীহারের সে আশায় বাদ সাধিলেন এক দিন গুপ্তভায়া-গৃহিণী স্বয়ং। এক দিন প্রেমনীহার বিকালে অভিসার করিয়াছে। কিন্তু তখনও শেফালী বা নীতি কেহই কলেজ হইতে ফিরে নাই। প্রেমনীহার তাহা জানিত। কিছু দিন ধরিয়া সে প্রতিদিনই কিছু সময় মিসেস্ গুপ্তভায়ার সঙ্গে কাটাইতে ভালবাসিত। সে জানিত যে, হাত বাড়াইলেই ফুল তুলিতে পারা যায় না। অনেক সময় ডাল ধরিয়া টানিলে তবে ফুল হাতে পাওয়া যায়। শেফালী ফুল, তাহার মাতা কণ্টকিত ডাল। কিন্তু পদ্যপাঠে আছে—'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও' ইত্যাদি।

—'নীহার, নীতুকে কি কিছু তুমি বলেছ?'

—'কি বিষয়ে?'

মিসেস্ গুপ্তভায়া কিছু গোলে পড়িলেন। তিনি বলিলেন, 'দেখ নীহার, তুমি বাড়ীর ছেলের মত। তোমাকে আমার কিছুই গোপন করবার নেই। আমি ভাবছিলাম—ভাবছিলাম কি?—এই মনে কর, তোমার এই নিঃসঙ্গ জীবন তুমি কেমন ক'রে বহন করুচ, তাই ভেবে আমার ভারি দুঃখ হয়।'

প্রেমনীহার বেশ একটু দীর্ঘ রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে মৌন হয়ে' রইল। সে মনে করিল, এক্ষেত্রে কিছু বলিতে যাওয়া হয় ত শোভন হইবে না।

মিসেস্ গুপ্তভায়া আবার বলিলেন, 'এমন সন্ন্যাসীর মত আর কত দিন থাকবে? এইবারে আবার ঘর-সংসার গুছিয়ে নেবার চেষ্টা দেখ।'

প্রেমনীহার ঠিক বুঝিতে পারিল না যে, তীর কোন্ দিকে ছুটচে। তাই সে একটু কুয়াসার সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, 'এই ত মাসিমা, বাড়ীতে দিনরাত মন ছট্‌ফট্ করে ব'লে ছুটে আসি আপনাদের কাছে। এখানে এলেই শান্তি পাই। আপনার স্নেহের কথা জীবনে ভুল্‌তে পারব না। দেখুন, আমার মা যখন ছিলেন—'

প্রশংসায় মিসেস্ গুপ্তভায়ায় যে কিছু অরুচি ছিল, তা নয়। কিন্তু পাছে আসল কথাটা এই ভাবে উচ্ছ্বাসে বাষ্প হয়ে' যায়, তাই তিনি আবার স্মৃতির জীর্ণ পঞ্জরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন, 'বৌমা, নীতিরই মত ছিলেন দেখ্‌তে—'

—'না, ওর চাইতে বোধ হয় একটু উজ্জ্বল। হাঁ, প্রায়ই ঐ রকম। মাসিমা আপনার শেফালী যার গলায় মালা দেবে, তার সৌভাগ্যের সীমা থাকবে না, এটা আমি predict করতে পারি।'

—'হাঁ, যে ওকে দেখে সে-ই ঐ কথা বলে। এখন

একটি ভাল ছেলে পেলে' তাকে সঁপে দিয়ে' নিশ্চিন্ত হতে' পারি। আমরা আর ক'দিন ?'

—'তাই বলে' যেন ব্যস্ত হয়ে' যার-তার হাতে দেবেন না, মাসিমা! শেফালী একটি jowel!'

মিসেস্ একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। তিনি কথাটাকে ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলিলেন, 'প্রভাত-কিরণ ছেলেটি বড় ভাল। তোমার কি রকম মনে হয় ?'

—'মন্দ নয়, মন্দ নয়। ভালই বল্‌তে হবে। তবে কি জানেন, অনেক struggle সাম্‌নে রয়েচে। ঠিক তৈয়েরী ছেলে যাকে বলে, ও ত মোটেই তা নয়, একেবারেই তা নয়।'

—'তবে লেখাপড়া শিখেছে। করে'-খেতে পারবে।'

—'কিছু বলা যায় না, মাসিমা! সংসারের ধাক্কা খেলে' বাছাধনের শিক্ষা-দীক্ষা সব অক্কা পেয়ে যাবে হয় ত। মানে, হতে পারে—কিছু বলা ত যায় না।'

—'তা বটে, তবে স্বভাব-চরিত্র, বুদ্ধি-বিবেচনা বেশ ভাল ব'লেই মনে হয়। কি বল ?'

—'না, হাঁ, সে সব কিছু আগে থেকে কি কিছু বুঝা যায় ? মেয়েছেলেরা যা পুরুষের মধ্যে লোভনীয় মনে করে—তা আছে ? বলুন দেখি, সে গুণ ওর মধ্যে দেখ্‌তে পেয়েচেন ? আমি ত পাইনি। নীতি ত ওকে একেবারে ছেলেমানুষ বলে' উপেক্ষা করে। শেফালী ত ওকে মানুষ বলেই গণ্য করে না।'

—'ও, তাই না কি ? হাঁ, ওদের আবার সবতাতে বাড়াবাড়ি। আমার বোধ হয়, নীতির জন্যে যদি একটি ভাল ছেলে পাই, তাহ'লে সে সরে গেলে', শেফালী আর একটু স্থিরবুদ্ধি হতে' পারে। দু'বোনে একসঙ্গে থাক্‌লে ওদের চঞ্চলতা এত বাড়ে যে, ভবিষ্যতের চিন্তা একেবারেই মনে আসে না। তুমি এর একটা উপায় কর, বাবা!'

এইবার প্রেমনীহার একটু থই পাইল। শেফালীর আশা করা যে আর সমীচীন হইবে না, ইহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন সে বলিল, 'নীতি চমৎকার মেয়ে। যেমন নম্র, তেমনই সুন্দর!'

'তা হ'লে, তুমিই ওকে নেও না।'

'এ ত আমার পরম সৌভাগ্য। মাসিমা, আপনি আমার মনের কথাটি ব'লেছেন। আমি সাহস ক'রে হয় ত বল্‌তে পারতাম না। একবার আঘাত খেয়েছি কি না, সে কথা ত আমার মনে আছে।'

'কিন্তু নীতির মন কি তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ, তারও ত একটা মতামত নিতে হবে—'

'সে আমার উপর ছেড়ে দিন, মাসিমা! আপনার সম্মতি আছে, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নীতিকে আমি যত দূর জানি, তাতে সে আমার প্রতি সুপ্রসন্ন আছে, এ কথা আমি আপনাকে বল্‌তে পারি গোপনে।'

'তা হলেই ভাল। তা হলে ত আর কোনও কথা নেই। আমি তা হলে সাহেবকে বলি ? ঐ যে উনি আস্‌ছেন।'

মিষ্টার গুপ্তভায়া সাদা হাফ্-শার্ট ও খাঁকির শর্ট পরে' ঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রেমনীহার উঠিয়া করজোড়ে নমস্কার করিল। মিঃ গুপ্তভায়ার দক্ষিণ হস্তে একটা বর্মা-চুরুট ছিল, এবং বাম হস্তে ছিল দেশলায়ের বাক্স; তিনি সেই বাক্সটি কপালে ঠেকিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, 'ওগো, শুনছ, নীহার আমাদের নীতিকে বিবাহ করতে সম্মত হ'য়েচে। এখন তোমার অনুমতির অপেক্ষা—'

প্রেমনীহার উঠিয়া গিয়া মিঃ গুপ্তভায়ার পাদস্পর্শ করিল। গুপ্তভায়া সজোরে তাহার করমর্দ্দন করিয়া দিলেন।

'বস, বস হে ছোক্‌রা, I congratulate you on your choice। নীতির মত মেয়ে হয় না, আমি হ'লেও ওকে partner করতে ইতস্ততঃ করতাম না। তা আমি দেবো—ভাল ক'রেই দেবো। I shall make it worth your while—বুঝেছ ? ওর বাপ-মা নেই বলে' কিছু ত্রুটি হবে না—'

'না না, সে লোভ দেখাবার দরকার নেই, নীহারকে। ও বড় ভাল ছেলে।—'

গৃহিণী দেখিলেন, শেফালীর বিবাহে অনেক খরচ আছে। আগে থাকিতে প্রেমনীহারের মত বরকে বেশী

টাকা-কড়ি দিয়া দেউলিয়া হইবার কোনও পার্থিব যুক্তি নাই।

মিঃ গুপ্তভায়া কৌচে বসিয়া চুরুট ধরাইবার বিধিমত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না! পরে যখন সে-দিকে কিছু সফলতার আশা হইল, তখন দগ্ধ একটি কাঠি বাম হাতে লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, 'সে জন্য তুমি ভেব না মিনি! অর্থাৎ—আমাকে কিছুই করতে হবে না, দাদা কিছু রেখে গিয়েছেন—বেশ কিছু ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন।'

এই কথায় প্রেমনীহারের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'আমাকে মাপ করবেন। নীতি অমূল্য রত্ন, তাকে যে কেউ যত্ন করে' মাথায় তু'লে নেবে। ঘুস দেবার দরকার নেই—'

গুপ্তভায়া বল্লেন, 'সে থাক্‌গে, একটা দিন ঠিক ক'রে ফেল মিনি! আজকাল যা দিনকাল প'ড়েছে মতিস্থির ব'লে কোনও জিনিস দুনিয়ায় পাবে না।'

প্রেমনীহার বল্লে, 'এই বৈশাখ মাসেই আমি রাজি, যদি আপনাদের অনুগ্রহ হয়।'

গুপ্তভায়া স্ত্রীর দিকে একটি চক্ষু মটকাইয়া চাহিলেন। স্ত্রী বলিলেন, 'একবার নীতির মতটা জেনে নেওয়া উচিত নয় কি—'

—'তার মত আছে, আপনারা ধরে' নিতে পারেন।'

ঠিক এমনই সময় কলরব করিতে করিতে শেফালী, নীতি ও প্রভাত-কিরণ একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল।

শেফালী একেবারে মায়ের গায়ের উপর গিয়া ঝাপাইয়া পড়িল! বলিল, 'মা, প্রভাতকিরণ আর নীতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।'

প্রেমনীহার লাফাইয়া উঠিল। গুপ্তভায়ার চুরুট পড়িয়া গেল। মিসেস্ গুপ্তভায়া ঘন ঘন আঁচল দিয়া আপনাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম-এ, অধ্যাপক, রায়বাহাদুর)।

পাশের বাড়ীর মেয়ে

আমার প্রিয়ার চলন দেখে
খঞ্জনারা নাচন শেখে,
বুলবুলিরা গান শেখে, তা'র
গলার আওয়াজ পেয়ে!
ও সে অপ্সরা নয়, কিন্নরী নয়,—
পাশের বাড়ীর মেয়ে!

বৃষ্টি ভীষণ, ঝড় উঠেছে,—
জল জমেছে চোখে
ছলছলিয়ে মোর মুখে চায়
জান্‌লা হ'তে ও কে?
বুকের ভেতর ঝড় ওঠে কা'র
এ জল-ঝড়ের চেয়ে,
চাঁদের মতন মুখখানি তা'র
পাশের বাড়ীর মেয়ে!

পদ্মকলি পাপ্‌ড়ি মেলি'
চাইলো ভোরের বেলা!
অরুণ আলো ঘুম ভাঙালো
সমীর দিল খেলা!
ফুলের মতন মধুর সরল,
মঞ্জুলা তা'র চেয়ে!
জ্যোৎস্না-ঢালা সেই মাধুরী
পাশের বাড়ীর মেয়ে!

শ্রীরামেন্দু দত্ত

সৃষ্টিধর মানুষ
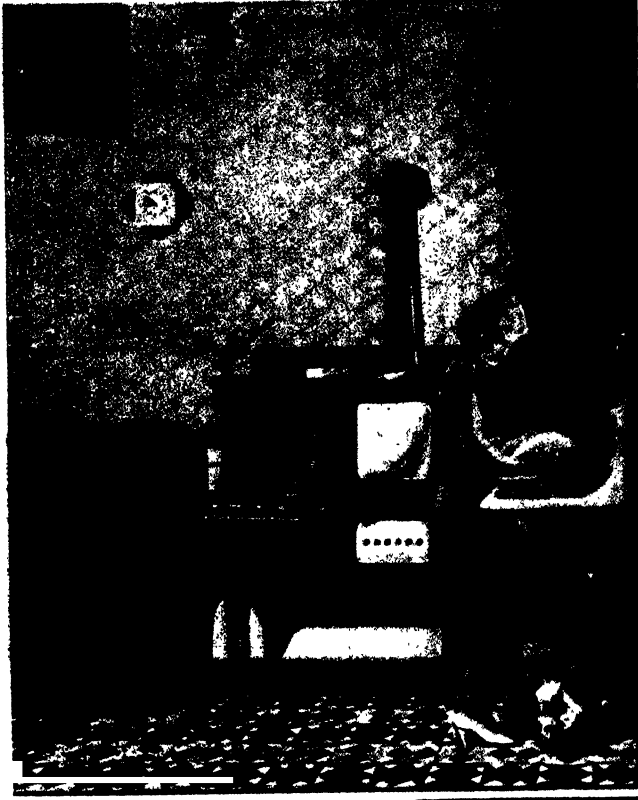
বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে এ-কালের রান্নাঘরের শ্রী

চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা বলিতেছি। আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি। গ্রীষ্মকালে ছাতা মাথায় দিয়া স্কুলে যাইতাম। সে ছাতার বাঁটে কোনো বৈশিষ্ট্য বা বাহার ছিল না। তার পর বাজারে [illegible] ছাতা আসিল—সে ছাতার বাঁটে কি অভিনব বৈচিত্র্য! সেলুলয়েডের বাঁট। দোকানদার বলিল,—আলু হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ বাঁট তৈয়ারী! আমাদের তাজ্জব লাগিল! আলু! সেই আলু কুটিয়া চটকাইয়া তাকে জালে চড়াইয়া এমন জিনিস সৃষ্টি করিয়াছে! দেখিতে হাতীর দাঁতের মতো! যিনি এ বাঁট সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁর উপর কি শ্রদ্ধা না হইয়াছিল! মনে হইয়াছিল, বিধাতার সঙ্গে পাল্লা দিবার শক্তি রাখেন—ইনি এমন সৃষ্টিধর!

তার পর এই চল্লিশ বৎসরে রসায়নের কল্যাণে মানুষ নব নব কত সামগ্রী সৃষ্টি করিয়া তুলিল, দেখিয়া বিস্ময়ের সীমা থাকে না! এ সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখিয়া মনে হয়, বিশ্বামিত্রের নব-সৃষ্টি হয় তো নিছক পুরাণের কল্প-কথা নয়! সে যুগে ঋষি বিশ্বামিত্র এমনি বিদ্যার বলে যদি নব নব সামগ্রীর সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রূপকথা বলিয়া সে-সৃষ্টি উড়াইয়া দেওয়া চলে না!

ভূমিকা বাঁধিয়া মানুষের এই সৃষ্টি-কৌশলের অপূর্ব ইতিহাসের আলোচনা

সে-কালের রান্নাঘর (অবৈজ্ঞানিক)

ল্যাবরেটরি

করা যাক। এ-আলোচনায় দেখিব, মানুষকে বিধাতা কি অসাধারণ শক্তিতে বিভূষিত করিয়াছেন এবং মানুষ সে-শক্তির সদ্ব্যবহার করিয়া বিধাতার নাম-গৌরব-রক্ষায় কতখানি তৎপর!

প্রাচীন যুগের মানুষ বিধাতা-রচিত নিসর্গ-দত্ত দ্রব্য-সামগ্রী লইয়াই নিজের অভাব-বিলাসের বাসনা পরিতৃপ্ত করিত। তাহাতে অসুবিধা ছিল এই, সকল সময়ে এবং সকল দেশে সকল-প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী মিলিত না। কোনোটা অল্প মিলিত,—প্রয়োজনের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত ছিল না! তার উপর নিসর্গ-দত্ত দ্রব্য-সামগ্রীতে নানা ত্রুটি, নানা গলদ ছিল। শোধন না করিলে সে গুলির দ্বারা
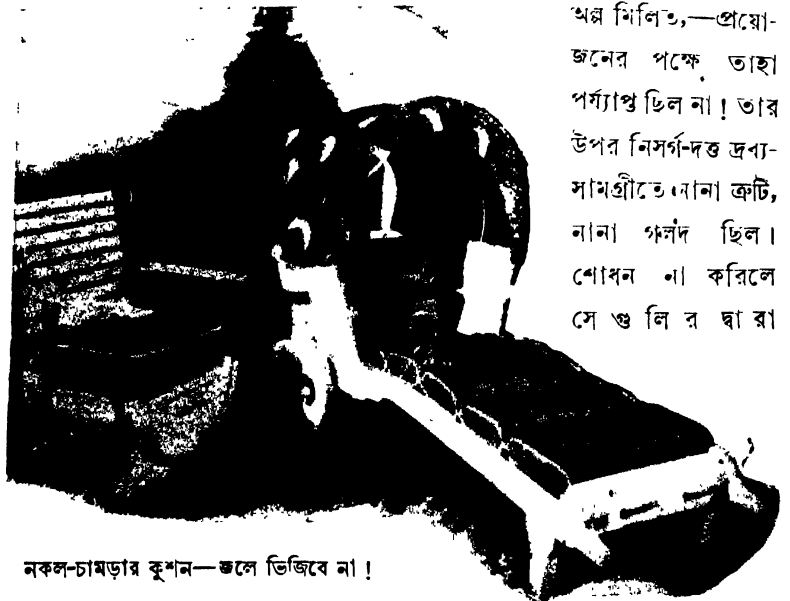
নকল-চামড়ার কুশন—জলে ভিজিবে না!

১। কাপড় পূর্ব্বে জ্বলিত ২। কাপড় এখন অদাহ্য

প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না। যে-দিন সর্ব্বপ্রথম বাষ্প-শক্তিকে (steam-power) দাস্থে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইল, জীবন-ধারাকে সে-দিন মানুষ স্বচ্ছ-সহজ করিয়া তুলিল। তার পর মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িল বৈদ্যুতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া; তার পর রাসায়নিক জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আজ জীবনকে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁদে গড়িয়া তুলিয়াছে।

বাষ্প এবং বৈদ্যুতিক শক্তি আমাদের জীবন-ধারার প্রণালীকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে। কর্ম্ম-সাধনা ও শ্রমশিল্প আজ গৃহ ছাড়িয়া বিরাট বিপুল কারখানায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। ইহা ঘটিয়াছে শুধু বাষ্প এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সংস্পর্শে। একমাত্র পশুকে বাহন করিয়া মানুষ স্থলপথে দূর-দুরান্তে পাড়ি দিত, মালপত্র বহা-বহি করিত; বাষ্প এবং বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ট্রেণ-মোটর চালাইয়া মানুষ দূরকে যেমন একান্ত নিকট করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি যান-বাহনের গতিবেগও বাতাসের গতিবেগের মতো দ্রুত ও ক্ষিপ্র করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ শক্তির সাহায্যে আমরা টেলিফোন পাইয়াছি; টেলিগ্রামে নিত্য-নিয়ত কত সুদূর দেশে সংবাদ পাঠাইতেছি, সেখানকার সংবাদ গ্রহণ করিতেছি! তার পর মানুষ বেতার-বার্তার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে; বিমানপোত চালাইয়া নিরাপদে শূন্য-পথে চলাফেরা করিতেছে। মানুষের কায়িক শ্রমের পরিমাণ কমিয়াছে—অবসর মিলিয়াছে—জীবন-যাত্রার প্রণালীকে আজ কতখানি স্বচ্ছন্দ-সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে!

বাষ্প-শক্তিতে আমাদের ট্রেণ চলিতেছিল; কিন্তু সে শক্তিকে মানুষ এমন আয়ত্ত করিতে পারে নাই, যার ফলে ট্রেণের গতিবেগ বাড়িতে পারে, বা সুনির্দ্দিষ্ট রেল-লাইন ছাড়িয়া সাদাসিধা পথে ঘোড়ার গাড়ীর মতোই সে বাতাসের মতো ক্ষিপ্রবেগে ছুটিতে সমর্থ হয়! তাই মানুষের

সাধনার অন্ত রহিল না! এবং অন্ত ছিল না বলিয়া মানুষ আজ মোটর-গাড়ী রচিয়াছে! এ-গাড়ী রেল-লাইন ধরিয়া চলে না—সিধা পথে অনায়াসে চলিতে পারে!

সেলুলোজ-ফিল্ম হইতে 'কলোনা'র শির-রক্ষণী' তৈয়ারী

এমনি করিয়া মানুষ তার সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখিয়া নিত্য তাহাকে সুপ্রসারিত করিয়া চলিয়াছে।

এই রেল, মোটর, টেলিফোন—এ সব তৈয়ারী করিতে মানুষ যে সব উপাদান লইয়াছে, সে উপাদান নিসর্গ-লব্ধ। নিসর্গ-লব্ধ এই সব উপাদানে প্রতি পদে অসুবিধা ঘটিতেছিল; তাই সে অসুবিধা দূর করিয়া নব নব উপাদান-সৃষ্টির সাধনায় মানুষ আত্মনিবেদন করিল এবং তার সে সাধনা আজ সার্থক হইয়াছে।

এ-সম্বন্ধে সহজ দৃষ্টান্ত লওয়া যাক এই মোটর-গাড়ী। এ গাড়ীকে মজবুত করিয়া তুলিবার জন্য এ-গাড়ীর নির্মাতা শিল্পীরা নানা ধাতু ব্যবহার করিতেন; সে সব ধাতু ছিল ভারী বোঝার মতো; এবং তাহা গাড়ীর গতিকে পদে পদে ব্যাহত করিত। তার উপর সে সব ধাতু দিয়া গাড়ী তৈয়ারী করিতে ব্যয় পড়িত অনেক বেশী। তার ফলে অসাধারণ ধনী ব্যক্তি ছাড়া মোটর-গাড়ী কিনিবার সামর্থ্য আর কাহারো ছিল না। কাচের সার্শি, উইণ্ডস্ক্রীন—একটু ধাক্কা লাগিলে এ-সব ভাঙ্গিয়া চুরমার হইত। গদির আসল চামড়া নিত্য-ব্যবহারে অল্পদিনে ছিঁড়িয়া যাইত,—পেট্রোল এবং মোবিল-অয়েল জমাট বাঁধিয়া গাড়ীর কল-কব্জাকে বিকল করিয়া তুলিত—গাড়ীর রং এক-বৎসরে

নানা-ধাতুর তৈয়ারী আধার

জ্বলিয়া চটিয়া যাইত এবং মরচে ধরিয়া এঞ্জিন বিকল হইয়া পড়িত। এমনি নানা অসুবিধার অন্ত ছিল না! কাজেই মোটর-গাড়ী রাখা—সে ছিল হাতী-পোষার মতো বিলাস-ব্যসন।

টেলিফোন, বিজলী-বাতি, বিজলী-পাখা—এ-সবেও এমনি নানা বিপত্তি ঘটিত। মানুষের সৃষ্টি-কুশলতা

ত্রুটি ছিল না। পয়সা খরচ করিতে মানুষের কুণ্ঠা ছিল না; অথচ প্রকৃতি-দত্ত উপাদানে এই সব ত্রুটি নিত্য নব-নব বিপত্তির সৃষ্টি করিত!

এ বিপত্তি আজ শুধু রসায়নের কল্যাণে ঘুচিয়াছে!

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে মানুষ এই রসায়নের কল্যাণে সৃষ্টি-ধারায় যুগান্তর আনিয়াছে! রসায়নের কল্যাণে মানুষ নব-নব যে-সব নকল ধাতু, কাগজ, কাপড়, কাঠ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অভিনবত্বে মানুষের সৃষ্টি-কুশলতার যেমন পরিচয় পাই, সে-সবের স্থায়িত্বও তেমনি প্রচুর!

নকল ধাতুর স্বচ্ছ পিয়ানো-কেস

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জার্মান-বৈজ্ঞানিক শোয়েনবিল্ নাইট্রিক এসিড ও সালফিউরিক এসিডে তুলা ভিজাইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 'গান-কটনের' (gun-cotton) সৃষ্টি করিলেন। সে 'গান-কটন্' সাংঘাতিক বিস্ফোরক! তার পর তুলায় নাইট্রিক এসিডের মাত্রা অল্প করিয়া রাসায়নিক উপায়ে বৈজ্ঞানিকেরা পাইরক্সিলিন নামে ধাতুর সৃষ্টি করিলেন!

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হায়াট্ নামে মার্কিন-বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক প্রণালীতে এই পাইরক্সিলিনের সঙ্গে কর্পূর মিশাইয়া সেলুলয়েডের সৃষ্টি করিলেন। এই সেলুলয়েড আজ নানা দিক দিয়া মানুষের যত প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে, তার আর সীমা-পরিসীমা নাই! সেলুলয়েড লইয়া বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা এখনো শেষ হয় নাই। এবং এ গবেষণার ফলে ফরাশী রাসায়নিক শারদনেঁ সেলুলয়েডের সূক্ষ্ম তন্তুরাজি সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অদাহ্য করিয়া সেই তন্তুরাজি দিয়া 'রেয়ন' নামে নকল-রেশমী-কাপড় তৈয়ারী করিয়াছেন।

এই সেলুলয়েড, পাইরক্সিলিন ও রেয়নকে আদি-উপাদান-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নব-নব বহু ধাতু-উপাদানাদির সৃষ্টি হইতেছে! মার্কিনের সৌখীন আসরে আজ যে সব নয়ন-বিমোহন পোষাক-পরিচ্ছদ অঙ্গে আঁটিয়া বিলাসিনীরা আসরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন, সে সব

সেলোফেনের তৈয়ারী স্বচ্ছ চা-দানি

পোষাক-পরিচ্ছদ এই নকল রেয়ন হইতে তৈয়ারী। এ যুগের যত সৌখীন এবং হাল্কা জামা-কাপড়—সে-সবও এই রেয়নে তৈয়ারী।

এ দিকে রসায়ন এই রকম রচনা করিয়া ক্ষান্ত নাই।—

রাসায়নিক প্রণালীতে এমন সব কাপড় আজ তৈয়ারী হইতেছে যে, সে সব কাপড়ে দাগ ধরে না ; জল লাগিলেও সে সব কাপড় ভিজিবে না—এবং ব্যবহারে এ-সব কাপড়ে কোঁচ পড়িবে না। এমনি কাপড়ে আজ ফ্রক, ব্লাউশ, সার্ট, হ্যাট, মোজা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে! এ কাপড়ে আজ বিরাট তাঁবুর আচ্ছাদনী-পট পর্য্যন্ত তৈয়ারী হইতেছে। এ কাপড় যেমন মজবুত, তেমনি এ কাপড়কে নানা বর্ণে রঞ্জিত করা হইতেছে। এ সব বর্ণও রাসায়নিক প্রণালীতে তৈয়ারী এবং কোনো বর্ণ-ই জলে বা রৌদ্রে জ্বলিয়া যায় না—অটুট অক্ষত থাকে!

নিত্য-দিন আমরা যে সব জামা-কাপড় ব্যবহার করি, কলপ দিয়া সেগুলিকে মসৃণ ও চিক্কণ রাখিতে হয়। রাসায়নিক প্রণালীতে মানুষ আজ এমন কলপ তৈয়ারী করিয়াছে যে, এই সব নকল কাপড়ে একবার মাত্র সে-কলপ লাগাইলে দীর্ঘকাল তাহা অটুট থাকে!

জুতা এত-কাল শুধু পশু-চর্ম্মে তৈয়ারী হইত। আজ রাসায়নিকের কল্যাণে নকল চামড়া তৈয়ারী হইতেছে।

কয়লা হইতে বিবিধ বর্ণের সৃষ্টি

এ স্নানের পোষাক রেয়নে রচিত। টেবল-ক্লথ নকল। খাদ্য-থলি চেলোফেনে তৈয়ারী
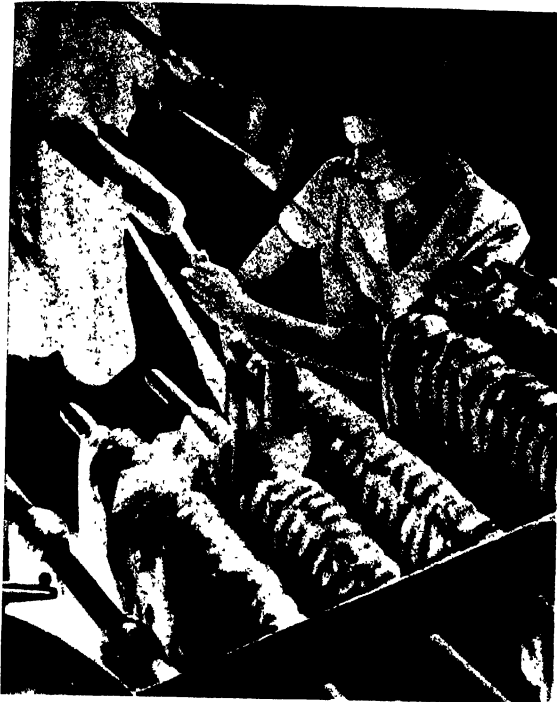
তৈয়ারীর সঙ্গে-সঙ্গে রেয়ন-পরীক্ষা

এ পরিচ্ছদ আগাগোড়া নকল কাপড়ে তৈয়ারী

নকল চামড়ার জুতা দামে শস্তা,—অথচ আসল-চামড়ার জুতার মতোই মজবুত! রাসায়নিক আজ অজস্র নকল উপাদান তৈয়ারী করিতেছেন এবং সে সব উপাদান সুলভ বলিয়া গরীব গৃহস্থের পক্ষেও আজ বহু সামগ্রী আর দুরাশার স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত নাই! তারাও বহু

নকল-স্যাটিন—জলে ভিজে না—দাগ ধরে না

সামগ্রী কিনিয়া অভাব-ও-বিলাস-বাসনা-পরিপূরণে সমর্থ হইয়াছে!

চামড়া, রবার প্রভৃতি কাঁচা-মালের দাম কখনো বাড়ে, কখনো কমে। কাঁচা-মাল হইতে যে সব প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র তৈয়ারী হয়, কাঁচা-মালের দাম

রাসায়নিক প্রণালীতে নব নব স্নগন্ধি, নব নব বর্ণ-স্নষমা সৃষ্টি করিতে! তিনি চান প্রকৃতি-দত্ত দ্রব্য-সম্ভারকে নব নব উপাদানে আরো সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে।

বাতাস, জল, কয়লা, লবণ, চুণ—এই সব সামগ্রী
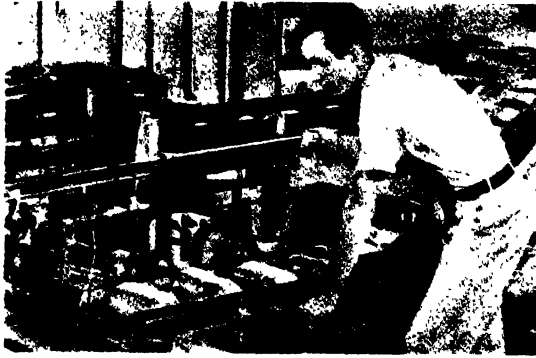
স্বচ্ছ নকল-রাধারে রুটি প্যাক্

হইতে রাসায়নিক প্রণালীতে মানবের পুষ্টিকর খাদ্য-পানীয় আজ তৈয়ারী হইতেছে; মানুষের জীবন সে সব খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করিয়া সুস্থ, স্বচ্ছন্দ থাকিবে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে রেয়ন কাপড়ের প্রথম সৃষ্টি। তাহাতে বিস্তর খুঁত ছিল। সিল্কের নিছা নকল বলিয়া রেয়নকে অনেকে তখন স্নুনজরে দেখিতেন না; এজন্য রেয়নের উৎকর্ম-সাধনের জন্য রাসায়নিকদের গবেষণার অন্ত রহিল না। এবং এ গবেষণাদির ফলে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রেয়নের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হইল। এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী জুড়িয়া এই নিখুঁত রেয়নের আদর এত বাড়িয়া উঠিল যে, আসল সিল্কের চেয়ে রেয়নের বিক্রয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল: পশমের সঙ্গেও রেয়ন সমানে পাল্লা দিতে লাগিল।

স্বাভাবিক বা আসল উপাদানে মস্ত গলদ এই যে, আবহাওয়া, দেশ ও মাটীর গুণাগুণ এবং আরো বহু কারণে এ-সব উপাদানে নানা পার্থক্য ঘটে! পশুর স্বাস্থ্য-হিসাবে পশু-চর্ম্মে তারতম্য দেখা যায়; গুটির স্বাস্থ্য, গাছ-পালার স্বাস্থ্য—এ-সবে তারতম্য থাকিলে গুটির রেশমে বা কাঠে ও পত্র-পল্লবে বহু পার্থক্য ঘটিবেই। তার উপর আমার যদি দশ ফুট দীর্ঘ চামড়ার বা তক্তার অথবা বিশ-গজ সিল্কের প্রয়োজন হয়, স্বাভাবিক উপাদান হইতে যে-তক্তা বা চামড়া কিম্বা সিল্কের কাপড় মিলিবে, তাহা আমার প্রয়োজনীয় মাপের কাঠ বা চামড়ার অনুযায়ী হইবে না। দীর্ঘতর চামড়া বা কাঠ হইতে আমার প্রয়োজন-মতো কাঠ বা চামড়াটুকু কাটিয়া কাজ চালাইতে হইবে। তার ফলে হয় তো অবশেষটুকু সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইতে পারে! নকল উপাদানের বেলায় সে বালাই নাই! যতখানি প্রয়োজন, মাপ করিয়া ঠিক ততখানি তৈয়ারী করিয়া লওয়া চলে। ফেলা-ছেঁড়ার উৎপাত নাই!

আজ যে রেয়ন তৈয়ারী হইতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক মাপ কষিয়া। এ মাপ নির্ভুল। ইচ্ছামত রেয়নকে মিহি বা মোটা করিয়া তৈয়ারী করা চলে। যে রঙ চান, সেই রঙেরই রেয়ন পাইবেন। নকল চামড়া বা নকল কাঠের বেলাতেও এই ব্যবস্থা। রাসায়নিকের হাতে নকল রেয়ন-তন্তু এমন ভাবে তৈয়ারী হইতেছে যে, তার গড়নও যেমন চান, তেমনি পাইবেন! রেয়নে যত রকমে ডিজাইন তোলা যায়, আসল-সিল্কে তেমন তোলা যায় না।
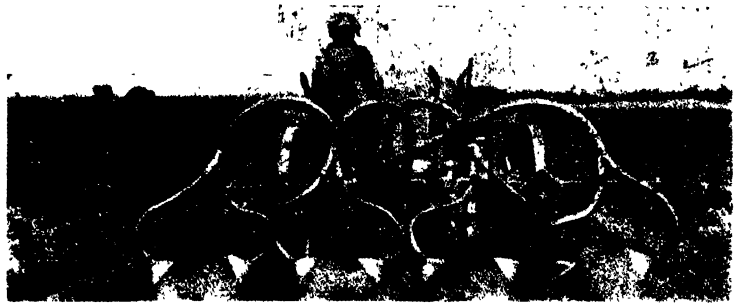
ক্ষেতে ক্যাল্‌সিয়াম-আর্সিনেট ছড়ানো

আসল সিল্কের দাম ছিল বেশী—সে সিল্ক ধনীর ঘরণী ভিন্ন অপরের অঙ্গে ঠাঁই পাইত না! রেয়ন সিল্কের দাম এত শস্তা যে, গরীবের ঘরেও তাহা দুরাশার স্বপ্ন নয়!

নিউ-ইয়র্ক ধনীর দেশ, বিলাসীর দেশ। দু'বৎসর পূর্ব্বে সেখানকার সৌখীন ধনাঢ্য সমাজ-বিলাসিনীদের পোষাক-পরিচ্ছদের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে, শতকরা

৯০ জন বিলাসিনী আসল সিল্কের মায়া ত্যাগ করিয়া নকল রেয়ন-সিল্কে বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিয়া ধন্য হইতেছেন্!

১৯৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে কয়লা হইতে তৈল তৈয়ারী করিবার জন্য রাসায়নিকদিগের সাধনা সুরু হয়। জার্ম্মাণ রাসায়নিক বার্জিয়াস এ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া তোলেন! তাঁর সে সাধনার ফলে জার্ম্মাণীতে বছরে আজ তিন লক্ষ টন-পরিমিত কয়লা হইতে তৈল তৈয়ারী হইতেছে। আসল পেট্রোল বা গ্যাশোলিন-নিষ্কাশনে যে ব্যয় হয়, কয়লা হইতে নকল পেট্রোল তৈয়ারী করিতে ব্যয় অবশ্য তিন-চার গুণ বাড়িয়াছে, তবু খরচ বেশী হইলেও জার্ম্মাণীকে পেট্রোলের জন্য আজ পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হয় নাই ইংলণ্ডেও এখন কয়লা হইতে নকল-পেট্রোলিয়াম তৈয়ারী করার ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে। আমেরিকাতেও সম্প্রতি জার্ম্মাণ রাসায়নিক বার্জিয়াস-প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে কয়লা হইতে তরল পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশিত হইতেছে।

বার্জিয়াস আর-একটি অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন। কাঠ পুড়াইয়া সেই কাঠকে কয়লায় রূপান্তরিত করিয়া সেই রূপান্তরিত কয়লা হইতে তৈল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পেট্রোল আজ আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী। রসায়নের কল্যাণে পেট্রোলের মতো আজ নব নব কত ধাতুর সৃষ্টি হইয়াছে, ভাবিলে মানুষের সৃষ্টি-কুশলতার কথা স্মরণ করিয়া বিস্ময়ের সীমা থাকে না!

টানটালাম, মাগবডেনাম, টাঙ্গষ্টেন, প্লাটিনাম, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কৃত হইলেও তাহা এত দুর্লভ যে, তার দাম সোনা-মণির চেয়ে অনেক বেশী। আধুনিক বিজ্ঞান বহু সাধনায় এমন বহু নকল ধাতুর সৃষ্টি করিয়াছে যে, সে সব নব-নির্ম্মিত ধাতুর কল্যাণে দুর্মূল্য দুর্লভ ধাতুর অভাব আমাদিগকে কোনো দিক দিয়া আজ উপলব্ধি করিতে হয় না!

লোহা পিতল এলুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুতে আজ রাসায়নিক প্রণালীতে ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম ও নিকেল প্লেটের যে-কোটিং বা প্রলেপ-আবরণী দেওয়া হইতেছে, সে প্রলেপে লোহা-পিতলের শ্রী-ছাঁদ ফিরিয়া গিয়াছে! দাঁড়কাক আজ রাসায়নিকের মন্ত্রে এমন ময়ূর সাজিতেছে যে, কাহারো সাধ্য নাই, দাঁড়কাকের কাকত্ব ধরিয়া ফেলিবে!

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ এই নব-রসায়নের মন্ত্র-স্পর্শে বহুগুণ সমৃদ্ধ হইয়াছে। নর-নারীর শারীরিক গঠনে যে পার্থক্য—তার মূলে আছে হর্মোনের ক্রিয়া। এই হর্মোনের ক্রিয়াগুণে পুরুষ ও নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, পেশীতে, কণ্ঠস্বরে আকাশ-পাতাল পার্থক্য; নর-নারীর মনের ছাঁচও এই হর্মোনের গুণে স্বতন্ত্র-বিভিন্ন। এই হর্মোনের ক্রিয়ায় একটু অনিয়ম বা অসামঞ্জস্য ঘটিলে নর-নারীর জীবনে বিপর্য্যয় গোলযোগ বাধে। রাসায়নিক আজ রসায়নের সাহায্যে আমাদের দেহে হর্মোনের ক্রিয়ার অসামঞ্জস্য ঘুচাইয়া চকিতে সে-ক্রিয়াকে অব্যাহত ও স্বচ্ছন্দ রাখিতেছে। বাতাস এবং জল হইতে আজ বহুবিধ রোগের ওষধি প্রস্তুত হইতেছে!
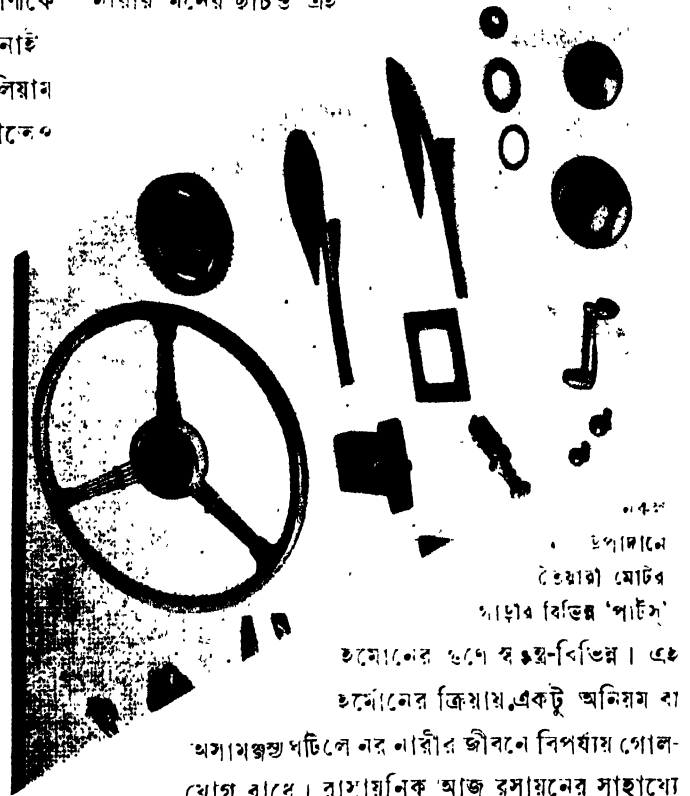
নকল উপাদানে তৈয়ারী মোটর গাড়ীর বিভিন্ন 'পার্টস'

তার পর নূতন যে সব 'প্লাষ্টিক' বা নকল ধাতু-উপাদান তৈয়ারী হইয়াছে, তাহাতে আমাদের সকল অভাব ঘুচিতেছে; কোথাও এতটুকু অসুবিধা ঘটিতেছে না। ষ্ট্রেপটোককাই-বীজাণুর প্রভাবে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া

জীবের জীবন-নাশ হয় ; নব-রসায়ন-সাহায্যে মানুষ আজ এই ষ্ট্রেপটোককাই-বিষ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়া জীবের জীবন-রক্ষার অমোঘ উপায় বিধান করিতেছে। বিষাক্ত গল-ক্ষত, এরিসিপেলাস, পেরিটোনাইটিশ প্রভৃতি রোগ বৈজ্ঞানিকের সাধনায় আজ আর সাংঘাতিক হইতে পারিতেছে না— এ সব রোগ আজ নির্দোষভাবে আরোগ্য হইতেছে। রক্তহীনতায় পূর্ব্বে মানুষকে বাঁচানো অসম্ভব ছিল ; এখন আর অসম্ভব নাই। ক্ষতের বীজাণু-নাশে রসায়ন আজ সর্ব্ব-সার্থকতা লাভ করিয়াছে! ল্যাবরেটরিতে আজ নকল-হর্মোন তৈয়ারী হইতেছে। এই নকল

নকল কাচ—হাতুড়ি মারিলে ভাঙ্গে না!

হর্মোনের গুণে নর-নারীর বহু ব্যাধি আজ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে।

তার পর পুষ্টিকর খাদ্য! ভিটামিনই আমাদের দেহের পুষ্টিসাধন করে এবং অপচয় পরিপূরণ করে। রাসায়নিক আজ বিজ্ঞান-বলে ভিটামিন-যুক্ত খাদ্যসার তৈয়ারী করিতেছেন। এ খাদ্যে যব ধান দুগ্ধ ছানা নাই ; রাসায়নিক নানা উপাদানে এ খাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ খাদ্য-গ্রহণে দেহের অপচয়-রোধ এবং পুষ্টি-সাধন আজ সুনিশ্চিত হইয়াছে। একরাশ ভাত, ডাল, ব্যঞ্জনের বদলে এই সকল খাদ্যের একটি বড়ি গলাধঃকরণ করুন, দেহে জোর পাইবেন, স্বাস্থ্য ভালো থাকিবে।

শিবের অসাধ্য রোগ ক্যান্সার। বৈজ্ঞানিক যে সাধনা করিতেছেন, তাহাতে আশা করা যায়, ক্যান্সার রোগকে অচিরে সৃষ্টিধর মানুষের শক্তির কাছে পরাজয় মানিতে হইবে।

কৃষির শত্রু দুষ্ট কীটকে রাসায়নিক আজ নিমেষে নির্ম্মূল করিতেছেন ; জমিকে আশাতিরিক্ত উর্ব্বর ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। রাসায়নিক মন্ত্রে আজ আধ-টন ওজনের কার্পাস বীজে এক এক গাঁট ভালো তুলা উৎপন্ন হইতেছে। কার্পাস বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া সে-তৈলে সাবান তৈয়ারী হইতেছে ; রন্ধনের উপযোগী তেল, স্যালাড তৈল, নকল-ঘী-মাখন চর্ব্বি তৈয়ারী হইতেছে।

পূর্ব্বে দুষ্ট কীটের অত্যাচারে আমেরিকায় ক্ষেতের ফশল যে-পরিমাণ নষ্ট হইত, হিসাব করিলে তার মূল্য দাঁড়াইত প্রায় ২০০০,০০০,০০০ ডলার! এ দুষ্ট কীট ছিল প্রায় ৩৪ জাতের। তার উপর ফশলে নানা ব্যাধি ঘটিত —সে ব্যাধির জন্য প্রায় ১৫০০০০০০০০ ডলার দামের ফশল নষ্ট হইত। এখন রাসায়নিক প্রতিকার ও প্রতিষেধকের গুণে এ-অপচয়ের মাত্রা প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়াছে। তার উপর জমির উর্ব্বরতা-শক্তি-বর্দ্ধনে রসায়ন যে-সাহায্য করিয়াছে, তার ফলে ফশলের প্রাচুর্য্য যেমন বাড়িয়াছে, তার গুণও তেমনি বাড়িয়াছে (vast improvements in both quantity and quality of yields.)

পূর্ব্বে যে প্লাষ্টিকের কথা বলিয়াছি, সেই প্লাষ্টিক দিয়া ঘটিবাটি, তৈজসপত্র, ব্রাশ, সাবানের বাক্স, আয়নার ফ্রেম,—কি না আজ তৈয়ারী হইতেছে!

বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ সৃষ্টি-ব্যাপারে যে যুগান্তর আনিয়াছে, তাহার ফলে ঘর ও বাহির সর্ব্ব দিক দিয়া শুধু বরণীয়-কমনীয় হইয়াছে, তা নয়, মানুষের জীবনযাত্রাও তাহার ফলে অনেকখানি স্বচ্ছন্দ নিরাময় ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে! অলক্ষ্যে বসিয়া বিধাতা বোধ হয় গর্ব্ব-গৌরব বোধ করিতেছেন যে, তাঁর হাতে গড়া মানুষ শক্তিতে আজ তাঁর সমতুল্য হইয়াছে এবং এ সাধনার সিদ্ধি-স্বরূপ মানুষ এক দিন মৃত্যুকে যদি জয় করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহা বিস্ময়কর হইবে না!

১৫

তিন-চার দিন যে কোথা দিয়া কি করিয়া কাটিল—যমের সঙ্গে সারাক্ষণ যেন যুদ্ধ চলিল! এ ক'দিন বীণা যেন কি হইয়া আছে! ডাকিলে মুখের পানে চায়, কথা কয় না! সে এক কেমন-ধারা মূর্ত্তি! জ্বরের ঝোঁকে কত রকমের কথা বলে! সে-কথায় কখনো ভয়, কখনো সংশয়, কখনো বা অনন্দের তীব্র উচ্ছ্বাস!

তারাচরণ রায় যেন পাগল! ডাক্তারের হাত ধরিয়া কথা বলিতে গিয়া দু'চোখ বাষ্পাকুল হইয়া ওঠে, কণ্ঠে স্বর বাহির হয় না! আবার কখনো নিজের সেই কঠিন আচরণের সবিস্তার কাহিনী বলিয়া শোকে জর্জ্জরিত হইয়া বলেন,—আমার অত-বড় পাপ···তার শাস্তি আমাকে পেতেই হবে! স্নেহকে অস্বীকার করে নিজের স্বার্থ আর অহঙ্কারকে বড় করে ছিলুম···

সকলে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। সান্ত্বনা দিয়া বলে—ভয় নেই! সলিলা সেরে উঠবে···আপনি এত আকুল হবেন না!

কিন্তু তারাচরণ রায় মানুষ! এ-ঘটনায় মানুষ আকুল না হইয়া পারে না!

চার-দিনের দিন। বেলা তখন প্রায় ন'টা, বীণা চোখ মেলিয়া চাহিল। ঘরে ছিল হিরণ্ময় আর প্রতিমা···তারাচরণকে লইয়া কিরণময়ী ছিল পাশের ঘরে। জোর করিয়া তাঁকে এক পেয়ালা চা খাওয়াইবে বলিয়া কিরণ পাশের ঘরে লইয়া গিয়াছিল। বীণা প্রতিমার পানে চাহিল, বলিল—আমি কোথায় আছি?

হিরণ্ময়ী ও প্রতিমা যেন চমকাইয়া গেল! সহজ কণ্ঠে এ যে স্বাভাবিক স্বর! চোখের দৃষ্টিতেও সে আচ্ছন্ন-ভাব নাই···দেখিলে মনে হয়, সুদীর্ঘ নিদ্রার পর বীণা যেন সদ্য জাগিয়া উঠিয়াছে।

প্রতিমা বলিল—তুমি আমাদের বাড়ী আছো। মনে নেই সেই কিরণ, মৃণ্ময়···মোটরে করে সকলে বেড়াতে গিয়েছিলে?

বীণা অবিচল নেত্রে প্রতিমার পানে চাহিয়া রহিল: কোনো জবাব দিল না। অনেকক্ষণ এমনি চাহিয়া রহিল।

প্রতিমা বলিল,—তোমার দাদু এ-বাড়ীতেই আছে··· তাঁকে ডাকবো?

দাদু! বীণার মাথায় এখনো সব কেমন সুস্পষ্ট হইল না! কোথায় যেন অনেকখানি অস্পষ্টতার আবছায়া! বীণা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

হিরণ্ময় বলিল,—কাকাবাবুকে আমি ডাকি···

হিরণ্ময় উঠিয়া পাশের ঘরে গেল।

প্রতিমা বলিল,—এখন ভালো বোধ করছো একটু?

যেন স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করিল, এমনিভাবে বীণা বলিল,—আমার কি-অসুখ করেছে? আমাকে বেঁধে রেখেছে কেন?

প্রতিমা বলিল,—গাড়ীর ধাক্কা লেগে তোমার হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। হাড় জুড়ে ডাক্তার তাই বেঁধে রেখেছেন। ভয় নেই···শীগ্‌গির সেরে উঠবে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বীণার কপালে হাত রাখিয়া প্রতিমা বলিল,—জ্বর বোধ হয় ছাড়ছে···ঘাম হচ্ছে!

কপালের উপর একরাশ বিস্রস্ত কেশ···প্রতিমা সযত্নে সে-কেশগুলিতে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল।

আরাম বোধ করিয়া বীণা চোখ বুজিল।

সহসা কাণের কাছে তারাচরণের কণ্ঠস্বর,—সলিলা···দিদি···

চমকিয়া বীণা চোখ চাহিল। সলিলা

তারাচরণ রায়ের পানে চাহিয়া বীণা কহিল,—কে ডাকছেন?

—তোমাকে ডাকছি দিদি! আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তোমার দাদু…

বীণার চোখে আবার সেই পলক-হীন দৃষ্টি…সে দৃষ্টি তারাচরণের মুখের উপর দৃঢ়-নিবদ্ধ।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কথা কও দিদি…আমাকে দাদু বলে ডাকো!…কেমন আছো, বলো…

বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর মৃদু স্বরে বীণা বলিল,—ভালো আছি।

তারাচরণ রায় আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। বুকের অতল গহনে কোথায় ছিল অশ্রুর সমুদ্র…সে-সমুদ্র হইতে এক-রাশ ঘন বাষ্প ঠেলিয়া একেবারে চোখের পিছনে আসিয়া জমিল।

বীণা আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না…চোখ বুজিল। তারাচরণ রায় হিরণ্ময়ের পানে চাহিলেন।

প্রতিমা বলিল,—চোখ চেয়ে দিব্যি কথা কইলে আমার সঙ্গে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কোথায়? আমি সব বললুম। জ্ঞান হয়েছে, কাকাবাবু! বুঝতে পেরেছে, এ ওর নিজের ঘর নয়, অন্য ঘরে শুয়ে আছে! …আপনি ভাববেন না!

হিরণ্ময় বলিল,—কথা বেশ সহজ! এমন সহজ ভাবে এ ক'দিন একটিবার কথা কয়নি। জ্বরের ঘোরে শুধু যা-তা বকেছে! তা'ছাড়া ঘাম হচ্ছে…জ্বর ছাড়লো এ্যাদ্দিনে।

তারাচরণ রায় কোনো কথা বলিলেন না; সুগভীর একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীণা আবার ঘুমাইয়া পড়িল।…

•

•

ডাক্তার আসিলেন বেলা সাড়ে ন'টায়। দেখিয়া বলিলেন,—ভালোই আছে। এবার ওকে স্পঞ্জ করিয়ে দিন। তা'হলে অনেকখানি আরাম পাবে।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এত ঘুমোচ্ছে কেন?

ডাক্তার বলিলেন,—এ ক'দিন কি ঘুমিয়েছিল? যে ঘুম দেখেছেন, ঘুম নয়! জ্বরের যাতনায় আচ্ছন্ন ছিল! এখন ভিতরের যাতনা কমেছে…এবার সত্য-সত্য ঘুমোবে।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—ঘুমোক্! তা'তে আমি তত উদ্বিগ্ন হবো না…মাঝে মাঝে যদি শুধু সহজভাবে কথা কয়!

ডাক্তার বলিলেন,—কথা কবে। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? দেখবেন'খন, আজই বিকেলে আপনার সঙ্গে রাজ্যের গল্প পেড়ে বসবে।

তারাচরণ রায় কোনো কথা বলিলেন না…

স্পঞ্জিংয়ের পর বীণা আরামে বেশ-খানিকক্ষণ ঘুমাইল। সে ঘুম ভাঙ্গিল বৈকালে।

চোখ চাহিয়া বীণা দেখে, সামনে চেয়ারে বসিয়া উমাঙ্গিনী…তার গায়ে হাত বুলাইতেছে। বীণা চিনিল। বলিল,—পিশিমা!

পরম পরিতৃপ্তি-ভরে উমাঙ্গিনী বলিল,—হ্যাঁ।

বীণা বলিল,—ভালো আছো?

উমাঙ্গিনী কহিল, হ্যাঁ। তুমি কেমন আছো?

বীণা বলিল,—ভালো।…আমাকে তুমি দেখতে এসেছো…আমার অসুখ করেছে, তাই?

উমাঙ্গিনী বলিল,—হ্যাঁ।

বীণা কহিল,—আমার খুব জ্বর হয়েছিল?

উমাঙ্গিনী বলিল,—হ্যাঁ…

বলিয়া বীণার ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিল; দিয়া বলিল,—এখন জ্বর নেই। জ্বর সেরে গেছে।

বীণা কহিল,—হুঁ…

তার পর সে চারিদিকে চাহিল। ঘরে আর কেহ নাই। উমাঙ্গিনী বুঝিল, বলিল,—তোমার দাদু ক'দিন এইখানেই আছেন…কোথাও যদি একটু নড়েন! আজ তাই এঁরা তাঁকে নিয়ে একটু বেরিয়েছেন! আমি একা তোমার কাছে রয়েছি। হিরণবাবুর স্ত্রীও আছেন,… তিনি গা-ধুতে গেছেন।

বীণা শুনিল…

উমাঙ্গিনী বলিল,—এ চার দিন যে করে' কেটেছে যেমন জ্বর, তেমনি তোমার বকুনি!

বীণা শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—বকুনি! কাকে বকেছি পিশিমা?

উমাঙ্গিনী বলিল,—সে-বকুনি নয়…যা-তা কথা বলেছো!

বীণার বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। এ ক'দিন কি

ভাবে কাটিয়াছে জানে না!···কেমন যেন স্বপ্নের আব্‌ছায়ার মতো কি কতকগুলা মনের উপর সারাক্ষণ ভাসিয়া বেড়াইত!

জ্বর ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব কথা মনে পড়িল···নব-কলেবরে এখানে সে আজ নূতন মানুষ···

উষাঙ্গিনী বলিল,—জ্বরের ঘোরে কাল বলছিলে,—বীণা নয়, বীণা নয়,—সলিলা!

শুনিয়া বীণা চমকিয়া উঠিল।

এই ভয়ই ছায়ার মতো মনের উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে! জ্বরের ঘোরে অবসন্ন থাকিলেও মন কেবলি বলিতেছিল, সে যেন অনেক কথা বলিয়াছে! কাঁটার মতো মনের উপর যে দুশ্চিন্তা অহর্নিশি খচ্‌খচ করিতেছে, সে-কাঁটা সকলে যেন দেখিয়াছে! এখন জ্বরের ঘোর কাটিতে মন কেবলি বলিতেছিল, কি যেন হইয়া গিয়াছে! যত-কিছু গোপনতা ছিল, সে-সব গোপনতা যেন প্রকাশ হইয়া গিয়াছে! এখন উষাঙ্গিনীর মুখে যে-কথা শুনিল···মন চকিতে ভয়ে পঙ্গু হইয়া গেল।

উষাঙ্গিনী বলিল,—বীণা কে, সলিলা? কাশীর কোনো মেয়ে, বুঝি?

বীণা বলিল,—কি আমি বলেছিলুম?

উষাঙ্গিনী বলিল,—অনেক কথা বলতে। সব কথা তেমন পষ্ট নয়! তবে ঐ-কথাটা প্রায় বলতে,—না, না, বীণা নয়, বীণা নয়, সলিলা!

একাগ্র মনোযোগে বীণা শুনিল। বুকের উপরে কে যেন একখানা ভারী পাথর চাপাইয়া সেই পাথরে মনকে পিষিয়া দিতে উদ্যত হইল।

উষাঙ্গিনী বলিল,—বীণাকে জানো না?

সভয়ে বীণা কহিল,—জানি।

—কে এ বীণা?···তাকে যেন তোমার কত ভয়! সে-কথা শুনে মনে হয়েছিল!

একটা কম্পিত নিশ্বাস! বীণা বলিল,—বীণা · হাঁ, কাশীতে।

উষাঙ্গিনী বলিল—তার কথা কেন বলতে?

একাগ্র অবিচল দৃষ্টিতে বীণা চাহিয়া রহিল উষাঙ্গিনীর পানে···মুখে কথা নাই!

উষাঙ্গিনী সাগ্রহে তার মুখে-গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

সহসা বীণা ডাকিল,—পিশিমা···

—কি বল্‌ছো সলিলা?

—ও-কথা বলে আমি খুব চেচাতুম?

উষাঙ্গিনী বলিল,—চেচানো নয়। চমকে চমকে উঠতে আর বলতে,—বীণা···বীণা! যেন বীণাকে ডাকছো! আমরা বলতুম, কে,···কে বীণা? বীণা এখানে নেই!···তখন তুমি কেমন চোখে চাইতে আর বলতে, না, বীণা নয়, বীণা নয়···সলিলা!

একটা সুগভীর নিশ্বাস! বীণা বলিল, —এ কথা আরো অনেকে শুনেছে?

উষাঙ্গিনী বলিল,—এ-ঘরে যারা থাকতো, তারা শুনেছে বৈ কি!

বীণা বলিল,—দাদা?

উষাঙ্গিনী বলিল,—শুনেছেন।

বীণা কোনো কথা বলিল না···অসহ্য নিরুপায়তায় বুক ভরিয়া উঠিল · চোখের উপরে দু'-ফোঁটা জল দেখা দিল।

উষাঙ্গিনী বলিল,—বীণা বলে সত্যি কেউ আছে?

বীণা সভয়-দৃষ্টিতে চাহিল; বলিল,—না, না···বীণা তো মরে গেছে। সত্যি, পিশিমা···নয়? বীণা বেঁচে নেই!

উষাঙ্গিনী ভাবিল, হয় তো খেলার সাথী, সহচরী ···মারা গিয়াছে! জ্বরের ঘোরে তাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে! উষাঙ্গিনী কহিল,—না, বীণা নেই! তোমার কোনো ভয় নেই। বীণা তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না··

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা উষাঙ্গিনীর পানে চাহিয়া রহিল, বলিল,—তুমি আমার কাছে থেকো পিশিমা··· এখানে তোমাকেই শুধু আমি চিনি। আর-সকলকে দেখে আমার কেমন ভয় করে! মনে হয় ··

বীণা চুপ করিল।

উষাঙ্গিনী কহিল,—কি মনে হয়?

—যেন কত কি···

উষাঙ্গিনী বলিল,—না সলিলা। কারো সম্বন্ধে কিছু

মনে করো না। এখানে সকলেই তোমাকে ভালোবাসেন। খুব ভালোবাসেন। এখানে সকলের কতখানি আদরের তুমি…বিশেষ তোমার দাদুর…তোমাকে পেয়ে তিনি যেন স্বর্গ পেয়েছেন!

বীণা চক্ষু মুদিল।

১৬

আরো দু'-তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে।

তারাচরণ রায়ের স্নেহ-যত্নে বীণার মনের ভার অনেকখানি হাল্‌কা হইয়াছে। বীণার লেখাপড়ার জন্য বাড়ীতে মাষ্টার রাখা হইয়াছে…গান শিখাইবার জন্য তারাচরণ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন…তার উপর তারাচরণ রায় পাত্রের সন্ধান করিতেছেন। বেশ ভালো পাত্র। তবে ঘটকদের বলিয়া দিয়াছেন, পৌত্রীর বিবাহ দিয়া তিনি জামাতাকে গৃহপোষ্যরূপে না রাখিলেও তাকে বাড়ীর কাছাকাছি রাখিতে চান। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পাইবে এই পৌত্রী এবং পৌত্রীর স্বামী: সুতরাং খুব ধনাঢ্য ঘরের পাত্রে তাঁর রুচি নাই। তিনি চান মানুষের মতো পাত্র—সে-পাত্র তাঁর মন বুঝিয়া চলিবে,—দরদ করিবে—সলিলাকে এখান হইতে উপ্‌ড়াইয়া ছিঁড়িয়া দূরে লইয়া যাইবে না…

সে-দিন গানের মাষ্টার চলিয়া গেলে বীণা একা বসিয়া স্বরলিপির বই দেখিতেছিল, এমন সময় দাক্ষায়ণী আসিয়া দেখা দিলেন। দাক্ষায়ণীর মুখ গম্ভীর। তাঁর সে-মুখ দেখিয়া বীণার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

কোনো রকম ভূমিকা না করিয়াই দাক্ষায়ণী বলিলেন,—মাষ্টার আসে গান শেখাতে, তার কাছে গান শিখবে! তার সঙ্গে অত হাসাহাসি হচ্ছিল কিসের?

হাসাহাসি? ঠিক!

বীণা বলিল,—একটা গানের সুর লইয়া কোন্ গানের মজলিসে গায়কের দলে কত-রকম কসরতি চলিয়াছিল, মাষ্টার মশায় তাহারি গল্প বলিতেছিলেন! সুরের খাতির করিতে গিয়া একটা কথাকে ভাঙ্গিয়া দু'দিকে চালাইয়া গানের যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা শুনিয়া বীণা হাসি চাপিতে পারে নাই! অর্থাৎ গানে কথা ছিল—প্রভু সাধনা মোর তোমার লাগি! সুরের খাতিরে এক জন আসরে বসিয়া গাহিতেছিল, প্রভু সাধনা-মোর তো…তার পর গাহিল, মার লাগি, মার লাগি মার লাগি,—তাই শুনিয়া সে হাসিয়াছিল।

দু'চোখে আক্রোশের আগুন…দাক্ষায়ণী বলিলেন,—এত বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা তো পাওনি—এ-বংশের শিক্ষা! তাই জানো না! না'হলে মাইনের চাকর গানের মাষ্টার—তার সামনে এ-বংশের এত বড় ধাড়ী মেয়ে অমন করে' হাসে! মামা-বাবুর ভীমরতি হয়েছে…নাৎনি পেয়ে এমন মেতে উঠেছেন, এ-সবে নজর নেই!…কিন্তু এ আদেখলো ভাব কাটিলে আস্ত রাখবে না! তাই বলে হুঁশিয়ার করছি বাছা…এ-বংশের আদব-কায়দা বজায় রাখা চাই। জানো তো, নিজের ছেলেকে মামাবাবু ত্যাগ করেছিল…শুধু এই বংশের মান-ইজ্জতের জন্য।

কথা শুনিয়া বীণা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল! মনে পড়িল, ট্রেণে উমাঙ্গিনী বলিয়াছিল এমনি কাহিনী। দাক্ষায়ণীর পুত্রবধূ ঐ বৌদি…বিবাহের নব-বধূ…গোপাল ভাঁড়ের গল্প শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়াছিল বলিয়া তাকে কি কথাই না শুনাইয়া দিয়াছিলেন…

কথা শুনাইয়া মনের অনেকখানি জ্বালা শান্ত করিয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন,—আরো একটা কথা ছিল বাছা…

ভয়ার্ত্ত চোখে দাক্ষায়ণীর পানে চাহিয়া বীণা বলিল,—কি কথা পিশিমা?

পিশিমা বলিলেন,—বিরজার সঙ্গে মেশো না কেন? সেধে সে গল্প করতে আসে, তুমি বই নিয়ে, গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকো। সে এই বাড়ীরই ভাগনী…এ বংশের রক্ত তার দেহে…তাকে এমন অবজ্ঞা করো কিসের দর্পে…বলতে পারো?

বীণার যেমন ভয়, তেমনি বিস্ময়! এ সব কথা কি করিয়া বলেন! বংশের মর্য্যাদা ধরিয়া যাঁর মনে এত গর্ব্ব—তাঁর মুখে এ কি ভাষা! মনের যত বিষ ভাষায় নিঃশেষে এমন ঢালিয়া দেন!…

বীণা কোনো জবাব দিল না; আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—সে তোমার দিদি হয়, এ-কথা মনে রেখো। আমাদের বংশে দেইজীগিরি নেই। ও ভাগনী, আর তুমি তারাচরণ রায়ের পৌত্রী বলে তুমি এ.

রাজ্যের সব, আর ও দাসী বাঁদী—তা যদি মনে করে থাকো, তা'হলে ভারী ভুল করেছো বাছা! এসে ইস্তক অসুখ করে' পড়ে রইলে,—না'হলে এ-বাড়ীর আদব-কায়দাগুলো শেখাতে পারতুম!…ধেড়ে-বয়সে শিখবে কি না জানি না! তবু আমার কর্ত্তব্য করতে হবে তো!

এ-কথার পর দাক্ষায়ণী দেবী এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন না। বীণার মলিন মুখের উপর দু'চোখের রুক্ষ দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। অকারণে এ-সব অপ্রিয় কথা কেন বলিল? সে এ বাড়ীর দাসী-চাকরকে পর্যান্ত সম্মান-সম্ভ্রম করিয়া চলে! অপরে না জানুক, সে তো জানে, এ-বাড়ীতে দাসী-চাকরের যে অধিকারটুকু আছে, তার তাও নাই! আর সে করিবে বিরজাকে অবজ্ঞা-অবহেলা! বিরজা তার কাছে আসে কৈ? যখন সে বই কিম্বা স্বরলিপি লইয়া বসে, তখন হয় তো ক্ষণেকের জন্য আসিয়া দেখা দেয়! বলে, গান শিখছো! বই পড়ছো! এ-কথা বলিয়া কেমন-এক চোখে তার পানে চাহিয়া থাকে, তার পর নিজের খেয়াল-ভরে চলিয়া যায়! ডাকিয়া তাকে বসিতে বলিবে, সে-সাহস বীণার নাই!

সে ভাবে, যে-দুঃখ যে-ঝড়-বিদ্যুতের মাঝে বীণা এত বড় হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারে, এখানে তার এ-আবির্ভাবে দাক্ষায়ণী দেবী বিরক্তিতে জলিয়া আছেন; এবং সে বিরক্তির হেতুও তার অবিদিত নয়! ট্রেণে প্রথম-পরিচয়ের সূচনায় উমাঙ্গিনীর কথায় দাক্ষায়ণী দেবীর সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পাইয়াছিল…

ভাবিল, তাকে কেন্দ্র করিয়া পিশিমার সে আক্রোশ আজ সুস্পষ্ট ভাষায় এই প্রথম সূচিত হইল! এ আক্রোশ এখন নানা-বেশে নানা-রূপে হয় তো উৎসারিত হইবে! দাক্ষায়ণী দেবী ভাবিয়াছেন, এত দিন নির্ব্বিবাদে এখানে বাস করিতেছিলেন, কোথা হইতে পৌত্রী সাজিয়া এ-মেয়েটা আসিয়া উদয় হইল,—তাঁর সব কল্পনা ফাঁশাইয়া চূর্ণ করিয়া দিবে!

একটা নিশ্বাস সে রোধ করিতে পারিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা ভাবিল, কি করিয়া দাক্ষায়ণীকে বুঝাইবে, এ-বাড়ীর ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য করিয়া সে এখানে আসে নাই! এ বাড়ীর কে কোথায় আপন-জন আছে, সে সংবাদ সে জানিত না; জানিবার বাসনা তার মনে কোনো দিন উদয় হয় নাই। যে-ভাবে কাশীতে পড়িয়াছিল,—কল্পনা-নেত্রে সামনে যত দূর চাহিত, দেখিত, অন্ধকার…শুধুই অন্ধকার! থাকিয়া থাকিয়া সে-অন্ধকারে মন কেমন হাঁপাইয়া উঠিত! এমন সময়ে দৈবাৎ তারাচরণের চিঠি গিয়া পৌছিল—স্নেহের সুমধুর আহ্বান! সে-চিঠি পড়িয়া কি যে তার মনে হইয়াছিল! না বুঝিয়া, না ভাবিয়া নিমেষের খেয়ালবশে সে-আহ্বানে সাড়া দিয়া বীণা চিঠি লিখিল। যাহা লিখিয়াছিল, সে-কথা মনে হইলে ভয়ে লজ্জায় ধিক্কারে আজ সে যেন মাটীতে মিশিয়া যাইতে চায়!…

বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যে-অন্ধকারে বাস করিত, সে-অন্ধকার ছাড়িয়া যেখানে বসিয়াছে, এখানে প্রতিক্ষণ ভয়ে চোর হইয়া আছে! চোর সে…সত্য! চোরে মানুষের কি-চুরি করে? টাকা-পয়সা, গহনা, ঘড়ি-চেন! আর সে…?

তারাচরণ রায়ের অগাধ স্নেহ-প্রীতি, মমতা…তাঁর মনের এই সুগভীর পরিতৃপ্তি…বীণাকে লইয়া তারাচরণের এই যে আনন্দ…বীণা তাহাতে মরমে মরিয়া যায়! তারা-চরণ দুঃখ করেন, বলেন—বুঝি দিদি, তোমার মা'র উপর, বাবার উপর যে দুর্ব্যবহার করেছি, তুমি তা ভুলতে পারছো না…তাঁদের কথা মনে করে আমার এ-স্নেহে তোমার মনে ঘৃণা হয়…

এ কথায় বীণার দু'চোখ জলে ভরিয়া আসে! সে বলিতে পারে না—না, না, তা নয়! এ-কুণ্ঠা…তার মনে কতখানি গ্লানি…তোমার সঙ্গে কতখানি কি হীন প্রবঞ্চনা বীণা করিয়াছে! তুমি তার কোনো অনিষ্ট করো নাই, তবু বীণা তোমাকে লইয়া এ ছলনা করিতে কেন আসিল…

থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যাই…ঐ পথে…দু'চোখের দৃষ্টি যে-দিকে তাকে লইয়া যায়! এ গৃহে এত স্নেহ, এত আদর…তার বুকে যে-ব্যথা বাজে, সে-ব্যথা কে বুঝিবে? কাহাকে সে বুঝাইয়া বলিবে?

এখন বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতেছিল…দুপ্-দাপ

শব্দে কিরণ্ময়ী আসিয়া উপস্থিত। কিরণ্ময়ী বলিল,—চুপ ক'রে বসে আছো যে সলিল!

ম্লান দু'টি চোখ তুলিয়া বীণা চাহিল, বলিল,—হ্যাঁ···

কিরণ্ময়ী বলিল,—দাদু কোথায়? দেখলুম না তো! বেরিয়েছেন বুঝি?

বীণা বলিল,—হ্যাঁ।

কিরণ্ময়ী বলিল,—বুঝেছি। বাড়ী থাকলে এখানে বসে তোমার গান শুনতেন···তা, আমি এসেছি একটা কাজে···

বীণা নিরুত্তরে কিরণ্ময়ীর পানে চাহিয়া রহিল।

কিরণ্ময়ী বলিল,—দাদার জন্মে একটি কনে দেখতে যাচ্ছি। মেয়েকে তাঁরা আনবেন ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে মাঠে। আমি আর মা যাচ্ছি। মা বললে, সলিলকে নিয়ে আয় রে! তাকেও নিয়ে যাবো···একসঙ্গে মেয়ে দেখবো। তা ভয় নেই, ভাই···এবারে দাদা গাড়ী চালাবে না। ড্রাইভার গাড়ী চালাবে। ধাক্কা লাগবে না!

কথাটা বলিয়া কিরণ্ময়ী হাসিল। তার পর বলিল,—তুমি ওঠো, তৈরী হয়ে নাও। তৈরী মানে, বেনারসী পরতে হবে না। আমাদের কেউ কনে দেখতে আসবে না···আমরা যাচ্ছি কনে দেখতে···

বীণা বলিল,—কিন্তু দাদু তো বাড়ী নেই!

কিরণ্ময়ী বলিল,—অনুমতি? ও! সে আমি ঠিক ক'রে নেবো। এখন যিনি বাড়ীর চার্জ্জে আছেন, পিশিমা···তাঁকে বলে' যাবো। তার পর একখানা চিঠি লিখে রেখে যাবো দাদুর নামে। আমার আবদার দাদু কোনো দিন নামঞ্জুর করেননি, কোনো দিন নামঞ্জুর করবেন না। সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

বীণা আপত্তি তুলিল না। মনটা যা হইয়া আছে,···বাহির হইতে পারিলে যেন বাঁচে!

বীণাকে লইয়া কিরণ্ময়ী বাড়ী আসিল। এবং সেখান হইতে ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়াল···

১৭

মেয়েটি দেখিতে বেশ!

কিরণ বলিল,—বৌদি বলে' ডাকতে পারবো···না সলিল?

মৃদু হাসিয়া বীণা বলিল,—হ্যাঁ।

কিরণ বলিল,—তোমার নাম কি ভাই, বৌদি?

মেয়েটি বলিল,—আমার নাম নন্দরাণী।

কিরণ বলিল,—সত্যি?···বেশ নাম। আজকাল যে সব নাম রাখা হয়···নাম শুনে আমাদের মতো মানুষ বলে' মনে হয় না। মনে হয়, যেন নভেল থেকে নায়িকা বেরিয়ে আসছে! নন্দরাণী বেশ নাম। আমার নাম কিরণ···আমি হলুম তোমার বাঘিনী ননদিনী···আমার সঙ্গে তোমাকে বাস করতে হবে···কত বাক্য-যাতনা সইতে হবে · কত গঞ্জনা দেবো! আর·এ হলো সলিল···এও তোমার ননদ। তবে ভালো ননদ। ও মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসবে, আদর করবে, মিষ্টি কথা কইবে···বুঝলে···আমাদের দু'টিকে চিনে রাখো। এক জন তোমার লক্ষ্মী-সরস্বতী, আর এক জন দুষ্টু-সরস্বতী!

নন্দরাণী হাসিল; কোনো কথা বলিল না।

প্রতিমা এ-দল হইতে একটু দূরে বসিয়া নন্দরাণীর মা'র সঙ্গে, পিশিমার সঙ্গে গল্প করিতেছিল।

কিরণ বলিল,—তুমি গান গাইতে পারো বৌদি···নিশ্চয়?

নন্দরাণী বলিল,—শিখছি···

কিরণ বলিল,—গান তো আমরা সকলেই শিখি···মা-বাবা ছাড়ে না, কাজেই! কিন্তু গাইতে পারে ক'জন, বলো? শুনেছি, তুমি রেডিয়োতে মাঝে মাঝে গান গাও। আগে জানতুম না তো তুমি বৌদি হবে! জানলে···শুনতুম। বাড়ীতে রেডিয়ো আছে—সে শুধু ফ্যাশনের খাতিরে! না থাকলে লোকে নিন্দা করবে তাই। নাহ'লে রেডিয়োয় যা-সব প্রোগ্রাম হয়···সত্যি ভাই বৌদি, রেডিয়ো খুলতে আমার ভয় হয়!

নন্দরাণী বলিল,—ভালোই করো! নাহ'লে আমার গান শুনে রেডিয়োর উপর রাগ আরো বাড়তো!

কিরণ বলিল,—কখ্‌খনো না। তোমার গান শুনতে তোমার প্রোগ্রামের সময় রেডিয়ো খুলে বসতুম বৌদির গান!

বীণার খুব ভালো লাগিতেছিল এই সহজ সরল কথাবার্ত্তা।

বীণা বলিল,—রেডিয়োয় যা হতো, তা নিয়ে তব

ক'রে কোনো লাভ নেই তো! তার চেয়ে গান শুনতে যদি চাও কিরণ-দি…

কিরণ বলিল,—সত্যি…গাও ভাই বৌদি। গিয়ে দাদাকে রিপোর্ট যা দেবো, দাদা চমৎকৃত হয়ে যাবে। সেই ফাঁকে দাদার কাছ থেকে কিছু আদায় করাও চলবে! কি বলো সলিল?

বীণা বলিল,—হুঁ!

কিরণ বলিল,—গাও…

নন্দরাণী বলিল,—লজ্জা করছে…ভারী তো আমি গাই!

কিরণ বলিল,—হাল্‌কা গানই গাও। কে তোমার ভারী গান শুনতে চায়! ভারী গান মানে তো সেই রাগিণী ভাঁজা! সে তাই পণ্ডিতের দল রাগিণী নিয়ে ভাম্বেল ভাঁজুন্! আমরা শুনতে চাই গান…যে-গান শুনে আরাম পাবো, যে গান কাণে ভালো লাগবে!…

কুণ্ঠিত স্বরে নন্দরাণী বলিল,—ওঁরা রয়েছেন…

হাসিয়া কিরণ বলিল,—ওঁরা গানের উপর চটা, এ-ধারণা তোমার মনে হলো কি ক'রে?…কোনো ভয় নেই …মা গান ভালোবাসে খুব…মা নিজে গান গায়… এখনো…জানলে!

নন্দরাণী নিস্তার পাইল না। তাকে গান গাহিতে হইল।

নন্দরাণী গাহিল—

> কেন বাজাও কাঁকণ কণ-কণ কত ছল-ভরে!
> ওগো ঘরে ফিরে চলো কনক-কলসে জল ভ'রে!…

গান শেষ হইলে নন্দরাণী বলিল,—এবারে তোমাদের গান শুনবো…তোমরা গাও।

কিরণ বলিল,—তোমার ও-গলা শুনে আমার গলা কাণ-মলা খাবে ভাই বৌদি। সলিলকে জিজ্ঞাসা করো, ও কখনো শুনেছে আমার গান?‥আমি সত্যি গান গাইতে পারি না। সলিল গান গাইবে। ও গান শিখছে ভালো লোকের কাছে। গাও তো সলিল…

লজ্জায় সঙ্কোচে বীণা এতটুকু হইয়া গেল! বীণা বলিল,—আগে গান শিখি, তার পর গেয়ে শোনাবো… সত্যি, শোনাবো। আমার গান শোনার চেয়ে চলো ভাই, একটু বেড়াই…এ-জায়গা আমার এত ভালো লাগছে!—কখনো মাঠে আসিনি তো…

কিরণ বলিল,—এ-মাঠটি আমার খুব ভালো লাগে ফাঁকা ফর্দা…তাই তো আজ যখন বৌদিকে কোথায় দেখবো এ নিয়ে কথা উঠলো, আমি বললুম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চলো, মা। আমার কথাতেই এ-মাঠ ঠিক হয়েছে!

নন্দরাণী চাহিল বীণার পানে, বলিল,—তুমি কাশীতে থাকতে?

বীণার বুকে চমক! কাশীর কথা কেন?

বীণা বলিল—হ্যাঁ।

কিরণ বলিল,—ওর ইতিহাস যদি শোনো বৌদি, রীতিমত রোমান্স! কত ঝড়-জল ওর মাথার-উপর দিয়ে বয়ে গেছে…আহা, বেচারী! ওর কথা যখন ভাবি, এত দুঃখ হয়!…সন্তোষ কাকার মেয়ে। খুব ছোটবেলায় সন্তোষ কাকাকে দেখেছি। কি চমৎকার মানুষ ছিলেন! আমাকে কত সন্দেশ, কত পুতুল-খেলনা দিতেন! আজো সে পুতুল আমার আছে। চমৎকার মেয়ে সলিল …কিন্তু আমার সঙ্গে ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-দাগে ওকে দেগে দিয়েছি, এ-জন্মে ও আর আমাকে ভুলতে পারবে না…শত চেষ্টা করলেও নয়!

দু'চোখে কুতূহলী দৃষ্টি লইয়া নন্দরাণী চাহিল কিরণের পানে, তার পর বীণার পানে।

কিরণ বলিল,—সকলে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম মোটরে চড়ে। দাদা মানে, তোমার বর গাড়ী চালাচ্ছিল… এক সাহেবের গাড়ীর সঙ্গে দিলে আমাদের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়ে…গাড়ী উল্টে গেল। সবাই ছোট্‌খাট চোট খেয়ে সে-যাত্রা ম্বরে গেলুম। সলিলের গেল কলার-বোন্ ভেঙ্গে! উঃ, সে কি-দিন যে গেছে…

নন্দরাণী শুনিল…বীণার পানে চাহিয়া সে বলিল,—কাশীতে কোথায় তোমরা থাকতে?

আবার কাশী!

কোনো মতে ঢোঁক গিলিয়া বীণা বলিল,—কোদাই-চৌকি।

নন্দরাণী বলিল—আমার এক খুড়ীমা থাকেন কাশীতে। কাশীতে আমি দু'বার গিয়েছি। তাঁর বাড়ীতেই

থেকেছি। খুড়ীমা থাকেন গোধুলিয়ায়। কোদাইচৌকির নাম শুনেছি। একা চড়ে' একা আমি কি ঘোরা ঘুরতুম! সকলে ঠাট্টা করতো, বলতো, বর্গী এসেছিস যেন।

কথাটা বলিয়া নন্দরাণী হাসিল।

কিরণ বলিল,—ও…দৌরাত্ম্যপনা তাহ'লে জানো! তোমার সঙ্গে আমার খুব বনবে ভাই বৌদি…আমিও কম হুড়ে নই।…মা বলে, মেয়ে না হ'য়ে ছেলে হ'লে তোকে মানাতো! সত্যি,—দাদা…মানে, তোমার বর খুব শান্ত-শিষ্ট। আমি কিন্তু…যাকে বলে দজ্জাল মেয়ে!

হাসিয়া বীণা বলিল,—আমি কিন্তু সে পরিচয় পাইনি। এ্যাদ্দিন এসেছি…

হাসিয়া কিরণ বলিল,—বোনের সঙ্গে দজ্জালপনা কি করবো, বলো?

প্রতিমা ডাকিল,—কিরণ…

কিরণ বলিল,—মা…

প্রতিমা বলিল,—শুধু বসে বসে গল্প করছিস ক'জনে! গাড়ীতে চকোলেট, কেক, লেবু, আপেল—এ-সব আনলি কেন? সেগুলোয় মাঠের হাওয়া লাগাবি বলে?

কিরণ বলিল,—তোমার বৌ এমন গুণ করেছে যে, সে কথা ভুলে গেছি মা…সত্যি! বৌ করছো বটে, কিন্তু এ মেয়ে যাদু জানে। যাদুকরী…বুঝলে! ভয় হচ্ছে, মায়ের স্নেহে শেষে বঞ্চিত না হই!

নন্দরাণীর মা হাসিলেন, বলিলেন,—বালাই! তা'ছাড়া তুমি যেখানকার স্নেহের সামগ্রী, সেখানে গিয়ে সব স্নেহ লুটে নেবে মা…হ'লেই বা মায়ের স্নেহে বঞ্চিত!

প্রতিমা বলিল,—যা, যা, গাড়ী থেকে সেগুলো আন্। এনে তিন জনে মিলে-মিশে খা। গাড়ী করে' সে সব আর বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না, বাছা…

কিরণ চাহিল নন্দর আর বীণার পানে, বলিল,—তোমরা বসে গল্প করো ভাই, আমি ফলটলগুলো নিয়ে আসি।

নন্দরাণী বলিল,—আমরাও যদি সঙ্গে যাই, আপত্তি আছে?

দু'চোখ কপালে তুলিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গী নকল করিয়া কিরণ বলিল,—খুব আপত্তি আছে। দেখে ড্রাইভার কি ভাববে! ভাববে, ওমা, বৌ হ'তে না হ'তে এতখানি গিন্নীপনা…

হাসিয়া নন্দরাণী বলিল,—গিন্নীপনা করবো না…সত্যি বলছি ভাই। শুধু সঙ্গে যাবো আর সঙ্গে ফিরে আসবো। ফলটল যা আনতে হয়, তুমিই এনো…

—ও…তাহ'লে এসো। বুঝেছি। ভাবছো, আনতে আনতে ক্রীম-চকোলেটগুলো যদি আগে-ভাগে খেয়ে ফেলি!

হাস্য-পরিহাসে তুফান তুলিয়া তিন জনে আসিল মেমোরিয়াল-গ্রাউণ্ডসের বাহিরে…

পথে গাড়ী। কিরণ গেল খাবার আনিতে…

নন্দরাণী আর বীণা ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল… নন্দরাণী বলিল,—কত দূর পর্য্যন্ত…কি চমৎকার দেখাচ্ছে!

বীণা বলিল,—হ্যাঁ…

বিমুগ্ধ নয়নে বীণা চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। ঝাউগাছের পিছনে বহু দূরে ঐ সব জাহাজের মাস্তুল…ঘোড়দৌড়ের মাঠ…ও-দিকে বহু দূরে ঐ অক্টার্লনি মনুমেণ্ট…চলন্ত গাড়ীর অবিরাম-গম্ভীর ধ্বনি…

হঠাৎ চোখ পড়িল একটু দূরে…পথের ও-ধারে একটা বেঞ্চে…

ঠ্যালাগাড়ী লইয়া একটা লোক হ্যাপি-বয় বিক্রয় করিতেছে এবং বেঞ্চে বসিয়া আর-একটি লোক সে হ্যাপি-বয় কিনিতেছে! লোকটার চেহারা…

তার মুখের পানে চাহিবামাত্র বীণার মাথায় যেন বাজ পড়িল! সর্ব্বনাশ! এ যে শ্রীপতি!

মাথা ঝিম-ঝিম করিয়া উঠিল। বীণা তাড়াতাড়ি ফিরিল…বলিল,—আমার বড্ড মাথা ধরেছে…হঠাৎ! আমি এগুই ভাই…

নন্দরাণী বলিল,—চলো, আমি সঙ্গে যাই। কিরণ তো ঐ আসছে।

ফিরিয়া দু'জনে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া আসিল… বীণার বুকের কাঁপন থামিতে চায় না!

চকিতের জন্য দাঁড়াইয়া বীণা চাহিল সেই বেঞ্চের দিকে। শ্রীপতি এ-দিকে দেখে নাই, হ্যাপি-বয় লইয়া পরমানন্দে কাঠি চুষিতেছে! [ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

নমনীয়-কমনীয়

চেহারা না খারাপ হয়, অর্থাৎ দেহ বর্ত্তুল-স্থূল না হয়, হাত-পা কাঠের মতো কঠিন না হয়—এ-দিকে মেয়ে-জাতের যে-অনুরাগ, তাহা একান্ত সহজাত। এ বৃত্তির মূলে বিধাতার জীব-সৃষ্টির ইঙ্গিত আছে!

কিন্তু সে-আলোচনার প্রয়োজন নাই।

নাচ দেখিতে গিয়া যখন দেখি, বিদেশিনী নর্ত্তকীর হাত-পা পল্লবিনী লতার মতো নমনীয়, যে-দিকে যেমন-খুশী তুলিতেছে, নামাইতেছে, বাঁকাইতেছে, তখন দেহের সে অনায়াস ছন্দ-লীলায় মন বিমুগ্ধ হয়!

মেয়েদের দেহকে ভগবান খুব কোমল করিয়াই গড়িয়াছেন। সে কোমলতা রাখিতে যত্ন নাই বলিয়াই যৌবনের মায়া-পরশে মেয়েদের দেহ কমনীয় হইতে না হইতে কঠিন, বিশ্রী হইয়া ওঠে! দেহকে নমনীয় রাখিতে হইলে স্বাস্থ্য ভালো রাখা চাই। দেহের এ-নমনীয়তাকে ইংরেজীতে বলে suppleness. নারীর দেহ supple বা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো হওয়া চাই—পেলব কোমল তনু-লতাতেই নারীর গৌরব।

মেয়েদের মধ্যে কাহাকেও দেখি খুব চটপটে,—গতিভঙ্গী যেন নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গিমার মতো! আবার কাহাকেও দেখি তন্দ্রালস-ভরে অবসাদে জর্জ্জরিত! তন্দ্রালসার দেহ পিণ্ডবৎ হইয়া ওঠে। সে-দেহে শ্রী-ছাঁদ থাকে না!

দেহকে যিনি নমনীয় রাখিতে পারেন, তাঁর দেহেই কমনীয়তা বিরাজ করে। যে-দেহ নমনীয়, সে-দেহের কোনো গ্রন্থি পঙ্গু হয় না। কঠিন হয় না; সে-দেহ-ধারিণী নারী সুস্থ সবল থাকেন; তাঁর দেহ সচল সলীল সক্রিয় থাকে; সে-দেহে ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। দেহে রক্ত-চলাচলের ক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে সে-দেহ নমনীয় থাকিবে। সে-দেহে ক্লেদ বা মেদ জমিতে পারে না এবং তার ফলে দেহের শ্রী-ছাঁদ কোনো দিন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মচকাইয়া বিশ্রী হইতে পারে না!

নাচে দেহের নমনীয়তা, সেই সঙ্গে যৌবনশ্রীকে ধরিয়া রাখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে নাচের নামে জয়-রব উঠিলেও বহু পরিবার নাচের চলনকে আমোল দিবেন না, জানি। কাজেই দেহের নমনীয়তা এবং সেই সঙ্গে যৌবনের শ্রী-ছাঁদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বিশিষ্ট ব্যায়াম-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। আজ আমরা সেই ব্যায়াম-প্রণালীর কথা বলিতেছি।

বসিবার বিচিত্র ও বিশিষ্ট ভঙ্গীর উপর এ-ব্যায়াম নির্ভর করিতেছে। এ ব্যায়ামের জন্য চাই একখানি চেয়ার।

চেয়ারে আরাম করিয়া বসুন। বসিয়া দুই পা এক-সঙ্গে সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া দিন। দুই গোড়ালিতে-গোড়ালিতে ঠেকিয়া থাকিবে। পিঠ সিধা খাড়া করিয়া দু' মিনিট বসিয়া থাকুন। তার পর পা দু'খানি টানিয়া আবার সরাইয়া আনুন। পা সরাইয়া দু' পায়ের গোড়ালিতে-গোড়ালিতে মিশাইয়া আবার দু' মিনিট চুপচাপ বসিয়া থাকুন; তার পর পূর্ব্বের মতো আবার দুই পা সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া দিন। এমনি ভাবে পাঁচ-ছয় বার একবার সামনে পা প্রসারিত করুন, আবার পরক্ষণে দু' পা নিজের দিকে টানিয়া আনুন। অভ্যাস হইলে এ ব্যায়ামের পর্য্যায়-মাত্রা বাড়াইয়া বিশ-পঁচিশ বার করিবেন।

তার পর চেয়ারের সামনের দিকে একেবারে ধার

ঘেঁষিয়া আলতো-ভাবে চেয়ারে বসুন। বসিয়া শুধু দু' পায়ের গোড়ালিটুকু মাত্র দিয়া মেঝে স্পর্শ করিয়া থাকুন। এ সময়ে দু' হাঁটু সিধা থাকিবে, বাঁকিবে না। সামনের দিকে দেহ একটু হেলাইয়া ডান হাতের চেটো পাতিয়া মেঝে স্পর্শ করুন,—এ সময়ে বাঁ হাত সিধাভাবে উর্দ্ধে তুলুন। আধ-মিনিটকাল এমনি ভাবে অবস্থান করিয়া ডান হাত উর্দ্ধে তুলিয়া বাঁ কর-তল পাতিয়া মেঝেয় রাখুন। এই ভাবে একবার বাঁ হাত তুলিয়া ডান কর-তল, পরক্ষণে ডান হাত তুলিয়া বাঁ কর-তল মেঝেয় পাতিবেন ছ'বার।

তার পর চেয়ার হইতে একটু দূরে মেঝেয় বসুন; বসিয়া দুই হাতের উপর ভর রাখিয়া দেহের উপরার্দ্ধ-ভাগ মেঝে হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া দুই পা প্রসারিত
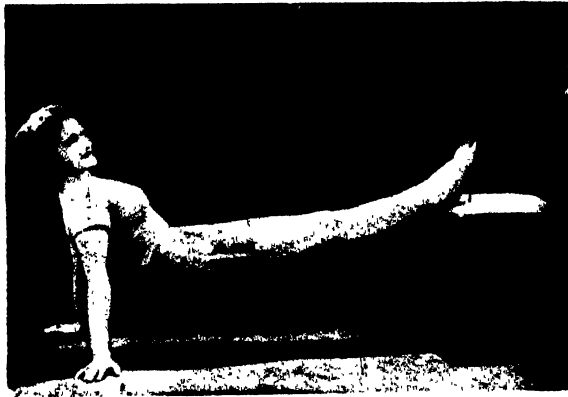
১। দুই হাতে ভর

করিয়া দু' পায়ের গোড়ালি চেয়ারের উপর তুলুন। একেবারে চেয়ারের প্রান্তদেশে (১নং ছবি দেখুন) পা রাখিবেন; তার পর ডান পা উর্দ্ধে সিধা ভাবে তুলুন (২নং ছবির ভঙ্গীতে)। ডান পা পূর্ব্ববৎ পায়ের প্রান্তে সংলগ্ন থাকিবে। তার পর বাঁ পা নামাইয়া ডান পা উর্দ্ধে তুলিতে হইবে। এ ব্যায়াম পর্য্যায়ক্রমে আট বার করিবেন।

এবারে ৩নং ছবির ভঙ্গীতে চেয়ারে বসুন। দু' হাতে চেয়ারের পিঠ ধরিয়া ৩নং ছবির ভঙ্গী মাফিক দু' পায়ের গোড়ালিমাত্র দিয়া ভূমি স্পর্শ করিয়া পিঠ খাড়া রাখিয়া শুধু গ্রীবা হইতে মাথা পর্য্যন্ত পিছন দিকে হেলাইতে হইবে। মাথা এমনি হেলাইয়া রাখিয়া এক হইতে দশ

২। ডান পা সিধে তুলুন

পর্য্যন্ত গণিবেন। গণা শেষ হইলে ধীরে-ধীরে মাথা খাড়া করিবেন; করিয়া এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণিয়া

৩। চেয়ারের পিঠ ধরিয়া

আবার পূর্ব্বের প্রথায় মাথা নামাইতে হইবে। এ ব্যায়াম আট-দশ বার করা চাই।

তার পর চেয়ারের সামনে দাঁড়ান,—দাঁড়াইয়া

দু' হাতে চেয়ারের পিঠ ধরিয়া ৪নং ছবির ভঙ্গীতে বাঁ পা পিছনে প্রসারিত করিয়া হাঁটুর কাছে মুড়িয়া ডান পা চেয়ারের উপর তুলুন। বাঁ পা যেন সিধা থাকে; এবং বাঁ

৪। বাঁ পা পিছনে

পায়ের আঙুলের ডগা ট্যারচাভাবে মেঝে ছুঁইয়া থাকিবে। এই ভাবে থাকিয়া এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণনা করিয়া ডান পা সরাইয়া বাঁ পা ঠিক এমনিভাবে চেয়ারের উপর রাখিয়া এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণিবেন। এ ব্যায়ামও আট-দশ বার করা চাই।

তার পর আবার চেয়ারে বসুন। পিঠ ঠাশিয়া পিঠ ও মাথা সিধা খাড়া রাখিয়া বসুন। বসিয়া দুই পা সামনে ৫নং ছবির ভঙ্গীতে প্রসারিত করিয়া দিন। দু' পা একবার প্রসারিত করিয়া সরাইবেন, পরক্ষণে আবার পায়ে পায়ে

৫। দুই পা সামনে

সংলগ্ন করিবেন। এ-ব্যায়ামের সময় দু' পা বরাবর প্রসারিত রাখিতে হইবে। দশ বার এ ব্যায়াম করা চাই।

এ ব্যায়ামে দেহ কোনো দিন মেদ-মাংসে জর্জ্জরিত হইবে না; কাঠের মতো কঠিন হইবে না; পল্লবিনী লতার মতো পেলব-কোমল থাকিবে; তার নমনীয়তা এবং কমনীয়তাও চিরদিন অটুট থাকিবে।

সহজসাধ্য

প্রাণ যদি ব্যথা পায় করা যায় দান,
মন পেলে কারও মন গড়া যায় গান;

বাধা যদি পড়ে বাঁধা হৃদয়ের প্রেমে—
দেখা যায় জগতের মাঝখানে নেমে।
ভাষা দিয়ে ভালবাসা কতটুকু আসে,
কাছে এলে প্রিয়জন নয়নে তা ভাসে।
বুকে যদি থাকে বল আঁধারে কি ভয়?
কাঁটা-পথে হাঁটা, তাও চরণেতে সয়।

আপনার ভুল-খোঁজা যদি হয় সারা,
আপনি তো ভেঙে যায় কামনার কারা।
কাছে যদি থাকে তীর বোঝা হ'ক ভারী,
সাগরের ঢেউ বুঝি তরী দেয় পাড়ি।
জীবনের অবকাশ যদি ভরে সুখে—
হাসিতে মিলায় হাসি, মরণ-সমুখে।

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

গল্পদাদুর বৈঠক

এ-দিন গল্পদাদুর বৈঠক বসিতেই রমা তার চোখের কালো কালো ভুরু হু'টি কপালে তুলিয়া বলিল,—আমরাও ভারি মুস্কিলে প'ড়েছি দাদু, আপনার তোতা-রাজাকে নিয়ে—

মীনা খপ. করিয়া বলিল,—সত্যি দাদু, ভারি মন কেমন করে আমাদের ঐ তোতা-রাজার জন্তে, আহা বেচারী—

দাদু হাসিয়া বলিলেন,—তোতার লীলা ত সাঙ্গ হয়েছে মীনা, এখন ত তিনি হীরেমন—

রমা অমনি দাদুর দিকে চাহিয়া বলিল,—লীলা সাঙ্গ হ'লেও তার দেহখানা এখনো ব্যাধের খাঁচায় কাত হ'য়ে প'ড়ে আছে যে! আর ব্যাধের পো মরা তোতাকে বেচবার জন্তে আর এক কাণ্ড বাধিয়ে ব'সেছে—মনে নেই?

এক-মুখ হাসিয়া গড়গড়ার তামাকের সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে দাদু বলিলেন,—মনে রাখবার ক্ষমতাটুকু না থাকলে কি গল্প-দাদু হ'তে পারতুম দিদি? যাক্—আমার গল্পের শেষের দিকটা এবার বলি শোন।

গল্পদাদু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

রাজকন্তা সে-দিন রাজা দীপঙ্করের মনের খবরটুকু ভালো ক'রে জানবার জন্তেই তাঁর মহলে এসেছিলেন, আর প্রতি কথাটির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখের পানে খর দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল, রাজার অমন সুন্দর মুখখানা যেন কি রকম হ'য়ে গেছে!' আগে তাঁর মুখ দিয়ে কেমন একটা উজ্জল আভা ফুটে বেরুতো, তার প্রভায় সারা দেহখানা যেন ঝল-মল করতো; এখন কিন্তু তার কোন চিহ্নই নেই! চোখ দু'টোও যেন কেমন-কেমন ঠেকছে; তার কোলে প'ড়েছে কালি, পাতাগুলো জড়িয়ে আছে, ধনুকের মত বাঁকানো অমন যে সুন্দর দু'টি ভুরু, একটুও স্থির নয়, ক্রমাগতই কুঁচকে উঠায় সুন্দর মুখখানাও বিশ্রী দেখাচ্ছে। রাজার মুখের এই অবস্থাটুক দেখেই বুদ্ধিমতী রাজকন্তা বুঝলেন যে, রাজার মনের ভেতর কি একটা গোল বেধেছে। তিনি জানতেন, মানুষের মনের ব্যায়রাম মুখ দেখেই ধরা যায়; মন খারাপ হলে মুখ কখনো ভালো থাকতে পারে না। রাজকন্তা মনে মনে ভাবছিলেন, রাজার মনের রোগটি কি ক'রে তিনি ধরবেন, কেমন ক'রে কথাটা পাড়বেন,—এমন সময় হীরে-মনকে নিয়ে সেই ঘরে এলেন পক্ষিরাণী। পাখী পেয়ে আর তার মুখে 'রাজকন্তা' বুলি শুনে রাজকন্তা গেলেন সব ভুলে; তখন তাঁর মনে কি আহ্লাদ! কিন্তু পাখীটা যেই রাজাকে দেখে 'ফন্দীবাজ' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো',—রাজকন্তাও তখুনি আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে গেলেন; সন্দেহের দৃষ্টিতে রাজার মুখের পানে চাইতেই দেখলেন—সুন্দর মুখখানা তাঁর যেন কালো হ'য়ে গেছে! এর পরেই খাজাঞ্চিখানা থেকে ছোট একটি ছেলে এসে মরা তোতার খবর দিতেই, রাজকন্তা অবাক হয়ে দেখলেন—এবার তাঁর মুখখান' মরা-মানুষের মুখের মতই ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে! রাজকন্তার মনের আহ্লাদ মনেই মিশে গেল; তিনি বুঝলেন—পেছনে একটা মস্ত রহস্য চাপা আছে, তাকেই এর কিনারা করতে হবে। মরা পাখীটির জন্তে ব্যাধকে টাকা দেওয়া হবে কি না—রাজার মুখের এই হুকুমটি নিতে খাজাঞ্চিখানার ছোকরা চাকরটি তাঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু রাজার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুবার আগেই রাজকন্তা ছেলেটির পানে চেয়ে বললেন,—খাজাঞ্চি মশায়কে বল গে, রাজা জ্যান্ত তোতাই চেয়েছেন, তার জন্তেই দাম দেওয়া হবে। মরা তোতার জন্তে ত ঢেঁড়া দেওয়া হয়-নি। এ-গেলো রাজার কথা। এখন আমাদের কথা হচ্ছে—এ রাজ্যে কারুর পাখী মারবার এক্তিয়ার নেই; মারলেই তাকে শাস্তি নিতে হবে। পক্ষীপুরের সওদাগরের সঙ্গে আমাদের এই রকম সর্ত আছে। মরা পাখী নিয়ে যে ব্যাধ এসেছে, পাখীশুদ্ধ তাকে আটক করে রাখো। আমি এই পক্ষীরাণীকে নিয়ে তার বিচার করবো। খাজাঞ্চিকে এই কথা বলগে।

হুকুম পেয়েই ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে গেল। রাজার দেহধারী পেটেল উপরি উপরি দু'টো ব্যাপারে যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাজকন্তার এই হুকুমটা শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—ওকে ডাকুন ডাকুন, হুকুমটা পালটাতে হবে।

রাজকন্তা মুখখানা শক্ত ক'রে বললেন,—আমার হুকুম কোন-দিন পালটায়নি, এ-ও পালটাবে না। কিন্তু হুকুমটায় আপনার আপত্তি কেন বলবেন?

রাজা পেটেল আমতা আমতা ক'রে জানাল,—কি দরকার বলুন ত এ সব হাঙ্গামার, তুচ্ছ একটা পাখী নিয়ে? বরং ওকে ডেকে ব'লে দিন—কিছু দিয়ে ব্যাধটাকে বিদেয় ক'রতে।

রাজকন্তা বললেন, বেশ, তাই হবে। কিছু টাকা না হয় ওকে দেওয়াই যাবে, কিন্তু পাখীটা কি ক'রে মরলো, আর মরা পাখী কেন আনলো, এটাও জানতে হবে বৈ কি। এতে ত আর আপনার কোন আপত্তি নেই?

রাজা-পেটেল একটু চুপ ক'রে মুখখানা বেঁকিয়ে বললে, না, আপত্তি আর কি! তবে আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে, রাজকন্তা, যদি দেন ত বলি।

রাজকন্তা একটু হেসে বললে, কথাটা না শুনে কি ক'রে বলি

বলুন? ধরুন, পক্ষিরাণী আপনার কাছে এসেছেন, আপনি যদি এঁকেই চেয়ে বসেন, আমি কি দিতে পারি?

রাজকন্যার কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন, পক্ষিরাণীর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো লজ্জায়; রাজকন্যার দিকে চেয়ে চাপা-গলায় তিনি বললেন, আপনি ত দেখছি ভারি দুষ্টু!

রাজা-পেটেল বললে, ভয় নেই, আপনার পক্ষিরাণীকে আমি চাইব না, আমি চাই তাঁর ঐ পাখীটি। যেটি তিনি আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন।

রাজকন্যা মুখখানা একটু গম্ভীর ক'রে বললেন, কিন্তু একে নিয়ে আপনি কি করবেন বলুন ত? এসেই ত ও আপনার ওপর এক-হাত নিয়েছে; এই দেখুন না, আপনার কথাগুলো যেন গিলছে! এর সঙ্গে আপনার বনবে না কখনো।

রাজা-পেটেল বললে, সেই জন্যই ত চাইছি ওটাকে। নিজের নিন্দে শুনতে আমি ভারি ভালবাসি, তা বুঝি জানেন না? আপনার হীরেমন আমাকে দুষমন মনে ক'রে গাল দেবে, আর আমি ওর তোয়াজ করব, ওকে পড়াবো, তাতেই আমার আনন্দ।

পক্ষিরাণীই এই সময় রাজা-পেটেলের কথাটার উত্তর দিলেন। বললেন,—তা হয় না রাজা! হীরেমনকে আমার পড়ানোই যে এখনো শেষ হয় নি। আপনাদের বিয়ের একটা কবিতা আমি বেঁধেছি, বিয়ের বাসরে হীরেমন সেই কবিতা প'ড়ে আপনাকে অবাক ক'রে দেবে। তার আগে ত হীরেমনের ছুটি নেই। এই জন্যেই আমি আগেই এসেছি হীরেমনকে নিয়ে।

রাজকন্যা বললেন, তা ছাড়া, হীরেমনের থাকবার জায়গা আমি যে নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছি। সেটা খালি থাকলে আমারও যে মন-কেমন করবে।

পক্ষিরাণী বললেন,—আর এরই মধ্যে দেখবেন হীরেমনকে লিখিয়ে-পড়িয়ে কেমন আপনার ভক্ত ক'রে তুলি! আজ যেমন আপনাকে দেখেই চোখ পাকিয়ে গাল দিলে, হীরেমন তখন ঐ মুখেই কত গুণগানই আপনার করবে! এই ব'লেই পক্ষিরাণী হীরেমনের গায়ের সুশ্রী পালকগুলির ওপর তাঁর নরম হাতখানি বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন হীরেমন? রাজাকে এবার মানবে ত?

হীরেমনের দেহের ভেতর থেকে অভাগা রাজা পক্ষিরাণীর কথাটায় সায় দিয়েই ব'লে উঠলেন,—রাজা—রাজা—রাজা! এ ঘরে এসেই তাঁর দেহের ভেতর পেটেলকে দেখেই রাগ তাঁর এমনি চড়ে যায় যে, তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারেন নি, সত্য কথাটা জানাতেই চেঁচিয়ে উঠেছিলেন অমন ক'রে। কিন্তু তাঁর দেহটা এখন পাখীর হ'লেও বুদ্ধিটুকু ত রাজার; তাই তখনি নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরে নিজেকে সামলে ফেললেন। বুঝলেন, কেউ তাঁর কথা এখন বিশ্বাস করবে না, আর পেটেল যদি তাঁকে সন্দেহ করে—তার হাত থেকে কিছুতেই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন না। এখুনি যদি পেটেল তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ঘাড়টি ভেঙ্গে দেয়, কে তাকে ঠেকাতে পারবে? তার পর কি সর্ব্বনাশই না হবে! দাঁড়ে বসে হীরে-রাজা এই সব ভেবে শিউরে উঠছিলেন, আর যে ভুলটুকু এভাবে ক'রে ফেলেছেন, কেমন ক'রে সেটুকু শোধরাতে পারেন, তারই ফুরসৎ খুঁজছিলেন। এমন সময় পক্ষিরাণীর প্রশ্ন যেন তাঁকে রাস্তাটি দেখিয়ে দিলে। অমনি তিনি ভাব করবার ভাণ ক'রে খুশী মনেই বলে উঠলেন, রাজা, রাজা, রাজা!

চোখের কোণে হাসি ফুটিয়ে পক্ষিরাণী এবার রাজার পানে চেয়ে বললেন, শুনলেন ত! এখন এই পর্য্যন্তই থাক। এর পর যা শেখাবো, শুনে আপনার তাক লেগে যাবে।

রাজকন্যা বললেন, আচ্ছা, এখন আমরা চললুম, আপনি বিশ্রাম করুন। কাল আবার দেখা হবে। ব'লেই রাজকন্যা মাথাটি নীচু করে রাজা-পেটেলকে অভিবাদন জানিয়ে পক্ষিরাণীর হাতখানি ধ'রে বেরিয়ে গেলেন। সখীরাও তাঁর পিছু পিছু চ'ললো। রাজা-পেটেলের মনে হ'ল, তাঁর মনটির মত ঘরখানা পর্য্যন্ত যেন অন্ধকার হ'য়ে গেছে।

নিজের ঘরের পাশেই আর একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো ঘরে রাজকন্যা পক্ষিরাণীর থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। যাতে তাঁর কোন অসুবিধা না হয়, রাজকন্যার মতই সখীরা তাঁর সেবা-যত্ন করে, রাজকন্যা নিজেই সে-দিকে নজর রাখলেন। পক্ষিরাণী হাসিমুখে ব'ললেন, আপনার আদর যত্নের ঘটা দেখে আমার কিন্তু লজ্জা ক'রছে, রাজকন্যা!

রাজকন্যাও হেসে ব'ললেন, আলাপটা আর একটু জমলে লজ্জা ভেঙ্গে যাবে। সেই ব্যবস্থাই আমি ক'রছি। এখন আপনাকে ব'লতে হবে—কি ক'রে আপনি এই হীরেমনটি পেয়েছেন? একে পাওয়ার ব্যাপারে কোন রহস্য আছে কি না, তাই আমি জানতে চাইছি, ভাই!—তোমাকে খুলে সব বলতে হবে।

পক্ষিরাণী বললেন, কেন ব'লবো না, হীরেমনকে যখন মন খুলে তোমার হাতে দিতে পেরেছি ভাই, তখন তার জীবনে যে রহস্যটুকু আছে, সেটা লুকিয়ে রেখে কি লাভ বল? তবে, হয় ত তোমার বিশ্বাস হবে না, রাজকন্যা!

রাজকন্যা বললেন, কিছু দিন আগে এ কথা ব'ললে হয় ত খাটতো; কিন্তু এখন আর বিশ্বাসকে ঠেলতে পারিনে। মনে হয়, সংসারে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। যাই হোক, তুমি ভাই তোমার হীরেমনের কথা আমাকে সব শোনাও।

পক্ষিরাণী তখন হীরেমনকে কেমন ক'রে পান, তাঁর বাবা রাজকন্যার জন্যে কত কষ্ট ক'রে তাকে পক্ষিপুরে আনেন, তার পর তাঁর আদর পেতে পেতে হঠাৎ কেমন ক'রে সে অক্কা পায়, তার পর হাজারটি টাকা নিয়ে বিড়-বিড় ক'রে কতকগুলো মন্তর প'ড়ে একটা ব্যাধ কি ক'রে তাকে বাঁচিয়ে দেয়,—একটি একটি ক'রে সব কথাগুলিই পক্ষিরাণী রাজকন্যাকে শুনিয়ে দিলেন।

রাজকন্যা পক্ষিরাণীর কথা নিঃশব্দে শোনেন, আর কত কি যেন ভাবেন। পক্ষিরাণী তাঁর কথাটা শেষ ক'রে রাজকন্যার পানে চেয়ে দেখলেন—তাঁর মুখখানি রীতিমত গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে। তিনি তখন তাঁর মুখখানি রাজকন্যার মুখের কাছে তু'লে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—কি ভাবছো ভাই! হীরেমনের বাঁচাটা খুবই আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু আমি বলছি, ও সবই সত্যি।

রাজকন্যা তাঁর হাতখানি পক্ষিরাণীর কাঁধটির ওপর রেখে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ভাই, ও-ভাবে বাঁচবার আগে হীরেমন কথা বলত?

পক্ষীরাণী ব'ললেন, খু—ব।

রাজকন্যা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি কথা তখন ব'লতো?

পক্ষিরাণী বললেন, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম, কালীতারা, হরেরাম, ধরো, পাকড়াও, পালাও—এই রকম সব কথা।

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আমার কথা ওর মুখে শুনেছ একটিবারও?

একটুখানি হাসিয়া পক্ষিরাণী ব'ললেন,—না। বেঁচে ওঠবার পর থেকে ও-যেন কেমন আলাদা রকমের পাখী হয়ে গেল। কতই যেন ভব্য-সভ্য ভারিক্কি-গোছের আর কি! মনে হ'তে লাগলো যেন মনের কথাই বলে, পরের কথা শুনে আর কপচায় না। সেই থেকেই ত আমাকে ভাই একবারে অতিষ্ঠ করে তুললে—তোমার নাম ছাড়া মুখে আর কোন কথা নেই; কেবলই বলে—'রাজকন্যা, রাজকন্যা! আমি যাবো তাঁর কাছে, নিয়ে চলো পক্ষিরাণী লক্ষ্মীটি!' ঠিক এই কথাগুলি দিব্যি মানুষের মতই ব'লে আমাকে ত ভাই অবাক ক'রে দিলে!

কথাগুলো শুনে রাজকন্যার মুখখানা আরও গম্ভীর হয়ে উঠলো। এই সময় রাজকন্যার এক চেড়ী এসে মাথা নুইয়ে জানালো, ব্যাধকে আনা হ'য়েছে। বাইরে সে দাঁড়িয়ে আছে।

রাজকন্যা হুকুম দিলেন—তাকে নিয়ে এসো এইখানে। পক্ষিরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, মরা পাখী এনেছে বলে সত্যি-সত্যিই কি ব্যাধটাকে শাস্তি দেবে রাজকন্যা?

রাজকন্যা একটু হেসে ব'ললেন, শাস্তি দেওয়া, মুক্তি দেওয়া, কিম্বা বকৃশিস কিছু দেওয়া সবই ত বিচারের ওপর নির্ভর ক'রছে। সত্যিই যদি বিনা দোষে পাখীটাকে মেরে থাকে, শাস্তি দেব বৈ কি।

এমনি সময় সেই ঘরে রাজকন্যার দাসীর পিছনে পিছনে এসে ঢুকলো সেই চেনা ব্যাধটি, হাতে তার চাদরে-ঢাকা খাঁচা, মুখখানা ভয়ে শুকনো, বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ ক'রে যেন হাতুড়ি প'ড়ছে। ঘরে ঢুকেই গালিচা-মোড়া মেঝের ওপর মাথাটি ঠেকিয়ে সে রাজকন্যাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো, মুখে তার কথাটি নেই।

পক্ষিরাণী তাকে দেখেই খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে ব'লে উঠলো, ওমা তুমই! করকরে হাজারটি টাকা পেয়েও তোমার আশ মেটেনি এখনো? ফের বেরিয়েচ পয়সার ধান্দায়!

ব্যাধের পো ত একেবারে থ! চোখ দু'টি তুলে পক্ষিরাণীর পানে চেয়েই বুঝলে, এ সেই সদাগর-কন্যে! কিন্তু এখানে কি ক'রে এলো, তা ভেবে ঠিক করতে পারলো না। কথার কোন উত্তরও তার মুখ দিয়ে বেরুলো না; শুধু মাথাটি হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো, আর মনে মনে নিজের লোভের নিন্দে ক'রে ব'লতে লাগলো—ঠিক হ'য়েছে, কথায় আছে—অতি লোভে তাঁতি নষ্ট! আমার অদেষ্টেও দেখছি তাই ঘটলো। এবার বুঝি প্রাণটা খাঁচাছাড়া হয়!

রাজকন্যা বুঝলেন—এই ব্যাধই পক্ষিরাণীর হীরেমনকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। অথচ রাজবাড়ীতে এসেছে মরা-পাখী বেচতে! তাঁর মনটা অমনি সন্দেহে দুলে উঠলো। মুখখানা রীতিমত ভারি করে গলার স্বরে জোর দিয়ে তিনি ব্যাধকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—তোমার খাঁচার ভেতরে কি আছে? মরা-পাখী; তোতা পাখী?

ব্যাধ কাঁপতে কাঁপতে ব'ললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ!

রাজকন্যা ব'ললেন,—খোল তোমার খাঁচা, পাখীটা দেখি।

ব্যাধ খাঁচার চাদরখানা সরিয়ে, তারের দরজাটি খুলে মরা পাখীটা রাজকন্যাকে দেখালে। পাখীর পালকগুলো তখন এলিয়ে প'ড়েছে, চোখ-দু'টা বুজে গেছে।

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—কি ক'রে পাখীটা মরলো?

ব্যাধ উত্তর দিলে,—তা জানিনে, খাঁচা খুলেই দেখি মরে র'য়েছে।

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—বাঁচালে না কেন?

ব্যাধ চুপ ক'রে মাথা চুলকাতে লাগলো; এ কথার যে কি উত্তর দেবে তা' ভেবে পেলো না। গলাখানা তখন তার শুকিয়ে কাঠ হ'য়েছে। পক্ষিরাণী এই সময় ব'লে উঠলেন, জবাব দিচ্ছ না যে! হীরেমনকে বাঁচিয়ে আমার বাবার কাছ থেকে হাজার টাকা আদায় ক'রে নিলে, আর এই তোতাটাকে বাঁচাতে পারছো না—এর মানে কি?

রাজকন্যা ব'ললেন, এই তোতাটাকেও তুমি বাঁচিয়ে দাও, আমিও তোমাকে হাজার টাকা দিচ্ছি। আর যদি না পারো, তা হ'লে আগেকার হাজার টাকা ত কেড়ে নেবোই, তার ওপরে এমন কঠিন শাস্তি তোমাকে দেব—

শাস্তির কথা শুনেই ব্যাধ ভেউ-ভেউ ক'রে কেঁদে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যার পায়ের কাছে আছাড়-খেয়ে প'ড়ে বলে উঠলো,—রাজার দোহাই, আমাকে দয়া করুন, অতি লোভেই আমি নিজের সর্বনাশ করেছি মা! পাকে-চক্রে আমি এখন মিথ্যেবাদী ব'লে ধরা প'ড়ে গেছি।

রাজকন্যা ব'ললেন, তুমি কাঁদচ কেন? পক্ষিরাণীর হীরেমনকে তুমি বাঁচিয়েছ, সে কথা ত মিথ্যে নয়। তবে—

ব্যাধ ভাঙ্গা-গলায় ব'ললে, কিন্তু তাকে বাঁচাবার ভাণ ক'রেছিলুম আমি, আসলে তাকে বাঁচিয়েছিল এই তোতা—যে খাঁচার ভেতর ঐ মরে প'ড়ে র'য়েছে।

পক্ষিরাণী ত কথাটা শুনেই অবাক! রাজকন্যা ব্যাধের পানে কটমট ক'রে তাকিয়ে ব'ললেন, যদি ভালো চাও কিছু না লুকিয়ে এই তোতা আর হীরেমনের কথাগুলো আগাগোড়া সব খুলে বলো।

রাজকন্যার মুখের এই কথাগুলো শুনে ব্যাধ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। স্বস্তির একটা নিশ্বেস ফেলে, হাত দু'টি জোড় ক'রে সে তোতা-ধরার জন্যে রাজার ঢেড়া থেকে সুরু ক'রে, বনের পথে জাল পেতে কেমন ক'রে এই তোতাকে ধরেছিল, তার মুখে মানুষের মত কথা শুনে, তাকে নিয়ে যা যা ক'রেছিল, সওদাগরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে তার মুখের সাড়াশব্দ আর না পেয়ে, খাঁচা খুলে তার মৃতদেহ দেখে কি কষ্ট তার মনে হ'য়েছিল, তার পর লোভে প'ড়ে তার মৃতদেহটা বেচতে এসে কি ফ্যাসাদেই সে এখন প'ড়েছে, একটি একটি ক'রে সমস্তই সে রাজকন্যাকে শুনিয়ে দিয়ে—আবার হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো; বার বার ব'লতে লাগলো—আমাকে মাপ কর মা! মাপ কর। বড় গরীব আমি, প্রাণে আমাকে মেরো না—

রাজকন্যা ব'ললেন—তুমি যখন সত্যি কথা সব ব'লেছ, তখন আর কোন ভয় নেই। এখন আমি যা ব'লবো, সেই মত কায যদি তুমি কর, তা'হলে তোমার ভাগ্য এমন ক'রে ফিরিয়ে দেব যে, পাখী ধ'রে আর তোমাকে সংসার চালাতে হবে না।

ব্যাধের মন এবার আহ্লাদে ভরে উঠলো, দুই চোখ দিয়ে আনন্দধারা যেন হু হু ক'রে বেরিয়ে এলো। দুই হাত জোড়

ক'রে সে ব'ললে, যা আপনি ব'লবেন, তাতেই আমি রাজি মা ! বলুন, আমাকে কি ক'রতে হবে ?

রাজকন্যা ব'ললেন, কি ক'রতে হবে—সে কথা তোমাকে পরে ব'লবো; আপাততঃ তোমাকে এই কথা ব'লছি যে, আর কারুর কাছে তুমি এ সব বলতে পাবে না, এমন কি, রাজাও যদি জিজ্ঞাসা করেন, সব চেপে যাবে। এখানে লোকে যেটুকু শুনেছে—'জ্যান্ত তোতা তোমার খাঁচায় ছিল, পথে সে মরে গেলো, মরা তোতা তুমি বেচতে এনেছ'—এর বেশী কোন কথা তুমি কাউকে ব'লবে না।

ব্যাধ তখন সাটপাট হ'য়ে রাজকন্যাকে গড় ক'রে ব'ললে, তাই হবে মা, তাই হবে। প্রাণ যাবে, তবু কোন কথা আমার মুখ থেকে বেরুবে না।

রাজকন্যা তখনি তাঁর দাসীকে ডেকে, ব্যাধকে বার-মহলে অতিথিশালার আলাদা একটা ঘরে খুব মানী অতিথির মতন আদরে, অথচ রাজবন্দীর মতন পাহারায় ঘিরে রাখবার হুকুম দিলেন। মরা তোতা শুদ্ধ খাঁচা, আর সওদাগরের দেওয়া হাজার টাকার থলিটা তাকে রাজকন্যার কাছে রেখে যেতে হ'ল। রাজকন্যা কথা দিলেন তাকে, কথা-মত কায যদি সে করে, তাহ'লে এ সব ত সে ফিরে পাবেই, তার ওপর সারাজীবন তার সচ্ছলভাবে কাটাবার আলাদা ব্যবস্থাও রাজকন্যা ক'রে দেবেন।

যে-ঘরে ব'সে রাজকন্যা এতক্ষণ ব্যাধের বিচার ক'রছিলেন, সেই ঘরেরই লাগোয়া, বেনারসী কাপড়ের পরদা দিয়ে আড়াল-করা আর একখানি ঘরের ভিতর সোনার দাঁড়ে হীরেমন দিব্যি আরামে দোল খাচ্ছিলেন। ব্যাধকে নিয়ে দাসী যেমন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো, রাজকন্যা অমনি তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের দরোজাটি নিজের হাতে বন্ধ ক'রে দিলেন—ভেতর থেকে। তার পর আস্তে আস্তে পরদাটিকে তুলে দু'খানা ঘরের মাঝের আড়ালটুকু ঘুচিয়ে দিলেন। রাজকন্যাকে দেখেই হীরেমনের কাচের মতন স্বচ্ছ দু'টি চোখের দৃষ্টি রাজকন্যার চোখের কালো কালো দু'টো তারার দীপ্তির সঙ্গে এমনি মিলে গেলো যে, রাজকন্যা আড়ষ্টের মত কিছুকাল দাঁড়িয়ে রইলেন। পক্ষিরাণীও এই সময় তাঁর পাশে এসে নিজের হাতে রাজকন্যার হাতখানি ধ'রে ব'ললেন, সত্যিই এ যে অবাক কাণ্ড রাজকন্যা ! আমি যে কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে ভাই !

রাজকন্যা ব'ললেন,—আমি পেয়েছি। এখন ভরসা আমাদের ইনি। এই কথা বলেই তিনি হীরেমনের দাঁড়ের ওপর হাতখানি রেখে হীরেমনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, বলবে তুমি সত্যি কথা ? হীরেমনের দেহের ভেতর প্রবেশ ক'রবার আগে তুমি কি ঐ তোতার দেহের মধ্যে ছিলে না ?

মানুষের মত দিব্যি স্পষ্ট স্বরে হীরেমন জবাব দিলে,—হাঁ। এই মাত্র ব্যাধ যে-সব কথা বলে গেলো, সে সব কথাই সত্যি।

রাজকন্যা এবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—তাহ'লে আমার মনে হচ্ছে, তোতার দেহেও তুমি এমনি ক'রে প্রবেশ ক'রেছিলে। এমনও হ'তে পারে, তার আগে তুমি মানুষ ছিলে ?

হীরেমন উত্তর দিলেন, হাঁ, তা ছিলুম।

রাজকন্যা প্রশ্ন ক'রলেন,—তাহ'লে বলবে আমাকে, কেন তুমি মানুষের দেহ ছেড়ে তোতা-পাখীর দেহের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিলে ?

হীরেমন বললো—এক ভক্তের ভক্তিতে পাগল হ'য়ে নিজের দেহ থেকে বেরিয়ে মৃতদেহে প্রবেশ ক'রবার বিদ্যেটা শিখতে পারায় তোতার দেহে ঢুকেছিলুম; কিন্তু ভক্ত অমনি আমার দেহটি এমন কায়দায় দখল ক'রেছিল যে, আমি আর তোতার দেহ থেকে বেরিয়ে আসবার সুযোগ পাইনি।

রাজকন্যার বুকের ভেতরটা যেন ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। দু'হাতে বুকটা চেপে-ধ'রে আপন মনে ব'লে উঠলেন—কি সর্ব্বনাশ !—তার পর হীরেমনকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার সে ভক্ত এখন কোথায় ?

হীরেমন উত্তর দিলেন,—আমার আগেকার দেহের মধ্যে বাস ক'রচে।

রাজকন্যা আবার জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—আর তোমার সেই ভক্তের দেহটা কোথায় ?

হীরেমন ব'ললেন,—নদীর গর্ভে। আমার ভেতরে ঢুকেই সে তলোয়ার দিয়ে তার দেহটা টুকরো টুকরো ক'রে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ায় সে দেহ জলজন্তুরা গ্রাস ক'রেছে। তোতাকেও সেই পথে পাঠাতে ভক্তটির কি আগ্রহ ! আর প্রাণটুকু বাঁচাবার জন্যে তোতার কি আকুলি-ব্যাকুলি ! পালিয়ে যে বাঁচবে তারও জো নেই; চারদিকে অমনি ঢেঁড়া প'ড়লো—তোতা ধ'রবার ! উঃ, কি কষ্টই যে গেছে—

বুকখানা বুঝি পাষাণে বেঁধেই রাজকন্যা এতক্ষণ হীরেমনকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রছিলেন, কিন্তু তাঁর গলার স্বর এবার মনের কষ্টে রুদ্ধ হ'য়ে গেলো; শুধু কান্নার মত স্বরে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—মা গো !

পক্ষিরাণীও অবাক হ'য়ে হীরেমনের কথা শুনছিলেন, আর রাজকন্যার মুখের পানে তাকিয়ে যেন দেখছিলেন—প্রত্যেক কথাটির সঙ্গে তাঁর সুন্দর মুখের ওপর কে যেন অদৃশ্য হাতে কালির এক একটা পোঁচ টেনে দিচ্ছিলো। এই সময় রাজকন্যার মূর্চ্ছা হওয়ার মত অবস্থা দেখে তিনি দুই হাতে তাড়াতাড়ি তাঁকে ধ'রে ফেলে একখানা কৌচে আস্তে আস্তে বসিয়ে দিলেন। তার পর ঘরের কোণে জলের যে পাত্রটি ছিল, তা থেকে খানিকটা জল এনে তাঁর মাথায় আর মুখে ঝাপটা দিতে লাগলেন। একটু পরেই রাজকন্যা সে ভাব কাটিয়ে মনের জোরেই যেন সোজা হ'য়ে বসলেন; মুখখান বেশ শক্ত ক'রেই পক্ষিরাণীকে ব'ললেন,—থামো ভাই, আমি সামলে নিয়েছি। তুমি যে বুদ্ধি ক'রে সখীদের ডাকোনি, এতে ভারি খুসী হ'য়েছি। আমার ইচ্ছা, এ খবর আর কারুর কাণে না যায়।

পক্ষিরাণী ব'ললেন,—এখন বুঝতে পারছি, কেন ইনি জোর ক'রে আমাকে টেনে এনেছেন তোমার কাছে; কেনই বা ও-ঘরে তাকে দেখে রাগে অমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন ! কিন্তু একটি কথা শুধু বুঝতে পারছিনে—তাহ'লে ও-ঘরে যাঁকে দেখলুম, যিনি—

এই পর্য্যন্ত বলেই পক্ষিরাণী থেমে গেলেন, কথা আর বেরুলো না তাঁর মুখ দিয়ে। রাজকন্যা ব'ললেন—সে এক জ্যোতিষী, নাম তার পেটেল। তার আশা ছিল আমাকে বিয়ে করবে। শেষে হেরে সে শেষে ওঁর অনুগত ভক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়, আর তার পর এই সর্ব্বনাশ তার বিশ্বাসঘাতকতার ফল।

পক্ষিরাণী দুই চোখ কপালে তুলে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—তাহ'লে এখন উপায় ?

রাজকন্যা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে ব'ললেন,—উপায় ত কিছু ভেবেই পাচ্ছিনে; দেহটা যে ওঁরই, আর তার ভেতরে ঢুকে বসে আছে সেই দুরন্ত দস্যু! দেহের ওপর হাত দেবারও জো নেই, আর ব্যাপারটা এমন নোংরা যে, জানাজানি হ'লেই মুস্কিল।

পক্ষিরাণী ব'ললেন,—আরও একটি মুস্কিল বাধিয়ে বসিয়েছেন আপনার হীরেমন নিজেই, তাঁর দেহ-চোরটিকে দেখে রাগ সামলাতে না পেরে যে রকম ক'রে মানুষের মতই রুখে উঠেছিলেন, তাতে চোরের মনে এঁর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সন্দেহ হ'য়েছে। সেই জন্যেই সে আপনার কাছে হীরেমনকে চেয়েছিল।

রাজকন্যা তখন ছল-ছল চোখ দু'টি মেলে হীরেমনের পানে একটিবার চেয়ে ব'ললেন,—ওর ভাবগতিক দেখে আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগে, তার পর হীরেমনের কথায় সেটা আরও ঘোরালো হ'য়ে দাঁড়ায়,—তাই কৌশল ক'রে ওর চাওয়াটা কাটিয়ে দিতে হ'য়েছিল।

পক্ষিরাণী ব'ললেন,—তবে মন্দের ভালো যে, উনি শেষরক্ষা ক'রেছিলেন; বোধ হয়, নিজের ভুলটুকু বুঝতে পেরেই শেষের দিকে চোরের মনের সন্দেহটুকু ঘোচাতে আর রাগ দেখাননি বরং 'রাজা রাজা' ব'লে ভুলটুকু শুধরে নিয়েছিলেন। এই পর্য্যন্ত ব'লেই পক্ষিরাণী হীরেমনের দিকে চেয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ঠিক নয় কি, হীরেমন মশায় ?

হীরেমন অমনি মুখখানা তুলে কথাটায় সায় দিয়ে বললেন, ঠিক! ঠিক!

রাজকন্যার বুঝি বুক ফেটে যাচ্ছিল—হীরেমনবেশী তাঁর প্রাণের রাজা বন্ধুটির সঙ্গে এভাবে আলাপ ক'রতে। আর হীরেমন-রাজারও ঠিক সেই অবস্থাই হ'য়েছিল। নইলে যখন তোতা হ'য়ে ব্যাধের খাঁচায় ঢুকেছিলেন, কত কথাই কইতেন—সে ত তোমরা শুনেছ, যেন মুখ দিয়ে তার খই ফুটতো; অথচ সেই তোতার মুখে এখন কথা আর নেই বললেই হয় যেন বোবা!

পক্ষিরাণী মনে মনে দু'জনের এই সঙ্কোচটা ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনিই এবার বুদ্ধি খাটিয়ে ব'ললেন,—দেখুন, একবার বুদ্ধির দোষে যা হবার নয়, তাই ঘটিয়ে ব'সেছেন, অমন রাজদেহ ছেড়ে পাখীর দেহের ভেতর বাঁধা প'ড়েছেন। কিন্তু এখন এ-রকম আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাবে থাকলে ত চলবে না; আপনাদের দু'জনকেই এখন লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রে আবার নতুন ক'রে বুদ্ধি খাটাতে হবে। সেই ব্যবস্থাই এখন হোক; আসুন, তিনটে মাথা এক ক'রে দেখি—বুদ্ধিটাকে কি ক'রে শানিয়ে নেওয়া যায়।

রাজকন্যা এবার মুখে একটু হাসি এনে, আর চোখের দৃষ্টিটুকু আড় ক'রে হীরেমনের দিকে চেয়ে ব'ললেন,—তুমিও ভাই যেমন! পাখী দেবে আবার বুদ্ধি!

পক্ষিরাণী কৌতুকের ভঙ্গীতে ব'লে উঠলেন,—অমন কথা ব'ল না রাজকন্যা! বুদ্ধির জোরেই ত উনি আবার তোমার সামনে এসে দাঁড়ে ব'সেছেন, নইলে চোরের দেহটার সঙ্গে সঙ্গেই নদীর নীচে তলিয়ে যেতেন কোন্‌কালে! যাক্, এসো এখন যুক্তি করা যাক, কি ক'রে চোরটাকে জব্দ করা যায়—রাজার দেহের ভেতর থেকে টেনে বাইরে এনে।

দুই নারী আর এক পাখী তিনটিতে মুখোমুখী ব'সে তখন মাথা খেলাতে সুরু ক'রলেন।

এই সময় মন্দিরেও সন্ধ্যার শাঁক বেজে উঠলো। শ্রোতাদের মনও মুসড়ে গেলো শেষটুকু এ-দিনও দাদুর মুখে শুনতে না পেয়ে। গল্পদাদু হেসে বললেন, ভেবো না, আসছে-বৈঠকে এ গল্প শেষ হবেই।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতি

কবে তোমায় দেখেছিলাম কোন্ আলোকের দিনে
মনে পড়ে—চোখের ভাষায় নিয়েছিলে কিনে।

মনে পড়ে বিষাদ-মাখা,
কত দিনের আঁধার-ঢাকা
তোমার চাওয়া নিথর চোখে কেবল আমার মুখে;
বালির মাঝে রূপার মত জাগ্‌ছে আজি বুকে।
মনে পড়ে তীরের পাশে
চাইলে তুমি মধুর হেসে,
নৌকা আমার পিছ্‌ল উধাও ভরা নদীর টানে,
পিছন ফিরে চাইনু কত, মিশনু প্রাণে প্রাণে।

একটি দাগা পড়্‌ল শুধু,
জল ভাতিল কেবল ধূ ধূ,
মাথার উপর আকাশখানা মোহের বুনন বোনে;
বুকের ভিতর কিসের তড়িৎ চমকে গেল ক্ষণে।
আজকে কেন কিসের তরে
তোমার দেখা মনে পড়ে,
মনে পড়ে—রবির মত কুয়াশারি দিনে;
মনে পড়ে দেখা-দেখি হৃদয় নিলে কিনে।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

আন্তর্জ্জাতিক-পরিস্থিতি

আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ—

জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ ও যথেচ্ছ বোমাবর্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জনপদ লণ্ডন বিধ্বস্ত হইতেছে। সরকারী ও বেসরকারী ভবন, প্রাসাদ ও পর্ণকুটীর, ধর্ম্মমন্দির ও প্রমোদ-শালা, চিকিৎসাগার ও ক্রীড়াভূমি—কিছুই এই নিষ্ঠুর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বার্লিনে এক বক্তৃতায় হিটলার বলেন যে, বৃটেন্ জার্ম্মাণীর বিভিন্ন নগরে ও গ্রামাঞ্চলে বেসামরিক অধিবাসীর প্রতি যথেচ্ছ বোমা-বর্ষণ করিতেছে; তিন মাস পর্য্যন্ত তিনি ইহার প্রত্যুত্তর দান করেন নাই; কারণ, তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, ইহা বন্ধ হইবে। কিন্তু মিষ্টার চার্চ্চিল তাঁহার এই নিষ্ক্রিয়তায় দৌর্ব্বল্যের ইঙ্গিত পাইয়াছেন। তাই জার্ম্মাণী এখন প্রতি রাত্রিতে প্রত্যুত্তর দান করিতেছে।

বৃটেনের উপকূলস্থিত কামান শত্রু-বিমানে গোলা-নিক্ষেপের জন্য লক্ষ্য স্থির করিয়াছে

বেসামরিক অঞ্চলে বোমাবর্ষণ—

এই তথাকথিত "প্রত্যুত্তর দান"ই জার্ম্মাণীর নৈশ আক্রমণ ও যথেচ্ছ বোমা-বর্ষণের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। জার্ম্মাণী এই কার্য্যের দ্বারা রাজনীতিক ও সামরিক সুবিধা লাভ করিতে চাহে। সে আশা করে, যথেচ্ছ বোমা-বর্ষণের ফলে রাজধানী লণ্ডন ও অন্যান্য অঞ্চলের আরামপ্রিয় ধনিক-সম্প্রদায় আতঙ্কগ্রস্ত হইবে, তাহাদিগের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অসম্ভব হওয়ায় তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে; ভোজনে, প্রমোদে, শয়নে সর্ব্বদা বিঘ্ন, সর্ব্বদা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন, ভূগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ—ইহা কখনও বিলাসী আরামপ্রিয় বৃটিশ ধনিক সহ্য করিতে পারিবে না। জার্ম্মাণী বৃটেনের ধনিকদিগকে নৈতিক মেরুদণ্ডহীন বলিয়া মনে করে; কিছু দিন পূর্ব্বে জনৈক জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ বৃটেনের বিরুদ্ধে অবরোধ-ব্যবস্থার সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া বৃটিশ ধনিকদিগের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন—Physically they have been extremely pampered for centuries and would find it very hard to adjust themselves to real privation. জার্ম্মাণী মনে করে যে, যথেচ্ছ বোমা-বর্ষণে ধনিকসম্প্রদায় যদি কিছুকাল অসহনীয় দুঃখ-ভোগ করে, তাহা হইলে সত্বর যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার জন্য তাহারা বৃটিশ সরকারকে চাপ দিবে। ইহা ব্যতীত, বাকিংহাম
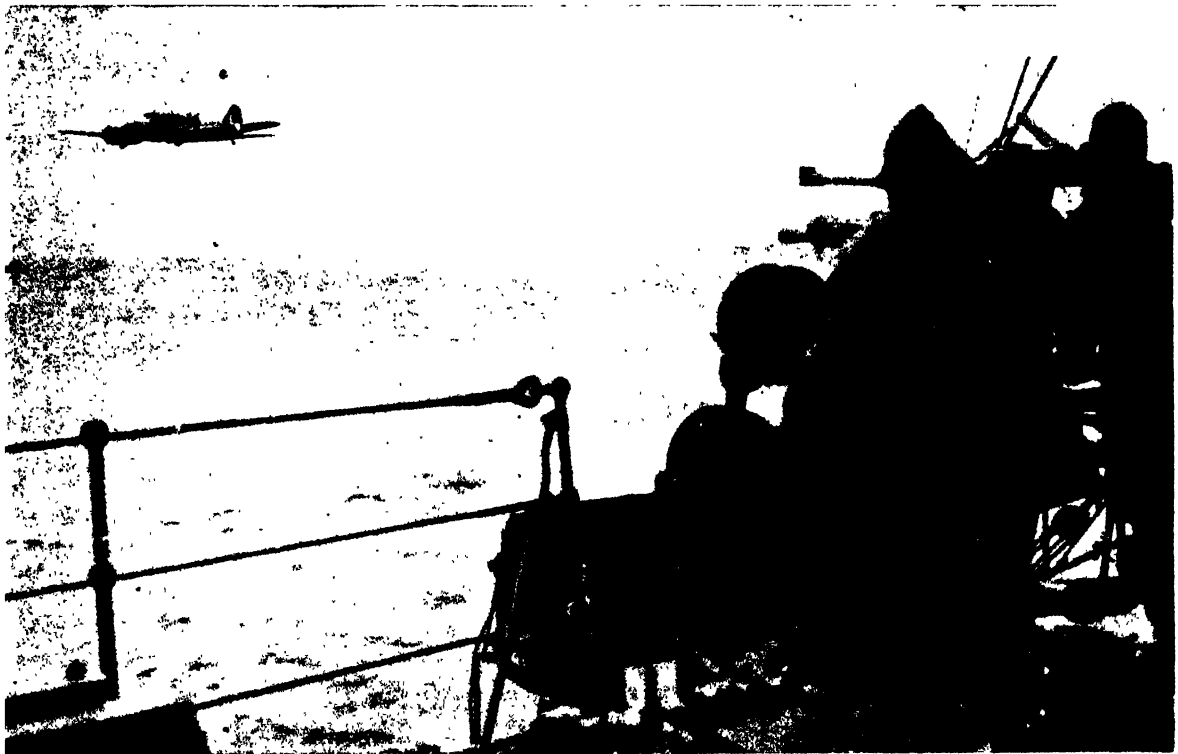
প্রাসাদ, ওয়েষ্টমিনষ্টার এবী, সেণ্ট পল্‌স্ কেথিড্রাল, পার্লামেণ্ট ভবন প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া জার্ম্মাণী বৃটিশ জনসাধারণের মনে তাহার শক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে গভীর রেখাপাত করিতে চাহিতেছে। সে বৃটিশ জনসাধারণের মনে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহে যে, বৃটেনের প্রতিরোধ শক্তি ক্ষীণ; প্রাসাদ, ধর্ম্মমন্দির, ঐতিহাসিক গুরুত্ব-সম্পন্ন ভবন প্রভৃতি রক্ষা করিবার ক্ষমতা বৃটেনের নাই। অবশ্য, জার্ম্মাণী কেবল ধনিকসম্প্রদায়-অধ্যুষিত অঞ্চল এবং প্রসিদ্ধ সরকারী ও বেসরকারী ভবনেই তাহার আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখে নাই—সে অন্যান্য স্থানেও নিষ্ঠুরভাবে বোমা-বর্ষণ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ, বেসামরিক অঞ্চলে বোম-বর্ষণ করিয়া জার্ম্মাণী সামরিক সুবিধা লাভের আশা করে। তাহার ধারণা—বেসামরিক অধিবাসীর মনে ত্রাসের সঞ্চার হইলে বৃটেনে জার্ম্মাণ সৈন্য অবতরণ করিবামাত্র তাহাদিগকে আর সংযত রাখা সম্ভব হইবে না। ফ্রান্সে যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণবাহিনী যখন অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে, তখন ভীতিবিহ্বল বেসামরিক অধিবাসীর অসংযত গতিবিধির জন্য ফরাসী সেনানায়কগণ অত্যন্ত অসুবিধায় পতিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে তাহারা এত অধিক সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিল যে, অতি প্রয়োজনের সময়ও দ্রুত সৈন্য-চলাচল সম্ভব হয় নাই।
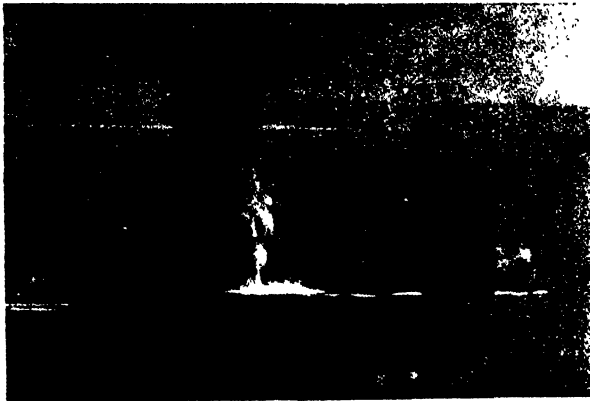
ডোভার প্রণালীতে জার্ম্মাণ-জাহাজ সমূহে বোমাবর্ষণ

ফ্রান্সের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন; বেসামরিক অধিবাসীরা যাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে গৃহের বাহিরে সমবেত না হয়, এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সাবধান করা হইয়াছে; সঙ্কটকালে বেসামরিক অধিবাসীর প্রতি মনোযোগ প্রদানের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। জার্ম্মাণী বৃটেনের বেসামরিক অঞ্চলে নির্ব্বিচারে বোমা-বর্ষণ করিয়া ঐ অঞ্চলবাসীকে সংযত ও সুশৃঙ্খল রাখিবার সকল আয়োজন পণ্ড করিবার চেষ্টা করিতেছে। ফ্রান্সের অভিজ্ঞতায় সে বুঝিয়াছে যে, শত্রু-দেশের বেসামরিক অধিবাসীর বিশৃঙ্খল গতিবিধিতে বিরাট সামরিক সুবিধা লাভ সম্ভব হয়।

প্রাথমিক আয়োজন—

জার্ম্মাণীর এই বিমান-আক্রমণ বৃটেনের বিরুদ্ধে স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনের প্রাথমিক আয়োজন। সে এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া তাহার প্রত্যেকটি কার্য্য করিতেছে। সে বৃটেনের শ্রমশিল্প কেন্দ্র, পোতাশ্রয়, বিমানঘাঁটি প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বোমা-বর্ষণ করিতেছে এবং বৃটেনে গমনাগমনের ব্যবস্থাও অচল করিতে চাহিতেছে। সর্ব্বোপরি বৃটেনের বিমানশক্তি

সমুদ্রোপকূলে লুক্কায়িত অবস্থায় বৃটিশ কামান

পঙ্গু করা জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য; কারণ, বৃটেনের বিমানশক্তি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে বৃটেনে সৈন্য অবতরণ করাইবার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে পারিবে না। সম্প্রতি রুশ-পত্রিকা 'কম্যুনিস্কায়া প্রাভাদা' জার্ম্মাণীর এই বিমান-আক্র-

পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূলের এই সকল স্থানে শত শত ইংরাজ নর-নারী প্রমোদ-ভ্রমণে যাইত

মণের ফলাফল সম্বন্ধে চমৎকার মন্তব্য করিয়াছেন। ঐ পত্র বলিয়াছেন—"The success or failure of German landing will be decided by air superiority not only over Britain but over the most valuable naval bases on the Straits of Dover and the mouth of the Thames." বস্তুতঃ সমগ্র বৃটেনের আকাশে অপ্রতিহত আধিপত্য লাভ করাই জার্ম্মাণীর বিমান-আক্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেসামরিক অধিবাসীর প্রতি আক্রমণ এই বৈমানিক অভিযানের গৌণ অঙ্গ।

জার্ম্মাণীর প্রাথমিক উদ্যোগ সফল হইবার কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। বোমা-বর্ষণের ফলে বৃটেনের বেসামরিক অধিবাসীর কোন দৌর্ব্বল্য এখনও প্রকাশ পায় নাই; বৃটেনের বিমান-শক্তি পঙ্গু হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যেকটি আক্রমণে জার্ম্মাণীর বিমানই অধিকতর সংখ্যায় বিনষ্ট হইতেছে।

প্রত্যক্ষ আক্রমণের পরিকল্পনা—

জার্ম্মাণী সম্প্রতি বৃটেনের বিরুদ্ধে স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনের জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতেছে। কেবল বিমান আক্রমণে কোন দেশ জয় করা সম্ভব হয় না; বৃটেনকে পরাজিত করিতে হইলে স্থলপথে তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালন অপরিহার্য্য। অথচ এই শরৎকালে যদি জার্ম্মাণী

টেম্‌স্ নদীতে টহল দিবার জন্য বৃটিশ 'প্যারাশট্' বাহিনী মোটর-বোটে আরোহণ করিতেছে

বৃটেনে সৈন্য অবতরণ করাইতে না পারে, তাহা হইলে আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তত দিনে বৃটেনের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে; বর্ত্তমানে বৃটেনে সৈন্য অবতরণ করান যদি কোন প্রকারে সম্ভবও হয়, আগামী বসন্তকালে তাহা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে, ইহা হিটলার জানেন। এই জন্যই অবিলম্বে প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনের জন্য তিনি অধীর হইয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন।

জনৈক মার্কিণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ জার্ম্মাণীর এই আয়োজনের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন—ক্যালের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যে সকল স্থানে ইংলিস্ প্রণালী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, সেই সকল স্থানে জার্ম্মাণী গুরুভার কামানশ্রেণী সন্নিবিষ্ট করিয়াছে। এণ্টওয়ার্প হইতে বোর্দো এবং ব্রেষ্ট পর্য্যন্ত নাজী-বাহিনী সমবেত হইয়াছে; ইহাদিগের মধ্যে দুই লক্ষ ইটালীয় সৈন্যও আছে। এই অঞ্চলে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র জাহাজ ও মোটর-চালিত ভেলা (raft) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভেলাগুলি সমুদ্রের অগভীর অঞ্চলেও যাইতে পারিবে এবং তীর সংলগ্ন হইতে পারিবে; এই জন্য উহার উপর অধিক নির্ভর করা হইতেছে। ইংলণ্ডের অপর পারে সমুদ্রোপকূলের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে সৈন্যবাহী বিমানের ঘাঁটি নির্ম্মিত হইয়াছে। বিরাটকায় জলগামী-ট্যাঙ্ক সম্পর্কে পরীক্ষা চলিতেছে; এই সকল ট্যাঙ্ক যাহাতে সমুদ্রের মধ্য দিয়া টানিয়া অপর পারে লইয়া যাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। বিমানে লঘু কামান ও ট্যাঙ্ক লইয়া যাইবার আয়োজনও চলিতেছে। জার্ম্মাণ সেনানায়কগণের আশঙ্কা—ইংলিস প্রণালী অতিক্রম করিবার সময় অথবা বৃটেনে অবতরণ কালে বহু-

ঘোড়া ও সওয়ার উভয়েই গ্যাস-মুখোস পরিহিত

সংখ্যক সৈন্য ধ্বংস হইবে। জার্ম্মাণ সৈন্যের সহিত যে দুই লক্ষ ইটালীয় সৈন্য সমবেত হইয়াছে, তাহারাই বৃটিশ কামানের গোলায় উড়িবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। বৃটিশ কামানের অগ্নিবর্ষণের মধ্যে কিছু সৈন্য বৃটেনে অবতরণ করিতে সমর্থ হইবামাত্র সৈন্যবাহী বিমানগুলি তৎপর হইয়া উঠিবে। এই ভয়াবহ পরীক্ষার সময় প্রয়োজন হইলে জার্ম্মাণী বিষবাষ্পও ব্যবহার করিতে পারে। প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিছু সৈন্য আক্রমণের ভাণ করিয়া বৃটেনের উপকূলের দিকে অগ্রসর হইবে। এই সকল সৈন্যের ধ্বংস অনিবার্য্য জানিয়া এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ ইটালীয় সৈন্যই ব্যবহৃত হইবে।

প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ও প্রতি-আক্রমণ—

জার্ম্মাণীর এই আক্রমণ-প্রচেষ্টা বিফল করিবার উদ্দেশ্যে বৃটেনে কিরূপ ব্যাপক আয়োজন হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে এই প্রসঙ্গেই

আলোচিত হইয়াছে। জার্ম্মাণীর বিমান-আক্রমণে বৃটেনের এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ১৭ই সেপ্টেম্বর মিষ্টার চার্চ্চিল কমন্স সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর যথেচ্ছ বোমা-বর্ষণে বহু হাসপাতাল, ধর্ম্মমন্দির এবং সরকারী গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু মিষ্টার চার্চ্চিলের ভাষায়—the injury to our war-making capacity has been surprisingly small. তিনি জানাইয়াছেন যে, বোমা-বর্ষণে বেসামরিক অধিবাসীর হতাহতের সংখ্যা দশ হাজার; কিন্তু যুদ্ধরতদিগের মধ্যে মাত্র দুই শত পঞ্চাশ জন হতাহত হইয়াছে!

জার্ম্মাণীর আক্রমণ-শক্তি বিনষ্ট করিবার জন্য বৃটেনের বিমান-বহর সম্প্রতি অত্যন্ত তৎপর হইয়াছে। জার্ম্মাণীর বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্র, রেল-ষ্টেসন, তৈলভাণ্ডার, বিমানঘাঁটি এবং উপকূলস্থিত জাহাজ

ইটালীয় বাহিনীর অগ্রগতি—

লিবিয়াস্থিত ইটালীয় বাহিনী গত ১৪ই সেপ্টেম্বর মিশরে প্রবেশ করিয়াছে এবং উপকূলপথে ষাট মাইল অগ্রসর হইয়া সিদি বারাণি অধিকার করিয়াছে। মিশরস্থিত বৃটিশ সৈন্য পূর্ব্বে নিস্ক্রিয় থাকিলেও এখন তাহারা তৎপর হইয়াছে। বৃটিশ বিমান-বহর ইটালীয় সৈন্যকে উত্যক্ত করিতেছে; বৃটিশ রণপোত হইতে মধ্যে মধ্যে ইটালীয় বাহিনীর প্রতি গোলা বর্ষিত হইতেছে। ইটালী যে আলেকজেন্দ্রিয়া এবং পোর্ট সৈয়দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে, ইহা সুস্পষ্ট। ইটালী এইরূপ ভাব দেখাইতেছে যে, মিশরের সহিত তাহার কোন শত্রুতা নাই, সে কেবল সামরিক প্রয়োজনে মিশরের উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইটালীর এই কৌশলে কিছু ফলও হইয়াছে;
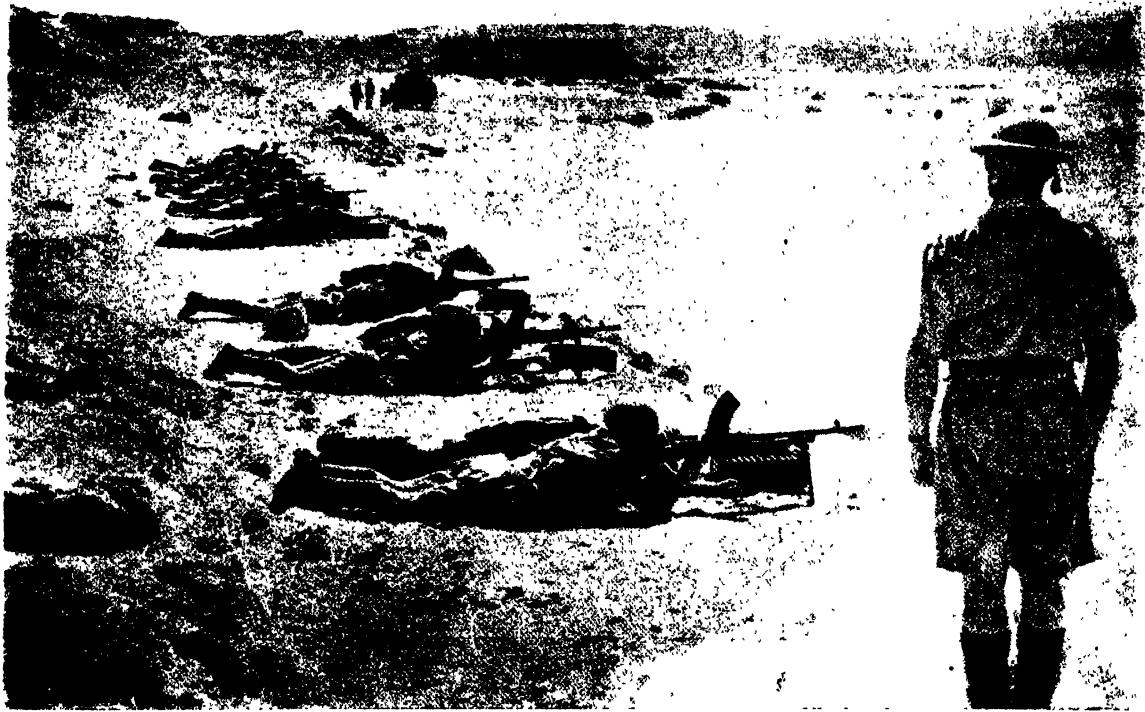
মিশরের তপ্ত বালুকায় বৃটিশ-সৈন্যের কুচকাওয়াজ

ও নৌকাগুলির উপর বৃটিশ বিমান-বহর প্রতিদিন বোমা-বর্ষণ করিতেছে। রাজধানী বার্লিনও এই আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না। বৃটিশ বিমান বহরের এই প্রতি-আক্রমণ আর উপেক্ষণীয় নহে। মিষ্টার চার্চ্চিল তাঁহার পূর্ব্বের বক্তৃতায় এই প্রতি-আক্রমণের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। কিন্তু ১৭ই সেপ্টেম্বর কমন্স সভার বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "We must not underrate the damage inflicted on the enemy by the very heavy nightly bombardment of his concentration of ships and on all focal points."

মিশরের মন্ত্রিসভা ইটালী সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট নীতি অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। মিশরের একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ইটালী সম্পর্কে মিশরে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। এক দল বলিতেছেন যে, ইটালীর বর্ত্তমান ক্রিয়াকলাপকে প্রকৃত আক্রমণ বলা চলে না; তাহার অভিসন্ধি আরও সুস্পষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। আর এক দলের অভিমত—সিদি বারাণি পর্য্যন্ত ইটালীর অগ্রগতিতেই তাহার অভিসন্ধি সুস্পষ্ট হইয়াছে; সুতরাং অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া কর্ত্তব্য। মতদ্বৈধতার জন্য ইতোমধ্যে মিশরের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছে।

সে যাহা হউক, স্থলপথে ইটালীর এই অগ্রগতির সময় পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে ইটালীয় নৌবহর এবং জার্ম্মাণ-ইটালীয় বিমান তৎপর হইতে পারে। সুয়েজ খাল এবং লোহিত সাগরে বৃটেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় পূর্ব্ব-আফ্রিকায় বৃটিশ-সোমালিল্যাণ্ড লাভে ইটালী বিশেষ উপকৃত হয় নাই; কেনীয়া অঞ্চলে তাহার সাফল্যও মূল্যহীন। জলপথে পূর্ব্ব-আফ্রিকার অধিকৃত অঞ্চলের সহিত ইটালীর সংযোগ স্থাপিত হইলে ঐ অঞ্চল ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জন্য সুয়েজ এবং লোহিত সাগরে বৃটেনের আধিপত্য দূর করা ইটালীর একান্ত প্রয়োজন; এই অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ইটালীর বাহিনী নৌপথে পাতের" জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই শীতকালীন অভিযানের ঘাঁটি প্রস্তুত করিবার জন্যই ইটালীয় কমিশন এখন সীরিয়া ও লেবাননে 'নরস্ত্রীকরণ-পর্ব্ব শেষ করিতেছে।

স্পেনের মনোভাব—

ইটালী যে ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ নৌবহরের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহার একটি প্রমাণ স্পেনের মনোভাব। জার্ম্মাণী ও ইটালীর আনুকূল্যে, বস্তুতঃ ইটালীয় সৈন্যের অস্ত্রবলে স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "কাজেই বৃটেনের চেম্বারলেন মন্ত্রিসভা অর্থবলে ফ্যাসিষ্ট-শক্তিকে "হাত করিবার" যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ইটালী সম্পর্কে যেমন বিফল

জার্ম্মাণীর আদর্শে গঠিত ইটালীর যান্ত্রিক-বাহিনী

অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে তাহার নৌ ও বিমান-বহরের তৎপরতাও সম্ভবতঃ আসন্ন। ইটালীর এই অভিসন্ধি বুঝিয়াই বৃটিশ নৌবহর ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জে ইটালীর নৌ ও বিমান ঘাঁটি আক্রমণে প্রস্তুত হইয়াছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। অবশ্য ডোডেকেনীজ দ্বীপপুঞ্জের বিমান ঘাঁটি হইতে এখনও উত্তর-পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও পশ্চিম-এশিয়ায় আক্রমণ পরিচালিত হইতেছে।

ইটালীয় বাহিনী জার্ম্মাণীর "তড়িৎগতি" রণনীতি অবলম্বন করিয়া সুয়েজ অঞ্চলে পৌছিতে উদ্যোগী হইবে বলিয়া মনে হয় না, তাহারা ধীরে ধীরে আগামী শীতকালের মধ্যে ঐ অঞ্চলে পৌছিবার চেষ্টা করিতে পারে। আগামী শীতকালে জার্ম্মাণী ও ইটালী একযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি "কৃপাদৃষ্টি

হইয়াছে, স্পেন সম্পর্কেও সেইরূপ বিফল হওয়াই স্বাভাবিক। গত মে মাসে চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভার যখন পতন ঘটে, তখন কমন্স সভায় বিতর্কের সময় মিষ্টার কয়েড জর্জ্জ বলিয়াছিলেন—"As regards Spain, I hope my fears about that country will not prove true". আজ তাঁহার এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

গত ১০ই জুন ইটালী যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার অব্যবহিত পরেই স্পেন নিরপেক্ষতার (Neutrality) ছদ্মাবরণ ত্যাগ করিয়া আপনাকে যুদ্ধ-বিরত (Non-belligerent) বলিয়া ঘোষণা করে এবং জিব্রল্টর প্রণালীর দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী আন্তর্জ্জাতিক অঞ্চল টেঞ্জিয়ারে সৈন্য-সমাবেশ করে। তাহার পর, স্পেন যে তাহার প্রয়োজনাতিরিক্ত তৈল আমেরিকা হইতে আমদানী

করিয়া জার্ম্মাণীকে সরবরাহ করিতেছিল, তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ স্পেনে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহারা যে ফ্রাঙ্কো-সরকারকে প্রভাবান্বিত করিতেছে, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

সম্প্রতি স্পেনের স্বরাষ্ট্র-সচিব সীনর সুনার সদলবলে বার্লিনে গমন করিয়া নাজী নেতৃবৃন্দের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সীনর সুনার "ফ্যালাঞ্জিষ্ট" নামক স্পেনীয় ফ্যাসিষ্ট দলের এক জন প্রভাবশালী নেতা এবং জেনারেল ফ্রাঙ্কোর "কুটুম্ব"। বার্লিনে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সুনার বলিয়াছেন যে, স্পেন বর্ত্তমানে যুদ্ধ-বিরত হইলেও সে স্বার্থশূন্য নহে। তাঁহার ভাষায়—"Spain has her mission in the new order in Europe and when the right moment comes, leaders in Spain will give the order for action". যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে ইটালী ঠিক এই সুরেই কথা বলিত এবং গত এপ্রিল মাসে জার্ম্মাণীর নরওয়ে আক্রমণের পর তাহার এই সুর চড়িয়াছিল। স্পেনের দাবী সম্বন্ধে সুনারের উক্তি ইটালীর হঠকারিতাকেও হার মানাইয়াছে। সুনার বলিয়াছেন যে, য়ুরোপে ইটালীর কোন দাবী নাই; কারণ, প্রকৃতপক্ষে যাহা সঙ্গত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ (restitution) তাহাকে দাবী বলা যায় না। এহেন মনোভাবাপন্ন স্পেনের প্রতিনিধি সুনারের সহিত বার্লিনে নাজী-নেতৃবৃন্দের আলোচনা হইবার পর জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব রিবেনট্রপ্ রোমে গমন করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে "কি বার্ত্তা" লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা জানিবার জন্য সুনার বার্লিনে প্রতীক্ষা করিতেছেন। নাজী-ফ্যাসিষ্ট নেতৃবর্গের এই শলা-পরামর্শ এবং সীনর সুনারের এই উক্তি হইতে স্পেনের মনোভাব ও তাহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই বোধ হয় পাওয়া যাইতেছে।

স্পেন যদি "যুদ্ধ-বিরত" না থাকে, তাহা হইলে অবস্থা নিরতিশয় সঙ্কটজনক হইবার আশঙ্কা আছে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় চেম্বারলেন-মন্ত্রিসভা নিরপেক্ষতার কপটাবরণে গণতান্ত্রিক স্পেনের ফ্যাসিষ্ট স্পেনে পরিণতিতে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই দৌর্ব্বল্য ও অদূরদর্শিতার বিষময় ফল হয় ত এখন উপলব্ধ হইবে। গত ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে গণতান্ত্রিক স্পেনের প্রেসিডেণ্ট সীনর আজানা ভালেন্সিয়ার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"The inva ion of Spain constitute the rupture of the system of equilibrium in Occidental Europe, and this rupture is directed against those powers which, until to-day bound in friendship with Spain, have been able to behold, without any kind of perturbation or preoccupation, the situation in Western Europe" সীনর আজানা তৎকালীন বৃটিশ ও ফরাসী মন্ত্রিসভার উদ্দেশেই এই উক্তি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইটালী ও জার্ম্মাণী পশ্চিম-য়ুরোপের এই অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব

মিশরে বৃটেনের সমরায়োজন

ইটালীর নৌবহর

উপলব্ধি করিয়া তথায় ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই সামরিক সুবিধা প্রয়োগের গোপন অভিসন্ধি তাহারা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল। স্পেনে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ফ্রান্স তিন দিকে ফ্যাসিষ্ট-শক্তি পরিবেষ্টিত হইয়াছিল এবং উত্তর-আফ্রিকার সাম্রাজ্যের সহিত তাহার সংযোগ বিপন্ন হইয়াছিল। অবশ্য স্পেন যুদ্ধে রত হইবার পূর্ব্বেই ফ্রান্স বিধ্বস্ত হইয়াছে। আজ ফ্যাসিষ্ট স্পেন যদি নিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে বৃটেনের পক্ষেও সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারিবে।

স্পেন যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে জিব্রল্টর প্রণালীর নিরাপত্তা বিনষ্ট হইবে। পর্ব্বতশ্রেণী-বেষ্টিত জিব্রল্টর দুর্গ অধিকার করা অবিলম্বে সম্ভব না-ও হইতে পারে; কিন্তু জিব্রল্টর প্রণালীর দক্ষিণ-উপকূল হইতে কামান ও বিমানবাহিনী ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ জাহাজের প্রবেশ ও নির্গমন বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিতে পারিবে। স্পেনের সৈন্যপূর্ণ টেঞ্জিয়ার ও স্পেনের অধিকারভুক্ত সিউটা এই উদ্দেশ্যে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে। স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় হইতেই সিউটায় জার্ম্মাণীর কামানশ্রেণী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার পর বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ; এই দ্বীপপুঞ্জের ইটালীর বিমানঘাঁটিই স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের সময় ঐ দেশের পূর্ব্ব-উপকূল শ্মশান করিয়াছিল। এই দ্বীপপুঞ্জে যদি ইটালী পুনরায় বিমান ও সাবমেরিণের ঘাঁটি নির্ম্মাণের অধিকার পায়, তাহা হইলে সে বিরাট সামরিক সুবিধা লাভ করিবে। টেঞ্জিয়ার, সিউটা ও বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিমান, সাবমেরিণ ও কামান বৃটিশ রণপোতের ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ হয় ত অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

বৃটেন্ উত্তর-আফ্রিকায় সৈন্য অবতরণ করাইতে পারে—এই আশঙ্কায় স্পেনীয়-মরক্কোতে সৈন্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। বস্তুতঃ জিব্রল্টর প্রণালীর নিরাপত্তা যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে বৃটেনের পক্ষে উত্তর-আফ্রিকায় সৈন্য অবতরণ করান ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকিবে না। স্পেনের মনোভাব যদি আরও সন্দেহজনক হইয়া উঠে এবং তাহার যুদ্ধে যোগদান সম্বন্ধে বৃটিশ মন্ত্রিসভা যদি নিঃসংশয় হন, তাহা হইলে তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নেই উত্তর-আফ্রিকায় সৈন্য অবতরণ করাইতে সচেষ্ট হইবেন, ইহা বোধ হয়, নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক, স্পেনের যুদ্ধে যোগদানের ফলে পশ্চিম-ভূমধ্য সাগর বিঘ্নসঙ্কুল হইবামাত্র পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে ইটালীর নৌবহর তৎপর হইবে বলিয়া মনে হয়। স্থলপথে ইটালীর সৈন্য সুয়েজ খাল লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে এবং সমুদ্রবক্ষে বৃটিশ নৌবহরের সহিত ইটালী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইবে।

ইন্দো-চীনে জাপানী সৈন্য—

ইন্দো-চীন সম্পর্কে ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত জাপানের মীমাংসা হইয়াছে। এই মীমাংসার সর্ত্ত অনুসারে জাপানী সৈন্য হাইফং হইতে চীনের ইউনান্ প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিবে; ইন্দো-চীনের টংকিং প্রদেশে বিমানঘাঁটি স্থাপনের এবং উহার রক্ষা

জন্য ঐ প্রদেশে ৬ হাজার সৈন্য রাখিবার অধিকারও জাপান লাভ করিয়াছে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত জাপানের চুক্তি হইবামাত্র ২২শে সেপ্‌টেম্বর জাপানী সৈন্য ইন্দো-চীনে প্রবেশ করে। ফরাসী সৈন্য আক্রমণকারীদিগকে প্রতিরোধ করিয়াছিল; পরে ফ্রাঙ্কো-জাপ মীমাংসার কথা জানিতে পারিয়া সৈন্যগণ না কি অস্ত্র-সঞ্চালনে ক্ষান্ত হয়।

চীনের চুংকিং সরকার এই অবস্থার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছেন; চীনের কোয়াংসী ও ইউনান প্রদেশে এখন দুই লক্ষ চীনা সৈন্য সন্নিবিষ্ট। জাপানী সৈন্য ইন্দো-চীনে প্রবেশ করিবামাত্র চীনা-বাহিনীও ঐ দেশ আক্রমণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা ছিল। কিন্তু চীনা সৈন্য এখনও ইন্দো-চীনের সীমান্ত অতিক্রম করে নাই।

ইন্দো-চীন সম্পর্কে জাপানের সহিত ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের দেড় মাসব্যাপী আলোচনার সময় যেমন বহু পরস্পর-বিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তেমনই জাপানী সৈন্য ইন্দো-চীনে প্রবেশ করিবার পর যে সকল সংবাদ প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইতেও প্রকৃত অবস্থা বুঝা দুষ্কর। ২২শে সেপ্‌টেম্বর জাপানী সৈন্য যখন ইন্দো-চীনে প্রবেশ করে, তখন ফরাসী সৈন্যের সহিত তাহাদিগের ১১ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ হয়; পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ পায়, ২৩শে তারিখে সীমান্ত হইতে ১২ মাইল দূরে ডংডাং অঞ্চলে সমস্ত রাত্রি তুমুল যুদ্ধ চলে। দ্বিতীয় দিনের এই যুদ্ধ গুরুত্বহীন সীমান্তের সংঘর্ষ বলিয়া মনে হয় না; জাপান এই যুদ্ধে প্রচণ্ডবেগে বিমান আক্রমণও চালাইয়াছিল। অথচ, জাপানের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, ইহা "বেদান্তের মায়া"; ভ্রান্তিবশতঃ ফরাসী সৈন্য জাপানীদিগকে বাধা দিয়াছিল, তাহাদিগের সে প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে।

ফরাসী সৈন্য যদি সত্যই ভ্রান্তিবশতঃ জাপানীদিগকে তিন দিন ধরিয়া বাধা দিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা তাহাদিগের গুরুতর ভ্রান্তি এবং এই ভ্রান্তি হয় ত অর্থপূর্ণ। ফ্রান্সের ভিসি সরকার জাপানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন এবং "সুদূর প্রাচীতে নব-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে ও চীনের সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে" তাঁহারা ইন্দো-চীন সম্পর্কে জাপানের অসঙ্গত দাবী স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইন্দো-চীনের কর্ত্তৃপক্ষ হয় ত এই নব ব্যবস্থা সম্পর্কে উৎসাহী নহেন। "ভ্রান্তিবশতঃ বাধা দান" হয় ত ইন্দো-চীনের কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ মনোভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কয়েক দিন পূর্ব্বে হংকংএর 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রে প্রকাশ পায় যে, সম্প্রতি চুংকিংএ ফরাসী প্রতিনিধিদিগের সহিত চীনা কর্ত্তৃপক্ষের গোপন আলোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, চীনা সৈন্যের ইন্দো-চীনে প্রবেশে সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ বাধা দিবেন না; ইন্দো-চীন যদি জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ফরাসী ও চীনা সৈন্য একযোগে তাহাদিগকে বাধা দান করিবে। 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রের এই উক্তির মূলে সত্য আছে কি না এবং ফরাসী সৈন্যের "ভ্রান্তিবশতঃ বাধা দানের" সহিত ইন্দো-চীন ও চীনের কোন গোপন চুক্তির সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা ভবিষ্যতের ঘটনাবলী প্রমাণ করিবে।

জাপানের ইন্দো-চীনে প্রবেশের আশু উদ্দেশ্য—চীন আক্রমণে সুবিধা লাভ; কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। সে বৃহত্তর এসিয়া গঠনের যে কল্পনা করিয়াছে, পশ্চিমাভিমুখে তাহার এই অগ্রগতি সেই পরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত। জাপান ইউনান্ প্রদেশে প্রবেশ করিলে সে ব্রহ্মদেশের সীমান্তে পৌঁছিবে। এই সময় শ্যামকে প্রভাবান্বিত করিয়া জাপান সেখানে প্রবেশের অধিকারও লাভ করিয়াছে; শ্যাম ইতোমধ্যে ইন্দো-চীনের নিকট অঞ্চলগত দাবী উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। জাপানের শ্যামে প্রবেশে সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। জাপান শ্যামে নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপন করিতে পারে। জাপানের এই সকল ক্রিয়াকলাপের সহিত জার্ম্মাণী ও ইটালীর আগামী শীতকালীন সমর-প্রচেষ্টার যোগ থাকা সম্ভব।

জাপানের এই ক্রমবর্দ্ধমান ঔদ্ধত্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে আপাততঃ সমর-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইবে না, ইহা নিশ্চিত। তবে, সে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। ইতঃপূর্ব্বে আমেরিকার তৈল ও ভাঙ্গা লৌহ হইতে জাপান বঞ্চিত হইয়াছে; অদূর ভবিষ্যতে হয় ত সকল প্রকার পণ্য হইতেই সে বঞ্চিত হইবে। অবশ্য ইহাতে জাপান নিরস্ত হইবে না, সে সুদূর প্রাচীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রবলতর প্রয়াস করিবে।

সুদূর প্রাচী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—

জাপান যখন বৃটেনের নিকট ব্রহ্মদেশের পথ অবরুদ্ধ করিবার দাবী উত্থাপন করে, তখনই আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, সুদূর প্রাচী সম্পর্কে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সহিত বৃটেনের গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হইতে পারে। গত আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আমরা ইঙ্গিত করিয়াছিলাম যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সুদূর প্রাচী সম্পর্কে গোপন মীমাংসার ফলেই বৃটেন্ হয় ত ব্রহ্মদেশের পথ সম্পর্কে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেছে। সে যাহা হউক, বৃটেন্ জাপানের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেও জাপানের এই ক্রম-বর্দ্ধমান ক্ষুধায় সে শঙ্কিত হইয়া উঠে; এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্টভাবে মিলিত হইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। তাহার পর, ৩রা সেপ্টেম্বর যে ব্যাপক ইঙ্গ-মার্কিণ নৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহার সর্ত্তাবলী বিবেচনা করিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশান্ত মহাসাগর রক্ষার ভার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর প্রদত্ত হইতেছে। বস্তুতঃ ঐ নৌচুক্তি পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সমুদ্ররক্ষায় বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট সহযোগের সূচনামাত্র। সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অপ্রতিহত সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানে বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান্ প্রতিনিধির সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-সচিব মিষ্টার কর্ডেল্ হালের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে। শুনা যাইতেছে যে, সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটিও মার্কিণী সরকারের প্রভুত্বাধীন হইবে।

বৃটেন আজ জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে প্রবৃত্ত। এই সময় জাপান যেরূপ সন্দেহজনক মনোভাবের পরিচয় দিতেছে, তাহাতে সুদূর প্রাচী সম্পর্কে মার্কিণী সরকারের উপর নির্ভরশীল হওয়া ব্যতীত বৃটেনের আর গত্যন্তর ছিল না। সুদূর প্রাচীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থও আজ বিপন্ন। কাজেই, তাহার পক্ষেও সানন্দে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রহরীর কার্য্য করিতে সম্মত হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীঅতুল দত্ত।

বিপ্লবী

বর্দ্ধমানের সারদা চৌধুরী! পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কে তাঁকে হত্যা করিয়াছিল! কে হত্যা করিল, বহু সন্ধানে কিনারা হয় নাই! যাঁরা খপরের কাগজ পড়েন, সে হত্যার কথা তাঁদের বোধ হয় মনে আছে!

সে হত্যার বিবরণ আমি জানি। সে বিবরণে খানিকটা বৈচিত্র্য আছে। এত দিন প্রকাশ করি নাই, নিষেধ ছিল। সে-নিষেধ···

সব কথা গোড়া হইতে খুলিয়া বলি।

সারদা চৌধুরী ব্যবসা করিতেন। মস্ত কারবারী। হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যে ধরিল নানা উপসর্গ! কারবার বেচিয়া বর্দ্ধমানে পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করিতে আসিলেন!

অগাধ পয়সার মানুষ। সংসারে কন্যা মধুমতী ভিন্ন আর কেহ ছিল না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, মধুমতীর বয়স তখন বিশ বৎসর। মধুমতীর দশ বৎসর বয়স, মা ইহলোক ত্যাগ করেন। এখন মধুমতী আই-এ পাশ করিয়াছে। দেখিতে যেমন সুশ্রী, স্বভাব তেমনি শান্ত। মধুমতীর বিবাহের জন্য বহু পাত্রের বহু আবেদন সারদা চৌধুরীর কাছে আসিতেছে। কিন্তু তাঁর এই একটি মেয়ে! সে-মেয়ে কোথায় পরের বাড়ী চলিয়া যাইবে! শিহরিয়া সারদা চৌধুরী সে-সব আবেদন নামঞ্জুর করিয়া বলেন,—না! এত শীগ্‌গির ওর বিয়ে দেবো না। লেখাপড়া করছে। ওর সখ···লেখাপড়া করুক।

বর্দ্ধমানে মস্ত বাড়ী, বাগান। এ বাড়ীতে বাপ আর মেয়ে···দু'টি প্রাণী।

সারদা চৌধুরীর শরীর ভালো নয়। নিত্য মনে হয়, দেহের কোথায় কি একটা যন্ত্র যেন বিকল হইয়া গেছে! ডাক্তার আসেন। কবিরাজ আসেন। ডাক্তারের প্রেশক্রপশন মানিয়া, কবিরাজের পথ্য মানিয়া চলেন। তবু শরীরে জুৎ ফিরিয়া পান্ না!

বড়বাজারের ও-দিকে গাঙ্গুলিদের বাড়ী। সারদা চৌধুরী বলেন, ছেলেবেলায় ঐ গাঙ্গুলিদের মাঠে তাঁদের খেলার হাট বসিত! গাঙ্গুলিদের তারাপদ ছিলেন তাঁরি সমবয়সী···

সে তারাপদ আজ নাই। তারাপদর স্ত্রী বাঁচিয়া আছেন; আর আছে তারাপদর ছেলে শশিপদ। তাদের অবস্থা ভালো নয়। তারাপদ একটা কোলিয়ারির লীজ লইয়াছিলেন। সে কোলিয়ারিতে কয়লা ওঠে নাই। অথচ এই কোলিয়ারি রক্ষা করিতে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে সেই খনির গর্ভে! তার পর এক দিন টাকার শোকে হার্টফেল!

শশিপদ তখন বি-এ পাশ করিয়া ল' পড়িতেছিল। তারাপদর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ল' পড়া ঘুচিয়া গেল। টাকার জন্য সে আসিল কলিকাতায়। এখানে ন' মাস পয়সার জন্য সাধনা করিয়া সহসা এক দিন বর্দ্ধমানে ফিরিল। ফিরিয়া নানা দ্বারে ঘুরিয়া কোথাও দু'মাস, কোথাও ছ'মাস কাজ করে। এখন কাজের মধ্যে আছে দু'টা টুইশনি। টুইশনিতে পঁচিশ টাকা পায়। এই পঁচিশ টাকাই সংসারের নির্ভর!

বাল্যবন্ধুর ছেলে বলিয়া সারদা চৌধুরী শশিপদকে স্নেহের নজরে দেখিয়াছেন। এ বাড়ীতে শশিপদ আসা-যাওয়া করে। মধুমতীর সঙ্গে নানা আলোচনা হয়। মধুমতী গান গায়, শশিপদ বসিয়া শোনে। শশিপদ রাজ্যের খপর বহিয়া আনে, মধুমতীকে বলে। মধুমতী ছোটখাট ফরমাশ করে—সেলাইয়ের প্যাটার্ণ দেখাইয়া রেশমী সুতা চায়, শশিপদ পাঁচটা দোকান ঘুরিয়া সে সুতা কিনিয়া আনে।

এ অন্তরঙ্গতায় সারদা চৌধুরী যেন অকূলে কূল খুঁজিয়া পাইলেন! শশিপদ ছেলেটি ভালো। বন্ধুর ছেলে! যদি ইহার হাতে মধুমতীকে…? গরীব। তাহাতে কি? তাঁর যা আছে…দু'তিন লাখ…মেয়ে-জামাইয়ের কোনো দুঃখ থাকিবে না!

মাসখানেক ধরিয়া কথাটা মনে-মনে আলোচনা করিলেন। তার পর এক দিন গিয়া শশিপদর মায়ের কাছে মনের এ-কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শুনিয়া বিধবা গলিয়া গেলেন। এ-কথা ক্রমে শশিপদ ও মধুমতীর কাণে আসিয়া পৌঁছিল।

তার পর কথাটা থামিয়া রহিল। বিবাহ দিতে গেলে তার জন্য যে উদ্যোগ প্রয়োজন, সে-উদ্যোগের কোনো সাড়া নাই! সে-সাড়া তোলার মালিক সারদা চৌধুরী। কিন্তু নিত্য তাঁর নানা রোগের অভিযোগ! সে রোগের তদ্বির করিতেই দিনের পর দিন কাটিয়া যায়!

এমনি করিয়া এ-কথা-প্রচারের পর পাঁচ-সাত মাস কাটিয়া গেল।

শশিপদর মনে সুখ নাই! এ-বয়সে তরুণ মন কত স্বপ্নই রচনা করে! সে-স্বপ্ন মনের কোণে জাগিবামাত্র শশিপদ আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে! তার পিছনে যে-শত্রু লাগিয়া আছে! তারা কি না করিতে পারে! তার উপর এ-দিকে এ-স্বপ্ন জাগাইয়া সারদা চৌধুরী এমন চুপচাপ আছেন…

শশিপদ ভাবে, হয় তো খেয়াল-বশে একটা কথা বলিয়াছিলেন। সত্যই তো, তার কি আছে, যার জন্য মধুমতীর মতো মেয়েকে তার হাতে সমর্পণ করিবেন!

আপনা হইতে এ-বাড়ীতে আসা সে এক-রকম বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ভাবিল, কাঙাল-ভিখারীর মতো আসে …হয় তো মধুমতী মনে-মনে হাসে! হয় তো ভাবে, শশিপদ এমন গাধা…বাবার সে-খেয়ালকে সত্য ভাবিয়া মনে-মনে আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথে!

শ্রাবণ মাসের কথা বলিতেছি।

মধুমতীর আহ্বানে সে-দিন শশিপদ আসিল সারদা চৌধুরীর গৃহে। মুখ মলিন…মন শত-চিন্তায় জীর্ণ!

মধুমতী বলিল,—আপনার কি হয়েছে শশিবাবু, এ পথ আর মাড়ান্ না?

শশিপদ বলিল,—শরীর ভালো নেই…

হাসিয়া মধুমতী বলিল,—বাবার রোগে পেয়েছে! ছোঁয়াচ!…কিন্তু বাবার বয়স হলো প্রায় বাষট্টি বছর! আপনার বয়স কত, শুনি?

শশিপদ বলিল,—আটাশ।

মধুমতী বলিল,—আটাশ বছর বয়সে আপনার যদি এ-রোগ হয়, তাহ'লে…

মধুমতীর মুখের কথা লুফিয়া শশিপদ গভীর হতাশা-ভরে বলিল,—বেঁচে কি হবে? জানেন না তো, আমার মাথার উপর কি খাঁড়া দুলচে! সত্যি, আমার বাঁচবার ইচ্ছা একটুও নেই!

মধুমতী হাসিল, বলিল,—জীবনে হঠাৎ এমন বৈরাগ্য হ'বার মানে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শশিপদ বলিল,—গরিবের জীবনের কি সার্থকতা…বলুন? যার ভবিষ্যৎ অন্ধকার …যার কোনো দিকে কোনো আশা নেই, ভরসা নেই, কি নিয়ে সে বাঁচবে, বলতে পারেন?

মধুমতীর দু'চোখে বিস্ময়! মধুমতী বলিল,—ও… বাবাকে এ-কথা বলবো?

শশিপদ বলিল,—তাঁকে বললেই কি এর প্রতিকার হবে? তিনি তো জানেন না!…তা'ছাড়া মানুষ যে-ভাগ্য নিয়ে জন্মায় এবং তার কর্ম্মফল…কারো সাধ্য নেই, বদলে দেবে! আপনার বাবা আমার এ-দুর্ভাগ্য ঘোচাতে পারেন কখনো?

অস্ফুট আভাসে মধুমতী বলিল,—বাবা যে-কথা বলেছেন…

আর-একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শশিপদ বলিল,—আমি পাগল হইনি যে, সে-কথার উপর…মানে, আপনার সঙ্গে আমার বিবাহ হতে পারে না। অসম্ভব!…এক দিন আপনি একটা গান গেয়েছিলেন, মনে আছে?

মধুমতী কহিল,—কি গান?

শশিপদ বলিল,—সেই যে

গরবে নলিনী মনে ভাবে
আকাশ-রবিরে বুঝি পাবে।

আপনি হলেন আকাশের সূর্য্য…আর আমি মাটীর বুকে পচা-পুকুরের পদ্ম!

মধুমতী বলিল,—আজ আপনি খুব psychologist হয়েছেন, দেখছি! আমি ও-সব psychology বুঝি না।…যে-জন্য ডেকেছি, বলি। কাল বাবার জন্মদিন। বাবাকে গরদের একজোড়া ভালো ধুতি-চাদর আমি দিতে চাই। আপনি বাজার থেকে খুব সরেশ ধুতি-চাদর এনে দেবেন? চুপি-চুপি? বাবা যেন জানতে না পারেন! বুঝলেন?

মাথা নাড়িয়া শশিপদ জানাইল, বুঝিয়াছে!

মধুমতী বলিল,—একটু বসুন। আমি টাকা এনে দি।…পঞ্চাশ টাকায় হবে?

শশিপদ বলিল,—হবে।

মধুমতী গেল টাকা আনিতে। শশিপদ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।…

মনের উপর রাজ্যের কলরব সুরু হইল। কা'রা যেন তার মনটাকে লইয়া ফুটবল খেলিতেছে! মধুমতী যেন গোল! এক দল রুখিয়া মনটাকে পাশ্ করিতে করিতে মধুমতীর সামনে আনিয়া শূট্ করিতে উদ্যত, অমনি আর-এক দল জোর-কিকে সে-মনকে ছুড়িয়া হাফ্-গ্রাউণ্ডের ও-দিকে আছড়াইয়া ফেলে!

সারদা চৌধুরী ঘরে আসিলেন, বলিলেন,—শশিপদ…

সসম্ভ্রমে উঠিয়া শশিপদ কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ…

সারদা চৌধুরী কহিলেন,—এই বটকেষ্ট-কবিরাজটি কিছু নয়! আমাকে দিলে অমৃত-রসায়ন…খেয়ে আমার রোজ অম্বল হচ্ছে। এ উপসর্গ আগে ছিল না…

শশিপদ বলিল,—তাহ'লে ওষুধটা ছেড়ে দিন।

সারদা চৌধুরী বলিলেন,—ছেড়ে দিন্! ছেড়ে দিন্ বললেই হলো অমনি! ছেড়ে দিয়ে তার পর? ওটা ছেড়ে আর একটা অন্য রসায়ন ধরতে হবে তো! সে রসায়নের জন্য কার কাছে যাবো, শুনি?

শশিপদ সমস্যায় পড়িল। নিজের যে-সমস্যা আছে, সে বড় সহজ সমস্যা নয়! তার উপর এই রসায়নের সমস্যা! এ আরো গভীর…

সে কোনো জবাব দিল না।

সারদা চৌধুরী বলিলেন,—হুঁ:…উপায় বলতে পারলে না তো! এইটে হয়েছে আরো বড় সমস্যা! কার সঙ্গে পরামর্শ করবো, এমন একটি লোক দেশে নেই! নাঃ, চিকিৎসা-বিভ্রাটেই মারা যাবো, দেখছি!

উত্তরের প্রত্যাশামাত্র না করিয়া প্রকাণ্ড একটা উদ্গার তুলিয়া সারদা চৌধুরী চলিয়া গেলেন।

শশিপদ হতভম্বের মতো বসিয়া রহিল। চোখের সামনে আলোর ক্ষীণ রশ্মিটুকু যেন নিবিয়া গেল! মনে হইল, যদি-বা কিছু আশা থাকিত, ঐ যে উনি বলিলেন, পরামর্শ করিব কার সঙ্গে, এমন লোক দেশে নাই! হয় তো এই জন্যই…

সত্যই তো…অভাব নাই! রাজা মানুষ! টাকা দিলে কত বুদ্ধিমান লোক আসিয়া জামাতৃ-পদ অলঙ্কৃত করিবে…পরামর্শ দিয়া সারদা চৌধুরীর সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে!

নিজের উপর রাগ হইল। এ সমস্যা-সমাধানের উপায় সে বলিয়া দিতে পারে না, এমন গর্দ্দভ!

গভীর ভাবে শশিপদ চিন্তা করিতে লাগিল…চিন্তার ফলে মনে হইল, ঠিক, বটকেষ্ট কবিরাজকে ছাড়িয়া যদি… ঐ শ্যাম-সায়রের কাছে আছেন জীবনবন্ধু কবিরাজ, তাঁকে …তাঁর নামটা অনায়াসে করিতে পারিত তো! এখন…

না ছুটিয়া গিয়া এ-নামটা এখন বলা চলে না… আচ্ছা, আর এক সময় না হয়…

মধুমতী আসিল। দশ টাকার পাঁচখানা নোট শশি-পদর হাতে দিয়া মধুমতী বলিল,—আমি তাহ'লে নিশ্চিন্ত রইলুম?

শশিপদ কহিল,—হ্যাঁ…

মধুমতী কহিল,—বাবা যেন জানতে না পারেন…

—না, না। জানতে পারবেন না।

মধুমতী বলিল,—আর কাল রাত্রে এখানে আপনার নেমন্তন্ন রইলো…বুঝলেন?

মাথা নাড়িয়া শশিপদ জানাইল, বুঝিয়াছে!

মধুমতী কহিল,—ধুতি-চাদর কখন পাবো?

একটু ভাবিয়া শশিপদ বলিল,—যদি রাত সাড়ে ন'টায় আনি?

ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া মধুমতী বলিল—রাত সাড়ে ন'টা ?

শশিপদ বলিল,—মানে, এখন বেলা চারটে। পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত একটা টুইশনি আছে, আর-একটা আছে সাতটা থেকে ন'টা। তাই ··মানে ··

মধুমতী বলিল,—ও···বেশ !

শশিপদ বলিল,—আপনার কোনো অসুবিধা হবে ?

—না, না ! অসুবিধা কিসের !

রাত্রি ন'টা বাজিয়া গিয়াছে।

একতলার বসিবার ঘরে মধুমতী বসিয়া রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ পড়িতেছিল।

সারদা চৌধুরী আসিয়া বলিলেন,—কাল রাত্রে মোটে ঘুমোতে পারিনি ! মনে করছি, শুতে যাবার আগে আজ খুব খানিকটা ঘুরে আসি।

মধুমতী বলিল,—কোথায় ঘুরে আসবে, শুনি ? সারা দিন বৃষ্টি হয়েছে···পথে জল-কাদা ! তা'ছাড়া এই অন্ধকার রাত্রি !

সারদা চৌধুরী বলিলেন,—বৃষ্টি ছেড়ে গেছে। না হয় বর্ষাতি-কোট সঙ্গে নেবো, হাতে থাকবে লাঠি···

মধুমতী বলিল,—লণ্ঠন নিয়ে রঘুয়া সঙ্গে যাক !

সারদা চৌধুরী বলিলেন,—না, না। ওরা খাচ্ছে-দাচ্ছে। তা'ছাড়া নানা ফাই-ফরমাশে সারা-দিন একটু বিশ্রাম করতে পায় না।···কোনো ভয় নেই মা। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে আসবো।

মধুমতী বলিলেন,—দেরী করো না। দেরী হ'লে আমি খুব ভাববো। তা'ছাড়া ডাক্তার-বাবু কি ব'লে গেছেন, মনে আছে ? খেয়ে দশটায় শুতে হবে।

সারদা চৌধুরী বলিলেন,—শুয়ে কি অস্বস্তি ভোগ করি, তা যদি বুঝতিস্ মা ! নিত্য-দিন এমন অনিদ্রা···

মধুমতী বলিল,—আমায় ডাকো না কেন ?

নিশ্বাস ফেলিয়া সারদা চৌধুরী বলিলেন,—আমাকে নিয়ে কত দুর্ভোগ তোকে সইতে হয় ! রাত্রে যদি ঘুমোতে না পাস্, তাহ'লে বাঁচবি কেন মা ? ভাবছি, আজ দেখি, ডাক্তাররা যে বলে ঘুমোবার আগে খানিকটা বেড়ানো···তাদের এ-কথা সত্য কি না !

সারদা চৌধুরী চলিয়া যাইতেছিলেন, মধুমতী দাঁড়াইয়া ছিল···সারদা চৌধুরী ফিরিলেন। ফিরিয়া মেয়েকে বুকে চাপিয়া তার ললাটে চুম্বন করিলেন ; তার পর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন।

মধুমতী খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল···নিস্পন্দের মতো ! তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া যোগাযোগের পাতায় মন দিল।

খানিকক্ষণ পড়িল। তার পর কি যে হইল ! চোখের দৃষ্টি বইয়ের লাইন ধরিয়া চলিয়াছে, মন কিন্তু সে-লাইনের ধার ঘেঁসিতে চায় না ! একখানা পাতা খুলিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিল, খেয়াল নাই !

হঠাৎ খেয়াল হইল ! খেয়াল হইতে ঘড়ির দিকে চাহিল, সর্ব্বনাশ ! বারোটা বাজিয়া গিয়াছে বাবা ?

ফেরেন নাই !

সাড়ে ন'টায় শশিপদর আসিবার কথা ! তারই বা কি হইল ?

দারুণ অস্বস্তি বুকে লইয়া আরো আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

পথে একটা শব্দ···ছুটিয়া মধুমতী বারান্দায় আসিল। কেহ নয় ! চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার ! গাছপালাগুলো এ অন্ধকারে যেন গায়ে-গায়ে জমাট বাঁধিয়া কিসের ষড়যন্ত্র করিতেছে ! মধুমতীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল ! এ অন্ধকারের পানে কত দিন চাহিয়াছে···এ-অন্ধকারকে এমন ভয় করে নাই ! আজ এ-অন্ধকারের যেন আর-এক মূর্ত্তি ! দারুণ ভয়ঙ্কর !

মধুমতী রঘুয়াকে ডাকিল···দরোয়ানকে ডাকিল। ডাকিয়া বলিল,—বাবু ?

তারা চমকিয়া উঠিল, কহিল,—বাবু !

মধুমতী বলিল,—হ্যাঁ। ন'টায় তিনি বেরিয়েছেন। বললেন, একটু ঘুরে আসি। রাত একটা বেজে গেল··· বাবুর দেখা নেই !

তারা বলিল,—কোথায় গেছেন ?

মধুমতী বলিল,—তোমরা বেরিয়ে ছাখো···

লণ্ঠন লইয়া টর্চ্চ লইয়া ভৃত্যেরা পথে বাহির হইল।

দু'চোখে জলের ধারা…মধুমতী প্রাণপণে ডাকিতে লাগিল—ঠাকুর…ঠাকুর!…

তিনটা বাজিল। চারিটা বাজিল…তার পর পাঁচটা! অন্ধকার চিরিয়া ফাঁকে-ফাঁকে আলোর রশ্মি!

মধুমতী পুলিশে খপর পাঠাইল।

সাতটার সময় চূড়ান্ত খপর মিলিল।

শ্যাম-সায়রের কাছে একটা ঝোপের ধারে সারদা চৌধুরীর লাশ পাওয়া গেছে। মাথায়-গায়ে বন্দুকের গুলী…মাথা ফাটিয়া গিয়াছে! দেহ রক্তে রক্তময়! বহু সন্ধানে পুলিশ বন্দুক বা পিস্তল পাইল না।

সকলকে ডাকিয়া পুলিশ নানা প্রশ্ন করিল। রহস্য ক্রমে নিবিড় হইয়া উঠিল।

শশিপদ?

মধুমতীর কাছে পুলিশ শুনিয়াছে, এ-বাড়ীতে শশিপদর আসিবার কথা রাত সাড়ে ন'টায়।

শশিপদ বলিল,—সাড়ে ন'টার একটু আগে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাইসিক্‌ল্ চড়িয়া শশিপদ বাহির হইয়াছিল সারদা চৌধুরীর গৃহের পথে। শ্যাম-সায়রের একটু দূরে আসিয়াছে, এমন সময় তীব্র আলোক-ছটা বিস্তার করিয়া পিছন হইতে নক্ষত্রবেগে একখানা মোটর আসিয়া পড়ে! চাপা পড়িবার ভয়ে সে একধারে সরিয়া দাঁড়ায়! তবু মোটরের ধাক্কা রোধ করিতে পারে নাই। সে-ধাক্কায় বাইসিক্‌ল্-সমেত পাশের নালায় সে ছিটকাইয়া পড়িয়া যায়! সে-ধাক্কায় তার সাইক্‌ল্ বাঁকিয়া গিয়াছে…গা ছড়িয়া গিয়াছে…বাইসিক্‌লের পাম্প ও ল্যাম্প খুঁজিয়া পায় নাই…কাপড়-জামা পাঁকে ঘা হইয়াছে…

পুলিশ দেখিল, বাইসিক্‌ল্ বাঁকিয়া গিয়াছে…সারা গায়ে ছড়া দাগ…কাপড়-জামা পাঁকে-কাদায় কদর্য্য! নালার মধ্যে মিলিল বাইসিক্‌লের ল্যাম্প এবং পাম্প! তার উপর পথের কাদায় মোটরের চাকার তাজা দাগ! তাহা হইলে শশিপদর কথা সত্য!

কিন্তু সাড়ে ন'টায় তার যাইবার কথা সারদা চৌধুরীর বাড়ী। মোটরের ধাক্কায় হাত-পা ভাঙ্গে নাই…তার পর সেখানে গেল না কেন?

শশিপদ বলিল,—কাদা-পাঁক-মাখা জামা-কাপড়ে যেতে পারি না তো! তাই বাড়ী এলুম। এসে চান ক'রে জামা-কাপড় বদলাতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেল। অত রাত্রে যাব্বো, তাই যাইনি! আজ সকালে যাবো ব'লে বেরুচ্ছি, এমন সময় যে-খপর শুনলুম…

আরো এক জন সাক্ষী পাওয়া গেল, সুদাম মিস্ত্রী। সে গিয়াছিল তালাগুতে…ফিরিতে ন'টা বাজিয়া যায়। শ্যাম-সায়রের পথে আসিতেছিল। একখানা মোটর সে দেখিয়াছিল। গাড়ী হইতে তিন জন ছোকরা-বাবু নামিল। তার পর ঝোপের ধারে বন্দুকের গুলীর শব্দ…তিন-চারটি শব্দ! গুলীর শব্দ শুনিয়া ভয়ে সে নালায় নামিয়া কোনো মতে…

মহা-সমারোহে পুলিশ তদারক জুড়িয়া দিল। মধুমতী রহিল বাড়ীতে পড়িয়া…একা…জীর্ণ মলিন লতার মতো!

পাড়ায়-পাড়ায় জনরব উঠিল—নিশ্চয় ঐ শশিপদর কাজ!

এক দল বলিল,—জানে, বুড়া মরিলে রাজ্য আর রাজকন্যা তা'র হইবে!

আর এক দল বলিল,—কিন্তু বুড়া নিজেই তা'কে জামাই করিবে বলিয়াছিল। রাজার আদরে থাকিবে! বুড়াকে মারিবার হেতু?

প্রথম দল বলিল,—কবে রাজ্য-ভোগ করিবে! তার চেয়ে নিষ্কণ্টক হইতে পারিলে রাত পোহাইতে না পোহাইতে…

শেষের দল বলিল,—কিন্তু বুড়া মরিলে বিবাহে বিলম্ব। বুড়াকে মারিলে বিবাহে নানা বিপত্তি! যদি ধরা পড়ে…

প্রথম দল বলিল,—বিবাহের সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কি আছে! এ-কালের মেয়ে মধুমতী…লেখাপড়া শিখিয়াছে…গান গায়! লভ্ গো লভ্! বিশ-বছরের ধাড়ি মেয়ে!

শেষের দল বলিল,—এখন যে দু'জনে মুখ-দেখাদেখি নাই!

প্রথম দল বলিল,—দোষ যদি না করিবে, শশিপদর ও-বাড়ীতে যাইতে কি বাধা, বলো তো বাপু?

এ-কথায় উত্তর দিতে না পারিয়া শেষের দল নিরুত্তরে শুধু মাথা চুলকাইল!

আমার কথা

আমি তখন বর্দ্ধমানে চাকরি করি,—পুলিশ-আফিসে কেরাণী।

বাঙলা ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাড়া অন্য বই পড়ি না! ব্লেকের গল্প পড়ি···রোমারের গল্প···শীমার্ক পড়ি! মন বলে, একটা সুযোগ যদি পাই, ধাঁ করিয়া কেরাণীগিরি ছাড়িয়া একদম্ ডিটেকটিভ···

এক-একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়িয়া তিন দিন ধরিয়া স্বপ্ন দেখি! বাঙলা দেশটা যদি প্যারিস কি লণ্ডন হইয়া যায়? স্ত্রী-পুরুষমাত্রেই দারুণ ফন্দীবাজ হইয়া ওঠে? মেষের চর্ম্ম আঁটিয়া নানা অভিসন্ধি বুকে লইয়া পরস্পরে পরস্পরের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়···আর আমি তাদের সে-অভিসন্ধি ফাঁশাইয়া সে মেষ-চর্ম্মের অন্তরাল হইতে আসল দৈত্যগুলাকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করি···

সারদা চৌধুরীর হত্যার কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত আমার মন বলিতেছিল,—নিশ্চয় ঐ শশিপদ!

কিন্তু কেন সে খুন করিবে?

মন বলিল,—বাঃ! কেন করিবে না, আগে সে কথার জবাব দাও।

এ কেমন আব্দার! কেন খুন করিবে, এ-কথার উত্তর আগে···

মন বলিল,—না! এটাই তো psychology···দুরূহ জটিল psychology···

আফিসের বাঁধা-টাইমটায় বসিয়া কলম পিষি; পিষিয়া বাড়ী ফিরি। বাড়ী ফিরিয়া যে-সব ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়া হইয়াছে, সেগুলার পাতা উল্টাইয়া বুদ্ধি সংগ্রহ করি!

খুনের প্রায় বারো দিন পরে হঠাৎ বুদ্ধি মিলিল। খুনের সব বইগুলাতেই দেখি একটা কথা লেখা আছে! সে-কথা, যেখানে খুন হয়, খুনীকে সেখানে আসিতেই হইবে···খুনের সাইকলজি!

রাত্রি তখন ন'টা! তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাহির হইলাম। টিপ্-টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। একটা ছাতা লইলাম। গৃহিণী বলিলেন,—এই বৃষ্টিতে কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি? ভূধর বাবুর ওখানে তাসের আড্ডায়?

বলিলাম,—না গো না,···বেরুচ্ছি আফিসের কাজে।

গৃহিণী বলিলেন,—রাত্তিরে কেরাণীর আবার আফিসের কি কাজ, শুনি?

বলিলাম,—তা যদি বুঝতে, তাহ'লে শাড়ী প'রে আমি রান্না করতুম, আর কোঁচা দুলিয়ে তুমি যেতে অফিসে কলম পিষতে।

কথাটা বলিয়া সরিয়া পড়িলাম। জানি, স্ত্রী-জাতির সহিত তর্ক বাধিলে সে-তর্কের শেষ জীবনে হয় না!

আসিলাম সোজা সেই ঝোপের পাশে যেখানে সারদা চৌধুরীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল।

জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই! সে-রাত্রির পর হইতে সন্ধ্যা হইলে এ-পথে মানুষ চলে না।

গা ছমছম্ করিতেছিল। যে-ভয়ের কথা এত কাল মনে জাগে নাই, সে ভয়···

মনে হইল, বৃষ্টি-পড়ার শব্দের ফাঁকে-ফাঁকে যেন কা'র হা-হা নিশ্বাস···কাণে শুনিলাম পায়ের ধ্বনি! বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো সশব্দে দুলিতে লাগিল! উৎকর্ণ রহিলাম···নিস্পন্দ···নিথর···

পায়ের শব্দ স্পষ্ট! জল ঠেলিয়া চলিলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি···

কল্পনা নয়···সত্যকার শব্দ!···হঠাৎ দেখি, একটা আলোর রশ্মি চক্রাকারে ঘুরিয়া ফিরিতেছে! নিশ্চয় এ টর্চ্চের আলো!

সে-আলো লক্ষ্য করিয়া দেখি, ঝোপের পাশে নালায় এক জন মানুষ···

আলোয় চিনিলাম···

শশিপদ! চোরের মতো যেন কি সন্ধান করিতেছে!

আমি তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলাম··নিশ্চল···নিথর! বুকের মধ্যে শব্দ ধ্বক্-ধ্বক্ ধ্বক্-ধ্বক্ ধ্বক্-ধ্বক্ তার বিরাম নাই!

কতক্ষণ কাটিল বলিতে পারি না··

টর্চ্চের আলো নালার উপরে…শেষে আমার সামনে…

বলিলাম,—কে ?

শশিপদ চমকিয়া উঠিল ! তার হাতে কি ছিল, লুকাইল।

আমি কহিলাম,—শশিপদ বাবু !

কম্পিত স্খলিত স্বরে শশিপদ বলিল,—হ্যাঁ।

— এখানে কি করছিলেন ? এত রাত্রে ?

শশিপদ বলিল,—কিছু না।

কহিলাম,—বলুন !

শশিপদ নীরব !

আমি বলিলাম,—আপনার হাতে ওটা…?

শশিপদ বলিল,—রিভলভার !

আমি বলিলাম,—রিভলভার-শুদ্ধ যদি পুলিশের হাতে আপনাকে ধরিয়ে দি ?

শশিপদ বলিল,—তা'তে খুনের কিনারা হবে না। তবে একটি ভদ্র-মহিলার মৃত্যু হ'তে পারে !

চমকিয়া উঠিলাম !

কহিলাম,—আমাকে বলবেন ?

শশিপদ বলিল,—কাকেও বলবো না, ভেবেছিলুম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখেছেন, তখন বলা উচিত। …বলবো। কিন্তু কোথায় ব'সে শুনবেন ?

কহিলাম,—বৃষ্টি থেমেছে। চলুন ঐ ফাঁকা বেঞ্চে…

—বেশ !

একটা বেঞ্চে বসিলাম। শশিপদ বসিল।

শশিপদ বলিল,—এ রিভলভার কার, জানেন ? সারদা বাবুর। তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তা জানেন ? এবং এ-আত্মহত্যার কথা প্রকাশ হ'লে তাঁর মেয়ে…

একটা নিশ্বাস সে রোধ করিতে পারিল না।

শশিপদ বলিল,—আমার বাবা মারা যাবার পর চাকরির সন্ধানে কলকাতায় গিয়েছিলুম। সেখানে আমার দু'টি বন্ধুর পাল্লায় পড়ি। তা'রা বললে, চাকরি দেবো। তাদের সঙ্গে রইলুম। শেষে দেখি, তারা ডাকাতি করে। তারা বলতো, পলিটিকাল ডাকাতি ! নিগ্রহে তাদের মমতা ছিল না ! আমি কাঁটা হয়ে থাকতুম ! এক দিন এমনি এক ব্যাপারে আমাকে সঙ্গী করতে চাইলো ! অর্থাৎ তাদের সঙ্গে ডাকাতি করতে যেতে হবে। আমি বললুম, না। তা'রা বললে, তাদের গুপ্ত-কথা জেনে যদি তাদের কাজে যোগ না দিই, যদি পালাই, তাহ'লে তা'রা আমার প্রাণ নেবে ! কোনো মতে নিজেকে তখন সম্বৃত রাখি। তার পর প্রথম-সুযোগ পাবামাত্র সরে পড়লুম। পালিয়ে এখানে আসি। ভেবেছিলুম নিরাপদ হয়েছি ! তা'রা জানে না আমার বাড়ী কোথায়, দেশ কোথায় ! মাস-খানেক আগে হঠাৎ একখানা উড়ো-চিঠি পাই। তাতে লেখা ছিল, আর এক মাস মাত্র তোমার পরমায়ু ! তোমার সন্ধান পেয়েছি। বিশ্বাস-ঘাতকের জীবনের কোনো মূল্য নেই !

চমকিয়া উঠিলাম ! বলিলাম,—সত্যি ?

শশিপদ বলিল,—সে চিঠি আমার কাছে আছে।

কহিলাম,—তার পর ?

শশিপদ বলিল,—কোথাও বেরুতুম না। সারদা বাবুর বাড়ীতেও না। সে-দিন আমাকে সারদা বাবুর মেয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন…তাই গিয়েছিলুম।

তার পর সাড়ে ন'টায় আমার যাবার কথা। যাবার জন্য বেরিয়েছি, পিছনে মোটরের আলো ! পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালুম। তবু ধাক্কা বাঁচলো না। খানায় পড়ে গেলুম। গাড়ীখানা একটু আগে থামলো। তার পর গাড়ী থেকে তিন জন লোক নামলো। গাড়ীর আলোয় তাদের চিনলুম …দাশু, মদন আর খলিল। এ-দিকে ও-দিকে তারা খোঁজ করলো ! নিঃশব্দে হামা দিয়ে নালা টোপকে ও-দিকে গিয়ে আমি মাঠে লুকোলুম ! তার পর বন্দুকের গুলীর শব্দ শুনলুম…পাঁচ-ছটা। চমকে উঠলুম ! তার একটু পরেই গাড়ী-চলার শব্দ। সে-শব্দ মিলিয়ে গেল ! তার পর আমি বাড়ী ফিরি।

আমি কহিলাম,—কিন্তু সারদা বাবুর আত্মহত্যা…

শশিপদ বলিল,—মাঝে মাঝে তিনি বলতেন, এ-রোগ থেকে যখন মুক্তি নেই, তখন কি মনে হয় জানো, মাথায় একটি রিভলভার-শট্…ব্যস্ ! তাঁর অসুখ ছিল, নিউরাসথেনিয়া ! তদারকে পুলিশ জানতে পেরেছে, শুধু বন্দুকের গুলী নয়, সেই সঙ্গে রিভলভারের গুলীও ছিল।

তখন থেকে আমি ভাবছি…সে-রিভলভার কোথা গেল ?……আমার বিশ্বাস, ঝোপের দিকে আমি গেছি

ভেবে ঝোপ তাগ্ ক'রে ওরা বন্দুক ছুড়েছিল!' হয় তো সারদা বাবুকে ভেবেছিল, আমি!

বলিলাম,—নালায় রিভলভার এলো কি ক'রে?

শশিপদ একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল,—দাশুরা গাড়ী ক'রে চলে গেলে আমি এসেছিলুম ঝোপের পাশে। পথের উপর ঝোপের ধারে রিভলভারটা আমার পায়ে ঠেকেছিল। জুতোর ঠোক্কর মেরে আমিই সে-রিভলভার নালায় ফেলে দি! তখন সারদা বাবুর কথা মনে হয়নি। ভেবেছিলুম, রিভলভারের জন্য ওরা যদি ধরা পড়ে…কে জানে, হয় তো আমার নামও করবে…আমিও তাহ'লে মরবো! যারা আমার প্রাণ নেবে ব'লে এত দূরে তেড়ে এসেছে…তারা কি না করতে পারে, বলুন?

যেন রীতিমত নভেল!

আমার মাথার মধ্যে স্তবকে-স্তবকে কল্পনার ফুল ফুটিতে লাগিল…

এ ঘটনা লইয়া যদি লিখিতে পারি…দেড়শো পাতার একখানা ডিটেকটিভ নভেল!

শশিপদ বলিল,—আজ পর্য্যন্ত সারদা বাবুর বাড়ী যাইনি! তার কারণ, মধুমতীকে কি বলবো?…কোনো দিন যদি বিয়ের কথা ওঠে…কি ক'রে বলবো, হাঁ? যে পণ নিয়ে এরা আমার পিছনে ঘুরছে…মারবেই। নিজের জন্য ভাবি না…কিন্তু মধুমতী…

সমস্যা!

বলিলাম,—কি করবেন?

শশিপদ বলিল,—এ-কথা কাকেও বলবেন না দয়া ক'রে! মধুমতী আমাকে তিন-চারখানি চিঠি লিখেছে। লিখেছে, একা…আর পারি'না! লিখেছে, এসো…এ-শোক আর সহ্য করতে পারছি না…। ভাবছি…যাবো…দেখা করবো,…এবং বিবাহও! কিন্তু এখনে নয়! এখান থেকে চলে যাবো…বোম্বাই…মাদ্রাজ…বর্ম্মা। তাহ'লে এরা আমার সন্ধান পাবে না…

এ ঘটনার ছ'মাস পরে শশিপদর সঙ্গে মধুমতীর বিবাহ…

বর্দ্ধমানে নয়, আগ্রায়। শশিপদ আমাকে চিঠি লিখিয়াছিল, বিবাহে যাইবার জন্য।

যাওয়া হয় নাই…আফিসে ছুটী মিলে নাই, তার উপর রেলের ভাড়া সামান্য নয়! আমি তাকে লিখিয়াছিলাম—নাম-ধাম গোপন রাখিয়া যদি এ কাহিনী…

শশিপদ জবাব দিয়াছিল, পাঁচ বৎসর পরে। তার আগে নয়! আমার স্ত্রীকে আমি এ-কথা বুঝাইয়া বলিব। তার পর…

সে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এত দিনে শশিপদ সারদা চৌধুরীর মৃত্যু-রহস্যের কথা মধুমতীকে নিশ্চয় বলিয়াছে…এবং এখন এ-কাহিনী যদি লিখি…

লিখিবার কারণ, ডিটেকটিভ-নভেল লিখিলে এ হত্যার দায় শশিপদর মাথায় চাপাইয়া প্লটটাকে খাশা জমাইয়া দিতে পারিতাম! কিন্তু বাস্তব জীবনে তা তো ঘটে নাই!

হয় তো ডিটেকটিভ উপন্যাসের পাঠক-পাঠিকারা বিরক্ত হইবেন। বলিবেন, নাই বা এ-কাহিনী লিখিতে বাপু! এ-কাহিনীর বদলে বেশ একটা রোমাণ্টিক গল্প…

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মানসী

আমার মানস-লক্ষ্মী চিরদিন দূরে রহ তুমি,
অশ্রান্ত জীবন দোলে জীবনের তটভূমি চুমি'।
আঘাতে আঘাতে মোর বক্ষখানি কর আন্দোলিত,
আলোর বন্যায় মোর জীবনেরে কর আলোড়িত,
তোমার আলোক-পাতে—আমার এ হৃদি-কক্ষ মাচি',
দু'বাহু বাড়ায়ে শুধু তোমারেই ফিরিতেছে যাচি'!

ঊর্ম্মিতে ঊর্ম্মিতে মোর উচ্ছ্বসিত অশান্ত হৃদয়,
মথিয়া এ বক্ষ-সিন্ধু দিবে মোর প্রাণ-পরিচয়।
পূর্ণিমার রূপে তুমি হে মানসী, কল্যাণী আমার!
চিরদিন উদ্বেলিয়া তোল এই হৃদি-পারাবার!
তুমি ত দিলে-না ধরা শুধু তব ছায়া অনিবার,
শতরূপে জীবনেতে বরষিছে সুধার পাথার!

পূর্ণরূপে ধরা কভু দেয় নাই মানসী তাহার,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভক্ত তাই কাঁদে বার বার!

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার (বি-এল)

কংগ্রেস ও সরকার

বৃটিশ কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে ভারত-সচিব মিঃ আমেরী বলেন, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় নেতাদিগের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহা গ্রাহ্য করেন নাই ; কিন্তু মুস্লিম লীগ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হইলেও তিনি কংগ্রেসের নিকট আর কোন নূতন প্রস্তাব করিবেন না।

ভারত-সচিবের এই উক্তি হইতে বুঝা গিয়াছিল, বৃটিশ-সরকারের পরিচালকবর্গ আর কংগ্রেসের কোন তোয়াক্কা রাখিবেন না। তাঁহারা মুস্লিম লীগের সহিতই গাঁটছড়া বাঁধিয়া চলিবেন। এই ব্যাপারে গান্ধীজী পর্য্যন্ত যেন একটু বিচলিত হইয়াছেন। তিনি লণ্ডনের 'নিউজ ক্রনিকল্' নামক পত্রিকা-মারফত বলিয়াছেন, "ভারত-সচিব বড়লাটের যে উক্তির প্রসঙ্গাবলম্বনে উক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা বড়ই বেদনাদায়ক। ইহার ফলে কংগ্রেসের সহিত বৃটিশ জাতির ব্যবধান বাড়িয়া গেল।" কংগ্রেসের বাহিরে যে সকল চিন্তাশীল ভারতবাসী আছেন, তাঁহারা-পর্য্যন্ত বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই। উদারনীতিক দল ধীরপন্থী বলিয়াই পরিচিত। তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন না,--চাহেন কেবল-মাত্র ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন। গত ভাদ্র মাসে তাঁহারা প্রয়াগে ডক্টর আর, জি, পরাঞ্জপেকে সভাপতি করিয়া এক জরুরী বৈঠক বসাইয়াছিলেন। সেই বৈঠকে তাঁহারা বড়লাটের প্রস্তাব এবং তদুপরি ভারত-সচিবের মন্তব্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহাদের সুদীর্ঘ মন্তব্যের মর্ম্ম এই যে, উহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, "সংখ্যাল্প সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে কথা বড়লাটের ও ভারত সরকারের উক্তিতে বলা হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিতে গেলে ভারতের রাজনীতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করা হইবে।" ছোট-বড় সকল রাজনীতিক সম্প্রদায়কে একমতে আনিয়া শাসনযন্ত্র রচনা কাহারো পক্ষেও সম্ভব হইতে পারে না ; ভারতবাসী যে তাহা বুঝে না, তত নির্ব্বোধ তাহারা নহে। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা অবধারণের জন্য কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বোম্বাইয়ে এক বৈঠক বসাইয়াছিলেন। এই বৈঠকে বিভিন্ন বক্তার উক্তিতে প্রকাশ, তাঁহারা সার্ব্বজনীন ভাবে আইন অমান্য চালাইতে চাহেন। যাহা হউক, অনেক চিন্তার পর স্থির হইয়াছে, সার্ব্বজনীন ভাবে আইন-অমান্য পরিচালন করা হইবে না ; গান্ধীজীকে অগ্রণী করিয়াই কংগ্রেস কার্য্য করিয়া যাইবে।

গান্ধীজী কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, বাহাত্তুরে হইয়া আবার তাহা মাথা পাতিয়া লইলেন। তবে সর্ত্ত এই যে, সকল কংগ্রেস-ওয়ালাকে তাঁহার আদেশ অবিলম্বে (বিনা প্রতিবাদে ?) মানিয়া লইতে হইবে। ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কারণ, এই ব্যাপারে কংগ্রেসের মধ্যে যে দুই-চারি জন চপলমতি লোক আছেন, তাঁহাদিগকেও কাবু হইয়া চলিতে হইবে। গান্ধীজীও বড়লাটের সহিত আর একবার দেখা করিতে আসিয়াছেন। দেখা হইল বটে, ফল কিন্তু 'নিহিতং গুহায়াম্!'

ভাদ্র মাসে শিরে-সংক্রান্তি করিয়া কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন, যুদ্ধে যোগদান সম্বন্ধে গান্ধীজী বড়লাটের সহিত আলাপ করিবেন। তাহার পর, বড়লাট যাহা বলেন, তৎসম্বন্ধে বিবেচনার জন্য ওয়ার্দ্ধায় আবার কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক বসিতে পারে, না-ও পারে। মৌলানা আজাদ ইহাও বলিয়াছেন, গান্ধীজীর হাতে যখন সকল ক্ষমতাই ন্যস্ত, তখন আর কার্য্যকরী সমিতির বৈঠক বসাইবার প্রয়োজন হইবে না।

বীমা আইনের সংস্কার

ভারত সরকার বীমা আইনের আর এক দফা সংস্কার করিয়াছেন। সরকারের খেয়ালের বিষয় অনেক আছে, কিন্তু এটি তাহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, ইহার উপর দেশের বহু লোকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। এইবার এই আইনের সংস্কার

করিলে ঐ কার্য্যটি বার-বার তিন-বার হইবে; তবে এক মুরগী দুই-বারই জবাই করিবার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে বীমা-সম্পর্কিত সংশোধিত আইন আমলে আসিয়াছে। তাহার পর এক বৎসর না যাইতেই আবার এই আইনের সংশোধনের প্রয়োজন অনুভূত হইল! সমাজের কল্যাণের সহিত এই আইনটির অত্যন্ত নিকট-সম্বন্ধ; সুতরাং সমাজের অবস্থা ভালরূপ না জানিয়া ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে গেলেই হিতে বিপরীত হইবে।

অল্প দিন পূর্ব্বে আইনটির যে নতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে,—তাহার ফল কিছু দিন দেখা আবশ্যক। যে তিনটি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা এই—(১) ম্যানেজিং এজেন্সি-রাহিত্য। (২) এজেন্টদিগের কমিশন হ্রাস, এবং লাইসেন্স গ্রহণ; আর (৩) তৃতীয়তঃ, বীমা কোম্পানীর অর্থনিয়োগ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা। এই তিনটি ব্যবস্থার ফলেই দেশীয় বীমা কোম্পানীর ক্ষতি হইবে বলিয়া অনেকেই আপত্তি করিয়াছেন। আগামী ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখের পর ম্যানেজিং এজেন্সির খতম। অথচ এই ম্যানেজিং এজেন্সির চেষ্টাতেই বহু বীমা কোম্পানী বড় হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে পরিহার করা সঙ্গত হইবে না। কর্ত্তারা সে আপত্তি কাণেই তুলেন নাই।

ম্যানেজিং এজেন্টদিগকে বিদায় দান করা হইবে, অথচ তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না—ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। গরিব এজেন্টদিগের উপর আর এক দফা কোপ পড়িবে! প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক এজেন্টের আনীত 'কেস' হইতে এক বৎসর যে প্রিমিয়াম আদায় হইবে, তাহার শতকরা ৪০ ভাগের অধিক কমিশন কোন এজেন্টকে দেওয়া হইবে না। আইন করিয়া পারিশ্রমিকের নিম্নতম হার ধার্য্য করাই রীতি। উচ্চতম হার কোন ক্ষেত্রে আইন করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। অথচ এই ক্ষেত্রেই কেবল এইরূপ উল্টা ব্যবস্থা করিবার কথা হইতেছে যে, বীমা কোম্পানীর তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ টাকা সরকারী এবং আধা-সরকারী সিকিউরিটিতে ন্যস্ত করিতে হইবে। ক্ষেত্রবিশেষে আরও অধিক টাকা ঐভাবে ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থাও হইবে। অনেক বীমা কোম্পানীর তহবিলের টাকা দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য নিয়োজিত হইত; ঐরূপ ব্যবস্থা করিলে তাহা আর হইবে না। দেশীয় বীমা কোম্পানীর উপর সরকারের এই নেক-নজর দর্শনে অনেকেই বিস্মিত! এ দেশে ধীরে ধীরে বীমার কাজ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সরকার যে ভাবে বীমা আইনের সংশোধন করিতেছেন,—তাহাতে এ দেশে বীমার কাজ চালাইয়া-উঠা কঠিন হইবে বলিয়া অনেকেরই আশঙ্কা। এখন শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার জন্য সকলকেই প্রতীক্ষা করিতে হইতেছে।

সমবায় আইনের পাণ্ডুলিপি

গত ৩রা আশ্বিন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ সমবায় ঋণ-দান আইনটির পাণ্ডুলিপিখানি পাশ করিয়া দিয়াছেন। বিলখানি সম্বন্ধে যে সকল ন্যায়সঙ্গত আপত্তি করা হইয়াছিল, তাহার একটি আপত্তিও টিকে নাই। রেজিষ্ট্রারের নিয়োগ সার্ভিস-কমিশনের হাতে থাকিবে না; তবে মিষ্টার মল্লিক আশা দিয়াছেন যে, সরকার ভাল লোককেই ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন, বিলখানি আইন হইলে তাহা যে ভাল হইবে, তাহা তাঁহাদের মনে হইতেছে না। অল্প দিন পরেই ফলাফল সব বুঝা যাইবে।

বাজারে পণ্যবিক্রয়-নিয়ন্ত্রণ বিল

কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকার বাজারে কৃষিজ পণ্য বিক্রয় করিবার জন্য এক আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়া একেবারেই বাঁধা-ভোটের জোরে তাহা সিলেক্ট কমিটীর হাতে দিয়াছিলেন। বিলখানিতে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে সিলেক্ট কমিটীর সকল সদস্য একমত হইতে পারেন নাই। বিলখানির উদ্দেশ্য সাধারণ দৃষ্টিতে ভাল দেখাইলেও উহার ত্রুটি অনেক। সিলেক্ট কমিটীর সদস্যদিগের মধ্যে মিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মিষ্টার প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মিষ্টার ঈশ্বরচন্দ্র মাল এবং মিষ্টার ক্ষেত্রনাথ সিংহ এই বিলখানিতে বিশেষ আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহাদের আপত্তি এই যে, কৃষিজ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় একই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে। সকল দেশেই উহা ভিন্ন আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হয়। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত পণ্যই এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে। প্রথমে পাট, ধান প্রভৃতি বিশিষ্ট পণ্য, ক্রয়-বিক্রয়ের আমলে আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। মার্কেট কমিটী কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। ঐ কমিটী যদি ঠিক-মত কাজ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাতে খরচা অধিক পড়িবে, বিক্রেতাদিগের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ফী আদায় করিয়া সেই খরচ নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কমিটীর সদস্য-নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা থাকিলে ঘোর অসুবিধা ঘটিবে। —ইঁহাদের কথা যুক্তিসঙ্গত হইলেও টিকিবে না। এইভাবে আইনটি পাশ হইলে সাধারণ বিক্রেতাদিগের পক্ষে হাটে সামান্য পণ্য বিক্রয় করা কঠিন ও ব্যয়বহুল হইবে। স্থানে স্থানে সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষে হাটে-বাজারে পণ্য বিক্রয় করা কঠিন হইবে বলিয়াও কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন। হাটে পণ্য বেচিতে গেলে বিক্রেতাদিগকে যে ফী দিতে হইবে—তাহাতে 'ঢাকের কড়িতে মনসা বিক্রয়ের' আশঙ্কা নাই কি?

—

দোকান-কর্ম্মচারী আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে দুই দিন আলোচনার পর গত ২৬শে ভাদ্র দোকান-কর্ম্মচারী আইনের পাণ্ডুলিপিখানি গৃহীত হইয়াছে। এখন বড়লাটের মঞ্জুরী পাইলেই ইহা পাকা আইনে পরিণত হইবে। আইনটি নূতন ধরণের! যাহা হউক, দোকান কতক্ষণ খোলা-রাখা হইবে, তাহা স্থানীয় লোকদিগের প্রয়োজনের উপরেই নির্ভর করে। পল্লী-অঞ্চলে দোকানগুলির উপর এই আইন জারি করিতে গেলে নানা অসুবিধা ঘটিতে পারে। দোকানের কর্ম্মচারীদিগের ছুটির পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেই যে কর্ম্মচারীরা তাহা পাইবে, এরূপ মনে করিবার কারণ কি?

—

সিন্ধুর অরাজকতা

সিন্ধুদেশ সিন্ধুনদীর শেষ অংশে অবস্থিত। উহা বৃটিশ সরকারের অধিকারভুক্ত হইয়া প্রায় এক শতাব্দী বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল; সুতরাং বোম্বাই সরকারের হস্তেই উহার শাসনভার ন্যস্ত ছিল। গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল (বিশ্ব-বেকুবের দিন?) হইতে সরকার অনেক বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইয়া উহাকে মুসলমান-প্রধান প্রদেশে পরিণত করিয়াছেন, এবং সেই ভাবেই উহার শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। এই প্রদেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় বার আনা (অর্থাৎ শতকরা ৭৩ জন) মুসলমান, অবশিষ্ট সিকি হিন্দু। এই প্রদেশের অধিবাসী মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ২৮ লক্ষ, হিন্দুর সংখ্যা ১০ লক্ষ। মস্লিম লীগের আব্দার অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া সরকার এই প্রদেশটিকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা তথায় সংখ্যাল্প সম্প্রদায় বলিয়া তাহাদের 'বাঁধামা'র খাইবার সুবিধা হইয়াছে—চমৎকার! তাহাদের বিরুদ্ধে সংখ্যাধিক ভোট একেবারে বাঁধা আছে। এখন সাম্প্রদায়িকতার হাঙ্গামার আতিশয্যে হিন্দুর সেখানে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিয়াছে, এবং 'খেদাইব না, উঠান চষিব'—এই নীতির কার্য্যকারিতা লক্ষিত হইতেছে।

সম্প্রতি গান্ধীজী তাঁহার 'হরিজন-পত্রে' এই প্রদেশ সম্বন্ধে যে তথ্য ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়! দস্যু, তস্কর ও পরধন-লুণ্ঠকদিগের উপদ্রবে এক একটা জিলার শত শত গ্রাম হইতে সংখ্যাল্প হিন্দুরা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অসহায় অবস্থায় অন্যত্র পলায়ন করিতেছে। দুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি লিখিয়াছেন, ঐ প্রদেশের পল্লীজীবন বিধ্বস্ত হইয়াছে, পল্লীবাসী হিন্দুরা স্ব স্ব বাস-গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের চাষের প্রধান উপাদান গো-মহিষাদি সমস্তই হাতছাড়া হইয়াছে। কোন গ্রামে একটিমাত্র হিন্দু-পরিবারের বাস; কোন কোন গ্রামে তাহাও নাই! সেই জন্য গান্ধীজী বলিয়াছেন, ভারত সরকারের এই ব্যাপার নিরপেক্ষভাবে (?) দেখা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এইরূপ অরাজকতা কেবল সিন্ধু প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না; ভারতের অন্যান্য অংশেও উহা বিস্তৃতি লাভ করিবে। ইহাও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বেলুচিস্থান হইতে মুসলমান গুণ্ডারা ঐ অঞ্চলে আসিয়া হিন্দুদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। প্রাদেশিক সরকার কার্য্যতঃ শাসন-কার্য্যে শক্তিহীনতা প্রকটিত করিতেছেন। আর ভারত সরকার দারুব্রহ্মের ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিয়া উদাসীন দৃষ্টিতে এই

ব্যাপার সন্দর্শন করিতেছেন! সিন্ধুকে কি পাকিস্থানে পরিণত করা হইতেছে?

সিন্ধুর গবর্ণর বলিয়াছিলেন—তিনি ঐ প্রদেশের হিন্দুদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সার ল্যান্সলট গ্রেহামের কি সে কথা স্মরণ আছে? অথবা বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িকতার আবর্ত্তে পড়িয়া তিনিও কি ভাবিতেছেন, 'ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারুক, দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে?' সম্প্রতি করাচী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সিন্ধুর এই অনাচার-সম্পর্কে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ষড়যন্ত্রকারীদিগের উদ্দেশ্য না কি হিন্দু নেতৃবর্গকে ইহলোক হইতে অপসারণ! এতদ্ভিন্ন, এ সংবাদও আসিয়াছে যে, বারচণ্ডির এক ফকিরের কতকগুলা চেলাকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে অনেক সাংঘাতিক অস্ত্র-শস্ত্রেরও সন্ধান মিলিয়াছে। এক জন খাকসারের বাড়ীতে একটা কলের কামানও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্যাপার যে উদ্বেগজনক ও অশান্তিবর্দ্ধক, এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে কি? যখন ষড়যন্ত্রের সন্ধান মিলিয়াছে, তখন এ আশা অসঙ্গত নহে যে, এ সম্বন্ধে আরও তথ্য প্রকাশ পাইবে। দেশবাসীরা সেই সকল তথ্য প্রকাশের প্রতীক্ষা করিতেছে। বাঙ্গালাতেও খাকসার আছে। ইহাদের শক্তির মূলকেন্দ্র কোথায়?

গণতন্ত্রবাদের অর্থ

মাদ্রাজের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের একখানি সংবাদপত্র ডেমক্রেসীর অর্থাৎ গণতন্ত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহার অর্থ অনেকেই জানেন না। মাদ্রাজের ঐ সংবাদপত্রখানি যথার্থই বলিয়াছেন যে, "গণতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফলেই ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। ডেমক্রেসী শব্দের অর্থ—সংখ্যাধিক দলের স্বৈরশাসন হইতে পারে না। ডেমক্রেসী অর্থে লোক সংখ্যাধিক দলের স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ শাসন,—ইহাই বুঝে বলিয়া আজ বাঙ্গালায়, সিন্ধুতে, এবং পঞ্চনদে অমুসলমান সম্প্রদায়ের দারুণ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসওয়ালা মন্ত্রিমণ্ডলী খুব সাবধানতার সহিত চলিয়াছিলেন বলিয়া অন্য সমাজের সেরূপ দুর্গতি হয় নাই। কিন্তু কংগ্রেসী দল যদি সাম্প্রদায়িকতা-ভাবিত হইত, তাহা হইলে তাহাও হইতে পারিত। সংখ্যাধিক সম্প্রদায় যদি সাম্প্রদায়িক ভাবে অতি-প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের স্বৈরিতা ব্যক্তি-স্বৈরিতার ভীষণতাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। সংখ্যায় যাহারা অধিক, তাহাদিগের হস্তেই ভোট দিবার অযথা ক্ষমতা দিলে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের উপর তাহাদের অত্যাচার অতি ভীষণ হইয়া থাকে,—তাহারা কর ধার্য্য করে—লুণ্ঠনের জন্য; এবং ব্যয় ও বিধি প্রণয়ন করে আপনাদের স্বার্থসাধনের জন্য। ইংরেজরা যে তাহা বুঝে না, তাহা নহে। দেশে যে সম্প্রদায়ের স্বার্থ যেরূপ নিহিত আছে, তাহা অপেক্ষা কোন সম্প্রদায়ের লোককে যদি অধিক মাত্রায় ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই সম্প্রদায়ের হস্তে লুণ্ঠন করিবার অস্ত্র হিসাবে করধার্য্য করিবার, এবং লাভের উৎসরূপে ব্যয় করিবার ও বিধি-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া থাকে।" কোন ইংরেজ সাংবাদিকের এই অভিমত সম্পূর্ণ সত্য। গণতন্ত্রের বিকার ঘটিলে তাহা যে ব্যক্তিগত শাসন অপেক্ষা ভীষণ হয়, তাহার পরিচয় অনেক স্থলেই পাওয়া যাইতেছে।

হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত

গত ৯ই আশ্বিন রাত্রিতে হলওয়েল মনুমেণ্ট সেণ্ট জন গির্জ্জায় অপসারিত হইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া উহার বিভিন্ন অংশ সেণ্ট জন গির্জ্জায় প্রেরিত হইয়াছে; ৯ই রাত্রিতে শেষ অংশও লোকচক্ষুর অন্তরালে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য মনুমেণ্টের চতুর্দ্দিকে যে টিনের বেড়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া-ফেলিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই ঐ স্থান দিয়া যানবাহন চলাচল করিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

পরলোকগত সূর্য্যকুমার সোম

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ময়মনসিংহের অলঙ্কার, বাঙ্গালার জননায়কগণের অন্যতম সূর্য্যকুমার সোম দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর সম্প্রতি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল; তাঁহার জীবনের সহিত বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত ছিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর তাহা চিরদিন স্মরণ থাকিবে; এ-বিষয়ে স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার আদর্শ ছিলেন, এবং দেশের সেবায় তিনি দেশবন্ধুর সহকর্ম্মী ছিলেন। তাহার গুণবতী সহধর্ম্মিণীও স্বদেশের জন্য তাঁহার ন্যায় বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। দেশের জন্য সূর্য্য বাবু একাধিক বার কারাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশানুরাগ এবং স্বজাতির প্রতি প্রীতি—তাঁহার দেশবাসীর চিত্তে চির-জাগরুক থাকিবে। দীর্ঘকালেও তাহার অভাব পূর্ণ হইবে না। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন।

পরলোকে ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

কবিবর রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে যে কয়েক জন সুকবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। ইনি টাকী রায় চৌধুরী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সংপ্রতি ৬৮ বৎসর বয়সে ভুজঙ্গধর বাবু পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন শুনিয়া আমরা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম। ভুজঙ্গধর বাবু উকিল ছিলেন; কিন্তু তিনি বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি কয়েকখানি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে-কালে অনেক মাসিক পত্রিকায় তাঁহার রচিত কবিতা প্রকাশিত হইয়া পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জন করিত। তিনি গীতা ও উপনিষদের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন; অনুবাদ হইলেও তাহা সুপাঠ্য। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—য়ুরোপে মহাপ্রলয় জন্য—কাগজ—কালী—ব্লকের সরঞ্জামের মূল্য তিনগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ণ একটি বৎসর আমরা এই ক্ষতি স্বীকার করিয়া সংসাহিত্যানুরাগী 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহকগণের চিত্তবিনোদন করিয়াছি? কিন্তু দীর্ঘকাল এই বর্দ্ধিত ব্যয়ভার বহন করা সম্ভবপর নহে। এ জন্য 'মাসিক বসুমতী'র মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করা অনিবার্য্য। যাঁহারা নগদ মূল্যে প্রতি-মাসের 'মাসিক বসুমতী' ক্রয় করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আশ্বিন-সংখ্যা হইতে প্রতি-সংখ্যা ॥৶০ দশ আনা মূল্যে ক্রয় করিবেন। নূতন ও পুরাতন গ্রাহক মহোদয়গণ অনুগ্রহ করিয়া অতঃপর বার্ষিক মূল্য ৭॥০ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক মূল্য ৩৸০ আনা অগ্রিম পাঠাইলে বাধিত হইব।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের প্রতি নিবেদন—কাগজের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধির জন্য 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মুদ্রণ-ব্যয়ও তিনগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। দৈনিক—সাপ্তাহিক পত্রিকার মত 'মাসিক বসুমতী'র এক পৃষ্ঠায় সংবাদ ও অপর পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। 'মাসিক বসুমতী'র সমধিক প্রচার এবং কাগজের মূল্য তিনগুণ বৃদ্ধির কথা স্বীকার করিয়াও অনেকে পুরাতন বিজ্ঞাপনদাতা বলিয়া পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত দরেই 'মাসিক বসুমতী'তে বিজ্ঞাপন প্রকাশের দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু আমরা বহুকাল যাবৎ সুপ্রসিদ্ধ কাগজ-ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে প্রতি বৎসর সেজন্য বহু সহস্র টাকার কাগজ ক্রয় করিয়া আসিতেছি—আমরা ত' পূর্ব্ব-মূল্যে বা কম মূল্যে কাগজ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। তবে তাঁহারা নির্দ্ধারিত মূল্যের কমে বিজ্ঞাপন মুদ্রণ-প্রকাশের আশা করিবেন কেন? অতঃপর 'মাসিক বসুমতী'তে কোন বিজ্ঞাপনই নির্দ্ধারিত মূল্যের কমে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবে না। বিজ্ঞাপনের মূল্যও অগ্রিম দেয়। 'মাসিক বসুমতী'র প্রচারের তুলনায় বিজ্ঞাপনের হার নিতান্তই সুলভ; এ অবস্থায় বিজ্ঞাপনের হার কমাইবার জন্য অনুরোধ না করিলেই বাধিত হইব।

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।